ষাণ্মাসিক

মাসিক বসুমতীর সূচীপত্র

৪৭ বর্ষ] ১৩৭৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত [১ম খণ্ড

বিবিধ-বিষয়ক রচনা—

বাঙলার নির্য্যাতিত, বাস্তুচ্যুত অমর কবি

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

• • • কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক • • •

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার মহত্তম সৃষ্টি চণ্ডীর কাহিনী—বাঙলার জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। রোমাণ্টিক সাহিত্য-সাধনার অগ্রদূত এবং বেদনাক্লিষ্ট বাঙলার প্রতিনিধি কবি মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত দুঃখ তাঁহার কাব্যে সর্বজনের দুঃখে রূপান্তরিত।

— বর্তমান গ্রন্থে আছে —

১। মূল কাব্য, ২। কবির জীবনী, ৩। কাব্য-পরিচিতি, ৪। কবিকঙ্কণে যুগের বঙ্গভাষা (বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৫। কাব্য সমালোচনা, ৬। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ, ৭। বর্তমান পাঠক্রম অনুযায়ী অধ্যাপক ডক্টর বিজিতকুমার দত্ত লিখিত সুবৃহৎ ভূমিকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০৮। বোর্ড বাঁধাই [illegible] রায় অঙ্কিত সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট।

মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্ত কবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিত পাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবন-সর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতীর অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত। মূল্য—প্রতি খণ্ড তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

পাখার জগতে মার্কনীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন

একখানা মার্কনী পাখা পৃথিবীর যত লোককে আনন্দ দিয়েছে আর কোন পাখাই তত দেয়নি

আপনার [illegible] ও গর্বের বস্তু
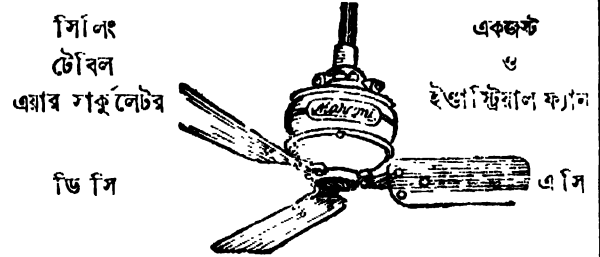
মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পোঃ প্রাঃ লিঃ

১[illegible], কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ; ফোন : [illegible]-[illegible]০৪৮

ডিলারগণ :—

১। পি চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ৫৩, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ; ২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং, ১৫/১-বি, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ; ৩। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ষ্টোরস, ১৬[illegible] ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ; ৪। ইকুইটেবল ট্রেডিং কোং লিঃ, [illegible], ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ; ৫। ক্যালকাটা রেডিও সার্ভিস প্রাঃ লিঃ, [illegible], গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ ; ৬। ট্রেডার্স ব্যুরো, ১২, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৪ ; ৭। ব্যানার্জী ইলেকট্রিক্যালস, [illegible] বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ ; ৮। ইষ্টার্ণ সাপ্লাইং এজেন্সী, ৭২ [illegible], বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ ; ৯। তরফদার মজুমদার এণ্ড কোং, [illegible], বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ ; ১০। এলাইট সার্ভিস এজেন্সী, ৫০, লিণ্টন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪ ; ১১। পি বি সরকার এণ্ড সন, ২৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২০

সহজ মাসিক কিস্তিতেও পাওয়া যায়

এ
কু
চো
তুল
দো
ডক্টঃ
দাড়ি
পরি
পতি
পৌর
বৌদ্ধ
বাইজী
বহুরূ
নিশরে
লাইট
স্টেটব
জীবন
উপেন্দ্র
কলিং
লাঠিয়া বাব।

নিঝুম রাতের প্রহরী

সারস পাখী

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পঞ্চ তন্মাত্র

সূক্ষ্ম আকাশের 'শব্দ'-গুণ। ঐ গুণে স্পর্শগুণ যোগ হলে ক্ষ্ম বায়ুতে পরিণত হয়। আবার সূক্ষ্ম 'বায়ু'তে রূপগুণ যোগ লে সূক্ষ্ম রূপে, সূক্ষ্ম 'রূপে' 'রস'-গুণ যোগ হলে ক্ষ্ম 'জলে' এবং সূক্ষ্ম 'জলে' 'গন্ধ'-গুণ যোগে ক্ষ্ম 'ক্ষিতি'-তে পরিণত হয়। সুতরাং 'ক্ষিতি'তে পাঁচটি ণই বর্তমান। সূক্ষ্ম আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রে প্রধানভাবে রের সারণীতে লিখিত গুণগুলি থাকে। এই পঞ্চ তন্মাত্র বিংশতি তত্ত্বের চতুর্থ থেকে অষ্টম তত্ত্ব।

পঞ্চতপা

পঞ্চতপা হচ্ছে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থেকে তপস্যা; অর্থাৎ চারিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করে সূর্যের নিম্নে তপঃ সাধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"রাজসিক সাধনে নানা রকম প্রক্রিয়া—এতবার রশ্চরণ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা রতে হবে,— এরকম সব।"

পঞ্চপ্রাণ

পঞ্চপ্রাণ হচ্ছে পঞ্চ বায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও মান—এই পঞ্চ।

(১) প্রাণ বায়ু—নাসাগ্রসঞ্চারী অগ্রনিঃসরণ-স্বভাব বায়ু। হার স্থিতি অনাহত কেন্দ্রে। এই প্রাণ বায়ুই অন্নময় কোষ প্রাণময় কোষের মধ্যে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে সংযোগক্ষা করে। আহার্য বস্তুকে উদর মধ্যে নেওয়া এই প্রাণেরই র্য; নাভির ঊর্ধ্বস্থ অঙ্গের প্রায় সকল ক্রিয়াই ইহা দ্বারা স্পন্ন হয়।

(২) অপান বায়ু—অধোগমনশীল এবং পায়ু (মলদ্বার) প্রভৃতি ভির নিম্নস্থ অঙ্গসঞ্চারী বায়ুর নাম অপান বায়ু। ইহা াধারণত মল, মূত্র, শুক্র, শোণিতাদি নিম্নমুখে প্রবাহিত বা হির্গত করে।

(৩) ব্যান বায়ু—ইহা সর্বনাড়ী সঞ্চারী ও সমস্ত শরীর ব্যাপী বায়ু দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত থেকে রস ও রক্তাদির চালনা এবং র্ম-নিঃসরণাদি কার্য করে।

(৪) উদান বায়ু—ইহা ঊর্ধ্বগতি-স্বভাব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বৃদ্ধিকারক; আবার ইহাই ভাষা, বাক্য, ও সঙ্গীতাদির স্ফুরক বং কণ্ঠ থেকে বহির্মুখী শব্দ উচ্চারক। ইহাকে উৎক্রমণ বায়ুও লে। ইনিই অন্যান্য বায়ু ও ইন্দ্রিয়গণের সূক্ষ্ম শরীররূপে

(৫) সমান বায়ু—ইহাই ভুক্ত দ্রব্যের সমীকরণকারী (অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক এবং রস-রক্তাদিরূপে যথাযথ বিভাগকারী) বায়ু। এই বায়ু প্রাণ এবং অপান বায়ুর মিলনকেন্দ্র নাভিস্থলে অবস্থান করে ঐ দুই বায়ুর কার্যের সমতা রক্ষা করে। ইহাই ভুক্ত দ্রব্যকে তিনটি ভাগে পরিণত করে; স্থূল অংশ পুরীষাদিরূপে, মধ্যম অংশ মাংসাদিরূপে এবং সূক্ষ্ম অংশ মনরূপে গঠিত ও পরিবর্ধিত হয়।

ইহা ছাড়া নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে আরও পাঁচ প্রকার বায়ু আছে। 'নাগ' বায়ুর কার্য উন্মীলন, সংকোচন আদি—যেমন চোখ খোলা, বন্ধ করা; কৃকরের কার্য ক্ষুধা, তৃষ্ণাদি; দেবদত্তের কার্য জৃম্ভন (হাই তোলা), নিদ্রা, তন্দ্রাদি; ধনঞ্জয়ের কার্য হিক্কা ও পুষ্টি ইত্যাদি। কোন কোন আচার্যের মতে নাগাদি বায়ু পূর্বোক্ত প্রাণাদি বায়ুরই অন্তর্গত।

সোজা কথায় হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্বাঙ্গে ব্যান বায়ুর অধিষ্ঠান। এই বায়ুগুলির স্বাভাবিক নিয়মিত ক্রিয়াই শরীরকে নীরোগ রাখে এবং পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত করে, পরমায়ু বৃদ্ধি করে। এরা বিকৃত হলেই নানাবিধ রোগ, জরা, বার্ধক্য এবং পরে ধ্বংস আসে।

তাই ব্রাহ্মণগণ ভোজনের আরম্ভে এই পঞ্চ প্রাণকে নিবেদনরূপ আহুতি দিয়ে ভোজনক্রিয়া আরম্ভ করেন; আবার এই বিকৃতি নিবারণের জন্যই প্রাণায়াম বিহিত হয়েছে।

পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে

শ্রীরামকৃষ্ণ—"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয় —সেই ক্ষুধাতৃষ্ণা, রোগ, শোক, ভয়—সবই ঠিক মানুষের মত। মহামায়ার ভুবনমোহিনী মায়ায় তিনিও মুগ্ধ হন; তবে একটি কথা আছে—অবতারাদি ঈশ্বর কোটি, তাঁরা ইচ্ছে করে চোখে কাপড় বাঁধেন, আর মনে করলেই মুক্ত হতে পারেন। দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কেঁদেছিলেন। পুরাণে আছে, হিরণ্যাক্ষ বধের পর বরাহ অবতার নাকি ছানাপোনা নিয়ে ছিলেন —তাদের মাই দিচ্ছিলেন; স্বধামে যাবার নামটি নাই। শেষে শিব এসে ত্রিশূল দিয়ে শরীর নাশ করলে তখন হেসে স্বধামে গেলেন। তাই বলে—'পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে', কিনা, যখন তিনি নরলীলার জন্য পঞ্চভূত অবলম্বনে স্থূল দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন, তখন মহামায়ার সব বন্ধনই তাঁকে মেনে নিতে হয়। তাই

পঞ্চ ম-কার সাধন

পঞ্চ 'ম'-কার সাধন হচ্ছে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চ-তত্ত্বের বা 'ম'-কার পঞ্চকের সাধনা। এই তত্ত্বগুলিকে দিব্যভাব, বীরভাব এবং পশুভাব অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক এই তিনভাবে সাধন করা যায়। সাধকের অধিকারভেদে এবং উপদেষ্টা গুরুর সাধনাপ্রাপ্ত জ্ঞানের উৎকর্ষের উপর সাধকের সাধনার ভাব সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পূর্ণজ্ঞানী সাধক-গুরু অতি বিরল। তাই অধিকাংশ স্থলেই সাধনাহীন অজ্ঞান গুরুর আশ্রয়ে পঞ্চ 'ম'-কার সাধনার কুৎসিত ফল প্রায়ই দেখা যায়। সেজন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চ ম-কার সাধনা নিষেধ করতেন। তিনি স্ত্রীজাতিকে—এমন কি বেশ্যাকে পর্যন্ত 'মা' বলে জানতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"অচলানন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতো; খুব কারণ করতো। আমার সন্তানভাব শুনে শেষে জিদ্,—জিদ্ করে বলতে লাগলো—'স্ত্রীলোক লয়ে বীরভাব সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে—বীর ভাবেরও সাধন আছে।'

"আমি বললাম,—কে জানে বাপু, আমার ওসব কিছুই ভাল লাগে না—আমার সন্তান ভাব।

"সিদ্ধাই-এর জন্য লোক পঞ্চ-'ম'-কার সাধন করে। কিন্তু উঃ কি হীনবুদ্ধি!"

পঞ্চযজ্ঞ

বেদ, সংহিতা ও পুরাণাদিতে পঞ্চযজ্ঞের কথা বর্ণিত আছে। গৃহস্থমাত্রেরই শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য এই পঞ্চ যজ্ঞ করা কর্তব্য। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞ। মনু বলেন—

অধ্যাপনং ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পিতৃ যজ্ঞেশ্চ তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

অর্থাৎ—(১) অধ্যয়ন ও অধ্যাপন অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের নিত্য পঠন-পাঠনকেই ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হয়। ইহাকে ঋষিযজ্ঞও বলে। শব্দব্রহ্ম সাধনই ঋষিযজ্ঞ।

(২) পিতৃগণের নিত্যশ্রাদ্ধ বা তর্পণই পিতৃযজ্ঞ।

(৩) অগ্নি হোত্রাদি হোম ও সূর্য চন্দ্রের জ্যোতিঃ স্মরণকে দেবযজ্ঞ বলে। দেবোদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি প্রদান এবং তাঁদের প্রীতির জন্য দ্রব্য ত্যাগ।

(৪) নিত্য অতিথি অভ্যাগতের বা দীন দরিদ্রের সেবাই নৃযজ্ঞ।

(৫) জীব (ভূত) মাত্রের বলি অর্থাৎ আহার্য বস্তু প্রদানরূপে জীবসেবাই ভূতযজ্ঞ।

পঞ্চযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—গৃহস্থেরা সকলেই নিত্য পঞ্চসূনা বা পঞ্চ পাপকার্যে লিপ্ত হয়; উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তা থেকে মুক্তিলাভ ও আত্মোন্নতি হয়। গৃহস্থের গৃহের পাঁচটি বধস্থান আছে—যথা উনুন, শিল-নোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকির গড় (অথবা উদূখল-মুষল) এবং জলের কলসি। এই পাঁচটিই গৃহস্থের পঞ্চসূনা।

পিতৃযজ্ঞ দ্বারা বায়ুতত্ত্বের নায়ক দেবপিতৃগণের ঋণ শোধ হয়। দেবযজ্ঞ দ্বারা তেজস্তত্ত্বের ঋণ, নৃযজ্ঞ দ্বারা ভাবময় অপ্তত্ত্বের ঋণ এবং ভূতযজ্ঞ দ্বারা স্থূল পৃথিবীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ঋণ শোধ হয়।

পঞ্চীকরণ

ঈশ্বর জীবের ভোগায়তন দেহ ও ভোগ্য পদার্থসমূহ সৃষ্টি করার জন্য আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের তামসাংশ থেকে পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূল ভূতসমূহ উৎপন্ন করেন। আকাশ তন্মাত্রের আট আনা ভাগ (অর্ধাংশ) ও অন্য চারিটি তন্মাত্রের প্রত্যেকের দু' আনা ভাগ (অষ্টমাংশ) মিশিয়ে স্থূল বা পঞ্চীকৃত আকাশ উৎপন্ন হয়। এইরূপে স্থূল বায়ু, স্থূল তেজ, স্থূল জল এবং স্থূল ক্ষিতিও তৈরী হয়। বিভিন্ন মাত্রায় (পূর্বোক্ত হিসাবে) পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূতের মিশ্রণে স্থূল ভূত উৎপাদনই পঞ্চীকরণ। এই পঞ্চীকরণের দ্বারা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত বা স্থূল হয়ে জীবের ব্যবহারের যোগ্য হয়।

পরকাল (পরলোক) ও পুনর্জন্ম

পরকাল হচ্ছে জীবাত্মার পরজন্ম। বর্তমান জন্মে কৃত কর্ম ও সঞ্চিত সংস্কারাদি নিয়ে জীবাত্মা পরজন্ম সুরু করে। পরকাল আর পরলোক একই জিনিষ—কেবল কথার হেরফের। পুনর্জন্মও তাই। পুনর্জন্ম হয়ে পরলোকে অবস্থানই পরকাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না—পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়—ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়, পুনর্জন্ম হয়—কোনোমতে নিস্তার নাই; ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞান লাভ হলে—ঈশ্বর দর্শন হলে, মুক্তি হয়ে যায়—আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না।

"সিধোনো ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না সে সংসার করতে পারে না। তার তো কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি নাই! সিধোনো ধান ক্ষেতে পুঁতলে কি হবে?

"যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে অমৃত-ফল লাভ করেছে তার পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্যলোক বল, চন্দ্রলোক—কোনও জায়গায় তার আসতে হয় না।

"আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। কেশব জিজ্ঞাসা করলে—মহাশয়, পরকাল কি আছে? আমি বললাম—'কুমোর হাঁড়ি শুকোতে দেয়। তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়িও আছে? কখনো গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে সেগুলি কুমোর আবার ঘরে আনে, এনে জল দিয়ে মেখে, আবার চাকে দিয়ে নতুন হাঁড়ি করে, ছাড়ে না। তাই বলি, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে কুমোর ছাড়বে না; যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে—ছাড়বে না; অর্থাৎ ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, নিস্তার নাই। তাঁকে লাভ করলে তবে মুক্তি হয়, তবে কুমোর ছাড়ে, কেন না, তার দ্বারা মায়ার সৃষ্টি কোন কাজ হয় না। জ্ঞানী মায়াকে পার হয়ে গেছে। সে তো মায়ার সংসারে কি করবে!

"তবে যাকে তিনি লোকশিক্ষার জন্য মায়ার সংসারে রেখে দেন—সে সব জ্ঞানী বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকেন। তাঁর কাজের জন্য তিনিই তাদের রেখে দেন—যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য।

"আর পরলোক আছে কিনা, সে হিসাবে তোমার দরকার কি?—পরলোক আছে কি না—তাতে কি হয়—এ সব খবর?

"তুমি আম খাও না! আম প্রয়োজন—তাঁতে ভক্তি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়—তবে ফল তরুর মূলে পড়ে—কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি ফল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। 'কালী কল্পতরু মূলেরে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি'।"

পরমহংস

শ্রীরামকৃষ্ণ—"পরমহংস কাকে বলি?—যিনি হাঁসের মত দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন—বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও পিঁপড়ের মত বালি ছেড়ে চিনিটুকু নিতে পারেন, অর্থাৎ বিদ্যা অবিদ্যা মিশ্রিত মায়ার সংসারে যিনি অবিদ্যা ছেড়ে গ্রহণ করতে পারেন তিনিই পরমহংস।

"বেদান্তমতে সিদ্ধকে বলে পরমহংস।

"পরমহংস তিন গুণের অতীত। তার ভিতর তিন গুণ আছে, আবার নাই। ঠিক বালক, কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেদের পরমহংসরা কাছে আসতে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে।

"পরমহংস সঞ্চয় করতে পারে না।

"পরমহংস দুই প্রকার—জ্ঞানী পরমহংস, আর প্রেমী পরমহংস—নিরাকারবাদী আর সাকারবাদী। নিরাকারবাদী জ্ঞানী যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। এঁরা আপ্তসারা—নিজের হলেই হল।

"পরমহংস যারা সাকারবাদী—প্রেমী তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হল, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি করছে। এরা যে সব সাধনা করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য। যেমন কেউ আছে, কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি-কোদাল ফেলে দেয়—আবার কেউ তুলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে।

"কেউ আম লুকিয়ে খেয়ে মুখ পুঁছে। কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায়—লোকশিক্ষার জন্য, আর তাকে আস্বাদন করার জন্য। 'চিনি খেতে ভালবাসি'।

পরমহংসের মুখের টক রস

শ্রীরামকৃষ্ণ—"হাঁসেরই শক্তি আছে দুধকে জল থেকে তফাৎ করা। হাঁসের জিহ্বাতে একরকম টক রস আছে, সেই রসের দ্বারা দুধ আলাদা জল আলাদা হয়ে যায়; তাই দুধে জলে মিশে থাকলে হাঁস শুধু দুধটুকু টেনে নিতে পারে। পরমহংসের মুখেও সেই টকরস আছে—সেটি হচ্ছে প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তি থাকলেই নিত্য-অনিত্য-বিবেক হয়। ঈশ্বরের অনুভূতি হয়,

পরমাত্মা

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে আত্মার ত্রিবিধ মূর্তির বিবরণ আছে। ভোগময় পুরুষের নাম ক্ষরপুরুষ (ক্ষর আত্মা বা জীবাত্মা)। এইরূপ বহু ক্ষরপুরুষ (প্রত্যেক কূটস্থ নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মের অংশস্বরূপ) বা অপ্রকাশ বদ্ধ জীবাত্মার সমষ্টিই হচ্ছে অক্ষর পুরুষ। এই কূটস্থ অক্ষর তত্ত্বে ক্ষরত্ব থেকে বিমুক্ত আত্মত্বের ভাবটি পরিস্ফুট। অথচ ক্ষরপুরুষ ওঁর থেকেই জাত এবং উনিই ক্ষরত্বের আশ্রয়। কিন্তু এখানে ঈশ্বরীয় মহিমা নাই; একমাত্র অক্ষরত্বই এঁর বৈশিষ্ট্য। তবেই হল,—ক্ষর পুরুষসমূহের সমষ্টিভূত একাত্ম-প্রত্যয়ই অক্ষর পুরুষ। আর এই ক্ষর ও অক্ষর থেকে ভিন্ন আর এক উত্তমপুরুষ আছেন—ক্ষর ও অক্ষর এই উভয়ই যাঁর মহিমা। সংসার-মায়াবৃক্ষ অশ্বত্থের সম্বন্ধযুক্ত ক্ষর পুরুষ, আর সংসার-বৃক্ষ-বীজভূত মায়াধীশ অক্ষর পুরুষ—এই উভয়ের থেকে উত্তম যিনি—এই উভয়ের যিনি ঊর্ধ্বে—তিনিই পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা। গীতা বলেন—

ক্ষরত্ব বদ্ধ পুরুষের লক্ষণ, অক্ষরত্ব মুক্ত পুরুষের লক্ষণ, আর পুরুষোত্তমের উপলব্ধিই কৈবল্য—পরমাত্মাতে লীন হওয়া।

পরমাত্মাই সকল আত্মার ও বিশ্বের মূল উপাদান ও নিয়ন্তা। পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয় তাঁহারই দ্বিবিধ প্রকাশ। পরমেশ্বর ভাবে নির্গুণ আত্মপ্রকাশ তাঁর পরাভাব, আর তাঁর জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি-রূপে যে ভিন্ন ভাব তাই অপরাপ্রকৃতি। এই দুই মহিমাই তাঁকে ধারণা করবার উপায়স্বরূপ। এই মহিমাদ্বয়ের একত্বে পর্যবসানই তাঁর অনির্বচনীয়তা। ইনিই কূটস্থ আত্মা ও অপরা প্রকৃতিরূপে—পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে—বিশ্বলীলায় বিশ্ব প্রকটনে সদা নিযুক্ত। কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত।

তিনিই একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বরাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তাই দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি বহুভাবে তিনি উপাসিত। ঈশ্বর, আত্মা, অপরা প্রকৃতি—এ সবই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মার নাম-রূপ-ক্রিয়াময় বিলাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বেদান্ত-বিচারে সংসার মায়াময়,—স্বপ্নের মত সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষীস্বরূপ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষীস্বরূপ। স্বপ্নও যেমন সত্য জাগরণও তেমনি সত্য।

"একটি চাষা ছিল; ভারী জ্ঞানী, ধার্মিক, অনেক দিন পরে একটি ছেলে হয়েছে; বাপমার নয়নের মণি। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ করছে, একজন এসে খবর দিলে ছেলেটির কলেরা হয়েছে। চাষা বাড়ী গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে, কিন্তু ছেলেটি বাঁচলো না। তার পরদিন আবার চাষ করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, পরিবার তখনো কাঁদছে। তাকে দেখে পরিবার বললে—'ও গো, তুমি কি নিষ্ঠুর! ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না?'

চাষা তাকে বললো—'কেন কাঁদছি না জানো? আমি কাল স্বপ্ন দেখেছিলুম যে রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। ছেলেগুলো রূপে গুণে সুন্দর—বিদ্যা, ধর্ম, উপার্জনে রত।'

সেই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। এখন ভাবছি যে তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদবো, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদবো?'

"জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগ্রত অবস্থাও তাই। চাষা জ্ঞানী; সেও তাই দেখাচ্ছিল; সে জানে এক নিত্যবস্তু সেই পরমাত্মা।

"আমি সবই লই। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়,—সব অবস্থাই লই। ব্রহ্ম, আবার মায়া, জীব, জগৎ—আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।"

পাকা আমি

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তাঁকে দর্শন করার পর তিনি যে 'আমি' রেখে দেন, তাকে বলে 'পাকা আমি'। যেমন তরবার পরশমণি ছুঁয়েছে, সোনা হয়ে গিয়েছে; তার দ্বারা আর হিংসার কাজ হয় না।

" 'কাঁচা আমি' ত্যাগ করে 'পাকা আমি' হয়ে থাকতে হয়। আমি তাঁর দাস', 'আমি তাঁর ভক্ত', 'আমি অকর্তা—তিনি কর্তা', 'আমি গুরু নই—তাঁর আদেশে-নির্দেশে শিক্ষা দিচ্ছি'—এসব ভাব 'পাকা আমি'। বালকের আমিও পাকা আমি।

"পাকা আমিতে কোনও দোষ নাই। 'আমি ঈশ্বরের সন্তান —এ রকম আমি ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। প্রহ্লাদ দুইভাবে থাকতেন—কখনো বোধ করতেন, 'তুমিই আমি, আমিই তুমি'— সোঽহং। আবার যখন অহং বুদ্ধি আসতো, তখন দেখতেন, 'আমি দাস, তুমি প্রভু'।

"এগারো 'পাকা আমি':

(১) অকর্তা (যন্ত্র) আমি;
(২) দাস আমি;
(৩) বালকের আমি;
(৪) বিদ্যার আমি;
(৫) ভক্তের আমি;
(৬) ভাল আমি;
(৭) সেবকের আমি;
(৮) সন্তান আমি।

পাকা ভক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে তখন সেই ভক্তির নাম 'পাকা ভক্তি'।

"ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। নিত্যে উঠে বিলাসের জন্য যে লীলায় থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তার পাকা ভক্তি। ভরদ্বাজাদি ঋষির 'পাকা ভক্তি'।

. "পাকা ভক্তি হলে ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। 'স্বপ্নবৎ' বলে না—বলে, তিনি সব হয়েছেন। মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানারূপ।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

এ মাসের প্রচ্ছদপট

ম্যাক্সিম গোর্কী

বিশ্ব সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে রাশিয়ার অবদান যেমনই বিরাট, তেমনই গৌরবময়। রাশিয়ার সাহিত্য জগতের বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশ্ব সাহিত্যের দিগন্তকে আলোকিত করে তোলার ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সহায়তা করে এসেছে। রাশিয়ার ইতিহাসকে এই অসাধারণ গর্ব ও গৌরবের অধিকারী যাঁরা করে তুলেছেন আপন আপন দুশ্চর সাধনার বৈশিষ্ট্যে এবং সৃজনীশক্তিতে— ম্যাক্সিম গোর্কী তাঁদেরই একজন।

সোভিয়েত সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় গোর্কী নিজে। সোভিয়েত পাঠক সমাজ তাঁর কল্যাণেই সাহিত্যের মাধ্যমে এক নতুন জগতের অকৃত্রিম আলেখ্য দেখতে একদল নতুন মানুষের চেহারা খুঁজে পেল। এক ভিন্ন জগতের সন্ধান পেল।

ম্যাক্সিম গোর্কী ইতিহাসবিখ্যাত এবং অবিস্মরণীয় নাম হলেও নামটি [illegible] অন্তরালে রেখে জীবনের প্রয়োজনীয় চিত্র এবং সমাজের শোষিত নিপীড়িত সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ রূপ নিখুঁতভাবে চিত্রিত করাই উদ্দেশ্য ছিল এ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভের।

১৮৬৮ সালে অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্বে তাঁর জন্ম। রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মলাভ তাঁর হয়নি। অতি সাধারণ শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান। শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি থেকে জীবিকার্জনের তাগিদটাই বেশী ছিল ঐ পরিবারে। শিশুকাল থেকেই দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করতে হয়েছে গোর্কীকে।

প্রতিভা ও সৃষ্টির উন্মাদনা তাঁর সহজাত। অধ্যয়নের দুর্দম পিপাসা তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথ করে দিল। সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসাবেই বেছে নিলেন গোর্কী। ভারতবর্ষের সঙ্গে গোর্কীর নিবিড় সংযোগ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গোর্কী চিরদিন বহন করে গেছেন বিপুল [illegible] বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অজস্র রচনার অনুবাদ হয়েছে। ভারতবর্ষের অসংখ্য নাট্যসম্প্রদায় তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করে থাকেন নিয়মিতভাবে। রাষ্ট্রনায়ক তথা আধুনিক রাশিয়ার জন্মদাতা লেনিন যথেষ্ট প্রীতির চোখে দেখতেন গোর্কীকে।

গোর্কীর বিখ্যাত রচনা 'মাদার'। এই প্রখ্যাতনামা গ্রন্থটিই পৃথিবীর দিকে দিগন্তরে তাঁর খ্যাতি প্রসারিত করে দেয়। প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতির বেদীমূলে। নিপীড়িত বঞ্চিত মানব শ্রেণীর জয়গানই তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। তথাকথিত অপরাধী, নির্বাসিতরাই তাঁর চরিত্র—মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির স্বপক্ষে সংগ্রামই যেন তাঁর লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য। তাঁর 'লোয়ার ডেপথ'ও ভারতীয়দের কাছে অতি সুপরিচিত রচনা।

১৯৩৬ সালে ৬৯ বছর বয়সে এই মহান সাহিত্য-নায়কের অসহায় মানব [illegible]

উপমা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্য

শ্রীনারায়ণ দেববর্মা

উপমাকে আমরা সাধারণ মানুষ কবিদের বিলাস বলে মনে করি। ওরও অবশ্য একটা কারণ আছে। উপমাকে বহুলভাবে কাজে লাগিয়েছেন কবিরা। তাঁদের হাতেই উপমাগুলি রঙিন হয়ে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উপন্যাসেও উপমার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। এটাকেও আমরা সাহিত্যিকদের বুদ্ধির বিলাসিতা বলি। কিন্তু উপমা যে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, তা ভাবতেও আমরা অবাক হয়ে শিউরে উঠি। কি সাংঘাতিক কথা। উপমা দিয়ে নাকি ধর্মের মতো এমন কঠিন বিষয়ের ব্যাখ্যা চলে। ধর্মের ব্যাখ্যা করা কি এতই সোজা। কত তন্ত্র-মন্ত্র, পুরাণের কথা বলতে হয়। সব সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাপার। এ কি চাট্টিখানি কথা। সত্যি উপমা দ্বারা ধর্মকথার ব্যাখ্যা করা চলে। অনেক কঠিন বিষয় সহজ করে বলা যায়, যাতে সাধারণ সাংসারিক মানুষ ধর্মের মূল ব্যাখ্যাগুলি সহজেই বুঝতে পারে। সহজেই ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে।

যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণই আমাদের চোখ খুলে দিলেন। উপমার সাহায্যে কত কঠিন বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। আমরা আকণ্ঠ কথামৃত পান করে ধন্য হলাম।

যোগীর চোখ কেমন?

পাখীর চোখের মতো।

সে আবার কি রকম?

হ্যাঁ, পাখীর চোখের মতো, দেখছ না পাখী যখন তার ডিমে তা দেয় তখন তার দৃষ্টি থাকে উপরের আকাশের দিকে, কোন বাজ পাখী আসছে কি না। কিন্তু মন পড়ে থাকে ডিমের দিকে। ডিম যেন না ভেঙে যায়, আর তাপও যেন ঠিক পরিমাণ মতো পায় যাতে সময়-মতো ডিম কেটে ছানা বেরুতে পারে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

বা। কি চমৎকার একটা উপমা দিয়ে এত কঠিন একটা বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা করে দিলেন যা বুঝতে ছোট শিশু হতে বৃদ্ধেরও কোন অসুবিধা হয় না। ঠাকুর উপমা প্রয়াসে একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর তুলনা তিনিই।

একজন শিষ্য প্রশ্ন করল ভক্ত কেমন? এ সম্বন্ধে তো হাজার হাজার পৃষ্ঠার বই লেখা হয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না।

পারছ না? তবে শোন, শুক্‌নো দেয়াশলাই দেখেছ? ঠাকুর সহজ করে বললেন।

হ্যাঁ।

তবেই তো হোল। ভক্ত ঐ শুকনো দেয়াশলাই-এর মতো। দেখেছ তো, ভিজে দেয়াশলাই হাজার বার ঘষলেও জ্বালানো যায় না, কিন্তু শুকনো দেয়া-শলাই একবার মাত্র ঘষলেই দপ করে জ্বলে উঠে। তাপ-আলো দুই পাওয়া যায়। ভক্তও ঠিক তেমনি। হরিকথা শুনলেই ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির এবং প্রেমের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠে। আনন্দে আনন্দাশ্রুপাত হয়। হৃদয় গলে যায়।

কত সহজ অথচ স্পষ্ট পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করলেন। ভক্ত কেমন, শুক্‌নো দেয়াশলাই যেমন। তুচ্ছ যে একটা দেয়াশলাই তাকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করে কতবড় একটা গুহ্য বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা করলেন ঠাকুর। কারও বুঝতে অসুবিধে হয় না। ভেবে অবাক হই সামান্য জিনিসটা আমরা এতোদিন বুঝতে পারিনি। কত জনে তো কতরকমভাবে ভক্তের ব্যাখ্যা করেছেন। কত সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত করেছেন যাতে ব্যাখ্যাটি আমা-দের সাধারণের মনে আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠে। কিন্তু ঠাকুরের মতো এমনটি কেউ বলেনি। কত সহজ কত সরল।

একজন প্রশ্ন করল, ঠাকুর, গেরুয়া পরার কি কোন প্রয়োজন আছে?

ঠাকুর কত আপন করে বললেন, দেখ যখন ছেঁড়া শার্ট এবং ছেঁড়া জুতো পরে রাস্তা দিয়ে হাঁট—তখন মনে দীনভাব আসে, ঠিক কিনা?

হ্যাঁ।

ঠাকুর বেশ টেনে বললেন, আবার যখন ফোপদুরস্ত পরিষ্কার শার্ট নতুন জুতো পরে মচমচ করে বেড়াতে যাও যেন মনটা আনন্দে থাকে। নিজেকে একটা দাম দাও। গণ্যমান্য মনে কর। সাহস যেন বেড়ে যায়। ঠিক তেমনি, গেরুয়া বসন পরলে সহজেই আপনা থেকে মনে সাধনার একটা ভাব উপস্থিত হয়। ত্যাগের কথা মনে হয়। মনে পবিত্র ভাব আসে।

কেমন হল? হবে না? এতো সহজ করে কি আর কখনো শুনেছি।

কেন বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না? উপমার মাহাত্ম্য। কোন একটি কঠিন বিষয়ও যদি সরল উপমার সাহায্য ব্যাখ্যা করা হয় তবে তা বুঝতে কোন বেগ পেতে হয় না। মনের মধ্যে গেঁথে যায়। বিশেষভাবে উপমাটি যদি সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়। ঠাকুর যে কোন বিষয়ের কথা বলতেই সব সময় সাধারণ শব্দই ব্যবহার করেছেন যা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি। আর উপমার বস্তুটিও আমাদের পরিচিত, যা আমরা সর্বদা আমাদের চারপাশেই দেখতে পাই। তাই ঠাকুরের কথা বুঝতে কোন পুঁথিগত বা কেতাবী বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। অথচ মনের জিজ্ঞাসু স্থানটি ঈপ্সিত অমৃত পেয়ে ধন্য হয়।

মানুষের মন কি রকম? প্রশ্নটা ছোট্ট হলেও জটিল। মন সম্বন্ধে কত পণ্ডিত ব্যক্তি রিমের পর রিম কাগজে লিখে ব্যাখ্যা করেছেন। হাজার হাজার পৃষ্ঠার বই ছাপা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি তো এই মন থেকেই। তার থেকে কত শাখা-উপশাখা গজিয়েছে। মনোবিজ্ঞান ক্রমে একটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ঠাকুর এই মনের ব্যাখ্যা করলেন কত সহজভাবে সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে। উপমার বস্তুটি আমাদের অতি পরিচিত।

সরষের পুঁটলী। মন কি রকম? সরষের পুঁটলীর মত। একবার যদি পুঁটলী ছেঁড়ে তবে পুঁটলীর সরষে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। সেগুলো কুড়িয়ে জড়ো করা খুবই কঠিন। মন যদি একবার কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয় তবে তাকে ঈশ্বর সাধনায় নিয়ে যাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। কত সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন ঠাকুর। বুঝবে না আবার।

যাই হোক মনকে অনেক কষ্টে ঈশ্বর সাধনায় ফেরানো হয়। তাতেই হল না। ঠাকুর সাংসারিক মানুষকে সতর্ক করে দিলেন চমৎকার একটি উদাহরণের সাহায্যে।

পুকুরের জলে পানা হয়েছে। সমস্ত পুকুরের জলটাই পানায় ঢাকা পড়ে আছে। কিছু পানা সরিয়ে দেয়ার পর জল দেখা গেল, তাতেই কিন্তু সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। পানা যাতে পুনরায় সমস্ত জলটাকে না ঢেকে দেয় তার জন্য চারদিকে আড় বাঁশ দিয়ে খোঁটা পুঁতে পানাগুলিকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তেমনি মনকে একবার নির্মল করেই ক্ষান্ত না হয়ে ঈশ্বরের নামের আড় বাঁশে ও ভক্তির খোঁটায় আটকিয়ে রাখতে হবে। সব বিষয়বাসনা, পাপ চিন্তা দূরে সরিয়ে দাও। মনে ভক্তি রাখ, ভক্ত হও। তবেই হবে। ভক্ত হতে হবে শুকনো দেয়াশলাই-এর মতো। হরিকথা শ্রবণমাত্রই দপ্ করে ভগবত প্রেম জ্বলে উঠবে।

সাকার উপাসনা ভাল না নিরাকার উপাসনা ভাল? ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন এক ভক্ত?

হাসলেন ঠাকুর। সাকার-নিরাকারে কোন প্রভেদ নেই। একই। নিরাকারবাদীরা সানাইয়ে ব্রহ্মের একটিমাত্র পো ধরে আছে, আর সাকারবাদীরা সানাইয়ে নানা রকমের বিচিত্র সুরে তান লয় বের করে অপার আনন্দ উপভোগ করছে। অন্যকেও আনন্দ দিচ্ছে।

কি সুন্দর উপমা, যেন একটি কবিতা। কবিই তো। ঠাকুর যে চিরকবি ছিলেন। পরম কবি ঠাকুর। তাঁর উপমার অভাব আছে নাকি। অফুরন্ত উপমা-সাগরের মালিক তিনি। উপমা-রত্নাকর।

বিষয়বাসনা কিরূপ? দাদের মতো দাদ চর্মরোগ। তাকেই সুন্দর উপমা হিসাবে ব্যবহার করেছেন ঠাকুর। দাদ চুলকাতে আরম্ভ করলে যতই চুলকানো যায় ততই ইচ্ছা করে আরো চুলকাতে। ঠিক তেমনি, বিষয়বাসনা, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত সাংসারিক লোক যতই বিষয়বাসনায় আসক্ত হবে ততই আসক্তি বাড়তেই থাকবে। তৃপ্তি পাবে না কখনও। যতই কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত হবে ততই ভগবৎ-প্রেম দূরে সরে যাবে। যেমন, যতই পশ্চিম যাওয়া যায় ততই পূর্বদিক দূরে সরে যায়। উপমার উপমা ব্যবহার করেন ঠাকুর। না বুঝে কি আর পারা যায়।

সংসারী লোকের সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দিলেন ঠাকুর। উটের সঙ্গে তুলনা করলেন। উটের প্রিয় খাদ্য কাঁটা ঘাস। তার প্রিয় খাদ্য কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে, তবু কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়ে না। আরো খায়। ঠিক তেমনি সংসারী লোক কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে শোক তাপে জর্জরিত হয়েও চৈতন্য লাভ করে না। আরো আসক্তির অতল গর্তে নিজেকে নিমজ্জিত করে।

আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম এবং হিন্দুর সনাতন ধর্মের তফাৎ দেখালেন চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে। তুলনা করলেন সঙ্গীতের সঙ্গে। ব্রাহ্মধর্মসঙ্গীতের একটিমাত্র পদ লয়ে গান করছে আর হিন্দুধর্ম সমস্ত সঙ্গীতটুকু সমস্বরে গান করছে। কি সুন্দর উপমা। অথচ এ সম্বন্ধে কত বাদানুবাদ হয়েছে। কত পুস্তকের শ্লোক উদ্ধৃত করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে, ঠাকুর সহজ সরল উপমা দ্বারা জটিল বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করলেন। কি সহজ ব্যাখ্যা। বুঝবে না আবার। হৃদয় যে আনন্দে নেচে উঠে। পেয়েছি, এত দিনে আলোর সন্ধান পেয়েছি। কত না শাস্ত্র আলোচনা করেছি। কই এমন ব্যাখ্যা তো পাইনি। সব যেন জটিল হতে জটিলতর হয়ে গ্রন্থি আঁটতে লাগল। ঠাকুর গ্রন্থি সরলভাবে ফস করে খুলে দিলেন। সব পরিষ্কার হয়ে গেল। পোড়া দড়ি, তাও ঠাকুর উপমার ব্যবহার করলেন। ঠাকুর যিনি ভগবান পেয়েছেন তার কি কোন রিপুর তাড়না নেই?

হ্যাঁ, আছে বৈকি। তবে নামমাত্র। যেমন পোড়া দড়ি। বাইরে দড়ির আকারটা ঠিকই থাকে। কিন্তু ফুঁ দিলেই উড়ে যায়। হাওয়ায় মিশে যায়। ঠিক তেমনি—আছে, অথচ নেই, এই পোড়া দড়ি কোন কাজে আসে না। নাই বলতে পারো।

আরো কত কি সুন্দর সুন্দর উপমার মাধ্যমে তিনি ধর্মের অনেক কঠিন ব্যাখ্যা সহজ সরল করে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি উপদেশের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই উপমার সার্থক প্রয়োগ। আবার দেখতে পাই একই উপমা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করে প্রয়োগ করা হয়েছে। অথচ তাতে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। নব নব রূপে, নব সাজে উপমাগুলির সার্থক ব্যবহার দেখে আমরা পুলকে রোমাঞ্চিত হই। মনে হয়, ঠাকুর যেন আমাদের সম্মুখে বসেই কথাগুলি বলছেন।

স্পষ্ট যেন শুনতে পাচ্ছি। তাঁর অমৃতনির্ঝর কণ্ঠস্বর এখনো কানে বাজছে। সত্যি তো তিনি দূরে চলে যান নি। শুধু একটা দেয়ালের ব্যবধান মাত্র। তাঁরই কথায় বলা যায়। আমি তো এই আছি। শুধু তোদের মায়ার দেয়ালটা আমাকে আড়াল করে রেখে তোরা আমায় দেখতে পাচ্ছিস না।

আমরা ক'জনে এত পুণ্য করেছি যে তাঁকে আবার স্বচক্ষে দর্শন করতে পারবো? মায়ার বাঁধন, দেয়াল কি সরাতে পেরেছি? তাঁরও চরণাশীর্বাদ থাকলে সবই পারবো।

সমাধান

শ্রীঅশোক রায়

ওগো বন্ধু, ওগো আমার ভাবুক কবি,
পড়লাম তোমার কাব্য লেখা,
আর বুঝলাম ত' ভাই সবই।

কিন্তু বল দেখি ভাই বল?
নদী আজ কি সুরে গায় বল?

ওই যে চলে আপনমনে কলকল, ছলছল?
কার খেয়ানে মাতোয়ারা
চলছে ছুটে পাগলপারা
সে কোন জনা বল?

নদীর ঢেউয়ে আলোক পড়ে
হল যে উচ্ছল।
হল সে উজ্জ্বল।
কার সে আলো, বল?

কে সেই জনা, কে সেই জনা
যার লাগি সে আপনমন
সকল বাধা বন্ধ ঠেলি
চলছে আগে কলকলি,
দাওনা তুমি বলি।

কবি দাওনা মোরে তাঁর ঠিকানা
কে সেই জনা, কে সেই জনা।
উতলা মোর হিয়াও ছোটে
আকাশ পড়ে পড়ছে লুটে।
তাঁহার কাছে যাবার লাগি
(তাঁর) তোমার কাছে হদিস মাগি,
কবি দাওনা বলে মোরে।
নদী আজ যাঁহার প্রেমডোরে
আছে বাঁধা।
যেমন ছিল দ্বাপর যুগে রাধা।
তাঁরেই আমি চাই
বল কেমন করে পাই,
তাঁরে কেমন করে পাই?

বলছ তুমি, ফুলে ফলে
অন্তরীক্ষে, জলে স্থলে
গিরিশৃঙ্গে সাগর জলে
তোমার হিয়ায়, আমার হিয়ায়,
ভালমন্দ সকল লীলায়
আছেন তিনি, বলছ তুমি?

তাঁরে সবার মাঝে পাব?
ভাল তারে বাসতে হলে
ভালবাসতে হবে ফুলে, ফলে,
মরুভূমি, ও জংগলে?
ভালমন্দ সব জনারে?
সব কিছুতেই পাব তারে?
এই কথা ঠিক বলছ কবি?
বলছ তবে বাসব ভাল সবই?
বেশ তাই হবে ভাই, আজ থেকে
আমি বাসব ভাল সবই।
চন্দ্র, গ্রহ তারা রবি—
আমি বাসব ভাল সবই।
তোমার কথাই রাখব আমি কবি।
বাসব ভালো সবই
আমি বাসব ভালো সবই।

সম্রাট বাহাদুর শা জফরের কয়েকটি দ্বিপদী

[শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শা' উর্দু সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কবি। 'জফর' ছিল তাঁর 'পেন নেম'। তাঁর সময়েই নির্বাপিতপ্রায় মোগল রাজ-এর দীপ একেবারে নিভে যায়। কিন্তু উর্দু সাহিত্যের প্রদীপ তাঁর রাজসভায় উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছিল। গালিব, জওক প্রমুখ শ্রেষ্ঠ উর্দু কবিগণ ছিলেন তাঁর কাব্য সঙ্গী। জফরের কবিতায় স্বকীয় কাব্য-সৌন্দর্য ব্যতীত সিপাহী বিদ্রোহোত্তর দিল্লী ও দেশের তথা জফরের নিজ মন ও মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায় ব'লে এর ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। বাংলায় পর্যন্ত জফরের কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়নি।]

॥ ১ ॥

বন্ধুরা মোরে জ্বালাল এত যে
ছাড়ি' চলিলাম(১) দেশ,
শমার(২) মতন জ্বলে কেঁদে আমি
ছাড়ি' এই সমাবেশ।
মালাকর(৩) মোর দেয়নিক মত
ছাড়ি চলিবার লাগি'।
ধুনীতে এসেছি, কাঁদিয়া বাগানে রহা
করিলাম শেষ।

॥ ২ ॥

দিল্লীর কথা নহে আর শোনাবার,
এ কাহিনী আজ কাঁদবার কাঁদাবার,
লুটেরারা তার প্রাসাদ করেছে শেষ,
যা ছিল সবার দেখবার দেখাবার।
ঘরদোর নেই জফর মাত্র আছে,
দিল্লীর কথা শোনানো কামনা তার।

১। ছাড়ি' চলিলাম দেশ---বাহাদুর শা ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

২। শমা---মোমবাতি। জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদার মতন এর মোম গলে পড়ে।

৩। মালাকর---ঈশ্বর।

॥ ৩ ॥

অপর জগতে দেখো হে জফর হয়
হাল কি রকম,
না পেলে না পেলে স্বস্তি শান্তি
দুনিয়ায় একদম।

॥ ৪ ॥

ভাগ্য এখন কেমনতরো বদলে গিয়েছে,
আসলো পরী হস্তে আমার,
পালিয়ে গিয়েছে।
আন্দোলিল যুগ্ম ভুরু সেই প্রেয়সীর যবে;
খুলল অসি, লক্ষ সেনা জমিন নিয়েছে।

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

উচ্চে এত উঠল আমার আর্তরবের শিখা,
বিজলী কেঁপে বেরিয়ে এলো, আকাশ
চিরেছে।
হায় জমানার বদলরে তোর হায়রে
কেমন ফের,
দিল্লী আমার হাতের থেকে
বেরিয়ে গিয়েছে।

॥ ৫ ॥

ছিল যে বাসনা কবর আমার রহিবে গো
মদিনায়,
হ'ল রেঙ্গুনে হিয়ার বাসনা রহিয়া গেল
হিয়ায়।
জমজম পানি (৪) বদলে আপন রক্ত-অশ্রু
খাই,
লও হে খবর জীবন আমার আর
বেশিদিন নাই।
আরব-রসুল (৫) হে নবী, এখন কামনা
করে জফর
চৌকাঠে যেন লাগে গো তোমার
আমার দীন নজর।

৪। জমজম পানি---আরব দেশে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র জল।

৫। আরব-রসুল হে নবী---হজরৎ মহম্মদ।

॥ ৬ ॥

দুঃখ কথা কারে বলি সমব্যথী কেহ নাই
নিরাশার হাহুতাশ ছাড়া।
জিজ্ঞাসয়ে কেহ যদি বলিবার কিছু নাই
থাকা ভালো হয়ে বাক্যহারা।

॥ ৭ ॥

কোনই উপায় পারেনি আমার হৃদয়ের
ক্ষত ভরতে
এক ভরে আর আর---গবাক্ষ খুলে যায়।
পরিবর্তে

॥ ৮ ॥

দরবেশের পোষাক না চাই,
লোভ নাই মুকুটের 'পরে।
মোরে জ্ঞান দেও এতটুকু
দিওয়ানা (৬) হই তোমা তরে।

॥ ৯ ॥

সে মহিমা দেখিনি কোথাও
দেখেছি যা হৃদয় মন্দিরে।
মসজিদে ঠুকিয়াছি মাথা,
দেবালয়ে গেছি ফিরে ফিরে।

॥ ১০ ॥

ভেবেছিনু দুঃখকষ্ট যত
কহিব সে আসিলে নিকটে।
এলো যবে কোনো দুঃখ ব্যথা
রহিল না হৃদয়ের পটে।

॥ ১১ ॥

নিজ হাল যবে আমি জানিতাম, নাকো,
দৃষ্টি যেত অপরের দোষগুণ 'পরে।
নিজ দোষ যবে আমি জানিনু তখন
অপরের দোষ আর চোখে নাহি পড়ে।

॥ ১২ ॥

বহুদিন পরে এলো কাছে যবে
মহিমার সেই চন্দ্রকায়া,
সবুর ও ধৈর্য রহিল না মোর,
জ্ঞানও রহিল না সরম ও হায়া (৭)।

৬। দিওয়ানা---পাগল।

৭। হায়া---লজ্জা।

॥ ১৩ ॥

জানিও না মানুষ জফর
তারে যদি জ্ঞানীও সে হয়,
সুখে যার খোদা নাই মনে,
ক্রোধে খোদা ভয় নাহি রয়।

॥ ১৪ ॥

প্রেমনেশা সহিবার লাগি যদি
খোদা দিলে মোরে হিয়া।
কেন তবে করিলে না কৃপা
দীর্ঘতর পরমায়ু দিয়া?

॥ ১৫ ॥

আর্তনাদ পারিনি করিতে,
যা'র হ'ত কামনা তাহলে।
আমারে তো তুমি হায় প্রেম
মারিয়াছ দাবাইয়া(৮) গলে।

॥ ১৬ ॥

বলবে নাকো দু'য়ের কথা
দশের মাঝারে।
পৌঁছে যাবে দশের কথা
দশটি হাজারে॥

৮। দাবাইয়া---চেপে।

॥ ১৭ ॥

আয়নার মতো কর সাফ
মন থেকে খারাপের জং।
তারপর দেখ ভালো করে
প্রকাশে কি মহিমার রং।

॥ ১৮ ॥

মন্দিরে মসজিদে কেন খুঁড়িতেছ মাথা,
খুঁজে খুঁজে হও হয়রান?
যাঁরে খোঁজ গুপ্ত তিনি তোমারি মাঝারে,
হায় নাই তোমার সন্ধান।

ফ্যাশন-শো

(রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে)

সৈয়দ হোসেন হালিম

জন্মদিনের উৎসব আজ আমরা তাই
মিলেছি এখানে—মৌচাক ঘিরে মৌমাছি
মাঝখানে দোলে ঝাড়-লণ্ঠন,
দু'পাশে আলোর মহোৎসব,
ধূপের গন্ধ, মালায়-মাইকে ত্রুটিহীন প্রস্তুতি!

অথচ আমরা প্রস্তুত কই!
ফিস্-ফিস্ কথা, ছায়া-ছায়া মন,
টুকরো-টুকরো কথার ঢেউ,
কবিতার নামে হাই ওঠে ঘন,
প্রবন্ধেতে মূর্ছা যাই,
গানের নামেতে বুজে আসে চোখ,
কাব্য-কবিতা—প্রেমের কবিতা
এ-যুগে দুটোই ব্যাক-ডেটেড!

অথচ আমরা মোম-জ্যোৎস্নায় ডুবিয়ে পা
গল্প করতে বড় ভালবাসি,
টুং-টাং কোন গিটারের সুরে স্বপ্নাবিষ্ট—অর্ধ চো-
ফুল ভালবাসি, ফুলের কেয়ারি,
ঝিরি-ঝিরি পাতা ঝাউয়ের বন,
তারা-বুটী আঁকা নীল গালিচায় রূপালী চাঁদ,
যদিও আমরা পান্‌সে নাটকে নায়ক-নায়িকা,
হাল্‌কা প্রেম—বলকানো দুধ—
রঙিন কাঁচের জারের মাছ!

এখন আমরা ছক-মাপা চাল,
ঠোঁট টিপে হাসি, কোণ ভরে কাঁদি,
নাক ভরে ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
বুকে বুক, পিঠে পিঠ দিয়ে থাকি, চোখেতে চোখ,
তবুও কাউকে কেউ তো চিনি না,
গহন গুহায় বন্দী মন,
সীল-করা ছিপি—বোতলে হৃদয়—
জলের হাঁস—ডানা ঝাড়লেই কোথায় জল!

এ-যুগের এই মৃত-সভ্যতা, তার উপরে মীনের রং
বুলিয়ে পেয়েছি গভীর শান্তি—গাভীর শান্তি—পাথরে চোখ,
সংস্কৃতির অংশ এখন বিয়ের তারিখ, জন্মদিন,
সূক্ষ্ম কাঠের রঙিন মোড়কে আভিজাত্যের শুকনো ফুল,
কবিতার নামে পলিটিক্সের ট্যাক্স দিই!

তবুও আমরা শো করি রূপের সমঝদার,
জন্মদিনের উৎসব করি ফ্যাশন্-শো
রঙেতে-তুলিতে খুব বেশী ফাঁক,
ঠ্যাং-ভাঙা গরু হাঁটতে পারি না—
খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে আকুল হই,—
ফাটা রেকর্ডের তীক্ষ্ণ পিনের সকরুণ প্রহসন!

ভাস্করানন্দ সরস্বতী

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে মার্ক টোয়েন একটি উজ্জ্বল নাম। হাস্যরসাত্মক রচনার জন্য তাঁর জগদ্ব্যাপী প্রসিদ্ধি। তাঁর কৌতুকধর্মী রচনা তাবৎ পাঠক সমাজকে কানায় কানায় পরিতৃপ্ত করেছে। কিন্তু হাস্যরসের এই শক্তিমান স্রষ্টা যে শুধু হাস্যকৌতুকের গণ্ডীর মধ্যেই আটক ছিলেন সুপ্রসারিত জীবনের গভীরতার এবং অনন্তরসের সমুদ্রেও যে কৃতিত্বের সঙ্গে অবগাহন করেছেন এবং সেখান থেকে লোনা জল না তুলে অমৃতবারি তুলতেই সক্ষম হয়েছেন তার নিদর্শন বিরল নয়।

টোয়েন এসেছিলেন ভারতবর্ষে। 'ইংলিশ ম্যান' কাগজের প্রতিনিধি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষে যা দেখলেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বস্তু কোনটি?'

টোয়েন উত্তর দিলেন---'বেনারস' এবং তার পবিত্রাত্মা মহামানবটি। স্বামী ভাস্করানন্দের ছবিটি দেখিয়ে দিলেন টোয়েন। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে টোয়েন বললেন---ইনি যে ঈশ্বরপ্রতিম।

শুধু মার্ক টোয়েনই নয়, পৃথিবীর নানা স্থানের নানা প্রখ্যাতনামা পুরুষ বারংবার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করে-ছেন এই পবিত্র আত্মা ভারতীয় মহা-সাধকের উদ্দেশে।

উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলার মৈথে-লালপুর ভক্তকবি এবং ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিদদের জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু এই মৈথেলালপুরকে সকলের তুলনায় যিনি অনেক বেশী প্রসিদ্ধির ও গুরুত্বের অধিকারী করে গেলেন তিনি সাধকপ্রবর ভাস্করানন্দ।

১৮৩৩ সালে তাঁর জন্ম। বাবার নাম মিশ্রীলাল। জন্মের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনজন সন্ন্যাসী এসে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন যে এই পুত্র একদিন ভাবী-কালের অসংখ্য মানবকে জীবনের প্রকৃত
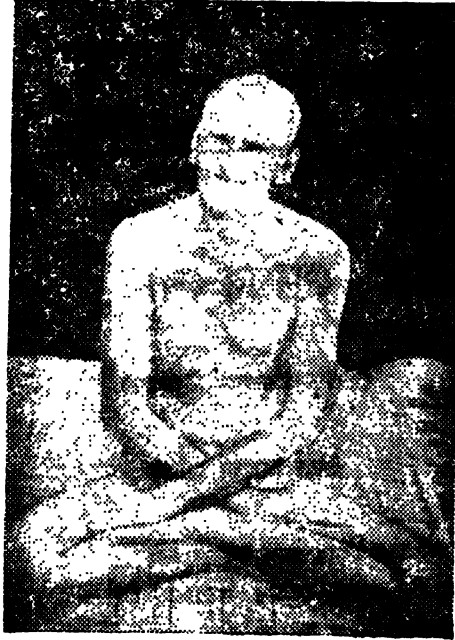
ভাস্করানন্দ সরস্বতী

চলার পথের সন্ধান দেবে। সাংসারিক আশ্রমের নাম হল মোতিরাম।

কিন্তু কতটুকুই বা সংসার জীবন—জীবনের ক'টা বছর সংসারের নিশ্চিন্ত সুখচ্ছায়ায় আরামে কাটল?---সবই খুব অল্প সময়ের মেয়াদ।

জর্জ এলেন

এক সহজাত মেধা ও অনুধাবন-শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন মোতিরাম। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে আয়ত্তে আনতে থাকেন মোতিরাম। শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য কাশীধামে এলেন মোতিরাম। সতের বছর বয়সে ফিরে গেলেন মৈথেলালপুর।

বাল্যকাল থেকেই পুত্রের বৈরাগ্যের ভাবটি চোখ এড়িয়ে যায় নি মিশ্রী-লালের। সংসারের আকর্ষণে জড়িয়ে ফেলতে চাইলেন পুত্রকে। পরমা-সুন্দরী এক লাবণ্যময়ী কন্যাকে ঘরে নিয়ে এলেন বধূরূপে।

কিছুকাল পর একদিন ঘরে শাঁখ বাজল। নবাগতের আবির্ভাব হয়েছে মিশ্রীলাল-মোতিরাম---দু' জনের মনের অবস্থাও তখন দু'রকম। মিশ্রীলাল ভাবলেন---ছেলের বৈরাগ্য এবার ঘুচল। ছেলে এবার পুরোপুরি সংসারী হল। এ বড় শক্ত বাঁধন এবার, এ যে বাৎসল্যের বাঁধন।

মোতিরাম ভাবলেন---এ কি হল একে সুন্দরী স্ত্রী---তারপর ফুলের মত সুন্দর সন্তান---বাঁধন যে ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠছে--এ তো কাটানো দুষ্কর হয়ে উঠবে শেষে---এই সংসারের জাল যে শেষে তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য থেকে তাঁকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাবে। আর দেরী করা উচিত নয়---আর দেরী করলে হয় তো সব কিছু উল্টেপাল্টে যাবে।

দেরী আর করলেন না মোতিরাম। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেইদিনই তিনি নিয়ে নিলেন। মধ্যরাত্রে গৃহত্যাগ করলেন। ছিন্ন করলেন সংসার বন্ধন। জীবনের একটি অধ্যায় অতিক্রম করে গেলেন সেদিন।

মহাকালেশ্বর শিবের অধিষ্ঠানক্ষেত্র শিপ্রা নদীর তীরবর্তী উজ্জয়িনী। সেখানে উপনীত হলেন মোতিরাম। অবলম্বন তখন আকাশবৃত্তি। শ্মশান তখন বাস-স্থান। এরপর তিন-চারবছর বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন দ্বারকায় থেকে। আবার ফিরে এলেন উজ্জয়িনীতে। বৃদ্ধ সাধক পূর্ণচন্দ্র সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নিলেন। মোতিরাম সেদিন হয়ে গেল অতীত---বর্তমানের আঙ্গিনায় ভবিষ্যতের হাত ধরে সেদিন দেখা দিলেন ভাস্করানন্দ সরস্বতী। বয়েস তখন সাতাশ।

তের বছর ধরে চলল ভারতভ্রমণ। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ। মাথার

উপর ধ্যানমৌন হিমালয়। পায়ের তলায় চঞ্চলচপলা কন্যাকুমারিকা। হরিদ্বারে বৈদান্তিক অনন্তরামের কাছে শিখলেন বেদান্তের গূঢ়তম তত্ত্বসমূহ।

এরপর কাশীধাম। এই সময় যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন তিনি করেন তা তাঁর জীবনেতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। আহার-বিহার তখন পরিত্যক্ত। শীত বা গ্রীষ্মে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য নেই। মনের মধ্যে তখন অষ্টপ্রহর ইষ্টের জপ আর ধ্যান, আর মুখে শুধু বিশ্বনাথের নামোচ্চারণ।

আমেঠির রাজা মিনতি জানালেন দুর্গাবাড়ীর কাছে আনন্দবাগে তাঁর উদ্যানবাটিতে স্বামীজীকে আসতে। সেইখানেই বাসা বাঁধলেন ভাস্করানন্দ।

মহামানবের কাজই হল পথভ্রষ্টকে পথে ফিরিয়ে আনা। দেখা গেছে কত নিকৃষ্ট ব্যক্তি, বহু জঘন্য নিন্দনীয় কার্যের নায়ক স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর কৃপাবলে এক ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে। বহু রত্নাকরকে বাল্মীকির রূপ দিয়েছেন মহাসাধক ভাস্করানন্দ।

কত মুমূর্ষু আতুরকে অলৌকিক শক্তিতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন তিনি। তাঁর দীক্ষিত শিষ্যেরই সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক। এদের মধ্যে ছিল কত বিচিত্র নরনারী, কত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা এসে মিলিত হয়েছে তাঁর চরণপ্রান্তে।

তিনি বলতেন জগৎ অলীক, মায়ামাত্র। এ কথা প্রশ্নসংশয় জাগাল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের মনে। রমেশ মিত্রের এই সংশয় তিনি ভেঙে দিলেন তাঁর সামনে থেকে নিজেকে অদৃশ্য করে। পরে বললেন সবই যদি অলীক না হয় তা হলে তোমার সামনে প্রতিক্ষণেই আমি আছি আবার প্রতিক্ষণেই আমি নেই এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে?

ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার উইলিয়াম লকহার্ট স্বামীজীর কাছে সস্ত্রীক যেতেন। একদিন নিজের জীবনে যুদ্ধজয়ের চমকপ্রদ গল্প শোনাচ্ছিলেন।

স্বামীজী লক্ষ্য করলেন গল্পের মধ্যে অহঙ্কারের সুর অনুপ্রবেশ করছে। বর্ণনার ভিতর প্রবেশ করছে অহমিকা। সমগ্র বর্ণনাটি হয়ে উঠছে 'আমি'ময়। সেনাপতিকে হঠাৎ ভাস্করানন্দ বললেন

ঐ পেন্সিলটা তুলে এনে আমায় দাও তো---প্রবল পরাক্রমী লকহার্ট সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ছোট্ট পেন্সিলটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুলতে পারলেন না।

স্মিতহেসে ভাস্করানন্দ বললেন, যে শক্তির এত গর্ব করলে সে শক্তির বিকাশ তাঁরই কৃপানির্ভর। দেখলে তো, এখন এই সামান্য জিনিসটুকুও তুলতে পারলে না। যা কিছু তাঁরই দান এই মনোভাব পোষণ কর, মনে রেখ তুমি নিমিত্তমাত্র।

নিজে ভারতের অসংখ্য রাজা, মহারাজা, জমিদার ছাড়াও আরও বহু বিদেশী ব্যক্তিত্ব তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যেমন সুবিখ্যাত ধর্মাচার্য ডাঃ ফেয়ারবার্ন, জার্মান পণ্ডিত ডয়সন, রাশিয়ার জারের পুত্র প্রমুখ। ঈশ্বরের যিনি মানসপুত্র তাঁর কাছ থেকে শ্রেণিগত সম্প্রদায়গত তারতম্য নেই। রাজা মহারাজারা যেভাবে তাঁর কৃপালাভ করেছেন সমানভাবেই তাঁর করুণা বর্ষিত হয়েছে অসংখ্য অনাথের বহু আতুরের প্রতি। তিনি শুধু ধনীরই নন, তিনি নিঃস্বেরও। তিনি সর্বমানবের। কোটিপতি থেকে নিঃস্ব ভিখারি সমানভাবে তাঁর কৃপালাভ করেছে।

১৩০৬ সালের ২৫-এ আষাঢ় (১৮৯৯ খৃঃ) এই মহাতাপসের পার্থিব লীলার অবসান ঘটে।

"হাওড়া স্টেশন দেখা যাবে কি করে? হাওড়ার পৌরকর্তারা গন্ধমাদন পাহাড় তৈরি করে দিয়েছেন শহরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে।"

পক্ষিজগতে সংখ্যাসাম্য

কোয়ালাটিট্ খুদে পাখি। বেশ চঞ্চল। এদের বাচ্চার সংখ্যা অনেক এবং গড়ে তিনটে কোয়ালাটিট্-এর বাসার মধ্যে একটায় এক বা একাধিক বাচ্চা বাপ-মার অবহেলায় মারা যায় খিদের জ্বালায়।

এরা প্রত্যেক দু' মিনিট অন্তর বাচ্চাদের খাওয়ায়। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে আঠার দিনে ন'টা বাচ্চাকে তাদের বাপ-মা সাত হাজার সাত শ' তেতাল্লিশ বার খাইয়েছিল। তবুও ওরা সবাই বাঁচে না। সংখ্যা তাই কখনও অ-স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পায় না।

কেন এই মৃত্যু? এতদিন অনেক পক্ষী-প্রেমিকের ধারণা ছিল এই উপায়ে বাপ-মা দুর্বল বা পীড়িত শাবকদের ত্যাগ করতো। কিন্তু তা সত্যি নয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে এই পদ্ধতিটি নির্মম হলেও এটি আসলে প্রাপ্ত খাদ্যের পরিমাপের সঙ্গে শাবক-সংখ্যার মিল রাখার একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যধারা।

কী ভাবে জানা গেল?

অত্যন্ত অবহেলিত বাচ্চাদের নিয়ে সমান [illegible] আরও ছোট বাচ্চা-বোঝাই ভিন্ন [illegible] রাখার ফলে দেখা গেল দিনের মধ্যেই অনাহারশীর্ণ শাবকগুলোর চেহারা ফিরে গেছে। একটা ফ্লাইক্যাচার ত' ওই অবস্থা থেকে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে পাঁচ হাজার মাইল উড়ে আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়ে, নিজের বাচ্চা-কাচ্চা পর্যন্ত ভালভাবে বড় করতে পেরেছিল। এ থেকেই প্রমাণ হয় এরা পূর্ণাঙ্গ এবং সক্ষম পাখিতে পরিণত হতে সক্ষম।

দৈহিক দুর্বলতা জন্মগত হলে ডিম ভেঙে সাধারণত শাবক বের হয় না। তা দেওয়ার আগে, কিংবা সামান্য পরেই মারা যায়। ধাড়ি তক্ষুণি তা বাসা থেকে ফেলে দেয়।

আবার, সব শেষে আসাও এর মূলে নেই। সব শেষে তা দেওয়া বাচ্চাটা যে দুর্বল থেকে শেষ পর্যন্ত মরবেই তাও ঠিক নয়। প্রমাণিত হয়েছে এরা প্রথমে অন্যান্যদের তুলনায় প্রায় অর্ধেক ওজনসমন্বিত হলেও মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ওজনে অন্যান্যদের সমান হয়ে উঠেছে। কাজেই, এদের মৃত্যুর প্রধান কারণ খাদ্যাভাব।

বর্ণাজীর

এখন দেখা যাক্ কী ক'রে বাপ-মারা ঠিক করে তাদের কোন্ কোন্ বাচ্চা ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরবে। মাত্র বার ইঞ্চি দূরে একটা লুকোবার জায়গা ঠিক ক'রে শত শত বার ফ্লাইক্যাচার আর নাট-হ্যাচ পাখিদের বাচ্চাগুলোকে খাওয়ান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে খাদ্য নিয়ে বাপ-মা আসার পর যে বাচ্চা প্রথমে হাঁ করে, সেই প্রথমে খাদ্য পায়। অন্যান্যদের তুলনায় এক সেকেণ্ড-এরও অল্প আগে এটি তৎপর। মা-পাখি প্রথমেই লক্ষ্য করে দলের কোন্ বাচ্চা সর্বপ্রথম হাঁ ক'রে এগিয়ে আসে এবং যদি সেটি সবার পেছনেও থাকে এবং অন্যান্যরা ইতিমধ্যে তারই মত হাঁ ক'রে হট্টগোল বাধিয়ে তোলে, তা হলেও মা-পাখি সকলকে ডিঙিয়ে পেছনে গিয়ে তাকে খাইয়ে দেয়।

এই ব্যবহারের সুসংবদ্ধ যৌক্তিকতা রয়েছে। সব থেকে বেশি খিদে যার সে-ই খাবার জন্য সব থেকে বেশি মুখিয়ে থাকে। খাওয়ার পর তার ঔৎসুক্য কমে এবং অন্যান্য ক্ষুধিত বাচ্চারা তখন খাদ্যের ভাগ পায়। যথেষ্ট খাদ্য পাওয়া গেলে মা-বাবা পাখি দু'টো চট্‌পট্ ফিরে আসে। তখন তারা সকলকে খাইয়ে তৃপ্তি দিতে পারে। কেন না, প্রথমে যে বাচ্চা পেয়েছিল, অন্যান্যরা খেতে খেতে তার আবার খিদে পায় এবং ঘন ঘন খাদ্য নিয়ে আসতে পারার ফলে তার দাবী পূরণ করা সম্ভব হয়। সে যাই হোক্, খাদ্যাভাব ঘটলে অল্প খাওয়ার ফলে এরা বারবার ক্ষুধিত হয়ে ওঠে, অথচ বারবার পর্যাপ্ত পরিমাণ খেতে না পাওয়ায় শেষের বাচ্চাটা মরে যায়।

লক্ষ্য করা দরকার যে, সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে অতি সামান্য হেরফের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে নির্বাচন বেঁধে দেয় ঠিকই, কিন্তু এর কোনও নির্বাচনী মূল্য আছে বলে মনে হয় না। আপাত-ভাবে, এটি উপর্যুক্ত যুক্তিসঙ্গত ঘটনাবলী ঘটতে সাহায্য করে।

বাচ্চা হওয়ার পর দু' তিন দিন আবহাওয়া খারাপ থাকার ফলে খাদ্য-সংগ্রহ দুরূহ হওয়া খুব সম্ভব। তখন যাতে দুমদাম ক'রে বাচ্চাগুলো মরে না যায়, সে জন্য মা-বাপ পাখি দু'টো তাদের থেকে থেকে খাইয়ে যায়।

এটা নিম্নোক্ত কারণে সম্ভব। শেষের বাচ্চা সকলের শেষে হাঁ করলেও দীর্ঘকাল হাঁ ক'রে থাকে। যদি সে সময় বাপ অথবা মা এসে পড়ে (একজন এসে ইতিমধ্যে খাওয়ানো সুরু করেছে), সেভাবে ঐটি প্রথমে হাঁ করেছে। খাদ্য তার বরাতে সে ক্ষেত্রে বাঁধা। সুতরাং সে এইভাবে কয়েক দিন টিঁকে যায় এবং খাদ্য সংগ্রহের বাধা অপসারিত হলে পূর্ণাঙ্গ পাখিতে পরিণত হয়। অন্তত সেই সম্ভাবনা থাকে।

সে যাক্। খেয়েদেয়ে নাদুসনুদুস বাচ্চাগুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেয়ানা হয়ে ওঠে। এরা তখন বাপ-মার আসার শব্দ আগেই বুঝতে পেরে তারা আসতে আসতেই যথাশাস্ত্র প্রস্তুত হয়ে ওঠে। তখন থেকে বাপ-মা সব শেষের বাচ্চাটাকে প্রথমে খাওয়ানো সুরু করে। এ ক্ষেত্রেও এক ইঞ্চির কয়েক ভাগের একভাগ এদিক ওদিক আগে

পরে থাকাতেই প্রথমে খেতে পাওয়া নির্ভরশীল।

দেখা গেছে সেয়ানা বাচ্চাগুলো অন্য শব্দর সঙ্গে বাপ-মার আসার শব্দর পার্থক্য বুঝতে পারায় ঠিক সময়মত পেছন দিকে সরে যায়। ছুট্‌কী তা না বোঝায় এগিয়ে আসে হাঁ ক'রে। একবার জনৈক পক্ষী-তত্ত্ববিদ খাওয়ানোর ঠিক আগে শব্দ ক'রে কাসার ফলে সেয়ানা বাচ্চাগুলো নিজেদের ঢেকে ফেলেছিল, ফলে অপুষ্ট খুদে বাচ্চাটা খেতে পেয়েছিল।

এই খুদে অপুষ্ট বাচ্চা বহুসংখ্যক বাচ্চাওলা পাখির বাসায় থাকবেই। কোয়ালটিট্, ব্লুয়েটিট্, স্টার্‌লিং, চড়াই ইত্যাদি এই জাতের পাখি। এদের পনেরটা পর্যন্ত বাচ্চা হয়। স্বল্প-সংখ্যক বাচ্চা যে পাখির তার বাসায় এরা নেই বললেই চলে। ক্রেস্‌টেড টিট্, মারশ টিট ইত্যাদি এই জাতের পাখি।

এ থেকে কি এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে, বহুসংখ্যক ডিমপাড়া পাখিগুলো সব বাচ্চাদের বড় করতে অক্ষম, কেন না, সাধ্যাতীত সংখ্যায় বাচ্চা হওয়ায় খাবার জোগাড় করা তাদের পক্ষে অসম্ভব? আদৌ তা নয়। এরা বাচ্চাদের জন্য সাধ্যমত কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখে না। ফলে, পৃথিবীতে এরাই সংখ্যাগুরু, অন্যান্য জাতের পাখি তুলনায় স্বল্প-সংখ্যক।

খুদে বিটার্‌ন পাখি ডিম পাড়ে অনেক। কিন্তু বাচ্চাদের খাওয়াতে ওদের বিশেষ কোন অসুবিধে হয় না। তুলনায় ক্ষুদ্রতর নলখাগড়ার ঝাড়ে ওরা বাসা বাঁধে, আর যথেষ্ট বড় জলাশয়ের পাশে থাকায় মাছ পায় পর্যাপ্ত। কাজেই বাচ্চা বহুসংখ্যক হলেও, বিটার্‌নদের রোগাপট্‌কা, মৃত্যুমুখী বাচ্চা নেই বললেই হয়।

আরও দেখা গেছে, এই খুদে বিটার্‌ন পাখিরা বড়সড়, পুষ্ট এবং খেতে ইচ্ছুক বাচ্চাগুলোকে অপেক্ষা করিয়ে ক্ষুদ্রতর শাবকগুলোকে জাগিয়ে আগে খাইয়ে দেয়।

What is Life ?

LIFE IS A CHALLENGE .. Meet it.
LIFE IS A STRUGGLE .. Accept it.
LIFE IS A SORROW .. Overcome it.
LIFE IS A MYSTERY .. Unfold it.
LIFE IS A TRAGEDY .. Face it.
LIFE IS A JOY .. Spread it.
LIFE IS A LOVE .. Love it.
LIFE IS A DUTY .. Perform it.
LIFE IS A ROMANCE .. Enjoy it.
LIFE IS A GAMBLE .. Watch it
LIFE IS A SONG .. Sing it.
LIFE IS A BLISS .. Embrace it.
LIFE IS A GAME .. Play it.
LIFE IS A DREAM .. Realise it
LIFE IS A BEAUTY .. Admire it.
LIFE IS A JOURNEY .. Complete it.
LIFE IS A PROMISF .. Fulfil it
LIFE IS A PUZZLE .. Solve it.
LIFE IS AN ADVENTURE .. Dare it.
LIFE IS AN OPPORTUNITY .. Grasp it.
LIFE IS A GOD'S GIFT .. Cherish it

—*Anon.*

ছিন্নপত্রের নায়িকা পদ্মা

'তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মা নদীর ধারা
কাঁপন লাগা বেণুর শিরে দেখছে শুকতারা
কাজল কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়ে দিল তটের বনে বনে
ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে,---
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে,
সর্ষে তিসির ক্ষেতে
দুই রাঙা সুর মিলিয়েছিল অবাক
আকাশেতে,
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে—
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।'
---সেঁজুতি।

এই ভাল লাগার, দোল দোলানোর ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র। পদ্মা সেই কাঁখে-কলস মুখর মেয়ের মতনই কলকণ্ঠের উল্লাস-ধ্বনি এবং প্রবাহের আবেগে কবির জীবনপাত্র উচ্ছলিত করে মাধুরি ভরে দিয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঠিক যে বয়সটি উচ্ছাসময়, মাধুর্যময় এবং প্রাণের আবেগে প্রাচুর্যে ভরপুর, সেই রঙিন স্বপ্নমায়া-ঘেরা যৌবনে নিতান্ত আকস্মিক ঘটনার মতনই কবি এসেছিলেন পদ্মাতীরে তাঁর পৈত্রিক জমিদারী তদারকি করতে এবং কার্যোপলক্ষে তাঁকে সাধারণত যাতায়াত করতে হয়েছে শিলাইদহ, পাতিসহর, পাবনা, কালিগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে।

কবির অপরিসীম নিসর্গ প্রীতি, শহরের আবেষ্টনে, শাসনের শাসনের কঠিন গণ্ডীর মধ্যে এতকাল রুদ্ধ আবেগে চাপা পড়েছিল। ফলে জমিদারী তদারকীর কাজে যখন তিনি গ্রামে গ্রামান্তরে, পল্লীতে পল্লীতে সবুজ শ্যামলের সহজ প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছেছেন কবির অন্তরের নিরুদ্ধ নির্ঝরের তখনই হয়েছে স্বপ্নভঙ্গ। নির্ঝরের সহস্র ধারায় কবি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবগাহন করে গেছেন। পদ্মার সেই অপরিসীম দানের কথা কবি তাঁর জীবনে বহুবার বহু বিচিত্র প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে গেছেন।

কেবলমাত্র বাইরের এই স্থূল নিসর্গের আমন্ত্রণেই কবিমন ধন্য নয়। বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনার জ্যোতির্ময় লোকে তাঁকে উৎবর্তিত হতে সাহায্য করেছে এই পদ্মারই সান্নিধ্য। কবির এই সান্নিধ্যের অনুকৃতি কয়েকটি কালির আঁচড়ে এমনই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, আমাদের দৃষ্টির কাছে যা সত্যই বিস্ময়কর।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

যেমন ২৭নং পত্রে কবি বলেছেন---

'আজকাল দুপুরটা বেশ লাগে। রৌদ্র চারিদিকে বেশ নিঝুম হয়ে থাকে, ভারী উড়ু উড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে বোট বাঁধা আছে সেইখান থেকে একরকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম তাপ গায়ের উপর এসে লাগতে থাকে। ---আর কোন শব্দ নেই, কেবল জলের বেগে বোটটা যখন ধীরে ধীরে ঠেকতে থাকে তখন কাছিটা এবং বোটের সিঁড়িটা একরকম করুণ মৃদু শব্দ করতে থাকে।'

অথবা ২৪ নং পত্রে যেখানে---

'বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বাঁধা' এবং সেখান থেকে সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যার ম্লানিমায় কবির মনে জাগছে---'এইখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ী। এই-খানে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়।---আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে।'

ক্রমে কবির বিচিত্র অনুরণন বেড়ে চলে। ৬৭ নং পত্রে কবি আদিম সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে আপন সত্তার জন্মান্তরব্যাপী একাত্মতা অনুভব করেছেন।

৪৮নং চিঠিতে কবির আবেগ---

'এই যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি' কারণ 'এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে।' এরই ফাঁকে ফাঁকে এসে নেমেছে 'প্রবাহিণী পদ্মার' প্রবাহ ধারা। 'বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, তার নীচ দিয়ে কতরকমের বিচিত্রশক্তি অবিরামে চলেছে, ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি। ---নদীর দুই তীর অস্পষ্ট আলোকে এবং গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেগে একাধারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে।' (১১৪ নং পত্র) এই স্রোতের বেগ কবির মনেও এনে দেয় উদ্দাম প্রবাহ। সৃষ্টিকে দেয় পথের নিশানা, ভাবনার পথ নির্দেশ করে পদ্মা।

'পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে---একাধারে বুক ফুলিয়ে চলেছে, আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তাহলে নদীর স্রোতে সেইটি পাওয়া যায়। সেইজন্য এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়।' (১১৮ নং পত্র)

একটা দুরন্ত মোহিনীশক্তি কবির মন ভুলিয়েছে। কবির সমস্ত অস্তিত্ব যেন পদ্মার গতি-প্রবাহের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তাই কবি ৭৭ নং পত্রে বলেছেন---

'বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকারের একটা স্বতন্ত্র মানুষের মতো।'

যে মোহিনীশক্তি কবির চোখে মায়ার মোহাঞ্জন লাগিয়ে নিরুদ্দেশের ঘাটে ঘাটে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সে

ক্রমে সুস্পষ্ট নায়িকার রূপ নিচ্ছে। তাই অন্যত্র কবি বলেছেন—

'নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ওপারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক এক জায়গায় টগবগ করে ফুটছে, আবার এক এক জায়গায় কে যেন অস্থির জলকে দুই হাত দিয়ে চেপে সমান করে করে মেলে দিয়ে যাচ্ছে। (১১৩ নং) এবং আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর এবং ওপারের বর্ণদৃশ্যের উপরে মেঘ এবং রৌদ্রের মুহুর্মুহু নূতন খেলা চলছিল —খোলা জানলার ভিতর দিয়ে যে দিকেই চোখ পড়ছিল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল।' (১০৪নং)

কিন্তু এত দেখে, এত নিবিড় করে পদ্মাকে পেয়েও কবির তৃপ্তি হয়নি। কবি বলেছেন—'প্রতি বারে এই পদ্মার ওপর আসবার আগে ভয় হয়। আমার পদ্মা বোধহয় পুরোন হয়ে গেছে।' (৬৭নং)

কিন্তু কবি যখন বোট ভাসিয়ে দেন, তখন দেখেন, 'সে মেয়ে বোধহয় একেবারে উন্মাদ হয়ে ক্ষেপে নেচে বেড়িয়ে চলেছে। সে আর কিছুর মধ্যে থাকতে চায় না।' (৬৩ নং)

এ যেন,—

'তোমায় নতুন করে পাব বলে
হারাই ক্ষণ ক্ষণ,
ও মোর ভালবাসার ধন।'

তাই পদ্মাকে ঘিরে কবির আবেগ যেন শতধারায় উচ্ছ্বসিত, বাসনার নানামুখী প্রকাশ—' আমার নদীটি বেন ঘরসংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি, আমারই ঘরের লক্ষ্মী—আমি যখন কাছারি থেকে ফিরে আসব এই জন্য সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহ স্পর্শ পেতুম। (১০০ নং)

এভাবে কবির নদীর সঙ্গে আন্তরিকতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে ইতস্তত ছিন্নপত্রের পত্রমর্মরে। প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ফসলের দানে ভরে উঠেছে কবির অন্তরের বিপণী। বিস্তৃত আকাশ, প্রকৃতি, ঋতুরঙ্গের বর্ণরেখা, গ্রাম-গ্রামান্তর নানা রকমের লোকজন, হাটবাজার, ঘাটবাট নানা সুখ-দুঃখের ঘটনা পদ্মার স্রোতের মতনই এসেছে কবির মনের সৈকতে। আর সেই অনুভূতির অক্ষর প্রকাশ ঘটেছে বারে বারে ক্ষণে ক্ষণে ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে। এ আনন্দের প্রকাশ ভাষায় সম্ভব নয়। কারণ অনুভূতি যেখানে তীব্র, ভাষা সেখানে মৌন। কবির মন পদ্মার আনুকূল্যে আনন্দে পরিপূর্ণ —রূপ থেকে অরূপের পথে তার অনাদ্যন্ত অবিচলিত অভিসার। কবির বিস্ময়বিমুগ্ধ মনকে পূর্ণতা দান করেছে পদ্মা। আর আনন্দের এই পূর্ণতাকে কবি "রঙ্গীন কাগজের নৌকোর মতো একটি একটি করে ভাসিয়ে" (১৫০নং) দিয়েছেন অসীমের উদ্দেশ্যে।

পরিতৃপ্ত কবিমনে একটি মাত্র কামনা—'এই নিস্তব্ধ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি একটি অতি ক্ষুদ্র সোনালী চিহ্ন রেখে দেবে?' (১৩৮ নং) তাই কবি আজ তাঁর স্মারক চিহ্ন রেখে যাচ্ছেন—আজ পূর্ণিমা—এ বৎসরকার বসন্তের প্রথম পূর্ণিমা। এই কথাটা লিখে রেখে দিলুম। হয়তো অনেকদিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে,—ঐ টি টি পাখীর ডাকসুদ্ধ, এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বর্ণের একটা পোঁচ এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ। (১২ নং)

এই দৃশ্যগুলির প্রত্যেকটিই একই সূত্রে গাঁথা মালার মতন, সত্যই একদিন কবির স্মৃতিপটকে উজ্জ্বল করে মনে পড়েছিল। যৌবন জীবনের সেই শেষ প্রান্তে। আজকের ঘটনা সেদিনের স্মৃতিতে কী মধুময় রূপ নিয়েছিল, তার প্রকাশ অসামান্য,—"মনে পড়ে যখন বোটে বসে লিখতুম, চারিদিকে জল বয়ে চলেছে, মৃদু কলধ্বনিতে, দূরে দেখা যায় বালির চর ধূ-ধূ করছে, আমি চলেছি, লিখেই চলেছি, মানসী (মানস সুন্দরী) যখন শুরু করেছিলাম তখন ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর, তারপর ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এলো আলো, আকাশ রঙীন করে অস্ত গেল সূর্য। একটিমাত্র চাকর আমার বোটে থাকতো। আমার নীরব সঙ্গী, সে কখন নীরবে মিটমিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল। আমি লিখেই চলেছি মানসী। কোথায় গেল সেইদিন। সেই পদ্মার চর, ধূ-ধূ করে সোনালী বালি, সেই মিটমিটে 'শিখার ম্লান আলো, সব চিহ্ন বুকে মুছে গেছে, শুধু আছে 'মানসী।'

—মংপূতে রবীন্দ্রনাথ।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবির কবি মানসী পদ্মার প্রতি এই যে বেদনার স্মৃতিতর্পণ এর তুলনা নেই। কবির সমগ্র জীবনে পদ্মার প্রভাব যে কি বিরাট, কি গভীর, কি ব্যাপকতর তা' কবির উপরের স্বীকারোক্তির মধ্যেই জীবন্ত হয়ে আছে।

ছিন্নপত্রের নায়িকা পদ্মা, নায়ক রবীন্দ্রনাথকে যৌবনের রাজটীকায় অভিষিক্ত করে একদিন সুন্দরের অভিসারে বার হয়েছিল, কিন্তু কবির অন্তরলোকে সে নিরুদ্দেশের পথে হারিয়ে যাবার যাত্রা শেষ হয়নি কোনদিন। তাই কবির শেষ কথা—

'তোমার সৃষ্টির পথ
রেখেছ আকীর্ণ করি,
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।'

এই ছলনাময়ী পদ্মার কাছে কবির ব্যাকুলিত আর্তি তাই বারবার—

'আর কতদূরে নিয়ে যাবে
মোরে হে সুন্দরী,
বলো কোন পারে ভিড়াবে
তোমার সোনার তরী।'

কিন্তু তরী কি তীরে সত্যই কোনদিন ভিড়েছিল? এ প্রশ্নের সঙ্গে কবির মানসী-প্রিয়া পদ্মাও রবীন্দ্র কাব্যধারায় যেন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তীরে তরী সত্যই ভিড়েছিল কিনা, রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন পত্রোত্তর সমগ্র কাব্য-সাহিত্যে কবি তারই উত্তর খুঁজে ফিরেছেন বারে বারে শত সহস্রভাবে।

তন্ত্র-পরিচয়

সত্যবান

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

শক্তির উপলব্ধি ও দেহতত্ত্ব

শক্তির তত্ত্ব-বিচার

কাউকে পূজা করতে হলে প্রথমেই তো প্রয়োজন—তাকে বুঝে নেয়া। ঠিক সেইভাবে শক্তিকেও পূজা করার আগে প্রয়োজন তাঁকে উপলব্ধি করা। দেখা যাক শক্তি বলতে আমরা কি বুঝি।

প্রথম বলি, আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকরা শক্তির যা সংজ্ঞা বের করেছেন। তাঁরা বলেন এ জগতে বস্তুমাত্রেরই আছে শক্তি, যার রূপ যেখানেই বদলাচ্ছে—সেখানেই ঘটছে শক্তির ক্রিয়া। এ হ'লো তাদের মতে স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

এবার বলি আমাদের দেশে তন্ত্র-শাস্ত্রে শক্তি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে। তাতে পাই—এই যে, সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে—যাকে ভারতীয় দর্শনের ভাষায় প্রপঞ্চ বলা হয়—তার মূলীভূত কারণ হচ্ছেন আদ্যাশক্তি—যাঁর অন্য নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে সর্বশাস্ত্রেই প্রধান ব'লে মেনে নেয়া হয়েছে। যখন সেই প্রকৃতিকে নাম দেয়া হ'লো কালী—তখনও সাধকরা বললেন—'কালীপ্রধানা হি।'

আবার বিজ্ঞান এ কথাও প্রমাণ করেছে যে, শক্তি যেখানে ক্রিয়াশীল নয়, সেখানে বস্তুর কোন রূপান্তর ঘটে না। তন্ত্রশাস্ত্রেও পাই—শক্তিকে স্তম্ভিত ক'রে রাখার প্রক্রিয়া —যে প্রক্রিয়ায় সাধক চিরযৌবন লাভ করতে পারেন, ইচ্ছা-মৃত্যুও লাভ করতে পারেন পরমায়ুকে দীর্ঘায়ত ক'রে। কিন্তু সে সাধনার কথা থাক—আগে দেখি, শক্তিকে কি উপায়ে মানুষ উপলব্ধি করলো।

তন্ত্রশাস্ত্রে ঐ ক্রিয়াশীল শক্তিকে বলা হয়েছে সগুণ, যা নির্গুণ ভাবকে রূপায়িত করে। পদার্থ বিদ্যায় যে স্ট্যাটিক ও ডিনামিক এনার্জির উল্লেখ আছে ঐ ক্রিয়াগত শক্তি আর ভাবগত শক্তির পার্থক্য যেন তেমনি ধরণের—যদিও তারা পরস্পর অচ্ছেদ্য।

এ কথাটা বোধ হয় আরও এক ভাবে বলা যায় যে, স্ফুরণ যার নেই সেই শক্তিকেই আমরা ভাবমাত্র বলতে পারি—যার সত্তা আছে কিন্তু আকার বা প্রকাশ নেই। সে যেন জ্যামিতির বিন্দু যার অবস্থান আছে কিন্তু আয়তন নেই। সেইভাব বা নিষ্ক্রিয় শক্তিকে রূপ দিতে গেলেই তো প্রয়োজন হয় সক্রিয় শক্তির। বাস্তবিকপক্ষে ভাব-মাত্রেই হচ্ছে নির্গুণ আভাস, যা একেবারেই অনির্বচনীয়। যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দান বা গ্রহণ করাও যায় না —যতক্ষণ সেই ভাবটিতে রূপ সঞ্চারিত না হয় সগুণশক্তির যোগে; যেমন দেখি—কবি কিছু অনুভব করলেন, কিংবা সুরকার কি চিত্রকর কি ভাস্কর কিছু অনুভব করলেন, অথবা আরো সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষ কিছু কল্পনা করলেন। যতক্ষণ সেই অনুভব বা ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যেই রয়ে গেল—ক্রিয়ার সাহায্যে তা কবিতায়, কি গানে, কি চিত্রে, ভাস্কর্যে অথবা কথাতে রূপলাভ না করলো —ততক্ষণ পার্শ্বস্থ অন্য কোন ব্যক্তিই সন্ধান পেলেন না কোথায়, কখন, কে কি অনুভব বা কল্পনা করেছেন। আবার যতোক্ষণ একের মনোগতভাব কোন ক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যের অধিগত না হয়, ততক্ষণ গড়ে উঠতেই পারে না কোন পরিবার বা গোষ্ঠী; ধর্মসমিতি বা সমাজ কি রাষ্ট্র গ'ড়ে ওঠা তো দূরের কথা। তাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন এই ক্রিয়াশীল শক্তিকে—তারি বলে ঘটছে সকলের সঙ্গে সকলের সংযোগ। একথা তান্ত্রিকরা ভাল করেই জানতেন—তাই শক্তিকে তাঁরা বলেছেন, 'সংসারবন্ধ-হেতু যোগমায়া।'

মানুষের দিক থেকে বিচার করলে দেখি—বাক্ই হ'চ্ছে প্রধানতম শক্তি, যা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের মূলসূত্র। দেবীসূক্ত, যা পাই ঋগবেদের দশম মণ্ডলে তার দেবতা হচ্ছেন এই 'বাক্।' অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে আত্মশক্তিরূপে বোধ ক'রে এই সূক্তের প্রচার করেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অম্ভৃণ শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে মুখব্যাদান করা। বাস্তবিকপক্ষে মুখ না খুলে কেউই পারেন না বাক্য উচ্চারণ করতে। যাই হোক ঐ সূক্তটিতে আটটি মন্ত্র আছে। তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করি—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।

●

অহমেব বাত ইব প্রবামি
আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ইত্যাদি

আমিই রাজ্যের অধীশ্বরী, আমিই এনে দিই সবায়ের কাছে ধনরত্ন, সমস্ত জ্ঞান আমারই অধিকারে, যজ্ঞের কাজে আমি হচ্ছি প্রথম। ---আমিই বিশ্ব-ভুবন সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে বায়ুর মতই বিচরণ করি—ইত্যাদি।

ঐ মন্ত্রগুলি রীতিমতভাবে বিশ্লেষণ করলে বেশ বুঝি যে, বাক্শক্তি কি রাষ্ট্র পরিচালনা কি সংসার রচনায় আর কি বা যাবতীয় জগৎকার্যে কি বিপুল সাহায্যই না করে। এই দেবীসূক্তটি পাঠ করার বিধি আছে শক্তিপূজায় মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী সপ্তশতী পাঠের অঙ্গরূপে—এ কথাটি স্মরণে রাখবার।

আবার বাক্ হচ্ছে শব্দমাত্রেরি অন্য নাম। তাই দেখি—'অভিনয় দর্পণ'। গ্রন্থের প্রথমেই নন্দিকেশ্বর শিবকে এই ব'লে প্রণাম ক'রছেন—

আংগিকং ভুবনং যস্য
বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ং।
আহার্যং চন্দ্রতারাদি
তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥

প্রণাম করি সেই সাত্ত্বিক শিবকে, সমস্ত ভুবন যাঁর অংগ, শব্দমাত্রেই যাঁর বাক্য, চন্দ্রতারাদি যাঁর আভরণ।

বাস্তবিক শব্দমাত্রেই তো ঈশ্বরের বাক্য। এ সত্য কেবল আমাদের দেশেই নয়, ইউরোপেও প্রচলিত বাইবেলের মাধ্যমে। মানুষ অবশ্য বিশেষ সাধনা করতে পেরেছে সেই বাক্য নিয়ে কারণ সৃষ্টি পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দেহযন্ত্র তার অধিকারে। তাই স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণকে আয়ত্তে এনে মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে।

শব্দ যে শক্তির কতখানিকে প্রকাশ করে তা গীতায় উক্ত 'শব্দব্রহ্ম' কথাটি থেকেই জানতে পারা যায়। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখি —'বাগ্বৈ ব্রহ্ম'—বচনটি।

বর্তমানকালে পদার্থবিজ্ঞান তো এই শব্দকে পাঁচটি তত্ত্বের মধ্য বা কেন্দ্র বলেই স্বীকার করে। তাতে পাই হিট্ বা তাপ, লাইট বা আলোক, সাউণ্ড বা শব্দ, ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ ও ম্যাগনেটিজম্ বা চুম্বকশক্তি। আমাদের শাস্ত্রে যে পঞ্চতন্মাত্র আছে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নামে তার সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞানের ঐ পাঁচটি তত্ত্বের চমৎকার মিল। শব্দ কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানেও যেমন কেন্দ্রস্থান অধিকার ক'রে আছে, আমাদের শাস্ত্রেও তেমনি প্রধান স্থানে গণ্য।

এই শব্দ যার নেই, তার অন্যান্য গুণ অর্থাৎ তাপ, আলোক ইত্যাদি থাকলেও তাকে সাধারণত জড় বলেই গ্রহণ করা হয়, যদিও সেই জড়ও আঘাত পেলে শব্দ প্রকাশ করে। যাই হোক, ঐ শব্দই সবায়ের সঙ্গে সবায়ের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। যার কোন শব্দ নেই তার পরিচয় জানা যায় না—সে তাই অতি ভয়াবহ। শব্দই যে শক্তির এক বিশেষ প্রকাশ ও পরস্পরের সংযোগের হেতু এ তথ্য কি প্রাচীন আর কি অর্বাচীন সমস্ত শাস্ত্রেই উদ্ঘাটিত। চণ্ডী সপ্তশতীর প্রথম চরিত্রে তাই দেখি, ব্রহ্মা দেবীকে স্তব ক'রছেন—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি
বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা॥

তুমি সকলের আহ্বানযোগ্য, তুমি সকলের অন্ন, তুমি বষট্কার বা নমস্কার-যোগ্য, তুমি উদাত্তাদি স্বরস্বরূপ।

মানুষ যেদিন সেই শব্দশক্তিকে আয়ত্তে এনে ভাষা সৃষ্টি করলো—সেই দিন থেকেই চলেছে গোষ্ঠী বা সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা। যুগে যুগে সেই সমাজের রূপ বিবর্তিত হ'য়ে চলেছে, আর হবেও, যতকাল ঐ সদক্রিয়াশীল শব্দশক্তি থেকে বা ভাষা থেকে মানুষ বঞ্চিত না হয়। সেই শক্তি কিন্তু এই দেহযন্ত্রেরই একটি প্রকাশ। কিভাবে এই দেহযন্ত্র থেকে বাক্য স্ফুরিত হয় তার দিকে তাই মানুষের দৃষ্টি অতি প্রাচীনকালেই আকৃষ্ট হয়। ক্রমে মানুষ এই দেহযন্ত্র-টিকেই পরিপূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা ক'রতে থাকে—সে চেষ্টা যে আজো চলেছে তার প্রমাণ দেবেন আধুনিক কালের শরীর-বিজ্ঞানীরা।

ঠিক কবে থেকে যে মানুষ নিজের দেহকে বিশ্লেষণ করার দিকে ঝুঁকেছে, তা আজকের দিনে বলা সম্ভব নয়। কারণ সে যুগ আমাদের কাছে একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যায়। কিন্তু এই দেহগত শক্তির উপলব্ধি করাই যে সদ্ধর্ম—তা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকরাও একবাক্যে স্বীকার করছেন। মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার তাই আজকে শেষ নেই। কঠিন প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা চাইছেন—মানুষ মাত্রকেই আরো কর্মক্ষম আরো বুদ্ধিমান ক'রে তুলতে। কারণ প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছে সমগ্র সমাজের মূল অংশ—যদি প্রত্যেক অংশকে সর্বশক্তিমান ক'রে তোলা যায়—সমগ্র সমাজও তাতে সমৃদ্ধিশালী হ'বে।

তান্ত্রিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক শক্তি

তর্ক উঠতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞাপন মানুষকে যে শক্তিতে অধিকারী বা শক্তিমান ক'রে তুলতে চাইছে, তা একেবারেই বস্তুতান্ত্রিক, বহিরংগ ও বহির্মুখী—কিন্তু ভারতে যে শক্তিকে তন্ত্রমতে পূজা করা হ'তো, তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক, অন্তরঙ্গ, অন্তর্মুখী। তাই আধুনিক শক্তি সর্বক্ষয়কর আর ঐ পৌরাণিক শক্তি সর্বশ্রেয়কর। সুতরাং বিজ্ঞানের তথাকথিত শক্তির সঙ্গে তন্ত্র-পূজিত শক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করতে যাওয়াই মূঢ়তার পরিচয়।

কিন্তু পণ্ডিতজনের চরণে একটি নিবেদন জানাবার আছে। তাঁরা কি নিশ্চয় ক'রে নির্ধারণ করতে পেরেছেন এই জগৎ ও জীবন ব্যাপারের মধ্যে বস্তু কতটুকু আর ভাব কতটুকু কিংবা বহিরংগ কতটুক আর অন্তরংগ কতটুকু। অথবা আরো স্পষ্ট ক'রে বলি—তাঁরা কি জেনেছেন আত্মা কতটুক আর দেহ কতটুকু? আজও তো দেখি যে-কোন আধি বা মানসিক পীড়া এবং ব্যাধি বা দৈহিক পীড়া চিকিৎসা করতে হয় নানা বস্তুর সংমিশ্রণে ঔষধ প্রস্তুত করে। তাঁরা কি বুঝিয়ে দেবেন জড়শক্তির প্রয়োগ করলে কি ক'রে তা চিৎশক্তির বা মানুষ প্রভৃতি প্রাণীর উপকারে আসে?

এ বিষয়ে তো পণ্ডিতজনেরা আজো নিজেদের মধ্যে তর্কে ব্যস্ত। কোন স্থির সিদ্ধান্তেই তো তাঁরা পৌছতে পারেন নি—যা সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বসম্মতি-সিদ্ধ। তাই দেখি একই ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করছেন তাঁরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে—ফলে গড়ে উঠছে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এমন কোন মতই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না যা সামগ্রিক বা সার্ব-জনিক। তাই এই কথাই বার বার মনে হয়—যাঁরা জীবজগৎকে ব্রহ্ম আর মায়া, পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিংবা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা—এই দুইভাগে ভাগ করছেন—তাঁদের কোথাও না কোথাও মারাত্মক ত্রুটি আছে। ত

যদি না থাকতো, তাহলে এতোদিনে তাঁরা নিশ্চয়ই একটি সর্বসম্মত স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারতেন—যেমন পেরেছেন বৈজ্ঞানিকরা। আর সাধারণ মানুষও তাঁদের সেই উদার মত অনুসরণ করে' বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডি ও জটিলতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেত। তখন তো তারা ধর্মকে নিত্য কর্মের অংগীভূত করে জীবনে সিদ্ধিলাভ ক'রতো।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল—ভাগবত মহাপুরাণে কৈলাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, সেই কৈলাসে পাঁচ প্রকার সিদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস —তাঁদের নামগুলি অত্যন্ত বিচিত্র। সেই সিদ্ধরা হ'লেন—জন্মসিদ্ধ, ঔষধিসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, মন্ত্র-সিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ। এর মধ্যে ওই ঔষধি সিদ্ধদের নাম করা হয়েছে,—তার [illegible] বিশেষ বিচার্য।

সাধারণের ধর্মজ্ঞান

কিন্তু যা ব'লছিলাম—এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, আজকের মানুষ ধর্মকে সভয়ে পরিহার করে চলেছে, ঐ পণ্ডিতজনের গুরুগম্ভীর বাক্যাড়ম্বর আর আনুষ্ঠানিক আতিশয্য দেখে। যে কোন একটি পথচারীকে যদি প্রশ্ন করা যায়—তিনি ধর্ম সম্বন্ধে কি ধারণা রাখেন—তৎক্ষণাৎ এই উত্তরই তিনি দেন যে, "অন্ন সমস্যার সমাধান করতেই অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছি। এখন কি ধর্মের দিকে মন দেবার সময় আছে? কোন ধর্ম না মেনেও তো বেশ দিন কেটে যাচ্ছে।"

সত্যিই কি ধর্মসাধনাকে বাদ দিয়েও মানুষ জীবন ধারণ ক'রতে পারে? তাই যদি সত্য হয়, তবে কি দরকার ধর্ম নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবার? আজকে তো আমরা কেবল ব্যবহারিক মূল্য বিচার করেই জীবনে ত্যজ্য কি আর গ্রাহ্য কি তার হিসাব করি। ধর্মের যদি কোন ব্যবহারিক মূল্যই না থাকে সে যদি কেবল পণ্ডিত-জনের তর্কসেব্য ও সময় ক্ষেপণের বস্তুই হয়, তবে আর ধর্মপালনের কথা কেন ওঠে?

ধর্মের প্রয়োজন

তাই তো আজকে একান্ত প্রয়োজন জেগেছে ধর্মের যা কিছু অসার জটিলতা ভেদ ক'রে —তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য শস্য কি আছে তারি বিচার করার। নিত্য এ জগতে যা ঘটে —তা থেকে এই সত্যই তো আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, —ভাব থেকে রূপ বা বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, আবার বস্তু থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে ভাব। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ না করে পারা যায় না যে, যিনি যত বড় অধ্যাত্মবাদী হোন—দেহরক্ষার জন্যে প্রতিক্ষণেই তাঁকে নানা বাহ্যবস্তুর ওপরে নির্ভর করতে হয়। কারণ ভাবমাত্র আহরণ বা সম্বল ক'রে থাকলে তাঁকে আর অধিক দিন দেহধারণ করে থাকতে হয় না, নিশ্চিহ্ন হয়ে তিনি ভাবেই বিলীন হয়ে যান।

আরো এক কথা, আজ পর্যন্ত যত্নে যাঁরা আধ্যাত্মিক শক্তি বা সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা তো কই কেউ সেই সিদ্ধি নিয়ে নিষ্ক্রিয় নিরীহ হয়ে একা কাল কাটাতে পারেননি বরং বেশী করেই তাঁরা বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছেন, এই বস্তুবহুল সংসারের ধূলি-কলংকজঞ্জাল মলিন মানুষকে; যদি আধ্যাত্মিকতা বা সিদ্ধি বা ভাব, বস্তুকে বাদ দিয়ে কিছু হয়, সংসার ধর্মকে বাদ দিয়ে কিছু হয়, তাহলে যে অরবিন্দের দিব্যভাব জেগেছিল, যে রামকৃষ্ণের মহাভাব জেগেছিল বা যে চৈতন্যদেবের রাধাভাব জেগেছিল, কেন তাঁরা সবাই সেই ভাবে বিলীন হয়ে না গিয়ে ঘোর সংসারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে নানা বিষয় ও বস্তুর মাধ্যমে তাদের আনন্দ ও শান্তি দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন? কিংবা কেনই বা বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ ক'রে জনগণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন? যিশুখৃষ্ট ও হজরৎ মহম্মদ সম্বন্ধেও ঐ একই প্রশ্ন করা যেতে পারে আর বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিদের সম্বন্ধে তো বটেই।

ভাব লাভ ক'রে কেউই কখনো পারেন নি—সেই ভাবকে সবায়ের কাছে না জানিয়ে। কারণ সেই ভাব হচ্ছে আত্মিস্বরূপ—সর্বদাই প্রকাশ হওয়াই তার ধর্ম। তাই কোন ভাবই কারো একান্ত বস্তু নয়—তা জাগামাত্রই সবায়ের হয়ে যায়—এমনি তার রীতি। সেই ভাবকে কেন্দ্র করেই জগতে জেগেছে নানা ধর্মের বিধিনিষেধ। মজা এই যে, সেই ভাব প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই নিত্য বিরাজমান। এর সম্বন্ধে চণ্ডী সপ্তশতীতে একটি চমৎকার মন্ত্র আছে—তাতে পাই—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য
জন্তোর্বিষয়গোচরে॥

যা কিছু জগতে জন্মায়, তাদের সবা- য়েরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে।

সেই জ্ঞান হচ্ছে ঐ ভাবের অপর নাম। যে ভাব বা জ্ঞান কোথাও অস্ফুট কোথাও অর্ধস্ফুট আর কোথাও বা পরিস্ফুট। সেই জ্ঞান বা ভাবকে সর্বত্র সুপরিস্ফুট ক'রে তোলার জন্যেই ধর্মের প্রয়োজন।

শক্তির উপলব্ধি

সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যেই প্রথম মানুষের দৃষ্টি পড়লো নিজের শক্তির দিকে। কি শক্তি আমার আছে, —তা না জেনে যদি সাধনা করতে যাই তাতে তো কেবলি পাব বাধা আর বিঘ্ন। তাই আগে বুঝে নেয়া দরকার আমার শক্তি কতটুকু বা আমার আধার কতখানি ধারণ করতে পারে।

তবে মানুষের দৃষ্টি প্রথমেই তার নিজের শক্তির দিকে ফেরেনি। তাও আমরা জানতে পাই মানুষের জ্ঞানোদয়ের ক্রমবিশ্লেষণ করে। তা থেকে জানা যায় যে, জড়বস্তুর চর্চা করতে করতেই মানুষ ক্রমশ নিজের শক্তি সম্বন্ধে অব-হিত হয়েছে। মানুষ তো আদিকাল থেকে চোখের সামনে পেয়েছে নানা বস্তু, সেই বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তারা পৌঁছে যাচ্ছে ভাবে। একথা বিজ্ঞানজগতের দিকেও যেমন সত্য, অধ্যাত্মজগতের দিকেও ঠিক তেমনি সত্য। আজকে কেউ যদি বলেন, যা বস্তুগ্রাহ্য তা ভাবগ্রাহ্য নয়, কিংবা তার

বিপরীত প্রতিজ্ঞা—তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে, তিনি খণ্ডিতবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন।

আরো এক কথা—যাঁরা বলেন যে, এক ও অদ্বৈত ব্রহ্ম বা নির্গুণ সত্তাই জগতের আদি কারণ, যখন তিনি ইচ্ছা করলেন—"একোঽহং বহু স্যাম" অর্থাৎ এক থেকে বহু হবো, তখন মায়া বা সগুণ শক্তিকে দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করিয়ে নিলেন। তাঁদের ঐ যুক্তি থেকেই তো প্রকাশ পাচ্ছে যে, ব্রহ্মের প্রকাশ বা বিবর্তন হচ্ছে মায়া বা শক্তি, আর সেই শক্তির প্রকাশ বা বিবর্তন হচ্ছে নানারূপময় জগৎবৈচিত্র্য। যদি মেনে নেয়া যায় যে, জগৎ নিত্য চলেছে ক্রম-বিকাশের পথে, তাহলে তো বলতেই হয় যে, ব্রহ্মের পরিণতি শক্তিতে আর শক্তির পরিণতি জগৎসৃষ্টিতে। এ কথার প্রমাণ তো উপনিষদেই পাই সেই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—আপ্তবাক্যটিতে। আবার চণ্ডী সপ্তশতীতেও তো একটি মন্ত্র পাই—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি-
স্তয়া সর্বমিদং ততম্॥

তিনিই নিত্য বিরাজমান, এই জগৎ হচ্ছে তাঁরই মূর্তি, এখানে যা কিছু আছে সবের মধ্যে তিনি প্রসারিত হ'য়ে আছেন।

মনে পড়ে যায়—পদার্থ বিজ্ঞানের মধ্যে যে দর্শনবাদ প্রতিষ্ঠিত। পদার্থ বিজ্ঞানে পাই, অদৃশ্য বায়ুভূত অবস্থা থেকে বস্তু বা ইলেকট্রন প্রোটনযুক্ত পরমাণুগুলি যখন ঘনত্ব লাভ করে, তখন দেখা দেয় তরল রূপ, আর সে তরল যখন আরো ঘনীভূত হয় তখনি পেয়ে যাই কঠিন রূপটি। বলা বাহুল্য এই সত্যকে বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ ক'রেছেন। এর বিপরীত সত্যকেও সমভাবে প্রামাণ্য অর্থাৎ যে কোন কঠিন দ্রব্য তরল বা বায়ুভূত অবস্থা লাভ করতে পারে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা। এর একটি চমৎকার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় যে-কোন লোহা গলানোর কারখানায়। তাপের মাত্রা বৃদ্ধি ক'রে কঠিন লোহাকে তরল করা হয় সেখানে। তখন সেই তরল লোহা জলের মত ফুটতে থাকে এবং বাষ্প হয়ে উড়েও যায়।

দেহ ও আত্মার ভেদাভেদ

সুতরাং যদি বলা যায় যে, আত্মা বা ভাব জমতে জমতে দেহরূপ ধারণ করে, আবার এই দেহই গলতে গলতে আত্মা বা ভাবে পরিণত হয়, তা কি অস্বীকার করা যায়?

জীবতত্ত্ব-বিজ্ঞান থেকে জানতে পাই যে, বংশবৃদ্ধির প্রেরণা আমাদের মনে প্রথমাবস্থায় কামনা বা ভাব মাত্র থাকে। মনে পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
এলেম আমি কোথায় থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,—
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।

সেই ইচ্ছা বা ভাব তো আসলে বায়ুভূত অবস্থা—কালক্রমে যতই সে ঘনীভূত হয়, ততই পরিণত হয় তরল রসে। অবশেষে সেই রস এমনি কঠিন অস্থি নির্মাণ করে যে, যুগ যুগ ধরে মাটির সংস্পর্শে থাকলেও তা নষ্ট হয় না। তাই তো প্রাগৈতিহাসিক যুগে লুপ্ত প্রাণী বা জীবজন্তুর করোটি ও কংকাল আজও প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভূগর্ভ খুঁড়ে বের করতে পারছেন। আর তারি সাহায্যে সেই সব জীবজন্তুর দেহসংস্থান কেমন ছিল তাও গড়ে তুলছেন।

শক্তি ও জগৎসেবা

শক্তি বা সিদ্ধিলাভ ক'রে সবাই তো দেখি জগৎকে সেবা করার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশ স'রে আসেন শিষ্যজনেরা মূল গুরুর উপদেশ থেকে। সে কেমন ভাব তাই বলি।

প্রথম বুদ্ধদেবের প্রচারিত পথের যে ইতিহাস পাই, তারি আলোচনা করি। বুদ্ধদেব যে শক্তি উপাসনা করেই সিদ্ধিলাভ করেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বিখ্যাত পুস্তক—বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস-এ মনসা মঙ্গলের তথ্য বিচার করতে গিয়ে। যাই হোক, সিদ্ধিলাভ ক'রে বুদ্ধদেব প্রচার করলেন অষ্টাঙ্গিক মার্গ—যে উপায়ে জগৎকে সেবা করা সম্ভব। তাঁর অনুগত শ্রমণ-শ্রাবকেরা তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বটে—কিন্তু সাধনা করতে লাগলেন পৃথক মতে। তাঁরা কেউ গেলেন না শক্তিসাধনার পথে, তাঁরা স্বয়ং বুদ্ধদেবকেই অবলোকিতেশ্বর অর্থাৎ যে ঈশ্বর নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন অথবা যে ঈশ্বরকে সবাই অবলোকন করেছে এই নাম পূজো করতে সুরু করলেন। প্রচার করলেন তাঁরা যে সিদ্ধার্থ গৌতম শাক্যমুনি ছাড়া আর কেউ বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারবে না বা তথাগত হতে পারবে না। এর থেকে বেশ মনে হয় নাকি যে, তাঁরা সবাই মূল গুরুর উপদেশ কেবল আংশিকভাবেই গ্রহণ করলেন? তাই শক্তিলাভ করার যে চেষ্টা ছিল গৌতম বুদ্ধের তাঁরা সে চেষ্টার দিকে না গিয়ে তাঁর প্রদর্শিত মার্গকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আঁকড়ে ধরলেন। তার ফল কি হ'লো তার কথা পরেই বলছি।

শিষ্য সম্প্রদায়ের জন্য মূল গুরুর উদ্দেশ্য যে এইভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তার আরো দু' একটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করলে বোধহয় অবান্তর হবে না।

একটি হ'লো—চৈতন্যদেবের যাঁরা ভক্ত—তাঁরা ভাল করেই জানেন যে মহাপ্রভু রাধাশক্তির উপাসনা করেই রাধাভাবদ্যুতি সুবাসিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই চৈতন্যদেবকেই অর্চনা করতে আরম্ভ করেন।

আবার রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধেও ঐ কথা সত্য। সকলেই জানেন যে, তিনি বামনীর উপদেশে চৌষট্টিখানা তন্ত্রের মতে সাধনা করেন, তাঁর ইষ্টদেবী ছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কালীমূর্তি—যাঁর নাম ভবতারিণী। কিন্তু রামকৃষ্ণ-শিষ্যরাও শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ ভজনার প্রবর্তন করেন। শোনা যায়—মহাকবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষই রামকৃষ্ণদেবের পায়ে প্রথম অঞ্জলি নিবেদন করেন। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করেন বেলুড় মঠে।

অরবিন্দ-ভক্তরাও তো ঐ পথের পথিক। যদিও অরবিন্দ স্বয়ং তন্ত্রমতেই দিব্যভাবের সাধনা করেছিলেন—"দি মাদার" বা জগন্ময়ী মা কালীই ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবী।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সাধনবলে নিজের শক্তিকে যে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি---সে কি করে পারবে জগৎকে সেবা করতে? এই কথা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে বারে বারেই প্রকাশ করেছেন যে,---প্রথমে লাভ করতে হবে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি। যে শক্তিহীন সে তো সহজেই পথভ্রষ্ট হয়ে কলুষিত ক'রে তোলে সংসারকে---সেই তো জাগায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অধর্ম।

এর প্রমাণ ঐ বৌদ্ধধর্মের অনুগতদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁদের কথাই বিশেষ করে বলি---কারণ বর্তমানে অধিকাংশ প্রচলিত ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, তার মূলে আছে বৌদ্ধতন্ত্রমত।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ শক্তিসাধনার চেষ্টা না ক'রে কেবল গৌতমবুদ্ধের নির্দেশিত পথে অষ্টাংগিক মার্গের অনুষ্ঠানটুকুই পালন করতে লাগলেন। তাঁদের আদর্শ হীনযান নামে চিহ্নিত হলো। এই আদর্শে যে বৌদ্ধধর্ম সম্যক বিকাশলাভ করেনি, তা প্রকাশ পেল সম্রাট কণিষ্কের যুগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে যখন কুণ্ডলবন নামে বৌদ্ধ সংঘারামে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত বসুমিত্র আর তাঁর সহাধ্যক্ষ ছিলেন সংস্কৃতে বুদ্ধচরিত রচয়িতা অশ্বঘোষ। সেই সময়েই বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন প্রচার করলেন মহাযান বৌদ্ধ আদর্শ।

যাঁরা হীনযান মত অনুসরণ করতেন---তাঁরা তো বলতেন---বুদ্ধদেবকে আমরা কেবল পুজো করতেই পারি---আমরা কেউই বুদ্ধ হ'তে পারি না। আর পারি আমরা বুদ্ধের নির্দেশ পালন ক'রে যেতে।

বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন যে মহাযান মতের প্রবর্তন করলেন---তাতে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, সাধনার বলে প্রত্যেক ব্যক্তিই পারেন শক্তি বা সিদ্ধিলাভ করতে এবং বুদ্ধত্ব লাভ করতে। তবে সেই সিদ্ধি বা বুদ্ধত্ব হ'বে প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী সীমিত। অর্থাৎ তিনি বললেন---গৌতমবুদ্ধ আমরা কেউই হ'তে পারব না, কারণ কোন দু'টি মানুষ জগতে একই ছাঁচে ঢালা নয়---কিন্তু আমি যদি সাধনা করি, তাহলে আমার মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত আছে, তাকে পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তুলতে পারি---সেই হচ্ছে আমার সিদ্ধি বা বুদ্ধত্ব। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই পারেন তাঁর নিজস্ব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে সিদ্ধিলাভ করতে।

আধুনিককালে অনেকেই মনে করেন যে, ঐ হীনযান বৌদ্ধমতের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কোন সাদৃশ্য আছে—বৈষ্ণবরাও বলেন যে, জগতে কৃষ্ণ মাত্র এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ, বাকী যা কিছু সবই রাধা বা প্রকৃতি। সেই রাধা পারেন কেবল কৃষ্ণের আরাধনা করতে।

আর মহাযান বৌদ্ধমতের সঙ্গেও তাঁরা তেমনি সাদৃশ্য দেখান শাক্তধর্মের। শাক্তরা বলেন যে, প্রত্যেকের মধ্যে যে সুপ্তশক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী আছেন---তাঁকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই সবাই শিবত্ব লাভ করতে পারেন। কিন্তু সে কথা থাক। (ক্রমশ।

সবধর্মের সাহিত্য!

॥ শ্রীরামকৃষ্ণজগতের কৃপাকথা ।

• লীলারহস্য কথা •

একদিকে যেমন নৈরাশ্যের চিত্র অন্যদিকে আবার দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর, কত ভাল ছেলে এবং মেয়েরা মায়ের কোল উজ্জ্বল করে সমাজে জন্ম নিচ্ছে। তারা নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অমৃতময়ী বাণী এবং জীবনাদর্শে তাদের জীবন গঠন করে জগতে নতুন যুগ আনয়নের জন্য জীবনপাত করবে।

গদাধর বাল্যজীবন শেষ করে কলিকাতায় এলেন। রাণী রাসমণি তখন কলিকাতায় বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী জমিদার পত্নী। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। গদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই মন্দির স্থাপনে এবং প্রতিষ্ঠায় রাণীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হলেন এবং সেই পুণ্যবান দক্ষিণেশ্বরেই গদাধর ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণরূপে গৃহীত এবং পরিচিত হলেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখবার কোন প্রচেষ্টা নেই। যোগ্যতর ব্যক্তিরা প্রভূত ধারাবাহিক জীবনী লিখেছেন এবং লিখছেন। এই জীবনী যে ভবিষ্যতে দেশ-বিদেশে নানাদিক থেকে আলোচিত হবে এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সেইসব পাঠ করে পরমানন্দের অধিকারী হবেন তাতে লেখকের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠাকুরের জীবনের মুখ্য ঘটনাগুলো নিয়ে অনুধ্যান এবং তার কিছুটা পাঠক-পাঠিকাকে উপহার-স্বরূপ দান।

এই সময়ে বন্ধু এলেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান সুরু হলো। বন্ধু বললেন—'ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর। আমিও তাতে অংশ গ্রহণ করতে চাই।'

আমি বললাম, 'বেশ তাই হউক।' বন্ধু তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত যে রামকৃষ্ণ জীবনে যা কিছু ঘটেছে তার খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি সমাজের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের কল্যাণের জন্য ঘটেছে।'

আমরা এই তত্ত্বটিকে পরখ করে দেখি চল। অবশ্য এই কথা

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বলে রাখি, ও বামন হয়ে চাঁদ ধরার চেষ্টার মত হবে। কারণ রামকৃষ্ণজীবনের অতল জলধিতে ডুব দেওয়া তোমার আমার কর্ম নয়। তা যাঁরা দেবেন তাঁদের চেহারা অন্যরকম। কথা বলার ভঙ্গি অন্য রকম, অনুষ্ঠানের ক্ষমতা অন্য রকম, আবার তাদের বিশ্লেষণের ক্ষমতা অন্য রকম। তাঁরা বিশেষ শক্তি নিয়ে জগতে আসেন তাঁরা ঠিক আমাদের মত নন।

আচ্ছা বলত বন্ধু, পিতা রামভক্ত, বিশিষ্ট রাম উপাসক। স্বপ্নে রামশিলা পেয়েছিলেন। পরিবারে সেই রামশীলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের বর্তমানে এখনও পূজিত হয়ে আসছেন, অথচ এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বুঝা যায় না ভগবান রামকৃষ্ণের জীবন দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরের সঙ্গে কেন জড়িত হলো? তাও যদি হলো তবে কৈবর্ত্ত জাতীয়া রাণী রাসমণির বাড়ীতে কেন তিনি বিশেষভাবে যুক্ত হলেন? বল, বন্ধু, বল। বিশেষভাবে অনুধ্যান করে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের এই দিকটার উপর আলোকপাত কর। তোমার ত্যাগ আছে, তপস্যা আছে, বিদ্যা আছে সবের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের উপর অপূর্ব ভক্তি এবং নিষ্ঠা আছে—বল বন্ধু, তুমি বল।

বন্ধু সুরু করলেন—তুমি ঠিক বলেছ এর ভিতরে এক অপূর্ব সত্য নিশ্চয়ই নিহিত আছে। রামনিষ্ঠ পিতার সন্তান, রামের উপাসনা রাম-চিন্তা, রাম-ভজন পরিত্যাগ করে কালীরূপের দিকে মেতে গেলেন কেন? এর শক্তি-দীক্ষা নেওয়ার পেছনে একটা বিশেষ ব্যাপার রয়েছে যেটা আমরা উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করবো। আমরা আগেই দেখেছি যে ঠাকুর বাল্যকাল থেকে 'চাল কলা বাঁধা' বিদ্যা থেকে মনটাকে তুলে নিয়েছিলেন। অনেক সন্ন্যাসী সঙ্গ তাঁর ঘরে বসেই হয়েছিল। তার উপরে আবার তখনকার দিনে কামারপুকুরে বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের মত কথকতা, যাত্রা ইত্যাদিতে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্মের মোটামুটি তত্ত্বগুলি জানবার অনেক সুবিধা ছিল। কিন্তু রাম সাধনাতে জীবন সুরু না করে কালী সাধনা কেন করলেন? তার পেছনে বিরাট সত্য আছে।

দেখ ভাই, রাম ভজন, কালী সাধন, কৃষ্ণ পূজন এগুলো পুরাণের ধর্ম। উপনিষদের সূত্রে এসব কি এভাবে ছিল? আমার তো মনে হয় না। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। এই কথার ভিতরে সব শব্দগুলিই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম ধর সর্বং কথাটা। সর্বং

কথাটাতে বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির দিকে ঋষি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন—যেমন মানুষ, পশুপক্ষী, গাছপালা, নদী, জল, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি—এগুলো সবই ব্রহ্ম। এগুলো সবই যদি ব্রহ্ম হয় তাহলে পৃথিবীতে ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই—কি বল? তাহলে ব্রহ্মই ব্রহ্ম এই বললেই ত' হতো। সবই ত' সেই। ব্রহ্ম দৃষ্টিই যদি খুলে গেল তাহলে সর্ব দৃষ্টি ত' তার আগেই চলে গেছে।

তার উপর আবার 'খলু' কথাটা বলা হয়েছে। 'খলু' দ্বারা ঋষি তাঁর সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। অর্থাৎ এই যে কথা—এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিশ্চয়, নিশ্চয় নিশ্চয়।

ভগবদগীতাতে শ্রীভগবান সখা অর্জুনকে বলেছেন, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি।' নমে ভক্ত প্রণশ্যতি বললেই হতো। 'প্রতিজানীহি' কথাটা বললেন কেন? বাজে কথা? ফালতু কথা? না। 'আমার ভক্তের নাশ নেই' এটা এত বড় সত্যকথা যে তুমি আমার সখা তোমায় আমি হলফ করে বলছি। তুমি আমার নামে প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার যে, আমার ভক্তের নাশ হবে না।'

কিন্তু প্রণশ্যতি মানে কি? ভক্তের রোগ তাতে আসবে না? গতিক সুখ-দুঃখ হবে না? তা কি হয়? প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে সবই আসবে, যাবে। কিন্তু সে যে ধর্মের পথে আরূঢ় হলে সেখান থেকে তার চ্যুতি নেই। সে লক্ষ বাধা অতিক্রম করে বীরের মত তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।

শ্রীশ্রীমা তাঁর শ্রীমুখে বলেছিলেন—'আমার ছেলেদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও কিছু করতে পারবে না। অর্থাৎ আমি তাদের ভার নিয়েছি আমি তাদের মুক্তিপথে চালিত করবো।'

অবশ্য সদগুরুর সন্তানদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ক্ষতি করতে চাইবেন কেন? তাঁরা বরং সর্ব ভাবে, সর্ব সময়ে সাহায্য করে তাদের মুক্তিপথে যেতে সাহায্য করবেন।

যাক্ সে সব কথা। আমরা মূল কথায় আসি। বন্ধু বলছেন—'আবার দেখ ঋষিবাক্য, ঈশাবাস্যং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ।' (জগতে চর অচর যত বস্তু আছে তাদের পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করবে) অর্থাৎ চর আর অচর বলে কিছু আছে তা মনে করো না। ঈশ্বরই নানা-রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। সর্বের ভিতরে সেই এককে ধর। এই কথার প্রতিধ্বনি শ্রীরামকৃষ্ণবাক্যে দেখা যায় ভগবান সত্য আর সব অসত্য।

তিনি বলছেন, এই তত্ত্বটি শুনে যাও আর যা কিছু কর, যা খুসী কর খালি দেখো সব সময়ে মন-বুদ্ধির সামনে এই কথাটি যেন সর্বক্ষণের জন্য বিরাজ করে। কালী বল, দুর্গা বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল—সবই ব্রহ্মের সগুণ ব্রহ্মের নাম। যে নামে খুশী যে ভাবে খুশী চলার পথে সেই নাম একপ্রাণ একচিত্তে স্মৃতিপথে রাখলে ভবিষ্যতে সব ঠিক হবে। একদিন দেখা যাবে যে, আমরা গন্তব্য-স্থানে পৌঁছে গেছি।

বন্ধু বললেন—বুঝলে? আমি বললাম, বুঝেছি, তাই কি করে বলি; বুঝিনি তাই বা কি করে বলি? বন্ধু, আরও বল।

বন্ধু বললেন, বেশ।

আমরা যদি বিজ্ঞান ফুটিয়ে তুলতে পারতাম তাহলে ত' আর কোন প্রশ্নেরই অবকাশ থাকতো না। আর প্রশ্নের সমাধানের জন্যও কোন প্রকার চেষ্টা বা উদ্যমের দরকার হতো না। দেখ, সমাজের দিকে তাকিয়ে আমাদের কি দুরবস্থা হয়েছে। এটা ঋষিদের দেশ। এই দেশ প্রাচীনকালে ঋষিদের অনুশাসনে চলতো। সমাজে বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সমাজের নিয়মগুলো মেনে চললেই মানুষ কালক্রমে জীবনের কাম্য অবস্থায় পৌঁছে যেত।

কালক্রমে সমাজে ঋষিদের অনুশাসন শিথিল হয়ে গেছে। চরিত্রবান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের এখন অভাব। আমাদের ছেলেমেয়েরা আদর্শজীবনের চিত্রটি ঠিক চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না। তারা অন্ধের মত পশ্চিমের হাওয়ায় নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। ওদেশ থেকে যা আসছে তাই ভাল, ওরা যা করে, আমাদের তাই করতে হবে। বেশভূষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা দেখলে মনে হয় যেন এদেশটা একটা ছোটখাট পশ্চিমের দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পশ্চিমের ভালগুলো আমরা গ্রহণ করবো না। আমরা যদি আমাদের চরম গন্তব্যস্থলের উপর দৃষ্টি রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে তাদের ভালগুলি নিয়ে এসে আমাদের মতন করে তাদের গ্রহণ করি তাহলে ত চমৎকার কথা।

কিন্তু তা ত হচ্ছে না। বন্ধু এবার জোর দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—'মেয়েদের বেশভূষা দেখেছ? রাস্তায় বাপ আর মেয়ে কি না আর ছেলে এক সঙ্গে বের হতে পারে না। কি রুচিবিগর্হিত পোষাক আমাদের দেশের মেয়েরা পরে বেড়াচ্ছে! কেন এরা এটা করছে? একমাত্র কারণ দেশের সত্যিকার আদর্শ এরা ভুলে গেছে। যে হরিদ্বার যাবে বলে ঘর ছেড়েছে তাকে হরিদ্বারের পথে পাওয়া যাবে। আর যে কোথায় যাবে জানে না, সে এলোমেলো ঘুরবে তার কোন স্থির লক্ষ্য নেই, কাজেই তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্যমেরও কোন বালাই নেই। ভগবান রামকৃষ্ণ তাঁর লীলাসঙ্গিনী এবং লীলাসহচরদের নিয়ে এসেছিলেন সেই লক্ষ্যটি নির্ধারণ করে শুধু ভারতবাসী নয়, জগতের সমগ্র মানব জাতিকে সেদিকে আকর্ষণ করার জন্য। শুধু মুখে বললে হবে না হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে হবে তাই প্রভু এলেন গণ্ডগ্রামে।

যৌগিক বিদ্যা অর্জনের কোন দরকার মনে করলেন না। সোজা আরম্ভ করলেন পরাবিদ্যার অনুশীলন এবং সেই অনুশীলনে কোন জটিলতা নেই। সোজা প্রাণের ভাষায় শিশুর মত জগৎ-

কারণকে 'মা' বলে [illegible] করলেন। অপূর্ব কথা। মানুষ এখন একেবারে দেহসর্বস্ব হয়ে গেছে। দেহটি কি করে সুখে থাকবে সেই নিয়েই মানুষ দিনরাত ব্যস্ত। অবশ্য সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের গণ্ডি আর একটু বাড়িয়ে পরিবার পর্যন্ত লোকেরা কি করে সুখে থাকবে তার চেষ্টাও আছে।

কিন্তু পাশ্চাত্যের হাওয়া লাগার পর থেকে এই পরিবারের পরিচয়ও ত' বদলে গেছে। এখন পরিবার মানে হচ্ছে তুমি আর তোমার স্ত্রী। তার উপর যদি দুই-একটি সন্তান থাকে তারাও পরিবারের সীমাভুক্ত হয়ে থাকে। যাঁরা পাশ্চাত্যের শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা ভাবতে পারেন না যে বৃদ্ধ পিতামাতাও তাঁদের পরিবার-ভুক্ত হতে পারেন। মাসী পিসী দূর আত্মীয়দের সঙ্গে ত' কোন সম্বন্ধই নেই। তাঁদের ঠিকানাও জানা নেই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই যে পরিবর্তন —বৃদ্ধ পিতামাতাও আমার পরিবার-ভুক্ত নন, তাঁদের কথা তাঁরা ভাবুন— এই যে ভাবে পরিবর্তন , এটা কেন হলো ? এর কারণ হচ্ছে সমাজ এখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, সমাজজীবন একদম উচ্ছৃঙ্খলতায় ভর্তি হয়ে গেছে। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য একদম ভুলে গেছি। বন্ধু এ পর্যন্ত বলে বললেন, এবার তুমি বল।

আচ্ছা বেশ, আমি বলছি। দেখ, আমরা বর্তমান যুগে আমাদের জীবনের পূর্ণ সংজ্ঞাটি হারিয়ে ফেলেছি। মানুষ মানে কি? পিতামাতার ইচ্ছায় আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। এই পৃথিবীর আলো-হাওয়া যখন চোখে লাগলো আস্তে আস্তে এই পৃথিবীর ব্যাপারগুলো বুঝতে লাগলাম।

মাতৃস্তনের আস্বাদ পেলাম এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হবার মুখেই। তারপর এই জননীই এই পৃথিবীর শিক্ষার প্রথম গুরু। তাঁর কাছেই শিখলাম কে বাবা, কে ভাই ইত্যাদি এবং পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থের সঙ্গে পরিচয় হতে লাগলো এই জননীর মাধ্যমে। তারপর পিতা। তিনিও পালন করতে লাগলেন। অনেক কিছু শিখলাম তাঁর কাছে।

তারপর চাইলাম সমাজের দিকে। যখন সমাজের অনুশাসন ছিল তখন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি অবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষটি পুরো গড়ে উঠতো। শেষ অবস্থায় বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস তাকে পরবর্তী জীবনের জন্য তৈরী করতো। সে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়িত্বের দিকে এগিয়ে যেতো।

কি সুন্দর ব্যবস্থা। কি অপরূপ ছিল তখন এই দেশের আকাশ-বাতাস। ধরিত্রী তখন শস্যপূর্ণা ছিলেন। মানুষের কোন অভাব-অভিযোগ ছিল না। চাহিদাও কম ছিল। প্রাচুর্যের ভিতর দিয়ে মানুষ জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মৃত্যুর অবস্থাগুলোকে অতিক্রম করে অনন্ত জীবনের পথে চলে যেতো। সমাজে সন্তোষ জিনিষটি সর্বক্ষেত্রেই লক্ষিত হতো।

বন্ধু, ভয় পেয়ো না। তুমি কি ভাবছো আমি বলতে চাইছি যে জগৎটা এখন উল্টো পথে চলুক? আমরা আবার রামরাজ্যে চলে যাই? না, তা নয়। আমি বিংশ শতাব্দীর লোক। কাজেই আমাকে একবিংশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। আমি ঘড়ির কাঁটা উল্টে দিতে চাই না। আজ মানুষ পৃথিবীর গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে চাইছে। কাল চন্দ্রলোক, পরশু শুক্রলোক, তারপর মঙ্গল বৃহস্পতি প্রভৃতি।

[ক্রমশঃ।

মহুয়া সুন্দরী —সীতেশ রায়

একটি শ্লোকে মেঘদূত

রামানন্দ আচার্য

চিরকালের কবি কালিদাস। মধুময় (১) কাব্য তাঁর মেঘদূত। শব্দ আর অর্থের সমন্বয়ে রসসৃষ্টির (২) চরম নিদর্শন এটি। বস্তুত সমগ্র জগতের মূলে আর পরিণতিতে রস (৩)। রস সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত, সমস্ত মানবমনে; আর তাই আস্বাদ্য হয়ে ওঠে উপযুক্ত কিছুর স্পর্শ পেয়ে (৪)। 'মেঘদূতের' মেঘ বর্ষণ করেছে মাঝে মাঝে, রসসঞ্চার করেছে সমগ্র কাব্যে; চিরন্তন পাঠক-সমাজে। মুক্তোর মত উজ্জ্বল কয়েকটি শ্লোকের এই গ্রন্থন বাণীকণ্ঠে শোভা পায় মালার মতো। মালায় মুক্তো-খণ্ডতার প্রাধান্য নেই, অখণ্ডতা সেখানে রূপ নিয়েছে খণ্ডতাকে অতিক্রম করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিটি মুক্তো ক্ষণে ক্ষণে হয় পরিদৃশ্যমান, মুক্তোর শোভা-সৌন্দর্য ব্যাহত নয়, যদিও মালার শোভার কাছে তা গৌণ। মেঘদূতের ক্ষেত্রেও তাই। মেঘদূত একটি অখণ্ড গ্রন্থন, কিন্তু তার প্রতিটি শ্লোকও আপন খণ্ডতাকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। এরূপ একটি শ্লোক :

ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং
সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ
প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎ সুক্যাদপরিগণয়ন্
গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেত-
নাচেতনেষু॥

'বাতাস, জল, ধোঁয়া এবং আলোকের কোথায় মেঘরূপী সমবায়, কোথায় ইন্দ্রিয়ে সুপটু, সজ্ঞান প্রাণীর প্রাপণীয় সমাচার। এ-ভেদ ভুলে গিয়ে ব্যগ্র বিরহী সে জানালে মেঘে তার যাচনা, চেতনে-অচেতনে দ্বৈত অবলোপ, তাই তো কামুকের স্বাভাবিক (৫)।'

যক্ষপ্রিয়া বাস করছেন অলকায়। অতি কঠোর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন তিনি। তাঁর কাছে বার্তা প্রেরণের জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছেন নির্বাসিত যক্ষ, উন্মত্ততায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। একমাত্র চৈতন্যময় চতুর প্রাণী সেই বার্তা বহন করতে সক্ষম। মেঘের মত জড়পদার্থ সে বার্তা নিয়ে যেতে অক্ষম, কিন্তু গুণ তার অসীম। পবন-আনুকূল্যে লাভ করে সে গতিশক্তি, চকিত হাস্যের মত বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে বিস্মিত করে প্রাণিজগৎকে; আবার স্নিগ্ধধারায় সিঞ্চিত করে প্রাণসঞ্চার করে ধরণীর; তাই ঘোরতর ধূম্রবর্ণেও সে আশাহত নয়।

তবুও সে জড়পদার্থ—বার্তা প্রেরণের ক্ষমতা তার কোথায়? একমাত্র যক্ষের মত উন্মাদই তাকে বার্তা নিবেদনের কাজে নিযুক্ত করতে পারে—বলে উঠবেন সমালোচকের দল। তবে কি যক্ষ সত্যই উন্মাদ? উন্মাদ তিনি একটু অন্য ধরণের। তাঁর উন্মাদনায় একটু শৃঙখলা আছে। সব ব্যাপারেই সামঞ্জস্য আছে তাঁর, নেই কেবল একটিতে, প্রিয়ার কথা মনে করলে তিনি আর ঠিক থাকেন না—প্রণয়ের কথা উঠলে উদ্বেল হয়ে পড়েন। সমস্ত জড়পদার্থ চৈতন্যময় হয়ে যায়—আপনিই হয়ে যায়। জড় বলে জ্ঞান থাকে না। কবি কালিদাস সমর্থন করে বললেন, সকল মদনপীড়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এটা স্বাভাবিক—

"কামার্তা কি প্রকৃতিকৃপণা-
শ্চেতনাচেতনেষু"।

আপাতদৃষ্টিতে শ্লোকের এই অর্থ প্রকট হলেও সৌন্দর্যসন্ধানী ব্যঞ্জনালভ্য অর্থটি নিতে উৎসুক। তিনি বলবেন, কবি কালিদাস এখানে চিরন্তন কবি-প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। 'কামার্তা (৬) হি প্রকৃতি কৃপণা-শ্চেতনাচেতনেষু' শ্লোকের এই অংশে প্রকাশ ঘটল তার।

কবিচিত্তে সতত চলে কামনার গুঞ্জরণ—প্রকাশের আর্তিতে, বেদনায় আকুল হয়ে উঠেন কবি (৭)। ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় ধ্যান-ধারণা, ভাব-ভাবনা, কবির অন্তরের সব কিছু। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

১। আলংকারিকের দৃষ্টিতে মেঘদূত খণ্ডকাব্য। খণ্ড অর্থাৎ টুকরো (এক-দেশী) কাব্য মেঘদূতের উপযুক্ত সমালোচনা নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তাই খণ্ডকাব্য। খণ্ড—খাঁড়গুড়। তন্ময় কাব্য—অমৃতময় কাব্য। অতএব তাকে বলা যায় মধুময় কাব্য।

২। শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম—ভামহ। কাব্য সম্পর্কে সম্ভবত কালিদাসেরও এই ধারণা—'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'।

৩। রস—জল।

৪। স্থায়িভাবরূপে রসের চিরন্তন অস্তিত্বমানবমনে। বিভাবাদির দ্বারা তা অভিব্যক্ত হয় মাত্র—'ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।'

৫। অনুবাদ—বুদ্ধদেব বসু।

৬। কামনায় (প্রকাশের কামনায়) আর্ত—কামার্ত—কবি প্রকৃতিকৃপণ—স্বভাবদীন উদাসীন। অর্থাৎ কবিগণ চেতন-অবচেতনের ভেদের প্রতি উদাসীন।

৭। 'কু' ধাতু থেকে কবি। আকৃতি আছে বলেই তাঁকে বলা হয় কবি। কবির আকৃতি প্রকাশের।

"অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা
অপার।
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ
করে প্রাণ॥"

বস্তুত প্রকাশের পূর্বমুহূর্তে কবির বুকে বাজে যে অসহ্য যন্ত্রণা, তাই প্রকাশের মুহূর্তে চেতনাচেতনের ভেদ দূর করে। রসের স্পর্শ পেয়ে অচেতন হয় চেতন, আবার রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই কবি চেতনকে অচেতনে রূপান্তরিত করে বসেন স্বাভাবিকভাবে। সব দেশের সব কাব্যেই এ রীতি প্রচলিত। বস্তুত কবিও এক স্রষ্টা। বিধাতার সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি তাঁর(৮)। চেতন সে জগতে অচেতন হয়ে দেখা দেয়, অচেতন চেতনে পরিণত হয়। সে জগতে পার্থিব সুখ-দুঃখের অনুভূতি তিরোহিত হয়, সে লোক কেবল অনবচ্ছিন্ন আনন্দের আধার (৯)। তাই সুনিপুণ আলংকারিক আনন্দবর্ধন বললেন—

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ
প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে তৎ তথেদং পরিবর্ততে॥
ভাবানচেতনানপি চেতনবচ্চেতনা-
নচেতনবৎ।
ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে
স্বতন্ত্রতয়া॥

সেজন্য ভামহের আলংকারিক যদি বলেন, মেঘের মত অচেতন পদার্থে চৈতন্য আরোপ করলে ত' কাব্যদোষ আসে (১০)। তাহলে কবির নিজের উক্তিতেই তার উত্তর দেওয়া যায়—কবিরা (কামার্তাঃ) ত' স্বভাবতই চেতন-অচেতনের ভেদের প্রতি উদাসীন। ধ্বনিকার তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবেন। পাশ্চাত্য সমালোচকও বলবেন, কবি ত' এখানে কোন ভুল করেন নি। বরং 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি'তে তা আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে।

আবার কাব্যানন্দ সহজে যাদেরকে মাতিয়ে তুলতে পারে না, সেই দার্শনিকদের মধ্যে একদল বলে উঠবেন—পঞ্চভূতের সমাহারে ত' জীবসৃষ্টি হয় না; আকাশ ত' প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়। অতএব মেঘ অচেতন হয়েও চেতন। তাহলে মেঘকে দূতের কাজে নিযুক্ত করায় ভুল হয় কোথায়? (১১)

আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা নিপুণ এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিতে শ্লোকের অর্থ নিরীক্ষণ করেন। তাঁরা বলেন সমগ্র কাব্যের প্রতিরূপক(১২) (সিম্বলিক এজেণ্ট) হচ্ছে মেঘ। পূর্ব মেঘের মেঘ নদী, গাছ, পালা, মাটি, পাথর—বিধাতার ছকে বাঁধা সৃষ্টি ছাড়িয়ে ধাওয়া করেছে কল্পরাজ্য অলকাপুরীতে; যেখানে আনন্দের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে—কাব্যলোকও ঠিক একই রকম যা কেবলই চির-আনন্দময়(১৩)। বিয়োগ-মিলনে, সকল অবস্থাতেই মানুষ সেখানে অলৌকিক আনন্দ লাভ করে। এই অলৌকিকতাই কাব্যের মূলে কাজ করে আর তার চরম ফলরূপে দেখা দেয় অপার ও অসীম আনন্দ (১৪)। যাই হোক, মেঘকে যদি কাব্যের প্রতিরূপক বলে ধরা যায়; তাহলে দেখি—মেঘের উপজীব্য প্রথমত নদী, মাটি, গাছপালা কিন্তু শেষে গিয়ে উত্তরণ ঘটল অলৌকিক রাজ্যে। কাব্যের বেলায়ও তাই—উপজীব্য নদী, মাটি, পাথর কিন্তু শেষে হল সার্থক রসসৃষ্টি যা কেবল আনন্দের আধার।

আবার দেখি ধূম, জ্যোতি, সলিল আর মরুতের সমবায়ে উৎপন্ন হচ্ছে মেঘ। ধূম এখানে পৃথিবীর প্রতিরূপক(১৫) সলিল স্নেহময়। জ্যোতি এখানে বিদ্যুৎ বোধক। মরুৎগতির সংশোধক। এইভাবে ধূমকে পৃথিবীর, সলিলকে প্রেমের, জ্যোতিকে চমকের বা অলৌকিক আনন্দদানের (এ্যাডমিরেসন) মরুৎকে গতির প্রতীক বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে বা মেঘদূতে 'পৃথিবী, গাছপালা, বন-জঙ্গল, স্ত্রী, সমাজ-সামাজিক,' সকলের কথা আছে। এদেরকে নিয়ে যে নূতন সৃষ্টি, সেই সৃজনের মধ্যে আছে চমক বা অলৌকিক আনন্দদানের ক্ষমতা। প্রেমময় এই কাব্যটি রসধারা লাভের জন্য স্বচ্ছন্দ গতিতে ধাবমান(১৬)।

৮। নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবেঃ—মম্মট।

৯। 'হ্লাদৈকময়ীং নির্মিতমাদধতী ভারতী কবেঃ।'—'বিগলিত বেদ্যান্তরমানন্দম্'—মম্মট।

১০। ১-৪২—কাব্যালংকার।

১১। এই যুক্তি কেবল তর্কের খাতিরে উপস্থিত করা হয়—সঙ্গে সঙ্গে রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

১২। বর্তমান শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে—সর্বত্রই 'সিম্বলিজম্'-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—বর্তমান চিন্তাধারায় সবই 'সিম্বলিক' হতে চলেছে। আধুনিক কবিতায় এই প্রতীকধর্মিতা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কবিদের অগ্রগণ্য জীবনানন্দের কবিতার একটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'—এই পঙক্তিতে বাচ্যার্থের আশ্রয় করে যদি বলি 'পাখীর নীড়ের মত চোখ' তাহলে কোন অর্থের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু 'পাখীর নীড়' কথাটিকে যখন 'আশ্রয়ধর্মিতার' প্রতীক বা প্রতিরূপক ('সিম্বলিক') হিসেবে ধরে নিই—তাহলে এক নূতন আস্বাদলাভ করি। আলোচ্য মেঘদূতের শ্লোকটিতেও এই প্রতীকধর্মিতার আশ্রয় নিয়ে নূতন ও আধুনিক ভঙ্গীতে রসাস্বাদ করতে পারি।

১৩। বিগলিত বেদ্যান্তরমানন্দম্—হ্লাদকময়ীম্।

১৪। কাব্য লোকোত্তরবর্ণনামূলক হবে— 'লোকোত্তরবর্ণনানিপুণকবিকর্ম কাব্যম্।

১৫। ন্যায়শাস্ত্রে ধূমকেও ক্ষিতি বলা হয়।

১৬। কালিদাসোত্তর যুগের কাব্যের গতিহীনতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মজে যাওয়া নদীর মত বর্ণনা কেবল এক জায়গায় ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে, মাটির গন্ধে ভরপুর(১৭), অলৌকিক গতিময়, এই প্রেমের লিপিজাল কি সহৃদয়ের হৃদয়ে সন্দেশ প্রেরণ করতে পারবে? না, একমাত্র চৈতন্যময়ই সহৃদয়কে নাড়া দিতে পারে? সহৃদয়-হৃদয় -সংবাদ - পরিবেশনে একমাত্র কাব্যই সমর্থ। অতএব এখানে প্রাণিজগৎ আর মেঘরূপী কাব্যের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, তা সূচিত করলেন কবি দুটি 'ক্ব' শব্দ দিয়ে। শ্লোকের চারটি পাদের অর্থের সঙ্গতি রেখে আরও বলা যায় যে, যক্ষের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হল। তিনি ভাবলেন, "মেঘরূপী এই প্রেমের লিপিজাল না কোন সুচতুর প্রাণী তার বার্তা প্রেরণে সক্ষম?" শেষে ভাবলেন প্রাণীর চেয়ে লিপিই এই কাজে পটু(১৮)। দুটি 'ক্ব' শব্দ দিয়ে কবি এ অর্থও বলতে পারেন।

সব শেষে সুচতুর সমালোচক বলবেন, শিল্পের খণ্ডখণ্ড রূপ ভেসে উঠলেও সহৃদয় অখণ্ডের রসগ্রহণে সতত উৎসুক। অখণ্ড মেঘদূতেই শিল্পের সার্থকতা। সেই অখণ্ডতা প্রতি শ্লোকের খণ্ডতার মাঝে লীন—প্রতি শ্লোকের খাতেই রসধারা বয়ে চলেছে। এই স্থানে খাতটি একটু গভীর—তাই সৌন্দর্যসন্ধানী এখানে অবগাহনের সুযোগ লাভ করেন।

১৭। সংস্কৃত সাহিত্যে বাস্তবতার লেশ নেই—এ-অভিযোগ সত্য নয়। মেঘদূতে বাস্তবতা আর কল্পনা একই খাতে বয়ে চলেছে। বস্তুত 'ইমোশন' এবং 'ইণ্টেলেক্টের' সামঞ্জস্যসাধনে কালিদাস সর্বাপেক্ষা অগ্রণী।

১৮। সুচতুর প্রাণী তার নিজের ইচ্ছা-মত বার্তা নিবেদন করতে পারে, বিকৃত করে পরিবেশন করাও তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু লিপিজাল যক্ষের মনের কথাটিই জানাবে—বিকৃত করে জানাবার সামর্থ্য তার নেই। অতএব মেঘরূপ কাব্যের (লিপিজালের) মাঝে সংবাদ প্রেরণ উন্মত্ততার পরিচয় নয়—বরং বুদ্ধিমত্তার।

রসধারা

সভূতি বিদ্যাবিনোদ

[illegible]-যোগ

স্ত্রীটি হ'লে বধিকালা স্বামীর তখন
বিড়ম্বনা প্রেয়সীরে প্রেম-সম্ভাষণ,
তোত্‌লা যদি হয় ফের জীবন-দেবতা,—
না বলাই ভাল হায় সে দুঃখের কথা।

•

অগ্রাধিকার

বহু নারী নিয়ে গেছে যমুনায় জল,
রাধারাণী হ'য়ে আছে আদর্শের স্থল,
গোপিকা কতই স্থান কৃষ্ণ-পদতল,—
ব্রজের রজই পেল প্রাধান্য কেবল।

অদৃষ্ট

পায়ে ধ'রে কত সাধে মল ললনার,
প্রেম করে কণ্ঠ বেড়ি' জড়োয়ার হার।

আত্মরক্ষা

প্রধান শিক্ষক মোরে বলিলেন ডেকে,
"পরীক্ষার গার্ড দিতে হবে কাল থেকে,"
সভয়েই বলিলাম তাঁরে ক্ষীণ স্বরে,—
"রিভল্‌বার দিতে হবে আত্মরক্ষা তরে।"

লাভের পরিমাণ

বেনারসী বেচিল যে পাঁচশ টাকার
লাভটুকু পেল শুধু,—কি পেল সে আর?
[illegible] যে পরিয়ে দিল [illegible]-বণিক—
লাভ সাথে কি পেল সে দেখ দিয়ে ঠিক।

পাতালপুরীর কথা

॥ তিন ॥

গবেষণার খাতিরে অপরাধ-প্রবণতাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে হয়েছে: (ক) পেশাগত অপরাধ এবং (খ) সমাজবিরোধী বা অ-পেশাগত অপরাধ। পেশাদার-অপরাধীদের মধ্যে পেশাদারী ঠারের ভাষার (প্রফেসনাল কোড) চলন। অ-পেশাদার অপরাধীদের পেশাদার অপরাধী ব্যবহৃত সান্ধ্যভাষার ব্যবহার করতে দেখা যায় কম। তবে সান্ধ্যশব্দগুলির গুপ্ত অর্থ লুপ্ত হ'লে তা সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এমনতরো বহু শব্দ আমাদের জগতেও হানা দিয়ে থাকে। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এইভাবে অপেশাদার অপরাধীরা লঘু ভাষার (নন প্রফেসনাল) সঙ্গে সান্ধ্যভাষারও ব্যবহার করে থাকে।

এখানে আমরা শুধুমাত্র সেই সকল অপরাধ এবং সমাজবিরোধিতার আলোচনা করবো যার সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার কোন সম্পর্ক রয়েছে, অর্থাৎ সান্ধ্য এবং লঘু ভাষার সঙ্গে অপরাধ এবং অপরাধপ্রবণতার যোগ থেকে গেছে।

এই নিবন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য অপরাধ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: (*) ১। ডাকাত, ২। তস্কর (রবার), ৩। ছিনতাই-কার (স্ন্যাচার), —২১৬, ৪। গব্বাবাজ (বার্টলার) —২২০, ৫। চোর—৩২৭, ৬। পকেটমার—৩০৭, ৭। চোরাইমালের ক্রেতা —৪৫, ৮। তোলনবাজ (লগেজ লিফটার)—২২৭, ৯। ছেলেমেয়ে তোলবাজ (কিডন্যাপার)—৫। ১০। ঠগ (চিট)—২০, ১১। জালিয়াৎ (ফর্জার)—১৮, ১২। পতিতা—১১, ১৩। পতিতাদের বাড়ীঅলা—১৯, ১৪। পতিতাদের দালাল—১৮৭, ১৫। চোরাই কারবারী (স্মাগলার),—৭৭, ১৬। সমাজবিরোধী যুবক (উগ্রপ্রকৃতি-সম্পন্ন বুলিজ এ্যাণ্ড ফাইটিং জ্যাকস) —১৭৬; ১৭। মেয়েদের পথেঘাটে যারা বিরক্ত করে (ইভ-টিজার)—১৪০, ১৮। হিজড়া—২৬, ১৯। ভিখিরি ও তাদের দালাল—৫২।

* প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে মোট কতো জনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হয়েছে। ডাকাত এবং তস্করের সংখ্যা হচ্ছে ২০৫। ডাকাত এবং তস্করদের প্রায় সকলে হিন্দিভাষী রাজ্যগুলো থেকে এ রাজ্যে আসে এবং এরা সকলেই নিরক্ষর।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

উল্লিখিত শ্রেণীগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

সমাজবিরোধী যুবক (উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন)।

এই শ্রেণীটি পুলিসের হাতে 'রফ' নামে অভিহিত হয়েছে। এরা সাধারণত বয়সে ১৬।১৭ থেকে ২৩।২৪-এর মধ্যে হয়ে থাকে। এই দলের সমাজবিরোধী যুবকদের অনেকে সময়ে সময়ে হিংসাত্মক অপরাধে মেতে ওঠে এবং কালে ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদির মতো জঘন্য ঘৃণিত অপরাধকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। জুয়া, মদ চোলাই প্রভৃতিও এদের নেশা-পেশা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অশিক্ষিত- অর্ধশিক্ষিত এবং সময়ে সময়ে 'শিক্ষিত' যুবকদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবাঙলায় সমাজবিরোধী যুবকদের শতকরা প্রায় নব্বুইজন হচ্ছে বাঙালি। বর্তমানে বাঙলা দেশে এই জাতীয় তরুণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং এই দুষ্ট ব্রণটির জন্য রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ দায়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক মারামারি, কাটাকাটি, বেকারজীবন, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজার এমনিতরো অনেক কিছু। বর্তমানের তরুণ সমাজ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা হারিয়েছে। অভিভাবক-শ্রেণী সম্পর্কেও শ্রদ্ধাবান নয়। তরুণদের মানসিক বিপর্যয়ের জন্য দেশের শাসক এবং অভিভাবক-শ্রেণীও কম দায়ী নন। হতাশা এবং উত্তেজনা এদের ভুল রাস্তায় টানছে। এ হলো বর্তমান কালের একটি সামাজিক ব্যাধি, এর হাত থেকে মুক্তি পেতে পুলিশী দণ্ডবিধি বা দেশের আইন বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারে বলে মনে হয় না।

অনেক সময়ে দেখা গেছে, অত্যন্ত কাঁচা বয়েসের ছেলে হয়তো ভুল করে বিপথগামী হয়ে পড়েছে, কোন দাগী বদমায়েসের হাতে পড়ে গেছে, তখন তার অবস্থা হয় মর্মান্তিক—না ঘরকা না ঘাটকা। কাঁচা ছেলেটির ফিরে যাবার রাস্তাগুলো একেবারে সীল করে দেওয়া হয়। গবেষণাকালে এমনতরো বহু হতভাগ্য ছেলের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। এদের অনেকে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, পদস্থ সরকারী-চাকুরেদের সন্তান। এরা সব ধরা পড়ে নানান ধরণের অপরাধের জন্য, কারুর কারুর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগও ছিল।

এইসব তরুণ অপরাধীরা স্বল্পায়াসে উপার্জনের স্বাদ পেয়ে গেছে, কঠিন শ্রমের মধ্যে যেতে এদের মন চায় না। তা ছাড়া, মদ-গাঁজা অন্যান্য নেশা এবং নারীসঙ্গ তাদের সহজ সাধারণ গৃহস্থজীবনে ফেরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দিনে দিনে দেহমনের স্বাস্থ্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মানসিক অবসাদ গলা টিপে ধরে তার

হাত ছাড়িয়ে নিতে দ্বিগুণ উৎসাহে প্যাঁক মাখামাখিতে মেতে ওঠে।

এইসব অ-পেশাদার সমাজবিরোধী যুবকরা বাঙলা ভাষার সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড এবং অন্যান্য উপ-ভাষাভাষী। এদের কথাবার্তা থেকে সান্ধ্য এবং লঘু ভাষার ভূরি ভূরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের বেশিরভাগই শহরে এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। পাক-ভারত সীমান্তে চোরাই চালানেও হাত পাকিয়েছে।

পকেটমার

বাঙালি অপরাধীদের মধ্যে পকেটমারের সংখ্যা অসংখ্য। পকেট-মার নানান জাতের নানান মর্যাদার। অপরাধ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল অনেকগুলি শ্রেণী রয়েছে; এখানেও স্পেশালাইজেশন কাজ করছে। যেমন, ছেচকিবাজ হচ্ছে যারা শুধু রেজকি অর্থাৎ খুচরো পয়সাকড়ি তুলে থাকে। এরা সাধারণত অত্যন্ত অল্পবয়েসের শিক্ষানবীশ। এই রকম একটি ৭।৮ বছরের শিক্ষানবীশ ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে পকেটমারিতে পোক্ত করে তোলা হয়েছিল। সে ধরা পড়লো ভিড়ের এক ট্রামে, তারপর তাকে কলকাতার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার লাল-বাজারে হাজির করা হলো। সেখানে সে ধুরন্ধর পুলিশ অফিসরদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল আর কি। হঠাৎ একটি পাহারাঅলার কেমন যেন সন্দেহ হলো, তখন তাকে পাঠানো হলো মহিলা অফিসরদের জিম্মায় এবং পরীক্ষায় জানা যায় যে, মেয়েটি একটি ছেলে। পরে পুলিশ তদন্তে এও জানা গিয়েছিল যে, সে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত একটি বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে। ছেলেটির এবং তার দিদির পকেট-মারির আয়ে তাদের বাবা-মার সংসার চলে। ভাইবোনের মিলিত উপার্জন নাকি দু-তিনশো টাকার মতো হয়ে থাকে।

ধাওবাজ

এরা পাকাপোক্ত সেয়ানা (চোর)। এদের সঙ্গে থাকে একটুকরো ব্লেড। জিভের তলায় তা রাখে, সুবিধে-মতো বার করে চালিয়ে দেয়। পকেট, কোমর বা গাঁটের কাপড় কেটে টাকা-কড়ি বার করে নিতে এরা ওস্তাদ।

চেনটানা পার্টি

এরা সাধারণত গলার বোতাম খুলে নেয়। পকেটমাররা তাদের শ্রেণী এবং এলাকা চট করে ত্যাগ করে না। শোনা যায় যে, ধাওবাজ সহজে চেন টানবে না। প্রতিটি দলের নিজস্ব একটি অঞ্চল থাকে। নিজেদের অঞ্চলের বাইরে সচরাচর যাবে না। যেমন, কোন পকেটমার উত্তর কলকাতার বিধান সরণীতে গ্রে স্ট্রীট থেকে বিডন স্ট্রীটের মধ্যে যদি ঘোরাফেরা করে তবে এর বাইরের এলাকা আইনত পকেটমারটির কাছে নিষিদ্ধ অঞ্চল। এলাকার বাইরে পকেটমারতে যাওয়া মানে অন্যদের অধিকারে হাত দেওয়া।

পকেটমারদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের 'রাজাবাবু' বলা হয়। এদের মাসিক আয় কখনো কখনো পনেরো-কুড়ি হাজারও হয়ে থাকে। পকেটমারই সংসার চালাবার একমাত্র পেশা এমন কথাও অনেকের মুখে শোনা গেছে।

পুরুষ-পকেটমারদের বেশির ভাগ অবিবাহিত। শুধু পকেটমার কেন, অপরাধীদের শতকরা পঁচানব্বই জন অবিবাহিত। তবে বয়স্কদের প্রায় সকলেই বেশ্যাসক্ত। কিছু সংখ্যক মেয়ে পকেট-মারও পশ্চিম বাঙলায় আছে। এদের প্রায় সকলে উদ্বাস্তু এবং অবাঙালী। এরা ট্রেনে ট্রামে বাসে এবং মেলা প্রভৃতি ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে। ধরা পড়বো-পড়বো করেও চট করে ধরা পড়ে না। কারণ হচ্ছে, একজন মেয়ে যে পকেট-মার হতে পারে মন যে তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

ছিনতাই ইত্যাদিতে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় যথেষ্ট, পকেটমারিতে বিপদের আশঙ্কা কম। অহিংস অপরাধ বলে পকেটমারিতে সাজাও হালকামতো। এই সব নানা কারণে পকেটমারি অনেক অপরাধীকে আকৃষ্ট করেছে।

যে সব অপরাধীরা চণ্ডু ইত্যাদির নেশা করে তারা ব'লে থাকে যে, পকেটে কারেন্সি নোট না কাগজ আছে, তা আঙুলের স্পর্শে সহজে বুঝতে পারা যায়। নেশার কৃপায় অর্থাৎ নেশার গুণে আঙুল নাকি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে।

পতিতাদের দালাল

দালালদের অধিকাংশ অবাঙালি। এরা আসে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে। পুলিশ রিপোর্টে জানা যায়, বাঙলা দেশের পতিতাদের অধিকাংশ বাঙালি তবে দালালিতে বাঙালির সংখ্যা নগণ্য। দালালদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান সর্বধর্মের সমন্বয় হয়েছে---মধ্যকলকাতায় মুসলমান এবং ক্রীশ্চান দালালরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালি দালালদের অনেকে বাড়ীঅলা। বাড়ীঅলাদের অনেকে জারজ সন্তান অথবা যৌবনে নোংরা জীবিকা গ্রহণ করে এ জগতে চলে এসেছে। পতিতাদের অনেকে বৃদ্ধবয়সে বাড়িওয়ালীর ভূমিকা নেয়; অনেক মেয়ের অভিভাবিকা সেজে তাদের উপার্জনের ভাগীদার হয়। দালালরা খরিদ্দার সংগ্রহ করে দিলে হতভাগ্য মেয়েদের উপার্জনের এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হয়। অনেক সময়ে পতিতার চাকর দালালের কাজ করে এবং কালে বাড়ীওয়ালী এবং পূর্বতন মনিবেরই মনিবের ভূমিকা নেয়।

গুন্ডাবাজ

এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসে। অবশ্য এখানেও হিন্দুস্থানীরাই সংখ্যাধিক্য। গুন্ডাবাজরা সাধারণত বাড়ীর চাকর দারোয়ান মালী প্রভৃতির কাছ থেকে সাহায্য পায়।

যারা ছেলেমেয়ে চুরি করে

এরা প্রায়ই পতিতা, দালাল, ভবঘুরে জাতীয় লোক হয়ে থাকে। এরা অনেক সময়ে জটাধারী সন্ন্যাসী সেজে বাচ্চা

ছেলেমেয়ে চুরি করতে সাহায্য করে। স্বেচ্ছায়ই ছেলেমেয়েদের বিক্রি করা হয়। তাদের কালে অপরাধী, ভিখিরি বা পতিতার জীবন বরণ করতে বাধ্য করা হয়।

ভিখিরি

এদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: (ক) দরিদ্র মানুষ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে। বার্ধক্য অসুস্থতা বৈধব্য এমনি কতো কি কারণ থাকতে পারে। (খ) দালালের চাপে ভিক্ষে করতে হয়। ভিক্ষের একটা মোটা অংশ দালালকে দিতে হয়। বিনিময়ে আধপেটা খাওয়া-দাওয়া আর বাসের সুবিধেটুকু পায়। (গ) পেশাদার অপরাধীরা অনেক সময়ে ভিখিরিদের নিয়োগ করে কোন বাড়ীতে বা দোকানে এরা চুরির পূর্বে সেখানে ঘোরাঘুরি করে খবরাখবর করে। অনেক সময়ে চোলাই মদ চালানের কাজও করে থাকে। স্ত্রীলোক ভিখিরির অনেক সময়ে কোলে ছেলে থাকে এবং একহাতে থলির মধ্যে বোতলে বা ব্লাডারে মদ নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়। ভিখিরির ঘর থাকতে পারে কিন্তু ভবঘুরের নির্দিষ্ট ঘর বা পেশার কোন বালাই নেই।

চোরাই মালের ক্রেতা

এরা সচরাচর ছোটখাটো দোকানদার শ্রেণীর মানুষ। ধনী ব্যবসায়ী অনেক সময়ে চোরাই মালের বিক্রেতা হয়ে থাকে। চোরাই মালের বিক্রেতারা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসে—শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-নির্ধন শহুরে-গ্রাম্য সব একাকার হয়ে আছে। এরা সকলে লুণ্ঠিত মাল কেনাবেচার ব্যবসা করে থাকে।

পতিতা

এই শ্রেণীটিকে আমরা 'অপরাধী' এই সংজ্ঞা দিতে পারি না। অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকলেও অন্যান্য কারণে গোষ্ঠীটি আলোচ্য বিষয় হতে বাধ্য। অপরাধের সঙ্গে পরোক্ষ যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অপরাধের অকুস্থলে রয়েছে এই শ্রেণীর একটি নারী। তাছাড়া, একজন অপরাধী একটি কুকর্মের পর হয়তো বেশ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশী অভিজ্ঞতা তো তাই বলে। ডাকাতি চুরি বা লুঠের টাকা অপরাধীরা দুহাতে ওড়াতে থাকে এই সব জায়গায় আশ্রয় নিয়ে। সদ্য কোন মানুষের প্রাণ নিয়েছে এমন যে খুনী, খুনের অল্পক্ষণ পরে সে প্রবেশ করে তার অতি পরিচিত বেশ্যাগৃহে—যেখানে নেশাভাঙ ক'রে স্ত্রীলোক সংস্পর্শে মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইবে। অনেক সময় ভাবী অপরাধের পরিকল্পনা করা হয় এ সব স্থানে।

কিছু সংখ্যায় হিন্দু তরুণী নিরুপায় হয়ে এই ঘৃণ্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে বাধ্য হয়ে, এরা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নিঃস্ব অবস্থায় এদেশে এসেছে। এদের সকলেই একদিন ভদ্র পরিবারভুক্ত ছিল। তাছাড়া রয়েছে এমন একদল মহিলা—যারা দেহদানের উপার্জনে ঘর সংসার চালাচ্ছে। এরা শহরের বুকে 'খালি কুঠি'র সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। যেখানে বেসাতি সুরু হয় সন্ধ্যার পর এবং সারাদিন ঘরগুলি শূন্য পড়ে থাকে।

বাঙলা দেশের পতিতাদের বেশির ভাগ অশিক্ষিতা এবং অর্ধশিক্ষিতা, তবে কলেজী শিক্ষাপ্রাপ্তা এক-আধজন যে নেই তা নয়। নিরক্ষরতা নিকৃষ্টতর অভিশাপ। নিরক্ষরতার সুযোগে পাপাচারীরা নিষ্পাপ মেয়েদের পাপের পথে টেনে আনে।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পতিতার সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। ধনী এবং নির্ধনের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ। সমাজের নামীমানী ব্যক্তিদের কাউকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পেলে বুঝতে হবে নিজের সমাজে তার সামাজিক মান উঁচুতে। উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্পর্শে যে মহিলারা আসে তারা সাধারণত উচ্চ বর্ণের।

অনেক বাঙালি পতিতা নারী তাদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলতে চায়। ছেলেমেয়েদের নোংরা আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে। নিজের জীবনের বিনিময়ে এদের গড়ে তুলতে চায়। এমনও শোনা যায় যে, ছেলে বা মেয়েকে খুব অল্পবয়সে দূষিত আবহাওয়া থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে রেখেছে। সন্তান তার মাকে চেনে না জানে না, মা দূর থেকে তাকে দেখাশোনা করে। সন্তানের কাছে মায়ের আত্মপরিচয় মুছে গেল, উদ্দেশ্য—সন্তানের জারজত্ব যেন তার স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু না করে।

হিজড়া

ভারতবর্ষের হিজড়ারা একটি গোষ্ঠিভুক্ত। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এরা গোষ্ঠিবদ্ধ নয়। য়ুরোপে আমেরিকাতে এরা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো কাজকর্ম করে থাকে। এদেশের হিজড়ারা সমাজবদ্ধ জীব। অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া মানুষ।

এদেশের প্রচলিত প্রবাদ হলো, হিজড়া দর্শন অমঙ্গলের প্রতীক। হিজড়াদের কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। জন্মসূত্রে যারা হিজড়া, তারা নারীপুরুষের মাঝামাঝি ; আচরণে এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে অত্যন্ত বিকৃত। অল্পসংখ্যায় এমন হিজড়াও রয়েছে যারা লিঙ্গ ছেদন করিয়েছে। লিঙ্গ ছেদন হিজড়া সমাজে একটি উৎসববিশেষ। ছেদন সম্পর্কীয় রীতিনীতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের। ছেদনকার্য সচরাচর দলপতি করে থাকে। ছেদক দু'টি হাত পেতে ধরে, হাতে একমুঠো টাকাকড়ি দিতে হবে,—সেই সঙ্গে একশো টাকা ফি। লিঙ্গ অপসারণের পর রুগীকে চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখা হয়। আড্ডায় তখন গান বাজনা হৈ-চৈ হতে থাকে। ঘা শুকোতে কাটা জায়গায় একতাল পানের খয়ের চাপা দেওয়া হয়। কর্তন সম্পন্ন হয় বীভৎস উপায়ে। অনেক সময়ে মৃত্যুও ঘটে।

বিবাহাদি এবং হিন্দু-মুসলমানের নানান উৎসবে এরা নাচগান করে উপার্জন করে থাকে। তবে বাঙালি

সমাজে এ সব রীতি নেই। কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল প্রভৃতি শহরে অবাঙালি শ্রমিকদের হোলি উৎসবে হিজড়ারা নাচগান করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে এদের দর্শন মেলে। উপার্জনের এলাকা ভাগ করা থাকে, একে অপরের এলাকায় ভিক্ষে করতে যাবে না।

এরা বিকৃত যৌন-সম্ভোগে ভাগী-দার। বিকৃত যৌন-রুচির মানুষের কেউ কেউ হিজড়া সঙ্গ করে থাকে। স্যার জর্জ ম্যাকমুন তাঁর The Under-world of India গ্রন্থে বলেছেন:

"The making of eunuchs has happily largely disappeared, but by no means entirely, for they are still in respect for the guardianship of the larger harems. Parents as rule select this career for their children and the operation is performed by a barber of experience. That parent should do so is a matter of wonder to Western ideas, but in this connection we should remember that that is how the wonderful boy voices were secured in days gone by for the Vatican choir. To this day, parents of a boy with a wonderful voice in Italy will sometimes secure for him the certainty for choral career by having this operation performed. In India it is usually done under opium----

পশ্চিম বাঙলার হিজড়ারা সাধারণত এসেছে উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যগুলো থেকে। গবেষণার প্রয়োজনে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে হয়েছে তারা এলাহাবাদ, কাশী, লখনউ প্রভৃতি জায়গা থেকে এসেছে। হিন্দু এবং মুসলমান হিজড়া একত্রে হোলি, ইদ প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

মৃত্যুর পর এদের কবর দেওয়া হয়। কবর দেওয়ার কারণ জানা নেই, তবে মনে হয়, ভারতবর্ষে হিজড়ারা বহুকাল মুসলিম সংস্পর্শে থাকার জন্যও হতে পারে।

দলের নেতাকে গুরু-মা বলা হয়। এরা প্রায়ই একটি দুধের বাটিতে দুজনে একত্রে চুমুক দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। গুরু-মার মৃত্যুর পর যে পরবর্তী নেতা হবে তার হাতে গুরু-মার যাবতীয় টাকা-কড়ি জিনিষপত্র তুলে দেওয়া হবে।

হিজড়াদের মধ্যে যতদূর শোনা গেছে কোন বাঙালি নেই। বাঙালি সমাজ ত্যাগ করে হিজড়া সমাজে এ জাতীয় কোন মানুষ আসে না।

প্রভাতে দাঁড়ায়ে বাতায়নে

[টি, এস, এলিয়ট]

মাটির নীচের রান্নাঘরে এবং বহুপদমর্দিত রাস্তার ধার-বরাবর
প্রাতরাশের থালা-বাটিগুলিতে ওরা ঝঙ্কার তুলছে।
আঞ্চলিক ফটকগুলির সামনে ভারাক্রান্ত মনে দাঁড়িয়ে
বিমর্ষভাবে চুল মেলে দেয় যে গৃহপরিচারিকা—
তাদের বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি।

রাস্তার তলদেশ থেকে কুয়াশার বাদামী ঢেউয়ের দোলনায়
উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে ওঠে আমার সামনে বিকৃত মুখাবয়বগুলি,—
ভেসে ওঠে কাদামাখা-জামাপরা পথচারিণীদের মুখে ফুটে-ওঠা
লক্ষ্যহীন হাসি; সে হাসি হাওয়ার ঘুরে ফিরে শেষে
ছাদগুলি ছুঁতে ছুঁতে মিশে যায় কোন্ নিরুদ্দেশে।

অনুবাদক—মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও বেশী হাঁটুন

পদাতিক

হঠাৎ মাথা যেন কেমন ফাকা ঠেকে, বিশেষত মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করার সময়। এ অভিজ্ঞতার অংশীদার সকলে এবং এ সময় উঠে পায়চারী ক'রে চিন্তাশক্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাও সর্বজনীন। বিশেষত খোলা হাওয়ায় হেঁটে বেড়ালে মাথা চমৎকার ছেড়ে যায়, স্বস্তি ফিরে আসে।

ব্যাপারটা জন্মগত সংস্কারজ। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এই কাজটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। পায়ে হাঁটা কেবল চিন্তাক্রিয়ার উৎসাহবর্ধকই নয়, অপরিহার্যও বটে। তা ছাড়া, স্বাস্থ্যরক্ষায় এবং নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে এটি অন্যতম নিশ্চিত পন্থা।

একজন বিখ্যাত শল্যবিদ্ চিকিৎসক একবার ঘোষণা করেছিলেন---পদচারণা, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য, এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এটি অস্ত্র-চিকিৎসার পরবর্তী চিকিৎসান্তরে যুগান্তকারী। এখন রুগীদের দু' থেকে তিন সপ্তাহ শুইয়ে না রেখে, অপারেশন হওয়ার দিন তিনেক পরেই, এমন কি কয়েক ঘণ্টা পরেও, ক্ষেত্রবিশেষে, আমরা তাদের সাধ্যমতন হাঁটতে উৎসাহ দিই। শুধু লক্ষ্য রাখা হয় সংক্রমণের বিপদ যেন না থাকে। কেন না, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্তচলাচলের ছন্দে ক্রতলয় এলে ঘা এবং ক্ষতস্থান সারে তাড়াতাড়ি। হেঁটে বেড়ানো এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশুদ্ধসহায়ক।

যুগটা অটোমেশন-এর। স্বয়ংক্রিয় ক্রমে গিরস্থালী পর্যন্ত আক্রমণ করছে ধাপে ধাপে। হাত-পা-মাথা---কোন অঙ্গই এখন আর দরকার হলে খাটানোর তেমন প্রয়োজন হয় না, যদি যন্ত্র যোগাড় করা সম্ভব হয়। ঘরে কাচাকুচি থেকে তৈরী খাবার পর্যন্ত না খেটে হয়ে যাচ্ছে।

এর ফলাফল দেহের ওপর অন্তত ভাল নয়। হওয়া সম্ভব নয়। দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যদি নিম্নতম খাটুনী পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে থাকে ত' বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। জং ধরে যায় হাত-পায় সে ক্ষেত্রে।

হাঁটার অভ্যাসও দিনদিন কমতির মুখে। সর্বত্র। গ্রামে আজও সাইকেল ভিন্ন বিশেষ কোন সুলভ যান না মেলায় এবং সাইকেল-ও অধিকাংশ মানুষের সাধ্যায়ত্ত না হওয়ায়, গ্রাম্য মানুষ এখনও কিছুটা হাঁটতে বাধ্য হন। 'কিছুটা' কারণ আগে পাঁচ-সাতটা গ্রামে একটা স্কুল থাকায় অধিকাংশ ছাত্রদের হাঁটতে হত মাইল-এর পর মাইল; হাট বসত একটা---কয়েকটা গাঁয়ের জন্য। সে কারণে হাঁটাহাঁটি হত প্রচুর। রেল তখন তেমন প্রসারিত না হওয়ায়, পদযুগল ছিল গ্রাম্য মানুষের সম্বল।

কিন্তু সহরে মানুষ ঘোড়া দেখেই খোঁড়া। বাইরে বেরুলেই রিক্সা-ট্যাক্সি এবং সর্বোপরি ট্রাম-বাস। বাধ্য না হলে কেই বা হাঁটতে চায়।

আধুনিক জীবনের ওপর হন্টনে অনীহার ফলাফল বহু বিচিত্র। শারীরতত্ত্বের জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপকের মতে বর্তমানে মানুষ যে ভাবতে পারে না তার কারণ সে হাঁটতে ভুলে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা হাঁটতেন পর্যাপ্ত পরিমাণে, খাটতেন অনলসভাবে এবং খেতেনও আমাদের দ্বিগুণ / তিন গুণ। আমাদের হাঁটা প্রায় বন্ধ, কায়িক পরিশ্রম করার তেমন দরকার হয় না, খাওয়াও তাই অত্যন্ত কম। যেটুকু পেটে যায়, তাও হজম হয় না। বাইকোলেট, চিকোল্যাক্স বা গ্ল্যাক্সেনা আমাদের নিত্যসাথী। অর্থাৎ, গণ্ডগোলের মূলোৎপাটন না ক'রে আমরা কেবল ব্যান্ডেজ বাঁধছি প্রাণপণে।

গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশিকালের পরিসংখ্যান বলছে গ্রাম্য ডাকহরকরা সেরা স্বাস্থ্যসম্পন্ন বৃত্তিজীবীদের অন্যতম। মানব-দেহযন্ত্রের পক্ষে দিনে ১২ থেকে ১৮ মাইল হাঁটা অবশ্য প্রয়োজন, অন্য কোনও কায়িক পরিশ্রম না করলে। সুফলপ্রদ।

একথা ঠিক যে, ঘরের কাজ, অফিস বা কারখানার খাটুনি এবং অন্যান্য কাজ করায় আমাদের শরীর 'পরিপূরক ব্যায়াম' থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু, স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ঘণ্টা দুয়েক হাঁটা বিশেষ প্রয়োজন।

হাঁটলে খিদে বাড়ে, হজমে সাহায্য হয় এবং স্নায়ুগুলো বিশ্রামলাভ করে। নিয়মিত হাঁটলে মাথাধরা অতি বিরল হয়। কোমর থেকে পা পর্যন্ত পুষ্ট হয়। মেয়েদের পক্ষে হাঁটাহাঁটি সর্বোত্তম ব্যায়াম। যাঁরা এতে অভ্যস্ত প্রসব তাঁদের সুসহ হয়।

ভাল ক'রে হাঁটতে হলে বুক খোলা রাখা দরকার, মাথা আর ঘাড় সামনের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়ে রাখা ভাল। হাঁটার ছন্দে শ্বাস মিলিয়ে নেওয়া উচিত। মোটামুটি ১২০ পা হাঁটলে ভাল হয়, প্রতি পদক্ষেপের পার্থক্য পুরুষের ক্ষেত্রে দু' ফুট এবং নারীর ক্ষেত্রে এক ফুট আট ইন্চি। সকলেরই ডান পা বাঁ পায়ের তুলনায় বেশি দূরে পড়ে।

হাঁটার সব থেকে বড় সুবিধা হল অন্যান্য জটিল ব্যায়াম বা খেলাধুলার তুলনায় এতে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত চলাচল বেশিমাত্রায় প্রভাবিত হয় না। ফলে বৃদ্ধবয়সেও এ অভ্যাস বজায় রাখা খুবই সম্ভব। বস্তুত, আজীবন হাঁটাহাঁটির অভ্যাস থাকলে বার্ধক্যের অনেক ব্যাধি এড়ান যায়, দেহ মোটামুটি সুস্থ থাকে। আর, সমান গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা লাভ হয়। মানসিক প্রফুল্লতা।

খোলা হাওয়ায় বেড়ালে এমনিতেই দেহমন প্রফুল্ল হয়। তাছাড়া অবসর গ্রহণের পর, সময় সাধারণত বোঝা হয়ে ওঠে। এ বোঝা নামানোর প্রকৃষ্ট উপায় সকাল-সন্ধ্যে নিয়মিত সাধ্যমতন বেড়ান। চমৎকার সময় কাটে। খুঁটিনাটি অনবরত চোখে না পড়ায় খিট্‌খিটে মেজাজ বাড়তে পায় না। দেহ সুস্থ এবং মন সতেজ থাকার ফলে অসংগতিও মাত্রাতিরিক্ত পীড়াদায়ক মনে হয় না।

আসুন আমরা হাঁ ।

মাসিক

বসুমতী

বৈশাখ / '৭৫

ক্লান্তি আমার
ক্ষমা কর
প্রভু—

—বিন্দুশেখর বিশ্বাস

অভিমানী

—নীহার তালুকদার

আলোকচিত্র

-প্র তি যো গি তা-

।। বিষয়বস্তু ।।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আলোর নীচে

আষাঢ় সংখ্যায় তৃষ্ণা

।। পুরস্কার ।।

১ম—২০ টাকা ২য়—১৫ টাকা

৩য়—১০ টাকা

ভোরের আলো
—বিশ্ববন্ধু বসাক

ছবির পিছনে বিষয়বস্তু ও নাম ঠিকানা লিখবেন

শৈলবিহারিণী
—অশোক ভকতভাই

মাসিক বসুমতী

বৈশাখ / '৭৫

কেদার-বদরীতে
—বিজয় ঘোষ

মাসিক বসুমতী। বৈশাখ / '৭৫

চিড়িয়াখানায়
—সমর সাহা

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ পাঁচ ॥

উনিশ শো পাঁচ সালে বাংলা দেশ ইংরেজদের ছুরিতে দু-ভাগ হয়ে গেল। সমস্ত দেশ ক্রোধে ও যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সে আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন থাকতে পারলেন না। প্রকাশ্যে অবতীর্ণ না হয়েও নেপথ্যে উপস্থিত থেকে আন্দোলনে আহুর্য জোগালেন। সর্বস্বত্যাগী বিপ্লবীদের হাতে বোমা, ঝাঁকে বিবেকানন্দের বই, মুখে রবীন্দ্রনাথের বাণী—

'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।'

ফাঁসির হুকুম হবার পর কাঠগড়া থেকে উল্লাসকর দত্ত চেঁচিয়ে উঠল :

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

বিচারকক্ষের সমস্ত নিস্তব্ধতা প্রতিধ্বনি করে উঠল—

'সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালোবেসে।'

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমও ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। সে শুধু সাময়িকতার আকস্মিক উত্তেজনা নয়, সে সর্বস্বাধীন নিয়প্রণেতার পূজা। বিশ্বদেবতাই স্বদেশের মূর্তিতে তাঁর সামনে প্রকাশিত। বিশ্বের কল্যাণের জন্যই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

তাঁর স্বদেশপ্রেম বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত বলে বিশুদ্ধ জাতীয়তায় বা নীরন্ধ্র স্বাদেশিকতায় আবদ্ধ থাকতে পারল না। জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে আর কোনো ধর্ম নেই, নীতি নেই, ন্যায়বোধ নেই—এ তিনি মানতে প্রস্তুত নন। বিদেশী বর্জনেই শক্তিকে নিঃশেষিত না করে স্বদেশী অর্জনের দিকেও তাকে প্রসারিত করা দরকার। ইংরেজকে আগে তাড়াই, পরে ঘড়ি-ঘড়ি ঘর গুছিয়ে নেব—এটা কোনো কাজের কথা নয়। যদি বেসামাল বুঝে ইংরেজ নিজের থেকেই সরে পড়ে তবে আমাদের কোন দুরপনেয় পাঁকের মধ্যে ফেলে যাবে তার ঠিকঠিকানা নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে বাঙালি ও ভারতবাসীকে ভারতবর্ষীয় হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হবারও ডাক দিয়েছেন। পথ দেখিয়েছেন গঠনের দিকে, সংস্কারের দিকে, বিচিত্র উদ্যম ও উদ্‌যাপনের দিকে। উত্তেজনার মোহে দেশের লোক তাঁকে ভুল বুঝল। অথচ এই উত্তেজনার মহান পুরোহিতই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন্ত্র ছিল দুটো : রাজশক্তির কাছে নত হয়ো না, আর গ্রামে-গ্রামে অন্তরে-অন্তরে স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করো। দেশের লোক প্রথম মন্ত্রটা নিল, দ্বিতীয়টা নিল না। পরে—অনেক পরে বুঝল, রবীন্দ্রনাথই সত্যদ্রষ্টা, অনধিকারীকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করলেই কাজ ফুরায় না, গৃহকে বসবাসের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হয়, ভিত্তি ঠিক করে উঁচু করে তুলতে হয় তার আরাধনের চূড়া, আলো-হাওয়া-খাওয়া বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দিতে হয় তার আবাহনের আয়তন। দেশের নেতা হলেই তো চলবে না, দেশের প্রণেতা হওয়া চাই।

অথচ কী সে সার্থক উত্তেজনা! ভাবের আতসবাজি নয়, প্রাণের আদিম শঙ্খধ্বনি।

'দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো, এই সমস্ত বড়ো বড়ো নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো; ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোশ পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা পরম শক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জন-গর্জন, এই-সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই-সমস্ত শাসন-শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র। ইহারা যদি-বা তোমাকে পীড়া দেয়, তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধে সেইখানেই নত হওয়ার গৌরব ; যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিয়ো।......হে আমার স্বদেশ, মহা পর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে তখন, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের কি কর্মের কি ধর্মের অনেক বিরোধ-মীমাংসা হইয়া যাইবে, এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, ভীত হইও না। তুমি আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জানো। এবং উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও, যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধার-শাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।'

এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী
তোমার স্থির অমর আশা॥
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে
অনির্বাণ ধর্ম-আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো
সংকটে দুর্দিনে হে

রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদায়
নিঃশংকে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়—
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

স্বাধীনতার যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু যুদ্ধ নয়, ধর্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধের আহ্বান ধর্মের আহ্বান।

'ধর্ম যবে শংখরবে করিবে আহ্বান,
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ।'

এই যুদ্ধের সারথি স্বয়ং ভগবান, বিপ্লবের নির্ঘোষের মধ্যে তাঁরই উদার শংখনাদ।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শংখধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখত্রাতা
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।

স্বদেশপ্রেম শুধু ভাববিলাসিতায় কালহরণ নয়, নয় বা শুধু শত্রুতাবুদ্ধির বিষবাষ্পের মধ্যে বাস করা। জাগ্রত ভগবানকে মাথার উপর রেখে এমন একটি মানবিক মিলনক্ষেত্র রচনা করা যেখানে সকল মানুষ নির্বিরোধে 'আমি ভারতবর্ষীয়' এই উদার মৈত্রীতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। সেই মন্দিরে এমন এক দেবতার প্রতিষ্ঠা করা যাঁর দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কখনো অবরুদ্ধ নয়। যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি তাই সার্বভৌমিক মানবপ্রীতি। আর তাঁর ভগবানে অটল বিশ্বাস আছে বলে মানুষেও অগাধ বিশ্বাস। তাঁর ভগবৎপ্রীতি সত্য বলে তাঁর মানবপ্রীতিও সত্য। যে ভগবানকে স্পর্শ করেছে সেই তো তাঁর প্রতিভূ মানুষকে স্পর্শ করে পবিত্র হবার কথা বলতে পারে। মানুষকে দেখতে পারে ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছায়া বলে।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে তাই শত্রুবিদ্বেষের চেয়ে মানবমিলনবুদ্ধিই বেশি প্রবল। তাঁর 'দুর্জনেরে হানো'-র চেয়ে 'দুর্বলেরে রক্ষা করো'-র নীতিই বলবত্তর। এই দুর্বলকে রক্ষা করতে গিয়ে তুমি বলিষ্ঠ হও, অজস্র হও, বিস্তীর্ণ হও, বদান্য হও।

'শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে, তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানা-দিগাভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো ; কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এতোদূর বিস্তৃত করো যে দেশের উচ্চ ও নিচ, হিন্দু-মুসলমান ও খৃস্টান, সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।'

শুধু হট্টগোলের কাঁধে চড়ে সিদ্ধিলোকে পৌঁছুনো যাবে না। শুধু মস্ত-বড়ো লোভেই মস্ত-বড়ো লাভ হয় না। নেশার জোরেই হয় না স্বপ্নের রূপায়ণ। ধৈর্যই শক্তি, নিষ্ঠাই শক্তি, অধ্যবসায়ই পরম উপায়। সৃষ্টিকর্তার ধন জাদুকরের ঝুলির মধ্যে লুকনো নেই। প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, আর তাই মানুষের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানুষের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস।

ধর্ম? হ্যাঁ, স্বাধীনতার পরাণ-পণ যুদ্ধের মধ্যেও ধর্ম। দেশপ্রেম সেই ধর্মেরই প্রতিফলন।

'ধর্মের মূল মাটির মধ্যে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই। ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী এক বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।'

তাই ভগবানে প্রভূত বিশ্বাস রেখে নিজের কাজ নির্বিচল নিষ্ঠায় নির্বাহ করো। তোমার প্রিয়তম দেশকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাও। কারু সাধ্য নেই বিধির বিধান লঙ্ঘন করে। এক দেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষকে পদানত রাখবে এ কখনোই বিধির বিধান হতে পারে না। এমন বাহুবল কারু নেই যে ভগবানের ইচ্ছাকে প্রতিহত করে।

শাসনে যতই ঘের' আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান॥

আকস্মিক অপমানের আঘাতে দেশপ্রেম চতুর্দিকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে—তা উঠুক, কিন্তু সেটা শুধু বিরোধের রুদ্ধ আবেগের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সেটা ঠিক নয়। সেই আবেগকে নিভৃত অবস্থায় সংহত করে বিস্তীর্ণ মঙ্গলসৃষ্টির কাজে চালিত করতে হবে। তবু আবেগটাকে অভ্যর্থনা না জানিয়ে পারলেন না রবীন্দ্রনাথ।

বাহির যদি হলি পথে ফিরিসনে তুই কোনোমতে
থেকে থেকে পিছনপানে চাসনে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে ভয় শুধু তোর নিজের মনে
অভয় চরণ শরণ করে বাহির হয়ে যারে॥

রবীন্দ্রনাথ সকলকে অভয়ের মধ্যে আহ্বান করে আনলেন। জড়ত্বের মধ্যে নিয়ে এলেন প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস, স্রোতহীন বন্দী নদীর মধ্যে নিয়ে এলেন সমুদ্রের পরিণাম। দুঃখের কণ্টককিরীটেই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্মান আনলেন সেই নতুন মূল্যবোধ। আর এই স্বাধীনতার বন্দরে পৌঁছেও যে যাত্রার শান্তি নেই, যেতে হবে অমৃতলোকের সন্ধানে লিখে রাখলেন সেই ইতিহাসের ভূমিকা।

নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান
দুঃখেই হোক তব বিত্ত মহান
চলো যাত্রী চলো দিনরাত্রি—
করো অমৃতলোক-পথ-অনুসন্ধান।
জড়তামস হও উত্তীর্ণ
ক্লান্তিজাল করো দীর্ণ-বিদীর্ণ—
দিনঅন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে করো স্নান॥

শুধু প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকো, শুধু কর্ষণ করে যাও, দৈবধন না মিলুক ভাণ্ডার-ভরা শস্য মিলবেই মিলবে।

'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।'

উদ্দেশ্য সুদূর হোক, আমার উপায়ও সুদীর্ঘ—এবং আমার অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু ভগবান আমার সঙ্গে আছেন বলে ধৈর্যে আমার ক্লান্তি নেই, শ্রমে আমার ঔদাস্য নেই, ত্যাগে আমার ক্ষতি নেই, বিঘ্নে আমার আতঙ্ক নেই। ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্র থেকে আমি বিচ্যুত হই নি।

আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে মানব না, ঘরের কোণে মরব না

আমার সমস্ত কাজ যদি ঈশ্বরেরই জয়ধ্বনি হয়, তাহলে আর আমার ভয় কোথায়? যদি মরণই আমার একমাত্র দোসর হয় তাকে বরণ করে নিতে কুণ্ঠা কিসের? মালার বদলে তুমি যদি আমাকে তরবারি দিয়ে থাকো সে-তো আমার বন্ধন কাটাবার জন্যে।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়॥

তেরোশ' বারো সালের তিরিশে আশ্বিন বাংলা দেশ দ্বিধাকৃত হল। রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধনের উৎসব সৃষ্টি করলেন। বাঙালি—হিন্দু হোক মুসলমান হোক খৃস্টান হোক বৌদ্ধ হোক—সব এক পরিবার, তাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা নেই, সবাই ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভূগোলে-ইতিহাসে কিছুতেই তারা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। সেদিন কলকাতায় রাখিবন্ধনের যে বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তার অগ্রণী ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কত লোককে যে তিনি সেদিন নিজের হাতে রাখি পরিয়েছিলেন তা গণনাতীত।

'গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখির ডোর।'

কিন্তু রাখি তো শুধু মানুষকে পরালেই চলবে না, ঈশ্বরকেও পরাতে হবে। তাঁকে বাঁধতে পারলেই তো সকলে বাঁধা পড়বে—তিনিই তো নতুনের মধ্যে চিরপুরাতন, তিনিই তো পুরাতনের মধ্যে চিরনবীন। তাঁকে আনন্দিত না করলে বিশ্বসংসারে কারু যে কোথাও আনন্দ নেই।

প্রভু, তোমার দক্ষিণ হাত
রেখো না ঢাকি।
এসেছি তোমারে, হে নাথ
পরাতে রাখি।
যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই
রবে না বাকি।

'শিবাজী' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে ভারতবর্ষীয়ের ভারত। জননীরূপে সে ভুবনমনোমোহিনী—'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন জাহ্নবীযমুনা বিগলিতকরুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী।' কিন্তু ভারতের অখণ্ড সত্তা স্বীকার করে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভূমিকেই প্রত্যক্ষ-বাস্তবে ভালোবেসেছিলেন। কী সে অতলস্পর্শ আন্তরিকতা।

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষি।
ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে.....
আমি পরের ঘরে কিনব না আর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি॥

বাংলাদেশও কবির মাতা—আর, 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।' খালি মাতা নয়, বিশ্বময়ী বিশ্বমাতা। 'জনকজননী-জননী'—আবার 'তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।'

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।...
আমার জনম গেল মিছে কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

পূজার ভাব মনে না আনতে পারলে বুঝি আত্মোৎসর্গেও তেজ আসে না। দেশ শুধু মাটি নয়, ভাব নয়, মোহ নয়—দেশ দেবতা, তার জন্যে ফাঁসি যাবার অর্থও মায়ের পূজার অর্ঘ্য হয়ে যাওয়া।

ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে
খুলল দুয়ার মন্দিরে যে—
লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই
কোথায় পূজার অর্ঘ্য।
এখন যার যা কিছু আছে ঘরে
সাজা পূজার থালার' পরে
আত্মদানের উৎসধারায়
মঙ্গলঘট ভর গো।
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে,
মরতে হয় তো মর গো।

দেশের এই মূর্তি দেবতার মূর্তি ছাড়া আর কী! এই অপরূপ রূপে মায়ের উদ্বোধন না হলে আত্মবলিদানের প্রেরণা আসবে কী করে?

আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাটনেত্র আগুনবরন।...
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে, হৃদয়হরণী॥

বঙ্গচ্ছেদ ঘটবার পর শীতকালে ইংরেজ রাজশক্তি যুবরাজকে ভারতবর্ষে নিয়ে এল এই স্থূল তথ্যটাই প্রমাণ করবার জন্যে যে বিদেশী রাজা ভারতীয় প্রজার কী নির্মম শত্রু! তার মধ্যে কুশল-সাধনের তন্তুমাত্র আন্তরিকতা নেই, প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যে তার একমাত্র কাজ শোষণ আর পীড়ন, একমাত্র উল্লাস দুর্বলীকরণ। ভারতবর্ষ ভক্তির দেশ, রাজাকেও সে ভক্তি করতে জানে যদি সে রাজার হৃদয় থাকে, যদি সে রাজার অভিধানে প্রজামঙ্গল বলে কথা থাকে, যদি সে মাত্র তামাসার রাজা না হয়।

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত, সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই সে দৈবসম্বন্ধ বলে মনে করে, কিন্তু হে ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক রাজা, তুমি যে দেবশক্তিতে সজীব নও—তোমার যে শুধু নির্বিবেক বর্বরতা—তোমাকে অভিনন্দন করি কী করে?

কী সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন রবীন্দ্রনাথ।

'আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ, যে-কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গল লাভ করি সেই সম্বন্ধের মধ্যেই আমরা আদি মঙ্গল-শক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই সকল উপলক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি তখনও মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাঁহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্য দুর্বলতা, তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, তাঁহারা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণসাধন করিতেছেন সেই পিতৃমাতৃত্ব জগতের পিতামাতারই প্রকাশ। ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ। শক্তি প্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান পুরুষের সত্তা অনুভব না করিয়া কোনোদিন তৃপ্ত হয় নাই। এই জন্যে বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষে নানা আকারেই ভক্তি-বিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্বদাই দেবশক্তিতে সজীব।

এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে, গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজা করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গল লাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে। কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাটাকে প্রণাম করে। ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে: কিন্তু ইহাও জানে, যন্ত্র একটা উপলক্ষ মাত্র—যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে; কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা, যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।'

কিন্তু এ রাজা তো মঙ্গলের দূত নয়, এ রাজা তো উপকারী আত্মীয়ের ভূমিকায় দেখা দেয় না, এ যে কেবলই একটা শোষণের যন্ত্র, পীড়নের দন্ড আর অপমানের কশা। এ যে সহনাতীত।

শুধু রাখিবন্ধন নয়, শুরু হল বিলাতি পণ্যবর্জন। শুধু বর্জনে হবে না, আত্মশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেন্দ্র হবে গ্রাম—দেশের যা অন্তস্তল। শিক্ষাকেও স্বাধীন করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে জাতীয় বিদ্যালয়। সমস্ত সক্রিয় ভাববিপ্লবের ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথ।

রাজার দন্ত আর নখর একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। শুরু হল উলঙ্গ নির্যাতন। যে সব দেশসন্তান কুপিত রাজদণ্ডে বিশেষ করে নিগৃহীত হল রবীন্দ্রনাথ তাদের মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানালেন: 'যাঁহারা মহাব্রত ধারণ করিয়া থাকেন, বিধাতা জগৎ-সমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া—সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যে কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বারম্বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—বন্দেমাতরম।'

ছাড়িসনে, ধরে থাক এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে
ওরে আর নেই ভয়।
ঐ দেখ পূর্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়।
ওরে, আর নেই ভয়।

এরা যে কেবল নিশাচর
অবিশ্বাস আপনার পর,
নিরাশ্বাস আলস্য সংশয়
এরা প্রভাতের নয়।
ছুটে আয় আয়রে বাহিরে
চেয়ে দেখ্, দেখ উর্ধ্বশিরে
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ময়
ওরে, আর নেই ভয়।

[ক্রমশ]

পঁচিশে বৈশাখ

বীণাপাণি সেনগুপ্ত

জগতের শুভ দিবসের মাঝে
রবির শুভ্র অম্লান সাজে
কালের কপোলে নিত্য বিরাজে
পঁচিশে বৈশাখ হয়ে সুন্দরতম॥
কবির জন্মদিনের মহিমা
আঁকিল ললাটে দীপ্ত গরিমা
ক্ষয়হীন সুধা নাহি যার সীমা
পঁচিশে বৈশাখ হলো অমৃতোপম॥

প্রতিদিনের দিন সে তো নয়
সে যে—পরম দিবস অসীম অব্যয়
লয়ে—অমর কবিরে আনন্দময়
পঁচিশে বৈশাখ চির উজ্জ্বলতম॥
মাটির দেহটি গিয়াছে মিলিয়ে
করি দিয়াছে নিজেরে কণ্ঠে দুলিয়ে
"নানা—রবীন্দ্রনাথের মালাখানি" নিয়ে
পঁচিশে বৈশাখ রাজে হয়ে মহত্তম॥

শ্রীমতী আশাবরী চৌধুরী

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(মহুয়া-বন পূর্ণিমার মায়ার আচ্ছন্ন)

রেবন্ত। (গাছপালার ভেতর দিয়ে একান্ত নির্জনে মগ্ন হয়ে চলেছে।)

---পাতাঝরা মহুয়ার ডালগুলি জটাজাল---
রূপালী আলোর ধারা, হাওয়ারা মন্থর হলো।
মহুয়ার গন্ধ-ভারে; মাতালের মতো ফেরে
বনের নিভৃতে---কিসের সন্ধানে যেন
আলোয়-ছায়ায়, স্পর্শ দিয়ে হেথায় হোথায়---
মাঝে মাঝে মৃদুশ্বাস ফেলে যেন ক্লান্ত হতাশায়।
(একটু থেমে অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে)
---বনের মাথায় চাঁদ চলা ভুলে থেমে যায়,
বলে 'যেন: বৃথা আর কেন মরো খুঁজে?
ওই সেই মায়াজাল---স্বপ্ন---পারাবার।
---এখানে জানে না কেউ রংগনার কথাগুলো---
ভাবনা নেই, চিন্তা নেই---শুধু অনুভব।
হু-হু হাওয়া পান করে মহুয়ার মধু আর
খুঁজে ফেরে আরো সুখ জ্যোৎস্নায় অংগ ঢেলে
রংগনার কথাগুলো বড়ো বেশী বাস্তব---
'ঘরে বসে, আলো জেলে বই নিয়ে বসে আছে
বুদ্ধির রেশম দিয়ে জাল বোনে, বন্দী করে
মুক্ত প্রাণ।' এ কি খেলা? বুদ্ধি ফাঁদে
পড়ে কাঁদে আনন্দের জীব---ভোলে তার
নিজধর্ম আত্মপরিচয়। মাকড়সার মতো
পচে মরে গৃহকোণে আকাশ হারিয়ে।
রংগনা এলো না তাই---লেখা নিয়ে ব্যস্ত সে।
'কে বোঝাবে ভুল তার, বুদ্ধিবাদী জীব;
আমি চাই মোহ-মায়া সে চায় সত্য যাহা
অনুভূতি ব্যবচ্ছেদ ধারালো ভাষায়।
চাইনে, চাইনে আমি রংগনার সঙ্গ
এখানে কাটাবো রাত চাঁদের মাধুরী মেখে---
চিরদিন মানুষের প্রেয়সী পূর্ণিমা ---হয়তো বা
ধরা দেবে সুন্দরী রমণী-রূপে আমার বুকেতে।
(মৃদু পায়ের শব্দে সহসা রেবন্ত সচকিত হয়ে ওঠে---বিলম্বতা কেটে কিছুটা আতঙ্ক যেন হয় এই গভীর রাতের চাঁদের আলোয় ভাসা নির্জন মহুয়া-বনে।)
ও কি? কার পায়ের শব্দ? ভালুক নয় তো?
কার ঐ সাদা আঁচল সরে গেলো?
কে তুমি? কে দাঁড়িয়ে ঐ গাছের ছায়ায়?
এ কি? এ যে এক নারী! স্বপ্ন নাকি?
তুমি কি মানবী না কল্পনা? কথা কও---
কথা কও! লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

তরুণী। (দ্বিধাজড়িত স্বরে)
তোমায় দেখছি আমি অনেকক্ষণ হতে---

রেবন্ত। লুকিয়ে দেখছিলে আমায়---কেন? কেন?

তরুণী। (সমুখে এসে, মিষ্ট হেসে---)
একলা এখানে উদাস হয়ে বসে আছ কেন?
কার পথ চেয়ে বাবু?

রেবন্ত। (চমকিত)
কারো পথ চেয়ে নয় গো---তুমি যাও,
------কোথা থাকো তুমি---

তরুণী। ওইখানে বনের ধারে তাঁবু আমাদের---
কয়দিন হলো এসেচি এখানে, বাবু।
বনের পথে আপন মনে চলে এলে তাই মনে হলো---
দেখি কেন একা একা এলে গভীর রাতে এই বনে,
------সাথী বুঝি এলো না কো? এই বনে
একলা থেকো না গো বাবু!

রেবন্ত। (কৌতুকে) কেন?

তরুণী। জানো না? এই 'পুনিয়া' রাতেই চাঁদের পরী
মহুয়ার বনে, সুন্দর পুরুষ একা পেলেই
ভুলিয়ে নিয়ে যায়। জানো বাবু, আমার ভাই ছিলো
সুন্দর তোমার মতো---গোরা মুখ, কোঁকড়ানো চুল।
একদিন মদ খেয়ে 'পুনিয়া' রাতে এমন

রাত ভোর শুয়ে ছিলো মহুয়ার এই বনে,
আর দেখা দিলো নাকো—বউ কেঁদে সারা!
আমাদের মেয়েরা বাবু এই রাতে কখনও
একা ছেড়ে দেয় নাকো স্বামীদের দূরে!
বাবু, তোমার হয় নি বুঝি বিয়ে?

রেবন্ত। তোমার হয়েছে?—কেন তবে মাঝরাতে একা এই বনে?

তরুণী। (মধুর হেসে) কেন শুনবে?
তাহলে বসি আমি তোমার পাশেতে- - -
ভয় নেই, আমি নই চাঁদের পরী সেই।
তুমি বসবে না? (রেবন্তর পায়ের কাছে বসলো।)
এই যে পাথরটার বোসো!

রেবন্ত। (পাথরে বসে তরুণীর হাত ছুঁইয়ে।)
যদি হও? সুন্দর তোমার মুখ—হরিণ-চোখ,
এতো ভালো আমাদের মেয়েরা নয় তো- - - !

তরুণী। না বাবু, চাঁদের, পরীরা হয় 'গোরা' সব—
তোমার মতন সুন্দর! আমি তো 'রুক্মিণী' বাবু।

রেবন্ত। বা:, রুক্মিণী তোমার নাম? বলো, শুনি—
একলা ঘুরছ কেন মাঝরাতে এই বনে!

রুক্মিণী। (নিঃশ্বাস ফেলে)
মোর পিরীতের সাথী 'ছুন্নু' তার নাম—
তাকে বাবু খুন করে ঝগড়ু ছুননুর শালা
আমাকে পাবার লোভে। বাপকে টাকা দিয়ে
জোর কোরে বিয়ে কোরে নিয়ে গেলো ঘরে।
- - - - - - তারপর দিন যায়। একদিন আমি তাকে
বিষ দিয়ে মেরে ফেলি। এখনও সাথী
পাইনি কো! একা একা আর ভালো লাগে না।
(আদর ভরা স্বরে)
জানো বাবু! ছুন্নু আমায় দিতো
ভালো ভালো 'জেবর' আর শাড়ী কতো—
ডাকাতির দলে ছিলো কি না! এই দ্যাখো—
ই 'চোলী', এই 'কান-ফুল' তো ওরই দেওয়া!
বড়ো ভালো ছিলো—একদিন চুরি করে
পড়েনি কো ধরা—এতো ভালো!
- - - এমন চাঁদের রাতে আমরা ঘুরেচি কতো—
বনে—বনে নেচেছি—মিশেচি কতো সারারাত—
মহুয়ার মদ খেয়ে কতো না গেয়েচি গান
মাদলের তালে তালে। কখন যে ঘুমিয়েছি—
হুঁশ নেই জড়ামড়ি! হায়!- - - একদিন অন্ধকার
'বরিষে'র রাতে ঝগড়ু মারলে তাকে
মাথার ওপরে লাঠি- - - কি রক্ত বেরুলো বাবু—
মাঠের সবুজ ঘাস লাল হয়ে গেলো! ও:,
ছুন্নুর শরীরে কি এতো রক্ত ছিলো? জোয়ান—
মরদ—ঝগড়ু তাকে শেষ করে বুড়ো জানোয়ার—
আমায় বিয়ে করে খুব খুসী! চুপচাপ কিছুদিন
থাকি- - - তারপর বিষ দিয়ে শেষ করে ফেলি!
- - - সাথী খুঁজি সেই থেকে, একা ভালো লাগে না;
'পুনিয়ার' রাতে আজ মেয়ে-মরদ মিলে
চলে গেছে দূর বনে, মাদল বাজাবে, কতো মদ খাবে;
ওদের পেছু যেতে যেতে তোমায় দেখি বনের পথে—
তোমার পেছনে আসি গাছের আড়ালে!- - -
কি সুন্দর তুমি!- - - তুমিও একলা বাবু?

রেবন্ত। (গম্ভীর) হ্যাঁ- - - আমিও একলা আজ।

রুক্মিণী। তোমার নেই কো সাথী?

রেবন্ত। আছে। আসেনি কো।

রুক্মিণী। আসেনি কো—কেন বাবু?

রেবন্ত। কি জানি, জানি নে।

রুক্মিণী। (প্রগল্‌ভ) আচ্ছা বাবু,
তোমাদের মেয়েরাও ভালোবাসে?

রেবন্ত। ভালোবাসে।

রুক্মিণী। আমরা যেমন বাসি?

রেবন্ত। (মৃদু হেসে) তোমরা কেমন বাসো?

রুক্মিণী। তাহলে চেয়ে দ্যাখো! কি দেখচ
আমার পানে এমন অবাক হয়ে?

রেবন্ত। (সন্ত্রস্ত) না না, কিছু নয়!- - - আঁচল সরাও কেন?
ভয় করে- - - ও কি!

রুক্মিণী। কেন, ভয় কেন? আমি তো 'পরায়া' নই!- - -
(রেবন্তকে জড়িয়ে ধরে।)

রেবন্ত। (ঠেলে) না না, ছাড়ো ভয় করে তোমায়- - -!

রুক্মিণী। (অভিমানে) কেন ভয়? আমি কি ভালুক?

রেবন্ত। ভয় করে কেন জানি নে—
হয়তো তোমার ঐ জ্বালা করা কালো রং
ঐ উদ্দাম এলো চুল দেখে ভয় করে- - - হয়তো বা
তোমার কালো ঝকঝকে চোখ দেখে ভয় করে—
হয় তো বা তোমার অত সাদা দাঁত দেখে
ভয় করে!- - - তুমি চলে যাও রুক্মিণী!

রুক্মিণী। (নাগিনীর মতো)
কেন যাবো? তোমাকে ভালো লেগেচে যে- - -!

রেবন্ত। না না রুক্মিণী, ছেড়ে দাও, যাও তুমি।

রুক্মিণী। আচ্ছা বেশ!
(চলে যায়।)

রেবন্ত। গেলো চলে। স্বপ্ন নয়তো? কি অদ্ভুত চোখ ওর!
কি মোহের ঘোর মাখা—দুই চোখে কি তীব্র চাহনী!
পিঠ ভরা খোলা চুল—অরণ্যের ঘন অন্ধকার!
- - - চলে গেলো! ও: কি ঢেউ তুলে দিলো অন্তরে
সমুদ্রে যে ঢেউ ওঠে চাঁদের আকর্ষণে।
উথাল পাথাল জল ফুলে ফুঁপে ওঠে—
আছড়ে তীরেতে পড়ে ব্যর্থতার ভারে।
চাঁদ হাসে, বলে 'এসো, উঠে এসো, ফেলে এসো
পৃথিবীর বাধা-বন্ধ-নীল-জল! নীল জল!
তুমি যে আমার!- - -' ও কে! কি স্বপ্ন দেখালো যেন

ও আমায়---মায়ার কাঠিতে যেন জাগালো
আমাকে ও। আলোক রাজ্যের কোন ছবি দেখি
ভাসাভাসা---ভালোবাসা ফোটে যেথা ফুলের মতোই
প্রাণ যেথা অফুরান, চঞ্চল আলোর মতো---
নেই তার স্মৃতির সেখানে---নেই মৃত্যুভয়।
সে রাজ্যের রাজা হতে ভয় বা পেলুম কেন---?
ফিরে এলুম দ্বার প্রান্ত হ'তে---ফিরিয়ে দিলুম ওকে।
হায়! এখন শুনি লোভের কান্না বুকের মাঝেতে।
ভুল করলুম?---চোখ এখনো স্বপ্ন ঘোরে ভরা---
বাসনা-সাগরে জোয়ার ডেকেছে---তবু পারলুম না---
পারলুম না ধরা দিতে ঐ মুক্ত নারীর বুকে;
ভীরু আমি: অভ্যাসের দাস আমি---সভ্যতার
পোষা জীব। ভুলে গিছি হাতছানি নগ্ন জীবনের---
ওখানে স্বাধীন সেই ভাবনা-বিহীন তাকে ভয় পাই?
পরিমিত জীবনের অভ্যাস আজীবন, সব কিছু
মাপা-জোকা না হলেই ভয়? খাঁচার পাখীকে যেন
ডেকে গেলো কোন এক বনের পাখী---
ফিরিয়ে দিলুম তাকে,
রুক্মিণী, তুমি ফিরে এসো একবার;
ভীরু আমি, ক্ষমা করো।
(করতলে মুখ ঢেকে চিন্তামগ্ন---সহসা ফুলের স্পর্শে চমকিত)
------এ কি: তুমি?---আবার এসেছ? এ কি?
আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে কেন?
ছি: রুক্মিণী!

রুক্মিণী। (হাসিভরা উচ্ছল ভংগীতে, হাততালি দিয়ে)
ভেবেছিলে আর আসবো না?

রেবন্ত। (কিছুটা বিব্রত) এলে কেন?

রুক্মিণী। তোমাকে মালা পরাবো বলে: গেঁথেছিলুম
সন্ধ্যেবেলা, মহুয়া-তলায়, ছিলো, নিয়ে, এলুম
তাড়াতাড়ি।

রেবন্ত। গলায় পরালে মালা: যদি ছিঁড়ে ফেলি?

রুক্মিণী। (ব্যাকুল হয়ে রেবন্তর দুটি হাত ধরে)
ছিঁড়ে ফেলবে? না, না, না---ছিঁড়ো না গো;
চুপ করো একটু বোসো---তোমায় সাজাবো।
(আঁচলভরা ফুল রেবন্তর সারা শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে নিপুণ
ক্ষিপ্রহাতে সাজাতে বসলো পাশে।)

রেবন্ত। (আত্মসমর্পণের ভাবে)
একি খেলা রুক্মিণী? ফুল দিয়ে সাজাবে
আমাকে?

রুক্মিণী। (আদরে)
হাঁগো, ফুল দিয়ে সাজাবো তোমায়:
এই দ্যাখো কতো ফুল এনেচি। বসে থাকো---
লক্ষীটি: তোমার কি ক্ষতি তাতে?

রেবন্ত। জানিনে। কেন তুমি এলে বলো? কেন এই খেলা?

রুক্মিণী। ভালো লাগে:---রাগ কেন হয়ো বাবু?
------চলে যেয়ো নয় পরে।

রেবন্ত। আর---যদি নাই যেতে পারি? যদি বাঁধা পড়ে যাই?

রুক্মিণী। (অভিমানে)
তামাসা? কেন বাবু, কালো রং বলে?
এই হাতে ফুল দিলে তাও নেবে না কো?
বেশ: তবে বাড়ী যাও, আমি চলে যাই।

রেবন্ত। যেয়ো না রুক্মিণী; তুমিও আমায় বুঝবে না।
বেশ, সাজাও ফুলি দিয়ে আমায়। ভালোই লাগে।

রুক্মিণী। (খুশী)
বেশ: চুপ করে বোসো। বড়ো বোকা তোমরা বাবু।
মাফ্ করো---সত্যি বলছি, কি নিয়ে, থাকো বলো তো?
ভালোবাসাই জানো না? কি সে বাঁচো তাহলে?

রেবন্ত। (গম্ভীর)
সে তুমি বুঝবে না। আমরা অনেক কিছু নিয়ে থাকি---
আমরাও হেসে, গেয়ে আনন্দ কোরেই বাঁচি---জানো:

রুক্মিণী। জানি, জানি, তোমরা ভালো ভালো খাও-পরো---
আর তোমাদের মেয়েরা পরে ঝলমলে শাড়ী-জামা,
কতো সোনা রূপো------দেখায় পরীর মতো:
কিন্তু ভালোবাসা?------বাসতে পারে? জানো?
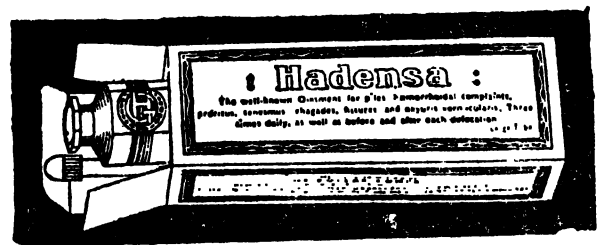
রেবন্ত। (হেসে)
খুব বাসতে পারি---জানি। মানুষ সবাই ভালোবাসে।
ভালোবাসতে তোমরাই জানো শুধু
এমন কি কোরে ভাবো?

রুক্মিণী। তাহলে একা বসে আছ কেন? সাথী কেন রইলো
ঘরে বসে? তোমাদের বউরা বাবু ভয় পায়
ঘরের বাইরে যেতে নয়? ঘর যে বোঝাই-করা
দামী দামী জিনিষেতে :------ছন্নু বলতো এসে।
চারদিক বন্ধ ঘরে কি করে বাতাস পাও?

রেবন্ত। জানলা আছে বড়ো-বড়ো------যাবে?

রুক্মিণী। না গো : মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে
তোমাদের ঘরে গেলে।

রেবন্ত। (কোমল স্বরে)
আমাদের দম বন্ধ সহজে হয় না।------এ কি।
তুমি যে ফুলে ফুলে আমায় ছেয়ে দিলে---রুক্মিণী :
সাপ জড়িয়ে ধরবে যে গন্ধে মাতাল হয়ে,------
ও কি :------হাসো কেন? আমায় দেখে?
কি সুন্দর হাসি তোমার :

রুক্মিণী। (দুই হাতে রেবন্তর গলা জড়িয়ে)
হাসচি তোমার বুদ্ধি দেখে---কি বোকা তুমি!
ছন্নু বোকা ছিলো---আহা।
তাইতো এত ভালো ছিলো
---আচ্ছা বাবু, সাপ যদি জড়িয়ে ধরে কামড়ায়---
কি করবে তখন?

রেবন্ত। করবো আবার কি : বিষে নীল হয়ে ব্যথায়
জ্বলবো যে তখন :

রুক্মিণী। (আবেগ-কম্পিত)
কিছু তালে কোরবে না---?

রেবন্ত। কিছু না---ভয়েই মরে যাবো।

রুক্মিণী। (তার বাসনাব্যাকুল বন্ধনে রেবন্তকে বন্দী করে)
বেশ, মরো তবে : ব্যথায় নীল হয়ে যাও : (চুম্বন করে)

রেবন্ত। (যেন সম্বিত পেয়ে নিজকে মুক্ত করে সরে দাঁড়ায়)
ছেড়ে দে নাগিনী, সারা দেহ জ্বলে গেলো দংশনবিষে
(একটু সচেতন)
বাড়িয়ো না হাত মায়াবিনী। ছাড়ো, আর নয় ;
গলা টিপে দোবো শেষে খুন হয়ে যাবে ;
---ও কি! পায়ে কেন মাথা রাখো? কাঁদো কেন?

রুক্মিণী। (অঝোর কান্নায় রেবন্তর পায়ে লুটোয়)
মাফ করো---আমার দোষ মাফ্ করো বাবু।
আমার কেউ যে নেই---মহুয়া বনেতে আজ
এলে তুমি জ্যোৎস্নায়---দেখে যেন পাগল হয়েচি।
মনে হলো দেখে আমি মানুষ না স্বপন?
মনে হলো ভালোবাসা হয়ে বুঝি তুমি দেবে ফুল।
খুন করো---খুন করো গলা টিপে---সেই মোর ভালো।

রেবন্ত। এ কেমন ভালোবাসা? একবার দেখাতেই?

রুক্মিণী। ভালোবাসা একবার দেখাতেই হয়। তোমরা
জানো না কিছু। একবার দেখাতেই মনে হলো
বুক চিরে---আমার পরাণ রাখি পায়েতে তোমার।

রেবন্ত। (সঙ্কুচিত)
আরে---ছাড়ো, পা ছাড়ো---পাগল হলে নাকি?
আশ্চর্য লাগছে বড়ো, এ রকম আমাদের
অভ্যাস নেই কি না। রুক্মিণী। লক্ষ্মীটি, ওঠো।
ঘরে ফিরে যাই---চাঁদের আলোয় আজ কেন যে
এমন বিবাগী হলো মন? পাগলের হাতে এসে পড়লুম

রুক্মিণী। (ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে পা ছেড়ে)
পাগল নই বাবু---। বেদরদ, তুমি চলে যাও।

রেবন্ত। (দ্বিধায় এক পা বাড়িয়ে ফিরে আসে)
এ বড়ো খারাপ লাগে। ধুলায় রইলে শুয়ে একা
এই বনে সাপ, বিছে জংগলেতে কতো কিছু
আছে---ওঠো। ওই দ্যাখো, চাঁদও পড়েছে চলে
আকাশের গায়।

রুক্মিণী। মায়া আর দেখিয়ো না---যাবো না কো আমি।
ঘরে ফিরে যাও বাবু তোমার বউ এর কাছে---
সাপ কামড়ালে মরে যাই যদি---তোমার কি?

রেবন্ত। (বিপন্নভাবে নীচু হয়ে রুক্মিণীর হাত ধরে
তুলতে চেষ্টা করে)
কিছু নয়, তবু বলি উঠে ঘরে যাও---
কথা শোনো, মুখ তোলো।---উঃ, কি জোর
তোমার শরীরে---লোহার তৈরী মেয়ে যেন।
(হাত ছেড়ে দেয়)

রুক্মিণী। (ভাঙ্গা স্বরে)
ঠিক আছে ; যাও চলে বাবু---
উঠবো না আমি তোমার কথায়।

রংগনা। (গাছের ছায়া হ'তে বেরিয়ে আসে)
আমার কথায় উঠবে তো? ওঠো ভাই।

রেবন্ত। এ কি তুমি? রংগনা, রংগনা---দ্যাখো
কি বিপদে পড়ে গিছি।

রংগনা। (রুক্মিণীর হাত ধরে ধূলায় বসে পড়ে)
দেখছি অনেকক্ষণ ধরে। বেদেনীর প্রেম-ফাঁদে
ছটফট করো, করুণায় প্রাণ কাঁদে দেখে।
বন-রাণী শুয়েছে ধূলায়---অভিমান ভাংগো।
তোলো ওকে? সংগে কোরে নাও?

রেবন্ত। (হতাশভাবে)
রংগনা। উদ্ধার করো, আর পারি নাকো।

রংগনা। (মধুর হেসে)
ওঠো ভাই লক্ষ্মীটি। তুমিও যেমন,
বাবুরা কি ভালোবাসা জানে? ওর'পরে
রাগ কেন মিছামিছি করো?---হ্যাঁ এই তো---

এই তো লক্ষ্মী মেয়ে! বাঃ কি সুন্দর তুমি
পুরুষ হতুম যদি---বাঁধতুম ঘর তোমাকেই নিয়ে;
চোখ মোছো---কান্না কেন? দুঃখ কেন?
ও একটা বোকা বাবু! আমি জানি ভালোবাসা—
ফেলে দেয়া মালা ওর আমি তুলে পরি এই—

(ধুলো হতে মালা তুলে পেলে না আদর ওর?---আমি
দেবো---এসো। গলায় পরলো)

(রুক্মিণীকে আদরে ভরে দিয়ে)

বাঃ কি সুন্দর তুমি! উজ্জ্বল হরিণ চোখ
হঠাৎ বিদ্যুৎ জ্বলা তনু মেঘলতা!

(হাতের কংকণ গলার মণিহার রুক্মিণীকে পরিয়ে দিলো)

রুক্মিণী। (বিস্ময়ে, আনন্দে ত্রাসে)
না না,—এযে সোনা, মণি, মুক্তো, দিদি!
আমায় পরালে কেন? চোর বলে ধরে নিয়ে যাবে-

রংগনা। নারে ধরবে না---বলবি দিয়েছে দিদি---
নতুন বাঁধবি বলে ঘর---ভালো বর খুঁজে নিবি---
কেমন?
এবার চল দিয়ে আসি তোদের ডেরায়?

রুক্মিণী। পারবো একাই যেতে---চলি দিদি!

(হরিণীর মতো দ্রুতপায়ে গাছের
আড়ালে মিলিয়ে গেলো।)

রেবন্ত। (বিষণ্ণ) চলে গেলো। আহা শুধু শুধু ব্যথা পেলো!

রংগনা। তুমি কিন্তু পেলে না কো ব্যথা!

রেবন্ত। পেলম না। খাঁচার পাখী কি বোঝে
বনের পাখীর ব্যথা?

রংগনা। বোঝে না—সে তো দেখলে! কল্পনায় যেতে চাও
বহু দূরে পিছু ফিরে আপনার পদ-চিহ্ন হতে;
বাস্তবে যে ঘুরে ফেরো আপনার গণ্ডীতেই—
বুকে টেনে বেদেনীকে নিলে কি?

রেবন্ত। (রংগনার হাত ধরে)
পারলম না রংগনা! গেলো না বুদ্ধির বাধা
স্পর্শে ওর বাসনা ব্যাকুল হলো—জাগালো
চিন্তাও তবু। ইন্দ্রিয় উন্মুখ হলো ওকে পেতে—
মন তবু রইলো ঘুমিয়ে। যুগ যুগান্তর ধরে
পূর্বপুরুষের সভ্যতার সাধনার পদচিহ্ন ধরে
সুদূরে এসেছি ফেলে মহুয়ার বন!

রংগনা। (হেসে) উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এ
পদচিহ্ন শুধু এগোবার
পিছোবার নয় গো! চলো চাঁদ দ্যাখো ডুবুডুবু—
ভোরের হাওয়ায় জেগেছে অরুণ ছোঁয়া—
পথ দেখা যায়

(দুজনে চলতে লাগলো)

॥ সমাপ্ত ॥

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

তোমার প্রেমে ধন্য করো যারে
সত্য করে পায় সে আপনারে।

মথুরানাথ ভাগ্যবান। তাঁর দৃষ্টি ছিল কি আঁধার পরপারে? কে জানে?

দয়াময় প্রভুর অপার কৃপায় তাঁর জীবন ধন্য। পরম পবিত্র। তাঁর প্রতি দয়াল সদয়। তাঁর আর কি চাই? কি করে হলো? এ যে হবারই ছিল। মার হুকুম।

আমাকে শুকনো সাধু করিস নি মা। রসে বসে রাখিস।

একজন দুজন নয়। চার চারজন রসদ্দার এসে দাঁড়ালো লাইন করে। কোত্থেকে এলো সবাই?

মা পাঠিয়েছেন। মা জগদম্বা।

মথুরানাথ তাঁদের প্রথম। তাঁদের প্রধান।

মথুরানাথের সেদিনের শিবকালী দর্শনের পরই গদাধরের মনে ভারী ভয় জাগলো। অকারণ ভয়।

'ভয় হলো। কেন জানিস? একথা কেউ জেনে যদি গিয়ে গিন্নিকে, রাণী রাসমণিকে বলে দেয়? সে কি ভাববে? হয়তো এও ভাবতে পারে আমি কিছু গুণ-টুন করেছি।'

গদাধর অনেক কষ্টে মথুরানাথকে থামালেন।

মথুরানাথ কি এমনি এমনি গদাধরের প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন নিজেকে? মথুর কি সাধে এতটা করতো? অমনি অমনি ভালবাসতো? মা তাঁকে অনেক সময়ে অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল যে তার ইষ্টের ওপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।

নিয়ম-কানুনের কথা বলছো সেজোবাবু! যিনি নিয়ম-কানুন তৈরী করেন তাঁর কি সে সব মানা না মানার প্রশ্ন ওঠে?

সেজোবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই। ঈশ্বরকেও আইন-কানুন মেনে চলতে হয় বৈকি। তিনি যে নিয়ম একবার করে দিয়েছেন তা রদ করার শক্তি কার আছে?'

একি কথা তোমার? হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন গদাধর।

যাঁর আইন, ইচ্ছে করলে তিনি তা নিশ্চয়ই যখন খুশী রদ করতে পারেন। ইচ্ছে করলে তিনি তার জায়গায় আর একটা আইন চালু করতে পারেন।

গদাধরের কথায় মথুরানাথ সায় দিতে পারলেন না।

সে কি কথা ঠাকুর? লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়। সে গাছে কখনও হতে দেখেছো সাদা ফুল? কেন? এ যে তাঁরই নিয়ম। তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হবে।

গদাধর বললেন, 'না সেজোবাবু। ঠিক তা নয়। তিনি ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারেন। ইচ্ছে করলে লাল ফুলের গাছেও সাদা ফুল ফোটাতে পারেন বৈকি।'

একটা দিন শুধু কেটেছে। ঝাউতলার পশ্চিম প্রান্তে গদাধর দেখলেন একটা লাল জবাফুলের গাছে একই ডালে দুটো ফুল—একটা লাল। আর একটা ধবধবে সাদা। লালের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই তাতে। গদাধর তাড়াতাড়ি ডালটা ভেঙ্গে নিলেন। মথুরানাথ ছিলেন কুটিবাড়ীতে। সেখানে গিয়ে তাঁর সামনে ফেলে দিলেন ডালশুদ্ধ ফুল দুটো, ফেলে দিলেন মথুরানাথের সামনে।

দেখে মথুরানাথ হতবাক্।

হার মানলেন ইংরিজী শিক্ষিত সেজোবাবু। তাঁর নিয়মের ন্যায় যুক্তিতর্ক মানে না যে। হার মানালে, আহত অভিমান। মথুরানাথের ক্ষীণ হাতে জ্বালা যুক্তির দীপমালা হয়ে গেল খানখান। সেজোবাবু পরালেন হার মানা হার তাঁর গলায়। আপন বশের ছলে পারলেন না রইতে দূরে। অভিমানে। ইংরিজী লজিকের অভিমানে।

সেদিন শিবমন্দিরের চারিদিকে গোলমাল শুনে মথুরানাথ ছুটে এলেন। ছোটো ভট্চায মশাই পাগল হয়েছেন। দেখো আবার মহাদেবের ঘাড়ে না চেপে বসে পড়েন। যা হচ্ছে ক'দিন থেকে।

কেউ বা চেঁচিয়ে ওঠে, সবাই তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? ওকে মন্দির থেকে তুলে বাইরে নিয়ে চলো।

বিবস্ত্র। সম্পূর্ণ ধুতিটুকু মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। গাল বেয়ে বইছে প্রেমাশ্রু। তোমার মহিমা বর্ণনা আমি কি করে করবো দেবাদিদেব মহাদেব মহেশ্বর। সমুদ্রের গভীর পাত্রে বিশাল হিমালয় শ্রেণীর মত পুঞ্জপুঞ্জ কালি রেখে, কোনো রকম অসম্ভব জিনিষ চাইলেও তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি করে যাঁর আছে যাচকের কামনা পূর্ণ করার ক্ষমতা, সেই কল্পতরু শাখায় কলম ও পৃথিবীর মতন চওড়া কাগজ নিয়ে মা সরস্বতীও যদি তোমার অনন্ত মহিমার কথা লিখে শেষ করার চেষ্টা করেন তিনিও তা পারেন না।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

সেখানে আমি কি করতে পারি? সরিয়ে নিয়ে চল্ ছোটো ভট্চায মশাইকে। দেখছিস কি সবাই দাঁড়িয়ে। শিবমন্দিরে আমলার দল ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

সেই শুধু ওঁর গায়ে হাত দেবে

যার ঘাড়ে দুটো মাথা। জানবে একটা মাথা এক্ষুণি ঘাড় থেকে সরিয়ে দেবো আমি।

সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। সেজোবাবুর কণ্ঠস্বর নয় এ যেন সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-গর্জন!

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন মথুরানাথ। নিজেকে নিযুক্ত করেন প্রহরীর পদে।

হুঁশ ফিরে আসে গদাধরের। এতক্ষণের মহাভাব গেছে কেটে।

তাকিয়ে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে সেজোবাবু। তার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ধুতিটুকু কুড়িয়ে নেন।

বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলিনি তো।

না ঠাকুর। তুমি মহাদেবের স্তব পাঠ করছিলে। তোমাকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে তাই আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে।

মথুরানাথ গদাধরকে প্রণাম করেন।

তিনি যে দেখেছেন আলোর ঝলক ঠিকরে পড়ছিল শ্রী-অঙ্গ থেকে!

ভক্তিভাব বেড়েই চলেছে মথুরানাথের। আজকাল মুহূর্তকাল গদাধরকে না দেখতে পেলে মন আনচান করে ওঠে। তাই যখন তখন এসে বেড়াতে নিয়ে যান। নিয়ে যান জানবাজারের প্রাসাদে। রূপোর গেলাস আসে। আসে সোনার থালা, রূপোর বাটি। যার জন্য? তিনি যে সেদিকে ফিরেও তাকান না।

শীতকাল। আসে হাজার টাকা দামের কাশ্মীরী শাল। ভারী খুশী গদাধর। নেড়েচেড়ে দেখেন। দেখান সবাইকে। যেন ছোট্ট শিশুর হাতে পড়েছে চক্‌চকে রঙীন খেলনা। শুধু ক্ষণিকের আনন্দ। তারপর? তারপরই আসে প্রবল দ্বন্দ্ব। এত মূল্যবান শালের দরকারটা কি ছিল? সাধারণ থেকে অসাধারণের পর্যায়ে যে তিনি পড়তে চান না। কাঙালের মনের মানুষ। বড় মানুষী ভাব মনে ঠাঁই পাবে কি করে?

কেন সোনার অঙ্গ সইছে না এমন শালের স্পর্শ? গায়ে যেন এক অজানা অনুভূতি—অস্বস্তিকর অনুভূতি। থু থু থু। কোথায় চক্‌মকিটা কোথায়? ঐ মূল্যবান শাল জ্বালাতে চলেছেন গদাধর? পিছন থেকে কে যেন ছুটে এসে বাঁচালো শালখানা। মথুরানাথের কানে পৌঁছুলো সব কথা।

বেশ তো ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুর যা খুশী করবেন। তাতে তোমাদের কি? আমারই বা কি? এ সব কি আমি দিচ্ছি? এ সবই যে তাঁর। আমি শুধু তাঁর দেওয়ান মাত্র।

ছোটো ভট্‌চায গুণ করতে জানে। না হলে সেজোবাবুকে অমন বসাচ্ছে ওঠাচ্ছে কি ভাবে? মনে মনে নয়, সর্বজনসমক্ষে প্রশ্ন করে পুরোনো পুরোহিত হালদার। হালদার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সেজো বাবুকে হাত করতে। কোথায় তার এত শক্তি? সূর্যের রশ্মি-চ্ছটায় প্রদীপের ক্ষীণ আলোর প্রভাব কার কতটুকু?

আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় হালদার। গদাধরকে ধরতে হবে। শক্তি চাই। গুণ করার শক্তি। সেজোবাবুকে হাত করার শক্তি। বশীকরণের মন্ত্র চাই।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে মার ধ্যান করতে করতে গদাধর অর্ধ-চেতনায় বসেছিলেন জানবাজারের প্রাসাদে। আশেপাশে কেউ ছিল না কাছে।

এই সুযোগই তো খুঁজছিল হালদার পুরোহিত।

পা পা করে এগিয়ে আসে গদাধরের কাছে।

বল্ বামুন কেমন করে হাত করলি সেজোবাবুকে? বল্। কেমন করে গুণ করেছিস? বল্ মন্ত্রটা। বলে দে।

গদাধর অর্ধ-চেতনায় নীরব।

বলবি না? ভণ্ডামি করছিস আমার সাথেও।

ভাবতেও শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। শ্রী-অঙ্গে লাথি মেরে চলে গেল হালদার। যা শালা বললি না?

হালদারের হাল আর কেউ ধরলো না। মায়ের হাতে যার হাল তাঁর আর কিসের ভাবনা, কিসের ভয়?

হাল দিয়েছি মায়ের হাতে
এখন কি আর ভাবনা করি?
ঝড় যদি ওঠে আকাশে
চাইব না আর আশেপাশে
ভরবো না উজান বাতাসে
যেদিক কেন যাক না তরী ॥

হালদারের হাল গেল। বিনা ঝড়েই ডুবলো তরী। চাকরীটাই ছুটে গেল।

গদাধর কিছুই বলেন নি মথুরানাথকে।

'কেন বলো নি ঠাকুর? দেখতাম ওর ঘাড়ে ক'টা মাথা?'

পরীক্ষা হয়ে গেছে। গদাধরের পরীক্ষা। রাজা মথুরানাথের গুরুর পরীক্ষা। না হলে কি [illegible] রাজগুরু?

ভাবতেও ভয় জাগে মথুরানাথের মনে। সেই সুন্দরী কুলটা ডেকে পরীক্ষা।

আয়নাতে নিজের ছবিই দেখা যায়। মথুরানাথ ধনী রাজা মানুষ। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তিনিযে এখন তাঁর হৃদয়দেবতা। তাই ভারী ইচ্ছে, তাঁকেও একটু বড়লোক করানো।

ক'দিন থেকে ভাবছি কি জানো ঠাকুর?

কি ভাবছো?

ভাবছি এই মন্দিরটা পুরোভাবে তোমার নামে দেবোত্তর করে দেবো।

এ কে?

মথুরানাথ দেখেন নি গদাধরের এ নটরাজ ভাব। রাগে কাঁপছে সর্বাঙ্গ থরথর করে।

তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস?

তাড়াতাড়ি পালাবার পথ পান না খুঁজে সেজোবাবু।

সর্বত্যাগী মহেশ্বরকে কে বাঁধবে এ সীমিত বন্ধনে?

বিশ্বজোড়া যাঁর ফাঁদ তাঁকে ফাঁদে ফেলবে কে?

এ যেন গদাধর নয়। তাঁর ওপর ভর করেছেন নটরাজ। কি কণ্ঠস্বর। কি রাগ। যেন প্রলয় নাচন হবে এক্ষুণি।

ক্ষমা করো বাবা। ক্ষমা করো ঠাকুর। দেবোত্তরে দরকার নেই। ভুল হয়েছে। তোমাকে কি দেবো? তোমারই জিনিষ। আমি তো তোমার দেওয়ান মাত্র।

শান্ত হল গদাধর। প্রখর রৌদ্র-

দীপ্তির পর স্নিগ্ধ বারিধারা। শান্তি স্নান সাধন ধন দেবাদিদেব। হৃদয়দেব।

নিশ্চিন্ত হন মথুরানাথ।

প্রহার খেতে খেতে বেঁচে গেছেন আজ।

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হলে উঠে যায়। ঈশ্বরীয় কথা হলে শোনে। এই যাঁর মহারাণী দেবোত্তর সম্পত্তি তাঁকে বাঁধবে কি ভাবে?

মনে মনে মথুরানাথ বলেন,

যে ধনে হইয়া ধনী,
মণিরে মানো না মণি
তাহারই খানিক মাগি আমি নতশিরে।

ঠিক আছে বাবা। সব ঠিক আছে। তুমি শুধু আমাকে তোমার সেবার ভার দাও। আমি তাতেই খুশী। তোমার দেখাশুনো, তোমার সেবায় জীবনের বাকী দিন ক'টা কাটাতে পারলে আমি এ-জীবনে আর কিছুই চাই না। তোমার সোনার থালা, রূপোর বাটির দিকে তুমি ফিরে তাকালে না। ওগুলোর দেখাশুনো আমিই করবো। তুমি আবার যখন আসবে জানবাজারে তখন এই থালাতেই এই বাটীতেই তোমাকে খাবার দিয়ে ধন্য হব। তোমার স্পর্শে যে থালা বাটীও পরম পবিত্র। এ থালায় আর কাউকে খেতে দিতে পারি?

এলায়িত আহার বিহার শয়ন। মথুরানাথ ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কি করলে ঠাকুর খুশী হবেন। কিসে তাঁর আনন্দ? মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে ইচ্ছে করে না গদাধরকে। তাই আহার বিহার ছেড়ে শয়নও একাসনে। তবুও মনের সাধ মেটে না।

অসূর্যম্পশ্যা অন্দরমহলের কুল-নারী। গদাধর এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়ান নির্বিচারে। রমণী-বেশ চাই গদাধরের। সখী-বেশ। আব্দার করেন মথুরানাথের কাছে।

বেশ তো। সেজন্য চিন্তা কিসের!

বেনারসী শাড়ী এলো। ওড়না এলো। নায় গয়না পর্যন্ত।

রমণী-বেশে বেশ মানিয়েছে রমণী-ভূষণকে।

জানবাজারের মেয়ে মহলে আনন্দের ঢেউ বইছে। কি করে জানলেন গদাধর রমণীদের আচার বিচার, তাদের মনের গোপন কথাটুকু।

আয় সাজিয়ে দিই তোকে। আজ এসেছে তোর মনের মানুষ। ভারী আনন্দ না রে? স্বামী এসেছে। আয় সাজিয়ে দিই।

পূর্ণ যৌবনা রমণীকে সাজাতে বসেন গদাধর। জানবাজারের অসূর্যম্পশ্যা রমণী-কুলে কলকল কণ্ঠে হাসির ফোয়ারা বয়ে যায়।

এত খেলাও জানতে ঠাকুর!

এবার শোন্ বসে। কি কি বলতে হয় তাঁকে। জানিস কি করে তাঁর প্রাণ পেতে হয়?

চল্ এবার তাঁর কাছে দিয়ে আসি। বেচারা একা একা বসে আছে তোর জন্য। দুশো ঘরের প্রাসাদ। তার অন্দরমহল। গদাধর রমণীকে এগিয়ে দেন তার শয়নকক্ষে।

এ কাহিনী উত্তরকালে ঠাকুর নিজমুখে শুনিয়েছেন সবাইকে।

মা দুর্গাকে বরণ করছে জানবাজারের কুলবধূরা। চামর ব্যজনে তন্ময় অপরূপ ভাবাবেগে প্রতিমার সাথে কথা কইছেন কে? কে রমণী?

সেজোবাবু স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে। রমণী যে এখন প্রতিমার সাথে এক প্রাণ। তাঁর এ ভাব ক'জন দেখে ধন্য করেছেন আপন জীবন?

বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ নেই স্ত্রী-পুরুষে। নেই কোনো মানসিক বিকার। কেন থাকবে? যাঁর ছবি যে সবার মুখে। যাকে কোনো ছেলে কখনও লজ্জা পায়?

'জানবি, মাতৃভাব সাধনার শেষ কথা। তুমি মা। আমি তোমার ছেলে। এই হলো শেষ কথা।'

এই ভাব যাঁর হয়েছে, তাঁর কি আর রমণী-পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে? তখন সব মুখেই যে শুধু সমুদ্ভাসিত তাঁরই প্রতিচ্ছবি।

শুধু কি মথুরানাথ?

মথুর-গৃহিণী স্বামীকে ডেকে বলেন, 'ওঁর কাছে লুকোবার কি আছে? উনি কি সাধারণ মানুষ? উনি যে অন্তর্যামী। তোমার আমার সবার অন্তরের প্রতিটি কথাই যে ওঁর জানা। তুমি বললেও উনি জানবেন। না বললেও। লুকোবার কি আছে? পেটের কথাটি পর্যন্ত উনি নিশ্চয়ই টের পাবেন।'

এই ভাব না হলে তিনি কি করে হলেন মথুরানাথের সহধর্মিণী? রাণী রাসমণি নন্দিনী? শ্রীরামকৃষ্ণের সরলা সেবিকা হলেন কি করে?

ভক্তি। অচলা ভক্তি। অপরিসীম অবিচল আস্থা। পূর্ণ সমর্পণ। পূর্ণ নিবেদন। শুধু কি নামেই জগদম্বা? গুণে রূপেও যে জগদম্বা।

আমায় ভাবসমাধির ভাব দাও। বাবা তুমি কৃপা করলেই আমার ভাব-সমাধি হতে পারে। আমি জানি। আমি মানি। আমি বিশ্বাস করি।

আব্দার করেন মথুরানাথ। সে কি রে? তুই ভাবসমাধি নিয়ে কি করবি এখনি? ভাবাবেশে বলেন গদাধর।

না বাবা। ওসব বুঝি না। আমায় দয়া করো। কৃপাবিন্দু দিয়ে ধন্য করো। ওরে শোন্। সব কিছুই কালে হবে। কালে হবে সব কিছু। সবুর কর্। একটা বীচি পুঁতলেই কি তা থেকে ফল হয়?

না ঠাকুর তা হবে না। কৃপা করো।

কেন রে? তুই তো বেশ আছিস। এদিক ওদিক দুদিক চলছে। ওসব হলে এদিক থেকে মন উঠে যাবে। তখন তোর বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবে কে? বারো ভূতে যে সব কিছু লুটে খাবে। তখন কি করবি।

না ঠাকুর। তুমি আমাকে অমনি-ভাবে তাড়িয়ে দিয়ো না। কৃপা করো। তুমি করুণাসিন্ধু। কি না করতে পারো। আমার ভাবসমাধির ভাব চাই-ই বাবা।

গদাধর খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। মথুরানাথের দিকে চেয়ে করুণা ভাষে।

কি জানি বাপু? মাকে বলে দেখবো। দেখা যাক কি হয়।

গদাধর আশ্বস্ত করেন শরণাগতকে।

কটা দিনও কাটলো না। মথুরানাথ গভীর ভাবসমাধিতে হলেন মগ্ন। কোনো কাজে কর্মে আর মন বসছে না।

কে এসে খবর দিল গদাধরকে।

মনে মনে বলেন গদাধর, জানতুম এমনি হবে।

গিয়ে দেখেন গদাধর মথুরানাথ আর মথুরানাথ নেই! যেন অন্য মানুষ। চোখ রক্তবর্ণ। জলধারা গড়িয়ে পড়ছে দুচোখ দিয়ে। শুধু ভগবানের নাম গাইছে। আর কেঁদে আকুল। সমস্ত বুক থরথর করে কাঁপছে।

গদাধরকে দেখে ছুটে এসে পড়লেন তাঁর পায়ে।

দয়াময় প্রভু। ভুল হয়েছে। আমার এ শক্তি ধরার সামর্থ্য কোথায়। তিনদিন হলো এ অবস্থা এসেছে। বিষয়কাজে বিন্দুমাত্র মন বসছে না। সব গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও বাবা। চাইনে মহাসমাধিভাব।

কেন রে? তোকে বলিনি এমনিটি হবে-

ও বলেছিলে বটে। তখন কে জানতো ভূতের মতন এসে এ আমার ঘাড়ে এসে চেপে বসবে? আমি যে ইচ্ছে করলেও আর কিছু করতে পারছি না ঠাকুর।

গদাধর কাছে এসে ধীরে ধীরে মথুরানাথের বুকে তাঁর চাঁপাফুলের মতন পাঁচটি আঙুল বুলিয়ে দেন। মথুরানাথ ধীরে ধীরে শান্ত হন। প্রকৃতিস্থ ভাবে আসেন ফিরে।

বল্ দেখি কি দরকার ছিল অযথা এ ভাব চাইবার? ধীরে ধীরে সবই এসে যায়। মার আশীর্বাদ হলে কি না হয়? তিনি নিজেই যে নেমে এসে সবকিছু দিয়ে যান।

এ মহাভাব ধারণ করার শক্তি চাই যে। ফুলদানির থেকে ফুলের গুচ্ছ ভারী হলে সেটা দাঁড়াবে কি ভাবে? এ শক্তির উৎস কোথায়? বৈরাগ্য থেকে। ত্যাগ থেকে। পরপারের সম্বলই যে কামনাহীন বাসনাহীন প্রাণমন। সেটুকু না থাকলে মাঝদরিয়াতেই যে বাসনা-কুমীর এসে অতলজলে টেনে নেবে। পরপারে আর যাওয়া হবে না।

মথুরানাথ কি করে শক্তি ধারণ করবেন? কোথায় তাঁর এত ত্যাগ? কোথায় তাঁর কামনাহীন মন? বাসনাহীন হৃদয়?

স্ত্রী জগদম্বা গদাধরের পাশেপাশে থাকেন। এই বিরাট প্রাসাদের দুশোখানা ঘরের কোথাও কখনও যদি বাবা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তাহলে কি হবে? কে দেখবে? বাইরে মথুরানাথ, ভিতরে জগদম্বা, যেন মা ভবতারিণীরই নিযুক্তা সেবক-সেবিকা।

এই তো ক'দিন আগেই হালদার পুরুত নাকি বাবাকে আঘাত করে গেছে। মথুরানাথের নির্দেশ, জগদম্বার আদেশ। তাই তো মুহূর্তের জন্য ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন না মথুরানাথ-সহধর্মিণী। ইনি যে অতি আপন জন। শুধু খাইয়ে-দাইয়ে আদর-অভ্যর্থনা সেবা করেই খুশী না। মথুরানাথ গদাধরের পাশে এসে শয়ন করেন রাসমণি-কন্যা। মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে চায় না মন। বাবা কিসে খুশী, কিসে সুখী, কিসে একটু আরামে থাকবেন? বাড়ীর শত কাজ ফেলে জগদম্বার দৃষ্টি শুধু গদাধর-সেবায়। নিবেদিতা। সমর্পিতা। পরম ধন্য জীবন।

(ক্রমশ।

পেয়ে গেলাম দীঘিপাড়ের সকল কিছুকেই

প্রশান্তকুমার মৌলিক

বট-পাকুড়ের শীতলছায়া দীঘির কালো জল
হারিয়ে গেছে অনেক আগেই; নেই সে-বকুলতল।
পাষাণপুরীর কঠিন দেওয়াল এখন শুধু হায়
সেই স্মৃতিরই রঙীন ছবি ঝুলিয়ে রাখে গায়।

বিজলী আলোর চোখ-ধাঁধানো হরেক ছটার মাঝে
প্রদীপ-শিখায় কেই-বা স্মরে প্রতি সরব সাঁঝে!
আঁধার রাতে দূরের তারা তাইতো আকাশ-তলে
প্রদীপ-স্মৃতি জাগিয়ে রেখে মিটমিটিয়ে জ্বলে।

পিচ-ঢালা এই তপ্ত পথে ক্লান্ত আমার মন
আকুল হয়ে খোঁজে শুধুই হারানো সেই ধন।
এমন সময় হঠাৎ দেখা লালদীঘির ওই পাড়ে
কাজল কালো মেয়ের সাথে ট্রামরাস্তার ধারে।

চোখেতে তার অতল দীঘির জল টলমল করে
মাটির প্রদীপ তার সে চোখে স্নিগ্ধ আলোক ঝরে।
লোহার শহর কলকাতাতেই পেয়ে কেই।
ছায়া-ঘেরা দীঘিপাড়ের সকল কিছু গেলাম সেই

ইতিহাসের নেপথ্যে

মানুষের কাহিনী ইতিহাস---শুধু রাজা মহারাজার উত্থান-পতন নয়। রাজারা তো 'নরপতি', জনগণেরই প্রতিনিধি। তাদের মাধ্যমে ভাঙাগড়ার খেলা যা হয়েছে, তারই নাম ইতিহাস---'ইতি-হ-আস।'

চক্কানিনাদে যাদের নাম ইতিহাসের রাজপথে প্রচারিত, সে রাজপথে আসার আগে অনেক অলি-গলি, অনেক মাঠ-ঘাট, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পেঁছিতে হয়েছে ওখানে।

বিপুলা পৃথ্বী এবং নিরবধি কাল কাউকেই ক্ষমা করে না, মহাকালের রথ সব কিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। থাকে শুধু চক্রচিহ্ন, যা ধরে আগে চলে মানবসমাজ ইতিহাসের পথ বেয়ে।

ইতিহাসের বহিরাঙ্গনে যাঁরা ভিড় করে থাকেন, তাঁদেরও নেপথ্য জীবন থাকে এবং তাঁদের প্রকাশ্য কাজকর্মের পেছনে নেপথ্য অন্দরের প্রতিফলন অনিবার্য। এ কাহিনী প্রায়ই গুপ্ত থাকে ---মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা কিছু জানা যায় মাত্র।

সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। বছরের পর বছর ধরে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই চেষ্টা করছেন ইংলণ্ডের সঙ্গে একজোটে হল্যাণ্ড আক্রমণ করতে, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর চার্লস-কে বাগে আনতে পারেন নি। বড় একগুঁয়ে রাজা চার্লস; ওদিকে আবার ইংলণ্ডের জনমত এ সন্ধির ঘোরতর বিরোধী। কাজেই চতুর্দশ লুই প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন।

এই সময়ে ফরাসী রাষ্ট্রদূত কোলবার্ট দ্য ক্রয়সী মহাশয় ফরাসী রাজকে পরামর্শ দিলেন যে চার্লস-এর নারী ঘটিত দুর্বলতার সুযোগ নিতে। চার্লস-এর এ দুর্বলতা তৎকালীন ইউরোপে সকলেই জানত। অমন চরিত্রহীন রাজা ইংলণ্ডে খুব কমই ছিল।

চতুর্দশ লুই ইতস্তত করলেন, 'কিন্তু চার্লস তো অপ্সরা পরিবেষ্টিত; এখন তো নেল্‌গুইন আর লেডি ক্যাস্‌ল্‌মেইন---দু'জনেই অপরূপা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু চার্লস-এর ক্ষুধা অসীম; সুন্দরী নারী

লুইস দ্য কারোয়ে'

দেখলেই সে থাবা বসাবেই। এবং এ সুযোগ গ্রহণ করা সর্বথা উচিত।' বললেন দ্য ক্রয়সী।

লুই-এর সহসা মনে পড়ে গেল লুইস্ নামক অপূর্ব সুন্দরী ফরাসী যুবতীর কথা---যার 'দয়া' তিনিও পেয়েছেন। বললেন, 'তুমি কি রক্তিমকেশী লুইস-এর কথা ভাবছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! ও যদি একবার বক্ষাবরণ খুলে চার্লস-এর সামনে দাঁড়ায় তা'হলে আর দেখতে হবে না,---ওর ওই বক্ষাবরণই ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে ফেলবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও একটু চেষ্টা করলেই চার্লসকে ডোভারের সন্ধিপত্রে সই করাতে পারবে।'

তৎক্ষণাৎ লুইস্‌কে ডেকে পাঠান হ'ল এবং স্বদেশের মঙ্গলার্থে তাকে ইংলণ্ড গিয়ে রাজাকে মোহিত করে কি কি করতে হবে তা' বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। তাকে সাবধান করে দেওয়া হ'ল যে অত্যন্ত সাবধানে এগোতে হবে এবং তার মোহিনী শক্তির চরমতম পরীক্ষা হবে ডোভারের সন্ধিপত্রে মোহিত চার্লসকে সই করান। কেন না, ইংলণ্ডের দিক থেকে বিচার করতে গেলে এ সন্ধির ধারাগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল। তিনটি ধারা---

১ম: ফ্রান্স-এর সাথে একজোটে হল্যাণ্ড আক্রমণ।

২য়: চার্লসকে ক্যাথলিক ধর্মমতে আনয়ন।

৩য়: চার্লস-এর ভ্রাতা (ভাবী ইংলণ্ডেশ্বর) ডিউক্ অফ ইয়র্ক-এর সঙ্গে একজন ক্যাথলিক মহিলার বিবাহ সংঘটন।

তৎকালীন নিয়মানুসারে, একবার চার্লস-এর সইটা করাতে পারলেই কেল্লা ফতে। সন্ধি অলংঘনীয় হবে।

রাজা এবং ঘানু রাজনৈতিকেরা যা এতদিন ধরে পারেন নি, সেই অসাধ্য সাধন করতে নিযুক্ত করা হ'ল এক রক্তকেশী যুবতীকে, যার আয়ুধ তার দৈহিক সৌন্দর্য এবং পঞ্চশর প্রদত্ত সায়কাবলী---আর কিছুই নয়।

কম্পিত বক্ষে রাজী হয়েছিল লুইস---রাজী হয়েছিল দেশের মঙ্গলার্থে সাগর

পেরিয়ে এক কানুকের কাছে আত্মবলি দিতে। আনতচক্ষে আভূমি নত হয়ে সে সম্মতি জানাল তার রাজার কাছে। উৎফুল্ল চতুর্দশ লুই তাকে বহু অর্থে পরিতুষ্ট করেছিলেন সেদিন।

প্ল্যান করা হ'ল---প্রথমে লুইসের একখানি আদুড়ুম্ব মোহিনী প্রতিকৃতি সরকারিভাবে চার্লস-এর কাছে পাঠান হল এবং লুইসকে তাঁর রাজসভায় যাবার অনুমতি প্রার্থনা করা হল।

চার্লস তো ছবি দেখেই পাগল হয়ে উঠলেন এবং অনতিবিলম্বে রাজকীয় জাহাজ ক্যালে বন্দরে চলে গেল লুইসকে ইংলণ্ডে আনতে রাজসম্মানে। জাহাজ থেকে যখন লুইস নামল, সকলে তাকে দেখে হতবাক, কানাঘুষো চলল, 'এইবার নেল-এর কপাল পড়ল।'

ঘোর রক্তবর্ণ কেশরাশি আগুল্‌ফলম্বিত, কম্বুগ্রীবা যেন দুধে-আলতায় মাখান, ধীরে ধীরে বক্ষের উপত্যকা দু' পাশে স্মেরুসদৃশ গর্বোদ্ধত মস্তক উত্তোলন করেছে---গজগামিনী মোহিনী স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন।

আসল কারণ তো কেউ জানত না---সবাই ভাবল যে চার্লস্ নিশ্চয়ই নিজে ফ্রান্স থেকে একে আনিয়েছে মুখ বদলাবার প্রয়োজনে। চার্লস-এর পক্ষে এটা এতই স্বাভাবিক ছিল যে কেউই এ নিয়ে আর মাথা ঘামাত না---কেবল রসাল আলোচনার খোরাক হিসেবে ব্যবহার করত।

আপাতদৃষ্টিতে অপাপবিদ্ধা কুমারী লুইস কিন্তু অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধা---১৭ বছর থেকেই সে ফ্রান্সের বহু উচ্চপদস্থ জমিদার এবং রাজকর্মচারীর শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছে।

বেচারা রাণী ক্যাথারিন! এ সব ব্যাপার তার এক রকম গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। পর্তুগালের রাজকুমারী ক্যাথারিন বিবাহের পর থেকেই এ ব্যাপার দেখতে দেখতে নির্বিকার হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই, ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র লুইসকে তাঁর সহকারিণী করে নিলেন তিনি, যাতে চার্লস-এর বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়।

মোহমুগ্ধ চার্লস একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন লুইসকে নিয়ে। দিবারাত্রের অধিকাংশ তাঁর কাটত লুইসের শয্যায়---খোলাখুলি।

কিন্তু লুইস তার দেশকে ভোলেনি। স্বৈরিণী এই নারীর দেশপ্রেম ছিল নিকলঙ্ক, প্রোজ্জ্বল। দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ মোহমুগ্ধ চার্লসকে নানা প্রশ্ন করে বহু গোপন সংবাদ সে জোগাড় করত এবং দেশে পাঠাত যা অন্য কেউ কোনমতেই জানতে পারত না। এভাবে অনেক অতি গোপনীয় রাজকীয় সংবাদ সে সংগ্রহ করে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মত দেশে পাঠিয়ে দিত।

এ সব তো হচ্ছিল, কিন্তু আসল যে কারণে প্রবাসে সুখশয্যা পেতেছিল লুইস, তার কিন্তু সুরাহা হচ্ছিল না। জনমতভীত চার্লস লুইস-এর প্রেমে যতই হাবুডুবু খাক, দেশের ক্ষতিকর ওই সন্ধিপত্রে সই করতে সে ভয় পাচ্ছিল।

অবশেষে, লুইস যখন ছ'মাসের গর্ভবতী, তখন সন্ধির প্রথম সর্তে চার্লস সই করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত চতুর্দশ লুই হল্যাণ্ড অধিকারের জন্য ফরাসী সৈন্য সজ্জিত করতে সুরু করলেন।

লুইস্-এর কাজের এক-তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হল এতদিনে।

যখন তার পুত্র ভূমিষ্ঠ হল, চার্লস ও লুইস দু'জনেই আনন্দে বিহ্বল। এই সুযোগে লুইস ইংলণ্ডের নাগরিক হবার আব্দার জানাল---মোহান্ধ চার্লস তৎক্ষণাৎ সে আব্দার পূরণ করলেন বিনা আপত্তিতে। লুইস-এর নতুন উপাধি হল: ব্যারনেস্ অফ পিটার্সফিল্ড, কাউন্টেস্ অফ ফার্নহ্যাম এবং ডাচেস্ অফ পোর্টস্ম্যাও। অর্থাৎ রাণী না হয়ে আর যত উঁচুতে ওঠা সম্ভব, তা লুইস উঠেছিল।

অবহেলিতা যে সব নারী আগে চার্লস-এর শয্যাসঙ্গিনী ছিল, তারা অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল লুইসকে সরাবার, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। অবশ্য, বাক্যযন্ত্রণায় অনবরত বিদ্ধ করত তারা লুইসকে---বুদ্ধিমতী লুইস্ কোনদিনও জবাব দিত না।

ফ্রান্সে তার রিপোর্ট নিয়মিতই পৌঁছত এবং চতুর্দশ লুই ও দ্য ক্রয়সী পরস্পরের পিঠ চাপড়ে আত্মপ্রসাদে স্ফীত হতেন। আনন্দবিহ্বল লুই বললেন, 'পুরস্কারও দিতে হবে না, কেন না চেটি চার্লসকে বেশ দুইয়ে নিয়েছে হে।'

কথাটা সত্যি। অজস্র অর্থ, গয়নাগাটি, জমিজমা, লণ্ডনে ও উপকণ্ঠে অনেক প্রাসাদাবলী---এসব চার্লস অকৃপণ হস্তে দিয়েছিলেন তাঁর প্রেমিকাকে। অবশ্য, বুদ্ধিমতী লুইস্ জানতেন যে চার্লস্-এর এ মোহ বেশীদিন থাকবে না, কেন না এটা নিতান্তই রূপজ---নতুনের সন্ধান পেলেই চার্লস্ সেদিকে ছুটবেন, সাজান বাগান শুকোবে, ইংলণ্ডের পাটিবাটি তাকে গুটোতে হবে। লুইস্ এর জন্যে প্রস্তুত ছিল।

ট্রেজারী থেকে প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড সে তুলেছিল এই অল্প সময়ের মধ্যেই এবং কামান্ধ চার্লস্কে দিয়ে বছরে বারো হাজার পাউণ্ড পেনসনের হুকুমও করিয়ে রেখেছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় কেমন করে জানাজানি হয়ে গেল যে লুইস্ আসলে ফরাসী গুপ্তচর। সাধারণ লোকেরা ক্রমে ক্ষেপে উঠল ওর বিরুদ্ধে। এ সব দেখে সাবধানী লুইস ইংলণ্ড ছাড়বার ব্যবস্থা সুরু করল অনতিবিলম্বে।

ছলাকলার চরম শক্তি প্রয়োগ করে লুইস চার্লস্-এর হুকুমনামা আদায় করল তাকে ফরাসী দেশস্থ অ-বিগনীর জমিদারী দিতে। হুকুম পেতে দেরী হল না এবং লুইসের অন্যান্য বহু উপাধির সঙ্গে যোগ হল: ডাচেস্ অফ অ-বিগনী।

জনমতের বিরোধিতার চাইতেও আরো বিশিষ্ট কারণ ঘটেছিল এই সময়ে। স্পেন দেশ থেকে এক অপসরা ইংলণ্ডে এলেন, নাম: ডাচেস্ হরটেন্স্ ম্যাট্সারিন্। যেমনি তাকে দেখা, নব মধুলোভী চার্লস্ সঙ্গে সঙ্গে লুইস্কে ছিন্ন বহির্বাসের মতই ছুঁড়ে ফেলে হরটেন্স-এর পেছনে ধাবিত হলেন। কপাল পুড়ল লুইস-এর।

লুইস্কে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসনে দেওয়া হল সুদূর পল্লীতে এবং তারই শয্যা অধিকার করল চার্লস্-এর নবতম রক্ষিতা হর্টেন্স।

কিন্তু, কিছুদিন পরে যখন চার্লস্ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তার সবাইকে ছেড়ে লুইস্কে মনে পড়েছিল এবং রোগশয্যার পাশে এসে সে যথল শুশ্রূষা করতে আর সান্ত্বনা দিতে।

স্বদেশ ভক্ত লুইস এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে ভুললে না---ক্রমাগত রুগ্ন চার্লসকে খোঁচাতে লাগল ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য এবং মরণকালে চার্লসকে দিয়ে ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করিয়ে তবে ছেড়েছিল।

এবারে আর ক্রুদ্ধ জনমতকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তারা একরকম জোর করেই লুইস-এর পেন্সন্ বন্ধ করে দিল এবং চার্লস প্রদত্ত গয়নাগাটি ও জমিজমা---এমন কি উপাধিগুলো পর্যন্ত কেড়ে নিল।

লুইসএর জন্য প্রস্তুত ছিল। অনতিবিলম্বে নগদ টাকা ইত্যাদি নিয়ে ফ্রান্সে ফিরল অ-বিগনীর জমিদারীতে বাস করতে।

শেষ জীবনে ছেলেটি তার মারা গিয়েছিল এবং কিছু অর্থাভাবও হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তাকে বাৎসরিক পেনসন্ এবং অন্যান্য বহু সাহায্য করা হয়েছিল ফরাসী রাজকোষ থেকে, 'ফ্রান্সের জন্য পরিশ্রম' করেছে বলে।

১৭৩৪ সালের ১৭ই নভেম্বর ৮৫ বৎসর বয়সে লুইস-এর ঘটনাবহুল জীবনের যবনিকা পতন হল।

ইতিহাসের পাতায় ডোভারের সন্ধিপত্রের কথা লেখা হল স্পষ্টাক্ষরে, কিন্তু যে নেপথ্যচারিণী এটা সম্ভব করেছিল তার সর্বস্ব দিয়ে, স্বদেশ-স্বজন থেকে দূরে এক কামুকের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে,---তার কথা ইতিহাস লেখেনি।

যে বন্ধনে সেদিন লুইস ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডকে বাঁধতে সাহায্য করেছিল, আজও পর্যন্ত তার প্রভাব বিদ্যমান। হতভাগিনী লুইস-এর অগৌরবের কথা, কলঙ্কের কথা অনেকেই হয়তো জানেন, কিন্তু ইতিহাসের নেপথ্যে তার নিঃশব্দ পাদচারণার একটু বিবরণ লিপিবদ্ধ করা উচিত নয় কি?

—কল্হন

প্রণয় বিষয়ক ভাস্কর্য

শেষাংশ

প্রণয় ভাস্কর্যগুলির ন্যায় উচ্চাঙ্গের শিল্পমানযুক্ত মূর্তির মধ্যে যদি কোন ভাব ও তথ্যগত বস্তু লুক্কায়িত থাকে তবে উহা শিল্পী তাঁর শিল্পদক্ষতা ও মহত্ত্বে আবৃত করে রেখেছেন, তথাপি যদি কোন দর্শকের অন্তরে ভাবান্তর উদিত হয় তবে উহা তাঁর নিজ অন্তরের প্রতিরূপের জন্যই হয়ে থাকে। ভাস্কর বহু যত্নে ও শ্রদ্ধা দিয়ে দেবমূর্তি নির্মাণ করেছেন সত্য। কিন্তু মানুষী-লীলায় মূর্তিগুলি রস মাধুর্যে ঐগুলিকে অতিক্রম করে গিয়েছে।

প্রণয় চিত্রগুলির অর্থ এ নয় যে দর্শনকারীকে ঐগুলি অভ্যাস করতে হবে বা তদ্ভাবে ভাবিত হতে হবে। কোন দৃশ্য দেখার সময় দর্শক যদি ঐ দৃশ্যের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, তবে তিনি সু ও কু'র দ্বৈত দ্বন্দ্বে শঙ্কাসঙ্কুল ঘূর্ণিতে পড়ে দুঃখকে আবাহন করবেন।

আধ্যাত্ম শিক্ষার মধ্যে ঋষি বলেছেন কোন দৃশ্য বা বাক্য যদি তোমার পরমার্থ জ্ঞানের প্রতিকূল হয় তবে ইষ্টদেবতা বা ইষ্টমন্ত্র জপ কোর। আমরা জ্ঞানে অজ্ঞানে অভ্যাসবশত করিও তাই। যদি এই নরলীলা কুৎসিত মনে হয় তবে নাম জপ করাই উচিত উহাতে তোমার কল্যাণ হবে এবং আত্মশুদ্ধি হবে, তুমি কু'র ভিতর দিয়ে সুরসন্ধান পাবে।

বাল্মীকি সবার ভিতর দিয়ে-পরমপুরুষ রামের দর্শন পেয়েছিলেন। ভারতীয়দের সর্বকর্ম ঈশ্বরকে স্মরণ করে করা হয়। গমনে—বামন, ভোজনে—জনার্দন, ঔষধে—বিষ্ণু, জলমধ্যে বা স্নানে—বরাহ, দুঃস্বপ্নে—গোবিন্দ, শয়নে—পদ্মনাভ প্রভৃতি। সর্বকর্মের মধ্যে পরমাত্মার অস্তিত্ব বর্তমান থাকায় উপদেশ ও শিক্ষা ভারতবাসীর জন্মগত সংস্কার। ভারতীয় জীবন ও কর্ম ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত, এই মহান শিক্ষা তাদের দৃষ্টির পবিত্রতা সম্পন্ন করেছে। উন্নত শিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণলাল দাশ

ও বুদ্ধির জন্য প্রণয় চিত্রগুলিকে ভারতবাসী শান্ত ও শুদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করেন উহার জন্য কোন অভিযোগ নেই।

খাজুরাহোর বহু প্রচারিত ও প্রশংসিত একখানি অপূর্ব প্রণয়চিত্র। পুরুষমূর্তিটি নারীদেহের সূক্ষ্ম বস্ত্র উন্মোচনে চেষ্টিত। পুরুষের বাম হস্ত নারীর বেণীবন্ধ কেশে সংস্থাপিত

বস্তুর অনধিকারীর যেমন দান করার ক্ষমতা থাকে না—তেমনি বিষয়কে অনুভব না করে তাকে ত্যাগ করা যায় না। পার্থিব সর্ববিধ আনন্দকে ভোগ ও অনুভব করার পরই ভোক্তা উহার গুণাগুণ বিচার করে গ্রহণ ও বর্জন করতে পারেন বস্তুর গুণাগুণ না জেনে বিচার না করে ত্যাগ করতে যাওয়া অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। প্রণয় রসকে ত্যাগ করতে হলে ঐ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে উহা করা উচিত। সম্ভাব্য সর্বপ্রকার প্রলোভন সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার পর বিচারবুদ্ধির দ্বারা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্পন্ন করতে পারেন। আদিরসাত্মক ভাস্কর্য মূর্তিগুলিকে যোগীদের বা ত্যাগীদের আত্মশুদ্ধির কষ্টিপাথর মনে করা হয়—কামসূত্রকার বলেন—

মুমুক্ষু ব্যোহ্যপি সিদ্ধয়ন্তি
বিরাগত্রাগ পূর্বকাৎ।
বিষয়েচ্ছোহ্য অনুবর্তিনো
নিসর্গাৎ প্রাণীনাংধির॥

—১।২১

মুক্তিকামী আসক্তির পর নিরাসক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হন। মানবচিত্ত স্বভাবত ইন্দ্রিয়ভোগলিপ্সু—এদিক থেকে প্রণয় ভাস্কর্যগুলি আত্ম-পরীক্ষার কষ্টিপাথর—চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় কি না যোগী নিজ অন্তরে অনুভব করে অধিক দৃঢ় ও সাবধান হতে পারেন। যাঁরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে বিশ্বাসী এবং ঐ মহামিলন রহস্যের প্রকৃত তথ্য ও পন্থা উদ্ভাবনে সর্বদা ব্যাকুল ও যত্নশীল তাঁদের উদ্দেশ করে নারায়ণ বলেছেন—

'সর্ব ধর্মান্ পরিত্যাজ্য
মা মেকং শরণং ব্রজ'

সর্বকর্ম ও সর্বধর্ম তাঁতে অর্পণ করে শরণ লওয়ার উপদেশের অর্থ হোল—বিশাল প্রেমের বাণী, গভীর প্রেম ব্যতীত পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ সম্ভব নয়। পার্থিব প্রণয়লীলার ক্ষণস্থায়ী। শিক্ষা ধীরে ধীরে পরমাত্মামুখী হয় এবং পার্থিব বন্ধন শিথিল হয়ে আসে, তখন প্রণয়লীলা লুপ্ত হয়ে প্রেমের ধারায় জীব বিগলিত হয়ে তাঁতে আত্মাহুতি দানের জন্য ব্যাকুল

হয়ে উঠে। চিন্তামণি—বিল্বমঙ্গলকে, তুলসীদাস-পত্নী তুলসীদাসকে বলেছিলেন—'আমার প্রতি তোমার এত প্রেম এত আসক্তি উহার এককণাও যদি তুমি ঠাকুরকে দিতে তোমার মঙ্গল হোত।'

প্রণয় নিবেদনকারী দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে এক মহামঙ্গল চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। চিন্তামণি ও তুলসীদাস পত্নীর মহাবাণীকে ভাস্কর দেবদেউলে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেছেন—চক্ষুষ্মান বুঝে নাও কি মায়া তোমার জন্য ফাঁদ পেতে বসেছে। ঐগুলি পার্থিব মহাবন্ধন মুক্তির ইঙ্গিত। ভক্তজন ঐগুলি দর্শন করেন আর প্রার্থনা করেন।

কোনারকে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যুক্তকরে অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা করছিলেন, 'ঠাকুর একটু প্রেম দাও, একটু করুণা কর।'

এক তরুণ অট্টহাস্যে তাঁকে বিদ্রূপ ইঙ্গিত করায় তিনি বললেন, 'ঐ দিব্য মূর্তিগুলি যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন দেবতা—দেবতা কি কখনও কুচিত্র আঁকতে পারেন। তাঁরা ছল করে ওর মধ্যে ঠাকুরকে ধরে রেখেছেন।'

এমন বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান ও সুদৃষ্টি ভারতবাসী এখনও শত সহস্র নয় কোটি কোটি।

শিল্পী একটি চটুল ও জটিল বিষয়কে কত উন্নত ও শুদ্ধমানে উন্নীত করতে পারেন উহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রণয়-ভাস্কর্যগুলি। প্রণয়প্রতীত প্রতিটি মূর্তির বদনমণ্ডল প্রশান্ত ও পবিত্রতাব্যঞ্জক, তাদের দৃষ্টি গম্ভীর ও প্রশান্ত, দুটি আত্মার মিলন মুহূর্তটি এক স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত। কাশীর গঙ্গাতীরস্থ ক্ষুদ্র পশুপতিনাথের মন্দির থেকে উড়িষ্যার জগন্নাথমন্দির একলিঙ্গ মন্দির, সূর্য-মন্দির, মধ্যভারতের খাজুরাহো মন্দির-সমূহ এবং দাক্ষিণাত্যের স্বল্পসংখ্যক মন্দিরে উত্তর ভারতের ন্যায় বিপুল বা সংখ্যাতীতভাবে না হলেও সংযত প্রস্তর বা কাষ্ঠনির্মিত শৃঙ্গার মূর্তি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

উড়িষ্যা ভাস্কর্যের এই অপূর্ব প্রণয়-মূর্তিটি প্রণয়-বিষয়ক ভাস্কর্যে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। এই মূর্তিটি ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি

নেপালে তিব্বতে এবং মোঙ্গলীয় শিল্পেও প্রণয় ভাস্কর্যকে বর্জন করা হয়নি। ঐ যুগে মানব জীবনের এই প্রয়োজনীয় প্রণয় বিদ্যাটিকে ভীতির চক্ষে দেখা হয়নি বা এই বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করতে রাষ্ট্রশক্তি সমাজনেতা বা শিল্পী আতঙ্ক হয়ে যাননি।

বিশ্বপ্লাবী প্রাণের বিপুল কামনাকে তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনম্রভাবে সাহিত্যে কাব্যে এবং প্রত্যক্ষভাবে ভাস্কর্য কলায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় দর্শন দেবতাকে পর্যন্ত ধ্যান করেছেন শৃঙ্গার বা মিথুন মূর্তির মধ্যে। মানুষের ন্যায় হরপার্বতী, লক্ষ্মী-জনার্দন, কালী, গণপতি ও তৎপত্নী পুষ্টি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার যুগল মূর্তি-মার্তণ্ডদেব প্রভৃতি মূর্তি প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন মধ্যে কল্পিত হয়েছে। নিজ উপাস্যদের মধ্যে কোন ভক্ত কখনও কদর্যভাব আরোপ করতে পারেন না—উহা কল্পনাতীত। শুধু একটিমাত্র যুক্তিতেই ভারতের রূপলোকের ও ধ্যানলোকের পবিত্রতা, স্বাধীনতা ও ব্যাপ্তি স্বীকৃতি পেতে পারে।

মৈথুনঃ পরমং তত্ত্বং
সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি
ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

আবার তন্ত্রশাস্ত্রকার তাঁদের বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন—

'যোনি কালী শিবলিঙ্গম
রমণং ব্রহ্মরূপকং।
ব্রহ্মশক্তি পরমং ব্রহ্ম
বিদিত্বা সিদ্ধি মাপ্নুয়াৎ॥

সর্বশেষে ভাস্কর তাঁদের পক্ষ থেকে বলছেন—

রূপবিদ্যার ক্ষেত্রে শিল্পী সর্ববিধ

রূপের উর্ধ্বে বিচরণ করেন। শিল্পীর উপর যখন যে কার্যভার অর্পিত হয়, তখন উহার অন্তস্তল থেকে বহিরাকৃতি পর্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করে উহার অন্তর্গত রূপ ও রসের বিকাশ সাধন করাই হয় শিল্পীর প্রধান কর্তব্য। রূপের ব্যাপারী পার্থিব সর্ববিধ যানের মধ্যে মনোযানকে শ্রেষ্ঠ যান বলে মনে করেন। উহার শক্তি গতি ও তৃপ্তির সর্ববিধ পথই তাঁর শিল্পবিদ্যার অন্তর্গত। ঐ-বুদ্ধি থেকে বলা বিষয়ঘটিত আপত্তিকে অতিক্রম করে উহাকে গৌণ করে নিলে শিল্প রসবোধের কোন অসুবিধা হয় না।

একদিন একটি ছাত্র পুষ্প ও লতাগুল্ম আচ্ছাদিত একটি জীর্ণগৃহের চিত্র অঙ্কন করেছিল। ঐ চিত্রখানি বর্ণে ও কলা-নৈপুণ্যে এত সুন্দর হয়েছিল যে আজও ঐ চিত্রখানির কথা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমিও ঐ ক্ষুদ্র পতনোন্মুখ স্থাপত্যটি দেখেছিলাম—উহার পারিপার্শ্বিক গৃহ ও পরিবেশের সঙ্গে বিষয়টি সর্বদিক থেকে ছিল আকৃষ্ট হওয়ার মত, কিন্তু উহা যে একটি খাটা পায়খানা উহা বিদেশী আমার নিকট ছিল অজ্ঞাত। যতক্ষণ ঐ গৃহের রহস্য আমার নিকট ছিল অজ্ঞাত ততক্ষণ আমি ছিলাম বিকারমুক্ত। রহস্য উদঘাটিত হওয়ার পর ক্ষণিকের জন্য সহজাত মানবিক ধর্মে বিকারগ্রস্ত হয়ে ছাত্রটিকে পায়খানা অঙ্কন করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তরে বলেছিল, 'উহার শিল্পগুণ আমাকে অঙ্কনে প্রলুব্ধ করেছিল—হলোই বা পায়খানা—আমিও দূরে বসে এঁকেছি—আমার কোন অসুবিধে হয়নি—আপনি যে শিবমন্দিরে বসে আছেন—আমি দূর থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উহাকেও দেখেছি কিন্তু ওর মধ্যে আঁকার মত কিছু পাইনি।

শিল্পিসুলভ অতি চমৎকার উত্তর। ছাত্র-জীবনে কোলকাতার মিউজিয়ামের কোন একটি বিশেষ স্থানে কয়েকটি উৎকট শৃঙ্গার মূর্তি সজ্জিত ছিল—উহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ঐ মূর্তিগুলির প্রতি কোন তরুণ শিক্ষার্থীর আগ্রহ ছিল না—ঐ মূর্তিগুলির গঠন, রূপ ও ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বিষ্ণু, সূর্য হরপার্বতী, গণপতি বা বুদ্ধ মূর্তিগুলির ভাব ও রূপ অধিক আকর্ষণীয় ছিল। শিক্ষার্থীরা নিবিষ্ট চিত্তে ঐগুলিই অধ্যয়ন করত।

তরুণ বয়সে বহু সতীর্থ পরিবৃত হয়ে আমরা নানা ভাবভঙ্গীযুক্ত মূর্তি দেখেছি অঙ্কও করেছি—আমরা প্রত্যেকে ছিলাম প্রণয়-রহস্যে অজ্ঞ। তথাপি যৌন কৌতূহল আমাদের সাধন

এ সকল ভাস্কর্যচিত্রের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না। বিষয় স্বয়ং স্বতঃ মুখরিত। পুরুষমূর্তি প্রণয়রসে যত জর্জরিত আদিরসে তত নয়। তার দেহ সূক্ষ্ম বস্ত্রে আচ্ছাদিত

পথে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। আমরা ধ্যানী-চিত্তে আদর্শের মহিমা ও রূপ-মাধুর্য রেখার সজীবতায় জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছি—মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চিত্রে কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করা—সতীর্থদের মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতা এবং কর্মশৈলীর কলাকৌশল আয়ত্ত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম।

যৌবনের ক্ষুধিত ইন্দ্রিয়গ্রামের সম্মুখে বহু নগ্না শিশুসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে 'পোজ' দিয়েছে, কিন্তু একটি শিক্ষার্থীকেও দেখিনি তাদের ধ্যানী-মন থেকে বিচলিত হতে।

মেয়ে-মডেল সংগ্রহ করার জন্য ছাত্রজীবনে প্রতি সপ্তাহে একবার করে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের পতিতালয়ে যেতে হোত, উহাই ছিল তৎকালীন আর্ট স্কুলের নিয়ম। বিপদও যে না হত তা নয় তবে আমরা ঐ সব উপেক্ষা করে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিপদকে আবাহন করিনি। একদিন কোন-এক বিখ্যাতা অভিনেত্রীর গৃহে বিপদ বেশ ঘনীভূত হয়েছিল। অভিনেত্রীকে ক্লাশে এনে 'স্টাডি' করা হয়ে গেলে তাঁর অনুরোধে অন্য মডেল সংগ্রহ করার আশ্বাস দিয়ে তিনি আমাকে সাতদিন পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে যেতে বাধ্য করেছিলেন।

প্রতিদিনই তিনি একটা কারণ দেখিয়ে বলতেন—কাল এস। সপ্তম দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি নানা কথার ছলে আমাকে আবদ্ধ করে রাখেন—পরে আমি তাঁর প্রতারণা বুঝতে পেরে যখন প্রত্যাবর্তন করার জন্য উন্মুক্ত ছাদে চলে আসি, তখন ছাদের অপর প্রান্তস্থ একটি কক্ষ থেকে দুটি সুসজ্জিতা তরুণী তড়িৎগতিতে ছুটে এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে যে সংলাপে অভিনয় করেছিল—ঐ দিনের কথা ও ঘটনাগুলি আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু বলেছিলাম—'আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য—নিকট—জেনে নেবেন—এখন পথ ছাড়ুন।

আমাকে স্পর্শ করার পূর্বে আমি উল্কার মত ছুটে আসি রাজ-পথে—প্রবল ক্রোধে আমার চিত্ত জ্বলে উঠে, কিন্তু অনতিকালপরে এক অপূর্ব আনন্দ ও শক্তির সন্ধান পেয়েছিলাম এই দুর্ঘটনার অন্তরালে। আমার সতীর্থ ও শিল্পী বন্ধুদের সম্পর্কেও আমি আমার মত অভিজ্ঞতা ও সাধনালব্ধ জ্ঞান আরোপ করতে পারি। শিল্পীরা চরিত্রহীন নন। তাঁরা কুৎসিত মন নিয়ে মূর্তিগুলি স্থাপন করেন নি। পদস্খলিত হওয়ার ঘটনা শিল্পীদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল। দেহাত্মবোধ নিয়ে শিল্প সাধনা কেন—

কোন সাধনাই হয় না। সাধন সময়ে বিশ্বের সর্ব কলুষের ঊর্ধ্বে থাকে মন, তখন থাকে না নিজ দেহের অস্তিত্ব শুধু বেঁচে থাকে দুটি চোখ আর মন ---শিল্পী শুধু বলতে পারেন প্রণয় মূর্তি ও শৃঙ্গার মূর্তিগুলি যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন তখন কোন সুরে বাঁধা ছিল তাঁদের মন।

শিল্পী---শিল্পী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিন্দা-প্রশংসাকে সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলেন। তাঁরা জানেন নিন্দা বা প্রশংসা উক্তি চাওয়া, উহার সাময়িক একটা প্রতিক্রিয়া থাকলেও উহা ক্ষণিক---উহা দ্বারা কর্মের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। তাঁরা সিদ্ধান্তে সর্ববিধ শুভ-অশুভ আলোচনাকে এড়িয়ে চলেন। এই জন্য শিল্পিসমাজ সাধারণ সমাজের শেষ পংক্তিতে নিজের আসন নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।

কারণ প্রান্ত থেকে বস্তুকে অধ্যয়ন করা সুবিধাজনক। কথার মালা গেঁথে চিত্র বা শিল্পবুদ্ধি জাগ্রত করা যায় না---উহা দান---উহা ভাব। স্রষ্টার ভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে---উহা ধরবার বুদ্ধি হলে স্রষ্টাই বুঝিয়ে দেন। শিল্পী সর্বদা স্রষ্টার ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে থাকেন---এই জন্য শিল্পীর চিত্র সর্বদা পরিস্ফুট হয় না। কিছু সুপ্ত থাকে---ঐ অপ্রকাশ্য বর্ণনা দর্শকের বুদ্ধি ও ভাবের উপর ন্যস্ত থাকে, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টা যেমন জড়িয়ে আছেন ---শিল্পীর কর্মের মধ্যেও তেমনি ভাবে শিল্পীর জ্ঞান-বুদ্ধি-চরিত্র সব কিছু লুকিয়ে থাকে। তাঁর কর্মের বাইরে তাঁর অন্য কোন সত্তা নেই।

যে সকল ভাস্কর বৃক্ষিকা, মাত্রিকা, সুরললনা, নৃত্যগীতরতা বা সঙ্গত কারিণীদের মূর্তি তক্ষণ করে ভারতের শুধু নয় বিশ্বের বন্দনীয় হয়ে আছেন তেমন গুণী-শিল্পীরা উন্মার্গগামী ছিলেন না। প্রণয় মূর্তিগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শৃঙ্গার মূর্তি অপরটি শুধু প্রণয় নিবেদনঘটিত বিভিন্ন অবস্থা। দ্বিতীয় মূর্তি সম্বন্ধে কোথাও আপত্তি হয়নি হয়েছে শৃঙ্গার মূর্তিগুলির জন্য---ঐগুলি সম্বন্ধে শিল্পী বলছেন, প্রাচীরসংলগ্ন শৃঙ্গার মূর্তিগুলি সৃষ্টির মূলমায়া, ঐ মায়া পরমপুরুষকে সর্বদা আবৃত করে রেখেছে---প্রকৃত জ্ঞানী ঐ মায়াজাল ছিন্ন করে পরমাত্মার সন্ধানে রত হন।

ভোগী মন্দিরের চতুর্দিকে ঘুরে ভোগের বহুবিধ পন্থা জ্ঞাত হয়ে যায়---সে আর দেবতার নিকট যাবে না---দেবতার কথা তার মনেও থাকবে না---শৃঙ্গারের মোহকর ভঙ্গীগুলি তাকে উত্তেজিত করবে---পার্থিব অপ্সরাদের বাহুবন্ধনে জীবন কাটিয়ে দেবে---দেবদাসীরাই হবে তার প্রার্থনীয়।

দেবতা সব প্রার্থীর প্রার্থনাই পূর্ণ করেন, তাঁর নিকট দেবদাসীর সঙ্গকামী লোকের সংখ্যা অধিক---ঐ জন্য বহুরূপী প্রার্থীর আদিরস কামনার পরিপূরণ হয় মন্দিরে। ভোগের নিবৃত্তির পর বা মায়ামুক্তির পর দেবদাসীদের জলসা-ঘর থেকে একবার হলেও ভোগী মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে নত হয়। দস্যুরা মা-কালীকে পূজো দিয়ে লুণ্ঠনে বহির্গত হয়।

সৃষ্টির মায়ার ভোজবাজী থেকে মুক্তি কি দু-এক জন্মে হয়? মুক্তির জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। শৃঙ্গার দৃশ্যগুলি কারো নিকট নরকের বিভীষিকা কারো নিকট পরম আনন্দময় সোপান। ভাস্কর মন্দিরের অভ্যন্তরবর্তী দেবতার চতুর্দিকে তাঁর সর্ববিধ মায়াকে ক্ষুদ্র পরিসরে উদ্ধৃত করে সর্বপ্রকার ভাবীর ভাবরস সঞ্চিত করে রেখেছেন, যাতে করে দর্শক অতি সহজে সমগ্র শাস্ত্রগ্রন্থ এক দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

তোমাদের ভাষায় যদি বলি শৃঙ্গার মূর্তি গুলি কুৎসিত তবে বলব এমন একটি লোক দেখিয়ে দাও যে ঐ পথ থেকে মুক্তি পেয়েছে। অথবা বুদ্ধের ভাষায় বলব---'যাও জননী এমন গৃহ থেকে সরষে নিয়ে এস যে গৃহে কেউ কখনও মরেনি।'

কুৎসিত বা পাপ বা দুঃখের রূপ কৃষ্ণবর্ণ---পাপ অনুষ্ঠিত হয় অন্ধকারে, দিনের আলোকে সুস্থ চৈতন্যময় অবস্থায় পাপী যদি তার মোহগ্রস্ত মনের বা বিকারগ্রস্ত কর্মের চিত্র দেখতে পায় তার কি মোহ ভঙ্গ হয় না? ঐগুলি ভোগীর মোহভঙ্গের উপদেশ---যাঁরা শৃঙ্গার মূর্তিগুলি কুভাবে দর্শন করেন তাঁরা মুক্তিপথযাত্রী, তাঁরা নমস্য---তাঁদের বলব যারা দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করতে চায় বা চোরাবালিকে জানতে চায় তাদের দেখতে দাও বাধা দিও না। কত কুৎসিতভাবে বিপরীত দেহকে সে ভোগ করেছে দিবালোকে ঐ চিত্র সে দেখে নিক। ঐগুলি ভোগীর মুক্তির পরোয়ানা।

পূর্বে বলেছি, প্রণয় মূর্তিগুলি নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি ঐগুলি সর্বকালের শুদ্ধমূর্তি---নারীবর্জিত জীবন হতে পারে না। তাকে অতি সংযমে ও শুচিতার মধ্যে গ্রহণ করলেই উন্নত প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায়---উহাও একটি কঠিন সাধন পথ---ঐ পথের পথিক একজন ঘোষণা করে গেছেন---

"রজকিনী প্রেম
নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়"।

ভাস্কর মিলন মূর্তিগুলির মধ্যে ভোগের পথে মুক্তির সংবাদ প্রচার করেছেন এবং কামের পথে প্রেমের পথে উপনীত হওয়া যায় সে কথাও বলেছেন।

প্রবন্ধ শেষে যাঁরা শিল্পীর মডেলরূপে 'পোজ' দিতেন তাঁদের কথা এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। একবার 'স্টাডি' করা মডেলকে পুনর্বার 'পোজ' দেওয়ার জন্য ডাকা হোত না---তাঁরা সাতদিন কি পনের দিন শিল্পীদের সান্নিধ্যে এসে যে সংযত ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে যেতেন তাতে তাঁরা নিজেদের ঘৃণিত জীবনের উপর বীতস্পৃহ হয়ে অত্যন্ত কাতরভাবে অনুরোধ করতেন---'তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিও না, ঐ ঘৃণিত জীবনে আর ফিরে যাব না।'

কিন্তু দুঃখিত শিল্পীদের কোন উপায় ছিল না। তাঁকে পুনর্বার গ্রহণ করার।*

---

* শিল্পী ও শিল্পগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে।

ব্যক্তিত্ব গঠন

জীবনের নয়-দশমাংশই অভ্যাস। মানবিক ব্যবহারের উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। কাজেই, ভালোর সঙ্গে মন্দ করার ক্ষমতাও অভ্যাসের আছে।

আমার এক বন্ধু একদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরুনোর ঠিক আগে দোতলায় গেলেন কাপড় বদলাতে। আধঘণ্টা হয়ে যায়, অথচ তাঁর পাত্তা নেই। অধৈর্য হয়ে উপরে উঠে দেখি তিনি ঘুমোচ্ছেন। কাপড় ছাড়ার সময় কেবল অভ্যাসবশে পাজামা গলিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে তোফা ঘুম।

অবশ্য অধিকাংশ মানুষই অভ্যাসের ব্যাপারে এতটা চরম কাণ্ড ঘটাতে অভ্যস্ত নন। নন তাই রক্ষে। কিন্তু প্রায় সবাই পুরনো অভ্যাসে মোটামুটি এতটা তৃপ্ত যে ওগুলো পাল্টে নতুন অভ্যাস গড়ে নিতে অনিচ্ছুক।

পুরনো অভ্যাস ভাঙা আর নতুন একটা গড়া হয় প্রায় একই নিয়মে। মনস্তত্ত্বর দিক থেকে প্রক্রিয়াটি এক বললেও অত্যুক্তি হয় না। আগে কোন অবাঞ্ছিত পুরনো অভ্যাস কী ভাবে ত্যাগ করা সম্ভব দেখা যাক্। এর ধাপ একাধিক।

ব্যাপারটা সাধারণ বুদ্ধি, বাস্তববোধ আর চিন্তাপূর্ণ ইচ্ছা-সাপেক্ষ। অর্থাৎ, প্রথমেই দৃঢ়ভাবে স্থির করতে হবে যে পুরনো অভ্যাসটা বাস্তবিক অবাঞ্ছনীয় এবং তা দূর করতে হবেই। বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার সুদৃঢ়ভাবে যে, পুরনোটা বাজে, ফেলিতব্য চীজ্, আর নতুনটি সে তুলনায় কত ভাল।

অস্যার্থ, যতটা সম্ভব দৃঢ় এবং সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। একটা ভালতর কিছু পাওয়ার শুভসূচনা কিছু হেলাফেলার যোগ্য নয়। বলা চলে, এতেই অর্ধেক যুদ্ধ জয়। আধাইচ্ছা, দোলাচলতা, অবাস্তবতা, কিংবা আত্মপ্রবঞ্চনা যে-কোন ব্যাপারকেই চুকিয়ে দেয় আগেভাগে। জন্মের আগেই তবিধ্বনি।

স্বকীয় ইচ্ছা বাইরে প্রকাশ করা দরকার। উঁহু, এ বস্তু আত্মপ্রচার বা অহংবোধের তৃপ্তির জন্য নয় আদৌ। আমাদের নতুন ইচ্ছার এ হল এক মূল্যবান আনুষঙ্গিক। কেবল নিজের কাছে প্রকাশিত ইচ্ছা রাখা যে হয় না বা অসম্ভব তা বলা হচ্ছে না, কিন্তু ঢেঁড়া পিটিয়ে তা একবার চাউর করলে চার থাকে একটানা ফলত, তা রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কেবল আত্মসম্মানবোধই নয়, এর সঙ্গে তখন জড়িয়ে পড়ে বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের মর্যাদা।

জ্ঞানান্বেষক

ঠিক এই কারণে একাধিক আন্দোলনের প্রবক্তারা অনুগামীদের প্রত্যেককে প্রকাশ্যে তাঁদের মত এবং পথের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, ব্যক্তিগত ইচ্ছা সম্পর্কে পাঁচজনকে জানান দেওয়ার পরই আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রমাণ করার সঠিক সময় আসে।

ব্যতিক্রম এড়িয়ে চলাই উচিত। দানের ব্যাপারে কর্ণ, কর্তব্যের ক্ষেত্রে কচ এবং নিজস্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে নিখিলেশ জীবনে কখনও ব্যতিক্রমের প্রশ্রয় দেন নি। সন্দীপের ব্যতিক্রম-বাতিকও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বদ্ অভ্যাস পরিবর্তনের কালে কোন অজুহাতই সম্মানজনক হতে পারে না, যে-কোন পাশ-কাটান কায়দা অগ্রাহ্য করা দরকার। মধ্যপন্থা-গোল্ডেন মিন্—অন্তত এ ক্ষেত্রে নিরস্তিত্ব।

এর কারণ মানসিক এবং দৈহিক। মনস্তত্ত্ব বলে, একটা ছুতো মানলে আর একটা এবং আরও একটা মেনে নেওয়া সহজতর হয়ে ওঠে; প্রত্যেক ব্যতিক্রমই 'বিশেষ' প্রয়োজনবশত হতে কোনও বাধা নেই; আর, সর্বনাশ আসে ঐ ছিদ্রপথে। শনৈ শনৈ।

দেহতন্ত্র বলছে প্রতিটি অভ্যাসই স্নায়ুতন্ত্রর প্রকৃত অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। পায়েচলার পথ ক্রমেই মজবুত হয় আরও বেশি চলাচলের উপযোগী হয়ে ওঠে। কিছুদিন না চললেই সে পথে ঘাস গজায়, মাটি নরম হয়, এবং একদিন হয়ত তাকে আর পথ বলে চেনাই যাবে না। স্নায়ুতন্ত্র এবং মস্তিষ্ক সংযোগ সম্পর্কেও এ যুক্তি প্রযোজ্য। কেবল নিয়মিত ব্যবহারে ওগুলো ক্রমে বেশি শক্তিশালী এবং অধিকতর ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে; অব্যবহারে হয়ে পড়ে অব্যবহার্য।

কাজেই, অভ্যাস পরিবর্তনেচ্ছু মাত্রেই উচিত স্নায়বিক এবং পৈশিক ট্র্যাকওয়ে-গুলো অব্যবহারে ভেঙে ফেলা, কেবল অভ্যস্তগুলো। অন্যান্যরা ষেটের বাছা। যে যেমন আছে সুখে থাক। তাদের ঘাঁটান অনাবশ্যক।

এখন উপযুক্ত 'ভাঙা'-র সঙ্গে 'জোড়া'-র কাজ চালান সুরু হোক। কেবল অবাঞ্ছিত একটা অভ্যাস ঝেড়ে ফেলার কথা না ভেবে কাঙ্ক্ষণীয় একটা আয়ত্ত করার কথা ভাবলে সাফল্য আসে সহজে। জীবনে শূন্যতার স্থান শূন্য। নিছক শূন্যতা বা নিরপেক্ষতা, মনোবিদের বয়ানে, অবাঞ্ছনীয়—আকাশকুসুম বই নয়।

তাই, কোন অভ্যাস ত্যাগ করার মত নেতিবাচক চিন্তার সঙ্গে ইতিবাচক এবং গঠনমূলক নতুন কিছু গড়ে তোলার চিন্তা খুবই দরকার। নতুন কিছু স্বভাবতই মন টানে, তার ফল শুভঙ্কর

জানলে তার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়।

মনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় অটো-সাজেশন্ (নিজের প্রতি নিজস্ব ইঙ্গিত, যা গভীরে চারিয়ে যায় ধীরে ধীরে) খুব কার্যকর। এ মন্ত্র অবচেতনে পৌঁছায়। এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সারার্থনির্দিষ্ট কাজ, উদ্দেশ্যপূর্ণ চেষ্টা এবং নিয়মমাফিক জীবনযাপন। কিন্তু অভ্যাসের মূল সচেতনের তুলনায় অবচেতনে চুঁড়লে মিলবে বেশি পরিমাণে। সুতরাং মনসায়রে ডুব দিলে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ঢের বেশি এবং অবচেতনে দৃঢ়মূল অভ্যাস পালটানোর উপায় অটো-সাজেশন্।

ঘুমোবার ঠিক আগে, মন যখন প্রাত্যহিক ব্যস্ততা সাময়িকভাবে ভুলে ঝিমোতে সুরু করে, তখন 'সচেতন' হওয়ার বিশেষ চেষ্টা না করে মনের সামনে যেমনটা সত্যি সত্যি হতে চাই সেই ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা ফলপ্রদ।

তারপর, নিজেকে : 'এই ত' সত্যিকার আমি। রোজ একটু একটু এই রকম হয়ে উঠছি। নতুন শুভঙ্কর অভ্যেসটা প্রতিদিন গেড়ে বসছে আমার জীবনে। যাক্, ভালই হচ্ছে ক্রমশ।'

এই কথা বারকয়েক বিড়বিড় করার পর, এমন কি করতে করতেই, ঘুমিয়ে পড়ুন। ব্যস, এতেই হবে। কোনরকম চেষ্টা, অভীষ্টপূরণের ব্যগ্রতা, একাগ্রতা, কিংবা স্নায়বিক তীব্রতা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।

চিন্তা এবং ইমেজগুলো এইভাবে আস্তে আস্তে, মৃদুপায়ে অবচেতনের মধ্যে জায়গা ক'রে নেয়, ক্রমে তা পুরো নিষিক্ত হয়, এদের ক্ষমতা অপরিসীম আর সৃষ্টিশীলও বটে। এই পদ্ধতিতে মানুষ চরিত্র পালটেছে, ব্যক্তিত্ব ভেঙেচুরে গড়ে নিয়েছে নতুন ক'রে।

কাজেই, পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে আবার বলা দরকার ভাঙাগড়া একসঙ্গে চলাই শ্রেয়। জীবনে যা অনাকাঙ্ক্ষিত তা ঝরে যাক্, কাম্যবস্তু আসুক অবিস্মরণীয় মূর্তি ধরে।

নতুন অভ্যাস আয়ত্ত করার জন্য তা হলে দরকার—

(১) প্রাথমিক ইচ্ছা ;

(২) প্রকাশ্য ঘোষণা ;

(৩) ব্যতিক্রম বর্জন ;

(৪) নতুন অভ্যাস গড়ে নেওয়ার সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি এবং

(৫) সাফল্য করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অটো-সাজেশন্ চালিয়ে যাওয়া।

অভ্যাস বস্তুত শত্রু এবং মিত্র দুইই। কিংবা কিছুই নয়। আমাদের ওপর নির্ভর করছে বস্তুটি আমরা প্রয়োজনমাফিক অদলবদল ক'রে জীবন গড়ার কাজে লাগাব, না পরিবেশের চাপে যা স্বনিয়মে গড়ে উঠেছে তার দাসত্ব ক'রে যাবো আজীবন, অসুবিধে, এমন কি অমঙ্গল হবে—অন্তত হওয়ার সম্ভাবনা আছে—জানা সত্ত্বেও। ইচ্ছা এবং চেষ্টার কার্যকারিতা সম্বন্ধে যে প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে তার উপযোগিতা রকেটের যুগেও এতটুকু কমে নি। সত্যি বলতে কি, এ যুগে মানবসভ্যতা পৌঁছেছে ঐ অমূল্য বস্তুটি পুঁজি ক'রে। ধনবাদী বা সমাজবাদী, সব সমাজের উন্নতির মূলমন্ত্র এই। এর অভাবে সব কিছু দাঁড়াত থমকি।

যে-কোন দিক দিয়েই দেখা যাক্ না কেন, এর অসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ব্যর্থ অপেক্ষা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এ জীবন হতাশার ব্যর্থ অপেক্ষা।
জ্বলে শুধু নিরাশার অগ্নিশিখা
রাবণের চিতাসম ; অনন্ত সে জ্বলায়
নাইকো বিরাম।

ক্লান্ত, ক্ষীণতনু, সহস্র অবসাদ
তবুও সজাগ ; যদি ওঠে ফুটে
অযুত বর্ষের সেই অন্ধকার ভেদ করে
আলোকের ক্ষীণতম রেখা,
সহসা সে এনে দেয় সহস্র উচ্ছ্বাস
অনন্ত বিশ্রাম।

কেটে যায় দিন, কাটে মাস-বর্ষ কত শত,
বিনিদ্র রজনী হায় গেছে কেটে কত
তবু আশা, তবু ভুলে থাকা ;
বেদনার কশাঘাতে একান্ত কাতর ;
বোঝে না তবু-ও সে ;
দৃষ্টির নিষ্ঠুর পরিহাস
তারই যে অলক্ষ্যে বসি ভুবনের আলো সব
সর্বগ্রাসী ক্ষুধা দিয়ে করে চলে গ্রাস।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ছাত্রসমাজ

শিক্ষকের সুপ্রভাব ছাত্রসমাজের উপর কতদূর কল্যাণকর হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনে। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষাজগৎ নানা সমস্যাসংকুল ; এই অবস্থায় এই মহাত্মার সঙ্গে ছাত্রসমাজের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তা আলোচনা করলে আমরা এই সমস্যা সমাধানের সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারি।

অশ্বিনীকুমারের শিক্ষকতা-জীবন প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরসংলগ্ন চাতরা নন্দলাল ইনস্টিটিউশনে। তখন তিনি এম-এ পাশ করেছেন, বি-এল পরীক্ষা দিয়ে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। চাতরার স্কুলে এসেই দেখেন যে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র অধিক বয়স্ক, লেখাপড়ায় নিতান্ত অমনোযোগী ও উচ্ছৃঙ্খল। তারা প্রধান শিক্ষককে তরুণ পেয়ে তাঁর সঙ্গেও হাসি ঠাট্টা করতে ছাড়ল না।

অশ্বিনীকুমার কিন্তু তাদের উপর মোটেই রাগ না করে সস্নেহে সবাইয়ের সঙ্গে মিশতে লাগলেন। তাঁর বাসস্থানে ছিল সব ছাত্রের অবারিত দ্বার। ছাত্রেরা যখন তখন সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে গল্প করত ; তিনিও তাদের সঙ্গে হাসিমুখে অনেক সরস ও শিক্ষাপ্রদ গল্প করতেন। কোনও কোনও দিন তাঁর অজ্ঞাতসারে রান্নাঘরে ঢুকে তাঁর জন্য রাখা দুধ কোনও কোনও ছাত্র খেয়ে ফেলত। পরে অশ্বিনীকুমার ভৃত্যকে এ জন্য তিরস্কার করলে অপরাধী ছাত্রেরা হাসতে হাসতে সব কথা বলত ; তখন তিনিও তাদের হাসিতে যোগ দিতেন।

বিদ্যালয়ের ছুটির পর অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের নিয়ে খেলতেন, বেড়াতেন, বনভোজনে যেতেন, গঙ্গার নৌকা বাচ খেলতেন, কোন কোন ছাত্র নৌকা ভ্রমণের সময় তাঁর কোলে মাথা রেখে তাঁরই শেখানো ভক্তিমূলক গান গাইত। কিছুদিনের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে এল অভাবনীয় পরিবর্তন ; তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা চলে গেল, লেখাপড়ায় এল মনোযোগ আর স্বভাব সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠল। ছাত্রদের এই পরিবর্তন দেখে স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকবৃন্দ বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাই কয়েক-

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী

মাস পর বি-এল পরীক্ষার ফল বের হলে, ওকালতি করবার জন্য যখন তিনি চাতরা স্কুল ছেড়ে বরিশালে যান, তখন ঐ স্কুলের ছাত্রেরা তাদের বিদায় অভিভাষণে তাঁর প্রতি তাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিল।

চাতরা নন্দলাল ইনস্টিটিউশনে অশ্বিনীকুমারের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ সুসজ্জিত প্রধান হলটির তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। ঐ হলে অন্যান্য অনেক মহাপুরুষের প্রতিকৃতির সঙ্গে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সুন্দর একটি তৈলচিত্র সভাপতির আসনের নিকটস্থ দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে।

ঐ বিদ্যালয়ের অশ্বিনীকুমারের অন্যতম ছাত্র শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য প্রাক্তন গুরুর আকর্ষণে শ্রীরামপুর থেকে গ্রীষ্মাবকাশে বরিশাল গিয়ে গুরু-নিবাসে কিছুদিন থেকে এসেছেন। তিনি বরিশাল শহরে ফিরে এসে ওকালতিতে বসে অসাধারণ মেধাবী, এম-এ বি-এল উকিল হন।

অশ্বিনীকুমার অচিরেই বেশ পসার করে তুললেন। ওকালতিতে তাঁর মেধা দেখে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন যে কলকাতা হাইকোর্টে তিনি ওকালতি করলে আরও অনেক পসার ও অর্থোপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার ওকালতিতে সত্যপথে থাকা কঠিন দেখে এই লাভজনক ব্যবসা ছেড়ে বরিশালে পিতার নামে ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে), এর ৫ বছর পরেই ঐ শহরে একটি কলেজও স্থাপন করেন। এই বিদ্যায়তনগুলির সাহায্যে ছাত্রদিগকে যথার্থ শিক্ষা দিয়ে তাদের তথা দেশের কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি এই বিদ্যায়তনে নিজে শিক্ষকতা করতেন, অথচ বেতন নিতেন না ; বরং বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য, সরকারী সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে নিজের অর্থ বহু পরিমাণে ব্যয় করেন।

ব্রজমোহন কলেজে অশ্বিনীকুমারের অধ্যাপনা কিরূপ উচ্চ শ্রেণীর ছিল তা শ্রদ্ধেয় শরৎকুমার রায় লিখিত 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত' পুস্তক থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে দিলেই পরিস্ফুট হবে।

'তিনি (অশ্বিনীকুমার) ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহার পাঠনা এমন হৃদয়গ্রাহী হইত যে ছাত্রেরা নির্বাক হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। ইংরাজী সাহিত্যে অশ্বিনীকুমারের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার সুমিষ্ট, বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অধ্যাপনার মনোহর ভঙ্গী ছাত্রদের হৃদয়রঞ্জন করিত। অতি উত্তম অভিনয় দর্শনে যেমন আনন্দ জন্মে সাহিত্যরসিক অশ্বিনীকুমারের নিকট ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, শেলি প্রমুখ কবিগণের কবিতা পাঠ করিয়া সেইরূপ আনন্দ

পাওয়া যাইত। তাঁহার মত বিদ্যানুরাগী, তাঁহার মত ছাত্রদের শুভানুধ্যায়ী আদর্শ শিক্ষক আর দেখিয়াছি মনে হয় না।'

অশ্বিনীকুমার সহকর্মিরূপে পেয়েছিলেন তাঁর মনের মত একদল শিক্ষক, যাঁরা বিদ্যাবত্তা, বিদ্যানুরাগ, ছাত্রপ্রীতি, আর্তের সেবা—সব বিষয়েই ছিলেন অনন্যসাধারণ। ঋষিকল্প আদর্শ পুরুষ জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রজনীকান্ত গুহ, সতীশ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন, সত্যানন্দ প্রমুখ অশ্বিনীকুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, উচ্চতর বেতনে অন্যত্র চাকুরী করার সুযোগ ছেড়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যানিকেতনে পরিণত করতে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এইসব পূতচরিত্র শিক্ষকের পরিচালনায় ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দরিদ্র বান্ধব সমিতি স্থাপন করে নির্ভয়ে কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করত, তাদের সেবার সব ভার নিত—এ কাজে তারা পেত বিমল আনন্দ, আর রোগীরা পেত নতুন বল। ছাত্রদের এই সেবাকাজে অগ্রণী হতেন অশ্বিনীকুমার, কালীশচন্দ্র প্রমুখ মহাপ্রাণ শিক্ষকগণ। তাঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্ররা এমন নিপুণতা ও দরদের সঙ্গে আর্তসেবা করত যে তা দেখে মোহিত হয়ে এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলেছিলেন: 'বিদেশে মৃত্যু হলে যেন এই বরিশাল শহরেই আমার মৃত্যু হয়।'

বরিশাল শহরে তখন ফায়ারব্রিগেড ছিল না, অথচ প্রায়ই আগুন লেগে অনেক ঘরবাড়ী পুড়ে যেত, অনেক লোক সর্বস্বান্ত হত। এই নিদারুণ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অগ্নিনির্বাপণের একটি সেবকদল গঠন করা হয়। হঠাৎ কোথাও আগুন লাগলে এই দল যেরূপে সামরিক শৃঙ্খলায় বিপন্ন ব্যক্তিদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করতে প্রাণপণে চেষ্টা করত তা দেখে বরিশালবাসী বিস্ময়াভিভূত হত। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও ব্রজমোহনের শিক্ষকেরা হতেন অগ্রণী। তাঁরা আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাতেন।

ব্রজমোহনের ছাত্র ও শিক্ষকগণ বরিশাল জেলার দুর্ভিক্ষের সময় সমগ্র জেলায় যেরূপ সুশৃঙ্খলভাবে বুভুক্ষু জনসাধারণের অন্ন জুগিয়েছেন, তা দেখে সবাই তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভগিনী নিবেদিতা এই সময় বাখরগঞ্জ জেলা পরিভ্রমণ করে মন্তব্য করেছেন:

'বরিশালের এই দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতির মত বঙ্গদেশে আর কোনও সমিতি এমন সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয় নি। আমার মনে হয়, বঙ্গদেশে কেহ কখন এমন মহৎ অনুষ্ঠান করেন নি। বাখরগঞ্জে ছাত্রদের সাহায্যে এক স্কুল মাস্টার এমন আশ্চর্য কাণ্ড করেছিলেন—বস্তুত স্কুল মাস্টারই অশ্বিনীকুমারের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।'

ব্রজমোহনের ছাত্রেরা যাতে লেখাপড়াতেও শীর্ষস্থানীয় হয়, সেদিকে অশ্বিনীকমার ও তাঁর সহকর্মীরা বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। তাঁরা শুধু বিদ্যালয়ে থাকাকালীন এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতেন তা নয়, স্কুলের সময় ছাড়া অন্য সময় ছাত্রদের বাড়ী গিয়ে কে কেমন পড়াশুনা করছে তার খবর নিতেন এবং প্রয়োজনমত সাহায্য করতেন। এক সন্ধ্যায় প্রবল বারিপাতের মধ্যে এক ছাত্রাবাসে এলেন স্বয়ং অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র। কতিপয় ছাত্রকে তাস খেলায় রত দেখে, তাদের অধ্যয়নে মনোযোগী করে চলে এলেন। শিক্ষকদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তাঁদের বিদ্যানুরাগ ও ছাত্রপ্রীতি ছাত্রদের অধ্যয়নে অগ্রগামী হতে খুবই উদ্বুদ্ধ করত।

শিক্ষকদের দৃষ্টান্ত দেখে ছাত্ররাও Plain living and high thinking-এর আদর্শ গ্রহণ করেছিল।

এই সব কারণে প্রথম থেকেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অতি উত্তম হতে লাগল। প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার অপেক্ষা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার হার অনেক বেশি হত এবং সরকারী বৃত্তি প্রাপকের সংখ্যায় বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮৯৭-৯৮ সালের বার্ষিক বিবরণীতে ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের পরিদর্শক মহাশয় এইরূপ মন্তব্য করেন:

The School (B. M. School) is unrivalled in point of efficiency. It is an Institution that ought to serves a model to all Schools, Govt. or private.

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক কানিংহ্যাম ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন—'ব্রজমোহন কলেজের মত উৎকৃষ্ট কলেজ থাকতে বাংলা দেশ থেকে ছাত্ররা কেন যে অক্সফোর্ডে পড়তে যায় তা আমি বুঝতে পারি নে।'

নৈতিক চরিত্রেও ছাত্রেরা যাতে খুব উন্নত হয় সেজন্য ব্রজমোহনের ছাত্রেরা নিয়মিত আর্তজনের সেবা করা ছাড়াও প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সৎপ্রসঙ্গে যোগ দেবার জন্য মিলিত হত। এই সাপ্তাহিক সভায় অশ্বিনীকুমার, জগদীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ধর্মপ্রাণ শিক্ষকগণ উপস্থিত থেকে নানা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করতেন। তাঁরা ঈশ্বরের উপাসনাও তথায় করতেন। উপাসনাকালে অশ্বিনীকুমারের হৃদয় ভগবদ্ভক্তিতে ভরে যেত এবং প্রেমাশ্রু তাঁর বক্ষস্থল প্লাবিত করত। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে সবাই অভিভূত হত।

ছাত্রদের খেলাধূলা, ব্যায়ামচর্চা ও নানাপ্রকার নির্দোষ আমোদপ্রমোদেও ব্রজমোহনের শিক্ষকবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। অশ্বিনীকুমার প্রবীণ বয়সেও ছাত্রদের সঙ্গে সমবয়সীর মত খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন। ব্রজমোহনের শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে চড়ুইভাতি, নৌকাভ্রমণ ইত্যাদিতে যেতেন এবং সেখানে তাঁরা কত সরস, শিক্ষাপ্রদ গল্প বলে সবাইকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতেন। এইসব উপলক্ষে ভাল ভাল গানও হত।

বরিশালের সমাজে তখনকার দিনে শিক্ষক ও ছাত্রদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদেরও সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ হত। শিক্ষকেরা ছাত্রদের নিয়ে সেই সব অনুষ্ঠানে গিয়ে এক জায়গাতেই বসতেন এবং নিমন্ত্রণকারীরা তাঁদের বিশেষ সমাদর করে বসাতেন।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমাজের উপর নৈতিক প্রভাবও ছিল অসামান্য। কোথাও কেহ অন্যায়, অবিচার করলে, উৎপীড়িত পক্ষ ছাত্রদের উপস্থিতির অপেক্ষায় থাকত এবং উৎপীড়নকারীরা ছাত্রদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। ছাত্রদের এই সৎসাহসের মূলে ছিল অশ্বিনীকুমার প্রমুখ শিক্ষকের শিক্ষা ও তাঁদের সস্নেহ আলিঙ্গন।

ছাত্রেরা কোন দোষ করলে তা অকপটে শিক্ষকদের কাছে না বলে থাকতে পারত না। তাঁরা সব শুনে তাদের উপর রুষ্ট না হয়ে, বুকে টেনে নিয়ে তাদের দোষত্রুটি চিরকালের জন্য সংশোধন করে দিতেন। ব্রজমোহনের ছাত্রদের রোজনামচা লেখার অভ্যাস করানো হত, তাতে তাদের ব্যক্তিগত কথা সব খোলাখুলি তারা লিখত এবং শিক্ষকদের সেগুলি দেখাতো এবং তাঁদে সস্নেহ উপদেশ পেয়ে উপকৃত হত।

পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্রজমোহনের ছাত্রদের পাহারার ব্যবস্থা করতে হত না; শিক্ষকেরা তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন, তারা সে বিশ্বাসের মর্যাদা পুরোপুরি রাখত। একবার পরীক্ষার হলে কোনও ছাত্রকে সকালের পরীক্ষার সময় ভুলক্রমে বিকালের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হলে, সে প্রশ্নপত্র না পড়ে, শুধু শিরোনামা দেখেই, তৎক্ষণাৎ ছুটতে ছুটতে অশ্বিনীকুমারের হাতে ঐটি ফিরিয়ে দেয়।

কলকাতা কর্পোরেশনের এক চিফ এঞ্জিনীয়ার, অশ্বিনীকুমারের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। তিনি খুব সততার সঙ্গে নিজ কাজ করে গিয়েছেন, উপরি-উপার্জন কিছু করেন নি। অশ্বিনীকুমার তাঁকে একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, তুমি ত' একাজে বিশেষ কিছু টাকা-পয়সা করতে পারলে না, কেন এমন হ'ল?'

তিনি জবাব দিলেন, 'কি করে তা পারব? আমি যে আপনার গোয়ালের লোক।'

ব্রজমোহন কলেজ সুরুতে অশ্বিনীকুমারের গৃহের নিকট অবস্থিত ছিল এবং স্থানাভাবে গোয়াল ঘরেও কোন কোন ক্লাশ হত।

অশ্বিনীকুমারের বরিশালের বাসগৃহে ছিল সবাইয়ের অবাধ প্রবেশাধিকার। সেখানে তিনি অতি সাদাসিধেভাবে থাকতেন। তিনি ছিলেন খুবই

হাসিখুশী, গোমরামুখো হয়ে থাকতে মোটেই ভালবাসতেন না। তাঁর সান্নিধ্যে যারা আসত, তারাই পেত এক অতি দরদী বন্ধু ও প্রচুর আনন্দের খোরাক। এ সম্বন্ধে তাঁর এক প্রিয় ছাত্র, কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট স্বর্গত গুণদাচরণ সেন অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিসভায় তাঁর গুরু সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা একটু বিস্তৃতভাবে তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

তিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক দিন স্কুল-কলেজের ছুটির পর বাড়ী আসিয়াই খাইয়াই মৌমাছির মত তাঁহার গৃহে সেই তক্তপোষখানার উপর তাঁহার পিঠের কাছে গিয়া বসিতাম, তিনি হয়ত কিছু পড়িতেন, না হয় কোন সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, আর আমরা ছেলের দল অভিভূত হইয়া শুনিতাম। তিনি কখন কখন আমাদিগকে লইয়া পায়ে হাঁটিয়া বা নৌকায় শহরের বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন। নুন-লঙ্কার সহিত চালতা মাখিয়া খাওয়া তাঁহার তখনকার সখ ছিল। মুড়ি প্রায়ই সঙ্গে থাকিত বা সংগ্রহ করিয়া লইতাম। সেই বনজঙ্গলে আমাদের মত তিনিও ছুটাছুটি করিতেন। রাত্রিতে কোনও দিন তাঁহার কাছেই থাকিতাম। ভালবাসিয়া প্রাণের কথা আদায় করিয়া লইতেন, অথচ কোন অসঙ্গত কাজ করিলে ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপিত। যখন যে অপরাধ করিয়াছি চোখের জলে ধুইয়া-মুছিয়া আবার কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। এমন কোনও দুষ্কার্য কেহ কখন করিতে পারে নাই যাহার দ্বারা তাঁহার ভালবাসা হইতে মুহূর্তের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। প্রেমে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। বয়স, জাতি, পদ, সাধু, পাপী নির্বিশেষে তিনি সকলকেই এই প্রেমমধু বর্ষণ করিয়াছেন।'

অশ্বিনীকুমার ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে তথা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন এবং ইংরেজ শাসকদের শত নির্যাতন উপেক্ষা করে তারা বিপুলভাবে এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। প্রধানত ছাত্রদের সাহায্যে বিলাতি পণ্য বর্জন আন্দোলন অশ্বিনীকুমারের পরিচালনায় সমগ্র বাখরগঞ্জ জেলায় এমন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে তাঁর আদেশ ব্যতীত কেউ ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও একগজ বিলাতী কাপড় বিক্রি করতে সাহস করত না। বি এম কলেজের সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বৃত্তি সরকারী আদেশে কাটা গেলেও তারা ঐ কলেজ ছেড়ে গেল না। এইরূপে শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েও সরকারী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন, কিন্তু বি এম কলেজ ছাড়লেন না। স্বদেশী আন্দোলন ছিল অশ্বিনীকুমারের নিকট এক পরম পবিত্র কর্তব্য। সুতরাং এ কর্তব্যে পশ্চাৎপদ থাকলে ছাত্রেরা মনুষ্যত্ব অর্জনেও পশ্চাৎপদ থাকবে, এই ছিল তাঁর দৃঢ় অভিমত। তাই তিনি ছাত্রদের বলতেন —'মনে রেখো সততি আর তেজ। যা সত্য, তাই করবো, আসুক যা লোকগুলি বা যা কিছু উৎপীড়ন। জীবনে এই জিনিষটি আনতেই ভক্তির দরকার।

অশ্বিনীকুমারের এই যে অপরিসীম ছাত্রবাৎসল্য, সর্বস্তরের মানুষকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসা, অকাতর ভাব তার মূলে ছিল তাঁর ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি। ঈশ্বরপ্রেমে তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণ, তাই তিনি সবাইকে ভালবেসে আপন করে নিতে পেরেছিলেন, সবাইয়ের কাছে নিজেকে নিঃশেষে দান করতে পেরেছিলেন। এই মহাত্মা সম্বন্ধে এই ঋষিবাক্য খুবই প্রযোজ্য—

> যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি সর্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখেন এবং আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই রকম মানুষই ছিলেন অশ্বিনীকুমার, তাই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। এই প্রকার শিক্ষক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'যেখানে তারা (ছাত্ররা) কোন মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায় দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়; সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে।'

রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, পৃঃ ১৬০।

কবিগুরুর উল্লিখিত কথাগুলি অশ্বিনীকুমার, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ শিক্ষাগুরুর জীবনে কত সত্য হয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা বলে শেষ করা যায় না। তাই তাঁদের প্রভাবধন্য বি এম কলেজের বহু ছাত্র উচ্চ বেতনে অন্যত্র কাজ প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষকতা গ্রহণ করে 'সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা'র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুরুদত্ত শিক্ষার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার চির-কৌমারব্রত অবলম্বন করে তাঁদের গুরুদের ন্যায় নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদের কল্যাণে, তথা সমাজের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে অশ্বিনীকুমার প্রমখ শিক্ষকের প্রয়োজন যে কত বেশি তা আর ব্যাখ্যা করে বলবার দরকার নেই। সমগ্র দেশ তাঁদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

ধারাবাহিক
উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

॥ চার ॥

ভোজের নিমন্ত্রণে যূথিকার বাড়ীতে এল রামদাস কনোরিয়া, দামোদরপ্রসাদ চৌবে, ধুন্মল দাস আর চিত্ততোষ রায়। লক্ষ্মীর মণি-কোঠার চাবির মত রাজনীতিতে ঢুকবার দরজার চাবিও ওদের হাতে। প্রায় ভগবানের মত সর্বশক্তিমান ওরা। ওরা ইচ্ছা করলে মানুষ মরবে। খেতে না পেয়ে, বেকার থেকে, ভেজাল ওষুধ খেয়ে মরবে মানুষ। ওদের মরজি না হ'লে বস্তা বস্তা মানুষের খাবার পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে। মানুষ কাঁদবে—দু'টি ক্ষুদ দাও, ফ্যান দাও বলে, গৃহস্থ চাষী রাস্তায় হাত পেতে বসবে ভিখিরী হয়ে, মরে থাকবে নর্দমায় মুখ গুঁজড়ে। এরাই আবার লঙ্গরখানা খুলে ভাত বিলোয়, হাসপাতালে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে খানায় ফ্রি-ওয়ার্ড। তখন কত ধন্যবাদ পায়, গলায় পরে ফুলের মালা। চোখ-ধাঁধানো ফ্লাশ লাইট জ্বলে ওঠে বারবার, কত গুণগান থাকে পত্রিকার প্রথম পাতায়। স্পেশাল নাম্বার বের হয়।

রাজনীতিতে ঢুকবার প্রবেশপত্র আছে ওদের জিম্মায়। সুতরাং গণ্যমান্য মানুষদের আপ্যায়ন করবার জন্য সুরেশ্বর খরচ করছেন দরাজ হাতে। ইংরেজী হোটেলের পার্টি না হ'লেও বাবুর্চি বয় ড্রিঙ্ক বাজনা সব আছে। খুব আনন্দ পেল অতিথিরা। বয়োজ্যেষ্ঠ রামদাসের কথায় প্রকাশ খুশীর খবর।

---বেশ, বেশ বেবস্থা করেছেন শান্তিনগরে। এ রকম পার্টি পছন্দ হয় আমার। আপনাদের বাঙালীদের হাল-চাল একদম ভাল নয়। বড় হোটেলে খানা দেয়, ঘরের জেনানা নিয়ে আসে মহফিলে। পর্দা নেই, ইজ্জত নেই। আওরৎ ভি শরাব পিতা, নাচনা করতা। একদম বেশরম। আরে ছোকরী না হ'লে যে পার্টি জমে না, সে তো সাচ্ বাত। লেকিন ওর জন্য তো বহুৎ বাহারকা লেড়কি আছে। রুপেয়া কবলালে মেমসাহেব ভি চলে আসবে। পয়সা বাঁচাবার জন্য বাঙালীবাবুরা নিয়ে আসে নিজকা বিবি। সিয়া-রাম, সিয়া-রাম, ইজ্জতের চেয়ে বড় পয়সা।

অ-বাঙালী অভ্যাগতরা রামদাসকে সমর্থন করে ঘাড় নাড়ল। মুখ লাল হ'ল চিত্ততোষ রায়ের। গত মাসে এন বিরাট পার্টি দিয়েছিলেন গ্র্যাণ্ডে। রামদাস, মথুরাপ্রসাদরাও নিমন্ত্রিত ছিল। ওদের স্ত্রীরা যায় নি, কিন্তু বাঙালীরা সবাই সস্ত্রীক ছিলেন। রায়ের স্ত্রীও ছিল। শরাব-ড্রিঙ্ক। একটু-আধটু ড্রিঙ্ক তো আজকাল সবাই করছে। ইচ্ছে না থাকলেও ভদ্রতা রাখবার জন্যই দু' একটা সিপ দিতে হয় গ্লাসে। অ-বাঙালীরা নিজেদের বউ আনেনি, কিন্তু ছলো বেড়ালের মত চাইছিল বাঙালী মহিলাদের দিকে। রাগ হল চিত্ততোষের। কুৎসা করবে, আবার পরিচিত হবার জন্য পাগলও হয়ে উঠবে। মনে পড়ল, কি রকম খোসামোদ করে, প্রায় মিনতি করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে গত সপ্তাহে মথুরাপ্রসাদ গিয়েছিল ক্লাব মুনলাইটে টুইস্ট নাচ দেখতে। টুইস্ট একটা অদ্ভুত নাচ। সমস্ত শরীর অবিশ্বাস্যরকমে দুমড়ে মুচড়ে নাচছে বাজনার সঙ্গে। আবার সমের মাথায় এসে কি অদ্ভুত শব্দ করে উঠছে। মনে হয় জীবনের মূলে আছে যে আদিম কামনা, তারই দুর্দান্ত পীড়নে অমন করে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে বুঝি ওদের বাহু, কটি, নিতম্ব। আধো-অন্ধকারে বসে-থাকা দর্শকদের শরীরেও আগুন জ্বলে উঠেছে। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমেছে রক্তস্রোত, নিঃশ্বাস বয়েছিল তপ্ত ঘন হয়ে। পঞ্চাশ বছর বয়সেও রায় অনুভব করছিল শরীরের উষ্ণতা।

হাত জড়িয়ে ধরেছিল মথুরা বিমি গুপ্ত, কণা ধরের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। তখন কি মোলায়েম কথা মথুরার।

—জানছেন মিস্টার রয়, বহুৎ বঢ়িয়া চিজ এই বাঙালী লেডিয়া। একদম খানদান ঘরের মেয়ে।

মেয়েরাই টুইস্ট নাচে, স্ত্রীদের মধ্যে অনেকে ওসব চপলতায় যোগ দেয় না। অবশ্য দিলেও দোষ নেই। গতবার আমেরিকা গিয়ে বুড়ো প্রফেসর আর তার বৌকে টুইস্ট নাচতে দেখে এসেছে চিত্ততোষ। রামদাসের কথার প্রতিবাদে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই শোনা গেল সুরেশ্বরের গলা।

খুব ঠিক কথা বললেন রামদাসজী। কলকাতা শহরে আর ঘরের ইজ্জত রাখছে না কেউ। আগে যেমন বাবুরা বাইজী নিয়ে বাগানবাড়ীতে যেত, এখন তেমনি বৌ নিয়ে যাচ্ছে পার্টিতে হোটেলে। কি তাদের পোষাক, কত রং, কিবা চুলের ঢং। পর-পুরুষকে ভোলাবার জন্য কি পাগল-করা সাজ।

নিজেকে আর সামলাতে পারল না চিত্ততোষ। বাঙালী হয়ে নিজেদের মেয়ের নিন্দা।

—কি বলছেন আপনি সুরেশ্বর-বাবু। মেয়েরা সাজতে ভালবাসে বলেই সাজে, কাউকে ভোলাবার জন্য

হয়। দেখেন নি ঘরের আব্রু থাকা মেয়েরাও কত সাজসজ্জা করে?

—তাই তো বলছি আমি, ঠাণ্ডা গলায় বললেন সুরেশ্বর।

ভোলাবার জন্যই মেয়েরা সাজে। না হ'লে সমস্ত দিন পেত্নী হয়ে থাকে, বিকেলে স্বামী ঘরে আসবার আগে আয়না, চুলের ফিতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেন? কাউকে দেখাতে না পারলে, কেউ মুগ্ধ না হ'লে আর সাজ কিসের। এখানকার মেয়েরা সুযোগ পেয়ে এক স্বামীর বদলে হাজার পুরুষকে মুগ্ধ করছে। আর স্বামীরা মেয়েদের এই মুগ্ধ করবার ইচ্ছেটাকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। রামদাসজী বলছেন —ঘরের বৌকে দিয়ে কাজ হাসিল করবার টোপ ফেলাটা সম্মানজনক নয়, এই আর কি।

অভিজ্ঞ রামদাস বুঝল আসর গরম হয়ে উঠছে। সব আমোদ বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে। প্রসঙ্গ বদলে নিল সে।

---তা আপনার দাঁড়াবার কি হোলো বেনাজিবাবু? কি রকম বুঝছেন? সুবিস্তা হোবে কিছু, না কেবল টাকা নষ্টো?

—তাই তো ভাবছি। বললেন সুরেশ্বর। আপনারা নমিনেশানের ব্যবস্থা করলেও ভয় আছে আদিত্য মণ্ডলের জন্য।

—আরে যদি ইলেকশনে জিততে চান, টাকা ঢালুন। মণ্ডলের এখুন টাকার বেজায় দরকার। হাজার চাল্লিশ টাকা দেখলাবেন, তো নাম উইথড্র করে নেবে।

---তা বোধ হয় নেবে না। ভারি তেজী মানুষ।

---গরম? টাকা লিবে না? তবে যন্তর-টন্তর আছে তো আপনার? কাজ-কাম করবার যন্তর?

রামদাসের ইঙ্গিত বুঝলেন সুরেশ্বর। হাসলেন---তা আছে।

---তবে আবার কি। ফাইনাল হোবার আগে খবর ভেজবেন--অর্থ লিবে তো লাও, নয়ত গোঁজা আছে। বাপ বাপ বলে ফয়সালা করবে তেখুন।

—যাতে মনঃপূত। প্রাণের ভয় নেই আদিত্য মণ্ডলের।

—প্রাণের ভয় নেই? ঠাট্টা ক'রে অট্টহাস্য করলেন রামদাস, মথুরা আর হরমুখ।

—বলে কি শান্তিনগর। প্রাণের ভয় নেই, এমন মানুষ আছে দুনিয়ায়? প্রাণের চেয়ে বড় কি আর? প্রাণ থাকলো, তো সোব থাকলো। বহুৎ দামী চিজ, সবসে আচ্ছা চিজ জীওন। ও রক্ষা পাবে, তো সব মিলবে। টাকা, ইজ্জত, জরু, লেড়কা--সব।

সবার চেয়ে বড় জীবন। খাদ্য-পানীয় পরিবেশনের তদারক করতে করতে কথা শুনছিল যূথিকা। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে সুরেশ্বরের রক্ষিতা সে। বাড়ী, মাসিক তিনশ টাকা, দরোয়ান আছে দরজায়। কড়া হুকুম—মালিকের অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকবে না বাড়ীতে। দরকার হ'লে সব রকম নির্দেশ মানতে হবে যূথিকাকে। সেই হুকুম শুনে অনেকবার অনেকজনকে সঙ্গ দিয়েছে যূথিকা। পরিবর্তে সুরেশ্বর অর্ডার পেয়েছেন। যূথিকাও কিছু পেয়েছে। তাকে শাড়ী, গয়না, কখনো বা মোটা নগদ টাকা দিয়েছেন সুরেশ্বর। আদর-সোহাগ? না, সে রকম বিহ্বলতা কখনো দেখা দেয় নি সুরেশ্বরের মনে। কথা ও ব্যবহারে একদিনের জন্যও তিনি ভুলতে দেন নি যূথিকাকে যে তাঁদের সম্পর্ক আর্থিক, হৃদয়ের নয়। প্রথম প্রথম নিজের দাম বুঝতে না পেরে হুকুম পালতে অবাধ্যতা করেছে যূথিকা, কঠিন শাস্তি দিয়েছেন তাকে সুরেশ্বর। এখন আর সে ভুল হয় না। মালিকের সব আদেশ মেনে নেয় যূথী নীরবে।

মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হয়, তবু সুরেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার ক'রে চলে যূথিকা। কোনো উপায় নেই অনুগত না থেকে। যূথিকা জানে কি প্রচণ্ড ক্রোধী সুরেশ্বর। প্রয়োজন ছাড়া কিছু বোঝেন না তিনি। প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে যূথিকা অপরিহার্য সুতরাং তাকে ছাড়বেন না। আর সেই বা যাবে কোথায়? বড় কষ্ট তাদের জীবনে। পেটে ভাত নেই, বস্ত্রাভাব। জ্বর হয়ত একশ দুই ডিগ্রী। তারি মধ্যে রং মেখে, কুৎসিত ঢং-এ নিজেকে লোভনীয় করে তোলা যে কত মর্মান্তিক তা কে বুঝবে ভুক্তভোগী ছাড়া।

সবাই দেখে রিক্সাওয়ালার বড় কষ্ট। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদে ছুটছে তারা, দরদর ঝরছে ঘাম। দুরন্ত মাঘের শীতে বৃষ্টি নেমেছে, কাঁপতে কাঁপতে চলেছে রিক্সাওয়ালা আলো জেলে, ঘোমটা ঢাকা গাড়ীতে যাত্রী নিয়ে। মজুর মুটে কৃষাণ—সবার বড় কষ্ট। কিন্তু পরিশ্রমের পরে তাদের জন্য আছে রাতের বিশ্রাম। আছে নিজের মানুষ তাদের দুঃখে দুঃখী হতে, সুখী হতে তাদের সুখে। তাদের জন্য আছে সমস্ত মানুষের সমাজ। জয় উঠেছে কৃষাণ-মজুর শ্রমিকের।

আর যে মেয়ে শরীরকে মূলধন করে, শরীর খাটিয়ে টাকা রোজগার করছে সে? সে কি? তার নাম পতিতা। তার স্বজন নেই, সমাজ সংসার কিছু নেই তার। নেই রাতের ঘুম, দিনের পেটভরা ভাত। তার কথা শুনবে এমন কেউ নেই। পৃথিবীর বুকে একটা মস্ত বড় পচা গন্ধ ঘা পতিতা মেয়ে।

সমস্ত দিন মানুষ তাদের এড়িয়ে চলে, ওরা যে দূষিত রোগের কারখানা। কিন্তু রাতের বেলা, কোন্ নর্দমার আবর্জনা হতে অন্ধকারে গা ঢেকে উঠে আসে রাশি রাশি পাপ। তাদের মূর্তি দেখে অবাক হয়ে যায় পতিতারা। দিনের আলোয় যারা ছিল পরম পুণ্যবন্ত, যারা বিধান দিয়েছিল ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে দহন, তারাই এসে দলে দলে ঘরে ঢুকছে। আশ্রয় নিয়েছে ক্লিন্ন পঙ্কিল শয্যায়। রাত ভ'রে তখন চলে পতিতা মজুরনীদের খাটুনি। তাদের শ্রান্তি-ক্লান্তি, অবসাদ—কিছু থাকতে নেই। কেবল হাসি রঙ রস দিয়ে তারা রাতের অন্ধকারকে মাতাল করে তুলবে।

দুর্গন্ধে যখন গা গুলিয়ে উঠতে

চাইবে, বুকে যখন জ্বলবে চোখের জলের সমুদ্র, একটা সাপ যখন ফণা তুলে কেবলি ছোবল দিতে চাইবে, তখনো ওদের হাসতে হয়, নাচতে হয়, বিকিয়ে দিতে হয় শরীর। ওরা যে পতিতা মেয়ে, কলঙ্কিনী। হেসে হেসে শরীর বিকিয়ে তবে তো ওদের ভাতের খরচ যোগাড় করতে হয়। ওরা পতিতা। কিন্তু যারা রাতের অন্ধকারে মুখ ঢেকে বীভৎস অত্যাচারে পৃথিবীর ঘাটাকে আরো দগদগে দগদগে করে তোলে, তারা পতিত নয়।

অনেক ভেবেছে যূথিকা, ভারি আশ্চর্য লাগে তার। রোগের ওষুধ দিয়ে দেহ জীবাণুমুক্ত করে তোলে ডাক্তার, তাদের কত সুনাম। দেবতার মত পূজো পায় তারা। কিন্তু শরীরের অসহ্য জ্বালায় জ্বলে যারা যূথিকাদের উপর পাপ ঢেলে আবার পরম পুণ্যবান হয়ে ওঠে, তারাই কেন পতিতা নাম দিয়ে এমন ঘৃণ্য করে দিল ওদের!

যূথিকারাই তো কত কুমারী, কত কুলবতীর জীবনকে ফুলের মত সুন্দর নির্মল থাকতে দিয়েছে। না হ'লে উন্মাদ লালসা যদি বাঁধন ছাড়া হয়ে সংসার ভরে ছড়িয়ে পড়ত, তবে কি আর পবিত্রতা ব'লে কিছু থাকত পৃথিবীতে? হয়ত স্ত্রী বোন মেয়েকে নিজেদের দুর্দান্ত লালসা হতে রক্ষা করবার জন্যই একদল মেয়েকে ঠেলে নীচে নামিয়ে দিয়েছে পুরুষ। বলেছে---তোমরা পতিতা। আনন্দ-সম্মান-প্রেমের স্বর্গ হতে পতন হল তোমাদের। কারোর স্ত্রী নও তোমরা। তোমাদের লজ্জাবরণ ছিন্ন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আমাদের কামনার লেলিহান নরককুণ্ডে। ধক্‌ধক্‌ জ্বলবে কামনার লোলুপ রসনা, তোমরা তাতে আহুতি দেবে তোমাদের দেহ, তোমাদের ইহকাল পরকাল। আমরা তোমাদের ভোগ করব, অর্থ দেব। তারপর তীব্র অভিশাপে বিধান দেব অনন্ত নরকবাসের। উন্মত্ত রাত্রি শেষে ফিরে যাব প্রভাতবেলায় আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরে। সেখানে আমাদের পাদোদকে উপবাস ভঙ্গ করবার জন্য বসে থাকবে পরম পবিত্র সতী-সাধ্বী স্ত্রী।

পানের খিলিতে গোলাপ জলের ছিটে দিতে দিতে যূথিকা শুনল রামদাস বলছে---ওসব কাজের জন্য আলাদা মেয়ে আছে, টাকা দিলেই তাদের পাওয়া যায়। সে তো সত্যি কথা। টাকা দিলেই আনন্দ দেবার জন্য, মজলিশ জমাবার জন্য মেয়ে ভাড়া পাওয়া যায়। তারাই পতিতা মেয়ে।

কিন্তু এখন দিনের বদল হয়েছে। আধুনিক যুগে মানুষ পতিতা নিয়ে আসর বসায় না, তারা স্ত্রীকে নিয়ে যায় মজলিশে। তারা বুঝে ফেলেছে, নারীদেহের প্রতি পুরুষের দুরন্ত লোভ জন্মসঙ্গী হয়ে এসেছে। তার হাত হতে অব্যাহতি নেই। নিজেদের সুবিধার জন্য ওরা আর একদল মেয়েকে পতিতা করে রাখতে চায় না। যাদের নিয়ে আনন্দ করে, বিয়ে করে তাদের ঘরে নিয়ে যায়। নিজের লুব্ধতার শাস্তি চাপায় না মেয়ের ঘাড়ে।

কিন্তু যুগ বদলালেও কি বদলাবে সব মানুষের মন? কত যুগ বদলাল, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। মানুষ কিন্তু সব সময় এক রকম। একদল পৃথিবীকে স্বর্গ বানাচ্ছে, আর একদলের কাজ হচ্ছে নরককুণ্ড ক'রে তোলা। তাইত সত্য যুগেও সৃষ্টি হয়েছিল পাপীকে শাস্তি দিতে জ্বলন্ত মশাল, কৃমি-কীটের কামড়। চিত্রগুপ্তকে খাতা ভ'রে লিখে রাখতে হ'ল পাপ-পুণ্যের হিসাব। ব্রহ্মা নাকি পাগল হয়েছিলেন নিজের মেয়ের রূপ দেখে, বৃহস্পতি নাকি হরণ করেছিলেন নিজের ভাইয়ের বৌকে। আবার ছিলেন ভীষ্ম। সব, সব থাকবে চিরদিন।

সুরেশ্বররা রক্ষিতা রাখবে আসর জমাতে, কাজ যোগাড় করতে, হয়তো ওর ছেলেই আবার বিয়ে করে ঘরে নেবে সেই পতিতার মেয়েকে। বসাবে তাকে গৃহলক্ষ্মীর আসনটিতে।

কুড়ি বছর বয়সে যূথিকা প্রথম সুরেশ্বরের আশ্রয়ে আসে। তাদের পাড়ার মালতীমাসী ছিল এক খোট্টা জমিদারের কাছে বাঁধা। মালতীর সঙ্গে একটা মজলিশের জৌলুষ বাড়াতে আরো কয়েকটি কম বয়সী মেয়েদের সঙ্গে যূথিকাও গিয়েছিল। নগদ মাথাপিছু পাঁচ টাকা, ভাল ভাল খাবার। আবার কপাল খুললে বরাত ফিরে যেতে বা কতক্ষণ। যূথিকার যেতে ইচ্ছে ছিল না। ওর মেয়ে মোটে দু' বছরের। ভীষণ দুষ্টু, দরজা খোলা পেলেই রাস্তায় চলে যায়। যদি---। মা যূথিকার আপত্তি শেষ করতে দেয় নি।

---যদি মেয়ে গাড়ী চাপা পড়ে?

পড়ে তো মরবে, আপদ যাবে। মেয়ের মা হয়েছ। বলি তোর মত কোন ছুঁড়ি এই বয়সে মেয়ে বিইয়ে কপালটি বাঁধিয়ে রেখেছে শুনি? তোদের মা-মেয়েকে বসে বসে খাওয়াবে কে? যাবি তো যা, না হ'লে কাল হতে মেয়ের বার্লিক, দুধ জুটবে না, বলে দিলুম পষ্টের কথা।

মায়ের খর রসনার বিষে জর্জরিত হয়ে যূথী হাওয়া শাড়ী আর ঘটি-হাতা ব্লাউজ পরে মালতী দিদির সঙ্গে বাগানে চলে গিয়েছিল।

মজলিশে এর আগে আসে নি যূথিকা। ব্যবসাতেই নামে নি সে। ভেবেছিল কখনো, কোনোদিন শত অভাবে পড়লেও এই পথে আসবে না। অনেক চেষ্টা করেও প্রতিজ্ঞা রাখতে পারল না যূথিকা। মেয়ে হবার আগে হতেই অসুখে পড়েছিল, মেয়ে হতে তো যমে-মানুষে টানাটানি। মাত্র মাস-চারেক হ'ল কাজ-কর্ম করবার মত হয়েছে। অবশ্য দু' পায়ে দাঁড়াবার বল পেতেই মা রোজগার করবার জন্য পিছনে লেগেছিল। দোতলার বিনো মাসির দুই মেয়ে তরি-ঝরিকে বর্ণ পরিচয় আর গান শিখিয়ে দশটা করে টাকা মাসে মাকে দিচ্ছিল ক'মাস ধ'রে। কিন্তু দশ টাকার কি নস্যির কৌটা হবে মা-মেয়ের?

তাছাড়া অসুখে কুসুমের হয়েছে একরাশ ধার। সে সব এখন শুধবে কে! রাগে অস্থির হচ্ছিল কুসুম। রাগ নিজের পেটের মেয়ের অসুখে চিকিৎসা করে?

শুনলে যে গালে হাত ঠেকাবে সবাই। তা আর ঠেকাবে না। তাদের তো আর খুদের কড়কড়ে টাকা গুণতে হচ্ছে না মাস মাস। যূথির দুঃখ শুনে গলে জল হচ্ছে, জানে কি, খবর রাখে কেউ, কত দুঃখে জ্বলে-পুড়ে আজ এমন আঙ্গার হয়ে গিয়েছে কুসুমের মন।

কুসুমের দুঃখের কথা? গলিত পতিত কুৎসিত একটা জীব, নর্দমার দুর্গন্ধ সব শরীরে, খড়ির গুঁড়ো মুখে লেপে এক টাকা আট আনার বদলে যে ভাড়া খাটায় শরীর, তার আবার জীবন, তার আবার দুঃখের কথা। সে কথাও আবার নাকি শুনতে হবে। ওকি কোনো নিপুণা নাটনী স্বচ্ছ বসনের আড়ালে ওর উদ্ধত যৌবন কি পুরুষের রক্ত উদ্দাম করে তুলবে, যে ওর জীবনকথার সঙ্গে ছবি ছাপা হবে পত্র-পত্রিকার প্রথম পাতায়? ওকি ছায়া-ছবির নায়িকা হয়ে রসালো ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়েছে নায়কের বুকে। ওর শরীরের সুডৌল নরম মাংস, চোখের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ কি বক্স অফিসের ভীড় বাড়িয়েছে? পুরস্কার পেয়েছে তাই রাষ্ট্রপতির হাত থেকে? ওতো কুসুম, কুসুমি, কুসি। একটা খারাপ মেয়েমানুষ।

কুসুমের রাতের খরিদ্দার চামড়ার কারখানার কাল্লু, ন্যাপলা, কানাই, গণি মিঞারা। সমস্ত রাত্রি খাটবার পর সকালবেলা ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে ও পতিতপাবনী গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে কিনে আনে পচা চিংড়ি, শুকনো কুমড়ো মোটা চাল। রান্না খাওয়া ক'রে একটু গড়িয়ে নেয় খালি মেঝের উপর। তারপর শুরু হয় রাতের জন্য প্রস্তুতি। পচা একটা নালি ঘা কুসুম---তার আবার দুঃখের কথা কি। ওতো দূষিত, রোগ-দুষ্ট হয়েই জন্মেছে। ওর ছোঁয়া লেগে দূষিত হচ্ছে গরীব বোকা মানুষগুলো।

কুসুমের গর্তে ঢোকানো কালি-পড়া চোখ, হাড় ওঠা গাল, শীর্ণ শরীর---ওরা যদি কথা বলতে পারত? যদি আকাশ ফাটানো স্বরে কেঁদে উঠতে পারত, যদি সেই কথা, সেই কান্না অন্ধ রাতের বুক হতে তুলে নিয়ে কেউ পাতা ভরে লিখে রাখত? কিন্তু কেউ কি পড়ত বস্তির আট আনা ঘরের ভাড়াটে কুসুমিদের জীবনকথা? ওদের কান্না শুনতে কি ভাল লাগতে পারে কারোর?

যাদের কান্নায় মতি ঝরে---কান্না তো তাদের জন্য। ফোঁটা ফোঁটা টলটলে চোখের জল বেরিয়ে এসেছে গ্লিসারিনের ছোঁয়া লেগে, ঝরছে ডালিমফুলী গাল বেয়ে। হায় হায় করে উঠছে শত শত দরাজ বুক, রাশি রাশি টাকা বেরিয়ে এসেছে মোটা মোটা পকেট হতে। আকাশছোঁয়া দামে নিলাম হয় এ সব বসন্তসেনাদের চোখের জল।

কুসুমিরা কাঁদবে কেন? দিনভর খাটা-খাটুনির পরে একটু ফূর্তি করতে এসেছে কাল্লু, গণি শেখ, ন্যাপলা গড়াই। মুখ হাঁড়ি করবে তো---দে দো লাথ উসকো মু'মে। সো ভি আচ্ছা মজাই হোগা।

তবু কুসুম কেঁদেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে সবার অগোচরে অনেক কেঁদেছে সে মরে যাওয়া পচে যাওয়া ভূতির জন্য। ভূতি আবার কে?

ভূতি বাইশ বছরের একটা মেয়ে ছিল। তার স্বামী ছিল, পর পর দ'বার ফল খসে যাবার পর কোলে এসেছিল ফুলের মত মেয়ে। ভূতির স্বামী ড্রাইভার। কার গাড়ী চালায়, কত টাকা পায়, কিচ্ছু জানত না সে। মায়ের সঙ্গে থাকে ভূতি, খেয়াল-খুশী হ'লে স্বামী আসত ঘরে। মদে চুর হয়ে আসে, থলি করে আনে মাংস। পেট ভরে মাংস-ভাত খেয়ে সিগারেট টানে, ভূতিকে নিয়ে শোয়। মেজাজ হ'লে আদর করে, কখনো বা মেরে আধমরা করে দেয়। মাঝে মাঝে টাকা, শাড়ী, মেয়ের জামা, এমন কি শীতের দিনে কুলকাফি, কমলা লেবু পর্যন্ত নিয়ে আসে অম্বিকাচরণ। কিন্তু সে বড়ই মাঝে মাঝে।

ভূতির ঘরে মা আছে, কোলে একটা মেয়ে। না খেয়ে থাকা যায় দু'চার দিন, বার মাস তো চলে না। পাঁচ বাড়ীতে তাই তো কাজ করে ভূতি। দুঃখ-কষ্ট আছে, তবু ভূতি গেরস্ত ঘরের বউ। অমানুষ স্বামী, গতরে খাটছে মেয়েটা। আহা। বড় ভাল মেয়ে ভূতি। বাসি-পান্তা, পুরনো শাড়ী, ছোট হয়ে যাওয়া বাচ্চার জামা সবাই দেয় ভূতিকে। সময় হলে কাছে বসিয়ে দু'টো ভাল-মন্দ কথাও বলে গিন্নীরা। খুব গতর ভূতির, কোনো কাজে না নেই। দু'টো পয়সা পেলেই বাড়তি কাজগুলো ক'রে দেবে হাসিমুখে।

খুব গতর ভূতির। বাইশ বছরের শরীরটা যেন নধর মর্তমান কলার ঝাড়। রাতের আঁধারে তত ঠাওর হয় নি অম্বিকার, আর বিয়ে করা বৌয়ের রূপ বসে বসে দেখে কোন্ মরদের বাচ্ছা। কিন্তু চাকরি গেলে ঘর নিতে হল তাকে। হাতে কিছু টাকা ছিল, চলল কিছুদিন। কিন্তু সে আর কতদিন।

মাল খাবার জন্য মনিব ব্যাটা খেদিয়ে দিয়েছে। রুজি-রোজগার বন্ধ। টাকা ছাড়া কি চলে পুরুষ মানুষের। একি মেয়েলোক যে এক-মুঠো ভাত দু'টো ছেড়াত্যানা হলেই চলবে। কত রকম খরচা পুরুষের। তারপর বাহারি জামা-কাপড়ও ছিঁড়ে এসেছে। জুতোর ফুটো দিয়ে বুড়ো আঙুল বেরিয়ে পড়ে। দাওয়ায় বসে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে চোখের চাউনি
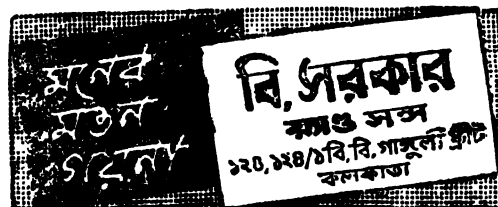
[illegible] করে অম্বিকা দেখল ভূতির মজবুত শরীর। পচা পান্তা খায়, ভূতের মত খাটে, ঘুমোয় রাত ভোর ভোঁস ভোঁস করে। ভূতির গায়ে দুর্গন্ধ, চিমসে গন্ধ পরণের শাড়ীতে। জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাজা ধরেছে হাতে পায়ে কিন্তু শক্ত মসৃণ শরীর। পাঁচ বাড়ীতে কত পায় ভূতি? ষাট টাকা? হাত্তোর মারি জুতো তোর ষাট টাকার। একটু চালাকি খেলিয়ে চলতে পারলে অমন ষাট টাকা মাইনের চাকর রাখবে ভূতি—অর্থাৎ কিনা ভূতির স্বামী অম্বিকা।

স্বামী কথাটার অর্থ হ'ল অধিকারী, প্রভু, মালিক। ভূতির নারী-দেহটার মালিক হ'ল অম্বিকাচরণ। টাকা থাকলে ট্যাক্সি কিনে তাই চালাতো অম্বিকা। টাকার অভাব থাকত না তার। মূলধনের অভাবেই তো ব্যবসা করতে পারছে না অম্বিকা।

টাকা নেই, কিন্তু ভূতির মত বউ তো আছে। সেই বৌয়ের মজবুত শরীর ভাড়া খাটালে অন্তত কুড়ি বছর পায়ের উপর পা তুলে আরাম করতে পারবে সে। আর টাকা জমিয়ে একখানা ট্যাক্সি কিনতে পারলে তো একেবারে বাদশা। ভূতিকে তখন নিজের ধান্ধায় চড়তে দিয়ে, বেশ একটি ডাগর দেখে মেয়ে বিয়ে করে ভদ্রলোক হয়ে বসতে কতক্ষণ। সুতরাং শাশুড়ীর সঙ্গে অনেক শলা-পরামর্শ করল অম্বিকা। ভবিষ্যতে তাকে একপো দুধ রোজ করে দেবার প্রতিজ্ঞা করে, দোক্তা পাতা হাতে তুলে দিল খান দুই। ফতোয়া জারি করল ভূতির উপর :

—এই, তুই কাল হ'তে আর কাজে যাস্‌নে।

—কাজে যাবুনি? ক্যান্ গো? কাজে না গেলে খাব কি? আশ্চর্য হয়ে ভূতি স্বামীকে জিজ্ঞেস করল।

—খাবি গু-মুত, আমার মাথা। দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিল অম্বিকা।

—খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে।

—ভাবতে হবে না, চাগ্‌রি হয়েছে বুঝি?

—কের মুখ-চোপা? খাড়ব এ্যারক্কা গাঁট্টা, তখন মজা বুঝবি।

বুঝল কুসুম। কতদিন ধরে কত পুঁথি-পুস্তকে লেখা হয়েছে ক্রীতদাসীদের উপর প্রভুর অত্যাচারের কাহিনী। গল্প রচিত হয়েছে চা-বাগানের বীভৎস অনাচার নিয়ে। ভূতিদের উপর স্বামীর অত্যাচারের কথা কেউ লেখেনি কোনোদিন। তাই কেউ জানল না কেমন ক'রে নিরীহ বোকা মেয়ে ভূতি কুসুমবালা হয়ে গেল। মুখে খড়ি মেখে, গায়ে পরে গিল্‌টির গয়না, তাকে দাঁড়াতে হ'ল অন্ধকার গলির কোণে।

দিনে দিনে ভূতি কুসুম হ'ল। ড্যাবডেবে চোখ, জড়ানো জিভ ভূতি কুসুম হয়ে, চোখ আর জিভ দিয়ে আগুন ঝরাতে শিখল। অম্বিকার ট্যাক্‌সি হল না। ক্রমে ক্রমে তাকে ঘরের কোণে ঠেসে দিতে লাগল কুসুম। তারপর মা মরে গেলে উঠে গেল মালতির একখানা একতলার ঘরে মাসে তিন টাকা ভাড়া দিয়ে। একটু তেজ দেখিয়ে হম্বি-তম্বি করতে গিয়েছিল অম্বিকা চকচকে চোখে হাসল গণি শেখ।

—রোখ মৎ করনা ইআর, জান চলা জায়গা। একটা ধাক্কা দিল ন্যাপ্‌লা।

—যা যা, ভাগ, বিস্তর ফ্যাচাং করিসনে। অগত্যা অম্বিকাকে ফের ঢুকতে হ'ল গিয়ে বস্তির ঘরে। ঘরের ভাড়া কুসুম মাসের চার তারিখ না পেরুতেই দিয়ে দেয়। দু বেলা দু থালা ভাতও দিয়ে যায় স্বামীকে। তা ধর্মজ্ঞান আছে মেয়েটার। সোয়ামীকে পুষছে নোয়া-সিঁদুরও ঘুচিয়ে দেয় নি। ও তো আর জাত-বেশ্যা নয়, গেরস্ত ঘরের মেয়ে, বৌ। পেটের জ্বালায় স্বামীতে মাতে মিলেই তো ওকে এ পথে নামিয়েছে। এইজন্যই একটু বেশী দর পায় কুসুম। একটু রকমফের না হলে আসবে কেন মানুষ। তাছাড়া গেরস্ত মেয়ের কাছে এসে একটু স্বাদ পায় বেশী। খারাপ মেয়ের কাছে খারাপ হতে এসে মজা নেই বেশী। গরীব ঘরের বৌ, ভুলিয়ে আনা ভদ্রঘরের বোকা মেয়ে, বড় ঘরের বিপথগামিনী—এমনি সব ইতিহাস থাকলে তবেই দাম ওঠে। এ পাড়ার সব মেয়েই তাই একটা সরলা অবলার ভাণ নিয়ে থাকে।

মেয়ে ছিল কুসুমের। ভূতি ভেবে রেখেছিল আট না পুরতেই মেয়ের বিয়ে দেবে টুকটুকে জামাই এনে। রাঙা ডুরে শাড়ীটি পরে সিঁদুর-মাখা চুলে ঘুরে বেড়াবে মেয়ে। বাবুদের হাতে-পায়ে ধরে জামাইকে ঢুকিয়ে দেবে ভূতি কোনো কারখানায়, কিম্বা অফিসের পিয়ন করে। ছ'টায় বাড়ী ফিরে জামাই চিড়ে-মুড়ির জলখাবার খেতে খেতে কথা কইবে মেয়ের সঙ্গে। ভূতিকে ডাকবে মা বলে। মেয়ে হাঁটতে শিখবার পর থেকেই এই সুখে ভূতির মন ভরেছিল। পাশের ঘরের কান্নু দিদির বাপ-মা মরা দশ বছরের বোনপোর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই রেখেছিল একরকম।

কুসুম হয়ে ভূতি দেখল পৃথিবীর আর একটা রূপ। আশা-আকাঙ্ক্ষা বদলে গেল তার। মেয়ে মেনী বাপের ফসা রং পেয়েছে, চোখ-মুখ-গড়ন ভূতির। যত্নে-আদরে রাখলে ও মেয়ে একদিন ভূতিকে বাড়ীউলী বানাবে। গরদের থান, সোনা দিয়ে বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে মাকে তীর্থধর্ম করাবে মেনী। পাপ হবে? ভূতির মা জামাই-এর সঙ্গে পো ধরে ভূতিকে ঠেলে দেয়নি এই পথে? আর পাপ ভাবলেই পাপ। এতই যদি পাপী, তবে ওদের দুয়োরের মাটি লাগে কেন শুভ কাজে। পাপ হ'ল তো রয়েই গেল। এ-জন্মে তো খেয়েপরে বাঁচবে, মরলে তবে পরকালের চিন্তা। না খেতে পেয়ে বেঁচেই যারা মরে রইল তাদের আবার পরকাল।

মালতীর মা পরামর্শ দিল :

—মেয়ের নামটা বদলে, একেলে করে দে কুসি। আর হারমনি বাজিয়ে গান শেখাবার লোক দ্যাখ। যদি আখের ভেবে চলতে চাস, পড়া-লেখা দেখাবারও একটা ম্যাস্টের রাখ। আমার মেয়ের নাম তো ভেবলি ছিল, তা বদলে, করে

শ্রীমতী সুশীলা গোয়েঙ্কার নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়ন রেলওয়ের দীপু দাস

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

বৈশাখ / '৭৫

শ্যামবাজার স্ট্রীট ও ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে স্বর্গত ভূপেন্দ্র বসুর মর্মর-মূর্তির আবরণ উন্মোচন করছেন পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু

কলকাতার বন্দর । শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে বন্দরে অচল অবস্থায় জাহাজ ও গাধা বোট

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির এ বি টি-এ হলে মহিলাদের সভার একাংশ

বৈশাখের খরতাপে পাখা কেনার ভিড়

অন্তিমশয়নে শায়িত নিগ্রো-নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং
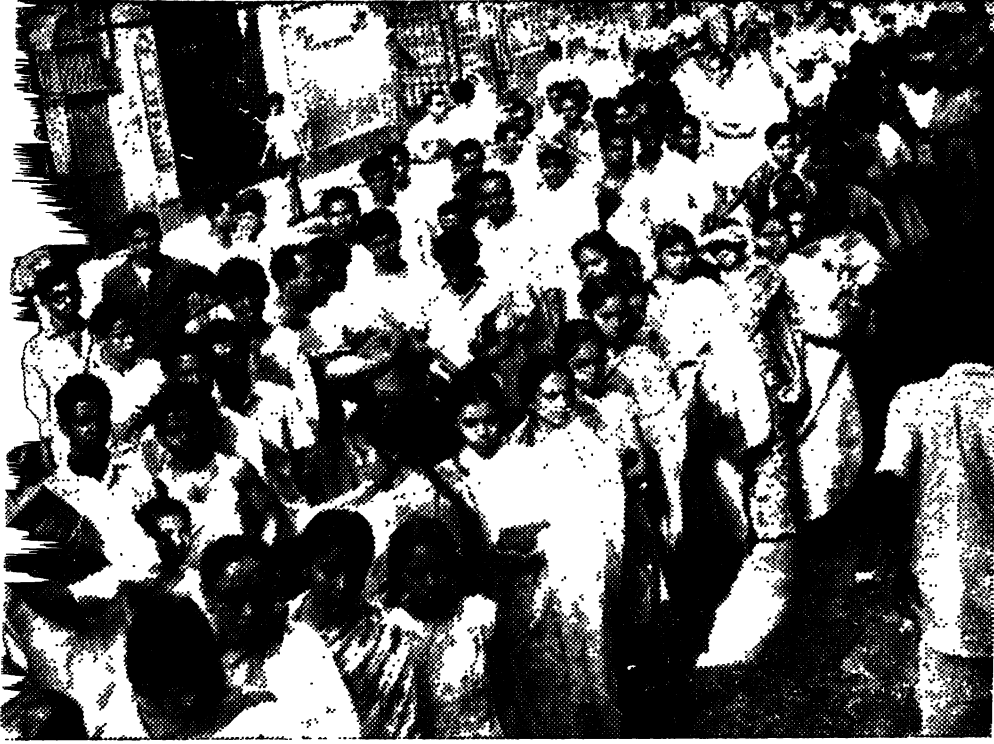
নববর্ষ উপলক্ষে ঠনঠনে কালী মন্দিরের সামনে পূজা দেবার ভিড়

হুগলী জেলার মহেশ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক বগলাপ্রসাদ
ভট্টাচার্যের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

দিনু মালতীমালা। ইস্কুলেও পড়েছে ক' বছর। তাইতেই তো এক বাবুর নজরে ধরল। বাঙালী-মেম রেখে কত লেখাপড়া শেখালে তিনি মালতীকে। এ্যাকন তো শুনছিস তোরা কেমন কতায় কতায় গ্যাড্ ম্যাড্ ক'রে ইংরিজী বলে মালতী। আর ঘর-দোর সোনা-দানাও দেখছিস।

মালতীর মায়ের কথামত মেনীর নাম বদলে যূথিকা করে দিল কুসুম। গান-বাজনা শেখাবার ভার নিল পাশের ঘরের কেয়াকদম্ব। বয়েস কালে ডাকসাইটে কেত্তুনী ছিল ও। এখন আর বুকে দম পায় না, এই কাজ ধরেছে। মাথাপিছু দু' টাকা নিয়ে গান শেখায় মেয়েদের।

এ-পর্যন্ত ভালই ছিল, কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হ'ল। মেয়েকে অতি গুণবতী করতে গিয়ে বিপাকে পড়ল কুসুম। কুন্নিদিদির সেই বোনপো জগৎ, একটা পাশ দিয়ে দিনমানে কোথায় একটা চাকরি করে পড়ছে রাতের কলেজে। দুর্বুদ্ধি চাপল কুসুমের মাথায়। জগৎ তো দিব্যি লেখা শেখাতে পারবে মেনীকে। লেখা অবশ্য মেনী শিখেছে কিছু কিছু, কিন্তু মেয়েকে একেবারে গড়গড় করে তুলতে চাইল কুসুম।

গঙ্গা ফেরৎ একদিন কুসুম চলে গেল আগের বাড়ীতে। তা মাঝে মাঝে তো তাকে যেতেই হয়। অম্বিকার জ্বর-বিকার হ'ল সেই ভাদ্দর মাসে, তখন তো সাত দিন কাটিয়েছে কুসুম ও বাড়ীতে। সবাই ধন্য ধন্য করেছে। হ্যাঁ, ভাল মানুষের মেয়েত বটে। নিজের অবস্থা ফিরিয়েছে। ঘরে তক্তোপোষ, শীতের লেপ, কাঁসার বাসন। ঝি পযন্ত রেখেছে। স্বামীর জন্যও করছে কত। মাসকাবারি ঘরের ভাড়া, দুবেলা ভাতের কাঁসি, ভালটা-মন্দটা নিত্যি পাঠাচ্ছে এত বছর ধরে। অবস্থা ভাল বলে দেমাক-গুমোর নেই। এ-বাড়ীর কেউ গেলেই দেবে চা-বিস্কুট, সময় অসময় ধারও দেয় টাকাটা সিকেটা।

কুসুমকে খাতির করে বসাল সবাই। হাতে ছিল পান দোক্তা। দুবার পিক ফেলে ঢোক গিলল কুসুম। চাইল কুন্নির দিকে।

—তোর বোনপো মেনীকে একটু পড়া শেখাবে তাই বলতে এলাম দিদি। জগৎকে পাঠিয়ে দিস ভাই।

—জগৎ পড়া শেখাবে? মেয়ে চাকরি করবে নাকি তোর? সবাই কল কল করে উঠল।

—কি করবে, কি জানি। বরাতে যা আছে তাই করবে। তবে মেয়েটাকে একটু পড়া শেখাবার ইচ্ছে আছে আমার। নিজে তো মুখ্যু, মেয়েটার পেটে কালির আঁচড় পড়ুক। তা মিনি পয়সায় খাটাব না জগৎকে। দুটো টাকা দেব মাস মাস। বিড়ি-দেশলাইয়ের খরচা উঠে যাবে জগতের।

—মা আমার কপাল। জগৎ বুঝি বিড়ি-সিগারেট খায়? ও যে রামকেষ্ট ঠাকুরের ভক্ত লো। নেশার জিনিষ ছোঁয়ও না। তা বলব জগৎকে। কিন্তু দেখিস ভূতি, ছেলেটাকে বিগড়ে দিসনে। আমার শত কোটি মাথার দিব্যি, মা মনসা, শেতলা, কালীর কিরে রইল।

কুন্নি হা[illegible] ধরে বলল কুসুমের।

—আতান্তরের কথা বলিসনে কুন্নি দিদি। রাগ ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিল কুসুম।

—জগৎ পড়াবে, গুরু হবে। বিগড়োবার খবর করছিস কেন?

—না, না, সমস্বরে বলেছিল শ্রোত্রীরা।

—সে ত্যাখন যদি হ'ত, তবে হ'ত। এখন মেনী হ'ল গিয়ে কুসুম বাইয়ের মেয়ে। বলে কত রাজা-উজীর গড়াগড়ি যাবে ওর পায়ে। সোনা খাবে, দুধে নাইবে। জগৎকে বিগড়ে দেবার কথাই ওঠে না। যাবে, যাবে জগৎ। আমরাই পাঠিয়ে দেব।

বাড়ীউলী মাসি গলা তুলল সবার উপরে :

—তুই তো পরীক্ষে দেবার ট্যাকা দিলি জগৎকে। নেমকহারাম হবে না জগৎ, বড় ভাল ছেলে। তোর মেনীকে পড়া লেখাতে একেবারে পোক্ত করে দেবে এখন।

তা পোক্তই করে দিল বটে। পোড়া-কপাল কুসুমের, ধরতে পারেনি ছাগল-পোকা চিতে বাঘ হয়ে উঠেছে। ষোল বছরে পা দিয়েছে যূথি, দালালরা হাঁটাহাঁটি করছে ওর জন্য। আরো ভাল খরিদ্দারের আশায় অপেক্ষা করছিল কুসুম, তখন একদিন সর্বনাশ হ'ল একেবারে। সকালে গঙ্গা নেয়ে বাড়ী ফিরে কুসুম দেখল মেয়ে ঘরে নেই। ঘরে নেই যূথি। নিপাট নিরীহ মেয়ে, সাত চড়ে মুখে রা নেই, সে যাবে কোথায়। কক্ষণো ঘর ছেড়ে নড়ে না যূথিকা। কাজকর্ম করে, মুখটি বুজে নিজের বই-পত্র নাড়েচাড়ে। সন্ধ্যা-বাতি জ্বেলেই দোর দেয় শোবার ঘরে। সে যাবে কোথায়। ঐ, ঐ জগতের কাজ। নিশ্চয়ই ভুলিয়ে-ভালিয়ে বোকা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তুলে দিয়েছে কারোর হাতে।

—ওমা, আমার কি সর্বনাশ হল গো। আছাড় খেয়ে পড়ল কুসুম। বাড়ীর অন্য মেয়েরা ভিড় জমিয়ে কলরব করতে লাগল। খোঁজ-খবর করে জানা গেল চাকরি ছেড়ে জগৎ চলে গিয়েছে। কিসের জোরে ছাড়ল জগৎ পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি? অমনি তো বোঝা গেল বৃত্তান্ত। যূথিকে বিক্রী ক'রে মোটা টাকা হাতিয়েছে, চলে গিয়েছে কোন্ মুলুকে। অনেক খোঁজ হল। যারা যূথির আশায় ছিল তারা মোটা টাকা দিয়ে চাইল থানা-পুলিশ করতে। যূথিকার খোঁজ মিলবে চোখের নিমেষে। নাবালিকা হরণের দায়ে জেলে যাবে জগৎ। কিন্তু থানা-পুলিশে রাজী নয় কুসুম। বড় জুলুমবাজী হয় ওখানে। তারপর চোখ কপালে তুলে হঠাৎ একদিন গেল সোয়ামীটা মরে। রাগী হোক, দাগী হোক্ ছিল তো একটা সোয়ামী। ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু করে মনটা ভার ক'রে রইল কিছুদিন কুসুম। তাল-মাটাল করে কাটল একটা বছর, খোঁজ পাওয়া গেল যূথির। বিক্রী করেনি, যূথিকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে জগৎ। কালীঘাটে মায়ের সামনে মালা বদল করে, সিঁথিতে পরিয়ে মায়ের প্রসাদী সিঁদুর,

যুথিকাকে বিয়ে করেছে জগৎ। বিকেল-বেলা মুখে সাবান রগড়ে সাজতে হবে না যুথিকে। রাত ভরে ঘুমোবে নিশ্চিন্ত হয়ে। খবর শুনে চোখের জল আর সামলাতে পারে না কুসুম। বাবুদের বুদ্ধি, মালতীর মায়ের তাগাদা কানেও তুলল না সে। দুদিন ব্যবসা কামাই দিল জ্বরের ছুতো করে। বড় ভাল ছেলে জগৎ। ও তো অভিব। [অভাব]র নয়, লেখাপড়া জানা ছেলে। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ইস্কুলের মাস্টার মশাই হয়েছে। বৌকে কোনোদিনও টাকার তাগাদায় পাপের পথে ঠেলবে না ও। আহা, পাপ যেন জানতে না হয় যুথিকে। মেটে হাঁড়িতে ভাত রেঁধে মোটা দুখানা শাড়ীতে বছর কাটিয়ে, বৌ হয়ে থাকুক মেয়ে।

সেই পাড়াগাঁ, যেখানে বৌ হয়ে আছে যুথিকা, তার স্বপ্ন দেখল কুসুম। বাং-চিতের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ীর উঠোন, নিকানো-পোছানো তুলসীতলা, ঘরে লক্ষ্মীর আসন পেতেছে যুথি। ছাত্ররা ডাকে ওকে মা বলে, গাঁয়ের মেয়েরা নিত্যি সিঁদুর ব্রত করে সিঁদুর আলতা পাঠায় যুথিকে। হাতে শাঁখা-নোয়া, সিঁদুর, লালপাড় শাড়ী পরা কুসুমের যুথিকা। ভগবান, হে ভগবান, কুসুমের পাপে যেন মেয়ে কষ্ট না পায়। তিনবেলা গঙ্গা নাইতে লাগল কুসুম। মা কালীর দরজায় কপাল কুটে কুটে ঢিবি হ'ল কপাল। ভাবল, ছেড়ে দেবে এই পাপ কাজ। কালীঘাটে আঁচল পেতে বসলেও কোনোমতে চলে যাবে একটা পেট।

কুসুমের প্রার্থনা কিন্তু শুনতে পেলেন না ভগবান। কত প্রার্থনা দিন-রাত করছে মহা মহা পুণ্যবন্তের দল দুধ-ক্ষীর, মোষ-পাঁঠা বলি দিয়ে, তাদের কথাই বড় রাখতে পারছেন, আর এ তো একটা অপবিত্র মেয়ের চোখের জলে ভেজা স্যাঁৎসেঁতে প্রার্থনা। ওর প্রার্থনা কানেই পৌঁছল না ভগবানের। দেড় বছরের মাথায় ম্লানমুখী যুথি ফিরে এল মায়ের ঘরে। টাইফয়েড জ্বরে জগৎ মরেছে একমাস আগে।

মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগল কুসুম। মায়ের পাপেই যে যুথির শাস্তি। কিন্তু কাঁদবার সময়ও বেশী পেল না কুসুম। যুথিকাও পড়ল টাইফয়েড জ্বরে। সে কি ভোগান্তি তখন। ওষুধ-ডাক্তার-পথ্য। একরাশ ধার হ'ল মালতীর কাছে। তারি মধ্যে শোনা গেল এক মাথা-ফাটানো খবর---মেয়ের পেটে বাচ্চা আছে।

আবার সেই দুঃখের দিন ফিরে এল কুসুমের। চৌত্রিশ বয়সের মেয়েমানুষের রোজগার মন্দা, তার উপর কুপুষ্যি জুটেছে মেয়ে, তার মেয়ে। সমস্ত বুক ভ'রে যে বৃষ্টি নেমেছিল তা একেবারে থেমে গেল। শুকনো খটখটে, নিষ্ঠুর হয়ে গেল কুসুম। ঘর দেখল মেয়ের জন্য। মাথা নাড়ল যুথি। কি কথা, না ব্যবসা করবে না। ওরে আমার ধর্মিষ্টিরে। মায়ের বুকে বসে খাবে মেয়ে নিয়ে, আর ধর্ম করবে? সুতরাং যুথিকে যেতে হ'ল মালতীমালার জলসাতে।

এককোণে বসে থাকা ম্লানমুখী মেয়েটাকে দেখছিলেন সুরেশ্বর। আশ্চর্য হয়েছিলেন দেখে। এই রকম মজলিশে একেবারে বেমানান। ও যেন একটি নিভৃত ঘরের কোণের মেয়ে। দুরন্ত দিবালোকে নির্লজ্জতার নগ্নমূর্তি দেখে লজ্জায় চোখ বুজতে চাইছে। হঠাৎ কেমন যেন ভাল লেগে গিয়েছিল, যুথিকার খবর নিয়েছিলেন, তার পরের দিনই সুরেশ্বরের লোক এসেছিল কুসুমের কাছে।

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের খবরে আনন্দে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল কুসুম। পোড়াকপালী মেয়ে কিন্তু বেঁকে বসল। কেঁদে-কেটে পায়ে গড়িয়ে পড়ল মায়ের।

---একটা ঝিয়ের কাজ দেখে দাও আমাকে। খেটে খাব, মেয়ে মানুষ করব। কু-পথে যেতে ব'লো না আমাকে।

---কু-পথ? ঝিয়ের কাজ করবি তুই?

---করব মা। উনি বলতেন খেটে খেতে লজ্জা নেই। কাতর হ'ল যুথি। ---এ কাজ পারব না আমি।

---পারবি না? ওলো, যোয়ান মেয়ে ঝি রেখে তার ইজ্জত আগে খায় বাবুরা। আর ঝিয়ের ইজ্জতের দাম পাঁচ টাকা। বুঝলি?

অনেক কষ্টে বুঝতে হয়েছিল যুথিকাকে। মেয়ের জন্যই শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হ'ল। এমন নিষ্ঠুর কুসুম, না খেতে দিয়ে দু'বছরের মেয়েটাকে মেরে ফেলবার দাখিল করল।

প্রায় ছ'মাস পরে যুথিকাকে আয়ত্ত করতে পারলেন সুরেশ্বর। আতরিবাইকে ছেড়ে দিলেন। ভদ্রপাড়ায় বাড়ী কিনে, তাতে তুললেন এনে যুথিকে। চাকর, ঝি, দরওয়ান বহাল হ'ল। কুসুমের হাতে দু হাজার টাকা দিয়ে সুরেশ্বর কঠিন হয়ে জানালেন:
---খবরদার, মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না।

---না, রাজাবাবু। সম্পর্ক রেখে কাজ কি আমার। কলকাতাতেই থাকব না আমি। কাশী চলে যাব।

---কাশী? একটু ভাবলেন সুরেশ্বর। আরো এক হাজার টাকা দিয়ে কুসুমকে কাশীতে থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। যুথির মেয়েকেও রেখে দিলেন একটা মিশনারী আশ্রমে। কথা রইল, মাসে একবার মেয়েকে দেখতে যাবে যুথিকা।

সুরেশ্বরের অযাচিত দয়ায় একেবারে আপ্লুত হয়ে গেল যুথিকা। খারাপ মেয়ের মত নয়, প্রায় স্ত্রীর সম্মান দিচ্ছেন রাজাবাবু। এমন কি মা গঙ্গাস্নান করতে কলকাতা এলে তাঁকে প্রণাম পর্যন্ত করতে যায় যুথিকা। হরপ্রিয়া অবশ্য ছোঁন না তাকে, কিন্তু আলাদা বাসনে খেতে দেন মিষ্টি, নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদও করেন।

কিন্তু এক বছরের মধ্যেই সুরেশ্বরের ভীষণ মূর্তি দেখল যুথিকা। বুঝল কোনো সম্মান নেই তার, এতটুকু মোহও নেই সুরেশ্বরের মনে যুথিকার সম্বন্ধে। প্রথম দিনে সুরেশ্বরের কথায় অসম্মতি প্রকাশ করেছিল যুথিকা, সুরেশ্বর চাবুক মেরে নীল দাগ ফেলেছিলেন তার পিঠে। তারপর নিজের ভাগ্য মেনে নিয়েছে যুথিকা। সুরেশ্বরের আদেশে নির্বিচারে তুষ্টি বিধান করেছে তাঁর নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের।

(ক্রমশ)

ভাঙ্গা ঢেউ

ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোন বেজে উঠল। অলকা রিসিভারটা তুলে ধরল—

হ্যালো।

ঐদিক থেকে শোনা গেল—শুনেছিস অমল মারা গেছে।

অমলদা মারা গেছেন! কবে? কি হয়েছিল?

বেলেঘাটা হাসপাতালে। অনাহারে মৃত্যু। গত মাসের ২ তারিখে মারা গেছে। আজ পুরো একমাস। খবরটা বাবাকে জানাস্—তাই ফোন করলাম—বলে অলকার দাদা রিসিভার রেখে দিলেন।

অলকাও আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো অন্যমনস্কভাবে। মনে পড়ল প্রবাদটা—'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শান।'

জমিদার, ধনী, ব্যবসায়ী মহিম-বাবুর ছেলেও অনাহারে মারা যায়। দুনিয়ায় তবে অবিশ্বাস্য, অসম্ভাব্য কিছুই নেই।

এই অমলদার চরিত্রটা বিচিত্র। আত্মচেষ্টায়, আত্মবিশ্বাসে স্বাবলম্বী হয়েছিলেন অমলদা। বিমাতার অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পিতার অবহেলাকে পদদলিত করে অভিমানী পুত্র অজানার উজানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বয়স তখন সবে ১৫।১৬। সুতরাং এমন কিছু আরম্ভ করা তখন সম্ভব হয়নি—যা ভাঙ্গিয়ে পরবর্তী জীবনের তরীর হাল ধরা যায়, তবু নির্ভীক অমলদা বেপরোয়াভাবেই নিজের ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছিলেন। একাগ্রতা, অধ্যবসায় যারা জীবন-যুদ্ধে কখনও পরাজিত হন নি। উদ্যোগী পুরুষ লক্ষ্মীর কৃপালাভ করে—এই প্রবাদ বাক্য অমলদার সম্বন্ধে খুবই প্রযোজ্য।

অমলদা কয়েকটা মলম আবিষ্কার করলেন। কিন্তু বাজারে তাঁর এই মলম চালু করতে অর্থের প্রয়োজন। অলকার দাদার বন্ধু ছিলেন অমলদা। তাছাড়া অধ্যবসায়, একানিষ্ঠার জন্য অলকার বাবা তাঁকে স্নেহ করতেন। তাই অমলদা তাঁর রিসার্চের বাস্তব রূপ দেবার জন্য অলকার পিতার সহায়তা কামনা করলেন। তিনিও হৃষ্টচিত্তে অর্থ-সাহায্য করেন তাঁকে। এই মলমে অমলদার কিছু কিছু আয় হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বই পড়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও তিনি সুরু করেন। বন্ধু

শিপ্রা দত্ত

ঝড়ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তবু অমলদার কাজে অধ্যবসায় বা একাগ্রতার অভাব কেউ দেখেনি। ১৫।১৬ বছর জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে অমলদা নিজেকে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করলেন। মেসের জীবন তখনও তাঁর চলেছে। বন্ধুরা বলে, অমল, দেশে ফিরে যা, তোর প্রাপ্য হতে কেন বঞ্চিত হবি?

স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, কর্তব্য নেই—সেখানে অধিকারের প্রশ্ন অবান্তর। বন্ধুরা অমলদাকে সংসারী হতে পরামর্শ দেয়।

অমলদা স্মিতহাস্যে বলে, আমার আবার জীবন। অহেতুক এই হত-ভাগ্যের সঙ্গে আর একটা ভাগ্যকে জড়িয়ে কেন দুঃখ দেওয়া। ওসব ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজন নেই, এই তো বেশ আছি। মেসের খাবার, তোদের সঙ্গ ও রোগীদের পরিচর্যা করেই জীবন কাটিয়ে দেব।

বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে বিপদে-আপদে অমলদার ডাক পড়ে। অমলদাও অম্লান বদনে যেয়ে সবার সাহায্য করে আসে, ছন্নছাড়া, গৃহহারার নিজের জন্যও যেমন কোন মায়া নেই, তেমনি মায়া নেই তার পেশায়, টাকায়।

কিন্তু অলকার পিতাই একদিন অমলদাকে বঝিয়ে বলেন, অমল, এভাবে বাবা-মার উপর রাগ করে জীবনটা ভাসিয়ে দিয়ে তোমার তো

তোমার শক্তি থাকবে না—কে তোমাকে তখন দেখবে ? রোজগারের সব টাকা বন্ধুদের জন্য উড়িয়ে দিও না। টাকা জমিয়ে, সংসার করে তোমার বাবাকে দেখিয়ে দাও—তাঁর কৃপাপ্রার্থী না হয়েও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছো, শুনেছি রোজগার তোমার আজকাল ভালই হচ্ছে।

প্রবীণ বিজ্ঞজনের কথাগুলি বোধ হয় অমলদার মনে দাগ কাটলো। তাই পাখীর ডানায় ভর দিয়ে যে আনন্দের সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন সে জীবনে ছন্দ টানলেন। মনোযোগ দিয়ে রোজগার করলেন। বন্ধুদের পরামর্শে জীবনের সায়াহ্নে গাঁটছড়াও বাঁধলেন। ভাড়া বাসায় সংসার করলেন। কৈশোরে গৃহত্যাগী, তাই গৃহের মাধুর্য, যত্ন, স্নেহ, প্রেমের মধুর আস্বাদ তাঁর জীবনে ঘটেনি। নববধূর আগমনের পর অমলদার জীবনের গতি যেন বদলে গেল। গৃহ রচনায় তিনি মনোনিবেশ করলেন। ছোট্ট ভাড়াটে সহরতলীর বাসাকে সুন্দর ছবির মত সাজালেন। দেখতে দেখতে বছরে বছরে তাঁর বংশবৃদ্ধিও হতে লাগল। অমলদা যখন ৪।৫টি সন্তানের জনক হলেন—তখন স্বল্প-পরিসরগৃহে স্থান অসঙ্কুলান উপলব্ধি করে সহরতলীতে একটা জমি কিনলেন।

অমলদা সহরতলীতে জমি কিনে আস্তে আস্তে সেখানে ঘর তৈরী করালেন। লাগালেন নানা ফল ফুল সব্জীর গাছ। ছোট্ট বাড়ীখানা পরিবেশের সজ্জায় মনোরম হয়ে উঠল। পরিবারকে নিয়ে নূতন বাড়ীতে উঠে এলেন। কেবল বাড়ুপালা দিয়েই তিনি গৃহসজ্জিত করেন নি। অমলদা হয়ে উঠলেন ঘোরতর সংসারী, গরু, ছাগল, মুরগী, হাঁস—সবই পুষলেন। মুরগী হাঁসকে রক্ষা করবার জন্য কুকুরও পুষলেন। সঞ্চিত সব অর্থই গৃহ ও গৃহসজ্জায় শেষ করলেন। বন্ধুরা ও স্ত্রী বলতেন—'সব টাকা শেষ করলে—বিপদে আপদে কি হবে ? কে দেবে ধার ?'

'ভগবান দেবেন। তাঁর ভরসাতেই তো সংসার করছি। নতুবা সাধ্য কি আমার অন্য কোনো দায়িত্ব নেওয়ার ? তাই তোমাদের আরামের ও শিশুদের একটু দুধের ব্যবস্থা করছি গরু ছাগল পুষে।'

অলক্ষ্যে হেসেছিলেন বোধ হয় বিধাতা পুরুষ। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বড় ছেলেটির হঠাৎ কলেরা হল। অমলদার চেম্বার কলকাতা সহরে। তিনি দৈনন্দিন রুটিনমাফিক দশটার ট্রেনে বের হয়ে এসেছেন। রাত্রে বাসায় ফিরছেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে বাসায় ফিরে দেখেন বড় ছেলে মৃতপ্রায়। নূতন পরিবেশে পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে তেমন পরিচয় অমলদার স্ত্রীর হয়নি—তাই কাউকে ডাকা বা খবর দেওয়াও সম্ভব হয়নি। অমলদা কাল-বিলম্ব না করে ট্যাক্সি করে ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে আসলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রতি প্রতিষ্ঠানে কর্ম-দক্ষতার পরিণামে সন্তানটিকে 'এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে' ভর্তি করার 'কিউ'তে দাঁড়াতে যেয়েই অমলদার জ্যেষ্ঠ সন্তানকে হারাতে হল।

জ্যেষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুতে অমলদা যেন মুষড়ে গেলেন। শবদেহ দাহ করে বাড়ী ফিরলেন। সবই যেন মায়ার মতই মনে হল অমলদার। বাড়ী ফিরে দেখেন তৃতীয় সন্তানটিও কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। এবার আর

একদিনে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি সন্তানকে হারালেন। আজীবন স্নেহবঞ্চিত অমলদা নিজের জীবনের ক্ষতি সন্তানদের পুষিয়ে দিতেন। তাই প্রত্যেকটি সন্তানই তাঁর বিশেষ স্নেহ-ভাজন ও আদরের ছিল।

সন্তান দুটি চলে যাওয়ায় অমলদা যেন অনেকটা শক্তি হারিয়ে ফেললেন। রোজই নিয়ম-মাফিক কলকাতায় এক্স চেম্বারে বসেছেন। কিন্তু কাজে যেন তেমন মন দিতে পারেন নি। বুকটা তাঁর হাহা করে উঠেছে দুটি সন্তানের জন্য। মনের এই নিদারুণ শোক তিনি একাই বহন করেছেন এমন কি স্ত্রীকেও তার ভাগ দেন নি। কারণ মার মনের দুর্বলতা, সন্তান বিয়োগের ব্যাকুলতা—তিনি তাঁর স্ত্রীর মধ্যে উপলব্ধি করেছেন।

হঠাৎ একদিন তিনি স্ট্রোকে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। পরিচিতমণ্ডলী তাঁকে প্রথমে হাসপাতালে, পরে তাঁর শহরতলীর বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। সেই যে অমলদা বিছানা নিলেন, ছয় মাস পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। রোজগার বন্ধ। সঞ্চিত অর্থ ভেঙ্গে ভরণ-পোষণ ও শুশ্রূষা হল।

তারপর বেশ কিছুকাল পর হঠাৎ একদিন অলকাদের বাড়ীতে অমলদাকে দেখা গেল। অলকার দাদার কাছে আইনের পরামর্শ নিতে অমলদা গিয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় চেম্বারের ভাড়া বাকী পড়ে বাওয়ায় মালিক উচ্ছেদের মামলা করেছে। কিন্তু এত বিলম্ব হয়ে গেছে যে প্রতিকারের কোন উপায় নেই। সেদিনই শেষ অলকার সঙ্গে অমলার কথা হয়েছিল। অলকা দেখেছিল তাঁর অস্থিচর্ম-সার চেহারা। মলিন ছিন্ন বস্ত্র। চোখ নিষ্প্রভ কোটরাগত। আমার ওপর হতে যেন বুকের পাঁজর গোণা যায়। ন্যুব্জ দেহ—সব মিলিয়ে দারিদ্র্যের করাল ছায়া ভেসে উঠেছিল অমলদার দেহে।

অলকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল বৈমাত্রেয় ভাই ও বিমাতার কথা। অমলদা জানিয়েছিল পিতার বাড়ী বদল করে তারা কলকাতাতেই এসে উঠেছিল। পিতার লক্ষ লক্ষ টাকাও পাকিস্থান হতে ইণ্ডিয়াতে স্থানান্তরিত করেছিল, কিন্তু প্রায় সবই নিঃশেষ হয়েছে বৈমাত্রেয় ভাইদের কৃপায় ঘোড়দৌড়ের ময়দানে ও সুরার পাত্রের দৌলতে বসত-বাড়ীটাও নাকি বাঁধা পড়েছে। কিন্তু অমলদার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। সেদিন অমলদাকে দেখে অলকার ভারী দুঃখ হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ আট দশ মাসের মধ্যে অমলদার কোন খবরাখবরই অলকারা শোনে নি। অর্থাভাবে মোটা সেলামী দিয়ে নূতন চেম্বার সাজিয়ে বসার সঙ্গতিও তাঁর হয়নি। তাই কলকাতায় আর অমলদার ছায়া কেউ দেখেনি। শোনা গিয়েছিল গ্রামেই প্র্যাকটিশ করেন অমলদা। গরু, ছাগল, মুরগী, হাঁস এক এক করে সবই বিক্রি করতে হয়েছে।

অনাহারে মৃত্যুর কোলে চলে পড়লেন অমলদা—তবু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কোন আত্মীয়বন্ধুর সামনে দাঁড়ান নি। পরিবারকেও কারও দ্বারস্থ হ'তে দেন নি। আজ তিনি চলে গেছেন। তাঁর স্ত্রী হয়ত অবস্থাপন্ন দাদার আশ্রয়ে যেয়ে উঠবেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অমলদা পরাজয়ের টীকা পরেন নি। অর্ধাহারে, অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছেন—তবু আসে নি অলকার দাদার কাছে সাহায্যের জন্য বা অন্য কারও কাছে। নিজের পুরুষকারের জোরেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আবার ভবিতব্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করে গেলেন।

অচেনাকে চিনে চিনে

কৃষ্ণা সেন

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি যখন আমরা লণ্ডন রওনা হলাম, আমাদের আত্মীয়-পরিজনেরা সবাই বিশেষ চিন্তিত হয়েছিলেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মুখে গিয়ে পড়ব, আমাদের ভেতো বাঙ্গালীর ধাতে সইলে হয়। আমাদের নবীন রক্তে অবশ্য তখন ছিল এ্যাডভেঞ্চারের নেশা। চারিদিকে রাশি রাশি বরফ, তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছি—একথা কল্পনা করেও কত আনন্দ। কাজেই ভয় না হয়ে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতিই আমাদের মনকে ভরিয়ে রেখেছিল।

ডিসেম্বরের শেষে যখন সত্যিই ল্যাণ্ডলেডীর ছোট ছেলেমেয়ের সাথে আমরাও খেলায় মাতলাম। জানলা দিয়ে স্নোবলের আদান-প্রদান চলতে লাগল। নেয়োমি আর পিটার একদিন বরফের মানুষও তৈরী করে ফেলল।

কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের আনন্দের জোয়ারেও ভাঁটা পড়তে সুরু করল। বরফ পড়ার আর কামাই নেই। কলে জল আসে না—পাইপের মধ্যে সব জমে আছে। আমাদের বাড়ীওলা পাইপ রাতদিন ঘরে আগুন জ্বালিয়েও কাঁপুনি কমে না। বাইরে বেরুলে ত' কথাই নেই—দেহের যেটুকু অংশই অনাবৃত থাকে মনে হয় কেউ ছুরির ফলা চালাচ্ছে। রাত্রে দশটা কম্বল গায়ে দিয়ে ভাবি আরো গোটাদশেক থাকলে ভাল হত।

১৯৬৩ সালের নববর্ষ উদযাপন হল। সবারই মুখে শীতের কথা ছাড়া অন্য কথা নেই। এ বছরের মত বেয়াড়া শীত নাকি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও ইংল্যাণ্ডে পড়ে নি। যাঁরা প্রথমে 'এটাই আমাদের দেশের স্বাভাবিক' বলে আমাদের বিস্মিত করতে চেয়েছিলেন,

আমরাও একাগ্রমনে এবার শীতের অবসানের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ফেব্রুয়ারী গেল, মার্চ এল। মার্চের শেষে শীতের উগ্র আলিঙ্গন অনেকখানি শিথিল হয়ে এল। সামনেই আসছে এপ্রিল মাস; তখন ইস্টারে কয়েকদিন ছুটি। আমরা ঠিক করলাম প্যারিসে যাব বেড়াতে। চার মাস একটানা শীতের মধ্যে কাটিয়ে দেহেমনে যে জড়তা এসে গেছে, হাস্যলাস্যময়ী প্যারী নগরীর উত্তাপে তাকে বিদূরিত করতে হবে।

লণ্ডন থেকে প্যারিসে যেতে প্লেনে লাগে একঘণ্টা। ১১ই এপ্রিল বিকেল সাড়ে চারটার সময় আমাদের প্লেন লণ্ডন ছাড়ল। সাহিত্যে, ইতিহাসে, কাব্যে, গল্পে যে প্যারিসের নাম এত পড়েছি, আর একঘণ্টার মধ্যে সেখানে আমরা হেঁটে বেড়াব, এই আনন্দে আমরা এতই মশগুল ছিলাম যে কখন অবতরণের আদেশ হয়ে গেছে টেরই পাই নি। নেমেই কিন্তু বিপদে পড়লাম। লণ্ডনে সব নতুন হলেও ভাষাসমস্যা ছিল না। এদের কথা একবর্ণও বুঝি না। এরা যারা ইংরাজী বোঝেও সহজে স্বীকার করতে চায় না। ইংরাজদের সাথে এদের জাতিগত রেষারেষি চিরকালের। এত কাছাকাছি বাস করেও দুই জাতির মধ্যে যে এত পার্থক্য থাকতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এয়ার পোর্ট থেকে বাসে করে এদের শহরের বিমান কেন্দ্রে পৌছলাম। লণ্ডনের এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের তিন-চারটি সস্তা হোটেলের নাম বলে দিয়েছিলেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল একটা না-একটাতে জায়গা ঠিকই পাব। অবশ্য প্রত্যক্ষ করে আমাদের মাথা খারাপ হবার জোগাড়। কোথায় কি রাস্তা কিছুই জানি না কাজেই নেমে ট্যাক্সি নিতে হয়েছে। ট্যাক্সিচালককে কাগজে লিখে বোঝাচ্ছি, সে ব্যাটা সামনের হোটেলে পাঁচবার পাক দিয়ে এসে নামাচ্ছে। আমরা একেবারে বোকা বনে গেছি। চারটে হোটেলের একটাতেও জায়গা পেলাম না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ট্যাক্সির মীটারের অঙ্কও বাড়ছে। অনন্যোপায় হয়ে ট্যাক্সিচালককে বললাম, যেখান থেকে এনেছ, সেখানেই আবার নামিয়ে দাও। অনেক সময় বিমান অফিস থেকে হোটেলের বন্দোবস্ত করে দেয়। আমাদের ভাগ্যক্রমে শহরের বিমান কেন্দ্রে পৌঁছাতেই টমাস কুকের এক এজেণ্টের সাথে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক বিলক্ষণ ইংরাজী জানেন। ট্যাক্সিচালকের সাথে আমাদের ভাড়া নিয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত দেখে একটা ফয়সালা করে দিলেন। এজেণ্ট মহাশয়ের দ্বিভাষিত্বের কোন কমিশন রইল কি না সেটা অবশ্য আমরা টের পেলাম না।

যাই হোক্ এতক্ষণ বাদে একজন ইংরাজনবীশ লোক পাওয়াতে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে আমাদের অসুবিধার কথা তাঁকে সব খুলে বললাম। আমাদের বসিয়ে রেখে ভদ্রলোক বিভিন্ন হোটেলে টেলিফোন করা সুরু করলেন। অবশেষে যখন আমরা ফের ভগ্নমনোরথ হতে সুরু করেছি তখন তিনি আমাদের অভয় দান করে বললেন, হোটেল 'ভ্যানো'তে একটিমাত্র ঘর খালি রয়েছে, তাও শুধু আজকে রাত্রের জন্য। কাল থেকে সেটাও বুক্‌ড্‌।

নতুন জায়গা, সন্ধ্যা আসন্ন, কাজেই উপায়ান্তর না দেখে এজেণ্ট মহোদয়কে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাদের যৎকিঞ্চিৎ নিউফ্র্যাঙ্কের কিয়দংশ তাঁর পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়ে 'জয়দুর্গা' বলে হোটেল 'ভ্যানো'র উদ্দেশে রওনা হলাম।

হোটেল 'ভ্যানো'তে অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পৌছে গেলাম। হোটেলের চেহারা দেখে আমরা অবাক। চারতলা বিশাল হোটেল। হোটেলের সাজসজ্জা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমরা যে মূল্য দিয়ে কয়েকদিন থাকব বলে স্থির করে এসেছি হয়ত আজ রাত্রে একদিনের খরচেই তা বেরিয়ে যাবে। মনের ভাব তখনকার মত মনেই রইল। পোর্টারের পিছু পিছু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট, আলোকিত বিশাল কক্ষে পৌঁছে গেলাম। রিসেপশ্যানিস্টের ব্যবহার খুব ভাল লাগল। মনে হল, আমরা হয়ত কাল হোটেলচ্যুত নাও হতে পারি। তবে এত ভাড়া দিয়ে থাকা আমাদেরই পোষাবে না।

রিসেপশ্যানিস্ট ভদ্রমহিলা ইংরাজী ভালই বোঝেন এবং অল্পবিস্তর বলতে-কইতেও পারেন। জিনিসপত্র ঘরে রেখে তাঁর জিম্মায় চাবি দিয়ে এবং প্যারিস 'মেট্রো' সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানার্জন করে আমরা লাস্যময়ী প্যারীতে স্বেচ্ছাবিচরণের অভিপ্রায়ে বার হয়ে পড়লাম।

বিলেতে যাকে বলে টিউব, প্যারিসে তাকেই বলে মেট্রো, অর্থাৎ মাটির নীচ দিয়ে যে রেল লাইন চলে গেছে সহরের

ফঁতেন্‌ব্লু প্রাসাদ
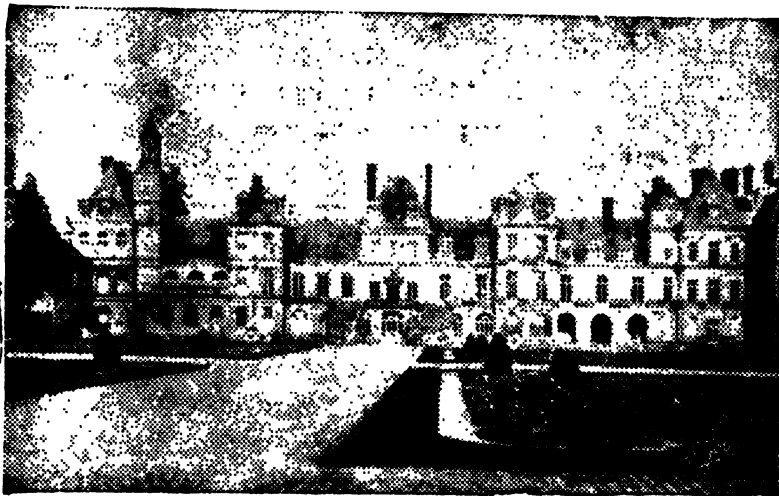
এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। যদিও বিলাতের টিউব ট্রেনের মত মেট্রোর ট্রেনগুলি এত পরিচ্ছন্ন নয় কিন্তু গতির দিক দিয়ে এরা অনেক দ্রুতগামী। একটি ট্রেন চলে যাবার মুহূর্তের মধ্যেই আর একটি এসে পড়ছে। ভাল করে চেপে বসবার আগেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাচ্ছি। এখানে আর একটি সুবিধা। লণ্ডনে গন্তব্যস্থলের দূরত্বের উপর টিকিটের মূল্য নির্ভর করে। এখানে সব টিকিটের একই দাম। একসঙ্গে যতগুলি ইচ্ছা টিকিট কিনে রাখা যায় এবং সুবিধামত সেগুলির ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনেকক্ষণ থেকেই জঠরাগ্নি তার ইন্ধনের জন্য জানান দিচ্ছিল। তাই ঠিক করলাম প্রথমেই খেয়ে নিতে হবে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে খানিকটা হাঁটতেই একটা চীনে রেস্তোরাঁ চোখে পড়ল। যদিও তখন লাল চীনের সাথে আমাদের রেষারেষি চলছে এবং আমরা যতটা পারি চীনে জিনিস বর্জন করব বলে স্থির করেছিলাম, তাহলেও সামনে খাবারের দোকান দেখে পা আর এগোতে চাইল না।

অগত্যা 'বিদেশে নিয়মো নাস্তি' এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে চীনে হোটেলেই ঢুকে পড়া গেল।

আমরা এককোণে বসে লালমুখো চীনেদের মুণ্ডপাত করছি এমন সময়ে মেনু এসে পৌঁছাল। অনেক গবেষণা করে যতটা সস্তায় সারা যায়, এই ভেবে বেছে বেছে খাবার যার করতে আমাদের বেশ খানিকটা সময় গেল। তারপরে অর্ডার মত খানা খেয়ে যখন বিল মেটাতে যাব বিল দেখে ভিরমি খাবার জোগাড়। মেনুকার্ডে যে জিনিসের যা দাম লেখা আছে বিলে দেখি সেই সব জিনিসের দাম ডবল। কি করি আর। বিল মিটিয়ে আর একদফা লাল চীন মূর্দাবাদ করতে করতে বেরিয়ে এলাম। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে এখানে রেস্টুরেন্ট-ওয়ালাদের ট্যাক্স এত বেশী দিতে হয় যে সব রেস্টুরেন্টেই মেনুকার্ডে যা লেখা থাকে যথার্থ দাম তার থেকে অনেক বেশী পড়ে যায়। সহৃদয় প্যারিসবাসীরা সম্ভবত ভোজনবিলাসীদের ভোজনের আনন্দ নষ্ট করতে চান না। তাই যথার্থ মূল্যটি আগে না জানিয়ে পরে জানান। যাই হোক, তখনকার মত মনের ক্ষোভ মেটাবার জন্য আমরা প্যারিসের বিখ্যাত রাস্তা 'শাঁজেলিজে' তে (Champs-de-Elyses) খানিকটা ঘোরাঘুরি করলাম। নেপোলিয়নের 'আর্চ-ডি-ট্রায়ম্ফের' সামনে দাঁড়িয়ে ফরাসীদের বিশ্ববিজয়ের ইতিহাস মানসপটে ভেসে উঠল। অবশেষে রাত বাড়ছে দেখে সেদিনকার মত হোটেলে ফিরে এলাম। মেট্রো স্ট্যাণ্ডের কাছেই আমাদের হোটেল। কাজেই ফিরে যাবার সময়ে কোনই অসুবিধা হল না।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হল আজ আবার একটোট থাকার জায়গা খুঁজে মরতে হবে। শুধু আমাদেরই নয়, লণ্ডন থেকে আমাদের এক বন্ধুও আজ এসে পৌঁছাবেন। তাঁর বাসস্থান ঠিক করার ভারও আমাদের উপর। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নীচে নামলাম। এদের ব্রেকফাস্ট ইংরাজদের মত নয়। এরা সকালে কফি, চা বা চকোলেটের সাথে খালি রুটি খায়। তবে সেই রুটিও অতীব সুস্বাদু। আমাদের দেশের কেক ফেলেও আমি সেই রুটি খেতে রাজী আছি। সত্যি বলতে কি, ইংল্যাণ্ড বা কণ্টিনেণ্টের কোথাও আমি অত ভাল ব্রেডরোলস্ খাই নি।

নীচে নেমে রিসেপশ্যানিস্ট দিদি-মণিকে আমাদের দুঃখের কথা জানালাম।

খানিকক্ষণ ভাবার পর দিদিমণি বললেন—তোমাদের একটা কথা বলি যদি তোমরা কিছু মনে না কর। আমাদের চারতলার উপরে ছোট ছোট কয়েকটি ঘর আছে, খুবই সস্তা, তোমাদের অনুপযুক্ত, তাই বলতে লজ্জা পাচ্ছি। তার দুটো খালি আছে। একটা তোমরা নিতে পার, আর একটা তোমার বন্ধুর জন্য রিজার্ভ করতে পার। বাকী সব ঘর ত' ভর্তি আর তাছাড়া এখন অন্য কোন হোটেলে তোমরা জায়গাও পাবে না।

আমাদের সামনে তখন ইষ্টদেব মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ালেও আমরা বোধ হয় অত আনন্দিত হতাম না। কারণ হিসাব করে দেখলাম যে ভারতীয় টাকার চৌদ্দ টাকায় আমাদের দুজনের থাকা হয়ে যাবে, তাছাড়া বড় হোটেলে বাস করার সব সুবিধাগুলিও আমরা পাব। ভদ্রমহিলাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পেলাম না। আমরা যখন বারে বারে তাঁকে 'মার্সি' (ধন্যবাদ) জানাচ্ছি, তখন তিনি বললেন, আমাদের হোটেলে এখন যারা আসবে, শহর ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে যাবে। তোমরা ইচ্ছুক থাকলে আমি টেলিফোনে রিজার্ভ করে দিই।

আমরা এককথায় রাজী। শুধু দিনের জন্যই নয়, রাত্রে দীপান্বিতা প্যারী নগরীর মনোমোহিনী রূপ দেখার লোভেও আমরা সম্বরণ করতে পারলাম না। রাত্রের জন্যও তিনটে টিকিট কিনে রাখা হল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি স্টেশন ওয়াগন আমাদের তোলার জন্য হোটেলে এসে গেল। ভিতরে একটি আমেরিকান পরিবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই এদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। আমেরিকানরা ইংরাজদের মত নয়। সাধারণত এরা নিজের থেকে এগিয়ে এসেই আলাপ করে। ইংরাজেরা যে এককালে আমাদের প্রভু ছিল, এ সত্য আমরা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলেও, ওরা যেন এ সত্যকে কিছুতেই আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারছে না। এই আমেরিকান পরিবারটি বহুদিন ইউরোপে ছিল কার্যোপলক্ষে। এখন দেশে ফিরে যাবার প্রাক্কালে ইউরোপের বিশিষ্ট সব দেশগুলি একবার পরিদর্শন করে যাবে। নইলে দেশওয়ালীরা বলবে কি ? সঙ্গে তিনটি ছোট ছোট ছেলে।

স্টেশন ওয়াগনটি আমাদের প্যারিসের বিখ্যাত অপেরা হাউসের সামনে নামিয়ে দিল। এখানে অনেকগুলি বাস দাঁড়িয়ে। বিভিন্ন দর্শনার্থীদের তাদের টিকিট ও দর্শনের স্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বাসে তুলে দেওয়া হল।

আমরাও নেপোলিয়নের স্মৃতিবিজড়িত প্যারিসের পথের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রা সুরু করলাম।

প্রত্যেক বাসেই একটি করে গাইড থাকে। এরা সব সময়েই দুই তিনটি ভাষায় নিজেদের বক্তব্য ব্যক্ত করে। ইংরাজী এদের অন্যতম ভাষা, কাজেই বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। প্রথমে বিপণি সজ্জিত প্যারীর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল অস্টারলিট্জ স্তম্ভ। অস্টারলিট্জ যুদ্ধ-বিজয়ী নেপোলিয়ন তাঁর যুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে এই পিলার নির্মাণ করেছিলেন। এর কাছেই টুইলারিজ ও ভেণ্ডোম স্কোয়ার। ফরাসী বিপ্লবের শতস্মৃতিবিজড়িত টুইলারিজ অধুনা এক বিশাল পার্ক-বিশেষ। অনেক মূর্তি দিয়ে সাজান। ছোট ছোট খাবার দোকান চারিদিকে ছড়ান। কয়েকটি সুন্দর ফোয়ারা আছে। তার ধারে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে সময়ের কয়েকটি সুন্দর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। এছাড়া বাগানে বসার জন্য চেয়ার ভাড়া দেবার বন্দোবস্তও আছে।

একটি ঘটনা প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখি। একদিন বিকালে ঘুরতে ঘুরতে বিশ্রামের জন্য এখানে এসে সামনেই দুটি চেয়ার দেখে লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বসেই পড়লাম। এর জন্যে যে পয়সা খরচ হবে তখন সেটা মাথায় আসে নি, তাহলে না হয় দিশী প্রথানুসারে ঘাসের উপরেই বসে পড়া যেত। যাই হোক্, বসার সঙ্গে সঙ্গেই শমনদূতের মত একজন এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। এখানে যে বসেছ পয়সা দিতে হবে তা জান। তখন জানি না বললে নিজেদের প্রেস্টিজ বজায় রাখা মুস্কিল হবে। হয়ত আমাদের একেবারে গ্রাম্য বলেই ঠাওরাবে লোকটা। কাজেই আমরা বুক ফুলিয়ে বললাম যে জেনেই বসেছি। পয়সা গুণে দিয়েও অবশ্য বেশীক্ষণ বসার সাহস হল না। কত সময়ের জন্য মূল্য দিলাম কে জানে? হয়ত আবার মিনিট দশেক বাদেই এসে বলবে সময় পুরে গেছে, আবার পয়সা চাই। প্যারিস খরচের জায়গা এ কথা আগে অনেকের মুখে শুনেছি। এখানে এসে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

ভেণ্ডোম স্কোয়ারের মাঝখানেও চমৎকার একটি ফোয়ারা। এর চারিপাশে বিভিন্ন ভঙ্গীমায় উপবিষ্টা কয়েকটি রমণী-মূর্তি ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশকে অভিব্যক্ত করছে। শুনেছি যখন এদের আলসেস্ লরেইন প্রদেশ উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত ছিল তখন সেই প্রদেশের পরিচায়ক মূর্তিকে এরা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। এখান থেকেই দূরে ফ্রান্সের সুপরিচিত আইফেল টাওয়ারের শীর্ষদেশ চোখে পড়ে। ক্রমশ আমরা এদের বিখ্যাত জনপথ শাঁ-জে-লিজেতে (Champs-de-Elyses) এসে পড়লাম। এখানেই নেপোলিয়ন নির্মিত তোরণ আর্চ-ডি-ট্রায়ম্প দিগ্বিজয়ী বীরের বিজয়-কীর্তির ঘোষকরূপে আজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই তোরণের মধ্যখানে একটি অখ্যাত সৈনিকের সমাধি চারিদিকে ফুল দিয়ে সাজান। মধ্যখানে আগুন জ্বলছে। এই আগুন দিন-রাত জ্বলে।

শাঁজে লিজে ই এদের সব থেকে বিখ্যাত ও বড় রাস্তা। বড় বড় দোকান-পাট অফিস ইত্যাদি সবই এই রাস্তার উপরে। 'ইনভ্যালিডস' এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ইনভ্যালিডসেরই একটি কক্ষে নেপোলিয়নের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। এইখানেই সৈনিক নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট ও যোসেফাইনকে সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই বিশাল কক্ষের শুব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে উঠল। হায়, আজ কোথায় গেল নেপোলিয়নের সেই ঐশ্বর্য আর কোথায় গেল সাম্রাজ্যের সেই অহঙ্কার। একদিন যে দম্ভের কাছে ধর্মগুরু পোপকে পর্যন্ত নত হতে হয়েছিল, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উন্নত শির আজ কোথায়? স্মৃতিভারাক্রান্ত সব কিছুই পড়ে আছে কেবল ভারমুক্ত নেপোলিয়নই আজ আর কোথাও নেই। তবে সমগ্র পৃথিবী যেভাবেই বোনাপার্টিকে নিক না কেন ফরাসীবাসী আজও শ্রদ্ধ চিত্তে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে তাদের অদ্বিতীয় বীরকে স্মরণ করে।

এবারে আমরা আইফেল টাওয়ারের সামনে এসে পড়লাম। লিফটে একেবারে চূড়োয় যাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এক এক তলায় রিফ্রেশমেন্টেরও বন্দোবস্ত আছে। দুঃখের বিষয় আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় না থাকায় আমাদের আর আইফেল টাওয়ারে চড়া হল না। এখান থেকে উপস্থিত হলাম নটরদামের গীর্জায়। পথিমধ্যে অবশ্য 'লুভে'র পাশ দিয়ে এসেছি। আজকের 'লুভ' মিউজিয়ম এককালে রাজপ্রাসাদ ছিল। লুভ থেকে নটরদাম আসতে 'সীন' নদী পার হতে হয়। নটরদামের গীর্জা শুনলেই মনে হয় ভিক্টর হিউগোর 'হাঞ্চব্যাক অব নটরদামের' কথা। বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউগো তাঁর যাদুকরী লেখনীর স্পর্শে নটরদামের গীর্জাকে অমর করে দিয়ে গেছেন। গীর্জাটি সত্যিই মনোমুগ্ধকর। ঢুকলেই একটি পবিত্র ভাব মনের মধ্যে উদয় হয়। আমরা গীর্জার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গীর্জার বাইরেই সুসজ্জিত বিপণি। এরা বিশেষ করে ট্যুরিস্টদের জন্য জিনিষ নিয়েই বসে থাকে। প্যারিসের স্মারক হিসাবে দু একটি ছোট জিনিষ কিনে আবার বাসে উঠে বসলাম। ফেরার রাস্তায় বাস 'মমার্টের' মধ্যে দিয়ে চলল। মমার্টের রাস্তা দিয়ে হাঁটলে ফ্রান্সের জনসাধারণের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। অল্পবয়সী নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রীরা মমার্টের জনপথ-বিপণিতে দলে দলে জটলা জমিয়েছে।

বাস থেকে নেমে কিছু খেয়ে হোটেলে ফিরে অল্প বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবারে আবার শহরের বিমান অফিস। এখানে আমাদের বন্ধু মিঃ চক্রবর্তী এসে পৌঁছবেন লণ্ডন থেকে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। প্লেন লেট। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুটা পরে উনি এসে পৌছালেন।

আমাদের হাতে তখন আর বেশী সময় নেই। মিঃ চক্রবর্তীর জিনিষপত্র হোটেলে জমা করে দেখা গেল ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে গেছে। রাত দশটায় বাস ছাড়বে। কাজেই ঠিক হল ঘোরার শেষে যা হয় কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।

রাত দশটায় আবার অপেরার সামনে থেকে বাস ছাড়ল। এবারে কোথাও নামা নেই। শুধু আলোকোজ্জ্বল প্যারী নগরীর প্রত্যন্তে প্রত্যন্তে পরিক্রমা। দীপান্বিতা শহরটির কোথাও ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। আলোকের অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে লাস্যময়ী নগরী যেন তার নিশীথ অভিসারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এদের বিখ্যাত 'মৌলা রুজে'র পাশ দিয়ে চলে গেলাম। শুনেছি এখানকার 'ফোলিসবার্জার' বিশ্ববিখ্যাত। বিচিত্র সাজে সজ্জিত নটরা যখন এক একটি ভঙ্গীমায় এসে দাঁড়ায় তখন নাকি মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। অন্যে পরে কা কথা। বিখ্যাত শিল্পীদের রচনাকে চিত্রায়িত ভঙ্গীতে এরা ফুটিয়ে তোলে। অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা যেখান অনবদ্য প্রকাশনা। দুঃখের বিষয় আমাদের এটা দেখা হল না। নটীদের লাস্যনৃত্য অপেক্ষা প্যারিসের ঐতিহাসিক পুরাবৃত্ত ভাল করে দেখব বলে আমরা বেশী উৎসুক ছিলাম। কাজেই আমাদের স্বল্পসঞ্চয় তার জন্যেই তোলা ছিল।

আমাদের নগর পরিক্রমা শেষ হতে হতে প্রায় বারোটা বাজল। আমাদের ধারণা ছিল প্যারী নগরীর হোটেলওলারা বোধ হয় সারারাতই তাদের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। শীঘ্রই আমাদের অনুমান ভুল প্রমাণিত হল। দোকান অবশ্য কয়েকটি খোলাই ছিল কিন্তু খাদ্যমূল্য আকাশছোঁয়া এবং পানীয় না নিলে খাবার মেলাও দুষ্কর। অনেক কষ্টে মাংস ভরা ব্রেডরোলস দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে সে রাতের মত হোটেলে ফিরে এলাম।

অত রাত্রে শুয়েছি কিন্তু ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে গেল। নতুন কিছু দেখার উত্তেজনা ও আনন্দে উঠে বসলাম। আজ সকালে যাব ম্যালমাসিয়ন ও ভারসেইলস। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নীচে এসে দাঁড়ালাম বাসের অপেক্ষায়। আবার আগের দিনের মতই সবাই এসে নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ম্যালমাসিয়নের উদ্দেশ্যে বাস রওনা হল।

ফ্রান্সের প্রথম কনসাল নেপোলিয়ন তখনো সম্রাট নেপোলিয়ন হিসাবে পরিচিত হননি। বোনাপার্ট ও যোসেফাইনের মানসাকাশে নানা মধুর ও রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা তখন আভাসিত হচ্ছে। সেই সময় প্যারিসের থেকে অল্প কিছু দূরে এই ছোট্ট প্রাসাদ নেপোলিয়নের বাসস্থান ছিল। সম্রাজ্ঞী না হলেও যোসেফাইনের জীবনে তখন ছিল সুখ ও সমৃদ্ধি। তাঁকে ঘিরে যে দলটি গড়ে উঠেছিল তিনিই ছিলেন তার মক্ষিরাণী। নেপোলিয়নের গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী, সব উৎসবের মধ্যমণি যোসেফাইনের মন তখন কত উচ্চাশায় ভরা। তিনিই যে সামান্য সৈনিক থেকে নেপোলিয়নকে ক্রমশ বিকশিত করে তুলছেন। ম্যালমাসিয়নের কক্ষে কক্ষে এখনো যেন যোসেফাইনের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডাইনিং রুম, বসার ঘর এখনো সুন্দর করে সাজান। প্রত্যেকটি কক্ষ ঘুরে দেখার সময় মনে হয় আজো এই বাসস্থান শূন্য হয়ে যায়নি। লাইব্রেরী ঘরের ছাদ সৈনিকের তাঁবুর মত করে করা। এই ঘরে বসে নেপোলিয়ন বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন যুদ্ধের পরিকল্পনা করে।

সম্রাট নেপোলিয়ন বংশরক্ষার জন্য যখন যোসেফাইনকে ডাইভোর্স করে অস্ট্রিয়ার রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন তখন এই প্রাসাদ সম্রাট যোসেফাইনকে দান করেন। যোসেফাইনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। যোসেফাইনের যতই দোষ থাক, নেপোলিয়নকে সত্যই তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। এই ঘরেই অবহেলিতা যোসেফাইন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দামী দামী আসবাবপত্র, বাসন ইত্যাদিতে সাজান কক্ষের মধ্য দিয়ে অবশেষে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায় থেকে বেরিয়ে এলাম বিংশ শতাব্দীর এক আলো ঝলমলে দিনে।

আবার যাত্রা সুরু হল। প্যারিসের উপকণ্ঠের পরিচ্ছন্ন সুন্দর রাস্তা আমাদের মুগ্ধ করল। এই সুবিস্তৃত পথ তার অভ্যন্তরে কত উত্থানপতনের ইতিহাস গোপন করে রেখেছে। আজ যে পথের উপর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম যানবাহন চলাচল করছে, কাল সেই রাস্তা দিয়ে অশ্বের হ্রেষা ও অস্ত্রের ঝংকার শোনা গিয়েছিল। আজ আমরা সভ্যতার

ভার্সাই প্রাসাদ

উন্নতিতে উন্নত, আধুনিক প্যারিস ও তার শহরতলী দেখে চমৎকৃত হচ্ছি। বিগত যুগে চতুর্দশ লুইয়ের রাজনীতি, নেপোলিয়নের উচ্চাভিলাষ, ভলটেয়ার ও রুশোর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার অমরবাণী বিশ্ববাসীকে সমভাবেই মুগ্ধ করেছিল। 'লিবার্টি' 'ফ্রাটারনিটী' ও 'ইকোয়ালিটি'র বাণীর জন্য ফ্রান্স বিশ্বের দরবারে চিরদিন শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

বাস থামতে চোখ তুলে তাকালাম। সম্মুখে এক বিশাল গৃহ। শুনলাম এই ছিল ফ্রান্সের রাজাদের আবাসস্থল। মনে পড়ল ঠাকুমার ঝুলির রূপকথার গল্প—এক যে ছিল বিশাল রাজ্য, তার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া—এই বিশাল রাজ্যের রাজারও সবই ছিল, কিন্তু রূপকথার রাজার ভাগ্যে শেষ যেখানে সর্বদাই মিলনান্তক, এ রাজার ভাগ্যে সেইখানেই ঘটল ট্র্যাজেডি।

সবার আগে গাইড আমাদের নিয়ে গেল মেরী আঁতোনোতের গ্রামে। শ্যামল ছায়াঘন ছোট পুষ্করিণীর পাড়ে দ্বিতল গৃহ। আয়তনে বেশী বড় নয়। ফ্রান্সের শেষ রাণী এই নিভৃত নির্জনে অনেক অবসর সময় কাটিয়ে দিতেন অলস মন্থরতায়। কিছুদূরে শ্বেতমর্মরে রচিত গোল একটি চত্বর। ভিতরে প্রেমের দেবতার পাষাণ মূর্তি।

এর পরে আমরা উপস্থিত হলাম রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। প্রতিটি কক্ষের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, অলঙ্কার, ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। প্রতিটি কক্ষের ছাদে পৌরাণিক ঘটনার চিত্রাঙ্কণ করে গেছেন শিল্পীরা। এই নামহীন শিল্পীরা নিজেদের কীর্তির মধ্যে আপনাদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি রেখার কি বিচিত্র প্রকাশ। প্রতিটি ভঙ্গীমা কি গভীর ব্যঞ্জনাময়। ঐশ্বর্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ মেরী আঁতোনোতের শয়নকক্ষে উপস্থিত হলাম। এই প্রাসাদে যে জীবন কাটিয়েছে তার শেষ রাত কাটল কারাদুর্গে। ভাগ্যবিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস। বিধাতার দরবারে সত্যিই সবার চুলচেরা বিচার হয়ে থাকে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে। যাকে শোষণ করা হয় সেই অবশেষে একদিন শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞীরা সন্তান হবার সময়েও পাবলিসিটির অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতেন না। যে ঘরে সম্রাজ্ঞীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হত তার পার্শ্ববর্তী ঘরে বিশিষ্ট প্রজামণ্ডলী সংবাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং সেই সংবাদ বহন করে এনে দিতেন নীচে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে। এর পরে চলে এলাম 'হল অফ মিরারস'য়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই আয়না-ঘেরা বিশাল কক্ষেই ভার্সেইলসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। হল অফ মিরারসের সংযুক্ত একটি ছোট ঘরেই বিভিন্ন রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নেতারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ভার্সেইলস প্রাসাদে ঢুকবার পথে প্রথমেই পড়ে প্রাসাদসংলগ্ন প্রার্থনা গৃহ। এই চ্যাপেলেই ষোড়শ লুই এবং অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা মেরী আঁতোনোতের পরিণয় হয়েছিল।

ভার্সেইলস প্রাসাদের বিরাটত্বের সঙ্গে সমান তালে তাল রেখেছে এর চারিদিককার জমি ও বাগান। বাগানটি আয়তনে এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কয়েক মাইল হবে। স্থানে স্থানে সাজান বিভিন্ন প্রস্তর মূর্তি। ফ্রান্স সরকার মোটামুটি সুন্দরভাবেই রক্ষা করেছেন তাঁদের জাতীয় সম্পদ। খানিকটা ইতস্তত পাদচারণা করে আমরা এসে আবার বাসে উঠলাম। সম্পূর্ণ ভার্সেইলস প্রাসাদ ঘুরে দেখা এত কম সময়ে সম্ভব নয়, কাজেই অল্পেতেই আমাদের সন্তুষ্ট হতে হল।

বাসের কেন্দ্রস্থলে নেমে আমরা হাঁটতে সুরু করলাম। সকালের ব্রেক-ফাস্টের পরে পেটে বিশেষ কিছু পড়ে নি। কাজেই সবাই কিছু না কিছু ক্ষুধার তাড়না অনুভব করছি। পয়সা বাঁচাবার জন্য ভার্সেইলসে এককাপ কফি ও দু একটি কেক খেয়েছিলাম। তবে আমার স্বামী বললেন যে, একেবারে 'সাঁকরে কোর' গীর্জা দেখে নিয়ে তারপরে খাওয়া হবে। কাজেই আপাতত সেই উদ্দেশ্যেই পা চালালাম। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে 'সাঁকরে কোর' গীর্জা। এই গীর্জাটিও সুন্দর। নটরডামের থেকে এখানে ভিড়ও বেশী। এই গীর্জার উপর থেকে প্যারিসের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। পাশেই একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল। তবে সেখানে এত ভিড় যে আমাদের আর দূর বীক্ষণ করা হল না। গীর্জার অভ্যন্তরে একটি কক্ষে নানারকম জিনিষও বিক্রি হচ্ছে। ক্রাইস্ট ও মেরীর প্রতিমূর্তি, ক্রস, ধর্ম-সংক্রান্ত পুস্তকাবলী, বেশীর ভাগ এই সমস্ত জিনিষই সাজান আছে দোকানে। এখানে খানিকটা সময় কাটিয়ে আমরা নীচে নেমে এলাম। আমাদের দেশের মত গীর্জার কাছাকাছি অনেকেই ভিক্ষা-পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

এবারে খাবার পালা। অনেক খুঁজে-পেতে রাস্তার ধারে একটি ছোট রেস্টুরেন্ট আপাতদৃষ্টিতে সস্তা মনে হওয়ায় আমরা ঢুকে পড়লাম। মেনু ত' সব ফ্রেঞ্চে লেখা, কাজেই বেছে খাবার বের করাই আমাদের একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অনেক দেখাশোনার পরে মাটনের একটা ডিস অর্ডার দেওয়া হল। আমরা যত ওয়েটারকে বলি যে, আমাদের মাটনের কিছু এনে দাও সে ততই ঘাড় নাড়ে। শেষকালে আমার স্বামী আকারে ইঙ্গিতে সেই চতুষ্পদ জন্তুটিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতেও সফলকাম হলেন না। তখন অগত্যা ভেড়ার ডাক ডাকা ছাড়া উপায় কি? যাক্ অতি কষ্টে অবশেষে আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল এবং আমাদের ঈপ্সিত খাবার এসে পৌঁছাল। কণ্টিনেণ্টের মধ্যে প্যারিসের রাঁধুনীরা নামকরা। বিশেষত এতদিন ইংলণ্ডের খাওয়া খাবার পর আমরা সত্যিই খুব তৃপ্তি পেলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর সহরের মধ্যে দিয়ে খানিকটা ঘুরে হোটেলে ফিরে এলাম। পথে বহু ভারতীয়ের সাথে দেখা হল। ইস্টারের ছুটিতে প্যারিসে বেড়াতে এসেছে। জার্মানী থেকে এক-দল এসেছে বাসে করে প্যারিস ভ্রমণে।

পরদিন সকালে আবার আগের দিনের পুনরাবৃত্তি। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বাস ধরা। তবে আজ আমরা ঠিক করেছি বাস ধরার আগে একবার ফ্রান্সের বিখ্যাত 'Bastille' দেখে নেব। মেট্রোতে উঠে নামলাম গিয়ে ব্যাস্টিল স্টেশনে। ব্যাস্টিল স্টেশন থেকে বেরিয়ে অল্প একটু হাঁটতেই চোখে পড়ল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি উঁচু স্তম্ভ। এই জায়গাতেই আগে ছিল ব্যাস্টিল কারাগার। রাজরোষে কত অভাগার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এই কারাগারের অন্ধকূপের নির্জনতায়। অবশেষে সেই বোধবহ্নি ফিরে প্রত্যাঘাত করেছে সিংহাসনের মর্যাদাকে। জন-বিক্ষোভের রথচক্রে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে ব্যাস্টিল দুর্গ। স্মারকচিহ্ন হিসাবে এখানে পরে এই স্তম্ভ তোলা হয়েছে। বাসের সময় হয়ে যাচ্ছে বলে আবার মেট্রোতে উঠে নামলাম এসে বাসের জায়গায়।

আজ আমাদের গন্তব্যস্থল 'ফঁতে ব্লু'। নেপোলিয়ন সম্রাট হবার পরে ভার্সেইলস প্রাসাদে থাকেননি। উনি থাকতেন এই 'ফঁতে ব্লু'তে। 'ফঁতে ব্লু' প্যারিস থেকে খানিকটা দূরে। আমাদের পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ খানিকটা বেলা হল। তবে রাস্তা এত সুন্দর যে বাসে যেতে কোন কষ্ট হয় না। এখানকার বুড়ো গাইড মশাইটি ভার্সেইলসের গাইড মহোদয়ার মত ভাল না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সারা রাস্তা ফ্রেঞ্চ মেশান ইংরাজীতে কি যে বললেন কিছু বিশেষ বোঝা গেল না। এই প্রাসাদটিও বড় তবে ভার্সেইলসের তুলনায় কিছুই নয়। অভিষেকের পোষাকপরিহিত নেপোলিয়নের একটি সুন্দর ছবি চোখে পড়ল। রাজা হবার কিছুদিন পরে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর ও নেপোলিয়নের শয়নকক্ষ দেখলাম। রাজকীয় ঐশ্বর্য ও সমারোহে সজ্জিত সব কক্ষ। তবে ভার্সেইলস প্রাসাদে যে চোখ ঝলসানো আভিজাত্য সর্বত্র বিরাজিত এখানে যেন তা অনেকটা স্তিমিত। নেপোলিয়নের মন্ত্রণাকক্ষ বা পোনরুমটিও সুন্দর। এই কক্ষে একদিন ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারিত হত, আর আজ আমরা কোথাকার নগণ্য জনমণ্ডলী হেলাভরে পাদচারণা করে বেড়াচ্ছি। মহাকালের কাছে সবাই নগণ্য। দেওয়ালে দেওয়ালে সুন্দর ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে। এককালে ফ্রান্সের ট্যাপেস্ট্রির পৃথিবী-জোড়া নাম ছিল। এতদিনের পুরানো হলেও এর সৌন্দর্য কিছুমাত্র কমেনি।

প্রাসাদের অন্যান্য কক্ষ পরিক্রমা করে আমরা আবার এসে বাসে উঠলাম। এবারে বাস এসে থামল ছোট একটি বাড়ীর সামনে। গাইড আমাদের নামতে বলল। জায়গাটি দেখতে একটি গ্রামের মত। গাইডের কাছ থেকে জানা গেল এই গ্রামটির নাম 'বারবাজিওন'। যে ক্ষুদ্র গৃহটির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে চিত্রকরেরা সব তাঁদের অঙ্কিত চিত্র এনে রাখেন; আমরা ইচ্ছা করলে তার থেকে কিছু কিনে নিজেদের কৃতার্থ করতে পারি। গাইড কড়া নাড়তে একটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। সত্যিই ক্ষুদ্র গৃহের দুটি কক্ষ বহু সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে ভরা। ফ্রান্সের বহু নামকরা চিত্রশিল্পী এককালে এই বারবাজিওন পেইন্টিং স্কুলের সদস্য ছিলেন এবং অনাগত ভবিষ্যৎও নিশ্চয়ই পৃথিবীখ্যাত কোন শিল্পীকে এর মধ্যে থেকে আবিষ্কার করবে। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করতে করতে আমরা গিয়ে ঢুকলাম উল্টোদিকের একটি রেস্টুরেন্টে। আমি ও মি: চক্রবর্তী দুই কাপ চা নিলাম, আমার স্বামী একটি কেক। বিল দেবার সময় দেখা গেল গ্রামটি ক্ষুদ্র হলেও গ্রামের দ্রব্যমূল্য মোটেই কম নয়। এই খেতে আমাদের খরচ হল দশ টাকা। আমরা চায়ের কাপগুলি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে দেখলাম কোথাও সোনা বাঁধান আছে কি না!

আবার বাসে করে ফিরে এলাম প্যারিসের কেন্দ্রে। আমাদের প্যারিস পরিক্রমা মোটামুটি শেষ। বাকী শুধু লুভ মিউজিয়াম দেখা। কাল আমাদের বন্ধু মি: চক্রবর্তী ফিরে যাবেন ইংলণ্ডে। আজ রাত্রে আমরা ঠিক করলাম এখানকার 'সেলফ সারভিস' রেস্টুরেন্টে খাব। প্যারিসে 'সেলফ সারভিস' রেস্টুরেন্ট লণ্ডনের মত অত প্রচুর নেই। লণ্ডনে এই রকম নিজের ইচ্ছেমত তুলে নিয়ে খাবার জায়গা যত্র তত্র। প্যারিসে আমরা অনেক খুঁজেপেতে একটির সন্ধান পেলাম। রেস্টুরেন্টের মধ্যে ভীষণ ভিড়। ব্যবস্থাও বিলাতের মত অত ভাল নয়। চারিদিকে যেন একটা গণ্ডগোল মারামারি চলছে। অনেক কষ্টে খাবার ও বসার জায়গা বার করে নেওয়া গেল। তবে খাবার অপূর্ব। এখনো যেন সেই খাবারের স্বাদ মুখে লেগে আছে।

পরদিন মি: চক্রবর্তীর প্লেন ধরার তাড়া। আজ আর আমরা বাস নেব না; নিজেরাই যাব লুভ মিউজিয়মে। ওখান থেকে মি: চক্রবর্তী চলে যাবেন শহরের এয়ার অফিসে। সকাল থেকেই অল্প অল্প বর্ষণ শুরু হয়েছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। লুভ মিউজিয়মে পৌঁছিয়ে টিকিট কাটলাম। ভিতরে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক। জগদ্বিখ্যাত এই লুভ মিউজিয়ামে দাঁড়িয়ে মনে হল এর কাছে আমাদের দেশের সব মিউজিয়াম যেন ছেলেদের খেলাঘর। এর কত বিভাগ, কত শাখা-প্রশাখা। ভালভাবে লুভ মিউজিয়ম দেখতে হলে কম করেও অন্তত দিনদশেক সময় হাতে থাকা চাই। আমাদের সময় খুবই কম, কাজেই প্রথমেই এসে উপস্থিত হলাম ভিনাস ডি মিলোর বিখ্যাত প্রস্তরমূর্তির সামনে। এর অনুকরণ কত দেখেছি, আজ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলাম। এর পর বিভিন্ন বিভাগের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আর্ট গ্যালারীতে পৌঁছলাম। প্রথমেই নজরে পড়ল লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির মোনালিসার উপর। বিভিন্ন প্রথিতযশা অমর চিত্রশিল্পীদের অক্ষয় কীর্তির উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলাম। শিল্পকীর্তি অনেক দেখেছি, কিন্তু রং আর তুলির সমাবেশে এখানে যে এক বিস্ময়কর সৃষ্টির আবির্ভাব হয়েছে তা বর্ণনা করতেও বিশেষ প্রতিভার আবশ্যক। এ জিনিষকে প্রাণমন দিয়ে অনুভব করতে হয়। লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে গেলে এর মাধুর্য যায় ক্ষয় হয়ে। যতই অগ্রসর হই, বিভিন্ন ঘরের সংগৃহীত দ্রব্যাদি দেখে ততই বিস্মিত হতে হয়। সারি সারি কয়েকটি ঘরে খালি ট্যাপেস্ট্রির প্রদর্শনী। এই সংগ্রহশালা এত সুসজ্জিত ও পরিষ্কার রাখতে ফ্রান্সের জাতীয় সরকার কতখানি পরিশ্রম করেন। শুধু সরকারই নয়, প্যারিসের প্রতিটি অধিবাসীই তাদের জাতীয় সম্পদের জন্য গৌরবান্বিত।

সময় সংক্ষেপ; অর্ধতৃপ্ত মন নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেশ জোর বৃষ্টি সুরু হয়েছে। বাইরে এসে ট্যাক্সি নিতে হল। মি: চক্রবর্তীকে নামিয়ে দিলাম এয়ার অফিসে। ওঁর বাস ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বেড়িয়ে এলাম। বারিসিক্তা প্যারী নগরীকে সদ্যস্নাতা শিশিরে ভেজা একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত মনে হল। আমরা খেয়াল-খুসীমত খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে ঢুকে পড়লাম হোটেল দা ইনভালিডসয়ে। আগেই বলেছি এই মর্মরগৃহের এক কক্ষেই কনসাল নেপোলিয়ন সম্রাট নেপোলিয়নরূপে অভিষিক্ত হন।

প্রাসাদটি ছোট হলেও এর প্রতিটি অলিন্দ প্রতিটি গৃহকোণ সেই বিজয়ী বীরের স্মৃতিবিজড়িত। একটি কক্ষে নেপোলিয়নের ব্যবহৃত বহু রকমের জিনিষ সজ্জিত আছে। বর্তমানে এই প্রাসাদের কয়েকটি কক্ষ ছাড়া সবই প্রায় মিলিটারীর দখলে। অনেক জায়গাই ধূলিধূসরিত।

প্যারিস দেখা একরকম শেষ হল। এবার হোটেলে ফিরে জিনিষপত্র গুছাবার পালা। রাত্রের ট্রেনে যাব লুর্ডস। খৃস্টধর্মের নামী তীর্থস্থান। ভোগের মহানগরী থেকে যাব ত্যাগের পীঠস্থানে। প্যারিসের এই স্বল্প কয়দিনের স্মৃতি মনের মধ্যে গাঁথা থাকবে অমূল্য হয়ে। এই কয়টি দিনের কথা সানন্দে চিরকাল স্মরণে রাখব।

পথে যেতে যেতে

জয়ন্তী রায়

যেতে দিতে হ'লো বলে
তোমার হৃদয়ে ঝরে শিশিরের জল—
এত কান্না কেন বুকে
যন্ত্রণার মোমগুলো জমা ক'রে রাখো কেন মনর কানাচে?
অথচ সমস্তক্ষণ জেনেছো জীবনে;
আকাশের তারা থেকে মাটির বকুল এক কথাবলে:
যেতে হবে—যেতে হবে চলে।
তোমার আমার পারে
সারাক্ষণ এই কথা নেচে নেচে ফেরে:
আলোর ফুলেরও ছায়া আছে
তার মৃত্যু আছে—অন্ধকার আছে।
একটি রাতের শেষে আর একটি দিনের মুঠিতে
ক্রমে ক্রমে রোদ্দুরের সোনা গলে গলে ঝরে,
বিকেলের আলো মেশে ছায়ার উঠোনে।

যেতে দিতে হ'লো বলে
তোমার হৃদয়ে ঝরে শিশিরের জল—
অথচ এ পথ দিয়ে তুমিও যখন যাবে
আলো কিংবা অন্ধকারে,
তুমিও যখন যেতে যেতে মুঠি ভরে
নেবে তুলে শুকনো বকুল,
মনে হবে এরা একদিন ফুটেছিল স্বপ্ন-ভোরে
আলো আর বাতাসের অন্তরঙ্গ হ'য়ে—
আজ শুধু ঝরা স্মৃতি;
মনে হবে এইটুকু থাক
ঝরা ফুল, ঘাসের শীষের বুকে শিশিরের দোল
আর কিছু সোনালী রোদ্দুর—
পথে যেতে যেতে মাটির ধুলোর রঙে
হৃদয়ের রঙ বদলায়।

অন্য ঠিকানায়

কুমারী দেবীর মন্দিরে গেলাম এক সন্ধ্যায়। মহাসাগরের কূলে, বরণমালা হাতে নিয়ে অনন্তের জন্য, অনন্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন রাজকন্যা কুমারী দেবী।

একটি পাহাড় কুঁদিয়ে তৈরী করা হয়েছে এই অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত বিশাল মন্দিরটি। মন্দিরের ভেতরে ঘোর অন্ধকার। কারণ চন্দ্র-সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। ওপরে পাথরের ছাদ চারিধারে পাথরের দেয়াল, তার অলিন্দে অলিন্দে জলছে হাজার হাজার দীপমালা। কবে প্রথম রাত এই ঘৃত প্রদীপমালায় সাজানো হয়েছিল দেবীর বিবাহ আসর, সেই আসরের বাতি আজো নেভেনি। এখানে চিররাত্রি বিরাজমান, ভোরের আলোর প্রবেশের অধিকার নেই।

কিম্বদন্তী বলেন যে, ওখানকার রাজার মেয়ে ভগবতী অংশ নিয়ে জন্মেছিলেন। তারপর তিনি মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য ঐ পর্বতে বসে তপস্যা করেন। আশুতোষ ভোলানাথ কন্যার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে রাজী হলেন, তবে একটি শর্তে, ভোর হবার আগেই তিনি বিবাহ-কর্ম অন্তে ফিরে আসবেন কৈলাসে। এদিকে অপূর্ব আলোকসজ্জায় সাজানো হল রাজকন্যার বিবাহ আসর। মঙ্গলঘট, দেউলের চূড়ায় চূড়ায়। বিচিত্র পুষ্প-সজ্জায় সুশোভিত আসরে, মালাচন্দনে সজ্জিতা রাজকুমারী বরণমালা হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন। পরনে তাঁর ঝকঝকে জরির কাজকরা বেনারসী, সর্বাঙ্গে হীরে-মুক্তোর অলঙ্কার।

বরণডালা, মঙ্গলঘট সাজানো চারিদিকে, পুরোহিত বসে আছেন আসনে, উৎসবমুখরিত রাজপুরী। ওদিকে কৈলাস পর্বতে মহাসঙ্কট উপস্থিত, কারণ কৈলাশ ত্যাগ করে চলেছেন কৈলাসপতি, যদি আর না ফিরে আসতে চান এখানে, তাহলে তো সৃষ্টি যাবে রসাতলে। তলব পড়লো নারদ-ঠাকুরের, বীণা হাতে এলেন নারদ-ঋষি দেবতাদের অভয় দিলেন যে, মহাদেবকে তিনি আজ রাতেই ফিরিয়ে আনবেন।

শুভক্ষণে বর রওনা হলেন,—কিন্তু মাঝপথে আসতেই নারদের চক্রান্তে হঠাৎ কাক ডেকে উঠলো

ঋরি দেবী

বৃক্ষশাখায়। আর পূবদিকে ঈষৎ লালের আভা দেখে মহাদেব চমকে উঠলেন। নারদ বললেন---বিবাহ লগ্ন তো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে প্রভু, ভোর হয়ে এল আর গিয়ে কাজ নেই এখান থেকেই ফিরে চলুন।

—তথাস্তু। ফিরে গেলেন মহাদেব। ওদিকে লগ্নভ্রষ্ট। ভোর হয়ে গেল, ম্লান হয়ে এল দীপালোক। রাজকুমারী বরণডালা ফেলে দিলেন সমুদ্রতটে,—তারপর?

তারপর, কেউ বলেন, তিনি ধীরে ধীরে পাষাণে পরিণত হলেন, অঙ্গে রইল নববধূর সজ্জা, হাতে মালা।

—আবার কেউ বলেন যে, তিনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে ব্যর্থপ্রতীক্ষার সমাপ্তি করেছিলেন।

তারপর রাজা-রাণী ও রাজ্যের প্রজাবৃন্দের আকুল কান্নায়, বুকফাটা হাহাকারে টলে উঠলো জগজ্জননীর আসন। তিনি রাজকুমারীর মূর্তিতে দেখা দিয়ে আদেশ করেছিলেন—এই পর্বতে মন্দির গড়িয়ে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজার ব্যবস্থা করতে। ঐ মূর্তিতে তিনি অধিষ্ঠান করবেন, জানিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারেই নাকি এই ব্যবস্থা যে মন্দিরে কখনও রাত্রি প্রভাত হবে না। পুষ্প-সজ্জায় ও দীপমালায় সর্বদা অভ্যন্তরটি বিবাহ আসরের মত সুসজ্জিত থাকবে, আর তাঁর কুমারী মূর্তি নববধূর সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে, মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন প্রিয়তমের প্রতীক্ষায়।

ঝুনো নারকোল, রুলি আর এলাচ দানা, এই দিয়ে যাত্রীরা পূজা দেন, আমরাও তাই দিলাম। কিছু সময় মুগ্ধ বিহ্বল চিত্তে অপলক দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলাম কুমারী দেবীর দিকে। প্রদীপের আলোয় তাঁর নাকের হীরের বেসর থেকে ও অন্যান্য হীরক আভরণ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল, ঝকমক করে জ্বলছিল তাঁর পরনের জরির জংলা কাজের বেনারসী শাড়ীখানি।

অপূর্ব লাবণ্য ঢলো-ঢলো দেবীর শ্রীমুখ ছেড়ে, চোখ যেন আর ফিরতে চায় না। চন্দন কস্তুরী আর ফুলের গন্ধে ভরপুর মন্দিরের অভ্যন্তরটি। তবুও বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয় সেখানে মনে হয়, যেন কোনো অলৌকিক সত্ত্বা বিরাজ করছে ওখানে। তাই পৃথিবীর রক্ত-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ ঐ আবহাওয়াকে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না।

মন্দির ছেড়ে আমরা চলে এলাম সমুদ্রের ধারে। ঐখানে বরণডালা ফেলে দিয়েছিলেন, কুমারী দেবী।

তাই বরণের পঙ্কগুঁড়ির রং লেগে, ওখানকার বালি লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনি প্রভৃতি রং ধারণ করেছে। এই রঙিন বালি ছোট্ট ছোট্ট ঝুড়িতে ভর্তি করে সমুদ্রধারে দোকানে রাখা হয়েছে। সেখানে নানা গড়নের শাঁখ, সমুদ্রের ফেনা, ছোটবড় বিচিত্র কারুকার্য করা কড়ি, ঝিনুক, শাঁখের মালা প্রভৃতি সামুদ্রিক দ্রব্যও আছে।

টুরিস্টরা এ সব কিনে নিয়ে যান ভালো দাম দিয়ে। ঝুনো নারকোল মালা দিয়ে ভারি চমৎকার ছাইদানী তৈরী করা হয়েছে এবং তা বিক্রিও হচ্ছে প্রচুর। এই পনেরোটা দিন, চিরস্মরণীয়রূপে চিহ্নিত রইলো, আমার জীবন-পাতায়।

মনের সকল দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ, গ্লানির বোঝাগুলো মহাসাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে তার কূলে কূলে মুক্ত আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা দুজন। তখন কে আমি? কোথায় ছিলাম? এখানে কেন? এ প্রশ্নগুলো বোবা হয়ে গিয়েছিল, শুধু একটি আনন্দময় উপলব্ধিতে মনটা পূর্ণ ছিল, কিন্তু এ আনন্দকে তো বেশীদিন ধরে রাখা যায় না। সমাজ সংসার যেখানে, সেখানে ফিরতে মন আর চায় না, তবুও ফিরতে হবে।

আমরা চলেছি ফেরার পথে। ওয়ালটেয়ারে নেমে পামবীচ হোটেলে ছিলাম তিনদিন। সেখান থেকে একদিন মোটরে করে, তিরিশ মাইল দূরে এই 'বিমুণী পত্তনম্'-এ এসেছিলাম দর্শনীয় স্থানটি দেখবার জন্য।

চমৎকার শান্ত নির্জন উপদ্বীপটিকে দেখে বড় ভালো লেগেছিল। ঝাউ আর তালবনে ঘেরা ছোট্ট শহরটি। সমুদ্রকূলে আছে একটি পরিত্যক্ত লাইট হাউস।

এখন নতুন লাইট হাউস তৈরী হয়েছে 'ভিজিগাপত্তম'-এ। তিন দিক সমুদ্র ঘেরা মনোরম স্থানটিতে যেন প্রশান্তি ছড়ানো রয়েছে। সূর্যকান্ত বললো —কলকাতায় গিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আমরা আবার ফিরে আসবো এইখানে। কিছু টাকা সঙ্গে থাকলে সারাটা জীবন এখানে কাটানো যায়, কি বলো?

—হ্যাঁ প্রস্তাবটা তোমার ভালোই, সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত, কিন্তু কিছু কাজ তো চাই। তুমি না হয় ডাক্তারী করলে, কিন্তু আমি? আমি কি করবো ভেবে দেখেছো?—জবাব দিলাম আমি।

—হ্যাঁ ভেবেছি বৈকি রূপা। তোমার কথা আমি অনেক ভেবেছি, এখনও ভাবছি, পরেও ভাববো।

একটা ব্যাপার যা স্থির করছি ভেবে, তা হলো এই, মনে হয় দেশটা বড় গরীব, ভালো হাসপাতালের অভাব আছে এখানে। সেই অভাব আমার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে দূর করার চেষ্টা করবো।

একটি আদর্শ আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে আমি হবো তার ডাক্তার, আর তুমি হবে মেট্রন, জীবসেবা হবে আমাদের ব্রত।

কাজের শেষে আমরা চলে আসবো সমুদ্রের ধারে, বসবো এই ডুবো পাথরের ওপর। তারপর মহাপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য আর আনন্দধারার অতলতলে হারিয়ে যাব আমরা—শুধু তুমি আর আমি। আমাদের শান্তিভঙ্গ করার জন্য কোনো তৃতীয় জন থাকবে না সেখানে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে, আবার বললো সূর্যকান্ত,—কাজটা কিন্তু খুব সহজে হবে না রূপ! কলকাতায় ফিরে প্রথম কাজ হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ। আইনের সাহায্য কিভাবে তুমি পেতে পারো সে বিষয়ে নামকরা উকিল ব্যারিস্টারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করবো। তারপর যে সঙ্কল্প ছিল আমাদের তাকে কাজে পরিণত করে, অর্থাৎ তোমাকে বিয়ে করে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে আসবো এখানে, আর এইখানেই ঘর বাঁধবো আমরা।

কলকাতায় ফেরার পর সব সঙ্কল্প আমাদের খানচাল হয়ে গেল। কারণ পার্ক স্ট্রীটে সূর্যকান্তর বাড়ীতে এসে উঠেছিলাম আমরা, ঐ বাড়ীর পুরোনো দরোয়ান মঙ্গল সিং আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বললো—এ কেয়া তাজ্জব বাত্? রূপাদিদি ভেদবমি হয়ে মারা গেছে এ খবর সে শুনেছে আমার বাবার বাড়ীর দরোয়ান লছমন সিং-এর কাছে। লছমন সিং তার দেশোয়ালী ভাই হয়।

সূর্যকান্ত ভেবেছিলো যে,—তার বিরুদ্ধে নারীহরণ আর ব্যভিচারের অভিযোগযুক্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ ওৎ পেতে আছে তার জন্য। কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হবে তাকে। কিন্তু সে সব কিছুই হয়নি, সামাজিক মর্যাদা আর পারিবারিক কেলেঙ্কারীর ভয়ে সব ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হয়েছে। তার বদলে রটানো হয়েছে আমার অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ।

আমি এখন সমাজ সংসারের কাছে মৃতা। মৃত মানুষের বিবাহ বিচ্ছেদ কি করে সম্ভব হবে? প্রথমে তাহলে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে বেঁচে আছে।

সূর্যকান্ত কয়েকদিন চিন্তা করলো, তারপর বললো,—থাক্ খুঁচিয়ে ঘা করে দরকার নেই। দেখা যাক্ ঘটনার স্রোতটা কোন দিকে বাঁক নেয়, সেই বুঝে কাজ করা যাবে।

হাতীবাগানের বাড়ী বিক্রি করে প্রায় দশ লক্ষ টাকা পেয়েছে সূর্যকান্ত, তাই টাকার প্রশ্ন আর নেই। বাইরের প্র্যাকটিস বাতিল করে এই বাড়ীর একতলার চেম্বারে বসে সকাল বিকাল রুগী দেখতো সে, আর ওষুধের ডিসপেনসারী চালাতো।

উন্নতির পর্বতশীর্ষে ওঠার জন্য মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, সবই ছিল সূর্যকান্তর। দুর্দান্ত তেজ, শক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা, সাহস, অটুট স্বাস্থ্য, অতুল ঐশ্বর্য, সব কিছু বিধাতা অকৃপণ হাতে দিয়েছিলেন ওকে, কিন্তু হায় এ সব, ওর জীবনকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার কোন সুযোগই পেল না। নিষ্কর্মার মত বাড়ীর চার দেয়ালে নিজেকে

বন্দী করে রেখে হঠকারিতার জন্য চরম মূল্য দিতে হল সূর্যকান্তকে।

তবু তো ওর জীবনে কাজ আছে, কিন্তু আমি কি করি? সেই হাতীবাগানের বিরাট লাইব্রেরীটা এখন এখানে আছে, কিন্তু আমার বেশীক্ষণ ওখানে ভালো লাগে না তাই অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াই এঘর ওঘর করে। বারান্দায় যাই না, পাছে কোন চেনামুখের সাথে দেখা হয়ে যায়।

ঘরের জানলা দিয়ে দেখি, রাজপথের কর্মচঞ্চল জনতাকে। আরো দেখি, আশে, পাশে, কাছে, দূরের ফ্ল্যাটবাড়ীর বাসিন্দাদের হাত মুখ নাড়া হাসি কান্না মজলিস, ঝগড়া, আর ওদের নাচ-গানের ঐকতানও ভেসে আসে কানে। আমার একাকিত্বের স্তব্ধ পরিবেশে, ঐ বিষয়-বস্তুগুলোকে মনে হয় অদৃশ্যসঙ্গী, তাই মনের দরোজা জানালাগুলো ওদের জন্যে খুলে রাখি। এ বাড়ীতে পুরোনো দরোয়ান মঙ্গল সিং, আর পাওয়ার সায়েব ছাড়া আর কোন লোকজন ছিল না। প্রথম যেদিন এসেছিলাম এখানে, পাওয়ার সায়েব ভাবলেশহীন মুখে স্বাগত জানিয়েছিল, নীরব ভাষায়। তারপর তাকে শুধু দেখেছি, খাবার টেবিলে, পরিবেশনের সময়, আর মাঝে মাঝে তার গীটারের সুর ভেসে আসে,—কোথায় যেন একলা বসে সে গীটার বাজায়।

সেদিন এমনিধারা অশান্ত চিত্তে ঘুরতে ঘুরতে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম, ছাদের ওপর। একটু দূরে পার্কটা একখানি মনোহর ছবির মত জেগে উঠল চোখের সামনে। ঘন সবুজের মেলায় এসেছে লাল, নীল, হলুদ ফুলের রাশ। ফুটফুটে বাচ্চারা কত রং-বেরঙের পোষাক পরে, হৈ-চৈ করে খেলা করছে মাঠে। একটা কৃত্রিম পাহাড়ের চূড়োয় বসে আছে কয়েক জোড়া মুগ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা। হু, হু করে বইছে ফাগুনের মিঠে বাতাস। একজন এ্যাংলো ছেলে বাজাচ্ছে মাউথ অর্গান আর তাকে ঘিরে জটলা করছে, ওর বয়সী ছেলের দল। মনে হল একটা আনন্দের সাগরের ঢেউ-এর ঢেউ, এ দোল খাচ্ছে ঐ ছোট পার্কটা।

মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে কতক্ষণ চেয়েছিলাম সেই দিকে। মন ভরে উঠেছে, দুচোখ ছাপিয়ে দরদর করে ঝরছে জলের ধারা। সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম একটি ধ্রুব সত্যকে। যে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের জীবনে সুখ দিতে পারে না, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, ভোগ, বিলাসিতার মূল্যবান উপকরণগুলিও সুখের সন্ধান দিতে পারে না। সমগ্র বিশ্ব বা আত্মীয়-স্বজন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্ত নিরালায় দুজনে ঘর বাঁধার উদ্দেশ্য যদি হয় শান্তি স্বস্তি বা আনন্দ পাওয়া, তাহলে, সে উদ্দেশ্য চরম ব্যর্থতায় সমাধি লাভ করে, এ সত্য আমার চেয়ে কে বেশী জেনেছে? আরো অনুভব করলাম যে, আত্মীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলকে নিয়ে, আর সকলকার জীবনের আনন্দ-বেদনা, সংস্কৃতি, সংস্কার উৎসব সব কিছু মিলিয়ে, গঠিত হয় একটি পূর্ণ জীবন। আর এই পূর্ণ জীবনই ক্রমশ দেশ, কাল, পাত্রের সীমানা ছাড়িয়ে অসীম অনন্তে পরিব্যাপ্ত হয় মহাজীবনের সন্ধানে। বোধ হয় অখণ্ড এবং নিবা সুখকে আস্বাদন করার অধিকার অর্জন করা এই মহাজীবনের পক্ষেই সম্ভব।

কারণ মানুষ যা চায়, ধন সম্পত্তি রূপ যৌবন, সম্মান আভিজাত্য, এ সবই ভগবান অকৃপণভাবে দান করেছিলেন আমাকে, তবু কেন অন্তরে এই শূন্যতার হাহাকার? কিসের অভাব প্রতিমুহূর্তে দংশন করছে আমার অন্তরকে? মামার বাড়ীতে যখন ছিলাম, তখন তো এ যন্ত্রণা ছিল না। তারপর যখন চলে এসেছিলাম বাবার বাড়ীতে তখনই এক মহাবৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া একটি পাতার মত নিঃসঙ্গ, অবলম্বনহীন মনে হয়েছিল নিজেকে।

আর সেই সময় থেকেই অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল এক শূন্যতার বিরাট গহ্বর, যাকে কোনো কিছুর দ্বারাই পূর্ণ করা আর সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আমার চারপাশে দেখছি যে সব মানুষের ভিড়, ওদের দুঃখ, দারিদ্র্য, দৈন্য আছে, তবুও বিরল স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে ওদের আছে প্রাণখোলা হাসির ঝরনা। নাচ গান স্ফূর্তি আনন্দ কিছুরই অভাব নেই।

আমার সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো যেন ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় হয়ে আসছে। প্রাণচাঞ্চল্যবিহীন দেহটাকে সময় সময় যেন বড় ভারী বলে মনে হয়।

পশ্চিম আকাশে পলাশ-রং ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্লান্তিভারে অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে ফিরে চলেছি সিঁড়ির দিকে, হঠাৎ নজরে পড়লো, বিরাট ছাদের শেষ প্রান্তে সুন্দর একটি বাগান।

বড় ভালো লাগলো দৃশ্যটা! সিমেণ্ট কংক্রিটে জমাট ছাদের এক-ধারে একটু মনোরম কোমলতা। এ যেন মরুভূমির রুক্ষ বুকে একখণ্ড ওয়েসিস। এগিয়ে গেলাম ঐ দিকে।

বড় বড় টবে ফুটেছে রাশি রাশি সুগন্ধি সাদা ফুল। বেল, যুঁই, হাসনা-হানা, সাদা গোলাপ, কত রকমের অর্কিড ক্যাক্টাস, আর আবিররাঙা বোগনভেলিয়া। বাগানের পাশে ছোট্ট একটি কাঠের ঘর, তার সামনে সবুজ রং করা দুখানি মুখোমুখি বেঞ্চি। খানিক আগেই কে যেন জলের ধারায় শীতল করে রেখে গেছে জায়গাটাকে। গাছের পাতা ফুল সবই জলসিক্ত। কাঠের ঘরের ছাদটি জাল দিয়ে তৈরী। তার ওপর লতানে যুঁই যেন আতর মাখা একটি সুগন্ধি শুভ্র চাদর বিছিয়ে রেখেছে।

আঃ! বুকভরে নিশ্বাস টেনে নিলাম। শরীর মন যেন জুড়িয়ে গেল।

বেঞ্চির ওপর বসে পড়লাম। চারিধারে সাদা ফুলের পবিত্র পরিবেশ। কি সুন্দর!

মনে পড়লো মামার বাড়ীর কথা।

বাগানে দিদিমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলতাম। পূজোর জন্যে দিদিমা নিজের হাতে ফুল তুলে সাজি ভর্তি করতেন। মাঝে মাঝে সমুদ্রদাও আমাদের সঙ্গে থাকতো।

কত রং বেরং-এর সুন্দর ফুল

ছড়ানো চারিদিকে, সে সব দিদিমা তুলতেন না। আমি প্রশ্ন করতাম, —ঐ লাল, নীল ফুলগুলোকে কেন তুলছো না—দিদিমা ?

—ও ফুলে যে গন্ধ নেই দিদি। তাই ও ফুলে ভগবানের পূজো হয় না। মানুষের বেলায়ও তাই। যার শুধু ওপরের চামড়াটা সুন্দর, অন্তর সুন্দর নয় সেও ভগবানের কাছে যেতে পারে না। আর যার ওপরে রূপ থাক বা নাই থাক, ভেতরে আছে সত্য, নিষ্ঠা, দয়া মায়া, ভক্তি—এই সব উন্নত গুণগুলো, সেই পায় ভগবানের সান্নিধ্য।

দিদিমার কথাগুলো তখন ভালো বুঝতে পারতাম না, কিন্তু এখন পারি। বেঞ্চির ওপর হাতটা ছড়িয়ে, তার ওপর মাথা রেখে চোখ বুজলাম। ভাবতে সুরু করলাম নিজের কথা। তবে কি আমার ভেতর কোনো সদগুণ ছিল না ? শুধু ওপরটাই সুন্দর ? তাই কি ভগবৎ কৃপায় আমি বঞ্চিত হলাম ? [ক্রমশ।

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্য-সাধনার মূলে জীবনেষণা

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নব-জাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্যরূপে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও সমাজ সেবায়ই তাঁর আত্মনিয়োগ হয়। প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে না পড়েও বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসের টীকা লিখে তিনি জাতীয়-ঋণ পরিশোধ করেন। তাঁর দেবঋণ বা ঋষি-ঋণের প্রসঙ্গ তোলা অবান্তর। বিবেকানন্দের আয়ুষ্কাল খুব সীমিত। যে বয়সে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে কিংবা জ্ঞানাহরণ করে তখনই তিনি যে চিন্তাসূত্র রেখে গেছেন তা ভারতের তথা বিশ্বের পরম গৌরবের বিষয়।

আমরা তাঁর ক্ষুদ্র রচনা 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকাটির কথা বলছি। বীরবলের সবুজপত্রের আগে, এমন কি রবীন্দ্রনাথও যখন কথ্য ভাষায় সাহিত্যে লিখতে সাহস পাননি তখন স্বামীজীর পক্ষে কথ্য ভাষায় সাহিত্যে লেখা এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দ 'ভাববার কথা' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' কথ্য ভাষার যে গদ্যশৈলী রেখে গেছেন তা সে যুগের পক্ষে সত্যই অভিনব। কারণ, তখন বাঙলা গদ্যের জন্ম হলেও তার সূতিকাগারের অশৌচ দূর হয়নি। এমন কি যেকালে সাহিত্য রচনা করা গদ্যরীতির শুচিবাইগ্রস্ত ছিল সেকালে কথ্য ভাষার সমর্থনে ওকালতি করা সত্যই বীরত্বব্যঞ্জক কাজ বলতে হবে।

স্বামীজী যে সাধু ভাষায়ও গদ্য লিখতে পারতেন তার একমাত্র প্রমাণ তাঁর বর্তমান ভারত'গ্রন্থখানি। এর রচনার স্টাইল ধ্রুপদী। তৎসম শব্দ দিয়ে অনেকটা সাধুভাষার রীতিতে ক্রিয়াপদ কমিয়ে তিনি এই গদ্য লিখেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাঙলায় স্বাভাবিক স্রোত ও শক্তি আনা যায় কি না। বহু ক্রিয়াপদভূষিত বাঙলা বাক্য ভাষার গতি ব্যাহত করে। সমাসবহুল বিশেষণ পদ গঠন করলে বাক্যের গতি যেমন বাড়ে, তার ওজঃশক্তিও বৃদ্ধি পায়। স্বামীজী বলেছেন: 'চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকত্ব অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।'

ভাগ্যলক্ষ্মী দেবী

ভারতের মোগল বাদশাদের সরিয়ে ইংরেজ যে সিংহাসন দখল করলো একে স্বামীজী 'অভিনব' বলেছেন।

বিবেকানন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পালা শেষ হয়ে জগতে শূদ্রের শাসন কায়েম হবে। শূদ্র শাসনে দেশে খুব বড় ও বিস্ময়কর প্রতিভার উদয় হয় না সত্য, সংস্কৃতিরও অবক্ষয় হয়, কিন্তু প্রজাপুঞ্জ শিক্ষা পাবে, পেটপুরে খেতে পারবে এবং আর্থিক উন্নতিও হবে।

'বর্তমান ভারতে'র শেষাংশে বিবেকানন্দের উদাত্ত গম্ভীর আহ্বানে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। তিনি নারীর সম্মুখে তিনটি আদর্শ চরিত্র তুলে ধরেছেন—সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী। সীতার পূতচরিত্র, সাবিত্রীর মৃত্যুরোধকারী ক্ষমতা ও দময়ন্তীর অপূর্ব রোমান্টিক পতিপ্রেম ভারত রমণীর নমস্য আদর্শস্থানীয়।

স্বামীজী স্বদেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : 'ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'

এই আহ্বান সমাজতন্ত্রবাদের নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বামীজী সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন কি না জানা যায় না। তবে তিনি মানবতাবাদের যে খাঁটি অধিবক্তা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ রচনাটির সর্বশেষে বলেছেন : 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

ব্রহ্মবাদী শাক্ত ও বৈদান্তিক বিবেকানন্দ মুমুক্ষুত্বের প্রসাদভিখারী হয়েও জগজ্জননীর নিকট যে প্রার্থনা জানিয়েছেন তাতে তাঁকে মানব-ব্রহ্মবাদী বলেই মনে হয়। কারণ তিনি মায়ের নিকট কাতর হয়ে বলেন 'আমায় মানুষ কর।'

মানুষ হবার এমন আর্তি মানব-মহাপ্রেমিকের লক্ষণ। মানুষ হয়ে তিনি দেশের মানুষের দুঃখ-দৈন্যদশা ঘুচাবেন। এই তাঁর আশা।

পণ্ডিত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার চেয়ে উচ্চ প্রশংসা আর হয় না।

সমালোচকপ্রবর বলেন : 'স্বামী বিবেকানন্দের যেমন ধর্মবোধ আছে, তেমনি যুগ-সমস্যার আবেগময় অনুভূতি আছে বলিয়াই তাঁহার সন্ন্যাসী-সত্তা তাঁহার সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করে নাই।'

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
বার-এট-ল

॥ সাত ॥
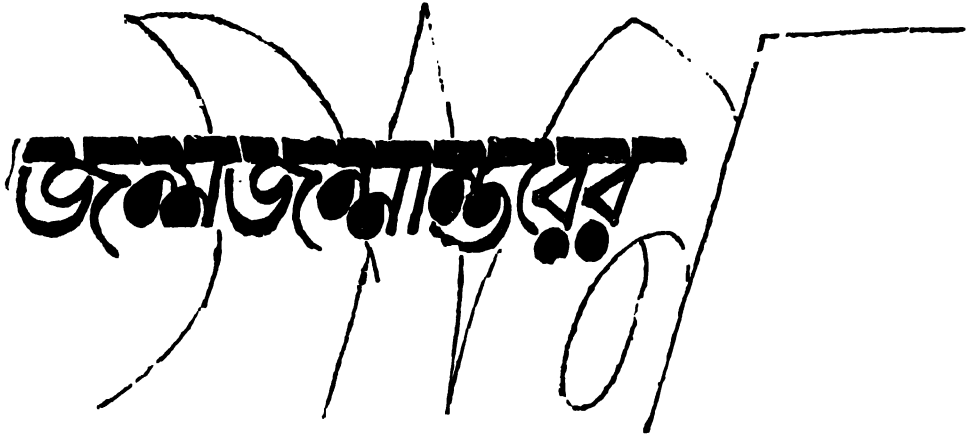
মিসেস পীচির কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে এলাম তখন স্নেহশীলা এই পক্ককেশ মহিলার মুখখানি বেদনায় উঠল ভরে এবং সত্যই চোখে জল দেখতে পেলাম।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'মিসেস পীচি আমি শপথ করে বলতে পারি আপনার কাছে কোনও রকম অসুবিধা হচ্ছিল বলে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। বরং আমি আপনার কাছে সত্যই খুব আরামে ছিলাম। সেজন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু জানেন ত' ওয়াই ভ্যালি দেখবার জন্যই বিশেষ করে এ-অঞ্চলে আমার আসা। সেই ওয়াই ভ্যালি, বিশেষ করে ওয়াই নদীর উপরেই থাকবার জায়গা যখন একটা পেয়ে গেলাম, তাই মনে করছি দিনকতক ওখানে থেকেই লণ্ডনে যাব ফিরে।'

মিসেস পীচি চুপ করে রইলেন। বিশেষ কিছু বললেন না।

বললাম, 'কোনও ছুটিতে সুবিধা করতে পারলেই আবার আমি আসব মিসেস পীচি। এসে আপনার এখানেই থাকব।'

মিসেস পীচি বললেন, 'আমার দরজা চিরকালই আপনার জন্য খোলা রইল।'

কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য আবার বললাম, 'আপনার স্নেহভরা আতিথ্যের কথা মিসেস কেনডেলকে বলবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি।'

বললেন, 'যদি সুবিধা হয় জেনিকে বললেন একবার যেন আমাদের কাছে বেড়িয়ে যায়।'

বললাম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

●

মেবেলের বাড়ী এসে যখন পৌঁছলাম দেখি মেবেল বাড়ীর ফটকের কাছে আছে দাঁড়িয়ে। আমার হাতে আমার সুটকেশ ছিল। সেটি আমার হাত থেকে মেবেল নিজের হাতে নেবার জন্য হাত বাড়াল।

বললাম, 'থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

সংক্ষেপে বলল, 'দিন না আমার হাতে'—এই বলে সুটকেশটি আমার হাত থেকে প্রায় কেড়েই নিল। তারপর বলল, 'চলুন।'

মেবেলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার একপ্রান্তে একটি বড় ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এইটি আপনার শোবার ঘর।'

সত্যই চমৎকার ঘরখানি। মেবেল চারিদিকের জানালা খুলে দিল এবং চোখ ভরে ভেসে উঠল ওয়াই ভ্যালির অপূর্ব মনোরম দৃশ্য।

মুগ্ধ হয়ে বললাম, 'কি চমৎকার।'

মেবেল বলল, 'ঐ শুনুন ওয়াই নদীর কুলুকুলু শব্দ শোনা যাচ্ছে। আপনার মনের মত হবে জেনেই এই ঘরটি আপনার জন্য রেখে দিয়েছি।'

চমৎকার ঘরখানি শোবার ঘরের উপযুক্ত সরঞ্জামে সাজান।

বললাম, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস স্মিথ। এত ভাল লাগছে যে আমি হয়ত এ-জায়গা ছেড়ে আর যেতেই পারব না।'

মেবেল মৃদু হেসে বলল, 'তাহলে ত' বেশ হবে।'

তখন গোধূলি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার কালোছায়া নেমেছে পৃথিবীর উপরে।

মেবেল বলল, 'আপনি এতটা হেঁটে এসেছেন, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আপনাকে একপেয়ালা চা বা কফি করে এনে দেব?'

বললাম, 'এখন থাক। আপনাদের সাপার খাওয়ার সময় ত' হয়ে এল।'

বলল, 'হ্যাঁ। একটু পরেই সাপার খেতে ডাকব। ততক্ষণ আপনি মুখ হাত ধুয়ে একটু জিরিয়ে নিন।'

এই বলে মেবেল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি সত্যই একটু ক্লান্ত হয়েছিলাম। সুন্দর খাটে ধবধবে বিছানার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রাণভরা একটা তৃপ্তি ও আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনা থেকে বেরিয়ে এল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে দরজায় টুক্-টুক্ করে আওয়াজ হল এবং মেবেলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আপনি কি তৈরী হয়েছেন—সাপার খেতে নামবেন কি?'

বললাম, 'হ্যাঁ আমি এখুনি যাচ্ছি।'

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ঘরের এককোণে পাতা মুখ ধোওয়া টেবিলের উপর গামলায় করা জলে মুখটা একটু

ধুয়ে নিয়ে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চলটাকে ভাল করে আঁচড়ে নিয়ে দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসেই দেখি একটু দূরে সিঁড়ির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মেবেল। বুঝলাম আমারই প্রতীক্ষায়। আমি বেরিয়ে এসে হেসে শুধালাম, 'দেরী করে ফেললাম বুঝি?'

মেবেল বলল, 'না না চলুন।'

নেমে গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম প্রশস্ত খাবার টেবিলে খাবার সাজান হয়েছে। মিসেস স্মিথ বসে আছেন, ভেরাও বসে আছে একটা চেয়ারে। মিঃ স্মিথকে দেখতে পেলাম না। ভেরা আমার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বলল, 'গুড ইভনিং।'

আমিও প্রত্যুত্তরে 'গুড ইভনিং' বলে শুধালাম, 'তুমি আজ ক্লাবে যাওনি ভেরা।'

ভেরা ঠোঁট চেপে বলল, 'নিশ্চরই গিয়েছিলাম। আমার ত' অন্যদিকে মত্তগুল হয়ে থাকার কোনও কারণ নেই।'

কথাটা যে মেবেলকে লক্ষ্য করে বলল না আমাকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাই হোক কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে শুধালাম, 'মিঃ স্মিথ সাপারে আসেন নি।'

মেবেল বলল, 'বাবার শরীর তত ভাল নয়। তিনি প্রায়ই সাপার খান না। বিকেলবেলা চায়ের সঙ্গে যা হয় কিছু খেয়ে নেন। বাবার সঙ্গে পরে আপনার আলাপ হবে। বাবার সঙ্গে আলাপ হলে আপনি খুব খুশী হবেন।'

শুধালাম, 'তিনি এখন কোথায়?'

মেবেল বলল, 'সমস্ত বিকেল বাগানটা তদারক করে বেড়ান। সন্ধ্যা-বেলা খানিকক্ষণ সেই ওক গাছের তলায় চুপ করে বসে থাকেন। একটু পরেই ফিরবেন।'

ভেরা বলল, 'বাবার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আপনার ত' গরজের কোনও কারণ নেই। যাদের সঙ্গে আলাপ করলে আপনি খুসী হন, তাদের সঙ্গে ত' আলাপ হয়েছেই।'

মেবেল একটু ধমকের স্বরে বলল, 'তুই চুপ কর।'

ভেরা বলল, 'উচিত কথা বলতে আমি কোনও দিনই ভয় করি না।'

এবার মেবেলের মা বললেন, 'ভেরা চুপ করে বসে খাও। এর মধ্যে কথা বলতে কেউ ডাকেনি।'

ভেরা বলল, 'আচ্ছা আমি চুপ করলাম, কিন্তু চোখ আমার খোলাই রইল।'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত সাপার শেষ করে আমি উপরে গেলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে এল মেবেল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'এইবার আপনি শুতে যান, আর কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

তারপর ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, 'আর কিছু রাত্রের মত প্রয়োজনীয় জিনিষ সব আছে ত'?'

তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, 'না। রাত্রে খাবারমত জল ত' রাখা হয়নি। আপনি একটু দাঁড়ান আমি এখুনিই জল নিয়ে আসছি।'

এই বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল এবং একটু পরেই কাঁচের গ্লাসে ঢাকা একটি কাঁচের কুঁজোয় জল নিয়ে উঠে এল এবং ঘরের ভিতর গিয়ে মুখ ধোয়ার টেবিলের এককোণে দিল রেখে।

আমি বললাম, 'আপনার এত কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল না। রাত্রে জল বড় একটা আমি খাই না।'

মেবেল বলল, 'তবুও থাক।'

মেবেল চলে যাচ্ছিল, আমি মেবেলকে ডেকে বললাম, 'একটা কথা বলতে চাই।'

'কি' বলে মেবেল ফিরে দাঁড়াল।

বললাম, 'যদি অসুবিধা না হয় ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় একপেয়ালা চা পেতে পারি কি?'

মেবেল বলল, 'ও বেড-টি। আপনার বেড-টি খাওয়ার অভ্যাস আছে বুঝি।'

বললাম, 'হ্যাঁ। যদি অসুবিধা না হয়।'

বলল, 'অসুবিধা আর কি। আমিই নিয়ে আসব। ক'টার সময়?'

শুধালাম, 'কখন আপনাদের ব্রেক-ফাস্ট?'

বলল, '৮টার সময় থেকে যখন আপনার সুবিধা হয়। মার উঠতে দেরী হয়, মা প্রায় ৯৷৷টার সময় ব্রেকফাস্ট খান।'

বললাম, 'আমিও একটু দেরী করে উঠি। এই ৮টার সময় বেড-টি পেলেই হবে।'

বলল, 'বেশ তাই হবে।'

আর কোনও কথা না বলে শুভরাত্রি জানিয়ে মেবেল চলে গেল। আমিও বিছানায় একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

●

পরের দিন সকালবেলায় দরজায় টুকটুক আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে দিয়ে দরজা খুলে দেখি মেবেল একটি চা-এর ট্রে হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেতে সাজান পটে চা পেয়ালা দুধ চিনি ইত্যাদি। আমি দরজা খুলে দিতেই মেবেল ট্রেটি হাতে করে ঘরে ঢুকল। ট্রেটি আমার বিছানার উপর রেখে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে চা তৈরী করতে লাগলো।

শুধাল, 'ক চামচ চিনি দেব?'

বললাম, 'এক।'

মৃদু হেসে একটু নিম্নস্বরে বলল, 'আপনার ঠোঁট দুটিতে বোধ হয় চিনি মাখান আছে---তাই এক চামচ চিনিতেই আপনার হয়ে যায়।'

মৃদু হেসে বললাম, 'নিজের ঠোঁট ত' নিজে ভাল করে চেকে দেখা যায় না। কেউ চেকে দেখে যদি বলে তবে কথাটা অবশ্য বিশ্বাস করব।'

শুধাল, 'আজ পর্যন্ত কেউ কি চেকে দেখেনি?'

বললাম, 'কিন্তু কেউ ত' ও কথা বলেনি। আজই প্রথম শুনলাম।'

মেবেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা করছিল। বললাম, 'বস না।'

বিনা দ্বিধায় আমার খাটের পাশে বসে পড়ল। কোনও সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না।

খাটে মেবেল যেখানে বসেছিল,

হাত বাড়ালেই অতি সহজে আমি মেবেলের পিঠে হাত দিতে পারতাম---কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচের বাধা এল আমার মনে।

সমস্ত দিনটা কেটে গেল, সকালবেলা মেবেল চা নিয়ে ঢুকল আমার ঘরে। ইতিমধ্যে আমি অনেকবার ভেবেছি---মেবেলের পিঠে হাতখানা রাখলে কি এমন দোষের হত। মেবেলের দিক দিয়েও সঙ্কোচের বালাই ত' ছিল না।

যাই হোক আজ মেবেল এসে চায়ের ট্রেটি খাটের উপর রেখে সহজেই নিজে খাটের উপর বসে পড়ল। 'অত কিনারায় বসেছ কেন---আর একটু সরে এস না', আমি মেবেলের পিঠে হাত দিয়ে মেবেলকে একটু কাছে টেনে নিলাম। অস্বীকার করব না মনে মনে সত্যই একটু অবাক হয়েছিলাম যে মেবেলের দিক দিয়ে কোনও বাধা বা সঙ্কোচের আভাসমাত্র পেলাম না। মনকে বোঝালাম---পল্লী-মেয়েরা বোধ হয় এইরকম সহজই হয়, শহরের মেয়েদের কলা-কৌশল তারা কোনও দিনই শেখেনি।

সরলভাবেই সব কথা বলি। এর দু'চার দিনের মধ্যেই মেবেলকে কাছে টেনে নিতে মেবেল যেন লুটিয়ে পড়ল আমার বুকে এবং আমিও চুম্বনের কয়েকটি রেখা এঁকে দিলাম মেবেলের ঠোঁটে-মুখে। শুধু লক্ষ্য করলাম মেবেলের মুখখানা লাল হয়ে একটা গাঢ় সিন্দুরের প্রলেপ যেন ছড়িয়ে গেল সারা মুখে।

পরের দিন মার্জরীকে টেলিফোন করবার সময় মেবেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা যে এতটা বেশী হয়েছে সেকথা অবশ্য কিছু বললাম না। তবে বলেছিলাম পল্লীবালাদের বেশ ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখলাম। মোটের উপর এরা সব সহজ এবং সরল বটে, কিন্তু বড়ই হালকা। একটু নাড়া দিলেই আর নিজেদের তাল সামলাতে পারে না। এলিয়ে পড়ে।

মার্জরী ঠাট্টা করে বলল, 'তুমি খুব নাড়াচাড়া দিচ্ছ বুঝি।'

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বললাম, 'না---না। আমি শুধু দূর থেকে সব লক্ষ্য করছি।'

মার্জরী বলল, 'ওয়াই ভ্যালী ত' প্রাণভরে দেখা হল, এইবার ফিরে এস।'

বললাম, 'আর ত' দিন সাতেক পরে আমাকে ফিরতেই হবে। সত্যিকথা বলছি মার্জরী বিশ্বাস কর, আর এসব পল্লীবালাদের সঙ্গ আমার ভাল লাগছে না।'

মার্জরীকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে না বললেও একটা কথা আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না যে, অত সহজে মেবেলের আমার কাছে ধরা দেওয়াটা আমার মনের দিক দিয়ে খুব যে একটা বড় আনন্দের ব্যাপার হয়েছিল তা মোটেই নয়। লুকিয়ে লাভ নাই, মেবেলকে আমি ইতিমধ্যে মনে মনে ভালবাসতে সুরু করেছিলাম। শুধু ভালবাসা নয় মেবেলের প্রতি একটা শ্রদ্ধায়ও মনটি উঠেছিল ভরে। তাই মেবেলের অত সহজে আমার কাছে ধরা দেওয়াতে সেই শ্রদ্ধায় লাগল আঘাত, তাই একটা ব্যাপারেই ধীরে ধীরে মনটা উঠল ভরে। মেবেল এত সস্তা।

এর দু-তিন দিন পরের কথা। একদিন বিকেলবেলা আমি ওক গাছের নীচে বসে আছি। সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল। দূরে প্রকাণ্ড একখানা চাঁদ আকাশের কোলে উঠেছিল ভেসে---প্রকৃতির সেই অপরূপ শোভার দিকে চেয়ে আমি তন্ময় হয়ে বসেছিলাম। এমন সময় মেবেল এসে পাশে দাঁড়াল। বলল, 'আজ ত' ক্লাবে গেলেন না। সমস্তক্ষণই কি এইখানে বসে প্রকৃতির শোভার মধ্যে তলিয়ে থাকবেন?'

বললাম, 'তা তুমিও ত' ক্লাবে যাওনি।'

মেবেল বলল, 'দেখলাম আপনার যাওয়ার কোনও গা নেই তাই আমারও যেতে ইচ্ছে করল না।'

শুধালাম, 'ভেরা? ভেরা ক্লাবে যায় নি?'

বলল, 'ভেরা ঠিক সময়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় কি বলে গেল জানেন?'

শুধালাম, 'কি?'

মেবেল বলল, 'বলে গেল---ক্লাবে তুমি আজ আর যাবে না। বুঝতেই পারছি, তোমার মানুষটির আজ ক্লাবে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, তিনি ওক গাছের তলায় ধ্যানস্থ হয়েছেন। অতএব আমি একলাই যাই।'

শুধালাম, 'ভেরা বলে গেল---তোমার মানুষটি?'

মেবেল মৃদুহেসে বলল, 'ও ধরেই নিয়েছে যে এতদিন পরে আমি আমার মনের মত মানুষটি পেয়েছি।'

মেবেলের হাতখানা ধরে বললাম, 'কথাটা কি সত্যি মেবেল?'

মেবেল সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, 'চলুন খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক।'

বললাম, 'কোথায় যাব বেড়াতে?'

বলল, 'ওয়াই নদীর ধার দিয়ে

একটি সুন্দর গ্রাম্যপথ আছে। চলুন মাঠের মধ্য দিয়ে সেই পথ ধরে খানিকটা বেড়িয়ে আসি। আপনার ভাল লাগবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বেশ ত' চল।'

আকাশের চাঁদ তখন অনেকটা উপরে উঠেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিকে একটা রহস্যের মায়াজাল। আমি ও মেবেল পাশাপাশি চলেছি ওয়াই নদীর ধার দিয়ে—ওয়াই নদীর কুলুকুলু শব্দ কানে এসে বাজছে আমাদের। চলেছি ত' চলেছি—পথের যেন আর শেষ নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ, লোকজন বড় একটা এপথে দেখা যাচ্ছে না।

এই অপূর্ব পরিবেশের ছড়ান মায়ায় আমি সত্যই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। মেবেল চলেছে আমার পাশে—কি সুন্দর তার চলার ভঙ্গি। এ-একবার মেবেলের পিঠে হাত দিয়ে তাকে একটু কাছে টেনে নিচ্ছিলাম, সেও সরে আসছিল আমার দিকে। কিন্তু বেশী নয়—দু একবার মাত্র।

মেবেল যে এতদিনে তার মনের মানুষটি পেয়েছে—ভেরার কথাটা মনের মধ্যে সমস্তক্ষণ বাজছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেরার আগের কথাগুলিও মনে পড়ল—মেবেল বড্ড নাক তোলা, সহজে কাউকে পছন্দ হয় না। তবে কি আমার জন্যই মেবেল এতদিন অপেক্ষা করছিল এই সুদূর পল্লীগ্রামে এই অপূর্ব প্রকৃতির লীলার মধ্যে? তাই কি আমাকে দেখেই চিনে নিয়েছিল এবং সহজেই আমার কাছে এগিয়ে এল পল্লীবালার স্বাভাবিক সরলতায়।

মনে মনে ভাবলাম—মেবেলকে সন্দেহ করে মেবেলের প্রতি ভুল বিচার করেছি। ঐটেই তবে মেবেলের স্বভাবের নিজস্ব ধর্ম। ভেরা ত' বলেছে আসলে মেবেল অত্যন্ত নাক তোলা—কাউকে ওর মনে ধরে না।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে মেবেলের প্রতি মনটা একটা অসাধারণ প্রসন্নতায় গেল ভরে। একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলাম মেবেলের প্রতি। মনে মনে ঠিক করে নিলাম—মেবেলই আমার উপযুক্ত মেয়ে। মেবেলকেই বিয়ে করব।

চলেছি—কতদূর যে চলে এলাম তার ঠিক নাই, তবে অনেক দূর। অন্তত মাইল দুই তিন হবেই। কেন না ক্রমে একটু ক্লান্তি বোধ করছিলাম। মাঠের মধ্য দিয়ে মেঠো পথ ওয়াই নদীর ধার দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে—চলতে চলতে চলার নেশায় দূরত্বের দিকটা আমরা যেন ভুলেই গেলাম।

বেশ খানিকটা দূর এসে দেখলাম ওয়াই নদীর রূপের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দুপারে উইলো গাছের সারি গজিয়েছে, ঝুঁকে রয়েছে ওয়াই নদীর দিকটায়।

মেবেল বলল, 'এদিকটার ওয়াই নদীর ধারে ধারে খুব উইলো গাছ—আমাদের ওদিকটায় ততটা নাই।'

বললাম, 'দু দিকে এত উইলো গাছ তবুও ওয়াই নদীর কুলুকুলু শব্দটি একটুও বন্ধ হয়নি।'

মেবেল বলল, 'না।'

আগেই বলেছি ক্রমে ক্লান্তি বোধ করছিলাম এবং খানিকটা দূরে এসে দেখলাম ওয়াই নদী বেঁকে চলে গিয়েছে অন্যদিকে এবং মেঠো পথটিও ঘুরে মাঠের মধ্য দিয়ে চলে গেল বোধ হয় অন্য গ্রামের দিকে।

মেবেল বলল, 'চল এবার ফেরা যাক্। অনেকটা হাঁটা হয়েছে।'

শুধালাম, 'তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত বোধ করছ মেবেল?'

বলল, 'না। মনের মত সঙ্গী থাকলে বেড়ান একটা আনন্দ। তাতে কষ্ট হয় না।'

যদিও আমি একটু ক্লান্তি বোধ করছিলাম, সত্যিকথা বলতে গেলে, ফিরতে আমার ইচ্ছে করছিল না। এমন সুন্দর চাঁদের আলোর রহস্যময় পরিবেশে নির্জন প্রান্তরে শুধু আমি আর মেবেল—মেবেল যাকে মনে মনে জীবনসঙ্গিনী রূপে ইতিমধ্যেই বরণ করে নিয়েছি।

হঠাৎ চেয়ে দেখি কিছুদূরে ঠিক ওয়াই নদীর বাঁকের মাথায় একটি সুন্দর এলেম গাছ—তলাটি পরিষ্কার বাঁধান। বোধ হয় শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্যই এই গাছটির গোড়া এমন সুন্দর করে বাঁধান হয়েছে।

বললাম, 'সত্যিকথা বলতে কি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। ঐ এলেম গাছের তলাটি বড় সুন্দর মনে হচ্ছে—এইখানে একটু বসি।'

মেবেল খুব উৎসাহের সঙ্গেই বলল, 'বেশ ত'। চল, তাই বসা যাক। সাপার খাওয়ার মধ্যে যদি না ফিরি মা ধরেই নেবেন আমরা সাপার খাব না।'

বললাম 'এই পরিবেশে নির্জন প্রান্তরে তুমি আর আমি—সাপার খাওয়া একদিন নাই বা হল।'

মেবেল একটু আমার কাছে সরে এল। আমি মেবেলকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বসলাম—এলেম গাছের তলায়। মেবেল আমার বাহুবন্ধনে নিজেকে ধরা দিয়ে আমার বুকে মাথাটি রেখে চুপ করে বসে রইল।

শরীর দুজনারই ক্লান্ত ছিল। কখন যে দুজনে এলিয়ে শুয়ে পড়লাম—সেই বাঁধান গাছটির তলায় খেয়াল নাই। কখন যে আমার নিবিড় বাহুবন্ধনে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে মেবেল আমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল—সবই যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেল। বিস্তারিত বিবরণে তাকে ধরা-ছোঁওয়া কঠিন।

(ক্রমশ)

কেয়াতলার সেই বাড়ীটা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

না ? হাত বাড়িয়ে মহা অনিচ্ছা প্রকাশ করল মালতী, আবার যে দুটো বেড়ে যাবে ? তাহলে এক করো, অতীনবাবুকে বলো কাল বাজার থেকে যেন আমার জন্য চারটে নেবু নিয়ে আসেন। দামটা দিয়ে দোবখ'ন। তাহলেই তোমার চারটে শোধ হয়ে যাবে। বুঝলে, অমলাদি।

অমলা হেসে জবাব দিল, আচ্ছা, আচ্ছা।

কিন্তু খুকু কিছুতেই তার বল্ দেবে না। সে মালতীর হাত ধরে টানতে লাগল, বল্ দে, বল দে মাস্সী, আমার বল্ দে।

অমলা তাড়াতাড়ি খুকুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোলে নিয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় চলে গেল আর এই অবসরে মালতী নেবু দুটো নিয়ে উঠে পড়ল।

এখানে এসে হেসে বেশ মিঠে-সুরে জিজ্ঞেস করল, কি কবিতা লিখলেন, পড়ুন দেখি।

অতীন বলল, এখনও শুধু ভাবছি, লেখা সুরু করি নি।

টেবিলের কাছে একটু এগিয়ে এল মালতী, প্রেমাংশুও কবিতা লেখে। তারপরই ফিক্ করে হেসে ফেলল, ওমা, সেদিন আমায় একটা শোনাল--- কি সব কথা, আমি আর লজ্জায় বাঁচিনে বলে সে খুক খুক করে হাসতে লাগল, আপনিও তেমনি কবিতা লেখেন নাকি ?

কি রকম ?

ঐ যে---তুমি চাঁদ, আমি ফুল, আরও কি সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা--- বলতে বলতে মালতী তার ত্রিশ বছরের ঝরে-পড়া শরীরে কালীঘাটের আঠারো বছরের মলীদির একটা অগ্নিশীর্ষ ঢেউ তোলবার অপচেষ্টা করে খিল খিল করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

ঠিক পনেরো দিন পরে কেয়াতলার এই বাড়ীতে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে গেল। কাণ্ডটা অবশ্য বলতে গেলে ঘটেছে চারদিন আগেই। কিন্তু সেটা যে কেলেঙ্কারী ব্যাপার, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চারদিন সময় গেল।

প্রথমটা বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি কেউ। সবাই ভেবেছে, স্বামী যেমন ইদানীং বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে, প্রায়ই বাইরে রাত কাটায়, মালতীও তেমনি রাগ করে প্রতিশোধ নেবার জন্য চলে গেছে কালীঘাটে বাপের বাড়ী। কিন্তু খোঁজ নিয়ে এল জিতেন সান্যাল, সেখানে যায় নি। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতেও খোঁজ নেয়া হল। চুপেচাপে তল্লাসী চলল। ত'রপর অকস্মাৎ দেখা গেল, সেদিন থেকে প্রেমাংশু আর ফিরে আসছে না। অর্থাৎ মালতীও নেই, প্রেমাংশুও নেই। দুজনেই হাওয়া। সুতরাং কেলেঙ্কারী ব্যাপার ছাড়া আর কি হতে পারে ?

প্রতিবেশীরা জানল, বাড়ীতে বাড়ীতে সরস আলোচনা আরম্ভ হল, পাড়ায় পাড়ায় জটলা সুরু হয়ে গেল এবং একদিন এই সংবাদ বালিগঞ্জ থেকে একেবারে বড়বাজারে পৌঁছে গেল। বাড়ীওয়ালা এসে হাজির হলেন। সোজা গিয়ে প্রথমে ঢুকলেন ফুল-ঠাকরুণের ঘরে। পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে এসে ঢুকলেন জিতেন সান্যালের ঘরে।

সান্যালবাবু, আপনাকে বাড়ী ছাড়তে হবে।

অপরাধ ? কঠিন স্বরে জিতেন সান্যাল জিজ্ঞেস করল।

অপরাধ আপনি কিছু করেন নি, লছমিনারায়ণ বলতে লাগলেন, অপরাধ করেছি আমি এই কেয়াতলায় বাড়ী তৈরী করে আর আপনার মত ভাড়াটেকে থাকতে দিয়ে। ক'জন তো চলেই গেছেন, যে ক'জন আছেন, সেই ভদ্রলোকদের সম্মান রক্ষার জন্য আপনার এখন চলে যাওয়াই উচিত।

সারা রাত জিতেন সান্যাল মদ খেয়েছে, কথাগুলো এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, জড়িত স্বরেই বলল, কেন, আমার বৌ-শালী ভেগেছে বলে ? আর আমি থানা-পুলিশ করি নি বলে ? তবে যে শালা ভাগিয়ে নিয়েছে, তার মেসো আর মাসী বাড়ী ছাড়বে না কেন ?

লছমিনারায়ণ শান্তকণ্ঠে বললেন, ওঁদের কাছে আমি সমস্ত ব্যাপারটা জেনে এসেছি। আপনার স্ত্রীই ঐ হাবাগোবা ছোট ছেলেটাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে।

কি বললেন, মাইরি, জিতেন সান্যাল হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, হাবাগোবা খোকা! বিয়ে দিলে অমনি দশটা খোকার বাবা হয়ে যেত, তাকে ভাগাবে ক্ষ্যামতা আছে কোন শালীর! আপনি কিসসু জানেন না, কিসসু বোঝেন না লছমিনারায়ণবাবু। দুজনে অনেক দিনই গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর চলছিল, বেঁটেদা আমায় সব বলেছে। সে দেখেছে দ্যাবা-দেবীকে আউটরাম ঘাটে নদীর ধারে বসে পেরেম করতে। তা মরুক গে, যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জিতেন সান্যাল, ও শালী পালিয়ে যাওয়ায় একরকম ভালই হল, এবার আমার খোলা মাঠ। আর শালা বিয়ের দড়ি গলায় পরি---ধ্যাৎ!

তারপর উঠে এসে লছমিনারায়ণের হাত ধরে মিনতি জানাল, মাসের এই ভাঙ্গা ক'টা দিন একটু দম ধরে থাকুন, আমি কথা দিচ্ছি---হ্যাঁ, এই ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে জিতেন সান্যাল কথা দিচ্ছে যে, এ মাসের শুধু কেন, আপনার বাকি-বকেয়া যত পাওনা আছে, সব---সব মিটিয়ে দোব, তারপর আপনার

নাকের ডগা দিয়ে ড্যাংডেঙ্গিয়ে চলে যাব, বুঝলেন? আর যদি চান, তাহলে শালা আমার বৌটাকেই খুঁজেপেতে নিয়ে নিন না। থানা-পুলিশ তো করব না, ওটা সুদ বাবদ আপনাকে দিয়ে দিলাম। এখন মেলা ঝামেলা করবেন না, যান।

বলে জিতেন সান্যাল লছমিনারায়ণের মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দিল। অপ্রকৃতিস্থ লোককে কি আর বলবেন, তিনিও ধীরে ধীরে গিয়ে মোটরে উঠলেন।

কিন্তু মাস শেষ হবার পর আরও ক'টা মাস চলে গেল, না ফিরে এল মালতী, না পাত্তা পাওয়া গেল প্রেমাংশুর। আর জিতেন সান্যালও একাই রয়ে গেল বাড়ীতে। হোটেলেই খেয়ে আসে সত্য, কিন্তু প্রায়ই রাত্রে বেসামাল হয়ে ফিরে আসে। ফিরে আসে ঠিক নয়, কারণ নিজের পায়ে আসবার মত অবস্থা আর থাকে না। বন্ধুরা ওকে ধরে ঘরে রেখে দিয়ে যায়। বিছানায় পড়ে ও আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে, তারপর এক-সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

লছমিনারায়ণ আর ওকে ঘাঁটালেন না।

কেয়াতলার এই বাড়ীর দিনগুলি আবার স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগল। নতুন কোন ভাড়াটের আসবার পথ বন্ধ। কারণ বাড়ীওয়ালা তাঁর সংকল্পে অটল, তিনি আর কাউকে ভাড়া দেবেন না। তাই কেউ চলে গেলেই সে দরজায় একটা বড় তালা এঁটে দিয়ে যান। কেউ গেলে হয়ত স্বস্তির নিঃশ্বাসই তিনি ফেলেন। কিন্তু দেখা গেছে, কেউ চলে যাবে শুনলেই এ বাড়ীতে যেন বিষাদের ছায়া নেমে আসে। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ যতই থাক, তখন সবাই তা ভুলে যায়। সবারই মন খারাপ। বিদায়কালে যে যায় আর যারা বিদায় দেয়, সবাই দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে, অনেকেরই চোখে শুধু জল দেখা দেয় নয়, কেউ কেউ হাপুস নয়নে রীতিমত কাঁদতে থাকে। আত্মীয়জনও অতটা বিচলিত হয় কি না সন্দেহ।

তারপর দিনের ব্যবধানে সবাই আবার তাকে ভুলে যায়, তার প্রসঙ্গই আর ওঠে না কখনো। ছোট ছোট তরঙ্গ তো অহরহই সৃষ্টি হচ্ছিল এই বাড়ীর সমুদ্রে কলহ-বিবাদের মধ্য দিয়ে, সে তরঙ্গ ফুঁসেও উঠত, গর্জে উঠত, উত্তাল হয়ে উঠত, মনে হত হয়ত বিপর্যয় কাণ্ডই সৃষ্টি করে বসবে। কিন্তু না, তা হত না। বিশাল সমুদ্রে সেগুলো ক্ষুদ্র বীচিমালা, সৃষ্টির পরই আবার লয় হয়ে যেত। সমুদ্র পার্টির মত নিরুদ্বেগ ও নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে পড়ে থাকত। জীবনের প্রবাহ আবার সহজভাবেই বয়ে চলত।

বিজয়বাবু নিজের দশটি ছেলে-মেয়ের কথা বলতে গিয়ে আমোদ করে নিজেকে হারাধনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মনে হয়, এই বাড়ীটাই যেন আর একটি হারাধন। হারাধনের মত বিজয়বাবুকে এখনও কাউকে হারাতে হয় নি, কিন্তু এই দুর্ভাগা বাড়ীটাকে সেই গল্পের হারাধনের মতই এক এক করে ভাড়াটেদের হারাতে হচ্ছে। এতদিন যেভাবে এক এক করে চলে যাচ্ছিল, তাতে হারাধনের ছেলেদের মতই তাদের মনে হচ্ছিল যে তারা যেন কেউ কাঠ কাটতে গিয়ে দু ফাঁক হয়ে গেছে, কেউ অত্যধিক খেয়ে পেট কেটে মরেছে, কেউ জলাশয়ে ডুবে গেছে। কিন্তু মালতী ও প্রেমাংশুর ঘটনা এ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। কালীঘাটের ডাকসাইটে জমিদার হলধর মুখুজ্জের নাতনী আর গদাধর মুখুজ্জের কন্যা পাড়া-বিখ্যাত মালতী মুখুজ্জে ওরফে মলদি, যার আঙুলের ফাঁক দিয়ে জিতেন সান্যালের মত অমন কত সান্যাল, ভট্টাচার্য, ঘোষ, বোস ও গাঙ্গুলী গলে গেছে, সে কিনা অবশেষে একটা বেকার লক্কা পায়রা বয়াটে ছোকরাকে নিয়ে ভেসে পড়ল? না কি এর পেছনে ঐ ফুলঠাকরুণেরও প্ররোচনা ছিল? অতীনরা গোপন খবর জানলেও অন্য সবাই ত' জানে প্রেমাংশু তার বোনপো। বোনপোর এই কীর্তির জন্য কোথায়, তার মনে কোন ভাবান্তর এসেছে বলে ত' মনে হয় না। সেই

আগেকার মতই চলছে তার কালীবাড়ী যাওয়া, কালীপূজা করা আর থেকে থেকে সেই কালীকীর্তনের কলি। নাকি ওদের আস্তানার খবর ওর জানা আছে? জিতেন সান্যাল না হয় মদ্যপ কিন্তু যা কিছু ন্যক্কারজনক কাজ তা সে বাইরেই সেরে আসে। স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ তার কোনদিনই ছিল না, তাই সে চলে যাওয়াতে হয়ত খুশীই হয়েছে। কারণ এবার আর খিটিমিটি করবার কেউ রইল না।

কিন্তু সুনীতি ও সুরুচির ধ্বজা-ধারিণী ঐ ভক্তিমতী মহিলাটি? অতীন ভাবল, কে জানে হয়ত ঐ পুলিনবাবুও ওর লোক-দেখানো স্বামী। আসলে সেও একজন দালাল। তাই এক দালাল প্রেমাংশু চলে যাওয়াতে তার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। রাতের ব্যবসা তার অবিচ্ছিন্নভাবেই চলছে। একবার ভেবেছিল অতীন যে সে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবে, তারপর পরেশ চৌধুরী, নকুল সাহা ও পাড়ার পাঁচ জনকে নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে খবর দেবে যে, গৃহস্থ বাড়ীতে গৃহস্থের মত বসবাসের অন্তরালে ঐ মহিলাটি সমানে পাপ ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ একবার হাত দিলেই ফুলঠাকরুণের অতীত ইতিহাসও যেমন বেরিয়ে আসবে তেমনি পুলিশ গলাধাক্কা দিয়ে ওকে বার করেও দেবে।

কিন্তু অমলা বরাবরই বাধা দিয়ে আসছে। সে বলে, যে কেলেঙ্কারী সবাই জেনেও বিশেষ হৈ-চৈ করছে না এবং যে নীরবতার সুযোগে তারা নিরুপদ্রব জীবনযাপন করতে পারছে, পুলিশ ডেকে এনে আবার তা খুঁচিয়ে তুললে নিন্দা ও অপবাদ এমনি বিশ্রিভাবে উত্তাল হয়ে উঠবে যে, ফুলঠাকরুণের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও মাথা কাটা যাবে। তার চাইতে আর ক'দিনই-বা আছে তারা? মালবিকার ছবির পরিচালনার কাজটা পেলেই ত' তারা এ বাড়ীকে নমস্কার জানিয়ে চলে যাবে। তারপর এখানে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটলেও অতীনদের কেউ কিছু বলতে যাবে না।
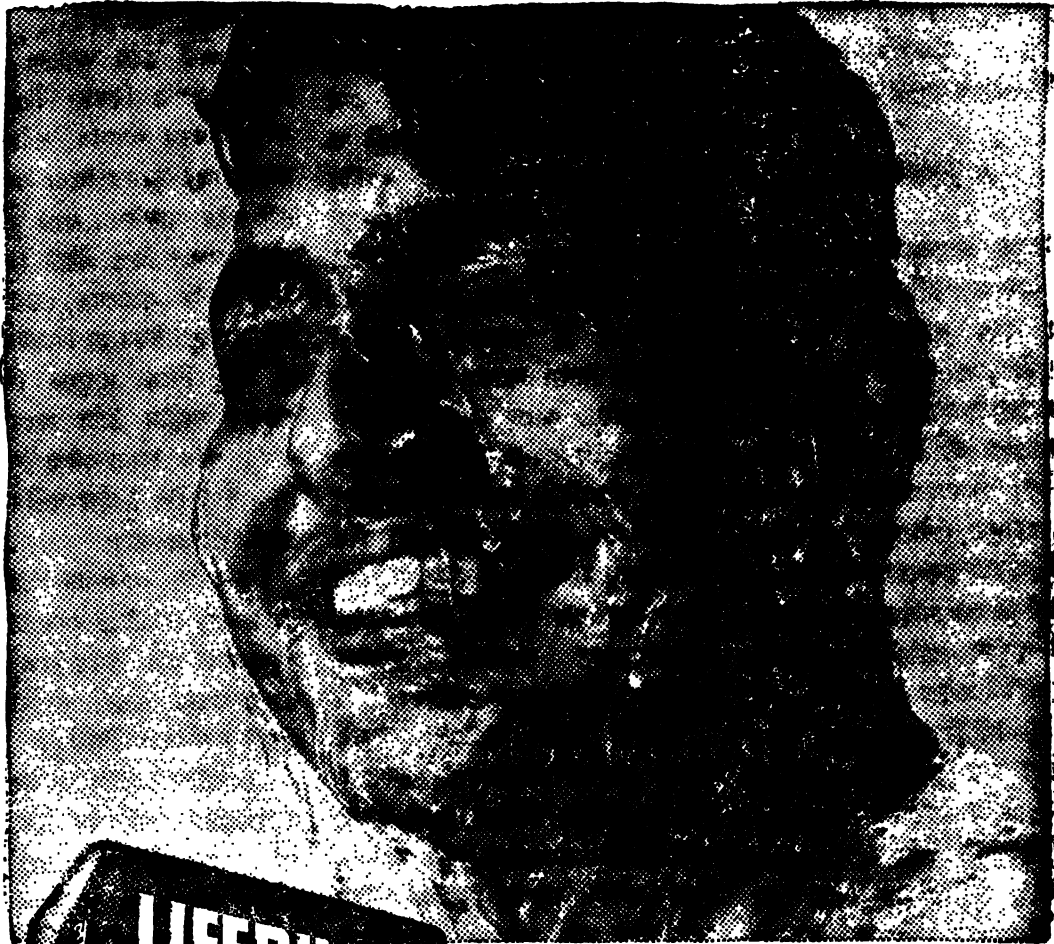
LIFEBUOY
for health
লাইফবয়
যেখানে
সেখানে

ফুলঠাকরুণের মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে তার সত্যিকার কদর্য রূপটা জগৎ-সমক্ষে উদঘাটিত করে দেবার প্রবল ইচ্ছেটা অতীন বার বার দমন করে চলেছে শুধু অমলার প্রবলতর বিরোধিতায়।

॥ সতেরো ॥

কেয়াতলা লেনের আরও উন্নতি হচ্ছে। খোয়ার রাস্তাগুলোতে পীচ পড়েছে। শেষ খানাডোবা বা নীচু জমি যা ছিল, সব ভরাট হয়ে গেছে। বেশ কয়েকখানা আধুনিক ডিজাইনের বাড়ী উঠেছে। পাঁচিলে ঘেরা, সামনে কিলিতি সব ফুলের বাগান, গ্যারেজে মোটর। রোজই এখানে-ওখানে জরীপ চলছে, ইট-সুরকি বোঝাই লরী আসছে, খাল খোঁড়া হচ্ছে। আরও বাড়ী উঠবে। দু চারটে বাড়ীর গেটে এ্যাডভোকেট, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারের নাম-ফলক দেখা যাচ্ছে। মাকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের এখন আর টিনের চালা নেই, পাকা বাড়ী। একাংশে খোলা হয়েছে মাকালী রেস্টুরেন্ট। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ভুঁড়ি বার করে কেলো ঘোষ আর মিষ্টির দোকানের কাঁচের আড়ালে বসে থাকে না। সে এখন কালীনাথ ঘোষ। হাফ সার্ট আর কোঁচানো ধুতি। মিষ্টির দোকানে নয়, রেস্টুরেন্টে ক্যাশ টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে থাকে। চারত টেলার্সের কাঁচের শো কেসে এখন আধুনিক ডিজাইনের ব্লাউজ ও সার্ট দেখা যায়। মেসিনও এখন চার-খানা। ইস্টবেঙ্গল লণ্ড্রিতে এখন ড্রাই ওয়াশের ব্যবস্থা হয়েছে কারণ তার পাশেই কলকাতার নাম-করা লণ্ড্রী কোম্পানী তাদের শাখা খুলেছে, তারা ড্রাই ওয়াশ করে। ক্যালকাটা হেয়ার কাটিং সেলুনের আর সেই খটখটে কাঠের চেয়ার নেই, এখন গদী-আঁটা এ্যাডজাস্টিবল কেদারা। কাটা চুল ঝেড়ে দেবার জন্য আর হাত লাগাতে হয় না, বিদ্যুৎচালিত কি একটা যন্ত্র মাথায় ঠেকিয়ে ধরলেই টুকরো চুলগুলো উড়ে বেরিয়ে যায়।

হোমিও ডাক্তার এ ডি সরকারের ডিসপেনসারী উঠে গেছে। সেখানে এখন হার্ডওয়ারের দোকান আর বিল্ডিং মেটেরিয়েলের। পাড়ার মধ্যে আরও ক'খানা এমনি দোকান হয়েছে এবং আরও হেয়ার কাটিং সেলুন, লণ্ড্রী ও দরজীর দোকান। ভিষক শাস্ত্রীর ঔষধালয় উঠে গিয়ে এখন হয়েছে সাধনা ঔষধালয়ের কেয়াতলা শাখা। নামহীন পলাইনার চায়ের দোকান এখন কাঞ্চনজঙ্ঘা টি হাউস। মণিহারী দোকানের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং বাজারের কাছে একটা স্কুল খোলা হয়েছে। এখন অবশ্য ক্লাশ এইট পর্যন্ত চলছে, শীগগিরই আর দুটো ক্লাশ খোলা যাবে, কারণ ছাত্রসংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। এমন কি মেয়েদের স্কুল খোলা যায় কি না, সে সম্বন্ধেও অভিভাবকদের কয়েকটা ঘরোয়া আলোচনা বৈঠক হয়ে গেছে।

যেমন বাড়ী উঠেছে, তেমনি পাড়ায় অনেক লোকেরও আমদানী হয়েছে। গোটা তিনেক ক্লাব খোলা হয়েছে। যেখানে এখনও বাড়ী ওঠেনি, তেমনি ফাঁকা জায়গায় নিয়মিত ফুটবল খেলা সুরু হয়ে গেছে।

কেয়াতলা অতি দ্রুত বিবর্ণ গ্রাম্য-রূপ পরিহার করে বালিগঞ্জের অভিজাত পল্লীর বর্ণাঢ্য শোভায় মনোলোভা হয়ে উঠছে, প্রত্যেকটি খালি জায়গায় বাড়ী উঠছে, প্রত্যেকটি বাড়ী নতুন নতুন লোকে ভরে উঠছে, শুধু সমগ্র কেয়া-তলার এই বাড়ীটার সেই নির্জনতা আর কমছে না। বরং বাড়ছে।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর নকুল সাহা এসে উপস্থিত।

অতীনদের ঘরে কেন, কারুর ঘরেই তিনি বড় একটা যান না। তাঁর ধর্মকর্ম সবই ঐ স্টুডিয়ো। হোটেলে খান, সুতরাং বাড়ীতে ফেরেন শুধু বিশ্রাম বা নিদ্রার জন্য। অনেক দিন আগে একদিন অতীনকে স্টুডিয়োতে বলে-ছিলেন, কি জরুরী কথা আছে, আসবেন। সেদিন দুবার খোঁজও করে গিয়েছিলেন। অতীন তখন বাড়ীতে ছিল না, দেখা হয় নি। তারপর নকুল সাহা এসে পড়েছেন।

সমাদর করে বসানো হল এবং অমলা চা ও বিস্কুট দিয়ে গেল। ক'দিন ধরে অমলার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে সর্বদাই আই-ঢাই করে আর ভাল করে ঘুম হয় না। খুকুর বেলায় কিন্তু এমনি কিছু হয় নি অথচ প্রথম সন্তানের বেলাতেই কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। চা দিয়েই সে আবার ও ঘরে গিয়ে খুকুকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। অতীন ঠাট্টা করে বলেছে, এবার আর রমলা-কমলা নয়, এবার নিশ্চয়ই রতীন কিংবা যতীন। সুতরাং তারই জয়জয়কার।

এ-কথা সে-কথার পর হাতের ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটে শেষ টানটা দিয়ে নকুল সাহা ওটা এ্যাসট্রেতে খুসে দিয়ে আসল কথায় এলেন, আপনাকে আমার ভীষণ দরকার অতীনবাবু।

সে ত' অনেক দিন আগেও একবার স্টুডিওতে বলেছিলেন যে, আমার সঙ্গে জরুরী কি কথা বলতে আসবেন, অতীন হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোটা আরও একটু বাড়িয়ে দিল, অমলা বলেছিল আপনি নাকি সেদিন আমার খোঁজও করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায়, তারপর ত' আর এলেন না। আপনার শুটিং কেমন চলছে?

সেই আলোচনাই করতে এসেছি অতীনবাবু, নকুল সাহা বেশ ঘন হয়ে বসলেন, শুটিং চলছিল এতদিন, কিন্তু আর বুঝি চালাতে পারব না।

কারণ?

কারণ, সাহা একবার ও ঘরের দিকে চকিতে দেখে নিয়ে বললেন, কারণ ঐ ঘটি তিনকড়িকে আর কত বোতল ঘুস দোব বলুন। আমার সঙ্গে শত্রুতা করে বাঁড়ুয্যে মুন্সীজীর কাছে লাগিয়ে আমার নেগেটিভ নীলামে চড়াবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল, সে ত' আপনি জানেনই। অথচ, আরও কত কোম্পানীর যে কত কালের ভাড়া বাকি পড়ে রয়েছে, তার ঠিক নেই।

আমি জানতাম ও ব্যাটা শুধু পান, চা আর সিগারেটেই ঘুস খায়, কিন্তু গোপনে গোপনে যে উনি একজন মালদার, তা তো জানতাম না। তবু আমি বললাম, ভেরি গুড, তাই দোব, তবু বই দুখানা আমার শেষ করে নোব। তারপর ঘটিদের একবার দেখিয়ে দোব বাঙালের ক্যারামতি। কিন্তু দেখছি অতীনবাবু, সাহার সিংহস্বর কেমন যেন মার্জারের কাঁদুনির মত শোনা যেতে লাগল, আগে ছিল তিন দিনে এক বোতল, তারপর চাইল শুটিং থাকলেই দৈনিক এক বোতল, এখন ব্যাটা বলে কিনা শুটিং থাক বা না থাক, সপ্তাহে চার-পাঁচ বোতল না দিলে---

কিন্তু ওকে ত' কোনদিন মাতাল হতে দেখি নি, অতীন খালি চায়ের কাপ দুটো টেবিলের ওপাশে সরিয়ে দিল, বাড়ীতে বসে খেলেও এত যে খায়, তাকে দিনের বেলাতেও কথা কইতে গেলে বোঝা যাবে।

নকুল সাহা বাধা দিল, না, না, ও খাবে কেন? এক ফোঁটাও ছোঁয় না। কিন্তু মাড়োয়ারীর ব্যবসায়ে ম্যানেজারী করতে করতে ব্যাটা পাকা ব্যবসায়ী হয়ে গেছে। ও সব বিক্রী করে দেয় কম দামে।---বলে হাসতে চেষ্টা করলেন সাহা, জানেনই ত' অতীনবাবু, স্টুডিয়োতে স্বনামধন্য ঘটি মালদার অনেক আছেন, কম দামে খাঁটি মাল পেলে নগদ দামেই কিনে নেন তাঁরা।

অর্থাৎ আপনার টাকা আপনি জল করে ফেললেন আর তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে সেই জল জমিয়ে আবার টাকা করে নেয়। বলে অতীন হাসতে লাগল, চমৎকার উপরি রোজগারের পথ বার করেছে ত'।

নকুল সাহা কোন জবাব দিলেন না, একদৃষ্টে লণ্ঠনের শিখাটির পানে চেয়ে রইলেন। মুখে যাঁর সর্বক্ষণ কথার খৈ ফোটে, ঘন ঘন 'ভেরি গুড' আর 'শুধু নামেই ডিরেক্টার' বলে ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইটের ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন, আজ যেন তাঁকে কেমন আনমনা কেমন গম্ভীর মনে হল অতীনের। লোকটার যত দোষই থাক, এই অভিশপ্ত বাড়ীর কোনো কুটচক্রে যেমন সে উৎসাহ দেখায় না, তেমনি প্রযোজকের সহজ সুযোগে একপাল মেয়ের সঙ্গে মিশলেও স্টুডিয়োতেও তার কোন দুর্বলতার কথা শোনা যায় নি। পূর্ব-বঙ্গের ধনী ধানচালের ব্যবসায়ী, কে তার মাথায় সিনেমার ব্যবসা ঢুকিয়ে দিয়েছে। লোকটা আবার এমনি সরল যে, ব্যবসার চাইতেও ঘটিদের একহাত দেখিয়ে দেবার ভাবপ্রবণতায় একেবারে মেতে গেছে। ধান-চালের ব্যবসায়ে যখন সে পারদর্শী, তখন ছবির ব্যবসা পারবে না কেন সে? কিন্তু অতীনের মনে হল, লোকটা সিনেমা লাইনে বোধহয় কোথাও ঘা খেয়েছে, বাঁড়ুয্যের বোতল যোগানোই একমাত্র কারণ নয়। তবু উৎসাহ দেবার জন্যই অতীন বলে উঠল, আরে মশাই, একখানি ছবি বাজারে ছাড়বার ব্যবস্থা করে ফেলুন, দেখবেন ঐ বোতল কেন, পিপে ভর্তি টাকা হাতে আসতে থাকবে।

অতীনের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নকুল সাহা ধীরে ধীরে বললেন, আজ পর্যন্ত আড়াই লাখ ঢেলেছি অতীনবাবু, বিশ্বাস করুন।

আড়াই লাখ! অতীন বিস্ময়ে চেয়ে রইল, বলেন কি! আড়াই লাখ দুখানা সাধারণ ছবির পক্ষে যথেষ্ট। এতে আর কোন ডিসট্রিবিউটরের কাছে হাত পাতবার কথা নয়। এ টাকায় দুখানা ছবির কাজ হেসেখেলে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। তবে আবার ফ্লোরের ভাড়া বাকি পড়ল কেন নকুলবাবু?

বাকি কি সাধে পড়েছে অতীন বাবু, নকুল সাহা বলতে লাগলেন, সিনেমা জগতে যে এত প্যাঁচ কে জানত তা? নকুল সাহা তারপর সেই প্যাঁচগুলোর কথা এক এক করে বিবৃত করতে লাগলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল, আবেগে কাঁপতে লাগল, কাঁচের পশ্চাতে চোখ দুটোও বুঝি ছলছল করে উঠল। তারপর এক সময় নিজের পরাজয়ের বেদনার কাহিনী শেষ করে আলোর উজ্জ্বল শিখাটির পানে পলকহীন নয়নে চেয়ে রইলেন এবং অবশেষে বললেন, অতীন বাবু, আমি পাকিস্তানে ফিরে যাব।

চমকে উঠল অতীন, তারপর উৎসাহ দিতে চেষ্টা করল, না, না, ফিরে যাবেন কেন? অজানা ব্যবসায়ে প্রথম নেমেছেন বলেই খানিকটে বেকায়দায় পড়ে গেছেন। আপনার টাকার যখন অভাব নেই, তখন আরও কিছু লাগালেই দেখবেন পুরোটা না হলেও অনেকখানি উঠে আসবে। এর পরের বার অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে আর লোকসান সইতে হবে না। প্রায় সমস্ত প্রডিউসারেরই এই একই ইতিহাস। সামান্য দু চারজন ভাগ্যবান আছেন, যাঁরা প্রথম ছবিতেই লাল হয়ে গেছেন।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন নকুল সাহা, কিন্তু আর আমার টাকা নেই অতীনবাবু। হুণ্ডি কেটে নয়, ব্যাঙ্কেই টাকা আনাই, নিজের লোকই নিয়ে আসে। তাই কমিশন বা বাট্টা কাউকে কিছু দিতে হয় না, পুরোটাই পাই। কিন্তু আর পাওয়া যাবে না। দাদা লিখেছেন, এবার ধানচালের অবস্থা ভাল নয়। তারপর আমাদের কমলাঘাট বন্দরে আগুন লেগে অনেকের সঙ্গে আমাদেরও পাঁচ পাঁচটা ধানের আড়ত পুড়ে গেছে। আমাদের বাড়ীটা বন্দর থেকে আধমাইলটাক দূরে, তাই বাড়ীটা ও বাড়ীর লোকজন বেঁচে গেছে। বন্দরেই যারা থাকত, তারা প্রায় এগারো জন পুড়ে মরেছে। বাড়ীতেই আমাদের চারটে ধানের গোলা ছিল বলে রক্ষে, নইলে আমাদের অতবড় পরিবারের তেত্রিশ জন লোকের খোরাকি চলাই কঠিন হয়ে যেত।

নকুল সাহা সিগারেটের টিনের ঢাকনিটা খুলে হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন, তারপর মুখ নীচু করে বললেন, দাদা লিখেছেন বন্দরের তিনটে সিন্দুকের সব টাকা জলে গেছে, আর টাকা পাঠানো সম্ভব হবে না। আমি পাকিস্তানে

চলে যাব অতীনবাবু। আমার ছবি দেখানার একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। যা পাই, তাতেই আমি বিক্রী করে দোব।

নকুল সাহা নীরব হলেন। অতীনও নীরব রইল। বেশ বড় রকমের ঘা খেয়েছেন নকুল সাহা। তাই অর্ধসমাপ্ত ছবি দুখানা জলের দরে ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের মত পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে চাইছেন। কিন্তু কে কিনবে ওঁর ছবি? হয়ত কোন কোন পরিবেশক আগ্রহী হতে পারেন, কিন্তু অতীনের তা জানা নেই। তারপর ছবির মূল্য দিয়ে ছবি কিনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ছবির ব্যাপারে দেনার দায়টাও তো ঘাড়ে এসে পড়বে। সে দেনার পরিমাণই বা কত, কে জানে।

কি বলবে, অতীন খুঁজে পেল না। নকুল সাহা চাকতিটা চেপে বসিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, কিন্তু কোন ঘটিকে দেবেন না, অতীনবাবু। আর তারা হয়ত পছন্দও করবে না, নেবে না। দুটো ছবিই আমার বাঙাল দেশের গ্রাম, গ্রাম্য চাষাভূষা, তাদের সামাজিক জীবন, তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে তোলা, এখানকার প্রডিউসরদের তা হয়ত ভাল লাগবে না। কিন্তু আমি ত' প্রডিউসরদের জন্য ছবিতে হাত দিই নি অতীনবাবু, টাকার জন্যও এদেশের কোন পরিবেশকের কাছে হাত পেতে নিজের গলা বাড়িয়ে দিই নি। আমি চেয়েছিলাম, নকুল সাহা কি ভেবে দেয়ালে বিলম্বিত নিজের ছায়াটার পানে তাকালেন, তারপর আবেগে বললেন, আমি চেয়েছিলাম, বাংলা দেশ ভাগ হবার ফলে যারা সোনার বাঙালের দেশ ছেড়ে এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়ে এলেও তারা সে দেশের গ্রামকে যেন না ভোলে, বাপ-দাদার দেশের যে মাটিতে তারা মানুষ হয়েছিল, শহরের চাকচিক্যে এসে যেন সেই মাটির কথা তারা না ভুলে যায়। তাই আমার ছবি সেই বাঙালদের ফেলে-আসা গ্রামের কাহিনী। এ ছবি সেই দর্শকদের জন্য, এতে ব্যবসা করাই আমার আসল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পারলাম না, অতীনবাবু। আর টাকা আনাতে পারব না।

এবারও অতীন কি বলবে খুঁজে পেল না। সব সময়ই লোকটাকে মনে হয়েছে চালিয়াৎ, বেশবাস ও চলাফেরা থেকে সুরু করে সিনেমা-শিল্পে যুগান্তর এনে ঘটিদের সায়েস্তা করবার লম্বা লম্বা বুলি শুনে মনে হত, লোকটা আর দশজন রিফিউজীর মতই পাকিস্তানে একটা বিশাল জমিদারী আর চকমিলান অট্টালিকা ফেলে-আসার কাল্পনিক কাহিনী ঝাড়ছে, আসলে ভাঁড়ে মা ভবানী। কিন্তু আজ যেভাবে ও যে ভাষায় লোকটা তার ব্যবসায়িক বিপর্যয়ের কথা বলল এবং পাকিস্তানে সবাইকে রেখে একা এই পশ্চিমবঙ্গে এসে ছবির মধ্য দিয়ে তার নিজের বুদ্ধিমত ছিন্নমূল মানবতার সেবা করার যে আদর্শের কথা ব্যক্ত করল, তার ফলে অতীনের এতদিনকার ধারণার সৌধ যেন ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল। নকুল সাহার চরিত্রের একটা উজ্জ্বল দিক ঝলমল করে উঠল। বাইরের আচরণ দেখে অনেক সময় মানুষের অন্তরের পরিচয় সঠিকভাবে বিচার করা যায় না। এ সত্য আর একবার জানা গেল।

আর বেশীক্ষণ কথা না বলে নকুল সাহা একসময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ অতীনের নজরে পড়ল উনি সিগারেটের টিনটা ফেলে গেছেন। কিন্তু তার বারান্দায় বেরিয়ে আসার আগেই সাহা নীচে চলে গেছেন। বোঝা গেল অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে গেছেন। উদগত অশ্রু চাপবার জন্যই লোকটা পলায়ন করল কি না কে জানে। অতীনের ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, থাকগে অতীনবাবু, আমার কাছে আরও টিন আছে। কালকে নিয়ে আসব'খন।

খেতে বসে অতীন সব কথাই অমলাকে বলল। অমলার কানেও কিছু কিছু পৌঁছেছিল। অমলা বলল, দেখ, নিজের দেশের মানুষের জন্য লোকটার কতখানি দরদ, কত মায়া। ওখানকার লোক এখানে এসে যাতে ওখানকার কথা না ভুলে যায়, শুধু সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই একেবারে অনভিজ্ঞ হয়েও সে সিনেমায় হাত দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলেছে, হয়ত আরও ঢালত, যদি না ওদের ব্যবসায়ে অমনি বিপর্যয় ঘটত। তার ফলে কৃতকার্য কতখানি হতে পারত বা আদৌ হত কি না, সেটাই বড় কথা নয়, বড় কথা ওর দেশপ্রেম, দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা।

অতীন মৃদু হেসে বলল, সেইজন্যেই লোকটা বাঙাল বলতে একেবারে পাগল। পশ্চিমের বা পশ্চিম বাঙলার লোকদের উপর ওর যে সত্যিই একটা আক্রোশ আছে, তা নয়। আসল কথা ও পূব বাঙলাকে এত ভালবাসে যে, এখানে এসে সর্বদাই পশ্চিম বাঙলার উপর খড়্গহস্তের ভাব দেখায়, পাছে এই বাঙলাকেও ভাল লেগে যায়। অদ্ভুত লোক। বিচিত্র ওর চিন্তাধারা।

ওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেল।

বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড গরম। তেমনি প্রচণ্ড মশা। অতীন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রাত এগারোটা বেজে গেছে। বালিগঞ্জ স্টেশনের ওদিকে আকাশটা
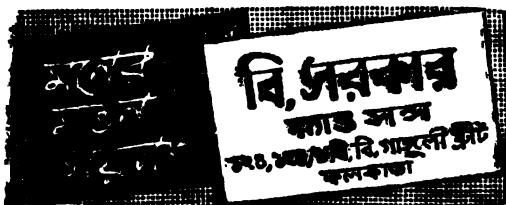
আলোর ছটায় উজ্জ্বল। মালগাড়ী শান্টিং হচ্ছে। পাড়ার দু একখানা বাড়ীতে তখনও বোধহয় আহারপর্ব শেষ হয় নি। আলো জ্বলছে। কথা-বার্তার শব্দ ভেসে আসছে।

ধীরে ধীরে পাশে এসে দাঁড়াল অমলা। কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, চল, শোবে চল।

অতীন তাকে বুকে টেনে নিল, বলল, লোকটার জন্য মনটা খারাপ লাগছে।

অমলা বলল, আমারও।

কিন্তু নকুল সাহার অর্ধ-সমাপ্ত ছবি কে নেবে? একেবারে নিজের লেখা কাহিনী না হলেও পূব বাঙলার কোন এক অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোককে দিয়ে লিখিয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর নাম শোনা যায় নি। তারপর গল্পের ধর্ম অনুযায়ী, বিশেষ করে সিনেমার গল্পের ছক অনুযায়ী লিখতে পেরেছেন কি না কে জানে। দেশের লোককে দেশের কথা মনে করিয়ে রাখাই যার উদ্দেশ্য, সে হয়ত একটা প্রচারমূলক কাহিনীই রচনা করিয়েছে, টিকিট ঘরের কথা মনেও ভাবে নি। তার বদ্ধমূল বিশ্বাস, এমনি করে সে ছবির মোড় ঘুরিয়ে দেবে। পশ্চিম বাঙলার চিত্র-জগৎকে নতুন শিক্ষাদান করবে। ওখান থেকে সঙ্গে করে পরিচালক আর টেকনিসিয়ানদের আনতে পারেনি বলে এখানকার লোকদেরই অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে নিয়োগ করেছে। তাও আপাতত। এর পরের ছবিতে সব ছেঁটে ফেলে দিয়ে নিজেই সমস্ত কিছু করবে বলে বার বার ঘোষণা করে থাকে। টেকনিসিয়ান এখান থেকে নিতে হলেও এদেশের একটিও আর্টিস্ট নেয় নি নকুল সাহা। নিজের পছন্দমত বাছাই করে নিয়েছে সমস্ত পূব বাঙলার পুরুষ ও মেয়ে। অনেকগুলো চরিত্রের মুখে পূব বাঙলারই ভাষা থাকলেও যাদের নেই, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার ভার দিয়েছে ঐ পরিচালকের উপর। নিজেও পশ্চিম বাঙলার কথা প্রায় নিখুঁতভাবেই রপ্ত করে ফেলেছে। তাই নিজেও শিক্ষকতা করতে ছাড়েনি।

লোকটার সর্বদাই ভয় এখানকার কোন লোকের হাতে কিছু ছেড়ে দিলে হয়ত সে ওখানকার কাহিনীর মেজাজটাই ব্যাহত করে ফেলবে। ফলে, তার ছবি করার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে। তাই নকুল সাহা কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা থেকে সুরু করে পরিচালনা, সম্পাদনা, এমন কি, প্রতিদিনকার শুটিংয়েও নিজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য নিজের রুচি ও পছন্দ আরোপ করে থাকে।

কিন্তু ছবি যারা কিনবে, তারা কিনবে নিছক ব্যবসায়ের মতলব নিয়ে। শুধু পূব বাঙলায় কেন, সারা বাংলা দেশ, সারা ভারতে ছবিখানা চলবে কি না, সর্বাগ্রে সেটাই হবে তাদের বিবেচ্য। প্রদর্শনের পরিধি যত বড় হবে, ততই বেড়ে যাবে তাদের লাভের অঙ্ক, এ সহজ সত্য তাদের অজানা নয়। অখ্যাতনামা কাহিনীকার, অতি সাধারণ পরিচালক ও একেবারে অজ্ঞাতনামা আর্টিস্টের ছবি যে সে প্রতিশ্রুতি বহন করে আনতে সক্ষম নয়, তাও তারা ভাল করে জানে।

সুতরাং নকুল সাহার অসমাপ্ত ছবির ক্রেতা হিসেবে কারুর কথাই মনে এল না অতীনের। কারুকে বলবার ভরসাই পেল না। (ক্রমশ।

লণ্ডন-এ পতিতাবৃত্তি

১৯৫৯ খৃস্টাব্দের পনেরই আগস্ট লণ্ডন-এ পতিতাবৃত্তি নিরোধকল্পে একটি নূতন আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল। বারবনিতাদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক ভঙ্গীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ আসিতে থাকায় এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। বিশেষত লণ্ডন-এ তাহাদের অত্যাচার না কি অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। তাহারা গৃহস্থপাড়ায় পর্যন্ত হানা দিতে শুরু করায় অবস্থা কেলেঙ্কারীর স্তরে পৌছায়।

পূর্বে প্রতিদিন প্ররোচনাদানের অভিযোগে কয়েকজন পতিতা ধরা পড়িত এবং দোষ স্বীকার ও পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা দিয়া মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় একই কাজে লিপ্ত হইত। নতুন আইনে প্রচুর জরিমানা, বারংবার একই অপরাধে অপরাধীদের কারাবাস ইত্যাদির বন্দোবস্ত হয়। ইহার ফলে তাহাদের অপরাধ প্রমাণ করিবারও প্রয়োজন ফুরাইল।

এই আইনের উদ্দেশ্য লণ্ডন-এর রাস্তাঘাট পতিতামুক্ত করা, পতিতা-বস্তির উচ্ছেদ নয়।

ইহার ফলে রাস্তাঘাট ভদ্রস্থ হইয়াছে। সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা গিয়াছে প্ররোচনাদাতাদের সংখ্যা শতকরা নব্বই ভাগ কম এবং এই লক্ষণীয় সংখ্যা হ্রাস কেবল লণ্ডন-এই নয়, ঘটিয়াছে সারা দেশে। পুলিশের কড়াকড়ি বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে এই ক্ষেত্রে। তাছাড়া, নারীর অবৈধ উপার্জনের উপর নির্ভরশীল পুরুষের সংখ্যাও কমের দিকে—এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার আগে ছিল মাসে গড়ে সতের জন, এখন মোটামুটি ছয় জন।

আপাতদৃষ্টিতে সুতরাং আবর্জনা সাফ্ বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু, বস্তুতপক্ষে এই নতুন আইন ময়লা ঢাকা দিয়াছে মাত্র, পরিষ্কার

লণ্ডনে পতিতাবৃত্তি

করিতে পারে নাই। নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে।

'মডেল' 'রক্ষিতাকে [illegible]'

ইত্যাদি ছদ্মবেশে যথারীতি পতিতাবৃত্তি বিজ্ঞাপিত হইতেছিল। পুলিশ কড়াকড়ি করায় 'সোহো' হইতে ঐগুলি উঠিয়া যায়। তারপর কয়েকটি বিশেষ জাতের সাময়িকপত্রে, এমন কি টেলিফোন নম্বর সমেত, ঐ ধরণের বিজ্ঞাপন চালু হয়। বিজ্ঞাপনে পণ্যা নারীর দেহের মাপ থাকে।

আগে পতিতাদের ধরা হইলেও তাহাদের মক্কেলরা বে-আইনী কাজ না করায় রেহাই পাইত। এখন তাহাদেরও জরিমানা হয়।

আগে কোন গৃহ হইতে মক্কেল জোগাড় করায় আইন ভঙ্গ হইত না। এই দশক হইতে তাহা বে-আইনী।

নতুন আইন হওয়ার সময় অনেকে এই বলিয়া আশংকা প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহার ফলে নতুন ধরণের অপরাধ এবং অপরাধী সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহাদের আশংকা পুরাপুরি ভুল প্রমাণিত হয় নাই।

লণ্ডন-এ ঐ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ক্লাব এবং মদ্যপানালয়ের সংখ্যা হু-হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। এইগুলি কুখ্যাত এবং কদর্য ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র এবং বাহির হইতে মক্কেল যোগাড়ের নিমিত্ত দালাল নিযুক্ত করে।

এইগুলির অধিকাংশের নিযুক্ত পরিচারিকরা আসলে বারাংগনা এবং তাহারা খরিদ্দারদের দামী রঙীন পানীয় কিনিতে সাফল্যের সহিত প্ররোচিত করে। প্রচুর পয়সা খরচ করিবার পর তাহারা অনুগৃহীত করিয়া থাকে কালেভদ্রে। এই ব্যবসায় প্রচুর অর্থ লগ্নী হইয়াছে এবং পতিতারা এখন ক্লাবগুলির পরিচালকবৃন্দের উপর নির্ভরশীল।

সন্দেহ নাই, বহু আংশিক পতিতা এবং বয়স্কা নরনারী নতুন আইনের ফলে ঐ বৃত্তি ছাড়িয়া অন্যত্র কাজ খুঁজিয়া লইয়াছে। কেউ কেউ অবশ্য এখনও রেস্তোরাঁ, ক্যান্টীন, কাফে ইত্যাদি জায়গায় দেহ-ব্যবসায় চালায় সুযোগমত।

কেউ আবার বিরাট রেলওয়ে স্টেশন-এ ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া খরিদ্দার সংগ্রহ করে। হোটেল লাউঞ্জ [illegible]

সম্বল। চোখের সামান্য ইংগিত বা হাসির আভাস দেখিয়াই অভিজ্ঞ পুরুষ বুঝিয়া লয় এবং ভিন্ন দরজা দিয়া বাহির হইয়া বাহিরে সাক্ষাৎ করে।

'কল-গার্ল'ও আছে। তবে, বাড়ি ভাড়া, আসবাব ভাড়া, ঝি, নিয়মিত বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে খরচ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এই জাতীয় দেহোপজীবিনীরা সংখ্যায় স্বল্প।

কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের মত নারীর অবৈধ রোজগারের উপর নির্ভরশীল পুরুষের সংখ্যা আবার বাড়তির দিকে। কেন না, রাস্তায় দুইটি নরনারী হাত ধরাধরি করিয়া হাঁটিলে গ্রেপ্তার করা যায় না। অথচ, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মক্কেলের আবির্ভাব হওয়ামাত্র পুরুষটিকে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

আগে যে সব রাস্তা থাকিত নীরব, কোলাহলহীন, সেই সব রাস্তায় কিছু-দিন যাবৎ লোক চলাচলের মাত্রা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে।

'স্ট্রিপ টীস্' ক্লাব লণ্ডন-এর পুরানো সংস্থা। নতুন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে এইগুলির সংখ্যা রীতিমত বাড়িয়াছে। অবশ্য, পতিতাবৃত্তির সহিত এইগুলির সম্পর্ক পরোক্ষ। ১৯৬০ খৃস্টাব্দের গণনায় জানা গিয়াছিল এই ক্লাব-এর মোট সদস্যসংখ্যা দশ লক্ষ। বিখ্যাত প্রথম দশটির সদস্য সংখ্যা ২৫০,০০০।

সভ্যরা নিয়মিত চাঁদা দেয় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে। চাঁদা দেওয়ায় আইনমত প্রমাণ হয় এইগুলি 'প্রাইভেট' প্রতিষ্ঠান, 'পাবলিক' নয়।

এখানকার প্রমোদ বিতরণের ভার গণিকাদের উপর ন্যস্ত নাই এবং ইহারা সভ্যদের গণিকা সংগ্রহ করিয়া দিবার কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য মক্কেলসন্ধানী গণিকার সাক্ষাৎ মেলে এবং ইহার চারিপাশ মক্কেল-শিকারীদের লীলাভূমি।

সুতরাং সংগত কারণেই বলা চলে ক্লাবগুলি পতিতালয়ের ধার ঘেঁষিয়া যায়। কয়েকটি ত' স্পষ্টতই জুয়াচুরীর আড্ডা, কারণ যে যৌন সম্ভোগের সুবিধার কথা তাহারা জানায়, তাহার ব্যবস্থা করে না।

পতিতাবৃত্তির নবরূপ সম্পর্কে ইংলণ্ড-এর পারলামেণ্ট-এ এই দশকের গোড়ার দিকেই অসন্তোষ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, আজও এই সমস্যার কোনও সুষ্ঠু সমাধান হয় নাই।

হওয়া সম্ভব কি? পতিতাবৃত্তি সভ্যতার সমবয়সী। কিন্তু ইহা যে সব মিলাইয়া কুফলপ্রদ তাহা আধুনিক দুনিয়ার সমাজতাত্ত্বিকবৃন্দ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন এবং এই প্রথা দূর করা সম্ভব কোন প্যালিয়েটিভ আইনের ভড়ং করিয়া নহে, একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ দিয়া। যেমন করিয়াছে রাশিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। সমাজের এক অংশ নিজে বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে আকৃষ্ট করিয়া রাখে পতিতাদের। তাহাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যূনতম নিরাপত্তা নাই। সুতরাং এই গোড়াকার সমস্যাটির সমাধান না হইলে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের ইচ্ছা দিবাস্বপ্ন থাকিয়া যাইবে।

কেবল লণ্ডন নয় প্যারিস, ন্যুইয়র্ক—পৃথিবীর তাবড় শহরগুলিতে (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাদ দিয়া) পতিতাবৃত্তির ব্যবসা বোলবোলাও। ইহা বন্ধ করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহা অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কর্ণধারগণের নাই। —বাৎস্যায়ন

প্রজাপতি কার্যালয়-এর স্থান ভারতীয় সমাজে

অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে একটা পরিবর্তন আজ এত চালু হয়েছে যে, সেটা আর নতুন কিছুর পর্যায়ে আছে কিনা সন্দেহ। এটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য-বোধ। নিজস্ব পৃথক সত্তার প্রতি প্রবল অনুরাগ। অত্যন্ত সামাজিক মানুষও বোধ করি এই অনুভূতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত নন।

প্রজাপতি কার্যালয়---বিবাহেচ্ছু নরনারী যে প্রতিষ্ঠানে নাম লেখান বিয়ের ইচ্ছায়, আধুনিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত। কিন্তু ঘটক এবং ঘটকালী শব্দ দুটো আমাদের দেশে সুপরিচিত। সুতরাং দীর্ঘকাল আগে থেকেই যুবক-যুবতীর বিবাহ-নির্বন্ধ তৃতীয় ব্যক্তিমাধ্যমে চলে আসছে।

কিন্তু আজ একটা প্রশ্ন উঠেছে। এই মধ্যস্থতা কি বাঞ্ছনীয়? কেন না, এটি মানলে কি ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বিত হয় না? এই মতে, সঙ্গী নির্বাচন একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, মধ্যস্থতা এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। প্রজাপতি প্রতিষ্ঠানের নাম শুনলেই এদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, ভাবেন কল্পলোকের 'প্রিয়' বা 'প্রেয়সী' ধরা দেবেই একদিন, বৃথা এই আত্ম-খর্বকারী প্রয়াস।

বাস্তববোধের রায় কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এ কথা মানতে হয় বিপত্তি অসংখ্য এবং মনোমত পাত্র-পাত্রী লাভ কোটিকে গুটিকের হওয়া সম্ভব কাব্যসম্মত বিশুদ্ধ রোমানস ঘেরা কুঞ্জপথে। ফুল না ফুটলেও বসন্ত আসতে পারে, আসেও; তবে সেই সংগে গৃহিণীসচিবসখা প্রিয়শিষ্যা-ললিতকলাবিধৌ আসেন না বড় একটা। ফলত, প্রচলিত বাংলা প্রবাদে,---লাখ কথায় বিয়ে---গলতিবিশেষ আছে বলে মনে হয় না।

প্রজাপতি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব তাই উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষত সহুরে মানুষ, বয়স যার বিয়ের গড়বয়স ছাড়িয়েছে, কোন বিশেষ কাজে যিনি লিপ্ত রুজির তাগিদে এবং শিক্ষার বৈশিষ্ট্যে স্ত্রী সম্পর্কে যার মনে নির্দিষ্ট পূর্ব ধারণা দৃঢ়মূল, তার পক্ষে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এখনও ভারতে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা এমন সর্বাঙ্গীণ বা নিঃসংকোচ হয়নি যে, তরুণ-তরুণী নিজেদের মনোমত পাত্রী-পাত্র খুঁজে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

সহরতলী বা গ্রামের ছবি অবশ্য কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

কাজেই মানতে বাধা নেই আজকের শিল্পপ্রধান সহরে জীবনে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।

ক্রমেই বেশিসংখ্যক মানুষ জীবিকার তাগিদে সহরে ভিড় জমাচ্ছেন কালকের সহরতলী আজ শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত। বস্তুত আধুনিক সভ্যতার ভিত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অদক্ষ দক্ষ কারিগর, এনজিনীয়ার কারুরই পর্যাপ্ত সময় নেই সঙ্গী নির্বাচনের। জীবনযাত্রার মান উচ্চাভিমুখী। প্রয়োজন মেটাতে তাই অন্য জীবিকার মানুষও অস্থির। এর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যমে নীড় বাঁধার সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে কি না সন্দেহ।

অনেকেই আজ এখানে কাল সেখানে; কাজও পালটায় কারো কারোর। সংগী খুঁজে নেবে কী ক'রে?

তা ছাড়া, যারা ব্যবসা বা বিশেষ কোনও বৃত্তি অবলম্বনে ইচ্ছুক, প্রস্তুতিতে তাদের সময় কেটে যায়, শুরুর পর প্রতিষ্ঠিত হতে করতে হয় প্রাণান্তকর পরিশ্রম। সুতরাং মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে স্ত্রী-স্বামী নির্বাচন এ সব ক্ষেত্রে ঘটা দুরূহ।

পাশ্চাত্যে বিবাহবিচ্ছেদ সাধারণ ঘটনা। এটি আজও ভারতে উপরতলা-কার নগণ্য ব্যাপার। ওদেশে তাই দ্বিতীয় বিবাহের সময় প্রথম স্ত্রীর সন্তানাদির কথাও বিবেচ্য। কাজেই, এই ক্ষেত্রে প্রজাপতি প্রতিষ্ঠান খুব কাজে আসে।

এ কাজে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিচালকের দক্ষতা এবং নৈতিক মান সম্পর্কে সচেতনতা। এ দু'টির অভাবে গোটা ব্যাপারটাই বিপর্যয়কর হয়ে ওঠা সম্ভব। সুতরাং এ ধরণের প্রতিষ্ঠানে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করানোর আগে পরিচালক সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য ব্যবসার মত প্রজাপতি কার্যালয়ও ভালমন্দ দুইই হতে পারে। কোনটা বেশ ভাল, উপকারে আসে বিবাহেচ্ছু নরনারীর। কোনটা হয়তো আইন বাঁচিয়ে যতদূর নিকৃষ্ট হওয়া সম্ভব তাই।

পাশ্চাত্যে আজকাল এ ধরণের প্রতিষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়। সমাজতাত্ত্বিকরা বলছেন, ব্যবস্থাটি ভালই। তাঁরা হুঁশি-য়ারী জানাচ্ছেন এই বলে যে, এ ব্যাপারে উভয়পক্ষের ধীরগতিতে এগোন উচিত, পারস্পরিক সামাজিক পটভূমি, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, রুচি ইত্যাদি খুঁটিয়ে বিচার ক'রে তবেই পরিচয় সার্থকতার প্রসাদ পেতে পারে।

ভারতে এখনও এ জাতীয় ব্যবস্থা তেমন প্রসারলাভ করে নি। করছে ধীরে ধীরে। পাশ্চাত্য সমাজ-তাত্ত্বিকদের লম্বা যদি পড়ে একটা আশংকা জাগে: শেষে ব্যাপারটা কচি সংসদীয় না হয়ে ওঠে। চায়ে ক' চামচ চিনি—এই সমস্যার সমাধান করতেই না যৌবন ফুরোয়।

—নির্বন্ধক

ভালোবাসা

আত্তিলিও বের্তোলুচ্চি (১৯১১)

তোমার নরম সুন্দর চোখদুটোর মধ্যে
ডেজিফুলের মুকুটপরা চাঁদটা হেসে ওঠে,
রুপোলী হরিণীরা
আকাশের কিনারায় খেলা করে।

ফুলগুলো রক্তে রাঙা হয়ে গেছে.....
দূরে, বহুদূরে, রাত্রির গভীরে
অন্ধকার সমুদ্রে
যেন একটি পালতোলা জাহাজ.....

কিন্তু শীঘ্রই
শুকনো সুরেলা পাঁপফুলের মরসুম আসবে,
এবং নারী হয়ে তোমাকে
ফিরে আসতে হবে।

অনুবাদক—পারোমা ভট্টাচার্য

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

॥ এগারো ॥

বিমল শুধালো, 'কার কথা জিজ্ঞেস করছেন অলকাদি?' বলেই তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমাকে দেখতে পেল, 'ও চিরঞ্জীব, আমার মামাতো ভাই।'

মহিলার নাম তবে অলকা। তিনি বললেন, 'ওঁকে যেন আগে কোথায় দেখেছি; ঠিক মনে করতে পারছি না। কোথায় দেখেছি বলুন তো আপনাকে?' জিজ্ঞাসু চোখে মহিলা আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, 'ভূষণবাবুর ওখানে।'

'কোন ভূষণবাবু?'

'ঐ যে যিনি ছেলেমেয়েদের পাইকিরি দরে মাথা কাঁপিয়ে দিচ্ছিলেন।'

এবার মনে পড়ে গেল। মহিলা যেন ভেতরে ভেতরে একটু গুটিয়ে গেলেন। হয়ত কিছুটা বিব্রত; কেন না সেদিনকার স্মৃতি তাঁর পক্ষে খুব মনোরম নয়। নিস্পৃহ সুরে তিনি বললেন 'ও'---

বিমল অবাক হয়ে গিয়েছিল। সবিস্ময়ে বলল, 'আপনাদের আগেই আলাপ-টালাপ হয়ে গেছে নাকি?'

মহিলা বললেন, 'আলাপও হয় নি, পরিচয়ও হয় নি। আমরা দু-জন দু-জনকে দেখেছি শুধু।'

বিমল বলল, 'ভূষণ মানে আমাদের কবিরাজ---সারী নামে যার একটা বিউটিফুল মেয়ে আছে?'

চোখের তারায় বিদ্যুৎ হেনে কেমন করে যেন হাসলেন মহিলা। রক্তাভ নরম ঠোঁটে দুটি ঝকঝকে দাঁত বসিয়ে

বিমলের গালে আস্তে তর্জনীর টোকা দিয়ে মহিলা বললেন, 'নটি বয়।'

একটু চুপ। তারপর বিমল বলে উঠল, 'কি ব্যাপার অলকাদি, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন নাকি? ভেতরে যেতে বলবেন না?'

মহিলা লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললেন, 'ওমা তাই তো। এসো তোমরা, এসো।'

পর্দা ঠেলে সামনের ঘরে ঢুকলেন মহিলা; আমরা তাঁর পিছু পিছু গেলাম।

ঘরখানি চমৎকার সাজানো। সোফা, কৌচ, ডিভান, দরজায়-জানালায় রুচি-শোভন পর্দা, দেওয়াল-ছাদ ডিস্টেম্পার করা। দুটো ঝকঝকে কাঁচের আলমারি চোখে পড়ল; একটাতে নানারকম দেশ-বিদেশের পুতুল। আরেকটাতে বই। বইগুলো কেউ কোনদিন খুলে দেখেছে বলে মনে হয় না; চিরদিন ওগুলো অনাঘ্রাত অস্পৃষ্ট থেকে যাবে বুঝিবা। বই যে গৃহসজ্জার উপকরণ হতে পারে, ধারণা ছিল না। মাঝখানে একটা ত্রিকোণ পিলার ঘিরে দুষ্প্রাপ্য আকড়ের টব বসানো। দেওয়ালে যামিনী রায়ের ছবি, সুদৃশ্য ওয়াল বুক—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহিলা বললেন, 'বসো।'

আমরা সোফায় বসে পড়লাম; মহিলা একটি নীলিকেতনী মোড়া টেনে মুখোমুখি বসলেন।

সেদিন সকালেই লক্ষ্য করেছিলাম মহিলার বয়েস তিরিশ পেরিয়েছে।

অন্তদিনেও না, মধ্যদিনেও না—দুয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় তাঁর রূপ থমকানো। উপমা দিয়ে বলা যায়, তাঁর দেহে বর্ষার ঢল আর নেই। আষাঢ়-শ্রাবণের প্লাবনে ভাদ্র-আশ্বিনের স্তব্ধতা এসেছে; দু'চার বছরের ভেতরেই সেখানে যুগপৎ শীতের আর ভাঁটার টান ধরে যাবে হয়ত।

রূপ যাই হোক, শরীরময় আকর্ষণের বস্তুগুলো এখনও রীতিমত শাণিতই। কামের অমোঘ অস্ত্রে যে-কোন পুরুষকে বিদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর অটুট আছে।

বিচিত্র ভ্রূভঙ্গ করে মহিলা বললেন, 'তারপর বিমল—'

'বলুন—' বিমল সোজাসুজি তাকাল।

'সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছে বলতে

মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ফিক-ফিকিয়ে বললেন, 'ইয়েস।'

'বাপটা বনমানুষ-মার্কা। কিন্তু মেয়েটি খাসা। ঐ বাপের ঐ মেয়ে, দেখেও বিশ্বাস হয় না।'

'যা বলেছ। তবে—'

'কী?'

'ভূষণ কবিরাজকে কমপ্লিমেণ্টস দিতে হয়; পৃথিবীকে ঐ রকম একটা সুন্দর জিনিস উপহার দিয়েছে।'

'রাবিশ।' বিমল বলতে লাগল, 'আর বাপকে নিয়ে আমাদের 'হেডএক'-টাই বা কিসের? মেয়েটিকে—' কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল সে।

'কেন ?'

'তুমি হঠাৎ এ-বাড়িতে ধুলো দিলে ; তা পথ ভুলে নাকি ?'

'পথ ভুলে হবে কেন ? আমি তো প্রায়ই আপনাদের এখানে আসি।'

'প্রায়ই আসো ? রীয়ালি ?'

একটু থতমত খেয়ে গেল বিমল, 'প্রায়ই বলতে রোজ না। এই তো দিন-দশেক আগে এসেছিলাম।'

'দিন-দশেক।' চোখ গোল করে মহিলা বললেন, 'স্মৃতিশক্তির যে রকম নমুনা দেখাচ্ছ তাতে কিন্তু ভয় পেয়ে যাচ্ছি।'

'কি রকম ?'

'দশ দিন না, পাকা দেড়টি মাস পর তুমি এখানে হানা দিলে।'

'কখন আসি কখন যাই, আপনি কি তার দিন-তারিখ হিসেব করে রাখেন ?'

'নিশ্চয়ই।' মহিলা বলতে লাগলেন, 'ডাইরি খুলে দেখিয়ে দেব শ্রীমান বিমল চট্টোপাধ্যায় লাস্ট কবে আমার এখানে এসেছিল ?'

বিমল স্তম্ভিত, 'আপনি ডাইরিতে এসব লিখে রাখেন নাকি ?'

'রাখি বৈকি।'

'তাতে লাভ ?'

'লাভ কতখানি বলতে পারব না। তবে—' দুই ঠোঁটের ফাঁকে উথলে -ওঠা একটা হাসিকে টিপে টিপে খুন করে ফেললেন মহিলা।

'তবে কী ?' বিমলকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাল।

'আমি দেখতে চাই, কতদিন তোমাদের ধরে রাখতে পারি। যদি দেখি ছ'মাসেও একবার আসছ না, বুঝব, আমার দাম কানাকড়ি হয়ে গেছে।'

'আপনার হিসেবমত দেড় মাস পর এলাম ; ছ মাস পর এলে যদি কানাকড়ি হয়ে যান এখন আপনার দাম কত ?'

'অঙ্ক-টঙ্ক করে পরে বলব।'

বিমল হাসতে লাগল।

মহিলা বললেন, 'থাক ফাজলামি রাখি।' বলে আমার দিকে ফিরলেন।

আমি তাকিয়েই ছিলাম, এবার স্নায়ুগুলিকে সজাগ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মহিলা বললেন, 'তোমাকে কিন্তু 'তুমি' করে বলব ; আমার চাইতে বয়েসে ছোটই তো হবে।'

বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তুমিই তো বলবেন। আপনার চাইতে কি, ও আমার চাইতেও ঢের ছোট।'

বিমলের কথার উত্তর না দিয়ে মহিলা আমাকে বললেন, 'তোমার আপত্তি নেই তো ?'

'আজ্ঞে না।'

'তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানি না।'

'আমার নাম চিরঞ্জীব বন্দ্যো-পাধ্যায়।'

'আমার নাম অলকা—বিমল আমাকে অলকাদি বলে। তুমিও তাই বলতে পারো।'

ঘাড় কাত করে জানালাম, অলকাদিই বলব।

মহিলা অর্থাৎ অলকাদি বললেন, 'তুমি কোথায় থাকো ? যাদবপুরেই কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওমা, আজ্ঞে-টাজ্ঞে আবার কি ?' অলকাদি গালে তর্জনী স্থাপনা করে বললেন, 'আমি তোমার জ্যেঠশাশুড়ী নাকি ?'

ঠাট্টাই, তবু আমার কান গরম হয়ে উঠল। অস্ফুটে কী বললাম, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট হল না।

অলকাদি মোড়া থেকে উঠে একটা সোফায় নিজেকে আধেক ঢেলে দিলেন ; বাকি অর্ধেকের ভার রাখলেন একটি হাতের ওপর। তারপর শুধোলেন, 'যাদবপুরে কোথায় থাকো ?'

বললাম।

এবার বিমলের দিকে তাকালেন অলকাদি, 'তোমার একটি মামাতো ভাই তোমাদের বাড়ি থাকে একথাটা তো আগে বল নি ?'

এসেছে ; দু-তিন দিন মোটে হল।'

'তার আগে কোথায় ছিল ?'

বিমল সব বলল।

খানিক অন্যমনস্কের মত অলকাদি বললেন, 'পাকিস্তানে থাকা আর বোধ হয় সম্ভব না। তাই না চিরঞ্জীব ?'

অলকাদির কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল না, এ-ব্যাপারে তাঁর খুব দুর্ভাবনা আছে। আমি ঢাকা থেকে এসেছি ; তাই বোধ হয় পাকিস্তানের উল্লেখ করলেন। অলকাদি যে প্রশ্নটা করেছেন সীমান্তের এপারে পা দেবার পর থেকে তার উত্তর আরো অনেকের কাছে দিয়েছি। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।

এ-প্রসঙ্গে অলকাদি আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একটুক্ষণ নীরবতা ; তারপর বিমলকে বললেন, 'ভালো কথা, খালি বকবকই করছি। কী খাবে, বল ? চা,কফি না অন্য কিছু ?'

চা ! কফি !' তেতো বড়ি গিলবার পর যেমন দেখায় বিমলের মুখখানা তেমনি হয়ে গেল, 'মাইরি অলকাদি, ফর গড্স্ সেক, চা-কফির নাম করবেন না। আপনার কাছে তেষ্টা মেটাতে আসি'—

চোরা চোখে দ্রুত একবার আমাকে দেখে নিয়ে অলকাদি বিমলকে শাসন করলেন, 'আ:, বিমল তুমি বড্ড বাঁদর হয়েছ। কাজুবাদাম দিয়ে লক্ষ্মীছেলের মত কফি খাও।'

বিমল কী বুঝল, কে জানে। হতাশ মুখভঙ্গি করে করুণ গলায় বলল, 'দেড় মাস পর এলাম, কফি খেতে বলছেন। বেশ।'

আমি ঢাকা জেলার সুদূর অভ্যন্তরে আমতলি নামে এক অখ্যাত নগণ্য গ্রামের ছেলে। ভূগোলের কোলাহল থেকে অনেক, অনেক দূরে সেই সামান্য জনপদটিতে তৃষ্ণা মেটানোর একটিমাত্র পানীয়ই আমাদের জানা, তার নাম জল। চায়ে না। কফিতে না—অন্য কোন্ তরলে বিমলের পিপাসা মেটে কে বলবে। বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম।

কফি এল, কাজুবাদাম এল

—দেবদত্ত
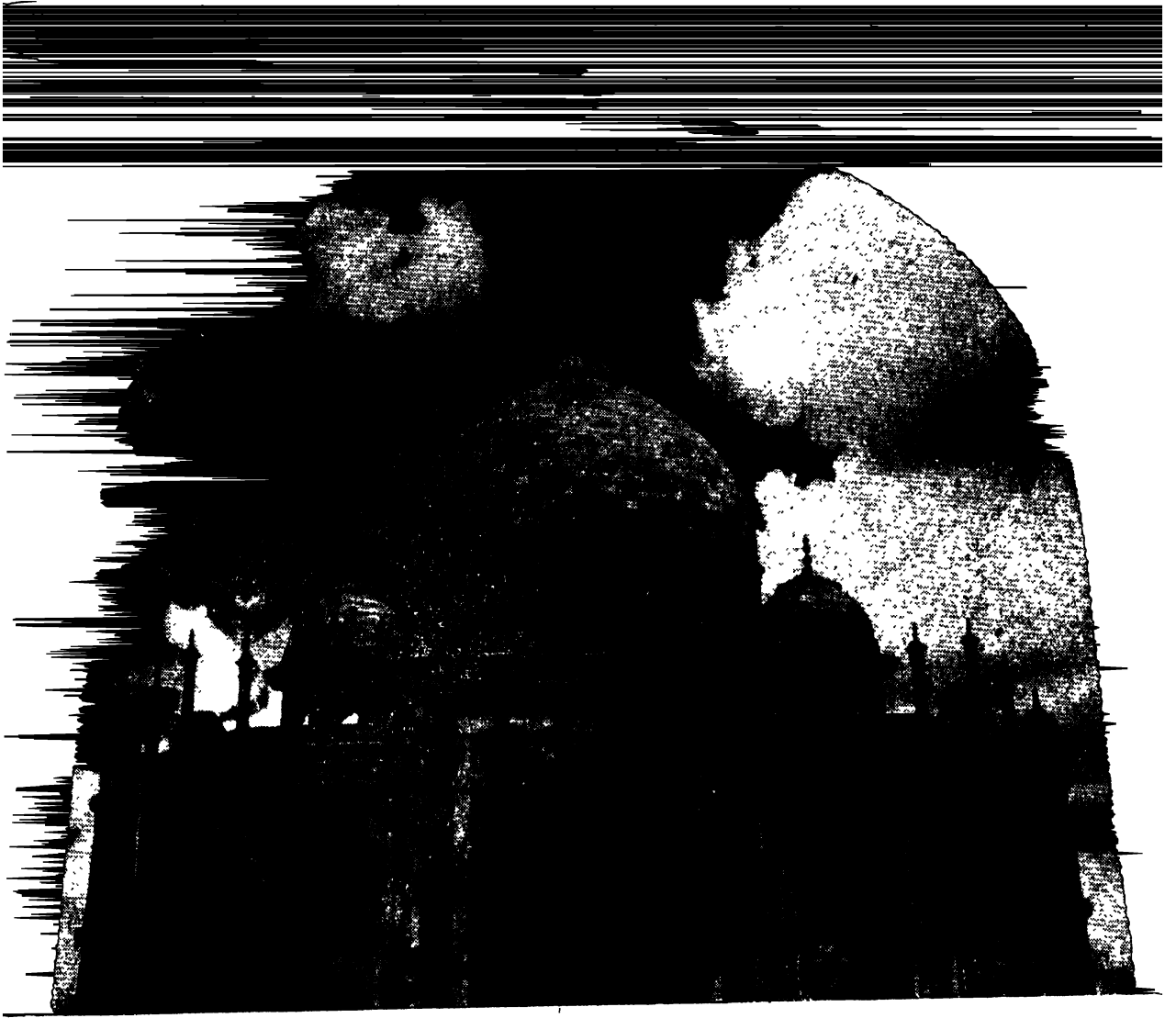
বিড়ালের খেলা

—কল্যাণ সরকার

মাসিক

বসুমতী

বৈশাখ / '৭৫

মঙ্গলের জন্য—
—বেলা সেন

মাসিক

বসুমতী

বৈশাখ / '৭৫

চা-চক্র
—বিশ্ববন্ধু বসাক

—আশুতোষ সিংহ
(১ম পুরস্কার)

প্রতিযোগিতা—ঝরাপাতা

—অঞ্জনকুমার নন্দী
(২য় পুরস্কার)

ঝরাপাতা

—নারায়ণ হালদার

(৩য় পুরস্কার)

পুরীর সমুদ্র

—প্রিয় গোস্বামী
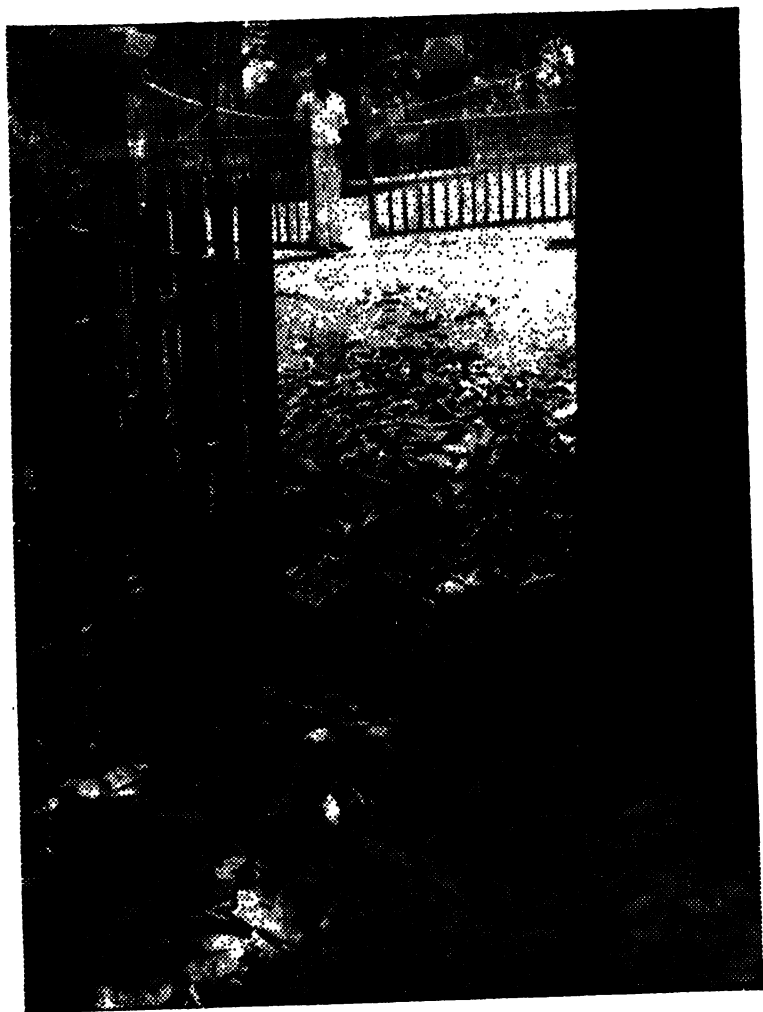
খাচ্ছিলাম ঠিকই কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। নাকের সামনে চাকরির টোপ ঝুলিয়ে এ আমাকে কোথায় নিয়ে এল বিমল। এই সুসজ্জিত চমৎকার ঘরে এক মোহময়ীর মুখোমুখি আরামদায়ক সোফায় শরীর সঁপে দিয়ে কফি আর কাজুবাদাম খেতে খেতে কোন্ স্বর্গলোকের চাবি হাতের মুঠোয় এসে যাবে, জানি না। অন্তত জীবিকার সন্ধান যে এখানে পাব না, সে ব্যাপারে আমি নিঃসংশয়।

কফিতে ছোট্ট চুমুক দিয়ে অলকাদি বললেন, 'তারপর বিমল—'

'বিমল তক্ষুণি সাড়া দিল, 'কী বলছেন?'

'এতকাল পর হঠাৎ কী মনে করে?'

'একটা বিশেষ দরকারে এসেছি অলকাদি।'

'বিনা উদ্দেশ্যে যে আসো নি তা বুঝতে পেরেছি; তেমন সৌভাগ্য আমার নয়। কী দরকার বলে ফেল।

একটু ইতস্তত করে বিমল বলল, 'চিরঞ্জীবের জন্যেই আপনার কাছে আসা।'

'কী ব্যাপার বল তো'—অলস শিথিল শরীর আস্তে আস্তে তুলে সোজা হয়ে বসলেন অলকাদি। তাঁর দু-চোখে যুগপৎ কৌতূহল এবং প্রশ্ন।

খুক্ খুক্ কেসে গলা পরিষ্কার করে নিল বিমল। তারপর বলল, 'চিরঞ্জীবকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে হবে।'

'চাকরি।'

'ইয়েস।'

একটা চাকরি পেলে আমি বেঁচে যাই; বাবা-মা সবিতাকে পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসে বাঁচাতে পারি। আমাদের প্রাণ-ভ্রমরা তা হলে এই মহিলাটির হাতে। স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে আমি খাড়া হয়ে বসলাম।

অলকাদি বললেন, 'তুমি তো আমায় বিপদে ফেললে ভাই—'

বিমল শুধালো, 'কি রকম?'

'চাকরি কি আমার হাতে যে দিয়ে দেব—'

'চাকরি আপনার হাতে নেই জানি। তবে—'

'তবে কী?'

'যাদের হাতে চাকরি তারা আপনার হাতে। হাতে কেন, তারা আপনার আঁচলে বাঁধা।'

অলকাদি উচ্ছল গলায় বললেন, 'কি যে বলো ভাই, তার ঠিক নেই। চাকরি দেবার মালিকেরা নাকি আমার আঁচলে বাঁধা।'

তোষামোদের সুরে বিমল বলতে লাগল, 'আপনার কাছে যারা আসে, একটা আঙুল তুলে যদি তাদের বলেন, আগুনে ঝাঁপ দাও, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝাঁপ দেবে। যদি বলেন সাগরে লাফিয়ে পড়; তারা সাগরে লাফাবে। যারা প্রাণ দিতে পারে তারা আপনি বললে একটা চাকরি দেবে না?'

চোখের তারা নাচিয়ে মারা দেহে বিচিত্র সংকেত ফুটিয়ে অলকাদি বললেন, 'যারা আসে আমার কথায় প্রাণ দিতে পারে বলছ?'

'সিওর।'

'তুমি পার?'

'পরীক্ষা করতে পারেন।'
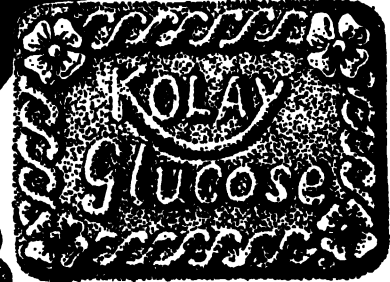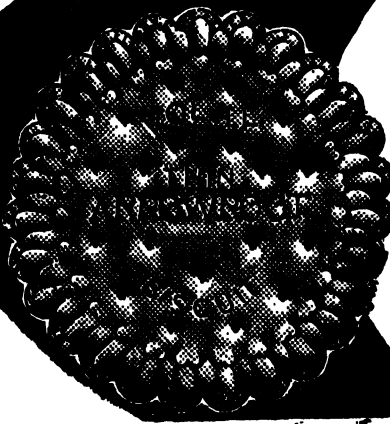
মনে রইল। যথাসময়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে।'

বিমল বলল, 'আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত।'

'দেখা যাবে।' অলকাদি হাসতে লাগলেন।

তৃপ্তিতে তোষামোদে দেবী সন্তুষ্ট; যে-কোন মুহূর্তে একটা বর দিয়ে বসা আশ্চর্য কিছু নয়। বিমল সুযোগটা ছাড়ল না, 'আপনি যদি সদয় হন একটা ফ্যামিলি বেঁচে যায়।'

বাধা দিয়ে অলকাদি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সদয়-টদয়, ও কি কথা। চিরঞ্জীবের জন্যে আমি চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা-টেষ্টা না, চাকরি একটা দিতেই হবে। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।'

'তাড়াতাড়ি বলতে?'

'আজ হলে আজই। এখন হলে এখনই।'

অলকাদি হেসে ফেললেন, 'এখন আর কোথেকে দিচ্ছি! আসছে উইকে একবার খোঁজ নিও, কেমন?'

'আচ্ছা।' বিমল ঘাড় কাত করল।

এরপর এলোমেলো অসংলগ্ন কথায় আরো অনেকটা সময় কাটিয়ে দিনের আয়ু কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে আমরা উঠে পড়লাম।

অলকাদি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আলাপ-টালাপ হল। সময় পেলে মাঝে-সাঝে এসো।'

জানালাম, আসব। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মহিলাকে যখন প্রথম দেখি তখন থেকেই বিচিত্র এক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছিল। ভেবেছিলাম, ভূষণের বাড়ি সেই দেখাই শেষ দেখা। কিন্তু নিতান্ত অভাবনীয়ভাবে তাঁর সঙ্গে যে আবার যোগাযোগ ঘটবে, তাঁর হাতেই যে আমার জীবনকাঠি রয়েছে, এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল? আমার পক্ষে তা ছিল অকল্পনীয়, অপ্রত্যাশিত।

বিমল তাঁর নামটাই শুধু বলেছে— অলকা, অলকাদি। কিন্তু কী তাঁর সামাজিক পরিচয়, তিনি কী করেন, সে সব কিছুই বলে নি। বিমলের কথা থেকে যেটুকু ইঙ্গিত পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে সমাজের উচ্চ চূড়োর বাসিন্দাদের সঙ্গে অলকাদির রীতিমত ঘনিষ্ঠতা আছে। সে ঘনিষ্ঠতা কী সূত্রে আমার জানা নেই। বিমলের সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কী, বুঝতে পারি নি। তবে দু-জনের ভেতর রহস্যময় অন্তরঙ্গতা যে আছে, অনায়াসেই টের পাওয়া যায়।

সেই কৌতূহলটা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল যেন। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দ্বিধান্বিত স্বরে বললাম, 'আচ্ছা বিমলদা—'

বিমল দূর আকাশে কি দেখতে দেখতে যাচ্ছিল; ফিরে তাকাল, 'কী বলছ?'

'মহিলাটি কে?'

'কেন, অলকাদি।'

'নামটা তো জানিই। বলছিলাম—' বলতে গিয়েও চুপ করে গেলাম।

আমার না-বলা কথার মধ্যে একটা অনুচ্চারিত প্রশ্ন ছিল, সেটা বোধ হয় ধরতে পারল বিমল। বলল, 'বুঝেছি। কিন্তু—'

'কী?'

'মুখে বলে অলকাদির পরিচয় কতটুকু দিতে পারব? আর এক-আধদিন দেখে তাঁকে বোঝাও যায় না। অলকাদি তো তোমাকে মাঝে মাঝে আসতে বলল। আসতে থাকো, আসতে আসতেই একদিন তাকে চিনে ফেলবে; ওকে বুঝতে আমাদেরও অনেকদিন লেগেছিল।'

আমি চুপ করে রইলাম।

বিমল আবার বলল, 'একটা কথা শুধু তোমাকে বলতে পারি।'

অসীম আগ্রহ নিয়ে তাকালাম।

বিমল বলল, 'অলকাদিকে আমাদের প্রাণ-ভ্রমরা বলতে পার। সে না থাকলে যাদবপুরের অনেকেই আত্মহত্যা করে বসবে। সী ইজ দি হার্ট থ্রব অব দিস লোকালিটি।'

এসময়ে এলোমেলো দ্রুত ছুড়ে টানার মত কি একটা সংকেত আমার স্নায়ুর ওপর ঝড় বইয়ে দিতে লাগল।

●

বাড়ি ফিরতেই প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হল সে মঙ্গল। মঙ্গল বলল, 'এই যে দাদাবাবু, কোথায় গিছলেন? আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান।'

বললাম, 'একটু দরকারে বেরিয়েছিলাম। কী ব্যাপার, খুঁজছ কেন?'

'এক ভদ্রলোক আপনার জন্যে দু-ঘণ্টা ধরে ধন্না দিয়ে আছে।'

'কে বল তো?'

'চিনি না। আপনার ঘরে বসিয়ে রেখেছি।'

বিমল সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে গেল, আর আমি লম্বা লম্বা পায়ে একতলায় নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

যদি বাঁচতে চাও

শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়

যদি বাঁচতে চাও আর পাঁচজনারই মত
তবে জীবনকে অত
নিবিড় করে আঁকড়ে ধরো না

যদি জড়াতে চাও ফলে-ফুলে সৌরভে আর
তবে শিকড় ধরে অত টেনো না

যদি চলতে চাও সবার সাথে মিলে-মিশে
তবে আর
গোঁজামিলের হিসেব নিও না

আর—
যদি সুখের জন্য দিতে চাও জীবন
তবে অত গভীর করে ভালবেসো না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার শেষে সবে আপিস ফাইলগুলো ঘাঁটতে বসেছি। শরীর মন কিছুই ভাল ছিল না। বেওয়ারিস মনটাকে একরকম জোর করেই বসিয়েছি আজকের এই ছুটির দুপুরে। ছিলাম একলা ঘরে।

দরজায় 'নক' করতে শুনে বিরক্ত মনে অগত্যা চেয়ার ছেড়ে উঠতেই হল। চেনা-অচেনার বিস্ময় নিয়ে ফিরে এলাম আপন আসনে। সামনের আসন দেখিয়ে বসতে বলেছি ভদ্রমহিলাকে। পাশের বাড়িই থাকেন। সেইটুকুই মুখ-চেনা পরিচয় মাত্র।

হঠাৎ যে কিছু একটা হয়েছে তা তাঁর চেহারা থেকেই আন্দাজ করা যাচ্ছে। বাড়ির দোরগোড়া পেরিয়ে এই কয়েক পা আসতে তাঁকে যে মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে চোখ মুখ তার পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। সংশয় আর সংকোচে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে। বেশ বুঝতে পারলাম থুতু দিয়ে তা একটু ভিজিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন।

কোনরকমে সংকোচ কাটিয়ে বললেন, দেখুন বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। তাই আপনি বিরক্ত হলেও আমি কিন্তু নিরুপায়। তারপর বুকের হতাশাকে জোর করে চেপে আস্তে আস্তে বললেন, আমার স্বামী গত দুদিন হল বাড়ি ফেরেন নি।

কথাটা অনেক কষ্টে শেষ করেই ভদ্রমহিলা যেন ঘরের সমস্ত বাতাস একলাই শুষে নিলেন। কেন না আমি যেন সেই মুহূর্তে কেমন বাতাসের অভাব বোধ করলাম। আর ভদ্রমহিলা আগের চেয়ে কিছু সুস্থ বোধ করছেন মনে হল।

বললেন, আপিসে হদিস করতে গিয়ে জানলাম, দু'বছর আগে সেখানকার চাকরি তাঁর গেছে। এখন কোথায় খবর করি বলুন তো?

জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, কোন বিপদ হয়নি তো? কিন্তু মনে হল এ প্রশ্ন নিরর্থক। তাঁর স্বামীর পরিচয় এর আগে আমার পথেঘাটে মিলেছিল। প্রশ্ন করে বসলাম, এর আগে কখনও এমন বাড়িছাড়া হয়েছেন কি?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ আর একবারও গিসলেন। সেবার প্রায় পনেরো দিন ঘর ছাড়া।

পরাশর

বললাম, তা হলে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দেখুন, হয়ত এসে পড়বেন।

হাসিটার মধ্যে একটু বিরক্তি রয়েছে। বললেন, সেবারও কিন্তু 'হয়ত'-র ওপর নির্ভর করে বসেছিলাম না। আপিস পর্যন্ত গিয়ে এক রকম জোর করেই টেনে তুলেছিলাম বাড়িতে। এবারও সেই চেষ্টাই করতাম। কিন্তু আপিস বদল করেছে তা তো জানতাম না।

দেখুন, হয়ত জিগ্যেস করা আমার উচিত হবে না। তবু বলছি কাছে থেকেও কি তিনি আপনাকে শান্তি দিতে পেরেছেন? পাশাপাশি থাকি। অনিচ্ছার মধ্যেও কিছু কিছু জানতে পারি। আমার তো মনে হয় দু'দিন আপনি স্বস্তি পেয়েছেন।

ক্ষমাসুন্দর তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি চুপ করে গেলাম। বললেন, হাজার হলেও তো স্বামী। কেমন করে না দেখে পারি বলুন তো?

সিঁথির সিঁদুর থেকে মুখের সবটুকু মিলিয়ে আমি কি খুঁজতে চেয়েছিলাম কি জানি। খেয়াল হতেই লজ্জা পেয়ে মাথাটা নিচু করলাম। ভাবলাম আত্মীয় স্বজন থাকতে আমাকে আবার এ ব্যাপারে জড়ানো কেন? জিগ্যেস করলাম আপনার কোন আত্মীয়স্বজন নেই?

মাথাটা নিচু করে, একটু ম্লান লজ্জিত ভঙ্গিতে চাপা এক দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে দিয়ে এমন এক বাসি হাসলেন, যা দেখে ভেতরের অর্থ পরিষ্কার হয়ে আসে।

বুঝলাম, নিজের দৈন্যকে কোন মেয়েই চায় না আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে তুলে ধরতে। কেন না তারাই বোধ হয় দুর্বল স্থানের সন্ধান পেলে বেশী করে আনন্দের স্বাদ পায়। খুব বেশী হলে বড় আপনজন-এর মতো কয়েকটা সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে যায়। তা কেবল উপদেশের মতই শোনায়। সংসারের প্রয়োজনে লাগে না।

বললাম, আমি আমার সাধ্যমত নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভদ্রমহিলা বললেন, দেখবেন ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়। কেন জানি না হঠাৎ আপনাকেই একমাত্র বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল।

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। আমি কেমন অসহায়ের মত স্থিরদৃষ্টিতে বসে রইলাম। আর সমস্ত মনের ওপর একটা কথা বার বার কাজ করে চলল—'কেন জানি না হঠাৎ আপনাকেই একমাত্র বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল।'

মনে পড়ে গেল এর আগে ভদ্রলোককে অন্য একটি মেয়ের হাত ধরে পার্ক স্ট্রীট আর দক্ষিণের লেক পল্লীতে বেশ কয়েকবার দেখেছি। মেয়েটা যে 'সোস্যাল গার্ল' তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কেন না তাদের মেক আপ-এর

ভঙ্গিই তার পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। এ থেকে ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল।

দেহই যদি সৌন্দর্যের একমাত্র মাপকাঠি হয় তবে মেয়েটি সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সুন্দরের আড়ালে ভিতরের কুৎসিত রূপটা অদ্ভুতভাবে চাপা পড়ে গেছে। অথচ এদের কোন শাসন নেই, আছে কেবল সমাজের প্রশ্রয়। একদিন এরা রক্তশোষা বাদুড়ের মতো রক্তটুকু শুষে নিয়ে সমগ্র সমাজকে সস্তা দরে বিকিয়ে দেবে। ওদের ঐ এক জাত। ইচ্ছে করে গায়ের চামড়াগুলো ছাড়িয়ে বীভৎস মনের সঙ্গে দেহের একটা দগদগে সম্পর্ক পাতিয়ে রাখি। ওরা মনে রাখে না চামড়ার আড়ালে সবাই আমরা নগ্ন অসম্পূর্ণ বীভৎস। মনে রাখে না দেহের গঠনের সাথে সাথে মনেরও একটা সুন্দর 'ফিগার' তৈরী হওয়া দরকার। কিন্তু বক্তৃতা এখন থাক। এখন উপায় কি করি।

এমন একটা চরিত্রের মানুষকে খুঁজে বেড়ানোর প্রবৃত্তি আমার একেবারেই ছিল না। ঘরময় পায়চারী করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্বাস করুন আমি আমার সমগ্র মনপ্রাণ নিয়ে তাঁর স্বামীর সন্ধান করে চলেছি। এতে আমার কাজের অনেক ক্ষতি হয়েছে। শরীরের ওপর অনেক অনিয়ম হয়েছে। দেহের বাঁধন অনেক আলগা হয়ে গেছে। তবুও আমি তাঁর স্বামীর সন্ধান কোথাও পাইনি। পার্ক স্ট্রীটের বহু রেস্তোরাঁয় আমাকে বিনা প্রয়োজনে কাপের পর কাপ চা শেষ করতে হয়েছে আর যখনই কাউকে ঢুকতে দেখেছি তখনই উৎসুক চোখে চেয়ে থেকেছি।

হয়ত এত করে সন্ধান করতাম না। মানুষের ধৈর্যেরও ত' একটা সীমা আছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। শীতের সেই রাতগুলোতে আমি দূর থেকে দেখতে পেতাম ভদ্রমহিলা ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন জানালা ধরে। চোখ আমার উপর-মুখো যেতো না। মাথাটা ক্রমশ আমার নিচু হয়ে আসতে চাইত। প্রতিদিন এমনি করেই তাঁর অশোভার নীরব উত্তর আমি দিয়ে চলেছিলাম।

তারপর একদিন দেখলাম তিনি আর দাঁড়িয়ে নেই। পরদিনও তাই। মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে হয়ত এখন ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। আমাকে কি ভেবেছেন তিনিই জানেন।

●

তারপর? তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। আমি উত্তর কোলকাতার ঘিঞ্জিপাড়া ছেড়ে চলে এসেছি দক্ষিণ কোলকাতার কোণঠাসা পাড়ায়। সেও আজ অনেককাল হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁকে য আবার এমনভাবে আমাকে দেখতে হবে তা আমি কখন কল্পনায়ও ভাবতে পারিনি। মহিলার সম্বন্ধে আমার মনে একটা দুঃখ ছিল বটে, সে দুঃখ অনেকটা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ওঠা ধোঁয়ার মত। আকাশ স্পর্শ করতে পারেনি। তাই আমি তাঁকে স্মৃতির আবডালে ঢেকে ফেলেছিলাম। কিন্তু আজ যেন আবার নতুন দৃষ্টি দিয়ে চিনলাম।

সেদিন চলতি পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন—What's the time?

আমি বিস্ময়ে মুখ তুলে চেয়েছিলাম। বোধ করি উত্তর দিতে একটু দেরীও হয়েছিল। বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ এক মহিলাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করতে দেখে আমি যে অবাক হইনি তা নয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনের মধ্যে একটা খটকা লেগেছিল। তারপর বহুক্ষণ চিন্তা করে তাঁকে চিনেছিলাম, হ্যাঁ ঠিকই চিনেছিলাম।

চেহারা দেখে কিছুই আন্দাজ করতে পারতাম না। অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মুখের মধ্যে কেমন এক কাঠিন্য বাসা বেঁধেছে। চোখ দুটো তেমনি আগের মতো। সাদা ফ্যাকাশে রংটা তামাটে বর্ণ পেয়েছে। সেই সাথে গায়ের চামড়া কেমন খসখসে হয়ে গেছে। দেখে আমার চৈত্র মাসকে মনে পড়েছিল।

এ পাড়ার সকলেই ওঁকে 'বায়স্কোপ' বলেন। অবশ্য ওঁর অসাক্ষাতেই বলে থাকেন। ওঁকে দেখে আমার কল্পনা বৌদির ঐ নামটাই মনে ধরেছিল। সেই থেকে সকলেই ভিতরে ভিতরে হাসিঠাট্টা করে আসছেন। কিন্তু বৌদি জানতেন না ওঁর ফেলে-আসা কাহিনী। দেখেছিলেন শুধু ওপরের রূপটা।

সারাটা দিন যেন কতই ব্যস্ত। সকালের শুরুতেই ময়লা তেলচিটে এক শাড়ি গায়ে জড়িয়ে, ঠ্যাং দুটো আধখানা বার করে হনহন করে চলেন পাড়ার মুদির দোকানে দু'চার নয়ার মালমশলা কিনতে। তারপরও দু'-চারবার এখানে ওখানে যাতায়াত যে করতে হয় না তা নয়। কখন বা দেড় হাত-ই লম্বা চটের থলে হাতে রেশন অপিস-মুখো, আবার কখন বা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে মেক আপ ঠিক করতে করতে ট্রাম লাইন বরাবর। এক এক সময় এক এক বেশ। চুল বাঁধারই বা কত রকমফের।

পুরুষরা মেয়েদের রূপের দিকটাই নজর দেয়। ফলে সাজ-পরিধানের ওপর আর খেয়াল যায় না। কিন্তু বৌদির পাল্লায় পড়ে অনেক দিন অনেক কিছুই দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করতে হয়েছে। শুনেছি দু'চার লাইন ইংরেজিও মুখস্থ রেখেছেন। অকারণেই সাধারণত প্রয়োগ করেন। ভুল বলেও নিজের উপর আত্মবিশ্বাস হারান না।

কিন্তু আজকে এই চলতি পথের মাঝদুয়ারে, একটিমাত্র প্রশ্ন করে আমাকে যেন তিনি বহু প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুললেন।

●

যদি কখন দক্ষিণ কোলকাতার অজ দক্ষিণে এসে পড়েন, যেখানে কারখানার চোঙাগুলো আকাশে আকাশে কালিমা ছিটিয়ে দিচ্ছে আর তখন যদি সূর্য সবে নিবু-নিবু হয়, দেখবেন এক রংচটা বাড়ির দোতলার জানলার ধারে বসে এক মহিলা হাতে মুখে বুকে পাওডার মাখতে ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁর সাজের মধ্যে সব কিছু পরিমিত নাও হতে পারে। হয়ত মুখে

একটু পাওডার প্রয়োজনের বেশীই পড়বে। দেখবেন খুব ব্যস্তভাবেই তিনি নিজেকে ফিটফাট করছেন। তিনি জানেন তাঁর স্বামী একদিন ফিরবেন। আর এই সন্ধ্যাকালেই। তাই নিজেকে যেন তৈরী করে নিচ্ছেন।

তার সাজ না হওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করবেন। হ্যাঁ ভাল কথা, আমি যে, গতরাত্রে দোতলা বাসের জানলার ধারে বসে ওঁর স্বামীকে অন্য একটি মেয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হতে দেখেছিলাম সে কথা আপনি ঘুণাক্ষরেও জানাবেন না। বলবেন আপনি ওঁর স্বামীর বন্ধু ও সহকর্মী। বিরাট মিলিটারী ক্যাম্পে এখন আপনারা একসঙ্গে কাজ করেন। স্বামী তাঁর কুশল জানতে চেয়ে পাঠিয়েছেন।

শুনে মহিলা হয়ত প্রশ্ন করবেন কোন চিঠি দিয়েছেন কি? উত্তরে জানাবেন হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা পথে মিস হয়ে গেছে। তারপরে হয়ত বলতে পারেন '৪৭ সালে তো দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখনও ওঁর এত কি কাজ?

আপনি বলবেন স্বাধীন হলেও দেশকে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নিয়েই লেগে পড়ে আছেন। সব ভুলে কাজ নিয়ে একেবারে মেতে উঠেছেন। তা' ছাড়া আমরা থাকি অনেক ভেতরের দিকে। সেখান থেকে ডাক বিভাগেরও কোন যোগাযোগ নেই। কোলকাতা এসে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করতেও একটু সময় লেগে গেল। না হয়ত আর দু'দিন আগেই খবর দিতে পারতাম। আর আপনি নিশ্চয়ই শুনে সুখী হবেন যে, সরকার হয়ত পরবর্তী মেজর জেনারেল হিসেবে ওঁকেই স্থির করবেন,

●

আশ্চর্যের বিষয়, সব শুনে তিনি এতটুকুও অবিশ্বাস করবেন না। তারপর আপনাকে মিষ্টি খাওয়াবেন, পাখার বাতাসও দেবেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আপনি এমন এক অনুভূতি নিয়ে ফিরতে পারবেন—।

না থাক। কেন আপনি সেখানে যাবেন? তাতে কতটুকু সুখী তাঁকে করতে পারবেন। দোহাই আপনাকে। হাতজোড় করে মিনতি করছি, আপনি কখনও ওখানে যাবেন না। হয়ত ঐ সব কথা উনি সরল প্রাণে বলে বেড়াবেন। আর তাই শুনে আমার বৌদিরা হাসি-ঠাট্টা জুড়ে দেবে। আমি কিন্তু কিছুতেই তা সইতে পারব না।

এ ঘটনার আদি পর্বের এখানেই শেষ। কিন্তু শেষেরও শেষ আছে। কেননা কোথায় যে শেষ সেইটুকুই আমাদের অজানা। একদিন কাজের অবসরে বিশ্রাম নিচ্ছি। অপিস করে খানিক আগে ঘরে ফিরেছি। চাকরের কথায় নীচে নেমে এলাম। দেখি স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দাঁড়িয়ে। হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমার কিছুই করা হল না। ভদ্রমহিলার উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে বন্দনা বৌদি আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রায় সমস্বরে জিগ্যেস করলেন---চিনতে পারেন?

আমি কেমন অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিলাম---না!

জানি না আমার সে উত্তর তাঁদের কানে পৌঁছেছিল কি না।

অবসাদে শুধু কালক্ষয়

অসিতবরণ হালদার

ঘর ঘনিষ্ঠ—সে ঘরে—
মন আমার রয় না পড়ে
সে ঘর উদাস—মাঠ ধু ধু—
ক্লান্ত-মন তাই ছুটে ফেরে—
পার্শ্ববর্তী যতকিছু মোহের টানে?
  ঘর হল পর—
  পর হল আপন।
তৃপ্ত-মন তৃপ্তিতে যে' মন
খুঁজে ফেরে অলিন্দে অলিন্দে
আর পাহাড় কন্দরে কিংবা পান্থশালায়
সে' মন উদাসী, পিয়াসী যাযাবর বৃত্তিতে
ভর করে ক্লান্ত শ্রান্ত হতোদ্যম;
  তাই ঘর হল পর
  পর হল আপন
বিস্ময়ে বিমূঢ় পরাজয়
অবসাদে শুধু কালক্ষয়।

সাহিত্যদরদী

যোগেন্দ্রনাথ

একলব্যের মতো নীরবে সাহিত্য-সাধনা করে গেছেন যোগেন্দ্রনাথ। কাজ আর কাজ এই ছিলো তাঁর জীবনের লক্ষ্য। অলসভাবে দিন কাটাতে ভালবাসতেন না। দিনরাত পড়াশোনা এবং লেখার মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ নিজেকে নিবদ্ধ রাখতেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ভারত সরকারের বিজ্ঞানানুশীলন এবং সাংস্কৃতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বাঙলা দেশের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলন করার জন্য---কিন্তু মৃত্যুর নির্মম হস্তক্ষেপ তাতে ছেদ টেনে দিলো।

ছেলেবেলা থেকেই যোগেন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা সুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বাবা-মা উৎসাহ প্রদানে কার্পণ্য করেন নি। গাঁয়ের টোলের কালীচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার থেকেও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তিনি। ইতিহাস ও সাহিত্যে ছিলো তাঁর পরম অনুরাগ। বাইশ বছরের যুবক যোগেন্দ্রনাথ কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনা করে রচনা করেছিলেন—'বিক্রমপুরের ইতিহাস'। এ বইটির তথ্য সংগ্রহ করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। এ জন্য লাঞ্ছনা এবং নিগ্রহ কম ভোগ করতে হয়নি। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' ১৩১৬ খৃস্টাব্দে আশ্বিন মাসে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন বহু ভাষাবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

গ্রন্থকার নিবেদনে লিখেছিলেন : ছেলে মাকে ভালবাসে, মায়ের কথা শুনিতে ও বলিতে তাহার ভাল লাগে, তার শৈশবসুলভ সরলতাপূর্ণ বাক্য-বিন্যাস যে মায়ের কতই না গুণবর্ণনা করে এবং তাহাতেই তাহার তৃপ্তি হয়, তেমনি আমার মাতৃভূমির প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি মসজিদ, প্রতি মঠ, প্রতি দেবালয় ও প্রতি মৃত্তিকাকণার মধ্য হইতে বিশ্বজননীর যে চেতনাময় আহ্বান আমাকে তাহারি গুণগানে হৃদয়ে প্রেরণা দিয়াছিল---ইহা কেবলি তাহারি বিকাশ।

এই কয়টি কথায় যোগেন্দ্রনাথের দেশমাতৃকার প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বইটি প্রকাশিত হবার পর তিনি রবীন্দ্রনাথকে একখানা বই পাঠিয়ে তাঁর মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উচ্চ প্রশংসা করে গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ করেছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জজ সারদা মিত্র, সাহিত্য সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি, সৌরভ সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার প্রমুখ বইটির সুখ্যাতি করেছিলেন। প্রবাসীতে এর বিস্তৃত সমালোচনা বেরিয়েছিলো।

সাহিত্য সাধকের বঙ্গের মহিলা কবি বইটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। বাংলা দেশের বিস্মৃতপ্রায় প্রখ্যাতনামা মহিলা কবিদের জীবনী এবং কাব্যালোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমুখের বিস্তৃত জীবনী এবং তাঁদের কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বইটির বিশিষ্ট সম্পদ। গবেষকদের কাছে বঙ্গের 'মহিলা কবি' মূল্যবান রেফারেন্স হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে ও আসবে। 'ভারত মহিলা' বৈদিক যুগের ঋষি-কন্যাদের গার্হস্থ্য এবং তপস্যালব্ধ জীবনের এক আদর্শ রূপায়ণ।

শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত পৃথিবীর ইতিহাস সিরিজের বই তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। নিজেও ঐ সিরিজের [illegible] বই লিখে [illegible]

সুধাংশু গুপ্ত

ছোটদের আসর

সাধক মহাপুরুষদের জীবন-চরিত রচনা তাঁর প্রান্তিক বয়সের শ্রেষ্ঠ অবদান। সাধক রামপ্রসাদ, মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ এবং সাধক কমলাকান্ত এই তিনটি গ্রন্থ রচনা করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন।

বাংলা ভাষার সর্ববিভাগে তিনি ছিলেন পারদর্শী। কবিতা, প্রবন্ধ, ইতিহাস, জীবনী, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি রচনায় কুশলতার পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন। উপন্যাসের মধ্যে মাধবী বইটি উপন্যাস জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং বিদগ্ধ পাঠক সমাজে নতুনত্বের ছাপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। পরলোক সম্বন্ধে তিনি শেষ জীবনে গভীরভাবে আলোচনা করতেন। তার ফলে কয়েকখানা পরলোকতত্ত্বের বই লিখে গেছেন।

নাটক রচনায়ও যোগেন্দ্রনাথের অসামান্য দখল ছিলো। নিজের গ্রামের ক্লাবের তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী। পুজোর সময় বই নির্বাচন থেকে শিক্ষাদাতাও ছিলেন তিনি। একবার চন্দ্রশেখর বইয়েতে তিনি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় মহা মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুস্কিলের আসান

তিনিই করেছিলেন। পাশের গ্রামের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় মহড়া দেখতে এসেছিলেন। তাঁকেই পাকড়াও করলেন এবং ঐ ভূমিকায় নামালেন। তাঁর অনুপম পরিচালন গুণে মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল। তিনি যোগেন্দ্রনাথকে প্রথম শিক্ষাগুরু হিসেবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। কলকাতার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখের কাছে তিনি সেই স্বীকৃতির সম্মানই পেয়ে গেছেন। স্বাধীনতা পত্রিকার এক পুজো সংখ্যায় কী করে থিয়েটারে এলাম প্রবন্ধে সুখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সে বিষয়ে অনেক কথা লিখে গেছেন।

'আনার কলি' গীতিনাট্যটি তাঁর প্রথম নাট্য রচনা। এই নাটকটি এক সময়ে অবৈতনিক সম্প্রদায় কর্তৃক বাংলা দেশের শহরে ও গ্রামে অভিনীত হয়েছিল। তা ছাড়া 'তসবীর', ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটারে বহুদিন সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। ঢাকার লায়ন থিয়েটার তাঁর 'চিড়িয়াখানা' এবং 'যাদুঘর' নাটক দুটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। ইন্দ্রাণী এবং সম্রাট অসুরবালিপাল তাঁর সর্বশেষ রচনা।

স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের কবিতার তিনি ছিলেন পরমভক্ত। একবার ভীষণ বিপদে পড়ে অর্থের অনটনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন কবি তাঁর ঢাকার বাসায়। যোগেন্দ্রনাথ বলধীর জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণের ঢাকার বাসায় দেখা করে তাঁকে অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। 'গোবিন্দ চয়নিকা' বইটির ভূমিকা কবির পুত্রের অনুরোধে লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর ভূমিকাটি উক্ত গ্রন্থের একটি মূল্যবান সংযোজন। গিরিশ বক্তৃতা মালার বই 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মৃত্যুর কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিলো। এতে গ্রন্থকার গিরিশজীবনের অনেক নূতন তথ্যের আলোকপাত করেছেন। তা ছাড়া গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিরও মনোজ্ঞ আলোচনা আছে।

ছোটদের সাহিত্যে তিনি ছিলেন সব্যসাচী। তাদের উপযোগী নানা বিষয়ের বই রচনা করে গেছেন তার সংখ্যাও কম নয়।

ইতিহাসের সন তারিখ বাদ দিয়ে মিষ্টি ভাষায় তিনি কিশোরদের জন্য পুস্তক রচনা করে গেছেন—যাঁরা ছিলেন দিগ্বিজয়ী এবং মরণবিজয়ী বীর। বাংলার ডাকাত দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর আর একটি শিশু সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন। বাংলার ডাকাত সম্বন্ধে সরকারী নথিপত্র এবং নানা জেলার গেজেট ঘেঁটে তিনি এর মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন।

শুধু একমাত্র 'শিশু ভারতী' সম্পাদনাই তাঁর নামকে অমর করে রাখবে। দশখণ্ডে গ্রথিত বাংলা ভাষায় ছোটদের বিশ্বকোষ প্রকাশ করে তিনি বাংলার ছেলেমেয়েদের বহু দিনের অভাব পূরণ করে গেছেন। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে চিরকাল এই সিরিজটি সকলের কাছে সমাদর লাভ করবে।

যেমন বড়দের জন্য তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থখানি রচনা করে গেছেন, তেমনি কিশোর-কিশোরীদের জন্য নানা সাহসিক এ্যাডভেঞ্চারমূলক ও নীতিমূলক বই প্রণয়ন করে প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ সাহিত্যিকদের ছিলেন একজন পরম হিতৈষী বন্ধু। তাঁদের নানা তথ্যাদির উপকরণ সংগ্রহে ছিলেন মুক্ত হস্ত। ভাক্ত, সুরুচি-স্বাভাবিক সৌজন্যের যোগ্য অধিকারী ছিলেন তিনি। তার মনটি ছিলো নরম—সামান্য আঘাত, দুঃখ ও অভিমান তাঁকে পীড়িত করে তুলতো—কিন্তু কখনো তার জন্য হিংসার আশ্রয় নিতেন না। আজীবন সাহিত্য সাধনা করে যোগেন্দ্রনাথ যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন—তা কালের বালুকা-সৈকতে স্থায়ী চিহ্ন রেখে দেবে।

ভালুক শিকার

কল্যাণকুমার মিত্র

আমরা একবার সদলবলে ভালুক শিকারে বেরিয়েছিলাম। কিছুদিন সেই ভালুকটাকে আমাদের দলনেতা আগে গুলি করেছিল কিন্তু কিছুটা রক্তঝরা ছাড়া তার আর কোন ক্ষতি হয়নি। তাই তাকে মারবার জন্যে আমরা খুব আগ্রহী হয়ে উঠলাম। যখন বনের কাছে গিয়ে হাজির হলাম তখন কয়েকজন বৃদ্ধ মেষপালক বললো, আপনারা এখনই তাকে মারতে যাবেন না, কিছুদিন—অন্তত দিন পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করুন। তাকে একটা জায়গায় বসতে দিন। তা নইলে সে ভয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে, তখন আর তাকে ধরতে পারবেন না।

এই সময়ে একজন জোয়ান ছোকরা তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলো। বললে, এখনই যাওয়া ঠিক, কারণ সেই ভালুকটা খুব মোটা আর চোটও লেগেছে। তা ছাড়া চারিদিকে খুব বরফ পড়ছে—এ রকম অবস্থায় তার পক্ষে বেশীদূর যাওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই আমরা তাকে ঠিক ধরবো যদি না পারি তাহলে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসা যাবে। এখন তো প্রচুর সময় রয়েছে।

আমি এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম, কিন্তু কমরেড (দলনেতাকে আমরা কমরেড বলতাম) রাজী হলো না। সে অন্য সকলকে নিয়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। কেবল আমি আর সেই ছোকরাটি —নাম তার ডেমিয়ন —এগোবার জন্যে তৈরী হলাম। কিছু রুটি আর জল সঙ্গে নিলাম।

বরফের ওপর ভালুকের পায়ের চিহ্ন ধরে এগোতে লাগলাম, মাঝে

মাঝে কিছু রক্ত দেখতে পেলাম। কিন্তু এতই তুষার পড়েছে যে আমাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। প্রায় ছয় ইঞ্চি করে পা তুষারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। এইভাবে নানারকম বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে একটা রাস্তা পেলাম কিন্তু সেখানে আর ভালুকের পায়ের চিহ্ন পেলাম না। হঠাৎ দেখি কতকগুলো ছাপ বন থেকে রাস্তার দিকে না গিয়ে রাস্তা থেকে বনের দিকে গেছে। ভাবলাম বোধ হয় অন্য কোন ভালুক এখান দিয়ে গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে পাকা-লোক ডেমিয়ন। সে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বললো, না, এগুলো সেই একই ভালুকের পায়ের ছাপ। আমরা যাতে ওর গতিপথ বুঝতে না পারি তা-ই সে এ রকম চাল চেলেছে।

ডেমিয়নের কথামত কিছুটা পেছিয়ে এসে দেখি সত্যিই তাই, ভালুকটা একটু পেছিয়ে এসে আবার ডানদিকে নতুন রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে গেছে। সেই পথ ধরে কিছুদূর এগোতে ডেমিয়ন বললো, কিছুদূরে ঐ যে জঙ্গল-জমিটা দেখা যাচ্ছে ভালুক নিশ্চয়ই ওর মধ্যে আছে, কারণ তার পায়ের ছাপ ঐ দিকেই গেছে। এখন আমরা নিঃশব্দে এই জায়গার চারিদিক ঘুরে দেখি---ভালুক এখনও আছে না বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।

ওর কথামত আমিও পা টিপে হাঁটতে লাগলাম যাতে কোনরকম শব্দ না হয়। কিন্তু এতটা পথ---প্রায় আট মাইল---একনাগাড়ে হেঁটে আমার শরীরের অবস্থা কাহিল। একটু বিশ্রাম না করলে আর চলছে না। তাই খালি পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। ডেমিয়ন আমার অবস্থা বুঝতে পারলো এবং আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলো। এইভাবে কিছুদূর গিয়ে আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে এলাম এবং নিঃসন্দেহ হলাম---ভালুক এর মধ্যেই আছে। কারণ তার বেরিয়ে যাবার পায়ের ছাপ কোথাও দেখতে পেলাম না। এইবার আমরা বিশ্রাম করতে পারি, আমাদের পরিশ্রম সফল হয়েছে।

একটা বড় ফারগাছের তলায় বসলাম। অধিক পরিশ্রমের ফলে অত ঠাণ্ডাতেও গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। খিদেও খুব পেয়েছিল, প্রথমে কিছুটা তুষার খেয়ে নিলাম তারপরে রুটি বার করে খেতে লাগলাম, মনে হল এত ভালো জিনিস আগে কখনো খাইনি। তারপর সেখানেই দুজনে শুয়ে পড়লাম হাতে মাথা রেখে। শরীর এত ক্লান্ত যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে মনে হল যেন সাদা মার্বেল পাথরের বড় হলঘরে শুয়ে আছি, চারিদিকে বড় বড় থাম, মাথার ওপরে নানা রঙের আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ভালো করে চোখ রগড়ে দেখি---না, আমরা যেখানে শুয়েছিলাম সেখানেই আছি। চারিদিক তুষারে ঢেকে গেছে। গাছগুলো তার থেকে বাদ যায়নি। আকাশে তারা জ্বলছে। আমাদের গায়ের ওপরেও অনেক তুষার পড়েছে সেগুলো ঝেড়ে উঠে পড়লাম। ডেমিয়নকেও তুললাম এবং আমাদের আস্তানার দিকে পা বাড়ালাম।

কমরেড আমাদের সম্বন্ধেই অন্য সকলের সঙ্গে কথা বলছিল। আমরা গিয়ে সব কথা তাকে জানালাম। শুনে সকলে আনন্দে নেচে উঠল। পরের দিন শিকারে বেরোবার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেল। কমরেড অন্য সকলকে সেইমত নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এইভাবে সমস্ত ব্যবস্থা সেরে, খেয়ে-দেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। আমার ক্লান্তি তখনো পর্যন্ত কাটেনি, তাই বিছানায় মাথা ঠেকাতেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন প্রায় দ্বিপ্রহরে কমরেডের ডাকে যেই ঘুম ভাঙ্গলো, ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম।

ডেমিয়ন কোথায় জিজ্ঞেস করতে কমরেড বললো, সে ভোরবেলায় উঠে 'বীটারের' ব্যবস্থা করতে গেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলাম তারপর পোষাক পরে রাইফেল দুটো নিয়ে কমরেডের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি জনাকতক পুরুষ ও নারী মিলে একটা গর্ত খুঁড়েছে, সেখানে আগুন জ্বালাচ্ছে।

বনের কাছাকাছি যেতে দেখি ডেমিয়ন একদল লোককে নিয়ে আমাদের কাছেই আসছে। এসে বললো, এই লোকগুলোকে 'বীটারে'র কাজে নিয়েছি। এরা জায়গাটা ঘিরে ফেলবে, এই বলে, সে তাদের সেই গন্তব্যস্থানের দিকে---যেখানে আমরা গতকাল ভালুকের সন্ধান পেয়েছি---সেখানে নিয়ে যেতে লাগল।

আমি ও কমরেড পেছনে চলেছি। অবশেষে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। ডেমিয়ন বীটারদের নিয়ে চারিদিকে দাঁড় করিয়ে দিতে গেল। আমি একটা ফারগাছের নীচে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে চারিদিক

রুশ পাঠক   চিত্র : অমিয়কুমার দাস

বেশ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল। কমরেড ডানদিকে কিছুদূরে আর একটা গাছের নীচে দাঁড়ালো। দুটো রাইফেলেই গুলি ভরে নিলাম। একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে রাখলাম, আর একটা বেশ বাগিয়ে ধরলাম। কোমরে ছোরাটাকেও এমনভাবে রাখলাম যাতে যে-কোন সময়ে দরকার-মতো কাজে লাগাতে পারি।

শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে আছি, এমন সময় চারদিক থেকে 'বীটার'দের 'হুয়া হুয়া' ধ্বনি শুনতে পেলাম। পুরুষ ও মেয়েরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, যাতে ভালুক এদিকে বেরিয়ে আসে।

আরে একি হল। পা কাঁপছে কেন, বুকটাও ধড়ফড় করছে, হাতও একটু একটু কাঁপছে। এভাবে তো ভয় পেলে চলবে না। এখুনি ভালুক এসে পড়বে। তাকে মারতে হবে।

নানাভাবে মনকে শক্ত করার চেষ্টা করছি। হঠাৎ দেখি কিছুদূরে বাঁদিকে কি যেন নড়ে উঠল গাছের ফাঁকে। ওই তো সেই ভালুক। তার মাথা টিপ্ করে গুলি চালালাম। কিন্তু আমার গুলি তার দেহ স্পর্শ করতে পারলো না। গাছের ডালে বাধা পেল। সেও নজরের বাইরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে দেখি ভালুকটা কমরেডের কাছাকাছি এসেছে। ভাবলাম—আমি যে সুযোগ হারিয়েছি এবার কমরেড তার সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু না, কমরেডের গুলিও ঠিক জায়গায় লাগলো না। ভালুকটা অক্ষত অবস্থায় আবার পালিয়ে গেল। এবার মনে বেশ সাহস এসেছে। ভালুকটা যদি আর একবার কাছে আসে তাহলে নিশ্চয়ই মারতে পারবো। এই ভেবে ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি দূর থেকে কী যেন একটা আমার দিকেই ছুটে আসছে। আরে, ওই তো

সেই ভালুক। ও কি আমায় দেখতে পাচ্ছে না? একটু কাছে আসতেই ওর বুকের সাদা অংশ আমার নজরে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে আমার গুলি সোজা ছুটলো। তারপর ওর মাথা টিপ করে আর একটা গুলি চালালাম। ব্যস, তাতেই বাছাধন কুপোকাৎ। আর এগুতে পারলো না। আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। সে সোজাসুজি আমার দিকে আসছিল বলেই তাকে মারা সহজ হয়েছিল, তা না হলে কি হত বলতে পারছি না।

সকলে তারপর ভালুকের কাছে এসে হাজির হলো, তার বিশাল আকৃতি দেখে অনেকেই চমকে গেল। বর্তমানে সে মডেল হিসেবে আমার বাড়ীতে শোভা পাচ্ছে।*

---

* টলস্টয়ের 'দি বীয়ার হাণ্ট' গল্প অবলম্বনে।

অভিশপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ কিশোর উপন্যাস ॥

॥ সাত ॥

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কথা শুনে হাণ্টার সাহেব যেন লাফিয়ে উঠলেন। মনে হোলো তাঁর আগের দুশ্চিন্তা ও ভাবনাগুলো এক মুহূর্তে যেন উবে গেল। তারপর মুখে চাপা হাসির রেশ এনে বলে উঠলেন, চলুন।

তারপর নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ পরে, হাতে টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দীননাথের সঙ্গে।

বহুদিন পর দক্ষিণের বড় মাঠের সরু পথটার অন্ধকার থেকে ছড়িয়ে পড়লো বহু পরিচিত ঠং ঠং করা তাঁর সেই জুতোর আওয়াজ আর সঙ্গে জ্বলে উঠলো অনেক দিন আগের ভুলে-যাওয়া সেই টর্চের আলো।

আজ আবার এদিকের সবাই যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো, এতদিন পর আবার হাণ্টার সাহেবের জমিদারের সদরে যাওয়ার কারণটা কি তা জানার জন্যে।

বহুদিন পর আবার হাণ্টার সাহেবের নেতৃত্বে শিকারের তাঁবু পড়লো চকোরের জঙ্গলে। এর পাহাড়ী পথটা আবার সরগরম হয়ে উঠলো যেন একটা যুগ পরে। রতনগড় থেকে শিবশঙ্কর রায়ের লোকজনদের আসতে দেখা গেল আবার

এখানকার পায়ে হাঁটা সরু ওই পথটা দিয়ে। বহুদিন থেকেই জমিদারের লোকজনদের এদিকে আসা-যাওয়া একরকম উঠেই গিয়েছিল। রাম তাঁতীর মৃত্যুর ঘটনাটার পর থেকেই এঁদেরকে আর এদিকে দেখা যায়নি। কিন্তু হঠাৎ, এতকাল পরে আবার এখানে এঁদের আবির্ভাব হওয়াতে এখানকার পাহাড়ী ও জঙ্গলী লোকেরা কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে উঠলো। কেমন যেন একটা ভীতির উদ্রেক হতে লাগলো এদের মনে। আর তাই জমিদারের লোক দেখামাত্রই

এরা সব লুকিয়ে পড়তে লাগলো ঝোপে-ঝাড়ে-জঙ্গলে।

এই নিয়ে সাঁওতালপাড়ায় এক গোপন পরামর্শও হয়ে গেল। তাদের সর্দাররা সব নিজের নিজের লোকজন-দের বলে দিল যে, কেউ যেন জমিদারের এই শিকারের কাজে না যায়। আর কেউ যেন দলছাড়া হয়ে ঘরের বাইরেও না যায়। তারপর থেকেই এরা সব লুকিয়ে লুকিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখলো জমিদারের লোকজনদের ওপর।

এদিকে রতনগড় থেকে কুলির মাথায় ও ঘোড়ার পিঠে একে একে শিকারের সাজসরঞ্জাম সব এসে পৌঁছতে লাগলো এখানকার জঙ্গলে ঢোকার পথে জমিদারী বাঙলোটায়। হাণ্টার সাহেবের তদারকে সে সব ওই বাঙলো বাড়ীর ঘরগুলোয় ঠিকমত গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখা হতে লাগলো। এবারের আয়োজনের আধিক্য যেন একটু বেশ মনে হোলো সবাইকার। যদিও এ আগের বারকার মতো সদরওয়ালাদের কেউ অতিথি হয়ে আসছেন না শিবশঙ্কর

রায়ের সঙ্গে। তাই সবাই ধরে নিল যে, শিবশঙ্কর রায়ের অবস্থানটা এখন হবে নিশ্চয়ই —বেশ কিছুদিনের জন্যেই। যাই হোক, সে কথায় পরে আসছি, আগে হাণ্টার সাহেবের কথাটা বলে নিই।

সেদিন হাণ্টার সাহেব দীননাথ চাটুজ্যেকে বললেন, দেখছেন মশায় সাঁওতাল ব্যাটারা আমাদের সঙ্গে নন-কোঅপরেশন করছে। আর এদিকে কালই এসে পড়ছেন স্যার। ম্যানেজারের সঙ্গে। তার আগে কাজ-কর্ম সেরে না রাখলে আমার পোজিশানটা কি দাঁড়াবে বলুন তো।

দীননাথ তাঁর থেলো হুঁকোটায় তামাক টানা বন্ধ করে উত্তর দেন, তা তো দেখছি সাহেব। তারপর একটা মোড়া টেনে এগিয়ে দিলেন হাণ্টারকে। পরে বললেন, একটু বসুন না এখানে।

সে কথা শুনে হাণ্টার চিৎকার করে উঠলেন যেন, বললেন, কাল থেকে এসে পর্যন্ত এই বারান্দায় বসে বসে শুধু তামাক টানছেন আর লোকজনদের সঙ্গে গল্পই করছেন। আর এদিকে আমার—

দীননাথ তাঁর কথাটা শেষ করতে না দিয়ে তার আগেই বলে উঠলেন, আরে মশাই—শিকারের জন্যে আমার আর প্রাণ হাঁপাচ্ছে না যে আপনার মতো ছুটোছুটি করবো।

—সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, ওয়ার্থলেশ বলে, তিনি তাঁর প্রজাপতি-মার্কা গোঁফ-জোড়াটাকে নাড়াতে নাড়াতে বিরক্তিতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

দীননাথ শুধু সেদিকে চেয়ে হেসে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে তামাক টানতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। দীননাথ তাঁর তামাক টানা বন্ধ করে উঠে পড়লেন। তারপর বেরিয়ে দেখলেন যে, একটু দূরে সাঁওতালদের একটা দলের সঙ্গে হাণ্টার সাহেবের বচসা শুরু হয়ে গেছে। এগিয়ে গেলেন সেখানটায়। সাঁওতালদের বুড়ো সর্দার তাঁকে দেখতে পেয়ে সেলাম করে উঠলো। তারপর বলতে লাগলো, ওই দেখ না বুড়াবাবু ই সাহেব ঠো
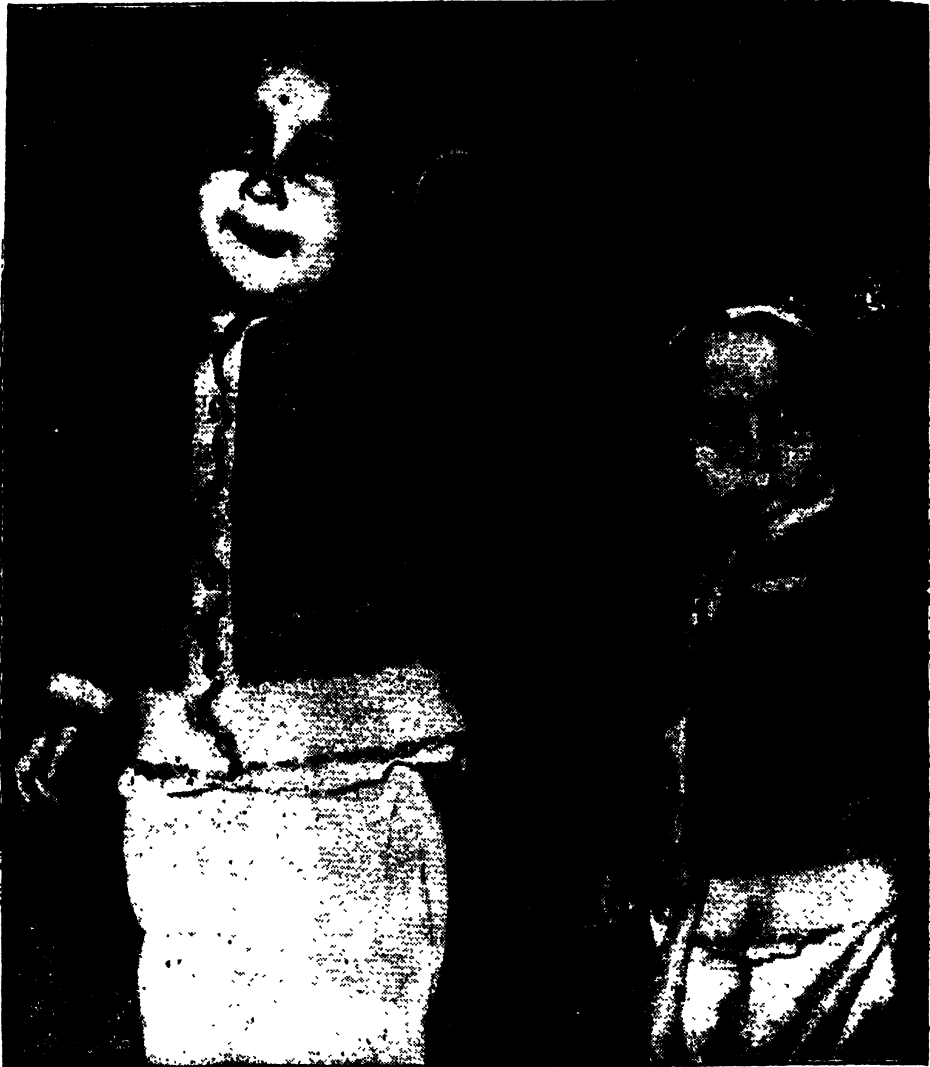
হামদের জোর করে জঙ্গলে নিয়ে কাম করায়ে নিতে চায়!

হাণ্টার তার কথায় বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, কেন কাজ করবি না—মজুরীর পয়সা তো পাবি।

সর্দার উত্তর দেয়, হামারা তুর পয়সা চাই না।

রাগে হাণ্টার সাহেব বোধ হয় তার গালে চড় মারতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে বাধা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে আনলেন দীননাথ। জোর করে টেনে আনলেন তাঁকে বাঙলোর বারান্দাটাতে। পরে বললেন, সাহেব আগের কাল আর নেই। বেশী জোর জবরদস্তি করলে ফল বিপরীতই হবে।

হাণ্টার আর কোন কথা বললেন না, শুধু কেবল ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন।

পরের দিন দুপুর নাগাদ ম্যানেজার মথুরবাবুর সঙ্গে শিবশঙ্কর রায় এসে পৌঁছলেন এখানে। এখানে আসতে শিবশঙ্কর রায়কে এবার বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। মথুর জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে, এত কষ্ট করে এভাবে এখন না এলেই তো পারতেন হুজুর। একে আপনার শরীর খারাপ তার ওপর—

শিবশঙ্কর তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন, কেন যে এলাম তা শুনলে তুমি অবাকই হবে। শিকার করার বাসনা যে আমার আর নেই সে তুমি ভালো করেই জানো।

মথুর উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তবে?

তিনি বলে যেতে লাগলেন, আমি এসেছি সেই কিশোর জঙ্গলী ছেলেটির খোঁজে—যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার রতনগড়ের আমবাগায়। জানো—সে দিনের সেই তাকে দেখার পর থেকেই কেমন যেন আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আর একবারটি তাকে দেখবার জন্যে।

মথুর জিজ্ঞেস করেন, ছেলেটি জঙ্গলের কোন দিকে থাকে জানেন তো?

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে উত্তর দেন, কিছুই জানি না হে।

—তাহলে কি করে খুঁজে বার করবেন?

—হ্যাঁ, সে কথা বুঝতে পারছি ঠিকই; তবু দেখা যাক্ এখানে যদি আবার সেদিনের মতো হঠাৎ দেখতে পাই তাকে। বলতে, বলতে শিবশঙ্করের কেমন একটা ভাবাবেগ এসে গেল যেন। কেমন যেন এক ব্যথার সুর তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠলো।

মথুর উত্তর দিলেন, অসম্ভব নয়, যখন জঙ্গলেই থাকে তখন নিশ্চয়ই একবার না একবার দেখা যেতেও পারে তাকে।

শিবশঙ্কর বললেন তখন, হ্যাঁ সেই কথা মনে করেই তো এসেছি এখানে। জানি না কি জন্যে সেই সেদিনকার পর, ছেলেটিকে দেখেই কেমন যেন এক গভীর আকর্ষণে পড়ে গেছি তার। সত্যিই, মনের মধ্যে এই প্রবণতা আমাকে বেশ চঞ্চল করে তুলেছে দেখছি।—

দুজনে কথা বলতে বলতে বাঙলোটার দোরগোড়ায় এসে পড়লেন তাঁরা।

তাঁদের সাড়া পেয়ে দীননাথ ও হাণ্টার বেরিয়ে এলেন।

শিবশঙ্কর একবার বাঙলোর ঢোকার পথে মহুয়া গাছটা দেখে নিলেন ভালো করে। দেখলেন মহুয়া গাছটাও বুড়ো হয়ে গেছে। ঠিক তাঁরই মতই। শিবশঙ্কর মথুরকে বললেন, জানো মথুর এই গাছটার বয়স আর আমার বয়স একেবারে এক। সেদিন আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবরটা বাবা এখানেই পেয়েছিলেন কারণ বাবা আর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রমজান কাকা এই বাঙলোটায় এসেছিলেন, সেদিন কি একটা জমিদারীর কাজে যেন। আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবরটা পেয়েই রমজান কাকা এইখানে একটা মহুয়া গাছ পোঁতান। আর তারপর বাবাকে বলেছিলেন সেদিন, রামশঙ্কর তোমার ছেলের জন্মদিনটিতে এই গাছটা পোঁতালাম, এটা তোমার ছেলের স্মরণ-চিহ্ন হয়ে রইলো এখানকার সকলের—বলতে বলতে আজ তাঁর চোখটা যেন একটু চক্‌চক্ করে উঠলো। তারপর সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে হাণ্টারকে জিজ্ঞেস করে উঠলেন, কি খবর গোমেশ?

বোয়ালী চিত্রঃ আশু ভট্টাচার্য

হাণ্টার উত্তর দেন, আজ্ঞে স্যার—আর বলেন কেন, এখানকার লোক-জনেরা বড়ই অবাধ্য হয়ে গেছে। একটা কথাও আর শোনে না।

শিবশঙ্কর শুধু একটু মৃদু হাসলেন।

হাণ্টার আবার বলে উঠলেন, দেখুন না স্যার—কিছুতেই এদেরকে দিয়ে শিকারের মাচাটা এখনো তৈরী করিয়ে নিতে পারলাম না!

মথুর বাধা দিয়ে তাঁকে বলে উঠলেন, ওসব পরে হবে এখন। আগে ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিন। আজ উনি খুবই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত।

—আচ্ছা, আচ্ছা। বলে হাণ্টার চুপ করে গেলেন।

তারপর সকলে বাঙলো বাড়ীটায় ঢুকে পড়লেন। শিবশঙ্কর ও মথুর তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট বাঙলোর মাঝের বড় ঘরটিতে এসে দুজনে ঢুকলেন। দেখতে দেখতে কখন দুপুর যে গড়িয়ে এলো কারুর চোখেই পড়েনি সেটা। এঁরা এখানে সেই যে ঢুকলেন আর বেরোন নি। মাঝে শুধু একবার আহারের জন্যে উঠেছিলেন এঁরা। এই করেই রাত্রিও গড়িয়ে এলো। সেদিন ভোর রাত্তিরেই ঘটলো আর এক লোমহর্ষক ঘটনা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

তপতী রায়

বাইরে বেরোবার আগে একবার হাত বাড়িয়ে দেখে নিলেন অবিনাশবাবু।

---না ছাতাটা নেওয়াই ভাল, বোধহয় বৃষ্টি হবে।

---আমি তো বারবার বললাম ছাতা নাও, তা সে কথা কি মনে ধরে?

দরমা ঘেরা ভেতরের রোয়াকের রান্নাঘর থেকে স্ত্রী কিরণশশী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

---মনে ধরার কি আছে? এই ভিড়ে ট্রামে বাসে ওঠাই যায় না, এর ভেতর আবার ছাতা বাক্স সঙ্গে নিলে উঠতেই দেবে না বাসে।

---না দেবে না, তোমার যত ছুতো। সব কাজেই তো তাই, যেমন ভাল পাত্র পাচ্ছ না, এই ছুতোয় মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছ না।

---পাচ্ছি না তো বটেই, না কি মিথ্যে বলছি।

---সত্যি মিথ্যে জানি না। ঘরে চব্বিশ বছরের মেয়ে ধিঙ্গী করে বসিয়ে রাখ, আমার কি? গলা দিয়ে ভাত গলছে কি করে তাই ভাবি।

চুপ করে থাকলেন অবিনাশবাবু। চুপচাপ থাকাই তাঁর স্বভাব।

বিশেষ করে এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী কিরণশশী রঙ্গমঞ্চে থাকলে বরাবর তিনি বোবার অভিনয় করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। স্ত্রীর কাছে তাঁর চিরদিনের হার।

ইংরেজীতে দুর্ধর্ষ এম-এ হয়েও তাঁর ভাগ্যে সনাতন বিদ্যাভবনের স্কুল টিচারী ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। তবু ও তো বুড়ো বয়সে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের পদটি পাওয়ায় স্ত্রী ও আত্মীয়দের কাছে কিছুটা সম্মান রাখা গেছে।

চিরজীবন অবিনাশবাবু লোকের কাছে অবজ্ঞা পেয়ে এসেছেন। বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ীতে। বিয়ে হবার সময়ই নাকি শাশুড়ীর অমত ছিল, শুধু ভাল ছাত্র বলে শ্বশুর আগ্রহান্বিত ছিলেন। তখনও তবু ভবিষ্যৎ সামনে বিছান ছিল। এখন তো সবই অতীত. এত বছর ধরে শেষ পর্যন্ত এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার। শ্বশুর বাড়ীতে এ পদের মাইনের তুচ্ছতাই বড়। মর্যাদার কথা তাঁরা চিন্তাও করেন না।

তাঁর আর দুটি ভায়রাভাই দুজনেই বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ। একজন উকিল, অন্যজন ব্যবসায়ী, যদিও সোজা আলোয় নয়, তবুও নানাভাবে তাদের মাসিক আয় প্রায়ই হাজারের অঙ্ক ছাড়ায়।

তাই কম দামের প্রেজেন্ট দিয়েও তাদের বেশী সম্মান। আর মরেপিটে বেশি দামের প্রেজেন্টও তাঁর সম্মান নেই। অন্য দুটি বোনের কাছে স্ত্রী নাকি নীচ হয়ে থাকেন।

হবে না কেন?

হাজার টাকা খরচ করেও তাঁরা তৃপ্ত নয়। তাঁদের মত নিত্য নূতন গয়না কাপড় কেনার সখ মেটান তো কল্পনারও বাইরে কিরণশশীর। মেয়েটা বড় হয়েছে ওর গায়ে দুখানা ভাল কাপড় গয়না দেবার সুযোগ হয় না।

তাঁর মত স্কুল টিচারের গৃহিণী হয়ে মাত্র চারশ টাকার মধ্যে সংসার চালান যে কত কঠিন তা শুধু কিরণশশীই জানেন। বাপের বাড়ীতে তাঁর সম্মান নেই, পাড়ায় তিনি মাতব্বর-গৃহিণী নন, মেয়ের কোন সাধ মেটে না, ছেলেটা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সব রকমের অনুযোগে ঠাসা থাকে প্রতিটি মুহূর্ত। তবু নাকি তাঁর মনের জ্বালার শতাংশের একাংশ তিনি নেভাতে পারেন না।

তার ওপর বুকের ওপর বসে যত বড় বিশ্রী কাল মেয়ে প্রতিমা। ছোট-বেলায় যাও বা দেখতে ছিল, নামটাকে উপহাস করেই বুঝি সে যত বড় হচ্ছে ততই যেন রং-এর জৌলুষ বাড়ছে। শ্যামলা নয়, বেশ কালই বলা চলে প্রতিমাকে।

অবিনাশ বাবুর বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তাঁর কপালে এই জীবন ছাড়া আর কিছু নেই।

এখন যেতে হবে সেই দারোগার বাড়ী। যার বি-এ ফেল ছেলের সঙ্গে তাঁর এম-এ পাশ মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য আজ একমাস হাঁটাহাঁটি করছেন তিনি। রং ফরসা হলেও না হয় তাঁরা নগদের পরিমাণ কিছু কম করতেন, কিন্তু মেয়ের রং যখন ময়লা তখন দুহাজারের কম নগদ নেওয়ার কথা উঠতেই পারে না।

অবিনাশ বাবু বারবার ভাবেন; সারা জীবন তিনি পড়াশুনা আর শিক্ষকতা করে কি পেলেন? ইউনিভার্সিটির একদা উজ্জ্বল রত্ন প্রথম জীবনে নিজেকে স্কুল টিচার হিসেবে ভাবতে বেশ গৌরবই বোধ করতেন।

তারপর ধীরে ধীরে কখন নানা আঘাতে নিজের সম্বন্ধে সে মূল্যবোধ আপনা হোতেই কমে গেছে। নিজেকে উপেক্ষা আর অবহেলার পাত্র ভাবাই তাঁর কাছে স্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষ করে স্ত্রী কিরণশশী আর শ্বশুরবাড়ীর মতামত শুনলে তো মনে হয় তাঁর মত মূল্যহীন জীবনের কোন সার্থকতাই নেই।

তাঁর একমাত্র গর্ব তাঁর ছাত্ররা। এই তিরিশ বছরে তিনি কম করে পঞ্চাশ জন ছাত্রকেও মানুষ করতে পেরেছেন যাঁরা তাঁর মুখ উজ্জ্বল করেছে। সেটুকুই তাঁর গর্ব।

স্ত্রীর কাছেও তখন তিনি বড় মুখ করে বলেন যখনই খবরের কাগজে বা লোক মারফৎ তিনি কোন ছাত্রের কৃতিত্বের কথা জানতে পারেন।

খুব তো গর্ব করছ। জোটাতে পারনা এমন একটি ছাত্রকে ? ঘরে আইবুড়ো মেয়ে বসান অথচ পরের ছেলের গর্বে তো বুক ফোলাচ্ছ।

পরের ছেলে বলছ? ওরাই তো আমার ছেলে।

হ্যাঁ নিজের ছেলে গেল তল। সে বেচারা দিবারাত্রি হা চাকরি জো চাকরি করে মরছে। বয়েস কালে বিয়ে করতে পারছে না আর তুমি এসেছ ফুটানি করতে।

ফুটানি কিসের আমার আবার ফুটানি কিসের ? কিন্তু এতে আনন্দ হয় না ?

আনন্দর মাথায় আগুন। পরের ছেলের জন্য আনন্দ। নিজের মেয়ের বর জোটাতে তো হিমসিম খাচ্ছ।

সত্যি এমন একটা ছেলে যদি আমার প্রতিমার জন্য পেতাম।

ঘরে বসে থাকলে সব পাবে কি করে, তারা কি তোমার মেয়ের রূপের সুখ্যাতি শুনে বাড়ী বয়ে আসবে নাকি ?

খবরদার ওকথা ব'ল না---প্রতিমা শুনতে পেলে মনে কষ্ট পাবে না ?

ওর আবার কষ্ট কি, ও কি জানেনা বাপ-মার বুকে কত বড় শেল বিঁধছে দিবারাত্র।

তাহোক ওকে কিছু ব'ল না। যাই আর দেরী করব না, বৃষ্টি আসবার আগেই রওনা দিই, ছাতাটা এনে দাও।

প্রতিমা তোর বাবাকে ছাতাটা এনে দে।

রান্নাঘরে ঢুকে সজোরে খুন্তি নাড়তে লাগলেন কিরণশশী।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও। দুগ্‌গা দুগ্‌গা অবিনাশবাবু হাঁক দিলেন।

কিরণশশী যেন নিজের মনেই বললেন।

বাস থেকে ঠেলাঠেলি করে নামা-মাত্র শুনতে পেলেন তিনি।

স্যার।

লালবাতি দেখে গাড়ী থামান ছিল। ওঁকে দেখে গাড়ীটা ব্যাক্ করে পাশের গলিতে ঢোকাল বরেন, তারপর নেমে এসে অবিনাশবাবুর পায়ের ধুলো নিল।

---ভাল আছেন স্যার ?

---হ্যাঁ বাবা ভালই, কিন্তু তোমাকে তো ঠিক---

---চিনতে পারছেন না স্যার। আমি বরেন।

---বরেন ? কোন বরেন ? কিছু মনে কোর না বাবা তোমায় ঠিক চিনতে পারছি না। মানে অত ছেলের ভেতর মনে রাখাটা---

---জানি স্যার, মনে করব কেন ? বছর বছর কত ছাত্র বেরিয়ে যাচ্ছে। চিনতে না পারারই কথা।

---না না আমি সত্যিই লজ্জিত, তোমরা ছাত্র তোমাদের চিনব না এ কেমন কথা।

---আমি বরেন মজুমদার স্যার, উনিশশো তিপান্নতে স্কুল থেকে বেরিয়েছি।

---ও ভাল ভাল। ভাগ্যিস তুমি চিনতে পারলে।

---আপনাকে চিনব না স্যার ? কত বকুনি খেয়েছি আপনার কাছে। আমাকে আপনার মনে পড়বে সেই ঘটনায়।

---কিসের ?

---সেই যে দুষ্টুমি করে সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে একটা দেশলাই চেয়েছিলাম ?

---ও। কাজটা ভাল করনি।

ঘটনাটা মনে পড়তেই খারাপ লাগল অবিনাশবাবুর বরাবরই দুষ্টুমিতে প্রথম ছিল এই বরেন। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যেদিন মজা ক'রে সাহস দেখাতে গিয়ে সে সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে বিড়ি খাবে বলে দেশলাই চেয়েছিল।

দুদিন ঘুমোতে পারেন নি তিনি, ছাত্রদের এমন অধোগতিতে।

গম্ভীর হলেন অবিনাশবাবু।

ভাবান্তর লক্ষ্য করল বরেন। তারপর হাসিমুখে বলল।

---আমি নিজেই লজ্জিত স্যার। এখন ও সব কথা, ঐ সব ছেলেমানুষি ভাবলেও লজ্জা লাগে। ক্লাশের ছেলেদের সামনে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে কত বোকার মত কাজ যে করেছি। এ জন্য ক্ষমা চাই স্যার।

---না না ক্ষমা কিসের ?

---আপনাদের ক্ষমা ছাড়া জীবনে তো চলাই যাবে না স্যার।

আবার পায়ের ধুলো নিল বরেন।

---বেঁচে থাক বাবা। তবু তোমরা আমাদের সম্মান দাও। কত বড় হয়েছ তবু মনে রাখ, এটুকু স্বীকৃতি যে আছে তাই সম্বল করে বেঁচে থাকা। নাহলে আমাদের মত ইস্কুল মাস্টারের আর কি দাম বল ?

---সে কি কথা স্যার, আপনাদের কাছে আমরা চিরদিনই সেই আছি। বাবার পরেই যাদের সম্মান করি তাঁরা হলেন শিক্ষক।

---শুনেও ভাল লাগে বাবা। এখন তো 'শিক্ষকদের সম্মান' কথাটাই উঠে গেছে। ছাত্ররা সব কাঁধে হাত দিতে চায়। যা দিনকাল পড়েছে।

---সত্যি স্যার দিনকাল যা পড়েছে মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। পেটে খেতে পাচ্ছে না সব।

---হ্যাঁ বেকার সমস্যা তো দিন দিন বাড়ছে। আমার ছেলেটাই তো বসে আছে।

---কি পাশ স্যার ?

---বি-এ পাশ করেছে গত বছর,

চিত্রতারকা মাধবী মুখার্জি বলেন:
'আমায় সুন্দর ক'রে রাখার ব্যাপারে লাক্সই আমার পছন্দ"
একই যত্নে পরিচর্যায় আপনার
ত্বকও সুন্দর রাখা চাই বই কি:
তাই লাক্স টয়লেট সাবান।
রূপসী মাধবী মুখার্জি বলেন: "কেবল লাক্সই
আপনি সাদা আর চার রঙে পাবেন,
আর গন্ধও তেমনি মিষ্টি চমৎকার।"
লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের
সৌন্দর্যসাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
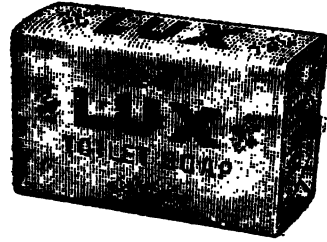
আর্টস কিনা কোন জায়গায় চাকরী পাচ্ছে না। আমি তো টাইপ শিখতে বলেছি। রোজগার তো করতে হবে।

—সে তো ঠিকই স্যার। রোজগার তো করতেই হবে। পড়াশুনো করার সুযোগ তো আসে না সবাইয়ের কাছে।

—সেই তো বলি ছেলেটাকে। কম কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছি তাকে। যাক—তুমি যাও বাবা কোথায় যাচ্ছিলে।

—সে আমি যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন স্যার? চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না না গাড়ীর দরকার নেই বাবা, এক্ষুনি বাস এসে পড়বে। যাব বেহালায়।

—সে কি হয়? আপনার সঙ্গে এতদিন বাদে দেখা চলুন স্যার।

—তুমি যে বললে বাবা এই ঢের, কতটুকুই বা রাস্তা আর। বাসেই যাব।

—আবেগে গলা মোটা হয়ে এল অবিনাশবাবুর।

—তা হোক স্যার, গাড়ী যখন রয়েছে তখন কষ্ট করে বাসে যাবেন কেন, চলুন।

আর কথা না বাড়ানই ভাল বিবেচনা করে গাড়ীতে উঠে বসলেন অবিনাশবাবু।

গাড়ীতে বসে ওর দিকে ভাল করে তাকালেন অবিনাশবাবু।

দামী টেরিলিনের সার্ট আর গাঢ় রং-এর প্যাণ্ট পরে দেখাচ্ছে বেশ বরেনকে। স্কুলে কেমন রোগা পটকা ছিল, এখন বেশ ভরে গেছে মুখটা। রুক্ষ চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে দুভাগ করে দিয়েছে। বেশ দেখাচ্ছে।

খুব দামী কোন সেণ্ট মেখেছে বোধহয়, নাকি আতর? কেমন একটা সুবাস ছড়াচ্ছে।

সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের চিহ্ন।

ভাল খেয়ে পরে থাকলে বোধহয় এমনটিই হয়। ওর চামড়া বেশ মসৃণ। স্টিয়ারিং'এ রাখা চওড়া মসৃণ কব্জিতে ঘড়ি বাঁধা ওর হাতটার দিকে তাকালেন অবিনাশবাবু। প্রতিমা মেয়ে হলেও তার মুখের চামড়া ওর থেকে নিশ্চয়ই খসখসে।

এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অবিনাশবাবুর বুক থেকে। এমন একটি ছেলে পাব না প্রতিমার জন্য। কি বিনয়, কি সৌজন্য।

—গাড়ীটা নতুন কিনেছ নাকি?

—না স্যার, আমার নয়। এক বন্ধুর। দরকার পড়লে নিই, ব্যবহার করি।

—বেশ আছ। তোমাদের জগতে আমাদের জগতের মত হিংসে হিংসে নেই। আমাদের চারপাশে যেন সব আরশোলার দল, কেউ একফোঁটা উদারতা দেখানর কথা কল্পনাও করতে পারে না। অথচ তোমাদের দেখ, কত ভাল সব বন্ধু।

—হ্যাঁ ভাল। শা—

বলে একটু থামল বরেন তারপর আবার বলল,—এমনি কি আর দিচ্ছে স্যার? স্বার্থ আছে। বদলা নেবে এর। জোঁকের মত সবাই বুঝলেন। তাছাড়া সকলেরই তো দুঃসময় আছে। পরস্পরের সাহায্য ছাড়া চলবে কি ক'রে?

—সে তো ঠিকই বাবা, তবু আজকালকার দিনে যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত কিনা।

—বাড়ীটা কোথায়?

—বড় রাস্তার ওপরেই। বেহালা থানায়।

—থানায়? কেন?

—ভদ্রলোকের কোয়ার্টার্স যে।

—সেখানে কেন?

বরেনের গলাটা হঠাৎ বদলে গেল।

—কেন একথা জিজ্ঞেস করছ?

—এমনি। এখানে কার কাছে যাবেন?

—ঐ দারোগার কাছে।

—দারোগার কাছে মানে খোদ দারোগার কাছেই?

—হ্যাঁ ঐ দারোগার কাছেই যে কাজ।

—চুরির কেস নাকি?

—না অন্য কথাবার্তা আছে।

—কথাবার্তা? দারোগা আপনার বন্ধু নাকি?

—না বন্ধু কিসের?

—তাই তো ভাবছি স্যার, আপনার মত লোকের বন্ধু দারোগা হবে কেন?

—না না সব দারোগা তো খারাপ নয়। অবশ্য এঁকে আমি ভাল চিনি না। তবে, সবাই তো আর সত্যিই খারাপ নয়।

—হোতে পারে।

—অন্তত আমি তো সেই আশাই করছি। নাহলে মেয়েটা আমার ভারী কষ্ট পাবে।

—আপনার মেয়ে কষ্ট পাবে কেন?

—ঐ দারোগার ছেলের সঙ্গেই যে আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। কত যে কষ্ট বাবা মেয়ে থাকার তা তো কাউকে বোঝাতে পারব না। যার আছে সেই বোঝে।

—বিয়ে না দিলে কি হয়?

—বল কি? গিন্নী তো দুবেলা গাল দিচ্ছেন। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটা পার হলে হয়।

—কি করে ছেলেটি?

—সেও তো পুলিশেই ঢুকেছে, কয়েক বছর হোল।

—আর পাত্র পেলেন না? পুলিশ?

জানি বাবা, আমার নিজেরও পুলিশে মেয়ে দিতে ইচ্ছে নেই। কি করব বল, তোমাদের মত পাত্র পেলে তো এত ভাবতাম না। গিন্নী তো রাতদিন---

কথা শেষ না করতেই বাধা পেলেন।

---কি যে বলেন স্যার। আপনারা ছাত্রদের স্নেহ করেন তাই ভাল বলেন নাহলে---

---না না বাবা তোমরা সত্যিই আমাদের আনন্দ। মাস্টারের জীবনে আর কি আছে? তোমাদের মত কৃতী ছাত্র দেখাও সৌভাগ্য। তোমার ঠিকানাটা কি?

পকেট থেকে নোট বই বার করে ঠিকানা লিখতে গেলেন অবিনাশবাবু।

ওঁর মনিব্যাগটা পড়ে গেল সীটের ওপর। বরেন সেটা দেখতে পেয়ে বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ওঁকে দিয়ে বলল,

---স্যার আপনি সেকরম ভুলোই আছেন। বাসে ট্রামে যাতায়াত করেন অথচ মনিব্যাগ ঠিক করে রাখেন না। এই নিন পড়ে গিয়েছিল।

---ওঃ দেখ, কি যে করি, কতবার যে এমনি হারিয়েছে।

সাবধানে রাখবেন স্যার। পকেট-মার যেতে পারে।

---পকেট মারই তো হয়েছে ওদের হাত এত সাফ, জান বুঝতেই পারবে না কখন পকেট তোমার খোয়া গেল।

বরেন কোন কথা না বলে গাড়ী চালাতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বলল।

---আপনার কখনও পকেট মারা গেলে আমাকে বলবেন, আমি মাল ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করব।

কি করে? ওদের আড্ডা জান নাকি?

---খানিকটা। সবই তো জানতে হয় স্যার জীবনে।

---সে তো ঠিক কথাই বাবা। কত হুঁসিয়ার ছেলে তুমি, তবে পকেট-মারের আড্ডা জানতো পুলিশে ধরিয়ে দাও না কেন?

---কি হবে বলুন। ওরাও তো করে খাবে।

---না না তা'বলে পকেট মেরে, ভাবাও যায়না, আর কি জান এইসব পকেটমারেরা দিব্যি ভদ্রলোক সেজে থাকে। চিনতেও পারবে না কে পকেট-মার, এমন মজা।

দূর থেকে থানা দেখা গেল। বাঁকটা ফিরলেই থানা। বরেন হঠাৎ গাড়ীর গতি কমিয়ে দিল।

---স্যার, আমি যদি আপনাকে এই মোড়ে নামিয়ে দিই তাহলে চলবে?

---বিলক্ষণ, আহা আমি তো সবটাই নিজে আসতে পারতাম, আমি তো বারণই করেছিলাম।

অবিনাশবাবু রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

---জান স্যার আপনি বারণই করেছিলেন, তবে ভাবিনি আপনি এ বাড়ীতে আসবেন।

---কেন? চেনো নাকি এঁকে?

---আমি চিনিনা, তবে উনি আমাকে ঠিকই চেনেন।

---সে আবার কি?

---হ্যাঁ স্যার লোকটা জাঁহা ধড়ি-বাজ। শালা বলেই জিভ কাটল বরেন।

---মাপ করবেন স্যার, লোকটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

হ্যাঁ আমিও শুনেছি লোকটা নাকি তেমন সুবিধার নয়। আমাকেই তো প্রায় প্রাণে মারছে। আচ্ছা এখানেই নামি তাহলে। একদিন এসো আমাদের বাড়ী।

---ঠিকানাটা কি স্যার, নিশ্চয়ই যাব।

---তেরোর সি নিতাই বসুর লেন। মনে থাকবে তো?

---মনে থাকবে, আমি বাড়ী গিয়েই লিখে রাখব।

---এসো ঠিক বুঝলে, তোমাদের মত ছাত্রদের দেখলেও আনন্দ হয়। তোমরা আমার গর্ব। গিন্নীকেও দেখাব।

হঠাৎ নীল হ'য়ে গেল বরেনের মুখ। ও গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল অবিনাশবাবুর সঙ্গে তারপর আস্তে আস্তে বলল, না স্যার বেশী বলছেন, আমি---

---বিলক্ষণ, একটুও বেশী বলছি না, এসো ঠিক বুঝলে? অফিস ফেরৎ একদিন চলে এসো।

---আমার ঠিক অফিস নয় স্যার।

---তাহলে কি ব্যবসা? তাহলে তো আরও ভাল, তোমার সময়মত তুমি চলে আসবে। এতো আর কাউকে বলে আসতে হবে না। স্বাধীন ব্যবসা।

---ঠিক তা নয় স্যার, আমার কাজ তো সারাক্ষণই। এমন কি রাতেও ছুটি নেই।

---তাই নাকি? তাহলে তো ভারী খাটুনি।

---খাটুনি?

একটু দ্বিধা করল বরেন। তারপর আস্তে আস্তে বলল---

---খাটুনি যত না, রিসক তার থেকে বেশী, তাছাড়া ভারী আনসারটেন।

---রিসক্ তো জীবনে আছেই, তবে এত যদি আন্‌সারটেন তাহলে কেন এ ব্যবসা করছ? কিসের ব্যবসা তোমার?

একটু ইতস্তত করল বরেন। ওর মুখের পেশীগুলো কেমন যেন বেঁকা হয়ে গেল। কণ্ঠে কোন একটা আবেগ করতে চাইল যেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠল।

---স্যার আপনার আশীর্বাদে আয় মন্দ হয়না। তবে---

---তাতে আর কি? ব্যবসা যখন ভাল আয় দেয়, ভাল ব্যবসাতে আছ তখন আর চিন্তা কিসের?

গম্ভীর হয়ে গেল বরেন। তারপর অবিনাশবাবুর পায়ের ধুলো নিতে নিতে যেন মরিয়া হয়েই বলেই ফেলল---

---স্যার আমি---আমি স্যার---ওদেরই দলে।

---কাদের?

ঐ মনি ব্যাগের কথা বলছিলাম না?

---হ্যাঁ তা কি?

---আমিও ওদেরই একজন।

---বল কি?

প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিলেন অবিনাশ বাবু।

---আজ্ঞে হাঁ, এ ছাড়া আর কোন পথ পেলাম না---চলি স্যার।

দ্রুত পায়ে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিল বরেন মজুমদার আর ওর অপস্রয়মান গাড়ীর দিকে তাকাতে তাকাতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন অবিনাশবাবু।

কখন আস্তে আস্তে তাঁর পাঞ্জাবী ভিজে গেছে খেয়াল নেই।

বৃষ্টি তখন বেশ জোরে নেমেছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পূর্বাভাস /

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

যুগাবতার পরমহংসদেব সম্বন্ধে গ্রন্থরাজির সংখ্যা বড় স্বল্প নয়, তবু যে তাঁর সম্পর্কে জানা আজও শেষ হল না ; মনে হয় বুঝিবা আরও কত দিক থেকে তাঁকে চেনা যায় জানা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। নানা কুসংস্কার ও অনাচারে দুষিত হয়ে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ যখন প্রায় মজ্জমান অবস্থায় পৌঁছেচে, তখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে। দেশের তাবৎ শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষ সেদিন স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিলেন, পেরেছিলেন স্বধর্মে পুনঃ আস্থা স্থাপন করতে। আলোচ্য গ্রন্থে তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে পরমহংসদেবের প্রকৃত মহিমাকে। বোদ্ধা পাঠকমাত্রই যে এ গ্রন্থকে সমাদরের সঙ্গে হাতে তুলে নেবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা এ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যকামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক---শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি, প্রকাশনা---বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---দুই টাকা।

যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি /

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

প্রবীন সাহিত্যসেবী লেখকের এই স্মৃতিচারণমূলক রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আজ পর্যন্ত যেসব মনীষীর সংস্পর্শে তিনি এসেছেন তার মধ্যে পুরোধাস্থানীয় কয়েক জনের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে একালের অনেক মনীষীকেই তিনি কাছ থেকে দেখেছেন এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে তিনি যে যথোপযুক্তভাবেই সম্মান দেখাতে সক্ষম, বর্তমান গ্রন্থোক্ত রচনাগুলি তার পরিচয়বাহী। তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতা

সাহিত্য পরিচয়

শুধু কৌতূহলোদ্দীপকই নয় যথেষ্ট মূল্যবানও। এরকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য বসুমতীর প্রকাশন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক---শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, প্রকাশনায়---বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---দুই টাকা।

হোল্ডার্লিনের কবিতা /

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স

বিখ্যাত জর্মান কবি ফ্রীডরিশ হোল্ডার্লিন-এর কবিতার এই বঙ্গানুবাদ সুধী ও বোদ্ধা পাঠককে আনন্দিত করে তুলবে। দুই বিপরীত মানসিকতার প্রতিভূ এই কবি, একদিকে তিনি বহুমুখী, বহুপ্রসূ, বিস্তীর্ণ, রাজকীয়, অপর দিকে তিনি একতন্ত্রী, নিবিষ্ট, সীমিত, সংহেলিত তীব্র ও ঐকান্তিক। এই দ্বন্দ্বসমাসে গড়ে উঠেছে যে প্রতিভা, কবিতাগুচ্ছের মাঝে তারই স্বাক্ষর আঁকা। ধ্যানীকবি বলতে যা বোঝায় হোল্ডার্লিন ছিলেন তাই, স্বরচিত মানসলোকে তিনি বাস করেছেন, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে উদাসীন থেকে। কবিতাগুলির মধ্যেও সেই সুন্দরত্বের আভাস, এক অসীমত্বের বিকাশ অনুভব করা যায়। লেখক নিজেও শক্তিশালী কবি, হয়ত সেজন্যই হোল্ডার্লিন-এর কাব্যের মূল কথাটি তিনি ধরতে পেরেছেন সহজেই। লেখক কৃত মূল্যবান ভূমিকাটি এই কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সুন্দর কয়েকটি আলোকচিত্র এ গ্রন্থের আর এক সম্পদ। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা---বুদ্ধদেব বসু, প্রকাশক---এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---সাড়ে তিন টাকা।

শার্লক হোমসের ডায়েরী /

বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

শার্লক হোমস্, কোন কাল্পনিক চরিত্রই আজ পর্যন্ত জীবন্ত মানুষের মত এত প্রীতি এত শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেনি, কোনান ডয়েলের অমর লেখনী-প্রসূত শার্লক হোমস্ চরিত্রটি যা পেরেছে। বস্তুত শার্লক হোমস্ নিছক কল্পনা-প্রসূত না বস্তুজগতের দেহধারী এ সম্বন্ধে একটা ধাঁধার ভাব লেগেই থাকে মনে এবং শোনা যায় যে স্বয়ং লেখকও জীবনে এ ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন বহুবার। আলোচ্য গ্রন্থে এই জনপ্রিয় চরিত্রকে নিয়ে চিত্তাকর্ষক কাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখক। শার্লক হোমসের চাঞ্চল্যকর কর্মজীবন এবং কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিজীবনই এ কাহিনীর বিষয়বস্তু। শার্লক হোমসের গল্প এর আগে বহুবার ইংরেজী থেকে অনূদিত হয়েছে বটে, কিন্তু কল্পনা ও সত্য জড়িয়ে এ ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম এবং এজন্য লেখক সত্যই ধন্যবাদার্হ। লেখকের আন্তরিকতায় রচনা একটা বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত, তার শৈলীও যথেষ্ট প্রাণবন্ত। আমরা বইটি পড়ে খুশী হয়েছি ও এর সাফল্য কামনা করি। অঙ্গসজ্জা পরিপাটি, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ, লেখক---অদ্রীশ বর্ধন, প্রকাশনায়---বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-১২, দাম---সাড়ে চার টাকা।

মিতুল নামে পুতুলটি / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

আলোচ্য গ্রন্থটি ছোটদের জন্য লেখা। মিতুল নামে একটি ছোট্ট পুতুলের ইতিকথা এটি। পুতুলওয়ালার দলের আর আর পুতুলদের সঙ্গে নাচ দেখাতো মিতুল নামে ছোট্ট এক পুতুল, ক্রমে পুতুলওয়ালার টাকার আমদানী হল বেশী করে, নতুন নতুন আরও কত পুতুল এল, আর সেই সঙ্গে কপাল ভাঙলো মিতুল ও অন্যান্য পুরানো পুতুলদের, শেষে টান মেরে তাদের একদিন রাস্তায় ফেলে দিলো পুতুলওয়ালা। তারপর কত অ্যাডভেঞ্চার করল মিতুল ও তার সঙ্গিনী আরেকটি পুতুল, রাজকন্যা যার নাম; তারই বিবরণে ভরে গেছে পাতার পর পাতা। আশ্চর্য রোমান্টিক শৈলী লেখকের, রূপকথার রাজত্বে সত্যই নিয়ে যেতে পারেন তিনি পাঠককে। ছোটরা যে সাগ্রহে এ রচনাকে হাতে তুলে নেবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখ্য সংযোজন বলেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---শৈলেন ঘোষ, প্রকাশক---আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম---তিন টাকা।

ইতুর থেকে ইত্যাদি / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

হালকা হাসির ছোঁয়ায় দুলতে যাঁরা ভালবাসেন, সরস রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার শিবরাম চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক এই রচনা তাঁদের যথেষ্ট আনন্দ দেবে। অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ হাসির খোরাক সংগ্রহ করেছেন লেখক, তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য পান এর প্রসাদে, আলোচ্য গ্রন্থটিও হয়ে উঠেছে উপভোগ্যতায় রমণীয়। প্রধানত কিশোর-কিশোরীদের জন্য লিখিত হলেও বয়স্করাও অবসর বিনোদনের জন্য বইটি হাতে পেলে খুশী হবেন। প্রচ্ছদ রীতিমাফিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন, লেখক---শিবরাম চক্রবর্তী, প্রকাশক---আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম---তিন টাকা।

লাল বল-লারউড / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

ক্রিকেট এখন সমস্ত দেশে জাতীয় খেলার পর্যায়ে পড়ে, ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়, এ গ্রন্থে বডিলাইন ক্রিকেটের একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্যায়ের ক্রিকেটের অদ্বিতীয় নায়ক লারউডের জীবনী বিধৃত। লারউডকে কেন্দ্র করেই বডিলাইনের সম্যক ব্যাখ্যা করেছেন লেখক কারণ এ দুটি নামই যে ক্রিকেটের ইতিহাসে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মারমুখো খেলোয়াড় লারউডের নামের সঙ্গে জড়িত কত ব্যথা, কত সংশয়, তাকে সমর্থন করতেও দ্বিধা জাগে, অবহেলা করতেও প্রাণ চায় না। ক্রিকেট জগতের এই অন্যতম মহানায়ক নিজেই যেন এক প্রহেলিকা। গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে লারউডের জীবন দর্শনকে বুঝতে চেয়েছেন লেখক এবং তাঁর উপলব্ধি যে ব্যর্থ হয়নি, বর্তমান রচনার মাধ্যমে তাই প্রমাণ করেছেন। বডিলাইন ক্রিকেটের গোপন রহস্যও এখানে উদ্‌ঘাটিত। ক্রিকেট রসিক লেখকের সুনিপুণ কথকতার প্রসাদে ক্রিকেট-অনভিজ্ঞ পাঠকও এ রচনা পাঠ করে সমূহ আনন্দ লাভ করেবেন। ক্রিকেটানুরাগীদের কথা তো বাদই দিলাম। লেখকের শৈলী সত্যই অনবদ্য। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক---শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রকাশক---আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম---ছয় টাকা।

অগ্নি স্বাক্ষর / গ্রন্থপ্রকাশ

বাঙলার বিস্মৃতপ্রায় এক যুগের যুবজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই গ্রন্থের কাহিনী। বিয়ের রাতেই স্বামীসঙ্গচ্যুতা হতে হল নববধূ চিরশ্রীকে, বিপ্লবী শমিত আকস্মিক দুর্বলতায় বিবাহে সম্মতি দিয়েও মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি যে সে দেশের পায়ে উৎসর্গীকৃত দেশ-মাতাকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত না করা অবধি ব্যক্তিগত জীবনযাপন করার কোনও অধিকার নেই তার। কর্তব্যের আহ্বানে চলে যেতে হল শমিতকে বাসরশয্যা পরিত্যাগ করে, সুন্দরী চিরশ্রী রইল অনাঘ্রাতা। অগ্নি-যুগের যুবজীবনের বঞ্চিত যৌবনের আলেখ্যও বুঝি আঁকতে চেয়েছেন, লেখক কাহিনীর মাধ্যমে এবং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সে প্রচেষ্টা তাঁর সার্থকও হয়েছে. চিরশ্রী ও শমিতের ট্র্যাজেডী সহজেই মনকে স্পর্শ করে। বইটির পাতায় পাতায় লেখকের অনবধানতার ফলে এমন কয়েকটি প্রমাদের প্রমাণ পাওয়া যায় যা রীতিমতই পীড়াদায়ক, আশা করি সংস্করণান্তরের সময় লেখক ঐ সম্পর্কে অবহিত হবেন। প্রচ্ছদরুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রকাশনা---গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---সাত টাকা।

মণিমালা

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে অসংখ্য ছোট ছোট সরস নীতিকথামূলক, অনেকটা সনেট জাতীয় কবিতা একত্রিত করা হয়েছে। কবিতাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য, কবির রসনিবিড় অন্তরটিকে যেন অনুভব করা যায় এদের মাঝে। বঙ্গ সাহিত্য সরস্বতীর কণ্ঠে এ রচনা ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান মণিখচিত সুন্দর, মালার মতই শোভা পাবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন, লেখক---বিভূতি বিদ্যাবিনোদ, প্রকাশক---শ্রীশরদিন্দু পাল, ৫৭, পার্বতী ঘোষ লেন, কলিকাতা-৭, দাম---এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রজাপতি / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড

সামাজিক অবক্ষয় ও বিকৃতির প্রকৃষ্ট ছবি এই উপন্যাস। সমস্ত যুগ-মানসটাই কিভাবে আবিল হয়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বার্থের ছোঁয়ায়, কি ভাবে সমস্ত মানবিক অনুভূতি লোপ পেতে বসেছে, এ গ্রন্থের নায়ক তারই উপলব্ধিতে দিশেহারাপ্রায়। সমরেশ বসু সাম্প্রতিক সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা জীবনের এক নির্গুণ সত্যকে যথাযথ আন্তরিকতার সঙ্গেই উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন তিনি, তাঁর বক্তব্য অকপট ও বস্তুনিষ্ঠ, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী আর একটু শালীন হলেই বোধহয় ভাল হত। সমস্ত রচনায় রুচিহীনতার এমন সব নিদর্শন ছড়ানো যে, অস্বস্তিবোধ না করে সম্ভব নয় কোন রুচিবান মানুষেরই পক্ষে। সত্যনিষ্ঠতা সাহিত্যকারের সবচেয়ে বড় প্রসাদগুণ নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেই সত্যের জন্য সুন্দরকে একেবারে বিস্মৃত হলেই বা চলবে কেমন করে? শৈলী বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---সমরেশ বসু, প্রকাশক---আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম---ছয় টাকা।

একান্ত / ক্লাসিক প্রেস

একদিন কোন এক সাময়িক সাহিত্যপত্রের পৃষ্ঠায় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে যে আলোচনার আসর জমে উঠেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই গ্রন্থ। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের বিবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক, গ্রন্থোক্ত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে লেখকের কলমে জোর আছে, সাহিত্য-বিষয়ক সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি ভেবেছেনও অনেক, ফলে তিনি যা বলেছেন তা স্বভাবতই সত্যসন্ধী হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রকৃত সাহিত্য সমালোচনার প্রয়োজন যে কত বেশী, লেখক সে সম্বন্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন যথাযথ। প্রত্যেক সাহিত্য সচেতন পাঠকই যে লেখকের সঙ্গে একমত হবেন এ ব্যাপারে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। লেখকের ভাষা সাবলীল, ভঙ্গী আন্তরিক, তাঁর বক্তব্যও তাই সহজেই মর্মস্পর্শ করে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---চাণক্য সেন, প্রকাশক---ক্লাসিক প্রেস, ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, দাম---ছয় টাকা।

আমি সিরাজের বেগম / নতুন প্রকাশক

আলোচ্য উপন্যাস পাঠকের অপরিচিত নয়, পূর্বেই ইতিহাসের আমেজমাখা এই রচনা আরও তিনবার আত্মপ্রকাশ করেছে, গ্রন্থটির এই নব-সংস্করণ এর জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের বেগম লুৎফা বা লুৎফউন্নেসার জবানীতে কাহিনী বিবৃত। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমির অনেকটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে আলোচ্য রচনার মাধ্যমে। ঐতিহাসিক কাহিনীকে স্বাদুতর করার জন্য যেটুকু রোমান্টিসিজমের প্রয়োজন কাহিনীতে তার অভাব নেই, সেই সঙ্গে আছে তৎকালীন নবাব দরবারের সুষ্ঠু বর্ণনা; সুতরাং গ্রন্থটি মোটামুটিভাবে সুপাঠ্য হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। ঐতিহাসিক কাহিনী পড়তে যাঁরা ভালবাসেন, বর্তমান রচনা তাঁদের মনোরঞ্জন করবে নিঃসন্দেহে। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---শ্রীপারাবত, প্রকাশনা---নতুন প্রকাশক, ১৩।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---তিন টাকা।

সোনালী ধোঁয়া / গ্রন্থ প্রকাশক

চিরন্তন ত্রিভুজ ও তার সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বিপ্লবী যুবক শঙ্কর বন্ধুর সঙ্গে তার মামার বাড়ীর গ্রামে এলো, শুধু বেড়ানোর তাগিদেই নয় আত্মরক্ষার তাগিদেও বটে, পুলিশের সতর্ক চোখ তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে চারদিকে। কিন্তু এক বিপদ এড়াতে গিয়ে আরেক বিপদে পড়ে গেল সে বুঝি বা, গ্রামের দুটি মেয়ে ভালবাসলো তাকে, প্রথমা কমলা সাহসিকা যৌবনবতী এক কন্যা, যে শুধু ভালবেসেই ক্ষান্ত নয়, সব দিয়ে সব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও সে রাখে, আর দ্বিতীয়া সুধা ভালবেসেই যে তৃপ্ত, দৈহিক উন্মত্ততার দাম যার কাছে বড় বেশী নয়। কমলাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেও শঙ্কর বিবাহ করলো সুধাকে, বুঝিবা সুধার সুধাময় নারীত্ব অলক্ষ্যে মোহসঞ্চার করেছিল তার মনে। কিন্তু মন মানলেও দেহ তো প্রবোধ মানে না, তাই আবার কমলার আবির্ভাব ঘটে, আবারও তাকে ঘিরে প্রমত্ত হয়ে ওঠে শঙ্করের কামনা, ফলে সুধা ও তার দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় গভীর ফাটল, মর্মাহত সুধা অকালে ভগ্নস্বাস্থ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ত্রিকোণ প্রেমের বিষাদময় পরিণতি নিপুণ হাতেই ফুটিয়েছেন লেখক, তাঁর আন্তরিকতা সহজেই মনকে স্পর্শ করে। লেখকের শৈলী সাবলীল ও উজ্জ্বল। প্রচ্ছদ সুষম, ছাপা ও বাঁধাই ভালো। লেখক---স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশনায়---গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---সাত টাকা।

॥ জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলাফল ॥

ভৃগুজাতক

কালবৈশাখীর তাণ্ডবের মধ্যেও এক ধরণের সুন্দর অনুভূতি আনে জ্যৈষ্ঠ মাস। বৈশাখের দাবানল আর রুদ্রতা প্রশান্ত হয়ে উঠছে, তার মাঝে সুন্দরের ধ্যানমগ্ন এক চিরতরুণ। এই মাসে যাদের জন্ম, তাদের মধ্যে এই চির-তরুণের স্বপ্ন থাকে। তারা সহজাত গুণে শিল্পী; সাহিত্য সৃষ্টি করুন আর নাই করুন, তাদের উপলব্ধি গভীর। জ্ঞানী, গুণী ও যোগ্য লোককে সহায়তা করতে এরা দ্বিধা করেন না। জন্মকালে শনি অথবা মঙ্গল নিতান্ত বিরুদ্ধ না হলে এদের আর্থিক কষ্ট হয় না; বরং নানাসূত্রে অর্থ-সম্পত্তি লাভ করতে পারেন। ঐ মাসের জাতিকাদের হৃদয় বাৎসল্য-রসে পূর্ণ। তারা সুগৃহিণী এবং সুশিক্ষিকা। যাক্ এবারের জ্যৈষ্ঠ মাস রাজনৈতিক দিক থেকে অশুভ ইঙ্গিতসূচক। রাশিয়ায় নূতন পরিবর্তন ঘটতে পারে। আরব-ইস্রাইল নিয়ে জটিলতা এবং আকস্মিকভাবে কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হতে পারে। ভারতের উপর অশুভ গ্রহের ছায়াপাত রয়েছে। পাকিস্তানের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে পারে। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে। অশান্তি ও অসন্তোষ মাঝে মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করবে। ভারতের পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে আসামের অবস্থা লক্ষণীয়। এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী জ্যৈষ্ঠমাসের শুভাশুভ আভাস দেওয়া হল :

মেষ : মনের দুর্বলতা বেশ উত্ত্যক্ত করবে। অথচ এমন কোনো জটিলতা নেই, যা আপনাকে ফ্যাসাদে ফেলতে পারে। চাকুরেই হোন, আর ব্যবসায়ীই হোন, কিংবা স্বাধীন প্রোফেশনের আইন-জীবী। চিকিৎসক কিংবা কন্ট্রাক্টার হোন্, তাতে কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই ঝঞ্ঝাট দেখা দেবে। ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা, এমন কি কাউকে ধার দিয়ে তা উশুল করতে গিয়ে অশান্তিতে পড়তে পারেন। পারিবারিক ক্ষেত্রেও আপনাকে প্রায়ই ভুল বুঝবে। অথচ খাটুনি বাড়বে প্রচুর। আয়ের নূতন পথও জুটবে। সেখানে সৌহার্দ্যের প্রসার ঘটবে। এমন কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে পারে, যিনি হয়ত আপনার বাকী জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। কাজ-কর্মে যাতে ভুল-ভ্রান্তি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখুন। স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। ব্যথা-বেদনা এবং উদর-সংক্রান্ত জটিলতা কষ্ট দিতে পারে। বিবাহ যোগ্যদের এ সময়ে বিবাহ হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এখন শুভকর। মহিলা জাতকেরও অনুরূপ ফল। কিন্তু গুরু-জন-কষ্ট এবং আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। মেষ লগ্নে জন্ম হলে শনি কিংবা রাহুর দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান। পারিবারিক অশান্তি এবং শত্রুতায় কুৎসা-প্রচার মনের উপর চাপ দেবে।

বৃষ : ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ধরণের দুর্ভাবনা মাঝে মাঝে বিচলিত করে তুলতে পারে। এর জন্য কাজকর্মের ব্যাপারেও এলোমেলো ভুল-ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। যদি কোনো উৎপাদনের কারখানা, কিংবা রাসায়নিক দ্রব্যের কারবারী হোন, তাহলে ও নিয়ে জটিলতাও দেখা দিতে পারে। ধীর-স্থির-ভাবে কাজ করুন। ব্যবসায়ে আশানুরূপ হবে না। চাকুরীক্ষেত্রে উন্নতির যোগা-যোগ রয়েছে। তবু কেমন যেন একরূপ নৈরাশ্য পেয়ে বসতে পারে। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। দাঁতের অসুখ ও চর্মরোগ সমন্ধে সাবধান। পারিবারিক সমস্যাও মাঝে মাঝে শান্তির বিঘ্ন ঘটাবে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কারো সঙ্কট পীড়ারও আশঙ্কা আছে। নিজের ভুলে আর্থিক ক্ষতি, চুরি যাওয়া কিংবা ভেঙ্গে চুরে গিয়ে ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। তরুণ-তরুণীদের এখন স্বেচ্ছা-কৃত বিবাহের ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। ঐ রাশির মহিলাদের কোনো সূত্রে লাভবান হবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে তা চাকুরীই হোক আর ব্যবসায়ই হোক, নূতন ভাবনা বিচলিত করবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। মঙ্গল কিংবা বুধের দশান্তদশা চললে সকল কাজেই সতর্ক হবেন।

মিথুন : আগের পরিকল্পনামত কাজে ব্যাঘাত এবং যাদের নিয়ে কাজ-কারবার তাদের সঙ্গে মতবিরোধ অশান্তি আনতে পারে। তবু সঙ্কল্পে অটল মনোভাব ও দৃঢ়তা আপনাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। নিজের মৌলিক কাজে বাধা পড়তে পারে। চুক্তির কাজ নিয়ে ঝঞ্ঝাটও হবে। এদিকে স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। উত্তেজনার কারণও রয়েছে। পারিবারিক দিক থেকে সহযোগিতার অভাব না থাকলেও গুরুজনদের কারো কঠিন পীড়া এবং ছেলেমেয়েদের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা করুন। সরল বিশ্বাসে কারো দ্বারা প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। উঁচু জায়গায় ওঠানামার সময় সতর্ক হবেন। চাকুরীক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। নূতন প্রার্থীদের চাকুরী লাভ হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ভাল। ইঞ্জিনীয়ার-কন্‌ট্রাকটারদের পক্ষে এখন অত্যন্ত ঝঞ্ঝাট। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্যের গোলমাল ও শত্রুতা মনের উপর চাপ দেবে। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে ব্যবসায়ে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপার উত্যক্ত করবে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ারও আশঙ্কা আছে।

কর্কট : আরম্ভটা ভালই। কিন্তু বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট এবং অন্যের কাজে সময়ের অপচয়, এমন কি আর্থিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এখন থেকে আশ্বিনের মধ্যে আয়বৃদ্ধির যোগাযোগ এবং বিশিষ্ট হিতৈষীদের সহায়তা পাবেন। অবশ্য গুরুজনদের কারো জীবনসঙ্কটও উক্ত সময়ের মধ্যে হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য কিছু কিছু উৎপাত করবে। পুরনো রোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়া পড়ে গিয়ে আঘাত লাগারও আশঙ্কা আছে। টাকা-কড়ি হারানো কিংবা দরকারী দলিল-পত্র সম্বন্ধে গোলযোগ হতে পারে। নীচগামী শনি ও ভাগ্যকে রাহু মাঝে মাঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলবে। কোনোরূপ ঝুঁকির কাজে ঝাপিয়ে পড়বেন না। ব্যবসায়ে মোটামুটি চলনসই। চাকরীক্ষেত্রে এখন ভাল বলাই চলে। তবু রাজনীতি দলীয় চক্রান্তে এবং বেফাঁস কথা বলা সম্বন্ধে সাবধান। বিবাহযোগ্য পুরুষ কিংবা নারীদের পক্ষে এখন বিবাহ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। মহিলাদের প্রায় অনুরূপ। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি ও নূতন যোগাযোগ রয়েছে। উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। বুধ কিংবা শনির অন্তর্দশা চললে তা বেশ ক্ষতিকর হতে পারে।

সিংহ : মনোমত পরিবেশে কাজ করবার সুযোগ আছে গোড়ার দিকে। শিল্পী, সাহিত্যিক ও গ্রন্থকর্তাদের এবারের সৃষ্টি স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে ডাক্তারী ও আইন ব্যবসায়ে কৃতিত্ব বাড়বে। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু বিভ্রান্ত কিংবা উত্তেজিত হয়ে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, এবং হিতৈষী-জনকে শত্রু করে না তোলেন, সেদিকে নজর দিন। পারিবারিক ক্ষেত্রে মোটা-মুটি শুভ অবশ্য শনির অগ্রগতি মাঝে মাঝে নৈরাশ্য সৃষ্টি করবে। গুরুবলে অনেক সঙ্কট থেকে বেঁচে যাবেন। রাজনীতি নিয়ে যাদের কারবার, তারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে পারেন। বৃহৎ পুঁজিপতিদের পক্ষে এখন থেকে ছয় মাস বিশেষ লক্ষণীয়। সাতান্নর উপর তেষট্টির মধ্যে যাদের বয়স, তাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। তরুণ-প্রণয়ী বা উক্ত বিষয়ে যারা উদ্যোগী, তাদের পক্ষে সংযত থাকা উচিত। কারো প্ররোচনায় বাইরে কোথাও গিয়ে বিপন্ন হতে পারেন। মহিলাজাতকের পক্ষেও অনুরূপ ফল। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক ক্ষেত্রে বাধা এবং শত্রুবৃদ্ধির যোগ। প্রোফেশনে আয় বাড়বে। মধ্য-ভাগ ও শেষের কয়েকদিন স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ প্রতিকূল।

কন্যা : কাজকর্মের দিক্ থেকে আগের চেয়ে সুযোগপ্রদ। মনের জোর রাখুন। অহংসর্বস্ব হওয়া কিংবা অযথা মর্যাদাবোধে নিজের ক্ষতি করা সম্বন্ধে সাবধান। স্বাধীন প্রোফেশনে আয় বাড়বে। নানা কারণে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হবে। নূতন বন্ধুর সংখ্যা বাড়বে। দোকানদারির মধ্যে ওষুধপত্র ও লোহার কারবারীদের পক্ষে অধিকতর ভাল। ইঞ্জিনীয়ার-কন্‌ট্রাক্টারদের পক্ষে ঝঞ্ঝাট। ছাত্রছাত্রীর পক্ষে পরীক্ষাদির ব্যাপারে অনুকূল। অভিনেতাদের পক্ষে সুযোগ আসবে। কিন্তু সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের সঙ্কট যাবে। আকস্মিক কোনো ফ্যাসাদে পড়ারও আশঙ্কা রয়েছে। অধ্যাপক ও লেখক শ্রেণীর পক্ষে সম্মান ও স্বীকৃতিসূচক। পারি-বারিক ব্যাপার মোটামুটি ভাল কিন্তু সন্তানদের মধ্যে কারো আচরণ ক্ষোভ জন্মাতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে কিছু ভাল হবে। নূতন প্রার্থী কাজ পেতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। মহিলাদের মনের উপর কালো-ছায়া পড়তে পারে। বিবাহযোগ্যাদের এখন বিবাহ না করাই উচিত। প্রতারিত হওয়া সম্বন্ধে সাবধান। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে জনপ্রিয়তা বাড়বে। আর্থিক টানাটানি যাবে। স্বাস্থ্য ও উৎপাত করবে।

তুলা : জ্যৈষ্ঠমাস কাজকর্মের দিক দিয়ে অনুকূল হবে। অবশ্য আর্থিক ব্যাপারে তেমন আশাপ্রদ নয়। গোড়ার দিকে পারিবারিক পীড়া ও নিজেরও কষ্ট যেতে পারে। শেষাংশে খাওয়া-দাওয়ার গোলমালে অসুখ-বিসুখে সম্ভাবনা। যাক্ স্বাধীন প্রোফেশনে মাটামুটি ভাল এবং নূতন কোনো উদ্যমেরও সম্ভাবনা। চাকুরীক্ষেত্রে সন্তোষজনক হবে না। গুপ্তশত্রুতার লক্ষণ আছে। ছেলেমেয়েদের কারো জন্য অশান্তি আসতে পারে। যৌথ কারবারী-দের পক্ষে সময় এখন গোলমেলে। সম্ভাব্যক্ষেত্রে জমি-বাড়ির যোগ। কিন্তু প্রতিবেশীদের দ্বারা উত্যক্ত হতে পারেন। সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে হঠাৎ বদলিরও সম্ভাবনা আছে। যা কিছু করুন না কেন, ধৈর্য ধরে করবেন। প্রলোভনের বশে কোনো কাজে হাত দেবেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার পক্ষে এ মাস অনু-

কূল। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট ক্ষতি হতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রিয়জনবিরোধ ও ন্যায্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা দেখা যায়। তুলা লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক নৈরাশ্য ও স্বাস্থ্যের গোলযোগ দেখা যায়। অবশ্য সামাজিক ক্ষেত্রে শুভ ভাব বৃদ্ধি পাবে। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে এ মাস সুযোগপ্রদ।

বৃশ্চিক : শনি আর রাহু একত্রে থেকে কিছু কিছু বাধা সৃষ্টি করলেও এখন বৃহস্পতির শুভ প্রভাব এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। শিরঃপীড়া ও রক্তের চাপ সংক্রান্ত গোলযোগ দেখা দিলে সতর্ক হবেন। চর্মরোগ ও ব্রণাদিও কষ্ট দিতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে খুব সাবধান হবেন। নিজে উত্তেজিত হয়ে কোনো অঘটন ঘটানো সম্বন্ধে সাবধান। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হবেন। ঔষধ-বিভ্রাটেও ক্ষতি হতে পারে। উপযুক্ত সন্তানের আচরণও মনের উপর চাপ দিতে পারে। যাক্, আপনার কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি বাড়বে। চাকুরীক্ষেত্রে দায়িত্ব-বৃদ্ধি এবং সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রমোশনও হতে পারে। বৈষয়িক ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা এড়িয়ে চলা উচিত। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এ মাস বেশ অনুকূল। নূতন ব্যবসায় কিংবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আগে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করবেন। বেফাঁস কথা বলে শত্রু সৃষ্টি করা সম্বন্ধে সাবধান। খেয়ালের বশে কোনো কাজ করবেন না। মহিলাদের পক্ষে এ মাস বেশ অনুকূল। অভীষ্ট সিদ্ধি এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে দূরভ্রমণের সুযোগ আসবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হবে। এবং পারিবারিক শুভকাজের সম্ভাবনা।

ধনু : বৃহস্পতি বেশ অনুকূল। এখন যা যোগাযোগ ঘটবে, বেশ হিসাব করে সেগুলো কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন। শত্রুরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, এমন কি নিজের লোকও বাধা দিতে পারে। এর জন্য উত্তেজিত হবেন না। আর্থিক দিক থেকেও শুভ লক্ষণ দেখা দেবে। চাকুরীক্ষেত্রে সুপরিবর্তন আসতে পারে। নূতন প্রার্থীদের চাকুরী লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার্থীর পক্ষেও এ মাস অনুকূল। শুধু নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না। ব্যবসায়ীদের তৎপর হওয়া উচিত। পুরানো ঝঞ্ঝাট মাসের মধ্যভাগে কিছু উৎপাত সৃষ্টি করতে পারে। বাড়ি-ঘর নিয়েও কিছু উত্ত্যক্ত হবার কথা। পারিবারিক ক্ষেত্রে কারো অসুখ-বিসুখ ও কারো আচরণ মনের উপর চাপ দিতে পারে। নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করার পক্ষেও অনুকূল। কিন্তু মূলধনের বিষয় আগে চিন্তা করবেন। মহিলা জাতকের পক্ষে শত্রু বৃদ্ধি ও মানসিক ঝঞ্ঝাট যাবে। তবু কোনো সূত্রে প্রাপ্তিযোগ আছে। ধনু লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি হলেও সম্মান-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যয়াধিক্য ও পারিবারিক ঝঞ্ঝাটও উত্ত্যক্ত করবে। নিজের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। বাইরে যাবারও সুযোগ আসবে।

মকর : কাজ-কর্মের দিক থেকে ঠিক মনোমত না হলেও আগের চেয়ে অনেকখানি অনুকূল অবস্থা আসছে। শিল্পী, লেখক ও অভিনেতারা এবার যোগাযোগের দিক থেকে লাভবান হতে পারেন। ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের পসার বাড়বে। অবশ্য সাধারণ দোকানদারদের পক্ষে এখন তত অনুকূল নয়।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

নাম----------

ঠিকানা---

মাসিক বসুমতী

শিল্পপতিরা কোনোরূপ সঙ্কটে পড়তে পারেন। যারা নূতন কোনো ছোটো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, তার সুযোগ পাবেন। বিশিষ্ট ক্ষেত্র থেকে সহায়তাও পাবার সম্ভাবনা। চাকুরীক্ষেত্রে গতানুগতিক চলবে। সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে সম্ভাব্য উন্নতিতে বাধা রয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। পেটের গোলযোগ এবং কোনোরূপ ব্যথা-বেদনা কষ্ট দিতে পারে। ছেলেমেয়েদের কারো সম্বন্ধে সুফল আশা করতে পারেন। অবশ্য আত্মীয়-স্বজন ও পারিবারিক ব্যাপারে উত্ত্যক্ত হতে হবে। এবং অযথা দায়িত্বের চাপও পড়বে। গুরুজনদের কারো সঙ্কট পীড়ারও আশঙ্কা। আর্থিক ব্যাপারে মাসের শেষাংশ আগের চেয়ে ভাল। মহিলা-জাতকের পক্ষে মোটামুটি ভাল কিন্তু স্বজনের শত্রুতা ও প্রতিবেশীর ঈর্ষা উৎপাত করতে পারে। মকর লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক উন্নতি ও কাজকর্মের দিক থেকে ভাল। কিন্তু যাদের বৃহস্পতির দশান্তর্দশা চলছে, তাদের পক্ষে নানারূপ ঝঞ্ঝাটসূচক।

কুম্ভ ঃ এমাসের গোড়ার দিকে কিছু ঝঞ্ঝাট, অপ্রীতি ও মনোমত কাজে বাধা আসতে পারে। কিন্তু তেরো তারিখের পর অনেকাংশে অনুকূল। নূতন কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে। প্রবাসী আত্মীয়-বন্ধুসহ মিলন হবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহে কিছু কিছু ঝঞ্ঝাট এবং উৎপাদনকারীদেরও এ বিষয়ে কিছু উত্ত্যক্ত হতে হবে। কলকারখানার মালিকদের পক্ষে নূতন দুর্ভাবনা দেখা দিতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে উন্নতিকর পরিবেশ দেখা যায়। নূতন প্রার্থীরা চাকুরী পেতে পারেন। ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা এড়িয়ে চলা উচিত। কোনো নূতন জমি কিনতে গিয়ে গোলমালে পড়তে পারেন। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এ মাস অনুকূল। মহিলা জাতকের পক্ষে সাংসারিক উৎপাত এবং আত্মীয়দের শত্রুতা মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাবে। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধির এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পুরনো কোন ব্যাপারে সুরাহা হওয়ায় বিশেষ আনন্দ পাবার কথা।

মীন ঃ ধীর স্থির ভাবে নিজের কাজ করে যান। অল্পে বিচলিত হবার ভাব ত্যাগ করুন। আপনার হাতে যে-সব কাজ রয়েছে, সেগুলো শেষ করে ফেলুন। অবশ্য মানসিক শান্তির ব্যাঘাতজনক অবস্থা এখনো মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই। শিল্পী, লেখক ও অধ্যাপক-শ্রেণীর পক্ষে এখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও সুযোগ লাভের সম্ভাবনা। পুরনো কারবার অথবা বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে স্বজন বিরোধের একরূপ সুরাহা হতে পারে। পরিবারিক ক্ষেত্রে সাধারণ অসুখ-বিসুখ ছাড়া অন্য উৎপাত নেই। নিজের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। কিন্তু জলে-ভেজায় ঠাণ্ডা লেগে কষ্ট পেতে পারেন। স্বাধীন প্রফেশান যাদের, তাদের মধ্যে আইনজীবী ও চিকিৎসকদের আয় বেশ বাড়বে। রাজনৈতিক ব্যাপারে যারা যুক্ত, তাদের সামনে নানা সমস্যা দেখা দেবে। নারী বন্ধুদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। ঐ রাশির তরুণীদের এখন বন্ধুদের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। বিবাহযোগ্যাদের বিবাহের ব্যাপারে এখন নিরস্ত থাকা যুক্তিযুক্ত। মীন লগ্নে জন্ম যাদের তাদের শনি কিংবা মঙ্গলের দশান্তর্দশা চললে বিশেষ কষ্ট দিতে পারে। তবু এ মাস আর্থিক দিক্ থেকে অনেকাংশে অনুকূল।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীরণজিতকুমার বসাক (পাইকপাড়া রো, (কলিকাতা)---(১) নয় মাসের মধ্যে না হলে আর হবে না, (২) গ্রহসন্নিবেশ এমনি যে, বিশেষ কোনো রত্নে উপকার হবে না। ● শ্রীমতী কনকলতা দেবী (আনন্দমোহন বসু রোড, দমদম)—(১) আয়ু গণনা হয় না, (২)শেষ কয়েক বছর মোটামুটি ভাল। ●শ্রীচিত্তরঞ্জন কর্মকার, (গাড়াপোতা, নদীয়া)—(১) ধৈর্য ধরে নয় মাস কাটান, (২) এরূপ আশঙ্কার কারণ নেই। ● শ্রীচন্দ্রকান্ত মান্না (অতুল ঘোষ লেন, সালকিয়া)—মাসিক বসুমতীর মাসিক রাশিফল পড়ে দেখুন। ● শ্রীজনরঞ্জন (পোস্টাল কোয়ার্টার) —(১) এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না, (২) তিন বছর ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। ● শ্রীমতী রমলা চৌধুরী (জানির লেন, কলিকাতা)---(১) আগামী শ্রাবণের মধ্যে না হলে তিন বছর দেরী হতে পারে। (২) বিদেশ ভ্রমণের যোগ নেই। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। ●কুমারী মধুমিতা চৌধুরী (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা)---(১) মেষ রাশি ও তুলা লগ্ন, (২) একুশ কিংবা চব্বিশ বর্ষে। ● শ্রী এ কে মুখার্জী (ডোভার লেন, কলিকাতা)---(১) উন্নতি হবে। (২) সব সময় রত্নের ফল ত্বরান্বিত হয় না। তবু পীতাম্বর নীলা পাঁচরতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীঅনিকেত ব্যানার্জী (বাগবাজার, কলিকাতা)—(১) সম্ভাবনা আছে। (২) কিছু গোলমেলে। ● শ্রীপ্রভাস চন্দ্র পাল (কলিকাতা) ---বসুমতীর কুপন ছাড়া উত্তর দেওয়া হয় না। এখন সময় ঝঞ্ঝাটপূর্ণ হবে।● কুমারী মঞ্জু মৈত্র (আনন্দ মোহন রায় রোড, দমদম)---বৃষ রাশি ও তুলা লগ্ন, (২)সাধারণ লাইনে। ● শ্রীশান্তিভূষণ রায় (হেমেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) সম্ভাবনা রয়েছে, (২) মোটামুটি ভাল কিন্তু নিজের দিকটা ঠিক রাখা দরকার। ● শ্রীরামকৃষ্ণ মুখার্জী (খরমপু বর্ধমান)--(১) মে-মাস থেকে তিন মাসের মধ্যে যোগাযোগ হতে পারে, ছয় রতি গোমেদ রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) আগামী এক বছর মায়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। ● শ্রী পি কে সি (নাগিগ্রাম, বর্ধমান)---(১) আটত্রিশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত

কিছু কিছু উৎপাত সহ্য করতে হবে। (২) নয় রতি রক্তমুখী প্রবাল ও ছয় রতি পীত পোখরাজ ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীদীপক সেনগুপ্ত (নিউ টি সি কলোনী, জামসেদপুর) (১) চাকুরীর যোগ থাকলেও ব্যবসা করতে হবে, (২) এ ব্যাপারে উভয়ের জন্মকুণ্ডলী দেখা দরকার। ● শ্রীচিত্তরঞ্জন কর্মকার (নদীয়া)—(১) আগামী জুলাই পর্যন্ত দেখুন, (২) এর মধ্যে না হলে হওয়া কঠিন। ● শ্রীমতী অলকনন্দা (কলেজ রোড, হাওড়া)—(১) জেনারেল সায়েন্স (২) কোষ্ঠীর গ্রহসন্নিবেশ শরীর ও মনের প্রতিকূল। চার রতি মুক্তা সোনার আংটিতে এবং ছয় রতি রক্তমুখী প্রবাল সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখুন। ●শ্রীনরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস। ডাক্তার বাই লেন, কলিকাতা—কুম্ভ লগ্ন ও বৃশ্চিক রাশি, (২) আগামী সালে কিছু ভাল হলেও গ্রহ-সন্নিবেশ জটিল। সব বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ●কুমারী নমিতা বিশ্বাস (ডাক্তার বাই লেন, কলিকাতা)—(১) আগামী আগস্টের মধ্যে হতে পারে, (২) শ্বেত প্রবাল ছয় রতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখুন। এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ● শ্রীঅশোক রায় (ঠাকুর গলি, চুঁচুড়া) —(২) জন্মকালে বৃষ লগ্নে বুধ, শনি ও রবির মিলন বিরুদ্ধ, রাশি হয়েছে মিথুন, (২) মনের জোর রাখুন। পাঁচ বছর ধৈর্য ধরে কাজ করুন। এর পরে অনুকূল অবস্থা আসবে। ● শ্রীমণ্টু (টালিগঞ্জ, রসারোড সাউথ)—(১) গ্রহ-সন্নিবেশ এমনিতে আশানুরূপ হবার পক্ষে বাধা, (২) পঁয়তাল্লিশ বর্ষ বয়সের পরে অনেকাংশে অনুকূল। পীতাম্বর নীলা ছয় রতি ও গোমেদ আট রতি রূপার আংটিতে যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী পদ্মফুল (রায়পাড়া) (১) বাইশ বর্ষ বয়সের মধ্যে হতে পারে, (২) মোটামুটি ভাল কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ● শ্রীপ্রশান্ত-কুমার বসু (সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) আর্থিক উন্নতি হবে, (২) পরবর্তী জীবনে মোটামুটি চলবে।

● শ্রীসুনীলকুমার রায় (বাটানগর) (১) আরো হতে পারে, (২) সম্ভাবনা আছে। ● শ্রীজ্ঞানভিক্ষু (হাওড়া-১)—আগস্টের মধ্যে না হলে পরে বাধা আসতে পারে, (২) বাধা এলে আরো তিন বছর অনুকূল হবে না। ● শ্রীঅনিল প্রামাণিক (প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ)—(১) শনির অবস্থান এবং চন্দ্রের সঙ্গে মঙ্গলের যোগ বিরুদ্ধ। আগামী বাংলা সালের শেষের দিকে কিছু ভাল হবে, (২) রক্তমুখী প্রবাল আট রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● মোঃ জিয়াউল হক (ডাফরিন রোড, ধুবড়ী)—(১) এ বছরেই হবে, (২) চুণী ধারণ করা প্রশস্ত। ● শ্রীচিত্ত-রঞ্জন (কলিকাতা-২৪)—(১) অত্যন্ত বাধা। তবু দেড় বছর দেখুন। (২) ব্যব-সায়ে উন্নতি। ● শ্রীকালী মুখার্জী (ইস্ট বারোনী কলিয়ারী)—(১) মিথুন রাশি, (২) পাঁচ রতি সাদা মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। সোনার আংটিতে। ● শ্রীঅমিয় বসু (হাররবাগ, বারাণসী)—(১) সম্ভাবনা আছে, (২) বাংলা নূতন বছরে চেষ্টা করুন, তা' না-হলে বেশ দেরী হবে। ● শ্রীজগবন্ধু বাগ (প্রতাপেশ্বর শিবতলা), বীরহাটা)—(১) বর্তমান ইংরেজী সালের অক্টোবর পর্যন্ত ভাল বলা চলে না ; কিন্তু জুন মাস থেকে শারীরিক উন্নতি দেখা দেবে। (২) চাকুরী ব্যাপারেও অক্টোবর পর্যন্ত দেখুন। প্রতিকার জন্য নয় রতি রক্তমুখী প্রবাল ও পাঁচ রতি মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীদীপান্বিতা (বাগনান)—(১) আগামী অক্টোবর পর্যন্ত দেখুন। এত তাড়াতাড়ি হওয়া কঠিন, (২) ও ব্যাপারে ধৈর্য ধরা দরকার। অযথা ক্ষতি হতে পারে। ● শ্রীব্যোমকেশ দত্ত (বর্ধমান) প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতীতে রাশিফল প্রকাশ হয়। ● শ্রীসুধাংশু কুমার কুণ্ডু (ডোমকল) সঠিক জন্ম-তারিখ, সাল ও সময় না জানালে রাশি জানানো সম্ভব নয়। ● শ্রীরাজকুমার গুচাইত (কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা) এ

বিভাগে বেশী বিচার হয় না। ● শ্রীলালু সরকার (পূর্ব চাঁদমারী, বারাকপুর) (১) আগামী বছর হতে পারে, (২) স্থিতিশীল ব্যবসায় হওয়া এখন কঠিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসার করে দেখতে পারেন। ● শ্রীখগেন্দ্র-ভূষণ ভৌমিক (হেমচন্দ্র স্ট্রীট, কলি) ● (১) কমপক্ষে আড়াই রতি উৎকৃষ্ট কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই সোনার আংটিতে এবং আট রতি পীত পোখরাজ সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। যথাবিহিত শোধনাদি প্রয়োজন। (২) ব্যবসা হতে পারে। অক্টোবর পর্যন্ত দেখুন। ● শ্রীমতী অনিমা রায় (শক্তিগড়, যাদবপুর) ভাল মুক্তা পাঁচ রতি সোনার আংটিতে এবং ভাল ইন্দ্রনীল পাঁচ রতি রূপার আংটিতে। যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীবিশ্বনাথ দে (কলিকাতা-৭)—প্রত্যেক মাসে মাসিক বসুমতীতে রাশিচক্র প্রকাশিত হয়। তাতে নিয়মাবলী দেওয়া আছে। বর্তমান সময় নয় মাস ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। ● শ্রীরেবা রায় (শক্তিগড়)—(১) একটু ধৈর্য ধরতে হবে, (২) প্রতিকার জন্য ছয় রতি শ্বেত প্রবাল সোনার আংটিতে। ● শ্রীবিমান চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)—(১) শিক্ষক-তার যোগ, (২) বর্তমান ইংরেজী সালেই ভাল কিছু হবে। ● শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য (চন্দননগর)—(১) আরো পড়াশোনা হবে, (২) সন্তান-কামনায় উৎকৃষ্ট কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই কমপক্ষে আড়াই রতি সোনার আংটিতে। ● শ্রীমতী ধর (বালিগঞ্জ গার্ডেননার, কলিকাতা)—(১) এখন থেকে নয় মাস দেখুন, (২) উক্ত সময় অনুকূল। ● শ্রীঅশোক (পার্কসার্কাস)—(১) সময় গোলমেলে, (২) বিদেশে যাবার চেষ্টা করুন। অবশ্য জুলাই মাসের মধ্যে এখানে পেতে পারেন। ● শ্রীঅশোককুমার দাস (কাশীপুর, বজবজ)—(১) জুলাই পর্যন্ত দেখুন (২) শেষের দিকটা ভাল নয়। ● শ্রীতারাদাস রায় (অধিক মিত্রি

লেন, কলিকাতা) (১) চাকরী পাবার সম্ভাবনা নেই, অধ্যাত্মযোগ আছে, (২) স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। কৃষ্ণাভ ক্যাটস আই আড়াই রতি। ● শ্রী "ক" (রেলওয়ে কোয়ার্টার, রাণাঘাট)—(১) প্রতিকার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই, তবু গোমেদ ছয় রতি রূপোর আংটিতে এবং পীত পোখরাজ আট রতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। (২) অনেকাংশে শান্তি হবে। ● শ্রীঅনিকেত ব্যানার্জী (রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা) (১) শিক্ষার যোগ ... টানুটি ভাল; কিন্তু আগামী তিন ... সব বিষয়ে সাবধান, (২) মনোমত এবং ভাগ্য বৃদ্ধির সহায়ক হবে। ● শ্রীঅশোক পাল (জি টি রোড, সালকিয়া) (১) পঁয়ত্রিশ বর্ষ বয়সের পরে, (২) উক্ত সময় থেকে। ● শ্রীনারায়ণচন্দ্র সমাদ্দার (মুড়াগাছা কলোনী, নদীয়া) (১) সময় প্রতিকূল তবু জুলাই পর্যন্ত দেখুন, (২) তিন বছর পর অনেকাংশে ভাল। ● শ্রীঅজিতকুমার মহাপাত্র (সি আই টি বিল্ডিং, কলি-৫৪)—(১) স্বাস্থ্যে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। (২) কোনো-সূত্রে প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীব্রজেন পাল (রায়পুর)—বৃশ্চিক লগ্ন কুম্ভ রাশি ও দেবারি। ● শ্রীমতী মঞ্জুরা দাশগুপ্ত (সি আই টি বিল্ডিং, খ্রীস্টপার রোড)—(১) ছয় রতি শ্বেত প্রবাল সোনার আংটিতে ধারণ করিয়ে দেখুন, (২) ঐ মতেই চলবে। কিন্তু এর সাথে পীত পোখরাজ ছয় রতি দিতে পারেন। ● শ্রীমতী অনামিকা (রামকৃষ্ণপুর)—বর্তমান নূতন বাংলা বর্ষে না হলে আরো তিন বছর দেরী হতে পারে। (২) দু' বছর মধ্যে আসতে পারে। ● শ্রীদীপক সেনগুপ্ত (নিউ টি সি কলোনী)—জুলাই মধ্যে হতে পারে। (২) এবার না হলে তিন বছর পর। ● শ্রীনিরঞ্জন সেন-গুপ্ত (রেল কলোনী),

আসানসোল)—(১) চেষ্টা করুন হতে পারে, (২) টেকনিক্যাল লাইনে। ● শ্রীরামরতন ঘোষ (ইছাপুর, রোড, হাওড়া)—(১) তিন বছর মধ্যে সুযোগ, (২) উক্ত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত অধ্যাত্ম-যোগের নির্দেশ পেতে পারেন। ● শ্রীমতী ডলি রাণী ঘোষ (ইছাপুর রোড, কলিকাতা)—(১) পরে ব্যবসায়ের যোগ, (২) ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করবেন না। ● শ্রীমতী রাজনমালা (রতনগড়)—(১) আগামী ভাদ্রের মধ্যে না হলে হওয়া কঠিন, (২) সাহিত্যক্ষেত্রে সাধারণভাবে। ● শ্রীগুরুদাস ব্যানার্জী (উলুবেড়িয়া, রতিপুর)—প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতীর রাশিফল প্রকাশিত হয়। এক সংখ্যা মাসিক বসুমতী পড়ে দেখুন। ● শ্রীঅমলেন্দু সেন-গুপ্ত (পিস রোড, রাঁচি)—(১) ছয় রতি পান্না ও পাঁচ রতি মুক্তা সোনার আংটিতে, (২) মোটা-মুটি ভালর দিকে যাচ্ছে, কিন্তু পাঁচ বছর কিছু কিছু ঝঞ্ঝাট থাকবে। ● শ্রীমতী মঞ্জু বসু (জামসেদপুর) কিছু দোষ থাকলেও জুনের পর ভালর দিকে যাবে, (২) হবার পক্ষে এখন প্রবাদ বাধা। শ্রীআর্য বসু (জামসেদপুর)—(১) দেড় বছর লাগবে, (২) সুপ্রতিষ্ঠ হবার যোগ বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়স থেকে। ● শ্রীপশুপতি গাঙ্গুলি জামালপুর, মুঙ্গের) —(১) বর্তমান বাংলা বছরের ছয় মাস মধ্যে, (২) উক্ত সময় দেখুন। ● শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ (নীলমণি রো, কলিকাতা)—(১) আগামী পাঁচ বছর কিছু কিছু ঝঞ্ঝাট থাকবে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান, অবশ্য এখন থেকে দেড় বছর পর কোনো ভাল ফলও পারেন, (২) চেষ্টা করুন হতে পারে। ● শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ (বৈদ্যবাটি)—(১) চাকুরী বর্তমান এপ্রিল থেকে আট

মাসের মধ্যে হতে পারে, (২) স্বাস্থ্য ঠিক মজবুত হবে না। ● শ্রীবিশ্বনাথ বা (রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) মিথুন লগ্ন, মৃগশিরা নক্ষত্র ও বৃষ রাশি, (২) এখন চাকুরী হবার পক্ষে বাধা আছে। আট রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রী এস্‌ রায় (লেক গার্ডেনস)—এবারে এপ্রিলের পর তিন মাস দেখুন, (২) আশানুরূপ হবে না। ● শ্রীবংশধর পাল (বেলগ্রাম)—(১) পাবেন কিন্তু আশানুরূপ নয়, (২) মোটামুটি চলনসই। ● শ্রীবিমলকুমার ঘোষ দস্তিদার (উনসানি)—বৃশ্চিক রাশি ও কর্কট লগ্ন, (২) অধ্যাপনার দিকে হতে পারে। ● শ্রীরণজিত গোস্বামী (নবদ্বীপ) প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতীতে রাশিফল থাকে। ● শ্রীরনু বসু (সাউথ ফুলিয়া রোড, কলিকাতা)—(১) আরো তিন বছর দেখুন। (২) সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভা আছে। ● শ্রীশিবদাস (সি আই টি বিল্ডিং, কলিকাতা)—(১) ব্যবসায়ে কিন্তু পাঁচ বছর বিশেষ ভাল নয়, (২) হতে পারে। ● শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু (চন্দননগর)—আগামী বছর থেকে কিছু ভাল হবে। লাল পলা আট রতি ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীনিখিল চক্রবর্তী (প্রি এস টি রোড, কলিকাতা)—(১) ভয় নেই (২) তিন বছর পর সুপরিবর্তন হবে। (১) ● শ্রী এস দত্ত (দামোদা কলিয়ারী) ধনু রাশি ও ধনু লগ্ন, (২) বাংলা নূতন সালেই পরিবর্তন আসবে। ● শ্রীমতী গীতা সান্যাল (দেবীনিবাস রোড, দমদম)—(১) কুম্ভ রাশি। ইংরেজী ত্রিশ সালের সেপ্টেম্বর, (২) আগামী অক্টোবরের পর কিছু ভাল হবে।

॥ এক ॥

পাশাপাশি পাঁচটি পরিবার যে নিয়মে চলে, অন্য দশটি ভাড়াটে প্রাত্যহিক যে অনুশাসন মেনে চলে, অপর্ণারা যেন তাদের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম। বেমানান নয়, বেখাপ্পা বাড়ীওয়ালা থেকে সুরু করে মোড়ের মাথার সস্তা চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করে ডজনখানেক তরুণচিত্ত চঞ্চলই হয়েছিল প্রথম প্রথম।

রাস্তার উল্টো দিকের বাড়ির গাড়িবারান্দা থেকে বীরেশ দত্তর স্ত্রী কৌতূহল আর চাপতে পারেন নি। অপর্ণাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছেন। তুচ্ছ অজুহাত নয়, সময় করে ওঠা সম্ভব হয় নি সারাদিন। কিন্তু বেলা যখন পড়ে গেল, বীরেশ দত্তর স্ত্রীর কৌতূহল তখন পৌঁছেছে আগ্রহে। নির্লিপ্ত থাকা কঠিন। অদ্ভুত ভাড়াটে তো, বেটাছেলে নেই বাড়িতে। পরদিন সকালে স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন। নিজের সম্ভব-অসম্ভব নানা কথার হিসেব মেলাতে এসেছেন।

চায়ের কাপ হাতে নিয়েই অপর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলে, একদম সময় করতে পারি নি। আজ নিশ্চয়ই যেতাম। আপনি বাইরে কেন? ভেতরে আসুন।

সারা ঘরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বীরেশ দত্তর স্ত্রী চটুল হেসে প্রশ্ন করেন, আপনার মালপত্তর ঠেলাগাড়ীতে এলো। একদম মুখোমুখি বাড়ি। তাই আলাপ করতে এলাম। একখানি মাত্র ঘর। আপনারা লোক ক'জন?

—আমরা দুজন। আমি আর আমার বোন অনুরাধা। আমরা দু'জনই থাকব।

এক দম নিয়ে আসা। কিন্তু কৌতূহল এবার অন্যদিকে প্রবাহিত হল। কয়েক মুহূর্ত থ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। অপর্ণা বুঝতে [illegible] বলে, আমরা তিন ভাইবোন। মা-বাবা আর ছোট ভাই ঢাকায় আছেন। বাবা ওখানেই জমিজমা দেখাশোনা করেন। বাড়ি বদলের ঝামেলায় অফিস থেকে কদিন ছুটি নিয়েছি।

—কি অবাক! এই সংসার আপনার মাথায়?

অপর্ণা হেসে ফেলেছে ভদ্রমহিলার বিস্ময়োক্তিতে। বলেছে, সংসার আর কি। দুবেলা দুটো রাঁধা, অন্য কোন ঝামেলা বিশেষ নেই। সারাটা দিন একরকম বাইরেই থাকি। অনু যায় কলেজে।

সৌরীন সেন

কথাটা বলেই নিজের কথায় যেন ভুল খুঁজে পায়। তার স্বল্প পরিধির গৃহস্থজীবনে সংসার সম্পর্কে সবচেয়ে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা—বাসন মাজা ও উনুন ধরানো। সেগুলো যখন করতে হয়, সংসার তখন আছে বৈকি। ঠোঁটে হাসি টেনে বলে, রাতদিনের লোক আমি রাখতে পারব না। দুবেলা কাজ করবার মত লোক পাওয়া যায় না এ পাড়ায়?

—চেনাশোনা লোক ছাড়া চাকর-বাকর রাখা আজকাল খুবই দায়িত্বের ব্যাপার। তাছাড়া আপনি থাকেন না বাড়িতে। ভেঙেচুরে সব নিয়ে গেল—আজকাল হামেশাই হচ্ছে।

অপর্ণা বলে, এঘর থেকে সব আর কি নেবে? নেবার মতো এমন লোভনীয় সামগ্রী নেই আমাদের। আসল কথা সারাদিনের লোক আমার দরকার নেই। অত মাইনে দিয়ে রাখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিকে ঝি হলেই চলবে।

—দেখি, আমার লোকটাকেই আজ বলব। বাড়ির ভাড়া কত ঠিক হল?

—পচাত্তর।

—এ দিকে বাড়িভাড়া একটু বেশি। তবে একখানা ঘর আর সামনের এ জায়গাটুকুর জন্য পঁচাত্তর একটু বেশিই হয়েছে। তবে পাড়াটা ভাল। কোনো ঝামেলা নেই। খালি বাড়ি এদিকে পাওয়াই দুষ্কর।

এ পাড়ার উপর অবশ্য অপর্ণার একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। পুরোপুরি বাঙালী পাড়া। তবু এ অঞ্চলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট আছে। এর অর্ধেক ভাড়াতে অন্য কোথাও একখানি ঘর মেলা অসম্ভব নয়। আগের বাড়িটা বেশ ছিল, বাড়ীওয়ালাও সজ্জন। তবু শান্তিতে বাস করা সম্ভব হল না।

প্রতিবেশীর কৌতূহলের উপর হাত নেই কিন্তু নির্লজ্জ আগ্রহ সহ্য করা অসম্ভব। বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই। অপর্ণা মাঝে মাঝে অনেক রাত করেও বাড়ি ফেরে। পুরুষ মানুষের আনাগোনা থাকে প্রায়ই। অনেকের সেখানে অনেক প্রশ্ন। মেয়েদের প্রশ্ন নেই, নীরব সন্দেহ। খুপরী খুপরী ঘরের চোরা চাউনি, পানওয়ালার দোকানের সামনে অশ্লীল যুবার পা ফাঁক করে সোজা খাওয়া-ইতর রসিকতা।

এ পাড়ায় বেশিরভাগ মানুষই বিত্তবান। নিজেদের নিয়েই এরা ব্যস্ত। অপর্ণা বাড়ি আছে, না অনেক রাত্রে কোনো পুরুষ বন্ধু তাকে পৌঁছে দিয়ে গেলে, সেদিকে বড় কারো ঔৎসুক্য নেই। ঘরের রেডিও রাস্তার মানুষকে ধাওয়া করে না। হিন্দী সিনেমার রঙচঙা নায়কের মত বেয়াড়া পৌরুষ মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে আসে না। সন্ধ্যের পর জানান না দিয়ে কোনো প্রতিবেশিনী একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে অপর্ণার হাড়হাভাতে তত্ত্বাবাসে আসার আশংকা কম। বাড়ীওয়ালার কৌতূহল শুধু কৌতূহলই। চায়ের দোকানের চঞ্চল তরুণচিত্ত অসহ্য নয়। তবে দু'একজন বীরেশ দত্তর স্ত্রীর মত মানুষের হাত এড়ানো কঠিন।

বীরেশ দত্তর স্ত্রী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। অনেক কিছুই জানতে চাইলেন। শিথিল খোঁপা ঠিক করার অজুহাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাতভরা গয়না দেখানো, ঘরের এক প্রান্তে এক আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানীর দেওয়াল পঞ্জিকার প্রসঙ্গ

তুলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার দীর্ঘ পাঁচ বছর ইওরোপের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রভূত জ্ঞানার্জনের পর কোলকাতা ফিরে আসার কাহিনী সুরু করেন। পি সি সরকারের হাতে করাত দ্বিখণ্ডিত সুন্দরী ললনার প্রাণ ফিরে পাওয়া ও হাসতে হাসতে স্টেজের উপর 'বাও' করার অত্যাশ্চর্য ঘটনার মত রেলের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে আত্মীয়স্বজনকে হেঁট হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঘটা করে প্রণাম করার কৃতিত্বের আখ্যানও অপর্ণাকে মন দিয়ে শুনতে হয়।

তবু ভাল লাগে। বীরেশ দত্তর স্ত্রীকে পছন্দই হয় এক রকম। সোজা ও ধীর স্বভাবের মানুষ, নিজের কথা বলতেই ব্যস্ত। অপর্ণা কত মাইনে পায়, মা-বাবা অপর্ণার বিয়েরই বা কি ব্যবস্থা করেছেন, একবারও জানতে চাইলেন না।

এসব অনেক দিনের কথা। পাড়ার মানুষের কৌতূহল আজ মিটেছে। বাড়ি-ওয়ালার আশ্চর্য স্বাভাবিক দৃষ্টি। অপর্ণাকে দেখেই তিনি নাকি ঠিক চিনেছেন। বীরেশ দত্তর প্রগল্ভ স্ত্রী আজকাল বড় কম আসেন। মন খুলে কথা বলার মানুষ হয়তো পান না।

শরীর খারাপের তুচ্ছ অজুহাত দিয়ে দিন দশেকের ছুটিতে আছে অপর্ণা। অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা করছিল। আজ সকালে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন চাকরীর নিয়োগপত্র এসেছে। চাকরী যদি করতেই হয়, কিছুটা ভাল পরিবেশ, মাইনেটা আর একটু ভাল। শৃঙ্খলের মধ্যেও শৃঙ্খলা।

ইদানীং অপর্ণার একটা ধারণা জন্মেছে, সে মানুষ চেনে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অপর প্রান্তে বসে সৌজন্যের হাসি টেনে তরুণ অফিসারটি অপর্ণার বহু কথার উত্তরে যখন দরখাস্তটি ড্রয়ারে রেখে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন,—আপনার কথা আমার মনে থাকবে। দরখাস্ত রইল, আপনাকে পরে জানাবো। সেই মুহূর্তেই অপর্ণা বুঝেছে আর যাই হোক, তার চাকরী এখানে হবার নয়।

অপর্ণার তাই হিসেব মেলে না। তিলমাত্র আশা নিয়েও সেদিন সে বাড়ি ফেরে নি। শুধু আশাতীত নয়, পুরোপুরি যেন অবিশ্বাস্য। খুশীর আবেশে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। দিনটা অনেক পরিষ্কার, অনেক বেশি ঝলমলে মনে হয়।

অনু বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে সেই দুপুর থেকে। দিনের বেলায় ঘুমন্ত মানুষ অপর্ণা একদম সহ্য করতে পারে না। কিন্তু অনুকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না বেচারা রাত জেগে পড়ে। বরাবরই ভাল রেজাল্ট করে।

চুপচাপ একা ঘরে থাকতে একদম ভাল লাগে না। কিছুমাত্র যোগসূত্র না রেখে টুকরো টুকরো নানা কথা ভিড় করে আসে, বিস্মৃতির গহ্বর থেকে পুরোনো বহুদিনের কথা পাখা মেলে উড়ে এসে সমস্ত কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে যায়।

নিজের দিকে ভাল করে তাকাবার সময় পায় নি অপর্ণা। য়ুনিভার্সিটি আর হস্টেল-জীবনে দম ফেলবার ফুরসুত মেলে নি। তার সবটুকু তাকানো অন্য কিছুতে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে আছে, নিজের দিকে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি দেবার অবসর ঘটে না।

নিজের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না, নিজের সম্পর্কে সে ভয়ানক বেশি উদাসীন। এভারেজ স্থূল ইচ্ছে অপর্ণাকে স্পর্শ করে নি কখনও—অপরের ঠোঁটের এই সাজানো বানানো মিথ্যে কথা বহুবার শুনে শুনে অপর্ণারও আজকাল সত্যি বলে মনে হয়।

পঞ্চাশখানা শাড়ী হয়তো প্রয়োজনের, কিন্তু অত্যাবশ্যক নয়। অপর্ণার পাঁচখানা শাড়ী সম্পর্কে প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রশ্ন উঠলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না, তর্ক করা যেত। কিন্তু সোজাসুজি হাত পড়ল। আলনায় সযত্নে পাট করা ভাল শাড়ীটাই অনভ্যস্ত অনু লাট করে এল কলেজ থেকে।

অপর্ণা মনে মনে যুদ্ধসজ্জ পরে ছিল। অনুর সঙ্গে তর্ক করবার বয়ানও সে সাজিয়ে রেখেছিল। কিন্তু পর্দা সরিয়ে অনুকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছে অপর্ণা। পরনের লাট শাড়ী দেখে নয়, শাড়ীতে জড়ানো অনুকে দেখে।

নিজের দেহতত্ত্ব নিয়ে অনু আজকাল আলোচনা করে হামেশাই, কিন্তু একমেটে করে রাখা অনুর দেহটি দুরন্ত ভাঙচোরের পর যে এত সুন্দর গড়ন পেয়েছে, অপর্ণা খেয়ালই করেনি এতদিন। যুদ্ধ সেদিন হয়নি। তর্ক করার সাজানো বয়ান বৃথা গেল। নিজের কথাতে নিজেই কেমন অবাক হয়ে যায় অপর্ণা,—দস্তুর মত লেডি! এবার থেকে তুই শাড়ীই পরিস অনু, চমৎকার মানায় তোকে।

সুতরাং ইচ্ছে ছিল না কোনোদিন, নিজের দিকে তাকাতে চায় নি অপর্ণা, এভারেজ স্থূলে ইচ্ছে কখনো স্পর্শ করে নি তাকে—এগুলো ঠিক সত্য ভাষণ নয়। পাঁচখানি শাড়ী থাকার ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্নই ওঠে নি কোনোদিন। অনুর বেয়াড়া যৌবন আলনা দখল করেছে নিঃশব্দে। অতি অনিচ্ছায় ইচ্ছেও তাকে ভাগ করে নিতে হয়েছে।

বিধাতা অনেক সময় মানুষের কাছে হার মানে। সামান্য চেষ্টার অতিশয় প্রিয়দর্শীকেও করে তোলে ভাণ্ডার। অপর্ণার চেহারায় সবচেয়ে আগে যেটি নজরে আসে সেটি হল তার ব্যক্তিত্ব। ইংরেজীতে যাকে বলে পার্সোনালিটি। মেঘগর্জনের কয়েক মুহূর্ত আগে অন্ধকার আকাশের বুকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত ঝিলিকমারা ওর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সবসময়ই আশ্চর্যরকম উপস্থিত। চোখ দুটো দেখে মনে হয় কটাক্ষ হানতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। অলস ভাবালুতায় ঘেরা পানসে ডাগর আঁখি বললেও ভুল হবে। কঠিন কিছুর সংঘাতে উৎপন্ন স্ফুলিঙ্গকণার মত প্রখর দৃষ্টিতে ধার হয়তো আছে, দীপ্তিও আছে যথেষ্ট।

একটা ব্যাপারে শুধু ইচ্ছে নয়, আগ্রহই ছিল অপর্ণার। য়ুনিভার্সিটির লেখাপড়ার পালা মিটিয়ে নিজের ইচ্ছে মত কিছু পড়াশুনো করতে চেয়েছিল। জরাজীর্ণ উপেক্ষিত কিছু কেতাবও সংগ্রহ করেছিল। উত্তরপাড়া-ম্যাটিয়ার গ্রন্থাগারে বহু পুরাতন নথিপত্র সে ঘেঁটেছিল বহুদিন। গিরিশ ঘোষের আমলের আস্থচর্মসার দুর্লভ এক বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে অনেক আশা নিয়ে। বাঙলা নাটকের একাল-সেকালের উপর মূল্যবান গবেষণায় সে অগ্রসর হয়েছিল অনেকখানি।

কিন্তু বাস্তবের কঠিন রঙ্গমঞ্চে অবিশ্রান্ত প্রবহমান চোরাঘূর্ণির আবর্তগুলো আর যাই হোক ফার্স্ট ক্লাইমেক্স নয়। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল, সে যা করে চলেছে সেটি নাটক নয়, নেহাৎই নাট্যকল্পনা।

নিমমভাবে সরে এসেছে অপর্ণা। বইপত্তর কাগজকলমে যেটুকু নিজে এগিয়েছিল, রিক্শায় চাপিয়ে শশাংক রায়ের ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে হাজির হয়েছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সরকারী হোমড়া-চোমড়াদের তনয়-তনয়ারা মিলে য়ুনিভার্সিটির আঙিনাতেও যে এক নিষিদ্ধ রাজ্য সৃষ্টি করেছিল, শশাংক রায় ছিল তাদের মধ্যমণি। ওর বাবা কিন্তু দাপুটে এডমিনিস্ট্রেটর নন। পহেলা নম্বরের সাকসেসফুল সিভিলিয়ানও নন তিনি। শশাংকের বাবা মৃগাংক মুসলমান এক জামাওয়ালার দোকানে ক্যাশমেমো লেখবার কাজে বহাল ছিলেন। শশাংক সে সংবাদ গোপন করে নি কোনোদিন। বিদ্যের সঙ্গে বুদ্ধির তার চিরকালের গাঁটছড়া। স্কলারশিপ ছাড়া পড়াশোনা হবে না, এটা সে ঠিক সময়েই বুঝতে পেরেছিল। কলমের ডগায় ফার্স্ট ক্লাশও তাই একটা মেরেছিল। সিভিল লিস্ট আলোকরা রোমহর্ষক মাসমাইনের শানবাঁধানো বন্দী প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শে যে কঠিন পরিখা খাড়া করা ছিল, বোহিসেবী এক জোয়ারের মত

শশাঙ্কের স্বকীয় কৌলীন্য যেন সব কিছু ভাসিয়ে নিল। জল সরে গেলে দেখা গেল বেদীর উপরে সে আসন বিছিয়ে নিয়েছে। দেখতে হল নামাবলী জড়ানো পুরোহিতের মত নয়, আতপচালের নৈবেদ্যের পিরামিডের ডগায় কলার উপর মিষ্ট বাতাসার মত।

অপর্ণার পিছনে কোনো বনেদী ঘরাণা ছিল না। কৌলীন্যের প্রসঙ্গ আর নাই বা তুললাম। অতি কষ্টে শেষের বেঞ্চের সেকেণ্ড ক্লাশ। তবে এত দেমাক কিসের? অপর্ণার অফুরন্ত নিলিপ্ততা কেমন যেন অসহ্য ঠেকেছে শশাঙ্কের। য়ুনিভার্সিটি ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিল সে। সাংস্কৃতিক সব কিছুর পাণ্ডাও ছিল। ভাইস-চ্যান্সেলারের ঘরে ছিল কারণে-অকারণে সহজ আনাগোনা। প্রথিতযশা অধ্যাপকেরও অতিশয় প্রিয়পাত্র। সঠিক কোনো অভিযোগ ছিল না কিন্তু সবটা মিলিয়ে অপর্ণাকে সহ্য করা অসম্ভব হল।

মজার খাতিরে একদিন দ্বারভাঙা বিল্ডিংএর দোতলার কাঠের সিঁড়ির বাঁকে কিছুটা নিভৃতে ডেকে বলেছিল, 'রক্তকরবী' করছি। নীলিমা বলছিল আপনার নাকি অভ্যেস টভ্যেস। নন্দিনী আপনাকে দেব ঠিক করেছি। আপনি খুব সুন্দর অভিনয় করতে পারেন কাল কফি হাউসে নীলিমার কাছে খবর পেলাম। আপনার কি খুব তাড়া? বুঝেছি! তবে কি জানেন, মঙ্গলকাব্যের ক্লাশ একদিন ফাঁকি দিলে খুব একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা নেই। প্রফেসর সোম একদম পড়াতে পারেন না।

অতি সাধারণ কথা, যথেষ্ট বিনয় ছিল। সৌজন্যের প্রকাশও ছিল শশাঙ্কর কথাতে। তবু অপর্ণার মনে হল গোটাটাই ছলনা। যেন আঘাত করছে। করুণামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের নির্মম প্রকাশ যেন ঝরে পড়ছে শশাঙ্কের ঠোঁটে হাসা আসক্তিতে।

হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়েই দিল অপর্ণা। সহজকণ্ঠে বলল, মাপ করবেন। আমার হাতে কাজ আছে। অতিকৃত অতিভঙ্গী নীলিমার স্বভাব। আমার অধিকার সম্পর্কে আমি সচেতন। আমার দৌড় নন্দ ঘোষ পর্যন্ত। নন্দিনীতে আমার হাত পৌঁছুবে না। কিন্তু আশ্চর্য ঃ রক্তকরবী করছেন কেন? লোক হাসাবেন নাকি?

আশ্চর্যরকম নিজেকে সংযত করেছে শশাঙ্ক। একরকম কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসেছে। একটা কথাও বলে নি। জবাব দিয়েছে লিখে। ম্যাগাজিনে শশাঙ্ক এক গল্প লিখে বসল। নাম দিল তার 'পার্বতী'।

অপর্ণা গ্রাহ্যে আনলে না ব্যাপারটা। নীলিমা নাছোড়বান্দা। দলবল নিয়ে বিবেকানন্দ রোডের হস্টেলে চড়াও করে এল। বলল, প্রতিবাদ করো। এত বড়ো অন্যায় মুখ পেতে সহ্য করবে? সবাই বলছে তোমাকে নিয়েই শশাঙ্কবাবুর এই ব্যঙ্গ। আসকারা পেলে সামনের সংখ্যায় আবার 'উমা-টুমা' লিখে বসবে।

অপর্ণা কিন্তু মৌন থেকেছে। ভ্রূক্ষেপেই আনলে না ব্যাপারটা। তবে সাহিত্যচক্রের অধিবেশনের দিন অপর্ণার আগেভাগে বেঞ্চ দখল করা দেখে খুশির আনন্দে ঝলমল করে উঠেছে নীলিমা। চাপা উত্তেজনা প্রকাশ করেছে—একদম চুরচুর করে দিতে হবে। আমরা তোমার পিছনে আছি।

শশাঙ্ক রায় দলবল নিয়ে এল। অপর্ণাকে দেখে সূক্ষ্ম কাশিধ্বনি কানে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘর সম্পূর্ণ ভরে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধ্রুব সেন চুরি করে অপর্ণার ফটো তুলে নিল। ধ্রুব সেন প্রায় পালাচ্ছিলই। অপর্ণা কিন্তু তাকে ধরে ফেলল। ক্যামেরা কেড়ে নেয় নি, স্পুলও খুলে নিল না। মিষ্ট অনুরোধ করল—এক কপি পাই যেন।

উপানন্দ বাগচী ছিল শশাঙ্কর ঢাকের কাঠি। ঢাকের বাদ্যি যদি বা সহ্য হয় কেতকী নন্দীর কাঁসরঘণ্টা অসহ্য। উপানন্দ বলে, নিজস্ব স্টাইলে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, সর্বোপরি ব্যঙ্গরসাত্মক লেখায় শশাঙ্কর হাত এমন উত্তীর্ণ যে, মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে পরশুরাম-টরশুরামের মত লেখা তার পক্ষে বিচিত্র নয়।

উপানন্দর পর আরো দু'চারজন সামান্য দু'চার কথা বলল। স্যাটায়ার হিসেবে 'পার্বতী' গল্পটা যে অপূর্ব সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শেষকালে ওঠে কেতকী নন্দী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা। লেখার আগে শশাঙ্ক 'পার্বতী' গল্পটা নিয়ে যে তার সঙ্গে কফি হাউসে আলোচনা করেছিল, তার বর্ণনা করল ঘটা করে। সবার শেষে শশাঙ্ককে আখ্যা দিল—একজন প্রথম শ্রেণীর রিয়ালিস্ট।

উপানন্দ নীলিমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করে। অসহায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে অপর্ণার দিকে ঘুরে তাকায় নীলিমা। পর মুহূর্তে সকলকে চমকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল অপর্ণা। শশাঙ্ক বসে হাতের তালু নিরীক্ষণে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথমে কিছুটা আড়ষ্ট। সংকোচও ছিল কিছু। কপালের উপর এসে পড়া কগাছি চূর্ণ কুন্তল সরিয়ে দিয়ে ঠোঁটে সামান্য হাসি টেনে বলে চলল, শশাঙ্কবাবু ভাল বাঙলা লেখেন সে কথা আমার স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। তবে কেতকী নন্দীর সামান্য ভুল আমি সংশোধন করতে চাই। শশাঙ্কবাবু রিয়ালিস্ট নন, উনি প্যারোডির একজন বাবু রিয়ালিস্ট। 'পার্বতী' গল্প নিয়েই আমার কিছু বলতে ওঠা। 'থিয়েডোরা' নামে স্প্যানিশ গল্পের হুবহু অনুবাদ না হলেও তারই যে বাংলা সংস্করণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লেখকের নাম আমার মনে নেই। আপনাদের কারও প্রয়োজন থাকলে বিক্রমপুরের দেশের বাড়ি থেকে ফেরত ডাকেই আনিয়ে দিতে পারি। শশাঙ্কবাবুর অবশ্য লেখকের নামটা জানা থাকা উচিত।

ঘরটা যেন পাথর হয়ে গেল। দেশলাই আর বোমার মধ্যে পলতের ব্যবধানের মত নিভু নিভু গুমোট ভাব সময়ের উপর দিয়ে বয়ে চলল।

কিছুটা গুঞ্জন। নড়ে চড়ে বসা তার পর। উপানন্দ কাঁপতে কাঁপতে ফেটে পড়ল—ন্যানার্স!

শার্টের কলার ধরে উপানন্দকে বসিয়ে দিল শশাঙ্ক। ভাবলেশহীন চাউনি। ঠোঁটের হাসিটুকুর ব্যাখ্যা নেই।

সিলেট হলের পেছনের মিউজিয়াম, বন্ধুদের সহজ প্রচলিত ভাঙা-চোরা এক

রেজোবেশেবের পাশে দেখা হয়েছিল। অপর্ণা প্রসঙ্গ এড়াতেই চেয়েছে প্রথমে, শশাঙ্ক অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে। অপর্ণা সহাস হেসে বলেছে, কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে?

শশাঙ্কর চোখমুখের আলো যেন নিভে গেছে। ম্লান এক টুকরো হেসে বলে, চুরি করা খারাপ। চোর আরো জঘন্য। আমি চোর নেই। ইদানীং কেন জানি না, আপনাকে বিভ্রান্ত করবার আশ্চর্য নেশায় পেয়ে বসেছিল। মনে মনে গল্প ফেঁদেছি কিন্তু জোরালো কিছুই হয় নি। 'থিয়োডোরা' গল্পটা পড়ে ওটাকেই আমি কাজে লাগালাম। সেটা আপনাকে যতটা ছেঁড়াছেঁড়ি করবার খাতিরে, থিয়োডোরা থেকে চুরি করবার বাসনা ঠিক ততটা আমার ছিল না। বিশ্বাস করুন, এই বুদ্ধদেব ছুঁয়ে বলছি......।

কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করেছে অপর্ণা,—আপনি চোর নন। এখন দেখছি পয়লা নম্বরের প্রতারক।

হাতজোড় করেছে শশাঙ্ক। চোখমুখে দম্ভের চিহ্ন নেই। বিদ্রূপের আভাস নেই ঠোঁটে। বলেছে, আমি অপরাধী। আপনি শাস্তি না দিলে শান্তি পাব না।

অপর্ণা শাস্তি দিয়েছিল কি না জানি না কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শশাঙ্ককে দেখে মনে হয় নি অশান্তি তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেছে।

উপানন্দ বিচলিত হয়েছে। নেপথ্যে মন্তব্য করেছে, ঠিক চিনেছিলাম। আসলে শিরদাঁড়া বলে কোনো পদার্থই নেই শশাঙ্কের। 'রক্তকরবীর' ওপর শশাঙ্কের কেন এত টান বুঝতে পারছি।

কেতকী নন্দীর কাঁসরঘণ্টা আর্তনাদ করে উঠেছে, কফি হাউসে মুখোমুখি বসে কথার আর শেষ নেই। অপর্ণা করবে নন্দিনী? শশাঙ্কের আশ্চর্য ইডিওসিনক্রাসিঃ সোসাইটিতে মেশে নি, মেয়েদের সম্পর্কে শশাঙ্কর কোনো ধারণাই নেই। আসলে অপর্ণা মেয়েটি সহজ নয়। শশাঙ্ককে হাতিয়ে ভাল রেজাল্ট করবার তালে আছে।

দৃশ্যান্তরে দেখা গেছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অপ্রতিহত গতিবেগ নিয়ে শশাঙ্ক সবকিছু চুরমার করে দিয়ে সিংহাসন দখল করেছে। চিকেন পক্সের গুটিকতক দাগ উপানন্দের সুন্দর মুখটিতে কুৎসিত কয়েকটি আঁচড় কেটে গেলেও শশাঙ্ককে ভয় পেয়ে পরীক্ষার ড্রপ করবার অপযশ থেকে নির্বিঘ্নে রেহাই পেল।

অবশ্য 'ওয়াক ওভার' পায় নি শশাঙ্ক রায়। খর্ব ক্ষীণদেহী মালীপাঁচঘরার সমীর দে থার্ড পেপারের পঁচিশ নম্বর ছেড়ে দিয়েও মাত্র সাত নম্বরের ফেরে পড়ে শশাঙ্কের কাছে পরাজয় বরণ করল। তলানি যা পড়ে রইল আর সবাই ভাগাভাগি করে নিল।

ফল যখন বেরুলো একটা পলিটিক্যাল এজিটেশানের খপ্পরে পড়ে সমীর দে তখন আলীপুর জেলে। জালের জাফরি দেওয়া লোহার কঠিন বেষ্টনীর অপর প্রান্ত থেকে শশাঙ্কের বিচলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, নিয়মিত ক্লাশ করেন নি। ক্লাশ লেকচারের চেয়েও য়ুনিভার্সিটি চত্বরে ঘাসের ওপর বসে পলিটিক্যাল ক্লাশই আপনাকে আমি বেশ নিতে দেখেছি। সত্যি আপনি আমাকে অবাক করছেন। আপনি একটা কি!

কথা কানেই তোলে নি সমীর। হেসে বলেছে, অপর্ণা এসেছিল কিছু আগে। রাজনীতি করে আমি গোল্লায় যাচ্ছি, তাই বোধহয় রসগোল্লাও এনেছিল খুড়িতে করে। অপর্ণা আমাকে সাব-ইন্সপেক্টরের মত ধমকে গেছে। আপনি ওসব কথা আর তুলবেন না। ভাল কথা, দুদিন কাগজ পড়তে পাই নি। হাঙ্গেরী সম্পর্কে নতুন কোনো খবর আছে নাকি? বুদাপেস্ট থেকে সোভিয়েট ট্রুপস উইথ ড্র করে নি?

এ সমস্তই আদি কথা, নিতান্ত পুরোনো কথা। রিক্সায় চাপিয়ে বই আর কাগজপত্রে ঠাসাঠাসি হয়ে ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়িতে অপর্ণা যেদিন এলো, শশাঙ্কের বাকশক্তি সেদিন হয়তো লোপ পেয়েছিল।

এক টুকরো হেসে অপর্ণা বলেছে, রিক্সওয়ালাকে মেটাও, বইওয়ালার কথা পরে হবে।

সব শুনে প্রবল বেগে মাথা নেড়েছে শশাঙ্ক,—এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। এত কষ্ট, এতদিনের পরিশ্রম 'দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ'। আমি জানি গবেষণাতে তুমি এগিয়েছ অনেকটা। তুমি ভুল করছ অপর্ণা।

চোখে জল ছিল না কিন্তু কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। নিজেকে সংযত করতে কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল। কাগজপত্রের উপর এক লহমা দৃষ্টি বুলিয়ে ধরা গলায় বলল, দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ কি না জানি না, তবে গিরিশবাবুর আমলের এক তবলচী মুগীহাটার চিন্তাহরণ দাসের রেমিনিসেন্স-গুলোতে অনেক নতুন কিছু পাওয়া যাবে। মাসখানেক আগে ভদ্রলোক মারা গেছেন। অপেরা হাউসে দেব কার্সনের 'বেঙ্গলী বাবু' যেমন দেখেছেন, 'মুস্তোফি সাহেবকা পাকা তামাশাও' তেমনি তাঁর স্বচক্ষে দেখা। অনেক নতুন নতুন চরিত্রের সন্ধান আছে। তাই আগুনে দিতে ভরসা পাই নি। তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমার অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।

শশাঙ্ক বলে, এসব তুমি কি করছ? এসব কি কেউ কাউকে দেয়?

অপর্ণা বলে, তুমি শুধু শেষ করো শশাঙ্ক। বিনোদবিহারী ও তরলাবালাকে খুঁজতে হলে আরও কিছু পরিশ্রম করতে হবে। আমার এসব হবে না। এ আমার হবার নয়। অণু-পরমাণু নিয়ে নাড়াচাড়া করা এ জন্মে আমার হলো না। বাবার চিঠি পেয়েছি। আমার ছোট বোন অনুরাধাকে আর অনু বলে চালানো যাচ্ছে না। সে আর ছোট নেই। কলেজে পড়তে আসছে। ঘর চাই। খরচ বাড়বে। মন দিয়ে চাকরীই করব ঠিক করেছি।

বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় শশাঙ্ক, এতটা এগিয়ে রিসার্চ তুমি ছেড়ে দেবে?

অপর্ণা বলে, সবই করি নি আমি। সার্চ করেছি, রিসার্চ করতে হবে। সঞ্চয় করেছি, চয়ন করা বাকি।

রংসাদৃশ্য এক বোবা মানুষের মত হতবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে শশাঙ্ক রায়। আশ্চর্য, অপর্ণা হাসছে। অতি স্বচ্ছ হাসিটুকু আজ যেন নতুনভাবে প্রতিভাত হয়। এ হাসিতে যেন দুঃখ নেই। পরাজয় নেই। তিলমাত্র আভাস নেই আত্মত্যাগ বা আত্মদর্শনের। এ হাসিতে অনেকটা যেন বিস্মৃতি, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ।

মুখোমুখি পড়ে গেলে আজ যদি কেউ আগ্রহ প্রকাশ করে—শুনেছি বাংলা নাটকের একাল-সেকালের উপর আপনি নাকি গবেষণা করছিলেন,—লেবেডফের আমলের দুইজন অখ্যাত উপেক্ষিত এলেন টেরীর সন্ধান পেয়েছেন, স্যর জন শোরের আমলের কিছু নাকি উদ্ধার করেছেন?

অল্পপরিসর জায়গার মধ্যে গাড়ি ঘোরাতে ড্রাইভারের যেমন দক্ষতার প্রয়োজন, অনেকটা যেন সেই নিপুণতা নিয়ে অপর্ণা প্রসঙ্গে এড়াতে চায়। হেসে উড়িয়ে দেয় না। প্রশ্নকর্ত্রীর শাড়ির ডিজাইন সম্পর্কে আশ্চর্যরকম কৌতূহল প্রকাশ করে। অথবা কি বিশেষ প্রোটীন আহার প্রশ্নকর্ত্রীর দেহের গড়ন দিয়েছে, সে কথা হেসে হেসে কবুল করতে বলে। কিংবা আকাশের দিকে এমন মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকে যেন মনে হয় আলীপুরের হাওয়া অফিসে তার মাসমাইনের ব্যবস্থা আছে।

শশাঙ্ক রায় এখন ডক্টরেট। দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক। উপানন্দ মার্কিন এক সংবাদ সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছে। আব্রাহাম লিংকনের সচিত্র জীবনকাহিনীর বাংলা তর্জমা লিখে এবং নিউইয়র্ক ক'বার ঘুরে এসে নিজের আসন আরো পাকা করে নিয়েছে।

আবু পাহাড় থেকে নেমে এসে কে এক জয়ন্ত দত্ত কেতকী নন্দীকে পাকা দেখে বিয়ে করে নিয়ে গেল। কেতকীর স্বামী বর্তমানে বারাসাতের এস পি।

চুটিয়ে সংসার করছে নীলিমা। হাতিবাগানের এক চকমেলানো বাড়ির সে হচ্ছে আজ বড় বউ। শ্বশুর অ্যাডভোকেট, স্বামী অ্যাটর্নী। নিয়মিত ঘোমটা দিতে হচ্ছে। প্রতি

বছর ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডে হাজিরা দেওয়াও বাধা।

স্থিত হয় নি একজনের। মালীপাঁচঘরার সমীর দে'র। মাঝে একবার শোনা গিয়েছিল হুগলীর এক মেয়েদের ক্লাশে সে গোপনে অনুপ্রবেশ করেছে। পরে একবারে নাকি হাতেনাতে ধরা পড়ে। অপরাধ ব্যাভিচার নয়, পোলিটিক্যাল স্বেচ্ছাচার।

সপ্তদশ শতাব্দীর সৈয়দ আলাওল আরাকানের কঠিন পাহাড়ের মধ্যে থেকে অপূর্ব রসমাধুরীর রোমান্টিক কাব্যে বঙ্গ-সাহিত্যের বৈষ্ণবীয় ললিত পদবিন্যাসের উপর যে সুশীতল নির্ঝরিণীর প্রবাহ টেনে আনলেন, অনার্স ক্লাশে সে কাহিনী অপ্রাসঙ্গিক নয়। পর্তুগীজ জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত সৈয়দ আলাওলের আরাকানে আশ্রয় নেওয়া, জনশূন্য গিরিবর্ত্মে আলমগীরের ভয়ে পলাতক শাহ সুজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ভাগ্যবিপর্যয়ে শাহ সুজা নিহত হওয়া ও আলাওলের কারালাঞ্ছনার আখ্যানও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর হলা আমলে নাৎসী অত্যাচারে গ্লানিবিদ্ধ কোনো এক জর্মন কবিকে দুটি দুর্ধর্ষ সেন্ট বার্নার্ড আলপসের তুষারঝটিকা থেকে উদ্ধার করে ভিয়েনার শেষ সীমারেখায় ফেলে যাবার আখ্যানে হৃদয়স্পর্শী মানবকাব্য হয়তো ছিল, কিন্তু রোখাঙের মুসলমানী কাব্যের বাষ্পমাত্র ছিল না।

প্রমাদ গুণে কলেজ-কর্তৃপক্ষ সমীর দে'কে বহিষ্কার করেন। প্রবীণ অধ্যাপক মন্তব্য করলেন, আশ্চর্য ছোকরা! অরিজিন্যালিটিও আশ্চর্য, কিন্তু পলিটিক্যাল স্কুলের কাটা-ওয়ালা দাদারা মাথাটা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে।

কৃশকায় দেহ আরো হয়েছে ক্ষীণ। এখন কখনো জেলে, কখনো অক্টারলোনি মনুমেন্টের তলায়, চটকল পাটকলের আনাচে কানাচে কখনো কখনো। মুণ্ডুহীন কেতুর মত সমীর দে এখনো ঘুরছে।

একমাত্র শশাঙ্কই আসে মাঝে মাঝে। নতুন লেখা ছাপাখানায় দেবার আগে অপর্ণাকে শুনিয়ে যায়। এতক্ষণটা মন দিয়ে শোনে। অনু কোথাও ভাল কাজের সন্ধান পেলে চটি নেবে কি না তা নিয়ে পরামর্শ করে। অনুরাধাকে চোখে চোখে রাখবে বলে তাকে নিজের কলেজে নিয়ে গেছে। অপর্ণার অনুপস্থিতিতে শশাঙ্কর কাছে অনু নিজের অ্যাম্বিশনের কথা বলে। কিছুটা শোনে, অনেকটা যেন মাথাতে নেয় না শশাঙ্ক।

সময় লেগেছে, তবে প্রচুর অভ্যাসে অপর্ণার মন শাসনে এসেছে। বাইরের কোনো হাতছানি দেখে মন আনচান আর করে না। কপাট দিয়েছে শক্ত করে, অন্য কোনো দরজা, জানলা, এমনকি ঘুলঘুলি দিয়েও ফিরেই যাচ্ছে। মনের বন্ধ দুয়ার খুলবে না। যেন পোষমানা কোনো বুনো পাখী খাঁচার উপর ঢাকনাটি পড়ে থাকলে শান্ত হয়ে আছে। কান পেতে শুধু শুনছে, চোখ মেলেও দেখছে। সামনের অফুরন্ত নীলাকাশ সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে গেছে।

হিসেবের খাতায় খরচ যে সেজারুর মত এতটা ভেড়ে আসবে অপর্ণা ভাবতেই পারে নি প্রথমে। বহু কৌশল আর নানা ছলাকলায় সাত হাত ঘুরে বিভূতিভূষণের প্রেরিত অর্থ অপর্ণার হাতে জানান না দিয়েই এসেছে। পদ্মা পেরিয়ে ভিসা পাসপোর্টের বেড়াজাল ডিঙিয়ে বছরে একবার বিভূতিভূষণ ছুটতে ছুটতে এসেছেন। অতি পুরাতন গুপ্ত কটো, পাথরের খাদা, সরু চাল আর নাড়ুবড়ি সযত্নে বেঁধে এনেছেন।

বৈশাখের গত ঘূর্ণি ঝড়ে কাছারি ঘরের সামনের কাঁঠালগাছটির ভূপতিত হওয়ার কাহিনী, রোহিণী কুণ্ডুর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতি হবার ঘটনা, কে কে আর গ্রাম ছেড়ে গেছে, ভজেন চৌধুরীর পুরাতন ভিটে জঙ্গল আর বুনো আগাছায় কিভাবে গ্রাস করেছে—খেতে বসে এক এক করে বলেছেন।

সকালবেলা চা খেতে বসে গুছোনো বই-এর পুঁটলি ফেলে আসবার সমস্ত দোষই অপর্ণার মায়ের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের ভুলে অপর্ণার ঠিকুজী যে কিভাবে চলে এসেছে, সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ চেপে গেছেন।

রাজরাণী হবে অপর্ণা। ঠিকুজীতে এই-রকম নাকি নির্দেশ আছে। তাই বিনাশক্ত ক্লান্ত শান্ত দেহে মেঝের ওপর আঁচল বিছিয়ে দুদণ্ড যখন বিশ্রাম নেয় অপর্ণা, তা দেখে ঠিকুজীর সোনার পালঙ্কের প্রসঙ্গ তুলে নির্মম কৌতুক করতে সাহস করেন না বিভূতিভূষণ।

অপর্ণা তখন ছোটো। ফুটন্ত দুধে হাত দেবার বয়স তার তখন। কাশীর বিশ্বনাথের গলিতে বিভূতিভূষণের কোলে ফুটফুটে অপর্ণাকে দেখে এক লামা থমকে দাঁড়িয়েছিল। গেরুয়া রঙের থলি থেকে ছাতুর গুঁড়ো অপর্ণার কপালে ছুঁইয়ে দীর্ঘদেহী তিব্বতী লামা বিভূতিভূষণের কানে কানে নাকি বলেছিল, তিমরো ছুরি রাণী হুন্ছ।

সেদিনও এ কাহিনী পাঁচজনের সামনে ঘটা করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আজ দর্প গেছে। রূপকথা শোনানোর স্পর্ধা আজ বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।

একরকম চলছিল। হঠাৎ ঘনঘটা করে এল। ও পারে থেকে যে টাকা চলাচলি, হুণ্ডী বা টাকা আসবার চোরা রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। বিভূতিভূষণের উৎকণ্ঠিত পত্রই আসে শুধু। বিবর্ণ এক মরা চাঁদের জোড়কে আক্ষেপ, অনুশোচনা আর আশীর্বাদে শুধু ভরা থাকে।

অপর্ণার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কিছুতেই কোনো কিছুর জন্য অনুশোচনা নেই আজ। মোটা দুঃখকষ্ট ওপর মনে মনে অভিমান পুষে রেখে নিজেকে অযথা পীড়ন করে না। দেখে মনে হয় দিনযাপনের গ্লানি যেন স্পর্শ করে নি এতটুকু। দেহের টসটসে বাংকম রেখাগুলো আগে ছিল স্পষ্ট। কিছুটা তার প্রচ্ছন্নতাও। এমন অনেক রোশ স্থির। অনেক বেশি নম্র। সবটা মিলিয়ে অপর্ণার চেহারায় ঝিলিক মিলিয়ে এসেছে। কিন্তু পরিপূর্ণ শোভা কিছুমাত্র ম্লান হয় নি।

সামান্য কয়েক বছরে সে বহুবার চমকে চমকে উঠেছে। তাই আকস্মিক আর নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নিয়োগপত্র যত আশাতীতই হোক, যত আকস্মিকই হোক না, অপর্ণা বিস্মিত হয় না। বিহ্বল হয় না কিছুতেই। ধৃতি গেছে, বুদ্ধিও তার হারিয়ে গেছে। আশাই ছিল না, নিরাশা নিয়ে সে আসে নি। তাই সফল দুরাশা বিচলিত করে সামান্যই।

ঘুম থেকে অনুরাধা বিছানা ঝাড়তে সুরু করে। ছড়ানো বইপত্র ঠিক করতে করতে অল্পক্ষণ পরে বলে, এ চাকরী যখন নিচ্ছ, বিকেলের কাজটা তখন বন্ধ রাখো। পার্শিডাঙার ছাত্রী পড়ানো এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল। বাবা নেই তাই দেখছি তুমি যা ইচ্ছে তাই সুরু করেছ। নিজের শরীরের দিকে একবার চেয়ে দেখেছো?

অপর্ণা বুঝতে পারে তার শরীর অনুর যতটা নজরে এসেছে, বিকেলের কাজটা তার চেয়ে চোখে পড়েছে অনেক বেশি। অফিসের পর ছাত্রী পড়ানো দোষের নয়, কিন্তু সন্ধ্যের পর কিছুক্ষণ মনোরঞ্জনদের ইউনিটে নাটকের রিহার্সালই অনুরাধাকে বিচলিত করেছে বেশি।

শুধু খেয়ালখুশী নয়। অপর্ণার শখও নয় মোটেই। ছাত্রী পড়ানোর পারিশ্রমিকের চেয়ে দশটাকা বেশি। সপ্তাহে চারদিন, মাসে পঞ্চাশ টাকার মনোরঞ্জনদের ওখানে নাটকের অভিনয় করবার নতুন কাজ নিয়েছে অপর্ণা।

সবটা মিলিয়ে মন্দ লাগছে না জায়গাটা। প্রথমটা কেমন যেন খটকা লেগেছিল। সোফা সেট আর কার্পেটমোড়া সুসজ্জিত ক্লাব-রুমে গাড়িওয়ালা মেম্বারদের দেখে খাম-খেয়ালী শৌখীন নাট্যকেপনা মনে হয়েছিল। কিন্তু সামান্য দিনেই ধারণা পাল্টাতে হয়েছে। লোকগুলো বেশ। যে কজন মেয়ে অভিনয় করে মোটামুটি সবাইকে সাহায্য করা চলে। একমাত্র অপর্ণাই টাকা নিয়ে অভিনয় করতে রাজী হয়েছে। অন্য সবাই যেন নিছক

মাসিক
বসুমতী
।। বৈশাখ, ১৩৭৫ ।।

(জলরঙ)

ইন্দ্রসভায় বেহুলার নৃত্য

—শ্রীসুধীর ধার অঙ্কিত

করতে চায়। নাটক তাদের নেশা। অপর্ণারই শুধু অবসর সময়ের পেশা।

অপর্ণাকে মৌন দেখে অনুরাধা বলে, রাগ হয়ে গেল নাকি! ঘাড়ের চেহারা দেখেছ, সন্ধ্যাতে তুমি বেরুবে না?

অপর্ণা বলে, ক'দিন তো যাচ্ছিই। কিন্তু নাটকই এখনও ঠিক হয় নি ওদের। আলোচনাই হচ্ছে শুধু। আজ আর যাবো না। তুমি কি কোথাও বেরুবে?

প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা করা গেল না ঘরের অপরপ্রান্তে এগিয়ে যায় অপর্ণা। হিটারে বসানো চায়ের জল ফুটছে। বাষ্প উঠছে সরু মুখটা দিয়ে। মাথার ঢাকনাটা শব্দ করে উঠছে-পড়ছে।

॥ দুই ॥

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কাচে মোড়া সুসজ্জিত অফিস বাড়ি। কয়েক গজ অন্তর অন্তর এলুমিনিয়ামের ঘোমটা টানা লম্বা ফ্লুরোসেন্ট টিউব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসবাবপত্র সাদা আলোতে ঝলমল করছে। কর্মরত মানুষগুলো চুপচাপ। সাদা আলোতে মাখামাখি হয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল।

কুম্ভ ব্রাদার্স একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন প্রচার দপ্তর। সামান্য প্রসাধন-সামগ্রী থেকে সুরু করে আমেদাবাদ মিল, ভারি বিদেশী যন্ত্রপাতি, মায় ওষুধপত্তরের পাবলিসিটির ভার নিয়ে থাকে এই কুম্ভ ব্রাদার্স।

বড় সাহেবের খাস কামরায় মিঃ সান্যাল অপর্ণাকে প্রথম নিয়ে এলেন। এক পাশে সারি সারি আলমারি। পিছনে দেওয়াল জোড়া ভারতের মানচিত্র। মাথা নিচু করে প্রয়োজনীয় বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন অরুণ মুখার্জী। মিঃ সান্যাল বলেন—একে অদিতিবাবুর ওখানেই দিচ্ছি।

নিজের কাজে ডুবে ছিলেন ভদ্রলোক। মাথা না তুলেই বলেন—তাই দিন।

অপর্ণার মত আরও জনাসাতেক মেয়ে কাজ করে ওখানে। দুজন মাদ্রাজী ও মিস্ ডোভ্রিন ছাড়া সবাই বাঙ্গালী। অল্প কয়েক দিনেই মিস ডোভ্রিনের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে ওঠে অপর্ণার। বছরখানেকের চাকরী। ইংরেজী রচনা করবার হাত সুন্দর। প্রথম-দিনের আলাপেই মিস্ ডোভ্রিন কথাপ্রসঙ্গে জানায়—পারিবারিক একটা গোলযোগে বর্তমানে তাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। কাকার খামখেয়ালির জন্যই তার দেশে ফিরে যাওয়া ব্যাহত হচ্ছে। সামনের মাসেতেই দেশে ফিরে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে।

আসলে মিস্ ডোভ্রিনের জন্ম এদেশেই। নেহাৎই ইংরেজী আমলের জের। পূর্বজীবন ঘাঁটাঘাঁটির প্রয়োজন নেই। তবে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের দুই কামরার ফ্ল্যাট বাড়িতে তার দীর্ঘকালের বাসস্থান। চেহারাটা মোটামুটি চলনসই। মুখশ্রী পরিষ্কার। কালো ছোপ নেই হাতেপায়ে। সারা মুখে কোথাও একটা তিল নেই। সেজেগুজে ছুটির দিন চৌরঙ্গী পাড়ায় যখন সচিত্র ইংরেজী পত্রিকার স্তূপের উপর চোখ ছোট করে দৃষ্টি বুলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর হিন্দুস্থানী হকারের কথা না বোঝবার ভান করে তখন অনেক আনাড়ি মিস ডোভ্রিনকে বিলিতি মেম সাহেব বলে ভুল করবে সহজেই। সুযোগ পেলেই পিতৃভূমি অস্ট্রেলিয়ার গল্প ঘটা করে বলে। দেশে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই চূড়ান্ত হয়, আবার একদিন অনিবার্য কোনো কারণে সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যায়।

দোষ অবশ্য মিস্ ডোভ্রিনের একার নয়। এদেশের শতসহস্র ডোভিড ও ডোভ্রিনের এই একই অবস্থা। এদেশকে ওরা স্বীকার করে নিল না, ওদেশেও এদের গ্রহণ করবে না কোনোদিন।

মিস্ ডোভ্রিনের কাল্পনিক পিতৃভূমি ও দাপুটে কাকার খিদিরপুরে আসার পথে মিড অ্যাট্‌ল্যান্টিকে গমের জাহাজ নিয়ে সর্বনেশে টাইফুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার রোমহর্ষক কাহিনী মন দিয়ে শুনে মানুষটাকে সম্পূর্ণ জয় করে ফেলেছে অপর্ণা। সে কাহিনীতে কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক দু'একটি ঘটনার সঙ্গে হাল আমলের একটি জনপ্রিয় ইংরেজী ছবির সঙ্গে হুবহু মিল থাকা সত্ত্বেও মিস্ ডোভ্রিনের কাহিনীর মৌলিকতায় অপর্ণা তিলমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করে না।

অলকা বোসের অনেক দিনের চাকরী। দীর্ঘাঙ্গিনী, ময়লা রং। ডাগর আঁখি। কপালের দুই প্রান্ত ঘেঁষে মাথার চুল আঁটো করে বাঁধা। মুখটা তেলতেলা। ডিম্বাকৃতি ব্লাউজের ঘের দুকাঁধের প্রান্ত স্পর্শ করেছে। কটিতট বেষ্টন করে ঘুরতে ঘুরতে বারো হাত শাড়িও কাঁধের কাছে এসে হঠাৎ ফুরিয়ে যায়। শুধু পায়ের দুফালি চটি দেখে বলা সম্ভব কি রঙের ব্লাউজ তার গায়ে আছে। শাড়ির পাড় দেখে কপালের সবুজ সিঁদুর আন্দাজ করা অসম্ভব নয়।

সবটা মিলিয়ে অলকা বোসকে মানায়। ভয়ানক তাড়াহুড়ো। কাজও করে নির্ভুল। সুন্দর ইংরেজী লেখবার হাত। কিন্তু হাতের লেখা জঘন্য।

অফিসে দেরি হয়ে যাওয়ার পেছনে অপর্ণার সত্যি সেদিন হাত ছিল না। মাঝ রাস্তায় একটা বাস বিগড়ে যাওয়াতে অফিস পৌঁছুতে প্রায় বিশ মিনিট লেট হয়ে গেল। একরকম ছুটতে ছুটতে নিজের শরীরটা লিফ্‌টের বাক্স চালান করে দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল লিফ্‌ট, কি দেখে লোহার ভাঁজ সরিয়ে সেলাম ঠুকে নেবে দাঁড়াল লিফ্‌টম্যান। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এসে ঢুকলেন অরুণ মুখার্জী।

অপর্ণা প্রথমটা বিব্রত বোধ করেছে। একেবারে মুখোমুখি পড়ে যাওয়া এই প্রথম। তারপর আবার লেট। ভদ্রলোক সামান্য হেসে বলেন, নতুন কাজ আপনার কেমন লাগছে?

—ভাল।

—মিঃ সান্যালের ওখানেই কিছুদিন এখন থাকুন। অল্পদিনে উনি আপনাকে আমাদের এখানকার কাজের মোটামুটি ধারণা করে দেবেন। আর অফিসে দেশবিদেশের যেসব জার্নাল আসে সেগুলি দেখবেন। বিজ্ঞাপন পরিবেশনের ব্যাপারে এ কাগজগুলো থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন। আপনার অরিজিন্যাল ওয়ার্ক মিঃ সান্যালের পছন্দ হয়েছে।

কিন্তু অদিতিবাবুর সঙ্গে অপর্ণার কিছুতেই বনাবনি হল না। বারবার নিজেকে শাসন করেছে, শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করতে পারে না।

শিল্পী হিসেবে অদিতি মিত্র সুপরিচিত। কমার্শ্যাল আর্ট আর ফাইন আর্টে অদিতির সমান দক্ষতা। কম কথার মানুষ। একটু বেশিমাত্রায় দাম্ভিক। পরনে গেরুয়া রঙের মোটা খদ্দরের ঢিলেঢোলা পাঞ্জাবী। গালে অজস্র ব্রণের দাগ অল্প দাড়ি দিয়ে ঢাকা। কথাবার্তায় অফুরন্ত একটা নির্লিপ্ততা। তাতে তাচ্ছিল্য হয়তো নেই, কিন্তু প্রচ্ছন্ন উপেক্ষা একটু থাকেই।

তুলি-রঙের টানটোনের মধ্যে অদিতিবাবুর দাম্ভিকতা সীমাবদ্ধ থাকলে হয়তো বলবার কিছু ছিল না কিন্তু অপর্ণার কাগজে কলমে সে দম্ভ দৌড়ে এলে খুশি হবার নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ নেই।

অপর্ণা বুদ্ধিমতী মেয়ে। অদিতি মিত্রকে রাগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন তার না থাকলেও রাগিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না বুঝেছিল। কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। মনকে শান্ত রাখতে পারেনি। ফস করে বলে ফেলল, রঙ-তুলি নিয়ে আপনার খেয়ালখুশিমত গড়ুন কিন্তু আমার লেখা ম্যাটার সম্বন্ধে আপনার কোনো মন্তব্য না থাকলেই আমার ভাল লাগবে। ইলাস্ট্রেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার লেখা নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভ হল না আপনার আঁকাটাই বড্ড বেশি 'গডি' বা 'লাউড'—সে বিচার আমার আপনার নয়। আমার লেখা এইভাবে কাটাছেঁড়া কেন করবেন আপনি?

অপর্ণার কাছ থেকে এতটা সোজা প্রশ্ন আশা করেন নি অদিতি মিত্র। কয়েক মুহূর্ত পরে অপর্ণার চেয়ে নিচু পর্দায় বললেন, আপনার অপছন্দ হলে অনধিকারচর্চা আমি করব না।

শান্ত স্বভাবের মানুষ। ধীর পদক্ষেপে অদিতি মিত্র নিজের ঘরে চলে গেলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই মিটল না। দিন তিনেক বাদে অরুণ মুখার্জীই ডেকে পাঠালেন। অরুণ নিজে আর্টিস্ট, তার উপর এই গোটা প্রচার দপ্তরের একচ্ছত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। কানে কথা পৌঁছোয় কম কিন্তু বুঝতে হয় বেশি। অদিতিবাবুকে তিনি ভালভাবেই জানেন। অপর্ণার চটে যাওয়ার কারণ বুঝতেও তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। তবে অপর্ণাকে ঘরে ঢুকতে দেখে কিছুমাত্র ভণিতা না করে বলেন, দেখুন, সবটাই রিলেটিভ। অদিতিবাবুর ইলাস্ট্রেশান আর আপনার লেখা ম্যাটার দুটোই আমি দেখে থাকি। তবে অদিতিবাবু আপনার চেয়ে অভিজ্ঞ। ও'র সামান্য সাজেশানে আপনি যদি এভাবে উত্তেজিত হন। অদিতিবাবু খুব দুঃখিত হয়েছেন।

অপর্ণা বলে, আমার লেখার ওপর কলম চালিয়ে যাওয়াকে যদি আপনি সাজেশান বলেন তবে আমার কিছু বলবার নেই।

বাধা দিয়ে অরুণ বলে, আপনাকে ছোট একটা উদাহরণ দেব। সেতার অনুসরণ করে তবলা বাঁধতে হয় জানেন। তাতে কিন্তু তবলার মর্যাদাহানি হয় না। একটা অপরটার উপর নির্ভরশীল। আপনার লেখা আর অদিতিবাবুর রঙ-তুলি ঠিক সেই নিয়মে কাজ করবে এই রকম আমি আশা করব। অবশ্য আপনি যদি সেতারের মালিকানা নিয়ে তর্ক করেন সে কথা আলাদা।

অপর্ণার শুকনো হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বলল, আপনি আমাকে কিন্তু ভুল বুঝলেন। সেতার বা তবলার মালিকানা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক আমার শোভা পায় না। কিন্তু আমার বক্তব্য সেতারও নয়, তবলাও নয়, আমার বক্তব্য সঙ্গীত। আমার লেখা বা অদিতিবাবুর ইলাস্ট্রেশানও বড় কথা নয়, বড় হল বিজ্ঞাপন। ও'র রঙ-তুলির ব্যবহার, কম্পোজিশান, পারস্পেকটিভ আমার প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমার লেখাতে সে রঙচঙ দৌড়ে এলে আমার ভাল লাগবার কি কারণ থাকবে বলতে পারেন? এটুকু মর্যাদা নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না?

অপর্ণা আর অপেক্ষা করল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আচমকা আলোর এক ঝলকানি রেখে এলো। অরুণ চিন্তিত। ওর চোখ এ আলোতে নিতান্তই অনভ্যস্ত। রঙের ব্যবহারে অতি সুনিপুণ অরুণ মুখার্জীর তুলির টানটোনে এই জাতের খাড়াই সোনালী ঝিলিক কেন ধরা পড়েনি। ফোনটা বেজে চলেছে অনেকক্ষণ। যান্ত্রিক শব্দটা থামানো দরকার। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিসিভার কানে তুলে নিতে হয়।

দিন দুই পর।

হাতে কিছু কাজ ছিল। তাই বাড়ি ফেরা সম্ভব হল না। অপর্ণা সোজা এলো রিহার্সালে।

সন্ধ্যের পর পায়ে-হাঁটা লোক এ অঞ্চলে সামান্যই। মানুষ এখানে কিছুটা ভিন্ন নিয়মে চলে। পাশাপাশি বাস প্রায় বিশ বছর। কিন্তু প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব দূরের কথা, সামান্য পরিচয়ও থাকে কিনা সন্দেহ। বেমক্কা মুখোমুখি পড়ে গেলে বিলিতি দিব্যি গেলে গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে অপরের পথ করে দেওয়া বা মহার্ঘ পোষাকসমেত ধোপার অন্তর্ধানের সংবাদ পাশের বাড়িতে ফোন করে সতর্ক করে দেওয়া অথবা অপ্রচুর গ্যাস সরবরাহে ক্ষিপ্ত কোনো পাঞ্জাবী ললনার নাইলনের খোলস উড়িয়ে বাড়িবাড়ি সই সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর বড় খাতির আছে বলে মনে হয় না।

পথে আলো সামান্যই বিরাট বিরাট অট্টালিকা। জমকালো নয় মোটেই। কলি ফেরানোর সময় পার হয়ে গেছে দীর্ঘদিন। ফুটপাথের কোল ঘেঁষে একমেটে দীর্ঘ পাঁচিল বিবর্ণ অগোছালো সবুজ আগাছা ভিড় করে আছে মাথাতে। যে পরিমাণ নতুন গাড়ির দালালের আনাগোনা হয় বাড়িতে তার চেয়ে অনেক কম হয় রাজমিস্ত্রীর আসা যাওয়া। পুরাতন গেট। পোর্টিকোর নরম আলোর তলায় নিঃসঙ্গ আমেরিকান গাড়ি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই হয়তো অন্য বাড়ির আউট হাউস সুরু হয়েছে। ছোট্ট জানালা, সামান্যই নজরে আসে বাইরে থেকে। তবে তাতে অসুবিধা বিশেষ নেই। দরোয়ানের বৌ পাশের বাড়ির নেপালী বাবুর্চির সঙ্গে প্রেম করতে পারে অক্লেশে। এই পথে সকালে বাজার নিয়ে ফেরে। উনুনে কোয়াসের জল শুকিয়ে যায়। ফ্যান পড়ে পড়ে আগুনও কখনও নিভে যায়। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। পরিচিত মানুষটি নজরে এলে জানালার জালে মুখ লাগিয়ে আস্তে যেন চুরি করে ডাকে, এদিন পুরুখ।

চওড়া রাস্তাটা লম্বায় অনেকটা। একটা চীনা লণ্ড্রী, কার্পেট ধোলাইখানা, বিলিতি মদের দোকান এবং দুটি পানের দোকান ছাড়া অন্য কিছু নজরে আসে না। তবে বহুপ্রচলিত পানের দোকানের সঙ্গে এ দুটি দোকানের প্রভেদ আছে।

এসব দোকানে যে পরিমাণ নানা লেবেলের সিগারেটের টিন পাওয়া যায়, চৌরঙ্গীর অনেক দোকানেই একসঙ্গে এত টিন অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। মুখোমুখি বিড়ির খরিদ্দার যত তার চেয়ে অনেক বেশি সন্ধ্যের পর বাবুরান সোডার জন্যতার ভিড়। নেপালী আয়ার সঙ্গে গল্প অনেক সময় গেছে, এখানকার স্টেয়ার্ড কিন্তু বাবুর্চি বেয়ারার চাকরী যাওয়ার ভয় নেই। অস্ট্রেলিয়ান কর্ন ফ্লেক পানের দোকানেই রাখা আছে।

একদিকে শুকনো বেগুন, কুমড়োর ফালি আর বিবর্ণ টোমাটো। ছোট ছোট ধামায় চালডাল। সেই সঙ্গে মশলাও। মাথার উপর দড়িতে ঝোলানো চাঁপা কলা ঝুলছে। আলু আর পেঁয়াজ কিছুটা তফাৎ রাখা। তারের জাফরিকাটা পাত্রে মুরগীর ডিম। নষ্ট ডিমের ফেরে পড়ে সকালবেলা প্রাতরাশের টেবিলের গড়ন দিতে বাবুর্চি দৌড়ে আসে এখানে। পানওয়ালা শ্লেটের উপর লিখে রাখে—সামসুদ্দিন—ডিম পাঁচখানা।

অন্ধকারের সঙ্গে রাত্রি যেন ভিড় করে আসে এ অঞ্চলে। মানুষের চলাচল অস্বাভাবিক রকম কমে আসে। সারাদিনের খাটুনির শেষে এক এক করে অনেকে পানের দোকানে এসে জমা হয়। বাগানের ঘাস চেঁচে আসে মালী। তার হয়তো একপোয়া মসুর ডালের সওদা করতে আসা। বাবুর্চি বেয়ারা আসে। সময় বুঝে মস্করা করতে আসে নেপালী আর মাদ্রাজী আয়া। বাড়িবাড়ি স্যুট আর গাউন পৌঁছে দিয়ে ধোপা আসে দিনের শেষে। গাড়ি গ্যারাজে তুলে দিয়ে ড্রাইভার আসে মশলা সোডার খোঁজে।

পথে আলো নেহাৎই অল্প। বাড়ির পোর্টিকোর ঘোলাটে লাগচে আলো পথে এসে পড়ে সামান্যই। শেক্সপীয়র পড়িয়ে প্রফেসর ভবানীপুরের পথ ধরেন। পাম্পসুর একটানা খটখট শব্দ শোনা যায় অনেকক্ষণ। চেনা মুখ বাঁচিয়ে চুরি করে প্রেম করতে করতে অনেকে এ পথে বাড়ি ফেরে। পানের দোকানে এসে ঘটা করে পান খেয়ে চীনে রেস্তোরাঁর পেঁয়াজের গন্ধ মারে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সারাদিনের গুমোট ভাবটার উপর এলোমেলো বাতাসের উচ্ছৃঙ্খল ঝাপটায় এক শীতল হাওয়া টেনে আনে। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও হল। পথচারীর চশমার কাঁচ ভিজে উঠল। পথ কিন্তু শুকনোই থাকে অনেকটা।

এ তল্লাটে মনোরমাদের রিহার্সাল রুম শুধু বেখাপ্পা নয়, বেমানানও। অবশ্য এ ব্যবস্থা পাকাপাকি নয়, অন্যত্র সুবিধেমত ঘরের সন্ধান চলছে। আপাতত দলের অন্যতম সভ্য স্বয়ং নাট্যকারের বাড়িতেই সবাই জমায়েত হচ্ছেন।

অপর্ণাকে দেখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মনোরমা। সাদাসিধে মানুষটির হাসি ঠোঁটে লেগেই আছে। সব কিছুতেই প্রবল উৎসাহ। অভিনয় ঠিক আসে না কিন্তু রোজ নিয়মিত এখানে আসা চাই।

যা হোক, তুমি এসেছো। এ ক'দিন এলে না, ভাবলুম কি জানি আসাই বোধ হয় স্টপ করলে। কি ব্যাপার? ডুব দিয়েছিলে কোথায়?

শুধু মনোরমাই নয়, উপস্থিত সবাইকে শুনিয়েই অপর্ণা বলে, ঝামেলা। ঝামেলা! একটা না একটা আছেই। কাল অফিস থেকে ফিরে চিঠিটা পেলাম। রিহার্সালের দিন পাল্টেছে তাতেই জানলাম। কিন্তু নাটক কোথায়? রিহার্সাল ফেলছো কবে?

সেক্রেটারী হিমানীশ রায় কোণের থেকে মন্তব্য করলেন, নাটক আমাদের তৈরি। দু'দিন ধরে পড়া হল। রিহার্সালও হল একদিন। এ ক'দিন না এসে আপনি বড্ড মিস করেছেন। বলুদা কাল আপনার খোঁজ করছিলেন। এবার থেকে আমাদের সবাইকে একটু বেশি রেগুলার হতে হবে। কাজ থাকেই, ঝামেলা আছেই।

শুধু অপর্ণাকে নয়, হিমানীশ সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে সুরু করে, আমার কথাই ধরুন, সকালে গেছি রিষড়ে। ভোর ছটায় আমার হাজরে দিতে হয়। বেলা পাঁচটা পর্যন্ত রঙ আর কেমিক্যালস নিয়ে নাকাল হয়েছি। পথে চাকা ফেঁসেছে। ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরেছি। তারপর সোজা এখানে। এই দেখুন না অধীর, তিনবার বাস পাল্টে আসে সালখে থেকে। এতদিন অনিয়ম সহ্য করা গেছে কিন্তু আর নয়। আর আপনাদের মধ্যে সবার সংগে বিশেষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়নি। তবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা ক্লাব যাই বলুন না কেন তার তরফ থেকে আমি এটুকু বলতে চাই, সময় সম্পর্কে সামরিক নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন হয়তো হবে না কিন্তু সাতটা-সাতটাই। পাঁচ-দশ মিনিটের হেরফের হয়তো মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু সোয়া সাতটায় দরজা বন্ধ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হিমানীশ রায় লোকটাকে বেশ লাগল অপর্ণার। ব্যক্তিত্ব আছে, ব্যবহার সুন্দর। সেক্রেটারী হবার যোগ্যতা রাখে। ছোটখাট মানুষটি, নিজে অভিনয় করেন না অথচ কিভাবে করতে হয় বেশ বোঝেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে সবাই এসে হাজির হল। পাণ্ডুলিপি হিমানীশ রায়ের হাতে। নাট্যকারের অনুপস্থিতিতে তিনিই কাজ চালিয়ে যেতে অভ্যস্ত।

সিগারেট ছাইদানে ডুবিয়ে দিয়ে হিমানীশ উঠে দাঁড়ালো। বললেন, বলুদার কিছু দেরি হবে। আমাকে ফোনে জানিয়েছেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা আমরা করব না। আমরা এবার কাজ সুরু করে দেব।

মাঝখানে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সবাই উঠে দাঁড়ায়। হাল্কা আসবাবপত্র দেওয়াল ঘেঁষে সরিয়ে রাখা হয়। নাটকের মহলা সুরু হয়।

হিমানীশ বলে, সুভাষ নাটকের কালীপদ চরিত্রটা তুমি জানো। নাটক-পাগল একটা লোক। সময়টা সেকালের। হুড় হুড় করে সেক্সপীয়র বলেন, অসম্ভব মদ খান। স্ত্রী ঊর্মিলাকে ভালবাসেন। তবু ঊর্মিলার সংগে কালীপদর জীবনের অনেক ফারাক। চরিত্রটা ধরতে পারছ? প্রম্প্ট দিলেও এই রোলটা বিশেষ করে তোমার তৈরি রাখতে হবে। বলুদা হঠাৎ আটকে গেলে কালীপদ তোমাকেই করতে হবে।

দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে হিমানীশ বলে, ডলি বিছানায় শুয়ে আছে। রাত অনেক। কালীপদ ঘরে ঢুকেছে। বাইরে থেকে তার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সেক্সপীয়ার আওড়াতে আওড়াতে আসছে কালীপদ। মঞ্চের মাঝখানে এসে একবার তাকাবে ঊর্মিলার দিকে। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসবে। সলিলকি এব্রাপ্ট থেমে যাবে। নাটকের সংলাপ সুরু হবে সেখান থেকে। পাণ্ডুলিপি অজিত মিত্রের হাতে দিয়ে হিমানীশ কোণের দিকে চলে যায়। সুভাষ দরজার একমুখো পাল্লার দিকে সরে গেছে। ডলি কোণের সোফাতে কাল্পনিক বিছানায় ঘুমন্ত ঊর্মিলার গড়ন দিয়ে শুয়ে থাকে।

এগিয়ে আসছে সুভাষ। আত্মগ্লানি, ক্ষোভ ও ক্রোধমিশ্রিত কণ্ঠ।

—ঊর্মিলা, আমি তোমাকে কষ্টই দিলাম শুধু। আমাকে পেয়ে তুমি যেন জীবনের সমস্ত কিছুই হারিয়েছ। আমি কাছে এলে তুমি শুকিয়ে ওঠো কেন? তুমি হাসতে পারোনা কেন ঊর্মিলা? তুমি কান্না চেপে থাকো কেন? তুমি মরে থাকো কেন ঊর্মিলা?

হিমানীশ থামিয়ে দিল সুভাষকে। গোড়া থেকে আবার সুরু করার নির্দেশ দিল। বলে, সলিলকি এব্রাপ্ট থেমে যাবে। প্রথম দুটো কথা ঠিক ঊর্মিলাকে বলা নয়। অনেকটা যেন স্বগতোক্তি। চারটে প্রশ্ন উঁচু পর্দা থেকে নামতে নামতে 'তুমি মরে থাকো কেন ঊর্মিলা'—যখন বলছ তখন তুমি ঊর্মিলার কাছে পৌঁছে গেছো। একটা উদ্দাম আবেগে কালীপদ তখন তছনছ হচ্ছে। আবার সুরু করো।

একমুখো দরজার ওপাশ থেকে আবার সুভাষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হঠাৎ বেদনামিশ্রিত সুভাষের কণ্ঠ অন্য আর একটি কণ্ঠস্বরে চাপা পড়ে গেল। সুভাষ দ্রুত সরে আসে। নিজের আসনে ফিরে আসে।

পর্দা সরিয়ে অপর একজনকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। অনুতপ্ত গম্ভীর কণ্ঠ। ধীর অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কণ্ঠস্বরের শেষ পর্দায় আরোহণ। একটু থামা। আবার মোচড় খেয়ে বেদনাহত কণ্ঠের জাতি সংযত সুষম ছন্দে অবরোহণ।

মহলা বেশ চলছিল। হঠাৎ আগন্তুক ভদ্রলোক নাটকের সংলাপ ভুলে ভয়ানক চটে উঠলেন। ঊর্মিলার উপর নয়, ডলির উপর।

—ডলি, তুমি হাসলে কেন? তুমি হাসলে কেন?

এবার শুধু ডলি নয়, উপস্থিত প্রায় সবাই হেসে ফেলে। দু'একজন মন্তব্য করলেন ঠিক শোনা গেল না। হিমানীশ বলে, বি সিরিয়াস ডলি, ঊর্মিলাকে তুমি বুঝতে চেষ্টা করো। দেখবে তোমার হাসি আসছে না।

সর্ষের মধ্যে ভূত থাকা আদৌ সম্ভব কিনা জানি না কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোককে দেখে অপর্ণার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। জমিটা যেন সরে যাচ্ছে। কথাবার্তা কিছুই তার কানে পৌঁছোয় না। পাথরের মত স্থির হয়ে বসে থাকে। অবিশ্বাস্য ঘটনা। কোথায় এসেছে সে?

মনে হল এ যেন রিহার্সাল ঘর নয়। কালীপদ বা ঊর্মিলা নজরে আসছে না। আশেপাশের অনেকগুলো মানুষ যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। মনের ওপর হু হু করে শীতল হাওয়া বয়ে যায়। চোখের ওপর ভেসে ওঠে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর। দেওয়াল-জোড়া ভারতের মানচিত্র একদিকে। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অপর প্রান্তে বসে ঠোঁটে সামান্য হাসি টেনে যেন বলছেন, আপনার কথা আমার মনে থাকবে। দরখাস্ত রইল। ঠিকানা নিশ্চয়ই দেওয়া আছে। আপনাকে আমরা পরে জানাবো।

চোখ তুলে তাকাতেই অপর্ণা একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবী আর পাজামা। ক্লান্তির ছাপ চোখেমুখে। রিহার্সালের বলুদা, অপর্ণা যাকে জানে কুক ব্রাদার্সের চীফ অরুণ মুখার্জী।

বিস্ময় ও কৌতূহল মেশানো অদ্ভুত হাসি ঠোঁটের কোণে ভেঙে পড়ে। হাতজোড় করে এগিয়ে এলেন। পরিচয় করিয়ে দিল হিমানীশ।—কি আশ্চর্য যোগাযোগ। আপনাকে তো আমি চিনি। খুব খুশি হলাম। হিমানীশ নিশ্চয়ই পরশু আপনার কথাই বলছিল।

হিমানীশ বলে, আমি মালিনী চরিত্রটা ওর জন্যই রেখেছি। সেকেণ্ড অ্যাক্ট আজ ধরা যাক। মালিনী চরিত্রটা কেমন আসে একবার দেখ না। দেরি আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যদি বলো সপ্তাহে চারদিন আমি রিহার্সাল ফেলবো বলে ঠিক করেছি। বিশেষ অসুবিধে হলে পরে না হয় কমিয়ে দেওয়া যাবে।

হিমানীশ অপর্ণার দিকে ফিরে বলে, মালিনী চরিত্রটার মোটামুটি ধারণা আপনার

থাকা দরকার। পূর্বজীবনে মালিনী এক ধনী জমিদার বাড়ির ছিল ছোট বৌ। বাড়িতেই রামায়ণের পালা বসেছিল। আড়াল থেকে রামের অভিনয় দেখে মালিনী মুগ্ধ হয়। পরদিন এই রামের সংগে মালিনী শহরে পালিয়ে আসে। রামের ভূমিকায় অভিনয় তারক ভালই করত কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে রাবণের প্রভাবই তার চরিত্রে বেশি ছিল। তবে আটকে রাখল না বরং কোলকাতায় মালিনীকে ফেলে তারক একদিন নিখোঁজ হল। তারপর........

অরুণ হিমানীশকে থামিয়ে দেয়। বলে, এখানে আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার। শুধু কাহিনী নয়, মালিনী চরিত্রটা আরো ভেঙে বলবার প্রয়োজন। মালিনী রামায়ণ পড়েছে। যৌবনের আগেই বিধবা হয়েছে। স্বামী যখন বেঁচেছিলেন, ছুটিতে ল' কলেজ যখন বন্ধ থাকত, দেশের বাড়িতে এসে মালিনীকে লুকিয়ে ইংরেজী পড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। বুদ্ধিভ্রমে আর যৌবনের বেয়াড়া তাড়নায় তারকের সংগে মালিনী কোলকাতা এল। দুশ্চরিত্র তারক মালিনীকে শুধু ফেলে গেল না, তার চেয়েও ভয়ংকর ভুবনবাবুর হাতে ফেলে গেল। নিজের ভুল যখন মালিনীর মাথায় এলো তখন সে অনেক দূরে পৌঁছে গেছে। ফেরা অসম্ভব। এমন সময় আচমকা একদিন এল কালীপদ। নতুন আলো দেখল মালিনী। বন্ধ ঘরে যেন এক সুশীতল বায়ু প্রবেশ করল জানান না দিয়ে মালিনী কালীপদকে আঁকড়ে ধরে মুক্তি পাবার চেষ্টা করল। স্বর্গ ও নরকের স্বাদ পাওয়া মালিনী একটা অদ্ভুত মানুষ। মালিনীর এই কমপ্লেক্স চরিত্র ঠিকমত ধরতে পারলে দেখবেন মালিনীকে আপনার ভাল লাগছে। হাতের ব্যাগ রাখুন, উঠুন তো দেখি, আপনার মালিনী কেমন আসে।

সোফা ছেড়ে অপর্ণাকে উঠতে হয়। মালিনীর কথা শুনে কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। নাটক করতে এসে আবার এক নাটকীয় দলের সুরু। সন্ধেবেলা ছাত্রী পড়ানোর কথা মনে হয়। একাজের চেয়ে ঢের টাকা কম। খাটুনিও ছিল যথেষ্ট। একমাথা চুল ছুঁড়া মেয়েটার মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু অবশ্য ছিল না তবু সে কাজটাই যেন সোজা ছিল। যুক্তি হয়ত এমন কিছু ছিল না কিন্তু মনের অস্বস্তি কিছুতেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হল না। তবু মালিনী একবারেই জন্দের উৎরোলো।

মহলা আজ বেশ ভালই জমেছিল। ভাঙল সোয়া নটায়। অরুণ মুখার্জী বললেন, চরিত্রটা আপনার চমৎকার এসেছে তো। আপনিই করবেন মালিনী।

ফেরার পথে অপর্ণাই কথাটা তোলে।

অনেকটা আসা গেল। কথাপ্রসংগে অপর্ণা বলে, দেখো, তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানে সবাই কিছু করতে চান। নাটক ভালবাসেন। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা কম বেশি সবাই প্রতিষ্ঠিত। অভিনয়, নাটক, রংগমঞ্চ এঁদের শখ। আমিই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। শখ, পছন্দ-অপছন্দ আমার আজ সব মরে গেছে। ইচ্ছেও হয় কিন্তু মনের দিক থেকে সাড়া পাই না। টাকা নিয়ে অভিনয় করছি। লুকোবো না, আমার কিন্তু সংকোচ হচ্ছে।

মনোরমা বলে, সবার অবস্থা সমান নয়। আমার কথাই ধরো অন্যের মুখে শোনা নয়, আমার নিজের ধারণা অভিনয় আমার আসে না। ওসব ছাই আমার হবে না। বুলুদা তবু আমাকে বলেছেন নিয়মিত আসতে হবে—টুকিটাকি যেটুকু দরকার করে দিতে হবে। বুলুদা না থাকলে আমি এখানে আসতাম না। একটা আশ্চর্য মানুষ। ছোটবেলা থেকে এমন অভিনয়ের শখ, এত কাজের মধ্যে আজও বিন্দুমাত্র কমেনি। বড়লোকের ছেলে হলে হয়তো চাকরী বাকরী ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারের পর্দা ধরেই জীবন কাটিয়ে দিতেন। বুলুদার অভিনয় আমি দেখেছি। কলেজে যখন পড়তেন তখন খালি ইংরেজী নাটক।

অপর্ণা বলে, কেন, বেশ ধনী লোক বলেই তো মনে হলো। চাকরীও করেন ভাল। এমন পাড়ায় বাড়ি।

—বাইরে থেকে এমন মনে হয়। আসলে বুলুদার খবর আমি সব জানি। সম্পর্কে আমার দিদির দেওর কিনা। চাকরী ভাল করেন তাই কোম্পানী থেকে গাড়ি-বাড়ি সব দিয়েছে। ঘরের ফার্ণিচার থেকে সুরু করে পর্দাগুলোও অফিসওয়ালার। বিরাট সংসার টানতে হয়। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। এমন একটা সহ্য...। লোকটার অসম্ভব স্যাক্রিফাইস্।

—সাংসারিক জীবনে কর্তব্যবোধ। এ আর এমন বড় কথা কি? একে স্যাক্রিফাইস্ বলছো কেন?

—সবটা বুঝিয়ে বলা যায় না দুদিন ভাল করে মিশে দেখো। আর্টিস্ট হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে। কোলকাতার এলিট সোসাইটি হাত বাড়ালেই পেতে পারেন কিন্তু মানসিক সংগঠনটা এমন অদ্ভুত কিছুতেই ওসব বরদাস্ত করতে পারেন না। সত্যিকথা বলতে কি, চার বছর বিলেত ঘুরে আসা মানুষ ইউরোপের ওপর এত রাগ নিয়ে ফিরতে পারে আমি আগে কখনো দেখিনি।

—ভদ্রলোকের একজন উৎকট অ্যাডমায়ারার বলে তোমাকে আমার মনে হচ্ছে। কোলকাতার এলিট সোসাইটি কি অপরাধ করল! ইউ-রোপের উপর এত রাগ করবার কি আছে?

...একটা ম্যানিয়া। এমন একদিন ছিল যখন গ্রাম থেকে কোলকাতায় কলেজে পড়তে এসে লোকে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে ঝুঁকতো। গলাবন্ধ কোট পরে সমাজে যেত। টেরোরিজমের উৎসাহ পেত গীতাতে। কেউ কেউ সাহেবদের নিখুঁত নকল করে চূড়ান্ত আনন্দ পেত। আজ তার রকমফের হয়েছে। এখন ধর্ম নিয়ে চুলোচুলি নেই। টেরোরিজমও অচল। সোস্যালিজমের দিকে ঝুঁকছে। ন্যাশানালিজমের বিগ্রহ বসিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ ডিনার টেবিলে কলাপাতা চালু করবার ফ্যাশান চালু করেছে। অনেক দেখলাম কিন্তু সুস্থ, নরম্যাল আর সহজে বোঝা যায় এমন মানুষের দেখা আজ পাওয়া দুষ্কর।

কথার মাঝখানে অপর্ণার হঠাৎ খেয়াল হল সে হয়তো অপ্রীতিকর কিছু বলেছে। তাই সহজ এক পাতলা হাসি টেনে বলে, আমি অবান্তর কথা বলছি। তবে তোমার সংগে অনেক দিনের পরিচয়। তুমিই আমাকে এখানে এনেছো। সপ্তাহে চারদিন এখানে আসা আমার কিন্তু অসুবিধে হবে।

হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিল মনোরমা, হিমানীশবাবু এ রকম বলেন। আর মানুষের কাজ নেই। আমার পক্ষে তিন দিনের বেশি আসা অসম্ভব।

অনেকটা পথ গল্পে গল্পে আসা গেল। দুজনে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। অপর্ণা নিল বাস। ট্রামে উঠে গেল মনোরমা।

খাওয়াদাওয়া মিটতে বেশ রাতই হল সেদিন। অন্ধকারের সংগে সংগে নানা চিন্তা ভিড় করে এল। ভাল ঘুমই হল না রাত্রে। শুধু স্বপ্ন। কিছুমাত্র যোগসূত্র না রেখে বিচ্ছিন্ন কতগুলো টুকরো টুকরো দৃশ্য। নতুন অফিস, অলকা বোস, নাটকের নির্দেশনা। অনেকটা সময় জুড়ে রইল মালিনী। খদ্দরের পাঞ্জাবী আর পাজামা পরা অরুণ মুখার্জী। সৌজন্যের পাতলা হাসি আর বিনীত একটু নমস্কার।

॥ তিন ॥

নিজের পছন্দমত মানুষ তার ভবিষ্যত জীবন গড়তে চায়। যে ইচ্ছে নিয়ে তরুণ যুবক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যায় সেই মন নিয়ে অপরজন ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজমের ক্লাশ করে। আইনের কেতাবের বিপুল সংগ্রহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এ্যাটর্নী পিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ল কলেজ সম্পর্কে অফুরন্ত বিতৃষ্ণা ও সেই সংগে ডাক্তারিবিদ্যা অধ্যয়নের প্রলোভন নিয়ে অবাধ্য পুত্রের বচসা পছন্দের হয়তো নয় কিন্তু অনিন্দনীয় নিশ্চয়ই নয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ সন্তান মনে করবার যথেষ্ট কারণ থাকে না।

অরুণের সঙ্গে পিতার লাগল অন্য জায়গায়। পিতা ধরণী মুখার্জী পুত্রকে ঠিক শাসন করবার সুযোগ পান নি। পড়াশোনায় ভাল, রোগভোগও কম। স্কুলে ছিল ফ্রী। ছাত্র পড়িয়ে অরুণ কলেজের খরচ চালাতো।

বেশ চলছিল এমন সময় সব কিছু প্রায় ছেড়েছুড়ে দিয়ে অরুণ অভিনয় আর নাটক নিয়ে পড়ল। অদৃশ্য রসাতল অরুণের ভবিষ্যৎ এভাবে যখন গ্রাস করছে, ধরণী অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়লেন। এমন সময় একদিন পান খেতে খেতে হাজির হল প্রমথ।

প্রমথ অরুণের মাতুল। আর্ট কলেজের কর্মচারী। নিতান্ত সামান্য চাকরী কিন্তু চরিত্রে এমন অদৃশ্য এক তৈলাক্ত মসৃণতা ছিল যে কই মাছের মত পিছলে পিছলে এমন জায়গায় গিয়ে হাজির হত দস্তুরমত প্যারী ঘুরে আসা অসামান্য মাস্টার-মশাইদেরও সে জায়গা নাগালের বাইরে ছিল।

প্রমথ বল্লে, অরুণের জন্যে আপনি ভাববেন না জামাইবাবু। সম্পূর্ণ ফ্রী। রং, তুলি আর কাগজ যোগান দেব আমি। অরুণ যেন হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলে।

ধরণী বিস্ময়ের শেষ পর্দায় পৌঁছে যান। বলেন, বিনা পয়সায়! আর্ট কলেজের ট্রেনিং?

অদ্ভুত এক জাতের মানুষ ধরণী মুখার্জী। লেখাপড়া কম। অভিজ্ঞতা আরও কম। আর কাণ্ডজ্ঞান ছিল অদ্ভুত। প্রমথর সমস্ত কথার মধ্যে থেকে একটা লোভনীয় কথাই শুধু খুঁজে পান—বিনা পয়সায়। পাটকল, চটকল বা চামড়ার কারখানাতেও যদি বিনা পয়সার ট্রেনিং হত তাহলেও তিনি এতটা আগ্রহই প্রকাশ করতেন। বিনা পয়সার কোনো কিছুর উপর তাঁর অফুরন্ত আকর্ষণ।

সাধারণত ক্যালেণ্ডারের পিছনে কপর্দকও খরচ করবার দরকার হয় না। হয়তো সেই কারণেই সারা বাড়িভর্তি ক্যালেণ্ডারের সংগ্রহ ছিল বিপুল এবং প্রতিটিই ধরণীর অত্যাবশ্যকীয়। সিনেমা-থিয়েটার দেখতেন না কিন্তু পাশ পেলে আর রক্ষে নেই। গভীর রাত্রে দ্রুত ধাবমান গাড়িতে কালো কোটপরা টর্চ হাতে নেওয়া অদ্ভুত নিশাচরের আকস্মিক আবির্ভাবের কথা মনে করে রেলের লোভনীয় দূরপাল্লার পাশ কিন্তু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেরৎ দিয়েছেন। বলেছেন, নামধাম গোপন করতে হবে এমন কাজ করব আমি? ধর্ম আছে, বিবেক আছে।

ধর্মের কথা বলা শক্ত কিন্তু বিবেক নিশ্চয়ই হেসেছে।

প্রমথর সবচেয়ে বড় গুণ সে ছিল অবিবাহিত। সামনের অসম্ভব বয়সগুলোকে পুঁজি করে তার কৌমার্যের রতর দিকে অর্থপূর্ণ চক্ষু হেসে যারা মন্তব্য করেছিল, দেখা যাবে; দেখা যাবে! ওরকম সবাই বলে —প্রমথ তাদের নির্বিঘ্নে হারিয়ে দিয়েছে।

মোটামুটি আত্মীয়-স্বজন সবাই স্বীকার করে নিল, প্রমথ অসাধারণ। চেহারা ও আকৃতিগত ঘোরতর অসামঞ্জস্য থাকায় প্রমথকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা দিতে নৈতিক সমর্থন হয়তো পাওয়া গেল না কিন্তু মাছ, মাংস ও ডিমে আর সিগারেট বিড়িতে আশ্চর্যরকম নিরাসক্ত দেখে ধরণী একবাক্যে স্বীকার করে নিল, প্রমথ একজন ত্যাগী পুরুষ।

প্রমথ পান খেতো। সেই সঙ্গে দোক্তা আর বড় এলাচ। ঈষৎ বক্র কৃশকায় দেহ। ডিম্বাকৃত উষর মাথাটিতে তামাটে মসৃণতা। মুখগহ্বরের দুর্গম অঞ্চলের চর্বিত পান জিবের আগায় সংগ্রহ করে আনার জন্যে ঠোঁটদোতে বিক্ষেপ তুলে যে মুখব্যাদান করত সে দৃশ্য অবশ্য খুব নয়নাভিরাম নয়।

অরুণ কিছুটা অবাক হয়। ফস করে মুখের উপর বলে দিলে, আর্ট স্কুলে পড়ে কি হবে? আমার মত ড্রয়িং অনেকেই করতে পারে।

জবাব প্রমথ দিল না। গামছা পরে দাঁতন করছিল ধরণী। তাই দাঁত খিঁচিয়ে ওঠা অনেক বেশি প্রকট হল। —যাত্রা-থিয়েটার করে পেট ভরবে? তোদের কথাবার্তা শুনে আক্কেল আমার কেমন গুড়ুম হয়ে যায়।

খেতে বসে প্রমথ বল্লে, আমার কথামত চল। জীবনে উন্নতি করবি। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট কখনো পড়ে থাকে?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অরুণ আর্ট স্কুলে ভর্তি হল। ইচ্ছে ছিল না তাই সময় লাগল। প্রচুর অভ্যাসে তুলি সত্যিই ধরতে শিখল।

সামান্য পরিচিত পৃথিবীর বাইরে এসে অরুণ আবিষ্কার করল সে অনেকের চেয়ে কিছু বেশি জানে। অনেকের কাছে হয়তো আত্মপ্রসাদের কিন্তু অরুণকে তাতে শুধু অশান্ত করে তুলেছে।

নাটক আর অভিনয় কিন্তু চলছিলই। একদিন বেশ রাত করে ফিরে অরুণ কলতলায় গেল। বিসর্জনের রঘুবীরের রঙ তুলছিল মুখ থেকে। ঘরে ঢুকে অরুণ বুঝল ধরণী তখনো জেগে আছেন। শব্দ করে পাখার হাওয়া খেতে খেতে যেন জানান দিচ্ছেন অরুণের সব কিছুই তিনি লক্ষ্য করছেন। হারপোকার উপর রাগ করে আলো জ্বালালেন। তারপর অরুণকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, আমি আর ক'দিন! সংসার তোমার কাছে অনেক আশা করে। তোমার ভবিষ্যৎ আছে।

অরুণ সংসারের কথা তখনো ভাল করে ভাবতে শেখেনি তবে এটুকু বুঝল, তার বাবা তার কাছে অনেক বেশি আশা করেন। গলাটা গম্ভীর। বিসর্জনের ঘোর তখনো কাটেনি। বলে, আমার ভবিষ্যৎ আমি বেছে নিয়েছি। তোমরা সবাই বলছ তাই আর্ট স্কুলে যাচ্ছি। আমার দ্বারা ওসব হবে না। মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে সিনেমার দেওয়াল আঁকব না। বিজ্ঞাপনের ছবি আর সাইনবোর্ড এঁকে রোজগার আমি করতে পারব না।

—ভবিষ্যৎ বেছে নিয়েছ? কি করবে তুমি?

—অভিনয় করবো, আমি অভিনেতা হবো।

অরুণ আশঙ্কা করেছিল ধরণী একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। কিন্তু ধরণী আশ্চর্যরকম মৌনতা অবলম্বন করলে। আলো নেভালে। শুয়ে পড়লে।

ধরণী জবাব দিলো পরদিন। ব্যাঙ্কের চাকরী। বেশ সুস্থ শরীরেই অফিসে এলো। লোকের চেক নিচ্ছে, পেতলের চাকতি ছুঁড়ে দিচ্ছে। হঠাৎ ধুকটা কেমন করে উঠলো লম্বা ঠ্যাংওয়ালা চেয়ার থেকে নামতে গিয়ে টলে গেলেন। ডাক্তার এল। চামড়ার ব্যাগে হাত পড়ল না।

চূড়ান্ত এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করে নীরবে ধরণী যেন অরুণের ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়ে গেলেন। অন্য দশজনের মত ভাগ্য দেওয়া ভবিতব্যের দীর্ঘ লাইনের পেছনে অরুণ এসে দাঁড়াল। মাতুল প্রমথর দান অনেকখানি। বললেন, সুরুতেই একশ-একটা খেলাখেলি কথা নয়। পরে একটা দোকান করে দেব। দাঁত কামড়ে লাইনে পড়ে থাক। দেখবে উন্নতি হবে। এমন কি পাঁচশ টাকাও রোজগার করতে পারো।

অরুণকে মানিয়ে নিতে হয়। তবে অনেকের চেয়ে সে যে কিছু বেশি জানে যখন সেটা অনুভব করেছে তখনই ব্যর্থতা তাকে আরো বেশি পীড়ন করেছে।

বাঁধা চাকরী ছাড়াও বাইরের টুকরো-টাকরা কাজ অরুণকে নিতে হয়। বড় ভাই কেষ্টনগরের মাস্টার। অর্ধেক সংসার সে ভাগ করে নিল। কাজ নিয়ে অরুণ প্রায়ই বাইরে যেত। কাজের খাতিরেই সেবার তার ধানবাদে ক'দিনের জন্য আসা।

ভরা চৈত্র মাস। সারাদিনের কাজ সেরে পরিশ্রান্ত অরুণ পথে নেমেছিল। আকাশে তারা নেই। চাঁদ নেই। গাছের পাতাগুলোও নড়ছে না। অন্ধকার থমথমে আকাশ।

উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে চলতে লোকালয় ছেড়ে অনেকটা পথ এসে পড়েছিল অরুণ। অন্ধকার নির্জন পথে দ্রুত ধাবমান গাড়িগুলো দেখতে বেশ লাগছিলো।

কতটা পথ এসেছিল ঠিক খেয়াল নেই। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। অন্ধকারে নজরে আসে সামান্যই কিন্তু নিজের কান এতটা ভুল করবে? জনশূন্য জি টি রোডে এত রাত্রে বেহালার আওয়াজ আসছে

কোথায় থেকে? দুরে না, যেন অতি কাছেটা।

অরুণের কৌতূহল বিস্ময়ে গিয়ে পৌঁছোয়। বয়সেও নবীন। কেমন যেন অবাধ হ'য়ে ওঠে পা। এ জায়গায় মাটির নিচে শুধু কয়লা। হয়তো এ সুর নয়, কান্না। খাদের তলায় চাপাপড়া কোনো মরা মানুষের কান্না। পাতালপুরীর কঠিন আবেষ্টন ভেদ করে অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

চোখ দিয়ে বুঝতে গিয়ে অরুণ যুক্তি খুঁজে পায় না। এ সংগীতের যেন এক আকর্ষণ আছে। অরুণ এগিয়ে গেল।

বিরাট এক যন্ত্রদানব। কালো এক জন্তু। প্রকাণ্ড সেগুন গাছের গায়ে হেলান দিয়ে একরকম উল্টে আছে। জীবনের কোনো চিহ্ন নেই। সব স্থির। নিশ্চল। শুধু রেডিওটা বন্ধ হয়নি তখনো।

স্টীয়ারিং হুইলের মধ্যে একাকার হয়ে আছে একটা মানুষ। পেছনের সীটে আর একটা দেহ। হাতের স্পর্শে অরুণ অনুভব করে দলাপাকানো নরম একটা দেহ। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতালের দোরগোড়া পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছেছিল অরুণ সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে না। ডাক্তার অরুণকে বলেন, আপনি না থাকলে ভদ্রমহিলা বাঁচতেন না। সর্দারজীর ট্রাকে চাপিয়ে কাঁধে করে নিয়ে এসেছেন। আপনি একটা অসম্ভব। আপনার সাহসও অসাধারণ।

পুলিশ অফিসার বলেন, ওয়্যারলেসে লালবাজারে খবর পাঠানো হয়েছে। ভদ্রমহিলা সম্ভবত এক ডাব্লু-ইউ-সি নিকলসনের স্ত্রী। গাড়ি থেকে সামান্য এটুকু সংবাদই আমরা উদ্ধার করেছি। নেপালীটা দুর্ঘটনার সংগে সংগেই মারা গেছে।

বিস্তৃত বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই। আদ্যোপান্ত ঘটনার বিশ্লেষণ এখানে আমাদের অবান্তর।

মাস দুই পরের কথা। নিকলসন সাহেব একদিন ডেকে পাঠালেন অরুণকে। মিসেস নিকলসন জড়িয়ে ধরলেন না, সস্নেহে করমর্দন করে বললেন, হোয়াট এ লাভলি বয়।

নিকলসন প্রশ্ন করলেন, কি করো? কি হতে চাও?

এ দুদণ্ড ভাবতে সময় পেয়েছিল অরুণ। কয়েক মুহূর্ত ভেবেওছিল। কিন্তু আশ্চর্য! অভিনয়ের কথা মনে হয়নি। অভিনেতা হিসেবে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার কথা একবারও মুহূর্তের জন্য মনে হল না।

মাথা নত। লাজুক অরুণ অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, আমি ছবি আঁকি। আমি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট

নিকলসন বলেন, ফ্যাটস্ ফাইন।

মিসেস নিকলসন অরুণের ছবি না দেখেই মন্তব্য করলেন, ট্যালেণ্ট। গিফটেড বয়।

অল্পক্ষণ পর নিকলসনের কথায় অরুণ হতবাক হয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমি আপনার কাছে কিছু আশা করি না। আকস্মিক দুর্ঘটনার রাতে আমিও দৈবাৎ সেখানে ছিলাম। মানুষের কাছে মানুষ এটুকু আশা করেই। আমি মহৎ কিছু করিনি। আমি সামান্য লোক। আপনারা আমাকে মনে রাখবেন তাতেই আমি খুশি হব।

নিকলসন শুধু ইচ্ছে নয়, অভিলাষই নয় শুধু। অরুণের কোনো কথাই তিনি শুনতে চাননি।

প্রথমে লণ্ডনের আর্ট কলেজ। তারপর ইউরোপের নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে প্যারী। যাবতীয় খরচা জুগিয়েছেন নিকলসন। বিদেশী চিত্ররীতি প্রভাবিত হলেও অরুণের ছবিতে আজ একটা আশ্চর্য সুনিপুণ স্বকীয়তা স্বতঃস্ফূর্ত।

রেখা আর রঙ, পারস্পেকটিভ আর কম্পোজিশন, আলো আর ছায়া ওর ছবিতে সুন্দর সামঞ্জস্যে বিধৃত। উচুঁদরের পোর্ট্রেট পেণ্টার হওয়া সত্ত্বেও পোস্টার, হেডিং, প্রেস লে আউট, ক্যালেণ্ডার, শো কার্ড তৈরীতে অরুণের সমান দক্ষতা।

একটি বৃটিশ প্রচার সংস্থায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে প্রথমে সে নিযুক্ত হয়। সেই কাজ নিয়েই দেশে ফিরে আসে। আর্ট ডিরেক্টারের কাজ নিয়ে প্রথমে কাজ সুরু। আজ সেই কুক ব্রাদার্সের আঞ্চলিক সর্বেসর্বা।

আজকাল শুধু কাজ দেখতে হয়। ছবি আঁকতে হয় কম। আঁকিয়ে আর লিখিয়েদের নির্দেশনা দিতে হয়। নতুন ধরণের বিজ্ঞাপন পরিবেশনার ইলাস্ট্রেশান আর লে আউট সম্পর্কে ভাবতে হয়।

সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে নিয়ে অরুণ কিন্তু বুক ফুলিয়ে আসতে পারেনি। ঘরে ফিরল একটু অপরাধীর মত। মনে হল সে যেন ঠকিয়েছে।

বাবার কথা মনে পড়ে। এলুমিনিয়ামের বেড়ার অপর প্রান্তে প্রতীক্ষারত গুটিকতক চেনা মুখ দেখে অরুণ অসম্ভব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। মায়ের অনতিব্যক্ত কাঁপা ঠোঁটের অদ্ভুত হাসিটুকু অরুণকে কেমন বিভ্রান্ত করে দেয়। মোনালিসার হাসিটুকুর অর্থ একমাত্র দা ভিঞ্চি জানেন কিন্তু মায়ের এই সামান্য হাসির যেন ব্যাখ্যা নেই। অরুণের তুলিতে এমন হাসি যেন কোনো কালেই ধরা পড়েনি। এ হাসিতে সুখ নেই, দুঃখ নেই, কান্নারও তিলমাত্র আভাস ছিল না। এই সংসারই নাকি তার কাছে অনেক কিছু আশা করে। এয়ার পোর্টের বাইরে এসেও অরুণ কথা বলতে পারেনি। কষ্ট হয়েছে।

খবর পেয়ে প্রথম এলো। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল।

—আমি বলিনি, বলিনি। অরুণ বংশের মুখ রাখবে।

কিন্তু জোর গেছে। গলা আর পূর্বের সুরে বাজল না। সে শক্তি নিঃস্ব হয়েছে এতাদনে। কৌমার্যের শেষ বেণ্চ থেকে টালিগঞ্জের এক চারুবালা প্রমথকে থাবা দিয়ে নিয়ে গেছে। আরও রোগা হয়েছে। বেঁকে গেছে আরও বেশি। প্রমথর কথা শুনে মনে হয় ভুল করারও আনন্দ আছে। পান খাওয়াটা কমেনি। হয়তো রসগর্ন্ধবিড়ম্বিত জীবনে প্রমথর একমাত্র রসিকতা।

প্রমথ এতটা মুখ রাখা কিন্তু সত্যি চায়নি। অরুণের পিঠে প্রায় পোঁছে যাওয়া হাতের কিল বাঁ হাতের মুঠিতে ক্ষিপ্রতার সংগে ধরে ফেলে মেঝের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে যথেষ্ট গাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রশ্ন করে,—রডন স্ট্রীটের ফ্ল্যাট যখন পাচ্ছো তাহলে এ বাসা তুলে দেবে ঠিক করলে?

—হ্যাঁ, সেই রকমই ঠিক করেছি।

নিজের পছন্দমত গোটা পরিবারটা অরুণ আজ সাজিয়েছে। বড় ভাই শুধু কেষ্টনগরের স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছেন। ভাইগুলো মানুষ হয়েছে। অভাব অনটনের হাতে পড়ে চরিত্র ভাংগে, সংসারে যে ফাটল ধরে অরুণ সেই অনিবার্য সম্ভাবনা থেকে গোটা পরিবারটাকে বাঁচিয়েছে।

অরুণের খুশি হওয়া উচিত। নিজের কর্তব্যে তার ত্রুটি নেই। সংসার তার কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করে বলে মনে হয় না। তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। চোখে ধরা পড়ার নয়, অনুভবের।

যারা বুঝতে চায় তারা জানে অরুণের প্রচ্ছন্ন একটা অভিমান আছে। পটে আঁকা ছবিতে রঙ-তুলির ব্যবহারে সে সিদ্ধহস্ত কিন্তু সত্যিকারের রক্তমাংসের জীবনকে সে আরো সুন্দর রূপ দিতে পারত সে ধারণা আজো তার কিছুমাত্র ম্লান হয়নি।

নাটকের প্রতি আকর্ষণ আজও অটুট। মনে মনে বিশ্বাস করে অভিনয় আর নাটকের মাধ্যমে সে আরও সফলতা অর্জন করত। বর্ণহীন রঙের ব্যবহারে অদৃশ্য কোন তুলির আঁচড়ে আরও বেশি সত্যি কথা, অনেক বেশি মনের কথা বলতে পারত। সুন্দরকে অনেক করে প্রকাশ করে দিতোই।

॥ চার ॥

রবিবার। ছুটির দিন।

দুপুরে একাই ছিল অপর্ণা। বিভূতিভূষণকে চার পাতার এক দীর্ঘপত্র লিখেও

যথেষ্ট সময় হাতে রইল।। অপর্ণার একবার মনে হয় দেশের সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কোলকাতা চলে আসবার নির্দেশ দিয়ে খবর জোরালো চিঠি লিখে দেবে মাস্টারমশাইকে। পর-মুহূর্তেই সে ইচ্ছে নাকচ করে দিতে হয়। কিছুমাত্র সুরাহা নেই। নিজে অসুবিধেতে পড়বে। তাদের অশান্তিরও শেষ থাকবে না।

বিভূতিভূষণ এক অদ্ভুত জগতের মানুষ।। শুধু দেশবিভাগ নয়, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অন্তর্নাটকার মর্মান্তিক ঘটনের শিকার সে প্রথম থেকেই। অপর্ণার অবশ্য সেসব কিছু মনে থাকবার কথা নয়। আবছা আবছা দৃশ্য আর বহুবার বহু মানুষের কাছে শোনা কথা থেকে বিভূতিভূষণের নাটকীয় জীবনের যে হাদশ মেলে অপর্ণারই যেন কেমন অসম্ভব মনে হয়।

বিভূতিভূষণ আর রেবতীভূষণ দুই ভাই। [illegible] শশিভূষণ যখন দেহত্যাগ করেন খুল্লতাত মণিভূষণ তখন নাবালক।

জমিদারিতেই অবস্থা অনেক পড়ে এসেছিল তবু শশিভূষণ যা রেখে গিয়েছিলেন তাতে আরো কয়েকটি পরিবার ও কয়েকজন ভৃত্যের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব ছিল।

শৈশবে, কৈশোরে বিভূতিভূষণকে নিয়মিত ভুগতে হয়েছে। গৃহশিক্ষকের যাতায়াত ছিল ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ডাক্তারবদ্যির আনাগোনা। ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্রের চৈত্র পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সহস্র যোজন দূরে থেকেছে। নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা বিভূতিভূষণের হয়নি।

হয়তো সেই কারণেই রেবতীভূষণ সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। রেবতী বিজ্ঞাপনের ছাত্র। তার কথাবার্তায় দৃশ্যলোকের স্থূল বস্তুর চেয়ে অদৃশ্য লোকের রাসায়নিক নানান কিছুর যে হাঁটাচলা থাকত তার কর্পদকও না বোঝবার আনন্দ নিয়ে বিভূতিভূষণ বেশ সুখেই ছিল।

রাসায়নিক কাণ্ডজ্ঞান হয়তো ছিল না কিন্তু রেবতীর অন্তরের ক্ষেত্রফল জরীপ করতে বিভূতিভূষণের গাণিতিক পারদর্শিতা কিন্তু যথেষ্ট ছিল। তাতে অন্তরবলনের প্রয়োজন হয় না। সমাবলনে নৈপুণ্যের প্রয়োজন থাকে না।

খুল্লতাত মণিভূষণকে সব সময়েই চোখে চোখে রাখতো বিভূতিভূষণ। রেবতী কেন যে এই সুন্দর কিশোরটিকে অযথা নির্যাতন করে বিভূতিভূষণের সহজ সরল মন তার সঠিক কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেত না। নিজে কিছুটা ঢিলেঢালা আলগা চরিত্রের মানুষ। কিন্তু মণিভূষণের প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি।

মণিভূষণ অন্যায় করলেও বিভূতিভূষণের ভাল লাগত। বিভূতিভূষণ দেখল মণিভূষণ দেরাজের ওপর থেকে ঘড়িটা নামালো, দম দিতে সুরু করল, চাব দিতে দিতে ঘড়িটা নষ্ট করল। তারপর হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই যথাস্থানে ঘড়িটা রেখে 'কিছুই করিনি, কিছুই করিনি' ভাব দেখিয়ে হাত পা দুলিয়ে সামনে পেছনে বেঁকেচুরে ঘাড় ফিরিয়ে নির্লিপ্ত পদক্ষেপে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, হেসে কুটি কুটি হয়েছে বিভূতিভূষণ।

কিন্তু রেবতীর সহ্য অপরিসীম। সামান্য একটা ঘড়ি নষ্ট করলে রেবতী হয়তো সহ্য করতে পারত কিন্তু ক্ষুদ্র সামান্য এই মণিভূষণ তার আরো ক্ষুদ্র মুঠিতে এই বিশাল সম্পত্তির যে আধখানা ভেঙে নিয়েছে আর বাকি অর্ধেকের আধখানা বিভূতিভূষণের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে হবে সে কথা যখন ভেবেছে মনটা তখন বিস্বাদে ভরে গেছে।

রেবতী বরাবরই হিসেবে পাকা। শুধু ধারেকাছের নয়, বহুদূর দেশের বিষয়সম্পত্তির সঠিক খবরাখবর সে কিছু বেশি রাখতো। প্রজারাও তাকে বেশি জানত। রেবতী আরো জানত বিভূতিভূষণ কিছুই জানে না। নিজের ভগ্নাংশ সম্পর্কে সে কিছুমাত্র অবহিত নয়।

ঠিক এই সময় মণিভূষণকে একদিন পাওয়া গেল না। প্রথমে এখানে ওখানে সন্ধান। এদিকে সেদিকে খোঁজ। সারাদিনের পর বেলা যখন পশ্চিমে গেল বিভূতিভূষণের চিন্তা-ভাবনা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পৌঁছোলো। পুলিশকে খবর দেওয়া হল। কিন্তু কোনো ফল হল না।

দিন দুই পরের কথা। মণিভূষণের গলিত শব বাড়ির কিছুটা তফাতে আমবাগানের মত কূপের মধ্যে পাওয়া গেল। রেবতীই আবিষ্কার করে। দোতলার বারান্দায় বিভূতি-ভূষণের পা জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে, দাদা, মণিকাকু নেই।

বিশেষ গণ্ডগোল কিছু হতো না। নিতান্ত দুর্ঘটনা হিসেবে মেনেও নিয়েছিল সবাই। বিভূতিভূষণ কিন্তু বললেন, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। মণি মরা কূপটা চিনত। আমবাগানে সে হামেশাই যেত।

পুলিশ পরদিন রেবতীভূষণকে কি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য নিয়ে গেল। ফিরিয়ে দিল না, একেবারে চালান করে দিল। সঠিক কিছু জানা গেল না, তবে শোনা গেল শুধু সন্দেহ নয়, রেবতীর বিরুদ্ধে গুরুত্ব-পূর্ণ অভিযোগ পুলিশের হাতে আছে।

বিভূতিভূষণের অবস্থা বর্ণনাতীত। রেবতীর বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ তিনি বিশ্বাস করলেন না। শুধু ঘরময় পায়চারি করেন আর বলেন, অসম্ভব! এ অসম্ভব!

হাজতে রেবতীর সঙ্গে দেখা করতে গেলো। নিভৃতে সাক্ষাৎ সম্ভবও হল। বহুক্ষণ ধরে কি কথা হল জানা নেই তবে বিভূতিভূষণ সেই রাত্রে ঘোড়া ছুটিয়ে থানায় আসে আবার। বিনীত অনুরোধ জানায়, মণিকে আমি খুন করেছি। রেবতী নির্দোষ। আমাকে তোমরা গ্রেপ্তার করো।

চতুর দারোগা বিভূতিভূষণকে বুঝতে পারে। মানুষটি অপরিচিত নয়। নম্র, স্বল্পভাষী, অতিবিনয়ী শশিভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতিভূষণকে এ অঞ্চলে সবাই যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। দারোগা বুঝলো, নিজের জীবন দিয়েও বিভূতিভূষণ কনিষ্ঠ রেবতীকে বাঁচাতে চায়। এই সদিচ্ছাকে পুরোপুরির সদ্ব্যবহার করা দরকার।

দারোগার প্রস্তাব অতি উত্তম। কিছুমাত্র ভূমিকা নেই, ভণিতা নেই। সোজাসুজি কথা। বলে, ছোটবাবুকে যে করেই হোক বাঁচাতেই হবে। আমার হাতের প্রায় বাইরে চলে গেছে। সদর পর্যন্ত মুখ বন্ধ করতে হবে। আপনি ভাববেন না, আমি দেখছি।

বিভূতিভূষণ স্যাকরা নয়। তাই হাঁ-করা মানুষের মুখ বন্ধ করতে যখন বড়বড় কয়েক ধামা গহনার পর কাগজপত্তরে হাত পড়ল তখন থমকে দাঁড়াতে হল। কিন্তু থামলে চলবে না। দুদণ্ড ভাববার অবসর তখন ছিল না। সদর পর্যন্ত মানুষের [illegible] পেছনে বিভূতিভূষণ দৌড়ে বেড়াতে [illegible]।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সব অন্য রকম। বিচারে মণিভূষণকে [illegible] হত্যা করার অভিযোগে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল রেবতীর।

বিভূতিভূষণ আপীল করল। কেস এলো কোলকাতা হাইকোর্টে। কিশোরগঞ্জের দারোগা আর সদর বিভূতিভূষণের চেনা ছিল। কিন্তু বিশাল কোলকাতা আর হাইকোর্টের অফুরন্ত মানুষের রোমহর্ষক হাঁ সামাল দেওয়া অসম্ভব। নিশিতে-পাওয়া মানুষের মত অন্ধকার শূন্য গহ্বরে পা ফেলে চলা। থামলে চলবে না।

সত্য মিথ্যা বিচার করবার মানসিক অবস্থাও তার শূন্য হয়েছে এতদিনে।

দীর্ঘ সাত মাস পর রেবতী ছাড়া পেল। সে নির্দোষ। সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

রেবতী বুক ফুলিয়ে এল। বিভূতি-ভূষণের বুক পিঠের মধ্যে ঢুকে গেছে। রেবতীকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে সে অনেক দোষে জড়িয়ে পড়েছে। ঋণ নামক অদ্ভুত একটি দুঃশাসন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। যতই ছাড়াতে যাচ্ছে বাঁধন শক্ত হচ্ছে অনেক বেশি।

রেবতী দেখল সমস্ত কিছু নিঃশেষিত। তার লোভ অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু বিষয় সম্পত্তির চিহ্নমাত্র নেই। বিভূতিভূষণকে প্রণাম করে একদিন বলে, আমি চললাম। আপাতত কোলকাতায় যাবো। মনীশের ওখানে থেকে কাজের চেষ্টা দেখব।

বিভূতিভূষণ কয়েক মাস পর দেশ ছেড়ে দিল। সম্পত্তির বৃহৎ অংশ ক্রয় করেছিলেন যিনি তাঁরই জমিদারীতে এক নায়েবের চাকরী নিয়ে বিক্রমপুরে আসে বিভূতিভূষণ। সঙ্গে স্ত্রী হেমলতা। অপর্ণা তখন নিতান্তই শিশু। একমাথা চুল আর অফুরন্ত হাসি-ভরা ফুটফুটে এতটুকু মেয়ে।

রেবতী আর ফেরেনি। তার সন্ধানও পাওয়া যায় নি দীর্ঘদিন। শোনা যায় তার অবাধ্য ও অশান্ত চরিত্র ভবিষ্যতে সংশোধন হয়েছিল। রবার খেতের সামান্য চাকরী নিয়ে সে মালয়ে যায়। সেখানেই সে পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছে। মাঝে একবার আকস্মিক এক পত্র আসে, বিজয়ার প্রণাম তাতে ভরা ছিল। বৌদিকে নাকি রেবতীর দেখতে ইচ্ছে করে। অপর্ণা কত বড় হয়েছে জানতে ইচ্ছে করে।

অনেক সময় লেগেছে তবু পত্রের জবাব দিয়েছে বিভূতিভূষণ। কিন্তু তার জবাব আর ফিরে আসে নি।

সত্যিই বিচিত্র এই জগৎ। মানুষ আরো বিচিত্র। পৃথিবীর এই সুবিশাল ঘূর্ণমান রঙ্গমঞ্চে আলো আঁধারের মধ্যে তুচ্ছ সব কুশীলব অদৃশ্য এক নাট্যকারের বিচিত্র চরিত্রে রূপ দিয়ে চলেছে।

রেবতীভূষণ অস্পষ্ট নয়, তার গোটা চরিত্রটা স্বচ্ছই মনে হয়। কিন্তু বিভূতিভূষণ অপর্ণার কাছে যেন পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। পরস্পরবিরোধী দুটো সত্তা এই মানুষটিকে নিয়ে ক্রমাগত ভেঙেছে, গড়েছে।

খুল্লতাত নাবালক মণিভূষণের প্রতি বিভূতিভূষণের অফুরন্ত ভালবাসায় তিলমাত্র সন্দেহ নেই। অথচ রেবতীভূষণকে ভয়ঙ্কর অপরাধ থেকে বাঁচানোর জন্য দিনের পর দিন কত যে সাজানো বানানো গল্প, সোনা দিয়ে কেনা হাজারও মিথ্যেকথার আশ্রয় নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু কথার কথা নয়, বিভূতিভূষণ মনে মনে বিশ্বাস করেন তার চূড়ান্ত সর্বনাশের পেছনে দারোগা, উকিল আর কোলকাতার এ্যাটর্নী ব্যারিস্টারদের ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্র ছিল। রেবতীভূষণ যেন শুধু দয়া ও করুণার পাত্র। মণিভূষণের সুন্দর মুখটাও সেখানে মিথ্যে হয়ে গেছে।

সবচেয়ে অপর্ণাকে অবাক করেছে মা হেমলতা। একদিনের জন্যেও তাকে অনুশোচনা করতে দেখে নি। কিভাবে যে রিক্ত হতে হয়েছে, নিঃস্ব হতে হল কেমন করে, একদিনের জন্যও হেমলতা সে প্রসঙ্গ তোলে নি।

বিক্রমপুর ছেড়ে বিভূতিভূষণের আসা অসম্ভব। বিভূতিভূষণকে ছেড়ে হেমলতার কোলকাতা আসা আরও অসম্ভব। অপর্ণা একদিন রসিকতা করে বলেছিল, তুমি যেন কি! দিন পনেরো বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারো না ?

হেমলতা রসিকতায় যোগ দেয় নি। কথাটা গ্রাহ্যেও আনলে না। বলে, খেতে তো পাস না। এ ক'দিন শুধু খা আর শুয়ে থাক। দুপুরের ক্ষীরটুকু ধরা আছে। লক্ষ্মী মা, তরমুজটা এবার কাটি।

পুরোনো দিনের কথা ভাবতে এক এক সময় বেশ লাগে। চিন্তায় বাধা পড়ে। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। পর-মুহূর্তেই ঘরের পর্দা সরিয়ে এসে হাজির হল শশাঙ্ক। অসময়ে শশাঙ্ককে দেখে কেমন অবাক হয় অপর্ণা। কোঁচকানো শাড়ি ঠিক করে খাট থেকে উঠে দাঁড়ায়।

আগের চেয়ে চেহারাটা অনেক বেশি ভরা ভরা হয়েছে শশাঙ্কর। সদ্য পাটভাঙ্গা ধুতি পাঞ্জাবী। কালো ফ্রেমের চশমা। চামড়ার ঝোলানো পোর্ট ফোলিও। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটটা অনেকটা পুড়েছে কিন্তু কিছুমাত্র টোস খায় নি।

অপর্ণা বলে, অসময়ে তুমি কোথা থেকে ?

—আপাতত কলেজ থেকে আসছি। শুনলাম তুমি নাকি চাকরী ছেড়ে দিয়েছ।

—আর একটা ধরেছে তাই আগেরটা ছাড়তে হল।

—তবু ভাল। সাতপাঁচ ভেবে সোজা তোমার এখানেই চলে এলাম।

—ফিরেছ কবে ? তোমার বোন সুমিতা এসেছিল সেদিন। সুমিতার কাছে শুনলাম তুমি বরোদা গেছো।

যেন চমকে ওঠে শশাঙ্ক। বলে, সুমি এখানে আসে নাকি ?

—মাঝে মাঝে আসে। অনুর সঙ্গে পড়ে। তাই সেদিন কি এক নোটস দেওয়া নেওয়া করতে এসেছিলো।

শশাঙ্কর চমকটা অপর্ণার চোখ এড়ায় নি। সুমিতা যে মাঝে মাঝে আসে শশাঙ্কর একথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়। তাই চমকটা ঠিক স্বাভাবিকভাবে নিতে অসুবিধে হয় অপর্ণার।

এখানে সুমিতা হামেশাই যাতায়াত করুক সে প্রসঙ্গে শশাঙ্কের অবশ্য কিছু বলবার ছিল না কিন্তু শশাঙ্কের ভয় অন্য জায়গায়। অসতর্ক কোনো মুহূর্তে শশাঙ্কের প্রসঙ্গ তুলে তার ব্যক্তিগত জীবনের নাড়িভুঁড়ি যদি নিজের অজ্ঞাতেই জানিয়ে দেয় সুমিতা। তার রচনার বই প্রতিটি স্কুলের সিলেবাসে যাতে স্থান পায় তার পেছনে যে পরিমাণ অপকৌশলের আশ্রয় তাকে নিতে হচ্ছে সে সব যদি প্রকাশ করে দেয়। সাংসারিক তুচ্ছ খুঁটিনাটি ধরে যদি নাড়াচাড়া করে। বয়সঙ্কোচের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে গিয়ে মায়ের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির উপর তার যে আশ্চর্যরকম বিশ্বাস জন্মেছে সে সমস্ত যদি সুমিতা প্রকাশ করে দেয়।

সুমিতার আরও জানা আছে। দশ বোতল বীয়ার কবুল করা সত্ত্বেও ট্রেন্সলেটারের কাজটি উপানন্দর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততার জন্যই যে শুধু জোগাড় করা সম্ভব হয় নি সে কাহিনী যদি সুরু করে সুমিতা। একমাত্র সন্ধান উপানন্দ, তবু তার কাল্পনিক ভগিনীর আঁচলের সঙ্গে গিঁট বেঁধে শশাঙ্ক যেভাবে উপানন্দকে বিশেষ বিশেষণে বিভূষিত করে ও বাইরের ঘরে একগাদা স্তাবকের সামনে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে নিজের চরিত্রের ধ্বংসস্তূপের বায়বীয় শেষ চিহ্ন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার আখ্যান যদি ঘটা করে বলে সুমিতা।

আশঙ্কা সেখানেই। ভয় সম্পূর্ণ অমূলক নয় শশাঙ্কের।

বিদ্যে সম্পর্কে কিছু বলবার নেই। বুদ্ধিরও বড় অকুলান নেই। কিন্তু একটা জায়গায় বিচারবুদ্ধি যেন নাগাল পায় না শশাঙ্কের। চতুর মেয়ে সুমিতা। শশাঙ্কর প্রসঙ্গ নিয়ে ওসব আলোচনা করবার জায়গা এটা নয় সে ভাল করে জানে। কিন্তু অপর্ণার আর জানার কিছু নেই। নতুন করে শশাঙ্ককে বোঝবার তিলমাত্র ইচ্ছেও আজ বেঁচে নেই।

এমন একদিন ছিল মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল এই শশাঙ্ক রায়। আসন পেতে রেখেছিল, নীরব আহ্বান জানিয়েছিল। শশাঙ্ক ভয় হয়তো পায় নি কিন্তু আসন দখল করবার সাহসে কুলোয়নি। 'থিয়োডেরা' থেকে অপ্রস্তুত এই মানুষটি চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে পকেটের নিমন্ত্রণপত্রের হিসাব মেলাতে বসেছে। হিসেব যখন মিলেছে সময় তখন পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, আসনে ধুলো জমেছে। থালায় সাজানো সুন্দর ফুল শুকিয়ে গেছে। প্রদীপের শিখাও নিভে চলে গেছে।

অপর্ণাকে চোখ মুছতে দেখে শশাঙ্ক শুধু ভেবেছে, পিলসুজের তেলপোড়া ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী অপর্ণাকে কষ্ট দিয়েছে অন্যায় করে।

সাজানো বানানো কথায় শশাঙ্কর সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল ছিল। কিন্তু স্পষ্ট সোজা কথা বলবার ভাষা তার ঠোঁটে কোনোদিন আসে নি। আউটরাম ঘাটে বসে, ব্যান্ডেলের পুরোনো চার্চের সামনের ঢালু জমিটা গঙ্গায় যেখানে মিশে গেছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সবুজ বিশাল প্রাঙ্গণে ইংরেজী বাংলা কবিতাই শুধু আউড়েছে শশাঙ্ক।

মালীর চোখে ধুলো দিয়ে শিবপুর বাগানের ফুলও ছিঁড়েছিল একদিন। কিছুটা তফাতে ঘাসের ওপর আসতে নামিয়ে রেখেছে,

অপর্ণার খোঁপায় কিন্তু হাত পৌঁছোয় নি। অপর্ণা যখন আশা করেছে চন্দ্রসূর্যের গতিবিধি লক্ষ্য করে পাঁজি খুলে দেখবে শশাঙ্ক ঠিক সেই সময় তাকে 'পূরবী' 'মহুয়া' টেনে নিতে অনেক বেশি আগ্রহশীল হতে দেখা গেল।

শশাঙ্ক রায়কে শুধু কল্পনাবিলাসী ভাবুক মানুষ হিসেবে দেখতে পেলেও অপর্ণার খুব খারাপ লাগত না। হঠাৎ এক-দিন আবিষ্কার করলে রবিঠাকুরের মহুয়াতে শশাঙ্ক মত্ত হয় ঠিকই কিন্তু ক্ষুদ্র কথা, আরো ছোট কথা, সামান্য স্বার্থের টানাটানিতে মহুয়ার রসে সিঞ্চিত কৃষ্ণকায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলওয়ালা আদিবাসীর মত শশাঙ্ক মাতলামো করে, সেদিন শিউরে উঠেছে অপর্ণা।

সমীর দে কিন্তু বিশ্বাস করেনি প্রথমে। হেসে বলেছিল, শশাঙ্ক নিজেকে বড় ভালবাসে। রূঢ়ভাবে আত্মকেন্দ্রিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এত বড় স্বার্থপর সে নয়। এ তোমার অন্যায় অভিযোগ অপর্ণা। এই মন নিয়ে তুমি শশাঙ্কের সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করছো?

এক ডাক্তারখানা থেকে ফোনে কথা বলছিল অপর্ণা। রিসিভার ভিজে উঠেছিল। বিচলিত ভাঙা কণ্ঠ অনেকটা আর্তনাদের মত শোনালো—আমার একথা বলতে খুব ভাল লাগছে না। তুমি অন্য জগতের মানুষ, তুমি বুঝবে না আমার কথা। আমি তছনছ হয়ে যাচ্ছি সমীর। চাকরীটা তোমার চলে যাওয়ার পেছনে শশাঙ্কের গোপন হাত ছিল। প্রমাণও আমার হাতে আছে।

কৌতূহলী মানুষের স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে অপর্ণার শিহরণ যদি সত্যি হয়, রিসিভারের জলটুকু যদি মিথ্যে না হয়, তবে রিক্সায় চাপিয়ে ডাঁই শ্রীরামপুরে এসেছিল কেন? শশাঙ্কর হাতে তার যাবতীয় সঞ্চয়, দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ সমস্তই উজাড় করে দিয়ে অপর্ণা শূন্য হাতে ফিরে এলো কেন?

নিতান্ত দুর্দিনেও মাথা অপর্ণা ঠিকই রেখেছিল। লাভলোকসান খতিয়ে দেখবার সময় ছিল না। তবে শেষ ভুলটুকু অপর্ণা সামলে নিয়েছে।

তার পরিচিত পৃথিবীর কোনো মানুষ অপর্ণাকে ভরসা দেয়নি। সমীর দে শুধু উৎসাহ দিতে জানতো। ইতিহাস কিভাবে খুঁজতে হয় বলে দিত। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পূর্ণবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। বাটরার লাইব্রেরীতে পুরাতন কেতাব ঘাঁটবার যথেষ্ট অধিকার জোগাড় করে দিয়েই সে খালাস। একমাত্র শশাঙ্ক রায় অপর্ণাকে ভরসা দিয়েছে।

তাই সব কিছু অন্য কারো কাছে উজাড় করে দিতে ভরসা পায়নি অপর্ণা। সমীর দে পেছনে তাকাতে চায় না। সে সামনের ইতিহাস রচনা করতে চায়।

অপর্ণা বুঝেছিল একমাত্র শশাঙ্ক তার গবেষণা শেষ করবে। তার অক্লান্ত পরিশ্রম সম্পূর্ণ বৃথা যাবে না। মুর্গীহাটার চিন্তাহরণ দাসের রিমিনি সেন্স হয়তো পৃথিবী বিস্মৃত হবে না। যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত বিনোদবিহারী আর তরলাবালা হয়তো শশাঙ্কর হাতে ঝলমল করে উঠবে।

তার সৃষ্টি ধুলোতে মিশে যাবে না। শশাঙ্কর হাতে পড়ে মর্যাদা পাবে। অপর্ণা জীবনে স্বীকৃতি পাবে না হয়তো কিন্তু তার সৃষ্টি সম্মান পাবে।

অধ্যাপক যশোদাদুলাল রক্ষিতের অধীনে অপর্ণা তার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই অপর্ণা আশা করেছিল শশাঙ্ক অধ্যাপক রক্ষিতের অধীনেই কাজ করবে। কিন্তু শশাঙ্ক অধ্যাপক শাসমলকেই যোগ্য ব্যক্তি মনে করল। শশাঙ্ক অধ্যাপক শাসমলের ছিল অতিপ্রিয় ছাত্র। ডি ফিল গেঁথে তুলতে শশাঙ্কর সময় লেগেছে কম। পরিশ্রম করেছে আরও কম।

পরিচিত সবাই ধরে নিয়েছিল শশাঙ্ক আর অপর্ণা অদৃশ্য এক শক্ত খিলে আবদ্ধ। কঠিন খিলেনে আটকা পড়ে ধারালো কাঁচির দুই ফলার মতো তারা নতুন নতুন ডিজাইনের লোভনীয় মূল্যবান কিছু পরিবেশন করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল শক্ত খিলেন নেহাৎই এক ফাঁস গেরো। মাধ্যাকর্ষণে একটি ফলা মাটির ওপরে আর্তনাদ করে আছড়ে পড়েছে, নরুনের মত অন্যটা যত্রতত্র খোঁচা মেরে চলেছে।

আজও শশাঙ্ক আসে। ভূপতিত ফলার চারপাশে নড়াচড়া করে। শক্ত খিলেন খোঁজে, না ভোঁতা ফলাতে শান দিয়ে যায় সে তত্ত্ব বোঝা মুস্কিল।

অপর্ণা বুঝতে পারে শশাঙ্ক আজ নিশ্চয়ই কিছু প্রয়োজনে এসেছে। একটা কিছু সে ভাবছে অনেকক্ষণ ধরে। কৌতুকের হাসি হেসে বলে, নতুন কিছু করছ না শুধু ইন্টারমিডিয়েটের খাতা দেখছ?

অপর্ণার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে শশাঙ্ক সিগরেটের ধোঁয়া ছাড়লো। একটু মিষ্টি হাসি হাসলো।

—ভরা দুপুরে হঠাৎ কি মনে করে?

—তোমার কাছে আজ একটু প্রয়োজনেই এসেছি অপর্ণা। কিছু সাজেশান নিতে এসেছি।

—অবাক করলে দেখছি। আমার কাছে প্রয়োজনে আস', সাজেশান নিতে আসা, ঠিক বুঝতে পারছি না। খুলেই বলো না।

শশাঙ্ক এবার জুত করে বসতে চেষ্টা করল। বলল, তুমি তো কিছুই করলে না কিন্তু তোমার এই অরিজিন্যাল ওয়ার্কগুলো এভাবে নষ্ট হওয়াও ঠিক নয়। তুমি হয়তো জানো, মাসিকে আর সাপ্তাহিকে ছড়া-পাঁচালীর ওপর বিচ্ছিন্ন টুকরোটাকরা কিছু লিখে-ছিলাম। কলেজ স্ট্রীটের সানি দত্ত গল্প উপন্যাসই ছাপেন, ইদানীং আমার এ লেখাগুলো বই করে বার করতে চান। পূর্ববঙ্গের ছড়া আমি কিছু সংগ্রহ করেছিলাম এককালে। তোমার পুরোনো খাতাপত্তরের মধ্যে কালো একটা মোটা ডায়রী আমার হাতে আসে। দেখলাম তোমার বেশ সুন্দর কালেকশান আছে। কয়েকটা আমি সেখান থেকে নেবো ঠিক করেছি। তোমার আপত্তি নেই তো।

—ঘোরতর আপত্তি আছে। শুধু এক সর্তে সেগুলো দিতে পারি, ভূমিকাতে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবে না।

—কিন্তু সেটা আমার কর্তব্য। অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে অন্য কথা। ভূমিকা লিখে আর কৃতজ্ঞতা কতটুকু জানাতে পারবো। কাজের কথায় আসা যাক। আমি ঠিক করেছি অপর্ণা পাঠকের সুবিধের জন্য প্রতিটি ছড়ার তলায় পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দেব। যেমন কোথাকার ছড়া, কিভাবে এলো— আইডিয়াটা কেমন মনে হয়?

—বেশ তো। মূল্যবান কাজ সন্দেহ নেই। বিশেষ করে দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের এইসব অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করবার নতুন কোনো কেউ চেষ্টা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

শশাঙ্ক উৎসাহ পায়। অপর্ণা আজ বেশ খোলা মনে আছে। বলে, তোমার সংগ্রহের মধ্যে শাশুড়ীর বধূনির্যাতনের রসালো ছড়াগুলো প্রায় সবগুলেই আমি কাজে লাগাবো। শুধু ছড়া নয়, ব্যাখ্যাও তুমি পাশেপাশে লিখে রেখেছো। তোমার খাতায় 'চুল' নামে ছড়াটার বার বার উল্লেখ আছে। কিন্তু ছড়াও নেই ব্যাখ্যা নেই। এখন কিছু মনে পড়ে?

—হাসালে দেখছি। ওসব কি ছাই আজ আর মাথাতে আছে? ঝেঁটিয়ে তোমার বাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছি বহুদিন। ফরিদপুরে মামার বাড়িতে ছড়াটা আমি আবিষ্কার করি। গ্রামের নাম খানখানাপুর। গাঁয়ের ধলা পিসিমার ছড়ার কালেকশান অপূর্ব। কথা তিনি প্রায় ছড়া কেটেই বলতেন। রোগা তামাটে শরীর। তামাকের গুঁড়োর অত্যধিক ব্যবহারে দাঁতে কালো কালো ছোপ। কর্কশ গলা। গাঁয়ের নাম ধলাবুড়ি। একেবারে কাটাওয়ালা শাশুড়ী ছেলের বিয়ে দিলেন। বৌ বরণ করলেন। বৌয়ের রূপও ছিল যথেষ্ট কিন্তু ধলা পিসিমার চোখ পড়ল অন্য জায়গায়। এক হাত ঘোমটা সে চোখ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। চুলোচুলি বাধলেও নতুন বৌয়ের হয়তো সহ্য হতো কিন্তু তার মাথার সামান্য

কপালে চুল নিয়ে অতুল পালকের মত তার মুখ বোধহয় বিকীর্ণ হয়েছিল।

শশাঙ্ক হো হো করে হাসতে থাকে। বলে, তুমি এমন চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারো, অবাক লাগে। খগেনদাদা, ধলা পিসিমা, [illegible] পাড়া। নতুন বৌ আর [illegible] ছড়া-পড়া [illegible] আমি ভিস্যুয়ালাইজ করতে [illegible]। তোমার [illegible] এমন চমৎকার [illegible] পারো। আচ্ছা, ছড়াটা [illegible]?

[illegible] গেল অপর্ণা আবার [illegible] ইচ্ছে নয়, চোখেমুখে এক [illegible] জলজ্বলে ওঠে। আপন মনেই [illegible] হয়। আঁচল চিবোতে থাকে। [illegible], অনেক কথাই ধলা পিসিমার ভুলে [illegible] এত ভোলা মুশকিল। লাগাতে [illegible] পারো, লিখে নাও—

মোমাদা হল চলো গুষ্টি,
বাবলে হয় গোড়া মরীচটি।
[illegible] চল কাশতে লুকায়,
[illegible] দিলে চল এমনি শুকায়।

ছড়া দেওয়া শেষ হল। শশাঙ্ক চা খেলো। ছড়ার প্রসঙ্গ ধরে অপর্ণা অনেক কথা বলে। আজেবাজে কথায় একবার পেয়ে বসলে অপর্ণা যেন থামতে চায় না।

মাঝে কিছুদিন শশাঙ্ককে অসহ্য ঠেকেছিল। দূরত্ব দিয়ে বুঝে বুঝে অপর্ণা এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। দুর্বলচিত্তের অতি সাধারণ শশাঙ্ককে আঘাত করবার ইচ্ছে হয়নি। এখন অপর্ণার মনে ভাব দাঁড়িয়েছে, অনেকেই আসে, শশাঙ্কও আসুক। যতদিন দুর্বলতা ছিল, সংকোচ ছিল। পাঁচজনের থেকে আলাদা করে শশাঙ্ককে যতদিন দেখেছে ততদিন প্রচ্ছন্ন একটা আড়ষ্টতা ছিল। আগে গল্প হত, এখন হয় আড্ডা।

ধীরে ধীরে অপর্ণা যে নিজেকে কতটা সরিয়ে নিয়েছে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

টেবিলের ওপর দাড়ি কামানোর ব্রাশ লক্ষ্য করে শশাঙ্ক প্রশ্ন করে, তোমার বাবা এসেছেন নাকি অপর্ণা ?

—না। কেন বল তো ?

—ব্রাশ দেখছি টেবিলে।

—ব্রাশটা সমীরের। মাস চারেক আগে ভোরবেলা এলো। বোম্বেতে কি এক কনফারেন্সে গিয়েছিল। মড়ার মত চেহারা হয়েছে। বললে সাতদিন ঘুমোয়নি। সারাদিন পর অফিস থেকে ফিরে দেখি মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে ঘুমুচ্ছে। ডেকে তুললাম। চা খেলো। হায়দ্রাবাদী দুখানা শাড়ী থলি থেকে বার করল। অনুযোগও বলেছিল। বেচারা কিছুতেই টাকা নিলে না। ছলছলে চোখ, জ্বর এসেছিল। বেসুরো গলায় মাদ্রাজী লোকসঙ্গীত শুনিয়ে পাগল করে দিল। তারপর বাড়ীর চেহারা দেখে একরকম দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল। অনেকদিন আসে না। কোলকাতায় আছে কিনা কে জানে ?

শশাঙ্কর চোখেমুখে বিস্ময়রেখা ফুটে ওঠে। ধীর সংযতকণ্ঠে বলে, কেন, তুমি খবর পাওনি ? প্রায় মাস দুই হল সমীর যাদবপুরে আছে। একটা ফুসফুসের অনেকটা ধরেছিল। এখন অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ নেই। তুমি এসব কিছুই জানো না ?

দাঁড়িয়ে ছিল অপর্ণা। খাট ধরে বসে পড়ল। কণ্ঠস্বর মুহূর্তে যেন নিঃস্ব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বলে, এতবড় একটা কথা আমি জানতে পারি নি কেন ?

শশাঙ্ক বলে, ভাবছি সময় করে একদিন যাবো। অনেকটা সেরেছে। তবে ভবিষ্যতে তাকে সাবধানে থাকতে হবে।

শশাঙ্ক চলে গেল। অপর্ণা কিন্তু খাটের ওপর বসেই রইল অনেকক্ষণ। পুরোনো দিনের বহু কথা মনের ওপর দিয়ে হুহু করে উড়ে গেল। থেকে থেকে সমীরের মুখটা বার বার আনমনা করে দিল। মনোরমাদের রিহার্সালের কথা ভুলে গেল। মালিনীর কথা একবারও মনে পড়ল না অপর্ণার।

এখানে সেখানে খোঁজ করতে করতে অনেকটা হাঁটা পথ পেরিয়ে সমীরকে খুঁজে পেল অপর্ণা।

লোহার খাট। সমীর কম্বলে পা ঢেকে চুপটি করে বসেছিল। জানালার সামনে আকাশমণির সবুজ বাঁকানো পাতার ওপর লালচে রোদ হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল।

কিছুটা তফাতে চেয়ার রাখা ছিল। টেনে সামনে আনতে দেখে সমীর বলে, তুমি ওখানেই বসো অপর্ণা। আমার কথা বলতে সুবিধে হবে। আমার খোঁজ তুমি পেলে কোথায় ?

—এই রোগটাই বাকি ছিল তবে নির্বিঘ্নে এত তাড়াতাড়ি যে বাঁধিয়ে বসবে ভাবতে পারি নি।

সমীর শুকনো ঠোঁটে সামান্য একটু হাসলো। বলে, তোমাকে একটা চিঠি লিখবো ভাবছিলাম। উপানন্দ তোমার খোঁজে একদিন গিয়েছিল। দেখা পায় নি। তাছাড়া তুমি কাজের মানুষ। এত ব্যস্ত থাকো আর এমন খবরও নয় যে ঘটা করে জানান দেব। কেমন দেখছ ? মোটা হইনি ? সাত পাউন্ড ওজন বেড়েছে। দারুণ খাওয়াচ্ছে।

—অনেক তো হল। এবার নিজের দিকে একটু তাকাও।

—তোমরা সবাই মিলে এমন বাজে বাজে কথা বলো। শরীরটাই আমার রোগা, স্বাস্থ্য আমার চিরকালই ভালো। হঠাৎ যে এমন হবে কে জানতো ? ইদানীং শরীরটা অনেক ভাল যাচ্ছিল না, অল্প অল্প জ্বর হচ্ছিল বিকেলে। উপায় শালার কাছে হামেশাই যেতাম। মাসিক চাঁদা ভদ্রলোক হাসতে হাসতে দিতেন। ইদানীং জ্বর হচ্ছে, শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না শুনে কাগজে খস খস করে খানিকটা লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, হয়তো এমন কিছু নয়। তবে একবার চেকআপ করলে দোষ কি। ডাঃ পত্রনবীশকে লিখে দিলাম, সন্ধ্যের আগে ফোনও করে দেব একটা। এক্সরের টাকা লাগবে না। কাইন্ডলি একবার দেখিয়ে নিন। এক্সরেতে কি পাওয়া গেল বুঝলাম না কিন্তু শালা-ভগ্নীপতি মিলে উপানন্দরা আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো। নজরবন্দী থেকেছি। সশ্রম কারাদণ্ডের অভিজ্ঞতাও কিছু আছে কিন্তু এভাবে আটকে থাকা যায়। এত একা একা লাগছিল, তুমি এসে খুব ভাল করেছ।

—দোষ কারো নয়, ইচ্ছে করে তুমি এসব বানালে।

—ইদানীং হোটেলে খেতে হচ্ছিল। অনিয়মও করেছি কিছু। তুমিও দেখছি উপানন্দর মত ধমকাতে সুরু করলে।

—হোটেলে খাচ্ছিলে ? কেন, তোমার বাড়ি কি হল ?

—সে সব মিটে গেছে বহুদিন। বাবা মারা গেলেন। ভাইদের নেড়া মাথার কাটা দাগগুলোর দোষ নেই। কিন্তু নাড়া খাওয়া শুঁয়োপোকার মত মনের অদৃশ্যে দাগগুলো বিলবিল করে উঠলো। সামান্য সম্পত্তি, বাড়িটাও যথেষ্ট নয়, তবু ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে একটা গৃহযুদ্ধ বেধে গেল। চার ঘরে চারটি হাঁড়ি। সারা বাড়িতে শুধু রান্নাঘর। কিছুদিন রাতে শুধু শুতে যেতাম। ইদানীং সব সম্পর্কই বাড়ির সঙ্গে চুকে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত বাড়িতে যা হয়ে থাকে আর কি।

—মধ্যবিত্তদের ঘাড়ে শুধু দোষ চাপিও না সমীর। দোষ তোমারও। রাজ্যের মানুষকে নিজের করেছো। কিন্তু বাড়ির একটা মানুষকেও তুমি নিজের মত করে গড়তে পারো নি।

—উপানন্দ ঠিক এই অভিযোগ করেছিল।

—উপানন্দবাবু আসেন বুঝি ? অনেক কাল দেখি না। শুনেছি ভয়ানক সাহেব হয়ে গেছেন।

—আজ আসবার কথা। এসেও পড়বে। ইদানীং উপানন্দকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। উপানন্দ অনেক পাল্টে গেছে অপর্ণা। আমার জন্যে যা করেছে তার তুলনা নেই। চিকিৎসার খরচা কোথা থেকে আসছে কিছুই জানতে পারি না। উপানন্দ বলে, চ্যারিটি নামে এক ধনভাণ্ডার তার পেছনে আছে।

চুলের সৌন্দর্য
তেলের অপচয়ে নয়
— যত্নে
চুলের যৌবনে ভাটা পড়লে অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই
কারণ চুল সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেরই একটা প্রচ্ছন্ন ঔদাসীন্য আছে।
কোন রকমে একটু তেল মাথায় দিয়ে চট্ করে স্নানের পাট চোকাবার
দিকেই আগ্রহটা বেশী। এতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চুলের
যত্নের চেয়ে তেলের অপচয়টাই বেশী হয়।
তেল চুলের প্রধান
খাদ্য তাই অন্ততঃ দশ মিনিট
চুলের গোড়াগুলিতে তেল বেশ ভাল
করে মালিশ করা উচিত। সামান্য
একটু যত্নে চুলের সৌন্দর্য যে
কত বর্দ্ধিত হতে পারে তা কিছুদিন
যত্ন নিয়ে জবাকুসুম তেল ব্যবহার
করলেই বুঝতে পারবেন।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
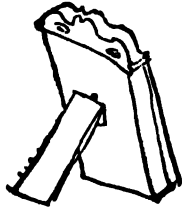
আয়ের দিকটা নজর রাখলেই চলবে, ব্যয়ের দিকটা দেখবার কোনো প্রয়োজনই নাই খরচাওয়ালার। উপা বিয়ে করেছে। গত রবিবার বৌকে নিয়ে এসেছিল। চমৎকার মেয়ে। অনেক কিছু রেঁধে এনেছিল। এমন সুন্দর স্বভাব। উপানন্দ ভাগ্যবান।

কথার মাঝখানে উপানন্দ হন্তদন্তভাবে এলো। অপর্ণা চিনতেই পারে নি প্রথমে। চেহারা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পুরো সাহেব। পরনে মহার্ঘ স্যুট। মানিয়ে পরা টাই। সুন্দর স্বাস্থ্য।

ঘরে ঢুকে অপর্ণাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। হাতজোড় করে বলে, নমস্কার। আপনি কতক্ষণ ! ভাল আছেন ?

শুধু চেহারা নয়, পোষাকেই নয় শুধু, উপানন্দর কথা বলার ঢঙটঙগুলোও কেমন যেন বদলে গেছে। পাশের চেয়ার দখল করে বসল। চেয়ার জুড়ে হাতল ধরে নয়, আলগোছে যেন অল্প একটু বসা।

উপানন্দ আবার সুরু করে, সমীরের কাছে ঠিকানা নিয়ে আপনার বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম। বাড়ি ভুল করেছিলাম কিনা জানি না কিন্তু মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া আমি আজও ভুলতে পারি নি। সেখানেই আছেন তো ? রাস্তাটার কি নাম যেন, কি নাম যেন.........?

উপানন্দ বাড়ি ভুল করে নি। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়াটাও মিথ্যে অভিযোগ নয়। কপাট দিয়েছিল অনু। ধারেকাছে কোথাও ডিনার ছিল সেদিন। হুইস্কির গন্ধ ঠোঁটে নিয়েই অপর্ণার বাড়ির দোতলার সিঁড়ি ভেঙে সমীরের খবর পৌঁছোতে গিয়েছিল। ইয়াঙ্কীদের সঙ্গে অত্যধিক দহরম মহরমের ঠেলায় হাবভাব চালচলন এমন কি ইংরেজী উচ্চারণও তার সংক্রামিত। স্কচ হুইস্কির ঝাঁঝালো উদ্গার ও দুর্মূল্য ফরাসী টোব্যাকোর বায়বীয় আমেজ পরিশোধিত হয়ে উপানন্দের অনতিব্যস্ত ওষ্ঠাধর থেকে আ[illegible] যে শব্দতরঙ্গ ঝরে পড়েছিল সেটা [illegible] লিভস্ হিয়ার'-এর কান ঘেঁষেও গেল না। অনেকটা যেন শুনতে হলো—'পর্ণালিব্‌জার্'।

ছেলেমানুষ অনুরাধা ভয় পেয়েছিল। মানুষটা অপরিচিত। ভাষাও দুর্বোধ্য। তাছাড়া উপানন্দের মহার্ঘ স্যুট থেকে, ঠোঁট থেকে, জঠরস্থ দলিত দ্রাক্ষার সোনালী আরক চতুষ্পার্শ্বে যে গন্ধ বিস্তার করেছিল অনুরাধা সেটাকে ঠিক সৌরভ হিসেবে মেনে নিতে পারে নি। হিন্দীতে বলেছিল,—এ বাড়ি নেহি হ্যায়, দোসরা বাড়ি দেখিয়ে।

তাড়াহুড়া করে মুখের ওপর সশব্দে কপাট দিয়েছে অনুরাধা।

অপর্ণা রাতে বাড়ি ফিরলে খেতে বসে ঘটা করে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেছে। উপানন্দ অনুরাধার ঠোঁটে ঠিক ঠিক কিভাবে চিত্রিত হলো জানা নেই, তবে ব্যাঙ্ক কাউন্টার থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত দিনে দুপুরে কেপমারিরা যে হামেশাই আনাগোনা করছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না কারো।

অপর্ণা মিষ্টি হেসে বলে,—আপনি অনেক বদলে গেছেন।

বুকের ওপর দুহাত গুটিয়ে চোখেমুখে কপট বিস্ময়রেখা ফুটিয়ে উপানন্দ বিস্ময়োক্তি করলো,—মি !

উচ্চারণগুণে শব্দটা ঠিক 'আ' বর্জিত 'আমি' না শুধু ইংরেজী 'মি' ঠিক বোঝা গেল না।

উপানন্দ প্রথমে চেষ্টা করেছে এখন কায়দা-কানুন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছে। লোভনীয় মাস মাইনেতে মার্কিন সংবাদ সর-বরাহ বিভাগে কাজ করে। সেখানে বাংলাই তাকে বেশি লিখতে হয় কিন্তু কথাবার্তা ইংরেজীতে বলেই সে অভ্যস্ত। কণ্ঠস্বরে একটা জড়িমা আছে। বাংলা উচ্চারণে স্বরবর্ণ বার বার পড়ে পড়ে যায়। দুই বাক্যের মাঝামাঝি কথা অনেক সময় অস্পষ্ট। ব্যঞ্জনবর্ণের খাড়াই মাথাগুলো ঠিক ঠিক লক্ষ্য না করলে অনেক আনাড়ির উপানন্দর বাংলা বোঝা মুস্কিল।

পূর্বের কথার জের টেনে অপর্ণা বলে,—প্রথমটা আপনাকে চিনতে পারিনি, দেখাও হয় না দীর্ঘদিন।

উপানন্দ একটু হাসলো। তারপর বলে,—কিন্তু আপনি একটা কি ! বদলানো দোষের নয়, কারণ বয়স বাড়ছে। কিন্তু আপনি দেখছি এখনও সিক্সস্ ইয়ারে পড়ে আছেন। এতটুকুও বদলান নি।

—একেবারে শালগ্রাম শিলা, শোয়া-বসা সমান।

—বিনয় রাখুন! বলুন না, বলুন না, ডিকে এরেস্ট করলেন কি করে? নিয়মিত যোগ-অভ্যাস করছেন না কি?

—অনেকটা ধরেছেন। সকালবেলার 'এক্সপ্রেস' বাস ধরার অভ্যাস আপনার নেই, আমার আছে। সেটা কি যোগ-অভ্যাস নয়!

দুপাশে মাথা নেড়ে উপানন্দ বলে,—ভাল বলেছেন। দস্তুরমত যোগঅভ্যাসই বটে।

একটু থেমে উপানন্দ বলে,—শশাঙ্কের খবর কি ?

প্রশ্ন অপর্ণাকেই করা। আচমকা এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব হলো।

অপর্ণা বলে,—আজ এসেছিলো। সমীরের খবর তার কাছেই জানতে পেলাম।

—শশাঙ্ক নাকি সরকারী একটা ভাল অফার পেয়েছে শুনলাম, সত্যি নাকি?

—আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম। কই আমাকে কিছু তো বললো না।

—চাপা লোক। আমরা যখন হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, বলে হাততালি দিই, ও সেখানে রেফারীর দৃষ্টি নিয়ে পেছনের জাল কাঁপা না দেখে হুইসিল বাজায় না। দেখুন শশাঙ্ক হয়তো আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। মাঝে প্রায়ই অফিসে আসতো। পপুলার আমেরিকান কেতাবের বাংলা তর্জমা আমরা বার করছি। তার একটা কাজের খাতিরে শশাঙ্ক আমাকে বহুবার অনুরোধ করেছে। কিন্তু ওকে আমি কিছুতেই বোধহয় বোঝাতে পারলাম না, ওপরওয়ালার ওপরেও ওপরওয়ালা আছে। শশাঙ্কের হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে অপ্রস্তুতের এক শেষ। দত্তসাহেব শশাঙ্ককে কি সূত্রে দেখলাম চেনেনও। বললেন—শশাঙ্কবাবু বাংলাই লিখতে জানেন না। ভয়ানক বেশি একাডেমিক, ও বিদ্যে নিয়ে ছাত্র ঠেঙানো চলে, লেখা চলে না।

উপানন্দ লক্ষ্য করে শশাঙ্কের প্রসঙ্গ তোলাতে অপর্ণা যেন কেমন কেমন হয়ে গেল। সমীর লাল কম্বলের রোঁয়া বাছতে মনোযোগী হয়ে পড়লো। চতুর লোক। পর-মুহূর্তেই প্রসঙ্গ পাল্টালো,—

—আপনার খবর বলুন। আশা করেছিলাম আপনি সভ্য কিছু করবেন। সমীরের কাছে শুনেছি সমস্ত কিছুই আজকাল ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন। কথাটা শুনে মোটেই ভাল লাগে নি। প্রফেসার রক্ষিতের সঙ্গে দেখা, আপনার কথা তুলে খুব দুঃখ করলেন। বললেন,—অপর্ণা আমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলো না। শশাঙ্ককে কেন যে সব দিয়ে দিল ! আসলে রক্ষিত আপনার জন্যে খুব ফিল করেন।

অপর্ণার ঠোঁটে সামান্য হাসির রেখা ফুটে ওঠে। ধীরকণ্ঠে বলে,—উপানন্দবাবু এসব কথা থাক। আমি নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে আছি। তবে অনুশোচনা আমার নেই। প্রফেসার রক্ষিতের কাছে আমি অপরাধী। তবে এটুকু আমি বলবো, আপনারা কয়েকজন আমার কাছে বড় বেশি আশা করেছিলেন। বিশ্বাস করুন আমার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে মোটামুটি আমি সচেতন। গবেষণা আমি শেষ করতে পারতাম না কোনদিন। শশাঙ্ক যা হোক একটা দাঁড় করালো। যেভাবে শেষ করলো সেটা আমার পছন্দ নয় সত্যি কিন্তু আমার অমর্যাদা সে করেনি। এমনিতেই কাগজপত্তর পড়ে থাকতো সে কাজে লাগালো। ভালই হলো।

কথার বাধা পড়ে। নার্স এসে ঘরে ঢোকে। তাপমানে সমীরের তাপ মেপে গেল। ওষুধও একদাগ খাইয়ে গেল। বেলা ফুরিয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জানলার ওপাশের আকাশমণি গাছটা নজরে আসছে না।

সমীর বললো,—সারাদিন একলা থাকা,

পড়াশোনাও [illegible] করতে পারে না। তুমি কাজের মানুষ, শুধু সময় সুযোগ করে এসো মাঝে মাঝে।

উপানন্দ বলে,—উঠছেন নাকি ? খুব তাড়া আছে নাকি আপনার ?

মনোরমাদের রিহার্সালের কথা মনে পড়ে। ঠোঁটে সামান্য হাসি টেনে বলে,—তাড়া খুব নয়, কাজ একটু ছিল, তবে এখন গিয়েও কোন লাভ নেই। বাড়িতেই ফিরবো সোজা।

সমীরের সংগে উপানন্দ তার প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিল। সামান্য সময়ে সমীর যে আশ্চর্যরকম সেরে উঠেছে তার কাহিনী অপর্ণাকে বিস্তৃত বর্ণনা করে। আরও মাস তিনেক দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা ও গ্রীষ্মের সুরুতে স্বাস্থ্যকর কোন জায়গায় মাস দুই থেকে এলে সমীরকে যে অনেকেই চিনতে পারবে না সে সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না উপানন্দের।

খোয়া বিছানো পথ পেরিয়ে অপর্ণা উপানন্দের সংগে এলো। পূর্বমুখো উপানন্দের গাড়ি অপেক্ষা করছে। মাঝারি গড়নের কালো একটা নতুন গাড়ি।

উপানন্দ সুরু করে,—আমার স্ত্রী রমা আপনাকে দেখলে খুব খুশি হতো। রমা সমীরের খুব একজন বড় ভক্ত। সমীর আপনার সম্পর্কে এমন সব গল্প করেছে, রমা অনেকদিন আমার কাছে আপনার কথা জানতে চেয়েছে।

অপর্ণা একটু হাসলো। তারপর বললো,—আপনার স্ত্রীর সংগে আলাপ করবার আমারও ইচ্ছে রইলো। কিন্তু সমীর আবার আমার কি কথা বললো! এমনিতে তো সাত চড়ে রা কাড়ে না জানি।

নিজের কথা বলতেই উপানন্দ ব্যস্ত হয়ে পড়ে,—রমাকে সমীর এমনভাবে আজকাল কব্জা করে ফেলেছে যে আমার দস্তুরমত ভয় হয়। সমীরের এক মস্ত চেলা। বেশ চাঁদা-টাঁদা তুলছে। খেতে বসে সমীরের মত পলিটিক্যাল চুলোচুলি বাধিয়ে নেয়। বেশি কিছু বলতেও পারি না, হয়তো ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত তুলছি বলে লাল সালুতে শ্লোগান লিখে একটা জেহাদ ঘোষণা করবে। বিয়ে আমাদের পাঁজি পড়ে, পাক খেতে খেতেই হয়েছে, বাপের বাড়ি থেকে আমার বাবার তৈরি পণ-এর লিস্টের বাইরের দুটো জিনিষ রমা ফাউ এনেছে। একটা বাত, অন্যটা সোসিয়ালিজম-এর বাতিক। বাতের জন্যে ডাক্তার আছে, কিন্তু বাতিক ! বরং সমীরের প্রেসক্রিপসন আমার হোম ফ্রন্টে একটা পলিটিক্যাল এনার্জির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমি অবাক হই একটা কথা ভেবে, আপনি তো কম মেশেন নি সমীরের সঙ্গে। হয়তো অনেকের চেয়ে কিছু বেশি মিশেছেন কিন্তু আপনি তো ঠিক আছেন। আমার কিন্তু খুব অবাক লাগে

দায়িত্বহীন সহজ কথা। অপর্ণার বেশ ভালই লাগে উপানন্দকে। সবটা মিলিয়ে লোকটা অনেক সহজ। যথেষ্ট মামানসই।

অনেকটা পথ চুপচাপ আসা গেল। অপর্ণা বলে,—আপনার কথা কিন্তু কিছুই শুনলাম না। আশা তো আমরাও কিছু করতে পারি !

ফিরে তাকায় উপানন্দ। একটু ছোট্ট করে তাকালো। তারপর হেসে বলে,—বলবো না, করে দেখবো ঠিক করেছি। সমীরকে কিছু দেখিয়েছিলাম, ওর মন পাওয়া যায়নি। বললে, আমার বাংলা ভয়ানক বেশি ইংরেজী ঘেঁষা। বিষয়বস্তু মান্ধাতার।

অপর্ণার কণ্ঠস্বরে একটা দুশ্চিন্তা নেমে আসে। চোখ দুটো আস্তে আস্তে তুলে বলে,—ভুল বলেননি! সত্যি সমীরের বিচার-বুদ্ধি আজকাল এমন একটা এক পেষে হয়ে যাচ্ছে। আগে অনেক সহজ ছিল, আজকাল অনেক কথা সমীরের আমি মেনে নিতে পারি না। ওঁর দৃষ্টিকোণ কিছুটা বেয়াড়া মাপের। আগে তর্ক করতাম, আজকাল যেন তারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

স্টিয়ারিং হুইলের ওপর খিল খিল করে হেসে ভেঙে পড়ে উপানন্দ। বলে,—নিশ্চয়ই বলে এস্কেপিস্ট্ !

অপর্ণা হাসিতে ঠিক যোগ দিতে পারে না। উইণ্ডস্ক্রীনের অগোছালো হাওয়ায় কপালের ওপরে এসে পড়া শুকনো চুলগুলো উড়ছিলো। আলগোছে বার বার সেগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলে,—এতটা নয় তবে আমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে কেমন শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন সাংঘাতিক একটা অপরাধ করেছি। বলে—আমি নাকি শুধু পড়ছিই, বুঝিনি কিছুই।

সহজ এক দরাজ হাসিতে ভেঙে পড়ে উপানন্দ। এতটুকুও চেষ্টা করা নয়। সুগঠিত স্বাস্থ্যের প্রাণখোলা হাসি।

অপর্ণার বাড়ির পথটা একমুখো। গাড়ি ঘোরানোর যথেষ্ট জায়গা ছিল তবু অপর্ণা মোড়েই গাড়ি থামাতে বললো।

সামনে ঘোলাটে অপ্রচুর গ্যাসবাতি। রাস্তাটা প্রায় অন্ধকার।

অপর্ণা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

গিয়ারের হাতল মুঠিতে নিয়ে সামনে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে অন্যমনস্কভাবে অপসৃয়মান অপর্ণার দিকে তাকিয়ে থাকে উপানন্দ।

কিছুমাত্র যেন পরিবর্তন হয়নি। এতটুকুও যেন বদলায়নি। তিলমাত্র ভাঙা-চোরা হয়নি অপর্ণার।

এক জাতের ফুল আছে তারা শুধু গাছে ফুটে থাকবার। মালা গাঁথা যায় না—ঝরে যায়। দেবালয়েও সে ফুল নিষিদ্ধ।

॥ পাঁচ ॥

অভিনয় মোটামুটি পছন্দ হলেও মালিনী যেদিন ঠিক ঠিক তার চরিত্র নিয়ে ধরা দিল সেদিন তৃতীয় আর একটি নারী চরিত্র অপর্ণার সমস্ত চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

প্রশ্নটা অসম্ভব সহজ হয়েছে। অকিঞ্চন এই অনিবার্য সত্যটি যে অতি নাটকীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে অপর্ণার ছিল কল্পনাতীত। কাঁটামুখ জাগিয়ে দেওয়ার আচমকা এক বিলেপ নয়, আত্মগ্লানি আর হতাশা কণ্ঠরোধ করে নি। শুধু মনে হলো আলোর ঝলকানি থেকে সে দুরন্ত বেগে হু-হু করা অন্ধকার বাতাসের সাথে ছুটে চলেছে। জানান না দিয়ে দৃশ্যমান জগতের সব কিছুর ওপর অদৃশ্য এক নির্দয় শিল্পী তার কালো রঙ বুলিয়ে চলেছে। ভারী কার্পেটের ওপর পা দুলে ওঠে। সোফার হাতল ধরে বসে পড়ে অপর্ণা।

উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে এসেছে অরুণ। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে একলহমা থমকে দাঁড়িয়ে নিকটে এসে প্রশ্ন করেছে,—অসুস্থ বোধ করছেন ! শরীর খারাপ লাগছে ?

ঘন চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে অপর প্রান্ত থেকে হিমানীশ বলে ওঠে,—সামনের জানালাটা খুলে দাও। মেয়েরা রয়েছেন তোমাদের বোঝা দরকার সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়াতে আমারই কেমন গুমট গুমট লাগছে।

নিজেকে সামলে নিতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে অপর্ণা। শুকনো ঠোঁটে ম্লান হাসির আভাস ফুটে ওঠে। কণ্ঠস্বর যেন নিঃস্ব হয়ে গেল। অরুণের মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে নিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। কয়েক মুহূর্ত পর বলে,—কই আমার কিছু হয় নি তো। আমি ঠিক আছি। এই দৃশ্যটা একদম নতুন কি-না তাই বোধ হয়—!

অপর্ণার কথায় বাধা দিয়ে অরুণ বলে, রিহার্সাল আজকে আপনি নাই-বা দিলেন। শরীর আপনার আজ নিশ্চয়ই ভাল নেই। আজ আপনি দেখুন। মনোরমা আজ আপনার প্রক্সি দেবে।

কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ। সামান্য সময়ের বিরতি। মহলা আবার নতুন করে সুরু হয়। অরুণের অভিনয় নিখুঁত। নাটকের কালীপদ চরিত্র সুন্দর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নাটকের সংলাপ শোনা যায়।

—মালিনী, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওথেলিয়ার সংগে হ্যামলেট-এর এই জায়গাটা আমি ঠিক বাংলা রূপে দিতে পারছি না। অনুবাদ হয় তো হচ্ছে কিন্তু আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না। তোমার পায়ে পড়ি, অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে মালিনী। আলমারীর চাবিটা একটু দাও। অল্প একটু খাব। সারারাত আমি লিখতে পারবো। মালিনী—!

মনোরমা মালিনী চরিত্রে প্রক্সি দিচ্ছিলো। অপর্ণার দিকে এক-নজর তাকিয়ে নিয়ে বলে,—তুমি কথা দিয়েছিলে কালীপদ—।

—মালিনী?

—তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ করেছিলে। মদ এখন তোমার শরীরে বিষের কাজ করবে। তুমি এখনও দুর্বল। শরীর নষ্ট হবে, লেখাও তোমার শেষ হবে না।

সুন্দর নরম সোফা, তবু বসে থাকা সম্ভব হলো না। দরজা পেরিয়ে পোর্টিকোর সামনে এসে দাঁড়ায় অপর্ণা। জনশূন্য রাস্তা। মেঘলা আকাশ। অপ্রচুর আলোতে সামনেটা ঘোলাটে। অরুণ মুখার্জীর মত জটিল, অস্পষ্ট।

এলোমেলো নানা কথা মনে হয়। পুরনো দিনের অসংলগ্ন বহু কথা। অপর্ণার মনে হয় সে যেন হেরে যাচ্ছে। দূরপাল্লার দৌড় শেষ করে এসে দূরে থেকে যদি কেউ দেখতে পায় তার প্রতিযোগী অনেক আগেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গিয়ে একপাত্র জল নিয়ে মিষ্টি হেসে তার অপেক্ষায় আছে, তবে সে দৃশ্য সহ্য হয় ক'জনার?

অপর্ণার হঠাৎ খেয়াল হয় সে পথে নেমে এসেছে। নির্জন রাস্তা পার হয়ে এসেছে অনেকখানি। কখন যে পথে নেমেছে, নিরালা রাস্তা পেরিয়ে এসেছে খেয়ালই করে নি এতক্ষণ।

অপর্ণার মনজুড়ে ছিল একজন। সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করেছিল এক নারী। সে তরলাবালা।

ঘুম হয় নি সে রাত্রে। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেছে। সকালে এক কাপ চায়ের পর চুটিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের সংসার করবার অভ্যস্ত প্রণালী কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এক্সপ্রেস বাস ধরবার কিছুমাত্র প্রয়োজন যেন নেই। ঘড়ির কাঁটা অপর্ণাকে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন করে না।

নানা কাজ ও বহু চিন্তার মধ্যে একই কথা অহরহ অপর্ণার মাথায় ঘুরপাক খেয়ে মরে। একই প্রশ্ন মনে হয়েছে বারবার। অরুণ মুখার্জী নাটকের এই কাহিনী পেলো কোথায়! যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিতা তরলাবালার সন্ধান অরুণ মুখার্জীর হাতে এলো কি ভাবে! বিনোদবিহারী ও তরলাবালা কালীপদ আর মালিনী চরিত্রের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করছে কি ভাবে!

খটকা একটা ছিলই। বেশ কিছুদিন মনে হচ্ছিলো মালিনী যেন চেনা। কালীপদর মধ্যে তার নিতান্ত পরিচিত এক মানুষ যেন আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু গত রাত্রের মহলায় অংকের নতুন দৃশ্যের শুধু কাহিনী নয় নাটকের সংলাপও তার রুলটানা কাগজের অতি পরিচিত নোটস-এর সংগে মিলে গেছে।

শশাঙ্কের ঠোঁটে এ ইতিহাস উদ্ঘাটিত হবে না। তবে কি চিন্তাহরণ দাস নিজেই কালীপদ তরলাবালার কাহিনীর গ্রন্থি দ্বিতীয়বার অরুণ মুখার্জীর কাছে উন্মোচন করেছেন।

মুহূর্তের জন্যেও সে কথাও বিশ্বাস হয় না অপর্ণার।

চিন্তাহরণ দাসের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তাচ্ছিল্যের হাসি টেনে অস্থিচর্মসার অতিবৃদ্ধ বলেছিলেন,—লেখাপড়া আমি শিখিনি। আমার জীবনের কথা তোমার মত মানুষের কি কাজে লাগবে বুঝতে পারি না। তবে এটুকু আমি বুঝেছিলাম বিনোদবাবুর কথা যার তাঁর এই লেখা নিশ্চয়ই কারো প্রয়োজন হবে। অনেক যত্ন করে এতদিন আমি গোপন করে রেখেছি। তোমার কোন ভয় নেই মা, আর কাউকে এসব কথা আমি বলবো না। বিনোদবাবুর কথা ক'জন বুঝবে! তরলাবালাকে আমি ভক্তি করতাম। তার কথা মনে হলে মাথা আমার নত হয়ে আসে। ক'জন মানুষ তার কথা বুঝতে পারে! তরলাবালাকে যিনি বাইজী মনে করবেন তাঁর মত আহাম্মক জগতে আর কে আছে! এতবড় মানুষের জীবন যাকে-তাকে দেব আমি? এ জীবনে নয়।

বেশ রাত করেই এলো মনোরমা। পরপর ক'দিন মহলায় অনুপস্থিত থাকার পেছনে শুধু শারীরিক অসুস্থতা নয়, সেই সংগে অতি প্রয়োজনীয় কিছু সাংসারিক কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপাতে অপর্ণাকে বেশ কিছু মিথ্যেকথা বলতে হলো।

তাতে কিন্তু বড় কাজ হলো না। উঁচু মহল থেকে বেশ কড়া চাপ পড়েছে বলে মনে হলো। তবে যে রকম মরীয়া হয়ে এসেছিল, অপর্ণার ভাবসাব দেখে অনেকটা গুটিয়ে নিল নিজেকে। মনোরমা বলে,—তুমি একদম রেগুলার হতে পারবে না জানলে আমি কখনও তোমাকে বিরক্ত করতাম না। শরীর আমাদেরও আছে, আর সাংসারিক কাজ তুমি একলা কর না। আসলে তোমার যেন কি একটা হয়েছে, আর কাউকে না বলতে পার তোমার মনের কথা আমার জানা দরকার। নতুন করে মালিনী ঠিক করতে বলবো সেটা কি ভাল শোনাবে। আমি নিজে পড়েছি ফ্যাসাদে।

অপর্ণা সহজ করে নিতে চায়। হেসে বলে,—আমার ওপর তুমি অযথা রাগ করছো।

অপর্ণার কথা কানে তোলে না মনোরমা। মাথা নেড়ে বলে,—তোমার অসুবিধে অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। কিছু টাকা বেশি পেলে নাকি তুমি রেগুলার হবে, এ রকম মন্তব্যও আমাকে শুনতে হয়।

—স্বাভাবিক বুদ্ধিতে, এই কথাটাই হাতের কাছে পাওয়া যায়। যিনি বলেছেন তাঁকে আমি দোষ দেব না। রাগ কোরো না ভাই, তোমরা মালিনী একজন দেখো। মেয়ে জোগাড় করা তোমাদের খুব অসম্ভব হবে না। আমাকে তোমরা বাদই দাও মনোরমা।

মনোরমা যেন চমকে উঠলো। অপর্ণা যে এতটা সোজাসুজি কথা বলবে ভাবতে পারে নি। শুধু বলে,—এটা কেমন দেখতে হবে বলতো? এতগুলো মানুষের প্রচেষ্টা। তৈরি নাটক। দুদিন বাদে স্টেজে নামবে। এখন তোমার এসব কি অদ্ভুত অনুরোধ। আশ্চর্য, আমার কাছেও তুমি খোলাখুলি কথা বলতে পার না?

—সেকথা তুমি বুঝবে না মনোরমা। তোমার অবশ্য কোন দোষ নেই। আমাকে একটু ভাবতে দাও। আমার নিজের কাছেই গোটা ব্যাপারটা অপরিষ্কার, তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

অপর্ণার সংগে তর্ক করে লাভ নেই। তবে পরিষ্কার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। মনোরমা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে দু'চার কথা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আরও কিছু তুচ্ছ কথা। ফুটপাতে নেমে মনোরমা ঘাড় ঘুরিয়ে পূর্বের আলোচনার জের টেনে একবার শুধু বলে,—তুমি কিন্তু ভাই ভেবে দেখো।

খোলা চুলের একটি অলস খোঁপা বেঁধে অপর্ণা সামান্য একটু হাসলো।

মেঘলা একটা গুমট ভাব অপর্ণাকে কিন্তু আচ্ছন্ন করে রইলো। অনেক চেষ্টা করেও সেটি কাটিয়ে উঠতে পারে না। অনেক ভেবেছে, তর্ক করেছে মনে মনে। যুক্তি দিয়ে বুঝতে গিয়ে বার বার খেই হারিয়ে যায়।

ইচ্ছে করে হেরে যাবার এক আনন্দ আছে। সে এক ধরণের বিলাস। বিনয়মিশ্রিত সে এক ধরণের দম্ভও। অবচেতন মনে এই দম্ভটুকু অপর্ণার হয়তো মনজুড়ে ছিল গুপ্তধনের মত। রিক্ত মানুষের শেষ সম্বলের মত।

হঠাৎ যেন এলো ঘনঘটা। অরুণ যেন থাবা মেরে সব নিয়ে গেল। ঠিক নিয়ে গেল না, অপর্ণার সযত্নে রাখা ঝুলি প্রকাশ্যে যেন খুলে দিল। প্রকাশ করে দিল, কিছু নেই, কিছু নেই। শুধু শূন্য বোঝা। হাস্যকর ফাঁকা দম্ভের স্তূপ। গোপন করে রাখার কিছুই নেই। প্রকাশ করে দিলেও কিছু যায় আসে না।

শুধু হার নয় অরুণ যেন অপর্ণাকে তার গবেষণা যেখানে শেষ করেছে, সে অধ্যায়ে এসে তরলাবালা আর বিনোদবিহারীকে সে আর খুঁজে পায় নি অরুণ তাঁদের উদ্ধার করেছে। বিস্মৃত ইতিহাসের কবরখানা থেকে আবিষ্কার করেছে তাঁদের।

এতদিনের সঞ্চয়, বহুদিনের গুপ্তধন যেন নিলামের ঘরে শূন্য হয়ে গেছে। বেহিসাবী এক উচ্ছৃংখল বাতাসের অসংযত ঝাপটায় সর্বকিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে।

অফুরন্ত এক শূন্যতা রেখে অপর্ণাকে যেন নীরব করে গেছে।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

● "স—১" বেহালা—

প্রশ্ন ১: আমার বর্তমান বয়স ৩১ ও বিবাহিত। আমি যখনই জল খাই তার অল্প কিছুক্ষণ পরে পরে প্রস্রাবের বেগ হয়। প্রায় ১৫-২০ মিনিট অন্তর অন্তর তিন-চার বার প্রস্রাব হয়।

এ-ছাড়া যখন office-এ কাজের মধ্যে থাকি তখন দু-তিন বার জল খাচ্ছি—একবারও প্রস্রাব হয় না। তাই ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ইচ্ছা করে Latrine-এ যাই প্রস্রাব যাতে হয়।

উত্তর: ঘন ঘন মূত্রত্যাগ নিম্নলিখিত কারণগুলিতে ঘটে—

(১) ডায়াবিটিস মেলাইটাস (যে-ধরণের ডায়াবিটিস রোগে, মূত্রের সঙ্গে 'গ্লুকোজ' বেরিয়ে আসে)।

(২) ডায়াবিটিস ইন্সিপিডাস্ (যে ধরণের ডায়াবিটিস রোগে, মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ বার হয় না অথচ বার বার প্রস্রাব হয়)।

(৩) স্নায়বিক উত্তেজনায় (Mental tension)

(৪) যৌন উত্তেজনায়।

(৫) অভ্যাসের বশে।

অতএব একবার প্রস্রাব এবং রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখিয়ে নেবেন। যদি ডায়াবিটিস মেলাইটাস থাকে, তার চিকিৎসা করাবেন, যদি না থাকে, তাহলে Nevrovitamin 4 (adult) দুটি বড়ি সকালে এবং দুটি বড়ি রাত্রে

প্রশ্ন ২: পাঁচমাসের একটি ছোট মেয়ে, মায়ের দুধ নাই। দেশী গরুর দুধ, বার্লি, গ্লুকোজ খাওয়ানো হচ্ছে। ভীষণ রোগা—তাই দুশ্চিন্তা, কি ধরণের জিনিষ খাওয়ালে স্বাস্থ্য ভাল হবে দয়া করে জানাবেন।

উত্তর: পাঁচমাসের শিশুকে বার্লি দেওয়া উচিত নয়, কারণ বার্লি, ভাত, ইত্যাদি জাতীয় খাদ্য হজম করাতে যে

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

Enzyme-এর প্রয়োজন, তা দেহ ছয় মাসের আগে তৈরী করতে পারে না। সেইজন্য ছয় মাস বয়সে অন্নপ্রাশন দিয়ে ভাত খাওয়ানো সুরু করা হয়।

আপনি শিশুকে গরুর দুধ সমপরিমাণ জল মিশিয়ে খেতে দেবেন। সকাল ছটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন। যথা সকাল ছটা ও নটায়, দুপুর বারোটা ও তিনটের, বিকেল ছটায় এবং রাত নটায় শিশুকে খাওয়াবেন। রাত নটার পর, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে শিশুকে খাওয়াবেন না।

এর সঙ্গে সকালে তিন ফোঁটা বিকালে তিন ফোঁটা A B D E C Drops খাওয়াবেন। এক মাস পরে চার ফোঁটা করে দেবেন, এবং আরও এক

● শ্রীপঙ্কজকুমার মুখার্জি, গাঙ্গুলীপাড়া রোড, বালী—

প্রশ্ন: আমার কন্যা (১৩ বৎসর) গত ছয় মাস হইতে আমবাতে ভুগিতেছে। আমি বড় চিন্তায় রহিয়াছি। কি উপায় অবলম্বন করিলে, নিরাময় হয়?

উত্তর: রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন। Eosinophil বাড়লে যিনি চিকিৎসা করছেন তাঁকে দেখান, যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। যদি না বেড়ে থাকে, Phenergan syrup রাতে শোবার সময় ২ চামচ করে খাবেন। অন্তত তিন মাস। তার সঙ্গে দুবেলা খাবার পর ২ চামচ করে Paladec syrup দেবেন।

● শ্রীবারীন্দ্রকুমার সাহা, আড়ংঘাটা, নদীয়া—

প্রশ্ন: আমি দীর্ঘদিন যাবৎ Low blood pressure-এ ভুগিতেছি।

উত্তর: এরজন্য ভাবনার কিছু নেই। নিয়মিতভাবে খাওয়া দাওয়া করুন এবং মাসে একবার প্রেসার পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।

● শ্রীনিত্যানারায়ণ মান্না, বালিঘাই,—

প্রশ্ন: মাথা প্রায় সব সময়ে ঘোরে, গায়ে একরকম খোসের মত কি বাহির হইয়াছে।

উত্তর: আপনি চালমুগরা তেল স্নানের পর গায়ে মাখবেন এবং Multivitamin বড়ি সকালে ১টি,

● শ্রীসৃষ্টিধর কোঙার, বড়বেলুন, বর্ধমান---

প্রশ্ন ১ : প্রায় ছেলেবেলা হতেই আমার গোড়ালি ফাটা। সর্বদাই জুতা ব্যবহার করি। কি করলে ভাল হতে পারে ?

উত্তর : আপনি প্রত্যহ দুবেলা গ্লিসারিন পায়ে মাখবেন এবং Haliborange দুবেলা খাবার পর ২ চামচ করে খাবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার বয়স ২৬ এবং স্ত্রীর বয়স ১৯ বৎসর। গত ২ বৎসর পূর্বে আমাদের একটা বাচ্চা হয়েছিল, কিন্তু অপারেশনের সময় বাচ্চার পিঠে ছুরি লেগে কেটে যায়, এবং পরে সেপটিক হয়ে বাচ্চাটি মারা যায়। তারপর থেকে স্ত্রীর মাসিক ধর্ম নিয়মিত হলেও স্রাব একেবারে হয় না বললেই চলে। ঐ সময়ে স্ত্রীর মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা এবং কোমরে খুব যন্ত্রণা হয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যান, স্থায়ী প্রায় ১৫-২০ মিনিট। আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক, বলেছেন ১টা বাচ্চা হলেই ঠিক হয়ে যাবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনার অভিমত জানাইবেন।

উত্তর : আপনার গৃহ-চিকিৎসক যে উপদেশ দিয়েছেন, তা সর্বতোভাবে সত্য। তাঁর উপদেশ অনুযায়ী D. C. I করিয়ে নিন, দেখবেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

● শ্রীমতী শিপ্রা রায়, কলি-১৪---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর ২ চামচ করে Haliborange এবং ভাত খাবার ১৫ মিনিট আগে ১ চামচ করে Elixir Neogadine খাবেন। দুপুর বেলায় ঘুমোবেন অন্তত দু ঘণ্টা। আপনাকে এর আগে চিঠিতে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্তত দেড় মাস পূর্বে।

● শ্রীমতী অর্চনা মৈত্র, কলিকাতা---

প্রশ্ন : আমার বয়স ১৯, ছেলেবেলা থেকে হাত ও পায়ের পাতায় ভীষণ ঘাম হয়, লিখতে গেলে খুব অসুবিধা হয়, শীতকালেও হাত পা ঘামে। গরম কালে তো কথাই নেই। এর কি কোন প্রতিকার আছে ?

উত্তর : এ ধরণের ঘাম সাধারণত মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে হয়। কোন কাজ করতে গেলে, বিশেষ করে লিখতে গেলে অবচেতন মনে এক চাপ পড়ে, আর তারই প্রকোপে এই ধরণের ঘাম হয়। এটা কিন্তু আসলে কোন রোগ নয়। শরীরকে সুস্থ রাখুন এবং জীবনের সব সমস্যাকেই অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করবেন। আপনি যখন লেখাপড়া করবেন, তখন ভাববেন আপনিই সঠিক লিখছেন। কোন সমালোচনাকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। মনে জোর এবং স্থিরতা আনবেন, দেখবেন ঘাম নিজের অজান্তেই কখন কমে গেছে।

● শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য, চন্দননগর---

দয়া করিয়া প্রশ্নগুলি ছাপিবেন না। যদি বলেন তো পরে নিজ নাম (আসল) লেখা খাম অথবা টিকিট পাঠাইব।

উত্তর : হয় প্রশ্নগুলি ছাপাতে হয়, অবশ্য সাধারণের উপকারে লাগে এমন ধরণের প্রশ্ন, আর নিতান্ত ব্যক্তিগত হলে নাম-ঠিকানা যুক্ত খাম থাকলে উত্তর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আপনি যদি ব্যক্তিগত উত্তর চান, নিজের নাম-ঠিকানা যুক্ত খাম পাঠিয়ে দেবেন (শুধু টিকিট পাঠাবেন না)। সেই সঙ্গে আবার প্রশ্নগুলি দেবেন।

● শ্রীকার্তিকচন্দ্র কৈবর্ত, উলাড়া, রসুলপুর, বর্ধমান---

আপনার বন্ধু ওষুধটি তিন মাস খাবেন।

প্রশ্ন ২ : শরীর বাগাইতে হইলে কি করিতে হইবে ?

উত্তর : নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম ও ঘুমাইতে হইবে।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বারাসত, কালিকাপুর---

একজন চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন আর একজন চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে উপদেশ নিতে নেই। তিনি আপনাকে যথাযথ পরীক্ষা করেই ওষুধ দিয়েছেন। যদি না বুঝে থাকেন, তাঁর কাছে গিয়ে বললেই তিনি বুঝিয়ে দেবেন।

● শ্রীসুভাষ রায়চৌধুরী, জোড়াঘাট লেন, চুঁচুড়া, হুগলী---

প্রশ্ন ১ : কিছুদিন যাবৎ আমার চোখের কোলে কালি পড়তে দেখা যাচ্ছে। এর প্রতিকার কি ?

উত্তর : হয় ভাল করে ঘুম হচ্ছে না, আর নইলে মানসিক দুশ্চিন্তা হচ্ছে। পেটভরে খেয়ে দুপুর এবং রাতে ঘুমোন দেখবেন কালি কমে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ২ : দিন দিন স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে

উত্তর : এ-প্রশ্নেরও একই উত্তর।

● শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর মাইতি, ক্ষেত্রহাট, পুলসিটা, মেদিনীপুর---

প্রশ্ন : প্রায় নয় বৎসর পূর্বে একটি সামান্য আঘাতে কানের পর্দাটি নষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ কানের শ্রবণ-শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। বর্তমানে ছয় বৎসর ঐ কানেই পুঁজ পড়িতেছে। বেশ দুর্গন্ধ। কানে ওষুধ দিলে মুখে চলে আসে। সকল রকম চিকিৎসা শেষ হইয়াছে। কিন্তু আজও কানের পুঁজ ভাল হচ্ছে না।

উত্তর : আপনার এতদিনের চিকিৎসা ঠিকমত হয়নি। আপনি আর দেরি করবেন না, যত তাড়াতাড়ি পারেন কলকাতার Medical College অথবা কোন বড় হাসপাতালের Outdoor-এর E N T Department-এ দেখিয়ে চিকিৎসা করান। এ রোগের চিকিৎসা বাইরে থেকে করে কোন সুফল পাবেন না।

● শ্রীভোলানাথ সেন, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি-৯---

প্রশ : আজ কুড়ি বৎসর যাবৎ আমার ডান কানটিতে পুঁজ পড়িতেছে। মাঝে মাঝে জ্বালা যন্ত্রণাও করে। কখনো জলের মতো বেরোয়, কখনো খুব পুরু বেরোয়। কানটিতে খুব কম শুনিতে পাই।

উত্তর : আপনাকেও বলি, কোন বড় হাসপাতালে দেখিয়ে চিকিৎসা করান।

● শ্রীনির্মল দেশমুখ, খড়গপুর---

প্রশ্ন ১ : মেয়ের বয়স ৫ বছর। প্রায় বছর দুই জিয়ার্ডিয়া রোগে ভুগছে। কয়েকদিন ভাল থাকে। তারপরই যাকে

তাই, সামান্য পেট ব্যথা হলে, পায়খানা নোংরা ধরণের। Stool form করে না।

প্রশ্ন ২ : বাচ্চা ছেলের (বয়স ৭) গুঁড়ো ক্রিমি, Antepar খাওয়াতেও কমেনি।

উত্তর : প্রশ্ন দুটি পরপর দিলাম, কারণ, উত্তর দুটিরই একই রকম হবে। প্রথমত দুজনকেই জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে দেবেন। দ্বিতীয়ত দুজনকে কোন ভাজা খাবার খেতে দেবেন না, অন্তত এক বছর। মাংস খেতে দিতে পারেন, কিন্তু চর্বি থাকবে না, এমন মাংস। শাকপাতা বেশি খাবে না, এই সাবধানতা অবলম্বন করে যদি জিয়ার্ডিয়ার চিকিৎসা করান, দেখবেন মেয়ে ভাল হয়ে উঠেছে। এই ধরণের রোগ চিকিৎসায় ভাল হয়ে গেলেও, আবার অসাবধানতার জন্য আবার সৃষ্টি হয়। জিয়ার্ডিয়ার অনেক ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে, চিকিৎসকের কাছে গেলেই তিনি নির্ণয় করে দেবেন। Antepar একবার খাওয়ালে সব ক্রিমি যায় না, কারণ একবার ওষুধ খাওয়ালে, অনেক ক্রিমি মরে, অনেক ক্রিমি বেহুঁস হয়ে যায়। যে সব ক্রিমি বেহুঁস হয়ে ওঠে এবং আবার বাড়তে থাকে। একেবারে নির্মূল করতে হলে, বার বার Antepar খাওয়াতে হয়। তিন সপ্তাহ অন্তর অথবা এক মাস অন্তর খাওয়াতে হয়, অন্তত চার-পাঁচ বার। এর সঙ্গে পুষ্টিকারক কোন টনিক খাওয়াতে হয়, যাতে শরীরে পুষ্টি তৈরি হয়।

● এইচ ভি মজুমদার, এ এম বোস রোড, দমদম---

১নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই, আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। আপনি প্রত্যহ রাত্রে ইসবগুলের ভুষি ভিজিয়ে খাবেন। দেখবেন উপসর্গ চলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ২ : আমার মুখের রঙ কালো। অথচ আমি শুনেছি, ছোটবেলায় আমি যথেষ্ট ফর্সা ছিলাম।

উত্তর : সাধারণত লিভারের দুর্বলতায় এই উপসর্গ হয়। আপনি কোন ভাল লিভার টনিক নিয়মিতভাবে খেয়ে যান।

Paralysis বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলেই যে মৃত্যুপথে যেতে হয়, এ-ধারণা ভুল। পক্ষাঘাত হবার কারণ অনেক।

● * * * সাঙ্কেতিক নাম, কলকাতা---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি লিখেছেন, আপনাকে আমি চিনি। ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও, যখনই কেউ নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তখনই তা গোপন রাখা হয়। সম্মান বাঁচিয়ে যতটা প্রকাশ করা সম্ভব, ততটুকুই পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

যাই হোক, আপনার উপসর্গের কথা পড়লাম। এ নিয়ে খুব চিন্তিত হবার দরকার নেই, কারণ এ রোগ অতি সহজেই নিরাময় হয়। আপনি সকাল বিকেলে ১টি করে Nevrovitamin 4 (adult) বড়ি খাবেন এবং দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের এক চামচ করে Melgadine অথবা Neogadine খাবেন এক মাস।

● শেখ সিরাজুল হক, গিজ-বেড়িয়া, উলুবেড়িয়া---

প্রশ্ন : আমি অত্যন্ত নার্ভাস টাইপের---

উত্তর : কোন স্নায়ুবলকারক টনিক নিয়মিত দুবেলা ভাত খাবার পর দু চামচ করে খাবেন। অন্তত দু মাস।

● শ্রীমতী হাসিরাণী দাশচৌধুরী, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলি-২৭---

আপনাকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়া হয়েছে।

● চিররুগ্ন, জামুরিয়া, বর্ধমান---

Insulin এবং Glucose Injection নিলে মোটা হওয়া যায়। তবে পরিমাণ চিঠির প্রশ্নোত্তরে লিখে জানানো সম্ভব নয়। কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গেলেই তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা করে দেবেন।

● শ্রী এ কে চ্যাটার্জি, বিরাটি, কলিকাতা-৫১---

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ২১। পূর্বে আমার মাথায় খুব ভাল চুল ছিল। আজ তিন বৎসর যাবৎ মাথার চুল উঠিয়া ফাঁকা হইয়া যাইতেছে। সেজন্য খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। Cidal Shampoo ব্যবহার করিয়াও কিছু হইতেছে না। চুল কি আবার ঘন হবে? বন্ধুরা বলে এ কমে না, এ কি সত্য?

উত্তর : মাথার চুল একবার পড়তে আরম্ভ করলে, তাকে থামানো বেশ আয়াসসাপেক্ষ, সেই দিক থেকে বন্ধুদের কথা খানিকটা সত্য। তবে চিকিৎসা করলে নিরাময় হয়ে যায়। চিকিৎসা করার আগে একটি কথা মনে রাখতে হবে। চিকিৎসকের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে, চিকিৎসায় কোন ফল পাবেন না।

● শ্রীকমলচন্দ্র বেরা, ঘাশরা, সিংভূম---

প্রশ্ন ১ : আমার দাদামহাশয়ের বয়স ৯০। স্বাস্থ্য ভাল, চলাফেরা করেন, কিন্তু বাতের জন্য মধ্যে মধ্যে কোমরে বেদনা হয়।

উত্তর : এ বয়সে ওষুধ বেশি দেওয়া উচিত নয়। ওঁকে কম করে নুন খেতে দেবেন, সকাল বিকেল একটু বেড়াতে বলবেন, আর গাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার চুলগুলি খুব মোটা এবং একটু খয়রা রং।

উত্তর : এর জন্য চিন্তার কিছু নেই। সকলের গায়ের রঙ যেমন একরকম হয় না, তেমনি চুলের রঙও একরকমের হয় না।

● শ্রীতাহিদের রহমান, বাসুদেব-পুর, হাড়ুই, হুগলী---

প্রশ্ন : আমার সর্দি ও শ্লেষ্মার ধাত বারো মাস।

উত্তর : আপনি নিয়মিত Pulmocod (Plain) দুবেলা চা-চামচের দু' চামচ করে খাবেন।

● দ ব (ছদ্মনাম), জাম মহম্মদ ঘাট রোড, নৈহাটি---

স্বপ্নদোষ নিয়ে বেশি চিন্তা করতে নেই। এ জিনিস হবেই। গত সংখ্যায় এ নিয়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আপনি ও বিষয়ে একদম ভুলে গিয়ে নিজের পড়াশুনা করুন, দেখবেন শরীর

ভাল থাকবে। ও নিয়ে যত ভাববেন, ত[illegible] পড়বেন।

● শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, রেলওয়ে কলোনী ([illegible]), আসানসোল---

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ২০ বৎসর। ওজন [illegible] মত আছে। গত আড়াই মাস ধরিয়া ব্যায়াম এবং ডন-বৈঠক করিতেছি। কিন্তু উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। কিছু রোগ আছে কি? কি করিব জানাইবেন।

উত্তর : এ কোন রোগ নয়। ভাল খাওয়া-দাওয়া করুন। সকাল বিকেল খালি হাতে ফ্রী হ্যাণ্ড ব্যায়াম করুন। পনেরো মিনিট থেকে আধঘণ্টার মধ্যে।

প্রশ্ন ২ : কোন প্রকার এবং কি প্রকার [illegible] কেমন করিয়া করিলে মজল [illegible] বিশেষ প্রয়োজন। [illegible] কি?

উত্তর : মাত্রাতিরিক্ত ব্যায়াম করলে শরীর রোগা হয়ে যাবে। যাই করুন মাত্রার চেয়ে বেশি করবেন না।

● শ্রীমানিক সাহা, কৃষ্ণপুর, বাঁকুড়া---

আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে আপনি রক্ত আমাশয়তে ভুগছেন। রক্ত আমাশয়ের চিকিৎসা করলেই সেরে যাবেন।

● শ্রীবিশ্বরূপ দে, বির্লাপুর, ২৪-পরগণা---

গোপন ব্যাধি বললে কিছু বোঝা যায় না। উপসর্গগুলো পরিষ্কার ভাবে লিখে দেবেন।

● শ্রীবিরাজকুমার সিংহ, হাল-হাজী, ত্রিপুরা---

আপনি তো লিখেছেনই বায়ু হয়। বায়ু নিরাময় করার ওষুধ (Combizym) ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

● শ্রীসুদীপ্ত খাঁড়া, চূড়ামণিপাড়া, আন্দুলমৌড়ি, হাওড়া---

আপনার পেটের জন্য Sioplex Enzyme ওষুধ দুবেলা ভাত খাবার ১৫ মিনিট আগে খাবেন।

● শ্রীদীপক সেন, মজদুমপুর, মালদা---

আপনার কোন ভয় নেই। যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা কোন রোগ নয়; প্রত্যেক পুরুষমানুষেরই ঘটে, অতএব ভয় না করে স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যান।

● শ্রীসীতানাথ মিত্র, সোনাপুর, জলপাইগুড়ি---

অনেকের কাশির ধাত থাকে। এজন্যে ভয় পাবেন না।

● শ্রীসঞ্জিতকুমার বড়াল, চুঁচুড়া, হুগলী---

আপনি নিয়মিত দুবেলা ভাত খাবার পর চায়ের চামচের ২ চামচ করে Elixir Melgadine খাবেন। অন্তত এক মাস।

● শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সোনারামপুর, মেদিনীপুর---

প্রশ্ন ১ : আমি যা খাই, তা হজম হয় না ও পেট ফুটতে থাকে। পায়খানা ভালো পরিষ্কার হয় না।

উত্তর : কোন ওষুধ খাবেন না। সকাল-সন্ধ্যে আধঘণ্টা বেড়াবেন।

প্রশ্ন ২ : আমি ক্লাশে পরীক্ষায় ভালো Result করতে পারি না। আমি খুব লম্বা ও রোগা, লোকের সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন আমার লজ্জা করে।

উত্তর : আপনি এ নিয়ে অতিরিক্ত ভাবছেন। আপনি নিয়মিত পেটভরে খাবেন এবং নিয়মিত পড়াশুনা করবেন। পুরুষমানুষের মনে এ চিন্তা কখনোই আসা উচিত নয় যে আমি দেখতে খারাপ। পুরুষের কাজই হচ্ছে তার সৌন্দর্য এবং আপনি পড়াশুনায় ভাল হলে দেখবেন সবাই সমীহ করে কথা বলছেন। অতএব কে কি ভাবছে, একথা না ভেবে চলুন।

● শ্রীঅর্ণব সেন, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা---

প্রশ্ন ১ : মুখে দুর্গন্ধ হয়। মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। বেশি খিদে পেলে দুর্গন্ধটা বাড়ে। প্রতিকার জানিয়ে বাধিত করিবেন।

উত্তর : মুখের দুর্গন্ধ সাধারণত পেটের গোলমালে হয়। আপনি Syrup Methionine Forte অথবা Hepobyle H M C জাতীয় ওষুধ চা চামচের দু চামচ করে খাওয়ার পর খাবেন। শাক একটু বেশি খাবেন। রোজ ভাতের সঙ্গে তেঁতো খাবেন। দু বেলা দাঁত মাজবেন। ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। আঙুল দিয়ে মাজবেন। অন্তত একবছর ব্রাশ ব্যবহার করবেন না।

প্রশ্ন ২ : পিঠে মেচেতা বা ব্রণ-জাতীয় হয়।

উত্তর : ১ নং প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছি, তাই করবেন।

● শ্রীমতী মিত্র, বল্লভপুর, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান---

প্রশ্ন দুটি ছাপতে নিষেধ করেছেন, তাই দিলাম না। দুটি প্রশ্নেরই উত্তর এক। শরীর থেকে আগের অনুপাতে চর্বি কমে গেছে, তাই ওই উপসর্গ-গুলি হচ্ছে। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর Sharkoferrol জাতীয় ওষুধ বড় চামচের এক চামচ করে খাবেন অন্তত তিন মাস।

● শ্রীমতী বারুণী ভৌমিক, কালিকা-পুর, বারাসাত---

আপনার চিঠিতে অজস্র প্রশ্ন আছে। অতগুলি প্রশ্ন আলাদা ভাবে দিয়ে, তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত উপসর্গ মিলিয়ে উত্তরে বলছি, আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ Haliborange জাতীয় ওষুধ খাবেন। আপনার মায়ের জন্য কোন ভাবনা নেই।

● শ্রীশশাঙ্কশেখর দে, মাদারহাট, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। (২টি কুপন আছে)---

প্রশ্ন ১ : আমার মাড়ি দিয়ে রক্তপাত হয়। দাঁতগুলিও গর্ত হইয়া গিয়াছে। মুখের মধ্যে দুর্গন্ধ হয়।

উত্তর : এ বিষয়ে, এই সংখ্যাতেই উত্তর দেওয়া আছে।

প্রশ্ন ২ : আমার চক্ষুর রঙ হলদে, বিশেষত একটু বেশী জলে থাকিলে বা রৌদ্রে ঘুড়ি ওড়াইলে চক্ষু আরও বেশি হলদে হয়ে যায়। ছেলেবেলায়

'ন্যাবা' রোগ হয়েছিল। চক্ষুর স্বাভাবিক রঙ কি আর ফেরানো যায় না?

উত্তর: নিশ্চয়ই যায়। এতদিন চোখ হলদে থাকার কথা নয়। আপনি একবার রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করিয়ে দিন। এর মধ্যে আপনি প্রত্যহ সকালে একগ্লাস করে মিশ্রীর সরবৎ পান করবেন। এ ছাড়া ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Syr. Methionine Forte অথবা Colibil S (Calcutta Chemical) খেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন ৩: আমার অত্যন্ত ঘাম হয়।

উত্তর: এটা খানিকটা দুর্বলতা-জনিত। একই ওষুধে এই উপসর্গ কমবে।

প্রশ্ন ৪: লং জাম্প দিতে গিয়ে আমার বাঁ হাঁটুতে খটকা লাগে। ইহাতে একটু ফোলে ও ব্যথা হয়। শুনেছি হাঁটুর লাগা আর সারে না। ইহা কি সত্য?

উত্তর: হাঁটুর ব্যথা সারতে বহুদিন সময় নেয়। দু তিন বছর খেলতে পারবেন না।

● শ্রীনিত্যলাল চৌধুরী, মোগলপুরা লেন, হুগলী—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার আগে চা চামচের দু চামচ করে Digeplex খাবেন।

● শ্রীজীবনকৃষ্ণ সাধু খাঁ, পোড়ামা-তলা, নবদ্বীপ, নদীয়া—

কোন ভয় নেই। পরীক্ষার আগে অমন মনে হয়। পরীক্ষাকেও জীবনের একটা খেলা বলে ধরতে হয়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে পারলেই পরে জীবনের পরীক্ষায় পাস করা যায়। যে ছাত্র ইউনিভারসিটিতে ফার্স্ট হয়, সেও পরীক্ষা দিতে বুক দুরু-দুরু করে বলে। পরীক্ষায় পাস-ফেল পরের কথা। পরীক্ষায় বসার অভ্যাসই হচ্ছে আসল কথা। পরীক্ষা পেছিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। এখন নয় পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু জীবনের সমস্যা যখন সামনে আসবে তখন কি আজ নয়, কাল করবো বলে রেহাই পাওয়া যাবে? পৃথিবী এবং জীবন অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সেই নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করে সুন্দর করে তোলাই মানুষের পরীক্ষা। সে পরীক্ষা দিতেই হবে।

● শ্রীদুলাইচন্দ্র কুণ্ডু, শুকসনাতন-তলা, চন্দননগর—

আপনার উপসর্গ পড়ে মনে হয় আপনি হাঁপানিতে ভুগছেন। কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে হাঁপানির চিকিৎসা করান।

● শ্রীনন্দলাল দে, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া—

আপনার স্ত্রীকে আপনি প্রত্যহ শাক খেতে দেবেন। দেখবেন উপসর্গ কমে গেছে।

● Mr. Choudhury, South Kharagpur, Kazipara—

আপনার পুত্রের Tongue-tie আছে কি না দেখে নেবেন। এ রোগের চিকিৎসা চিঠিতে করা সম্ভব নয়।

● শ্রীমুরারিমোহন বসু, গোবরডাঙ্গা ১ নং কলোনি, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন ১: চুলকানি সারাবার পথ কি? শরীরের বিভিন্ন অংশে হয়েছে—

উত্তর: Ascabiol অথবা Scabalcid গায়ে মাখবেন, দিনে দুবার। তাছাড়া Multivitamin খাবেন। এ ছাড়া জামাকাপড় অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন।

প্রশ্ন ২: কবিরাজি ঔষধ সেবন

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাংকেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সংগে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

করার মত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করা চলে কি না।

উত্তর : সেটা নির্ভর করছে কি ধরণের ওষুধ ব্যবহার করছেন, তার ওপর।

● শ্রীঅজিতকুমার সেন, ঘোষ-বাগান, বর্ধমান—

এত চিকিৎসাতেও যখন সারে নি, তখন সারবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এ নিয়ে যখন কষ্ট হচ্ছে না তখন ভাবনার কিছু নেই।

● শ্রীসুবোধকুমার সরকার, চাপড়িয়া, নদীয়া—

আপনি কোন বড় হাসপাতালের out door-এ দেখান। সেখানে ক্ষতটি যথাযথ পরীক্ষা করে সুষ্ঠু চিকিৎসা করাবেন।

● শ্রীসমরেশ বসু, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর—

আপনার জীবনে যা ঘটেছে, স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে। ও নিয়ে মাথা ঘামালেই পড়াশুনায় ক্ষতি হবে। কোন ভয় নেই। ও সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

● 'জিজ্ঞাসু' ইব্রাহিমপুর রোড, কলি-৩২—

প্রশ্ন ১ : ছোট শিশু পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে ডাক্তার আসার আগে পর্যন্ত তাকে কি ভাবে রাখা উচিত?

উত্তর : কিছু করা উচিত নয়। কারণ কি জন্যে অজ্ঞান হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে বোঝা সম্ভব নয়। কিছু করতে গিয়ে আরও ক্ষতি হয়ে যায়। নরম বিছানায় শুইয়ে দেবেন। আশে-পাশের ভিড় কমিয়ে দিয়ে বাতাস করবেন, যাতে Oxygen বেশি করে পায়। এ ছাড়া আর কিছু নয়। যত তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনতে পারেন ভাল, অথবা Ambulance বা ট্যাক্সী ডেকে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।

প্রশ্ন ২ : চোখের প্লাশ পাওয়ার (অর্থাৎ চালসে) বেড়ে যাওয়ার কোন প্রতিকার আছে কি?

উত্তর : প্লাশ পাওয়ার হলেই যে চালসে হবে, তার কোন মানে নেই। যাই হোক চালসে বেড়ে গেলে, চশমার পাওয়ার বদলে কাজ চালাতে হবে। এ ছাড়া কোন প্রতিকার নেই।

● ছদ্মনাম, মুকুটিপাড়া, বীরভূম—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Ferradol খাবেন অন্তত চার মাস। যে জায়গায় চুলকোয়, Nebasulph মলম লাগাবেন।

● শ্রীগৌতম গুপ্ত, সেলিমপুর লেন, কলি-৩১—

প্রশ্ন : অনেকদিন যাবৎ আমার কপালের উপর একটি আঁচিল হয়েছে।

উত্তর : Getsid নামক ওষুধ তুলি করে আঁচিলের ওপর লাগাবেন, দিনে দু বার।

● "ভ্রমর" কলিকাতা, কলেজ স্ট্রীট।

আপনি দিনে দুবার করে Diapepsin ওষুধ চা চামচের দু চামচ করে খাবেন।

● শ্রীমতী অনামিকা চৌধুরী, কৈলাশহর, ত্রিপুরা—

কিছুদিন Plastic-এর চিরুণী ব্যবহার বন্ধ করে দেখুন। তাছাড়া দুবেলা Multivitamin খাবেন।

● শ্রীমতী রমা রায়, রঙ্গলপাড়া, কলটি—

আপনি নিয়মিত দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Sharkoferrol অথবা Ferradol খাবেন।

● শ্রীমতী চিত্রা মুখার্জি, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—

প্রথম প্রশ্নের উত্তর : জায়গাটিতে বেশি করে হাওয়া লাগাবেন। ঘাম এবং বন্ধ থাকায় হয়। আপনি দিনে তিনবার করে জায়গাটিতে Betnovat C (Glaxo) মলম লাগাবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার মাথায় ভীষণ খুস্কি হয়েছে। মাথা খুব চুলকায়।

উত্তর : পুরনো চিরুণী ব্যবহার করবেন না। আপনার চিরুণী কাউকে ব্যবহার করতে দেবেন না। সপ্তাহে দু দিন শ্যাম্পু করবেন। স্নানের পর রোজ মাথায় Pragmata মলম ঘষে ঘষে লাগাবেন। Multivitamin নিয়মিত খাবেন।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মেজিয়া, বাঁকুড়া—

আপনার বয়স দুর্বল হয়েছে। আপনি কোন দিতাস টনিক খান। আর শুধু নারিকেল তেল মাখুন।

● শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ লাল, বজরঙ্গ মিল, বেতিয়া—

আপনি নিয়মিত খাবার পর ২ চামচ করে (চা চামচের) Aminozyme খাবেন অন্তত তিন মাস।

● বেনামী লেখক, বেলঘরিয়া—

আপনার যে রোগ হয়েছে, তা ওষুধে সারবে না। অভ্যাস করে সারাতে হবে।

● শ্রী এ কে চ্যাটার্জি, বিরাটি, দাশনগর রোড, কলি-৫১—

ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে সারে না। আপনা থেকেই আবার ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্ন ২ : আসনের চার্ট দেখিয়া যৌগিক আসন করি, এতে কি কোন ক্ষতি হয়?

উত্তর : সঠিকভাবে করলে কোন ক্ষতি হয় না।

—বিশেষ ঘোষণা—

হাসপাতালকে উন্নত করে তুলতে সরকারের এবং কর্তৃপক্ষের যেমন কর্তব্য, তেমনি জনগণেরও কর্তব্য। আপনাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে চিঠি আহ্বান করছি। আপনাদের জানমত অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠাতে পারেন। নাম ঠিকানা গোপন করতে চাইলে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা হবে।

নারী-মহিমা

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নারীর অভিযাত্রা (মিশন)

সন্তানের কর্তব্য পালনের ভার অধিকাংশ নারীকেই লইতে হয়। তাহার জন্য যে বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন পুরুষের সে-গুণ থাকার আবশ্যকতা নাই। নারীর চাই নিষ্ক্রিয়তা পুরুষের চাই সক্রিয়তা। নারী স্বভাবতই গৃহকর্ত্রী আর পুরুষ হইতেছে উপার্জক। সেই উপার্জনজাত অন্নের রক্ষক ও পরিবেশিকা হইতেছে নারী। প্রতিরক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, নারী সর্বক্ষেত্রেই সেই প্রতিরক্ষিকা। মানব শিশুর রক্ষণ ও প্রতিপালন হইতেছে তাহার বিশেষ কার্য বিভাগ এবং ন্যস্ত কর্তব্য। নারী দ্বারা রক্ষিত না হইলে, নারীর যত্ন না পাইলে, মানব সমাজ লুপ্ত হইবে।

নারীকে যদি লোকে গৃহস্থালী ত্যাগ করিয়া বন্দুক ঘাড়ে লইয়া ঐ গৃহস্থালী রক্ষার জন্যে আহ্বান করে তবে পুরুষ ও নারী উভয়ে হীনতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বর্বর যুগে ফিরিয়া যাওয়া হয় এবং অবলুপ্ত হওয়ার প্রারম্ভ ঘটে। নারী যদি পুরুষের মত ঘোড়সওয়ার হইতে চায় তবে উভয়েরই পতন ঘটিবে।

নারীকে তাহার বিশিষ্ট ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য অথবা প্রলুব্ধ করিলে সে পাপ মানুষের উপরই বর্তাইবে। গৃহসংসারকে বাহ্য আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে যতটা সাহসিকতার প্রয়োজন, গৃহস্থালীকে সুব্যবস্থিত রাখিতে তাহার চাইতে কম সাহসিকতার প্রয়োজন হয় না।

নারী পুরুষের কর্তব্য বিভাগের মহান সমস্যায় আমার অবদান হইতেছে এই যে আমি জীবনের সকল স্তরে উভয়কেই সত্য এবং অহিংসার পথ লইতে বলি। ইহা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি জাতির ক্ষেত্রেও ইহা সমান প্রযোজ্য আমি এই আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি যে এই সমস্যা সমাধানে নারীই হইবে অবিসম্বাদী নেত্রী। এইভাবে নারী মানবজাতির বিকাশে যোগ্যস্থান লইলে তাহার ভিতর যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে পুরুষই বড়, নারী ছোট, সেই মানসিক বিভ্রান্তিও দূর হইবে।

নারী যদি এই কর্তব্য পালনে সমর্থ হয় তখন সে দৃঢ়ভাবে সে কথা তুচ্ছ করিতে, অবিশ্বাস করিতে শিখিবে যে কথা আধুনিকতা শিক্ষা দেয় যে মানুষের সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তিই যৌন আবেদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

—ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৫-১১-১৯২৬, পৃঃ ৪১৫ (১০০)।

নারী ও পুরুষের চারিত্রিক শুদ্ধি

আচ্ছা নারীদের চরিত্র যাহাতে শুদ্ধ থাকে পুরুষদের এত উগ্র আগ্রহ রাখা হয় কেন? পুরুষদের চরিত্র শুদ্ধ রাখার বিষয় নারীদের কি কোনও হাত আছে? এরূপ কথা তো শুনি না। স্ত্রীদিগকে শুদ্ধ রাখার জন্য পুরুষ নিজেকে রক্ষকের স্থান কেন নিজের উপর আরোপ করিয়া লইবে?

চরিত্রের পবিত্রতা রুদ্ধ ঘরে গড়িয়া উঠার মত জিনিষ নহে। পর্দার অন্তরাল দ্বারা তো ইহা রক্ষা করা যায় না। ইহা ভিতর হইতে গড়িয়া উঠার জিনিস। এই জন্য ব্যক্তিগত চেষ্টাই ইহা গড়িয়া তুলিতে পারে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে অহিংস তেজস্বিতার রূপ

গান্ধীজী সত্য ও অহিংসা একই অর্থবহ বলিয়া জানিয়াছেন। সত্যপরায়ণ হইতে হইলে অহিংস হইতেই হইবে। আবার অহিংস হইতে হইলে সত্যপরায়ণ হইতে হইবে। দুই অবিচ্ছেদ্য। সত্য বলিতে যেখানে লজ্জায় বাধা দেয়, যেখানে ক্ষতির আশংকা থাকে, অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে অকপটে সত্য বলার ও সেজন্য দুঃখ বরণ করার ক্ষমতার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র সাহিত্যে নানাস্থানে ছড়ান আছে। জবালা ও গান্ধারীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব।

—রবীন্দ্র রচনাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ-৬১৮।

সরস্বতীর তীরে গৌতম মহর্ষির আশ্রম।

মহর্ষি গৌতম

কহিলেন বৎসগণ ব্রহ্মবিদ্যা কহি
কর অবধান।

হেন কালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক, বন্দি ফল ফুল দলে
ঋষির চরণ পদ্ম নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে
ভগবন ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর—
"কুশল হউক সৌম্য গোত্র কি তোমার?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।"

বালক কহিলা ধীরে

ভগবন গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য কর অনুমতি।

* * *

শুধাইল সত্যকাম

কহ গো জননী, মোর পিতার কি নাম
কি বংশে জনম।

মাতঃ কি গোত্র আমার?

শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনত মুখে
কহিলা জননী, যৌবনে দারিদ্র্য দুঃখে
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে।

* * *

সত্যকাম

কাছে আসি ঋষি পদে করিলা প্রণাম
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে
আচার্য আশীষ করি শুধাইলা
কী গোত্র তোমার সৌম্য প্রিয় দরশন?

তুলি শির কহিলা বালক, ভগবন
নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি, সত্যকাম,
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।

শুনি সে বারতা

ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত সবে বিস্ময় বিকল
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন!
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।

* * *

কথাটা ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে গৃহীত। উপনিষদের কাল হইতে ভারতে কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে—জবালার মত কত নারী গোত্রহীন পুত্রের জন্ম দিয়াছে। কিন্তু গোত্রহীনতা স্বীকার কোনও পুত্র করিয়াছে, কোনও মাতা শিখাইয়াছে সাহিত্যে ইহার পরিচয় নাই। উপনিষদ নারী-হৃদয়ে এই দুঃসাহসিক পবিত্রতার ইতিহাস রক্ষা করিয়া অহিংসা ও সত্য কি সে কল্পনার সাক্ষ্য দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ জবালাকে সম্মুখে ধরিয়া নারী-চরিত্রে অহিংসা ও সত্যের বিকাশ কোথায় পৌঁছিয়াছিল সে জ্ঞানদান করিয়াছেন। বঙ্গবাসী পাঠক সমাজকে ধন্য করিয়াছেন। বর্তমান বঙ্গসমাজ অহিংসা প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের ইহা এক পরম অবদান।

গান্ধারীর আবেদন

সত্যরক্ষার জন্য নিজের সর্বনাশের আহ্বান রবীন্দ্রনাথ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন গান্ধারীর প্রার্থনায়। এই প্রকার সত্যনিষ্ঠার বিকাশ গান্ধারী হেন রাজমহিষীতে প্রকট করিয়া গান্ধী যে নারীর জন্য আহ্বান দিতেছিলেন সেই নারীকে পুরাতন দিন হইতে তুলিয়া চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সত্যের সে অমোঘ তেজে পুত্রপ্রেম, স্বামিপ্রেম ভস্মীভূত হইয়া নির্বাণ আনিয়া দিয়াছে।

হায় নাথ সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠ রব।
প্রাসাদ পাষাণ ভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা ঘৃণা করুণার তাপে. ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভা মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা—ধর্ম জানে
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব

মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি দূর করো জননীর লাজ।
বীরধর্ম করহ উদ্ধার. পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন. অবনত
ন্যায় ধর্মে করহ সম্মান ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

হে আমার
অশান্ত হৃদয় স্থির হও! নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে. সেদিন দারুণ দুঃখ দিনে।

তারপরে নমো নমো
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি নমো নমো নমো
কল্যাণ কঠোর কান্ত ক্ষমা। স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণ নির্বৃত্তি
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী উভয়েই নারীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মানবজাতিকে জাগ্রত করিয়া শ্রেষ্ঠ মানবিকতার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারত সমাজে এই প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

১৪ সংখ্যক গান্ধীজীর লেখা উদ্ধৃতির পর লেখকের টিপ্পনী

হিন্দু বিবাহে পুরুষ নারীকে সম্রাজ্ঞী করিবে বলিয়া মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করে। গত ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ পার্লামেন্টে রাজ্য-পালের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনাকালে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীবিশ্বনাথন প্রসংগত বলেন যে, নারদ স্মৃতি অনুসারে "নারী বাক্য এবং দান" ফেরৎ লওয়া যায় না।

এই উক্তিতে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ার ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি মনে করেন যে ভারতে নারীকে বিলিয়ে দেওয়া যায়?

এই বিষয়ে চর্চা করিতে গিয়া কলিকাতার দৈনিক পত্রিকা "যুগান্তর" সম্পাদকীয় মন্তব্যে ৯ই ডিসেম্বরে লিখিয়াছে, হিন্দু বিবাহে নারীকে যে সম্প্রদান করা হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ডক্তার সুশীলা নায়ারের মনে রাখা উচিত বিবাহের মন্ত্রপড়ার সময় বর বধূকে "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরাং, তব. সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব" অর্থাৎ তুমি শ্বশুর ঘরে সম্রাজ্ঞী হইতেই আসিতেছ।"

গান্ধীজী লিখিয়াছেন নারী শ্বশুর ঘরের রাণী আর হিন্দু বিবাহের বর বলে যে তোমাকে সম্রাজ্ঞী করার জন্যই পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছি।

বর্তমান আচার ইহার বিপরীত। বাংলা দেশে বর যখন বিবাহ করিতে যাত্রা করিয়া বাহির হয় তখন স্ত্রী আচারে মাতা আনুষ্ঠানিক-ভাবে আশীর্বাদ করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "কোথায় যাইতেছ"? উত্তরে পুত্র বলে "তোমার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছি"।

এই ঘৃণ্য আচার পরিত্যক্ত হউক। বরঞ্চ পুত্র বলুক গৃহের সম্রাজ্ঞী আনিতে যাইতেছি—কেন না এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াই তো সে বধূকে গৃহে আনিবে।

নারী-মহিমায় রবীন্দ্রনাথ

নারী স্বভাবত পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ.

ত্যাগে, সংযমে, কষ্টবরণে

নারীর জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব

(৪)

এতাবৎ-নারীমহিমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। ২ সংখ্যক প্রবন্ধে গান্ধীজীর লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে গান্ধীজী শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা নির্বিচারে নারী-পুরুষ অপেক্ষা হার্দিক গুণে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ। বর্তমান প্রবন্ধে দেখা যাইবে যে নারীর জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গান্ধী যাহা কিছু বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই ভাষাতেই সেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "নারী" শীর্ষক প্রবন্ধ যাহা তিনি অশীতি বৎসর বয়সে লিখিয়াছেন তাহা হইতে কতক উদ্ধৃত হইল।

—রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ-৩৭৭।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্যামন করে যেন আড্ডা চলছিল।

নাঃ ঠিক আড্ডা নয়, বরং বললে ঠিক হবে বিতর্ক। বিষয়বস্তু প্রফেসার মৈত্র।

গতকালকার ঘেরাও ঘটনা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা এবং উত্তেজনার ঝড় বইছে। ঘটনাটার প্রস্তুতিপর্বেই ছাত্রদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল, কাজেই এখন চলছে দুই শিবিরের ধাক্কাধুক্কি।

অবশ্য ছাত্রদের এই দলবিভেদটা যে কেবলমাত্র তাদের অধ্যাপকের লাঞ্ছনাকে ঘিরেই ঘটেছে তা নয়, এমনিতেই রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্যে তারা বহু শিবিরে বিভক্ত।

বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, বাম-দক্ষিণ পন্থী, দক্ষিণ বামপন্থী এবং বাম-উগ্র বাম, দক্ষিণ-উগ্র দক্ষিণ, বামেতর দক্ষিণ বা দক্ষিণেতর বাম ইত্যাদি নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাখায় বিচরণ তাদের।

তারা কেউ কারো সঙ্গে পান-ভোজন করে না, কেউ কারো সঙ্গে খেলাধুলা করে না এবং একে অপরের শুধু অস্পৃশ্যই নয়, ব্যঙ্গের পাত্র, করুণার পাত্র, অনস্তাব পাত্র।

আবার ওরই মধ্যে যারা বেশী বলবান গোষ্ঠী তারা দুর্বল পক্ষকে ভয় দেখিয়ে দলভুক্ত করবার চেষ্টাতেও দ্বিধা করে না।

স্বাভাবিকই।

আমার মতবাদে যে আস্থাশীল নয়, সে আবার মানুষ নামের যোগ্য নাকি? এই তো মনোভাব মানুষের। অতএব হয় তাকে স্বমতে এনে মনুষ্য পদবাচ্য করে তুলবো, নয় তাকে ঘৃণা করবো, অবজ্ঞা করবো, করুণা করবো।

বন্ধুত্ব?

কদাচ না।

আমার দলে না ভিড়লে আবার বন্ধুত্ব কিসের? বন্ধুত্ব করবো তুমি একটি সুন্দর হৃদয় ঐশ্বর্যের ঐশ্বর্যবান বলে? ধত্তোরি রাবিশ।

'হৃদয় আবার একটা বস্তু নাকি? হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধুত্ব, ওসব ছেঁদো কথায় আর বিশ্বাস করে না এ যুগ।'

এ যুগ জানে বন্ধুত্ব সম্ভব কেবলমাত্র মতবাদে মতবাদে। বন্ধুত্ব সম্ভব শুধু একই শিবিরের ছায়ায়। সেখানে হৃদয় বস্তুটা হাস্যকর।

তা এরা সেই এক শিবিরেরই লোক, অসিত, দিলীপ, অনিল, কুমারেশ, বিমল, শিবেন্দু, অরনীশ, ইন্দ্রজিৎ, পরাশর এবং আরো অনেকে। সম্প্রতি প্রফেসর মৈত্রকে কেন্দ্র করে ওদের মধ্যেও দলবিভেদ ঘটে গেছে। আবার আর একটি শিবির বেড়ে গেছে।

এদের এক পক্ষ গতকালকার ঘটনায় লজ্জিত দুঃখিত মর্মাহত, অপর পক্ষ উল্লসিত, উচ্ছসিত, বীরত্বে গর্বিত।

ছেলেবেলার স্কুলে থাকাকালীন অবস্থাতেও এ পদ্ধতি ছিল তাদের। কোন এক ছেলের সঙ্গে কোনো এক ছেলের ঝগড়া হলেই চটপট দুটো দল গড়ে উঠতো, যার নাম 'গ্যাং'। একটা 'গ্যাঙ্' একটা ছেলেকে সমর্থন করতো, অপর গ্যাঙ অপর ছেলেকে! বলা বাহুল্য কলহ অনলকে অত্যন্ত জীইয়ে রাখতো তারা নিজ নিজ দুইটি ইন্ধনে। যাদের মধ্যে বিবাদ, তারা পরস্পরে অনুতপ্ত হলেও, ঝগড়া মিটিয়ে নেবার উপায়টি আর থাকতো না তাদের নিজের হাতে।

এখন এরা নিজেদেরকে আর 'গ্যাঙ্' নামে অভিহিত করে না বটে। তবে মনোভাবটার পরিবর্তন ঘটেনি।

পরিবেশ অন্য, সহপাঠিকা অন্য, কারণও অন্য, কিন্তু মনোভাব অপরিবর্তিত। তাই এক পক্ষ যখন বলে, কালকের কাজটা ভাল হয়নি,' অপর পক্ষ তখন বলে, 'আরে রেখে দিন মশাই আপনাদের মেয়েলিপনা। ঠিক কাজ হয়েছে। মুখের মত জুতো হয়েছে, কুকুরের উপযুক্ত মুগুর।--- শা---কে যা টাইট দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে আর 'চ্যাঁ-ফোঁ' করতে হবে না। শা---সুধু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। এবার বুঝবেন বাছাধন সাপের ল্যাজে পা দেওয়ার ফলটা কি!'

অতঃপর তর্ক উদ্দাম।

'এভাবে কথা বলা নিজেদেরই সভ্যতা নষ্ট করা।'

'ও হো হো তাই নাকি? চুক্ চুক্! এটা বাইবেলের কোন অধ্যায় ব্রাদার?'

'সে আপনারা যাই বলুন, আমি বলবো, প্রফেসর মৈত্র সত্যিকার ভাল লোক।'

'ভালো লোক! 'ভালো' শব্দটার ধাতুরূপ কী মাইরী। লোকটা একটা পেঁতি বুর্জোয়া, বুঝলেন? স্রেফ একটা পেঁতি বুর্জোয়া। আবার—গাড়ী চড়ে কলেজে আসা হয়। মাইনে তো চুঁ-চুঁ কোম্পানী, তাতে সংসার চালিয়ে গাড়ী চালানো যায়? হুঁঃ! অন্য আয় আছে বুঝলেন?'

'সেটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু নিশ্চয় বলবো পড়ানোর ব্যাপারে ওঁর তুল্য আর একজনও নেই। সবাই তো ফাঁকিবাজের রাজা। তাদের মুখ্য বিজনেস খাতা দেখা আর টিউশানি করা। ক্লাশ নেওয়াটা গৌণ। সাইড বিজনেস।'

'কিন্তু প্রফেসর মৈত্রের—'

'আরে বাবা ক্যাপাসিটি থাকলে তো? ওই পড়ানোটুকু পর্যন্তই ক্ষমতার সীমা।'

'তা' আমাদের সেটাই দরকার।'

'হতে পারে। তবে একটু ভাল পড়ায় বলে ধরাকে সরা দেখবে? হাতে মাথা কাটবে? 'গেট আউট' বলবে? অত কিসের? ব্যস দিয়ে দেওয়া গেল একটু টাইট। আর বলতে হবে না কিছু। মাথাটি হেঁট করে এসো, মাথাটি হেঁট করে চলে যাও ব্যস! ওসব মধ্যযুগীয় জমিদারের মনোভাব নিয়ে বাঘের বাচ্চা চরাতে আসা চলবে না বাছাধন। স্টুডেন্টরা তোমার খাস তালুকের প্রজা নয়।'

অপর পক্ষে প্রতিবাদ ওঠে, 'এটা আপনাদের বাড়াবাড়ি হচ্ছে। উনি মোটেই ও ধরণের নন।'

'কী হল মশাই? মৈত্র কি আপনাদের উকিল রেখেছে? 'উনি' কি ধরণের আপনার থেকে আমি ভাল জানি। একদিন ও এই শিবেন্দুর হাত থেকে একটা বই নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল তা জানেন?'

ছিঁড়ে ফেলেছিলেন? বই? কী বই?'

'নামটা ঘোড়ার ডিমের মনে নেই। একটু 'ইয়ের' ব্যাপার আর কি-- সাদা বাংলায় বলি মশাই একখানি কড়া 'সেক্সের' বই। বহু চেষ্টায় জোগাড় করেছিল বেচারা -'

'তা' সেখানি ক্লাশে এনে প্রফেসরের নাকের সামনে না পড়লে চলতো না?'

হঠাৎ ও পক্ষ থেকে সমবেত একটি হাস্যধ্বনি ওঠে। হাস্যরোলই।

'সদাচার সমিতিতে' নাম লেখান গে মশাই, সেটাই আপনাদের উপযুক্ত জায়গা—'

'ঠাট্টা করুন। তবু বলবো এভাবে শিক্ষককে অপমান করার মধ্যে নিজেদেরও কোনো মর্যাদা নেই। আমরা যদি আমাদের মা-বাপকে অপমান করতে বসি, সেটা আমাদেরই অসম্মানকর।'

কথাটা সম্পূর্ণ শেষ হয় না হয়, একটা ছক্কাহুয়া ধ্বনিতে চাপা পড়ে যায়। এরা তুলছে ওই শেয়াল-ডাক। এরা হেসে টেবিল চাপড়ে বলছে—'আহা হা চুকচুক, দেশে কোথাও ধর্মযাজকের পোস্ট খালি নেই? চলে যান, চলে যান। সেটাই উপযুক্ত ক্ষেত্র আপনাদের।'

তারপর নিজেদের বাহাদুরীতে উল্লসিত দল নানা জানোয়ারের ডাক ডাকতে সুরু করে প্রতিপক্ষ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তা' ছাড়া আর কি করতে পারে? চিরদিনই বর্বরতার দাপটে সভ্যতা চাপা পড়ে যায়, চীৎকারের নীচে মৃদুতা।

ওদের চলে যাওয়া দেখে এরা আরও খানিক হৈ-হৈ করে উঠলো, তারপর আবার সুরু করলো, 'আজ আর কলেজে আসেনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বোধহয় অপমানের জ্বালায় বাসায় গিয়ে মরে আছে। ক'দিন না এসে থাকবে যাদু? এখানেই যে ভাত জল। --- বলে কিনা কাজটা ভাল হয়নি। হুঁ: খাশা হয়েছে। বেশ হয়েছে। উত্তম হয়েছে। ওই একজনের টাইটে আরো সবাই সায়েস্তা হয়ে যাবে। --- হুঁ হুঁ এ হচ্ছে বাবা সায়েস্তা খাঁর আমল।'

আরো কিছু অর্থহীন অভব্য উক্তির প্রতিযোগিতা চালাতে থাকে ওরা। যেন যে যত নোংরা আর অমার্জিত কথা বলতে পারবে সে তত বাহাদুর। তার সঙ্গে অনুপান অশ্লীল হাসি।

অথচ এরা একটি বিশিষ্ট কলেজের ছাত্র, লেখাপড়ায় খারাপও নয় হয়তো, যখন শিল্প, সাহিত্য, সমাজনীতি বা রাজনীতি নিয়ে কথা বলে, মনে করা যেতে পারে বুদ্ধিমান চিন্তাশীল সর্বজ্ঞ।

কিন্তু কোনো একটা উপলক্ষে যদি একবার খুলে পড়ে উপরের খোলস, ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আদিম বর্বরতা। যে বর্বরতা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম স্নেহ ভালবাসা রুচি আচরণ, সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিয়ে একটা বন্য সুখে উল্লসিত হয়।

কে জানে সত্যিই এদের ভিতরটা এই রকম অশালীন অপালিশ না এটা শুধু যুগের ফ্যাসান। কোনো কিছুকে মূল্য দেব না এই ফ্যাসান নিয়ে এরা নিজেদেরকে নিবারণ করে উন্মত্ত নৃত্য করে।

ওরা ভাবছে ওরা খুব বাহাদুর, জানে না যুগ এ কথায় হাসে। জানে না ওরাই এ যুগের প্রধান বলি। যুগ ওদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, ওদের মধ্যে যা কিছু সুন্দর যা কিছু শুভ তা' নিঃশেষে নিষ্কাশিত করে দিয়ে ওদের সেই শুকনো চামড়াখানায় জয়ঢাক বাজাতে চাইছে।

যুগ ওদের দিয়ে নোংরা কথা বলাচ্ছে। নোংরা চিন্তা করাচ্ছে, ওদের চোখ থেকে সব রং কেড়ে নিচ্ছে, মন থেকে সব রস।

তাই ওরা 'নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতা,' এই সব শব্দগুলোকে 'ভেড মডেল' বলে হেসে ওঠে। 'প্রেম' 'ভালবাসা' এ শব্দগুলোকে ধিক্কার দেয়। গুরু এবং গুরুজনকে 'টাইট' দিতে পারাটাকেই ওরা চরম আধুনিকতা ভাবে। ভাবে—মানুষ নামের জীবটার যুগ-যুগান্তরের রুচির সভ্যতার আর সংস্কৃতির সাধনাকে মুছে ফেলে, তার কেবলমাত্র জৈবিক সত্তাটাকেই 'শেষ-কথা' বলে ফতোয়া জারি করাটাই হচ্ছে আধুনিকতা।

চিরাচরিতকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় এরা চিরন্তন আচার আচরণকে উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, আর ভাবে সেটাই আধুনিকতা। ওদের কাছে আধুনিকতার সংজ্ঞা এই। সাহস আর উচ্ছৃঙ্খলতা যে এক জিনিস নয়, সেটা ভেবে দেখে না।

অধ্যাপক-প্রসঙ্গ স্তিমিত হয়ে গেলে

ওরা হয়তো মডার্ন কবিতা বা মডার্ন আর্ট নিয়ে বিতর্ক সভা বসাবে এবং বোলচাল শুনে মনে হবে প্রত্যেকেই এরা ওই 'মডার্ন' রহস্যে ওয়াকিবহাল। ওদের চলনে বলনে সেই মাতব্বরি, ওদের ভাষার ছটায় সেই তীব্রতা।

কিন্তু এরাই কি সব?

নাঃ, এরাই সব নয়।

হয়তো এরা নিতান্তই সংখ্যালঘু।

তবু এরাই যেন আজ যুবসমাজের প্রতিনিধির ভূমিকা নিয়ে আসরে নেমেছে, এদের কণ্ঠ সোচ্চার। সেই উচ্চ চীৎকারে সংস্কৃতির ক্ষীণকণ্ঠ চাপা পড়ে যাচ্ছে। আশঙ্কা হচ্ছে ক্রমশ এরাই বাঝি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

কারণ তীব্রতার একটা আকর্ষণ আছে, বলমত্ততার একটা প্রভাব আছে। আর—'ভালোছেলে' নামের ধিক্কার বাণীটা বড় ভয়ঙ্কর। তাতে ভালো ছেলেদের লজ্জায় দিশেহারা করে কোথায় না কোথায় নিয়ে যেতে পারে।

দিবাকর ভালো ছেলে নয়, দিবাকর বরং বন্যতার প্রতিমূর্তি। তাই দিবাকরের প্রেম, ভালবাসা, আসক্তি, উগ্র অসহিষ্ণু। তার মধ্যে স্নেহের স্বাদ নেই। তাই মীনাক্ষী নিজের বাড়ির দরজার মধ্যে ঢুকে গেলে দিবাকর খানিকক্ষণ হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যেন মীনাক্ষীর ওই নিশ্চিন্ত আশ্রয়টুকু ওই আরাম-আয়েস সুখ-স্বস্তিভরা গৃহকোণের অধিকারটুকু ছিঁড়ে-কুটে তছনছ করে দিতে পারলে ওর জ্বালা মেটে।

কারণ দিবাকরের ওসব নেই।

দিবাকর জানে এখান থেকে মোচড় খেয়ে ঠিকরে গিয়ে একটা বাসে চেপে পড়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যে দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে ও, সেখানে ওর ভূমিকা দরজায় দাঁড়ানোরই। যে ঘরে গিয়ে ঢুকবে সেখানে দিবাকরের কোনো অধিকার নেই।

নিতান্তই গ্রাম-সম্পর্কের এক মামার অবহেলার আশ্রয়ে বাস দিবাকরের। দিবাকর জানে এখন গিয়ে সেই প্রাসাদতুল্য বাড়িটার নীচতলায় একখানা অন্ধকার-অন্ধকার ছোট্ট ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে তাকে। যে ঘরটার অর্ধাংশ দখল করে থাকে ও বাড়ির ঝাড়ুমোছ-করা চাকর নবীন।

ঘরটা রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আর ঘুঁটে কয়লার ঘরের মাঝামাঝি কোনো এক খানে; বাইরের আলো-হাওয়ার প্রবেশ পথ বলতে একটিমাত্র সংকীর্ণ জানলা আছে গলিপথের দিকে। নবীনের শোবার চৌকীটা সেই জানলার নীচে। অতএব দিবাকরের ঠাঁই গুমট দেওয়ালের দিকে।

দিবাকরের সেই চৌকীর গা ঘেঁষেই দেওয়ালের গায়ে টানা লম্বা একটা দড়ি টাঙানো, যেমন ও দেওয়ালে নবীনের। নবীনের দড়িতে নবীনের জামা পায়জামা ধুতি সার্ট গেঞ্জি গামছা, দিবাকরের দড়িতে দিবাকরের প্যাণ্ট বুশসার্ট লুঙ্গি তোয়ালে গেঞ্জি।

নবীনের মাথার কাছের দেওয়াল-আলমারীতে নবীনের গোলাপ ফুল আঁকা টিনের সুটকেস, ক্যালেণ্ডার থেকে সংগৃহীত নানা দেবদেবী ও সিনেমা স্টারের ছবি, বড় সাইজের একখানি আর্শী, প্লাস্টিকের চিরুণী, 'কুন্তল বাহার' তেলের শিশি, 'মলয়' সাবান, 'রেণু' পাউডার, আর গোছাভর্তি দাঁতন কাঠি।

দিবাকরের মাথার কাছের দেওয়াল-আলমারীতে দিবাকরের সস্তাধরণের চাউশমার্কা নকল চামড়ার সুটকেশটা ধরে না বলে, সুটকেশটা ওর চৌকীর নীচে ঢোকানো আছে। দিবাকর সেটাকে সর্বদা তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখে এবং যখন তখন তালা খুলে উলটেপালটে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে হিসেব মিলোতে বসে সব ঠিক আছে না চুরি গেছে।

আলমারীর তাকে দিবাকরের নবীনের থেকেও সস্তামার্কা আর্শী চিরুণী তেল সাবান মাজন সেভিংসেট। আর আছে পাঠ্যপুস্তক ও খাতা কলম, পার্থক্য শুধু এই।

দিবাকর এখন গিয়ে পরনের সার্ট ট্রাউজার সাবধানে ভাঁজ করে দড়ির আলনায় তুলে রেখে লুঙ্গিটা জড়িয়ে বেজার মুখে নিজের চিরশয্যা পাতা চৌকীটায় গিয়ে বসে কিছুক্ষণ হাতপাখা চালিয়ে গায়ের ঘাম শুকিয়ে নিয়ে তারপর উঠোনের ধারের চৌবাচ্ছাটার কাছে গিয়ে উঁকি মারবে। যদি দেখে কিছু কিঞ্চিৎ জল আছে, মুখের পেশীগুলো তার একটু ছড়িয়ে পড়বে; উলটোটা হলে সেই পেশীগুলো আরো গুটিয়ে যাবে, মুখটা ঝামা ইঁটের চেহারা নেবে—মগ ঠুকে ঠুকে কোনরকমে একটু স্নান সেরে যখন ঘরে এসে কুচি কুচি করে ছাঁটা চুলগুলো ঝেড়ে আঁচড়াবে দিবাকর তখনও সেই চেহারাটাই বজায় থেকে যাবে। ঝামা ইঁটের চেহারা।

বরং আরো বেড়েই যাবে মুখের সেই ঝামাত্ব; দোতলা তিনতলার আলোঝলমলে ঘর-বারান্দাগুলোর চেহারা স্মরণ করে।

ওই ওপরতলাগুলোকে চোখে দেখবার সুযোগ তার মাঝে মাঝে হয়, মামী কখনো কখনো কোনো কুট ফরমাসে ডাকেন। বলেন, 'নবনের দ্বারা এ সব তো হবে না, বিল্টুটাও তেমনি বুদ্ধু। তুমি এটা কর দিকি।'

কদাচ 'তুমি' ছাড়া তুই বলেন না মামী, নিকটতম স্নেহ সম্বোধনে আত্মীয় সম্পর্কটাকে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছে তাঁর নেই বলেই মনে হয়।

দিবাকর মামীর ঘরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, মামী হয়তো কিছু কেনবার জন্যে টাকা দেন, হয়তো কোনো একটা ঠিকানা আর বাসভাড়া। কোনো খবর আনতে হবে, কি কোনো খবর পৌঁছুতে হবে।

হয়তো তেমন আদেশ দিবাকরের পরীক্ষার দিনও আসতে পারে। দিবাকরের সাহস হয় না যে কথা উল্লেখ করবার। কারণ এখানের ওই নবীনের ঘরের অর্ধাংশের আশ্রয়টুকু ও দুবেলার নিশ্চিত অন্নের নিশ্চিন্ততাটুকু এই মামীরই বদান্যতায়।

প্রথম যখন দিবাকর দেশ থেকে এসে ন্তুন মামা সম্পর্কের ভরসাটুকু গ্রহণ করে এই বড় বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল মামা প্রকাশ মণ্ডল তো প্রায় সেই দরজা থেকেই বিতাড়িত করেছিলেন। 'এখানে জায়গা কোথায়' বলে।

মামীই দয়ার গলায় বলেছিলেন, 'ও' ও তো তোমার ওপরতলায় ওঠবার বায়না করছে না গো, নবনের ঘরের একপাশে একখানা চৌকী পেতে পড়ে থাকবে। থাকার অভাবে গরীবের ছেলের লেকা-পড়াটা হবে না।'

প্রকাশ মণ্ডল বেজার গলায় বলেছিলেন, 'আত্মীয় সম্পর্কটা হচ্ছে বিষধর সর্পের মত বুঝলে? দুধকলা দিয়ে পুষেছ কি মরেছ।'

মামী আরো দয়ার গলায় বলেছিলেন, 'দুধকলার বায়না আবার কে করছে গো? সাপ্টা হেঁসেলের দুটো চালভাত গুড়-রুটি খাবে, নিজের দিন কিনে নেবে, হয়ে গেল ব্যস। না না তুমি অমত কোরো না, তোমার ঘরে মা-লক্ষ্মী হেলাফেলা। একটা পেট বৈ তো নয়।'

সেদিন সেই বহু আড়ম্বরপূর্ণ ঘরে পালঙ্কোপবিষ্টা অষ্টালঙ্কারভূষিতা এই মহিলাটিকে দেবীসদৃশ মনে হয়েছিল দিবাকরের, কারণ দিবাকর তখন ভয়ঙ্কর একটা উচ্চাশা নিয়ে দেশ থেকে চলে এসেছিল সদ্য স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে। হোস্টেলে থেকে পড়বে এমন সামর্থ্য নেই। দাদারা বিরক্ত চিত্তে মাত্র পড়ার খরচাটা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

তা' মামীর করুণায় থাকিটা হয়ে গেল, কোথা থেকে যেন একটা পায়া নড়বড়ে চৌকী এসে গেল নবীনের ঘরে, মামীর খাস ঝি অবলা এসে দাঁড়িয়ে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল কোন দিকে নবীনের জিনিষপত্র থাকবে, কোন দিকে দিবাকরের।

'উনি লেকাপড়া করবে, জাঁল্লার দিকটা ওনার থাক---' এ বিবেচনা প্রকাশ করেছিল অবলা। কিন্তু নবীনের কাঠকবুল প্রতিজ্ঞা জানলার ধারের অধিকার ছাড়বে না। কাজেই দেয়ালের দিকেই দিবাকর কায়েম হলো।

বরাদ্দ হলো সাপ্টা হেঁসেলের চালভাত গুড়রুটি। যে হেঁসেলটার অধীনস্থ প্রজা হচ্ছে প্রকাশ মণ্ডলের দোকানের কর্মচারিকুল---নবীন, বিষ্টু প্রমুখ। অবলা খাস ঝি। অবলা এদের দলে নয়। কর্তা-গিন্নীর হেঁসেলের তলানিতেই তার ভালো ব্যবস্থা হয়ে যায়।

তখন মামার এক বছর চোদ্দর মেয়ে ছিল যার নাম ব্রজবালা; মেয়েটা সম্পর্ক সূত্র শুনে দিবাকরকে 'দাদা' বলতে সুরু করেছিল এবং বিশেষ একটু নেকনজরের বশে লুকিয়ে চুরিয়ে দিবাকরকে দুধটা মিষ্টিটা মাছটা ডিমটা সাপ্লাই করতে সুরু করেছিল, কিন্তু নবীনের বিশ্বাসঘাতকতায় লুকোচুরিটা প্রকাশ পেয়ে গেল। ঘরের ভাগ দিতে বাধ্য হওয়া পর্যন্ত নবীন দিবাকরের দিকে আক্রোশের দৃষ্টি ব্যতীত কদাচ সমীহর দৃষ্টিতে তাকায় না, এ হেন সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়ল না।

ফলস্বরূপ ব্রজবালার নীচে নামা বন্ধ হলো, দিবাকরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ হলো। মরুভূমির ওয়েসিসটুকু শুকোলো।

তারপর তো ব্রজবালার বিয়েই হয়ে গেল।

এখন ব্রজবালা শ্বশুরবাড়ি থেকে আসে যায় সোনার ঝলক দিয়ে, কারণ তার শ্বশুর গুড়ের কারবারে অনেক লক্ষপতি। সেই সোনার ঝলসানিতে ব্রজবালারও বোধ করি মনে থাকে না দিবাকর নামে কেউ একটা থাকে এ বাড়িতে। দিবাকর রাগে ফোঁসে।

তবু মাথার উপর ছাদ।

কোলের গোড়ায় বাড়া ভাতের থালা।

তাই দিবাকর এখানেই পড়ে আছে।

পড়ে থাকার আর একটা সুবিধে বাইরে থেকে এসে ঢোকে তো মস্ত দেউড়ীটা ঠেলে। সাবান কেচে ইস্ত্রী করে বহু কষ্টে ফিটফাট করা পোষাকটি পরে যখন বেরোয় কলেজের বই খাতা নিয়ে তখন তো বেরোয় সেই দেউড়ীটা খুলে।

লোককে তো বলা যায় 'বিরাট' মামার আদুরে ভাগ্নে। সেটাই কি কম পাওয়া। সেই আদরের চেহারাটা তো বন্ধুসমাজ দেখতে আসে না?

বাড়িতে কাউকে ডাকতে পারে না দিবাকর, কারণ মামা 'ছাত্রজীবনে আড্ডা দেওয়া' পছন্দ করেন না।

এই বালির দুর্গে বাস দিবাকরের।

তাই ভিতরে তার এত দাহ।

তাই তার প্রেয়সী যখন নিজের পাথরের দুর্গে গিয়ে ঢোকে, আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে সে।

সকালবেলা ছেড়ে রেখে যাওয়া লুঙ্গিটা পরে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে আর এক আক্রোশের মনোভাব নিয়ে দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখছিল দিবাকর।

চকমিলোনো ছাঁচের বাড়ি, নীচতলা থেকে ওপরতলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা যায়। থাকলে দেখতে পাওয়া যায় চড়া পাওয়ারের আলো জ্বলা। দেওয়ালে রং করা কেমন শনশন করে বিদ্যুৎ পাখা ঘুরে ঘুরে বাতাসের দাক্ষিণ্য বিতরণ করছে।

দোতলায়, তিনতলায়।

দোতলাটা মামা-মামীর মন্দির, তিনতলাটা মামীর ভাই-ভাজের। সমান রাজকীয়। অথচ ওরাও আশ্রিত –

ভাবলো দিবাকর। অনেক বাড়তি জায়গা আছে ওপরতলার। ওদের ঘরের একাংশে গিয়ে বসলে আলাদা করে বিদ্যুৎ খরচ হবে এমন নয়।

তবু দিবাকরকে চাকরের ঘরের কোণে বসে ভাঙা হাতপাখায় বাতাস খেতে হয়।

দিবাকর তবে অন্নদাতা আর আশ্রয়দাতা বলে কি করে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হবে সে ওই প্রকাশ মণ্ডলের প্রতি?

দিবাকর কেন সর্বদা চিন্তা করবে না কি করে লোকটার অনিষ্ট সাধন করা যায়।

চিন্তা করে, কিন্তু সুযোগ নেই।

নির্বোধ বৃজবালাটার উপর দিয়ে সে আক্রোশ মিটিয়ে নেবার বাসনা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ওই শয়তান নবীন, সর্বদা শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে থেকেছে, সুযোগের সুযোগ আসেনি।

তারপর তো বৃজবালা বৃজধামে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো।

আজ নাকি এসেছে বরের সঙ্গে। প্রকাণ্ড গাড়ী চড়ে।

গাড়ীটাই গেট থেকে সংবাদ বহন করছে। দেখলে বিষ ওঠে।

জামাইটা নাকি একটা 'পাশ' করা। সেই গৌরবে গরবিনী মামী এমন ভাব করেন যেন জামাতা না দেবতা।

এই পৃথিবীতে থাকতে হয় দিবাকরকে।

বামুন ঠাকুর একটা পিতলের রেকাবী করে জলখাবার রেখে গেল। রুটি, একটুকরো বেগুন ভাজা, খানিকটা গুড়।

নবীনের সঙ্গে এইটুক পার্থক্য, দিবাকরের নবীনের থেকে এইটুকু খাতির, জলখাবারটা ঘরে দিয়ে যায়। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে আবেদন করতে হয় না।

তবু ওই থালাটা দেখলেই যেন গা জ্বালা করে। কিন্তু ফেলে দেওয়ার সামর্থ্যও নেই। খিদের সময় অযাচিত পেয়ে যাওয়া গরম রুটির মূল্যই কি কম?

দেশের বাড়িতে এই বস্তুটাও তো দুর্লভ ছিল। খাবে খাও মুড়ি চিঁড়ে খাও।

এখন আর দেশের বাড়িতে গিয়েও ভালো লাগে না। দিবাকরের এই কলকাতার মোহমদ নেশাচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে। থাক দৈন্য, হোক অপমানের ভাত, তবু তো জুটছে এই মদ।

কলকাতার আকাশে বাতাসে, প্রতিটি ধূলিকণায় মদিরাস্বাদ।

তাই যারা বছরের পর বছর ফুটপাথে পড়ে থাকে, লোহার পাইপের মধ্যে বাস করে, স্টেশনের প্লাটফর্মে জন্মমৃত্যু বিয়ের লীলায় লীলায়িত হয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। যারা মানুষের চেহারা নিয়ে জানোয়ারের জীবনে নিমজ্জিত থাকতে বাধ্য হয়, তারাও পারে না কলকাতাকে ছেড়ে যেতে।

কলকাতা তার 'অক্টোপাশের' বাহুতে বেঁধে রেখেছে সবাইকে।

দিবাকরও সেই বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে।

দিবাকরের দাদারা বলেছিল, 'একটা পাশ করেছো, আর দুটো পাশ করে এসে গাঁয়ের ইস্কুলে মাস্টারী করো নিজেরও ভালো গাঁয়েরও ভালো।'

কিন্তু দিবাকর জানে গ্রামের জীবনে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয় তার।

দিবাকর এই চার বছরেই কলকাতার রসে জারিত হয়ে গেছে। দিবাকর কলকাত্তাইদের সঙ্গে তাল দেবার চেষ্টায় এত জোরে দৌড় দিয়েছে যে, তাদের ছাড়িয়ে গেছে।

দিবাকর তাই তার নিগ্রো নিগ্রো চেহারা নিয়েও অধ্যাপকের মেয়ের চোখে 'হীরো'।

●

চেহারাটার ওই বিশেষণ স্পষ্ট করে কানে এল।

খাওয়ার শেষে বেগুন ভাজার খোসাটাও মুখে পুরে যেন তাড়াতাড়ি উঠোনের কলে জল খেতে যাচ্ছিল দিবাকর (না জলের গ্লাশ দিয়ে যায় না ঠাকুর) দেখলো সিঁড়ি দিয়ে জামাই নামছে। পিছু পিছু বৃজবালা।

বৃজবালার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে না সেও চলে যাবে। মনে হচ্ছে এবার থাকতে এসেছে। অতএব বরকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। বিদুষী নয় বলে কি আপ-টু-ডেট হতে পারে না?

গদগদ হাসিতে বিগলিত হয়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে।

জল খাওয়া হল না, চট করে গলির দিকের প্যাসেজে ঢুকে পড়লো দিবাকর। আর সেই সময় পিছনে পটকা ফাটলো।

'কাক্রী কাক্রী' দেখতে ওই ছোকরাটি তোমাদের কে বল তো?'

'কাক্রী কাক্রী?' বৃজবালা ভুরু কুঁচকে বলে, 'দিবুদার কথা বলছো না কি? ও মাগো জানো তোমার ডবল বিদ্বান উনি।'

'তাই নাকি? আহা।'

গুড়ের কারবারের ভবিষ্যৎ মালিক কণ্ঠে গুড়ের প্রলেপ বুলিয়ে বলে, 'তবে তো তোমার বাবার উচিত নয় ওঁকে চাকরের ঘরে থাকতে দেওয়া। যথাযোগ্য সম্মানে- - -'

বাকি কথা শোনা গেল না। উঠোন পার হয়ে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল কম্পাউণ্ডে। যেখানে গুড়ের কারবারির প্রকাণ্ড গাড়ীখানা অপেক্ষা করছে।

জলতে জলতে ঘরে ফিরে এল দিবাকর জল খেতে ভুলে। আর সেই মুহূর্তে তার আগুনের ঢেলার মত চোখ দুটোয় জলে উঠলো একটা রূঢ় সঙ্কল্পের শিখা।

একটা নির্বোধ মেয়েকে নষ্ট করতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়?

কিছু না কিছু না।

বিবাহিতা?

পতিব্রতা সতী?

ফোঃ।

ওসব কথাগুলোর কোনো মূল্য আছে নাকি?

বরং বিবাহিতাদের সাহস বেশী। দিবাকরের সে অভিজ্ঞতা আছে। স্কুলের

ওরা গাল করে আহ্লাদে। আগেই সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে দিবাকর। রাঙাপিসির মেয়ে চামেলীদির কাছ থেকে। অবশ্য বয়েসটা তার তখন নিতান্ত স্কুল-জনোচিত ছিল না।

চামেলীদি'র শ্বশুরবাড়িতে 'জ্বালা' তাই চামেলীদি বাপের বাড়িতে বসে থাকে। বর আসে সপ্তাহে সপ্তাহে।

কিন্তু চামেলীদির ওই মুষ্টিভিক্ষায় পেট ভরে না। তাই চামেলীদি উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়ায়। আর হেসে হেসে বলে, 'বিধবা নই, আইবুড়ো নই, ভয়টা কি?'

অতএব বুঝতে বাকি থাকেনি দিবাকরের ভয়ের বাধাটা আসলে কোথায়?

দিবাকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

দিবাকর তার সেই চামেলীদিকে দিয়ে সব মেয়েকে বিচার করছে।

দিবাকর ফিরতি মুখে পথ আগলায়, 'বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হয়ে বুজবালা যে আর গরীবদের দেখতেই পাও না?'

বুজবালা হঠাৎ এই আক্রমণে থতমত খায়, অপ্রস্তুত গলায় বলে, 'বাঃ দেখতে পাবো না কেন?'

'কই আর পাও? আসো যাও, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, তুমি তো ফিরেও চাও না।'

'আমি তো বেড়িয়েই চলে যাই এসে থাকতেই পাই না। এবারেই কিছুদিন—'

বুজবালা একটু রহস্যময় কটাক্ষ করে।

অর্থাৎ এবারে ব্যাপার আলাদা। এবারে কিছুদিন থাকবার অধিকার নিয়ে এসেছে।

দিবাকর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে, নবীন নেই ধারেকাছে, কেউই নেই। চট করে বুজবালার গালটায় একটা টোকা দিয়ে নীচু গলায় বলে ওঠে, 'তাই নাকি? নতুন খবর?'

বুজবালা রেগে ওঠে না।

বুজবালা লাল লাল মুখে বলে, 'আঃ অসভ্য।'

দিবাকর একটা বেপরোয়া হাসি হেসে বলে; 'এইটুকুতেই অসভ্য? উঃ কী' ভাগ্যিস। ক্লাবের মেয়েদের সঙ্গে বা চালাই দেখলে কী যে বলতে তুমি।'

বুজবালা মাটির সঙ্গে আটকে যায়।

বুজবালা বিস্ফারিত চোখে বলে, 'তোমাদের কেলাশে মেয়েমানুষও আছে না কি?'

'তা' নেই?'

'তাদের সঙ্গে তুমি এই সব ইয়ার্কি করো?'

'এই সব?' দিবাকর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'আরো কত সব।'

'ধ্যেৎ।'

'ধ্যেৎ তো ধ্যেৎ।'

'এই দিবুদা সত্যি?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি? বিশ্বাস করো না করো তোমার ইচ্ছে।'

বুজবালা হঠাৎ সতেজে বলে, 'ওই জন্যেই ও বলে লেখাপড়া শিখলে মেয়েমানুষ জাহান্নমে যায়।'

'ও'? মানে তোমার বর।'

'তবে' না তো কি।'

'বলবেই তো। নিজে তো সে আস্বাদ পেলো না কখনো।'

'আহা, ও কক্ষণো ও রকম নয়।'

'ভালো। না হলেই ভালো। তুমি যখন অত শুচিবাই। তবে আমি তো কিছু দোষ দেখি না।'

'দোষ দেখো না?'

বুজবালা যেন হঠাৎ ভয় পায়, বলে ওঠে, 'যতো · বাজে কথা। শুনতে চাই না।' বলে দুড় দুড় করে পালায়।

দিবাকর একটা পরিতৃপ্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে।

ভয় পেয়েছে।

পাক। সেটাই দরকার।

ভয়ের কাছেই আকর্ষণ।

দিবাকর অপমানের শোধ নেবে।

দিবাকর নিশ্চিত জানে বুজবালা ওই ভয়-ভয় করা ভয়ঙ্কর কথার লোভে সুযোগ সৃষ্টি করবে। নবীনকে ছুতো করে ভাগাবে।

গা ছমছমে নির্জনতায় এসে বসে বলবে, 'বল তো শুনি তোমার কেলাশের মেয়েদের কথা। আমার তো বাবু বিশ্বাস হয় না, তোমার নিশ্চয় সব বানানো।'

দিবাকর অবশ্যই বানাবে।

বুজবালা সেই বানানো গল্প গো-গ্রাসে গিলবে, গো-গ্রাসে বিশ্বাস করবে, আর আস্তে আস্তে জালে পড়বে। মাকড়সার জালে বন্দিনী পোকার মত ছটফট করবে। কিন্তু বেরোতে পারবে না। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

আর হয়তো ভাববে, 'আমার আবার ভয়টা কি? বিধবা নই, কুমারী নই—'

●

কিন্তু মীনাক্ষী?

তাকে, কবে সম্পূর্ণ কবলিত করে ফেলতে পারবে দিবাকর?

সেটার প্রয়োজন আছে।

দিবাকর তার নিজ গণ্ডি থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে চায়। প্রফেসর মৈত্রের মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে সেই চাওয়াটা রূপ পেতে পারে। আর ওই বিয়েটার জন্যেই চাই কবলিত করার দরকার।

মেয়েগুলো ভারী বোকা হয়।

একটু এদিক ওদিকেই ভাবে আমার সব গেল; গেল আমার শুচিতা, আমার পবিত্রতা, আমার সততা।

অতএব বিয়ে ভিন্ন আর গতি নেই আমার। বিশেষ করে মীনাক্ষীর মত ভীরু মেয়ে। ও যেই ভাববে আমার সব গেছে, তখনই ও ওর সেই আদর্শবাদী অধ্যাপক বাবার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ে বিয়ের জন্যে আর্জি করবে। দিবাকরকে কিছু করতে হবে না।

দিবাকর সেই ভরসাতেই আছে।

দিবাকর তাই কড়া কড়া বিদেশী নভেল পড়ে বোলচাল মুখস্থ করে রাখে। যাতে মীনাক্ষীকে বিধ্বস্ত করে ফেলা যায়।

ঘরে এসে দিবাকর আবার চৌকীতে বসলো, দেখলো বালিশের তলায় একটা পোস্টকার্ড গোঁজা।

তার মানে এসেছে কোনো সময়, নবীনবাবু অনুগ্রহ করে রেখে দিয়েছেন।

দিবাকরের [illegible] হয়, হয়তো তার অনুপস্থিতিতে আসা চিঠিগুলো ফেলে দেয় নবীন। অবশ্য চিঠি কোথা থেকে আসবে সেটা জানা নেই দিবাকরের।

ভাল চিঠি। প্রত্যাশার চিঠি।

মাঝে মাঝে যা আসে সে তো ওই কদর্য অক্ষরে রচিত পোস্টকার্ড মাত্র। ওটাকে যত্ন করে রেখে না দিলেও ক্ষতি ছিল না। ওতে যে কি লেখা আছে দিবাকরের জানাই আছে। চিঠি দিবাকরের দাদার লেখা—

'কল্যাণবরেষু—

দিবাকর, পরে সবিশেষ জানাই বাটিস্থ সকলের কুশল। তবে মাতা-ঠাকুরাণী বাতের বেদনায় বিশেষ কাতর এবং মধু ও গোপাল পেটের রোগে ভুগিতেছে, তৎসহ জ্বর। প্রভাকরও কয়েকদিন যাবৎ আমাশায় কষ্ট পাইতেছে। তা ছাড়া তোমার বড় বউ-ঠাকরুণও 'কাবকুল' [illegible] গত। এই সব কারণে [illegible] ভাল যাইতেছে না।'

'বাটিস্থ সব কুশল' এর পর [illegible] ফিরিস্তি দাখিল করে দাদা অতঃপর সুরু করবে 'ঝড়ে একটি আমগাছ পড়িয়া গিয়াছে। বুধীর একটি বকনা বাছুর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাঁশ বাগান হইতে কে বা কাহারা কাটিয়া লইয়াছে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর শেষ কথা তোমার কবে একজামিন শেষ হইবে? তোমার আসার আশায় দিন গুণিতেছি, তুমি আসিয়া পড়িলেই সব সুসার হইবে [illegible] নিকট এই প্রার্থনা। ইতি—

নিত্য আঃ---

তোমার বড়দাদা

এই চিঠি।

পর পর সাতখানা চিঠি সাজিয়ে রাখলে মনে হবে একই চিঠির কার্বন কপি। শুধুমাত্র কখনো আমগাছের বদলে জামগাছ, কখনো বুধীর বদলে মঙ্গলা, অথবা বকনার বদলে এঁড়ে।

তা ছাড়া সব এক।

প্রবৃত্তি হয় না হাত বাড়িয়ে হাতে নিতে। প্রবৃত্তি হয় না পড়তে। তাই দিবাকর ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে মাত্র।

আশ্চর্য, দিবাকর সম্বন্ধে কী ধারণা ওদের। দিবাকর লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি গিয়ে দাঁড়ালেই ওদের ছেলের পেটের অসুখ, মায়ের বাত, ভায়ের ফোঁড়া ইত্যাদি সব সেরে যাবে আর হবে না। পড়শীরা বাঁশ কেটে নেবে না। ঝড়ে আর গাছ পড়বে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

থাকো ভুয়ো এই আশা নিয়ে:

দিবাকর আর যাচ্ছে না। দিবাকর তোমাদের আত্মীয় বলতে লজ্জা পায়।

[ক্রমশ।

বাংলা ছায়াছবি

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
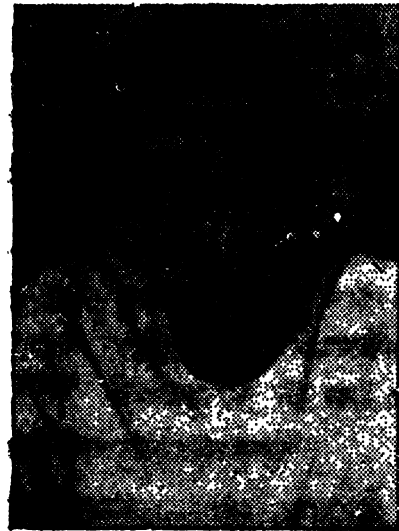
অজয়ের মত ছেলে সংসারে খুব অল্পই দেখা যায়। নম্রতা, ভদ্রতা ও ব্যবহারে অজয়ের জুড়ি মেলা ভার। তবু এ হেন ছেলেকেও তার দাদা ভুল বুঝল, অহঙ্কারী ভাবলো অথচ এই অজয়ের জন্য হরি কি না করেছেন। স্ত্রীর গায়ের গহনা বিক্রী করেছেন, মালিক রমণীমোহনের গদী থেকে তিনি নিজে টাকা চুরি করেছেন, জেল খেটেছেন। কিন্তু কেন? শুধু একমাত্র মায়ের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে করেই হোক না কেন ভাইকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন, মানুষ করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়েও ভাই এমন পরপর হল কি করে। নিশ্চয়ই তৃতীয়জন কেউ ছিল তিনি হলেন এঁদেরই কাকা বীরেশ্বর। মা মারা যাবার পর হতে ভাইপোদের সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টায় ছিলেন তিনি।

এদিকে হরির মাসিক মাহিনা মাত্র পঁচিশ টাকা। অথচ ভাইয়ের পরীক্ষার জন্য তিন শো টাকা পাঠাতেই হবে। উপায়ান্তর না দেখে তিনি মালিকের সিন্দুক ভেঙ্গে সেই টাকা ভাইকে পাঠিয়েছেন। যার জন্য হরির হয়েছে ন' মাসের জেল।

জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী এসে কানে আসে অশুভ সংবাদ। রতন তাঁর নেই। তাঁদের ছেড়ে সে চলে গেছে দূরে বহুদূরে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন হরি। স্ত্রী সুরমা বলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা। কারণ এখানে তাঁদের পরিচয় তাঁরা চোর। হরিও সে কথায় সায় দেন। কিন্তু গ্রামের প্রতিবেশী সহৃদয় হরগোপাল নিষেধ করেন। মেয়ে কমলা ও তার মাও অনুরোধ করেন এ কাজ হরি যেন না করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা চলে আসে কোলকাতা শহরে।

'দুরন্ত চড়াই' চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়
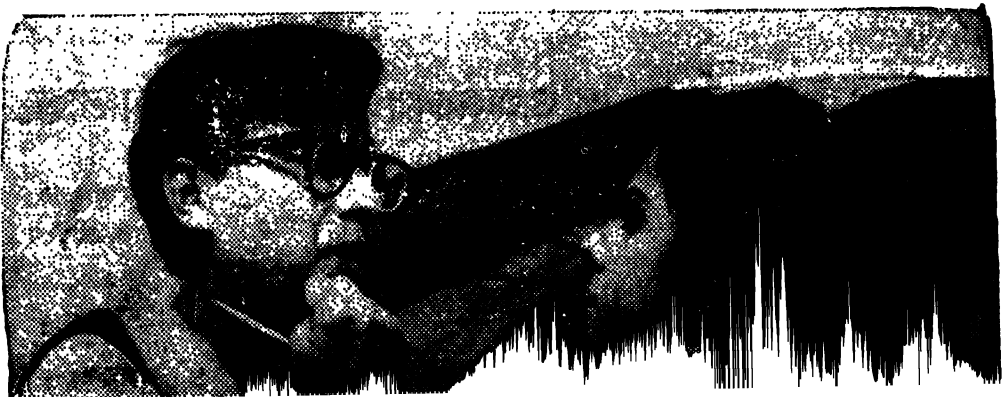
এদিকে অজয় গ্রামে ফিরে এসে দাদা-বৌদিকে বাড়ীতে খুঁজে পায় না। কমলাই তাকে সব কথা জানায়। অজয়ের বুঝতে বাকী থাকে না বীরেশ্বর কাকারই চক্রান্তে এ সব ঘটনা ঘটেছে। দাদাও তাকে সেই কারণেই ভুল বুঝেছে। অজয় আর অপেক্ষা করে না। দাদা-বৌদির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। আসার সময় কমলাকে কথা দিয়ে আসে যে করেই হোক দাদাকে সে খুঁজে বার করবেই।

কিন্তু বললেই কি হয়। কোলকাতা শহর কি এতই ছোট। তাই অজয় অনেক খুঁজেও যখন পেল না তখন একরকম প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে বললেই হয়।

এদিকে হরি কোলকাতায় এসে কোন এক কারখানায় কুলীর কাজ জোগাড় করে নিয়েছে। সামান্যই মাইনে কিন্তু কোনরকমে দিন চলে যায়। গাঁ থেকে হরগোপালবাবু খোঁজ নেন। ঘটনাচক্রে মিঃ রায়ের ঐ কারখানাতেই একদিন হরি দেখতে পেয়ে যান অজয়কে অফিসারের পদে। দেখেও কথা বলেন নি হরি। একদিকে আত্মমর্যাদা অপরদিকে অভিমান। এই দুই-ই অজয়ের সঙ্গে কথা বলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কিন্তু এইভাবে লুকিয়ে বেড়ানো একদিন ধরা পড়ে গেল। পাশকাটিয়ে চলে যাওয়ার সময়ই অজয়ই আবিষ্কার করলো তার দাদাকে। আর ঠিক সেই সময়ই ঘটল দুর্ঘটনা।

মিঃ রায়ের গাড়ী করেই অজয় নিয়ে এলো তার দাদাকে বস্তীর এক বাড়ীতে। এসে দেখলো বৌদি সুরমা শয্যাগত। পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সেবা করছে বস্তীরই অপর এক ছেলে শঙ্কর। নিজের দাদা না থাকায় হরিকে যে দাদারই মত শ্রদ্ধা করে, বলা চলে তারই চেষ্টায় হরির এই চাকরী। দাদার পরিপূর্ণ স্নেহও শঙ্কর পেয়ে থাকে হরির কাছ থেকে।

অজয়কে দেখে সুরমা চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না। অজয় আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরে তার বৌদিকে। একদিকে হারানো বৌদি অপরদিকে শঙ্কর যেন সেও হারানো রতন।

মিঃ রায়ও থাকতে পারেন না। সুরমার কথা শুনে এবার চোখে দেখে তিনিও যেন কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েন। বলে ওঠেন আমাদের ঘরে ঘরে যদি সুরমা দেবীর মত বৌদি থাকেন তাহলে ঠাকুরপোদের চিন্তা কি?

কমলা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিল। এবার ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন অজয়ের কাছে। মিলনের আনন্দে তাঁর চোখেমুখে তখন লাল আভা।

পূর্ণেন্দু প্রডাকসন্সের পতাকাতলে ছবিটি পরিচালনা করছেন দিলীপ বসু। কাহিনী চিত্রনাট্যও তাঁর। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন রবীন চ্যাটার্জী। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন, হরি—কালী ব্যানার্জী, সুরমা—সন্ধ্যারাণী, অজয়—অনিল চ্যাটার্জি, কমলা—লিলি চক্রবর্তী, হরগোপাল—পাহাড়ী সান্যাল, কমলার মা—পদ্মা দেবী, বীরেশ্বর—কালী চক্রবর্তী; মিঃ রায়—বিকাশ রায়, শঙ্কর—অনুপকুমার। এ ছাড়া আছেন, মঞ্জিলা দেবী, কমল মিত্র, মাঃ বাপী ও মাঃ শঙ্কর প্রমুখ।

হীরেন নাগ পরিচালিত 'সবরমতী' চিত্রে একটি মুখ্য চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবী

নাট্যলোক

জননী, বাঙালী ও শুভদা
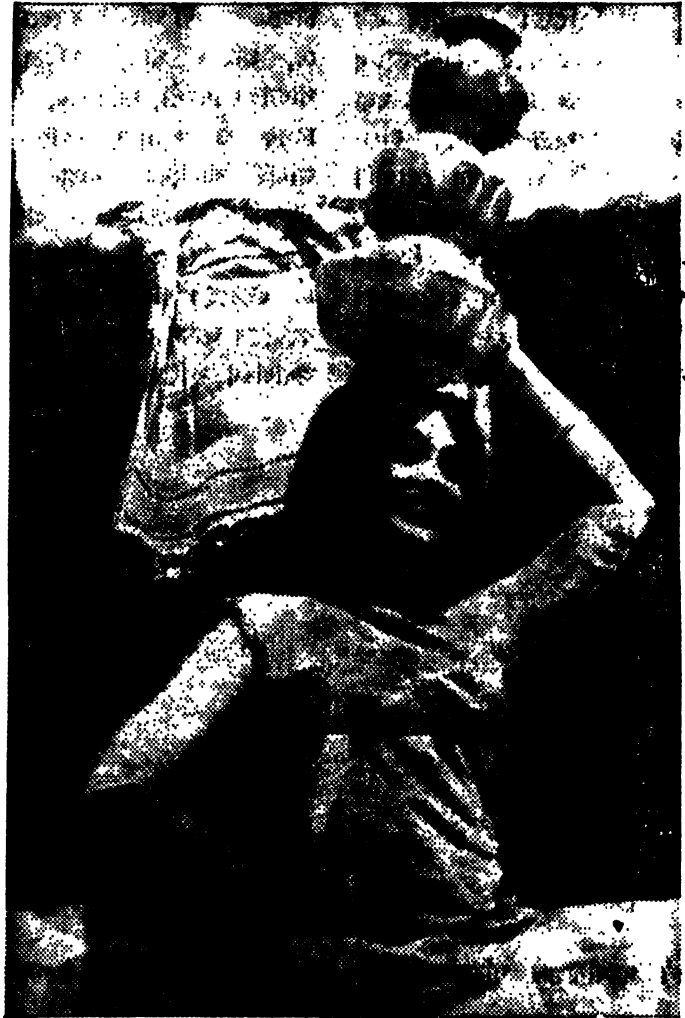
গত ১৫, ১৬ ও ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৮ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনী তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করলেন। যথাক্রমে শচীন সেনগুপ্ত রচিত 'জননী'; ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক 'বাঙালী' এবং শরৎচন্দ্রের শুভদা কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীরাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী। নাটকগুলি পরিচালনা করেন রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী ও জীবন গোস্বামী। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শ্রীশচীন বসু। শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনী নাটকগুলির আন্তরিকতা ও মুন্সিয়ানার সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে যে কঠিন পরিশ্রম করেছেন তা অনস্বীকার্য। শিল্পীদের বলিষ্ঠ অভিনয় দর্শকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পেরেছে বলা যায়। শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনীর অভিনয় মাধুর্যমণ্ডিত। ইতোপূর্বে এই সংস্থা নাটক মঞ্চস্থ করে ধন্যবাদভাজন হয়েছিলেন। শিল্পীদের সংলাপ বলা প্রশংসনীয়। নাট্য-পরিচালক রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী ও জীবন গোস্বামী নাট্য পরিচালনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীশচীন বসু পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

'জননী' নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন জীবন গোস্বামী, আশা বোস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে।

'বাঙালী' নাটক সার্থক হয়েছে। নটসূর্য নরেশ মিত্রের অভিনয় দর্শকসাধারণকে বিশেষ মুগ্ধ করে। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে নতুন করে বলা বাহুল্য। অন্যান্য ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী, জীবন গোস্বামী, অপর্ণা দেবী, সবিতা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা পাল, আশা বোস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শুভদা' নাটকে পাঁচুর চরিত্রে সব্যসাচী হাজরার অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের। হারান মুখুজ্যের চরিত্রে জীবন গোস্বামী দর্শক-সাধারণকে মুগ্ধ করেছেন। শুভদা, ললনা ও কাত্যায়নীর চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন গীতা দে, প্রতিমা পাল, সবিতা মুখোপাধ্যায়। শিল্পী, নাট্যকার, সঙ্গীত-পরিচালক ও অন্যান্য সহশিল্পিবৃন্দকে জানাই আমাদের ধন্যবাদ। শুভদা নাটকটি পরিচালনা করেন রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী এবং তাঁর পরিচালনা সার্থক হয়ে উঠেছে। 'বাঙালী' নাটক পরিচালনা করেছেন জীবন গোস্বামী এবং তিনিও অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত পাম্প ফিল্মসের 'চৌরঙ্গী' চিত্রে উত্তমকুমার ও জয়শ্রী সেন

সুখের পায়রা

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কাইটন ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলো দাশগুপ্তার 'সুখের পায়রা' নাটকটি সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। সংস্থার অভিনয়শিল্পীরা ঐ দিনের অভিনয়ে দর্শকদের মন জয় করতে পেরেছিলেন, দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়, বিশেষ কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেন মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না মিত্র, নৃপেন সাহা, সাধন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ শেঠ ও প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়, এঁরা অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন, এছাড়া অজয় মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, অতীন্দ্রনাথ সোম, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ ঘোষ, দেবিকা দাস, ইলোরা দে, রাইমোহন রায়, নিত্যানন্দ দত্ত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। অরুণকুমার সেনগুপ্ত কৃতিত্বের সঙ্গে নাটকটি পরিচালনা করেন।

উত্তর পুরুষ

শিবাজী সংঘ তাঁদের উনবিংশ বার্ষিক উৎসবে দীপ্তিকুমার শীল রচিত 'উত্তর পুরুষ' নাটকটি সম্প্রতি মহাজাতি সদনে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। হাস্যরসাশ্রিত বলিষ্ঠ সংলাপ ও বিভিন্ন টাইপ চরিত্রের আবির্ভাব নাটকটিকে উপভোগ্য করে তোলে। শিল্পীদের অভিনয়ও প্রশংসার যোগ্য। বিশু চট্টোপাধ্যায়ের মিঃ রায়, দীপ্তিকুমার শীলের মৃণাল, দিলীপ বসাকের শৈলেন, ডাঃ বিমলচন্দ্রের রামকেষ্ট, বিশু রায়ের সমাজপতি ও গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ন্তী অভিনয়গুণে প্রাণবন্ত, অসীম সরকার—পাইলট, সত্য কুণ্ডু—তরুণ, মিহির চন্দ্র—নরেন, প্রশান্ত মজুমদার—অনুকূল, ব্যোমকেশ ঘোষ—মিঃ ঘনশ্যাম, বিমল দে—রমেশ ও অশোক চন্দ্র—আদ্যনাথ চরিত্রানুগ অভিনয় করেন, নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং।

পুনর্জন্ম ও অভিনেত্রীর স্বামী

কুশীলবের শিল্পীরা সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গনে দুটি নাটক অভিনয় করলেন। এঁদের অভিনীত নাটক হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' ও শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'অভিনেত্রীর স্বামী'। প্রথম নাটকটিতে অভিনয় করেন রণেন্দ্র ভড়, সুশীল সামন্ত, সুকুমার দত্ত, ধনঞ্জয় নাগ, সৌরেন অধিকারী ও শ্রীমান শঙ্কর, দ্বিতীয় নাটকের শিল্পিদলে ছিলেন প্রমথ পাল, সাধু রায়, অভিজিৎ নন্দী, সুশীল সামন্ত, শ্রীমান শঙ্কর, সৌরেন অধিকারী, শীতল মণ্ডল ও সত্যেন ঘোষাল। দুটি নাটকেরই নির্দেশনায় ছিলেন সত্যেন ঘোষাল।

তপতী

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাভবনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শিক্ষায়তনের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের এ নাটক প্রশংসার সঙ্গে অভিনয় করলেন। অভিনয়ে বিশেষ ভাবে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন সুমিত্রারূপী ছন্দা বসু ও বিক্রম চরিত্রে মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও নজরে পড়েছেন আগমনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জুলা গঙ্গোপাধ্যায়, সমগ্র অনুষ্ঠানটি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন প্রিন্সিপ্যাল পরিব্রাজিকা বেদপ্রাণা।

তপন চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত চিত্র 'শাশ্বতী'। এই সামাজিক চিত্রটি পরিচালনা করছেন খগেন রায়। সঙ্গীতাংশের ভার অর্পিত হয়েছে খ্যাতনামা সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের উপর। চিত্রটির নায়িকার চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন স্বনামধন্যা শিল্পী শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, জহর রায়, কাজল, গীতা দে প্রমুখ। এন দাস 'ফিল্মসের চিত্র 'শাশ্বতী'।

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নায়ক ও দেশবরেণ্য মনীষী শ্রীঅরবিন্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসকে 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রে চিত্রায়িত হচ্ছে। এই মহান পুরুষের চিত্রটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন পরিচালক দীপক গুপ্ত। চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির নামভূমিকায় অভিনয় করছেন দিলীপ রায়। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, তমাল লাহিড়ী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, এন বিশ্বনাথন, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য প্রমুখ। এ কে বি ফিল্মসের চিত্র মহাবিপ্লবী অরবিন্দ।

গুপী গাইন বাঘা বাইন

প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চিত্র 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। চিত্রটি প্রযোজনা করছেন নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত। চিত্রটিতে রয়েছেন নবাগত তপেন চট্টোপাধ্যায় (গুপী), রবি ঘোষ (বাঘা), হরিধন মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুল চট্টোপাধ্যায়, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় দত্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, রাজকুমার লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিণীতা

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী 'পরিণীতা'কে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত করবার দায়িত্ব নিয়েছেন অজয় কর। চিত্রটির সুরসংযোজনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নেপথ্যে কণ্ঠদান করছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও সুরকার স্বয়ং। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করনে খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ। চিত্রলিপি ফিল্মসের চিত্র 'পরিণীতা'।

অজয় কর পরিচালিত 'পরিণীতা' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী ও বিকাশ রায়

দুরন্ত চড়াই

সমরেশ বসুর 'দুরন্ত চড়াই' চিত্রটির চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, জহর রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শিশির বটব্যাল, সোমেন চক্রবর্তী, মাঃ মলয়, অপর্ণা দেবী, পদ্মা দেবী, সন্মিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই) প্রমুখ। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্যামলকুমার মিত্র। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছে প্রতিভা চিত্র-মন্দির। নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু ও সুরকার শ্রীমিত্র।

পদ্মাবতী জয়দেব

ধর্মমূলক ও গীতিবহুল চিত্র 'পদ্মাবতী জয়দেবের' মুক্তি আসন্ন। চিত্রটিতে রূপদান করেছেন খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। চিত্রটিতে সুর দিয়েছেন বিজন পাল। পরিচালনা করেছেন চিত্রদূত। সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু ও গীতা দাস প্রমুখ। নৃত্য-পরিচালনায় রয়েছেন গোপীকৃষ্ণ। সানরাইজ পিকচার্সের চিত্র 'পদ্মাবতী জয়দেব'।

গোরা পিকচার্সের 'নতুন পাতা' চিত্রে নবাগতা শিখা রায়চৌধুরী

পান্না হীরে চুনী

'পান্না হীরে চুনী' পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক অমল দত্ত। চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। চিত্রটিতে সুর-সংযোজনা করছেন অভয় দাস। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, গীতা দে, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, অনু দত্ত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, শিশির বটব্যাল, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কণ্ঠদান করেছেন শ্যামল মিত্র, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, পিণ্টু ভট্টাচার্য, তাপস চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল মিত্র। দীনেশ চিত্রমের প্রথম সঙ্গীতবহুল চিত্র 'পান্না হীরে চুনী'।

'শেষ থেকে শুরু' চিত্রে দীপঙ্কর দত্ত ও সমীর মজুমদার

তিন তরঙ্গ

ডঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী 'তিন তরঙ্গ'কে রূপালী পর্দায় প্রতিষ্ঠিত করছেন প্রবীণ চিত্র-পরিচালক হীরেন নাগ। কাহিনীর চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন কাহিনীকার স্বয়ং। সঙ্গীত বিভাগের ভার নিয়েছেন গোপেন মল্লিক। চিত্রের প্রধান দুটি ভূমিকায় থাকছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী, বি এন ডি মুভিজের চিত্র 'তিন তরঙ্গ'।

তাসের দেশ

গত ৬ই এপ্রিল ১৯৬৮ গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ তাঁদের স্কুল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করলেন। নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশনে উক্ত স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। সমবেত দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করার ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। দর্শকবৃন্দ আগ্রহসহকারে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। মনোরম পরিবেশ সৃষ্টিতে সঙ্গীতে শিল্পীদের প্রয়াস প্রশংসনীয়। নৃত্যনাট্যটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন শক্তি নাগ। তাসের দেশের রাজার চরিত্রে শ্রেয়সী মুখোপাধ্যায়কে সুন্দর মানিয়েছিল। তাঁর চরিত্রায়ণ বলিষ্ঠ। রাজকুমারের ভূমিকায় মিনতা ভগতের অভিনয়ও মনে রাখবার মত। রুইতনের চরিত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত। রঞ্জিতা দাস, সুজাতা ভগত, রঞ্জনা গঙ্গোপাধ্যায়, সঙঘ মিত্রাবসুর অভিনয় দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। অন্যান্য চরিত্রচিত্রণে ছিলেন সুদেশনা বসু, মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপা দে, রুবী চক্রবর্তী, ইভা দত্ত, সীমা ঘোষ, অদিতি ধর, নন্দিতা বসুরায়, ইন্দ্রাণী সেন, প্রীতা গুহরায়, শীলা দত্ত, উমা সেন, মধুরী কুণ্ডু, চিত্রা চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী বসু, স্বাতী ঘোষ, শান্তিশ্রী রক্ষিত, সুচরিতা দাস, পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, শশিপ্রভা জালান, শুক্লা পাঠক, শ্রাবণী হালদার। সঙ্গীতাংশে সর্বাণী সেন, লীলা রায়, পূরবী মুখোপাধ্যায়, রুবি গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণা সাহা, অপরাজিতা বসু, সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপ্রিয়া গুপ্ত, কস্তুরী দাশগুপ্ত, বীথি সেন, অরুণা চট্টোপাধ্যায় শ্রেয়সী পালচৌধুরী, অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিতা রায়, শ্রীপ্রভাতভূষণ, শ্রীঅসীম রায় প্রমুখ। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচালনা করেন বেলা ভট্টাচার্য ও আলপনা মিত্র।

'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে রাজার ভূমিকায় কুমারী শ্রেয়সী মুখোপাধ্যায়, [illegible] চরিত্রে কুমারী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] পণ্ডিতের চরিত্রে কুমারী [illegible] বসু ও [illegible] ভূমিকায় [illegible]

সাগরপারের মায়ালোক

রমেন চৌধুরী

ক্যাথারিন হেপবার্ন ষাট বছরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে জয়ের মালা গলায় পরলেন। নিজে নিজে অনেক কিছুই তো পরা যায়, সাত রাজার ধন মাণিক দিয়ে গাঁথা বিলিয়ন ডলারের মুকুট মাথায় চাপানোতেও বিত্তবানদের কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু এ যে যশের সাতনরী হার। একে জয় করতে হয় আপন মনের ধেয়ান দিয়ে। কেউ সহজে স্বীকৃতি দিতে চায় না কী—একটা শুকনো ধন্যবাদ জানাতেই মানুষ পঞ্চাশ বার আগুপিছু করে থাকে (এদেশে হয়তো বেশি, ওদেশেও এটা থাকতে বাধ্য)। আর এ যে মুক্তকণ্ঠে জয়গান করা। "আহা, কী অপরূপ পেখলু" বলে সমবেত কণ্ঠে স্বীকারোক্তির পর তবেই মাল্যটি গলায় ওঠানো হয় সৌভাগ্যশালী বা শালিনীর। তার মানে এ সব আদায় করে নিতে হয়—এবং তা যোগ্যতা দিয়ে, গুণপনা দিয়ে।

শ্রীমতী হেপবার্ন 'গেস্ হুজ কামিং টু ডিনার' ছবিতে অসামান্য অভিনয়-প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখেছেন। এ শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব। হেপবার্ন কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে অপাংক্তেয় বলে গণ্য হবার মতো। তাঁর চোখধাঁধানো রূপ বলতে কিছুই নেই। বরং তিনি ঠিক তার উল্টোটি। কিন্তু সার্থক অভিনয় তার নিজস্ব সৌন্দর্যে মোহিত করে—হোক না শিল্পী কুরূপ কিংবা কুরূপা। শ্রীমতী হেপবার্ন যে ভূমিকাটিতে এবার অংশ নিয়েছেন সেটি হোলো মায়ের। সেই মা যাঁর মেয়ে নিগ্রোকে বিয়ে করছে। মেয়ের অস্বাভাবিক প্রেমে সামাজিক কারণে মা বিপন্ন হয়ে পড়ছেন। কিন্তু মা যে অসহায়, একদিকে বাৎসল্যরস অন্যদিকে কঠিন কর্তব্য—তার যে অপরূপ অভিব্যক্তি—হেপবার্ন অনায়াসে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর অভিনয়ে। তাই না বিচারককুল বিগলিত বিমুগ্ধ। দ্বিতীয়বার তাই অস্কার পুরস্কারটি করায়ত্ত করলেন হেপবার্ন। এবারে তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন স্বর্গত স্পেনসার ট্রেসি।

'দি নাইট অব ড্রিমস' চিত্রে ইয়েভজেনা উশাকভ

১৯৩২ সালে বয়েস যখন মাত্র বাইশ—একাডেমি পুরস্কার (অস্কার) ধরা দিলো ক্যাথারিনকে। ছবির নাম 'মর্নিং গ্লোরি'। তার সবটুকু গ্লোরিই যেন হেপবার্ন আহরণ করে নিলেন। তারপর চললো বিজয়রথ। হেপবার্ন তাঁর আসন স্থায়ী করে নিলেন দর্শকের অন্তরলোকে। কিছুদিন হোলো অভিনয় জগৎ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন—আবার ঘটলো অবিস্মরণীয় আবির্ভাব এই ৫৮ বছর বয়েসে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা মোনিকায় ১০ই এপ্রিল বসেছিলো এবারের পুরস্কার বিতরণীর আসর। কমেডিয়ান বব হোপ একে একে তুলে দিলেন বহুবাঞ্ছিত পুরস্কারগুলি নির্দিষ্ট শিল্পী প্রভৃতির হাতে। '৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অস্কার পেয়েছেন রড স্টেইগার। শ্রীস্টেইগার 'ইন দি হীট অব দি নাইট' ছবিটির জন্যে এই পুরস্কারে সম্মানিত। সহ-অভিনেতারূপে অস্কার পেয়েছেন জর্জ কেনেডি। ছবির নামঃ 'কুল-হ্যান্ড লিউক'। এস্টেল পারসন্স শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী নির্বাচিতা। 'বনি অ্যান্ড ক্লাইড' ছবিটি এনে দিয়েছে তাঁকে সম্মান। বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি নির্বাচিত : 'ইন দি হীট অব দ নাইট'। পরিচালনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন মাইক নিকলস 'দি গ্র্যাজুয়েট' ছবির কল্যাণে।

অ্যালফ্রেড হিচকক, গ্রেগরি পেক ও আর্থার ফ্রিড পেয়েছেন বিশেষ পুরস্কার।

জিরি মেনজেল পরিচালিত চেক-চিত্র 'ক্লোজলি ওয়াচড্ ট্রেনস' শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবিরূপে অস্কার বিজয় করেছে। গত বছরেও এ স্বীকৃতি লাভ করেছিলো চেকোশ্লোভাকিয়া।

আজ হয়তো অনেকেরই একথা জানা নেই আকাদেমি অব মোশান পিকচার্স আর্টস এণ্ড সায়ান্স প্রদত্ত এই পুরস্কার 'অস্কার' নামে অভিহিত হয়েছে সূচনার অনেক পরে। ছোট্ট সোনার মূর্তির এই উপহারটি দেওয়া শুরু হয় ১৯২৭ সাল থেকে। চল্লিশ বছরের বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ এর ইতিহাসে প্রথম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে উৎসব অনুষ্ঠানে। নির্ধারিত দিনে উৎসব হ'তে পারে নি। তার কারণ নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর আকস্মিক মৃত্যু। নিহত মানবতার পূজারীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে দু'দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিলো উৎসব।

●

মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ-বেদনায়—বলেছেন কবি। তাই কি অহরহ চারদিকে কেবল বিচ্ছেদের জ্বালা ছড়িয়ে

পড়তে দেখি? তবে এ বিচ্ছেদ যে চিরতরে! ক্যারি গ্র্যান্ট ও ডায়ান ক্যানেনের কথাই বলছি। বেশ কিছুদিন ধরে ও'দের বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন আদালতের চার দেয়ালের আড়ালে চরম নির্দেশ পাবার প্রতীক্ষায় ছিলো। এবার হয়েছে যবনিকা-পাত। ডায়ানার পক্ষেই গিয়েছে সব। ও'দের সন্তান জেনিফার মায়ের কাছে থাকবে বলে শুনানীতে বলা হয়েছে। ক্যারীকে দেড় হাজার ডলার মাসে মাসে খরচ দিতে হবে সন্তানের ভরণপোষণের জন্যে। তাছাড়া স্ত্রীর ক্ষতি-পূরণ বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ বেশ মোটা রকমের হবে। জোগাতে হবে নিয়মিত।

●

ফ্রেশ ফিল্ড এন্ড প্যাসচারস নিউ যেমন দরকার তেমনি প্রয়োজন নিউ ব্লাডের। তা না হলে কাঁহাতক একই লোককে দিয়ে কাজ চলে। অভিনয়-শিল্পীদের সম্পর্কে যেমন কথাটা খাটে, চলচ্চিত্রকারদের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। নবীন বলতে এখানে কাঁচাদেরই (আক্ষরিক অর্থে) বোঝায়, ওখানে কিন্তু মোটেই তা নয়। ক'দিন কোনো পরিচালকের সহকারী নামধারণ করে ঘুরলে তো কথাই নেই, না ঘুরলেও পরিচালকের গদীতে ঠাঁই পেতে বাধা হয় না। বাধা দেবার যেটি অর্থাৎ কিনা অর্থ-ই তো তার করায়ত্ত। আর কে না জানে অর্থ কতো অনর্থ ঘটাতে পারে। ওই অর্থের বলে বলীয়ান হয়ে পরিচালকপুঙ্গব তখন চীনামাটির দোকানে ষণ্ড মহাপ্রভু যেমন কান্ডটি ঘটাতে পারে, হুবহু তাই করে থাকে। তার ফলে গোটা চলচ্চিত্র শিল্পই একেবারে লন্ডভন্ড! হয়তো সে ছবি পুরোপুরি তৈরি হ'তে পেল না কিংবা তৈরি হ'লেও মানুষজন তার বক্তব্য কোনোকিছুই বুঝতে পারলো না। অতএব ওদের সম্মিলিত না-বোঝা একেবারে পর্বত প্রমাণ বোঝা হয়ে চেপে বসলো ইন্ড্রাস্টির পলকা ঘাড়টিতে। মটকে গেল না বটে, তবে চরম মুহূর্তটির দেখা মিলতে দেরি না হওয়াই সম্ভব।

●

টলিউডের এ কথা থাক—হলিউডে এখন তরুণদেরই বাজার। শিল্পীর তো ছড়াছড়ি, কলাকুশলীরাও সব নবীন গোষ্ঠীর। নামী যাঁরা, দামীও সেই সঙ্গে। তাঁদের নিয়ে কাজ করার শত অসুবিধা। বায়নাক্কা তাঁদের হাজারো রকমের। নতুনদের সেসব বালাই নেই। তারা তো কাজে ডুবে থাকতেই চায়। কাজ পেলেই হোলো। অবিশ্যি সংশ্লিষ্ট মহলের দুশ্চিন্তা ছিলো—না জানি জিনিসটা দর্শকদের আনুকূল্য পাবে কিনা। তাঁদের সে ধারণা অমূলক বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। ফলে একটা বিরাট সম্ভাবনার সপ্তদ্বার খুলে গেছে।

শিল্পী নতুন এখন সংখ্যাহীন। সপ্তদশী রূপসী অভিনেত্রী পামেলা ফ্রাঙ্কলিং-এর কথাই ধরা যাক। তাঁর অবতরণ ঘটছে দুখানি ছবিতে। মার্লোন ব্র্যান্ডোর বিপরীতে পামেলাকে দেখা যাবে 'দি নাইট অভ দি ফলোয়িং ডে'-তে। সুজি কেন্ডালেরও তাই। ক্যাথারিক রোজ ও ডাস্টিন হফম্যান 'গ্র্যাজুয়েট' ছবিতে একত্রে অবতীর্ণ। 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড'-এ একটি বিশেষ ভূমিকায় প্রুনেলা র‍্যামসাম নির্বাচিতা। এ'র এটাই হোলো 'ডেবাট'। নবাগতার তালিকায় আরো উল্লেখনীয় কয়েকটি নাম হচ্ছে : সানি ওয়ালিস (গায়িকা), ফ্র্যাঙ্কো নিয়ো, অ্যানা কারিনা প্রমুখ।

পুরুষদের মধ্যে নবীন ডাস্টিন হফম্যান 'গ্র্যাজুয়েট' ছবিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

...ইন

নতুন সোভিয়েট চিত্র 'ট্রাভলিং থ্রু রাশিয়া'র অন্যতম চরিত্র অ্যালিওসা পেশকভ। শিল্পী : এ লকটেভ

আডমিসেবল এভিডেন্স'-এ যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ। মাইকেল ক্রাউফোর্ড, অলিভার রীড-এর আবির্ভাব ঘটেছে ইতিমধ্যে।

●

'দি রেড টেন্ট' নাম। কাহিনী অবলম্বন উত্তর মেরুর দুর্ধর্ষ অভিযানের চমকপ্রদ ঘটনারাজি। ভিডাস সিনেমাটোগ্রাফির প্রযোজনায় মিলিয়ন ডলার প্রোডাকসন (আসলে খরচ হবে কয়েক কোটি ডলার)-এর কাজ বেশ সন্তোষজনক গতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিচালক মিখাইল কালাটোজভ লেনিনগ্রাদ, বাজকাল, মস্কো প্রভৃতি লোকেশানে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফেলেছেন। এইবার শুরু হবে অন্তর্দৃশ্য রূপায়ণের ব্যবস্থা। দিনো দি লরেন্তিস স্টুডিও-তে বাকি অংশ তোলা হবে। এটি রুশ-ফরাসী সম্মিলিত প্রয়াস। মুখ্য একটি চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন পিটার ফিঞ্চ এবং ক্লদিয়া কার্দিনাল।

●

স্টুডিও হামবুর্গ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাচ্ছি। এটি আসলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কাজের কামাই নেই। সাকুল্যে বারো শ' কর্মী সর্বদা কর্মতৎপর। এখানে তোলা হয় ছায়াছবির জন্যে, টেলিভিশানের জন্যে যাবতীয় ফিল্ম। হয় গান বাণীবন্ধ করা। রঙিন টেলিভিশান তোলারও বন্দোবস্ত রয়েছে।

গত বছর এখানে তোলা হয়েছিলো পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ন'টি। এর মধ্যে জার্মানির পাঁচটি, বাকীগুলো বিদেশী। ৪১৫টি ছোট ছোট ছবি টেলিভিশানের জন্যে তোলা হয়েছিলো। ফিল্ম, টেলিভিশান আর বিজ্ঞাপনের জন্যে যে গান বাণীবন্ধ করা হয় তার সংখ্যা ৩৫০০।

এ'দের একটি বিশেষ কাজ হচ্ছে এখানকার তোলা এবং অন্যান্য স্টুডিওর তোলা ছবি বিশ্বের বাজারে বিক্রি করা। এজন্যে একটি বিশেষ বিভাগই রয়েছে। 'স্যান্ডম্যান' নামে একটি শিশুচিত্র (এ'দেরই তোলা) ১০০০ বার বিক্রি করা হয়েছে। অবিশ্যি সময় লেগেছে আঠারো মাস।

সামনের তিন বছরে ১৩টি রঙিন টেলি-ভিশান ছবি তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সবগুলিই অপেরা। মোৎজার্টের 'ম্যারেজ অভ ফিগারো'-দিয়ে শুরু হবে কাজ।

●

ভিট্টোরিও ডি সিকা সামনের বসন্তে সুইডেনের ইতালিয়ান পল্লীতে একখানি ছবি তুলবেন। প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যে সমাধা হয়েছে। সিজার জাভাত্তিনী চিত্রনাট্য লেখা শেষ করেছেন, ডি সিকাও স্টকহোমের এবং আশপাশের লোকেশন দেখে ফিরেছেন। বহির্দৃশ্য তোলা হবে সেখানে। ব্যাপারটা এখনও পাকাপাকি না হলেও সোফিয়া লোরেন এ ছবির নায়িকার রূপসজ্জা নেবেন বলে জানা গেছে।

'ক্যারলিন পেরী'-র নতুন চিত্ররূপটিতে ডি সিকা পিতার চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

●

প্রেমের বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ড অবাধ এবং উন্মুক্ত করে দেখাবার জন্যে (যা কান্ড সাধারণত হয় তার ওপরেও? না জানি কী কেলেঙ্কারীই হবে! হয়তো 'ব্লু প্রিন্ট'-এর সার্বজনীন সংস্করণ এ ছবি গোল্লায় দেবে দেশকে!) প্যারামাউন্ট পিকচার্স একটি ছবি তোলার ব্যবস্থা করেছে। ইস্টম্যানকালারের এই ছবিতে নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের দৃশ্যাদিতেও কোনো আবরণ টেনে না দেওয়ার কথা। ফ্রান্সের রিভিয়েরার পটভূমিকার কাহি-নীর বিস্তার। মার্গারি গোর্কি পরিচালক।

'হিরোসিমা মন আমোর'-এ ফরাসী চিত্রাভিনেত্রী ইমানুয়েল রিভা ও জাপানী অভিনেতা এইজিওকেদা

চরিত্রলিপির নামগুলি হচ্ছেঃ মেরি জ্যান্স বয়ার, অ্যানবেল্লা ইনকনট্রেরা, ফ্রাংকাইন লেন্সিয়া, ড্যানিয়েল মুসম্যান প্রভৃতি।

●

বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসব এবার ২১শে জুন আরম্ভ হচ্ছে। ২রা জুলাই পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান। তিনটি বিভাগে দেখানো হবে উৎসবের ছবিগুলো, বলা বাহুল্য এটি নতুন কিছু নয়, গতবারও এই ব্যবস্থা হয়েছিলো। ইনফরমেশন শো এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। নির্বাক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী পরিচালক অ্যাবেল গাঁস-এর ছবি এবং আমেরিকান কৌতুকশিল্পী মিঃ ফিল্ডস-এর কিছু ছবি উৎসবের বিশেষ প্রদর্শনীতে এবার দেখানো হবে। গত উৎসবে আর্ণস্ট লুবিৎস-এর ছবি এ পর্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছিলো।

উৎসবের ছবি নির্বাচনী কমিটিতে রয়েছেন চিত্র-সমালোচক এনভিরা রিৎজ, জর্জ হাম্মৎবার্গ, পিটার লেভিগাস, ডনফার্ম স্কুৎ, ডেটার স্টানৎস, জার্মান চিত্র জগতের দুজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, বার্লিন উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পরিচালক মিঃ আলফ্রেড বায়ের। আমন্ত্রণ-লিপি দেশে দেশে পাঠানো কবেই সারা—উত্তরও এসে গেছে চব্বিশটি দেশ থেকে। পয়লা মে ছবি পাঠাবার শেষ তারিখ গেছে।

●

'দি সিক্রেট লাইফ অভ ওয়াল্টার মিটি', 'ব্লাই হ্যাভর্ক', ডীপ ভ্যালি—বিশিষ্ট ছবিগুলির অন্যতম। এই ছবিগুলিতে যাঁর অভিনয় বিশেষ উল্লেখনীয় বলে সর্বসাধারণের স্বীকৃতি পেয়েছে সেই অতীত দিনের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী এফ বেল্টার ১৬ই এপ্রিল অমরলোকে প্রয়াণ করেছেন। বয়েস হয়েছিল চুয়াত্তর। শ্রীমতী বেল্টার অস্কার পেয়েছিলেন তিশে বছর [illegible] ছবির নামঃ 'জেজেবেল'।

সঙ্গীত-জগতে নক্ষত্র পতন

ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত জগতে যে কয়জন প্রতিভাধর শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। সঙ্গীত-জগতে বড়ে গোলাম আলীর নাম ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করবে। সঙ্গীতে তাঁর অপরিসীম অবদানের কথা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গীতকে তিনি জীবনের ধ্যান-জ্ঞান রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এককথায় সঙ্গীতই তাঁর জীবনস্বরূপ ছিল। সঙ্গীতের জন্য তিনি যে কঠোর সাধনা করেছিলেন তা তাঁর সঙ্গীতের মধ্যেই সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর অনবদ্য কণ্ঠের গান শোনার জন্য সঙ্গীতপিপাসুমাত্রই উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী ছিলেন সুরের যাদুকর। শ্রোতাদের তিনি সুরে সুরে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত করে তুলতেন।

১৯০২ সালে এই মহান শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র চার বছর বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি তাঁর কাকা ওস্তাদ কালে খানের নিকট প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা পান এবং সাতবছর বয়সে তাঁর পিতা আলী বক্স খান সাহেবের নিকটও সঙ্গীত-শিক্ষা পান।
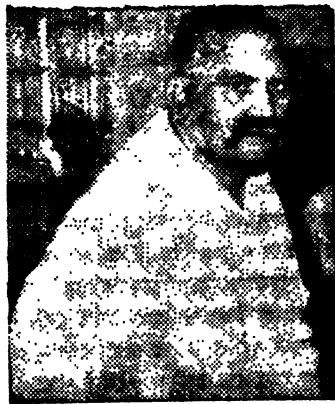
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ

১৯১৯ সালে তিনি প্রথম লাহোরে সঙ্গীত সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে তিনি গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষেই নয় ভারতের বাইরেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে দিক থেকে দিগন্তে।

ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করেন। রবীন্দ্রভারতী তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন।

গত ১০ই বৈশাখ, ১৩৭৫ সালে মাত্র ৬৬ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নিবে গেল। সঙ্গীত-জগতের তিনি ছিলেন এক বিরাট স্তম্ভ। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত-জগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল তা আর কোনদিনই পূরণ হবার নয়। এই দেশবরেণ্য শিল্পীর মৃত্যুতে আজ সারা ভারতবর্ষ মুহ্যমান। আমরা এই বিরাট প্রতিভাবান শিল্পীর দুশ্চর সাধনার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি।

॥ ইন্দ্রাসেন ॥

"যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরব স্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥"

—তন্ত্রচূড়ামণি

কৃষ্ণপক্ষের তমসাচ্ছন্ন রাত্রি।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কিছুই নয়নগোচর হয় না। অরণ্যচারী পশুদের সরব [illegible] শোনা যায় মধ্যে মধ্যে। বৃক্ষশীর্ষে পেচককুল [illegible] শব্দে ডেকে চলেছে অবিরাম। গভীর বনাঞ্চলে [illegible]। হয়তো কাছাকাছি কোথাও ব্যাঘ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। [illegible] প্রাণ সভয়ে ছোটে তড়িৎ-গতিতে। কোথায় যে একটুকু নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যায়। মৃত্যুভয়ে যেন [illegible] দিশেহারা তারা। শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে ওৎ পেতে [illegible]। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। ইছামতী নদীর তীরে চলেছে যার, সেদিকে আর চায়না। ইছামতীর [illegible] করতে চলে দিনের শেষে।

[illegible]। দূরে শুধু আলোর আভাস পাওয়া যায় নব-নির্মিত [illegible] প্রাসাদে। প্রধান তোরণের দুই পাশে রাম-মশাল জ্বলছে। উর্দ্ধমুখী অগ্নিশিখা লক লক করছে। দূর থেকে দেখায় যেন দুটি জ্বলন্ত বিভীষিকা, আকাশের বক্ষ লেহন করতে চাইছে।

রাজ-প্রাসাদের বিস্তীর্ণ এক কক্ষে সান্ধ্য-আসর বসেছে। অনুগত পার্ষদবৃন্দ ঘিরে আছেন মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে। ছক-পাশা খেলায় মেতে উঠেছেন মহারাজা। তানপুরা সহযোগে গান ধরেছেন গীত-রসিক ওস্তাদ গায়ক। সুপেয় সরবৎ পরিবেশিত হয় দফায় দফায়। নিদাঘ রাতের তপ্ত বাতাস চলেছে এখনও। কাঁচা আমের সরবৎ শেষ হতে না-হতে আসে আনারসের পানীয়। তারপর আসে দধিজলে মিশ্রিত পেস্তার সরবৎ। খসখসের স্নিগ্ধ সুগন্ধে বাতাস যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

ঢাকাই মসলিনের বুটিদার বেনিয়ান প্রতাপের অঙ্গে। তাও যেন অসহ্য ঠেকছে নিদারুণ গরমে। মাথার' পরে টানা-পাখার হাওয়া খেলছে অবিরত। তবুও স্বেদবিন্দু ফুটছে মহারাজার প্রশস্ত কপালে। কণ্ঠে ঝুলছে মতিবেলের গোড়ে মালা। মনে হয় যেন সাপের বেষ্টন। মালা খুলে ফেলে দিলেন প্রতাপ। বললেন,—মাল্য যেন দংশন করছে।

পার্ষদরা তিরস্কারের সুরে বললেন,—পাখাবরদার, হাত চালাও।

সঙ্গে সঙ্গে টানাপাখার গতি বর্ধিত হয়। কক্ষমধ্যে যেন ঝড় বইতে থাকে।

সূর্য কখন অস্তাচলে গেছেন, রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে, উত্তাপ তবু যেন হ্রাস পায় না। মাঝে মাঝে তপ্ত বাতাসের ঢেউ আসে: অগ্নিকণা বহন করে আনে যেন বৈশাখী হাওয়া।

প্রাসাদরক্ষক কমল খোজা গ্রীষ্মের আধিক্যে অস্থির হয়ে অশ্বারোহণে চলতে থাকে বনপথ ধরে। বাসনা, ইছামতীর তীরে গিয়ে খানিক ঘোরাফেরা করে। ইছামতীর তীরে হয়তো মিলতে পারে ঠাণ্ডা মুক্ত বায়ু।

অগম্য ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল ইছামতীর তীরে। শ্বাপদসঙ্কুল বন। তথাপি ভয়ের লেশ নেই কমল খোজার বুকে। কটিতে ঝুলছে ক্ষুরধার তরবারি। হাতে আছে সূক্ষ্মমুখ বর্শা। আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কমলের। ধূমঘাটের প্রাসাদ-রক্ষক সে। অসীম শক্তির অধিকারী। মহারাজা প্রতাপাদিত্য তার রণনিপুণতায় মুগ্ধ হয়ে প্রাসাদ-রক্ষার ভার অর্পণ করেছেন তাকে। কমল খোজা জাতিতে মুসলমান। কিন্তু প্রতাপের প্রতি তার অকৃত্রিম ও অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি। মহারাজার সমীপে দাসখৎ লিখে দিয়েছে কমল। যতদিন সে জীবিত থাকবে ততকাল প্রতাপের সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকবে। যে শক্তিমান সেই শক্তিধরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। প্রতাপের দৈহিক শক্তির পরিচয় পেয়ে কমল যেন বিস্ময়াবিষ্ট ও মোহগ্রস্ত হয়ে আছে।

মন্থরগতিতে ধীরপদে এগিয়ে চলেছে কমল খোজার ঘোড়া। দাবদাহে সেও যেন শ্রান্ত ক্লান্ত। আরোহীর মুখে

আল্লার নাম উচ্চারিত হতে থাকে। এমন বিরল নির্জনতা আর কোথায় পাওয়া যাবে। হয়তো এই কারণেই সাধু আর ফকির সাধনার উপযুক্ত স্থান হিসাবে গভীর বন পছন্দ করেন।

সহসা কমল খোজার চক্ষে বিস্ময়ের ঘোর নামলো। ঘোর অমানিশা, তবু এত আলো কোথা থেকে আসে। তবে কী সূর্যের একটা ভগ্নাংশ খসে পড়েছে ধরিত্রীতে? উদ্ভাসিত প্রখর আলোয় কমলের চোখ দুটি যেন ঝলসে উঠছে। চোখ বন্ধ করলো সে; এত আলো আর সোজা চোখে দেখতে পারছে না। উল্কাপাত নয় তো? প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে পারে। নানা রকমের প্রশ্ন জাগে কমলের মনে। উত্তর মেলে না।

---হা আল্লা।

স্বগতোক্তি করলে কমল। ভয় কাকে বলে জানা নেই তার। আজ এই প্রথম উপলব্ধি করে ভীতির অনুভূতি। দেহে যেন শিহর খেলছে। গা ছম ছম করছে। কণ্ঠ ছেড়ে ডাক পাড়বে তেমন শক্তি নেই। আর এগোতে সাহস হয় না। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নেয় ত্বরায়। ফিরে চলে। যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথে ঘোড়া ছোটায়। বার বার ফিরে তাকায়। দেখে নেয় আলো আছে, না নেই। নিজের চোখ দুটিকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। স্বপ্ন দেখছে না কি জাগরিত অবস্থায়? ঐ তো সেই আলোকরশ্মি, ঝলমল করছে। যেন ভরা দুপুরের দৌলালোক। অলৌকিক কিছু একটা দেখেছে, অনুমান করে কমল। যাই হোক, মহারাজকে এখনই জানাতে হয় ব্যাপারটা। তিনি স্বয়ং এসে দেখতে পারেন, মুখের কথা বিশ্বাস না হয়। অশ্বের বেগ দ্রুততর হতে থাকে। অধিক বিলম্ব করলে যদি ঐ আলো অদৃশ্য হয়ে যায়। বলা যায় না কিছু।

ছক-পাশা খেলায় মেতে আছেন পার্ষদপরিবেষ্টিত প্রতাপ। কক্ষের দুয়ারে পৌঁছে কুর্নিশ ঠুকলো কমল খোজা। ঘর্মাক্ত কলেবর তার। আবেগ আর উত্তেজনার আধিক্যে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। মৃত্যু যেন ঘনিয়ে আসছে তার।

প্রতাপাদিত্য দেখে যেন বিস্মিত হলেন। বললেন,---কমল, তোমার কিছু বক্তব্য আছে কী? দেখে মনে হয়, তুমি যেন অসুস্থ?

---মহারাজা! রুদ্ধশ্বাসে বললে কমল খোজা। বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেলছে সে। বুকভরা শ্বাস নিয়ে আবার বলে,---মহারাজা শীঘ্র আসেন।

---কোথায় যাবো?

---ইছামতীর নদীর তীরে।

---এই রাত্রিকালে? কেন? কি কারণে? তুমি কী পানোন্মত্ত হয়েছো কমল?

---না মহারাজা। আল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি জাঁহাপনা, পান আমি করি নাই। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। দোহাই।

---কেন ওই তো ব্যক্ত করলে না। ব্যাঘ্র দেখলে না কি ইছামতীর তীরে?

---না জাঁহাপনা। বাঘ ভালুক নয়।

---তবে কি গণ্ডার দেখেছো?

---বাঘ ভালুক গণ্ডার তো হামেশাই দেখছি। আলো দেখেছি জাঁহাপনা। রৌশনি দেখেছি। আপনিও দেখতে পাবেন।

---ইছামতী নদীর তীরে রোশনাই? ঐ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে?

---হাঁ মহারাজা। আল্লার খেলা। হা আল্লা। আল্লার দয়ায় দিনে তারা দেখা যায়, রাতে সূর্য দেখা যায়।

---চল, যাই গিয়া দেখি।

পারিষদরা বললেন,---মহারাজা একা যাবেন, তা হবে না। আমরাও সঙ্গে যাই। যদি কিছু বিপদ-আপদ ঘটে। কমল খোজার কি অভিসন্ধি কে জানে।

প্রতাপাদিত্য বললেন,---শঙ্কর আর সূর্যকান্ত সঙ্গে থাকলেই চলবে। আর আর সকলে এই স্থানেই অবস্থান কর।

তিন বন্ধুতে তিনটি অশ্বে উঠে যাত্রা করলেন তৎক্ষণাৎ। অগ্রে চলে কমল খোজা। যেন পথ দেখিয়ে চললো পথ-প্রদর্শক।

কিছুদূরে যেতেই সত্যই আলোর আভাস দেখা যায়। রূপালী বর্ণ চিক চিক করে। কাঁপা কাঁপা সূর্যকিরণ যেন। চারটি অশ্বের পদধ্বনিতে বনভূমি যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। আলোকজালে দেখা যায় ভীতত্রস্ত হরিণের পাল লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। দেখা যায় গণ্ডারের ক্ষুদ্র চক্ষু জ্বলজ্বল করছে। বুনো খরগোস ছুটছে।

---কমলের কথা মিথ্যা নয় বন্ধু।

প্রতাপাদিত্য বললেন। অশ্বের গতি সংযত করলেন।

নিশীথকাল। অদূরবর্তী নদীতটে অপূর্ব জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করতে থাকেন তিন বন্ধুতে। কী অপরূপ আলো। এই অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে যেন তাঁরা বিহ্বল বিভোর হয়ে থাকেন। প্রতাপাদিত্য আবিষ্কার করলেন, একখানি শিলাখণ্ড থেকে এই অদ্ভুত জ্যোতি নিঃসৃত হতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই স্থান পরিষ্কার করতে আত্ম-নিয়োগ করলেন প্রতাপাদিত্য স্বয়ং। মহাসমারোহের সঙ্গে তিনি নিজেই শিলাখণ্ডকে পূজা-অর্চনা করতে আরম্ভ করলেন। মহারাজা ঘোষণা করলেন, মহামাতৃকার আবির্ভাব হয়েছে।

জনসাধারণ এই অপূর্ব কথা শুনে দলে দলে আসতে থাকে মাতৃদর্শনের অভিপ্রায়ে। পূজা দেয় সকলে। দেখতে দেখতে স্থানটি যেন মহাতীর্থে পরিণত হয়।

প্রতাপাদিত্য প্রত্যহ অনন্যমনে দেবী ভগবতীর পূজা মহোৎসবের সহিত সম্পন্ন করতে লাগলেন। দেশের জনগণ প্রতাপের ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখে তাঁকে ভগবতীর বরপুত্র এবং প্রধান ভক্ত আখ্যা দিলেন।

সাধারণ লোকের এরূপ বিশ্বাস হয় যে, মহারাজা

প্রতাপাদিত্য ভগবতীর কৃপায় ও অনুগ্রহে সমরজয়ী হবেন। দেবীর কৃপায় তিনি সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবেন। দৈববলে বলীয়ান প্রতাপ এই সময় হতে হিন্দু ও মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের নিকট সসম্ভ্রমে পূজিত হতে থাকেন।

জনসমক্ষে মহারাজা প্রচার করলেন,---এই সেই দেবী যশোরেশ্বরী। যশোহর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী এক্ষণে আমার প্রধানতম কর্তব্য, দেবীর মন্দির নির্মাণ করা। দেবীর পুরাতন মন্দিরটি কালগ্রাসে পতিত হয়েছে। দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, বহু প্রাচীনকাল হতে এই যশোহর যশোরেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্ত্রাদিতেও যশোরেশ্বরীর উল্লেখ আছে। দিগ্বিজয় প্রকাশের মতে অনরি নামে এক ব্রাহ্মণ বন-মধ্যে দেবীর শতদ্বার যুক্ত মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পরে গোকর্ণসম্ভূত ধেনুকর্ণ রাজার ও লক্ষ্মণ সেনের নামও যশোরেশ্বরীর মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়।

প্রতাপাদিত্য আরও ব্যক্ত করলেন,---এই স্থানেই মহাদেবীর মস্তক হতে সতীদেবীর বাহু ও পদ পতিত হয়েছিল।

অল্পকালের মধ্যে ঈপ্সিত দেবীর মন্দির-নির্মাণ কার্য শেষ হলে মহারাজা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন,---সমীপবর্তী রাজন্যবর্গের সহিত একপ্রাণে মিলিত হতে হবে। শঙ্কর ও সূর্যকান্ত, তোমরা প্রস্তুত হও। যাত্রার উদ্যোগ কর।

শঙ্কর ও সূর্যকান্ত বললেন,---কোথায় যাবেন মহারাজা? গন্তব্য ব্যক্ত করেন।

প্রতাপাদিত্য বললেন,---উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করতে মনস্থ করেছি। উৎকল দেশে যেতে চাই জগন্নাথ-দর্শনে। এই উপলক্ষে উড়িষ্যার বিভিন্ন নৃপতি-বর্গের সহিত সাক্ষাৎ হ'তে পারে। শঙ্কর ও সূর্যকান্ত তোমরা যুদ্ধনিপুণ, ক্লেশসহিষ্ণু, অসীম সাহসিক সৈন্যদের নির্বাচন কর'। যাত্রার পূর্বে আমি স্বীয় রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করতে ইচ্ছা করি।

রাজা বসন্ত রায় লোকপরম্পরায় জানতে পারেন প্রতাপ উৎকল-যাত্রার আয়োজনে উদ্যোগী হয়েছেন। সংবাদ শুনে বসন্ত রায় মহাখুশী হলেন। প্রতাপকে তিনি বললেন,---বৎস, আমার একটি অনুরোধ আছে। যদি রক্ষা কর' আমি বাধিত হই।

মহারাজা বললেন,---মহাশয়, অকপটে ব্যক্ত করেন। অনুরোধ নয়, বলেন আদেশ। সাধ্য কুলায় তো অবশ্যই পালন করি।

বসন্ত রায় বললেন,---অবগত হ'লাম, তুমি না কি উৎকল দেশে চলেছো। তাই বলি, যদি পুণ্যক্ষেত্র পুরীধাম হতে গোবিন্দদেবের বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আনয়ন করতে সক্ষম হও, আমার শেষ জীবনের একটা আশা পূর্ণ হয়। স্বপ্ন সার্থক হয়।

প্রতাপাদিত্য বললেন,---চেষ্টার ত্রুটি হবে না জানবেন। ঈশ্বর যদি সহায় হন।

সত্যকথা বলতে কি, উড়িষ্যায় প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা প্রকাশের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপূর্বে উড়িষ্যার রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়া যাক। কেন না রাষ্ট্রবিপ্লব উপলক্ষেই প্রতাপ উড়িষ্যায় উপস্থিত হলেন।

উড়িষ্যা স্বাধীন হিন্দু রাজগণ দ্বারা শাসিত হ'ত। ১৫৬৭'-৬৮ খৃঃ-অব্দে গৌড়াধিপ সুলেমান প্রথমে উড়িষ্যা অধিকার করেন। উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব যাজপুরের নিকট সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তদবধি উড়িষ্যা গৌড়সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সুলেমানের আমীর উলুওমরা লোদী খাঁ উড়িষ্যার এবং কতলু খাঁ লোহানী পুরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বয়াজিদ, তৎপরে তাঁকে হত্যা করে সুলেমানের জামাতা হাঁসো গৌড়-সিংহাসন অধিকার করলেন। লোদী খাঁ উড়িষ্যা থেকে এসে হাঁসোকে নিহত করে দায়ুদকে সিংহাসন প্রদান করলে দায়ুদ স্বাধীনতা অব লম্বনের পরে আকবর বাদশাহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে কতলু খাঁও পুরী থেকে এসে দায়ুদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দায়ুদ বাঙলা থেকে বিতাড়িত হয়ে বহুদিন উড়িষ্যায় অবস্থান করেন। কতলু খাঁ বরাবর দায়ুদকে সাহায্য করেছিলেন। ততঃপর দায়ুদ পরাজয় বরণ করে নিহত হলেন

এরপর কতলু খাঁ ক্রমে ক্রমে উড়িষ্যা অধিকার করলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পরে কতকগুলি মোগল সৈন্য উড়িষ্যায় অবস্থিতি করছিল। কিয়া খাঁ ও মীর নাজাৎ তাদের পরিচালনায় নিযুক্ত হন। ১৫৮১ খৃঃ-অব্দে ঐ সমস্ত সৈন্য উড়িষ্যা থেকে ফিরে এলে কতলু খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করলেন এবং কিয়া খাঁকে একটি দুর্গে অবরোধ করলেন। কিন্তু কিয়া খাঁর সৈন্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করলে তিনি আফগানদের হস্তে মৃত্যুবরণ করেন। মীর নাজাৎও কতলু কর্তৃক আক্রান্ত ও বর্ধমানের দক্ষিণ সেলিমাবাদের নিকট পরাজিত হয়ে হুগলীর পর্তুগীজ অধ্যক্ষের আশ্রয়ে পলায়ন করেন। তারপর মঙ্গলকোটের নিকট বাবা খাঁ কাকশালের লোকজনের সঙ্গে কতলুর সংঘর্ষ উপস্থিত হল। কিন্তু কতলু জয়লাভ করলেন। অতঃপর আজিম খাঁ বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে কতলু খাঁ উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুর পর্যন্ত অধিকার করে দামোদর নদ পর্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। আজিম খাঁ তাঁকে দমনের অভিপ্রায়ে একদল মোগল সৈন্য প্রেরণ করলেন।

মোগল আমীরগণ বর্ধমানের নিকট অবস্থিতি করে কতলু খাঁর সহিত সন্ধি করবার ইচ্ছায় সেখ ফরীদ উদ্দীন নামে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। কতলু সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন না। কিন্তু বাহাদুর খাঁ নামক তাঁর একজন অনুচর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় ফরীদ কোনরূপে আত্মরক্ষা করে মোগল শিবিরে উপস্থিত হন। তারপর আমীরগণ দামোদর নদ পার হয়ে কতলুর দমনে অগ্রসর হন। কতলু পরিবেষ্টিত হয়ে আপনার শিবিরে অপেক্ষা করেন। বাহাদুর খাঁ কর্তৃক সৈন্যসহ অন্য স্থানে ছিলেন। তিনি সাদিক খাঁ ও সকুলী খাঁ প্রভৃতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পলায়ন করেন ও কতলুর নিকট উপস্থিত হন। আমীরগণ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে কতলুর শিবির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উচ্চস্থান থেকে গোলা-বর্ষণ আরম্ভ করলে কতলু উড়িষ্যার অরণ্য প্রদেশে পালিয়ে গেলেন। তারপর ওয়াজীর খাঁ ও মানসিংহের সঙ্গে কতলুর সংঘর্ষ উপস্থিত হল। কিন্তু অচিরে কতলুর দেহাবসান ঘটলো।

কতলুর পরে ঈশা খাঁ ও তারপরে ওসমান আফগানদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কতলু খাঁ ও ঈশা খাঁর সঙ্গে মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায়ের অত্যন্ত সৌহার্দ্য ছিল। কতলু ও বিক্রমাদিত্য দায়ুদের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। যে সময়ে কতলু উড়িষ্যা পরিত্যাগ করে দাউদের নিকট উপস্থিত হন, সেই সময়ে উড়িষ্যাবাসিগণ আবার কিছুদিন স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিল। কতলু তাদের দমনে সর্বদা ব্যাপৃত ছিলেন। আবার মোগলদিগের সঙ্গে তাঁকে অবিরত যুদ্ধ করতে হ'ত। এই সময়ে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হওয়ার প্রতাপাদিত্য পিতৃবন্ধু কতলু খাঁর সাহায্যের জন্য উড়িষ্যায় উপস্থিত হন। কতলুর সাহায্যের জন্য তাঁকে উড়িষ্যাবাসিগণের ও মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করতে হয়। প্রতাপের স্বাধীনতা প্রকাশের প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা এই স্থানে প্রাপ্ত হই।

উড়িষ্যায় অবস্থানকালে প্রতাপ যথাবিহিত পুণ্যকৃত্য-সকল সম্পন্ন করলেন। দরিদ্রগণকে বহুল পরিমাণে ধন-রত্ন বিতরণ করলেন। মোগলপ্রপীড়িত বহুসংখ্যক উৎকলী ও পাঠান প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রতাপের সহৃদয় ব্যবহারে সকলেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলেন। তাঁরা প্রতাপের নিকট দুঃখকথা কীর্তন ক'রে হৃদয়ের বেদনা লাঘব করতে লাগলেন। কিন্তু মোগল অনুগৃহীত উৎকলীরা প্রতাপকে মোগল বিদ্বেষি-গণের শ্রদ্ধার পাত্র হ'তে দেখে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করেন।

রাজা বসন্ত রায় আদেশ করেছেন, চির অভীষ্ট উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং গোবিন্দদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের পরম কমনীয় বিগ্রহ আনয়ন করতে হবে। ভগবান উৎকলেশ্বর ও গোবিন্দদেব উড়িষ্যাবাসিগণের পরমারাধ্য দেবতা। উড়িষ্যার মধ্যভাগ থেকে তাঁদের আনয়ন করা সাধারণ কথা নয়।

বন্ধুদের কাছে প্রতাপাদিত্য গোপনে বললেন,—দেব-দ্বয়ের পূজকগণকে হাত করতে হবে। এজন্য যদি বেশ কিছু অর্থ দান করতে হয় তজ্জন্য আমি প্রস্তুত আছি। তোমরা পূজারীদের সহ যোগাযোগ স্থাপন কর।'

অর্থলোলুপ পূজকরা হাতে প্রচুর অর্থ পেয়ে দেবতাদ্বয়কে হস্তান্তরিত করে।

উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, আর কালক্ষেপ নয়। প্রতাপ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চললেন উৎকলেশ্বর শিব ও গোবিন্দদেব।

দেবতারা অপহৃত হয়েছেন জেনে উৎকলবাসীরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতাপের পিছু নিলো। প্রতাপকে আক্রমণ করলো তারা। যারা ইতিপূর্বে প্রতাপের প্রশংসার কথা শুনে ঈর্ষা প্রকাশ করেছিল, তারা এই অবকাশে জনসাধারণকে প্রতাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে মনস্থ করলো। তারা দলবদ্ধ হয়ে প্রতাপকে অকস্মাৎ আক্রমণ করলে।

প্রতাপ উৎকলবাসী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অল্পকালের মধ্যে তাদের পরাজিত ক'রে নির্বিঘ্নে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করতে লাগলেন। উৎকলবাসীদিগের পরাজয়বার্তা তড়িৎবেগে দেশমধ্যে রাষ্ট্র হ'ল। উৎকলী রাজন্যবর্গ আপন আপন সৈন্য-সামন্ত ল'য়ে প্রতাপের গতিরোধ করবার জন্য বিদ্যুৎগতিতে ধাবিত হ'লেন।

প্রতাপও নিশ্চিন্ত থাকলেন না। উৎকলীদের ঘোরতর

আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকলেন। তিনি নির্দিষ্ট সৈন্যগণকে একত্র ক'রে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম বিভাগে কতিপয় অসীম সাহসী সৈন্য পাঠিয়ে গন্তব্যপথের সংবাদ সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করলেন। দ্বিতীয় বিভাগ তিনি স্বয়ং পরিচালনা ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

সৈন্যগণ অহর্নিশ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত। কি শয়ন, কি উপবেশন, কোন সময়েই কেউ নিশ্চিন্ত নয়। সকলেই আশু ঘোরতর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রতাপ এইরূপ সৈন্য পরিচালনা ক'রে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। উৎকলী রাজন্যবর্গ বহু সৈন্য সংগ্রহের পরে সুবর্ণরেখার তটে বঙ্গীয় সেনাকে আক্রমণ করলেন। প্রতাপও সিংহবিক্রমে উৎকলী-দিগকে প্রতিরোধ করলেন।

দেখতে দেখতে চতুর্দিকে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হ'ল। শঙ্কর, সূর্যকান্ত, ভবেশ্বর প্রমুখ বীরপুরুষরা যেন বহুরূপ ধারণ ক'রে প্রতিটি সৈনাকে প্রোৎসাহিত করতে লাগলেন।

সুশিক্ষিত বঙ্গীয় সেনা ও সেনাপতির কাছে উৎকল শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হয়ে পড়লো। সুবর্ণরেখার তটভূমে প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্যকান্ত প্রমুখ বীরগণের যুদ্ধ-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হ'ল। সমবেত উৎকলী রাজন্যবর্গ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ক'রে কয়েকজন প্রধান নৃপতিকে প্রতাপ বন্দী করলেন।

বন্দী নৃপতিরা প্রতাপের সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হ'লো।

প্রতাপ বন্দী নৃপতিদের যথেষ্টরূপে সম্মানিত ও বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত ক'রে বিদায়প্রদান করলেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতাপ সখ্য সংস্থাপন করে স্বদেশযাত্রা করলেন।

যশোরে সংবাদ আসে, প্রতাপ যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। রাজা বসন্ত রায় প্রতাপের সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন। অতি সমারোহের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানে স্থানে বিজয়-তোরণ সংস্থাপিত হ'ল। রাজপথ ও গৃহসকল সুসজ্জিত করা হয়।

এই বিজয়বাহিনী দেখার জন্য চতুর্দিকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো।

উৎকল দেশ হ'তে আনীত দেববিগ্রহ বিনয়পূর্বক পিতৃব্যদেবের হস্তে প্রতাপ অর্পণ করলেন।

ধর্মপরায়ণ বসন্ত রায় তাঁর চির-অভীষ্ট দেবতাদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়ে অপরিসীম আহ্লাদ প্রকাশ করলেন। দেবতাদের স্থাপন করবার আয়োজন করতে উদ্যোগী হলেন তিনি। অল্পকাল মধ্যে দেবপ্রতিষ্ঠার উপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হ'ল।

উৎকলেশ্বর মহাদেবকে বসন্ত রায় বেতকাশীতে স্থাপিত করলেন। অভ্রভেদী মন্দির নির্মিত হ'ল। মন্দির-গাত্রে প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ হ'ল। খোদিত লিপিতে লিখিত হ'ল—

নির্মমে বিশ্বকর্মা যৎ পদ্মযোনি প্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্॥
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্ত রায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তথ॥

গোবিন্দদেবকে স্থাপিত করা হয় যশোরের গোপালপুর নামক স্থানে, এক বিরাট মন্দিরে।

উড়িষ্যা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে প্রতাপাদিত্য আপনাকে স্বাধীন ভূঁইয়া নামে ঘোষণা করলেন। স্ব-নামে মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থাও করলেন। মুদ্রার সম্মুখ-ভাগে লিখিত হয়—শ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহা-রাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য। মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে লেখা থাকে —বজ্রৎছিকা বছিনো ভরবে বাঙ্গাল মহারাজ প্রতাপাদিত্য জল্লাল।

ব্যাপার গুরুতর দেখে বাঙলার সুবেদার আজিম খাঁ ভীষণ রুষ্ট হ'তে থাকেন। তিনি অনুমান করেন, প্রতাপ নিশ্চয়ই বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হবে। এর প্রতিকারে মনোনিবেশ করলেন আজিম খাঁ। তিনি স্থির করলেন, প্রতাপকে অচিরে দমন করতে হবে। নতুবা সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে।

দেখা যাক, বিজয়লক্ষ্মী কার মস্তকে আশীর্মালা নিক্ষেপ করেন!

[ক্রমশ।

দলবদলের খেলা

তিনিই প্রকৃত দেশনায়ক বা দেশসেবক যিনি সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণ কামনা করেন এবং দেশ বলিতে যিনি নিছক খানিকটা ভৌগোলিক সীমানাচিহ্নিত স্থান মনে করেন না, বিপুলসংখ্যক নরনারী, জাতীয় সমস্যা, চিন্তাধারার সম্বন্ধে যিনি দেশকে চিন্তা করেন তাঁহাকেই অনায়াসে যথার্থ দেশনেতা বলা চলে। তিনি কোন দলের গণ্ডীর ভিতর হইতেই দেশকে ভাবেন না। দেশকে দেশের গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব দিয়াই উপলব্ধি করেন। একটি দেশের অগণিত অধিবাসী তাহাদের সুখ, দুঃখ-আনন্দ, বেদনা, সমস্যা, সঙ্কট সব কিছুর সমন্বয়ে তিনি দেশকে চিন্তা করিয়া থাকেন এবং দেশের স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিয়া থাকেন, দেশের চিন্তাই নিজের চিন্তা, ধ্যান, জ্ঞান, সাধনারূপে বিবেচনা করিয়া থাকেন, শুধু দল বলিলে ভুল হয়—সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি দেশকে স্থান দিয়া থাকেন।

সুখের বিষয় গৌরবের বিষয় এই মহাদেশসদৃশ ভারতবর্ষও এই শ্রেণীর অসংখ্য মহান নায়কদের বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে। তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিতে গরীয়সী হইয়া আছে। তাঁহাদের মহামূল্য অবদানে নিজেকে পরিপূর্ণা করিয়া তুলিয়াছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ধরণের নায়কদের অভাব ক্রমশই পরিলক্ষিত হইতে থাকিল। রাজনীতির আসরে যে সব নবাগত নায়কদের আবির্ভাব হইতে লাগিল পূর্বসূরীদের গুণাবলীর শতাংশের একাংশও অর্জাইল না। নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় ভারতবর্ষের শেষ নেতা স্বর্গত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরই বলিতে গেলে ভারতবর্ষ প্রকৃত নেতাশূন্য হইল।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চ শূন্য নয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সব সময়ই যে রাজা থাকেন তাহা নয়, কখনও কখনও তাঁহার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতেও বিদূষক আসিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। রাজার সগৌরবে প্রস্থানের পর বিদূষকের নাচন-কোদন আরম্ভ হয়। যে পরিবেশ রাজার মহিমায় উজ্জ্বল হইয়াছিল বিদূষকের ভাঁড়ামি তাহার আলেখ্য সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিল।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের গৌরবের দিকটি এই রচনার মধ্যেই আলোচিত হইয়াছে এইবার এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বেদনার দিকটি আলোচনা করা যাক।

বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চটির অবস্থা ঠিক রঙ্গমঞ্চের অনুরূপই হইয়াছে। জনগণবন্দিত নেতৃবৃন্দ আজ অতীত কিন্তু তাঁহাদের স্থানে আজ যাঁহাদের দেখা যাইতেছে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ এবং তৎসহ যোগ্যতা, দক্ষতা কোনদিক দিয়াই পূর্বাচার্যদের সহিত কোনক্রমে তুলনীয় নয়। কি যোগ্যতায়, কি চরিত্রে, কি দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনদিক দিয়াই তাঁহাদের সহিত ইঁহাদের তুলনা হয় না। বরং এ কথা বলা চলে যে—যে আসন তাঁহারা মর্যাদাসমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ইঁহাদের দ্বারা সে মর্যাদা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ইঁহাদের নিকট দেশ, জাতি—এ সব কিছুই নয়, ইঁহাদের হৃদয়ে জাতীয় স্বার্থ, সুখ-দুঃখ কোনকিছুই রেখাপাত করে না। দেশের কল্যাণ চিন্তা মুখে ইঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্যরূপ। ইঁহাদের শ্রীমুখ হইতে যে-সব বাণী নিঃসৃত হয়—ইঁহাদের কার্যাবলীর সহিত তাহাদের তিলমাত্র মিলও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেশ তাঁহাদের নিকট গৌণ, স্বার্থসিদ্ধি তাঁহাদের কাছে মুখ্য এবং সে স্বার্থ দেশের বা জাতির নয়—আপন আপন। যেখানে আপন স্বার্থসিদ্ধি দেখা যায় কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তখনই তাঁহারা তাহা পূরণ করার জন্য জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী যে কোন কাজ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। সে কাজ সিদ্ধ হইলে দেশের স্বার্থ যতই ক্ষতিগ্রস্ত

হউক তাহাতে তাঁহারা এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করেন না।

দলের মাধ্যমে দেশকে সেবা করা যে অনুচিত এ কথা আমরা একবারও বলি না। তবে, দেশ অপেক্ষা দল যদি বড় হয় তখনই পরিতাপ উদ্রেক করে।

দলত্যাগ ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে নূতন নয়। একদা সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া নূতন দল গঠন করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নব দলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দলত্যাগের মূলে যে কারণ আছে তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়---যেখানে তাঁহারা ব্যক্তিত্বের অবমাননা এবং আদর্শের সংঘাত অনুভব করিয়াছেন। দেশসেবা ছিল তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই যখনই তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে সেই দলের মাধ্যমে তাঁহাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশসেবা বা দেশের কল্যাণ সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে তখনই দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

এখানে এত কথার অবতারণা এই কারণে যে গত চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর হইতে রাজনৈতিক (অভি) নেতৃবৃন্দের মধ্যে যেভাবে দলবদলের খেলা সুরু হইয়াছে তাহার পরিণতি যে কোথায় এবং কতদূর গড়াইবে তাহা যথেষ্ট চিন্তার কারণ। পূর্বতন শ্রদ্ধাস্পদ নেতবৃন্দের অনুকরণে ইঁহারা যে দলত্যাগের খেলায় মাতিয়াছেন তাহা আসলে তাঁহাদের অবমাননাই করা হইতেছে বলা চলে, তাঁহাদের দলত্যাগের পিছনে যে কারণ বিদ্যমান ছিল ইঁহাদের দলত্যাগের নেপথ্যে রহিয়াছে একেবারে তাহার বিপরীতধর্মী দৃষ্টান্ত। ইঁহারা যখনই বোঝেন যে আপন আপন স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে বা ক্ষমতার গদী বরাতে জুটিল না তখনই ইঁহারা আপন দলের ত্রুটি ও গলদগুলি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন ও সঙ্গে সঙ্গে অন্য দলে যোগ দেন (যদি সেখানে মিলিত হইলে কপাল খোলে, এই জাতীয় মনোভাব লইয়াই হয়তো)।

রাজনৈতিক নেতাদের যদি এই আদর্শ এবং স্বরূপ হয় তাহা হইলে দেশের পক্ষে তাহা যে কতখানি মারাত্মক ব্যাপার বোধ করি কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সে সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলার দরকার হইবে না। এই জাতীয় রাজনীতিকদের হাতে পড়িয়া দেশের এতগুলি মানুষের ভাগ্য বা জীবন যে সর্বনাশের কোন প্রান্তে উপনীত করিবে তাহা ভাবিলে উদ্বেগের অবধি থাকে না। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর একাধিক নূতন দল গঠিত হইল (বি-কে-ডি, লোকদল, আই এন ডি-এফ প্রভৃতি) নেতাদের মধ্যেও কে যে কখন কোন দলের বাসা বাঁধিতেছেন তাহাও বলা কঠিন। এই নবগঠিত দলগুলি তাঁহাদের যে সকল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ব্যক্ত করিতেছেন তাহার সুস্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় দূরীভূত হয় কি?

তাই দেশের এই চরম দুর্দিনে দলবদলের ইতিহাসের এবার পালাবদল ঘটুক, দলের উর্ধ্বে এবার দেশকে স্থান দেওয়া হউক, নচেৎ দুর্গতির অবধি থাকিবে কি?

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা

স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের যে ক'টি অবিস্মরণীয় কীর্তি তাঁহার দূরদর্শিতা এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন চিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করিতেছে---সেই তালিকায় দুর্গাপুর প্রকল্প একটি অমলিন নাম।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যের কল্যাণমূলক যে সকল কার্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুর্গাপুর, কল্যাণী প্রভৃতি শীর্ষস্থানে উল্লেখযোগ্য। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে 'পশ্চিমবঙ্গের সার্থকনামা স্থপতি'আখ্যা দেওয়া সঙ্গত।

বিধানচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি দুর্গাপুর দেশের শিল্পপ্রগতির জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিল আরও একটি বিরাট গুরুত্ব তাহাতে অর্পিত হইল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অগণিত মানুষ তাঁহাদের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্র পাইল। বহু কুশলী, ইঞ্জিনীয়ার তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশেরও একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইলেন এবং সকলের সম্মিলিত শ্রমে ও ঐকান্তিকতায় এই প্রকল্পের জয়যাত্রা রাজ্যের শিল্প সমৃদ্ধিরই ব্যাপক জয়যাত্রার অন্যতম নিদর্শন বলিয়া চিহ্নিত হইল।

কিন্তু আজ দুর্গাপুর প্রকল্পকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি গুরুতর সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে। দীর্ঘদিন পূর্বের কথা নয়, কিছুকাল পূর্বেও এই অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহৎ কর্ম সংস্থান কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত ছিল। শুধু ইস্পাত কারখানাই নয়, পরিপার্শ্বে আরও অনেকগুলি কল-কারখানা স্থাপন করিয়া রাজ্যের শিল্পসমৃদ্ধির আরও ব্যাপক উন্নয়ন সাধনই ছিল বিধানচন্দ্রের লক্ষ্য।

এখন দেখা যাইতেছে যে সরকারী প্রকল্পগুলি যদি ঠিকমত পরিচালিত হইত তাহা হইলে কর্মসংক্রান্ত দুশ্চিন্তাও থাকে না, কিন্তু জানা গিয়াছে যে, দুর্গাপুর প্রকল্প নিদারুণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে এবং এই ক্ষতি এক নিদারুণ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। এই ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ প্রতি মাসে এগার লক্ষ টাকা। এখন প্রতি মাসে

লোকসান যেখানে এগার লক্ষ টাকা সেখানে সে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষাই এক নিদারুণ সমস্যার ব্যাপারে পরিণত হয়। সম্প্রতি রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এই দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা রীতিমত নৈরাশ্যসূচক এবং তাহা অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, রাজ্যপাল দুর্গাপুরের অন্ধকারময় ভবিষ্যতটিই যেন প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

ইহা অবশ্যই ঠিক যে প্রতি মাসে এত বিপুল আর্থিক ক্ষতির মধ্যে প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভবপর নয়। কিন্তু চালানো সম্ভব নয় বলিয়া প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘোষণাও তো কোন কার্যকর ব্যবস্থাও নয়। যেখানে অসংখ্য কর্মী দিনের অন্নসংস্থান করিতেছেন তাঁহারা নিরন্ন হইলে দেশের বেকারিত্ব যে কি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেশকে সর্বনাশের সীমায় আরও কতদূর আগাইয়া দিবে তাহা ভাবা যায় না।

শুধু দুর্গাপুর নয়, ডি-ভি-সিতেও প্রায় দেড় হাজার কর্মী আজ কর্মহীন হইতে চলিয়াছে। কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া সোজা, কিছুমাত্র শক্ত নয়, নোটিশটি জারী করিলেই হইল কিন্তু তাহার পরিণতিটিও ভাবা উচিত, একে তো রাজ্যের তথা সারা দেশের আজ শোচনীয় অবস্থা। খাদ্য-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, গৃহ-সমস্যা ইত্যাদি। ইহার পর বেকারিত্ব তো আছেই। বলা বাহুল্য, এই সমস্যাগুলিকে অনায়াসে এক একটি দুরারোগ্য এবং ভয়াবহ ব্যাধির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে—তাহা হইলে যেখানে ব্যাধি দুরারোগ্য সেখানে ব্যাধিকে নিরাময় করার পরিবর্তে যদি তাহাকে আরও জটিল এবং দুরারোগ্য করা হয় তাহা হইলে কি অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা বুঝাইয়া বলার আবশ্যক নাই।

প্রশ্ন এই যে এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও এবং প্রচুর আশা আলোর উজ্জ্বল রশ্মি সত্ত্বেও দুর্গাপুর বা ডি-ভি-সির এই অবস্থা কেন? কি কারণে সেখানকার এতগুলি কর্মী আজ কর্মহীন হইতে চলিতেছে এই বিপুল আর্থিক ক্ষতি ... হইতেছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজিতে হইলে তাহাদের পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এত বড় বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং যোগ্যতম গোষ্ঠীর প্রয়োজন যাঁহাদের কল্যাণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা তৎসহ একাধারে দৃঢ় আবার সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রতিষ্ঠানকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিবে। কিন্তু অব্যবস্থা, ঔদাসীন্য এবং অযোগ্যতা এ সব ক্ষেত্রে কোনক্রমেই বরদাস্ত করা চলে না। যেখানে সারা রাজ্যের একটি বিশেষ-বিষয়ক প্রগতি এবং সর্বোপরি অগণিত মানুষের মুখের অন্নের প্রশ্ন জড়িত সেখানে কোনপ্রকার অব্যবস্থা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

এ সমস্যা দুর্গাপুরের নয়, ডি-ভি সি'র নয়। এ সমস্যা সারা বাঙলা দেশের। ইহা জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যাকে আর টিকাইয়া রাখা কোনক্রমেই উচিত নয়, অবিলম্বে তাহার সমাধান চিন্তা জাতীয় মহান কর্তব্যেরই নামান্তরমাত্র।

আমাদের শিক্ষা-সমস্যা

বিশ্ব সংস্কৃতির গৌরব ও মহিমা বিবর্ধনে যে বঙ্গদেশের অতুলনীয় অবদান এবং মহান ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ—সেই বঙ্গদেশেই শিক্ষাজগতের আজ যে শোচনীয় অবস্থা ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সুধী-সমাজে রীতিমত উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে।

সুজলা-সুফলা বঙ্গদেশের এই দুর্যোগের দিনগুলিতেও শিক্ষা সম্বন্ধে গর্ব করিবার যে কারণটুকু অটুট ছিল আজ তার সে গর্বও বুঝি ভূলুণ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশ আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের রাজত্বে পরিণত হইয়াছে। বাঙালীর অনেক গর্ব আজ ভাগ্যদোষে শুধু অতীতের একটি সুখস্মৃতিমাত্র। তথাপি বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে আজও অবাঙালীকে মাথা নত করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে শিক্ষা-জগৎ পরিচালিত হইতেছে তাহা যে ঘোর অকল্যাণকে দু হাত বাড়াইয়া আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

বাল্যকাল হইতে স্কুলের ছাত্রেরা শিখিয়া থাকে—'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' অধ্যয়নই ছাত্রদের একমাত্র ধ্যান - জ্ঞান - সাধনারূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। ছাত্রজীবনে অন্য কোন বৃত্তির অনুপ্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয়। যে কোন সাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার অগ্রগতির ক্ষেত্রে ছেদ পড়ে। তেমনই অধ্যয়নের মধ্যে যদি রাজনীতি প্রবেশ করে তাহা হইলে সেই দোটানায় একূল, ওকূল দুই কূলই নষ্ট হয়।

বর্তমানে শিক্ষাজগৎ যেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের এক লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীগণকে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রীড়নক

...হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ...শই সশস্ত্র পুলিশকে উপস্থিত হইতে ...। যে কোন ঘটনা ঘটিলেই বিশ্ব-...্যালয় প্রাঙ্গণে বা তাহার এলাকায় ...যুদ্ধ সুরু হইয়া যায়। নিরীহ পথ-...রীর পক্ষে ঐ এলাকায় পথচলা হয় ...শঙ্কনক, দরিদ্র বিপণিকারদের পক্ষে ...ম্ভব হইয়া থাকে দোকান সাজাইয়া ...। ফলে মাসের মধ্যে সেই হতভাগ্য ...কানদারদের ব্যবসা যে কতদিন বন্ধ ...কে কে তাহার হিসাব রাখে?

ছাত্রদের সম্বন্ধে এই সকল বিষয়-...কে কেন্দ্র করিয়া নানা অভিযোগ, ...রণ, বহু অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলিতে দেখা ...য তাহাদেরই নায়কত্বে অনুষ্ঠিত ...তেছে। এমন বহু কার্যে তাহারা ...জেদের জড়াইয়া ফেলে যাহার ফলে ...হারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ...রিপার্শ্বিক পরিবেশও প্রতিকূল করিয়া ...লে।

তবে তাহাদের সম্বন্ধে অভিযোগ ...স্থাপন করিলে আরও কয়েকটি বিষয় ...বিয়া দেখা সমীচীন। শিক্ষাজগতের ...জ যত কিছু সমস্যা সব কিছুর জন্য ... তাহাদেরই দায়ী করিলে অত্যন্ত ...কদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হইবে ...বং তাহাদের প্রতি সত্যই অবিচার ...রা হইবে। শিক্ষাজগতের সমস্যা ...্র ছাত্র-গোলযোগকে কেন্দ্র করিয়াই ...য আরও একাধিক কারণে আজ ...শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্যামূলক পরিস্থিতির ...ষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য ছাত্র-সমাজ ...বলমাত্র দায়ী নয় বরং সেই সকল ...রিস্থিতি তাহাদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করে ...য়া তাহারা ক্ষুব্ধ বিচলিত হইয়া ...ঠে এবং ধৈর্য হারাইয়া ফেলে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মালিক তাহার বিদায়-সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে এই বিষয়ে যে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য সাধুবাদ তাঁহার প্রাপ্য। শিক্ষাজগতের ভিত্তিতে আজ যে গলদ এবং দীর্ঘসূত্রতা তৎসহ ঔদাসীন্যের বীজ উপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে মহীরুহের রূপলাভ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

শিক্ষাজগতের ভিত্তি আজ দুর্বল ও শুথ হইয়া গিয়াছে। কোন দুর্বল বা শুথ ভিত্তির উপর কখনও সুদৃঢ় ইমারত গঠিত হইতে পারে না। সে ইমারত তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িবেই। শুধু ছাত্র অসন্তোষই যে শিক্ষাসমস্যার একমাত্র কারণ তাহা বলা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। আরও নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। যেমন সমগ্র পড়াশোনাটাই একরকম দায়সারা ধরণের হইয়া থাকে, ইহার প্রতি কোন আন্তরিকতা বা ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করা হয় না। যেটুকু না করিলে নয়—সেইটুকুই কোনক্রমে কর্তব্য সারা ধরণের করা। পড়াশোনা সম্বন্ধে শ্রীমালিক ইহাও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে যথাযথ তত্ত্বাবধায়নও হয় না। সুতরাং যেখানে যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাব, সেখানে সমগ্র কার্যটিকেও ঐকান্তিকতার স্পর্শসমৃদ্ধ পুরোপুরিভাবে বলা যায় না। পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। সর্বোপরি ছাত্রদেরই নিয়মনিষ্ঠ ও সময়সচেতন হইতে বলা হয় কিন্তু অধ্যাপকমহলেও সেই সদগুণগুলির অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা গুরু, শিক্ষাদাতা, অগ্রজ, তাঁহারা যদি বর্জনীয় আদর্শ স্থাপন করেন তাহা হইলে অনুগামীর দল কি সেই আদর্শই অনুসরণ করিয়া চলিবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অধ্যাপকদের মধ্যেও এই সদগুণগুলির উল্লেখযোগ্য অভাব বিদ্যমান অধ্যাপক এবং ছাত্র উভয়ের সম্পর্ক হওয়া উচিত পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতিশীল।

ভারতবর্ষের সনাতন সভ্যতার ইতিহাসে যে তপোবনকেন্দ্রিক জীবনধারার পরিচয় মেলে তাহাতে গুরু-শিষ্যের আদর্শ সম্পর্কটি সুচিত্রিত। সেকালের ভারতীয় জীবনযাত্রায় ছাত্রেরা গুরুগৃহে বাসের মধ্যে অধ্যয়ন ছাড়া যে আত্মীয়তার নৈকট্য গড়িয়া উঠিত তাহা এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী গঠনের অভিমুখে সমাজকে পরিচালিত করিত। গুরু যদি শিষ্যদের সম্পর্কে অবজ্ঞা-সূচক মনোভাব প্রকাশ করিতে থাকেন

...সে ক্ষেত্রে ছাত্রেরাই বা কোন যুক্তিতে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিবে।

অতএব শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনার অভ্যন্তরে যে গলদগুলি আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে সেগুলি অপনোদন সর্বৈব কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া অবিলম্বে আবশ্যক। নতুবা সব কিছুর জন্য ছাত্রবিক্ষোভ এবং ছাত্রদের অসন্তুষ্টিকেই দায়ী করিয়া একদেশদর্শিতার পরিচয় দিলে সমস্যার সমাধান হইবে না বরং ক্রমশই বর্ধিত হইয়া এক সর্বনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

সমগ্র বঙ্গের সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত গত ১ই বৈশাখ ৮৮তম জন্মদিনে অন্তিমনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 'দাদাঠাকুর' নামে ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। সাহিত্যসেবী এবং সমাজসেবী ছাড়াও তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সরস কৌতুককর ও বিদ্রূপাত্মক রচনা ও গানকে কেন্দ্র করে। বহু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। বেশভূষায়, আচারে আচরণে, জীবনযাত্রায়, নীতিতে, আদর্শে সকল দিক দিয়েই এক অদ্বিতীয় পুরুষ। দীর্ঘ জীবনে কখনও কোন পরিবেশেও আপন আদর্শ ও নীতি থেকে এই ক্ষণজন্মা মানুষটি বিচ্যুত হননি। যে কোন সময়ে বা স্থানে বা পরিবেশে বিনা প্রস্তুতিতে কথা রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে তাতে সুর সংযোজন করে এবং সেই সঙ্গে দর্শকসমক্ষে তার সার্থক পরিবেশনের এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে ছিল। 'বিদূষক' নামক সুবিখ্যাত পত্রিকার তিনিই ছিলেন লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রণকর্মী ও বিক্রেতা। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর জীবনী অবলম্বনে একটি ছায়াচিত্র নির্মিত হয়েছিল। কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাঁর জীবনীচিত্র নির্মাণের নজীরও সেই সর্বপ্রথম সৃষ্টি হল।
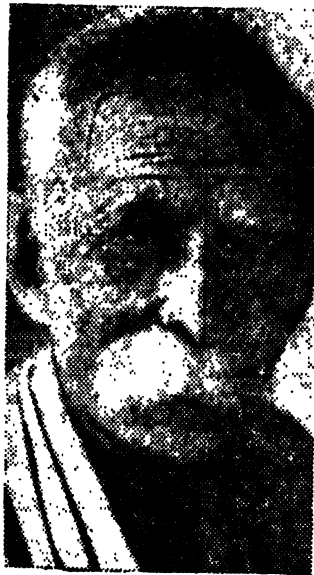
...ণ্ডিত

কালী সরকার

সুপ্রসিদ্ধ নট কালী সরকার গত ১৪ই বৈশাখ ৬৩ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। চলচ্চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকালব্যাপী অভিনয়ের মাধ্যমে একজন দক্ষ ও শক্তিমান নট হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বাঙলা দেশের নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

...প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসদ্‌কুমার...

সম্পাদকীয় সম্পর্কে

মহাশয়, আপনাদের ফাল্গুনের (১৩৭৪) 'পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রপতির শাসন' ও চৈত্র সংখ্যার 'পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচন' সম্পাদকীয় শীর্ষকগুলি সত্য সত্যই অপূর্ব এবং অভূতপূর্বভাবে আমাদের এই সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নব নব পরিবর্তনের ইতিহাসের ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রবর্ত্তনের ফলে যে এই রাজ্য সেই রাহুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আপনারা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; সাধারণ নির্বাচনের পর হইতেই এই রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ হইতে ক্ষমতায় আসীন হইবার যে বহুল প্রয়াস দিনের পর দিন পরিলক্ষিত হইতেছিল—তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি ভয়াবহ। শৃঙখলা ও আইনকে কোণঠেসা করিয়া ও গণতন্ত্রকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার যে প্রচেষ্টা এই রাজ্যে চলিতেছিল—তাহ'র তুলনা নাই বলিলেই চলে। লক আউট, ঘেরাও, মিছিল, ঘন ঘন জন-বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে এই রাজ্যের জনসাধারণের জীবন বিষময় ও জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিধান সভা অচল হইয়াছিল কেহই আর সচল করিতে পারিলেন না। কোন মন্ত্রিসভাই—শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিল না। বিশৃঙখলা ও অরাজকতার তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকিল। আমরা রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রবর্তনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে গণতান্ত্রিক আইনানুগ রাষ্ট্রপতির শাসন চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

সেই জন্য ইলেকসন কমিশনার বিভিন্ন দলের মতামত গ্রহণ করিবার পর আগামী নভেম্বর মাসে অন্তর্বর্তী-কালীন নির্বাচনের দিন ধার্য করিয়াছেন। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন করিলেই কি আমাদের সমস্ত সমস্যা মিটিয়া যাইবে। আমাদের মনে হয় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উহাতে আমাদের সমস্যা তো মিটিবেই না উপরন্ত কেরলের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের মতো নূতন জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা বহু প্রচেষ্টার ফলেও এই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙখলা আনিতে পারেন নাই।

জন স্টুয়ার্ট মিল ও রুশোর মতে জাতীয় প্রয়োজনের সময় Absolutism becomes a need and necessity.

আমাদের দেশেও বোধ হয় সেই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হই-য়াছে। সাধারণ মানুষ চায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান। তারা রাজনীতির বড় বড় বুলি ও কচকচি লইয়া মাথা ঘামাইতে চায় না। আমাদের মনে হয় রাজনৈতিক নেতাদের গণতন্ত্রে নব-চেতনা না আসা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন আরও দীর্ঘ-দিন স্থায়ী করা একান্ত কর্তব্য হবে। এ কথাটা যেন আমরা কখনও না ভুলি যে, রাজনৈতিক নেতারা ছাড়াও আমা-দের এই পশ্চিমবঙ্গে আরও বহু চিন্তা-শীল ও মনীষী ব্যক্তি আছেন যাঁহারা এই অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে-ছেন না বা উহা চাহেন না। আমরা ২৯টি রাজনৈতিক দলের সন্ধান ইতি-মধ্যে পাইয়াছি এবং ইহার পরে যে আর কয়টি মাথা গজাইয়া উঠিবে কে জানে। আমার মনে হয় অন্তর্বর্তীকালীন নির্বা-চনের পূর্বে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের গণতন্ত্রের ইতিহাসে নূতন পক্ষ লইবার বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ভবদীয়—

শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯সি, সি এন রায় রোড, কলিকাতা-৩৯।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে

মহাশয়, গত চৈত্র সংখ্যার মাসিক বসুমতীর 'সম্পাদকীয়' বিভাগে প্রকাশিত 'কলিকাতা মহানগরীর আবর্জনা সমস্যা' প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তর নগরী কলকাতার পৌরকার্যের অব্যবস্থার দরুণ প্রতি বছর এখানে রোগ বিস্তার লাভ করা সহজসাধ্য হয়। এর ফলে অনেক সময় নাগরিক সাধারণের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে বসন্ত কলেরা প্রভৃতি রোগের সংক্রামণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নাগরিকেরা সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কলকাতা মহানগরীকে আবর্জ্জনামুক্ত যদি না করা যায় রোগের ব্যাপক বিস্তার রোধ করা অসম্ভব। আশা করি, পৌর কর্তৃ-পক্ষ এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়ে নাগরিক স্বার্থে মহানগরীকে জঞ্জালমুক্ত করবেন।

ইতি—শ্রীতিমির দাশগুপ্ত, ৭৭, অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা-১০।

আরোগ্য বিভাগ প্রসঙ্গে

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর আরোগ্য বিভাগ আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধন করছে। বিনামূল্যে ডাক্তারের মতামত ও ওষুধের প্রেসক্রিপসনে আমরা উপকৃত হচ্ছি। এই ধরণের একটি মূল্যবান ও জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ খোলার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মাসিক বসুমতীতে ছোট গল্পের সংখ্যা যাতে বাড়ে সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয়গুলি বর্তমান অবস্থার পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুলিখিত। গত সংখ্যা মাসিক বসু-মতীতে কলিকাতার পূতিগন্ধময় জঞ্জাল অপসারণে কলিকাতার কর্পো-রেশনের যে ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরে-ছেন তা সত্যই অতি প্রশংসনীয়। এতেও কি আমাদের কলিকাতার

পৌরসংস্থার কর্তৃপক্ষের সুবুদ্ধির উদয় হইবে না? বলিষ্ঠ সম্পাদনার জন্য আমরা পুনরায় আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি এখানেই সমাপ্ত করছি।

নমস্কারান্তে— ইতি। বিনীত— গোকুলচন্দ্র বোস, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২।

উপন্যাস প্রসঙ্গে

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত কয়েকটি ধারাবাহিক রচনার মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী লিখিত 'গাছের পাতা নীল', ইন্দ্রসেন লিখিত 'তিন পুরুষ', বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'কলিতীর্থ কামারপুকুর,' প্রফুল্ল রায়ের 'বাতাসে প্রতিধ্বনি' এবং অন্যান্য রচনাগুলি আমরা যথেষ্ট মনোযোগসহকারে পড়ছি। এগুলি পড়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত কবিতাগুলি আর একটু সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করলে ভাল হয়। কয়েক মাস থেকে মাসিক বসুমতীতে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস দেবার যে পরিকল্পনা আপনারা করেছেন তা পাঠকদের কাছে আশা করি সমাদর লাভ করবে। নটরাজন লিখিত এবং দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'এক রাতের রাণী' পড়ে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছি। লেখকের লেখনীর বলিষ্ঠতা উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। উক্ত উপন্যাসের লেখক নটরাজনকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

নমস্কারান্তে—ইতি—সুনন্দা ভট্টাচার্য, সুনয়নী ভট্টাচার্য, শ্যামলী ভট্টাচার্য, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

রঙিনচিত্র প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আমরা মাসিক বসুমতীর দীর্ঘদিনের পাঠক। মাসিক বসুমতীর ৪৬ বর্ষ হইতে ৪৭ বর্ষে পদার্পণ করার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ বাংলা দেশে একটি মাসিক পত্রিকার ৪৭ বর্ষে পদার্পণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অভিনন্দনীয়। দীর্ঘ ৪৭ বছর নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়েও অপ্রতিহত-গতিতে এগিয়ে চলেছে। একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে একটি বিজয় অভিযান বলা যায়। মাসিক বসুমতীর নিয়মিত বিভাগগুলি সত্যই আকর্ষণীয়। গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অঙ্কিত রঙিন চিত্রটি অপূর্ব। তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্য জেনেও শিল্পীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। মাসিক বসুমতীতে প্রচ্ছদে প্রকাশিত বিদেশী মনীষীদের ছবি প্রকাশের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। মাসিক বসুমতীর এই বিরাট সাফল্যে আমরা গর্বিত। আপনি আমাদের নমস্কার জানবেন ও অন্যান্য সহকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাবেন।

ইতি—ভবদীয়—অবিনাশ পুরকায়স্থ, কানপুর।

জাতীয় ভাষা প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আজকাল জাতীয় ভাষার প্রশ্নে সারা দেশে তুমুল আলোড়ন চলিতেছে, একপক্ষে ইংরাজি ও অপর পক্ষে হিন্দী, ইংরাজি প্রথমত বিদেশী ভাষা এবং প্রায় দুই শত বৎসর ইংরাজ শাসন এবং ইংরাজিতে পঠন ও পাঠন থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই ইংরাজি জানেন। আবার হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যতীত অন্য অঞ্চলে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলে অনেক আপত্তি—বিশেষত দক্ষিণে এবং কিছুটা বাঙ্গালা দেশে।

এই অবস্থায় সংস্কৃত ভাষাই কেবল রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। প্রথমত এই ভাষা কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়, অথচ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষার উৎপত্তি এই ভাষা হইতে। অনেকের ধারণা যে তামিল ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোন যোগ নাই কিন্তু শ্রীশিবজ্ঞান মুনিবর তামিল ব্যাকরণ 'চৌল কাপ্পিয়ামের' টীকায় বলিয়াছেন,

'সংস্কৃত ব্যতীত তামিল ব্যাকরণ বুঝিতে বেশ অসুবিধা হয়।' কিছুদিন পূর্বে ফরাসী ও ভারতীয় ভাষায় পণ্ডিত অধ্যাপক জে ফিনিজোয়াট আন্তর্জাতিক সংস্থা তামিল ভাষা গবেষণা দপ্তরের সভাপতি বলিয়াছেন, 'ইংরাজি ও পার্সী ভাষার প্রচলনের পূর্বে ভারতবর্ষে যৌগিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ব্যবহৃত হইত এবং তামিলভাষী ব্যক্তিরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন, ইংরাজির ন্যায় সংস্কৃত যৌগিক ভাষা হওয়ার ফলে সংস্কৃত সহকারী কিন্তু তামিলভাষীদের ভাব ব্যক্ত করিবার প্রধান ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইত।'

সংস্কৃত ভাষাকে মৃত এবং দুরূহ ভাষা বলা হয়। কিন্তু যে ভাষায় এখনও প্রতি বৎসর অসংখ্য পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশিত হয়, কেবল এদেশে নহে বিদেশেও বিশেষত রাশিয়া ও জার্মানীতে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চলিতেছে সেই ভাষাকে মৃতভাষা কোনক্রমেই বলা যায় না। প্রয়াগে দুই বৎসর পূর্বে একটি সংস্কৃত সম্মেলনে এক পণ্ডিত ব্যক্তি সংস্কৃতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, যাঁহারা হিন্দী ভাষী তাঁহারা মনে করিতেছিলেন তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা দিতেছেন আর যাঁহারা বাঙালী ছিলেন তাঁহাদের মনে হইতেছিল সাধু বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হইতেছে, সুতরাং সংস্কৃত দুরূহ ভাষা নয় অন্তত ইংরাজি অপেক্ষা অল্প আয়াসে এবং অল্প সময়ে শিক্ষা করা যায়। এই বিষয়ে পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয়ের অভিমত বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য—

'আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বিশেব এখন বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া সমাদৃতা। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে ভাষার যে রূপ তাহাকে বলা হয়, সাধুভাষা বা লেখ্যভাষা। ইহারই পাশাপাশি এই বাংলারই আর যে একটি রূপ চলিয়াছে তাহাকে বলা হয় কথ্য-ভাষা। প্রথম শিক্ষার্থীরা যাহাতে সহজ বোধ করে, সেই উদ্দেশ্যে গোড়ার দিকে এই অপেক্ষাকৃত সহজ কথ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা দেবার বেলা আমরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করি না। প্রথম শিক্ষা সুরুর সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধি-সমাসসংযুক্ত পদবিশিষ্ট বাক্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে শুধু শিক্ষার্থী কেন, বহু বয়ঃপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও অস্বস্তি বোধ হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষাদান বিষয়ে এই পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ইহার আশু পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। বাংলায় যেমন---

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এল বান' —অথবা—'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' ইত্যাদি শ্রুতিমধুর কবিতায় শিক্ষার্থীর মন প্রফুল্ল হয়, উৎসাহান্বিত হয়, নূতন পাঠ শিখিতে কৌতূহল জাগে, সংস্কৃত শিক্ষা দিবার সময়ও এই রূপ করাই উচিত। অসংখ্য সহজ ও শ্রুতিমধুর কবিতা রহিয়াছে—

জয় জয় ভবভয় বারণ হে
জনন-ভরণ নয়—কারণ হে—

অথবা—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি বঙ্গে
ত্রিভুবন-তারিণী তরল তরঙ্গে—

কি সুন্দর, কি সহজ ও সরল। অথচ আনুষঙ্গিক নামমাহাত্ম্য তো রহিয়াই গেল; মানো না মানো, উহা ব্যর্থ হই-বার নয়।

আর একটা ভয়ঙ্কর ত্রুটি হইল নূতন বর্ণমালাকে সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্য মনে করা, যে 'দেবনাগর' বর্ণমালাকে লোক সাধারণ সংস্কৃত বর্ণমালা মনে করে, তাহা ঠিক নয়। সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশে একটা সর্বভারতীয় ঐক্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অতি অল্পদিন পূর্বে ঐ বর্ণমালা স্বীকৃত হইয়াছে। এখনও নেপালে কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে নেপালী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহাতে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক ভীতিটা একেবারেই থাকে না।

আমাদের দেশে রামায়ণ, মহা-ভারত, গীতা, চণ্ডী আজও বাংলা অক্ষরে ছাপা হয়। পৌরোহিত্যের দশ-কর্মের পুঁথির বর্ণমালাও বাংলা। অথচ প্রথম শিক্ষার্থীর ঘাড়ে গোড়া হইতে এই ভয় চাপাইবার কোন কারণ নাই। বঙ্গাক্ষরে শিক্ষা প্রবর্তন করিলে দেখি-বেন, ছেলেরা কেউ সংস্কৃত ছাড়িবে না, পড়িতে না পারার ভয় একেবারেই কাটিয়া যাইবে।

আর একটা কথা হইল সন্ধিবিযুক্ত পদ সন্নিবেশ চেষ্টা, পদগুলি স্বতন্ত্র মূর্তিতে দেখা দিলে অতি সহজেই চিনিতে পারা যায়, মানে বুঝিতেও অসুবিধা হয় না। 'সন্ধিরেকপদে নিত্যং' তা ছাড়া সর্বত্র তো বিভাষী। সুতরাং যথাসম্ভব সন্ধিটা এড়াইতে পারিলে শিক্ষার্থীদের যে খুবই উপকার হয়, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হউক বলিয়া শুধু সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই হইবে না, সংস্কৃত যাহাতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়, তার জন্য চেষ্টাও করিতে হইবে। টোলের কথা ছাড়িয়া দিই, সেখানে ন্যায়-দর্শনের মত কঠিন শাস্ত্র পড়াবার ব্যবস্থা থাকিলেও দুই ছত্র সংস্কৃত লেখা বা

...নার ব্যবস্থা নাই। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়।

ভরসা এখন স্কুল-কলেজের শিক্ষক মহাশয়েরা। তাঁহারা এই ধারণা গ্রহণ করিলে (কর্তৃপক্ষ সংস্কৃত একেবারে তুলিয়া না দিলে) প্রত্যেকেই সংস্কৃত লইবে (বিকল্প বিষয় থাকিলেও) মাতৃভাষার সহিত সংস্কৃতের সৌসাদৃশ্য অনুধাবন করিতে পারিলে ভাবী বংশধরেরা ইংরাজি বা হিন্দীর মোহপাশ ছিন্ন করিতে একদিনও বিলম্ব করিবে না। সংস্কৃতের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির অমৃত রসনিষিক্ত হইয়া নিজেরাও কৃতার্থ হইবে। বিশ্ববাসীকে অমৃতের সন্ধান দিয়া কৃতার্থ করিতে পারিবে। দেশের সেই শুভদিন ত্বরান্বিত করিতে সকলে সহযোগিতা করেন, ইহাই সনির্বন্ধ অনুরোধ।

ভবদীয় শ্রীপ্রভাসচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ (অর্থনীতি) ১৫ নং, চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা—২০।

এক রাতের রাণী প্রসঙ্গে

মহাশয়,

গ্রাহিকা না হইলেও আমি নিয়মিতভাবে মাসিক বসুমতী কিনিয়া বা সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া থাকি।

আপনাদের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় 'এক রাতের রাণী' নামে যে একটি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শুধু একটি প্রশ্নই করিতে চাই; মাসিক বসুমতীর এতগুলি পৃষ্ঠা নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল কি?

যাহা ছাপিয়াছেন তাহা উপন্যাস পদবাচ্য হইতেই পারে না। এমন কি উহা কোন পত্রিকায় ছাপাইবার যোগ্য নহে। আরম্ভ অতি পানসে, এমন ঘটনা—সমুদ্রতীরে চিত্রকরকে দেখিয়া প্রেমে পড়া, তারপর দৈত্য ভিখারীর হাত হইতে নায়ক কর্তৃক নায়িকা উদ্ধার—হাজারো গল্পে পড়িয়াছি। সেও অনেক আগে, এখন এমনি আরম্ভ পাঠকমহলে একেবারেই অচল। তারপর লেখকের দেখাবার জন্য নায়ক-নায়িকার একই হোটেলে অবস্থান, প্রায় পাশাপাশি ঘর, অন্য ঘরগুলি খালি, দেশলাইয়ের খোঁজে নায়কের নায়িকার ঘরে গমন—সবটাই জোর করে সাজানো।

সবার উপর লেখক টেক্কা দিয়াছেন এক স্বপ্নের প্রবর্তন করিয়া। সারা উপন্যাসটাই স্বপ্নের কাহিনী বলা যায়, স্বপ্নে অবাস্তব কিছু থাকিবেই। তাই এক প্রমীলা রাজ্যের কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু স্বপ্নের কাহিনীতে আর সবই নিখুঁত স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়াছে। সেখানে আরও অনেক মেয়ের কাহিনী আমদানী করা হইয়াছে, যাহার সহিত মূল গল্পের কোনই সম্পর্ক নাই। শুধু এইটুকু যে নায়িকা সেই প্রমীলা রাজ্যের গভর্নর অন্য মেয়েদের ছোট ছোট কাহিনীগুলিও বর্ণহীন, উত্তাপহীন, একঘেয়ে, হাজারো বার শোনা বা পড়া গল্পের পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু এক রাতের রাণী কে তাহা বোঝা দুঃসাধ্য। সমাপ্তিকা স্বপ্নে প্রমীলা রাজ্যের গভর্নর, হইয়াই কি এক রাতের রাণী বনিয়া গেল? কিন্তু তাহা হইলেও স্বপ্নের কাহিনীতে গভর্নরের অবদানই বা কতটুকু? বরং অন্যান্য চরিত্র সেখানে প্রাধান্য পাইয়াছে।

এমনি আজগুবি, অসম্ভব ও অসংলগ্ন প্রলাপ কখনও গল্প হইতে পারে না। ইহার পর আবার সেই প্রশ্নটাই করিতে ইচ্ছা করে। দুই মাসে পত্রিকার এতগুলি পৃষ্ঠা নষ্ট করিলেন কেন?

সম্পাদক ও সাহিত্যিক হিসাবে আপনার ব্যক্তিগত সুনাম আছে। কিন্তু এমনি ধরণের কাঁচা লেখা কিভাবে নির্বাচন করিলেন, ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে আমার এই পত্র ছাপাইবার সৎসাহস দেখাইলে বাধিত হইব। বিনীতা—

নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, মুরান দাইকা ইভাপ্রুটজ, ডিব্রুগড়ি।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ডাক—লখিমপুর, জেলা: গোয়ালপাড়া, আসাম ● শ্রীমতী মঞ্জুলা দেব, অব—এস এল দেব, কোয়ার্টার নং এস ৪।১, ডাক—হীরাকুদ, সম্বলপুর, উড়িষ্যা ● শ্রীমতী সবিতা বসু, নং ই-১১, করপোরেশন কলোনী, মহানগর, লক্ষ্ণৌ, ৬ ● শ্রী নদীয়াচন্দ্র পট্টনায়ক, গভঃ কোল্ড স্টোরেজ, কোয়ার্টার নং-৩, সাসত্রপুরা, ভুবনেশ্বর-২, পুরী ● গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ, ১৭৯।১, শীল কুঞ্জ ইউনিভার্সিটি এস্টেট, রুরকী, জেলা: সাহারানপুর ● শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরী, অবঃ—ডঃ বি পি চৌধুরী, ৭ বুলেভার্ড রোড, তিসাজারী, দিল্লী-৬ ● শ্রীহীরালাল সাহা, গ্রাম—বুলনপুর, ডাক—গোয়ালটোর, মেদিনীপুর ● প্রধান শিক্ষিকা, কেশরকুমারী বালিকা বিদ্যালয়, ডাক—আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ● নায়েক সমর দত্ত, হেড কোয়ার্টার, ৭৪ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড, C/o ৫৬ এ, পি, ও। ● গ্রন্থাগারিক, সম্মিলিত উদ্বাস্তু বালক বিদ্যালয়, বাপুজীনগর, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২ ● গোপালকুমার খাস, গ্রাম—আসামবেড়িয়া, ডাক—অনন্তরামপুর, জেলা: ২৪ পরগণা ● ডিঃ জে বি আড্ড্য, ফ্ল্যাট নং ৫, ১০/ সি রেলওয়ে অফিসার্স কোয়ার্টার, দাদার, বোম্বাই-১৪।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা বাবদ ১৮৲ টাকা পাঠালাম। অনুগ্রহপূর্বক প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাবেন। শ্রীমতী মঞ্জুলা দেব, অবঃ—শ্রী এস এল দেব, হীরাকুদ, সম্বলপুর।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮৲ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকা যথাসময়ে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী।

মাসিক বসুমতীর ১৩৭৫ সালের চাঁদা বাবদ ১৮৲ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবেন। সুনীলকুমার ভট্টাচার্য, পোঃ—পানিটোলা, জেলা—লখিমপুর, আসাম।

একটানা ফরাসে বসে, আরামে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে, অথবা নরম বিছানায় তাকিয়ায় মাথা রেখে কোন বই খুলে পড়তে পড়তে প্রায়শই আপনি ঘুমিয়ে পড়েন। সে কারণ, সব পড়াই সোজা বসে চেয়ার-টেবিলে বিধেয়। কিন্তু আমাদের এই নির্বাচিত সুখপাঠ্য বইগুলি যে অবস্থাতেই আপনি পড়ুন না কেন, আপনার চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসবে না। বই আপনাকে তার গুণে টেনে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত—আপনি ভুলে যাবেন আহার-নিদ্রা।

বিয়ে বাড়তে
বউয়ের হাতে
• বই দিন •

উপন্যাস

প্রাণতোষ ঘটক
আকাশ-পাতাল
মূল্য ১৮.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
শুভবিবাহ কথা
মূল্য ৩'০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
যখন তরঙ্গ
মূল্য ৭'০০

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়
সেই প্রেম আস্বাদন
মূল্য ৩'০০

সুনীলকুমার নাগ
মনের আলোয় দেখা
মূল্য ৫'০০

বনফুল
পঞ্চপর্ব
মূল্য ৭'০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সোহো স্কোয়ার
মূল্য ২'৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
মহাযুদ্ধের ইতিহাস
মূল্য ৪'০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
অমৃত সঞ্চয়
মূল্য ১০'০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
অনুষ্টুপ ছন্দ
মূল্য ৪'০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়
কান্নাহাসির দোলা ৩'৭৫

দিলীপকুমার রায়
অঘটনের ঘটা ৬'০০

বিমল মিত্র
কন্যাপক্ষ ৪'০০

বুদ্ধদেব বসু
হে বিজয়ী বীর ৩'৫০

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সৃষ্টি ৫'৫০

কবিতা

মোহিতলাল মজুমদার
সুনির্বাচিত কবিতা
মূল্য ৪'০০

চিত্তরঞ্জন দাস
কবি-চিত্ত
মূল্য ৫'০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
সম্রাট ২'৫০
কখনো মেঘ ৪'০০

প্রমথ চৌধুরী
সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা
মূল্য ৩'০০

উমা দেবী
অরণ্য-মন
মূল্য ৪'০০

বনফুল
নূতন বাঁকে ২'৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
নীল আকাশ
মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শতাব্দীর সংগীত
মূল্য ৫'০০

দেবেশ দাশ
সুদূর বাঁশরী
মূল্য ২'৫০

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সেই আমি সাংবাদিক
মূল্য ৩'০০

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী
প্রেমের কাব্য
মূল্য ৩'০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
স্ব-নির্বাচিত কবিতা
মূল্য ৪'০০

কালীচরণ ঘোষ সম্পাদিত
হৃদয়নন্দন বনে ৩'০০

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কবি-প্রণাম ৫'০০

যে কাব্য-সম্পদে সাহিত্য সমৃদ্ধ, যে কবিতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-পাঠ অসম্পূর্ণ, সেই কবিতার রসাস্বাদ আপনি করবেন বই কি!
তবে
আধুনিক কবিতা যদি আপনার ভাল না লাগে, তাহলে আমাদের এই মিলন-মধুর উচ্চাঙ্গের ভাবৈশ্বর্য ও রসসম্পদে সমৃদ্ধ উপভোগ্য কবিতার বইগুলি পড়ুন এবং
রসিক-রসিকা প্রিয়জনকে উপহার দিন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭
গ্রাম : কালচার (বি) ফোন : ৩৪-২৬৪১

যশোদা
ও
গোপাল

পাকা ভক্ত
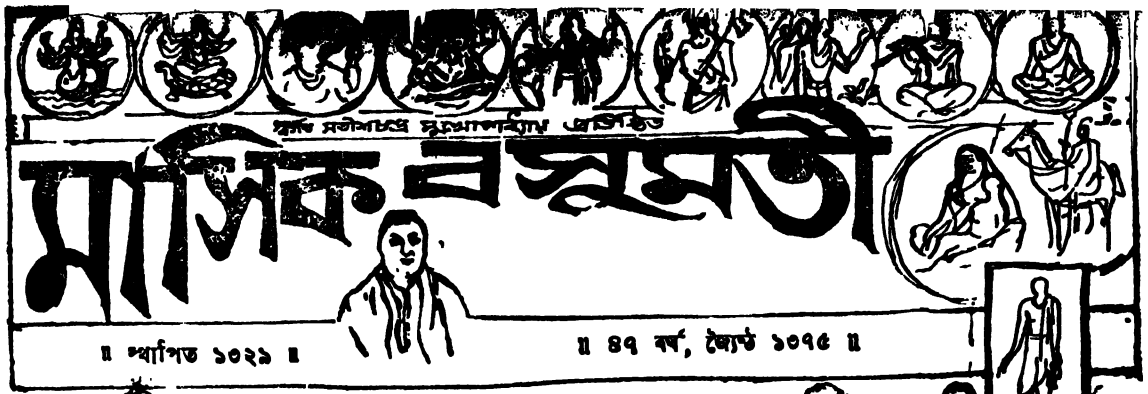
"শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে, আবার নিজেকেই শ্যাম বোধ হলো। পারার হ্রদে সীসে অনেক দিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায় ; নড়ে না ; শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। ভক্ত তাঁকে ভেবে ভেবে অহং শূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে—তিনিই আমি, 'আমিই তিনি'।

"আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।"

পাগল হও

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো—প্রার্থনা করো, 'দেখা দাও' বলে; ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো; এবার তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে অমুক ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়ে গেছে। দিনকতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

"শুধু তিনি আছেন বলে বসে থাকলে কি হবে? পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো—ছিপ ফেলো। তখন গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে, তখন আনন্দ হবে; সাড়ায় উঠলে তো কথাই নাই!

"দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে! একটা একটা করে সাতটা দেউড়ী পার হলে তবে তো রাজাকে দেখতে পাবে! তিনি তো আছেন সাত দেউড়ীর পারে। তাই কর্ম চাই।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানকে একদিন বলেছিলেন—'সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস—টাকার দাস, মনিবের দাস, মেগের দাস। তার উপর আবার সালিসী, মোড়লী, এ সব কাজ কি? দয়া—পরোপকার? অনেক তো হলো। এখন ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দেবার সময় হয়েছে। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি; তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব উদ্ধার।

"'লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো'—তাই হয়েছে তোমার। এখন পাগল হও,—ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও! লোকে না হয় জানুক যে ঈশান এখন পাগল হয়েছে—আর পারে না। তা হলে তারা সালিসী মোড়লী করাতে আর তোমার কাছে আসবে না। কোশাকোশী ছুঁড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক করো।"

'আমায় দে' মা পাগল করে।
আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে॥'

পাটোয়ারী

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কপটতা, পাটোয়ারী, এসব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যে ভগবান চায় সে একেবারে ঝাঁপ দেয়—হিসাব বুদ্ধি করে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

"ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বললেন, তোমার তপস্যা দেখে বড় প্রসন্ন হয়েছি, তুমি একটি বর নাও। সাধক বললেন—'ঠাকুর, যদি বর দেবেন ত এই বর দিন, যেন সোনার থালে নাতির সঙ্গে বসে খাই'। এক বরেতেই অনেকগুলি হলো—ঐশ্বর্য হল, দীর্ঘায়ু হল, ছেলে হল, নাতি হল। এর নাম পাটোয়ারী।"

পাপের দায়িত্ব ও শাস্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তিনিই সব করাচ্ছেন—তিনিই কর্তা, মানুষ যন্ত্রস্বরূপ। আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কা-মরিচ খেলেই পেটজ্বালা করবে—তিনিই বলে দিয়েছেন। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে, এটি তাঁরই নিয়ম।

"মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হতো—পাপকে ভয় হতো না, পাপের শাস্তি হতো না। ঈশ্বর লাভ হলে মনে হয় 'আমি যন্ত্র মাত্র—স্বাধীন নই।

"যে ঈশ্বর-দর্শন করেছে সে পাপ করতে পারে না। যার ঠিক বিশ্বাস ঈশ্বরই কর্তা, আর আমি অকর্তা—তার পাপকার্য হয় না। যে নাচতে শিখেছে তার বেতালে পা পড়ে না; যার সাধা গলা তার সুরেতে সা, রে, গা, মা-ই এসে পড়ে।

"তাই পাপের দায়িত্ব আছে কি না—তাতে কি শাস্তি হয়—এ সব খবরে তোমার কি দরকার? তুমি আম খাও না। আম প্রয়োজন—তাতে ভক্তি!

"তুমি এ সংসারে ঈশ্বর-সাধন জন্য মানব জন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয় তাই চেষ্টা কর। ফিলসফি লয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? আধ পো মদে তুমি মাতাল হতে পার, শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে সে হিসাবে তোমার কি দরকার? তাঁর উপর সব ভার দাও। পাপের শাস্তি দিবেন, কি না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন।

"যাতে তাঁর উপর ভক্তি হয়, তুমি তার জন্য কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা কর। তিনি কল্পতরু—'কালী কল্পতরু মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি!' কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়—তবে ফল তরুর মূলে পড়ে; তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি ফল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।"

পারায়ণ

নিয়ম করিয়া কোন নির্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন ধর্মগ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠকে 'পারায়ণ' বলে। যদু মল্লিকের বাগানে যখন পারায়ণ হয়, তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা সেখানে যেতেন। কয়েক মাস ধরে পারায়ণ হয়েছিল।

পুঁজি অনুসারে দর

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে সে আনন্দের কথা বুঝা যায় না। এই রকমই হয়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে সকলে ধরতে পারে না; অবতারকেও সকলে চিনতে পারে না। যার যেমন পুঁজি সে জিনিষের সেই রকম দর দেয়। বেগুনওয়ালা একখানা হীরের বদলে দিতে চাইলে নয় সের বেগুন—তার বেশী নয়। সেই হীরেখানারই দাম কাপড়ওয়ালা দিতে চাইলে ৯০০৲ টাকা; আবার একজন জহুরী তার দর দিলে এক লাখ টাকা। তবেই দেখ, যার যতটা জ্ঞান বা অধিকার (পুঁজি) সে অনুপাতেই বস্তুর মূল্য ধার্য করে। তেমনি অবতারকেও সকলে বুঝতে পারে না। কেউ ভাবে পারে না। কেউ ভাবে সাধারণ মানুষ; কেউ ভাবে একজন সাধু; আর দু'-চারজন অবতার বলে ধরতে পারে। রামচন্দ্রকে ভরদ্বাজাদি বারজন ঋষি কেবল অবতার বলে জেনেছিলেন।"

(শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্তরঙ্গেরা শুধু অবতার বলে জেনেছিলেন)।

পুরশ্চরণ

পুরশ্চরণ হচ্ছে পুরঃ (অগ্র বা প্রথম) চরণ (আচরণ বা অনুষ্ঠান)—কিনা, অচৈতন্য মন্ত্রকে সচৈতন্য করবার জন্য মন্ত্রসাধনার যে প্রাথমিক কার্য, তারই নাম পুরশ্চরণ। পুরশ্চরণবিহীন মন্ত্র জীবনহীন দেহের মত নির্বীর্য। পুরশ্চরণের প্রধান লক্ষ্য মন্ত্রচৈতন্যলাভ।

পুরশ্চরণ মুখ্য ও খণ্ডভেদে দুই প্রকার। মুখ্য বা পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ জপ, হোম, তর্পণ অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন, এই পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট। এই পুরশ্চরণকালে নির্দিষ্টসংখ্যক মন্ত্রজপ ও তার আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কার্যও যথাবিধি করতে হয়।

গৌণ বা খণ্ড পুরশ্চরণে মন্ত্রজপের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না; তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বা কালের মধ্যে করতে হয়—যেমন চন্দ্রসূর্যের উদয়াস্ত, অস্তান্ত, অস্তোদয়, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি।

পুরশ্চরণের অনেক শাস্ত্রোক্ত বিধি নিয়মাদি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, বা শুধু তাঁর নামটি নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। রাজসিক সাধনায় নানারকম প্রক্রিয়া—এতবার পুরশ্চরণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, ইত্যাদি।"

ঈশান ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে পুরশ্চরণ করবেন শুনে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"কি জান, ও সব কাজ লোকের খপরে যত না আসে ততই ভাল। যারা সত্ত্বগুণী, তারা ধ্যান করে মনে, কোণে ও বনে; কখনও মশারির ভিতর ধ্যান করে।"

পুরাণ মত

শ্রীরামকৃষ্ণ—"পুরাণ মতে ভক্ত একটি ভগবান একটি; আমি একটি, তুমি একটি। শরীর যেন সরা; এই শরীর মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ জল রয়েছে; ব্রহ্ম সূর্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করে।

"বেদান্ত মতে জগৎ সব ভুল, স্বপ্নবৎ। কিন্তু পুরাণ মত বা ভক্তিশাস্ত্র বলে যে ঈশ্বরই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন; তাঁকে অন্তরে বাইরে পূজা কর। যিনি ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন। তাই ভক্ত 'ঈশ্বর-মায়া-জীবজগৎ' এক দেখে। কেউ সমস্ত রামময় দেখে; কেউ রাধাকৃষ্ণময় দেখে। যা কিছু দেখি সবই রাম—কৃষ্ণ!

"পুরাণ-মতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম করলেই হয়। যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র,—এসব দরকার নাই। বেদোক্ত কর্মের কোন প্রয়োজন নাই।"

পুরুষকার

পুরুষকার হচ্ছে খুব রোকের সহিত চেষ্টা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"দুটি জ্ঞানের লক্ষণ—প্রথম, কূটস্থ বুদ্ধি; হাজার দুঃখকষ্ট, বিঘ্নবিপদ হোক্—তবু নির্বিকার। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার—খুব রোক্। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তো একেবারে ত্যাগ।

"ত্যাগ করতে হলে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। ঋষিদের এই পুরুষকার ছিল। এই পুরুষকারের দ্বারা ঋষিরা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন। তাঁরা সর্বদা হয় নির্জনে, নয় সাধুসঙ্গে থাকতেন—তাই তাঁরা অনায়াসে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরেতে মনোযোগ করেছিলেন—নিন্দা ভয় কিছু নাই।

"কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁধ করে দেয়, চারখানা করে কাটলেও হাত-পা বার করবে না।"

পুরুষ-প্রকৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি; আর যখন ঐ সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। কিন্তু যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি; যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন। জল স্থির থাকলেও জল, আর হেললে দুললেও জল। সাপ এঁকেবেঁকে চললেও সাপ, আবার চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ। পুরুষ আর প্রকৃতি; আনন্দময় আর আনন্দময়ী।

"শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ—চিদাত্মা; শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আদ্যাশক্তি, চিচ্ছক্তি, প্রকৃতি। পুরুষ আর প্রকৃতি।

"যুগলমূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। তাঁদের ভেদ নাই। পুরুষ প্রকৃতি না হলে থাকতে পারে না; প্রকৃতিও পুরুষ না হলে থাকতে পারে না। একটি বললেই আর একটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না, আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা-শক্তিকে ভাবা যায় না। প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল।

"এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তির ভাবনা এসে পড়ে। যেমন সাপ আর তির্যক গতি

"নামরূপ যা আছে, সবই চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য। চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য সমস্তই—যা কিছু দেখি।

"গৌরাঙ্গের ভাব কি জান? একই দেহে দুই ভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন।

"সাধনার সময় তিনি আমায় দেখিয়েছেন, চতুর্দিকে শিব আর শক্তি। মানুষ, জীব, জন্তু, তরুলতা, সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি—পুরুষ আর প্রকৃতি।"

পূর্বজন্মের সংস্কার

শ্রীরামকৃষ্ণ—"পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শবসাধন করছিল,—গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগলো; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে সে নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ করতেই মা সাক্ষাৎকার হলেন ও বললেন—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, বর নাও। মা'র পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে—মা, একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি। সে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এতদিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হলো না—আর আমি, কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন আমার উপর এত কৃপা!

"ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন—বাছা, তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই; তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধন-বলে তোমার এরূপ জোট-পাট হয়েছে। তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও?

"কি জান? অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারেতে হয়; লোকে মনে করে, হঠাৎ হলো।

"একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল, তাতেই বেজায় মাতাল হয়ে চলাচলি আরম্ভ করল। লোকে অবাক্। একপাত্রে এত মাতাল কি করে হলো? একজন বললে—ও তো, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে।

"দেখ না, লালাবাবু*—এত ঐশ্বর্য; পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে ফস্ করে কি বৈরাগ্য হয়? আর রাণী ভবানী—মেয়েমানুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি!

"শেষ জন্মে সত্তগুণ থাকে; ভগবানে মন হয়, তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়, নানা বিষয় কর্ম থেকে মন সরে আসে।

---

* লালাবাবু— পাইকপাড়ার 'কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ'। যৌবনে বৈরাগ্য—সাত লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ করে ত্রিশ বৎসর বয়সে মথুরাবাসী হন। চল্লিশ বৎসর বয়সে ভিক্ষাজীবী হন—মাধুকরী ব্রত গ্রহণ করেন। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে 'প্রাপ্তি ঘটে। পত্নী রাণী কাত্যায়নী। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজী—ভক্তমাল গ্রন্থের বাংলা পদ্যে অনুবাদক।

প্রকৃতি

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ এর কোনটারই যখন কোন প্রকাশভাব থাকে না—অথচ সকলেই সম্যকরূপে অপ্রকাশভাবে বর্তমান থাকে, তখন গুণত্রয়ের নিষ্ক্রিয় অবস্থা। গুণত্রয়ের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থার নামই প্রকৃতি। গুণসকল কোন কার্য না করে অপ্রকাশভাবে থাকলেও লুপ্ত হয় না। দেখ না, একজন লোক বন্ধুর সঙ্গে মিষ্টালাপ করছে বা ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ করছে, তার ক্রোধের কোন লক্ষণ নাই। কিন্তু তাই বলে তার যে ক্রোধ নাই তা নয়; উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হলেই সেটা প্রকাশিত হয়। আবার দেখ, যে কারণটা আমার ক্রোধের উদ্দীপন করে, সেই কারণ বা তদপেক্ষা গুরুতর কারণও হয়তো তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করে না; তবেই হলো, ক্রোধ নামক বৃত্তিটি আমারই ধর্ম, বাইরের কোন কারণের ধর্ম নয়। আর এই ধর্মটি অপ্রকাশভাবে আমাতেই আছে—অপ্রকাশ থাকাকালে যে তাহা নাই তা নয়—আছে এবং উদ্দীপক কারণ পেলেই তা প্রকাশিত হয়, অন্য সময় অপ্রকাশভাবে থাকে। গুণত্রয়ও তেমনি নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে অস্তিত্ববিহীন হয় না—'সংস্কার'-মাত্র-রূপে থাকে। গুণত্রয়ের এই সংস্কারমাত্র অবস্থাই প্রকৃতি।

ব্রহ্ম যখন সৃষ্টির অতীতভাবে ছিলেন, তখন তিনি মায়াশক্তিকে নিজের ভিতরে একীভূত করে রেখেছিলেন; অর্থাৎ তাঁতে একীভূত তাঁর যে শক্তি তারই নাম মায়া। এই মায়াশক্তির অতি অল্পাংশ ব্রহ্মাণ্ড রচনায় নিযুক্ত হয়েছে। এই মায়াশক্তিই প্রকৃতি।

'প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা॥'

প্র পদের অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে; কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি। সৃষ্টি বিষয়ে যে শক্তি সর্বশ্রেষ্ঠা তাকে প্রকৃতি বলে।

কার্যমাত্রই বিকার। যে শক্তি দ্বারা সর্ববিকার বা কার্য প্রকৃষ্টভাবে কৃত হয় তা-ই অপরা প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির বিকারকে (অপরা প্রকৃতিকে) দেখি, প্রকৃতিকে (পরা প্রকৃতিকে) দেখি না।

'বিকারানেব যো বেদ ন বেদ প্রকৃতিম পরাম।
তস্য স্তম্ভো ভবেৎ বাল্যাদ্ভ্রান্তি স্তম্ভোহনুপশ্যতঃ॥'

—যে লোক শুধু বিকারসমূহকেই জানে, পরা প্রকৃতিকে (ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতি থেকে শ্রেষ্ঠা প্রকৃতিকে—ব্রহ্মকে) যে জানে না, সে মূঢ়ভাবশত 'প্রকৃতি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে' এই গূঢ় উপদেশের মর্মও উপলব্ধি করতে পারে না। পরা প্রকৃতি দর্শন না হ'লে যথার্থ দর্শন হয় না। শক্তিমান ব্রহ্ম পুরুষ প্রকৃতি বা শক্তি থেকে কখনই স্বতন্ত্র থাকেন না। 'শক্তি শক্তিমতোর ভেদঃ' ভগবানের এই শক্তিই প্রকৃতি বা মায়া। শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রকৃতির নাম মায়া: মলিন সত্ত্বময়ী প্রকৃতির নাম অবিদ্যা।

প্রজ্ঞা

সমাধিকালে ধ্যাতার চিত্তে কোনরূপ পাপাদি কলুষেতার অভাব-প্রযুক্ত একটি শুক্লধর্মের উৎপত্তি হয়। শুক্লধর্মে রজঃ তমের লেশমাত্র না থাকায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞা তিন প্রকার। তার মধ্যে 'শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা' শ্রবণ জন্য, 'চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা' মনন জন্য এবং শেষ 'ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা' নিদিধ্যাসন জন্য উৎপন্ন হয়। তখন আর ব্যুত্থান হয় না।

প্রণব

শ্রুতি বলেছেন—'ওঁ কারো বৈ সর্ববাক্'। প্রণবেই সর্ববেদ নিহিত। একমাত্র প্রণব-তত্ত্ব জ্ঞানে ও সাধনায় ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হয়। যে একটিমাত্র শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করা যায় তাহা এই প্রণব—ওঁকার। ওঁকারকে প্রণব কেন বলে? 'প্রকৃষ্টরূপেণ নূয়তে স্তূয়তে অনেন ইতি প্রণবঃ'—প্রণব শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের সকল অবস্থা, সকল গুণ, সকল ভাবই ব্যক্ত হয় এবং সর্বপ্রকারে তাঁর স্তব করা হয়, তাই এর নাম প্রণব।

পতঞ্জলি বলেছেন—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' (১।২৭)—প্রণব ঈশ্বরের বাচক—প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। পতঞ্জলি আরো বলেছেন—প্রণবের জপ ও তদর্থ ভাবনাকারী যোগী উক্ত জপ ও ভাবনারূপ সাধন দ্বারা স্বরূপ দর্শন করেন। তাঁর মুক্তির বিঘ্নকর অন্তরায়-গুলিও তাতে দূরীভূত হয়।

> 'আকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্ত মহেশ্বরঃ।
> মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥'

অ, উ, ম,—এই তিনটি মিলে ওঁ—প্রণব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা—এই প্রণবেরই বাচ্য ভগবান ব্রহ্ম থেকে তাঁদের বিভিন্ন শক্তি লাভ করেছেন। ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ—তাঁর ইচ্ছা-ক্রিয়া ও জ্ঞান—কার্য কারণ তত্ত্ব, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় সব কিছুরই বাচক হচ্ছে প্রণব।

প্রণবের অকারকে সূর্য, উ-কারকে চন্দ্র, আর ম-কারকে অগ্নি বলা হয়। মৈত্র্যুপনিষদ বলেন—"রবি (=স্থূল=জাগ্রং) মধ্যেই চন্দ্র (=সূক্ষ্ম=স্বপ্ন) এবং তার মধ্যে অগ্নি (=কারণ=সুষুপ্তি); এই কারণেই অতীত স্থানে সত্ত্ব এবং সত্ত্বমধ্যে অচ্যুত ব্রহ্ম অবস্থিত (৬।৩৮)। তাই প্রণবের ধ্যান সম্বন্ধে ভাগবত (১১।১৫।৩৫-৩৬) বলেন—"দেহান্তরবর্তী ঊর্ধ্ব বৃন্ত, অধোমুখ, অষ্টপত্র কর্ণিকাযুক্ত, মুদ্রিত হৃদয় পদ্মকে বিপরীতভাবে ঊর্ধ্বমুখ প্রস্ফুটিত করে ধ্যান করবে। কর্ণিকাতে উত্তরোত্তর সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ধ্যান করবে। বহ্নি মধ্যেই আমার মঙ্গলজনক রূপ ধ্যান করবে।"

এই প্রণব নির্গুণ এবং সগুণ উভয়ই নির্গুণ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম—আর সগুণ ব্রহ্মকে অপরব্রহ্ম বলে। পরব্রহ্মরূপে প্রণবের উপাসনায় মোক্ষ লাভ হয়, এবং অপর-ব্রহ্মরূপে প্রণবের উপাসনায় ব্রহ্মলোক করেও কামনারূপ প্রতিবন্ধক হেতু সে উপাসনায় মুক্তিলাভ করেন না; কিন্তু ব্রহ্মলোকে হিরণ্য গর্ভের স্থিতিকাল পর্যন্ত ভোগ করে তত্ত্ব জ্ঞান লাভের পর তাঁদের মোক্ষ লাভ হয়।

> 'ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
> পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥'
>
> —বেদান্ত পরিভাষা।

অর্থাৎ প্রতিসঞ্চর সম্প্রাপ্তে (প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত হ'লে) পরস্য অন্তে (হিরণ্যগর্ভের মুক্তিকালে), তাঁহারা কৃতাত্মা হয়ে (ব্রহ্মের আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার-সম্পন্ন হ'য়ে) ব্রহ্মের পরম পদ (পরমপদ 'পা' নহে—ইহা একটি অবস্থা মাত্র; যেন অনেকটা ব্রহ্মৈকত্বানুভূতি) প্রাপ্ত হন।

তাই বলা হয় সগুণ উপাসনার ফল নির্গুণ উপাসনার অন্তর্ভূত।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

প্রেমানন্দ পটচিত্রপট

কাউণ্ট লিও টলস্টয়

মুহূর্তকালের উপর দাঁড়িয়ে লেখনীর মাধ্যমে যাঁরা নিত্যকালের সন্ধান দেন, জীবনের সুখ দুঃখ, ঘাত প্রতিঘাতময় একটি আলেখ্য অঙ্কনেই যাদের লেখনী সীমাবদ্ধ থাকে না, সে লেখনী জীবনের যা গভীর, যা শাশ্বত, যা পরম সত্য তাদের সঙ্গে মানুষকে নিবিড় করে তুলতে সহায়তা করে, জীবনের যা মহৎ, যা বিরাট যা চিরন্তন সে সম্বন্ধে সচেতনতা যাঁরা এনে দেন লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্য ও সামাজিক সমাজে তাঁরা ঋষিরূপেই বরণীয়। শুধু একটি শক্তি-শালী কলমই নয়, এক প্রগাঢ় ধ্যানদৃষ্টি, গভীর উপলব্ধি-শক্তি তাঁদের সহজাত। সেই ধ্যানদৃষ্টিতে জগতের এবং জীবনের যত জটিলতার হয় গ্রন্থিমোচন, অন্ধকারের হয় অবসান, চরম জীবন-প্রশ্নের মেলে যথার্থ উত্তর। এই ঋষিপ্রতিম সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্যে টলস্টয় একটি অমর নাম। বিশ্বের স্মরণীয় সাহিত্য স্রষ্টা সমাজে শুধু শক্তিমান সম্রাটের গরিমায় নয়, পূজ্য ঋষির মহিমায় যিনি কোটি কোটি শ্রদ্ধার ও বন্দনার আবৃত্তিতে সমুদ্ভাসিত হয়ে আছেন সেই কাউণ্ট লিও টলস্টয় ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য জগতের আর এক ঋষি---স্রষ্টা ও দ্রষ্টাকুলের আচার্যকল্প ঋষি বঙ্কিমের আবির্ভাবের তখনও দশ বছর দেরি। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর এবং মহাকবি মধুসূদন সেদিন যথা-ক্রমে আট বছরের বালক ও চার বছরের শিশু। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান কাউণ্ট টলস্টয়ের অমর লেখনী থেকে যে অসামান্য ফসলগুলি ফলেছে তাদের মধ্যে ওয়ার এ্যাণ্ড পীস, রেজারেকসান, এ্যানা কারেনিনা প্রভৃতি এক একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। তাঁর মহাজীবন কাব্যের পর্যায়ভুক্ত এই অনন্য সৃষ্টিগুলি দেশ-কাল-সমাজ নির্বিশেষে আজও পূজা পেয়ে চলেছে।

১৯১০ সালে বিরাশী বছর বয়সে এই মহান স্রষ্টা ও মহৎস্রষ্টা এবং সুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসকের তিরোধান ঘটে। মৃত্যুর অতি অল্পকাল পূর্বে আফ্রিকা-বাসী এক তরুণ ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর কিছুকালব্যাপী পত্রের আদানপ্রদান চলেছিল। সেই তরুণ ভারতীয়ের নাম---মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গান্ধীজীর সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত দীর্ঘায়তন কবিতাটিতে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন---

> "আসন যাঁহার বুদ্ধের কোলে,
> টলস্টয়ের পাশে।"

● অপ্রকাশিত ●

জন্ম ও মৃত্যু

ক্ষিতিমোহন সেন

জন্ম ও মৃত্যুকে যিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন তিনি সত্যকে দেখতেই পান নি। সঙ্গীতে তাল বিনা সুর ব্যর্থ আর সুর ছাড়া তাল মিথ্যা। জন্মমৃত্যুও সুরতালের মত পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করবে। এই পৃথিবী অনন্ত আকাশে জ্যোতির আনন্দে যে ঘুরে ঘুরে সূর্যের চারিদিকে নৃত্য করে চলেছে—দিন হোলো তার পা-ফেলা আর রাত হোলো তার পা-তোলা। এই দুইয়ে মিলে তবে নৃত্য সুসম্পূর্ণ। এই দ্বৈতাদ্বৈতের যুক্তযুগলের এক পক্ষকেই যাঁরা বিচ্ছিন্ন করে আঁকড়ে পড়ে থাকেন তাঁরা অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণতাকে পান নি।

দিবস আমাদের চারিদিককে উজ্জ্বল করে সমস্ত আকাশের অসীমের জাজ্বল্যমান রূপটি ঢেকে রাখে আর রাত্রি আমার চারদিককে অন্ধকার করে অসীমের রূপকে উদ্ভাসিত করে। জীবনের মধ্যে তেমনি আমরা চতুর্দিককে স্পষ্ট দেখি আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে অনন্তের উপলব্ধি আসে। যিনি যোগী তিনি যোগদৃষ্টিতে এই উভয়কে যুক্ত করে অসীম স্থান কালের সত্যরূপ ও তার নিত্যলীলা ও মৃত্যুলীলা দেখেন।

এই যোগ যিনি অন্তরে উপলব্ধি করতে পারেন নি 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি' তিনি মৃত্যু হতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হতে হতে বলেন, তাঁর সদাই 'মহতী বিনষ্টিঃ' তখন সদাই দৈন্য সদাই শঙ্কা সদাই মৃত্যু। এই যোগতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েই মহাপুরুষেরা অমৃতের অধিকার আমাদের কাছে অবারিত করে দিয়ে যান। তাই আথর্বণ ঋষি মৃত্যুভীত মানবকে অভয় দিয়ে বলছেন—

মৃত্যুরীশে দ্বিপদাং মৃত্যুরীশে চতুষ্পদাম্।
তস্মাৎ ত্বাং মৃত্যোর্গোপতে রুদ্ধরামি স মা বিভেঃ॥
—অথর্ব, ৮, ২, ২৩।

"যারা চতুষ্পদ তারা মৃত্যুর শাসন-শাসিত, যারা দ্বিপদপশু তারা মৃত্যুভয়ে ভীত ও মৃত্যুর দ্বারা বিচলিত, সেইজন্য পশুরা মৃত্যুকেই তাদের নিয়ন্তা অধিপতি বলে জানে। ভয় নেই, সেই মৃত্যুর হাত হতে তোমাকে উদ্ধার কোরতে। তুমি মানুষ, অমৃতের অধিকারী, যে মৃত্যুভয়ে পশুরা কম্পমান সে তোমায় কি করতে পারে?

সোঽমুরিষ্টন মরিষ্যসি ন মরিষ্যসি মা বিভেঃ।
—অ, ৮, ২, ২৪।

হে সর্বজয়ী, ক্ষতিমৃত্যুজয়ী অমৃত মানব! ভয় নেই, মৃত্যু তোমার জন্য, নয়, মৃত্যু তোমার কোথাও নেই।

য ত্রেদং বৃক্ষ ক্রিয়তে পরিধি জীবনায়কম্॥
—অ, ৮, ২, ২৫।

যদি এই বৃক্ষকে জীবনের পরিধি করে থাক, যদি বৃক্ষের দ্বারা জীবনকে বেষ্টিত করে থাক, তবে তোমার কাছে জীবনের আর কোনো অভাব, কোনো টানাটানি কোনো অবসান নেই। তবে জীবনের দৈন্য কোথায়?

মহাত্মা কবীর বলেছেন,—

জনম মরণ তাঁহা পড়ী পড়ত হৈ, হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ।
উঠত সেনকার তহঁ নাদ অহনদ ঘুরৈ তিরলোক মহলকে
প্রেম বাজি॥ —১১, ৬৩

জন্মমৃত্যুর সুর ও তাল যেখানে চলেছে যেখানে আনন্দের মহোৎসব, অসীম গগন সেখানে সঙ্গীতে ভরপুর হয়ে উঠেছে, সেখানে অসীমের ঝঙ্কার চলেছে সেই ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে অসীমের পূর্ণ সঙ্গীত বাজছে, ত্রিলোকধামের প্রেম সেখানে বাজছে।

জনম মরণ বীচ দেখ অন্তর নহীঁ দছে ঔর বাম-যুঁ এক আহী।
কহৈঁ কবীর যা সৈন গুংগা তঁক বেদ কাবকী গম্যনাহীঁ॥

চেয়ে দেখ জীবন ও মরণের মাঝে কোনো প্রভেদই নেই, দক্ষিণ ও বাম সে তো একই কথা। মায়ের এ কোল আর ও কোল। কবীর বলেন, এ সন্ধান যিনি পেয়েছেন তিনি সে কথা প্রকাশ করে বলবার ভাষা পান নি, বেদ কোরানের অতীব এ সব গভীর তত্ত্ব।

সাঁচহী কহত ঔর সাঁচহী গহত হৈ বাঁচকুঁ ত্যাগকর সাঁচ লাগা।
কহৈঁ কবীর যুঁ ভক্ত নির্ভর হুয়া জন্ম ঔর মরণকা ভর্মভাগা।

সত্যকেই আমি বলছি আর সত্যকেই গ্রহণ করেছি, ঝুটাকে ত্যাগ করে সত্যের সঙ্গেই যোগে যুক্ত হয়েছে, কবীর বলেন, এমন করেই ভক্ত ভয়ের অতীত হন,

এমন করেই জীবন-মৃত্যুর ভেদবুদ্ধি দূরে পালায়।

মহাত্মা দাদু বলেছেন,—

> মরণ তেঁ তুঁ না ডরই মরনা অংত নিদান
> রে মন মরণা সিরজা কহিলে কেবল প্রাণ ॥
>
> —মুরারে ৩৪, ৪৭

মরণকে কিসের ভয়? মরণই তো জীবনের যথার্থ পরিণতি, পূর্ণতা। মৃত্যুর সৃষ্টি হয়েছে কেবল এই কথাটি প্রকাশ করবার জন্য যে 'হে প্রাণ তুমিই সত্য।'

জন্মমৃত্যুর এই যোগের কথা মহাপুরুষেরা কেবল মুখেই প্রকাশ করে যান নি, জীবন দিয়ে এই যোগটি তাঁর আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। মৃত্যু যে জীবনকে নষ্ট না করে পরিপূর্ণই করে দেয় এই সত্যটি তাঁরা জীবন দিয়ে প্রকাশ করে যান। এই মহা সত্যে উদ্বোধনই যথার্থ উদ্বোধন। এই তত্ত্বে দীক্ষা যিনি পেয়েছেন তিনি পরিপূর্ণ জীবন নূতন জীবন পেয়েছেন, তিনিই দ্বিজ। এই দীক্ষা যে জীবন থাকতে পেলো না, তার জীবন ব্যর্থ। জীবনের উৎসব যে সম্ভোগ করতে পারলো না, জীবন তার পক্ষে নিত্য দৈন্য, নিত্য লজ্জা, নিত্য ভয়ের ক্ষেত্র।

২১ বৎসর আগে মাঘ মাসের এই উৎসবেরই মুখে যোগযুক্ত জীবনটাকে উৎসর্গ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি নিত্যকালের উদ্বোধন সাধনার্থীদের জন্যে রেখে গেছেন। অভ্যাসের জড়তায় চেতনার অভাবে যে মহা-উদ্বোধনও ভুলে গিয়েছিলেন, তাই ২১ বৎসর পরে ঠিক তেমনি দিনে এই ব্রহ্মোৎসবের মুখে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র আজীবন ব্রহ্মসমাহিত ধ্যানযোগী দ্বিজেন্দ্রনাথ গত শ্রীপঞ্চমী দিনের অবসান ব্রাহ্মমুহূর্তে শিরবসান ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন হয়ে আমাদের চিত্তকে আবার একটি মহা উদ্বোধনে উদ্বোধিত করে গেছেন। পরম শান্তিতে জীবনটিকে উৎসর্গ করে তিনি বলে গেলেন মৃত্যুতেই জীবনের পরিপূর্ণতা, দেহের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় যে জীবন, সে দীন জীবন-বৃক্ষলতা পশুপক্ষীর। মানুষের অধিকার অনেক গভীর; তার 'বিরাট মৃত্যু:' তার মৃত্যু বিরাট। সে অমৃতের অধিকারী। জীবনে সে দেহ নিয়েই ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যুতে সে দেহের ব্যবধানটুকুও ঘুচিয়ে ফেলে প্রবেশ করবে সেই পরব্রহ্মসাগরে, এই হোল জীবনযোগ। জীবনের প্রতিবিন্দু উৎসর্গ করে নিত্য দীপটি জ্বালিয়ে তুলতে হবে। অনাড়ম্বর যোগীন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাদের কাছে এমনই একটি মহা উদ্বোধন রেখে গেলেন। এবারকার উৎসবে তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করে সকলকে বঞ্চিত করে সরে যান নি, এবার তিনি উৎসবের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন। এবার আর আমাদের কোনো উদ্বোধনের প্রয়োজন নেই, আমাদের হৃদয় মন প্রাণকে অনুকূল করে সেই সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষির উদ্বোধক বাণী শুনতে হবে।

তাঁর উদ্বোধনবাণী আজ এই উৎসব-আকাশকে পূর্ণ করে ধ্বনিত হচ্ছে এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে বদ্ধ হয়ে আপনাকে ব্যর্থ কোরো না। হে মানব, অসীম তোমার অধিকার, মৃত্যুর সাধ্য কি তোমাকে শেষ করে দেয়? মৃত্যুর আবরণ শরীরে দিয়ে অমৃতের মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করতে হবে। এমন উদ্বোধনই তোমার উপযুক্ত উদ্বোধন। এমন দীক্ষাই তোমার যোগ্য দীক্ষা। নবজীবন লাভ কর, দ্বিজ হও, সম্পূর্ণ হও, জীবনকে উৎসব করে তোল।

অন্তরাত্মার মধ্যে যদি এই বাণী শুনতে পাই তবে কি আজ আর কোনো উদ্বোধন-বাণীর প্রয়োজন আছে? মহর্ষির সাধনায় সিদ্ধপীঠ শান্তিনিকেতনে যিনি ৩০ বৎসর অটল যোগাসনে আসীন ছিলেন, তাঁর প্রাণময়ী বাণী স্থান ও কালের সব বাধাকে অতিক্রম করতে সমর্থ। তাঁর বাণী কি আমাদের অভ্যাসের জড়তা ও অচেতনতার কাছে পরাজিত হবে? আজ তাঁর অশরীরী যোগসিদ্ধ মহাবাণীর কাছে আমাদের চিত্তের সব দৈন্য দারিদ্র্য অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস দূর হয়ে যাক্, কপটতা স্বার্থবুদ্ধি নীচ অভিমান বন্ধ হয়ে যাক্।

আজ এই আকাশে কেবল যে দ্বিজেন্দ্রনাথের উদ্বোধন বাণী ভাসছে তা নয়, যদি স্থির হয়ে শুনি তবে শুনতে পাব তাঁর বাণীর পশ্চাতে কত কত সাধকের মহাবাণী ধ্বনিত হচ্ছে। অন্তরে দীক্ষার মহা উদ্বোধনে কেবল তাঁর মন্ত্রই আজ ধ্বনিত হচ্ছে তা নয়, ভিতরে বাহিরে সমস্ত কোলাহলকে শান্ত করে ধ্যানস্থ হবে শুনতে পাব অগ্নিময়ী বাণী আসছে—

> তূ চৈতন্য স্বরূপ হৈ জড় বন্ধন ভ্রমরূপ।
> সে তেরো অভ্যাস হৈ সাধি হো মনভূপ ॥
> মরণ মায়া হৈ মৃধা তমরূপী ভ্রমরূপ।
> তূ অনংত স্বরূপ হৈ অহনদ আনন্দ রূপ ॥

তুমি চৈতন্যস্বরূপ, যে সব বন্ধন তোমাকে বাঁধিতেছে সে সবই জড়বন্ধন ও ভ্রমরূপ। শুধু অভ্যাস ও সংস্কারবশত সেই সব বন্ধনকে অতিক্রম করতে পাচ্ছো না, সাধনার বলে বন্ধন অতিক্রম করে মনের অধিপতি হও। মরণ তো মায়া মিথ্যা, মরণ তমোরূপী ভ্রমরূপ। তুমি অনন্তস্বরূপ, অসীম তোমার আনন্দরূপ।

ভিতর বাহিরের সব কোলাহল দূর না হলে এই সব মহাবাণী প্রকৃতভাবে শুনতে পাবে না। দিবসের পরিমিত অতি আলোতে আমরা আমাদের নিকটকেই অতি উজ্জ্বল করে দেখি, কিন্তু তাতে গ্রহ চন্দ্র তারামার অসীমের অনন্ত রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। রাত্রির মত

স্তব্ধ মৌনী ও গভীর হলে দেখতে পাবে অনন্ত আকাশ ভরে কত কত জীবন্ত সত্তা জল জল করে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে।

নিরখড় পরখত রহুহু বহুত নহিঁ বোলহুরে
রজনী কিবা দীনহ শান্তি কুংপীতেঁ খোল হুরে।
চমকত নির্মল রূপ বাবকত জন্ধ হীরা রে।
জগজীবন বহু মগন ঠেহিঁ তারা রে॥

বেশী বাচালতা গোলমাল কোরো না, শুধু স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখ। রাত্রির রুদ্ধ কপাটখানি শান্তির চাবি দিয়ে খুলে ফেল, তখন দেখতে পাবে কি নির্মল রূপ চমকাচ্ছে। অগণিত গ্রহ নক্ষত্র তারায় বিশ্বজীবন হীরার মত ঝলমল করছে। জগজীবন বলচেন গভীর যোগমগ্ন হয়ে প্রেমমগ্ন হয়ে সেই অনন্ত জীবন সমুদ্রের তীরে স্থির হয়ে বোসো।

বিধাতার সঙ্গে গভীর যোগে যুক্ত হতে হবে, তাঁর রসের রসিক হতে হবে, তাঁর দরদের দরদী হতে হবে, তবে এই বিশ্বের জীবন্তলীলা ও মহোৎসব আমাদের কাছে ধরা দেবে। যে তুলিতে বিধাতা এই বিশ্বছবি আঁকছেন তা প্রেমের জীবন্ত তুলি। অনন্ত শক্তি তাঁর আছে বটে, কিন্তু আমার প্রতি যে তাঁর প্রেম। সেই প্রেমের রস না পেলে, তাঁর সর্বশক্তিমত্তার শুকনো রংগুলি তিনি গুলবেন কিসে? শক্তি যদি রসে না গলে তবে সৃষ্টি হয় কেমন করে?

সুন্নকে কাগজ পর, মাণিক কলম লিয়ে,
অরূপ সেতী রূপ ন্যারো ন্যারো নিকরি আয়ো হৈ।
য়ারী সো আদি ওঁকারে, জাসো য়হ ভয়ো সংসার,
হৌঁ রস বর্ণক বীচ বিনা চিত্রন পায়ো হৈ॥

শূন্যের পটের উপর তিনি প্রেমমাণিকের তুলি দিলেন, আর অমনি অরূপের ভেতর থেকে কত শত বিচিত্র রূপের পর রূপ বেরিয়ে আসতে লাগলো। আদিতে সেই ওঁকার, যা হতে হলো এই সংসার, য়ারী বলছেন তাঁর শুকনো বর্ণকের মধ্যে আমিই মিলিয়েছি রস। আমি ছাড়া এই বিশ্বচিত্রের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এই সৃষ্টিতে যদি আমার কোনো অধিকার না থাকতো তবে এই বিশ্বের উৎসবে আমার কিসের আনন্দ?

এই উদ্বোধন যদি জীবনে সত্য হয়, যদি অন্তরের দৃষ্টি সত্যি খুলে যায় তবে দেখবো এই বিশ্বজগৎ প্রেমের যোগে চলে চলেই একটি প্রেমের সমাজ সৃষ্টি করেছে। অণু-পরমাণুর নৃত্য থেকে সূর্যের পরে মহা-সূর্যের প্রচণ্ড প্রচণ্ড গতি এক কেন্দ্রস্থ প্রেমযোগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সবাই আপন আপন প্রেমের দীপটি জ্বেলে প্রেমেরই পথে পরম পুরুষ জীবনস্বামী পর-ব্রহ্মকে জীবন-প্রদীপ দিয়ে বরণ করে নিতে যাত্রা করেছে। আমাকেও তারা নিরন্তর ডাকছে, যদি যোগ-যুক্ত হয়ে সে ডাক শুনতে পেতাম তবে সব চঞ্চলতা স্বার্থবুদ্ধি নীচ কপটতা অভিমান দূর করে নিজের অন্তরকে ডেকে বলতাম---

মন তুম প্রেম পংথ চলন সমাজী।
অবিগতি গতি ব্রহ্ম বিরাজী॥
অতরজ দিয় না বারো মন্দির মে।
প্রেম জ্যোতি ছবি ছাজা॥
ধরণী আকাশ তঁহা নহি দীখত
সুন্দর পুরুষ ইহ সাজী॥

হে মন, তুমি প্রেমপথে চলন-সমাজী। অগতির গতি ব্রহ্ম সেই প্রেম সমাজে বিরাজিত। এই বিশ্ব-মন্দিরে প্রত্যেকের হাতে এক একটি আশ্চর্য প্রদীপে কি প্রেমজ্যোতির শোভাই উদ্ভাসিত হয়েছে। ধরণী আকাশ কিছুই সেখানে দেখা যাচ্ছে না, কেবল সুন্দর রূপম পুরুষ জীবনের স্বামী সেই প্রেম-সমাজে আপনার শোভায় আপনি দীপ্যমান।

তখন আমিও সেই জীবনস্বামীকে বলি---'হে প্রিয়তম, আমার এই জীবনদীপখানি যদি না জ্বলে তবে তো এই মানব-জীবনই ব্যর্থ, তা তার যত জ্ঞান, যত ঐশ্বর্য, যত শক্তিই থাক না। কবে আমি সার্থক হয়ে বলতে পারবো যে,---তিনি তাঁর প্রেম-পরশমণি আগুন দিয়ে আমার প্রাণকে প্রদীপ্ত করেছেন, আমার উদ্বোধন হয়েছে, আমি বিশ্বজগতের ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিতে পেরেছি?'

যহিতন কৈ জগদীপ কিয়োপ্রীত বতিয়াপ গায়।
পাঁচতত্ত্ব কৈ তেল চুয়ায়ে ব্রহ্ম অগিন জগায়॥
প্রেম পিয়ালা পিয়ইয়ে হো পিয়া দিয়ো বৌরায়॥

প্রেমের শিখা লাগিয়ে এই তনুটিকেই বিশ্বদীপ করে তুলেছি। 'ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুদ ব্যোম' বিশ্বের এই পঞ্চ-ভূতকে ভৌতিক বলে ঘৃণা তো করি নি। তা দিয়েই অন্তরের রসটুকু তেলের মত চেনে বের করে, তাই দিয়েই এই জীবনে ব্রহ্মশিখাটুকু জ্বালিয়ে তুলেছি। এই শিখাটুকু জ্বলতেই দেখি প্রিয়তম সামনে বসে আছেন। তিনি তখন প্রেমের পিয়ালা পান করিয়ে আমাকে মত্ত করে দিলেন।

জীবনের এই ব্রহ্মশিখাটুকু জ্বালিয়ে তোলাই হোলো আসল উদ্বোধন, প্রেমের ব্যথা ছাড়া এই শিখা জ্বলে না। আঘাত ছাড়া যেমন আগুন জ্বলে না তেমন দরদ ছাড়াও প্রেমের শিখা জ্বলে না।

আগুন জ্বালতে হলে তার উজ্জ্বল জ্বালার মূল্য দেওয়া চাই। দগ্ধ হ'তে স্বীকার না করলে দীপ তার উজ্জ্বল শিখটি পেতো কোথায়? তা হলে তাকে জীবনের ব্যর্থ উপকরণের ভার বহন করে বারে বারে অনন্তকালে অন্ধকারেই কাটাতে হোতো। প্রিয়তমের মুখ যদি

দেখতে চাই, তবে জীবনের প্রেমের দীপ জ্বলতে হবে, দগ্ধ হতে হবে, জ্বলে মরতে হবে। জীবনের এই শিখাটি মন্দিরে নেওয়ার নামই হোল উদ্বোধন।

বিরহিনী, মন্দির দিয় না বার।
বিন বাতি বিন তেল দরদ সোঁ প্রেমদীপ উজিয়ার।
প্রাণপিয়া মেরে ঘর আয়ো, য়ারী অপব কোবার।

ওগো বিরহিণী, জীবন-মন্দিরের দীপটি জ্বালিয়ে তোল। তেল ও সল্‌তে যদি না থাকে তবে নাই থাকুক, শুধু দরদে ব্যথাতেই প্রেমের দীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠবে। আজ তো জ্বলে উঠতেই হবে, ভয় পেলে তো চলবে না, প্রাণের প্রিয়তম আজ যে উৎসব করতে আমার মন্দিরে এসেছেন, হে য়ারী, আজ নিজেকে জ্বালিয়ে প্রদীপ করে তাঁর সম্মুখে ধর।

আজ এই পুণ্যতিথিতে যাঁরা এই উৎসব-ক্ষেত্রে একত্র হয়েছেন, তাঁরা কোনো বিশেষ সঙ্কীর্ণ দলের লোক নন। নানা ঘর নানা মন্দির থেকে, আজ—এখানে যাঁরা একত্র হয়েছেন তারা সব 'প্রেমপংথ চলন সমাজী' সবাই মিলেছেন প্রিয়তমের ডাকে, তাঁরই উৎসবে।

রাত্রির কপাট খুলে গেছে 'চমকত নির্মলরূপ ঝলকত জনু হাঁরা' "অযুত তারক চমকে কাঞ্চন হার কত চন্দ্র কত সূর্য নাহি অন্ত তার।' আজ বসুন্ধরার কি শোভা। ধন্য মহেশ্বরের অপরূপ রচনা। 'সুয়াকে কালপর মানিক কলম লিয়ে' কি বিচিত্র রূপ বেরিয়ে এলো। কি উৎসবই তিনি আজ রচনা করলেন। এ যে তাঁর নিজের উৎসব। তাঁর প্রিয়দেরই তিনি আপন উৎসবে ডেকেছেন।

এই মন্দিরে প্রিয়তম আজ উৎসব করতে এসেছেন আজ যদি দগ্ধ হবার ভয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখি তবে এই অকৃতার্থতার আর প্রায়শ্চিত্ত কৈ? অতএব আজ আর ভয় করবার উপায় নেই, আজ যদি নিজে না পারি তবে তাঁকেই বলবো—তুমি আমাকে দেবালয়ের দীপ করে ধন্য কর, আমাকে তুমি সত্য উদ্বোধন দাও, এমন অমূল্য উৎসব ব্যর্থ হতে দিয়ো না।

হে স্বামী তোমাকে যদি না পাই তবে বিশ্বের কোনো ঐশ্বর্য কোনো সম্পদই আমাকে চরিতার্থ করতে পারবে না। এমন মানব-জন্মের সার যে তোমার মিলন-মহোৎসব তা ব্যর্থ হতে দিয়ো না। এতে যদি দগ্ধ হতে হয় তবু ভাল, তবু তুমি স্বয়ং আমাকে তোমার বুকশিখা দিয়ে উদ্বোধিত কর, প্রদীপ্ত কর, সার্থক কর। উৎসব সত্য হোক।

বাঙালীর লেখা প্রথম ইংরাজী কাব্য

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই এদেশবাসী যুবকগণ বিশেষ করে বাঙালী তরুণ-দল ইংরেজী শিক্ষায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বাঙালী যুবকদের মধ্যে ইংরেজী কাব্যনাটক সাহিত্য পাঠের সাড়া পড়ে যায়। তারা শেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রণ প্রভৃতি ইংরেজ কবির রচিত কাব্য-নাটক পাঠ করে অমৃত আস্বাদ লাভ করেন। ইংরেজ কবির রচিত অমৃতময় কাব্য-নাটক পাঠ করে তারা এমনি চমৎকৃত, মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তারা অনুরূপ কাব্য নাটক রচনার বাসনা মনে মনে পোষণ করতেন।

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে, কেবল-মাত্র কয়েক বছরের ইংরেজী শিক্ষার দৌলতে ইংরেজী কাব্যরচনা সহজসাধ্য ছিল না। একটা ভাষায় যথেষ্ট অধিকার না থাকলে কেউ কখনও সেই ভাষায় কবিতা রচনা করতে সমর্থ হন না। তাছাড়া নরের দুর্লভ ধন কবিত্বশক্তি না থাকলে কেউই কবিতা রচনা করতে সক্ষম হন না। কিন্তু দেবী সরস্বতীর কৃপায় সবই সম্ভব হয়। দেবী সরস্বতীর কৃপায় কাশীপ্রসাদ ঘোষ নরের দুর্লভ ধন কবিত্বশক্তি অর্জন করেন। কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষই বাঙালী তথা ভারত-বাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় কাব্য বিচরণে সাফল্য অর্জন করেন এবং খ্যাতির যশোমাল্য অর্জন করেন।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রথম দলের ছাত্র। সুবিখ্যাত কবি ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের শিষ্য। তাঁদের উভয়ের কাছেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। উভয়েই ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক—কবি সাহিত্যানুরাগী। এঁদের দুজনের সাহচর্যে এসে কাশীপ্রসাদের মনে ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনার বাসনা জাগে। এ বিষয়ে প্রাচ্য বিদ্যা-বিশারদ এইচ, এইচ, উইলসন সাহেবের উৎসাহ-প্রেরণাও বড় কম ছিল না।

কাশীপ্রসাদ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, '১৮২৭ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে কলেজের পরিদর্শক উইলসন সাহেব, প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা যাতে ইংরেজী ভাষায় কবিতার রচনা অভ্যাস করে সেইদিকে বিশেষ নজর দেন। কাসে একমাত্র আমিই প্রথম ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা করতে সক্ষম হই।'

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদের "শায়ের এণ্ড আদার পোয়েমস্' কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটি বাঙালী তথা ভারতবাসীর দ্বারা রচিত প্রথম ইংরেজী কাব্য। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় অথবা কোন বাঙালীর রচিত কোন ইংরেজী কাব্য প্রকাশিত হয় নি, 'শায়ের' কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ও বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজে প্রভূত আলোড়নের সৃষ্টি করে। উভয় সমাজেই কাব্যগ্রন্থটি পড়ার জন্য প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। একজন বিদেশী বি-ভাষীকে ইংরেজী ভাষায় এমন সুন্দর সুললিত মধুর কাব্য রচনা করতে সক্ষম দেখে, উভয় সমাজেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়। ইংরেজী কাব্যকুঞ্জে তরুণ বাঙালী কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানান শুধু এদেশবাসীই নয়, সাগরপারের দেশ সুদূর ইংলণ্ডেও পর্যন্ত। সে দেশেও কাব্য গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও সমাদর হয়।

'শায়ের' কাব্য-গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজ-সম্পাদিত বিখ্যাত 'হরকরা' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। যখন কাব্য-গ্রন্থটি প্রথম 'হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন কাব্যামোদী রসিকজনের দৃষ্টি সেই কাব্যটির দিকে আকৃষ্ট হয়। এই তরুণ বাঙালী কবিকে ইংরেজী কাব্যসাধনায় উৎসাহিত করার জন্য তৎকালীন 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক একটি প্রশংসাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করেন। সেই কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্যটি এই :

কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাব্য চর্চা। (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০।১৭ই ফাল্গুন ১২৩৬) হরকরা নামক সংবাদ-পত্রের দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংলণ্ডীয় কাব্যের স্বকপোল রচিত এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় কাব্যক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় লোকের প্রথম অধিকার এই। তৎকাব্যান্তর্গত প্রকরণের যে কিয়দংশ হরকরা কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে যদি সমুদয় কাব্যের বিবেচনা করি তবে বোধ হয় যে তাহাতে তৎকাব্য-কর্তার অনুপম যশোলাভ হইবেক। তৎপুস্তক হইতে সংগৃহীত যে কিয়ৎ প্রকরণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাতে তৎ কবির কাব্যীয় গুণ এবং ইংরেজী ভাষায় নিপুণতা প্রকাশ হইতেছে। ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকার-করণ ক্ষমতাতে যদি আমাদের মনে কিছু সন্দেহ থাকিত তবে এই কাব্যের দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইল।

পূর্বোক্ত কাব্যের প্রস্তাবেতে সুযোগ বুঝিয়া আমাদের এই বক্তব্য যে গত দশ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশীয়

অনুশীলনেতে তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা অতি অবিস্মরণীয়। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষত উপরে প্রশংসিত কাব্যরচক এক ইংরেজী ভাষাধ্যয়নে এমত দৃঢ়াভিনিবেশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকাংশেরা যে পুস্তক রচনায় উৎসাহ রহিত, সেই পুস্তক প্রস্তুতকরণে সক্ষম হইয়াছেন।

শায়ের ফার্সী শব্দ; এর অর্থ সন্ন্যাসী গায়ক কবি। এই কাব্যগ্রন্থে একজন সন্ন্যাসী গায়ক কবির করুণ জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি যেমন অপূর্ব ভাব, ভাষা ও রসমাধুর্যে সমৃদ্ধ, তেমনি সুললিত ছন্দসুষমায় অলঙ্কৃত। সর্বোপরি কাব্যের মঙ্গলাচরণটি স্মরণীয়:

প্রিয় মোর স্বদেশের বীণা
ভারতের অতীত গৌরব।
সুমধুর সঙ্গীত যাঁহার
আজিও হায় হয়েছে নিরব।
একবার দেহ মোরে ওগো
স্পর্শিতে তোমার স্বর্ণ তার
মুগ্ধ কর সঙ্গীতের মধু
অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত যার।
প্রতিভার বরপুত্র কত
তাহাদের মোহন পরশে
সুখসুপ্ত মাধুরী তোমার
জাগাইয়া তুলিত হরষে
যদিও বিগত সেই দিন
ব্যর্থ নহে, এ-প্রয়াস মম
ক্ষুদ্র শক্তি এই করে যদি
জাগি উঠে সুর ক্ষীণতম।
(কবি মন্মথনাথ ঘোষ অনূদিত)

এইরূপ জাতীয় ভাবোদ্দীপনা কবি কাশীপ্রসাদের কাব্যের প্রাণ। এই কাব্যের জায়গায় জায়গায় অসাধারণ কবিত্ব ও অপূর্ব ভাবুকতায় পূর্ণ। পড়তে পড়তে মুগ্ধ হতে হয়।

গভর্নমেন্ট গেজেটের মাসিক-পত্রে (২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৩০) ইংরেজ সম্পাদক কবিকে অভিনন্দন করে শায়ের কাব্যের প্রশংসাব্যঞ্জক

শায়ের কাব্যের দ্বিতীয় অংশে 'হিন্দু ফেস্টিভল' নামে একটি খণ্ড কাব্য সংযোজিত হয়েছে। ভূমিকায় কবি লিখেছেন, কোন বন্ধুর অনুরোধে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেন। এই কাব্যে কবি হিন্দুর এগারটি ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের পৌরাণিক কাহিনী সুললিত ভাষায় কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন। দশহরা, রাসযাত্রা, কার্তিক পূজা, জন্মাষ্টমী, শ্রীপঞ্চমী, দুর্গোৎসব, দোলযাত্রা, কোজাগর পূর্ণিমা, ঝুলনযাত্রা, কালীপূজা ও অক্ষয় তৃতীয়া এই এগারোটি ধর্মীয় উৎসবের কাহিনী বর্ণনায় কবি যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। এই খণ্ডকাব্যটি পাঠ করে তৎকালীন বিদেশীগণ হিন্দুর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছিলেন। এই কারণে কাব্যটি বিদেশীদের নিকট সে যুগে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ও কবি ডি, এল, রিচার্ডসন সম্পাদিত ক্যালকাটা লিটেরারী গেজেট পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

শায়ের কাব্যের তৃতীয় অংশ সবচেয়ে মূল্যবান। এই অংশে কতকগুলি গীতি-কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। কবিতাগুলির গীতিময়তায় মুগ্ধ হতে হয়। কবিতাগুলি ভাবসম্পদে যেমন সমৃদ্ধ তেমনি অপূর্ব এক ছন্দের ঝঙ্কারে সদা অনুরণিত। এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যে The Boatmans song to Ganga নামক কবিতা সুবিখ্যাত। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেব তাঁর বিখ্যাত Selection from British Poems নামক ইংরেজ কবিদের কাব্য সঙ্কলন গ্রন্থে বিখ্যাত ইংরেজ কবিদের পাশে তরুণ বাঙালী কবি কাশীপ্রসাদের এই কবিতাটি স্থান দিয়ে যুগপৎ কাশীপ্রসাদ ও বাঙালী-জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। শুধু এই নয়, রিচার্ডসন সাহেব কবিতাটি সম্বন্ধে তাঁর নিজের স্বদেশবাসীদের নিকট চ্যালেঞ্জ করে লিখেছেন,—

minded person who are in the habit of looking down upon the native of India with an arrogant and vulgar contempt read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language but even in their own.

বহু বিদগ্ধ জনের প্রশংসাধন্য সেই কৌতূহলোদ্দীপক বিখ্যাত কবিতার কিছু অংশ আমরা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

Gold river! Gold river!
Row gallantly now
Our bark on thy bright,
breast is lifting her prow,
In the pride of her beauty,
how swiftly she flies;
Like a white-winged spirit
thro' topaz-paved skies.

Gold river! gold river!
thy bosom is calm
And o'er thee, the breezes
are shedding their balm:
And nature beholds hire
fair features portrayed
In the glass of thy bosom—
serenely displayed.

এই কবিতাটি পাঠ করে তৎকালীন ইংরেজী বাণী-সাধকগণ এমনি মুগ্ধ-বিস্মিত হয়েছিলেন যে, এই তরুণ বাঙালী কবির কবিত্বের পরিচয় দানের জন্য এই কবিতাটি বারবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পুস্তকে। কবি ও সমালোচক রিচার্ডসন কর্তৃক কাব্য সঙ্কলিত গ্রন্থ ছাড়াও ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে Fisher's Drowing room Scraps Book নামক চিত্র গ্রন্থে (Album) বিখ্যাত ইংরেজ মনীষিগণের সঙ্গে ভারতের তথা বাঙলার কবি কাশীপ্রসাদের কন্দর্পপ্রতিম

প্রতিকৃতি সহ উক্ত কবিতাটি মুদ্রিত হয়। কমাণ্ডার রবার্ট এলিয়ট সঙ্কলিত Views in India, China and on the shores of the red sea নামক চিত্র গ্রন্থে এই কবিতাটি সহ কুমারী জে ড্রেমণ্ড অঙ্কিত কাশীপ্রসাদের প্রতিকৃতি ও বিদুষী ইংরেজ কুমারী এমা রবার্টস্ লিখিত কাশীপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও কাব্য পরিচয় প্রকাশিত হয়। এছাড়া সেকালের অনেক চিত্র গ্রন্থে কুমারী জে ড্রেমণ্ড অঙ্কিত কাশীপ্রসাদের এই চিত্রটি মুদ্রিত হয়। এই সমস্ত কবিতা সম্বলিত চিত্রগ্রন্থ তৎকালীন ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারের ড্রইং-রুমের শোভা বর্ধন করত।

কুমারী এমা রবার্টসন (১৭৯৪-১৮৪০) যিনি Oriental Scenes, Dramatic Sketches প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, Scenes & Characteristics of Indostan, The East India Voyager প্রভৃতি পুস্তক ও Bombay United Servce Gazette সম্পাদনা করে সে যুগে প্রভূত খ্যাতি ও যশোলাভ করেন, তিনি কবি কাশীপ্রসাদের কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন,---

'ইংরেজী সাহিত্য রসাস্বাদনে কাশীপ্রসাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি কলিকাতার সাময়িক পত্রের অন্যতম লেখক ছিলেন। তিনি বাঙলায় সঙ্গীত রচনাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজী ভাষায় রচিত। তাঁর ইংরেজী রচনা এমনি ওজস্বিতাপূর্ণ, প্রাঞ্জল ও গতিশীলা যে বিদেশী ভাষায় কবিতা রচনা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, যাঁরা জানেন তাঁরা সকলেই তাঁর রচনা দেখে বিস্মিত ও চমৎকৃত হবেন। কলিকাতার সাময়িক পত্রে এই তরুণ কবির কাব্যের যে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে, তার ফলেই শায়ের কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এবং এই কাব্য-গ্রন্থটিই কবিকে ভারতবর্ষে সুকবি রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এমন কি সাগর-পারের দেশ সুদূর ইংলণ্ডে পর্যন্ত এই কাব্যটির যথেষ্ট সমাদর হয়। শায়ের কাব্যের এমন কতকগুলি গুণ রয়েছে, যা এই কাব্যটিকে চিরদিন আদরণীয় করে রাখবে।'

ইংরেজী-শিক্ষার প্রথম যুগে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কয়েক বছরের ইংরেজী-শিক্ষার দৌলতে একজন বিদেশী বিভাষী তরুণের পক্ষে ইংরেজী ভাষায় কবিতা বিরচনে সফলতা অর্জন করা এবং দেশী-বিদেশী বাণী-সাধকগণের প্রশংসাধন্য হওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়।

কিন্তু মাতৃভাষা ব্যতীত বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করে অমরতা লাভ করা সহজসাধ্য নয়। পরবর্তীকালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি নব্য ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকগণ এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তাঁরা বিদেশী ভাষা ত্যাগ করে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করে বাঙলা সাহিত্যে আজও অমর হয়ে আছেন। আর কাশীপ্রসাদ? কাশীপ্রসাদকে আজ আমরা ভুলে গিয়েছি; তাঁর অনুপম 'শায়ের এণ্ড আদার পোয়েমস কাব্যগ্রন্থ বিস্মৃতির অতল-তলে তলিয়ে গিয়েছে।

কবি রাজকৃষ্ণ রায় কবি কাশী-প্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে লিখেছেন,---

বৃটনীয় ভাষা শিখি পরিচয় তার
দিলে তুমি ভাল রূপে ঘোষজ সুজন।
গাঁথিয়া অপূর্ব, চারু কবিতার হার
ইংরেজী ভাষায়। শ্রুতিপথ বিমোহন
কবিতার ছটা তব। দূর বন জাত
ফুল্ল-ফুলকুলে যথা গাঁথে মালাকার
কমনীয় দাম (দাম প্রচুর তাহার),
ভুলাতে নয়ন, মন, হারে পারিজাত।
তেমতি সাগর পার বিদেশী ভাষায়
কবিতা মালিকা তুমি স্বগুণে গাঁথিলে
বঙ্গবাসী হয়ে। পরি অন্তর গলায়
এ তব গুম্ফিত হার আনন্দ সলিলে
সন্তরে পাঠক সদা; সুধার ধারায়
তব যশঃ গায় সবে। সুকীর্তি রাখিলে।

আমরা কি চাই

ভেলেমির খ্লেব্‌নিকভ (১৮৮৫-১৯২২)

আমরা কি চাই, খুব বেশি চাই নাকি—
বেশি নয়, শুধু একটি টুকরো রুটি;
দুধ যদি চাই—এক ফোঁটা চেয়ে থাকি
নুন, সে তো দেবে মেঘ—ঘটবে না ত্রুটি;
মাথা ঢাকতে তো আকাশটা আছে বাকি।

* * *

ঘোড়া যদি মরে, সে মরে নাভিশ্বাসে,
ঘাস—সে ফ্যাকাশে যেই নিভে এলো প্রাণ;
সূর্য যখনি মরে—হিম হয়ে আসে,
মানুষ কেবল মরণেও গায় গান।

অনুবাদ: অরুণাচল বসু

পুরাতন জেল বা মেদিনীপুর দুর্গের একাংশ

মেদিনীপুর

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
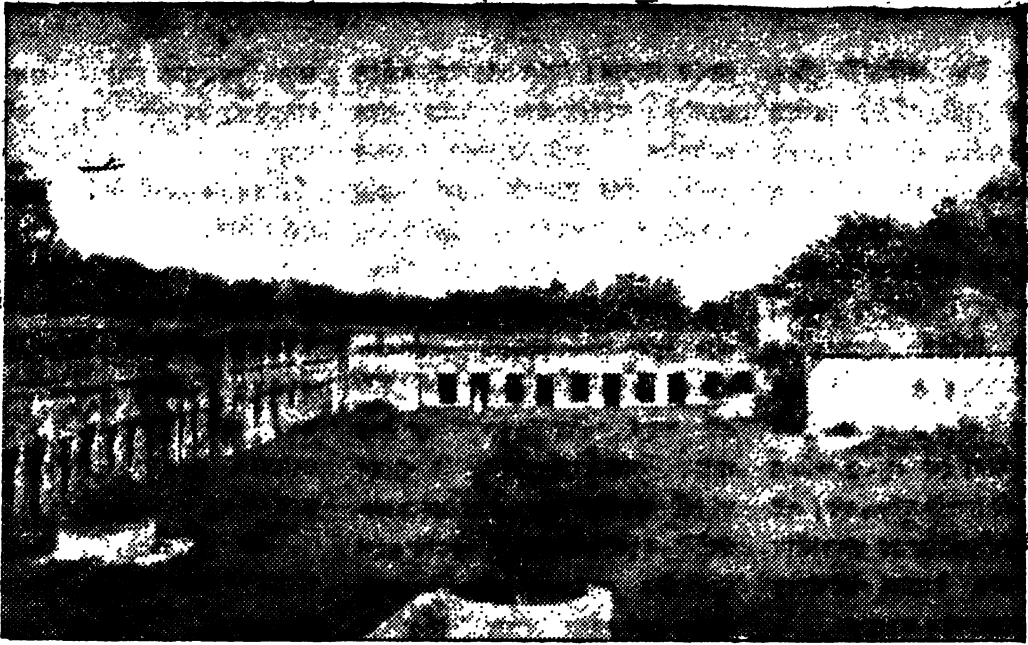
প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পূর্বপ্রান্তে রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত তমলুক নামে যে নগরটি আছে, একদা সুনীল সিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলে সফেন উচ্ছ্বাসে উহার পাদমূল ধৌত করে যেত। পাশ্চাত্য ও এদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে আধুনিক তমলুক বলে স্বীকার করেছেন। মহাভারত, অথর্ব পরিশিষ্ট, বিষ্ণু পুরাণ, বায়ু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের নাম আছে। মহাভারতে [illegible] তাম্রলিপ্ত ও তার নরপতিদের কথা পাওয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থেও তাম্রলিপ্তর উল্লেখ আছে। এই তাম্রলিপ্তের অপর নাম বেলাকুল। (শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান মেদিনীপুর অঞ্চল কারো মতে প্রাচীন কলিঙ্গের অন্তর্গত, আবার কারো মতে প্রাচীন সুহ্ম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং তাম্রলিপ্ত নগর এই রাজ্যের রাজধানী বলে পরিগণিত ছিল।

এক সময় তাম্রলিপ্ত বাঙলার বন্দর ছিল। ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-খ্যাতি সারা সভ্য জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধদের একটা প্রধান স্থান ছিল। অশোক এই স্থানে একটা স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সেকালে সিংহলে যেতে হলে এই স্থান দিয়ে যেতে হত। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন তখন ইহা গঙ্গার মোহনার কাছে অবস্থিত সামুদ্রিক বন্দর ছিল। তিনি এখানে ২৪টি বৌদ্ধমঠ দেখেছিলেন। দু বছর এখানে বাস করে ধর্মগ্রন্থ সকলের অবিকল নকল ও চিত্রিত মূর্তিগুলির যথাযথ নক্সা এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। যুয়ং চয়ঙ যখন এখানে আসেন তখনও তাম্রলিপ্ত ১৫০০ লি বা ২৫০ মাইল বিস্তৃত ছিল। তিনি এখানে ৫০টি দেবমন্দির ও ১০টি বৌদ্ধমঠ ও ২০০ ফুট উঁচু অশোকের আদেশবাণী ঘোষিত স্তম্ভ দেখেছিলেন। এরপর তাম্রলিপ্ত পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় প্রদেশের অন্তর্গত হয়।

১০২১-১০২৩ খ্রী: কাঞ্চিপতি রাজেন্দ্র চোড়দেব রাঢ় দেশের দক্ষিণাংশ উৎখাত করে ধনাদি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। এরও ১০০ বছর পরে উৎকলরাজ চোড় গঙ্গদেব মান্দার নরপতিকে পরাস্ত করে মেদিনীপুর অধিকার করেন।

এই অঞ্চলের নাম তখনও মেদিনীপুর হয়নি। দ্বাদশ শতকের শেষ পাদে মেদিনীপুর নামে এক রাজা এই স্থানে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই শিখর ভূমির রাজা রামচন্দ্র কৃত পুঁথিখানি হতে আবিষ্কার করেন যে প্রাণকর নামে জনৈক রাজা কর্ণগড় প্রদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র মেদিনীকর 'মেদিনীপুর' নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই মেদিনীকরই 'মেদিনী-কোষ' নামে এক অভিধান রচনা করেন। এই মেদিনীকোষের মধ্যে তিনি নিজ পিতার নাম উল্লেখ করেন।

এই জেলার মধ্যেই আফগান ও মোগলদের অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। মোগলেরা রাজ্যে কিছুদিন শান্তি এনেছিল। তারপর ১৭শ শতাব্দীতে সম্রাট-পুত্র খুরম এই মেদিনীপুরের ভেতর দিয়ে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। ১৬৮৭ খ্রীঃ হিজলী অবরোধ করলে দেশে আবার অশান্তি উপস্থিত হয়। ১৬১৬ খ্রীঃ শোভা সিংহের বিদ্রোহে দেশে অরাজকতা ও অশান্তি হয়। শোভা সিংহ আফগান সর্দার রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে মেদিনীপুর হতে রাজমহল পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবাঙলা লুণ্ঠন করেন।

আলিবর্দি খাঁর রাজত্বে বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ যখন উৎপীড়িত, তখন মেদিনীপুরের ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা ঘটেছিল। এই হাঙ্গামায় মেদিনীপুরের বহু ক্ষতি হয়, তা অবর্ণনীয়। ক্রমে ইংরেজরা এল। ইংরেজাধিকার কালের প্রথম থেকেই নানা রকম অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই অঞ্চলে বহু জমিদার। তারা সুযোগ পেয়েই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে। চুয়াড় বিদ্রোহ, নায়েক বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন ইতিহাস মেদিনীপুর রচনা করে। প্রাচীন কাল থেকে এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছে হিন্দুরা, বৌদ্ধরা, পাঠানরা, মোগলরা, ইংরেজরা।

ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানী বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যাকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করে। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে চাকলা-বিভাগগুলিকে জেলা বিভাগের মূল ভিত্তি বলা যেতে পারে। চাকলা মেদিনীপুর সে সময় জলেশ্বর ও মেদিনীপুর এই দুই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিক মেদিনীপুর জেলার সমস্ত ভূভাগ তৎকালে বর্ধমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও হিজলী এই জেলারই অন্তর্গত ছিল। ১৮১৯খ্রীঃ বর্ধমান জেলার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করে হুগলী জেলা গঠিত হলে এই জেলার উত্তরাংশের কয়েকটি পরগণা আবার হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। উত্তরকালে বর্ধমানের অন্তর্গত বগড়ি পরগণা ও হুগলীর অন্তর্গত পরগণাগুলি ও সমগ্র হিজলী জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করে।

বর্তমান মেদিনীপুর জেলা গঠিত হয়েছে রূপনারায়ণ নদ ও সুবর্ণ রেখা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশটি নিয়েই। উত্তরে বাঁকুড়া জেলা, পূর্বে হুগলী ও হাওড়া জেলা এবং হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিম বালেশ্বর জেলা, পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য ও সিংভূম জেলা ও পশ্চিম-উত্তরে মানভূম জেলা—এই চতুঃসীমান্তবর্তী প্রদেশটি বর্তমানে মেদিনীপুর জেলা নামে পরিচিত।

এই জেলা ২২'৪৬ ৪০'' হতে ২১ ৩৬ ৪০'' অক্ষাংশ উত্তর ও ৮০ ১৫ ৫'' হতে ৮৬৩৫ ২২'' দ্রাঘিমাংশ পূর্বে অবস্থিত।

এই জেলার মোট আয়তন ৫২৫৮ বর্গমাইল (কিছু কিছু পরিবর্তন হতে পারে)। এই জেলা বাংলা দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন জেলা। লোকসংখ্যা (১৯৫৭সালে) ৩৩,৫৯,০২২।

রাজ্য শাসন ও রাজস্ব সম্পর্কীয় নানারকম কাজকর্মের সুবিধার জন্য ইংরেজ আমলে এই জেলাকে মেদিনীপুর সদর, কাঁথি, তমলুক ও ঘাটাল নামে ৪টি মহকুমায় ও ২৬টি থানায় ভাগ করা হয়েছে। এই জেলায় বর্তমানে ১১৫টি পরগণা আছে এবং গ্রামের

...ত পাড়া গ্রামে শিবমন্দিরে সংলগ্ন জৈনমূর্তি

সংখ্যা কম-বেশী সাড়ে এগারো হাজার।

মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগর মেদিনীপুর শহর। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগর বলে ঘোষিত হয়েছে। এই শহর কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২২'২৫ ২৩" উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৭'২১' ৪৫" পূর্ব। এই নগর কতদিনের তা জানবার উপায় নেই। তবে আইন-ই-অকবরীতে জলেশ্বরের মধ্যে মেদিনীপুর একটি বড় শহর বলে উল্লেখ আছে।

এই শহরে জেলার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিভিল সার্জেন প্রভৃতি উচ্চ রাজ কর্মচারীরা থাকেন।

সদর মহকুমার মধ্যে মেদিনীপুর শহরে একটি প্রাচীন প্রস্তরনির্মিত দুর্গ আছে। কতদিন পূর্বে কার দ্বারা এটি তৈরী হয়েছিল তা জানা যায়নি। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যখন মেদিনীকর মেদিনীপুর নগর স্থাপন করেন তখন এই দুর্গ করেছিলেন। তারপর এই দেশ মুসলমান অধিকারে এলে এই দুর্গটিও তাদের হস্তগত হয়। সেই সময় এই দুর্গের ভেতর একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এই দুর্গটি তারপর থেকে সেনানিবাস হিসেবে মুসলমান এবং ইংরাজরাও ব্যবহার করেন। তারপর সেনানিবাস উঠে গেলে জেলরূপে ব্যবহৃত হয়। আজও এটি পুরাতন জেল নামে পরিচিত।

মেদিনীপুর শহরে জগন্নাথ, শীতলা ও হনুমান জীউর মন্দির আছে। শহরের উত্তর প্রান্তে হবিবপুর পল্লীতে প্রাচীন পঞ্চমুণ্ডী আসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি আছে। শহরের মাঝে বিবিগঞ্জে দুর্গামন্দির, কর্নেলগঞ্জে রামচন্দ্র মন্দির উল্লেখযোগ্য। কেরাণীটোলা পল্লীতে খ্রীস্টানদের গীর্জা ও সমাধিক্ষেত্র। শহরের ৩ মাইল পশ্চিমে গোপগিরি নামে একটা ছোট পাহাড় আছে। এখানে এককালে একটা দুর্গ ছিল বলে মনে হয় মিয়াবাজারের মসজিদ, দেওয়ানখানার মসজিদ প্রভৃতি কয়েকটি মসজিদ এই শহরে আছে।

কাঁথি—১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে কাঁথি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঙলা দেশের মহকুমাগুলির মধ্যে কাঁথি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শ্রীরামপুর মহকুমার পর কাঁথি। এর আয়তন পরিমাণ ৮৪৯ বর্গমাইল।

কাঁথি মহকুমার মধ্যে একটি সুউচ্চ বালুকাস্তূপ শ্রেণী আছে। এই বালুকাস্তূপ পূর্বদিকে রসুলপুর নদীর মোহনা হতে আরম্ভ হয়ে পশ্চিম দিকে সুবর্ণরেখা নদীর মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত।

কাঁথি শহরেই এই মহকুমার দেওয়ানী, ফৌজদারী আদালত ও সরকারী অফিস আছে। এখানে নন্দকুমার পুষ্করিণী নামে এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। পূর্বে এখানে নিমকির কুঠি ছিল, বর্তমানে সেই সব স্থানে সরকারী কার্যালয় হয়েছে।

কাঁথি থানার অন্তর্গত জুনপুট, দৌলতপুর এবং রামনগর থানার অন্তর্গত চাঁদপুর, বীরকুল, দীঘা প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। ১৮শ শতাব্দীতে ইংরেজগণ সময় সময় বিশ্রাম লাভের জন্য এই সকল স্থানে আসতেন। বীরকুলে ওয়ারেন হেস্টিংসের গ্রীষ্মাবাস ছিল।

পূর্বে দীঘার সমুদ্রতীরে একটা ডাকবাংলো ছিল—সরকারী কর্মচারীরা সময়ে সময়ে সেখানে গিয়ে বাস করত। বর্তমানে দীঘা সরকারী প্রচেষ্টায় প্রমোদ ভ্রমণের ও সমুদ্র দর্শনের আকর্ষণীয় স্থান বলে পরিগণিত হয়েছে। প্রতি বছর বহু লোক দীঘায় সমুদ্র দর্শন করে আসে। এই স্থানকে মনোরম করবার জন্য সরকার বহু অর্থব্যয় করেছেন।

এছাড়া কাঁথি মহকুমার পটাশপুর, ভগবানপুর, খাজুরী, রামনগর প্রভৃতি স্থান বিখ্যাত।

তমলুক মহকুমা মেদিনীপুর জেলার পূর্ব প্রান্তে ও কাঁথি মহকুমার উত্তর-পূর্বে

'খাঁদারাণী' নামে পরিচিত জৈনমূর্তি লাউপাড়া

অবস্থিত। ১৮৫২ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে এই মহকুমা গঠিত হয়। ইহার পরিমাণ ফল ৬৫৫ বর্গমাইল। একসময় এই তমলুকে রেশমের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ছিল; নীলের চাষও হত। এখন তমলুকে বালতি ও স্টীলের ট্রাঙ্ক তৈরী হয়। এই মহকুমার প্রধান নগর তমলুক রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে।

এই মহকুমার মহিষাদল গ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহিষাদলে রাজার বাড়ী, গড়, দেবদেবীর মন্দির, সুবৃহৎ সরোবর, দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

এই অঞ্চলে পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, গেঁওখালী, হরিখালী প্রভৃতির বাজার প্রসিদ্ধ। এই মহকুমার স্থানে স্থানে মাদুর ও বস্ত্রাদি তৈরী হয়। তমলুকের মশারির থান বিখ্যাত।

এখানে 'কপালমোচন তীর্থ'—এক তীর্থস্থান ছিল। বর্গভীমার মন্দির, জিষ্ণুহরি মূর্তি—কৃষ্ণার্জুনের যুগলমূর্তি, নেতা ধোপানীর পাট, ময়নার ধর্ম ঠাকুর, ময়নাগড়, মহিষাদলের নবরত্নের মন্দির, রামবাগের রামজীউর মন্দির, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঘাটাল মহকুমা মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে এই মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিমাণ ফল ৩৭২ বর্গমাইল। ঘাটাল নগর শিলাবতী নদীর তীরে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যালয়াদি এই নগরেই অবস্থিত।

এই মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, রাধানগর প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট ধুতি, শাড়ী, চাদর, ছিট, কাপড় তৈরী হয়। স্থানে স্থানে রেশমের কাপড়ও তৈরী হয়। চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ঘাটাল ও খড়ারের কাঁসা ও পিতলের বাসন প্রসিদ্ধ। এই মহকুমার নানা স্থানে মাটির হাঁড়ি, কলসী তৈরী হয়। জনশ্রুতি—চন্দ্রকোণা শহরে ৫২টি বাজার ছিল।

চন্দ্রকোণার দ্বাদশদ্বারী গড়ের ধ্বংসাবশেষ, চন্দ্রকোণার পশ্চিম প্রান্তে রামগড় ও লালগড় নামে দুটি দুর্গ ছিল। রামগড় দুর্গে রঘুনাথ জীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

মাঙ্গলিকী

অরুণা ঘোষ

হে নবীন, হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে তোমারে বরিতে
গাঁথিয়াছি আনন্দের মালা,
ফুলে, ফলে, কিশলয়ে, শত শুভ কামনায়
সাজায়েছি বরণের ডালা॥
ভুলে যেতে চাই মোরা, অতীতের মলিনতা
হিংসা, দ্বেষে, ব্যথাভরা দিন,
জ্বলে যাক্-পুড়ে যাক্, যত কলুষতা সব
অস্তাচলে হোয়ে যাক্ লীন।
তুমি কি এনেছো বলো বাংলার তরে
আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ।
কম্পিত, আতঙ্কভরা বাঙালীর মন আজ
একবিন্দু মাগে আশীর্বাদ।
দুরু দুরু হিয়া কাঁপে, তবুও উৎসব মুখর
গেয়ে যায় আগমনী গান
সেই সুরে সুর দিয়ে মলয় বহিয়া চলে,
কিশলয় দিয়ে যায় তান।
তোমার নবীন স্পর্শে, নবীন আলোতে
আমাদের মন কর আলো,
তোমার মঙ্গলহস্তে, মাঙ্গলিকী ভরে আনো
দূরে যাক্ বিভীষিকা কালো॥

ইতিহাস চিরদিনই বলে আসছে দেশপ্রসিদ্ধ জননায়ক ও রাজা-রাজড়ার কথা, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনকে যাঁরা প্রভাবিত করেছে, অকৃপণ হাতে সেবা প্রেম ও মাধুর্য বিতরণ করে তাদের ক'জনের খবরই বা আমরা রাখি?

বিখ্যাত ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুইয়ের প্রেমিকা ছিল অনেক, তবু তাদের মধ্যে এমন নারী একজনই ছিল যাকে বলা যায় অনন্যা, স্নেহ প্রেম সেবা দিয়ে ভরে দিয়েছিল সে রাজাকে, যদিও তাতেও দুশ্চরিত্র লুইয়ের মনকে সে চিরদিনের মত বেঁধে রাখতে পারেনি।

কিন্তু সেসব যেন স্পর্শও করে না লা ভ্যালিয়েরকে, সে যে সূর্যের সাধনায় মগ্ন সূর্যমুখী ফুলের মত রাজার দিকেই চেয়ে আছে সদাই অবশ্য অত্যন্ত সংগোপনে, বাইরে সে ভীতা সঙ্কুচিতা এক সদ্য তরুণী মাত্র।

চতুর্দশ লুইও তখন তরুণ বয়স্ক। বিবাহিতা পত্নী অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী মারিয়া থেরেসা তখনই তাঁর কাছে পুরানো হয়ে উঠেছেন, প্রেমের সন্ধানে চারদিকে চোখ বুলিয়ে সদ্য-বিবাহিতা ভ্রাতৃবধূ হেনরিয়েটার উজ্জ্বল রূপ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তাঁর। রাজার পক্ষপাতিত্বে সাড়া জাগলো তরুণী নববধূর বুকেও;

একজনকে ভালবেসেছেন, তার সান্নিধ্য তিনি কামনা করেন একথা লোক-জানাজানি হলে পর স্বয়ং হেনরিয়েটা সম্বন্ধে যে গুজবটা উঠেছে তা অচিরেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং পারিবারিক শান্তিও বিঘ্নিত হওয়ার কোন কারণ থাকবে না; তা ছাড়া এই ছুতোয় রাজাও নিত্যি আনাগোনা করতে পারবেন হেনরিয়েটার মজলিশে, দরবারী কেতা অনুযায়ী মেড অফ অনার বা সখীকে সর্বদাই থাকতে হয় কর্ত্রীর কাছাকাছি। শিখণ্ডীর ভূমিকায় নির্বাচন করা হল লুইসকে যদিও সে নিজে এ পরিকল্পনার কিছুই জানলো না।

কল্পনার দেবতাকে প্রেমিকরূপে

নেপথ্য নায়িকা

শ্রীমতী

অপর নারীর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে নীরবেই একদিন সরে যেতে হয়েছিল তাকে একক জীবনের নিঃসঙ্গ আশ্রমে। তবু রাজাকে ভোলেনি সে কোনদিন; লুইস দ্য ভ্যালিয়েরের জীবনে রাজা চতুর্দশ লুইই ছিলেন একমাত্র পুরুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

লুইস দ্য লা ভ্যালিয়ের প্রথম দেখেছিল তরুণ রাজাকে এক পল্লী ভবনে, প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো কিশোরী লুইস কিন্তু রাজা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন তখনও।

কিছুদিন পরে অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টায় রাজার ভ্রাতৃবধূ ইংলণ্ডের রাজকুমারী হেনরিয়েটার সখীরূপে নির্বাচিতা হয়ে লুইস এলো প্যারিসে, রাজদরবারের সান্নিধ্য সে এই প্রথম পেলো সেখানে কত না ছলনা কত না ব্যভিচারের স্রোত বয়ে যাচ্ছে দিনরাত;

সকলের অগোচরে মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা চললো এই দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে।

কিন্তু প্রেমের পথ চিরকালই অমসৃণ, ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষো চলতে লাগলো অল্পবিস্তর, বিধবা রাজমাতা পুত্রকে ডেকে কঠিন তিরস্কার করলেন: বিচলিত হলেন রাজা, বিচলিতা হেনরিয়েটাও, তাঁর স্বামী রাজভ্রাতা ফিলিপও নাকি এ নিয়ে বিস্তর গঞ্জনা দিয়েছেন স্ত্রীকে।

বুদ্ধিমতী হেনরিয়েটাই অবশেষে ভেবে ভেবে এক মতলব ঠিক করলেন যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে।

স্থির হল তাঁর সখীদের মধ্যে একজনকে শিখণ্ডীস্বরূপ দাঁড় করিয়ে প্রেমলীলা চালাবেন তাঁরা গোপনে।

রাজা রাজকুমারীর সখীদের মধ্যে এগিয়ে আসতে দেখে সেদিন লুইসই কি কম বিস্ময় বোধ করেছিল? ভীরু ভালবাসার স্পর্শে কাঁপা থরথর হৃদয়ে শুধু সে বরণ করে নিয়েছিল অবিশ্বাস্য সেই সৌভাগ্যকে।

কথিত হয় যে, সুচতুর প্রেমিক চতুর্দশ লুই দু' একটি প্রেমের কথার অবতারণা করার সঙ্গে সঙ্গে নাকি লুইস কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নতজানু হয়েছিল তাঁর সামনে, বলেছিল অস্ফুটভাষে—'প্রভু আমার, রাজা আমার, আমি যে আপনাকেই চেয়েছি এতদিন, তবে কি সত্যই এতদিনে সার্থক হল, অভাগী লুইসের জন্য?'

অভিনয় করতে এসে ধরা পড়ে গেলেন রাজা, কুমারীর অমলিন হৃদয়খানি প্রেমে শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য—এ ডালি কি তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন?

নব অনুরাগের এই জোয়ারের

বাঁধে ভেসে গেল আর সব, বুকে তুলে নিলেন তিনি লা ভ্যালিয়েরকে।

রাজ-প্রণয়িনীর ইঙ্গিত পটভূমিকায় দীপ্ত হয়ে উঠলো নতুন একটি নাম, লুইস দ্য লা ভ্যালিয়ের।

সুমহান এই নরপতির প্রেম লাভ করেও কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারিণী হতে পারেনি লুইস, আনন্দর সঙ্গে বেদনা প্রায় সর্বদাই অঙ্গাঙ্গিভাবে ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে সে।

রাজ-পরিবারের বিশেষত রাজ ভ্রাতৃবধূ হেনরিয়েটার ঈর্ষা-কুটিল মন সদাই তৎপর হয়ে থাকতো, তার সুখের দিন শেষ করে দেওয়ার জন্য আর সেজন্যই বহু জঘন্য চক্রান্ত চলতো তার বিরুদ্ধে সর্বদা, সরল স্বভাবা নারী জানতোই না কিভাবে সবকিছুর মোকাবিলা সম্ভব, সে শুধু কেঁদেছে আর ভালবেসেছে।

রাজরক্ষিতার সম্মানজনক পদটি পেয়েও কোনদিন এতটুকু গর্ব প্রকাশ করেনি লুইস, এই অবৈধ সম্পর্ক যে লজ্জাকর এ জ্ঞান তার বরাবরই ছিল।

রাজা প্রণয়িনীকে বহু সম্পদ ও সম্মান বিতরণ করেছেন বারবার, যদিও সে সবের জন্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়নি লুইস কোনদিনই, তার মোহ ছিল শুধু তার প্রিয়তম লুইয়ের ওপর; অবৈধ জেনেও সে ধরা দিয়েছিল তাঁর বাহুবন্ধনে তাই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে।

১৬৬৩ খৃস্টাব্দে রাজার ঔরসে লুইসের একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সদ্যোজাত শিশুকে সরিয়ে ফেলা হয় তার মায়ের কাছ থেকে: এর কিছুদিন পরে আরেকটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছিল সে এবং তারও কিছুকাল পরে একটি মেয়ে হয়েছিল তার, উত্তরকালে যে নাকি মায়ের রূপলাবণ্যের অধিকারিণী হতে পেরেছিলো।

১৬৬৭ খৃস্টাব্দে রাজা লুই, লুইসকে ডাচেস উপাধিতে ভূষিতা করলেন মহাসমারোহে, কিন্তু তখনই তার আসল সৌভাগ্য-শশী কিছুটা রাহুগ্রস্ত।

অপরূপ সুন্দরী মাদাম দ্য মন্তেসপাঁকে নজরে ধরেছে রাজার; বিষণ্ণা ভালমানুষ লুইসকে ক্রমেই ক্লান্তিকর ঠেকছে তাঁর।

এর পরের ইতিহাস তো একটানা দুঃখের—রাজা ও মাদাম দ্য মন্তেসপাঁর প্রেমলীলা রঙ্গ দিনের পর দিন চোখ মেলে চেয়ে দেখতে হয়েছে লুইসকে; মন্তেসপাঁর প্ররোচনায় রাজা তাকে দরবার থেকে ছুটি নিতেও অনুমতি দেননি। এই দিনগুলি বড় দুঃখেই কাটিয়েছিল লুইস, তার নিজের ডাইরীতে নিজের হাতে লিখে রেখেছে সে এই সব দিনের ইতিহাস।

সে লিখেছিল—আমাকে কি বসে থাকতে হয়নি, প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মুখোমুখি? আমার প্রিয়, আমার রাজা বসেছিল তারই পাশে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

তাদের হাস্যোৎফুল্ল আনন, তাদের সানুরাগ দৃষ্টিবিনিময় কি বারবারই চোখে পড়েনি আমার? হে ভগবান এই তো নরক; আমাকে শান্তি দাও, শান্তি দাও প্রভু। তবু প্রিয়তমের ক্ষণসান্নিধ্যটুকুরও আশা সহজে ছাড়তে পারেনি হতভাগিনী লুইস। বহু অপমান বহু দুঃখের পর অবশেষে ঈশ্বরের করুণা হল তার প্রতি, সংসার ছেড়ে গেলো কার্মেলাইট সম্প্রদায়ভুক্ত। সন্ন্যাসিনীদের এক আশ্রমে প্রবেশাধিকার পেলো সে, সেখানে তার নতুন জন্ম হল সিস্টার লুইস নামে, জীবনের বাকি ত্রিশটি বছর কেটেছিলো তার এখানেই। সামান্য কয়েকটি বছরের ভালবাসার স্মৃতি কি মুছে গিয়েছিলো দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্রসাধনে? সন্ন্যাসিনী লুইস কি অতিক্রম করেছিলো প্রেমিকা লুইসকে শেষ পর্যন্ত?

কে দিতে পারে এ প্রশ্নের উত্তর?

তবু ইতিহাসে সে রইলো চিহ্নিত হয়ে এক অনন্যা নারীরূপে; সর্ব ঐশ্বর্যসম্পন্ন প্রেমিকের কানে কানে যে গুঞ্জন করেছিলো একদা—

'ধন নয় মান নয়, কিছু ভালবাসা,
করেছিনু আশা।'

নাট্টাও

[মূল বর্মী কবিতার অনুবাদ। কবি পোথুডও, উ, মিন। 'নাট্টাও' হচ্ছে বর্মাদেশে প্রচলিত সম্বৎসরের নবম মাস, যেমন আমাদের বাংলার পৌষ।]

কম্পাসের আট কোঁটা (কিংবা মাত্রা, যা ই বলো)
ঊষার কুয়াশার মত অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে—
অথচ প্রকৃতির আঙিনায় শিশিরধোওয়া সমুজ্জ্বল।
বিভিন্ন অর্কিড আর পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ্ যত
দক্ষিণবায়ুর দেবতার চুম্বনে ফুল্ল হয়ে
সুরভি বর্ষণ করে প্রাচ্য বনস্থলীগুলির
যত্র তত্র—সর্বত্র ঊর্ধ্বে
মৃগশিরা আর পূর্ণচন্দ্র ভ্রাম্যমাণ
নিজ নিজ কক্ষপথে—একত্রে—
যেখানে মিশেছে ঐ
যুগন্ধরশৃঙ্গের সমুন্নত শিখরমহিমা।

অনুবাদক—অজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ শ্রীরামকৃষ্ণজগতের কৃপাকথা ॥

• লীলারহস্য কথা •

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বন্ধু বললেন, ওহে তুমি কি ভুলে গেছ তোমার বলবার বিষয় বস্তু ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ কেন তাঁর পিতার ইষ্ট ছেড়ে কালী মন্দিরের পুজারী হলেন এবং কালীরূপের সাধনা করলেন।

আমি বললাম, "বন্ধু, উতলা হয়ো না, আমি সে কথা বেশ জানি। একটু ধৈর্য ধরে থাক, দেখবে আমি সেই কথাটিই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চাই।"

বন্ধু বললেন---বেশ, তাই হোক।

শোন, পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোকেই যাক আর নক্ষত্রলোকেই যাক এই দেহেন্দ্রিয় বিশিষ্ট মানুষ মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে যেতে পারবে না। দুটি কথা বন্ধু মনে রেখো---এক চিত্রগুপ্ত আর এক যমরাজ। এই দুইজনের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। তুমি যা করছ যা ভাবছ এই 'গুপ্ত মশাই' অটোমেটিক যন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে সব তাঁর খাতায় তুলে নিচ্ছেন। কেউ তাঁর কাজে বাধা দিতে পারবে না। প্রতিটি চিন্তার সংস্কার এবং প্রতিটি কর্মের সংস্কার আমাদের চরিত্রের ক্রমিক বিকাশ করে যাচ্ছে লৌকিক ভাষায় যাকে বলে 'কপালের লেখা'।

এই কপালের লেখাই হচ্ছে চিত্রগুপ্তের খাতার আমাদের হিসেবের লেখার একটা মোটামুটি সারাংশ। এই বোঝা আমাদের বহন করতেই হবে। তবে হ্যাঁ এক অবতারই কপাল মোচন। তিনিই তোমার কর্মের নাকি ভার ঘাড়ে নিতে পারেন।

স্বামীজী তাই বলেছেন, 'অবতার কপাল মোচন।' কিন্তু অবতার কপাল মোচন কথার অর্থ হলো যেটা তোমাকে ভুগতে হতো সেটা তিনি ভুগেছেন। ভুগছেন। কর্মের ফল হবেই। ফল হবেই। ইংরেজীতে যাকে বলে Every action must have its reaction পাশ্চাত্য খৃস্টধর্মে এই কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন প্রভু যীশু। তিনি বলেছেন---'বিশ্বাস কর তোমার মুক্তির জন্য আমি প্রাণ দিলাম। আমাকে যদি বিশ্বাস কর তাহলে তোমার মুক্তি অবশ্যই হবে।'

একে বলে vicarious punishment আসল কথা হলো এই চিত্রগুপ্ত---এ এক অপূর্ব ব্যাপার। এ সম্বন্ধে অবশ্য পণ্ডিতেরা অনেক বলতে পারবেন।

এটাই হচ্ছে 'law of karma'। এই চিত্রগুপ্ত আমাদের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে রয়েছেন। প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে আছেন। আর আছেন যমরাজ। তুমি যতই কিছু আস্ফালন কর না কেন একদিন মৃত্যু এসে তোমাকে গ্রাস করবেই এবং ইন্দ্রজালের ভিতর তুমি এই সংসারের স্থায়িত্বের কল্পনা করছ তা এক মুহূর্তে চূর্ণ করে দিয়ে চলে যাবে। তুমি হঠাৎ জেগে উঠে দেখবে তোমার এই পৃথিবীর খেলা শেষ।

তখন কি? তখন কি হবে বন্ধু ভেবেছ? উপনিষদ বলছেন, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহন জনা।

যারা আত্মঘ্ন অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা গভীর অন্ধকারে যাবে। কি সর্বনাশ এই আমার ৪টা মটর গাড়ী, লক্ষ লক্ষ টাকা জমিয়েছি ব্যাঙ্কে। আমাকে পরম-মুহূর্তে অন্ধকারের দরজায় দাঁড়িয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হতে হবে? এই কি আমার গতি?

না বন্ধু, তুমি আলোর পথেও যেতে পার। তুমি যদি আলোর পথে যেতে চাও তাহলে আলোর পথের জন্য টিকেট কাট। তার জন্য এখন থেকেই ব্যবস্থা কর। তার কি ব্যবস্থা বল। তার খবর আমি ত রাখি না।

তবে তুমি সত্যি জানতে চাও? মনকে ভাল করে জিজ্ঞাসা কর। বল। উপনিষদ তোমাকে তাও বলছেন। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং"---যদি বিজ্ঞান চাও অর্থাৎ এসব প্রশ্নের প্রত্যক্ষ জবাব যদি চাও তাহলে যাও বিশেষজ্ঞর কাছে। কে তিনি?---তিনি শোত্রিয় অর্থাৎ Intellect দিয়ে বিচার? শুধু বিচার করে তিনি নিঃসন্দেহ হন নি। তিনি একেবারে ব্রহ্মনিষ্ঠ। অর্থাৎ তিনি সে সত্য জ্ঞান লাভ করেছেন এবং সেই সত্যে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। তার কাছে যাও তিনি তোমার উপায় করবেন।

বন্ধু বললেন---দাঁড়াও তোমার কথায় প্রচণ্ড ফাঁক আছে তার কি করবে?

---বল বন্ধু কোথায় ফাঁক?

আরে তুমি সোজা বলে দাও না বিশ্ববিদ্যালয়ে এক এক জন বিরাট প্রতিভাশালী তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত আছেন তাঁদের কাছে গেলে ত চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়।

আমি বললাম---বন্ধু তুমি যে এই প্রশ্ন তুলবে ঋষিরা তা জানতেন। তাই বিধান দিলেন শুধু শ্রোত্রিয় হলে তাঁকে ব্রহ্মনিষ্ঠও হতে হবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া মানে তাঁর শুধু বাচনিক এবং মানসিক জ্ঞান থাকলে হবে না। সত্যকে তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করা চাই। কেবল তিনিই তোমার সমস্যা চিরতরে মিটাতে পারবেন।

বন্ধু তুমি ভাবছ এ আর বেশী কথা কি? এর ভিতর অনেক কথা আছে। আমরা চল সে সব অনুধাবন করি। ভয় পেয়ো না আমরা সূত্র হারিয়ে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভেবো না।

বলছিলাম যে মানুষের জন্ম আর মৃত্যু দুটোকেই মনে রেখে জীবনযাত্রা চালাতে হবে। যেমন যতদিন বেঁচে আছি ততদিন এই পৃথিবীতে যাতে সুখে কাল কাটাতে পারি তার চেষ্টা করব। তেমি মনে রাখবো যে মৃত্যুর পরও যাতে জীবনের যা অবশিষ্ট থাকে তাও যেন সুখে কাটাতে পারি তার চেষ্টা করবো। তা না হলেই গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করার সম্ভাবনা। ঋষিরা এসব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে এ সব কথা বলেছেন। এসব না মেনে উপায় নেই।

কাজেই মানুষের চিরকালের সমস্যা হয়েছে, এই মৃত্যু রাহিত্য অবস্থা লাভ করা। আর এই মৃত্যু রাহিত্য অবস্থা লাভ করতে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে চূড়ান্ত নিষ্কৃতি পেতে হবে; অর্থাৎ যেমন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে তেমি জন্মের হাত থেকেও রক্ষা পেতে হবে। এই পেতে হলে, তার কি ভাবে জীবন যাপন করতে হবে সেই খবরটা প্রতি মানুষের বুদ্ধিমান মানুষের বিশেষ করে জানা দরকার।

সেটা দু হাজার বছর আগেও যেমন সত্য ছিল যদিও তেমনি সত্যি আর দু হাজার বছর পরও থাকবে। এক সময়ে ঋষির অনুশাসনে এই দেশটা চলতো। আজ এই দেশের অসম্ভব দুরবস্থা। কাজেই যারা উন্নত স্তরের জীব তাঁরা প্রাণের অন্তস্থল থেকে চান যে মা বুঝতে যে ভগবান লাভে অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভেই মানষের একান্ত উদ্দেশ্য। এই চিন্তা নিয়েই রামকৃষ্ণ পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন এবং এই কাজে যাতে বিরাট ভাবে করতে পারেন এই জন্য লীলা সহচরী, আমাদের শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ লীলা-পার্ষদের নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা আজ লক্ষগুণ বেড়ে গেছে। রামচন্দ্রের পৃথিবী অথবা শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবী আজ নেই এমন কি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পৃথিবীও আজ নেই। আজ পৃথিবীর সুদূর পার্শ্বে কিছু ঘটলে পর মুহূর্তেই তা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই "শ্বেত জাতি" আর "পীত জাতি" বলে কথাগুলো নাই বললেই চলে।

মানুষ পরস্পরের জন্য পরস্পর ভাবিত হয়। কাজেই এবার ভগবানের অবতরণও বিশেষভাবে দরকার ছিল তাই, 'অবতার বরিষ্ঠ' জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সীমাহীন।

তিনি ভবিষ্যতের সব খবর জানতেন যেমন অতীতের জানেন। ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানে বলে কালের যে বিভাগ তা ভগবানের কাছে মূল্যহীন। এইজন্য এইবার এত শক্তি নিয়ে তিনি এসেছিলেন যে পৃথিবীর এইবারের ভার বহনের তাঁর ক্ষমতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বিচার আরও বিশদভাবে আমরা ভবিষ্যতে করবো। এখন যে কথা হচ্ছিল তাই হোক।

মানুষের ভবিষ্যত জীবনের গতি যেমন অনন্তের দিকে, আমরা অতীতেও অনন্তের ভিতরেই ছিলাম। আমরা উর্দ্ধ গতি (evolution) এবং অধোগতি (involution) উভয়ের ভিতর দিয়েই এসেছি। শাস্ত্র বলছেন আমরা ৮৪ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে মানুষ দেহ পেয়েছি।

আর এই জন্য মৃত্যুর অন্তহীন চক্রে আমাদের জীবন চলছে। তাঁর হাতের ক্রীড়নক হয়ে আমরা আর থাকতে চাই না যখন এই ভাব সত্যিকার বহু ভাগ্যের ফলে মনে উদিত হয় তখনই আমাদের বৈরাগ্য অবস্থা হয়। সেই অবস্থায় আমরা কিরূপে মৃত্যু রাহিত্যের দিকে এগুতে পারি তার ছক ঋষিরা আমাদের জন্য অনেক আগেই কেটে রেখেছেন।

এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ছক হাতে নিয়েই আমাদের মৃত্যুরাহিত্যের দিকে আহ্বান করছেন। অল্প কথায় কতকগুলি অবস্থা আমাদের লাভ করতে যা না হলে ভগবানের পথে আমরা কিছুতেই এগুতে পারবো না। প্রথম পবিত্রতা দ্বিতীয় সত্যনিষ্ঠা এবং তৃতীয় বিচার। 'শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন' বলছেন শাস্ত্র।

বর্তমান সময়ে সমাজে ঘোরতর ব্যভিচার, অসংযম আর ঘুষখেচ্ছ চোরিতা সমাজকে পঙ্গু করতে চাইছে। আমরা যদি বুঝি আমরা মৃত্যুর হাতের পুতুল থাকতে নারাজ তাহলে আমাদের পবিত্রতা এবং সত্যনিষ্ঠা এই দুটির দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

পবিত্রতা লাভ করতে হলে পরস্ত্রী, এমন কি একটা অবস্থায় এসে, নিজের স্ত্রীর ভিতরে মাতৃবুদ্ধি আনতে হবে। চণ্ডীর সেই বাক্যটি "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"র অর্থটি অন্তরের শিরায় উপশিরায় উপলব্ধি করতে হবে।

এই প্রস্তুতি নিয়ে যখন আমরা ভগবান লাভের জন্য চেষ্টা করবো তখনই দেখতে পাবো যে আমাদের চেষ্টা ফলবতী হচ্ছে। এবার আমি গোড়ার কথাটায়, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কালী মূর্তির উপাসক হয়ে জীবন আরম্ভ করলেন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

আগেই বলা হয়েছে ভগবানের কথা জানতে হলে এবং সেই ভাবে আরোহণ করতে হলে প্রথমেই চাই পবিত্রতা যা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

এই পবিত্রতা কি জাতির ভিতর আছে? ব্রহ্মচর্যের আচার বহুকাল থেকে বিদ্যালয়ে বা শিক্ষার স্থানগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে উঠে গেছে। ছেলে মেয়েদের ভিতর এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই নেই। তবে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরা তাদের শিষ্য পরম্পরায় ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জোর দিয়ে এসেছেন, তাই আমাদের চিন্তাধারার ভিতর থেকে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা একেবারে লুপ্ত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ব্রহ্মচর্যের পরিপূর্ণ বিগ্রহ। স্বপনেও তাঁর কামচিন্তা কোনও দিন মনে উদিত হয়নি।

স্বীয় ধর্মপত্নীকে মন্দিরের আনন্দময়ী মা এবং নহবতের গর্ভ-ধারিণীর সার সঙ্গে সম পর্যায়ের বলে শ্রীশ্রী মায়ের কাছেই বলেছিলেন। এটা তাঁর কাছে কথার কথা ছিল না তিনি এ কথা প্রাণে বিশ্বাস করতেন। শুধু বিশ্বাস করতেন বললেই যথেষ্ট হয় না। জীবনে কোন অসতর্ক মুহূর্তেও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বিচ্যুত হননি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জন্ম থেকেই জানতেন যে তিনি জন্মেছেন মানুষকে ভগবান-মুখী করবার জন্য। 'ভগবান সত্য আর সব মিথ্যা।' এই ছিল তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর জন্মের উদ্দেশ্য কি? জীবোদ্ধারের চিন্তা তাঁকে দিন রাত অত্যন্ত ব্যাকুল করেছিল।

শ্রীশ্রীমাও জানতেন যে রামকৃষ্ণ ভগবানেরই অবতার এবং তিনি জন্মেছেন স্বামীকে এই মহৎ কার্যে সাহায্য করবার জন্য। অর্থাৎ তিনিও নিজেকে জীবোদ্ধারের জন্যই জন্মেছেন এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকৃত সহধর্মিণীর ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে পরি-পূর্ণভাবে সাহায্য করেছেন। জীবোদ্ধার কথার অর্থ হলো জীবকে ভগবদমুখী করা। অর্থাৎ মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে এমনভাবে চলতে শিখতে হবে যে, তার প্রতিটি কাজেই তাকে তার ভগবান লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

যোগশাস্ত্রে দেখা যায় যে, 'যম আর নিয়ম হচ্ছে ভগবানের পথে চলবার প্রথম শিক্ষা। এই যম আর নিয়ম পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের উপরই দণ্ডায়মান। অর্থাৎ সেখানে ব্রহ্মচর্য লাভের চেষ্টা নেই সেখানে উচ্চস্তরের জীবন লাভ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

মানুষকে এই ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত করা একমাত্র জগৎ কারণকে মাতৃভাবে ভাবনা দ্বারাই সম্ভব। ভগবানের পথে এগিয়ে যাবার প্রথম পদক্ষেপ। 'আমি ষোলটাং করেছি তোরা একটাং কর। তার মানে হচ্ছে তোরা জগৎকারণকে মাতৃভাবে জারিত হয়ে—'মা মা' বলে ডেকে জীবন সুরু কর। তা হলেই দেখবি জীবনে ভগবানের পথের অন্তরায়গুলো অতি শীঘই দূর হয়ে যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কারণেই মানুষকে মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কালীরূপে, মাতৃরূপে ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত সন্তানেরা সারা বিশ্ব জুড়ে মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ। কাজেই সমাজে এই ভাবেই ব্রহ্মচর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের ইচ্ছা মনে শেকড় বেঁধে উঠলেই সত্যনিষ্ঠা এবং অন্যান্য গুণগুলো মানুষের চরিত্রে অবলীলাক্রমে ফুটে উঠবে আর ঋষিদের অনুশাসনে আবার জগতে শান্তি ও সন্তোষ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। বন্ধু আমার মতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনে পৈত্রিক ইষ্ট রামচন্দ্র ছেড়ে মা কালীকে গ্রহণ করবার হেতু এই।

বন্ধু উতলা হয়ো না। ভয় পেয়ো না। ঠাকুর মা কালীকে গ্রহণ করলেন রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করলেন তাই যদি বুঝে থাক তাহলে অত্যন্ত ভুল বুঝেছ। শোন, অনেক কথা আছে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। ঠাকুর কোন দেব-দেবীকেই গ্রহণ এবং কোন দেব-দেবীকেই বর্জন করেন নি। সত্যকথা বলতে গেলে তিনি সবই গ্রহণ করেছেন বর্জন কাউকে করেন নি। যদিও মুখ্যত জগতের কাছে মনে হয় যেন তিনি মাতৃভাবেই উপাসক বিশেষত মা কালীর। তিনি কেন মুখ্যত মা কালীর উপাসক তাও এতক্ষণ বলা হলো। তিনি এসেছিলেন ধর্মকে এই যুগের উপযোগী ভাষায় জগতের কাছে নতুন করে প্রকাশ করতে এবং এত দুঃখ কষ্ট এবং গ্লানির মধ্যে মানুষকে ভগবন্মুখী করবার জন্য। ব্রহ্মচর্যহীন জগতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা হতে পারে না এটা তাঁর কাছে গোড়াতেই ধরা পড়েছিল তাই তিনি বিশুদ্ধ মাতৃভাবের আদর্শ এই বিশ্বে ছড়িয়ে দিলেন। সমস্ত জগৎ জুড়ে তাঁর পবিত্র কণ্ঠে মাতৃনাম উচ্চারিত হওয়ার জন্য ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ যে আদ্যাশক্তি, তিনি দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য মন্দিরে তাঁর পুণ্য প্রকাশ নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ধরা দিলেন এবং অশান্ত বালকরূপী এই ভগবানকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি আর বালক এক। দুইয়ে কোন প্রভেদ নাই। 'অনেক শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত চতুর্দিক হতে তোর কাছে আসবে তুই তাঁদের মাধ্যমে বিশ্বের জনগণের জন্য এই নব-জাগরণের বাণী প্রচার কর।' শ্রীশ্রীঠাকুরের শুদ্ধ মাতৃমন্ত্রে এবং মাতৃভাব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতে সমগ্রভাবে মাতৃভাবের মাতৃরূপের কম্পন এবং স্পন্দন আরম্ভ হলো। এই স্পন্দন একেবারে পশুভাবাপন্ন মনুষ্য ছাড়া বিশ্বের সর্বত্র মাতৃভাবের স্পন্দন দ্বারা মানুষের চিত্তে আঘাত করবে এবং মাতৃভাবে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে। আর তার যেদিন হবে সেদিন জগতে অসংযম এবং ব্যভিচার আর মাথা তুলতে পারবে না। সমষ্টি জীবনের তখন ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা হবে। তখন মানুষ ভগবন্মুখী হবেই, তা ছাড়া বিশ্বে ভগবানের ভাবের উপর দিয়ে প্রচারের ঢেউ বইয়ে যাবে এবং সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মের স্বরূপ বিশ্বে রূপ গ্রহণ করবে। ঋষির বাণীর সার্থকতা হবে। বুঝতে পারছ বন্ধু,

কতবড় উদ্যোগ, এই বিরাট যোগ-প্রবণতার, সুদূরপ্রসারী চিকিৎসার আয়োজন।

তাই ত' বলছিলাম ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যে মাতৃনামের উচ্চারণের ধ্বনি তুলেছেন সেই ধ্বনি ছন্দে ও তালে বিশ্বের সর্বত্র ধ্বনিত হবে। মানুষ ঘরে স্ত্রীর ভিতরে মাকে খুঁজবে। সন্তানের ভিতরে মাকে খুঁজবে ঘাটে মা, পথে মা, বাজারে মা, স্কুলে মা, কলেজে মা, মনে মা, চিন্তায় মা, বুদ্ধিতে মা, জন্মে মা, মৃত্যুতে মা, সুখে মা, দুঃখে মা, নিদ্রায় মা, জাগরণে মা—শুধুই মা—মা আর মা।

ধন্য প্রভু আর ধন্য তাঁর মা! আবার ধন্য মানুষ জাতি যে এই যুগে তারা জন্মগ্রহণ যারা প্রভুর আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছে।

বন্ধু বললেন—বাঃ বাঃ বেশ লাগছে ত' শুনতে। কথা আবার শুরু হলো। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। চৈতন্য মহাপ্রভুর কোন ভক্ত বোধহয় একথা বলেছিলেন। অর্থাৎ জীবকে শিক্ষা দিতে হলে শুধু উপদেশে তা দেওয়া যায় না। তোমার উপদেশ কেউ শুনবেই না। মানুষ উপদেশ নেবার আগে দেখতে চায় যিনি উপদেশ দিচ্ছেন তাঁর জীবন কি প্রকারের—যে সব কথা তিনি বলছেন তাঁর নিজের চরিত্রে তা কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন 'চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।'

তাই উপদেশ দেওয়ার আগে নিজের উপদেশগুলো আচরণ করে দেখাতে হবে। একজন মহাপুরুষ ধর্মোপদেশের ক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছেন, প্রথম চাই 'বিচার', তারপর 'আচার' এবং সর্বশেষে 'প্রচার'। যিনি বিচার এবং আচার নিজে না করে প্রচার করবেন তাঁর সেই প্রচার বাক্যে শ্রোতার কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলেও মরমে পৌঁছবে না।

বিচার করে তত্ত্বটি উপলব্ধি করে আচার দ্বারা যখন বিচারের বিষয়বস্তুটি বিচারকর্তার রক্তে এবং মাংসে এবং দেহ মনের অণুপরমাণুতে প্রবেশ করবে এবং এই প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করবেন তখনই বিষয়বস্তুটি সত্যিকার প্রচারযোগ্য হবে। আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি হলে প্রচারটি যে সব সময়ে বাচনিকভাবে হবে তার কোন প্রয়োজন নেই। তখন তাঁর দেহের প্রতি রক্তবিন্দু হতে তত্ত্ব ধ্বনিত হবে এবং সেই তত্ত্বের বার্তা মানুষের মরমে পৌঁছে যাবে। মানুষের হৃদয়ের কেন্দ্রদেশে সেই বার্তা তার সাক্ষ্যদান করবে।

আমরা শুনেছি সুদূর আমেরিকায় স্বামীজী যখন বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাড়াতেন তখন নাকি তাঁর চোখ-মুখের দৃষ্টি বদলে যেত। তিনি যেন তাঁর সত্তায় বিরাট শক্তির অনুভব করতেন এবং তাঁর বাণী শ্রবণ করে শ্রোতৃমণ্ডলীর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হতো এবং বক্তৃতার মর্মকথা তাঁদের সত্তাকে শুধু পুলকিত করতো না আলোকিতও করতো।

জয় প্রভু! ধন্য তোমার মহিমা! শ্রীগদাধর, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আদ্যাশক্তি বা পরাশক্তি পুণ্যধামে দক্ষিণেশ্বরে একস্বরূপে প্রকাশিত হলেন। এই দক্ষিণেশ্বরই ভবিষ্যতে মানব জাতির মহাতীর্থ ভূমি, মহামিলন ভূমি। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃনাম বিশ্ব-কুণ্ডলীতে স্পন্দন সৃজন করেছে। আজ এই "মা" কথাটি অনাহত ধ্বনির সঙ্গে মিলে এক হয়ে গেছে। এই "মা" সুদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের প্রতিটি চৈতন্য-ময় সত্তার কেন্দ্রমূলে ধ্বনিত হবে. তারপর জগতে যে নবজাতির সৃষ্টি হবে তা বন্ধু, তোমার বুঝতে কি দেরী হচ্ছে? ধন্য বাঙলা দেশ! ধন্য গঙ্গাতীর! ধন্য পুণ্যধাম দক্ষিণেশ্বর! আর সর্বোপরি ধন্যা রাণী রাসমণি!!!—এক বিচিত্র দৈবখেলা—ভাবতে গেলে বিস্ময়ে আর পুলকে অভিভূত হতে হয়। বন্ধু ভুলে যেও না, নতুন যুগের সৃষ্টি-কর্তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ধনী কামারণী আর রাণী রাসমণি। দুটি রমণী রত্নই জাতিতে অব্রাহ্মণ কিন্তু গুণে, কর্মে ব্রাহ্মণোত্তমা, দৈবীসম্পদে ভূষিতা। বন্ধু, বুঝে নাও সমাজ সংস্কারের কি অপূর্ব ধারা! সংস্কারের রূপটা নিয়ে অনুধ্যান কর ডালে পাতায় সংস্কার নয় একেবারে মূলে সংস্কার, কেন্দ্রে সংস্কার।

বন্ধু বললেন, তুমি কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর কথার অবতারণা করলে। চমৎকার কথা! কিন্তু মূল প্রশ্নটা কি ছিল সেটা ভুলো না। সেটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সুরু হলো মাতৃভাবে রামকে নিয়ে নয় কৃষ্ণকে নিয়ে নয় শিবকে নিয়ে নয়। কিন্তু এরাও পরে স্তরে স্তরে সাধ্যবস্তু হয়ে ফুটে উঠে-ছিলেন এটা কিন্তু তমি বুঝিয়ে বলবে।

ঠাকুরের জীবনের মূল সূত্রটি গদাধর কি করে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী পরাশক্তির সঙ্গে এক হলেন তার উপর ইঙ্গিতে আলোকপাত হলো আর এই পরাশক্তি যে রামকৃষ্ণকে একধাপ নীচে নেমে 'ভাবমুখে' থাকতে বলেছিলেন তাও আমরা জানি। ভাবমুখে থাকার অর্থ হলো শুদ্ধভক্ত নিয়ে থাকা এবং জগতে মায়ের বাণী প্রচার করা। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু ঘোরতর তপস্যার শাস্তি করে তখন থেকে ভক্তের সঙ্গে লীলারহস্য করতে লাগলেন।

(ক্রমশ।

খাড়া ঃ বড়ি ঃ থোড়

বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

যেহেতুঃ
ওরা—
স্বামী ও স্ত্রী;

নিরূপমা ভাজে
খাড়ের ছেঁচকি।
দীপঙ্কর পান গালে

বাসস্টপের কাঁটা।
ধন্য রমণিক।
ধন্য কর্মিক॥

সংস্কৃতি ও সাহিত্য

সমর ভিয়েৎনাম

নির্মলা সেন
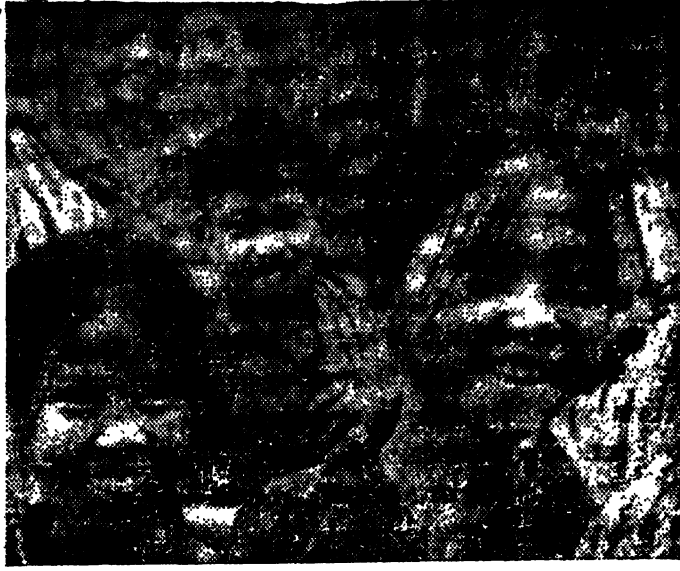
এখন নাম হয়েছে ভিয়েৎনাম। তাও আবার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ১৭ অক্ষরেখা বরাবর দ্বিধাবিভক্ত —উত্তর ভিয়েৎমিন ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রে। নইলে একই দেশ। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও এক। আগে নাম ছিল ইন্দো-চীন।

খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের দিকে সাগর—মেখলা এই ভিয়েৎনামকেই ভারত একদা 'মকর-চূড় মুকুটখানি' তার কবরী ঘিরে পরিয়ে দিয়েছিল। মাধবী নিশিথিনী হয়ে উঠেছিল তখন মধুর; হয়েছিল বুঝি বিধুর। মহাকাশের কোলে হেসে উঠেছিল তখন পূর্ণ চাঁদ। সাগরজলে দোল খেয়েছিল শিব-শিবানীর আলোছায়া। তারপর সহসা বায় বইল প্রতিকূল। প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে। চম্পা (এখানকার নাম [illegible]) আর কম্বোজ [illegible] ঔপনিবেশিক ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি ফুরাল। হিন্দু আর বৌদ্ধধর্ম আর সংস্কৃতির রত্নভরা তরী ডুবল বুঝি লবণ-জলে।

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। উত্তর দিক থেকে আগত চীনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর পর্তুগীজ, স্প্যানিস, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী। বণিকের দল একে একে হানা দিয়েছে এই দেশে। শোষণ ও লুণ্ঠনের মধ্যেও ভিয়েৎনামের ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বনিয়াদ হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধতর। পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতকের দিকে চীনা লে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় ভিয়েৎনামের জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। চুনম নামে ভিয়েৎনামী ভাষার লিখন-পদ্ধতির যে প্রচলন হয় তার বর্ণমালা ছিল চীনা। চীনা বর্ণমালার পরিচয় জ্ঞান না থাকলে [illegible] পাঠে তার সম্ভব ছিল না। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible]-শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনসাধারণের নাগালের বাইরে। [illegible] মুখে মুখেই [illegible] [illegible] সেকালের ভিয়েৎনাম লোকসাহিত্য। কিংবদন্তী, লোকগাথা, সামন্তযুগীয় বীরগাথা [illegible] [illegible] সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। দরবারী নয়। কাজেই সূ রসবোধ ও উৎকর্ষের সীমা অতিক্রান্ত ঠিক বলা চলে না। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সুখ-দুঃখের প্রতিফলন খোঁজা তাতে বিড়ম্বনা। তবু মহিলা-কবি ডোযান থি ভিয়েম (সৈনিক-পত্নীর বিলাপ) হো জুয়ান হুয়াং অথবা সুবিখ্যাত কবি গুয়েন-দুর ক্ষুদ্র লোক-কবিতা কাদাও সেকালের ভিয়েৎনাম সাহিত্যের অনেকখানি স্থান ছিল জুড়ে। বিদ্রূপাত্মক হাল্কা রসের তাঁদের 'কানাও'গুলি পঠিত হতো সমাদরের সঙ্গে। মাত্র চার পংক্তি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই পংক্তির ভাবসমৃদ্ধ রসঘন এই কাব্যকণিগুলি ভিয়েৎনামী সাহিত্যের অনবদ্য সম্পদ। জাতীয় সত্তার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। শুধু সেকালের সাহিত্য নয়, আধুনিক ভিয়েৎনামী কাব্যেও স্থান তার সু-উচ্চে।

আগেই বলা হয়েছে, দীর্ঘকাল ধরে ভিয়েৎনামের ভাষা সরকারী চীনা ভাষার দ্বারা ছিল আচ্ছন্ন। চীনা ভাষার মারফতই সেকালের ভিয়েৎনামে (ইন্দো-চীনে) প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মমত, শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার আলো ছড়িয়ে

পড়ে। ভিয়েৎনামে চীনের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব এমনি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, চৈনিক শাসকদের বিদায় নেবার বহু বৎসর পরও ভিয়েৎনামের পণ্ডিতরা চীনা ভাষাকে পবিত্র দেবভাষা হিসেবে গণ্য করতেন। পূজা-অর্চনা, বিবাহাদি প্রত্যেকটি শুভ অনুষ্ঠান চীনা ভাষা দিয়েই প্রথম স্বরু হতো। আধুনিক ভিয়েৎনামের বর্ণমালা 'কুই নগুর', কোনো কোনোটির মূল উৎস হলো চীনা লিপিমালা। নগুয়েন দিয়ুর সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'কিম্ ভন কিয়েন' প্রভৃতি সেকালের বহু ভিয়েৎনাম ক্লাসিকাল সাহিত্য এ বর্ণমালায় লেখা। ১৯২৫ সালেই প্রথম ভিয়েৎনাম ভাষা ও সাহিত্য মুক্তির স্বাদ পায়। ভাষা ছিল এতদিন টোল-পণ্ডিত আর বিদ্বান ব্যক্তিদের ছাঁদনাতলায় বন্দী। এবার ছাড়া পেল বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে। লিখন-প্রণালী ও বিষয়বস্তুরও হলো অনেক পরিবর্তন। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপিত হবার পর নতুন ভাবধারার বান ডাকল ভিয়েৎনাম সাহিত্যে। ছক্‌কাটা মামুলী সাহিত্য সৃষ্টির বাঁধ গেল বুঝি ভেসে।

কাব্য-সাহিত্য

এখানে লক্ষ্য করবার এই যে, প্রাচীন প্রথামত যাঁরা কবিতা লিখতেন তাঁরা হলেন সব বৃদ্ধের দলের। চীনা শিক্ষা-দীক্ষার জারক-রসে তাঁরা হয়েছিলেন জারিত। তুং লাম, হুয়ুন থাক্ খাং প্রমুখ এ প্রাচীনপন্থী কবির দল নতুন কবিতার বিরুদ্ধে বিযোদ্গার শুরু করলেন এই বলে যে, নতুন কবিতা কেবল কতকগুলি ঠুনকো কথার সমষ্টি---না আছে তাতে ছন্দ, না আছে ভাবের গাম্ভীর্য বা বিষয় বস্তুর সুসামঞ্জস্য। আজকালকার কবিরা মিল রেখে কবিতা লিখতে পারে না বলে বিস্তর বিলাপ করতে লাগলেন প্রাচীনপন্থী কবির দল। তবু কিন্তু কবি দিলু, হান মাক-তু, লুউ এংলু প্রমুখ বহু কবি আধুনিক ভিয়েৎনাম কাব্য-সাহিত্যের জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

১৯৪৫-এর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আগে থেকে কিছু কিছু সাম্যবাদী কবিতাও গোপনে প্রচার হতে থাকে ভিয়েৎনামে। বিপ্লবী কবি তো-হুউ হলেন এই শ্রেণীর কবিতার পথিকৃৎ। বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর জন্য যৌবনে তাঁকে দীর্ঘকাল কারা-অন্তরালে যাপন করতে হয়েছিল। অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর কবিতা লিরিকধর্মী না হলেও শোষিত আর বঞ্চিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাষা পেয়েছে তাতে। তাঁর কবিতার সুরটিও রীতিমত জঙ্গী।

প্রাচীন ভিয়েৎনাম কাব্যের অনুরূপ কিছু রচিত না হলে আধুনিক ভিয়েৎনাম সাহিত্যে ভালো কবিতা যে একেবারে লেখা হচ্ছে না, একথা বলা চলে না আজ।

বিপ্লবী হাতিয়ার

১৯৪৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের পর সত্যিকারের ভিয়েৎনামী সাহিত্যের সূচনা বলা যা[illegible]। যেসব কবি ও

উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো চি মিন

লেখক সাহিত্যের ললিত-নিকুঞ্জবনে লোকরঞ্জন রচনার স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করছিলেন, তাঁরা এবার ধরলেন জাতীয়তার বিপ্লবী হাতিয়ার। জনসাহিত্য রচনায় করলেন আত্মনিয়োগ। নগো-ভাৎ-তো, তো হোয়াই, নাম কাও নাওয়েন হং, নগুয়েন তুয়ান, নয়ং কোয়াক-চান প্রমুখ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও লেখক হো চি-মিনের নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধ সংগ্রামকে নিজেদের লেখনীর জ্বালাময় রচনা দ্বারা জোরদার করে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন। এ সব সংগ্রামী কবি ও লেখকের মসি রূপ নিল অসিতে। শুধু কাদাও নয়, সার্থক কথা-সাহিত্যের অনুশীলনও হতে থাকে ভিয়েৎনামের কুশলী শিল্পীদের হাতে।

ভিয়েৎনামের সংগ্রামী কবিদের মধ্যে তো হুউ অধিকার করে আছেন এক বিশিষ্ট স্থান। ১৭ বছর বয়েস থেকে তিনি বিপ্লবী কবিতা রচনা করে আসছেন। ফরাসী সরকারের শত নির্যাতন ও নিপীড়ন তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। ১৯৪৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের সময় হুউ অঞ্চলের বিদ্রোহীদের তিনি করেন পরিচালনা। বর্তমানে তিনি স্বাধীন ভিয়েৎনাম সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের উপমন্ত্রী। ভিয়েৎবাক তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা সঙ্কলন। ভিয়েৎনামী কৃষক, সাধারণ মানুষ ও মেহনতী জনতার তিনি হলেন প্রিয় কবি। তাঁর কা-দাও-এর একটি কলি---

'জনগণ হলো সমুদ্র,
শিল্পকলা হলো জাহাজ।'

তো হুউব মতো আর একজন শক্তিশালী কবি তু-মো। কা-দাও রচনায় তিনিও সিদ্ধহস্ত। চিরাচরিত প্রথায় লিখিত হলেও তাঁর কাব্যে সমকালীন বিষয়বস্তুকে ভিয়েৎনামের পুরাতন কাব্যের ধাঁচে ঢালবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা যেমন তীব্র কশাঘাত-মুখর ও ব্যঙ্গাত্মক তেমনি রসাত্মক ও জনপ্রিয়। ভিয়েৎনামী সাহিত্যের প্রাচীন ঐশ্বর্যকে তুলে ধরেছেন তিনি অপূর্ব মহিমায় তাঁর বিবিধ রচনায়। প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক ড্-নগক-পাগ এ সম্পর্কে লিখেছেন :

'আমাদের পুরানো কবিতার সুমিষ্ট জলের কলকল প্রবাহধারা এখনও শুকিয়ে যায়নি। কেন না, ভিয়েনামীরা পুরাতনী ধারায় চির অভ্যস্ত।

সোভিয়েট লিটারেচার, ১৯৫৭।

তু মোর লেখাই বুঝি তার প্রমাণ। কবিতা ছাড়া তিনি কিছু উপকথা ও কুয়ান হো বা প্রশ্নোত্তরে ছড়া-গানও

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে উত্তর ভিয়েতনামের প্রধান প্রতিনিধি জুয়ান থুই (মধ্যে) ও সহকারী প্রধান কর্নেল হা বান লাউ

রচনা করেছেন। প্রাক্-বিপ্লব দিনের তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদীদের ভিত দিয়েছিল নড়িয়ে। বুর্জোয়া সংস্কারবাদের প্রতিবাদী নামে তাঁর এক ব্যঙ্গ কবিতা তিন খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর প্রতিরোধ যুদ্ধের হাসি এখন শ্রেষ্ঠ হাসির কবিতা-পুস্তক স্বাধীন ভিয়েৎনামে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

তো হোয়াই আর গুয়েন গক্-এর রচনায় ভিয়েৎনামী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাবনধারা ও সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি বিশেষ করে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। ভিয়েৎনামের পার্বত্য এলাকায় লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতির অনুরণনও মেলে তাঁদের বিবিধ লেখায়। তো হোয়াই-এর প্রথম দিককার গল্প—'পরভূমি' এবং 'দরিদ্র পরিবারে' ভিয়েৎনামের দুঃস্থ, অসহায়, ধ্বংসোন্মুখ তন্তুবায় সম্প্রদায়ের নিরানন্দময় দৈনন্দিন জীবন যাপনের বাস্তব-চিত্রই ফুটে উঠেছে। বিদেশী যন্ত্রদানবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভিয়েৎনামী কুটির-শিল্পের ক্রম-বিলুপ্তির কথা তিনি দরদের সঙ্গে বলে গেছেন তাঁর 'দরিদ্র পরিবারে'। 'আর্ট ফর আর্ট সেকে'র তিনি নব পূজারী। পঞ্চাশের জাতীয় সংগ্রামেরও তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় যোদ্ধা। মসি ছেড়েই তিনি ধরেছেন অসি।

প্রেসিডেন্ট হো চি-মিনের গণফৌজে যোগদান করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ভবিষ্যৎ গল্প-উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেন ভিয়েৎনামের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য এলাকার সাধারণ লোকদের নিকট থেকে। তাঁর 'উত্তর পশ্চিমের কাহিনী' অথবা 'এ ফুস' সৃজনশীল রচনায় এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধান পাওয়া যায়। তো হোয়াই-এর সৃষ্ট 'মি', 'ইহ্ন' প্রভৃতি নারী-চরিত্র ভিয়েৎনামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর প্রতীক।

তাঁর প্রথম দিককার রচনায় রোমান্টিক ভাবালুতা ও নৈসর্গিক বর্ণনার বর্ণ-চ্ছটা পরিলক্ষিত হলেও, উত্তর জীবনে তিনি তাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন বলা যায় বহুল পরিমাণে। ১৯৫৪ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে কথাশিল্পী তো-হোয়াই স্বদেশের ভূমি-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সম্প্রতি রচিত 'পূর্ব থেকে স্বতন্ত্র' কাহিনীতে স্বাক্ষর রয়েছে নতুন এই ভূমিপ্রথা সংস্কারের।

জনপ্রিয় তরুণ কথাশিল্পী গুয়েন গক্-এর লেখার অসাধারণ সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভূমির উত্থান' তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। বইখানি ১৯৫৪-'৫৫ সালের সাহিত্য পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। সমাদর ও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে পাঠক সাধারণ ও সুধী সমাজের। বীরপুরুষ-বিশেষকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ছক কাটলেও তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নেহাৎ চরিত কথার মধ্যে পর্যবসিত করে রাখেন নি। বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ও দশের জীবন-আলেখ্য প্রকটিত করবার চেষ্টা করেছেন নিপুণ হস্তে। বহু কিংবদন্তী, পৌরাণিক কাহিনী, লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতির জারকরসেও রচনা তাঁর জারিত

শুধু গুয়েন গক্ নন, প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনামের বহু তরুণ কবি ও কথা-শিল্পীই আজ এ-কালের ভিয়েৎনামের সার্থক সাহিত্য সাধনায় ব্রতী।

রাষ্ট্রপতি হো

আধুনিক ভিয়েৎনাম সাহিত্যাকাশে অন্যতম হলেন তার রাষ্ট্রপতি ডঃ হো চি-মিন। 'হো চাচা' নামে তিনি আবাল-বৃদ্ধ ভিয়েৎনামের জনসাধারণের নিকট পরিচিত। হো চি-মিন ভিয়েৎনাম গণরাষ্ট্রের (ভিয়েৎনাম ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক) শুধু রাষ্ট্রগুরু নন, ভিয়েৎ-মিন গণ-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎও। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পদানত ভিয়েৎনাম জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে, ফরাসী উপনিবেশিকতা ছিন্ন করে উন্নত মস্তকে মাথা তুলে দাঁড়াবার সংগ্রামে একদা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন অশীতিপর এই মহাবিপ্লবী। আর তাঁর এই স্বাধী-

মুক্ত সংগ্রামে সম্ভ বহু রচিতাদির ছিল জনগণের সহজবোধ্য বিপ্লবী সাহিত্য—এ-কালের ভিয়েৎমিন সাহিত্য।

সাহিত্যের জন্য সাহিত্য করতে তিনি আসেন নি। তাঁর সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল মনোরঞ্জন নয়,—গণচেতনা। সাম্রাজ্যবাদীর যাঁতাকলে পিষ্ট পরাধীন দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বহির্বিশ্বকে বিদিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি একদা লেখনী ধারণ করেছিলেন। দেশের মুক্তিসাধনায় হো-চি-মিন তখন ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাম্যবাদী নেতাদের যোগাযোগে ফরাসী উপনিবেশ ভিয়েৎনাম মেহনতি জনগণের মুক্তির উপায়-নির্ধারণে রত। ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বামপন্থী পত্রিকা 'পপুল্যায়র'-এর সম্পাদকের সঙ্গে প্যারিসে তাঁর তখন পরিচয় হয়। তিনি তখন হো-চি-মিনকে নিপীড়িত ও নির্যাতিত ভিয়েৎনাম জনগণের মর্মকথা তীব্র ভাষায় 'পপুল্যায়রে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করতে অনুরোধ করেন। হো তাতে রাজী হলেন। কিন্তু নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবার মতো ফরাসী ভাষা তখনও তাঁর তেমন রপ্ত হয়ে ওঠেনি। প্রতি পদে তিনি তাই বাধা পেতে লাগলেন। তাছাড়া সাংবাদিকতার সূক্ষ্ম কারিকুরিও তাঁর মোটেই জানা ছিল না। হো-চি-মিন কিন্তু তাতেও দমলেন না। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে মনোযোগে ব্রতী হলেন। কিন্তু দেশের শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের কথা বাহিরের সংগ্রামী জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবেই।

হো-চি-মিন তাই করতেন কি,—তাঁর বিভীষিকার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি তাঁর বক্তব্য এক ফরাসী আইনজীবীর নিকট ব্যক্ত করতেন। আর তা লিপিবদ্ধ হলে নিজে সংশোধন করে সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাঠাতেন। সাম্যবাদী সুবিখ্যাত পত্রিকা 'এল হিউম্যানিৎ'-এর পৃষ্ঠায় তিনি এবার ছোট গল্প লিখতে শুরু করলেন। ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষ চাষীমজুরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, তাদের প্রাচীন উপকথার ইতিবৃত্ত—তাঁর এইসব গল্প-কাহিনীর ছিল উপজীব্য বিষয়। প্রতিটি গল্পের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পারিশ্রমিকও কম পেতেন না, একশ' ফ্রাঁ নতো। তাঁর এই সব গল্প সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী শাসকদের নগ্নরূপ শুধু প্রকটিত করে নি, সাহিত্যরসও সঞ্জীবিত করেছে। বলিষ্ঠ লেখক হিসেবে তরুণ হো-চি-মিন্ অতি শীঘ্র স্বীকৃতি লাভ করলেন। গদ্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লিখেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। 'বাঁশের ড্রাগন্' তাঁর এক রূপক গীতিনাট্য। সূক্ষ্ম এই প্রহসনের মারফত তিনি ভিয়েৎনামে (তখনকার ইন্দো-চীনে) ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্নরূপ রূপায়িত করেন লোকচক্ষুর এই নাটিকায়। এই বইখানি কিন্তু ফরাসী সরকারের কোপানলে পতিত হলো। দক্ষ সমালোচক আর ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রগতিশীল ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হলেও সরকারবাহাদুর তাকে বাজেয়াপ্ত করে দেয়।

প্যারিসে অবস্থানকালে হো-চি-মিন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক নেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'লীগ অব কলোনিয়াল কান্ট্রিস'-এর মুখপাত্র 'পারিয়া'-এর পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার এই তরুণ বিপ্লবীর উপরই ন্যস্ত হয়। ফরাসী উপনিবেশে এই পত্রিকার প্রচার যদিও নিষিদ্ধ ছিল, হো-চি-মিন্ কিন্তু জাহাজের শ্রমিকদের সহযোগিতায় স্বদেশের এই পত্রিকা পাচার করতেন ফরাসী পুলিশের সতর্ক চোখের উপর। সাংবাদিকতা, কথাসাহিত্য কিংবা কবিতা রচনা—সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবী হো চি মিন তরুণ বয়সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন সহজ সাবলীল বাচনভঙ্গি ও রচনারীতির জন্য।

তিনি বলতেন:

'প্রবন্ধ লেখ আর যাই-ই লেখ, লেখক মাত্রকেই মনেপ্রাণে একনিষ্ঠ হতে হবে। নিজের লেখার যদি উৎকর্ষ

প্যারিসে শান্তি বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি কিস গর্ডন, জে· জে· এ্যান্ড্রু গুডপেস্টার, হ্যারিম্যান, সাইরাস ভ্যান্স, ফিলিপ হবিব ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ

সাধন করতে চাও তবে সমালোচনা আর আত্ম-সমালোচনা করতে ভুল করো না।'

প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বাক্যও তিনি বৃথা প্রয়োগ করতেন না। তাঁর কবিতা তাই গম্ভনাময় চিত্রানুরূপ শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ।

নিউজিল্যাণ্ডের কবি রেউই এ্যাল-কৃত ইংরেজী অনুবাদ হো চি-মিনের দু-একটি কবিতার বাংলা করা গেল:

●

রূপালী রাত লুটিয়ে পড়েছে
ঘরের মেঝেতে
জানালার ফাঁকে ফাঁকে
সাধ যায় কবিতা লিখিতে;
কবিতা লিখিব হায়, সেই সময় বা কই
সৈনিকের কাছে?
কান পেতে শোন ওই
ঢঙ্ ঢঙ্ করে বাজছে ঘণ্টা
পর্বতের মন্দিরে মন্দিরে
আমাদের বিজয়বার্তা আনছে বহিয়া।
শারদ রাতে স্বপ্ন দেখার এই কী সময়?

●

পাঠে যখন আমি মগ্ন ছিলাম,
পাখীটি উড়ে এসে বসল কার্নিসে
ফুলের ছায়াটি পড়েছে এসে দেয়ালে
আর ওই দেখ ক্লান্ত ঘোড়াটি বার বার
ছুটে এসে জানাতে লাগল আমাদের
বিজয়বার্তা।

তোমার কথা স্মরণ করেই লিখলাম এই পংক্তি কয়টি।

●

লড়াইয়ের পর এসেছে নেমে
বিশ্রামের অবসর;
শরতের মৃদু হাওয়া
ঝির ঝিরে বৃষ্টি
আর কন্‌কনে শীত
বাতাসে বাতাসে আসছে ভেসে
জয়োল্লাস গীত।
গেরিলা সৈনিক দল ফিরেছে বুঝি
বিজয়গর্বে
পানীয় এবার যোগাতে হবে, সে কী হর্ষ!

কবিতা রচনা বা সাহিত্য-চর্চা ছিল রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনের সংগ্রামের হাতিয়ার, আগেই তা বলা হয়েছে। উপরের কবিতাটিতেও তাই প্রতিফলিত হয়েছে। স্বদেশের প্রতি ধূলিকণা ছিল এই মহাবিপ্লবীর প্রিয়বস্তু। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয় আর গেরিলা বাহিনীর বিজয়োল্লাসে তিনি তাই অভিভূত। সোনার এই মুহূর্তগুলি তাই বুঝি তিনি ধরে রেখেছেন কবিতার স্বর্ণাক্ষরে। স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মতো দেশের অগণিত ছেলেমেয়েদের তিনিও একান্ত ভালোবাসতেন। উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের এক শিশু সমাবেশে স্বরচিত এই বাণীটি তিনি লিখে পাঠান:

শারদোৎসবের মাঝা-মাঝি কাল:
পূর্ণ চাঁদ
মৃদু হাওয়া,
নিস্তরঙ্গ হ্রদ,
আর শরৎকালের নীল আকাশ
বয়ে এনেছে তোমাদের জন্য আনন্দ
আর সন্তোষের বার্তা—
হাসি-উল্লাসে মুখরিত তোমরা আজ
'চাচা হো'ও আজ তোমাদের মতো
আনন্দমুখর।
বলতে পার কেন?
আমি যে তোমাদের ভালোবাসি তাই;
তারপর কেন জান,
আমরা স্বাধীন হলাম এ বছরে
ক্ষুদে কৃতদাস নও আর তোমরা সব—
স্বাধীন দেশের নওজোয়ান;
স্বাধীন দেশের স্বাধীন প্রভু।

মৃত্যুর তিনদিন বাকি

বিশ্বজিৎ প্রতিহার

এখনো হয় নি করা দুটো টেলিফোন,
এখনো হল না জানা মানসীর মন,
এখনো পড়েনি ধরা অন্তরঙ্গ ফাঁকি
মৃত্যুর নাকি আর তিনদিন বাকি!

পৃথিবীর দিনগুলো কাটছিলো ভালো,
প্রতি রাতে জ্বলেছিলো নিয়নের আলো,
স্মৃতি এনে দিয়েছিলো সুরা আর সাকী
মৃত্যুর মোটমাট তিনদিন বাকি!

খাঁচাতে পাখীটি পুষে খাইয়েছি দানা,
পাখীর পাখিনী খুঁজে হল না যে আনা,
সঙ্গিনী আসবে ঘরে আশা নিয়ে থাকি,
হঠাৎ জেনেছি মৃত্যুর তিনদিন বাকি!

কানঢাকা চুল বেঁধে রূপতমা সাজলে,
মোনালিসা-হাসি নিয়ে দূরে দূরে থাকলে,
মনোনীত আমিও হয়েছি, ওরা বলে গেল ডাকি,
তৈরি তো? মৃত্যুর তিনদিন বাকি।

[মহাভারতের সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা শুনিয়েছিলেন। দূরদর্শনের ক্ষমতা ছিল সঞ্জয়ের, অনেকটা যেন তা টেলিভিশান-দৃষ্টি। গীতায় 'সঞ্জয় উবাচ' কথাটি তাই যুদ্ধক্ষেত্র এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশদ ব্যাখ্যানের ইঙ্গিত বহন করে।

'সঞ্জয় উবাচ' উপন্যাসখানিও অনুরূপ আর এক সংগ্রামক্ষেত্রের কাহিনী,—সে সংগ্রাম জীবন-সংগ্রাম, বাংলা তথা ভারতের শিল্পোদ্যোগ এবং শিল্পপ্রসারের কঠিন সংগ্রাম এবং তার পটভূমির বর্ণনা আছে এতে। বর্তমানের সঞ্জয়ও দূরদর্শন করেছেন, তবে সে কোন সুদূর স্থানের বা দূর অতীতের কথাও নয়, বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ কালের কথা।

তখনও টাটানগর সৃষ্টি হয় নি, সিংভূমের নিভৃত জঙ্গলের মধ্যে জামসেদপুর নিদ্রিত। কলকাতার স্কাই লাইনে ওঠে নি কলকারখানার সারিবন্দী চিম্‌নির সঙ্গীন। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে বিলিতি কাপড়ের চালাও সরবরাহে বাংলা তথা সারা ভারত প্লাবিত। ঢেউ ওঠে নি স্বদেশীর, চরকা-খদ্দরের। মহাত্মা গান্ধীরও আবির্ভাব ঘটে নি ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে।

সেই সময়কার একজন আত্মপ্রচার-বিমুখ নিভৃত কর্মী বাঙ্গালী শিল্পপতির জীবনের পটভূমিতে বিধৃত এই বিচিত্র স্বাদের কাহিনীটিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, বটকৃষ্ণ পাল ও তদীয় পুত্র ভূতনাথ পাল, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন, 'বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির আনাগোনা। এই সব ঐতিহাসিক পুরুষের বহু অজ্ঞাত কাহিনীর তলায় তলায় বয়ে চলেছে ভারতের রসায়ন শিল্প (Chemical Industry) প্রতিষ্ঠার শুভ প্রচেষ্টার অলিখিত কথা। বাংলা ভাষায় এজাতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসও বোধহয় এই প্রথম।

লেখক বহু গ্রন্থ প্রণেতা একজন বয়স্ক সাহিত্যিক, সৌভাগ্যক্রমে যিনি নিজেও এই ঘটনাপ্রবাহের শেষাংশে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর এই স্মৃতিকথা 'সঞ্জয় উবাচ' তাই যেমন বিষয়-বৈচিত্র্যে কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অবজ্ঞাত দিকের উপর নতুন আলোকসম্পাতে ভাস্বর। বাঙ্গালীর মনে প্রেরণা যোগাবার মত বলিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ কাহিনী এটি।

উপন্যাসখানির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক্—এটি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীভূমিকাবর্জিত। কঠোর সংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে বুঝি গান্ধারী-কুন্তী-উত্তরাদের উপস্থিতি অচিন্তনীয়। তাই উপন্যাসখানির নাম 'সঞ্জয় উবাচ' সব দিক দিয়েই সার্থক হয়েছে মনে করি।

—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী]
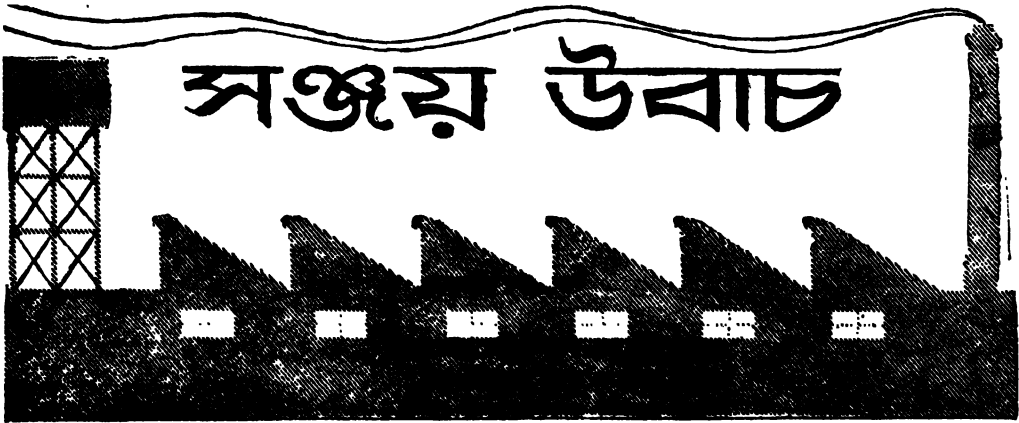
'মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলি।'

চট্‌পট্‌-চট্‌পট্‌ হাততালির মধ্যে তলিয়ে গেল বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠ। এই কোম্পানীর আজ সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছেন বৃদ্ধ সঞ্জয় চ্যাটার্জি, এই কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মচারী। তাঁকে দিয়েই একটি বিশিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠান হয়ে গেল এইমাত্র—দর্শকদের সেই হাততালি থামে নি এখনও।

আজ কোম্পানীর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বোসের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল কোম্পানীর প্রশস্ত হল ঘরে। প্রধান অতিথি মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন

করে মাল্যদান করে এলেন, তারই হাততালি পড়ছে। মর্মর বেদীটি ফুলে ফুলে সাজানো, ধূপ গুগ্‌গুল জ্বলছে, তারই মৃদু সৌরভে আমোদিত সভাকক্ষ। সভার দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিটি হর্ম্যে পুষ্পস্তবক। বিশিষ্ট অতিথিবর্গ এবং কোম্পানীর কর্মিবৃন্দের উপস্থিতিতে সভা গম্‌গম্‌ করছে। লাইন করে ঝোলানো টিউব লাইটগুলিও ঈষৎ দুলছে। সমস্ত সভাকক্ষ উৎসবমুখর।

বৃহৎ অফিস বাড়ির বাইরে প্রধান প্রবেশ দরোজায় সুসজ্জিত তোরণ উঠেছে, সেখানেও ফুলের মালা। রাতের বেলা আলোক-সমারোহের প্রচুর আয়োজন করা হয়েছে। রাস্তায় সারিবন্দী গাড়ি দাঁড়িয়ে। ধোপদুরস্ত পোষাক পরে কোম্পানীর পিতলের

তকমা বুকে ঝুলিয়ে দরোয়ান বেয়ারারা ছুটাছুটি করছে, কয়েকজন প্রবীণ দরোয়ান সেজেগুজে গেট পাহারা দিচ্ছে।

গেটের কাছেও একটা লাউড স্পীকার মুখ বাড়িয়ে আছে। পথ-চারীরাও ভিতরের উদ্বোধনী গান শুনে দাঁড়িয়ে গেছে। বেশ ভিড় জমেছে। কলকাতায় কোন কিছু উপলক্ষে সাজসজ্জা দেখলেই এক শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে যায়—ভিতরে কি হচ্ছে কিছুটা না শুনে নড়তে চায় না। এই সব রবাহূতের দলকে ঠেকাতেই দরোয়ানরা মোতায়েন আছে।

লম্বা একটা লিমোসাইন গাড়ি এসে থামতেই একজন দরোয়ান ছুটে গিয়ে গাড়ির দরোজা খুলে ধরলে। গাড়ির আরোহী খদ্দরপরিহিত একজন নামকরা সাংবাদিক, বিশিষ্ট একটি দৈনিকের সম্পাদক। বলাই বাহুল্য, তিনি বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথি। তাঁকে হলে ঘরে নিয়ে গেলেন কোম্পানীর সেক্রেটারী। হলের দোরের কাছে একটি ষোড়শী তাঁকে একটি বেলফুলের মালা পরিয়ে দিলে। আর একটি মেয়ে তাঁর হাতে একখানি স্মারক গ্রন্থ দিলে। তিনি হাসিমুখে প্রথম পংক্তির একটি শূন্য আসনে বসলেন এবং অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলেন— তাঁর কাগজের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার সবাই উপস্থিত আছেন কি না।

ডানদিকে প্রেস রিপোর্টারদের নির্দিষ্ট আসন ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গেছে। ক্লিক ক্লিক শব্দে চার-পাঁচটি ক্যামেরায় ছবি উঠছে।

সভাপতি এবার ইঙ্গিত করলেন প্রধান অতিথিকে। হাততালি থেমেছে, আপনি সুরু করুন।

সঞ্চয় বলতে লাগলেন—মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলি এবং আমার স্নেহভাজন কর্মিবৃন্দ। আজ এই কোম্পানীর পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্তিতে যে সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে তাতে আমার মত একজন বৃদ্ধকে এই সম্মানের আসনে বসাবার একমাত্র কারণ, আমিও এক সময়ে এই কোম্পানীর একজন কর্মী ছিলাম। যে মহাপুরুষের মর্মরমূর্তি আজ প্রতিষ্ঠিত হল, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁকে দীর্ঘকাল থেকে জানবার, দীর্ঘকাল হতে তাঁর সঙ্গে কাজ করবার। একদিন এই কারখানার গোড়াপত্তনে যারা ছিলান, তাঁদের মধ্যে বোধহয় আমি একাই শুধু পারের ঘাটে পড়ে আছি, আর সবাই ওপারে চলে গেছেন। এবং আমি এখনও বেঁচে আছি বলেই আজ সুযোগ পেলাম এই পুণ্যদিনে সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁকে মাল্যদান করতে। উদ্যোক্তাদের এ জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এখানে অনেক বিশিষ্ট নেতা, দেশসেবক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পপতি এবং চিকিৎসক উপস্থিত আছেন, যাঁরা ডাঃ বোসকে নানা ভূমিকায় দেখেছেন, তাঁরা তাঁদের ভাষণে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করবেন। আমি শুধু সেই দূরদর্শী শিল্প-প্রবর্তক, ভারতে রসায়ন শিল্পের জনকের প্রতি আমার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এইটুকু বলে প্রধান অতিথি আসন গ্রহণ করতে যাবেন এমন সময় কর্মীদের মধ্যে একজন একটি কাগজের টুকরো সভাপতির হাতে এগিয়ে দিলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

মাননীয় প্রধান অতিথি মহাশয়ের কাছে আমাদের একটু নিবেদন আছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রবীণতম কর্মী। তিনি ডাঃ বোসকে যত নিকট থেকে দেখেছেন, শিল্প-প্রবর্তক হিসাবে তাঁকে তিনি যেভাবে চিনেছেন, বস্তুত ডাঃ বোসের সমগ্র জীবন কথা তিনি যত অন্তরঙ্গভাবে জানেন, তেমন আর কেউ জানেন কি না সন্দেহ।

এ জন্য আমাদের অনুরোধ, এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর অনুরোধ, তিনি যদি তাঁর সেই পুরাতন স্মৃতিকথা আজ আমাদের কিছু শোনান, আমরা বিশেষ বাধিত হব। এই প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তীর পক্ষে প্রতিষ্ঠাতার মর্মর মূর্তি স্থাপনের মত তাঁর সংগ্রামসংকুল জীবনকথা আলোচনাও আমাদের অবশ্যকর্তব্য মনে করি।

সঞ্চয় বললেন—বেশ, তাই হবে।

॥ দুই ॥

সঞ্চয় বলতে সুরু করলেন—

তাঁর কথা বলতে গেলে অনেক কথাই ভিড় করে মনে আসে। অনেক ছোটবেলা হতেই তাঁকে দেখেছি, তাঁর জীবনের অনেক কাহিনী তাঁর নিজের মুখেই বহুবার বহু উপলক্ষে শুনেছি। সব কথা মনে নেই, সব কথা গুছিয়ে বলবার সামর্থ্যও এখন আর আমার নেই। সারা জীবন ধরে মুখে মুখেই আমার সহকর্মীদের কাছে বলেছি তাঁর কথা। আজ জীবন-সায়াহ্নে যেটুকু মনে পড়ে তাও যদি বলে না যাই হয়ত, আমার মৃত্যুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গটুকু লুপ্ত হয়ে যাবে। আজ যখন আমার প্রীতি-ভাজন সহকর্মীরা তাঁর কথা শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যেটুকু পারি বলব। যদি অনবধানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তার জন্য আগেই মার্জনা চেয়ে রাখি।

ডাঃ বোসের জীবনকথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা দেশ তথা ভারত-বর্ষের শিল্প-প্রতিষ্ঠার ইতিকথা। যখনকার কথা বলছি তখন সারা ভারতেই কলকারখানার অভাব। তখনও টাটানগরের জন্ম হয় নি, গড়ে ওঠে নি ভারতের ইস্পাত-শিল্প। তখন কলকাতা সহরও এত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে নি। গঙ্গার ধারে ধারে কিছু পাটকল ব্যতীত অন্য কলকারখানার চিহ্ন ছিল না। কলকাতার স্কাই লাইনে কারখানার চিম্নি চোখে পড়ত না। ট্রেন স্টীমার চলত বটে, রাস্তায় তখনও ঘোড়ায় টানা ট্রাম, ল্যাম্প পোস্টের মাথায় কেরোসিনের বাতি। হ্যারিসন রোড—এখন যার নাম হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড—ওটিই তখন সব সেরা রাজপথ, শিয়ালদা আর হাওড়া স্টেশন দুটিকে যেন একটি লম্বা বাঁকের দুই প্রান্তে ঝুলিয়ে সারাদিন ছুটতে থাকত।

হ্যারিসন রোডেই সর্বপ্রথম গ্যাসের আলো জ্বলল। আমরা ছোকরারা দল বেঁধে দেখতে এসেছিলাম—দিনের মত ফুটফুটে আলো সারিবন্দী লোহার থামের মাথায় জ্বলছে। হ্যারিসন রোডের সে চেহারা কোথায় তলিয়ে গেল।

এর ছিল চিৎপুর এবং কলুটোলা। কাছে মুর্গিহাটা, বড়বাজার। ওদিকে অভিজাত বসতি পাড়া—বাগবাজার। তখনও ভবানীপুরের লোকেরা শেয়ালদায় এলে কলকাতায় যাচ্ছে বলত। বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ অঞ্চল তখনও নিশুতি পাড়া গাঁ।

কলকাতায় দূর দূর অঞ্চল হতে তখনও লোকে কাজকারবার চাকরি-বাকরির জন্য রোজ আসত। কিন্তু তার জন্য যাতায়াতের মোটর-বাস ছিল না। এঁড়েদা, বরানগর, দক্ষিণেশ্বর হতে লোকে নৌকা করে গঙ্গা ধরে স্ট্র্যাণ্ড রোডে এসে নামত। আমরা যারা হরিনাভি, কোদালিয়া, চিংড়িপোতা, সোনারপুর প্রভৃতি অঞ্চল হতে আসতাম, আমাদের জন্যও কোন ডেইলি প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল না। সোজা পায়ে হেঁটে আসতে হত, ফিরতেও হত সেইভাবে।

আমাদের ঐ অঞ্চলেই সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক মশাই-এর বাড়ি ছিল। হরিনাভিতে এখনও তাঁর নামে ইস্কুল, লাইব্রেরী এইসব আছে। কোদালিয়ায় ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতৃপুরুষের বাস। আর পাশের গ্রাম চিংড়িপোতায় জন্মেছিলেন—আমাদের আলোচ্য ডা: কার্তিকচন্দ্র বসু।

চিংড়িপোতা গ্রামে বাস করতেন প্রসন্নকুমার বসু। তিনি রোজ কলকাতায় এসে একটি বিলাতি সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন। প্রসন্নকুমারের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলে প্রবোধ, মেজো কার্তিক, ছোট চারু। ঝামাপুকুর লেনে তাঁর দাদা থাকতেন। ছেলেদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে চিংড়িপোতার বাস তুলে নিয়ে তিনি বড় ভাইয়ের কাছে ঝামাপুকুরে চলে এলেন। তাঁর দাদা অচিরে কাশীবাসী হলে প্রসন্নকুমার সপরিবারে ঝামাপুকুর লেনেই বাস করতে লাগলেন।

প্রসন্নকুমারের এক আত্মীয়ের শিয়ালদার মোড়ে একখানি দোকান ছিল। ছোট ছেলে কার্তিককে মাঝে মাঝে দেখা যেত সেই দোকানে বসে কেনা-বেচা করতে।

সেই দোকানখানি ছোট ছিল, কিন্তু তাতে ছোট্ট দোকানটির শিক্ষানবিশীর আগ্রহ কম ছিল না। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে হাটে-বাজারে ঘুরে দেখত, কোথায় কোন জিনিসটি কি দামে পাওয়া যায়। পোস্তার আলু সস্তা। উল্টাডাঙ্গার গুদামে তেল নুন চিনির দাম বড়বাজারের তুলনায় কম কি বেশী। সব কিছু থাকত তার নখ-দর্পণে। ফলে পারিবারিক কেনাকাটার ভারও তার উপর এসে পড়েছিল। বলতে গেলে এইভাবেই নেহাৎ ছেলেমানুষ থাকাকালীন কার্তিকের মনটা ঝুঁকেছিল কারবারের দিকে।

ঝামাপুকুর লেন যেখানে সুবলচন্দ্র লেনের দিকে মোড় ঘুরেছে ওখানে একখণ্ড জমিতে তাঁর জ্যেঠামশাই যে বাসা করেছিলেন, তার বাবা এখন সেখানেই তাঁর সংসার পেতেছিলেন।

গরিবের সংসার, কিন্তু অভাবের মধ্যে থেকেও স্বভাব বিগড়ে যায় নি কারো। প্রসন্নকুমারের লক্ষ্য ছিল ছেলেদের লেখাপড়ার দিকে। বড় ছেলে প্রবোধ লেখাপড়ায় খুবই ভালো। সারাদিন পড়াশুনায় মশগুল থাকে। বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হয়। ছোট ছেলে চারু—চিররুগ্ন। ঘন ঘন ম্যালেরিয়ায় ভোগে, ইস্কুল কামাই হয়। কিন্তু ভারী ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির ছেলে চারু। লেখাপড়ায় তারও খুবই আগ্রহ। ভাবনা ঐ মেজো ছেলে কার্তিককে নিয়ে। স্বভাবে চঞ্চল, ব্যবহারে দুরন্ত। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা, দৌড়ঝাপ, মারপিট—সে আছে সর্বঘটে। কার্তিককে সামলানোই কঠিন।

প্রসন্নকুমার তাকে সঙ্গে করে গাঁয়ের বাড়িতে যান, তরিতরকারি নিয়ে আসেন। পিসেমশাই-এর সঙ্গে বাজারে যায় সে দোকানের মাল কিনতে। সংসারের বাজার করতেও ছুটবে কার্তিক তা আর আশ্চর্য কি?

একবার গরমকাল, কলেরা মহামারী রূপে দেখা দেওয়ার সময় আসন্ন। কার্তিকের মা সহসা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাসের শেষ, প্রসন্নকুমারের হাতে টাকা ছিল না। একটা দিন কেটে গেল—ডাক্তার ডাকা সম্ভব হল না। টোটকা ওষুধ যে যা বলল, দেওয়া হল, কিন্তু কোন কাজ হল না। কার্তিক দিনরাত মায়ের সুশ্রূষা করলে, কিন্তু তার উদয়াস্ত পরিশ্রমই সার হল।

প্রসন্নকুমার পরদিন অফিস হতে কয়েকটি টাকা ধার করে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন সব শেষ। তাঁর পত্নীর মৃতদেহ উঠানে নাবিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বসে কাঁদছে।

হাত থেকে ঝনঝন্ করে টাকাকটি ছুঁড়ে ফেলে প্রসন্নকুমার পত্নীর মৃতদেহের কাছে লুটিয়ে পড়লেন।

বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেলেন দেখে কার্তিকের চোখের জল শুকিয়ে গেল। উঠানের কোণ থেকে টাকাকটি কুড়িয়ে নিয়ে সে মায়ের সৎকারের আয়োজন করতে গেল। কিশোর ছেলে কার্তিক—তখনই কর্তব্যে দৃঢ়, শোকে অচঞ্চল।

কিন্তু তখনই বালক-মনে একটা দুর্জয় প্রতিজ্ঞা জাগল তার। যদি সে বড় হয়ে ডাক্তার হতে পারে, তবে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেবে না কোনো গরিবের গৃহিণীকে, মাতৃহারা হতে দেবে না কোনো অসহায় ছেলে-মেয়েকে।

এই প্রতিজ্ঞা আশি বছরের বৃদ্ধ হয়েও ডাক্তার বোস ভুলতে পারেন নি; ছুটে গিয়েছেন দীনদরিদ্রদের কুঁড়ে ঘরে, হিন্দু-মুসলমান খৃস্টান জাতিধর্ম-নির্বিচারে সব গরিবের আর অসহায়ের তিনি ছিলেন মা-বাবা। তাই যেদিন তাঁর মৃত্যু হল, তাঁর প্রাসাদোপম গৃহের প্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছিল সেই সব দীন-দরিদ্র বস্তিবাসীদের ভিড়ে, শোকে মুহ্যমান অবনত মস্তক শিশু বৃদ্ধ পুরুষ নারীদের ভিড়ে। কেউ তাদের ডাকে নি,

দিয়েছিল তা কেউ জানে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও মনে পড়ে।

তখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলছে। রোজকার মত সেদিনও ডাঃ বোস চলেছেন তাঁর ঘোড়ার গাড়ি চেপে, মেছুয়াবাজারের মধ্য দিয়ে। সহসা গাড়ির পা-দানিতে ছোরা হাতে লাফিয়ে উঠল এক গুণ্ডা, আরোহীকে হত্যা করবে। পিছন হতে তার হাত চেপে ধরল আর একজন—বললে, কাকে খুন করতে চাস, এযে ডাগদর সাব, যিনি তোর আম্মাজানের জান বাঁচিয়েছিলেন।

কাহিনীটা।

এক গরিব বস্তিবাসীর ঘরে একটি প্রসূতি প্রসব-বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে শুনে ডাক্তার বোস তার স্বামীর অনুরোধে তাকে দেখতে গেলেন এবং তখন আর তাকে হাসপাতালে পাঠাবার সময় নেই, বুঝে নিজের হাতে তাকে প্রসব করালেন। তারপর হাত ধুয়ে বাইরে এসে দেখেন একটা ন্যাংটা ছেলে সঙ্গে করে তার বাপ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।—হাতে টাকা-পয়সা নেই বাবু, আপনাকে কিছু দিতে পারলাম না এখন—বললে সে সকাতরে।

ডাক্তার বোস তাড়া দিয়ে বললেন—বরকে খোকা গরম দুধ দিও।

দুধ? তাই বা কিনবে কি দিয়ে?

পকেট থেকে দুটি টাকা বের করে লোকটির হাতে দিয়ে তিনি বলেছিলেন দুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে।

সেই উপকার ভুলতে পারে নি বুড়ো বাপ, তাই ছেলে ডাক্তার বোসের বুকে ছোরা বসাতে গেলে বাপ তার হাত চেপে ধরেছে, বেইমানি করতে দেয় নি। মনুষ্যত্ব আছে সবার মধ্যেই, শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তা ঢাকা পড়ে যায় মাঝে মাঝে।
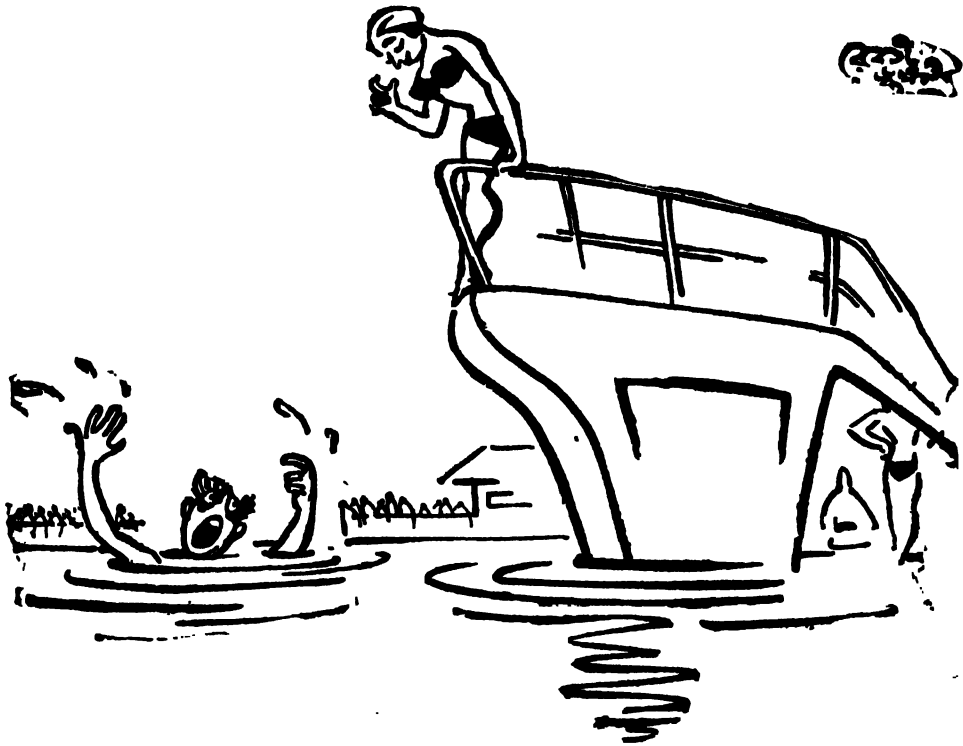
[ক্রমশ।

—"প্লীজ, প্লীজ মিস্ চাকলাদার, সাঁতার ভুলে গেছি আমাকে বাঁচান।"

ফুলদানি

—মৃণাল রায়

বড্ড গরম !

—সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক

বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ / '৭৫

অজন্তা ভাস্কর্য
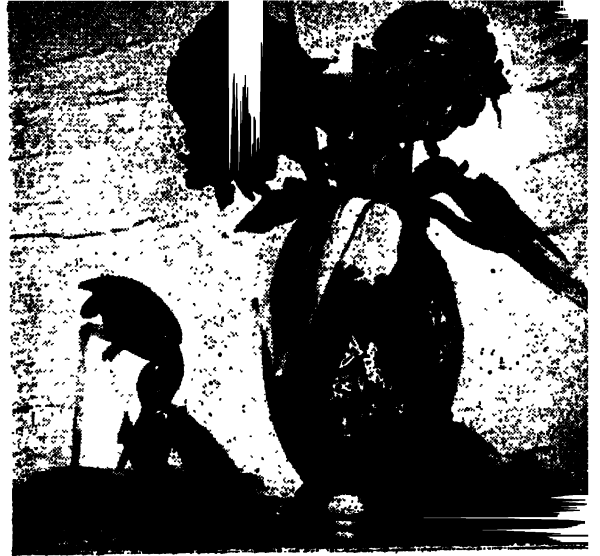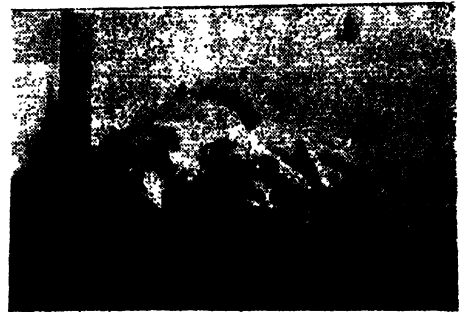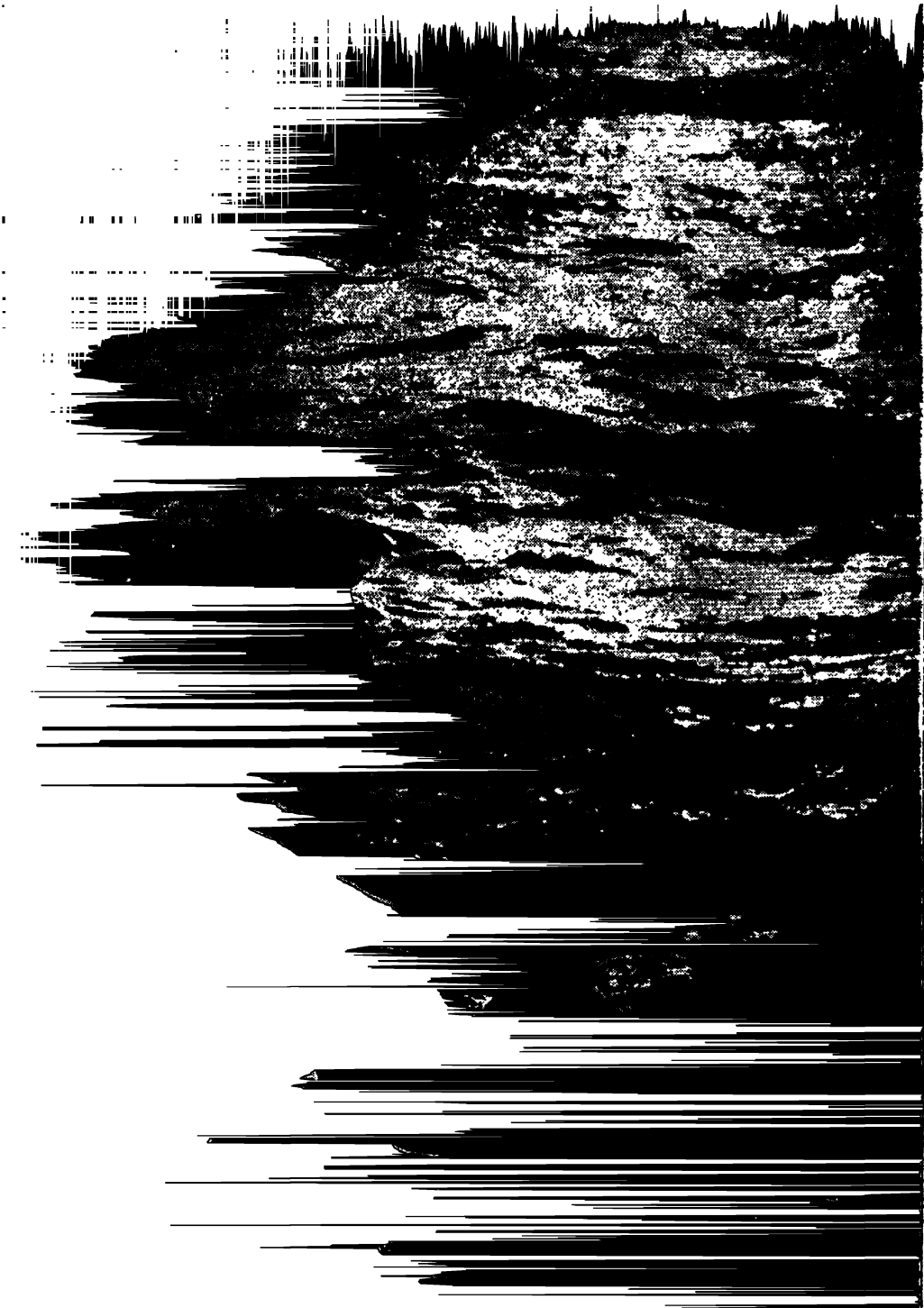
—দীপক চক্রবর্তী

অসীমের সন্ধানে
—দেবদত্ত

মাসিক

বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ / '৭৫

মাসিক

বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ / '৭৫

অসীমের বন্ধনে
—সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

আসা যাওয়ার পথের ধারে—
শ্রীমতী ন[illegible] ঘোষ
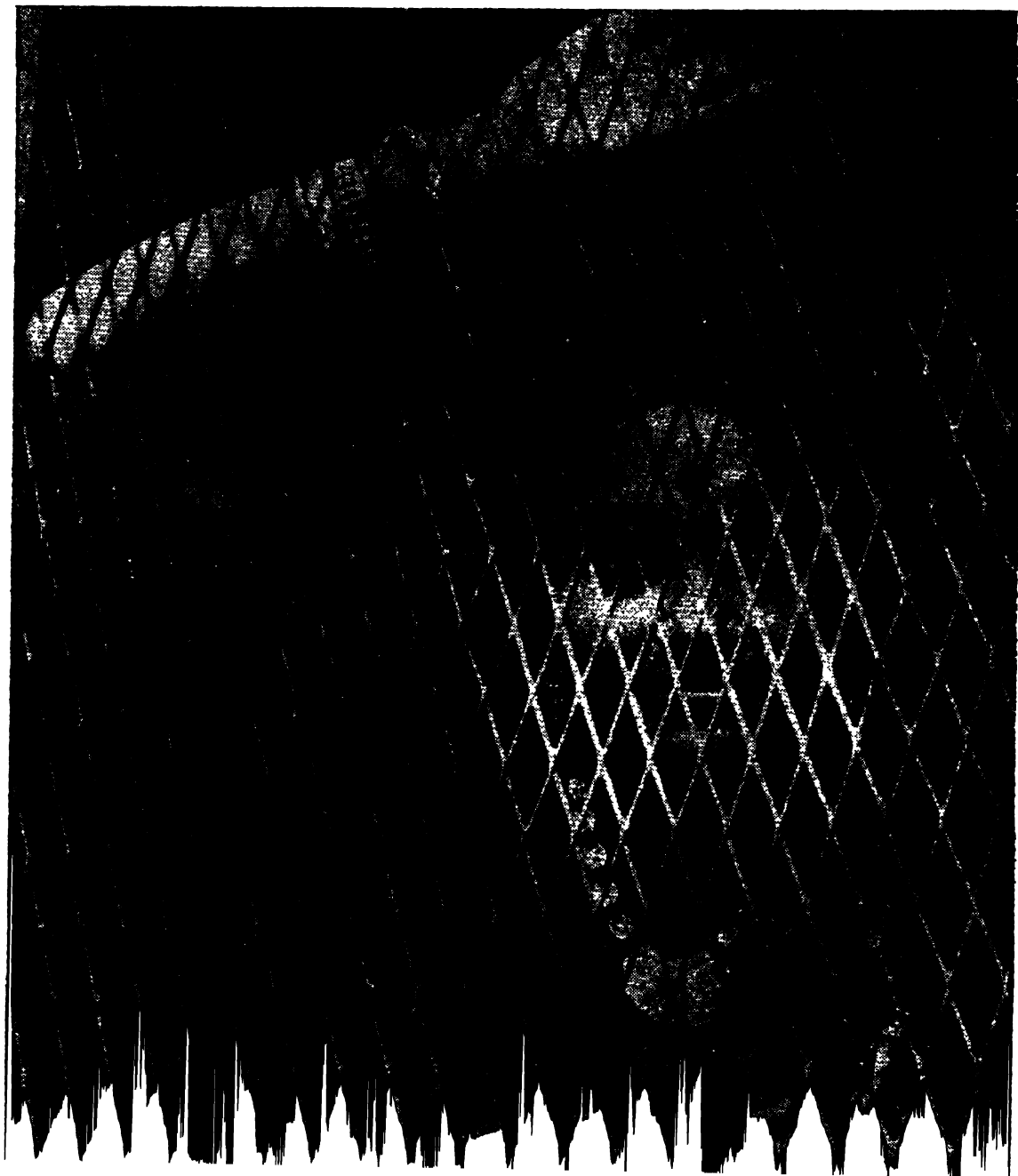
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আষাঢ়	শ্রাবণ
বিষয়	বিষয়
তৃষ্ণা	পাঠশালা

প্রথম পুরস্কার ২০৲ ২য়—১৫৲ ৩য়—১০৲

গরীব পাপর
—আশ[illegible]কুমার দত্ত

পূর্ব সীমান্তের পুণ্যতীর্থ পরশুরাম কুণ্ড

মনে বহুদিনের তীব্র বাসনা ছিল পরশুরামকুণ্ডে যাব। ইতিপূর্বে আরও দু'বার চেষ্টা করেও সফলকাম হইনি। কারণ প্রতি-রক্ষার প্রয়োজনে এই সীমান্ত অঞ্চলটি সৈনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে; কেবল উত্তরায়ণ সং-ক্রান্তিতে ১০টি দিনের জন্য ঐ বিধি নিয়ম লঘু করে দেওয়া হয়, যাত্রিসাধারণের সুবিধার জন্য। তাই এবার আমরা এক মাস আগে থেকেই তিনসুকিয়া এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলাম।

স্থানীয় ভক্তদের প্রচেষ্টায় আমাদের সফরকে কেন্দ্র করে তেজুর জনগণের মধ্যেও সাড়া পড়ে গিয়েছিল। খবর এল সেখানে সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। ১৩ই জানুয়ারী ভোরবেলা আমাদের মোটর-কার বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলেছে ব্রহ্মপুত্রের তীরে সেখোয়া ঘাটের দিকে। তিনসুকিয়া থেকে আসফালটের প্রশস্ত সুদীর্ঘ ৪০ মাইল পথ। পথের দুই পাশে সমান করে ছেঁটে দেওয়া চা বাগানগুলি মেসিনে কাটা ঘাসের অন্তরণের মত দেখাচ্ছিল। সূর্য তখন সবেমাত্র পূর্বাকাশ লাল করে উঁকি দিচ্ছিল। তীর্থযাত্রীদের জীপ, বাস-কার বা ট্রাকগুলি কে কার আগে গিয়ে সেখোয়ার ফেরিঘাটে লাইনে দাঁড়াবে সেই আশায় একটু সুবিধা পেলেই আগের গাড়ীর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে ছুটছিল। আমাদের গাড়ি গিয়ে ফেরিঘাটের লাইনে দাঁড়াল সকাল ৭টায়। মোটরে চালিত ২টি করে নৌকার উপর পাটাতন দিয়ে তৈরি ফেরীগুলি একসাথেই একটি বাস ও ৬টি গাড়ি অনায়াসে পার করতে পারে তবু আমাদের নম্বর এল বেলা প্রায় দুটোয়। ব্রহ্মপুত্রের চর ঘুরে ঘুরে উত্তর পাড়ে গিয়ে পৌঁছতে সময় লাগলো প্রায় দেড় ঘণ্টা। নেমেই গাড়ি আবার ছুটলো, কিন্তু দিবাং নদী পথরোধ করেছিল মাইল দুই পরেই। আবার লাইন, আবার ফেরি পার করে সদিয়া যখন পৌঁছেছিলুম সূর্য তখন পাটে বসেছিল। ১৯৫০ সনের প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে তলিয়ে যাওয়া বিশাল বনভূমির গগনচুম্বি বৃক্ষসমূহের শুষ্ক অগ্রভাগটুকু শুধু দেখা যাচ্ছিল সেই ধ্বংসলীলার সাক্ষীরূপে।

নেফায় প্রবেশের অনুমতিপত্র ও মেডিকেল সার্টিফিকেট আমরা আগে থেকেই পেয়েছিলাম সুতরাং সদিয়ার গেইটে হাজার হাজার লোকের আর ভিড় ঠেলতে হল না। পরশুরাম কুণ্ডু তীর্থ বিকাশ সমিতির স্বয়ং সেবকগণের তৎপরতায় দশ-পনের মিনিটের মধ্যে কাজ হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় ২।৪ জন প্রমুখ নাগরিক এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানালেন যেন ফিরার পথে সেখানে অন্তত দু'দিন থেকে গিয়ে গীতা প্রচার করা হয়।

সদিয়া থেকে তেজুর পথের অধিকাংশ রাস্তাই আধা কাঁচা আধা পাকা কিন্তু সৈনিক চলাচলের জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। তেজুর কাছাকাছি বিমান ঘাঁটির কাছে রাস্তা দুইভাগে বিভক্ত। আমরা ভুল করে ডানদিকের তেজুর পথ ছেড়ে দিয়ে সোজাই চলে গেলাম লোহিতের পথে প্রায় ৮।১০ মাইল। হঠাৎ সন্দেহ হওয়ায় এক মিলিটারী ক্যাম্পের প্রহরারত সৈনিককে জিজ্ঞাসা করায় সে পথ বলে দিল মমতাভরা সহানুভূতির সংগে।

স্বামী বিষ্ণুপুরী পরমহংস

আমরা তেজুর পৌঁছলাম রাত সাতটায়। আমাদের জন্য আহার বাসস্থানের সুব্যবস্থা ছিল এক নবনির্মিত কাঠের বাড়িতে। যাত্রী-সমাগমে সারা তেজু সরগরম। মহল্লের মধ্যে মাইক খাটিয়ে ভজনে কীর্তনে পরিবেশ সৌম্য ও রমণীয় হয়ে উঠলো। পরশুরাম কুণ্ডু তীর্থের মাহাত্ম্য এবং এই অঞ্চলে ধর্ম-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে ভাষণ হয়েছিল তাহার প্রভাব সরকারী উচ্চাধিকারী-দের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছিল।

তেজুর লোহিত ডিভিশনের মধ্য কেন্দ্র। ছোটখাট শহরটি হিমালয়ের কোলে প্রাকৃতিক শোভায় ছবির মত সুন্দর স্বচ্ছ ও সুবিন্যস্ত। শহরে রাজস্থানী এবং বাঙ্গালীদেরই সংখ্যা অধিক। তাছাড়া নেপালী তিব্বতী এবং ভারতের সকল প্রান্তেরই কিছু কিছু লোক রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ মিসমি জাতীয়। তাদেরকে নাগাদেরই পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। শিক্ষা-দীক্ষার আলো ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পৌঁছতে আরম্ভ করলেও তা মোটেই আশানুরূপ নয়। তাদের দুঃখ দৈন্য ও অশিক্ষা দেখে ভারতীয় ধর্মগুরুদের আত্ম-বিস্মৃতিতে মনকে ব্যথিত করে তুলেছিল। বেদের সুপ্রাচীন প্রতিজ্ঞা কৃণ্বন্তু বিশ্বমার্যম্ আজ আমরা ভুলে গেছি। এক অবাস্তব আত্মম্ভরিতা ও আড়ম্বরের মনোভাব নিয়ে যাঁরা অবতারত্বের দাবি করেন তাঁদের পদধূলি এসব অঞ্চলে কেন পড়ে না তাহার জবাব পাই না। ঋষি অগস্ত্য ইন্দোনেশিয়া শ্যাম কম্বোডিয়া ভিয়েৎনাম আদি দেশকে এক কালে আর্যধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন; আর তাঁদেরই বংশ পরিচয়ে গৌরবান্বিত আমাদের পবিত্র ভূমিতে বিদেশী মিশনারিদের অনুপ্রবেশ। জানা গেল শুধু এই অঞ্চল-টুকুই এখনও খৃস্টান মিশনারিদের কবল থেকে বেঁচে আছে পরশুরাম কুণ্ডের প্রতি তাদের শ্রদ্ধালু মনোভাবের দৌলতে। ঐ মিশনারিদের প্রচার আজ যে ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, নয় তাহা স্বয়ং ভারত সরকারও অবিদিত নন। তারা নাগাভূমির অধিবাসীদের মত সকল আদিবাসীদেরকেই শিখিয়ে চলেছে যে তারা ভারতীয় নয়। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সংগে তাদের কোন সংযোগ বা সম্পর্কও নেই অথচ ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্রের পাতায় পাতায় নাগকন্যা উলুপির সংগে অর্জুনের বিবাহের প্রসংগ এবং মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত রয়েছে এই সংবাদটুকু আধুনিক নাগ-বংশোদ্ভূতদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মত সুযোগটুকু বিগত পাঁচিশ বছর থেকে ভারত-বাসী পায় নি। বিধি নিষেধের অভেদ্য গণ্ডী ছিল ঐ অঞ্চলে প্রবেশের জন্য কিন্তু কি আশ্চর্য তাহা শুধু হিন্দুধর্ম প্রচারকদের জন্যই ছিল সীমাবদ্ধ।

ভোর হতে না হতেই আমরা ছুটে গেলুম এক অত্যদ্ভুত শিববাণ দর্শনের জন্য। তেজুর থেকে মাইল ৩০ দূরে কামেশ্বরী মাতার মন্দিরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খননকালে উপলব্ধ এই বিশাল শিববাণটি অক্ষত অবস্থায় তুলে নিয়ে আসা হয়েছে তেজুতে। বাণটির উচ্চতা প্রায় ৬' ফুটের কাছাকাছি। জলাধারী কিন্তু দুটি দেখলুম। যেটিতে বাণ বসান রয়েছে সেটি চতুষ্কোণ। পাশেই আরেকটি জলাধারী পড়ে আছে সেটি ষটকোণ, তাতে কোন বাণ প্রতিষ্ঠিত নেই। তাতেই মনে হল খুঁজলে হয়ত আরেকটি বাণ উপলব্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। এই বাণের আয়ুষ্কাল কারো কারো মতে ৪।৫ হাজার বৎসরের কম নয়। কোন প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে হয়ত এই কামেশ্বরী ভূগর্ভে তলিয়ে দিয়ে থাকবে। দেখে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি আর ভেবেছি

পাদ্রীদের প্রচার সবটাই যা অর্থহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সনাতন ধর্মের অমর-প্রসারী বিজয় বৈজয়ন্তীর কথা তারা যে একেবারে অবিদিত তা নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাবে। সুদূর আফগানিস্তান পামিরের তীরে বাকুতে বড়ী মাইয়ের মন্দির আজও অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান। কোথায় সেই সমুদ্র মেখলা মেরু, সেখানে প্রাচীন আর্য সভ্যতার অবশেষের হিন্দু সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন। সুমাত্রা যাভা, বালি ও শ্যাম, কম্বোডিয়ার কেবল যে প্রাচীন নিদর্শনই আছে তা নয়; হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব সেখানে নগণ্য হলেও উপেক্ষণীয় নয়, তাদের প্রাচীনদের কথা এই পাদ্রিগণের সুবিদিত। হিমালয়ের পাদমূলের দেশগুলি চিরকালই হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল এবং আজও আছে। আজকের কাবুলই মহাভারতের যুগের গান্ধার দেশ, আর সে দেশের রাজকন্যা গান্ধারী ছিলেন হস্তিনাপুরের কুলবধূ। কাশ্মীর, কুলু, হিমাচল প্রদেশ, গাড়োয়াল; কুমায়ূন, নেপাল, সিকিম, ভুটান যেখানে আজও হিন্দু সভ্যতার লীলাক্ষেত্র সেখানে নেফা ও নাগাভূমির জনগণের প্রতি পাদ্রিগণের দেশদ্রোহী উপদেশ যে অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তাহা বলাই বাহুল্য।

সেই বিশাল শিববাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে একটি মন্দির তৈরি হচ্ছে পরশুরাম কুণ্ড তীর্থ বিকাশ সমিতির প্রচেষ্টায়। আসামের মুখ্যমন্ত্রী চালিহা ২৫০০০ টাকা দান দিয়েছেন ঐ মন্দির নির্মাণ তহবিলে। সেই তুলনায় দেশের হিন্দু জনতার অবদান একেবারেই নগণ্য।

১৪ই সকাল ৮টায় আমরা তেজু ছেড়ে অগ্রসর হলাম। ১৫ মাইল দূরে আবার ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করতে হল মিসমি ঘাটে। এখানেও ফেরি রয়েছে; সরকারী বড়কর্তাদের নির্দেশে আমাদের গাড়িটি পার হওয়ার সুযোগ পেল, মেলায় গীতা প্রচার ক্যাম্প খোলা হবে বলে। ঘাট পার হয়েও ৬ মাইল যেতে হল। পথের দুইপাশে সুবিস্তীর্ণ ঘাসের বন। হয়ত কাহারো অসতর্কভাবে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত বিড়ি সিগারেটের আগুনে দাবানল জ্বলে উঠেছে আর তার ধোঁয়ায় চতুর্দিক তখন অন্ধকার। মেলাক্ষেত্রটি ঠিক পরশুরাম কুণ্ডের পাড়ে নয়; বনাকীর্ণ একটি সুউচ্চ পাহাড়ের পরপারে। পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ি করে দেওয়া হয়েছে, প্রায় ১॥ মাইল উপরে চড়ে প্রায় ততটাই নামতে হয়, নামার পথটি ভয়ানক খাড়া। যাত্রীরা যাতে ঐ সংকীর্ণ পথে ভিড় করে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয় সৈনিক পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের অক্লান্ত ও সতর্ক তৎপরতা চারিদিকে। হিমালয়ের পর্বত-সীমা অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র যেখানে এসে সমতলে নেমেছে তার পাশেই একটি শীর্ণ জলধারার পাশে ছিল এই পরশুরাম কুণ্ড। ১৯৫০ সালের ভূমিকম্পে তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বর্তমানে ঐ জলধারা যেখানে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে তার পাশেই নদীর জলে স্নান হয়। ঐ স্নানের পরেই আর একটি শবদাহ প্রস্রবণে আবার স্নান করার বিধি। আরেকটি মজার দৃশ্য এই যে, যে কাপড় পরে যাত্রীরা স্নান করছেন সেটি সেখানেই ফেলে আসছেন তাঁরা। স্থানীয় মিসমিরা অথবা দূরাগত ভিখারীরা সেসব তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতের সকল প্রদেশের লোকই দেখেছি এই তীর্থক্ষেত্রে মাদ্রাজী বা কাশ্মীরী কেউ বাদ পড়ে নি—তবে বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও নেপালের যাত্রীই বেশি। তার পরের স্থান তিব্বতি-দের। যদিও আসাম প্রদেশেই এই তীর্থের অবস্থান তবু দেখলাম অসমীয়া তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অতীব নগণ্য। যার কারণ নির্ধারণ সম্ভব হল না।

পরশুরাম কুণ্ড সম্পর্কে প্রাচীন ইতি-হাসে যা পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে এই—ঋষি জমদগ্নি ছিলেন পরশুরামের পিতা। তিনি একদিন স্বীয় পত্নী রেণুকার কোন অশোভন আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্র পরশু-রামকে মাতৃহত্যার আদেশ করেন। পরশু-রামের এক ধর্ম সংকট। একদিকে ধরিত্রীর চেয়েও যার গুরুত্ব সেই গর্ভধারিণী স্নেহ-ময়ী মা আর অপর দিকে পরম তপস্বী পিতা-পুত্রের কাছে—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম
পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ॥

পিতার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য নির্দ্বিধায় করে নিকৈল এবং পিতার প্রীতির জন্য বিনা দ্বিধায় মায়ের শিরশ্ছেদন করলেন তীক্ষ্ণ পরশুর আঘাতে। ঋষি জমদগ্নি পুত্রের আজ্ঞাবহতায় প্রসন্ন হয়ে যখন বর দিতে চাইলেন পরশুরাম পিতার চরণযুগল জড়িয়ে ধরে বর প্রার্থনা করলেন জননীর জীবন দান। অধিকন্তু তাঁর ঐ ক্রূর কর্মের কথা যেন মায়ের স্মৃতিপথে কোনদিনই না আসে। প্রসন্ন জমদগ্নি তথাস্তু বলে বর দিয়েছিলেন কিন্তু মাতৃহত্যাজনিত অদৃশ্য পাপের ফলে পরশুরামের হাতের পরশু হাতেই লেগে রইল অংগাঙ্গিভাবে। যখন কোন মতেই তা আর ছাড়ান গেল না পরশুরাম ঐ পাপ ক্ষালনের আশায় তীর্থ পর্যটনে প্রবৃত্ত হলেন।

জ্ঞাত-অজ্ঞাত বহু তীর্থে স্নান দান জপতপ করেও তাঁর হাতের পরশু আর ছুটল না। একবার এই প্রদেশে পরিভ্রমণ কালে তিনি তদানীন্তন এই অজ্ঞাত কুণ্ডে যখন স্নান করলেন আশ্চর্য চকিত হয়ে দেখলেন হাতের পরশু আর হাতে নেই। পাপ ক্ষালনে এই কুণ্ডের এই অভূতপূর্ব মাহাত্ম্য দেখে পরশুরাম লোক কল্যাণার্থ প্রচার করলেন এই ব্রহ্ম কুণ্ডের কথা; সেই থেকে আসাম প্রদেশকে পরশুরাম ক্ষেত্র বলা হয়।

সারাদিন মেলায় প্রচার চললো। গীতার সুসমাচার ঘোষিত হল দিগদিগন্তে। সন্ধ্যা হতেই না হতেই এক প্রচণ্ড তুফানী হাওয়া। এই তুফান নাকি আকস্মিক নয়, প্রত্যহ সন্ধ্যা ছয়টায় ঘড়ির কাঁটার সংগে তাল রেখে এই ঝড়ের তাণ্ডব আরম্ভ হয় আর পরদিন সকাল আটটা নাগাদ গিয়ে শান্ত হয়। তারই মধ্যে শত শত সাধু ধুনী জেলে বসেছিল মাঠের মাঝখানে। গৃহস্থ তীর্থযাত্রিগণের কেউ কেউ অপরিসর ধর্ম-শালায়, আবার কেউ বা মিসমিদের তৈরি ঘাসের কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রচণ্ড শীতের রাত্রে ঐ ঝড়ের এক অদ্ভুত অনুভূতি।

মনে পড়লো ১৯৫৮ সালের কৈলাস যাত্রা-কালে রাবণ সরোবরের সেই প্রচণ্ড তুফানী রাতটার কথা। ১৫ই জানুয়ারী উষাকালে আমরা সংক্রান্তির স্নান করলাম পরশুরাম কুণ্ডে। তার পরেই ফিরে আসার পালা, তেজুর নাগরিকবৃন্দ কিছুদিন অবস্থানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ জানাল, আবার নেফায় যাব প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপাতত ফিরে এলাম তিনসুকিয়ায়।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

আশীষ বসু

বাড়ীটায় ঢুকতে গিয়ে মণিময় থমকে দাঁড়ালো। রাত না হলেও সন্ধ্যে হতে দেরী নেই আর। শীতের বিকেলে বিকেলটাই যেন অতি ছোট। আসতে না আসতেই সরে যায়। সন্ধ্যার আঁধার দানা বাঁধে বড় তাড়াতাড়ি। রাত ঘন হয়ে আসে সত্বর। বাড়ীটার ছোট গেটটা পার হয়ে ভেতরের জমাট বাঁধা অন্ধকার মাখা নিশ্চুপ চেহারাটা কেমন অচেনা লাগল তার। মণিময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বৈঠকখানা সেকেণ্ড বাই লেনের গলির আর আর সব বাড়ীগুলো থেকে এ বাড়ীটার চেহারা যেন কেমন একটু আলাদা। অনেকগুলো বাড়ীর মধ্যে এর কেমন যেন একটু পরিপাটি চেহারা। যত্নের ছাপ সর্বত্র পরিস্ফুট। ইঁট বার করা, চুন-খসা, কার্নিস ফাটা, জানলা-দরজার রঙ চটা বাড়ীগুলোর সারিতে কেমন যেন বে-মানান। সার সার বাড়ীগুলোর ভীড়ে তাই শুভময়-বাবুর বাড়ীখানা সহজেই চোখে পড়বে। তার সামনে একটু গোল বারান্দা। বারান্দাটা ঘিরে নানা মরশুমী ফুলের কেয়ারী, পাতা বাহারের ঝাড়, দরজা-জানলার রঙ যেন সবে কাল-পরশুর করা, বাড়ীর বিস্কুট-রঙটা যেন আজই লাগানো হোল। বাইরের গেটটা সহজে খোলা যাবে না, অথচ জানা থাকলে কতো সহজেই না কল ঘুরিয়ে তা খোলা যাবে। এ বাড়ীর গেটটা খুলতে গেলে নড়বড় করবে না, কুৎসিত আওয়াজ হবে না একটুও, ঠেলতে হবে না জোর হাতে। জানলার শিকগুলো ক্ষয়ে যাওয়া কি রঙ-ওঠা নয়, সোজা সোজা করে সাজানো নয় এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে, গ্রীলগুলোর সঙ্গে মেলানো কোম্পানীতে প্যাটার্ণ পাঠিয়ে তৈরী করা সব কিছু। অর্থাৎ এক কথায় বাড়ীটাকে যেন বৈঠকখানা সেকেণ্ড বাই লেনে মানায় না, আশ-পাশের সঙ্গে যেন তার অমিলটা বড় বেশী প্রখর। এ বাড়ী যদি হোত দক্ষিণ কলকাতায়, আলীপুরে, ওল্ড বালীগঞ্জে কিংবা পার্ক সার্কাস এমন কি শ্যাম-বাজারের নতুন রাস্তার গায়ে তবু বা যদি মানাতো।
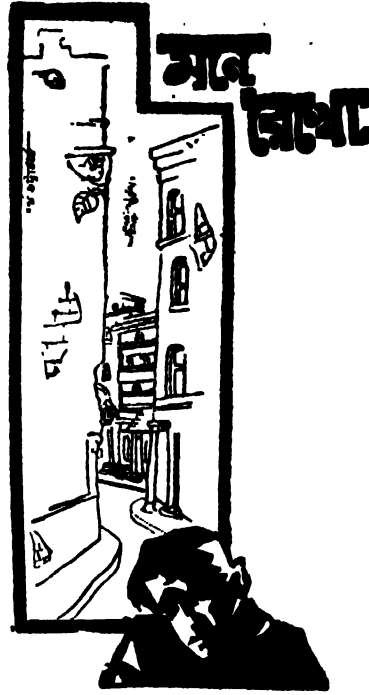
মানায় না যে তা এ পাড়ার সবাই জানে। জানে এ বাড়ীর লোকেরাও। তাই তফাৎ রেখে চলে দু'পক্ষই। এরাও ওদের খবর রাখে না, ওরাও এদের না। শুভময়বাবুর বড় মেয়ে মেঘমালা যখন বাড়ীর ছোট্ট মাইনর মরিসটা চড়ে কলেজে যায় কি কলেজ থেকে ফেরে তখন এ পাড়ার সবাই এই ব্যতি-ক্রমটা শুধু মুখ তুলে কখনো দেখে, কখনো দেখেও দেখে না। শুভময়বাবুর পনেরো বছরের ছেলেটি যখন ইংলিশ ভেলভেট কর্ডরয়ের অতি আধুনিক ছাঁটের প্যান্টের সঙ্গে চোখ ধাঁধাঁনো স্পোর্টস-সার্টটা গায়ে চড়িয়ে স্কুটার চেপে টেনিস র‍্যাকেট হাতে খেলার মাঠে ছোটে তখন এ পাড়ার অন্যান্য ছেলেরা ঈর্ষান্বিত নয়নে চেয়ে থাকে, তাদের মন্তব্য সবটাই যে সুরুচিপূর্ণ হয়ে থাকে সব সময় তা বলা চলে না। এ পাড়ায় কোনও বাড়ীর সামনে তিনখানা অতিথি-দের গাড়ী অহর্নিশ দাঁড়িয়ে থাকাটা যেন নিতান্তই খাপ ছাড়া। নীলকণ্ঠ কেবিনের মালিক হরিপদবাবু, কাঠ-কয়লার গোলাওয়ালা শ্যামসুন্দর বসু, চাল-ডাল মশলার দোকানের জ্ঞানবাবু, বন্ধকী দোকানের কারবারী হরিচরণ মল্লিক, ওপাশে দু'টো বাবুদের মেস, একটা কলেজের ছেলেদের হোস্টেল, সার সার ভাড়াটে বাড়ী, ওপাশের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট, বস্তীর পাশের খোলার ঘরের লণ্ড্রী থেকে কামেশ্বরের পান-সিগারেটের দোকান নিয়েই এ পাড়ার আসল চেহারাটা রূপ পেয়েছে। বাজা-রের সামনেই রাস্তা সেখানে বাজারটা যেন উপচে এসে পড়েছে। সেখানে আধ পচা আলু, বেগুন, পটলের হাট বসে গেছে যেন পচা-ভাঙ্গা ডিম নিয়ে বসেছে কেউ, কেউ বা গরম গরম তেলে ভাজা ভাজছে, আলুর চপ, বেগুনী, ফুলুরি। কেউ বিলের মাছ কোঁচড়ে ভরে এনেছে গ্রাম থেকে। কেউ বা কাদামাখা মাছগুলো থেকে বেছে আলাদা করছে চিংড়ী, পুঁটি, খয়রা, কই, এক এক ভাগের এক এক দাম। ওপাশে একটা পুরাণো জিনিষের দোকান, হরেক রকমের টিন, শিশি আর কৌটো পাবেন সেখানের জলের দামে, অন্তত দোকানী তাই বলে চেঁচাচ্ছে। এইসব চেঁচামেচি, মেসের-হোস্টেলের বোর্ডারদের কোলাহল, বস্তীর ছেলেমেয়েদের কান্না, ওপাশের খাটালের নোংরা আবহাওয়া, গরু-মোষগুলোর চিৎকার, ধোঁয়া, ধুলো, কর্পোরেশনের ডাস্টবিন উপচে পড়া আবর্জনার স্তূপে দু'টো কুকুর খাবার খুঁজছে, একটা মানুষ ময়লা কাগজ কুড়োচ্ছে এই পরিবেশে শুভময়বাবুর বাড়ীটা যেন সত্যি মানায় না।

মানায় না যে শুভময় দত্তও যে সেটা না জানতেন তা নয়। তবু বাড়ীটা তিনি এখানেই করলেন। কেন করলেন তার একটা ইতিহাস আছে। শুভময় দত্ত মধ্য কলকাতার বৈঠকখানা রোড অঞ্চলের প্রাচীন এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান। একদিন ছিল যখন এ-পরিবারের ঐশ্বর্য খ্যাতি ছিল বহুদূর বিস্তৃত। কালে পরিবারের জনসংখ্যা বেড়েছে কিন্তু আয় বাড়ে নি একটুও।

খরচের মাত্রা বেড়েছে নানা আচারে-অনাচারে, রোজগার বাড়াবার চেষ্টা দেখেন নি কেউ। শেষে একদিন ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু কর্তাদের কড়া বন্দোবস্তে তা আর সম্ভব হলো না। সাবেকী আমলের বন্দোবস্ত ছিল এ-বাড়ীর ছেলে হয়ে জন্মালে আশ্রয় আর খাদ্য নিশ্চিত থাকবে। মেয়ে হয়ে জন্মালে বিয়ের খরচা দেবে স্টেট, আর জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব যাবে স্টেটের খরচে। সকলের জন্য খাবার আসবে ভাত, ডাল, তরকারী, সুক্তো, ভাজা, মাছ আর চাটনী। জমিদারী থেকে আসবে গাড়ী বোঝাই কফি, আলু, কুমড়ো, লাউ, পালং শাক, মাছ। সরকার মশাই চালাবেন জমিদারী আর তদারক করবেন রান্নাঘর। বাবুরা বসে বসে তাশ-পাশা খেলবেন, ছেলেরা ফুটবল। মেয়েরা চুল বাঁধবে, আলতা পরবে, পাউডার ক্রীম মাখবে, দলবেঁধে সিনেমায়, সার্কাসে, থিয়েটারে যাবে কালেভদ্রে। স্টেটের বন্দোবস্তের বাইরে যদি কেউ ভাতের সঙ্গে চায় ডিম ভাজা কি মাংস, দই কি সন্দেশ তবে সে খরচা তার নিজের। ইয়ার-বন্ধুদের বাড়ী ডাকলে রান্নাবাড়ীতে খবর পাঠাতে হবে ক'খানা বেশী ভাত চাই।

কিন্তু কালের চাকা ঘুরে গেছে ক্রমে। কর্তাদের তৈরী এমন চমৎকার একান্নবর্তী প্রথাতেও একটু একটু করে ফাটল ধরে গেল। বাড়ীর মেজ জ্যাঠাইমার ছেলেটি যেদিন বিলেত ব্যারিস্টারী পড়ে এসে নতুন ক্যাডিলাক্ গাড়ী কিনে কোর্টে বেরোন শুরু করল সেদিন থেকেই ভাবতে লাগল আলীপুরে বাড়ী করার কথা, যেন তার মতন লোকের পক্ষে বৈঠকখানা রোডের এই এঁদো গলিতে থাকা পোষায় না। ভাল দেখায় না। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বাড়ীর ঠিকানা দিতে লজ্জা করতে লাগল। বাড়ীর আর পাঁচটি ছেলেও সবাই কিছু সকালে ক্লাস বা কিস্ আর বিকেলে ফুটবল হকি খেলে দিন কাটালো না। দু' একজন ডাক্তারী পড়তে লাগল, কেউ ইঞ্জিনীয়ারিং কেউ আর্টস. কেউ সায়ান্স বিশেষ করে পড়ার খরচ যখন স্টেটের। স্কুল-কলেজের মাইনে যখন আসবে জমিদারী থেকে তখন ক'খানা পাঠ্যপুস্তক আর স্কুলে যাতায়াতের খরচ কেনই বা যোগাবেন না অভিভাবক। ইঞ্জিনীয়ারিং, ড্রইংয়ের যন্ত্রপাতির বাক্স কি ডাক্তারী পড়ার ক'খানা হাড় আর মাথার খুলি কি কিনে দেবেন না তারা। ফলে বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের দু' তিনশ লোকের মধ্যে কেউ চাকরী নিয়ে গেল বিদেশে, কেউ চেম্বারে বড় ভীড় এই অজুহাতে ছড়িয়ে পড়লো সহরের এমাথা ও-মাথায়। চেম্বারের সঙ্গে বাড়ী হলেই নাকি পসার বেশী। অনেক পরিবার-পরিজনাবৃত বিবাহিত জীবনে রোমান্সের অভাবের কথা ভেবে নীড় বাঁধলো নব-বিবাহিত দু'একজন অন্যত্র। তবু ওরই মধ্যে যেসব অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ পরিবার মাথা গুঁজে রইলো স্টেটের ব্যবস্থার মধ্যে তাদের মাঝে একটা অতি সহজ বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল অপেক্ষাকৃত কম বিত্তবানদের সঙ্গে। একের শাড়ী গহনা অপরের পক্ষে মারাত্মক মনে হতে লাগলো। একের স্ফীতি অপরের পক্ষে ভীতির কারণ হল। বনিবনা না হলেও একই ছাদের নীচে পাশাপাশি রইলো তারা মাঝে দেওয়ালের বেড়া তুলে। শুধু এক ছেঁড়া-সুতোর বাঁধনের মতো গিঁটটা লেগে রইলো রান্নাবাড়ীতে, সবাইয়ের জন্যে একই হাঁড়িতে সেখানে চাল ফোটানো হচ্ছে, একই থালায় বাড়া হচ্ছে সরকার মশাইয়ের মেনু ভাত, ডাল, তরকারী, ভাজা, সুক্তো।

তিন, চার, পাঁচ নম্বরের পাশাপাশি তিনখানা বাড়ীতে খোপে খোপে বাসা বেঁধে ছিল শ' তিনেক মানুষ তবু। বৈঠকখানা রোডের সেকেণ্ড বাই লেনের নড়বড়ে ইঁট বার করা বাড়ীটার মায়া কাটায় নি বেশীর ভাগই। কিন্তু একদিন সবাইকেই যেতে হল।

এ-বাড়ীর ওপর দিয়ে বড় ঝাপটা গেছে অনেক। দারোগা-পুলিশ থেকে সাহেব পুলিশ কমিশনার অবধি এলেন যেদিন তিন নম্বরের বাড়ীর দোতালার সাহেব বাবুর বৌকে পাওয়া গেল বুকে গুলী লাগা অবস্থায়। ওদিকে সাহেব বাবু ভোর থেকে ফেরার। সেদিন সরকার মশাই গোলাপ বাবু একাই সামলালেন চারদিক তার দুই বলিষ্ঠ হাতে। একসঙ্গে যেদিন মারা গেলেন বাড়ীর দুই কর্তা পাশাপাশি বিছানায় ম্যানেঞ্জাইটিস হয়ে সেদিনই বা কি কম নাকালটা হতে হয়েছে তাঁকে। আমিনিয়া-বাইয়ের মেয়ের সঙ্গে যেদিন ঘর ছেড়ে বোম্বাই পাড়ি জমালো মেজবাবুর বড় ছেলে শান্তিময় সেদিন তার করে বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে তাদের ধরলেন এই গোলাপ সিকদার, বৈঠকখানা রোডের মস্ত বাড়ীর সরকার মশাই। এ জমিদারীতে সিকদার মশায়ই সব, তিনি বিনা আর সব অন্ধকার। মণি মাসীকে যেদিন তার ছোট জামাইয়ের মৃত্যু সংবাদ দিতে হলো সেদিন সরকার মশাইকেই সেকথা ভেঙ্গে বলতে হোল আস্তে আস্তে, আবার সান্ত্বনাও দিতে হলো ধরা গলায়। গোলাপ বাবুকে সবাই দেখে এসেছে একই রকম। বছরের পর বছর ধরে একই ছড়ি তাঁর হাতে, সেই চুনোট করা ধুতি, গায়ে ফিনফিনে আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী, শীতে সার্জের ঘিয়ে রঙের ঢিলে হাতা জামার ওপর কাজ করা কাশ্মীরী শাল গায়ে। আত্মীয়-পরিজন কেউ তাঁর আছে কিনা কেউ জানে না। কখনো ছিল নিশ্চয়ই, তিনি নিজেও আজ হয়তো তাদের ভুলে গেছেন। ছোট কর্তা বলেন গোলাপ বাবুকে তিনি অমনি সাদা চুলে দেখছেন ছোটবেলা থেকে, বড়কর্তাও বলেন তাই, ছোটদের কথা বাদ দিই। বাড়ীর সবাইকে তিনি বলেন তুমি, বাড়ীর বড় বৌমাকে ডেকে বলেন, বৌমা ছেলের বিয়ের জোগাড় দেখি কি বল, বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছে। বড় বাড় ব্যাটার। একেবারে যেন বাঘের বাচ্চা। একবার চার হাত এক করি, বাছাকে আর দুটি বছর ঘরের বাইরে দেখা যাবে না।

সেই তিন, চার, পাঁচ নম্বর বৈঠকখানা সেকেও ঝাই লেনের দত্তবাড়ী যাকে শিয়ালদা অঞ্চলের সকলেই একবাক্যে বড়বাড়ী বলে ডাকতো, তাও ভেঙে গেল। ভেঙে গেল ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের একখানা নোটিশ পেয়ে। জমিদারীর আয় দিন দিন কমে আসছিল তবু গোলাপবাবুর মেনু কমে নি রান্নাবাড়ীর। কষ্টে-স্বষ্টে চলছিল সংসার কোনওক্রমে ঠাট বজায় রেখে। বাড়ী ভাঙার নোটিশ এলে তবু গোলাপবাবু সাহসে বুক বাঁধলেন। এই বুক দিয়ে বহু ঝড়-ঝাপটা তিনি সয়েছেন। বহুবার বহু কাজে হাত দিয়েছেন, জিতেছেন, হেরেছেন। তবু এমন করে হার আর বুঝি তার জীবনে কখনো হয় নি। ট্রাস্টের নোটিশ পেয়ে সরকারী দপ্তরে ঘোরাঘুরি শুরু করলেন। কিন্তু মামলা শেষ করে যেতে পারলেন না, তার আগেই পড়লেন অসুখে। যেমন পড়লেন তেমনি উঠলেন; একই বিছানায়। ভেতরে ভেতরে মাটি ক্ষয়ে যাওয়া গাছটা যেমনি হঠাৎ একদিন হুড়মুড় করে পড়ে তেমনি চলে গেলেন গোলাপবাবু। তেমনি চলে গেল দত্তবাড়ী, গোলাপবাবু যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই। তিন, চার, পাঁচ নম্বরের বাড়ী ভেঙে পড়ল বুলডজারের ধাক্কায়। দত্তবাড়ীর বুক চিরে বেরোলো নতুন রাস্তা, পাশে পাশে বেরোল নতুন জমি। ফালি ফালি প্লট, দুই, তিন, চার কাঠার।

খবরের কাগজে ট্রাস্টের বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছিল শুভময় দত্তর। নিজের পৈতৃক বাড়ীর জমি বিলির নোটিশ পড়লেন তিনি। বহুদিন আগে ছেড়ে আসা বাড়ীটির প্রতি কিছু মমত্ববোধ বোধ হয় ছিল তখনও। যুদ্ধের বাজারের কণ্ট্রাক্টগুলো তখনও হাতছাড়া হয়নি তাই কাঁচা পয়সা জমা ছিল হাতে। বাড়ী তৈরীর জায়গা কেনা ছিল বালীগঞ্জ প্লেসের একটেরে, তবু বৈঠকখানা রোডের ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ঐ জমিটুকুর দিকেও হাত বাড়ালেন তিনি। শুধু জমিই কিনলেন না বাড়ীও করলেন সেখানে এবং বসবাস শুরু করলেন পাকাপাকিভাবে। সাড়ে চার বিঘের বিরাট দত্ত বাড়ীটা ভেঙে টুকরো হয়ে জন্ম নিল পৌণে তিন কাঠার নতুন দত্ত বাড়ীর, যেমন বিরাট বটগাছটা মরে গিয়ে জন্ম দিয়ে যায় ছোট বটগাছের তেমনি। বৈঠকখানা রোডের বাড়ীতে বাস করতে হবে শুনে দত্ত গিন্নী গিয়ে উঠলেন ল্যান্সডাউনে বাপের বাড়ীতে মেয়ে মেঘমালার হাত ধরে। ছেলে প্রীতিময় গিয়ে উঠলো বন্ধুর বাড়ীতে ফার্ন রোডে। কিন্তু শুভময় বাবু অটল রইলেন। জিদ বজায় রেখে একাই এলেন নতুন বাড়ীতে। শাস্ত্রে আছে, নবগৃহে সস্ত্রীক প্রবেশ করাই বিধি, তিনি তা অমান্য করলেন। তারপর একদিন সবাইকেই আসতে হোল তারই কাছে, কারণ শুভময়বাবুর ব্যাঙ্ক ব্যালান্সটা যে ঠিক কতো তা কারোরই জানা ছিল না, এমন কি দত্ত-গিন্নীরও না।

বাড়ীটায় ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো মণিময়। কেমন যেন একটা অপরিচিত আবহাওয়া লেপা সারা

[illegible]টার। মানুষ-জনের সাড়া নেই কোথাও। আলো নেই কোন ঘরে। চাকর হরিহর, ঠাকুর লোকনাথ নিশ্চুপ। মেঘমালার পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে না। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসর বসায় নি প্রীতিময় বাইরের বসার ঘরে। ভুবনবাবুর দাবার আসরে ওপাড়ার ভূতনাথ উকিল আজ অনুপস্থিত।

কোনও দিন ডাকে না, আজ কিন্তু গোল বারান্দাটা পার হয়ে নীচু গলায় প্রীতিময়ের নাম ধরে ডাকলো মণিময়। অপরিচিত পরিবেশটায় ধাক্কা খেল যেন। কেউ সাড়া দিল না তার ডাকে। একটু এগিয়ে গোল বারান্দাটার ওপর থেকে আর একটু জোর গলায় ফের ডাকলো মণিময়। এবারেও সাড়া নেই কোনও। আরও অবাক হল সে।

এ বাড়ীর সঙ্গে মণিময়ের পরিচয় আজ আট বছরের। মেঘমালা আর প্রীতিময়কে পড়াতে এসেছিল সে যখন তখন মেঘমালার বয়স বারো, প্রীতিময়ের ছয়। মণিময় তখন সবে আই, এস, সি পাশ করে বি, এস, সি পড়তে ঢুকেছে কলেজে।

ক্লাস এইটের মেয়েকে দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাসের আলাদা-আলাদা খাতা করে দিয়েছিল মণিময়। স্কুলের পড়ার বই রেখে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিল পৃথিবীর সেরা সেরা মানুষের কথা নিয়ে। বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারকে সহজ কথায় বুঝিয়ে ছবি এঁকে ভরিয়ে দিয়েছিল তার খাতা। বলেছিল মানুষের জন্ম বৃত্তান্ত, এ্যামিবা থেকে রেপটাইল, রেপটাইল থেকে ম্যামালস কি করে জন্ম নিল তারই সহজ বৃত্তান্ত। মুখে মুখে বুঝিয়ে দিয়েছিল চীনের, পারস্যের, ইতালীর, ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লবের কথা, লেনিনগ্রাডের বিদ্রোহ, এ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের আত্মত্যাগ, আমেরিকার অভ্যুত্থান। রামায়ণ, মহাভারত পড়া হোল কোনওদিন। কোনওদিন সহজ ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা, পুরাণের গল্প। ধর্ম এল কোনওদিন। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ-ধর্মে দেবদেবীর ব্যাখ্যা, বাইবেল, কোরান থেকে বাহাই ধর্মের মূলকথা অবধি সব ঘাড় নেড়ে শুনেছিল বারো বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটি কিছু বুঝে কিছু না বুঝে।

পৃথিবী ভুলে গেল মণিময়। স্কুল-কলেজে প্রতি বছর প্রাইজ পাওয়া ভাল ছেলে সে, খেলার মাঠে আছাড় খেয়েছে সারাজীবন। কলেজের ছুটির ঘণ্টার ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরীর বই নিয়েছে আর শেষ করেছে। যা পেয়েছে তাই পড়েছে। ধর্ম, দর্শন ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য সব কিছু ইংরাজী এবং বাঙলায়।

গরীবের বাড়ীর ছেলেই বলতে হবে তাকে। মণিময়ের বাবা চন্দ্রকান্ত মিত্র কলকাতার ডালহৌসী অঞ্চলের এক সওদাগরী অফিসের সামান্য কেরাণী। তিনটি ছেলে, দুটি মেয়েকে নিয়ে চন্দ্রকান্ত বাবুর সংসারে বড় ছেলে মণিময়। বয়স ছাব্বিশ। পরের ছেলে ইন্দ্রনাথের কুড়ি। শেষ ছেলে মল্লিনাথের বয়স আঠারো। মেয়ে চামেলী আর শ্যামলী। বয়স ষোলো আর বারো। দুশো টাকা মাইনের কেরাণীর সংসার হিসাবে পোষ্যের সংখ্যা একটু বেশীই। তবু তারই মধ্যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই চন্দ্রকান্ত বাবুর। বহু কষ্টে নূর মহম্মদ লেনের একতলার অন্ধকারভরা দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটে দীর্ঘ আটাশ বছর কাটিয়েছেন তিনি। আশা করেছেন, কোনওদিন তার ছেলেগুলি বড় হবে, মানুষ হবে, অনেক টাকা রোজগার করে আনবে। গৃহিণী চারুলতা স্বপ্ন দেখেছেন জমি কিনবেন, বাড়ী করবেন দক্ষিণ কলকাতায় কি সহরের এমন কোনও প্রান্তে যেখানে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে, ধোঁয়ায় জ্বালা করবে না চোখ সকাল থেকে রাত অবধি। বারো জনের সঙ্গে একত্রে কল থেকে লাইন দিয়ে তুলতে হবে না জল, সকালে উনুন ধরাতে গিয়ে পাখার বাতাস করতে করতে হবে না প্রাণান্ত। ঠিকে ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে না রোজ। কম খাওয়া আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিল তিল করে ক্ষয়ে যাবে না জীবন। যেসে [illegible] চন্দ্রকান্তর তিনকুলে পরিচয় দেবার [illegible] ছিল না কেউ। অল্প বয়সে বা[illegible] হারিয়ে এক দূর সম্পর্কের আত্মী[illegible] বাড়ীতে তার ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে [illegible] হতে হয়েছিল তাকে অতিকষ্টে। চা[illegible] জোগাড় করে দিয়েছিলেন তা[illegible] ম্যাট্রিক পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] চন্দ্রকান্ত জীবন-সংগ্রাম কাতর। যেখ[illegible] ঢুকেছিলেন সেখানেই রইলেন মুখ বু[illegible]

চন্দ্রকান্ত এমন এক শ্রেণীর ম[illegible] যারা জীবনে অভিযোগ করতে জা[illegible] না। যাদের উপর দিয়ে অনায়[illegible] অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো য[illegible] প্রতিবাদ করা যাদের আসে না কখ[illegible] কোনও অবস্থাতেই অভাবটাকেও [illegible] চন্দ্রকান্ত সহজে মেনে নিলেন। যে[illegible] নিলেন নূর মহম্মদ লেনের মাসিক [illegible] টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটে পাতা পা[illegible] টাকা মাইনের সওদাগরী অফি[illegible] চাকরীর সংসার। মণিময়কে মে[illegible] নিলেন যেদিন সে বললো কলে[illegible] পড়বে। ঐ নূর মহম্মদ লেনের দেড়খা[illegible] ঘরের ফ্ল্যাটে বসে চন্দ্রকান্ত যুদ্ধ দেখেছে[illegible] দাঙ্গা দেখেছেন, দুর্ভিক্ষ দেখেছে[illegible] র‍্যাশনের দোকানে ব্যাগ হাতে লা[illegible] দিয়েছেন, চাল কিনে এনেছে[illegible] তারকেশ্বর লাইনের সিঙ্গুরের হা[illegible] গিয়ে সস্তায়। বৈঠকখানা বাজারে[illegible] কম দামের আলু-পটল-বেগুন, পুঁ[illegible] চিংড়ি কিনে সংসার চালিয়েছেন[illegible] চন্দ্রকান্ত সব মেনে নিয়েছেন। চন্দ্রকা[illegible] পরিবর্তনশীল এই জগতকে মে[illegible] নিয়েছেন। মাসিক সাত টাকার ঘর ভা[illegible] যেদিন আটাশ টাকা হোল তিনি আপ[illegible] করেন নি। পঁয়তাল্লিশ টাকা মণের চা[illegible] কিনেছেন, ছ' সাত টাকা সেরের মা[illegible] তিন টাকা মণের কয়লা। কালোবাজা[illegible] ওষুধ কিনেছেন ছেলের অসুখে, সেদি[illegible] ফল কিনেছেন অতি উচ্চদামে। ছেলে[illegible] মেয়েরা মুখ করেছে। গিন্নীর বাক[illegible] যন্ত্রণা, মেয়েদের ক্ষুরধার রসনা, অফিসে[illegible] বড়বাবুর গঞ্জনা তিনি সব মেনে নিয়ে[illegible] ছেন। মেনে নিয়েছেন আপন স্বাভাবি[illegible] নিয়মে। তাই বড়ছেলে মণিময় যেদি[illegible]

একগাদা প্রাচীন বাসের বাসন থেকে এসে প্রবেশ করলো প্রথম। সেদিন থেকে কোথায় একটা আলোর আভাস দেখেছিলেন তিনি। চারুলতা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে নিয়ে। তারপর অনেকদিন পরে কোলে এসেছে ইন্দ্রনাথ, চেহারায় স্বভাবে মণিময়ের সঙ্গে যার কোনও মিল নেই। মণিময়ের কেমন যেন স্বপ্ন মাখা টানা টানা চোখ ভাসা ভাসা দিগন্তবিস্তৃত, চওড়া কপাল, টকটকে ফর্সা রঙ, দোহারা গড়ন, বুদ্ধির প্রাচুর্য চোখে মুখে সর্বত্র। ইন্দ্রনাথ তেমনি লাজুক, কশতনু, কেমন যেন ভীরু ভীরু স্বভাব চন্দ্রনাথের নিজেরই মতো, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। দুটিতে প্রভেদই বেশী, মিল কম। পরে এলো মল্লিনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রকৃতি নিয়ে। অদ্ভুত চঞ্চল তার স্বভাব, ঘরের চেয়ে বাইরের বড় রাস্তার প্রতি টান তার বেশী। ছোট ছোট চোখ, একমাথা চুলে কপালটা যেন কেমন ভরা ভরা, গায়ের রঙ মধ্যমাধ্যিক, দোহারা গড়ন তারও। মেয়ে চামেলী পেয়েছে মায়ের স্বভাব, শ্যামলী বাবার। শ্যামলী সব কিছুতেই বিদ্রোহ করতে চাইবে, কিন্তু পারবে না তার ভীরু স্বভাবের জন্য, চামেলী সব বলে বসবে সামনাসামনি। শ্যামলী কিছুই চাইবে না মুখফুটে, চামেলীর মুখ ভার হয়ে উঠবে ক্ষণে ক্ষণে নানা আবদারে। একজনকে খাওয়াবার জন্য সাধ্যসাধনা করতে হবে অন্যজন না বলতেই হাত পেতে এসে দাঁড়াবে কি জোর করে কেড়েই খাবে সব।

এই সংসারে মণিময় নিজেকে কোনওদিনই খাপ খাওয়াতে পারে নি। তার আদর্শবাদ অচল হয়ে গেছে চন্দ্রকান্তের দু'শো টাকা মাইনের সংসারে। তাই যতো বড় হয়েছে তত সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সে। শামুকের মতো নিজের মধ্যে নিজেই ঢুকে গেছে ক্রমে। গাদা গাদা বই এনে রাস্তার পাশের জানলাটায় বসে নীরবে পড়েছে একটির পর একটি। মুখ বুজে এক তরকারী ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে স্কুলে, কলেজে। নিজের মনের কথার আলোচনা বাড়ীতে করা হলে নি। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সে সব বলতে গিয়ে পেয়েছে পরিহাস। আত্মীয়েরা আমল দেয় নি তার আদর্শবাদে।

বারো বছরের একটি নীরব শ্রোতাকে তাই যেদিন একেবারে নিজের হাতের মুঠোয় পেলো মণিময় তখন পৃথিবী ভুলে গেছে সে। ভুলে গেছে কাকে সে কি বলছে। বি, এস, সি'র ছাত্র আঠারো বছরের মণিময় বারো বছরের মেঘমালাকে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার বিলিয়ে দিল মুক্ত-হস্তে। দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ইতিহাসে ভরিয়ে দিল তার মন।

মেঘমালার বিলাতী স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর মারফৎ চাকরীটা পেয়েছিল মণিময়। শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় তার ভাইয়ের সূত্রে। সে আর ছেলেটি একই কলেজে এক ক্লাসে পড়তো। স্বাভাবিক নিয়মে যাতায়াত ছিল সে বাড়ীতে।

সার্টিফিকেট আর মার্ক সিটগুলো সঙ্গে ছিল মণিময়ের, কিন্তু সে সব দেখেন নি শুভময় দত্ত। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি নাম বললে, মণিময় মিত্র। মণিময়, আমাদের বাড়ীর নাম। শুভময়, প্রীতিময় সেখানে মণিময়, মন্দ নয়। তার ডাগর চোখের ভাষায় কি তিনি পড়েছিলেন কে জানে। মেয়ে মাষ্টারের কথা ভেবেছিলেন কিন্তু সিদ্ধান্ত পালটে মণিময়কেই রাখবেন ঠিক করলেন। বললেন, স্কুল-কলেজে তো ভালোই রেজাল্ট করো তুমি। বি, এস, সি পড়ছো কেন? ডাক্তারী কি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেলে না কেন জিজ্ঞাসা করবেন ভেবেছিলেন কিন্তু চাকরী প্রার্থীকে তা জিজ্ঞাসা করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই ভেবে আর কথা বাড়ালেন না বেশী।

দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাসের দুরূহ তথ্যের সহজ ব্যাখ্যার মধ্যে দু' একবার উঁকি দিয়েছিলেন শুভময়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠ ও ব্যাখ্যার মাঝে কান পেতেছিলেন তিনি অলক্ষ্যে। কিন্তু শুনতে পান নি কোনও কিছু আপত্তিজনক। পরীক্ষায় ভাল ফল করা মেয়ে মেঘমালার শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল সামান্যই। স্কুলের পাঠপুস্তকের বাইরের জ্ঞান বাড়াবার প্রয়োজন মিটছিল তার মণিময়ের সাহায্যে।

দ্বিতীয়বারের ডাকেও সাড়া না পেয়ে গেটটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরেই আসছিল মণিময়। রাস্তায় পা দিতে গিয়ে দেখা হল ঠাকুর লোকনাথের সঙ্গে। অতি সন্তর্পণে লোকনাথ ঢুকছে বাড়ীর মধ্যে। মণিময়কে দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। বাড়ীর মধ্যে গেছিলে দাদাবাবু?

না, সব অন্ধকার, ব্যাপার কি বলো তো?

বাবু যে কাল শেষ রাতে মারা গেছেন তা বুঝি শোন নি।

বাবু, শুভময়বাবু মারা গেছেন কাল, বলছ কি তুমি। খানিকটা চুপ করে থেকে বলল মণিময়, প্রীতি, মালা-টালা সব কোথায়।

খোকাবাবু তো শ্মশান থেকে ফেরেন নি এখনো। মায়েরা সব ওপরে আছেন।

হঠাৎ বজ্রপাত হলে মানুষের যে চমক লাগে আর তাতে সে যেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তেমনি ভাবে সকলে একত্র হয়ে বসেছিলেন দোতালার কোণের ঘরে। প্রীতিময়ের মা, মাসীমা, জ্যাঠাইমা সবাই একত্রে। মায়ের কোলে নিঃশব্দে মুখ গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে মেঘমালা। সিমেন্টে কিছু পাতার কথা মনে পড়ে নি কারও। অন্ধকার নেমেছে বাইরে কিন্তু মনের মধ্যে যে অন্ধকার দানা বেঁধে রয়েছে সে অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে সব কিছু। আলোর সুইচটা অবধি টিপতে ভুলে গেছেন সবাই। হয়ত আগামী দিনের বিরাট অন্ধকারের কথা ভেবে আজকের অন্ধকার ভালো লাগছে, নয়তো অন্ধকারের মধ্যে তৃপ্তি পাচ্ছে সদ্য শোকাতুরা মন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীরা এসেছেন সারাদিন। ফুলে ধূপের গন্ধে, চন্দনে ঘর ভরে গেছে। মন ভরে গেছে কান্নায়। কোথায় যেন একটু চন্দনের আর ধূপের মেশানো গন্ধ রয়ে গেছে,

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে তা অনুভব করা যায়। এত নিঃশব্দ ঘর যে নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভয় হচ্ছে। কেউ বা ভাবছেন গত সন্ধ্যার এমনি সময়টির কথা। যমে মানুষে টানাটানি হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালটে পালটে আসছে ডাক্তার। অক্সিজেনের সিলেণ্ডার লাগানো হচ্ছে, বদলানো হচ্ছে ইনজেকশন।

লঘু পায়ে দোতালায় উঠে এল মণিময়। এ-বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় তার দীর্ঘদিনের। কিছু কম আট বছরের। আঠারো বছর বয়সের যে কিশোরটি টানা-টানা ভাসা ভাসা চোখ নিয়ে এসেছিল এখানে আজ ছাব্বিশ বছর বয়সে তারও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। যে স্বপ্ন সে দেখেছিল একদিন যে চোখে সে চোখের দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেছে অনেক। স্বপ্ন সরে গেছে অনেক দূরে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত লেখাটির জন্য যেদিন পাঁচ টাকা পুরস্কার পেয়েছিল মণিময় সেদিনটার কথা তার সারা জীবন মনে থাকবে। দৈনিকের ছোটদের পৃষ্ঠায় গল্প প্রতিযোগিতায় বারো হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলো সে। সংবাদপত্রে ছাপা হল সংবাদ, প্রকাশিত হলো গল্প বর্ধমানের পথে যেতে দেবীপুর ও বৈঁচি স্টেশনের মধ্যেকার পথের এক দুর্ঘটনার ইতিহাস। মণিময়ের চিন্তা ছাপা হয়ে পৌঁছে গেল আরও নানা জনের মনে। এক সঙ্গে তিনখানা একই দিনের একই কাগজ কিনলো মণিময় তিনজন আলাদা আলাদা হকারের কাছ থেকে। অবাক হয়ে মিলিয়ে দেখলো তার লেখা তিনটি কাগজেই ছাপা হয়েছে একই জায়গায় তিনবার তিনখানা কাগজে ছাপা তার গল্পটা সে পড়লো আলাদা আলাদা করে। একই ভাবে ছাপা, একই রকম কালী দিয়ে, একই রকম, হুবহু। তারপর মনে মনে হেসে সারা হোল, কি বোকামীই না সে করছে। কাগজের ছাপা একই দিনে কি আলাদা আলাদা হবে আর গল্প যখন ছাপা হয়েছে তার তখন কি সেটা ছাপা হবে একটা কাগজে আর ছাপা হবে না আর একটায়। কি বোকা সে। সত্যিই কি বোকাই না সে ছিল।

তারপর থেকে পাগলের মতো লিখে গেছে মণিময়। পড়েছে আর লিখেছে। বাঙলায় আর ইংরাজীতে। যত পেরেছে। কিন্তু আর পাঠায়নি ছাপতে। তখন শুধু ঘরে বসে রেওয়াজ শুধু জমার ভাণ্ডার ভরে তোলা।

মেঘমালা মণিময়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নিজের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা মণিময়কে সকলের সামনে বার করে দিল সে। কবিতা লেখার খাতা এগিয়ে দিয়ে বললো, প্রতিদিন একটা করে কবিতা লিখে দিতে হবে তাকে। প্রতি মাসে লিখে দিতে হবে একটা করে গল্প। সেই কবিতা, গল্প সে পাঠাবে বাঙলার সব সেরা সেরা দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে। মণি-ময়কে তুলে ধরবে আর সকলের সামনে।

লাজুক মণিময় তার জ্ঞানের ভাণ্ডার একটিমাত্র মানুষের কাছে খুলে দিয়েই তৃপ্তি পেয়েছিল বেশী। মেঘমালায় প্রস্তাবে তাই যে বললো, আমি শুধু তোমার জন্য লিখবো মালা, আর লিখবো আমার জন্য। মেঘমালা বলেছিল, আপনি স্বার্থপর, সারা দুনিয়ার কাছে কেন জানাবেন না আপনার কথা।

মণিময়কে দেখে মেঘমালার মা বললেন, এসো বাবা বস, এই চেয়ার-টায় এদিকে। ঘরে অন্য মানুষের সমাগমে বোধ হয় সম্বিত ফিরে এলো তাঁর। আলোর সুইচটা টিপে দিলেন উঠে। বললেন, আজ আমাদের বড় বিপদের দিন বাবা। এই প্রীতি এই মেঘমালাকে রেখে ওদের বাবা চলে গেলেন। এরা যে আজ অনাথ হল বাবা। এদের যে আজ দেখার আর কেউ রইল না। এই সব ছেলেমানুষগুলোর কি হবে। তুমি তো আজ আট বছর আসছ এ বাড়ীতে। দেখেছো তো দত্তবাড়ীর ওঠা, পড়া। কিন্তু আর কি এ বাড়ী উঠবে। ওইটুকু ছেলে প্রীতি কি পারবে সব গুছিয়ে তুলতে।

হয়তো দত্তবাড়ী আবার উঠবে, পড়া-দত্তবাড়ীকে যেমন করে ভরিয়ে তুলেছিলেন শুভময় তেমনি হয়তো শুভময়ের সাধনাকে সার্থক করে তুলবে প্রীতিময়, মণিময় ঠিক জানে না। সে শুধু শুনেছে পুরণো দত্তবাড়ীর কথা লোকমুখে। ভরে ভয়ে মেঘমালার ডিমের খোসার মতো সাদা হাত টিপে জমিয়ে দেখেছে পুরণো দত্তবাড়ীর রক্তকে। এই দত্তবাড়ীর নানা অত্যা-চারের কাহিনী লোকমুখে বহু প্রচলিত। সেই বংশের রক্ত মেঘমালার শরীরে। নিজের বুকের মধ্যে মেঘমালার মুখ-খানাকে টেনে এনে অবাক হয়ে তার বড় বড় টানা টানা চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবতো মণিময় পুরণো দত্তবাড়ীর কথা। সেই বংশের মেয়ে কেমন পরম নিশ্চিন্তে তার বুকের মধ্যে শুয়ে আছে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের সব খাতাগুলো পড়ে রইল আধখানা ভরা হয়ে। বি এসসি পাশ করার পর চাকরি খুঁজতে বেরোতে হল মণিময়কে। শুভময় ডেকে বললেন, বাবা মণিময় চাকরি করে কি করবে। পড়ো, খুব পড়ো। চাকরি তোমার জন্য নয়। মেঘ-মালা কেঁদে ভাসিয়ে দিল, চাকরি নিয়ে অনেক দূরে চলে যাবে মণিময়। কল-কাতা থেকে একশো মাইল দূরে।

যাবার আগে একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পাশে বালী উইলিংডন ব্রীজের নীচে একটা নিরিবিলি কোণ দেখে পাশাপাশি বসলো তারা, গঙ্গার দিকে মুখ করে। মেঘমালা কি মণিময় কথা কইলো না কেউ। তবু কত কথাই না হোল দু'জনার। সাক্ষী রইলো চলমান নদীর স্রোত। উঠে আসার আগে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মেঘমালা, তুমি যাবে না মণিময়, তুমি যেতে পারবে না। আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে মেঘমালা ক' বছরে।

তবু যেতে দিতে হল, ভাবছিল মণিময়, তাকে আটকাতে পারলো না মেঘমালা। কথা দিতে হল মাসে দুবার অন্তত আসব কলকাতায়। দুবার নিশ্চয়ই। (ক্রমশঃ)

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
বার-এট-ল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ আট ॥

প্রাণভরা একটা আনন্দ ও প্রফুল্লতা নিয়ে দুজনে বাড়ীর দিকে ফিরতে শুরু করলাম। মেবেল আমার কাছে ধরা দিয়েছে, মেবেল এখন সম্পূর্ণ আমারই—একটা পুলকের শিহরণ অনুভব করলাম সমস্ত প্রাণে প্রাণে। মেবেল, আমার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী আগেই আমার কাছে দিল ধরা।

কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতে কোথা থেকে যে একটা কাঁটা উড়ে এসে মনের অন্তস্তলে গেল বিঁধে, প্রথমটা ঠিক টের পাই নি। কিন্তু চলতে চলতে ক্রমেই তার ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠল।

মেবেল, যাকে আমি জীবনসঙ্গিনী করতে চলেছি, সে এত সহজে দিল ধরা। এখনও তার সঙ্গে বিবাহের কথা পর্যন্ত পাকা হয় নি, কিন্তু ধরা দিতে ত এতটুকু দ্বিধা দেখলাম না। তবে কি মেবেল সেই ধরণের মেয়ে, যার পর-পুরুষের কাছে ধরা দিতে কোনও দ্বিধা নেই তা সে পুরুষ যেই হোক না কেন, পল্লীবালা। ওদের পল্লীবালারা তাহলে এই রকমই হয়। হঠাৎ যেন পল্লীবালার মোহটা প্রাণ থেকে গেল কেটে।

বাড়ী যখন ফিরে এলাম, মনটা দেখলাম একটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছে। ভালবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধা না থাকলে সে ভালবাসার ভিত্তি পাকা হয় না। দেখলাম সেই শ্রদ্ধাটুকুই আমার হারিয়ে গেছে।

সমস্ত রাত এই বেদনার ভারে ভাল ঘুম হল না। সকালে উঠেই ঠিক করে ফেললাম—না, মেবেলকে বিয়ে করা চলবে না।

●

৫।৬ দিন পরেই আমার লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার সময় হল। ওয়াই ভ্যালি অঞ্চলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম লণ্ডন অভিমুখে। একখানা ঘোড়ার গাড়ী করে রওনা হলাম হিলটন-অন-ওয়াই ছেড়ে লিডনী অভিমুখে। বেলা ১২টা আন্দাজ রওনা হলাম। যাওয়ার দিন সকালবেলা সেই ওক-গাছের তলায় খানিকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম এবং মেবেল এল সেখানে। শুধু শুধাল 'আবার কবে আসবে'?

বললাম, 'দেখি আবার কবে ছুটি পাই।'

মেবেল আর দ্বিতীয় কথা বলল না। মেবেলের চোখের দিকে দেখলাম—একটা অভূতপূর্ব গভীর বিষণ্ণতায় মেবেলের চোখদুটি যেন কোথায় তলিয়ে গেছে। এর পূর্বে মেবেলের চোখে বিষণ্ণতার এতখানি অতলছায়া কখনও দেখি নি।

গাড়ী যখন বাড়ীর ফটক দিয়ে বেরুচ্ছে, একবার গাড়ীর জানালা দিয়ে বাড়ীটার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম মেবেল দাঁড়িয়ে আছে দোতালায় আমারই শোবার ঘরের জানলায়। আশা করেছিলাম, একদৃষ্টে চেয়ে থাকবে আমার গাড়ীর দিকে—কিন্তু তা নয়, চোখদুটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে নিজেরই বিষণ্ণতার অতল গভীরে। মেবেলের চোখের এ রকম চাহনি এর পূর্বে আর কখনও দেখি নি—এ যেন সমস্ত সৃষ্টি হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। সৃষ্টির সঙ্গে কোনও যোগ নেই। গাড়ীর দিকে দৃষ্টি একেবারেই নেই। সত্যকথা বলতে কি, মনটা খারাপ হয়ে গেল।

●

লিডনি ষ্টেশন এসে দেখি অনেক লোক হয়েছে আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য—বেশীর ভাগেরই হাতে ফুল। ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে অনেকেই এসেছে, এমন কি বৃদ্ধ পিচী ও সিরিল এসেছে। কেবল আসে নি মেবেল ও ভেরা। যাই হোক, এত লোক এসেছে দেখে সত্যই অত্যন্ত অভিভূত হলাম। আমি যে ইতিমধ্যে সকলের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম—কখনও ভাবি নি। সকলের সঙ্গে করমর্দন করলাম এবং দেখে অবাক হলাম করমর্দনের সময় হাতে হাত মেলাতেই মিস জয়েসের চোখ ছল ছল করে উঠল। ফ্রেড্ চীৎকার করে গান ধরল 'হি ইজ এ জলি গুড ফেলো' ইত্যাদি এবং এমন কি মেয়েরাও সকলে সমস্বরে সেই গানে দিল যোগ।

ক্রমে ট্রেন এল। ট্রেনের কামরায় উঠে বসলাম। ছুটল ট্রেন লণ্ডন অভিমুখে।

নানা এলোমেলো চিন্তায় মনটাকে পেয়ে বসল। লণ্ডনে পৌঁছেই মার্জরীর

সঙ্গে দেখা হবে ---সে নিশ্চয়ই আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে প্যাডিংটন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ভাবতে মনটা থেকে আনন্দে উঠল ভরে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যাদের ছেড়ে এলাম তাদের কথা, প্রত্যেকের কথা একে একে মনের মধ্য দিয়ে ভেসে গেল, এবং ঘুরে ফিরে মনটা যখনই মেবেলের ওপর এসে পড়ল---মনটা একটা ব্যথায় যেন টন টন্ করে উঠল। থেকে থেকে মনে হল মেবেলের সেই শেষ চাহনি-সত্যিই কি মেবেলকে আমি বুঝতে পারি নি?

ট্রেন প্যাডিংটন স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই দেখি মার্জরী ঠিক দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। আমি ট্রেন থেকে নামতেই ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে আমাকে চুম্বন করল। আমি মার্জরীকে কাছে টেনে নিলাম।

মনে হল সত্যি মার্জরীর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

॥ নয় ॥

ক্রমে শেষপর্যন্ত আম মার্জরীকেই বিয়ে করলাম।

বিয়ে করার আগে অবশ্য সঙ্গে ২১৪ খানা চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল। মেবেলের ওপর সব চিঠিতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা---ফিরে এস, তুমি ফিরে এস আমি আর সইতে পারছি না। আমিও তাকে আশ্বাস দিয়ে চিঠির উত্তর দিতাম ---শীঘ্রই যাবার চেষ্টা করব, ছুটি পেলেই যাব। কিন্তু ক্রমে মার্জরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে চিঠি পত্রের আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে গেল।

মার্জরীর কাছে বোধ হয় হিলটন-অন-ওয়াইয়ের বিষয় অনেক গল্প করেছিলাম---সেখানকার গ্রাম্য ক্লাবের জীবন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্য কথাই বলি, মেবেল বা তার সম্পর্কে কোনও কথাই মার্জরীকে বলি নি। কেন বলি নি---তার কৈফিয়ৎ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার কোর্টের ছুটি হলেই মার্জরী আমাকে ধরে বসত, 'চল দিনকতক তোমার হিলটন-অন-ওয়াই বেড়িয়ে আসি।' আমার স্বামীটি বড় দেখতে ইচ্ছে করে, আমি নানা ওজর আপত্তিতে কথাটা কাটিয়ে দিতাম। তার পরিবর্তে মার্জরীকে নিয়ে কোনও ছুটিতে স্কটল্যাণ্ড কখনও বা সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়েছি। যদিও এইখানেই বলে রাখি, 'হিলটন-অন-ওয়াই' নামটা শুনলেই আমার বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠত। মার্জরীকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা কখনও কল্পনায়ও আনতে পারি নি।

●

দেখতে দেখতে ৭।৮ বছর কেটে গেল। প্র্যাকটিস আমার ভালই জমেছে। এজওয়ার রোডে মার্বল আর্চের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি আমি ও মার্জরী। মার্জরী সুন্দর গুছিয়ে সংসার করে আর আমাকে এত যত্নে রাখে যে মনে মনে মার্জরীর প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা অনুভব না করে উপায় ছিল না। মোটের উপর খুব শান্তিতেই ছিলাম দুজনে লণ্ডনে।

আরও বোধহয় ২।৩ বছর পরে এলো ডেরার চিঠি। চিঠিখানি ঠিক আমার হাতেই পড়েছিল, তাই মার্জরীর চিঠি দেখার কোনও অবকাশ হয় নি। বাড়ী ছেড়ে হাইড পার্কে গিয়ে একটি নিভৃত কোণে বসে চিঠিখানা অনেকবার পড়লাম। ডেরা আমাকে কোনও সম্বোধন না করে লিখেছে---

তোমাকে মানুষ বলে ভাবতে আমার ঘৃণাবোধ হয়। তুমি মানুষ নয়---মনুষ্যরূপে পিশাচ।

তুমি চলে যাওয়ার পর মেবেল তোমার শোবার ঘরের জানালায়ই বেশীর ভাগ দাঁড়িয়ে থাকত---এক দৃষ্টে চেয়ে থাকত পথের দিকে। এই রকম চেয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখের চাহনিই বদলে গেল। কেমন একটা ফাঁকা উদাস চাহনি। বাবা-মা'র ভয় হল ও পাগল হয়ে না যায়। অনেক রকম করে ওকে ভোলাবার চেষ্টা করা হল---কিন্তু কল কিছুই হল না। ক্রমে ক্রমে কথাবার্তাও একটু অসংলগ্ন হয়ে যেতে লাগল---বুঝলাম ও পাগলই হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বাবা একবার ঠিক করেছিলেন, ওকে নিয়ে লণ্ডনে গিয়ে তোমাকে খুঁজে বার করবেন। কিন্তু আমি বাধা দিলাম---কেননা আমি বুঝেছিলাম, ফল কিছুই হবে না। কেননা আমি তোমাকে দেখেই চিনেছিলাম---তুমি মনুষ্যরূপে শয়তান। মাও অবশ্য আমার দিকেই মত দিলেন। কেননা মা হাজার হলেও স্ত্রীলোক, প্রথমটা ঠিক চিনতে পারেন নি, পরে তোমাকে একটু একটু বুঝতে সুরু করেছিলেন। যাই হোক মেবেলের লণ্ডনে যাওয়া হল না।

তারপর শোন। আজ তোমাকে সমস্ত ব্যাপারই শোনাতে চাই। যদি তোমার মধ্যে মনুষ্যত্বের এতটুকু ছোঁয়া কোথাও লেগে থাকে, সেখানে যদি একটু বাজে সেই আঘাত। হয়ত মেবেলের আত্মা তাতে একটু শান্তি পাবে।

হ্যাঁ। মেবেল আর নাই। মেবেল ওক গাছের ওখান থেকে ওয়াই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে শেষ করি।

মেবেলের ওরকম মৃত্যুর শোক বাবা সইতে পারলেন না। বাবার শরীর ভাল ছিল না---বাবা এক বৎসরের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিলেন। কেন তোমাকে তোমার বিষয় বিস্তারিত খবর না নিয়ে পেয়িং গেস্ট করে রাখা হয়েছিল---এই অনুতাপে ক্ষয় হয়ে মাও বছর দুই-এর মধ্যে চলে গেলেন।

আমি রইলাম একা। এই এতবড় বাড়ীতে আমি একা। আমি যেন আর এ বাড়ীতে টিকতে পারছি না। চারিদিকে মেবেলের স্মৃতি, আমি যেন শুনতে পাই, ওয়াই নদীর কুলু কুলু ধ্বনি, মধ্যে মেবেলের গলা শুনতে পাই। আমি চমকে চমকে উঠি। ভাবলাম---আমিও শেষ পর্যন্ত কি পাগল হয়ে যাব। এ বাড়ীতে থাকা আমার চলবে না। পালাতেই হবে। পালাতেই হবে।

সুযোগ ঘটতে দেরী হল না। এ
ক্লে এলেন একটি কানাডাবাসী।
মি তাকে আমার বাড়ীতেই পেয়িং
স্ট করে রাখলাম---একা থাকার
ত থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্য।
ড---আশাকরি তোমার ফ্রেডকে
ন আছে, সেই সব ব্যবস্থা করে
য়েছিল।

ভগবানের অসীম কৃপায় তিনি
মাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন।
মি সহজেই রাজী হলাম---বুঝতেই
র। কালই আমরা এ বাড়ী ছেড়ে
ওয়া হচ্ছি---কানাডা অভিমুখে।

যাওয়ার আগে তোমাকে এ চিঠি
লিখে যাচ্ছি, তার প্রধান কারণ---
তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যেতে যাই।
জানি তোমাকে---অভিশাপ দিচ্ছি---
আমাদের সংসার তুমি যেমন জ্বালিয়ে
পুড়িয়ে দিয়েছ, তোমার জীবনও সেই-
রকম জ্বলেপুড়ে যাক। এ অভিশাপ
কখনও মিথ্যা হবে না---নইলে বুঝব
ভগবান মিথ্যা।

---ভেরা।

●

এইখানেই বলে রাখা ভাল---এই
অভিশাপের ফলে কিনা জানিনা মাস
৭।৮ পরে হঠাৎ মার্জরীর মৃত্যু হল।
আমি কোর্টে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে
আর মার্জরীকে দেখতে পাই নি।
শুনলাম, অসহ্য বুকের ব্যথায় অজ্ঞান
হয়ে পড়ে---আর জ্ঞান হয় নি। যে
বাড়ীতে ছিলাম, তার অন্য অন্য ফ্ল্যাটের
লোকেরা ডাক্তার ডাকিয়ে অনেক চেষ্টা
করেছেন---কিন্তু কোনও ফল হয় নি।

আজই কোর্টে বেরুবার সময় আমার
গলা জড়িয়ে বলেছিল---একটু সকাল
সকাল ফিরে আসার চেষ্টা করো। আজ
সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনে বেড়িয়ে
সিনেমা দেখে বাইরে কোথাও খেয়ে
আসব। বলেছিলাম, 'আচ্ছা'।

কিন্তু যখন ফিরে এলাম---মার্জরী
নেই। কোথায় গেল? কার সঙ্গে,
কোন সিনেমা দেখতে গেল। এ প্রশ্নের
কোনও উত্তর নেই।

মার্জরী চলে গেল। একা---সমস্ত
ইংলণ্ডে, মনে হল আমি যেন একা।
অসম্ভব হল এ দেশে টিঁকে থাকা।

ক্রমে ঠিক করে ফেললাম---আমি
দেশেই ফিরে যাব। আর ইংলণ্ড
নয়।

(ক্রমশ।

পৃথিবীর বৃহত্তম টানেল

বাষট্টি বছর আগে, এক মনোরম বাসন্তী প্রভাতে ছোট্ট সুইস শহর ব্রিগের সব নাগরিকেরা উঠে পড়েছিলো বিছানার মায়া ছেড়ে ঝটপট।

সিমপ্লন পাশের ঠিক পাদদেশেই অবস্থিত, ছোট্ট শহরটির লোকেরা সকাল সকাল শয্যাত্যাগ করে তদারক করছিলো রাস্তাঘাট ও রেলওয়ে স্টেশনটির, সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিলো সব, ফুল ও পতাকা দিয়ে।

সেদিনটা ছিল ১৯০৬ সালের ৯ই মে, বোধ হয় ব্রিগের ইতিহাসে সব-চেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা দিন।

সেদিন নবনির্মিত রেলওয়ে টানেল সিমপ্লন পাশের ভেতর দিয়ে ইটালীর রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েল আসছেন, সুইস কনফিডেরাসীর প্রেসিডেন্ট ম্যঁসিয় ফরারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।

এই বিশেষ দিনটির প্রায় একশো বছর আগে, আরও একদিন উৎসব মুখর হয়ে উঠেছিলো এই নগরী, এই ধরণেরই কোন এক উপলক্ষে, সেদিন নেপোলিয়ানের আদেশে আলপসের ওপর দিয়ে ৬৫৯০ ফুট লম্বা এক রাস্তা নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছিলো।

কিন্তু সেদিনের সে কৃতিত্বের মহিমা আজ অনেকটাই খণ্ডিত, কারণ আলপসের দেহ ভেদ করে আজ তৈরী হয়েছে যে নতুন টানেল তার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে সহজতর, বারো মাইল পাঁচশো সাঁইত্রিশ গজ লম্বা এই টানেল এখনও পৃথিবীর বৃহত্তম টানেল।

ব্রিগ শহরের অধিবাসীরাও যে আজ এত উন্নতি তা মোটেই অকারণ নয়, মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে তারা ইটালীতে এই টানেলের কল্যাণেই তো ? আগে কত না ঝামেলা পোয়াতে হত।

ঠিক সময়ে রাজকীয় অতিথিকে বহন করে ট্রেনটি সুসজ্জিত স্টেশনে এসে ঢুকলো। তোপধ্বনি করেও গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হল ইতালীর নরপতিকে—পদস্থ কর্মচারি-বর্গের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ফরার স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, অভ্যর্থনা শেষে সকলে স্টেশনেরই এক বৃহৎ কক্ষে ভোজন সমাধা করলেন মহাসমারোহে। দুটো বেজে ত্রিশ মিনিটে দলটি আবার রওয়ানা হল ইটালীর দিকে টানেল অতিক্রম করে—এবার সুইস প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সঙ্গদান করলেন, ইতালীর নর-পতিকে।

ইতালীর প্রান্তীয় শহর ডোমো-ডোসলাতে পূর্ববৎ সমারোহের সঙ্গে

রেবা দেবী

অভ্যর্থনা করা হল মান্য অতিথিকে বন্দুকের আওয়াজে, জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে বাজি পুড়লো, গার্ড অফ অনারও প্রদর্শিত হল, শেষ পর্যন্ত বিরাট এক ভোজও দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে সমাপ্ত হল সিমপ্লন টানেলের দ্বারোদঘাটন উৎসব।

ঠিক আট বছর আগে, ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্থুরু হয়েছিলো উক্ত টানেল নির্মাণের কাজ, হামবুর্গের এক ঠিকাদার সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়েছিলো ঐ গুরুদায়িত্বভার।

প্রথমটা শান্তির সঙ্গে কাজ চালিয়ে গেলও প্রায় মাইল চারেকের মত খনন-কার্য চালাবার পর এক অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হতে হল কর্মকর্তাদের, তাপমাত্রা উঠে গেলো ১১৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটে।

৯০ ডিগ্রী তাপ অবধি হিসেব করা ছিলো ইঞ্জিনীয়ারদের, কিন্তু এত

তাঁরা, যে খাই প্রেশার কৃত্রিম বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করে ও বরফ জল পাথরের ওপর ছিটিয়ে ছিটিয়ে কোনক্রমে কাজ চালু রাখার জন্য সচেষ্ট হলেন তাঁরা।

ইতালীর প্রান্ত ঘেঁষা টানেলে কাজ করাটা অবশ্য অত কঠিন হল না তবু সেখানেও কিছুটা অসুবিধা করতে হল বৈকি।

পাহাড় কেটে গর্ত করার সময় আর এক ধরণের বিপদ দেখা দিলো, মনে হল পাথরের চাপ ক্রমেই নীচের দিকে নেমে আসছে। অগত্যা সমস্ত টানেল জুড়ে মাপমাফিক লোহার জয়েস্ট বসাতে হল এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য।

জয়েস্ট বসানোর পর যেটুকু ফাঁকা জায়গা রইলো তা ভরানো হল সিমেন্ট দিয়ে।

ত্রিশ লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ড খরচা হল মোটামুটি, টানেলটি তৈরী করতে, চার হাজার লোক খেটেছিলো এই কাজে এবং আটচল্লিশ জন প্রাণ দিয়ে-ছিলো এই কাজ করতে করতে, এদের মধ্যে ছিলেন প্রধান স্থপতি অ্যালফ্রেড ব্র্যাণ্ডট।

বলা বাহুল্য যে উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের প্রধান যোগসূত্র হিসাবে প্রথমাবধিই এই টানেলের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ।

ক্রমশঃই একটি পাইলট টানেল খননের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। অবিলম্বে এবার এ কাজে সরাসরি এগিয়ে এলেন সুইস সরকার, জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই পাইলট টানেল খননের মত ব্যয়সাধ্য কর্মেও তাঁরা ব্রতী হলেন নির্দ্বিধায়। সুরু হয়ে গেল কাজ এবং যথাসময়ে সমাপ্তও হল। ১৯২১ খৃস্টাব্দে দ্বারোদঘাটন হল পাইলট টানেলের।

এত বিলম্ব হওয়ার কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং সেই ধরণেরই কয়েকটি বাধাবিপত্তি যা নাকি দেখা দিয়েছিলো প্রথম টানেলটি নির্মাণকালেও।

খুব বেশী করে ধরলেও দুটি টানেলের দেওয়াল পরস্পরের কাছ থেকে

মাত্র চল্লিশ ফুট তফাতে দাঁড়িয়ে-ছিলো। এক এক জায়গায় তো এটুকু ব্যবধানও ছিলো না।

আলপস পর্বতের ঠিক মাঝামাঝি এক জায়গায় টানেল দুটি পাশাপাশি এসে গিয়েছিলো একেবারে, এমন কি ভিন্ন প্রাচীর তোলারও উপায় ছিলো না একটুও, ফলে চৌকোমতন একটা ঘরের দুপাশে অবস্থিতি ঘটলো দুটো টানেলের কিছুটা পথ ব্যেপে।

যুদ্ধের সময় সুইসরক্ষীরা দিবা-রাত্র পাহারা দিতো টানেলে প্রয়োজন হলে মুহূর্তে যাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে টানেল ধ্বংস করে দেওয়া যায়, সে আয়োজনও প্রস্তুতই থাকতো সদা সর্বদা।

যুদ্ধকালে গুরুত্বপূর্ণ ঐ পথ যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে, সেজন্য সব সময়ই সতর্ক থাকতে হতো সুইস সরকারকে।

বছর বছর সুইটজারল্যাণ্ডে এই যুগ্ম টানেলের জন্মোৎসব পালন করা হয়। বহুদিন আগে তৈরী করা হয়ে থাকলেও আজও স্থাপত্যবিদ্যার উজ্জ্বলতম এক নিদর্শন হিসাবেই গণ্য হয়ে থাকে অদ্বিতীয় এই সিমপ্লন টানেল।

আধুনিক পূজা ও আড়ম্বর

মনুষ্য সৃষ্টির আদিকাল থেকেই দেখা যায় যেখানে ব্যক্তির শক্তি কোন প্রাকৃতিক শক্তি বা কোন পরাশক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে, সেখানেই ব্যক্তি বশ্যতা স্বীকার করেছে সেই সকল উচ্চ শক্তির কাছে। শুধু বশ্যতা স্বীকারই নয়, দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পণ করেছে জ্ঞানাতীত, ধারণাতীত সেই সব দুর্জয়, দুর্জ্ঞেয়, দুরন্ত শক্তির কাছে, পরম নিষ্ঠা-ভরে। এই নিষ্ঠাই পরবর্তীকালে তাকে টেনে এনেছে পূজা-পাঠের পুণ্য অঙ্গনে। বনের লতাপাতা সাপ বাঘ, জলের হাঙ্গর কুমীর, আকাশের মেঘ বিজলী থেকে সুরু করে ক্রমে সূর্য চন্দ্র বরুণ ইন্দ্র শিব-দুর্গা কালী করালীর পূজার মধ্যে। স্পৃশ্য ও দৃশ্য জগতের বাহিরে যাহা কিছু তাহাকেই সে একটি সহজ বোধ ও ধারণার রাজ্যে আনিবার জন্য মূর্তি গঠনে ব্রতী হয় এবং এইভাবে মনুষ্যসমাজে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। মন ও বুদ্ধির অগোচর, স্বীয় শক্তি অপেক্ষা শত সহস্র গুণ শক্তিসম্পন্ন কোন বস্তু বা ভাববস্তুর নিকট আপন সত্তার নিঃশেষ নির্দ্বিধ আত্ম নিবেদনের ভিতর দিয়া যে পূজা হইত তাহাতে ছিল পরিপূর্ণ নিষ্ঠা কিন্তু অনাড়ম্বর আয়োজন।

লতাপাতা ঘেরা গ্রাম্য পরিবেশে মাটির প্রদীপ, নৈবেদ্যের মৃৎপাত্র, বনের ফলমূল, সর্বোপরি আরাধ্যের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন শুচিশুভ্র পুরোহিত ও তাঁকে ঘিরে ভক্তিনম্র নতমুখ গ্রামবাসিগণ পূজা-লয়ে শুচিতা ও মহিমা প্রকট করিত। মূর্তির অবয়বে ফুটিয়া উঠিত কোন নৈসর্গিক ভাবের দ্যুতি। বস্তুত মূর্তি রচনায় প্রাধান্য পাইত বস্তুজগতের বাহি-রের কোন কাল্পনিক স্বর্গীয় রূপরেখার। আধুনিক মূর্তি রচনায় যে ধারাটি দেব-দেবী মূর্তিকে পরিদৃশ্যমান মনুষ্য সন্তানের আকৃতি বিশিষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, অঙ্গের সাজসজ্জায়, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে, মনুষ্য সন্তানের সম-গোত্রীয় করিতে যত্নবান হইতেছে, সে সব দিনে তাহা মানুষের ধ্যান ধারণা ও ইচ্ছার বহির্ভূত ছিল। তাহারা মূর্তির মধ্যে অসীমের সন্ধান করিত, সসীমের নয়। তাই অবিচল নিষ্ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা পূজাঙ্গন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত, অসংলগ্নভাবে পূজাঙ্গন হইতে পদাঙ্গনে প্রমোদ ভ্রমণ করিয়া পূজাঙ্গনকে ধন্য করিত না। বর্তমান-কালের ন্যায় পূজাঙ্গনের আড়ম্বরসজ্জা সৃষ্টি করিতে তাহাদের সমস্ত শক্তি, অনুরাগ, ধৈর্য ও চাতুর্য নিঃশেষিত হইত না, পরন্তু প্রাকৃতিক বাতাবরণে উপস্থিত পূজার্থী ও পূজার্থিনীগণের একান্ত ভক্তির সামগ্রিক ধারাটি যেন মূর্তিকে ঘিরিয়া সেই স্থানে কোন অলৌকিক অলক্ষ্য আবির্ভাবকে অনুভব করাইত।

মাটির প্রদীপ জ্বলিত, এখনও জ্বলে, কিন্তু একালের ন্যায় কোন নিওনের চোখ ধাঁধানো আলোয় প্রদীপের আলো নিষ্প্রভ দেখাইত না। ঢাক বাজিত, এখনও বাজে, কিন্তু মাইকের গানে পূজা-প্রাঙ্গণ সর্বক্ষণ মুখরিত থাকিত না। পূজাঙ্গনের গাম্ভীর্যময় পরিবেশকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া পুরোহিতের সধ্যান-পূজায় বিঘ্ন ঘটাইত না কিংবা তাঁহার সুললিত মন্ত্র-ধ্বনিকে সেই বজ্রধ্বনির অন্তরে তলাইয়া দিত না। প্রতিমা দেখিব, না প্রতিমার চারিপাশের রূপ ও রসের সমারোহ দেখিব। ধ্যানসমাহিত করিব ওই স্থির নিশ্চল স্বর্গীয় রূপরেখার আয়তনে, না পরিবর্তনশীল, সদাচঞ্চল চিত্তবিচলিত-কারীবিভ্রান্তিকর আঙ্গিকের রূপরেখায়।

কোন মান্যগণ্য ব্যক্তির দ্বারা প্রতিমার আবরণ উন্মোচন না করা পর্যন্ত বর্তমানের পূজাঙ্গনের দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় না, অথচ সেকালে প্রতিমার পরিকল্পনার প্রথম স্তর হইতে প্রতিমা পূজাবেদীলগ্ন হওয়া পর্যন্ত সকলেরই স্বাধীন দর্শন ও অবাধ আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ ছিল। প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক বিতরণের হয় চালোয়া বন্দোবস্ত, প্রসাদ মেলে কি মেলে না, পুরোহিতের, বাজনদারের পাওনায় পড়ে ঘাটতি, কাঙ্গালীর ভোগে পড়ে ঘাটতি। দর্শনার্থী আগন্তুকের প্রতি থাকে না পূজার উদ্যোক্তাদের সেই প্রাণখোলা সাদর আহ্বান, সবই যেন যান্ত্রিক, দায় সারা ভাবে চলে। বিসর্জনের দিনের সেই করুণ ভাবের লেশমাত্রও আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন আড়ম্বর-পূর্ণপূজা, তেমনই আড়ম্বরপূর্ণ বিসর্জনের আয়োজন। লোকলস্কর, গাড়ী, হাসা-নাচা-সিস দেওয়া। বিষাদের সুরে করুণ আবহাওয়া নয়, যেন বীভৎসতার এক তাণ্ডবময় পরিবেশ। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা হাল্কা ও অশালীন ভাবের মধ্য দিয়ে আধুনিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। জাতিকে এইরূপ আচার সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের মুক্তি নাই।

---শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি যূথিকাকে নিয়ে কিছু অসুবিধায় পড়েছেন সুরেশ্বর। অবশ্য অসুবিধার কথাটা নিজের মনেও স্বীকার করছেন না তিনি। কিন্তু একটা কাঁটা বিঁধছে খচ খচ করে। মুশকিলটা বেঁধেছে যূথিকার মেয়েকে নিয়ে।

যূথির সেই পাঁচকে মেয়েটা, যাকে মিশনারী আশ্রমে রেখে মাসিক একটা খরচ বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন, সেটা বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে মেয়েটা। আশ্রম হতে চিঠি এসেছে, এখন হয় তাকে নিয়ে যেতে হবে, না হয় খৃস্টান করে দিতে হবে মেয়েটাকে। তখন মায়ের আর কোনো দায়-দাবি থাকবে না, আশ্রমের হয়ে যাবে সে। এই ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই ভাল ছিল কিন্তু যূথিকার মুখের দিকে চেয়ে একটু দুর্বলতা এল সুরেশ্বরের। আর মজাটা এই, যে জীবনে একটু দুর্বলতা এলেই বিপদে পড়েন সুরেশ্বর। এবার ও পড়েছেন। সুরেশ্বরের সম্মতি পেয়ে

শরীরটা কেন সুরেশ্বরের আয়ত্তের মধ্যে আসবে না, তা ভেবে পান না তিনি।

●

একদিন যেমন কুসুমের কাছে লোক গিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে সুরেশ্বরের লোক এল যূথিকার কাছে। দশ হাজার টাকা পাবে যূথিকা। কাশী-বৃন্দাবন যেখানে ইচ্ছা তার, ছোট একখানা বাড়িও করে দেবেন সুরেশ্বর। মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাক সে। কলকাতার বাড়ি মেয়ের নামে লিখে দেবেন সুরেশ্বর। মাসিক বরাদ্দ ইত্যাদিও থাকবে বিধিমত।

অস্ফুটে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল যূথির মুখ হতে। আতঙ্কে সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। কি সর্বনাশ করেছে যূথিকা মেয়েকে বাড়িতে এনে। খৃস্টান হয়ে ধর্মের একটা পবিত্র আশ্রয়ে থাকত হিমিকা, এ যে একেবারে কুমীরের মুখে এনে ফেলেছে সে মেয়েকে। চোদ্দ বছর ধরে যূথি জানে সুরেশ্বরকে। তিনি যা জেদ ধরেন, তা হতে নিবৃত্ত করবার সাধ্য নেই কারোর। যা

সর্বনাশ হয়েছে তোর। তা এতে আবার ভয়-ভাবনার কি আছে। বরং আহ্লাদ হবে, তা না কাঁদতে এসেছিস। তোর সামনে এখন ভারী বয়েস। এখন তো ওসব ছাড়লেই ভাল। দিব্যি তীর্থ-ধর্ম করবি, ঠাকুরের দোরে পড়ে থাকবি। অবিশ্যি তোদের তো আর পরকাল নেই, সব জন্মেই এই কাজ কত্তে হবে। ভাল হয়ে থাকলে স্বর্গের বাইউলি হবি, দুষ্টু বজ্জাত হলে যাবি নরকে, বিষ্ঠার গর্তে ডুববি। সুরেশ্বর তোর মেয়েকে চাইছে, মানে মানে সরে দাঁড়া। কান্নাকাটির কি আছে? আমি বাপু কিছু বলতে পারব না তাকে। তেজী পুরুষ মানুষ, টাকা আছে, শখ হয়েছে একটা, আমি কেন বাধা দিতে যাব বল?

—হিমিকে আমি পাপের পথে যেতে দেব না মা। কান্না নিষ্ফল বুঝে চোখ মুছে ফেলল যূথিকা।

—দিবি না? সুরেশ্বরকে রুখবি তুই? বড্ড সাহস হয়েছে যে তোর। কুকুরকে নাই দিলেই অমনি হয়।

ধারাবাহিক উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

যূথিকাতো নাচতে নাচতে মেয়ে নিয়ে এসেছে বাড়িতে, আর সেই সতেরো বছরের মেয়েটাকে দেখে একেবারে চমকে গেছেন সুরেশ্বর।

লম্বা ছিপছিপে চেহারার একটা মেয়ে। চারুছন্দে হেঁটে যায়, ডাকলে বড় বড় পক্ষ্ম-ঘেরা চোখ নত করে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়। সুরেশ্বরের বুকের রক্ত উদ্দাম হয়ে ওঠে তখন। অবশ্য ষাট বছর বয়সে যতটা উদ্দাম হয়ে ওঠা সম্ভব।

যূথিকার মেয়ে। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে সুরেশ্বরের অর্থে ওর দেহ পুষ্ট হয়েছে, পুরুষকে মাতাল করবার জন্য যৌবনের লাবণ্যে ভরেছে। ওরা কেন জন্মায়? ওরা তো সমর্থপুরুষের সামর্থ্যকে তুষ্টি দেবার জন্যই পৃথিবীতে এসে থাকে। তবে যূথিকার মেয়েই বা কেন সুরেশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে না, কৃতার্থ হবে না তাঁর ভোগে লেগে।

শান্তিনগরের মার্বেল-প্যালেসের নরম বিছানায় শুয়ে শরীর গরম হয়ে ওঠে, বাতাসে আরাম নেই, বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করতে থাকে। কলকাতার সেই লাল বাড়ির দোতলায় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা সতেরো বছরের নরম শরীর। চোদ্দ বছরের

চাইবেন, ছলে-বলে কৌশলে নিশ্চয়ই নেবেন সে জিনিষ। কি করবে যূথিকা! তার হিমিকে দেখবে নষ্ট হয়ে যেতে? বিছানায় শুয়ে বলেছিল জগৎ—তোমার মেয়ে হলে, তাকে বরং মেরে ফেলো তবু খারাপ হতে দিয়ো না। তার স্বামী জগৎ—কত সুন্দর কথা বলেছিল যূথিকে। কোনো কথা রাখতে পারে নি সে। খারাপ, নষ্ট দুষ্টু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হিমিকাকে বাঁচাবে যূথিকা। যে করে হোক, রক্ষা করবে রাক্ষসের গ্রাস হতে। তারপর সঁপে দিয়ে আসবে আশ্রমে মা-মণির হাতে।

কুমারটুলীর বাড়িতে হরপ্রিয়া এসেছেন কার্তিক মাসে গঙ্গা-বাস করতে। যূথিকা এসে প্রণাম করল তাঁকে।

—ওমা, যূথি! তা এই সন্ধ্যেবেলায় কোথা হতে এলি? হয়েছে, হয়েছে, আর এগুস নি। শেষে ছুঁয়ে দিবি। আমি বাপু মরছি বাতের জ্বালায়, ভর সন্ধ্যেতে ডুব দিতে পারব না। বোস ঐ মোড়াটায়। তারপর বল শুনি কি বৃত্তান্ত।

বৃত্তান্ত রুদ্ধ কণ্ঠে বিবৃত করল যূথিকা।

মাথা নীচু করে কিছু সময় বসে থেকে যাবার জন্য পা বাড়াল যূথিকা। ততক্ষণে হরপ্রিয়ার মাথায় আর একটা মতলব এসেছে। তিনি খুশী হলেন কথাটা মনে পড়ায়। হরপ্রিয়ার বাপের বাড়ি বৈষ্ণব-মন্ত্রী। মায়ের গুরুদেব রাধা কানুচরণ গোঁসাই বাবাজীর সেবাদাসীটি গত হয়েছে কয়েক মাস হল। সত্তর বছরে ভারি কষ্ট পাচ্ছেন সেবাদাসী ছাড়া।

—দাঁড়া, দাঁড়া যূথি। তোরই ভাগ্য, ভাল কথা মনে পড়েছে আমার। গোঁসাই-দাদুর সেবাদাসী করে দে তোর মেয়েকে। ধর্ম ধর্ম করছিলি, একেবারে উদ্ধার হয়ে যাবে মেয়ে। বৃন্দাবনে থাকবে, রাধাকানুচরণ গোস্বামীর চরণসেবা করবে, আর কি চাস? যা, বাড়ি যা এখন। একটু বুদ্ধি করে সুরেশ্বরকে ঠেকিয়ে রাখ ক'দিন, তারপর আমি গোঁসাইদাদুর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

পায়ে পায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল যূথিকা। সেবাদাসী হতে হবে হিমিকাকে। হয় রক্ষিতা, নয় সেবাদাসী, আর কোনো পথ নেই ওর জন্য। আর একটা পথ আছে, সামনে বইছে গঙ্গা। তাকে বলে সবাই পতিতপাবনী।

রাতের আঁধারে মেয়ে নিয়ে এসে গঙ্গায় নামলে হয়। মাথা নীচু করে কোনোমতে গাড়ীর কাছে এল যূথিকা। বাধা পেল গাড়ীতে উঠতে গিয়ে; সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলে।

—আমি অলকেশ্বর, সুরেশ্বর বাবুর মেজ ছেলে। পরিচয় দিতে মুখ লাল হ'ল অলকের।

নিজের অজ্ঞাতেই মাথায় কাপড় আরো একটু টানল যূথিকা।

—গাড়ীতে উঠুন। আমি একটু যাব আপনার সঙ্গে, কথা আছে।

কথা! বুকের মধ্যে নিজের ধক্ ধক্ শব্দ শুনল যূথিকা। এ-ও হিমিকে রক্ষিতা রাখবার প্রস্তাব করবে নাকি!

গাড়ীতে যূথিকার মুখোমুখি বসল অলক।

—আপনি ঠাকুমাকে যা বলেছেন, আমি শুনতে পেয়েছি সে সব। মেয়েকে বাঁচাতে হ'লে, কান্নাকাটি চলবে না। শক্ত হয়ে থাকবেন আপনি। আপনার মেয়েকে পাঠাবার মত কোনো নিরাপদ আশ্রয় আছে ?

—আছে, আছে। অকূলে যেন কূল দেখল যূথি।

—মিশনারী আশ্রমে ছিল ও ছোটবেলা হতে। সেখানে পৌঁছে দিলেই তারা ওকে রাখবেন। কোনো ভয় থাকবে না আর। কিন্তু পৌঁছে দেবে কে? দরোয়ান পাহারা দিচ্ছে। হুকুম নেই হিমির বাইরে যাবার।

—ঠিক আছে। আমি পৌঁছে দেব আপনার মেয়েকে। সোমবার সকালে আসব।

—দরোয়ান—

—দরোয়ান ঠেকাতে পারবে না আমাকে।

দু' চোখ ভরে আবার জল নামল যূথির। দু' হাতে অলকের পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকাল। বাধা দেবার সময় পেল না অলক। আবার রক্তবর্ণ হ'ল তার মুখ।

—ভয় নেই। গাড়ী থামিয়ে নেমে গেল অলকেশ্বর।

ভয় নেই বই কী! গাড়ীর পা-দানীতে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে মহাবীর পরসাদ। রাজাবাবুর সঙ্গে বেইমানী করতে চাইছে যূথিকা বিবি। মেয়ে দেবে অলকবাবুকে। সোমবার মেয়ে নিয়ে ভেগে যাবে অলকবাবু।

বৈঠকখানার বসে গড়গড়া টানছিলেন সুরেশ্বর। যূথিকা উপরে উঠে গেল, দেখলেন। মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। তাছাড়া যূথির বাইরে যেতে বারণ নেই। নিষেধ দিয়েছেন শুধু তার মেয়ের সম্বন্ধে। সেলাম দিয়ে এসে দাঁড়াল মহাবীর।

—কি-রে?

—হুজুর মালিক—

—কি বলবি?

—হুজুর যূথিকাবিবি বহুৎ বেইমান আছে। অলকবাবুর নামে নালিশ দিয়েছে মাইজীর কাছে। অলকবাবু ওর লেড়কীটাকে নিয়ে যাবে সোমবার সকালে।

নিমেষের মধ্যে রক্ত উঠে গেল সুরেশ্বরের মাথায়। সিঁড়ি কাঁপিয়ে উঠে এলেন তিনি।

●

যূথিকার কানে বাজছিল হরপ্রিয়ার কথা—আর মুক্তি নেই তোদের। কেন মুক্তি নেই? অহল্যার তো উদ্ধার হয়েছিল। তাকে উদ্ধার করতে গোলোক ছেড়ে নেমে এসেছিলেন ভগবান এই দোষ-ভুল ভরা পৃথিবীতে। আর যূথির হিমিকা তো নষ্ট হয় নি। ওর জন্মে কোনো কলঙ্ক নেই। মায়ের চোখের সামনে, তাঁর প্রসাদী সিঁদুর পরিয়ে, কালীমন্দিরে যূথিকাকে বিয়ে করেছিল জগৎ। তবে হিমিকাকে নষ্ট হতে হবে কেন? সেদিন তো যূথিও নষ্ট ছিল না। জগতের বউ হয়েছিল সে। বাকী জীবন তার বিধবা বউ হয়েই বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। বড়লোকের টাকা, যূথির নিরুপায়, জোর করে খারাপ, নষ্ট বানাল তাকে। তারপর হতে সত্যি সত্যি নষ্ট হয়ে গিয়েছে যূথিকা। সুরেশ্বরের হুকুমে কতবার নষ্ট হতে হয়েছে তাকে। ওর আর মুক্তি নেই। মুক্তি নেই রম্ভা-মেনকাদেরও। হুকুম হলেই ওদের সাজতে হবে, ছুটতে হবে সব অন্যায় কাজ করবার জন্য। ওরা চিরদিন স্বর্গের পতিতা হয়ে থাকবে।

কিন্তু যার হুকুমে ওরা পতিতা হ'ল, তার? তার আবার কি হবে। ওরা যে পুরুষ, ওদের কাছে পাপ ঘেঁষতে ভয় পায়। ওদের খুশী করবার জন্যই স্বর্গেও পতিতা চাই, না হ'লে স্বর্গের সুখ সম্পূর্ণ হবে না। কি আশ্চর্য ব্যাপার, কত ধর্মবন্ত পুণ্যবন্ত জন আসে যূথিকাদের কাছে, তাঁরা সমাজের নেতা স্বর্গের রাজা। আর তাঁদের সংসর্গ করবার পাপেই যূথিকারা হয়ে গেল পতিতা।

হরপ্রিয়া বলছেন হিমিকে গুরুঠাকুরের সেবাদাসী করে দিতে। সত্তর বছরের গুরু। আশ্রম—সেখানেও চাই অল্পবয়সী সেবাদাসী। না হ'লে আশ্রম-সুখ পূর্ণ হবে না। ভেজাল ঘি দিয়ে তৈরী বাজে দোকানের সস্তা খাবার এক দুটো তুলসীপাতা ছিটিয়ে দেবতার ভোগ দিলেই যেমন অমৃত হয়ে যায়; তেমনি হিমিকে দুটো কাঠের মালা পরিয়ে, কপালে নাকে তিলক ছাপ মেরে দিলেই মহাপবিত্র হয়ে যাবে সে। তখন তার নতুন নাম হবে—সেবাদাসী। রক্ষিতার মেয়ে গোঁসাইবাবাজীর সেবাদাসী। এর চেয়ে আর বেশী কি সৌভাগ্য চায় যূথিকা হিমির জন্য? ভগবান! হিমিকা যে তার হিমানীর [illegible] পবিত্র। পৃথিবীর সম্বন্ধে, মায়ের কলঙ্ক সম্বন্ধে তার যে কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু [illegible] বড় [illegible]; একদিন সব [illegible] [illegible]। হিমিকার অন্তর চুরমার [illegible]...

আলোর নিচে বসে কি একটা বই পড়ছে হিমি, মাকে দেখে আবছা হাসল। যূথিকার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল, বন্ধ হয়ে এল গলা। তবু কথা বলল সে:

হিমি; যা বলছি ভাল করে শুনে নে। দুবার বলবার সময় পাব না। আমাকে তুই যা ভাবিস আমি তা নই। রাজাবাবুর রক্ষিতা আমি। কিন্তু আগে বিয়ে হয়েছিল। তোর বাবার নাম জগৎ সরকার তিনি সাধুপুরুষ ছিলেন, আমাকে ইচ্ছে করে বিয়ে করেছিলেন। অসময়ে চলে গেলেন; তাই এই দুর্গতি আমার।

হিমিকা বড় বড় চোখ তুলে স্তম্ভিত মুখে তাকাল মায়ের দিকে। দরজায় এসে দাসী দাঁড়িয়েছে।

—রাজাবাবু ডাকছেন।

—ডাকছেন? এক্ষুণি যাচ্ছি। তুমি সরুন ঠিক করুগে। একটু থামল যূথিকা। দাসী চলে যেতে আবার বলল—আমার ডাক পড়েছে, এক্ষুণি যেতে হবে। তোকে চান রাজাবাবু। যে করে পারিস, পালিয়ে তুই মা-মণির কাছে চলে যাস। খৃস্টান হলে তোকে আর ছুঁতেও পারবেন না।

—মা!

—চুপ, চুপ। আমি হয়তো আর আসতে পারব না তোর কাছে। ভয় পাসনে, পালাস। পিছনে জমাদার ঢুকবার সিঁড়ি আছে, গলির মুখে ছোট দরজা। তালা নেই খিল তোলা থাকে। যে করে হোক পালাস।

—রাজাবাবু ডাকছেন। আবার ডাকল দাসী। যূথিকা আর কথা বলল না, তাকালও না মেয়ের মুখের দিকে। ওদিকের বড় ঘরে ঢুকে গেল।

—এই হারামজাদি! কি পরামর্শ করেছিস তুই অলকের সঙ্গে?

একটা ঘুঁষি এসে লাগল মুখে, ঠোঁট কেটে রক্ত বের হ'ল।

—আমাকে অপমান করবি সেই পরামর্শ করছিস? জানিস তোর কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে তাড়িয়ে দেব। আমাকে চিনিস না তুই? দু' চোখ জ্বলছে সুরেশ্বরের, তাঁর বাবা ভুবনেশ্বরের চোখ।

—তুই মায়ের কাছে নালিশ করতে গিয়েছিলি, এত সাহস তোর!

প্রচণ্ড একটা চড় পড়ল যূথিকার মুখে। দেখতে দেখতে বাঁ চোখটা ফুলে উঠল।

—মেয়ে! বড় মেয়ের দেমাক হয়েছে তোর! এক্ষুণি চুলের মুঠি ধরে ওকে নিয়ে যাব অমিদ-বুলাকি দাসের বাগানে। রোজ সাতটা মানুষ ছিড়ে খাবে ওকে। বেচে দেব ধনজনের কাছে।

প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মত দেখাচ্ছে সুরেশ্বরকে। কিন্তু এবার ভয় পেল না [illegible]

যূথিকা। প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও যূথিকার সাহস দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলেন সুরেশ্বর। ভাবছিলেন—অলক বাড়িয়েছে এই স্পর্ধা। কিন্তু ভুল হয়েছিল সুরেশ্বরের। যে যূথিকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করেছিলেন তিনি, এ সে যূথিকা নয়। তার সামনে দাঁড়িয়েছে রক্ত-মাখা মুখে মা যূথিকা। ভগবান তাকে বাঘিনীর ভয়াল দাঁত, বিকট নখ দেন নি বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য। তার ছিল কেবল চোখের জল, পায়ে ধরে কাতর প্রার্থনা। ছুটে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল যূথিকা। দু'হাত বিস্তার করে পথ আটকাল।

—একবার, একবার আমার কথা শুনুন। আপনার নিজের মেয়ের মুখ মনে করুন একবার।

নিজের মেয়ে! যূথিকার স্পর্ধায় যেটুকু বোধশক্তি বাকি ছিল, তাও হারালেন সুরেশ্বর। লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল যূথি। আর একটা লাথি দিলেন। শক্ত হাতে গলা টিপে ধরলেন।

—যা, মর, বজ্জাত কসবি। গড়াতে গড়াতে যূথিকার অচেতন দেহটা একতলায় এসে ঠিকরে পড়ল।

—রামু!

—হুজুর! কাঁপতে কাঁপতে গড়গড়া নিয়ে এল রামু। কাঁপছিল বাড়ির অন্য দাসী চাকর দুজনও। অনেক জলের ঝাপটা, পাখার বাতাস দিয়ে, এতক্ষণে বুঝেছে ওরা, আর জ্ঞান হবে না যূথিকার।

মোড়ের ডাক্তার দু'হাজার টাকা পকেটে রেখে ডেথ-সার্টিফিকেট দিলেন—৭৭ নম্বর বাড়ির যূথিকা দাসীর হার্টফেল করে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ফোন পেয়ে এল সংকার সমিতি। ছত্রিশ বছরের একটি লাঞ্ছিত জীবনের সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু হিমিকা, পতিতা মায়ের মেয়ে, কুটিল পৃথিবীর পথে অনভিজ্ঞা কিশোরী, তার কি হল? তাকে কি সেই রাতেই বুলাকি দাসের বাগানে পাঠিয়ে দিলেন সুরেশ্বর। ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল সে লালসার দশনাঘাতে? না না, ঠিক অতটা নিষ্ঠুর নন সুরেশ্বর। তারপর চোদ্দ বছর ধ'রে অনুগত হয়ে থাকা মেয়েটাকে মেরে ফেলে, ঠিক অনুতাপ না হলেও মনটা বিচলিত হয়ে গেল খানিকটা। তারপর আবার সীতারাম কানোরিয়া যূথিকার মৃত্যু শুনে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে ফেলল।

—চুক চুক! ওমোন সুন্দর হেলথ, একেবারে কাবার হোয়ে গেল? একটা ডাংদার দেখলাবার সময় পেলেন না? বড়ি তাজ্জব কি বাত।

বেশ বোঝা যাচ্ছে সীতারামজীর পছন্দ হয়েছিল যূথিকে। দু'একটা রাতের বদলে, বেশ সুবিধা পাওয়া যেত।

না! একেবারে চণ্ডাল রাগ। বয়েস হল, তবু রাগ হ'লেই পৃথিবী লাল হয়ে ওঠা। সেবার কারখানাতেও লাথি লাগিয়ে, মেরে ফেলেছিলেন একটা কুলিকে। তারপর কি ঝঞ্ঝাট। আর কি বেইমান যূথিকা। অলকের সংগে পরামর্শ। তাকে মেয়ে দিতে আপত্তি নেই। আপত্তি সুরেশ্বরের বেলা। কেন? বুড়ো হয়েছেন ব'লে? বুড়ো! আবার প্রচণ্ড রাগ হয়, মাথায় গিয়ে রক্ত ওঠে। তীব্র আক্রোশে অলকের চব্বিশ বছরের শরীরটা টুকরো টুকরো করে কাটতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, যৌবন বয়সে একবার আলতাবাইয়ের সংগে তার তবলা বাজিয়ে ছোকরাকে দেখে যেমন চাবুক মেরে তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলেন, তেমনি শাস্তি দেবেন অলককে। অলক আর ছেলে নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী, কেড়ে নিতে এসেছে অধিকৃতা নারীকে। ডাকলেন সরমাকে।

—তোমার ছেলের কীর্তি-কাহিনী শুনেছ নাকি?

বিবর্ণ হল সরমা। তোমার ছেলে ব'লে সুরেশ্বর সর্বদা অলককে নির্দেশ করে থাকেন।

—লালবাড়ির মেয়েমানুষকে ফুসলে সরিয়ে আনছে তোমার ছেলে। মেয়ে-বাজি করবার মত টাকা পায় কি করে? দিচ্ছ নাকি মোটা কিছু বাপের বাড়ির মাসোহারা হ'তে?

সরমা গরীব ঘরের মেয়ে, তারি ইংগিত। নত মুখে রইল সরমা। বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল—অলক, অলক করবে এমন কাজ! তাও কি সম্ভব! নাকি বংশের রক্তের দাবি!

—সাবধান করে দিয়ো শুয়ারকে। বাড়াবাড়ি করলে, ত্যাজ্যপত্র করে, বের করে দেব শান্তিনগর থেকে।

●

স্ত্রীর মারফৎ ছেলেকে শাসন করেও মনের অস্থিরতা কমছে না। ব্যবসা-পত্র, আবার সামনে আছে ইলেকশনের ঝামেলা। মনটা স্থির হওয়া দরকার। মাঝে মাঝেই যূথিকার মুখ মনে পড়ে। খুব বাধ্য ছিল, কিন্তু ষড়যন্ত্র করতে গেল কেন অলকের সংগে। তাতেই তো মাথায় রক্ত চড়ে গেল। যাক, যা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। পাপ হ'ল? শাস্ত্রে আছে শূদ্র, স্ত্রী আর মাকড়শা বধের এক প্রায়শ্চিত্ত। তার মধ্যে আবার ঘৃণ্য স্ত্রী। বিশ্বাসঘাতিনী বেশ্যা। ওকে মারলে যদি পাপ হয়, তবে তো পাপ হবে কেঁচো মারলেও। তবে যূথিকার মেয়ের দিকে আর অগ্রসর হলেন না সুরেশ্বর। মেয়েটা নাকি দিন-রাত বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। থাকুক। ওর শান্তি ভংগ করে দরকার নেই এখন। শোক শেষ হলে নিজেই উঠবে, ওর মধ্যের পাপ-রক্ত লক লক করে জিভ বাড়াবে জ্বলবার জন্য। তখন নয়তো দেবেন সীতারাম দাসকে। কিন্তু বয়স হয়েছে সীতারামজীর। অত ছোট মেয়ে হয়তো পছন্দ হবে না। যাকগে, যা হয় করবেন ঘুরে এসে। এখন একটু ক'দিন কাটিয়ে আসবেন বাইরে গিয়ে।

বিশ্বস্ত দারোয়ান ছিলই, আরো একটা মুসলমান খবরদার রাখলেন পাহারা দেবার জন্য। কেউ যেন বাড়ির চৌকাঠেও পা দিতে না পারে।

সেলাম ঠুকে বলল আব্দুল: হামকো জান কবুল মহারাজ, কোই নেই কোঠীমে ঘুষনে সেকে গা।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুরেশ্বর একবার কাশীধাম ঘুরে আসতে গেলেন। এ সময়ে কাশীর স্বাস্থ্য ভাল, সুখাদ্য এবং ইত্যাদি। ইত্যাদির ব্যবস্থা তো সর্বদাই চমৎকার। যাবার সময় বুলাকি দাসকে তোয়াজ করে গেলেন। এবার তার মহাফিলের জৌলুষ বাড়াবার জন্য নয়া ছুকরী দেবেন। একদম নতুন—স্কুল-গার্ল, তার নতুন স্বাদ, নতুন গন্ধ।

নতুন স্বাদ, নতুন গন্ধ! স্তিমিত হয়ে আসা বাসনার শিখা আবার জ্বলে উঠল। নতুন স্বাদের লোভেই একদিন যূথিকাকে এনেছিলেন সুরেশ্বর। কিন্তু অনাঘ্রাতা যেমন ভেবেছিলেন তেমনটিও ছিল না সে। ওর সন্তান ছিল। যূথিকার মেয়ে কিন্তু একেবারে অস্পৃষ্ট। ওর ভীরু সরল চোখের চাওয়ায়, কুমারী শরীরে কেমন যেন অনাস্বাদিত মধু, কি যেন অপূর্ব একটা মাধুর্য আছে ওর। বয়স হয়েছে সুরেশ্বরের? তা হ'লই বা। টাকা গাড়ি-বাড়ি সোনা-মাণিক সব দেবেন তিনি। আর কি চাইতে পারে যূথিকার মেয়ে! আর চাইবার সাহস হতে পারে তার! পঁচিশ বছর বয়সের একটা উন্মাদনা অনুভব করেন সুরেশ্বর তাঁর রক্তের মধ্যে। —প্রৌঢ়ত্বে বালিকা বধূ সাবালা প্রাণদায়িকা। হিমিকার তরুণ বয়সের তাপ লেগে আবার তারুণ্যে ফিরে যাবেন তিনি।

অলকের ব্যাপারটা বাড়িতে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সুরেশ্বর কঠিন তিরস্কার করেছিলেন অলকের মা সরমাকে। হরপ্রিয়াও ছাড়েন নি, বলেছিলেন—অমন গর্ভে আগুন ধরিয়ে দাও বউমা। শত ধিক তোমার ছেলেকে। বাপের মেয়েমানুষের উপর চোখ! চোখে নুন টিপে অন্ধ করে দিতে হয় অমন ছেলেকে।

দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল সরমা। অলক—তার একমাত্র ভরসা অলক, সেও এমন হ'ল! বড় ছেলে অপদার্থ, বংশের সমস্ত দোষ নিয়ে জন্মেছে ছোট ছেলে। মহামায়াকে সে বুঝতেই পারে না। সরল

উদার অলকের দিকে চেয়ে জমিদার বাড়ির বউ হবার অভিশাপ সহ্য করছিল সরমা। অলকের প্রতি [illegible] সুরেশ্বর তা জানে সেই যে অলক বাপের সদৃষ্টিতে ছেলে পড়ল না সেই কারণগুলো জানে বলেই নিশ্চিন্ত ছিল এতদিন। কিন্তু একি শুনল, অলকের মধ্যেও জেগে উঠেছে বংশের জঘন্য প্রবৃত্তি? দুচোখে জল নিয়ে সরমা এসে ছেলের ঘরে দাঁড়াল। শুনবে ছেলে কি বলে।

—অলক, কি বিশ্রী কথা বলছে ওরা?

বিছানায় চুপচাপ শুয়ে অলক ভাবছিল কি করা যায়। লালবাড়ির ত্রি-সীমানার মধ্যে ঘেঁষবার উপায় নেই, জোর পাহারা বসেছে। অথচ যূথিকাকে সে আশ্বাস দিয়ে এসেছে। আশ্বাস দেবার মত জোর কি আছে তার? পারবে বাবার অদম্য ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে? পারবে না। মনে মনেই ঘাড় নাড়ল অলক। অজস্র আরাম আর অফুরন্ত নিশ্চিন্ত সুখের ব্যবস্থা সাহসী হতে দিচ্ছে না অলককে। হঠাৎ মায়ের কান্না-ভেজা চোখ দুটো দেখে চমকে গেল সে। উঠে বসল।

—কি হয়েছে মা? কে কি বলছে?

—তোর ঠাকুমা—, স্বামীর নাম মুখে আনতে সাহস, প্রবৃত্তি দুটোরই অভাব বোধ করল সরমা।

—কি বলছে ঠাকুমা?

—বলছেন তুই নাকি কোন খারাপ মেয়ে নিয়ে ভারি কেলেঙ্কারী করছিস।

—আমি? মা—।

—উনি, উনিও খুব রাগ করছিলেন। প্রাণপণে বলে ফেলল সরমা।

বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল অলক।

—তোমাকে কি বলেছেন বাবা?

—তুই নাকি ও'র—সেই লালবাড়ির কাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলি। ভীষণ কাণ্ড হয়ে গিয়েছে তার ফলে।

সরমাকে সুরেশ্বর বলেছিল যূথিকার মৃত্যুর কথা। —তোমার ছেলেকে ব'লো, বেশি পাখা বের করলে, ওর ঘাড়টাও অমনি করে নোখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলব আমি।

স্তম্ভিত অলক সব কথা শুনল মায়ের মুখে। দুপুরবেলা কলকাতা গেল, সমর সেনকে ধরল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। মুখবন্ধের দরকার হ'ল না। সমর জানালো যূথিকার মৃত্যু-কাহিনী। নগদ দু'হাজার টাকা পকেটে পেয়ে ডাক্তার ন্যাচারাল ডেথ্ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সমরই সব ব্যবস্থা করেছে।

—আপনি?

—হ্যাঁ, অলকবাবু আমিই করেছি। না হ'লে আমাকেই হয়তো খুনের দায়ে পড়তে হ'ত। যাকগে, আমি আপনার বাবার কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আমার কেবল একটা কথা বলবার আছে। লালবাড়িতে যূথিকার মেয়েটি আছে, পারলে ওকে রক্ষা করবেন। আপনার বাবার ইচ্ছা বুলাকি দাসকে [illegible] পাঠাবেন মেয়েটি।

●

অনেক রাত পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে সেই ঘৃণ্য আশ্রয়েই ফিরে আসতে হ'ল অলককে। সমরের কথার প্রতিবাদ করে নি অলক। সে জানত সমরের আশঙ্কা অমূলক নয়। সুরেশ্বরের নির্দেশ না মানলে অনায়াসে তাকে খুনী ব'লে ধরিয়ে দিতে পারেন তিনি। অলক চুপ করে রইল, কিন্তু তার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল, বেপরোয়া দুর্দমনীয় বংশের রক্ত। বাপের সঙ্গে শক্তি লড়াই দেবার জন্য প্রত্যেকটি স্নায়ু ওকে উত্তেজিত করছিল। কানে এল তিলকের কথা। পাশের ঘরটি তিলকের বৈঠকখানা। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ওখানে আসর জমায় তিলক। অন্তরঙ্গ কোনো পারিষদের কথার উত্তরেই হয়তো বলছিল সে—একেবারে আনকোরা নতুন মেয়ে। স্কুলে পড়া, দেখতে মল্লার মালার চেয়েও বেশি অ্যাট্রাকটিভ।

—কিন্তু তাকে তুমি হাত করবে কেমন করে? রাজাবাবুর শখের মেয়েমানুষ। শোনা গেল ভজু রায়ের গলা।

—আরে রাখ তোর রাজাবাবু। ছুঁড়ী-টাকে ক'দিন পোষাবে ষাট বছরের বুড়োয়? নাকাল হয়ে বাবা দেখবি ক'দিন পরই একটা মানানসই বুড়ী-টুড়ী যোগাড় করে নেবে। তখন—বুঝলি না?

—তা তোমার বাবার মেয়েমানুষকে তুমি—

—মেলাই ধম্মকথা বলিসনে ভজা। বাবার মেয়েমানুষ! আর বাবার প্রসাদ খাই না? এই যে বড়লোকী করছি, এও তো লাস্ত-গুষ্টির এ'টো প্রসাদ। মেয়েটাও তাই হবে। নয়তো একবার কপালে ঠেকিয়ে নেব।

তিলকের রসিকতায় পরম আহ্লাদে হ্যাক হ্যাক ক'রে হেসে উঠল ঘরশুদ্ধ সবাই। অলকের ইচ্ছা হ'ল, ভাইয়ের মাথাটা দেয়ালে ঠুকে ভেঙে দেবে। পাশের ঘরে তখনো তিলক কথা বলছে—মেজকর্তা তো মেয়েটার জন্য পাগল। পায়তারা কষছে বাবার সঙ্গে ডুয়েল ফাইট চাম্বাবার জন্য।

ঘর ভরে হাসির রোল উঠল। তিলক বলতে লাগল—এদিকে দাদা আমার ভাইপাড়ার ভচার্যি। ক্লাবে একবার উঁকি মারে না, সতীত্ব নষ্ট হবার ভয়ে। বাপের মেয়েমানুষের পিছনে ছুটছে,—তাতে কোনো দোষ নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করল অলক। শক্ত হয়ে বসে রইল ঘরের মধ্যে।

॥ ছয় ॥

[illegible] যায়। [illegible] খাওয়াটা বড় [illegible] হয়েছিল কি না। তাই বেঘোরে ঘুমিয়েছে। কল্যাণতার পাহাড় জমেছিল ডাস্টবিনে, পচে কত খাবার। মাছের অর্ধেক, মাংসের হাড়। প্রচুর লুচি। অমৃতি, রসগোল্লা তিন ঝুড়ি বোঝাই করেছিল ঝুমরা। কুকুরগুলো উৎপাত করে, তাই লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সোপা, দুখনা; আর ঝুমরা খাবার তুলেছে। এই ফুটপাথ-ফ্যামিলীটার লীডার হচ্ছে সে। ওরা ছ'জন মরদ চারটে জেনানা আর তিনটে বাচ্চা আছে এই দলে। শিউ বুড়ো আন্ধা হয়ে ভিখ মাগে, ঝুমরা সাচ সাচ খোঁড়া। অন্যেরা যে যেখানে ইচ্ছা হয় যায়। এক এক দিন তো চলে যায় কালীঘাটেও। ঠাকুর বাবা, কালী মাই—এসব জায়গাতে খুব ভাল ব্যবসা চলে। এক একজন পাঁচ ও ছ'ও রুপেয়া কামায় একদিনে।

সন্ধ্যেবেলাতে আস্তানায় ফিরে তিন ইটের চোকা বানিয়ে ভাত রাঁধে, রোটি বানায়। রান্না করে বাজার হতে কুড়িয়ে আনা সবজি। মেয়েরা রাঁধা করে, মরদরা গোল হয়ে বসে গল্প করে, বিড়ি ফোঁকে। তারপর পেট-ভর্তি খেয়ে তোফা ঘুম। বৃষ্টি এলেই যা মুশকিল। তখন আবার ফুটপাথ ছেড়ে লোকের বাড়ির রোয়াকে গিয়ে উঠতে হয়। বাবুরা টের পেলে ধমকে ধমকে ফের নামিয়ে দেয় রাস্তায়।

খুব ভোরে উঠে বাসি খাবার খেয়ে ঝুমরারা বেরিয়ে পড়ে রোজগারের ধান্ধায়। গত রাত্তিরে আর রান্না হয় নি। সামনের বড় বাড়িটাতে সাঁঝ হতেই ভোজ লেগেছিল। বাচ্চাগুলোকে প্রথম পাতার খাবার খাইয়ে দেবার পর, ঝুমরারা রাত দু'টোয় খেল বিরাট ভোজ। ঝুমরা দলের সর্দার। সমানভাবে সে খাবার বেটে দিয়েছে সবাইকে। ইঃ! কি রইস আদমী সব এসেছিল ভোজে— কিছু খায় নি ভারা। পাতা ভর্তি খাবার ঢেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে। সবাইকে প্রচুর দিয়েও কিছু রইল। বাচ্চা তিনটের মায়েদের হাতে দিল ঝুমরা সেই খাবার। সকালে উঠেই তো ওরা চিল্লাতে শুরু করবে। সকালে খাবার জন্য প্রত্যেকেই ওরা নিজের ভাগ হতে কিছু কিছু রেখে দিল।

সু-সু-সু দূরে শব্দ হচ্ছে রাস্তায় জল দেবার। ইস বেলা হয়ে গিয়েছে। এক্ষুণি ওদের এদিকেও চলে আসবে জলের পাইপ, ভিজিয়ে দেবে সবাইকে।

—এই, ওঠ, ওঠ। ঝুমরা ডাক দিল। ধড়ফড় করে উঠে বসল সবাই। দেরি হয়ে গিয়েছে, বাচ্চাগুলোকে টেনে তুলল মায়েরা।

...ওরা বসবে ফুটপাথের পাড় ঘেঁসে ... করবার জন্য।

—ওঠ, চল। ধমক দিল ঝুমরা।

—...চল, ও রাস্তায় জল দেওয়া হয়ে গিয়েছে, ওখানে বসবি গিয়ে।

...হয়ে কালো ঝুল ন্যাকড়ার বোঝা, ...হাঁড়ি কৌটো লোহার থালা যার যা ...নিয়ে সবাই ওদিকের ফুটপাথে গিয়ে ...হল। সদ্য জল-ছিটানো পরিষ্কার রাস্তায় বসল ভুকালি, ফুদুয়া মিট্টি। ...ওরিয়াও বসে গেল। বুড়ী হয়ে গিয়েছে, ...শরম নেই তার।

—...দি, জলদি কর। তাড়া লাগাল ঝুমরা।

—দুধের গাড়ি এসে দাঁড়াবে এখানে, ...পড়বে। ময়লা পাড়িয়ে বাবুরা তখন ...।

...স খাবার কোনোমতে গিলে ফেলল ...। ...গুলো খাবার হাতে নিয়ে খেতে ... যে-যার এলাকার দিকে। ঝুমরা ...লাঠি হাতে নিয়ে কোমর বেঁকিয়ে ... পা ফেলতে ফেলতে আবার ফিরে ... আস্তানার কাছে। দাঁড়াল লাল ...ড়ির দরজায়। না, ভিখ মাঙতে নয়, কেউ ওঠে নি ঘুম থেকে, ভিখ দেবে কে! এখন কেবল রাস্তায় জল ছিটাচ্ছে কর্পোরেশনের ... আর খবরের কাগজগুলো তাদের ... থামিয়ে থামিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ...।

লাল বাড়ির দোতলার জানালার দিকে তাকাল ঝুমরা। হ্যাঁ, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ঝুমরা জানে মেয়েটাকে। ওর মা মরে গিয়েছে এক মাস হল। বাড়িতে আছে ...দরওয়ান, দুই ঝি। বড়া বদমাস, দর-...র কাছে গেলেই তাড়া লাগায়, ঝুমরা যেন ... নয়, কুত্তা, বিল্লি। এই কোঠাটা এক ...স আদমীর। বহুৎ মেজাজী আদমী। ...বাবু বলে সেলাম বাজায় দরওয়ান। ...ড়ির বিবি মরে যাবার পর বাবুটা আর ...সছে না। মেয়েটা একা থাকে, মাঝে মাঝে ...দে জানালায় দাঁড়িয়ে। ক'দিন হতে লক্ষ্য ...ছে তাকে যেন কি বলতে চাইছে মেয়েটা। ... ভোরে, আন্ধার থাকতে ও এসে ...লায় দাঁড়ায়, একটু আলো ফুটলেই ...কে যায় ঘরের ভিতর। আজ যদিও বেলা ...ছে তবু দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ...রাকে দেখে হাত নাড়ল, ছুড়ে একটা কি ...ল ঝুমরার পায়ের কাছে। চট্ করে ...ট হতে পারে না ঝুমরা। গাড়ির ধাক্কা ...গে কোমর ভেঙে গিয়েছে তার। অনেক ...ট একটা শক্ত জিনিষ জড়ানো কাগজের ...রোটা তুলে নিল ঝুমরা। দরজা খুলবার ...দ হচ্ছে, মেয়েটা সরে গিয়েছে জানালার ... থেকে। ঝুমরাও খোঁড়াতে খোঁড়াতে

[illegible]

একটা টাকা জড়ানো কাগজ। দূরে এসে কাগজটা দেখল ঝুমরা। কি লেখা আছে কাগজে। কি লিখা? লিখা পড়তে জানে না ঝুমরা। তাদের দলের মধ্যে কেবল শিউ বুড়ো পড়া জানে। সে এখন অন্ধ হয়ে ভিখ মাঙছে। তাছাড়া এ তো বাংলা লিখা, বাংলা লিখা জানে না শিউ। ভোলা বাংলা জানে। ছোট বয়সে এক বাংলা বাড়িতে ছিল ও। তাদের ঘড়ি চুরি করে পালিয়ে যায়। টিকিস না করে টিরেনে চড়েছিল, তাড়া খেয়ে লাফ, আর ডান হাতটা একদম বরবাদ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভোলা এখন কোথায় আছে। কাল বলেছিল ভিখ মাঙতে যাবে গংগার ঘাটে। একটা স্নান-পুণ্যের দিন আজ। গংগাঘাটে মিলবে চাল-ডাল আর পয়সা। কিন্তু বড় আলসে ভোলা। পেট ভরা আছে, নিশ্চয়ই ভিখ মাঙতে যায় নি। কোনোখানে বসে ঠিক বিড়ি ফুঁকছে। ভাবতে ভাবতে টিনের কৌটোটা সামনে ধরে হাঁটতে লাগল ঝুমরা। দু-একটা পয়সা পড়ল কৌটাতে। কেউবা বলল—জোয়ান মরদ, খেটে খেতে পার না! লজ্জা নেই ভিক্ষা করতে?

এই সব কথা শুনলেই মাথা গরম হয়ে যায় ঝুমরার। সে কি খেটে খেতে ভয় পেত? খাটুনিকে ভয় ছিল ঝুমরার? সেই দূর বিহার জিলার সরিয়া গাঁও থেকে পরথম কলকাতা এসে কি ভিখ মেগেছিল ঝুমরা? তখন তো রিক্সা টানত। বৃষ্টিতে বুক দিয়ে জল ঠেলে, মাঘের হাড়-কাঁপানো জাড়ে কাঁপতে কাঁপতে, গরমের ঠা-ঠা রোদ মাথায় গামছা জড়িয়ে রিক্সাতে সওয়ারী বইত ঝুমরা। ফুটপাথে শুয়ে, পিতলের ভাঙা কলা থালায় ছাতু, নুন, মিরচি খেয়ে মাসে মাসে সত্তর-আশি রুপেয়া ভেজে দিত দেশে। ভেবেছিল ধার শোধ হয়ে গেলে ক্ষেত ফিরে পাবে, দুটো ভইষা কিনবে। লচ্ছা লহটি বানিয়ে দেবে গণিয়ার মাকে, কিনে দেবে নয়া চুনরী। মোটরকারওয়ালা এক বাবু চাপা দিল ঝুমরাকে। তিন মাস পরে হাসপাতাল হতে ফিরল সে ভাঙা কোমর নিয়ে। কি করে রিক্সা টানবে ঝুমরা? না খেয়ে মরে যাবে? না খেয়ে মরবে গণিয়া ধনিয়া আর ওদের মা? তখন খাড়া হতে পারত না, শরীর কাঁপত দাঁড়ালে, হাঁটবে কি করে! তাইতো ভিখ মাঙতে হল ঝুমরাকে! এখন হাঁটতে পারে কিন্তু রিক্সা টানতে মাল বইতে পারবে না ভাঙা কোমর নিয়ে। ভিখ ছাড়া উপায় নেই ঝুমরার। এখনও মাসে মাসে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে সে। ছেলেরা দশ-বার বছরের হলে ভইষা কিনবার বন্দবস্ত করবে। কিছু টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে যাবে। বসবে বিড়িপাতা নিয়ে। বড়ম-তলায় একটা খাটিয়া বিছিয়ে বসে বসে বিড়ি বাঁধবে। আর যদি ক্ষেতটা হয়ে যায় বড়মদেবের কিরপাসে তবে তো আর দেখতেই হবে না।

থু-থু। খানিকটা থুতু ছিটাল ঝুমরা ভদ্দর আদমীদের উদ্দেশে। ভিখ মাঙতে লজ্জা? তোমরা বাবুরা ভিখ মাঙছো তো হরদম। ক'দিন পর পর যে রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে হাঁটতে থাক চিল্লাতে চিল্লাতে, সে তো ভিখ মাঙা। তোমরা সর-কারের কাছে ভিখ মাঙ, ঝুমরারা ভিখ চায় তোমাদের কাছে। আবার যে ভোট দাও ভোট দাও বলে চিল্লাও সে ও-তো ভিখ মাঙা।

পথ চলতে চলতে দাঁড়াল ঝুমরা। ঠিক যা ভেবেছিল। পোসাকখানার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছে ভোলা আর তাকিয়ে আছে সিনেমা ঘরের গায়ে লাগানো এক বেশরম জেনানার ছবির দিকে। ওকে দিয়ে চিঠিটি পড়াবে ঝুমরা? ছবির মেয়ের গায়ে আটকে থাকা ভোলার কুৎকুতে চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থমকে গেল ঝুমরা। বড়া বদমাস ভোলা, ওর হাতে দেবে না জওয়ান ছুকরীর লিখা। ওকে দিয়ে কাগজটা পড়ালে হয়তো খারাপ হবে মেয়েটার। কিন্তু

নিশ্চয়ই কোনো বিপদ আছে, না হলে কাগজে খত লেখে ঝুমরাকে দেবে কেন। হে ভগবান! কি করবে ঝুমরা? ডাক বাক্সে ফেলে দেবে কাগজ একটা টিকিস লাগিয়ে? পড়া লিখা আছে? উল্টে পাল্টে কাগজটা দেখল ঝুমরা। কিছু বুঝতে পারছে না।

পা টেনে টেনে ঝুমরা হাঁটতে লাগল। দুপুর গড়িয়ে ওর পুরোনো জায়গা রিকসার আড্ডাতে পৌঁছতে। সেখানে আছে জলদা, বাঙালী, ঝুমরার দোস্ত। ও পড়তে জানে।

বেড়াটা লেগেছে। গাছতলায় ছায়া খুঁজে খুঁজে রিক্সা রেখে রিক্সাআলারা বসেছে ছাতুওয়ালাকে ঘিরে। চকচকে পিতলের থালা, হলুদ বরণ ভাল ভাল ছাতুর গোল্লা। নুন মিরচি মুখেতে দেয় ছাতুওয়ালা। সবাই খাচ্ছে। জলদও খাচ্ছে। একটু দূরে বসে সে-ও খেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু বাঙালী কি না, ছাতু খেতে পারে না ও। পাউরুটি কিনেছে, খাচ্ছে গুড় দিয়ে। একদম বুরবাক্ বাঙালী। আরে ছাতুতে জোর কত। চানা হতে ছাতু হয়। চানা খেয়ে ঘোড়া মাল টানে, রেস দৌড়ায়, মানুষ ভি লড়াই করে। পাউরুটি খেয়ে খেয়ে কম জোরি হয়ে গিয়েছে জলদ।

রাস্তায় ঝুড়ি ভর্তি ক্ষীরা নিয়ে বিক্রী করছিল ফেরীওয়ালা। ভাল দেখে দুটো ক্ষীরা কিনে নিয়ে জলদের কাছে গিয়ে বসল ঝুমরা। পুরনো সহকর্মীকে দেখে খুশী হ'ল জলদ।

—বস বস ঝুমরা। খবর-বার্তা কি কও শুনি। অনেক দিন পর আইলা এই দিকে। আরে না ভাই, তোমার ঐ রামশিঙা মুখে রুচব না আমার। ও তুমিই খাও।

খাওয়া শেষ করে একঘটি জল খেল জলদ। বিড়ি ধরিয়ে দুটো টান দিল।

—তারপর, কোথায় কি, কি জন্য আইছ কও দেখি। ক্ষীরা খেতে খেতে খবর দিতে করল ঝুমরা, কাগজ দিল জলদের হাতে। আর্ধেক খাওয়া বিড়ি ঝুমরাকে দিয়ে অনেক-ক্ষণ ধরে খুব মন দেগে চিঠি পড়ল জলদ।

—কি লিখছে বোল না। কি লিখছে মেয়েটা? ঝুমরা জিজ্ঞেস করল।

—লেখছে তো ভয়ানক কথা, শোন তুমি। আর একবার চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে জোরে পড়ল জলদ :

আমাকে এখানে আটকে রেখেছে, বের হতে দেয় না। কেউ নেই আমার। হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে নয়তো বিক্রী করে দেবে দূর দেশে। আমি তোমার মেয়ে, আমাকে রক্ষা কর।

বাংলা ভালই বোঝে ঝুমরা। বিপদে পড়েছে মেয়েটা। ওকে বাঁচাতে বলছে, কেউ নেই। ওর মেয়ে বলছে। কোমর ভাঙা পথের ভিক্ষুক ঝুমরার বুকের মধ্যে গণিয়া ধনিয়া তাদের মা, সবাই একসঙ্গে কেঁদে উঠল।

একটু সময় চুপচাপ। জলদ বলল :

—কোথায় পাইলা এই পত্র ঝুমরা ভাই? এইটা একেবারে থানা-পুলিশের কম্ম। নাকি তোমারে ফাঁদে ফালাইতে চায়? মাইয়াটা বিচ্ছু নাকি?

—আরে না না। শোন সব তুই। ওখানে একটা লাল রঙা কোঠি আছে, একটা বিবি, ছোকরীটার মা থাকতো কোঠিতে। মা-টা মরে গিয়েছে, কে জানে বাবুটাই মেরেছে নাকি তাকে। এখন লেড়কীটাকে মারবার তালে আছে। দোঠো দরওয়ান, কোঠির বিচমে ঘুষতে দেয় না কাউকে। বুঝলি?

—হ বুঝছি। যেমন তুই বলদ, তেমন বলদের একশেষ মাইয়াটা। আরে বেকুব, এইটা বোঝস না যে, মারনের লইগ্যা বুর্বাত মাইয়ারে কোন মানুষ দরওয়ান পাহারা দিয়া কোঠা-বালাখানায় রাখে না। বাবুটা মাইয়াটারে খারাপ বানাইতে চায়। সুন্দর হইলে বেচতেও পারে, মোটা টাকা পাইব হাতে। অখন তুমি কি করবা? আমার বুদ্ধিতে লয়, অরে অর ভাইগোর হাতে ছাইড়া দাও। বলে কত সোনার মাইয়া আমরা ডালি দিয়া আইছি হেই পাড়ে। আমার নিজের মাইয়া দুইটারে দিছি ঝুমরা ভাই।

নিশ্বাস ফেলল জলদ। জ্বল জ্বল করে উঠল ওর কোটরে বসা শুকনো চোখ। বেলা দুটোর সময় কলকাতার ময়দানে বসে দিবাস্বপ্ন দেখল জলদ দাশ।

পদ্মা পাড়ের জেলে জলদ। পদ্মা-মেঘনা ধলেশ্বরীতে মাছ ধরেছে সে কাল-বৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ে নৌকা ভাসিয়ে। লাল টুকটুকে রুই, মৃগেল, কাৎলা, রুপালী ইলিশ নামিয়ে দিয়েছে চাঁদপুর গোয়ালন্দের বাজারে। ইস্পাতের মত শক্ত শরীর। একসের আউস চালের ভাত খেয়ে, দা-কাটা তামাকে টান মেরে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোতো জলদ। জাল মেরামত করত দুই মেয়ে নমুনা-ঝমুনা। ডাঙ্গর হয়েছে যমজ দুই মেয়ে, বার বছরে পড়েছে তারা। জোড়া বছরে বিয়া নাই, তাই তের বছরে, সামনের আগন মাসে বিয়ে হবে তাদের। তালতলার নবীন দাশের পুত আর ভাই-পুতের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। হাতে আর একটা মাসও নেই, মেয়েদের মা পড়শিনীদের নিয়ে চিড়ে কুটছে, মুড়ি ভাজছে। জলদকে তাড়া দিচ্ছে হাটে গিয়ে দানের থালা-কলসী কিনবার জন্য। যাই-যাচ্ছি করে গড়িমসি করছে জলদ। হাটে গেলেই মনটা খারাপ হয়। সেই জৌলুষ আর নেই তালতলার হাটের। পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাবার ধুম পড়েছে। কেন যে মানুষ পালাচ্ছে, তা বুঝে উঠতে পারে না জলদ। দেশ ভাগ হয়েছে, তো কি হয়েছে। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী তো আর ভাগ হয় নি।

তাদের বুক ভরা রয়েছে চিতল বোয়াল ইলিশ কাতলে। তিনপুরুষের জেলে ডিঙি লোহার মত শক্ত, ঢেউয়ের দোলায় নাচতে নাচতে চলে যায় মাঝ গাঙে। ভরা জাল উঠে আসে হাতের টানে।

বাজে ভাবনা ভাল লাগে না জলদের। বিপদ, বিপদ হবে কেন নিজের ঘরে? বিপদের বাস তো বিদেশে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার সময় পেল না জলদ। বাজের আগুনের মত বিপদ ভেঙে পড়ল তার মাথার উপর। নজু ভাই, আসান উল্লা চাচা—চিরদিন যারা জলপান খেয়েছে উঠানে বসে দশমীর দিন, তারা আর আপন রইল না। জলদের ঘরের চালের আগুন রাতের অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতে চাইল কিন্তু তার ধোঁয়ায় চোখ ঝাপসা হয়ে গেল জলদের। চিরদিনের পড়শীদের চিনতে পারল না সে। পদ্মার চরে বসে রোদ পোহায় যে কুমীরগুলো, অবিকল তাদের দেখতে পেল জলদ।

কেমন করে যেন দলের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে জলদ পার হল বর্ডার। তার বউ মেয়েরা? নেই, কেউ নেই। তারা তো আসতে পারে নি। ওরা যে কুমীরের শিকার হয়েছিল। মস্ত মস্ত দাঁত দিয়ে নমুনা ঝমুনা, ওদের মা, সকলের নরম নধর শরীর চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে কুমীরগুলো।

জলদকে ঝিমুতে দেখে ঠেলে দিল ঝুমরা।

—এ জলদা নিদ ছেড়ে একঠো বুদ্ধি বাতলে দে। তোর মাথা তো বহুৎ সাফ, বোলো কি হোবে! লেড়কীটা বলছে—রক্ষা করতে।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল জলদ। রক্ষা করতে হবে? কি বলছে নমুনা ঝমুনা? বাঁচাও বাঁচাও, রক্ষা কর। পার হয়ে পদ্মা-মেঘনার জলতরঙ্গ, ভেদ করে স্বাধীনতা দিবসের জয়ধ্বনি, কতদিন ধরে এই শব্দ কানে পৌঁচাচ্ছে জলদের—বাঁচাও রক্ষা কর। আজ আবার কাগজের লেখা হয়ে জলদের কাছে এল দুটি কথা—রক্ষা কর। রক্ষা করবে? কেমন করে বড়লোকের শিকার থাবা হতে একটি মেয়েকে রক্ষা করবে পথ-ভিখারী ঝুমরা, রিক্সওয়ালা জলদ। ওদের মনে কষ্ট হবে, চোখে জল আসবে কিন্তু এই দুর্বলতম হাতিয়ার নিয়ে কি লড়াই করা চলে অনেক টাকাওয়ালা মানুষের সঙ্গে

●

ক'দিন ধরে জানালায় আর মেয়েটাকে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে না। ভাবনায় পড়ল ঝুমরা। মেয়েটা যে বাড়িতেই আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঝুমরা এ রাস্তা ছেড়ে নড়ছে না এক মিনিটের জন্যও, সেই রাক্ষস বাবুটা তো আসছে না এক মাসের উপর

কিন্তু হল কি মেয়েটার? এক জায়গায় পড়ে থাকবার জন্য ঝুমরার ভিক্ষা মিলছে না মোটে। তার কথা এড়াতে না পেরে জলদকে চলে আসতে হয়েছে বে-পাড়ায়। অনেক অসুবিধে। পথ-ঘাট ভাল জানা নেই। বাবুদের কথায় রাজি হয়ে, পরে দেখতে পায় এক টাকার বদলে আট আনা ভাড়ায় চলে এসেছে দু'মাইল পথ।

অন্ধকার রাত, টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে। ইলেকট্রিক খারাপ হয়েছে ঘণ্টাখানেক হল, আরো কতক্ষণ থাকবে ঠিক নেই। দূরে দূরের রোয়াকে গুটি শুটি মেরে পড়েছিল দলের সবাই। ঝুমরা একা লালবাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎ মৃদু করস্পর্শে চমকে চোখ চেয়ে দেখল জানালার মেয়েটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন করে যেন অন্ধ-কারের সুযোগ নিয়ে জমাদার ঢুকবার পথ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এক্ষুণি তো বাড়ির সবাই জেনে ফেলবে। কি করবে, কি করবে ঝুমরা! এ রামজি! বচা দে ভগওয়ান, তেরা নাম দয়াবান।

সত্যি সত্যি রামজি দয়াবান। ঠিন ঠিন করতে করতে চলছে জলদের রিক্সা। সওয়ারী নেই। ওঠ, ওঠ জলদি। যে মকনা ফেলো। ঘুসে যা ঐ গলির ভিতরে। যারে, ঘুমাব, তব ডাহিনা, বড় সড়ক মিলবে, নিয়ে যা তোর ঘরে। দৌড়, দৌড় জলদি।

টান টান হয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল ঝুমরা। এখন নড়তে পারবে না। দরওয়াজা খুলবার শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলে গেল। ব্যস্ত হয়ে মোমবাতি হাতে রাস্তায় নেমে এল দারোয়ান দুটো আর একটা রাক্ষসী চেহারার ঝি।

—কি যে বুদ্ধি তোমাদের! এখানে কোথায় আসবে? ঝুল অন্ধকার, বৃষ্টি পড়ছে। দেখ গে লুকিয়ে আছে বাড়ির মধ্যে। হয়তো বসে আছে পায়খানার এককোণে।

—দেখেছি, দুটো পায়খানাই দেখেছি, সেখানে নেই। ঝি বলল।

—তবে কয়লার ঘর, আলমারির পিছন, জলের চৌবাচ্চার পিছনেও দেখতে হবে। আর শালার অন্ধকারে দেখাও যাচ্ছে না কিছু। কোথায় লুকলো মেয়েটা?

—ওই মড়াটাকে একবার জিজ্ঞেস কর না।

—ও-এ সেই খোঁড়া ভিখারীটা ঘুমোচ্ছে, নাক ডাকছে। ওকে জিজ্ঞেস করে কি হবে।

—আহা, তবু কর না জিজ্ঞেস। তুলে দাও এখান থেকে। মনে নেই হুকুম, দরজার কাছেও কাউকে আসতে দেওয়া হবে না।

বৃষ্টি পড়ছে,..যাকগে দেই তুলে। এই, এই খোঁড়া! পা দিয়ে ঝুমরার মাথায় কয়েকটা ধাক্কা মারল একজন। হাতে-পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসল ঝুমরা।

—এই খোঁড়া, কাউকে দেখেছিস এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে? একটা মেয়ে—

—আঃ! আব্দুল একেবারে বোকা তুমি। খন খন করে উঠল মেয়ের গলা।

—ওকে ওসব জিজ্ঞেস করতে হবে না। ওদিকে গিয়ে শুতে বল।

—যা যা এখান থেকে। সরে ওদিকে গিয়ে শো।

প্রায় গড়াতে গড়াতে রাস্তার ওদিকের ফুটপাথে গিয়ে শুয়ে পড়ল ঝুমরা কিন্তু কান পেতে রইল, শোনা গেল ভাঙা ভাঙা কথা কিছু কিছু।

—কোথায় গেল?

—দু'দিন জ্বরে.........একটু আলগা.....

—সর্বনাশ হবে, একেবারে মেরে..

—ইস্, সর্বনাশ! আমি পরোয়া করি না।

(ক্রমশ।

উত্তর বসন্তে নিঃসঙ্গতার গীতি-কবিতা

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমন্তী সন্ধ্যা। শিশিরস্নাতা। কুয়াশার ওড়না; তারার চুমকি জ্বলে টিপটিপ। ক্যালেণ্ডুলা---পপি আর কসমসের এমব্রয়ডারী সবুজ ঘাসের বুকে। কিছু কপোত মনের কাছাকাছি চোখে পড়ে অনেক দূরে।-- বাসন্তী আঁচলে একমুঠো দুরন্ত বাতাস. চূর্ণী চুলের রাশি।----নির্জন পার্ক, নির্মল আকাশ। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ঘুম ভেঙে চমকে ওঠে; কুঁড়ির আধো ঘুম চুরি করা শিশুরা আসে। তাদের অজস্র কাকলির মাঝে সাগরের গান উদ্বেল উদ্দাম। কখনও বা প্রকৃতির একান্ত আপনার জন---অনেক পাখীরা কথা বলে ওঠে; ----শ্যাম্পেনের মত আনন্দ অফুরন্ত। কোথাও বা খুশী সুগন্ধ। পার্কের প্রান্তে আকাশ নামে নীলিম হয়ে।---দূরে গীর্জার ঘড়ি বাজে ঢং ঢং।

ঘাসের গভীরে শরীর এলিয়েছি আমি। ক্ষুধার্ত আমি। কিন্তু ডাইনিং টেবিল থেকে এইমাত্র পালিয়ে এসেছি। যদিও সুস্বাদু খাবারের গন্ধ বাতাসে 'ম ম' করছিল। ন্যাপকিন, কাঁটাচুরি-মিলির গিটকিরি দেওয়া হাসি।---হঠাৎ জেগে উঠলো তীব্র বিবমিষা---দৌড় দিলাম অর্চিনে। চোখ বন্ধ করে দৌড়। কেউ যদি দেখে ফেলে আবার বসিয়ে দেয় ঐ নীল ঢেউ-ওঠা কুথ আবৃত ডাইনিং টেবিলে।-- পার্কে আদিগন্ত সমুদ্র ---সবুজ সমুদ্র।---বিরাট আকাশ। আমি যেন ভেসে চলেছি অনেক অনেক দূরে।---একটা মখমলের মত নরম আরামের স্বাদ পাচ্ছি যা শুধু ছড়িয়ে আছে দুজনে দুজনকে জানার মাঝে আর আলোর মত ছিটিয়ে পড়া কৈশোর গানে।

ক্ষুধা মনে। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' আমার বুকে। সেখানে একখণ্ড কণ্ঠও নেই। খা-খা করছে উষর মরুভূমি।---কিন্তু অনেক পাওয়ার তারা জ্বলা এই জীবন। গাড়ী---আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী---ডাইনিং টেবিলে অনেক খাবার---মিলির নরম কেকের মত হাসি।

তবু ----

গভীর রাতে। অন্ধকার যখন ল্যাম্প পোস্টের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকে। নক্ষত্রে ভরে-যাওয়া আকাশ আর ঝিমঝিম---ঝিঁঝির জ্যাজ বাজে।

তখন ----

স্লিপিং স্যুটের অন্তরালশায়ী বুকে নির্জন নিঃসঙ্গতা একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। নেই, নেই, কিছু নেই। শিরায় শিরায় যন্ত্রণার আর্সেনিক---রক্ত নীল। সমস্ত রাত ম্যামীর নিষ্পলক চোখ মেলে চেয়ে থাকে। শুধু আমাকেই দেখে। লাস কাটা ঘরে পড়ে থাকা তিন দিনের বাসি মড়ার ঠাণ্ডা স্পর্শ অন্ধকারে।---শ্মশানের গন্ধ বাতাসে। দৌড়ে পালিয়ে আসি---ঘুম নামে---ফ্রিজে রাখা আইসক্রীমের মত ঠাণ্ডা একরাশ ঘুম। সকাল আসে। সোনা ঝরে। জ্বালা---জ্বালা মধ্যাহ্ন নামে। উচ্চপদের গাম্ভীর্যের নির্মোক আমার মুখে। বিগত রাত তখন চলে যায় বিস্মৃতির কবরে। সন্ধ্যা নামে---মনোরমা সন্ধ্যা। পার্টি, ফক্সট্রট, শিভারি---তরল জীবনের উদ্দাম ঢেউ, শ্যাম্পেন আর হুইস্কী, বীয়ারের বুদ্বুদ। মার্ভেলাস ফাইন ---অফুলি সরি ---চমকিত টুকরো টুকরো কথার বিদ্যুৎ।

এই তরঙ্গ দোলায় দোলে জীবন। ক্লান্তি ভয়াবহ। শিরা-উপশিরার গহন অরণ্যে নগ্ন নির্জনতা। একাকিত্বের বিকীর্ণ যন্ত্রণা। বুকের গভীরে বয়সের বিরাট খাদ। শান্তি-সুখের আলো সমাধিস্থ সে খাদে।

হৈমন্তী রাত। ফাঁকা পার্ক। ছুটে চলে অস্টিন। দু'সারি দেবদারুর মাঝে একরাশ অন্ধকার। পিছনে তাকালাম---গভীর কালো---সম্মুখে জমাট কুয়াশা---আলো নেই। চোখ বুজে এল ঘুমে।---আমি ও আমার প্রৌঢ় সত্ত্ব ডুব দিলাম নিঃসঙ্গতার নির্জনে।

কেন ভুল করি ?

আমরা প্রতিটি মানুষই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অজস্র ছোটখাট ভুল করে ফেলি। এমন মানুষের সাক্ষাৎ বোধ হয় সত্যিই পাওয়া যায় না, যে নির্ভুলভাবে সমস্ত কাজ করে দিন কাটায়। থাকতে পারে এমন মানুষ যে খুব নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে চলে, কোন অসতর্ক মুহূর্তে কি তারও ভুল হয় না? অতি পরিচিত কোন লোকের নামও কোন সময় সে ভুলে যায় না? কোন বিশেষ জরুরী জিনিষও কি সে কখনও ভুল করে ফেলে যায় না? কোনও গুরুত্বপূর্ণ কথাও কি সে কখনও লিখতে ভুলে যায় না? আর কোন ভুল বেফাঁস কথাও কি কখনও সে বলে ফেলে না?

আশা করি এমন কোন মানুষ নেই যে এই সব প্রশ্নগুলির উত্তর নাতিবাচক-এ দেবার ক্ষমতা রাখে। কারণ, আমরা, ছোট, বড়, স্ত্রী, পুরুষ ভেদে সবাই কিছু না কিছু ভুল ব্যবহার অবশ্যই করে থাকি। আর অনেক সময় এই সব ছোটখাট ভুলের মাশুল দিতে বেশ বেগ পেতে হয়, অনেক ক্ষতিও হয়ে যায়। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছি যে, এই ভুলের পিছনে কি আছে, এর কারণ কি। ভুল হয়ে যাবার পর হয়ত কখনও অবাক হয়েছি বা খুব জোর অনুতাপ করেছি, এর বেশী না। আর এসবের কারণ নিয়ে কখনই মাথা ঘামাই না। কিন্তু আমরা মাথা না ঘামালেও মনোবৈজ্ঞানিকরা এ নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন, ফলে মনোবিজ্ঞান-এর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই ভুলগুলির যথেষ্ট আকর্ষণীয়ভাবে ব্যাখ্যাও তাঁরা করেছেন।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী 'ফ্রয়েড' এই ছোটখাট ভুলগুলিকে বলেছেন সাইকো-প্যাথালজি। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা এই 'ভুল করা' নিয়ে অত বিশদভাবে আলোচনা করতে রাজী হন নি তাঁদের মতে এগুলি হয় এ্যাকসিডেন্টালি, কিন্তু 'ফ্রয়েড'-এর মতে 'নো এ্যাকসন ইজ উইদাউট কজ।' নাইনটিন্থ সেনচুরীর বহু আগে এই বিষয়কে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা 'স্পিরিট'-এর ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাঁদের মতে এগুলি ছিল ভূত-প্রেতজনিত ব্যাপার। তার ওপরে নাইনটিনথ সেঞ্চুরীতে এই

মৈত্রী গুপ্ত

এ্যাকটিভিটির ব্যাখ্যা করা হয়েছিল 'ব্রেন প্যাথালজি'র আকারে। কিন্তু তাঁদের মতও গ্রাহ্য হয়নি। কারণ অতি স্বাভাবিক মানুষও এই প্রকারের নানাভাবে ভুল করে থাকে। তাই এর ওপর যে মস্তিষ্কের হাত নেই তা সহজেই প্রামাণ্য। তবে একথা ঠিক যে, মনোবিকৃত বা মানসিক রোগের দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ যখন ভুল ব্যবহার করে তখন সেই ব্যবহারের সাথে স্বাভাবিক (নর্ম্যাল) মানুষের ছোটখাট ভুলের অনেক তফাৎ থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষও ভুল করে। আর সে ভুলের কারণই আলোচ্য বিষয়। এর পরবর্ত্তীকালে যখন মনোবিজ্ঞান আরও উন্নত হল তখন এই প্রকার এ্যাকটিভিটির পিছনে সাইকোলজিক্যাল কজকেই মানা হল। তখন এই ব্যবহারের কারণ খুঁজে পাওয়া গেল আমাদের অচেতন মন (আনকনসাস মাইণ্ড)-এর ভিতর। যদিও আগে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীরাও

[illegible]
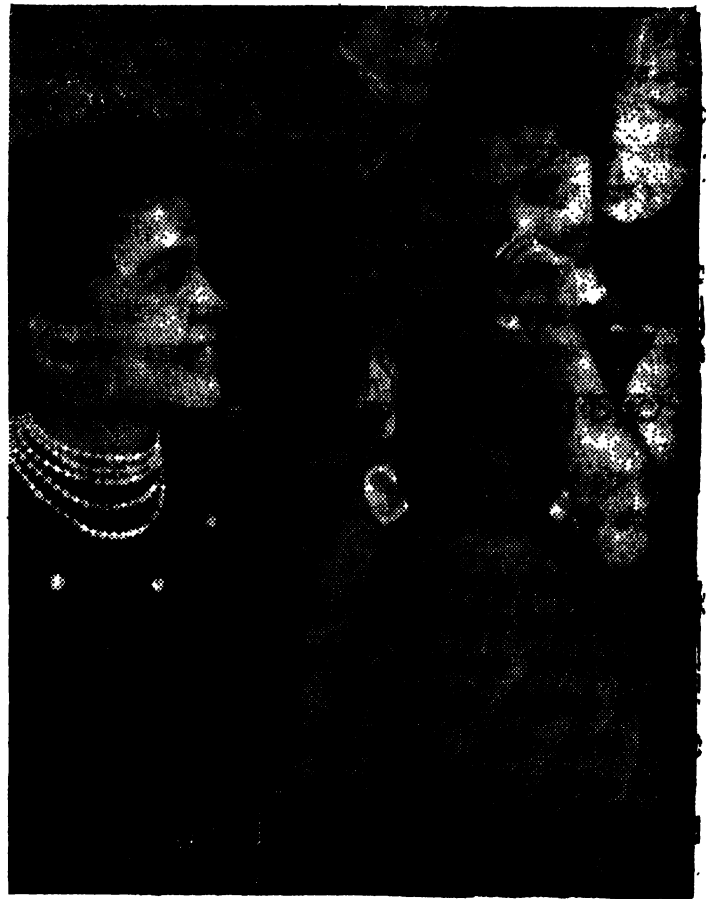
এই অচেতন মন-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা শুধুমাত্র চেতন মন (কনসাস মাইণ্ড) কেই প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু 'ফ্রয়েড' এসে প্রমাণ করলেন যে আমাদের এ্যাক্টিভিটির ভিতর শতকরা নব্বই ভাগ এই অচেতনের কারসাজী। চেতন মন যে সকল কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, আকাঙক্ষাগুলিকে বরখাস্ত করিতে পারে না সেগুলি রিপ্রেসড হয়ে অচেতন মন-এ স্থান পায়। আর এই সকল ডিজায়ারগুলি সর্বদা অচেতনের লৌহদ্বার-এর কঠিন আবরণ ভেদ করে বাইরে আসতে চায়। কিন্তু চেতন মন-এর জন্য সোজা রাস্তায় আসতে অনেক বাধা। তাই সেগুলি খোঁজে বাঁকা রাস্তা, অর্থাৎ ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের প্রকাশ করার চেষ্টায় থাকে। তাই সুযোগ পেলেই এই ভুল-এর মাধ্যমে এই ডিজায়ারগুলি নিজেদের ইচ্ছাব পূর্তি করে নেয়। এই সকল এ্যাক্টিভিটির ছদ্মবেশে তারা তখন চেতন মনে চলে আসে। এইভাবে এই সকল ভুল ব্যবহার-এর মাধ্যমে অচেতনের ইচ্ছাই চেতন মনে পূরিত হয়। তাইত অনেক সময় আমরা আমাদের অতি পরিচিতের নাম, কোন বিশেষ স্থান, কারণ, ইত্যাদি অদ্ভুতভাবে ভুলে যাই। অনেকে আবার নিজের ফোন-নম্বরই মনে রাখতে পারে না। কোন নির্দিষ্ট কাজ করতেও আবার কেউ ভুলে যায়। আর এও দেখা যায় যে, লেখা চিঠি পোস্ট করতে ভুল হয়ে যায়। যেমন—একটি লোক তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুকে চিঠি লিখল। কিন্তু রোজই সে চিঠিটা পোস্ট করার কথা ভুলে যায়। তারপর একদিন যখন সে চিঠিটা পোস্ট করতে দিল তখন দেখল যে, চিঠির খামের ওপরে বন্ধুর নাম লিখতেই ভুলে গেছে। তারপর যখন নাম লিখে আবার চিঠিটা পোস্ট করতে গেল তখন হঠাৎ খেয়াল হল যে, চিঠিতে উপযুক্ত টিকিটই লাগান হয়নি। এইভাবে বার বার সে ভুল করছে।

এই ধরণের বহু উদাহরণ আমরা আমাদের জীবনে পাই এবং এগুলিকে 'নেহাৎ ভুল' বলে উড়িয়ে দিই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা এইভাবে উড়িয়ে দিতে পারেন নি, তাঁদের মতে এগুলির কারণ হচ্ছে অচেতনের বিরুদ্ধ মনোভাব। তাই মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে উপরি-উক্ত ভুল ব্যবহারের কারণ বেশ জোরালো পেঁচানোই হবে। অর্থাৎ লোকটির মনের গভীরে তার চেতনের বিরুদ্ধ ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও চেতন মনে সে তার বন্ধুকে খুবই ভালবাসে তবু তার অচেতন মনে বন্ধুটির জন্য ভালবাসা ও প্রীতির একান্তই অভাব। তাই অচেতন মন এইভাবে ভুলের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছা পূর্তি করে দিল ছলে-বলে-কৌশলে।

এই রকম ভুলের উদাহরণ অনেক বড় বড় ও নামী লোকেদের জীবনীতেও অনেক পাওয়া যায়। এগুলিকে মনোবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ভাগ করেছেন, তাঁদের মতে এই প্রকার এ্যাক্টিভিটি নানাভাবে হতে পারে। যেমন—স্লিপ অফ পেন, স্লিপ অফ টাঙ, মিস প্রিণ্ট, মিসটেক্স ইন রিকগ্নিশন, সিমটমিক এ্যাক্ট, ইত্যাদি। এগুলির পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক অদ্ভুত ও আকর্ষণীয় উদাহরণ পাওয়া যায়।

কিন্তু আমার মত অখ্যাত এক মেয়ের জন্য অত সব লেখার স্থান বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় দিতে রাজী হবেন না। তাই অচেতনের ইচ্ছাপূরণ করার শক্তি যে কতটা তীব্র হতে পারে সেটা 'কার্ড ম্যারিপ্পার'-এর ভাষায় দু লাইনে বলে আমার লেখা শেষ করছি।

'কার্ড ম্যারিপ্পার' তাঁর বই 'মেন এগেনস্ট হিমসেল্ফ'-এ বলেছেন যে, 'ইভন ডেথ কামস, ইট ইউইসড বাই আওয়ার আনকনসাস মাইণ্ড।'

তাই উপসংহারে বলি যে, এইসব ছোটখাট ভুলের পিছনে অচেতনের কারসাজী তো সহজেই মান্য, কিন্তু যেখানে দেখি মৃত্যুর পিছনেও অচেতনের ইচ্ছা, সেখানেই বিস্ময় বোধ করি।

আকাশ প্রদীপ

কল্যাণী রায়চৌধুরী

চরণ ধরি বারণ করি
চেও না আর চোখের পানে।

কুঞ্চিত গালে হাসি খেলে যায়—। এস্রাজ বাজিয়ে এই গানটি গাইতো রসময় ডাক্তার। রসময় রসের সাগর, রসের নাগর। নৃত্যপ্রভার বয়স তখন বাইশ-তেইশ, ডাগর ডাগর কালো কালো চোখে একবার হাসির ঝিলিক দিয়ে নৃত্যপ্রভা নৃত্যের ভঙ্গিতে পালিয়ে যেত। রসময় ডাক্তার অনেক বেলা অবধি এস্রাজ নিয়ে বসে থাকতো, বসে বসে এস্রাজ বাজাতো আর রসিয়ে রসিয়ে গান গাইতো—

চরণ ধরি বারণ করি
চেও না আর চোখের পানে।

এখন আর চোখের পানে চাওয়ার চোখও নেই নৃত্যপ্রভার। চরণ ধরে বারণ করার জন্য রসময় ডাক্তারও নেই।

পাশের ঘরে তখনও এস্রাজ বেজে যাচ্ছে কাফী রাগে। নৃত্যপ্রভার কানে কিন্তু একই সুর বাজছে--

চেও না আর চোখের পানে।

কুঞ্চিত গালে আবার হাসি খেলে যায়। গালের লোল চামড়ার ওপর দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে যায়। কতক্ষণ গড়িয়ে যায় খেয়াল থাকে না। নৃত্যপ্রভা একসময়ে দেখেন বালিশের বেশ খানিকটা চোখের জলে ভিজে গেছে।

অনেক রাত অবধি জেগে থেকে থেকে পাশের ঘরের এস্রাজ বাজানো শোনেন নৃত্যপ্রভা।

জেগে জেগে খোলা জানলা দিয়ে আকাশের তারার কাঁপন দেখেন। ঐ জ্বলজ্বলে তারাটা তখনও জ্বলতো ওর রাত জাগার সাথী হয়ে, অনেক

রাত্রে আসতো রসময় ডাক্তার। কূজনে গুঞ্জনে ভরে উঠতো সারা ঘর। রজনী রাত্রি যাপনের ক্লান্তিতে অনেক বেলা অবধি ঘুমাতেন নৃত্যপ্রভা। জানলা দিয়ে রোদের একটা কড়া ধারা এসে যতক্ষণ না চোখে বিঁধতো, ততক্ষণ ঘুমই ভাঙতো না নৃত্যপ্রভার। মনে মনে লজ্জিত হলেও নৃত্যপ্রভা বেপরোয়া।

এমনি বেপরোয়া ভাবেই একদিন রসময় ডাক্তারকে গোপন খবরটি দিয়েছিলেন নৃত্যপ্রভা। খবর শুনে হাঁ করে হতভম্ব হয়ে বসেছিল রসময় ডাক্তার। তারপর আস্তে আস্তে উঠে চলে গিয়েছিল। প্রথমে ওষুধ দিল রসময় ডাক্তার নিজে। তারপর ছকাই ওঝা ঝাড়-ফুঁক করলো, তাতেও যখন কিছু হলো না তখন এলো গোলাপী দাই---শেকড় বাকড়ের একটি পাঁচন সেদ্ধ করে দিয়ে বলে গেল তিন দিনের মধ্যে তার ওষুধের ফল হবে---কিন্তু হলো না।

রসময়ের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। বজ্রপাত হলো নৃত্যপ্রভার মাথায়।

তারপর খবরটি কানাঘুষো হলো, তারপর জানাজানি। ভাই-এর সংসারের আশ্রিতা নৃত্যপ্রভা এবারে হলেন নিগৃহীতা।

অসহায় বৃদ্ধা মা কাঁদতে লাগলেন আরও অসহায় ভাবে। অবশেষে সধবার পোষাক পরে রসময় ডাক্তারের সাথে ট্রেনে উঠলেন নৃত্যপ্রভা। লালপেড়ে শাড়ী পরলেন, হাতে পরলেন শাঁখা, কানে ইয়ারিং, নাকে নাকছাবি একেবারে পাকাপাকি সধবা। আসামের চাঁপারকলি স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপলেন কলকাতার পথে। ঐ স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন নৃত্যপ্রভার দাদা। কলকাতা এসে অবশ্য একদিন কালীঘাটে স্নান করতেও গিয়েছিলেন। দীনতারিণী তারাকেও কত করে ডাকলেন নৃত্যপ্রভা, কিন্তু সে ডাক তারার কানে পৌঁছাল না। একটি দুরন্ত প্রাণী প্রাণের অস্থিরতা নিয়ে ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে উঠতে লাগলো, প্রতি মুহূর্তে আপনার প্রাণের স্পন্দন জাহির করতে লাগলো। রসময় ডাক্তার তখন ওঁর সাজানো স্বামী।

তখন তিনি ৯ বৎসরের বালিকা। স্বামীকে আবছা আবছা মনে পড়ে ওঁর। তিনদিনের জ্বরে মারা গেলেন স্বামী। কি হয়েছে ভাল করে বোঝার আগেই কে যেন তাকে বিশ্রী গ্রাম্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে ডাকলো ওলো ও---খেকি ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস, এদিক পানে একবার এসে ভাতারের কাছে বস না। ছুঁয়ে থাকতে হয় যে।

একটি হিমশীতল স্পর্শ যেন আজও ওঁর সারা দেহের ভেতর সঞ্চারিত হয়ে ওঠে। মৃতের হিমশীতল পা দুখানি ওর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে কে একজন ওকে বললে এমনিভাবে থাক সারাক্ষণ। এমনিভাবে ছুঁয়ে থাকতে হয় পাটা মাথায় নিয়ে; সাপের মত ঠাণ্ডা আর ভয়াল সে পা দুখানি।

তারপর জীবনে অনেকবার সেই অনুভূতির কথা ভেবেছেন তিনি, আর প্রতিবারই সাপের মত ঠাণ্ডা আর ভয়াল এক অনুভূতি সারাদেহে শির-শিরিয়ে উঠতো যেন।

ভোরবেলাতে স্বামীর দেহ বহন করে নিয়ে গেল সকলে। তারপর পৃথিবীর রং একেবারে বদলে গেল —একটি সাদা থান উঠলো অঙ্গে। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যায় চললো নিশিপালন। স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী এলেন তিনি।

তারপর।

তারপর ন' বছরের দেহে পড়লো আরো নটি বছরের স্বাক্ষর। আঠারোটি বসন্তের মঞ্জরিত বকুল কলি আপনার সৌরভে আপনি অন্ধ হয়ে গেল যেন; হাসিতে লজ্জা এলো, চলাতে ছন্দ। আসামের ছোট্ট এক রেল স্টেশন চাঁপারকলি। ডাক্তারী করতে এসে রসময় ডাক্তার নৃত্যপ্রভার চলার ছন্দে আটকা পড়ে গেলো।---

---অবশেষে রসময় ডাক্তারকে দেখানো ঠিক হলো, ডাক্তারের হাতযশ খুব এ অঞ্চলে, তাছাড়া প্রবীণ ডাক্তার কিছুতেই জ্বরটা ছাড়াতে পারছে না, অবস্থা তিন দিন ধরে খুব খারাপ। একেবারে বেহুঁস।

তিনদিন অঘোর জ্বরের পর নৃত্য-প্রভা যখন চোখ খুলে চাইলেন, রসময় ---ডাক্তার হিসাবে আত্মতৃপ্তি লাভ করলে।

আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলেন নৃত্যপ্রভা। দুর্বল দেহখানা আরাম কেদারায় এলিয়ে দিয়ে দুর্বল ক্ষীণ হাতে বই পড়তে পড়তে উদাস চোখে দূরে তাকিয়ে থাকতেন---বাইরে পাহাড়ের গায়ে তখন সূর্যের ঢল নামতো ---আর ঢল নামতো---নৃত্যপ্রভার চোখে।

ডাক্তার ছাড়াও যে তৃষিত মনটি ছিল---সে যেন আকণ্ঠভরে সেই নয়ন-সুধা পান করে ধন্য হলো। আর বুঝিবা সেইদিন থেকেই সে মনে মনে গাইলো---

চরণ ধরি বারণ করি,
চেও না আর চোখের পানে।

নৃত্য প্রভা সেরে উঠলেন কিন্তু এ বাড়ীতে পাকাপাকি ছাড়পত্র পেয়ে গেল রসময় ডাক্তার।

যুদ্ধপূর্ব সময়ে ছোট্ট পাহাড়ী স্টেশনে যখন সারাদিনে খুব কম ট্রেন থাকতো,---লাইন ধরে ধরে চাঁদের আলোতে কতদূর চলে যেতেন নৃত্য-প্রভা।

ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন নির্ভীক আর ডানপিটে স্বভাবের। অনেক দূরে চলে গেলে দেখা হত রসময়-এর সাথে। সাইকেল চড়ে আসতো রসময় ডাক্তার পাহাড়ী পথ ভেঙ্গে। শালগাছের মত শক্ত বাহু—গায়ে শার্দুলের মত ক্ষমতা—জোয়ান। শালের মত শক্ত বাহুতে বেষ্টন করে ডাক্তার নিমেষে নৃত্যপ্রভাকে সাইকেলে তুলে নিত। পাহাড়ী পথে একান্ত একেলা, চলতো ওদের এগিয়ে

বাঁচা। এ পথ যেন অজানা অচেনা, এর যেন পৃথিবীতে কোথাও শেষ নেই। একদিন যখন ঝিলের জলে চাঁদের ছায়া পড়েছিল—রসময়ের কোলে মাথা রেখে নৃত্যপ্রভা অকারণে খিল খিলিয়ে হেসে উঠেছিলেন।

সেদিন কিন্তু ফিরতে একটু রাতই হয়েছিল; বৌদি তখন নতুন বউ তাই একটু ভয়ে ভয়েই হয়তো চুপ করে-ছিল। মা তখন মামার বাড়ী বেড়াতে গেছেন।

রসময় ডাক্তার যেন হাত ধরে—আঁধার থেকে আলোয় নিয়ে এলো নৃত্যপ্রভাকে, পৃথিবী থেকে কোন স্বর্গে তুলে দিল; মৃত্যুর দরিয়া থেকে জীবনের তীরে।

রসময় ডাক্তার মাতাল হয়েছিল সেই নদির রসে। ছন্দঃপতন হলো। নৃত্যপ্রভা যেদিন বেপরোয়াভাবে সংবাদটি জানালেন একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল রসময় ডাক্তার।

নৃত্যপ্রভা ভিন্ন জাতের; নৃত্যপ্রভা বিধবা; সে কথা যেন ধাক্কা খেয়ে প্রথম উপলব্ধি করলো ডাক্তার।

কাশীতে যখন পৌঁছিল তখন নৃত্যপ্রভার প্রায় আসন্ন অবস্থা।

এখানের এক আশ্রমে নৃত্যকে ভর্তি করে দিয়ে কাছেই একখানা সাধারণ ঘর ভাড়া দিয়ে থাকলো ডাক্তার। নূতন জায়গাতে নতুন পরিবেশে হাতযশের মূলধন নিয়ে পসার জমাতে খুব কষ্ট হলো না ডাক্তারের। নৃত্যপ্রভার কোল জুড়ে তখন এসেছে এক সুন্দর ফুটফুটে শিশু, ধীরে ধীরে সে বড় হয়। হাত পা ছুঁড়ে সে খেলা করে ছোট ছোট মুঠিতে নৃত্যপ্রভার চুল চেপে ধরে। নৃত্যপ্রভা বলেন—ওরে বাবা গেলাম, ছাড় ছাড়; না বুঝে খোকা চুল ছেড়ে দিয়ে ফোকলা দাঁতে হাসে, নৃত্যপ্রভা হেসে খোকার সারা গায়ে চুমু খান। মা হওয়ার গ্লানি কবে কেটে গেছে। মনে মনে তিনি যেন মহীয়সী। আড়ালে ঘরে কত কেঁদেছে নৃত্যপ্রভা। কত বলেছে দেখ খোকাকে দেখ. চল আমরা মন্দিরে গিয়ে ফিরে ... হরিদাস—আত্মকাহিনী। এক দেশে সেই আশ্রমের খোকাকে তুমি গ্রহণ কর। খোকাকে রসময় গ্রহণ করেনি। শেষ দিকে আশ্রমে টাকাও দিত অনিয়মিতভাবে। অবশেষে টাকা দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিল। তারপর ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে দান করা ছাড়া আর উপায় থাকলো না। আর ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে দান করে দিলেন। এক আদিম বর্জিত নারীসত্তা মাতৃত্বের সত্তাকে দুই হাতে গলা টিপে একেবারে পিষে মেরে ফেলে দিল।

আবার রসময়ের সাথেই ফিরে এসেছিলেন নৃত্যপ্রভা চাঁপারকলি স্টেশনে।

রসময় কিন্তু তারপরে আর কখনও চাঁপারকলি আসেনি।

এরপর বহু দেশে বদলী হয়ে ভাই-ভাজের সাথে ঘুরেছেন নৃত্যপ্রভা। মা গত হয়েছেন বহুদিন।

●

আজ জীবনের একেবারে শেষ পর্বে আবার এসেছেন কাশী। গঙ্গা নাইতে রোজই যান। ঘাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়ান, এদিক ওদিক কাকে যেন খুঁজে বেড়ান। দৃষ্টি কখনও বা ঝাপসা হয়ে আসে। কাউকে দেখে হয়তো ছুটে যান। তার নাম ধাম বাস জিজ্ঞেস করেন। মুখের আদল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের আরতি দেখতে যান। জনতার মধ্যে শুধু খুঁজে বেড়ান কাকে যেন-----মুখের আদলে যেন কাছে টানে নৃত্যপ্রভাকে আরও কাছ ঘেঁষে অকারণে কথা পাড়েন---। না হলো না ভুল হয়েছে ওঁর।

যে আশ্রমে ৩০ বছর আগে উঠে-ছিলেন, সেখানে প্রকাণ্ড এক শিশু-বিদ্যালয়। পুরনো ছাপরী কুঁড়ের ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে এক আকাশচুম্বি সৌধ মাথা তুলেছে—কোথায় যে সে আশ্রম উঠে গিয়েছে আজও কেউ তার ঠিকানা বলতে পারল না। আর সেই আশ্রমের সিদ্ধেশ্বরী মা তিনি দেহ রেখেছেন হরিদ্বার—কে বলবে সেই ৩০ বছর আগের শিশুর ঠিকানা।

আজ সে কত বড় কে জানে। কত বড়। শালবৃক্ষের মত বিশাল বাহু আর শার্দুলের মত সাহস তার। আজ সে কোথায়? কাশীর কোন প্রান্তে।

বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজে---- সকালে পুণ্যার্থী স্নানযাত্রীর ভিড়ে গঙ্গার ঘাট মুখরিত হয়, ঝাঁক ঝাঁক কপোত উড়ে যায় প্রাতরাশ খেয়ে। সামনে গঙ্গা বয়ে যায়-----মণিকর্ণিকার ঘাটে ধ্বনি ওঠে বলহরি হরিবোল, দূরে নৌকা চলে যায় বোঝা নিয়ে। পাশের ঘরে এস্রাজ বাজে---

চরণ ধরি বারণ করি
চেও না আর চোখের পানে।

আমার যা ছিল

পার্বতী সেনগুপ্ত

আমার যা ছিল, গোলাপের পরিপূর্ণতা
নিয়ে ফুটে উঠলো তোমার হাতে,
যার মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছিলো
প্রশংসার স্তুতি।
হাতের গোলক ধাঁধায় ছুটি না পেয়ে
আপন হলো,
একান্তে এলো
তোমার নতুন স্বপ্ন
এক কল্পনার আলিঙ্গন উত্তাপে,
না জানা পাখির অচেনা ডাকে
ভিতর-দুয়ারে হাওয়া কাঁপে...

অনুভব করলে কি?
কোন চেতনার রঙে রাঙিয়ে গিয়েছিল
দিনের শেষ আকাশ।

অনুমান করলে কি?
রাত্রির শেষ যামে আকাশ
ধূসর অথবা অভিসারিণীর নীল শাড়ির
সার্থক অনুকরণ।

আমি জানি—
তোমার সহজাত প্রবৃত্তি রাত্রির
শেষ পদক্ষেপ পেয়োলে দেখবে
আগামীর ইঙ্গিত;
আলোর ইশারা।

অন্য ঠিকানায়

না মরেও সমাজ-সংসারের কাছে মৃত, তার মনের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হতে পারে, আমার মত আর কেউ উপলব্ধি করেছে কি না জানি না। তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এ বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন বটে বরং উপসংহারে বলেছেন যে, সে মরে প্রমাণ করে গেল, যে সে মরেনি।

তবে কি আমাকেও তাই করতে হবে?

সুগন্ধি বাতাসের স্নিগ্ধ প্রলেপে, মস্তিষ্কের উত্তপ্ত স্নায়ুকেন্দ্রটি ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসছিলো। দুচোখ দিয়ে দর দর জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিলো। তার মাঝেই কখন যে মৃদুতন্দ্রাভারে চোখ দুটিকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা নিজে টের পাইনি।

হুঁস ফিরে পেলাম--সিস্টার! সিস্টার। ডাক্ শুনে।

চমকে উঠে বসে দেখলাম, পাওয়ার সায়েব দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তার দু' চোখে গভীর বেদনার ম্লান ছায়া। হাতে গীটার।

একটু আশ্চর্য হলাম ওকে দেখে। এমন করে তো ও কোন দিন এগিয়ে আসেনি আমার কাছে? বাবার বাড়ীতে থাকাকালীন যখন গীটার শিখতাম ওর কাছে, তখন শিক্ষার বিষয় প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া একটিও বাড়তি কথা বলেনি আমার সঙ্গে। তারপর যখন এখানে এলাম, তখনও সর্বদাই আমার সঙ্গ এড়িয়ে চলতো পাওয়ার সায়েব।

আজ তাই ওকে দেখে ভারি আশ্চর্য লাগলো---ওকে জিজ্ঞাসা করলাম--আমায় কিছু বলবে?

কোন জবাব দিল না পাওয়ার সায়েব শুধু দু হাত বাড়িয়ে গীটারটাকে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি বাজনাটা ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম,---অনেক দিন যে বাজাই নি সায়েব, সব ভুলে গেছি।

---এ তোমায় ভোলেনি সিস্টার। মানুষ তো নয়, তাই বেইমানী শেখেনি। জবাব দিল পাওয়ার।

আমার দুচোখ বেয়ে আবার নামলো অশান্ত জলের ধারা। দু হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে বললাম,---তুমি বাজাও সায়েব।

বারি দেবী

---বাজাচ্ছি। বলে আমার কোল থেকে গীটারটা তুলে নিয়ে, সামনের বেঞ্চিতে বসলো পাওয়ার। তারপর তারে সুর বাঁধতে বাঁধতে বললো,---এর সঙ্গে দোস্তি কর সিস্টার, দেখবে এমন দোস্ত দুনিয়ায় আর মিলবে না।

আমি বললাম---এ বাগানটা কে তৈরী করলো সায়েব? ভারি চমৎকার লাগছে এখানে এসে।

---ঐ---খানে, এখানে বাগান করার মত জমি নেই কি না, বড্ড কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতো, তাই এইটুকু করা, তোমার ভালো লাগবে জানি। সায়েবেরও ভালো লাগে। বললো পাওয়ার।

---তুমি যে মহৎ শিল্পী সায়েব, তাই তোমার সৃষ্টি---এত পবিত্র, এত সুন্দর।

---কি যে বলো সিস্টার। আমি আবার একটা মানুষ? সলজ্জ হাসির সঙ্গে মুখ নিচু করলো পাওয়ার সায়েব। তারপর মন দিল গীটারে।

দুচোখ বন্ধ করে সুরসাধনায় তন্ময় হয়ে গেছে সে। গীটারের অন্তরমথিত সজল করুণ সুরধ্বনি, যেন জাগতিক সীমা ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে অসীমের সন্ধানে।

আমার তাপদগ্ধ অন্তরে সেই সুর যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ঐ কুৎসিত মানুষটার ভেতরে যে এমন একটি দরদী সংবেদনশীল মন ছিল, তার পরিচয় এতদিন আমার কাছে অজানা ছিল।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে, বার বার দিদিমার সেই কথাগুলো মনে পড়ছে---ওপরের রূপ যেমনই হোক না কেন, ভেতরটা যাদের হয় সুন্দর, পবিত্র---তারাই ভগবানের কাছে যেতে পারে।

লেখা আমায় থামাতে হল। পাওয়ার সায়েব আসছে। দুখানি খাম এনে সে আমার হাতে দিল।

একখানি এসেছে পাওয়ারের নামে, সে খামটি খোলা হয়েছে, অপর হস্তলিপি আমার বড় চেনা। ক'দিন ধরে যেন এই লেখাটির জন্য অধীর প্রতীক্ষার দিন রাত কেটেছে আমার।

এ আমার জীবনে প্রথম প্রেমপত্র!

পাওয়ার সায়েব বললো---তুমি চিঠি পড়ো সিস্টার আমি ততক্ষণে কফি বানিয়ে আনি।

বুকের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। খামটা খুলে সমগ্র মনপ্রাণ মেলে পড়লাম চিঠিখানি।

কয়েক ছত্রের চিঠি, তবুও ঐ মধুক্ষরা অক্ষর ক'টা যেন মণি-মাণিক্যের রূপ ধারণ করে জ্বলছে আমার চোখের সামনে।

বলছে রজত সেন: '[illegible]র কূলে যে অমূল্য রত্নটি অকস্মাৎ কুড়িয়ে

পেয়েছি, তাকে যে আমার মনের মণি-কোঠায় একান্ত আপন করে রাখতে চাই রূপ। তার জন্য যদি জীবনের আর সব কিছু ছাড়তে হয়, তা আনন্দের সঙ্গেই ছাড়বো। তুমি চলে এসো রূপ্! তোমার অদর্শন যে আর সইতে পারছি না। তোমার সকল ঝঞ্ঝাট বিপত্তি আমি মাথায় করে বহন করবো। কবে আসছো জানাও।'

হ্যাঁ যাবো। রজত, তোমার ডাকে সাড়া যে আমায় দিতেই হবে। আমি যে এই অস্থির অনির্দিষ্ট, লক্ষ্য-হীন অভিশপ্ত জীবনের বোঝা একা আর বইতে পারছি না। তাই তোমার ডাকে আমায় যেতেই হবে।

স্থির করলাম, আজই পাওয়ার সায়েবকে বলবো, ট্রেনের বার্থ রিজার্ভের কথা।

দ্বিতীয় চিঠিখানি এবারে খুলে চোখ বোলাতেই চমকে উঠলাম। দরোয়ান মঙ্গল সিং লিখেছে পাওয়ারকে---কয়েক দিন হল বোস সায়েব মোটর এ্যাকসিডেণ্টে সাংঘাতিক জখম হয়ে হসপিটালে রয়েছেন। মাথায় ভীষণ চোট লাগার জন্য জ্ঞান নেই। এক-খানা পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি। মঙ্গল সিং এসব খবর পেয়েছে আমার বাবার দরোয়ানের কাছ থেকে।

চিঠির শেষে আরো লিখেছে যে ---দিদিমণি এখন ফিরে আসতে পারেন, কারণ, বোস সায়েব এখন আর তাঁকে বিরক্ত করতে আসতে পারবেন না।

'বোস সায়েব' মানে ধর্মত ও আইনত তিনি আমার স্বামী, তবুও তাঁর এত বড় সঙ্কটের সংবাদ, আমার মনে কেন একটুও বেদনার দাগ কাটতে সক্ষম হলো না কারণ কি?

কারণ অবশ্যই আছে। সেই অমানুষ-টির জন্য আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র সমবেদনা থাকার কথা নয়। ঐ কাপুরুষটার বাড়ী থেকে যখন সূর্য রায় আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল, তখন সে কেন পুলিশ, বা আইনের সাহায্য নিয়ে আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলো না? তাহলে হয়তো তার প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা জাগতো আমার মনে। তা-না করে সে আমার মৃত্যু-সংবাদ রটিয়ে নিজের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করলো। শুধু এটুকু করেই সে রেহাই দেয়নি আমাদের। তারপর সে নানাপ্রকার হীন চক্রান্তের জাল বিস্তার করে আমাদের সেই ফাঁদে বন্দী করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

খুন করা হবে, ভয় দেখিয়ে বেনামী চিঠি দেওয়া, টেলিফোনে অন্য নামে শাসানো, সদা সর্বদা পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে আমাদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা, এইসব হামলা তার বছরের পর বছর, আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো।

সূর্যকান্ত প্রথমে বাড়ীর বার হতো না। তারপর বছরখানেক পরে, আমরা ধীরে ধীরে সাবধানে সন্ধ্যের দিকে একটু বেড়াতে শুরু করলাম। নাইট-শো'তে সিনেমাও যেতাম।

আরো কিছুদিন পরে সূর্যকান্ত আবার নিয়মিত বাইরের কলে যাতায়াত করতে লাগলো। সেই সময় একটি পেসেণ্টকে দেখে গাড়ীতে ওঠবার কিছু আগেই প্রচণ্ড শব্দে গাড়ীর ভেতর একটি বোমা ফেটে গিয়ে গাড়ীটা ভেঙ্গে তুবড়ে গেল।

ড্রাইভারের অজান্তে গাড়ীর সিটের তলায় কখন, কে এই বোমা রেখে গিয়েছিল, তা জানার কোন উপায় হল না বটে, তবে এ দুষ্কর্মটি কার হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমাদের কারুর সন্দেহ রইলো না। পুরনো ড্রাইভারকে এই ষড়-যন্ত্রে সন্দেহ না করলেও পাওয়ার সায়েব তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে, নিজে গাড়ী চালাবার ভার নিল। পাওয়ার সায়েব বেরিয়ে যায়, সূর্যকান্তর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একা ওপরতলায় আর গেটে থাকে মঙ্গল সিং। দারুণ ভয় করতো আমার, কিন্তু কি করবো? উপায় কিছু নেই।

একদিন সূর্যকান্ত একতাড়া কাগজ নিয়ে এলো। আমাকে পড়ে শোনালো। তার মর্মার্থ। একটি দানপত্রের খসড়া এ্যাটর্নির সাহায্যে তৈরী করেছে সে। দানপত্রে সে তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান করেছে। মঙ্গল সিংকে দেওয়া হয়েছে। দশ হাজার টাকা, আর পাওয়ার সায়েবকে পঁচিশ হাজার টাকা। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তবে ঐ টাকা বাদে আমাকে প্রদত্ত সব কিছু পাবে হসপিটাল। দেশের দুঃস্থ গরীব মানুষ, বিনা খরচায় বা অল্প খরচায় এখানে চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

সব শুনে আমি বললাম---এমন কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমার মাথায় এই শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ? এ দানপত্র ছিঁড়ে ফেলো।

---অনেক ভেবেচিন্তেই এ কাজ করতে হয়েছে রূপা। তোমার আজকের এই অবস্থার জন্যে তো সম্পূর্ণ দায়ী আমি। আমাকে বধ করার জন্য যে ভাবে সপ্তব্যূহ তৈরী করা হচ্ছে, কখন পড়ে যাব তার মধ্যে, বলা যায় না। তারপর আমার অবর্তমানে সব সম্পত্তি চলে যাবে পরহস্তে, মানে তোমার বাবার হাতে। এ সবই তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি কিনা। তা-ই ঠিক করলাম যে যদি কোনদিন আমি তোমার পাশে না-ও থাকি, তবু তখন আমার সম্পত্তি, থাকবে তোমার জন্যে। বুঝতেই তো পারছো, পয়সা বলও একটা বড় বল। এটুকু তোমার জন্যে না করতে পারলে যে বড় অশান্তি ভোগ করছি রূপা! তুমি ভাল মনে এ কাজে মত দাও আমায়---আর দানপত্র করলেই তো মানুষ মরে না, থাক্ না একটা ব্যবস্থা করা।

কি জবাব দেব? তখন বিশেষ কিছু চিন্তা করার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না, তাই ওর সবল দৃঢ় হাতখানি নিজের দুর্বল হাতে চেপে ধরে অবসন্ন-ভাবে বিছানায় পড়ে রইলাম।

যথাসময়ে দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রী হয়ে গেল। তারপর সূর্যকান্ত স্থির করলো, দীর্ঘকালের মত চলে যেতে হবে, অন্য কোথাও।

"হেথা নয়, হোথা নয়,
অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে।"

বিশ্বকবির সেই জীবনসঙ্গীত ধ্বনিত হতে থাকলো আমাদের চলার পথে।

আমি, সূর্যকান্ত, আর আমাদের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু পাওয়ার সায়েব, আমরা চলেছি ভারত ভ্রমণে। প্রথম কয়েকটা মাস কাটলো, বেনারস, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর ভ্রমণে।

ভুলে গেলাম মহানগরীর ক্লেদাক্ত জীবনের বেদনা। "তীর্থের আছে স্থান-মাহাত্ম্য।" মানুষ তাই তীর্থভ্রমণে গেলে দেহমন পবিত্র হয় শান্তি পায়। এসব কথা শুনেছি দিদিমার মুখে। আজ তার সত্যতা অনুভব করছি মনেপ্রাণে। মন্দির দেউল মসজিদ গীর্জা, সব মিশিয়ে আমাদের মহাতীর্থ রচিত হয়েছে। মন্দির-গাত্রে কি বিচিত্র শিল্পকলা। এই অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পে আছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃস্টান সকল ধর্ম, সকল জাতির মিলিত অবদান। তীর্থস্থান-গুলি হয়তো, ঝকঝকে সুন্দর সাজানো সহর নয়। সেখানে আছে অনেক ধূলো ধোঁয়া, নোংরা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কার। তথাপি এক অমোঘ সত্য অনুভব করলাম যে একটি অনির্বচনীয় শান্ত মধুর পবিত্র ভাবধারায় ভরপুর ওখানকার আকাশ বাতাস। তাই বুঝি, লক্ষ লক্ষ নরনারী সকল বাধা বিপত্তি দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে অবিরাম ধারায় চলেছে তীর্থভ্রমণে।

জয়পুর থেকে আমরা গেলাম হরিদ্বারে।

আহা কি অপূর্ব স্থানটি। ওখানকার গঙ্গার রূপ একেবারে অন্যরকম। ফিকে নীল রং-এর কাচের মত স্বচ্ছ জলধারার খরস্রোতে নিরাপদে স্নান করার জন্য মোটা মোটা লোহার শেকল ঝোলানো রয়েছে। ঐ শেকল ধরে স্নান করলাম আমরা। মনপ্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল, দেবভূমির পুণ্য ধারায় অবগাহন করে। বড় বড় মাছের ঝাঁক কেমন নির্ভয়ে মানুষের কাছে এগিয়ে আসছে তাদের কাছ থেকে খাবার নেবার জন্য। ওখানে ওদের সঙ্গে মানুষের খাদ্যখাদক সম্পর্ক নয়, তাই ভয় নেই ওদের। বড় ভালো লাগলো পবিত্র দৃশ্যটাকে। হরিদ্বারের আশ্রম মন্দির, সব দর্শন করে আমরা হৃষীকেশ, লছমনঝোলায় গেলাম। হিমালয়ের পথে যত এগিয়ে যাচ্ছি আমরা ততই বাড়ছে তার প্রতি আকর্ষণ। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে স্তব-স্তোত্র, ভজনের সুগম্ভীর মধুর ধ্বনি।

অদৃশ্য লোক থেকে যেন ভেসে আসছে এক উদাত্ত আহ্বান---আয়, আয়, চলে আয়! সেই মরমী আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য বুঝি, হাজারে হাজারে লোক ছুটে চলেছে কেদার বদ্রীনারায়ণ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, গোমুখ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থপথে।

আমাদেরও প্রবল বাসনা জাগলো ঐ পথে যাবার জন্য, কিন্তু দমন করতে হল কারণ, পাওয়ার সায়েব বললো, এবারের প্রোগ্রাম যেমন আছে তেমনিই থাক্ সামনের বছরে হিমাচল প্রদেশ ভ্রমণ করবার জন্য সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে আসবো আমরা।

সূর্যকান্ত বললো---সেই ভালো। শুধু আসবো না, আমার মনে হচ্ছে--- মহা প্রস্থানের পথেই আমরাও মহা-প্রস্থান করবো, অর্থাৎ আর ফিরবো না এখান থেকে। তুমি কি বলো রূপা?

পরীক্ষা আরম্ভের পূর্বে শেষবারের মত পাঠরতা ছাত্রীবৃন্দ

---আমিও তো চাই। এই আকাশ, জঙ্গল, পাইন বন, নদী, ঝরনা, আর হিমালয়ের পর্বতমালা, এসব ছেড়ে, সেই নরকে ফিরতে কার আর মন চায়? জবাব দিলাম আমি।

হরিদ্বার ছেড়ে আমরা এসেছি ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। স্বর্গই বটে। ডাল লেক-এ পদ্মবনের ধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে শিকারা করে আমরা যখন ঘুরে বেড়াতাম, আর গীটার বাজাতো পাওয়ার সায়েব তখন একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম যে এই পৃথিবীর কোথাও হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, দুঃখ বেদনা আছে।

তখন একটি আশ্চর্য সুন্দর দার্শনিক ভাবে মনটা যেন সিক্ত হয়েছিল,---এই সুন্দর জগতে আমরা দুদিনের পর্যটক মাত্র। কোনো বাধা বন্ধন নেই আমাদের চলার পথে। জীবন সত্য। আনন্দ সত্য।

সেই মহাজীবনের বিচিত্র রূপ দর্শন করলাম আমরা, আর তার মধুর রসটি পান করে ধন্য হলাম, তৃপ্ত হলাম।

ভূস্বর্গে কিছুদিন কাটিয়ে বোম্বাই রওনা হলাম আমরা। হতাশ হলাম জায়গাটাকে দেখে। বড্ড যেন নকল মানুষের ভিড় এখানে। সাজ পোষাক, সুদৃশ্য প্রাসাদ, হোটেল, দোকান প্রভৃতি মিলিয়ে একটি ঝকমকে সুন্দর সহর, যাকে বলা যায় আধুনিক মানুষের প্রাণকেন্দ্র। এখানে পয়সা থাকলে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বা আরামের অভাব হবে না, তার জন্য যথার্থ উপকরণ যা কিছু দরকার সব আছে এখানে, শুধু মনে হয় সব থেকেও কি যেন নেই।

এখানকার সমুদ্রকে যেন সমুদ্র বলতে ইচ্ছা করে না। তার উত্তাল ফেনিল তরঙ্গমালা, বালুকাবেলায় এসে আছড়ে পড়ছে না, কারণ সে পাষাণ প্রাচীরে বন্দী হয়ে আছে। সেই প্রাচীরের এ পাড়ে বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত নরনারীর মিছিল, দেখা যায় সকাল সন্ধ্যায়। ওরা আসে খোলা-মেলা স্থানে, দু চার দণ্ড আনন্দ স্ফূর্তির জন্য, কিন্তু অসীমের সান্নিধ্যে এসে তার ধ্যানে তন্ময় হয়ে, বিরাটের সাথে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মহামিলনের আশ্চর্য আনন্দ কেউ উপলব্ধি করে না। তবুও এখানে দর্শনযোগ্য কিছু স্থান আছে। কমলা নেহেরু পার্ক, মালাবার হিল্ আর সমুদ্রের ভেতর আছে---বিচু দ্বীপ। এগুলো আমরা ঘুরে দেখলাম। খুব ভালো লাগলো এলিফেণ্টা কেভস্ দ্বীপটিকে।

বোম্বে সহর ছেড়ে আমরা গেলাম পুণাতে। পুণার যাত্রাপথটি বড় সুন্দর। চারিধারে বড় বড় খাদযুক্ত পর্বতমালা, মাঝে মাঝে ঝরনা ট্যানেল ঘন সবুজ অরণ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য, বৈচিত্র্য দর্শনে গভীর আনন্দ লাভ করলাম আমরা।

পুণার শান্ত পরিবেশটিও আমাদের নিরুদ্বেগবাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান হওয়াতে তিন চার মাস আমরা সেখানে রইলাম।

বিশ্বস্ত দরোয়ান মঙ্গল সিং চিঠিপত্র দ্বারা সর্বদা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিলো, আর পাওয়ার সায়েব, তার গীটারের করুণ সুরধারায় আমাদের মনপ্রাণ সর্বদাই সিক্ত করে, দুশ্চিন্তার দাহজ্বালাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতো। এই দরদী বন্ধুটি সঙ্গে না থাকলে, আমাদের এই প্রবাস জীবন, হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠতো। দীর্ঘ ভ্রমণে যখনই ক্লান্ত হয়েছি আমরা, পাওয়ার সায়েব তার বিচিত্র সুরধারায় মুছিয়ে দিয়েছে আমাদের দেহমনের ক্লান্তি। আর তখনই বার বার মনে পড়েছে, তার সেই কথাগুলোকে---এই বাজনার সাথে দোস্তি কর সিস্টার, তামাম্ দুনিয়ার এমন দোস্ত আর পাবে না।

দীর্ঘ এক বছর পরে কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে ফিরে এলাম আমরা। মঙ্গল সিং লিখেছিলো, ডিস্পেনসারীতে পুলিশ এসেছিল, তাই সূর্যকান্তর শীঘ্রই ফিরে আসার দরকার।

সূর্যকান্ত ফিরে এসেই জানতে পারলো,---কয়েকজন কেমিস্টের হাতে ওষুধের দোকানের ভার দিয়েছিল, তারা কিছু ভেজাল ওষুধ বিক্রি করে লাভবান হবার চেষ্টা করছিল, সেজন্য পুলিশ হানা দিয়েছে। ঝামেলা মিটতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিলো। তারপর দোকান, ডিস্পেন্সারী সব তুলে দিল সূর্যকান্ত।

এবারে কি করা যায়? পরামর্শ করি আমরা তিনজনে মিলে। সময় যে আর কাটতে চায় না। আমি বেদনা-বিক্ষুব্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি ওর দিকে। হায়, সামান্য একটি মেয়ের জন্যে, আর তুচ্ছ একটি অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য একটি উজ্জ্বল জীবন কিভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো!

সব কাজকর্ম হারিয়ে অত্যন্ত জোয়ান মানুষটা ক্রমশ যেন কেমন স্থবির হয়ে পড়ছে। অনেক চিন্তার পর বললো সূর্যকান্ত,---বাড়ী টাড়ী বিক্রি করে চলো দুজনে বিলেত চলে যাই। সেখানে গিয়ে দুজনেই পড়াশোনা করবো, মানে তুমি যাবে নার্সিং লাইনে আর আমি ডাক্তারী ব্যাপারের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে পড়াশোনা করবো। আর সবচেয়ে বড় কথা যে, ওখানে গিয়ে আমরা প্রথমে খৃস্টধর্ম নিয়ে, সেই মতে আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলবো। তারপর দরকার হলে, নিজের ধর্মে পরে ফিরে আসা যাবে। আর এখানে যখন আমাদের আত্মীয় বন্ধু আপন জন বলতে কেউ নেই তখন ঐ দেশেই থাকি জীবনটা কাটাবো মনে করছি। কারণ তুমি দেখো, ওদেশের মানুষগুলো এমন নীচ সঙ্কীর্ণ মনের নয়, ওখানে আমরা বেশ ভালোই থাকবো। তুমি কি বলো রূপা?

আমি? আমি কি বলবো? স্রোতের ফুল তো স্রোতেই ভেসে চলেছি। স্রোতের টান আমাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবো। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবই অবান্তর।

এ সব কথা মনে রেখে, মুখে বললাম ---তোমার মতই আমার মত। ভালো-মন্দর ভার তো সবই তুমি নিয়েছো।

আমাদের দুজনের পাশপোর্টের জন্য চেষ্টা করা হতে লাগলো, আর বাড়ী বিক্রির জন্য দালালরা আনাগোনা সুরু করলো।

এখন ভীষণ ব্যস্ততার মাঝে কাটছে আমাদের দিনগুলো। আমাদের পড়াশোনার ব্যাপার নিয়ে ওদেশের সঙ্গে চিঠিপত্র মারফৎ নানারকম প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে সূর্যকান্ত। দালালরা আনছে নিত্য নতুন খদ্দের। [illegible] আসবাবপত্তর, ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতি সমেত বিক্রি হবে বাড়ীটা, সব মিলিয়ে দাম দাঁড়াচ্ছে [illegible] লাখ টাকায়। [illegible]। নতুন উৎসাহে আবার জেগে উঠেছি দুজনে। দুজনের মিলিত জীবন আকাশ, অমানিশার ঘন ঘোর অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন, সেখানে লেগেছে নব প্রভাতের অরুণাভার শুভ ইঙ্গিত। দীর্ঘ চার বছর পরে, দুঃস্বপ্নের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করে, আবার সুন্দর স্বাভাবিক জীবনপথে যাত্রা শুরু করেছি আমরা। নতুন আশা, নতুন পরিকল্পনা, নবীন উদ্যম হয়েছে আমাদের চলার পথের সাথী।

নিয়মিত গাড়ী করে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই আমরা, কয়েক পাক ঘোরার পর, মোটর থেকে নেমে, দুজনে বসি গিয়ে গঙ্গার কিনারে। পাওয়ার সায়েব থাকে গাড়ীতে।

সেদিনও খানিকটা ঘোরবার পর গঙ্গার ধারের পুরনো অশ্বত্থ গাছতলার বেঞ্চিতে বসেছিলাম দুজনে। সময়টা বোধ হয়, জানুয়ারীর মাঝামাঝি হবে। চারিদিকে জমাট কুয়াশার অন্ধকার ছড়ানো, গঙ্গার বুকে কুয়াশার পর্দা নেমে এসে, ওপারের আলো ঝলমলে দৃশ্যটাকে ঢেকে দিয়েছে। বিশেষ লোকজন আর নেই আশেপাশে। কনকনে ঠাণ্ডার ঝাপটা লাগছে চোখে-মুখে। আমি বললাম—বড্ড নির্জন হয়ে গেছে, এবারে চলো বাড়ী ফেরা যাক। আমরা ছাড়া, আর বোধ হয় কেউ নেই এখানে।

সিগারেট ধরিয়ে বেশ আমেজের সঙ্গে টানছে সূর্যকান্ত। সে জবাব দিলো লোকের ভিড় তো বাঞ্ছিত নয় আমাদের পক্ষে, এই ভালো। ভয়ের কি আছে? পাওয়ার তো পাশেই রয়েছে। আমার আর একটু কাছে সরে এসে গা ছুঁয়ে বসলো সে। আমার একটা হাত নিজের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে, বোধহয় আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইলে।

চ্যাঁ-চ্যাঁ, রব তুলে কোন গাছের [illegible] থেকে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল রাতজাগা পাখী। কেমন যেন এক অজানা অশুভ ইঙ্গিতের আভাসে, থরথর করে কেঁপে উঠল আমার বুকটা। মনে হচ্ছিলো আশেপাশে কারা যেন ঘোরাঘুরি করছে।

আমি সূর্যকান্তর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—চলো গাড়ীতে গিয়ে বসিগে, জায়গাটা কেমন যেন ভালো লাগছে না আমার।

—বেশ তাই চলো, বলে পা বাড়ালো সূর্যকান্ত। তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কি যে ঘটে গেলো। কালো চাদর মুড়ি দিয়ে ছুটে এলো দুটো মূর্তি, গাছের আড়াল থেকে। ওদের হাতে ঝকঝকে দুটি ছোরা। একজন সূর্যকান্তর বুকে, আরেকজন পিঠে, সজোরে বসিয়ে দিলো ছোরা দুটো।

দুজনের আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকারে, খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়লো নির্জনতার আসর।

বেঞ্চির ওপর সূর্যকান্ত ঢলে পড়লো আমার কোলে। তার মুখ থেকে একটা ঘরঘর করে বিকৃত গোঙানির আওয়াজ বেরোলো, আর তার বুকের তাজা রক্তে ভিজে উঠলো আমার কাপড়জামা।

আমাদের চিৎকারে ছুটে এলো, [illegible] কিছু লোকজন। আর্তনাদের শব্দ শুনে ছুটে এল পাওয়ার সায়েব। ততক্ষণে পালিয়ে গেছে নরঘাতক দস্যুরা।

সূর্যকান্তকে ধরাধরি করে এনে শোয়ানো হল গাড়ীতে। আর ওর তাজা রক্তের ধারায় গঙ্গার ধারে লেখা হইলো এক অপরিণামদর্শী, উদ্দাম, দুঃসাহসী প্রেমিক যুবকের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি।

হস্পিটালে নিয়ে আসার কয়েক ঘণ্টা পরেই; জীবনপথের হঠকারিতার চরম মূল্য দিয়ে, চলে গেলো সূর্যকান্ত রায়।

(ক্রমশ।

পশ্চিম জার্মানীর ডুসেলডর্ফে অন্ধদের জন্য একটি চিত্র প্রদর্শনী

তখন পাশার বয়স খুব কম আর বর্তমান অপেক্ষা দর্শনেও বেশী সুরূপা এবং কণ্ঠস্বরও অধিকতর মধুর ছিল। পাশার গ্রীষ্ম-বাটিকার অলিন্দে তার গুণগ্রাহী নিকোলাই পেট্রোভিচ্ কোলপাকভ উপবিষ্ট ছিল। দুঃসহ শ্বাস-রুদ্ধকারী গরম। স্বল্পকাল পূর্বে আহার সমাপনান্তে নিকোলাই পর্যাপ্ত সুলভ-মদ্য পান করে এসেছে। তার মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে, কিছুই ভাল লাগছে না। একটা নিবিড় অবসন্নতা পাশা ও নিকোলাই উভয়কেই বেষ্টন করে রয়েছে। উষ্ণতা হ্রাস পেলে তারা একটু ভ্রমণ করে আসবার অপেক্ষায় রয়েছে।

সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বারে ঘণ্টা ধ্বনিত হল। তখন নিকোলাইয়ের পরিধানে ছিল কেবল সার্ট আর পায়ে চটি। ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করে চেয়ার ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসু-নেত্রে পাশার প্রতি দৃষ্টিপাত করল।

: সম্ভবত পিওন অথবা মেয়েদের কেউও হতে পারে। পাশা বলল।

পিওন কিংবা পাশার বান্ধবীদের কেউ এলে নিকোলাইয়ের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার অবশ্য কিছু নেই, তথাপি

আন্তন শেখভ

জরুরী প্রয়োজনের সংশয়ে নিকোলাই একহস্তে পোশাক ও পাদুকা নিয়ে পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল। পাশা দুয়ার উন্মুক্ত করতে গেল।

দ্বার উদ্‌ঘাটন করে পাশা যথার্থই আশ্চর্যান্বিত হল। এক অজ্ঞাত রূপসী যুবতী---মার্জিত রুচির পরিচ্ছদই তার অভিজাত বংশের সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়। কিন্তু তার মুখ ফ্যাকাশে আর ক্রন্দনের জন্য চক্ষুদ্বয় রক্তিম।

: আপনার কি চাই ? পাশা প্রশ্ন করল।

মহিলাটি তখনই কোন জবাব দিল না। এক পা অগ্রসর হয়ে এসে ধীরে ধীরে চতুর্দিক দেখে নিল। তারপর কিছু বলবার জন্য তার রক্তশূন্য ওষ্ঠাধর স্পন্দিত হল।

: আমার স্বামী কি তোমার বাড়ীতে আছে ?

: আপনার স্বামী ? অস্ফুটস্বরে পাশা জিজ্ঞাসা করল।

: আমার স্বামী নিকোলাই পেট্রোভিচ্ কোলপাকভ্।

: না না, আমি কোন স্বামীকে চিনি না।

ক্ষণকাল স্তব্ধতায় অতিবাহিত হল। নবাগতা নারী কয়েকবার রুমাল তার শোণিতহীন ঠোঁটে স্পর্শ করাল, নিঃশ্বাস রোধ করে রইল যেন সে তার বক্ষাভ্যন্তরের ভীষণ কম্পন দমন করতে চায়। চক্ষুতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টি নিয়ে পাশা তার সম্মুখে নিশ্চল দণ্ডায়মান রইল।

: তাহলে তুমি বলছ আমার স্বামী

সিকিমের অগ্রবর্তী অঞ্চলের একটি সামরিক হাসপাতাল পরিদর্শনরত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গা

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী
জ্যৈষ্ঠ / '৭৫

কলকাতার প্রাচীন ঐতিহ্য—ঘোড়ার গাড়ি

এসপ্লানেড ইস্টে পুলিশবেষ্টনীর সামনে বিক্ষোভরত কলেজ কর্মিবৃন্দ
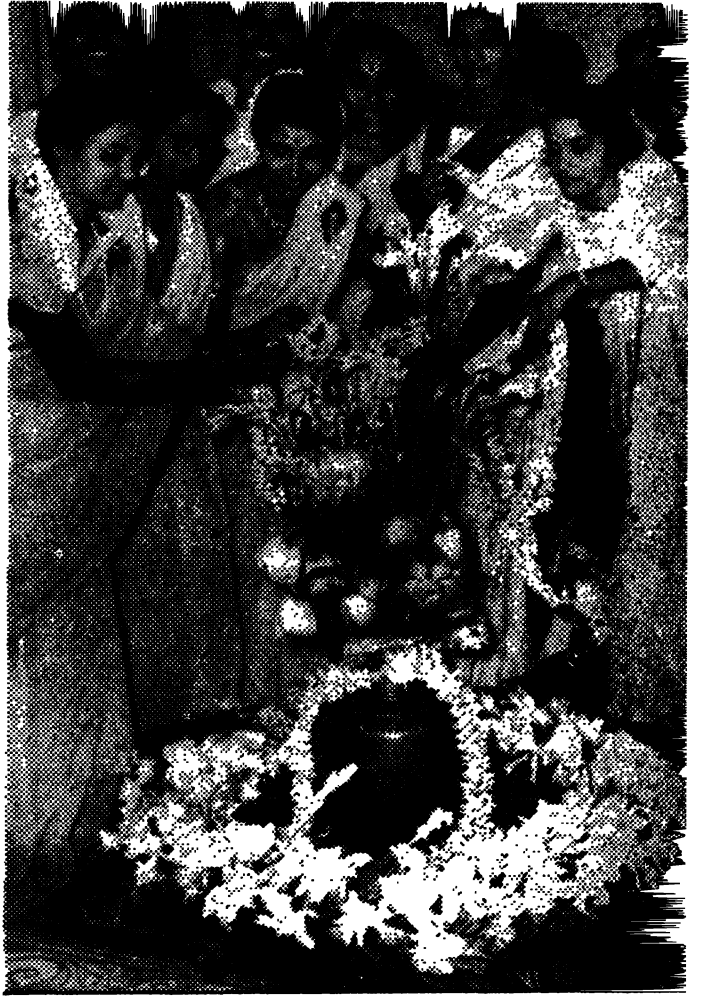
পিচ গলাবার কারনেসে জঞ্জাল পোড়ানোর দৃশ্য

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরুর শুভ জন্মদিনে
শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছেন মহিলাবৃন্দ

ভুটানের থিম্পুতে থিম্পু ফুন্টশলিং জাতীয় সড়কের উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রসের উদ্যোগে বিশ্ব রেডক্রস দিবসের এক অনুষ্ঠানে সমবেত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

কলকাতায় ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিক্ষণবিষয়ক আলোচনা-চক্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন
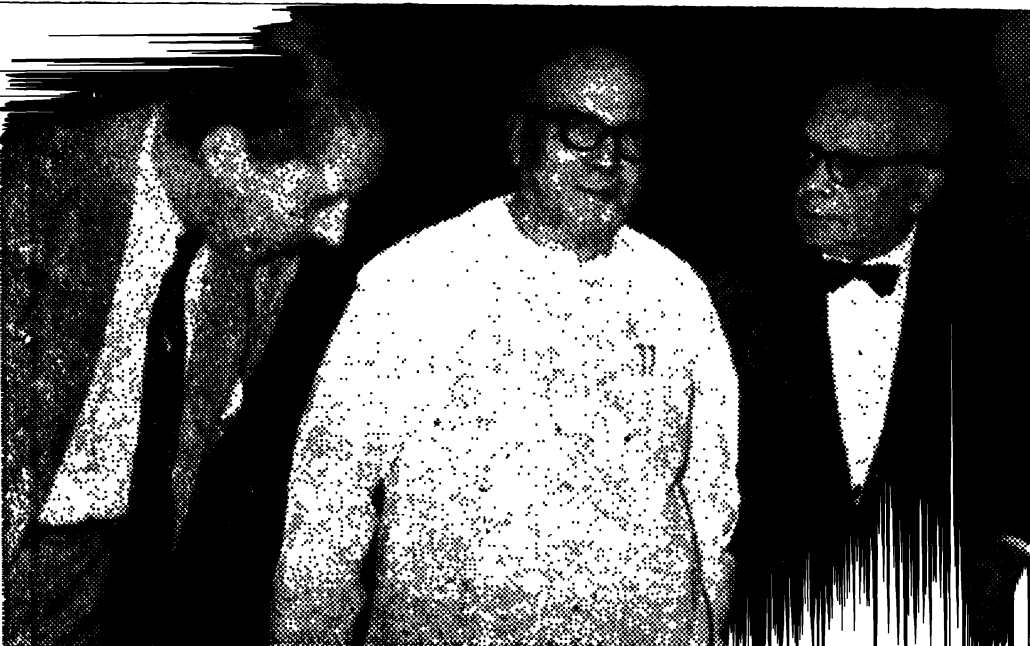
এখানে রেখে? আগন্তুক এক অদ্ভুত হাসি হাসল।

: আমি বুঝতে পারছি না আপনি কার সন্ধান করছেন।

: বদমাশ মেয়েমানুষ কোথাকার। অকস্মাৎ মহিলাটি ক্রোধে ও ঘৃণায় বিদীর্ণ হয়ে পড়ল।

পাশা হৃদয়ঙ্গম করল যে, তার সম্বন্ধে নবাগতার চিত্তে একটা ঘৃণ্য কদর্য প্রতীতি সৃজিত হয়েছে।

: আমার স্বামী কোথায়? অবশ্য তার এখানে থাকা বা না-থাকায় কি বা আসে-যায়। তবু আমি জানিয়ে রাখছি, তার সব প্রতারণা ধরা পড়ে গিয়েছে। ওর সন্ধানে লোক বেরিয়েছে, খুঁজে পেলেই গ্রেপ্তার করবে। দেখ, তুমি কি সর্বনাশ করেছ!

রমণী উঠে দণ্ডায়মান হল, ভয়ংকর উত্তেজনায় ঘরের ভিতর পাদচারণ করতে আর ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগল।

: আজই ওকে তল্লাশে বের করে গ্রেপ্তার করবে। তুমিই যে তার এই অবস্থার জন্য দায়ী তা আমি বুঝি। তুমি, তুমি! ঘৃণায় সে তার ঠোঁট বক্র ও নাসিকা কুঞ্চিত করল।

: অসহায় আমি, তবে ঈশ্বর আছেন আর তিনি সব কিছু দেখছেন। আমি তাঁর নিকট ন্যায়বিচার পাবই। আমার প্রতি ফোঁটা অশ্রুর জন্য আর প্রত্যেকটি বিনিদ্র রজনীর জন্য তিনি তোমার নিকট কৈফিয়ৎ চাইবেন। দেখ, যথাসময়েই আমার কথা তোমার স্মরণ হবে।

পুনর্বার নীরবতা। মহিলাটি হাত মোচড়াতে মোচড়াতে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করল। তখনও পাশা দাঁড়িয়েছিল। পূর্বের ন্যায়ই তার চোখে নির্বোধের দৃষ্টি। তার কাছে সব কিছুই দুর্বোধ্য বোধ হচ্ছিল।

: কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না। অবশেষে পাশা বলল। তারপর হঠাৎ ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ল।

নারীর চক্ষু হতে যেন বহ্নি নির্গত হল : মিথ্যাবাদী কোথাকার। আমার সব জানা আছে। গত মাসের প্রতিটি দিন ও এখানে অতিবাহিত করেছে।

: কিন্তু তাতে কি হয়েছে? কত লোকই তো আমার কাছে আসে। আমি তো কাউকে ধরে আনি না, তারা স্বেচ্ছায় আসে।

: আমি তো তোমায় বলেছি যে, ওর জুয়াচুরি ধরা পড়েছে। তোমার মত একটা অতি হীনাবস্থা মেয়ের জন্য সে অপরের কাছ থেকে প্রবঞ্চনা করে টাকা আদায় করেছে। তোমারই জন্য তার এই কুকাজ। অটল ভঙ্গীতে পাশার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আগন্তুক বলে চলল : তোমার তো নীতিজ্ঞান নেই। তবু আমার এরূপ ধারণা হয় না যে, তুমি এত হীন হয়ে গিয়েছ যাতে মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি পর্যন্ত খুইয়েছ। ওকে যদি সাইবেরিয়ায় পাঠায় তাহলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমি কি বলছি তা বুঝতে পারছ? তবে দারিদ্র্য আর অবমাননার হাত থেকে ওকে আর আমাদের সকলকে রক্ষা করবার এক উপায় আছে। প্রতারণা করে যাদের কাছ হতে অর্থ আদায় করেছে আজ তাদের যদি ন'শ' রুবল প্রত্যর্পণ করে তাহলে তারা ওকে নিষ্কৃতি দেবে।

: কোন ন'শ' রুবল? মৃদুস্বরে পাশা বলল : আমি বুঝতে পারছি না---আমি তো তার কাছ থেকে ------

: তোমায় কাছ থেকে আমি তা চাইছি না। তোমাদের ন্যায় মেয়েদের লোকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দেয়। তুমি কেবল আমার স্বামীর দেওয়া অলঙ্কারগুলো আমাকে ফেরত দাও।

: কিন্তু আপনার স্বামী আমাকে কোন গহনাই দেয় নি। পাশা চীৎকার করে উঠল, এতক্ষণে তার নিকট সব কিছু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

: এত টাকা পয়সা তাহলে কোথায় গেল? আমার সব কিছু নিঃশেষ করে অবশেষে ও অপরের টাকায় হাত দিয়েছিল। সে সব কি হল? শোন, ক্রোধের বশে তোমাকে অনেক কুকথাই বলেছি। তোমার কাছে আমি মার্জনা চাইছি, বুঝি আমাকে তুমি ঘৃণা করছ, তবু তোমার হৃদয়ে যদি একটু মমতা-করুণা থাকে তাহলে তুমি আমার দশা উপলব্ধি করতে পারবে। আমি করজোড়ে বলছি, তুমি আমায় ওগুলো ফিরিয়ে দাও।

: বেশ, তবে---। পাশা গ্রীবা সঞ্চালন করল, এবার যেন একটু কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

: আমি তো দিয়েই দিতাম। ঈশ্বর জানেন, ও কিছুই দেয় নি আমাকে। তবু দেখি একবার। হ্যাঁ, কেবল দু'টো গহনা ও আমাকে কিছুদিন আগে দিয়েছিল। চান যদি তো ফেরত দিচ্ছি।

পাশা রূপসজ্জার টেবিলের একটা

দেরাজ উন্মুক্ত করে একটা চাকচিক্য-পূর্ণ সোনার ব্রেসলেট আর একটা স্বল্প পাথরখচিত হালকা স্বর্ণাঙ্গুরী বার করল। আগন্তুকার হস্তে বস্তুগুলি প্রদান করে বলল : আপনি নিন।

রমণীটির আনন রক্তিম হয়ে উঠল। ওষ্ঠাধর কম্পিত হতে লাগল। ভয়ানক মানসিক চাঞ্চল্যে সে বিদীর্ণ হয়ে পড়ল : আমাকে এ তুমি কি দিচ্ছ? আমি তোমার কাছে ভিক্ষা নিতে আসি নি। আমার হতভাগ্য স্বামীর দুর্বলতার সুযোগে তুমি যা সংগ্রহ করেছ, কেবল তাই আমাকে দাও। বৃহস্পতিবার লতাকুঞ্জে ওর সঙ্গে তোমাকে দেখেছি। তুমি দামী ব্রোচ আর ব্রেসলেট পরেছিলে। আমার কাছে আর অজ্ঞতার ভাণ ক'রো না। শেষ প্রশ্ন করছি, জিনিসগুলো দেবে কি দেবে না?

: আপনি কি অদ্ভুত। পাশা এবার রুষ্ট হল : বার বার বলছি এই ব্রেসলেট আর আংটি ছাড়া নিকোলাই আমাকে আর কিছু দেয় নি। কোন জবাব নেই। মুখে রুমাল ঘর্ষণ করতে করতে মহিলাটি ডুকরে রোদন করতে লাগল।

: হাতজোড় করছি। তুমি আমার স্বামীর সর্বনাশ করেছ, তথাপি তোমাকে তাকে রক্ষা করতে বলছি। তার জন্য তোমার তো কোন করুণা নেই, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো---কি করেছে তারা যে, তাদের উপর এই দুরদৃষ্ট নেমে আসবে?

পাশা চক্ষুর সম্মুখে যেন বিলোকন করল যে, নিকোলাইয়ের সন্তান-সন্ততিরা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা ক্ষুধায় ক্রন্দন করছে। তার নিজের চোখেও অশ্রু নেমে এল।

: কিন্তু কি করব আমি? আপনি আমাকে শয়তান বলছেন, আমি আপনার স্বামীর সর্বনাশ করেছি, তবু ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি, আমাকে আপনার স্বামী কিছুই দেয় নি। আমাদের মুক্তারই উপার্জন শুধু ভাল।

: আমাকে কেবল অলঙ্কারগুলো দাও। তোমার নিকট আমি কাঁদছি, মস্তক নত করছি। যদি তুমি ইচ্ছা কর, এই আমি তোমার পায়ে পড়লাম।

শঙ্কিত হয়ে অকস্মাৎ পাশা চেঁচিয়ে উঠল। সে অনুধাবন করল যে, অভিনয়ের বচন-বক্তা এই ভদ্র নারী এবার বাস্তবিকই তার পদালিঙ্গন করবে। সে স্বীয় অহঙ্কারের বশেই তা করবে। কিন্তু এর পরিণামে যে নিজেকে উর্ধ্বে স্থাপন করা আর পাশার পাপ বৃদ্ধি করা তা জ্ঞাত হয়েই এ-কাজ করবে।

: বেশ সব দিচ্ছি। চোখ মুছে পাশা তৎপর হয়ে বলল : তবে যাই চিন্তা করুন, ওসব নিকোলাই আমাকে দেয় নি। ওগুলো অন্য লোকের দেওয়া।

টেবিলের উপরের টানা খুলে একটি হীরক-খচিত ব্রোচ, একটি প্রবালের মালা, কতকগুলি অঙ্গুরী আর একটা ব্রেসলেট বার করে মহিলাটির হস্তে অর্পণ করল।

: যান। ওগুলো নিয়ে বড়লোক হোন গে যান। আর যদি আপনি সত্যকার ওর সতী পত্নী হন তাহলে ওকে একটু সতর্ক দৃষ্টিতে রাখবেন। কোনদিন আমি আহ্বান করি নি, ও স্বেচ্ছায় আসে।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে রমণীটি অলঙ্কার-সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে করতে সহসা বলল : এতেও হবে না। এতে মাত্র পাঁচ শ' রুবলের মত হবে।

পাশা দেরাজ উন্মুক্ত করে এবার একটা সোনার ঘড়ি, সিগারেট-আধার, জামার হাতের একজোড়া বোতাম বার করে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করল। তারপর হস্ত সঞ্চালন করে বলল : আমার আর কিছুই রইল না, আর কিছু আছে কি না দেখুন।

মহিলাটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কম্পিত হস্তে অলঙ্কারগুলো একটা রুমালে বেঁধে নিল। একটিও কথা না বলে বিদায়সূচক মস্তক কিঞ্চিৎ নত না করেই সোজা কক্ষ হতে সে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত করে নিকোলাই বেরিয়ে এল---পাণ্ডুর মুখ, নয়নে অশ্রু।

: তুমি আমাকে কি গহনা দিয়েছ? পাশা এবার নিকোলাইকে নিয়ে পড়ল : বল, আমাকে বল।

: গহনা! কে বলল ও : ও তোমার কাছে এসেছিল।

তারস্বরে পাশা বলে উঠল : বললে না তোমার কাছে আমি কি পেয়েছি?

: ভগবান! সে যে নিষ্পাপ, সে যে মহীয়সী। সে তোমার মত একটা রাক্ষসীর পায়ে পড়তে চাইল। আমি এ কি করেছি : বসে বসে আমি তাই প্রত্যক্ষ করলাম। দু'হাতে মস্তক চেপে ধরে নিকোলাই আর্তনাদ করে উঠল : কোনদিন আমি তোমায় ক্ষমা করব না, কখনও না, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, ঘৃণ্য পশু কোথাকার।

পাশার সান্নিধ্য বর্জন করে নিকোলাই ত্বরায় পরিচ্ছদ পরিধান করল, তারপর দরজা খুলে প্রস্থান করল।

ভূলুণ্ঠিতা হয়ে পাশা ফুঁপিয়ে রোদন করে উঠল। ঝোঁকের প্রবণতায় অলঙ্কারগুলি প্রদানের জন্য স্বল্পকাল পূর্বেই তার অনুতাপ হচ্ছিল। তিন বৎসর পূর্বে এক ব্যবসায়ী অকারণে তাকে নির্মমভাবে প্রহার করেছিল, সেই পুরাতন স্মৃতি অদ্য আচম্বিতে তার চিত্তে উদিত হওয়ায় তার ক্রন্দন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল।*

অনুবাদক—নির্মলগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

*'কোরাস গার্ল' গল্পের বঙ্গানুবাদ।
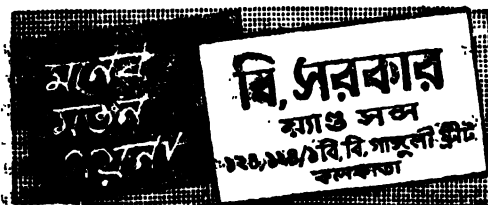
একাঙ্কিকা

● চরিত্রলিপি ●

॥ পুরুষ ॥		॥ স্ত্রী ॥	
প্রাণকেষ্ট	--- বাড়ির কর্তা	অণিমা (অণু)	--- প্রাণকেষ্টর স্ত্রী
নিরঞ্জন	--- প্রাণকেষ্টর ভায়রা-ভাই	মহিমা	--- অণিমার বোন ও নিরঞ্জনের স্ত্রী
বিনিকেষ্ট	--- প্রাণকেষ্টর পূর্বপুরুষ		
কালীকেষ্ট	--- ঐ	ইলা	--- মহিমার মেয়ে
হরেকেষ্ট	--- ঐ	ইতু	--- অণুর প্রতিবেশিনী ননদ

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[মধ্যবিত্ত পরিবারের বাইরের ঘর (ড্রইং রুম)। ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, চারখানা চেয়ার, একটি আরাম-কেদারা, একটি বুক কেস---তাতে কতক-গুলি বই। বুক কেসের উপর একটি ফুলদানি ও একপাশে ধূপদানি, বাড়ীর গৃহিণী অণিমা অর্থাৎ অণু ৩০।৩৫ বৎসরের এক মহিলা (সন্ধ্যাবেলা) বাড়িঘর সাজাতে ব্যস্ত। ফুলদানিতে ফুল রাখতে রাখতে আপন মনে বলে চলেছেন]

অণু। (আপন মনে) সাতটা বেজে গেল--- এখনো ওর দেখা নেই। এখনি হয়তো মহিমারা এসে পড়বে। আপিস থেকে একটা দিনও--- আজকের দিনটাও কি একটু চটপট বাড়ি ফিরতে নেই।

(ইতুর প্রবেশ)

ইতু। আচ্ছা অণু বৌদি একা একা কার সঙ্গে বক্‌বক্ করে চলেছ।---

অণু। কার সঙ্গে আবার নিজের সঙ্গেই। আচ্ছা ভাই কার না রাগ হয়। এই দ্যাখো না, ওর আসার আগে যদি ওরা এসে পড়ে তাহলে কি হবে বলো তো?

ইতু। কি আর হবে। এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

অণু। কি যে বল তুমি। অতিথি এসে যদি গৃহকর্তাকে বাড়িতে না দ্যাখে তাহলে কী বিচ্ছিরি হবে ভাবো দিকি? কোনদিনও কি একটু আক্কেল হবে না ওর?

শিবরাম চক্রবর্তী

ইতু। এতে ভাবনারই বা কি আছে? আর তাছাড়া দাদার আক্কেল দাঁতই ওঠেনি তার আক্কেল হবে কোত্থেকে।

অণু। ঘর সাজানো ঠিক হয়েছে তো?

ইতু। হ্যাঁ, বেশ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে ---

(এমন সময় বাইরে আওয়াজ হয়। ইতু যাবার জন্য প্রস্তুত! প্রাণকেষ্টর আবির্ভাব হয়। অণু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ----)

ইতু। এই রে এসে গেছে। আমি পালাই বৌদি।

অণু। আচ্ছা, আবার এসো কিন্তু।

(প্রাণকেষ্টর প্রবেশ)

অণু। আচ্ছা, আজকের দিনেও কি একটু দেরি করতে হয়? আজও কি একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে নেই?

প্রাণ। কেন---কি হয়েছে?

অণু। কি হয়েছে আবার? আমি মরছি বলে ছটফট করে---কখন তুমি আস---কখন ওরা আসে---আর তুমি এদিকে ----

(প্রাণকেষ্ট প্রতিবাদ করবার জন্য বার কয়েক হাঁ করেছিল---কিন্তু অণুর মুখের তোড়ে 'না' হয়ে মুখ বুজে গেল)

অণু। যাও, অমন করে আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে নাও। এখুনি তারা এসে পড়তে পারে, জানো তো।

প্রাণ। সেকথা বারবার জানাবার দরকার করে না অণু, আমি জানি, তারা আসবেই।

অণু। যখনই আমার আত্মীয়-স্বজন আসে তুমি যেন কেমন ধারা হয়ে যাও।

প্রাণ। আমি, আমি কোন ধারার ধার ধারি না।

অণু। (ঝঙ্কার দিয়ে) আপনার লোক আসুক কে না চায়? তারা বাইরের [illegible]

ফিরিয়ে দেয়। বাবা-মার একঘেয়েমি থেকে বাঁচায় আমাদের।

প্রাণ। একঘেয়েমি দূর করতে অনেক ঘা খাবার কোন মানে হয় না।

অণু। তুমি যেন কী। দিনকে দিন কি যেন হয়ে যাচ্ছ---একঘেঁড়ে, একগুঁয়ে কী রকম যেন। কোনো আমোদ-ফূর্তি নেই প্রাণে---যেন একটি জরদ্গব। নিরঞ্জনকে দ্যাখো তো। তোমার চেয়ে বয়সে বড় অথচ কেমন ফূর্তিবাজ।

প্রাণ। দেখেছি। গতবার যখন এসেছিল তার ফূর্তির চোট দেখা গেছল। দু খানা চেয়ার দিয়ে সেই যে কী কায়দা দেখিয়েছিল---

অণু। ভাবো দেখি কি আমোদ---

প্রাণ। কায়দা দেখাতে গিয়ে চেয়ার দুখানা ভাঙল---দুখানাই দামী দামী চেয়ার---সেই সঙ্গে নিজেও পা ভেঙে পড়ে রইলো মাস-খানেক। কি আমোদের ঠ্যালা রে বাবা।

অণু। তুমি কারও নিন্দা করতে পেলে---

প্রাণ। হ্যাঁ, তা তো বটেই---দিনরাত রুগীর পাশে তটস্থ থেকে সেবা-শুশ্রূষার হ্যাঙ্গাম---সেই ডাক্তার ডাকো---ওষুধ আনো---সে সব ভুলবার?

অণু। তা আপনজনদের জন্য একটু করতে হয়।

প্রাণ। হুঁ, তা বই কি? তার ওষুধের দাম, রোগের পথ্যি, ডাক্তারের ফি---তাও আমাকে গুণতে হয়েছে। অথচ চেয়ার নিয়ে ঐ ফূর্তি না দেখালেই কি তার চলতো না? যত সব, ফূর্তিবাজের বাজে ফূর্তি যত্তো। এ কি রকমের আত্মীয়তা বাপু?

অণু। আত্মীয়তার মানে তুমি বোঝো? নিজে কোথাও যাবে না, বেরুবে না, আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেবে না, কেবল নিজের ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকবে। আত্মীয়তা কি জিনিস তুমি কি জানবে ---?

প্রাণ। আত্মীয়তা কি জিনিস তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

অণু। বেশ করেছ। যাই বলো মহিমারা এসে এবার বেশ কিছুদিন এখানে থাকে তাই আমি চাই।

প্রাণ। তাই না কি?

অণু। তুমি যে কি একটুও আনন্দ নেই

প্রাণ। (হুঙ্কার দিয়ে) হুঁ। মড়ক মহামারী দুর্ভিক্ষ অনেক সময় পথ ভুল করে। পঙ্গপালও ভুল করে অন্য ক্ষেতে গিয়ে পড়ে, মৃত্যুও শিয়রে এসে অজান্তে ফিরে যায় এক এক সময়। কিন্তু। আত্মীয়দের বেলা কখনো অন্যথা হয় না। যে গাড়ীতে আত্মীয়রা আসে তাতে কলিশন হবার কথা কখনো শোনা যায়নি।

অণু। ছিঃ, ওকথা মুখে আনতে নেই।

(দরজার কড়া নাড়ার শব্দ)

প্রাণ। ঐরে! ওরা এসেছে। ওরাই। নির্ঘাৎ ওরা। ওরা ছাড়া কেউ না।

(অণু দরজা খুলে দেয়। নিরঞ্জন মহিমা ও তাদের মেয়ে ইলা সুটকেশ ও হোল্ডল হাতে প্রবেশ করে)

অণু। এসো, এসো---তোমাদের কথাই হচ্ছিল।

নিরঞ্জন। এই যে প্রাণকেষ্ট! কেমন আছ প্রাণ? বহাল তবিয়ৎ তো?

প্রাণ। নিরঞ্জন যে! ভালো আছো বেশ?

নিরঞ্জন। (মহিমার দিকে চেয়ে) আরে মহিমা যে, আমাদের যে ভুলে যাওনি, তুমিও যে এসেছো---তাতে যে কি খুসী হলাম বলতে পারি না।

মহিমা। আপনাদের কখনো ভোলা যায় জামাইবাবু, কী যে বলেন!--- (ইলার দিকে তাকিয়ে) ইলা তোমার মেসোমশাইকে প্রণাম করো।

প্রাণ। থাক, থাক। হয়েছে। ওতেই হবে। ইলা আমাদের খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

নিরঞ্জন। লক্ষ্মী মেয়ে। হ্যাঁ লক্ষ্মীই বটে। আর দু এক বছর সবুর করো না ভায়া, তারপর দেখো ইলাকে। ওর পদভরে এখনই আমাদের সারা পাড়া কাঁপছে।

প্রাণ। তাই নাকি, ইলামণি? এতো বড়ো হয়েও তুমি এখনো পাড়াময় ছুটোছুটি করে বেড়াও নাকি।

নিরঞ্জন। ছুটোছুটি কি হে। তুমি যে অবাক করলে বন্ধু। ইলা ছুটবে কি? ইলা নাচে। এর মধ্যেই ও যা নাচ শিখেছে দেখলে তাক লেগে যাবে।

ইলা। আমি এমন কি বড় হয়েছি মেসো-মশাই? আমার বয়স তো মোটে বারো।

(একসঙ্গে সকলের হাসি)

প্রাণ। ও, তাই নাকি ইলামণি? আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।

(জলযোগের পর আসর বসেছে)

প্রাণ। হ্যাঁ ভালো কথা ---নিরঞ্জন, এবার তোমরা বেশ---বেশ কিছুদিন এখানে থাকছ তো?

অণু। আঃ চুপ করো।---

নিরঞ্জন। তা---মেরেকেটে দিন পনেরো থাকা যাবে'খন। ছুটি পেলে আরো কিছুদিন কাটানো যেতো কিন্তু---

মহিমা। সত্যি। দিদির এখানে এমন আরামে দিনগুলো কাটে যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তোমার তো আপিস বাবা।

নিরঞ্জন। (পকেট হাতড়াইয়া প্যাকেট দেখে) ওহে প্রাণকেষ্ট সিগ্রেট আছে? আমার ফুরিয়ে গেছে দেখছি।

প্রাণ। সিগ্রেট। সিগ্রেট তো আমি খাইনে---জানো তো পঠদ্দশায় খেতাম, তারপর বাধ্য হয়ে ছাড়তে হয়েছে।

অণু। আঃ কী যে বলো।

প্রাণ। আচ্ছা আনিয়ে দিচ্ছি সিগ্রেট। নিয়ে আসছি বোসো।

অণু। সত্যি! আনিয়ে রাখা উচিত ছিল আগেই। নিরঞ্জনবাবু আবার ভীষণ সিগ্রেট ভালোবাসেন।

আমি বলতে ভুলে গেছি আর উনি—উনি যে নিজের থেকে খেয়াল করে কিছু করবেন তবেই হয়েছে।

।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

[খাবার ঘর—নৈশ-ভোজন সমাধার পর নতুন সমস্যা দেখা দিল। নিরঞ্জন, মহিমা ও ইলা পাশের ঘরে। অণু ও প্রাণকেষ্টর মধ্যে ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে আলোচনা]

অণু আচ্ছা। শুনছো?

প্রাণ। কি বল।

অণু। দ্যাখো ইলা না হয় আমার কাছে শোবে। মহিমা আর নিরঞ্জনকে না হয় আমাদের বাড়তি ঘরটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তুমি শুচ্ছ কোথায়?

প্রাণ। তাই তো? আমি কোথায় শুই!——তা—আমার শোয়া—আমাকে শোয়ানো কি এতই দরকার?

অণু। বাজে কথা রাখো। ভাঁড়ারঘরে যে বেঞ্চিটা আছে তার থেকে হাঁড়িকুড়িগুলো নামিয়ে তোমার জন্যে বিছানা করে দেবো? ডবল করে পাতা যাবে'খন—বিছানাটা বেশ পুরু হবে। আরাম করে শুতে পারবে।

প্রাণ। সেই বেঞ্চিটা—যার থেকে সেবার আমি পড়ে গেছলাম? সেবারে নিরঞ্জনরা এলে শুয়েছিলাম যাতে—সেইটে তো? না, তাতে আর আমি শুচ্ছিনে।

অণু। অবাক করলে। কেন বেঞ্চিতে কি শোয়া যায় না? শোয় না মানুষ? রেলগাড়িতে লোকে শুয়ে যায় কি করে?

প্রাণ। প্রাণ হাতে করে। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—নিজেকে হাতে করে থাকা আমার পোষাবে না। তার চেয়ে আমি মাটিতে শোবো।

অণু। বেশ। তা'হলে স্নানের ঘরে তোমার জন্যে বিছানা করে দিই?—কেমন?

(ইলার প্রবেশ)

ইলা। আমি স্নানের ঘরে শোবো মাসিমা। আঃ, চান করার ঘর—আহা—সেখানে শুতে কী আরাম!

অণু। না। তুমি কেন স্নানের ঘরে শুতে যাবে? তুমি আমার কাছে শোবে।

প্রাণ। আমি স্নানের ঘরে শুতে পারবো না। কলটা খারাপ হয়ে গেছে, টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ে!—আমার মাথায় জল পড়লে আমার আবার ঘুম হয় না।

অণু। কেন, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুমানো যায় না—না কি? তুমি তাজ্জব করলে!

প্রাণ। তার চেয়ে আমি বাইরের ঘরে শোবো। আমার আরাম চেয়ারে।

অণু। নিরঞ্জন তো ঐ চেয়ারটায় আরাম করবে। অনেক রাত অবধি সে গল্পের বই পড়ে—জান না নাকি?

প্রাণ। তাহলে আমার শোবার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি আরো বাইরে গিয়ে শোব—সামনের ফুটপাথেই। সেও আমার ভালো।

(প্রাণকেষ্ট জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সবেগে বেরিয়ে যায়)

অণু। (ইলার দিকে তাকিয়ে) তোমার মেসোমশাই ঐরকম। আপনার লোকরা বাড়ী এলে য্যাতো খুশী হন যে বলা যায় না। যাতে সবার আরাম হয়, সবাই সুখে থাকে তাই চান। নিজের জন্যে ভাবেন না মোটেই।

ইলা। তাহলে মেসোমশাই কোথায় শোবে?

অণু। উনি শোয়ার জায়গা ঠিক করে নেবেন। চল, তুমি শোবে চল।

(ইলা ও অণুর প্রস্থান।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অন্ধকারের আয়না

সমরেন্দ্র ঘোষাল

তারা তখন একদল সারিবদ্ধ বৃক্ষদের অকপটে
নিশ্চিন্ত চিন্তায় রৌদ্র পোহাতে দেখতে চেয়েছিল।
তারা তখন তাদের ফিসফিস চিন্তাকে জানালায় ঝুলিয়ে রেখে
বুকটান নির্ভাবনায় শায়িত হতে চেয়েছিল।

তখনও তারা এক বিস্ময়কর সূর্যস্নানের অভীপ্সায়
নিজেদের শোণিতে আছড়ে পড়া অন্ধকারকে
আর অহংকারকে নির্লজ্জভাবে নগ্ন করতে চেয়েছিল।

আর ঠিক তখনই তাদের স্বদেহের অন্ধকারের স্রোত
সামনের এক থৈ থৈ নদীকে প্লাবিত করে
অগ্রমুখী করে তুলেছিল।

অতঃপর চলেছিল তাদের চুপি চুপি নিঃসাড়ে
দর্পণ হাতে স্ব স্ব প্রতিবিম্ব দর্শন।
দর্পণ আর প্রতিবিম্বে তারা সেই আলো ঝলমল বৃক্ষগুলিকে
দীর্ঘপ্রয়াসের ফলেও একবারের জন্যেও দেখতে পায় নি।
অবশেষে তারা স্বদেহের জমাট অন্ধকার নিয়ে
পানপাত্র হাতে পূর্ব দিগন্তের দিকে অগ্রবর্তী হয়েছিল।

তন্ত্র-পরিচয়

নাগার্জুনের কীর্তি

এখন কথা হচ্ছে যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সুপ্তশক্তি আছে এ সত্য নাগার্জুন কি ক'রে ধরতে পারলেন ?

অনেকে মনে করেন যে বেদের মধ্যে যে বায়ুর কথা আছে, সর্পরাজ্ঞীর কথা আছে সেই হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাতের চেষ্টা । কিন্তু আজকে তো আমরা নিশ্চয় করে জানতে পারছি না যে ঠিক কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই পূর্বাচার্যরা ঐ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। আবার আয়ুর্বেদের মধ্যেও তো বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে বহু উল্লেখ পাওয়া যায়---কিন্তু তা থেকেও সহজে জানা যায় না কি ভাবে সেদিনকার আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা ঐ তিনটি ধাতু সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাঁরা সাধক তাঁরা ঐ তিন ধাতুর সম্বন্ধে কি অপূর্ব রূপ কল্পনা করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন পিত্ত হ'চ্ছেন ব্রহ্মা, বায়ু হ'চ্ছেন বিষ্ণু আর কফ হ'চ্ছেন শিব। যাঁরা হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, সোরা, সাইকোসিস আর সিফিলিস এই তিন বস্তুই বিশ্বসৃষ্টির মূলে কাজ করছে। বলা বাহুল্য, পিত্ত, বায়ু ও কফের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের মূল তিনটি তত্ত্বের বেশ মিল আছে।

কিন্তু পূর্ব প্রশ্নটি তো থেকেই যায় যে---জানতে পেলেন তাঁরা কি ক'রে ওই তিনটি মূল কারণকে ? এ প্রশ্নের উত্তর বেশ কিছুটা পাই ওই নাগার্জুনের জীবনচর্যা থেকে।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই যে নাগার্জুনের বৃত্তি ছিল চিকিৎসকের, তিনি রাজা কণিষ্কের সভায় ভিষগাচার্যরূপে যুক্ত ছিলেন। এ শুধু ইতিহাসের বর্ণনা মাত্র নয়---তিনি যে রীতিমত চর্চা করতেন ওই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের---তার একটি দুটি প্রমাণও আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে। একটি হ'চ্ছে---চিকিৎসা শাস্ত্রের পুঁথি---যার নাম নাগার্জুনকক্ষপুটম্। আজকাল যেমন বিভিন্ন শাস্ত্রে 'হ্যাণ্ড বুক' তৈরী করেন শাস্ত্রবিশেষের মনীষীরা---কারণ ছাপাখানার দৌলতে বই তো এখন হাতে হাতেই ফেরে। আগেকার দিনে তেমনি তৈরী করতেন বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ

সত্যযান

ছোট ছোট পুঁথি---যা কক্ষে বা বগলে নিয়ে বেড়ানো যেত। ভিষগ্বর নাগার্জুন তেমনি একটি কক্ষপুট বা ক্ষুদ্র পুঁথি তৈরী করেছিলেন আয়ুর্বেদের সারাংশ নিয়ে। শুধু তাই নয়। ওই নাগার্জুনই ভারতীয় শল্যচিকিৎসার আদিশাস্ত্র 'সুশ্রুত সংহিতা'র প্রতিসংস্কার ক'রেছিলেন। চিকিৎসাবিদ মাত্রেই জানেন সুশ্রুত সংহিতায় ওই কারণে নাগার্জুনকে 'ভগবান্ নাগার্জুন' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐ সুশ্রুত সংহিতা থেকেই আমরা জানতে পাই সেই যুগে কি ভাবে শবব্যবচ্ছেদ ক'রে শরীর বা শরীরের মধ্যে নিহিত যাবতীয় নাড়ী প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হ'তো ছাত্রকে। বলাই বাহুল্য সেই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলেই নাগার্জুনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ঐ সংহিতার প্রতিসংস্কার করা। এর থেকে কি আমরা এই অনুমান ক'রতে পারি না যে---শবব্যবচ্ছেদ করার বিদ্যা আয়ত্ত ক'রেই নাগার্জুন নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছিলেন যে প্রত্যেক মানুষের দেহাভ্যন্তরে কি শক্তি সুপ্ত রয়েছে ? এই অনুমান আরো যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় এই কারণে যে নাগার্জুন কথিত ঐ মহাযান মতের অনুসরণ করেই বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান নামে আরো নানা বৌদ্ধ পথ প্রসারিত হয়---আর এ সবগুলি মতের ভিত্তি হচ্ছে---দেহতত্ত্ব বা শরীর বিজ্ঞান।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মশাইও তাঁর রচিত 'চিন্ময় বঙ্গ'---পুস্তকে বাংলা তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যায় লিখতে গিয়ে আয়ুর্বেদের কথা উত্থাপন না ক'রে পারেন নি।

আরো একটি কথা---বেদ পরিচয় গ্রন্থে এ কথা সবিশেষ আলোচনা করেছি যে অথর্ববেদ, যার উপবেদ হচ্ছে আয়ুর্বেদ, তার সমধিক প্রচার ও প্রসার ছিল বঙ্গ দেশে বা আরো ভাল করে বলতে হলে বলতে হয় বৃহৎ বঙ্গে---তখন বঙ্গের বিস্তৃতি ছিল পশ্চিমে কাশীধাম পর্যন্ত। মজার কথা এই যে---বাংলা দেশে যত বেশী শিব ও পঞ্চানন্দের মন্দির আছে---তত আর কোন অঞ্চলে নেই। আবার এই বাংলা দেশে আয়ুর্বেদ চর্চার এমনি প্রসার ঘটেছিল এককালে যে---তার ফলে এই অঞ্চলে বৈদ্য সম্প্রদায় ও করণ কায়স্থ সম্প্রদায় নামে দুটি বিশেষ বর্ণ বা জাতি জেগে উঠেছিল। অবস্থা এমনি হয়েছিল তখন যে যদি দেবীবর ঘটকের সাক্ষ্য মানতে হয় তাহলে তো স্বীকার করতেই হয় যে---রাজা আদিশূরের রাজত্বকালে বাংলা দেশে কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণই ছিলেন না তাই প্রয়োজন হয়েছিল কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে বরণ করে নিয়ে আসার। অর্থাৎ আদিশূরের কালেও তথাকথিত ত্রয়ীর প্রসার ছিল না বাংলা দেশে। তা হলে কি এখন আমরা বলতে পারি না যে---'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'---এই প্রবচনটি গভীর

অর্থবহ? কিন্তু সে কথা এই পর্যন্ত থাক।

এখন তন্ত্রের মধ্যে যে সব সাধন প্রক্রিয়ার কথা আছে শক্তিকে আয়ত্তে আনার জন্যে, তারই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি---ঐ নাগার্জুনের জীবনচর্যার আলোকে।

একটি কথা এখানে বলে রাখি যে ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে বর্তমানে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্র নামে যা প্রচলিত, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে বৌদ্ধতন্ত্র। আর ইদানীং কালের বৈজ্ঞানিকজনেরাও মনে করেন যে---তন্ত্র-মতের সাধন-প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে শরীর বিজ্ঞানের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যদিও প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ ক'রে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কেউই প্রকাশ করেন নি। তবে বিজ্ঞানবাদী ইওরোপ আমেরিকাদি দেশে দেখা যায় যে---সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছেন চিকিৎসকরা। এমন মতও ঐ সব দেশে প্রচারিত যে---বর্তমান সমাজকে সুস্থ মনোবৃত্তির ভিত্তিতে গঠন বা স্থাপন করতে হ'লে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই পারেন একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক হ'তে। কারণ চিকিৎসকরাই দেহধর্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে ক'রতে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করছেন মনোধর্মের গোপন লোক। যাঁরা সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ ক'রেছেন, তেমন বহুজন কৃতী চিকিৎসকের নামোল্লেখ করা যেতে পারে এখানে---কিন্তু তাতে এ প্রবন্ধের পরিসর বৃদ্ধি হ'বে ভেবেই নিরস্ত হচ্ছি।

তান্ত্রিক-প্রক্রিয়ার অর্থভেদ

এখন বরং তান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির অর্থভেদ করার চেষ্টা করি। তন্ত্রের মতে সিদ্ধিলাভ ক'রতে হ'লে যে প্রথম তিনটি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হ'তে হয়---তার নাম অল্প বিস্তর সকলেরই জানা আছে। সে তিনটি হ'লো শব সাধনা, ষট্‌চক্রভেদ ও পঞ্চ মকার সাধন। সাধারণ অনেকেই মনে করেন বা শুনেছেন যে---ঐ তিনটি প্রক্রিয়ার যে কোন একটিকে অভ্যাস করলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাবে যে---ঐ তিনটি প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কোন একটিকে বাদ দিলে অন্য কোনটিরই আয়ত্ত করা সম্ভব নয় এবং তার ফলে সিদ্ধিও থাকে সুদূর পরাহত। ঐ তিনটি প্রক্রিয়ার অর্থভেদ করতে পারলেই এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবো।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে---ওই তিনটি প্রক্রিয়ার মূল তথ্যকে ঘিরে এমনি একটি রহস্যের আবরণ জেগে আছে যে সেই আবরণ ভেদ ক'রে মূলে পৌঁছান খুবই দুরূহ। তাই সব সময়েই বলা হয়েছে যে---তন্ত্রের চর্চা করতে হলে গুরু বা উত্তরসাধক ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। বাস্তবিকই দেখা যায় যে মন্ত্রের জালে, কাব্যের ঘটায় ও রূপকের ছটায় ঐ প্রক্রিয়ার বর্ণনাগুলি এমনি ঘনঘোরঘটাচ্ছন্ন যে---একক চেষ্টায় যা ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে অসম্ভব নয়, কারণ মানুষ যা সৃষ্টি করেছে তা বুঝে নেবার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই আছে। তার জন্য প্রয়োজন সাধনার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে---তন্ত্রের বিদ্যাকেও যেমন বলা হয় গুরুমুখী তেমনি শরীর বিজ্ঞানের বিদ্যাও তো গুরুমুখী।

একটি সত্য সকলেই জানেন যে বিদ্যামাত্রেই হচ্ছে গুরুমুখী। বেশী দূরে যাবার দরকার কি? এই, যে আমরা কথা বলি---এই কথা কইবার বিদ্যাও কি পেরেছি আমরা একদিনে অকস্মাৎ অর্জন করতে? এ বিদ্যাও তো শিখেছি আমরা আমাদের মহাগুরু মায়ের মুখ থেকে। তিনিই তো শিশু সন্তানের মুখের উপর মুখ রেখে অপার করুণায় প্রথমে 'মা' শব্দটি উচ্চারণ করার কৌশল শিখিয়ে দেন। ক্রমে তাঁরি স্নেহমধুর নির্দেশে শব্দমাত্রকেই উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় শিশু বহুদিনের সাধনায়। এই সত্য বয়স্ক মানুষের মনে যদি নাই থাকে---তবু যা সত্য, তা সত্যই থেকে যায়। এমনি ভাবে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখি, গুরু না হলে কোন বিদ্যাই কেউ অর্জন করতে পারে না। এ সম্বন্ধে চমৎকার একটি বচন আছে তন্ত্রে তাতো পাই---

মধুলোভী যথা ভৃঙ্গো
পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলোভী তথা শিষ্যো
গুর্বাৎ গুর্বান্তরং ব্রজেৎ॥

মধুর লোভে যেমন ভৃঙ্গ এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ধেয়ে যায়, জ্ঞানের লোভে তেমনি শিষ্যও এক গুরু ছেড়ে অন্য গুরুর কাছে চ'লে যায়।

এই সত্য আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে প্রকটিত। তবু দুঃখ এই---যাঁরা গুরুবাদী তাঁরা বিশ্বাস করেন যে---একই গুরু পারেন শিষ্যকে আমরণ শিক্ষা দিয়ে যেতে। এর সম্বন্ধে একটি কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যে পাঠশালার গুরুর প্রয়োজন কি মিটে যায় না ইস্কুলের ছাত্রের তেমনি ইস্কুলের মাষ্টার মশায়ের প্রয়োজন কি আর থাকে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে।

অথচ আমাদের দেশে যাঁরা তন্ত্রের মতে গুরুগিরি করেন---তাঁরা কেন যে শিষ্যকে আগলে রাখতে চান, জানি না। যদিও সেই তন্ত্রের মধ্যেই দেখছি গুরুপূজার মন্ত্র রয়েছে---

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ॥
ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ॥
ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ॥
ওঁ পরমেষ্ঠী গুরুভ্যো নমঃ॥

মন্ত্রগুলিতে যে শব্দ ক'টি প্রয়োগ করা হয়েছে---তার থেকেই কি বোঝা যায় না---যে কোন একটি গুরুকে লক্ষ্য ক'রেই মন্ত্রগুলি বলা হচ্ছে না? বেশ তো দেখা যাচ্ছে যে---শিষ্য যেমন উন্নত হচ্ছেন শিক্ষায়, গুরুর ক্রমও তেমনি উত্তর উত্তম হচ্ছে। আরো লক্ষ্য করবার যে, সবগুলি মন্ত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে বহুবচন যার লক্ষ্য কখনোই এক হ'তে পারে না।

কিন্তু হায়---অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুরা যেমন অশেষ স্নেহে শিষ্যকে স্বেচ্ছায় সব কিছু শিক্ষা দেন---তন্ত্রের ক্ষেত্রে তেমন গুরুর সন্ধান কই? তান্ত্রিক গুরুরা স্বেচ্ছায়

কোন শিষ্যকে কিছু নির্দেশ দিতে চান না। অনেক সময় দেখেছি শিষ্যের পরমাগ্রহ দেখেও গুরু থাকেন মুখ ফিরিয়ে অধিকার ভেদ ও আধার ভেদের গণ্ডি রচনা করে অথবা মন্ত্রগুপ্তির অনুদারতা দেখিয়ে। কে জানে এই মন্ত্রগুপ্তির ফলেই তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি লোপ পেতে ব সেছে কিনা। তবে মন্ত্রগুপ্তি যে তন্ত্রের পথে মহা বাধা সৃষ্টি করেছে তা স্বভাবতই মনে হয়। আর একটি সন্দেহও জাগে যে—হয়তো তন্ত্রে যে সমস্ত সাংকেতিক ও পরিভাষা ব্যবহার করে গিয়েছেন পূর্বাচার্যরা—তার প্রকৃত অর্থ বিস্মরণের অতলে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে—সম্যক চর্চার অভাবে। আজকে তাই তন্ত্র বেঁচে আছে পূজাদির একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গমাত্র হ'য়ে। অথচ আমাদের দেশে যাঁরাই ধর্ম সম্বন্ধে সামান্যমাত্র চর্চা করেন তাঁরাই জানেন যে, বর্তমানে আমাদের হিন্দুধর্মে যে পঞ্চসম্প্রদায় আছেন, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ও সৌর নামে, তাঁদের সবায়েরই মূল ভিত্তি হচ্ছে এই তন্ত্র। তবু তন্ত্র লোপ পেল কেন—এ প্রশ্ন কেবলি কি মনে জাগে না?

কিন্তু আজকের দিনে কোন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ঐ তন্ত্রকথিত ধর্মকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। কি ক'রে পারবেন? এখন আর মানুষের এত অবসর সময় নেই যে, একাসনে বসে লক্ষ জপে নিযুক্ত হবেন। কিংবা গুরু-পুরোহিতের নির্দেশে তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাধকের জীবন যাপন করবেন। বর্তমানে তো ঐ গুরু-পুরোহিতরা তন্ত্রের জটিলতার কথাই নানাভাবে প্রচার করছেন। অথচ তন্ত্রকাররা সবাই ব'লে গিয়েছেন তন্ত্রের পথ অত্যন্ত সুগম। তাঁরা বলেছেন—

গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং
ন গুপ্তিরনৃতং বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্যাৎ
কৌলিকঃ কুলসাধনম্॥

—সত্যকে গোপন ক'রলেই তা হেয় হ'য়ে যায়—কারণ গোপন করতে গেলেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কাজেই যিনি কৌলিক বা সমর্থতান্ত্রিক—তিনি প্রকাশ্যভাবেই সাধন করবেন—এই বিধি।

কিন্তু কোথায় তেমন সমর্থ তান্ত্রিক যিনি তন্ত্রসাধনার মূল সত্য প্রকাশ ক'রে, সবাইকে সেই সাধনার মর্ম বুঝিয়ে দিয়ে সবায়ের সিদ্ধি ও সার্থকতা লাভের পথ সুগম ক'রে দেবেন?

তবে তন্ত্রেই একটি আশার বাণী পাই যে,—

অয়ন্তু পরমো মার্গো
গুপ্তোঽপি পশুসংকটে।
ব্যক্তীভবিষ্যত্যচিরাৎ
সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ॥

—যদিও এই তন্ত্রসাধনার মার্গ সব থেকে শ্রেষ্ঠ তবু তা গুপ্ত হ'য়ে রয়েছে, পশু সংকটে বা অজ্ঞানতার ঘোরে, যখনি কলি প্রবল হ'বে—তখনি তা ব্যক্ত হ'বে।

কলি প্রবল হ'বার লক্ষণ কি তাও ওই তন্ত্রেই দেখি—মনে হচ্ছে সেই বর্ণনার সংগে বেশ মিলে যাচ্ছে বর্তমান কালের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক। কিন্তু আবার সন্দেহও হয় যে, যদি সত্যিই সময় হ'য়ে থাকে তো এখনো কেন তন্ত্রের সত্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে না?

আজকে যারা তন্ত্র নিয়ে চর্চা করছেন তাঁদের উদ্দেশ্য তো দেখি জীবিকা অর্জন ও সম্প্রদায় গঠন। তাঁরা ঐ তন্ত্রে বর্ণিত নানা বীজ নিয়ে যেন পুঁটুলি বেঁধে বসে আছেন—কিসে তা থেকে ফলবান বৃক্ষ জন্মলাভ করতে পারে—তার চেষ্টা তো কই দেখি না তাঁদের মধ্যে। তাঁরা তো কই ভেঙে দিচ্ছেন না নানা বীজ ও মন্ত্রের অর্থ। নেহাৎ অভ্যাসবশে পাখীর মতই শব্দগুলো উচ্চারণ করে যান তাঁরা। একবার কি ভাবেন না অর্থ না বুঝে মন্ত্র উচ্চারণ করার অপরাধে কতখানি অপরাধী হচ্ছেন তাঁরা?

এখানে একটি কথার উল্লেখ না ক'রে পারা যায় না যে, তন্ত্র অবলুপ্তির জন্যে মূলত দায়ী বোধ হয় শংকরাচার্য। বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ ক'রে তিনি যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, ইতিহাসে পাই—তখন বহু বৌদ্ধ কাপালিক প্রাণভয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন, মন্ত্রগুপ্তির অভ্যাসও জেগেছে খুবই সম্ভবত সেই কাল থেকে। তাই আজ তন্ত্র হেয়, অবজ্ঞাত হয়ে উঠেছে কিন্তু তা যে হেয় নয়, অত্যন্ত মূল্যবান জীবনসাধনা—তার পরিচয় পাব তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অর্থভেদ করতে পেলে

মায়ের লিপি

শ্রীঅভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ অনেকদিন, বহুদিন পরে,
মায়ের লেখা লিপিখানি পেলাম আমারই ঘরে।
লিপিখানি ছোট্ট বটে জীর্ণ অতি দীন।

সত্তা তবু রয়েই গেছে হয়নি তো মলিন॥
কালির আখর নয় তো এটি পবিত্রতায় ভাস্বর।
অনন্ত করুণা লুকিয়ে হেথায়, স্নেহেরই স্বাক্ষর॥

প্রাণ জুড়ানো, মন ভোলানো এটি কতই স্নেহমাখা।
ভাবছি মনে উদাস প্রাণে, যেন মায়েরই পেলেম দেখা॥

কে বলে রে প্রাণহীন? শব্দহীন? এ অতীতের পত্র?
প্রাণে প্রাণে দেখছি হেথায় ছড়িয়ে আছে স্নেহেরে দানসত্র॥

ত্রিশ বছর আগের লেখা, যেন মাই আছেন হেথা।
আজ প্রভাতে, কার কৃপাতে, পেলাম মা'রই আবার দেখা।

মরজগতে নেই মা আজ, জানি না—ঊর্ধ্বে কোথা আছে।
চিঠি নয় এ তো জীবনবীণার সুর এতেই যেন বাজে॥

নীরব নয় এ হাতের লেখা—
সরব। এতে শুনি তাঁরই কণ্ঠস্বর।
প্রণাম করি কোটি কোটি এই লেখকে অতঃপর॥

এমন স্থানে গেছেন মাতা আসবে না তো আর ফিরে।
এই লিপিতেই মা রয়েছেন নিজেরই সত্তায় ঘিরে॥

দাদাঠাকুরের সান্নিধ্যে

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়

সে আজ চার-পাঁচ বছর আগের কথা।

দাদাঠাকুর হাওড়ায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় এসে উঠেছেন। আমরা চার-পাঁচজন আষাঢ়ের এক বিকালে সেই স্থানে গিয়ে হাজির, সঙ্গে দাদাঠাকুর-এর জীবনী-ভাষ্যকার নলিনীকান্ত সরকার। দোতলার কপাটে ঠোকা দিতেই দরজা খুললেন দাদাঠাকুর—আদর করে বসালেন আমাদের ঘরের মধ্যে। এর আগে হতেই অবশ্য আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলছে। আমি তখন রেলে চাকরী করি খড়গপুরে বাসা। আমার বাসার ঠিকানায় কোয়ার্টার নম্বর, ইউনিট নম্বর ইত্যাদি লিখতে হত। দাদাঠাকুর তারই উল্লেখ করে বললেন, ওরে নলে, এর ঠিকানা লিখতে যে আমার আবার ভগ্নাংশ লিখতে হচ্ছে।

দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ চেহারা, পক্ব গুম্ফ, গলায় শুভ্র উপবীত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর একজোড়া চোখ। চোখের মধ্যেই যেন হাসি উপচে পড়ছে। কাপড়ের শেষপ্রান্ত কোমরে জড়ানো—অপর প্রান্ত দাদাঠাকুরের মনিব্যাগে [illegible]। আমরা প্রণাম করলাম। দাদাঠাকুর নলিনীকান্তের দিকে ফিরে বললেন, 'নলে দেখ দেখি তোর জন্য এতগুলো লোক কষ্ট করে আমাকে দেখতে এসেছে।'

ঘরের মধ্যে খাটের এধারে-ওধারে মোটা মোটা বই। একটা বই মাত্র পাঁচ-ছয় দিন আগে কেনা—অক্সফোর্ডে প্রকাশিত ইংরাজী কোটেশানের বই। আমরা যাবার আগে দাদাঠাকুর 'ক্রস-ওয়ার্ড' সমাধান করছিলেন। এটা ছিল দাদাঠাকুরের একটা নেশা। একাধিকবার এর জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন।

দাদাঠাকুর একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছেন আমরা তন্ময় হয়ে

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

শুনছি। একবার দাদাঠাকুর কল-কাতার এক বন্ধুর বাসায় থাকেন। হঠাৎ তাঁর দেশের বাড়ী জঙ্গীপুর হতে এক দেহাতী এসে হাজির দাদা-ঠাকুরের কাছে চাকরীর সন্ধানে। দাদাঠাকুর তখন বাসায় ছিলেন না। দাদাঠাকুরের বন্ধু দাদাঠাকুরের সংগে একটু রসিকতা করবার লোভ দমন করতে পারলেন না। তিনি এই চাকুরী-প্রার্থী যুবককে শিখিয়ে দিলেন দাদা-ঠাকুরকে জোর করে পাকড়াও করবার জন্যে।

দাদাঠাকুর বাসায় ফিরলে পর বন্ধুর কথামতো দাদাঠাকুরকে সে চেপে ধরল। দাদাঠাকুর যত বলেন তাঁর হাতে কোন কাজ নেই সে ততই নাছোড়বন্দা। এদিকে বন্ধু মাঝে মাঝে ফোঁড়ন কাটেন 'দিন না বেচারাকে একটা চাকরী করে। আপনি তো ইচ্ছে করলেই পারেন, এত লোকের সাথে আলাপ।'

দাদাঠাকুর এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। চাকুরীর আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত করলেন সেই দেহাতী যুবককে।

সন্ধ্যায় বন্ধু বসে আছেন—দাদা-ঠাকুর ঘর হতে বেরিয়ে বন্ধুকে শুনিয়ে বললেন, দেরী হয়ে গেল, কিছু হ্যাণ্ডবিল ছাপতে দিতে প্রেসে যেতে হবে।

বন্ধু জানতে চাইলেন কিসের হ্যাণ্ডবিল।

দাদাঠাকুর তাঁর হাতে লেখা কপিটা বন্ধুর হাতে দিলেন। চোখ দুটো তখন দাদাঠাকুরের আনন্দে নাচছে।

এদিকে বন্ধুর তো হ্যাণ্ডবিল পড়ে চোখ চড়কগাছ। শুকনো গলায় বললে, 'কই আমি তো এসব বলি নি।'

দাদাঠাকুর বললেন, 'বলেছিস কি না বলেছিস সেটা বুঝবি যখন সন্ন্যাসীর দল এসে চিমটে নিয়ে হাজির হবে। নইলে ভাল চাস তো এর একটা চাকরীর ব্যবস্থা কর।'

বন্ধু কথা দিলে তার পরদিন তার কাজের চেষ্টা করবে। না করে উপায়ই বা কি!

দাদাঠাকুরের হ্যাণ্ডবিল ছিল: 'যে সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসী অর্থাভাবে গঙ্গাসাগর মেলায় যাইতে অক্ষম তাঁহাদের নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। তাঁহাদের যাতায়াতের পাথেয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।'

নীচে বন্ধুর নাম ও ঠিকানা। সময়টা ছিল পৌষ মাসের শেষের দিক।

আর একবার কলেরা রোগীর অভিনয় করে সায়েস্তা করেছিলেন একদল বরযাত্রীর। বরযাত্রীদের উদ্দেশ্য ছিল কন্যাপক্ষকে হেয় করা। দাদাঠাকুর এমন নিখুঁতভাবে কলেরা রোগীর অভিনয় করেছিলেন যে বরযাত্রীরা আর এই মারাত্মক ব্যাধি-অধ্যুষিত গৃহে ভোজন করতে সাহস করে নি।

এর কিছুদিন আগে দাদাঠাকুরের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নলিনীকান্ত সে কথা জিজ্ঞাসা করলে দাদাঠাকুর বললেন, 'সে আর বলিস না ভাই। আমি ভয়ে পালিয়ে এলাম। ব্রাহ্মণী হয়তো মরবার আগে বলে বসল বেদানা খাব। বেদানা না খেয়েই যদি সে মারা যায় তবে হয়ত তার শ্রাদ্ধের সময় ছেলেরা বলে বসবে—'মা বেদানা খেতে চেয়েছিলেন মরবার আগে। অতএব তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্য ব্রাহ্মণদের বেদানা খাওয়াতে হবে।' আর সেই বেদানা যোগাড় করে আমার হবে বুক বেদনা।'

কথার মারপ্যাচে দাদাঠাকুর সিদ্ধহস্ত। সেই সময় সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পুরীতে রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। দাদাঠাকুর শুনে বললেন, 'ওর ত' কষ্ট কেউ ঘোচাতে পারবে না ভাই—'ওর নামের মধ্যেই যে কষ্ট আছে। নৃ শব্দের অর্থ মনুষ্য। নৃ-এর সাথে 'পেন' (pain) তো জড়িয়ে আছে।'

এক দেশীয় রাজার কথা উঠল। নলিনীকান্ত বললেন ওদের অমুক জায়গার বাড়ীটা ওরা একলক্ষ টাকায় বিক্রী করে দিল। দাদাঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর;—'ওদের লক্ষ্য তো ভাই সব সময়েই লক্ষের দিকে।'

দাদাঠাকুরের কথায় লোকে প্রথমে হকচকিয়ে যেত যেমন আমরা গেছলাম যখন দাদাঠাকুর 'নাথুরাম গড়্সেকে' বললেন 'এনার্জি অব ইণ্ডিয়া'। দাদাঠাকুরই পরে মানেটা বুঝিয়ে দিলেন—Nathoo Ram Godsay অর্থাৎ—N. R. G.

দেখতে দেখতে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল—আমরা উঠলাম।

দাদাঠাকুর হাসতে হাসতে আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

মনে হচ্ছে সে এই কালকের কথা।

অভিযাত্রী প্রাণী

মিনতি সেন

বিভিন্ন প্রাণীর অভিযান বা দেশান্তর যাত্রা জীববিজ্ঞানের এক বিচিত্র জিনিষ। এর মূলে সাধারণত দুটি কারণ আছে, বিরূপ আবহাওয়া ও খাদ্যের অভাব; এই দুই অসুবিধার হাত থেকে বাঁচার জন্য কয়েক শ্রেণীর পাখী ও জন্তু নানা বিপদ বাধা দূর করে যেভাবে এক দেশ থেকে হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানে অভিযান করে তা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না।

প্রাণীদের দেশান্তর যাত্রার কথা বলতে গেলে সব আগে পাখীদের কথা বলতে হয়, অবশ্য যাযাবর পাখী আমাদের যে একেবারে অপরিচিত তা নয়, প্রতি বছর শীতকালে কলকাতা চিড়িয়াখানার লেকে একদল যাযাবর পাখী এসে জোটে, এ ব্যাপার অনেকেই দেখেছেন; শুধু কলকাতা নয়, বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এরকম বহু যাযাবর পাখীর ঝাঁক এসে উপস্থিত হয়।

ইউরোপের এক বিজ্ঞানী অভিযাত্রী পাখীদের মোট নয়টি ভাগে ভাগ করেছেন; এদের যাত্রাপথ দেখলেই বোঝা যাবে, একটানা কত দীর্ঘপথ এরা অতিক্রম করে। প্রথম পাখীর দলটি সাইবেরিয়া ও উত্তর রাশিয়া থেকে যাত্রা করে নরওয়ের তীর ধরে বিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এসে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় দলটি যাত্রা করে স্পিটসবার্জেন থেকে এবং নরওয়ে তীর ধরে বরাবর এগিয়ে ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগাল হয়ে পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে হাজির হয়। তৃতীয় দলটির যাত্রাস্থলও উত্তর রাশিয়া, সেখান থেকে শ্বেতসাগর ও নেগা ও ল্যাডোগা এবং ফিনল্যাণ্ড উপসাগর পার হয়ে হাজির হয় হল্যাণ্ডে; সেখান থেকে আবার দুটো দলে ভাগ হয়ে একটি দল উপরোক্ত দ্বিতীয় দলের সঙ্গে মিশে যায় এবং আর একটি রাইন ও রোণ নদীর ওপর দিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে গিয়ে উপস্থিত হয়। চতুর্থ দল রাশিয়ার ও ব-নদীর মোহনা থেকে যাত্রা করে ভলগা নদী, আজভ সাগর, কৃষ্ণসাগর ও বসফরাস পার হয়ে মিশরে এসে যাত্রা শেষ করে। পঞ্চম দলটি বৈকাল হ্রদের ওপর দিয়ে মঙ্গোলিয়ার দিকে চলে যায়। ষষ্ঠ দলটি লেনা নদী থেকে বেরিয়ে আমুর নদী বরাবর এগিয়ে প্রথমে জাপান সাগরে উপস্থিত হয়, সেখানে সাইবেরিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে আগত সপ্তম ও অষ্টম দলের সঙ্গে মিলিত হয়, নবম বা শেষ দলটি গ্রীনল্যাণ্ড ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে যাত্রা করে বিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে ফ্রান্সের উপকূলে এসে তাদের অভিযান সমাপ্ত করে।

উপরের যাত্রাপথগুলি পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে এদের প্রত্যেকটির দূরত্ব বেশ কয়েক হাজার মাইলের কম নয়; এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে পাখীদের কত সময় লাগে, অনেকেরই সে কৌতূহল হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এদের গড় গতিবেগ

ঘণ্টায় ৬০ মাইলের মত। সারস জাতীয় কোন কোন পাখীকে অনুকূল বায়ু প্রবাহে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগেও উড়তে দেখা গেছে। আবার এমন পাখীও আছে, যারা একটানা কয়েক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে; যেমন সোনালী প্লোভার পাখী, উত্তর আমেরিকার ল্যাব্রাডার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা পর্যন্ত প্রায় আট হাজার মাইল দীর্ঘ এই সমুদ্র পথ এরা অবিরাম উড়ে আসে; অর্থাৎ এদের না থেমে ১০০ ঘণ্টারও বেশী উড়তে হয়। টার্ন পাখী প্রতি বছর বাইশ হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করে।

এই সব যাযাবর পাখীর একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে; এরা এক বছর যে স্থানে এসে বাসা তৈরী করে প্রতি বছর সেই বিশেষ স্থানটিতেই তাদের ফিরে আসতে দেখা যায়। একজোড়া ফ্যালকনকে ফিনল্যাণ্ডের একটি টিলা ওপর ১৭৩৬ সাল থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে এসে বাসা বাঁধতে দেখা গেছে। ঠিক এইভাবে দুটি নীল টিটমাউস পাখীকে ১৭৭৩ সাল থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত অক্‌সব্রীজের একটি মাঠে প্রতিবার ফিরে আসতে দেখা গেছে।

আর একটি বিচিত্র অভিযাত্রী পাখী হচ্ছে লেমিং; এদের দেশান্তর যাত্রাকে অভিযান না বলে মৃত্যুর মিছিল বলাই ভাল, কারণ পাখীগুলি নিজের বাসস্থান ছেড়ে দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়ে একটি উদ্দেশ্য নিয়েই---সেটা হচ্ছে সমুদ্রের জলে একসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া। কথাটা আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি।

আকৃতি ও প্রকৃতিতে ইঁদুরের প্রায় সমগোত্রীয় এই পাখীগুলির রং মেটে, কান ও লেজ ছোট ছোট, সামনে তীক্ষ্ণ দাঁত আছে এবং মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। তবে ইঁদুরের চাইতে আকারে এরা কিছু বড়, এদের প্রধান খাদ্য গাছের ছাল ও শিকড়।

তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসী লেমিংদের জীবন আদৌ সহজ ও নিরাপদ নয়; শীতল মেরু অঞ্চল এমনিতেই বৃক্ষ-বিরল, তার ওপর বছরের অধিকাংশ সময় বরফে ঢাকা থাকে বলে মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন ছাড়া খাদ্য সংগ্রহ করা লেমিংদের পক্ষে রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ওপর আছে এদের বংশবৃদ্ধির সমস্যা; বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্ত্রী-লেমিং তার স্বাভাবিক সংখ্যা অপেক্ষা তিনগুণ বেশী সন্তান প্রসব করে এবং এক এক দলে দশটির বেশী বাচ্চা থাকে।

তৃণবিরল মেরু অঞ্চল স্বভাবতই এত অধিকসংখ্যক প্রাণীকে খাদ্য সরবরাহ করতে পারে না; সুতরাং খাদ্যের সন্ধানে বাসা ছেড়ে তাদের বেরিয়ে পড়তে হয় বিভিন্ন দিকে। তখনই সুরু হয় লেমিংদের বিস্ময়কর অভিযান---প্রাণিজগতে এটি সত্যিই এক বিচিত্র জিনিষ। হিমশীতল ল্যাপল্যাণ্ডের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলগুলিই এদের অভিযানের মূল লক্ষ্য।

অভিযাত্রী লেমিংদের এই রকম এক একটি দলে কতগুলি করে পাখী থাকে, তা বলা শক্ত, তবে কয়েকজন বিশেষজ্ঞদের মতে এদের সংখ্যা শত ও হাজারের সীমা ছাড়িয়ে কখনো কখনো লক্ষেতেও গিয়ে পেঁ ছোয়।

সংখ্যাতীত এই লেমিংদের অভিযানের সমাপ্তি---সীমাহীন সমুদ্রে। জনপদ পার হয়ে পাখীগুলি যখন সমুদ্রের ওপর এসে উপস্থিত হয় তখন কোন এক অজ্ঞাত কারণে দলবদ্ধ হয়ে তারা লাফিয়ে পড়ে সমুদ্রের মধ্যে তারপর নিমেষের মধ্যে সেই কয়েক লক্ষ পাখী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সাগরের অতল গর্ভে। পাখীগুলির এরকম সমবেত আত্মহননের কারণ আজো রহস্যাবৃতই থেকে গেছে।

কয়েক শ্রেণীর কাঁকড়া ও প্রজাপতিও এভাবে দূরদেশে অভিযান করে। জ্যামাইকার (ভায়োলেট ল্যাণ্ড ক্র্যাব) সাধারণত ছোটখাটো নদীতে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে; বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে ডিম পাড়ার জন্য দল বেঁধে এদের সমুদ্রের দিকে যাত্রা করতে দেখা যায়; দিনের বেলা বিশ্রাম নিয়ে সমস্ত রাত এরা চলে থাকে। সমুদ্রে ডিম পাড়ার পর এরা আর কোথাও দাঁড়ায়

খোকাসোনা — চিত্র : দিলীপকুমার সেনগুপ্ত

না—পথের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে সোজা চলে আসে নিজের আস্তানায়।

ডিম পাড়ার জন্য কাঁকড়াগুলি কখন কখন ২৫০ থেকে ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। সন্ন্যাসী কাঁকড়াও ডিম পাড়া এবং খোলস পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে একটানা বেশ কয়েক মাইল পথ হেঁটে থাকে। এদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল; একদল কাঁকড়াকে তাদের বাসস্থান থেকে বেশ কিছুদূরে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে, কিছুদিন পরে এরা ঠিক এসে হাজির হয়েছে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে।

কাঁকড়াগুলির শারীরিক গঠন বিচিত্র ধরণের, ডিম পাড়ার আগে এদের দেহ প্রতিদিন অল্প অল্প করে বৃদ্ধি পেতে থাকে; তারপর এমন একদিন আসে যখন সেই পুরানো খোলায় আর চলে না; দেহের তুলনায় খোলা অনেক ছোট হয়ে পড়ে; তখন বাধ্য হয়ে কাঁকড়াগুলি অভিযান করে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রগর্ভে কোথাও বড় শুক্তির খোলা পরিত্যক্ত অবস্থায় পেলে এরা তৎক্ষণাৎ নিজের পুরানো খোলা ছেড়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ডিম পাড়ার পর শরীর আবার স্বাভাবিক আকার ধারণ করলে এরা আবার সেই দীর্ঘপথ হেঁটে নিজেদের পুরানো স্থানে ফিরে আসে।

টুনা মাছও একটি বিচিত্র জীব, শীতপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসী এই মাছগুলি ডিম পাড়ার জন্য উষ্ণ সমুদ্রের দিকে পাড়ি জমায়। সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে টুনা মাছই বোধহয় সবচেয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে—দরকার হলে এরা একটানা দু হাজার মাইল পথও যেতে পারে। সমুদ্রে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত মাছগুলি দিনরাত অবিশ্রাম সাঁতার কাটে; কখন কখন একটানা দুশো ঘণ্টাও এদের সাঁতার কাটতে দেখা যায়।

গল্প হলেও সত্যি

ইংরাজীতে একটি কথা আছে---'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান।'

অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যা নাটকের মতই বিচিত্র, অথচ তা নাটক নয়---বাস্তব। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যথা আধুনিককালের দুজন মার্কিন প্রেসিডেণ্টের জীবনে অদ্ভুত নাটকীয় ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। দুজনের জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে রয়েছে আশ্চর্য সাদৃশ্য। এঁরা দুজন হলেন—এব্রাহাম লিঙ্কন ও জন কেনেডি।

লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হন ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে আর কেনেডি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে। দু'জনই নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিল কার্যকরী করতে গিয়ে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

শ্রীমৃণালকান্তি বসু

দুজনেরই নিহত হবার দিন ছিল শুক্রবার।

লিঙ্কন এবং কেনেডি দুজনের দেহেই তখন ভরা যৌবন---জীবন তাঁদের মধুর সম্ভাবনাময়। দুজনেই ভালবাসতেন দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের। কিন্তু দক্ষিণের অধিবাসীরা ছিল তাঁদের প্রতি বিরূপ। আমেরিকার নিগ্রোদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য তাঁরা ছিলেন আগ্রহী। কিন্তু এ ব্যাপারে দুজনেই বাধা পেয়েছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে।

লিঙ্কন এবং কেনেডি দুজনেরই ভাগ্য ছিল একই সূত্রে গাঁথা।

লিঙ্কনের ছিল চারটি ছেলেমেয়ে। তাঁর জীবিতকালেই দুটির মৃত্যু হয়েছিল। কেনেডির জীবনেও ঘটেছিল ঠিক সেই আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁরও চারটি সন্তান। দুটি সন্তানের মৃত্যুশোক তিনিও
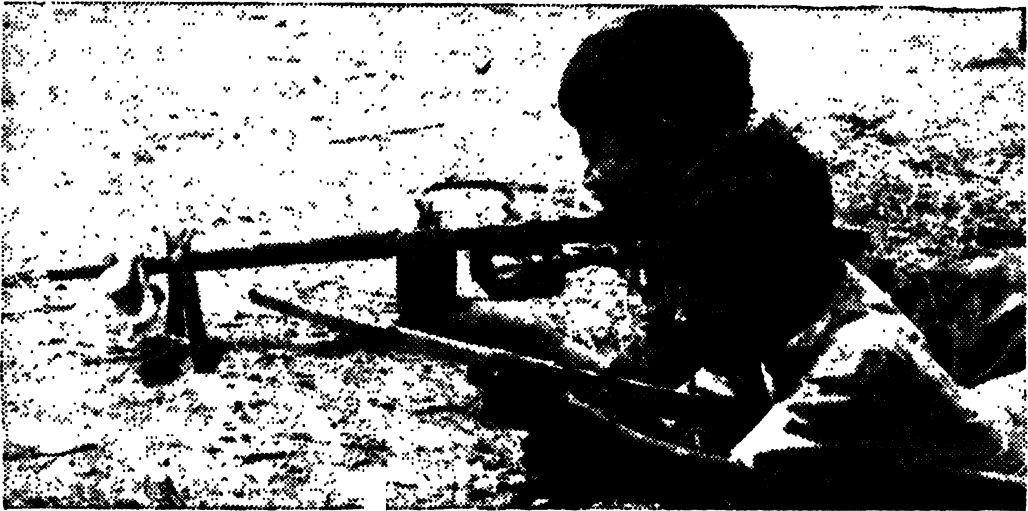
ভিয়েৎনামের কিশোরদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার দৃশ্য

ভোগ করেছিলেন। সবচেয়ে ছোট শিশুটির প্রতি দুজনেই ছিলেন অনুরক্ত। দুজনেই তাদের সঙ্গে শিশুর মত খেলা করতেন।

লিঙ্কন এবং কেনেডি দুজনের চালচলনই ছিল খুব সাধারণ।---কিন্তু তাঁদের উভয়েরই স্ত্রী ছিলেন ফ্যাসান-দুরস্ত। শুধু তাই নয়, দুজন প্রেসিডেণ্টেরই জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন কাব্য এবং চিত্রানুরাগিণী।

লিঙ্কন এবং কেনেডি দুজনেই বাইবেল পড়তে ভালবাসতেন। ওল্ড টেস্টামেণ্ট এবং নিউ টেস্টামেণ্ট থেকে দুজনেই আবৃত্তি করতে পারতেন অনর্গলভাবে।

লিঙ্কন এবং কেনেডি দুজনেই বারে বারে খেতে ভালবাসতেন। খেতেন অল্প এবং সাধারণ। ভালো খাওয়ার দিকে কারুরই কোন লোভ ছিল না। দুজনেই বই-পুস্তক পড়তেন অপর্যাপ্ত। শত কাজের মাঝেও সময় করে বই পড়তেন এবং অবসর সময়ে তাঁদের হাতে থাকতো বই।

দুজনের চরিত্রে যেমন ভয়ানক মিল ছিল তেমনি দুজনের মৃত্যুর ব্যাপারেও মিল ছিল অদ্ভুত। হত্যাকাণ্ডের সময় দুজনের স্ত্রীই স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। হত্যাকারী দুজনেই পেছন থেকে গুলি করেছিল এবং সেই গুলি বিদ্ধ হয়েছিল মস্তকে। লিঙ্কনের হত্যাকারী বুথ থিয়েটার হলে লিঙ্কনকে গুলি করে মদ চোলাই কারখানায় পালিয়ে গিয়েছিল, আর কেনেডির হত্যাকারী মদ চোলাই কারখানা থেকে কেনেডিকে গুলি করে পালিয়ে গিয়েছিল থিয়েটার হলে।

প্রেসিডেণ্ট হবার পর লিঙ্কনের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভয়ানক উদ্বিগ্ন ছিলেন নিউ ইয়র্কের তৎকালীন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ। তাঁর নাম ছিল জন কেনেডি। আবার কেনেডির প্রেসিডেণ্ট হবার পর তাঁর জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সর্বদাই চিন্তিত ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাঁর নাম ছিল এভিলিন লিঙ্কন। কি বিচিত্র নামের যোগাযোগ।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন এবং কেনেডির মৃত্যুর পর যাঁরা প্রেসিডেণ্ট হন তাঁদের দুজনেরই নাম জনসন। তাঁদের দুজনেরই জন্মের মধ্যেও কী অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। লিঙ্কনের পর প্রেসিডেণ্ট হন এণ্ড্রু জনসন---তাঁর জন্ম হয় ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে। কেনেডির মৃত্যুর পর প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন লিণ্ডন জনসন ---তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন---১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে।

খুকুর পুষি

অমল চট্টোপাধ্যায়

খুকু বসে বুনছে উল
পুষি ঝিমোয় পাশে,
হাত ফসকে পড়ল হঠাৎ
উলের বলটা খসে।

গড়াতে গড়াতে বলটা ক্রমেই
যাচ্ছে চলে দূরে,
পুষিকে তাই বললে খুকু
'আনগে ওটা ধরে।'

কাজেই পুষি গোঁফ বাগিয়ে
নিল বলের পিছু,
কিন্তু মাথায় বুদ্ধি যে তার
ঘাটতি ছিল কিছু।

তাইত পুষি পড়ল প্যাঁচে
আনতে গিয়ে ধরে,
থাবার মাথায় বলটা লেগে
কেবলি যায় সরে।

বারান্দাটার শেষ প্রান্তে
থমকে হাঁফায় পুষি,
ভাবল এবার ধরবে ঠিকই
মনটা বেজায় খুশী।

পায়ের নীচে কুড়ুটা চেপে
বলটা খুঁজেই সারা,
কাণ্ড দেখে খুকু তখন
হেসেই পাগল-পারা

অভিশপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ কিশোর উপন্যাস ॥

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিবশঙ্কর ও মথুর তখন পাশাপাশি দুটো খাটে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। এমন সময় বাইরে দীননাথের বিকট এক চীৎকার শোনা গেল---হুজুর হুজুর বলে।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন দুজনে। মথুর উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার চাটুজ্যে মশাই।

দীননাথ আর কথা বলতে পারলেন না তারপর, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতের টর্চটা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মহুয়া গাছটাকে।

মথুর বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কি?

---খুন।

---এঁ্যা।

---হ্যাঁ, হাণ্টার সাহেব খুন হয়েছেন---চাপা কান্নার স্বরে বলে উঠলেন দীননাথ।

---বলেন কি! বলে, মথুর ত্বরিতে বেরিয়ে এসে দেখলেন মহুয়া গাছটায় ঝুলছে হাণ্টারের লাস। চারিদিকে লোকজনের তখন চ্যাঁচামেচিতে ও তাদের গোলমালের মধ্যে ছোট-খাটো ভিড়ও হয়ে গেছে সেখানে।

তারপর শিবশঙ্করও এসে পড়লেন সেখানে। দেখলেন যে হাণ্টারের মৃতদেহটা ঝুলছে ওই গাছের মগডালটায়। টর্চের আলোয় ভালো করে দেখলেন সেটাকে। দেখলেন যে, কে যেন হাণ্টারকে হত্যা করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে গেছে। আর তার পিঠে একটা তীর গাঁথাও রয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন তিনি হাণ্টারের মৃতদেহটার দিকে। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন মথুরকে, সকাল তো হয়েই এলো, এইবার থানায় লোক পাঠাও।

তখন ফর্সা হতে শুরু হয়েছে চারিদিকটায়।

তারপর বেলা বাড়লে পুলিশের

লোকজন এলো পড়লো। পুলিশের প্রয়োজনীয় তল্লাশ-তদন্ত ইত্যাদিতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে এলো। তারপর তারা হাণ্টারের মৃতদেহটা নিয়ে চলে গেল।

যাওয়ার সময় পুলিশ ইনসপেক্টর শিবশঙ্করকে বলে গেলেন, আপনাদের প্রোটেক্সনের জন্যে একটা পুলিশ ট্রুপ রেখে গেলাম। ভয়ের কোন কারণ নেই, আপনারা সবাই শুধু একটু সতর্ক থাকবেন।

শিবশঙ্কর বললেন তাকে, দেখবেন ইনসপেক্টর হত্যার তদন্তে অযথা যেন কারুর ওপর অন্যায় জুলুম না হয়।

ইনসপেক্টর হেসে বলে গেলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার; সে রকম কিছু করবো না আমরা।

ইনসপেক্টর চলে গেলে শিবশঙ্কর মথুরকে ডেকে বললেন, এখানে থাকার আমার আর ইচ্ছে নেই। যে জন্যে এসেছিলাম তা তো হলোই না, উল্টে আর একজনের প্রাণ গেল। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, এই বোধ হয় হল এখানে আমাদের আসার শেষ পর্ব। বলতে বলতে তাঁর চোখটা যেন চকচক্ করে উঠলো।

॥ আট ॥

আবার চকোরের গভীর জঙ্গলে, রাজার পর্ণকুটিরের আঁধারে জ্বলে উঠলো প্রদীপের আলো। এই আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল সেই ন্যুব্জকুব্জ বুড়ী ধাইমা। এ আলোর রূপ হোলো এবার ভীষণ ভয়ঙ্কর। এ এবার প্রতিহিংসার আগুনে যেন লেলিহান। ওই বুড়ী রাজাকে বলে গেল, বেটা---বেইমানের বদলা নেওয়ার আজই হোলো উপযুক্ত সময়।

রাজা বাচ্চুকে ডেকে বললে তাই, বেটা---আজ রাতেই কাম ফতে করে আসতে হবে।---আজই বেইমান শিবশঙ্করকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তারপর বললেন তাকে, তাঁর নিজের জীবনের সেই ঘটে যাওয়া দুঃখের ইতিহাসটা। বললেন সেই সব কথা, কেমন করে সব হারিয়ে তাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল সেইদিন রমনা ছেড়ে। আর বললেন কিভাবে আশ্রয় পেলেন এই চকোরের জঙ্গলে। আরও বললেন তিনি এই বুড়ী ধাইমার কথাও। কিন্তু কিছুই বললেন না, বাচ্চুর নিজের কথা।

বাচ্চু জিজ্ঞেস করলো তাকে, তার শিশুকালের কথা---তার মার কথা।

রাজা সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। বললেন তিনি, পরে সব বলবো বেটা। আগে কাম ফতে করে আয়, তারপর সকলের কথাই বলবো। সময় খুবই অল্প। আজকের রাতেই---ভোর হওয়ার আগেই; তোকে শিবশঙ্করের জিন্দগীর খেল খতম করে আসতে হবে। বলতে বলতে তাঁর চোখদুটোতে জ্বলে উঠলো যেন ভাটার আগুন। তারপর তিনি তাঁর বিছানার নীচ থেকে একটা খাপে মোড়া ধারালো ছোরা বের করে তার হাতে দিয়ে আবার বললেন, বেটা---আমার ইজ্জৎ, আমার রমনার মাটির ইজ্জৎ আজ আমি তোর হাতে তুলে দিলাম।

বাচ্চু সেটা গ্রহণ করে বললে, ঠিক আছে বাপজান।

তারপর রাজা উপায় বাতলে দিলেন, কেমন করে শিবশঙ্করকে হত্যা করতে হবে। আর বলে দিলেন কেমন করে শিবশঙ্করের কাছে গিয়ে সে পৌঁছবে---সেই পথটা। ভাছাড়া এও বলে দিলেন যে, তিনি খবর সংগ্রহ করে রেখেছেন যে শিবশঙ্করের আজকাল রাত্রে ঘুম আসে না, আসে তার ঘুম ভোর রাত্রে। সেই সময়ই কাজ হাসিল করে ফেলতে হবে তাকে।

সব শুনে নিয়ে, রাজার নির্দেশেই সেই রাত্রে বেরিয়ে পড়লো সে। বেরিয়ে পড়লো ঘোড়ায় চড়ে।

রাত গভীর হওয়ার আগেই বাচ্চু পৌঁছে গেল রতনপুরের শহরে, তারপর অপেক্ষা করে রইলো সেই নির্দিষ্ট সময়টার জন্যে শিবশঙ্করের প্রাসাদের কাছাকাছি কোন এক জায়গায়।

তারপর যখন সেখানকার দেউড়ির পেটা ঘড়িতে শুনতে পেলো রাত তিনটের ঘণ্টা তখন সে এসে পৌঁছলো শিবশঙ্করের লাইব্রেরীর ঘরটার নীচের দিকে। এই লাইব্রেরী ঘরটার বারান্দার পাশ দিয়ে যে গলি পথটা আছে সেখানে এসে তার ঘোড়াটাকে রাখলো। এদিকটা বেশ অন্ধকার। আর এদিক দিয়েই তার কাজ শেষ করে পালিয়েও যেতে পারবে। তাই সে এখানেই তার ঘোড়াটাকে বাঁধলো প্রাসাদের পাঁচিলের থামের সঙ্গে। তারপর সে ঘোড়াটার পিঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে উঠলো পাঁচিলের মাথায়। সেখান থেকে সে লাইব্রেরী ঘরের নীচের জানলার গরাদে পা রেখে বারান্দার কার্নিসটা ধরে উঠে এলো একেবারে লাইব্রেরীটার সামনে। সেখান থেকে পা টিপে টিপে টর্চের আলো জ্বেলে পথ দেখে দেখে গিয়ে পড়লো একেবারে শিবশঙ্করের শোবার ঘরের সামনে। ওই ঘরের একটা জানলায় দেখতে পেলো সে অস্পষ্ট আলো। আস্তে আস্তে উকি মেরে দেখলো সেখান থেকে সে যে শিবশঙ্কর ঘুমে আচ্ছন্ন।

ওই ঘরের আধ-নেভানো সেজের আলোটায় দেখতে পেলো সে শিবশঙ্করের অস্পষ্ট মুখটাকে। এদিক থেকে ওই ঘরে ঢোকার পথ বন্ধ ছিল কারণ এদিকের একমাত্র দরজাটা ভেতর থেকে খিল আটকানো। তারপর সে দেখতে লাগলো চারিদিকটা ভালো করেই। দেখলো পেছনের দিকে পূবমুখো একটা গরাদবিহীন জানলা খোলা রয়েছে শিবশঙ্করের খাটের একপাশে।

কিন্তু সেখানে পৌঁছুনোর কোন পথই নেই। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো সে। কিন্তু মনে পড়ে গেল যে বাপজান বলে দিয়েছিলেন যে একটা চাঁপা গাছ আছে সেখান থেকেই লাফিয়ে জানালা দিয়ে ঢুকতে হবে। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো সে। হ্যাঁ, দেখতে পেলো চাঁপা গাছটাকে। আর একটুও দেরি না করে সে চাঁপা গাছটায় চড়ে বাইরের কার্নিসে পা দিয়ে ওই খোলা জানলাটার সামনে এসে পড়লো। তারপর সেখান দিয়ে

অতি সন্তর্পণে টুপ করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো সে।

ঘরে ঢুকেই দেখে নিল সেটাকে ওই অস্পষ্ট আলোতেই। দেখলো, একটা পালঙ্কে শিবশঙ্কর একদিকে পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছেন। সেদিনকার রতনগড়ের আম রাস্তায় দেখা ওই শিবশঙ্করের সঙ্গে আজকের এই ঘুমিয়ে থাকা শিবশঙ্কর রায়কে যেন বেশ আলাদা রকম মনে হতে লাগলো তার। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে তাঁর দিকে। তাঁকে আজ বাচ্চুর মনে হোলো যেন তিনি বেশ অসুস্থ। কেমন যেন এক বিপরীত ভাব উদয় হোলো তার মনে। মুহূর্তে সে ভুলে গেল যে, সে এখন এসেছে এখানে ওই শিবশঙ্কর রায়ের প্রাণ হরণ করতে। ভুলে গেল সে তার বাপজানের কথা। ভুলে গেল তাঁর সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ মুখের প্রতিচ্ছবিটাকে। একেবারে ভুলে গেল বাপজানকে দেওয়া তার নিজের প্রতিশ্রুতির কথা। তার বদলে, তার মনে এক কোমলতার স্পর্শ তাকে অভিভূত করে দিল এখন। এখন সে কেমন যেন শিবশঙ্করের প্রতি দরদী হয়ে উঠলো।

হঠাৎ খুট করে কিসের আওয়াজ হোলো একটা। বাচ্চুর চমক্ ভাঙলো। দেখতে পেলো সে যে শিবশঙ্কর উঠে পড়েছেন। তারপর তিনি সেজের ওই আলোটাকে বাড়িয়ে দিলেন। আর তারপরেই ছুটে এলেন বাচ্চুর কাছে। এসে অভূতপূর্ব বিস্ময়ে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার---তুমি---এই অবস্থায়।

উত্তর দিল বাচ্চু, হ্যাঁ---চুরি করে ঢুকেছি।

---কেন? ধরে ফেললেন শিবশঙ্কর তার হাতটা।

---আপনাকে হত্যা করতে।

কি কারণে আমাকে হত্যা করবে? শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করেন।

---বাপজান আমার পাঠিয়েছে আপনার বেইমানীর বদলা নিতে।

---কে তোমার বাপজান? জিজ্ঞেস করেন আবার শিবশঙ্কর।

---আমার বাপজান, রতনগড়ের ভূতপূর্ব মালিক রাজা আলিমিয়া।

---সে কি! রাজা তাহলে বেঁচে আছে। কোথায়? অস্ফুটে তিনি বলে উঠলেন।

---তিনি চকোরে আত্মগোপন করে আছেন।

সে কথা শুনে একটু যেন কি চিন্তা করলেন শিবশঙ্কর, তারপর বললেন, ও তুমি আমায় খুন করে পালিয়ে যেতে চাও---এই তো।

বাচ্চু আর কোন কথা বলল না, শুধু চুপ করে রইল।

তারপর তিনি তাঁর আলমারীটা খুলে বন্দুক ও একটা কার্টিজ বের করে এনে দিলেন বাচ্চুর হাতে। বললেন, নাও এখনোও রাত আছে, আর একটু হোলে হয়ত ভোর হয়ে যাবে---ওই বন্দুক দিয়ে আমাকে গুলি করে মেরে পালিয়ে যাও।

বাচ্চু ওই বন্দুক আর কার্টিজটা হাতে করে নিলো, তারপর সেটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চোখের পলকে জানলার যে পথটা দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই লাফিয়ে পড়ে ত্বরিতে পালিয়ে গেল। সেখান থেকে নীচে বাঁধা ঘোড়াটার পিঠে চড়ে ছুটলো চকোরের জঙ্গলে যাওয়ার নালার পথটায়।

তাই দেখে শিবশঙ্করও বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। এসেই ছুটলেন আস্তাবলে। সেখান থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে, তাতে চড়ে বিদ্যুৎবেগে ধাওয়া করলেন বাচ্চুকে ওই নালার পথেই। দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে উঠলো তখন চারিদিকে।

বাচ্চু তার ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ভীষণ বেগে, তার পেছন পেছন শিবশঙ্করও ছায়ার মত তাঁর ঘোড়াটাকেও চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তড়িৎগতিতে। যখন চকোরের জঙ্গলের মধ্যে বাচ্চু ঢুকে পড়লো, তখন শিবশঙ্কর তাঁর ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরলেন একটু। তারপর তিনি নিজেকে একটু তফাতে রেখে, বাচ্চুকে অনুসরণ করে চললেন জঙ্গলের গাছপালার মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে। দেখতে দেখতে জঙ্গলের ভেতরটাতেও তখন প্রত্যুষের আলো এসে পড়লো।

তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন যে, বাচ্চু তার ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে ঢুকে পড়লো একটা কুটীরের মধ্যে। বেশ বুঝতে পারলেন তিনি যে, ওইখানেই রাজা অপেক্ষা করে আছে বাচ্চুর জন্যেই। তিনিও এবার ঘোড়া থেকে নেমে ত্বরিতে এগিয়ে গেলেন ওই কুটীরের দরজাটার কাছেই। সেখান থেকেই শুনতে পেলেন তিনি রাজার কণ্ঠস্বর। সে কণ্ঠস্বর চিনতে আজ তাঁর এতটুকু ভুল হলো না। মনে হোলো তাঁর---এ যেন তাঁরই জীবনে ঘটে যাওয়া একটা বহু পুরাতন অধ্যায়, যা আজ আবার ফিরে এলো বুঝি এখানে।

তিনি শুনতে পেলেন। বাচ্চুকে রাজা বিষম উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠলো, কাম ফতে?

-না বাপজান, বাচ্চু মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো গিয়ে যেন।

---অ্যাঁ, বলে-- চিৎকারে ফেটে পড়লো রাজা। সে যেন হিংস্র শার্দুলের মত আওয়াজ করে ওই কুটীরটাকে কাঁপিয়ে তুলল।

শুনতে লাগলেন হাঁপাতে হাঁপাতে তা শিবশঙ্কর, ওই দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে। তিনি তখন একটু ভেবে দেখছিলেন যে, কি ভাবে তিনি তাঁদের মাঝে গিয়ে হাজির হবেন---সেই কথাটা।

বাচ্চুর মুখে তখন আর কোন কথাই ছিল না। এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তারপর তিনি।---সে বলে উঠলো রাজাকে, বেটা---আমাদের দেখছি এতদিনের সমস্ত তৈয়ারী---একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।

---হ্যাঁ, দেখছি আমাদের বহুৎ বড়া ভুল হয়ে গেল। বলতে লাগলো রাজা বার বার সে কথাটা। ক্রোধে সে তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল বুঝি। সে বলতে লাগলো বাচ্চুকে, বেইমানের

রক্ত যে তোর গায়েই বইছে—তাই তো তুই ফিরে আসতে পারলি।

কুটীরের মধ্যে ওই বৃদ্ধা বাধা দিতে গেল রাজাকে, কিন্তু পারলো না। সে বলে যেতে লাগলো, তুই আজ ভালো করে জেনে নে তুই আমার কেউ না। তোকে একদিন আমি চুরি করে এনেছিলাম এখানে।

শিবশঙ্কর এতক্ষণ শুনছিলেন ধীবভাবে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে এদের সমস্ত কথাগুলো। কিন্তু এইবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি শুনতে পেলেন, বাচ্চু জিজ্ঞেস করছে রাজাকে কে আমি তাহলে?

রাজা ক্রুদ্ধ হাসি হেসে বলে উঠলো তখন,—তুই কে?—তবে শোন আজ, আমি হেরে গেছি বলেই আজ তোকে বলছি যে—

শিবশঙ্কর তখন চরম উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সেইখানে।

রাজা বলে যেতে লাগলো, তুই হলি আমার চিরশত্রু শিবশঙ্করেরই ছেলে।

সেখানে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল এবার। শিবশঙ্কর এবার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না সেখানে। ঢুকে পড়লেন তিনি রাজার কুটীরের মধ্যে।

কুটীরের মধ্যে সবাই তখন তাঁকে দেখে হতবাক্ হয়ে গেল যেন। রাজাই প্রথমে কথা বলে উঠলো, বললেন—কে?

—আমি বন্ধু তোমার শত্রু শিবশঙ্কর রায়। তারপর তিনি বৃদ্ধাকে দেখে একটু এগিয়ে গেলেন পরে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন কে নহবুবাই!

—হাঁ, আমি; উত্তর দিল বুড়ী ধাই মা।

—তাহলে সত্যিই তুমি বেঁচে আছ?

—হাঁ, এখনও বেঁচে আছি এই জন্যে যে, আপনার উপযুক্ত শাস্তিটা এখনও দিতে পারি নি আপনাকে।

—তাহলে দাও, শিবশঙ্কর বলেন তখন।

—না, সেটা আর আমরা পারলাম না। অনেক কৌশলে আপনার ওই ছেলেকে, আপনাব স্ত্রীর কাছ থেকে চুরি করে এনেছিলাম আমি। বুড়ী বললে সে কথা।

—বল কি নহবুবাই? শিবশঙ্কর যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

—হাঁ, যেদিন আমার স্বামীর ফাঁসী হোলো হত্যার অপরাধে আর সে হত্যা আপনারই প্ররোচনায় যে ঘটেছিল, সেকথা বেমালুম আপনি অস্বীকার যেদিন করলেন আদালতে,—সেই দিনই আমি বদলা নেবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আর তাই, যখন আপনার স্ত্রী ওই সন্তান প্রসব করে প্রসূতি ঘরে মারা গেলেন, সেই সময় আমি সরকারী হাসপাতাল থেকে একটি মরা ছেলেকে এনে ওর জায়গায় শুইয়ে দিয়ে ওকে নিয়ে পালিয়ে যাই।

—নানী! বাচ্চু অস্ফুটে বলে উঠলো।

—হাঁ, তারপর থেকেই ওকে এই জঙ্গলে মানুষ করে তুলেছি। তারপর রাজা আলিকে পেলাম, আর আমার প্রতিশোধ-স্পৃহা আরোও দৃঢ় হয়ে উঠলো। এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলাম এই গভীর জঙ্গলে, অনেক কষ্ট করে, শুধু আপনার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই। কিন্তু তা পারলাম না আজ। আবেগের সঙ্গে বলে গেল বুড়ী, ওই কথাগুলো।

এইবার রাজা এতক্ষণে কথা বললেন, শিবশঙ্কর, হার আমাদেরই হোলো আবার।—জিৎ তোমারই হোলো এবারও। কথাগুলো বলতে গিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়লো তাঁর।

এতক্ষণ শিবশঙ্কর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। এইবার তাঁর যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। বললেন তিনি, জিৎ তোমাদেরই হয়েছে রাজা; হার আমারই হয়েছে। তাই তো আমাকে তোমাদের কাছে আজ আত্মসমর্পণ করতে হোলো বন্ধু। আমার যেটা বড় সম্পদ, সেটাই তো আজ তোমাদের। বাচ্চুকে দেখিয়ে বললেন কথাগুলো।

বাচ্চু নির্বাক হয়ে চেয়েছিল তখন তাঁর দিকে।

তারপর তিনি ধীরে ধীরে গিয়ে রাজার হাতটা ধরে ফেললেন। রাজা তখন জঙ্গলের ওপারে দূরে দেখছিলেন বুঝি সূর্যের রক্তিম অরুণ আলোটাকে।

॥ সমাপ্ত ॥

পতিতার মুক্তি

প্রুসিয়ান সেনার অধিকারে ফরাসীদের কোন একটি গ্রাম। নাম স্যাটোভু ভিল্। তারই এক প্রাসাদ-দুর্গ। বলা বাহুল্য ঐ নামেই অভিহিত। ফরাসী জমিদারের পরিত্যক্ত এই সুরম্য প্রাসাদ-দুর্গে বসে প্রুসিয়ান কমাণ্ডিং অফিসার মেজর গ্রাফ্ ভন্ ফার্লসবার্গ সেদিনের সমস্ত চিঠিপত্র পড়ছিলেন। মার্বেল পাথরের চুল্লীর উপর বুটজুতা শোভিত চরণ দুটি তাঁর স্থাপিত। তদধিক চমৎকার ও সুকোমল এক আরাম-কেদারায় দেহটি তাঁর এলায়িত। মার্বেল পাথরের গায়ে বুটজুতার গোড়ালীর দাগ বসে গেছে। দীর্ঘ তিন মাসের নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানের কঠিন সাক্ষ্য।

দারুশিল্পের উৎকর্ষের চমৎকার নিদর্শন একটা গোল কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর কফির পেয়ালা ক্রমাগত ধূম উদ্গিরণ করছে। নানা জাতীয় পানীয়ের কলঙ্ক-কালিমায় টেবিলটির বার্নিস্ এখানে সেখানে চটে গেছে। অসংখ্য চুরুট পোড়া দাগ এবং পেন্সিল কাটা ছুরীর অগণ্য আঁচড় বিজয়ী সেনানায়কের নানা খেয়ালপ্রসূত নানা মূর্তি, নানা নক্সা অঙ্কে ধারণ করে আছে।

চিঠিপত্রগুলি পড়া শেষ হল। তারপর জার্মান পত্রিকাগুলি পড়াও তিনি শেষ করলেন। তাঁর আরদালী তক্ষুণি সেই পত্রিকাগুলি তাঁর টেবিলে রেখে গিয়েছে। তারপর আসন ছেড়ে তিনি উঠে পড়লেন। কয়েকটি কাঁচা কাঠের টুকরো সেই চুল্লীতে ফেলে দিয়ে জানালার কাছে চলে গেলেন। হাড়-কাঁপানো শীত। বীরপুঙ্গবদের দেহগুলিকে উত্তপ্ত রাখা চাই। অতএব শাস্তি পেতে হলো সামনের বৃক্ষশোভিত পার্কগুলিকে, ওরা বৃক্ষশূন্য মরুভূমির মত হয়ে গেছিল। কাঁচা কাঠ তারই নিদর্শন।

বাইরে প্রচণ্ড বেগে বারিবর্ষণ চলছে। নরম্যাণ্ডি প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও এমন একনাগাড়ে বারিবর্ষণ হয় না। আকাশের ফোয়ারার মুখগুলি যেন কোন ক্রুদ্ধ দানব প্রচণ্ড আক্রোশে খুলে দিয়েছে। তির্যক এক প্রাচীরের ন্যায় বৃষ্টির পুরু আস্তর-শীতার্তা ধরণীর

গী দ্য মোপাসাঁ

পৃষ্ঠে বৃষ্টির ঘন ঘন চাবুক পড়ছে। কল্‌কল্ খল্ খল্ শব্দ হচ্ছে সব যেন রসাতলে যাচ্ছে। রুঁয়ে অঞ্চলটি যেন ফ্রান্সের একটি 'সাওয়ার বাথ' বা ধারাযন্ত্র, বারিধারায় পরাজয়ের গ্লানি ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।

অদূরে কানায় কানায় ভর্তি 'আণ্ডেল' নদী। বাঁধভাঙা জলের মত তীর উপছে জল উঠছে। বৃক্ষশূন্য পার্কের উপর দিয়ে অফিসার মহাশয়ের দৃষ্টি সেই দিকে নিহিত। কোন এক অজানা স্ফূর্তিতে জানালার গরাদের উপর জার্মান ওয়ালটজ্ নাচের বাজনা সে সেখানে টুং টাং করে আঙুল দিয়ে বাজাচ্ছিল। হঠাৎ একটি শব্দে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল। মুখ ফিরিয়েই দেখেন তাঁর অধস্তন অফিসার ক্যাপ্টেন ব্যারন ভন্ কেলউইঙ্গস্টাইন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

চওড়া কাঁধ ছিল ঐ মেজরটির, একগাল দাড়ি ঝুলে লম্বা হয়ে বুকের উপর পড়েছে। চিবুকটা যেন তার 'যুদ্ধং দেহি' আস্ফালনকারী এক ময়ূরের পেখম। চোখ দুটি তার নীল, ভাব শান্ত, আবেগ-চিহ্নরহিত। একগালে তরোয়ালের একটা কাটা দাগ বর্তমান। অস্ট্রিয়ার যুদ্ধের পুরস্কার। সদাশয় ও সজ্জন বলে তার খ্যাতির অভাব ছিল না।

ক্যাপ্টেনটি কিন্তু ছিল হৃষ্টপুষ্ট বেঁটে লোক। গোল মুখখানা যেন তার সামরিক পোষাক ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। উজ্জ্বল লাল চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। লাল চুলের এই পরিবেশে মুখখানি তার জোনাকীর আলোর ন্যায় দ্যুতি প্রকাশ করত।

সামনের দুটো দাঁত নেই। পানোন্মত্ত কোন এক সন্ধ্যার হৈ-হুল্লোড় ও অত্যাচারের কঠিন সাক্ষ্য। দাঁত দুটি যে তিনি কেমন করে হারিয়েছেন এখন আর তা তাঁর মনে নেই। দাঁতের ঐ বিরাট ব্যবধান দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দে তাঁর কথাগুলি বেরুত। এজন্য মাঝে মাঝে তাঁর কথা হৃদয়ঙ্গম করাই মানুষের পক্ষে মুস্কিল হত। সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষৌরিকৃত মাথার ন্যায় তাঁর মাথায় মস্ত একটা টাক। আর মরুভূমিসদৃশ মাথার খুলিটার চারিদিকে পাতলা পাতলা কোঁকড়ান চুল।

মেজরটি তাঁর সাথে করমর্দন করে তার কফির পেয়ালা একচুমুকে শেষ করল। সকাল থেকে তার অধস্তন কর্মচারীদের কাজের ফিরিস্তি নিতে নিতেই যে কয় পেয়ালা কফি নিঃশেষ হচ্ছিল এটা তার মধ্যে ষষ্ঠ। জানালার কাছে গিয়ে দুজনে পরিস্থিতি যে জটিল আকার ধারণ করছে এই নিয়ে আলোচনা করছিল। মেজরের স্বভাবটি ছিল শান্ত। দেশে তার স্ত্রী বর্তমান। জীবনটাকে সে অন্যান্যের মত সহজ সরলভাবেই নিয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন কেলউইঙ্গস্টাইন ছিল বহু দিনের ঝানু এক ডন্ জুয়ান। কুখ্যাত বারবনিতা পল্লীগুলি তার নখদর্পণে। কাঁচা বয়সের মেয়ে-ছেলে দেখলেই তার চিত্তচাঞ্চল্য জাগত। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে একাদিক্রমে

তিন মাস সাধুসন্তের ন্যায় নিরুপায় হয়ে নিরামিষ থেকে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল।

দরজায় একটা মৃদু করাঘাত—তারপর মেজরের কর্কশকণ্ঠে ডাক, 'ভেতরে এস', দরজা ফাঁক করে কুর্তিচাপকান পরিহিত এক পরিচারক ঢুকল। আহার্য যে প্রস্তুত তা জানাবার জন্য ওর উপস্থিতিটুকুই ছিল যথেষ্ট।

ভোজনকক্ষে তারা তিন জন 'সাবালটার্ন'কেই দেখতে পেলো। লেফটানেণ্ট অটো ভন্ গ্রসলিং আর দু'জন দ্বিতীয় স্তরের লেফটানেণ্ট ফ্রিজ স্যুম্যানবার্গ এবং মার্কুই উইলহেল্ম ভন আইরিক্। ভন্ আইরিক ছিল বেঁটে সুদর্শন তরুণ। তার তিরিক্ষি মেজাজ তার অধীনস্থ লোকদের পক্ষে বেশ ভয়ের বস্তু ছিল। পরাজিত ফরাসীদের তার কাছে কোন ক্ষমাই ছিল না। বারুদের ন্যায় কখন যে সে ফেটে পড়বে তা কেউ জানত না।

ফ্রান্সে পদার্পণ করার পর থেকেই তার বন্ধুরা তাকে 'ম্যাডমোয়াজেল ফিফি' বা ভদ্রমহোদয়া ফিফি বলে ডাকত। তার ছিল মেয়েলী ভাবভাব।

আর তন্বীসুলভ ছিমছাম চেহারা। তাকে দেখলে মনে হ'ত মেয়েদের মত যেন কাঁচুলী পরে আছে। পাণ্ডুর মুখের উপর সামান্য একটু গোঁফের রেখা। দুনিয়া ও মানুষের প্রতি তার বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রেই 'ফিফিডক' এই ফরাসী বুলিতে প্রকাশ পেত। কথাটা উচ্চারণের সময় তার মুখ থেকে একটা হিস্ হিস্ শব্দও বেরুত। তার এই নামের ইতিহাস এ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্যাটো ভু ভিলের এই ভোজন কক্ষটি দীর্ঘাকার ছিল। মান্ধাতা আমলের কাচের ঝাড়লণ্ঠন, মাঝে মাঝে তার মধ্যে বন্দুকের গুলীর চিহ্ন। জানালায়, কপাটে ফ্লেমিস রীতির পরদা—পর্দাগুলি মাঝে মাঝে তরবারির খোঁচায় ফালি ফালি হয়ে ন্যাকড়ার মত ঝুলছে। ম্যাডমোয়াজিন ফিফির হাতে যখন কোন কাজ থাকত না তখন তার সময় কিভাবে কাটত এই সব যেন তারই সাক্ষ্য বহন করে আছে।

তিনটি বড় বড় প্রতিকৃতি ঝুলছে চারপাশের দেয়ালেতে। সমরসজ্জায় সজ্জিত এক নাইট বা বীরপুরুষের একটি, একজন কার্ডিনাল ও একজন প্রেসিডেণ্টের আর দুটি। তিনটি প্রতিকৃতির মুখেই একটা করে চীনামাটির পাইপ এঁকে দেওয়া হয়েছে, আর একটি প্রতিকৃতি হ'ল আঁটসাঁট পোষাক পরা সম্ভ্রান্ত এক মহিলার—তার মুখে আবার কাঠকয়লা দিয়ে এক বিরাট গোঁফ এঁকে দেওয়া হয়েছে।

এই অভিশপ্ত ভোজনকক্ষে অফিসারদের ভোজনপর্ব নীরবেই সমাধা হচ্ছিল। চারিদিকে মেঘলা আকাশের ঘনান্ধকার বৃষ্টির পুরু পরদা। চারিদিকে পরাজয়ের একটা গ্লানি। ওক্ কাঠের তৈরী লৌহকঠিন মেঝে সরাইখানার নোটিশ বোর্ডের মতই কঠিন ও অকরুণ।

ভোজনপর্ব শেষ হ'ল। তারপর চলল পানীয় ব্র্যাণ্ডি ও নানা জাতীয় সুরার মহড়া। একই সাথে প্রত্যেকের মুখে একটা পাইপ জ্বলে উঠল। দাঁতের কোণে পাইপটা ধরা অবস্থাতেই গ্লাস গ্লাস মদ চলছে। পাইপের অগ্রভাগে চীনামাটির তামাক আধার চিত্র বিচিত্র হটেণ্টট রীতিতে আঁকা চিত্রসমৃদ্ধ।

মদের গ্লাসগুলি খালি হ'বার সাথে সাথেই-ও ছাড়া যেন আর করবার কিছু নেই এইভাবে শ্রান্ত হস্তে তারা সেগুলি ভরে নিচ্ছিল। কিন্তু 'ফিফি' তার গ্লাসগুলি বার বারই ভেঙ্গে ফেলছিল—আর একজন সৈনিক তার সাথে সাথেই তার হাতে আর একটা করে গ্লাস জুগিয়ে যাচ্ছিল।

তামাকের ধোঁয়ার কড়া কটু গন্ধে চারিদিক আচ্ছন্ন। মদের নেশায় তারা ঝিমিয়ে পড়ছিল। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যেন তাদের এই পথ ধরতে হয়েছে। মনের এই বিষণ্ণ পঙ্গু ভাবঘোরে তারা মুহ্যমান ছিল।

'ব্যারন'ই প্রথম যে আর স্থির থাকতে পারলে না। তার এ সব যেন আর সহ্য হচ্ছিল না। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে সে বলে উঠল, 'দূরছাই—সব কিছু গোল্লায় যাক, না এভাবে আর কিছুতেই চলতে পারে না। প্রাণে রঙ-লাগানো আমেজ টেনে আনার এমন কিছু ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।'

অটো এবং ফ্রিজ মহাশয় একযোগে উত্তর করল, 'কি হ'ল স্যার? হঠাৎ উত্তেজিত হ'লেন কেন? ব্যাপারখানা কি?'

কিছুক্ষণ থমকে থেকে সে বলল, 'শুনতে চাও,—ব্যাপারটা কি? তবে শোন আমাদের কমাণ্ডিং অফিসারের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা এখানে একটা দিলখুস মাতোয়ারা মধুচক্রের আসর বসাতে চাই।'

মেজর মহাশয় ঠোঁট থেকে তার পাইপটা নামিয়ে প্রশ্ন করল, 'ক্যাপ্টেন কি রকম আসর?'

তার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে ব্যারন বলল, 'স্যার ভাববার কিছু নেই। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার হাতে ছেড়ে দিন। বেছে বেছে রূপসী কয়েকটি মেয়েছেলে সংগ্রহ করবার কাজে রুয়েতে আমি আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাতে চাই। কোথায় তাদের নাগাল পাওয়া যাবে তাও আমি জানি। আমরা এখানে একটা নৈশ পান-ভোজনের আয়োজন করব—যা কিছু দরকার আমাদের সব কিছুই এখানে আছে, অন্তত একটা চমৎকার চাঁদনী রাত—যাকে বলে আরব্য রজনীর মত রাত এইখানে আমরা সৃষ্টি করতে চাই।'

মেজর মহাশয় নিজের বিশাল কাঁধ দুটিতে একটা ঝাঁকনি দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'বুড়ো খোকা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

আর অমনি সব ক'জন অফিসারই এর মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে কমাণ্ডিং অফিসারের চারিদিকে জমায়েত হ'য়ে ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবের অনুকূলে অনুমতি দিতে পীড়াপীড়ি করা সুরু করল। 'দয়া করে ক্যাপ্টেনকে এই বিষয়টা পাকা করবার অনুমতি দিন, এখানে এই সাত্ত্বিক নিরামিষ ভাবে থাকতে আর ভাল লাগছে না।'

মেজর মহাশয় অবশেষে এদের পীড়াপীড়িতে টললেন। তিনি রাজী হ'য়ে বললেন, 'বেশ, তাহলে তাই হোক, ব্যারন অনন্তর কালবিলম্ব না করে তার অনুচর-প্রধানদের ডেকে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে যিনি উপস্থিত হলেন, তিনি ছিলেন একজন ম্যান নন-কমিশনড অফিসার। কেউ তাঁকে কখনও হাসতে দেখেনি। উর্দ্ধতন অফিসারদের যে কোন আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। মুখের অভিব্যক্তি তার ভাবলেশহীন। ব্যারনের আদেশ সে একবার মনোযোগ সহকারে শুনল। তারপর চলে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মস্ত বড় একটা চার ঘোড়ার গাড়ীতে সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই দ্রুত-বেগে সেই প্রাসাদদুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল।

তারা তখন সবাই যেন ধ্যান হতে জেগে উঠল; কোথায় গেল তন্দ্রা আর কোথায় গেল শরীরের ম্যাজম্যাজানি। কোন কালে যে তা'রা চেয়ারে বসে ঝিমুত তাও মনে হ'ল না। একঘেয়ে জীবনের পাইকারী অভিভাব তাদের ভেতর থেকে একেবারে অন্তর্হিত হল। তারপর আসন্ন আনন্দের আস্বাদ নিয়ে তাদের মধ্যে জোরালো আলোচনা চলল।

ঝড়বৃষ্টি থামবার কোন সুদূর লক্ষণই দেখা গেল না। তথাপি মেজর মহাশয় গম্ভীর চালে বলে উঠল, 'ঝড়জল এই আসল বলে।'

'লেফটেন্যাণ্ট অটো তখন তার সুরে সুর মিলিয়ে যেন আকাশ পরিক্রমা করে সংবাদ নিয়ে এসেছে এইভাবে বলল, 'আকাশ এই পরিষ্কার হ'তে চলেছে।'

ভদ্রমহোদয়া ফিফি পর্যন্ত স্থির হ'য়ে বসে থাকতে পারছিল না। হরদম ওঠবোস করছিল। ইস্পাতের ফলার ন্যায় তার নীল চোখের ধারাল চাহনি সব কিছু কেটে ছিঁড়ে ভেঙ্গে পুড়িয়ে ছারখার করার মত বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সেই গোঁফ-ওয়ালী মহিলা প্রতিকৃতির দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। তক্ষুণি সেই সুদর্শন তরুণ তার রিভলবারটা বের করল। 'বেহায়ার ন্যায় আমাদের এই পানোন্মত্ত আসর তুমি চেয়ে চেয়ে দেখবে? তা আর হ'তে দিচ্ছি না।'

এই চীৎকার করে চেয়ার থেকে না উঠেই সে তাগ করতে লাগল। পর পর দুটি গুলি গিয়ে প্রতিকৃতির দুটি চোখই পুড়িয়ে দিল।

চীৎকার করে তারপর সে বলে উঠল 'এবার চলুন 'মাইন' পাতা হোক। নতুন আনন্দের টাটকা উত্তেজনা পাবার লোভে সারা দলের মধ্যে একটা নিথর ভাব দেখা দিল।

ঘরেতে 'মাইন' পাতা ছিল, ফিফির নিজস্ব একটা আবিষ্কার। নিছক খেয়াল ও কৌতুক চরিতার্থ করবার মানসে বিজিত দলের সব কিছু ভেঙ্গে চুরে উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়াই তার ছিল অতি প্রিয় খেলা।

প্রাসাদ-দুর্গ ছেড়ে পালাবার সময় প্রাসাদের আইনত যিনি মালিক সেই কাউণ্ট ফার্নাণ্ড ডুময় ডু ভিল তৈজস-পত্র আসবাবপত্র ইত্যাদি কিছু লুকিয়ে রেখে যাবার কিংবা সাথে করে নিয়ে যাবার সময় পান নি। কেবল রূপোর কিছু তৈজসপত্র প্রাচীরের এক গর্তের মধ্যে সেঁদিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না---নবাব বাদ-শাহের ন্যায় বিলাস-ব্যসনে তিনি বাস করতেন। তাঁর এই আকস্মিক পলায়নের পূর্বে তাঁর ভোজন কক্ষের লাগোয়া বিরাট বৈঠকখানাটি একটা যাদুঘরের ন্যায় দেখাত।

দেয়ালে দেয়ালে ছবি, হাতে আঁকা কিংবা জলরঙে। টেবিলগুলির ড্রয়ারের মধ্যে, আলমারীর তাকের মধ্যে নানা ছোটখাট দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ, ছোট ছোট পাথরের মূর্তি, পুরানো হস্তিদন্ত নির্মিত সৌখীন জিনিষ, ভিনিসীয় কাঁচের রকমারী সৌখীন বস্তু, লতাপাতা আঁকা চীনামাটির নানা পাত্র ও ফুল-দানী নানা দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য সংগ্রহ সেখানে পুঞ্জীভূত ছিল। কিন্তু এখন ওখানে সে সবের আর কিছুই নেই। ওগুলি যে লুণ্ঠিত হয়েছে তা নয়, মেজর মহাশয় তা কখনই হ'তে দিত না। কিন্তু মাঝে মাঝে ভদ্রমহোদয়া 'ফিফি' যে সেখানে 'মাইন' পাতত এবং সে দুর্দৈব যখন সেখানে ঘটত তখন সামরিক অফিসার-গোষ্ঠী পাঁচ মিনিটের জন্য অনাবিল কৌতুক অনন্দ উপভোগ করত।

ক্ষুদে মার্কুই মহাশয় রসদ আনবার জন্য বৈঠকখানা ঘরে ঢুকল। একটি হংসডিম্বাকৃতি চীনামাটির টি-পট সে ঘর থেকে বের করে আনল। তারপর চলল তার পেটে বারুদ ঢোকান পর্ব। তা শেষ হ'লে মস্ত লম্বা একটা ফিউজ তার সেই টি-পটের নল দিয়ে অতি সন্তর্পণে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, দেশলাই হ'তে তার মুখাগ্নি করা হ'ল এবং সেই আগুন তার চেয়ে তার যাত্রা সুরু করবার সাথে সাথেই সে সেই দানবীয় যন্ত্রটি নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

মুহূর্ত কয়েক পরেই ফিরে এসে সে দুই কক্ষের মাঝখানের দরজাটি বেশ এঁটে বন্ধ করে দিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় রয়ে গেল। সব কটা জার্মানই তখন দাঁড়িয়ে। মুখে তাদের ছেলেমানুষের হাসি। হাস্যরোলের মাঝে তারা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ---মুহূর্তে সারা প্রাসাদটি কেঁপে উঠল। আর অমনি স্কুলের ছেলেদের ন্যায় হুড়মুড় করে তারা সেই ঘরে ঢুকে পড়ল।

'ভদ্রমহোদয়া ফিফি'ই এই দলের পুরোভাগে ছিল। যাক। অবশেষে ভেনাস দেবীর মূর্তির মাথাটা উড়িয়ে দেওয়া গেছে। 'ফিফি'র কি আনন্দ। মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলি দেবীর আশী-র্বাদের ন্যায় তারা প্রত্যেকে হাত পেতে নিল। টুকরোগুলির মধ্যে নানা বিচিত্র নক্সা। প্রত্যেকেই একদৃষ্টে যার যার নক্সাগুলি যাচাই করে দেখছে। ইতি-পূর্বেও এইরূপ আর একটি বিস্ফোরণ হয়েছিল। কতকগুলি খণ্ড মনে হচ্ছে যেন সেই বিস্ফোরণেরই দান। অতএব সেগুলি এবারের পুরস্কারের অযোগ্য।

মেজরের চোখে পিধ্যবৎসল গুরুর প্রবীণ দৃষ্টি। প্রাচীন শিল্পকলাসমৃদ্ধ গুগুধনের ছিন্নভিন্ন দেহাংশ সারা ঘরময় ছড়িয়ে আছে। মেজরের দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ। কোন অত্যাচারী 'নীগ্রো' যেন ঘরের মধ্যে মেসিনগান ফিট করে এন্তার চারদিকে গুলীবর্ষণ করে গেছে। সবার আগেই তিনিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মুখে তাঁর আত্মতৃপ্তির আভাস। বলে উঠলেন, 'আজকের এই মাইন' বিস্ফোরণ একটা বিরাট সাফল্যের নজীর রেখে গেল।'

তামাকের ধূমা তার উপর বিস্ফোরণের এই ধূম্রা। দুয়ে মিলে যে ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে তাঁতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করাও দুরূহ ব্যাপার। মেজর মহাশয় নিজেই তক্ষুণি জানালাটা খুলে দিলেন। অবশিষ্ট একগ্লাস করে ব্র্যাণ্ডি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাকে এইবার নিঃশেষ করবার জন্য অন্যান্য তৃষিত অফিসার ইতিমধ্যেই সেখানে জমায়েৎ হয়েছিল।

বাইরে হিমসিক্ত শীতল বাতাস। জানালা খোলা পেয়ে হু-হু করে বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ল। জলপচা ক্ষেতের দুর্গন্ধ ছিটে বৃষ্টির ঝাপসা কুয়াশা বাতাসের সাথে ভিড় করল। অফিসারদের ছোটবড় নানা আকারের দাড়িগুলো হিমে ভিজে চপচপে। ঝটিকা দানবের কাছে অবশিষ্ট বৃক্ষদলের ঘন ঘন কুর্নিশ। বিশাল উপত্যকার বক্ষে কুয়াশার আবরণ। কালো কালো মেঘগুলি নিগ্রো কুলিদের মত পিঠের মোট নাবিয়ে যাচ্ছিল। দূরে আকাশভেদী ধূসর সূচ্যগ্র। ওটা কি? ওটা আর কিছু নয়, ওটা গীর্জার সূচলো চূড়া।

তারা ওখানে বেশ কিছুদিন ধরে বহাল তবিয়তে আছে। কই ঐ গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি তারা তো কখনও শোনেনি। গীর্জার কেন এই নীরবতা? ওটাই তা হলে তাদের শত্রু, তাদের প্রতিপক্ষ একমাত্র প্রতিরোধ যেন ওটাই নীরব উপেক্ষা অস্ত্র দিয়ে হেনে আসছে। গীর্জার যাজক মহাশয় বিজয়ী জার্মান সেনাদলের থাকা খাওয়া আদর আপ্যায়নে যত্ন নিতে ত্রুটি করেন নি। বিয়ার ব্র্যাণ্ডি ও স্যাম্পেনের ধ্বংসযজ্ঞে বিজয়ী পক্ষের নিমন্ত্রণ যে তিনি পেতেন না তাও নয়। বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের সাথে তার মাধ্যমেই যুদ্ধ সন্ধি শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালাত। কিন্তু গীর্জার পূর্বরীতি অনুযায়ী ঘণ্টা বাজানোর ব্যাপারে যাজক মহাশয় একেবারে বেঁকে বসলেন; বরং বুক পেতে গুলী দেবেন তবু ওটাকে বাজতে দেবেন না।

এই নীরব উপেক্ষাই তার প্রতিরোধ—নীরব নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ। ত্রিশ মাইল এলাকাব্যাপী প্রত্যেকেই যাজক মহাশয়ের এই যুদ্ধনীতি শ্রদ্ধা ও গর্বের সাথে তারিফ করে যাচ্ছিল। পরাজয়ের দুঃখ ও গ্লানি প্রকাশে এই নীরব উপেক্ষা প্রকাশ করতে যাজক মহাশয়ের সৎসাহসের অভাব ছিল না।

তাঁর এই অসহযোগ নীতির পশ্চাতে সারা গ্রামবাসীর নীরব অকুণ্ঠ অনুমোদন ছিল। এর জন্য যে কোন মূল্য দিতে তারা পশ্চাৎপদ ছিল না। এই ত' তাদের জাতীয় গর্ব—এই ত' তাদের জাতীয় মর্যাদা। এইভাবে তারা তাদের নগণ্য গ্রামখানির নাম জগতের ইতিহাসে একটা সুরক্ষিত আসন দিয়ে যাবে। এ ছাড়া তারা তাদের জার্মান প্রভুদের সব রকম আবদারই মেনে চলত।

অদ্ভুত খেয়ালের এক প্রতিরোধ। মেজর মহাশয় ও তাঁর অফিসার গোষ্ঠী এই দেখে প্রাণখুলে হাসত। যাকগে। আশেপাশের গ্রামগুলো যখন অবনত মস্তকে তাদের অন্যান্য আদেশ মেনে চলছে, তখন নাই বা করল তারা এই সামান্য একটু অভিবাদন। এতে আর কি এসে যায়।

ক্ষুদে মার্কুই উইল্‌হেল্ম কিন্তু এই ব্যাপারটাকে অমর্যাদার মনে করত। সে এটাকে সহজভাবে নিতে পারে নি। তার উপরওয়ালা অফিসারের এই ধর্মযাজকভীতি বা তার প্রতি সমবেদনায় সে মেজরের উপর হাড়ে হাড়ে চটে ছিল। প্রতিদিন গীর্জার ঘণ্টা বাজুক এই তার জিদ। হোক না সেটা এ নিছক মজা—তাতে কি আসে যায়। মেজর মহাশয়কে প্রতিদিনই সে এই নিয়ে পীড়াপীড়ি করত। মেয়েলীভাবে রাতদিন এই নিয়ে কর্তার কাছে ঘ্যানঘ্যান করা কিংবা বিড়ালের মত রাতদিন ম্যাও ম্যাও করার ন্যায় দিনের পর দিন তাকে অনুযোগের সাথে পীড়াপীড়ি করত।

কিন্তু মেজর মশায় অটল। অবশেষে 'ফিফি' মহোদয়ার পক্ষে নিজের সান্ত্বনার জন্য স্যাটো ডু ভিলে 'মাইন' পাতা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

খোলা জানালা। পাঁচজন অফিসারই সেখানে ঠাণ্ডা বাতাসে একঠাঁই একটানা দাঁড়িয়ে। অবশেষে লেফটানেণ্ট ফ্রিজ হো-হো করে হেসে বলে উঠল, 'তরুণী সংসদ ঘোড়াগাড়ীতে আসবার মুখে এখানকার আবহাওয়ার একটা তিক্ত পরিচয় নিয়ে আসবে।'

হঠাৎ যার যার ফেলে আসা কাজের প্রতি তাদের মনোযোগ গেল, অমনি সভা ভঙ্গ—যে যার কাজে চলে গেল। আসন্ন ভোজনোৎসবের তদারক করতে ক্যাপ্টেন মহাশয় রন্ধনশালার দিকে পা বাড়ালেন।

সন্ধ্যাবেলা। আবার আর একটা ঘরোয়া বৈঠক। সবার ফিটফাট সুবিন্যস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ। এই নিয়ে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে হাসাহাসি ঠাট্টা টিটকারি, ইউনিফর্মের বোতামগুলি ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে। মনে হচ্ছে তাদের বুঝি সামরিক কোন কুচকাওয়াজ হবে। সবাই সদ্যস্নাত। চুলে গন্ধ তেল—গায়ে সেণ্ট পাউডারের সুবাস। আহা, মেজরের চুলগুলি তো ভোরবেলায় পাকা ছিল এবার কি করে কাঁচা হ'ল! ক্যাপ্টেনের মুখে দাড়ি গোঁফের চিহ্নও নেই। একটু আগুনের ঝলকের ন্যায় উপরের ঠোঁটে সামান্য একটু সোনালী গোঁফের রেখা।

বিরামহীন বৃষ্টি। জানালাটি তবু খোলা। কেন না মাঝে মাঝে ওদের মাঝে কেউ না কেউ ওখানে গিয়ে গাড়ীর শব্দের জন্য অধীর আগ্রহে কান পেতে

থাকে। ছ'টা বেজে দশ মিনিট। মেজর মহাশয়ের মনে হ'ল দূরে যেন গাড়ীর চাকার শব্দ শোনা গেল। তার মুখে ঐ কথা শোনামাত্রই সবাই অমনি হুড়মুড় করে জানালার কাছে ভিড় করল। অচিরেই বিশালায়তন ঘোড়ার গাড়ী-খানা ঘড়ঘড় শব্দে সেই প্রাসাদ দুর্গের ফটক দিয়ে প্রবেশ করল। পথের কাদা-মাটি ঘোড়াগুলির অঙ্গে লিপ্ত, তাদের মসৃণ অঙ্গ হতে বাষ্প বেরুচ্ছে—তারা হাঁপাচ্ছে।

পাঁচটি মেয়েছেলে—সুঠাম সুন্দর চেহারা—গাড়ী থেকে নেমে এল। বেশ দেখেশুনে বাজিয়েই ক্যাপ্টেনের এক বন্ধু এই মেয়ে পাঁচটিকে নির্বাচন করেছিল।

এখানে আসা নিয়ে তারা কোন ওজর-আপত্তি করে নি। মোটা আয়ের দিকে চেয়ে কেই বা আপত্তি করতে পারে। এই তিন মাস ধরে প্রুসিয়ানদের চিনতে তাদের আর বাকী নেই। সমস্ত গ্লানিকর অবস্থাগুলিকে তারা যেমন সয়ে এসেছে এদের আবদার অত্যাচার-গুলিও তাদের সইতে হয়েছে এবং সইতে হবে। গাড়ীতে তাদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনাই ছিল ত' এই। শুধু-মাত্র ত' এই এক রাত্রি এইভাবে তারা তাদের বিবেককে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

সোজা ভোজনকক্ষের দিকে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। চারিদিকে ঝলমল আলো—মনমাতানো দৃশ্য। ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ। মনটা অস্বাভাবিকভাবে পীড়িত হয়। টেবিলের উপর ভোজ্যদ্রব্যের পাহাড় বহুমূল্য চীনামাটি ও রূপোর তৈজসপত্র। তাদের প্রাচীর-গর্ভে লুক্কায়িত স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। যেন একটি দস্যুদলের আড়ম্বর। লুণ্ঠনকরা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে এইবার ভোজপর্বের সুরু হবে।

ক্যাপ্টেনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। সে যে এ বিষয়ে ঝানু, পাকাপোক্ত সে বিষয়ে তার যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় আছে। তাইত মেয়েদের ভার সে নিজেই নিয়েছে। তারা কে কি রকম—কার বাজারদর কত—পণ্যদ্রব্যের মত সে সবই যাচাই করে দেখছিল। তিনজন তরুণ অফিসারের মেয়েদের মধ্যে তিন জনকে বড়ই পছন্দ। তারা তাদের নিতে চাইল। ক্যাপ্টেন দৃঢ়তার সাথে তাদের বাধা দিল। সামরিক পদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব অনুযায়ী মেয়ে বণ্টন করতে হবে—এই তার ব্যবস্থা বিধি।

বিচার বিতর্ক আলোচনা, পক্ষ-পাতিত্বের সন্দেহের কোন অবকাশ না দিয়ে সবচেয়ে লম্বা পটকা মেয়েটিকে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম।'

জোরে ঝাঁজাল কণ্ঠে উত্তর এল, 'পামেলা।'

অমনি ঘোষিত হ'ল, 'এক নম্বর যার নাম পামেলা তাকে কমাণ্ডিং অফি-সারের ভাগে দেওয়া হল।'

দ্বিতীয় নম্বর বুণ্ডিনকে সে অবশ্য নিজের ভাগেই রেখে দিল। মোটা 'আমান্দা'কে সে লেফটানেণ্ট অটোর ভাগে দিল। তারপর লাল টমাটোর মত চেহারা 'ইভা'কে দ্বিতীয় লেফটেনেণ্ট ফ্রিজকে দিল। তারপর 'র‍্যাচেল'। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, বেঁটে চেহারা, রংটা একটু ময়লা। চোখদুটি তার কয়লার মত কালো। থ্যাবড়া নাক অথচ জাতে ইহুদী। ভগবানের সব-চেয়ে প্রিয় সেরা জাতির যে বড়শীর মত বাঁকা নাক—এই বিচারে সে ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সবচেয়ে বয়সে ছোট অফিসর ছিলেন মার্কুই উইলহেল্ম ভন আইরিক। সেই ছিপছিপে গড়ন অফিসারের ভাগে পড়ল 'র‍্যাচেল'।

তরুণ অফিসার তিনজন তাদের জুটির মেয়েদের নিয়ে তক্ষুণি দোতলায় যেতে চাইল—পথশ্রম দূর করার জন্য ওদের সাবান বাস ইত্যাদি দিয়ে স্নান করান দরকার—এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিচক্ষণ ক্যাপ্টেন এ বিষয়ে তাদের অনুমতি দিল না। তার মতে ওরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে যারা উপরে গিয়ে আবার ফিরে আসবে তাদের নিজেদের জুটি বদলাবার ইচ্ছে হবে। তা হলে এই নির্বাচনটাই মাটি হয়ে যাবে এ বিষয়ে তার ঝানু অভিজ্ঞতার কাছে তারা হার স্বীকার করল। তারা তার ব্যবস্থাই মেনে নিল।

হঠাৎ র‍্যাচেলের দম বন্ধ হ'য়ে এল, খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে নাক থেকে একরাশ ধূয়া ফুঁ দিয়ে তাড়াতে তাড়াতে সে চীৎকার করে উঠল। মার্কুই আদর করবার অছিলায় তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে একমুখ সিগারের ধূয়া তার মুখের উপর ছেড়ে দিয়েছিল।

কোন প্রতিবাদ না করে এবং কোন কথা না বলে র‍্যাচেল তার কাল চোখের কোণ দিয়ে শুধু একটু ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করেছিল। মেজর মশায় পর্যন্ত ওদের নিয়ে বেশ মজা করছিল। তার ডানে পামেলা এবং বাঁয়ে বুণ্ডিনকে বসিয়ে খাবার তোয়ালেখানা বুকের সামনে সাজিয়ে সে বলে উঠল, 'ক্যাপ্টেন কেলুইঙ্গস্টাইন বলিহারি তোমার বুদ্ধি—কী চমৎকার তোমার ব্যবস্থা।'

লেফটানেণ্ট অটো ও ফ্রিজ ছিল. ভদ্র আদবকায়দায় চালচলন দুরস্ত। তাদের জুটি দুটিকে এ দিয়ে তারা প্রায় নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। কিন্তু ব্যারন কেলুইঙ্গস্টাইন নারীঘটিত. ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকার জন্য একাই আসরটাকে জমজমাট রেখেছিল, ক্রমাগত তার মুখ দিয়ে অশ্লীল কথা বেরুচ্ছিল। লাল চুলওয়ালা মাথাটা তার মশালের মত দেখাচ্ছিল। সেই মশালের আলোয় তার মুখখানি উদ্ভাসিত। ভাঙা ভাঙা ফরাসী ভাষায় সে প্রেম নিবেদন করছিল। তার দুটো দাঁত যেখানে নেই সেই ফাঁক দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দে কথাগুলি বেরুচ্ছিল—আর কথার সাথে থুথুগুলি ছিটকে ছিটকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

যা হোক মেয়েরা ওর কথার একবর্ণও বোঝে নাই তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। ওর অশ্লীল ইয়ারকি ঠাট্টা তামাসার অর্থ মেয়েরা শুধু আন্দাজ করেই হাসাহাসি কচ্ছিল। প্রথম মদের বোতল কয়টির নেশা যখন তাদের মগজকে আচ্ছন্ন করল তখন মেয়েরাও চলে চলে পড়ে অশ্লীল গান সুরু করল—তারপর সুরু হ'ল চলাচলি, চিমটি কাটা, চীৎকার ইত্যাদি। যে বারটা

পারে এইভাবে মদের গ্লাস ক'টি তারা কাড়াকাড়ি করে পান করা আরম্ভ করল। ফরাসী এবং জার্মান গানের দুই এক কলি তারা মদবিহ্বলকণ্ঠে গেয়ে চলেছিল।

বীরপুঙ্গব কাঁও বাদ ছিল না। তারাও মদের নেশায় মশগুল। একত্র এতগুলি কাঁচাবয়সের মেয়েছেলে সামনে দেখে তারাও মাতলামো করা সুরু করল। প্লেট গ্লাস ছোড়াছুড়ি চলল, সব কিছু তাদের দাপটে চুরমার। নির্লিপ্তভাবে পরিচারক সৈনিকরা কাঠের পুতুলের মত তাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা শুধু দেখে যাচ্ছিল।

শুধু মেজর মহাশয়ই একটু ধাতস্থ ছিল। ভদ্রমহোদয়া ফিফি র‍্যাচেলকে নিয়ে মজা কচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাকে এত জোরে চিমটি কাটছিল যে সে বেচারী থেকে থেকে ব্যথায় চীৎকার করে উঠছিল। হঠাৎ সে তাকে এমন, ভাবে কামড়ে দিল যে মেয়েটির চিবুক বেয়ে রক্ত পড়ে তার ফ্রকটা ভাসিয়ে দিল।

মেয়েটির চোখে ক্রুদ্ধ চাহনি। বলে উঠল, 'এর জন্য তোমাকে ভুগতে হবে বলে দিচ্ছি।'

নির্মম হাসির সাথে সে বলল, 'ভুগতে আমি রাজী আছি।'

তারপর 'স্যাম্পেন মদ্যপানের পালা এল। সম্রাজ্ঞী অগাস্টোর সম্মানার্থে যেমন শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্য সহকারে সম্রাজ্ঞীর স্বাস্থ্যপান করা হ'ত মেজর তার আসন ছেড়ে ততোধিক সম্মান ও গাম্ভীর্য সহকারে ঐ সব মেয়েদের লক্ষ্য করে বলল, 'চলুন আমরা এদের সম্মানার্থে এদের স্বাস্থ্য কামনা করে মদের পিয়ালায় চুমুক দিই।' পর পর কয়েকবার ক্রমাগত এইরূপ চলল। বিশ্রী তামাসা, অশ্লীল-কথাবার্তা ইত্যাদি সুরামত্ত অফিসার-দের মুখ থেকে হরদম বেরুতে লাগল। তখন তারা একজনের পর একজন আসর ছেড়ে উঠতে লাগল। মেয়েরা এত অধিকমাত্রায় মদ খেয়েছিল যে তারা দাঁড়াতে পাচ্ছিল না। দৃষ্টি তাদের ঘোলাটে, ঠোঁটগুলি নেশায় জড়িত---মুখে কথা আটকে যাচ্ছিল। পুরুষদের আনন্দধ্বনিকে তারা জোরে জোরে বাহবা দিতে লাগল।

ক্যাপ্টেন তাদের জয়ধ্বনিকে বীররসে সিঞ্চিত করবার জন্য বলে উঠল, 'আমরা এবার হৃদয় জয় করার সাফল্যের আনন্দে আসুন আর একগ্লাস পান করি।'

রীতিমত যেন কৃষ্ণ অরণ্যানীর একটি ভল্লুক এইভাবে লেফটানেণ্ট ভটো টলতে টলতে বিরাট ভল্লুকের মতই খাড়া হলেন—তারপর সুরাজনিত স্বদেশ-প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, 'ফরাসী দেশ জয়ের গৌরবের খাতিরে আর একগ্লাস চলুক!

মেয়েরা এত অধিক সুরাপান করেছিল যে তারা এই কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহসা পেরে উঠল না।' র‍্যাচেল তখন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল, দেখুন, আমি এমন কিছুসংখ্যক ফরাসী ব্যক্তিকে জানি, যাদের সামনে এমন উক্তি করতে আপনাদের সাহসে কুলাত না।'

তার পাশে বসে ক্ষুদে মার্কুই মত্ত আনন্দে হো-হো করে হেসে উঠল, 'তা হতে পারে, অসম্ভব কিছুই না কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সাথে আমাদের কোন সাক্ষাৎই হয়নি।---আমরা আসামাত্রই তারা সটকে পড়েছে।'

মেয়েটি ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় ফোঁস করে বলে উঠল, 'তুমি একটা পাজী মিথ্যুক।'

যেমন করে সে দেয়ালের প্রতি-কৃতিগুলির দিকে চাইত যখন ক্যান-ভাসের পটে আঁকা ছবিগুলি তার গুলীতে ঝাঁজরা হ'য়ে যেত--- ঠিক সেই ভাবে ক্রুদ্ধ নীল চাহনী দিয়ে শুধু এক সেকেণ্ড সে মেয়েটার দিকে ক্রুরদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপর হো-হো করে তার হাসি চলল। বলল, 'সখি, চল বিষয়টি আমরা বিস্তারিতভাবে আলো-চনা করি---যুদ্ধই যদি ওরা করতে পারত—তাহলে কি আমরা এখানে এগুতে পারতাম।' তারপর আবার গম্ভীরভাবে বলে চলল, 'আমরা এখন তাদের প্রভু, ফ্রান্স এখন আমাদের পদানত।'

মেয়েটি লাফ দিয়ে তার পাশ থেকে উঠে গিয়ে নিজের আসনে গিয়ে মুষড়ে পড়ল। তার যেন মূর্চ্ছার মত ভাব হল। মার্কুই উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'ফ্রান্স, তার সমস্ত অধিবাসী, তার বিশাল মাঠ প্রান্তর নদী নালা পাহাড় পর্বত তার বাড়ীঘর সব এখন আমাদের অধিকারে।'

পাশবিক আনন্দে পানোন্মত্ত আর সব সৈনিক ও অফিসারগণ চীৎকার করে উঠল। 'প্রুসিয়া দীর্ঘজীবী হউক,' আর একচুমুকে আর একগ্লাস শেষ করল।

মেয়েদের পক্ষ হ'তে কোন প্রতি-বাদ এল না---তারা তখন ভীত, সন্ত্রস্ত ও বাক্‌শক্তিরহিত। এমন কি র‍্যাচেলও কিছু বলতে পারল না তার বলবারই বা আর কি ছিল।

ক্ষুদে মার্কুই তারপর স্যাম্পেনের গ্লাসটি ভরতি করে ইহুদী মেয়েটির মাথার উপর ভারসাম্য বজায় রেখে বসিয়ে বলে উঠল, 'ফ্রান্সের সমস্ত মহিলাই এখন আমাদের সম্পত্তি---আমরা তাদের নিয়ে যা খুশী করতে পারি।'

র‍্যাচেল লাফ দিয়ে উঠল ---গ্লাসটি মাথার উপর কাত হয়ে পড়ে গিয়ে সমস্ত সোনালী মদ খৃস্টধর্মীয়করণের পবিত্র বারির ন্যায় মেয়েটির কালো চুল দিয়ে এবং গা বেয়ে পড়তে লাগল---গ্লাসটিও মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। ক্রোধে ও আবেগে ঠোঁট দুটি তার কাঁপছে, মুখে কথা বেরুচ্ছে না। অফিসারটি হো হো করে হেসে উঠল। মেয়েটি ক্রোধকম্পিত স্বরে জড়িত-ভাবে বলে উঠল, 'মিথ্যাকথা! ভগবান জানেন ফরাসী মহিলাদের আপনারা জয় করতে পারেন নি।'

যেন ভাল করে বসে অনেকক্ষণ হাসবার জন্য অফিসারটি বসে পড়ল ---তারপর বলে উঠল, 'ভাল, খুব ভাল সখি, তাহলে জিজ্ঞেস করি, মহাশয়ার এখানে কি করে আগমন হ'ল?'
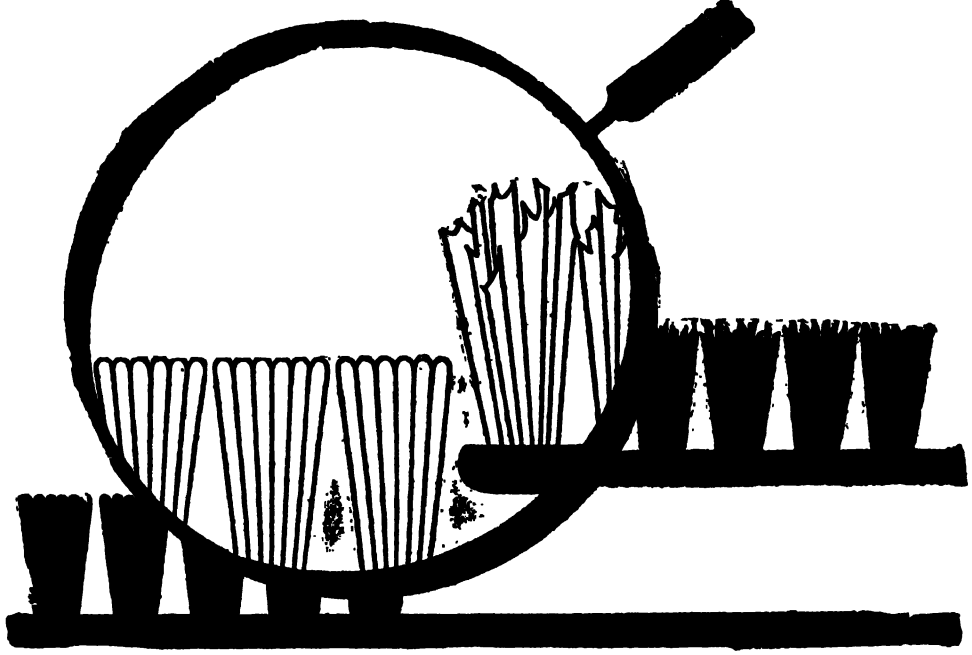
মেয়েটির মস্তিষ্ক সুরার প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল---কিছু বুঝতে না পেরে সে ক্ষণিকের জন্য চুপ করে রইল। তারপর কথাটির তাৎপর্য যেই বুঝতে পারল তখন তীব্র প্রতিবাদে ও আক্রোশে বলে উঠল, 'আমি---আমি ---আমি ত' ভদ্রমহিলা নই---আমি একটি ভ্রষ্টা, একটি পতিতা, একটি বারবনিতা---অবশ্য আপনাদের ন্যায় প্রুশিয়ানদের পক্ষে এরাই যথেষ্ট, এরাই মানানসই।

কথাটি তার মুখ থেকে বের হ'বার সাথে সাথেই অফিসারটি তার মুখে কষে একচড় লাগিয়ে দিল এবং আবার যখন আর একটি চড় মারতে উদ্যত হ'ল, তখন মেয়েটি টেবিলের উপর থেকে একটা রূপোর রুটিকাটা ছুরি তুলে অফিসারটির কণ্ঠে আমূল বিঁধিয়ে দিল।

অফিসারের মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেল। বড় বড় চোখ দুটি তার বিস্ফারিত হয়ে মুখটা হাঁ হয়ে কড়ি-কাঠের দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করে পড়ে রইল।

অমনি চারিদিকে তুমুল সোর-গোল। লেফটেন্যাণ্ট অটো যেই মেয়েটিকে ধরতে যাচ্ছে অমনি একখানা চেয়ার মেয়েটি তার পা দুটোর ফাঁকে ঠেলে দিতেই অটো মহাশয় মুখ থুবড়ে চিৎপাত হ'য়ে পড়ে গেল---আর মেয়েটি ধরা পড়বার পূর্বেই জানালার কাছে ছুটে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই লাফ দিয়ে নীচে পড়ে পালিয়ে গেল।

দু মিনিটের মধ্যেই 'ম্যাডমোয়া-জেল ফিফি' মারা গেল। ফ্রিজ ও অটো তাদের তরবারি নিষ্কোষিত ক'রে অন্যান্য মেয়েদের কেটে ফেলতে চাইল। তারা কাকুতি মিনতি কচ্ছিল।

এই হত্যাকাণ্ড রোধ করতে মেজর মশাইকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সে তখন বাকী মেয়ে ক'টিকে দুজন সৈনিকের পাহারায় এক কুঠুরীতে বন্দী করে রাখল। তারপর সামান্য একটা পলাতকা মেয়েকে ধরবার জন্য সে তার বিরাট ফৌজকে চারিদিকে পাঠালে---এমন একটা ভাব নিলে যেন সে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা কচ্ছে। তার বিশ্বাস ছিল মেয়েটি নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

কমপক্ষে পঞ্চাশজন সৈনিক সেই অঞ্চলটিকে চষে, ভয় দেখিয়ে, শাসিয়ে মেয়েটির অনুসন্ধান করতে লাগল; আরও দু-শজন লোক আশেপাশের বনজঙ্গল এবং বাড়ীঘর তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল।

ডাইনিং টেবিলটি তখনই পরিষ্কার করা হল। মৃতদেহটি তার উপর শায়িত করা হল। অফিসার চতুষ্টয় জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে অন্ধকারের মাঝে এদিক ওদিক বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কর্তব্যরত সৈনিকের ন্যায় খোঁজাখুঁজি করতে লাগল, যদি ওখানে কোথাও মেয়েটি গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা ---তারপর আর একটা ---ক্রমে ক্রমে এইরূপ চারটি পর পর গুলীর আওয়াজ শোনা গেল---দূরে সৈন্যদের কোলাহলও শোনা যাচ্ছিল। তাদের সাঙ্কেতিক ধ্বনিও শোনা গেল।

ভোর হ'ল। সমস্ত সৈনিকই ফিরে এল। তাদের গতরাত্রির গুলীতে নিজেদের মধ্যেই দুজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছিল---অন্ধকারে কেউ কাউকে চিনতে পারেনি।

র‍্যাচেলকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারপর সুরু হ'ল কড়া শাসন। চারিদিকে ফরাসীদের লোকালয়গুলি তন্ন তন্ন করে বার বার খোঁজা হল। তারপর অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার, নিপীড়ন আরম্ভ হ'ল। কিন্তু ইহুদী মেয়েটি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে বলে মনে হ'ল।

ব্যাপারটি প্রধান সমরাধিনায়ক মহাশয়ের কর্ণগোচর হওয়াতে সমস্ত বিষয় বেমালুম চেপে যাওয়ার আদেশ এল। বেশী জানাজানি হ'লে সমগ্র সৈন্য-দলের মধ্যে একটি জঘন্য দৃষ্টান্ত ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিতে পারে এই ভয়ে সব চেপে দেওয়া হল। মেজরের বিরুদ্ধে অনাচারের অভিযোগ আনয়ন ও শাস্তিমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করা হ'ল। জেনারেল মহাশয় বললেন, 'শুধুমাত্র ভ্রষ্টা, পতিতা স্ত্রীলোকদের সাথে প্রেম করবার জন্যই কোন দেশের বিরুদ্ধে অন্য কোন দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয় না।'

তখন গ্রাফ ভন্ ফার্লসবার্গ আক্রো-শের বশবর্তী হ'য়ে স্থানীয় জন-সাধারণের উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ-পরিকর হ'ল। তার এই কড়া আইন কানুনের যেন একটা অজুহাত চাই---এই জন্য সে গীর্জার ধর্মযাজককে ডাকালে এবং মার্কুই ভন্ আইরিকের শবযাত্রায় ও শেষকৃত্যে গীর্জার ঘণ্টা বাজাতে হবে,এই আদেশ দিলে।

তারপর এক আশ্চর্যের বিষয় দেখা দিল। যাজক মহাশয়ের দিক থেকে এবার কোন প্রতিবাদ, কোন ওজর আপত্তিই এল না। তিনি অবনত মস্তকে এই আদেশ পালন করতে স্বীকৃত হ'লেন। সৈন্যরা যখন ম্যাডমোয়াজেল ফিফির মৃতদেহ সমাধিক্ষেত্রের দিকে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, কফিনের চার পাশে টোটাভর্তি রাইফেলের মাথাগুলি যখন গর্বের সাথে চারিদিক উপেক্ষা করে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই প্রথমবার গীর্জার ঘণ্টা অসীম আনন্দ ও আগ্রহের সাথে পরপারের যাত্রার ধ্বনি বাজাতে লাগল---এত স্ফূর্তির সাথে সেটা বাজছিল যে মনে হচ্ছিল যেন কোন বন্ধু, কোন প্রিয়জন আদরের সাথে তার পিঠ চাপড়াচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলায় আবার ওটা বেজে উঠল---তার পরদিন---তার পরদিনও এবং প্রতিদিনই বাজনাটা বেজে বেজে যেন নিজের কৃতিত্বই আপন মনে উপভোগ কচ্ছিল। এমন কি গভীর নিশীথেও ওটা কখনও কখনও আপনা হ'তেই বেজে উঠত। দু তিনটে কোমল সুর অন্ধকারের বুকে চমক লাগাত। কোন এক রহস্যময় কৌতুক বক্ষে ধারণ করে ও যেন আচমকা জেগে উঠত---আত্মতৃপ্তির আনন্দে ও যেন প্রলাপ বকে যেত।

চাষী-মজুররা মনে করত ওটাকে ডাইনীতে পেয়েছে, ডাইনী তো বটেই। শুধুমাত্র ধর্মযাজক ও ঘণ্টাবাদক মহাশয় ছাড়া ওর কাছে কেউ যেতে সাহস পেত না। সত্যকথা বলতে কি এক দরিদ্রা বারবনিতা ঐ গীর্জার চূড়ে বাস করত। একটা কোন অজানা আতঙ্কে সে ওখানে নির্জনে থাকত আর পূর্বোক্ত ভদ্রলোকদ্বয় তার খাবার সেখানে দিয়ে আসত।

জার্মানরা ঐ এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে ওখানেই ছিল। তারপর এক সন্ধ্যাবেলা। যাজক মহাশয় গাঁয়ের রুটিওয়ালার কাছ থেকে তার ঘোড়ার গাড়ীটা চেয়ে নিল। নিজে গাড়ী চালিয়ে এই বন্দিনী রাজকন্যাকে রুঁয়ে নগরীর ফটক পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এল। বিদায়ের সময় যাজক মহাপ্রভু এই পতিতা নারীরই করচুম্বন করল; মেয়েটি গাড়ী থেকে নেমে হন হন্ করে তার পুরানো পতিতালয়ে চলে গেল। পতিতালয়ের মালিক তাঁকে কিন্তু মৃতা বলেই ধরে রেখেছিলো---সে যে আবার ফিরে আসবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

কিছুদিন পরে স্বদেশপ্রেমিক এক তরুণের সাথে মেয়েটির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল। তরুণটির মনে কোন অন্ধ কুসংস্কার ছিল না---সে মেয়েটির দুঃসাহসের কীর্তিটির জন্য ওকে ভালবাসত; তারপর শুধু মেয়েটির খাতিরেই সে তাকে ছাড়া আর থাকতে পারত না। অবশেষে বিবাহবন্ধনে তারা দুজন আবদ্ধ হ'ল। অন্যান্য অনেক সতী-সাবিত্রী স্ত্রীলোকের ন্যায় মেয়েটিও সুন্দরী সতীলক্ষ্মী গৃহিনী হ'য়ে উঠল। তরুণটির মহানুভবতা মেয়েটিকে পৃথিবীর পঙ্কিল পথ থেকে তুলে এনে সমাজে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করল।

অনুবাদক—নৃপেন্দ্রকুমার মৌলিক

হরিদ্বারে অর্ধকুম্ভ

শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অহরহ করি প্রতিগ্রহ,
কী দেব তোমায়!
মনের প্রস্তাব বহু,
রসিকা বুদ্ধি কিন্তু হাসে মৃদু মৃদু—
মাথা নাড়ে চোখ দুটি বুজে,
কিছুই পায় না খুঁজে,
শুধু অন্ধকার,
অমানিশায় যেন শ্রেণীবদ্ধ ঝাউয়ের বাহার।

অথচ ধুলোর গন্ধ
প্রবল বাতাসে,
ধ্যানালোক স্বল্পান্ধ আকাশে!
কী হবে উপায়?

দেখতে শুনতে গেলাম হরিদ্বারে
অর্ধকুম্ভের
যুদ্ধ যত সুরাসুর শুম্ভ নিশুম্ভের।
কিন্তু কি আশ্চর্য! অমন বিশাল জনতা,
কোলাহলেও কহিল না একটিও কথা।

সব ভিড় মিলেমিশে একটি নরম পেন্সিল
এঁকে অর্ধমাত্রা নির্জন বিন্দু এক
স্তব্ধ ক্যানভাসে;
তারই যেন অসংখ্য স্টেনসিল
তরঙ্গে তরঙ্গে আর ফেনায় ফেনায়—
মহাসিন্ধু হাসে!
কিন্তু পরে তাও গেল মুছে।
তখন পাই না আর খুঁজে
কোনও পাপপুণ্য—
নীরন্ধ্র অন্ধকার—শূন্য, মহাশূন্য।

অবশেষে তাই
স্নান করে নিলাম গঙ্গায়
ব্রহ্মকুণ্ডে হল না যাওয়াই।

পিতামাতার জ্ঞাতব্য যৌনজ্ঞান

যৌন-ঘনিষ্ঠতার সময় যে ছেলে-মেয়েদের সতর্কতার সংগে দূরে রাখা উচিত, কোনও বাপ-মাকেই তা বলা অপ্রয়োজন। সভ্যসমাজে মিলন স্থানের গোপনীয়তা রক্ষার প্রথা এত দৃঢ়মূল যে দুর্ঘটনা ছাড়া ছোটদের পক্ষে এ সময় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব।

তবে এ ধরণের ঘটনা আদৌ ঘটে না তা নয় এবং মনস্তত্ত্ববিদরা কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর যৌন-অসংলগ্নতার হেতু হিসেবে পিতামাতার মিলনকালে দৈবাৎ উপস্থিত থাকার উল্লেখ করেছেন।

অপর পক্ষে, একাধিক ভিন্ন সংস্কৃতি-সম্পন্ন সমাজে বাপ-মা এ ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ মানেন না; অথচ যে সব শিশুরা এইসব দেখে, শোনে এবং অনুকরণ করে তাদের ওপর পরে কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয় না। এ অবস্থা অত্যন্ত গরিবের ঘরেও হওয়া সম্ভব—সেখানে অত্যল্প মাত্রাধিক ঘেঁষাঘেঁষি। সকলে দিন কাটান গায়ে গা লাগিয়ে।

এই বিপরীত ফলাফল ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশজ অর্থাৎ চিরায়ত প্রথা, নিয়ম, বিধিনিষেধ ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের সমাজেও প্রতিক্রিয়া সব পরিবারে একরকম না হওয়ার কারণ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

দৈবাৎ দেখা বাবা-মার ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য মনের ওপর কোনও ছাপ রেখে যাবে কি না তা পারিবারিক পরিবেশ-নির্ভর। দেখছে যে শিশু তার বয়স আলোচনা করলেই এই বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যাবে।

খুব শৈশবে এ ভয়শূন্য। যে কোন কারণে হোক না কেন, ঘুম ভাঙলে এবং তক্ষুণি ঘুমোতে না পেলে শিশু অস্বস্তি বোধ করে। তখন কিছুই সে বোঝে না। বয়স বাড়ার সংগে সংগে অবস্থা পাল্টায়। বছর চারেকের ছেলের চোখে বাপ-মার নিবিড় আলিংগন ঝগড়াসূচক মনে হওয়া বিচিত্র নয়। ঐ অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে এবং অশ্রুত-পূর্ব শব্দ শুনে সে হয়ত খুব ভীত হয়ে উঠতে পারে। অথচ, তখন তাদের কাছ থেকে স্বাভাবিক সান্ত্বনা লাভ তার বরাতে জোটে না।

এ সত্ত্বেও, প্রণয়পূর্ণ সমাদরের বদলে বাবা-মা তখন উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যভিযোগ করলে সম্ভবত তার ফল শিশুমনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত না।

এর কিছুদিন পরে সে যখন যৌন ব্যাপারে কিছু কিছু শেখে, বুঝতে পারে যৌন সুখলাভের পথে বাধা বিস্তর, তখন হয়ত সে তার বাবা-মা এই নিষিদ্ধ ক্রিয়াসক্ত কি না জানার জন্য খুব উৎসুক হয়ে উঠতে পারে।

এই জ্ঞান যদি নিছক আন্দাজ আর এঁচোড়ে পাকা ছোকরাদের প্রদত্ত খবরনির্ভর হয়ত তার পক্ষে রাত জেগে বাবা-মার দৈহিক ঘনিষ্ঠতা বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত গড়ান সম্ভব। ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ, চাপা হাসির শব্দ, পাশ ফেরার আওয়াজ—সব মিলে তার উত্তেজনা হওয়াও অসম্ভব নয়। ফলে তার পক্ষে হস্তমৈথুনাসক্তি সম্ভব এবং ফলস্বরূপ—বিশেষত বাবা-মার কাজকে যদি সে স্বপ্নে দেখে ত'—অপরাধবোধও গড়ে ওঠে।

এই অবস্থায় বাড়ির যৌন-পরিবেশ অত্যন্ত মূল্যবান। যদি 'যৌনতা' নিন্দিত হয়—নোংরা কাজ হিসেবে ত' সেই কাজে লিপ্ত বাবা-মাকে সন্তান ভণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করবে। তাদের দেওয়া নৈতিক উপদেশ তখন আগাগোড়া মিথ্যা পরিণত হয়। এতদিন শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুণের যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল তা বিবর্ণ হয়ে ওঠে এবং যেহেতু এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণামুক্তি অপরিণত মনে বিভ্রান্তি ঘটাতে বাধ্য, সে জন্য এই হতাশা শিশুমনে এমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে যার সংক্ষোভজ ফলাফল গুরুতর।

এতক্ষণে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে সত্য আর ভাণের মধ্যেকার পার্থক্যই এই গণ্ডগোলের মূলে। সাজান পৃথিবী হঠাৎ বাস্তবতার অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ। কিন্তু শিশুকে ঐ কাচের স্বর্গে বাস করানোর দায়িত্ব বাবা-মার।

যে সব পরিবারে যৌনতা স্বাভাবিক প্রবণতার মর্যাদা প্রাপ্ত সেখানে এই ভয় প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু তাই বলে আদৌ নেই তা নয়। যখনই, যেখানেই হোক না কেন, কোন শিশু অন্য একজন ভাই বা বোনের তুলনায় কম ভালবাসা পাচ্ছে মনে করি, অথবা অন্য কোনও সংক্ষোভজ দ্বন্দ্বে ভোগে, বাবা-মার

যৌনক্রিয়া তার মনে অধিকতর জটিলতা সৃষ্টি ক'রে থাকে।

বাবা-মার সংগে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সম্পর্ক না থাকায় এই শিশুদের নিউরটিক প্রতিক্রিয়ার শিকার হওয়া অসম্ভব নয়; ঐ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তা এ যাবৎ মানসিক স্থৈর্যরক্ষাকারী বাঁধ ভেঙে দিতে সক্ষম।

ফলে, একটি মিষ্ট স্বভাবের বাধ্য ছেলে হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। তার বিদ্রোহের ধরণ পারিবারিক আবহাওয়া-নির্ভর। যৌনতা চরম নিন্দার্হ যে বাড়িতে, সেখানে সে বাবা-মাকে ঘৃণা করবে, কারণ তারা ঐ 'নিন্দনীয়' ক্রিয়াসক্ত।

কেউ কেউ এতকাল যে সব নিয়ম মেনে এসেছে সে সব উড়িয়ে দেয়। তারা তখন অবাধ্য এবং দুর্বিনীত; তাদের ঘৃণা রূপ পায় বাপ-মাকে ঠকান, মিথ্যা-ভাষণ, চুরি ইত্যাদির মধ্যে। অন্যরা যৌন-ক্রিয়ার বাধানিষেধ পায়ে দলে অন্যদের প্রলুব্ধ করে সদ্যলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়।

প্রায়ই শিশুরা দৃষ্ট দৃশ্যটিকে মা-র আনুগত্যর অভাব হিসেবে চিহ্নিত করে। কী হচ্ছে বুঝতে পারে, অ-পরিচিত আলোড়ন তাই এমন একটা খেলা ভাবে যা থেকে তাদের অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে।

শিশুর কাছে এটি বিশেষ খাতির হারানর তুল্য। হয়ত সে বন্ধ দরজায় ইচ্ছাপূর্বক আঘাত ক'রে নিজের প্রতিবাদ জানায়। আবার, তার মনে প্রবল ভয় জন্মানও বিচিত্র নয় এবং প্রতিকার হল সর্বদা বাবা-মার ঘরে তার অবাধ প্রবেশাধিকার।

এ-ধরণের বহু শিশু হিংসায় ঘুমোতে অক্ষম। ফলে তারা সান্ত্বনা খোঁজে। তারা তখন কাঁদতে কাঁদতে বাবা-মার কাছে এসে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে তাদের পাশে শুতে চায়। মিলনের ফল জানে অথচ ভাই-বোন চায় না এমন শিশুদের অনিদ্রা রোগ হয়। তারা বাবা-মার নির্জনতা ভঙ্গ ক'রে এই বিপদ রোধ করতে চেষ্টা করে।

মনে রেখো দরকার যে তিন থেকে দু' বছরের শিশু বাবা-মার যৌনক্রিয়ার দৃশ্য দেখলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বয়স্ক শিশুরাও এ-জাতীয় দৃশ্য দেখলে যে আঘাত পায় তা তাদের চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তারী।

বিশেষত যে বালিকারা মাকে মনে করে বিশুদ্ধতার আদর্শ তাদের মনে বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া আসা খুবই সম্ভব। এই স্বপ্নভংগের প্রতিশোধ তারা পুরুষ-দের সংগে যৌন ব্যাপারে উদারতার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে।

প্রকৃতপক্ষে দাবী করা হয় অবৈধ মাতৃত্বের মূলে এই কারণটি সক্রিয়।

আবার, বাবা-মার গাম্ভীর্য আর জাপ্‌টাজাপ্‌টির অসাম্য যাদের মনে হিংসার ইঙ্গিতবহ, তারা যৌন ব্যাপারে ভীত হয়ে উঠতে পারে, নারীজনোচিত ভূমিকার প্রতি অনীহা জন্মানও অসম্ভব নয়।

দু' ক্ষেত্রেই অসুবিধা ঘটতে পারে; মেয়েটি ভবিষ্যতে হয়ত বিয়েই করবে না, বা চাইবে পুরুষালী ভূমিকা নিতে, কিংবা যৌনতৃপ্তি খুঁজবে সম-কামের আশ্রয়ে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণা কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরুষের ধর্ষকামী মানসিকতার মূলে সক্রিয়।

একথা ঠিকই যে এই ধরণের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া নিউরটিক প্রতিক্রিয়ামুখী শিশু মনেই হয়, তবুও বাবা-মার অবশ্য বোঝা দরকার, আগেভাগে ঐ মানসিকতা টের পাওয়া খুবই শক্ত।

যে-ক্ষেত্রে বাবা-মা এবং সন্তানের সম্পর্ক মমতাময়, অথচ তীব্র ভাবাবেগ-তাড়িত নয়, সে ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা কম, কিন্তু সন্তানের সব অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করা বাবা-মার সাধ্যাতীত।

বাবা-মার স্নেহসিক্ত প্রাক্-কৈশোরে মাত্রানুযায়ী বয়স্কদের যৌন ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানযুক্ত, বালক তাদের মিলন দেখলে অগম্যাগমনের স্বপ্নে শিউরে ক্রমে অপরাধীর মনোভাব গড়ে তোলে; মনমরা হয়ে যায়, স্কুলের কাজে উৎসাহ পায় না। অথবা সে এমন প্রতিরোধ গড়ে এই অনুভূতির হাত থেকে রেহাই চায় যার ফলে ভয়-ঠাসা, বাধ্যতামূলক এবং অব্‌সেসিভ্ চিহ্ন ফুটে ওঠে।

এই সব অভাবিত কথা স্মরণ রেখে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে শিশুরা, দু'বছর বয়স পেরুলে ত' বটেই, মলমূত্রাদি ত্যাগের জন্য বাবা-মার শোবার ঘরে ঢুকতে না চায়। তাকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে রাখা দরকার, যাতে সে বাবা-মার কোন কিছু শুনতে না পায়, তাদের যৌনক্রিয়া যেন তার চোখে দৈবক্রমেও না পড়ে।

এ সত্ত্বেও যদি সন্তান বাবা-মার যৌন-ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ত' খুব সাবধানতা অপরিহার্য। সন্তান যখন দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদে, তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে এনে শোওয়ান অবশ্যকর্তব্য। রূঢ়তা এক্ষেত্রে [illegible]। মার কাজ তখন সন্তানকে অন্য কোন ব্যাপারে, দুঃখে যেমন সান্ত্বনা দেন, ঠিক তেমনভাবে আদর করা, তার মন থেকে ভয় মুছে ফেলা। কী জন্য সে অস্বস্তি বোধ করছে তা না জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিন্তু সে ঠিক কী দেখেছে তা জানার চেষ্টা ক্ষতিকর।

শিশু যখন কোন ঝগড়াঝাঁটির উল্লেখ করে, তখন তাকে বলা দরকার ব্যাপারটা নিছক মজা বই নয়। বড়রাও খেলেন।

তাকে বোঝান দরকার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না, করা হয়ও নি। তারপর একসময় তাকে বোঝান দরকার অন্যান্য বিবাহিত মানুষদের মত তাঁরাও চুম্বন, আলিংগন, মিলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভালবাসা প্রকাশ করেন।

এই সুযোগে শিশুকে জানান দরকার যৌনতা স্বাভাবিক এবং কয়েকটি বিশেষ নিয়ম-নির্ভর হলেও এটি নোংরা বা অশালীন নয় এবং সে নিজেই যৌন-মিলনের ফসল। বয়সকালে সে নিজেও একইভাবে সন্তানের জনক হবে। সব থেকে বেশি

দরকার তাকে বোঝানো যে বাবা-মার পারস্পরিক ভালবাসার ফলে সে তার পাওনা স্নেহ-ভালবাসা থেকে কোন-ভাবেই বঞ্চিত হবে না।

একটা কথা সব শেষে বলা দরকার: আজও বাবা-মার মিলন দৃশ্যে সন্তানের মনে ঠিক কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি। সুতরাং উত্তরও পরীক্ষামূলক। এর সঠিক জবাব পেতে হলে অসংখ্য পরিবারভুক্ত বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা দরকার।

উৎপাড়ক বলাৎকারী

'বলাৎকার' শব্দটা শোনামাত্র মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে অন্ধকার কানা গলির ছবি, যেখানে এই জাতীয় পুরুষ মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করছে, এমন কি খুনও সুদুর্লভ নয়। বলাৎকারী সব দেশে সব কালে সন্দেহের বস্তু। মানুষ তাকে বা তাদের দেখলে ভয় পায়, ঘৃণাবোধ করে। ধরা পড়লে নিষ্ঠুর শাস্তি তার ন্যায্য পাওনা বলেই সাধারণের ধারণা। আমেরিকায় এর শাস্তি—ষোলটা রাজ্যে—আজীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যু; অন্য সাতাশটায় কুড়ি বছর থেকে আজীবন কারাবাস।

কেবল বলপ্রয়োগেই নয়, সম্মতি নিলেও তা বলাৎকার হতে পারে, যদি সংশ্লিষ্ট মহিলা তখন নেশাচ্ছন্ন থাকেন বা তাঁর মানসিক বিকার প্রমাণিত হয়, কিংবা বয়স যদি হয় আইনের চোখে কম। এই ধরণের কোন বলাৎকারে বলপ্রয়োগ ঘটে না।

সাধারণ মানুষের পক্ষে হিংস্র বলাৎকারীর যৌন-ব্যাপারে বলপ্রয়োগ বুঝে ওঠা কঠিন। কেন না অধিকাংশ মানুষই যৌন-সম্পর্ককালে পারস্পরিক প্রীতি অনুভব করেন, অন্তত একটা বোঝাপড়া ক'রে নেন—যা দৈহিক এবং সংক্ষোভ-তৃপ্তির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এমন কি শিশুপীড়কও পীড়নের আগে আদর করে, ঘুষ দেয়—পয়সা বা মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়ে নাবালক-নাবালিকাকে খুশি করার চেষ্টা করে। যদিও তার বে-আইনী (এবং অ-স্বাভাবিক) কাজ শেষ পর্যন্ত হিংস্রতায় পর্যবসিত হওয়া সম্ভব, সাধারণত ধরা পড়ার ভয় থাকলে আতঙ্কিত হয়ে সে হিংস্র হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে, প্রকৃত হিংস্র বলাৎকারী স্বভাবে হিংস্র এবং প্রায়ই যৌনক্রিয়াকালের ধস্তাধস্তিই তার কাছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, বলপূর্বক বলাৎকার মানেই ধর্ষকাম নয়। বলাৎকারী কর্তৃক প্রযুক্ত শক্তি এ-ক্ষেত্রে বেদনার উৎস—হয় আক্রান্ত মহিলা আতঙ্কে মাংসপেশী শক্ত করার ফলে, না হয়ত যৌনক্রিয়াকালে বেদনাদায়ক ভঙ্গী গ্রহণে বাধ্য হওয়ায় ব্যথা লাগে। কিন্তু ধর্ষকামীর মত বলাৎকারী বলপ্রয়োগ থেকে আনন্দ পায় না। অপরকে যন্ত্রণা দিয়েই ধর্ষকামী আনন্দ লাভ করে।

অনেক ক্ষেত্রে অদম্য সংক্ষোভজ প্রয়োজন থেকে বলাৎকারী বলাৎকারে

প্রাচীন চিত্র—রোমানরা সেবাইন জাতীয় নারীদের দলে দলে বলাৎকার করেছিল

অভ্যস্ত হয়। যত চেষ্টাই সে করুক না কেন, এ-ব্যাপারে সে যুক্তিবোধ কাজে লাগাতে অক্ষম।

এই জাতের মানুষ এক গভীর-মূল মানসিক সমস্যায় ভোগে।

কেউ ভাবে ঐটাই জীবন; তারা যে অন্যথা করতে চেষ্টা করে না তা নয়, কিন্তু সে চেষ্টা প্রায়ই কাজে আসে না। সমাজের চরম বিমুখতাও তাদের বেপরোয়া ক'রে তোলে অনেক ক্ষেত্রে।

সম্ভবত প্রতি ক্ষেত্রে যে গতিশীলতা স্পন্দমান তার স্বরূপ ভিন্ন, কিন্তু অনেকেরই কোন না-কোন ধরণের নারী-দেহের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব বর্তমান, সঙ্গে থাকে পুরুষত্বহীনতার ভয়।

মনে রাখা দরকার অন্যান্য যৌন-বিকারের মত বলাৎকারও প্রতিটি মানুষের মনে গুপ্ত ইম্পালস্-এর বহু-গুণিত প্রকাশ বই নয়। অনেক সামাজিক পুরুষই আক্রমণাত্মক মিলনে বেশি সুখ পান। কিন্তু, তাঁদের মূল তৃপ্তি আসে সঙ্গিনীদের যৌন সাড়া থেকে, তাঁদের দৈহিকভাবে অভিভূত ক'রে ফেলা থেকে নয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলাৎকারী অন্যান্য ব্যাপারে বেশ সামাজিক হতে পারে। পারিবারিক জীবনের জন্য তার ইচ্ছা থাকাও সম্ভব।

সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা এড়াবার জন্য হিংস্র বলাৎকারীকে হয় পুনর্বাসিত করা, না হয় কোনও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে আটক রাখা দরকার। শাস্তি দিলে কোনও লাভ হবে কি না খুব সন্দেহ, কারণ সে ইচ্ছাপূর্বক ঠাণ্ডা মাথায় বলাৎকারে মত্ত হয় না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জেল এক্ষেত্রে কোনও সমাধান হতে পারে না। অথচ ঐটাই এখন পর্যন্ত আপাতভাবে সমাজের একমাত্র আত্মরক্ষার দুর্গ।

বিশেষজ্ঞরাও সঠিক কোনও সমাধান বাৎলে দিতে অক্ষম। মানসিক চিকিৎসা নানা কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। অধিকাংশ মানুষ অত অর্থশালী নন, তারপর রাষ্ট্রও সকলের দায়িত্ব নিতে অপারগ। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা সম্ভব।

দেখা গেছে অধিকাংশ বলাৎকারীর বয়স ত্রিশের নিচে, সুতরাং এদের ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠন অপেক্ষাকৃত সহজ।

এক একটা দলকে একসঙ্গে চিকিৎসা ক'রেও সুফল মিলেছে। যারা এককভাবে কোনও চিকিৎসার সুযোগ পেত না, এই ব্যবস্থার ফলে তারা উপকৃত হচ্ছে। একাধিক জেলে এইভাবে চিকিৎসা চালু হয়েছে। আমেরিকায় চালু এই পদ্ধতি অবশ্য বেশি কাজে আসে না, কারণ এক্ষে ত' খুব বেছে নেওয়া হয়, তার ওপর এত অল্পকাল চিকিৎসা চলে যে তা আজীবনের মানসিক সাম্য ফিরে পাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। অধিকাংশ বলাৎকারী জেলে কঠোর জীবনযাপন অন্তে বাইরে এসে আবার ঐ কাজে লিপ্ত হয়।

সুস্থ বলাৎকারীর সমস্যাও কম নয়। সামাজিকভাবে গৃহীত হওয়াই অন্যতম বিরাট সমস্যা। অবশ্য, বিরাট সহরে তা তেমন জোরালো নয়। কিন্তু ছোটখাট সহর, বা সহরতলী, বা গ্রামে যেখানে সম্পর্ক অনেক পরিমাণে ব্যক্তিগত, এই সমস্যা গুরু-বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে বন্ধু লাভ বা সুস্থ আমোদ-প্রমোদে অংশগ্রহণ সম্ভব নাও হতে পারে। এই সামাজিক অসহযোগিতার ফলে আবার অন্যায় কাজে গা ভাসিয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

এই ক্ষেত্রে সংঘ বা অন্যান্য সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সম্ভব এবং উচিতও বটে। চাকরির ক্ষেত্রেও এরা ভাল সুযোগ পেলে ফলাফল ভাল হয়। আসল কথা, দরকার উৎসাহদান আর কিছুটা বোঝাপড়া। তা থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান অবশ্যম্ভাবী।

—বাৎস্যায়ন

জীবনের স্বাক্ষর

আরতি চন্দ

জীবন কখনো দেখিনি দু'চোখে, তবু জানি বেঁচে আছি
মৃত্যুকে ক'রে ভয় ;
বদ্ধ দেওয়ালে মাথা কুটে মরি, কুরে কুরে খায় বুক
নিদারুণ সংশয়।

এখানে আকাশ নেই তবু দেখি মেঘের পাহাড় ঘিরে
কী যে কালো ছায়া ভাসে,
অন্ধকারের অতল গভীরে কোথা তুমি কোথা আমি ?
কেউ নেই কারো পাশে।

ধূসর হতাশা কুয়াশার মতো ঘিরে আছে চারদিক,
পূর্ণিমা চাঁদ ফিকে ;
মৃত সূর্যের সমাধির পর অমাবস্যার রাতে
কেন জ্বালা জোনাকিকে !

ঘোলাটে দু'চোখে ক্ষুধিত পিপাসা ম্লান আত্মার শিখা—
তবু তো বাঁচিয়া আছি ;
ঊর্ণনাভের জটিল জালের হিংস্র নিষ্পেষণে
আধমরা মৌমাছি।

জীবন-স্পন্দে ক্ষত-বিক্ষত সীমিত পদক্ষেপে
ধুঁকে ধুঁকে পথ চলা ;
তুমি আর আমি স্তব্ধ দু'জনে, শেষ হয়ে গেছে বুঝি
সব ক'টি কথা বলা।

তোমার দু'চোখে ঘৃণা সন্দেহ, মুছে গেছে ভালোবাসা
আমার হৃদয় বিষ—
তপ্ত মরুর বালুর পাহাড়ে শুধু আছে মরীচিকা
মিলবে না ওয়েসিস্।

তুমি আর আমি সুমেরু কুমেরু দুই জনে দুই দিক—
তবুও পরস্পর
বুকের রক্তে মৃত পৃথিবীর বুকে ভরে রেখে যাই
ফসলের স্বাক্ষর।

নারী-মহিমা

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কালান্তর নারী

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনুগত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রস-ধারায় আপনার সংসারকে শস্যশালী করে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে আশিক্ষিত পটুত্ব মাধুর্যে ঐশ্বর্যে তাহাদের সহজে লাভ করা।

মেয়েদের হৃদয়-মাধুর্য ও সেবা-নৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবের বাঁধন মানা প্রবণতা আছে, সেই জন্যেই এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখতে পাই তবে দেখা যাবে যে এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন করে উন্নতির দুর্গমপথে এগিয়ে চলা দুঃসাধ্য আবিল বুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়। তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সবচেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই যে সব আবিল মনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারিদিকে গড়ে উঠছে মেয়েদের অন্ধ বিচারবুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিত্তের বন্দিশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রতি-দিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে দৃঢ়।

(সৃষ্টির আদিতে অরণ্যই প্রাণ লইয়া দেখা দেয়। পরে অরণ্য ভূগর্ভে ডুবিতে থাকে)...অরণ্য ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহু যুগ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পাতালের দ্বার যেদিন উদ্ঘাটিত হল, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্যতেজকে পাথুরে কয়লার আকারে লাভ করল আপন কাজে; তখনি নূতন বল নিয়ে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল।

একদিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতার বাহিরের সম্পদ নিয়ে, আজ তেমনি অন্তরের সম্পর্কের একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায়, ক্রমে ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে।

নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে, মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়ত্ব এবং সকল প্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে।

নারী মাহাত্ম্য

যে-সকল পতিতা নারী জীবনে উত্তরকালে শুদ্ধ হইয়া পূজারিণী অথবা পূজ্যা হইয়াছে তাহাদের কয়েকটির কথা উল্লেখ করিয়া ঐ চর্চা সমাপ্ত করার পর কয়েকটি নারীমূর্তি অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হয়। কেন আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে? ভুলি নাই, কিন্তু প্রবন্ধ বাড়াইতে অনিচ্ছাই তাহার কারণ। অভিযোগ চলিতেই লাগিল। এক্ষণে এই অভিযোগকারিণীদের কয়েকজনার সহিত পরিচয় করাইব এবং তারপর অপরা আরো যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের নিকট মার্জনা চাহিব।

ইহাদের মধ্যে একটি—

(ক) পৌরাণিকী নারী। সে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে প্রলুব্ধ-কারিণী এক বারাঙ্গনা।

(খ) অপরা ঐতিহাসিক কালের : কবীরকে যে নারী লাঞ্ছিত করিয়াছিল সে।

বাকি দুটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রসূত। যাহাদের একের সাক্ষাৎ পাই—

(গ) "বিচারক" গল্পে এবং অপর একটি "তিন সঙ্গীর" গল্প।

(ঘ) সমষ্টির "ল্যাবরেটরীর" গল্পের নায়িকা "সোহিনী"তে।

এই চার চরিত্র বর্ণনার পর আমরা রবীন্দ্রনাথের—

(চ) সতীস্বর্গে প্রবেশ করিয়া পতিতা সতীদের পরিচয় লইব।

এই প্রসঙ্গ এই পতিতাদের প্রসঙ্গ। ইহা সমাপ্ত করিয়া আমরা—

(ছ) অনূঢ়া সতীর পরিচয় লইব।

(ক)

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তাঁহার আশ্রম হইতে আনাইয়া যজ্ঞ করিতে পারিলে তবে দেশ বাঁচে। এ কারণ মন্ত্রীমহাশয় মন্ত্রণা করিলেন এবং বারাঙ্গনা নিয়োজিত করিলেন ঋষিকে ভুলাইয়া আনিতে। তাহাদিগকে মন্ত্রণা দিলেন এবং স্বর্ণ দিলেন তাহাদের হাতে।

রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যানে একটি বারাঙ্গনার অন্তরস্থ 'নারী' ঋষির সংস্পর্শে যেন পুনর্জন্ম পাইয়া কুমারীসম হইল। নিম্নে তাহার আখ্যান উদ্ধৃত হইতেছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ

রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড পরিশিষ্ট—পৃ—৯০৭

পতিতা।

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী
চরণ পদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা
লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা।
সাজায়ে যতনে ভূষণ রতনে
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।

হাওড়া স্টেশনে, আলোর নীচে

(১ম পুরস্কার)

—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন]
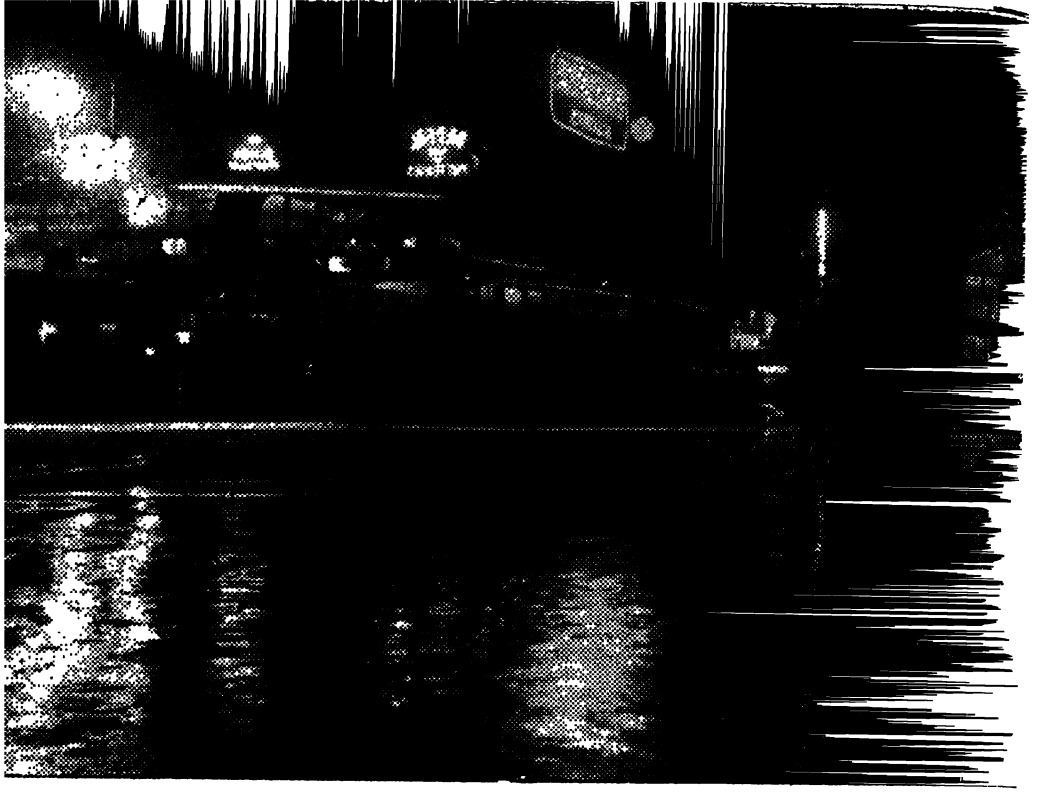
(২য় পুরস্কার)

—দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়

ড়ার টেবলে, আলোর নীচে

(৩য় পুরস্কার)

—শ্রীমতী নূপুর ঘোষ
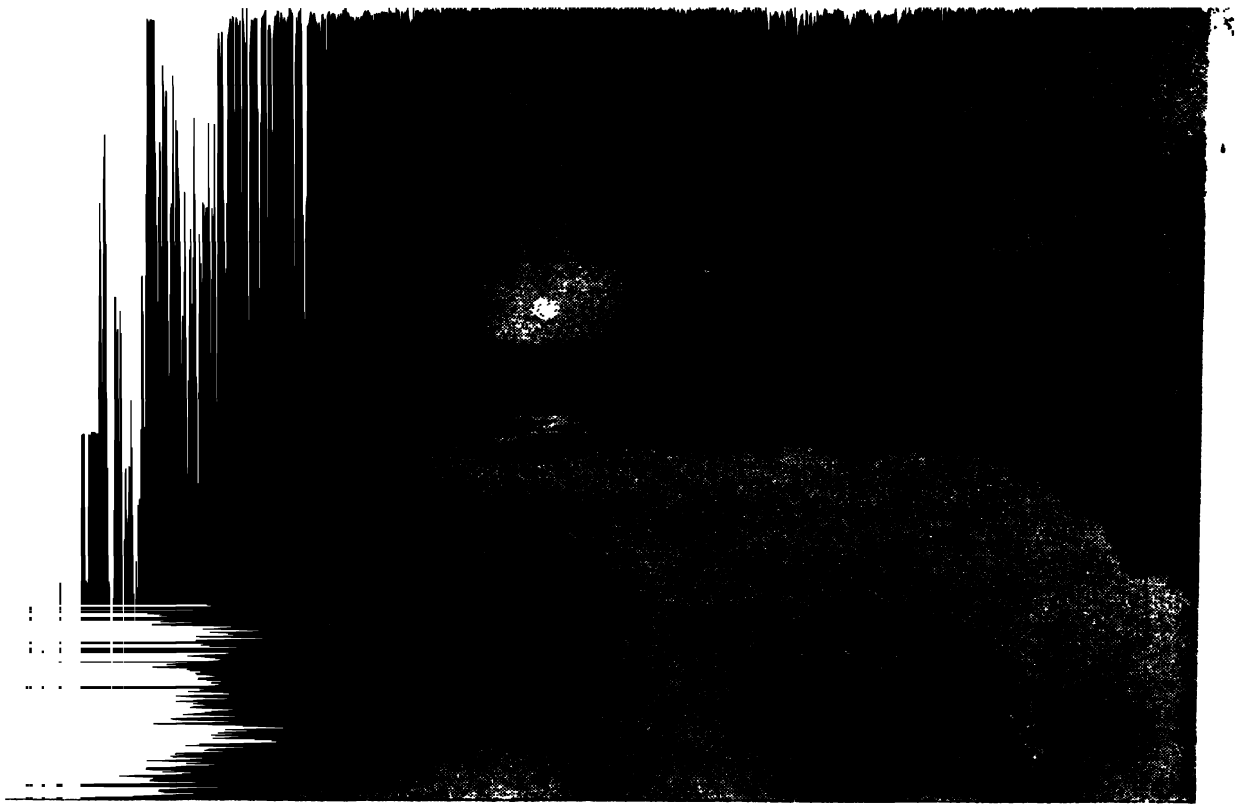
শেষরশ্মি
—বিমল দে

পরীক্ষার্থিনী
-নারায়ণ হালদার

মাসিক
বসুমতী
জ্যৈষ্ঠ / '৭৫

এই বারাঙ্গনা দেখিয়াছিল যে পাপিনীর [illegible] [illegible] ফেলিয়াছে তখন—

প্রথমে চকিত দেব শিশুসম
　　চাহিলা কুমার কৌতূহলে।
কোথা হতে যেন অজানা আলোক
　　পড়িল তাহার পথের তলে।
হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
　　অঞ্চলতল অধরে চাপি।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িত চমক
　　ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।

সেই নারী তখন—

ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
　　করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি।
কহিনু "হে মোর প্রভু তপোধন
　　চরণে আগত অধম দাসী।"
তীরে লয়ে তাঁর সিক্ত অঙ্গ
　　মুছানু আপন পট্টবাসে।
জানুপাতি বসি যুগল চরণ
　　মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।
তারপর মুখ তুলিয়া চাহিনু
　　ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মত।
তাপস কুমার চাহিলা আমার
　　মুখপানে করি বদন নত।
প্রথম রমণী দরশ মুগ্ধ
　　সে দুটি সরল নয়ন ভরি
হৃদয় আমার নারীর মহিমা
　　বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরি।
ধন্য রে আমি ধন্য বিধাতা
　　সৃজেছ আমারে রমণী করি
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়
　　উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।
জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
　　কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয় বীণার তন্ত্রে
　　বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি
　　*　　*　　*
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
　　কোন দেব আজি আনিলে দিবা
তোমার পরশ অমৃত সরস
　　তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

বারাঙ্গনা কহিল—

আমিও দেবতা ঋষির আঁখিতে
　　এনেছি বহিয়া নূতন দিবা
অমৃত সরস আমার পরশ
　　আমার নয়নে দিব্য বিভা।
আমি শুধু নহি সেবার রমণী
　　মিটাতে তোমার লালসা ক্ষুধা।
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
　　আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।
কহিল কুমার চাহি মোর মুখে
　　আনন্দময়ী মূরতি তুমি
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
　　ফুটে আনন্দ চরণ চুমি।

সহসে সে যখন হেরি সে নারী
　　দুই চোখে [illegible] কাঁদিল বাঁধি
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
　　বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।
ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায়
　　লুটায়ে ছিন্ন লতিকাসমা
কহিনু তাপসে পুণ্য চরিত
　　পাতকিনীদের করিও ক্ষমা।
আমারে ক্ষমিও আমারে ক্ষমিও
　　আমারে ক্ষমিয়ো করুণা নিধি।
　　*
দেবতারে তুমি দেখেছ তোমার
　　সরল নয়ন করেনি ভুল।
দাও মোর মাথে নিয়ে যাই সাথে
　　তোমার হাতের পূজার ফুল।
তোমার পূজার গন্ধ আমার
　　মনমন্দির ভরিয়া রবে
সেথার দুয়ার রুধিনু এবার
　　যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।

পতিতা নারী দেবতা স্পর্শে কুমারী হইয়া বাহির হইয়া আসিল, জীবিতকাল কুমারী থাকিয়া দেহ পবিত্র রাখিয়া সমর্পিত জীবন কাটাইবে।

ধন্য এই বারাঙ্গনা।

(খ)

কবীরকে লাঞ্ছিত করার জন্যে এক পতিতা স্ত্রীকে দাঁড় করান হয়—

—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড "কথা" পৃ-৬৪১।

ব্রাহ্মণ দল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল কাঞ্চন দিল হাতে।

এদিকে—

বসন বেচিতে এসেছে কবীর
　　একদা হাটের বারে,
সহসা কামিনী সবার সামনে
　　কাঁদিয়া ধরিল তারে।
বিনা অপরাধে আমারে ত্যজিয়া
　　সাধু সাজিয়াছ ভাল
অন্ন বসন বিহনে আমার
　　বরণ হয়েছে কালো।
কহিল কবীর অপরাধী আমি
　　ঘরে এসো নারী তবে,
আমার অন্ন রহিতে কেন বা
　　তুমি উপবাসী রবে।

কবীর লাঞ্ছিত হইল, ব্রাহ্মণদল টিটকারী দিল। সে নারীকে লইয়া চলিতে লাগিল। মধ্যপথে ভীতা নারী কয়—

"লোভে পড়ি আমি করিয়াছি পাপ
　　মরিব সাধুর শাপে"
কহিল কবীর ভয় নাই মাতঃ
　　লইব না অপরাধ
এনেছ আমার মাথার ভূষণ
　　অপমান অপবাদ।
ঘুচাইল তার মনের বিকার
　　করিল চেতন দান।
সঁপি দিল তার মধুর কণ্ঠে
　　হরিনাম গুণগান।

[illegible] পশ্চাতে ফাঁকা। তখন নারী কহে—

> [illegible] অন্তরে রয়েছে দুয়ারে
> [illegible] অপমান,
> তাহারে করিও জননী তুমিই যে
> [illegible] প্রণয় দান॥

(গ)

রবীন্দ্র রচনায় পতিতা পূজ্যনারী।

"বিচারক" গল্প হইতে

—রবীন্দ্র রচনাবলী—৭ম খণ্ড, "গল্পগুচ্ছ"-পৃ ২৫০।

ক্ষীরোদা ও তাহার প্রতারক জজ মোহিতের কাহিনী

হেমশশী মধ্যবিত্ত ঘরের বালবিধবা, বয়স ১৪ হইবে। স্বামী কি তাহা সে জানিবার পূর্বেই বিধবা হইয়া বাপের বাড়ীতে অনূঢ়া কন্যার মত আছে।

গলির অপর পার্শ্বে মেসে বাস করে এক সুন্দর যুবক মোহিত। প্রতারণার জন্য হেমশশীকে মিথ্যা নাম বিনোদচন্দ্র পরিচয়ে পত্র দিতে থাকে। একরাত্রে হেমশশীকে লইয়া বিনোদ বাহির হয়। ঘোড়ার গাড়ীতে স্টেশনে ও পরে ট্রেনে অন্যত্র যাইবে। ঘোড়ার গাড়ী চলিতেই হেমশশীর সম্বিৎ ফিরিয়া আসে। এ কোথায় যাই?

"হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল; কাঁদিতে লাগিল: এখনো রাত আছে। আমার মা আমার দুটি ভাই এখনো জাগে নাই। কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না।"

"ওগো পায়ে পড়ি আমাকে ঘরে রেখে এসো। মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।"

"ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন। রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।"

হেমশশী এখন ক্ষীরোদা নাম লইয়াছে। অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

"ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়ী ভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই—তিন বৎসরের শিশু-পুত্রটাকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই—যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটা লোককেও আপন করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্ত রাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাসামুখে অসীম ধৈর্যসহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে, তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারম্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়িয়া রহিল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

"ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকার মধ্য হইতে ভগ্নকাতরকণ্ঠে 'মা মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।"

"তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।"

"শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশিগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটা মরিয়া গিয়াছে।"

"হাসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্যলাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।"

দায়রা জজ ছিলেন সেই মোহিতবাবু যিনি এই নারী হেমশশীকে (এখন ক্ষীরোদা) বিনোদচন্দ্র ছদ্মনামে লইয়া ঘরের বাহির করিয়াছিলেন। জজ সাহেব বিচার করিয়া হেমশশীকে ফাঁসির হুকুম দিলেন। জজ সাহেব জেলের বাগানে সব্জী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। স্ত্রী-কয়েদের ভিতর হইতে গোলমাল ও ঝটাপটির শব্দে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দূরে হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। "ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারী ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে।"

মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ক্ষীরোদার মনে অনুতাপ উদ্রেক করার জন্য মোহিতবাবু ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হওয়ামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করজোড়ে কহিল, "ওগো জজবাবু দোহাই তোমার! উহাকে বলো আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।" ঐ আংটি তাহার মাথার চুলের মধ্যে লুকানো ছিল।

"মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব।"

"প্রহরীকে কহিলেন, কই আংটি দেখি! প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।"

এই আংটি দিয়া মোহিত অসহায়া হেমশশীকে গন্ধর্ববিবাহ করিয়াছিলেন।

"তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির একদিকে হাতীর দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফ-শ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপরদিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে বিনোদচন্দ্র।"

"তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর একটি অশ্রুসজল, প্রীতি-সুকোমল সলজ্জ শঙ্কিত মুখ মনে পড়িল, সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তারপরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"

এই তো রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত কাহিনী। হেমশশী বিশ্বাস করিত যে সে বিনোদচন্দ্রের বিবাহিতা পত্নী। স্বামীদ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া শরীর বিক্রয় করিয়া ক্ষীরোদা নামে তাহাকে পতিতাবৃত্তি লইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। হেমশশী শেষ পর্যন্ত তাহার পতি বিনোদচন্দ্রের প্রতি অর্পিত জীবন শুদ্ধ রাখিয়া গেল। মোহিত যে স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো উদ্ভাসিত রূপ দেখিয়াছিলেন, উহা সতী হেমশশীরই রূপ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য.

॥ এক ॥

অপর্ণা ঘর থেকে বেরিয়েই আসছিল, কিন্তু থামতে হলো।

অরুণের ঠোঁটে অল্প একটু হাসি। চোখের কোণে সামান্য কৌতূহল।

—আপনি কিন্তু বড্ড বেশি সময় নিচ্ছেন। আপনার মতামত আমার জানা দরকার। মনোরমাকে আপনি কিছুই জানান নি। আপনার অসুবিধের কথা জানতে পারলে আমি অন্তত চেষ্টা করে দেখতাম। মালিনী একজন করছেন কিন্তু আপনার মত হচ্ছে না। নিউ এ্যাম্পায়ার-এ ডেট নিয়েছি সামনের মাসে, সময়ও বড় হাতে নেই। আপনার সুন্দর হচ্ছিল, হঠাৎ রিহার্সাল আসা বন্ধ করলেন কেন বুঝতে পারলাম না।

অপর্ণা কোন কথা বলে না, ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এলো।

অরুণ আবার সুরু করে,—মনোরমা অবশ্য বলছিলো, আমাদের ইউনিটে টাকা নিয়ে অভিনয় করতে সংকোচ বোধ করছেন। এতে সংকোচের কি আছে আমি বুঝি না। সবার অবস্থা সমান নয়, আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও হয়তো এইভাবে রোজগার করতে বাধ্য হতাম। সুভাষ নিতান্ত ছেলেমানুষ, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল। আপনি বিশ্বাস করুন সামান্য কয়েকজন ছাড়া আপনার পারিশ্রমিক নেবার কথা জানেই না।

কথাগুলো শুনতে অপর্ণার মোটেই ভাল লাগছিল না। তবু অরুণের বক্তব্য শেষ করতে দিল। অল্প একটু মাথা নেড়ে বলে,—আমার টাকার দরকার। পারিশ্রমিক নিতে আমার সংকোচ নেই। ওদিক দিয়ে আমি কিছু ভাবি নি। মনোরমাকে বলে কোন লাভ নেই। বললে, আপনাকেই বলা উচিত। আমার কিছু বলবার ছিল।

—দেখুন হেঁয়ালী আপনি করবেন না আমি জানি। তবে আমার খুব পরিষ্কার লাগছে না। আপনার বক্তব্য থাকলে নিশ্চয়ই বলবেন। সন্ধ্যের পর আজ রিহার্সাল নেই, আমি অবশ্য বাড়িতেই থাকবো। আসুন না। অফিসে এসব নিয়ে আলোচনা বরং থাক। বিশেষ কাজ না থাকলে দয়া করে একবার আসুন না আজ। আমার খুব ইচ্ছে আপনি মালিনী করুন।

অপর্ণা এতটুকু নড়লো না। চোখ দুটো শুকনো। একটুকরো হাসতে চেষ্টা করলো। তারপর অরুণের চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলে,—সন্ধ্যের পর আসবো।

সৌরীন সেন

আজ আমার কাজও কিছু নেই হাতে।

ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। অপলক নয়নে কয়েক মুহূর্ত অরুণ তাকিয়ে থাকে। যান্ত্রিক শব্দে ফোন বেজে চলেছে একটানা খেয়ালই হয় না অনেকক্ষণ।

অপর্ণা কথা রেখেছে। সন্ধ্যের পর এলো। বেশ কয়েকদিন আসা যাওয়া করায় এদিকের নির্জন রাস্তাটা আর আগেকার মত ভয় করে না। অন্য দিন বহু মানুষের ভিড়ে পূর্ণ থাকে ঘরটা। আজ চুপচাপ। বড় নির্জন। নরম একটা আলো জ্বলছে বাইরের ঘরে। ভেতর থেকে সামান্য দু'এক টুকরো আওয়াজ ভেসে আসছে।

হিসেবে মেলে নি তবু অরুণ ভেবেছে নিতান্তই কোন তুচ্ছ কথা অপর্ণার ভাবপ্রবণ মনকে নাড়া দিয়েছে। আঘাত পেয়েছে কারো কথায়। জানান না দিয়ে রিহার্সালে আসা তাই বন্ধ করেছে অপর্ণা।

অপর্ণাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। এত সুন্দর মালিনী চট করে পাওয়া অসম্ভব। অপর্ণারই অপেক্ষায় ছিল। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, অপর্ণাকে কিছু বলতে না দিয়ে আজে বাজে তুচ্ছ কথায় খানিকটা গল্প করে, দুপাশে মাথা দুলিয়ে অনেকটা শুনবো না, শুনবো না ভঙ্গিতে সামনের দিন ঠিক ঠিক রিহার্সাল-এ হাজির হবার অনুরোধ নয় কিছুটা আদেশই করবে।

প্রথমটা অতি সহজ। অপর্ণার কথাতে কিছুমাত্র সংকোচ নেই। নাটকের মূল বক্তব্য অপর্ণাকে এত গভীরভাবে স্পর্শ করেছে দেখে অরুণ খুব খুশি হয়।

অপর্ণা বলে,—কালীপদ বিছানায়, ওথেলোর অনুবাদ তখনও শেষ হলো না। ঘরময় পাণ্ডুলিপি উড়ছে। মালিনীকে জানলা বন্ধ করে দেবার অনুরোধ করছে কালীপদ। পরে দেখা যাচ্ছে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি গুলুবাবুর হাতে দিয়ে মালিনী গৃহত্যাগ করছে। কালীপদ তার আগেই পলাতক। এক-শ বছর আগেকার সম্পূর্ণ পটভূমি আপনার নাটকে অপূর্ব এসেছে। আপনার নাটকে কালীপদ ও মালিনী চরিত্রের মধ্যে সেকালের কলকাতা, সামাজিক অবস্থা ও প্রগতিশীল শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নাটক লেখা খুব শক্ত শুনেছি, আপনি এত চমৎকার লেখেন কি করে...।

সিগারেট ধরিয়ে অরুণ জুত হয়ে বসলো। অপর্ণার স্বতন্ত্র স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ বেশ ভাল লাগে। উৎসাহ পায় আগ্রহ ভরা কণ্ঠে বলে,—নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে আপনি ভেবেছেন দেখছি। আচ্ছা, মালিনীকে যখন শেষ দিকে কাশীতে দেখা গেল, কালীপদর সঙ্গে দেখা হলো কিন্তু মালিনী চিনতে পারলো না ঐ জায়গাটা কেমন হয়েছে? পরে সেই মালিনীই যখন কালীপদর মৃতদেহ সনাক্ত করলো, পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে মালিনী যখন বললো—নাম মুখে আনতে পারবো না, দিন লিখে দিচ্ছি। এই

কথার ওপরেই নাটক শেষ হচ্ছে। মালিনী চরিত্র এখানে কোথায় উঠে গেছে বলুন তো। মূল দৃশ্যটা আপনার কেমন লাগলো?

—অনেক ভেবেছি কিন্তু কোনখানেই আমার তেমন পছন্দ হয় নি। নাটকের নামটা নিয়ে ভাবছিলাম। আচ্ছা "শেষ সঙ্গীত" হলে কেমন হয়।

—খাসা তো, বেশ নাম। তবে শেষ দৃশ্যটা সম্পর্কে আমার কিছু বলার ছিল।

অল্প একটু হাসলো অরুণ। মাথা নেড়ে বলে,—বেশ তো, বলুন।

—শেষ দৃশ্যটা আমার একদম পছন্দ হয় নি। নাটক আপনার আগের দৃশ্যেই শেষ হয়ে গেছে। কালীপদকে ওভাবে কৃপার পাত্র করে মালিনী খুব বড় হয় নি কিন্তু নাটকের মূল বক্তব্য অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। অবশ্য আমি লিখি না, নাটকও বড় বুঝি না, তবে সাধারণ একজন দর্শক হিসাবে গোটা নাটকটা দেখে আমার এই রকম মনে হয়েছে।

অরুণের মুখের ছোট-খাটো ভাঙাচোরা রেখাগুলো মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বরও কিছুটা বদলে গেল। সামান্য কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর ধীরে ধীরে বলে,—মালিনীকে বড় করেছি, কালীপদকে খাটো করবার জন্যে নয়। মালিনী এ রকম হলে কেমন হয়?

—কিছুটা অবাস্তব। দর্শকদের কথা জানি না, হয়তো ভাল লাগবে। সেন্টিমেন্টাল অ্যাপিল আছে। তবে আপনার নাটক অপর্যাপ্ত করুণ রস সৃষ্টি করে খুব একটা 'টিয়ার জার্কার'-এ শেষ হোক এ ঠিক আমি মেনে নিতে পারি না।

—সেন্টিমেন্ট থাকবে না, ইমোশন থাকবে না? সেন্টিমেন্ট ছাড়া মানুষ! আপনি শুধু করুণ রসের ভয় পাচ্ছেন।

—সেন্টিমেন্ট আর ইমোশন একটা মানুষের সবটুকু নয় অরুণবাবু। অবশ্য আপনার নাটক, চরিত্রগুলোও আপনার। আপনার ইচ্ছেমত সাজাবেন, তবে এটুকু আমি না বলে থাকতে পারলাম না।

মাথা চুলকে দুপাশে মাথা নেড়ে ঠোঁটে হাসি টেনে অরুণ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়। বলে,—যাক, যে জন্যে আপনার আজ আসা। রিহার্সালে আসা বন্ধ করলেন কেন? আপনার কি বলবার আছে বলুন?

অফিসের পর অপর্ণা আজ বাড়ি যেতে পারে নি। অনেক দ্বিধা আর সংকোচ নিয়ে শেষ পর্যন্ত এসেছে। তার বক্তব্য কতটা মর্যাদা পাবে অরুণের কাছে। হয়তো মনে মনে অসন্তুষ্ট হবে। হয়তো বা চটে যাবে। হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়েই দেবে হয়তো।

সুন্দর মুখশ্রী ঘিরে একটা ক্লান্তির রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কপালের ওপর এসে পড়া চুরচুরে চুলগুলো একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলে,—মালিনী চরিত্রটা আমার খুব ভাল লাগছে না। নাটকের শেষ দৃশ্যটা সম্পর্কেই আমার কিছু বলতে আসা। হয়তো অনেকটা সেই কারণেই আমি অভিনয় করতে খুব একটা সাড়া পাচ্ছি না। আমি হয়তো আপনাকে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না—।

চমক নয়, বিস্ময়ের ঘোরও নেমে এলো সামান্য। কথাগুলো এমন ধোঁয়াটে আর অস্পষ্ট অথচ স্বচ্ছন্দে সহজ অর্থ করে নেওয়া যেতে পারে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে অরুণ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে। ভাবলেশহীন চাউনী। সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন।

অরুণ দৃষ্টি মাটিতে নামিয়ে নিল। একটি পতঙ্গের অবিরাম বসা আর ওড়া নিরীক্ষণে অতিশয় মনোযোগী হয়ে পড়ে। নাটকের সমালোচনা দোষের নয় কিন্তু অপর্ণার এ যে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা।

ঘরের নীরবতা অপর্ণাকেই ভাঙতে হয়। স্পষ্ট ধীর কণ্ঠ। কিছুমাত্র জড়তা নেই। দ্বিধা বা সংকোচের তিলমাত্র আভাস নেই।

—আপনার সঙ্গে সামান্য পরিচয়। অফিসে আপনাকে একভাবে জানলাম, অদ্ভুত এক যোগাযোগে আপনার বাড়িতেও আসতে হলো। তবে দেখেছি অপরের মতামত আপনি শুনতে চান। সমালোচনার অধিকার আপনি অস্বীকার করেন না, সেই ভরসাতেই......!

অরুণ অল্প একটু হাসতে চেষ্টা করলো। অল্পক্ষণ পর বলে,—প্রসঙ্গ যখন তুললেন, তখন আমাকে কিছুটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। মালিনী চরিত্রটা আপনার বাড়াবাড়ি মনে হয়, নাটকের শেষ দৃশ্যের করুণ রস আপনার পছন্দ নয় বললেন, কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, মালিনী কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়, শেষ দৃশ্যটার পেছনে আমার নিজের কোন হাত নেই। কালীপদ আমার আপনার মত এক সময়ে ছিল। নাটকের কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয় অপর্ণা দেবী।

—কাল্পনিক নয়!

—মোটেই নয়। আপনি নাটক ভালবাসেন, অভিনয় আপনার ভাল আসেও। হয়তো শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না। অদ্ভুত এক যোগাযোগ কালীপদ ও মালিনীর কথা আমি জানতে পারি। আমার এক বন্ধু, পলিটিক্যাল এ্যাজিটেটর হিসাবে বাজারে সুনাম আছে। একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে আমার বাড়িতে কয়েক মাস আত্মগোপন করেছিল। আমার বন্ধুর এক সহপাঠিনী বাংলা নাটকের একাল-সেকালের ওপর গবেষণা করেছিলেন। আমার বন্ধু সেই ভদ্রমহিলার প্রতি অসম্ভবরকম সশ্রদ্ধ। প্রসঙ্গক্রমে একদিন ভদ্রমহিলার মৌলিক গবেষণা থেকে এক কাহিনী আমাকে পড়তে দেয়। পুরনো দিনের কাহিনী ও সেকালের কথা ঘাঁটতে ঘাঁটতে গিরিশ ঘোষের আমলের একজন অজ্ঞাত উপেক্ষিত অভিনেতা শাস্ত্রশীলা নটের খোঁজ পান। বই-পত্তর আর সেকেলে কাগজের জরাজীর্ণ আবর্জনার মধ্যে থেকে এই আশ্চর্য মানুষকে ভদ্রমহিলা আবিষ্কার করেন।

অরুণ থামলো। অপর্ণার নিষ্পলক আঁখি। বিবর্ণ ওষ্ঠাধর।

অরুণ আবার সুরু করে,—জয়নগরের বিখ্যাত জমিদার বংশের একমাত্র পুত্র ছিল বিনোদবিহারী চৌধুরী। ইংরেজী শিক্ষার জোয়ার চলেছে কলকাতায়। সেকালে ধর্মের প্লাবন বয়ে চলেছে নব্য শিক্ষিত সমাজে। শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের থিওজফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজ। নানা ভাবের, নানা ব্যাখ্যার ধর্মের প্রবাহ। নিরীশ্বরবাদ ও নাস্তিকতাবাদ আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজে ঢেউ তুলেছে। অস্থির, উদ্দাম তরুণ চিত্তের বিনোদবিহারী একদিন জয়নগরে ফিরে এলো। পরণে গলাবন্ধ কোট নেই, ফিতে বাঁধা কামিজ নেই। পুরো সাহেব। গলায় টাই। ঠোঁটে অনর্গল হ্যামলেট।

ঠিক সেই সময়ে বিপিনবিহারী ঢাক ঢোল ধুনোর ধূম্রজালের মধ্যে নামাবলী জড়িয়ে মুণ্ডমালিনীর পুজোতে ব্যস্ত। দেবীর পাদমূলে দীর্ঘদেহী কুলগুরু সমাসীন। পাথরের মত স্থির নিশ্চল দেহ। হঠাৎ হাতের তাম্র কুশি কেঁপে ওঠে। কোশা দুলে ওঠে। পরমুহূর্তেই কুলগুরুর বজ্রকণ্ঠ শোনা যায়,—বিপিন, দেবালয়ে অমঙ্গলের পদধ্বনি শুনি।

বিপিনবিহারী ব্যস্ত হন। বলেন,—প্রভু, অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি!

কথা শেষ হলো না বিপিনবিহারীর। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কুলগুরু। বিক্ষিপ্ত কোশা-কুশি। তাম্রাধার রাখা অমৃত ভূমি স্পর্শ করছে।

আর্তনাদ করে ওঠেন বিপিনবিহারী,—প্রভু আমি যে নির্বংশ হলাম। অমৃত সুধা মাটি স্পর্শ করছে।

কুলগুরুর স্থির নিষ্পলক আঁখি। কঠিন ওষ্ঠাধর। ধীরে ঘুরে তাকান বিপিনবিহারীর দিকে। নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল তারপর,—বিপিন তুমি নির্বংশ হয়েছো অনেক আগেই। তাম্রধার অমৃত শূন্য, বিষভাণ্ড দেবীর বেদী স্পর্শ করছে।

ভয় ও বিস্ময়ে বিমূঢ় বিপিনবিহারী অপসৃয়মান কুলগুরুর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকেন। এমন সময় বিনোদবিহারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কথা জড়ানো। ভাষা ইংরেজী। ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

পরবর্তী কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। খৃস্টধর্মে দীক্ষিত পুত্রকে

বিপিনবিহারী ত্যাগ করেন। পরদিনই বিনোদবিহারী কলকাতা ফিরে আসেন।

বিনোদবিহারী ভাল অভিনয় করতে জানতেন। সঠিক যোগাযোগের হদিশ জানা নেই তবে ছাতুবাবুর বাড়ি ও পাইকপাড়ায় দু-রাত্তির 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এ ব্যাসানিও-র অভিনয় করে কলকাতার সুধীসমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

কিছুদিন পরের কথা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র এডওয়ার্ড কলকাতায় আসেন। ভবানীপুরের জগদানন্দ মুখার্জির বকুলবাগানের বাড়ির মেয়েরা যুবরাজকে সম্বর্ধনা করেন। সামান্য ঘটনা। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার আমলে এই তুচ্ছ ঘটনাটি খুব সামান্য ছিল না। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জগদানন্দবাবুর ইংরেজ প্রীতি ও নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে অন্দরমহলে যুবরাজের নিমন্ত্রণকে কেন্দ্র করে নানা গরম গরম আলোচনা সুরু হয়। অল্পদিন পর এই জগদানন্দবাবুকে কেন্দ্র করেই বিখ্যাত প্রহসন 'গজদানন্দ' মঞ্চস্থ হলো। সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক মঞ্চস্থ হল তার কিছুদিন পর। উপেন দাস ও অকৃত বসু ইংরেজের রোষানলে পড়েন। চালু হোল 'ড্রামাটিক পারফরমেন্স এ্যাক্ট'।

গোটা ব্যাপারটা অদ্ভুত রকম নাড়া দিল বিনোদবিহারীকে। তাঁর অশান্ত শিল্পিমন ঘরে বাইরে অস্থিরতা টেনে আনে। গজদানন্দ—প্রহসন দেখতে দেখতে তাঁর মনে হয়েছে জগদানন্দবাবু শুধু একা নন, তাকেও যেন যথেষ্ট হাস্যাস্পদ করা হয়েছে অনেক জায়গায়।

ইংরেজী কায়দা কানুন, হাবভাব, চালচলন এমন কি সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিনোদবিহারীকে সম্পূর্ণ কব্জা করে ফেলেছে। এই অদৃশ্য দৃঢ় আবেষ্টনের মধ্যে বিনোদবিহারীর অন্তরের শিল্পিমন ও প্রাণশক্তির অজস্রতা আর্তনাদ করে ওঠে।

তারপরের অধ্যায় আরও আকস্মিক। অপ্রস্তুত বিনোদবিহারী পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। নিদারুণ এক অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি বিপর্যস্ত। গির্জের আর আকর্ষণ নেই, দেবালয়ের দরজা হয়েছে রুদ্ধ।

বেশ কিছুদিন বিনোদবিহারীর খোঁজ মেলেনি সেই থেকেই। 'সাধারণী' ও 'সুলভ সমাচার'-এ বাংলা নাটকের ওপর বিনোদবিহারীর বিচ্ছিন্ন দুটি প্রবন্ধের হদিশ মিলেছে শুধু।

এমন সময় সংবাদ এলো বিনোদবিহারীর যেন নবজন্ম হয়েছে। খবরটা 'অমৃতবাজার' না 'সংবাদ প্রভাকর' পরিবেশন করেছিলো ঠিক জানা নেই। নীলদর্পণে তোরাপের ভূমিকায় অভিনয় করে বিনোদবিহারী বাংলা নাট্যমঞ্চের একজন অতি শক্তিশালী নট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সংবাদে আরও ছিল, অভিনয়কালে বিনোদবিহারী উড সাহেবের চরিত্রে জোড়াসাঁকোর ভণীবাবুকে নিজের থাবার মধ্যে এমনভাবে এনে ফেলেছিলেন যে বাংলার প্রপীড়িত শত-সহস্র দরিদ্র জনসাধারণের পুঞ্জীভূত ইংরেজবিরোধী বিক্ষোভ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

সামনে বেশ কয়েক গিনির দুর্মূল্য আসন অধিকার করেছিলেন ইংরেজ সুপার। ভুলে গিয়েছিলেন তিনি অভিনয় দেখছেন। ভুলে গিয়েছিলেন পাদপ্রদীপের সামনে উড সাহেব নয়—নেহাৎই বাঙালী, জোড়াসাঁকোর ভণীবাবু। সামান্য একজন মুসলমান চাষা তোরাপের হাতে তাঁদের একজন শ্বেতাঙ্গকে এভাবে নিগৃহীত হতে দেখে লাফ দিয়ে মঞ্চে আরোহণ করেন। অভিনয়ের মধ্যে অবাঞ্ছিত এই দ্বিতীয় উড সাহেবকে বিনোদবিহারী প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। তবে শ্যামচাঁদের আরশমার শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপারের হাতের রোলারটি উপর্যুপরি কবার যখন নিজের দেহের ওপর আছড়ে পড়লো, তখন বুঝলো এই অবাঞ্ছিত মানুষটি বেমওকা এসে পড়ার পেছনে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বড় হাত নেই।

এইখানেই সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যেতে পারতো কিন্তু তা হলো না। এক খৃস্টান পাদরীর প্ররোচনায় বিনোদবিহারীর নামে মিথ্যা মামলা রুজু করা হলো। রাজরোষ চারদিক থেকে বিনোদবিহারীকে ঘিরে ধরলো। স্বয়ং পুলিশ সুপার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে হাজির হলেন বিনোদবিহারীর মেছুয়া বাজারের আস্তানায়—

কথা বলতে বলতে অরুণ থামলো। অর্পণা স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। চোখের পাতা কাঁপছে না। শরীরের ওঠা-পড়াও নজরে আসছে না। যেন সজীব নয়, অপর্ণা যেন নিশ্চল পাথর হয়ে গেছে।

অরুণ একটা সিগারেট ধরালো। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল। জানলা খুলে দিয়ে ফিরে আসবার সময় বলে,—আমার নাটকের প্রথম অংক এখানেই শেষ হয়েছে। নাটকের খাতিরে বিপিনবিহারীকে ছোট করে, স্ত্রী ঊর্মিলাকে বাড়িয়েছি। বিনোদবিহারী চলে যাচ্ছে, মানে আমার নাটকের কালীপদ যখন পালাচ্ছে সেখানেই দৃশ্যটা শেষ করেছি। তারপরের ঘটনাই আসল নাটক। সেকালের কাগজে ও বই-পত্তরে বিনোদবিহারীকে না পেলেও এই সব ঘটনার আবহাওয়া পাওয়া যায় কিন্তু বিনোদবিহারীর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার বন্ধুর কথা প্রথমে আপনাকে আমি বলেছি, তার সহপাঠিনী এই বিনোদবিহারীকে খুঁজে পান। গবেষণা করতে করতে এই শক্তিশালী—নটের অসম্ভব জীবনী তিনি আবিষ্কার করেন। আমার নাটকের সমালোচনা করতে এসে এমন কাহিনী আপনার হয়তো ভাল লাগছে না। আপনার নিশ্চয়ই খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি... !

বাধা দিয়ে অপর্ণা বলে,—আপনি বলুন অরুণবাবু। বিনোদবিহারীর কথা আমার শুনতে খুব ভাল লাগছে। কালীপদ যে অবাস্তব একটি চরিত্র নয় একথা শুনে আমার আরও ভাল লাগছে। আপনি থামবেন না অরুণবাবু।

অরুণ সুরু করে,—বিনোদবিহারীকে খুঁজে পাওয়া গেল চীৎপুরের কুখ্যাত এক অঞ্চলে। ঠিক খোঁজা নয়, ভদ্রমহিলা বিনোদবিহারীকে একরকম আবিষ্কার করেন।

আত্মগোপন করে বিনোদবিহারী যার ঘরে এসে আশ্রয় নেন সে তরলাবালা।

বিস্ময়োক্তি নয়, নিজের অজ্ঞাতে এক কাতরোক্তি ঝরে পড়ে অপর্ণার ঠোঁট থেকে।

অরুণ বলে,—আপনি অমন করলেন কেন অপর্ণা দেবী।

শুকনো হাসিটুকু মুহূর্তের জন্যে ঝিলিক মেরে ওঠে অপর্ণার চোখে। বলে,—আপনি বলুন অরুণবাবু। থামবেন না। তরলাবালার কাহিনী বলুন।

অরুণ কি যেন ভাবলো। সুরু করতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। কণ্ঠস্বর ঝরঝরে। বর্ণনা ভঙ্গিতে সহজ এক আকর্ষণ আছে। সিগারেট ছাইদানে ডুবিয়ে দিয়ে সুরু করে,—পূর্বজীবনে তরলাবালা ছিল বসিরহাটের এক ধনীগৃহের ছোট বৌ। তরলাবালার যখন ভরা যৌবন স্বামী কুঞ্জলাল আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় মারা যান। দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিজের বাড়িতেই যাত্রাগানের পালা বসেছিল। চিকের আড়ালে বসে প্রহ্লাদরূপী প্রিয়গোপাল দত্তকে দেখে তরলাবালার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। এই প্রহ্লাদের সঙ্গেই নাকি তরলাবালা গভীর রাত্রে ইছামতী নদী অতিক্রম করে।

শ্রীহরির ভক্তিরসে বিভ্রান্ত-তরলাবালা প্রিয়গোপালের নিকট সান্নিধ্যে এসে আবিষ্কার করলো তার সঙ্গের মানুষটি আর যাই হোক প্রহ্লাদ নয়। এই মানুষটির হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তির কণামাত্র নেই। এমন কি ভয়ংকর হিরণ্যকশিপুর সঙ্গেও যেন তার অসম্ভব চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হলো। অল্পদিন পর বহু পথ পেরিয়ে এক নতুন দেশে এনে অর্ধমৃত তরলাবালাকে ফেলে পালিয়ে যায় প্রিয়গোপাল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি প্রহ্লাদ নেই। চারদিকে কোথাও মাটি নেই, জল নেই, আকাশের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। দিন না রাত্রি বোঝা অসম্ভব। চারদিকে শুধু এক বেষ্টনী। সামনে যেন এক ভয়ঙ্কর নৃসিংহ-

...মূর্তি তাকে জানুর ওপর স্থাপন করেছে ...র তার বক্ষ দুই হাতের নখে বিদীর্ণ করে ...ধ করতে উদ্যত।

চারদিকের বেষ্টনী আসলে একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষ। জায়গাটা চাংপুর। আর ভয়ঙ্কর নৃসিংহ ছোটাই মল্লিক ছাড়া আর কেউ নন। ছোটাই মল্লিকের বীভৎস প্রেমের প্রবল আকর্ষণে তরলাবালার অন্তরের মণিকোঠার পবিত্র ভক্তি প্রেমের অজস্রতা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেল।

ছোটাই মল্লিকের ভয়ে বিনোদবিহারীকে আশ্রয় দিতে ভয় পেয়েছে তরলাবালা। বিনোদবিহারীকে দেখে সে প্রথমে অবাক হয়েছিল। তরলাবালাকে দেখে বিনোদবিহারী চমকে উঠেছিল। বিস্ময়রেখা ফুটে উঠেছিল চোখেমুখে। কয়েক মুহূর্ত পর বলেছে,—আমার হয়তো উপায় ছিল না, কিন্তু তুমি এখানে কেন? কোথায় ছিলে, এখানে এসেছো কেমন করে? স্রোতস্বিনী ইছামতী নদী বেয়ে অদৃশ্য উত্তাল তরঙ্গস্রোতে তছনছ হতে হতে তরলাবালা তখন ভেসে চলেছে। সামনে দুর্যোগ, ভীষণ কুজ্ঝটিকা, পেছনে অন্ধকার। প্রচুর দ্বিধা, সন্দেহ আর অবিশ্বাসের মধ্যে বিনোদবিহারীকে আশ্রয় দেয় তরলাবালা।

বিনোদবিহারী বলে,—আমি নিজেকে এখানে এনেছি, তার জন্যে আমার দুঃখ নেই কিন্তু তরলা তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও। তুমি এই অসম্ভব জায়গায় এলে কেমন করে? জীবনে অন্যায় করেছি বহু, অপরাধ করেছি অনেক। আমি তোমাকে উদ্ধার করবো। রক্ষা করবো তোমাকে। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর তরলা।

তরলা বলে,—তুমি সাধারণ মানুষ নও। বিশ্বাস করে রিক্ত হয়েছি তাই অবিশ্বাস আমাকে কারণে-অকারণে পেয়ে বসে। তুমি ক্লান্ত। বিশ্রাম দরকার তোমার।

বিনোদবিহারীর হিসেবে ছিল কোথাও রাত কাটিয়ে প্রত্যুষে সে ঢাকা রওনা হবে। রাজরোষ তাকে যেভাবে জড়িয়ে ফেলেছে কলকাতা তার কাছে কিছুমাত্র নিরাপদ নয়।

ভোররাত্রে নিঃশব্দে চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছিল বিনোদবিহারী। আচমকা এক অপ্রত্যাশিত শীতল কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়াতে হয়। হাতের স্পর্শে নিভু নিভু হেরিকেনের আলো জোরালো হয়ে ওঠে। দরজের কম-...শির ফেরে পড়ে উল্টোদিকের দেওয়ালে তরলার ছায়ামূর্তি বিরাট হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বিস্ময়াবিষ্ট বিনোদবিহারী অপলক দৃষ্টিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তরলা বলে,—অপরের বিশ্বাস কুড়োবার আগে নিজেকে বিশ্বাস কর বিনোদ। চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছ দেখে আমিই কেমন লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সামনে কোন দ্বার নেই, উদ্ধারের কোনো প্রয়োজনই নেই আর। যাও, তোর হয়ে আসছে। তোমার যাত্রা শুভ হোক। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

জবাব দিতে বিনোদবিহারীর বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। অপরাধীর মত বলে,—আমাকে ক্ষমা কর তরলা। আমি অন্যায় করেছি। নিজের মানসিক নানা চিন্তায় আমি বিপর্যস্ত। তুমি ঘরকে পর করেছো, আর ঘর আমাকে বিতাড়িত করেছে। একটা জায়গায় আমাদের দুজনের বড় মিল। ইংরেজের রোষানল থেকে বাঁচতে চাই আমি, আর ছোটাই মল্লিকের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাও তুমি। আমি পারবো, আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবো। তুমি এস। চল এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই। তোমার দায়িত্ব আমার। তোমার সুন্দর জীবন ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব আমি বহন করবো জীবন দিয়ে।

বিনোদবিহারীর সঙ্গে তরলা ঢাকায় আসে। কিছুদিন পর অবস্থার পরিবর্তন হলো। কলকাতা ফিরে আসা সহজ হলো।

আবার নাটক। আবার রঙ্গমঞ্চ।

বিনোদবিহারী বলেন—তরলা তুমি না থাকলে আমি এত সুন্দর অভিনয় করতে পারতাম না। আমার অফুরন্ত প্রাণশক্তির অবস্থা অপচয়ই হতো শুধু।

তরলা বলে,—আমি মরে ছিলাম। পাষাণ হয়ে ছিলাম। তোমার স্পর্শে বেঁচে উঠেছি।

খুশীতে ঝলমল করে ওঠে বিনোদ বিহারী,—দেবরাজ ইন্দ্রের ছলনা অহল্যা বুঝেছিল কিন্তু বিষপ্রেমে আচ্ছন্ন ছিলে তুমি প্রহ্লাদরূপী জহ্লাদকে চিনতে পার নি। তাই তুমি অহল্যার চেয়ে বড়। তুমি আরও পবিত্র, অনেক বেশি মহৎ।

জীবন যেন সার্থক। মাথা নত হয়ে আসে তরলার।

বিনোদবিহারীর সঙ্গে তরলাবালাও এই সময় রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে। বিনোদবিহারী বলেন—তুমি কাছে থাকলে আমি মদ একটু কম খাবো। আরও অনেক বেশি ভাল অভিনয় আমি করতে পারবো।

প্রতিভা হয়তো নয়, কিন্তু অতি শৈশব থেকে তরলাবালার অত্যাশ্চর্য দু একটি গুণ লক্ষ্য করা গেছে। সুর করে রামায়ণ পড়তে পারতো যখন তখন তার বয়স পাঁচ বছরের বেশি নয়। কণ্ঠস্বর মধুর। খাঁটি সোনা সন্দেহ নেই, তবে নিপুণ স্যাকরার হাতে না পড়ে কামার বাড়ির হাপরের দাপটে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল সুক্ষ্ম রুচি আর শিল্পিমন নিঃশেষ হয়েছিল।

দস্তুরমত বিস্ময়। অন্য মানুষ হয়ে গেল তরলাবালা। রঙ্গমঞ্চ যেন তার নতুন জীবন দিল। মাত্র চার রাত্রের অভিনয়। আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে তরলাবালা বাংলার নাট্যমঞ্চে এক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হিসাবে সুনাম অর্জন করে।

বিনোদবিহারী বলেন—তুমি আমার আবিষ্কার আমি দস্তুরমত ভাস্কো-ডা-গামা।

তারপর এক স্মরণীয় অধ্যায়। স্বয়ং গিরিশ ঘোষ সংবাদ পাঠালেন,—সৌখীন নাট্যসংস্থা ছেড়ে বিনোদবিহারী ও তরলাবালা যদি পাকাপাকিভাবে তাঁর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগদান করে তিনি নিতান্ত প্রীত হবেন। তাঁর দরজা বিনোদবিহারীর জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। বিনোদবিহারীর মত প্রতিভাবান নট তাঁর হাতে থাকলে আরও মূল্যবান নাটকে তিনি হাত দিতে ভরসা পান।

জীবন হয়তো নাটক নয় কিন্তু অদৃশ্য এক নাট্যকারের হাতে যে অনিবার্য দৃশ্য লেখা হয়েছিল তার চূড়ান্ত নাট্যরূপ বিনোদবিহারীকে একদিন দিতে হলো।

অন্ধকার। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। জোর অভিনয় চলছে তখন। সহস্র মানুষ অনুতপ্ত এক সেনানায়কের ভূমিকায় বিনোদবিহারীর অভিনয় দেখছে বিমুগ্ধচিত্তে। এমন সময় আকস্মিক কলরব। মুহূর্তে বহু মানুষের কোলাহল পৌঁছলো আর্তচিৎকারে। চারদিক থেকে চিৎকার উঠলো—আগুন! আগুন!

সামান্য কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল বিনোদবিহারীর। মনে হলো একদিকে বড় আলো। গ্রীনরুমের দরজা জ্বলছে। উইংস আর পর্দার দিকে অসহ্য গরম যেন ছুটে আসছে।

একজনের মুখে শোনা গেল, রাণী কেন বদল করছেন। রাজমহিষীর মেক-আপ নেওয়া এখনও শেষ হয় নি।

লাল সালুর পর্দার আড়ালে নীল আলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আড়বাঁশীতে করুণ সুর টানতেন লাটুবাবু। বিনোদবিহারীকে তিনি বাধা দিয়েছিলেন—কিন্তু পারেন নি।

বিশৃঙ্খল প্রেক্ষাগৃহে শতসহস্র মানুষের কণ্ঠকে পেছনে ফেলে বিনোদবিহারীর মর্মান্তিক চীৎকার শোনা গেল,—তরলা-আ-আ-আ।

জ্বলন্ত সিল্কের আঁচল উড়িয়ে রাজমহিষীকে অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে আর একজন জ্বলন্ত মানুষ। সিল্কের আঁচল পুড়ে গিয়েই ফুরিয়ে গেল। কিন্তু বিনোদবিহারী জ্বলছে অনুতপ্ত সেনানায়ক পুড়ছে।

কি মর্মান্তিক রূপান্তর। সামান্য সময়ে ছ-ফিট লম্বা এক মেফিস্টোফিলিস দলা পাকানো অস্থির এক মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। শরীরের ডানদিকটা একরকম নষ্ট হয়ে গেল। সুন্দর মুখটা বিকৃত হয়ে গেল অনেকটা

অসহ্য কষ্ট। যন্ত্রণা কল্পনাতীত। আগুনে

LIFEBUOY
for health
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে
লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু
গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে !
লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

তরলার দেহকে স্পর্শ করতে পারে নি তখনো ঈশ্বরের মত প্রসন্ন হাসি বিনোদবিহারীর বিকৃত মুখে ফুটে ওঠে। সান্ত্বনা দেয় তরলাকে,—তরলা তুমি কেঁদো না। আমি ভাল হয়ে যাব। বিশ্বাস কর, আমি বুঝতে পারছি আমি সুস্থ হয়ে উঠবো। আবার আমি অভিনয় করবো। আয়নাটা আমাকে একটু দেবে?

শিউরে উঠেছে তরলা। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করেছে। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলতে চেয়েছে,—তুমি মানো না, আমি মানি। আয়নায় এখন মুখ দেখতে নেই। তাতে অমঙ্গল হয়। আমি তোমার পাশে আছি। আমিই তো তোমার আয়না।

বেশ সুখেই ছিল বিনোদবিহারী। তরলার হাত ধরে সেদিন জানলার পাশে এসে বসে। ডান পা কেন যে এতদিনেও সোজা হচ্ছে না সেই কথাই শুধু বলে। কোন মন্তব্য করে না তরলা। নীরবে অশ্রুপাত করে। সে বুঝেছে ঠিক। ঘা সেরে গেছে। চামড়াও শুকিয়ে গেছে অনেকখানি। স্বাভাবিক নিয়মে পা ফেলবার অধিকার থেকে বিনোদবিহারী যে আজ সম্পূর্ণ বঞ্চিত তরলা বুঝতে পারে।

চুপচাপ বসেছিল। হঠাৎ যেন চমকে উঠলো। জানলার কাঁচের সার্সিতে প্রতিফলিত নিজের মুখটা দেখে কাতরোক্তি করে ওঠে।

এত কষ্ট বোধহয় জীবনেও সে কখনও পায় নি। দলা পাকানো মাংসপিণ্ড হয়ে স্টেজের ওপর যেদিন আছড়ে এসে পড়েছিল সেদিনও নয়।

স্থির মানুষটি মুহূর্তে অশান্ত হয়ে ওঠে। পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে,—তরলা তুমি আমাকে প্রতারণা করেছো। তুমি মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছো। এ আমি কি হয়েছি। আমি তো আর মানুষ নই তরলা। আগুনে আমার মুখটা কেমন করেছে বল। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। আলো নেই ঘরে? আমি যে অন্ধ হয়ে গেলাম তরলা।

অশান্ত মানুষটি ধীরে ধীরে চেয়ারের ওপর নিশ্চল পাথর হয়ে গেল। যেন এক-টুকরো সাদা কাগজ আগুনে জ্বলে কালো হয়ে গেল। এঁকে-বেঁকে শীর্ণ বিবর্ণ এক-ফালি ছাই হয়ে ফুরিয়ে গেল। চোখদুটো শুধু জ্বলছে। মরা ছাইয়ের বুকে আগুনের শেষ ক্ষুদ্র দুটি কণা যেন জ্বলছে-নিভছে।

বিনোদবিহারীকে কিন্তু বাঁচতে হলো। বিছানায় শুয়ে জানলার ওপাশে আকাশ দেখে দিনভরে। পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে তরলা। সারা শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। তরলা বোধহয় কাঁদছে।

বিনোদবিহারী অফুরন্ত মৌনতা ভেঙে বলে,—তরলা, আমার পথ আমি খুঁজে নিয়েছি। অন্ধকারের মধ্যে আলো আমি দেখতে পেয়েছি। দুঃখ করো না তুমি। আমি শুধু বেঁচে থাকবো না, সুন্দর জীবন যাপন করবার নিশানা আমি পেয়েছি।

বিনোদবিহারী প্রথমে ম্যাকবেথ-এ হাত দিল। সেক্সপীয়ার-এর অমর নাটক অনুবাদ করবার দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিলে।

কিছুটা পড়া। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অভিনয় করা। কলম টেনে নেওয়া। লেখা তারপর। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অসুস্থ বিনোদবিহারী অস্থির হয়ে পড়ে। সুন্দরকে সে সাজাবে। নিজেকে সে প্রকাশ করে দেবেই।

অরুণ একটু থামলো। উল্টোদিকের সোফাতে অপর্ণা স্থির হয়ে বসে আছে। ক্লান্ত শরীর। শান্তির স্তূপ নেমে এসেছে চোখের পাতায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে।

অরুণ বলে,—আমাদের আসল বক্তব্য ফেলে অনেক দূরে সরে এসেছি। তবে অপ্রাসঙ্গিক খুব হয়তো হচ্ছে না। আপনার ভাল লাগছে তো?

—খুব ভাল। আপনার বর্ণনা সুন্দর।

অরুণ বলে,—একটা কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছি অপর্ণা দেবী, একজন তবলচী ঠিক এই সময় বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে এদের সঙ্গে। তরলা গান করতো, বোধহয় নাচতো-ও। আপনাকে আমার বন্ধুর কথা বলেছি, তার সহপাঠিনী যিনি নাটকের ওপর গবেষণা করতে করতে বিনোদবিহারী ও তরলাবালার এই আখ্যান উদ্ধার করেন; তাঁর সঙ্গে তবলচীর দেখা হয়েছিল। সামান্য কয়েক বছর আগেকার কথা। ভদ্রলোকের বয়স তখন শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। তবলচীর নাম চিন্তাহরণ দাস।

অপর্ণার মনের ওপর আচমকা এক বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। আকস্মিক শিহরণে শরীরটাও হয়তো কেঁপে উঠেছিল।

অরুণের দৃষ্টি এড়ায় নি। বোঝে নি কিছুই, তবু একটু অবাক হয়। অল্পক্ষণ পর বলে,—অতিবৃদ্ধ এই চিন্তাহরণ দাসকে ভদ্রমহিলা কিভাবে আবিষ্কার করেন আমার জানা নেই, তবে এই মানুষের বিগত জীবন অনুসন্ধান করে গবেষণার দু-একটি অমূল্য তথ্য ভদ্রমহিলার হাতে আসে। যাক এবার আসল কাহিনীতে আসা যাক।

দাবানলে ভস্মীভূত বনাঞ্চলের পোড়ামাটি ভেদ করে বর্ষার পর যেমন সবুজ জীবনের পদধ্বনি শোনা যায় ঠিক তেমনি শ্রীহীন, সর্বস্বান্ত মৃত বিনোদবিহারীর আবার যেন নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো।

তরলাবালা বুঝতে পারে বিনোদবিহারী এক দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছে। তার [illegible] কলম থেকে কাগজের ওপর ঝরে পড়ছে।

একমাত্র চিন্তাহরণ দাস আসে। তরলার কণ্ঠের সঙ্গে, পায়ের ঘুঙুরের সঙ্গে তবলার সঙ্গত করতো। বিনোদবিহারীর অনুরোধে তরলা এখনও ও দুটো ছাড়ে নি। ছায়ার মত বিনোদবিহারীর পাশে পাশে থাকে তরলা। এটা-সেটা এগিয়ে দেয়। অতি সামান্যই মাথাতে নেয় তবে বুঝতে পারে বিনোদবিহারী এক দুর্লভ কর্ম সম্পাদন করে চলেছে।

সমুদ্রের মৌনতা কিন্তু সমুদ্রের সবটুকু পরিচয় নয়। ঢেউ সেখানে আসে। ফেনিল তরঙ্গরাশি শত পাকে বাহু বিস্তার করে যেমন প্লাবন ডেকে আনে অনেকটা যেন সেই নিয়মেই শান্ত, স্নিগ্ধ সুন্দর জীবনে ভয়ঙ্কর আলোড়ন টেনে আনে।

কারণ সামান্যই। তরলার অভিযোগ ছিল যৎসামান্য।

গভীর রাত্রে বিনোদবিহারী একদিন তরলাকে ডেকে তোলে। ভাবাবেগে উদ্বেলিত বিনোদবিহারীর ছিল নিতান্ত তুচ্ছ অপরাধ।

তরলা বলে,—দিনের পর দিন কি যে ছাইমাটি কর, রাতেও ঘুমুতে পারবো না তোমার জ্বালায়। শুধু লিখছোই, কি লিখছো তা তুমিই জান ভাল। শেষ আর তোমার হবে না জীবনে। লেডি ম্যাকবেথ-এর পাগলামো আমি বুঝি না, কিন্তু তোমার যন্ত্রণায় আমার মাথা খারাপ হতে বসেছে।

বরনাম জঙ্গল যেন ডানসিনান পর্বতে এগিয়ে আসছে। একদম থ হয়ে গেল বিনোদবিহারী।

কয়েক মুহূর্ত পর বিনোদবিহারী অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে,—আমি যে তোমাকে এতটা কষ্ট দিচ্ছি, এসব তো আমি কিছুই জানি না তরলা।

—নাটক করো না। তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি শুধু সান্ত্বনা চাও। অক্ষমের ফাঁকা দম্ভ আমার অসহ্য। নিজে হেরে গেছো সেই সঙ্গে আমাকে সর্বস্বান্ত করেছো। বলবো সত্যিকথা......।

বিনোদবিহারী যেন পাথর হয়ে গেল। খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে খানিকটা বাতাস এসে টেবিলের ওপরে রাখা পাণ্ডুলিপিগুলো নাড়িয়ে গেল। কয়েকটা কাগজ এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে গেল। দোয়াতটা কাৎ হয়ে গেছে একদিকে। মলিন কাপড়ের ঢাকনাতে কালি লেগেছে অনেকখানি। কালিটা ছড়িয়ে পড়ছে। যেন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আলোটাও বোধহয় লজ্জা পেল। কবার দপ্ দপ্ করে হেরিকেনটা নিভে গেল।

সামান্য সন্দেহ হলেও তরলা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় নি। সকালের পর

দ্বিপ্রহর। বেলা গড়িয়ে এলো দিন শেষে, কিন্তু বিনোদবিহারীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

চিন্তাহরণ বলে,—আমি দেখছি। জোড়াসাঁকোর ভনীবাবু নিশ্চয়ই বিনোদবাবুর সন্ধান দিতে পারবেন। ইদানীং একমাত্র ওঁর কাছেই কাগজ-পত্র নিয়ে যাতায়াত করতেন মাঝে মাঝে আমি জানি।

অপরাধীর মত তরলা বলে,—বড় সম্মানী লোক। আমার কথায় আঘাত পেয়েছেন। হয়তো আর ফিরবেন না দাসবাবু।

কথা বলতে বলতে অরুণ একটু থামলো। বিনোদবিহারী ও তরলাবালার কাহিনীতে তন্ময় হয়ে গেছে অপর্ণা। ক্লান্ত চোখদুটো ছলছলে। মুক্তার মত দু ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে ঝরে পড়ে।

অরুণ কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করে। হেসে বলে,—আপনি বড় ভাবপ্রবণ। তরলার জন্যে আপনার কষ্ট হচ্ছে। বিনোদবিহারীর কাহিনী আমাকেও যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে। কতটা বলতে পারলাম জানি না, আমার বন্ধুর হাত দিয়ে ভদ্রমহিলার এই লেখাটা আমার যখন হাতে এসেছিল, একরাত্রে আমি পড়ে ফেলি। ভদ্রমহিলার লেখায় অদ্ভুত এক্সপ্রেশন।

অপর্ণা একটু হাসতে চেষ্টা করলো। বলে,—তারপর কি হলো?

অরুণ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আপন মনেই বলে চলে,—আপনি তরলাবালা আর বিনোদবিহারীর জন্যে কষ্ট পেলেন, কিন্তু আমার কার জন্যে খারাপ লাগে জানেন? যিনি এই কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজে বার করেছেন অথচ নিজে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছেন যখন ভাবি তখন আমার খুব খারাপ লাগে। তরলাবালা আর বিনোদবিহারীর সন্ধান দিয়ে বাংলা নাট্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ঘাটিত করে তিনি বিদায় নিলেন। আজ আমি নাটক করছি, কাল কেউ উপন্যাস লিখবেন। তরলাবালা আর বিনোদবিহারী ভাঙিয়ে হৃদয়স্পর্শী ফিল্ম তুলবেন কোন চিত্র পরিচালক কিন্তু মৌলিক গবেষণা যার, ইতিহাস সে মানুষকে জীবনেও স্বীকার করবে না। তরলার চেয়ে এই মেয়েটির দুঃখ আমার মনে হয় কিছুমাত্র কম নয়। গবেষণা প্রায় শেষ করে এনেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। মারা গেলে কিছু বলার ছিল না। প্রচুর সম্ভাবনা ছিল এমন একটি প্রতিভার অকালমৃত্যুতে শোকসভা ডেকে দায়িত্ব সারা যেত। কিন্তু তিনি বেঁচে রইলেন। হয়তো সে সম্পূর্ণ দৈহিক বেঁচে থাকা। আমার বন্ধুর কাছে শুনেছি, গবেষণার সমস্ত কাগজপত্তর অন্য একজনকে তিনি দিয়ে দেন। তিনি আজ সাক্সেসফুল। জীবনে প্রতিষ্ঠিত।

অপর্ণার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছিলো। দুঃসহ আবেগে নরম বুকটা মোমের মত গলে গলে যায়। মাটির সঙ্গে মাখা যেন একাকার হয়ে যাবে।

অরুণ আবার শুরু করে,—কিন্তু নিতান্ত দুঃখের কথা ভদ্রমহিলা যে ভদ্রলোককে এই গবেষণা দিয়েছিলেন তিনি পুরোপুরি জিনিসটার মর্যাদা দিলেন না। গবেষণা তিনি শেষ করেন নি। বগলদাবা করে ঐ পাণ্ডুলিপি য়্যুনিভারসিটিতে জমা দেন। বিনোদবিহারীকে তিনি আর খোঁজেন নি, তরলাবালার সন্ধানের কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নি। তাতেও ডি ফিল নির্বিঘ্নে মেরে বসা সম্ভব হলো।

—তরলার আরও কথা জানা গেছে নাকি? বিনোদবিহারীর সন্ধান কেউ পেয়েছেন?

—সেই কথাই আপনাকে আমি বলতে চাই। তরলাকে ফেলে বিনোদবিহারী চলে গেল। তবলচী চিন্তাহরণ দাসের আনাগোনাও কমে গেল। তরলাবালা অন্য আর একটি নাম নিয়ে আবার রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে। চিন্তাহরণ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো সে সময়ে তরলার একদমই ছিল না। স্টেজে লখিন্দর কতটা উৎরোলো জানা নেই, কিন্তু তরলা বেহুলার ভূমিকায় অভিনয় করে অতুলনীয়। বিষ ও অমৃত তরলাকে সমানভাবে স্পর্শ করেছে। বেহুলাকে তরলা হয়তো ঠিক চিনেছিল।

এমন সময় অদ্ভুত এক যোগাযোগ। দক্ষিণেশ্বর থেকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন অভিনয় দেখতে এলেন। চাঁদ সওদাগর দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হন নি কিন্তু বেহুলার অভিনয় দেখে তাঁর হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়। তরলার মাথায় হাত রেখে শুধু বললেন,—এ মা তুই কি দেখালি। আসল-নকল সমান দেখলাম। করুণাময়ীর আশীর্বাদ তুই পেয়েছিস। তুই যে সাক্ষাৎ দেবী।

কি অসম্ভব স্পর্শ। কি অত্যাশ্চর্য অনুভূতি। এত সুখ, এত শান্তি। নির্মল স্বর্গীয় সুখানুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে তরলাবালার যেন জ্ঞান ফিরে এলো। নিজের ওপর অফুরন্ত শ্রদ্ধা আসে। দুর্লভ শান্তির অবিশ্রান্ত ধারা যেন অমরাবতী থেকে ঝরে নামে।

বৃহত্তর জীবনের হাতছানি দেখেছে তরলা। পেছনের সবকিছু আকর্ষণ যেন শূন্য হয়ে গেল। পাদপ্রদীপের জোরালো আলো আর নজরে এলো না। সুন্দর স্বাস্থ্যের বঙ্কিম রেখাগুলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবারও দেখবার ইচ্ছে করলো না।

তরলাকে আর পাওয়া গেল না। শান্তির জন্যে ব্যাকুল হৃদয় মানুষের কোলাহল ছেড়ে চলে গেল।

তারপর তরলাবালার দেখা মেলে নি, আবির্ভাব ঘটেছে। পাদপ্রদীপের সামনে তার চঞ্চল ভ্রূভঙ্গি আর দেহভঙ্গীর বিভ্রম দেখে দিনের পর দিন কয়েক গিনি কবুল করেছেন যাঁরা, তরলাকে আর তাঁরা চিনতে পারেন নি।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট। উষার আলোর হদিশ মিলেছে হয়তো হবে, কিন্তু বেণীমাধবের ধ্বজার পাশ দিয়ে অজস্র পায়রার ঝাঁক নেমে আসার অনেক আগে, মারাঠী ব্রাহ্মণের ভৈঁরোর মিঠে আলাপ নিস্তব্ধ পাতলা ফালি ফালি সিঁড়ির ওপর নুয়ে পড়বার যখনও অনেক দেরি ধীর পদক্ষেপে আলো-আঁধারীর মধ্যে নীরব জনশূন্য গঙ্গার তীর বেয়ে এক রমণীর আবির্ভাব হয়। আবার আলোছায়ার মধ্যেই সে সিক্তবসনা নারী হারিয়ে যায়। রেখে যায় শুধু স্পষ্ট শীতল সুন্দর ক্রমশ বিলীয়মান পদচিহ্ন। তারপর বহু মানুষের পায়ে পায়ে সেটুকু হারিয়ে যায়। হঠাৎ কখনও কারো নজরে এলে অবগুণ্ঠনে ঢাকা রহস্যময়ী এই নারীর দিকে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

মহা অষ্টমী। কাশীতে সেদিন বড় ধুম। মন্দিরে পুজো দিয়ে তরলাবালা ফিরছিল। পুণ্যার্থী বহু মানুষের আসা-যাওয়া। বহু দূর দূরান্ত থেকে আসা, পথে বিভিন্ন জাতের মানুষ। প্রকৃত তীর্থক্ষেত্র।

পথের দুধারে সারি সারি মানুষ অর্ধ-উলঙ্গ, মলিন পোষাকের মানুষ। বিকলাঙ্গ দেহ। চলে যায়। পয়সা চায়। সজীব এক একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছিলো তরলা। প্রথমটা সম্পূর্ণ নিজের ভুল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। এবার কিছুটা কাছে। অতি নিকটেই।

শুধু অবিশ্বাস্য নয় যেন সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। ফুল ছিল হাতে, জপের মালা জড়ানো ছিল আঙুলে। ফুল ঝরে গেল, মাটিতে খসে পড়ে জপের মালা। দীর্ঘদেহী সেই মানুষ প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মুখের একদিকে নোংরা দাড়ি, ঝলসে যাওয়া ডানদিকটা সম্পূর্ণ উষর। শুধু চোখ দুটো আর খাড়াই নাকটার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি।

আচমকা জোয়ারের ঢেউ বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর যেমন আছড়ে পড়ে, টুকরো টুকরো হয়ে আবার ফিরে যায়—তরলার মনের ওপর অতর্কিতে এক বেয়াড়া বাতাস হু হু করে যেন ছুটে এলো। জোয়ারের ঢেউ বাঁধানো সিঁড়িতে রেখে যায় ভিজে শুকনো মালা, আর পোড়া কাঠের টুকরো। তরলার ভস্মীভূত মণিকোঠায় যেন নিয়ে এলো নতুন এক দহন। অদৃশ্য আগুন। রং নেই, তাপ নেই। শুধু দাহ।

তবু বিনোদবিহারীকে চিনতে চায় কি

তরলা। নিজেকে সংযত করে ফিরে এসেছে। সমস্ত প্রয়োজনই আজ ফুরিয়েছে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। তরলাকে আবার পথে নামতে হলো। নিজের অজ্ঞাতেই সে পথে নেমেছে। জ্বলতে জ্বলতে ছুটে এসেছে। কিন্তু ততক্ষণে বিনোদবিহারী সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। অন্য মানুষ। সম্পূর্ণ অচেনা তরলা নিজেকে আর সংযত করতে পারে নি। একে ওকে প্রশ্ন করেছে। হারানো মানুষের সন্ধান জানতে চেয়েছে। শতসহস্র ভুখা মানুষের মিছিলের মধ্যে বিনোদবিহারী কোথায় যে হারিয়ে গেছে সে সন্ধান কারো জানা নেই।

বাড়ির সামনেই এক ভাঙা মন্দির। যুগ যুগ ধরে বিশাল এক বটগাছ অনেকটা জায়গা নিয়ে আঁধার করে রেখেছে সেদিকটা। বড় স্যাঁৎসেঁতে। ঝুরি নেমেছে। লোকালয় থেকে কিছুটা তফাৎ-এ বড় নির্জন।

চৈত্রের ভরা দুপুর। তরলা ঘরেই ছিল। এমন সময় মানুষের পদধ্বনি। কয়েকটি মানুষের কণ্ঠস্বর।

একটি চেনামুখ। অপরিচিত মানুষের মধ্যে একজনের পরনে খাকি পোষাক। মাথায় শোলার টুপি।

অল্পবয়স্ক খাকি পোষাকপরা লোকটি কিছুটা এগিয়ে এসে বলে,—থানা থেকে আসছি। আপনাকে একটু আসতে হবে।

পরিচিত চেনা মুখটি দ্বিধা আর সংকোচের সঙ্গে বলে,—আপনি হয়তো চিনতে পারবেন। নামধাম হয়তো বলতে পারবেন। কাল খোঁজ করছিলেন......।

বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর ছেড়ে পথে নেমে আসে তরলা। জমি দুলছে। দৃশ্যমান জগতের সবকিছু যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। সামনেই সেই বটগাছ। ঝুরি নেমেছে। ভাঙা মন্দির আড়াল করে রেখেছে অনেকখানি। কোন কিছু নিয়ে ছোট্ট একটা জনতা।

সবাই কেমন চমকে উঠলো। শুধু পরিবর্তন হলো না তরলার। তড়িতাহত মানুষের মত স্থির। পাথরের মত নিশ্চল।

সেই চোখ, সেই নাক। নোংরা দাড়ি একদিকে। পুড়ে যাওয়া অন্যদিকটা সম্পূর্ণ ঊষর। ঠোঁটের আগায় অল্প একটু হাসি। সুখ দুঃখ হাসি কান্না মন্থন করে গোটা দুনিয়ার সামনে বিনোদবিহারী এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি রেখে গেছে।

খাকি পোষাকপরা থানার লোকটি তরলাকে প্রশ্ন করে,—আপনি চিনতে পারেন?

তরলা নিরুত্তর।

—এই লোকটাকে আপনি জানেন?

তরলা নির্বিকার।

—এঁর পরিচয় আপনার জানা আছে?

তরলা তখনও নীরব।

—ইনি আপনার কেউ হন। এঁর নাম জানেন?

ঠোঁট কাঁপলো না। চোখের পাতা পড়লো না। ধীর সংযত কণ্ঠ—নাম আমি মুখে আনতে পারবো না। দিন লিখে দিচ্ছি।

চৈত্রের ভরা দুপুর। সমস্ত ধরিত্রী স্তব্ধ। গঙ্গায় জোয়ার আসছে। একটা নোঙরহীন নৌকো দুকূল ছাপিয়ে ওঠা ফেনিল জলোচ্ছ্বাসে উধাও হয়ে গেল। রেখে গেল ঘূর্ণি। ক্রমশ বিলীয়মান ভয়ঙ্কর আবর্ত।

অল্পক্ষণের নীরবতা। অরুণ অল্প হেসে বলে,—আমার নাটকের আসল উৎস শুনলেন। আমি শুধু নাম পাল্টেছি। মালিনী তরলাবালাকে ছোট করে নি, কালীপদ বিনোদবিহারীকে খাটো করে নি। তবে কাশীর ঘটনা, রামকৃষ্ণের সঙ্গে তরলার দেখা হওয়া ও নাটকীয়ভাবে বিনোদবিহারীর আবির্ভাব ওটুকু আমার নিজের। এবার আপনার বক্তব্য বলুন।

অপর্ণা বলে,—রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তরলার দেখা হওয়া থেকে বিনোদবিহারীর মৃত্যু পর্যন্ত ভয়ানক বেশি নাটকীয়। এ অংশটা আপনি বাদ দিন অরুণবাবু।

অনেকটা আশা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল অরুণ। মতামত জানতে চেয়েছিল হাসতে হাসতে। কিন্তু অপর্ণার জবাবে হোঁচট খেলো। বাধা নয়, আচমকা আঘাত পেল।

অরুণ তারপর অদ্ভুত ব্যবহার করলো। হঠাৎ বোধহয় সে আবিষ্কার করে যে সময় নষ্ট করছে। নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে অপর্ণার সঙ্গে আলোচনা যেন তার অন্যায় হয়েছে। শেষ দৃশ্যটি নিয়ে অপর্ণার সঙ্গে আলোচনা করবার কোন অর্থ হয় না।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অরুণ। বলে,—বেশ রাত হয়েছে। আজ এই পর্যন্তই থাক। আপনাকে আমি পৌঁছে দেব।

পর্দা সরিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অরুণ।

অপর্ণা অন্য কথা ভাবছিলো। অরুণকে তার এই গবেষণার কাহিনী সমীরই দিয়েছে। পলিটিক্যাল এজিটেটর যখন। নিশ্চয়ই সে ছাড়া কেউ নয়। মনে পড়ে সমীর তার পাণ্ডুলিপি পড়েছিলো। এ প্রসঙ্গে আলোচনাও সে করেছে বহু। কিন্তু অরুণ শেষের দৃশ্যের ঘটনাগুলো পেল কোথায়? রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তরলার সাক্ষাৎ হয়েছিলো? বিশ্বাস হয় না। অরুণ নেহাৎই নাটকের খাতিরে অবাস্তব আর কল্পনাপ্রসূত ঘটনার আশ্রয় নিয়েছে।

একবার মনে হয় অরুণকে সব খুলে বলে। তরলাবালা আর বিনোদবিহারী যে অপর্ণারই আবিষ্কার অরুণ সে কথা জানুক। ইচ্ছে হয় হাতজোড় করে বলে,—অরুণবাবু, তরলাবালা আমার বিনোদবিহারী আমার আবিষ্কার। আপনি নাটকের খাতিরে এঁদের যথেচ্ছ ব্যবহার করবেন না। আপনি কুশ্র্যাদার্সের বড় সাহেব। লে-আউট বোঝেন। আর্ট ডিরেক্টরকে ধমকানোর আনন্দ নিয়ে বেশ তো সুখেই আছেন। ছবির টোন-টোন বোঝেন। তুলি আর রঙের ব্যবহার আপনার ভালই জানা আছে স্বীকার করি কিন্তু রঙ্গমঞ্চ আর পর্দার আপনি কি জানেন? নিজের রাজ্যে সম্রাট থাকুন। ঘণ্টা বাজালে ঠাণ্ডা ঘরে গিয়ে কুর্নিশ করতে পারি, কিন্তু আমার শান্ত কুটীরে এ আপনার কী অন্যায় চৌর্যবৃত্তি?

পরমুহূর্তেই মনে হয় অরুণ তো কিছু গোপন করে নি। মালিনী আর কালীপদ যে তার মৌলিক চরিত্র নয় সে তো স্বীকার করেছে। চিনতে হয়তো পারে নি কিন্তু তরলার চেয়েও অপর্ণাকে সে শ্রদ্ধা জানিয়েছে অনেকখানি।

অন্য আর একটা প্রসঙ্গ অপর্ণার সে চিন্তাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তরলার মিথ্যে সাক্ষাৎ আর কাশীর অবাস্তব কাহিনী শেষ দৃশ্যে জুড়ে নাটক হয়তো ভালই হয়েছে তবে মৌলিক গবেষণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে।

অপর্ণা অন্য দিন হলে হয়তো আপত্তি করতো। ঠিক আপত্তি নয় এড়িয়ে যেত। কিন্তু একটার পর একটা চিন্তা এমনভাবে তাকে পেয়ে বসে, বিপর্যস্ত করে তোলে যে অরুণের কথা সে ভাল করে শুনতে পায় না। যন্ত্রচালিতের মত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গাড়িতে উঠে বসে।

একটা কথাও নয়। অপর্ণা ভয় পেয়েছিলো, অরুণ একবার অন্তত তাকে মালিনী করবার অনুরোধ করবে।

অরুণ সেদিক দিয়েই গেল না। মালিনীর কথা নয়। অপর্ণার সুবিধে অসুবিধের কথা নয়। পূর্ব আলোচনার জের টেনে তরলাবালা বা বিনোদবিহারীর কথা উঠলো না। শেষ দৃশ্যের ঔচিত্য সম্পর্কে অরুণ আশ্চর্য-রকম মৌনতা অবলম্বন করলো। সামনের দিন অপর্ণা রিহার্সালে আসবে কি না সে প্রসঙ্গে অরুণ তিলমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না।

অপর্ণার নির্দেশমত অরুণ গাড়ি রাখলো। অসম্ভব রকম নির্লিপ্ত। শুধু ঠোঁটে সামান্য হাসলো।

আলো আঁধারীর মধ্যে হাসিটুকু অপর্ণার নজর এড়ায় না। নিতান্তই চেনা হাসি। অরুণের অফিসের তোলা হাসি। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরার পেশাদারি ঠাণ্ডা হাসি।

ফেরবার পথে নিজের ওপরই অরুণ অসন্তুষ্ট হয়। ভাবে ঘরে তার সঙ্গে শেষ সংগীত নাটক নিয়ে আলোচনা করবার কোন অর্থ হয় না। তরলাবালা আর

বিনোদবিহারীর আহ্বান অপর্ণার কাছে এত জোর করে বলে-সময়ই নষ্ট হয়েছে শুধু।

॥ দুই ॥

টুক্লা দাসকে হিমানীশ নিয়ে এলো একদিন। চেহারায় বেশ ঝিলিক আছে। কণ্ঠস্বরটি ঝরঝরে, পরিষ্কার। অরুণ পরীক্ষা নিলে। অল্পকথায় মালিনী চরিত্রটা বর্ণনা করলে। তারপর হেসে বলে,—আপনি রেগুলার আসতে পারবেন তো? এর আগে অভিনয়-টভিনয় কোথাও করেছেন নাকি?

ম্যানিকিওর করা আঙুলে নিরীক্ষণ করতে করতে টুক্লা দাস বলে,—বলবার মত এমন কিছু নয়। কলেজে আর ক্লাবে সামান্য কিছু করেছি। তাও আবার ইংরেজী। শখ আছে, তবে ভাল অভিনয় করতে পারবো মনে করি না। শেখার আমার খুব ইচ্ছে। বিয়ের পর হতে হলো বনবাসী। মাসখানেক কলকাতায় এসেছি। সন্ধ্যের পর এত খারাপ লাগে। হিমানীশবাবু বললেন, তাই এলাম আপনাদের এখানে।

রসিকতা করে অরুণ বলে,—বিয়ের পর বনবাসী হলেন কেন, দশরথ আপনার পিছু নিয়েছিলো। নাকি?

ঠাট্টায় যোগ দেয় টুক্লা। বলে,—দশরথ নয়, দস্তুরমত মন্থরা। চোদ্দ বছর নয়, বনবাসে ছিলাম বছর তিনেক।

এখানে কিছুটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। টুক্লা হাল আমলের সীতা নয়। বাপের বাড়ির সংগে জনকমুনির আশ্রমের তিলমাত্র সাদৃশ্য ছিল না।

পিতা অঘোরনাথ বোস ছিলেন আই সি-এস। তাঁর সাহেবীয়ানার দাপট শ্বেতাংগ সহকর্মীদেরও ছিল অলোচনার বিষয়বস্তু।

অঘোরনাথ বোস তখন দার্জিলিং-এর শাসক। একমাত্র মেয়ে টুক্লা ফিরিঙ্গি স্কুলে বড় হয়েছে। সিনিওর কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়ে পাহাড়ে এলো একদিন।

টুক্লা কিছুটা সাদাসিধে ভাল মানুষ। ফিরিংগী স্কুল-কলেজের 'ম্যানার্স' আর 'এটিকেট' তার চালচলন, হাত পা নাড়া, ইংরেজী উচ্চারণ বড়জোর মাথার চুল পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। অতি পরিচিত 'টুকু-টুকু' ভাবটা ওর চরিত্রে অম্লান ছিল।

মিসেস বোস কিন্তু প্রথম থেকেই মেয়েকে চলে সাজাতে চাইলেন। টুক্লা যেদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অনাদি রক্ষিতের স্ত্রীর হাতে আলতা পরে এলো সেদিন রাগে তাঁর বাকশক্তি লোপ পেতে বসেছিল।

অল্পদিনেই টুক্লা নিজেকে মানিয়ে নিল। কনজারভেটর-অব-ফরেস্টস-এর স্ত্রীকে বলতে হবে 'আন্টি' কিন্তু ডেপুটির স্ত্রী সর্বসময়ই 'মাসিমা'। টপকে টপকে প্রোমসন পেয়ে শেষ বয়সে যিনি এস পি তাঁকে মেসোমশায় বললে ক্ষতি নেই কিন্তু তেইশ বছরের এতটুকু ছেলে অনিল চৌধুরী ঠ্যাঙ উঁচু করে চুরুট ফুঁকতে বসলেও আপত্তি করবার উপায় নেই। কারণ অনিল চৌধুরী, আই পি এস।

সেবার বড় দুর্দিন। বেশ ক'দিন ধরেই দুর্যোগ। পাহাড়ের কোল বেয়ে ধস নেমেছে। ক্ষয়ক্ষতি বহু। প্রাণহানিও বড় কম হলো না।

জায়গাটা ছিল শুখিয়াপোখরী। বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে অঘোর বোস সন্ধ্যের পর ডাক বাংলোতে ফিরে এলেন। সংগে টুক্লা। সারাদিন শুধু ঘুরেছেই।

রজত দাসের সংগে টুক্লা'র এখানেই আলাপ। পোর্টিকোর বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে অঘোর বোসের সংগে বিশেষ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রসংগ ছিল ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ।

রাত্রে একসংগে ডিনার খাওয়া। সেইসংগে আরও কথা। বেহিসাবী বাজে কথাও। ঘরে ফিরে এসে অঘোর বোস মন্তব্য করেছেন,—রজত একটা জিনিয়স, গভমেণ্ট সার্ভিসে এসে ভুল করেছে। ফরেস্টস সার্ভিসে না এসে বটানীর প্রফেসর হলে রজতকে মানাতো।

টুক্লা বলে,—মিঃ দাস খুব সিরিয়স লোক। ফ্লোরা-ফণা খুব ভালবাসেন।

লোকালয় থেকে কিছুটা তফাৎ ছিল ডাক বাংলো। চারদিক ছিল নিস্তব্ধ। টুক্লার ঘুম হয় নি সে রাত্রে। সারা রাত রজত দাসের কথা ভাবতে বড় ভাল লাগলো।

প্রভাতের রাঙা আলোতে রজতকেও কিছুটা অন্যরকম দেখালো। সবুজের গায়ে হেলান দিয়ে আগুন ছিটানো খুটিয়া ফ্রাণ্ডোসা'-র রক্তিম শোভা দেখেছে রজত নয়ন ভরে, কই কখনও তো মন তার এভাবে রাঙিয়ে তোলে নি।

দুঁদে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর অঘোর বোস কিন্তু কল্পনাও করতে পারেন না। রজতের ডায়রীতে অবশ্য লিখেছেন, বড্ড বেশি হেড-কোয়ার্টার্স-এ থাকছে। টুর বড়ই কম করছে, ইত্যাদি। কিন্তু ম্যাল আঁকড়ে বসে থাকবার প্রকৃত কারণ তার সম্পূর্ণ ছিল অজ্ঞাত।

টুক্লা একদিন মাকে বেপরোয়া হয়ে বলে দিল,—রজতকে আমি বিয়ে করবো। সে এ প্রসংগে কথা বলতে চায়।

মোটা বই ছিল হাতের কাছেই। মিসেস বোস সেটি আলগোছে হাতে টেনে নিলেন। হয়ে গেলেন। পেন্সিলে আঁকা ভ্রূ বাঁকা পাঁজি নয়—সিভিল লিস্ট। একদম যেন বোবা ছুরির মত লাফিয়ে ওঠে,—গুড লর্ড! বারশো তে শেষ তোর গলায় দড়ি জোটে না টুক্লা।

সব শুনে থ হয়ে গেলেন অঘোর বোস। স্ত্রীর উদ্বেগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলেন। বললেন,—পে স্কেলের ওপর হাত নেই। তবে ডেরাডুনে ছোকরা থার্ড হয়েছিল। সিভিল লিস্টে পজিশন ওর ভালই। প্রমোশন আছে তাড়াতাড়ি কিন্তু রজত যে সিডিউল কাস্ট। আমি কি মরে গেছি নাকি।

টুক্লাকে চালান করা হলো পুণা। খাকীপরা মিলিটারী মেসো সান্টাক্রুজে এসে নামিয়ে নিলেন। অঘোর বোসের মোক্ষম এক ডি-ও। 'ইন দি ইণ্টারেস্ট অব পাবলিক সার্ভিস' রজতকে অধঃপাতে নামতে হলো। পাহাড় ছেড়ে মাটিতে। দারজিলিং থেকে কেষ্টনগর বদলী হয়ে গেল রজত:

অঘোর বোসের হিসেবে ছিল [illegible] প্রতি টুক্লার [illegible] সাময়িক দুর্বলতা। খাকীপরা মিলিটারী মেসোর নিখুঁত [illegible] টেবিল টুক্লার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেবে।

মিসেস বোস বললেন,—দোষ [illegible], রজতকে এত বেশি জিনিয়স, জিনিয়স বলেছো, টুক্লাকে এত বেশি মিশতে দিয়েছো, আমি কিন্তু কোনদিনই রজতকে বড় ভাল চোখে দেখে নি।

অঘোর বোস বলেন,—আমি ভাবতেই পারি নি রজত এতটা সিলি হবে। আর কালো পাঁচ ফুট রোগা জিনিয়সটা টুক্লার যে কিভাবে ভাল লাগতে পারে আমি ভেবে পাই না।

যেভাবে ছাড়াছাড়ি করা গেল, সে নিরক্ত ছেঁড়াছেঁড়ি করা গেল না। সংবাদটা এলো আরও আকস্মিকভাবে। খাকীপরা মিলিটারী মেসো পুণা থেকে তিন পাতার এক চিঠি ঝেড়ে বসলেন। জানালেন—এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লভ এণ্ড ওয়ার। টুক্লা কী খুকী নয়, রজত ছেলেটা কি ফেলনা হলো?

ঝানু অঘোর বোস বুঝলেন তাঁর পছন্দ-অপছন্দ টুক্লাকে বড় টলাতে পারে নি। গজ-ফিতে দিয়ে পুণা থেকে কেষ্টনগরের ব্যবধান মেপে লাভ নেই। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে গৌরব কিছু বাড়বে না। দরকার হলে চাবাগানের কুলি সর্দারের সংগেও তো হেসে হেসে কাছে বসিয়ে কথা বলতে হয়। ঠিক পিতার অধিকার নিয়ে নয় অনেকটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তৃতীয় নয়ন অঘোর বোসের সক্রিয় হয়ে উঠলো।

বিয়ে বেশ ঘটা করেই হলো। টুক্লা বলে,—বাবা কেমন আশ্চর্যরকম বদলে গেছেন দেখলে।

রজত রসিকতা করে বলে,—তবু আমার সংকোচ একটু থেকেই গেল। মনে হচ্ছে তোমাদের পরিবারে আমার অবাঞ্ছিত অনু-প্রবেশ, অনেকটা শাল প্ল্যানটেশনে 'ক্যাসিয়া সাইমা'-র মত ইণ্ট্রুডার।

ঠিক গলদ নয় অনেকটা যেন ফাঁকি ছিল কোথাও। রজত কতটা জেনেছিল জানি না

কিন্তু নিজেকেই টুক্লা ভুল চিনেছিল অনেকখানি।

বাইরে থেকে রজত খুব একটা চোখে পড়বার মত নয়। মাথায় খাটো, একহারা চেহারা। চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত সন্দেহ নেই কিন্তু কপাল জুড়ে ভ্রূ। উচ্চারণে সিলেট টান। 'ওয়েস্ট বেংগল' বলতে পারে না, কথাটা ওর ঠোঁটে দাঁড়ায় 'ওয়েস্ট ব্যাংগল'। ধুতি পাঞ্জাবীতে লোকটা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, স্যুটও ঠিক মানায় না।

চেহারা বা আকৃতিগত গঠনের ওপর হাত নেই কিন্তু রজতের চারিত্রিক সংগঠনটি টুক্লা ঠিক ধাতস্থ করতে পারলো না।

রজত টুক্লাকে খুশি করবার মত হাতে পায়ে আফসারী কায়দা জানতো না। মাকে টাকা পাঠানোর আগে টুক্লার সংগে যে পরামর্শ করতে হবে এসব সে ভাবেই নি। তাছাড়া চুপচাপ ভাল মানুষের মত অল্পকথা বলা আর অপরের সব কথাতে মৌন সায় দেওয়ার মধ্যে ছিল অফুরন্ত নির্লিপ্ততা। নিজে যেটাকে ঠিক বুঝবে সেটুকু সে করবেই। টুক্লা মনে করেছিল ওঠা রজতের দুর্বলতা। সোসাইটীতে মেশে নি তাই কিছুটা মুখচোরাও।

বিয়ের ক'মাস পরের কথা। রজত একদিন অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করলো,—তোমার বাবার সংগুণ থেকে তুমি বঞ্চিত কিন্তু মায়ের চরিত্রকে তুমি প্রায় ধরে ফেলেছো। সহ্য করতে না পার দূরে থাক, কিন্তু উপেক্ষা করবার অধিকার তোমার নেই। স্বামীকে টপকে টপকে কথা বলাতে যে স্ত্রীর গৌরব বাড়ে তা আমি তোমার কাছেই দেখছি। দোষ আমারও, আমি ভুল করেছি। কিন্তু আমার কি দেখে তুমি ভুললে?

পেয়ালার গায়ে চামচের আক্ষেপ-বিক্ষেপ তুলে টুক্লা তার জবাব দিল। চায়ের কাপটি রজতের দিকে এগিয়ে দিয়ে ছোট্ট করে একটু তাকালো। আরও অল্প একটু হেসে বললো,—কমপ্লিটলি হ্যালিউসিনেশন।

সম্পূর্ণ মিথ্যেকথা। রজতের অভিযোগও পুরোপুরি সত্য ভাবণ নয়। এমন কাটা-ওয়ালা, এবড়ো-খেবড়ো এ্যাবস্ট্রাক্ট একটা চাহিদা নিজের অজ্ঞাতেই বেড়ে উঠেছিল সে হদিশ টুক্লার সম্পূর্ণ ছিল অজ্ঞাত। তুচ্ছ ছোটখাটো কথা ধরে মনে পৌঁছোতে গিয়ে রজতও টুক্লাকে বার বার ভুল বুঝল। অসামঞ্জস্য যদি বা কিছু থেকে থাকে তাতে অঘটন কিছু ঘটবার নয়। সে অসংগতি শোধরানো চলে। আগুন জ্বলে আর পোড়ায় তারপর ছাই হয়ে মরে যায়। কিন্তু অদৃশ্য আগুনের দাহ শুধু দহন করে। সে মরে না। রজতের শরীর থেকে টুক্লা পেল শুধু দাহ। চর্মরোগের ওষুধ আছে কিন্তু চরিত্রের এই এলার্জির হয়তো কোন চিকিৎসা নেই।

তাই টুক্লার আজ জ্বলতে জ্বলতে ছুটে চলা। আজ শিকার, কাল হাতী খেদা। মুক্তির শখ। দূরেপাল্লার মোটর দৌড়ের বাতিক। টুক্লার আজ অফুরন্ত এণ্ডিওরেন্স ট্রায়াল।

হয়তো কিছুটা সেই কারণেই আজ হিমানীশের সংগে আসা। নাটকও আজ তার ভাল লাগা। অরুণের সব কথাতেই সায় দিয়ে যাওয়া। মালিনী তার করতে চাওয়া।

প্রথম দিন মহলা খুব একটা জমলো না। মালিনী নিয়ে মহাসমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, টুক্লা আসাতে সবাই একটু নড়েচড়ে বসলো।

এক এক করে সবাই গেল। টুক্লার বাড়িতে আজ অতিথি আসবেন, তিনিই হোস্ট তাই তাঁকে আগেই যেতে হলো। অরুণের মুখোমুখি হিমানীশ। ছাইদানে তার সিগারেট পুড়ছে।

টুক্লার প্রসংগ তুলে অরুণ বলে,—কি রকম বুঝলে। এঁকে দিয়ে মালিনী হবে?

হিমানীশ বলে,—চেপে রিহার্সাল দিতে হবে। মনে হয় তুলে নেবেন, তবে অপর্ণার মত মালিনী তুমি চট করে পাবে কোথায়। অপর্ণার সবচেয়ে বড় হয়ে......

অরুণ হাত নেড়ে হিমানীশকে থামিয়ে দিল। বলল—তোমারা সবাই দেখছি খুব অপর্ণার ভক্ত হয়ে উঠছো। অবশ্য আমি মানি প্রতিভা না হলেও অভিনয়-দক্ষতা তার যথেষ্ট। মালিনী চরিত্রটা ধরতেও পেরেছিলেন বেশ কিন্তু এই রকম আন-উইলিং এলিমেণ্টস নিয়ে কাজ হয় না। ভদ্রমহিলার কমপ্লেক্স প্রচুর। এঁদের দিয়ে আর যাই হোক নাটক হয় না। এভাবে আমাদের বসিয়ে দেবার কোন অর্থ হয়।

সেদিনের কথা অরুণ কিন্তু সম্পূর্ণ গোপন করে গেল। হিমানীশ যে আসনে বসে আছে, সামান্য ক'দিন আগে অপর্ণা একা এসে ওখানেই বসেছিল অনেকক্ষণ সে কথা অরুণ একবারও তুললো না। তুচ্ছ অজুহাত নয়, নাটকের শেষ দৃশ্যের সংগে অপর্ণা যে একমত হতে পারে নি সে প্রসংগ অরুণ সম্পূর্ণ চেপে গেল।

॥ তিন ॥

এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল ঘুরে পাশের ঘরে ঢোকবার সময় প্রায় মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। সামান্য একটু চোখে হেসে দরজাটা পেরিয়ে আসা গেল না। অরুণ অল্প একটু হেসে বলে,—কেমন দেখছেন?

ছবির প্রদর্শনীর আকর্ষণ অপর্ণার কাছে সামান্যই। বিখ্যাত বহু ছবি সে আজও চেনে না। নামও শোনে নি অনেকের। মিউজিয়াম হাউসে শিউলী মিত্রের ছবির প্রদর্শনী দেখতে আসা যতটা শিউলীর জন্যে, ছবির খাতিরে ততটা নয়।

অপর্ণাই আলাপ করিয়ে দিল,—আমার বন্ধু শিউলী মিত্র—শিউলী তুমি নিশ্চয়ই নাম শুনে থাকবে, আলাপ নেই হয়তো—অরুণ মুখার্জী।

লজ্জায় যেন ভেংগে ভেংগে পড়লো শিউলী মিত্র। দুহাতের মধ্যে অল্প একটু নমস্কার। প্রসারিত দৃষ্টিতে অপ্রস্তুতের ভাব। বললো,—আপনি যে আমার এখানে এতক্ষণ এসেছেন ভাবতেই পারি নি। ওঘরের ছবিগুলো দেখলেন?

চোখ বন্ধ করে অরুণ ছোট মন্তব্য করলো,—অপূর্ব। রং-এর ব্যবহার আপনার খুব সংযত, তের নম্বর ছবিটা আমার খুব ভাল লাগলো।

অপেক্ষাকৃত কিছুটা তফাৎ-এ দাঁড়িয়ে টুক্লা। অরুণের সংগেই তার ছবির প্রদর্শনীতে আসা। অপর্ণা প্রথমটা বুঝতে পারে নি। কিছু লোক ছবি দেখছেন দেওয়ালে ঘুরে ঘুরে, শুধু টুক্লা একদৃষ্টে অপর্ণাকে দেখছিল। এ তরফ থেকে বিশেষ কোন সাড়াশব্দ না পাওয়ায় এগিয়ে এলো। অরুণ পরিচয় করিয়ে দিল।

অল্পকথাতেই বোঝা গেল ছবি টুক্লা বেশ ভালই বোঝে। টুক্লার চেহারায় এক ঝিলিক আছে সত্যি, কিন্তু চিলকে চিলকে ওঠবার পেছনে প্রসাধন আর বেশভূষার যথেষ্ট হাত ছিল। শিউলী হয়তো রঙের কম্পোজিশন দেখছিল। অপর্ণা ঠিক দেখছিল না ভাবছিল।

টুক্লার পরণে হাতীর পেছনে হাতীর অবিরাম পিছু নেওয়া আগুনে রঙের সিল্কের শাড়ি আঁটো করে দেহের সংগে লেপটানো। পেটিকোটের সিল্কের লেসের অনেকটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পরিপুষ্ট নিম্নাংশ যে পরিমাণ আঁটো পাক খেয়ে ঘুরে এসে আঁচল কাঁধের কাছে খাটো হয়ে গেছে। ব্লাউজের হাতা নেই। সুডৌল উলংগ হাত দুটো কাঁধ থেকে নেমে এসেছে। শুধু শৈশবের বেরসিক টিকেওয়ালীর দেওয়া দুটি বড় বড় গভীর দাগ দেখতে বড় বেমানান। ব্লাউজের বহরে মিতব্যয়িতায় বিশেষ ক্ষতি ছিল না কিন্তু দুঃসাহসী ধারালো কাঁচির অমিতব্যয় দেখলে ভয় হয়। বর্ষার দিনে পাঁচতলার ফ্ল্যাটবাড়ির নোনা ধরা কার্নিশের ওপর হেঁটে যাওয়ার মত ব্লাউজের কাঁধের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে নেমে যাওয়া দেখলে কেমন পা শির শির করে।

সতের নম্বর ছবির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে টুক্লা বলে,—দার্জিলিং-এ আমি ছিলাম তাই ছবির খুঁটিনাটি আমার আরও ভাল লাগছে। ঐ নেপালী মেয়েটা চৌ চৌ বেচছে, পাশে তোংবার পিপাসিং ঠোঁটে নিয়ে নেপালী ভুটিয়া—টিবেটিয়ান মুখগুলো চমৎকার এসেছে। রঙ-এর ব্যবহার এত স্পষ্ট স্যাঁৎসেঁতে দিনের আবহাওয়াটা এসেছে

সুন্দর। ক্লোদ মনে-এর আঁকা বিখ্যাত 'ফোলি-বের্জের' ছবিটার কথা মনে পড়ছে।

অপর্ণা ছবির বড় কিছু বোঝে না। তবে দৈবাৎ 'ফোলি-বের্জের' ছবিটা তার দেখা ছিল। স্মরণশক্তিও খুব খারাপ নয়, তবু সংকোচ একটু ছিলই। তবু বলে ফেললো,—আপনি হয়তো ভুল করছেন মিসেস দাস! ক্লোদ মনে-র সংগে এদুয়ার মানে-কে জড়িয়ে ফেলছেন। যতদূর জানি 'ফোলি-বের্জের' মানে-র ছবি—ক্লোদ মনের নয়।

শিউলী কথা বললো না, তবে অপর্ণার কথায় সায় দিল।

সামান্য ব্যাপার। তুচ্ছ কথাটা অতি সহজে বলা হয়তো গেল কিন্তু শোনা গেল না। টুক্লার মুখটা মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। তির্যক ভংগিতে একবার অপর্ণাকে দেখে নিল, তারপর অরুণের দিকে ফিরে তাকালো।

অরুণ চতুর লোক। প্রসংগটা এড়ানোর জন্য তাড়াহুড়ো করে তাচ্ছিল্যের হাসি টেনে বলে,—মনের সংগে এদুয়ার মানের আমারও বড় গণ্ডগোল হয়ে যায়। অবশ্য সবাই ওরা এক গোয়ালের—ফরাসী ইম্প্রেশনিস্টদের মধ্যে ক্লোদ মনে-র নামই আগে করতে হয়। তারপর ধরুন দেগা, এদুয়ার মানে, সেজান, রেনোয়ার এ'রা সবাই ইম্প্রেশনিস্ট। এই ধরুন পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট......!

থমথমে ভাবটা এলোমেলো প্রসংগ, অবান্তর কথা তুলে অরুণ কাটিয়ে তুললো।

শিউলী মিত্র দাঁড়িয়েছিল। কথাও বলছিল মাঝে মাঝে। কিন্তু মন ছিল না। চোখ ছিল দরজার দিকে।

অরুণ বললো,—নির্মল ঘটকের কাছে শুনলাম, তাই আপনার ছবি আজই দেখতে এলাম। ঘটক আপনার খুব প্রশংসা করছিলো।

শিউলী বলে,—কিন্তু কই নির্মলবাবু তো কিছুই করছেন না। বলে গেলেন, লিখবেন। খুব ভাল রিভিউ করবেন।

—ফোন করুন, কুঁড়ের বাদশা। ওকে দিয়ে কিছু লেখাতে যদি চান ফোন করুন। চেপে ধরুন। আশা করে বসে থাকবেন না!

অনেক মানুষের মধ্যে কোন এক বিশেষ লোককে দেখে শিউলী তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। সেই সংগে অপর্ণাকে বিব্রত করে গেল।

অরুণ বলে,—আপনার বন্ধুর হাত খুব মিষ্টি।

টুক্লা বললো,—টান-টোনগুলো অনেক বোল্ড।

কথায় কথায় গেট পেরিয়ে আসা গেল। অরুণ আর টুক্লার সংগ এড়িয়ে যাবার সামান্য অজুহাতও পাওয়া গেল না।

অপর্ণার সংগে এভাবে সাক্ষাৎ অরুণেরও বড় ভাল লাগে নি। সঠিক কারণ নেই তবু অপর্ণাকে এড়াতে পারলেই যেন ভাল হতো। তবে সহজে বিব্রত হবার মানুষ সে নয়। দৈবাৎ কোথাও যদি তিলমাত্র আড়ষ্টতা প্রকাশ পায় তাই হয়তো জোরে জোরে কথা বলে, অতি সহজ সরল ব্যবহারিক আটপৌরে কথা সে বলে চলেছিলো।

—আপনার নাটক চলছে কেমন?

অরুণ একটু অবাক হলো। মুহূর্তে নিজের সে মনোভাব গুটিয়ে নিয়ে ছোট হেসে বলে,—চলছে।

টুক্লা একবার ফিরে তাকালো। তারপর বললো,—শুনেছি আপনি মালিনী-র রোলটা করছিলেন, ছেড়ে দিলেন কেন?

জবাব অপর্ণাকে দিতে হলো না। অরুণ বললো,—ও'র অসুবিধে আছে।

এখানেই অরুণ থামলো না। অপর্ণাকে সমর্থনের ভংগিতে মনগড়া অতি স্থূল অসুবিধের কথা স্বচ্ছন্দে বলে গেল। অরুণকে কেমন নিষ্প্রভ মনে হলো। সে যেন কিছু লুকোতে চায়। মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তুচ্ছ এ ওকালতিটুকু না দেখতে পেলেই অপর্ণার ভাল লাগতো।

ধারেকাছে প্রয়োজনীয় কাজের অজুহাত দিয়ে অরুণের গাড়ির হাত থেকে নির্বিঘ্নে রেহাই পাওয়া গেল।

গাড়ির কাঁচ নামিয়ে টুক্লা অপর্ণার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে,—আচ্ছা আপনি কি লরেটোতে পড়তেন?

অল্প একটু হাসলো অপর্ণা। বললো,—না।

—তবে কি ডাউ-'হলে ছিলেন কখনও?

—কখনও না।

অন্য কেউ হলে কথা উঠতো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানান হয়তো দিত না কিন্তু অর্থ-পূর্ণ হাসাহাসি আর চোখের ইশারায় অনেক কিছু বলাবলি কেউ ঠেকাতে পারতো না। সবাই জানে, সবাই দেখছে কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করতে সাহস করে না।

টুক্লাকে যে অরুণ কিছু বেশিমাত্রায় প্রাধান্য দিচ্ছে স্বয়ং হিমানীশের সেটা চোখ এড়ায় নি। মহলার সময় অরুণকে ছাপিয়ে টুক্লার কিছু বলতে চাওয়া, অতিরিক্ত সাজ-পোষাক করা আর সময় সময় নাটকের নির্দেশনা নিয়ে অরুণ যখন টুক্লার মতামত মন দিয়ে শোনে হিমানীশের তখন অসহ্য লাগে।

মহলার দিন ছিল না আজ। তবু কিছু কাজ ছিল। হিমানীশকে অরুণ আসতে বলেছিল। নাটকের দৃশ্যপট আর মঞ্চসজ্জা নিয়ে আলোচনা ছিল। সেট অরুণ নিজেই আঁকবে ঠিক করেছে। সোজা আর খাড়া খাড়া ব্রাশ বুলিয়ে একমেটে করবার জন্যে মোটামুটি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন অন্য আর একজন হলেই তার চলবে।

হিমানীশ বললো,—আমার মনে হয় এ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু করার চেয়ে, চলতি নিয়ম কতটা গ্রহণযোগ্য সেটুকু ভেবে দেখা দরকার।

অরুণ বললো,—আমারও অনেকটা তাই মনে হয়। তবে কথা কি জান, দর্শকদের বেকুব মনে করবার কোন কারণ নেই। তাঁরা অনেক বেশি সচেতন আজকাল। কিছু কিছু সাজেশান—এ তোমাকে রাখতেই হবে।

অরুণের কথায় বাধা পড়লো। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো টুক্লা।

আজ অন্য কারো আসবার কথা নয়। তবু টুক্লাকে দেখে হিমানীশ কিন্তু খুব একটা অবাক হলো না।

অরুণ বললো,—আসুন! সেটের কাজে এ'কে পেলেই আমার কাজ চলবে, বুঝলে হিমানীশ। মোটামুটি কাল রাত্রে আমি চারটে সেটই কাগজে-কলমে দাঁড় করিয়েছি। মিসেস দে কাল একটা সুন্দর কথা বলেছেন, জানি না স্টেজে ডেপথ্‌ কতটা পাব—ভাংগা মন্দিরের পেছনে গংগার একটা ইম্প্রেশন যদি আনতে পারি, সত্যি সিনের টোটাল এফেক্ট খুব সুন্দর আসবে।

টুক্লা বলে,—সেটের কাজ কবে থেকে ফেলছেন অরুণবাবু?

—সামনের সপ্তাহে পর পর দিন তিনেক অফিস বন্ধ; ভাবছি সময়টা কাজে লাগাবো।

গতরাত্রের আঁকা সেটের ডিজাইন অরুণ খুলে বসলো। বিশেষ কিছু হিমানীশ বোঝে না। তবে ফুট অথবা ইঞ্চি মেপে মেপে পাইন কাঠের মোট ঘনফল অল্পক্ষণেই কষে ফেলে।

কলম পকেটে নিয়ে হিমানীশ বলে,—আমি এখন আর বসবো না। কিছু তাড়া আছে। সেটের কাজ আমার পছন্দই হলো বুলুদা।

হিমানীশ চলে গেল। টুক্লার সংগে অরুণ দৃশ্যপটের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা সুরু করলো।

টুক্লা অরুণকে মুগ্ধ করেছে। তুলনা-মূলক সমালোচনায় অপর্ণা টুক্লার চেয়ে মালিনী অনেক ভাল করতো অরুণ আজকাল আর বিশ্বাস করে না।

টুক্লা বলে,—আপনার সংগে আলাপ করে রজতের খুব ভাল লেগেছে।

—গুণী লোক, অল্প কথার মানুষ। নাটকে আগ্রহ নেই আর আপনার অভিনয় করাটা বোধহয় খুব পছন্দ হচ্ছে না।

টুক্লা কোন জবাব দিল না। শাড়ির আঁচলের উল্টো পিঠটা দেখতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে মুখটা তুলে অরুণের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বলে,—আপনি ঠিক বুঝেছেন।

অরুণ শুধু একটু হাসলো।

রজতের সংগে অরুণের দুদিনের দেখা। একদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছিল টুক্লা। আর একদিন পথেই অল্পক্ষণের দেখা। অল্প আলাপে অরুণের মনে হয়েছে,

পরিমল গাছ-গাছালি চেনেন, নিজের স্ত্রীকে ততটা জানেন নি। টুক্রাকে নিয়ে রজত শুধু শুধু ভাংগছে—গড়তে পেরেছে সামান্যই। টুক্রার শিল্পিমন—রজত কিছুমাত্র মর্যাদা দিতে পারে নি।

রজতের কথা অরুণের বেশ ভাল মনে আছে। টুক্রাকে অভিনেত্রী হিসাবে অরুণ আবিষ্কার করেছে দেখে ভদ্রলোক খুব খুশি হন নি। শুধু হেসে বলেছে—টুক্রার অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রতিভার পরিচয় আমি কিছু কিছু পেয়েছি, কিন্তু এদিকটা আমার নজরেই আসে নি এতদিন। হাউ ফ্যানি।

কথাগুলো একটু বাঁকা। একটু তির্যক। অরুণ প্রথমটা বুঝতে পারে নি। তাই বোধ হয় আগ্রহের সুরে বলেছিল,—চেষ্টা করলে মিসেস দাস সুন্দর অভিনয় করতে পারবেন। একবার যখন হাতে পেয়েছি—।

রজত আরও একটু হাসলো। ঠিক হাসি নয়, রজতের চোখেমুখে একটা কৌতূহলী রেখা ফুটে উঠলো। তারপর বললো,—পারবেন কি! আপনার সম্পূর্ণ পন্ডশ্রম হতে পারে। প্রতিভা হয়তো অন্যদিকে ধাবিত হবে ততদিনে।

একজাতের মানুষ আছে যাদের সংগে তর্ক চলে না। যুক্তিও সেখানে অর্থহীন। রজতকে অনেকটা তাদের একজন মনে হলো। আর মনে হলো, টুক্রা বড় একাকী। স্ত্রী হিসাবে এই সুন্দরী নারীটি সার্থক হয়েছে সামান্যই।

অনেকগুলো খাপছাড়া চিন্তা কাজ করছিল। টুক্রা বললো,—আপনি ভাবছেন কি অরুণবাবু?

—আপনাকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি।

টুক্রা দুষ্টুমিভরা চটুল একটু হাসলো। অরুণ ঠোঁটের হাসিটুকু আরও ভেংগে দিল। বললো,—আপনি সত্যি প্রতিভা! আই লাইক ইউ।

॥ চার ॥

নিয়মিত অফিস কিন্তু করতেই হচ্ছে অপর্ণাকে। একদিন অরুণের সংগে প্রায় মুখোমুখি দেখা লিফটে। চোখ নামিয়ে নিয়েছে অপর্ণা। বৈদ্যুতিক বোতামের জ্বলা-নেভা দেখতে অতিশয় মনোযোগী হয়ে পড়েছে অরুণ।

কাজের খাতিরে অপর্ণার আগে আগে হামেশাই ডাক পড়তো। ডাক পড়তো তুচ্ছ কথাতে, অনেক সময় অকারণেও। অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু নিয়েও আলোচনা করতে অরুণকে যথেষ্ট উৎসাহী হতে দেখা গেছে। আজকাল কিন্তু সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলছে।

দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছেই অপর্ণার ছিল। সমীরের সংগে দেখা হয় না অনেক-দিন। দুদণ্ড তার সামনে বসে গল্প করলেও অনেকটা হাল্কা লাগে। বেচারা কতটা সেরেছে কে জানে!

মিঃ সান্যাল প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন। বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একনজর তাকিয়ে নিয়ে বললেন,—বড় সাহেব আপনাকে ডাকছেন। আজকের প্রেস-ম্যাটার সব ছেড়ে দিয়েছেন তো। ধনপতির বিজ্ঞাপনের নতুন যে ম্যাটার তৈরি করেছেন সেটা নিয়েই হয় তো কথা বলতে চান। ...

একমুখো পাল্লা সরিয়ে অরুণের ঘরে ঢুকে অপর্ণা কিন্তু বুঝলো অন্যরকম। অরুণের ব্যবহারে অবাকও হলো অনেকটা। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে অরুণ একটু হাসলো। তারপর বললো,—সো ইউ আর লিভিং আস।

প্রশ্নটা এত তাড়াতাড়ি করা, কথাগুলো এত আকস্মিক, অপর্ণা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। বোকার মত তাকিয়ে রইলো শুধু।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল সম্পূর্ণ খালি। শুধু সামনে কয়েকটা ফটোগ্রাফ। একটা ব্লক পাশে কাৎ করে রাখা। অরুণ ঠোঁটের হাসিটুকু ভেংগে দিল। নড়েচড়ে বসে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর বললো,—আপনি আমাদের ওপর চটেছেন?

কথাটা আকস্মিক নয় বিভ্রান্তিকর। অপর্ণা কিছু বলতে যাচ্ছিল অরুণ বাধা দিয়ে বলে,—আপনার অসুবিধেটা কিসের! চাকরী ছাড়ছেন কেন?

অপর্ণা কেমন থ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর বিস্ময়োক্তি স্বরে পড়লো,—আমি চাকরী ছাড়ছি! এখানে আমার অসুবিধে!!

—খুব বিব্রত করলাম দেখছি।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আজকাল আপনিও খুব পরিষ্কার নন। দেখুন অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা আপনি করছেন না? কফি এক্সপ্যানশন বোর্ডে আপনি চেষ্টা করছেন না?

গোটা ব্যাপারটা আস্তে আস্তে অপর্ণার মাথাতে এলো। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায়। প্রচ্ছন্ন এক কৌতূহল চোখে নেমে আসে।

হ্যাঁ, কিছুদিন আগে কফি বোর্ডে দরখাস্ত একটা করেছি বটে, তবে এ চাকরী ছাড়ছি...!

—পছন্দমত ভাল চাকরী পেলে আপনি অন্যত্র চলে যাবেন, তাতে অবশ্য আমার কিছু বলা উচিত নয়। শোভনও নয়। আপনাকে আটকে-ই বা আমার কি লাভ। কফি বোর্ডের মিঃ সেন ফোন করছিলেন। আপনার সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। আমার যা বলবার বললাম, তাতে আপনার ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

—আমি সে কথা ভাববো কেন? দরখাস্ত সেখানে অনেকেই করেছেন। চাকরী আমার সেখানে হবেই, একথা বলা চলে না। তাই এখানকার চাকরী ছাড়ছি, ঠিক বুঝতে পারি নি প্রথমে।

নির্লিপ্ত একটু করো হেসে অরুণ হাত উল্টে বলে,—দেখুন।

সকাল সকাল অফিস থেকে বেরুনো অবশ্য হলো না তবু সমীরের সংগে দেখা করবার জন্যে বাস স্টপেজের দিকে এগিয়ে গেল।

অনেকক্ষণের পথ। বাস স্টপেজ থেকে হাঁটতেও হয় অনেকটা। ঘর চিনে আসতে কিন্তু অসুবিধে হয় না মোটেই। জানলার পাশে আকাশমণি গাছটা কিছুমাত্র ভুল চেনে নি অপর্ণা।

সমীরের উচ্ছ্বাস চিরদিনই কম। তারপর রুগ্নতা তাকে আরও নীরব করেছে। অপর্ণাকে দেখে ঠোঁটে খুশির পাতলা হাসি ছড়িয়ে পড়ে। বিছানাতে বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল। নড়েচড়ে উঠে বসলো।

অপর্ণা চেয়ারের হাতল ধরে বসতে গিয়ে বললো,—কেমন আছো?

ডান হাতের আঙুলের এতটুকু মরা চামড়া চিমটি দিয়ে তুলতে তুলতে সমীর বললো,—সে তো তোমরা বলবে! কেমন দেখছো?

—ভালই তো!

—আমি এখন ভালই আছি অপর্ণা।

সমীর আকাশমণি গাছের ওপারের সবুজ মাঠের বুকে ফালি ফালি লাল সুরকীর সর্পিল পথের দিকে চেয়েছিলো। অপর্ণা লাল কম্বলে ঢাকা শীর্ণ সমীরকে দেখছিলো।

অল্পক্ষণ পর সমীর বললো,—আজ এসে তুমি খুব ভালই করেছো। দিনটা আমার একাই কাটাতে হতো। উপানন্দ আজ আসবে না। অন্য কারো আসবারও কোন কথা নেই।

—উপানন্দবাবু ঠিক আগের মতই আছেন। দুম করে এমন সব কথা বলেন—।

মলাট ছেঁড়া একটা বই হাতের কাছেই ছিল। অন্যমনস্কভাবে তার পাতা ওল্টাচ্ছিল সমীর। একপাশে সেটি সরিয়ে রেখে বলে,—কাজের কথা আগে সেরে নিই। গল্পে গল্পে ভুলে যেতে পারি, তোমার সংগে আমার একটু প্রয়োজন আছে।

—প্রয়োজন আমার সংগে, খারাপ কিছু সংবাদ নয় তো?

—আরে না, সেসব কিছু নয়। তুমি আজ এসে খুব ভাল করেছো।

—তবু ভাল, কি ব্যাপার বল তো!

—এমন কিছু নয়, শুনলেই তুমি আমাকে থামিয়ে দিতে চাইবে। কথাটা খুব জরুরী।

—ভূমিকা দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছে, হেঁয়ালীর বড় প্রয়োজন নেই। বল, কি ব্যাপার—।

—হেঁয়ালী করবো না, তবে একটু

[illegible] বলতে হবে। আজ থেকে বছর দেড়েক আগের কথা—আমি তখন পলাতক। পুলিশের নজর এড়াবার জন্যে ক্রমাগত আস্তানা পাল্টাচ্ছি। উমানন্দর শালার কথা তোমাকে এর আগে একদিন বলেছি। ভদ্রলোক রাজনীতি করেন না— তবে বোঝেন। চাঁদা আদায় করতাম নিয়মিত। অল্পদিনেই বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আজ যে এই হাসপাতালে জায়গা পেয়েছি সে ভদ্রলোকের হাত এর পেছনে অনেকখানি। পালিয়ে পালিয়ে যখন ঘুরছি ভদ্রলোক একদিন বললেন,—আমার বাড়িতে আসুন। এমন সাহেব পাড়ায় আত্মগোপন করলে কেউ টের পাবে না। অরুণবাবুর বাড়িতেই আমি মাস তিনেক ছিলাম। তুমি হয়তো শুনে থাকবে, অরুণ মুখার্জীর নাম শোনো নি?

অপর্ণা বুঝতে পারে না সমীর হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুলছে কেন! দৃষ্টি প্রসারিত করে অল্পক্ষণ পর বলে,—আর্টিস্ট অরুণ মুখার্জীর কথা বলছো ছবি আঁকেন?

—চিনেছো দেখছি!

—নাম শুনেছি।

—ছবিই শুধু আঁকেন এইটুকু পরিচয় কিন্তু অরুণবাবুর যথেষ্ট নয়। ভদ্রলোক অভিনয় করেন অপূর্ব। নাটক লেখবার সুন্দর হাত। অরুণবাবুর বাড়িতে আমি যখন ছিলাম, নানা প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা হতো। কি কথাতে তোমার কথা একদিন উঠলো!

—আমার কথা?

—তোমার কথা ঠিক নয়, তোমার লেখা-পড়ার কথা আমিই তুলেছিলাম। তোমার সেই খাতাটা তখনও আমার সঙ্গে ছিল। অরুণবাবুকে তোমার ঐ লেখাটার খসড়া পড়তে দিলাম। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। অভিনয় আর নাটকের নেশা—সেই কারণে হয়তো আরও বেশি ভাল লেগেছিল। তোমার সেই কি নাম যেন—বিনোদবিহারী আর তরলাবালার জায়গাটা অরুণবাবুকে অভিভূত করেছিল—।

অপর্ণা সমীরের কথায় বাধা দিয়ে বলে,—এসব পুরনো কথা কেন তুলছো সমীর। এসব আলোচনা আজকাল আমার একদম শুনতে ইচ্ছে করে না। তুমি অন্য কথা বল। অন্য কিছু শুনতে আমার ভাল লাগবে।

সমীর একটু নড়েচড়ে বসলো। বললো,—বিনা কারণে এ কথা আমি তুলিনি। প্রয়োজন আছে। দরকারটা আমার, আমাকে বলতেই হবে। অরুণবাবু সাহিত্যের ছাত্র নন তবে রসিক লোক, পড়াশুনোতে খুব দীনতা নেই। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে অবাক করেছেন। তুমি বিনোদবিহারী আর তরলা-বালাকে যেখানে হারিয়েছো, শশাঙ্ক যেখান থেকে অনুসন্ধান আর করে নি, অরুণবাবু [illegible] অন্বেষণ করেছেন। খুঁজেও পেয়েছেন। অন্য কেউ হলে আমি সহজে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু অরুণবাবুকে আমি চিনি, ভাল করেই জানি। তাঁর কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।

—খুব আনন্দের কথা। এরকম কি যেন একটা শুনেছিলাম সেদিন।

—শুধু তাই নয় অপর্ণা, অরুণবাবু একটা নাটক লিখেছেন। তোমার বিনোদবিহারী ও তরলাবালার কাহিনী ও শেষের অনুসন্ধান একত্রিত করে একটা জোরালো নাটক লিখেছেন। আমি কিন্তু তোমার মতামত না নিয়েই অরুণবাবুকে কথা দিয়েছি।

অপর্ণা চমকে উঠলো,—কি কথা দিয়েছো?

—অরুণবাবু নাটকটি আমাকে দিয়ে গেছেন। অরুণবাবুর ইচ্ছে নাটকটি পড়ে তুমি মতামত দাও। উনি মনে করেন তোমার মতামত, উপদেশ ওঁর খুব কাজে আসবে। কোন চরিত্রের বা গল্পের কোথাও কোন অসঙ্গতি যদি তুমি লক্ষ্য করো—

—নাটকের আমি কি বুঝবো। আমার মতামত কোন কাজেই আসবে না।

—তুমি ভুল করছো, নাটক সম্পর্কে তোমার বিশেষ মতামত ঠিক নয়, বিনোদ-বিহারী-তরলাবালাকে তুমি সবচেয়ে বেশি চেনো, একদিন তাঁদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে হয়েছিলো। অরুণবাবু আশা করেন নাটকের খাতিরে চরিত্র দুটোর ওপর সে যদি কোথাও অন্যায় করে থাকে, নিশ্চয়ই সেটুকু তোমার নজরে পড়বে।

অরুণ সম্পর্কে সমীর অনেক কথাই বলে গেল। কিছুটা শুনলো, অনেকটা যেন কানেই পৌঁছলো না। অল্প একটু ম্লান হেসে বললো,—কথা যখন দিয়েছো, নাটকটি আমি নিয়ে যাব। কিন্তু মতামত দেবার মতন মন আমার আর নেই সমীর। তোমার কাছে লুকোব না, মনের কথা হয়তো গুছিয়ে বলতে পারব না, মনে হয় যেন বঞ্চনা করেছি বোকার মত নিজেকেই ঠকিয়েছি। পাঁচ-জনের মত আমি নই, আমি কিছুটা আলাদা—একটু স্বতন্ত্র। মনে মনে এই ধারণা নিয়ে গর্ব করেছি নিজের কাছে কিন্তু আজ দেখছি আমার আলাদা ধরণের অস্তিত্বই নেই কোথাও, আর বাকি পাঁচজনের মধ্যে আমার স্থান সংকুলান নেই। এত বেশি সিরিয়াস না হলে হয়তো জীবনের বহু জায়গায় সার্থক হওয়া যেত। ঠিক ব্যর্থতা নয়, হতাশ হয়ে পড়েছি, একথাও আমি মানতে রাজি নই। তবে কি জান সমীর এক অফুরন্ত শূন্যতা আজকাল এমনভাবে পেয়ে বসে, এডজাস্ট করে করে এমন জায়গায় এসে ঠেকেছি যে আর সামান্য নাড়াতেই বড় বেশি লাগে।

সমীর অপর্ণাকে জানে। সহজে নিজের কথা প্রকাশ করে দেবার মেয়ে সে নয়। তাই বোধহয় চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে মুখটা তুলে বললো,—অপর্ণা, তোমার কথা আমি বুঝতে পারি। অন্য কেউ হলে মোটা দামের এক ব্যবস্থাপত্র দিয়ে মানসিক এ অবস্থা তোমার সারিয়ে নিতে বলতাম কিন্তু তুমি সে মেয়ে নও। তোমার সম্পর্কে কিছু বলবার অধিকার আমি অর্জন করেছি তাই অসঙ্কোচেই বলতে পারি, তোমার অসাধারণ অন্তর-সম্পদ অদৃশ্য এক চোরাই দম্ভের আবর্তে বড় নিষ্করুণ-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে মাঝে মাঝে। অনেকে মনে করে সেটি তোমার উপেক্ষা। এডজাস্ট তুমি করেছো দুর্বলের সঙ্গে। গগন-স্পর্শী আত্মসম্মান তোমার, এডজাস্ট বলতে ঠিক আমি যা বুঝি সে তুমে কোনকালেই করতে পারবে না। হয়তো সে চরিত্র তোমায় না দেখতে পেলেই আমার ভাল লাগবে।

অপর্ণা একটু হাসলো। তারপর বললো,—তারপর।

বালিশটা একদিকে একটু হেলিয়ে নিয়ে সমীর বলে,—বাইরে জগতে হেরে গেলে ক্ষতি হয়তো আছে, কিন্তু নিজেকে যেদিন নিজের কাছেই পরাজিত মনে হবে সে বড় মর্মান্তিক আবিষ্কার অপর্ণা। এটুকু আমি বিশ্বাস করি, কোন খাদ নেই, কোন জোড়া-তালি নেই। শরীর আমার অসুস্থ কিন্তু মন আমার অসম্ভব বলশালী।

কথা বলতে বলতে সমীর ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অপর্ণার কাছে এক-পাত্র জল চাইলো। একটু কেশে আবার বালিশের মধ্যে ভেঙ্গে বসলো। জল খেয়ে যেন ঘামতে সুরু করলো।

অপর্ণা বললো,—কি সব আজেবাজে কথা তুলে তোমাকে আমি বকাচ্ছি। কথা বোলো না, এবার একটু শোবে?

সমীর নিজেকে পরিশ্রান্ত মনে করে। ইশারায় অপর্ণাকে ব্যস্ত হতে বারণ করে। পাণ্ডুর মুখশ্রীতে ম্লান একটুকরো হাসি ছড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটো যেন অপরাজিত। রুগ্নতা এতদিনেও চোখ দুটোকে কিছুমাত্র নিষ্প্রভ করতে পারে নি।

নিজের থেকে মনে করেই অরুণের নাটকের পাণ্ডুলিপি অপর্ণা চেয়ে নিল। সমীর একটু হাসলো।

অপর্ণা বললো,—তাড়া নেই তো ফেরৎ দেবার!

—বেশি দেরি করবে না। সামনের সপ্তাহে একদিন তো আসছই তখনই সঙ্গে এনো। শুনলাম শীঘ্রই নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছে।

অপর্ণার একবার ইচ্ছে হলো সমীরের কাছে সব কথাই খুলে বলে। কি ভেবে সে ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত গোপন করলো। এ নাটক সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত স্বয়ং অরুণ মুখার্জীকে যে অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে অপর্ণা সে কথা গোপন করলো।

॥ পাঁচ ॥

হাল্কা মন নিয়েই অপর্ণা বাড়ি ফিরলো। অরুণ মুখার্জীকে নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করলো। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তরলাবালার সাক্ষাৎ কাল্পনিক নয়, কাশীর ঘাটে বিনোদবিহারীর সঙ্গে তরলাবালার নাটকীয় কাহিনীর পেছনে অরুণের নিজের কোন হাত নেই, এই রকম বিশ্বাস করতে ভাল লাগলো।

শুধু পড়া নয় কয়েকটি দৃশ্য অপর্ণার মুখস্থই আছে তবু গোড়া থেকে সুরু করলো নতুন করে।

গভীর রাত্রে পাণ্ডুলিপি পড়া শেষ হলো। ঠাণ্ডা দিকটা পাবার জন্যে ক্রমাগত বালিশ পাল্টিয়ে ক্লান্ত হয়ে অনুরাধা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো অপর্ণা। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'শেষ সংগীত' অভিনীত হচ্ছে। মাঝে মাঝে ক্যামেরার আলো চমকে চমকে উঠছে। শত শত দর্শকের করতালি আর হর্ষধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রেক্ষাগৃহ।

পর পর নয়, খাপছাড়া। বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো দৃশ্য। কিছুমাত্র যোগসূত্র নেই। সংগতি নেই কিছুতেই।

অভিনয় শেষ হতে চলেছে। ভাঙ্গা মন্দিরের সামনের চাতালে মৃত বিনোদবিহারী। পাশে যুগ যুগ ধরে অন্ধকার বুকে নিয়ে বৃদ্ধ বটগাছটি দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তের জন্যে বিদ্যুতের মত চমকে উঠলো তরলাবালা। ঠোঁটে এতটুকু হাসি টেনে বললো,—নাম মুখে আনতে পারব না, দিন লিখে দিচ্ছি।

পেছনে নিস্তব্ধ গঙ্গায় জোয়ারের প্লাবন আসছে। দুকূল ছাপিয়ে ফেনিল জলোচ্ছ্বাস আছড়ে এসে পড়ছে—আবার ফিরে যাচ্ছে। আকাশে বড় ঘনঘটা। ওপরে ঝড়—নীচে প্লাবন। শক্তিশালী ডিমারের আলো পরাজিত। তরলা হারিয়ে গেল। পর্দা নেমে এলো।

উচ্ছ্বসিত এক শ্রেণীর দর্শক মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দরজা খুলে গেছে, লোক বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি দল অরুণকে ঘিরে ধরেছে। প্রচুর দাড়ি আর মুখের পোড়া দিকটার মেক-আপ তুলতে তুলতে পরিশ্রান্ত অরুণ মুখার্জী মিটি মিটি হাসছে। নাটকের অসামান্য সাফল্য বিচলিত করেছে মানুষটাকে।

অপর্ণা নিজের আসনে চুপটি করে বসে আছে। প্রেক্ষাগৃহ সম্পূর্ণ জনশূন্য, খেয়ালই হয় নি এতক্ষণ।

দৃশ্যপট ওঠানো-নামানো হচ্ছে। পেছনের গোটানো লোহার দেওয়াল তোলবার যান্ত্রিক আওয়াজে ঘুম ছুটে যায়।

তাকিয়ে দেখে প্রেক্ষাগৃহ নয়, সামনে রঙ্গমঞ্চের চিহ্নমাত্র নেই। অতি পরিচিত বিছানা। অনুরাধা চা নিয়ে ডাকাডাকি সুরু করেছে।

কয়েকদিন পরের কথা। ছুটির দিন। খাওয়া দাওয়া মিটতে বেশ বেলা হলো। দুপুরে অল্প একটু গড়িয়ে নেওয়াতে অনুরাধার নিতান্ত নিরাসক্তি দেখে হেসে বললো,—মতলব কি? এই দুপুর রোদে বাড়ির বাইরে যাবে না কিন্তু।

নখ খুঁটতে খুঁটতে অনু বললো,—বিকেলে কিন্তু আমি বেরুবো। অমত করতে পারবে না কিন্তু।

—বিকেলে বেরুনোর মত চাইছিস! ব্যাপার কি বলতো।

—রাগ করবে না বলো।

—বলই না।

—সুজাতার বাড়িতে যাব।

—সেখান থেকে সমীরের ওখানে দেখা করতে যাবে, এই তো?

—আশ্চর্য—কি করে তুমি বুঝলে?

—ঢাকুরেতে সুজাতাদের বাড়ি যখন যাবি শুনলাম তখনই বুঝতে পেরেছি। তা বেশ তো যাবে। সকাল সকালই ফিরবে, বাড়ি এসে কাপড় জামা ধুয়ে দেবে।

—কোন শাড়িটা পরি বল তো?

—ও একটা হলেই হলো।

—না হাসপাতাল কিনা, তাই রঙচঙ পরতে চাই না, তোমার সাদা শাড়ি একটা দেবে।

—নিস।

অল্পক্ষণ চুপচাপ। অনুরাধা আবার সুরু করলো,—আচ্ছা দিদি, সমীরদা কবে ভাল হবে রে?

—শীঘ্রই ভাল হবে।

—বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন শুনেছিলাম, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কোথায় যাবেন?

—ব্যবস্থা একটা হবেই। বেচারা ভালয় ভালয় এখন সেরে উঠুক।

—রাজনীতি সমীরদা জীবনেও ছাড়বে না, না রে দিদি।

—সেই রকমই তো মনে হয়।

—দুটো টাকা দিবি?

—কেন?

—ফল নিয়ে যেতাম।

—নিস।

দুহাতে বালিশ আঁকড়ে ধরে অপর্ণা বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

অনুরাধা বলে,—শুচ্ছো যে দুপুরে, শরীর খারাপ নাকি?

—কই না!

—তোমার আজকাল হচ্ছে কি বলতো! দুপুরে শুয়ে পড়ছো ছুটির দিন। মিঠে পান খেয়ে দাঁত লাল করেছো, তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছো!

—কেমন হয়ে যাচ্ছি রে?

—আগের মত আর নেই। মা বলেছিলেন গায়ে অন্তত একটু সোনা রাখতে, সরু চেনটা পরতে তোর কি হয় রে?

—বয়স হচ্ছে তো।

একটু থেমে অনুরাধা বললো,—তোমাদের নাটক হচ্ছে দেখছিলাম। কাগজে তুমি দেখো নি?

—কি লিখেছে রে?

—অনেকটা লিখেছে। রাইট-আপ-টা খুব ভাল হয়েছে। অরুণ মুখার্জীর বলিষ্ঠ নাট্য প্রচেষ্টা, মঞ্চসজ্জা নাকি দেখবার মত হয়েছে। শীঘ্রই ও'দের কবে যেন শো হচ্ছে। তুই ছেড়ে দিলি কেন রে দিদি?

—এমনি।

কথাটা অনুরাধার মনঃপূত হলো না। নানা প্রশ্ন ওর মাথায় আসছিল। অপর্ণার সঙ্গে কথা বলতেও বেশ লাগছিল।

—কফি বোর্ডের চাকরীটা যদি হয় নিবি?

—মাইনে বেশি হলে, চলে যাব।

—এ চাকরীটা ভাল লাগছে না বুঝি!

—চাকরী কি খুব ভাল লাগে রে অনু, লাগাতে হয়। আচ্ছা অনু—।

—হুঁ!

—ভাবছিলাম এক কাজ করবো—।

—কি!

—বাড়ি ছেড়ে দেব।

কথা বলতে বলতে অপর্ণার পাশে এসে শুয়ে পড়েছিল অনু। অপর্ণার কথা শুনে উঠে বসলো। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলো অপর্ণার দিকে। অনুরাধার হাতের সরু চুড়িটা দু-আঙুলে ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে অপর্ণা বলে,—মা-বাবাকে কলকাতায় নিয়ে আসবো মনে করে বাড়ি নিলাম। কিন্তু তাঁরা আসবেন না। মা বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। এখানে এলেও অসুবিধে অনেক। তাই ভাবছিলাম, শুধু শুধু সংসার পাতবার কোন মানে হয় না। বাইরের কাজের পেছনে আমার হাত নেই, সে কাজ করতেই হবে। তবে ঘরে ফিরেও এইসব তেল-নুন আর জিরে বাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা আমার অসহ্য হয়ে উঠছে। জানিস অনু, ভাবছি আবার পড়াশুনো করবো। এমন পাগল পাগল হয়ে গেছি না, একদম ভাল লাগে না। আচ্ছা এত ভাল লাগে না কেন রে?

—কিন্তু বাড়ি তুলে দিয়ে যাব কোথায়?

—কেন হোস্টেলে। তুই আর আমি বেশ থাকবো। ন্যাশানাল লাইব্রেরীর মেম্বার হবার নতুন নিয়ম-টিয়ম জানিস তুই।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো অনুরাধা। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ব্লাউজের কোন গোপন অঞ্চল থেকে একটা সেপটিপিন টেনে নিয়ে হাতের চুড়িতে লাগাতে লাগাতে বললো,—বাবা যে কি করে,—আমারও আজকাল চাকরী করতে ইচ্ছে করে!

—আর কি ইচ্ছে করে রে?

—আবার কি করবে।

—বল না। বল না।

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দুষ্টু হেসে অনুরাধা বলে,—তোর বিয়েতে খুব সাজতে ইচ্ছে করে।

কৌতুকে অপর্ণারও যোগ দিতে ভাল লাগে। বললো,—অনু, তোর বিয়েতে আমি কি করলে তোর ভাল লাগবে রে?

অপর্ণার গালে আঙুল ঘষতে ঘষতে অনুরাধা সলজ্জ হেসে বলে,—দুস, আমার বিয়ে হবেই না।

দু বোন একসঙ্গেই বেরুলো। মোড় থেকে আলাদা হয়ে যাবার সময় অনুকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল অপর্ণা,—সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে, রাত করবে না। সমীরকে বলবে সামনের শনিবার আমি যাব। একা একা থাকে, কথা বলতে চায়। তুমি কিন্তু বেশি বকিও না সমীরকে।

অনুরাধা চলে গেল।

বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মনোরমার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় নি অনেকদিন। যতই চটে থাকুক, একবার বাড়িতে গিয়ে দেখা করলে সমস্ত রাগ অভিমান জল হয়ে যাবে; অপর্ণা সে কথা ভাল করেই জানে।

শুধু অভিমান ভাঙাতে নয়, একটু কাজও ছিল। 'শেষ সংগীত' মঞ্চস্থ হবার দিন আসন্ন। সেই সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন একটা কৌতূহল অপর্ণার মনে ছিল।

চওড়া ফুটপাথের কোল ঘেঁষে অপর্ণা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছিল। এদিকটা বড় নিরালা, লোকজনও এ পথে সামান্যই। বাড়ির নম্বর এদিকটা একটু গোলমেলে। রাস্তার নাম হয়ত আছে কিন্তু লোকে তার হদিশ রাখে না। কর্পোরেশনের পাকা খাতায় বহু বাড়ির নাম এখনও ওঠে নি। প্লট নম্বর অমুক—তমুক ব্লকের এক্সটেনশন। বাড়ির নামের আগে ইংরেজী "পি" আরও বিভ্রান্তিকর।

সামনে একটা বাঁক। ডানদিকে অনেকটা ফাঁকা জমি। রাস্তার শেষ সীমানায় মনোরমাদের বাড়ি।

—তুমি অপর্ণা না?

কিছুমাত্র ভুল হবার নয়, তবে সামনে পেছনে কাউকে না দেখে অপর্ণা ইতি-উতি তাকায়।

—এই যে আমি এখানে।

অল্প একটু লোহার গেট। সাদা একতলা বাড়ি। হাঁটুর ওপরে কাপড়, খালি গা। ফুলবাগানে জল দেবার টিনের পাত্র হাতে। গেট পেরিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রায় পথে নেমে এলেন।

অপর্ণার কৌতূহল সহজ এক বিস্ময়োক্তিতে ঝরে পড়লো। নত হয়ে প্রণাম করলো। তারপর স্মিত হেসে বললো,—কি অবাক! আপনি এখানে।

—এস মা ভেতরে এস। তুমি চেন নি, কিন্তু আমার ভুল হয় নি।

লোহার গেটটা পেরিয়ে এলো অপর্ণা। অধ্যাপক রক্ষিতের সঙ্গে এখানে যে দেখা হবে ভাবতেই পারে নি।

—এদিকে চলেছিলে, কাজ ছিল বুঝি! তা থাকুক, সহজে তোমাকে ছাড়ছি না। চল ঘরে বসি। চা খাই। তারপর তোমাকে বাড়ি দেখাবো। অল মোস্ট কমপ্লিট। মালপত্তরের অভাবে পেছনের একটা ঘর এখনও শেষ হয় নি। লোহা পাই তো সিমেন্ট পাই না, সিমেন্টের পারমিট যদি বা পেলাম রাজমিস্ত্রী পলাতক। এর মধ্যে আবার চারশ খাতা এসে পড়ে আছে।

বাড়ি দেখবার শখ অপর্ণার আদৌ অবশ্য ছিল না কিন্তু রক্ষিতের চোখে-মুখে একটা আগ্রহের ভাব ফুটে উঠলো।

—সুন্দর জায়গায় বাড়ি। বাইরে থেকে দেখতেও হয়েছে চমৎকার।

—বসো, চা করতে বলি।

রঙ আর চুণ সুরকির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বসবার ঘরটা বেশ চওড়া-সওড়া। বেশ সাজানো। কাশ্মীরী কাজ করা গোল টেবিল। সুন্দর সোফাসেট জয়পুরী নক্সাদার ঝালরের আবরণে ঢাকা। পায়চারী করার ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের বড় একটা ছবি দেওয়ালে টাঙানো। কোণের দিকে একটা চৌকি পাতা। বই-খাতা-পত্তর তাতে ছড়ানো।

অধ্যাপক রক্ষিত বেশ পরিবর্তন করে এলেন। গায়ে গেঞ্জি, হাঁটুর কাপড়ও নামানো। রবারের চটিতে শব্দ তুলে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললেন,—অনেকদিন পর দেখা। তোমার খবর বল। চাকরী করছো শুনেছি।

অপর্ণা অল্প একটু মাথা নাড়লো। রক্ষিত অপর্ণাকে জানেন একটু বেশি করেই জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় শুধু নয় রক্ষিতের প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতেও অপর্ণার ছিল আসা-যাওয়া। অধ্যাপক রক্ষিতের অধীনেই সে গবেষণা করেছিলো। অপর্ণা গবেষণা ছেড়ে দিলে হয়তো সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হয়েছিলেন রক্ষিত। অপর্ণার বাড়ির খবর ভাল করেই জানতেন তবু গবেষণা ছেড়ে দেওয়ায় অপর্ণার ওপর মনে মনে প্রচ্ছন্ন অভিমান একটু ছিলই।

নিজের কথা চাপা দেওয়ার জন্যে অপর্ণা নতুন বাড়ি সম্পর্কে কৌতূহলী হতে চেষ্টা করলো। সোফাতে ডুবে গিয়ে রক্ষিত কিন্তু আপন মনেই বলে চললেন,—জীবনে মানুষের সুযোগ একবারই আসে। পরিশ্রম তো তুমি কম কর নি। কিন্তু সফল হতে পারলে না। এক সময় সত্যি আমার খুব খারাপ লেগেছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। দেখ অনেকেই আসে, বাজারে নামও তাদের কারো কারো কম নয়, কিন্তু আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তুমি একমত হবে কি না জানি না, আমার মনে হয় না বাঙলা নাটকের ইতিহাস-এর ওপর স্বয়ংসম্পূর্ণ বই আজও একটা লেখা হয়েছে। বাজারে আমার যে দুখানা বই আছে সে যথেষ্ট নয়। ছাত্রদের মুখ চেয়ে লেখা। আমাদের একটা মস্ত দোষ সর্বত্র জ্ঞান দিয়ে অভ্যস্ত হওয়াতে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে আমরা ভেবে দেখি না। আজকাল আমি দেখছি, আমারই ছাত্র, বয়সে নিতান্তই নবীন, অভিজ্ঞতাও অল্পদিনের কিন্তু আশ্চর্য-রকম খেটেছে। অধ্যয়ন করেছে যথেষ্ট। তাদের উত্তরগুলো আমার মনঃপূত হয় না, মাঝে মাঝে কিন্তু প্রশ্নগুলোতে কোন ফাঁকি নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই গোটা জিনিসটা আজকাল নতুন করে দেখছি। একটা বড় কাজে হাত দেব। লেখাটা আয়তনে বেশ বড়ই হবে। কি ইচ্ছে-টিচ্ছে আছে?

—সত্যি আপনার অধ্যবসায় দেখলে অবাক হতে হয়।

—দেখ, শশাঙ্ককে আমার ভাল লাগে না। সেটা শাসমলের জন্যে নয়। তুমি তাকে ভাল করেই জান, সে অতিমাত্রায় একাডেমিক।

—সে কি আপনার সঙ্গে কাজ করতে চায়?

—খুব চায়। তবে আমার ভয় হয় কিছুদিন কাজ করে সে সরে পড়বে। মাস ছয়েক হলো শশাঙ্ক একটা পুঁথি নিয়ে গেল, গ্যাংটকের পলিটিক্যাল অফিসার-পরিত্যক্ত এক গুম্ফা থেকে সেটি উদ্ধার করে। পালি আমি ভাল জানি নে, মাঝে মাঝে তিব্বতী হরফ—তাই কি মনে করে দিলাম। শশাঙ্ক দেব-দিচ্ছি করে চলেছে, শেষ পর্যন্ত আমার হাতে আর ফিরে আসবে কি না কে জানে। এইসব নানা কারণে শশাঙ্ককে আমি নেব না। মৃগেনকেও আমার পছন্দ নয়। মৃগেনকে তুমি চেননা, ইংরেজীর ছাত্র। ফার্স্ট ক্লাশ, তবে বেচারা কানে শোনে না তাই কোন কলেজে কাজ পাওয়া শক্ত। মৃগেনের পড়াশুনো আরও ব্যাপক। দু-একটা প্রবন্ধ পড়ে আমি রীতিমত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। পরে দেখলাম তথ্যের চেয়ে চমক বেশি। আর বক্তব্য খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। এস না, কাজকর্ম সুরু করো।

অপর্ণা একটু হাসতে চেষ্টা করলো।

—বই আমি ঠিক লিখছি না। আমাকে দিয়ে লেখানো হচ্ছে। খরচ করবে। একা আমি পেরে উঠবো না, তুমি এস না আমার সঙ্গে। বুঝেছি, একটু রাস্তি হয়ে গেছে, ওসব তুমি কিছু ভেবো না আমি ঠিক করে নেবো। তোমার ভাল লাগবে, কাজের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে দেখবে......।

জ এগোবে যেই মনো [illegible] আর ঘুচোলো আম।

শব্দ করে চায়ে চুমুক দিয়ে অপর্ণার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে রক্ষিত বলেন,—ভাল কথা, তুমি বাড়ি দেখতে চেয়েছিলে। আচ্ছা চাটুকু আগে শেষ করে নি।

প্লেটের আম সরিয়ে রাখছিল অপর্ণা, রক্ষিত হাঁ হাঁ করে উঠলেন,—ওটুকু মুখে দিতে হবে। বাজারের নয়, কাশী থেকে মানু এনেছে। তুমি না খেলে সে দুঃখিত হবে। এত সুন্দর ল্যাংড়া তুমি কলকাতায় পাবে না।

ভাল না লাগলেও সম্পূর্ণ অপরিচিত কাশীর কোন এক মানুকে খুশি করবার জন্যে আমের টুকরোগুলো অপর্ণাকে খেতে হলো। তারপর বাড়ি দেখবার পালা। এঘর-ওঘরের পর রক্ষিত অপর্ণাকে বাথরুমে নিয়ে এলেন। যদিও বাথরুমের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে অপর্ণার কিছু বলবার ছিল না তবু রক্ষিত সুরু করলেন,—না না না! বারো বায় ছয় বাথরুম তুমি আজকাল বড় কাউকে করতে দেখবে না। এই একটু হাত-পা খেলিয়ে, উনি তো আমার দেশ গোটা কি না......।

বাথরুম দেখে ফেরবার পথে বারান্দায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন রক্ষিত। চোখে সামান্য হেসে বললেন,—তাই বলে তুমি মনে করো না রান্নাঘর আমি নেগলেক্ট করেছি। এসো। ঠাকুর-চাকরের ওপরে বিশ্বাস নেই, মেয়েদের রান্নাঘরেই বেশি থাকতে হবে।

রান্নাঘর দেখে অপর্ণার সত্যিই ভাল লাগলো। বললো,—এইটা একটা ভাল কাজ হয়েছে। গরমের মধ্যে অল্প জায়গায় রান্নাঘরে মেয়েদের যে কি কষ্ট হয়। খুব ভাল হয়েছে।

ধারেকাছে কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। তবু অপর্ণার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন,—আমি ইঞ্জিনীয়ারের কথা শুনি নি। বেশ কিছুটা জায়গা আমি বারান্দা থেকে চুরি করে রান্নাঘরে লাগিয়েছি।

নিজের চাতুরী নিজেই উপভোগ করেন। হেসে কুটি কুটি হন অধ্যাপক রক্ষিত।

বাইরের ঘরে ফিরে এসে সমস্ত একটা হাই তুলে রক্ষিত বলেন,—বাড়ির সবাই আজ চন্দননগর গেছে। আমার স্ত্রী তো তোমাকে চেনে, আমার মেয়ে মিনতির সংগেও তো তোমার আলাপ আছে।

—হ্যাঁ, এককালে তো খুব আসতাম-টাসতাম।

—কাশী থেকে মানু এসেছে, খুব ধরেছে। আমারও যাবার কথা ছিল, তবে অনেক খাতা এসে পড়ে আছে, ফুলগাছ-গুলোতে জল দেওয়া আছে। বাড়ি চিনে গেলে, আবার আসছো কবে?

—সময় করে আর একদিন আসবো।

—আমি যা বললাম একটু ভেবে দেখো। লেখাতে হাত দেবার আগে আলোচনার আছে বহু। প্লটটামুটি একটা আঁচ তৈরি করেছি, এস একদিন বিস্তৃত আলোচনা করবো।

লোহার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন রক্ষিত। কাঠের ওপর মাথা নামিয়ে বললেন,—এসো।

মনোরমার বাড়িতে আজ আর যাওয়া হলো না। সময় হয়তো ছিল কিন্তু কেন যেন ইচ্ছে আর হলো না।

উল্টোদিকের রাস্তা ধরলো অপর্ণা। নির্জন আর অন্ধকার অনেকটা হাঁটা পথ।

●

অধ্যাপক রক্ষিতের কথা ভাবতে ভাবতে অপর্ণা বাড়ি ফিরলো। একবার মনে হয় আবার নতুন করে লাগে, কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেয়। নানান কিছুতে শক্তি ও সময়ের অপচয়ই হচ্ছে শুধু।

অধ্যাপক রক্ষিত একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁর সংগে কাজ করতে পারা সৌভাগ্যের কথা নিশ্চয়ই। সময়ের অভাব চিরদিনই থাকবে কিন্তু এ সুযোগ পায় কজনে।

ঘরের আলো নেভানো। রাস্তার অল্প আলো বাড়ির সামনের দেওদার গাছটার অনেকটা ছায়া সংগে নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। ঘরে ঢুকে চেয়ারে এসে বসলো। বীরেশ দত্তের স্ত্রী সেতারে রবীন্দ্রসংগীত বাজিয়ে চলেছেন। অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছে।

অল্পক্ষণ পর সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। আলোটা জ্বলে উঠলো সেই সঙ্গে। কিছু বলবার আগেই হুড়মুড় করে অনুরাধা এগিয়ে এলো: চাপা কণ্ঠ। কৌতূহলী দৃষ্টি।

—এক ভদ্রলোক আমার সংগে এসেছেন। সমীরদার ওখানে দেখা, উনিও হাসপাতাল থেকেই আসছেন। মিঃ মুখার্জীকে চেন তুমি! ডাকি ভেতরে?

মতামতের অপেক্ষা অবশ্য অনু করলো না। জানান দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনুর কণ্ঠ শোনা গেল,—দাঁড়িয়ে কেন, আসুন ভেতরে। দিদি বাড়িতেই আছেন।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত। অপর্ণার অনুমান মিথ্যে নয়। কিন্তু অসম্ভব এই সাক্ষাৎ তখন এড়ানো কঠিন। অনুরাধা আগে এলো। পরক্ষণেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো অরুণ।

আকস্মিক কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। অপর্ণা বিব্রত হয়েছে। অপ্রস্তুতের যেন একশেষ। কিন্তু অরুণ?

সে মুহূর্ত বর্ণনাতীত। বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে অরুণ অস্পষ্ট স্বরে শুধু বললো,—আপনি।

অপর্ণা কথা বলতে পারে নি। অপলক নয়নে শুধু তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ!

সামান্য সৌজন্য বোধেও টান পড়লো। অপর্ণা চেয়ার [illegible] ভুলে গেল।

গুমোট ভাবটা অনুরাধাই ভেঙে দিল। চেয়ারটা একটু এগিয়ে দিয়ে বললো,—বসুন।

কি ভেবে পরমুহূর্তেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনুরাধা।

অপর্ণা আস্তে আস্তে বলে,—অনুর সংগে সমীরের ওখানে বুঝি আপনার দেখা হলো। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

অপর্ণার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেই অরুণ পিছু হটে হটে চেয়ারে বসলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো,—আপনি এতদিন নিজেকে গোপন করে রেখেছেন কেন! সন্দেহ আমার একটু হয়েছিল, সমীরের কাছে নাম শুনে খটকাও লেগেছিল আমার, কিন্তু বিশ্বাস হয় নি। আমার আসবার কোন দরকার ছিল না, নতুন করে আপনার মতামত জানবার আর প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন, আপনাকে আমি জানতাম না তাই দৈবাৎ যদি কিছু অন্যায় করে থাকি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

—আমার কিন্তু অবাক অবাক লাগছে। আপনি আসবেন, আমি ভাবতেই পারি নি।

—নিউ এম্পায়ার-এ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে সত্তেরই! তাই আমার বিশেষ একটু তাড়া ছিল। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের সংগে সবচেয়ে যাঁর পরিচয়, বিনোদবিহারী ও তরলাবালা যাঁর আবিষ্কার তাঁর মতামত আমার শোনা দরকার তাই সমীরবাবুর মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছিলাম। আপনার হাতে পাণ্ডুলিপি আসবে, আর ঘুরতে ঘুরতে আমাকেও আপনার কাছে আসতে হবে জানলে কখনই আসতাম না।

—কেন আসতেন না?

—প্রয়োজন ছিল না। আপনার মতামত আমি শুনেছি, কি বলবেন সে তো আমি জানি।

—কি জানেন?

—শেষ দৃশ্যটা বাদ দিতে বলবেন।

—বলবো না।

অপর্ণার কথায় অরুণ থমকে গেল। স্থির দৃষ্টি প্রসারিত করে অল্প একটু ঠোঁটে হাসে। অপর্ণা যেন অস্পষ্ট। গোটা মানুষটাই যেন ধোঁয়াটে।

ঘরের নীরবতা ভেঙে অপর্ণা বললো,—বিশ্বাস হলো না।

—খুশি করছেন?

—একদম স।

—ভরসা পাচ্ছি না।

—আমার কাছে ভরসা চাইছেন আপনি। এতটা দুর্বল মানুষ আপনি নন।

অরুণ একটা সিগারেট ধরালো। অল্পক্ষণ পর বলে,—তরলাবালা একটি ছদ্মনামে আবার রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সংগে তরলাবালার সাক্ষাৎ কল্পনাপ্রসূত নয় অপর্ণা দেবী। কাশীর ঘটনা অতিরঞ্জন নয়

বিশ্বাস করুন। প্রমাণ আমার আছে। ইতিহাস খুঁজতে আপনি ভাল জানেন, সাহিত্যের ছাত্রও আমি নই। কাশীর ঘটনা দৈবাৎ আমার হাতে আসে—

—এসব কথা বলছেন কেন অরুণবাবু?

—নিজের হয়ে ওকালতি করছি।

—কিন্তু মামলা যে মিটে গেছে।

সিগারেটে ধোঁয়া ছেড়ে অরুণ অল্পক্ষণ পর বলে,—সত্যিই নাটক আমি মঞ্চস্থ করবো বলছেন?

—একেবারে বীরদর্পে।

—আপনার নতুন মতামত নিয়ে আমার বাড়িতেও আপনি একবার আসতে পারতেন, না এতটা আশা করা উচিত হতো না। অতি নাটকীয়তার ভয় ছিল।

ম্লান একটুকরো হাসলো অপর্ণা। তারপর বললো,—গায়ে পড়ে কি হেরে যেতে কেউ চায় অরুণবাবু। আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো?

—বিশ্বাস করুন এতদিন খুব একটা ভাবি নি, তবে এই মুহূর্তে আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছেন।

—ভরসা এই দুর্ভাবনার মধ্যে আপনাকে ফেলি নি।

—দুর্ভাবনা হয়তো নয় কিন্তু আপনার কাছে জিতে নেবার কোন আনন্দ নেই। আপনাকে আমি চিনতে পারি নি তাই হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে অপরাধ কিছু করেছি।

—দোষ আপনার নয়, আমার। ভুল না করেই আপনার ওপর অন্যায় করেছি কিছু।

'শেষসংগীত' টেবিলে কাত করা ছিল। অপর্ণা সেটি নিয়ে এসে অরুণের হাতে দিল। দুপাশে মাথা নেড়ে সহজে হেসে অরুণ বলে,—মতামত দেবেন না?

অপর্ণার আর্দ্রকণ্ঠ,—আপনাকে আমি চিনতে পারি নি।

—এখন চিনেছেন?

—এত সহজে কি চেনা যায় অরুণবাবু।

—আপনাকে মালিনী করবার অনুরোধ যদি করি আমি।

ম্লান একটুকরো হাসি অপর্ণার সারা মুখে যেন নাড়া খেয়ে উঠলো। তারপর বললো,—এমন অনুরোধ আপনি নিশ্চয়ই আজ করবেন না আমি জানি।

একতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিল অপর্ণা। অভিনয়ের খাতিরে নাটকের সামান্য যেটুকু রদবদল করতে হয়েছে খুব মন দিয়েই শুনলো।

বিদায় নেবার সময় অরুণ অল্প একটু হাসলো। তারপর গাড়িতে গিয়ে বসলো। সামান্য একটুকরো নমস্কার বা সৌজন্যসূচক কোন ভঙ্গির কিছুমাত্র প্রয়োজন হলো না।

রাত হয়েছে তাই পথ অনেক নির্জন। অনেক বেশি চুপচাপ। শুধু গ্যাসবাতিটাকে ঘিরে চক্রাকারে অজস্র ছোট ছোট পতঙ্গ পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে।

॥ ছয় ॥

দিন দুই পর কফি বোর্ড থেকে চাকরীর নিয়োগপত্র এলো। মাইনে বেশিই। সামনের মাসের গোড়া থেকেই চাকরীতে যোগদান করবার নির্দেশ আছে।

অনুরাধা বললো,—চাকরী হলো কিন্তু তুমি এ চাকরী রাখতে পারবে না।

অপর্ণা একটু হেসে বলে,—কেন?

—শুনেছি টিফিনের সময় ওখানে পুরো একগ্লাস দুধ দেয়। ঐ দুধের হাত থেকে বাঁচতে গেলে চাকরী তোমার ছাড়তে হবে।

—বাজে বকিস না, চুপ কর।

অনুরাধা তবু বাজে বকছিল। দুধ খেলে মুখটা কেমন বোকা বোকা লাগে সেই-সব কথা বলছিল।

সকালবেলা বেহিসাবী হবার উপায় নেই। কথাও চলছিল, কাজও হচ্ছিল। মোটামুটি সব সমাধা করে অপর্ণা নাইতে গেল।

অফিসে এসে প্রাত্যহিক কাজের ভিড়টা কাটিয়ে উঠতে অপর্ণা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কফি বোর্ডের চিঠিটা সঙ্গেই ছিল। অরুণের কাছে কথাটা কিভাবে পাড়বে, সেই কথাই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল।

তবে শেষ পর্যন্ত কথাটা অপর্ণাকে তুলতে হলো না। অরুণই ডেকে পাঠালো। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে আপন মনেই বলে গেল,—সেন ফোন করছিল, আপনাকে না জিজ্ঞেস করেই আমি কিন্তু জানিয়ে দিলাম।

—কি জানিয়ে দিলেন?

—জানিয়ে দিলাম আপনাকে আমরা ছাড়তে পারবো না।

বিস্ময় ও কৌতূহলভরা কণ্ঠে একটু টেনে বললো অপর্ণা,—কেন?

—ছাড়তে পারছি কই! আপনার স্বার্থই শুধু নয়, কোম্পানীর স্বার্থও আমাকে দেখতে হবে। অনেক ভেবে দেখলাম, কফি বোর্ডে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। প্রথমত নন-বেঙ্গলীদের একটা ক্লিক্ সব সময়ই আপনাকে ফেস করতে হবে। সেন নিজেই কফি বোর্ড ছেড়ে দিচ্ছে দুদিন বাদে। আর আপনি এখানকার কাজ ছেড়ে দেবেনই বা কেন! ভাবছি বাঙ্গালী সেকশনটা সম্পূর্ণ আলাদা করে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেব। এমনিতে আমি এত ব্যস্ত থাকি, ভরসা করার মত মানুষ পেলে আমারও একটু সুরাহা হয়। আপনার সামান্য দিনের চাকরী আমি কতটা কি করে উঠতে পারি সুযোগ দেবেন তো। আর এই সব সামান্য সামান্য ব্যাপার আপনি আমার ওপরই ছেড়ে দিন।

অপর্ণা কোন কথাই বলতে পারলো না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা অরুণ এত সহজ করে নিল। খচ খচ করে কাগজে সই করতে করতে, কখনও বা মুখ তুলে একটু হেসে স্বচ্ছন্দে কথাগুলো সে বলে গেল।

অপর্ণার তরফ থেকে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অরুণ বলে,—কি কিছু বলুন। চুপচাপ রইলেন যে, সেনকে বলে ভাল করি নি?

অপর্ণা বোকার মত একটু হাসলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠেই আসছিল অপর্ণা, অরুণ বাধা দিয়ে বলে,—উঠবেন না, কথা আছে।

অরুণ ড্রয়ার খুলে সাদা একটা চওড়া খাম বার করে অপর্ণার হাতে তুলে দিল। বললো,—রবিবার সকালে কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। কোন কাজের অজুহাত শুনবো না কিন্তু।

খামটি খুলতে খুলতে অপর্ণা বললো,—রবিবার, আপনাদের শো-এর কথা বলছেন তো।

নিজের কথায় অরুণ একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। বলে,—খুব সাড়া পাচ্ছি। টিকিটও অনেক বিক্রী হয়েছে। রবিবার হাউস আমরা খুব ভাল পাব আশা করছি।

—আপনার অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হোক এটুকু কামনা করি। রবিবার সকালে নিশ্চয়ই আসছি।

হৈ-চৈ করার মত ভঙ্গিতে অরুণ চেয়ারের মধ্যে নড়েচড়ে বসলো। তারপর বললো,—কফি বোর্ড থেকে আপনি আমাকে রেহাই দিলেন। গোটা ব্যাপারটাই আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন তো?

খামটা হাতে নিয়ে অপর্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কোন কথা বললো না। শুধু অল্প একটু হাসলো।

॥ সাত ॥

লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ে নাড়া খাওয়া চৌরঙ্গী সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। পোর্টি-কোর তলায় অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের সারি সারি দেহ। নিয়ন আলো নিভে যাওয়ায় টিনের গর্তের মধ্যে নিষ্প্রাণ টিউবের আঁকাবাঁকাগুলো শ্রীহীন। অফুরন্ত ট্রাফিকের চিহ্নমাত্র নেই। খাকী পরা নেপালী প্রহরী কোন কোন দোকানের সামনে এখনও জাগ্রত। দুএকজন পুলিশও নজরে আসে।

ফিরপোর তলায় হিমানীশের সঙ্গে, অরুণ কথা বলতে বলতে এসে দাঁড়ালো। অরুণের পাঞ্জাবীটা ঘামে অনেকটা ভিজে গেছে। সেটে কাজ করায় নানা রঙের দাগ লেগে আছে হাতে। একটানা ঘণ্টা দুই পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সকাল সাতটা থেকে স্টেজ রিহার্সাল। আজ গভীর রাত্রে তাই সেট পড়ছে।

অরুণ বললো,—ঘড়িতে আড়াইটে বেজে গেছে হিমানীশ, চল এবার ফেরা যাক। ওরা কতদূর কি করলো দেখা যাক।

অমিয়বাবু শেষ দৃশ্যে গঙ্গার একটা ইম্প্রেশন আনবার জন্যে অনেকটা জায়গা চেয়েছেন। কাশীর সেটটা আমাদের একটু এগিয়ে বসাতে হবে।

নিঃশেষিত সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দিয়ে হিমানীশ বললো,—ব্যাক স্টেজে বহু মানুষের থাকবার কোন দরকার নেই। ঘর ডিভিশন করে দেব; অল্প ক'জন হলেই চলবে। সেট চেঞ্জের খাতিরে ড্রপ বেশিক্ষণ ফেলে রাখা ঠিক হবে না। টেম্পো ভয়ানক বেশি ভাবে মার খায়। সিফটার অবশ্য থাকবে, ব্যাক স্টেজ তোমাকে একদম ভাবতে হবে না বুলুদা। ওটি সম্পূর্ণ আমি নিজে দেখবো।

অন্ধকার বাতাসে ফিরফোর আনাচে-কানাচে সোঁদা সোঁদা একটা গন্ধ। উল্টো-দিকে ফটোর দোকানের সামনে কয়েকটি খাটিয়া পাতা। পেতলের কলসী মাথার সামনে রেখে চা-ওয়ালা মড়ার মত পড়ে ঘুমচ্ছে। বই-এর আর অবাংগালীদের ফালি ফালি কাপড়ের দোকানগুলোর মুখ কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ। কোটের দোকানের শো-কেসে-এ জনপ্রিয় এক চিত্রতারকা গভীর রাতেও মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। পেছনে নিউ মার্কেট। অনেক বেশি নির্জন। আরও বেশি যেন অন্ধকার।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে অরুণ মঞ্চের দিকেই যাচ্ছিল। লোহার হাতল ধরে হিমানীশ।

দাঁড়িয়ে পড়ে বললো,—কাশীর সেটটা ফেলে অমিয়বাবুকে পেছনের স্পেসটা দেখিয়ে আমি কিন্তু একটু বিশ্রাম করবো। নইলে সকালে একদম পরিশ্রম করতে পারবো না। তুমিও একটু বিশ্রাম কর বুলুদা।

মঞ্চে ফিরে এসে অরুণ দেখে সবাই ব্যস্ত। সুভাষ খালি গায়ে কাজে লেগেছে। বোমা পেরেক আর হাতুড়ি নিয়ে কি একটা কাজ করছে। উইংস নিয়ে টানাটানি করছে ক'জনে।

কালীপদর কলকাতার মেছুয়া বাজারের বাড়ির সেট মঞ্চ জুড়ে আছে।

অরুণ বললো,—সবাইকে বলে দিতে হবে ডানদিকের ফার্স্ট-উইংস শো-র দিন ব্যবহার করা চলবে না। ওখানে টেপ রেকর্ডার আর এমপ্লিফায়ার থাকবে। একজিট—এনট্রি সব সেকেন্ড উইংস দিয়ে।

কোণের দিকে বসে মনোরমা একমনে পর্দা সেলাই করছিল। অরুণ একটু হেসে বলে,—মনোরমা না থাকলে সত্যি এত কাজ কিভাবে যে হতো, আমি ভাবতে পারি না।

সুভাষ রসিক। হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে বলে,—হতো না।

মনোরমা খুশি হয়। কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে হাতের সূচটা সুভাষের দিকে উদ্ধত করে বলে,—রসিকতা করবেন না সুভাষবাবু।

একজন সিফটার মদের খালি বোতলে কোথা থেকে যেন চা বোঝাই করে এনেছে। একহাতে অনেকগুলো খুরি। বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে চা বিতরণ করে চলেছে।

হিমানীশ বলে,—টুকাদি কোথায়?

সুভাষ বললো,—এতক্ষণ তো সেটেই ছিলেন। সত্যি রাত বারটা থেকে কি খাটান না খেটেছেন। গ্রীনরুমের দিকেই তো গেলেন—।

একপাত্র চা নিয়ে হিমানীশ গ্রীনরুমের দিকে এগিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অরুণ মঞ্চ ছেড়ে অডিটোরিয়াম-এ নেমে আসে। মাথায় শুধু সেটের কথাই ঘুরছে। সামনে থেকে বোঝা যায় না, ইট বার করা আঁকা দেওয়াল দূরে থেকে কেমন আসে তাই দেখতে অরুণ পেছনে এগিয়ে চললো।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে। আঁকা দেওয়াল মনেই হয় না। সম্পূর্ণ অন্ধকার অডি-টোরিয়াম। শত শত শূন্য আসন। মঞ্চ থেকে শুধু সুভাষের হাতুড়ির আওয়াজ আর দু'একজনের অস্পষ্ট কথা ভেসে আসছে।

অন্ধকারে কার্পেটে মোড়া পথ ধরে অরুণ আরও পিছু হটে এলো। আরও সুন্দর। দূরে থেকে কালীপদর মেছুয়া বাজারের বাড়ি অনেক জীবন্ত মনে হয়। লালচে ইট বের করা দেওয়াল, সাদা তুলির আঁচড়ে ভেণ্টি-লেটারটা আরও সুন্দর।

সরতে সরতে দরজা পেরিয়ে আসে অরুণ। পেছন দিয়ে স্টেজে আসবার করিডোরের ঢালু পথটা নিতে গিয়ে বোধ হয় দরজা ভুল করলো। যে দরজা সরিয়ে ভেতরে এলো সেটা ছিল বক্সের। করি-ডোরের ঢালু পথটা আরও দক্ষিণে।

সামনে আবার স্টেজ। যত দেখছে ততই অরুণ মুগ্ধ হচ্ছে। চেয়ারের হাতল ধরে গদি আঁটা অন্ধকার চেয়ারে বসে পড়ে। হিমানীশকে স্টেজে দেখে ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু থামতে হলো।

নরম একটা গন্ধ। সম্পূর্ণ অন্ধকারে নজরে কিছুই আসে না। তবু পাশের আসনে সজীব কোন কিছুর আভাস পেল অরুণ।

—এখানে কে?

—আমি—টুকা।

—তবু ভাল! কিন্তু আপনি এখানে একা?

—দূরে থেকে কালীপদর ঘরটা দেখছিলাম আর মালিনীর কথা ভাবছিলাম।

অরুণ একটু লজ্জিত হলো। এত রাত্রে এই নির্জন জায়গায় টুকার সঙ্গে এভাবে দেখা হওয়ায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। জবাবদিহির সুরে বলে,—বিভিন্ন কোণ থেকে সেট দেখছিলাম, করিডোরের দরজা ভুল করে বক্স-এ এসে ঢুকেছি। চলুন স্টেজে ফেরা যাক। অমিয়বাবু নিশ্চয়ই ঘুমচ্ছেন।—

বিলম্বিত অনুনাসিক কণ্ঠ টুকার,—বসুন না।

—আপনি খুব ক্লান্ত। তখনই বললাম রাত্রে আপনার জাগা ঠিক হবে না। রঙ-চটা জায়গাগুলোতে ব্রাশ টানবার জন্যে রাত জাগাটা আপনার ঠিক হলো না। শুনলেন না তো! আপনি আর মনোরমা একটু ঘুমিয়ে নিন। বলুন তো হিমানীশ বাড়িতে পৌঁছেও দিতে পারে। ভোর ছটা নাগাদ চলে আসবেন। এখন কিন্তু তিনটে বেজে গেছে।

টুকার অলস কণ্ঠ শোনা গেল,—বাজুক না।

—আপনার দস্তুরমত ঘুম পাচ্ছে।

—আপনি পাশে থাকলে ঘুম আমার আসবে না। আপনি সত্যিই অদ্ভুত, কিছুই কি বুঝতে পারেন না অরুণবাবু!

অন্ধকারের মধ্যেও টুকার চোখ দুটো যেন মুহূর্তের জন্যে চিলকে উঠতে দেখা গেল। আর্দ্রকণ্ঠ শোনা গেল,—পাষাণ হয়েছিলাম, তোমার স্পর্শে জেগে উঠেছি—অপূর্ব! মালিনীকে দিয়ে চমৎকার কথা বলিয়েছেন, কিন্তু সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ যে নিয়মে কথা বলে আপনি কিন্তু তার একবর্ণও বোঝেন না অরুণবাবু।

—আপনার কথা আমি কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি না মিসেস দাস।

—বুঝতে চেয়েছেন কোনদিন?

—আপনি কি কিছু বলবেন?

—শোনবার মত কান আছে তো আপনার।

—আপনি নাটক করতে বসলেন দেখছি।

—সে নাটক তো আপনারই হাতে গড়া! এটা তো আর স্টেজ নয়, মুখস্থ সংলাপ তাই আমার কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একটু এক্সটেম্পর হলোই বা। আপনি তো আর সহজ অভিনেতা নন। কিউ খুঁজে পেতে অসুবিধে হচ্ছে বুঝি?

—কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন?

—'আই লাইক ইউ'—যেদিন আপনি বলেছিলেন সেদিন আমিও আপনার কথা বুঝতে পারি নি প্রথমে। কিন্তু সবটাই কি শোনার আর বলার ভুল, আমাদের দুজনের মধ্যে সত্যিকথা কি কিছুই নেই। আমি মিথ্যের পর মিথ্যেই শুধু গড়েছি! একটা নরম হাত অরুণের হাতে এসে পড়ে।

আকস্মিক এক বিদ্যুৎ প্রবাহ অরুণের সারা দেহে খেলে গেল। চেয়ার থেকে একরকম লাফিয়ে উঠলো। কণ্ঠস্বরও যেন মুহূর্তে হারিয়ে গেল! কথাগুলো অদ্ভুত শোনালো,—দোষ আমার! আপনি আমাকে মাপ করবেন।

পরমুহূর্তে ভেজানো দরজা সরিয়ে অরুণ একরকম ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক সময়ে রিহার্সাল সম্পূর্ণ হলো।

আকস্মিক কোন কঠিন কিছুর আঘাতে মাথাটা যেন বিবশ হয়ে যায়। শেষরাত্রের ছোট্ট একটু ঘটনা অন্ধকারের দুঃস্বপ্নের মত অরুণকে শুধু তছনছ করে দিচ্ছিলো।

তিলমাত্র পরিবর্তন হলো না টুক্লার। সে আগের মতই সহজ। পূর্বের মতই স্বাভাবিক। সকাল হতে না হতেই উৎসাহ আর উদ্দীপনা যেন আরও বেড়ে গেল। মেয়েদের ডেকে নিয়ে গেল গ্রীনরুমে। বললো,—অনেকগুলো মুখ মেক-আপ করতে সময় লাগবে।

প্রথম দিকটা বেশ চললো। অমিয়বাবুর আলোর নির্দেশনা সুন্দর। অভিনয়ও বেশ জমে উঠলো। শুধু সময় ক্ষেপণ বোঝাবার জন্যে আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেতারের এফেক্ট মিউজিক ঠিক সময়ে টেপ-রেকর্ডার-এ বাজলো না।

অরুণ চিৎকার করে উঠলো,—বলাই।

বোতাম টিপে এপাশে-ওপাশে ফিতে ঘুরিয়ে সেতারের মুখটা খুঁজে পেয়ে বলাই বললো,—দেখেছি! কনভাটারের ভোল্টেজ মাঝে মাঝে ড্রপ করছে।

সেতার বেজে উঠলো। ক্রমশ বিলীয়মান সুরের সঙ্গে সংগতি রেখে আলো কমে আসে। স্টেজ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়। পর্দা নেমে আসে।

অল্পক্ষণের বিরতি।

পরের দৃশ্যে মালিনী। টুক্লার সঙ্গে অভিনয় করতে বার বার সংলাপ অরুণ ভুলে যেতে লাগলো। কিছুতেই সহজ হতে পারে না। তুলি আর রঙের নিখুঁত ব্যবহারেও টুক্লার মুখটা অরুণের কাছে মুহূর্তের জন্যেও সুন্দর বলে মনে হলো না। সুগঠিত স্বাস্থ্যের বঙ্কিমরেখাগুলো অতি উগ্র, অনেক বেশি ঝাঁজালো মনে হলো। অনভ্যস্ত বা নতুন নয়, তবু টুক্লার সামান্য স্পর্শ নিদারুণ অস্বোয়াস্তি আর বিতৃষ্ণার সঞ্চার করলো। প্রমটার কথা পৌঁছে দিচ্ছিল ঠিকই কিন্তু অরুণের কানে আসছিল না।

কোন কিছুই যেন স্পর্শ করে নি টুক্লাকে। নিখুঁত অভিনয়। জীবন্ত মালিনীকে যেন চিত্রিত করে চলেছে। আবহ সংগীত আর আলোর সুষম গতিছন্দ গোটা পরিবেশটাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে।

ভাবাবেগে উদ্বেলিত মালিনীর কণ্ঠ ঝরে পড়ে,—পাষাণ হয়ে ছিলাম, তোমার স্পর্শে বেঁচে উঠেছি।

তড়িতাহত মানুষের মত নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে অরুণ। সবাই দেখে কালীপদ স্তব্ধ। খুশির আভাস নেই, বিষণ্ণতার স্তূপ অরুণের সারা মুখটিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রমটার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। দেবরাজ ইন্দ্রের ছলনা আর অহল্যার কথা বার বার অরুণের কাছে পৌঁছে দেবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

দর্শকদের মধ্যে থেকে অরুণ চিৎকার করে ওঠে,—প্রমটার।

চেয়ারের হাতলের ওপর আছড়ে পড়লো অরুণ।

হিমানীশ চেঁচিয়ে উঠলো,—স্টেজ লাইট অন।

টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে সেতার থামিয়ে বলাই উইংস-এর পাশে এসে দাঁড়ায়।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত। অরুণের সম্বিৎ ফিরে আসে। সামনে টুক্লা। হিমানীশ দাঁড়িয়ে পাশে। উইংসের পাশে পাশে কৌতূহলীদের ভিড়।

টুক্লাই প্রথম কথা বললো,—রাত জেগে শরীর হয়তো খারাপ লাগছে অরুণবাবুর।

অরুণ স্থিরদৃষ্টি মেলে একবার তাকালো টুক্লার দিকে। তারপর হিমানীশের দিকে ফিরে তাকালো। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল তারপর,—পজিশন! সাউন্ড, লাইট, প্রমটার! আমার কিছু হয় নি হিমানীশ, আমি ঠিক আছি।

জোর করে অনেকটা স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলো। শেষ দিকে অনেকটা সহজও হওয়া গেল। অভিনয় শেষে অরুণ সোজা গ্রীনরুমে ফিরে এলো।

হিমানীশ সিস্টারদের সঙ্গে সেট সংক্রান্ত কথা বলা শেষ করে এলো। অনেকেই এক এক করে চলে গেল।

সবাইকে আর একবার সতর্ক করে দিয়ে হিমানীশ বলে,—রবিবার সতের তারিখে শো-এর দিন সবাই সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন। আমরা অনেকেই আরও আগে থেকেই এখানে থাকবো। মেক-আপ ম্যান বলছেন, এত জনের মেক-আপ-এ অন্তত ঘণ্টা তিনেক লাগবে। সবাই ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

টুক্লা ছোট একটু হাসলো। আরও ছোট করে বললো,—আমার কিন্তু অল্প দেরি হবে। অবশ্য যথেষ্ট চেষ্টা করবো সকাল সকাল পৌঁছুতে।

হিমানীশ বলে,—আপনাকে আর কি বলবো। স্টেজ রিহার্সেলেই মালিনী আজ যা করলেন, আপনি দেখছি বুলুদাকেও হার মানালেন। সত্যি তুলনাহীন।

নানা রঙের আঁচড়ে টুক্লার মুখটা যথেষ্ট লাল ছিল। হিমানীশের কথায় আরও যেন রক্তিম হয়ে গেল।

টুক্লা অরুণের দিকে ফিরে সলজ্জ হেসে বললো,—রবিবার দশজনের সামনে কেমন করবো কে জানে! আজকের মালিনী আপনার কেমন লাগলো অরুণবাবু?

অরুণ পরাস্ত হলো না। নিখুঁত অভিনয় করে গেল। রংগমঞ্চের কালীপদও যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। অল্প একটু হাসলো। অর্থপূর্ণ সে হাসি টুক্লা নিশ্চয়ই ঠিক চিনেছিল। ক্লান্ত চোখ দুটো টুক্লার ওপর মেলে ধরে সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে অরুণ বললো,—আপনি প্রতিভা। অভিনয় আপনি ভালই করেন। আই লাইক ইউ।

॥ আট ॥

মোটা কাচের দরজার একমুখো পাল্লা সরিয়ে চওড়া লবিতে পা দিতেই অধ্যাপক রক্ষিতের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

একগাল হেসে রক্ষিত এগিয়ে এলেন। প্রণাম করতে যাচ্ছিল, রক্ষিত অপর্ণার হাত ধরে ফেলেন। তারপর বলেন,—রাইট ম্যান ইন রাইট প্লেস! কিন্তু দশ টাকার নিচে যে টিকিট নেই।

সংকুচিত পাটভাঙ্গা পাঞ্জাবী। কোঁচান ধুতি, এণ্ডির চাদর আলগোছে কাঁধের ওপরে রাখা—অধ্যাপক রক্ষিতের অতি পরিচিত পোষাক।

অপর্ণা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, রক্ষিত বাধা দিয়ে বলেন,—মৃগেনের কাছে শুনেই আমার আসা, ফোনে বললো, এ নাটক আমার নাকি দেখা দরকার। তুমি এঁদের মধ্যে আছো নাকি? অরুণ মুখার্জী ভাল কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, সে আবার নাট্যকার হলো কবে হে! তোমার টিকিট আছে তো?

অপর্ণার কাছে দুটো গেস্ট কার্ড ছিল। শেষ পর্যন্ত একাই এসেছে অপর্ণা। অধ্যাপক রক্ষিতকে স্বচ্ছন্দে একখানা টিকিট দেওয়া সম্ভব।

অপর্ণা হেসে বললো,—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হলো। আমার সঙ্গে একখানা টিকিট বেশি আছে। ভাগ্যিস ঢুকতেই দেখা হলো হয়তো টিকিটখানা ফেরৎই দিয়ে দিতাম।

—কত দামের?

—ঠিক টিকিট নয়, গেস্ট কার্ড। আসুন আর দাঁড়িয়ে নয়, ভেতরে যাই। কি সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি।

লবিতে বেশ লোকজন। দল বেঁধে এসেছেন অনেকেই। কলমের খোঁচায় দিনকে রাত করে দিতে পারেন এমন একটা ছোট গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে পূর্বদিকে একটা জটলা। দীর্ঘ গড়নের এক সুদর্শন যুবক দুর্মূল্য সিগারেটের টিন খুলে তাঁদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। গালে অল্প লালচে দাড়ি। ক্রীজবিহীন মহার্ঘ পোষাক পরণে। কাঁধের সঙ্গে ক্যামেরা ঝোলানো। লোকটা বাংলায় কথা বলছে, কিন্তু অবাঙালীদের মত দেখতে।

দেওয়ালের সঙ্গে শো কার্ড কাৎ করে রাখা। 'শবসংগীত' নাটকের কতগুলো স্টীল। আগ্রহভরে অনেকে দেখছে।

নীল পোষাক পরা লোকটা টর্চ হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে টিকিট নিচ্ছে। লোক ঢুকছে। কেউ কেউ সিগারেটের শেষ টান দিচ্ছে আনাচে-কানাচে। মেয়েদের পোষাক

মধ্যে উজ্জ্বল রূপ বিলীয়মান সেন্টের গন্ধ। গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবী আর পাজামা পরা এক ক্ষীণ স্বাস্থ্যের তরুণ একজন শ্বেতাঙ্গ মোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

আসন ছিল ভালই, দ্বিতীয় সারির মাঝামাঝি। তবু অপর্ণার অস্বস্তি লাগছিল। আশে-পাশে সবাই নিমন্ত্রিত। অপর্ণার পাশে অধ্যাপক রক্ষিত। শ্বেতাঙ্গ জনাকয়েক তাঁর পাশে। অপর্ণার ডানদিকে, সামনের সীটে পেছনের আসনে আর জার্মানী অতিথি। প্রেস আর বিদগ্ধ পণ্ডিতের সমাবেশ।

রক্ষিত হেসে বললেন,—তুমি দেখছি আমাকে সাহেবদের মধ্যে এনে বসালে। বাংলা নাটকের এঁরা কি বুঝবেন?

গ্রীবা ঘুরিয়ে স্নেহমধুর দৃষ্টি বুলিয়ে অপর্ণা অল্প একটু হাসলো। তারপর বললো,—কনসল-টনসল হবে। ট্রেড-এজেন্ট, কালচারাল রিপ্রেজেন্টেটিভ—আজকাল সাত-সতের কি সব যেন হয়েছে। আস্তে কথা বলুন, দুম করে দেখবেন ও'রা কেউ আপনার সঙ্গে বাংলা বলতে সুরু করবেন।

গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী পরা ক্ষীণ স্বাস্থ্যের তরুণ অপর্ণার সামনের সিটে ছিল। পাশে সেই শ্বেতাঙ্গ মোটা ভদ্রলোক। সোনালী অনেকটা গোঁফে হাসির রেখা। আস্তে কথা, তবু আলোচনা কানে আসছিল।

নাটক নিয়েই কথা। তরুণটি-র কণ্ঠস্বরটি সুন্দর। মস্কোতে নিজের চোখে দেখা হ্যামলেট নিয়ে কথা হচ্ছিল। রাশিয়াতে নাকি হ্যামলেটকে লোকে গাম্‌-লেৎ বলে। 'আন্না কারেনিনা' নাটকে ট্রেনে আন্নার কাটা পড়ার দৃশ্যের বর্ণনা করতে করতে পরিচালক দানচেংকোর অত্যাশ্চর্য দক্ষতা ও তুলনাহীন দৃশ্যসজ্জার তারিফ করছিলেন ক্ষীণ স্বাস্থ্যের তরুণটি।

দুটি অল্পবয়সী মেয়ে দুদিক থেকে অনুষ্ঠানের প্রসিওর বিলি করছে। আপ্যায়নের হাসি, চটুল ভ্রূভঙ্গি। আগে-পাছে এক এক কপি নিমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

অপর্ণা মলাটই অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। আগে আগে এসব দিকে তার নজরই পড়তো না। মলাটের নিচের দিকে এক চকলেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের ভাষা, কথা সাজানোর কায়দা, ক-রকমের রঙ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

এমন সময় মনোরমা। অল্প আলোতেও ভুল হবার নয়। একজন প্রবীণ ভদ্রলোককে প্রথম সারিতে বসাতে এসেছে। একটু বেশি সেজেছে, চওড়া বেণী ঘাড়ের পাশ দিয়ে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়াটা মনোরমার বয়সের সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছে না।

অপর্ণাকে দেখে চোখে-মুখে এক বিস্ময় প্রকাশ করলো। তারপর সামনে এগিয়ে এসে বলে,—কতক্ষণ!

—এই এলাম। তুমি কি রিসেপশনে আছো নাকি! দেখলাম না তো এতক্ষণ?

মনোরমা কথার জবাব দিল না। অপর্ণাকে ইঙ্গিতে ডেকে নিল।

—বেশ লোক, লুকিয়ে শো দেখে যাবে তুমি, চল বাইরে যাই।

মনোরমা হলের বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বলে,—কাণ্ড ঘটে গেছে, শো সুরু হতে বোধ হয় কিছু দেরি হবে। মিসেস দাস এখনও আসেন নি। হিমানীশবাবু খোঁজে গেছেন এখনও ফেরেন নি।

—মিসেস দাস—।

—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। স্টেজ রিহার্সালে কি খাটা খাটলেন, কালও আমার সঙ্গে গড়িয়াহাটায় দেখা—!

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। তাড়াহুড়ো করে মনোরমা সেদিকে এগিয়ে গেল। বললো,—কি খবর, মিসেস দাসের খোঁজ পেলেন?

ভদ্রলোক মনোরমার কথার জবাব দিল না। শুধু বললো,—হিমানীশদা নিশ্চয়ই এখনও আসেন নি, বুলুদা কোথায়......!

মনোরমার কথার অপেক্ষা না করেই ভদ্রলোক দ্রুত চলে গেলেন।

দিশেহারা মনোরমা অস্ফুট এক কাতরোক্তির শেষে বলে,—কি কাণ্ড! তুমি ভাই গিয়ে বসো। আমি একটু দেখছি।

মনোরমা চলে গেল। ঘড়িতে ভয়ংকর সময় জানান দিচ্ছে। "শেষসংগীত" নাটক-এর শো কার্ড-এর দিকে স্থির দৃষ্টি তুলে অপর্ণা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। পুড়ে যাওয়া ভয়ংকর কালীপদ মালিনীর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে অপর্ণা দেখে। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

সামনের বিরাট চত্বরে অসংখ্য শূন্য চেয়ার। কোন কোন টেবিলে সামান্য দু'চার-জন। সুসজ্জিত বার একরকম জনশূন্য। পথটা কাত হয়ে গেছে একদিকে। সমতল নয়—ঢালু। করিডোরটা সোজা চলে গেছে স্টেজে। জায়গাটা নির্জন। শুধু একটানা যান্ত্রিক চাপা আওয়াজ। অবিশ্রান্ত 'টিকি-টিকি' শব্দ আসছে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র থেকে।

অব্যবহার্য নানান কিছুতে সামনের অনেকটা জায়গা আটকে আছে। স্তূপীকৃত সেট আর উইংস-এর বড় বড় পাল্লা। দরজা পেরিয়ে অপর্ণা একটু থমকে দাঁড়ালো।

মঞ্চের এদিকটা কাজে আসে না। অপর প্রান্তে গ্রীনরুম। এ দরজার ব্যবহারও হয় কম।

আলোও এদিকে সামান্যই। নজরে আসে নি কিন্তু পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে অপর্ণা পাশে তাকালো। অপেক্ষাকৃত কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে অরুণ হিমানীশের সঙ্গে কথা বলছে,—তুমি দেরি করছো কেন হিমানীশ জানিয়ে দাও আজকের শো আমাদের বন্ধ।

—আরও কিছুটা দেখি। সময় এখনও আছে। সাড়ে দশটায় শো হলেও দ্বিতীয় দৃশ্যের আগে মালিনী আমাদের দরকার হচ্ছে না, মিসেস দাস এসে পড়তেও পারেন। শো বন্ধ করবো কেন। মনোরমা করবে। নাটক তার মুখস্থ।

—তা হয় না হিমানীশ। মালিনী নাটকের অনেকখানি, মনোরমাকে দিয়ে হয় না। মিসেস দাস আসবেন না। আর কোনদিনও আসবেন না। তুমি মাইকে বলে দাও। অপ্রীতিকর তো বটেই তবে বেশির ভাগ টিকিট আমাদের পুশ-সেল। অডি-টোরিয়াম ভালই, জঘন্য কিছু ঘটবে না বলেই আমার মনে হয়।

কয়েকবার চেষ্টা করেও অপর্ণা কথা বলতে ব্যর্থ হলো। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের একটানা 'টিকি-টিকি' শব্দের সঙ্গে সংগতি রেখে নরম বুকটা যেন শুধু উঠছে-পড়ছে। অস্ফুট স্বরে শুধু একবার বললো,—হিমানীশবাবু!

শুনতে পেল না হিমানীশ। ধীরে ধীরে চলে গেল।

শুনলো অরুণ। অস্পষ্ট আলোতে আবছা অপর্ণা নজরেও এলো। চমক নয়, বিস্ময়েরও যেন আভাস নেই চোখেমুখে। স্থির দৃষ্টি প্রসারিত করে অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি-হীন দৃষ্টি। ভাবলেশহীন চাউনী।

অপর্ণার নিষ্কম্প নির্নিমেষ আঁখি-পল্লবে দ্বিধা আর সংশয়ের স্তূপ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। অন্তরের মণিকোঠায় সাফল্যের এক অব্যক্ত সুরে তুচ্ছ জয়-পরাজয়ের আবিলতাকে মন্থন করে ঝংকৃত হয়ে ওঠে,—আমাকে গ্রীনরুমে পৌঁছে দিন অরুণ-বাবু।

অরুণ কোন কথা বলতে পারে না। পূর্বের মত অচঞ্চল আঁখি। শুধু প্রশান্ত ললাটে দু-একটি রেখা ভেঙ্গে পড়ে। অনির্বচনীয় এক খুশির ঝালর সারা চোখে-মুখে নেমে আসে। বলিষ্ঠ হাতটা আস্তে আস্তে প্রসারিত করে ধীরকণ্ঠে বলে,—অপর্ণা!

মুহূর্তের জন্যে অধরোষ্ঠ যেন কাঁপলো। নরম হাতটা অরুণের উষ্ণ স্পর্শে একটু নাড়া খেল। ধীরে ধীরে সুদৃশ্য বঙ্কিম ভ্রূলতায় স্নিগ্ধতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। নরম হাসিটুকু সারা মুখটিতে ছড়িয়ে পড়লো অপূর্ব সুষমায়।

আলো নিয়ে সর্বশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়েছে। দূরের লবি থেকে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে। অন্ধকার সরে যাচ্ছে। মঞ্চসজ্জা পরিস্ফুট হচ্ছে। মুঠো মুঠো আলো ছিটোচ্ছে শক্তি-শালী ডিমার।

॥ সমাপ্ত ॥

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

॥ বারো ॥

দুয়ারে পা দিয়েই আমি অবাক। সুরেশ বসে আছে। পরশু দিন অমল তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে; তার সর্বহারা সমিতি দেখিয়ে এনেছে।

এত তাড়াতাড়ি সুরেশ আমার খোঁজে আসবে, ভাবতে পারি নি। আমার কাছে তার কী প্রয়োজন, বুঝতে পারছি না। তবে ব্যাপারটা যে বিশেষ জরুরী অনুমান করা যাচ্ছে। নইলে ঝাড়া দেড়-দু'ঘণ্টা সময় আমার জন্য সে বসে থাকবে কেন?

আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুরেশ, 'এই যে ব্রাদার, আসছ। তোমার লেইগ্যা কতক্ষণ বইসা আছি জানো?'

'মঙ্গলের কাছে শুনেছি; অনেকক্ষণ এসেছেন।' মুখোমুখি একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম, 'আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'নিশ্চয়ই।' সুরেশ মাথা নাড়ল, 'না হইলে দ্যাড় দুই ঘণ্টা বইসা আছি।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম।

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে সুরেশ আবার বলল, 'আইজ তো বুধবার---'

'হ্যাঁ।'

'শনিবার যাদবপুর থিকা একটা মিছিল বাইর হইব।'

'কিসের মিছিল?'

'বাস্তুহারাগো (বাস্তুহারাদের)।'

আমি চুপ করে রইলাম।

সুরেশ বলতে লাগল, 'বিরাটভাবে অর্গানাইজ করতে আছি, বুঝলা? এই যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জে যত বাস্তুহারা আছে, কেউ সেদিন ঘরে থাকব না: সগলে মিছিলে বাইর হইব।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ট্রাম-বাস-লরী-মোটর সগল সেদিন বন্ধ হইয়া যাইব; কইলকাতা সহরের লাইফ একেবারে অচল কইরা ছাড়ুম।'

খানিক ইতস্তত করে বললাম, 'মিছিল বার করবেন কেন?'

মুঠো পাকিয়ে হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে সুরেশ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দাবী, দাবী আদায় করতে যামু।'

'কিসের দাবী?

আমার অজ্ঞতায় যেন হতবাক হয়ে গেল সুরেশ। কিছুক্ষণ নিষ্পলকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমাগো, এই যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জ এলাকার বাস্তুহারাগো উপর গভর্নমেণ্ট কতবড় অন্যায় করতে আছে তুমি জানো?'

আমাকে জানাতে হল, জানি না।

সুরেশের উত্তেজনা এবার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। তীক্ষ্নস্বরে সে বলল, 'এই সব জয়াগায় আগে ছিল বন আর বিল; শিয়াল-সাপ-শুয়োরের আস্তানা। মানুষ এদিকে আসত না। আমরা আইসা বন কাইটা সাপ-শিয়াল মাইরা শরীরের রক্ত জল কইরা কলোনী বসাইছি। এখন এর মালিক বাইর হইয়া পড়ছে; ঘরে আগুন দিয়া পিছনে গুণ্ডা লাগাইয়া আমাগো উৎখাত করতে চায় কিন্তু অ আমরা হইতে দিমু না।'

এ অঞ্চলে উপনিবেশ পত্তনের ইতিহাস কিছু কিছু শুনেছি। সীমান্তের ওপার থেকে যেদিন এখানে আসি তার পরদিনই একটা উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়ে সে কথা শুনে এসেছি। কিন্তু গভর্নমেণ্ট কিভাবে অন্যায় করছে তা আমার অজানা। জানি না বলে কিছুটা কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সুরেশ খাড়া হয়ে বসল। সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'এই যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জে কতদিন হইল রিফিউজি কলোনি বসছে, তুমি জানো।'

'না।'

'নাইনটিন ফরটি এইটের শেষাশেষি থিকা।'

'তার মানে দু-তিন বছর।'

'হ।' সুরেশ ঘাড় কাত করল, 'এতদিন আমরা এখানে আছি কিন্তু স্বত্ব এখনও পাকা হয় নাই। অথচ পতিত অনাবাদী জমি আর বন-জঙ্গল-বিল—কোনদিন এইসব কারো কামে লাগত না। গভর্নমেণ্ট ভরসা দিছিল যত জবরদখল কলোনি আছে আইন করিয়া লীগেলাইজ করব; আমরা এর স্বত্ব পামু। অবশ্য খালি হাতে না; এর জন্যে আমরা ন্যায্য যা দাম লাগে, দিম।

কিন্তু সরকার নাকের সামনে প্রতিশ্রুতি-খান ঝুলাইয়াই রাখছে; এর বেশি আর কিছুই করে নাই।'

একটু চুপ।

সুরেশ বলতে লাগল, 'অনেক আবেদন-নিবেদন করছি, দিনের পর দিন অনেক ধর্ণা দিছি। যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জ থিকা কতবার যে রিপ্রেজেণ্টেশন পাঠাইছি তার হিসাব নাই। কিন্তু সরকারের এক কথা, 'সবুর কর সবুর কর।' কিন্তু কতকাল সবুর করা যায় বল?'

অস্পষ্ট গলায় বললাম, 'তা তো বটেই।'

'স্বত্ব নাই তবু আমরা হাজার হাজার রিফিউজি এই জায়গার মাটি কামড়াইয়া পইড়া আছি; আমাগো অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত। স্বর্গেও না, মর্ত্যেও না—শূন্যে ঝুইলা আছি। কিন্তু এইভাবে কত কাল থাকা যায়। প্রতিশ্রুতির ফাঁকা আওয়াজের উপুর আর ভরসা রাখা সম্ভব না।'

এবার আমি কিছু বললাম না।

সুরেশ বলতে লাগল, 'আবেদন নিবেদন আর হাতে পায়ে ধরাধরি অনেক হইছে; এ পথে আর না। দাবীটা এইবার অন্যভাবে আদায় করতে হইব।'

'কিভাবে?'

চোখের তারা দপদপিয়ে উঠল সুরেশের, 'লড়াই কইরা; যতদিন না দাবীটা আদায় হয় আমাগো লড়াই থামবো না।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর সুরেশ বলল, 'তোমার কাছে যে জন্যে আসা এইবার বলি।'

আমি উন্মুখ হলাম।

সুরেশ বলল, 'শনিবার তুমি আমাগো সঙ্গে মিছিলে যাইবা। কারণ—'

আমি তাকিয়েই আছি।

সুরেশ বলল, 'কারণ তুমি বাস্তুহারা টাটকা টাটকা দ্যাশ ছাইড়া আসছ। দাবী আদায় করতে তোমারও যাইতে হইবে।'

মিছিল শব্দটা আমার কাছে অপরিচিত কিছু নয়; মিছিল দেখার অভিজ্ঞতা আমার আছে। দেশে থাকতে ঢাকায় গিয়ে বারকয়েক জন্মাষ্টমী আর মহরমের মিছিল দেখে এসেছি। কিন্তু সে-সব নিতান্তই শোভাযাত্রা। বিশেষ করে জন্মাষ্টমীর মিছিল আমার কাছে রমণীয় স্বপ্নের মত। মানুষ-গাড়ি-ঘোড়া-হাতী—চতুরঙ্গে সুসজ্জিত সেই অন্তহীন প্রবাহ কোনদিন ভুলবার নয়; আমার স্মৃতির ভেতর বিচিত্র সম্মোহের মত তা মিশে আছে। মহরমের মিছিলও বেশ জমকালো।

কিন্তু মিছিল করে কিভাবে দাবী আদায় করা যায়, আমার কাছে তা অভাবনীয়। কৌতূহল এবং সংশয়, মনের দুই বিপরীত প্রান্তে দোল খেতে খেতে বললাম, যাব। কিন্তু—'

'কী?'

'মিছিল বার করে কিভাবে দাবী আদায় করবেন?'

সুরেশ হাসল, 'গেলেই দেখতে পাইবা।'

একটু ভেবে বললাম, 'আরেকটা কথা—'

'বল।'

'আপনারা তো যাবেন কলোনি লীগেলাইজ করতে; আমি কলোনিতে থাকি না। শুধু শুধু আমি গিয়ে—'

আমার অনুচ্চারিত কথাগুলোর ভেতর একটা প্রশ্ন ছিল। সুরেশ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, খালি কলোনির ব্যাপারেই যামু না; ঐটাই অবশ্য 'মেইন' ব্যাপার। তবে অন্য ব্যাপারও আছে। এই মিছিলের সঙ্গে সব রিফিউজিরই স্বার্থ জড়াইয়া রইছে। তুমি যখন রিফিউজি তখন তোমার যাওয়া উচিত; নিশ্চয়ই যাইবা। তুমি আমি হাজারে হাজারে লাখে লাখে উদ্বাস্তু—সগলে যদি একজোট না হই, কাঁধে কাঁধ না মিলাই তা হইলে আর বাঁচনের আশা নাই।'

সুরেশের কথাগুলো আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। বললাম, 'নিশ্চয়ই যাব। তবে—'

'তবে কী?'

'আপনাদের মিছিল কখন কোথা থেকে বেরুবে, তা তো জানি না।'

সুরেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'শনিবার দুপুরবেলা তুমি আমাগো বাস্তুহারা সমিতির অফিসে চইলা আইসো। মিছিল ঐখান থিকাই বাইর হইব।'

'আচ্ছা।' আমি মাথা নাড়লাম।

একটু চুপ। তারপর সুরেশ বলল, 'মিছিলের কথা তো হইয়া গেল। তোমার সঙ্গে আরো একটা কথা আছে।'

'কী?'

'দ্যাশে তোমাগো কত কানি (বিঘা) জমি আছে?'

'প্রায় দেড়শ কানি।'

'পুকুর-টকুর আছে?'

'আছে তিনটে।'

'আর কি কি আছে?'

জানালাম আমাদের বসত বাড়িটা দেড় বিঘে জমির ওপর। নারকেল আর সুপুরির একটা বাগিচা আছে যার আয়তন কমপক্ষে পাঁচ বিঘে। তা ছাড়া ফুলবাগান আছে। ভাটি অঞ্চলে আছে কিছু নাবাল জমি যেখানে প্রচুর বোরো ধান হয়; এক আধ বছর বাদে বাদে পাটের চাষও করান বাবা। ওখানকার মাটি ফসলের প্রাণের ভারে সবসময় লাবণ্যময়ী হয়ে আছে।

সব জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম; 'কি ব্যাপার সুরেশদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের বাড়ি ঘর জমি-জমার হিসেব নিচ্ছেন যে?'

অন্যমনস্কের মত সুরেশ বলল, 'দরকার আছে।'

'কী দরকার?'

সোজা আমার চোখে চোখ রেখে সুরেশ হঠাৎ বলল, 'সেইদিন কইতে আছিলা না, একটা চাকরি-বাকরি হইলে তোমার মা-বাবা-বইন (বোন) সগলরে কইলকাতায় নিয়া আসবা?'

'হ্যাঁ।'

'ধর চাকরি পাইলা; সগলেরে নিয়াও আসলা। কিন্তু দ্যাশের বাড়ি-ঘরের কী ব্যবস্থা করবা?'

এখনও কিছুই ঠিক করিনি—'

খানিক ইতস্তত করে সুরেশ বলল, 'এই ব্যাপারে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি।'

উৎসুক চোখে তাকালাম, 'কী?'

পরামর্শ দেবার আগে সংক্ষিপ্ত একটু ভূমিকা করে নিল সুরেশ, 'দ্যাখো ভাই, পাকিস্তানের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া উঠতে আছে। পুরাপুরি ঐটা ইসলামিক স্টেট; ঐখানে হিন্দুগো বাস করা অসম্ভব।'

আমি কিছু বললাম না।

সুরেশ বলতে লাগল, 'তাই কইতে আছিলাম জমিজমা বাড়িঘর এক্সচেঞ্জ কইরা লও।'

সবিস্ময়ে বললাম, 'এক্সচেঞ্জ!'

'হ; বদলাবদলি।'

এক্সচেঞ্জ শব্দটার অর্থ যে বিনিময় করা, তা জানি। আমার বিস্ময় সে জন্য নয়। বললাম, 'বদলে তো নিতে বলছেন কিন্তু কিসের সঙ্গে?'

সুরেশ বুঝিয়ে দিল, পূর্ব বাঙলা থেকে হাজার হাজার হিন্দু যেমন চলে আসছে, সংখ্যায় অত না হলেও ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন থেকে কিছু কিছু মুসলমান পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। সীমান্তে এ পারে তাদের যে জমি-জমা-সম্পত্তি আছে ওপারে সেই রকমটি পেলে তারা বদলাবদলি করে নেবে।

আমি রীতিমত উৎসাহিত হলাম। পাকিস্তানে যখন থাকা হবেই না তখন এই ব্যবস্থা মন্দ কি। দেশে বাড়িঘর খেতখামার আমাদের যা-যা আছে ইণ্ডিয়ায় যদি তা পেয়ে যাই তার চাইতে ভাল আর কি হতে পারে। পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ে যেতে দ্বিধান্বিত সুরে বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'ভারতবর্ষ ছেড়ে যে সব মুসলমান পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে তেমন কারোকে তো চিনি না।'

'চিনতে হইব না; তুমি রাজী কিনা সেই কথাটাই খালি কও। সব বন্দোবস্ত আমি কইরা দিমু।'

বললাম, 'আমার রাজী হওয়া না-হওয়া বড় কথা নয়; বাবার মতামতটাই আসল। বাবাকে একটা চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছি।'

সুরেশ বলল, 'তাড়াতাড়িই লিখো, আমার হাতে দুই-চারজন লোক আছে। দেরি করলে তারা অন্য লোকের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ কইরা ফেলতে পারে।'

'আজই লিখব।'

'তা হইলে আইজ উঠি ব্রাদার; শনিবার দেখা হইতে আছে।'

'আচ্ছা।' আমি ঘাড় কাত করলাম।

সুরেশ উঠে দাঁড়াল। আমি তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

●

কথামত পরের দিন সকালবেলা কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় পিসেমশাইর ঘরে হাজিরা দিলাম।

পর্দা ঠেলে আমিও ঘরে পা দিয়েছি, দেয়াল ঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হল। আমার সময়নিষ্ঠা পিসেমশাইকে হয়ত খুশীই করল। একবার ঘড়ির দিকে, পরক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বোসো।'

খুব সন্তর্পণে একটা সোফায় বসে পড়লাম।

উচ্ছ্বসিতও না, আবার নিরুচ্ছ্বাসও নয়—এমন সুরে পিসেমশাই বললেন, 'সাড়ে ছ'টার সময়ই তো তোমাকে আসতে বলেছিলাম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সময় জ্ঞানটা থাকা ভাল; নইলে মানুষ উন্নতি করতে পারে না।'

আমি কি বলব, চুপ করে রইলাম।

শীতের এই সকালবেলাটায় এখনও রোদ ওঠেনি। পাতলা নরম সিল্কের মত কুয়াশার চারদিকে ঝাপসা আড়াই। কলকাতার এই সুদূর সহরতলী এখনও ঘুমের আরকে ডুবে আছে। এ বাড়িতে পিসেমশাই, মঙ্গল আর আমি ছাড়া কেউ ওঠেনি। কাল অনেক রাত্তিরে অমল আর বিমল ফিরেছে; আমিই তাদের গেট খুলে দিয়েছিলাম। তারা কখন উঠবে, আদৌ এ বেলা উঠবে কিনা—কেউ জানে না। রিণ্টু কাল কখন ফিরেছে, বলতে পারব না। যখনই ফিরুক, ঘুমের ব্যাপারে দুই দাদা তার আদর্শ। তিন ভাইয়ের একজনও কোন দিন সূর্যোদয় দেখেছে কিনা, সন্দেহ। সূর্যটা আকাশের সিকি ভাগ পার না করিয়ে কেউ বিছানা ছাড়ে না।

মঙ্গল যে উঠেছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। নীচের তলায় রান্নাঘর; সেখান থেকে বাসনের আওয়াজ চামচ নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে।

পিসেমশাই বললেন, 'চা খেয়েছ?'

বললাম, 'আজ্ঞে না।'

'তোমার চা তো তোমার ঘরেই দিয়ে আসে মঙ্গল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পিসেমশাই বললেন, 'মঙ্গলকে বলে এসো, আজ যেন এখানে তোমার চা দেয়।' একটু থেমে ভেবে বললেন, 'আজ কেন, রোজই তোমাকে আসতে হবে। সকালবেলার চা-খাবার এখানেই খাবে। যাও—'

একতলায় রান্নাঘরে গিয়ে মঙ্গলকে বলে তক্ষুণি ফিরে এলাম। একটু পর মঙ্গল ট্রে-তে কাপ-প্লেট সাজিয়ে চা আর খাবার নিয়ে এল।

খেতে খেতে পিসেমশাই বললেন, 'তোমাকে আমার যে সব কাজ করতে
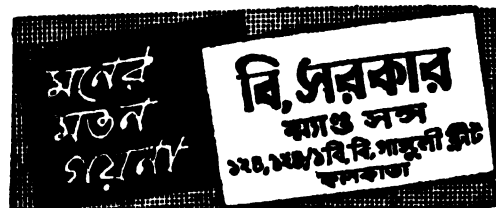
হলে সে সম্বন্ধে আগেই একটু আলো-চনা করে নেওয়া ভাল।'

আমি উন্মুখ হলাম।

পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'প্রথমত আমার কিছু হিসেবপত্তর তোমাকে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাঝে-মাঝে দু-চারখানা চিঠি ড্র্যাফট করে টাইপ করতে হবে। তৃতীয়ত, কখনও যখনও আমি বেরুলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

বললাম, 'আমি তো টাইপ জানি না।'

'তা আমার জানা আছে। তুমি আগেও একদিন বলেছিলে।' পিসে-মশাই বলতে লাগলেন, 'আমার দুটো টাইপরাইটার মেশিন আছে। সময় করে এসো; আমি তোমাকে টাইপ শিখিয়ে দেব।'

'আসব।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর পিসেমশাই আবার বললেন, 'আচ্ছা চিরঞ্জীব---'

আমি তাকালাম।

'এ বাড়ির রত্ন তিনটির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?'

ঠিক কাদের কথা পিসেমশাই বল-ছেন বুঝতে না পেরে দ্বিধান্বিত গলায় বললাম, 'আজ্ঞে---'

পিসেমশাই বললেন, 'আমার ছেলে তিনটের কথা বলছি। পিণ্টু-মিণ্টু আর রিণ্টু; তাদের ভালো নাম অমল, বিমল আর শ্যামল।'

নিজের ছেলেদের সম্বন্ধে পিসে-মশাইর যে অসীম বিতৃষ্ণা, প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। অমল বিমলদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সেদিনই তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। তাদের সঙ্গে যে এরই ভেতর আলাপ হয়েছে, কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও, তা বলতে সাহস হল না। দ্বিধান্বিত আধফোটা গলায় বললাম, 'আজ্ঞে---'

স্থির নিষ্পলকে তাকিয়েছিলেন পিসেমশাই। আমার বিব্রত ভাবটা নিশ্চয়ই লক্ষ্যও করেছেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আলাপ-টালাপ তা হলে হয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতন ভঙ্গি করতে করতে বললাম, 'আজ্ঞে ওরা---'

হাত তুলে বাধা দিলেন পিসেমশাই, 'জানি, তোমাকে আলাপ করতে হয়নি ওরাই এসে করেছে। ঐ গুণটি আছে; যেখানেই নিজেকে লুকিয়ে রাখো না---ওরা ঠিক টেনে বার করবে।'

শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। আস্তে আস্তে বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস সহজভাবে বার করে দিলাম।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'ঐ তিনটে সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?'

আমার সঙ্গে অমলদের যেটুকু আলাপ-পরিচয় তাতে অভিযোগ করার কিছু নেই। ব্যবহার প্রায় নিখুঁত, ত্রুটি-শূন্য। তাদের সম্বন্ধে যদি ভাল বলি, উচ্ছ্বসিত হই তার প্রতিক্রিয়া পিসে-মশাইর ওপর কি রকম হবে বুঝতে পারছি না। কাজেই চাতুরির খেলা খেলতে হল। বললাম, 'খুব সামান্য আলাপ হয়েছে। তা থেকে ভালোমন্দ ধারণা করতে পারি নি।'

গম্ভীর মুখে পিসেমশাই হাসলেন, 'তুমি খুব বড় ডিপ্লোম্যাট হতে পারবে, সে যাই হোক আমার ছেলেদের আমার চাইতে কে আর ভালো চেনে। ওরা হল সাগর-ছেঁচা তিনখানি মুক্তো।'

চাতুরি ধরা পড়ে গেছে। কুণ্ঠিত মলিন মুখে চুপচাপ বসে রইলাম।

পিসেমশাই একটু ভেবে বললেন, 'বিমলের বয়েস কত মনে হয় তোমার?'

'বছর তিরিশ।'

'প্রায় ঠিকই বলেছিলে; ওটা বত্রিশ হবে। আর অমলের?'

'পঁচিশ-ছাব্বিশ।'

'রাইট।'

'রিণ্টুর?'

'সতের-আঠার।'

পিসেমশাই বললেন, 'রিণ্টুকে বাদ দাও; আইনের চোখে সে এখনও মাইনর। অমল বিমলের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তারা রীতিমতো এডাল্ট।'

পিসেমশাই কেন ছেলেদের বয়েসের অঙ্ক নিয়ে বসলেন, বুঝতে পারছি না। পারছি না বলেই প্রাণে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

পিসেমশাই থামেন নি, 'অথচ দেখ, দু'জনেই এম-এ পাশ করেছে কিন্তু কিছুই করে না। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেওয়া আমার কর্তব্য, তা আমি করে দিয়েছি। এর পর চাকরি-বাকরি কিংবা ব্যবসা করে যে নিজের নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত, সে হুঁশ ওদের নেই। কাজকর্ম না করে অলস-ভাবে পরগাছার মত দিনযাপন করলে মানুষের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। অনেক দিন থেকেই ভাবছি'---বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তিনি।

নিজের অজান্তেই যেন জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবছেন?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে পিসেমশাই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ঐ টেবিলটার ওপর প্যাড আর কলম আছে; নিয়ে এসো।'

প্যাড-কলম নিয়ে এলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'মোটামুটি একটা আইডিয়া দিচ্ছি; সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে ফেল দেখি। এইভাবে লিখবে, ডিয়ার স্যার, ইউ আর সাফি-সিয়েণ্টলি গ্রোন আপ---

পিসেমশাই যা বললেন অনেকটা এই রকম।

তোমাদের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে; উপার্জন করে নিজের নিজের খরচ চালানো অনেক আগে থেকেই উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে তোমাদের আদৌ কোনরকম প্রচেষ্টা নেই। রোজগার করে খরচ দিতে পার ভাল, নইলে আজকের তারিখ থেকে তিন মাসের ভেতর এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বাধিত হব। ইতি---

তোমাদের বিশ্বস্ত---

বক্তব্যটা সাজিয়ে গুছিয়ে পিসে-মশাইর হাতে দিলাম। চোখ বুলিয়ে অনুমোদনের সুরে বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

তারপর তিন কপি টাইপ করে তলায় নিজের নাম সই করলেন, তারিখ দিলেন। দু'খানা চিঠি দুটো খামে পুরে

মুখ এঁটে একটায় অমলের নাম হাতে লিখে দিলেন, আরেকটায় লিখলেন বিমলের নাম। উত্তর দিকের দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড আলমারিটা দেখিয়ে বললেন, 'ওটার ভেতর অনেক ফাইল আছে। সাতাশ নম্বরটা নিয়ে এসো।'

বিমূঢ়ের মত উঠে গিয়ে সাতাশ নম্বর ফাইল নিয়ে এলাম।

দু'খানা চিঠি খামে পোরা হয়ে গিয়েছিল। বাকি চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে পিসেমশাই বললেন, 'আজকের তারিখ দিয়ে এটা রেখে দাও।' তারপর গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মঙ্গল---মঙ্গল---'

একতলা থেকে সাড়া এল, 'যাচ্ছি বড়বাবু---

ফাইলের পাত উল্টোতে উল্টোতে চোখে পড়ল, আগেও ছেলেদের তিনি অনেকবার নোটিশ দিয়েছেন। যাই হোক আজকের তারিখ দিয়ে চিঠিটা রেখে দিলাম।

একটু পর মঙ্গল এসে পড়ল। চিঠি দুটো তাকে দিয়ে পিসেমশাই বললেন, 'পিণ্টু নিণ্টু বাড়ি আছে?'

মঙ্গল বলল, 'আছে। ঘুমুচ্ছে।'

'এই চিঠি দুটোর একটা পিণ্টুর, একটা মিণ্টুর। তারা উঠলে দিয়ে দিস।'

'আচ্ছা।'

মঙ্গল চলে গেল। আর আমি বিহ্বলের মতন বসে রইলাম। দরকার হলে মানুষ আপন সন্তানকে বকে, মারে, ভর্ৎসনা করে। কিন্তু এভাবে নোটিশ দিতে আগে আর কখনও দেখিনি। এমন চমকপ্রদ বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা জীবনে এই আমার প্রথম।

(ক্রমশ।

সিলভ্যানিয়া লক্ষ্মণ লিঃ-এর নতুন শাখা

সিলভানিয়া লক্ষ্মণ লিমিটেডের কলকাতা শাখার সম্প্রতি ৬ মিডলটন স্ট্রীটস্থ ভবনে সমারোহে উদ্বোধনকার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মিঃ এল এস আগরওয়াল উদ্বোধন করেন। বিদ্যুৎশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকহায় রাম সা, শ্রী জে, পি, চতুর্বেদী, শ্রী হরিভাই সা, ন্যাশন্যাল এ্যাডভারটাইজিং প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীজি, চোপরা, সিলভানিয়ার প্রোডাক্ট ম্যানেজার শ্রী এম সি রামকৃষ্ণ, কলিকাতা শাখার ম্যানেজার শ্রী টি, শেষ গিরি রাও-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সিলভ্যানিয়া লক্ষ্মণ লিমিটেডের কলিকাতাস্থ শাখার উদ্বোধন করছেন চেয়ারম্যান মিঃ এল এস আগরওয়াল

॥ পাঠিকারা পড়বেন না ॥

●শ্রীবিমল দত্ত, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া—

প্রশ্ন : আমার ছেলে, বয়স বারো বছর। প্রায় ছ' সাত মাস হল জিয়া-ডিয়ায় ভুগছে। কিছুতেই সারছে না। এ ব্যাপারে আপনি কিছু পরামর্শ দিন।

উত্তর : জিয়াডিয়া রোগের ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়ে গেছে। আপনি চিকিৎসকের মত নেবেন, কারণ এই ওষুধের মাত্রা বালকের দৈহিক পুষ্টির ওপর নির্ভর করে—ওষুধের নামটা Camaquin (Park Davis) অথবা Amodiaquin (Albert David) পরিমাণ আপনি ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নেবেন, ছেলেকে দেখিয়ে।

●শ্রীতারাপদ দাস, সিংগী, বীরভূম—

আপনি স্নানের পর Pragmata নামক মলম মাথায় ঘষে ঘষে লাগাবেন।

●শ্রীসন্দীপ রায়, বেনিয়াপাড়া লেন, কলি-১৪—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। পরপর অনেকগুলি প্রশ্ন থাকায়, প্রশ্নগুলি দিতে পারলাম না। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চায়ের চামচের ২ চামচ করে Vitaphor অথবা Phosfomin খাবেন।

●শ্রীআশিস মিত্র, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু রোড, বজবজ—

প্রশ্ন ১ : রসুন খাওয়া কি শরীরের পক্ষে ভাল?

উত্তর : নিয়মিত রসুন খেলে অন্ত্রে আমাশয়ের কীটানু বাঁচতে পারে না। রসুন দিয়ে তৈরী আমাশয়ের ওষুধ আছে, নাম Aliquin (Squib)

প্রশ্ন ২ : আমার স্মরণশক্তি দিন দিন লোপ পাইতেছে।

উত্তর : আপনি নিয়মিতভাবে Glutamic Acid খাবেন, তার সঙ্গে যে-কোন পুষ্টিকারক ভাল একটা টনিক।

●S C Chakravortty, I D D Hostel, Nadia—

আপনার রোগটি জটিল। চিঠিতে
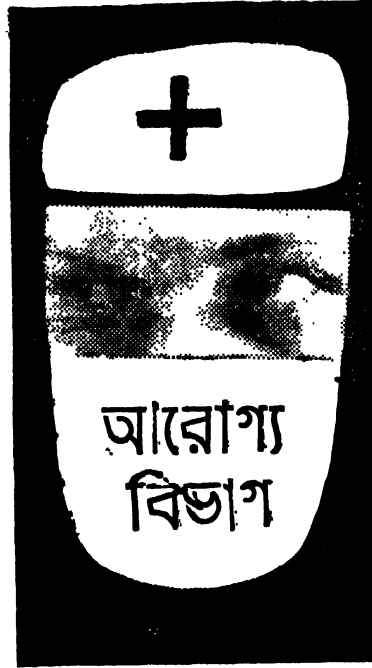
সমাধান করা সম্ভব নয়। আপনি যে-কোন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন।

●শ্রীঅনুকূল চক্রবর্তী, খোড়প, হাওড়া—

আমাদের বিভাগের নিয়মাবলী কিছু নেই। দুটি প্রশ্ন পাঠাবেন, প্রশ্নগুলি

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

শারীরিক বিষয়ে হওয়া চাই। প্রশ্নের সঙ্গে মাসিক বসুমতীর কুপন কেটে পাঠাতে হবে।

●শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, উলাড়া, রসুলপুর—

আপনি Litrison বড়ি দুবেলা খাবার পর ১টি করিয়া খাইবেন অন্তত তিন মাস।

●শ্রীঅশোককুমার চ্যাটার্জি, সাউথ রোড, বার্নপুর—

আপনি ও বিষয় সম্পূর্ণ ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। সকালে তিন ঘণ্টা, সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা নিয়মিত পড়তে বসবেন। জোরে জোরে পড়বেন, তাতে অন্য চিন্তা মাথায় আসবে না। বিকেল বেলার আধঘণ্টা ছুটোছুটি বা ব্যায়াম করবেন (যা করছেন)। দেখবেন উপসর্গগুলি চলে যাচ্ছে।

●বুলবুল, রামকৃষ্ণনগর, কাছাড়—

প্রশ্ন ১ : রাত্রে যখন আমি পড়ায় বসি, তখন আমার Loverদের কথা মনে হয়। কাহাকে Love করবো ভেবে পাই না, চিন্তা করিয়া পাই না। তাই মন উত্তেজনায় পূর্ণ থাকে। বহু চেষ্টা করিয়াছি। এই রোগ ছাড়াইতে পারিতেছি না। তাই পড়ায় খুব অসুবিধা হয়।

উত্তর : এ ধরণের চিন্তা মাথার মধ্যে সবসময়ে আসবে। তাকে দূরে ঠেলে রেখে নিয়মিত পড়াশুনা করাই হচ্ছে মানুষের কাজ। আপনি রোজ পড়তে বসবেন। সকালে তিনঘণ্টা, সন্ধ্যেবেলা তিনঘণ্টা পড়বেন। জোরে জোরে আপনার পড়া মুখস্থ করবেন। ছুটি, রবিবার প্রভৃতি প্রত্যেকদিনেই এই নিয়ম চলবে। বিকেলবেলায় মাঠে ছুটোছুটি করবেন, তাতে শারীরিক পরিশ্রম হবে। কায়িক পরিশ্রম হলেই দেখবেন রাতে গভীর নিদ্রা হচ্ছে, আর গাঢ় ঘুম হলে উপসর্গগুলি আপনা থেকেই চলে যাবে। একটা কথা মনে রাখবেন, চিন্তা করা একটা অভ্যাস। যে ধরণের চিন্তার কথা ভাববেন, সেই চিন্তাই মনে গেঁথে থাকবে।

●শ্রীমনোজবন্ধু গুপ্ত, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার—

প্রশ্ন ১ : ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে উপরের পাটির দুটো দাঁত ভেঙে গিয়েছে। তার মধ্যে একটি দুধ দাঁত। ব্যথা নেই। কিন্তু বড়ই বিশ্রী লাগে। এই দাঁত দুটো উঠিয়ে ফেলে বাঁধানো দাঁত দেওয়া যায় কি না জানাবেন।

উত্তর : Dentist-কে দেখিয়ে নেবেন। তিনি যদি বলেন, দাঁত আর উঠবে না, তাহলে দাঁত দুটি উঠিয়ে ফেলে দাঁত বাঁধিয়ে নেবেন। Fixed দাঁত লাগাবেন তাতে হঠাৎ বোঝা যাবে না বাঁধানো দাঁত বলে, আর ভালও থাকবেন।

প্রশ্ন ২ : ব্যায়াম করলে কি Brain dull হয়?

উত্তর : না। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিয়মিত ব্যায়াম করতেন; তাঁদের brain কি dull?

● শ্রীসমীরণ চক্রবর্তী, এম, সি, ঘোষ লেন, হাওড়া—

প্রশ্ন : আমার মুখমণ্ডলে এবং সমস্ত শরীরে অনেকগুলি তিল হইয়াছে।

উত্তর : তিল সারাবার কোন ভাল ওষুধ আমার জানা নেই।

● শ্রীঅমল ভট্টাচার্য, বাগবাজার, কলি-৩—

প্রশ্ন ১ : সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোবার সময় সাগুদানার মত গোটা গোটা কফ্ বেরোয়, দানাগুলো ঠিক সাগুদানার মত, এতে আমার সংক্রামক রোগ বলে ভয় হচ্ছে।

উত্তর : সংক্রামক রোগ হতে যাবে কেন? সারারাত গলার মধ্যে যে কফ্ জমে সকালবেলায় তা বেরিয়ে আসে, এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। সর্দির ধাত কমে গেলেই ওগুলো কমে যাবে।

প্রশ্ন ২ : গর্ভাবস্থায় অবস্থায় স্ত্রীর সহিত অধৈর্যবশত সহবাস করায়, যদি কারো কোন ক্ষতি হয় বা কোন অপরাধজনক হয় তাহা বিধান করিয়া জানাইবেন—৭ মাস গর্ভাবস্থা—

উত্তর : গর্ভাবস্থায় সহবাস করার কিছু বিধিনিষেধ আছে। প্রথম তিন মাস সহবাসের আঘাতে গর্ভপাত ঘটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সাতমাস থেকে প্রসব হওয়া পর্যন্ত সাবধানে সহবাস করতে হয়, কারণ যে কোন সময়ে Membrane Rapture হয়ে অসময়ে প্রসব সুরু হয়ে যেতে পারে। সেইজন্যে এই সময়ে সহবাস সাবধানে করতে হয়, যাতে আঘাত না লাগে।

● ডা: কনোজকুমার রায়চৌধুরী, নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলি-৬—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনার বক্তব্য বিষয় সম্পাদক মহাশয়কে জানান।

● সিংহরায়, রিষড়া, হুগলী—

আপনার চিঠি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়লাম। আপনি যে সব উপসর্গের কথা লিখেছেন, তার একটিও রোগ নয়। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকের জীবনেই ও জিনিস ঘটে থাকে। আপনার মনে জোর আনুন, আর দুবেলা ভাত খাবার পর B. G. Phos অথবা Phosfomin জাতীয় ওষুধ সেবন করুন। দেখবেন ও সমস্যা কমে গেছে।

● শ্রীস্বপনকুমার চক্রবর্তী, বাগীনগর, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন ১ : আমার চোখের রোগ আছে। ধরা পড়ে দশ বৎসর বয়সে। তখনই পাওয়ার ছিল -৪, কিন্তু ধীরে ধীরে -৫ বর্তমানে -৬।

উত্তর : পুষ্টিকর খাদ্য খান। পুষ্টিহীনতার জন্য সাধারণত মাইনাস্ পাওয়ার হয়। মাছ, মাংস, ডিম বেশি করে খাবেন। যতটা পারেন দুধ খাবেন। চোখের ডাক্তার যেভাবে বলেন, সেই ভাবে চশমা ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন ২ : মাসে দুই একবার আমাশয় হয়। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ আছে অবশ্য এখনও অপারেশান করি নাই।

উত্তর : আমাশয় শতকরা নিরানব্বুই জন লোকের আছে, এ নিয়ে ভয় পেলে কি চলে? Davoquin জাতীয় বড়ি ব্যবহার করে দেখবেন, সুস্থ হয়ে উঠবেন।

প্রশ্ন ৩ : আমি ১১ বৎসর বয়সে আমার এক অসৎ বন্ধুর কাছ হইতে হস্তমৈথুন করা শিখি এবং সপ্তাহে প্রত্যেক দিনই করতাম। বর্তমানে বীর্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। কি করিলে আবার বীর্যশক্তি ফিরিয়া পাইব?

উত্তর : প্রথমে নিয়মিত কাজকর্ম ও ব্যায়াম, দ্বিতীয় ভাল খাদ্য, তৃতীয় কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

(২টি কুপন ছিল)।

● শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাল ঘোষ, বর্ধমান—

প্রশ্ন ১ : আমার বয়স ৮০। স্বাস্থ্য ভালই। কাশিতে কষ্ট পাচ্ছি।

উত্তর : এ বয়সে সর্দি-কাশি হলে সারতে দেরি হয়। আপনি Siozide Syrup (Albert David) চা-চামচের এক চামচ সকালে, এক চামচ দুপুরে এবং এক চামচ রাতে খাবেন। এর সঙ্গে Pulmocod (Plain) দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে খাবেন।

প্রশ্ন ২ : প্রস্রাব ১ ঘণ্টার বা তার কম সময়ের ব্যবধানে করতে হয়। স্বাভাবিক সরলভাবে নিঃসরণ হয় না। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটু একটু করিয়া শেষ করিতে হয়।

উত্তর : আমার মনে হয় আপনার Prostate enlarged হয়েছে। আপনি যে কোন ভাল Surgeon-এর মতামত গ্রহণ করুন।

● রঞ্জন, কালীঘাট, কলিকাতা—

আপনি দাড়ি-গোঁফ কামাবার পর Parendran Ointment নামক মলম মুখে ঘষবেন। আগের সংখ্যায় আপনার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

● শিবপ্রসাদ সরকার, নারায়ণপুর, বর্ধমান—

আপনার অজীর্ণজনিত কারণে ওরকম হচ্ছে। Digeplex (T. C. F.) অথবা Sioplex Enzymes (Albert David) জাতীয় ওষুধেই সেরে যাবে। আপনার বন্ধুর ওটা কোন রোগ নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

● শ্রীঅরণ্য রায়, বরিশা, কলি-৮—

লম্বা হবার কোন ওষুধ আমার জানা নেই। রিং করে দেখতে পারেন, তবে ফল পাবেন বলে মনে হয় না।

আপনি Livogen Injection 1 ml করে Intramuscular রোজ নেবেন, দশদিন।

● শ্রীনানবেন্দ্র শীল, করিমপুর, নদীয়া—

প্রশ্ন ১ : আমার মুখে ব্রণর দাগে মুখ খুব বিশ্রী হয়ে গিয়েছে।

উত্তর : আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। মুখে Dienoestrol Cream (Johnson & Johnson) দুবেলা মাখবেন। ব্রণতে পুঁজ জমলে Terramycin Cream মাখবেন।

প্রশ্ন ২ : শরীরটা একটু ভাল করতে চাই।

উত্তর : আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর Siomethionine Forte (Albert David) অথবা Hepobyle M. C. (Dragon

(Chemicals) জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন।

● শ্রীমৃণাল রায়, গৌহাটী—

প্রশ্ন: আমার বয়স ২৩। আজ ৪ বৎসর যাবৎ মাঝে মাঝে আমার নাক দিয়ে টাটকা রক্ত পড়ে, এর প্রতিকার কি?

উত্তর: আগে কোন E N T. Specialist-কে দেখিয়ে নিন। Polyp থাকলে তার চিকিৎসা করিয়ে নেবেন। তা যদি না থাকে, তাহলে ভাববার কিছু নেই। আপনা থেকেই সেরে যাবে। আপনি নিয়মিত একগ্লাস করে কমলালেবু অথবা মুসাম্বির রস খেতে পারেন।

● শ্রীনিত্যগোপাল বসু, সুবর্ণপুর, নদীয়া—

আপনার বর্ণিত রোগীকে ডাক্তার না দেখিয়ে কোন ওষুধ দেবেন না। আপনি যে-কোন ভাল চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করুন।

● শ্রীসুভাষ সাহা, বিজনীবাজার (নতুন দোকান), গোয়ালপাড়া, আসাম—

আপনি ব্রণর জন্যে মুখে Dieno-estrol Cream মাখবেন।

● শ্রীগীতিকার রায়, প্রবাসনগর, ২৪ পরগনা—

প্রশ্ন: যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত (২২-২৩ বৎসর) হস্তমৈথুনের দ্বারা জৈবপ্রবৃত্তি দমনে প্রবৃত্ত আছি। প্রায় প্রতিদিন হস্তমৈথুন করতে বাধ্য হই। বিবাহ এখন একরকম অসম্ভব। পড়াশুনা করতে হচ্ছে। উপায় বলে দিন।

উত্তর: এটি একটি অভ্যাস। অভ্যাস করলেই যেমন অভ্যাস হয়, আবার পরিত্যাগ করলেই কমে যায়। আপনি সকালে তিনঘণ্টা সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা জোরে জোরে পড়বেন। বিকেল-বেলায় ব্যায়াম অথবা খেলাধুলা করবেন। রাতে একা শোবেন না, এবং নির্জন জায়গায় যাবেন না।

● শ্রীঅনিল দত্ত, শশাঙ্কশেখর শীল, শোভাবাজার, কলি-৫—

প্রশ্ন ১: আসন করলে কি বেশি পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন? ইহা করিলে দেহ নীরোগ হয়?

উত্তর: স্বাভাবিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করলেই দেহ সুস্থ থাকবে। আসন করলে দেহ বলিষ্ঠ হয়, আর বলিষ্ঠ দেহে রোগ কম হয়।

প্রশ্ন ২: বয়স ২২ বৎসর। দাড়ি ও গোঁফ খুব অল্প পরিমাণে উঠিয়াছে। এমন কি মলম আছে যা লাগাইলে দাড়ি গোঁফ হয়?

উত্তর: Parendran Ointment দু'বেলা মুখে মেখে দেখতে পারেন, আর নিয়মিতভাবে রোজ দাড়ি কামাবেন।

● শ্রীরাণাকুমার মিত্র, ফরডাইস লেন, কলি-১৪—

আপনি Siozan Tablet সকালে দুটো, দুপুরে দুটো এবং রাতে দুটো সাত দিন খাবেন, তা ছাড়া Amino-zyme ওষুধ দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে খাবেন।

● শ্রীসন্তোষ সোম, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯—

কোন ভয় নেই। এটা কোন রোগ নয়। আপনা থেকেই সেরে যাবে।

● শ্রীঅজিতকুমার সাহা, ভাংরা পাড়া, রাণাঘাট—

আপনি প্রত্যহ রাতে চা চামচের দু চামচ করে Quino Bael জলে ভিজিয়ে খাবেন।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাংকেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সংগে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

● শ্রী বি গুহ, এস কি গার্ডেন রোড, কলি-৩০—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর ১টি করে Calcium Pantothenate বড়ি খাবেন, অন্তত তিন মাস।

● শ্রীসুদীপকুমার বসু, নাকতলা, কলিকাতা-৪৭—

আপনি যে প্রশ্ন দুটি পাঠিয়েছেন, তার কোনটিই অসুস্থতাজনিত কারণে ঘটে নি। ওগুলি স্বাভাবিক। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া ও কাজকর্ম করলেই কমে যাবে।

● শ্রীসুনীতিকুমার পুড়িয়া, বেনাড়ী, হাওড়া, উলুবেড়িয়া—

চিঠিতে আপনার বয়সের উল্লেখ নেই। যদি বয়স চল্লিশের বেশি হয়, তাহলে কোন আশা নেই।

● শ্রীশ্যামাকান্ত দাস, বোনপাস, কামারপাড়া, বর্ধমান—

আপনি নিয়মিত দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Aminozyme খাবেন, অন্তত দু' মাস।

● শ্রীবলরাম নস্কর, গোপালপুর, ২৪ পরগনা—

প্রশ্ন : আমার হার্ট খুব দুর্বল ; মাঝে মাঝে বাঁদিকে বেদনা অনুভব করি। আর মাঝে মাঝে মাথা ঘোরা ও চাপা অম্ল উদগার হয়।

উত্তর : আমার মনে হয় চাপা অম্লের জন্য বুকে ব্যথা হচ্ছে। তবু আপনি একবার কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে তার মতামত নেবেন।

প্রশ্ন ২ : এমতাবস্থায় আমার বিবাহের প্রস্তুতি চলিতেছে। এই অবস্থায় আমার বিয়ে করা চলে কি না তাহাও জানাইবেন।

উত্তর : যদি হার্টে কোন দোষ না থাকে, তাহলে বিয়েতে কোন বাধা নেই।

● শ্রীঅজিতকুমার দাস, নারিকেলবাগান, কলি-৩২—

প্রশ্ন : আমি অসহায় দুস্থ কুষ্ঠরোগীদের বিনামূল্যে দৈবপ্রদত্ত ওষুধ বিতরণ করিতে প্রস্তুত।

উত্তর : আপনি এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

● শ্রীবিনয়কুমার কর, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর ১টি করে Spemen Forte বড়ি খাবেন, অন্তত একমাস।

● শ্রী এ কে বিশ্বাস, হায়াৎ খাঁ লেন, কলি-৯—

আপনি সকাল সন্ধ্যে Calcinol জাতীয় ওষুধ চা চামচের দু চামচ করে খাবেন। আর সকালে ১টি, দুপুরে ১টি এবং রাতে ১টি Davoquin বড়ি খাবেন, দশ দিন।

● শ্রীপ্রভাতকুমার নন্দ, এগরা, মেদিনীপুর—

কোন ভয় নেই। আপনি নিয়মিত পড়াশুনা করবেন, দেখবেন উপসর্গ কমে গেছে।

● শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য, গরিফা, ২৪ পরগনা—

আপনি সকালে ১টি, সন্ধ্যেয় ১টি Amicline জাতীয় বড়ি খাবেন, অন্তত ১৫ দিন।

● শ্রীঅমলকুমার সাহা, ব্যানার্জি পাড়া, নৈহাটি—

ক্রিমি সারাজীবন ধরে থাকতে পারে। কোন ভয় নেই। আপনি ক্রিমির চিকিৎসা করান, দেখবেন উপসর্গ কমে যাচ্ছে।

● শ্রীপার্থপ্রতিম রায়, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলি-১২—

আপনি যে প্রশ্ন দুটি করেছেন, তার দুটিই মানসিক দুর্বলতা থেকে হয়েছে। বেঁটে হলেই যে বোকা হবে, তার কোন অর্থ নেই। পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিও বেঁটে তার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। নেপোলিয়ান অত্যন্ত বেঁটে ছিলেন। আপনি নিজের কাজ করে যান। আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই দেখবেন, বন্ধুরা আর ঠাট্টা করছে না, সমীহ করছে।

● শ্রীসুব সেন, উত্তর বিহার—

দু নম্বর প্রশ্নে যা লিখেছেন, তা স্বাভাবিক। ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই। এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বলছি আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর ১টি করে Nevrovitamin—4 (Adult) বড়ি খাবেন, অন্তত দু মাস।

● সুনীলকুমার চক্রবর্তী, বুদবুদ চটি, বর্ধমান—

এ বিষয়ে খুব একটা আশা দেওয়া যায় না। তবু Glutamic Acid বড়ি নিয়মিত খাইয়ে যাবেন।

মহিলা মহল

॥ পাঠকরা পড়বেন না ॥

● মিসেস সারবানু হক, কালী নগর, মুর্শিদাবাদ—

আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন তার কোন বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ নেই। অপারেশন ছাড়া সঠিক পথ নেই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে।

● শ্রীমতী সুজাতা চট্টোপাধ্যায়, বিডন স্ট্রীট, কলি-৬—

প্রশ্ন : চুল ওঠা কি করিলে বন্ধ হইবে ?

উত্তর : আপনি নিয়মিত Vitamin B Complex ইনজেকশন নেবেন অথবা খাবেন। চুল শুকনো রাখবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে দূর করবেন।

● নন্দিতা, দক্ষিণপল্লী, সোদপুর—

প্রশ্নগুলি ছাপালাম না। আপনি মুখে Dinoestrol Cream দুবেলা মাখবেন।

● শ্রীমতী, কলিকাতা—

আপনার নাম প্রকাশ করতে চান না যখন, তখন কেন প্রকাশ করবো। প্রশ্নও দিতে চান না। বেশ, উত্তরেই বলছি, বিয়ে করতে কোন বাধা নেই। একবার পরীক্ষা করে দেখে নেবেন পুরনো রোগের রেশ আছে কিনা। যদি না থাকে নিশ্চিন্তে বিবাহ এবং সংসার করতে পারেন।

● শ্রীমতী গৌরী চ্যাটার্জী, ল্যান্স ডাউন রোড, কলিকাতা—

আপনি নিয়মিতভাবে Paladec দু চামচ করে দুবার খাবেন। Masse Cream যেখানে বলেছেন মালিশ করবেন দুবার করে, আর মুখে

বিমল মিত্রের

হাতে রইলো তিন

"বেগম মেরী বিশ্বাস", "সাহেব বিবি গোলাম", "চলো কলকাতা" প্রভৃতি গ্রন্থের খ্যাতি বিমল মিত্রকে মহত্ত্বের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দিলেও তাঁর এই সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসটিই হয়তো তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে চিহ্নিত হবে ॥ দাম ৬·০০ ॥

বিমল করের

যদুবংশ

বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধের শেষ আশ্রয়টুকুও যারা হারিয়েছে, অবিশ্বাস-বঞ্চনা-নৈরাশ্য ও অবিবেক যাদের সামনে রচনা করেছে আত্মহননের গভীর খাদ—সেই ভ্রষ্ট, উন্মার্গ যুবসমাজের ভয়ংকর-সুন্দর প্রতিচিত্র "যদুবংশ" ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৭·০০ ॥

বুদ্ধদেব বসুর

গোলাপ কেন কালো

স্নাতকোত্তর সাহিত্যের ক্লাসের এক উজ্জ্বল ছাত্র, কবিতা ছিল যার অতিপ্রিয়, স্বয়ং ঈশ্বরের ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলিকে পর্যন্ত যে নতুন সৃষ্টির ফুলে আকীর্ণ করার স্বপ্ন দেখতো, তারই এক জবরদস্ত আই-সি-এস-এ বিবর্তনের মর্মস্পর্শী কাহিনী এই উপন্যাস ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৫·০০ ॥

সমরেশ বসুর

প্রজাপতি

সমরেশ বসুর "বিবর" পর্বের তৃতীয় উপন্যাস "প্রজাপতি"র নায়ক সুখেন্দুর জন্যে সকলেই চিন্তিত, বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। পাঠক, সমালোচক, এমন কি লেখকও। কিন্তু সুখেন্দুর জন্যে দায়ী কে? সুখেন্দুর রচয়িতা? সুখেন্দু নিজে? নাকি সুখেন্দুর স্রষ্টা? তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০ ॥

সাগরময় ঘোষের

ঝরাপাতার ঝাঁপি

"সম্পাদকের বৈঠকে"র পর এবার "ঝরাপাতার ঝাঁপি"। স্বত্ব একই, স্বাদও—সেই সরস বৈঠকী গল্প, সেই হালকা আড্ডার মেজাজ। "সম্পাদকের বৈঠকে"তে ছিল শুধু সাহিত্যিকদের গল্প, এতে তা তো আছেই, আছে আরো অনেক কিছু ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৪·০০ ॥

শ্রীপান্থের

হারেম

আলো-আঁধার হাসি-কান্নার এক বিচিত্র লীলাভূমি মধ্যযুগের রাজ-অন্তঃপুর ঝাঁক ঝাঁক হুরীর সুলতানী বেহেস্ত হারেম। শ্রীপান্থ তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে এই রহস্যময় জগতের একটি জীবন্ত ছবি এঁকেছেন এ গ্রন্থে ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৫·০০ ॥

শিবরাম চক্রবর্তীর

ইতুর থেকে ইত্যাদি

যখের ধন পেয়েছেন শ্রীযুক্ত গদাই লস্কর মশায়, এবং তিনি স্থির করেছেন সে ধন তিনি বিলিয়ে দেবেন। কিন্তু একটি শর্ত: প্রার্থীদের একটি অদ্ভুত প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হবে—যা কুমার-বিমলের দুঃসাহসিক অভিযানের চেয়ে কিছু কম রোমাঞ্চকর নয় ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৩·০০ ॥

প্রফুল্লকুমার সরকারের

লোকারণ্য

দেশসেবা তথা রাজনীতির জটিল পরিপ্রেক্ষিতে সুবিন্যস্ত একটি মধুর প্রেম-কাহিনী "লোকারণ্য"। আদর্শ এবং আন্তরিকতায় দীপ্ত এমন সুসংযত রচনা ইদানীং কালে দুর্লভ। বহুকাল অমুদ্রিত থাকার পর এই সুরচিত উপন্যাসটির নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হল ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অফিস: ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র: ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৩৪

রর মেয়ে
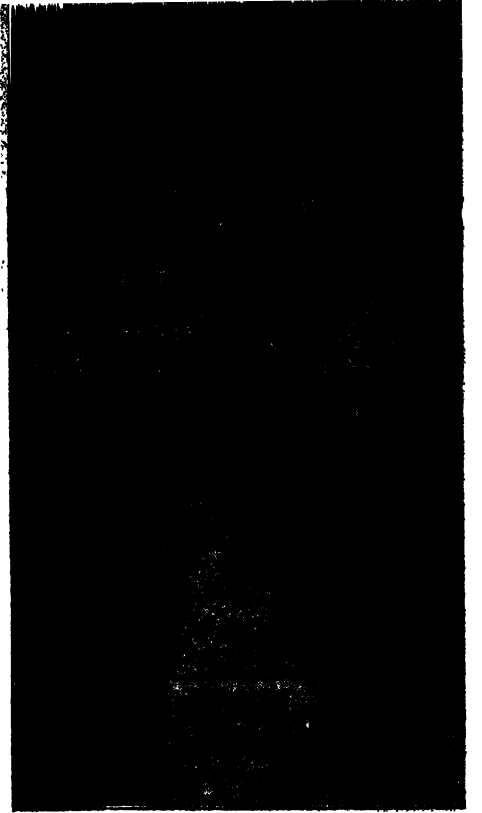
শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

কালো মেয়ে

Terramycin Ointment লাগা-বেন।

● শ্রীমতী জয়া মুখার্জি, শরৎ বসু রোড, কলি-১৭—

আপনি এত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন কেন? আপনার যে সমস্যা তা নিশ্চয়ই চলে যাবে, কারণ আপনার বয়স অত্যন্ত কম। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Sharkoferrol ওষুধ খাবেন, দু মাস ধরে। ও সব নিয়ে কিচ্ছু ভাববেন না। সর্বত্র বেড়াতে যাবেন, কেউ কিছু বললেও ভ্রুক্ষেপ করবেন না। দু মাস পরে জানাবেন কেমন আছেন।

● শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, সি, ঘোষ লেন, হাওড়া—

আপনি সকাল-সন্ধ্যা চা চামচের ১ চামচ করে Elixir Neogadine খাবেন কিছু খাবার পর, আর দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Aminozyme খাবেন, অন্তত দু মাস।

● শ্রীমতী শিপ্রা সান্যাল, চন্দননগর, হুগলী—

আপনি নিয়মিতভাবে দিনে দুবার করে Dienoestrol Cream মাখবেন। ওগুলো যেতে দেরি হবে, ধৈর্য হারাবেন না।

● শ্রীমতী সাধনা ত্রিপাঠী, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলি-১২—

আপনি Cantheridine তেল মেখে দেখুন, হয়ত উপকার পাবেন।

● শ্রীমতী মেহেরুন্নিসা, মেহের-মঞ্জিল মিয়াবাজার, মেদিনীপুর—

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। বিরক্ত বোধ করবো কেন? প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দেওয়ার জন্যই তো আরোগ্য বিভাগ।

প্রশ্ন ১: আমার একজন আত্মীয়—তার ১২ মাসই হাত-পায়ের তেলোয় ভীষণ ঘাম দেয়, ঘামের ফলে হাতের চামড়া ওঠে। প্রতিকার কি?

উত্তর: হাত-পা ঘামে সাধারণত মানসিক দুশ্চিন্তায় (Mental Tension)। এ জিনিষ কমানো বেশ আয়াসসাপেক্ষ। আপনি Stemetil 5mg জাতীয় বড়ি সকালে ১টি, রাতে ১টি দিন পনেরো খাইয়ে দেখতে পারেন।

প্রশ্ন ২: মাঝে মাঝে আমার মাথা ঘোরে। রান্না করার সময় উনুনের পাশে হয়ত বসে আছি, হঠাৎ মাথা ঘুরে ওঠে, যখন তখন হঠাৎ-হঠাৎই মাথা ঘোরে।

উত্তর: এ ধরণের মাথা ঘোরা সাধারণত কম ব্লাডপ্রেসার থাকলে হয়। গরমে ব্লাডপ্রেসার কমে, শীতে বাড়ে। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে Sharkoferrol ওষুধ খাবেন, দেখবেন উপসর্গ কমে গেছে।

নতুন প্রণয়ী মন

করুণাময় বসু

একদিন এসেছিল বুঝি
নতুন প্রণয়ী মন, পেয়েছি সেদিন খুঁজি
রোদ ধরা গাছে গাছে সোনালি আদর,
একঝাঁক পাখিদের গানে গানে ভোরের আদোর॥
ছিল ঢেউ তোলা নদী, ছিল বাঁকা চাঁদ,
ছিল মায়াময় বনরেখা, নব চেতনার স্বাদ।
ছিল দূরে আরো দূরে ইন্দ্রধনু রেখা,
সেই রঙ চুরি করে মনে মনে ছিল কিছু লেখা।
তখন এসেছ তুমি,
ফুলে ফুলে ভরা ছিল দূর বনভূমি।

তারপর মন চলে গেল,
ঝরা পাতা এলোমেলো
উড়ে গেল কৃষ্ণচূড়া বনে;
মন নেই, আমি একা গহন নির্জনে।
রোদে আর মায়া নেই, কেঁদে মরে চাঁদ,
তুমি আর তুমি নেই, ভুলেছি আস্বাদ।
অন্ধকারে দুই হাতে ভাগ করে খোঁজা,
তবু জানি তুমি শুধু বোঝা।
মুছে গেছে, ভুলে গেছি আগের চেহারা,
মনে আর রঙ নেই, নেই কোন সাড়া।

একদিন তাই বসে ভাবি
নতুন প্রণয়ী মন খুঁজে আনে
স্মরণের মায়াময় চাবি;—
যে চাবি হারায়ে গেলে
মুছে যায় রাঙা রাত,
খুঁজে আসে জীবনের মধুময় ঝাঁপি।

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ ছাব্বিশ ॥

বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন বসছে—রাজনৈতিক সম্মিলন। তার সঙ্গে বসছে সাহিত্য সম্মিলন। রাজনীতিকে কে চালাবে যদি তার পিছনে ভাবের আবেগ না থাকে? সাহিত্যই সেই ভাবের ভাণ্ডার। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ভাণ্ডারী আর কে আছে? তাই রবীন্দ্রনাথই সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি।

রবীন্দ্রনাথ নৌকা করে বরিশালে পৌঁছুলেন, থাকলেনও নৌকোয়। কিন্তু প্রাদেশিক সম্মিলন পুলিশের লাঠিতে ভণ্ডুল হয়ে গেল। ফুলারসাহেব পূর্ববঙ্গের ছোটলাট, তারই চেলা বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন। তখন বরিশাল স্বদেশী-আন্দোলনে বিশাল হয়ে উঠেছে—ত্যাগে বিশাল, তেজে বিশাল, প্রেমে বিশাল—আর সেই বিরাট আন্দোলনের নেতা বিশালশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার দত্ত। ভিন্ন করো, ভিন্ন করে দুর্বল করো, দুর্বল করে পীড়ন করো—ইংরেজের এই কারসাজি অশ্বিনীকুমারের সংগঠনশক্তির সঙ্গে এঁটে উঠল না। তখন ইংরেজ সোজাসুজি লাঠি চালাল। বিলিতি নুন বর্জন করবে? সেই সঙ্গে তবে কিছু স্বদেশী রক্তও বর্জন করো।

সাহিত্য সম্মিলন হতে পারল না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তি-নিকেতনে ফিরে এলেন। কিন্তু মনের মধ্যে অশান্তি, চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে একজন উপযুক্ত সেনানায়ক দরকার—দেশনায়ক। বরিশালে ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন যাকে দণ্ড দিয়েছে, অপমান করেছে, সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেশনেতা। কলকাতায় গিয়ে সভা করলেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথকে দেশনায়ক রূপে বরণ করলেন আর তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় একজোট হয়ে দাঁড়াবার জন্যে ডাকলেন দেশবাসীকে।

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে॥
লুঠ করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো—
একনিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে॥

আরো পরে, প্রায় ত্রিশ বছর পরে, আরো একবার, আরেক-জনকে দেশনায়ক-রূপে বরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। সে আর কেউ নয়, সে নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ এবার 'খেয়া' নিয়ে বসলেন। রূঢ় বাস্তবতার ঘাট থেকে এ খেয়া নিয়ে চলেছে মনোরম অধ্যাত্মলোকে। 'নৈবেদ্য' স্পষ্ট, উচ্চকণ্ঠ—'খেয়া' অজানারি রহস্য দিয়ে ভরা। ঈশ্বর জানা হয়েও আবার অজানা। যখন জানা, তখন নৈবেদ্য। যখন অজানা তখন খেয়া। যখন নিকটের প্রতি বিশ্বাস তখন নৈবেদ্য। যখন সুদূরের প্রতি ব্যাকুলতা তখন খেয়া।

'চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে,
অজানার অতি দূর পারে।'

ঈশ্বর সন্নিহিততম হয়েও আবার সুদূরতম। কখনো রূপে, কখনো অনুভব। রূপে নৈবেদ্য, অনুভবে খেয়া।

নৈবেদ্যে ঢেলে দেওয়া, খেয়ায় উড়িয়ে দেওয়া, পাঠিয়ে দেওয়া। যখন একটি নমস্কারে সকল দেহ সংসারে লুটিয়ে পড়ে তখন নৈবেদ্য, আবার যখন মানসযাত্রী হংসের মত সমস্ত প্রাণ একটি নমস্কারে মহামরণ পারে উড়ে চলে তখন খেয়া। ঈশ্বরকে পেয়ে যেমন আমার সুখ, তাঁকে খুঁজে খুঁজে না-পাওয়াও আমার তেমনি সুখ। সোনার তরী আমাকে না তুলে শুধু আমার সোনার ধান কটি নিয়ে চলে যায় বলে আমার দুঃখ, কিন্তু খেয়াতরী আমাকে পার না করলেও আমার দুঃখ নেই কেন না যা এপার তাই আবার ওপার। যাঁর পার তাঁরই অপার। নৈবেদ্য পারের কবিতা, খেয়া অপারের।

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া
যে হাওয়াতে চলত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।
নেই যদি বা জমল পাড়ি
ঘাট আছে তো বসতে পারি
আমার আশার তরী ডুবল যদি
দেখব তোদের তরী বাওয়া॥

যেখানেই থাকি, ঘাটেই থাকি বা জলেই থাকি বা পারেই থাকি, সর্বত্রই ঈশ্বর-আশ্রয়। যিনি ইচ্ছা করলে পার করে দিতে পারতেন তিনিই ইচ্ছা করে ঘাটে ফেলে রেখেছেন। যদি জলের তলায় নিয়ে যান সেও তাঁরই ইচ্ছা। সর্বত্র তাঁর ইচ্ছা এই উপলব্ধিতে জাগ্রত হতে পারলে সর্বদাই তো তাঁর মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। তবে আর আমার চাই কী। তখন কী বা ঘাট, কোথায় বা পার, কাকে বলে অতলতলে নিমজ্জন!

'শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার, আমি তা মনে করিনে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে আমি তাঁর মধ্যেই আছি, কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে: কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ। আমার শরীর-মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না, যদি আকাশ পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন; তাঁরই আনন্দ শক্তিরূপে ছোট বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই

শান্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তারই দানে, এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে সহজ করে তুলতে হবে—এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা কর্ম এবং ভোগ, আমাদের সত্য, মঙ্গল এবং সুখ সমস্তই সহজ হয়ে যাবে —কেন না যিনি স্বয়ম্ভূ, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।'

'খেয়া' বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা। উৎসর্গের ক্ষুদ্র কবিতাটির মধ্যেই সমগ্র কাব্যের অন্তর্লীন সুরটি ধরা আছে।

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কী পেয়েছে আকাশ হতে
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।

কোথায় দূর আকাশে বিবস্বান সূর্য, কর্তা-হর্তা-তমিস্রহা —আর কোথায় মর্ত্যের এককোণে ভয়কুণ্ঠিতা লজ্জাবতী লতা। কিন্তু কী কৌশলে, কী অলক্ষ্য সংযোগ, সূর্যের আত্মীয়তাটুকু নিজের পত্রে-বৃন্তে সঞ্চারিত করে নিয়েছে। হে অন্তরতম বন্ধু, তুমি তার প্রাণের কথাটি বুঝে নিও। তার একমাত্র কথাই যে প্রকাশিত হওয়া, সে কথা তুমি ছাড়া আর কে বেশি বুঝবে? সন্ধ্যা হয়ে এল, ডালপালা সব ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে, তবু সে প্রতীক্ষা করে আছে তোমার মাঝে বিকশিত হবে বলে।

. . . .

তারার দিকে চেয়ে-চেয়ে কোন খেয়ানে রতা,
আমার লজ্জাবতী লতা'!

বন্ধু, তোমার তড়িৎ-স্পর্শ আনো। এ লজ্জিতা লতাকে পুলকাঞ্চিত করো, তাকে সার্থক করো পরমতম চেতনায়। সে যে এই চেতনার জন্যেই প্রতীক্ষা করে আছে।

তারপরেই বললেন সার কথা:

তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

এই লজ্জাবতী লতা কত ভীরু, কত ভঙ্গুর, কিন্তু তার প্রকাশপিপাসা তো সত্য। এই প্রকাশপিপাসায় সে তো আকাশচারী সমস্ত গ্রহনক্ষত্রেরই সতীর্থ—সে আর তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়, লজ্জালু নয়। তারও যে সে একই উন্মোচনের স্বপ্ন। সে প্রতীক্ষায়ই তো সে জেগে আছে, সইছে ঝড়জল রৌদ্রদাহ, সইছে নিষ্ফলতা। সে স্থিতিতে ক্ষুদ্র শক্তিতে ক্ষুদ্র কিন্তু এসে তাকে বৃহৎ অভীপ্সায় বৃহৎ—তার প্রতীক্ষা নিরবধি। তুমি এসে তাকে ছোঁবে, বলো সেই স্বপ্নের চেয়ে সত্য আর কী আছে?

অন্তত প্রতীক্ষায় তো আমি অবিচ্যুত।

দিন শেষ হয়ে এল, ঘুমের দেশটিকে দেখছি এপার থেকে। কত না জানি শান্তি আর বিরতি দিয়ে ভরা। আর এ পারের সংসার মোহকর মনে হচ্ছে না। দিন শেষ হয়ে এল, ও পারের মাথায় এ পারের কাজ ছুটি নিতে চাইছে। ও পারের গান এ পারের কোলাহলের চেয়ে কত বেশি চিত্তহর! আর এ দেশ ভালো লাগছে না, আমি যাব ওপারে। হে কর্ণধার, হে জীবনতরীর মাঝি, আমাকে নিরুদ্দেশের দেশে খেয়ায় পার করে দাও।

কিন্তু কোথায় আমার নেয়ে? কত লোক কাজকর্ম চুকিয়ে জীবনসায়াহ্নে কী নির্বাধ নির্মল স্রোতে চলে যাচ্ছে ওদেশে। আমি কি ওদের কাউকে চিনি? ওরা কি আমার স্বজন, আমার ঘনতর আত্মীয়? ওদের কাউকে ডাকলে কি আমাকে তুলে নিয়ে যেত? ওরা কেউ আসত না, আর ওদের ডাকবই বা কোন নামে? হে প্রাণের কর্ণধার, আমি শুধু তোমাকে চিনি, তোমাকে ডাকি। তুমি আমায় পার করে দাও।

যে যার আপন আপনার ঠাঁই নিয়েছে, কেউ ঘরে, কেউ ওপারে। কিন্তু আমি ঘরছাড়া, ঘরেও আমার স্থান নেই, পারের নৌকোও খুঁজে পাচ্ছি না। পথে পড়ে আছি, তুমি ছাড়া কে আর আমাকে আশ্রয় দেয়? সংসার আঁকড়ে থাকবার না আছে আসক্তি, পরপারে গিয়ে দাঁড়াবার না আছে আধ্যাত্মিক সামর্থ্য। 'ঘরেও নহে পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে?' আমি ঘরে থাকবার উপযুক্ত নই, পারে যাবারও উপযুক্ত নই, তবু হে দয়াময়, আমি তোমার কোলে যাবার কোলে থাকবার উপযুক্ত।

নাই বা ফুটল আমার ফুল, নাই বা ফলল আমার ফসল, তবু সমস্ত ঝরা-মরা সত্ত্বেও আমি তোমার হিসেবে অনির্বাচ্য নই। আমি যে তোমারই বাগানের ঝরাফুল তোমারই মাঠের মরা ফসল। তাই আমাকেই বা তুমি কেমন করে ফেলবে? তুমি তো শুধু চরিতার্থের নও তুমি ব্যর্থমনোরথের। তুমিই তো হতাশের শেষ আশা, নিঃস্বের শেষ সম্বল, সর্বস্বান্তের অন্তসর্বস্ব। 'দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁজের আলো জ্বলল না, সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।' আমি জানি আমারও মৃত্যু আছে, আমারও মাঝি আছে।

বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'হে আনন্দসমুদ্র, এ পারও তোমার, ও পারও তোমার। কিন্তু, একটা পারকে যখন আমার পার বলি তখন ও পারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়, ওপারের জন্যে ভিতরে-ভিতরে কেবলই তার প্রাণ কাঁদতে থাকে। আমার পারের আমিটি তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিণী। পার হবার জন্যে তাই এত ডাকাডাকি।'

আরো বলছেন, 'এইটে আমার ঘর বলে আমি-লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরছে। যতক্ষণ না বলতে পারলে 'এইটে তোমারও ঘর', ততক্ষণ তার যে কত দাহ, কত বন্ধন, কত ক্ষতি তার সীমা নেই—ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে-করতে তার অন্তরাত্মা কেঁদে গাইতে থাকে, 'হরি, আমায় পার করো।' যখনই সে আমার ঘরকে তোমারই ঘর করে তুলতে পারে তখনই সে ঘরের মধ্যে থেকে পার হয়ে যায়। আমার কর্ম মনে করে আমি-লোকটা রাত্রিদিন যখন হাঁসফাঁস করে বেড়ায়, তখন সে কত আঘাত পায় আর কত আঘাত করে, তখনই তার গান 'আমায় পার করো'—যখন সে বলতে পারে 'তোমার কর্ম', তখন সে পার হয়ে গেছে।'

এই আমিত্বের কারাকক্ষে বসেই হঠাৎ কোনো শুভক্ষণে দিব্যচেতনার চকিত স্পর্শ লাভ করি। তখন 'মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে।' আমার মধ্যে দুটো আমি আছে—কাঁচা আমি আর পাকা আমি, ক্ষণিক আমি আর সুচির আমি। ক্ষণিক আমি-র ক্ষুদ্র হিসেব, সে শুধু সুখকে খোঁজে আর দুঃখকে এড়ায়, কিন্তু সুচির আমি হঠাৎ এক দুর্লভ মুহূর্তে সমস্ত সংকীর্ণ হিসেব ওলোটপালোট করে দিয়ে একটা বড়ো দুঃখকেই আঁকড়ে ধরে শাশ্বত আনন্দের আস্বাদ পায়। হে ঈশ্বর, তুমিই আমার সেই বড়ো দুঃখের চিরন্তন সুখ।

রাজার দুলাল আজ আমার ঘরের সমুখ পথ দিয়ে চলে যাবে—মা গো, আমার জীবনে আজ সেই শুভ মুহূর্ত এসেছে, বলো আজ আমি কী করে আমার অভ্যস্ত জীবনে আবদ্ধ থাকি, কী করে প্রতিদিনের পুরোনো গৃহকাজেই ঘুরি-ফিরি? মা গো,

তবে আমাকে ঘরের ক্ষুদ্র বাতায়নকোণটিতে দাঁড়াতে দে। আমি ছলামই বা না কুণ্ঠিতা-গুণ্ঠিতা গোপচারিণী অন্তঃপুরের মেয়ে, রাজদর্শনের যোগ্য সাজে আমাকে সাজতে দে—কিন্তু কী হবে আমার উৎসববেশ আমি কিছুই জানি না। তুই বলে দে আমি কেমন সাজে সাজব? হ্যাঁ, জানি একপলকের দেখা —তাই তো এক জন্মের সুখ, বল কোন ভঙ্গিতে কোন বর্ণের বসন পরব? 'ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ'—আমার তো সেই রাধিকার কান্না—

'কোটি নেত্র নাহি দিল, দিল মাত্র দুই।
তাহাতে নিমিখ কৃষ্ণ কি হেরিব মুই॥'

তবু সেই নিমেষটির জন্যে আমি না সেজে থাকি কি করে? শুধু নিমেষের দেখার জন্যে এক জীবনের আয়োজন।

মাগো, রাজার দুলাল আমার ঘরের সমুখ পথ দিয়ে চলে গেল। আমি বাতায়নকোণে দাঁড়িয়েছিলাম, ভালো করে দেখবার জন্যে মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়েছিলাম, এক নিমেষকে যুগায়িত করে দেখলাম সেই রাজেন্দ্রকে, আর চকিতে কী হল কে জানে, বুকের মণিহার ছিঁড়ে তার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিলাম। কত দিনের কত সঞ্চয়ের এই মণিহার—কত স্পর্ধার এই ঐশ্বর্য, তাকে তৃক্ষণ-তক্ষণি দিয়ে দিতে একবিন্দু দ্বিধা হল না। মাগো, সে-মণি সে নিল না কুড়িয়ে, রথের চাকার তলায় তা গুঁড়ো হয়ে গেল, রইল পথের ধুলোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে।

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ—
ধুলায় রহিল ঢাকা॥

কিন্তু সে নিক বা না নিক, আমি যে তাকে আমার বুকের মণি দিতে পেরেছি এতেই আমি কৃতকৃতার্থ। আমি যে এতদিন জেগেছি আর জ্বলেছি, আমি যে তাকে দেখেছি আর দেখামাত্রই চিনেছি এতেই আমার পরম তৃপ্তি। সে নিল কি না-নিল এতে আমার কিছুই যায়-আসে না, আমি যে সেই ক্ষুদ্র নিমেষের মধ্যে আমার বুক-উজাড় করা ধন তাকে দিয়ে দিতে পেরেছি এতেই আমি পরিপূর্ণ। মাগো, তুই বল, তাকে দেখামাত্রই বুকের মণি কি না দিয়ে থাকতে পারা যায়?

তবু রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখ পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে।

সে শুধু চলেই যায় না, কখনো-কখনো চলে আসে, ঢুকে পড়ে। দরজা বন্ধ থাকলে দরজা ভেঙে ফেলে। কেউ পারে না তাকে প্রতিরোধ করতে। আসে ঝড় হয়ে আগুন হয়ে বন্যা হয়ে ভূমিকম্প হয়ে। আসে যুদ্ধের মূর্তিতে, মহামার অশান্তির আকৃতিতে। শোক হয়ে দুঃখ হয়ে অকালমৃত্যু হয়ে। তবু, প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ আবৃত করে যদি ভয়াল-করাল মূর্তিতেই আস, তোমাকে আমার শূন্য ঘরে অভ্যর্থনা করে নেব।

ভেবেছিলাম তুমি আসবে না। আরামের অভ্যাসে বন্ধ ঘরে নিশ্চিন্ত নিরীহতায় শুয়েছিলাম। দরজায় তোমার আঘাত লেগেছিল, ভেবেছিলাম বাতাসের শব্দ। রথচক্রের ঘর্ঘরও বুঝি কানে আসছিল, ভেবেছিলাম মেঘগর্জন। পাছে আরামের ব্যাঘাত ঘটে সেই আলস্যে বিশ্বাস করতে চাই নি যে তুমি আসবে, তুমি আসতে পারো। কিন্তু সহসা তুমি ঘরের সমস্ত দরজা ভেঙে প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মূর্তিতে দেখা দিলে। আমাকে এতটুকুও প্রস্তুত হতে দিলে না। কোথায় আলো কোথায় মালা কোথায় সভা, কোথায় আসন—আমি তোমাকে কী দিয়ে অভ্যর্থনা করব? ভেবো না ভয় পেয়ে মুখ লুকোব, বা কিছু আয়োজন নেই বলে লজ্জায় মুখ লুকোব। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাই দিয়ে তোমাকে বরণ করে নেব। শূন্যতা দিয়েছ, সেই শূন্যতা দিয়েই আবাহন করব তোমাকে, রিক্ততা দিয়েছ তাই দিয়ে তোমার নৈবেদ্য রচনা করব।

'যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।'

ভেবো না ফিরিয়ে দেব তোমাকে। আমার আর্তনাদই তোমার শঙ্খধ্বনি হোক। আমার অশ্রুই হোক তোমার পাদ্য অর্ঘ্য। ঘর নেই, আমার আঙিনাই যখন ঘর, তখন ঐ আঙিনায় ছিন্ন শয়ন পেতে দেব, হে মহারাজ, সেইখানেই তুমি বোসো আমার পাশটিতে।

ওরে দুয়ার খুলে দেরে
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে
বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখ রাতের রাজা॥

কিন্তু তোমার দেওয়া দুঃখ আসলে তো তোমারই জন্যে দুঃখ। তাই কতক্ষণ পরে দেখি আমার অশ্রুর সরোবরে প্রসাদ-সুন্দর একটি শ্বেতকমল ফুটেছে—শান্তির শ্বেতকমল। আর-সমস্ত-কিছুর জন্যে যে কাঁদি সে আবিল অশ্রু, তোমার জন্যে যে কাঁদি সে অমল অশ্রু। দুঃখ দিয়ে যখন বোঝাও এ তোমার স্পর্শ, তোমার দান, তখন অশ্রুর আবিলতা কেটে যায়, সব হারিয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যখন তোমাকে নিতে চাই, তখন দেখি কিছুই হারায় নি, অশ্রু তখন প্রেমাশ্রু হয়ে ওঠে। প্রেমাশ্রুই তো অমল অশ্রু।

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটিমাত্র শ্বেত শতদল
আলোকে-পুলকে করে ঢলঢল
কখন ফুটিল বল মোরে বল
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিল মাঝে॥

কে জানত তুমি এমন অশান্তির রাজা হয়ে শান্তিরও অধিপতি। দুঃখযামিনীর তিমিরমঞ্জুষার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ একটি অমূল্য রত্ন, সে যে তোমারই প্রেমপ্রসন্ন মুখের উদার আশ্বাস। তুমি আছ, শত ঝড়ে-মেঘেও তোমার মুখখানি অম্লান আছে। আর কে না জানে ঝড় এসেছিল ঘর ভেঙেছিল সব গিয়েছিল বলেই দুঃখরাত্রির বুকচেরা ধন, তোমাকে পেলাম।

ইহারি লাগিয়া হৃদিবিদারণ
এত ক্রন্দন এত জাগরণ
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
বক্ষে লেখি।
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

আমি জানি তুমি ক্ষুদ্রাত্মা নও, আমিই বা কেন তবে দীনাত্মা হব? না, আমি শুধু কোমলতা চাইব না, নেব তোমার কঠোরকে, তীক্ষ্ণকে, কর্কশকুটিলকে। নেব লাঞ্ছনা অপমান নেব সমস্ত প্রাতিকূল্য। সব কিছুকেই তোমার দয়া বলে মনে করব —শুধু হার নয়, প্রহারকেও। তাই বুকে করে রাখব, রাখব তোমার দান ও দয়ার মর্যাদাকে। আমি কাঙালের মতো তোমার ফুলের মালা চাইব না, দাও দাও তোমার উগ্র-নগ্ন তরবারি, দাও তার নির্মম আঘাত, ব্যথা পাব, তবু সে আঘাত নেব বুকে পেতে।

রাখতে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান।

তোমার ভীষণের মধ্যেই তো অভয়, তোমার নিদারুণের মধ্যেই তো মঙ্গল, তোমার লেলিহান অগ্নিশিখাই তো আনন্দের মুখ। ফুলের মালা তো শুধু বাঁধতে চাইত, তরবারিই তো বন্ধনকর্তনের উপায়। দুঃখ দিয়েই তো তুমি আমাকে উজ্জ্বল করো সম্মানিত করো, অশান্তির মধ্যে শান্তির বাসা বাঁধো। সমস্তই তোমার বিচিত্র ছলনা, একমাত্র তুমিই শান্তির নিকেতন।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে......
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

রঞ্জন।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

বৃন্দাবনের বন নিকুঞ্জে শ্রীরূপ গোস্বামীর
কুটীরাঙ্গনে উপনীত হলো একদা ভক্তবীর
সাধু একজন,—মুখে তাম্বুল বুকে ভরা অভিমান,
গত রজনীতে আরোপে তাঁহার শ্রীমতী করেছে দান
এ মহাপ্রসাদ; মনে মনে ভাবে—"পরম নিষ্ঠাচারী
এ হেন সাধুর পদধূলি নিতে পড়ে যাবে কাড়াকাড়ি
বৃন্দাবনের ভক্ত সমাজে;—এমনো হইতে পারে,
স্বয়ং শ্রীরূপ বহু সম্মানে বুকে টানিবেন তারে।"

আসলে কিন্তু হইল না তাহা; গোঁসাই শুধান "ভাই
আজ একাদশী, শ্রীহরিবাসর একথা কি মনে নাই?
মুখে কেন তবে হেরি তাম্বুল?" ভক্ত কহিল তেজে,
"কোথা তাম্বুল? শ্রীরাধারাণীর করুণামৃত এ যে!"

শুনে গোস্বামী রাগিয়া কহেন,—"আরে রে অর্বাচীন:
কে দিয়েছে তোরে এমন শিক্ষা শাস্ত্র বিধানহীন
ভক্তি বিরোধী আচার এমন? যা' তুই কুঞ্জ ছেড়ে,
ভক্তি আমার থাকিলে তো রাধা, নয় রাধারাণী কে রে?

কে সেই কৃষ্ণ রাস-রস-রাজ রসিক শেখর কে বা?
সিদ্ধি আগে না সাধনা আগে রে? প্রসাদ আগে না সেবা?"

সাহিত্য পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব / বাক্-সাহিত্য

ইতিহাসাশ্রিত রচনায় হাত পাকানোর পর, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক এবার পাঠকের দরবারে পেশ করেছেন একটি পুরাণ আশ্রয়ী উপন্যাস। বিষয়বস্তু হিন্দুমাত্রেরই অতি পরিচিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও লীলাপ্রসঙ্গ; তবু এত পরিচয়ের বাঁধন ছিঁড়ে যে সত্য আত্মপ্রকাশ করেছে তার মাধুর্য চির-অপরিচয়ের নিশানা আঁকা। ভগবানকে এখানে আঁকা হয়েছে মানুষ করে, অপ্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষরূপে না এঁকে গ্রন্থকার তাঁকে এঁকেছেন বীর্যবান, হৃদয়বান ও কর্তব্যপরায়ণ এক প্রেমিকরূপে। পুরাণের পাশে ইতিহাস এসে দাড়িয়েছে কত সহজে, লেখক সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে লিখে পৌরাণিক কাহিনীকে একটা নতুন আস্বাদে ভরে দিতে চেয়েছেন এবং বলা বাহুল্য সফলও হয়েছেন। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখক যে এরই মধ্যে নিজস্ব একটি আসন সংগ্রহ করে নিতে পেরেছেন তার মূলেও আছে এই সন্ধানপিপাসা। আলোচ্য গ্রন্থটির বৈচিত্র্যও এ কথার স্বাক্ষরবাহী, লেখকের অনন্য শৈলী বিষয়বস্তুর মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে। প্রচ্ছদ রুচিস্মিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বারীন্দ্রনাথ দাশ। প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯; দাম—নয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি / সাহিত্য-সংসদ

ভগবান বুদ্ধ ও তৎপ্রচলিত বৌদ্ধ মতবাদ বা সংস্কৃতির মাধ্যমে একদিন ভারতীয় সংস্কৃতি বহুলাংশে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, আজকের বঙ্গীয় তথা বিশ্ব সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের সারস্বত সাধনায়ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট; রবীন্দ্র সাহিত্যেও এই প্রভাব লক্ষণীয়, বস্তুত ভারতীয় আর কোন সাহিত্যেই বোধহয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব এত বেশী নয়। বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্র সাহিত্যের এই বিশেষ দিকটি নিয়েই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটির প্রত্যেক অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর অংশবিশেষ নিয়ে সুচিন্তিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ও পরিণতির ধারাবাহিক ইতিহাস বিধৃত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র জীবনে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির চেতনা সঞ্চারে সমকালীন ভাবধারা ও ঘটনা প্রবাহের একটা সুস্পষ্ট আভাস দানের প্রয়াস পরিলক্ষিত। এইভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে নিজের বক্তব্যকে যথেষ্ট পরিচ্ছন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক অনুসন্ধিৎসু ও বোদ্ধাপাঠকমাত্রই যে এ গ্রন্থকে যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ, লেখক—সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, প্রকাশনায়—সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯, দাম—দশ টাকা।

সমুদ্রের চূড়া / প্রকাশ ভবন

কোন-এক বিখ্যাত ছায়াচিত্র কাহিনীর সঙ্গে যে এ গ্রন্থের কাহিনীর সৌসাদৃশ্য আছে সে কথা ভূমিকায় স্বীকার করেছেন লেখক; কিন্তু তাও স্বাদে গন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক। বিখ্যাত চিত্র কাহিনী বো, জেস্টই যে বর্তমান গ্রন্থ-কাহিনীর মূলসত্তা এ কথা অনস্বীকার্য, তবু এ কাহিনী আশ্চর্যরূপেই মৌলিক এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র অথচ মহা-সম্ভ্রান্ত এক ভূস্বামীর ধর্মপত্নী রাণীজির দুই পালিত পুত্র ও গর্ভজাতা কন্যা মীরা এ কাহিনীর তিন প্রধান কুশীলব। অত্যাচারী স্বামীর নৃশংস ক্রোধের আঘাত থেকে মাতৃকল্পা রাণীজিকে বাঁচানোর জন্য যেচে মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে একদিন অকূলে ভেসে পড়ল করণ ও অর্জুন দুটি ভাই, সুকুমারী মীরাও পুরুষবেশে বেরিয়ে পড়ল তাদের অন্বেষণে। বৃটিশ আমলের সে এক পৌরাণিক অধ্যায়, ফৌজে যোগ দিল করণ আর অর্জুন এবং পুরুষবেশী মীরাও, যদিও একে আরেকের আড়ালেই রয়ে গেল তারা। সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হল ছোট-খাট এক বৃটিশ বাহিনী—করণ অর্জুন ও মীরা ছিল যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যুদ্ধে নিহত হল করণ, মীরা গেল তার সঙ্গে সহমরণে, অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে আসা চোখে অর্জুন দেখলো সে দৃশ্য। কাহিনী মোটামুটি এই, তবে গ্রন্থকারের অসামান্য কথকতার প্রসাদে সামান্য কাহিনীই অনন্য এক আবেদনে জারিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেকালের ফৌজী জীবনের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় রচনার মাঝে, তা যেমন কৌতূহলপ্রদ তেমনই আকর্ষণীয়। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রকাশক—প্রকাশ ভবন। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—সাত টাকা।

রবিতীর্থ / নলেজ হোম

আলোচ্য গ্রন্থটিকে রবীন্দ্র জীবন সাহিত্যের এক সুপরিকল্পিত কোষ-গ্রন্থ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলা চলে। বস্তুত রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য নিয়ে এ ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ বোধ হয় খুব বেশী নেই। রবীন্দ্র সাহিত্য-জিজ্ঞাসু অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা বইটি হাতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন বলে মনে হয়, কারণ এর মাধ্যমে রবীন্দ্র সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন জ্ঞান জন্মাবার অবকাশ বটে। এতবড় বিরাট শ্রমসাধ্য এক দায়িত্ব পালন করার জন্য লেখক আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ নিঃসন্দেহে। রবীন্দ্র জীবন শিক্ষা ও সাধনার এক অনবদ্য দলিল হিসাবেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ। বাঙ্গালা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রচনা অনস্বীকার্যরূপে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। প্রকাশক---নলেজ হোম, ৫৯, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। দাম ---দশ টাকা।

স্ত্রীচরিত্র / মানবমন, পাভলভ ইনস্টিটিউট

আলোচ্য গ্রন্থটি এক নাট্যসংকলন। মোট তিনটি নাটক একত্রে সংগৃহীত---স্ত্রী-চরিত্র, শিলাকমল ও অনুয়। এই নাটকগুলিতে আছে এ যুগের প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ইতি-বৃত্ত। মনোবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন লেখক। চিত্রিতা, কমলকলি ও বিপাশা যথাক্রমে তিনটি নাটকের নায়িকা, যুদ্ধোত্তর সমাজের পরিবর্তিত পটভূমিতে এদের উপস্থাপিত করে বৈশ্লেষিক ভঙ্গীতে এদের দেখেছেন ও দেখিয়েছেন লেখক। নাটকগুলি মূলত ইনটেলেকচুয়াল হলেও ইমোশনে বঞ্চিত নয় এবং সেজন্যই এগুলো পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট আকর্ষণীয় বলেই প্রতীয়মান হয়। আধুনিক যুগ-যন্ত্রণা যথাযথভাবেই উপস্থিত এদের মাঝে এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যকার তার পর্যালোচনা করেছেন তাও বর্তমান যুগজীবনের পটভূমিতে বেমানান নয়। নাটকগুলি বোদ্ধা পাঠককে আনন্দ দেবে বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ ইঙ্গিতময়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক---মানবমন, পাভলভ ইনস্টিটিউট, ১৩২।১এ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪, দাম---ছয় টাকা।

দ্বিজেন্দ্র দর্পণ / বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের সাহিত্য ও জীবন প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন আলোচ্য গ্রন্থে সেগুলিকে সঙ্কলিত করা হয়েছে। মোট চারভাগে বিভক্ত এই ভাষণাবলী---(১) ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল, (২) কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, (৩) স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল ও (৪) ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক মনীষা ও ব্যক্তিত্ব এই দ্বিবিধ গুণই পরিস্ফুটিত প্রবন্ধ কয়টির মাঝে, লেখকের আন্তরিকতায় তা হৃদ্যও বটে। রচনার প্রারম্ভে লেখক বলেছেন বটে যে, ভাষা বা বর্ণনার সাহায্যে কোন মানুষের স্বরূপ নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়; কিন্তু বইটি পড়লে মনে হয়, এক্ষেত্রে অন্তত কথাটি খাটে না। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা নিখুঁত-ভাবেই ফুটে উঠেছে লেখকের উজ্জ্বল রচনাশৈলীর প্রসাদে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-মাত্রই যে এ গ্রন্থকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়-বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬।---পাঁচ টাকা মাত্র।

গুপী গাইন, বাঘা বাইন / কিশোর সাহিত্য সঙ্ঘ

বাঙ্গালা শিশু সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ, উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর এই রচনাটি প্রায় বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনা হয়েছে। গুপী গাইন ও বাঘা বাইনে গান বাজনার জুটি মিলেছিল ভাল, যদিও তাদের আসর বসাতে দেখলে শান্তিপ্রিয় মানুষমাত্রই নীল হয়ে যেত আতঙ্কে। মজার গল্প ও মজার ছবি-ভরা এই কাহিনী যে শিশু পাঠক-মাত্রকেই মাতিয়ে তুলবে একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। এ কাহিনীর চিত্ররূপ মুক্তি প্রতীক্ষায়, সুতরাং ছোটদের দলে ভিড়ে বড়রাও যে বইটি হাতে নিতে উৎসুক হয়ে উঠবেন একথা ও অসংশয়ে মানতে হয়। প্রচ্ছদ, শোভন ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক---উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, প্রকাশক---কিশোর সাহিত্য সঙ্ঘ। ১৬, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩। দাম---এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আগুন রাঙা / কথাশিল্প

আলোচ্য গ্রন্থটি এক ছোট গল্প সঙ্কলন। মোট বাইশটি কি তেইশটি গল্প একত্রে গ্রথিত হয়েছে, স্বাদে তারা ভিন্ন কিন্তু বিস্বাদ নয় কোনটিই। সহজ সরল গল্প বলতে পারাটাই যে গল্প-লেখকের সব চেয়ে বড় কেরামতি, এ ধরণের রচনা হাতে পড়লে প্রথমেই সেকথাটি মনে পড়ে। লেখিকার (বা লেখক নয়তো ?) ভাষা সাবলীল, ভঙ্গী হৃদ্যতাপূর্ণ, সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের ভাণ্ডারে যে অক্ষয় গল্পের ঝুলিটি লুকোনো থাকে, তা তিনি জানেন ও মানেন। প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট ঘটনাই তাই তাঁর হাতে গল্প হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কত-টুকু বললে রচনার শিল্পমান বজায় থাকে সেকথাও অজ্ঞাত নেই তাঁর কাছে; তাইেই গল্পগুলি শিল্পোত্তীর্ণও হয়ে উঠতে পেরেছে স্বচ্ছন্দে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা---ছবি বসু, প্রকাশনায়---কথাশিল্প। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---চার টাকা।

প্রতিফলিত গোলাপ

এই ছোট কাব্যগ্রন্থটিতে কয়েকটি আধুনিক চালে লেখা কবিতা একত্রিত করা হয়েছে। কবির শৈলী সহজ, ভঙ্গী আন্তরিক দীপ্তি না থাক স্নিগ্ধতা আছে তাঁর রচনায়। অলস মুহূর্তে কবিতাগুলিতে চোখ বোলাতে বোলাতে বেশ একটা আমেজ ঘনিয়ে ওঠে মনে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক---নীহার গুহ। প্রকাশনা---নীহার গুহ, ১৯পি, অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা-১০।

নির্জন শিখর / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখকের গল্পের গাঁথুনি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। তাঁর কাহিনীর প্রথম থেকে যে আন্তরিকতা এবং যে মহৎ আদর্শ লক্ষ্য করা যায় তা একটি মহৎ শিল্পকর্ম। চরিত্রগুলি যা সৃষ্টি করেছেন তাও বিশেষ সার্থক হয়ে উঠেছে। সাপ্তাহিক বসুমতীর শারদীয়া সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তারপর গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলো। প্রতিভাবান ছাত্রের কর্ম ও জীবন মাঝপথে থেমে যেতো যদি শিক্ষকের শুভদৃষ্টি সেদিকে পতিত না হতো, প্রকৃত শিক্ষকের কর্ম ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায় ছাত্রের মেধা লক্ষ্য করে তাকে সহায়তা করার মাধ্যমে। এখানে এই গ্রন্থে সেই মহৎ হৃদয়ের ছাপ বিদ্যমান। খ্যাতিমান লেখকের কাহিনীর এটাই একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য। সমস্ত চরিত্রগুলিই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার সহায়তা করেছে। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই মনোরম। লেখক---নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক---বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি ১২। দাম---চার টাকা।

সার্থক জনম / বাক্ সাহিত্য।

প্রখ্যাত কথাকারের সাম্প্রতিক এই গল্পসংগ্রহটি হাতে পেয়ে সাহিত্য রস-পিপাসু পাঠকমাত্রই আনন্দ লাভ করবেন। লেখক মানবদরদী, মানুষকে তিনি ভালবাসেন, মানুষের মনুষ্যত্বে তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং সেজন্যই তাঁর রচনায় নেতিবাদ একেবারেই অনুপস্থিত। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলির মাধ্যমে ও লেখকের এই জীবন-দর্শন উপস্থাপিত। মানুষ যত ছোট যত সাধারণই হোক না কেন তার জীবনে যে গল্পের মাল-মশলা থাকবেই একথাও অনস্বীকার্য অন্তত লেখকের মতে। আর হয়ত বা দেখবার সেই চোখ আছে বলেই সাধারণ পোস্টাল ক্লার্ক হরিসাধন হালদারের জবানীতে গড়ে উঠতে পারে 'পোস্টাপিসের' মত মত অনবদ্য গল্প, টেলিফোন ও 'হনিমুনের' মত দুটি নিটোল কাহিনী। লেখক লেখেন কম কিন্তু যেটুকু লেখেন তার সুধা গৌড়জন নিরবধি আনন্দে পান করেন। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। রুচি শোভন, প্রচ্ছদ, অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। লেখক---শংকর, প্রকাশক---বাক-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম---পাঁচটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

উপনিষদ / জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

আলোচ্য গ্রন্থটি কয়েকটি বিখ্যাত উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সঙ্কলন। এই দুরূহ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা বড় কম কথা নয়, তারপর অনুবাদকর্মটি করা হয়েছে লালিত্যপূর্ণ কাব্যের ছন্দে। সংস্কৃত ভাষা যাঁরা জানেন না তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অসীম মূল্যবান বলেই প্রতিভাত হবে। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সাবলীল, স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনীযোগে দুরূহ তত্ত্বের সমীচীন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার ফলে খুব সাধারণ পাঠকও বিষয়বস্তুর মর্মগ্রহণে সক্ষম হন। মোট চারটি উপনিষদকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এই অনুবাদকর্মটির মাধ্যমে, আশা করি প্রতিভাময়ী লেখিকা বারান্তরে বাকিগুলিকেও এইভাবে পাঠকের দরবারে পেশ করবেন। আমরা গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখিকা---চিত্রিতা দেবী। প্রকাশনা---জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। দাম---পাঁচ টাকা মাত্র।

মামাবাবু ফিরেছেন / আলফা বিটা

বরেণ্য কথা-সাহিত্যিকের বুদ্ধি আশ্রয়ী এই রচনা নামে কিশোর সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও কাজে ছেলে-বুড়ো সকলকেই খুসীর রসদ জোগাবে। অনন্য ভাষা ও নিপুণ বৈশ্লেষণী ভঙ্গীর প্রসাদে সাধারণ রহস্য গল্পেও লেগেছে সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক---প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক---অ্যালফা বিটা পাবলিকেশনস, ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪। দাম---তিন টাকা।

ধৃতিদীপা

একটি সাহিত্য পত্রিকার ৩য় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা। নচিকেতা ভরদ্বাজ, মানস মোহন চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার গুপ্ত-চৌধুরী, শ্রীসুসেন, নন্দলাল শর্মা, বোম্মানা বিশ্বনাথন, বিনয় চৌধুরী, দীপককুমার দত্ত, হিরন্ময় মুন্সী, খেলোয়াড়, ইলা সরকার, জয়শ্রী মজুমদার কালীপদ ঘোষ, হরিপদ ঘোষ প্রমুখ লেখকের কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলি পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। সম্পাদক : বিবেক-রঞ্জন চক্রবর্তী। ৪০, বদ্রীদাস টেম্পল রোড কলি-৪। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রুতি

একটি কবিতা সঙ্কলন। মৃণাল বসু-চৌধুরী, তপনলাল ধর, প্রভাতকুমার দাস, পরেশ মণ্ডল, সুকুমার ঘোষ, মদন-মোহন বিশ্বাস, স্বপন সেনগুপ্ত, কালী-পদ কোঙার. গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পুষ্কর দাশগুপ্ত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতাপুঞ্জ বেশ উঁকিঝুঁকি দেয় মনের আনাচে কানাচে সুর তুলতে চেষ্টা করে যেন। কবিতাটির অষ্টম সঙ্কলন। সম্পাদক---সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল। ৩৫/এক রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলি-৫, দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

অধুনা

পত্রিকাটির পঞ্চম সঙ্কলন এইটি। তারাপদ রায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, রামেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, বাম্মিক রায়, রত্নেশ্বর হাজরা, রবীন সুর, মৃণাল হালদার প্রভাত চৌধুরী, তপনপ্রকাশ ভট্টাচার্য কালিদাস সমাজদার, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায়, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কতকগুলি কবিতা এই সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি করেছে তাছাড়া প্রবন্ধ লিখেছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, প্রীতিভূষণ চাকী। প্রবন্ধগুলি বেশ মূল্যবান। পত্রিকাটির উন্নতির কামনা করি। সম্পাদক-সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়। হালিসহর, ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত। দাম : চল্লিশ পয়সা।

আজাদ হিন্দ নেতাজী / দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট প্রেস প্রাইভেট লি:।

সৃষ্টিশীল সাহিত্যের হৃদস্পন্দনে আন্দোলিত 'আজাদ হিন্দ নেতাজী' মহাকাব্য—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকারের প্রতিষ্ঠাবর্ষ আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগে। সেদিনের জাতীয় গৌরবে মহিমান্বিত স্মৃতি উদযাপনে আজাদ হিন্দ রজতজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন যখন চলছে তখন 'আজাদ হিন্দ নেতাজী' মহাকাব্য একথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—নেতাজীর বীর বিপ্লবী চরিত্র কালজয়ী মহিমায় জ্যোতির্ময়। নেতাজীর জীবন-সিদ্ধি, বাণী ও শিক্ষা, জাতীয়ভাবাদী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত আদর্শকে ভিত্তি করে। নেতাজীর বিপ্লবদর্শন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ফলশ্রুতি। এই মহৎ আজাদ হিন্দ নেতাজী মহাকাব্য ৭৭৫ পৃষ্ঠায় মাত্রাবৃত্ত সপ্তপদী ছন্দ মণ্ডলে নেতাজীকে উপস্থাপিত দেখি, ১৬টি সর্গে সুচিমান শ্রীমান ধীমান বীর্যবানরূপে অনন্য লোকোত্তর মহত্ত্ব-ব্যঞ্জনায়। আজাদ হিন্দ যুগের পৌরুষের বিষয়বস্তু বিস্তারে ও গভীরতায় চিরন্তন মহিমায় দৃঢ়মূল স্বরাট্র সত্ত্বর অধিকার। 'আজাদ হিন্দ নেতাজী' মহাকাব্য একাধারে সার্থক মহাকাব্যের আন্তর সৌন্দর্যে চরমোৎকর্ষের মর্মস্পর্শী রূপ এবং দেশাত্মবোধের উদ্বোধক চেতনায় আজাদ হিন্দের মহানায়ক নেতাজী জীবনের ওজস্বিতাপূর্ণ বীরাচারী ভাবকে অমৃত সমান করেছে—এই কালজয়ী সৃষ্টি শ্রবণে পঠনে জাতিকে করবে নি:সন্দেহে পুণ্যবান। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। মহাকাব্য, দাম—কুড়ি টাকা। ৭৭৫ পৃষ্ঠা। প্রকাশক—দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট প্রেস প্রাইভেট লি:। ১৬, সৈয়দ আমেদ আলি এভেনিউ, কলিকাতা-১৭।

রিগেল গ্রহের হানাদার / অ্যালফা-বিটা

বিজ্ঞানভিত্তিক কিশোর সাহিত্য রচনার যে প্রবল জোয়ার এসেছে বর্তমানে, আলোচ্য গ্রন্থটি তারই অন্যতম নজির। মস্কোর আকাশে বিকটাকার জানোয়ারের দাপাদাপি তর্জন গর্জন, আকাশ নানা রঙে রঙীন, বিচিত্র বেশী নারীর কপালে অত্যাশ্চর্য প্যারালাইজার মণি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ উত্তেজনাময় ঘটনার পর ঘটনার প্রবাহ; ছোটরা তো বটেই বড়রাও যে এ গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ লাভ করবে তাতে সন্দেহ-মাত্র নেই। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শিশির সিংহ-প্রকাশক—অ্যালফা বিটা পাবলিকেশনস, ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। দাম—তিন টাকা।

বাড়ীউলি / রূপা অ্যাণ্ড কোং

সুবিখ্যাত রুশ লেখক দস্তয়েভস্কির খোজইকা নামে উপন্যাসের অনুবাদ এই গ্রন্থ। গভীর ও মর্মস্পর্শী বিষয়বস্তু সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, অনুবাদকের দক্ষতায় মূল কাহিনীর রস বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। চরিত্র-চিত্রণে আশ্চর্য সফল লেখক, বিশেষত নায়িকা কাতেরিনার চরিত্রটি সত্যই এক অপূর্ব সৃষ্টি। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দস্তয়েভস্কি; অনুবাদক—দেবব্রত রেজ, প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোং; ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

ইতিকথা

প্রগতিশীল পত্রিকার দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। এই সংখ্যায় লিখেছেন—বেলা দে, সুধাংশু মিত্র, হরিদাস সান্যাল, সুখেন চট্টোপাধ্যায়, অমল ঘোষ, পঙ্কজ মিত্র, জয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ-মুখোপাধ্যায়, কার্তবীর্যার্জুন, শ্রীমতী উষা ভট্টাচার্য প্রিন্স সুশীল চন্দ্র সেন, গীতা দে প্রমুখের গল্প ও প্রবন্ধ পত্রিকাটির মান বাড়িয়েছে। লেখাগুলি যথেষ্ট সুরুচিসম্পন্ন এবং হৃদয়গ্রাহী। সম্পাদক-মণ্ডলী : পঙ্কজ মিত্র, গীতা দে, করালী শঙ্কর মিত্র। ১১সি, মনোহরপুকুর রোড, ভারতী প্রেস থেকে সম্পাদিত। দাম :—পঁইত্রিশ পয়সা।

প্রতিদ্বন্দ্বী

আন্না আখমাতোভা (১৮৮৮-১৯৬৬)

বলেছিলো কেউ নেই প্রতিদ্বন্দ্বী তার
আমি নই তার চোখে জাগতিক নারী,
শীতের তুহিনে আমি রৌদ্র উপহার
গাঁয়ের উধাও সুর ভাটিয়ালি-সারী।

আমার মৃত্যুতে তাই সে পড়বে না ভেঙে,
বলবে না শোকে ক্ষিপ্ত : তাকে ফিরে দাও—
চকিতে বুঝবে, দেহ মিথ্যে রোদ বিনে
সুর ভিন্ন একদণ্ড বাঁচে না আত্মাও,
......অথচ এখন?

অনুবাদক—অরুণাচল বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সরোজাক্ষ তাঁর সংসারের মাথায় এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিলেন। সরোজাক্ষ তাঁর চাকরীতে ইস্তফা দিলেন।

প্রথম জীবনে যখন সরোজাক্ষ তাঁর জীবিকা বেছে নিয়েছিলেন, তখন কেন যেন তাঁর মনে হয়েছিল এটা ঠিক চাকরী নয়। এই অবাস্তব ভুল ধারণাটি অবশ্যই সরোজাক্ষর নিজস্ব মানসিক গঠনের ফসল, তবে সেই ভুল ধারণাটি সমূলে উৎপাটিত হবার তেমন কোনো কারণও ঘটেনি। অতএব সেই ভুলের রসটাই কোন অলক্ষ্যে থেকে সরোজাক্ষকে সঞ্জীবিত রেখেছিল।

কিন্তু সরোজাক্ষর এই বিপুবাত্মক কর্মই ভুলটা সমূলে উৎপাটন করলো। সরোজাক্ষর কানের কাছে এখন অবিরত এই ধ্বনি, 'চাকরী ছেড়ে দিলে?---চাকরীটা ছেড়ে দিলেন?---আজকাল-কার দিনে যদি এতো তুচ্ছ ব্যাপারে চাকরী ছাড়তে হয়, তাহলে তো—'

যারা হিতৈষী, তারা এ প্রশ্নও করলো---'এই বয়সে কোথায় তুমি কমপিটিশনে নামতে যাবে, ইয়ং গ্রুপের সঙ্গে?---কথায় কথায় এখন মেয়ে-ছেলেরা ডি ফিল, ডি এস সি, পি-আর এস হচ্ছে।'

বিস্ময় বিরক্তি লাঞ্ছনা গঞ্জনা---উপদেশ আক্ষেপ বহুবিধ আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে সরোজাক্ষকে, সব আক্রমণের সার কথা—চাকরীটা ছাড়া উচিত হয়নি। অতএব এখন সরোজাক্ষর মনের মধ্যে আর সেই পুরনো ভুলটা বসে নেই। সরোজাক্ষ জেনে নিয়ে-ছেন তিনি চাকরী করছিলেন, চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন।

কেন?

মেজাজের দোষে।

মেজাজ দেখিয়েছিলেন সেখানে, অতএব 'শিক্ষা' দিয়ে দিয়েছে তারা, সরোজাক্ষ সে জায়গায় সমঝে না গিয়ে আরো মেজাজ দেখিয়ে চাকরীটাই ছেড়ে দিলেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য এককথায় সরোজাক্ষর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন নি, সরোজাক্ষকে ভাবতে সময় দিতে

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

চেয়েছিলেন, কিন্তু সরোজাক্ষ সে সময় নেন নি। সবিনয়ে বলে এসেছেন, 'নতুন করে আর কী ভাববো? ভেবেই তো দিয়েছি—'

তার মানে সরোজাক্ষ কেবলমাত্র নিজের মান-অপমানের কথাই ভেবে-ছেন, আর কিছু ভাবেননি। ভাবেননি —তাঁর স্ত্রী আছে, নাবালক পুত্র আছে, অবিবাহিতা কন্যা আছে এবং 'সারদা-প্রসাদ' নামের একটা অর্থহীন অবান্তর পোষ্য আছে। ভাবেন নি, তাঁর উপার্জন-শীল সাবালক ছেলেটা একটা অমানুষ এবং নিজে তিনি এ যাবৎকাল 'ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন।

তবে?

তবে তোমায় কে সহানুভূতির চক্ষে দেখবে?

সংসারী মানুষ তুমি, একটা সংসারের (কর্তা বলে কেউ না মানলেও দায়িত্বের আইনে) কর্তা, তুমি অমনি কোথায় একটু মানের কানা খসে গেল বলে দুম্ করে চাকরীটা ছেড়ে দিলে? কর্তব্য নেই তোমার? দায়িত্ব নেই? মায়া মমতা বিবেচনা কিছু নেই?

তা' এ সবই যদি না থাকে, শুনতেই হবে কটুকথা। যাদের সঙ্গে তোমার এই ব্যাপারের কোনো লাভ লোক-সানের প্রশ্ন নেই তারাও শুনিয়ে যাবে দুটো ধিক্কারের কথা। আর যাদের সঙ্গে ঘোরতর সম্পর্ক, তারা তো-

হ্যাঁ, একা বিজয়াই নয়, বাড়ির লোকে জনে জনে লাঞ্ছিত করেছে সরোজাক্ষকে (যদি সেই লাঞ্ছনায় মতি ফেরে) তবে বিজয়াই অগ্রণী। বিজয়া তাঁর 'কাচা কাপড়ে'র দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙে এঘরে বিছানার ধারে এসে বসে পড়ে বলেছেন, 'ব্যাঙ্কে তোমার কত টাকা আছে?'

সরোজাক্ষ চোখ তুলে তাকিয়ে-ছেন বোধ হয় একটু অবাক-অবাক দৃষ্টিতে। কারণ তখনো সরোজাক্ষ ভেবেছিলেন, বিজয়া খামোকা একটা বোকার মত প্রশ্ন করলো কেন।

কিন্তু বিজয়া সব ক্ষেত্রে বোকা নয়।

বিজয়া সেই সদ্য-বিবাহের কাল থেকেই ক্ষেত্রবিশেষে চালাক। বিজয়া যখন নেহাৎ নতুন বৌ, তখনই সরোজাক্ষর অনুপস্থিতিতে সরোজাক্ষর আলমারি দেরাজ বুক সেলফ এমন কি মোটা মোটা বইয়ের পাতাগুলি পর্যন্ত উল্টে উল্টে চতুর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখতো। কোনোখান থেকে কোনো দলিল সংগ্রহ করে ফেলতে পারে কি না সরোজাক্ষর, কোনো দুর্বলতার সাক্ষ্য জোগাড় করে ফেলতে পারে কিনা।

আছে অপরাধ, আছে দুর্বলতা, এ বিষয়ে সেই সদ্য কৈশোরপার তরুণীটি নিঃসন্দেহ ছিল। নইলে বিজয়ার মত অমন একটা লোভনীয় বস্তুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও লোকটা দিনে রাত্রে সকালে সন্ধ্যায় তার

সদ্ব্যবহার করে না? তাকে 'কী নিধি' পেলাম বলে সর্বদা গলায় ঝুলিয়ে রাখে না?

করে না। রাখে না।

অতএব নির্ঘাৎ অন্য ব্যাপার।

অন্য ব্যাপার না থাকলে, এক্ষেত্রে রক্তমাংসের শরীরওলা যুবক বর সেফ হ্যাংলা বনে যেতো।

সেই প্রত্যাশিত হ্যাংলামি তো করেই না বিজয়ার বর বরং নেহাৎই রক্তমাংসের দাবি মেটাতে একটু দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললেই যেন মরমে মরে যায়। যেন ঘৃণায় লজ্জায় মুষড়ে পড়ে। তাকিয়ে দেখে না, তার সেই রূপবতী এবং স্বাস্থ্যবতী যুবতী বৌ তা'তে কী পরিমাণ অপমান বোধ করে।

করতো অপমান বোধ বিজয়া।

আর সেই অপমান বোধ থেকেই আক্রোশ উঠতো ধুঁইয়ে। সেই আক্রোশে অধিকতর 'আকর্ষণময়ী' হবার জন্যে লজ্জা সরমের বালাই রাখতো না এবং সরোজাক্ষকে একদিন কাঠগড়াতে দাঁড় করাবার জন্যে খুঁজে খুঁজে বেড়াতো তার অপরাধের দলিল।

হয়তো ঠিক এ পথে চিন্তাকে প্রবাহিত না করলে বিজয়া সরোজাক্ষর চিত্তজগতে স্থান করে নিতে পারতো। দেহকে সম্বল করেও মনের দরজায় টোকা দিতে পারতো। কিন্তু বিজয়া নিজের ভুল চিন্তাতেই নিমজ্জিত থেকে ছিল, বিজয়া তার স্বামীর মনটাকে হাত ফসকে পালিয়ে যেতে দিয়েছিল। ভালবাসার বদলে ঘৃণা সংগ্রহ করেছিল।

সেই ঘৃণাটা প্রথম উপচে উঠেছিল সেই একদিন দুপুরে। যে দুপুরে সরোজাক্ষ হঠাৎ জ্বর হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।

এসে দেখলেন সরোজাক্ষর তিনতলার ঘরটা একেবারে তছনছ। দেরাজ খোলা, ট্রাঙ্ক খোলা, আলমারী খোলা, বিছানা ওলটানো, র‍্যাকের বইগুলো ছড়ানো, যেন পুলিশে খানাতল্লাসি করে গেছে। আর দেখলেন কারুকার্য করা সেই চন্দনকাঠের বাক্সটাকে নিয়ে বিজয়া—

হ্যাঁ সারা ঘর তছনছ করেও বিজয়া সেই পাতলা গড়নের ছোট চন্দনকাঠের বাক্সটার চাবি সংগ্রহ করতে পারেনি। বিজয়া স্থির নিশ্চিত ছিল ওই চাবিটা খুলে ফেলতে পারলেই সরোজাক্ষর সেই গোপন ঘরটা খুলে পড়বে, যে ঘরে লুকোনো আছে সরোজাক্ষর অপরাধের প্রমাণপত্র অবৈধ প্রেমপত্র। প্রেম বস্তুটাকে 'অবৈধ'ই ভাবতো বিজয়া।

ওই বাক্সটাকে দেখেছে বিজয়া ইতিপূর্বে, নেড়েছে চেড়েছে, আর ভেবেছে অবসরমত এটাকে নিয়ে পড়তে হবে। আজকে পড়েছিল তাই। ভেবেছিল চিঠি তো পাবোই, ফটো-টটোও কোন না পাবো। কিন্তু নেই, কোথাও নেই চাবি।

তার মানে এমন কোনো গোপন জায়গায় রেখে দেয় যা বিজয়ার চোখকেও ফাঁকি দিতে পারে। তার মানে দেখতে যেমন আলাভোলা বরটি তার, ভেতরে তেমন নয়। কে জানে ঘরের সিলিঙে কড়ি-বরগার মধ্যেই কোথাও খাঁজ কেটে রেখেছে কিনা।

সে বাড়িটা—বিজয়া যে বাড়িটায় বিয়ে হয়ে এসেছিল, সেটা ছিল ভাড়াটে বাড়ি। পুরনো ধরণের বাড়িটা, তিনতলাটা পুরো ছাদ ঘর মাত্র একখানাই।

বিয়ের আগে থেকেই ঘরটার অধীশ্বর ছিল সরোজাক্ষ নামের সেই পড়ুয়া ছেলেটা। বিজয়া এল তারপর। অধীশ্বরী হয়ে বসলো।

কিন্তু শুধু ঘরের অধীশ্বরী হয়ে কী লাভ বিজয়ার?

চাবি সংগ্রহে হতাশ হয়ে নিজের চাবির রিংটা নিয়ে যে ক'টা চাবি দিয়ে চেষ্টা করা সম্ভব, তা করে বিফল হয়ে মরীয়া বিজয়া করে বসলো—এক কাণ্ড। বাক্সটার ডালার খাঁজে একটা ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিতে বসলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সরোজাক্ষ এসে ঢুকলেন জ্বরে টলতে টলতে।

ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন এবং দেখতে পেলেন, সুন্দর কারুকাজ করা সেই মহীশূরী চন্দনকাঠের বাক্সর ডালার খানিকটা অংশ উপড়ে বেরিয়ে এল ছুরির সঙ্গে, ডালাটা খুলে গেল চাবির কব্জা আলগা হয়ে।

সরোজাক্ষ খাটের উপর বসে পড়ে ঘরটাকে দেখে নিলেন, দেখে নিলেন বিজয়াকে। রুক্ষ গলায় বললেন, 'এ সব কি?'

এতখানি ভয়ঙ্কর মুহূর্তে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে সাহস করলো না বিজয়া, তাই খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'ও মা তুমি এমন অসময়ে যে? ঘরটার সব এলোমেলো করে ঝাড়াঝুড়ি করছিলাম—'

সরোজাক্ষর মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল, সরোজাক্ষ তবু শুয়ে পড়েন নি, আরো রুক্ষ গলায় বলেছিলেন, 'ওই বাক্সটায় ভেতরের ধুল ঝাড়ছিলে?'

বাক্সটা!

এর কি জবাব দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে বিজয়া চুপ করে গিয়েছিল। আর বোধ করি মনে মনে শক্তি সংগ্রহ করছিল। সরোজাক্ষ খাট থেকে নেমে বাক্সটাকে হাতে নিয়ে তার দুর্দশা দেখলেন, তারপর তার ভিতর থেকে একগোছা কাগজপত্র বার করে বাড়িয়ে ধরে ঘৃণা আর ব্যঙ্গে তিক্ত গলায় বলে উঠলেন, 'প্রেমপত্র খুঁজছিলে? নাও। পড়ে দেখো। যদি অবশ্য পড়বার ক্ষমতা থাকে।'

কাগজপত্রগুলো সরোজাক্ষর ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট, চশমার প্রেসকৃপশান, ক্যামেরার গ্যারান্টিপত্র ইত্যাদি। হয়তো উপহার পাওয়া সৌখীন আধারটায় ওই সার্টিফিকেটগুলোই রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল সরোজাক্ষর, তারপর এটা ওটা ঢুকে পড়েছে। চাবিটা পাছে হারিয়ে যায় বলে মায়ের কাছে রেখে দিয়েছিলেন সরোজাক্ষ।

বিজয়ার হৃতশক্তি ফিরে আসছিল যে শক্তিটা নাকি ধৃষ্টতার গর্ভজাত। ধৃষ্টের গলাতেই বলে উঠেছিল বিজয়া, 'বাব্বা। এই সব জিনিষ আবার মানুষে এত বাহারি করে রাখে তা' কি করে জানবো?'

সরোজাক্ষ আর কথা বলেন নি। শুধু সরোজাক্ষর চোখমুখ দিয়ে ঘৃণা উপছে উঠেছিল। ঘৃণার সেই প্রথম প্রকাশ। তারপর সারাজীবনই প্রতিনিয়ত—ধরা পড়ে যায় সেই ঘৃণা সেই ব্যঙ্গ।

সরোজাক্ষর বাবা মারা যেতে বিজয়া যখন ডুকরে-ডুকরে কেঁদেছিল, 'ওগো আমার রাজা শ্বশুর ছিল যে গো! ওগো—আমি যে রাজকন্যের আদরে ছিলাম গো—' ইত্যাদি 'আখর' দিয়ে দিয়ে। সরোজাক্ষ মৃতের বিছানা থেকে উঠে এসে বলেছিলেন, 'তোমার এই শোকটা যদি চালাতেই হয়, তো তিন-তলায় নিজের ঘরে যাও।'

সরোজাক্ষর মা মারা গিয়েছিলেন তার আগে। বিজয়া তখন সধবা শাশুড়ীর হাতের লোহা আর পায়ের আলতার প্রসাদ নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি করেছিল। সরোজাক্ষ তীব্র গলায় বলে ছিলেন, 'তোমার এই' ভক্তি নাটকটা বড় বেশী ওভার এ্যাকটিং হয়ে যাচ্ছে বিজয়া, অসহ্য লাগছে।'

এমন অনেক উদাহরণ আছে বিজয়ার দাম্পত্যজীবনে, যা নাকি অপরের চোখেও ধরিয়ে দিয়েছে সেই জীবনের ফাঁকি। সেই আক্রোশ বিজয়াকে উগ্র করেছে, নির্লজ্জ করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়াই বিজয়িনী হয়েছে।

বিজয়িনী তো হবেই।

মোক্ষম হাতিয়ার যে এসে গেছে তখন তার হাতে। ঝুপঝাপ করে চার চারটে ছেলেমেয়ে এসে গেছে।

হয়তো সবগুলোই সরোজাক্ষর দুর্বলতার সাক্ষী নয়, বিজয়ার বেহায়ামী কারণ, কিন্তু সে ইতিহাসের তো সাক্ষী নেই। সরোজাক্ষ তো বিজয়ার মত অপরের কান বাঁচাবার চেষ্টামাত্র না করে দরবে প্রশ্ন করবেন না, 'তখন মনে পড়েনি?' সরোজাক্ষ তো ঘোষণা কর-বেন না, 'বড় যে বেন্না আমার ওপর, বলি এগুলো এলো কোথা থেকে? রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি?' সরোজাক্ষ তো হেসে হেসে বলবেন না, 'এদিকে তো তেজে মটমট। বলি সে তেজ থাকে? তেজ ভেঙে মাথা মুড়োতে আসতে হয় না? মনে ভাবো সাক্ষী থাকে না, কেমন? বলি আগুন কি ছাই চাপা থাকে?'

হ্যাঁ বিজয়া এ সব কথা অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারতো, আর সরোজাক্ষর নিরুপায়তায় মনে মনে হাসতো। আবার সেই বিজয়াই কোনো এক সাক্ষীহীন শান্ত অন্ধকারকে নখে আঁচড়ে আঁচড়ে কেঁদে কেঁদে বলতো, না হয় রাগের মাথায় একটা অন্যায় কথা বলেই ফেলেছি, তাই বলে তুমি আমায় ত্যাগ করবে? তা হলে খানিকটা বিষ এনে দাও আমায়, খেয়ে মরি।' বেহায়া উদ্ধত, আর আত্মসম্মান জ্ঞানহীন স্ত্রীর কাছে 'স্বামীনাবক জীবটা' যে কত অসহায় সে কথা হয়তো কেবল-মাত্র তাঁর সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

অবশ্য এখন নাটক অন্য দৃশ্যে পৌঁছেছে। এখন বিজয়া আত্মস্থ গলায় বলতে পারছেন, 'ব্যাঙ্কে তোমার কত টাকা আছে?'

হঠাৎ কথাটাকে সরোজাক্ষর অবান্তর বলে মনে হয়েছিল।

তারপর ভাবলেন, বিজয়া কোনো মোটা খরচের ধাক্কায় ফেলতে চাইছেন তাঁকে। হয়তো কোনো ব্যয় সাপেক্ষ ব্রত, হয়তো কোনো সুদূর তীর্থযাত্রার সংকল্প।

কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যেই।

বিজয়ার বিদ্রূপ কুঞ্চিত মুখে বিজয়ার প্রশ্নের আসল মানেটি লেখা ছিল। অতএব সরোজাক্ষ উত্তর দিলেন না, অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বিজয়া আবার চিমটিকাটা স্বর ব্যবহার করলেন, 'কই জবাব দিলে না?

সরোজাক্ষ গম্ভীর গলায় বললেন, 'অনেক টাকা।'

বিজয়া সহজের রাস্তা ধরলেন। বললেন, 'হ্যাঁ সে কথা তো আমার অবিদিত নেই। তবে বলি ভাঁড়ে যখন মা ভবানী, তখন এত তেজ দেখাবার কী দরকার ছিল?'

সরোজাক্ষর উত্তর দিতে ইচ্ছে হয় না, তবু সরোজাক্ষ জানেন, কোনো একটা উত্তর না নিয়ে ছাড়বেন না বিজয়া। তাই তেমনি গম্ভীর কণ্ঠেই বলেন, 'যদি বলি ছিল দরকার?'

বিজয়া তাঁর সেই কাঠ কাঠ হলুদরঙা মুখটা বাঁকিয়ে কুদর্শন করে বলে ওঠেন, 'তা তুমি আর বলবে না কেন? নিজের কাজকে কি আর অদরকারি বলবে? তা' সেই দরকারটা বোধ হয় স্ত্রী-পুত্রের পেটের ভাতের থেকেও বড়?'

সরোজাক্ষ অন্য-দিকে তাকিয়ে-ছিলেন। সরোজাক্ষ অন্যমনস্কের মত বলে ফেললেন, 'হয়তো বড়ো।'

কিন্তু বিজয়া কি রাগ করে উঠে যাবেন? বিজয়া বলে উঠবেন না, 'তা তোমার কাছে তাই হতে পারে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ত্রিজগৎ তা' বলবে না। আমি বলছি ও সব তেজ-মান রেখে আবার জয়েন করতে হবে তোমায়।'

'তা' হয় না।'

'হয় না তো, যেমন করে পারো রোজগার করে আনো। আর নয়তো আমায় অনুমতি দাও, ঝুলি হাতে করে ভিক্ষেয় বেরোই।'

সরোজাক্ষ হঠাৎ হাতজোড় করে বলে ওঠেন, 'তুমি একটু এ ঘর থেকে যাবে?'

এই, এইটিই অস্ত্র সরোজাক্ষর।

এরপর আর থাকেন না বিজয়া। চোখে আগুন ঝরিয়ে চলে যান। কিন্তু সেদিন চলে যাননি। সেদিন তীক্ষ্ণ ধারালো গলায় চীৎকার করে করে বলেছিলেন, 'তাড়িয়ে দিয়ে পার পাবে ভেবেছ? সে আর এখন হয় না। মাস মাস যতটি টাকা সংসারে লাগে, তা যে করে হোক আমায় এনে দেবে, এ দিব্যি গালো, তবে আমি নড়ছি।'

সে চীৎকারে সারদাপ্রসাদ ছুটে এসেছিলেন, বলেছিলেন, 'কী হচ্ছে কি বৌদি? মানুষটা এই সেদিন মরণ-বাঁচন রোগ থেকে উঠেছে, আবার এই সবে যদি একটা স্ট্রোক-টোক্ হয়ে যায়? যান, যান আপনার পুজোর ঘরে চলে যান।'

বিজয়া এ সুযোগ ছাড়েন নি।

বিজয়া হাত-মুখ নেড়ে বলে উঠেছিলেন, 'মুখে হিতৈষী হতে সবাই পারে গো ঠাকুরজামাই। বলি এতগুলি লোকের পেট তা'তে মানবে?'

সেদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। যে সারদাপ্রসাদ ব্যঙ্গবিদ্রূপ কাকে বলে জীবনে জানে না, সে হঠাৎ সেই গলায় বলে উঠেছিল, 'কেন, আপনার 'ঠাকুর' কি করছেন? শুধু নিজে বসে বসে ছানা-মাখনের ভোগ লাগাবেন? তিনি পারবেন না এই পেট-গুলোর ভার নিতে?'

বিজয়া সহসা এ কথার উত্তর দিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই 'ন্যাকামী' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সিঁড়িতেই উঠে গিয়েছিলেন।

সারদাপ্রসাদ সুউচ্চ কণ্ঠে বলেছিলো, 'হ্যাঁ, তাই যান। তাঁকেই জ্বালাতন করুন গে। চিরটাকাল তাঁকে নিয়েই পড়ে থাকলেন, এখন বিপদকালে মানুষের ভরসা কেন?'

এত ঝামেলার মধ্যেও হঠাৎ সরোজাক্ষর মুখে একটু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল যেন। বলেছিলেন 'তোমার তো আজকাল খুব সাহস বেড়েছে দেখছি।'

সারদাপ্রসাদ লজ্জিত গলায় বলেছিল, 'কী করবো দাদা, হঠাৎ রাগটা কেমন চড়ে গেল। বুনো গোঁয়ার তো।'

তারপর নিজেই বলেছিল,—'তারপর? এখন কী ঠিক করছেন? কিছু তো একটা করতেই হবে?'

'তা তো হবে।'

সারদা ক্ষুণ্ণ গলায় বলেছিল আমার বইটা শেষ হয়ে গেলে, এত ভাবতাম না। কী করবো, হয়ে তো ওঠেনি। তবে গোটা কয়েক দিন চালিয়ে নিন, ও বই ছাপা হলে—একেবারে 'হট্ কেক্' হবে। অথচ এদিকে দামটা ভালো হবে। টাকা কুড়ির কম তো নয়ই। ধরুন যদি ফার্স্ট এডিশানে দু হাজারও ছাপায়—এ সব গবেষণার বইটই অবশ্য তা' ছাপে না। একেবারে চার-পাঁচ হাজার ছাপে। যাক আমি না হয় দু হাজারই ধরছি। তা' হলেও—আপনার গিয়ে চল্লিশটি হাজার ঘরে আসছে। আর কি ভাবনা। পরের পার্টটাও তো লেখা হতে থাকবে ততদিনে।

সারদাপ্রসাদের মুখটা আহলাদে ভরে ওঠে। সারদাপ্রসাদ সেই 'ভাবনা-শূন্য' দিনটির কল্পনায় বিভোর হয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করতে যায় তার লেখা।

সরোজাক্ষ সেদিকে তাকিয়ে থাকেন, একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত স্নেহের সঙ্গে।

তা' সরোজাক্ষর অনেক কিছুই উল্টো পাল্টা বৈ কি। নইলে সারদাপ্রসাদের জন্যে 'শ্রদ্ধা'! স্নেহ করুণা কৃপা দয়া যায়া এগুলো না হয় ক্যামাফেয়ার ব্যাপার। কিন্তু শ্রদ্ধা? সরোজাক্ষর ছেলেমেয়েরা শুনলে হেসে কুটিকুটি হতো।

এখন অবশ্য সরোজাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাসবার মুড ছিল না। বাবার ওই চাকরী ছাড়ার গোঁয়ার্তুমীতে সকলেই 'আহত।'

বড়ছেলে বলে গেছে, 'যা করেছেন নিজের দায়িত্বেই করেছেন আমার কিছু বলার নেই। তবে আমার কাছে সংসার যেন কিছু প্রত্যাশা না করে, এই হচ্ছে আমার সাফ কথা। তবে হ্যাঁ। বলতে পারেন, আমার 'ফ্যামিলি'র দায়িত্বটা আমারই। বেশ বলে দিন স্পষ্ট করে, চলে যাব নিজের ফ্যামিলি নিয়ে।'

এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো একটুক্ষণ, যেন অর্ডারটা পেলেই চলে যায়। নেহাৎ যখন কোনো শব্দ উঠল না ঘরে, নীলাক্ষ শরীরে একটা মোচড় খেয়ে বলে চলে গেল, 'ঠিক আছে। যখনই অসুবিধে বোধ করবেন, বলে দেবেন।'

ময়ূরাক্ষী এল বিকেলে।

বৌদিকে 'টেক্কা' দেওয়া সাজ সেজে। এসেই পাখার স্পীডটা বাড়ালো। তারপর বললো, 'আপনি হঠাৎ এমন একটা তিলকে তাল করা কাণ্ড করবেন বাবা, এটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। আশ্চর্য। ঘেরাও আজকাল কে না হচ্ছে? প্রাইম মিনিস্টার থেকে—হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত বাদ আছে কেউ? সবাই কাজকর্ম ছেড়ে দিচ্ছে?'

সরোজাক্ষ একটু হেসে বললেন, 'তুমি আমায় হিতোপদেশ দিতে এসেছ না কৈফিয়ৎ তলব করতে এসেছ?'

'হিতোপদেশ।' বরের সামনে এ হেন অপমানে লাল হয়ে গিয়ে ময়ূরাক্ষী বললো, 'আপনাকে 'হিতোপদেশ' দিতে আসবো, এমন মুখ্যু আমি নই বাবা। আর—কৈফিয়ৎই বা কিসের? আপনার চাকরী ছাড়ায় তো আমার সংসার অচল হয়ে যাবে না। এমনি কথার কথাই বলছিলাম। আপনি আমাদের 'সন্তানের' মর্যাদা না দিলেও আমরা তো সম্পর্কটা ভুলতে পারি না।'

বড় মেয়ের বাক্যের ছলে সরোজাক্ষ বিব্রত হয়েছিলেন। বিপন্ন গলায় বলেছিলেন, 'এ সব কথা বলছো কেন? চাকরী ছাড়াটা হয়তো সংসারের পক্ষে অসুবিধেকর, কিন্তু আমার বিবেকে বাধছে। মনে হচ্ছে এতকাল ওদের ঠকিয়ে মাইনে নিয়ে এসেছি। ওদের 'শিক্ষা' দেবার ভাণ করেছি অথচ দিইনি শিক্ষা। পিটুলী গোলা খাইয়ে 'দুধ খাওয়াচ্ছি' বলে মিথ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। তারপর—মেজাজের ওজন হারিয়ে ফেলেছি ওরা শিক্ষিত' হয়নি দেখে। এতদিন খেয়ালে আসেনি বলেই চালিয়ে আসছিলাম। এখন আর—'

সরোজাক্ষর জামাই শ্বশুরের সামনে মুখ খোলে কম। যা কিছু মন্তব্য করে, আড়ালেই করে। আজ কিন্তু মুখ খুললো। একটু চোরা-হাসি হেসে বললো, 'ছাত্ররাই তাহলে আপনার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে বলুন?'

সরোজাক্ষ একবার ওই আত্মজার আহ্লাদে মুখটার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বলেন, 'তাই দিয়েছে বলতে হবে।'

ময়ূরাক্ষীর নিজের মতবাদ যাই হোক বইয়ের কথায় প্রতিবাদ করবেই। ওই প্রতিবাদটাই হয়তো ওর আসল মতবাদ।

ও তাই নিজের কথাই খণ্ডন করে বলে, 'তুমি থামো তো! এ যুগের ছেলেগুলো হচ্ছে পাজী নম্বর ওয়ান। সভ্যতা নেই, ভব্যতা নেই, কোনো কিছুতে শ্রদ্ধা নেই—'

'হয়তো ওদের সামনে—' সরোজাক্ষ একটু থেমে বলেন, 'ওদের শ্রদ্ধার যোগ্য কিছু নেই।'

'ঠিক বলেছেন।' সরোজাক্ষর জামাই উৎসাহিত গলায় বলে, 'নেই কিছু। দেখছে তো চারিদিক তাকিয়ে। বুদ্ধি তো হয়েছে। দেখছে—যেমন অপদার্থ দেশের সরকার, তেমনি অপদার্থ কর্পোরেশন, তেমনি অপদার্থ ইউনিভার্সিটিগুলো, আর—।'

'থাক জয়ন্ত, বৃথা কষ্ট কোরো না' সরোজাক্ষ আস্তে বলেন, 'এ দেশের অপদার্থতার লিস্ট করতে বসলে কাগজে কুলোবে না। তোমরা বরং চা-টা খাও গে—'

খাও গে।

অর্থাৎ অন্যত্র সরে পড় গে।

জয়ন্ত মুচকে হেসে বলে, 'তাই ভালো। কী বলো মক্ষী? বাবাকে অনর্থক ডিসটার্ব করার কোনো মানে হয় না।'

'না না—ডিসটার্ব কেন?' সরোজাক্ষ কুণ্ঠিত গলায় বলেন, 'অনেকক্ষণ এসেছ, চা-টা খাবে তো একটু?'

ময়ূরাক্ষীর বাবাকে হিতকথা শোনানোর প্রচেষ্টা ঐ চা খাওয়াতেই ইতি হলো। আর ভাগ্যক্রমে সেদিন তখনও নীলাক্ষ বাড়ি ছিল, ছিল সুনন্দা।

সুনন্দাই নিজের ঘরের সৌখীন সরঞ্জাম বার করে চা খাওয়ালো, খুব প্রশংসার গলায় বললো, 'মক্ষী তো খুব চমৎকার সেজেছ? শাড়ীটা নতুন কিনেছ তাই না?'

ওই নিরীহ প্রশ্নটার মধ্যে ময়ূরাক্ষী যে অপমানের কী পেল। ক্রুদ্ধ হলো সে। আজেবাজে করে বলতে লাগলো, নতুন শাড়ী দেখাবার জন্যেই সে এসেছে, এমন নীচু কথা সুনন্দা ভাবতে পারলো কি করে। নেহাৎ না কি বাবার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে কি না দেখতে—বললো, হয় এরকম। হঠাৎ হঠাৎ অপমানে মানী লোকেদের ব্রেনের মধ্যে এদিক ওদিক হয়ে যায়।

সুনন্দা এতক্ষণ এদের কথায় যোগ দেয় নি। সুনন্দা লীলায়িত ভঙ্গীতে চা বিস্কিট কাজু সরবরাহ করছিল, এখন একটু হেসে বললো, 'হঠাৎ বুঝি?'

ময়ূরাক্ষী ভুরু কোঁচকালো, 'কী বলছো?'

'কিছু না। অপমানটা হঠাৎ হলে, একটা এদিক ওদিক হয়ে যায় বলছিলে কি না, তাই জিগ্যেস করছিলাম 'হঠাৎ কি না।'

ময়ূরাক্ষী লাল লাল মুখে বলে, 'ত সে অপমান তোমরাই করে চলেছো। মেয়েদের থেকে বাবা কোনো আঘাতই পান নি।'

'কোথা থেকে কি সে কথা তো বলিনি ভাই মক্ষী, চটে উঠছো কেন?' সুনন্দা হাতের প্লেটটা বাড়িয়ে ধরে বলে, 'আর দুটো কাজু খাও।'

নীলাক্ষ বলে ওঠে, 'এটা হচ্ছে আমার প্রতি শ্লেষ, বুঝলি মক্ষী? শ্রীমতী সুনন্দার ধারণা আমার বাবাকে উনি আমার থেকে বেশী ভালবাসেন।'

'ভালবাসা।'

সুনন্দা হঠাৎ বেয়াড়া ভঙ্গীতে হেসে ওঠে, 'সেটা আবার কী বস্তু? ভালবাসা। হি হি হি। তোমাদের দাদা বেশ মজার মজার কথা বলেন মক্ষী, কী জয়ন্তবাবু, শুনে আপনার মজা লাগছে না?'

মীনাক্ষী বাবাকে দোষারোপ করে নি, শুধু বলেছিল, 'কলেজটা ছাড়া যখন আপনার পক্ষে অনিবার্যই হলো বাবা, তখন আমায় একটু কিছু করবার অনুমতি দিন, যাতে নিজের দরকারটাও অন্তত—'

সরোজাক্ষ একটা অপ্রত্যাশিত কথা বললেন। বললেন, 'আমি তো তোমাকে কোনো কিছু করতে কোনোদিন নিষেধ করি নি, হঠাৎ এখন অনুমতির কথা কেন?'

মীনাক্ষী এ কথা আশা করে নি। মীনাক্ষী ভেবেছিল বাবা আহত হবেন, ক্ষুব্ধ হবেন। তাই ঈষৎ বিচলিত হলো মীনাক্ষী। বললো, 'এতদিন এ দিকটা ভেবে দেখি নি। বেশ, আপনার যখন অমত নেই—'

মীনাক্ষীকে থামতে হলো।

মীনাক্ষীর বাবা তাঁর চোখের থেকে চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে সেই চশমাহীন গভীর ছাপপড়া চোখ দুটো মেয়ের চোখে ফেলে বললেন, 'আমার অমত, আমার অনুমতি এগুলোর সত্যিই কোনো প্রয়োজন আছে তোমাদের জীবনে?'

মীনাক্ষী চমকে উঠলো।

মীনাক্ষী কেঁপে উঠলো।

মীনাক্ষীর মনে হলো, সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বাবার কাছে আর কিছুই অবিদিত নেই। তবু মীনাক্ষী ভাবলো এই সুযোগ। এখনই তার নিজের কথা বলে ফেললে ভাল হতো।

কিন্তু মীনাক্ষীর স্বরযন্ত্রটাকে কে যেন আটকে ধরলো।

মীনাক্ষী আরো অন্যদিনের মতই ব্যর্থ হলো।

মীনাক্ষী মাথা নীচু করে বললো, 'এ কথা কেন বলছেন?'

'বলছি—একটা উত্তর পেতে চাই বলে। এটা আমার জিজ্ঞাসা।'

মীনাক্ষী ঘাড় নীচু করে বসে রইল।

সরোজাক্ষ মৃদু হেসে বললেন, 'প্রশ্নপত্রটা বড় শক্ত হয়ে গেছে, তাই না? এত তাড়াতাড়ি উত্তরপত্র তৈরী করা সম্ভব নয়। আচ্ছা থাক।'

মীনাক্ষী বোকার মত একটুক্ষণ বসে থেকে উঠে গেল। মীনাক্ষী তারপর নিজের ঘরে এসে চিঠি লিখতে বসলো।

আজই দেখা হয়েছে?

তাতে কি?

আবার এখুনিই তো কত কথা জমে উঠেছে। প্রেমের কথা না হোক প্রয়োজনের কথা।

দিবাকর আজ বলেছিল, 'তোমার বাবার যা মতবাদ দেখছি, তাতে ওঁর

প্রতি আর আস্থা নেই। এখনো এ যুগেও তিনি এতটুকু মান-অপমানে বিচলিত হন। এখনো আশা করেন ছেলেগুলি 'সুশীল সুবোধ' হবে। এরপর আর কি করে তবে ভাবা যেতে পারে তিনি তাঁর মেয়ের এই স্বয়ংবরা হওয়াটা সুচক্ষে দেখবেন। না: আশা নেই।'

'আশা তো করছি না।'

'তবে আর আমায় ঝুলিয়ে রাখা কেন বাবা? ছেড়ে দাও। বাবার বাধ্য কন্যা হয়ে পিঁড়িতে বসোগে।'

মীনাক্ষী আজ ক্ষুব্ধ ছিল।

মীনাক্ষী উদ্ধত গলায় বলেছিল, 'বেশ দরকার নেই বাবার প্রসন্ন অনুমতির তোমাকেও আর 'ঝুলিয়ে' রাখতে চাইনে। কালই চল নোটিশ দিতে, এখন বল, বিয়ে করে আমায় কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে।'

দিবাকর হো হো করে হেসে উঠলো। 'একেই বলে মেয়ে। যে-কোনো বয়সেই তোমরা ঘোরতর বিষয়ী।'

'বিষয়ী' না হতে পারলে, কোনো বিষয়েই এগোনো যায় না দিবা। ডাঙার মাটি না দেখেই নৌকো থেকে পা তুলে নেওয়া নির্বুদ্ধিতা মাত্র।'

'উ: একেবারে টাকা - আনা - পাইয়ের হিসেব।'

মীনাক্ষী বিরক্ত মুখে বসেছিল, উত্তর দেয় নি।

দিবাকর তখন এক গল্প ফেঁদেছিল। বলেছিল, 'মেয়েরা যে কত হিসেবী হয় তা হলে বলি—'

তারপর দিবাকর তার মামার মেয়ে ব্রজবালার নাম দিয়ে সেই তার দেশের বৌদির গল্পটা শুনিয়ে দিয়েছিল।

মীনাক্ষী রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল, 'এই কথা বললো সে তোমায়?'

'বললো তো! দিব্যি স্বচ্ছন্দেই বললো।'

দিবাকর দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল, 'দোতলায় ঠিক ওর ঘরের পাশেই হচ্ছে আমার ঘর, এ ঘরে চলে এসে হাসতে হাসতে বললো, 'তোমাদের ভগ্নীপতি আজ দশদিন হলো আসছে না। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। তাই আড্ডা দিতে এলাম তোমার ঘরে।'

আমি তো বিব্রত বিপন্ন।

বললাম, 'কিন্তু এত রাত্রে?'

ও অনায়াসে ধূর্ত হাসি হেসে বললো, 'তাতে কি? বিধবা নই, কুমারী নই ভয়টা কি? বাবা মা থিয়েটার দেখতে গেছে—কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি দিবুদা, আমার সেই হতভাগা বরটা যখন আসবে, যেন দেখে না তোমার সঙ্গে আমার চেনা আছে। তুমি বাবার ভাগ্নে, এই পর্যন্ত।'

বোঝো তাহলে? সাধে বলছি মেয়েরা হচ্ছে এক নম্বরের হিসেবী। তারা সব সময় দু নৌকোয় পা রাখে যাতে দুটোই দখলে থাকে। তারা মাটিতে পা না রাখা পর্যন্ত নৌকো ছাড়ে না। যেমন তুমি।'

মীনাক্ষী রুদ্ধ গলায় বলেছিল, 'ছেলেরা আর আমাদের অবস্থা কি বুঝবে।'

'হুঁ। সেই চিরকেলে মেয়েলি প্যানপ্যানানি। এ দেশের আর উন্নতি হয়েছে।'

'মেয়েরা খুব বেপরোয়া হলেই বুঝি দেশের খুব উন্নতির চান্স?'

'বেপরোয়া মানেই সাহসী।' দিবাকর বলেছিল, 'সাহসের অভাবই আমাদের দেশকে শেষ করেছে।'

দিবাকরের সেই ঘোর কালো রঙের আঁটি সাঁটি ধরণের মুখটা যেন ঘৃণায় বেঁকে গিয়েছিল, এ দেশের সাহসের অভাবের কথা স্মরণ করে।

মীনাক্ষীর মুখে আর কথা যোগায় নি, কিন্তু বলবার কথা অনেক ছিল।

সেই কথা লিখতেই কাগজ কলম নিয়ে বসলো মীনাক্ষী। লিখলো, 'তুমি কেবল আমার সাহসের অভাবই দেখছো, নিজের অভাবটা তো কই দেখছো না? এতবার বলছি তোমার মামার কাছে, তোমার মার কাছে আমাকে একবার নিয়ে চল, কই যাচ্ছো না তো? তার মানে সাহস হচ্ছে না। ঠিক আছে, আমি একলাই যাবো। দেখবো কী তাঁরা বলেন আমায়।'

●

মীনাক্ষী যখন তার হাতের কলমটা থামিয়ে ভাবনার গভীরে ডুবে গিয়ে ভাবছিল, আচ্ছা আমাদের দেশের সেই প্রথাটাই কি তবে ভাল ছিল? সুখের ছিল? বালিকা বয়সেই বাপ-মা ধরে একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতো, ব্যস নিজের দায়িত্ব বলে কিছু থাকতো না।—আর জ্ঞান হওয়া ইস্তক যাকে একমাত্র অবলম্বন বলে জানতো, তাকেই ভালবেসে ফেলতো—মীনাক্ষী ভাবনা থামিয়ে হাসলো। ভাবলো আমার মা-বাপের দাম্পত্য জীবনই তো আমার প্রশ্নের উত্তর।

মীনাক্ষীর তার নিতান্ত শৈশবের কথা অস্পষ্ট মনে পড়লো। মনে পড়লো তার মায়ের সেই একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র মূর্তি। তার বাবার সেই নিবিড় ঘৃণা আর অবজ্ঞার মূর্তি।

অথচ ওঁরা একসঙ্গে কাটিয়েও এলেন এই দীর্ঘ জীবনটা। ওঁরা কোনোদিন বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করেন নি, কোনোদিন পালিয়ে যাবার, আত্মহত্যা করবার সমস্ত সংসারের কাছে নিজেদের এই ফাঁকির ঝুলিটা খুলে ধরবার সাহসও অর্জন করতে পারেন নি।

মীনাক্ষীর বাবাও ঠিক সেই সময় সেই কথাই ভাবছিলেন।

'অথচ এই জীবনের মধ্যে কাটিয়ে এলাম এতখানি বয়েস পর্যন্ত। কোনোদিন ভাবি নি, এই ফাঁকির জীবনটাকে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ধুলোয় ফেলে দিয়ে, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াই।

সরোজাক্ষ ভাবছিলেন—

আসলে আমি আমার এই পারিবারিক সত্তাটাকে 'গৌণ' ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম, আমার কাছে 'মুখ্য' ছিল আমার কর্মময় সত্তাটি। তার উপরেই আমার 'আমি'টাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানেই ছিল আমার ভালবাসা, আমার আশ্রয়।

এখন সহসা ধরা পড়ে গেছে,

[illegible] আমার একান্ত ভালবাসার, একান্ত [illegible] জায়গাটা আরো বিরাট একটা ফাঁকির [illegible] করে রেখে বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

মনে হচ্ছে জীবনে বোধহয় আর কোনোদিন আমার সেই অভ্যস্ত কাজে ফিরে যেতে পারবো না। আমি বোধহয় পড়াতে ভুলে গেছি। ভুলে গেছি আমার অধীত বিদ্যাকে।

না আমি এখন আর আমার ছাত্রদের ঔদ্ধত্যে মর্মাহত হচ্ছি না, বুঝতে পারছি এ ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না তাদের। তাদের আমরা শুধু 'বিদ্যা'ই দিয়ে এসেছি, শিক্ষা দিতে পারি নি।

বিদ্যাটা তো একটা হাতিয়ার মাত্র। যেটা তাদের জীবনযাত্রায় কাজে লাগবে, জীবন সাধনায় নয়।

ওদের সামনে অনেক আশার ছবি তুলে ধরছে জগৎ, তুলে ধরতে পারছে না কোনো আদর্শের ছবি। 'চরিত্র' বস্তুটা দেখতে পাচ্ছে না ওরা, 'চরিত্রবান' হবে কোথা থেকে তবে? ওদের কাছে প্রত্যাশার পাত্র খালি পেতে ধরলে বিফল তো হবোই।

না, আমার ছাত্রদের দোষ দিতে পারছি না আমি। আমার সন্তানদেরও নয়।

আমার অক্ষমতাই আমার সন্তানদের অসার করেছে, অবিনয়ী করেছে, অসভ্য করেছে। আমাদের প্রেমহীন বিকৃত দাম্পত্য জীবনের অসহায় বলি ওরা। ওদের জন্য বেদনাবোধ করবার আছে। ওদের কাছে ক্ষমা চাইবার আছে।

(ক্রমশঃ

উদ্বাস্তু

নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

উদ্বাস্তু চিত্তের দরকার কি রাত দিন
এর-তার, প্রশস্তির; মিলছেই যখন ঋণ
চাল ছাইতে বাঁশ খড়, ঘর তুলতে ইঁট কাঠ
ধান বুনতে বীজ, আর, চাষ করতে ঢের মাঠ।

রকার কি রাতদিন, উদ্বাস্তু চিত্তের
স্বপ্নের আকাশ নীল? কল্পান্ত তীর্থের
যাত্রীর যখন ঠাঁই, সেই পথ সীমান্তেই,
পশ্চিম মেঘের নাও, রাত্রেই হারায় খেই।

উদ্বাস্তু চিত্তের রাত দিন কি দরকার
ধ্বক্ ধ্বক্ বুকের তাল, অশ্রান্ত ঘর-বার।
ফাক জোছনা ফুট্‌ফুট্ ফুটবেই ঝিনিক তার
তার ঢেউ, হাজার ঢেউ, দরকার কি গোনবার

উদ্বাস্তু চিত্তের দরকার কি দিন রাত—
উত্তর তারার সাধ—নির্জন দখিন হাত?
স্বপ্নের তামাম শোধ, শেষ রাত্রে ম্লান চাঁদ
চক্ষের কিনার ছোঁয়, নিঃশেষ আলোর স্বাদ।

রাত দিন কি দরকার উদ্বাস্তু চিত্তের
হাল, পাল, সামলে নাও—নীল ঢেউ সমুদ্রের!
মানচিত্রে বিষ নীল, স্থূল রংগ ব্যংগের
ছন্দের পাখায় ঝিম্, কল্পের বিহংগের।

মাসিক রাশিফল

এ আষাঢ় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তেসরা আষাঢ় (১৭ই জুন) শনি মীন থেকে মেষে যাচ্ছে। রাজনৈতিক আবহাওয়া আরো জটিল হয়ে উঠবে। চারদিকে ষড়যন্ত্র, দলাদলি এবং অহংসর্বস্বতা ভয়ানকভাবে প্রকাশ পাবে। বড় বড় কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপরও পড়বে দারুণ আঘাত। শনি এগিয়ে চলেছে সব লণ্ডভণ্ড করার জন্যই। এই বাংলা বর্ষের ২২এ শ্রাবণ থেকে ১২ই আশ্বিন শনির বক্রীকাল অত্যন্ত অশুভ আর মেষে থাকার আড়াই বছরে শনি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে পারে। যেমন করেছিল ইংরেজী ১৯৩৯ সালে। আর এবার তার চেয়েও বেশী কুপ্রভাব পড়বে এশিয়া আফ্রিকার দক্ষিণাংশের উপর। আজ কবিগুরুর কথা মনে পড়ে,---
'অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।'

যাক্, এ : পাকৃতিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত অবস্থা দেখা'তে পাবে। শাসন ও প্রশাসনিক ব্যাপারে গুরুতর পরিবর্তনের আশঙ্কা। এদিকে পাকিস্তানের ব্যাপার বেশ ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। আষাঢ় মাসে যাঁদের জন্ম, তাঁদের প্রকৃতি মধুর। কিন্তু ক্ষণরাগী। থাকবে দুটানা ভাব। ওঁরা হাতের কাজে, বাজনায়, শিল্প-নৈপুণ্যে বেশ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন; ভালবাসার ক্ষেত্রে দ্বৈত-বিরোধে অনেক সময় জীবন দুর্বহ হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য বুধ ও শুক্রের উপর তা নির্ভর করছে। আষাঢ় মাসের জাতকেব জল থেকে ভয় থাকে। তাদের প্রত্যেকের সাঁতার শেখা উচিত। সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারেও তাদের সহজাত যোগ্যতা থাকে। ঐ মাসের জাতিকারা স্বামি-প্রিয় হতে পারেন। সহজেই তাঁদের প্রতি লোকে আকৃষ্ট হবে। এরূপ জাতিকার মঙ্গল ও শুক্র বিরুদ্ধ হলে তাঁদের পক্ষে বিবাহ না করাই উচিত। যাক্, এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী আষাঢ় মাসের ব্যক্তিগত শুভাশুভের আভাস দিচ্ছি। শনি জন্মকালে শুভ থাকলে এ মাসের জাতক এ বৎসরে বাইরে থেকে সম্পত্তি, অর্থ কিংবা লটারীতে টাকা পেতে পারেন।
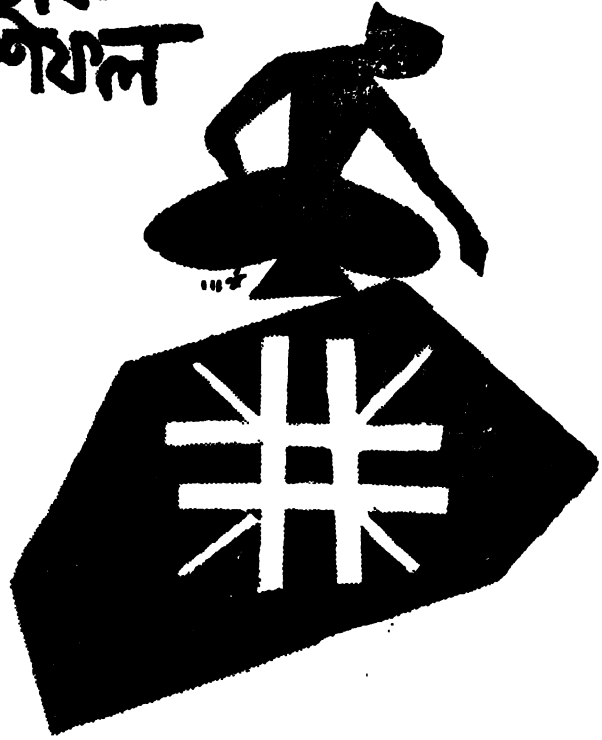
॥ আষাঢ় মাসের ফলাফল ॥

মেষ ঃ কাজকর্মের পরিবেশ সুন্দর হলেও কেমন যেন একরূপ মানসিক উৎকণ্ঠা বা ভয় আপনাকে মাঝে মাঝে অত্যন্ত উদ্বেল করে তুলতে পারে। সাংসারিক কারণে খরচপত্র অত্যন্ত বেশী হবে। সঞ্চিত অর্থে টান পড়বে। এমন কি ধারকর্যও হতে পারে। শরীর

ভৃগুজাতক

করবে উৎপাত। পাকাশয় ও মূত্রাশয়-ঘটিত কোনো গোলযোগ দেখা দিলে সাবধান হবেন। আপনার প্রতিভার ক্ষেত্রে অথবা সত্যিকারের যোগ্যতার ক্ষেত্রে আপনাকে চেপে রাখার অপচেষ্টা চলতে পারে। সহিষ্ণুভাবে নিজের কাজ করে যান; আপনার হিতৈষীর সংখ্যা বেশী। ছেলেমেয়েদের কারো বিবাহ কিংবা চাকুরীর ব্যাপারে সুরাহা হতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন চিন্তা দেখা দেবে। পুঁজিবাদীরা সাবধান। মহিলা জাতকের পক্ষেও প্রায় অনুরূপ কিন্তু প্রিয়জনদের কারো অসুখ-বিসুখ উৎপাত করতে পারে। মেষলগ্নে জন্ম হলে পারিবারিক ক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে। এখন থেকে বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা দরকার। শুক্র কিংবা রাহুর দশান্তর্দশা চললে বিশেষ কষ্টদায়ক হবে।

বৃষ ঃ কাজকর্মর ধারা বাধা হয়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা। নিতান্ত আকস্মিকভাবে এমন কোনো ব্যাপার ঘটতে পারে, যাতে পরিকল্পনা ওলোট পালোট হয়ে যেতে পারে। স্বাধীন প্রোফেশনের লোকেদের বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা উচিত। অবশ্য বিদেশ গমনেচ্ছু বিদ্যার্থীদের এবার বেশ সুযোগ আসতে পারে। শিল্পপতিদের ও সংবাদ-পত্রের মালিকদের পক্ষে এ মাস অত্যন্ত জটিলতাসূচক বে-আইনী কাজ সম্বন্ধে সাবধান। সাংসারিক ব্যাপার মোটামুটি চলনসই। আর্থিক অপচয়, চুরি ও অন্যের দ্বারা কুৎসা প্রচার মানসিক চাঞ্চল্য এনে দিতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উন্নতিতে বিলম্ব ঘটবে। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এ মাস অনুকূল।

কিন্তু গুরুজনের পীড়াদি বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নতুন কাজ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পক্ষে এ মাসের শেষাংশ অনুকূল। মহিলাজাতকের পক্ষেও অনুরূপ ফল। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বৃষলগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রের উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাধা পড়তে পারে। এবং স্বাস্থ্য জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

মিথুন ঃ গোড়ার কয়েকদিন কার্য কারণে অস্বস্তিবোধ করতে পারেন। স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে। পারিবারিক ব্যাপার মনমেজাজ ঠিক রাখার পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠবে। মাসের তেরো দিনের পর আট দিন কাজকর্মের যোগাযোগ ও সুবিধা আদায়ের পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠতে পারে। স্বাধীন প্রোফেশনে চাহিদা অনুযায়ী কাজ মেটানোর পক্ষে দারুণ অসুবিধা হবে। হুজুগের কাজে অনেক সময় নষ্ট হবে। কেউ আশা দিয়ে নিরাশ করতে পারে। দূরে কোথাও যাবার আমন্ত্রণও আসতে পারে। শিল্পী, সাহিত্যিক ও অভিনেতাদের পক্ষে বেশ সুযোগপ্রদ। মিল মালিকদের পক্ষে যোগাযোগের দিক থেকে ভাল কিন্তু মৌলিক সমস্যা সঙ্কটে ফেলতে পারে। চাকরীর ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বাড়লেও ভেতরে ভেতরে শত্রুবৃদ্ধি হঠাৎ বিক্ষোভের মধ্যে ফেলতে পারে। মহিলাজাতকের পক্ষে প্রিয়জনের সাফল্য ও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলযোগ ও আর্থিক দুশ্চিন্তা থাকবে। কিন্তু নতুন যোগাযোগ হবে। মঙ্গল ও শুক্রের দশান্তর্দশা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কর্কট ঃ নতুন কোনো উদ্যম; বন্ধুত্বের প্রসার ও কাজের চাপ বাড়বে। গোড়ার দিকে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে স্বাধীন প্রোফেশন হলে অন্যের সঙ্গে যাতে সঙ্ঘর্ষ না ঘটে, সেদিকে নজর রাখা উচিত। চাকুরী ক্ষেত্রে যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। কিন্তু সুযোগ এলেও প্রতারিত করতে পারে। বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও ফ্যান্সি দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের পক্ষে জটিলতাসূচক। মিলমালিক ও পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠানে দুর্ভাবনার লক্ষণ রয়েছে। মোট টাকার ক্ষতি ও আইনের প্যাঁচ কোনো গোলমালে পড়তে পারেন। অধ্যাপক ও লেখক শিল্পী শ্রেণীর পক্ষে ভাল। পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি হবে। কিন্তু হঠাৎ পুরুষের পক্ষে পত্নীর এবং পত্নীর স্বামীর জন্য দুর্ভাবনার কারণ রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যও কিছু উৎপাত করবে। নতুন প্রার্থীদের চাকুরী লাভ হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার পক্ষে অনুকূল। মহিলাজাতকের পক্ষে স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ ঘটতে পারে এবং কোনো কারণে গতানুগতিক শৃঙ্খলায় বাধা পড়বে। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে সম্পদ বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা মনের উপর চাপ দিতে পারে। শনি কিংবা বুধের দশান্তর্দশা চললে এবং ষাটের উপর বয়স হলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

সিংহ ঃ আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ পাবেন। অবশ্য সকলের মধ্যে থেকেও আপনার মধ্যে এক ধরণের একাকভাব আছে; সেখানে আপনার দোসর কেউ নেই। এলোমেলো চিন্তা এলোমেলো লেখা কিংবা এলোমেলো আঁকার দিকে ঝোঁক যাবে। অথচ সৃষ্টিধর্মী যাদের মন, যারা শিল্পী কিংবা সাহিত্যিক তাদের এমাসের লেখা বা সৃষ্টি অনন্য হয়ে উঠতে পারে। আইনজীবীদের পক্ষে এ মাস অত্যন্ত গোলমেলে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে গোলমালে পড়া সম্বন্ধে সাবধান। বারো থেকে আঠারো বছর বয়সের ছেলেমেয়ে থাকলে তাদের কারো স্বাস্থ্য কিংবা কোনোরূপ উৎপাত বেশ দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ে চলনসই অবস্থা। চাকরীক্ষেত্রে ঈর্ষামূলক শত্রুতা প্রকাশ পাবে এবং আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে মতানৈক্য উৎপাত করবে। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রিয়জনের জন্য উৎকণ্ঠা এবং নিজের বিভ্রান্তিতে মানসিক কষ্ট পাবার আশঙ্কা। ঐ রাশির বিবাহযোগ্যাদের বিবাহ হতে পারে। সিংহলগ্নে জন্ম হলে সামাজিক ঝঞ্ঝাট এবং পারিবারিক উৎপাত উত্ত্যক্ত করতে পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। শনি কিংবা বুধ অথবা শুক্রের দশান্তর্দশা চললে বিশেষ কষ্ট দিতে পারে।

কন্যা ঃ শনি সরে যাচ্ছে। কাজেই অনেকাংশে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। রাহু অত্যন্ত অশুভ। কিন্তু এখন যাঁদের আপনার শুভানুধ্যায়ী মনে করেন অথবা যাঁরা আপনার সহায়তা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করুন। এবার সাফল্য আসতে পারে। তবু এক ধরণের নৈরাশ্য আপনাকে পেয়ে বসবে। যে সূত্রে আয় তার অনেকগুলো সূত্রে আয় কমে যেতে পারে। কন্ট্রাকটার-ইঞ্জিনীয়ারদের পক্ষে এখন বেশ হিসাব করে চলা উচিত। পুঁজিপতিদের সঞ্চিত অর্থ সম্পর্কে দুর্ভাবনার কারণ ঘটতে পারে। স্বজনের সঙ্গে মতানৈক্য এবং বিরোধ দেখা দিতে পারে। বাড়িঘর তৈরীর ব্যাপারে যাদের উপর ভার, তাদের দ্বারা উত্ত্যক্ত ও প্রতারিত হতে পারেন। চাকরবাকর ও অপরিচিত অভ্যাগতের সম্বন্ধে সাবধান হবেন। মহিলাজাতকের পক্ষে কোনো সূত্রে লাভ ও ভ্রমণের যোগাযোগ ঘটতে পারে। কন্যালগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলমাল এবং পারিবারিক অশান্তির আভাস কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যশোবৃদ্ধি এবং চাকুরী ব্যাপারে নূতন কিছু ঘটতে পারে। শুক্র কিংবা বৃহস্পতির দশান্তর্দশা চললে বিশেষ কষ্ট দিতে পারে।

তুলা ঃ শনি মেষে আসায় জটিলতা বাড়বে। খুব সাবধানে কাজকর্ম করুন। আগামী তিন বছর অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ। এ মাসে নতুন কোন কাজ করতে গিয়ে বাধা পেতে পারেন। ব্যয় হবে বেশী। পুরনো কোনো ঝামেলাও আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বাড়িঘর নিয়েও ঝঞ্ঝাট হবে। পঞ্চাশের উপর বয়স হলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান। জ্বর হলে কিংবা চর্মরোগ হলে তা সহজে সারতে চাইবে না।

ব্যবসায় গতানুগতিকভাবে চলবে। মহাজনের সঙ্গে আগের সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন হবে। পত্নীর স্বাস্থ্য গোলমাল করতে পারে। বিশেষ করে তার ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো ব্যথা কিংবা ক্ষতাদি দেখা দিলে যথেষ্ট কষ্টের কারণ ঘটবে। চাকুরী ক্ষেত্রে মনোমত উন্নতির পক্ষে এখন বাধা আছে। কোনো ছেলের জন্যও অশান্তি ভোগের আশঙ্কা। মহিলা জাতকের পক্ষেও অনুরূপ ফল হবে। তুলালগ্নে জন্ম হলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়বে। কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের গোলমাল থাকবে। মঙ্গলের দশান্তর্দশা চললে তা বেশ ক্ষতিকর হতে পারে।

বৃশ্চিক : আগের কোনো সমস্যা বিব্রত করলেও কাজকর্মের দিক থেকে ভাল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। যাদের বয়স ত্রিশের কাছে, পঁয়তাল্লিশের কাছে কিংবা ষাটের উর্ধ্বে তাদের সামান্য খুঁটিনাটিও অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। জনতার ভিড় ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস এ মাসে এড়িয়ে চলুন। অনেক দিনের প্রতিষ্ঠিত কারবারেও দুর্ভাবনার কারণ ঘটতে পারে। নিতান্ত আপনজনের মধ্যেও কারো বিশ্বাসঘাতকতা করার সম্ভাবনা। পুস্তক ব্যবসায়ী ও ছাপাখানার মালিকদের পক্ষে মাসের শেষাংশ নৈরাশ্যজনক। লেখক, অভিনেতা ও শিল্পীদের যোগাযোগের দিক্ থেকে ভাল। বিশেষ সম্মান ও স্বীকৃতি লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে। চাকুরী ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এবার বেশ অনুকূল। বে-আইনী কারবারীদের দুর্ভোগের আশঙ্কা। মহিলাজাতকের শত্রুবৃদ্ধি ও সন্তান কষ্টের আশঙ্কা। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে শুভ সূচনার সম্ভাবনা। কিন্তু পত্নীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। শুক্র কিংবা বুধের দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান।

ধনু : মাসটা একটু গোলমেলে মনে হতে পারে। টাকাকড়ি যথেচ্ছ অপচয় এবং স্বজনের জন্য উৎপাত হতে পারে। কাজকর্মের যোগাযোগের দিক থেকে ভাল; কিন্তু সাংসারিক অথবা বৈষয়িক ব্যাপারে প্রতিবেশী বা জ্ঞাতির উৎপাত অসহ্য হয়ে উঠতে পারে। মধ্যভাগের পর শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। ব্যথা বেদনা ও উদর সংক্রান্ত পীড়াদি উৎপাত করবে। ষাটের কাছাকাছি বয়স হলে বিশেষ সাবধান। দূরে কোথাও যাবার সম্ভাবনা। শিল্পপতিদের পক্ষে একদিকে যেমন সুযোগপ্রদ, অপর দিকে তেমনি সঙ্কটপূর্ণ। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন। সন্তানের জন্য ঝঞ্ঝাট বাড়তে পারে। ব্যবসায়ে

চলনসই। নতুন কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়। চাকুরী ক্ষেত্রে আগের চেয়ে ভাল। পরীক্ষার্থীর পক্ষে এ মাস অনুকূল। কোনো সূত্রে কিছু প্রাপ্তিও হতে পারে। মহিলাদের পক্ষে দাম্পত্য চিন্তার আশঙ্কা। ধনুলগ্নে জন্ম হলে স্নায়বিক দৌর্বল্য ঘটা সম্বন্ধে সাবধান। সাধারণভাবে কর্মক্ষেত্রে ভাল ফল আশা করা যায়। আর্থিক উন্নতিরও লক্ষণ আছে। শেষাংশ ব্যয়বাহুল্যের চাপ থাকবে।

মকর ঃ এ মাস আপনাকে বেশ সুযোগ দেবে। যোগাযোগগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখুন। বিশেষ করে আইনজীবী, লেখক, শিল্পী ও অভিনেতাদের পক্ষে অর্থাগমের বেশ অনুকূল; ইচ্ছা করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না। চাকুরী ক্ষেত্রে অবশ্য মনোমত হবে না। বরং মনের উপর বারবার চাপ পড়বে। মাসের তেরো থেকে একুশ তারিখ বিশেষ লক্ষণীয়। নতুন কোনো কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সম্ভাবনা। এ সময়ে সহায়তা পাবেন। ছোট ছোট শিল্প উৎপাদনকারীদের পক্ষে ভাল। বৃহৎ শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের মোটা রকমের অর্থ এবার মার খেতে পারে। প্রিয়জনের অসুখ বিসুখ ও পৈতৃক সম্পত্তি নিয়েও ঝঞ্ঝাট আছে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। শেষাংশে জ্বর ও আমাশয়াদি কষ্ট দিতে পারে। সাধারণ দোকানদারদের পক্ষে গতানুগতিক অবস্থা চলবে। তরুণী মেয়েদের সঙ্গী নির্বাচনে ও ভ্রমণে সাবধান থাকা উচিত। বিবাহযোগ্যাদের বিবাহের কথা দেবার আগে বিশেষ চিন্তা করা উচিত। মকর লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের উৎপাত থাকবে। ব্যয়বৃদ্ধি বিচলিত করবে। শত্রুরা জব্দ হতে পারে এবং নতুন কোনো উদ্যমের সম্ভাবনা দেখা যায়।

কুম্ভ ঃ এমন এক অবস্থা যে সাফল্যের মুখে এসেও কাজ যেন আর এগুবে না। মনের উপর চাপ থাকবে এলোমেলো চিন্তা ও সাংসারিক বিশৃঙ্খলা উত্যক্ত করবে। আশ্রিতদের মধ্যে অবাঞ্ছিত লোকের আবির্ভাব হতে পারে। সামাজিক ব্যাপারে মতবিরোধ শত্রুসৃষ্টি করবে। এদিকে নিজের স্বাস্থ্যও ঠিক ভাল যাবে না। অবশ্য আগের কোনো কাজের সুরাহা এখন হতে পারে। কাজের জন্য বাইরে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। আইনজীবী, পুরোহিত-শ্রেণীর ব্যক্তি কিম্বা দালাল-শ্রেণীর কারো সঙ্গে বেশ মতবিরোধ ও বিসম্বাদ ঘটতে পারে। ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধি হবে। কিন্তু গোপনে আপনারই টাকাকড়ি যে কেউ চুরি করছে তা ধরা পড়তে পারে। পুঁজিপতিদের পক্ষে এখন বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্যের গোলযোগ হলেও অনেক দিনের কোনো অভিলাষ পুরণ হতে পারে। কুম্ভলগ্নে জন্ম হলে আয় বৃদ্ধি, কর্মের প্রসার ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির যোগ। কিন্তু শেষাংশে স্বজনের শত্রুতা ও সন্তানপীড়া কষ্ট দিতে পারে। বৃহস্পতি কিংবা মঙ্গলের দশান্তর্দশা চললে কষ্টদায়ক হতে পারে।

মীন ঃ শরীরের দিকে খেয়াল রাখুন। পরিকল্পনামত কাজের সুযোগ এবার পাবেন। আর্থিক দিক থেকেও এখন ভাল হবে। সাংসারিক কারণে মনের উপর চাপ থাকবে। পুরনো সম্পত্তি কিছু থাকলে তা নিয়ে শরিকদের সঙ্গে গোলমাল হতে পারে। আপনার পক্ষে এখন এ সব ঝামেলা এড়িয়ে চলা উচিত। ছাপাখানার মালিক ও পুস্তক ব্যবসায়ীর পক্ষে এখন ভাল। কিন্তু রাসায়নিক দ্রব্য, তৈল উৎপাদনকারী কিংবা তৈল ব্যবসায়ীর পক্ষে এখন ঝঞ্ঝাট ও সঙ্কট দেখা দিতে পারে। অধ্যাপক ও লেখক শ্রেণীর পক্ষে এখন যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকরা এবার সুযোগ পাবেন। হাতের কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করুন। এ মাসে বাজে কাজে অনেক সময় নষ্ট হতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হলে পুনর্নিয়োগের আশা কম। মহিলাজাতকের প্রীতির প্রসার, কোনোসূত্রে লাভ ও বাইরে যাবার সম্ভাবনা। মীনলগ্নে জন্ম হলে কর্মের প্রসার ও শত্রুবৃদ্ধির যোগ। চাকুরী ক্ষেত্রে শুভ হতে পারে। যাদের শনি বুধ কিংবা শুক্রের দশান্তর্দশা চলছে তাদের পক্ষে বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা উচিত।

● পত্রোত্তর ●

● সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল (ত্রিবেণী রেল স্টেশন)—(১) অন্য চাকুরী আড়াই বর্ষ মধ্যে, (২) হবে না। ●শ্রী স প-সদার (পানাগড়)—(১) মকর রাশি ও ধনু লগ্ন, (২) গোড়ার দিকে তেমন ভাল নয়; তবে শ্রাবণের পর অনেকাংশে ভাল। ● শ্রীমতী ছন্দা ঘোষ (উত্তরপাড়া) —(১) এ সব ব্যাপার থেকে এখন সরে থাকা ভাল, (২) শ্রাবণের পর নিজের যে ভাল হচ্ছে বুঝতে পারবেন। ● শ্রী পি চ্যাটার্জী (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা)—এ ভাবে ব্যক্তিগত উত্তর আমরা দিই না। (১) সময় অনুকূল নয়, (২) আপোষ করাই ভাল। ● শ্রীশচীন বসু (গড়পার রোড, কলি)—(১) দেড় বছর মধ্যে না হলে আর হওয়া কঠিন; (২) প্রতিকার করলেই উপকার হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। তবু রক্তমুখী প্রবাল ছয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ●.শ্রী ডি চক্রবর্তী (রামাপুরা, বারাণসী) —(১) বর্তমানের মত, (২) পুস্তকাদির ব্যবসায়। ● শ্রীঅশোককুমার (কালীপুর)—(১) কোথাও চাকুরী হবে; (২) লটারীতে হবে না। শ্রীভরত নাগ (অভয় হালদার লেন, কলিকাতা)—(১) জন্মকালে শনি ও মঙ্গলের অবস্থান অত্যন্ত অশুভ; (২) বর্তমানে শনি গোচরে অশুভ হবে। একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। পরে ভাল হবে। নবমে শনি ভাল নয় এবং বৃহস্পতিও দোষযুক্ত। তবু এ সব সত্ত্বেও আট-নয় বছর পর ভাগ্য বলবান

হবে। ● শ্রীনি কুঞ্জবিহারী তালুকদার (সিঙ্গাতলা, মালদহ)—(১) পেটের ব্যাধির জন্য বিশেষজ্ঞ এলোপ্যাথ দেখান এবং গ্রহের প্রতিকার জন্য পীত পোখরাজ ছয়রতি ও আটরতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখুন। (২) চাকুরীতে উন্নতি আছে। কিন্তু অক্টোবর পর্যন্ত সকল কাজে সাবধান। ● শ্রী বি কুমার (কলি-৫৪)—(১) এখন করতে পারেন, (২) চলনসই। ● শ্রী বি কুমার (কাঁকুড়গাছি)—(১) উদর ও মূত্রাশয়ঘটিত পীড়াদির সম্বন্ধে সাবধান। (২) এভাবে ফ ড়া বলা সম্ভব নয়। ● বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (জগদলপুর, বস্তার)—(১) পরে কেটে যাবে, (২) অক্টোবর পর্যন্ত। ● নকুলেশ রায় (বেহালা)—এ সম্বন্ধে আমার কোনো কিছুই জানা নেই। তন্ত্রের বই পড়ে দেখুন। ● শ্রীসুবীরকুমার দত্ত (গড়পাড় রোড, কলি)—(১) মোটামুটি, (২) ভাল হবে। ● শ্রীপ্রবীরকুমার দত্ত (গড়পাড় রোড, কলি:)—(১) পরে ভাল, (২) বাধা দূর করার জন্য রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ধারণ করা উচিত। ● শ্রীরজতকুমার ঘোষ (রাঁচী)—(১) নয় মাসের মধ্যে না হলে হওয়া কঠিন। (২) ভালই হবে। ● শ্রী আর এম (আলিগড়)—(১) এখন থেকে এগারো মাসের মধ্যে প্রবার সম্ভাবনা, (২) ঠিকুজী মেলাবার আবশ্যক নেই। ● শ্রী বি কুমার (সি আই টি, কলিকাতা-৫৪)—(১) মিথুন রাশি ও মীন লগ্ন, (২) হবে না। ● শ্রী বি কুমার (কাঁকুড়গাছি) —(১) পরে ব্যবসায়ে, (২) শনি ও মঙ্গল বিরুদ্ধে। প্রতিকারে সব ক্ষেত্রে ফল হয় না। বত্রিশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত যেতে দিন। ● শ্রীমতী মাধুরী সরকার (ব্যারাকপুর) —(১) ধৈর্য ধরুন, এবার শ্রাবণের পর অনেকটা ভাল। (২) উন্নতি হতে কিন্তু অক্টোবরের পর। ● শ্রীতপনকুমার কুণ্ডু (গোবিন্দবসু লেন, কলি:)—(১) জুলাই-এর মধ্যে না হলে এখন হবে না। (২) এবারে সুযোগ আসতে পারে কিন্তু পারিবারিক ঝঞ্ঝাট উৎপাত করবে।

● শ্রীসমীরণকুমার জানা (সারিশদা, মেদিনীপুর)---ঠিকুজীর যা নকল দিয়েছেন, তা দুর্বোধ্য। আবার উক্ত ফাল্গুন মাসের সাত তারিখে বুধবারও নয়। রাশিনাম যা আছে, তাতে মীন রাশি বুঝায়। বর্তমানে মীন রাশির উপর রাহু ও শনির কুপ্রভাব। ● মিস রায় (বালী, হাওড়া)---(১) সম্ভব নয়, (২) তার দুর্বলতা আছে। ● শ্রীচন্দ্রশেখর মল্লিক (যদুপণ্ডিত রোড, কলিকাতা-৬)---(১) বাধা রয়েছে; তবু এখন থেকে জুন পর্যন্ত দেখুন। তা না হলে বেশ দেরী হবে, (২) লগ্নে নীচস্থ শনির সঙ্গে বৃহস্পতি অত্যন্ত গোলমেলে। প্রতিকার-স্বরূপ পীতাম্বর নীলা ছয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীলালমোহন দাস (শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা)---(১) বর্তমান বর্ষে গৃহাদির যোগ না হলে এখন আর হবে না। (২) বৈশাখ থেকে আশ্বিন মধ্যে হতে পারে। ●শ্যামলকুমার বিশ্বাস (শিবচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট, বেলুড়)---(১) বুধবার, (২) এবারই জুনের মধ্যে আশা অনেকাংশে সফল হতে পারে। ● শ্রীস্যানডো বিশ্বাস (শিবচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট, বেলুড়)---(১) মকর রাশি ও মিথুন লগ্ন, (২) কয়েক মাসের মধ্যে সুফল পাবেন। ● শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত (সুভাষ পল্লী, খড়্গপুর)---(১) সাত আট রতি শ্বেতপ্রবাল সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। (২) স্বাস্থ্য খুব মজবুত হবে না; তবু বর্তমান বাংলা বছরে অনেকটা উন্নতি হবে। ● শ্রীঅরুণকুমার দত্ত (সুভাষ পল্লী, খড়্গপুর)---(১) কর্কট রাশি ও ধনু লগ্ন, (২) এ বছরেই কিছু ভাল। ● শ্রীঅনীতকুমার দত্ত (খড়্গপুর)---(১) মিথুন লগ্ন ও কুম্ভ রাশি, (২) লেখাপড়া মোটামুটি ভাল হবে কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ● শ্রীবারীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (চাতরা, চৌধুরী পাড়া)---(১) অক্টোবরের মধ্যে না হলে অনেক দেরী হবে, (২) শনির জন্য পীতাম্বর নীলা ছয়রতি রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● [illegible] সরকার ([illegible])---(১) [illegible] বছরের মধ্যে যোগাযোগ হতে পারে,

(২) শেষ জীবন বর্তমানের মতই কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে। ● হরিপ্রসাদ পাল (পাম এভিনিউ, কলিকাতা)---(১) আরো তিন বছর লাগবে, (২) বাধা অনেক; তবু দেড় বছর দেখুন। ● ইন্দ্রজিৎ রায় (নেতাজী সুভাষ রোড, আসানসোল) ---আগস্টের পর কিছু ভাল হবে, আরো পড়াশোনা করুন। ● বংশীবদন দত্ত (কান্দী, গোপীনাথপুর)---(১) সম্ভবনা, (২) মোটামুটি ভাল হবে। ● [illegible] চট্টোপাধ্যায় ([illegible])---বর্তমান বাংলা বর্ষে ভাল [illegible]। ●শ্রীমতী মনীষা সেন ([illegible])—(১) কষ্টে কাটিলেও [illegible] কিছু [illegible] হবে, (২) পরে সচ্ছল হবারই কথা। ●অমল চক্রবর্তী ([illegible])---(১) রক্তমুখী প্রবাল আট নয় রতি। রূপার আংটিতে ডানহাতের অনামিকায় ধারণ করতে পারেন। (২) ব্যবসায়ে উন্নতি। ●শ্রীমন্মথকুমার মজুমদার (খানা রোড, অণ্ডাল)---(১) আগে চাকুরী (২) আগামী বর্ষে কিছু সুরাহা হবে। ● শ্রীগোরাচাঁদ সেন (কাপাসডাঙ্গা, হুগলী)---(১) ইঞ্জিনীয়ারিং, (২) জুনের মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীঅশোককুমার বসু (মাধবপুর)---(১) পেটের গোলমাল কিছু থেকে যাবে, (২) চাকুরী স্থায়ী হবে। ●শ্রীমতী শীলা (রামকৃষ্ণপুর)—(১) পঁচিশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত, (২) উক্ত সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানধর্মী চাকুরে হতে পারে। ●শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার (সন্তোষপুর ইস্ট রোড, যাদবপুর)---(১) মেষ লগ্ন ও মেষ রাশি। সুতরাং আগামী তিনবছর শনি বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য দেবে না, (২) মোটামুটি চলনসই। প্রতিকার জন্য গোমেদ ছয়-সাত রতি ধারণ করতে পারেন। রূপার আংটিতে। ● শ্রীসোনিয়া (আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর)---(১) কন্যা রাশি ও মিথুন লগ্ন, (২) এড়িয়ে চলা উচিত। ● শ্রী এস কে রায় (উত্তর দমদম, রবীন্দ্রনগর)---(১) স্বাধীন প্রোফেশনে, (২) ঐরূপ কোনো কাজে। ● শ্রীঅপরাজিতা (বালিগঞ্জ)—(১) বদলীর সম্ভাবনা; (২) গ্রহের দশান্তর্দশা জানানো সম্ভব নয়। ● শ্রীসমী (বালিগঞ্জ)—

(১) এগারো মাস দেখুন, (২) বিশেষ থাকবে না। ● শ্রী এম (হুগলী) –(১) বৃহস্পতি শনির মধ্যে, (২) উক্ত সময়। ● শ্রীসুভাষচন্দ্র পালিত (উখাগ্রাম, আসানসোল)---(১) বেসরকারী চাকুরী, জুনের মধ্যে, (২) তিন বছর পর; আগামী নয় মাসের কার্যকারণের উপর উচ্চশিক্ষা নির্ভর করছে; কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। ●শ্রী প্র কু ব্যা (উত্তরপাড়া) ---(১) পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না, (২) এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে উভয়ের রাশিচক্রের প্রয়োজন। ● শ্রীমতী শিপ্রা মুখার্জী (ভিখনপুর, বিহার)---কর্কট রাশি, বিপ্রবর্ণ, অশ্লেষা নক্ষত্র, রাক্ষস গণ, (২) আরো পাঁচ বছর হতে পারে। ● শ্রীক-দা-গু (কলিকাতা)--(১)আগামী শ্রাবণ পর্যন্ত ছেলেটির মতামত পালটাতে পারে, সে পর্যন্ত দেখুন, (২) ওঁর মতামত বিরুদ্ধ হলে বর্তমান বাংলা বছরেই অন্যত্র হতে পারে; বিবাহিত জীবন সুখের হবে এর জন্য ভয় নেই। ● শ্রীসৃষ্টিধর কোঙার (বড়বেলুন, বর্ধমান)---(১) জন্ম সাল, জন্ম তারিখ, সময় ও জন্মস্থানের উল্লেখ না করলে রাশি ও লগ্নাদি জানানো সম্ভব নয়, (২) কোনো ভাগ্যবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্নের সময় ও তারিখ এবং বর্তমান বয়স জানাতে হয়। ● শ্রীমতী হাসি ঘোষ (কেয়ার অব শ্রীযুবরাজ ঘোষ, কান্দি)---(১) পরিবর্তন হবে। রূপার আংটিতে একটি রক্তমুখী প্রবাল রত্ন ধারণ করিয়ে দেখুন, (২) পরে ভালই করবে। ● শ্রীরাণা পাল (হাওড়া-১)---(১) উনিশ মাসের মধ্যে পরিবর্তন আসবে; জুলাই মধ্যে একবার বেশ সুযোগ, (২) উপরি-উক্ত সময়। ● শ্রীছত্রধারী (হেম চক্রবর্তী লেন, হাওড়া)---(১)এবার আগষ্টের মধ্যে হতে পারে, (২) ব্যবসায়ে সাধারণ। ●শ্রী সু-ব (ফকির দাস মঙ্গল লেন, হাওড়া)---(১) বত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ, (২) বর্তমান বাংলা বছরে হতে পারে। ● শ্রীবিমলকুমার দেবনাথ (ধর্মতলা রোড, কলিকাতা) ---(১) পদোন্নতি জুলাইয়ের মধ্যে না হলে দেরী হবে, (২) মোটামুটি ভাল। ● শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত (রূপনারায়ণ নন্দ লেন, কলি:)---(১) পঞ্জিকা দেখে এভাবে তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, (২) বর্তমান বাংলা সালেও একই রূপ চলবে. ●শ্রী আর চ্যাটার্জী (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা)---(১) বৃহৎ কোনো ব্যাপার ঘটবে না, (২) এখন সুবিধা হবে না। ● শ্রীজীবেশকুমার সান্যাল (রাজবল্লভপুর সাহা লেন, হাওড়া)---(১) পঞ্জিকার ব্যাপারে অনেক সময় গোলযোগ হয়। বর্তমানটি ঠিক, উন্নতি হবে এবং পরিবর্তন হবে। ● শ্রীঅভয় সেনগুপ্ত (ক্রীক রো, কলি)---(১) উনিশ মাসের মধ্যে না হলে আর হওয়া কঠিন, (২) এরূপ পীড়া কষ্ট দিতে পারে। ● শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী (অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া)---(১) এগারো মাস দেখুন, (২) এখন হবে না। ● শ্রীঅনিলবরণ দাস (গঙ্গারাম পালিত লেন, কলি)---(১) রত্ন ধারণ করলেই যে উপকার হয়, তার নিশ্চয়তা নেই, তবু পীতাম্বর নীলা ছয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। রূপোর আংটিতে। (২) বর্তমান বাংলা মাস দেখুন। ● শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা)---(১) তিন বছর বিশেষ ভাল নয়, (২) এবার হতে পারে। প্রতিকারে গোমেদ আটরতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি। রূপোর আংটিতে। ● শ্রীদীপু রায় (শ্রীগোপালমল্লিক লেন, কলি)---(১) বিদেশ যাত্রা হবে না, (২) সম্ভাবনা আছে। ● শ্রীহরিসাধন দে (অবিনাশ শাসমল লেন, ---কলি:)---(১) শীঘ্র হ

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

কুপন

নাম- ....

ঠিকানা- ....

....

মাসিক বসুমতী

(২) ভাল করার সম্ভাবনা। ●শ্রীফণীন্দ্রনাথ দে (পি মিত্র রোড, আলমবাজার)—পীত পোখরাজ ছয়রতি ও রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ধারণ করে দেখুন। কবিরাজী চিকিৎসা করুন। ●শ্রীকালাপাহাড় (কালিয়াগঞ্জ)—(১) কুম্ভরাশি, (২) হবে। ●শ্রীপ্রণব সরকার (হরিদেবপুর রোড, কলি)—প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতীতে রাশিফল বের হয়। ●শ্রীবিভূতি নন্দী (গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিঃ)—(১) ধৈর্য ধরে পাঁচ বছর কাটাতে হবে। (২) হীরক একরতি ও কনক ক্ষেত্র ক্যাটস আই কমপক্ষে আড়াই রতি। ●শ্রীমতী চন্দ (ভিগবর)—(১) একুশ বৎসর মধ্যে লেখাপড়া শেষ হতে পারে; (২) আশা পূর্ণ হতে পারে। ●শ্রীঅনামিকা (দিনু মাস্টার লেন, শিবপুর)—(১) বর্তমান বর্ষ হলে, পঁচিশে, (২) সম্ভাবনা আছে। ●শ্রীশঙ্করনাথ মিত্র (শ্যামকুঞ্জ, টাটানগর)—(১) মোটামুটি ভাল, (২) চলনসই। ●শ্রীশান্তনা মুখার্জী (সার্কুলার বাই লেন, হাওড়া)—(১) পারা যাবে, (২) এবারই কোনো কাজ হবে। ●শ্রীমতী বিভা (খড়গপুর)—(১) শ্রাবণ থেকে আগের চেয়ে ভাল; (২) পান্না বেশী উপকারী হবে। ●শ্রীদেবব্রত (গোলবাজার, খড়গপুর)—(১) বর্তমানে তিন বৎসর বিশেষ ভাল নয়। (২) তবু শ্রাবণের পর কিছু ভাল হবে। ●শ্রীনীলমণি মিত্র (ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া)—(১) বাধা আছে, (২) রূপার আংটিতে রক্তমুখী প্রবাল আটরতি। ●শ্রীদেবেশ রায় (মেদিনীপুর)—(১) তাঁর জন্মকুণ্ডলী দরকার, (২) মুক্তা পাঁচরতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয় রতি। উভয় রত্নই সোনার আংটিতে। ●শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (গয়েশপুর, নদীয়া)—(১) সম্ভাবনা। (২) জুলাই পর্যন্ত দেখুন। ●শ্রীভবতারিণী (বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা)—(১) এ ভাবে রাশিচক্র ঠিক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, (২) সপ্তমস্থ রাহু ও মঙ্গল শুভফল দেয় না। ●শ্রী এ মৈত্র (রায়বাগান স্ট্রীট, কলি)—তিনখানি কুপন এক সঙ্গে পাঠিয়েছেন। (১) রিসার্চের সুযোগ পাবেন, গানবাজনার দিকটা বেশ উন্নতিকর। সাতাশ বর্ষে বিদেশ যাত্রার সুযোগ, (২) কনক ক্ষেত্র ক্যাটস আই থেকে পাঁচ রতির মধ্যে সোনার আংটিতে, বিবাহের যোগাযোগ তেইশের মধ্যে হতে পারে। পে ব্যাঙ্কের সুযোগ আছে। ●শ্রী এম মৈত্র (রায়বাগান স্ট্রীট, কলি)—দুখানি কুপন। লেখাপড়ার সাধারণ। নাচ গানে বেশী সাফল্য। (২) নাচ গানে যশ হবে এবং স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। প্রতিকার শ্বেতপ্রবাল ছয়রতি। সোনার আংটিতে। ●শ্রী এস মৈত্র (রায়বাগান স্ট্রীট, কলিঃ)—দুখানি কুপন। (১) এখন থেকে দেড় বছর মধ্যে গাড়ির যোগাযোগ এবং উক্ত সময়ে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হবে। (২) মেয়েদের সম্বন্ধে চিন্তা নেই। শুধু ওদের স্বাস্থ্য দেখবেন এবং বছর দেড়েকের মধ্যে স্থান পরিবর্তন। ●শ্রী এস কে মৈত্র (রায়বাগান স্ট্রীট, কলি)—দুখানি কুপন। (১) অক্টোবরের মধ্যে না উঠলে এখন উঠবে না। বর্তমান বর্ষে উন্নতি হতে পারে। (২) অন্য ব্যবসায় হতে দেরী। অনেকাংশে উচ্চপদ পাবার যোগ। শ্রীতারকনাথ দে (রাজেন্দ্রনাথ সেন, লেন, কলিঃ)—(১) আয়ু এখনো আছে, (২) গ্রহের প্রতিকার জন্য শ্বেত প্রবাল নয়রতি এবং পীত পোখরাজ নয়রতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীমতী টগর মুখার্জী (ধানবাদ)—(১) মোটামুটি চলনসই অবস্থার, (২) ছেলেরা অশান্তি করবে না। ●শ্রীঅসিতবরণ মুখার্জি (ভাওরা, ধানবাদ)—(১) পরীক্ষার ফল আমরা বলি না (২) এই মাত্র বলা চলে ছেলেটি উন্নতি করবে। কিন্তু ওর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবেন। ছয়রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ ● করিয়ে দেখুন। শ্রীসুধী মুখার্জী (নিমচাঁদ বাজার রোড, কলি)—(১) পরীক্ষার ব্যাপারে আমরা উত্তর দেই না। (২) এবার চাকুরী হতে পারে। ●শ্রীমতী শ্যামলী মুখার্জী (নিমচাঁদ কাঁড়ার রোড, কলি)—(১) পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না। (২) বিবাহ বিশেষ বিচার করে দেখবেন। ●শ্রীসুবন্ধু ঘোষ (কাঁটাটিবার, বর্ধমান)—প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতীতে সেই মাসের ব্যক্তিগত রাশিফল প্রকাশ হয়। আপনি মাসিক বসুমতী দেখুন। এমনি কোনো উত্তর দেওয়া হয় না। ●শ্রীআশীষকুমার রায়, (…)—(১) তিন বছর বিশেষ ভাল নয়; কিন্তু বর্তমান বাংলা সালের শেষাংশ থেকে কিছু উন্নতি হবে, (২) পাই হবে একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। ●শ্রী…শেফালী রায়চৌধুরী (বৈদ্যবাটি)—(১) ভাল চিকিৎসক দেখান। শ্রাবণের পর কিছু ভাল, (২) উৎকৃষ্ট চুনী কমপক্ষে আড়াই রতি এবং গোমেদ পাঁচরতি ধারণ করে দেখতে পারেন। শ্রীনরেন মুৎসুদ্দি (চণ্ডীদাস এভিনিউ, দুর্গাপুর)—(১) এখন থেকে দশকাল মধ্যে হতে পারে, (২) তিনটির বেশী হওয়া কঠিন। ●শ্রীদেব দত্ত (কোহিমা)—ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেওয়া হয় না। রাশিমিথুন ও মৃগশিরা নক্ষত্র, (২) সরকারী চাকুরী। ●শ্রীপীযূষকান্তি সিকদার (রাণাঘাট)—(১) এবার হবে, (২) শনি ও রাহু। ●শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (শ্যামলাল রোড, মিলা)—(১) আয়ু ও লগ্ন সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্নোত্তর বিচার হয় না, (২) গোমেদে বিশেষ উপকার হবে না। ●শ্রীস্বপনকুমার দাসবিশ্বাস (শেওড়াফুলী)—(১) জন্মকালে মঙ্গল শনি একত্রে স্বাস্থ্যের গোলমাল ঘটাবে, (২) অবস্থা একটু ভাল হবে এখন থেকে। ●শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী (বাদমা, জামসেদপুর) (১) ওষুধের ব্যবসায়, (২) লাল চুনী চার পাঁচ রতি। ●শ্রী ডি ঘোষ (গড়িয়াহাট)—(১) চাকুরী ও পরে ব্যবসায়, (২) সিজোন সংক্রান্ত। ●শ্রীমতী (তিলজলা, কলিকাতা)—(১) জুলাই মধ্যে সুযোগ, (২) প্রত্যেকের কোষ্ঠী দেখা দরকার। ●কুমারী শিখু (কলিকাতা)—(১) ভাল হবে কিন্তু ছোটবেলায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান, (২) কুম্ভরাশি, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ও ধনু লগ্ন।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী স্মরণে

জগতে এমন কয়েকজন শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা সঙ্গীতকে তাঁদের জীবন-চর্যার অঙ্গীভূত করে তোলেন। তাঁদের জীবন-বেদ সুর-সাধনা, সুরই তাঁদের আদর্শ এবং সুরেই তাঁদের মোক্ষ। তাঁদের সুরের আবেদন ও মোহজাল দেশকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সুরের সৌন্দর্য, মাধুর্য তাঁদের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁরা চলে যান এই পৃথিবী ছেড়ে, কিন্তু তাঁদের সাধনার ধন সুরলহরী থেকে যায় অবিস্মরণীয় হয়ে। অসংখ্য শ্রোতা, অসংখ্য সুরপিপাসুদের তাঁরা যে আনন্দ বিতরণ করে যান, তা' কোনদিনই স্মৃতি থেকে মুছে যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে সম্ভব হয়েছে তাঁদের কণ্ঠকে যথাযথভাবে সংরক্ষিত করা, যদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ কোনদিন বঞ্চিত হবে না তাঁদের সঙ্গীত-রসাস্বাদনে।

কিন্তু এরূপ শিল্পীদের দেখা এবং সেই তাঁদের সঙ্গীত শোনা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শিল্পীরা যখন সঙ্গীত পরিবেশন করেন তখন তাঁদের ভাব, আবেগ, আনন্দ, যা তাঁরা নিজে উপভোগ করেন, তার একটি মহৎ প্রভাব আছে শ্রোতাদের ওপর। তাই

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'টেপ-রেকর্ড' প্রভৃতিতে হাজার গান শুনলেও, মানুষ ছুটে যায় শিল্পীর কণ্ঠে গান শোনার জন্য।

সম্প্রতি একজন শিল্পী চলে গেলেন এই পৃথিবী থেকে---তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী শ্রোতা ও ভক্তের মায়া ত্যাগ করে---চলে গেলেন তাঁর বাঞ্ছিত সুরলোকে। আমাদের দেশ হারাল একজন সার্থক শিল্পী---যাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সুর মানব অন্তরকে ঝঙ্কৃত করে তুলত।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেব ছিলেন এমন একজন শিল্পী---সুর যাঁর ছিল নিত্য সঙ্গী। গোলাম আলী খাঁ সাহেবের পরিচয়---গোলাম আলী খাঁ সাহেব এবং তাঁর গান। তিনি যে গান গেয়ে গেলেন তা' কোন নির্দিষ্ট যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনাগত ভবিষ্যতে সঙ্গীত-প্রেমিক অনুপ্রাণিত হবেন তাঁর গানে। তিনি পাতিয়ালা ঘরনার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু তাঁর মর্যাদা কি ঘরানার প্রতিনিধিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? আমি তা' মনে করি না। তাঁর গানে ছিল মৌলিকত্ব এবং ভাবের দিক দিয়ে, সুরের আঙ্গিকের দিক দিয়ে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতে নব আলোকপাত করে গেছেন। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। কুসুম সৌরভের ন্যায় তাঁর কণ্ঠ থেকে রাগ সৌরভ অবলীলাক্রমে বিকীর্ণ হত এবং এক আনন্দময় পরিবেশ রচনা করত।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সুন্দরের পূজারী এই শিল্পীকে দেখা এবং তাঁর গান শোনা। বহুবার সান্নিধ্যে এসেছি কত সম্মেলনে, বাড়ির আসরে তাঁর গান শুনেছি। ---যতবারই শুনেছি, ততবারই মুগ্ধ হয়েছি---তাঁর অনন্য-সাধারণ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সুললিত সুরলহরী রাগে-ছন্দে মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

একবার কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউটে তাঁর এক সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত থেকে, তাঁর বিষয়ে প্রশস্তি জানাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ধন্য হয়েছিল, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ, শ্রীযামিনী রায় প্রমুখ দেশবরেণ্য শিল্প সাধকগণকে ডি-লিট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিবৃত করা উল্লেখযোগ্য মনে করি। খাঁ সাহেব ডি-লিট দ্বারা সম্মানিত হওয়ার পর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে তাঁর গান শোনার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। ছাত্রছাত্রীদের আবেদনে খাঁ সাহেব সম্মতি দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ

থেকে খাঁ সাহেবকে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি তাঁর কলিকাতার বাসভবনে গিয়ে দেখা করলাম। তখন বিকেলবেলা।

খাঁ সাহেব ঐ দিন রেডিওতে অনেক রেকর্ড করেছেন; পরিশ্রান্ত, শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমি যাবার পরই খাঁ সাহেব তাঁর ঘরে আমাকে ডাকলেন এবং হাত ধরে শুভেচ্ছা জানালেন। খাঁ সাহেব নির্ধারিত দিনে রবীন্দ্রভারতীতে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং আমন্ত্রিত শ্রোতাদের সমাগমে হল পূর্ণ ছিল। খাঁ সাহেব প্রথম সুরু করলেন পুরিয়া ধানেশ্রীর খেয়াল, তারপর ঠুংরী, ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে আরও গান গাইলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও দু' ঘণ্টার ওপর গাইলেন। সামনে বসে তাঁর মুখে গান শোনা আমার এই শেষ।

আসরের পূর্বে ও পরে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে পরিচয় পেয়েছিলাম একটি নিরহঙ্কার, উদার ও স্নেহভরা হৃদয়। সেদিন শুনেছিলাম গান প্রাণভরে: একটি সুন্দর পরিবেশের মধ্যে। গানের শেষে মনে হল—এ সুর কি পার্থিব জগৎ ছেড়ে ভগবানের কাছে পৌঁছাল?

বালিতে এক সংগীতানুষ্ঠানে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, পিছনে উপবিষ্ট পুত্র মুনাব্বর আলি খাঁ অঙ্কিত তাৎক্ষণিক স্কেচ শিল্পী রেবতীভূষণ

অদ্বিতীয়া

খ্যাতনামা লেখক নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক সমস্যাসঙ্কুল কাহিনী 'অদ্বিতীয়া।' চিত্রটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন কাহিনীকার স্বয়ং। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিকাশ রায়, সবেন্দ্র, মাধবী মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, স্বরূপা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, প্রেমাংশু বসু, পদ্মা দেবী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, প্রীতি মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চিত্রটির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন বোম্বাইয়ের সুদর্শনা চিত্রাভিনেত্রী ডেইজী ইরাণী। চিত্রটি পরিবেশনায় রয়েছেন এন এ ফিল্মস। চিত্রটির নেপথ্যে যাঁরা কণ্ঠ দিয়েছেন তাঁরা হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, লতা মুঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলে। চিত্রটিতে সুর সৃষ্টির দায়িত্বে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অগ্নিবীণা

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী 'অগ্নিবীণা'-কে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রমেন ঘোষ। চিত্রটির সুরকাররূপে থাকছেন অশোক মজুমদার। চিত্রটিতে অংশগ্রহণ করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুভা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

আরোগ্য নিকেতন

বহু পঠিত ও জনপ্রিয় এবং 'রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত কাহিনী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্য নিকেতনকে রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করছেন প্রবীণ চিত্র পরিচালক বিজয় বসু। চিত্রটির সুরসংযোজনার বিরাট দায়িত্ব বহন করেছেন প্রখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। চরিত্রচিত্রণে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, ছায়া দেবী, রবি ঘোষ, সন্ধ্যা রায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বঙ্কিম ঘোষ, কালী সরকার, রুমা গুহঠাকুরতা প্রমুখ। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের চিত্র আরোগ্য নিকেতন। চিত্রটির মুক্তি-আসন্ন।

তিন অধ্যায়

'তিন অধ্যায়' চিত্রটি পরিচালনা করেছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। চিত্রটির সুরসংযোজনায় রয়েছেন গোপেন মল্লিক। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন অপসরা ফিল্ম। রূপায়ণে সুপ্রিয়া দেবী, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, ছায়া দেবী, ছন্দা দেবী, বিদ্যা রাও, জয়শ্রী সেন, বঙ্কিম ঘোষ, ইন্দিরা দে, জহর রায়, রবীন মজুমদার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মান্না দে। নৃত্য পরিচালনায় রয়েছেন শক্তি নাগ ও অশোক রায়।

আদ্যাশক্তি মহামায়া

ভক্তিমূলক ও সঙ্গীতবহুল চিত্র 'আদ্যাশক্তি মহামায়া।' অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী আদ্যাশক্তি মহামায়াকে চিত্রে রূপায়িত করছেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। সঙ্গীত বিভাগের দায়িত্ব বহন করেছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সুরকার সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি

বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী পরিচালিত 'দিবারাত্রির কাব্য' চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়
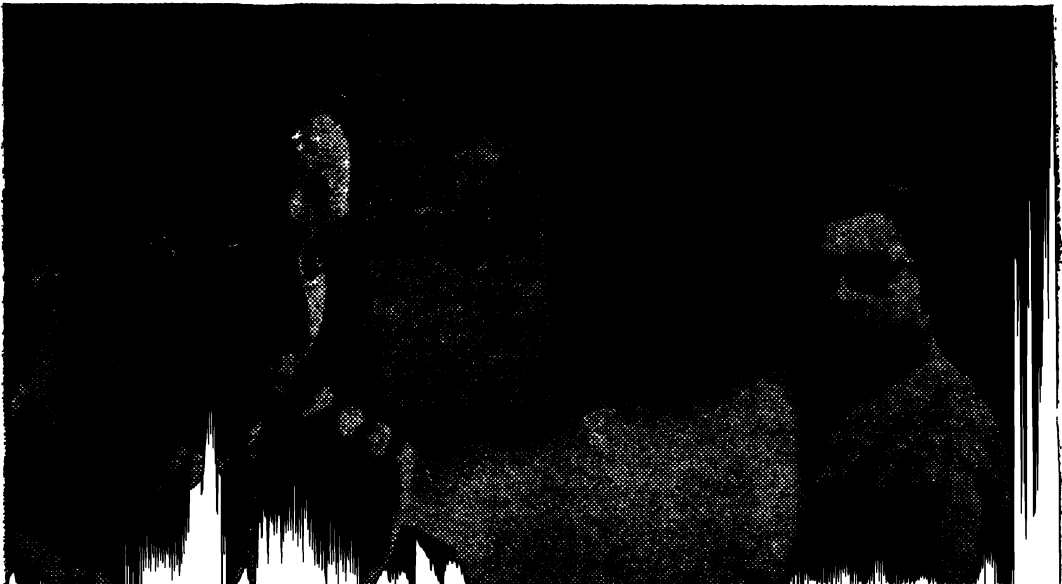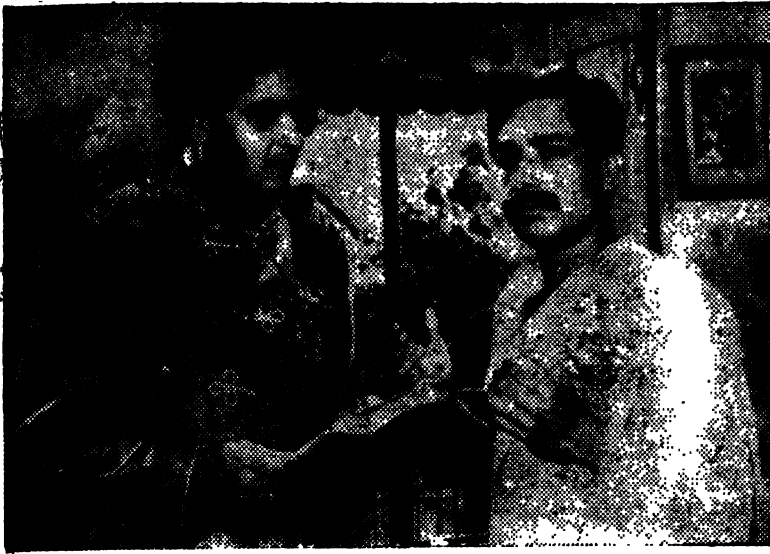
দীপক গুপ্ত পরিচালিত 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রে
দিলীপ রায় ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চক্রবর্তী, অসিতবরণ, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, রেণুকা রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, আশা দেবী, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

পদ্মগোলাপ

সুসাহিত্যিক ডঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী 'পদ্মগোলাপ'কে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন চিত্র পরিচালক শ্রীঅজিত লাহিড়ী। চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সুলেখক বারীন্দ্রনাথ দাশ। নায়কের চরিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার ও নায়িকার ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্র গুলিতে অংশ নেবেন খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ।

কমললতা

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কাহিনী শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের নায়িকা কমললতাকে রূপালী পর্দায় সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন প্রবীণ ও খ্যাতনামা পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত। চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছে চারুচিত্র। পরিবেশনায় ছায়াবাণী প্রাঃ লিঃ। কমললতার চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। শ্রীকান্তের ভূমিকায় উত্তমকুমার। অন্যান্য চরিত্রে নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, রমা চৌধুরী, জহর রায় প্রমুখ।

এ আর সি প্রোডাকসন্সের 'অগ্নিবতীয়া'
মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সর্বেন্দ্র

নাট্যলোক

সাগরিকা

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা শাসক ও স্থানীয় রবীন্দ্র পরিষদের আমন্ত্রণে স্থানীয় এক প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেন কলকাতার 'মহুয়া' শিল্পিগোষ্ঠী। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন 'মহুয়া' সঙ্গীত শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মানসী পাল। পরিচালিকার কণ্ঠে সাগরিকার গানগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শ্রীপদ্মনাভন তাম্পে। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী মানসী পাল, গীতা চন্দ, তৃপ্তি ঘোষ, মঞ্জুশ্রী গুপ্তা, কবিতা মুখার্জী, পার্থ পাল, অমল চাকী, শ্যামল রায় ও ধনঞ্জয় হাজরা। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন শ্রীসত্য মজুমদার ও শ্রীকালীপদ দাস। নৃত্যে কৃতিত্ব দেখান শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তী। এ ছাড়া নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন পামেলা নন্দী, কবিতা সেন, মৈত্রালী পাল, সুদীপ্তা সিংহ ও পদ্মনাভন তাম্পে।

ভাষ্যকার ছিলেন শ্রীপ্রবীর পাল। সাফল্যমণ্ডিত এই অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্য

গত ১১ই মে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে সুসংহতির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্য বিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কথাকলি বিশ্বপ্রণামে শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়, ভারতনাট্যমে কৃষ্ণা রায়, পুতুল খিয়েতে শিপ্রা সেন, মিতা পাল, পুরাম বিদাই—'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শ্যামা (শুক্লা সেনগুপ্তা), বজ্রসেন (সুতপা দত্ত), উত্তীয় (পাপড়ি বোস) ও অন্যান্য ভূমিকায় শেলী দাস, মন্দিতা চক্রবর্তী, মিতা হোপ, শুভ্রা গাঙ্গুলী ও সুচরিতা ঘোষ সু-অভিনয় করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় বিপুল ঘোষ এবং সহকারিরূপে সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুইনি চক্রবর্তী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না সেনগুপ্তা, বেবী ঘোষ, রুবি ঘোষ, কবিতা বোস ও বিন্দু চৌধুরী, সহকারী নৃত্য-পরিচালনায় অনুপশঙ্কর ও স্বপ্না সেনগুপ্তা, তবলা ও খোল সংগত করেন অরবিন্দ মিত্র। ব্যবস্থাপনায় স্বপনকুমার দাস। কোটালের ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন অনুপশঙ্কর।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একটি বিশেষ চরিত্রে মঞ্জরিকা ঘোষ

পুতুলনাচের অনুষ্ঠান

গত ৯ই মে বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন হলে 'কলাবতী'র উদ্যোগে এবং শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'পুতুল নাচের' একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়ে গেল।

বাংলা দেশে পুতুল নাচের এই ধরণের অনুষ্ঠান যে, অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কবিতা চক্রবর্তী, মমতা চক্রবর্তী, মন্দিতা চক্রবর্তী, দীপক ও বুবু।

চিরকুমার সভা

প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্যে সুখ্যাত কলকাতার অভিজাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অরূপ শিল্পী গোষ্ঠী' রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে সম্প্রতি একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে কবিগুরুর 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ করেন। এই শিল্পী গোষ্ঠীর প্রযোজনায় নাটকটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শক্তিমান সৌখীন অভিনেতা কল্যাণ রায় নাটকটি পরিচালনা করেন।

সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রানুসারী সঙ্গীতাংশ এই নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীত পরিচালকরূপে হিমাংশু রায়চৌধুরী শুধু কৃতিত্বই দেখান নি, রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁর নিষ্ঠা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অভিনয়ে দলগত-নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষিত হলেও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (রসিক), অধ্যাপিকা বন্যা মজুমদার (নীরবালা), কল্যাণ রায় (অক্ষয়), কিরণ্ময় লাহিড়ী (পূর্ণ) ও শুক্লা রায়চৌধুরী (পুরবালা) বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। শ্রীমতী মজুমদার ও কল্যাণ রায়ের সাবলীল অভিনয় দর্শকদের অনেক দিন মনে থাকবে। বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করতে শুক্লা রায় চৌধুরী ও কিরণ্ময় লাহিড়ী উল্লেখযোগ্যভাবে সচেষ্ট ছিলেন। ধারা রায়ের 'শৈলবালা' যথাযথ।

অন্যান্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন, অধ্যাপক ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীশ), দেবকুমার চট্টোপাধ্যায় (চন্দ্রবাবু), সুনীতি বসু (বিপিন), সুন্দর সরকার (দারুকেশ্বর), ভবতোষ ভট্টাচার্য (মৃত্যুঞ্জয়), হেমাঙ্গ রায় (বনমালী), প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য (কলিমদ্দি), সুবীর গাঙ্গুলী ও সুব্রত মুখার্জী (ভৃত্য), ধারা রায় (শৈলবালা), গীতা ভট্টাচার্য (নৃপবালা) ও কল্পনা গাঙ্গুলী (নির্মলা)।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিমল মিত্র, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বসুভদ্র, শিল্পী শৈল চক্রবর্তী, ফণিভূষণ, সমরজিৎ সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রবীন্দ্র ধারানুসারী প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্যে নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই শিল্পী গোষ্ঠী নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ করার আয়োজন করলে, নাট্যরসিক মণ্ডলীর সাধুবাদ অর্জন করবেন।

অধ্যাপক শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের নাম সঙ্গীত-অনুরাগীর কাছে আজ হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়, তাঁর নাম বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠানসূচীতে ও গ্রামোফোন রেকর্ড-এর লেবেলে মুদ্রিত হয়ে বহু সঙ্গীত শ্রোতার কানে পৌঁছেছে। আধুনিক বাংলা গান, রাগাশ্রিত গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, গীত ও ভজন গানে শ্রীচট্টোপাধ্যায়-এর গীতি-মাধুর্য শিল্পিমহলে, সঙ্গীত রসিক মহলে পাধ্যায় রচিত গানের কথায় এবং সুরসৃষ্টিতে এক স্বতন্ত্র আবেদন ও মৌলিকত্ব আছে। তাঁর কথায় ও সুরে যুগস্রষ্টা শিল্পী শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জন-প্রিয় শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী ইলা বসু, শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা এঁর গানে কণ্ঠদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক। অধ্যাপক শিল্পীর ভূমিকায় এঁর আত্ম-প্রকাশ বিশেষ অভিনন্দনের দাবী রাখে।

নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা ও দর্শক

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় আছে কালি, কলম, মন লেখে তিনজন।

এও যেন তাই। অর্থাৎ একটা নাটককে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে হলে কিংবা ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'এ নেশন ইজ নোন বাই ইটস থিয়েটার্স' কথাটির যথার্থতা প্রমাণ করতে গেলে নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা এবং দর্শক সকলকেই সচেতন হতে হবে। দায়িত্বও অল্প-বিস্তর প্রায় সকলকারই সমান।

প্রথমেই ধরা যাক নাটক, মোটামুটি নাটক বলতে যা বোঝায় তা হোল, ড্রামা ইস লাইফ রিপ্রেসেন্টেড ইন এ্যাকসান। অর্থাৎ জীবনের এক দ্বন্দ্বময় গতিশীল রূপ নাটক। ব্যক্তি-জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে যে মানসিক দ্বন্দ্ব তা বাইরের জীবন-ধারার সংস্পর্শে এসে যে সংঘাতের সম্মুখীন হয়, তারই ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতের গতিবেগে এক অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। এই ভাবে নাটক গড়ে ওঠে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন— 'শতপ্রকার রচনা আছে নাটক রচনা সর্বাপেক্ষা কঠিন ও শ্রেষ্ঠ। সংসার ও লোকচরিত্রের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টির আবশ্যক। পুত্রশোকে মা যেরূপ ভাষায় কাঁদে পিতা সেরূপ কাঁদে না। শোক উভয়েরই কিন্তু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র। নাটক সব ক্ষেত্রেই অনু-করণ ইহা নাট্যকারের স্মরণে রাখা উচিত।

অপর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার বিড়ম্বনাবিশেষ। নাটক রচনা নাট্যকার বিচার করবেন না, প্রত্যক্ষ করবেন— বিশুদ্ধ ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে, সহজ ও সুগভীর মানবতার চেতনায় চিন্তাহীন কি সংশয়হীনতাকে অকুণ্ঠিত অবাধ জীবনাবেগকে অনুভব করবেন। এই দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে সাক্ষাৎকার যত অব্যবহিত হবে নাটক হবে তত জীবনায়িত ও সার্থক। তা যদি না হয় তাহলে অসার্থকতায় সমাবিষ্ট হতে সে নাটক বাধ্য। তাই নাট্যকারকে নাট্যোল্লিখিত চরিত্রসমূহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং নির্লিপ্ত থেকে ঘটনাপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, সংলাপ ও নাট্য পরিস্থিতির মাধ্যমে চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সের দিকে। তাই পৃথিবীতে বহু ভাষায় বিভিন্ন ধরণের নাটক রচিত হলেও প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের সংখ্যা খুব অল্পই।

এরপর আসছে পরিচালক। তিনি নিজেও একজন শিল্পী। তবে পরস্পরের মাধ্যম ভিন্ন ও নির্দিষ্ট। পরিচালকের কাজ, অভিনেতার অভিব্যক্তিকে

ভূপেন রায় পরিচালিত 'অগ্নিযুগের কাহিনী'র সেটে সীমন্তিনী রায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক

স্বভাবসিদ্ধ করে তোলা। ঐতিহাসিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান করে তোলা, জীবনের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা এবং সবার উপর অভিনেতার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তার সৃষ্ট চরিত্র শিল্প হিসাবে প্রকাশমান কি না এই লক্ষ্য রাখাই পরিচালকের শিল্প-সৃষ্টি সহায়কের ভূমিকায় যথার্থ গুরুত্ব। সে নির্দেশ কখনো তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আবার কখনোও বা হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এইভাবে পরিচালকের সৃজনপ্রতিভা অভিনেতার শিল্প সৃজনে বাধা বাঁধে।

এবার অভিনেতা। সুঅভিনেতা কাকে বলে। অসকার ওয়াইল্ডের ভাষায় 'টু কনসিল আর্টিস্ট এ্যাণ্ড টু রিভিল আর্ট ইস দি রিয়েল মটো অফ আর্ট'—প্রত্যেক সুঅভিনেতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সচেতনতা এবং বোধকে নিয়োজিত করবেন একটা চরিত্রকে রূপ দেওয়ার জন্য এবং এক অভিনেতা থেকে অন্য অভিনেতার পার্থক্যটা ধরা পড়ে এই বোধের তারতম্য অনুসারে। নির্দেশকের নির্দেশ যান্ত্রিকভাবে মেনে নিয়েও অভিনেতা আরো কিছু সংযোগ করবেন অর্থাৎ সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগাবেন। তবেই না সৃষ্টি হবে আসল চরিত্রটি। জীবনের নানান অভিজ্ঞতার জারক রসে মজলেই অভিনেতার কল্পনার প্রসার ঘটে। 'রিয়ালিটি'র সঙ্গে পরিচয় অভিনেতার জীবনে অবশ্যই ঘটা চাই। সুঅভিনেতার চাই বিশুদ্ধ উচ্চারণ ক্ষমতা, না থাকলে প্রখ্যাত অভিনেতা হওয়া যায় না। তা ছাড়া অনায়াসে কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলে আবার প্রয়োজন হলে পরমুহূর্তেই নিম্নতম পর্যায়ে আনার ক্ষমতাও তার থাকা চাই।

'শিশিরকুমার আরো বলতেন মুক্তোর মত ঝকঝকে কথাগুলো কানের ভিতর দিয়ে একেবারে যেন মর্মে প্রবেশ করে। তার মানে এই নয় যে, অভিনেতাকে তার সংলাপের প্রতিটি শব্দকেই রঙ মাখিয়ে বলতে হবে। তাতে বিপরীত ফলই হবে। অর্থাৎ অভিনেতা যা বলতে চাইছেন তাকে আরো অস্পষ্ট ও অর্থহীন করে তোলা হবে।

তিনি বলেছেন, প্রত্যেক সু-অভিনেতা নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুটি মানুষ বহন করেন। একজন যিনি সৃষ্টি করেন অর্থাৎ বিচারক অপরজন যিনি সৃষ্ট হন অর্থাৎ কর্মী। এই দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সত্যিকারের আর্টিস্টের জন্ম। এ কথা যিনি না বোঝেন অভিনয় করা তাঁর বৃথা।

নাট্য ও মঞ্চকে যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেন রুচিশীল ও কৃষ্টিবানদের পক্ষ থেকে তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। তাঁরাই বাঁচিয়ে রাখেন দেশের ও জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতাকে। কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয়। দর্শকদেরও স্বীয় দায়িত্বের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে। যে ধরণের নাটক তাঁরা চান, যে রকম নাটক মঞ্চস্থ হওয়া উচিত সে রকম নাটক প্রযোজনা করবার পরামর্শ দিয়ে দর্শকদের এগিয়ে আসতে হবে। মঞ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাতে হবে কি রকমের, কি ধরণের নাটক তাঁরা চান। অন্যথায় মঞ্চ থেকে অবহেলা-ভরে সরে গিয়ে, পৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত করলে সেটা দর্শকদের পক্ষে দায়িত্বপালনের বিরোধিতা হবে।

অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থাকার অর্থই হচ্ছে জাতীয় কৃষ্টিকলার সামগ্রিক অবনতি ডেকে আনা। রুচিবান দর্শক-সমাজের কর্তব্য যে অবনতির পথকে সব সময় রুদ্ধ করা।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

সম্প্রতি কলামন্দির সদনে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, সঙ্গীত-শিল্পী, গীতিকার ও অন্যান্য কলাকুশলীবৃন্দকে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কৃত করা হয়।

এই সাড়ম্বর ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীকে কে শাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীবি এন সরকার।

১৯৬৭ সালের বাংলা চিত্র 'ছুটী' প্রথম স্থান অধিকার করে। শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালনার জন্য পুরস্কৃত হন শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী। বাংলায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত হন উত্তমকুমার (গৃহদাহ) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান শ্রীমতী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতার পুরস্কার পান বিকাশ রায়। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ছুটী চিত্রে অপূর্ব অভিনয়ের জন্য বিশেষ পুরস্কার পান কুমারী নন্দিনী মালিয়া। শ্রেষ্ঠ গীতিকারের পুরস্কার পান গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-পরিচালকের পুরস্কার পান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ নেপথ্যে কণ্ঠ-দানের জন্য পুরস্কৃত হন মান্না দে ও মুকেশ। সংলাপ-রচয়িতার পুরস্কার পান বিমল কর। হিন্দী চিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য পুরস্কার লাভ করেন সুনীল দত্ত, শ্রীমতী নতুন ও শ্রীমতী নয়না সাহু। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য পুরস্কার পান হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। বিশেষ পুরস্কার পান চুনটি। অনুষ্ঠান সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ লাভ করেন সেবাব্রত গুপ্ত ও শ্রীবাগীশূর ঝা প্রমুখ।

সাগরপারের মায়ালোক

পত্র-পত্রিকায় চিন্তাতুর প্রশ্ন।
ব্র্যাণ্ডো কি অভিনয় ছাড়ছেন?- --

খবরটা ক'দিনই দেখেছি। মনকে নাড়া দিয়েছে—বলাই বাহুল্য। সাগরপারের মায়ালোকের অন্যতম কীর্তিমান মায়াধর মার্লোন ব্র্যাণ্ডো একটি স্মরণীয় নাম। খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে আজ তিনি অধিরূঢ়। তাঁকে এখন কিছুই চাইতে হয় না, সব যেন ডানা মেলে উড়ে এসে হাজির হয় তাঁর কাছে—না বলতেই। আমাদের মানুষের সামনে একটা বিশেষ গণ্ডি আছে, সেটা অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। অনেককে নিষ্ফল মাথা কুটেই যেতে হয় জীবনভোর; কিন্তু একবার যদি গণ্ডিটা পেরিয়ে যাওয়া যায় তা হলে ছাপ্পর ফুঁড়ে বৃষ্টির ধারায় পড়তে শুরু করে সাত রাজার ধন-দৌলত, যশ-প্রতিপত্তি—কতো কী!

ব্র্যাণ্ডো আপন যোগ্যতায় এমনই কাঙ্ক্ষিত লোকে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ শিল্পী মনস্থির করে ফেলেছেন—হেলাভরে সব ফেলে রেখে মাথায় তুলে নেবেন পরম দুরূহ কর্তব্যের বোঝা। মানবতার জ্বলন্ত প্রশ্নে যে বোঝা বইতে গিয়ে তাঁর দেশেরই বহু মানুষ নিগৃহীত, কেউ বা বুক পেতে দিয়েছেন উন্মত্ত ঘাতকের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে। লিঙ্কন, কেনেডি প্রাণ দিয়েও বর্ণান্ধদের চেতনা জাগাতে পারেন নি। তাই বলে প্রচেষ্টা বন্ধ হয় নি। চলছে এবং চলবে যাতে কালো আর সাদা চামড়ার মানুষরা পাশাপাশি গলাগলি করে বাস করতে পারে। ভোগ করতে পারে সমানভাবে সব অধিকার।

জাত্যাভিমান, বর্ণ-বিদ্বেষ কি সহজে যেতে চায় মানুষের মন থেকে। এদেশ ওদেশ ভেদাভেদ দেখি না তো। এদেশে জাতের প্রশ্নে এই সেদিনও মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, লোকসভায় বাদানুবাদের ঝড় উঠতে দেখেছি। আর ওদেশে বর্ণবিদ্বেষ যে কী মারাত্মক প্রাণঘাতী—মার্টিন লুথার কিং-এর অভাবিত মৃত্যুতে তার ভয়াবহ রূপ উদ্ঘাটিত। ব্র্যাণ্ডো রাজনীতিবিদ বলে খবর পাই নি। তাঁকে শিল্পীরূপেই দেখে আসছি। কিন্তু তিনি

রমেন চৌধুরী

শিল্পী বলে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চান নি—ধন-মান ইত্যাদির মোহ দূরে সরিয়ে ফেলে তিনি মানবাধিকারের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকায় চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কাণ্ডকারখানা তাঁকে বিচলিত করেছে নিঃসন্দেহে। তাঁর এই ত্যাগ সকলকে শ্রদ্ধাপ্লুত করেছে। আমাকে তো বিশেষভাবে।

শ্রীব্র্যাণ্ডোর উক্তিটি স্মরণীয়—। তিনি বলেছেন দৃঢ়কণ্ঠে: 'একটি কৃষ্ণকায় মানুষের মৃত্যু আমার সন্তানের মৃত্যুর সামিল।'

পশ্চিম জার্মানীর মহিলা চিত্র-পরিচালিকা মে স্পিলস নির্মিত কমেডি চিত্র 'ঘেট টু দি পয়েন্ট ডার্লিং' চিত্রের দৃশ্য

অতএব অপত্য-স্নেহাতুর শিল্পী প্রতিজ্ঞাভরে মানবতার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন---এ আর বেশি কি।

চিত্রজগৎ থেকে তাঁর বিদায় যদি সাময়িক না হয়, তাতেও অনুরাগীদের ক্ষোভ না করাই উচিত। স্বীকার করবো এর ফলে অনেক চিত্রনির্মাতা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, বিশেষভাবে ক্ষতি হবে মহাত্মা গান্ধীর জীবনী চিত্রটির। ছবিটির নাম-ভূমিকায় অংশ নেবার কথা ছিলো ব্র্যাণ্ডোরই। ডেভিড লীন সেজন্যে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। কিন্তু অনেক বড়ো কাজে ব্রতী হয়েছেন প্রিয় চিত্রতারকা---তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হোক। তিনি যেন অসাধ্য-সাধন করতে পারেন।

●

ওরা দ্বৈতকণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলতে পারে---'আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থী।'

হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থে তাই-ই বটে! ঘরে মন টেঁকে না, কেবলি বেড়াতে প্রাণ চায়। ওরা মানে লিজ টেলর আর রিচার্ড বার্টন। ঘর তো রয়েছে মেক্সিকোয়, আছে সুইজারল্যাণ্ডে। কিন্তু সেখানে কেউই বাস করতে চায় কি? তাহলে সব ছেড়েছুড়ে পথের ডাকে সাড়া দিতে বেরিয়ে পড়বে কেন? পথে পথে এদেশে সেদেশে ঘুরতেও পারে না পুরোপুরি, মাঝ পথে বাতিল করে দেয় আরো বেড়াবার পরিকল্পনা। গোটা ইউরোপ বেড়ানো বন্ধ হয়। পড়ে থাকে এটা ওটা সেটা এখানে সেখানে ওখানে।

লণ্ডন রোম প্যারিস নিউইয়র্ক---খুঁজলে পাওয়া যাবে সবখানেই ওদের টুকিটাকি অনেক কিছু জিনিসপত্তর। মায়া নেই বোধ হয় কোনো কিছুতে। অমন যদি ভাঁড়ার ভরা থাকত বৈভবে তাহলে আমারও অমন মন হ'তে পারতো। দৃক্‌পাত করতুম না! লক্ষ তনখার প্রতি লক্ষ্যই থাকতো না। ওরা সেই---সেই মন নিয়েই ভ্রাম্যমাণ। কেউ বলে কাজের হাত এড়াতেই এই যাযাবরবৃত্তি। কিন্তু সেটাই কি সত্যিকথা? আসলে বার্টন বেশিরকম অসহিষ্ণু। চট্‌ করেই বিরক্ত হয়ে পড়ে নানান ব্যাপারে। কোথাও বেশিদিন থাকায় যেমন তার আপত্তি, তেমনি বিপত্তি বাধে কারুর সঙ্গে দীর্ঘদিন সহবাসে। জিনিসের বেলায় যা, মানুষের সম্পর্কেও তা! তাই তো লিজের আগে কতো নারীর আবির্ভাব হয়েছে তার জীবনে, তাদের অন্তর্ধান ঘটাতেও বেশি দেরী হয় নি। লিজ কি তাই মেনে নিয়েছে বার্টনের এই মনোবৃত্তি স্বেচ্ছায়! না আশঙ্কায়? হয়তো দুটোই সত্যি! অলখ-ডোরের বাঁধন যদি মনে পরানো যায় তবেই না---পায়ে বেড়ি দিয়ে কি মানুষকে বাঁধা যায়, বিশেষত মনের মানুষকে! এলিজাবেথ রিচার্ডকে অন্তত তেমনি করে ধরে রাখতে চায়! তাই ওরা আজও সুখী!

●

ছায়াছবি এ পর্যন্ত অনেক উন্নতি করেছে। যত দিন যাবে ততো সে কাজ অব্যাহত থাকবে। ওদেশে নানা-ভাবে ছবিকে বাস্তবানুগ করার প্রচেষ্টা চলে। সময় সময় তো ভাবলে অবাক হতে হয়---কি করে তা সম্ভব হোলো। এই অতি বাস্তবতার জন্যে নানান্ বিপত্তি ঘটে যায়। কখনো শিল্পী কলাকুশলীর প্রাণসংশয় হয়ে থাকে।

রেকর্ডে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পশরা

এবার রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানীর আয়োজন খুবই চমৎকার হয়েছে। 'চিরকুমার সভা' এবার একখানি লং প্লেইং রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য। এগারোখানি ই পি রেকর্ডে বাছাবাছা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ঋতু গুহ, অর্ঘ সেন, মানসী পাল, শৈলেন দাস, পূর্বা সিংহ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, সাগর সেন এবং সুমিত্রা ঘোষ। সাধারণ রেকর্ডে গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলবুল সেন, সীমা মুখোপাধ্যায়, সুশীল মল্লিক ও রিণি চৌধুরী। আকারে ও আয়োজনে এ যেন একেবারে আর একটি পূজার তালিকা তবে সবই রবীন্দ্রসঙ্গীত। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার এমন বিপুল আয়োজন এর আগে আর কোন উৎসবে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

তা ছাড়া এবারে গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ হতে হিন্দি হাই স্কুলের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে যে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয় তাও খুবই চমৎকার হয়েছিল। কাজী সব্যসাচীর উদাত্তকণ্ঠে শিল্পীপরিচয় প্রত্যেকটি শিল্পীকে যেন নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। যে সব গায়ক-গায়িকা এবার রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন, তাঁরাই মঞ্চে এসে একের পর এক গাইলেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ স্তব্ধ বিস্ময়ে সে মাধুর্য প্রাণভরে উপভোগ করে গ্রামোফোন কোম্পানীর চমৎকার ব্যবস্থাপনার সাধুবাদ করে ফিরেছে। আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত-রসিকদের এবারের নতুন রেকর্ডগুলি বাজিয়ে শুনতে অনুরোধ করি। তাঁরা শুনে তৃপ্ত হবেন।

কাঠিয়া বাবা

নিষ্কাম ভক্তি এবং অচল বিশবস থেকে নির্ভরতার জন্ম। এই দুয়ের সমন্বয় নির্ভরতাকে সৃষ্টি করেছে। ইষ্ট এবং গুরুর প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতা নিজেকে নির্দ্বিধায় তাঁদের পাদমূলে সমর্পণ করে দেওয়া সাধনমার্গে সিদ্ধি-লাভের এক প্রাথমিক পন্থা। ধৈর্য, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা, অচলা ভক্তি এবং সীমাহীন বিশ্বাস সাধনার দুরূহ যাত্রাপথের পরম পাথেয়। প্রবল প্রতিকূলতায় প্রচণ্ড বাধা দাঁড়াবে অগ্রসরণের পথরোধ করে, আসবে ভয়ের হাতছানি, আসবে প্রলোভনের সম্ভার। সব কিছু উপেক্ষা করে সব কিছু জয় করে পথযাত্রীকে এগিয়ে যেতে হবে। এই বিরাট বাধা এবং প্রতি-কূলতার সঙ্গে সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার নির্ভরতা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং স্থির লক্ষ্য। অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যেতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানো কেউ রোধ করতে পারবে না।

যোগিবর কাঠিয়াবাবার জীবনী অনুধাবন করলে এই গভীর সত্যটির আর একটি উজ্জ্বল প্রমাণ মেলে। রামদাস কাঠিয়া বাবা সাধনার শ্রেষ্ঠ শিখরে উপনীত হয়েছেন অনেক কৃচ্ছ্রসাধন, অনেক অগ্নিপরীক্ষা, অনেক অনিশ্চয়তা বরণের সোপানগুলি অতিক্রম করে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও নিজে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি, ধৈর্য হারান নি, সত্য থেকে বিচ্যুত হন নি। এই দৃঢ়তাই তাঁকে উপনীত করেছিল 'সব পেয়েছির দেশে'।

কাষ্ঠনির্মিত কটিবাস পরিধান করতেন গুরুর নির্দেশে। তাই সাধারণ্যে তাঁর পরিচিতি কাঠিয়া বাবা নামে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত লোনা চামারি গ্রামে তাঁর জন্ম। লোনা চামারি অমৃতসর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। পিতা দীক্ষাদান করতেন। বাল্যকালে এক

জর্জ এ্যালেন

সাধুকে আপ্যায়িত করেছিলেন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। পরিতৃপ্ত সাধু আশীর্বাদ করে-ছিলেন 'কালে তুমি একদিন যোগিরাজ হবে'।

মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

কাঠিয়া বাবা

পাঠ সমাপ্ত হল, কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনের সন্ধিলগ্নে তখন উপনীত রামদাস। ধর্মনিষ্ঠ, বিনয়ী, মেধাবী পুত্রের বিবাহের জন্য বাবা-মার ব্যস্ততা দেখা দিল। কিন্তু বাল্যকালে লব্ধ সেই সাধুর আশীর্বাদ তাঁর মনে-প্রাণে অহোরাত্র তখন আন্দোলিত চলেছে। সেই আশীর্বাদের স্মৃতি তাঁর অন্তরলোক উদ্ভাসিত করে আছে। বিবাহবন্ধনে তিনি আবদ্ধ হলেন না।

গায়ত্রী-সিদ্ধ হলেন রামদাস। দেবী গায়ত্রী কৃপাঘন মূর্তিতে তাঁকে বর দিতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু তরুণ রামদাস সবিনয়ে জানালেন তিনি সন্ন্যাসী—তাঁর তো কামনা বাসনা থাকতে নেই, তাই বর-প্রার্থনার প্রশ্নও তো আসে না। শুধু তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন থাকুন, এই তাঁর আকুল প্রার্থনা।

মঞ্জুর হল সে প্রার্থনা। একটির পর একটি পরীক্ষা আসে—এক যুবতী এসে দেহদান করতে চায় সাধককে। তরুণ সাধক নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি। তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন সে স্থান থেকে। এক করদ রাজ্যের বিধবা রাণী বয়সে তরুণী এবং অত্যন্ত সুন্দরী। সাধককে দেখে তিনি অভিভূত হন এবং সেবাযত্নের মাধ্যমে তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন। পরম লাবণ্যময়ী রূপসী রাণী এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিপুল বিত্তবৈভব—কিন্তু সাধকের বিবেক এবং স্থির লক্ষ্য তাঁকে পথভ্রষ্ট হতে দেয় নি। সকল প্রলোভন তিনি এইভাবে জয় করেন।

প্রলোভনের ক্ষেত্রে তিনি জয়ী হলেন। এইবার ক্লেশবরণ এবং লাঞ্ছনা স্বীকারের পালা। গুরু প্রথমেই বলে-ছিলেন এই মুহূর্তে এখান থেকে ঝাঁপ দাও। গভীর পার্বত্য খাদ এবং এক

খরস্রোতা নদী। একবার মনে বিচলিতভাব এল। এ যে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু নির্ভরতার প্রাবল্যে দ্বিধাবোধ না করে সেই সর্বগ্রাসী নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন একটি হাতের সাহায্যে তিনি উপর দিকেই উঠে যাচ্ছেন। হাতটি গুরুর। পরীক্ষা যিনি নেন, তিনিই তো প্রতিটি দুর্যোগ থেকে প্রতিটি বিপর্যয় থেকে রক্ষাও করেন।

আর একদিন গুরু বললেন—তিনি বেরোচ্ছেন, ফিরে না আসা পর্যন্ত শিষ্য যেন আসন ত্যাগ না করে।

সপ্তাহব্যাপী আসনে বসে রইলেন রামদাস। আহার নেই, পান নেই, প্রাকৃতিক নিত্যকৃত্য বন্ধ। একমনে জপ আর ধ্যান। যত দিন যেতে থাকে, তত যেন ইষ্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে থাকেন রামদাস।

শিষ্যকে এইভাবে সাধন পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন গুরু।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি যখন পরিভ্রমণরত তখন একদল গোরা সৈন্য তাঁকে গুলী করতে উদ্যত হয়। হাতের বন্দুক কে যেন টান মেরে যমুনার জলে ফেলে দিল, তখন হঠকারী সৈনিকের চেতনার উদয় হয় এবং সাধকের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

রামদাসজী ধ্যানে বসেছেন সঙ্গে আর একটি সন্ন্যাসীও বাস করত। তাঁর প্রতি সেই সন্ন্যাসীর ছিল নিদারুণ ঈর্ষা। রামদাসজী যখন ধ্যানে বসেছেন ঈর্ষান্বিত সন্ন্যাসী তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সঙ্কল্প করল। চতুর্দিকে আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ লাল করে ফেলল। সকলের স্থির ধারণা সাধুজী নিশ্চয়ই দগ্ধ। আগুন নিভতে দেখা গেল সাধুজী অক্ষত দেহে আছেন। মুখে চিরাচরিত স্মিত প্রসন্ন হাসি, চোখে ক্ষমার অতলান্ত সমুদ্র। অপরাধী তখন পলাতক। অতি শীঘ্র তার কৃতকর্মের ফল সে পেয়ে গেল।

কঠোর তপস্যা এবং ব্যাপক পর্যটন শেষ হল। এইবার স্থিতি। অন্বেষীর এবার লোকগুরুরূপে আবির্ভাবের কাল সমাগত। বৃন্দাবনকেই নির্দিষ্ট করলেন বসবাসের ক্ষেত্র হিসাবে।

বৃন্দাবনে সাধক রামদাসও যেমন থাকতেন, দুর্বৃত্ত গোঁসাইও তেমনই থাকত। চোদ্দ বছর দ্বীপান্তর বাস করে ফিরে এসেও তার চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। এমন কোন পাপকার্য ছিল না—যা সে করতে পারত না। যেদিন রামদাসজী তাকে টেনে নিলেন চকিতের মধ্যে অসম্ভব, অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। ঘৃণিত, দুর্বৃত্ত, দস্যু কোন অমৃতের স্পর্শ পেল কে জানে সেই মুহূর্ত থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে নতুন মানুষ হয়ে গেল। সাধকের করুণার পরশমণিতে তার নবজন্ম হল।

রামদাসজীর গুরু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত, ভারতের সাধক সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত দেবদাসজী যেভাবে ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা এমন কি নির্মম প্রহারে জর্জরিত করে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিলেন, আপন শিষ্যদের। সেরূপ অনুরূপ ব্যবহারই করেছিলেন কাঠিয়া বাবা। গরীবদাস প্রমুখ শিষ্যের দল যে মুহূর্তে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—সেই মুহূর্তে করুণা ও স্নেহের মূর্তিমন্ত বিগ্রহ রামদাসজী বুকে টেনে নিয়েছেন শিষ্যদের। স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহে জুড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকল জ্বালা, মিলিয়ে দিয়েছেন মনের বেদনা।

তাঁর বাঙালী শিষ্যদের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী তারাকিশোর চৌধুরী এবং অভয়চরণ রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। তারাকিশোরই পরবর্তীকালে 'সন্তদাস বাবা' নামে সাধকমহলে খ্যাত হয়েছিলেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও আসতেন কাঠিয়া বাবার আশ্রমে। মৌন থেকেই চলে যেতেন। কথাবার্তা হত না কিছুই। কথাপ্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ একদিন বললেন—মৌনতার মধ্যেই আমাদের নিত্য আলাপ হয়। যা কিছু জিজ্ঞাসা তার প্রাঞ্জল উত্তর মেলে।

আপাতদৃষ্টিতে কারো কারো সঙ্গে তাঁর অতীব রূঢ়, কর্কশ এবং হৃদয়হীন ব্যবহার অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্যথিত করত। পরে তিনি নিজেই তাঁর এই বিপরীত আচরণের রহস্য ব্যক্ত করতেন। তখন আর কারো মনে তিলমাত্র কালো মেঘ থাকত না।

১৩১৬ সালের ৮ই মাঘ (জানুয়ারী ১৯১০)—মহাসাধক কাঠিয়া বাবা অপ্রকট হন।

শীতকালীন

(এ লি মাকেন)

"শীতকালীন দিনসম মোদের জীবন,
বহিয়া যাইছে চলি ধরি অনুক্ষণ।
প্রাতঃকালীন ভোজ সমাধা করিয়া
এই সরাইখানা কেহ যায় যে ছাড়িয়া,
কেহ বা মধ্যাহ্নভোজ সবে সাংগ করি
আনন্দে চলিয়া যায় ধরা হতে সরি;
নৈশ ভোজ অন্তে, যেথা থাকে সুখতরে
জীবনের ঋণগুলি তাহার বেশী ধরে।
যে আগে চলিয়া যায় মায়া ত্যাগ করি,
জীবনের দেনা তার থাকে শূন্যোপরি।"

অনুবাদিকা—শ্রীমতী রমা বসু

১৩৭৪ সালের উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী ও মনীষী প্রসঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
উদ্যত খড়্গ (২য় খণ্ড)। আনন্দধারা প্রকাশন। ৭৲

অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য।
একজন আরো কয়েকজন। ডি এম লাইব্রেরী। ৪৲

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়।
বহুরূপী গান্ধী। রূপা অ্যাণ্ড কোং। ফেব্রুয়ারী '৬৮। ৬৲

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
চার্লি চ্যাপলিন। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ভাদ্র। ৩৲

অবনী মুখোপাধ্যায়।
গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণ। ভারতী বুক স্টল। ৬৲

আবদুল আজীজ আল আমান।
মক্কা মদিনার পথে। হরফ প্রকাশনী। [আষাঢ়]। ২৲

গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ। ১০৲

দয়িতা চক্রবর্তী।
বিদ্যাসাগর। জিজ্ঞাসা। বৈশাখ। ৬৲

প্রমদারঞ্জন ঘোষ।
শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা ও জীবনদর্শন। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ১৫৲

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক।
আমাদের জওহরলাল। প্রথম খণ্ড—সৈনিক। ওরিয়েণ্ট বুক কোং। ১০৲

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।
পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। ২০শে বৈশাখ '৭৪। ৮৲

ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য।
ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও বাণী। অশোক প্রকাশন। ৭·৫০

ভবেশ দত্ত।
প্রভু নিত্যানন্দ। ভোলানাথ প্রকাশনী। আষাঢ়। ৩৲

মালতী গুহরায়।
ভারতী নিবেদিতা। বাক্ সাহিত্য ৬·৫০

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়—অনুলেখক ও সম্পাদক।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা। ওরিয়েণ্ট বুক কোং। [অক্ষয় তৃতীয়া '৭৪]। ৮৲

রমেশ বাগচী।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ভোলানাথ প্রকাশনী। ফেব্রুয়ারী '৬৮। ১·৫০

সুজিতকুমার নাগ।
সবার মা সারদা। আদিত্য ২·০০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।
সাধুতপস্বী—১ম খণ্ড। বেংগল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। জ্যৈষ্ঠ। ৭৲

জীবনী—স্মৃতিকথা

অনন্ত সিংহ।
অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম। ১ম খণ্ড। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ। ফেব্রুয়ারী '৬৮। ১১৲

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিপ্লবের সন্ধানে। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ১০৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্রণবকুমারের স্মৃতিচারণ। আনন্দধারা প্রকাশন। ১৪·০০

লীলা মজুমদার।
আর কোনখানে। মিত্র ও ঘোষ। মার্চ '৬৮। ৫৲

বিনোদিনী দাসী।
আমার কথা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত। কথাশিল্প প্রকাশ। ৫৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
যে কথা বলা হয় নি। নকুল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। প্রকাশ ভবন। ১লা বৈশাখ '৭৫। ৬৲

ছোট গল্প

অজিতকৃষ্ণ বসু।
সৈকতসুন্দরী ও বহু পুরুষ। রূপরেখা। জ্যৈষ্ঠ। ৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
সাঁঝের মল্লিকা। অমর সাহিত্য প্রকাশন। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৫৲

চিরঞ্জীব সেন।
অপরাধীর মিছিল। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ফাল্গুন। ৬৲

দীপক চৌধুরী।
মধু ঋতু। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৫৲

নলিনী ভদ্র।
অরণ্য প্রেমকথা। কথাশিল্প। ১লা বৈশাখ '৭৫। ৪·৫০

ফণিভূষণ আচার্য।
মহুয়ার নেশা। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। ২·৫০

বনফুল।
একঝাঁক খঞ্জন। বাক্ সাহিত্য। ৬·৫০

বশীর আলহেলাল।
স্বপ্নের কুশীলব। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। ৩·৫০

বীরু চট্টোপাধ্যায়।
লৌকিক অলৌকিক। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। জুলাই '৬৭। ৬৲

বুদ্ধদেব গুহ।
বনবাসর, গ্রন্থপ্রকাশ, আশ্বিন, ৪৲

বুদ্ধদেব বসু।
তুমি কেমন আছো। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। আগস্ট। ৬৲

মায়া বসু।
পতঙ্গের প্রেম। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স জুলাই '৬৭। ৫·৫০

মিহির আচার্য।
গল্প সংগ্রহ। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। ৫৲

রমাপদ চৌধুরী।
ত্রয়োদশী। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। মার্চ '৬৮। ৫৲

রূপদর্শী।
ব্রজদার গল্প-সমগ্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। অক্টোবর '৬৭। ৬৲

শংকর।
সার্থক জনম। বাক্ সাহিত্য। ১লা বৈশাখ '৭৫। ৫·৫০

শিবরাম চক্রবর্তী।
মনের মত মেয়ে। রূপরেখা। জ্যৈষ্ঠ। ৪৲

সমরেশ বসু।
...শ্রেষ্ঠ গল্প। বেংগল পাবলিশার্স আশ্বিন। ৮৲

সুনীলকুমার ঘোষ।
ভালবাসা বলো ভালবাসা। আগস্ট '৬৭।

উপন্যাস

রমেশ মজুমদার।
শুকসারী—প্রগতি প্রকাশনী ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা শ্রাবণ, '৭৪। ৩৲

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী।
প্রতিরোধ। টাইমস ডিস্ট্রিবিউটরস। ৩৲

রত্নমাধব ভট্টাচার্য।
শাশ্বত দিগন্ত। অরুণা প্রকাশনী। ১৬৲

মনোজ বসু।
সেতুবন্ধ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। মে '৬৭। ১২·০০

মন্মথ রায়।
পূর্ব সীমান্ত। সাহিত্য ব্রতী ৪·০০

মিহির মুখোপাধ্যায়।
কালপুরুষ। বিদ্যাভারতী। ১লা বৈশাখ '৭৫। ৮·৫০

মৈনাক।
সুবর্ণরেখার তীরে। মিত্র ও ঘোষ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৫·৫০
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি।
নতুন জনপদ। রূপা অ্যান্ড কোঃ। ডিসেম্বর '৬৭। ৬৲
যজ্ঞেশ্বর রায়।
শাওন। প্রান্তিক প্রকাশন। আশ্বিন। ৫৲
রঞ্জিত সেন।
কাল বিহঙ্গ। জয়দীপ প্রকাশনী। অক্টোবর '৬৭। ৭·৫০
লোকনাথ ভট্টাচার্য।
দুয়েকটি ঘর, দুয়েকটি স্বর। গ্রন্থপ্রকাশ। জ্যৈষ্ঠ। ৮৲
শক্তিপদ রাজগুরু।
অন্য কোনখানে। সাহিত্য জগৎ। শ্রাবণ। ৫৲
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
সজারুর কাঁটা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। জুন '৬৭। ৪৲
শিবরাম চক্রবর্তী।
প্রজাপতয়ে। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। মে '৬৭। ২·৫০
শীতাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত।
বাদশা সিরিগড়। আনন্দধারা প্রকাশন। ১০৲
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।
ঘুণপোকা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। নভেম্বর '৬৭। ৪৲
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
দুষ্টু প্রজাপতি। তুলিকলম। জুন '৬৭ ২৲
সমরেশ বসু।
প্রজাপতি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ডিসেম্বর '৬৭। ৬৲
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
প্রান্তবঙ্গ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। জ্যৈষ্ঠ। ৩৲
সুনীলকুমার ঘোষ।
টাইপিস্ট গার্ল। আরতি প্রকাশনী, আষাঢ়। ৪·৫০
সুনীলকুমার নাগ।
মনের আলোয় দেখা। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ। আষাঢ় ৫৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
সুখ অসুখ। অরুণা প্রকাশনী। ৬৲
সুনীল ঘোষাল।
লোহা থেকে ইস্পাত। দেয়ালী প্রকাশনী। বৈশাখ '৭৪। ৫৲
সুবীর রায়।
চিন্তা। বুক সার্ভিস প্রাঃ লিঃ। চৈত্র। ৮৲
সুভাষ চক্রবর্তী।
রূপে রূপে। সেন্ট্রাল লাইব্রেরী। আষাঢ়। ৩৲
সুলতানা চৌধুরী।
তুর্কী হারেম। মণ্ডল বুক হাউস। ৮৲
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।
হিজল কন্যা। হরফ প্রকাশনী। জ্যৈষ্ঠ। ৩·৫০
সৌরীন সেন।
অপরিচিতা। রূপরেখা। অগ্রহায়ণ। ৭৲
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আঁধি। মিত্র ও ঘোষ। মার্চ '৬৮। ৭·৫০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
অন্য দেশ অন্য দাহ। অমর সাহিত্য প্রকাশন। এপ্রিল '৬৮। ১৫৲
নীহাররঞ্জন গুপ্ত।
স্মৃতির প্রদীপ জ্বলে, মিত্র ঘোষ। ৯৲
রমাপ্রসন্ন চৌধুরী।
জরীর আঁচল মিত্র ঘোষ। ৪৲
বিমল মিত্র।
সখী সমাচার মিত্র ঘোষ। ৬৲
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
পূর্বাচল মিত্র ঘোষ। ১১৲
বিমল কর।
যাদুকর অমর সাহিত্য প্রকাশন। ৫·৫০
প্রফুল্ল রায়।
আলোছায়াময়, অমর সাহিত্য প্রকাশন। ৮·৫০
শঙ্কর।
রূপতাপস বাক সাহিত্য। ৪৲
মিত্র মিত্র।
কথাচরিত মানস, প্রকাশ ভবন। ৩৲
মনোজ বৈরাগী।
জয়জয়ন্তী, বাক্ সাহিত্য ৯৲
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সোমালী ধোয়ব, গ্রন্থপ্রকাশ। ৭
নমিতা চক্রবর্তী।
দ্বিতীয় বষণ, গ্রন্থপ্রকাশ। ৩·৫৫
প্রবোধকুমার সান্যাল।
বসন্তবাহার, গ্রন্থপ্রকাশ। ৪·৫০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত।
অগ্নিস্বাক্ষর গ্রন্থপ্রকাশ। ৭৲
অদ্রীশ বর্ধন।
গোলোক ধাঁধায় ফাদার ঘনশ্যাম গ্রন্থপ্রকাশ। ৪৲
অজাতশত্রু।
রূপসী অন্ধকার, বেঙ্গল পাবলিশার্স। ৭৲
প্রফুল্ল রায়।
রাজা বেঙ্গল পাবলিশার্স। ৪৲
মনোজ বসু।
রাণী। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ৩·৫৫
গজেন্দ্রকুমার মিত্র।
আয়ুষ্মতী বেঙ্গল পাবলিশার্স। ৪৲
বিশ্বনাথ মৈত্র।
বেত্রবতীর বুকে গৌতম প্রকাশনী। ২৲
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
চলে নীল শাড়ি। ভারবি। পৌষ। ১০৲
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।
পুতুল। হরফ প্রকাশনী। ৪৲
আবদাশঙ্কর রায়।
বিশল্যকরণী। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ৫৲
আবদুল আজীজ আল-আমান।
সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন। হরফ প্রকাশনী। ৩৲
আশা দেবী।
নীল চিঠি। সুরভি প্রকাশনী। জুলাই '৬৭। ৩৲
আশুতোষ সরকার।
আদিগঙ্গা। রূপরেখা। বৈশাখ '৭৫। ৮৲
কর্ণিক।
তিন দুয়ারী ঘর। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮৲
কবিতা সিংহ।
সরমা। চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী। ৪৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্র।
সমুদ্রের চূড়া। প্রকাশ ভবন। ১লা বৈশাখ '৭৫। ৭৲
চাণক্য সেন।
সমুদ্র শিহর। নবভারতী। ৭৲
চিরঞ্জীব সেন।
চম্বলের আতঙ্ক। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। আগস্ট '৬৭। ৫৲
জগদীশ চক্রবর্তী।
স্বর্ণপাশ। মৈত্র প্রকাশনী। ৬·৫০
জরাসন্ধ।
বন্যা। মিত্র ও ঘোষ। জানুয়ারি '৬৮। ৪·৫০
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।
নির্বাপিত সূর্যের সাধনা। ক্লাসিক প্রেস। মাঘ। ৭৲
জ্যোতির্ময়ী দেবী।
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। রূপা অ্যাণ্ড কোঃ। এপ্রিল '৬৮। ৪·৫০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।
অনুভার স্বপ্ন। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। জ্যৈষ্ঠ '৭৪। ৪৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুকসারী কথা। মিত্র ও ঘোষ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৮·৫০
দরবেশ।
সুয়েজে সূর্যোদয়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কার্তিক। ৭·৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
নির্জন শিখর। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ২রা বৈশাখ '৭৫। ৪৲
নিত্যগোপাল সামন্ত।
মহুয়াবনের মেয়ে। স্বস্তি বিদ্যায়তন। আশ্বিন। ৬৲
নির্মলচন্দ্র মৈত্র।
লোপমুদ্রা। আনন্দধারা প্রকাশন ১০৲
নির্মলা দেবী।
স্বপ্নমধুর। রূপা অ্যাণ্ড কোঃ [নভেম্বর]। ৬·৫০

পরেশ ভট্টাচার্য।
রঙমহল। ক্লাসিক প্রেস। ভাদ্র। ৫্

পার্থ চট্টোপাধ্যায়।
প্রতিনায়ক। আনন্দধারা প্রকাশন। ১লা বৈশাখ '৭৫। ৭্

প্রফুল্ল রায়।
কিন্নরী। মিত্র ও ঘোষ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৪·৫০

প্রবোধকুমার সান্যাল।
নগরে অনেক রাত। মিত্র ও ঘোষ। মার্চ '৬৮। ৪·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র।
হৃদয় দিয়ে গড়া। তুলি কলম। জ্যৈষ্ঠ। ২·৫০

বনফুল।
প্রচ্ছন্ন মহিমা। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ। কার্তিক। ৪্

বারীন্দ্রনাথ দাশ।
শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব। বাক্ সাহিত্য। ৯্

বিজয় চক্রবর্তী।
শেষ অন্বেষণ। অরুণা প্রকাশনী। ৫·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
এবার প্রিয়ংবদা। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। [ ]। ৬্

বিমল কর।
পূর্ণ অপূর্ণ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। মে '৬৭। ১০্

বিশ্বনাথ রায়।
বিহঙ্গের গান। রূপা অ্যাণ্ড কোঃ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৬্

বুদ্ধদেব গুহ।
হলুদবসন্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। অক্টোবর '৬৭। ৩্

বুদ্ধদেব বসু।
গোলাপ কেন কালো। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ফেব্রুয়ারী'৬৮। ৫্

বেদুইন।
মানার কালো মানুষ। ক্লাসিক প্রেস। অগ্রহায়ণ। ৮্

অনুবাদ

অনিলরঞ্জন গুহ।
কেনেডি মানস। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোঃ। নভেম্বর '৬৭। ৩্

(শ্রী) অরবিন্দ।
আমার দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দ্য লাইফ ডিভাইন (৭—৮ অধ্যায়)। শম্ভুনাথ ভদ্র অনূদিত। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স। পৌষ। ২্

ইউজিন ও'নীল।
সপ্তডিঙা। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী অনূদিত। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ৩·৫০

উইলিয়ম শেক্সপীয়র।
হ্যামলেট। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত। সেনগুপ্ত বুক হাউস। জুলাই '৬৭। ৩·৫০

এন এ নিকম্ ও আর ম্যাককেওন।
অশোকের অনুশাসন। সাবিত্রী দত্ত অনূদিত। জিজ্ঞাসা। বৈশাখ। ২·৫০

এফ ফ্রেজার-বণ্ড।
সাংবাদিকতার গোড়ার কথা। সন্তোষকুমার দে অনূদিত। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ৪·৫০

চেস্টার বোলজ।
উদারপন্থী বিবেক। রণজিত সেন অনূদিত। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ৫্

থিওডোর সি সোরেনসেন।
কেনেডি। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ৩্

ফ্রেন্সিস হার্বার্ট ব্রেডলি।
অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার। জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার অনূদিত। বিশ্বভারতী। বৈশাখ। ৮্

ব্রায়ান ক্রোজিয়র।
এশিয়ার ধূমায়িত অগ্নিকোণ। মণি গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত। বাক্ সাহিত্য। ৩্

(লেঃ জেনারেল) বি এম কল।
অকথিত কাহিনী। সান্যাল এণ্ড কোম্পানী। ডিসেম্বর '৬৭। ২০্

মেডোস টেইলার।
ঠগী কাহিনী। সুবর্ণরেখা ১৫·০০

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
মানুষ আমার ভাই। কৃষ্ণ কৃপালনি দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত। প্রিয়রঞ্জন সেন অনূদিত। সাহিত্য আকাদেমী। ৭·৫০

রবার্ট ফ্রস্ট।
রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা। মণীন্দ্র রায় অনূদিত। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ৩্

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সি এফ এণ্ড্রুজ।
রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী। শ্রীমতী মলিনা রায় অনূদিত। বৈশাখ। বিশ্বভারতী। ২·৫০

রিচি কাল্ডর।
বিজ্ঞান নয় অবোধগম্য। প্রবোধকুমার মজুমদার অনূদিত। জিজ্ঞাসা আষাঢ় '৭৪। ৫·০০

স্টুয়ার্ট চেজ।
মানব ও সমাজবিজ্ঞান। রেবা চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। বাক্ সাহিত্য। ৩্

(ডঃ) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।
ধর্মে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য। মিত্র ও ঘোষ, সেপ্টেম্বর '৬৭। ৫্

শামসুল হক্।
বিদেশী কবিতা। বাংলা কবিতা প্রকাশনী। ৩্

কবিতা

অধীর সরকার।
মনের মধ্যে বুকের মধ্যে। এশিয়া পাবলিশিং কোঃ। আষাঢ়। ২্

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়।
অন্তরীণ। সুরভি প্রকাশনী। এপ্রিল '৬৮। ৩্

কবিরুল ইসলাম।
কুশল সংলাপ। পূর্বাশা প্রকাশন। আষাঢ়। ৩·৫০

কাত্যায়নী দেবী।
হারিয়ে যেতে চাই। আনন্দমন পাবলিশার্স। ফাল্গুন। ২্

কালীকৃষ্ণ গুহ।
রক্তাক্ত বেদীর পাশে। কল্পলোক। মে '৬৭। ৩্

তরুণ সান্যাল।
রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা। সারস্বত লাইব্রেরী। ৩্

পুষ্কর দাশগুপ্ত।
এখানে আমি। অব্যয়। জুন '৬৭। ২্

প্রকৃতি ভট্টাচার্য।
জলের অতলে বড় যাদু জানে। বাংলা কবিতা প্রকাশনী। ২্

বিনায়ক সান্যাল।
ঝিনুক নিয়ে খেলা। ভারতী বুক স্টল। ২্

মণীন্দ্র রায় ও রাম বসু—সম্পাদক।
উজান যমুনা। গ্রন্থপ্রকাশ। ২রা বৈশাখ '৭৫। ৬·৫০

মিহির আচার্য।
সুকান্তনামা। সারস্বত লাইব্রেরী। ৩্

শঙ্খ ঘোষ।
নিহিত পাতালছায়া। বিদ্যা। ৩·৫০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়।
সোনার মাছি খুন করেছি। ভারবি। আষাঢ়। ৩্

শক্তি ভট্টাচার্য।
সিক্ত সিঁথি দুরন্ত শ্রাবণ। সাহিত্যশ্রী। ২·৫০

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়।
কলকাতায় বৃষ্টি। সাম্প্রতিক প্রকাশনী। জুন '৬৭। ২্

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।
অনুক্ত সংলাপ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। শ্রাবণ। ৩্

সন্তোষ দাশ।
বেপথুমতী। বুক সার্ভিস প্রাঃ লিঃ। আষাঢ়। ৩·২৫

সুনীথ মজুমদার।
মৃত্যুকোকনদে। প্রতিবিম্ব প্রকাশনী। জানুয়ারী '৬৮। ৩্

স্বদেশরঞ্জন দত্ত।
স্বর্গের পুতুল। বাংলা কবিতা প্রকাশনী। ১্

স্বপনকুমার রায়।
অশ্রুত কাকলি। বুক সার্ভিস প্রাঃ লিঃ। বৈশাখ। ৪্

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
কবিতা '৬৬ ইণ্ডিয়া ৩,

ইতিহাস

অংশু দত্ত।
উত্থিত আফ্রিকা। আনন্দধারা প্রকাশন। ১২.০০

ইন্দ্রজিৎ সেন।
আরব-কাটা ইজরায়েল। মণ্ডল বুক হাউস। ১০,

ফকিরনারায়ণ কর্মকার।
বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। মে '৬৭। ৬.৫০

শঙ্কর ভট্টাচার্য।
বাংলা থিয়েটারে অভিনয়। ডি এম লাইব্রেরী। ৪

শ্রীপান্থ।
হারেম। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। মার্চ '৬৮। ৫,

সৌরীন সেন।
মুসোলিনী ও মন্টিফৌজ। আনন্দধারা প্রকাশন। ৯,

খেলাধুলা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
লাল বল লারউড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ডিসেম্বর '৬৭। ৬,

গণতন্ত্র

জ্ঞান দত্ত।
গণযুগ ও গণতন্ত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। নভেম্বর '৬৭। ৩,

চিত্রকলা

নারায়ণ সান্যাল।
অপরূপ অজন্তা। ভারতী বুক স্টল। ২০,

নীরদ মজুমদার।
রামপ্রসাদী ছবি। সুবর্ণরেখা। ২২.৫০

নাটক

উৎপল দত্ত।
ইতিহাসের কাঠগড়ায়—কংগ্রেস কারাগারে—সভ্যনামিক। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। বৈশাখ। ২.৫০

চাণক্য সেন।
তারারা শোনে না। বাক্ সাহিত্য। ৩,

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজা বদল। লিপিকা। আগস্ট '৬৭। ৩,

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।
মিনিস্টার। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। বৈশাখ '৭৪। ৩,

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
স্ত্রী চরিত্র। মানবমন, পাবলভ ইনস্টিটিউট। । নভেম্বর '৬৭। ৬,

দেবেশ ভট্টাচার্য।
গোর্কি ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোঃ। ১লা বৈশাখ '৭৫। ১.৫০

প্রশান্ত ঘোষ।
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। প্রতিমা পুস্তক। জ্যৈষ্ঠ। ৩,

মনোরঞ্জন বিশ্বাস।
ভাসানি : আর এক চড়াই ভেঙে। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। আষাঢ়। ৩,

শান্তিপদ রাজগুরু।
মসনদ। লিপিকা। ১লা বৈশাখ '৭৫। ২.৫০

শচীন ভট্টাচার্য।
কাগজের নৌকা। প্রিয়া পাবলিশিং হাউস। মে '৬৭। ৩,

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।
শেষ থেকে শুরু। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ভাদ্র। ৩,

সমর মুখোপাধ্যায়।
চুপ। পলাশী। ভাদ্র। ৩,

সলিল সেন।
উৎসর্গ। লিপিকা। ১লা বৈশাখ '৭৫। ২.৫০

সুনীল দত্ত।
হঠাৎ রাজা। পলাশী। ভাদ্র। ২.৫০

হীরু মুখোপাধ্যায়।
এখানে থিয়েটার হবে। সিটি বুক এজেন্সী। ভাদ্র। ২.৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত।
রাত্রিশেষ, মিত্র ঘোষ। ৩,

বাংলা সাহিত্য—আলোচনা ও ইতিহাস

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস। ক্লাসিক প্রেস। মাঘ। ১৮,

অলোক রায়।
প্রবন্ধকার [illegible]মচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ মন। বাগর্থ পাবলিশার্স। ডিসেম্বর '৬৭। ৩,

খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
শতাব্দীর শিশুসাহিত্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ। জুলাই '৬৭। ১০,

জয়ন্ত গোস্বামী।
বাঙলা গদ্য প্রসঙ্গ। সাহিত্যশ্রী। [ ]। ২.৫০

শক্তি ভট্টাচার্য।
বাঙলা ঐতিহাসিক নাটক। সাহিত্যশ্রী। ৮,

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।
শরৎ চেতনা। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ। ১৬,

ভ্রমণকাহিনী

ইবনে ইমাম।
সরাইখানার যাত্রী। হরফ প্রকাশনী। ১০,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
কুমারী গিরিপথে। অমর সাহিত্য প্রকাশন। মার্চ '৬৮। ৫,

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতদর্শন (মাদ্রাজ পর্ব)। ক্লাসিক প্রেস। মাঘ। ৮,

দিলীপ মালাকার।
মস্কো থেকে মাদ্রিদ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। চৈত্র। ৫.৫০

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত।
একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ। ৮,

ধীরেন্দ্রলাল ধর।
নীলাচলের পথে। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। ৭,

নরেন দেব।
কবিতীর্থ। ডি এম লাইব্রেরী। ১০,

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
খাজুরাহো চন্দেল্ল স্মৃতি। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। মাঘ। ৬.৫০

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।
ভূস্বর্গ কাশ্মীর। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। জুলাই '৬৭। ৬,

ভক্তি বিশ্বাস।
হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ। এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ৫,

রামপদ মুখোপাধ্যায়।
হিমালয়ের অঙ্গিনায়। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ। ৫,

শঙ্কু মহারাজ।
গিরিকান্তার। অমর সাহিত্য প্রকাশন। আগস্ট '৬৭। ৯,

সুবোধকুমার চক্রবর্তী।
রম্যাণি বীক্ষ্য—কোশল পর্ব। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ। ৮.৫০

সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
হিমালয়ের তিন তীর্থ। মিত্র ও ঘোষ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৩.৫০

সৈয়দ আবদুল বারি।
প্যালেস্টাইন থেকে আরব। হরফ প্রকাশনী। জ্যৈষ্ঠ। ৭,

শঙ্কু মহারাজ।
গিরিকান্তার অমর সাহিত্য প্রকাশন ৯,

দিলীপ মালাকার।
মস্কো থেকে মাদ্রিদ বেঙ্গল পাবলিশার্স। ৫.৫০

ভাষা

গোপাল হালদার।
ভারতের ভাষা। লেখক সমবায় সমিতি। জুন '৬৭। ৪,

দক্ষিণারঞ্জন বসু।
ভারতের রাষ্ট্রভাষা। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ। ৩.৫০

রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চা

আবু সয়ীদ আইয়ুব।
আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। ভারবি। ১লা বৈশাখ '৭৫। ৮৲
আশা দাশ।
বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ। কল্লোল প্রকাশনী। ভাদ্র। ৫৲
নেপাল মজুমদার।
ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। চতুষ্কোণ প্রাঃ লিঃ (পরিবেশক)। ১২৲
মনোরঞ্জন জানা।
রবীন্দ্র পরিচয়। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। ২০৲
বিষ্ণু দে।
মাইকেল-রবীন্দ্র ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা। সংসদ ১০৲
সুধাংশুবিমল বড়ুয়া।
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি। সাহিত্য সংসদ। [ ]। ১০৲
সুরজিৎ দাশগুপ্ত।
দান্তে গেটে রবীন্দ্রনাথ। ডি এম লাইব্রেরী। ৫.০০

রম্য-রচনা

নীলকণ্ঠ।
রাজপথের পাঁচালী। প্রকাশ ভবন। ৬৲
শ্যামল দত্তচৌধুরী।
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অমিতাভ। গ্রন্থালয়। প্রাইভেট লিঃ। ৩৲
সাগরময় ঘোষ।
ঝরাপাতার ঝাঁপি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ৭ই বৈশাখ '৭৫। ৪৲
সুজাতা।
সুয়েজ পেরিয়ে (২য় খণ্ড)। প্রফুল্ল গ্রন্থাগার। ৫৲
সৈয়দ মুজতবা আলী।
পছন্দসই। মিত্র ও ঘোষ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৭৲
হিরণ্ময় ভট্টাচার্য।
মন্দ মধুর। মিত্র ও ঘোষ। আগস্ট '৬৭। ৪.৫০
নিমাই ভট্টাচার্য।
আকাশভরা সূর্যতারা, বাক্ সাহিত্য ৪৲
বিমলকৃষ্ণ সরকার।
ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ণ প্রকাশ ভবন। ১২৲

শিশু ও কিশোর-সাহিত্য

অমরনাথ রায়।
বঙ্গ আমার। বিদ্যাভারতী। ডিসেম্বর '৬৭। ৩৲
অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ।
চাঁদের দেশে সুনীল কুমার। অশোক প্রকাশন। ৩৲
আদিত্য ভট্টাচার্য।
রামধনুর রঙ মাণিক। বুক সার্ভিস প্রাঃ লিঃ। ফাল্গুনে। ২৲
আশাপূর্ণা দেবী।
সে সব গল্প। মিত্র ঘোষ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ৬.৫০
ইন্দিরা দেবী।
ইন্দিরাদির আরো গল্প। সিটি বুক এজেন্সী। আশ্বিন। ১.৭৫
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
বিচিত্র বাঘ শিকার। এশিয়া পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ। ৩৲
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
কিশোরের কালিদাস। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ। আশ্বিন। ৪৲
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।
ছোটদের বিশ্বকোষ—১ম খণ্ড। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। ১২৲
গীতা দাশ—সম্পাদক
ছোটদের ভৌতিক গল্প, এশিয়া পাবলিশিং কোঃ। ৩.৫০
জ্যাক লণ্ডন।
কল অব দ্য ওয়াণ্ড। অমিয়কুমার চক্রবর্তী অনূদিত। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। শ্রাবণ। ৩৲
তাহাওয়ার আলি খান।
সুন্দরবনের নরখাদক। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। চৈত্র। ৫৲
তুষারকণা দে।
আরব্য রজনীর গল্প—১ম ও ২য় খণ্ড। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। বৈশাখ '৭৪। ১০৲
ধীরেন্দ্রলাল ধর।
উদো রাজার বুদো মন্ত্রী। অশোক প্রকাশন। ২৲
পরিচয় গুপ্ত।
আষাঢ়ে ভূতের গল্প। রূপা অ্যাণ্ড কোঃ। নভেম্বর '৬৭। ৪৲
প্রদ্যোৎ গুপ্ত।
গণেদার বাহাদুরি। সিটি বুক এজেন্সী। ভাদ্র। ১.৭৫।
প্রণব মিত্র।
মন পবনের নাও। ক্লাসিক প্রেস। বৈশাখ। ২৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র।
চাঁদ তারা জোনাকীরা। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ। শ্রাবণ। ৩.৫০
ভোলানাথ চক্রবর্তী—সংকলন।
ছোটদের বাঘের গল্প। কিশোর সাহিত্য সংঘ। ২৲
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
বাবুরের অ্যাডভেঞ্চার। রূপা অ্যাণ্ড কোঃ। ফেব্রুয়ারী '৬৮। ৪.৫০
লীলা মজুমদার।
মাকু। নিউ স্ক্রিপ্ট। ৩.৫০
বিনয় ঘোষ।
বুগপুরুষ বিদ্যাসাগর। পাঠভবন। ৪৲
বিশ্বনাথ দে—সম্পাদক।
বাজীকরের ঝাঁপি। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। আশ্বিন। ৩৲
শংকরীপ্রসাদ বসু।
আমাদের নিবেদিতা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। জুলাই '৬৭। ৬৲
শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
আফ্রিকার বনে জঙ্গলে। সিটি বুক এজেন্সী। আষাঢ়। ২৲
শান্তিময় মৈত্র।
কথামালার দেশে। লিপিকা বৈশাখ '৭৫। ১৲
শিবরাম চক্রবর্তী।
ইঁদুর থেকে ইত্যাদি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ফেব্রুয়ারী '৬৮। ৩৲
শৈল চক্রবর্তী।
ঘটোৎকচ বিজয়। সিটি বুক এজেন্সী। শ্রাবণ। ২৲
শৈলেন ঘোষ।
মিতুল নামে পুতুলটি। আনন্দ পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ। ভাদ্র। ৩৲
সরোজকুমার রায়চৌধুরী।
রাজার কুমার। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ। ভাদ্র। ৩৲
সত্যব্রত।
স্বামী বিবেকানন্দ। লিপিকা। বৈশাখ '৭৫। ১.৫০
সম্রাট সেন।
রাজসিক। লিপিকা চৈত্র। ১.৫০
সুকমল দাশগুপ্ত ও কমলেশ রায়।
বিজ্ঞানের ছয় মনীষী। ১.৫০
সুজিতকুমার নাগ।
যে রাজ্যে রানী নেই। প্রতিমা পুস্তক। ১.৫০
সুবোধকুমার চক্রবর্তী।
আমাদের দেশ মহীশূর। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোঃ লিঃ। ২.৫০
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
ফ্রাংকেনস্টাইন। অরুণা প্রকাশনী। ২.৫০
সুশীলকুমার গুপ্ত।
মণিমাণিক। লেখাপড়া। আশ্বিন। ১.৫০।

সংকলিত রচনাবলী

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
উপেন্দ্রকিশোর গ্রন্থাবলী। মিত্র ও ঘোষ। সেপ্টেম্বর। '৬৭। ১০৲
কুমুদরঞ্জন মল্লিক।
কুমুদ কাব্য-সম্ভার। মিত্র ও ঘোষ। আগস্ট '৬৭। ১০৲

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার। প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত। মিত্র ও ঘোষ। সেপ্টেম্বর '৬৭। ১২,
দীনবন্ধু মিত্র।
রচনাবলী, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। মে '৬৭। ১৩,
বিমল মিত্র।
গল্প-সম্ভার। সুভাষচন্দ্র সরকারের ভূমিকা সংবলিত। বাক্ সাহিত্য। ১৬,
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
মানিক গ্রন্থাবলী—২ খণ্ড। গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ। ১২,
সুকান্ত ভট্টাচার্য।
সুকান্ত সমগ্র। সারস্বত লাইব্রেরী। ১৫,

বিবিধ

অনল রায়।
যুগের আলো। মৈত্র প্রকাশনী। ৯,
অন্নদাশঙ্কর রায়।
খোলা মন খোলা দরজা। ডি এম লাইব্রেরী। ৮,
অনিল বিশ্বাস।
আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ফাল্গুন। ৫,
অমল মিত্র।
কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়। প্রকাশভবন। ৬,
অমিয়কুমার মজুমদার।
বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা। রূপা অ্যাণ্ড কোঃ। আগস্ট '৬৭। ৬,
গোপাল ঘোষ।
ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস। মনীষা গ্রন্থালয়। ৪·৫০
গোষ্ঠেন্দু ঘোষ।
মাটি ছেড়ে মহাকাশে। বিচিত্রা প্রকাশন। ২·৫০
চাণক্য সেন।
একান্তে। ক্লাসিক প্রেস। মাঘ। ৬,
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
নারী রহস্যময়ী। রূপা অ্যাণ্ড কোঃ। জুলাই '৬৭। ৫,
দিলীপ মালাকার।
নানান দেশের নানান সমাজ। প্রকাশ ভবন। ৪,
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ইংরেজী সাহিত্যের ধারা। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ। ১০,
নকুল মুখোপাধ্যায়।
দেবতার পাহাড়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। অক্টোবর '৬৭। ৩,
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে সংবাদপত্র। মৈত্র প্রকাশনী। ১·৫০
নির্মলচন্দ্র রায়চৌধুরী।
বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা—২য় পর্ব। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোঃ। ১২,
নীরদচন্দ্র চৌধুরী।
বাঙালী জীবনে রমণী। মিত্র ও ঘোষ। মার্চ '৬৮। ১০,
নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।
লক্ষ্মীঃ আশা থেকে আশ্বিনে। মনালোক আষাঢ়। ৩,
প্রফুল্লকুমার দাস।
রাগাঙ্কুর। জিজ্ঞাসা। মাঘ। ১০,
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোঃ। ২·৫০
মেজোবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ।
ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র। জিজ্ঞাসা। আশ্বিন। ২০,
ভারতকোষ—৩য় খণ্ড।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ২০,
যতীন্দ্রনাথ মজুমদার।
মৃত্তিকাবিজ্ঞান। ভারতী বুক স্টল। ১২,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
চিঠিপত্র (১০)। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত। বিশ্বভারতী। বৈশাখ। ৬,
শুকদেব সিংহ।
শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য। ভারতী বুক স্টল। ১৫,
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
ছন্দসরস্বতী। আনন্দধারা প্রকাশন। ২·৫০
সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ধাতু ও তাহার ব্যবহার। সাহিত্যব্রতী। ২·২৫
সাধনকুমার ভট্টাচার্য।
শিল্পতত্ত্ব পরিচয়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ৯,

গল্পগ্রন্থ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
গোপীগাইন বাঘা বাইন, কিশোর সাহিত্য সংঘ। ২,
বুদ্ধদেব গুহ।
বসবাসর গ্রন্থপ্রকাশ। ৪·০০

রহস্যকাহিনী

অদ্রীশ বর্ধন।
শার্লক হোমসের ডায়েরী বেঙ্গল পাবলিশার্স। ৪·৫০

ধর্মগ্রন্থ

কাজী আব্দুল ওদুদ।
পবিত্র কোরআন্ ১ম ও ২য় ভারতী লাইব্রেরী। ৮, ও ১২,

নিসর্গের প্রতি

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এই সব পথ জুড়ে একদিন নিসর্গ তোমার
পদধ্বনি শোনা যেতো। একদিন স্বচ্ছ অঙ্গীকারে
অম্লান ফুলের গন্ধ, শব্দ, ধ্বনি, নিহিত ঝঙ্কার
আমাদেরো নিয়ে যেতো, প্রতিক্ষণ হৃদের কিনারে।

অথচ শহর আজ বৃক্ষহীন স্বাগত নিশ্বাসে
তোমার নিভৃত ইচ্ছা, নির্জন স্মৃতির ছবি আঁকে।
অথচ তোমাকে ছাড়া প্রতিদিন আহত নিঃশ্বাসে
সমুদ্র শঙ্খের স্বর, প্রাণভাষ্যে, লেখা হয়ে থাকে।

সমস্ত শহর জুড়ে বাঁকা পথ, আঁকা বাঁকা গলি
তোমার যন্ত্রণা নিয়ে জেগে থাকে সারাদিন রাত।
তোমার অঙ্কুর থেকে দূরাগত সঙ্গীতের কলি
প্রতিক্ষণ স্পর্শ করে, আমাদের প্রসারিত হাত—
তোমার জন্মের পুণ্যে, হে নিসর্গ, বুকের ভেতরে

॥ ইন্দ্রসেন ॥

"কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন?"

—নবীনচন্দ্র সেন

ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

তখন শুকতারা দপ দপ করে আকাশে। সদ্য-ফোটা ফুলের সুগন্ধে বাতাস যেন ভারী ভারী ঠেকে। রাজপুরীর সংলগ্ন দায়রে প্রাতঃস্নান সেরে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়েন। বিলম্ব নয় একপলও ব্যাকুল হৃদয় মহারাজের। সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছতে হবে মন্দিরের দুয়ারে। সিংহদ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন প্রতাপাদিত্য। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত—ভক্তিমান এক মানবের। রাজবেশ নেই, নিরলঙ্কার নিরহঙ্কার তিনি। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে ঠাওর হয় না, তিনিই মহারাজা প্রতাপাদিত্য। পরিধানে পট্টবস্ত্র, পট্ট-উত্তরীয়। আকুল প্রাণের ভক্তিপ্লুত প্রণতি যেন শেষ হতে চায় না। মাতৃপদে কত যে নিবেদন করেন প্রতাপ। অশেষ আবেদন জানাতে থাকেন।

মনে যে অনেক আশা। মাতৃনাম উচ্চারণের সঙ্গে মহারাজা বলেন,—'জগজ্জননী, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।'

নির্জন নাটমন্দির, প্রতাপের কণ্ঠনিনাদে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আরব্ধ কাজ শেষ করতে হবে, তাই আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন একাগ্র চিত্তে। মা যশোরেশ্বরীর কৃপালাভ করতে না পারলে সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভূমিতে মাথা ঠুকতে থাকেন গৌড়ের অধিপতি। যেন এক নিঃস্ব রিক্ত ভিখারী।

পূর্বাকাশের রক্তিম সূর্য ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। ভোরের আলো আঁধারে যশোরেশ্বরীর আয়ত আঁখিযুগলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। মুখে যেন হাসি ফোটে অনুগত ভক্তকে দেখে। মাতৃমুখের প্রসন্ন হাসি দেখতে দেখতে প্রতাপের চক্ষু থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে।

পূজারী পূজায় বসেন। তন্ত্রধারক স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করেন। মন্দিরের সেবক জনৈক ব্রাহ্মণ সোনার সাজি এগিয়ে দেন সন্তর্পণে। সাজিতে সপ্তমুখী রক্তজবা, বিল্বপত্র, নীল অপরাজিতার স্তূপ।

হাতে যা ওঠে তাই দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করতে থাকেন প্রতাপাদিত্য। মায়ের পায়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেন বিনম্র মস্তকে। কখনও বলেন, ধনং দেহি। কখনও বলেন, —বলং দেহি।

অমিতশক্তির অধিকারী হতে হবে, অনমনীয় বলসঞ্চয় করতে হবে—তবেই না বঙ্গভূমির স্বাধীনতা হবে অব্যয় অক্ষয়।

বাঙলা দেশে প্রতাপের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, মহারাজা প্রতাপাদিত্য ভৌমিকগণের নেতা হিসাবে সসম্মানে গণ্য হবেন।

কিন্তু আজিম খাঁ, বাঙলার সুবেদার, কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না প্রতাপকে। কেমন যেন প্রতাপের মতিগতি ভাল লাগছে না আজিম খাঁর। তিনি বয়স্ক অভিজ্ঞ, মহামান্য আকবরের অধীনে বহুকাল শাসনকার্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি সুনজরে দেখেন না, প্রতাপের অভ্যুত্থান।

অনুচরের দল আজিম খাঁর হাতে তুলে দেয় একমুঠো রৌপ্য-মুদ্রা। বলে,—এই দেখেন, তঙ্কাগুলিতে জাঁহাপনার নামগন্ধ নাই। অথচ এ দেশে চালু হয়ে গেছে।

—শাহানসা আকবরের নাম নাই? তবে কার নাম?

আজিম খাঁর কথায় যেন বিস্ময়ের সুর। মুখে ক্রোধের ভঙ্গী। চোখে বিরক্তি। আজিম হাতের তালু তুলে ধরেন চোখের সম্মুখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন বাঙলা ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রাপৃষ্ঠে লেখা প্রতাপাদিত্যের নাম।

বড়ই অপমান বোধ করলেন আজিম খাঁ। নিজেকে যেন অযোগ্য, অকর্মণ্য মনে হয় তাঁর। সম্রাট আকবর জানতে পারলে আজিমের প্রতি তাঁর কী ধারণা হবে, ভাবতে পারলেন না সুবেদার।

দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের ষড়যন্ত্রের পরিচয় আগেই পেয়েছেন আজিম খাঁ। তাই যদি না হবে, প্রতাপ কেন কতলু খাঁর হাতে হাত মিলাতে যায়?

প্রতিকারে মন দিলেন আজিম খাঁ।

এখনই প্রতাপকে দমন না করলে অচিরে তার ফলভোগ করতে হবে। বিষবৃক্ষের চারা গজিয়েছে মাত্র। সমূলে বিনাশ না করলে এই সদ্যোজাত চারা একদিন সুবিশাল মহীরুহে পরিণত হতে পারে।

অনুচরেরা আরও জানালো,—মহাশয় কী অবগত আছেন, মহারাজা প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে দুর্গ-নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন?

—দুর্গ-নির্মাণ করছে প্রতাপ? শুনি নাই এ যাবৎ।

বীর যোদ্ধা আজিম খাঁ। তবুও যেন তিনি ঈষৎ বিচলিত হয়ে উঠলেন।

অনুচর বললেন,—বেশ কয়েক জায়গায় দুর্গ-তৈয়ারীর কাজ চলেছে পুরোদমে।

ব্যগ্রকণ্ঠে শুধালেন আজিম খাঁ,—কোথায়?

—কোথায় নয় তাই বলেন হুজুর। কথার শেষে ব্যঙ্গের হাসি ফোটে অনুচরের মুখে। নকল হাসির সুরে সে বলে,—ঈশ্বরীপুরে, মুকুন্দপুরে, মৌতলায়, গড় প্রতাপনগরে, গড় কমলপুরে—

নিশ্চুপ থাকতে পারছেন না আজম। ধৈর্য ধরতে পারেন না আর। বললেন,—আর কোথায়?

শ্বাস ফেলার ফুরসৎ চাই তো। অনুচর আবার বললে,—খড়িশা বেহালার গড়ে, জগদ্দলে, মাতলায়। তা ছাড়া রাজধানীর নিকটেই সৈন্যাবাস স্থাপন করেছেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

আজিম খাঁ সাগ্রহে বললেন,—সে আবার কোথায়? কোন্ মুলুকে?

অনুচর বললে,—পর্টুগীজ যোদ্ধারা প্রতাপের সৈন্যদের শিক্ষাদীক্ষা দানের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। পর্টুগীজদের নির্দেশেই তৈরী হয়েছে সৈন্যাবাস। পর্টুগীজরা যাকে বলে ব্যারাক। জায়গাটার নাম দিয়েছে ব্যারাকপুর। আর প্রতাপের সৈন্যরা যেখানে যুদ্ধশিক্ষা করছে তার নাম কুশলীক্ষেত্র। প্রত্যয় না হয়, গুপ্তচর পাঠাতে পারেন। সবই জানতে পারবেন।

কথাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার ভাণ করলেও আজিমের কপালে চিন্তারেখা উঁকি দেয়। হাসতে হাসতে বললেন,—আহা, যত্তো সব আনাড়ী আহাম্মক তো, পর্টুগীজদের কাছে আদব কায়দা শিখতে চাইছে। আচ্ছা! দেখা যাক পর্টুগীজরা রক্ষা করতে পারে কি না।

সত্যিই পর্টুগীজদের নিয়োগ করেছেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। স্থল ও জলযুদ্ধের রীতিনীতি, কৌশল আয়ত্ত করছে প্রতাপের সৈন্যগণ। গুলী, গোলা ছুঁড়তে বন্দুক আর কামান চালনার নিয়মকানুন শিখছে তারা।

অনুচর আবার বললে,—গোলাগুলি বানানো হচ্ছে দমদমায়। লোহাগড়ার মাঠে। দুধলী আর জাহাজঘাটায় শ'য়ে শ'য়ে জাহাজ তৈরী করছেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। দুধলীতে মহলা চলছে পাণিযুদ্ধের। সাগরে, চকশ্রীতে নৌবাহিনী রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যয় না হয় গুপ্তচর পাঠিয়ে দেন হুজুর। জানতে কিছুই বাকী থাকবে না। বিলকুল জানতে পারবেন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কাণ্ডকারখানা।

মহারাজা প্রতাপাদিত্য। মহারাজা আবার প্রতাপাদিত্য! আরে ছো ছোঃ! তোমরা আর হাসিও না আমাকে। কার কত কেরামতি জানা আছে আমার। সিংহচর্ম গায়ে চাপালেই গাধা কখনও সিংহ হতে পারে না। ডাক ছাড়লেই ধরা পড়ে।

তাচ্ছিল্যের সুরে, গর্বভরা কত কথাই বলতে থাকেন আজিম খাঁ। তবুও কপালের চিন্তারেখা লুকাতে পারেন না। একবার ক্ষণেকের জন্য নিরালা খাসকামরায় গিয়ে বসতে চান আজিম। শোনা কথাগুলি মনে মনে পর্যালোচনা করতে হবে। শত্রুকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বিষধরের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হয় —যাতে কামড়ালেও ক্ষতি করতে না পারে। মহামান্য আকবরের শক্তির তুলনায় প্রতাপাদিত্য যে অকিঞ্চিৎকর, তা জেনেও নিজে যেন স্থির থাকতে পারছেন না আজিম। কেমন অস্বস্তি বোধ করছেন থেকে থেকে। কামরার পর্দা টেনে দিয়ে বসে পড়লেন আরাম-কেদারায়। মাথার 'পরে জোর টানা-পাখা দুলে উঠলো।

সরাবের পাত্র টেনে নিলেন আজিম খাঁ। খানিক সরাব পান করলে যদি চিন্তার হানাদারি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যাই হোক একটা কিছু পন্থা আবিষ্কার করতে হবে। প্রতাপকে বিনাশের পথ বাতলাতে হবে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে চান আজিম খাঁ। বিনা রক্তপাতে যদি মোকাবিলা হয়ে যায়, ক্ষতি কী!

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারলে, খুশী হবেন আজিম খাঁ। প্রতাপের বক্তব্য সে নিজ মুখেই ব্যক্ত করুক। তাই প্রতাপকে এত্তালানামা পাঠালেন আজিম। জরুরী তলব পাঠালেন। বাংলা মুলুকের সুবাদার তিনি, মহামান্য দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি। প্রতাপকে ডেকে পাঠানোর অধিকার আছে আজিমের।

কিন্তু এত্তালানামাকে আমল দিলেন না মহারাজা প্রতাপাদিত্য। আজিমের প্রেরিত লিপি স্বহস্তে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বাহককে বললেন,—ইচ্ছা যদি হয়, আজিম খাঁ আমার সমীপে আসতে পারে। প্রয়োজন তাঁরই, সুতরাং তিনিই সাক্ষাৎপ্রার্থী হোন।

প্রতাপের সদর্প উত্তর শুনে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আজিম খাঁ। স্বগতোক্তি করলেন,—ওস্তাদী সহ্য করবো না আমি। বেয়াদপী বরদাস্ত করবো না। প্রতাপাদিত্য, তুমি যদি আক্কেল-সেলামী দিতে চাও, আমি তো নাচার।

প্রভাতে উঠেই আজিম খাঁ প্রতাপকে দমনে সচেষ্ট হ'লেন। একেই বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন তিনি। দুঃস্বপ্নের মত ঠেকেছে রাত্রিটা। শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আজিম ডাক পাঠালেন পঞ্চাশহাজারী মনসবদার সেখ ইব্রাহিম খাঁকে। ইনি ফতেপুর সিক্রির সুপ্রসিদ্ধ ফকীর সেখ সেলিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই সেলিমের নামানুসারেই আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের নামকরণ হয়।

সেখ ইব্রাহিম খাঁকে বহাল করেছেন স্বয়ং আকবর বাদশাহ। ইব্রাহিম একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা। আকবর তাঁকে পুষে রেখেছেন, যদি বাংলা ও বিহারে কখনও বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান হয়, দমন করতে। তবে ইব্রাহিমকে থাকতে হবে আজিম খাঁর অধীনে।

ইব্রাহিমকে প্রতাপের দিকে লেলিয়ে দিলেন আজিম।

নববলে বলীয়ান প্রতাপাদিত্য। বললেন,—মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হ'তে চাই আমি। শক্তিযুদ্ধে কার জয় হয় দেখা যাক।

যুদ্ধটা বাধলো মৌতলায়।

সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যদের প্রচণ্ডবেগে বাধাদান করলে বঙ্গীয় সেনাগণ। যুদ্ধ পরিচালনা করছেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

মৌতলা দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীর মোগলদের গোলাবর্ষণে অটল অটুট থাকে। কয়েক দিন আর রাত্রি ধরে যুদ্ধ চললো [illegible]। অবশেষে আক্রমণকারীকে পরাস্ত করলেন প্রতাপ। ইব্রাহিম খাঁ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ শুনে আজিম খাঁ প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না যেন। তিনি জানেন, ইব্রাহিম অজেয়। পাহাড় যদিও টলতে পারে, ইব্রাহিমকে কেউ টলাতে পারবে না। তেমন শক্তি কারও নেই।

অবিশ্বাস্য ঘটনা সত্য হ'তে পারে, এই প্রথম অনুধাবন করলেন আজিম খাঁ। এক চরম অপমানের জ্বালা ধরলো আজিমের বুকে। প্রতাপকে শায়েস্তা করতে না পারলে, বুঝলেন, তাঁর চোখে ঘুম আসবে না। চিরবিখ্যাত রণকুশলী আজিম খাঁ। স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করলেন।

জনৈক বাঙালী সেনাপতিকে সঙ্গে রাখলেন আজিম। তাঁর নাম ভবেশ্বর রায়। ইনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয়। যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ভবেশ্বর। বাংলা দেশের পথ-প্রান্তর নদী-নালা ভবেশ্বরের নখদর্পণে।

প্রতাপ মোগল সৈন্যকে মৌতলাক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ক'রে, রায়গড়ের অবরুদ্ধ সৈন্যের সাহায্য করবার জন্য সূর্যকান্ত প্রমুখ সেনাগণকে প্রেরণ করলেন। মোগলগণ ইতিপূর্বেই ইব্রাহিমের সম্পূর্ণ পরাজয়-কথা শ্রবণ করেছেন। এরূপ অবস্থায় অল্প সৈন্য ল'য়ে শত্রুদেশে অবস্থান করা হিতজনক নয় ভেবে গমনের উদ্যোগ করছেন, এমন সময়ে হতাবশিষ্ট ইব্রাহিম-সৈন্য পালিয়ে এসে মোগলদের সঙ্গে মিলিত হয়।

রডা, সূর্যকান্ত, কমল খোজা প্রমুখ সেনানায়কগণ আবার ভৈরব-বিক্রমে মোগল সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। পদে পদে পরাজয় হওয়ায় ভয়-বিহ্বল হ'য়ে পুনরায় মোগলগণ পলায়ন করতে আরম্ভ করলেন।

মোগলদের তাড়িয়ে বহুল পরিমাণে বিজয়লব্ধ দ্রব্যাদি ল'য়ে রাজধানী যশোহর নগরে প্রত্যাগমন করলেন। যাঁর করুণা-কটাক্ষে প্রতাপ সমরবিজয়ী, সেই জগজ্জননী মহামায়ার অতি সমারোহের

সংগে পূজার ব্যবস্থা হয়। ব্রাহ্মণগণ বিশেষভাবে পূজিত ও অর্থ প্রাপ্ত হন। দীনদরিদ্রদের অকাতরে ধনবিতরণ করা হয়।

অসামান্য বিজয়লাভের পরে মোগল রাজ্য আক্রমণে উদ্যোগ করতে লাগলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। পররাজ্য। পররাজ্য আক্রমণের পূর্বে মহাভাগ প্রতাপ স্বীয় রাজ্যের শাসন-শৃংখলা বিধিবন্ধ করলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে যাতে রাজ্যমধ্যে কোন-প্রকার বিশৃংখলা না হয়, তজ্জন্য তিনি আত্মীয় ভবানীদাস রায়-চৌধুরী এবং লক্ষ্মীকান্ত গংগোপাধ্যায়কে রাজস্ব ও শাসনবিষয়ক প্রধান কর্মচারিপদে নিযুক্ত করলেন। ভবানীদাস ও লক্ষ্মীকান্ত অত্যন্ত নিপুণতার সংগে প্রতাপের অনুপস্থিতকালে রাজকার্য সম্পন্ন করতে থাকেন।

সেনাপতিদের প্রতি প্রতাপ নির্দেশ দিলেন,—অসংখ্য সুদৃঢ় রণতরী একত্র করা হোক। যুদ্ধের রসদ উপকরণে ও খাদ্যবস্তুতে পূর্ণ করতে হবে এই সকল রণতরী।

অতঃপর শুভদিবসে বিপুলবাহিনী সমেত মোগলরাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে বহির্গত হলেন। মৃতপ্রায় নিস্তব্ধভাবে নৌকা-সকল অনুকূল বায়ুভরে সুন্দরবনের হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ বিজন প্রদেশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ অতিক্রম করে ভাগীরথী-গর্ভে পতিত হলেন। এ সময় হ'তে তাঁরা অতি সতর্কতার সংগে অগ্রসর হ'তে থাকেন।

অকস্মাৎ শত্রু-আগমন নিবারণ এবং তাদের অবস্থানের বিষয় সংবাদ দেওয়ার জন্য, কয়েকখানি দ্রুতগামী রণপোত অগ্রে ও পশ্চাতে থাকতে আদিষ্ট হ'ল।

প্রতাপাদিত্য এই প্রকারে বিপুলবাহিনী ল'য়ে একদিন অকস্মাৎ সপ্তগ্রাম আক্রমণ করলেন। মোগলদের বাংলা দেশ থেকে বিতাড়িত করাই প্রতাপের মোগল রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্য। সুতরাং সাধারণ প্রজাগণের ওপর যেন কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, সেই জন্য তিনি সৈন্যগণকে কঠোর আদেশ প্রদান করলেন।

মোগলরা প্রতাপ-সৈন্য কর্তৃক চতুর্দিক হ'তে আক্রান্ত হয়ে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করলো, কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প হওয়াতে যুদ্ধে পরাজিত হ'ল।

সপ্তগ্রামের যাবতীয় রাজকীয় ধনরত্ন লুণ্ঠনের পরে পুনরায় নাবিকগণকে অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা প্রদান করলেন।

দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লো প্রতাপের মোগল রাজ্য আক্রমণের ভয়াবহ সংবাদ। উড়িষ্যার হিন্দু রাজন্যবর্গ ও পাঠান সেনা-নায়কগণও চতুর্দিক থেকে দলে দলে মোগলরাজ্য আক্রমণ করলেন। এ'দের পদভরে বংগভূমি কম্পিতপ্রায় হয়ে উঠলো।

হিন্দু ও পাঠানে এক হয়ে মোগলদের আক্রমণ করায় তাঁরা বিজাতীয় ভীতিপ্রদ হয়ে উঠলেন।

গংগাতীরের সমীপবর্তী মোগলনগর সকল আক্রমণ করতে করতে রাজমহলের নিকটে উপস্থিত হলেন প্রতাপ। এসে মিলিত হলেন পাঠান সেনানায়কগণ। জল ও স্থলপথে চতুর্দিক হ'তে রাজমহল আক্রান্ত হ'ল।

কয়েকদিন ধরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চললো।

জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় না। প্রতাপ অতি নিপুণতা সহকারে কামান সকল দুর্গের চতুর্দিকে সংস্থাপন ক'রে অনবরত লোক-সংহারক অগ্নিময় ভীষণ গোলা বর্ষণ করতে লাগলেন।

মোগলদের সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পেতে থাকে। আহার্য সামগ্রীও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে নিঃশেষ হ'য়ে আসে। দুর্গ-প্রাচীরও স্থানে স্থানে ভূমিসাৎ হয়।

এইরূপ ঘোরতর সংকটাবস্থায় মোগলগণ আত্মসমর্পণ করেন। প্রতাপ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে রাজমহলের শাসনভার ন্যস্ত করে বিজয়লব্ধ দ্রব্যসহ পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রতাপের সৈন্য-সংখ্যা দিনে দিনে বর্ধিত হ'তে থাকলো। প্রতাপের আদেশে মোগলদের যুদ্ধতরী সকল ধৃত হ'ল। শত্রুপক্ষের হাতে যেন না পড়ে, এজন্য তিনি বহুসংখ্যক মোগল রণতরী ধ্বংস ক'রে ফেললেন। মোগলদের মারতে মারতে তিনি পাটনা নগরীর সমীপবর্তী হ'লেন।

ইতিপূর্বেই বিহার প্রদেশের জমিদারগণ মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। তাঁরা সুযোগক্রমে মোগলদের আক্রমণ কর-ছিলেন। এক্ষণে প্রতাপকে বিজয়বাহিনী পরিচালনা করতে দেখে তাঁরা সকলে পংগপালের মত এসে প্রতাপের সংগে মিলিত হলেন। প্রতাপাদিত্য, সূর্যকান্ত, শংকর প্রমুখ বীরপুরুষগণ বহুদিন থেকে বিহারী জমিদারদের সুপরিচিত। পূর্বে তাঁরা যাঁদের সৌম্যবেশে দেখেছিলেন এখন দেখলেন তাঁদের রৈব বেশে। বেশের পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্তন হয় নাই।

প্রতাপ সদলবলে পাটনা আক্রমণ করলেন।

পাটনা বিহার প্রদেশের রাজধানী। মোগলদের বিশেষ সেনানি-বেশের কেন্দ্রস্থল এই পাটনা।

আগেই সৈন্য পরিচালনার জন্য সেনাপতিদের এক-এক ভাগে নিয়োগ করেছেন প্রতাপাদিত্য। সূর্যকান্ত গুহ প্রধান সেনাপতি। পূর্বে দেশীয় সৈন্যদের পরিচালক রঘু। ফিরিংগী ও গোলন্দাজ সৈন্যদের পরিচালক পর্টুগীজ যোদ্ধা রডা। পদাতিক সৈন্যদের ভার গ্রহণ করেন সুখা গুপ্ত। ঢালিগণের পরিচালক মদন মাল। প্রতাপ সিংহদত্ত রথিগণের অধিপতি।

ব্রাহ্মণ তনয় শংকর চক্রবর্তী ও কমল খোজা বিশ্বস্ত অনুচর-দের পদ লাভ করলেন।

এতদ্ভিন্ন প্রতাপের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্য সৈন্য পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

পাটনায় মোগলদের ভৈরববিক্রমে আক্রমণ করলেন প্রতাপাদিত্য।

দেখতে দেখতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধলো। এক পক্ষের বীরগণ স্বাধীনতা লাভের আশায়, স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গকে মোগলদের গ্রাস থেকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়ে, পরম পবিত্র দেবমন্দিরসমূহ
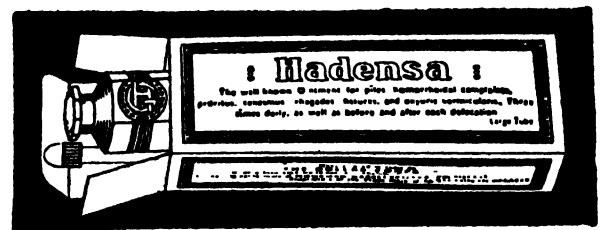
পাষণ্ডগণের পদদলন থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অন্য পক্ষে মোগল বীরগণ প্রভুত্বের খর্ব হওয়াতে, ভোগ-বিলাসদ্রব্য হ্রাস হওয়াতে ক্রোধে অধীর হয়ে যুদ্ধে ব্রতী হয়েছেন।

হিন্দু সৈন্যগণ জীবনাশা ত্যাগ ক'রে শাণিত তরবারি প্রহারে মোগলব্যূহ মধ্যে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন।

লোমহর্ষণ যুদ্ধে আর আত্মরক্ষা করা যায় না। মোগলরা পালিয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

জয়মদোন্মত্ত বীরগণ আবার ঘোরতর পরাক্রমের সঙ্গে দুর্গ অবরোধ শুরু করলেন।

কামান থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। গোলক উদ্গিরণের আলোয় রাত্রি যেন দিনের রূপ পায়। গোলার শব্দে কেঁপে ওঠেন ধরিত্রী।

কয়েকদিন ধ'রে গোলাবর্ষণ চলার পর দুর্গ ধূলিসাৎ হওয়ার উপক্রম হয়। এই অবকাশে শাণিত কৃপাণহস্তে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেশে হিন্দু সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলো।

পাটনার দুর্গ অধিকার করলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। হাতে পেলেন বহুল পরিমাণে নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য। বেশ কিছু যুদ্ধের উপকরণ। মজুত খাদ্যভাণ্ডার।

সুবে বাঙলা থেকে মোগলদের তাড়িয়ে এক এক প্রদেশের শাসনভার দিলেন সেই সেই প্রদেশের ভূস্বামীকে। সর্ত থাকলো, রাজ্যপালন এবং যুদ্ধকালে ক্ষমতানুসারে সৈন্যসাহায্য দিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হবে।

অনেক যুদ্ধ হয়েছে, আর নয়।

কিছুদিনের বিশ্রাম চাই প্রতাপের। তিনি যেন কিঞ্চিৎ ক্লান্ত বোধ করছেন। যশোরের জন্য মধ্যে মধ্যে মনটা ছটফট করে। স্ত্রী-পুত্রদের দেখতে ইচ্ছা হয়।

স্বদেশ প্রত্যাগমনের আগে একদিন যুদ্ধকালে সহায়ক বীর যোদ্ধাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। বললেন,—বীরগণ! স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য আপনারা যে এই অপর্যাপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করলেন, এজন্য আপনাদিগের অক্ষয়কীর্তি চিরকাল ঘোষিত হবে। ঈশ্বর আপনাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন। এই দেশটাকে যাঁরা প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসেন তাঁদের প্রত্যেককে পুরস্কৃত করতে চাই। আর আমাদের মধ্যে যে সকল কুলাঙ্গার স্বদেশদ্রোহী সুবিধাভোগী আছে তাদের ক্ষমা নাই জানবেন। আমার হাত থেকে বেইমানরা নিস্তার পাবে না।

ধনরত্ন ভাগ ক'রে দিলেন প্রতাপাদিত্য। যাঁর যেমন প্রাপ্য হয় তাঁকে তাই দিলেন। প্রত্যেকের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য সঙ্গে ল'য়ে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

[ক্রমশ।

আকাশের সুর

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আকাশ অনেক দূরে!
অনেক অনেক সুরে ভরা,
এই পৃথিবীর স্নেহ-সুরভির
অজানা অন্ধকারে
সময়ের হাত যায় না কখনও ধরা।

এখানে সবুজ নাই।
হতাশা-পাখিরা উড়ছে এখন,
ছন্দের দু'ধারে রূপসী নদীর
সোনালী স্মৃতির তারে—
কি শোভা দেখছে অবুঝ মরুচে মন!

তুমি আছ। আমি আছি।
খুশির নিওনে সাজান শহর আজ:
বাদামী দিনের মিষ্টি-গন্ধ আনে,
ব্যথার প্রলেপে হৃদয়-কুঁড়িরা হত;
সাধ সংসারে বিনা-মেঘে পড়ে বাজ!

এইত জীবন ফুল!
নাই প্রতিকার, একটু করুণা নাই।
লজ্জায় রাঙা—রজনীগন্ধা শত!
মরীচিকা, মায়া, আলোর নিশানাটুকু!
বুঝতে পারি না কেন আরও দূরে যাই!!

শতবর্ষের অর্ঘ : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, পরম ভট্টারক ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-সহচর এবং বর্তমান বাঙলার সাংবাদিক-কুলের প্রণম্য পূর্বসুরী ও পথিকৃৎস্বরূপ স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘটনাবহুল ও গৌরববিমণ্ডিত জীবনের শতবার্ষিকীর অবিস্মরণীয় মুহূর্ত আজ সমাগত। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী সংস্কৃতির সেবক-বৃন্দের নিকট স্বভাবতই যথেষ্ট তাৎপর্য এবং গুরুত্ব বহন করে।

বাঙলা দেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ অবদান এবং নিঃস্বার্থ সেবার পুণ্যকাহিনী স্মরণ করার লগ্ন আজ দুয়ার হইতে অদূরে।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—'প্লেইন লিভিং এ্যাণ্ড হাই থিংকিং' উপেন্দ্রনাথ যেন এই কথাটিরই একটি মূর্তিমন্ত দৃষ্টান্ত। জীবনের বোধনলগ্নেই তিনি লাভ করিয়াছিলেন পরম ভট্টারকের অমূল্য কৃপা। যে কৃপার আলোকরশ্মি তাঁহার জীবনকে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়া সেই অনুযায়ী তাঁহার জীবনকে পরিচালিত করিয়া সারা দেশ ও জাতির বিরাট উপকার ও কল্যাণসাধন করিয়াছিল। সামান্য অবস্থা হইতে তাঁহার জীবনসাধনা সুরু। কিন্তু সেই সাধনায় তিলমাত্র ফাঁকি বা কৃত্রিমতা ছিল না বলিয়াই সাধনার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতার পরশ-মণি পূর্ণমাত্রায় ছিল বলিয়াই জীবন-সাধক অবশেষে সিদ্ধির সহিত হাতে হাত মিলাইতে পারিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে অর্থের দিক দিয়া তিনি বিত্তবান না হইলেও মনোবল এবং উদ্যমের দিক দিয়া তিনি রীতিমত বিত্তশীল ব্যক্তিই ছিলেন।

ভগবান রামকৃষ্ণের উপদেশে এবং নির্দেশনায় যে ব্যবসায়ে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কালে তাহাই একদিন বীজ হইতে লতা-পাতা শাখা-প্রশাখাসমন্বিত বিরাট মহীরূহে পরিণতি লাভ করিয়া দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণসাধনে সমর্থ হইল এবং বাঙালীর গৌরবের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেচিত হইল।

মূলত উপেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ী হইলেও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। সেখানে তাহার পরিবর্তে দেখা গিয়াছে সেবকের মনোবৃত্তি।

বসুমতী প্রতিষ্ঠান সারা জাতির এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে সেবা করিয়া আসিতেছে এবং নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার বারংবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন-প্রকার মন্তব্য না করাই শ্রেয় মনে করি। তবে, যে সার্থকতা, সফলতা ও জন-প্রিয়তা আজ বসুমতীকে অর্জন করিতে হইয়াছে তাহারই মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠাতা নিত্য নব মহিমায় জনচিত্তে জাগ্রত হইতেছেন।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথের জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি সুলভ মূল্যে সৎ-সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। উপেন্দ্রনাথ স্বল্পবিত্ত অথচ সাহিত্যা-নুরাগী নরনারীর কথা বিবেচনা করিয়াই বসুমতীর প্রকাশনবিভাগের পত্তন করিয়াছেন। সাহিত্যানুরাগী এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা শুধু অর্থাভাবে পাঠতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না। উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সুলভ মূল্যে তিনি গ্রন্থাদি পরিবেশন করিতে থাকিলেন—ফলে বহুজনের ঘরে সৎসাহিত্যের

প্রবেশ ঘটিল। বহুজনে তখন সকল গ্রন্থাদি ক্রয় করায়, ইহাতে সাধারণ পাঠকও উপকৃত হইলেন এবং সৎ-সাহিত্যের পরিধিও অনেকখানি বর্ধিত হইল। সাহিত্যের বাণী, সাহিত্যের উপকরণ, ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার, সর্বসাধারণকে সাহিত্যরসে উদ্দীপ্ত করার ব্রতে এইভাবে উপেন্দ্রনাথ সফলকাম হইলেন।

লোকসেবা এবং লোকপালনের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ যে ঐতিহ্য এবং আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গেলেন তাহার মর্যাদারক্ষা এবং তাঁহার পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান রাখা আজ এক পবিত্র কর্তব্যস্বরূপ, আমরা মনে করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং জনগণের শুভেচ্ছায় এই গুরু-দায়িত্ব পালনের পথে অগ্রসর হইবার শক্তি আমরা লাভ করিব।

সাম্য এবং সমতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। বিরাট প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং অবিসম্বাদিত স্বত্বাধিকারী হইয়াও তিনি আসলে ছিলেন সর্বমানবের বন্ধু। দয়া, করুণা, সহানুভূতির এক আশ্চর্য সমন্বয় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছিল। প্রতিটি কর্মীর সহিত তাঁহার পিতা-পুত্রসুলভ আচরণ বহুজনের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

বাঙলা দেশের সাংবাদিকতার আঙ্গিক প্রকাশভঙ্গী রচনারীতির সময়ের অগ্রসরণে আজ ব্যাপক পরিবর্তনই ঘটিয়াছে, তথাপি যাঁহারা পথিকৃৎ, যাঁহারা পথপ্রদর্শক, যাঁহারা পথের দিশারী ইতিহাসে তাঁহারা অমর মহিমায় সগৌরবে বিরাজমান। ইতিহাসে তাঁহার মূল্য চিরন্তন।

এই মহান পুরুষের, এই প্রেমময় মানুষটির, এই লোককল্যাণব্রতীর অমর স্মৃতির উদ্দেশে শত বরষের প্রদীপ জ্বালাইয়া শ্রদ্ধার আরতির মাধ্যমে আমরা সকৃতজ্ঞে বন্দনা করি।

এই প্রসঙ্গে আরও একজনের উদ্দেশে আমরা প্রণতি নিবেদন করি। সৌভাগ্যক্রমে আজও তিনি আমাদের নিকট বর্তমান। বিগতের সহিত বর্তমানের সেতুস্বরূপ। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আজও জীবিতা। তিনি উপেন্দ্রনাথের সকল শক্তির উৎস, প্রেরণাস্বরূপা সহধর্মিণী পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী।

সাম্প্রতিক

উপ-নির্বাচন ॥ অন্তর্বর্তী নির্বাচন

ভারতবর্ষের একাধিক রাজ্যে সম্প্রতি যে উপনির্বাচন ও অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, বলা বাহুল্য নানা কারণে সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব এবং তাৎপর্যবাহী।

শুধু মুখের কথায়, শূন্যগর্ভ আস্ফালনে এবং চটকদারি বাকচাতুর্যে চিরকাল দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখা যায় না সেই মহান এবং শাশ্বত সত্যটিই এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পর দেখা গিয়াছিল যে কংগ্রেসের ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হইয়াছে। কংগ্রেসের ইতিহাসের মোড় ফিরিয়াছে, কংগ্রেসের অপ্রতিহত জয়যাত্রা ব্যাহত হইয়াছে, দেশের জনগণ তাহাদের নির্বাচনী জয়মাল্য সেবার কংগ্রেসের কণ্ঠে দোলাইয়া দিল না।

ভারতের নানাস্থানে কংগ্রেসী শাসনের অবসান হইল, বিরোধী দলগুলি সরকার গঠন করিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা কংগ্রেসের যে সব দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়া সেগুলির নিরসনের প্রতিশ্রুতি বাক্য উচ্চারণ করিলেন পরে দেখা গেল সেই সকল দোষ-ত্রুটি আরও অধিকমাত্রায় তাঁহাদেরই মধ্যে প্রকটিত। জনগণকে অত্যাচারী শোষণকারীর রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া যাঁহারা সমৃদ্ধির উন্নত তুঙ্গে পৌঁছাইয়া দেওয়ার শপথ গ্রহণ করিলেন, দেখা গেল অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদেরই হাতে জনগণের দুর্দশার অবধি নাই। তবে হ্যাঁ। ইঁহারা প্রগতিবাদী বই কি, ইঁহারা নিঃসন্দেহে গতির উপাসক। কংগ্রেসের স্থবিরতা জড়তার লেশমাত্র ইঁহাদের মধ্যে নাই। তাই কংগ্রেস কুড়ি বছরে যে অবস্থায় দেশবাসীকে উপনীত করিয়াছিল ইঁহারা কুড়ি সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইতেই সেই অবস্থার মুখোমুখি হইয়া দুর্ভাগ্যের চিরন্তন শিকার দেশবাসীকে সর্বসাধারণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ এবং মিলিটারীর মেরুদণ্ডটি ভাঙিয়া দিলেন। ফলে, সারা দেশ এক অরাজক অবস্থায় পতিত হইল। দেশে আইন শৃঙ্খলার কঙ্কালটুকু রহিল, দেশবাসীর নিরাপত্তা বলিয়া আর কিছু রহিল না। শ্রমিক কল্যাণে ইঁহারা মালিকদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার করিয়া ছাড়িলেন। ফলে, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দরজায় তালা চাবি পড়িল এবং যাহাদের কল্যাণের জন্য এই নীতি তাহারাই দলে দলে বেকার হইতে থাকিল।

এখন প্রমাণিত হইল যে রাজ্য-শাসনে তাঁহারা পুরোপুরি অক্ষম, কংগ্রেস যে সব অযোগ্যতা ও অব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছিল তৎসত্ত্বেও দেশবাসী কোনপ্রকারে প্রাণধারণ করিয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদের হাতে সেটুকুরও আশা নাই। জনগণও সেই মর্মেই তাহাদের রায় ঘোষণা করিল। সেই রায় ঘোষিত হইল হরিয়ানায়, হইল কৃষ্ণনগরে। সারা ভারত এ বিষয়ে এখন ব্যাকুলভাবে চাহিয়া আছে উত্তরপ্রদেশের দিকে এবং পশ্চিম বাঙলার দিকে।

সরকারী কর্মীদের প্রতীক ধর্মঘট

পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন ঘটনাগুলির মধ্যে ১৬ই মে তারিখের সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট যথেষ্ট উল্লেখের দাবীদার।

ধর্মঘট জিনিসটি গত কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে এক অতি পরিচিত ব্যাপার। একপ্রকার নৈমিত্তিক ঘটনার দৃষ্টান্তস্বরূপ। তথাপি এই ধর্মঘটটির মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। সরকারী কর্মীদের এই ধরণের ঘোষিত প্রতীক ধর্মঘট এই প্রথম।

নন-গেজেটেড স্তরের সরকারী কর্মীদের আট-দফা দাবী লইয়া এই ধর্মঘটের সূত্রপাত। এই ধর্মঘটের আওতাভুক্ত কর্মীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার।

প্রশ্ন এই, ধর্মঘটের মাধ্যমে, কর্মবিরতির হুমকিতে যদি সমস্যার সমাধান হইত, তাহা হইলে যে হারে এ রাজ্যে ধর্মঘট হইয়াছে তাহার সুফলস্বরূপ আজ সোনা ফলিত। মানুষের দৈনন্দিন কর্মজীবনকে ব্যাহত, বিপর্যস্ত করিয়া প্রতিবাদ জানানো যায় বটে, কিন্তু সে প্রতিবাদ কখনও জনগণের সমর্থন ও প্রসন্নতাপুষ্ট হয় না।

এক শ্রেণীর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আছেন যাঁহারা চিরকাল আগুন জ্বালাইয়াই দিতে পারেন কিন্তু সেই সর্বভুক হুতাশনের লেলিহান শিখাকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল বা দক্ষতা কোনটিই তাঁহাদের অধিকারভুক্ত নয়। ফলে, তাঁহাদের উস্কানির বলি যাহারা তাহারাই ভস্মীভূত হইয়া যায় কিন্তু ইঁহারা ঠিক আগুনের তাতটি হইতে দূরে সরিয়া থাকেন।

এ অবস্থার সম্মুখীন জনগণকে বহুবার হইতে হইয়াছে, অতএব কোন কিছুতেই বিভ্রান্ত না হইয়া চলাই তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন।

লবণাক্ত

প্রগতির রথচক্র দুর্বার গতিতে মহাকালকে সাক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহার বিপুল গতিবেগকে কোন বাধা, কোন প্রতিবন্ধকতা আজ প্রতিহত করিতে পারিতেছে না। এই অপ্রতিহত জয়যাত্রা আজ সমগ্র বিশ্বকে শুধু যে সচকিত করিয়াই তুলিয়াছে তাহা নয়, প্রকম্পিতও করিয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। বিশ্বের আকাশে বাতাসে চরাচরে আজ শুধু প্রগতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। চতুর্দিকে প্রগতির ব্যাপক আবাহন। প্রগতির জয়রথের বেগ যত বর্ধিত হইতেছে ততই স্বভাবত প্রতিযোগিতার স্পৃহাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। প্রগতির সহিত তালে তাল রাখিয়া প্রতিযোগিতার মাত্রাও ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছে।

প্রগতির যুগে শ্রেষ্ঠত্বের স্বপ্ন মানুষকে ভরিয়া রাখে। সকল বিষয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়া প্রগতির অভিজ্ঞান টীকায় আপন ললাট সুরঞ্জিত করিবার বাসনায় ভরপুর। এই প্রতিযোগিতার মেলায় বিরাট বিশাল বসুন্ধরা আজ অনেকখানি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। বহু দুর্গম আজ সুগমে পরিণত হইয়াছে, অনেক অজানা আজ জানার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়াছে।

এত কথা বলার অর্থ এই যে, এই সত্যটি আজ আমাদের মনে এক নতুন চিন্তা বা ধারণার উদ্ভব করিতেছে, এই সত্যের আলোকে মনে হয় আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠানও বোধ করি এইরূপ কোন প্রতিযোগিতায় আজ অবতীর্ণ হইয়াছে। যে যে-বিষয় আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, প্রগতির অভিজ্ঞানপত্র তাঁহারই অধিকারে আসার কথা। অতএব পৌরপ্রতিষ্ঠানই বা এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ প্রদর্শন করিবেন কেন? তাই আমাদের মনে হয় যে, এই প্রতিযোগিতায় হয়তো পৌরপ্রতিষ্ঠান মহাসমুদ্রকেই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাছিয়া লইলেন। 'মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার' অর্থাৎ প্রতিযোগী সাধারণ রাম, শ্যাম কেহ নয়, স্বয়ং মহাসমুদ্র, এখানেও অনেকের তুলনায় টেক্কা মারা।

কিসের প্রতিযোগিতা? কোন ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া এত কথার অবতারণা? মহাসমুদ্র তাহার অগাধ অসীম জলরাশির মধ্যে লবণ সরবরাহ করিয়া থাকে, পৌর প্রতিষ্ঠানও সেই দেখাদেখিই কি পানীয় জলকে আজ লবণাক্ত অবস্থায় সরবরাহ করিতেছেন।

বাঙলায় একটি কথা আছে—'জলই জীবন।' জল ব্যতীত মানুষ জীবনধারণ করিতে পারে না। রোদ-আলো-বাতাস-খাদ্য এই পর্যায়ে জলের উল্লেখের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। জীবনের যোধনমুহূর্ত হইতে অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষণে জলের প্রাধান্য অবিসম্বাদিত। একটি স্কুল-বালকও এ তথ্য সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত যে, মানব-জীবনে জলের গুরুত্ব কতখানি।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, একটি বালকের জ্ঞানও পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অধিকারে নাই। তাঁহাদের সাম্প্রতিক জল সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখিয়া এই মন্তব্য করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। বলা বাহুল্য এই মর্মন্তুদ ঘটনা আমাদের রীতিমত মর্মাহত করিয়াছে।

পৌর প্রতিষ্ঠান এমন একটি সংস্থা, যাহার দায়িত্ব এবং কর্তব্য যেমনই বিরাট তেমনই পবিত্র। মানুষের প্রাণরক্ষার ভার তাহাদের উপর। দেখা যাইতেছে, ক্রমশই তাঁহাদের শৈথিল্য

এবং ঔদাসীন্য লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর দিকে ধাপে ধাপে আগাইয়া দিতেছে।

রূপলাবণ্যে ভরপুর তাবৎ বিশ্ব-বাসীর বিস্ময়, সৌন্দর্যের লীলানিকেতন এই কলিকাতা মহানগরী আজ আবর্জনা নগরীতে রূপান্তরিত। পদে পদে চতুর্দিকে আজ পরিদৃশ্যমান রাশি রাশি জঞ্জালের স্তূপ এবং আবর্জনাপুঞ্জ এই স্তূপীকৃত জঞ্জাল এবং রাশি রাশি আবর্জনা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে যে কতখানি ভয়াবহ এবং সর্বনাশা ব্যাপার, সে সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে কাহাকেও বুঝাইবার কিছু নাই। এতগুলি মানুষের, লক্ষ লক্ষ নরনারীর অগণিত স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা যদি এই প্রকার উদাসীন দায়িত্বজ্ঞানহীন বা পরিবেশের প্রতিকূলতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে আর লজ্জার এবং কলঙ্কের অবধি থাকে না। কোন সুসভ্য দেশে যদি এই অবস্থা ক্রমানুয়ে ঘটিতে থাকে তাহা হইলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংজ্ঞা সম্বন্ধেও আজ সত্যই সন্দিহান হইতে হয়।

পৌর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ইঞ্জি-নীয়ারবৃন্দ আছেন, চিকিৎসকগণ আছেন, তৎসত্ত্বেও জলে কেন এত লবণ থাকিতেছে এবং কেন তাহা পরি-শোধিত অবস্থায় সরবরাহ হইতেছে না, আশা করি এ প্রশ্নের অধিকার প্রতিটি আবালবৃদ্ধবনিতার আছে। জানি না, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কোন্ সদুত্তর তাঁহারা পাইবেন। জীবন-ধারণের অপরিহার্য উপকরণ—জল, শুধু তৃষ্ণা নিবারণই করে তাহা নয়, সেই সঙ্গে বহুবিধ প্রয়োজনে তাহাকে লাগে। জল যদি লবণাক্ত অবস্থায় মানুষের তৃষিত ওষ্ঠাধর প্রতিনিয়ত স্পর্শ করে, তাহা হইলে পরিতৃপ্তির পরিবর্তে যে ঘোর তিক্ততার উদ্ভব হইবে এবং তাহার ফল যে কি মারাত্মক তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার সময় এখনও আসে নাই।

প্রতিযোগিতাতে যদি পৌর-প্রতিষ্ঠানই নামিলেন এবং সমুদ্রকেই যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করিলেন, তাহা হইলে বাছিয়া বাছিয়া ঠিক লবণ-সমুদ্রকেই তাঁহাদের মনে পড়িল। ক্ষীর-সমুদ্র অমৃতসমুদ্র তাঁহাদের স্মৃতির কক্ষপথ হইতে সম্পূর্ণ দূরেই রহিল; ইহাই বড় আশ্চর্য লাগে।

মানুষের তৃষ্ণার জল দূষিত এবং বিকৃত স্বাদে পরিবেশন যাঁহাদের অযোগ্যতায় এবং অক্ষমতায় হইতেছে, তাঁহাদের এই কথাটুকু সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, অশ্রুর স্বাদও লবণাক্ত হয়, হয় তো আপন আপন অশ্রুর স্বাদে তাঁহাদের বুঝিতে হইবে যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে যে জল তাঁহারা একদিন তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আস্বাদ কি রূপ।

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ ৭৯ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরূপে ইনি রসিকসমাজে যথেষ্ট স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সের সচিবের আসনে তিনি দীর্ঘকাল সমাসীন ছিলেন।

কালিদাস দত্ত

বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত গত ৩১-এ বৈশাখ ৭২ বছর বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ইনি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়

মনস্বিনী সরোজিনী নাইডুর অনুজা মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় ৩১-এ বৈশাখ হায়দ্রাবাদে ৮৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন এবং দর্শনশাস্ত্রে 'ট্রাইপস' লাভ করেন। ভারতের মুক্তি-আন্দোলন কর্মে জার্মানীতে ইনি অগ্রজ প্রখ্যাতনামা বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়ের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেন।

রাধারাণী দেবী

মধ্য কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলের শ্রীকেশবসখা মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী রাধারাণী দেবী গত ২৩-এ বৈশাখ ৬৪ বছর বয়সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ইনি দানশীলা, পুণ্যব্রতা মহিলা ছিলেন। এঁর মধুর আচরণ সকলকে মুগ্ধ করত। মহানগরীর অন্যতম জাস্টিস অব দ্য পীস বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর অন্যতম পুত্র।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসদ্‌কুমার [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

একরাতের রাণী প্রসঙ্গে

মহাশয়, বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্তা নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় 'এক রাতের রাণী'র লেখক শ্রীযুক্ত নটরাজন ও শ্রদ্ধের সম্পাদক মহোদয়ের উপর মাত্রাতিরিক্ত অবিচার করেছেন বলে মনে হয়। শ্রীযুক্তা লেখিকাকে পুনরায় বিশেষ একটু অভিনিবেশ সহকারে 'এক রাতের রাণী' পড়তে আমি অনুরোধ করি।

আমি সাহিত্য-পাড়ার কোন বাসিন্দা নই। গল্প-উপন্যাসের Grammar-এর কোন আইন ভঙ্গ হল কি না তা তদারকী করার আমি Inspector-ও নই। গল্প-উপন্যাসের Æsthetic রসের আমি একজন অখ্যাত রস-পিপাসু মাত্র।

'এক রাতের রাণী' আমার কাছে রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলে ধারণা। সাহিত্য জগতের Satire, pun বা humour-এর একটু ক্ষীণ মোলায়েম সূত্র, নিপুণ পরিমিত সংযমের মাধ্যমে সাহিত্য-পাড়ার এই নবীন অথচ শক্তিশালী লেখক বেশ একটু তাৎপর্যের সহিত সমাপ্তিকার চরিত্র চিত্রণ করেছেন। Rip Van Winkle-এর বিশবছরের ঘুমের চাইতে শ্রীমতী সমাপ্তিকার এক রাতের ঘুম যে অতি রসঘন মূর্তি নিয়ে পুরুষ বিদ্রোহিণী অথচ প্রেম-বিধুর চিরন্তনী নারী চিত্তে এক স্বাপ্নিক রাণীর সৌন্দর্য-মহিমা সৃষ্টি করে তুলেছে---এটা অস্বীকার করা যায় কী ?

Ultra modern জেনানারা (রাজভাষা) একটি সার্বভৌম স্বাধীনতা-পুষ্ট---শিশুকে তাঁদের অতি উগ্র আধুনিক মানসিকতার দোলনায় লালন পালন করছেন না কী? এই সংখ্যাতীত দল-বেদল প্রাচুর্যের দেশে হয়ত তাঁরা শীঘ্রই একটা 'জেনানা (প্রমীলা) পাকিস্তান' দাবী করে এই মিছিল নগরীর রাজপথে 'আমাদের দাবী মানতে হবে'র শ্লোগান আর প্লাকার্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। সেখানে গুরুর্জর (রাণী)---পদ্মজা নাইডু নন! সমাপ্তি-কাদের দর্শনে আমি, আপনি সবাই ধন্য হব। অথচ এই সমাপ্তিকা এণ্ড কোম্পানী সবাই 'রাতের রাণী'।

তাই মনে হয় শ্রীযুক্ত নটরাজন একজন স্রষ্টা যেহেতু তিনি একজন শিল্পী। আর তাঁর 'রাতের রাণী' উপন্যাস নয়, এক কৌতুকময়ী গদ্য-কবিতা হয়ে উঠেছে। সবিনয়ে আরও একটু বলতে চাই---Oscar Wilde-এর পরে 'নটরাজনে'র 'রাতের রাণী এই বিংশ শতাব্দীর এক অভিনব Parable। এর ভিতর এক অনস্বীকার্য বিরাট Socio-moral teaching-এর মূল্যায়ন আছে।

নারী যতই পুরুষ-বিদ্রোহিণী হ'ন---সৃষ্টির লীলা-রহস্য পুরুষ-প্রকৃতি নিয়ে।---একেবারে Historical Dialectics! ---একটি অপরটির পরিপূরক বা অনুপূরক। মাঝটা (Hyphen) অনন্ত প্রেমের আর এমন কি প্রমীলা রাজ্যের প্রমীলাদের 'বভ্রুবাহনের' ক্ষুধার সেতুবন্ধনে বিধৃত। অতএব এই 'রাতের রাণীর' স্রষ্টা আর তাঁর সৃষ্টিকার্যের প্রচার-সহায়ক মনীষী সম্পাদক উভয়েই নমস্য এবং প্রশংসাভাজন।

—কুমারী ঝর্ণা সমাজদার, মহাজাতি-নগর, ব্লক নং ৪, কলিকাতা-৫১।

সমাজ-বিজ্ঞানে গবেষণা

মহাশয়, 'মাসিক বসুমতী'র ১৩৭৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ২৭-৩১ পৃষ্ঠায় 'পাতালপুরীর কথা' (তিন) শীর্ষক প্রবন্ধে যে সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'নৈতিক' নামক একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের কথা মনে পড়ে গেল। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের যে গন্ধটা আমি পেয়েছি তাই আমি এখানে লিখছি, দয়া করে কসুর বা ধৃষ্টতা মাফ করবেন।

এই প্রবন্ধটি লেখা ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের, তিনি প্রথমেই বলে-ছেন, সান্ধ্য ও লঘু ভাষার সঙ্গে যে অপরাধ ও অপরাধ-প্রবণতার যোগ থেকে গেছে তিনি শুধুমাত্র সেই সকল অপরাধ ও সমাজ-বিরোধিতার আলোচনা করবেন। এদের কোড আছে। তিনি এই অপরাধকে ১৯টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর কয়-জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাহারও লিস্ট দিয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষ-দর্শীর সাক্ষ্যের ন্যায় মূল্যবান।

ঐ 'নৈতিক' উপন্যাস উপন্যাস হইলেও উহাতে বর্তমান সমাজ ব্যব-স্থার উপর কটাক্ষ আছে। দুর্গোৎসব পূজায় অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে বেশ্যা বাড়ীর দোরের 'মাটি' লাগে পুরাতন সেকেলে পদ্ধতির পূজায়। বাবা সাত্ত্বিক সেকালে পুরোহিত, কোন স্কুলে সেকেলে ধরণের পূজার ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু ঐ দ্রব্যটি সংগ্রহের ভার স্বীয় স্কন্ধে লয়ে, মাটি সংগ্রহ করতে যেয়ে সেখানে মার খেলেন, বাড়ীতে ফিরে দেখেন একটি মাতাল ধনী সন্তান মটরে বসে তাঁর ঘরের দুয়ারে ডাকছেন তাঁর কন্যাকে---যে-কন্যা বাবার অজ্ঞাতে সিনেমায় যোগ দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুর্গাপূজায় মহামায়ার স্নানের জল তৈরি করতে বেশ্যা বাড়ীর দরজার মাটি লাগে কেন? আজ আমাদের সার্বজনীন পূজায় সেটা বাদ দিয়ে চলে গেলেই তা হবে না। তার দ্বারা সমাজ ও তৎকালীন বর্ণাশ্রমের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত এখন তার বিকল্প বা অনুকল্প ব্যবস্থা কি হবে তা সামা-জিক, অর্থনৈতিক ও শাসন বিভাগের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। স্বা' দেশে সমাজের ও বর্ণাশ্র—

ও অখণ্ডত্ব রক্ষা করতেই হবে কাকেও বাদ দেওয়া চলবে না।

আমরা আগে এঁটো জায়গায় বা অপবিত্র স্থানে গোবর জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করতাম, এখন তার স্থলে ফিনাইল বা তদনুরূপ কিছু দিয়ে পরিষ্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। কেবল দুর্গোৎসবেই ঐ মাটি লাগত তা নয়, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায়ও মাটি লাগত, এর পিছনে কি যুক্তি কি হেঁয়ালী ছিল তা যাঁরা জানেন তাঁরা এই সঙ্কটমুহূর্তে উদ্ঘাটন করিলে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারেরই ছেলে-মেয়ে আছে, পূর্বকালের সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের গুরু, পুরোহিত, কুল-বিশেষজ্ঞ ঘটকগণ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও সর্বোপরি সন্ন্যাসিগণ প্রত্যেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আমাদের সমাজের একত্ব অখণ্ডত্ব ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেন, মাঝে মাঝে ভগবান অংশাবতার গ্রহণ করে আমাদের সমাজের একত্ব বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখতেন। আমাদের পল্লীকবি তাঁর 'পারের কড়ি'তে বলেছেন:

বেশ্যা বাড়ী যার সাধনার মঠ,
হৃদয়েতে আঁকে নটিনীর পট
তাহার দুয়ারে মঙ্গল ঘট,
'শোভিয়ে যখন রয়
সে যে গো আপন করিয়া মনন
চলে যাও নাহি ভয়।'

আমাদের মা কালী দিগ্বসনা, চন্দনে চর্চিত জবা তাঁর পদতলে দিয়ে আমাদের মেয়েরা তাঁকে বসন পরবার অনুরোধ জানাতেন। আমাদের বাৎস্যায়নের কাম শাস্ত্রের অনুবাদ করে ফরাসী দেশে ক্রমে. গবেষণা দ্বারা সেখানেও নাকি দিগ্বসনা নারী সমাজে গড়ে উঠেছে। কিন্তু গেরুয়া পরলে যেমন সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অন্য দেশের বাহ্য শো অনুকরণ করে অন্তরের শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

মল্লিক মহাশয় লিখেছেন, 'পশ্চিম বাঙলার সমাজবিরোধী যুবকদের শতকরা ৯০ জন বাঙালী, বয়স ১৬ থেকে ২৪ মধ্যে। অত্যন্ত কাঁচা বয়সের ছেলে, হয়তো ভুল করে বিপথগামী হয়েছে, কিন্তু দাগী বদমায়েসের হাতে পড়ে ফিরে যাবার রাস্তাগুলো একেবারে সীল করে দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, পদস্থ সরকারী চাকুরেদের সন্তান। বদসঙ্গ অন্যান্য পেশা ও নারীসঙ্গ তাদের গৃহস্থ জীবনে ফেরার বাধা জন্মায়।' পুলিশ রিপোর্টে জেনেছেন 'বাঙলা দেশের পতিতাদের অধিকাংশ বাঙালী, তাদের দালালদের মধ্যে বাঙালী নগণ্য, মধ্য কলিকাতায় মুসলমান ও খ্রীশ্চান দালালরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দালালরা খরিদ্দার সংগ্রহ করে এক-চতুর্থাংশ কমিশন নেয়। এ নারীরা খেতে না পেয়ে এ বৃত্তি গ্রহণ করেছে।' এ বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনা হতে থাকলে একটা পন্থা ও উদ্ভাবন হবে আশা করা যায়।

—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩২এ সুলতান আলম রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম

মহাশয়, সন ১৩৭৫ সালের বৈশাখ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে 'ভাগবতী তনু' (২৫) শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ৩০-৩৬ পৃষ্ঠায় ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের রবীন্দ্রনাথের 'রাখী বন্ধন' ও কবিতার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের যে অপূর্ব মূর্তি উদ্ঘাটন করেছেন তাহাতে অপূর্ব মৌলিকতা আছে। তিনি বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি সার্বভৌমিক মানবপ্রীতি। তাঁর ভগবানে অটল বিশ্বাস মানুষে ও অটল বিশ্বাস' তিনি ভগবানকে স্পর্শ করেছেন, তাই মানুষকে ঈশ্বরের 'প্রতিচ্ছায়া' বলে দেখাতে পেরেছেন। তাঁর প্রতিভার এমন

দেবতার প্রতিষ্ঠা, যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন তিনি সর্বভারতের দেবতা। 'নানাদিগভিমুখী মঙ্গলচেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বেঁধে ফেলো; কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো —এমন উদার করো যে দেশের উচ্চ ও নিচ, হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।'

'শুধু হট্টগোলের কাঁধে চড়ে সিদ্ধিলোকে পৌছান যাবে না। শুধু মস্ত বড়ো লোভেই মস্ত বড় লাভ হয় না। ধৈর্যই শক্তি, নিষ্ঠাই শক্তি, অধ্যবসায়ই পরম উপায়।---'উৎপাতের সংকীর্ণ পথসন্ধানই কাপুরুষতা, আর তাই মানুষের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানুষের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস।

'স্বাধীনতার পরাণ-পণ যুদ্ধের মধ্যেও ধর্ম। দেশপ্রেম সেই ধর্মেরই প্রতিফলন।'

'আবেগকে নিভৃত অবস্থায় সংহত করে বিস্তীর্ণ মঙ্গলসৃষ্টির কাজে চালিত করতে হবে।

তিনি কিছুই তুচ্ছ করা পছন্দ করতেন না, সবই কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন।

রবীন্দ্রনাথের যে সকল গান আমরা প্রায়শ রেডিওতে শুনি, ভাষ্যকার অচিন্ত্যবাবু তার অচিন্ত্য ব্যাখ্যা করেছেন। 'শুধু প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকো, শুধু কর্ষণ করে যাও, দৈবধন না মিলুক, ভাণ্ডার ভরা শস্য মিলবেই মিলবে। আমার অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু ভগবান আমার সঙ্গে আছেন বলে ধৈর্যে আমার ক্লান্তি নেই, শ্রমে আমার ঔদাস্য নেই, ত্যাগে আমার ক্ষতি নেই, বিঘ্নে আমার আতঙ্ক নেই।---সমস্ত কাজ যদি ঈশ্বরের জয়ধ্বনি হয়, তাহলে আর আমার ভয় কোথায়?'

'শিবাজী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। 'বাংলা দেশও কবির মাতা---আর যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা'।

'শুধু রাখি-বন্ধন নয়, শুরু হল বিলাতী বর্জন, শুধু বর্জনে হবে না, আত্মশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেন্দ্র হবে গ্রাম---দেশের যা অন্তস্তল। শিক্ষাকেও স্বাধীন করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে জাতীয় বিদ্যালয়। সমস্ত সক্রিয় ভাব বিপ্লবের ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথ।' আর তিনি ল্যাবরেটরী স্কেলে ইহা রূপায়ণ করলেন শান্তিনিকেতনে।

এখানে কবির ন্যায় ভাষ্যকারের কৃতিত্ব নিতান্ত কম নয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের এই সঙ্কট মুহূর্তে চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়ে দিলেন---গ্রাম কেন্দ্র কর, সেখানে নূতন ধরণের কৃষি উন্নয়ন করিতে, চাই বিপুল পরিমাণে কম্পোস্ট বা আবর্জনা-পচাই সার। এত আবর্জনা গ্রামে কোথায় মিলবে? কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় অজস্র আবর্জনা জমে আছে, লরী অভাবে স্থানান্তর করা যাচ্ছে না। এই আবর্জনা যদি গ্রামের বৃহৎ কৃষক ও পচাই সার প্রস্তুতকারকগণকে বিনা মূল্যে ও বিনা লাইসেন্সে সরাইয়া লইতে দেওয়া যায়, তবে তাহারা নিজ নিজ প্রয়োজন মত আবর্জনা সরাইয়া লইয়া কম্পোস্ট সার তৈয়ারী করিবেন, প্রয়োজনের অধিক যাহা প্রস্তুত হইবে বিক্রয় করিয়া তাহাদের খরচা তুলিয়া যদি লাভবান হন, বিনা খরচায় কলিকাতার রাস্তাসমূহ পরিষ্কার হইয়া যাইবে আশা করা যায়। ইহাতে বোঝা যায় অচিন্ত্যবাবু শুধু সাহিত্যিক ও ভাষ্যকারই নহেন---বাস্তব জগতের ঘটনাপ্রবাহও তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ

—শ্রীউষাকান্ত মুখোপাধ্যায়, ৩২ নং সুলতান আলম রোড, কলিকাতা-৩৩।

পত্রিকা প্রসঙ্গে

মহাশয়,

মাসখানেক আগের কথা। বন্ধুবর জয়নারায়ণ সাহার সাথে প্রেস থেকে অভিযান ২য় খণ্ডের প্রুফ দেখে বাসায় ফিরছি। তখন বেলা দেড়টা দুটো হবে। টাউন ক্লাব মাঠের সামনে পাড়ার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সাথে দেখা। ভদ্রলোক ব্যক্তিগত ভাবনে আমার বিশেষ বন্ধু। জলপাইগুড়িতে শিক্ষকতা করেন। পড়াশুনো রয়েছে প্রচুর। অথচ মনের সংকীর্ণতা থেকে উনি নিজেকে কিছুতেই মুক্ত কোরতে পারেন নি। কথায় কথায় উনি বলেন: 'মোশাই বাঙালদের সব কিছুই বাড়িয়ে বলা অভ্যেস। আপনাদের আচরণ দেখে মনে হয় পাকিস্তানে আপনারা এক এক জন কেউকেটা ছিলেন। আরে বাবা, তাই যদি হবে ওখানকার স্থানীয় লোকদের মার খেয়ে ওখানে থাকলেই পারতেন?'

ভদ্রলোক মানুষ গড়ার কারিগর। মানুষকে ভালোবাসাই হলো ওনার প্রধান ধর্ম। সেই মানুষকে ঘেন্না করা ওনার মতো একজন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু [illegible] যায়া ভদ্রলোকের এ ত্রুটির [illegible]

ভাবে জ্ঞাত, তারা তাঁর এ সব প্রশ্ন সব সময় সযত্নে এড়িয়ে যাই।

সেদিন আমাকে দেখেই ভদ্রলোক গভীর বিরক্তিভরে বললেন: 'মোশাই, পৌষ সংখ্যায় আপনার চিঠি পড়লাম। কোন পত্রিকা সম্পর্কে প্রশংসা করার সময় সংক্ষেপে সংযতভাবে করবেন।'

সবিনয়ে বললুম: মাসিক বসুমতীর সাথে আমার পরিচয় ৩০ বছর ধরে তাই স্মৃতিচারণ কোরতে গিয়ে স্বভাবতই কিছুটা উচ্ছ্বাস এসে থাকবে এজন্য কারো বিরক্তির কারণ হোয়ে থাকলে---আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে প্রকাশিত মাসিক বসুমতীর মতো অন্য একটি, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকার নাম দয়া কোরে বলুন তো?

ভদ্রলোক বললেন: 'কেন অনেক গুলো পত্রিকাই রয়েছে।'

আমি বললুম: আপনি তো পণ্ডিত মানুষ---দয়া কোরে ওর সমতুল্য একটি পত্রিকার নাম বলুন?

ভদ্রলোক এবার কিন্তু নিশ্চুপ।

---তপনকিরণ রায়, উকিলপাড়া। রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে

মহাশয়, আপনাদের জ্যৈষ্ঠের সম্পাদকীয় 'শতবর্ষের অর্ঘ: উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' প্রবন্ধটিকে ও স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চরণে মুঠো মুঠো শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে দুই একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আপনারা আপনাদের উক্ত সম্পাদকীয়তে উপেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে স্তরে স্তরে সত্য। আপনারা সুন্দরভাবে বলেছেন 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, পরম ভট্টারক ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-সহচর ও বর্তমান বাংলার সাংবাদিক কুলের প্রণম্য পূর্বসুরী ও ন স্বরূপ স্বর্গত উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘটনাবহুল জীবনের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত আজ সমাগত।'

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের ও বিশেষ করে মাসিক বসুমতীর যে বীজ একদিন উপেন্দ্রনাথ বপন করেছিলেন তাহাই আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত লাভ করিয়া 'দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইল ও ও বঙ্গবাসীর গৌরবের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিবেচিত হইবে।' সাহিত্য ও সাংবাদিক জগতে উপেন্দ্রনাথ একটি উজ্জ্বল তারকা এবং তিনি দেশকে ও দেশবাসীকে প্রচুর ভাবে 'সাহিত্যের বাণী, সাহিত্যের উপকরণ; ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দেওয়ার, সর্বসাধারণকে সাহিত্য রসে উদ্দীপ্ত করার ব্রত এইভাবে উপেন্দ্রনাথ সফলকাম হইবেন।'

সাংবাদিক জগতেও উপেন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য বাংলা দেশের সাংবাদিকতার অঙ্গিক প্রকাশ ভঙ্গী রচনা রীতির সময়ের অগ্রসরণে আজ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তথাপি যাহারা পথের দিশারী তাহারা অমর মহিমায় সগৌরবে বিরজমান। ইতিহাসে তাঁহার মূল্য চিরন্তন। এই মহান পুরুষটিকে ও প্রেমের মানুষটিকে শ্রদ্ধার আরতির মাধ্যমে আমরা সকৃতজ্ঞে বন্দনা করি।

---শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ সি, সি এন রায় রোড, কলি-৩৯।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● ডঃ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম -।- ডাক কাঁথি, জেলা---মেদিনীপুর ● সচিব স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ওয়েল ফেয়ার কমিটি, ডাক---কুচিন্দা সম্বলপুর, উড়িষ্যা ● শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, রাজবল উচ্চ বিদ্যালয়, ডাক---রাজবল, হুগলী ● সচিব বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, চোরপালিয়া, মেদিনীপুর, ● ক্যাপটেন এ ভট্টাচার্য, 2(A) MED Coy NCC Medical College Compound, Kurnool, A. P. ● শ্রীমতী গৌরী সরকার, অবঃ এস সরকার, এজেন্ট Olpherts (P) Ltd কাটনি, M. P. ● শ্রীবিনয়কুমার মণ্ডল, ডাক---গনপুর, বীরভূম ● শ্রীপ্রাণতোষ চক্রবর্তী, ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিক্স, কুইন্স ইউনিভার্সিটি কিংসটন, অণ্টারিও, কানাডা ● শ্রীমতী জয়ন্তীরাণী চক্রবর্তী, অবঃ শ্রী এস চক্রবর্তী, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গভঃ সেকেণ্ডারী টেকনিক্যাল স্কুল, বাইকাঘাগিচা, জব্বলপুর এম-পি ● শ্রীক্ষেত্র কুমার রায়, অবঃ ভুয়েরা ফ্রি প্রাইমারী স্কুল, ডাক---ভুয়েরা, বর্ধমান ● শ্রীগোপিকারঞ্জন নাগ, সিঃ. ওঃ এম ই স্কুল, ডাক---বাজারীছারা, কাছাড় আসাম ● শ্রী এ, কে রায় ১৫বি, সুইনহো স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯ ● শ্রী কে এম আরেফ, ডাক মারগ্রাম, জেলা---বীরভূম, ● আসগর খাঁ বালিখোলা, গ্রাম -।- ডাক---হাকিমপুর, ২৪ পরগণা ● কুমারী ইলারাণী ঘোষ, অবঃ এ ন আর ঘোষ, রেলওয়ে কোয়ার্টার, Tyg 19, ডাক---কল্যাণ, মহারাষ্ট্র ● শ্রী অভিজিৎ ঘোষ, 89, Olive Road, Plaistow, London E-13 U. K.

I am sending herewith Rs. 18·00 being the annual subscription for Masik Basumati. Please send the magazine regularly. L. M. Samanta, Golukdih Colliery, P. O. Jharia, Dt. Dhanbad.

Please enroll me as a subscriber of Masik Basumati. I am sending herewith Rs. 7·50 being the five issues subscription for Masik Basumati. Please send the magazine regularly.—S. N. Choudhuri, P. O. Lakhipur, Dt. Goalpara, Assam.

যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ—যোগ-সাধনায় দীর্ঘজীবন লাভের নির্দ্দেশ

যোগশাস্ত্র

সিদ্ধযোগিগণপ্রদত্ত পুঁথিদৃষ্টে সুসংস্কৃত বড় অক্ষরে মূল—সরল বিশদ বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত পরিবর্দ্ধিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনায় প্রকাশিত।

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষটচক্রনিরূপণম্, ৬। দত্তাত্রেয় যোগ-রহস্যম্, ৭। পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। অতি দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের অভাবনীয় সমাবেশ। যে সকল গুহ্য সাধনতত্ত্ব এতদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহায় নিহিত ছিল—যে সকল মহাপুরুষের উপদেশ—সাধন নির্দ্দেশ উপেক্ষা—অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণ, নানা রোগাক্রান্ত স্বল্পজীবী, অল্পভোগী হইতেছি, একমাত্র যোগশাস্ত্র পাঠে—অনুশীলনে—সাধনায় তাহার প্রতিকার সম্ভব। হিন্দু সন্তান আবার আর্যগণের বল-বীর্য, প্রতিভা-দীর্ঘায়ুর অধিকারী হইয়া নীরোগ, সুস্থ শরীরে জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়া মোক্ষসাধনায় আত্ম-নিবেদন করিবে। যোগের প্রভাবে মানুষ দেবতা হয়। প্রথমে সহজ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান-ধারণা, ধৃতি, শুদ্ধি, শৌচাচার, দেহতত্ত্ব অবগতি, মনঃশুদ্ধি বাহ্য ও অন্তর-শুদ্ধি প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিঃ ধ্যানে—দর্শনে আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধনে সিদ্ধি-লাভ সুনিশ্চিত। অশেষ মঙ্গলনিলয় দেবাদিদেব মহাদেব উপদিষ্ট—সিদ্ধঋষিগণ অনুষ্ঠিত যোগশাস্ত্র অনুশীলনে—সাধনায় যোগের অতুল বিভূতি লাভ সম্ভব হইবে। তুলট কাগজে সুন্দর নির্ভুলভাবে মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। মূল্য পাঁচ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥"
—ব্রহ্মসংহিতা

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ মূর্তি, আদি ও অনাদি, গোবিন্দ এবং সর্বকারণকারণম্।

বিদ্যাপতির পদাবলী	৪৲
চণ্ডীদাসের পদাবলী	৪৲
জ্ঞানদাসের পদাবলী	২৲
গোবিন্দদাসের পদাবলী	২৲
গীতগোবিন্দম্—জয়দেব	৪৲
শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ—কৃষ্ণদাস বাবাজী	৬৲
বিদগ্ধমাধব—রূপ গোস্বামী	৪৲
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ	৮৲
শ্রীচৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবনদাস	৬৲
বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী	৫৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, সংস্থাসমূহ, আশ্রম, সংঘ ও আখড়া প্রভৃতির জন্য বিশেষ কমিশন শতকরা পনেরো টাকা।।

।। নামমাত্র মূল্যে ও সুলভে বৈষ্ণব সাহিত্য বিতরণ ।।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন
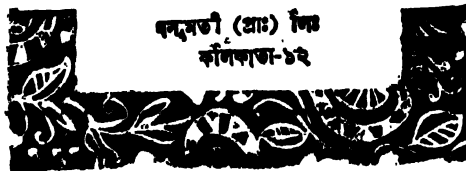
মাসিক বসুমতী
।। আষাঢ়, ১৩৭৫ ।।

কবিরবি
—মিহিরকুমার সেনগুপ্ত অঙ্কিত

প্রণব

চৈতন্যদেব বলেছেন—প্রণবই বেদের মহাবাক্য, পূর্ববর্তী আচার্যগণ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদির যে ব্যাখ্যা করেছেন তা বেদের প্রাদেশিক বাক্যমাত্র। প্রণবকে অবলম্বন করেই বেদ ব্যাখ্যাত হ'য়ে থাকে। প্রণব মহাবাক্য ; ঈশ্বরের মূর্তি—একসঙ্গে নাম ও রূপ। প্রণব থেকেই চরাচর জগৎ ও বেদ উৎপন্ন।

"প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব, সর্ব বিশ্বধাম॥
সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন॥"

—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—, ট—অ—অ—অ—ম্ যোগী নাদ ভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম লয় হয়।"

মহিমাচরণ ঠাকুরকে উত্তর গীতা পড়িয়া শুনাইতেছিলেন ; প্রণব শব্দ কিরূপ তাই পড়িতেছেন—

"তৈলধারামবিচ্ছিন্নম্—দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদবৎ"।

প্রণামী

ঠাকুর যদু মল্লিকের বাড়ি এসেছেন। সেখানে সিংহবাহিনীর নিত্যসেবা হয়। সিংহবাহিনীকে দর্শন করে ঠাকুর সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে একজনকে টাকা দিয়ে নমস্কার করতে বললেন ; কেন না, ঠাকুরের কাছে এলে কিছু প্রণামী দিতে হয়।

অধর জানতেন না যে প্রণামী দিতে হয়।

প্রতিবিম্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব লেশমাত্রও থাকে না। টাকা নিজের হাতে তো লবেই না,—আবার কাছেও রাখতে দেবে না।

"লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী এখানে প্রায়ই আসতো। একদিন বললে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেব, তার সুদে তোমার সেবা চলবে।

"যাই ও কথা বলা, অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে এলে বললাম, 'যদি অমন কথা আর মুখে আনো, তা হ'লে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার

"তখন সে হৃদয়ের কাছে দিতে চাইলে। আমি বললাম—'তা হ'লেই আমায় বলতে হবে—একে দে, ওকে দে ; না দিলে রাগ হবে। টাকা থাকাই খারাপ। সে সব হবে না।

"আরশীর কাছে জিনিষ থাকলে প্রতিবিম্ব হবে না। (মনোদর্পনে কাঞ্চনের প্রতিবিম্ব।)

"জ্ঞানীরা সব কিছুই মায়া বলে উড়িয়ে দেয় ; সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে। প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয় ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারা বলে দেহাত্মবুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায় ; প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। এই বুদ্ধি চলে গেলে তবে সোঽহং অনুভূতি হয়।"

প্রতিবিম্ব সূর্য

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা করো—আর কাঁদো। চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে যাবে। তখন নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। 'ভক্তের আমি' রূপ আরশীতে সেই সগুণব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। কিন্তু আরশী খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না।

"যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্যকে দেখতে হয়, সূর্যকে দেখবার আর কোন উপায় হয় না। আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য বই সত্য সূর্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যই ষোল আনা সত্য ; যতক্ষণ 'আমি' সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যও সত্য—ষোল আনা সত্য। সেই প্রতিবিম্ব সূর্যই আদ্যাশক্তি।

"মনে কর সূর্য আর দশটি জলপূর্ণ ঘট রয়েছে, প্রত্যেক ঘটে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। প্রথমে দেখা যাচ্ছে একটি সূর্য ও দশটি প্রতিবিম্ব সূর্য। যদি ৯টা ঘট ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে বাকী থাকে একটি সূর্য ও একটি প্রতিবিম্ব সূর্য। এক একটি ঘট যেন এক একটি জীব। প্রতিবিম্ব সূর্য ধরে ধরে সত্য সূর্যের কাছে যাওয়া যায়। জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় পৌঁছান যায়। জীব (জীবাত্মা) যদি সাধন ভজন করে তাহলে পরমাত্মার দর্শন করতে পারে। শেষের ঘটটি ভেঙে দিলে কি থাকে মুখে বলা যায় না। কেন জান? কে বলবে! প্রতিবিম্ব সূর্য না থাকলে সত্য সূর্য আছে কি করে জানবে! সমাধিস্থ হলে অহংতত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেবে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না।

"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্যসূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন, তাঁকেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দেবেন। কেন না যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ

প্রতিমা পূজা

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়। মাটির প্রতিমা পূজা কেন করছো? যদি মাটিরই হয় সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজো ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এ সব করেছেন অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে—মা নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন—যেটি যার পেটে সয়,—যেটি যার ভাল লাগে, তার জন্য সেই রকম; বুঝলে?

"তা ছাড়া তিনি তো অন্তর্যামী! যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। এ সব না ভেবে নিজের জ্ঞান ভক্তি যাতে হয় তার জন্য চেষ্টা কর।

"প্রতিমা পূজোতে দোষ কি? বেদান্তে বলে, যেখানে 'অস্তি, ভাতি আর প্রিয়' সেখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিষই নাই।

"আবার দেখ ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কতদিন করে? যতদিন না বিবাহ হয় আর যতদিন না স্বামী-সহবাস করে। বিবাহ হ'লে পুতুলগুলি পেটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর প্রতিমা পূজার কি দরকার?

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেছেন—"যে কোন স্থানে আপনাকে ছাড়িয়া দাও—ভগবান বলিয়া ছাড়িও। তোমার আশ্রয় জড়পদার্থ হইলেও সাধনার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না। জড়প্রতিমা কিম্বা জড়দেহ তোমার ভগবৎজ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মাইবে না। নিষাদপুত্র একলব্য দ্রোণমূর্তির নিকট অদৃষ্টপূর্ব অস্ত্রপ্রয়োগ কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার যে তোমারই অন্তরে অবস্থিত! বাহ্যবস্তু সেই জ্ঞান-উন্মেষের অবলম্বন মাত্র। সম্পূর্ণ শরণাগত হইলেই হইবে।"

প্রত্যগাত্মা

প্রত্যক অর্থাৎ আন্তর। প্রত্যগাত্মাই অন্তরাত্মা যাহা পর পর আবরণে আবৃত। এই আবরণগুলিই পঞ্চকোষ: অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়। এই পঞ্চকোষে আবৃত অন্তরাত্মা বা জীবাত্মাই প্রত্যগাত্মা। পরমাত্মা (পরমব্রহ্ম) প্রত্যগাত্মারূপে জীবের অন্তস্থ হ'য়েও অসঙ্গ ও অকর্তারূপে অবস্থান করেন।

প্রত্যয়

প্রতীয়তে অনেন ইতি প্রত্যয়ঃ। যাহা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহাই প্রত্যয়; সুতরাং প্রত্যয় ইচ্ছে বস্তুর নিশ্চয় জ্ঞান অর্থাৎ আন্তরিন্দ্রিয়ে বস্তুর যথার্থ এবং সম্পূর্ণ অনুভূতিই প্রত্যয়।

প্রত্যাহার

মনকে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় থেকে টেনে সরিয়ে এনে [illegible] গুলির ভোগের সঙ্গে মন সদা বিচরণশীল। মনের সাহায্য ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি শক্তিহীন হয়ে পড়ে—মনের সায় না পেলে কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয় ভোগে উৎসাহ থাকে না। তাই ইন্দ্রিয় বশীভূত করার প্রধান উপায় হচ্ছে মনকে ইন্দ্রিয়বিষয় থেকে সরিয়ে রেখে চিত্ত-নিরোধ করা। এভাবে শব্দাদিবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ব্যসনাভাব হয়। ব্যসন শব্দে আসক্তি বুঝায়; যাহা শ্রেয় থেকে পুরুষকে দূরে ঠেলে দেয় তাহাই ব্যসন। ইন্দ্রিয়গুলি যদি আপন আপন বিষয়ে যুক্ত হওয়ার সুযোগ না পায় তবে তারা চিত্তের স্বরূপেরই অনুসরণ করে—চিত্তের সঙ্গে যেন একতা প্রাপ্ত হয়। একেই প্রত্যাহার বলে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মনকে বিষয় থেকে সরাবার উপায় কি? সে উপায় হচ্ছে, মন যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ভোগের দিকে এগিয়ে যায় সেই সকল বস্তুর সম্বন্ধে বিচার। বিচার করলেই দেখা যায় যে ভোগ্য বিষয়গুলি ক্ষণিক সুখ দিয়ে থাকে বটে, কিন্তু তাদের অর্জনে, রক্ষণে এবং নাশে দুঃখ অনেক বেশি। আবার যে ক্ষণিক সুখ পাওয়া যায়, তা-ও কিন্তু বিষয় থেকে আসে না। বস্তুটি পাওয়ার জন্য বাসনা-চঞ্চল মন সেটি পেয়ে ক্ষণিক শান্ত ভাব ধারণ করায় সুখস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব সাময়িকভাবে দর্শন করে সুখী হয় মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে বিষয় ভোগে উপলব্ধ যে সুখ তা বিষয় থেকে আসে না—ভিতর থেকে আসে। কুকুর অস্থি চর্বণকালে তদ্দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত নিজ মুখের রক্ত আস্বাদন করে মনে করে অস্থি থেকে ঐ স্বাদ আসছে। বিষয়-সুখ-ভোগেও জীব আত্মানন্দকে বিষয়ানন্দ বলে ভুল করে। এরূপ বিচার দ্বারা বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হলে প্রত্যাহার স্বাভাবিক হয়ে পড়ে; আর প্রত্যাহারের ফলে ইন্দ্রিয় জয় হয়—ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে পড়ে।—(পাতঞ্জল দর্শন—সাধনপাদ, ৫৪-৫৫ সূত্র)

প্রবর্তক ও নিবর্তক পূজা

বাসনা ও সঙ্কল্পযুক্ত যে সকল পূজা গৃহিগণ করে থাকে তার নাম 'প্রবর্তক' পূজা। এরূপ পূজায় পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা ফললাভ হয়, কিন্তু স্বর্গসুখ ভোগের পর পুনর্জন্ম হয়।

বাসনা ও সঙ্কল্প বর্জিত হয়ে, 'আমার ইহা কর্তব্য, তাই করছি', এই ভেবে, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে পূজাদিকার্য যাহা করা হয়, তাকে 'নিবর্তক' পূজা বলে। এরূপ পূজাদি কর্মে জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয় না। সাধকগণ নিজ নিজ অভিলাষ অনুযায়ী প্রবর্তক ও নিবর্তক পূজার অনুষ্ঠান করেন।

প্রবর্তক-সাধক-সিদ্ধ-সিদ্ধের সিদ্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বৈষ্ণবদের সাধনার অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন নামে সাধক অভিহিত হয়—প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সবে পথে উঠেছেন—সবে ঈশ্বরের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁকে 'প্রবর্তক' বলে। প্রবর্তক পড়ে, শুনে, ফোঁটা কাটে, তিলকমালা পরে আর বাইরে খুব আচার করে। কর্তাভজাদের কাছে [illegible] বলে প্রবর্তক।

"সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, [illegible] [illegible] [illegible] প্রার্থনা করে আর পূজা জপ ধ্যান নামসংকীর্তন এসব করে। তাদের প্রবর্তকের মত অত বাইরের

"যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করছে—যার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়েছে যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব করছেন—যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাকে সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে,—অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়; জানালায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়; খাটে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়! নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, 'ইহ'—এই বাবু; অর্থাৎ অস্তিবোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে, কিন্তু বিশেষরূপে জানা হয় নাই—আলাপ হয় নাই।

"সিদ্ধের সিদ্ধ কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। শুধু বোধ নয়, শুধু দর্শনও নয়; কেউ পিতৃভাবে, বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। কাঠে আগুন আছে এই বিশ্বাস, আর কাঠ জ্বালিয়ে আগুন বার করে ভাত রেঁধে খেয়ে শান্তি আর তৃপ্তি লাভ করা দু'টি আলাদা জিনিষ।

"ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম ভক্তি দ্বারা বিশেষ আলাপ যখন হয় তখন এই অবস্থা। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে, কিন্তু যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন যেমন চৈতন্যদেব। ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা কথাবার্তা—আলাপ।

সিদ্ধের সিদ্ধকেই ওরা সাঁই বলে। সাঁই-এর পর আর নাই।"

প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তি থেকেই যত রকম কামনা-বাসনা; সে জন্যই মন সংসারে নোয়ানো—মনের নিম্নদৃষ্টি। প্রবৃত্তি থেকেই বন্ধন, আর দাসত্ব! প্রবৃত্তির দাস হয়ে মানুষ কামিনী-কাঞ্চন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পরমার্থ-চিন্তা ভুলে যায়; বাসনা কামনার চরিতার্থতার জন্য ব্যস্ত হয়। তাই বিবেক-বৈরাগ্য তার কাছেও আসে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দু'টি বিরুদ্ধমুখী। প্রবৃত্তি চলেছে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার দিকে, আর নিবৃত্তি যাচ্ছে বিদ্যা বা জ্ঞানের দিকে। প্রবৃত্তির পথ সরল নিম্নমুখী; সে পথে চলতে কোন যত্নের বা পুরুষার্থের প্রয়োজন হয় না—অতি সহজে সেই ঢালু পথে নামা যায়। কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী নিবৃত্তিমার্গে উঠতে হলে প্রতি মুহূর্তেই সেই ঢালের দিকে ঠেক দিয়ে অতি সাবধানে প্রবল পুরুষকারের সাহায্য নিয়ে উঠতে হয়। প্রতি পদক্ষেপে নিম্নমুখী ঢালু পথের স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে উঠতে হয়। এটাই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির যুদ্ধ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। যিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন তাঁর মুক্তি সুনিশ্চিত।

শাস্ত্র প্রবৃত্তিকে রজোগুণজাত এবং অন্ধ বলেছে। এই প্রবৃত্তির সঙ্গ করেই মনের কাম ক্রোধাদি শতপুত্র উৎপন্ন হয়। ইহারা জীবের নানাভাবে বন্ধনের কারণ। প্রবৃত্তির অধীন হয়ে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) ভোগই বন্ধনের কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তাঁর বৈরাগ্য হয় না কেন জিজ্ঞাসা করছো? ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি এসব আছে বলে। প্রবৃত্তি ভাল নয়—নিবৃত্তিই ভাল। নিবৃত্তির পথেই তাঁকে পাওয়া যায়। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। চুষি ফেলে যখন চীৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নাবিয়ে এসে পড়ে।"

প্রস্থানত্রয়

মূল বেদান্তশাস্ত্র তিন শ্রেণীর—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। 'উপনিষৎ' সকল বেদান্ত শ্রুতি; উপনিষদের মীমাংসা 'বেদান্ত সূত্র' (ব্রহ্ম সূত্র বা শারীরক ভাষ্য) হচ্ছে বেদান্ত ন্যায়; এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'সনৎসুজাত পর্বাধ্যায়' ও 'শ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম' —এই তিন গ্রন্থে বেদান্তের অনেক সিদ্ধান্ত ও মত সন্নিবিষ্ট থাকায় এই তিনখানি গ্রন্থকে বেদান্ত স্মৃতি বলা হয়েছে। এই তিন শ্রেণীর বেদান্ত শাস্ত্রই প্রস্থানত্রয় বলে উল্লিখিত হয়।

যে সকল আচার্য মত প্রবর্তক, তাঁরা প্রথমেই এই প্রস্থানত্রয়ের নিজ মতানুযায়ী ভাষ্য রচনা করে নিজে তদ্রূপ আচরণ করেন এবং তদনুরূপ প্রচার করেন। আচার্য শংকরের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্য বল্লভাচার্য (বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়) ইত্যাদির দ্বৈতবাদ, এবং নিম্বাচার্যের (নিম্বার্ক স্বামীর) ভেদাভেদ বাদ—সকলই এভাবে আচরিত ও প্রচারিত।

প্রাণ (প্রাণবায়ু)

যার অবস্থানে জীবাত্মা দেহে অবস্থিত, যার উৎক্রমণে উৎক্রান্ত হয়—তাহাই প্রাণ। আমাদের স্থূল দেহটা এবং ইন্দ্রিয়াদি প্রাণের দ্বারাই চালিত। প্রাণাপানাদি বায়ু পঞ্চকই পঞ্চপ্রাণ। দেহের ও ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় ক্রিয়াশক্তি এই প্রাণেরই ক্রিয়া; অর্থাৎ যাকে আমরা জীবনীশক্তি (Vital Energy) বলি, তাহাই এই প্রাণবায়ু। সাধারণভাবে বলা যায়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি থেকে প্রাণ উৎপন্ন। কর্মেন্দ্রিয়গুলির কর্ম প্রাণেরই আকুঞ্চন বিকুঞ্চন। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সম্মিলিত রজোভাগ থেকে এই ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রাণবায়ুর উৎপত্তি।

মুখ্য ও গৌণ ভেদে প্রাণ দ্বিবিধ। মুখ্য প্রাণ জীবের সুষুম্নাদি নাড়ীত্রয়ে, বিশেষরূপে সুষুম্নাতেই মুখ্যভাবে প্রবাহিত থেকে দেহত্রয়ের ক্রিয়াসমূহ সর্বদা রক্ষা করে। কুণ্ডলিনী শক্তিই জীবের যথার্থ মুখ্যপ্রাণ এবং কুণ্ডলিনী বিবর সুষুম্না পথেই তাহা সতত পরিচালিত হয়। গৌণ প্রাণ কেবল স্থূল দেহ-পরিচালক প্রাণাদি পঞ্চ এবং নাগাদি পঞ্চ এই দশবিধ গৌণ প্রাণক্রিয়া সম্পাদন করে।

মুখ্যপ্রাণ সহস্রার থেকে অনুলোম পথে মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মূলাধারে অবস্থিত হয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে মূলাধারের বহির্দেশ থেকে গৌণ প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ কচ্ছেন। কুণ্ডলিনীরূপে প্রাণশক্তিই মূলাধার কেন্দ্রে অবস্থিত থেকে জীবের রক্তস্থলীতে

(Heart-এ) স্পন্দন সৃষ্টি করে সমগ্র স্থূল শরীরের উপর গৌণ প্রাণের যাবতীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন।

মুখ্যপ্রাণ বা কুণ্ডলিনীর প্রতিলোম বা বিপরীত ক্রিয়ার সাহায্য আবার এই গৌণ প্রাণের প্রতিলোম ক্রিয়া দ্বারাই সংঘটিত হয়। তার ফলেই সাধকের ষট্ চক্রাদি ভেদ সম্ভব হয়। তখনই মুখ্যপ্রাণ-শক্তিরূপা কুণ্ডলিনী বিলোমে (প্রতিলোমে) বা বিপরীত পথে) সহস্রারে পৌঁছে 'কুলকুণ্ডলিনী'রূপে পরিণতা হন।

মুখ্য প্রাণই পরমাত্মার সর্বাধিকারী—ছায়ার ন্যায় অভিন্ন। আরশিতে প্রতিবিম্বের মত এই প্রাণেই পরমাত্মা জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট। প্রাণই সন্তানরূপে প্রাণদান করে এবং যাকে দান করে সেও প্রাণ। মুখ্য প্রাণই ইন্দ্রিয়াদিকে পরিপোষণ করে—আবার বিনষ্টও করে। প্রাণ স্বীয় শক্তিতে প্রকাশ পায়; ইহা পরতন্ত্র নয়।

সমগ্র জগৎ একমাত্র প্রাণেরই সেবায় নিরত। কিন্তু প্রকৃতির আবরণহেতু মানব সেদিকে লক্ষ্যহীন। একটু খেয়াল রাখলেই একথা বুঝা যায়। মানুষ মৃতের সেবা করে না, জীবিতের সেবা করে। কেন? না, জীবিতের প্রাণ আছে বলে। ঋষি সনৎকুমার বলেছেন (ছান্দোগ্য—৭।১৫।১)—'প্রাণই প্রাণের (স্বীয় শক্তির) সাহায্যে গমন করে, প্রাণ প্রাণকে দান করে এবং প্রাণেরই উদ্দেশ্যে দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য; প্রাণই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ দাতা, দেয় ও গৃহীতা প্রভৃতি সমস্তই প্রাণস্বরূপ—তদতিরিক্ত কিছুই নাই।' সনৎকুমারের এই কথা থেকে আমরা বুঝি যে বিশ্বচরাচরে প্রাণ একটিমাত্র—প্রাণের বহুত্ব নাই। জীবে, উদ্ভিদে, সমস্ত কিছুতে যে প্রাণশক্তি আমরা অনুভব করি তাহা এক এবং অদ্বিতীয়। পিতা, মাতা, ভাই, বোন, বন্ধু, বান্ধব, আচার্য, ব্রাহ্মণ, কেহই প্রাণের অভাবে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না—প্রাণই একা সকলের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। অতএব পিতা মাতা ইত্যাদি নামগুলি প্রাণেরই মহত্ত্ব, অর্থাৎ একমাত্র প্রাণ জগতে বহুরূপী হয়ে আপনাতে আপনি অবস্থান করছেন।

ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা এ প্রাণকে অনুভব করি। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, উচ্চারণ ও রসাস্বাদন দ্বারা প্রাণ যে আছেন তা অনুভূত হয়—প্রত্যক্ষ হয়।

প্রাণের সংকল্পেই মন্ত্র হয়; প্রাণবান্ ব্যক্তিই অধ্যয়ন করতে পারে—চিন্তা করতে পারে। প্রাণহীন অচল ব্যক্তি পারে না।

শরীরের ন্যায় প্রাণও জড় পদার্থ—অচেতন বস্তু। প্রাণ যে অচেতন তার প্রমাণ এই যে নিদ্রাবস্থায়ও (সুষুপ্তি অবস্থায়ও) প্রাণের কার্য অবিচ্ছেদে চলতে থাকে, কিন্তু কোনরূপ চৈতন্য থাকে না। প্রাণ অন্নময়; অন্নই প্রাণকে বর্ধিত করে। আর আত্মা আনন্দময়; আত্মাই চৈতন্য।

তাই প্রাণ আত্মা নয়। কথায়ও বলে—'আমার প্রাণ', কিনা, আমি বলে যে জীবাত্মা, তার প্রাণ; আমি প্রাণ কখনো বলে না। 'আমি' (জীবাত্মা) প্রাণের উপরে—প্রাণের মালিক।

প্রাণকে প্রজ্ঞাত্মা বলা হয়—কারণ প্রজ্ঞা প্রাণেই সমর্পিত আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াচরিত পাপ দ্বারা প্রাণও বিদ্ধ হয়। প্রাণ পাপবিদ্ধ। হলেই সুগন্ধ দুর্গন্ধ গ্রহণ করে। তাই যাতে প্রাণের বিশুদ্ধি হতে পারে সে উদ্দেশ্যে বাক, চক্ষু, কর্ণ ও মনকে উপাসনা দ্বারা পবিত্র করে নিতে হয়, যাতে তারা বিষয়ে আসক্ত না হয়।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

এ মাসের প্রচ্ছদপট

নিকোলাস ভ্যাসিলিভিচ গোগোল

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়া, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অঙ্কুরোদগমও সেদিন হয় নি। সাধারণের অধিকার, মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক দাবী সম্বন্ধে সচেতনতাও সেদিন অনুপস্থিত। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অঙ্গুলিহেলনে সারা রাশিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, রাজশক্তির এবং রাজার আশেপাশে যাঁরা—তাঁদের খুশিমর্জিমাফিক রাশিয়ার সব কিছু চলছে তখন। সাধারণ নরনারীর কণ্ঠস্বরকে তিলমাত্র মূল্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি তাঁরা। রাশিয়ায় সেদিন জারেদের আধিপত্য। আলেকজাণ্ডাররা-নিকোলাসরা সেদিন রুশীয় সিংহাসনে।

সেই পরিবেশে, দেশের সে হেন অবস্থা যে সময়ে, সেই সময়ে প্রকাশিত হল— 'ইনস্পেক্টার জেনারেল।' রুশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়ে সরস বিদ্রূপাত্মক রচনা আর অতি প্রচ্ছন্ন অথচ প্রাঞ্জলভাবে তীব্র কশাঘাত; সে হেন সময়ে এ ধরণের গ্রন্থ লেখা নিঃসন্দেহে অসাধারণ দুঃসাহস এবং অপরিসীম সত্যনিষ্ঠার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই বলিষ্ঠ এবং দুঃসাহসিক গ্রন্থের রচয়িতা গোগোল।

পুরো নাম, নিকোলাস ভ্যাসিলিভিচ গোগোল। ১৮০৯ সালে জন্ম। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যক্তিত্ব তিনি। দ্বিতীয়ার্ধ সুরু হওয়ার প্রাক্কালে তিনি পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে নিয়েছেন গৌরবময় প্রস্থান। পরমায়ু মাত্র তেতাল্লিশ বছর নির্দিষ্ট রেখেছিল তাঁর জন্যে। কিন্তু এ ধারণা তো অনায়াসে করা যেতে পারে যে, তাঁর প্রতি পরমায়ু যদি এই যুক্তিবিহীন কৃপণতা প্রকাশ না করত তা হলে শুধু রাশিয়ারই নয়, বিশ্বের সাহিত্যজগৎ আরও বহুলাংশে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হতে পারত এই মহান শিল্পীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী এবং শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে।

গোগোলের আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি—'ডেড সোলস'।

রাশিয়ার রাজনৈতিক চেহারা আজ বদলেছে, রাষ্ট্রনীতির পরিমণ্ডলে নতুন বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু বহুকাল পূর্বে যিনি এর ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন সেই মনস্বী স্রষ্টাকে সেই দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে—তিনি শুধু দিকপাল কথাকারই নন, জাতীয় গণচেতনারও এক নমস্য অগ্রদূত।

মথুরা ভাস্কর্য

কুষাণ (৭৮-২০০ খ্রীস্টাব্দ)

মথুরা কুষাণরাজ কণিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের রাজ্যের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। কুষান সম্রাটদের রাজধানী ছিল পুরুষপুরে।

ঐ স্থান এখন পেশোয়ারের অন্তর্গত। মথুরার বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করদের ত্রিমাত্রিক মূর্তি ব্যতীত, আলঙ্কারিক সূত্রে প্রচুর বহুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিশেষভাবে শালভঞ্জিকা মূর্তিগুলিকে ভিনসেণ্ট স্মিথ রুচিবিগর্হিত বলে মত প্রকাশ করেছেন—উহাদের নগ্নতা ঐতিহাসিকপ্রবরকে বিশেষভাবে আহত করেছিল—তিনি উহা সহ্য করতে পারেন নি। উহাদের ছান্দিক ভঙ্গী দেখে তিনি বলেছেন উহারা নর্তকী। এখানে মনে রাখা উচিত কলারসিক ও ঐতিহাসিকের অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মূর্তিগুলি আগ্রা অঞ্চলে প্রাপ্ত রক্তবর্ণ বেলে প্রস্তরে নির্মিত। যে সকল বৃক্ষ অবলম্বন করে মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছে, স্মিথ উহাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি।

পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ ঐগুলিকে শালভঞ্জিকা মূর্তি বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং বৃক্ষগুলিরও পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের মতে বৃক্ষগুলি কদম্ব ও অশোক, অন্য জাতীয় বৃক্ষ থাকলেও উহাদের মধ্যে কদম্বই সংখ্যায় অধিক। লক্ষ্ণৌ ও মথুরা মিউজিয়ামে বহু শালভঞ্জিকা মূর্তি রক্ষিত আছে। ঐ বৃক্ষলগ্না মূর্তিগুলি অধ্যয়ন করলে সহজেই অনুমিত হয় ঐ মূর্তিগুলি ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে বা কোন প্রকার নৃত্যলীলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মিত হয় নি—ভারত শিল্পের ঠাম বা ভঙ্গ ভাস্কর্যে ও চিত্রে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়।

সিন্ধুর ধাতুনির্মিত কোমরে হাত দেওয়া মূর্তিটিকে যেহেতু উহার একটি হাত কোমরে ন্যস্ত আছে সেইহেতু উহাকে নর্তকী পর্যায়-ভুক্ত করা হয়েছে। নৃত্যের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিশ্রামসময়ে কি কোমরে হাত দেওয়া নিষিদ্ধ? এভাবের ব্যাখ্যা দ্বারা দর্শক বিভ্রান্ত হয় এবং শিল্পের ও ক্ষতি হয়। ভারতের প্রায় সর্বপ্র[...] মূর্তি উহাদের ভাবরহস্যের স[...] পরিপূর্ণ সঙ্গতি রেখে কখনও সমভ[...] আভঙ্গ কখনো ত্রিভঙ্গ ও অতি[...] ঠামে মূর্তি নির্মিত হয়। ভার[...] ভাস্কর্যে মূর্তিগুলির পদাঙ্গুলী থেকে [...] পর্যন্ত ভাব-শৃঙ্খলে বন্দী—প্রত্যে[...] অঙ্গের মধ্যে শিল্পী স্বতন্ত্রভাবে [...] প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন—[...] দেহকে তাঁরা অনন্ত প্রাণময়বিশ্বের [...] ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করেন। বি[...]

অভ্যন্তরে যে বস্তু যে উপাদান ও নিহিত আছে দেহের বিভিন্ন কা[...] উহা তেমনিভাবে বিধৃত আছে। দে[...] প্রাণময় কোষের অভিব্যক্তির ভারতীয় শিল্পীর যে সাধনা ও

অবলম্বন করতে হয় অন্য দেশে উহা প্রয়োজন হয় না। বৃক্ষলগ্না মূর্তিগুলি বনদেবী, যক্ষী বা শালভঞ্জিকা যে-কোন নামেই উহারা চিহ্নিত হোক না কেন---স্মিথ সাহেব বলেছেন এগুলি অশ্লীল এবং খুব সম্ভব ইহারা হিন্দুদের পূর্ববর্তীকালে নির্মিত হয়েছে।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য এ ভাবের নগ্নতা জবথিত হয় নি। যে জাতি নগ্নমূর্তি বা সৃষ্টিতত্ত্বের মূর্তি ও শিবল সম্মুখে রেখে ঈশ্বরের সন্ধান করে---ঐ জাতির মানসিকতায় তলিয়ে না গেলে শ্লীল বা অশ্লীলের মোহ কাটতে পারে না। ভারতীয় ভাস্কর্যের সমালোচনা করার অর্থ হিন্দু ধর্মকে সমালোচনা করা---হিন্দু ধর্মকে জানতে হলে তার নগ্নতাকেও জানতে হবে---উহাও জীবনের একটি অবস্থা।

মথুরার একটি বেষ্টনীস্তম্ভে গভীর ভাবে ক্ষোদিত সালঙ্কারা বিগতযৌবনা পূর্ণস্বাস্থ্যবতী একটি নারীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, উহার আশ্রিত বৃক্ষ-শাখাটি কদম্ব কিন্তু পল্লবগুলির আকৃতি নাগকেশর বৃক্ষের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্য-যুক্ত---পত্রমধ্যস্থ বর্তুলাকার পুষ্পগুলির আকৃতি দেখে ইহাকে কদম্ব বৃক্ষ বলা হয়েছে, অর্থাৎ এই মূর্তির পশ্চাৎ-পটে কদম্ব বৃক্ষের প্রায় অর্ধবৃত্তাকার আকৃতির পল্লবগুলি যথার্থভাবে উৎকীর্ণ না হয়ে সমান্তরাল রেখার ন্যায় উৎকীর্ণ হয়েছে। মূর্তির পদতলে একটি শিশু-মূর্তি হামাগুড়ি দিচ্ছে। নারীমূর্তিটি শিশুর পৃষ্ঠদেশের উপর ত্রিভঙ্গ ঠামে দণ্ডায়মানা। ভারতীয় ভাস্কর্যে বিগ্রহ-মূর্তির পদতলে যে বামন দৈত্য উৎকীর্ণ হয়, উহার মেরুদণ্ড ভগ্ন, উহা চলৎশক্তিহীন---কিন্তু এ মূর্তিটি বিগ্রহ মূর্তি নয় পদতলের মূর্তিটিও ভগ্ন মেরু-দণ্ড নয়, উহার গতি আছে---এইজন্য ইহাকে বামন মূর্তি বলা ভুল হবে। নারী মূর্তিটি মেদবহুল হওয়ায় দেহে লালিত্যের অভাব সুস্পষ্ট, ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রসম্মত বিধান এই মূর্তিতে যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে নি---পায়ে যাঁতার ন্যায় সুবৃহৎ মল, কটিতে মেখলা, কণ্ঠে, বাজুতে ও কব্জীতে বিবিধ অলঙ্কার উহারা সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য-হীন ও সাধারণ শিল্পজ্ঞান নিয়ে নির্মিত হয়েছে। মূর্তির উত্তোলিত বাহুদ্বয় কদম্ব পুষ্প ও শাখায় সন্নিবিষ্ট। প্রলম্বিত স্তনযুগল ভারতীয় আদর্শে নির্মিত হয় নি এবং উহার মধ্যে যৌবন ও শ্রী আরোপিত হয় নি। নাভী গভীরভাবে ক্ষোদিত, মুখভাব শান্ত ও প্রফুল্ল, দেহের

তালবিভাগ বা অনুপাত ভারতীয় পদ্ধতি-সম্মত হওয়ায় ভাস্করের প্রাথমিক জ্ঞানের ত্রুটিগুলি তত পীড়াদায়ক হয় নি।

এভাবের অপর একটি বৃক্ষিকা-মূর্তির পদতলে ও একটি শয়ান শিশুমূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে---পূর্বের শিশু মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থায় আর এ মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে চিৎভাবে শয়ান অবস্থায়---বৃক্ষিকার একটি পা শিশুর দক্ষিণ বাহুর উপর, অপর পা তাহার মস্তকের উপর বিন্যস্ত করে নির্মিত হয়েছে। দুটি মূর্তিই এক ভাস্কর নির্মিত---ইহাদের গঠন ও নির্মাণ-কৌশলে উহা সুস্পষ্ট। শেষোক্ত মূর্তিটির কণ্ঠে একটি রত্নখচিত পৈত্রে আছে, ললনা দক্ষিণ হস্তে পৈত্রে আকর্ষণ করে রেখেছে, বাম বাহু নিম্নভাগে প্রলম্বিত। মূর্তির পশ্চাতে যে নাগকেশর বৃক্ষটি উৎকীর্ণ হয়েছে উহাতে বৃক্ষের পরিচিত্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট---বৃক্ষ, পল্লব ও শাখা প্রভৃতির কম্পোজিসানে উৎকৃষ্ট শিল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত হয়েছে। উভয় মূর্তির কেশবিন্যাস ও খোঁপার মধ্যে নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। মূর্তিটি প্রলম্বিত স্তনভারনতা, - শান্ত ও কমনীয় মুখ-কান্তিতে পবিত্রতা দৃষ্ট হয়।

বৃক্ষিকা বা বনদেবীর মূর্তিগুলির সঙ্গে বিভিন্ন বৃক্ষ সংযুক্তির মূলে ভারতীয় মানসিকতার একটি কাব্যিক তথ্য নিহিত আছে। কালিদাসের যুগ থেকে রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত উহা অব্যাহত আছে। নারীর চরণস্পর্শে অশোক বৃক্ষ মঞ্জরিত হওয়ায় একটি কাব্যিক ভাব-ধারা কবি কালিদাস-বর্ণিত কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। অশোক বৃক্ষের সঙ্গে নারীমূর্তিকে অধিক সংখ্যায় যুক্ত করার মূলে স্বাস্থ্যবুদ্ধি বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানগত তথ্য ভাস্করকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। অশোকবৃক্ষ স্ত্রী-ব্যাধির একটি ফলপ্রদ বিখ্যাত ঔষধ।

নারীমূর্তির সঙ্গে অশোকবৃক্ষের আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়া বা উহাতে পুষ্পিত করার জন্য পাদস্পর্শে উহাকে ধন্য করার প্রচেষ্টা বা ব্যবস্থা একটি কাব্যিক ভাবাদর্শ ব্যতীত অপর কোন প্রকৃত তথ্য ভাস্করকে সৃষ্টিকার্যে অনুপ্রাণিত করে নি।

অশোক তরুতলে রাজা অগ্নিমিত্র তাঁর প্রণয়িনী মালবিকা সহ এক নৃত্য-অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যেয়ে মালবিকা দেখতে পেলেন, তখনো অশোকতরু মঞ্জরিত হয় নি। তিনি রাজাকে বললেন, অশোক আমার পাদস্পর্শে পুষ্পিত [illegible]

আছে। তিনি নৃত্যকালে পাদস্পর্শে অশোককে পুষ্পিত করতে যেয়ে ব্যর্থকাম হয়ে ক্রোধভরে বললেন—এ বৃক্ষটি নীচ তাই আমাকে অপমানিত করেছে।

প্রসঙ্গত তন্ত্রশাস্ত্র বর্ণিত একটি ধারণা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। শাস্ত্রকার বলেন, ললনাগণের পদাঘাতে অশোক বৃক্ষ মুখমদিরাসেকে—বকুল ও কনিকার বৃক্ষ মুকুলিত হয়—আবার তাঁদের হাস্যে—আম্র ও নিম্ব, সঙ্গীতে—তিলক, নমেরু ও পিয়ালবৃক্ষ মুকুলিত হয়। শুধু মধুর বাক্য ও সম্ভাষণের দ্বারা—কর্ণিকা পুষ্পিত হয়।

শাস্ত্রকার পুনর্বার বলছেন—ললনাদের বক্ষের উষ্ণ আলিঙ্গনে কুরুবক সিন্দুবারের সবদেহ যৌবন-শ্রীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাঁদের সুকোমল করস্পর্শে কদম্ব বৃক্ষের সর্বদেহ পুষ্পাচ্ছাদিত হয়। তন্ত্র শাস্ত্রকার এ সকল বৃক্ষকে বলেছেন কুলবৃক্ষ। ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকায় ইহাকে এক প্রকার কাব্যিক যৌনতৃপ্তি বলা যেতে পারে।

শ্রুতিকার আবার—বিল্ব নিম্ব শ্লেষ্মান্তক (শোণ আলু) করঞ্জ, অশ্বত্থ, কদম্ব, বট, উডম্বর, ধাত্রী (আমলকী) চিঞ্চা ও তেঁতুল বৃক্ষকে পবিত্র ও কুলবৃক্ষের অন্তর্গত করায় জনসাধারণ এই বৃক্ষগুলি উৎপাটন বা ছেদন কার্যকে দোষাবহ মনে করেন।

ভাস্কর্যের সঙ্গে বিভিন্ন বৃক্ষশ্রেণী সংযুক্ত হওয়ার মূলে তৎকালীন কাব্য, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ কথা ও কাহিনী ভাস্করদের সৃষ্টিকার্যে প্রভাববিস্তার করেছিল।

অশোক বৃক্ষের পরে কদম্ব ভারতের জনমানসে এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে কদম্ববৃক্ষ গভীরভাবে বিজড়িত—কুষাণ যুগের মথুরা-ভাস্কর্যে এই কারণে কদম্বের প্রাচুর্য দেখা যায় মথুরায় অক্ষত অবস্থায় একটি স্তম্ভে সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি বৃক্ষিকা মূর্তি পাওয়া গিয়েছে—উহার বাম বাহু বৃক্ষ বেষ্টন করে দক্ষিণ হস্ত বৃক্ষের দল পত্রান্তরালে নিবিষ্ট করে রেখেছে। যুবতীর ঊর্ধ্ব অঙ্গের পরিপূর্ণতার সঙ্গে দেহের নিম্নভাগের সঙ্গতি ও রূপসৃষ্টিতে ভাস্কর সিদ্ধকাম হতে পারেন নি। নিতম্ব ও জঙ্ঘার শীর্ণতা এবং পদদ্বয়ের অতি বৃহৎ আকৃতির দল অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও পীড়াদায়ক। বদনমণ্ডলে মনোহর নারীসুলভ কমনীয়তা ও লজ্জা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চাৎ পটের পুষ্পিত কদম্বশাখা প্রকৃত কদম্বশাখার প্রতিচ্ছবি।

মথুরায় প্রাপ্ত রাজা কণিষ্কের দেহাংশ ও জনৈক কুষাণরাজের মস্তক
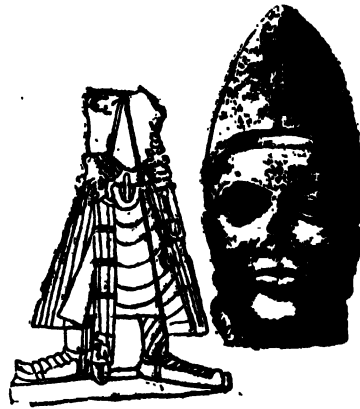
এখানে অপর একটি ভগ্নমূর্তির পশ্চাৎ-পটে চম্পকবৃক্ষের দলপল্লব ও পুষ্প অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। ইহার গভীর পত্রগুচ্ছ ও গন্ধপুষ্প সাহিত্যে কাব্যে ও শিল্পে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। অপর একটি লোকরঞ্জন বৃক্ষ নাগকেশর।

মথুরার ভাস্কর্য ব্যতীত ভারতের অন্য প্রান্তেও ইহার পুষ্পিত শাখা-ভাস্কর্য অত্যন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল—কোন কোন ভাস্কর্যে উদ্ভিদ-জগতের নির্মাণ-পারিপাট্যে প্রাণী ও মনুষ্যমূর্তিকেও অনেক সময় অতিক্রম করেছে। ভারত ভাস্কর্যেও এ ভাবের মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছে কিন্তু শিল্পমানে উহারা মথুরা মূর্তির ন্যায় উন্নত কলা-নৈপুণ্যের দাবী করতে পারে না।

কেরেলায় চম্পাবৃক্ষের প্রাচুর্যে দেখা যায়—ঘনকৃষ্ণ পল্লবযুক্ত নাতিদীর্ঘ বৃক্ষ—পাতাগুলি অনেকাংশে কাঠকরবীর পাতার ন্যায়—ফুলগুলি গুচ্ছবদ্ধ ও অত্যন্ত সুগন্ধি। এখানে বাম পাণিতলে অর্ধআচ্ছাদিত উপর্ণ [illegible]হস্তে একটি মধ্যবয়স্কা নারীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে উহার মস্তকের কেশগুচ্ছ পশ্চাৎদিকে পরিপাটি করে আঁচড়ান। কেশের সূক্ষ্ম কলাকর্ম প্রশংসার যোগ্য—ইহার নিম্নাংশ ভগ্ন অলঙ্কার অত্যন্ত সাধারণভাবে নির্মিত হয়েছে—কটিতে পাকান একখণ্ড স্থূল বস্ত্রখণ্ড জড়ান—এ মূর্তিগুলি সূক্ষ্ম-বস্ত্রপরিহিতা—জঙ্ঘা থেকে পা পর্যন্ত নিম্ন অংশটি পাওয়া যায় নি—দেহের ঊর্ধ্ব ভাগে কোন আবরণ নেই কণ্ঠে মটরমালা, নাভিপদ্ম গভীর—স্তন-যুগল মাতৃসুলভ বিলম্বিত ও স্থূল—কর্ণে বৃহৎ চক্রাকৃত কুণ্ডল, কটিতে মৎস্য-মস্তক সদৃশ্য মেখলা—বাহুতে বালা ও বহুসংখ্যক চক্রাকৃতি বালা সমগ্র বাহুকে স্প্রীং-এর ন্যায় জড়িয়ে আছে।

ঊর্ধ্ব বাহুতে বাজু-অলঙ্কার শিল্পে গুপ্ত-শিল্পীরা কিছুমাত্র দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। অলঙ্কার শিল্প সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল গুপ্ত যুগে। মূর্তির পশ্চাৎ পটের চম্পক-বৃক্ষের পত্র ও পুষ্পগুলি গভীরভাবে ক্ষোদিত হলেও প্রস্তরের বুকে যে কমনীয়তা সৃষ্টি করেছেন, ভাস্কর্য এভাবের লক্ষণ খুব সুলভ নয়। পত্র-গুলির সংগঠন-রীতিতে ও গভীর শিল্প-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রলম্বিত দক্ষিণ হস্তে একটি চম্পক কুসুম—ইহা একটি পূজারিণী মূর্তি। অত্যন্ত মসৃণ প্রস্তরে মূর্তিটি নির্মিত। অঙ্গহীন হলেও এ মূর্তিটি মথুরা ভাস্কর্যে একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

ইউরোপে বহু নগ্ন নারীমূর্তি নির্মিত হয়েছে—উহারা সম্পূর্ণ না হয়ে আংশিক ভাবে বিবসনা হয়েও নির্মিত হয়েছে—সম্পূর্ণ বিবসনার চেয়ে আংশিক বস্ত্রপরিহিতাদের মধ্যে যৌন কৌতূহল থাকে অধিক, সেভাবে নগ্ন ভারতীয় বৃক্ষিকা মূর্তিগুলি বিবসনা

অথচ সর্বাধিক অলঙ্কারশোভিতা—উহা নগ্নতাকে অধিক তীব্রতর করায় স্মিথ সাহেব বিব্রত হয়েছেন—সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত মূর্তির মধ্যে যে সরলতা থাকে ইহাতে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

মথুরায় এই নগ্না মূর্তিগুলিকে কোন কোন ঐতিহাসিক বনদেবীরূপে বর্ণনা করেছেন—এই দেবীবৃন্দ অশোকবৃক্ষলগ্না হওয়ার অর্থ বন্ধ্যা ললনা যদি অশোকবৃক্ষাশ্রয়ী দেবীর পূজো করেন—তবে তিনি তার সন্তান কামনা পূর্ণ করে থাকেন। ঐ কারণে তার পদতলে শিশু-মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে এভাবের মূর্তি নির্মিত হয় নি—ইহাদের মধ্যে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকে দ্বিতীয় শতকের অন্তবর্তী সময়ে প্রাপ্ত কণিষ্কের হস্ত ও মুণ্ডহীন মূর্তিটি ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—কটিতে রোমান তরবারির ন্যায় দুখানি দীর্ঘ তরবারি। উহা বেল্টের সঙ্গে রজ্জু বা চর্মনির্মিত ফিতায় আবদ্ধ-মূর্তির বামদিকের অসিমুষ্টিতে বামহস্ত আবদ্ধ ছিল। আঙুলের চিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট। দক্ষিণ দিকস্থ অপর অসিমুষ্টির উপর দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ছিল—আঙুলের অস্তিত্ব না থাকায় উহা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও ভগ্ন অঙ্গুলি চিহ্ন বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায় উহা অঙ্গুলি চিহ্ন। তাহলে মূর্তির আকৃতি বাহু না থাকলেও কল্পনা করা যায়। উভয় পার্শ্বস্থ অসিমুষ্টিতে উভয় হস্ত বিন্যস্ত অবস্থায় বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল। পাদুকা বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত—বক্ষোদেশ বা কটির উর্ধ্বদিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় পোষাক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না, তবে নিম্নাংশের পোষাক দেখে মনে হয়—অভ্যন্তরে একটি অন্তর্বাস ছিল, উহার উপরে একটি চাপকান জাতীয় পোষাক পরিধান করেছেন।

বিচ্ছিন্নভাবে একটি ভগ্ন মস্তক হস্তগত হওয়ায় উহার শিরস্ত্রাণ ও মুখের আকৃতি দেখে পণ্ডিতগণ উহাকে কোন কুষাণ সম্রাট বলে অনুমান করেছেন। সম্রাটের মস্তক থেকে তৎকালীন ভাস্করদের শিল্প-পদ্ধতির ধারণা করা যায়। এই যুগের ভাস্কর্য প্রত্যক্ষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিরস্ত্রাণের সঙ্গে ভারতীয় অপর কোন যুগের শিরস্ত্রাণের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এসব শিরস্ত্রাণ ধাতুনির্মিত কি চর্মনির্মিত উহা নির্ধারণ করা যায় না। বর্ম ও হতে পারে। এই শিরস্ত্রাণের সঙ্গে অসীরিয় বা পার্সী সম্প্রদায়ের শিরস্ত্রাণের বহু সাদৃশ্য আছে। কুষান নারী-

১০ম খৃস্টাব্দে মেডিয়াভেলযুগে মথুরায় প্রাপ্ত ধ্যানী বিষ্ণুমূর্তি। ধ্যানী শিবমূর্তিই অধিক দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুমূর্তির ধ্যানীরূপ কচিৎ দৃষ্ট হয়। শঙ্খ আসনের নিম্নভাগে, ভক্ত সুরগণের মধ্যে স্থাপিত। মস্তকের কিরীট ও মুকুটের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়

পুরুষ মূর্তির মুখ স্থূল—মাংসল আর্য মুখাকৃতির সঙ্গে যতটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়—দ্রাবিড় বা মোঙ্গলীয় আকৃতির সঙ্গে ততটা পাওয়া যায় না।

মথুরা ভারতীয় ভাস্কর্যকর্মের একটি প্রধান কলাকেন্দ্র ছিল—এখানে বহু বুদ্ধ মূর্তি যেমন নির্মিত হয়েছে হিন্দু দেবমূর্তিও তেমনি বহু লীলামাহাত্ম্যের মধ্যে রূপপরিগ্রহ করেছেন। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যযুগীয় এই ধ্যানমগ্ন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিটি মথুরা ভাস্কর্যের অন্তকালীন সৃষ্টিরূপে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—ইহাকে অধ্যয়ন করে মথুরার ভাস্করদের কর্মপ্রণালীর উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করা যেতে পারে—এ মূর্তি যখন নির্মিত হয়েছে তখন ভাস্করবৃন্দ ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে যে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন, উহা মূর্তির গঠন-পরিপাট্যে সুন্দরভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

শরীর কাণ্ড গোমুখাকারয়—পদদ্বয় পদ্মাসনবদ্ধ—হস্তদ্বয় ধ্যান বা যোগ মুদ্রায় নিবদ্ধ—কণ্ঠ-শঙ্খসমাধৃতত্ব বা ত্রিবলীভূষিত ধ্যান-নিমিলিত চক্ষু, গম্ভীর বদনমণ্ডল, মস্তকে কিরীট মুকুট—পশ্চাৎভাগে জ্যোতির্মণ্ডল, বক্ষে কস্তুভ মণি, কণ্ঠে রত্নহার, বাম স্কন্ধে স্বর্ণনির্মিত পৈতা—বাজু ও কব্জীতে বালা ও বাজু—অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট অলঙ্কারগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পদতলে চক্রচিহ্নও ভাস্কর উৎকীর্ণ করেছেন। ধ্যানরত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি অধিক দৃষ্ট হয় না—ভারতীয় ভাস্কর্য শিবকেই অধিক ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। পশ্চাৎ দিকের দক্ষিণ হস্তে কৌমোদকী নামক গদা—বাম হস্তে সুন্দর সুদর্শন চক্র—চক্রপ্রক্ষেপণ দণ্ডটিও উহার সঙ্গে সংলগ্ন। শঙ্খ ও পদ্মধৃত হস্তদ্বয় যোগমুদ্রায় নিবদ্ধ থাকায় শঙ্খ আসন সম্মুখে স্থাপন করে রেখেছেন—শঙ্খের আকৃতি অতি সুন্দর—উহা সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবাদর্শে নির্মিত। নারায়ণ পদ্মের উপর উপবিষ্ট—সম্মুখে ভক্তদেবমণ্ডলী সঙ্গীতরত—অন্তরীক্ষে সিদ্ধ ও দেবগণ প্রার্থনারত। মুকুট-সংলগ্ন সুবৃহৎ কুণ্ডলে কর্ণদ্বয় আবৃত—চরণে নূপুর এবং দক্ষিণ নিতম্বের উপর একটি ক্ষুদ্র জপমালা।

বসুমতীর

রূপকার

উপেন্দ্রনাথ

আমার এই জীবন-সায়াহ্নে স্মৃতি-কথার মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সুযোগ ঘটিবে কি না সন্দেহ। এজন্য আমি এই স্থলে ঠাকুরের পুরাতন ভক্ত, বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রের কথা কিছু লিখিয়া রাখিতে চাই। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত---তখন একদিন ঘরভরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অঙ্গুলিনির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এই ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থ কামনা করিয়া আসে-যায়।'

বটতলায় বৈষ্ণব বসাকদের বই-এর দোকানের অনতিদূরে রাস্তার পশ্চিম ধারে উপেন্দ্রের একখানি ছোট্ট বইয়ের দোকান ছিল। ধর্মপুস্তক কিনিতে গিয়া ---উপেন্দ্রের ছোট্ট দোকানঘরে রামগীতা, জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র, উত্তরগীতা প্রভৃতি পুস্তক দেখিয়াছি। কবীন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা', 'বর্ষবর্তন' ও 'সবিতা সুদর্শন' প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থের একমাত্র বিক্রেতা উপেন্দ্রই ছিল। আমি যে কত 'বর্ষবর্তন' ও 'সবিতা সুদর্শন' ঐ দোকান হইতে লইয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। পরে ঠাকুরের কাছে তাহার সহিত পরিচিত হইবার পর, আহিরীটোলায় তাহাদের বাড়ির কাছে একটি বড় তমালবৃক্ষ দেখিতে যাই।

উপেন্দ্রের সাধুসেবার অনুরাগ যে কিরূপ ছিল, সেই সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। ঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে স্বামীজী প্রমুখ আমরা কয়জন গুরুভাই যখন অনাথ-অসহায় অবস্থায় ব্যাকুলচিত্তে বরাহনগর মঠ হইতে কোনদিন কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত গিয়া---'ওয়া গুরুজী কী ফতে'---শ্রীগুরুর জয়ধ্বনি করিতে করিতে ঠাকুরের গৃহী-ভক্তগণের বাড়ি বাড়ি গিয়া, রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষুধাতুর অবস্থায় উপেন্দ্রর সেই ছোট্ট

স্বামী অখণ্ডানন্দ

দোকনটিতে পৌঁছিতাম। উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চ্যাঙারী নানা প্রকারের খাবার ও দোনা দোনা পান খাওয়াইয়া আমাদের তাজা করিয়া দিত। বীডন গার্ডেনের ধারে ছ্যাকরা গাড়ির আড্ডা ছিল। সেই গাড়োয়ানরা বরাহনগর, কাশীপুর। চার পয়সা হাঁকিত। ভাড়া দিয়া উপেন্দ্র আমাদের সেই গাড়িতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন যে উপেন্দ্র আমাদের খাওয়াইয়া বরানগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত, তাহা বলা যায় না, জ্ঞানানন্দ অবধূত (নিত্যগোপাল) তখন রামদাদার বাড়িতে থাকিত। সে প্রত্যহ বৈকালে উপেন্দ্রের দোকানে আসিয়া, ভিতরের অন্ধকার কুঠরিতে বসিয়া থাকিত ও উত্তমরূপে জলযোগ করিয়া একটু বেশী রাত্রে চলিয়া যাইত।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দে ঠাকুরের অন্তর্ধানের প্রায় ছয় মাস পরে আমি উপেন্দ্রের সেই অবস্থাই দেখিয়া যাই। প্রায় তিন বৎসর পরে স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে যখন উত্তরাখণ্ডে আমার দেখা হয়, তখন তাহারই মুখে শুনিলাম অনূন তিন বৎসরের মধ্যে উপেন্দ্রের আর্থিক অবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। সে তখন সঙ্গতিশালী। তাহার 'জ্ঞানাঙ্কুর' মাসিক পত্রিকার বেশ কাট্‌তি হইয়াছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় স্বামীজীর ঈশানুসরণ 'Imitation of Christ'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত। কিন্তু এক 'রাজভাষা' পুস্তকেই উপেন্দ্রর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

উপেন্দ্রর যে কিছু অর্থ কামনা ছিল তাহা বলিয়াছি। ঠাকুরের আশীর্বাদ এবং সাধুসেবার ফলেই তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। স্বামীজী বলিতেন যে, 'দ্যাখ, সেই উপেনের আজ কি হইয়াছে। সাধুসেবার প্রভাব যে কিরূপ আশুফলপ্রদ, তাহা উপেনকে দেখিলে বেশ বুঝা যায়।'

আমেরিকা হইতে আসিবার পর উপেন্দ্রকে দেখাইয়া স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন, উপেনের Business head---ব্যবসায়-বুদ্ধি খুব আছে। সেই সময়ে আমি সেখানে ছিলাম।

---মাসিক বসুমতী মাঘ ১৩৪৩।

বসুমতীর প্রবর্তক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ১৭ই চৈত্র (১৩২৫) সায়াহ্নে 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। উপেন্দ্রবাবুর সহিত 'সাহিত্যে'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৬ সালে উপেন্দ্রবাবু ৩নং বীডন স্কোয়ার হইতে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক একখানি মাসিক পত্রের প্রচার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' প্রকাশিত হয়। শিবপ্রসন্নবাবু চারি-পাঁচ মাস 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, অগ্রহায়ণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' আমার চোখে পড়ে এবং আমি উপেন্দ্রবাবুর সহিত পরিচিত হই। উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে এবং বর্তমানে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল, আমার অগ্রজতুল্য সুহৃদ মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আমি 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। আমার সহিত 'কল্পদ্রুমে'র কোনও আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না। প্রথমে বর্ষের 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নয় মাসে সমাপ্ত হয়। চৈত্র মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ গণনার ও নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করি এবং 'কল্পদ্রুম' বর্জন করিয়া 'সাহিত্য' নাম রাখি। কিন্তু ডাকঘরে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামে স্ট্যাম্পের টাকা জমা ছিল। এই জন্য প্রথম তিন মাস 'সাহিত্যে'র মলাটে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামও রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেও উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১২৯৭ সালের শেষভাগে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। আমি ১২৯৮ সাল হইতে 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে 'সাহিত্য' দিবার পর, বোধ হয়, ১২৯৮ সালে, উপেন্দ্রবাবু আবার 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পর্যায়ে সাহিত্যপরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফী 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' বন্ধ করিয়া দেন।

উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র প্রথম প্রবর্তক এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহার ও তাহার সম্পাদকের হিতৈষী ও অনুরাগী ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর সূত্রে জড়াইয়া নিয়তি আমাকে 'সাহিত্যে'র সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ মহাকালের ইঙ্গিতে কোথায় উড়িয়া গেল। উপেন্দ্রবাবু সেই ত্রিশ বৎসরের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। গত বৎসর কাগজের অভাবে 'সাহিত্য' বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। শত কার্যে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়াও উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র জন্য কাগজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' ও তাহার সম্পাদক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

উপেন্দ্রনাথের জীবন বৈচিত্র্যময়। তাহাতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা বাঙ্গালীর প্রণিধানযোগ্য। আশা করি তাঁহার জীবনকাহিনী বাঙ্গালীর অগোচর থাকিবে না।

১৭ই চৈত্রের (১৩২৫) 'দৈনিক বসুমতী'তে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উপেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

'উপেন্দ্রনাথের জীবন বৈশিষ্ট্যময়। দারিদ্র্যের বিদ্যালয়ে উপেন্দ্রনাথ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য শিক্ষা করিয়াছিলেন—জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি উৎসাহ ও উদ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, কর্মক্ষেত্রে তিনি সাফল্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার ক্ষমতায় বাঙলা দেশে আপনার যশ কালজয়ী করিয়া গিয়াছেন। বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ সন্ধানে একক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং সে প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার সহায় ছিল—আত্মশক্তিতে প্রত্যয়, সম্বল ছিল—আপনার অসাধারণ উৎসাহ। সেই সহায় সম্পদ লইয়া তিনি পদে পদে সাফল্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর যেন আপনার অসাধারণ নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া বাঙলার সাহিত্য প্রচারে ও সংবাদপত্রে নতুন আদর্শ স্থাপন করিয়া তিনি পূর্ণস্বত্ত্ব অবস্থায় অপরিণত বয়সেই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।'

'তিনি যখন সাহিত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন বাঙলায় এত পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। তখন মধুসূদন 'মহীর পদে মহানিদ্রাগত', বঙ্কিমচন্দ্রে প্রতিভাতপন মধ্যগগনে জ্যোতি বিস্তার করিতেছে, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় কেবল অরুণবিকাশসূচনা। তখনও 'বটতলা' বাঙলার পুরাতন সাহিত্যের দ্বারপাল; পরিষদের কল্পনা তখনও বিকশিত হয় নাই। সেই সময় উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পরিণতি 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে'। সেই সাহিত্য-মন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি নামমাত্র মূল্যে বাঙালীর গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়াছে। সেই মন্দির হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ, সঞ্জীবচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। এই সাহিত্য প্রচারই বোধ হয় তাঁহার নিয়তি-নির্দিষ্ট কার্য ছিল। যে ভাব বাঙলার নবীন সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল—সেই ভাবমন্দাকিনী ধনবাদেরই অধিগম্য ছিল। কিন্তু তাহাতে জাতির উদ্ধারসাধনের উপায় হইতে ছিল না। উপেন্দ্রনাথ ভগীরথের মত সাধনা করিয়াই সেই ভাবমন্দাকিনী বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিয়া বাঙালীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন

বসুমতী-প্রবর্তক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বসুমতী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উৎসবের একটি দৃশ্য। চিত্রে (ডান থেকে বাঁয়ে) স্বামী পূর্ণানন্দ, অনুষ্ঠান-সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার, উদ্বোধক শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে দেখা যাচ্ছে

—বাঙলার শ্মশানভস্মে জীবন-সঞ্চারের উপায় করিয়াছেন।

'পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের মধ্যে এক-একজন এক-একদিকে দিক্‌পাল; এক-একজন এক-এক বিভাগে কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মত উপেন্দ্রনাথও এক বিভাগে কার্যের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়াই রামকৃষ্ণের দেবত্বের নিদর্শন শেষবার বিকশিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দ গুরুর দেবত্বে সন্দেহ করিলে গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'এখনও তোর মনে সন্দেহ!' আর যেদিন তিনি দেহরক্ষা করেন, সেদিন উপেন্দ্রনাথ যেরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বটে। গুরু দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার শব জাহ্নবীপুলিনে শ্মশানে আনিয়াছিলেন—পথে উপেন্দ্রনাথ বিষধর-দশন-দষ্ট হইলেন। তিনি নীলবর্ণ হইয়া চলিয়া পড়িলেন। সে অবস্থায় কেহ জীবনলাভ করে না। কিন্তু একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই উপেন্দ্রনাথ জীবনলাভ করিলেন। যে জীবনের কাজ তখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে সে কাজ সম্পন্ন না করিলে তিনি ত' যাইতে পারেন না। তাহার পর সে কাজ শেষ হইয়াছে—বাঙলার নবভাবের প্রচার হইয়াছে। তাই বুঝি আজ তাঁহার অতর্কিত তিরোভাব। ইহাতে শোকের কারণ যতই থাকুক না, সান্ত্বনার প্রচুর অবসর আছে।

'সেই ভাববিকাশের অন্যতম উপায়—'বসুমতী'। বিবেকানন্দ যখন তাঁহার 'গুরুভাই' উপেন্দ্রনাথকে পুন: পুন: সংবাদপ্রচারে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তখন উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—'সাহস হয় না।' তিনি তখন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

তিনি তখন বাঙলা সাহিত্যের সাধনা করিতেছিলেন। তদবধি তিনি একাধিক পত্র প্রচার করেন—নানা কারণে সে সকলে স্থায়িত্ব সম্ভব হয় নাই। তাহার পর 'বসুমতী' প্রচার। 'বসুমতী' ২০ বৎসরকাল একইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একই সাধনা করিয়া আসিয়াছে। সে ভাব জাতীয় ভাব—দেশাত্মবোধের ভাব। সে সাধনা—মা'র সাধনা।

'যে 'সাহিত্য' আজ সমাজপতির সম্পাদকত্বে সর্বত্র সমাদৃত উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক। তখন বাঙলায় উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের অভাব ছিল—বিশেষ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হেতু তখনকার মাসিকপত্রগুলি সম্প্রদায়বিশেষেরই রচনায় সমৃদ্ধ হইত—নতুন লেখকদিগের প্রতিভা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য 'সাহিত্যে'র প্রচার,—উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক, সমাজপতি তাহার সম্পাদক।

'সামাজিক জীবনে উপেন্দ্রনাথ বিনয়ী, স্বধর্মনিষ্ঠ ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলেই লোক তাঁহার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইত, তাঁহার বিনয়ে আকৃষ্ট হইত। তিনি বহু লোকের উপকার করিয়াছিলেন, বহুলোক-প্রতিপালক ছিলেন। একসময় 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্র, 'হিতবাদী'র কাব্যবিশারদ ও 'বসুমতী'র উপেন্দ্রনাথ বাঙলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রত্রয়ের পরিচালক ছিলেন, উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদের শেষ। কাজেই তাঁহার আনন্দ ছিল, তিনি কখনও কাজ ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। মৃত্যু-ব্যাধিতে পক্ষকাল শয্যাগত থাকিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি কখনও এতদিন কাজ ছাড়িয়া থাকেন নাই।'

১৮ই চৈত্র (১৩২৫) দৈনিক বসুমতীতে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, উপেনের উদ্দেশে তাহা আমার সামান্য পুষ্পাঞ্জলি। তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

'বাঙলার বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতের ও 'বসুমতী'র 'উপেন মুখুয্যে'—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত ও তদীয় ভক্তমণ্ডলীর চিরপ্রিয় উপেন ধরার পান্থশালায় 'বাসাংসি জীর্ণানি' পরিহার করিয়া আনন্দধামে চলিয়া গেলেন। কর্মপ্রিয়, কর্ম-সর্বস্ব, কর্মবীর উপেন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞে মানব-জীবনের সমগ্র উদ্যম উৎসাহ অধ্যবসায় আহুতি দিয়া কর্মশেষে কর্মবন্ধন ছিন্ন করিলেন। ধর্মপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ-চরণ-কমলের মধুমত্ত ভৃঙ্গ উপেন অন্তিমে তাঁহারই নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে সেই চিরবাঞ্ছিত পদারবিন্দে শান্তি ও নিবৃত্তিলাভ করিলেন।'

'অনেক দিনের সম্বন্ধ, বহুদিনের বন্ধন, বহুকালের সুখ-দুঃখের স্মৃতি শ্মশানে ভস্ম হইয়া গেল। নৈমিত্তিক অপ্রীতির কালো মেঘের ছায়া আর কখনও নিজ প্রীতির উজ্জ্বল আলোক আচ্ছন্ন-ম্লান করতে পারিবে না। চিতার আলোকে অতীতের পটে উপেন্দ্রনাথের কর্মজীবন আজ যে বর্ণে যে রেখায় ফুটিয়া উঠিল, তাহাই ত' উপেন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপ।'

'সেই শৈশবে সহায়হীন, নিঃস্ব, নিরুপায় ব্রাহ্মণ-বটু সংসার-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, তথাপি ধরণীর চিরন্তন জীবন-দ্বন্দ্বে নবোদ্যমে সদা অগ্রসর ব্রাহ্মণ কিশোর, আর এই বহুজনের আশ্রয়, বহুজনের অন্নদাতা, বিশাল অনুষ্ঠানের কর্ণধার 'বসুমতী'র উপেন্দ্রনাথ—বিবিধ বিচিত্র অধ্যায়ে সুসম্পূর্ণ জীবন উপন্যাসের নায়ক উপেন্দ্রনাথ বাঙলার কর্মক্ষেত্রে 'সাধিলেই সিদ্ধির আদর্শ রাখিয়া গেলেন।'

কৈশোরে উপেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সেই দেবতার পূজাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। 'তস্য প্রিয়কার্য-সাধনম্' যদি 'তদুপাসনম্' হয় তাহা হইলে ভক্ত গৃহী উপেন্দ্রনাথ চিরজীবন তাঁহারই উপাসনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঙলায় অবতীর্ণ হইয়া বাঙালীকে যে মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্নরূপে তাহা স্বপ্রকাশ। উপেন্দ্রনাথের ঐহিক কর্মে সেই দেবতার আশীর্বাদ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ধর্মজীবনের উপযোগী কর্মজীবন গঠন করিবার জন্য স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ গৌড়ভূমির উর্বরক্ষেত্রে যে লোকশিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ললাটের স্বেদে সেই বীজে জলসেক করিয়াছেন। ইহাই ত' 'তদুপাসনম্'।

'উপেন্দ্রনাথের কর্মসূচনা ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। সাংসারিক প্রয়োজনে তাহার সৃষ্টি; ঐহিক ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার পুষ্টি; আপাতদৃষ্টিতে তাহা সংসারীর খেলাঘর বটে। কিন্তু এই ঐহিক কর্মের সিকতা-বিস্তারের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবাহিণী বহিয়া গিয়াছে তাহা সেই রামকৃষ্ণ-ভক্তির মন্দাকিনী, বাঙ্গালা দেশে তাহা জ্ঞানের ভাবের অমৃত বিতরণ করিয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিয়া, লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া, নবভাবের নতুন উচ্ছ্বাস বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিবার জন্য বটতলার সেই 'ছোট' কেতাবের দোকানখানির পত্তন করিয়াছিলেন, তাহার পর সেই ক্ষুদ্র সূচনা 'বসুমতী'র বর্তমান সাফল্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতার গুরুমন্ত্র প্রচারে সহায় হইয়াছিল,—জীবন-চরিত্রের পক্ষে এমন নির্দেশ লোভনীয় হইতে পারে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের জীবনে তদপেক্ষা শতগুণে বরেণ্য মহাসত্যের পরিচয় আছে। সে সত্য এই যে, উপেন্দ্রনাথ যে একবিন্দু গুরুকৃপা লাভ করিয়াছিলেন সেই পুণ্যে তাঁহার ঐহিক অনুষ্ঠানে ও জ্ঞানে অজ্ঞানে রামকৃষ্ণ-মন্ত্রের উপাসনা, রামকৃষ্ণপন্থী-দিগের কর্মব্রতে সাহচার্য সম্ভব হইয়াছিল। 'কয়লাকী ময়লা তব ছোড়ে, যব আগ করে পরবেশ।' আজ চিতাগ্নির জ্বালাময়ী লেখায় ভক্তের এই মহাবাণীই দেদীপ্যমান দেখিতেছি। উপেন্দ্রনাথের ব্যবসায়, বাণিজ্য, বেসাতির কয়লা সেই পুণ্য পাবকের স্পর্শে নির্মল তত্ত্বাবিস্তারের যন্ত্র হইয়াছিল।

'বসুমতী'র একজন প্রিণ্টার রাধিকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন—'এটা বসুমতী, অফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত'। ইহা সত্য। উপেন্দ্রনাথ এই সদাব্রতের ভাণ্ডারী ছিলেন। এই সদাব্রত হইতে ভাঁড়ারী উপেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ পুঁথি প্রচার করিয়া বাঙ্গালীকে মনের খোরাক যোগাইয়াছেন। অনেক বাঙ্গালীকে ক্ষুধার অন্নও দান করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ 'ভোগী'র দুর্ভাগ্য ভোগ করিবার দুষ্কৃতি লইয়া আসেন নাই। তিনি রামকৃষ্ণমণ্ডলীর একটা হাত-বাক্স। লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়াছেন; আর পাত্রসাৎ করিয়াছেন। সদাব্রত নয়?

'বসুমতী'র প্রবর্তক হইতে নিম্ন-পর্যায়ের সেবক পর্যন্ত সকলেই রামকৃষ্ণ-ভক্ত। এ সমবায় আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া এই ভক্তমণ্ডলীর গঠন করেন নাই। তিনি গুরুর কৃপায় যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই রামকৃষ্ণ-পরিবারে পরিণত হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ এই পরিবারের কেন্দ্রশক্তি ছিলেন। তিনি গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইলেন। নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুর আশীর্বাদে তাঁহার শক্তি তাঁহার পরিবারে অন্য আধার আশ্রয় করিবে। সর্বান্তঃকরণে আশা করি ও কামনা করি,—তাঁহার শক্তি, তাঁহার ভাব, তাঁহার গুরুর আশীর্বাদ, তাঁহার প্রতিচ্ছবি পুত্রে ফুটিয়া উঠিবে। —উপেন্দ্রকল্পিক এই রামকৃষ্ণ-পরিবারকে আরও সংহত করিবে; একসূত্রে গাঁথিয়া এক লক্ষ্যে ধরিয়া রাখিবে। এই আরম্ভ চরম পরিণতি লাভ করিবে।

এই প্রবন্ধটি 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিত ও ১৩৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

র্মবীর উপেন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

বর্তমান বৈচিত্র্যময় জগতের বক্ষে উদিত হইয়া যে সকল বিশিষ্ট কর্মী এই বাঙ্গলা দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসব—জাতীয় কর্তব্যরূপে গ্রহণীয়। কেন না তিনি তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টাকে একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহা হইল সুলভে জ্ঞানপ্রচার। ব্যক্তি ও সমাজকে জ্ঞাননিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত করিতে পারিলে রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণ করা হয়। সংবাদ-পত্রের দ্বারা এবং গ্রন্থ প্রচারের দ্বারা দেশবাসী যত অধিক শিক্ষালাভ করে, আর কোনও উপায়েই তাহা সম্ভবপর হয় না। উপেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যপরবশ হইয়া 'বসুমতী' সংবাদপত্র প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। সহায়-সম্পদ্ এমন কিছু ছিল না, যাহাতে তখনকার দিনে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সুষ্ঠুভাবে পরি-চালিত করা যায়। এখনকার মত পাঠক-সংখ্যাও তখন অধিক ছিল না, বিজ্ঞাপনদাতার সংখ্যাও ছিল পরিমিত, তথাপি উপেন্দ্রনাথ সংবাদ ও সৎ-সাহিত্য প্রচারকামনায় 'বসুমতী'কে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল দৃঢ় সঙ্কল্প এবং অসাধারণ পরিশ্রম। এই দুই গুণে তিনি কলিকাতার উত্তরাংশে (গ্রে স্ট্রীটে) বসুমতীকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করিতে পারিয়াছিলেন।

মধ্য কলিকাতায় (প্রেসিডেন্সী কলেজের সন্নিধানে) তখন 'বঙ্গবাসী' এবং পরে কলুটোলায় 'হিতবাদী' এই দুইখানি বৃহদাকার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত ও বহুল প্রচারিত ছিল। উপেন্দ্রনাথ এই নব-পরিকল্পিত 'বসুমতী'কে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্রের সম্মুখীন করিয়াও নিজের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত; শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ-সুন্দর ধর্মবাণীকে তিনি পুরোভাগে রাখিয়া মানবচিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন ও বাঙ্গলার অবিশ্বাসবিধুর তরুণচিত্তে ভগবদ্বিশ্বাসের বীজ রোপণ করিয়া-ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণের মুখপাত্র হইয়া বিশ্ব-সংসারকে যেভাবে আলোড়িত করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রকাশ ও প্রচার বাঙ্গলা দেশে 'বসুমতী' সংবাদপত্রের দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছিল।

উপেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি আজ সার্থক হইয়াছে। বঙ্গবাসী বা হিতবাদী আজ অস্তমিত। 'বসুমতী' আজ দীপ্তির সহিত বিরাজ করিতেছে। তাহার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংস্করণ আজ দেশের একটি সম্পদ। কে জানিত যে,—বহুল প্রচারিত বাঙ্গলা সংবাদপত্র দুইখানি তিরোহিত হইবে? শুধু উপেন্দ্র-নাথের দূরদৃষ্টি বুঝিয়াছিল যে, একদিন 'বসুমতী'ই বসুমতীর পৃষ্ঠে সগৌরবে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।

উপেন্দ্রনাথের জীবনকাল দীর্ঘ হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার সত্য-সঙ্কল্পের বল সঞ্চারিত হইয়াছিল তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্রে। যে 'বসুমতী' কতকটা দীনতার মধ্যে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারে নাই, সে 'বসুমতী' সতীশচন্দ্রের যত্নে বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছে। উপেন্দ্রনাথের হস্তরোপিত একটি বীজ আজ ফল-পুষ্পপল্লবসমন্বিত এক মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। উপেন্দ্রনাথের সঙ্কল্পিত সাধনার ধন আজ মান-মর্যাদায় ও গৌরবে বাঙ্গলার বিভূতি-রূপে সর্বাদৃত হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথের প্রেরণা এখনও অনুভূত হইতেছে। যাহার ফলে—

মনীষী সর্বশ্রী অশোককুমার, প্রাণতোষ, বিবেকানন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই বসুমতীর কর্ণধাররূপে সমবেত হইয়াছেন।

'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' আজ সত্যই দেবমন্দিরসদৃশ, এখান হইতে প্রকাশিত---মীমাংসাদর্শন, শঙ্করাচার্য গ্রন্থনিচয়, উপনিষদের অনুবাদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি প্রভৃতি ভারতীয় মনীষার মান-মঞ্জুষা---আজ কি সর্বসাধারণের দর্শনযোগ্য সম্ভবপর হইত?

উপেন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণের অপূর্ব লেখনীপ্রসূত অমূল্যগ্রন্থরাজি আজ সুলভে পরিবেশিত হইয়াছে। আজ এই শতবার্ষিকী উৎসবে উপেন্দ্রনাথের সাধনানুভূতিকে আমরা আমন্ত্রণ জানাইতেছি। নৈরাশ্যময় কোলাহল-চঞ্চল বাঙ্গালীর জীবনে পুনরায় একটি আশার স্নিগ্ধ প্রদীপ স্থির আলোক বিতরণ করুক।

এস হে উপেন্দ্রনাথ! বাঙ্গালীর হৃদয়ে তুমি দিব্যমূর্তিতে আসন পাতিয়া বস। তোমার আদর্শ, তোমার উদ্যম, অধ্যবসায়, তোমার সত্যসঙ্কল্প বাঙ্গলার জাতীয় জীবনকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুক আর তোমার 'বসুমতী' বসুমতীর পৃষ্ঠে সর্বজনপ্রিয় হইয়া বিরাজ করুক।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণং শরণং প্রপন্নং
জ্ঞানপ্রচার পরিকল্পিত বৃত্তপত্রম্।
উদ্ভাসিতাং বসুমতীং সুমতিং নয়ন্তং
শ্রদ্ধাবশাৎ স্মরত ভোস্তমুপেন্দ্রনাথম্॥

যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন---জ্ঞান প্রচারের জন্য যিনি সংবাদপত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন---ভীত-চকিত বসুমতীকে যিনি সুমতি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, হে দেশবাসী। সেই উপেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাবশত স্মরণ কর।

উপেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

নরেন্দ্র দেব

শতবর্ষ আগে তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু শাপভ্রষ্টের মতো জীবন-মধ্যাহ্নেই অস্ত যান।

'শতবর্ষ' শুনলে মনে হত----না জানি সে কতকাল। কিন্তু আজ 'বসুমতী'র জনক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই শতবার্ষিকী জয়ন্তী অনুষ্ঠানে এসে বারবার কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছে---সময় কত দ্রুত চলে যায়। শতবর্ষ কতটুকু এই মহাকালের মোহনায়?

এই তো সেদিনের কথা। ১৯১৯ সালের প্রারম্ভেও উপেন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে ছিলেন। আমাদের কৈশোরে ও যৌবনে এই জীবনযুদ্ধে জয়ী আশ্চর্য মানুষটিকে বহুবার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আশৈশব আহিরীটোলায় তাঁর মাতুলালয়ে দুঃখে-কষ্টে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। পাঠশালায় বোধোদয়ের সঙ্গেই তাঁর শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। মাতুল ছিলেন ঘড়ির দোকানের একজন কারিগর মাত্র। দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যেই শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করতে হয়েছিল তাঁকে। শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবেন, বাল্যবয়সে কোনও ডাক্তারখানায় তিনি শিশি-বোতল ধোয়ার কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু, লগ্নচাঁদা যে ছেলে সে কি দাসত্ব করবার জন্য জন্মেছে? গেলেন সেখান থেকে বটতলার এক ছোট্ট বইয়ের দোকানের সামান্য কর্মচারী হয়ে। মাসিক বেতন মাত্র পাঁচটাকা। বালক উপেন্দ্রনাথ মহা উৎসাহে এই কাজই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় অন্তরাল থেকে সেদিন প্রসন্নহাস্যে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কায়িক শ্রমকে যে হীনকাজ বলে মনে করে না, জীবনে তার উন্নতি অপ্রতিরোধ্য।

বটতলার সেই পুস্তক-প্রকাশক কোনও কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠানটি বেচে দিয়ে অন্য কিছু করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, দুঃসাহসী নিঃসম্বল উপেন্দ্রনাথ সেই বটতলার ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশকের দোকানটি মাতুলানীর কাছ থেকে টাকা ধার করে কিনে ফেললেন। নিঃসন্তান মাতুলানী পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করেছিলেন উপেন্দ্রনাথকে। তাঁকে অদেয় কী থাকতে পারে?

সেদিন হয়ত উপেন্দ্রনাথও জানতেন না যে তিনি বটতলার যে ক্ষুদ্র দোকানখানি স্নেহময়ী মাতুলানীর বদান্যতায় ক্রয় করেছিলেন তার মধ্যেই কোথাও সংগুপ্ত ছিল---তাঁর লক্ষ্মীর ঝাঁপি, তাঁর সৌভাগ্য---মন্দিরের সোনার চাবি।

দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠলো বটতলার সেই ছোট প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানটি। শুধু কেবল 'ধারাপাত', 'প্রথমভাগ', 'শুভংকরী' আর 'শিশুবোধক' বেচেই নয়; উপেন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ। তিনি অন্যান্য প্রকাশকদের পুস্তকাবলীও সংগ্রহ করে এনে বিক্রয় করতেন। তদানীন্তন জনপ্রিয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'মহিলা'র তিনিই ছিলেন একমাত্র বিক্রেতা ও পরিবেশক।

ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ হাসির ছড়া ও সামাজিক কেচ্ছার সন্ত্রাদানের চটি বইয়ের সে সময় প্রচুর চাহিদা ছিল। উপেন্দ্রনাথ এ সুযোগ নিতেও অবহেলা করেন নি। তার যতদূর শুনেছি 'রাজভাষা' বইখানি প্রকাশের পরই তার অভাবিত চাহিদা ও অসংখ্য বিক্রয়ের ফলে নিঃস্ব উপেন্দ্রনাথ অর্থশালী হ'য়ে ওঠেন।

আমরা ভাগ্যের সঙ্গে কঠিন

যুদ্ধে লিপ্ত দু:খী-দরিদ্র উপেন্দ্রনাথকে দেখি নি। আমরা যখন তাঁকে দেখি তিনি তখন বিত্তবান্ সম্পন্ন ব্যক্তি। সুন্দর সুপুরুষ সুকান্ত ছিলেন তিনি মাথাভরা কুঞ্চিত কালো কেশদাম। ধনী বিলাসীর মতো ছিল তাঁর সৌখীন বেশভূষা। সেদিন মোটর ছিল না, ট্যাক্সি ছিল না, সেকেণ্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি চড়ে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। উপেন্দ্রনাথের জীবনী অনুসরণ করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন পরদু:খকাতর দয়ালু মানুষ। তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্ব বহু লোককে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল।

তিনি প্রায়ই আসতেন তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু কুমারকৃষ্ণ মিত্রের ১৪ নং আহিরীটোলা স্ট্রীটের বাড়িতে। কুমারদা ছিলেন আমাদের আত্মীয়। গিরিডিতে তাঁর অভ্রের কারবার ছিল। উপেনবাবুকে দেখেছি আমরা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে আসতে। দেখেছি, ক্লাসিক থিয়েটারে "অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে আসতে; নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের লোভনীয় সঙ্গ করতে। প্রতি সপ্তাহেই ছুটতেন জীবন্ত-বিগ্রহ রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ও প্রণাম করতে।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অশেষ করুণালাভে ধন্য হয়েছিলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ উপেন্দ্রনাথকে সবিশেষ স্নেহ করতেন। মঠের স্বামী বিবেকানন্দ উপেন্দ্রনাথকে সবিশেষ স্নেহ করতেন। মঠের সন্ন্যাসীদের সবারই প্রিয় ছিলেন তিনি। তাই 'বসুমতী' অফিসে গেলেই আমরা দেখতে পেতুম সেখানে স্বামীজীদের প্রাধান্য।

উপেন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন মজ্‌লিসী মানুষ, তেমনি ছিলেন ধর্মানুরাগী ও মানবপ্রেমিক। তাঁর পুস্তক-প্রকাশন ব্যবসায় শ্রীমন্ত হয়ে উঠলো, চলে এলেন তিনি বটতলার নিন্দিত পল্লী ছেড়ে বীডন স্ট্রীটে। উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ না পেলেও উপেন্দ্রনাথ তখনকার দিনের পণ্ডিতমণ্ডলী শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন, তাঁর উদার হৃদয়বত্তার গুণে। সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদের অর্থাভাব তাঁকে পীড়া দিত।

নানা বৈচিত্র্যের ও দুর্ভাগ্য-পীড়িত ছিল তাঁর প্রথম জীবন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয় দেবীর কৃপাবঞ্চিত হয়ে তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হলেও, যৌবনে তিনি নিজ অধ্যবসায়ের গুণে দুজনেরই আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন। যারা দু:খ জয়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, দারিদ্র্যকে পরাস্ত করার দ্বন্দ্বযুদ্ধে কঠিন পণ নিয়ে অগ্রসর হয়, অভাবকে অগ্রাহ্য করবার মত্রে মনের বল যাদের থাকে, জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে জয়তিলক্ অর্জনে তারাই সক্ষম হয়।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই জীবন-যুদ্ধের একজন আদর্শ বিজয়ী বীর। তাঁর জীবনের এই প্রাথমিক সংঘাত দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। কারণ, তিনি ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় বিশ বৎসর পরে পৃথিবীর আলোয় আমি চোখ মেলেছি। আজ থেকে বাহাত্তর বছর আগে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তখন আমাদের বয়স আট-নয় বছরের বেশী নয়। সংবাদপত্রে তখন 'খেলাধূলা'র কথা থাকতো না 'ছোটদের পাতা'ও ছিল না। কাজেই, খবরের কাগজের খবর আমরা রাখতুম না বটে, কিন্তু সেই বিপুলকায় 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' ও 'বসুমতী' আমাদের খেলার সঙ্গী ছিল। নৌকা, স্টীমার, জাহাজ, গাধার টুপী, বোটজামা, চাউস ঘুড়ি কত কি তৈরী করতুম সেই কাগজ দিয়ে। একবার খেলাঘরের রঙ্গমঞ্চও তৈরি করেছিলুম এইসব দিগ্‌গজ-প্রলয় খবরের কাগজ দিয়ে। সেটা ১৯০৩ সাল। আমার বয়স তখন ষোল। তরুণ কিশোর। আর উপেন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ যৌবন। জীবনযুদ্ধে জয়ী এক আদর্শ পুরুষ তিনি।

কিন্তু তাঁর জীবনের সঙ্গে যখন পূর্ণ পরিচয় ঘটলো তখন আমি একুশ বছরের যুবক আর উপেন্দ্রনাথ তখন চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু যৌবন তখনও তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে রয়েছে। সেই কুঞ্চিত কালো কেশদাম, সেই ত্রকরকৃষ্ণ গুম্ফ, দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ। চল্লিশের পরেও তিনি ছিলেন রূপবান পুরুষ। দেখলে নারী-পুরুষ উভয়েই মুগ্ধ হতেন।

এ সময় উপেন্দ্রনাথের ভাগ্যদেবী সবিশেষ সুপ্রসন্না। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' প্রকাশের পরই দু:সাহসী উপেন্দ্রনাথ গ্রে স্ট্রীটে তাঁর কারবার তুলে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানেও আর স্থান সংকুলান হয় না। বড়ো বড় বাড়ি চাই অফিসের জন্য, প্রশস্ত স্থান প্রয়োজন ছাপাখানা তুলে আনবার জন্য। এগিয়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু আহিরীটোলার কুমারকৃষ্ণ মিত্র।

বহুবাজারের বিরাট বাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমি কুমারদের উৎসাহে ও প্ররোচনায় তিনি কিনে ফেললেন বটে, কিন্তু অত টাকা তাঁর ছিল না। কুমারদা সাহস দিলেন, টাকা ধার-কর্জ করেও কিনে ফেল। এই সম্পত্তি থেকেই যা আয় হবে তাইতেই দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে। ভয় পাবার কিছু নেই। কুমারকৃষ্ণ মিত্র বিষয়ী ও ব্যবসায়ী লোক। উপেনবাবুও দু:সাহসী। টাকা ধার করেই কিনে ফেললেন বৌবাজারের সম্পত্তি। বিষয়বুদ্ধি ছিল তাঁর সহজাত সম্পদ। অবিলম্বে ক্রীত সম্পত্তির আয় থেকেই তিনি ঋণমুক্ত হয়েছিলেন।

সাপ্তাহিক বসুমতী কী করে 'দৈনিক বসুমতী'তে রূপান্তরিত হ'ল সেই ইতিহাসটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো।

১৯১৪ সাল। ইউরোপ হতে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমাদের জীবনে আমরা পর পর ৬টি যুদ্ধ পেয়েছি—বুয়োর ওয়ার, ইজিপ্টের যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আর ইংলণ্ডের ছাট রাজ-রাণীর অধীনে পরাধীন দাসত্ব-জীবন

যাপন করেছি—যথা কুইন ভিক্টোরিয়া, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড, চতুর্থ জর্জ অষ্টম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ এবং কুইন এলিজাবেথ। তারপর; মূঢ়ের মতো দেশ বিভাগ করে আজ বিশ বছর ধরে স্বাধীনতা ভিক্ষা পেয়েছি এবং পৃথিবীর দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে অন্ন-বস্ত্রের জন্য অর্থী ও প্রার্থী হয়ে কোনও রকমে বেঁচে আছি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় উপেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যুদ্ধের সংবাদ জানবার জন্য প্রতিদিন জনগণের সে কি ঔৎসুক্য। সেই ঔৎসুক্য মেটাবার জন্য উপেন্দ্রনাথ বার করেছিলেন 'দৈনিক বসুমতী'। এ খানিই বাংলার প্রথম 'সান্ধ্য দৈনিক', 'বসুমতী টেলিগ্রাফ' নামে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল।

আজ সেই 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকাই 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের' প্রধান বিগ্রহ বলা চলে। সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন বলে উপেন্দ্রনাথ তাঁর সদগ্রন্থ প্রচার ও প্রকাশ বন্ধ করেন নি। উপেন্দ্রনাথের কৃপায় আজ ঘরে ঘরে বিবিধ শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস-পুরাণ, বৈষ্ণবকাব্য-পদাবলী ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রত্নগুলি বাংলার ঘরে ঘরে ও প্রতি পাঠাগারে শোভা পাচ্ছে। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

তরুণ বয়স থেকেই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর স্বনামধন্য শিষ্যগণের নিয়ত সঙ্গ করার ফলে উপেন্দ্রনাথ বিবাহ করে সংসারীর জীবনযাপন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব স্বয়ং তাঁকে বিবাহ করে সংসারী হবার আদেশ দেন। এবং তাঁর নিজেরই পূর্বপরিচিত ঘরের একটি সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। কন্যার নতুন নাম করেছিলেন তিনি ভবতারিণী। উপেন্দ্রনাথের পত্নী রূপসী না হলেও সুগৃহিণী ছিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী ভবতারিণীর কৃপায় উপেন্দ্র-নাথের সংসার প্রাচুর্যে উথলে উঠেছিল।

১৯১৯ সালের ৩১শে মার্চ একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্রকে রেখে অকালে উপেন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হলেন। সতীশচন্দ্র তখন সবে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন 'বাপকো বেটা'। সুযোগ্য সন্তান। পিতৃসুকৃতি সমস্তই তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং ব্যবসায়ে প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। সমসাময়িক সমস্ত সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর শুধু হৃদ্যতাই নয় আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব ছিল। তাই মাসিক বসুমতী প্রকাশ করতে না-করতেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবাসী ও ভারত-বর্ষকে পশ্চাতে ফেলে মাসিক বসুমতী আজও সগৌরবে আপন প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সতীশচন্দ্রের সুযোগ্য জামাতা সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের পরিচালনায় মাসিক পত্রখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র তাঁর পিতার মতোই খেয়ালবশে মাঝে ইংরেজী দৈনিক বসুমতী প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজী দৈনিককে সে সময় প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল বটে, অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগেই বুদ্ধিমানের মতো তিনি কাগজখানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, সতীশচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁর একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র যিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, তাঁর অকাল-বিয়োগ ঘটে। এই শোকের শেলাঘাত বোধ করি সহ্য করতে না পেরে সতীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নীরও শরীর ও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং তাঁরাও অসময়ে সংসার থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। কিন্তু যাবার আগে 'উপেন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতাল' ও 'রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়' বহুলক্ষ টাকা দান করে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই উপেন্দ্র শতবার্ষিকীর সন্ধ্যায় তাঁদের তিনপুরুষের অনুরাগী বন্ধু ও গুণমুগ্ধরূপে আমার অন্তরের অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

প্রৌঢ়ত্বে

মানুষ প্রথম সত্যিকার অবসর পায়। কর্মময় অবসর।

প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন অপূর্ণ স্বপ্ন থাকে, থাকে কোনও অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা। মধ্যবয়সে, ছেলে-মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হলে, সংসারের দায়িত্ব তুলনায় অনেক হালকা হলে, সে অবসর পায় অপূর্ণ স্বপ্নসিদ্ধির। পূর্ণ অবসর গ্রহণের তখনও সময় হয় নি, অথচ দায়িত্ব কমেছে—এই সময়ই সাধ মেটানোর পক্ষে প্রকৃষ্টতম। এবং তখন নিজের কাজের জন্য প্রতিবেশীর কাছে সাফাই গাওয়া নিষ্প্রয়োজন। জীবন তখন তার নিজের, স্বপ্নও তার—অন্য কারুর নয়।

যে মানুষ নিজের মানসিক ক্ষতির প্রাক্ হিসেব নিয়ে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখে না, সে বস্তুত নিজেকে দুভাবে উপকৃত করে—সে কেবল প্রৌঢ়ত্বের অনিবার্য যন্ত্রণাই লাঘব করে না, পরবর্তী জীবনের আরও বেদনাময় অবস্থা এড়াতে সক্ষম হয়। পরিবর্তিত জীবনের সংগে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে সে যে উপায় উদ্ভাবন করে তা তাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত, অবসর গ্রহণের পরবর্তী-কালেও, সমানে সাহায্য করে।

প্রৌঢ়ত্বে জীবনের প্রথম পরিণতি। যা পাওয়ার ছিল মানুষ তা এই বয়সে পেয়ে যায়। বুঝতে পারে যৌবনের অপূর্ণ আশা কুহকিনী। সাংসারিক দেনাপাওনার হিসেব চুকিয়ে স্থিত হওয়ার প্রথম কাল প্রৌঢ়ত্ব। এই অবসরে সাধ্যায়ত্ত ইচ্ছাপূরণ জীবনকে সুখী করে, বাঁচার প্রেরণা দেয়।

তন্ত্র-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

তান্ত্রিক প্রক্রিয়া—শবসাধনা

এখন শব সাধনার কথা বলি। শব সাধনা সম্পর্কে শোনা যায় ঘোর অমাবস্যা রাত্রের নিশাথে কোন অপঘাতে মৃত চণ্ডালের শব সংগ্রহ করতে হবে অতি গোপনে। পরে কোন মহাশ্মশানে গিয়ে সেই রাত্রেই শবটিকে উত্তান বা চিৎভাবে শায়িত করে---তার হাত ও পদ বিস্তৃত করে দিতে হবে। আর চারটি খোঁটা পুঁতে শবের হস্তপদ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করতে হ'বে। তারপর সাধককে একপাত্র সুরা ও একপাত্র চরু নিয়ে শবের বুকের উপর বসে মন্ত্র জপ করে যেতে হবে নির্ভয়ে। সাধকের কাছেই কিছুদূরে উপস্থিত থাকবেন গুরু---যাঁর তান্ত্রিক নাম উত্তরসাধক অর্থাৎ যিনি সাধকের থেকে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছেছেন। তিনিই রক্ষা করবেন সাধককে সমস্ত বিঘ্ন ও বিপদ থেকে। সাধক যখন দেখবেন যে, শব তাঁকে আসনচ্যুত করবার চেষ্টা করছে---তখন ঐ সুরা বা চরু পর্যায়ক্রমে শবের মুখে দিয়ে নিরস্ত করবেন তাকে---ইত্যাদি অতি ভয়াবহ ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ড ঘিরে আছে ঐ শবসাধনাকে।

এ বিবরণ শুনলে সাধারণ মানুষ তো সভয়ে শতহস্ত দূরে সরে যাবেন, সাধনার সংকল্প পরিত্যাগ করে। কিন্তু এই সব রোমাঞ্চকর বিবরণকে ভেদ করে যদি ঐ শবসাধনার গূঢ় রহস্যটুকু বুঝে নিতে পাই---তাহলেই দেখব ঐ বিবরণের মূলে কি সত্য বিরাজ করছে। সেইভাবে দেখা যাক এ বিবরণের মূলে পৌঁছান যায় কি না।

যদি শরীরবিজ্ঞানবিশারদদের মতে ব্যাখ্যা করা যায় ঐ প্রবাদগুলির তাহলে একটি সার্থক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পাই। এখানে আবার একবার বলে দিই যে তন্ত্রের সাধনা যে শরীরবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত---তা পূর্বাচার্যরা বার বার বলে গিয়েছেন নানাভাবে---বিশেষ করে এদেশে প্রচলিত দেহতত্ত্বের গানগুলি থেকেই তার

সত্যবান

নির্দেশ পাওয়া যায়। সন্ধানীরা জানেন যে---বৌদ্ধ আচার্যরা সন্ধ্যা ভাষায় যে 'চর্যাপদ' নামে গানগুলি রচনা করে গিয়েছেন---তারও ভিত্তি ঐ দেহতত্ত্ব। সেই থেকে বৈষ্ণবদের গীতিকাব্যে ও শাক্তদের পদাবলীতেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে ওই দেহতত্ত্বের। এখানে কেবলমাত্র রামপ্রসাদের একটি গানের উল্লেখ করেই বক্তব্য শেষ করি---অন্যথা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এ প্রবন্ধ। রামপ্রসাদের গানটি এই---

কালী কালী বল রসনা রে।

*   *   *

(ও মন) ষট্‌চক্র রথমধ্যে
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।
তিনটে কাছি কাছাকাছি
বাঁধা আছে মূলাধারে।।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়
রথ চালায় দেশ দেশান্তরে।
(ও মন) ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস
শীতল হ'তে অন্তঃপুরে।।
---ইত্যাদি।

ষট্‌চক্র তো এই দেহের মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু সেগুলি কি, কেমন ও কোথায় তা জানতে হলে প্রয়োজন দেহের অভ্যন্তরভাগের জ্ঞান আহরণ করা বা সাদা কথায় অ্যানাটমী ও ফিজিওলজীর জ্ঞানলাভ করা। তিনটে কাছি বলতে তো বোঝায় ইড়া, পিংগলা ও সুষুম্না। পাঁচ ক্ষমতা মানে পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু। রথ হচ্ছে এই শরীর। আর ত্রিবেণী হচ্ছে ঐ তিনটি কাছি বা নাড়ীর সংগম স্থান। এ সব তো মানুষের দেহের বাহ্য অংশটুকু দেখে বোঝবার নয়। বুঝতে হয় শবব্যবচ্ছেদ করে। সেই শবব্যবচ্ছেদেরই তান্ত্রিক নাম কি শবসাধনা ?

তাই তো সন্দেহ হয়। বিশেষ করে যখন জানি যে---দেহতত্ত্ব শব্দটির আর এক অর্থ হচ্ছে শরীরবিজ্ঞান। বাস্তবিক পক্ষে কি কর্ম আর কি ধর্ম যে-কোন বিষয়েই আমরা সিদ্ধিলাভ করতে চাই---তার প্রথম ও প্রধান সহায় হচ্ছে আমাদের এই শরীর। এই শরীরকে যদি বুঝে না নিতে পারি, যদি সুস্থ রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে না পারি তবে আর কি ফল ফলবে আমাদের জীবনে?

মনে পড়ে মহাকবি কালিদাস তাঁর রচিত 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যে ছদ্মবেশধারী শিবের মুখে একটি বাক্য পরিহাসচ্ছলে প্রয়োগ করেছেন---

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।।

শরীরই হচ্ছে সকল ধর্মসাধনের মূলস্বরূপ।

বাস্তবিকই এর মধ্যে একটি পরম সত্য উদঘাটিত হয়েছে। তাই এ বাক্য একটি জীবন্ত প্রবাদরূপে মুখে মুখে ঘোষিত হয়। আর শুধু আমাদের দেশেই নয়---অনুরূপ একটি প্রবচন ল্যাটিন ভাষাতেও শোনা যায়---

'নেন্ যান। এন্ করপোরে সানো॥

যার ইংরাজী প্রতিরূপ হচ্ছে---

'সাউণ্ড মাইণ্ড ইন্ এ সাউণ্ড বডি।'

এই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যেই তো মানুষ নানা বিধিনিষেধ পালন করে বা চিকিৎসকের পরামর্শমত ঔষধাদিও সেবন করে। তান্ত্রিক আচার্যরা চেয়েছিলেন প্রত্যেক মানুষকে শরীর সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে, তবে না মানুষ সুস্থ শরীরের সহায়ে সুস্থ-মনোবৃত্তি লাভ করে সার্থক সমাজ সৃষ্টি করতে পারবে।

কিন্তু যা বলছিলাম, দেহতত্ত্বের গান বিশ্লেষণ করলেই জানা যায় যে, শরীরবিজ্ঞান দেহের অভ্যন্তর ভাগের যে বর্ণনা দেয়, তারি কথা বলা হয়েছে ভিন্ন নামে। অর্থাৎ তান্ত্রিক পরিভাষা ও সংকেতগুলি, আয়ুর্বেদের পরিভাষা ও সংকেত থেকে বেশ বিভিন্ন ---যদিও লক্ষ্য তাদের একই। তন্ত্রের সংগে আয়ুর্বেদের আর এক বিশেষ পার্থক্য এই যে---আয়ুর্বেদ যেখানে ঔষধ ও আহারের অর্থাৎ বহিরাগত বস্তুর প্রয়োগে দেহীর বলাধান করে---তন্ত্র সেখানে কেবল এই দেহের অন্তরস্থিত বস্তুগুলির সম্বন্ধে দেহীকে সচেতন ক'রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পথ দেখায়। আর শরীরের ভিতরকার সম্বন্ধে জানতে হলে শব ব্যবচ্ছেদ তো অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু শব আহরণ সম্বন্ধে ঐ যে তান্ত্রিক প্রবাদ আমরা শুনি তার উৎপত্তি হলো কি করে? এ বিষয়ে বুঝতে হ'লে আমাদের জানতে হ'বে---বর্তমানে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের যে শবব্যবচ্ছেদ করানো হয়, তার জন্য শব কি ভাবে আহরণ করা হয়। এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলেন যে---শবব্যবচ্ছেদ করার জন্যে সেই সমস্ত শবই যাঁরা ব্যবহার করেন---যে সব শবের দাহাদি করবার লোক জোটে না, বা যে শব কেউ দাবী করে না।

এখন কি বেশ বোঝা যাচ্ছে না যে---তান্ত্রিকরা শবসাধনার জন্য যে শব সংগ্রহ করতেন, তা তাঁদের কত সন্তর্পণে সবদিকে লক্ষ্য রেখে তবে করতে হতো? কাজেই অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি ছাড়া তাঁরা শব সংগ্রহ করতেন না এবং কেবল অপঘাতে মৃত চণ্ডালের শবই নিতেন---যে শব স্পর্শ করবার পর্যন্ত লোক জুটতো না। গোপনে সে কাজ না করলে সমাজের সবাই যে তাঁদের বাধা দিতেন। যেমন আজো সবাই দেন, কোন শবের প্রতি কেউ যথেচ্ছ ব্যবহার করলে।

ব্যবচ্ছেদ করার জন্যে কেউই চান না আত্মীয়-পরিজনের শব চিকিৎসকদের কাছে দিতে---যদিও চিকিৎসকরা পারেন কোন শবকে ব্যবচ্ছেদ করার পরে, তা আবার নিখুঁতভাবে সেলাই করে দিতে, যা দেখে কেউই বুঝতে পারেন না সে শবকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল।

এ সম্বন্ধে বর্তমান কালের এক বিলেতফেরৎ ডাক্তার এই নিবেদন করেছিলেন যে---'বর্তমানে বহু ব্যক্তি এমনই দুশ্চিকিৎস্য রোগে মারা পড়ছেন যে, তাঁরা কি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তা নির্ণয় করাই সম্ভব হয় নি। যদি সেই সব মৃতের উত্তরাধিকারীরা ডাক্তারদের কাছে শবটি ব্যবচ্ছেদ করবার জন্যে দেন, তাহলে সেই সব অনির্ণীত রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব হয়। ব্যবচ্ছেদের পরে অবশ্যই শবটাকে এমনভাবে সেলাই করে দিতে পারবেন ডাক্তাররা যে, কেউ ধারণাও করতে পারবেন না যে, শবটিকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল।'

এ প্রস্তাবটি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকাতেই বের হয়েছিল---কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন উদারমনা ব্যক্তির খবর পেলাম না, যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির জন্যে ঐভাবে কোন সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। আজকে তো মানুষ শিক্ষায় অনেকখানি অগ্রসর, তবু শব সম্বন্ধে কেউই অতখানি দার্ঢ্য দেখাতে পারেন না। সুতরাং ভাবুই বোঝা যায় যে সেই আগেকার দিনে কত কঠিনই ছিল ব্যবচ্ছেদের জন্যে একটি শব সংগ্রহ করা। সেই কথাই তো প্রকারান্তরে প্রকাশ পেয়েছে ওই তন্ত্র সাধনার জন্যে শব সংগ্রহের বর্ণনা থেকে।

আবার ঐ যে বলা হয় যে, শবসাধনা করতে হবে মহাশ্মশানে গিয়ে---তারও তো বেশ অর্থ পাই। তন্ত্রশাস্ত্রে শ্মশান শব্দের অর্থ হচ্ছে শূন্য আগার। অর্থাৎ কোন নির্জন স্থানে বসেই শবব্যবচ্ছেদ করতে হয়। এখনো তো চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যে ব্যবচ্ছেদস্থানে ছাত্র ব্যতীত আর কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে। আর সেখানে অধ্যাপকও সর্বদা উপস্থিত থাকেন, ছাত্রদের বুঝিয়ে দেন শরীর সংস্থানের নানা তথ্য ও তত্ত্ব। সেখানে অব্যবসায়ীর উপস্থিতি তো একেবারেই অবাঞ্ছনীয়।

বই

ইতিহ স্বভাবে ধূমকেতু। পতন হলে তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। প্রতিহত স্মৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভাব্যতার সীমাতীত।---কিন্তু লিখিত জ্ঞান স্থির নক্ষত্র, অজ্ঞানতার ঘোর ঘন তা আচ্ছন্ন করতে পারে, করেছেও; সেই ঘনজাল অপসৃত হওয়ামাত্র আবার তা পূর্বগৌরবে দীপ্তিমান। স্বস্থানে।---বই সুতরাং বিলুপ্ত ভাণ্ডার, যা সাময়িকভাবে অনাদৃত বা বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু আবার খুঁজবেই তা জ্ঞান বিলোর।

---ডঃ জনসন।

চট্টগ্রাম জালালাবাদ যুদ্ধের স্মৃতি স্মরণে

চট্টগ্রাম জালালাবাদ যুদ্ধের নিহত শহীদ তেগরা বল, মতি কানুনগো

১৯৩০ সাল। তখনও সারা বিশ্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যাহ্নসূর্য। ইংলণ্ডেশ্বরকেই ভারত-ঈশ্বররূপে গ্রহণ করবার প্ররোচনা দিত রাজভক্ত ও মিশনারীদের মাধ্যমে। তখন মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দশম বর্ষ পূর্তি। যদিও গান্ধীজী অবিরাম কোন জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করেন নাই, একটু উপদ্রবের প্রমাণ পেলেই তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করে দিতেন। বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় অগ্নি উৎপীড়ন ও বহুবার রক্ত নিশান উড়িয়েছে বিগত ত্রিশ বছর ধরে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে দমন করে বৃটিশ রাজশক্তি ভারতের বুকে নিষ্কণ্টক রাজত্ব চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই হয়ত জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডেও বৃটিশ শক্তিকে কুণ্ঠিত হতে দেখা যায় নি। সময় সময় ভারতের জঙ্গীলাট সাহেব এ্যাসেম্বলি হাউসে হুঙ্কার দিয়ে ঘোষণা করতে দ্বিধা করত না, 'আমরা তলোয়ারের শক্তিতে ভারতবর্ষ জয় করেছি এবং তলোয়ার দিয়েই ভারতবর্ষ শাসন করে যাবো।'

অবশ্য এই সময়েই (ইং ১৯৩০) মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণ ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই আন্দোলনে, যার আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ অহিংস এবং অসহযোগ ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তি সেই পবিত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং মানবতার আবেদন উপলব্ধি করতে পারে নাই। তারা সেই আন্দোলন দমন করতে বদ্ধপরিকর হল।

চলল নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলিবর্ষণ, বেয়নেট চার্জ। ডাণ্ডার আঘাতে অজস্র মস্তকের রক্তপাত। এমন কি টজুতো পায়ে তরুণ ছাত্রদের বুকে লাফিয়ে উঠে তাদের মুখে রক্তের

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

হলকা ছুটিয়েও মজা দেখেছে। যুবকেরা দিশেহারা, নিরুপায়। প্রতিশোধ নেওয়ার জাগ্রত তেজ ভেতর থেকে উঠেও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তার পরিণামে দুর্বলতা ও বীর্যহীনতার দোষেও কলুষিত হতে চলল যুবভারত। মহাবিপ্লবী সূর্য সেন (মাষ্টারদা) আর অপেক্ষা করলেন না। তাঁর সর্বভারতীয় গণবিপ্লবের সাধনা বা বাংলায় সশস্ত্র উত্থানের চেষ্টার ক্ষীণ আশাও লুপ্তপ্রায়।

এখন তিনি সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করলেন, এবং উদ্ধত, দর্পিত এবং নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদ-শক্তিকে এই সময়ে একটি কঠিন আঘাত হানতে প্রয়াসী হলেন। এই সুযোগে এবং এই সময়ে যদি তা না করা হয়, তবে জাতীয় জীবনের গ্লানিকর নিরাশার ছায়া পড়তে পারে। যুবকেরা আত্মবিশ্বাস ও শৌর্য হারিয়ে ক্লীবত্বকে প্রশ্রয় দেওয়াও বিচিত্র নয়। আর দেরী নয়, 'সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে।' এইরূপ মনোভাব মাষ্টারদা প্রকাশ করলেন।

ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়ক ও সভাপতিরূপে মাষ্টারদা তাঁর প্রধান লেফটেন্যাণ্ট অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন (ধলঘাট যুদ্ধে নিহত), অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং উপেন ভট্টাচার্য এর উপর বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

(মাষ্টারদার অপর দুজন বন্ধু ও সমর্থক মাষ্টারদার সাম্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ থেকেই তাঁর বৈপ্লবিক সঙ্ঘকে বিভিন্নভাবে সাহায্যদান করে এসেছেন। তাঁদের নাম সতীভূষণ সেন ও নগেন সেন। তাঁদের অবদান ও চট্টগ্রাম বিপ্লব সঙ্ঘে উপেক্ষণীয় নয়। যদিও তাঁরা দুজন প্রত্যক্ষভাবে চট্টগ্রাম বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন নাই)।

১৯৩০, ১৮ই এপ্রিল। চট্টগ্রামে পুলিশ লাইন, রেলওয়ে ম্যাগাজিন হাউস, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন অফিস একই সাথে আক্রমণ করে দখল করা হয়েছিল। এবং কলিকাতা ও চট্টগ্রামের রেল চলাচল বন্ধ করে দিয়ে সারা চট্টগ্রামকে বিপ্লবীদের করতলগত করা হল। সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব

নিহত শহীদ প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত ও নির্মল লালা

কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করে পুলিশ লাইনে সমবেত হলেন। পুলিশ লাইনে অস্ত্রাগারের শিখরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল। অস্ত্রাগার পরিবেষ্টন করে বিপ্লবী রক্ষীরা রাইফেল হস্তে দাঁড়ালেন। মাষ্টারদার প্রধান সহকর্মীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মাষ্টারদাকে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়কের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করলেন।

তিনি প্রশান্ত চিত্তে সেই সম্মান ও অভিনন্দন গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল হতে দেখা যায় নি। তার স্বাভাবিক শান্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ মুখের প্রদীপ্তি এখনও ছবির মতো চোখে ভেসে উঠে। তিনি দাঁড়িয়ে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চিটাগাং ব্রাঞ্চের এর ঘোষণাপত্র গম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করলেন। সেদিন তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘোষণা করলেন এবং ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হল —এই বাণীও প্রচার করলেন।

ইতিমধ্যে ওয়াটার ওয়ার্কস-এর উপর থেকে শত্রুপক্ষ লুইস গানের গুলি বর্ষণ করতে লাগল। মাষ্টারদার প্রধান লেফটেনাণ্ট ও বাহুবল অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও ৺লোকনাথ বল সবাইকে ব্যূহ রচনা করে গুলির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে উৎসাহ দিলেন এবং মাষ্টারদার অপর দুজন পরামর্শ দাতা বন্ধু নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী অবস্থার মোকাবিলা করতে মাষ্টারদার সাথে পরামর্শে নিযুক্ত হলেন।

আরম্ভ হল বিজয়ী বিপ্লবীদের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সে কি ভীষণ গুলিবৃষ্টি। বিপ্লবীরা মাটিতে শায়িত অবস্থায় সেই লুইস গানের গুলির মোকাবিলা করে দক্ষ যোদ্ধার পরিচয় দিলেন। কারো মুখে ভীতির চিহ্ন নেই, শংকা নেই বরং গর্বে তাঁদের বুকের ছাতি প্রসারিত হয়ে উঠেছে। সে কত দিনের সাধনা। স্বাধীনতার জন্য শত্রুর সাথে শক্তির পরীক্ষা দেবে। এক এক জন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর।

ঘণ্টা দেড়েক অবিরাম সংগ্রামের পর হঠাৎ নিস্তব্ধ হ'ল শত্রুশিবির। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত হল পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার। কিন্তু বিপ্লবীদের নেতৃস্থানীয় সকলের মনেই প্রশ্ন জাগল—'শত্রু দুর্বল হলেও এখনও শক্তি আছে। কারণ জেলের অস্ত্রাগার, প্রাইভেট বন্দুকের দোকান, ট্রেজারী হাউস ও পাহাড়তলীর একটি অস্ত্রাগার তখনও অক্ষত অবস্থায় ছিল। দিনের বেলায় শত্রুরা অল্পবয়স্ক ছাত্রদের দেখলে তারা প্রবল আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে—বিশেষ করে যখন তাদের তখনও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা সম্ভব হয় নি।

পুলিশ লাইনের চালু জায়গাও বিপ্লবীদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। সম্মুখের দিকে শাল গাছের আড়াল ছিল বলে তখনও কেউ আহত হন নি। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে লুইস গান ফিট করা হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। এই দ্বন্দ্বমূলক চঞ্চলতার মধ্যেই অস্ত্রাগারে আগুন দিয়ে স্থানান্তরিত হবার প্রস্তাব অনুমোদিত হ'ল। মাষ্টারদাও নীরব সম্মতি জানালেন। কারণ প্রধান বিপ্লবী সৈন্যাধ্যক্ষদের উপরে তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের কৌশলেও তিনি তাঁদের উপর ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলিবারুদ তুলে নিয়ে অবশিষ্ট অস্ত্রাগারে পেট্রোলের সাহায্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। এই সময়ে দুর্ঘটনা ঘটল। হিমাংশু দেশলাই ব্যবহার করে বসল। অন্যান্যেরা গুলির সাহায্যে আগুন দিয়েছিলেন। দুর্দৈব যখন আসে তখন বুদ্ধিরও বিলুপ্তি ঘটে। হিমাংশু দেশলাই ব্যবহার করে সর্বনাশ ডেকে আনল। তার সারা শরীর পেট্রোলের আগুনে ধরে উঠল। সে ছুটে চলল। মনে হচ্ছিল যেন একটা আগুনের বৃহৎ বৃত্ত বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে। সে চীৎকার করছিল 'অনন্তদা বাঁচান! অনন্তদা বাঁচান।'

অনন্তদার (অনন্ত সিংহ) কানে কাতর কণ্ঠ পৌঁছল। তিনি তাকে মাটিতে গড়িয়ে দিলেন এবং সম্মুখের জীপ গাড়ীতে তুলে নিলেন।

গণেশদা (গণেশ ঘোষ) বসন্ত রোগ ও জ্বরে কাতর ছিলেন। তিনিও অনন্তদার পাশে গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাখন ঘোষাল (চন্দননগর যুদ্ধে নিহত শহীদ) ও আনন্দও লাফ দিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ী অদৃশ্য হ'ল। চট্টগ্রাম বিপ্লব আন্দোলনের ছন্দপতন ঘটল।

মাষ্টারদা দু' এক পা এগিয়ে এসেছিলেন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন বলে। লোকাদা ও কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার

ঘটল যে মুহূর্তের মধ্যেই আমরা দুভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এক পক্ষের মনের অবস্থা অপর পক্ষকে জানাবার সুযোগও ঘটল না। এই অবস্থার জন্যে কোন পক্ষই প্রস্তুত ছিলেন না।

বিপদ অজ্ঞাতসারেই আসে। সুতরাং এই অবস্থার জন্যে পরস্পরকে দোষারূপ করাও অবান্তর। অবশ্য আমাদের ধারণা হয়েছিল যে দগ্ধ হিমাংশুকে নিরাপদ স্থানে রেখে নেতৃদ্বয় পুনরায় ঘটনাস্থলেই ফিরে আসবেন। সেই উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই অপেক্ষমাণ ছিলেন।

আমরা কেন জীপ গাড়ীর পিছনে ছুটে গেলাম না? অবাস্তব প্রস্তাব। হ্যাঁ সেই মুহূর্তে আমরা বিভক্ত গ্রুপে সদর আক্রমণ করতে পারতাম? সেই কাজ পুলিশ লাইনে আগুন দেওয়ার পূর্বেই সম্পন্ন করা অধিক বাঞ্ছনীয় ছিল নয় কি? অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের সমস্ত প্রোগ্রামের উপর থেকে আস্থা আমরা হারিয়েছিলাম। নূতন প্রোগ্রাম নেওয়াও একটু সময়সাপেক্ষ ছিল। বিশেষত মিলিটারী স্ট্রাটেজি ও ট্যাকটিক্স নিতে হলে মাষ্টারদা অনন্ত সিংহ (অনন্ত দা) ও গণেশ ঘোষ (গণেশ দা) এর উপর নির্ভর করতেন। অধিকন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা পুনরায় মিলিত হতে পারব না ইহাও আমাদের ধারণাতীত ছিল।

পুলিশ লাইন দখল করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল অনন্তদা ও গণেশদার উপর। সুতরাং সেই ১৮ই এপ্রিলের বিজয়-গৌরব এই নেতৃদ্বয়েরই প্রাপ্য। আমি নিজের চোখে তাঁদের নির্ভিকতা ও আক্রমণাত্মক কৌশল দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম। কারণ সরোজ গুহ, হরিপদ মহাজন, দেবু গুপ্ত হিমাংশু সেন ও আমি একই মোটরে অনন্তদা ও গণেশদার সাথে ছিলাম। কিভাবে ধীরে ধীরে অনন্তদা নিজের হাতে মোটর চালিয়ে পুলিশ লাইনের সম্মুখে গিয়ে থামলেন এবং সহজ, স্বাভাবিক মিলিটারী কায়দায় কিভাবে দুজন বিপ্লবী সেনানায়ক তালে তালে পা ফেলে সিঁড়ি অতিক্রম করলেন এবং

নিহত শহীদ জীতেন দাস, মধু দত্ত ও পুলিন ঘোষ

সেন্ট্রির সম্মুখে গিয়ে তাকে একই সাথে গুলি করলেন। আমরা পিছন থেকে ছুটে গিয়ে তাঁদের সাথে যোগ দিলাম— সেই সব ঘটনা রোমাঞ্চকর।

সেন্ট্রিরা পালিয়ে যাবার পর আমাদের চারিদিকে পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে আদেশ দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি আরম্ভ করতে বললেন। প্রতিধ্বনি করে মাষ্টারদা সদলবলে উপস্থিত হলেন সেই বিজয়ী শিবিরে। অনন্তদা আমাকে পুলিস লাইনের পিছনের প্রধান ফটকে রক্ষিরূপে দাঁড়াতে বললেন। মাষ্টারদার উপস্থিতি দেখে মাষ্টারদার আদেশ নিয়ে ছুটে গেলেন লোকাদার (লোকনাথ বল) সাহায্যে। লোকাদা ও নির্মলদার উপর ভার ছিল 'রেলওয়ে ম্যাগাজিন হাউস' দখল করার। সেখান থেকে বিজয়ী বন্ধুদের নিয়ে ফেরার পথে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখীন হয়ে খণ্ডযুদ্ধ জয় করে মাষ্টারদার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের ও যোগ্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিপ্লবাত্মক প্রস্তুতির জন্যও এই নেতৃদ্বয়ের শ্রম ও সাধনা ছিল অপরিসীম।

মাস্টারদা ছিলেন আমাদের জীবনাদর্শ, প্রাণের ঠাকুর। অনন্তদা (অনন্ত সিং) ছিলেন আমাদের যৌবনের তরঙ্গস্রোত। অনন্তদার সাথে গণেশদা ও লোকাদার নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিন্নভাবে গণেশদাকে বিপ্লবের অগ্নিশিখা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অপরদিকে অম্বিকাদা নির্মলদা ও উপেনদা ছিলেন মাস্টারদার আজ্ঞাবহ সহকারী। মাস্টারদার সান্নিধ্যে এক একজন বিপ্লবী আত্মা যেন জলন্ত অফুরন্ত শক্তির আধার হয়ে উঠলেন। তবু আমাদের ক্ষমাহীন ত্রুটি বিদ্যমান ছিল?

হ্যাঁ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়ত ছিল। অকূল সাগর পাড়ি দিতে নাবিকের দিগভ্রান্ত-ত্রুটি আমাদের ঘটেছিল। কিন্তু আমরা পথ বয়ে গিয়ে সাহারার বুকে থেকেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম। ইহাও শাশ্বত সত্য। সুতরাং বিচ্ছেদক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ দেখালেও ক্ষমাহীন ত্রুটি ছিল না কারুরই। অধিকন্তু 'চট্টগ্রাম বিপ্লব'-এর ছন্দপতন ঘটেও বিজয়ের শৌর্য এবং আত্মাহুতির মহিমা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অদ্বিতীয় হয়ে থাকবে।

আমাদের পুনর্মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হোল। আমরা অম্বিকাদার নেতৃত্বে পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। সংযোগ করার চেষ্টা চলতে থাকল। ১৯শে এপ্রিল রাত্রে একখানা মোটরগাড়ী আলো জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে হাটাজারীর রাস্তায় যেতে এবং ফিরতে দেখা গেল। সেই গাড়ী পুলিসের অনুচর কিংবা বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্কেত কি না জানবার জন্যে

নিহত শহীদ নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন ও বিধু ভট্টাচার্য

২০শে তারিখে দূত হিসাবে চট্টগ্রাম শহরে প্রেরণ করলাম আমাদের এক সহকর্মীকে। তারই খেসারত হিসেবে দিতে হোল একটি বিপ্লবী তরুণ প্রাণ —অমরেন্দ্র নন্দী। অভিমন্যুর মত সপ্তদিকে আক্রান্ত হয়ে বীর অমরেন্দ্র নন্দী ফিরিঙ্গি বাজারের একটি কাল-ভার্টের নীচে আত্মদান করল, আত্ম-সমর্পণ করল না।

১৮ই এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত আমরা ৺অম্বিকাদার নেতৃত্বে একবেলা সামান্য আহার্য পেয়েছিলাম। ২২শে এপ্রিল সবাই জালালাবাদ পাহাড়ে উপস্থিত হলাম সেইদিনই শহর আক্রমণ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

বেলা দ্বিপ্রহর। পাহাড়ে রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে প্রাণ অতিষ্ঠ, তৃষ্ণায় সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত। গ্রুপ ভাগ করে বন্ধুরা অর্ধশায়িত অবস্থায় রাত্রের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনায় সময়ের সদ্ব্যবহার করছেন। এমন সময় তিনটি শক্তিশালী বৃটিশ রেজিমেণ্ট বিপ্লবীদের সম্মুখীন হ'ল। ক্যাপ্টেন টেট, কর্ণেল ডালাস স্মিথ এবং ডি আই জি ফারমার রেজিমেণ্টগুলি পরিচালনা করে এগিয়ে এসেছিল। অবস্থার মোকাবিলার জন্য মাষ্টারদা ৺লোকনাথ বলকে পূর্ণ দায়িত্ব-ভার অর্পণ করে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করলেন।

এইখানেই মাষ্টারদার ধীশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি ৺অম্বিকাদার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব কনিষ্ঠ যুব-বিপ্লবী লোকনাথ বলকে প্রদান করতে একটুও ইতস্তত করলেন না। কারণ তিনি জানতেন সেই সময়ে যুবকদের উপর পূর্ণ দায়িত্ব না থাকলে তারা অন্তরের সহিত ছুটন্ত গোলাগুলির সম্মুখীন হতে হয়ত উৎসাহ পাবে না। এই অমূল্য দৃষ্টান্ত আদর্শ হয়ে আজ স্বাধীন ভারতেও যুবকদের অগ্রণী করা বাঞ্ছনীয়।

৺অম্বিকাদার বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত ও অনু-করণীয়। তিনি বিনা প্রতিবাদে আনন্দের সহিত মাষ্টারদার নির্দেশ গ্রহণ করলেন। পাহাড়ের শীর্ষস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন লোকনাথ বল। পাশে দুজন বন্ধু নরেশ রায় ও বিধু ভট্টাচার্য দুটি শক্তির স্তম্ভ-রূপে সাহায্য করলেন। ছুটে গেলেন ত্রিপুরা সেন। ত্রিপুরা সেনকে দেখে মনে হোত আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতে। তাঁর চেহারা ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি স্বাস্থ্য ও সৎসাহস ছিল।

সুরু হোল জালালাবাদ পাহাড়ে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামে বিপ্লবীদের এগারোজন উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বীর প্রাণোৎসর্গ করলেন।

টেগরা বল (হরিপ্রসাদ বল) প্রথ শহীদের সম্মান পেলেন।

প্রভাস বল, নরেশ রায়, বি ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা সেন, পুলিন ঘোষ মধুসূদন দত্ত, নির্মল লালা, শশাঙ্ক দত্ত মতি কানুনগো, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতে দাশ এঁরাই হলেন জালালাবাদ যুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর।

আহত হয়েছিলেন তিনজন অম্বিকাদা কপালে আঘাত পে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে গেলেন বিনোদ চৌধুরী কণ্ঠনালী বিদীর্ণ হয়ে আহত হলেন। আমারও সম্মুখের ডান কাঁধে গুলিবিদ্ধ হ'ল। গুলি বিদ্ধ হওয়া মাত্র মনে হয়েছিল—একটুকরা হিম-শীতল বরফ ভ্রমরের আকৃতিতে আমার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করলো এবং সাথে সাথে আমার সমস্ত শরীর বরফ হয়ে গেল। এর চেয়ে বেশী যন্ত্রণা অনুভব হয় নাই। অবশ্য আমি বেশীক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলাম না। কারণ রাইফেলের বুলেটটি আমার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে বের হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ামাত্র দেখি ঝড়ের মত চারিদিকে গুলি বৃষ্টি হচ্ছে। অবিরাম লুইস গানের গর্জন, জালালাবাদ পাহাড় শহীদ রক্তে প্লাবিত হয়ে উঠেছে। সেই রক্ত রঞ্জিত স্বাধীনতা সংগ্রাম বিপ্লবীদের রণোন্মাদ করে তুলেছে।

জ্ঞান ফিরে পেতে পিছন থেকে রাইফেলে গুলি ভর্তি করে আমার হাতে তুলে দিলেন নির্মলদা। আমি বাম হাতেই ট্রিগার টিপে আবার সংগ্রামে লিপ্ত হলাম। নির্মলদা পিছন দিকে সমস্ত অচল রাইফেলগুলি সরিয়ে নিচ্ছেন। তিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যেন একটি কারখানা স্থাপন করে বসেছেন। তাঁর সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিপ্লবীদের খুব সহায়ক হয়েছিল।

'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে চারিদিক। উপরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়ছে। শত্রুপক্ষের রেজিমেণ্টগুলি জালালাবাদ পাহাড় পরিবেষ্টন করে ফেলবার সর্বপ্রকার চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

বিজয়ী সেনাপতি লোকনাথ বলের সুদক্ষ প্রত্যুত্তর এবং দূরদর্শিতা বৃটিশ রেজিমেণ্টকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিল। সেদিন তিনি মাষ্টারদার উন্নত মস্তকে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিপ্লবীরা কার আগে কে প্রাণ দিতে পারেন এই দিন তারই প্রতিযোগিতা। প্রায় ৪ ঘণ্টা অবিরাম যুদ্ধের পর বৃটিশ রেজিমেণ্ট পরাজিত হয়ে ক্রমশ পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রেখার সাথে বিপ্লবীদের রক্তরাঙ্গা জালালাবাদ পাহাড় সেদিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। বিপ্লবীরা সেইদিন বুকের রক্ত ঢেলে যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিল, তার মূলে ছিল স্বদেশ-প্রেম এবং মাতৃভূমির গ্লানি ও দীনতা মুছিয়ে দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প। একমাত্র মন্ত্র ছিল—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙখল বল কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায়।'

মাষ্টারদার আদেশে যুদ্ধ ক্ষান্ত হল। লোকাদা শহীদদের অভিনন্দন জানিয়ে সবাইকে স্থানান্তরিত হতে আদেশ দিলেন। একের পর এক সারিবদ্ধ হয়ে পাহাড় থেকে নামছে। ইত্যবসরে মাষ্টারদা প্রতিটি শহীদের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে গেছেন কাউকেও ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব কি না। পরিশেষে তিনি অম্বিকাদার কানের কাছে মুখ নিয়ে বিদায় নিলেন। তারপর তিনি একহাতে বিনোদ চৌধুরীকে ধরে এবং অন্য হাতে আমাকে তুলে নিয়ে নামতে আরম্ভ করলেন। অদৃষ্টের পরিহাসে লোকাদা অগ্রবর্তী দলকে নিয়ে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। আমরা সেই রাত্রে অন্য একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। রাত্রি প্রভাতের সাথে সাথে আমাদের মাথার উপর দিয়ে অসংখ্য গুলিবৃষ্টি হতে লাগল। আমরা নীরব ছিলাম। সারাদিন একবিন্দু জল গ্রহণ না করে সেই প্রখর রৌদ্রের তাপ সহ্য করে শায়িত অবস্থায় কাটিয়ে দিলাম।

বেলা ৩টায় পুনরায় গুলিবর্ষিত হল। এবারও আমরা নীরব। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রস্তুত হলাম। এখন মাষ্টারদা কালী দে'র কাঁধে আমার বাঁ হাতখানি চেপে দিলেন। বিনোদ চৌধুরী লোকাদার দলেই পড়েছিলেন। আরম্ভ হল পাহাড়ের ঘূর্ণিপথে যাত্রা।

সুবোধ চৌধুরী ও মহেন্দ্র চৌধুরী বন্ধুদ্বয় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। হঠাৎ রেল রাস্তা পেয়ে মাষ্টারদা আদেশ দিলেন কালী দে যেন আমাকে নিয়ে কোন গ্রামে আশ্রয় নেন। কারণ আমার শরীর ফুলে গিয়েছিল, জ্বরও হয়েছিল। আর তা ছাড়া ক্ষতস্থান থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। আমি সাথে থাকলে সবায়ের বিপদ হতে পারে ভেবে মাষ্টারদা আমাকে একটা রিভলবার দিয়ে বিদায় দিলেন।

মাষ্টারদার বাহিনী ও কোঁদালার বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন পথে কোয়েপাড়া গ্রামের বিনয় সেনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, এখানেই হলো মাষ্টারদার দুর্ভেদ্য বৈপ্লবিক শিবির, আমি ফতেয়াবাদ গ্রামে নগেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে ডাক্তার অতুলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের অশেষ সেবাযত্নে আরোগ্য লাভ করে মাষ্টারদার গোপন ঘাঁটিতে যোগ দিলাম।

অপর দিকে হিমাংশু সেন (শহীদ) গ্রেফতার হয়ে হসপিটালেই মৃত্যুবরণ করেছে। আমাদের অগ্রবর্তী বিচ্ছিন্ন অংশ পুনর্মিলনের নিষ্ফল চেষ্টার পরে কলিকাতা রওনা হওয়ার পথে ফেনী ষ্টেশনে পুলিসের সাথে একটি সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে কলিকাতায় গিয়ে পৌঁছেছেন। তাদের সাথে মাষ্টারদার সংযোগ স্থাপনও হয়েছে। চট্টগ্রাম বিপ্লব-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব নূতনভাবে সূচিত হলো। মাষ্টারদা প্রতিটি গ্রামকে এমনি করে সংগঠিত করলেন—গ্রামের প্রতিটি গৃহ বিপ্লবীদের এক একটি শক্ত দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত হলো। রাজশক্তির মিলিটারিতে ছেয়ে গেল দেশ। গ্রামগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। মাষ্টারদার পিছনে দাঁড়ালো ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণ। মাষ্টারদা আবার পাঞ্চজন্য নিনাদ করলেন—

'ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা,
আঘাতে আঘাত কর ;

আরম্ভ হল দীর্ঘস্থায়ী গরিলা যুদ্ধ। (একটার পর একটা এক্শন) ১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী মাষ্টারদা ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করেন।

বই

যদি প্রচুরসংখ্যক ধর্মীয় বই এদেশের (ইংলণ্ড-এর) জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না যায় এবং তারা ধর্মপরায়ণ না হয়ে ওঠে, ও'জাত হিসেবে আমাদের কী গতি হবে, আমি ভাবতে পারি না। এবং এ চিন্তা প্রত্যেক স্বজাতিপ্রেমিক এবং খৃস্টান-এর গভীর চিন্তাযোগ্য। সত্য প্রচারিত না হলে অ-সত্য তেঁকে বসবে, ঈশ্বর এবং তাঁর বাণী না জানলে, গৃহীত না হলে শয়তান আর তার কুক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করবে; ধর্মীয় গ্রন্থ প্রতিটি গ্রামে না পৌঁছলে তৈরী হবে নোংরা এবং লালসাপূর্ণ বই; সারা দেশ জুড়ে যদি গসপেল-এর সুসমাচারের শক্তি অনুভূত না হয়, তা হলে নৈরাজ্য আর কুশাসন, অবদমন আর দুঃখ, শঠতা আর অন্ধকার রাজত্ব করবে বিনা বাধায়। অনন্তকাল ধরে।

—ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার

শতবার্ষিকীর আলোকে প্রমথ চৌধুরী

গোপাল ভৌমিক

১৯৬৮ সালের ৭ই আগস্ট বাংলা সাহিত্যে বীরবল নামে খ্যাত প্রমথ চৌধুরীর জন্ম-শতবার্ষিকী। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা সাধারণ পাঠক-পাঠিকা তাঁদের কাছে এই নামটি সবিশেষ পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্যকৃতির সঙ্গে তাঁদের খুব একটা পরিচয় আছে, এমন মনে হয় না। এমন কি বর্তমান যুগের সাহিত্যিক সমাজও বাংলা সাহিত্যে এই মনীষীর দান সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। ঐতিহ্য-সচেতনতা বোধ হয় আজকের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরাধের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা নইলে আজ যেখানে আমরা প্রতিপদে সজ্ঞানে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির কথা প্রতিনিয়ত মুখে বলি, সেখানে রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মেও যে সাহিত্যিকটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত ছিলেন তাঁকে আমরা ভুলে যাই কি করে? অথচ দুই দশককাল পূর্বেও তিনি আমাদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সক্রিয় সাহিত্য-সাধনায় নিরত ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর মত একজন বিদগ্ধ মননশীল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর যথাযথ মর্যাদা কেন পান নি এবং বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে তাঁর ভূমিকাই বা কত বড়, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বিষয় দুটি সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া বোধ হয় উচিত। প্রথমোক্ত বিষয়টি নিয়েই প্রথম আলোচনা করা যাক। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবন কম-বেশী চার দশক ধরে বিস্তৃত। তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'তেল-নুন-লকড়ি' প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে এবং তাঁর 'আত্মকথা' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর বৎসর ১৯৪৬ সালে। এই দীর্ঘকাল সাহিত্যসাধনায় নিরত থেকেও তাঁর প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা কিন্তু ২০।২১খানির বেশী নয়। তিনি লিখতেন কম, পড়তেন বেশী। বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির মাপকাঠি কিন্তু রচনার উৎকর্ষ নয়—রচনার সংখ্যা। প্রমথ চৌধুরী যে পরিমাণে গুণী ছিলেন, সে পরিমাণে তাঁর খ্যাতি না হবার একটা কারণ এরই মধ্যে নিহিত। দ্বিতীয় কারণ হল তাঁর ভাবালুতা-বিরোধী যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী মন। বলা বাহুল্য এটাও বাঙালী চরিত্র-বিরোধী। বাংলা দেশ হৃদয়বাদের দেশ। আমাদের হৃদয়ের কাছে যাঁর আবেদন তাঁকে আমরা যত সহজে গ্রহণ করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি ও মগজের কাছে আবেদন জানান তাঁকে আমরা তত সহজে গ্রহণ করতে পারি না। গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রমথ চৌধুরীর আবেদন কিন্তু আমাদের বুদ্ধি ও মগজের কাছে, হৃদয়ের কাছে নয়। প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে তাই সহজ ও সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন সম্ভব হয় নি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আত্মসচেতন শিল্পী—ভাব বা প্রেরণার বশে তিনি লেখেন নি। এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'তাঁর (প্রমথ চৌধুরীর) যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মনন-ধর্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে, যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়।...এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে বাঙালী সাধক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি। ...রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই।' কবিগুরুর এই প্রশংসাবাণীর মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর জনপ্রিয় না হবার অন্যতম কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সচেতন শিল্পী প্রমথ চৌধুরী নিজেও বলেছেন:

'পয়সা করি নি আমি, পাই নি খেতাব:
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি নি কেতাব।'

এই পাঠকের মুখ চেয়ে কেতাব না লেখার দোষই হয়তো তাঁকে জনপ্রিয় সাহিত্যিক হতে দেয় নি।

সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রমথ চৌধুরীর জ্ঞান ছিল সুগভীর এবং এসব বিষয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল অতি সুস্পষ্ট। তাঁর এই মতামত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মিলত না। কিন্তু তাই বলে তিনি জীবনের কোন পর্যায়েই প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য জনপ্রিয় না হবার এটিও একটি বড় কারণ। আমরা প্রায় ক্ষেত্রে সেই সাহিত্যই পড়তে ভালবাসি, যার সঙ্গে আমাদের মানসিক সংস্কার ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব বাধে না। মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের মন কতকগুলি সংস্কার ও বিশ্বাসের বাণ্ডিলমাত্র। যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে এদের অধিকাংশই আমরা যাচাই বাছাই করে নিতে প্রস্তুত নই। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ঠিক এর বিপরীতধর্মের লোক।

তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের পথিক এবং নিজের সত্যানুসন্ধিৎসার আলোকেই তিনি আজীবন পথ চলেছেন। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পরের মুখে ঝাল খাওয়া ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। এই সত্যানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান-স্পৃহার তাগিদে সমাজে প্রচলিত বহু ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করেছেন প্রমথ চৌধুরী। অর্থাৎ অনেক সামাজিক ও সাহিত্যিক অনাচার ও জঞ্জাল পরিষ্কার করার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়েছিল এবং সে দায়িত্ব পালনে তিনি কুণ্ঠিত হন নি কখনও। এই বিরাট দায়িত্ব পালন করতেই তাঁকে আত্ম-গোপন করতে হয়েছিল 'বীরবল' ছদ্মনামের আড়ালে। আকবরের সভাসদ সুরসিক ও রঙ্গব্যঙ্গপ্রিয় বীরবল ছিলেন বিদূষক। কিন্তু তাঁর এই বিদূষক ভূমিকার আড়ালে ছিল একজন মহাজ্ঞানী চিন্তাবিদের সত্তা। রঙ্গরসের মাধ্যমে জীবন-সম্পর্কিত বহু অপ্রিয় সত্যই তিনি তাঁর সমকাল ও পরবর্তী-কালের মানুষদের শুনিয়ে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রেও তাঁর বীরবলী ঢঙ্ ছিল একটা 'বাক্‌ছল' মাত্র। পাণ্ডিত্যে পরিশীলিত, বুদ্ধিবাদে ভাস্বর তাঁর মননশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর হালকা চালে লেখা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-প্রধান রচনাবলীর মধ্যে। এইজন্য জীবনের প্রায় প্রথম থেকেই তিনি ভারতচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্যিক গুরুর মর্যাদা দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের কবিতায় তিনি পেয়েছিলেন মননশীলতা ও হাস্যরসের পরিচয়। হাস্যরস ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে জাতির সুপ্ত বিচার-বুদ্ধিকে জাগ্রত করার অভিপ্রায় থেকেই তিনি তাঁর **'Bernard Shaw'** সম্পর্কিত সনেটে বলেছিলেন :

'এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।'

আগেই বলেছি প্রমথ চৌধুরী ছিলেন স্বাতন্ত্র্যবাদী ও আত্মসচেতন শিল্পী। বহু প্রযত্নে আত্মপ্রকাশের জন্য যে রচনা-শৈলী তিনি গড়ে তুলেছিলেন, শত প্রলোভনে কিংবা বিরূপ সমালোচনায়ও তার থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে নি। এক হিসাবে এরূপ স্বধর্মনিষ্ঠ শিল্পীর সাক্ষাৎ বাংলা সাহিত্যে আমরা খুবই কম পেয়েছি। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন : 'আমার প্রথম লেখার ভিতরে যে গুণ অথবা দোষ ছিল, আমার আজকের লেখার ভিতরেও সেই গুণ অথবা দোষ আছে আর সে বস্তুর নাম individuality।' এই আত্মমূল্য নিরূপণে প্রমথ চৌধুরী আদৌ ভুল করেন নি। এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাঁর লেখাকে এমন করে চিহ্নিত করেছে যে-কোন সাবধানী পাঠক নাম না দেখেও তাঁর যে-কোন বয়সের যে-কোন রচনা চিনে নিতে পারেন। তাঁর রচনার যে 'বীরবলী' ঢঙ্ সেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। আর এটাই হল তাঁর নিজস্ব স্টাইল। তাঁর এই স্টাইলের বৈশিষ্ট্যে কোথাও কোথাও গুরুগম্ভীর বিষয় আপাতদৃষ্টিতে লঘু হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও বা লঘু বিষয় হয়ে উঠেছে গুরুগম্ভীর। বাংলা সাহিত্যে এ নতুন স্বাদ বুদ্ধিপ্রধান কিছু কিছু পাঠকের ভাল লাগলেও তাঁর যুগে অধিকাংশ পাঠক ও সমালোচকের প্রীতিপ্রদ হয় নি। তাই তাঁকে নানাবিধ বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বারবার। কিন্তু সত্যসন্ধ প্রমথ চৌধুরী সে জন্য আত্মপ্রত্যয়চ্যুত হন নি কখনও। এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব নিম্নোক্ত 'সমালোচকের প্রতি' শীর্ষক কবিতাটির মধ্যে পরিস্ফুট :

'তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভাল শতগুণে
দেরা ফির লেখায় অলম্,
তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।'

তাঁর পরিচ্ছন্ন, অলঙ্কার-প্রধান, বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যরচনার যে বিশেষ ভঙ্গী প্রমথ চৌধুরীর জনপ্রিয়তা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণধী সমালোচক-মন কিন্তু সচেতন ছিল। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

'তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি—কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাস-বুনানি। এ গুণ কিন্তু প্রাপ্য নয়।··· ওতে লেখকেরও সংযমের দরকার করে, পাঠকেরও তাই—তাড়া থাকলে সেটা করা যায়, কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই সেখানে গয়ংগচ্ছ চলনটাই মানুষ স্বভাবত পছন্দ করে। এই সকল কারণেই তোমার গদ্যরচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে, আমাদের দেশের পাঠকরা তার পুরা দাম দিতে প্রস্তুত নয়। গদ্য লেখাও যে একটা রচনা সেটা এখনো আমরা স্বীকার করতে শিখি নি।' প্রমথ চৌধুরীর রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি অভ্রান্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর রচনায় শিল্প-নৈপুণ্যজাত সংযমের যে পরিচয় আমরা পাই তার একাংশও যদি আমাদের মধ্যে থাকত, তাহলে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যে মননশীল সাহিত্যের একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠত, তেমনই সাহিত্যক্ষেত্র অনেক আগাছামুক্তও হতে পারত। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মত সুনিপুণ ও সংযমী সাহিত্যশিল্পীর আদর্শ আমাদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ঢিলে-ঢালা শিথিল ভাবালুতার সংস্কার আজও কাটে নি। তাই বাংলা সাহিত্যে পাঠকদের স্নেহধন্য এমন অনেক বই আজও আমরা প্রকাশিত হতে দেখি, যেগুলি তাদের অর্ধায়তনে সংক্ষেপিত করলেও তাদের সাহিত্যমূল্য কমে না। রচনার উৎকর্ষ যে তার আয়তন ও সংখ্যার মধ্যে নিবদ্ধ নয়, রচনার গুণগত উৎকর্ষই যে তার প্রাণ—এ সত্য

আমরা আজও শিখি নি। এই প্রমথ চৌধুরীর প্রকৃত কদর না হবার কারণ বোঝা কষ্টসাধ্য নয়।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার স্বল্পতা ও জনপ্রিয়তার অভাব সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন স্মরণীয় পুরুষ। নিজেদের মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভার গুণে যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করেছেন, তিনি ছিলেন সেই মুষ্টিমেয়দের অন্যতম। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য মহারথী বাংলা সাহিত্যে শুধু তাদের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টির জন্যই স্মরণীয় নন, তাঁরা তাঁদের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নানাভাবে প্রভাবিত করার জন্যেও স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে বিবর্তনের নানা পর্যায়ে তাঁরা আমাদের লেখ্যভাষা গড়ে তোলায় সাহায্য করেছেন, নিত্যনতুন ছন্দ: প্রকরণ উদ্ভাবন করে পরবর্তীকালের শিল্পীদের পথ সুগম করে দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা এঁদের সমপর্যায়ের না হলেও, তিনি এঁদের সগোত্র—এ কথা অনস্বীকার্য। আমাদের সাহিত্যে অন্তত তিনটি বিষয়ে তিনি যে মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এ কথা সুধীজনস্বীকৃত। এই তিনটি ক্ষেত্র হল—(১) আমাদের চলতি মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যের ভাষারূপে গড়ে তোলা, (২) 'সবুজপত্র' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকরূপে সম্পাদনা-ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান এবং (৩) রবীন্দ্রযুগের মানুষ হয়েও বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির দুরূহ সাধনা করা। নীচে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের এই তিনটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হল।

আজকের বাংলা সাহিত্যে লেখ্য রূপে সাধুভাষা একেবারে অপাংক্তেয় না হলেও গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যে মৌখিক বা চলতি ভাষারই প্রাধান্য। আজ আমাদের অধিকাংশ লেখক-লেখিকাই এই চলতি ভাষাতে লিখে থাকেন। অথচ এই চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করে তুলতে আজ থেকে ৪০।৫০ বৎসর আগে প্রমথ চৌধুরীকে কি বেগই না পেতে হয়েছিল। সাধু ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ বঙ্গভারতীকে মুক্তি দেবার তাঁর সেই প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির পর প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও আরও কয়েকজন প্রতিভাবান লেখকের প্রয়াসে আমাদের সাহিত্যে যে গদ্যরীতির উদ্ভব হয়েছিল, লৌকিক ভাষার সঙ্গে তার প্রভেদ ছিল অনেকখানি। আমরা যে ভাষায় কথাবার্তা বলি এবং যে ভাষায় লিখি তার মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে আর কোনও লেখকের চোখে পড়ে নি—এমন মনে হয় না। তবে তাঁরা কেউ সাহস করে তাঁর মত ব্যাপকভাবে ভাষা সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসেন নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীই প্রথম লৌকিক বা চলতি ভাষার প্রয়োগ করেন নি। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম পর্যায়ের উদাহরণ হল টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। এর পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে রচিত কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনীতে ও পত্র সাহিত্যে আমরা লৌকিক ভাষার উদাহরণ খুঁজে পাই। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত কোন কোন নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুখে কথ্য ভাষার প্রয়োগ খুঁজে পাওয়াও দু:সাধ্য নয়। স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের কোন কোন রচনার মধ্যেও চলতি ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু সাধু ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে লৌকিক ভাষাকে দাঁড় করানোর বৈজ্ঞানিক প্রয়াস প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে আর কেউ করেন নি। তাঁর আগে যে সব বিচ্ছিন্ন প্রয়াস হয়েছিল সেগুলি ছিল ব্যক্তিগত-ভাবে কোন কোন লেখকের খেয়াল-খুশিপ্রসূত পরীক্ষা-নিরীক্ষামাত্র এবং তৎকালীন বা পরবর্তীকালের সাহিত্যের উপর সেগুলি কোন স্থায়ী দাগ কেটে যেতে পারে নি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী মননশীল যুক্তিবাদী মন লৌকিক ভাষার অন্তর্নিহিত বেগ, সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয় নি; সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ভাষাকে তিনি গৌরবের আসনে বসিয়ে তবে ছেড়েছেন। প্রথম জীবনের মাত্র দু-একটি প্রবন্ধ ছাড়া তাঁর নিজের সকল সাহিত্যকর্ম তিনি এই লৌকিক ভাষাতেই সম্পন্ন করেছেন; শুধু তাই নয় নিজে 'সবুজপত্র' নামক মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে এবং সেই পত্রিকার সাহায্যে একটি সমধর্মী মননশীল সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে তুলে তিনি অক্লান্ত প্রয়াসে চলতি ভাষাকে আমাদের সাহিত্যিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই ভাষাকে তৎকালীন বিভিন্ন রক্ষণশীল সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় 'কিষ্কিন্ধ্যার ভাষা', 'পেত্নীভাষা', 'চণ্ডালী ভাষা', 'ইঙ্গবঙ্গ ভাষা' প্রভৃতিকে অন্যায় অভিহিত করা হলেও ইতিহাসের বিচারে তাঁর প্রবর্তিত এ ভাষার শক্তিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সাত বৎসরের ছোট এবং বৈবাহিকসূত্রে তাঁর আত্মীয়। রবীন্দ্র-নাথের অলৌকিক প্রতিভার প্রকৃত সমঝদার হলেও এবং রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃজনশীলতার পর্বে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে গা ঢেলে দেবার মত লোক ছিলেন না তিনি। রবীন্দ্রযুগের ব্যাপক প্রভাব থেকে কোন সাহিত্যিকই যখন আত্মরক্ষা করতে পারেন নি, সেই যুগে আমরা দেখি প্রমথ চৌধুরী আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

তার কারণও অবশ্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টি প্রতিভার দানে আমাদের সাহিত্যের সকল বিভাগ নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও তিনি ছিলেন মূলত কবি এবং তাই হৃদয়বাদ ছিল তাঁর স্বাভাবিক ধর্ম। আর অপর-দিকে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বুদ্ধিবাদের উপাসক ও ধারক। তাই তাঁদের দুজনের রচনা একই সময়সীমার মধ্যে রচিত হলেও তাঁরা কেউ কাউকে বড় একটা প্রভাবিত করতে পারেন নি। তাঁদের দুজনের রচনাভঙ্গী আলাদা, রচনার জাতও আলাদা। ভাষাদর্শের দিক থেকে বরং বলা যায় যে প্রমথ চৌধুরীই 'সবুজপত্রের' পরবর্তী-যুগের রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে-ছিলেন।

'সবুজপত্র' প্রকাশের পর থেকে এবং প্রধানত তাঁরই একান্ত উৎসাহে ও তাগিদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী জীবনের গদ্যে একটানা চলিত ভাষা ও রীতি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর নব্যরীতির ভাষারূপ মেনে নিয়ে নিজের কবিত্ব-সুধমায় তাঁকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। তাই একই চলিত ভাষায় লিখিত প্রমথ চৌধুরীর গদ্য ও রবীন্দ্র-নাথের গদ্যের মধ্যে বিরাট ব্যবধান যে-কোন লোকের চোখে পড়বে।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কবিতার হাস্যরস, বাক্‌চাতুর্য ও মননশীলতা যে প্রমথ চৌধুরীকে প্রভাবিত করেছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি। ভাষাদর্শেও তিনি অনেকটা ভারতচন্দ্রপন্থী ছিলেন। তিনি তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছেন: 'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।'

এটা শুধু কথার কথা নয়—এটা তাঁর অন্তরের সত্য। বাংলা সাহিত্য ভারতচন্দ্র আদিরস ও হাস্য-রসের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে আদিরস নেই, হাস্যরসের প্রাচুর্য আছে। ভারতচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির পিছনে ছিল একটি পরিহাসপ্রিয় বুদ্ধি-বিদগ্ধ মন। তিনি ছিলেন অলঙ্কার উপমা ও বাক্‌-চাতর্যের একজন দক্ষ শিল্পী। এই শেষোক্ত গুণগুলির সমাবেশ প্রমথ চৌধুরীর মধ্যেও দেখতে পাই। ভাষার ক্ষেত্রেও দেখি যে ভারতচন্দ্র সেই প্রাক্‌-বৃটিশ যুগে তাঁর বাংলা ভাষায় নিঃসঙ্কোচে যাবনী শব্দের মিশাল দিয়েছেন। এতে তাঁর ভাষা লোকমুখে প্রচলিত ভাষার রূপ গ্রহণ করে আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে।

প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন এই পথের পথিক। তাঁর প্রচলিত লৌকিক গদ্যে তিনি স্বদেশী-বিদেশী অনেক কথাকে নিঃসঙ্কোচে স্থান দিয়েছেন। এমন কি, পঞ্চাশ বৎসর আগে লেখা তাঁর কবিতায় সংস্কৃত শব্দের পাশে ইংরেজী পদের ব্যবহার খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর নয়। অর্ধশতাব্দীর পূর্বে এ ছিল রীতিমত বৈপ্লবিক দুঃসাহস। বর্তমানে সাহিত্যে লৌকিক ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর একটি অভিমত উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করি—

'যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা—ঐক্য নষ্ট করা নয়। ...ভাষার এখন শাণিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয় সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে ধার কিংবা চুরি করে এন না।'

সাহিত্য মাসিক 'সবুজপত্র' প্রকাশ প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়। 'সবুজপত্র' তাঁর ভাষাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত ছিল। প্রমথ চৌধুরীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ রচনাই যেমন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' তেমনই রবীন্দ্রনাথের নতুন ধারার অনেক লেখাও বেরিয়েছে এই পত্রিকায়। 'সবুজপত্র' ছাড়া প্রমথ চৌধুরী এবং প্রমথ চৌধুরী ছাড়া 'সবুজপত্র' এর কোনটিই আমাদের পক্ষে ভাবা যায় না। সাহিত্যে যা কিছু নবীন ও প্রাণশক্তির পরিচায়ক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন তারই পৃষ্ঠপোষক। তিনি বাংলা সাহিত্যে যে নতুন বুদ্ধিবাদ, মনন-শীলতা ও নতুন রচনারীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তারই প্রতীক হয়ে 'সবুজপত্র' প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে।

প্রথম পর্যায়ে পত্রিকা চলেছিল প্রায় ৮ বৎসর। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই পত্রিকা আবার বেরিয়েছিল ১৯২৫ সালে, চলেছিল প্রায় তিন বৎসর। এ ধরণের নিছক সাহিত্য পত্রিকা চালানো যে সহজসাধ্য নয়, সে কথা জেনেও প্রমথ চৌধুরী তাঁর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপতেন না, কোন ছবিও ছাপতেন না।

প্রচলিত সংস্কারধর্মী প্রাচীনপন্থী সাহিত্য পত্রিকাগুলিকে নিয়ে বিদ্রূপ করার জন্যেই যেন আবির্ভাব ঘটেছিল 'সবুজপত্রের'। 'সবুজপত্রের' সঙ্গে প্রথম থেকে রবীন্দ্র-নাথের আন্তরিক যোগাযোগ ঘটেছিল এবং এ পত্রিকা তাঁর নিয়মিত স্নেহ-আনুকূল্যে পুষ্ট ছিল।

হলে কি হবে? পত্রিকা টিকে থাকে যে ব্যবসায়-বুদ্ধির জোরে সে ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রমথ চৌধুরীর কোন কালেই ছিল না এবং এ নিয়ে চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথও আপশোষ প্রকাশ করেছেন। তবু 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্তন করে আমাদের দেশের সার্থক সাহিত্য পত্রিকাগুলির মধ্যে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে।

বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রেও সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব ও মননের স্বাতন্ত্র্য একে করে তুলেছিল সাহিত্যে নবযুগের বাহন। 'সবুজ-পত্রে'র নামকরণ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'সবুজ হচ্ছে নবীনপত্রের রং-রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যাপ্তি।'

সাহিত্যে তিনি ছিলেন সর্বদাই

নতুন পথের পথিক। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন: 'জীবনে আমরা সকলেই এক পথের পথিক এবং সে পথ হচ্ছে নতুন পথ।'

'সবুজপত্র' প্রকাশের কারণ দিতে গিয়ে তিনি অন্যত্র বলেছেন: 'আমরা দেশী কি বিলাতী পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাঙলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনও গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ব অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। ---আমাদের নবমন্দিরের চারদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে।---সে মন্দিরে স্থান হবে না শুধু শুষ্ক পত্রের।'

প্রমথ চৌধুরীর এই ঘোষণা ও 'সবুজপত্র' সম্পাদনায় তাঁর কার্যক্রমের মধ্যে কোন বিভিন্নতা ছিল না। সেই সময়ের সাহিত্য পত্র-পত্রিকা যেমন 'নারায়ণ,' 'মানসী ও মর্মবাণী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি ছিল সংরক্ষণশীলতা ও সংস্কারের ধারক-বাহক। 'সবুজ-পত্র'কে কেন্দ্র করে প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন বাঙ্গালীর মানস সংগঠনকে মননশীল ও যুক্তিবাদী করে গড়ে তুলতে —তাকে জড়ত্ব ত্যাগ করে পথচলার মন্ত্র শেখাতে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই ছিল 'সবুজপত্রের' সমান আগ্রহ।

কয়েকজন নতুন অথচ ক্ষমতাশীল লেখককে কেন্দ্র করে তিনি এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। যা কিছু গতানুগতিক এবং সমাজে প্রচলিত ভাবধারার সহায়ক তার স্থান ছিল না 'সবুজপত্রে।' সম্পাদকের মনন-শীলতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে প্রত্যেকটি লেখা পত্রস্থ করা হত বলে প্রতিটি রচনাই পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যেত—প্রতিটি বিষয়ে তার মনে নতুন চিন্তার উদ্রেক করত।

প্রমথ চৌধুরী যে নতুন গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রচার ও প্রসারে 'সবুজপত্রে'র ছিল বিশেষ ভূমিকা। 'সবুজপত্র' কিভাবে রবীন্দ্র-নাথকে লৌকিক ভাষা ব্যবহারে উৎসাহিত করেছিল সে কথা আগেই বলেছি। তা ছাড়া 'সবুজপত্রে'র সম্পদ ছিল খাপখোলা তলোয়ারের মত প্রমথ চৌধুরীর নিজের লেখা-গুলি। 'সবুজপত্রের' প্রতি সংখ্যাতে তাঁর কোন না কোন প্রবন্ধ ত' থাকতই, তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্পও লেখা হয়েছিল 'সবুজপত্রে'রই প্রয়োজন মেটাতে।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তির যে সজ্ঞান প্রয়াস প্রমথ চৌধুরী করেছিলেন, এবার সে সম্বন্ধে কিছু বলে এই আলোচনা শেষ করি। বাংলা গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে ভাব ও ভাষার জোয়ার এনে-ছিলেন তার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী কারও চেয়ে কম অবহিত ছিলেন না এবং রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শকে তাঁর পরবর্তী-দের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখে প্রমথ চৌধুরীর শিল্পিমন যে পীড়িত হয়ে-ছিল---একথা নানাভাবে বোঝা যায়। রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যর্থ অনুকরণ করতে গিয়ে তৎকালীন কবিকুলের হাতে বাংলা কবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভাব ও ভাষায় শিথিল—হৃদয়োচ্ছ্বাসের অগভীর ও অসুন্দর প্রকাশমাত্র। বাংলা কবিতায় এই সংযমের অভাব, কবিতা রচনায় এই ঢিলেঢালা ভাব এবং প্রকাশভঙ্গির অস্পষ্টতা লক্ষ্য করেই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরী তাঁর সনেট-গুলি রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কেন না খাঁটি সনেট রচনায় মানসিক সংযম ও ভাবশৃঙ্খলার প্রয়োজন সর্বাধিক-একটা নির্দিষ্ট ছন্দোবন্ধন মেনে নিয়ে মাত্র চৌদ্দটি পংক্তির মধ্যে কাব্যরূপ ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিকর্মের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা [illegible]

দের হাতে পড়ে বাংলা কাব্য সরস্বতী যে ভরল রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন, তা প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিবাদী মনকে আন্দোলিত করেছিল। এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ যে আছে তার পরিচয় মিলবে তাঁর নিজের কবিতার নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি থেকে---

'যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল,
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার।'

---গজল।

কিংবা

'প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালবাসা
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,
জোর-করা ভাব আর ধার-করা ভাষা'
বড় কবি কিম্বা হতে যদি তত আশা,
ভাবুক বলিবে তোমা জন-সাধারণ,
যোগো যদি সমাজের, করি প্রাণপণ,
দরকারি ভাব আর সরকারি ভাষা।
যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে।'

---উপদেশ।

এ বিষয়ে আরও অধিক উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হলেও সেটা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রথমে উদ্ধৃত পংক্তি দুটির মধ্যে মোটামুটি প্রমথ চৌধুরীর

কাব্যাদর্শ বিধৃত আর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির মধ্যে পাই, তাঁর সমকালীন কবিতার দুরবস্থার চিত্র। জীবনে প্রমথ চৌধুরী বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন 'জোর-করা ভাব' ও 'ধার-করা ভাষা'কে এবং 'দরকারি ভাব' ও 'সরকারি ভাষা'কে অথচ তৎকালীন কাব্য-সাহিত্যে তিনি এই কয়েকটি বিষয়েরই উৎপাত দেখেছিলেন। বলা বাহুল্য এ সবই গতানুগতিক ধারায় রচিত তৎকালীন অধিকাংশ কবিতার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গোক্তি। কবিতার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতি নির্ভরশীল তাঁর 'পদ-চারণ' ও 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর স্বল্প-সংখ্যক কবিতার উপর। এ কবিতা-গুলিও তাঁর উত্তর যৌবনের রচনা। প্রমথ চৌধুরী মূলত কবি ছিলেন না ---প্রবন্ধকারের প্রতিভাই ছিল তাঁর সহজাত। তবু যে তিনি কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সবোচ্চস্তরে তখন সে-গুলি প্রকাশ করেছিলেন। তার মূলে ছিল রবীন্দ্রানুসারী আদর্শের বাইরে নতুন একটি কবিতার আদর্শ তৎকালীন কবি-সমাজ ও কাব্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরার স্পৃহা। সকল রচনার ক্ষেত্রেই প্রমথ চৌধুরী ছিলেন 'অনাহত সুরে'র অন্বেষণকারী। কবিতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

তাঁর রচিত কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে কতদূর সার্থক হয়েছে সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও ভাব, ভাষা ও ছন্দে সেগুলির উপর রবীন্দ্র-প্রভাব যে বিশেষ ছিল না---এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। তাঁর কবিতাগুলি ছিল সম্পূর্ণ-রূপে তাঁরই নিজস্ব---সেগুলির মধ্যে 'ধার-করা ভাষা' কিংবা 'সরকারি ভাষা' খুঁজে পাওয়া যায় না।

সনেট রচনার সূত্রপাত মাইকেল মধুসূদনের যুগে হলেও রবীন্দ্রনাথের ভাবসারী গীতিমুখর প্রতিভার বিকাশে সনেটের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সার্থক চতুর্দশপদী কবিতা কিছু কিছু থাকলেও তিনি সনেটের কঠিন বন্ধনকে কখনও আয়ত্ত করে নেন নি। প্রমথ চৌধুরী তার যুক্তিধর্মী মনের ভাব প্রকাশের জন্য বেছে নিয়েছিলেন সনেটের এই কঠিন বন্ধনকেই। সনেটের রূপ নির্বাচনেও তিনি পেত্রার্ক- সনেট কিংবা সেক্সপীরীয় সনেটকে গ্রহণ করেন নি---তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন ফরাসী সনেটের রূপকর্মকে। এর মূলে তাঁর সচেতন শিল্পিমন কাজ করেছিল বলে মনে হয়। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভাই ছিল মূলত হাস্যরস-আশ্রয়ী প্রতিভা। তাঁর কবিতাগুলিও এই হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। সমালোচকদের মতে হাস্যরস প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ফরাসী সনেটের রূপকর্ম। তাই তিনি এই রূপকর্মকেই নিয়েছিলেন বেছে। বলা বাহুল্য, ফরাসী সনেটের সার্থক চর্চায় বাংলা সাহিত্যে তাঁর কোন জুড়িও নেই।

যে সুর কানে ঢুকে চোখে জল আনে তা যে প্রমথ চৌধুরী ভালবাস-তেন না---সে কথা পূর্বোদ্ধৃত গজল কবিতাটি থেকেই বোঝা যায়। অথচ সেই সময়ের রবীন্দ্রানুসারী যুগে কবিতার করুণ রসের ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের খান ছেকেছিল। প্রমথ চৌধুরীর কবিতাগুলি ---তা সে সনেটই হোক, বিদেশী টেরজা রিমা কিংবা ট্রিয়োলেট ছন্দে লেখাই হোক---এই প্রচলিত ভাবধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহবিশেষ। প্রমথ চৌধুরীর কবিতার রসগ্রহণ করতে হলে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝা অত্যাবশ্যক। 'হাসি ও কান্না' নামক একটি কবিতায় তিনি নিজে বলেছেন---

'আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি।'

সামান্য কিছু হৃদয়বাদী কবিতা যে তিনি লেখেন নি, এমন নয়। তবে মূলত তাঁর কবিতাও তাঁর অন্যান্য সাহিত্যের মত বুদ্ধিবাদী। তাঁর একটি কবিতা-গ্রন্থ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর কবিতায় আর কিছু না থাক 'আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason।' সেই হৃদয়বাদী ভাবোচ্ছ্বাসের যুগে এ ছিল রীতিমত দুঃসাহস---যে যুক্তিবাদ গদ্যের ধর্ম তাকে তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন কবিতার শরীরে। আমরা তো এ যুগে কবিতাকে গদ্যধর্মী করে তোলারই চেষ্টা করছি। সুতরাং প্রমথ চৌধুরী যে এক্ষেত্রে একদিক থেকে আমাদের পথিকৃৎ সে কথা অস্বীকার করা চলে কি?

রাজনীতি

বিশেষ প্রশ্ন খুঁটিয়ে বিচার করতে আমার ভাল লাগলেও যাকে বলে 'রাজ-নৈতিক অর্থ' তা আমি বাদ দিয়ে চলি।---এ রকম 'বিজ্ঞান' হয়ই না। এ শাস্ত্রের কোনও নিয়ম নেই, নির্দিষ্টতা বা অপরিবর্তনীয়তা এ ক্ষেত্রে না থাকায়, একে বিজ্ঞান বলা চলে না।---এ ক্ষেত্রে সম্প্রতি আমি অ্যাডাম স্মিথ থেকে অধ্যাপক ডিউ পর্যন্ত গোটা কুড়ি বই পড়েছি, এবং এ থেকে যদি একদিকে নিছক 'ট্রুইজম্' আর অন্যদিকে সব সন্দেহজনক বক্তব্য রাখি, ত' প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

---আর্থার ওয়েবুস্তার।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণজগতের কৃষ্ণকথা ॥

• লীলারহস্য কথা •

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

বন্ধু এলেন, বললেন—'ভাই রামকৃষ্ণ-জীবনের কোন একটা বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা কর এবং দেখিয়ে দাও—ধর্ম-জগতে তাঁর এই ভাবটা একটা মৌলিক ভাব। এটা আর আগে দেখা যায় নি।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা চল গভীর চিন্তারাজ্যে ডুব দিই—দেখি কিছু উদ্ধার করতে পারা যায় কি না। কিন্তু থেকে থেকে একই কথা মনে আসছে, কিছুতেই এই সমস্যার কথা ভুলতে পারছি না। ঠাকুর কেন মাতৃভাবের সাধনার উপর এত জোর দিলেন।'

আবার আরও খানিকটা আলোচনা করে পরে দেখা যাবে—ঠাকুরের জীবনের অন্য বিশেষত্ব নিয়েও আলোচনা করা যাবে। কথা হচ্ছে হয়ত দেখবে এখানে আলোচনা করতে বসে অনেক পুনরুক্তি হচ্ছে। তা ত' হবেই। তা নিয়ে যদি তুমি কিছু মনে না কর তবেই আমার পক্ষে সম্ভব এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া। তা না হলে আমার আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তাই বলছি ঠাকুর দিবা-নিশি ভেবেছেন, চিন্তা করছেন, কি করে জীবোদ্ধার হবে। কি করে মানুষ ভগবদমুখী হবে। আচ্ছা এ সব কি নিছক পাগলামী? না, মোটেই পাগলামী না। বন্ধু, একটু ধৈর্য ধর। চল এগিয়ে চল। এই পরমপুরুষের Problemটা কি বুঝতে পারলে ত'? এই Problem শুধু ভারতের জন্য নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত ছিল সমস্ত জগতে। সমগ্র জগতের মনুষ্য জাতির দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার জন্য তিনি এসেছিলেন, তা আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পাব এবং বুঝতে পারব।

বিধাতার নির্দেশেই যেন প্রভু লোকচোখের উপর নতুন আলোকপাত করলেন ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা করে এবং উদ্বুদ্ধ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেশে বৈষ্ণবভাবে সাধনা সুরু না করে মাতৃভাবে সুরু করলেন এই জন্য যে—এই মাতৃভাবের সাধনাই এই যুগোপযুক্ত ছিল। ব্রহ্মচর্য, সত্য এবং ঈশ্বরে শ্রদ্ধা এই তিনটা জিনিষেরই বর্তমান যুগে বিশেষ অভাব। অথচ ভগবদ্মুখী হয়ে যাঁরা এগিয়ে যাবেন, বর্তমান যুগে সাধারণ লোকেদের ভিতর এই মাতৃভাব আদর্শরূপে স্থাপন না করলে মানুষের মন কিছুতেই ভগবদ্মুখী হবে না।

ঠাকুর 'কামিনী-কাঞ্চন' কথাটা ব্যবহার করেছেন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের উপরই ভাগবত জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই যুগের মানুষদের এত দুর্ভাগ্য যে, আহার এবং বাসস্থানের জন্য সাধারণ লোকের যতটুকু কাঞ্চন না হলেই নয়—ততটুকু কাঞ্চন সংগ্রহ করার সামর্থ্য তাদের নেই, কাজেই এখন কামিনীই প্রথম সমস্যা। শুধু প্রথম নয় হয়ত বা দেখা যাবে একমাত্র সমস্যা।

কামিনী ত্যাগ মানে কি? না যেখানেই কামিনী বা রমণী সেখানেই মা স্বয়ং উপস্থিত এই ভাবটির অনুশীলনই মানুষের ভগবদমুখী হবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাই না চণ্ডীতে বলা হয়েছে—'স্ত্রিয়াঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু'—জগতের সমস্ত স্ত্রী-মূর্তিতেই দেবী ভগবতীই বিদ্যমানা এই ভাবটিকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা। এই ভাবের ভিতর দিয়ে মানুষ যতখানি অগ্রসর হবে ততই তার সাধনপথে চলা ততখানি সুগম হবে। ঠাকুরের জীবনে এই ব্যাপারটি সমস্ত জীবন ধরে কি অপূর্বভাবে প্রকাশ বা বিস্তারলাভ করেছে। স্ত্রীলোক দেখলেই, তার ভিতরে মা-কালী স্বয়ং রয়েছেন এই ভাবটি সব সময়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটে উঠতো। তাই যখন মা-কালী দেখালেন যে, তাঁর একটি পুত্র হবে, তখন তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। তা কি করে সম্ভব, তাঁর যে সবই মাতৃযোনি। পৃথিবীতে লুপ্ত ব্রহ্মচর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যিনি জন্মেছেন, তাঁর সাধনধারাও সেই মাতৃমূর্তিটি নিয়ে। তা না হয়ে কি উপায় আছে? কি অপূর্ব সে সাধনার ইতিহাস। শিশু ত' মা ছাড়া কিছু জানে না, মা ছাড়া কিছু বুঝে না, মা না হলে তার চলে না। কাজেই মনেপ্রাণে তিনি একেবারে একটি শিশু হয়ে গেলেন এবং দিন-রাত জগৎ-কারণ ভগবানকে মাতৃরূপে, স্নেহময়ী মা-রূপে পাবার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন।

বলছেন—স্বপনেও কামচিন্তা হলো না। নিজের বিবাহিতা পত্নীর প্রশ্নের জবাবে বলছেন—

মন্দিরের মা, গহ্বরের মা আর তুমি একই —সেই আনন্দময়ী মা। মন্দিরের মা মানে মা-কালী। গহ্বরের মা মানে স্বীয় গর্ভধারিণী—জননী চন্দ্রাদেবী আর তাঁর বিবাহিতা ধর্মপত্নী এই তিনকেই তিনি একদৃষ্টিতে দেখতে পান। সত্যিকার প্রত্যক্ষ অনুভূতি করেন।

মনকে শাসন করে বুদ্ধির সাহায্যে নজীর তৈরী করে একটা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা নয়—প্রত্যক্ষ অনুভূতি! কি অপূর্ব ব্যাপার। পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কারও এই উক্তি আছে কি? শুধু উক্তি থাকা নয়। সেই উক্তি যে ষোলআনা সত্য তা বুঝাবার জন্য দিনে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত থাকা এবং রাতে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা।

মানুষ ত' দূরের কথা—দেবতার চরিত্রও কি এই প্রকারের বস্তুনিষ্ঠায় তৈরী কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? আমি মূর্খ অত শাস্ত্রটাস্ত্র জানি না, তবে গভীরভাবে এই শক্তিটার অনুধ্যানের চেষ্টা করেছি। তিনি যদি মানুষ হন তা হলে এই দুনিয়ার অন্য সব মানুষকে কি মানুষ বলা যায়?

ছেলেবেলার একটা গল্প মনে পড়লো। এক পরমহংস সন্ন্যাসী ছিলেন শ' তিনেক বছর আগে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী গেরুয়া আলখেল্লা পরতেন। নীচে গেরুয়া-কৌপীন। তবে যখন আশ্রমে থাকতেন বেশীর ভাগ সময়েই নেংটো থাকতেন। এ সম্বন্ধে চেলারা কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেতেন না। একদিন সকালবেলায় আশ্রমে বসে চেলাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছেন হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন এবং তাঁর এক প্রবীণ চেলাকে ডেকে বললেন, 'শীগগিরই আবার আলখেল্লা নিয়ে এসো। এখনই চাই দেরী করো না।' সঙ্গে সঙ্গে চেলারা দৌড়ালেন আলখেল্লার জন্য। পরমহংস উঠে আলখেল্লা পরলেন আর বেশ ভারিক্কী মুখ করে বসলেন যেন কোন বিশেষ অতিথি আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন।

দেখতে দেখতে এক মুসলমান ফকির এসে উপস্থিত হলেন। একজন আর একজনকে দেখে কেঁদেই অস্থির, তারপর একে অপরকে ধরে প্রথম জড়াজড়ি, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি। হৈ-হৈ ব্যাপার। চেলারা ত' কিছুই বুঝতে পারছেন না, ব্যাপার কি? সব অবাক হয়ে কাণ্ডখানা দেখছেন। হঠাৎ দেখা গেল উভয়েই উঠে দাঁড়ালেন এবং পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন তারপর আস্তে আস্তে ফকিরটি চলে গেলেন। আর উনি—আমাদের পরমহংস মহারাজ আস্তে আস্তে আলখেল্লাটা খুলে ফেলে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু ব্যাপারখানা কি? শিষ্যরা ত' কিছুই বুঝলেন না। শেষ-পর্যন্ত যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চেলা, তিনি উপস্থিত হয়ে অনেক মিনতির পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরুদেব, ব্যাপারখানা কি? আমরা ত' কিছুই বুঝলাম না। কৃপা করে একটু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।'

গুরুদেব হঠাৎ কৃপা করে বলে উঠলেন—'হ্যারে এই সোজা জিনিষটা তোরা কেউ বুঝলি না। শোন, আজ যদি তোদের কেউ জঙ্গলে চলে যাস, আর যদি দেখতে পাস যে ত্রিসীমানায় কোন মানুষ নেই শুধুই জঙ্গল, তবে শেয়াল, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি আছে—তাহলে কি করিস? সেজে গুজে আর কাপড় পরে থাকিস না, কাপড়খানা খুলে নেংটো হয়ে চলতে তোর কোনই দ্বিধা থাকবে না, কেমন?'

সমস্বরে সবে উত্তর দিলে—হ্যাঁ গুরুদেব, জঙ্গলে আর কাপড় পরে থাকবার প্রয়োজনীয়তা কি? আমরা নিশ্চয়ই কাপড় খুলে ফেলে নেংটো হয়ে ঘুরে বেড়াবো। 'তা হলে ত' বুঝতেই পারছিস আমার ব্যাপার। আমি দিনরাত বসে আছি জঙ্গলে। যে দিকেই তাকাই দেখি, কেউ কুকুর, কেউ বিড়াল—কখনও বাঘও দেখি, কাজেই আমার আলখেল্লা পরার দরকার হয় না। আজ হঠাৎ দেখলাম এদিকে একটা মানুষ আসছে দেখে লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি তোদের প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম আলখেল্লাটার জন্য।'

চেলারা বুঝতে পারলেন গুরুদেব তাঁদের মানুষ বলে মনে করেন না, কিন্তু গুরুদেবের মতে এই মুসলমান ফকির মানুষ পদবাচ্য। আচ্ছা তাই না হয় হলো। গুরুদেব এতকাল পরে মানুষ দেখে তাঁকে যথারীতি আদর-অভ্যর্থনা ত' করলেনই না, দুটো মনের কথাও ত' বললেন না। তা হলে গুরুদেবের কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য কোথায়? গুরুদেব বুঝলেন ব্যাপার সুবিধের নয়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় তোদের বুঝবার বাকী রইলো।'

চেলারা শুনতে পেলেন গুরুদেব বলছেন কত কথা আমাদের হলো, কত পরস্পরকে আদর যত্ন, কত ভাবে আপ্যায়ন। শেষ পর্যন্ত ফকির বললেন, 'আজ ভাই যাই ভবিষ্যতে যদি সুবিধে হয় আবার আসবো।'

যাই হোক আগের কথায় ফিরে আসা যাক। ঠাকুর বুঝলেন আমি মা বলে জগৎ-কারণকে ডাকতে আরম্ভ করলে, আমার বার্তাবহ হয়ে যারা আসবে তারাও মা বলে ডাকতে আরম্ভ করবে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত মনুষ্য-জাতি 'মা' বলতে বলতে বিভোর হয়ে যাবে। তাতে হবে এই ভবিষ্যতে মানব-জাতির ভিতর থেকে রমণীরা লুপ্ত হয়ে যাবেন এবং তার পরিবর্তে দেখা দেবেন মাতৃমূর্তির দল, দেবী-মূর্তির দল। তখন আস্তে আস্তে ঘাটে মা, পথে মা, বাজারে মা, ঘরে মা, বাইরে মা। চমৎকার! বিশ্বজোড়া এক জগন্মাতা বহু মাতৃমূর্তিতে বিরাজমানা থাকবেন। অবশ্য পুরোটাই এই হবে তা ঠাকুর চান নি। ঠাকুরের অনুশাসন —দুই একটি পুত্রসন্তান হলে ভাই-বোনের মতন থাকবে। যখন সমাজে এই মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা হবে তখন ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের মাতৃভাবের সাধনার মর্যাদা এবং উদ্দেশ্য মানবজাতি বুঝতে পারবে।

(ক্রমশ।

শেষ রাগ
-বিজয়কুমার আচার্য

মাসিক
বসুমতী
আষাঢ় / '৭৫
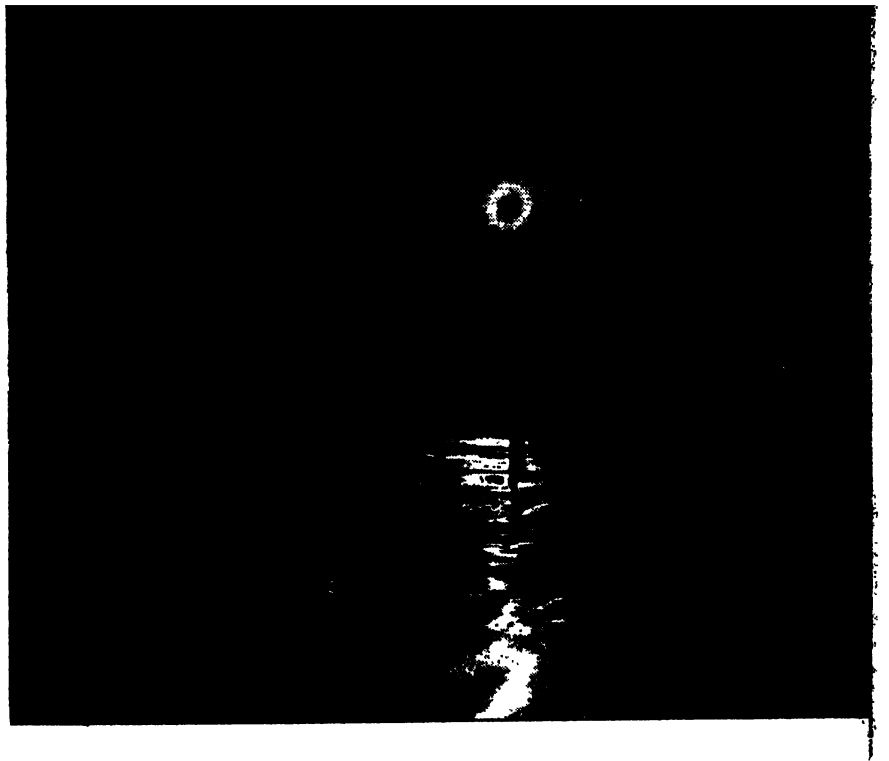
আলোকচিত্র

আউটরাম ঘাট (কলকাতা)
—কার্তিক ভট্টাচার্য

শেষ খেয়া
—অরুণ চৌধুরী

সীমাবদ্ধ

—রণজিৎ পাল
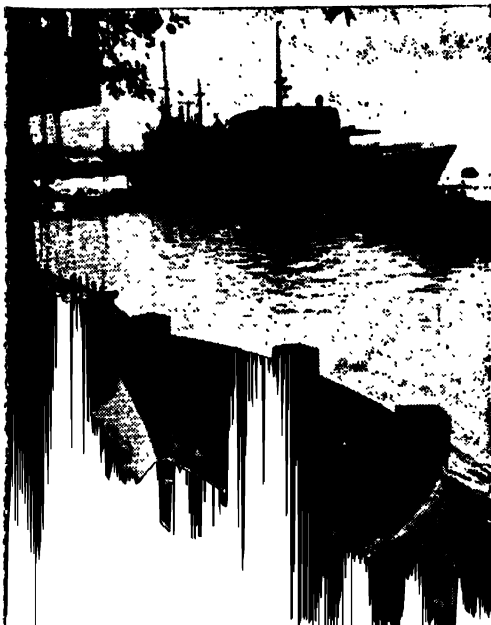
ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা ও বিষয়বস্তু লিখবেন]

ময়দানের কাব্য

—জি মুখোপাধ্যায়

রাতের রহস্য

—বিণ্টু গুপ্ত

মাসিক

বসুমতী

আষাঢ় / '৭৫

●

[ছবি বর্ধিত আকারে গ্লাস কাগজে পাঠাবেন]

●

শেষের কবিতা
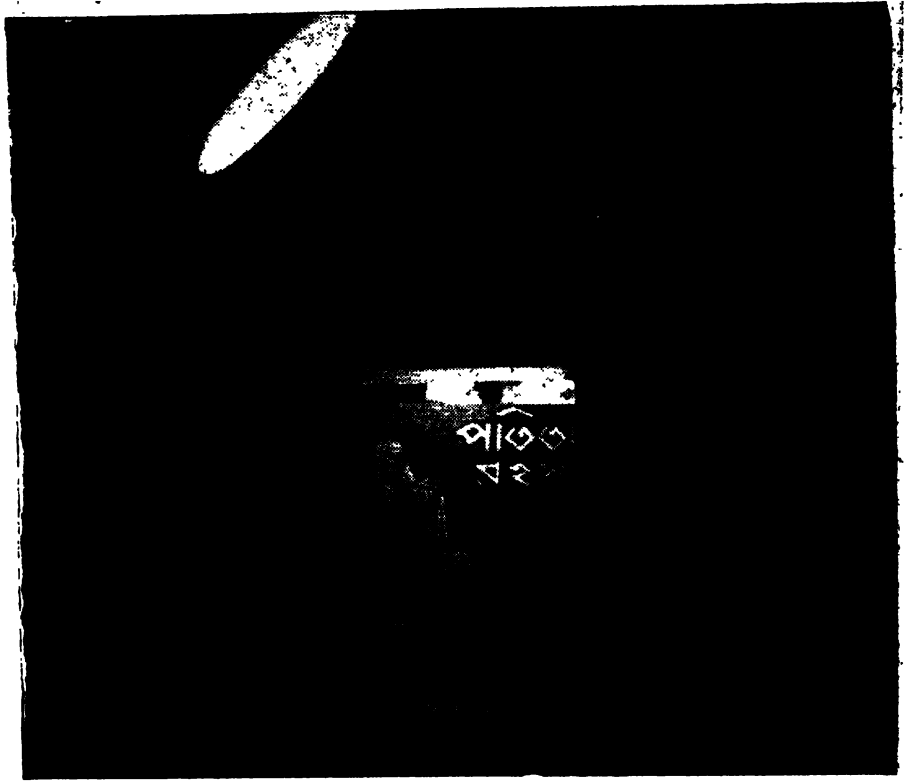
—নীহার তালুকদার

ওক গাছ (রাণী ক্ষেত)

—দীপক বসু

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

শ্রাবণ সংখ্যায়

পাঠশালা

ভাদ্র সংখ্যায়

চোখ

১ম পুরস্কার	২০ টাকা	
২য় "	১৫ "	
৩য় "	১০ "	
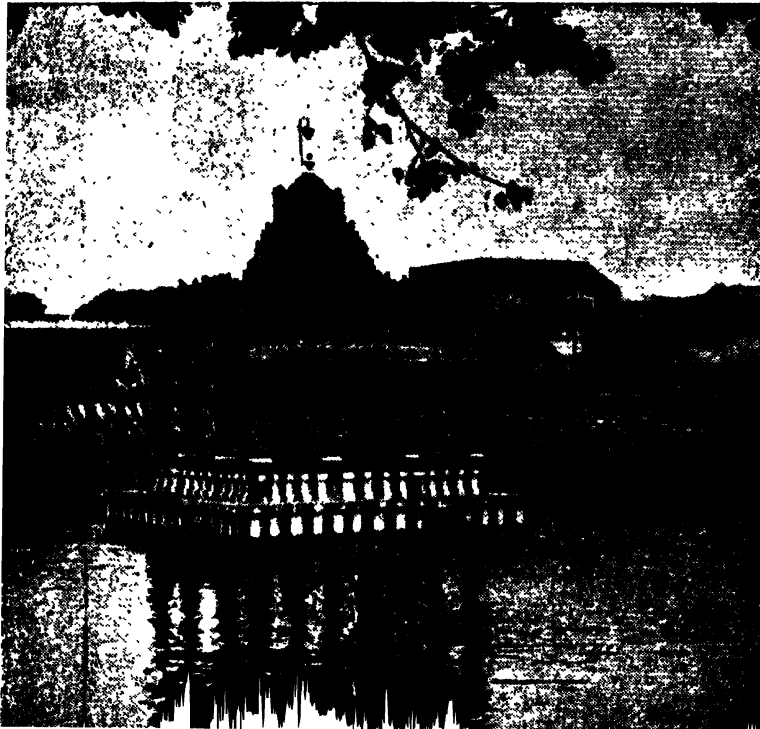
মাসিক

বসুমতী

আষাঢ় / '৭৫

জলঘর
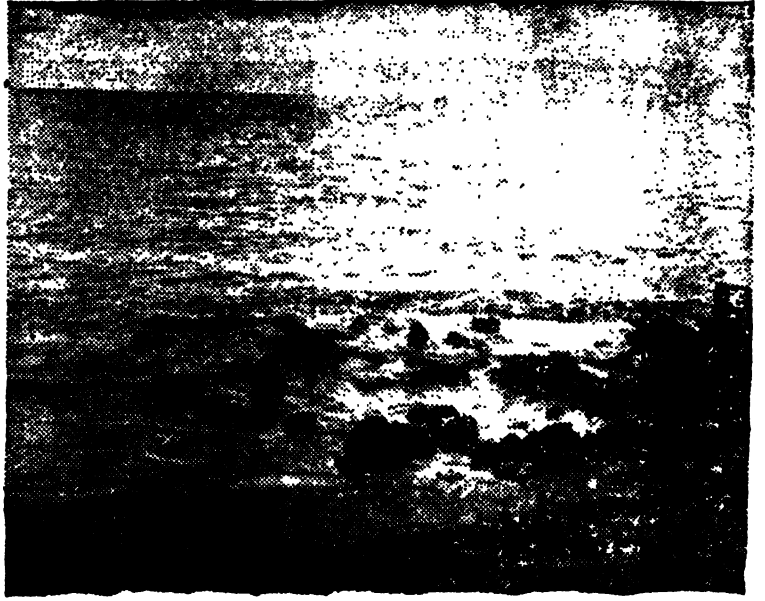
—পি জি রাও

তীর্থে তীর্থে

নারায়ণ হালদার

রামেশ্বরের সমুদ্রোপকূলে দাঁড়ালে দেখা যায় খণ্ড-বিখণ্ড ছোট ছোট ঢেউ নীল দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কূলে পাথরের চাঁই

রামেশ্বরম্

সুনীল বঙ্গোপসাগর---যার বক্ষে হাহাকার তোলা ঢেউগুলো উথাল পাথাল করে---যার সোনালি বেলাভূমি মাইলের পর মাইল ব্যাপ্ত---যার মাতাল হাওয়া তীরভূমির ঝাউবনবিথির ভিতর সোঁ সোঁ আওয়াজ তোলে, শাখাপ্রশাখা উড়িয়ে, ঘুরিয়ে দুলিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাউবনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, গাছের [illegible]র মতো পাতাগুলি দাপাদাপি করে; নড়ে, ঝরে, পড়ে---কোথাও বা এই মাতাল হাওয়া ঝাউবনবিথি না পেয়ে বেলাভূমি বালি উড়িয়ে, ঘুড়িয়ে, চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়---যার তটরেখায় রয়েছে ঘন অরণ্যবিশিষ্ট মোহনা ও বদ্বীপ---বিক্ষিপ্ত শিলাস্তর---তার সঙ্গে কিন্তু বঙ্গমাতার মিতালি---উচ্ছল ঢেউগুলি শততরঙ্গের ভঙ্গীতে সদাই তাকে বন্দনা করছে---উপকণ্ঠে থেকেও এই সাগর আজও বাঙ্গালীর কাছে অচিন, অনাত্মীয়। দীঘার সৈকতাবাস গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কিছু কিছু ব্যক্তি সাগরকে আপন করতে চেয়েছে, পেরেছে।

এই সেই সাগর, যার তটরেখায় গড়ে উঠেছে কত শহর, বন্দর, জনপদ ও সৈকতাবাস---দীঘা, পুরী, গোপালপুর ও ওয়ালটেয়ার। বাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও মাদ্রাজের গা ঘেঁষে অবশেষে ভারত মহাসাগরে গিয়ে এ এলায়িত। আমি
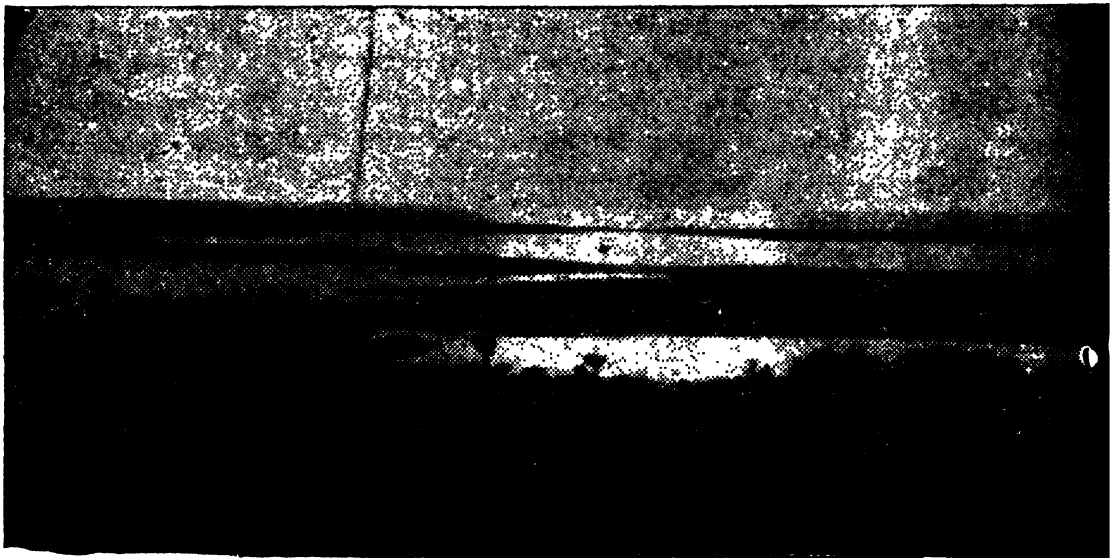
সমুদ্রোপকূলে বিস্তৃত তন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা ইত্যাদি

আজ যার কথা বলব সেটি মাদ্রাজের মহোপসাগরের কূলে একটি ছোট্ট শহর —বাবার খান। রামেশ্বরম। এটি মাদুরা জেলায় মাদুরা থেকে ১০০ মাইল পূর্বে, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ অগভীর সমুদ্রের উপর তৈরী বিখ্যাত পানবাম ব্রীজ ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপটির সংযোগ স্থাপন করেছে। দ্বীপটি আকৃতিতে গোলাকার, জলে ভাসা শুকনো ডাবের খোলের মতো। রাম-ঝরকায় (গন্ধমাদন পর্বত) একটি বাইনাকুলার হাতে নিয়ে উঠলে এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। খালি চোখে ও হতাশ হবেন না। রামেশ্বর গিয়ে রামঝরকায় না উঠলে যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সকাল সন্ধ্যায় এখানে গেলে দেখবেন সাগর থেকে স্নানকরা সূর্য গা শুকিয়ে আপন কক্ষপথে থেকে সাগরেই ডুব দেয়। এখানে দাঁড়িয়ে দূরে দৃকপাত করলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা অতি পরিচিত এক শ্লোককে মনে করিয়ে দেয় দেয়—

দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
ধারনিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

রামেশ্বর একটি বড় তীর্থক্ষেত্র। শংকরাচার্য কৃত ভারতের চারধামের এক ধাম এই রামেশ্বর। অপর তিনটি পুরী, বদরিনাথ ও দ্বারকা। এখানকার শিব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। তা ছাড়া বাইশটি তীর্থের (কুণ্ডুর) সমন্বয়ে ভাস্বর এই তীর্থক্ষেত্র—যেগুলি রামেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণেই রয়েছে। রামেশ্বরের মাহাত্ম্য তাই সীমাহীন। যুগ যুগ ধরে তাই ভারতের অগণিত নরনারীকে আকর্ষণ করেছে। পবিত্র তীর্থ এই রামেশ্বরম। বিশেষ বিশেষ উৎসবে তীর্থস্থানে জমায়েত হওয়াই আমাদের দেশের রীতি। তাই বিজয়া দশমীতে বাবার নবরাত্রির উৎসবে যাত্রীরা জমায়েত হয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে। রামচন্দ্র এখানে বালির শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রামায়ণের এক অপূর্ব কাহিনী।

রামঝরকা (গন্ধমাদন পর্বত)। এখানে রামচন্দ্রের চরণকমলে পুজো হয়

রামচন্দ্রের বানর সৈন্য এখান থেকে সেতু বেঁধেছিল সমুদ্রবক্ষে লঙ্কা যাবার জন্য। রামচন্দ্র এখান থেকেই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। যুদ্ধ ছিল সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত। রাক্ষসরাজ দশানন রাবণের মৃত্যুর পর পাপমুক্তি অর্থে সবাই রামচন্দ্রকে উপদেশ দেন শিব প্রতিষ্ঠা করে পুজা করতে। রামভক্ত হনুমান ছুটল কাশী থেকে শিবলিঙ্গ আনতে। হনুমানের বিলম্ব দেখে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বালির শিবলিঙ্গ তৈরী করার আদেশ দেন এবং রামচন্দ্রই তাঁর পুজো করেন। হনুমান যখন শিবলিঙ্গ নিয়ে ফিরে এল তখন শিবপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এতে হনুমান অভিমানে বিশেষভাবে আহত হলো।

বালুর তৈরী শিবলিঙ্গ সে লেজ দিয়ে পাকিয়ে উপড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু হায় বৃথা এ চেষ্টা। মহামায়া সীতার প্রতিষ্ঠিত শিব উপড়ায় কার সাধ্য। শ্রীরামচন্দ্র তখন হনুমানকে সান্ত্বনা দিয়ে তার আনা শিবও প্রতিষ্ঠা করতে বললেন তিনি আদেশ দিলেন—এই শিবের পুজা আগে হবে তারপর সীতার প্রতিষ্ঠিত শিবের। মন্দিরে উভয় শিবের পুজো হচ্ছে আজও। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদা মা একবার এই রামেশ্বরে দেবদর্শনে এসে আপন মনে নাকি বলে ফেলেছিলেন, 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনটি আছে।'

সৌন্দর্যপিপাসু ব্যক্তিরা সকলেই দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার সময় এই স্থানটির কথা ভোলেন না। ঐতিহাসিকেরাও। তবে তীর্থের মন নিয়ে যারা যান, মন্দিরের ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁদের মন হয় ভাবরসে আপ্লুত। ভোর ৪টা থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অনেক কিছুরই আকর্ষণ দৈনন্দিন জীবনধারাকে ভুলিয়ে দেয়। তন্মধ্যে বাদ্য সহকারে ভোরের শয্যা উত্থান আরতি, সন্ধ্যা ও রাত্রের শয়নারতির অপরূপ প্রভাব, সমুদ্রঘাটে ধনুকোটির পুজা, সিক্ত বস্ত্রে মন্দির-প্রাঙ্গণে বাইশ কুণ্ডের স্নান, অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের পুজোও অন্যতম। সমুদ্রস্নান করে তীরে ধনুকোটির পুজো দিয়ে পাণ্ডার সঙ্গেই সবাই দক্ষিণ গোপুর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। পাণ্ডারাই বড় দড়া দিয়ে বাইশ কুণ্ড থেকে জল তুলে স্নান করায়। সর্বশেষে পুজো।

উত্তর গোপুরের কাছে সাজান ডালা পাওয়া যায়। পাণ্ডারা ইচ্ছামত কারও কাছ থেকে পুজোর জন্য কিছু নিতে পারে না। তাদের হাত বাঁধা, তা ছাড়া তাদের দৌরাত্ম্যও কম। পুরী, গয়া, বৃন্দাবনের মত তারা কারও গলা কাটে না। কারণ মন্দিরের পরিচালনার ভার

রয়েছে এক ট্রাস্টির উপর। পূজারীরা ও পাণ্ডারা বেতনভুক। মন্দিরের ট্রাস্টির একজন কোষাধ্যক্ষ থাকেন। বিভিন্ন রেটের পূজোর জন্য বিভিন্ন রেটের টিকিট তিনি বিক্রয় করেন। পাণ্ডার হাতে কেউ পুজোর জন্য পয়সা দিলে তা নিঃসন্দেহে মন্দিরের ফাণ্ডে যাবে—টিকিট দেখলে তা বুঝা যায়।

রামেশ্বরের সমুদ্রোপকূলে দাঁড়ালে দেখা যায় খণ্ড বিখণ্ড ছোট ছোট ঢেউ নীল দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। নীল আকাশ থেকে সাগরের জল এখানে আরও নীল। এখানে বেলাভূমি পুরীর মত স্নানোপযোগী নয়। আশে পাশে পাথরের চাঁই। তা ছাড়া আছে বিষাক্ত মাছের ভয়। সমুদ্রের দিকে দক্ষিণ গোপুর আর শহরের রাস্তা এসে মিশেছে উত্তর গোপুরে। মন্দিরকে ঘিরে উত্তর গোপুরকে স্পর্শ করেছে, অত্যাশ্চর্য এক করিডর। করিডরটি আয়তাকার। মোট দৈর্ঘ চার হাজার ফুট। করিডরটি প্রস্থে সতের থেকে বাইশ ফুট। করিডরের মধ্যে দিয়ে চলার সময় মনে হয় কোন এক সুরক্ষিত দুর্গের মধ্য দিয়ে চলেছি। কোনকালে কোন রাজা কি পূজার অবলম্বনে এই সুরক্ষিত দুর্গে থেকে রাজত্ব চালাতেন? করিডরের শেষে মূল মন্দিরের সামনে এক নন্দী মূর্তি রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের মন্দির-প্রাঙ্গণের এই নন্দীই সব চেয়ে বড়।

ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় এখানে সারা বৎসরই বেশ গরম। কাজেই শীতকাল বড়ই রমণীয়। এখানে বেড়ানোর পক্ষে সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী এই কয়মাস প্রশস্ত সময়। অবশ্য এই সময় বৃষ্টিভয় আছে, কারণ মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে বৎসরে দুবার বর্ষাকাল।

রামেশ্বরে সী-ফিসিং। দিনেরবেলায় শত শত ডিঙি সাগরের বুকে ভাসে

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে রেল পথে রামেশ্বরের সংযোগ রয়েছে। হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ খড়গপুর, ওয়ালটেয়ার হয়ে গেছে দক্ষিণ রেলপথের মাদ্রাজে। খড়গপুর থেকে একটি লাইন জামসেদপুর হয়ে বোম্বাই গেছে। এগমোর থেকে মিটার গেজ লাইনের জাল পাতা রয়েছে মাদ্রাজের শহর, মন্দির ও বন্দরে। একটি লাইন চিঙ্গলপুট, তাঞ্জোর ও মাদুরা হয়ে রামেশ্বর গেছে।

এই তীর্থদর্শন প্রতিটি ভারতবাসীর জীবনের চরম আকাঙখার বস্তু। কিন্তু তীর্থযাত্রী ছাড়াও দেশী বিদেশী পর্যটক আসেন মন্দিরের শিল্পের আস্বাদ পেতে। সামুদ্রিক ঝড়ে পুরাণো পানবান ব্রীজ উড়ে যাওয়ার পর আবার তা তৈরী হয়েছে। কিন্তু পানবান থেকে ধনুষ্কোটি যাওয়ার রেলপথ বিধ্বস্ত হওয়ার পর আর পাতা হয় নি। ফলে সিংহলে যাওয়ার জাহাজ এখন রামেশ্বর থেকেই ছাড়ে।

রামচন্দ্র যেখানে সেতু বেঁধেছিলেন, সেখানে নাকি সমুদ্র অগভীর এবং একটি গিরিশৃঙ্গ ভারত ও সিংহলকে যোগ করে রয়েছে। বৃটিশ ভারতে সিংহল-রামেশ্বরের সেতুর কথা চিন্তা করা গেলেও বর্তমান রামরাজ্যে তা কল্পনা করা চলে না, কারণ সিংহল আজ স্বাধীন।

সব বুঝি

শ্রীসনৎ গুপ্ত

মেপে মেপে কথা বলা,
ভেবে ভেবে পথ চলা,
তোমাদের সব বুঝি
ভাবটুকু ছাড়া।
রং মেখে ভালবাসা,
সং সেজে কাঁদা-হাসা,
তোমাদের সব বুঝি
রংটুকু ছাড়া।

কথা দিয়ে কথা গাথা,
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা,
তোমাদের সব বুঝি
কথাটুকু ছাড়া।
বেচা কেনা দর দাম,
লেন দেন নাম ধাম,
তোমাদের সব বুঝি
দামটুকু ছাড়া।

॥ সাত ॥

সকাল হতেই ঝুমরার মন ছুটতে চাইল জলদের কাছে। কিন্তু বেশ বুঝছে এখন যাওয়া চলবে না। লাল বাড়ীতে খুব খোঁজাখুঁজি চলছে, অবশ্য খুব চুপিচুপি। ওরাও যেন সব গোপন রাখতে চায়। বে-আইনী কারবার, না হ'লে তো মানুষ হারালে থানা-পুলিশ করা নিয়ম। এ যেন হারানোর খবরটা কাউকে জানতে দিতে চায় না। ঝি দুটো যে পড়শীদের ঝি-চাকরের সঙ্গে কিছু খবর পাবার আশায় ভাব জমাচ্ছে তা বেশ বুঝল ঝুমরা।

একটু বেলা বাড়লে দলের সবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুমরাও পাড়ার বাইরে চলে এল। হাঁটতে সুরু করল জলদের ঘরের দিকে। অনেক দূর রাস্তা। কমসে কম পাঞ্চ ছও মিল। অনেক তাড়াতাড়ি

ভিজানো ভাতের অর্ধেকটা ঝুমরার জন্য রেখে, বাকীটা চটপট করে খেয়ে বেরিয়ে পড়ল জলদ। দশটা বেজে গিয়েছে বোধ হয়। কে জানে তার জন্য আছে কিনা রিক্সা।

বড় মুশকিলে পড়ল ঝুমরা জলদ। মেয়েটার জর ছাড়ে না। ঝুমরা ঘরে না থাকলে জলদের বের হবার উপায় নেই। বের তো হতেই হবে তাকে। ঝুমরার স্বাধীন ব্যবসা, ইচ্ছা হলে ভিক্ষা করবে, ইচ্ছা না করলে রেস্ত থাকলে হাতে, বসে থাকবে সাতদিন। জলদের সেটি হবার উপায় নেই। তার মালিক কড়া মানুষ। ঠিকমত রিক্সা না দিলে, আর দেবে না। মরবে তখন জলদ না খেয়ে। সুতরাং রোজগার বন্ধ করে ঝুমরাকেই ঘরে বসতে হয়। আবার তাকে ফিরেও যেতে হয় নিজের

বড় ভাল। বড়লোক। গাড়ী আছে, সেই গাড়ীর চাকা কাটলে-ফাটলে আমার রিক্সা ছাড়া ওঠেন না তিনি। তান পোলা ডাক্তারী পাশ করছে, তারে দেখাইতে পারি। কাপড়ে তাপ্পি লাগাতে লাগাতে জলদ উত্তর দিল।

---তবে সেই ডাংদার বাবুকে ডেকে আন জলদা। বহুৎ দুখ হচ্ছে লেড়কীর জন্য। তোর হচ্ছে না?

---হ, দুঃখ তো হয়ই। পোড়াকপালীর মুখখানা যেন নমুনার মত। অবিকল সেই চক্ষু, সেই নাক, কেবল বর্ণখান গোরা। কিন্তু ডাক্তারবাবুরে তো এইখানে আনন যাইব না ঝুমরা ভাই। তেনার বাড়ীতে নিতে হইব মাইয়াটারে।

---বাড়ীতে দিয়ে যাবি, উর তো গেয়াম ভি নাই।

ধারাবাহিক উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

হেঁটে ও চনচনে রোদ উঠবার আগে জলদের ঘরে পৌঁছতে পারল না ঝুমরা। ঘর তো ভারি, এর চেয়ে ফুটপাথ ভাল ঝুমরাদের। খোলার চাল, জানালা-হীন একটা দম আটকানো খুপরি। ভগবানের আলো-বাতাস ভুলেও ঢোকেনি সেই ঘরে। জরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। তাকে চাপাচুপি দিয়ে রেখে, গালে হাত দিয়ে বসে আছে জলদ। ঝুমরাকে দেখে কথা ফুটল মুখে।

---আইছ? এইটা যে বড় বিপদে পড়লাম ঝুমরা। মাইয়াটা জরে অজ্ঞান অচৈতন্য। গাও যেন তপ্ত খোলা। আর একলা থুইয়া বাইর হইতে পারলাম না। এদিকে মালিককে তো পাঁচ সিকা দিতেই হইব দিনটা গেলে। অখন বস তুমি, মাথায় একটা জল পটি দাও। আমি যাই। দেখি, যদি পারি আমার কালে লইয়া আমুম জরের ওষুধ।

আস্তানায় নিয়মমত। না হ'লে, কে জানে, ঝুমরাকে না দেখলে যদি লাল বাড়ীর লোকেদের সন্দেহ জাগে তাহলে আর উপায় নেই। তিন দিন কেটে গেল, জর মোটে ছাড়ে না মেয়েটার। ডাক্তারখানা হতে জরের ওষুধ সাদা বড়ি কিনে এনেছিল জলদ। গুঁড়ো করে জলের সঙ্গে মেয়েটাকে খাওয়ানো হল। বড়ি খেয়ে ঘাম দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য জর কমে পা ঠাণ্ডা হয় বটে, কিন্তু আবার সেই গরম। হুঁশও নেই ভাল করে। ভয় পেল জলদ-ঝুমরা। যদি মরে যায় মেয়েটা, ওরা বিপদে পড়বে। ঝুমরা বলল :---একটা ডাংদার দেখলাতে পারিস জলদা?

---ডাক্তার? হ, ডাক্তার তো পারিই দেখাইতে। এই কাছেই থাকেন তো আমাগো জানাশুনা একজন মানুষ।

---না থাকল, রিক্সায় তুইল্যা গামছা দিয়া বাইন্ধা দিমু, তারপর ছাপ্পর দিয়া ঢাইক্কা একছুটে ঢুকুম গিয়া বাবুর বাড়ীর বাগানে। তুমি এইখানে থাক। আমি আগে গিয়া বাবুরে ঠিক করি, তারপর মাইয়াটারে নিয়া যামু। একটু বার্লিক খাওয়াও ততক্ষণ ওরে।

●

খবরের কাগজের উপর ছায়া পড়তে মুখ তুললেন অজয়। ও। জলদ, মোড়ের রিক্সাওয়ালা।

---কি খবর? কালকের ময়দানে সভা হ'ল কেন জানতে এসেছ?

মাঝে মাঝে জলদ এসে অজয়ের কাছে প্রসেশন, সভা এ সবের কারণ জানতে চায়। কলেজের মাস্টার অজয়বাবু পণ্ডিত মানুষ।

---আইজ্ঞা না বাবু। মাথা নাড়ল জলদ, অজয়ের পায়ের কাছে বসল উবু হয়ে। যদিও কি বলবে ভাল করে

ভেবে এসেছিল তবু কথা আটকে গেল জলদের।

—তবে ? পাকিস্তানের খবর ?

না, তাও নয়। মাথা নাড়ল জলদ।

—বড় বিপদে পড়েছি বাবু। আমার মাইয়াটা জরে জরে একেবারে কাহিল হইয়া পড়ছে। ডাক্তারবাবু যদি একখান পিসকিশন দেন, তবে ওষুধ দিব চাক্তারখানায়। বিনা কাগজে ওষুধ দিতে চায় না তেনারা।

—তোমার মেয়ের জর ? খুব ? সাত আটদিন ধরে ভুগছে ? তাই তঁ ? অনু, অনু, শুনে যা তো একবার। ছেলের উদ্দেশে ডাক দিলেন অজয়।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল অনল। জন্মা ছিপছিপে সদ্য পাশকরা চব্বিশ বছরের ডাক্তার। ওর অসম্ভব ফর্সা লালচে রং, লালচে মাথার চুলের জন্যই ঠাকুর্দা নাম রেখেছিলেন অনল।

—বাবা, ডাকছো ?

—হ্যাঁ, শোন। এই যে জলদ, ওর মেয়ের খুব জর। সাত দিন ধরে জর ছাড়ছে না। একটা প্রেসক্রিপশন চাইছে।

—কিন্তু না দেখে কি করে ওষুধ দেব বাবা ? কি ধরণের জর সেটা না বুঝলে—

সোফায় বসতে বসতে বাবার দিকে চেয়ে বেশ অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতই বলল অনল।

—ঠিক, ঠিক। না দেখলে তো ওষুধ দেওয়া যাবে না। তুমি একটা কাজ কর জলদ। তোমার রিক্সা তো আছেই, চাকাচুকি দিয়ে নিয়ে এস মেয়েকে। বেশ ভাল ক'রে পরীক্ষা করে অনু ওষুধ লিখে দেবে এখন।

জলদ বেরিয়ে গেল, একটু পরেই মেয়ে নিয়ে চলে এল ডাক্তারবাবুর বসবার ঘরে। পাখীর মত হালকা শরীর দু'হাতে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল মেঝের উপর।

—আরে, আরে, একি। ইস্। অনু অনু শীগগির আয়। এ যে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। ব্যস্ত হয়ে ছেলেকে ডাকলেন অজয়।

অনল এল, ছুটে এল মেয়ে অপর্ণা ঝি-চাকর আর সরবালা। পাশের ছোট ঘরটিতে চৌকীর উপর বিছানা পেতে শুইয়ে দেওয়া হ'ল হিমিকাকে। বাড়ীতে গৃহিণী নেই। প্রায় দশ বছর আগে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে অজয়ের। পুরনো ঝি-চাকর আছে, আর আছে সরবালা। অজয়ের স্ত্রী হেমলতার বাপের বাড়ীর মেয়ে। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে এসেছিল হেম দিদির আশ্রয়ে তার হাতেই এখন সংসার। সেই বিছানা ঠিক ক'রে দিল, দু' এক চামচে গরম দুধ খাওয়াল হিমিকাকে। ভীষণ বকুনি খেল জলদ। নিউমোনিয়া, দুটো লাংসেই ধরেছে। নড়ানো চলবে না কোনোমতে আর জলদের সেই খুপরিতে থাকলে তো মরণ অনিবার্য। কলেজ হতে বেরিয়ে প্রথম সঙ্কটাপন্ন রোগিণীকে বাঁচাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল অনল। এখানেই থাকবে জলদের মেয়ে।

—তোমার মেয়েকে নাড়তে গেলে মরে যাবে। ভীষণ দুর্বল, শ্বাস নিতে পারছে না। মেয়ে নিয়ে তুমি থাক এখানে।

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলল অনল।

—আমি ? আমি সারাদিন তো বইস্যা থাকতে পারুম না বাবু। রিক্সা না টানলে খামু কি ? ওষুধ পত্য পয়সা যোগাড় করুম কিভাবে ? হাত-জোড় করল জলদ।

—সত্যি তো অনু, জলদের তো বসে থাকলে চলবে না। বললেন অজয়।

—বেশ তো ও সমস্ত দিন নাই থাকল। রাতে এলেই চলবে। অপি তো পরীক্ষার পর বেকার বসে আছে, ও পারবে না ওষুধ খাওয়াতে ?

—আমি ? দাদার কথায় ভয় পেল অপর্ণা।

—আমি তো কখনো, অ ছাড়া কঠিন অসুখ বলছ—।

—কোনো চিন্তা নেই, আমরাই দেখব। গম্ভীর মুখে এগিয়ে এল [illegible]। রিক্সাওয়ালার মেয়ে নিয়ে [illegible] ভাল লাগেনি তার কিন্তু অনু যখন [illegible]ছে, তখন তো একটা ব্যবস্থা করতে [illegible]বে।

—বেশ, বেশ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অজয়—এর চেয়ে ভাল আর কোনো ব্যবস্থা হয় না। সরবালাই দেখবে জলদের মেয়েকে।

খুব ভাল, এর চেয়ে ভাল যে আর কিছু হতে পারে না তা বলল ঝুমরা জলদ দু'জনেই।

—ভাল তো হইল। অখন তোমার পাড়ার অবস্থা কি কও শুনি। জলদ জিজ্ঞেস করল।

—খোবোর আবার কি। খইনি মুখে দিল ঝুমরা।

—খুব খোঁজ তল্লাস চলছে। সেই বাবুটা ফেরেনি দেহাদ হতে। সে এলে, মালুম হয়, খুব জবর একটা কিছু হোবে। তবে হামি দল নিয়ে চলে যাব। উখান থেকে। চলে যাব কালীঘাটে।

—তুমি তো যাইবা, কিন্তু আমি মাইয়াটারে নিয়া কি মুশকিলে পড়লাম কও দেখি।

—আরে ভাইয়া, ছোড় দো মুশকিল কা বাত। ও তো তুমার লেড়কি বনে গিয়েছে। ওকে লিয়ে ফিন ঘর বাঁধবে তুমি। আমিও এক এক রোজ মেহেমান হয়ে যাব। লিয়ে যাব জিলাবি মিঠাই।

হাসিমুখে জলদের মুশকিলের ফয়সালা করে দিল ঝুমরা।

রাগ করে উঠল জলদ।

—না না। মাইয়া লইয়া সংসারের কাম নাই আমার। নিজে বলে খাইতে পাই না। মাইয়া পুষুম। ভাল হইলে তর মাইয়া লইয়া যাবি তুই।

—বস-বস মেজাজ করিস না জলদা। আমি লিয়ে যাব মাইয়া। দেশে ভেজে দিব জরুর কাছে। রাখ তুই কুড়ি রুপেয়া। ডাংদারবাবুকে দিস। বোখার টুটল ওর ?

জর কমছে না হিমিকার। আগুন গরম শরীর। নিঃশ্বাসের কষ্টে ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছে বারে বারে। কৃশ করুণ এক-ফোঁটা মেয়ে। শক্ত থাবা দিয়ে ওকে

পেয়েছে মৃত্যু। বারবার আশঙ্কায় থর থর করে কাঁপছে প্রাণ। প্রতিজ্ঞায় কঠিন হ'ল অনলের মুখ। ও মৃত্যুকে হার মানাবে। ছিনিয়ে আনবে মৃত্যুর মুখ হতে তার শিকার। অনল ইনজেকশন দিতে লাগল, দিল নানা রকম ওষুধ নিজের প্রফেসরের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে এনে দেখাল দু'দিন। রাত জেগে ইজিচেয়ারে বসে রইল, শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে দিল মৃদু পথ্যে। মৃত্যু হারছে ধীরে ধীরে শিথিল হচ্ছে তার দৃঢ়মুষ্টি।

কুড়ি দিন পরে প্রথম চোখ চাইল হিমিকা। নিঃশ্বাসের মত মৃদু শব্দ বেরিয়ে এল তার পাণ্ডুর ওষ্ঠ ভেদ করে—মা।

অনল সামনেই চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিল। চমকে উঠে এল কাছে।

—মা এক্ষুণি আসবে। এটুকু খেয়ে ফেলো। ঈষদুষ্ণ পানীয় পড়ল মুখে। আবার ঘুমে চোখ বুজে গেল হিমিকার। অনলের ঘুম পাচ্ছে। ঘড়িতে চারটের ঘণ্টা বাজল। সরবালাকে ডাকল—সরমাসী, ওঠ, ওঠ। রোগীর কাছে বসো একটু। ভোর হয়েছে। শোন, আমি শুতে যাচ্ছি। এগারোটার আগে কিন্তু আমাকে ডাকবে না।

—ডাকব না? চোখ মুছতে মুছতে কাছে এল সরবালা।

—ঘুমুবে এগারোটা অবধি? হাসপাতালে যাবে না।

—যাব তিনটের পরে। খবরদার, খাবার নিয়ে যেন ডাকাডাকি কর না। তা' হলে কিন্তু না খেয়েই হাসপাতালে চলে যাব।

জর ছেড়েছে হিমিকার। অত্যন্ত দুর্বল রক্তশূন্য। প্রায় সমস্ত দিন ঘুমিয়ে থাকে। এক সপ্তাহ পরে ভাল ক'রে চাইল হিমিকা, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল মানুষের প্রথম উচ্চারিত শব্দ—মা।

অপর্ণা কাছে বসে বই পড়ছিল তাড়াতাড়ি বই রেখে উঠে এল।

—বাবা। তোমার বাবাকে ডাকছ মমুনা? সে আর একটু পরেই আসবে।

বাবা। ভীষণ জোরে শব্দটা আঘাত করল হিমিকার দুর্বল মস্তিষ্কে। বাবা: ওর তো কখনো, কোনো দিন বাবা নেই। কিন্তু এ কে? কোথায় এসেছে হিমিকা। ভয়ে সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল হিমিকার। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। চোখ বুজে ফেলল জোর করে।

—এ কি, কাঁদছে কেন রোগী? অনলের প্রশ্নে আবার বই হতে চোখ তুলল অপর্ণা। আরে। সত্যি তো বন্ধ চোখের কোল বেয়ে জল ঝরছে। ভয় পেয়েছে অচেনা মুখ দেখে? তাই হবে।

—শোনো, শোনো মমুনা। শিয়রে এসে বসল অপর্ণা, আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিল চোখের জল।

—কোনো ভয় নেই, এটা আমাদের—ডাক্তারবাবুর বাড়ী। তোমার খুব অসুখ হয়েছিল তো, তাই এখানে তোমাকে এনে রেখেছে তোমার বাবা। এক্ষুণি আসবে সে।

ডাক্তারবাবু। অসুখ। আস্তে আস্তে অনেক কিছু মনে পড়তে লাগল হিমিকার। ঝুমরা, একটা রিক্সাতে উঠেছিল। খুব কষ্ট, তারপর সব অস্পষ্ট ঝাপসা।

আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল হিমিকা। দুধের সঙ্গে রুটি, নরম ভাত, মাগুর মাছের ঝোল। দশ দিনের মধ্যেই নিজে উঠে গিয়ে বাথরুমে স্নান করল হিমিকা। রিক্সাওয়ালার মেয়ে পরিচয়ে এ বাড়ীতে আছে সে। নীরবে মেনে নিল সেই পরিচয়।

দেখতে দেখতে কেটে গেল এক মাস। আর কত দিন এখানে রাখা যাবে মেয়েটাকে। ডাক্তারবাবু আর তার বাবা অবশ্য দেবতুল্য মানুষ, কিন্তু বাড়ীর দেখাশুনা করে, গিন্নিমতন বিধবা মেয়েমানুষ, তার বিশেষ মত নেই আর রাখবার। ছুতায় নাতায় জিজ্ঞেস করে মেয়েকে নিয়ে যাবার কথা, কোন্ দিন হয়তো পরিষ্কার বলবে নিয়ে যেতে। মান থাকতেই সরে যাওয়া ভাল। সুতরাং একদিন দুপুরের নির্জন অবসরে জলদ চলে এল হিমিকার কাছে। ছোট তক্তোপোষটিতে চুপ করে শুয়েছিল হিমিকা। জলদকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

—আহা, তোমার ওঠনের কাম নাই দুর্বল শরীর, শুইয়াই থাক।

মেজেতে বসল জলদ, গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেল একটুক্ষণ।

—অখন তো ভাল হইছ। যাইবা কোথায় অখন কও তো। ভাই বন্ধু আপনজন কে আছে তোমার কইলে খবর করতে পারি। পৌঁছাইয়া দিতে পারি সেইখানে।

ভাই বন্ধু আপন জন? কে আছে আপন জন এই পৃথিবীতে হিমিকার? বাবা? সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি কঠিন পুরুষ, তিনি স্বামী নন, হিমিকার মায়ের মালিক ছিলেন। তার মালিকও হবার কথা ছিল তাঁর তিন মাস পর। ঝি মানদা সবিস্তারে হিমিকে বুঝিয়েছিল তার অবস্থার কথা। হিমিকার বাবা নেই। বাবা থাকতে নেই তাদের। তার মা যূথিকা যে খারাপ মেয়ে ছিল। খারাপ মেয়ে হিমিকার মা। ভোর আকাশের তারাটির মত শান্ত স্নিগ্ধ হিমির মা খারাপ ছিল? হিমিকাকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখে কপাল চাপড়েছিল মায়ের পুরনো দাসী।

—বরাত দিদিমণি, সবই বরাত। না হ'লে, অমন সুবোধ মেয়ে তোমার মা, ফুলের মত তুমি, তোমাদের এই দুর্দশা হয়? ভগবান বুড়োর দেখা পেলে সাত ঝাড়ু মারতাম তার মাথায়। তারপর নয়তো যেতাম নরকে। এ সব পুণ্যাত্মাদের স্বর্গের চেয়ে নরক ঢের ভাল। অমন মেয়ে, যোলটা বছর ঘর করল বৌয়ের বাড়া সেবাযত্ন করে। তাকে গলা টিপে মারল গা মুখপোড়া। কি, না মেয়ে নেবে। পোড়াকপাল লোভানির—ষাট বছরের বুড়ো মিনসে, নিজের সন্তানের মত ছোট মেয়েটার জন্য একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে। যেয়াও করে না নিজের পরিস্থিতিকে।

কান্না ভুলে পাথর হয়ে হিমিকা শুনেছিল মানদার কথা।

বাড়ীতে মায়ের কাছে থাকবার কথা বিশেষ মনে নেই হিমিকার। কখনো থেকেছে বলেই মনে পড়ে না। জ্ঞান হতে নিজেকে দেখেছে এক খৃস্টান বোর্ডিং স্কুলে। সেখানে ঘণ্টা বাজে, সেই ঘণ্টার নির্দেশে চলে জীবন। এক ব্যতিক্রম রবিবারে। রবিবারে তাকে চার্চে যেতে হ'ত না। মা আসত রবিবারে। কি সুন্দর সেই রবিবারের বিকেল। কত জিনিষ নিয়ে মা আসত। মাঝে মাঝে তাকে বেড়াতেও নিয়ে যেত। কিন্তু সেই সুখের আয়ু বড় অল্পক্ষণ। সন্ধ্যা ছ'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বাজত ঘণ্টা, মা চলে যেত হিমিকাও ঢুকে যেত বোর্ডিং-এ, আবার রবিবার আসতে কত ঘণ্টা, কত মিনিট বাকী সেই হিসাব করতে করতে।

রবিবার গুণে গুণে ষোল বছরের হয়েছিল হিমিকা। মাদার মা'কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পর। তার সামনেই কথা হয়েছিল। মাদার মা'কে বলেছিলেন---এখন তোমার মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে যুথি।

মায়ের চোখে গলায় আতঙ্ক ফুটেছিল।---নিয়ে যাব মা-মণি? কিন্তু---

---বস বস। ব্যস্ত হয়ে মা'কে থামিয়ে দিয়েছিলেন মাদার।

হিমিকা বুঝেছিল কি যেন একটা কথা মা'কে বলতে দিলেন না তিনি।

---যদি মেয়েকে নিয়ে যেতে না পার, খৃস্টান হতে হবে তাকে। এরপর তাকে আর খৃস্টান না হলে মিশনে রাখা চলবে না।

খৃস্টান। ভেবে দেখবার সময় চেয়ে হিমিকে বাড়ী নিয়ে এসেছিল মা। ঘণ্টার হুকুম হতে ছাড়া পেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল হিমি।

তারপর এল সেই ভয়ানক দিন। ক'দিন হতেই মা'কে চিন্তিত দেখছিল হিমিকা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোথা হতে ফিরে, তার ঘরে এসে ঢুকল মা কত কথা বলে গেল ঝড়ের মত। বুঝল না হিমিকা কথাগুলো, তার শরীর কাঁপছিল। একটু পরেই শোনা গেল অস্ফুট গোলমাল। হিমিকা শুনল তার মা নেই, হার্টফেল করে হঠাৎ মরে গিয়েছে যূথিকা।

মানদা দু'দিন পরে জানাল তাকে। হার্টফেল করেনি, মেয়ে দিতে চায় নি, তর্ক করেছে রাজাবাবুর সঙ্গে তাই রাজাবাবু গলা টিপে মেরে ফেলেছেন হিমিকার মা'কে। খারাপ মেয়েদের প্রায়ই এমনি মৃত্যু হয়।

ভয়ে কাঁদতে ভুলে গিয়েছিল হিমিকা। মা নেই, কেউ নেই তার। বাবা? বাবা নন সেই পুরুষটি, তার মায়ের মালিক। তারো মালিক হবেন কিছুদিন পর। যূথিকা খারাপ ছিল, হিমিকাকেও খারাপ মেয়ে হয়ে যেতে হবে। মা বলেছে পালিয়ে মাদারের কাছে যেতে। কিন্তু দরজা যে বন্ধ। দরজায় বসেছে দুটো দরোয়ান। যদি একবার মাদারকে খবর দেওয়া যেত, মাদার একবার শুনলেই নিশ্চয় ছুটে আসতেন। হিমির গলায় ছুঁইয়ে দিতেন

জালি ক্রশ। তখন পৃথিবীতে কারো সাধ্য হ'ত না হিমিকাকে খারাপ মেয়ে করে দেবার।

চিঠি দিয়ে মাদারকে খবর দেবার চেষ্টা করল হিমিকা। ফলে পাহারা আরো কড়া হ'ল। পুরনো দাসী আনদাকে তাড়িয়ে রাখা হ'ল একটা রাক্ষুসীর মত মেয়েকে। জানালায় বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়াতে পারতো না হিমি একা একা। সেই বিশ্রী ঝিটা সর্বদা লেগে আছে হিমির সঙ্গে, কুৎসিত কথা ব'লে হেসে ভেঙে পড়ত হিমির গায়ে। খারাপ মেয়ে হবার সূচনা দেখেই একটা তীব্র ঘৃণায় ভরে গেল তার মন। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করল কক্ষণো খারাপ মেয়ে হবে না। যদি প্রাণ নিয়ে এ-বাড়ী থেকে পালাতে না পারে, দোতলায় চিলে ছাদে উঠবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ফুটপাথে পড়ে। যদি কাউকে—কাউকে নিজের কথা জানাতে পারতো হিমিকা। কত দয়াবানদের কথা তো পড়েছে হিমি বইয়ের পাতায়, তাদের কি দয়া হ'ত না। তারা কি একটি মেয়েকে খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা করবার জন্য একটুও চেষ্টা করত না। রাস্তার ভিখিরী? হোক না ভিখিরী খোঁড়া। ও হয়তো গড-সেণ্ট। অনেক ভেবে একটি চিঠি লিখে ঝুমরার উদ্দেশ্যে ফেলে দিল হিমিকা। দেখল চিঠি তুলে পালিয়ে যাচ্ছে ঝুমরা। না, ও দরোয়ানদের বলে দিয়ে বকশিস নেবে না। তারপর প্রবল জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ল হিমি।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হিমিকে পাহারা দেবার দরকার নেই, ঝি-টা তাই দরোয়ানদের ঘরে গল্প করতে গিয়েছে। বাতি নিভে অন্ধকার হয়ে গেল সমস্ত বাড়ী। জ্বরে শরীর কাঁপছে, মাথার মধ্যে যন্ত্রণা, ব্যথা বুকে-পিঠে। কিন্তু হিমিকার সমস্ত স্নায়ু সতর্ক হয়ে উঠেছে। এই, এই সময়ে যদি পালাতে না পারে, আর সুযোগ আসবে না। মায়ের কথা কানে বাজছে, পাইরাল বেয়ে নামতে হবে, জমাদারের গলি। গলিটা ভাল করেই দেখে রেখেছে হিমিকা। টলতে টলতে নেমে এল, ছোট দরজা খুলতেই পথ। যদি ধরা প'ড়ে, পালাতে না পারে, তবু এ বাড়ীর মধ্যে প্রাণ থাকতে কেউ আর ঢোকাতে পারবে না তাকে।

কিন্তু তারপর? সেই দরজা পার হয়ে কোথায় এল, কে নিয়ে এল তাকে এই বাড়ীতে। আশ্রয় দিয়ে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলল তাকে? চোখ বন্ধ করে ভাবতে চাইল হিমিকা। সব অন্ধকার, কিছু মনে পড়ছে না। বন্ধ চোখের ও-পারে এসে দাঁড়িয়েছে হিমির অপরাধিনী মা। মুখ নীল, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তার। সমস্ত পৃথিবীর ঘৃণা আর পাপের উত্তরাধিকারিণী করে গিয়েছে সে হিমিকে। হিমি দেখল উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে এক তরুণী। তার অপরাধের বিচার হয়ে গিয়েছে। যারা ওকে নিয়ে পাঁকের পল্বলে অবগাহনের আনন্দে মত্ত হয়েছিল, তারাই বিচারাসনে বসে আদেশ করেছে পাথর ছুড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে ব্যভিচারিণীকে। ওর শরীরটা শয়তানের বানানো। ওকে দেখে প্রলুব্ধ হয় পুরুষ। তাই ওকে মরতে হবে। হাজার হাতের পাথর এসে পড়বে ওর গায়ে, টুকরো টুকরো হয়ে মরতে হবে, তাই তো পাপীদের শাস্তি। থর থর করে কাঁপছিল সেই মেয়ে। পাথর নিয়ে উদ্যত হাত, আকাশে প্রচণ্ড তাপ, পায়ের নীচে রুক্ষ কর্কশ শিলাভূমি, কোথাও একবিন্দু করুণার আশ্বাস নেই।

আশ্বাস ছিল। হিমিকা বাইবেলে পড়েছে সেই আশ্বাসের করুণার কথা। যে কোনোদিন পাপ করেনি, সেই কেবল পাপীকে শাস্তি দেবে, লেখা আছে বাইবেলে।

হিমিকার মা যূথিকাকে পাথর ছুড়ে মারে নি। যে পৃথিবী বিষাক্ত করেছিল যূথিকা, সেই পৃথিবীর বাতাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে ওর বুক হতে। কিন্তু হিমিকার কি হবে? ওকে খারাপ করবার জন্য যে একটা শক্ত থাবা এগিয়ে আসছিল, ও তাকে এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে। বিষাক্ত আশ্রয় ছেড়ে নেমেছে পথে। কিন্তু পথেও তো কত বিপদ। কে হিমিকাকে রক্ষা করবে? খোঁড়া ভিক্ষুক ঝুমরা, পাকিস্তানের বুড়ো জেলে রিক্সাওয়ালা জলদ রক্ষা করবে ওকে? ওদের কি এত শক্তি আছে।

মেয়েটা কাঁদছে। জলদের চোখেও জল এল। কি করবে। ওর সাধ্য কতটুকু। গামছা দিয়ে নিজের চোখের জল মুছে ফেলল। কত আর কাঁদবে। চোখের জল ধ'রে রাখলে যে আর একটা গাঙ হয়ে যেত।

—কাইন্দ না সোনা। কি করবা, কপালের লেখন। যদি থাকে দরদীজন তোমার কেউ কোনোখানে, তারে খবর দিতে পারি।

চোখের জল মুছল হিমিকা। স্কুলের ঠিকানা দিল জলদকে। মেসের নাম, খৃস্টান ইস্কুলের ঠিকানা। মাইয়াটা খ্রীস্টান নাকি! ঝুমরার সঙ্গে একটা শলা করতে হইব।

●

আজ ঝুমরাদের আড্ডায় বেশ একটা ভোজের ব্যবস্থা। রাত একটার ডাস্টবিনের পাতা কুড়িয়ে উচ্ছিষ্ট ভোজ নয়। নিজেদের উপার্জিত চাল ডাল তরকারী। মস্ত বড় হাঁড়িটাতে খিচুড়ী ফুটছে। শালপাতায় কোটা রয়েছে তরকারী। দুখনা আবার মস্ত বড় একটা শোল মাছ যোগাড় করেছে যেন কি উপায়ে। সবার চোখ জ্বলজ্বল করছে। রাস্তার চাপা কলে স্নান করে তেল মেখেছে সবাই চুল। বাচ্চাগুলোর গা তেল-চুকচুকে করেছে মায়েরা। ক্যাবলার রান্নার হাত ভাল, সেই হাঁড়িতে কাঠি দিচ্ছে। তরকারীটা কিন্তু রাঁধবে সবাই মিলে। ভীষণ দামী তরকারী। বেগুন, কচু, আলু পর্যন্ত কেনা হয়েছে। তেলও এনেছে। মাছের তরকারীতে তেল চাই। মেয়েগুলো একে অন্যের মাথায় বিলি কাটছে, ঘামাচি মারছে পুটপুট। কেউবা চট-কাঁথার মধ্যে ছারপোকা খুঁজছে। জলদ এসে দাঁড়াল একটু দূরে, অন্য দিকের ফুটপাথে। ডাক দিল—এই ঝুমরা।

ঝুমরা তার লাঠিকে তোয়াজ করছিল, জলদকে দেখে কাছে এল।

—চল্ ওদিকের গাছতলায় গিয়ে বসি।

গাছতলায় গিয়ে বসল দু'জনে। ঝুমরা জিজ্ঞেস করল : নমুনা তোর সাথে বাত্ করলো, বাত্লালো কোইকো নাম, পত্তা ?

—নাম-ঠিকানা। যত কথা। কেবা আছে মাইয়াটার ত্রিভুবনে। একটা খ্রীস্টান ইস্কুলের ঠিকানা দিচ্ছে। মাইয়াটা বোধ করি খ্রীস্টান।

—আরে না না। ও মেমসাবকো ইস্কুলসে পড়া-লিখা করতো।

—ও বুঝছি। সেইখানে আবার যাইতে চায়। তবে খিরিস্টান হইলেও অগো দয়া-মায়া আছে। যিশু ভজায় সত্য কিন্তু মান-সম্ভ্রমও দেয় মানুষরে। মাইয়াটার তো আর কোনো স্থান নাই, খ্রীস্টানই হইব এইবার।

—কেরেস্তান হোবে লেড়কিটা ? এইটা বরা বুরা বাত। এ জলদা ভাই, তোর মাথা তো জবর সাফ, একটা পথ বাত্লে দে ওর হিন্দু থাকবার। হিন্দুর মেয়ে কেরেস্তান হোবে, এ আচ্ছা লাগছে নাই। একটা বেবস্থা করে দে ভাই।

—আমি ব্যবস্থা করুম ? হাসালি ঝুমরা। আরে আমি কি আর তারপাশার জলদ দাশ আছি যে অমন পাঁচটা মাইয়া পোষণের ক্ষ্যামতা রাখি ? রিক্সা টা·. নিজের প্যাট ভরাইতেই প্রাণান্ত। তবে হ, কথাটা কইছস সত্য। হিন্দুর মাইয়া খ্রীস্টান হইব, মনে হইলেই প্রাণটা কেমন করে।

চোখ নাক কুঁচকে ভাবতে লাগল জলদ। আশ্রয়ের অভাবে মেয়েটা গিয়ে সাহেবদের মিশনে উঠবে। কুঁকড়ো খাবে, যিশু ভজবে কালী-দুর্গাকে বাতিল ক'রে? একটা কথা মনে এল।

—শোন ঝুমরা, বাবুরে সব কথা কইলে কেমন হয় ? দয়া-মায়া আছে তান হৃদে।

বাবুকে ? ভয়ে আঁতকে উঠল ঝুমরা। পুলিশে ধরিয়ে দেবে বাবু। ভদ্রলোকের কারো ভাল করে না। দুঃখীদের দুঃখ বাড়িয়ে দেয় ওরা কেবল।

—তু একদম বাউরা আছিস জলদা। তোর বাবু সব শুনলে জেহেলমে ঘুসিয়ে দেবে আমাদের।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, গোলমাল শুনে ঘুরে তাকাল। দলের মধ্যে মারামারি লেগেছে। দুখ্নার বুকের উপর উঠে বসে তার গলা টিপছে সোমাই। যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে দলের মধ্যে চলে এল ঝুমরা।

—এ শালে, ছোড়, ছোড়দে দুখ্নাকো।

সোমাইয়ের পিঠে লাঠির এক ঘা কশাল ঝুমরা। ক্যাবলারা এতক্ষণ মজা দেখছিল, এবার ছাড়িয়ে দিল দু'জনকে। মারামারির কারণ শুনল ঝুমরা।

সুন্দরী দুখ্নার মেয়েমানুষ। ক'দিন হতেই সুন্দরীর চাল-চলনে মেজাজ বিগড়ে আছে সোমাইয়ের। সুন্দরী উদাস হয়ে চেয়ে থাকে। সোমাইয়ের ঘায়ে তেল দিতে চায় না। আজকে এখন দুখ্না প্রস্তাব করেছে মাছের মাথাটা আস্ত থাকবে, সেটা খাবে সুন্দরী। কারণ দেখিয়েছে ক'দিন আগে সুন্দরীর জ্বর হয়ে দুবলা হয়ে গিয়েছে ও। মাছের মাথা খেলে তবিয়ৎ ঠিক হবে।

কথা শুনে জ্বলে উঠেছে সোমাই। দুখ্নার দরদের মধ্যে খারাপ মতলব দেখেছে সে। সুন্দরীর মত জ্বর তো দলের আরো অনেকের হয়েছে। ভেলুয়ার বোখার এখনো টুটে নি। মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে, তরকারীর গন্ধে পর্যন্ত উঠে বসেনি। আর সুন্দরীর জন্য এত ভাবনা করতে হবে না দুখ্নাকে।

দুখ্নাও সমান তেজে উত্তর দিয়েছে—কেনো হোবে না ? উ কি তুর বিয়ারি আওরৎ যে এতনা জুলুম করবি ? জওয়ান ছুকরী, যার কাছে মন যাবে, থাকবে তার কাছে। পাট্টা লিখা আছে যে বরাবর থাকবে তুর দখলে ?

সোমাই বিশেষ জবাব দিতে পারেনি। জবাব বিশেষ ছিল না। তারপর সোমাই আবার তোত্লা। রাগলে কথাই বের হয় না মুখ দিয়ে। কথার বদলে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুখ্নার উপর, তার গলা টিপে ধরেছে দু'হাত দিয়ে। অতর্কিত আক্রমণে দুখ্না বে-কায়দায় পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেও ছাড়েনি। সোমাইয়ের পায়ের দগদগে ঘায়ে লাথি মেরে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড করেছে।

দলের মধ্যে এ রকম ঝগড়া হওয়া ভাল নয়। ঝুমরা ক্যাবলাকে বলল সব মাছ মাথা ভেঙে তরকারীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। তাতে সোয়াদ ভাল হবে আর সবাই পাবেও ঠিকমত।

কিন্তু ঝগড়া আর মিটতে চায় না। দুখ্না সোমাই থেকে থেকেই তেড়ে উঠতে লাগল। ঝুমরা জলদকে ডাকল

—এ জলদা, তু আভি চলে যা। ই বদমাসগুলো বহুৎ কাজিয়া করছে। একটা ফয়সালা করতে হচ্ছে. এখন আর বাত হোবে না।

জলদ একটা সওয়ারী পেয়ে রিক্সা ঠনঠন করতে করতে চলে গেল। ঝুমরা এসে বসল সবার মাঝখানে। পিঠে
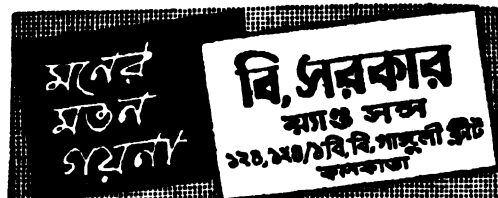
বুড়ো তাকে বলল : সুনরী আর সোমাইকো সাথ থাকবে নাই ঝুমরা।

---কেনো ? কি গলতি হোলো সোমাইকো ? গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল ঝুমরা।

---সোমাইকে খাওতে ঘিন লাগে উর।

---ঘিন লাগে ? খাও আছে বলে কত রোজগার করছে সোমাই ? তিন বরষ ধ'রে পালছে ও সুনরীকে। খারাপ বেমারী হয়ে মরতে বসেছিল তো সুনরী। কত ডাংদার দেখাল, ওষুধ করল সোমাই। আজ খাওতে ঘিন লাগছে। বদমাস ছুকরী। জরুর উ থাকবে সোমাইকো সাথ।

---ঠিক বাত। মাথা নাড়ল দলের সবাই ঝুমরার কথায় কিন্তু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল দলের সবচেয়ে বয়স্কা মেয়ে বুড়ী এতবারিয়া।

---এ তুর জবরদস্তি ঝুমরা। সোমাই ডাংতার দেখাল, সব সাচ বাত। সুনরী ভি থাকল সোমাইকো সাথ তিন বরিষ, পেটে ছেলিয়া ধরল উর। এখুন মন উদাস লাগছে, উঠে গেছে মন উর থেকে, কেমন করে মাইয়াটা থাকবে উর কাছে?

---ঠিক, ঠিক। এবারও মাথা নাড়ল দলের সবাই।

---সুনরীর মন লাগছে নাই, ছোড়দে জবরদস্তি ঝুমরা। উ থাক দুখনার কাছে।

সুনরীর মন লাগছে না, জবরদস্তি করে কেউ ওকে রাখতে চাইল না সোমাইয়ের সঙ্গে। সোমাইয়ের দুঃখ হতে পারে, কিন্তু যেখানে মন উঠে গিয়েছে, সেখানে করবার কি আছে। ফুটপাথের এই যাযাবর ভিক্ষুকের দল, ওরা শহরের আবর্জনা বাড়াচ্ছে, ছড়াচ্ছে দূষিত সংক্রামক রোগ। কেমন ক'রে ওরা জন্মাচ্ছে, বড় হচ্ছে, বাঁচছে তারপর মরে যাচ্ছে কেউ তার খবর রাখে না। ওরা তো পথের কুকুরের মত। কিন্তু কি আশ্চর্য। ওরাও খায়, ঘুমায়, অবিকল সভ্য মানুষের মত মিলিত হয় দেহের তাগিদে। ওদের মিলনের জন্য মন্ত্র নেই, ধর্ম, সমাজ-আইন কিছু নেই। কেবল আছে এক মন। সুনরীর একদিন মন হয়েছিল, তাই মিলেছিল সোমাইয়ের সঙ্গে। আজ মন উঠে গিয়েছে, কিসের জোরে ওকে বেঁধে রাখবে সোমাই!

ঝুমরা জাত-ভিক্ষুক নয়। ডাস্টবিনের খাবার তুলে মুখে দিতে এখনো ওর ঘৃণা হয়। বিহারের বরাকর নদীর পাড়ে আছে ঝুমরার ছোট্ট গাঁও সরিয়া। দু'টো মস্ত ভইষ, আর মহাজনের কাছ হতে ক্ষতি ছাড়াবার স্বপ্ন আজো ভাঙেনি তার। ষাট বছর বয়সে নিজের ঘরে ফিরে যাবে ঝুমরা। চারপাইতে বসে খইনী টিপতে টিপতে আজব শহর কলকাত্তার কহানী শুনাবে সে পড়শীকে। ছনিয়া-সুনিয়াকো মাতারি হাতে মোটা খাঁড়ু পরে বড় বড় ক'রে যাঁতা ঘুরিয়ে মকাই কলাই ভাঙবে। বিশ সাল তো উর দেখা মিলবে না মরদের সাথে। কোমর ভাঙা ভিখারী ঝুমরার কাছে থেকে মন উঠে যাবে তবে ছনিয়ার মায়ের? সোমাইয়ের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠল ঝুমরার। কিছু বলবার নেই, তাই চুপ করেই রইল সে।

সব ঝামেলার ফয়সালা হয়ে গেল। ফুর্তি করে খেতে বসল সকলে। ভোজের জৌলুষ বাড়াতে জিলাবি কিনে নিয়ে এল দুখনা। তার খরচায় বিড়িও ফ'কল সবাই। সুনরীর সঙ্গে দুখনার মিলের জন্যই যেন ভোজটা হ'ল, এমনি মনে হতে লাগল। ভোলা মনের আনন্দে একটা গান ধরে দিল---পিয়ার করলো, নেইতো ফাঁসী চড় যায়গা। সুন্দকি বাজিয়ে কেউ কেউ তাল দিল গানের সঙ্গে।

হাঁটুতে মাথা গুঁজে পিছন দিকে চুপচাপ বসেছিল সোমাই। ঝুমরা গিয়ে ঠেলল তাকে।

---এ সোমাইয়া, এ সোমাইয়া, খা লে ভাই। কুত্তা-উত্তা নয়তো মেরে দিবে খাবারটা। বরষা ভি আসতে পারে। আকাশে তারা নেই, বহুৎ মেঘ দেখা যাচ্ছে।

সারাদিন উপবাসী সোমাইয়ের পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছিল। কিন্তু বুকের মধ্যেও যে আগুন। সুনরী চলে গেল, মন লাগছে না সুনরীর ? দু'মাস আগেও সোমাইকে বলেছিল---তু মেরি রাজা, তুকে ছোড়াই কব কভি নেই যায় গা।

ঝুমরা দলা পাকিয়ে সোমাইয়ের মুখে খাবার ঠেলে দিতে লাগল হাঁড়ি হতে নিয়ে। সোমাইয়ের সানকি সুনরীর কাছে থাকে, কে এখন চাইতে যাবে। খানিকটা খেয়ে প্রকৃতিস্থ হ'ল সোমাই। শুনল ওদিকে কথা বলছে শিউ বুড়ো :

---ছেলিয়াটার পা দু'টো ভেঙে দে দুখনা। বড় হলে নুলো পা পাড়বে না, তখন বহুৎ রোজগার করতে পারবে।

---চলবে কেমন করে? ক্যাবলা জিজ্ঞেস করল।

---চলবে ? হাথে দুটো চট জড়িয়ে লিবে, তাই দিয়ে চলবে। ভারী রোজগার হোবে। আন্ধাকে সব সময় বিশোয়াস করে না মানুষ। কিন্তু নুলো পা দেখলালে কিরপা হোবে।

---খবরদার। লাফিয়ে উঠল সোমাই।

---আমার ছেলিয়ার গায়ে হাথটি ছোঁয়াবে না, খুন নিকলে দেব তবে।

---আঃ। এতো রক্ত গরম কেনো তোর সোমাইয়া। সোমাইকে বোঝাতে চাইল শিউ বুড়ো।

---এখুন পা ভাঙলে, শরীর বড় হোবে, তো পা থাকবে সাত মাসের বাচ্চার। তোর খাওয়ের থেকে বেশী রোজগার করবে ছেলিয়াটা।

---শালা, হারামজাদা, কুত্তা অশ্লীল গাল দিল সোমাই। মজা দেখবার জন্য অনেকে উঠে বসল ঘুম ছেড়ে। কয়েক পা বাড়িয়ে সোমাই কোলে তুলে নিল চট জড়ানো সাত মাসের বাচ্চাটাকে বুকের উপর। নিজের থলি তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে।

---ছেলিয়াটাকে নিয়ে কি করবি তুই ? সোমাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল ঝুমরা। পার্কের পাশে গিয়ে বসল দু'জনে। আবার বলল ঝুমরা :

—বাচ্চাটা মায়ের দুধ খাচ্ছে, উকে জালদি, মরে যাবে যে উ।

—মরবে? তব তো রামজী বহুৎ কিরপা করবে ঝুমরা চাচা। ও পা ভেঙে লেংড়া হোবে না, আন্ধা হোবে না আঁখমে কাঁটা চুকিয়ে। গরম তেল ঢেলে ঘাও বানাতে হবে না। রামজী আপনা মহলমে লিয়ে যাবে উকে।

—বাচ্চাটা কাঁদবে উর মায় লেগে।

—কাঁদলে ভালাই হোবে পথের মানুষ পয়সা দিবে। উর মা তো উকে লেংড়া বানাবে চাচা। আমি ছেলিয়াটাকে ভিখারী হতে দিব না চাচা। উকে আমি লিখা শিখতে দিব। একঠো কারখানাতে কাম শিখতে লাগিয়ে দিব। উ সাইকেল মেরামত করবে। ওর ঘর হোবে, রাস্তার ভিখ মেঙে কুত্তার মত জীওন খতম করবে না উ।

সোমাইয়ের কথা শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল ঝুমরার। বুকের মধ্যে ছেলেকে জড়িয়ে সোমাইও ঘুমোলো। ঝিরঝিরে একটু বৃষ্টি ঝরল। মেঘের ফাঁকে উঁকি মেরে পৃথিবী দেখল কয়েকটা তারা। নতুন ভোরের বাতাস। ট্রাম ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা বাজছে, জল ছিটাচ্ছে কর্পোরেশনের লোক। তবু গভীর ঘুম ভাঙল না সোমাই-ঝুমরার। বাচ্চাটা একবার জেগে বড় বড় চোখ করে দেখল চারদিক, আবার আঙুল মুখে পুরে ঘুমিয়ে পড়ল সেও। পথের ওপাশে, চারতলার মালিক বিনিদ্র রাতের তপ্ত শয্যা ছেড়ে বারান্দায় এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। দেখলেন পার্কের পাশে ভিজে ফুটপাথে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে দু'টো ভিখারী। তাঁর চোখ ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। ঘুম! কত সিডেটিভ, ট্র্যাঙ্কুলাইজার কিছুতে ঘুম আসছে না। ঘুম নেই পাঁচ বছর ধরে। একটা গাড়ি বের হচ্ছে ওয়েসাইড গ্যারেজ হবে। আঃ! একবার গাড়িটা উঠে পড়ে ফুটপাথের উপর, পিষে চ্যাপটা হয়ে যায় ভিখারী দু'টো, বাচ্চাটা, তা'হলে টের পায় অমন মরার মত পড়ে পড়ে ঘুমোবার মজা।
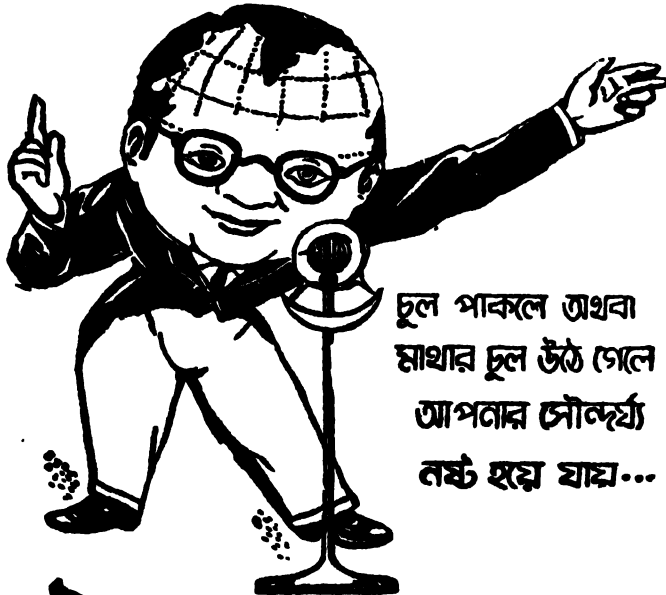
(ক্রমশ।

গৃহে ও বিদ্যালয়ে শিশুর অব্যবস্থিততা—হেতু ও প্রতিকার

অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ

সুস্থ, সুন্দর, আনন্দময় জীবনের জন্য সর্বত্রই প্রয়োজন সঙ্গতিস্থাপনের (adjustment)। শীতের দিনে গরম জামা পড়িয়া বা আগুন জ্বালিয়া আমরা বাহিরের জড় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করি; গাছ হইতে পাকা ফল পাড়িয়া খাই আর গরু-ভেড়া ছাগলের হাত হইতে ফুলের বাগান বা সব্জী রক্ষা করিবার জন্য বেড়া দেই; পূজার দিনে পূজামণ্ডপে একত্র হই, প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময় করি। এ সবই আমাদের বাহ্য পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের দৃষ্টান্ত। যেখানে সঙ্গতিস্থাপনে অসমর্থ হই সেখানেই ঘটে সংঘর্ষ, অস্বস্তি ও অশান্তি। নূতন জায়গায় গিয়া, নূতন পরিবেশে, নূতন মানুষদের সঙ্গে নূতন বৌ মানাইয়া চলিতে না পারিলে তাহার নিজের যেমন অশান্তি, অন্যেরও সে বিরক্তিভাজন হয়, নিন্দা ও সমালোচনার কারণ হয়। সংসারে ও সমাজে নিত্যই এই সঙ্গতিস্থাপনের সমস্যা দেখা দেয় ছোট বড় বিষয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোটামুটি সঙ্গতিস্থাপন করিতে বেশীর ভাগ মানুষই [illegible] সমর্থ হয়। তাহা পারে বলিয়াই---সংসার ও সমাজ চলিতেছে তাই জীবনে দুঃখের চেয়ে সুখের পরিমাণ বেশী।

সঙ্গতিস্থাপন মানেই মানাইয়া চলা। ইংরাজীতে এই মানাইয়া চলার অনেক প্রতিশব্দ আছে---যেমন: accommodation, adoptation, getting along, being habituated ইত্যাদি। সু-অভ্যাস গঠনের উদ্দেশ্যই হইল সংসারে নিজেকে মানাইয়া চলিবার প্রস্তুতি।

যতগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল সবই অন্যের সঙ্গে মানাইয়া চলিবার ক্ষেত্র। কিন্তু সঙ্গতিস্থাপনের আর একটা আন্তরিক দিক আছে; সেটা হইল নিজের সঙ্গেই নিজেরই দ্বন্দ্ব মিটানো। সব মানুষই নিজের ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা, উদ্যোগ কর্মের মধ্যে একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয়।

যাঁরা সম্পূর্ণভাবে এই কঠিন কাজটি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করিতে পারেন—তাঁহাদের আমরা বলি স্থিতধী, মহাপুরুষ। সাধারণ মানুষ আমরা, মহাপুরুষ নহি তাই আমরা বিপরীত ইচ্ছা, কামনা বাসনার দ্বন্দ্বে, প্রলোভন ও আদর্শবাদের দ্বন্দ্বে পীড়িত হই। তথাপি মোটামুটি কাজ চলা গোছের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারি বলিয়াই আমাদের ব্যক্তিত্বের একটা ঐক্য বজায় থাকে, এবং আমরা বিভিন্নভাবে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করি বলিয়া আমাদের ব্যক্তি চরিত্রও প্রত্যেকের বিভিন্ন।

সামঞ্জস্য স্থাপনে যেখানেই আমরা অক্ষম হই (তা সে বাহ্য পরিবেশের সঙ্গেই হোক বা নিজ আন্তর পরিবেশের সঙ্গেই হোক) সেখানেই আমাদের পূর্ণশক্তি প্রয়োগে (efficiency) আমরা অপারগ হই। যারা এই সঙ্গতিস্থাপনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যভাবে অপারগ হয়—তাহাদের আমরা বলি সমাজ ও সংসার জীবনে অব্যবস্থিত (maladjusted)। তারা নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিল না (misfits)। তাহারা নিজেরাও দুঃখ ও অস্বস্তি ভোগ করে পরেরও অশান্তির কারণ হয়। এই অব্যবস্থিততা একটা মাত্রা ছাড়াইলে আমরা তেমন মানুষকে বলি মানসিক বিকারগ্রস্ত নিউরোটিক। আর যাদের অব্যবস্থিততা এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে বাস্তব-জগতের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছে; যারা নিজেদের সৃষ্ট এক অলীক কল্পনার জগতে বাস করে, তাহাদের আমরা বলি উন্মাদ, সিজোফ্রেনিক, মেলান্কোলিক ইত্যাদি ইত্যাদি। এরা অবশ্যই সুস্থ সাধারণ মানুষের অপেক্ষা বিভিন্ন মাত্রায় ব্যতিক্রম (abnormal)। এরা স্বভাবতই ক্ষীণশক্তি। ইহাদের নিয়াই পরিবারের ও সমাজের সমস্যা।

সুখে শান্তিতে থাকিতে সবাই তো চায়। সকলেই তাই সঙ্গতিস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু ক্ষীণশক্তিরা এই সঙ্গতিস্থাপনে সমর্থ হয় না। অথবা বিপরীতভাবে বলিব, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করিতে পারিল না বলিয়াই ইহারা ক্ষীণশক্তি ও অসুখী। ইহারা দুর্ভাগা। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারিল না দোষটা সব সময় তাহার নাও হইতে পারে। সচ্চরিত্র আদর্শনিষ্ঠ ছেলে যেমন অফিসে নূতন চাকুরীতে ঢুকিয়া দেখিল, সেখানে বড়বাবু হইতে শুরু করিয়া সকলেই ঘুষ খায়। সে ঘুষ খাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে দেখিল যে ঘুষ না খাইলে তাহার চাকুরী থাকিবে না। এখানে পরিবেশই দূষিত এবং এ ক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন অর্থই ব্যক্তির নৈতিক অধঃপতন।

বিধাতার ইহা শুভ বিধান যে শিশুদের মধ্যে গুরুতর মানসিক রোগ বড় একটা দেখা যায় না। শিশুর পরিবেশ

অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর এবং তাহাতে জটিলতা খুব বেশী নাই। শিশুর শক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি সবই অপরিণত কাজেই পরিবেশের জটিল ও বিপজ্জনক রূপ তাহার চেতনার সামনে উপস্থিত হয় না। পরিবার ও সমাজ শিশুর কাছে পূর্ণ সঙ্গতিস্থাপন দাবী করে না। তাহার সঙ্গতি স্থাপন যাহাতে সহজ হয় সে জন্য পিতা-মাতা ধীরে ধীরে শিশুর দেহ-মনকে প্রস্তুত করেন, তাহার উপযুক্ত সু-অভ্যাস গঠনে সাহায্য করেন; বাহিরের আঘাতগুলি তাহার গায়ে লাগিতে দেন না; নিজেরা বুক পাতিয়া শিশুকে রক্ষা করেন। ছোট-খাটো ত্রুটি ক্ষমার চক্ষে দেখেন; স্নেহ ও উপদেশ দিয়ে শিশুকে পরিবার ও সমাজের বিধি, নিষেধ, আদর্শ, দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত করান। তাই তীক্ষ্ণ অনুভূতির সংঘাত শিশুর জীবনে কদাচিৎ ঘটে।

তথাপি শিশুর গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে কোন সংঘর্ষ ও বিভ্রান্তির কারণ ঘটে না, একথা সত্য নয়। এ গুলির আলোচনার প্রয়োজন। তা থেকেই আমরা বুঝিতে পারিব কেন শিশুর জীবনেও নানা অব্যবস্থিততা ও অশান্তি ঘটে, কি করিয়াই বা এই দ্বন্দ্ব, অস্বস্তি ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা দূর করা যায়, অথবা তার উপশম সম্ভব হয়।

শিশুর শিক্ষা, কর্ম, অনুভূতির ক্ষেত্র তিনটি (১) গৃহ (২) প্রতিবেশী (৩) বিদ্যালয়। এই তিনটি ক্ষেত্রকে করিয়াই শিশুর সুখ-দুঃখ, গৌরব নিরাশা। তিনটি ক্ষেত্রেই সুখ ও গৌরবের কারণ হইতেছে সুসঙ্গতি (well adjustment) আর দুঃখ নিরাশা-অস্বস্তির কারণ হইতেছে সঙ্গতির অভাব-অব্যবস্থিততা (maladjustment)

শিশুর জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর গৃহ-পরিবেশের নিরাপদ গণ্ডীর মধ্যেই কাটে। সেখানে পিতা-মাতার ভালবাসা ও যত্ন তাহাকে সমস্ত ঝড়-ঝাপটা ও প্রতিকূল অবস্থা হইতে রক্ষা করে। শিশুর এই বাল্যের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাহার ভবিষ্যৎ দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বাল্যে যে শিশু স্বাভাবিক স্নেহ-মমতায় বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার পথে অব্যবস্থিত হইবার আশঙ্কা কম থাকে।

শিশুর জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর মা-ই সমস্ত আনন্দ, ও নিরাপত্তার আধার। পিতার সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ অনেকটা গৌণ। মাতার নিকট হইতেই শিশু খাওয়া মল-মূত্রত্যাগ স্নান, পরিধান, ঘুম ইত্যাদি জীবনের মৌলিক ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সু-অভ্যাস গঠনের শিক্ষালাভ করে। ভাষা শিক্ষা, সামাজিক আচার আচরণ শিক্ষা ইত্যাদি শিশু প্রধানত এবং প্রথমত মাতার নিকট হইতেই গ্রহণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতা শিশুর প্রতি এই কর্তব্যগুলি বিরক্তির হইলেও স্বাভাবিক স্নেহ ভালবাসার সঙ্গেই করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রেই কখনো কখনো শিশুর সঙ্গে মায়ের বিরোধের বীজ উপ্ত হয়। এটা অনেক সময় আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না যে শিশুর পক্ষে এই সমস্ত জটিল ক্রিয়া ও অভ্যাস আয়ত্ত করা সহজ নয়। এ সব দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে শিশুর যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। নিজ হাতে খাওয়া, পোষাক পড়া, মুখ ধোওয়া, ঘরের দামী জিনিষপত্রে হাত না দেওয়া, অন্য শিশুর খেলনা কাড়িয়া না নেওয়া এ সব গুলিই কৃত্রিম সংস্কার এবং দিগম্বর শিশু ভোলানাথের পক্ষে এই সমস্ত নিজ ইচ্ছা ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ সংস্কারের সঙ্গে মানাইয়া চলা খুব সহজ কাজ নয়। বহু ক্ষেত্রেই এ সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়া সংসারে হাজারো কর্মে বিব্রত মাতা ধৈর্য রাখিতে পারেন না। শিশুকে বকিয়া ঝকিয়া মারিয়া শীঘ্র শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য অস্থির হইয়া যান। তাঁহার ক্ষমতা আছে, শিশুর প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের ক্ষমতা নাই। শিশু মার প্রতি আক্রোশ সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না এবং তার অবচেতনায় মার প্রতি বিদ্বেষের বাষ্প সঞ্চিত হইতে থাকে। সে তখন গোপনে অন্য কোন দুষ্কর্ম করিয়া (মা'র শাড়ী ছিঁড়িয়া, বাবার জুতা লুকাইয়া রাখিয়া) তাহার শোধ তুলিতে চায়। অথবা মা-বাবা মারধর করিলে বা কঠোর শাসন করিলে তাহার অবচেতন মনে এই ভয় হয় যে, মা তাহাকে ভালবাসেন না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন (re-jectance) এবং তাহার নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হয় এবং আধুনিক সমস্ত শিশু মনোবিজ্ঞানীর ইহা অভিমত যে শিশুর অবচেতন মনে নিরাপত্তা বোধের অভাব ভবিষ্যতে নানা অব্যবস্থিততা এবং মানসিক বিকারের হেতু।[১] কোন কোন মা শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে অথবা ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে অতিমাত্রায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[২] এই উদ্বেগ শিশুর মনেও সঞ্চারিত হয় এবং ইহাও তাহার সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের পথে হানিকারক। ফ্রএড-পন্থীদের মতে মাতার এই অতিরিক্ত উদ্বেগ মাতার অবচেতন মনে শিশুর প্রতি বিদ্বেষ এবং তজ্জনিত পাপবোধ আবরণের বাহ্য বিপরীত প্রকাশ মাত্র।[৩] কারণ

---

১ এ বিষয়ে Hadfield এর Childhood & Adolescence, Dr. Bowleyর Child Car, & growth of love, Valentine-এর The Normal Child&Some of his abnormalities, Bowley-র Natural Development of the Child, Maud Merril--Child Delinquency পুস্তকাদি দ্রষ্টব্য।

২। পিতামাতা অনেক সময় শিশুর শক্তিসামর্থ বিবেচনা না করিয়া শিশুকে অতি দ্রুত বিদ্বান করিয়া তুলিতে চান, ইহাতে শিশু-মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। ইহাতে শিশু অযথা উদ্বেগ ভোগ করে। এই উদ্বেগ অতিরিক্ত হইলে শিশু নিজের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে এবং লেখাপড়ায় পিছাইয়া পড়িতে থাকে।

৩। On the bringing up of children by five Psycho-analysts: বিশেষত Ella Sharp

যাহাই হউক শিশুর উপর ইহার প্রভাব একেবারেই শুভ নয়।

অবশ্য বিপরীত আরচণও কোন কোন মাতার মধ্যে দেখা যায়। তাঁহারা সন্তানকে অতিরিক্ত আদর দিয়া নষ্ট করেন এবং সুশাসন দ্বারা বাল্যকালে শিশুর সু-অভ্যাস গঠনে চেষ্টিত হন না। এক্ষেত্রেও এমনটি হওয়া অসম্ভব নয় যে, মাতার শৈশব জীবন অত্যন্ত কঠোর শাসনে কাটিয়াছে। সেই জীবনের দুঃখময় স্মৃতি তাই তাঁহাকে সমস্ত কঠোর শাসনের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। ফ্রয়েডপন্থীদের মতে এই মাতার শিথিল ব্যবহার তাঁহার নিজ মাতার কঠোর স্নেহহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিপূরণ (Compensation)-এর প্রয়াস মাত্র।

ইহা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা যে অতিমাত্রায় প্রশ্রয়ও শিশুদের নষ্ট করে। তাঁহারা ভবিষ্যতে স্বেচ্ছাচারী, পরনির্ভর এবং নিজ ক্ষমতার উপর আস্থাহীন হইয়া গড়িয়া ওঠে। ভবিষ্যতে ইহারাও অন্যের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে না। গৃহ-পরিবেশ যেখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধাহীন, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহজ ভালবাসার সম্বন্ধ নাই, যেখানে পরিবারের মানুষের মধ্যে সহানুভূতি দয়ামায়ার সহজ সম্বন্ধ নাই সেখানে শিশুর পক্ষে সুস্থ মন নিয়া গড়িয়া ওঠা কঠিন। এ সমস্ত দুষ্ট পরিবারের প্রতিকূল পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ছেলেমেয়েরা হৃদয়হীন, মিথ্যাবাদী এবং রুচিহীন হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

শিশুর অব্যবস্থিতার কারণ আলোচনা করিতে হইলে শিশুর জীবনের মৌল প্রয়োজনগুলি কি তাহা জানা আবশ্যক। হ্যাড্‌ফিল্ডের মতে—

শিশুর জীবনে তিনটি মৌল প্রয়োজন: (১) বুক জুড়ানো স্বতঃ উৎসারিত স্নেহ (২) কিছুটা স্বাধীনতা এবং (৩)সুশাসন। গৃহে হোক্ বিদ্যালয়ে হোক, প্রতিবেশীর সঙ্গে মেলামেশার হোক্ সর্বক্ষেত্রেই এই তিনটি মৌল প্রয়োজন যথোচিতভাবে মিটাইবার ব্যবস্থা থাকিলেই শিশু সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

গৃহে স্নেহপ্রীতির আকাঙখা মিটাইবার অভাবে শিশুর জীবনে নানা অশান্তি ও বিকারের আশঙ্কা থাকে ইহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এবার অন্য দুইটি প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থার কথাও আলোচনা করিব।

শিশুকে যেমন স্নেহ ভালবাসা দিয়া আবরণ করিয়া রাখিতে হইবে—ধৈর্যের সঙ্গে তাহার নানা সদভ্যাস গঠন ও নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে হইবে তেমনি সবল ব্যক্তিত্ব গঠন করিতে হইলে, শিশুকে কিছুটা স্বাধীনতাও দিতে হয়।

শিশু কৌতূহলী, সে নানা উদ্ভট, আজগুবী আপাত অসঙ্গত প্রশ্ন করিবে—তাহার এই স্বাভাবিক আত্মবিকাশের আগ্রহকে উৎসাহ দিয়া এবং সুপরিচালনা দ্বারা পুষ্ট ও উদ্দেশ্যমুখী করিতে হইবে। তাহার বুদ্ধি বিকাশের স্তর অনুযায়ী তাহার প্রশ্নের যথাসম্ভব সদুত্তর দিতে হইবে। অসঙ্গত বা অশ্লীল বিবেচনা করিয়া শিশুকে ভর্ৎসনা করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। অশ্লীলতাবোধই শিশুর নিষ্পাপ মনে জন্মে নাই। গুরুজনেরা তাহার নিতান্ত শিশুসুলভ কৌতূহলের উত্তরে যদি গোপনতার চেষ্টা করেন, অথবা তাহাকে পীড়ন করেন তবেই তাহার সরল কৌতূহল বিকৃত হইবে। সব শিশুই বড় হইতে চায়, গড়িতে চায়, সৃষ্টি করিতে চায়—এ জন্য তাহাকে কাঠের টুকরা, রঙীন কাগজ, বালি, প্লাস্টিক ইত্যাদি উপকরণ দিয়া জিনিষ গড়িতে উৎসাহ দিতে হইবে। নিশ্চয়ই তাহার ক্ষমতার অভাবে, ধৈর্যের অভাবে, বুদ্ধির অভাবে সে কিছু জিনিষ ভাঙিয়া চুরিয়া লোকসান করিবে, তবুও একটা মাত্রা পর্যন্ত সে লোকসান সহ্য করিতে হইবে। সে নিজে নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে, পরীক্ষা করিতে, ছেঁড়া ছবি, ভাঙা মারবেল, রং ওঠা পুতুল, টিকটিকির ডিম ইত্যাদি নানা 'ছাই ভস্ম' সংগ্রহ করিতে চাহিবে ইহার মধ্য দিয়াই তাহার বুদ্ধি বাড়িবে, কুশলতা বাড়িবে, নিজের উপর আস্থা বাড়িবে। রাশিয়া দেশে প্রত্যেক বাড়ীতেই নিতান্তই ছোট হইলেও শিশুদের জন্য একটি কোণ (চিলড্রেন্‌স কর্নার) পৃথক করা থাকে। সেই কোণে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীন, পিতামাতা শুধু দেখেন যেন তারা কৌতূহলবশত নিজের বা অন্যের বিপদ ডাকিয়া না আনে (যেমন আগুন নিয়া খেলা)। আর একটা কর্তব্য হইল শিশুর কৌতূহল ও গঠন স্পৃহাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং কুশলী কর্মে পরিণত করিবার জন্য সতর্ক চেষ্টা। পিতামাতা তাহাদের সঙ্গী হইয়া, তাহাদের চালক হইয়া তাহাদের খেলাধূলায় যোগ দিলে শিশুরা আনন্দিত হয়, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সুস্থ প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে এবং শিশুদের কৌতূহল ও কর্মের উদ্যম সুশৃঙ্খল হইয়া ওঠে এবং তাহার সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়।

তৃতীয় প্রয়োজন হইল সুশাসন। শিশুরা সমস্ত প্রকারের শাসন অপছন্দ করে ইহা সত্য নয়। তাহারা বিশৃঙ্খল এলোমেলো, সম্পূর্ণ অর্থহীন কাজ বা অবস্থায় স্বস্তিবোধ করে না। তাহারা পিতামাতা গুরুজনের উপর কিছুটা নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেও ভালবাসে। কিন্তু শাসন অর্থই পীড়ন নয় এবং বাধাদান নয়। শাসন অর্থ ঠিক পথটি দেখানো সেই পথে আগাইয়া দিবার মত বুদ্ধি দৃঢ়তা ও ভালবাসা।

এর Planning for Stability এবং Susan Isacas এর Habit প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শাসন করিবার সময় অনেক সময়েই আমরা ভুলিয়া যাই যে শিশুকে একদিন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত নূতন পরিবেশে নিজের স্থানটি করিয়া নিতে হইবে সুতরাং আমাদের দিনের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী, সমস্ত অভ্যাস, সমস্ত কুশলতা তাহাদের উপর চাপাইয়া দিয়া ঠিক আমাদেরই মত করিয়া তাহাদের গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা যতই সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হোক না কেন, শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনে সুব্যবস্থিত তার পক্ষে তাহা মস্ত বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সমস্ত সুশাসনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তোলা। ডিউই এবং আধুনিক শিশু-মনোবিদেরা শিক্ষার এই দিকটির উপর যথেষ্ট জোর দিয়াছেন।

শৈশবে শাসনের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। কারণ সুস্থ জীবনের জন্য কতগুলি সুঅভ্যাসে শিশুকে অভ্যস্ত করাইতেই হইবে। সংসার ও সমাজ জীবনের উপযোগী করিয়া শিশুকে গড়িতেই হইবে সেজন্য কিছু মৌল রীতিনীতি তাহাকে শিখাইতেই হইবে—এই মর্ম সত্যটি শিশুকে জানিতেই হইবে নিজের স্বার্থই যে কেবল খোঁজে সে নিজেও সুখী হইতে পারে না, অন্যেরও বিরক্তির কারণ ঘটায়।

গুরুজনদের শাসনের ব্যাপারে শিশু অনেক সময়ই বিভ্রান্ত বোধ করে, সে নিজেকে মানাইয়া নিতে পারে না কারণ বিভিন্ন গুরুজন বিপরীত আদেশ, নিষেধ দেন, এমন কি একই ব্যক্তিও শাসন করার কালে সব সময় একই নীতি মানিয়া চলেন না। কাজেই শিশুর অব্যবস্থিততার জন্য গুরুজনদের পরস্পরবিরোধী শাসনও কখনো কখনো দায়ী—যদিও শাস্তিটা শিশুদেরই প্রাপ্য হয়।

প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ের সঙ্গে অধিকাংশ শিশুই (একটা বয়স হইলে) সহজে মেলামেশা করিতে পারে। কিন্তু সব সময়ে ইহা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন রুচি ও সামর্থ্যের ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে মেলামেশা, খেলাধুলার মধ্যে বিষয় প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের আশঙ্কা অনেক সময়েই থাকে। এসব ক্ষেত্রে দুর্বল, ভীরুস্বভাব ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ নৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ পায় না। ইহাতে তাহারা আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। আর গুণ্ডা স্বভাবের ছেলে-মেয়েরা হয়তো ছোট ও দুর্বলদের উপর ছোটখাটো উৎপীড়ন করিয়া আনন্দ পায়। ভবিষ্যতে ইহারা হয়তো পর-পীড়ক হয়—অন্যের ত্রাসের কারণ হয়। বয়ঃসন্ধিকালে অনেক সময় শিশুরা কুসঙ্গীর পাল্লায় পড়িয়া নষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণ-ভাবে ইহা সত্য যে বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে অন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গ তাহার সুস্থ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন। ইহার মধ্য দিয়াই শিশু পৃথিবীকে চিনিতে শেখে অন্যের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিবার সমাজিক শিক্ষা লাভ করে, তাহার আগ্রহ ও কর্মের পরিধি বিস্তৃত হয়, সে নিজেকে পূর্ণতর বিকাশের সুযোগ লাভ করে। পাঁচ ছয় বৎসরের পর হইতে সব শিশুর পক্ষেই একটি 'দল' দ্বারা গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আজকাল অনেক পিতামাতাই অন্য পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজ সন্তানদের মিশিতে দিতে অনিচ্ছুক বিশেষত সে সব পরিবার যদি আর্থিক সঙ্গতিতে অথবা সামাজিক মর্যাদায় নিজেদের অপেক্ষা হীন হয়। ইহার প্রভাব শিশুদের উপর শুভ হয় না। তাহারা এভাবে শৈশব হইতেই উন্নাসিক, পরের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাপরায়ণ ও সন্দিগ্ধ প্রকৃতির হইয়া ওঠে।

বিদ্যালয় শিশুর জীবনবিকাশে একটি অত্যন্ত গুরুতর পদক্ষেপ। বিদ্যা-লয়ে শিশুর জগতের পরিধি হঠাৎ অনেকখানিই বাড়িয়া যায়। এখানে শিশুর সুপ্ত শক্তি, বুদ্ধি, রুচি ও নৈপুণ্য প্রতিযোগিতার তাড়নায় আত্মপ্রকাশের নূতন সুযোগ পায়। তাহার বড় হইয়া বাড়িয়া উঠিবার আকাঙ্ক্ষা, তাহার অহং-বোধ তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু বিদ্যালয়ের জগৎ শিশুর কাছে নূতন জগৎ। এই জগতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত শিশুর পথেই মায়ের আঁচলের নিরাপদ আশ্রয় ছাড়িয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম দিনগুলি বিষম উদ্বেগ ও যন্ত্রণার দিন। কোন কোন শিশু এই উদ্বেগ ও যন্ত্রণার দাহ বহু দিন পর্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারে না। নূতন অবস্থায় নিজেকে মানাইয়া নিবার ক্ষমতাকেই অনেক সময় বুদ্ধি বলা হয়। এ বুদ্ধির দিক দিয়া যাহারা হীন তাহাদের পক্ষে বিদ্যালয়ের নূতন পরিবেশে নিজেদের মানাইয়া নেওয়া স্বভাবতঃই কষ্টকর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত তীক্ষ্ণধী, অভি-মানী, রুচিসম্পন্ন মানুষও বিদ্যালয়ে সুখী হইতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ের পরিবেশ গৃহপরিবেশ হইতে কতগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত। গৃহের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত, নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি সেখানে অনেক কম। শিশুর স্বাধীনতা অনেকখানি অবাধ, সেখানে শিশু আদরের ধন, সমস্ত আঘাত হইতে সযত্নে রক্ষিত। কিন্তু বিদ্যালয়ে অন্য দশ জন শিশুর মধ্যে একজন, তাহাকে বিশেষ করিয়া কেহ আদর করিবে না, কেহ তাহার দিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিবে না—সেখানে চেঁচামেচি বারণ, দৌড় ঝাঁপ নিষিদ্ধ : সেখানের আবহাওয়া শাসন-শৃঙ্খলার নৈর্ব্যক্তিক, কঠোর, ফর্মাল। এখানে সহপাঠীদের সঙ্গে খেলাধুলার সম্বন্ধ শুধু নয়—লেখাপড়ার প্রতিযোগিতার। শিক্ষকদের প্রচুর স্নেহ মমতা না থাকিলে এবং শিশু মন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে শিশুর পক্ষে এই নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া কঠিন হয়। বিদ্যালয়ে এমন সব বিষয় তাহাকে শিখিতে হয় (যেমন জ্যামিতি, ভূগোল) যাহার সঙ্গে তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন যোগ নাই। এ অবস্থায় কখনো কখনো শিশু দিশাহারা হয়। তাহার উপর শিক্ষক যদি কঠোর ও সহানুভূতি-শূন্য হ'ন, তবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় তাহার পক্ষে বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায়।

সে জন্যই বর্তমান কালে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া নূতন ধরণের শিশু বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে যেখানে খেলা ও শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহই হইবে শিক্ষার প্রধান উপায়। যে সমস্ত শিশুরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের একেবারেই খাপ খাওয়াইতে পারিল না, তাহারা কখনো কখনো স্কুল হইতে পলাইয়া যায়। ইহা গুরুতর অব্যবস্থিততার লক্ষণ। ইহাদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার প্রয়োজন হইতে পারে।

এবার শিশুদের অব্যবস্থিততা বিষয়ে তিনটি তত্ত্বের সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ফ্রএডের মতে জীবনের মূল শক্তি হইতেছে আদিম কাম। সমস্ত স্নেহ ভালবাসা, প্রীতির মূল এই কাম বা যৌনতা (সেক্সুয়ালিটি)। শিশু মাতাকে ভালবাসে, তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া পাইতে চায়। কিন্তু কিছু বড় হইলেই শিশু দেখে তাহার এই তীব্র ভালবাসা সমাজ নিন্দার চোখে দেখে। সে স্পষ্ট চেতনায় বুঝে যে, তাহার স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির পথে পিতা মস্ত বাধা। তাহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ্যভাবে দেখাইবার উপায় নাই। তাই তাহার মনের এই দ্বন্দ্ব (মাতার প্রতি আকর্ষণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেষ) অবচেতন স্তরে বাসা বাঁধে। এই অমীমাংসিত তীব্র অনুভূতির দ্বন্দ্বের জটিল জালকে ফ্রয়েড বলিয়াছেন ইদিপাস কম্‌প্লেক্স্। সেই সঙ্গেই পিতার নিকট শাস্তি পাইলে তাহার অবচেতনায় একটি বিষম উদ্বেগের সৃষ্টি হয় তাহা হইল লিঙ্গচ্ছেদের ভয়। এমনি করিয়া শিশুর স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষা সমাজের নির্বোধ কুশাসনের ফলে যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সচেতন মন হইতে সজোরে নির্বাসিত বা অবদমিত হয়, সেখানেই অব্যবস্থিততার মূল সৃষ্টি হয়। এই অবদমিত কামনাকে সচেতন মনে মুক্তি দিবার যে উপায় তাহাকেই ফ্রএড বলিয়াছেন মনোবিকলন এবং ইহাই অব্যবস্থিততার প্রকৃত চিকিৎসা।

এ্যাড্‌লারের মতে শিশুর জীবনের মূল বেগ হইতেছে হীনতাবোধ এবং তাহা অতিক্রমণের চেষ্টা। শিশু জন্মকাল হইতে সুরু করিয়া পাচ-ছয় বৎসর পর্যন্ত পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল---তাহাদের ইচ্ছার দ্বারা চালিত। এ জন্যই তাহার মনের মধ্যে একটি গভীর হীনতাবোধ গড়িয়া ওঠে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে শিশু নিজ শক্তির উদ্বোধন দ্বারা এই হীনতাবোধ অতিক্রম করিয়া সুস্থ সবল ব্যক্তিত্ব নিয়া গড়িয়া ওঠে। কিন্তু যাহারা ভীরু ও দুর্বল তাহারা নিজ বিফলতার জন্য কেবলই অজুহাত খোঁজে---অন্যের দোষ দেয়, নিজের অস্বাস্থ্যকে দায়ী করে। অনেক সময় এই অসুস্থতা শারীরিক নয়, তাহার মনের বা কল্পনার সৃষ্টি। ইহা মানসিক অব্যবস্থিততার লক্ষণ। এই মানসিক রোগগুলির নাম তাই দেওয়া হইয়াছে সাইকোসোম্যাটিক ডিজিজ ইহাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিস্টিরিয়া। পিতা, মাতা ও শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। শিশুর মনের এই হীনতাবোধকে নিজ উদ্যম দ্বারা অতিক্রম করিতে শিক্ষা দেওয়া।

সোভিয়েট রাশিয়া ফ্রএড্ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। তাঁহারা বলেন---সুবিচারের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া নূতন সাম্যবাদী সমাজ গঠন করিয়া, প্রত্যেক শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ এবং শক্তি ও রুচি অনুযায়ী সুশিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। প্রতিযোগিতার ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভের ভিত্তিতে নয়, সহযোগিতাও সমবায়ের ভিত্তিতে গঠনমূলক যৌথ শিক্ষা দিতে হইবে---সমাজের কাজের মধ্যে শিশুকাল হইতেই শিশুদের অভ্যস্ত করিতে হইবে। প্রচুর পরিশ্রম, সুষম খাদ্য, যৌথ কর্মোদ্যমের ভিত্তিতে শিক্ষাদানই শিশুকে আত্মমর্যাদাশীল এবং সমাজ-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া গড়িয়া তুলিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এ শিক্ষা যে শিশু গ্রহণ করে, সে অব্যবস্থিত হইতে পারে না।

এই তিনটি মতের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয় যে, আমাদের দেশের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেই আমরা অধিকতর সুফল লাভ করিব।

দর্পণে তোমার মুখ

বসুমিত্র দত্ত

দর্পণে তোমার মুখ সোহাগে উজ্জ্বল মণিমালা
প্রতিবিম্ব কথা বলে ; বাঁকানো ভুরুর তীব্র রেখা
অবিরত কাছে ডাকে চোখের আলোর ইশারায়
ত্রিকোণ চিবুকে তিল—দুর্গদ্বারে সজাগ প্রহরী।

সেই পুরাতন আমি আত্মহননের দুঃখ নিয়ে
বিরল স্মৃতির মূল্য দিতে চাই স্পর্ধিত আমাকে
দেয়ালে টাঙানো ছবি ক্রুশবিদ্ধ পবিত্র যন্ত্রণা
কিংবা আকাশের নীলে একফালি চাঁদের সংসার
নিরুদ্দিষ্ট মেঘমালা ; হৃদয়ের গভীর গোপনে
মড়ো অন্তর্গত দুঃখ বিষাদে মলিন হয়ে থাকে
সম্মুখে চোখ রাখি—উদ্ভাসিত মায়াবী দর্পণে
[illegible] তোমার মুখ সোহাগে উজ্জ্বল মণিমালা।

নারী-মহিমা

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(ঘ)

রবীন্দ্র রচনায় পতিতা পুজ্যনারী।
"তিন সঙ্গী" গল্পের "ল্যাবরেটরী" আখ্যান।
সোহিনী চরিত্র।
—রবীন্দ্র রচনাবলী—৭ম খণ্ড। পৃঃ—৯৭৭।

নন্দকিশোর লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ উচ্চ ডিগ্রী লাভ করিয়া দেশে আসিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর দুটো বড়ো ব্রীজ তৈরি করার কাজের মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। "ও-কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডান হাত বাঁ হাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি। এসব কাজের দেনা-পাওনা নাকি কোম্পানি নামক একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তার সঙ্গে জড়িত, সেই জন্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের তহবিলে এ পীড়া পৌঁছয় না।

"ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জীনিয়স বলত, নিখুঁত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নীচের দলের বিলিতি কর্মচারী প্যান্টের দুই ভরা পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মল্লিক' বলে ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত তখন ওঁর ভাল লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফন্দি জানতেন ভালো করেই।

"পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনদিন বাবুগিরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলির একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানা -ঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

"কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন খুব মস্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শখ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে, এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফুড়ে উঠল—আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

"এরকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে যেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে লোকে সন্দেহ করেছে। লোকটা ছিল সৃষ্টি-ছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠতো ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মান থেকে আমেরিকা থেকে এমন সব দামী দামী যন্ত্র আনতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পাড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সস্তা-দরের পাতা পাড়া হয়। ওদের দেশে বড় বড় যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকতেই ছেলেরা টেক্সটবুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্য বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে, এই হল ওঁর পণ।

"দুর্মূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্ম-বোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়ো সাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণ দক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরী ছাড়তে হল। সাহেবের আনুকূল্যে রেল-কোম্পানির পুরনো লোহা-লক্কড় সস্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসলেন। তখন ইউরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর মুনাফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমন সময় আর একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

একসময়ে নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটা ঘাগরা দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত—জ্বলজ্বলে তার চোখ, ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শাণদেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁসে এসে বললে, "বাবুজী আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দুবেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

"নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি।"

"সে বললে, চিড়িয়াখানার কোন দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে?"

"নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

"নন্দকিশোর হেসে বললেন, কি গুণ দেখলে বলো দেখি।"

"ও বললে "এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজী, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল—ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালী, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উল্টে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনও বোঝে নি, আমি বুঝে নিয়েছি।"

"নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে একটি চীজ বটে—সহজ নয়। মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্টি গণনা করে বলেছিল, একদিন দুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।"

"নন্দকিশোর বললে, বল কী। শয়তানের?"

মেয়েটি বললে, "জানো তো বাবুজী, জগতে সবচেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্ ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে, খৃষ্টানির জোরে নয়।

কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানের কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, "বাবু রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

নন্দকিশোর হেসে বললে, "কী করতে হবে।"

"দেনার দায়ে আমার আইমার ঘটিবাটি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

"সাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল, ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে?"

"তারপর আমি তোমার সঙ্গ কখনও ছাড়ব না।"

"কী করবে তুমি।"

"দেখব, যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।"

কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপর দাগ পড়ল একটা দামী ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটার ভিতর থেকে ঝক ঝক করছে ক্যারেক্টারের তেজ—বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে এ কটুমাত্র সংশয় নেই। নন্দকিশোর অনায়াসে বললে, "দেব টাকা"—দিলে সাত হাজার বুড়ী আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী বলে। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। কিন্তু চেহারার মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ-একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি? উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশীমাত্রায় নয়, সহামতো। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রফেসারি করতে যাবে নাকি।" নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দকিশোরী করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।" বলত, "আমি অসবর্ণ বিবাহ পছন্দ করি নে।"

"সে কী হে।"

"স্বামী হবে এঞ্জিনীয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানব ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

এই তীক্ষ্ণধী চতুরা বারবনিতা নন্দকিশোরকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। বারবনিতা সোহিনী সতীসাধ্বী স্বামী-পরায়ণা স্ত্রীতে পরিণত হইল। অতীত জীবনের কালিমার বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া আত্মসমর্পণের দ্বারা স্বামীর কর্মসঙ্গিনী হইয়া পড়িল।

এই সৌভাগ্য সোহিনীর অধিক দিন থাকে নাই। নন্দকিশোরের যখন মৃত্যু হইল, তখন সোহিনী একজন পুরা সায়েন্টিস্ট। স্বামীর রিসার্চ সংস্থা সার্থক করিবার চেষ্টায় নিয়োজিত রহিলেন। তাঁহার পূর্ব অবস্থার জাত গোত্রহীনা কন্যা নীলাকেও এই যজ্ঞের বিঘ্নরূপে জানিয়া নীলার নিজ ইচ্ছা অনুরূপ জীবন যাপন করিতে দিলেন। কিন্তু ল্যাবরেটরীর শত হস্তের মধ্যেও আসা নিষেধ করিলেন। নীলা রিসার্চিস্ট এবং অধ্যাপকদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া অধঃপতিত করার অথবা বিবাহ করিবার চেষ্টা করিত। এই কারণে সোহিনী তাহাকে বর্জন করিলেন। লোকে নীলাকে দিয়া পিতার সম্পত্তির অংশ লইবার জন্য নালিশ করিতে প্ররোচিত করিতেছিল। সোহিনী তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে উইলের সহিত এ্যাফিডেবিট সংলগ্ন আছে যে তাহার কন্যা নীলা গোত্রহীনা এবং নন্দকিশোর তাহার পিতা নহে। নন্দকিশোরের সহিত সাক্ষাতের বহু পূর্বেই সে জন্ম লইয়াছিল।

এই পতিতা সাধ্বীকে আমরা অবশ্যই সতীলোকে দেখিতে পাইব।

(চ)

পতিতার সতীস্বর্গে বাস

যে সকল পতিতা উত্তরকালে জীবন পরিবর্তন করিয়া পাতিব্রাত্য ব্রত পালন করিয়াছে, তাহাদের জন্য কবি সতী-সাধ্বীদের স্বর্গলোকে যে স্থান রাখিয়াছেন—

সতী

সনেটে তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—পৃঃ—৬৬৮।

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাতনামিনী
খ্যাতিহীনা কীর্তিহীনা কত না কামিনী
কেহ ছিল রাজসৌধে কেহ পর্ণ ঘরে,
কেহ ছিল সোহাগিনী কেহ অনাদরে;
শুধু প্রীতি ঢালি দিয়া মুছি লয়ে নাম
চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি মর্ত্যধাম।
তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী
মর্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি।
হেরি তারে সতীগর্বে গরবিনী যত
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কী জানিবে বার্তা, অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্ব কাহিনী

(ছ)

কুমারী-সতী-স্বর্গলোক

—রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ—৯৬০।

তিন সঙ্গী' গল্পে "শেষ কথা।"

সতী স্বর্গলোকেরও ঊর্ধ্বে কল্পনা করা যায়, 'কুমারী সতী স্বর্গলোক'। পুরুষের আগ্রহে কোন কুমারী যুবতীর বিবাহ প্রস্তাব হইল, বিবাহ সামাজিক প্রথানুসারে স্থির হইল। পরে পুরুষ অন্তর্ধান করিল এবং অপর নারীকে বিবাহ করিয়া পতিত হইল।

যে কুমারী যুবতী বিবাহ নিশ্চয় জানিয়া ভালবাসিয়াছিল তাহার অবস্থা কী প্রকার হয়। মনে মনে সে যুবতী তো এক পুরুষকে পতিরূপে স্বীকার করিয়াছিল। এই নারী ছিল সকল দিক হইতে শ্রেষ্ঠতম। গুণে লক্ষ্মী রূপে সরস্বতী। এই কন্যা পুরুষের কাম্য, রূপে, গুণে, যৌবনে এবং আধুনিক কলেজী পাণ্ডিত্যে ধন্যা। মুগ্ধ এবং যোগ্য পাণিপ্রার্থী সম্মুখেই আছে। এই আগন্তুককে ভালবাসা যায়, আদর করা যায়, কিন্তু পতিরূপে গ্রহণ করা যায়? বিবাহ প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়? না, দেওয়া যায় না। পতিরূপে স্বীকৃতিতে পূর্ব চিন্তধারার শুচিতা মলিন হয়। যাহার সহিত বিবাহ স্থির ছিল সে ব্যক্তি অশ্রদ্ধেয় এবং অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। কন্যার ভালবাসা কিন্তু পূর্বস্মৃত ছায়ার প্রতি আছে। যুবতী আর বিবাহ করিবে না। সে তাহার প্রথম প্রেমের শুচিতা লইয়া জীবন কাটাইল। ইহাই অচিরার কাহিনী।

রবীন্দ্ররচনাবলীর ৭ম খণ্ডে "তিনসঙ্গী" গ্রন্থের "শেষ কথা" আখ্যানের ১৭৪-১৭৭ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া "অচিরা দেবীর" শুচিস্মতের বিবরণ পাঠককে দিতেছি।

"আপনি যদি সাধারণ মেয়েদের মতো হতেন, তাহলে আপনার কাছে সত্যকথা শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে মুখে বাধত।"

অচিরা বললে, "বলুন আপনি, দ্বিধা করবেন না।"

বললুম, "আমি সায়াণ্টিস্ট, যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা ইম্পার্সোনালভাবে বলব। আপনি একদিন ভবতোষকে অত্যন্ত ভালবেসেছিলেন। আজও কি আপনি তাঁকে তেমনি ভালবাসেন।"

"আচ্ছা, মনে করুন, বাসিনে।"

"আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।"

"তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইজন্যে আমি এই সরে আসাকে শ্রদ্ধা করিনে লজ্জা পাই।"

"কেন করেন না।"

"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।"

"ভালোবাসাকে আপনি এমন করে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে?"

"নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিষ। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিষটা মনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজো করছিলাম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।"

"আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে?"

"না।"

"তার কাছে যেতে পারেন?"

"না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"

"ভালো বুঝতে পারছিনে।"

"আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়—যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকী থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙমনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।"

আমি বললুম, "দেখুন, তর্ক করবার সময় আর নেই। এখানকার কাগজে বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। অ্যাসিস্টেণ্ট জিয়লজিস্ট লিখেছেন, এখান থেকে আরও কিছুদূরে সন্ধানের কাজ আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু—"

"কেন গেলেন না।"

"আপনার কাছ থেকে—"

"আমার কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনতে চান, প্রথম কথাটা পূর্বেই আদায় করা হয়েছে।"

"হাঁ ঠিক তাই।"

"তাহলে কথাটা পরিষ্কার করে বলি। আমার ঐ পঞ্চবটীর মধ্যে বসে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেন নি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয় নি কারও সঙ্গের। এক-একদিন মনে হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পান নি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলেছে। এমনিতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনও দেখি নি। দূর থেকে ভক্তি করেছি।"

"এখন বুঝি—"

"না বলি শুনুন। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে। এই তো আপনার দিকের কথা, এখন আমার কথাটা বলি। আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি—যে-চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তি রাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তখনই বিছানা ফেলে ছুটে গিয়ে ঝরনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি স্নান করেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিলে, "দাদু।"

অধ্যাপক তাঁর পড়া ফেলে রেখে কাছে এসে মধুর স্নেহে বললেন, "কী দিদি।"

"তুমি সেদিন বলেছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে?—তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।"

"দাদু, এইবার তোমার আমার কথাটা চুকিয়ে দিই। ক'দিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়ে বললুম, "তাহলে আমি যাই।"

"না আপনি বসুন। দাদু, তোমার সেই কলেজের যে অধ্যক্ষপদ তোমার ছিল, সেটা আবার খালি হয়েছে। সেক্রেটারী খুব অনুনয় করে তোমাকে লিখেছেন সেই পদ ফিরে নিতে। তুমি আমাকে সব চিঠি দেখাও, কেবল এই চিঠিটাই দেখাও নি। তাতেই তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে ঐ চিঠিটা চুরি করে দেখেছি।"

"আমারই অন্যায় হয়েছিল।"

"কিছু অন্যায় হয় নি। আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আসন থেকে নিচে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই আছি।"

"সম্প্রতি আমার চৈতন্য হয়েছে, যিনি শিক্ষক তাঁকে গ্রন্থকীট করে তুলছি। এমনি করে তপস্যা ভাঙি নিজের অন্ধ গরজে। সে কাজ তোমাকে নিতে হবে, এখনই যেতে হবে সেখানে ফিরে।"

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো অচিরার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "ও, বুঝেছি, তুমি ভাবছ আমার কী গতি হবে। আমার গতি তুমি।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার কী পরামর্শ নবীন।"

উনি পণ্ডিত মানুষ বলেই জিয়োলজিস্টের বুদ্ধির 'পরে ওঁর এত শ্রদ্ধা। আমি একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললুম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হঠে গেলুম। অচিরা বললে, "সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে আর কিন্তু দেখা হবে না।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সে কী কথা দিদি।"

"দাদু, তুমি অনেক কিছু জান, কিন্তু অনেক কিছু সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশী, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিও।"

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে আলিঙ্গন করে ধরে রইলেন "আমি জানি সামনে তোমার কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

এই অচিরা শুচিতা নারী-চরিত্রের মৌলিক উপাদান। উহা রক্ষা করিলেই নারী মাতৃরূপে জগদ্ধাত্রীরূপে স্ত্রীরূপে মানবজাতিকে উন্নীত করার নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

॥ সমাপ্ত ॥

উপেন্দ্রনাথ প্রশস্তি

লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর
দীননাথ॥
জ্ঞানী, কর্মী স্রষ্টা সাধক কে মহান,
উপেন্দ্রনাথ॥
পরাধীনতার আঁধার যখন ঢেকেছিল চারিদি
মসীর আঘাতে জাগাইলে দেশ
হে বীর সাংবাদিক,
'বসুমতী'র জনম দানিলে
বঙ্গবাসীরে জ্ঞান বিতরিলে
সত্যসেবা ত্যাগের আদর্শে
করেছিলে প্রাণপাত, তুমি উপেন্দ্রনাথ॥
বঙ্গমাতার সন্তান যত ভোলে নাই তব ঋণ
শত বরষে মিলেছে হরষে
পূজিতে শুভ এ জনমদিন
শ্রদ্ধা, ভক্তি, সহজে মোদের
লহ শত প্রণিপাত॥
মহাপ্রাণ উপেন্দ্রনাথ॥

কথা—অধ্যাপক সুধীরমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সুর—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

এককালের সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজা-রাণী, পাত্র মিত্ররা যেমন ছিলেন বাস্তবের মানব-মানবী—তেমনি তাঁদের কোষাগারের হীরে জহরৎ চুণী-পান্না-মণি রত্নগুলোও ছিল একান্তভাবেই সত্য। আর এসব মণি-মুক্তা তাঁরা কখনও আহরণ করেছিলেন সমরশক্তির জোরে অপর দেশকে আক্রমণ করে তাকে শ্মশানে পরিণত করে—সে দেশের রাজার মাথার মুকুট, সম্পদ সব নিয়ে এসে জমা করতেন নিজের কোষাগারে। আবার কখনও বা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে অপরের সম্পদ হরণ করতেন। এসব মণি-মুক্তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক একটা দীর্ঘ ইতিহাস। বিষণ্ণ হতাশা আর অশ্রুর মিশ্রণে সে সব কাহিনী রসঘন।

এমনি ধরণের একটি মণি ছিল রাশিয়ার জারের কোষাগারে।

রাশিয়ার জার অর্থাৎ সম্রাটরা ছিলেন বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য তাঁরা শাসন করতেন। এশিয়া আর ইউরোপ এই এই দুটো মহাদেশের বিশাল অংশ জুড়ে ছিল তাঁদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। ধন দৌলত, মণি-মুক্তা কোনও কিছুর অভাব ছিল না। ফলে তাঁদের কোষাগারে সম্পদের পাহাড় জমেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এক জার বা জারিনার পতন ঘটলে পরবর্তী জার বা জারিনা যেমন মস্কোর সিংহাসনে বসতেন তেমনি এই অফুরন্ত ধনাগারেরও তাঁরা অধিকারী হতেন।

কিন্তু বুলক খাঁর পান্না-খানা রোমানফ বংশের হাতে এসেছিল অভিশাপ হিসাবে। ওই পান্না খানার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশেছিল হত্যা ষড়যন্ত্র সিংহাসনচ্যুতি আর মৃত্যুর বীজ। তাই যখনই রোমানফ বংশের যে কেউ এই পান্নার অধিকারী হয়েছেন এবং সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এই পান্না অঙ্গে ধারণ করেছেন, তখনই তাঁর উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। তিনি মৃত্যুর পারাবারে নিমজ্জিত হয়ে হারিয়ে গেছেন।

দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে এই অভিশাপের ইতিহাস রচিত হয়েছে।

সবুজ রঙের একখানা বড় পান্না সপ্তদশ শতাব্দীতে রাশিয়ার বলদৃপ্ত জার বংশের কোষাগারে স্থান লাভ করে। রাজপরিবারের এই মহামূল্যবান সম্পদটি কিন্তু ছিল অভিশপ্ত। প্রায় দু'শতাব্দী ধরে এই পান্না রাশিয়ার সিংহাসনের অধিকারী-অধিকারিণীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এবং বদনামও কুড়িয়েছে।

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

রোমানফ বংশের অধিকৃত এই সবুজ পান্নাখানি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রোমানফ পান্না নামে কুখ্যাতি লাভ করেছে। বহু বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। অনেক গুপ্তহত্যা হয়েছে, অনেক নারীর চোখের জল পড়েছে—অনেক রাজা সিংহাসন হারিয়েছে। হয়ত এসব বেদনাদায়ক ঘটনার কারণ এবং উৎস ভিন্ন ছিল, কিন্তু একদল মানুষ যাদের সংখ্যা নগণ্য নয়, তারা আঙুল তুলে নির্দেশ করেছে—অভিশপ্ত পান্নাই এর জন্য দায়ী।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অংশে রাশিয়ার জার ছিলেন আইভান—ইতিহাস তাঁর নাম দিয়েছে আইভান দি টেরিবল। জার আইভানের অত্যাচারের রথ থামল ১৫৮৪ খৃস্টাব্দে। তাঁর ছেলে ফিওডর হলেন রাশিয়ার জার। কিন্তু বড় দুর্বলচিত্ত মানুষ। জারিনা ক্যাথারিন শুধু অপূর্ব সুন্দরীই ছিলেন না—ছিলেন বুদ্ধিমতী। তখন রাশিয়ার বিস্তীর্ণ সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চলে তাতার পোল আর স্যুইসরা বিদ্রোহ ছড়াচ্ছিল। দেশ রক্ষার ভার ছিল বীর বোরিস গোডুনফের হাতে। ইনি আবার জারিনার ভাই। জারের মৃত্যুর পর রাশিয়ার সিংহাসনের অধিকারিণী হলেন জারিনা ক্যাথারিন। কিন্তু নিজের হাতে জারিনা রাশিয়ার রাজমুকুট ভাই বরিসের মাথায় পরিয়ে দিলেন।

তারপর থেকেই রাশিয়ার রাজমুকুট ঘিরে ষড়যন্ত্রের কালোছায়া ঘনিয়ে উঠল।

বরিস গোডুনফ ছিলেন শক্তধাতের মানুষ। নৃশংস সৈনিক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অন্যায়ভাবে তিনি জারের সিংহাসন দখল করে রেখেছেন। রোমানফ বংশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী একদিন তাঁর কাছ থেকে রাজমুকুট কেড়ে নেবে। সেদিন রাশিয়ার জনসাধারণও সেই রোমানফ বংশের উত্তরাধিকারীকেই সমর্থন জানাবে। কাজেই রাজমুকুট আর সিংহাসন নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করার জন্য বোরিস ষড়যন্ত্রের পথ ধরলেন। তাঁর হুকুমে জার থিওডরের ছোট ভাই ডিমিট্রি গুপ্ত-ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন।

রোমানফ বংশের এক রাজকুমার ছিলেন নিকিতা। সুন্দর যুবাপুরুষ—কিন্তু খুব খামখেয়ালী। মদ খেয়ে হুল্লোড় করতেন। সিংহাসন অধিকার করার লোভ তাঁর ছিল না। সুন্দরী মেয়ের প্রতি ছিল অপরিসীম লালসা। নিকিতা রোমানফ ভালবেসেছিলেন এক তাতার কন্যাকে।

তাতার যুবরাজ বুলুক খাঁর অতি আদরের একমাত্র কন্যা ছিল ইজমা।

মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদের কাছেই একটা বাড়ীতে বুলুক খাঁ মেয়েকে নিয়ে থাকত। কাজানে ফিরে যায় নি। নির্জনতা ভালবাসত তাই খুব বেশী লোকজন বাড়ীতে আসা পছন্দ করত না। নিকিতা রোমানফ কিন্তু খাঁয়ের প্রাসাদে যাতায়াত করত।

ইজমা আর নিকিতার চার চোখের মিলন ঘটল এক উৎসবের রাতে।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসল।

সুন্দরী তাতার কন্যা ইজমা নিজের কুমারী দেহের ডালি তুলে ধরল প্রিয় নিকিতা রোমানফের সামনে। ফুলের মতন নিষ্পাপ, ভালবাসায় রঙীন ইজমার দেহ উপভোগ করল নিকিতা। সন্তানসম্ভবা হল ইজমা।

ইজমা ভালবেসেছে নিকিতাকে। তার সেই ভালবাসায় বাধা দেয় নি বুলুক খাঁ। বরং সেই ভালবাসা যাতে সফল হয়, সামাজিক বন্ধনে দু'টি জীবন মিলিত হতে পারে, তাদের সন্তান যাতে পরিপূর্ণ গৌরবের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হতে পারে—বুলুক খাঁ তাই নিকিতাকে বলল ইজমাকে বিয়ে করতে। যাকে, ভালবেসেছো, যার নিষ্পাপ দেহকে কলুষিত করেছো তা'কে বিয়ে কর—তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত কর না।

নিকিতা রোমানফ ইজমাকে বিয়ে করতে রাজী হল।

চেঙ্গিস খাঁর বংশধর বুলুক খাঁর তাতার রক্ত এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফুঁসে উঠল। নীরবে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

সে সময় মস্কোর উপকণ্ঠে এক ডাইনী বাস করত। তার সেই অন্ধকার গুহার দিকে ভয়ে কেউ যেত না। ডাইনী বুড়ীর খুব বদনাম ছিল। বুলুক খাঁ সেই ডাইনী বুড়ীর কাছে হাজির হল। সব কথা বলে নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করল।

নিষ্ঠুর হাসি হেসে বুড়ী বলল: বুঝেছি, তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও।

হ্যাঁ। শুধু নিকিতার উপর নয় সমস্ত রোমানফ বংশের উপর প্রতিশোধ নিতে চাই।

বুলুক খাঁ। একটু দাঁড়াও। তোমার ইচ্ছা পূরণ করবো। বুড়ী গুহার অন্ধকারে ঢুকল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সোনায় বাঁধান একখানা বড় পান্না নিয়ে বুড়ী বাইরে এল। একটা বড় গামলার জলে পান্নাখানা ডুবিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল। তারপর পান্নাখানা বুলুক খাঁর হাতে দিয়ে বলল—শয়তানী এই পান্নাখানা দিন দিন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এর আকর্ষণ বাড়বে। কিন্তু এই অভিশপ্ত পান্না যে ধারণ করবে, মৃত্যু তাকেই গ্রাস করবে। এখানাই নিকিতা রোমানফকে দেবে। আমার টাকা দিয়ে যাও।

বুলুক খাঁ সেই অভিশপ্ত পান্না নিয়ে ঘরে ফিরল।

এক ভোজের ব্যবস্থা করে বুলুক-খাঁ নিকিতা রোমানফকে নিমন্ত্রণ করল।

ইতিহাসকাররা বলেন যে, নিকিতার কাছে লেখা বুলুক খাঁর নিমন্ত্রণ পত্র রাখা আছে, রাশিয়ার মহাফেজখানায়: মহান ও শক্তিশালী নিকিতা রোমানফের একান্ত অনুগত বুলক খাঁ মহাশয়ের সম্মানে এক ভোজের ব্যবস্থা করেছে তাঁর বাড়ীতে—এবং আশা করছে যে, নিকিতা রোমানফ তার বাড়ীতে হাজির হয়ে তাকে বাধিত করবেন।

বুলুক খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে ভোজের ব্যবস্থা করল।

নিকিতা রোমানফ খাঁয়ের বাড়ী হাজির হল এবং প্রাণ ভরে ফুর্তি করল।

নিকিতার বিদায়ের সময় বুলুক খাঁ সেই অভিশপ্ত পান্নাখানা রাজকুমারের হাতে তুলে দিয়ে বলল: আমার ইচ্ছা অতীতের সব কথা ভুলে আপনি এই পান্নাখানা ব্যবহার করবেন। আমাদের মহান পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খাঁর এই মহামূল্যবান পান্না আপনার পোষাকে লাগাবার উপযুক্ত করে দিয়েছি।

সেই উজ্জ্বল সুবৃহৎ পান্নার সৌন্দর্য দেখে নিকিতা মুগ্ধ হল; অবাক হল—খুশী হয়ে গ্রহণ করল। ভাবল, বিদেশী কুকুরটা ভয় পেয়ে গেছে তাই তাকে খুশী করতে চাইছে। ক্লোকের উপর পান্নার পিনটা আটকে নিল।

তিন রাত্রিও কাটল না।

জার বোরিস গুডনফের সৈন্যরা এসে নিকিতাকে বন্দী করল।

নিকিতা তখন সারা রাত ফুর্তি করে একটি সুন্দরী যুবতীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। সাড়া-শব্দে যখন ঘুম ভাঙল তখন উনি বন্দী।

নিকিতার অবস্থিতি গুডনফকে ভয়ার্ত করে তুলিছিল।

কাজেই নিকিতাকে নির্জন সাইবেরিয়ার বরফ-প্রান্তরে পাঠান হল।

নিকিতার অনুরোধ, তাঁর স্ত্রীর কাতর কান্না—কোনও কিছুই জারের কঠিন বরফ-হৃদয় গলাতে পারল না সৈন্যরা তাকে সাইবেরিয়ায় নিয়ে গেল।

নির্জন প্রান্তর। চারিদিকে নিঃসীম সাদা শাদা বরফ।

স্লেজ গাড়ী থামল।

সৈনিকরা গাড়ী থেকে নেমে বরফের মধ্যে মানুষপ্রমাণ একটা গভীর গর্ত খুঁড়ল। তারপর নিকিতা রোমানফকে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। গর্তের মুখ ঢাকল বরফের ভারী চাঙাড়ে। মাঝে মাঝে প্রহরী এক টুকরো রুটি আর জলের পাত্র সেই গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিত। তিন বছর বন্দী জীবন যাপন করে সেই বরফ-গর্তেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন নিকিতা। তাঁর পোষাকে লাগান ছিল সেই পান্না।

অভিশপ্ত পান্নার প্রথম বলি হলেন রাজকুমার নিকিতা রোমানফ।

●

তারপর ঠিক পিটার দি গ্রেটের রাজত্বকালের আগে আবার অভিশপ্ত পান্না রোমানফ কোষাগারে ফিরে এল। তখন রাশিয়ার সিংহাসনে জার-কন্যা সুন্দরী সোফিয়া আরোহণ করেছিলেন। নাবালক রাজকুমার পিটারের ভিডি

অভিভাবিকা ছিলেন। নিকিতা রোমানফের দুর্ভাগ্যের কাহিনী তাঁর জানা ছিল। জার গুডনফের আদেশে সেই গর্তের মধ্যেই নিকিতার দেহ বরফ-চাপা দেওয়া হয়েছিল।

জার-কন্যা সোফিয়ার আদেশে নিকিতার কবর খোঁড়া হল। পুরানো পোষাকের সেই অভিশপ্ত পান্নাখানাও আবার রাজধানীতে ফিরিয়ে আনা হল।

উজ্জ্বল পান্নার সবুজ দ্যুতি মুগ্ধ করল জার-কন্যা সোফিয়াকে। উনি গলার হারের সঙ্গে পান্নাখানা লকেট করে নিলেন। বুলুক খাঁর অভিশপ্ত পান্নার কাহিনী তখন রাশিয়ানদের মুখে মুখে রাজধানীর চৌহদ্দির বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই ডাইনী বুড়ীর কাহিনী তখন অনেকেই বিশ্বাস করতো। জার-কন্যার পরিচারিকারা তাঁকে সাবধান করে দিল। সুন্দরী সোফিয়া ওদের কথা কানেও তুলল না।

কয়েকদিনের মধ্যে অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলল।

পিটার দি গ্রেট বড়বোনের হাত থেকে সমস্ত শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জার হয়ে বসলেন এবং তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। ক্রেমলিন প্রাসাদের সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হলেন সুন্দরী রাজকুমারী সোফিয়া। কারাগারের অন্ধকার গহ্বরে তাঁর জীবনদীপ নিভেছিল। শুধু একদিন অপরাহ্নে একটা খোলা জানালার ধারে তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই জানালার বাইরে তৈরী করা হয়েছিল একটা মস্ত বড় ফাঁসিমঞ্চ। জার-কন্যা সেই জানালায় বসে দেখতে বাধ্য হলেন কেমন ভাবে ফাঁসিমঞ্চের উপর তাঁর অনুগামী রাজপুরুষদের একে একে মাথা কেটে ফেলা হচ্ছে।

তবে মরবার আগে জার-কন্যা সোফিয়া সেই অভিশপ্ত পান্না খানা পিটার দি গ্রেটের মহিষী ইউডোক্সিয়া লপুখিনার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন; পান্নার অভিশাপে জারিনার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটল। কঠোরহৃদয় পিটার জারিনাকে নির্বাসিত করলেন। আর এক সুন্দরী চাষী-কন্যা রাশিয়ার জারিনা হলেন।

রোমানফ বংশের উপর পান্নার অভিশাপের কাল তখনও শেষ হয় নি।

জারিনা ইউডোক্সিয়া রাজধানী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে পান্নার লকেটখানা নিজের একমাত্র ছেলে আলেক্সির গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। তরুণ আলেক্সি সেই সময় জারের চেয়েও নিজেকে বেশী শক্তিশালী মনে করতেন। ব্যস। পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব শুরু হল। মহা শৌর্যশালী পিটার দি গ্রেট ছেলেকে ক্ষমা করলেন না। সেণ্ট পিটার দুর্গে বন্দী পুত্র আলেক্সিকে জার পিটার নিজের হাতে নির্মমভাবে চাবুক মেরেছিলেন এবং ক্ষত-বিক্ষত আলেক্সির অল্প দিন পরেই মৃত্যু হয়েছিল।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে পিতার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে বলেছিল: আমি তোমায় ক্ষমা করেছি, বাবা। তারপর নিজের গলায় ঝোলান একটা কাল থলে চেপে ধরেছিল। সেই থলেতে ছিল রোমানফ বংশের অভিশপ্ত পান্নাখানা।

আলেক্সির মৃত্যুর পর পান্নাখানা জারের কাছে আনা হল।

কিন্তু জার পিটার দি গ্রেট সেই অভিশপ্ত পান্নাখানা স্পর্শও করলেন না। অভিশপ্ত পান্না জারের কোষাগারের অন্ধকারে স্থান লাভ করল।

●

রাজকুমারী আনা আইভ্যানোভনা তখন রাশিয়ার অধীশ্বরী।

উনি পিটার দি গ্রেটের ভাইঝি। ধনাগারের মণিরত্ন দেখার সময় অভিশপ্ত পান্নার উপর তাঁর নজর পড়ল। বা! চমৎকার পান্নাখানা ত। তিনি পান্নাখানা প্রিয়পাত্র কুরল্যাণ্ডের জমিদারকে উপহার দিলেন। কিন্তু অভিশপ্ত পান্না তাঁর সহ্য হল না। তিনি আইভ্যানোভনার উত্তরাধিকারিণী এলিজাবেথ পেট্রোভনার বিষদৃষ্টিতে পড়লেন।

কুরল্যাণ্ডের জমিদার অভিশপ্ত পান্নার কাহিনী জানতেন। তিনি প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য পান্নাখানা রাণী পেট্রোভনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পান্নার জ্যোতি দেখে রাণী বিমুগ্ধ হলেন।

তিনি কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। একটা আঙটিতে পাথরখানা বসিয়ে পেট্রোভনার আঙটিটা ভাইপো পিটারকে উপহার দিয়েছিলেন। পেট্রোভনার পর পিটার জার হলেন। নাম হল তৃতীয় পিটার। সুন্দরী রাণী ক্যাথারিন হলেন জারিনা।

আবার রোমানফ বংশধরের উপর অভিশাপ বর্ষিত হল।

ক্যাথারিন স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেন।

তাঁর নির্দেশে প্রাসাদ-প্রহরীরা জারকে বন্দী করে রপসকা দুর্গ প্রাসাদে সরিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে রাণীর মনের মানুষ গ্রেগরি অরলফ জারের গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলল। জার পিটারের হাতে ছিল সেই পান্নার আঙটিটা।

জারিনা ভয়ার্ত হলেন। আঙটিটা দেখতেও রাজী হলেন না।

পান্নার আঙটি আবার জার কোষাগারে স্থানলাভ করল।

তারপর বহু বছর গড়িয়ে গেল।

রপসকা দুর্গপ্রাসাদের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি বিবর্ণ হয়ে এল।

একদিন জারিনা ক্যাথারিন দি গ্রেট পান্নার আঙটিটা আনতে হুকুম দিলেন। পান্নার জ্যোতি তাঁকে মুগ্ধ করল। উনি ঠিক করলেন যে, এই পান্না-খচিত একখানা গহনা উনি ওঁর ছেলের বউ মেরী ফিওডোরভনাকে দেবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পান্নাখানা হাতে নিয়ে উনি স্বর্ণকারের সঙ্গে কথা বলছিলেন—সহসা সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হলেন ক্যাথারিন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রথম পল জার হলেন।

বন্ধু হিতৈষীদের অনুরোধে জার তাঁর তরবারির হাতলে নিকিতা রোমানফের পান্নাখানা বসিয়ে নিলেন। দেহে

ধারণ না করেও উনি দ্যুতিময় সেই পাথরখানা ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হলেন। তার ফলও পেলেন সঙ্গে সঙ্গে। যেদিন পান্নাখচিত তরবারি জারের হাতে উঠল সেইদিন রাতের বেলা তাঁর ছেলে আলেকজাণ্ডারের হুকুমে এক দল গুপ্তঘাতক তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে তাঁকে আক্রমণ করল। পল তরবারি নিয়ে আত্মরক্ষা করতে উদ্যত হলেন। তরবারির হাতল থেকে পান্না-খানা ছিটকে পড়ল। জার ভীষণভাবে আহত হলেন।

প্রথম আলেকজাণ্ডার জারের সিংহাসন দখল করে এই অভিশপ্ত পান্নাখানা কোনও গীর্জায় দান করতে চাইলেন—কিন্তু শয়তানের সম্পত্তি বলে কোনও গীর্জা এই অভি-শপ্ত পান্নার মালিক হতে চাইল না।

কাজেই জারের হুকুমে সবুজ রঙ পান্না আবার প্রাসাদ-কোষাগারের বাক্সে বন্দী হল।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। রাশিয়ার অধীশ্বর হলেন দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। প্রাসাদ-কোষাগারে রাখা সেই অভিশপ্ত পান্নার কাহিনী তিনি শুনেছিলেন কিন্তু পান্নাখানা চোখে দেখেন নি। একদিন তিনি সেখানা দেখতে চাইলেন। পান্নার রঙ তাঁর মন হরণ করল। সেখানা নিজের পকেটে রাখলেন তাঁর বোনকে দেখা-বার জন্য। সেদিন বোনের বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল।

ফেরবার পথে নিহিলিস্ট রাজ-দ্রোহীদের বোমার আঘাতে আলেক-জাণ্ডারের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পান্নাখানা বরফের উপর ছিটকে পড়েছিল। একজন পুলিশ কর্মচারী পান্নাখানা কুড়িয়ে পেয়ে রাজকোষে জমা দিল।

পান্নাখানা আবার বাইরের আলো দেখল রাশিয়ার সবশেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের মহিষী জারিনা মেরীর দয়ায়। তিনি এই অভিশপ্ত কাহিনী বিশ্বাস করতেন না। এই পান্না বসিয়ে তিনি এক ছড়া হার করিয়ে নিলেন। সাইবেরিয়ার নির্জন প্রান্তরে বিপ্লবীরা যখন জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে নির্বাসিত করে তখন মেরী আলেকজান্দ্রা স্বামীর সঙ্গে সাইবেরিয়া চলে যান। পান্নার হার তাঁর গলায় ছিল। একাটারিন বার্গের নির্জন কারান্তরালে যখন বিপ্লবীরা জার দ্বিতীয় নিকোলাস জারিনা মেরী আলেকজান্দ্রাকে হত্যা করে, তখনও পান্নার সেই হার জারিনার কণ্ঠে ছিল।

তারপর থেকে নিকিতা রোমানফের অভিশপ্ত পান্নাখানা হারিয়ে গেছে।

রোমানফ বংশের সমস্ত শৌর্য ক্ষমতা ও গরিমা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সবুজ দ্যুতিময় পান্নাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। তিন শ' বছর ধরে অভিশপ্ত জীবন যাপন করেছে সেই পান্নাখানা। হত্যা, ষড়যন্ত্র ও লোভের স্মৃতি বহন করেছে। একটা বিশাল রাজবংশের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্তের সঙ্গে মূক পান্নার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী মিশে গেছে। ঐতিহাসিক বস্তুতে পরিণত হয়েছে।*

---

* ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবলম্বনে।

জল-তরঙ্গ

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভালবাসবার আগে ভুল করে ভেবেছ কখনও
সেই সব কুসুমের মুখ!
যারা তোমাকেই, শুধু তোমাকেই চেয়েছিল,
কাছে এসেছিল, হেসেছিল ;
তারপর (নিজেকে হারিয়ে) অকস্মাৎ ভালবেসেছিল!

হয়ত বা অন্তরের নূপুরের সুমিষ্ট গুঞ্জনে, হঠাৎ কখন
প্রগলভ্ চেতনার আস্তরণে নারীদের নক্ষত্র-যৌবন
ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবীর অন্ধকার আকাশকে ভালবেসেছিল,
নিজেকে বাঁধবার লজ্জারুণ কিংশুক আকাঙ্ক্ষায়
বধূ থেকে সুনিবিড় মাতৃত্বের পূর্ণায়ত সাধ জেগেছিল!

সুরভিত রজনীগন্ধার ডালে হাত বাড়াবার আগে
সময়ের চোখে চোখ রেখে খুঁজেছ কখনও
সেইসব মুকুলিত-আকুলিত পাখিনীর নাম,
যারা তোমাকেই, শুধু তোমাকেই চেয়েছিল,
কাছে এসেছিল, হেসেছিল ;
তারপর (নিজেকে হারিয়ে) অকস্মাৎ ভালবেসেছিল!

এখনও আশ্চর্য ভাব নাকি? গঙ্গা, যমুনা, ত্রিবেণীর
একই মিল দেখে! একই ইচ্ছার স্রোতে গা-ভাসিয়ে,
হৃদয়ের মৃদংগের দেশে ডুব দিয়ে—
সমুদ্রে মিশবার জন্যে মালা গাঁথ নাকি শতাব্দীর?

॥ দুই ॥

সাপকে যতই দুধ খাওয়াও না কেন ছোবল দেবার সময় সে বিষই ঢালবে, দুধ ঢালবে না, বলেছিলেন মণিমাসী, মাসখানেকের জন্য শুভময়ের বাড়ীতে এসে। মণিময়ের সকাল-বিকাল এ বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া-আসাটা তার পুরোনো চোখে ভাল লাগে নি। অতবড় মেয়ের অমন ছোকরা মাষ্টারের কাছে বসে অতসব কথা কওয়া, মুখে মুখে তর্ক করা, এ সব ভালো চোখে দেখেন নি তিনি। সময় -অসময়ে মণিময়কে রান্নাঘরে ডেকে খেতে দেওয়া কেমন যেন বিসদৃশ মনে হয়েছে তার। বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে সপ্তাহে দুদিন এ বাড়ী থেকেই মণিময়ের সোজা কলেজ যাওয়া এবং কলেজ থেকে আসাটা। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টি যেন কোথায় কি একটা বেসুরো জিনিষ খুঁজে পেয়েছে। তাই তিনি মাঝে-মাঝেই মেঘমালার মায়ের কাছে আপত্তি জানিয়েছেন। বলেছেন, মেয়ের বয়স হচ্ছে, এবারে একটি সুপাত্রের খোঁজ করো বৌমা। আর না হয় তো বলো আমার মাসশ্বশুরের বড় ছেলেটির সঙ্গে--- ।

কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন স্নেহলতা, মেঘমালার মা। বলেছেন, ওর আর বয়স কি দিদি। এই তো আষাঢ়ে ষোলয় পা দেবে। এ কি আর সেই দিন আছে যে, ন' দশ না-পেরোতে পেরোতেই ঢাকায় জুড়ে দেবো। তা আপনার মাসশ্বশুরের কথা বলবো ওকে।

পাড়ার দু' চারজনও যে দু' একটা কথা বলে নি এমন নয়। সে সব গ্রাহ্য করেন নি স্নেহলতা। মায়ের অপরিসীম স্নেহ দিয়ে এই দুটি কিশোর-কিশোরীকে পাশাপাশি বড় করে তুলেছেন তিনি। প্রীতিময়কে ডেকে বলেছেন—ওকে মণিময়দা বলবি বুঝলি। ও কি বাড়ীর বুড়ো মাষ্টার নাকি যে বার বার মাষ্টারমশাই, মাষ্টারমশাই বলিস ? কচি মনটা বুড়ো হয়ে যাবে না ওই কথা শুনতে শুনতে। স্কুল থেকে এলে খাবারের প্লেট সাজিয়ে যেমন যত্ন করে খাইয়েছেন মেঘমালা আর প্রীতিময়কে, তেমনি যত্ন করে খাইয়েছেন মণিময়- কেও।

মণিময় এমন এক সংসারে মানুষ যেখানে এই যত্নটুকু তার কোনও দিনই পাওয়া হয়ে ওঠে নি। তার নিজের মা আর ক'টি ছেলেমেয়েকে সামলিয়ে নূর মহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের দুশো টাকা মাইনের সংসার চালিয়ে মণিময়ের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে খোঁজ নেবার অবকাশ বড় একটা পান নি।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

আশীষ বসু

তাই যেদিন শুভময় মণিময়কে ডেকে বললেন, বি এস সি পাশ করে চাকরি করবে কি। পড়ো, খুব পড়ো। চাকরি তোমার জন্য নয়, সেদিন খুবই ভাল লেগেছিল তার; বি এস সি'র কেমিস্ট্রীতে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়া ছেলের চাকরি খুঁজতে সত্যিই খুব কষ্ট হয়েছিল সেদিন, যেদিন চন্দ্রকান্ত এসে বললেন তার চাকরি থেকে রিটায়ার করার কথা। বললেন, চাকরি খুঁজতে হবে বাবা, আর তো পড়ার খরচ দিতে পারবো না আমি। এবার সংসারের ভার নিতে হবে তোমাকে। আমার অধ্যায় শেষ হোল, এবার সুরু হল তোমার জীবন।

শুভময় তাকে সেদিন পড়া চালিয়ে যেতে বললেন, তার কয়েক দিন পরেই চন্দ্রকান্ত তাকে এক পাশে ডেকে এনে চুপি চুপি বললেন, বাড়ীতে কাউকে বলি নি, তুমি বড়ো হয়েছো তোমাকে ছাড়া আর বলবো কাকে, সামনের মাসটাই শুধু চাকরি আছে আমার, তারপর থেকে রিটায়ার করবো। সামান্য যা কিছু পাবো তা ভেঙে খাওয়া তো চলবে না, মেয়ে দুটো বড় হচ্ছে। পড়াশোনার খরচ আর চালানো সম্ভব হবে কি। তার চেয়ে আমি বলি কি---। বাকীটুকু শেষ করতে পারলেন না তিনি। নিজের ছেলেকে আত্মহত্যা করতে বলতে কোনও পিতা সহজে পারেন কি।

বাবাকে সেদিন নতুন চেহারায় দেখলো মণিময়। সদানন্দ, নিরভিমান স্বল্পবাক এই মানুষটিকে কখনো এতো কথা একসঙ্গে বলতে শোনে নি সে। জীবনযুদ্ধে আহত এক ম্রিয়মাণ সৈনিকের রূপ সেদিন চোখে পড়লো তার। নিজের বাবার দিকে ভাল করে ফিরে দেখলো সে। রোগা একহারা কালো চেহারায় একটা অস্বাভাবিক বড়ো মাথা, তাতে পিছনের দিকে সামান্য কয়েক গোছা কাঁচাপাকা চুল। সোজা হয়ে দাঁড়ালেও যে চেহারার উপরের দিকের অর্ধাংশ সামনের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে থাকবে। গোঁফ দাড়ি অযত্ন বর্ধিত। সপ্তাহে দু'দিন তার মুখ পরিষ্কার দেখা যায়। একমাত্র সোমবারে তার জামাকাপড় থাকে ধোপাবাড়ীর পাটভাঙা। শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে সব ঋতুতেই তার হাতে ছাতি দেখা যাবে। ছাতিটির বয়স কিঞ্চিদধিক সাত-আট বছর নিশ্চয়ই। তিন চার বছরের পুরানো পাম্প-সু বেশ কয়েকবার হাফ-সোল দেওয়া, এক-আধটা তালি ভাল করে নজর করলে চোখে পড়ে। বাবাকে নতুন করে দেখলো মণিময়। আর তার পরদিন থেকেই সে খুঁজতে লাগলো চাকরি।

মেঘমালা এসে দাঁড়ালো আর এক দিকে। স্নেহলতা শুভময় সে পাশে। স্নেহলতা অবুঝ নন। সব বুঝলেন অতি সহজেই এমন কি মণিময় কিছু না বলা

সত্ত্বেও। শুভময়ও বুঝলেন। বললেন, চাকরিরই চেষ্টা করো মণিময়, কোথাও যদি কাউকে বলার দরকার হয় তো আমাকে বলো দেখবো যদি চেনা-শোনার মধ্যে হয়। মেঘমালা কিছুই বুঝলো না। দু হাত দিয়ে মণিময়কে ঝাঁকিয়ে বললো, তুমি মরে যাবে মণিময় এমনি করে, লড়াই করবে না? তোমার প্রতিভা শেষ হয়ে যাবে পরের গোলামী করে?

অতি সহজ, অতি সীমায়িত মেঘমালার সংসার জ্ঞান তাই সেদিন অমনি করে বলতে পারলো ওকথা। সে জানে না পৃথিবীর সব বড় প্রতিভাই কোন না কোনভাবে গোলামীই করে থাকে। মণিময় আস্তে আস্তে মেঘমালার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, লড়াই তো আমার শুরু হল মালা। সে লড়াই কিসের জানো? জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আশার সঙ্গে নিরাশার, অর্থের সঙ্গে দারিদ্র্যের।

চাকরি পেলো মণিময় কিছুদিনের মধ্যেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোও তার পাশ করা ছিল সাধারণের চেয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে। স্বাস্থ্য, স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি, মেধায় সে ছিল অনেকের চেয়ে উঁচুতে। সুতরাং সরকারী পরীক্ষায় পাশ করতে তার দেরী হল না মোটেই। ইণ্টারভ্যুতেও ভালই ফল করলো সে।

●

আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারটার একটা ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টের বাঁ দিকের বেঞ্চে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে সামনের বিস্তৃত ধানক্ষেতের ওপরের পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়েছিল মণিময়। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট গ্রাম। কয়েকটি ঘরবাড়ী কিছু গাছপালা দেখা যায় আকাশের সঙ্গে মাটি যেখানে মিশেছে সেখানে। তারই কাছাকাছি যেন সূর্য এখন অস্ত যাচ্ছে। সেই লাল আভাটা ছড়িয়ে পড়েছে ছোট গ্রামটির বড় বড় নারিকেল আর তালগাছগুলির মাথায়। সিঁদুরের মতো টকটকে লাল রঙ ছড়িয়ে পড়েছে সারা মাঠে।

কার্তিক মাস, ধান পাকার সময় হয়ে এলো। এখন দুধের মতো সাদা রঙ এসে যাবে ধান গাছের শীষের মাথায়। টিপলে কষ বেরোবে। যেন দুধ গড়াচ্ছে। লোকে বলে, মা ধরিত্রী গর্ভবতী হয়েছেন। কিন্তু কোথায় কি এখানে। সবুজের দেখা নেই সারা মাঠ জুড়ে। ধুলো উড়ছে সারা মাঠে যেখানে উলটো পালটা হাওয়া। মাটির রঙ ধোঁয়াটে সাদা আর কালোয়-মেশানো তার গায়ে বড় বড় ফাটল বেরিয়েছে, পুরোনো ক্ষ যেন। মা বসুমতীর অঙ্গে দুষ্টক্ষত।

পর পর স্টেশন আসছে আর যাচ্ছে। রাণাঘাট থেকে তখন লাইন বেঁকেছে লালগোলার দিকে। রাণাঘাট, কালীনারাণপুর, বীরনগর, তাহেরপুর, বাদকুল্লা, কৃষ্ণনগর। মাটি এ যাবৎ সাদা, ধোঁয়াটে সাদা, গেরুয়া সাদা। এরপর মাটিতে যেন ঈষৎ লালের আভাস পাওয়া গেল। এলো বাহাদুরপুর, ধুবুলিয়া, মুড়াগাছা, বেথুয়াডহরি, সোনাডাঙা, দেবগ্রাম, পাগলাচণ্ডী, পলাশী, রেজিনগর, বেলডাঙার পর আরও ছোট-খাটো দু একটা স্টেশন পার হলে পাওয়া যাবে বহরমপুর।

'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র হাজারী ঠাকুরকে বার বার মনে পড়ে মণিময়ের যখনই এ পথ দিয়ে যায় আর রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ী থামে। তারপর থেকে রেল লাইনের পাশের মাটির রঙ দেখে সে। এ মাটিতে কৃষ্ণনগরের ঘূর্নির পটুয়ারা মূর্তি গড়ে। আরশোলায় চিরকাল ভয় মেঘমালার। একবার দুটো কৃষ্ণনগরের পটুয়ার গড়া মাটির আরশোলা ছেড়ে দিয়েছিল তার গায়ে। সে কি চেঁচামেচি মেঘমালার। ছুটে মায়ের কাছে নালিশ করতে গিয়েছিল সে। স্নেহলতা মিথ্যা ধমক দিয়েছিলেন মণিময়কে। তখন হাতের আরশোলা দুটোকে বার করে সে উপহার দিয়েছিল মেঘমালাকে। বলেছিল, বকুনী খাওয়ালে তো মার কাছে। দেখো কি সুন্দর জিনিষ এনেছি তোমার জন্য। মুখ এতটুকু মেঘমালার। সত্যিই তো বকুনী খাওয়ালো ছেলেটাকে। শেষে খোসামোদ করে রাগ ভাঙায় মণিময়ের। রাজী হয় একখানা বড় চকোলেট দুজনে একসঙ্গে মুখে দিয়ে ভাগাভাগি করে খাবে। জানে দুষ্টু ছেলেটা বড় অংশটা সব সময় ঠেলে দেবে তার মুখে। সে কি পারে নাকি দস্যির সঙ্গে।

প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছে মণিময়। জীবনে তার একটিই শখ। দেখেছে দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, কাশী। গেছে পুরী, মাদ্রাজ, ওয়াল্টেয়ার, ত্রিবেন্দ্রাম, কখনো বা বোম্বাই, পুণা কি দার্জিলিঙ, শিলং। সব জায়গা থেকে মেঘমালার জন্য কিছু না কিছু এনেছে কিনে। যেখানেই গেছে স্টেশনে নেমেই টেলিগ্রাম করেছে মেঘমালাকে, নিরাপদে এসেছি। জানে, মেঘমালা শুধু ঘর আর বার করছে পৌঁছানোর সংবাদটুকুর জন্য। কিনে এনেছে যেখানে যা বিখ্যাত। এনেই বলেছে, চোখ বোজ মালা। তারপর হয়তো গলায় পরিয়ে দিয়েছে হার, হাতে চুড়ি, আঙুলে আংটি কিংবা মুখে দিয়েছে খাবার।

ছোটবেলার কত কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মেঘমালাকে একটু একটু করে আবিষ্কার করার কথা। কলেজ থেকে ফিরেছে মণিময়। মেঘমালা এসে মুখের দিকে তাকিয়েছে। বুঝতে পেরে বলেছে, খিদে পেয়েছে তো খুব। কেন খেয়ে যাওনি কলেজে। মার সঙ্গে ঝগড়া করেছো বুঝি। বেশ ভালোই জানে মেঘমালা, ঝগড়া করেনি মণিময়, ঝগড়া করতে সে পারেনা। শুধু একতরফা বকুনী খেয়ে গেছে হয়তো। অভিমানে মুখ গুঁজে ভাত খেয়ে গেছে। খেতে পারেনি সবটুকু খিদে মিটিয়ে। কলেজের টিফিনে নিশ্চয়ই খায়নি কিছু কিনে। হয়তো পয়সাই ছিল না পকেটে।

প্লেটে সাজিয়ে খাবার চেয়ে আনবে মায়ের কাছ থেকে। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে তাকে। তোয়ালে এনে দেবে মুখ মুছিয়ে। জলের গ্লাস, মেঘমালা জানে,

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

শ্বশুরের কাছে থাকতে হবে মণিময়ের না হলে মুখ ভারী হয়ে উঠবে ছেলের। কি আবদার, একদিন বলেছিল, আমি কি আপনাকে দাসখৎ লিখে দিয়েছি নাকি মশাই।

স্টেশন আসছে আর যাচ্ছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল মণিময়। কৃষ্ণনগর গেল। দুটোয় ট্রেন ছেড়েছে শিয়ালদা স্টেশন থেকে। এরই মধ্যে বেলা গড়িয়ে ছ'টা। সূর্য ডুবে গেল পশ্চিমের মাঠে। [illegible] ছেড়ে এক [illegible] গোলা অবধি। [illegible], মুড়াগাছা, [illegible] সোনাডাঙ্গা, [illegible] পুর। হরি[illegible]।

●

মণিময় [illegible] বসলো—যে ঘরে [illegible] ত্যাগ করেছেন। [illegible] মা, মাসীমা, [illegible] প্রভৃতি [illegible] আছেন। [illegible] মুখ [illegible] কুণ্ডলী পাকিয়ে [illegible]।

প্রীতিকণা [illegible] থেকে ফিরছে।

আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে যায় সব। মা ভুলে যায় ছেলেকে, স্ত্রী স্বামীকে, ভাই বোনকে, বন্ধু বন্ধুকে। সময় সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। [illegible] সহজ হয়ে এলো সবে। একটু একটু করে প্রকাশ পেল, শুভময়কে যেমনটি ভেবেছিল সবাই তেমনটি নয়। শুভময়ের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সম্পর্কে যতটা ছিল জনশ্রুতি তার শতাংশের একাংশের ছিল না সত্য। বাজারে তার সঞ্চয়ের চেয়ে দেনাই বেশী। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পাঁচ, সাত, দশ দিন বাদে অবস্থা বুঝে আস্তে আস্তে যে যার সরে গেলেন।

নতুন রূপ দেখা গেল স্নেহলতার। একাই হাল ধরলেন সংসারের। গাড়ী বেচে দিলেন। ড্রাইভার, চাকর ছাড়িয়ে দেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে। একটিমাত্র ঠিকে ঝি রইলো সংসারে। বামুন-পিসীকে ডেকে বললেন, সংসারের অবস্থা তো বুঝছো বামুন-বৌ, তোমাকে আর কি বলি নতুন করে। লোক রাখার সঙ্গতি নেই আমার। নীচের তলায় ভাড়াটে বসালেন তিনি। রান্না-বাড়ীতে পার্টিশন করে আলাদা বন্দোবস্ত করালেন। বাড়ীতে ঢোকার জন্য পৃথক পথের বন্দোবস্ত করা হল। ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন, বিপদে ভেঙে পড়ো না কেউ। ভগবান সবার আছেন, তাঁকে মনে রেখো। মেজবালাকে বললেন, পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে মা। এবার কি করবে বল? তোমার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কোনও কথা বলি নি। বিয়ে করতে চাও করো, চাকরি করতে চাও করো। তুমিই আমার বড় ছেলের মতো কাজ করবে এখন। নানা কাজে পরামর্শ দেবে। তোমাকে তো মা ছেলের মতোই মানুষ করেছি আমি।

সেদিনই মণিময়কে চিঠি লিখলো মেজবালা, মণি, জীবনে প্রথম চোখ খুলে যে মানুষটিকে দেখেছি তাকেই চেয়েছি, পেয়েছিও হয়তো। তবু আজ সেই মানুষটির কাছে আরও একটা জিনিস চাইবার আছে আমার। না চাইতেই দিয়েছি তাকে সব, পেয়েছিও তাকে সব ভাবে চেয়েছি। তবু আজ আরও কিছু চাওয়ার আছে আমার। পুরুষ নারীর কাছে কি চায় সঠিক জানি না, অনুমান করতে পারি কিছু কিছু কিন্তু নারী পুরুষের কাছে কি চায় তা জানি কিন্তু তোমাকে তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না, কেন না কোনও মেয়েই তা পারে না। নিজেকে কোনও মেয়েই সবটুকু জানতে দেয় না। তোমার কাছেই শেখা, যা সত্য যা সুন্দর তাই ঠিক, যা মিথ্যা যা অসুন্দর তাই অশ্লীল। তাই যখন যা মনে হয়েছে তোমাকে তা বলেছি অসংকোচে, যখন যা ভেবেছি গোপন রাখি নি তা তোমার কাছে। কারণ তুমি বলেছ, যাকে ভালবাসবে তার কাছে কোনও কিছু গোপন রাখবে না।

যে কথা বলছিলাম, তোমার কাছে আজ চাইছি কিছু। সব নারী সব পুরুষের কাছে যা চায়। সব কিছুর উপরে নারী চায় ঘর, নারী চায় স্ত্রীর সম্মান, প্রীতিপূর্ণ এই বন্ধন। যে বন্ধন তাকে সমাজে স্বীকৃতি দেবে, অন্নবস্ত্র দেবে, ভালবাসার মানুষ দেবে, সন্তান দেবে। আজ আমি জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি: মা আজ আমাকে ডেকে বললেন, তুমি কি করতে চাও বিয়ে, না চাকরী। সেই একই প্রশ্ন যা আজ একশো বছর ধরে শিক্ষিত মেয়ের বাবা-মা জিজ্ঞাসা করে আসছেন। কিন্তু প্রত্যেকটি মেয়ের জীবনেই এ প্রশ্ন যখন আসে নতুন করেই আসে। আজ আমার সামনেও সেই প্রশ্ন। বলো তো কি জবাব দেব আমি?

চিঠিখানা লিখে বার বার পড়লো মেজবালা। [illegible] করলো খামে। রাতে বিছানায় শুয়ে চিঠি লিখছিল। খামে ভরা চিঠিখানা মাথার বালিশের নীচে রেখে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো সে। ভাবলো কাল সকালে উঠে ডাকে দেবে।

মণিময়ের বাবা চন্দ্রকান্ত পেনসন নিয়েছেন আজ তিন বছর। চাকরি ছেড়ে চন্দ্রকান্তর পরিবর্তন হোল অনেক। সারা জীবন যে মানুষ শুধু কাঁধে সংসারের বোঝা নিয়ে চোখে ঠুলি বাঁধা অবস্থায় ঘুরেছেন হঠাৎ তাঁর ছুটি হয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি দিশেহারা অবস্থা হোল প্রথম। চাকরি ছাড়ার সঙ্গে গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি মিলিয়ে হাজার [illegible] পেলেন। টাকাটা হাতে করে বাড়ী এসে প্রথমেই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো টাকাটাই। এতো টাকা, একেবারে নিজের করে, কখনো পান নি হাতে একসাথে। ছেলে মণিময় বললো, চুপচাপ বসে কি করবে, ব্যবসা করো। স্ত্রী চারুলতা বললেন, মেয়েরা বড় হচ্ছে বিয়ের জন্য জমিয়ে রাখো টাকাটা।

ইন্দ্রনাথ বললো, জমি কেনে একটা কোথাও। দাদা চাকরি করছে তোমার টাকাটা দিয়ে বাড়ী করো। কয়েক বছরের মধ্যে বি-কম পাশ করে আমিও লাগছি কোথাও তখন আর ওদের বিয়ের ভাবনা কি। মল্লিনাথ ধারো বছরের ছেলে বাবার কাছে আবদার ধরলো, বেড়াতে চলো না বাবা কোথাও, এই তো সেদিন আমাদের ক্লাসের সুকান্তরা বেড়িয়ে এলো রাজগীর থেকে। শ্যামলী আর চামেলীর বয়স তখন দশ আর আট। তাদের টাকা খরচ করার বয়স হয় নি তখনো।

কারোর কোন কথা শুনলেন না চন্দ্রকান্ত। পোস্টাফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্টে জমা দিলেন কিছু টাকা আর বাকীটা নিয়ে বিদেশে বেরোলেন, একা। তাঁর তীর্থভ্রমণে যাবার কথা শুনে মণিময় চারুলতা, ইন্দ্রনাথ সব অবাক। তাতে আবার সঙ্গে কাউকে না নেবার কথা শুনে। মণিময় সব শুনে বললো মাকে, যে মানুষটা তার জীবনের বেশীর ভাগ সময়টা কাটিয়ে দিল নূর মহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটে সে যদি বাইরের ধোঁয়া ধুলো-হীন মুক্ত হাওয়া নিতে চায় একটু, তবে তাকে বাধা দিও না।

চারুলতা ভাবলেন সংসারের কথা। তবু বললেন তা যাক না। তবে একলা কেন। ওই মানুষ, বিদেশে ওকে দেখবে কে। বিপদ-আপদের কথা বলা যায় না, ভগবান না করুন একটা অসুখ-বিসুখ হলে কি হবে তখন। পাড়ার লোকেরা শুনে বলল, মিত্তিরমশাই কি পাগল হলেন নাকি চাকরির শোকে।

টাইম-টেবল আর ম্যাপ নিয়ে রোজই বসেন চন্দ্রকান্ত। সকাল-বেলাটা কাটে খবরের কাগজ আর চা নিয়ে। প্রথম দু-এক মাস খুব সকাল সকাল উঠে নিয়মিত গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে যেতে শুরু করলেন। ট্রামের অল-সেক্সন মান্থলী টিকিট কেটে ঘুরতে লাগলেন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী। প্রতিজ্ঞা করলেন দুপুরে কিছুতেই ঘুমোবেন না। দুপুরে ঘুমুলে নাকি শরীরটা আলগা হয়ে যায়। ওই দু-এক মাসই। তারপর সম্বল হোল ওই সকালের খবরের কাগজ আর পাড়ার তারিণী-বাবুর চায়ের দোকান—যে দোকানে বসা লোকগুলিকে আজ পঁচিশ বছর অফিসে যাবার আসবার প্রাক্কালে তিনি প্রতিদিন বসে আড্ডা দিতে দেখেছেন এবং তীব্র ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করেছেন, তাদেরই নিয়ে তাঁকে কাটাতে হলো সকাল নটা থেকে এগারোটা, বিকেল ছটা থেকে রাত আটটা। সকালে দেরীতেই ওঠা হতে লাগল ঘুম থেকে, বেশ দেরীতেই। সাড়ে সাতটা, আটটায়। চা-খাবার আর খবরের কাগজটা পড়েই চায়ের দোকান কি ওপাড়ার বিনয়বাবুর বাড়ীতে দাবার আড্ডায় যেতে লাগলেন। বেলা বারোটায় বাড়ী ফিরে খেয়ে যথারীতি দিবানিদ্রা। বিকেল ছটা থেকে রাত আটটা অবধি আবার সেই আড্ডায়। এই কিছুদিন হঠাৎ খেয়াল হয়েছে বিদেশে যাবার, তাই টাইম-টেবিল আর ম্যাপ নিয়ে বসেছেন তিনি।

শেষ অবধি সত্যিই বেরোলেন চন্দ্রকান্ত। গেলেন গয়া, কাশী, বৈদ্যনাথ, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল। মথুরা, বৃন্দাবন থেকে ধনুষ্কোটি অবধি প্রায় সব তীর্থ ঘুরে এসে হাতের গাজার দুয়েক জমানো টাকা নিঃশেষ করলেন। এক তীর্থে যান আর সেখান থেকে দেন এক দীর্ঘপত্র। তাতে পথের অভিজ্ঞতার নানা বর্ণনা ভরা থাকে। কোথায় কেমন মানুষ দেখেছেন, কোথায় কি কিনে জিতেছেন, কি হেরেছেন থাকে তার সরস বর্ণনা, আরও থাকে পথের কোনও কষ্টকর অধ্যায়, কোনও ধর্মশালা কি হোটেলে রাত কাটাবার বিস্তারিত বিবরণ। চিঠি পান আর অবাক হয়ে থাকেন চারুলতা। নিজে লেখাপড়া ভাল জানেন না তাই মণিময়কে ডেকে বলেন তাঁর নামে আসা চিঠি পড়তে। সে চিঠিতে থাকে এমন দু একটা রসিকতা যা শুনে তিনি এই বয়সেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠে পালান ছেলের সামনে থেকে। মনে মনে ভাবেন, মানুষটার হোল কি। মণিময়ও ভাবে, সেই সারাজীবন কথা না বলা মানুষটির মধ্যে কোথায় জমা ছিল এত কথা। অদ্ভুত হয়ে উঠলেন চন্দ্রকান্ত দিনে দিনে। কখনও চিঠি দেন সপ্তাহে দুখানা আবার কখনও তাঁর কোনও খবরই নেই মাসাধিক-কাল।

চারুলতা বিচলিত হন। বিদেশে কোথাও কোন বিপদ-আপদ হোল কি না কে জানে। কে বলতে

পারে পড়লেন কি না কোনও অসুখে বিসুখে। পুরোনো ঠিকানায় পত্র দেন, কোনও উত্তর নেই। আবার চিঠি দেন, কোনও জবাব নেই। রেজিস্ট্রী চিঠি ফেরৎ চলে আসে ওখানে ওনামে কোনও লোক নেই। দু একদিন বাদেই হয় তো এসে হাজির হয় তাঁর পত্র অন্য কোনও ঠিকানা থেকে। এর কিছুদিনের মধ্যেই মণিময় চাকরি পেল। মণিময়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে সকলেই খুসী হল। চারুলতা যেন অকূলে কূল পেলেন। চাকরির খবর নিয়ে এসে বাবাকে দেখে প্রণাম করলো মণিময়। বললো, চাকরি পেলাম।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়?

সেই যেখানে ইণ্টারভ্যু দিয়ে এসেছিলাম সেদিন।

ওঃ সরকারী চাকরী করছো তাহলে। দেশের উন্নতি করবে গ্রামে গিয়ে, যাও। আমি কিন্তু তোমাকে আগেই বলে রাখছি গ্রামে গিয়ে বাস করতে পারবো না তোমার সঙ্গে।

অবাক হল মণিময়। বাবাকে এভাবে কথা বলতে জীবনে শোনে নি কখনো। জবাব দিল মণিময়, কিন্তু দু জায়গায় দুটো সংসার চালানো কি সম্ভব হবে যা মাইনে পাবো তাতে?

জানি না। ইচ্ছা হয়, তোমরা সবাই চলে যেতে পারো। আমার জন্যে কোনও চিন্তা নেই।

তা কি করে হয়, একটু থেমে বললো মণিময়, না হয় আমি একাই থাকবো ওখানে।

যেমন ইচ্ছা তোমার। চন্দ্রকান্ত কথা শেষ করে উঠে চলে গেলেন বাইরে।

[ক্রমশ

আমি ভালোবাসি

(Vladimir Mayakovsky-এর 'I Love' কবিতা হইতে)

জন্মের সঙ্গেই নিয়ে আসে প্রেম প্রতিটি মানুষ,
আমি বসে বসে দেখি
কিন্তু কর্মচঞ্চলতা এবং
অর্থোপার্জন
ইত্যাদির মধ্যে
চাপা পড়ে যায় তার হৃদয়টি
রুক্ষ মাটির আস্তরণে—যেখানে প্রেমের
স্ফুরণ অবিশ্বাস্যরূপে কঠিন
হৃদয় আছে বটে দেহের ভিতর,
দেহের বাইরে পোষাকের বিচিত্র চাতুরী।
তাতেও কিন্তু, যাচ্ছে না ভুলোনো,
বোকা শ্রেষ্ঠ! কোনো অ-মানুষ এসে
ধরে ফেলছে লোক দেখানো পোষাকের কেরামতি,
হাততালি দিচ্ছে শিশুর আহার্যে যাদুঘরের
ড্যালা মেশানোর কপটতা দেখে।
দেহের জরা আসে এগিয়ে—
প্রসাধনে নিজেকে সাজিয়ে ভুলাতে চায় নারী
আর তাই দেখে লুব্ধ পুরুষ কামনা করে
তীব্রতম শিহরণ।
কিন্তু বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে তাদের!
দেহের ভাঁজগুলি জাঁকিয়ে ওঠে এখানে ওখানে।
প্রেম শুকিয়ে যায়
প্রেম ঝরে যায়
এবং—
ফুরিয়ে যায়।

অনুবাদিকা—ছন্দা গুপ্ত

নমো করুণাঘন

নিজেদের কথা শোনাতে গেলে শুরু করবো জন্মমুহূর্ত থেকে—কিন্তু আজ যাঁর কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি তিনি ছিলেন অসাধারণ মহাপুরুষ,—স্বর্গের দেবতাদের আমরা চোখে দেখিনি—শুধু কল্পনাই করেছি কিন্তু মানুষের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব ঘটে, সে কথা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। তাই এ-হেন অসাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে শুরু করতে হবে জন্মমুহূর্তেরও আগের ঘটনা থেকে।

হুগলী জেলার দেড়ে গ্রাম—সেখানে থাকেন গরীব ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম। জমিজমা, টাকাকড়ির দিক থেকে গরীব কিন্তু মনের দিক থেকে গরীব নন। ঠাকুর দেবতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি, আর মানুষের প্রতি অন্তর থেকে উজাড় করে দেওয়া ভালবাসা। সত্যকে নিজের জীবনে পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন—কোনও অন্যায়কে কোনো দিন প্রশ্রয় দেন নি, কোনো প্রলোভনের কাছে মাথা নত করেন নি—অভাব-অনটন নিত্যই লেগে থাকতো কিন্তু স্বভাবের ঐশ্বর্যে থাকতেন ভরপুর হয়ে।

গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়—তাঁর কোপ পড়লো এই গরীব সদ্ব্রাহ্মণটির উপর। মিথ্যা মামলায় সাক্ষী হতে চাইলেন না—এই অপরাধে গ্রামে বাস করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো।

স্ত্রী চন্দ্রামণি একই ধাতে গড়া মানুষ। স্বামীর হাত ধরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলেন। নতুন আশ্রয় হলো কামারপুকুর। অনিশ্চিত সংসারের হাল, তবু পরম নিশ্চিন্তে ভগবানের কাছে নিজেদের নিবেদন করে দিলেন চন্দ্রামণি আর ক্ষুদিরাম।

মানুষের অন্যায় আর অবিচারের পথ বেয়ে নেমে এলো ভগবানের করুণাধারার আশীর্বাদ।

চন্দ্রামণি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন তাঁর ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

ক'দিন পর শিবমন্দিরে পুজো করতে গিয়ে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে যখন জ্ঞান ফিরে এলো বললেন: কি দেখলাম। মন্দিরে পুজো করতে গেছি। চোখের সামনে শিবঠাকুর। হঠাৎ দেখছি ঠাকুরের গা থেকে ধোঁয়ার মত কি উড়ছে। তারপর সেই ধোঁয়া কুয়াশার মত চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো আমায়। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ইন্দিরা দেবী

ক্ষুদিরাম তখন গয়ায়—অনেক দিন সংসার বাস হলো . এবার সংসার ছেড়ে শুধু ভগবৎ আরাধনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাবেন—এমনি ইচ্ছা মনে। সমস্ত দিন এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত ক্ষুদিরাম সন্ধ্যার কিছু পরে ঘুমিয়ে পড়লেন—স্বপ্ন দেখলেন তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে গৃহদেবতা রঘুবীর—তিনি বলছেন: ক্ষুদিরাম। সংসারে আরো কিছু দিন তোমায় থাকতে হবে। তোমার ঘরে আমি ভূমিষ্ঠ হতে চলেছি।

ক্ষুদিরাম-চন্দ্রামণির স্বপ্ন সত্য হলো—তাঁদের ঘর আলো করে মানুষের দেহে জন্মগ্রহণ করলেন 'নারায়ণ'। নামকরণ হলো গদাধর। গদাধর থেকে রামকৃষ্ণের উত্তরণের কাহিনী মানুষের ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে সোনার অক্ষরে।

গ্রামের পথেঘাটে, হাটেমাঠে সর্বত্র গদাধরের মুক্তগতি। গ্রামের বাইরে পুরীযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীরা মাঝে মাঝে এসে দু-চারদিনের জন্য আশ্রম নিতেন। গদাধর এই সাধুসন্তদের সেবায় মেতে উঠতেন। পাঠশালায় যেতেন কিন্তু বই পড়ার চেয়ে ঝোঁক ছিল নাচ-গানের দিকে বেশী। ভারী সুন্দর মিষ্টি স্বভাব। যে দেখতো সেই আদর করে কোলে তুলে নিতো। শুধু গদাইকে একটিবার দেখতে না পেলে পাড়ার সকলেরই মন ভাল লাগতো না।

তারপর গদাধরের বয়স যখন ষোলো-সতেরো—সে সময় বড় ভাই

রামকুমার তাকে নিয়ে এলেন কোলকাতায়। ইচ্ছে এখানকার কোনো টোলে ভর্তি করে তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু গদাধর তাতে রাজী নয়। বলেন, যে বিদ্যা শিখে চালকলা বাঁধতে হয় তা আমার দরকার নেই। এর কিছুদিন পর রামকুমার ও গদাধরকে দেখা গেল—দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে। রাণী রাসমণি এখানে গঙ্গার তীরে প্রতিষ্ঠা করেছেন নতুন কালীবাড়ী ও শিবমন্দির। মন্দিরের পুরোহিত হয়ে এলেন রামকুমার, গদাধর তাঁর সহকারী।

এইখানে ঘটলো সেই বিস্ময়কর পরিণতির সূচনা— গদাধর থেকে রামকৃষ্ণের রূপান্তর— ।

মায়ের আত্মভোলা ছেলে—চোখে জলের ধারা, মুখে মা-মা ডাক। কখনও কখনও বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়। সংসারে মন বসবে এই আশায় রামকুমার ভাই-এর বিবাহ দিলেন। চট্টোপাধ্যায়-গৃহে এলেন জয়রামবাটির মুখোপাধ্যায় ঘরের কুটকুটে মেয়ে সারদামণি। চন্দ্রামণির মন ভরে উঠলো। লক্ষ্মী প্রতিমা দেখে—কিন্তু গদাধর যথাপূর্বং তথা পরম্।

তাঁর মনের ভাবের এতটুকু বদল হলো না, বরং মার কথা চিন্তা, মাকে ডাকা তাঁর জীবনের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। রামকুমারের দেহান্তর ঘটলে এবার পুজোর ভার পড়লো গদাধরের উপর। কিন্তু পুজোর মন্ত্রতন্ত্র নিয়ম প্রণালীর কিছুই ধার ধারতেন না নতুন পূজারী। আপন ইচ্ছামত চলতেন।

প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই বললেন, 'এঁকে দিয়ে পুজো আচার চলবে না।

কিন্তু রাসমণি বললেন: না, এঁকে তোমরা চিনতে পারনি—ইনি হলেন মার প্রকৃত ভক্ত, এঁর মত পুজোর অধিকার আর কারো নেই।'

মথুরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তিনিও বুঝতে পারলেন রাসমণির বিচার নির্ভুল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ পাকাপাকিভাবে থেকে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বর একদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের লীলাভূমি অন্যদিকে ভারতধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। এখানকার পঞ্চবটিতে সাধনার সিদ্ধিলাভ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্ম সম্বন্ধে কোনো গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিতেন না। খোলা মন নিয়ে সব ধর্মমতে নিজেকে পরিচালিত করলেন দীর্ঘকাল ধরে। কখনও অন্য মতে, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণব, কখনও সাকার, কখনও নিরাকার উপাসক। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন সব ধর্মই আসলে এক। বলতেন—'যত মত তত পথ।'

দলে দলে লোক আসতে লাগলো। সকাল-সন্ধ্যে পুজো মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠতো সে আওয়াজ মেলাতে মেলাতে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠতো দর্শনার্থী জনতার কোলাহলে। মন্দিরের উপাস্য দেবী ভবতারিণীকে দর্শন করে তারা তৃপ্ত হতো না, গঙ্গার উপরে একতলা ছোট বাড়ীটির বারান্দায় এসে তারা জড় হতো। ঠাকুরের মুখ থেকে পরম শ্রদ্ধায় তারা শুনতো তাঁর অমৃত উপদেশ। দর্শনার্থী জনতার মধ্যে থাকতো সকল বয়স আর প্রায় সব শ্রেণীর মানুষ।

শিশুর মত লীলাচ্ছলে কথা কইতেন ঠাকুর তাদের সঙ্গে। তাঁর ভালোবাসার অনুভূতি মুহূর্তকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো দর্শনার্থীদের মনেপ্রাণে। যা বলতেন তা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতো কত জটিল তত্ত্ব। শাস্ত্র জুড়ে তার কত রকমের ব্যাখ্যা। তর্কের জাল আর যুক্তির ঝড়—বুঝতে গিয়ে না বোঝার বোঝা ভারী হয়ে উঠতো।

কিন্তু ঠাকুরের কাছে অতি বড় সমস্যারও নির্ভুল সমাধান মিলতো—ছোট্ট ক'টি কথার ভিতর। উপদেশ দিতেন সহজ সরল ভাষায়, গল্পচ্ছলে। যাঁর অন্তর্দৃষ্টি যত বেশী প্রখর, যাঁর অনুভূতি যত বেশী তিনি তত সহজে ও নির্ভুলভাবে অন্যের মনে নিজের মনের ছায়াপাত ঘটাতে পারবেন। তাই তো ঠাকুরের কথার মধ্যে দেখতে পাই কত গভীর জটিল তত্ত্ব উদঘাটিত হয়েছে কত সহজভাবে।

ঠাকুর বলতেন: ঈশ্বর এক, শুধু তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছে অনেক।

এই তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য তিনি বলেছিলেন, 'দেখ জল এক পদার্থ কিন্তু দেশকালপাত্র ভেদে এর নানা রকম নাম হয়, বাংলা ভাষায় জল বলে। হিন্দিতে পানি, ইংরাজীতে ওয়াটার বলে। কিন্তু তিনটি শব্দই এক—কত সহজ কিন্তু গভীর কথা। এই ঈশ্বর আর ধর্ম নিয়েই পৃথিবীতে কত অশান্তি আর রক্তক্ষয় ঘটে গিয়েছে।'

ঠাকুরের কাছে কত লোক আসতেন। মহা মহা পণ্ডিত। সমাজে যাঁদের স্থান শীর্ষস্থানে—তবু ঠাকুর সব চাইতে ভালবাসতেন তাঁদের—যাঁরা জানতে চাইতেন ঈশ্বরের কথা, শুনতে চাইতেন ধর্মের বাণী।

একজন মিশনারী কলেজে-পড়া পাশ্চাত্য শিক্ষা অভিমানী যুবক জানতে চাইলেন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? প্রশ্নকর্তা ভেবেছিলেন—অন্য দশ জায়গায় যে জবাব পেয়েছে, এখানেও ঘটবে তার পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু তাকে সচকিত করে তাঁর কানে ভেসে এলো অদ্ভুত কথা—সে কি রে, ঈশ্বরকে দেখি নি? তোকে যেমন দেখছি, কথা কইছি, তাঁর সঙ্গেও তেমনি কথা কই, দেখি। তিনি কি আমাদের পর? তাঁকে চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়।

কি গভীর বিশ্বাস ছড়িয়ে আছে প্রতিটি কথার মধ্যে। এ তো শুধু মুখের কথা নয়—সব ক'টি কথা অন্তরের কথা। তাই তো যাঁকে বললেন কথা ক'টি—তাঁর জীবনে সঙ্গে সঙ্গে ঘটল আশ্চর্য পরিবর্তন। ইংরাজী শিক্ষা আর দর্শনের আবহাওয়ায় যাঁর মন ও চিন্তা গড়ে উঠেছিল—এক মুহূর্তে তিনি নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন ঠাকুরের পায়ে।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস অধিবেশনে আলাপরত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসনেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

আষাঢ় / '৭৫

কাশীপুরের এক পাটের গুদামে দমকলবাহিনীর কর্মীদের আগুন নেভানোর দৃশ্য

আততায়ীর গুলীতে নিহত সিনেটর রবার্ট কেনেডিকে সপরিবারে দেখা যাচ্ছে

গ্রস অধিবেশনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

শ্রীমতী এথেল কেনেডি স্বামীর মৃতদেহের
দিকে করুণ নয়নে চেয়ে আছেন

নিহত দুই সহোদর—জন এফ কেনেডি ও রবার্ট কেনেডি

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণরত প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অন্তর আর অনুভূতি দিয়ে যে সত্যকে জেনেছিলেন সেই সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন আরো কত মহাপ্রাণ যুবক। স্বামীজী ঠাকুরকে পেয়েছিলেন বছর পাঁচেক। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি এত বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন যে রামকৃষ্ণের বাণী সারা দেশে এমন কি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার পণ গ্রহণ করলেন। তাঁর দুর্জয় সঙ্কল্পের কাছে ভেসে গেল সব বাধাবিঘ্ন। সন্ন্যাসধর্মী দীক্ষিতদের উপর ভারতবর্ষের ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব রেখে তিনি নিজে বীর সন্ন্যাসী বেশে পরিক্রমা করলেন পাশ্চাত্য জগৎ। স্বামীজীর মাধ্যমে যে বিরাট শক্তি উৎসারিত হলো, তার আলোতে দূর হয়ে গেল অন্ধকারের নির্দেশ।

ঠাকুর সকল মানুষের জন্যে রেখে গিয়েছেন তাঁর উপদেশ। ধনী নির্ধন ছোট বড় নারী পুরুষ সংসারী সংসারত্যাগী—সকলের জন্য। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষা। সকল ধর্মের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন পরম সত্য।

যে যুগে ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন আমাদের জীবন অনেকখানি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল —ঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চলছিল তর্কের ঝড়---আবার ইংরাজী-শেখা মানুষদের মধ্যে ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছিল নিজ ধর্মের প্রতি কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রচার করলেন তাঁর ধর্মমত। তাঁর মধ্যে ছিল না পাণ্ডিত্যের জৌলুষ---সহজভাবে শুধু সহজ কথাই বলতেন না, কঠিন কথাও সহজ ছিল তার। নিজেকে মায়ের কাছে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের বলতে কিছুই ছিল না তাঁর, তাই তো কত সহজে সকলের মন কেড়ে নিতে পারতেন, ধর্মের আসল অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারতেন। সব কিছুর মধ্যে দেখতে পেতেন মায়ের লীলা, জীবের মধ্যে শিব। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন---

> বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
> ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
> তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
> নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
> দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
> সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

●

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

বধূবরণ   চিত্র ঃ নৃপেন্দ্র ঘোষ

পীঠস্থান নিরাময় ও তারাপীঠ

নিরাময়ের অতিথিশালা

শান্তিনিকেতনের দুদিকে দুটি বিপরীতধর্মী পীঠস্থান দেখার সুযোগ ঘটে গেল একযোগে—সে দেখাও আবার একই মায়ের টানে। সে মাটি—-আধুনিক যুগের বহুবিশ্রুত বিস্ময়—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

মা আসছেন প্রথমে নিরাময়ে ও তারপরে তারাপীঠে। মায়ের শান্তিনিকেতনবাসিনী মেয়েরা কি আর স্থির থাকতে পারে? মাঘের শীত—রাস্তার খবর—নানা অসুবিধা—কি যায় আসে তাতে? এত কাছে মা আসছেন, যেতেই হবে।

জনাকয়েক মিলে শেষ রাত্রে উঠে তোড়জোড় করে ভোর ছটায় উঠে বসা

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

গেল শিউড়ীগামী সর্বসাধারণের 'বাসে'। শীতের ভোর, কুয়াসাচ্ছন্ন আলো-আঁধারি, দুপাশে ধু-ধু মাঠ, রাস্তা চমৎকার। পাঁচ-ছয় বৎসর আগের খারাপ রাস্তার বদলে, এবারে দেখা গেল বীরভূম জেলার দূরপাল্লার রাস্তাগুলি, চিকণ কালো রূপে মনোহর রূপ ধারণ করেছে।

কেঁদুলি জয়দেবের মেলা সবে মকর-সংক্রান্তিতে শুরু হয়েছে—দেখতে দেখতে সে রাস্তা বাঁ দিকে রেখে সোজা পথে 'বাস' এগিয়ে চললো দুবরাজপুরের দিকে। বহুদিন পূর্বে দেখা কেঁদুলি মেলার বিশাল বটবৃক্ষটি মনে ভেসে ভেসে উঠতে লাগলো।

আশ্চর্য বটগাছ। চতুর্দিকে অসংখ্য ঝুরি নামিয়ে যেন খোপ খোপ এক বিরাট অট্টালিকার সৃষ্টি করেছে, উপরে ঘনসন্নিবিষ্ট সবুজ পাতার চন্দ্রাতপ। এই মেলায় সমস্ত বীরভূমের যাযাবর বাউলের দল সপরিবারে এসে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় নেয় এই প্রকৃতিদত্ত বিনা ভাড়ার শান্ত শীতল প্রকোষ্ঠগুলিতে। সারারাত ধরে চলে তাদের দেহতত্ত্ব ও ভগবৎ-বিষয়ের নৃত্যসম্বলিত মনোমুগ্ধকর সরল গানগুলি। শীতের শীর্ণকায়া অজয় নদী ওপারে দেখা যায় চিতার আগুনে লাল হয়ে ওঠা শ্মশানভূমি। উদাসী বাউল সুরের যাদুতে মন টেনে নিয়ে যায় কোন অসীমের সীমানায়

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে অনেক যাত্রী ওঠা-নামা করার পর এসে পড়লো

একটি হাসপাতালঘরের অভ্যন্তর

দুবরাজপুরের একটু আগের বিরতি স্থান, শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরবর্তী--'নিরাময়'।

সমতল ভূমি থেকে একটু উঁচুতে এক বিরাট প্রান্তর---তার মধ্যে দেখা গেল নবনির্মিত প্রকাণ্ড অতিথিশালা---যেন অচিন দেশের স্বপনপুরী---শীতের মরশুমি ফুলে ফুলময়, দূরে দূরে ছড়ানো নানা ধরণের নূতন বাড়ি, কিছু সমাপ্ত কিছু বা অসমাপ্ত।

'নিরাময়' একটি বিরাট যক্ষ্মা আরোগ্য-নিকেতন। পাঁচশত বিঘারও অধিক জমি নিয়ে, হেতমপুরের গিরিডাঙ্গা নামক গ্রামের গায়ে এই সুপরিকল্পিত হাসপাতালটি ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে প্রধানত---গরীব বিনা পয়সার রোগীদের জন্য। ৪০০টি শয্যার পরিকল্পনা নিয়ে, বহু ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শে এই আরোগ্যশালার জন্ম। বর্তমানে এর শয্যা-সংখ্যা ৩৩১।

এর সুপরিচ্ছন্ন ডাক্তার ও শুশ্রূষা-কারীদের আবাস---নিজেদের পোস্ট অফিস, বেকারী, পোলট্রি, দুধের ব্যবস্থা, বিশাল ইঁদারা---দূরে দূরে রোগীদের বাসস্থান। এই বিরাট উন্মুক্ত প্রান্তরের মালিন্যহীন বিশুদ্ধ বায়ু---ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুসগুলিকে দ্রুত আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে প্রচুর। শোনা গেল হেতমপুরের রাজা এই বিশাল ভূখণ্ড এ কাজের জন্য দান করে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

এখানকার ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত ও সেক্রেটারী ডঃ রায়ের তত্ত্বাবধানে অতি সুষ্ঠু অতিথি সেবার ব্যবস্থা হল। শুনি---শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে এখানকার সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং মাঝে মাঝে তাঁকে এনে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

'গেস্ট হাউসের' বিরাট হলঘরে সভা বসলো বেলা এগারোটায়। চড়া রোদের মধ্য দিয়ে মা এসে সভা আলো করে বসলেন---মাথায় একটি সাদা বড় তোয়ালে। তাতেই তাঁকে দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর এবং তাঁর শুভ্র শুচিতায় যেন চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঘরে লোক আর ধরে না---স্তোত্র, নামগান ও কিছু কথাবার্তার পর এক জটাধারী সন্ন্যাসী অনুরোধ জানালেন---মার মুখের কিছু বাণী শোনার জন্য।

হেসে হেসে মা বললেন---কথা আর কী বাবা? কথা তো ঐ একটিই---'ভগবানের কথা ভিন্ন আর সব বৃথা ও ব্যথা'---ঐ কথাটি মার মুখে সর্বদাই শোনা যায়।

শুনি---কিছুক্ষণ পরে মাকে বক্রেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হবে। এখান থেকে উষ্ণ প্রস্রবণসম্বলিত বক্রেশ্বর তীর্থ খুব কাছে। আমরাও পরিপাটি আহারাদির পর স্মৃতিটুকু হৃদে নিয়ে স্বস্থানে ফিরে এলাম।

নিরাময়েই শোনা গেল---মা দিন দুই ওখানে থেকে যাবেন তারাপীঠে---সেখানে থাকবেন দিন তিনেক। আমরা আবার সেখানে যাবার বিধি-ব্যবস্থায় লেগে গেলাম। এবার শান্তিনিকেতন থেকে দূরত্ব---৬০ মাইল। ট্রেনে অথবা মোটরে---দু'ভাবেই যাওয়া যায়। ট্রেনে বোলপুর স্টেশন থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত গিয়ে, মাইল পাঁচেক রাস্তা বাস অথবা সাইকেল রিক্সায় যাবার ব্যবস্থা আছে। রওয়ানা হবার আগের দিন কাগজে দেখা গেল রামপুরহাটে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে। স্টেশন থেকে যানবাহন সব বন্ধ।

কী করা যায়? সমবেত পরামর্শে স্থির হল---বাসেই যাওয়া হউক। বারবার ওঠা-নামা নেই, বাড়ী থেকে উঠে একেবারে তারা-মার পদতলে গিয়ে নামা হবে। তৎক্ষণাৎ সারাদিনের জন্য বাস 'রিজার্ভ' করে, পরদিন ভোর ৭টায় আবার পাড়ি জমালাম তারাপীঠের উদ্দেশে।

দেহে-মনে একই পথের পথিক ষোল জন নারীকে নিয়ে ছোট 'স্টেশন ওয়াগন'টি ছুটে চললো তারাপীঠের উদ্দেশে। সমস্ত পথ নামগানে মুখরিত করে তারামার মন্দিরের নীচে এসে নামা হল বেলা দশটায়। আনন্দময়ী মার আগমনে আজ এই জনবিরল তীর্থ কোলাহল-মুখরিত।

রামপুরহাটের প্রধান রাস্তা থেকে নেমে মাইল পাঁচেক উঁচুনীচু গলির

নিরাময়-কর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনরতা মা আনন্দময়ী

রাস্তাটি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল দুর্গম্য। শোনা গেল তখন পদযুগল অথবা গরুর গাড়িই ছিল সম্বল। দুধারে লোকালয়হীন শুধু ক্ষেত ও খোলা জমি।

নির্জনে সাধন-ভজনের অনুকূল স্থান তারাপীঠের নাম বহুজনবিদিত। আনন্দময়ী মায়ের নির্দেশে তাঁর জাগতিক স্বামী বাবা ভোলানাথ অনেকদিন এখানে মৌনাবলম্বন করে কঠোর তপস্যা করেন। তখন থেকেই মা এখানে আসতেন সদা-সর্বদা। এবারে তাঁর একভক্ত মায়ের আশ্রম ও নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঁকে আনার ব্যবস্থা করেছেন।

আরও অনেক আগে বামা ক্ষ্যাপা নামে এক সাধু এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন শুধু অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ---সে সব কাহিনী অনেক পুস্তকে ও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে তারা মায়ের মন্দির। অনেকগুলো ধাপ উঠে মায়ের মন্দিরে এসে দেখি---যদিও এই

তারা মা

বেলা দ্বিপ্রহরে মন্দির-দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবার কথা--- আমাদের ভাগ্যক্রমে এবং আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষে অনেক জনসমাগমে, আজ সমস্ত দিনই মন্দির দ্বার খোলা। তারামায়ের মূর্তি একটি সুউচ্চ শিলা --তার উপরে ধাতুনির্মিত মুখ ও ভূমাবলুণ্ঠিত পিঙ্গল কেশ। সমগ্র শিলাটি সুন্দর পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে মনে হয় যেন একটি দাঁড়ানো মাতৃমূর্তি।

তারাপীঠের উদ্ভব সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী। তার মধ্যে একটি--মহাদেব শিব যখন সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছিলেন তখন নারায়ণ-চক্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই দেহ ভারতময় একান্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে একান্নটি পীঠস্থানের জন্ম হয়। এখানে পড়েছিল সতীমায়ের চোখের তারা। আজও পাণ্ডারা একটি আধারে রক্ষিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ গোলার্ধ দেখিয়ে বলেন---এই সতীমায়ের চোখের তারা।

আর একটি---পৌরাণিক যুগে

তারামায়ের মন্দির

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাভরণম্ নামে এক পণ্ডিত চূড়ামণি এখানে তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তারামায়ের ছায়ামূর্তি দর্শন করেন—সেই থেকে এই স্থান তারাপীঠ নামে খ্যাত। প্রবাদ—এখানে বসে যে-কোন সাধক তিন লক্ষ নাম জপ করলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

মহামুনি বশিষ্ঠদেবও এখানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন বলে শোনা যায়। মন্দিরের সামনের জলাধারটির নাম এখনও 'বশিষ্ঠ কুণ্ড' অথবা 'জীবিৎ কুণ্ড'। এই কুণ্ডের জলের গুণ ছিল তখন মৃতসঞ্জীবনী—মৃতদেহ এই জলে প্রাণ পেতো।

তারামায়ের মন্দির দর্শন ও জীবিৎ-কুণ্ডের জল স্পর্শ করে এলাম বামদেবের মন্দিরে। এখানে সাধকপ্রবর বামা ক্ষ্যাপার সমাধি। এর পরে কয়েক ধাপ নেমে গিয়ে আরম্ভ হয় তারাপীঠের মহাশ্মশান।

এই শ্মশানের কথা 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনার ভিতর দিয়ে পরিচয়ে ধারণা হয়েছিল—ধূ-ধূ বিস্তৃত খোলা মাঠে অনির্বাণ চিতার আগুন এবং চতুর্দিকে মড়ার মাথা ও হাড়গোড়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অদ্ভুত কালচে সবুজ রং-এর ঘন সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট ঝোপজাতীয় গাছে বিস্তীর্ণ স্থানটি ঢাকা। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবা দ্বিপ্রহরেও আবছা অন্ধকার এবং একটা ভিজে স্নিগ্ধ ভাব। মনে হল সাধনার অনুকূল সত্যিই নির্জন ও ছায়াঘন শান্ত শীতলতায় পূর্ণ এ-স্থান।

শ্মশানে জুতো পায়ে যাবার নিয়ম নেই—লেখন দেখে জুতো উপরে রেখে, নামা হল শ্মশানভূমিতে—তখন বেলা প্রায় একটা।

নীচে দুদিকে দুটি পাকা ইমারত। একদিক থেকে একটি কঙ্কালসার সাধু বেরিয়ে এলেন কিছু সাহায্যের আশায়—অন্যদিকে ছোট একটি শিব-মন্দির ও পঞ্চমুণ্ডির আসন। আবছা আলোয় ঝোপঝাপের ভিতর দিয়ে আরও এগিয়ে দেখা গেল—চিতার আগুন। দু'জন কালো জোয়ান মানুষ লম্বা বাঁশ নিয়ে মৃতদেহ উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। শিশুকালে পড়া হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার কাহিনীর, হরিশ্চন্দ্রের ডোম-বেশের ছবিটি মনে পড়ে গেল।

এই মহাশ্মশানে দাহকার্য করলে তার ঊর্ধ্বগতি হয়—এ-ধারণা এদিকে বহুকাল ধরে প্রচলিত। তাই অনেক দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে শব নিয়ে আসে এখানে। একটির পর একটি করে এখানে দিবা-রাত্রি জ্বলে অনির্বাণ চিতা। মানব-দেহের পরিণতি দেখে মন উদাস হয়ে উঠলো—স্বভাবতই মনে আসতে লাগলো—শ্রীভগবানের নাম। চতুর্দিকে হাড় ও নরমুণ্ড ছড়ানো শ্মশান পরিক্রমা করে আমরা আলোর রাজ্যে উঠে এলাম—বেলা তখন দুটো। ফেরার পথে একটি শীর্ণকায়া নদীর দর্শন পেলাম। শোনা গেল এই নদীর জল অতি পবিত্র, নাম দ্বারকা।

এরপর কিছু জলযোগ ও ঘরে ফেরার পালা। এ-যাত্রায় আমাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বর্গীয় এবং একটি জীবন্ত মায়ের দর্শনে প্রাণ পূর্ণ হয়ে গেল।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বারি দেবী

হু হু করে কেটে গেছে আরো দু'টো মাস।

উঃ! কি ভীষণ সে দিনগুলো? তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। অনুভূতির তীব্র যন্ত্রণা কি ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব? খাঁ-খাঁ করা ঐ বিরাট বাড়ীতে, আমরা তিনটি-মাত্র প্রাণী। আমি, পাওয়ার সায়েব, আর মঙ্গল সিং। দরোয়ান মঙ্গল সিং থাকতো নীচে, আর পাওয়ার সায়েব থাকতো, ঘর-ঝাড়পোঁছ, রান্না ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত। যথাসময়ে টেবিলে আমার খাবার রেখে, একটা ঘণ্টি বাজিয়ে জানিয়ে যেতো,—এই রইলো খেও।

খাবার সব ঢাকাই পড়ে থাকতো, কারণ আমি তো দিনরাত ঘুমের পিল খেয়ে এলিয়ে পড়ে থাকতাম বিছানায়। ঘুম নয়, আবার জাগরণও নয়, সে এক অদ্ভুত জীবন্মৃত অবস্থা চলেছে আমার। আমার দেহ ছেড়ে, তখন মানসিক সত্ত্বাগুলো সব যেন উধাও হয়ে চলে গিয়েছে অন্য কোনখানে। দেহটা ছিল, কিন্তু তার মস্তিষ্কের কোন ক্রিয়া ছিল না, তাই সুখ-দুঃখ বোধও ঠিকমত ছিল না। পাওয়ার সায়েব আবার ঠিক সেই আগের মত গম্ভীর হয়ে গেছে। প্রয়োজন ছাড়া আসে না আমার ঘরে। তবে সারাদিন যখন দেখে সে আমার সব খাবারগুলোই টেবিলে পর পর সাজানো রয়েছে, তখন কিছু ফলের রস, বা সরবৎ হাতে নিয়ে মৃদুস্বরে অনুরোধ করে, সেটুকু পান করবার জন্য।

ঠেলতে পারি না ওর অনুরোধ, নিঃশব্দে পালন করি। ঐ অসুস্থ অবস্থার মাঝেই শুনেছিলাম পাওয়ারের মুখে,---যে সূর্যকান্ত'র সম্পত্তির দাবী নিয়ে তার বাবার বাড়ী থেকে কে যেন এসেছিল, পাওয়ার সায়েব তাকে সোজা কোর্টের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে।

আরো শুনেছিলাম,---সূর্যকান্ত'র হত্যাকারীকে ধরবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তবে খুনী এখনও ধরা পড়ে নি।

●

ক্রমেক্রমে আমি যেন এক হিমশীতল সমাধি-গহ্বরে তলিয়ে গেলাম। আমার মাঝে মাঝে নিজেকে মিশরীয় মমি বলে মনে হত। ঠিক তাদের সমাধি-গহ্বরের মতই যেন একটি বিরাট পাষাণ-গহ্বরে শুয়ে আছি আমি, আর আমার চারিদিকে সাজানো কত বিলাস-দ্রব্য, খাদ্য পানীয় আসবাবপত্র। নেই শুধু প্রাণসত্ত্বাটি।

অর্দ্ধচৈতন্য অথবা সম্পূর্ণ অচেতন ছিলাম কি-না জানি না, তবে মাঝে মাঝে অনুভব করতাম, ভারি জুতোর মশ্‌মশ্‌ শব্দ করে কারা সব যেন ঘরে ঘোরাফেরা করছে। শুভ্র পরিচ্ছদ-ধারিণী নার্সের ইউনিফর্ম্‌ পরা দু-চার জনকেও দেখেছি ঘুম ঘুম চোখে। গায়ে ছুঁচ ফোটানোর ব্যথা মাঝে মাঝে অনুভব করেছি। মাঝে মাঝে যখন দূর থেকে ভেসে আসতো শিশুদের কান্না [illegible], তখন আমার সুপ্ত আত্মা আকুল হয়ে কেঁদে উঠতো, ঐ সমাধি-গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য; কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার সে ঝিমিয়ে চলে পড়তো মরণ-ঘুমের কোলে।

কতদিন পরে জানি না, আমার ওপর থেকে সেই গুরুভার পাষাণের আবরণটা, ধীরে ধীরে, সরে গেল। আমি জেগে উঠলাম।

জেগে উঠলো আমার দৈহিক আর মানসিক সুমন্ত সত্ত্বাগুলো।

জাগার পর, প্রথমেই চোখে পড়লো পাওয়ার সায়েবের বিষণ্ণ গম্ভীর মুখখানা।

---আমি কোথায়? ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

---পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে সিস্টার! আমাকে চিনতে পারছো?

আমার মুখের কাছে একটু ঝুঁকে পড়লো পাওয়ার সায়েব।

---হ্যাঁ পারছি সায়েব! আমার ঘরে এত লোক কেন? ওরা কারা? বললাম আমি।

---তোমার যে বড্ড অসুখ করেছিল সিস্টার। এঁরা ডাক্তার আর নার্স। যা-হোক্ এখন তুমি আর কথা বোলো না, বড্ড দুর্বল আছ কি-না।

জবাব দিল পাওয়ার।

---অসুখ? কৈ কিছু তো বুঝতে পারি নি আমি? খুব ভালো ছিলাম তো।

আমার কথার কোন জবাব দিল না পাওয়ার সায়েব, শুধু মনে হল, ওর চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে।

●

আরো কিছুদিন পরে, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম আমি। তখন আবার অন্য এক যন্ত্রণা দেখা দিল মনে। সময় কাটবে কেমন করে?

সূর্যকান্ত'র অভাব মনকে নিদারুণ ভাবে দগ্ধ করলো। চারিধারে আমার কি বিরাট শূন্যতা। আমি বড় একা। আমার দিন-রাতগুলো যেন ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে।

এখনও একজন নার্স আছে আমার কাছে। নাম তার সিস্টার অ্যারোমা।

বড় ভালো লাগে ওকে। দিন-রাত নানা রকম গল্প বলে, সে আমাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করে।

ওকে আমি বললাম---তুমি চলে গেলে আমি কেমন করে দিন কাটাবো সিস্টার?

---একটা কিছু কাজ করতে হবে। শুধু গান, গল্প, ছবি আঁকা, বা সেলাই ফোঁড়া, যাই কর না কেন, মনের [illegible] শূন্যতা যাবে না, সেজন্য চাই কোনো এক জনকল্যাণমূলক কাজে সব সময় নিজেকে খুব ব্যস্ত রাখা! তার মানে এই যে, শুধু নিজেকে নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না, সঙ্গী চাই। যেখানে সঙ্গী পাওয়া সম্ভব হলো না সেখানে একটা কোনো উদ্দেশ্য চাই, যে উদ্দেশ্য বহু প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, একটি নিঃসঙ্গ একক প্রাণকে। আমার নিজের কথাই বলছি তোমাকে। যখন যুদ্ধে আমার স্বামী মারা গেলেন, ঠিক তোমার মতই ভেঙে পড়েছিলাম আমি। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না, শুধু দিন কাটাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

অনেকে অবশ্য বিয়ে করার উপদেশ দিলেন, তার প্রস্তাবও এলো কিন্তু আমার কি মনে হয়েছিল জানো? একজন তো মনটাকে ভেঙে চুরে দিয়ে পালালো, আবার যাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইবো, সেও যে আমাকে ফেলে পালাবে না, সে রকম গ্যারান্টি কোথায়? তারচেয়ে এমন কিছুকে আঁকড়ে ধরবো যা কোনদিন হারাবে না, আর আমার মনটাকেও কেউ আর সুখ-দুঃখের ঢেউ-এ নাকানি-চোবানি খাওয়াবে না। আমার মন আমারই থাকবে।

তখন বেছে নিলাম এই পথ। তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে, তোমাকে আমি শপথ করে বলতে পারি, এই কাজের ভেতর আমি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি।

কারণ ছোট্ট সংসারের গণ্ডিতে তো মনটা আমার আর আবদ্ধ হয়ে নেই, ঈশ্বরের বিরাট সংসারে ব্যস্ত হয়ে আছে সে। সকলকার সুখ-দুঃখের ভাগীদার হওয়ার চরম সুখ, পরম-শান্তি আমি এই কাজের ভেতর থেকে পেয়েছি ডার্লিং। তাই তোমাকে বলতে পেরেছি, কোনো জন-কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সমর্পণ করো, তার মাঝেই মিলবে এমন আনন্দ, যা কখনও হারাবে না।

বড় ভালো লাগছিলো সিস্টারের কথাগুলো। ওর কথা শুনতে শুনতে কখন যে ঘুম এসেছে চোখে, নিজেই বুঝতে পারি নি।

ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখলাম,---আমি হয়ে গেছি সিস্টার অ্যারোমা!

তার মত ড্রেস্-এ সজ্জিত হয়ে আমি একটি বিরাট হলে ছুটোছুটি করছি। সেই হলে কত বেড। কত শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ শুয়ে আছে ঐ বিছানাগুলোতে। আমি প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছি, হাতে আমার নার্সিং ট্রে, আর মনে নিবিড় প্রশান্তি!

আমি আর নিঃসঙ্গ নই, আমার চারিধারে কত আপনজন। ওদের সুস্থ করার, সুখী করার অক্লান্ত সাধনায় নিয়োজিত আমি!

সূর্যকান্ত চলে গেছে, তারপর কেটে গেছে আরো ছ'টা মাস। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

বিদায় নিয়েছে সিস্টার অ্যাঞ্জেলা। আমার মনে নার্সিং শেখার সঙ্কল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। ঠিক সেই সময় আমার অদৃষ্ট আকাশে যে আবার এক নতুন দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে, তা কে জানতো?

সেদিন সন্ধ্যেবেলায়, বসে শুনছিলাম রেডিওর প্রোগ্রাম, পাওয়ার সায়েব কি একটা দরকারে বাইরে গেছে। দরোয়ান এসে জানালো, একজন সায়েব আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

---সায়েব? কৈ কোন সায়েবের সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই। কে আসতে পারে?

অনুমান করলাম, সূর্যকান্ত'র মৃত্যু সম্পর্কীয় কোন জরুরী সংবাদ হয়তো, কেউ নিয়ে এসেছেন। দরোয়ানকে বললাম---সায়েবকে নিয়ে এসো। সেই সময় সায়েবের কি নাম বা পরিচয়, এসব আগে যদি জেনে নিতাম, তাহলে বিপদটাকে হয়তো কাটানো যেতো, কিন্তু তা হয় নি, আমার ভুলের জন্য।

মস্‌মস্ করে জুতোর আওয়াজ তুলে, দামী স্যুটপরা যে লোকটি দরোয়ানের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁকে আমি চিনতে পারলাম না, কারণ তাঁর মাথার টুপিটা কপালে নীচু করে নামানো, এবং চোখে ছিল কালো চশমা।

ভদ্রলোকের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে চাইলাম, তারপর ওঁকে বসতে বললাম।

টেবিলের ওপাশের সোফায় বসলেন তিনি।

ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কি প্রয়োজনে এসেছেন? ভদ্রলোকটি মাথার টুপি, ও চোখের চশমা খুলে ফেলে, আমার দিকে চেয়ে, একটি বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে বললেন---আমাকে চিনতে পারছো?

ভীষণ চমকে উঠলাম ওকে দেখে। একটা ভয়ের বিদ্যুৎ যেন আমার সর্বাঙ্গে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। আমার সামনে সশরীরে অবস্থান করছেন, আমার ভূতপূর্ব স্বামী বিশ্বমোহন বোস।

আমার গলার স্বর বোধ হয় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই নির্বাক হয়ে, আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

বোস্ সায়েব বেশ আরাম করে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে, একটা সিগারেট ধরালো, তারপর বেশ অমেজের সঙ্গে কয়েকটা টান দিয়ে বললো---কি? কথা বলছো না কেন? খুব অবাক্ হয়ে গেছ, ভাবছো যে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে, হঠাৎ এলাম কেন, তাই না?

আমি জবাব দিলাম না ওর কথায়।

---আচ্ছা ঠিক আছে। কোন্ প্রয়োজনে এসেছি সেইটাই বলি তাহলে। প্রয়োজন এমন কিছু নয়, তবুও, কিছু আছে বৈ-কি। আমার বিয়ে করা স্ত্রী তুমি, একথা তো অস্বীকার করতে পারো না,---তাই মনে হল যে, সেই শয়তানটার হাত থেকে নিষ্কৃতি যখন পেয়েছো, তখন অন্য কিছু ব্যবস্থা করার পথে এখন আর বাধা নেই। মানে এই যে, মনে হল, তুমি এখন বড় অসহায়, সেজন্যই আমি ছুটে এসেছি তোমার কাছে। তোমার আপত্তি না থাকলে তোমার সব দায়িত্ব আমার আমি নিতে প্রস্তুত। অবশ্য সমাজ-ভয় আছে, সেজন্য খোলা পথে কিছু করা সম্ভব হবে না।---তা না হোক্, তারজন্যে নানা রকম উপায় আছে। অর্থাৎ সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না,---এই আর কি। এখন তোমার মতামতটা জানতে পারলেই, আমি কাজে এগোতে পারি।

স্বামী। হ্যাঁ, আইনত উনি যে আমার স্বামী, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর অমানুষ হলেও, একদিন তো নারায়ণ অগ্নি সাক্ষী করে, ওঁর গলাতেই তো বরমাল্য দিয়েছিলাম। আজ সব দোষ-ত্রুটি, বিপর্যয়, বা সমাজের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আমার কাছে উনি ছুটে এসেছেন, কর্তব্যপালনের জন্য, আমাকে আবার ফিরিয়ে নেবার জন্য।

ওঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় মনটা আমার দুলে উঠলো। দু চোখ ভরে জল এলো।

ধরা গলায় জবাব দিলাম—তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এখুনি আমি যেতে প্রস্তুত। কোথায় নিয়ে যাবে? কাশীপুরের বাড়ীতে, আমায় নিয়ে যাবে তো? মা, বাবা, আমাকে ফিরিয়ে নিতে রাজী হবেন তো?

আমার কথায় একটু হাসলো বোস সায়েব। বললো, ---না, সেটা আর সম্ভব হবে না সোনা। কারণ সেখানে তুমি মৃত। যেদিন তুমি সেই বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলে, তারপর-দিনই তোমার মৃত্যু-সংবাদ রটনা করা হয়েছিল, রীতিমত ডাক্তারী সার্টিফিকেট, এমন কি জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রারের খাতায়ও তোমার মৃত্যু রেজিস্ট্রী করা হয়েছে। জানো তো, আমাদের বিরাট বনেদী বংশ, আর তার মান-সম্মান, ইত্যাদির জন্যে এসব করতে হয়েছে, অবশ্য তোমার বাবা আসল ঘটনা জানেন, তবে তিনিও আমাদের এই ব্যবস্থায় সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ তাঁর বংশমর্যাদাও তো কিছু কম নয়। তাই বুঝতেই পারছো সেখানে তোমাকে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়।

আমি বলছি যে,---তা নাই বা হলো সোনা, তুমি যেমন আছ, তেমনিই থাকো, আমি আসবো তোমার কাছে। আমরা দুটি প্রাণ এক হয়ে আবার নতুন পদ্ধতিতে ঘর বাঁধবো। দুজনে পাশাপাশি থাকবো চিরদিন। দুজনকে আমাদের আর পৃথক করতে কেউ পারবে না। কোনো শয়তানকে আর আমাদের মাঝে আসতে দেবো না, এই কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসো আমরা আবার নতুন জীবন সুরু করি।

কথা বলতে বলতে বিশু বোস ছুটে এসে বসলো আমার পাশে। আমার একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতের মুঠোয়।

ঠিক সেই সময় ঘরে প্রবেশ করলো পাওয়ার সায়েব। সে বোসকে কোন-দিন দেখে নি, তাই একজন অচেনা পুরুষকে আমার পাশে এমন ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখে, হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো আমার দিকে।

আমি আমার হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিলাম, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললাম পাওয়ার সায়েবকে, ---এসো সায়েব, তোমার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন, শ্রীবিশুমোহন বসু। মানে, মানে --------

আমার মুখে আটকে যাওয়া কথাটার শেষ করলো বোস্ সায়েব,—মানে, ইনি হচ্ছেন আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আর আমি হচ্ছি এঁর আইনসিদ্ধ স্বামী। আর আপনি বোধ হয় সেই বিখ্যাত গীটার-শিল্পী পাওয়ার সায়েব?

হাত তুলে গম্ভীর মুখে নমস্কার জানালো পাওয়ার সায়েব, তারপর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে, ঘর ছেড়ে চলে গেল।

---উঃ! কি ভয়ঙ্কর অবস্থা তোমার? আমার দিকে চেয়ে বললো বোস সায়েব,---এই ভয়াবহ দৈত্যটার সঙ্গে, একা বাস করছো তুমি? আহা---হা, হা। ওকে দেখলে আমারই যে ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করছে।

---না, না, ও বড় সুন্দর। বড় ভালো। বড় সৎ, ও---না থাকলে আমি মরেই যেতাম। জবাব দিলাম আমি।

একটু পরে চা আর কেক্ এনে টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করলো পাওয়ার সায়েব,---সায়েব রাতে ডিনার খাবেন কি-না।

---না, আজ নয় সায়েব,---আরেক দিন খাবো। জবাব দিলো বোস্ সায়েব।

(ক্রমশ।

শিল্পী—রেবতীভূষণ ঘোষ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দশ ॥
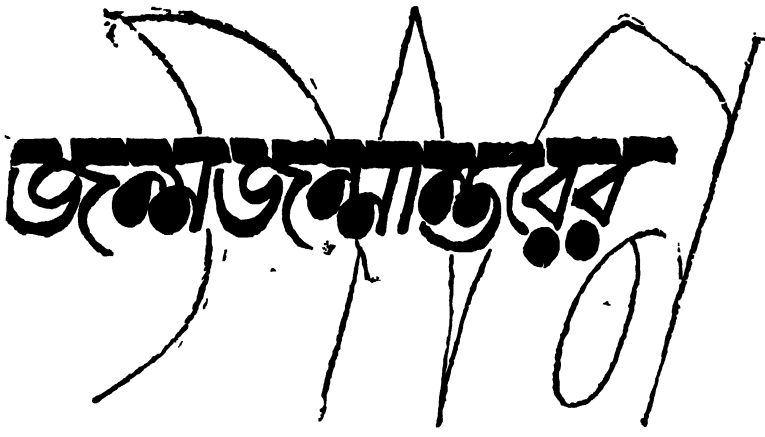
মিঃ কিং ও তার একটি জুনিয়ার মিঃ অডিকে আমার হাতের কাজকর্মগুলো বুঝিয়ে ব্যবস্থা করে দিতে আরও ২০।২৫ দিন সময় লাগবে এবং দিন পঁচিশ পরেই ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার জাহাজে টিকিট কিনে নিজের স্থান ঠিক করেও ফেললাম।

এমন সময় একদিন হঠাৎ ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান-এ খবরটি বেরুল। সবাই অবাক হয়ে পড়ল।

গ্লস্টারসায়ারে হিলটন-অন-ওয়াই গ্রামের একটি পুরাতন পোড়োবাড়ী থেকে এক অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল। প্রত্যেক পূর্ণিমার দিন রাত্রে সেই বাড়ী থেকে কান্নার সুরে একটি গান শোনা যায়, অথচ বাড়ীতে কেউ থাকে না।

খবরটা অনেকদিন ধরেই আমাদের কানে আসছে। শেষ পর্যন্ত যে ব্যাপারটা সত্যিকারের কি---ভাল করে তদন্ত করবার জন্য আমাদের দুজন রিপোর্টার পাঠালাম। তাঁরা মাসাধিক কাল হিলটন-অন-ওয়াইয়ে বাস করে ব্যাপারটা চারিদিক থেকে অনুসন্ধান করেছেন। দুটো পূর্ণিমার রাত তাঁরা হিলটন-অন-ওয়াইতে কাটিয়েছেন এবং তাঁরা স্পষ্ট এই করুণ গান শুনতে পেয়েছেন। বলতে লজ্জা করব না পূর্ণিমার রাত্রে বাড়ীতে ঢুকে অনুসন্ধান করার সাহস তাঁদের হয়নি। এমন অবস্থায় হয়ত অনেকেরই হত না। তবে দিনের বেলায় বাড়ীতে ঢুকে তাঁরা তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন। বাড়ীর সংলগ্ন বাগান জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে আছে। বাড়ীটাও জীর্ণ হয়ে এমন অবস্থায় আছে---হয়ত শীঘ্রই ধ্বসে পড়বে। কিন্তু এই গানের উৎস যে কোথায় তাঁরা কিছুই বুঝতে পারেন নি।

টাইমস পত্রিকায় খবরটি পরের দিন বেরুল, একটু অন্যভাবে। টাইমস্ ব্যাপারটি বিশ্বাস না করে লিখল---হয়ত কোনও পাগল কিংবা মাতাল রাত্রে ঐ বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গান করে। গান যে শোনা যায়, এ-খবর আমরাও পেয়েছি। আমাদের মতে

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বার-এট-ল

পুলিশের এখুনিই অনুসন্ধানের ভার নেওয়া উচিত। রাত্রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ভাল করে সব অনুসন্ধান করা উচিত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিন ৮।১০ পরে ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান-এ আবার খবর বেরুল। লিখেছে---টাইমস্ পত্রিকার ইঙ্গিত অনুসারে পুলিশ পর পর দুটি পূর্ণিমার রাত্রে বাড়ীর ভিতর ঢুকে অনেক অনুসন্ধান করেছে কিন্তু কিছুই খুঁজে পায়নি।

ক্রমে ইংলণ্ডের প্রায় সব পত্রিকায়ই এই নিয়ে নানা আলোচনা সুরু হল।

একটি পত্রিকায়---যতদূর মনে পড়ে ডেলি এক্সপ্রেস-এ জোরের সঙ্গে লিখেছিল---তাদের রিপোর্টাররা ৩।৪ মাস ঐ অঞ্চলে থেকে ব্যাপারটার বিষয় চারিদিক থেকে তদন্ত করে ব্যাপারটা যে সত্য, সে বিষয় আর কোনও সন্দেহই পোষণ করেন না। বরং যে গানটি প্রত্যেক পূর্ণিমায় শোনা যায় সে গানটিও যতদূর সম্ভব উদ্ধার করে লিখে নিয়ে এসেছেন। গানটি পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল।

কোন সে কালের আদি উষায়
তোমার প্রথম গানে
বলেছিলে ভালবাস আমার কানে কানে
ওগো আমার কানে কানে
সেই যে মন্ত্র সঙ্গে দিলে
যাত্রা আমায় করিয়েছিলে
ভেবেছিলাম আমার পাশে
থাকবে সকল গানে
বলেছিলে ভালবাস আমার কানে কানে।

তাই ত আমি ভয় করিনি অভয় বাণী নিয়ে
কত জীবন কত না পথ এলেম পাড়ি দিয়ে
ওগো এলেম পাড়ি দিয়ে
হঠাৎ দেখি শুষ্ক ধরা
রিক্ত হিয়া দৈন্যে ভরা
কোথায় তুমি নাই পাশে নাই
সুর বাজে না প্রাণে
বলেছিলে ভালবাস আমার কানে কানে।

ক্লান্তি ভরে এলো প্রাণে শুষ্ক এ-পথ চলায়
হঠাৎ তুমি বসলে পাশে
এলেম গাছের তলায়
ওগো এলেম গাছের তলায়।
মর্মরিয়া হেনকালে
পাতায় পাতায় ডালে ডালে
আনন্দেরই জোয়ার এল আমার সারা প্রাণে
বলেছিলে ভালবাস আমার কানে কা

তখন আবার মন্ত্র পেলাম সুর লাগল গলায়
আবার নূপুর উঠল বেজে আমার এপথ
চলায়

ওগো আমার এ-পথ চলায়
চেয়ে দেখি গাছের পাতায়
সবুজ ঘাসের মাথায় মাথায়
রঙে তোমার প[illegible]
[illegible] হাওয়ায় আনে
বলেছিলে ভালবাস আমার কানে কানে।

পূর্ণিমার আজ মায়ার পথে চলি গগনতলে
আমার চলায় তোমার পরশ বাজে জলে-স্থলে
---ওগো বাজে জলে-স্থলে
সেই সে পরশ তারায় তারায়
আপন মায়ায় ভেসে বেড়ায়
শিরায় শিরায় কাঁপন লাগে তোমার গভীর
টানে
বলেছিলে ভালবাস আমার কানে কানে।

শেষ করেছি এবার চলা প্রণাম করি পায়ে
ভুবন ভরা তোমার ও রূপ মেখেছি আজ
গায়ে
ওগো মেখেছি আজ গায়ে।
এখন আমার গানের সুরে
দিচ্ছ ধরা জগত জুড়ে
মিলন রাগে গগন ভরে চাইছ আমার পানে
বলেছিলে ভালবাস আমার কানে কানে।

●

তখনও আমার দেশে রওনা হতে দিন ১৫ দেরী। একদিন মিঃ কিংয়ের চেম্বারে আমি, অডি, হ্যারিস ও নেলসন এই চার বন্ধুতে মিলে এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ডেলি এক্সপ্রেস পত্রিকাটি আমাদের সামনে খোলাই ছিল।

অডি মাথা নেড়ে বলল 'যত সব বাজে ব্যাপার—এসব আমি বিশ্বাস করি না।'

হ্যারিস বলল, 'কিন্তু যে রকম সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, একেবারে উড়িয়েই বা দিই কি করে?'

অডি বলল, 'দূর! দূর সে রকম ভাবে তদন্ত করলে সত্যিকারের রহস্য বেরিয়ে যাবে।'

নেলসন বলল, 'তদন্ত ত' অনেক হয়ে গেছে, শুধু খবরের কাগজের রিপোর্টারই নয়, পুলিশ পর্যন্ত এ-ব্যাপার নিয়ে বিশেষ ভাবে তদন্ত করেছে। কিন্তু কৈ---'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অডি বলল, 'পুলিশ অনেক সময় তদন্ত করতে ভুল করে, মিথ্যা লোককে দোষী বলে চালান দেয়, কেন এ রকম মামলা ত' কত হয়েছে। অনেক সময় আসল দোষীকে খুঁজেই বার করতে পারে না সে দৃষ্টান্তের ত' অভাব নেই।'

নেলসন বলল, 'কি জানি---ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না।"

অডি সজোরে বলল, 'তুমি কি বলতে চাও এটা সত্যিই একটা ভৌতিক ব্যাপার।'

নেলসন বলল, 'আমি কিছুই বলতে চাই না।'

হ্যারিস আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি চুপ করে আছেন যে, আপনার কি মনে হয়?'

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, 'আমি মানি।'

অডি চেঁচিয়ে উঠে শুধাল, 'কি মানেন?'

বললাম, 'মৃত্যুর পরে পরলোক মানি। পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব মানি। তাকে যদি ভূত বলেন, তাও মানি।'

অডি হো হো করে হেসে উঠল। বললে, 'ভারতবাসী কিনা---ওঁরা সবই মানেন। মেনেই যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন।'

আমার দেশকে নিয়ে খোঁচা দেওয়াতে একটু রাগ হল। একটু জোরের সঙ্গে বললাম---'আপনাদের পরম সৌভাগ্য যে অতবড় মহাকবি সেক্সপীয়র আপনাদের দেশেই জন্মেছিলেন। তিনি এদেশে জন্মেও দেশ-কাল এবং এ দেশের বিশিষ্ট আবহাওয়ার অনেক উর্দ্ধে উঠেছিলেন। তাই তিনি আজও বিশ্বের কবি হয়ে আছেন। তাঁর প্রধান নাটক হ্যামলেট এর প্রথম এবং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রধান চরিত্রই একটি ভূত।'

অডি বলল, 'ও সব কবিদের কল্পনার কথা ছেড়ে দাও।'

জোরের সঙ্গে বললাম, 'এদেশে জন্মেছিলেন বলেই তিনি জোর গলায় আপনাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। There are more things in Heaven and Earth, than are dreamt of etc.

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনারা সে শিক্ষা নিলেন না। নেবার যোগ্যতা পর্যন্ত আপনাদের এখনও হয়নি। আমাদের দেশে অবশ্য প্রাচীন সাহিত্যে জন্ম-জন্মান্তর নিয়ে অনেক গ্রন্থ আছে, যা আজও অমর হয়ে আছে।'

অডি বোধ হয় বুঝতে পারল, আমি একটু রেগেছি। চুপ করে গেল।

হ্যারিস বললে, 'তর্কাতর্কি করে কি লাভ। তার চাইতে চলুন না, সবাই মিলে একটা পূর্ণিমার রাতে জায়গাটা বেড়িয়ে আসি। ব্যাপারটাও বুঝে আসি।'

নেলসন বলল, 'সে মন্দ কথা নয়।'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। পূর্ণিমার তখন আর চারদিন বাকী। ঠিক হল সবাই মিলে হিলটন-এন-ওয়াই গিয়ে নিজেদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ যদি সম্ভব হয় খণ্ডন করে আসব।

বলা বাহুল্য এ-প্রস্তাবে আমার আগ্রহ সবচেয়ে হল বেশী।

৩

লিডস্ স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম, তখন বিকেল, অন্ধকার হয়নি। আমাদের চার বন্ধুকে অভ্যর্থনা করে নেওয়ার জন্য কোনও লোক স্টেশনে ছিল না।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দেখলাম, একখানা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে---ভাড়া খাটার জন্য। সিরিল নয় ত? চেয়ে দেখলাম না। দাড়িওয়ালা একটি বৃদ্ধ কোচম্যান। সেই গাড়ী ভাড়া করে আমরা চারজনে হিলটন-অন-ওয়াইয়ের পথে যাত্রা করলাম।

বৃদ্ধ কোচম্যানটি গোড়ায় একটু আপত্তি করেছিল। বলল, 'আজ পূর্ণিমা, আজ ত' হিলটন-অন-ওয়াই গ্রামে কেউ যায় না।'

নেলসন শুধাল, 'কেন?'

বলল, 'কি জানি, ও গ্রামে কিসের যেন একটা মায়া লেগেছে। পূর্ণিমায় একটা অবাস্তব আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। গেলে গা ছম্‌ছম্‌ করে। তাই কেউ যায় না।'

শেষ পর্যন্ত ডবল ভাড়া দেব ইত্যাদি নানা রকম বুঝিয়ে কোচম্যানকে রাজী করান হল।

গাড়ীতে উঠে বসলাম---গাড়ী ছুটল তীরবেগে। কোচম্যান ঘোড়াকে চাবুকের পর চাবুক মারছে এবং নিজের মনেই বক্‌বক্‌ করছে। ঘোড়াকে উদ্দেশ্য করেই বোধ হয় বলছে, 'চল বেটা চল। জলদি চল। রাত হওয়ার আগে হিলটন-অন-ওয়াই পৌঁছতে হবে যে।'

●

আমরা চারজনে যখন মেবেলদের বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চাঁদের উদয় হয়েছে কিন্তু চাঁদ তখনও উপরে উঠে দৃষ্টিপথে আসেনি।

মেবেলদের বাড়ীটার দিকে চেয়ে প্রায় চোখে জল এল। অমন সুন্দর বাগান আগাছায় ভরে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গেছে। বাড়ীখানার গায়ের আস্তর চারিদিকে ধসে গিয়ে জীর্ণ দুর্দশায় ধূলিসাৎ হওয়ার জন্য যেন তৈরী। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় সমস্ত বাড়ীখানি যে কি একটা অপরূপ অবাস্তব রূপ নিয়েছে---না দেখলে লিখে বোঝান যাবে না।

আমরা চারজনে দাঁড়িয়ে আছি গেটের ঠিক বাইরে--চারদিক চুপচাপ নিস্তব্ধ। যেন পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে--আর মানুষ বাস করে না। সত্যই সমস্ত আবহাওয়াটা এমন হয়েছে যে আমারও গা ছমছম করে উঠছে। বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললাম, 'চলুন না, এই সময় ভিতরে গিয়ে ভিতরটা একবার ভাল করে পরীক্ষা করে আসি।'

বলল, 'কি দরকার, এইখান থেকেই ত' গান শোনা যাবে।'

অডিকে লক্ষ্য করে বললাম, 'আপনি ত' কিছু মানেন না, ভয়-ডরের বালাই নাই, চলুন না আপনি আর আমি যাই।'

অডি তাড়াতাড়ি বলল, 'কি দরকার, এইখান থেকেই আগে ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই।'

ক্রমে চাঁদ আকাশের গা বেয়ে উপরে উঠল। আমরা সকলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। আমি ঠিক গেটের সামনে---বন্ধুরা একটু পিছনে, একসঙ্গে জড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ যেন ওয়াই-নদীর কুলুকুলু শব্দ গেল থেমে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠল গান---'কোন সে কালের আদি উষায়, ইত্যাদি পরিষ্কার মেবেলের গলা---অস্বীকার করব না আমার সমস্ত শরীর শিউরে শিউরে উঠেছিল। বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললাম, 'চলুন চলুন সব এইবার ভিতরে চলুন।'

কিন্তু বন্ধুরা তখন অনেকটা দূরে সরে গেছেন। সকলের আগেই অডি। অডিকে বিশেষ করে লক্ষ্য করে বললাম, 'কি হল! আপনি অন্তত চলুন।'

অডি তখন পিছন ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। বেশ দ্রুত তার চলন।

চেঁচিয়ে বললাম, 'কি মিঃ অডি, আপনিই শেষ পর্যন্ত সকলের আগে পালাতে সুরু করলেন।'

অডি চলতে চলতেই চীৎকার করে উত্তর দিল, 'আমি এসব ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না।' বলে অতি দ্রুত চলতে আরম্ভ করলেন।

চেয়ে দেখি অন্য অন্য বন্ধুরাও সবাই পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করেছে। আমি একা। পরিষ্কার মেবেলের গলা। গান চলেছে। শেষ পর্যন্ত যখন গাইল 'শেষ করেছি এবার চলা প্রণাম করি পায়ে'---আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সমস্ত শরীরের মধ্যে এমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি খেলে গেল আমাকে যেন জোর করে পাঠিয়ে দিল গেটের ভিতরে।

চীৎকার করে ডাকলাম---মেবেল! মেবেল!

নিজের গলা নিজেরই কানে অস্বাভাবিক মনে হল। এ যেন আর কারও গলা।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ওয়াই নদীর কুলুকুলু শব্দ পর্যন্ত নাই। কি ভীষণ নিস্তব্ধতা---জীবনে কখনও এ রকম অনুভূতি হয় নি।

শরীর শিউরে শিউরে উঠছে। তবুও সমস্ত বুকের জোর দিয়ে অস্বাভাবিক চেঁচিয়ে বললাম, 'মেবেল! মেবেল! আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। ভালবাসা যে এমন স্তরে উঠতে পারে যে তার সামান্য ছোঁয়া লাগলেই শরীর মন এমন কি ইচ্ছাশক্তি পর্যন্ত শিথিল হয়ে অবশ হয়ে যায়---এ আমার জানা ছিল না। এ রকম ভালবাসার পিছনে থাকে জন্ম-জন্মান্তরের টান। আমি বুঝতে পারি নি---বুঝতে পারি নি মেবেল---

হঠাৎ গলা বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত শরীর তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমার শেষ মেবেল ডাকের প্রতিধ্বনি

সাফল্য না ব্যর্থতা ?

জীবনে সাফল্য অর্জনের মূল পাঠ মানুষ পায় শৈশবে---মা'র কাছে আর স্কুলে। এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ দেড় জীবনীশক্তির তুলনায় অধিকতর তৎপরতা। কোনও কোনও শিশু বেশ তৎপর, সংগীরা ক্লান্ত হলেও তারা চঞ্চল, এবং ভেবেচিন্তে ফন্দী আঁটিতে পারংগম। কোন সফল ব্যক্তিত্বর সংস্পর্শে এলে এ জন্যই অস্বস্তি লাগে, মনে হয় জনা তিনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। দ্বিতীয় লক্ষণ অবিরাম উৎসাহ, কোন কারণেই ঝিমিয়ে না পড়া।

সাধারণত নিরবচ্ছিন্ন উৎকণ্ঠাকে ভুল করা হয় (বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে) জীবনীশক্তির অ-সাধারণ প্রকাশ হিসেবে। কিছুদূর পর্যন্ত উৎকণ্ঠাও কাজে আসে, দুশ্চিন্তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছু দূর এগিয়ে দিতে সক্ষম।

লেখকের একজন সফল ব্যবসায়ী বন্ধু সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে দু'টি জিনিসের উল্লেখ করেন : কঠোর পরিশ্রম আর ভাগ্য। একটু খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় ভাগ্য কেবল চটপট কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা নয়, তা পূর্বপরিকল্পিত এবং রূপায়িত সময় জ্ঞানও বটে। আমাদের ভুলগুলো আমাদের ঠিক করা সময়ের তুলনায় সবসময় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য ধনীরাই এ ব্যাপারে সৌভাগ্যবান আলোচনা কাজ করার সময় ঠিক করে নির্দিষ্ট [illegible] কাজ করার বরাত তাদেরই ঘটে। [illegible] মানুষ বাধ্য হয় পারিপার্শ্বিক [illegible] নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করতে।

কোনও উদ্দেশ্যের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ আর তা রূপায়িত করার অবিরাম প্রচেষ্টা কালেভদ্রে বিফল হয়। এ জাতের মানুষ আজ না হয় কাল সফলতা অর্জন করেন। এর মূলে নিরাপত্তার অনুভূতি এবং দৃঢ় বিশ্বাস সক্রিয়।

বিফলতার সান্ত্বনা এই যে, রাতারাতি সাফল্য বলে কোনও বস্তু নেই। সাফল্য না আসা পর্যন্ত পূর্ববর্তী ধাপগুলো অসফল হতে বাধ্য। সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সর্বোদ্যম কুচিৎ জন্ম নেয় নিরাপদ পারিবারিক আবহাওয়া। এইসব বাড়ির ছেলেরা ঠিক পাঁচটায় কাজ শেষ করে। বউকে নিয়ে সিনেমায় যায়। ছুটি পেলে দেশ ভ্রমণে বেরোয় আগে হোটেলের স্যুট বুক করে। জীবনের সাফল্য এবং তার সংগে জড়িত ব্যক্তিগত সুখের সম্বন্ধ যে কী তাই এরা জানে না।

একেবারে অসফল ব্যক্তিরা আগে বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, আত্মীয়-কুটুম্ব প্রমুখের সংগে পরামর্শ সেরে শেষকালে যখন মনস্তত্ত্ববিদের কাছে আসেন তখন হয়ত আর কিছু করার থাকে না। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য।---বিশেষত সমৃদ্ধপূর্ণ জীবনের অংশ যদি তাদেরও তাদের কাছে থাকে।

অথচ, পূর্ব অসাফল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বারবার অসফলতা বই নয়। সঠিক বৃত্তান্ত জানা গেলে অবস্থান্তর ঘটানো কিছুকাল আগেও অসম্ভব হত না। যে মানুষটি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হয়ে এখন পাঁচ হাজার টাকা ধার চাইছেন, হয় ত একই অবস্থায় দশ বছর আগে তার এক হাজার টাকা হলেই চলে যেত। অসাফল্যর প্রয়োজনীতাও অত্যাচারিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার মত প্রতিষ্ঠা করা যায়।

অতিমাত্রায় সফল, অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বাবা ছেলের ব্যর্থতাবোধের মূলে অনেকখানি দায়ী। বিদ্যাসাগর বা রবি ঠাকুরের কথা এ প্রসংগে মনে আসতে পারে। আবার, অতিমাত্রায় বিবেকবান এবং বিব্রত বাবাও ছেলেকে ব্যর্থ হতে সাহায্য করেন। শৈশবে নিরাপত্তার অভাববোধ যাদের তীব্র, তারাও উত্তরজীবনে অসফল হয়।

সাফল্যের মূলে, দেখা যাচ্ছে, কর্মক্ষমতা, সময় নির্দিষ্ট করার এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ রূপায়ণের ক্ষমতা আর আত্মবিশ্বাস সক্রিয়। এ সবই সাধারণকৃত মন্তব্য। প্রতি ক্ষেত্রে এর হেরফের অল্পবিস্তর ঘটবেই। কেন না, মেজাজে যেমন মানুষ মাত্রেই স্বতন্ত্র, পরিবেশও মানুষমাত্রেই ভিন্ন। তবুও মূল বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে, অবস্থার বিশ্লেষণ সহজসাধ্য হওয়ায় ভুলত্রুটি সাধ্যমত সংশোধন করা সম্ভব এবং এই সংশোধনী ক্ষমতা সাফল্যের শেষ মন্ত্র। সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

চারিদিক থেকে আমার কানে এসে এমন তীক্ষ্ণভাবে বিঁধতে লাগলো যে আমার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। কোনও রকমে গেটের বাইরে এসে যেন বাঁচলাম।

বাইরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম---গান আর শোনা গেল না। হঠাৎ ওয়াই নদীর কুলুকুলু ধ্বনি আমার কানে এল। সেই ধ্বনিতে কেন জানি না শরীর মন একটু যেন আশ্বস্ত হল।

এরপর লণ্ডনে ফিরে এসে শুনেছিলাম---হিলটন অন-ওয়াইয়ের পূর্ণিমার গান থেমে গেছে---আর নাকি শোনা যায় না।

এর কিছুদিন পরেই ইংল্যাণ্ড ছেড়ে রওনা হলাম ভারতবর্ষ অভিমুখে 'চায়না' জাহাজে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছি, ইংল্যাণ্ডের তটভূমি ক্রমেই দূর হতে দূরে সরে যেতে লাগল আমার চোখে---সেই ইংল্যাণ্ড যেখানে ধূলার সঙ্গে মিশে আছে মার্জরী, যেখানে একদিন উঠেছিল মেবেলের গান।

॥ সমাপ্ত ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তিন ॥
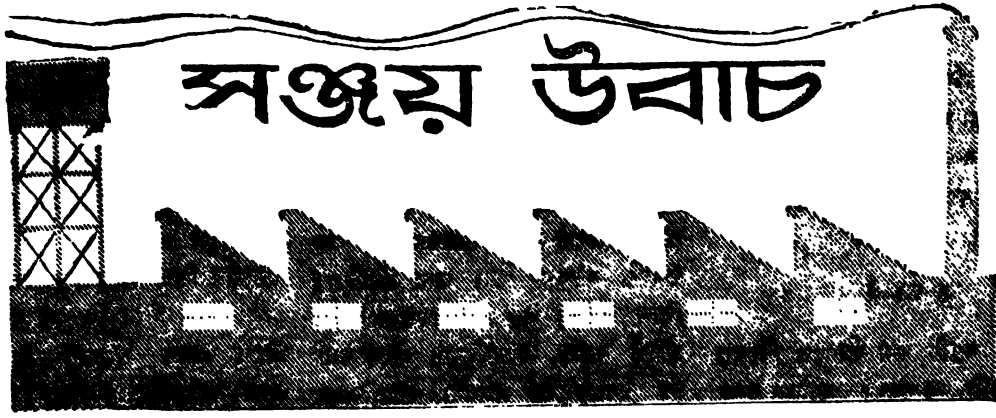
যাক্ ও প্রসঙ্গ। বালক কার্তিকের ব্যবসায়ে হাতেখড়ি শোভাবাজার পিসেমশাই-এর ছোট্ট দোকানটিতে। সময় পেলেই সেখানে সে যায়। এদিকে ইস্কুলেও পড়ে। তবে ইস্কুলের পড়ায় তত মন বসে না। পাড়ার লাইব্রেরীতে যে বই পায় পড়ে। সেই অল্পবয়সেই তার বাইরের বই পড়বার ঝোঁক এত প্রবল ছিল যে ইস্কুল পাশ করবার আগেই সে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কাব্য মুখস্থ করে ফেলেছিল। রামায়ণ-মহাভারতও বার বার পড়েছিল। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম চরিত্রটি তার বড় ভালো লাগত। ভীষ্ম যেমন তাঁর বাবা শান্তনুর বিয়ে দিয়েছিলেন, মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কার্তিকের বাবা যখন আবার বিয়ে করলেন, কার্তিক কোমর বেঁধে লেগেছিল সেই কাজ উদ্ধারে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গর্বভরে বলত সে কথা---ভীষ্মের মত আমিও আমার বাবার বিয়ে দিয়ে এলাম।

দাদা প্রবোধচন্দ্র ছিলেন খুব ভালো ছেলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেলেন, ফার্স্ট আর্টস পড়তে পেলেন। সেখানেও বৃত্তি পেলেন। বি-এতে, এম-এতে আইন পরীক্ষায়---সব পরীক্ষাতেই খুব ভালো ফল দেখিয়েছিলেন। চাকুরি জীবনে মুনসেফ হতে কালক্রমে জেলা-জজ হয়ে অবসর নিয়েছিলেন।

মুশকিল হল কার্তিককে নিয়ে। প্রবেশিকায় ফল ভালো হল না, ফার্স্ট আর্টস-এও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ। সেকালে ভালো ছেলেরা জজ ম্যাজিস্ট্রেট উকিল ব্যারিস্টার হত। খারাপ ছেলেদের দারোগা হওয়াই ছিল ললাট-লিপি। অগত্যা মড়াকাটা বিদ্যা---ডাক্তারি ভালো ছেলেরা সহসা কেউ ডাক্তারি পড়তে যেতে চাইত না তখন।

কার্তিকের যখন লেখাপড়া হবে না, অগত্যা ওকে ডাক্তারি পড়ালেই হয়---ভাবলেন প্রসন্নকুমার। কিন্তু

সঞ্জয়

ডাক্তারি পড়ানো---যে অনেক খরচের ব্যাপার। বড় ছেলের জন্য কোন বেগ পেতে হয়নি, বৃত্তির টাকায় চলেছে তার। মেজো কার্তিককে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা।

প্রসন্নকুমারের অফিসের বড়বাবু সজ্জন ব্যক্তি। তিনি সব শুনে বললেন, তা, তোমার যদি একান্তই ইচ্ছা হয়, ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবে, তখন ভর্তি হওয়ার টাকাটা না হয় আমিই দেব।

কিন্তু দিতে চাইলেই কি নেওয়া যায়? কার্তিক রাজি হবে কি? সে রাজি হল একটি সর্তে---বড়বাবুর ছেলেদের সে এক বছর পড়াবে বিনা বেতনে।

বড়বাবু শুনে বললেন---বেশ, তাই হবে। তবে কলেজের বেতনটাও তা হলে আমিই দেব।

সে যুগে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া এখনকার মত দুঃসাধ্য ছিল না। কঠিন ছিল বইপত্র সংগ্রহ করা। ডাক্তারি বই---যেমন ভারি তার চেহারা তেমনি মোটা তার দাম। গ্রে-র অ্যানাটমি সেকালেও পড়তে হত।

ভর্তি হয়ে অবধি কার্তিক এক উপায়ে কিছু কিছু রোজগারের পথ আবিষ্কার করলে। কলেজের ছেলেদের খাতা পেনসিল বই কিনে এনে দিতে সুরু করলে, তাতে কিছু কমিশন মিলত। অ্যানাটমি পড়বার সময় একটা কঙ্কাল কিনতে হয়। অনেক টাকার দরকার। কার্তিক কয়েকটি ছেলের জন্য হাড় কেনবার বিনিময়ে নিজে একসেট হাড় বিনামূল্যে কমিশন পেল। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।

কিন্তু বই? সহপাঠীদের বই নিয়ে কার্তিক অল্প সময়ে পড়ে নোট নিয়ে ফেরত দিত। উপরের ক্লাসের ছেলেদের কাছ হতেও বই ধার করে নিত।

ভর্তি হওয়ার টাকা ধার করা, কলেজের বেতনের জন্যও---বাবার অফিসের বড়বাবুর বাড়ি নিত্য টিউশনি করতে যেতে হয়। কার্তিক ভাবে, যদি কোনরকমে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া যায় তবে বেতনের বোঝা ঘাড় থেকে নামে, কলেজে ফ্রীশিপ পাওয়া যায়। আর বেতনের টাকার ভাবনা না থাকলে তাকে আর টিউশনি করে, ছাত্র পড়িয়ে সময় নষ্ট করতে হয় না, সে সময়টা নিজে পড়তে পারে। অতএব যে-কোন প্রকারে ফার্স্ট হতেই হবে এই হল তার সংকল্প।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিল সে।

চেয়েচিন্তে বই সংগ্রহ করে, নোট টুকে নিয়ে, দিনরাত পরিশ্রম করে পরীক্ষা দিল সে। ফল বেরুলে দেখা গেল---কার্তিকচন্দ্র বসুর নামটা সবার উপরে, ফার্স্ট হয়েছে কার্তিক।

॥ চার ॥

কিন্তু আমি ধান ভানতে শিবের গাজন গাইছি না তো? অবান্তর কথা হয়ে যাচ্ছে না তো কিছু। তোমাদের যদি শুনতে ভালো না লাগে আমি এখানেই থামতে পারি।

সভার সুমুখের সারি থেকে কয়েক জন উৎসাহী শ্রোতা বলে উঠলেন---না, আপনি বলুন। আমরা আজ এই বিশেষ অধিবেশনে শুনতে চাই তাঁর কথা--কিভাবে তিনি ভাবতে রসায়ন-শিল্প প্রবর্তন করেছিলেন।

সঞ্জয় বললেন,---সে কথাটা জানবার জন্যই দরকার এই মানুষটির সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা। তাঁর বিদ্যাবত্তা, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি, তাঁর কর্ম-প্রেরণা এবং কর্মপদ্ধতি---সব কিছু সম্পর্কে একটু না বললে তো সে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আপনি বলুন, সব কাহিনীই আমরা শুনতে চাই।

এ ঘটনাও ঘটেছিল মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বছরেই।

তখনকার দিনেও ডাক্তারি পড়তে হলে কিছুটা কেমিস্ট্রি পড়তে হত, অথচ কোন কলেজে তখন প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস হত না। বইতে যা পড়ানো হত, হাতে-কলমে তা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ ছাত্ররা পেত না। অবশ্য কেমিস্ট্রির বিষয়বস্তু তখন এখনকার মত বিস্তৃত হয়নি। সবে ও বিষয়ে ছেলেরা হাতেখড়ি দিচ্ছে তখন।

কিন্তু কার্তিক দেখতে চায়, বইতে যা যা লেখে তার কিছুটাও অন্তত বাস্তবে করা যায় কিনা। সেই উদ্দেশ্যে সে কয়েকটি রাসায়নিক বস্তু অল্প পরিমাণে কিনতে গেল বটকৃষ্ণ পালের দোকানে। দোকানে তার জিনিষের তালিকাটি দিয়ে সে গেল কলেজে, ফিরবার পথে জিনিষগুলি নিয়ে যাবে বলে গেল।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানী তখন সারা ভারতে সেরা ডাক্তারখানা। আর তখনও বটকৃষ্ণ পাল স্বয়ং জীবিত। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় 'সেলফ-মেড ম্যান'। তাঁর বৃহৎ ব্যবসায়ের প্রত্যেকটি বিষয় ছিল তাঁর নখদর্পণে, প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকত। যদিও ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব অনেকটা ছেড়ে দিয়েছিলেন পুত্র ভূতনাথের উপর, তবু নিজে রোজ গদিতে বসতেন, কর্মচারীদের কাছে তখনও তিনিই বড়-কর্তা।

একদিন দুপুরে বড়কর্তা গদিতে এসে লক্ষ্য করলেন, কাউণ্টারে ছয়টি এক আউন্স শিশি লেবেল আঁটা, ওষুধ ভর্তি, সাজানো রয়েছে। কর্ম-চারীকে শুধোলেন---ওখানে ওগুলি কি রয়েছে কাউণ্টারে?

কর্মচারিটি বললে---একটি কলেজের ছেলে অর্ডার দিয়ে গেছে, বিকেলে নিয়ে যাবে।

বড়কর্তা শিশি ক'টি দেখতে চাই-লেন। তারপর দেখে নিজের টেবিলে রেখে দিয়ে বললেন---ছেলেটি ওষুধ নিতে এলে আমার কাছে নিয়ে আসবে তাকে। আমার দরকার আছে তার কাছে।

কলেজ ছুটি হলে পায়ে হেঁটে গেল কার্তিক বনফিল্ডস লেনে, বটকৃষ্ণ পালের ওষুধের দোকানে। গিয়ে কম্পাউণ্ডারকে বললে---সকালে যে অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলাম, সেই ওষুধ-গুলি দিন।

কম্পাউণ্ডার বললে---সব তৈরী করে রেখেছি। ভিতরে এসো, বড়কর্তার কাছে সব গুছানো রয়েছে।

কার্তিক গেল ভিতরে। বৃদ্ধ বটকৃষ্ণ-বাবুর কাছে তাকে নিয়ে কর্মচারীটি বললে---এই ছেলেটিই ওই ওষুধগুলি অর্ডার করে গিয়েছিল, এখন নিতে এসেছে।

বটকৃষ্ণবাবু বললেন---বোসো বাবা, বোসো। তোমার নাম কি, পিতার নাম কি। কোথায় থাকো? কি করো? তোমার পিতা কি কাজ করেন?

পয়সা দিয়ে জিনিস সওদা করতে এসে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ভাবে নি কার্তিক। মনে মনে বিরক্ত হলেও বয়স্ক লোকের সুমুখে তা প্রকাশ করা সে যুগে নীতিবিরুদ্ধ ছিল। তখন পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হলে বয়স্ক ব্যক্তিরা অপরিচিত অল্প-বয়স্কদেরও নাম-ধাম-পিতৃপরিচয় শুধোতেন। সেটাই ছিল রীতি। কার্তিক তাই জবাব দিল সব প্রশ্নের

বড়কর্তা এবার জিজ্ঞাসা করলেন---তুমি মেডিক্যাল কলেজে পড়ো, ছাত্র, তা এসব কেমিক্যালস্ নিয়ে কি করবে?

কার্তিক বললে---এক্সপেরিমেণ্ট করব। কেমিস্ট্রি বইতে যা পড়ি বাড়িতে তা হাতে-কলমে করে দেখব।

খুব ভালো, খুব ভালো। তা এগুলি তুমি নিয়ে যাও, এর আর দাম দিতে হবে না। আবার যখন লাগবে, আবার এসে নিয়ে যেও। তোমার দাম দিতে হবে না।

পয়সাকড়ির সচ্ছলতা ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে অকারণে এক-জনের দান হাত পেতে নেওয়া ভালো লাগে না কার্তিকের। সে মাথা নেড়ে বললে---দাম না নিলে আমি জিনিসগুলি নিতে পারব না।

বটকৃষ্ণবাবু হেসে বললেন,---তাতে কোন অপরাধ হবে না হে বাপু। মনে কোরো না এটা আমি অকারণে তোমায় দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আরো দিতে চাইছি। এতখানি বয়স হল, কোনও ছাত্রকে কখনও এভাবে কেমি-ক্যালস্ কিনে এক্সপেরিমেণ্ট করে কেমিস্ট্রি পড়তে দেখি নি। আমার তো মনে হচ্ছে, তোমার ডাক্তারি পড়া সার্থক হবে। আর ডাক্তারি পাশ করেই তুমি সোজা চলে আসবে আমার এই

ডাক্তারখানায়। তোমার জন্য চেম্বার তৈরী থাকবে। এখানে বসে তুমি রোগীর চিকিৎসা করবে---তার জন্য টাকা পাবে তো ?---এই কেমিক্যালসগুলি সেই খাতে মনে কর আগাম দিচ্ছি। এগুলি নাও, এতে কোন অপরাধ হবে না।

বৃদ্ধের এই মিষ্টভাষণে খুশী হয়ে কার্তিক শিশি ক'টি সেদিন নিয়ে গেল।

পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল, প্রথম বছরের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে কার্তিক। ছুটে গেল সে বনফিল্ড্‌স লেন-এ। বৃদ্ধ বড়কর্তাকে খবরটা বলতেই তাঁর চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে উঠল। তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন---আমি এ কথা আগেই বলেছিলাম। তুমি শাইন করবে, নিশ্চিত শাইন করবে।

তিনি ডাকলেন ভূতনাথকে, আলাপ করিয়ে দিলেন কার্তিকের সঙ্গে। বললেন,---ভূতি, এই ছেলেটিকে চিনে রাখ্‌, ও ডাক্তারি পড়ে। পাশ করামাত্র চলে আসবে আমাদের এই ফার্মাসীতে, বসবে আমাদের চেম্বারে। আমি ওকে কথা দিয়েছি।

শুধু প্রথম বছর নয়, প্রতি বছরের পরীক্ষায় ফার্স্ট হত সেই উৎসাহী ছাত্রটি। তারপর ফাইনাল এম-বিতেও য়ুনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েছিল, পেয়েছিল অনেকগুলি বিষয়ে প্রথম হওয়ার গৌরব, একগাদা গোল্ড্‌ মেডাল ও বৃত্তি---এই সব। সেগুলি নিয়ে বাড়িতে দেখিয়ে সর্বাগ্রে গিয়েছিল সে বটকৃষ্ণবাবুর কাছে। তিনি সেই তরুণ ডাক্তারটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, নিজে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন একটি চেম্বারে। ভারতের সব সেরা ফার্মেসীর চেম্বারে পাশ করে বেরুবার প্রথম দিনেই বসলে ভারতের ভেষজ ও রসায়ন শিল্পের ভবিষ্যৎ জনক ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসু, এম-বি।

বটকৃষ্ণবাবুর ছেলে ভূতনাথের সঙ্গে সেদিনের সেই পরিচয় পরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তিনিই সহায় হয়েছিলেন কার্তিকের শিল্প-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে। ঐ ফার্মেসীতেই তৈরী হয়েছিল ভারতের সর্বপ্রথম পেটেন্ট্‌ মেডিসিন। সে সব কথা পরে বলছি। ছাত্র জীবনের দু-একটি ঘটনা আগে বলে নি', পরে হয়ত ভুলেই যাবো।

॥ পাঁচ ॥

মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল সে সময়েও রোগীদের চিকিৎসা এবং ডাক্তারীর ছাত্রদের হাত পাকাবার জন্য ব্যবহৃত হত। উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের হাসপাতালে ডিউটি পড়ত, রাতেও তদারক করতে হত রোগীদের। আর যে ওয়ার্ড যে ডাক্তার বা প্রফেসরের অধীনে থাকত তিনিও রাতে মাঝে মাঝে ওয়ার্ডে আসতেন, কোন রোগী কেমন আছে দেখতেন, রোগীর শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি হচ্ছে কি না তার তদারক করতেন।

কার্তিকের বই নেই, উপরের ক্লাসের ছাত্রদের বই চেয়ে নিয়ে সে পড়ে নিত। কারো কাছে হয়ত জুরিস-এর বইটা নিল, বেশ খানিকটা অগ্রিম পড়ে নিয়ে বইটা ফেরৎ দিল। ফলে ক্লাসে যখন ঐ বিষয় পড়ানো হত তখন সে ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারত, কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তাও জেনে নিতে পারত, আর কোনো প্রশ্ন তুললে তাও হত বেশ বুদ্ধিমানের প্রশ্ন। ফলে অধ্যাপকেরা তার উপর প্রসন্ন ছিলেন। এদিকে পরীক্ষাতেও সে ফার্স্ট হয়েছিল বলে অধ্যাপকদের দৃষ্টি স্বভাবতই তার উপর পড়েছিল।

কিন্তু বিধি বাম। একদিন এক সায়েব প্রফেসার গেলেন চটে। তখন মেডিক্যাল কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপক ছিলেন ইউরোপীয়। প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর বমফোর্ড ছিলেন যেমন পণ্ডিত তেমন রাশভারি। আবার ছাত্রদের কাছে করুণাময় বাপের মত।

যাক্‌। যে সায়েবটির কথা বলছি তিনি ছিলেন সার্জারির অধ্যাপক। তাঁর অধীনে হাসপাতালের যে ওয়ার্ডটি ছিল, একদিন রাতের বেলায় তিনি তা তদারক করতে এলেন। পাছে ডিউটিরত ছাত্রেরা নার্সেরা টের পায়, তাই সাহেব চুপিচুপি এসেছেন কে কি করছে দেখতে।

টানা বারান্দা, মাঝে মাঝে গ্যাসের মিটমিটে আলো। তখনও বিজলি বাতি আসে নি। সায়েব দেখতে পেলেন, বারান্দার শেষ দিকে একটি আলোর তলায় বসে কে একমনে একখানি বই পড়ছে। নিশ্চয় কোনও কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া ছাত্র পালিয়ে এসে রহস্য উপন্যাস পড়ছে---'লণ্ডন রহস্য' বা 'নীলবসনা সুন্দরী'।

চুপিচুপি পিছন থেকে এসে তিনি ছাত্রটির কাঁধে হাত রাখলেন। ঝপ্‌ করে বন্ধ করে ফেলে বইখানি লুকোবার চেষ্টা করল ছাত্রটি। কিন্তু লুকোনো গেল না। হাতে-নাতে ধরা পড়ল সে। সায়েবের জেরায় পড়ে বলতে বাধ্য হল, ছাত্রটি অপরের হয়ে প্রক্‌সি দিতে এসেছে হাসপাতালে। বিনিময়ে এই নিয়ে এসেছে অন্য ছাত্রটির এই বইখানি। রাতের অবকাশে পড়ে নিতে হবে যতটা পারা যায়---কারণ তার ফার্মাকোলজির বই নেই, বই কিনবার সামর্থ্যও নেই।

সাহেব বইখানা খুলে দেখেন, সত্যি। রাতজেগে ডিউটি থেকে পালিয়ে ছাত্রটি যে বইখানি পড়ছিল তা কোন রহস্য উপন্যাস নয়, কলেজের পাঠ্য, নিতান্ত নীরস ফার্মাকোলজির বই।

অবাক হলেন অধ্যাপক, এই গভীর রাতে যখন গোটা পৃথিবী নিদ্রামগ্ন, সকল রোগী অঘোরে ঘুমুচ্ছে, নার্সেরা ঘুমুচ্ছে, জমাদারেরা ঘুমুচ্ছে, তখনও জেগে আছে একটি তরুণ-বয়স্ক ছাত্র। তার চোখে ঘুম নেই। গভীর অভিনিবেশে, পরম নিষ্ঠায় সে পড়ে চলেছে তার কলেজের পাঠ্য, নোট করে নিচ্ছে---যা যা সে লিখে রাখতে চায়।

তিনি ছাত্রটিকে উৎসাহিত করে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

ছাত্রটি ভয়ে ভয়ে বললে---আমার নাম কার্তিকচন্দ্র বোস।

শ্বা-বৃত্তান্ত

সারমেয় প্রভুভক্ত। প্রভুকে সাধ্যমত সে খুশি করার চেষ্টা করে। দু'টি মূল ধারণা তাদের মাথায় আসে---প্রভু খুশি হয়েছে, না হয় নি। এর চেয়ে বেশি কিছু তাদের কাছ থেকে আশা করাই অন্যায়।

শ্বা-নন্দন-নন্দিনীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া দরকার। প্রথমে আদর, একবার তার আস্থা অর্জন করতে পারলে শিক্ষাদান বেশ সহজসাধ্য। খুশি মনে সে তখন কথা শোনার চেষ্টা করে।

অনেক পেশাদার শিক্ষাদাতার মত ছ'মাস বয়স থেকে শিক্ষাদান-পর্ব সুরু হওয়া উচিত। তার আগে নয়।

অন্য মতে মাস দুয়েকই এ ব্যাপারে আদর্শ বয়স। বিশেষত যদি গোটাকে শেষপর্যন্ত বাড়িতে রাখার পরিকল্পনা থাকে। সাধারণত সকলেই মোটামুটি মনে করেন একটু সকালসকালই শেখানো সুরু করলে সুফল মেলে।

এক বন্ধুর হবু স্ত্রী'র মতে তাঁর কুকুরটি পাক্কা শয়তানবিশেষ। জ্বালিয়ে মারে। তিনি নাকি ভাবছেন আগেভাগে চুক্তি করবেন বিবাহিত জীবনে তাদের বাড়িতে কুকুরের প্রবেশাধিকার থাকবে না।

তাঁর প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। তাঁর কুকুরটি সত্যি অত্যন্ত বেয়াড়া। কিছুতেই বাগ মানান যায় না। অশিক্ষিত কুকুরকেও অন্তত অন্যের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নজর রাখতে শেখান উচিত।

প্রথমত, তার নাম ধরে ডাকলে সাড়া দিতে এবং আসতে বললে, আসতে শেখান দরকার।

তারপর 'হ্যাঁ' আর 'না' শব্দ দু'টোর মানে তাকে বোঝানো প্রয়োজন।

তাছাড়া, তাকে বলামাত্র বসতে বা শুতে, কোনও জিনিস রক্ষা করতে এবং নড়তে না বলা পর্যন্ত স্থির থাকতে শেখান যায়। বহু কুকুরকেই এসব শিক্ষা সাফল্যের সংগে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তা নতুন পড়ুয়াদেরও দেওয়া খুব সম্ভব।

দরজা দিয়ে ঢোকার সময় কুকুর পেছনে থাকবে। এবং পা ভিজে থাকলে অপেক্ষা করবে মুছিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত।

আর একটি বদ্ অভ্যাস বহু কুকুরের আছে। অপরিচিত কাউকে দেখামাত্র গায়ের ওপর ওঠা। ধমক দিন---না, শুয়ে পড়, চুপচাপ বোস্। তারপর নরম গলায়---যাও, কিংবা এদিকে এসো।

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কুকুরকে সামনে এগোতে না দিয়ে বাঁ পাশে চলতে দেয়া। এবং আদেশ পাওয়ামাত্র সে হবে একপায়ে খাড়া।

যদি সে আগে আগে ছুটতে চায় ত টেনে পেছনে আনা দরকার, দৃঢ়ভাবে। তবে, শান্ত মেজাজে। হেঁচকা মেরে নয়, রূঢ়ভাবে নয়। মেজাজ বিগড়োলেই কুকুর হতভম্ব হয়ে পড়বে, কুঁকড়ে যাবে ভয়ে।

দরজায় আওয়াজ হলে, বা ঘণ্টা বাজলে কলার ধরে কুকুরকে দরজার কাছে নেওয়া উচিত। তবে, বন্ধুস্থানীয় কেউ এলে বসার পর পরিচয় করিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তার আগে নয়।

অপরিচিত কেউ এলে কুকুর হাতে ধরা থাক্, পরিচয় করানর কোনও প্রয়োজন নেই। গায়েপড়া ভাব দেখালে কুকুরকে সংযত করা দরকার। যথাসময়ে সে আপনি বুঝবে তার কাছ থেকে কী চাওয়া হচ্ছে, এবং অপরিচিত কাউকে দেখলে সাবধান করে দেবে।

কুকুর মানুষের অন্যতম সেরা বন্ধু। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে উপযুক্ত ক'রে নিলে সে আমাদের সেবা অনেক ভালভাবে করতে পারে।

অ'---যু আর দ্যাট বোস হু স্টুড ফার্স্ট দিস্ ইয়ার ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার।

মাথা নেড়ে স্বীকার করলে কাতিক।

সি মি টুমরো, মাই বয়। আই হ্যাভ টু টক টু য়ু'।

পরদিন দুরু দুরু বক্ষে গেল কাতিক সেই অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি তাকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, বললেন---প্রিন্সিপ্যালকে বলেছি তোমার কথা। তিনি খুব খুশী হয়েছেন তোমার চেষ্টায়। তুমি খুব যত্ন করে পড়ো। আমি

সার্জন করে তুলব। তৈরী করব তোমায় ভালো চক্ষু-চিকিৎসক করে।

এই যে কি দৃষ্টি পড়ল অধ্যাপকের। কাতিক বছর বছর ফার্স্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত এম-বি পরীক্ষাতে শুধু য়ুনিভার্সিটির মধ্যে ফার্স্ট হল তাই নয়, ফার্স্ট হল সার্জারিতেও। আর যেদিন সে পরীক্ষার ফল জেনে বেরুল সেইদিনই ঐ অধ্যাপকের অধীনে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে চক্ষু বিভাগ---আই ইনফারমারিতে চাকুরীতে নিযুক্ত হল। সেই অধ্যাপক তাঁর প্রিয় ছাত্রকে

করিয়ে দিতেন। রোগী দেখতে নিজে গেলে সঙ্গে নিয়ে যেতেন তরুণ ডাক্তার বোসকে, পুনর্বার যাওয়ার প্রয়োজন হলে নিজে না গিয়ে ছাত্রকেই পাঠাতেন। এইভাবেই অচিরকাল মধ্যে কলকাতার ধনী-পরিবারগৃহসমূহে তরুণ ডাক্তারের পাকা ঘর হয়ে গেল অনেকগুলি। তার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক কলকাতায় থাকতে থাকতেই কাতিককে কলকাতায় একজন সেরা চক্ষু-চিকিৎসকরূপে খ্যাতিমান করে তুলেছিলেন।

প্রেম-কলা

প্রেম একটি কলা বিশেষ। সংস্কৃত সাহিত্য এবং শাস্ত্রে শিক্ষিত এবং মার্জিত নরনারীর পক্ষে কয়েকটা অবশ্য শিক্ষণীয় বিদ্যাকে কলাবিদ্যা বলা হয়। বাল্মীকি, বামন, মাঘ, ভবভূতি, দণ্ডী প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা এবং 'কামসূত্র' রচয়িতা বাৎস্যায়ন তাঁহাদের গ্রন্থে 'কলা' শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন একাধিকবার। শেষ জন এবং ভাগবত-রচয়িতার মতে কলার সংখ্যা ৬৪। বুদ্ধজীবনী 'ললিত বিস্তর' গ্রন্থে ৮৬টির কথা লিখিত, যদিচ উল্লেখ মাত্র ৬৪টির। জৈন গ্রন্থে ৭২টি কলার উল্লেখ আছে। কামসূত্র গ্রন্থের টীকাকার যশোধর-এর মতে কলার সংখ্যা ৫১৮। 'পুরুষ-কলা' এবং 'স্ত্রী-কলা'---কলার দুইটি মূল ভাগ।

এর মধ্যে কাম-কলা (বা প্রেম-কলা) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষণীয়। বাৎস্যায়ন ছাড়া পঞ্চাল, যশোধর, কল্যাণমল্ল প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতরা এ বিষয়ে বই লিখেছিলেন।

সে যুগের অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান ওই সব বইতে প্রতিফলিত। কিন্তু,

এ-যুগের আলোচনার সংগে তার কারণগত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট---তাঁরা এবং আজকের পণ্ডিতরা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে মোটামুটি অজ্ঞ (অন্য বিষয়ে তার যতই পাণ্ডিত্য থাকুক না কেন), এবং এই অজ্ঞতা কেবল তাদের দাম্পত্য-জীবনকে বিপন্ন করে না, একটু ভাবলেই ধরা পড়ে এর প্রভাব তাদের পরিবার এবং ক্রমে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে অশান্তি আনে। সুতরাং যৌন-জীবনকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিলে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে সুখ এবং শান্তি আসে না, অসংখ্য দম্পতির এই তৃপ্ত মনোভাবের সুদূরপ্রসারী সামাজিক সুফল থাকতে বাধ্য। কি ভাবে তা সম্ভব সেই পথ-নির্দেশই বাৎস্যায়ন থেকে হ্যাভলক এলিস, মেরী স্টোপস্ থেকে আজকের গন্য পাশ করা যৌন বিশেষজ্ঞ---সকলের একমাত্র ব্রত।

এই ব্রতোদ্‌যাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, যন্ত্র-সভ্যতা, প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার জটিলতা বাড়ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে মানসিক জটিলতা। যেহেতু যৌনতা মানব-জীবনের একটা তীব্রতম এবং প্রায় সমগ্র জীবনব্যাপী অনুভূতি, যৌন জীবনের তৃপ্তির মূল্যও তাই অপরিসীম।

প্রাচীন কামশাস্ত্রকারদের মত নবীন যৌন বিশেষজ্ঞও তাই বলছেন প্রেম একটি কলাবিশেষ। জীবন ভরে তুলতে আর পাঁচটা বিষয় মানুষ যেমন যত্ন ক'রে শেখে, বহু কষ্ট আর পরিশ্রমে আয়ত্ত করে নানা বিদ্যা, ঠিক তেমনই যৌনজীবনযাপন বিদ্যা শিক্ষা এবং অভ্যাস সাপেক্ষ। এ-শিক্ষা কেবল দেহ-ক্ষুধা মেটানর পন্থামাত্র ভাবা সম্পূর্ণ ভুল, মানসিক তৃপ্তি---যা যে-কোন সুখী এবং সৃষ্টিশীল জীবনের প্রাথমিক সর্ত---যৌনতৃপ্তির অবিচ্ছেদ্য ফল।

অসংখ্য স্বামী আজ স্ত্রীর দৈহিক এবং মানসিক চাহিদার কথা না জানায় ভুল করছেন বারবার, এবং তাদের দাম্পত্য-জীবনে অতৃপ্তির রেশ ক্রমেই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। সুখের লাগিয়া তাদেরও পীরিতি, কিন্তু দুঃখ আর তাদের ঠাঁই ছাড়া হয় না কোনমতেই।

এর একটা প্রধান কারণ তাদের আত্মতৃপ্তি নিয়েই মগ্নতা। স্ত্রীর যৌন-তৃপ্তির কথা তারা খুব একটা তলিয়ে ভাবেন না, বা ভাবতে অক্ষম। প্রাকৃতিক কারিকুরিতে পুরুষের চরম পুলকলাভ মিনিটখানেক সময় সাপেক্ষ হওয়াও অসম্ভব নয়। অথচ, নারীর চরম পুলক লাভ রীতিমত দুরূহ। তা কেবল দৈহিক উত্তেজনাসাপেক্ষ নয়, মানসিক প্রস্তুতি সাপেক্ষও বটে। এবং এজন্য স্বামীর তরফে ধৈর্য এবং সহানুভূতি অতি প্রয়োজনীয়। অধিকাংশ পুরুষের কাছে যৌনতা নারীর সংগে দৈহিক মিলন মাত্র। নারীর কাছে তা দেহ এবং আত্মার

সংযোগ। তার ভালবাসার জনের সামগ্রিক প্রেম-চেতনার চরম প্রকাশ।

একাধিক যৌন-বিশেষজ্ঞর মতে যৌন-অতৃপ্তি আজ লক্ষ লক্ষ স্ত্রীর জীবনে ছায়া ফেলেছে, এবং এর মূল কারণ স্বামীদের অপর্যাপ্ত যৌন শিক্ষা

সব থেকে দুঃখের কথা কেউ কেউ শিখতে গররাজি। জানি না বলতে তাদের আত্মসম্মানে লাগে। অথচ, শিক্ষিত পুরুষেরও এ বিষয়ে আরও জানার চেষ্টা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কেউ যখন গান শেখেন তখন নৈপুণ্য অর্জনে তাঁর অনলস প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। কোন বাদ্যযন্ত্র আয়ত্ত করা, কিংবা অন্য কোনও শিল্প বা খেলা শেখার ক্ষেত্রেও তা সত্যি। নাচের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি। স্বামী-স্ত্রীকে বলা চলে দ্বৈত-সঙ্গীত গায়ক-গায়িকা, কিংবা যুগ্ম নৃত্যশিল্পী। শিক্ষায় তাদের অনুরাগ যত গভীর হবে, প্রচেষ্টা হবে যত আন্তরিক, নৈপুণ্যও বাড়বে সেই মাত্রায়। তাদের যৌথ যৌনজীবন ততই ভরে উঠবে সুসম ছন্দ আর তালে।

দু'-একজন হয়ত এমনিই সক্ষম, কিন্তু অধিকাংশ পুরুষেরই অর্জিত বিদ্যার মূলধন অবশ্য প্রয়োজন। প্রয়োজন অধিকতর সুখী দাম্পত্য-জীবন আর যৌন-জীবন যাপনের জন্য।

যৌনতা অর্থ নিছক মিলন নয়। প্রত্যেক মানুষই এর স্বাদ আপনা হতে পায়।

সার্থক প্রেম-কলা স্বামী-স্ত্রীর যৌন-জীবনে সামঞ্জস্য আনে, ফলতঃ তাদের গোটা দাম্পত্য-জীবন সুসম হয়ে ওঠে। শিক্ষিত স্বামী চেষ্টা করে স্ত্রীকে যৌনজীবনে সুখী করতে। সাধারণত তার ভূমিকা আক্রমণাত্মক, স্ত্রীর রক্ষণমূলক। কিন্তু, সার্থক যৌন-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত সক্রিয় উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। যৌনবিদ্যায় শিক্ষিতা স্ত্রী সক্রিয় হনও, এতে তার ইচ্ছা এবং সহযোগিতা প্রকাশ পায়, যৌনক্রীড়া সাফল্য লাভ করে।

অনেক স্বামী বড় বেশি মাত্রায় ধীর। আধুনিক শিক্ষার একটা কুফল যে তা পুরুষকে মৃদুস্বভাবী ক'রে তোলে। স্ত্রীদের এটা একটা প্রধান অভিযোগ। যৌনজীবনে অসাফল্যের এটা একটা কারণ, এর মূলে যৌন-শিক্ষার অভাব এবং দৈহিক পবিত্রতা সম্বন্ধে এক ধরণের যুক্তিহীন মানসিক বিলাস সক্রিয়।

তা বলে গুহাবাসী আদি মানবের কায়দাও আর চলে না। কেউ কেউ ভাবেন স্ত্রী বুঝি দৈহিক নির্যাতন পছন্দ করেন, ধর্ষিত হওয়ার ইচ্ছা তাদের প্রবল।

আর একদল কাঁচা উপন্যাস বা ছায়াছবির নায়কের ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নায়িকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে চুম্বনে উৎসাহী। কিন্তু এই নকলনবিশী নিতান্তই ম্যাড়মেড়ে। ফলে, তার ভালবাসার পাত্রী কেবল অপ্রয়োজনীয় কষ্ট পায়। কেউ কেউ দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে সঙ্গিনীর দম বন্ধ করার উপক্রম করেন। পুরুষ হওয়া এক, রূঢ় বা কর্কশ হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যে স্বামী নিয়মিত চটপট্ নিজের যৌনপুলক লাভ করেন স্ত্রীকে অতৃপ্ত রেখে, তিনি মিলনরীতি সম্পর্কে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। এটি এক ধরণের যৌন অসুস্থতা। এর চিকিৎসা দরকার।

কোন কোন স্বামী আবার অতি মাত্রায় যৌন-আদর করার দোষে দুষ্ট। নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় যৌন মিলনের চেষ্টাও এরই মত প্রায়ই সুফলপ্রসূ হয় না।

উল্টো পক্ষে, অনেকে মিলনের আগে পর্যাপ্ত যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি দ্বারা স্ত্রীকে দেহে ও মনে মিলনের উপযোগী ক'রে তুলতে অপারগ।

এটি খুবই জরুরী। এবং সাবধানে করা দরকার। এমনভাবে শৃংগার করা উচিত যাতে স্ত্রীর মনে না হয় তিনি কেবল যৌন-সংগী, তার ব্যক্তিত্ব যেন স্বীকৃতি পেয়ে তৃপ্ত হয় শৃংগারাদি প্রাক্-মিলন যৌনকলা চর্চায়।

স্ত্রীদের ওষ্ঠ, স্তন, স্তনবৃন্ত, উরু, ভগদেশ, ক্লিটরিস্, এবং মিলন-পথ অত্যন্ত সংবেদনশীল। মিলনের আগে স্বামীর অবশ্য কর্তব্য উপযুক্ত অংগ-গুলোর এক বা একাধিক ব্যবহার ক'রে স্ত্রীকে মিলনমুখী ক'রে তোলা।

সর্বোপরি, যৌন মিলন যেন কখনও ছকে বাঁধা একটা প্রাত্যহিক কর্মে রূপান্তরিত না হয়ে ওঠে। যৌন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তিযুক্ত কোনও কিছুই সুখী দম্পতীর যৌন-জীবনে অস্বাভাবিক নয়, যদি শয়ন-কক্ষের নির্জনতায় তা পারস্পরিক তৃপ্তি এবং আনন্দজনক হয়ে ওঠে।

মিলনের পরেই কোন কোন স্বামী পাশ ফিরে ঘুম লাগান। এটা ঠিক নয়। মিলনান্তে পারস্পরিক প্রেম-বিনিময় এবং মধুর আলাপ স্ত্রীরা পছন্দ করেন।

সাবধানতা অন্য আর একটি ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। পুরুষের উত্তেজনা সহজেই আসে। বারবার। স্ত্রীদের নয়। সুতরাং উত্তেজিত হলেই স্ত্রী-সংগ কামনা দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি ঘনিয়ে তুলতে পারে।

সব শেষে উল্লেখ করা উচিত এ-ব্যাপারে এমন কোন বাঁধাধরা 'নিয়ম' নেই যা সর্ব অশান্তিহর। যে-সব অসুবিধা দম্পতীর যৌন-জীবনে আসে তার আলোচনা করার উদ্দেশ্য—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদের ত্রুটি বুঝতে এবং ত্রুটিমুক্ত হতে সাহায্য করা। কোনও দু'জন মানুষ একই অবস্থায় কখনও একভাবে সাড়া দেন না। দিতে পারেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকার সুখী সম্পর্ক গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ উপায় পারস্পরিক ভালবাসা, যা ত্রুটি সম্বন্ধে মৃদুকণ্ঠ সচেতক, এবং গুণ সম্বন্ধে প্রশংসামুখর। সব সময় দু'জনেরই মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, দাম্পত্য-জীবন দীর্ঘস্থায়ী, এখন এটা বা তখন সেটা নিয়ে কখনও অশান্তি ডেকে আনতে নেই। দু'জন দু'জনের প্রতি

বিশৃঙ্খল হলে, পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করলে দাম্পত্যসুখ আসবেই।

প্রেম-কলা সম্পর্কে শেষ কথা (এখনও পর্যন্ত) এই যে, স্বামীর সুখ স্ত্রী-নির্ভর, এবং স্ত্রীর সুখও স্বামীর সুখ-নির্ভর। এবং এজন্য দরকার:

১। স্ত্রীর যৌন সাড়া স্বামীর বিবেচনা করা উচিত। স্ত্রী সুখী হলে তার সুখও প্রতীয়মান হতে বাধ্য।

২। কামজ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীও স্বামীর সংগে সহযোগিতা করবেন। তার প্রেম-কলায় পারদর্শিতা সম্বন্ধে সাবধানে মন্তব্য করবেন। কেন না, তার মন্তব্য স্বামীর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তিনি স্বামীকে সার্থক হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করলে স্বামীও আপ্রাণ চেষ্টা করবেন ঐ খ্যাতি বজায় রাখতে।

৩। এজন্য উভয়ের যৌন-শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষিত দম্পতী অপরিসীম যৌনসুখ উপভোগ করতে সক্ষম।

৪। দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা, শয়ন-কক্ষে অপ্রীতিকর আলোচনা বর্জনীয়। ভয়, লজ্জা বা অপরাধবোধ থেকে মানসিক মুক্তি প্রয়োজনীয়।

৫। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকাও জরুরী। ভালবাসার মতন ভালবাসায় নিষ্ঠুরতা, অশ্রদ্ধা, বা ঈর্ষার কোন স্থান নেই।

সুসম, ছন্দোময় যৌনজীবন উন্নততর জীবনের অভ্রান্ত ভিত্তি, বিবাহিত জীবনের ভালবাসা এবং সুখ লাভের নিশ্চিত উপায়।

—কল্যাণমল্ল

উত্তরাধিকার এবং যৌনজ্ঞান

যৌনতা সম্পর্কে কয়েক শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা আজও মোটামুটি জনসমর্থিত, এবং ফলে অসংখ্য মানুষের জীবনে অকারণ অসুখের ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষত জন্মবিজ্ঞান---উত্তরাধিকার নির্ণয় যে বিজ্ঞান শাখার কাজ---অধুনা এই সব ভুল ধারণার কিছু কিছু সংশোধন করেছে।

উদাহরণ স্বরূপ 'পুরুষের সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব'র ধারণাটি নেওয়া যাক্। এর ফলেই চিরকাল মানুষ---স্বয়ং জননীরা পর্যন্ত---পুত্র সন্তান চেয়েছে। মনুর বচন—কন্যাও পুত্রসম পালনীয়—বিশেষ কাজে আসে নি। কোনও কোনও সমাজে পুত্র সন্তান না জন্মানর 'অপরাধ' ছিল অমার্জনীয়, বিবাহ-বিচ্ছেদ বা স্ত্রীকে বাপের বাড়ি অসম্মান করে পাঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত হত এর শাস্তিস্বরূপ।

এমন কি, য়ুরোপ, আমেরিকা, ভারতবর্ষ ইত্যাদি মহাদেশও দেশে আজও প্রথম সন্তান পুত্র না হলে স্ত্রীকে 'দায়ী' করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে নিন্দাবাদ-মুখরও হয়ে ওঠে। সন্তানের লিংগর ব্যাপারে পুরুষের হতাশা স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত মনোভাবের মধ্য দিয়ে যে আত্ম-প্রকাশ করার প্রবণতা সম্পন্ন, তাতে সন্দেহ নেই। ফলত, হাজার হাজার দম্পতির জীবনে অহেতুক অসুখ গেড়ে বসেছে এবং অসংখ্য মহিলার মানসিক স্বাস্থ্য গোল্লায় গেছে।

এ-সম্পর্কে আজও যারা এই পুরনো এবং অ-বৈজ্ঞানিক ধারণার দাস, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানিতে, তথ্য জানলে তারা নিশ্চয় সুফল লাভ করবেন। তারা জানবেন যে বাবাই প্রকৃতপক্ষে সন্তানের লিংগনির্ধারক---যদিও লিংগ বেছে নেওয়ার ক্ষমতা তারও নেই। এই জন্মবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এবার আমরা 'উত্তরাধিকার' সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু জেনে নেবো।

আমরা জানি, জননীর ডিম্বকোষ থেকে নির্গত একটা অতি ক্ষুদ্র ডিম্বে পিতার শুক্রকীট প্রবিষ্ট হলে জন্মের সূচনা। মায়ের জরায়ুতে তার পুষ্টি এবং বিবর্ধন। একটা আলপিনের সূঁচলো ডগার চেয়েও ডিম্বটি অনেক ছোট, আর শুক্রকীটের আকৃতি এক ইঞ্চির চারশ' ভাগের এক ভাগ, এর নিউক্লিয়াস-এর পরিধি এক ইঞ্চির ১৯২।১,০০০,০০০ ভাগ।

প্রত্যেকটার মধ্যে চব্বিশটি ক্রোমোসোম থাকে। এগুলো আকারে দণ্ডবৎ। 'ক্রোমোসোম' শব্দার্থ রঙিন শরীর---ক্রোমো—রং, সোমা—শরীর। রং করলেই কেবল অণুবীক্ষণে এগুলো দেখা যায় বলে এদের ঐ নাম।

মায়ের এবং বাবার ক্রোমো-সোমগুলো A থেকে X পর্যন্ত নামাঙ্কিত দু'জনেরই হুবহু এক—কেবল একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাড়া। বাবার ২৪নং ক্রোমোসোম দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব হতে পারে।

দীর্ঘ হলে নাম হয় X, মায়ের চব্বিশ নং ক্রোমোসোম-এর মত। হ্রস্ব হলে বলা হয় Y। প্রত্যেক বাবা X ক্রোমোসোম এবং XY ক্রোমোসোম-সম্পন্ন শুক্রকীট উৎপাদন করেন সমান সংখ্যায়। মায়েরা কেবলমাত্র ক্রোমোসোম-সম্পন্ন ডিম্ব উৎপাদনক্ষম।

ডিম্বটি উর্বর হলে বাবার শুক্র-কীটের ক্রোমোসোমগুলো মায়ের গুলোর সঙ্গে ডিম্বে সমতা স্থাপন করে—AA, BB, CC ইত্যাদি হতে হতে চব্বিশসংখ্যক পর্যন্ত। এই চব্বিশ সংখ্যকটিকে বলা হয় যৌন ক্রোমো-সোম, কেন না এরাই ঠিক করে সন্তানের লিংগ।

মনে রাখা দরকার X এবং Y সম্পন্ন ক্রোমোসোম সংখ্যায় সমান। যদি উর্বর-কারী শুক্রকীট ক্রোমোসোমবাহী হয় ও ডিম্বর X টির সঙ্গে মিলিত হয়ে জোড় বেঁধে কন্যা সন্তানের জন্ম দেবে। উর্বরকারী শুক্রকীট Y ক্রোমোসোম থাকলে ডিম্বর X-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে XY জোড় বেঁধে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়।

এইভাবে জন্ম-বিজ্ঞানের আবিষ্কার

থেকে আমরা জানতে পারি—ছেলে বা মেয়ে হওয়া ঘটনাচক্র বই নয়, সুতরাং ছেলে হওয়ার 'গুণ' বা মেয়ে হওয়ার 'দোষ' বাবা কিংবা মা কারোরই নয়।

কখনও কখনও দেখা যায় কোন কোন পরিবারে কেবলমাত্র ছেলে বা পরপর মেয়ে হচ্ছে। সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী একই ঘটনার আবর্তনে এরকম হয়। কিন্তু বড় পরিবারে শুধু ছেলে বা মেয়ে হলে তার পেছনে জন্ম-বিজ্ঞানের আর একটি সূত্র সক্রিয়।

অদ্ভুত মনে হলেও একথা সত্যি যে, ডিম্বর উর্বরীকৃত হওয়ার মুহূর্ত থেকে শিশুর জন্ম পর্যন্ত এবং তার পরেও মেয়েদের টিঁকে থাকার সম্ভাবনা ছেলেদের তুলনায় বেশি। জীববিজ্ঞানের দিক থেকে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। সুতরাং মায়ের স্বাস্থ্য আর তাঁর গর্ভের যে পরিবেশে ভ্রূণ বেড়ে ওঠে তার ওপর উর্বরীকৃত ডিম্বর পুত্র বা কন্যারূপে টিঁকে থাকা নির্ভরশীল।

একইভাবে বলা যায় বাবার X এবং Y ক্রোমোসোম সমসংখ্যক হলেও দু'টোর একটা হয়ত অধিকতর সক্রিয়, ফলে সেটাই প্রতিবার ডিম্ব উর্বর করে এবং ফলে পরপর পুত্র বা কন্যা জন্মায়।

এখনও পর্যন্ত গর্ভস্থ পরিবেশ আর শুক্রকীটের গতিবিধি সংক্রান্ত খবর কিছুটা তাত্ত্বিক, কিন্তু এসব হলে মূলে 'জীন' -এর প্রভাব সক্রিয়। 'জীন'গুলোই আমাদের উত্তরাধিকার-নিয়ন্ত্রক—ঠোঁট বা নাকের আকৃতি, চুলের রং আর ধরণ, চোখের রং, ন্যাটা হওয়া বা না হওয়া, হাঁপানী, কৃমি 'হে ফিভার' ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা—এইসব 'জীন'-নির্ভর।

'জীন' কি? মা এবং বাবার চব্বিশটা ক'রে ক্রোমোসোম। প্রত্যেকটা মালার মটরদানার মত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমবায়। জীবনের সূচনায় সুতরাং আটচল্লিশটা ক্রোমোসোম চব্বিশটা জোড়ায় থাকে, কেবল চব্বিশ নম্বরটা হয় XX কিংবা XY এবং প্রত্যেকটা ক্রোমোসোম অসংখ্য 'জীন' দিয়ে তৈরী।
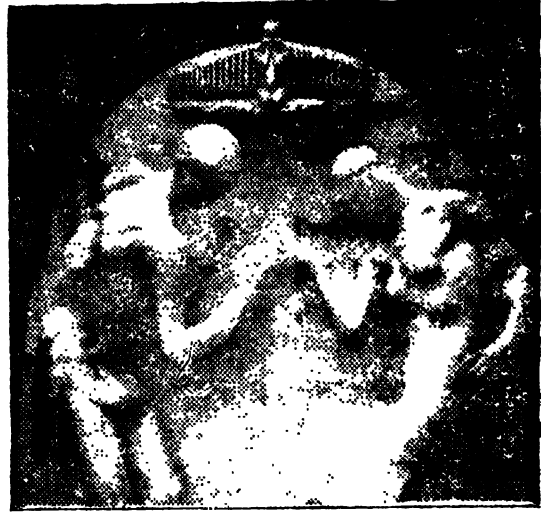
'পরিবার'—ইতালীয় ভাস্কর্য। পুরুষটির কোমরে অস্থানি ইঙ্গিত দিচ্ছে সফল পিতৃত্বের

ডিম্ব বিভক্ত হয়ে নতুন 'সেল' বা কোষ তৈরী সুরু করলে এই 'জীন'-গুলো বেড়ে খুব দ্রুত বহুগুণিত হতে থাকে, এবং প্রত্যেকটা নতুন কোষ মূল চব্বিশটা ক্রোমোসোম জোড়ার এবং তন্মধ্যস্থ 'জীন'গুলোর হুবহু নকল।

কোটি কোটি কোষসমন্বিত মানব-দেহ গড়ে ওঠে কোষবিভাজন এবং 'জীন'-এর বহুগুণিত হওয়ার সংগে সংগে; কিন্তু 'উত্তরাধিকার প্রবণতা' মূল চব্বিশ জোড়া ক্রোমোসোম-নির্ভর, এবং যে 'জীন'গুলো ক্রোমোসোম তৈরী করে বাবা-মা থেকে—মোট চল্লিশ থেকে ষাট হাজার সেই 'জীন'-নির্ভর।

বাবা এবং মা উভয়েই সন্তানের উত্তরাধিকার নির্মাণে প্রতিনিধিত্বকারী—এ মন্তব্যর স্বপক্ষে যুক্তি আছে। সাধারণভাবে বলা যায়—এদের কোন একজনকেই সন্তানের উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ দুর্বলতা বা ত্রুটি এবং কৃতিত্বের জন্য দায়ী করা চলে না।

দ্বিতীয়ত, আমরা জৈবিক উত্তরাধিকারের সংগে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার গুলিয়ে ফেলি অনেক ক্ষেত্রে। চেষ্টা করলেই বোঝা যায়, যেগুলো আমরা জৈবিক ত্রুটি মনে করি তার অনেকগুলো আসলে স্বরূপে সাংস্কৃতিক—অর্থাৎ, সমাজ যা যেমন আশা করে তা ঠিক তেমন নয়।

একটি শিশুর ছবি নিয়ে এর উদাহরণ দেওয়া যায়। শিশুটির আশেপাশে ছড়ান খেলনা জাতীয় জিনিস দেখেই কেবল তার লিংগ অনুমান করা যায়। যেমন, ফুল এবং পুতুল পাশে ধরলে মনে হয় শিশুটি মেয়ে, বন্দুক ধরলেই ছেলে। কেন না, ফুল, পুতুল ইত্যাদি মেয়েলী বলে আমাদের সাংস্কৃতিক সংস্কার, বন্দুক আমাদের চোখে পৌরুষের প্রতীক।

এভাবে উত্তরাধিকার খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় অনেক যৌন সমস্যা সাংস্কৃতিক পরিবেশজ—যা শিক্ষার সাহায্যে পরিবর্তিত করা সম্ভব; এবং এও বোঝা সম্ভব যে, ওগুলো 'জন্মগত' নয়, ছেলে বা মেয়ে বলেই ওগুলো নিয়ে কেউ জন্মায় নি।

এই কারণেই আজকাল অনেক আধুনিক স্কুল যৌনজ্ঞান দিচ্ছে মানবিক উত্তরাধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান ভিত্তি ক'রে, চিরাচরিত স্বাস্থ্য, অ্যানাটমি বা শারীর বিদ্যার মাধ্যমে নয়।

—অনুবাদ

মেদিনীপুর

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোভিরাম। নদ-নদী, বৃক্ষ-লতাদি শৈলমালা ও বন-জঙ্গলাদি বিরাজিত যেমন এই জেলা, তেমনি অনন্ত নীল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলে এর পদ-চুম্বন করে যাচ্ছে সাগর।

এই জেলায় যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে তেমনি পশু, পাখী, সাপ মাছ প্রচুর। জঙ্গলে বাঘ, নেকড়ে, ভালুক, বনবরাহ, সজারু, উদ্, খট্টাশ, শিয়াল, বাঁদর, হনুমান, খরগোস প্রভৃতি বন্য-জন্তু অধ্যুষিত। সময় সময় বন্যহস্তীও ময়ূরভঞ্জ জঙ্গল থেকে আসে। নদীতে কুমীর, হাঙ্গর, শুশুক দেখা যায়। হরিণ, ময়ূর অনেক স্থানে আছে পাখীর মধ্যে টিয়া, ময়না, বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নানা প্রকারের আছে।

ধান এই জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। আগে এদেশে তুলা, নীল ও তুঁতের চাষ হত। এখন ওগুলো উঠে গেছে। একসময়ে রেশমের ব্যবসায় এখানে প্রচুর ছিল। আজকাল ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় কফি ও গোল আলুর চাষ যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। এ ছাড়া নারিকেল, সুপারি, আনারস, কলা প্রচুর পরিমাণে হয়। তরমুজের চাষও স্থানে স্থানে হয়। হিজলীর বালুকা-স্তূপের ওপর একরকম বাদাম ফলের গাছ হয় খেতে সুস্বাদু, তাকে হিজলী-বাদাম বলে। এই জেলার জঙ্গল অঞ্চলে শাল, পিয়াশাল, মহুল, কুসুম, পলাশ প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মে।

এছাড়া এদেশে মাদুর, কাঁসার ও পিতলের বাসন, তাঁতের কাপড় মাটির পাত্র, মশারির থান, স্টীলের ট্রাঙ্ক, বাতি প্রভৃতির ব্যবসা প্রচুর পরিমাণে হয়।

নদ-নদী এই জেলাকে শস্যশালিনী করেছে। এই জেলায় ৫টি প্রধান নদী—

(১) শিলাবতী বা শিলাই—এই নদী-টিতে বুড়ি, গোপা, পুরন্দর ও কুবাই নদী মিলিত হয়ে শিলাবতী নাম পেয়েছে। এই নদী রামগড় পাহাড় থেকে নেমে এসে বগড়ী পরগণার ভেতর দিয়ে, মহকুমার মধ্যে দিয়ে দারুকেশ্বর নদের সঙ্গে মিলেছে। পরে এই উভয় নদী নিজেদের নাম পরিত্যাগ করে রূপ-নারায়ণ নদ নাম গ্রহণ করে তমলুকের গেঁওখালী হয়ে হুগলী নদীর সঙ্গে মিলেছে।

(২) কাঁসাই বা কংসাবতী নদী—এই নদীটি ছোট নাগপুরের পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে এই জেলায় উত্তর-পশ্চিম কোণে রামগড়ের মধ্যে দিয়ে মেদিনীপুর শহরের নীচে গিয়ে পূর্ব-দিকে চলে আবার দক্ষিণমুখী হয়ে কেলেঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

(৩) কালীঘাই বা কেলেঘাই নদী—এই নদী জেলার পশ্চিম প্রান্ত থেকে এসে উত্তরে নারায়ণগড়, ময়না এবং দক্ষিণে ঘটনগর, পটাশপুর ও অমর্শি পরগণার ভেতর দিয়ে গেছে। পরে দক্ষিণ-বাহিনী কংসাবতীর সঙ্গে মিলিত হয়ে হলদী নদী নাম নিয়ে উত্তরে মহিষাদল ও সুতাহাটা এবং দক্ষিণে নন্দীগ্রামের মধ্যে দিয়ে হুগলী নদীর সঙ্গে মিলেছে।

(৪) সুবর্ণ রেখা—এই নদী ধল-ভূম প্রদেশ থেকে এসে এই জেলার দয়াবসান পরগণার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

(৫) বাগদা রসুলপুর নদী—এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বাগদা নদী নামে বেরিয়ে কালিনগরে বোরোজ (বর্তমান সদরখাল) নদীর সঙ্গে মিশে হুগলী নদীতে পড়েছে।

মেদিনীপুর জেলায় প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিদর্শন আছে। সেগুলি দেখলে মেদিনী-পুরের পূর্ব গরিমার ভগ্নস্তূপ বলে মনে হয়

গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত কিয়ার চাঁদে দু ফুট হতে চার ফুট উঁচু প্রায় হাজারটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়।

বগড়ী পরগণার কৃষ্ণরায় জীউ মন্দির, সম্ভবত: বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

গড়বেতার সর্বমঙ্গলা ও কামেশ্বর মন্দির। এই প্রস্তরনির্মিত সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরটি একটি প্রাচীন কীর্তি। কেহ কেহ বলে রাজা গজপতি সিংহ এর প্রতিষ্ঠাতা। কামেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি কতকাংশে সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের অনুরূপ।

খেলাড়গড়ের যুগলমূর্তি। খেলাড়-গড়টি নরাগ্রাম রাজ বংশের ২য় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের প্রতিষ্ঠিত। প্রস্তর নির্মিত সুবৃহৎ রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে গড়টির চারদিকে উঁচু পাঁচিল ও পরিখা। এখন রাজবাড়ী প্রস্তরস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই গড়ের ভেতর নীল পাথরে তৈরী একটি অশ্বপৃষ্ঠে একত্রে উপবিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তি আছে। সচরাচর এ রকম মূর্তি দেখা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—ওটি পারসীক বা শক প্রতিমূর্তি। তমলুকের বর্গভীমার মন্দির বহু প্রাচীন। সম্ভবত ময়ূরবংশীয় রাজা গরুড়ধ্বজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্য-পুরাণে আছে—'তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।'

কেশিয়াড়ী থানার প্রাচীন কীর্তির

মধ্যে সর্বমঙ্গলা দেবীর [illegible] উল্লেখযোগ্য ভবানীপুরের [illegible] মধ্যস্থলে সর্বমঙ্গলা মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি তিনটি অংশে বিভক্ত। সামনে প্রাঙ্গণ, তারপরে সিংহদ্বার, সিংহদ্বারের পর জগমোহন হতে দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। দেবী প্রস্তরনির্মিত। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে চক্রধর ভূঁইয়া নামে কোন জমিদার এই মন্দির তৈরী করেন। এর কারুকার্য চমৎকার।

দাঁতনে কিছুকাল বুদ্ধদন্ত ছিল। এই স্থানের নাম দন্তপুর—তা থেকেই দাঁতন হয়েছে।

দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এই স্থানের অন্যতম প্রাচীন কীর্তি। কতদিন পূর্বে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল তা এখন জানার উপায় নেই। জনশ্রুতি ভোজ নামে কোন রাজা এঁর প্রতিষ্ঠাতা।

মেদিনীপুরের বিভিন্ন অংশে কতক-গুলি জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনকালে এই জেলার ওপর যে জৈনধর্মের প্রভাব ছিল তা এই মূর্তি হতে জানা যায়। নেপুরায় (বনগার) ধনভূী নামে পরিচিত পার্শ্বনাথের মূর্তি। ভবজোড় গ্রামে কালা মদন নামে পরিচিত মূর্তিটি নিঃসন্দেহে পার্শ্বনাথের মূর্তি। সাতপাটা গ্রামে, মণ্ডলকুলি গ্রামে, লাউপাড়ায়, বলরাম-পুরে কতকগুলি জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মেদিনীপুরের ক্ষিতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মূর্তিগুলি আবিষ্কার করেছেন।

মেদিনীপুর জেলায় দুর্গ, গড় ও পরিখার চিহ্ন যত অধিক পরিমাণে দেখা যায়, বাঙলার আর কোনও জেলায় তত দেখতে পাওয়া যায় না। কয়েকটি গড়ের নাম দিলুম—

ময়নাগড়—ময়না রাজবংশের রাজা [illegible] একটি প্রাচীন কীর্তি। [illegible] গড় ও ভিতর গড় নামে দু' ভাগে বিভক্ত। ভিতর গড়ের পরিমাণ ৫৬২, ৫০০ বর্গফুট। তার চারদিকে যে পরিখা আছে, তার প্রত্যেক পাশের দৈর্ঘ্য ৭০০ ফুটের ওপর।

কর্ণগড়—এটিও প্রাচীন গড়। মেদিনীপুর শহরের উত্তরে তিন ক্রোশের মধ্যে।

চন্দ্রকোণার দ্বাদশদ্বারী গড় বা দুর্গ—এই বার-দুয়ারী দুর্গটি চন্দ্রকোণার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজবাটী ছিল।

নাড়াজোল গড়—দাসপুর থানার অন্তর্গত নাড়াজোল রাজবংশের রাজ-বাটী। এই গড়ের আয়তন ৫০০ বিঘা। বাহির গড় ও ভিতর গড় নামে দু ভাগ। এই রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে দুটি প্রশস্ত পরিখা এই দুই গড়ের চারদিক বেষ্টন আছে।

রামগড় বা লালগড়, চন্দ্ররেখা গড়, আনাস গড়, শীবসিংহের গড়, বলরামপুর গড়, কলাইকুণ্ডা গড়, গড় কিল্লা বা আলি শার গড়। গড়-বেতার রায়কোটা দুর্গ, বাহিদার দুর্গ, জামবনী গড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য এই গড়, মন্দির প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান অনেক কিংবদন্তী আছে।

১৬শ শতাব্দী থেকে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত মেদিনীপুর সাহিত্য ভাণ্ডারে বহু সম্পদ আহরণ করেছে। বৈষ্ণব কবি শ্যামানন্দ, রসিকানন্দ, গোপীজনবল্লভ, গোবর্ধন দাস, ভানুরাম দাস, দুঃখী-শ্যামাদাস, এঁরা বৈষ্ণব সাহিত্যকে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন। ভক্তকবি বাসু ঘোষ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবি-কঙ্কণ চণ্ডী', ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্ম-মঙ্গল', বলরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী', [illegible] চক্রবর্তীর 'ভাগবতের পদ্যানু-[illegible]', রামেশ্বরের 'শিবায়ন', নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল', দয়ারাম দাসের 'লক্ষ্মীচরিত্র', বাঙলার প্রাচীন সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

সঙ্গীত সাহিত্যে রামসুন্দর গঙ্গো-পাধ্যায়, গঙ্গাবিষ্ণু গঙ্গোপাধ্যায়, জগন্নাথ দাস, রমাপতি গঙ্গোপাধ্যায়, কৈলাসে-শ্বর বসু, মহিলা-কবি তারিণী দেবী, করুণাময়ী দেবী, কবি রামনারায়ণ ভাটের গান ও কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গদ্যসাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুরের গৌরব।

পরলোকগত সাহিত্যসেবীদের মধ্যে রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর, নীলকণ্ঠ মজুমদার, ঈশানচন্দ্র বসু, মনীষিনাথ বসু, ক্ষেত্রমোহন সিংহ দেবদাস করণ প্রমুখ মেদিনীপুরের সাহিত্য সম্পদকে বৃদ্ধি করেছেন।

মেদিনীপুরে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান বহু আছে, তন্মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরি-ষদের মেদিনীপুর শাখা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এখানে সাহিত্য সম্মেলনও বহুবার হয়েছে।

সাময়িকপত্রের অভাব মেদিনীপুরে ঘটে নি। 'মাধবী', 'মেদিনীপুর', 'হিজলী গার্ডিয়ান', 'মেদিনী', 'মেদিনী-বান্ধব', 'মেদিনীপুর হিতৈষী', 'নীহার', 'কাঁথি সমাচার', 'সত্যবাদী', 'মেদিনী-বাণী' প্রভৃতি সাময়িকপত্রিকাগুলি মেদিনীপুরের গৌরব।*

---

* এই প্রবন্ধ লিখতে বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়), মেদিনীপুরের ইতিহাস (যোগেশচন্দ্র বসু), তমলুকের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

রাজনীতি

রাজনীতিতে সত্যিকার প্রয়োজন ব্যবসায়ী—এর থেকে বৃহত্তর মিথ্যা প্রচার আর কিছু হতে পারে না। রাজনীতি একটা ব্যবসা ঠিকই—অন্তত এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন আর উপযোগিতা মেটাতে অভিজ্ঞতা খুবই কাজে আসে—এবং যে মানুষ সারা জীবন ধরে কোনও একটা ব্যবসা বেশ ভালভাবে গড়ে তুলেছেন, সাধারণত জনসাধারণের কাজ চালানর কাজে তিনি খুব দড় হন না।

—উইলিয়াম হাওয়ার্ড [illegible]।

তৃতীয় দৃশ্য

[পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কয়লার ঘর। দু'খানা বেঞ্চি একসঙ্গে পাশাপাশি জুড়ে তক্তপোষের মত করা। ক্লান্তদেহে প্রাণকেষ্ট ফিরে আসে এবং কয়লার ঘরে শোবার জন্য ঢুকে পড়ে। কোঁচার খুঁট দিয়ে একটু ঝেড়ে সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।]

প্রাণ। (আপন মনে বলে চলে) মানুষের সবচেয়ে কঠিন পীড়া হচ্ছে আত্মীয় পীড়া। নানা রকমের মারাত্মক বীজাণু আত্মীয়ের ছদ্মবেশে এসে বাসা বাঁধে। সহজে সারে না—সরে না---মেরে তারপর---

(খুট করে একটা শব্দ হয় এবং অণুর প্রবেশ)

অণু। আচ্ছা কি যা-তা বকে চলেছ তুমি।

প্রাণ। হ্যাঁ,—হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। এই ব্যায়রামের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে ব্যয় আছে, কিন্তু আরাম নেই। তা ছাড়া উপসর্গ অনেক---কোনটা কখন দেখা দেবে বলা কঠিন।

অণু। এসব কি বলছ তুমি, ওদের কানে যদি এসব কথা যায়---

প্রাণ। যায় যাবে তাতে বয়েই গেছে। উঃ। আত্মীয়দের মেরে ধরে তাড়ানো রীতি নয়---তাতে আত্মীয়তা থাকে না। অথচ এধারে আত্মরক্ষা ও আত্মীয়তা রক্ষা একবারে অসম্ভব।

অণু। বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন আসলেই তোমার পাগলামো শুরু হয়।

প্রাণ। সত্যি সত্যি পাগল হলেই বাঁচতাম। ----কিন্তু পাগল হওয়াটা কি সহজ? ইচ্ছে করলেই কি পাগল হওয়া যায়?

অণু। আচ্ছা তোমার হল কি?

প্রাণ। কিচ্ছু হয়নি। জান—পাগল হওয়াটা একরকমের দৈব ওষুধ---দৈবাৎ এক 'আধজন পাগল হয়।

অণু। কোন ওষুধ খেয়েছ নাকি?

শিবরাম চক্রবর্তী

প্রাণ। ওষুধ খেতে যাবো কেন? দাওয়াইটা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বটে, কিন্তু সবাই কি পায়? প্রাণকেষ্টর তেমন বরাত নয় বুঝলে?

অণু। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) এখন আমি কি করি।

প্রাণ। কি আবার করবে? আমার কিচ্ছু হয়নি। একা একা যে নিজের দুঃখের কথা নিজেই শুনবো তারও কি উপায় আছে। যাও যাও শুয়ে পড় গিয়ে।

অণু। বেশ, বেশ আমিই তো তোমার শত্রু—আমি যাই তুমি শান্তিতে থাক।

(অণুর প্রস্থান।

●

[প্রাণকেষ্ট শুয়ে পড়ে। আলো কমতে থাকে। শুয়ে স্বপ্ন দেখে কে একজন লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে।]

বিনিকেষ্ট। বাবা প্রাণকেষ্ট।

প্রাণ। হ্যাঁ। কে তুমি---কি বলছ?

বিনিকেষ্ট। তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম বুঝি?

প্রাণ। বিশ্রাম? না না, এমন কিছু বিশ্রাম নয়। অবিশ্রাম বলতে পার বরং— নিজের চোখেই তো দেখছ।

(দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ)

বিনিকেষ্ট। দেখলাম বলেই তো ছুটে এলাম। না এসে পারলাম না। তুমি যে সমস্যায় পীড়িত হচ্ছ তার ওষুধ আমার জানা আছে— সেই কথাই তোমাকে জানাতে এলাম। আমায় চিনতে পারছ কি?

প্রাণ। না তো।

বিনিকেষ্ট। কি করে চিনবে। তোমার জন্মাবার ঢের আগেই যে আমি পটল তুলেছি। আমি তোমার বেশ কয়েক পুরুষ আগেকার— তোমারই পূর্বপুরুষ। আমার নাম বিনিকেষ্ট। শ্রীবিনিকেষ্ট পাতিতুণ্ডি। আমি কোম্পানীর আমলের লোক।

প্রাণ। ও---তাই বলো। তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি, তো চিনব কি করে? কিন্তু সে কথা থাক, আমার এই আত্মীয় সঙ্কটের কি একটা ওষুধ তোমার আছে— বলছিলে না?

বিনিকেষ্ট। হ্যাঁ, সেই কথাই। আমার আত্মীয়েরা তোমার মত নয়— তারা আরো নিকটাত্মীয় ছিল। যার-পর-নাই আপনার—তাদের খপ্পর থেকে কি করে বাঁচলাম— সেই কথাই বলছি।

প্রাণ। বলো কি? তোমাদের সময়েও আত্মীয়ের হানা দিত নাকি? আমি তো জানতাম এসব ব্যাধি

আধুনিক সভ্যতার আমদানি। তখনো আত্মীয়রা ছিল---বটে?

বিনি। ছিল বলে ছিল! আমার বাবা তিনশো তেয়াত্তরটা বিয়ে করেছিলেন।

প্রাণ। হ্যাঁ ---, তিনশো তেয়াত্তরটা!

বিনি। হ্যাঁ, আর বড় জ্যাঠামশাই চারশো নিরানব্বইটা বিয়ে করতেই দেহরক্ষা করেন---পাঁচশো পূরো করে যেতে পারলেন না---এই দুঃখ নিয়ে ৯০ বছর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

প্রাণ। (অবাক হয়ে) হ্যাঁ!

বিনি। তারপর আমার মেজ---সেজ---ন---রাঙা---ছোট এইসব জ্যাঠা-আর খুড়োরা মিলে কতো যে বিয়ে করেছিলেন তার লেখা-জোখা নেই।

প্রাণ। অবাক কাণ্ড তো?

বিনি। এতে আর অবাক হবার কি আছে? তবে শোন---আমার সহোদর ভাই ছিল সাতজন---কিন্তু পৈত্রিক ভায়ের সংখ্যা এগারশো চুরাশী---এরা তো আত্মীয় নয়, আপনার ভাই---পরমাত্মীয়।

প্রাণ। বেশ---বেশ তারপর---

বিনি। তারসঙ্গে জেঠতুতো খুড়তুতো সব যোগ করে ক' হাজার দাঁড়িয়েছিল তা ধারণা করা যায় না। এইসব আত্মীয় এবং এদের আত্মীয়---এবং তাদের আত্মীয়দের আত্মীয়তা---এত ধাক্কা আমাকে সামলাতে হয়েছে---ঠ্যালা বোঝ!

প্রাণ। তা, এত আত্মীয় নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছিলে বোধ হয়?

বিনি। বিপদ? বিপদ বলে বিপদ। কোম্পানীর চাকুরি নিয়েছিলাম বলে আমার একটু উপরি রোজগার ছিল। তাই সবাই মিলে আমার স্কন্ধে এসে ভর করল।

প্রাণ। হ্যাঁ? কি বললে---

বিনি। হ্যাঁ, নিকট আত্মীয়, দূর-আত্মীয়, সুদূর আত্মীয়---কোন দূরাত্মাই বাদ দিল না। কেউ ছেড়ে কথা কইল না।

প্রাণ। কেউ বাদ দেয়নি তবে।

বিনি। তবে ভগবানের ভারী দয়া ছিল আমার ওপর---

প্রাণ। সে কি রকম?

বিনি। এক বছরের মড়কে আমার অনেক আত্মীয় খসে গেল---আরেকবার পদ্মার ভাঙনে তলিয়ে গেল কতকগুলো---আর আমার মেজ শালীকে টেনে নিয়ে গেল বাঘে---

প্রাণ। আহা; মহিমাকেও একটা বাঘে টেনে নিয়ে যেত যদি!---কিন্তু বাঘ কি আর আছে আজকাল?---এই কলিকালে?

বিনি। বাকী যারা রইল তারা নাছোড়-বান্দা। একেবারে যমের অরুচি। বাঘ-ভালুক কুমীর-টুমীর কেউ তাদের ছোঁয় না। কি করি?

প্রাণ। কি করলেন তখন তাদের নিয়ে?

বিনি। তখন করলাম কি; কোম্পানীর চা-বাগান খুলেছিল---সেই চা-বাগানে তাদের চালান করে দিলাম। ধরে ধরে নিয়ে জোড়া পিছু কুড়ি টাকা হিসেবে বেচে দিয়ে এলাম।

প্রাণ। হ্যাঁ, তাদের বেচে দিলেন? পাপ হবে না?

বিনি। পাপ আবার কিসে? আসলে ওরাই তো পাপবিশেষ---শাস্ত্রে আছে যত তাড়াতাড়ি পার পাপ বিদেয় কর। একটু কষাকষি করলে আরো কিছু দর উঠত জানি, কিন্তু কে অতো সবুর করে?

প্রাণ। কষাকষি করলে দাম বাড়ত তা বাড়ালেন না কেন?

বিনি। ওরা আমাকে এমন জ্বালিয়ে-ছিল যে অমন সব আত্মীয়দের দর বাড়াবার একটুও মেজাজ ছিল না---ভাবলাম আর অত আদরে কাজ নেই। কিসের এত গরজ? নগদ যা মেলে তাই লাভ।

প্রাণ। একটু ঝুঁকি নিলে আরো লাভ হতো। আহা আমিও যদি---

বিনি। কাজ নেই ঝুঁকি বয়ে। আত্মীয়দের ব্যবসা বইতো নয়। আর বলতে কি, আত্মীয়দের থেকে এত উপায়, এমন লাভ আমার জীবনে আর হয়নি। পাতিভুক্তি বংশে তো নয়ই।

প্রাণ। তাহলে আপনি পাতিভুক্তি বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলতে হয়?

বিনি। (গর্বভরে) হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আত্মীয়ের ব্যবসায় আমার মত কেউ লাভ করেনি। ভেবে দ্যাখো ১২০৲ টাকা হিসাবে ডজন---দু'শো টাকা করে কুড়ি---এই দরে যে কত ডজন কত কুড়ি বেচেছি তার ইয়ত্তা হয় না।

প্রাণ। আহা, আমিও যদি পারতুম। তাহলে নিরঞ্জন জোড়াটিকে বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু কিনবে কে? সে চা-বাগান কি আর আছে?

বিনি। কেন? চা-বাগান তো এখনো আছে।

প্রাণ। বাগান আছে ঠিকই---কিন্তু অমন করে বাগানো নেই। এখন কেনাবেচা করতে হয় না---এখন ওমনি থেকে লোক সেধে গিয়ে চা-বাগানের চাকুরি নেয়। সভ্যতা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের অসভ্যতা যেমন বেড়েছে, তেমনি অসুবিধাও বিস্তর।

বিনি। তা'হলে---তাহলে আমার ওষুধ তোমার কোনো কাজে লাগবে না মনে হচ্ছে।

[বিনিকেষ্টকে ম্রিয়মাণ দেখা যায়। এমন সময় খড়ম খট্‌খট্ করতে করতে আর একজনের আবির্ভাব। পরনে লাল চেলী---গায়ে লাল চাদর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা। তাঁর একহাতে মড়ার খুলি, তাতে তরল মত কি যেন পানীয়। তাঁকে দেখে বিনিকেষ্ট সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পায়ের ধুলো নিল।]

বিনি। ঠাকুর্দা, এ কি মনে করে এখানে?

প্রাণকেষ্ট। আহা, বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে। সেইজন্যেই আসতে হল আমায়।

প্রাণ। (অবাক হয়ে) এ কে?

বিনি। ইনি আমাদের আরও পূর্বপুরুষ, বুঝলে প্রাণকেষ্ট? আমার ঠাকুর্দা কুলাচার্য শ্রীমৎ কালীকেষ্ট পাতিতুণ্ডি। সেকালের একজন নামজাদা তান্ত্রিক ছিলেন। কালী সাধনা করতে গিয়ে শেষে ইনি কাপালিক হয়ে যান।

কালী। বৎস। প্রাণকেষ্ট। তুমি আত্মীয়দের নিয়ে বড় বিব্রত বোধ করছ—তাই না? আর কিছু না, এক কাজ করো। খেয়ে ফ্যালো।

প্রাণ। খেয়ে ফেলবো—! কী বলছেন? কাকে খাবো?

কালী। কেন ঐ আত্মীয়দের। এক একটাকে ধরো, আর ধরে ধরে খাও। এছাড়া উপায় নেই—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

প্রাণ। আত্মীয়দের খাবো, বলছেন কি আপনি। তা কি করে খাওয়া যায়? তারা অতি অখাদ্য যে।

কালী। মোটেই না, তোমার ধারণা ভুল। শুধু ঐ ভাবেই ওরা সুস্বাদু হতে পারে। রসনার পথেই ওদের রসালো করা যায়—নতুবা ওরা ভারী বেরসিক। আমি কাপালিক হলাম কেন?

প্রাণ। কেন?

কালী। কেবল ঐ খাবার লোভে। আমার আত্মীয়দের—যারা আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল আর আমার গৃহে স্থান নিয়েছিল—খেতে দ্বিধাবোধ করিনি।

প্রাণ। এও কি সম্ভব?

কালী। আমাদের সময়ে অবশ্য একটা সুপ্রথা ছিল। নরবলি প্রথা।

প্রাণ। নরবলি প্রথা—কিন্তু এখন—

কালী। এখন আর নেই বোধ হয়। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। আগে ওদের কালীঘাটে নিয়ে যাও আর কাটো। বলি দিয়ে তারপর খেয়ো। তাহলে আর কোনো দোষ থাকবে না। তাতে তুমিও উদ্ধার পাবে, ওরাও উদ্ধার হয়ে যাবে। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা—ওরই নাম মহাপ্রসাদ।

প্রাণ। না যতই ত্যক্ত হই—তা আমি পারব না। ও কাজ করলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। যাদের খাওয়াতে ফতুর হতে হয় তাদের খেলে না জানি আরো কি দুর্গতি হবে। হয়তো সেটা ফাঁসির খাওয়া হতে পারে।

কালী। তোমার কোনো ভয় নেই, মা আছেন। এই নাও একটু কারণবারি পান করে নাও। মনে জোর পাবে।

(মড়ার খুলিটা এগিয়ে দেয়)

বিনি। ছিঃ, ঠাকুর্দা। এমন মানী, প্রবীণ, বিবেচক হয়ে তুমিও কিনা শেষটায় ছেলে বকাচ্ছো, ছিঃ।

কালী। কোনো দ্বিধা কোরো না প্রাণকেষ্ট। পান করো। তোমার ওপর আমি অনেক ভরসা করেছিলাম। আমাদের বংশে আর একজন কাপালিক জন্মাবে—এই আমার সাধ ছিল। যদি আমার সে আশা তোমার দ্বারা পূর্ণ হয় সারা বংশ কৃতার্থ হবে। আমিও ধন্য হবো।

[প্রাণকেষ্ট কারণ-বারি একবার মুখে ছোঁয় কিন্তু মনে কোন উৎসাহ পায় না—কালীকেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়।]

প্রাণ। আজ্ঞে, একেবারে না খেলে কি হয় না? রামকেষ্টদেব—তিনি আমাদের পাতিতুণ্ডি বংশের কিনা জানি না—বলতেন যে ফোঁস কোরো, তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু ছোবল মেরো না কখনো। তা আত্মীয়দের বেলাও, না খেলে কেবল ফোঁস করলে হয় না?

কালী। (রাগতভাবে)—রামকেষ্টদেব? কে সে? তিনি দেবতা হতে পারেন, কিন্তু আমাদের আত্মীয়দের তিনি কী বোঝেন? কি জানেন তিনি? এ বিষয়ে কদ্দূর তাঁর অভিজ্ঞতা শুনি?

প্রাণ। তা বটে। এ সব দৈত্য নহে তেমন।

কালী। তাছাড়া, যদ্দূর মনে হচ্ছে, তিনি পাতিতুণ্ডি ছিলেন না। কে ছিলেন রামকেষ্টদেব? আমরা কখনো তাঁর নাম শুনিনি—তিনি যেই হউন, যত বড় দেবতাই হন, পাতিতুণ্ডিদের সমস্যা বোঝা তাঁর কর্ম নয়।

প্রাণ। তা'হলে প্রভু—

কালী। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বটকেষ্ট পাতিতুণ্ডির কথা বলতে পারো। তিনি বলতেন, যদি ফোঁস করে ছেড়ে দাও তো পরে আপসোস করবে।

প্রাণ। আহা এমন কথা তো কখনো শুনিনি।

কালী। তবে মন দিয়ে শুনে যাও। ফোঁস নয় আগে ফাঁসাও—নইলে দেখবে সেই এসে তোমাকে ফুস করে দিয়েছে—আত্মরক্ষার জোর সুযোগ না দিয়েই। তাই ফাঁসি যেতে হয় তাও স্বীকার কিন্তু আগে ফাঁসিয়ে যাওয়া চাই।

প্রাণ। কে আসছেন না? চেনা চেনা আওয়াজ পাচ্ছি। আমাদের কোন আত্মীয় বোধহয়?

[হরেকেষ্টর আবির্ভাব। নামাবলী গায়ে, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি ও জপের থলি, থলির মধ্যে জপের মালা, ডান হাতে মালা জপতে জপতে হরেকেষ্ট প্রবেশ করে।]

কালী। আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ—প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীহরেকেষ্ট পাতিতুণ্ডি। তোমাদের ইনি কে হন তোমরাই আন্দাজ করে নাও।
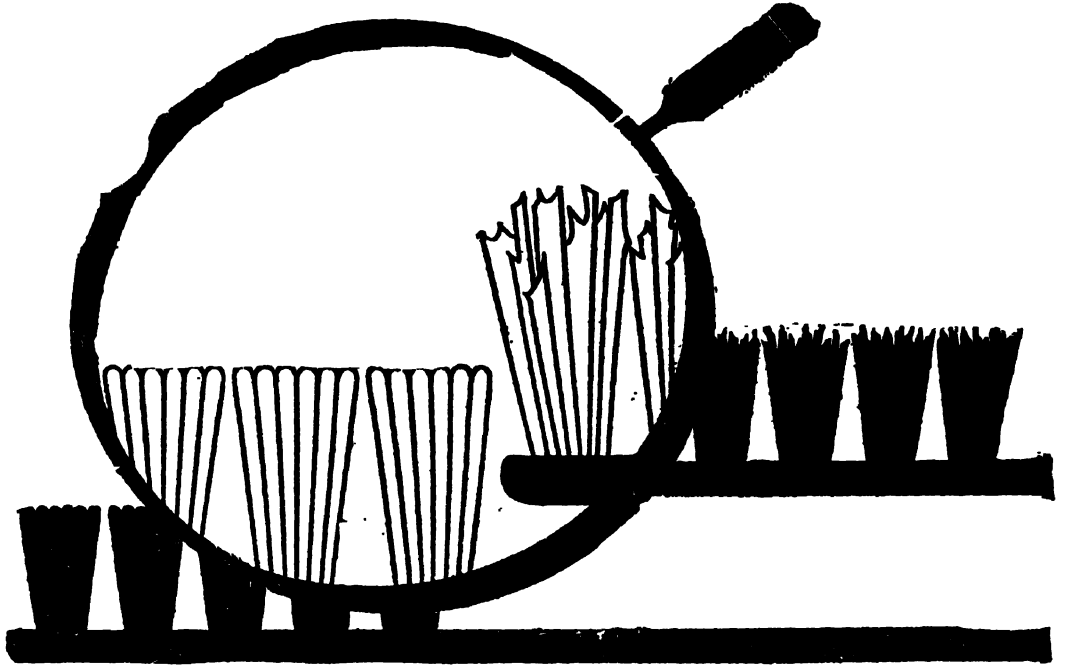
[কুলাচার্য কালীকেষ্ট ও বিনিকেষ্ট নত হয়ে প্রণাম করে]

রাজা। প্রভুপাদ, এমন বেশে এখানে যে হঠাৎ ?

হরেকেষ্ট। আর বলো কেন ? বংশ লোপের আশঙ্কায় আসতে হলো। বেচারা প্রাণকেষ্ট পাছে বাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়ে যায় সেই ভয়ে।

প্রাণ। (কাঁদ কাঁদ হয়ে) প্রভু একটু-খানি আমাদের কুঁড়ে, আমাদের দুজনেরই কুলোয় না---তার ওপরে আবার---

হরেকেষ্ট। ঠিক কথা। আমার জীবনেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমার কুঁড়েতেও রাজ্যের কুড়ে লোকদের আমদানি দেখেছিলাম। তবে আমি কিন্তু তাদের তাড়ালাম না, আসতেও বারণ করলাম না---।

প্রাণ। হ্যাঁ,---সে কি ?

হরেকেষ্ট। তাদেরই ঘাড় ভেঙে আমার প্রাসাদ বানালাম। কালক্রমে সেই প্রাসাদ ফলাও হয়ে বেড়ে উঠে মহাপ্রাসাদ হয়ে দাঁড়াল।

প্রাণ। হ্যাঁ, উনি বলছিলেন বটে--- মহাপ্রসাদের কথা। কিন্তু ওতে আমার তেমন রুচি হচ্ছে না।

হরে। মহাপ্রসাদ নয় মুর্খ--মহাপ্রাসাদ। রাজারাজড়াদের যা থাকে, তাই। নবাবদের রঙমহল, শীসমহল, খাস মহল সব জড়ালে যা এক-খানা হয়, তার কথাই বলছি।

প্রাণ। প্রভু, কি করে তা হলো ?

হরে। সেরেফ মন্ত্রের জোরে আবার কি ? তারাও আসতে লাগল, আমিও তাদের মন্ত্র দিয়ে গুরু-দক্ষিণা নিয়ে ছাড়তে লাগলাম। গলায় কণ্ঠি আর কীর্তন দিয়ে, কণ্ঠে আর পৃষ্ঠে নামাবলী দান করে ছেড়ে দিলাম।

প্রাণ। আহা কি মহৎ কাজ।

হরে। তাদের ইহলোকের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পরলোকের পথ মুক্ত করে দিলাম। যেমন হাসতে হাসতে তারা এসেছিল---কাঁঠাল হাতে করে আমার মাথায় ভাঙবার মতলবে---তেমনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল একদিন।

প্রাণ। কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল তারা ?

হরে। হ্যাঁ, কিন্তু তা কান্না নয়--- তাই জীবের সম্বল---তারই নাম কৃষ্ণ-কীর্তন।

প্রাণ। কীর্তন আমি শুনেছি। কিন্তু মারাত্মক বলে তো মনে হয়নি।

হরে। শুনেছো কিন্তু শোনার মত শোনোনি। তাহলে মন্ত্রের মত ফল দেখতে। তোমরা একালের ছেলেরা মন্ত্রশক্তিকে বিশ্বাস করো না, নইলে কলিতে নাম ছাড়া আর কি আছে ? কালৌ নাস্ত্যেব কেবলম্। প্রভো, তুমিই সত্য। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। (যুক্তকরে প্রণাম করে)।

প্রাণ। তা জানি। এ যুগে নামের জন্যই যা কিছু করা। তা ঠিক।

হরে। আর কী নাম। কেমন মন্ত্রের মতো অব্যর্থ এই নাম। যেমন জোরালো তেমনি ধারালো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। অর্থাৎ তিনিই সব হরণ করেন, আমরা শুধু নিমিত্তমাত্র, তাঁর সহায় হই বই তো না।

প্রাণ। আহা কি সুন্দর কথা।

হরে। তিনি তো বলেই গেছেন, নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্। নিমিত্ত হও, নিমিত্ত হলেই সব্যসাচী হতে পারবে।

প্রাণ। কেবল নাম দিয়ে আপনি কাম ফতে করলেন ? মন্ত্রের কেরামতিতে ঐ কুড়েদের দ্বারা কুঁড়েঘরের থেকে আপনার মহাপ্রাসাদ হলো ? এ যে আলাদীনের কাণ্ড!---এ কি আমি পারবো ? আমার মধ্যে কি অতো গুরুত্ব আছে ?

হরে। খুব পারবে বৎস। আত্মীয়দের ধনে প্রাণে মারতে পারবে না--- কী যে বলো ? তুমিও যে তাদের আত্মীয়, সেকথা কেন ভুলে যাচ্ছ ? আত্মীয়ের পক্ষে এর চেয়ে সহজ কাজ আর কি আছে ? প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দেখো---খোদ্ কেষ্টর কথাটাই ভাব না একবার।

প্রাণ। (অবাক হয়ে) খোদ কেষ্ট ? তিনিও কি পাতিতুতি ছিলেন ?

হরে। পাতিতুতি না হন, পতিতপাবন তো বটে। সমগোত্র বই কি। আত্মীয়র কবলে যারা পতিত তাদের উদ্ধারকর্তা যে তিনি। নিজে তিনি কি করেছিলেন মনে নেই।

প্রাণ। কি করেছিলেন আপনার মনে নেই ?

হরে। হ্যাঁ মনে পড়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়েছিল কে ? তিনিই তো ? অতো আত্মীয় নিপাত আর কোন যুদ্ধে হয়েছে ?

প্রাণ। ঠিক কথা।

হরে। তাতেও শান্তি না পেয়ে শেষে নিজের যদুবংশ ধ্বংস করে তবে তিনি শান্ত হন। এতেই বোঝ।

প্রাণ। আমি কি পারবো ? অমন একটা কুরুক্ষেত্র করতে পারবো কি আমি ?

হরে। খুব পারবে, সংশয় কোরো না। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। প্রত্যহ গীতা পাঠ করো। নাকের ওপর তিলক চড়াও।

প্রাণ। গীতা পাঠ করলেই হবে ?

হরে। হবে, হবে, আর সেই সঙ্গে পাইকারি দরে নামাবলী আর কণ্ঠির বায়না দিয়ে রাখো। আত্মীয়দের ডাকো। সহজে না আসে, নিমন্ত্রণ করে খাবার লোভ দেখিয়ে আনাও।

প্রাণ। তারপর কি করব ?

হরে। আর তারপরে, নামাবলীর ফাঁস জড়িয়ে---নামজাদা গামছা গলায় দিয়ে---বুঝতেই পারছ।

প্রাণ। হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি। তবে---

হরে। শেষটায় আমি আর আত্মীয় অনাত্মীয় বাছিনি, যে এসেছে, কাছে ঘেঁষেছে, যাকে ধরতে পেরেছি তাকেই দীক্ষা দিয়েছি। হাড়ে হাড়ে দীক্ষা। না দিয়ে

তো দিবার নেই—জীবে দয়া নামে রুচি আমার ধর্ম কি না।

কালী। আমার বেলায় কিন্তু জীবে রুচি আর নামে দয়া—দয়াটা আমার নামমাত্র কিন্তু রুচিটা আপনার চেয়ে বেশী।

হরে। তুমি আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। তিন কুল খেয়ে শেষ করেছ। তাদের বাঁচিয়ে রোজগারের উপায় করলে কতো লাভ হতো সেটা একবার ভেবে দেখেছিলে? ---প্রভো, তুমিই সত্য। (প্রভুপাদ নিজের টিকিতে হাত বুলান।)

কালী। (রাগতভাবে) আর তুমি বুঝি আমাদের বংশের মহা-পুরুষ? তাই না? (একটু কারণ-বারি পান করে) বটে? পুরুষ তো অনেক দেখলাম—চোখেও দেখেছি—চেখেও দেখেছি—মহাপুরুষকে তো দেখি একবার।--

হরে। (ভয়ে ভয়ে) তার মানে?

প্রাণ। মার দয়ার সাধারণ পুরুষই মহাপ্রসাদ হয়ে ওঠে, কিন্তু একটা মহাপুরুষ কিরূপ দাঁড়ায় সেটাও তো একবার দেখতে হয়।

হরে। (চিৎকার করে) ওরে বাবা রে। মেরে ফেললে রে।

[হরেকেষ্ট প্রাণভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে যায়। কালীকেষ্ট খড়ম হাতে তার পিছু পিছু তাড়া করে।]

[উভয়ের প্রস্থান।

বিনি। ধরতে পারলে মেরে ফেলবে ঠিক। আমি চললাম। দূরে দাঁড়িয়ে দেখি গে—কদ্দূর গড়ায়। মহাপ্রসাদ পর্যন্ত গড়ায় কি না দেখা যাক। ফাঁক পেলে একটু ঝোল চাখব না হয়।

[বিনিকেষ্টর প্রস্থান।

প্রাণ। (ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে) বেশ একটা ঘরোয়া বৈঠক জমেছিল—ইস এমনভাবে ভেঙে গেল।

[প্রাণকেষ্ট ঘুমোচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে নেপথ্যে অণু ডাকে—কৈ উঠলে বলে অণুর প্রবেশ।]

প্রাণ। (চড়ানো গলায়) রক্ত চাই—রক্ত চাই!

অণু। গ্যাঁ কী বলছো?---কী হয়েছে তোমার? (কপালে হাত দিয়ে) ইস! গাটা যেন গরম দেখছি।

প্রাণ। আমি খাবো। ধরব আর খাবো—এক একটাকে ধরে কেটেকুটে মশলা দিয়ে গরগর করে রাঁধবো—

অণু। কি যা তা বলছ?

প্রাণ। হ্যা ঠিক বলছি। চপ—কাটলেট—কারি—কোর্মা—বোগ্‌দা—কালিয়া—কিমা---। তার-পরে সেই কালিয়াদমন করা আমার কাজ। আমাদের চৌদ্দপুরুষের কম্মো।

অণু। (ভয়ে ভয়ে দু' পা পিছিয়ে) য়্যা---

প্রাণ। আমাদের বংশের আদিপুরুষ কে ছিল জানো? খোদ কেষ্ট—যে কুরুক্ষেত্র আর কালিয়াদমন করেছিল। আমিও করবো।

অণু। খাবে বৈ কি? চা হয়েছে, মুখ-হাত ধুয়ে খাবে এসো।

(টুথ ব্রাশ হাতে নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। হতভাগাটা বকছে কি? রাত্রে ইঁদুর কামড়েছে—ব্যাটার বোধ-হয় র‍্যাট পয়জন হয়েছে।

প্রাণ। কেন, আমি কি কুরুক্ষেত্র করতে পারি নে? (এক লাফ দিয়ে) ম্যায় ভুখা হুঁ!

নির। (তিন পা পিছিয়ে) আরে মোলো যা। ভুখা হুঁ তো আমি কি করবো? তোমার গিন্নিকে বলো খাবার আনিয়ে দেবে।

প্রাণ। খাবার নয়, তোমায় খাবো। হাড় খাবো মাংস খাবো, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো। কেন—আমি কি তোমার আত্মীয় নই? চপ-কাটলেট বানিয়ে খাবো তোমাকে।

নির। (ব্যঙ্গোক্তি করে) সাধের কথা শুনে মরে যাই। এ ভালো আপদ হলো। ওর কি আজকাল মাঝে মাঝে এমনি ধারা হয় না কি?

অণু। (কাতরস্বরে) কই কখনো তো দেখি নি। বাড়িতে হতে দেখে নি তো কখনো।

[ইলা ও মহিমার প্রবেশ। চাপা স্বরে মহিমা বলে]

মহিমা। জামাইবাবুর কি হলো দিদি?

প্রাণ। (নেচে নেচে) রক্ত চাই, রক্ত চাই। নজরুলকে মনে নেই? শোন তবে---

'বল রে বন্য হিংস্র বীর।
দুঃশাসনের চাই রুধির॥
চাই রুধির রক্ত চাই।
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই॥
দুঃশাসনের রক্ত চাই।
দুঃশাসনের রক্ত চাই।।'---

ইলা। বাঃ মেসোমশাই, তুমি তো বেশ নাচতে পারো। আমাদের যে নাচ শেখায় তার চেয়েও দেখছি তুমি ওস্তাদ।

প্রাণ। তোকে আমি খাবো। কড়মড় করে খাবো।---চেঁছে পুছে খাবো---কাটলেট বানালে কেমন হয়?

ইলা। বেশ হয়। কিন্তু আমাকেও একটু চাখতে দেবে তো?

প্রাণ। তা দেখা যাবে। আগে তো তোকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দিই। কালি[illegible] তখন পরের কথা। [illegible] পর।

মহিমা। ওমা, কি অলুক্ষণে কথা গো। বলে কি? ষাট ষাট—বালাই ষাট।

প্রাণ। (হাত নেড়ে মহিমা ইলা ও অঞ্জনকে দেখিয়ে) এক দুই তিন। মোটমাট পৌনে এক গণ্ডা। কোয়ার্টার ডজন। চা বাগানে নেয় না আজকাল—তবে কষাই-খানায় নেবে।

ইলা। কি মেসোমশাই?

প্রাণ। এই তোদের কথা বলছি। দশ টাকা দরে বেচলেও পৌনে এক গণ্ডার দাম ত্রিশ টাকা—মন্দ কি? তবে পুরো এক গণ্ডা

হলেই ভালো তো। ভালো তো হতো, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?

ইলা। মাসিমাকেও ধরো, তাহলেই গণ্ডা পুরবে।

প্রাণ। (অণুর দিকে তাকিয়ে) ওটা গণ্ডার। গণ্ডার কষাইরা ছোঁবে না। গণ্ডার মানুষে খায় না তো।

[অণু চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে ওঠে।]

ইলা। হঠাৎ কেনাবেচার কথা কেন মেসোমশাই? খাবার কথাটা কি বাদ পড়ে গেল নাকি?

প্রাণ। কেন, বাদ পড়বে কেন? খাবো তো আলবাৎ। কচি পাঁঠা, বৃদ্ধ মেষ,---দইয়ের মাথা, ঘোলের শেষ। না---ঘোল আমি খাবো না। ঢের ঘোল খেয়েছি।

ইলা। খাবো খাবো তো বলছো---খাচ্ছো কৈ?

প্রাণ। দাঁড়া। কাটি তোদের। বঁটি আনি আগে।

[প্রাণকেষ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মহিমা, নিরঞ্জন, ইলা ও অণু সভয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে]

অণু। একি হলো যে---

প্রাণ। (বঁটি হাতে প্রাণকেষ্টর প্রবেশ) জয় মা কালী---। মা কালী বলি দিচ্ছি মা, কিছু মনে করিস নে মা।

[প্রাণকেষ্ট বঁটি নিয়ে তেড়ে যায়। নিরঞ্জন মহিমাকে---মহিমা ইলাকে হ্যাঁচকা টানে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রাণকেষ্ট পিছু পিছু তেড়ে যায়]

প্রাণ। (আপন মনে গাইতে থাকে) উজাড় করে নাও হে আমার যা কিছু সম্বল---
ফিরে চাও, ফিরে চাও, ফিরেচাও, হে চঞ্চল।

অণু। (কেঁদে কেঁদে) ও মাগো আমার কি হলো---

(প্রাণ ফিরে এসে ইজিচেয়ারে আরাম করে কাত হয়ে হাসতে হাসতে---)

প্রাণ। হাঃ হাঃ হাঃ, আর ওরা ফিরবে না। এ জন্মে নয়।--- আঃ বাঁচা গেল।

অণু। হ্যাঁ তোমার তাহলে কিছু হয় নি। ওঃ আমিও বাঁচলাম বাব্বা।

প্রাণ। আমার কালকের কেনা নতুন টুথব্রাশটা নিয়ে গেল--- যাক্ গে। আত্মীয়তা থাকলে অমন কত যায়। সুটকেশ আর হোল্ডল রেখে গেছে---মস্তর না দিয়েই পাওয়া গেছে---মন্দ কি? যা লাভ হয় তাই ভাল।

অণু। (হাসতে হাসতে) অনেক হয়েছে, চল চা খাবে, চলো।

প্রাণ। যাই বলো---ওদের মধ্যে ইলা মেয়েটিই বেশ ভাল।

[অণু ও প্রাণকেষ্ট খাবার ঘরের দিকে যেতে থাকবে। আস্তে আস্তে পর্দা নামতে থাকবে।]*

---

* শিবরাম চক্রবর্তী লিখিত 'আত্মীয়-সঙ্কট' গল্পটির---রোশনাই সম্পাদিকা শ্রীমতী গীতা দাস কর্তৃক নাট্যরূপান্তরণ।

—কী অসভ্য ঝড়টা মলয়দা...!
—ঘাবড়ো না মলি, আমি ঝড়ের চেয়েও জোরে ছুটতে পারি!

ভারতে রসচর্চা

প্রণবনাথ ভট্টাচার্য

পা[illegible] —আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। ছোট বড় নানান শিল্পে, ওষধিতে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পারদ অপরিহার্য। অপেক্ষাকৃত ভারী আয়াসলভ্য রজত-শুভ্র এই ধাতুটি তারল্য গুণ হিসেবে অনন্য—সেজন্য থার্মোমিটার, ব্যারো-মিটারে এর ব্যবহার। পারদ তাই শারীরিক সুস্থতার বা বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতার মাপকাঠি। পারদকে বাষ্পী-ভূত করা সম্ভব কম তাপমাত্রায় (৩৫৬ সে) তাই এটি বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগানো হয়েছে আমেরিকায় দুটি কারখানায় জলীয় বাষ্পের বদলে। উত্তম বিদ্যুৎ চালন শক্তির জন্য রেফ্রি-জারেটারের মত যন্ত্রপাতিতে পারদ স্বয়ং-ক্রিয় সুইচের ব্যবহার। সারা পৃথিবীর রাজপথ আলোকিত করে আছে পারদ-বাষ্পজনিত নানান্ আকারের বৈদ্যুতিক বাতি। আরও কত এর প্রয়োজন।

দন্তগহ্বর পূর্ণ করতে ডেন্টিস্ট যা ব্যবহার করছেন তা অধিকাংশ রজত-পারদ যুগ্ম ধাতু। কালো কী নীল ছাপার কালি প্রভৃতিতে পারদ। যা বঙ্গললনা সৌভাগ্যবতীদের সীমন্তে (ঠোঁটে নয়।) শোভা পাচ্ছে তা পারদ ও গন্ধক সংযোজিত রসায়ন। এমন কী বিস্ফোরণ ঘটাতে পারদ (Mercury fulminate) যার ব্যবহার অবশ্য কমে এসেছে। আতস বাজী যা মিশর মাজের সাপ ব'লে বিখ্যাত তাও পারদ-ঘটিত (Mercurous thiocy-anate)। পারদের তুলনা নেই ওষধি প্রস্তুতিতে। ক্লোরিন গ্যাস ও পারদ সংযোগে প্রস্তুত রসকর্পূর (Calomel), মারক্যুরোক্রোম বা আয়ুর্বেদীয় মকরধ্বজ সুবিদিত। এমনি কত অসংখ্য ব্যবহার এই ধাতুটির।

এই অনন্য সাধারণ ধাতুটি যদি পাথরের সঙ্গে প্রকৃতিতে যে ভাবে প্রধানত আছে, তার নাম হিন্দুবিজ্ঞানীরা দিয়েছিলেন হিঙ্গুল বা দরদ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যা সিনাবার (Cinnaber) এই পারদ ও গন্ধক-সংমিশ্রিত খনিজটি টুকটুকে লাল বা কমলা রঙে মেলে। অমিশ্রিত ধাতু হিসেবেও প্রকৃতিতে মেলে পারদ তবে তার পরিমাণ সামান্য। দরদ থেকে পারদ উদ্ধার প্রণালীও সহজ। কেবল দরদ অথবা চূণজাতীয় ক্ষার পদার্থ বা লৌহ সহযোগে গরম করলে পারদ ধাতু বাষ্পীভূত হ'য়ে বের হ'য়ে আসে। পাতন বা তির্যক পাতন প্রক্রিয়ার সহায়তায় এত সহজে অপর কোন ধাতু উদ্ধার বা শুদ্ধীকরণ সম্ভব নয়।

সর্বদেশ পারদের মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ। শস্য-সম্ভার বাণিজ্যের দেবতা, সৌভাগ্য ও সম্পদের প্রতীক মার্কারীর নামানুসারে পাশ্চাত্যে ধাতুটির নাম মার্কারী (Mercury) (Merkur)। রোমদেশীয় উপকথা। যেদিন জন্ম-গ্রহণ করলেন মার্কারী সেই দিনই তিনি তাঁর প্রথম তৈরী বীণায় মুগ্ধ করলেন এপোলোদেবকে। তাঁর সর্বপ্রথম গো-সম্পদ অপহরণ ক'রে লুকিয়ে রেখে-ছিলেন মার্কারী। রুষ্ট এপোলোদের শাস্তি দিতে এসে মুগ্ধ হ'লেন। আশীর্বাদ দিলেন দৈবশক্তির। মার্কারী দেবদূত, তাঁর পাদুকায় পক্ষ। ছুটে চলেন দেবতাদের সংবাদ বহন ক'রে। পারদ-বিন্দুও সদা চঞ্চল, সামান্য আঘাতে শতবিন্দুতে পরিণত হয় ও ছুটে চলে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মার্কারী—সৌভাগ্য ও সম্পদের প্রতীক।

ভারতে পারদ-ইতিহাস প্রাচীন। বিভিন্ন গুণের অধিকারী এই আশ্চর্য ধাতুটির সন্ধান ভারত রাখতো আদি যুগ থেকে। পারদ-ঘটিত ওষধির পূর্ণ বিকাশ এদেশ দাবী করতে পারে। দরদ সন্ধান মেলে মহেনজোদড়োর ধ্বংসা-বশেষ থেকে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে এই সুদর্শন পারদ খনিজটি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিল (সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা ২৫০০ খৃঃ পূঃ—১৮০০ খৃঃ পূঃ)। হয় তো শুধু প্রসাধনে এর ব্যবহার ছিল সে যুগে। খৃষ্টজন্মের তিনশো বছর পূর্বে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত মন্ত্রী চাণক্যবিরচিত অর্থশাস্ত্রে হিঙ্গুলের বর্ণনা আছে। বিবরণ আছে কি প্রক্রিয়ায় হিঙ্গুল থেকে পারদ প্রস্তুত করা যায়, উল্লেখ আছে পারদের বিশেষ স্বভাবের কথা, যার সাহায্যে যুগ্মধাতুতে পরিণত হতে পারে। দেখা যাচ্ছে পরশ পাথর হিসেবে পারদের গুণাগুণ তখন ভারতের অজানা ছিল না। এর অনেক পরে চীনের বিখ্যাত রাসায়নিক কো হুঙ বর্ণনা করেছেন পারদ-প্রস্তুত-প্রণালী পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। গ্রীক রাসায়নিক ডিওসোরাইডস্ ও প্লিনি (খৃঃ অঃ ৫০) অনুরূপ বর্ণনা দেন তাই পারদ বিজ্ঞানে ভারত বিশ্বে অগ্রণী বলা যেতে পারে।

পারদ চর্চা ও গবেষণার পূর্ণবিকাশ হয় ভারতে তান্ত্রিক যুগে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে। যে বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এর মূলে তিনি হ'লেন নাগার্জুন। ভারতে তখন বৌদ্ধ প্রভাব অবসান হয়ে হিন্দুধর্ম পুনরু-ত্থানের যুগ। দুই প্রভাবই পাশাপাশি বিরাজ করছে। তান্ত্রিকরা কেউ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা কেউ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী যেমন নাগার্জুন নিজে। হিন্দু তান্ত্রিকরা

খনিজ (Mineral) বা হাল্কাভাবে ধাতু বা ধাতব (Metallic)। এর পূর্বে ধাতুঘটিত ওষধির প্রচার ছিল নগণ্য ভেষজ ওষধির তুলনায়। তখন রস বলতে বোঝাত মানব-দেহের জলীয় অংশ---Body fluid। যখন পারদ-ঘটিত ওষধি ভেষজের সঙ্গে যোগ দিল, রস শব্দ পারদ স্থলে ব্যবহৃত হ'তে লাগলো। তার কারণ, পারদ তরল এবং মানব-দেহে অলৌকিক কর্মপ্রভাব পারদঘটিত রসায়নের। রসসিদ্ধ বলা হ'তো তাঁদের---পারদ বিজ্ঞানে চর্চা করতেন যাঁরা।

পারদ-ঘটিত ওষধিতে এমন উৎকর্ষতা লাভ করেছিলেন তাঁরা যে পারদকে শিববীর্য বা শিবশক্তি ব'লে বর্ণনা করেছেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক নাগার্জুন পারদকে ব'লেছেন, ধাতু-শ্রেষ্ঠ বা রসরাজ---King of metals মানুষ খুঁজছিল অমৃত---elixir of life ---যা পান ক'রে জরামরণ থেকে অব্যাহতি মেলে। রস সেই সন্ধান দিল। রস বা পারদ যেমন শিবশক্তি, অভ্র (Mica) তেমনি হরের ঘরণী পার্বতীর শক্তি ব'লে আখ্যাত ছিল। পারদ ও অভ্রের সংমিশ্রণে উদ্ভূত রসায়ন অলৌকিক গুণসম্পন্ন ব'লে পরীক্ষিত। এই ওষধি সেবনে জরামরণ থেকে অব্যাহতি পেয়ে অমরত্ব লাভের পন্থা ব'লে মনে করতেন তাঁরা। নাগার্জুন তাঁহার 'রস রত্নাকর' গ্রন্থে এমনি অনেক ওষধির বর্ণনা দিয়েছেন। গোবিন্দ ভাগবত তাঁর রসহৃদয় গ্রন্থে এমন অনেক রসসিদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যাঁরা হরগৌরীর আশীর্বাদে অর্থাৎ পারদ ও অভ্রজনিত ওষধির কল্যাণে চির-সহযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ এখনও সর্বরোগহর ব'লে সম্মানিত।

পারদ অপব্যবহারের কাহিনীও আছে। অষ্ট ধাতুর গুণাগুণ বিশেষ অবহিত ছিলেন সে যুগের বিজ্ঞানীরা। তাম্র, রৌপ্য, দস্তা ও সীসা পারদের সঙ্গে সহজে মিলে মিশ্র ধাতুতে (amalgam) পরিণত হয়। এর সঙ্গে হরিতাল (arsenic sulphide or Orpiment) যোগ করলে, মিশ্র-ধাতু সোনার রঙ পায়। অনুরূপ নকল সোনা তৈরীর অনেক প্রক্রিয়ার বর্ণনা তান্ত্রিক শাস্ত্রে আছে। সে যুগের মানুষ পারদের মধ্যে যেন পরশপাথর খুঁজে পেল, যার সাহায্যে অক্ষয় ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়। এভাবে পারদের অপব্যবহার কিন্তু বে-আইনী ঘোষণা করতে হয়েছিল সে যুগে। মনুর আইন ছিল নির্মম শাস্তির বিধান দিয়ে।

নাগার্জুনের পর যে সব বিজ্ঞানী পারদ চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন ও উন্নত করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভাগবত বৃন্দা ও চক্রপাণি। তাঁরা প্রস্তুত করেছেন নানান প্রসাধন সামগ্রী---পাকা চুলে কলপ, কাজল, তৈরী করেছেন ধতুরা সহযোগে কীটনাশক ওষধি। এ ধরণের পারদঘটিত রসায়ন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অনেক পরে এসেছে। তখন গৌড়দেশে বিক্রমশীলায় এই তান্ত্রিক সংস্কৃতির রাজত্ব করতেন পাল বংশ। তাঁরা রক্ষক ও পালক ছিলেন। তারপর সেন রাজবংশ এই বিদ্যার প্রতিপালন ক'রে এসেছেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় তিব্বত ও দক্ষিণ ভারতে তা ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে তারপর এলো মুসলমান যুগ, সে সময়ও পারদঘটিত ওষধির গবেষণা গোয়ার পোর্তুগীজ কাস্রেন হলেন এখন থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে এবং নানান্ গোপন ব্যাধির প্রসারে তাঁরা দায়ী এ দেশে। ফিরঙ্গী রোগের চিকিৎসার রসকর্পূর বিধান আছে রস প্রদীপ গ্রন্থে। আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির পূর্ব পর্যন্ত আয়ুর্বেদোক্ত এইসব ওষধ ছিল এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র সহায়।

হিন্দু-শাস্ত্রে পারদ-বিজ্ঞানের এতো উৎকর্ষতা ও গুণকীর্তন সত্ত্বেও---তবুও আশ্চর্য লাগে যে, এই ধাতুটির সন্ধান ভারতের মাটিতে এখনও মেলে নি। শিল্প ও বিজ্ঞানের চাহিদা মেটাতে পারদ পুরোটাই স্পেন, ইটালী ও কিছু পরিমাণ আমেরিকা থেকে আমদানী করতে হয়। স্পেন ও ইটালীতে পৃথিবীর বেশীরভাগ পারদ-খনি বর্তমান। প্রতি বছর ভারত সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় দু'শো কোটি টাকা---২৫০ টন পারদ আমদানীর জন্য। চীনের কুই চৌ অঞ্চলে পারদ এখনও মেলে, হয় তো এই প্রতিবেশীর কাছ থেকে ভারত পারদ সংগ্রহ করতো। মিশরের মধ্য দিয়ে ইটালীর পারদও ভারতে এসে থাকতে পারে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে পারদ সংগ্রহের কোন বিবরণ নেই। ভূতত্ত্ব-বিদ্‌রা মনে করেন অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিলাশ্রেণীর অন্তরালে পারদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। আসাম থেকে কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলে এ ধরণের শিলা বর্তমান। কে জানে হয় তো পুরাকালে এই অঞ্চলেই রসসিদ্ধরা শিবশক্তি সংগ্রহ করতেন। মুনি ঋষিদের তপোভূমি হিমালয় গুহাকন্দর কী ভারতকে রজত-শুভ্র এই রসশ্রেষ্ঠের সন্ধান দেবে?

রাজনীতি

সরকারী ব্যাপারে নাক গলান সাধারণের কাজ নয়---অনেকে এ কথা বলেছেন,---কথাটি সাহসী এবং অসৎ, যা কেবলমাত্র উৎপীড়ক বা দাসের মুখ দিয়ে বেরুতে পারে। সাধারণ মানুষ সরকারী ব্যাপারে নাক গলাতে পারে না বলার অর্থ তাদের নিজেদের সুখ-দুঃখের ব্যাপারে তাদের কিছুই করার নেই বলা। বলা যে, ন্যাংটাই হোক বা পরনে কাপড় থাকুক, খেতে পাক বা না পাক, বঞ্চিত হোক বা শিক্ষা পাক, রক্ষিত হোক বা ধ্বংস হোক---কিছুতেই তাদের কিছু করার নেই।

---কেটো

মাসিক

বসুমতী

আষাঢ় / '৭৫

তৃষ্ণা

(১ম পুরস্কার)
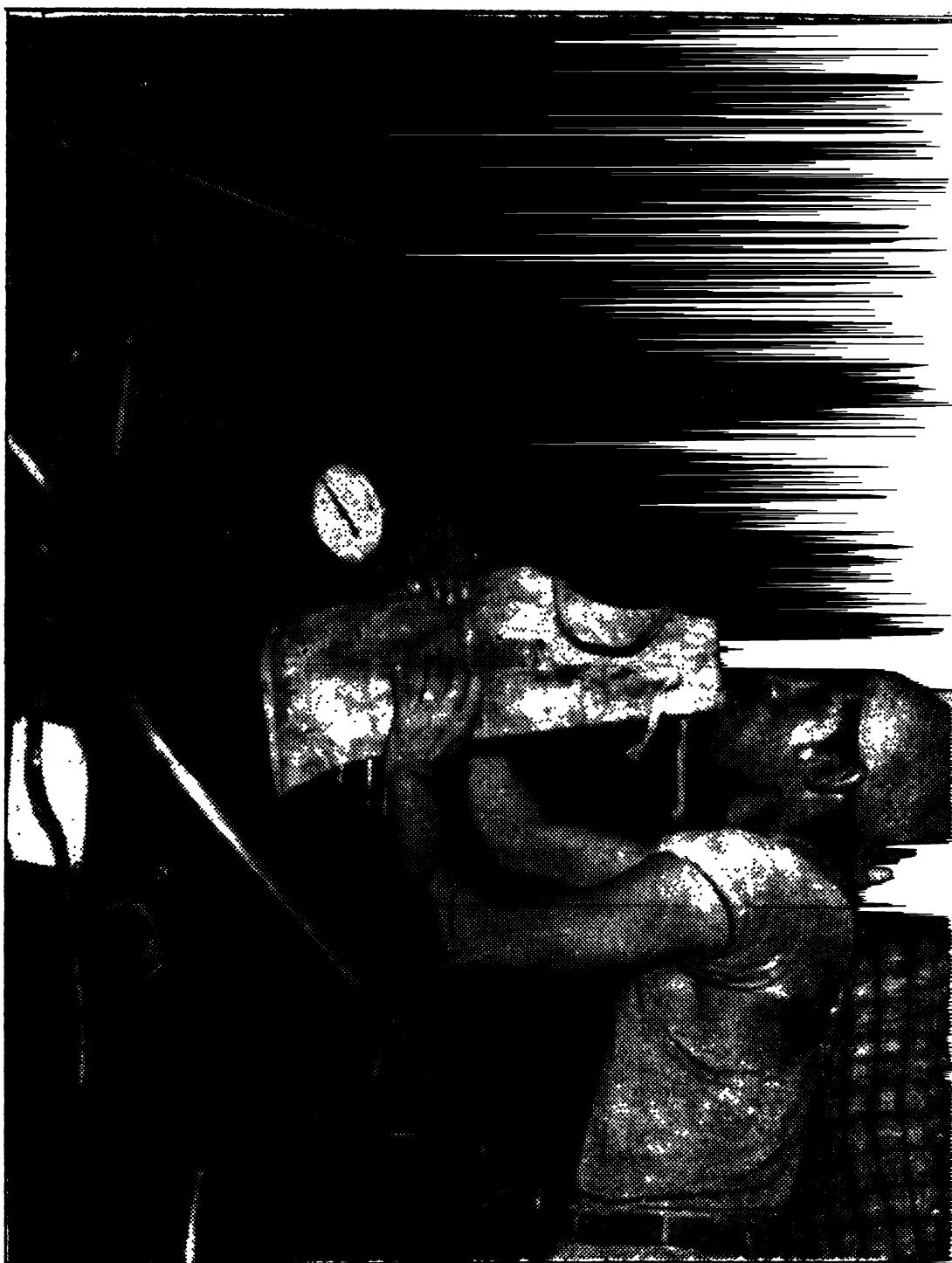
—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃষ্ণা (২য় পুরস্কার)

—দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকেন্দ্রা

-হারাধন পাইন

মাসিক বসুমতী
আষাঢ় / '৭৫

তৃষ্ণা
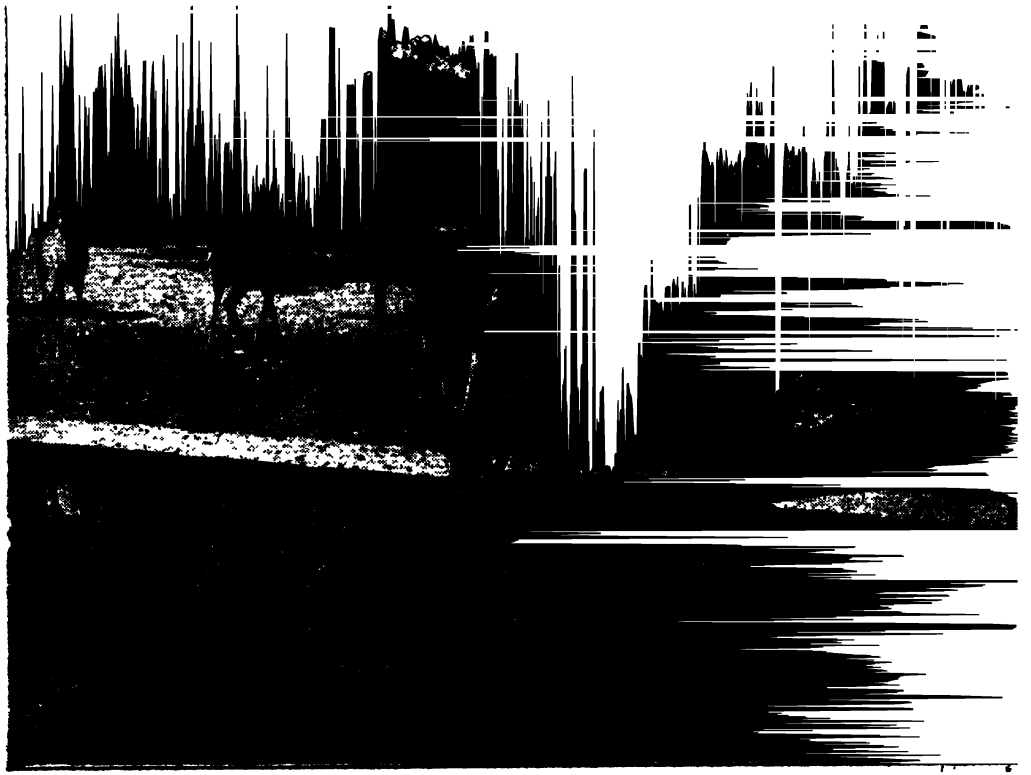
(৩য় পুরস্কার)

—দীপক চক্রবর্তী

মাসিক

বসুমতী

আষাঢ় / '৭৫

নিশাতবাগ (কাশ্মীর)

—রোহিণীনন্দন সিংহ

মেঘের খেলা

-দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

॥ তের ॥

মদন চলে যাবার পর পিসেমশাই বললেন, 'ঐ আলমারিটা খোল।' বলে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড স্টীলের আলমারি ; প্রায় ঘরের সিলিং পর্যন্ত উঁচু।

আলমারিটার গায়ে চাবি লাগানোই ছিল ; ঘুরিয়ে হাতলে চাপ দিতেই খুলে গেল। ভেতরে আগের আলমারিটার মতন সারি সারি কত যে ফাইল সাজানো।

পিসেমশাই বললেন, 'ওখানে দুরকম ফাইল আছে।'

'সাতচল্লিশটা হবে।'

পিসেমশাই হাসলেন, 'ফাইলের সংখ্যাটা বুঝি ডায়েরির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে?'

ব্যাপারটা তা-ই। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ-মানে---'

পিসেমশাই বললেন, 'সাতচল্লিশ না, বাহান্ন। পনের বছর বয়েস থেকে আমার দিনলিপি লেখার অভ্যেস। বাহান্ন বছরে বাহান্নটা ডায়েরি জমেছে।'

আমার কিছু বলার ছিল না ; নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'প্রথম ছ'খানা ফাইল আর সাতটা ডায়েরি নিয়ে এস।'

আছে। শুধু---' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

ভয়ে ভয়ে শুধালাম, 'শুধু কী?'

'এক শ' পঁচিশ টাকার হদিস ওতে নেই। কবে কিভাবে টাকাটা খরচ করেছি, মনে করতে পারি না।' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন পিসেমশাই। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'খুব ভাল করে ফাইলগুলো দেখবে চিরঞ্জীব। আমার জীবনে হিসেবের গরমিল থেকে যাবে, ভাবতেই পারি না। যেমন করে পার, ঐ এক শ' পঁচিশ টাকার ব্যাপারটা তোমাকে বার করতেই হবে।'

'চেষ্টা করব।'

'আরেকটা কথা।'
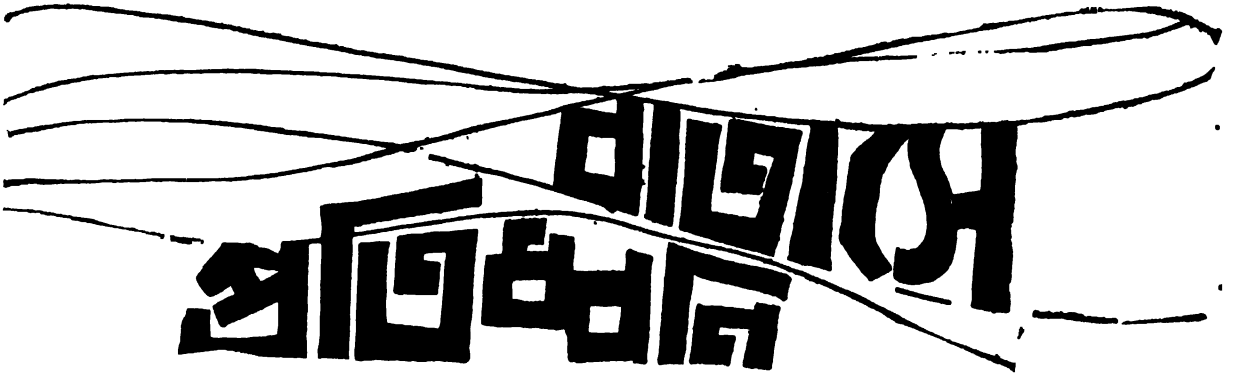
পেছন ফিরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

পিসেমশাই বললেন, 'ওপর দিকের তিনটে তাকে যে ফাইলগুলো রয়েছে তাতে আছে আয়ব্যয়ের হিসেব। কুড়ি বছর বয়েস থেকে রোজগার করছি, এখন সাতষট্টি চলছে। তার মানে সাতচল্লিশ বছর। ওখানে সাতচল্লিশটা ফাইল আছে। প্রতি ফাইলে এককে বছরের হিসেব লেখা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'তলার দিকের দুটো তাকে অনেকগুলো ডায়েরি আছে।'

চট করে মুখ ফিরিয়ে দেখে নিলাম। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কতগুলো ডায়েরি আছে আন্দাজ করতে পার?'

কথামত খুঁজে খুঁজে ফাইল আর ডায়েরিগুলো বার করে ফিরে এলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'প্রতিদিন ছ'টা করে ফাইল আর সাতখানা করে ডায়েরি তোমার ঘরে নিয়ে যাবে ; বুঝলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সাত-আটদিন সময় তোমায় দিলাম। এর ভেতর সব ডায়েরি আর ফাইল পড়া শেষ করতে হবে।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

পিসেমশাই কি এক ভাবনার ভেতর যেন ডুবে রইলেন। অনেকটা সময় পর বললেন, 'সাতচল্লিশ বছরের প্রতিটি পয়সার হিসেব ওতে লেখা

'বলুন--'

'ডায়েরিগুলোও খুব ভাল করে পড়বে। জীবনে কারো ওপর কোন অন্যায় কোন অবিচার করেছি কি না, দেখবে। যদি তেমন কিছু পাও, আমাকে তক্ষুণি জানাবে।'

ঘাড় কাত করে বললাম, 'জানাব।'

পিসেমশাই বললেন, 'তা হলে এখন তুমি যাও। ডায়েরি আর ফাইলগুলো সাবধানে রেখো ; হারিয়ে না যায় আবার।'

'আচ্ছা।' আমি উঠে পড়লাম।

●

দেখতে দেখতে সেই শনিবারটা এসে গেল। সুরেশের কথা আমার মনে ছিল।

দুপুরবেলা এ বাড়িতে সাড়ে বারোটার আগে পাত পড়বার নিয়ম নয়।

এগারটা বাজতে না বাজতেই চান-টান সেরে মঙ্গলকে বললাম ; 'মঙ্গলদা, আজ আমাকে এখনই খেতে দিতে হবে।'

মঙ্গল শুধলো, 'এত তাড়াতাড়ি?'

'জরুরি দরকার আছে ; এক্ষুণি না বেরুলেই না।'

'কিন্তু দাদাবাবু---'

'কী?'

একতলার করিডরের শেষ প্রান্তে একটা দেয়ালঘড়ি আটকানো। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মঙ্গল বলল, 'সবে তো এগারটা বাজল, সাড়ে বারোটার আগে এখেনে খাবার দেবার হুকুম নেই।'

মলিন মুখে বললাম, 'তা হলে থাক ; আমি ফিরে এসেই খাব। আমার ঘরে ভাত-টাত ঢাকা দিয়ে রেখো।'

আমার চোখমুখ দেখে বুঝিবা করুণাই হল মঙ্গলের। বলল, 'আচ্ছা এটু দাঁড়ান দিকিন ; আমি আসছি---'

'কোথায় চললে?'

'এসে কইচি।'

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল মঙ্গল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পর ফিরে এসে হতাশ সুরে সে বলল, 'না, হল না। ভাত-তরকারি ঢাকা দিয়ে রাখব 'খন। আপনি ফিরেই খাবেন।'

আমি অবাক। বললাম, 'গিয়েছিলে কোথায়?'

'বড় বাবুর কাছে। কিন্তক অডার (অর্ডার) মিলল না।'

বুঝলাম আমার জন্য বিশেষ হুকুম-নামা আদায় করতে গিয়েছিল মঙ্গল। কিন্তু যিনি সারাজীবন অঙ্ক কষে চলেছেন, হিসেব করে করে পা ফেলেছেন আমার জন্য তিনি যে তুচ্ছ অনিয়মটুকুও মেনে নেবেন এমন আশা নেহাতই দুরাশা। অন্য কোন সাংঘাতিক ব্যাপারে না, নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ আগে সামান্য খাওয়ার জন্য দরবার করতে হল, ভাবতে গিয়েই লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল।

বললাম, 'হিসেবশাস্ত্রীর কাছে তুমি কেন গেলে মঙ্গলদা?'

মঙ্গলও বিব্রত হয়ে পড়েছিল। বিব্রত যতখানি তার চাইতে ঢের বেশি দুঃখিত। আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, যাওয়াটা ঠিক হয় নি। দেড় ঘণ্টা আগে খেলে কি মহাভারত যে অশুদ্ধ হয়ে যায় ভগমান জানে।'

আমি আর কিছু বললাম না ; নিঃশব্দে সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে এলাম। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় বদলে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লাম---সোজা সুরেশের 'বাস্তুহারা সমিতি'র দিকে।

'বাস্তুহারা সমিতি' পর্যন্ত আর যেতে হল না। কবিরাজের বাড়ির পাশ দিয়ে খানিকটা যাবার পরই দেখা গেল মিছিল আসছে। খুব বড় অবশ্য না, সব মিলিয়ে আড়াই শ তিন শ' লোক। পুরুষের চাইতে শিশু আর মেয়েমানুষই বেশি। তাদের হাতে অনেকগুলো পোস্টার চোখে পড়ল ; খবর কাগজের ওপর ভুসো কালিতে বড় বড় করে নানা রকম দাবীদাওয়ার কথা তাতে লেখা। সবার আগে স্বয়ং সুরেশ ; এই মুহূর্তে তাকে বেশ 'নেতা' 'নেতা' মনে হচ্ছে।

জনকতক ছোকরা ব্যস্তভাবে মিছিলটার গায়ে গায়ে চলেছে। চলছেই না, হাঁকডাক করে মিছিলটাকে ঠিক পথে সুশৃংখলভাবে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কয়েকজনকে চিনতে পারলাম ; অমলের সঙ্গে 'বাস্তুহারা সমিতি'তে গিয়ে দেখে এসেছিলাম। এরা সুরেশের চেলা।

ছোকরাদের কেউ কেউ হাওয়ায় মুঠি পাকিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে, 'আমরা কারা?'

সমস্ত মিছিলটা গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, 'বাস্তুহারা।'

'আমাদের দাবী---'

'মানতে হবে।'

'যাদবপুর---টালিগঞ্জ---গড়িয়ার সব কলোনি---'

'বৈধ করতে হবে।'

'রাত্রিবেলা মালিকের গুণ্ডাবাজি---'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর।'

'রুজি-রোজগারের---'

'ব্যবস্থা চাই।'

সুরেশ দেখতে পেয়েছিল। চোখা-চোখি হতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। কাছে যেতেই খুশী গলায় বলল, 'আসছ তা হইলে?'

হেসে বললাম, 'সেদিন তো আসতেই বলে এসেছিলেন---'

'কইলেই কি সগলে আসে? ইচ্ছা কইরা ভুইলা যায়। এই দ্যাখো না, টালিগঞ্জ---যাদবপুর---গড়িয়ার এমুন জায়গা নাই যেখানে খবর দেই নাই। এখানে পঞ্চাশ-ষাইট হাজার রিফিউজি থাকে। অথচ মিছিলটার দিকে তাকাইয়া দ্যাখো, কয়জন আসছে।' সুরেশকে ক্ষুব্ধ দেখল।

'আমি কিন্তু আমার কথা ভুলিনি ; ঠিক এসে গেছি।'

'সগলের যদি তোমার মত দায়িত্ব-বোধ থাকত।'

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। এদিকে মিছিলটা আমাদের ফেলে কিছুটা এগিয়ে গেছে। সুরেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চল---চল---'

যেতে যেতে সে বলতে লাগল, 'লোকে মনে করে কি ; এইটা খালি আমার কাজ? তাগো (তাদের) কোন স্বার্থ নাই? আইজ কলোনি লিগে-লাইজড্ হইলে, রুজিরোজগারের একটা ব্যবস্থা হইলে তার ফল কি একা আমি পামু না সগলে পাইব?'

বললাম, 'সকলে পাবে।'

সুরেশ বলল, 'এই কথাটা কেউ ভাইবা দ্যাখে না। মাত্তর আড়াই শ' তিন শ' মানুষ সঙ্গে নিয়া দাবী জানাইতে যাইতে আছি ; এতে দাবী কখনও জোরদার হয়? আইজ যদি যাদবপুর-টালিগঞ্জের বেবাক(সব) মানুষ একজোট হইয়া যাইতে পারতাম, চিন্তা করতে পারো, কী হইত?'

'কী হত?'

সুরেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাঁ হাতের তালুতে ডানহাতের প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে বলল, 'সরকারের গদী

টইলা যাইত। ইউনিটির মত শক্তি জগতে আর নাই।'

'তা তো ঠিকই।' আমাকে ঘাড় নাড়তেই হল।

একটু চুপ। তাপর সুরেশ বলল, 'যাও, মিছিলে খাড়ইয়া (দাঁড়িয়ে) পড় গিয়া।' পরক্ষণই কি চিন্তা করে মতটা বদলে ফেলল, 'থাউক, মিছিলে যাইতে হইব না; তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই চল।'

স্লোগান দিতে দিতে মিছিল এগিয়ে চলেছে। আমরাও হাঁটছি।

সুরেশ বলল, 'অবশ্য মিছিল এতটুকুই থাকব না; চলতে চলতে আরো কিছু লোক জুইটা যাইব।'

আমি কিছু বললাম না।

হঠাৎ কি মনে পড়তে সুরেশ বলল, 'ভালো কথা---'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম, 'কী বলছেন?'

'তোমারে না কইছিলাম তার কদ্দুর কী হইল?'

'কোন ব্যাপারে বলুন তো।'

'সেই যে বাড়িতর এক্সচেঞ্জের—'

'আপনি যেদিন বলেছেন সেই দিনই বাড়িতে চিঠি লিখেছি।'

'উত্তর এসেছে?'

'না।' আমার মনে পড়ে গেল এই চিঠিরই শুধু না; আমার আগের চিঠিরও জবাব আসে নি দেশ থেকে। অন্যমনস্কতা দুর্ভাবনা---একসঙ্গে দুদিক থেকে যেন আমাকে ঘিরে ধরল। দশ বারো দিন হয়ে গেল, কলকাতার এসেছি এখনও কেন যে বাবা উত্তর দিচ্ছেন না। আমার চিঠি কি তিনি পান নি? দেশে কি আরো গণ্ডগোল হল? কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনটা বিচিত্র অস্থিরতায় দুলতে লাগল।

সুরেশ বলল, 'আমার হাতে যে পার্টি রইছে তারা কিন্তু ঘন ঘন তাগাদা মারতে আছে। কবে লাগাত (নাগাদ) চিঠির জবাব আসব, মনে হয়?'

'বুঝতে পরছি না।' আবছাভাবে বলতে লাগলাম 'এর ভেতর এসে যাওয়া তো উচিত ছিল।'

সুরেশ আর কোন প্রশ্ন করল না। মিছিল চলেছে তো চলেইছে।

সুরেশ যা বলেছে তা-ই। যেতে যেতে আরো কিছু লোক মিছিলে জুটে গেল। শিশু-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে এখন সবসুদ্ধ পাঁচ শ' মানুষ।

একসময় যাদবপুর পেরিয়ে, ঢাকুরিয়ার লেভেল ক্রশিং পেছনে ফেলে রাসবিহারী এভেনিউতে এসে পড়লাম। এতক্ষণ আমরা যেখানে ছিলাম সেটা কলকাতার সবচাইতে অন্ত্যজ আর উপেক্ষিত অংশ। ঢাকুরিয়া পেরুবার পর এই শহরের জমকালো জমজমাট রূপের শুরু।

ঢাকুরিয়া-যাদবপুরে থাকতে নিতান্ত নিয়ম রক্ষার জন্যই যেন স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল; তার মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল না।

রাসবিহারী এভেনিউতে পা দেবার
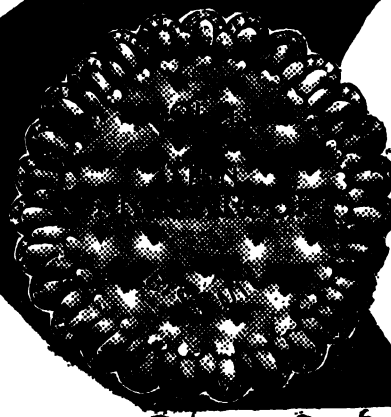
সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা কারা?'

মিলিত কণ্ঠের চিৎকারে আকাশ চৌচির হয়ে যেতে লাগল, 'বাস্তুহারা।'

'যাদবপুর---গড়িয়া---টালিগঞ্জের সব কলোনি---'

'বৈধ করতে হবে।'

'অন্ধকারে গুণ্ডাবাজি---'

'চলবে না, চলবে না।'

শীতের এই দুপুরে রাস্তাঘাট লোকজনে পরিপূর্ণ। আকস্মিক চিৎকারে অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে; দু চোখে বিরক্তি আর বিস্ময় ফুটিয়ে নতুন কালের নতুন ইহুদীদের দেখছে।

যত এগুচ্ছে মিছিলের চিৎকার ততই বাড়ছে। এর পেছনে কোন মানসিকতা কাজ করছে? হয়ত যারা সুখে আছে, আনন্দে আছে, প্রগাঢ় তৃপ্তির ভেতর দিন কাটিয়ে চলেছে---তাদের স্নায়ুতে ধাক্কা দিয়ে বলা হচ্ছে, আমাদের দিকে একটু তাকাও, আমাদের কথা একটু শোন, একটু ভাবো। নইলে তোমাদের সুখ, তোমাদের শান্তি, তোমাদের নিরাপত্তা, তোমাদের পরিতৃপ্ত বিশ্রাম---সব, সব কিছু তচনছ করে দেব।

বাসবিহারী এ্যাভেনিউর পর রসা রোড। তারপর আশুতোষ মুখার্জী রোড হয়ে চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গীর পর রাজভবন। সেখানে যখন আমরা পৌঁছুলাম দূর প্রাসাদশীর্ষের বড় ঘড়িটার দেড়টা বেজে গেছে।

আসতে আসতে সুরেশ জানিয়েছিল, আমাদের গন্তব্য রাইটার্স বিল্ডিং। উদ্দেশ্য চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে দশ-দফা দাবী পেশ।

রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত যাওয়া হল না; রাজভবনের কাছে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য একদল পুলিশ অপেক্ষা করছিল। বিদ্যুৎ গতিতে সারা রাস্তা আটকে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

এগুবার পথ নেই। সুরেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'বইসা পড়, বইসা পড়।'

পুলিশ দেখে বুড়ো-বাচ্চা-মেয়ে-পুরুষের দলটায় সন্ত্রস্ত গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। সুরেশের চিৎকারে কলের পুতুলের মতন ঝপাঝপ সবাই বসে পড়ল।

আমি অবশ্য বসিনি; সুরেশের গায়ের সঙ্গে গায় লেপ্টেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ উদ্দীপ্ত সুরে বক্তৃতা শুরু করে দিল সুরেশ। পুলিশকে দেখে ভয় পাবার কারণ নেই। আমরা এখানে চুরি ডাকাতি বা রাহাজানি করতে আসিনি; কোনরকম অনুগ্রহ কিংবা করুণার জন্যও নয়। আমরা এসেছি ন্যায্য দাবী নিয়ে। নেতাদের রাজনৈতিক পাশাখেলায় ঘরবাড়ি সর্বস্ব গেছে; সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাযাবরের মতন ভেসে বেড়াচ্ছি। ক'টি লোকের অবিবেচনার জন্য আজ আমাদের এই অবস্থা; যতদিন দাবী আদায় না হয় ততদিন সংগ্রাম চলবে। তার জন্য চাই একতা। আমরা যদি জোট বাঁধি, এক হই, পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের রুখতে পারবে না। সুরেশের বক্তৃতা সংক্ষেপে এই রকম।

বক্তৃতা শেষ হবার পর সমস্ত এস্প্ল্যানেড অঞ্চলকে চমকে দিয়ে স্লোগান উঠল, 'আমরা কারা?'

'বাস্তুহারা।'

'আমাদের দাবী---'

'মানতে হবে।'

'টালিগঞ্জ---গড়িয়া---যাদবপুর সব কলোনি---'

'বৈধ করতে হবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি---

স্লোগান শেষ হবার পর সুরেশ সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একজন পুলিশ অফিসার সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

সুরেশ বলল, 'মিছিল আটকাবেন না; আমাদের যেতে দিন।'

লক্ষ্য করলাম যে সুরেশ পূর্ব-বাঙলার আঞ্চলিক ভাষায় আঞ্চলিক সুরে ছাড়া কথা বলে না সে এখন অনায়াসে দীর্ঘকালের কলকাতাবাসীদের মতন কথা বলছে।

অফিসার বললেন, 'তা হয় না।'

'কেন?'

'আপনারা যেখানে যেতে চাইছেন সেখানে হানড্রেড্ ফরটি ফোর রয়েছে। কি করে যেতে দিই বলুন---'

'কিন্তু চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা না করলেই নয়।'

'এ ব্যাপারে আমি হেল্‌প্‌লেস।'

'আমাদের ব্যাপারটা কিন্তু লাইফ এ্যাণ্ড ডেথের।'

একটু চিন্তা করে পুলিশ অফিসার বললেন, 'একটা কাজ তো করতে পারেন---'

সুরেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'সবাইকে তো একসঙ্গে যেতে দেওয়া হবে না। কেউ একজন গিয়ে চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে দাবীটাবীগুলো জানিয়ে আসুন। আপনি যান না---'

'কথাটা মন্দ বলেন নি।' বলেই ফিরে এল সুরেশ। আমাকে বলল, 'চীফ মিনিস্টারের লগে এট্টু দেখা কইরা চার্টার অফ ডিম্যাণ্ডটা পেশ কইরা আসি।' মিছিলের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা বস; আমি যামু আর আমুম।'

আমাদের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরে পূর্ব বাঙলার টান এসে গেল।

যাই হোক সুরেশ চলে গেল। তার দৃপ্ত ভঙ্গি, নেতৃত্ব, উদ্বাস্তু উপনিবেশের জন্য দুর্ভাবনা, পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা---সব মিলিয়ে আমার মধ্যে একটি বীরের ছবি যেন মুদ্রিত হয়ে গেল। আমি মুগ্ধ হলাম; অভিভূত হলাম। সুরেশের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মনে ভরে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর সুরেশ ফিরে এল। এদিকে শীতের সূর্য পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গেছে। রোদ এখন মলিন, নিস্তেজ। উত্তুরে বাতাস এলোমেলো ছোটাছুটি করছে।

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না।' ঘাড় নাড়ল সুরেশ।

'তবে?'

'চীফ মিনিস্টার খুব ব্যস্ত। তাঁর সেক্রেটারির কাছে আমাগো দাবী-টাবীগুলি লেইখা দিয়া আসলাম।'

'তাতে কিছু কাজ হবে?'

'দেখা যাউক।' সুরেশ বলতে লাগল, 'যদি কিছু না হয়, আবার মিছিল লইয়া আসুম। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাগো আসতে হইব। একবারে না হয় দুইবার। দুইবারে না তিনবার। তেমন দরকার হইলে হাজারবার আসুম।'

এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন না করে বললাম, 'এখন কী করবেন?'

সুরেশ বলল, 'মিছিল লইয়া যাদবপুর ফিরুম। তুমি আমাগো লগে যাইবা তো।'

এখানে আমার কোন কাজ নেই। তবু যখন এসেই পড়েছি, এত তাড়াতাড়ি ফিরতে ইচ্ছা হল না। বললাম, 'আপনারা যান; আমি পরে ফিরব।'

'আইচ্ছা।'

মিছিল নিয়ে ফেরার ব্যবস্থা করতে লাগল সুরেশ। আর আমি লক্ষ্যহীনের মতন সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ খেয়াল হল, খিদে পেয়েছে। মিছিলে বেরুবার পর থেকে বিচিত্র এক উত্তেজনা আমাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল; আচ্ছন্নের মতন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ল, দুপুরবেলা আমার খাওয়া হয় নি। পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।

একটা খাবারের দোকান থেকে কিছু পুরী আর মিষ্টি খেয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে শিয়ালদায় চলে এসেছি, টের পাইনি।

সূর্যটাকে এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বলে দিনের আয়ু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতন শীতের আকাশটা এখনও আরক্ত হয়ে আছে।

পায়ে পায়ে স্টেশনের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ভেতরে সেই পরিচিত দৃশ্য; কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে গিয়েছিলাম যে সব ছিন্নমূল মানুষ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের কোন প্রান্তেই আশ্রয় পায় নি, শিয়ালদা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ডেলা পাকিয়ে দিনের পর দিন পড়ে আছে। আট-দশ ফুটের মতন জায়গা ইঁট দিয়ে ঘিরে একটা পরিবার নিজের নিজের সীমানা ঠিক করে নিয়েছে।

সেদিন চারদিকে লাল সালুর অসংখ্য ফেস্টুন ঝুলতে দেখে গিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে দেখার মতন শারীরিক বা মানসিক কোন অবস্থাই তখন ছিল না। আজ দেখতে পেলাম সেগুলোর ওপর নানা প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা। 'মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি', 'হিন্দু সৎকার সমিতি', বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন, 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'। উদ্বাস্তুদের সেবায় এই শহরের অসংখ্য মানুষ নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছে।

যাই হোক, এই মুহূর্তে খাবার ঘণ্টা চলছিল। স্টেশনের দক্ষিণদিক ঘেঁষে লঙ্গরখানা। শত শত অর্ধোলঙ্গ ক্ষুধার্ত শীর্ণ মানুষ থালা-বাটি-মগ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটল।

কৌতূহলের বশে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে লোকগুলো কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সামনের দিকে কতকগুলো স্বেচ্ছাসেবক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি আর ডেকচি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁড়িগুলো হলুদ রঙের তরল খিচুড়িতে বোঝাই; ডেকচিতে কালচে থকথকে তরকারি।

কি একটা টিকিট দেখিয়ে লাইনের লোকগুলো দু-হাতা করে খিচুড়ি আর খানিকটা করে তরকারি নিয়ে ফিরে আসছে।

একটা লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'টিকিটটা কিসের?'

সে বলল, 'আমরা যে সত্যকার রিফুজ (রিফিউজি) তার চিহ্ন। আগে আগে বাইরের ভিখারিরা আইসা খাইয়া যাইত। কে রিফুজ আর কে রিফুজ না, ভিড়ের মধ্যে চিনার উপায় নাই। তাই এই টিকিটের ব্যবস্থা হইছে। এইটা না দেখাইলে খাইতে দ্যায় না।'

'দিনে ক'বার খেতে দ্যায়?'

'খাওয়ার কথা আর কইয়েন না বাবু। দুইবার অবশ্য দ্যায়। সকালে একবার, আর এই সময় একবার। এই তো খাওনের নমুনা!' বলে খাদ্যসমেত হাতের মগটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, 'বলেন, মানুষে এই বস্তু খাইতে পারে না। এইতে প্যাট ভরে। নেহাত বাঁচতে হইব, তাই খাওয়া।'

লোকটার টিকিটখানাও দেখলাম। তাতে 'মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি'র ছাপ মারা আছে।

আরেকটা লোককে দাঁড় করিয়ে দেখলাম, তার টিকিটে 'ভারত সেবাশ্রমে'র ছাপ। অনুমান করলাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই মানুষগুলোকে ভাগ ভাগ করে সেবার ভার নিয়েছে।

একটা না, খাবার নেবার জন্য অনেকগুলো লাইন। খুব সম্ভব একসঙ্গে এখানে রান্নাবান্না হয় না। নানা প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা 'কিচেন' খুলে তাদের তালিকাভুক্ত উদ্বাস্তুদের খাওয়ায়।

অন্যমনস্কের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ কার চেঁচামেচিতে চকিত হয়ে চোখ ফেরাতে হল। একটা রোগা বুড়ো মানুষ দেখি উদ্‌ভ্রান্তের মতন একবার এ লাইনে, একবার ও লাইনে, একবার সে লাইনে ছোটাছুটি করছে। আর কেঁদে কেঁদে গোঙানির মতন সুর করে বলছে, বড় ক্ষুদা পাইছে; আমারে কিছু খাইতে দ্যান। কিছু না পাইলে আমি মইরা যামু।'

কিন্তু কেউ তার কথা গ্রাহ্য করছে না। বরং যে লাইনেই যাচ্ছে সেখান থেকেই ধাক্কা মেরে বার করে দিচ্ছে।

আমার ডান দিক দিয়ে একটা লাইন গেছে। সেখান থেকে একটা লোক এইমাত্র বুড়ো মানুষটাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরলাম, 'কী ব্যাপার,

তুমি বুড়ো লোকটাকে ফেলে দিলে যে?'

আমার মুখচোখ দেখে সে ভয় পেয়ে থাকবে। সন্ত্রস্ত স্বরে বলল, 'ওর টিকিট নাই।'

'টিকিট নেই মানে?'

'আইজক বুড়া (বুড়ো) পাকিস্তান থিকা আইছে। অখনও কোন পিতি-ষ্ঠানের টিকিট পায় নাই। টিকিট না পাইলে খাওন দিবন না।'

এদিকে বুড়োটা উঠে পড়েছিল; আবার সে অন্য একটা লাইনের দিকে ছুটল। সেখান থেকে বাধা পেয়ে আরেক দিকে।

আমার একবার ইচ্ছা হল, লোকটাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দিই। সে জন্য এগিয়েও গেলাম। কিন্তু তার আগেই বুড়োটা মুখ থুবড়ে পড়ল। ক্ষীণ জীবনী-শক্তি যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ খাদ্যের জন্য ছোটাছুটি করেছে; এবার আর সে উঠতে পারল না।

চারিদিকে এত অসংখ্য মানুষ। কিন্তু কেউ লাইন ছেড়ে বুড়োটার দিকে গেল না। মানুষ কত নির্দয় হয়ে গেছে।

আমার সত্তার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোতের মতন কি যেন বয়ে গেল। একরকম লাফ দিয়েই বুড়োটার কাছে এসে তাকে কোলে তুলে নিলাম। এদিক সেদিক তাকাতেই একটা রেড ক্রশের গাড়ি চোখে পড়ল। বুড়োকে নিয়ে তাতে তুলে দিলাম। আর সেই মুহূর্তে কে যেন পেছন থেকে ডেকে উঠল, 'চিরঞ্জীব---'

চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল---অলকাদি।

অলকাদিকে এখানে শিয়ালদা স্টেশনের এই পটে দেখব, ভাবিনি। বিমূঢ়ের মতন বললাম, 'আপনি।'

'হ্যাঁ, আমিই। খুব অবাক হয়ে গেছ, না?' অলকাদি হাসলেন, 'আমি কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম। বুড়ো মানুষটাকে তুমি ওখান থেকে তুলে এনে রেডক্রশের গাড়িতে উঠিয়ে দিলে---সারভিস টু দি হিউম্যানিটি। এ্যাঁ---'

বিব্রত মুখে বললাম, 'সারভিস আর কি---'

অলকাদি বললেন, 'মনে মনে ক'দিন ধরে তোমাকে খুব খুঁজছিলাম।'

অলকাদির সঙ্গে আমার মোটে একদিনের আলাপ; বিমলের সঙ্গে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি আর ক'টা কথা বলেছি; দু-একটা হুঁ-হাঁ ছাড়া প্রায় সারাক্ষণ মুখ বুজেই ছিলাম। যাই হোক তাঁর প্রতিধ্বনি করে বললাম, 'আমাকে খুঁজছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'বা রে, সেদিন বিমল তোমার চাকরির কথা বলে এল না? মোটা-মুটি একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে।'

আমার হৃৎপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে হাতখানেক ওপরে উঠে এল। প্রায় চিৎকারই করে উঠলাম, 'চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন অলকাদি। বললেন, 'তোমাকে পেয়ে ভালই হল। নইলে আবার খবর দিতে হত। আচ্ছা, এখন তোমার কোন কাজ আছে?'

'না।'

'তবে এসো আমার সঙ্গে।'

আচ্ছন্নের মতন অলকাদির পিছু পিছু পা বাড়িয়ে দিলাম।

(ক্রমশ।

মা মেয়েকে যা বলতে পারেন

যুব উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে যে প্রচণ্ড গোরগোল উঠেছে, তার মধ্যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে না; কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগ দায়িত্বশীল এবং নির্ভরযোগ্য।

সমাজতত্ত্ববিদদের মতে এর একটা কারণ সাংসারিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সমীক্ষায় প্রকাশ, অধুনা মা-বাবার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক আগের তুলনায় ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ। আগে ছিল একটা ভয়জাত শ্রদ্ধা, অনেক ক্ষেত্রেই ছোটরা গুরুজনদের এড়িয়ে চলত। এখন অবস্থা পাল্টেছে। এই পরিবর্তন শুভঙ্কর।

যে-কোন পরিবর্তনই কিছুটা বিভ্রান্তিকর, গোড়ার দিকে। এ-ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। যুগ যুগ ধরে এক নির্দিষ্ট সম্বন্ধের বাঁধনে ছোটরা গুরুজন-দের সমীহ করত। এখন বোঝাপড়ার ঢেউ লেগেছে। বেসামাল অবস্থার জন্য ছোটদের তুলনায় বড়দের দায়িত্ব বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারাই ঠিক করতে পারেন না আধুনিক জীবনের, সঙ্গে তাল রেখে ছোটদের কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এই দোলাচলতার ঢেউ ছোটদেরও প্রভাবিত করছে।

এই দোলাচল মনোভাব সব থেকে ক্ষতিকর হয় ছেলে এবং মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে অপ্রতিরোধ্য যৌন অনুভূতি সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞানের অভাব থাকলে। ছেলেরা তবুও বন্ধু-বান্ধব এবং বই থেকে কিছুটা জানতে পারে। সঙ্কোচ তাদের কম।

মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্কোচ খুব বেশি। তারা মুখ খুলতেই চায় না অনেক ক্ষেত্রে। এ সময় তাই মা মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। তার মাসিকচক্র সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ধারণা মা-ই কেবল সুষ্ঠুভাবে দিতে পারেন। কীভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয়, এই সূচনা যে ভাবী পরিণতির সূচনা এবং সর্বোপরি এটা জীবজগতের কেবল স্বাভাবিক ঘটনা নয়, জীবনস্রোত নিত্যবহমান রাখার উপায় —এইসব কথা মা মেয়েকে বোঝাতে পারেন। মঙ্গল আসে এভাবে। ত্রুটি ঘটলে উত্তর জীবনে অনেক অবাঞ্ছিত জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। হয়ও।

শঙ্করাচার্যের গল্প—

প্রাচীন ভারতে আর্যদের যে সাহিত্য ছিল, তা বেদ নামে পরিচিত। এই বেদের দুটি প্রধান বিভাগ---জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড। যে বিদ্যার দ্বারা অনুরূপ ব্রহ্মকে জানা যায় এবং মোক্ষলাভ করা যায় তা-ই জ্ঞানকাণ্ড নামে পরিচিত। এবং যে জ্ঞানের দ্বারা যাগ-যজ্ঞ করে পুণ্যের পথ প্রশস্ত করা হয়, তারই নাম কর্মকাণ্ড। প্রাচীন ভারতে এই জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান প্রচারকের নাম শঙ্করাচার্য। ইনি প্রায় তেরশ' বছর আগে দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। এই শঙ্করাচার্যই ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। ইনি মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। এঁর সম্বন্ধে যে অনেক রকমের প্রবাদ গল্প হিসেবে চলে আসছে; তারই একটি বলছি---

শঙ্করাচার্য তাঁর যৌবনকালের মধ্যে তখনকার ভারতবর্ষের বড় বড় দার্শনিকদের তর্কে হারিয়ে দিয়ে নিজের মতকেই বড় বলে প্রমাণিত করেছেন। এমন সময় তিনি শুনলেন যে, দাক্ষিণাত্যেই কুমারিল ভট্ট নামে কর্মকাণ্ডের একজন বড় দার্শনিক আছেন। শঙ্করাচার্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন কুমারিল ভট্টের কাছে; তাঁকে তর্কে পরাজিত না করলে যে শঙ্করাচার্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে না।

কুমারিল ভট্টের আশ্রমে গিয়ে শঙ্করাচার্য শুনলেন যে, তিনি তুঁষের আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছেন। শঙ্করাচার্য এগিয়ে গেলেন কুমারিল ভট্টের সঙ্গে আলাপ করতে এবং গিয়ে দেখলেন, তিনি তুঁষের আগুনের উপর শুয়ে নিজেকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাচ্ছেন।

শঙ্করাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এমনভাবে আত্মাহুতি দিচ্ছেন কেন?

---কে আপনি সৌম্য?---জিজ্ঞাসা করলেন কুমারিল ভট্ট।

---আমি শঙ্করাচার্য। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

---আপনি শিবাবতার শঙ্করাচার্য? আপনিই অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা? আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

শঙ্করাচার্য বিনীতভাবে উত্তর দিলেন---আমি অদ্বৈত বেদান্তের একজন দীন প্রচারকমাত্র। কিন্তু আপনি আত্মাহুতি কেন দিচ্ছেন তা তো বললেন না।

বড় নিষ্ঠুর সে কাহিনী, শুনুন তবে---কুমারিল ভট্ট বলতে সুরু করলেন। ---আমি কর্মকাণ্ডের প্রচারক হলেও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমার খুব আগ্রহ ছিল। তাই বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে

শ্রীবরেণ্য ভট্টাচার্য

জ্ঞানার্জনের জন্যে আমি তিব্বতে গিয়েছিলাম একজন বৌদ্ধ-ভিক্ষুর কাছে। কিন্তু আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম আমার বর্তমান পরিচয় গোপন করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে পড়লাম তাঁর কাছে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন। আসলে কর্মকাণ্ড আমার সম্পূর্ণ অধিগত। তাই পাঁচ বছর ধরে বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন পড়েও আমার মনে হোল---বৌদ্ধ-দর্শনের তুলনায় মীমাংসা দর্শন, যা কর্মকাণ্ড বলেই পরিচিত, অনেক গভীরতর এবং উচ্চতর। মীমাংসার যুক্তি দিয়ে বৌদ্ধ দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করা যায়। আমি সেকথা আমার গুরুদেবকে বলতেই তিনি রেগে উঠলেন এবং আমাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং এই সর্ত দিলেন যে, যিনিই পরাজিত হোন না কেন, তিনি বিজয়ীর ধর্ম গ্রহণ করবেন অথবা বিজয়ীর ধর্ম গ্রহণে অনিচ্ছা থাকলে আত্মাহুতি দিতে হবে।---

এই সব কথা বলতে বলতে কুমারিল ভট্টের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে এল। তুঁষের আগুনে অল্প অল্প দগ্ধ হতে থাকলেও তিনি একটু অপেক্ষা করে আমায় সেই নিদারুণ কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন---

গুরুদেবের সেই সর্ত আমি মেনে নিলাম। তর্ক আরম্ভ হোল আমাদের দুজনের মধ্যে। সেখানে আমার সহপাঠী বন্ধুরা ছাড়া আর কেউই ছিল না। চারিদিক নিস্তব্ধ। কয়েক দিন ধরে চলল আমাদের তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই বিজয়ী হোলাম। গুরুদেব পরাজিত হলেন।

আমার মন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একজন দীন প্রচারক হিসাবে হিন্দু ধর্মকে আমি উচ্চতর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আস্তে আস্তে আমি আমার গুরুদেবকে বললাম, 'গুরুদেব, এবার আমার ধর্ম গ্রহণ করুন।'

গুরুদেব চমকে উঠলেন, বললেন 'না, আমি মৃত্যুই বরণ করব।'

তাই হল। গুরুদেব স্বহস্তে

ছোটদের আসর
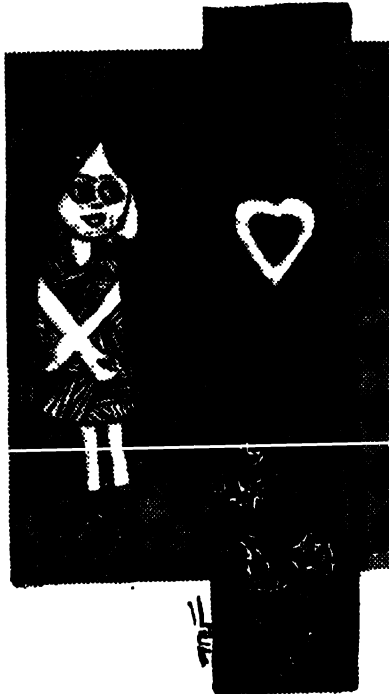
রচিত প্রজ্জ্বলিত চিতাতে উঠে আত্ম-বিসর্জন দিলেন।

আমি ফিরে এলাম স্বদেশে। কিন্তু সেখান থেকেই আমার মনে হচ্ছে আমি অসাধারণ পাপ করেছি। আমার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। মনে কোনও শান্তি নেই। আমার মতো গুরুহন্তার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করলাম---এর প্রায়শ্চিত্ত কি?

উত্তর পেলাম---তুঁষের আগুনে অল্প অল্প দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, তাই আমার এই আত্ম-বিসর্জন।'

কুমারিল ভট্ট চুপ করলেন। চোখের দু'কোণ বেয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। শঙ্করাচার্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, এই মহান ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করেও শান্তিতে মরতে পারছেন না। অথচ আর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হবে চারিদিক লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার মানুষ এবং অগণিত শিষ্য তাদের প্রিয় গুরুর মৃত্যুতে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক মহান দার্শনিক অপর এক দার্শনিকের মৃত্যুকে ব্যথিত অন্তরে প্রত্যক্ষ করছেন।

সর্বাঙ্গ অল্প অল্প করে পুড়ছে। এই অসহ্য কষ্ট কুমারিল ভট্ট মুখ বুজে সহ্য করছেন। হঠাৎ চোখ খুলে শঙ্করাচার্যের দিকে তাকালেন, বললেন ---'আপনি কিসের জন্যে এসেছেন, বললেন না তো?'

---'এসেছিলাম আপনার সঙ্গে তর্ক করতে। কিন্তু এখন দেখছি তর্কে আপনাকে পরাজিত করা কিংবা আমার বিজিত হওয়া, কোনটারই সৌভাগ্য আমার হোল না।'---শঙ্করাচার্য নিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

---'আমার সঙ্গে তর্ক হোল না বলে মনে কোন দুঃখ রাখবেন না'---কুমারিল ভট্ট অনেক কষ্ট করে বললেন 'মিথিলাতে আমার এক শিষ্য আছে। মুণ্ডক মিশ্র তার নাম। আপনি তার কাছেই যান। তার সঙ্গে তর্কে আপনি আনন্দ পাবেন।'

কুমারিল ভট্ট আর কিছু বলার চেষ্টা করেও পারলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

দুঃখিত মনে মিথিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন শঙ্করাচার্য। উপস্থিত হলেন মুণ্ডক মিশ্রের বাড়ীতে। কুমারিল ভট্টের আত্মাহুতির কারণ বর্ণনা করে তাঁর মিথিলাতে আসার কারণ বললেন। মুণ্ডক মিশ্র তর্কযুদ্ধে রাজী হলেন এবং সর্ত এই ঠিক হল যে, যিনি পরাজিত হবেন, তিনি বিজয়ীর মত এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেবেন।

আরম্ভ হল প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ। এই তর্কে বিচারকের পদে ছিলেন মুণ্ডক মিশ্রের বিদুষী পত্নী উভয়ভারতী। প্রবল তর্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। অবশেষে কুমারিল ভট্টের সুযোগ্য শিষ্য মুণ্ডক মিশ্র পরাজয় স্বীকার করলেন। তিনি শঙ্করাচার্যকে গুরু বলে স্বীকার করে অদ্বৈত বেদান্তে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। গুরুদেবের দেওয়া নামে মুণ্ডক মিশ্র সুরেশ্বরাচার্য নামে পরিচিত হয়ে অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারে মনোনিবেশ করলেন।

আলপনা শিল্পীঃ প্রীতি মুখোপাধ্যায়
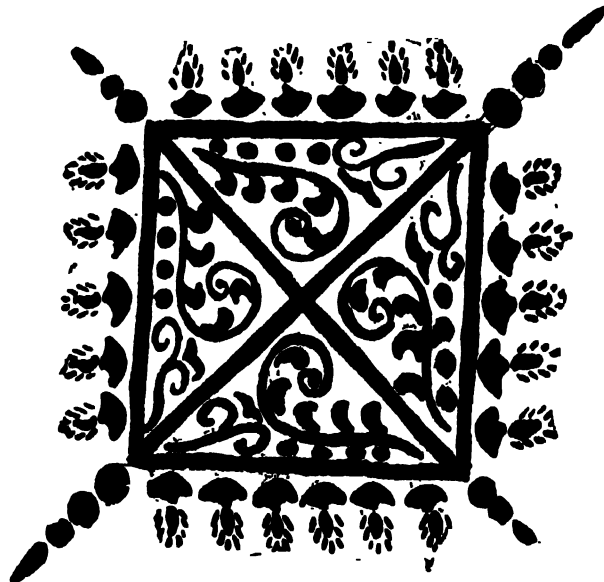
আশ্চর্য

একদিন একটি কৃষক এক গরুর গাড়ী ভর্তি পিয়ার ফল নিয়ে গ্রামের বাজারে গিয়েছিল বিক্রী করতে। বহু লোক তার গাড়ীটিকে একেবারে ঘিরে ফেলেছিল পিয়ার ফল দেখবার জন্যে। জনতা কৃষকের অমন সুন্দর ফল দেখে খুব অবাক হয়েছিল। কৃষকের ফলের সুনাম প্রায় মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই-সঙ্গে একটা বদনামও রটেছিল কৃষকের। সে ছিল ভীষণ কৃপণ আর তার ফলের দামও বড্ড বেশী।

জনতা যখন সেই কৃষককে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-পরা এক পুরোহিত এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে করতে সেই জনতার মধ্যে এসে পড়ে। তারপর সেও কৃষকের পিয়ার ফলগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। হঠাৎ পুরোহিতটি খুব বিনয়ের সঙ্গে কৃষকের কাছে একটি পিয়ার চাইল।

কিন্তু কৃষকের মনটা ছিল ভারী নীচু আর মেজাজটা ছিল ভারী খিঁচ্রী। সে কিছুতেই ফল দিতে চাইল না।

পুরোহিত কৃষকের কটু কথায় হতাশ হয়ে হাঁ করে তাকিয়েছিল ফলের গাড়ীর দিকে। এতে কৃষক রেগে পুরোহিতকে যা-তা বলে গালাগালি দিতে লাগল।

পুরোহিত কৃষকের কথা গায়ে না মেখে শুধু বলল, দেখ ভাই, তোমার গাড়ীতে কত পিয়ার ফল রয়েছে, এর থেকে একটা ফল আমায় দিলে তোমার এমন কিছু ক্ষতি হোতো না।

জনতার মধ্যে থেকে একজন বলল, কেন তুমি এই গরীব লোকটিকে একটি পিয়ার ফল দিচ্ছো না? ভাল দেখে যদি না দিতে চাও, একটু নরম দেখেই না হয় দাও, এতে তোমার কিছু লোকসান হবে না।

কৃষকটি লোকটির এই ধরণের কথা মোটেই বরদাস্ত করতে পারল না। আগের চেয়ে আরও খারাপ কথা বলে গালাগাল দিতে লাগল।

আমি কত কষ্ট করেছি গাছের জন্যে, তবে এতো সুন্দর পিয়ার ফল হয়েছে। আমি এগুলি বাজারে লোকদের দান করবার জন্যে আনিনি?

বাজারের লোকেরা দু'দল হয়ে গিয়ে একদল কৃষকের পক্ষ নিয়ে আর একদল পুরোহিতের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে লাগল। তাদের কথা জোর হতে লাগল ক্রমশ নানান বাগ্-বিতণ্ডা হতে লাগল। গোলমাল চরম পর্যায়ে পৌঁছোলো। শেষে একজন লোক এসে কৃষককে একটি পয়সা দিয়ে বলল, দয়া করে এই পুরোহিতকে একটি ফল দাও।

কৃষক পুরোহিতকে একটি ফল দিলো। পুরোহিতটি ফল নিয়ে মাথা নীচু করে লোকটিকে সম্মান দেখাল। পরে সে উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বলল, আমি ভেবে পাচ্ছি না যার যত বেশী থাকে সে ততো কৃপণ হয় কেন? এই যেমন কৃষকের এতো ফল থাকা সত্ত্বেও একটি ফল দিতে চাইল না। আমি পুরোহিত হবার সময় আমার সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছি। আমার টাকা নেই, বাড়ী নেই, সংসার নেই, তবু আমার যা আছে, তাই আমি সবাইকে আনন্দের সঙ্গে ভাগ করে দিই। এই যেমন, আমার একটি ফলে পর্ণ পিয়ার গাছ আছে। আমি সবাইকে একটু অপেক্ষা করতে বলছি, পরে আমরা সবাই সেই ফল একসঙ্গে মিলেমিশে ভাগ করে খাবো।

যদি তোমার এতো ফল থাকে, তবে কেন তুমি বাজারে এসে একটি ফল ভিক্ষে চাইছো? একটি লোক জিজ্ঞাসা করলো।

'আঃ! আগে আমি গাছটিকে উৎপন্ন করি,' পুরোহিত বলল।

পুরোহিত তার হাতের ফলটি খেয়ে কেবল একটি মাত্র বীজ হাতে রেখে দিলো। তারপর সে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই বীজটি পুঁতে দিল।' 'কিন্তু একটু জল চাই যে' সে বলল। জনতা এই সব কাণ্ড দেখে হাসতে আরম্ভ করে দিলো। কিন্তু একটি ছোট ছেলে একটি পাত্র করে জল এনে পুরোহিতকে দিলো। পুরোহিত জলটা মাটিতে ঢেলে দিলো।

●

হঠাৎ সকলে দেখলো একটি ছোট চারা মাটি থেকে মাথা তুললো। একটু বড় হলো গাছটি। তারপর শাখা-প্রশাখা ছড়ালো। বড় গাছে পরিণত হলো, ছোট চারা গাছটি। আরও বড় হলো, আরও বড়---। প্রচুর পাতায় গাছটি ঢেকে গেল। মুকুল দেখা দিলো। ফুল ফুটল। ফুল ঝরে ছোট ছোট পিয়ার ফল দেখা দিলো। আস্তে আস্তে ফল বড় হলো। ফলের ভারে গাছের ডালগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কেবল পিয়ার---আর পিয়ার---।

লোকেরা এই কাণ্ড দেখে খুবই অবাক হলো। পুরোহিতের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। সে একটি করে ফল তুলতে লাগল আর লোকদের বিলোতে লাগল। যত লোক ছিল সবাইকে ফল দিলো। যে কৃষকটি পুরোহিতকে ফল দিতে অস্বীকার করেছিল সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখটি হাঁ করে। সব শেষের ফলটি আশ্চর্য গাছ থেকে তুলে পুরোহিত দূরে ফেলে দিলো। তার পিঠের ঝোলায় যে ছোট কুড়ুলটি ছিল সেটা বার করে গাছটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো। তারপর গাছের টুকরোগুলি জড়ো করে কাঁধে চাপিয়ে বাজার ছেড়ে চলে গেল। জনতা তখনও পিয়ার ফল খাচ্ছিলো।

সেই কৃষকটিও অন্যান্য লোকদের মত পুরোহিতের কার্য-কলাপ দেখছিল।

শ্রীমতী রেবা দত্তরায়

লোকটি চলে যাবার পর কৃষক গাড়ীর দিকে ফিরলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, তার পিয়ার ফলে পূর্ণ গাড়ীটি একেবারে খালি। একটি ফলও পড়ে নেই। এই না দেখে কৃষকের মাথা ঘুরে গেল।

পরে সমস্ত বুঝলো কেমন করে এই কাণ্ডটি ঘটলো, পুরোহিত যে সবাইকে পিয়ার ফল দিয়েছে, তা সমস্তই তার গাড়ী থেকে নিয়েছে। পুরোহিতের ফল নয় ওগুলি, সবই কৃষকের। পরে সে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল কেমন করে এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটলো। তারপর আরও দেখতে পেলো, তার গাড়ীর একটি হ্যাণ্ডেলও উধাও হয়ে গেছে। গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝলো, পুরোহিত এই হ্যাণ্ডেলটি ছোট কুঠারে পরিণত করে গাছটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিলো।

কৃষকটি ভীষণ রেগে গেল। সে ছুটতে আরম্ভ করলো পুরোহিতকে ধরবার জন্যে। কিন্তু কৃষক তাকে আর দেখতে পেলো না। কেবল রাস্তায় এক দেওয়ালের পাশে তার গাড়ীর ভাঙ্গা হ্যাণ্ডেলটি দেখতে পেলো।

যখন সবাই পুরোহিতের অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারটি বুঝতে পারলো তখন খুব হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। কেবল কৃপণ কৃষকটি যোগদান করতে পারে নি সেই হাসি-তামাশায়।

সেই বুড়ো পুরোহিতকে সেই অঞ্চলে আর কখনও দেখা যায় নি।*

* চীন দেশের গল্প অবলম্বনে

তাই ফু

স্বপন চৌধুরী

অনেক, অ-নে-ক দিন আগে চীন দেশে তাই ফু নামে একটি ছেলে ছিল। তাই ফু মানে সুখদা। তার বাপ-মা ছিল খুব গরীব। কোনরকমে তাদের সংসার চলত। ওর যোল বছরের সময় ওর বাপ-মা দু'জনেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হ'লেন। তাই ফু বড্ড ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তার ডাকতে সে পুবদিকের একটা গ্রামে গেল। সেখানকার ডাক্তার ছিলেন ডাঃ ওয়াং। তাই ফু'র অনুনয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার ফীস্-এর টাকা তোর বাপ-মার জীবনের চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান।'

আরও ভয় পেয়ে তাই ফু পশ্চিম-গাঁয়ের ডাক্তার ডাঃ লুইকে ডাকতে গেল। ওর কাতর অনুনয় সত্ত্বেও ডাক্তার বিনা ফিস্-এ রুগী দেখতে রাজী হলেন না। বললেন, 'তোর বাবা-মা'র জীবন ওষুধের থেকে বেশি দামী নয়।'

কয়েকদিন পরে বিনা চিকিৎসায় তাই ফু'র বাবা-মা মারা গেলেন। দুঃখে মুহ্যমান তাই ফু প্রতিজ্ঞা করল---'আমি ডাক্তার হ'ব। যারা পয়সার অভাবে ডাক্তারের ফীস দিতে পারে না, আমি বিনা ফীস-এ শুধু তাদের চিকিৎসা করব।'

বাপ-মা মারা যাবার পর প্রতিবেশীরা তাই ফুর তদারক করতে এলেন। তাঁরা শীঘ্রই ওর ডাক্তার হবার ইচ্ছা জানতে পারলেন। 'ও কথা ভেবে লাভ নেই'—তাঁদের একজন সান্ত্বনার সুরে বললেন—'আমরা গরীব। পয়সা ছাড়া তো পড়াশুনা করা সম্ভব নয়।'

কিন্তু তাই ফুর সংকল্পে দৃঢ়তা দেখে প্রতিবেশীরা তাকে একজন বুড়ো ডাক্তারের কাছে নিযুক্ত করে দিলেন।

সমস্ত দিন কাজ করত তাই ফু। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে বুড়ো ডাক্তারের চিকিৎসা পদ্ধতি সতর্কভাবে গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করত। এইভাবে সে নাড়ীর গতি অনুভব করতে শিখল। শিখল রোগের কারণ নির্ণয় করতে আর প্রেসক্রিপসন লিখতে। রোজ রাত্রে ডাক্তারের অজ্ঞাতসারে সে দেরাজের গায়ে লেখা রোগ-নিরামক ওষুধগুলোর নাম পড়ত। ক্রমে সে ওষুধগুলির নাম আর তাদের ব্যবহার আয়ত্ত করত।

'এই গাছ-গাছড়াগুলি প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ, সকলের মংগলের জন্য এদের ব্যবহার করা উচিত'---এক বছর থাকার পর একদিন তাই ফু বুড়ো ডাক্তারকে বলল---'গরীব লোকদের রোগ নিরাময়ের জন্য আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি।'

শুনে বুড়ো ডাক্তার খুব রেগে গেলেন। কিন্তু তাই ফু ঠিক বেরিয়ে পড়ল।

তাই ফুকে ফিরতে দেখে প্রতিবেশীরা খুশী হ'ল। কর্তব্যসচেতন তাই ফু জানত যে, উত্তর দিকের এক পাহাড়ে ওষুধের গাছ আছে। পরের দিন সকালে একটা ঝুড়ি ধার করে তাই ফু সেই পাহাড়ের দিকে চলল। ওটাকে 'ওষধি পাহাড়' বলা হ'ত, সেই দিনটা বড় গরম ছিল। পাহাড়টাও অনেক দূরে। আশ্চর্য। পাহাড়ে পৌঁছে সে কোন ওষধি গাছ দেখতে পেল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। আকাশে উঠল তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদ। সমস্ত পাহাড় ভরে গেল আবছা জ্যোৎস্নায়। সর্বত্রই আলো আলো ছায়া-ছায়া। তাই ফু পাহাড় থেকে নীচে নামার কোন পথ দেখতে পেল না। কিন্তু একটা চলমান মানুষের ছায়া দেখতে পেয়ে ও অশান্বিত হয়ে উঠল। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঝকঝকে সবুজ মখমলের পোশাক-পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেল। মৃদু সমীরণে দোলায়মান ফুলের মতন লঘু তার প্রতিটি অংগভংগী। তাই ফু তাকে অনুসরণ করতে লাগল। এইভাবে যেতে যেতে সে পথের দুধারে বহু মূল্যবান ওষধি

গাছ দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি সেগুলো ছিঁড়ে সে তার ঝুড়িতে ভরে ফেলল। কিন্তু পেছন ফিরে দেখে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামনে দিয়ে একটা জল-স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। সেই জলস্রোতে সামনের চূড়া থেকে একটা জলপ্রপাত নির্গত হচ্ছে। চারিদিক ঘুরে এসে তাই ফু অবাক। সামনেই একটা মসৃণ সোজা রাস্তা। তখন প্রায় ভোর হয় হয়। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে সুরু করল।

সেদিন থেকে সে গরীব রোগীদের বিনা পয়সায় রোগ সারাতে সুরু করল। একদিন সে এক রোগীর কাছে গেল। তার গলায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। ওটা কেবল এক রকম পাহাড়ী চা-পাতায় সারানো যায়; সেগুলো পাথরের উপর ফোটে। তাই ফুর কাছে ওষুধটা ছিল না।

তাই সে আবার সেই পাহাড়টায় গেল। সমস্ত দিন—রাত্তির খুঁজেও সে ওষুধটা পেল না। সামনের উঁচু পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে সে ভাবলো, হয়তো ওষুধটা ওখানে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেমন করে জলস্রোত ডিঙিয়ে সে অত উঁচু পাহাড়ে উঠবে। হঠাৎ তার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। সে হয়তো তাই ফু-কে ওখানে নিয়ে যেতে পারত। ঠিক সেই সময় একটা বাঘ তীক্ষ্ণ দাঁত আর নখ-গুলো বার করে তার দিকে ছুটে আস-ছিল। ভয় পেয়েও তাই ফু নিজেকে সামলে নিল। 'ব্যাঘ্ররাজ'—সে মিনতি করে বলল, 'আমি অসুখ সারাবার জন্য জঙ্গলী চা-পাতা নিতে এসেছি; আমাকে মেরো না।'

মনে হল বাঘটা বুঝেছে। মাথা নেড়ে লেজ দুলিয়ে সে পাহাড়ের দিকে তাকাল। যেন বলতে চায়, 'আচ্ছা এস, আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

তাই ফু বুঝতে পারল। সাহস করে সে বাঘটার লেজ ধরল। বাঘটা এক-লাফে পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে উঠলো।

সেই পাহাড়ের চূড়ো দুষ্প্রাপ্য ওষধি গাছ আর মনোরম ফুলে আকীর্ণ। সেগুলো তুলতে গিয়ে সে শুনতে পেল, 'কে আমার দুষ্প্রাপ্য ওষধি গাছ তুলছে?'

পিছন ফিরে সে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দেখতে পেল। 'এই মেয়েটিকেই তো আমি সে দিন দেখে-ছিলাম'—তাই ফু আশ্চর্য হয়ে ভাবে।

'আমি ওষধি পরী'—মেয়েটি বলল —'তোমাকে এখানে আনার জন্য আমিই ব্যাঘ্ররাজকে অনুরোধ করেছিলাম।' সে তাই ফুকে নিজের ঝুড়িটি দিয়ে বলল, 'এই ঝুড়িটা ঐন্দ্রজালিক। এটা চির-কাল ওষধি সরবরাহ করতে পারবে। এর সাহায্যে গরীবদের নীরোগ কর।'

উত্তর দিতে গিয়ে তাই ফু দেখল মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে কি এটা একটা স্বপ্নমাত্র? না। কারণ তার হাতে সুগন্ধি ও বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট ওষধিপূর্ণ একটি ঝুড়ি ছিল।

গ্রামে ফিরে গিয়ে চা-পাতার সাহায্যে তাই ফু সেই গলায় ক্ষতযুক্ত লোকটিকে নীরোগ করে তুলল। তখন থেকে যেই তার কাছে আসত সেই সুস্থ হয়ে ফিরে যেত। সে কারও কাছ থেকে পয়সা নিত না। ক্রমে রোগীর ভিড় বাড়তে লাগল।

সম্রাট এই কথা শুনলেন। তাই ফুকে রাজ-চিকিৎসকরূপে রাজধানীতে আনবার জন্য তিনি স্বনামাংকিত অনু-রোধপত্র দিয়ে একজন মন্ত্রীকে পাঠা-লেন। কিন্তু মন্ত্রিবর কিছুতেই তাকে রাজ-ধানীতে আসতে রাজী করাতে পারলেন না। অবশেষে তিনি তাকে জোর করে রথে তুলতে সৈন্যদের হুকুম করলেন।

সব কথা শুনে গ্রামবাসীরা এসে রথ থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সৈন্যরা তাদের মেরেধরে তাই ফুকে নিয়ে চলে গেল। তারা যখন 'ওষধি-পাহাড়ে'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ পাহাড় থেকে ধ্বস নামল। পাহাড়টা ফেটে গিয়ে পাথরের কুচি চারিদিকে ছিটকে যেতে লাগল। মন্ত্রীমশাই নিহত হলেন। তাই ফু অবাক হয়ে দেখল সেই মেয়েটি তাকে একখণ্ড সাদা মেঘের ভেলায় বসিয়ে 'ওষধি পাহাড়ে'র সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তাই ফু রোগগ্রস্ত মানুষদের ভুলতে পারেনি। যখনই কেউ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখনই সে সেই ঐন্দ্রজালিক ঝুড়িটা নিয়ে এসে তাকে রোগমুক্ত করে দিয়ে যায়।*

---

* চীনা গল্প থেকে

প্রার্থনা — চিত্র : বিজয় খাঁ

সাবাস ছেলে

এক চাষার ছেলে। বাবা-মা কেউ নেই বেঁচে। ছেলেবয়সে বেরিয়ে পড়তে হলো রুজি-রোজগারের জন্য তাকে। দেশ-বিদেশের নানা জায়গা ঘুরে বেড়ালো সে। কিন্তু এমনি মন্দ বরাত, কাজ জুটলো না কোথাও তার।

একদিন রোজকার মতো ঘুরতে ঘুরতে সে এক গহীন বনের ভেতর পৌঁছে গেলো। বনে এতো বড় গাছ যে দিনের বেলায়ও সূর্যের আলো প্রবেশ করে না সেখানে। দূর থেকে মনে হয় দৈত্য-দানার দেশ---আর সেগুলো ঝাঁকড়া চুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। গাছের ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার বনপথ, ফুরোতে চায় না। ছেলেটা চলতে চলতে দূর থেকে দেখতে পেলো একটি কুঁড়ে ঘর। শ্রান্ত, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সে সেখানেই বসে পড়লো। গাছের শাখায় ঢাকা, ঘন পাতার আড়ালে ঘরটি। দরোজার ঠিক সামনে ঘর আগলে বসে রয়েছে এক বুড়ো। চোখ দুটি তার বন্ধ।

পাশেই একটি খোঁয়ার তাতে গোরু ভেড়া ছাগলে ভর্তি। সেগুলো তখন চেঁচামিচি করছিলো। আর বুড়ো নিজের মনে কাদের উদ্দেশ্য করে বকে যাচ্ছিলো। কী করবো বল? অন্ধ মানুষ আমি। আমার এমন সাধ্যি নেই তোদের আশে পাশের জমিতে চরিয়ে নিয়ে আসতে পারি।

ছেলেটি সাহস করে বুড়োর কাছে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে করুণ স্বরে বললো: আপনি আমার বাবার চেয়েও বয়সে বড় হবেন, তাই দাদু-ভাই বলছি। আমার আপনার জন সব মারা গেছেন। তাই একটু মাথা গুঁজবার এবং দু' মুঠো অন্নের জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। যদি দয়া করে আমাকে রাখেন। তা হ'ল আপনাকে প্রাণপণে সাহায্য করতে পারি। আপনার পশুগুলোকে মাঠে চরিয়ে আনতে পারি।

তার কথা শোনে বুড়ো আকাশ থেকে পড়লো যেন। সে বললো---তোমার বাড়ি ঘরের কিছু খবরই আমি জানি না। তুমি কে হে বাপু? তুমি কেমন করে এখানে এলে। ভারী মিষ্টিতো তোমার কথাগুলো। ছেলেটি তখন কাঁদ কাঁদ মুখে তার কাছে সব কথা খুলে বললো।

তার নাম যে জন ও কথা বলতে সে ভুললো না।

ছেলেটির মধুর ব্যবহারে ও সুমিষ্ট বাক্যে তার মন গলে গেলো। সেখানে থাকবার অনুমতি তখুনি পেয়ে গেলো সে। তাকে সাবধান করে দিলো---সে যেন বনের বাইরে পাহাড়টির দিকে

সুধাংশু গুপ্ত

না যায়। দুষ্টু পরীরা বাস করে ওখানে; কিছু না কিছু খাইয়ে, কিংবা শুঁকিয়ে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে চোখ উপড়ে নেয়া কাজ তাদের। ওই দুষ্টু পরীরাই আমার সর্বনাশ করেছে---তাই আমি আজ অন্ধ।

জনের মাথা গোঁজবার স্থান পেয়ে আনন্দের অবধি রইলো না। তার আর ঘোরাঘোরি করতে ভাল লাগছিলো না।

প্রতিদিন যে পশুপালকে চরিয়ে নিয়ে আসে বনের আশেপাশে। কিছু দিন কাটলো। একদিন তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠলো। পরী-দের আবার ভয়? যা আছে কপালে, এই-না ভেবে সে বনের বাইরে পশু-দের ছেড়ে দিলো। মনের আনন্দে পশুগুলো তাজা সবুজ ঘাস চিবোতে লাগলো। নিজে একটা বড়ো গাছের ছায়ায় চুপটি করে রইলো বসে। অল্প পরেই সে অবাক হয়ে দেখতে পেলো বকের পালকের মতো শুভ্র পোষাক পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে। হরিণের চোখের মতো কালো চোখ মেয়েটির। মাথায় এক রাশ চুল।

মেয়েটি তার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললো: ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার জন্য আমাদের বাগান থেকে তুলে এনেছি টুকটুকে লাল একটি আপেল। তুমি খেলে এর স্বাদ বুঝতে পারবে।

একটু ঘাবড়ে না গিয়ে জন চট্‌পট্‌ জবাব দিলো: সে হয় না। এর জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমি যে মনিবের কাছে থাকি, তার আপেলের বাগান আছে---সেখানে কত না অসংখ্য ফল ফলে রয়েছে। সে খেয়েই শেষ করতে পারি না। আমাকে মাপ করো বোন।

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে যে পথে এসেছিলো---সে পথ দিয়ে ফিরে গেলো।

জন তো আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে---পরীদের প্রলোভনে সে ভুলবে না।

খানিক বাদেই আর একটি পরমা-সুন্দরী মেয়ে এসে তার কাছে হাজির হলো। তার হাতে ছিলো একটি রক্ত গোলাপ। হাসি মুখে সে বললো: আমার হাতের সুন্দর গোলাপটি নাও না ভাই। এর সুগন্ধে তোমার প্রাণমন ভরে উঠবে। একবার শুঁকেই দেখ না।

জন সঙ্গে সঙ্গে বললো: তুমি হয়তো জান না যে আমার মনিবেরও গোলাপ বাগান আছে। তারা ও মিষ্টিগন্ধী। আমায় ক্ষমা কোরো।

রাগে গরগর করতে করতে সে প্রস্থান করলো। আবার আর একটি মেয়ে এলো। আগেরটির চেয়ে আরো বেশি লাবণ্যময়ী। সে বললো: তোমাকে দেখলেই মনে হয় বড্ডো ছেলেমানুষ তুমি। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত এলো-মেলো তোমার। আমার কাছে এস না। একটি সুন্দর চিরুণী আমি এনেছি। যদি বলো তবে এখুনি পরিপাটি করে আঁচড়ে দিতে পারি।

এবারে জন টুঁ শব্দটি করলো না। যেমনি মেয়েটি তার কাছে এলো---

অমনি মাথার টুপি খুলে তা থেকে বের করলো পাকানো এক দড়ির গোছা---তার একটি খুলল। তারপর দড়ি দিয়ে শক্ত করে তাকে বাঁধলো।

মেয়েটি ভীষণ কান্নাকাটি সুরু করে দিলো। আর চীৎকার করে বললো কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও। আমায় মেরে ফেললো যে।

চেঁচামিচি শুনে আগের মেয়ে দুটি ছুটে এলো। তারা মেয়েটির অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলো। জনকে সম্বোধন করে বললো: রাখাল ভাই, কেন মিছিমিছি আমাদের বোনকে কষ্ট দিচ্ছো। বন্ধন কেটে দাও।

সে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গেলো। শুধু ক্রুদ্ধস্বরে বললো যে, আমি পারবো না। সাহস থাকে তো নিজেরাই বাঁধন কেটে মুক্ত করে দাও।

অগত্যা আর কী করে তারা। বাঁধন খোলবার জন্য যেমনি তারা এগোতে যাবে, অমনি জন হাতের খুন্তি তাদের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। তারপর দু'জনকে আগের মেয়েটির মতো বেঁধে ফেললো। বললো, তোমাদের শয়তানি আমি বুঝতে পেরেছি। তোমরাই আমার মনিবের চোখ হরণ করে অন্ধ বানিয়েছো। এবার তার সমুচিত শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।

ইতিমধ্যে সে এক সময় মনিবের কাছে ছুটে গেলো। তাকে সবিস্তারে সব বললো। তাকে হাত ধরে সেখানে নিয়ে এলো।

এসে প্রথম মেয়েটিকে বললো: অমি এক সর্তে তোমার বাঁধন খুলে দিতে পারি---যদি আমার মনিবের চোখ দুটি এনে বসিয়ে দিতে পারো। তা' না হলে পাহাড়িয়া নদীর জলে তোমাকে ফেলে দেবো।

মেয়েটি বন্ধনমুক্ত হয়ে তাকে পাহাড়ের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ভেতর নিয়ে এলো। কী আশ্চর্য। ছোট-বড় নানা ধরণের চোখ রয়েছে তাতে, মেয়েটি দুটি চোখ খুঁজে পেতে বের করে এনে বুড়োকে পরিয়ে দিলো। বুড়ো কিন্তু যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। বলল: এতো আমার চোখ নয় জন। এ যে পেঁচার চোখ। আমি তো খালি খালি পেঁচাই দেখছি। জন তখুনি এই দুষ্টু পরীটাকে নদীতে ফেলে দিলো। দ্বিতীয় মেয়েটিকে নিয়ে সে আবার গুহার মধ্যে ঢুকলো। এবার যে জোড়া চোখ এনে বুড়োকে পরানো হলো, তাতেও সে চেঁচিয়ে উঠলো। বললো! এতো নেকড়ে বাঘের চোখ। আমি শত শত নেকড়ে বাঘ দেখতে পাচ্ছি।

জন ভীষণ রেগে গিয়ে দ্বিতীয় পরীটাকেও আগের মতো নদীর জলে নিক্ষেপ করলো।

এবার তৃতীয় পরীর পালা। তার দেয়া চোখ পরে' বুড়ো উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো:---এ বাঁদরের চোখ। রাজ্যের যতো বানর আছে সব এসে দাঁড়িয়ে কিচ্ কিচ্ করছে আমার সম্মুখে।

জনের চোখ থেকে আগুনের হল্কা বেরুলো। ওই মেয়েটিকে যেমনি ফেলতে যাবে, অমনি সে ডুকরে কেঁদে উঠলো। মিনতিমাখা কণ্ঠে বললো: আমাকে ফেলো দিও না ভাই। আমি তোমার মনিবের আসল চোখ ফিরিয়ে দিচ্ছি। বলেই গুহার ভেতর লুকনো জায়গা থেকে তা খুঁজে পেতে নিয়ে এলো। সেই জোরা চোখে লাগিয়ে দিতেই সে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো। আর বলতে লাগলো: এতদিন পরে আমার হারানো ধন পেয়ে গেছি। এখন যে-দিকে তাকাই না কেন আলোর ঝরণাধারা বয়ে যাচ্ছে। হে ভগবান, তোমার অশেষ করুণায় আমি ধন্য হলাম। আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ কর। তারপর---জনকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে নাচতে সুরু করলো সে। তার দু' চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু দু' ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো।*

---

*বোহেমিয়ার [illegible]

ঠাকুরপূজা চিত্র: শ্রীঅরুণকুমার দাস

কলিতীর্থ কামারপুকুর

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

॥ ছেচল্লিশ ॥

ধরা না দিলে কে চিনবে তাঁকে? নিজে চিনিয়ে না দিলে কে পারে তাঁকে চিনতে? কে তাঁকে পারে জানতে? বেদ বেদান্ত যেখানে পায় না অন্ত, অন্ধকারে খুঁজে মরে—সেখানে সাধারণ মানুষ কি করতে পারে?

চব্বিশটি ঘণ্টা পাশে রয়েছেন পার্শ্বচরের মতন তবুও তাঁকে চিনতে পারলেন না মথুরানাথ।

দুর্গাপুজায় নিয়ে এসেছেন মথুরানাথ গদাধরকে। মায়ের পুজো। চারিদিকে বসেছে আনন্দের হাট। তৃপ্তির মেলা। সবার মনে শুধু ভরা ফূর্তি। এ যে ফূর্তির ফোয়ারা।

সেদিন বোধ হয় ছিল সপ্তমী পুজো।

সন্ধ্যারতিতে সবাই ব্যস্ত। জানবাজারের প্রাসাদের অন্দরমহলের মেয়েরাও গিয়ে যোগদান করেছে মহামায়ার সন্ধ্যারতি বন্দনায়।

কে ঐ অপরূপ লাবণ্যবতী নারী? মুখে উদ্ভাসিত পরমানন্দের পূত দীপ্তি? সর্বাঙ্গ ঢাকা স্বর্ণালঙ্কারে। মথুরানাথ চোখ ফেলতে পারেন না। একাগ্রমনে চামর ব্যজন করছেন জগজ্জননী দুর্গাকে। ভারি সুন্দর মানিয়েছে স্বর্ণালঙ্কারে। গায়ের রঙের সাথে যেন একেবারে মিলে গেছে স্বর্ণচ্ছটা। নিশ্চয়ই কোনো বড় ঘরের ঘরণী। হবে কোনো প্রতিবেশিনী। ঘরে ঘরে গেছে যে মার উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ।

জগদম্বা ফিরে আসেন অন্দরমহলে। বিস্মিত সেজোবাবু ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা বলোতো অত গয়না পরে অপূর্ব লাবণ্যবতী সুন্দরী রমণীটি কে ছিলেন?

জগদম্বা খিল খিল করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েন। এতদিন এত কাছে থেকেও চিনতে পারলে না ওঁকে?

কে বলোতো?

সেজোবাবুর বিস্ময় হাজারগুণ বেড়ে যায়।

পারো নি তো? আহা উনি যে আমাদের বাবা। ঠাকুর।

যেন বিশ্বাস হয় না মথুরানাথ বিশ্বাসের।

সে কি?

হ্যাঁ। ঠিকই বলছি।

আরতির সময় এসে পড়েছিল। এদিকে ওঁর কাছে এসে দেখি একাকী গভীর ভাবাবেশে তন্ময়। বড় চিন্তায় পড়লাম। এভাবে কি করে একা ফেলে যাই? আরতির বাজনা শুনেই তো ছুটবেন। এতগুলো ঘর ছাড়িয়ে। থাম

ছাড়িয়ে। কে জানে হয়তো কোনচাতে ধাক্কা খেয়ে পড়েই যাবেন। ভাবাবেশ কাটেনি কি না। নিজেকে যে বিন্দুমাত্র সামলাতে পারেন না। মনে নেই একবার ওরকম ছুটতে গিয়ে গুলের আগুনের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ভাবলাম কি করা যায়? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো। তাঁর ঐ ভাবাবেশেই তাঁকে নিজের গায়ের গয়না খুলে পরিয়ে দিলুম। শাড়ী পরালুম। তাহলে যে মেয়ে মহলে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারবো। তাছাড়া তখন যে ছিল তাঁর সখীভাব। সাজিয়ে গুজিয়ে কানের কাছে বললুম 'বাবা চলো। মায়ের আরতির যে সময় হয়ে গেছে'।

মায়ের নাম করতেই আমার দিকে তাকালেন।

আবার বললুম 'চলো। মায়ের আরতি দেখতে। আজ যে আমরাও আরতি করবো।'

বললেন 'চলো'। যেন একটা উদাস দৃষ্টি।

তাঁর হাত ধরে আমি তাঁকে নিয়ে চললুম। ছোট্ট শিশুটি যেন সাথীদের সাথে খেলতে চলেছেন। মা'র মূর্তি দেখেই তাঁর ভাবাবেশ আরও গভীর হলো। সেই ভাবেই গিয়ে তাড়াতাড়ি চামরটা তুলে নিলেন। চামরটা হাতে পেয়েই ব্যজন শুরু করে দিলেন। সে ব্যজনের যেন নেই কোনো শেষ। কি আশ্চর্য তুমি তাঁকে চিনতে পারলে না? অষ্টপ্রহর ঘুরছো তাঁকে নিয়ে। দিবানিশি সাথে সাথে ছায়ার মতন রয়েছো। আর তাঁকে পারলে না চিনতে?

সত্যি বলছি বাবাকে একেবারে চিনতে পারি নি।

আমার গয়নাগুলো দেখেও চিনলে না?

আর কথা জিজ্ঞাসা করছো বলতো।

ঐ যে দীর্ঘ সময়ে তন্ময় ভাবে মায়ের পুজোয় যিনি ছিলেন মগ্ন?

ঐ যিনি চামর ব্যজন করছিলেন মা দুর্গাকে? লাল বেনারসী পরা ছিল কি? গা ভরা গয়না।

সেজোবাবু বলেন, হ্যাঁ ঠিক ধরেছ ঠিক যেন মা দুর্গারই রঙ্। অতসীকুসুম বর্ণ। অনেকক্ষণ ধরে ব্যজন করছিলেন। কে তিনি বলো তো?

মুখখানা ছিল যেন একঝলক আলো? ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। অলকরাগে রঞ্জিত? আঙুলগুলো যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত চাঁপাফুল?

হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন সেজোবাবু। ঠিক তাই।

এবার মথুরানাথের হাসার পালা। হাসিতে ফেটে পড়েন সেজোবাবু। ও মুখের দিকে তাকিয়ে আর কারুর গয়নার কথা মনে থাকে পিসি? আমি যে অপলক নয়নে শুধু তাঁর দিকেই তাকিয়েছিলুম। এতো লাবণ্য, এতো রূপ এলো কোথেকে? শুধু নিজেকে এই প্রশ্নই করছিলুম আমি। আপনি না চেনালে কেউ চিনতে পারে তাঁকে?

তুমি কেন? মেয়েদেরই ভুল হয়ে যায়। কার সাধ্যি তাঁর হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, হাঁটা-চলা, এমন কি হাসি-পরিহাসের উচ্ছলতায় ধরে যে তিনি মেয়েমানুষ নন।

সত্যি এ রূপের যেন নেই কোনো তুলনা। শুধু মথুরানাথ কেন? মণ্ডপের রমণীকুলও যে প্রতিমা ছেড়ে তাকিয়েছিল নবাগতার অপরূপ রূপরাশির দিকে। উত্তরকালে ঠাকুর ভক্তদের নিজমুখে বলেছেন, 'তখন এমন রূপ হয়েছিল যে, যে লোকে চেয়ে থাকতো। বুক মুখ সব লাল হয়ে থাকতো। আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুতো। লোকে চেয়ে থাকতো বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম। আর মাকে ডেকে বলতুম, 'মাগো তোর বাইরের রূপ তুই নিয়ে নে। আমাকে শুধু ভিতরের রূপ দে।' গায়ে হাত বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা। ভিতরে ঢুকে যা।'

মা জগদম্বাই যে সেখানে চির-বিরাজিতা। তাইতো ফেটে পড়তো এত রূপ। তাইতো অঙ্গ থেকে ঠিকরে পড়তো হাজার মাণিক শশীর আলো। আশ্চর্য ঘটনা! বুক চাপড়ে ওরকম বলতে বলতে কিছুকালের ভিতরই গদাধরের সে রূপরাশি ধীরে ধীরে কোথায় গেল মিলিয়ে। ওপরের সৌন্দর্য কেমন যেন মলিন হয়ে এলো।

রূপ আর রূপ। অরূপের সাধনায় সবাই মগ্ন থাকে না কেন? যাঁর বাণী অজ্ঞে চিত্তে মুক্তি এনে দেবে?

হ্যাঁরে হৃদু এত ভীড় কেন রে?

গদাধর এসেছেন কামারপুকুর। প্রতিবারই আসেন বর্ষাসমাগমে। কিছুদিন থাকেন। তারপরে আবার চলে যান দক্ষিণেশ্বরে। সেজোবাবুই এসব বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। তাতে শরীরটাও ভালো থাকবে, মনটাও থাকবে হাল্কা। তাছাড়া আর একটা জিনিষ রয়েছে যে। সেটা হলো কামারপুকুর গ্রামবাসীর বহুদিনের সাধনা। তাঁরা যে ডাকছেন পরম-পুরুষকে পরমানন্দে তাঁদের সাথে লীলায় মত্ত রাখতে। কে রাখবে তাঁকে দূরে? এ ডাক যে হৃদয়ের ডাক। অন্তরের ডাক। মর্ম স্পর্শ করে এ আকুল আহ্বান।

হৃদয়রাম বললেন, 'এরা যে তোমাকে দেখতে এসেছেন'।

সে কি রে? রোজই তো দেখছে। আজ আবার নতুন দেখার কি আছে?

আজ তুমি জয়রামবাটী যাচ্ছো। ক'দিন দেখতে পাবেন না তাই।

তাই বুঝি?

তাছাড়া তুমি চেলী পরে সেজেছো। চেলি পরলে তোমায় যে ভারি সুন্দর দেখায়। তার ওপর পান খেয়ে ঠোঁট দুটি লাল করলে যে রূপের ফোয়ারা বয়ে যায়। তাই তো ছুটে এসেছে সবাই রূপসাগরে ডুব দিতে।

সে কি রে? সবাই শুধু রূপটুকুই দেখতে এসেছে? একটা মানুষের রূপ দেখার এত মোহ? যা। তুই গিয়ে বলে দে। আমি বাইরে কোথাও যাব না। সেখানেও তো হবে এমনি ভীড়। রূপের কি মোহ! কি মায়া!

হৃদয় জানতেন গদাধরকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে টলাবার শক্তিটুকু নেই কারুর। সনির্বন্ধ অনুরোধ, আকুল মিনতি সব সঙ্কল্প বানের জলে ভেসে গেল। সেদিন জয়রামবাটী আর যাওয়া হলো না।

॥ সাতচল্লিশ ॥

কে ঐ অপরূপ সুন্দরী রমণী মূর্তি? কেন এ নীরবতা? মুখে মাখানো বিষণ্ণতার গ্লানি? কে ঐ দুখিনী নারী? কে ঐ দেবী?

পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছিলেন গদাধর। গভীর তপস্যা। রঘুবীর। বলে কখনও ছুটে গাছের ডালে উঠে বসেন। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। ধুতিটুকু কখোন কোথায় খুলে পড়ে গেছে নেই তার খেয়াল। রঘুবীর। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র। কোথায় তুমি? প্রসাদীফলটুকু দু' হাত দিয়ে খেয়ে ফেলেন। ফলের সাথে আরও কি মুখে গেল সেদিকে নেই কোন খেয়াল।

কে তুমি দেবী?

মনে মনে প্রশ্ন করেন গদাধর।

এমন সময় হুপ্ করে সামনে এসে পড়ে একটা বানর। দেবীর সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। কি আশ্চর্য!

তাহলে? তাহলে ইনি কি রঘুকুল-সঙ্গিনী জানকী? জনক রাজার কন্যা? তাই কি মুখে এ বেদনার ছাপ?

ভক্তিভরে প্রণাম করেন গদাধর।

এ কি হলো?

ধীরে ধীরে রমণী মূর্তি এগিয়ে আসেন গদাধরের দিকে। তারপর? তারপর আস্তে আস্তে মূর্তিটি মিলিয়ে যায় গদাধরের শরীরে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন রামভক্ত। সীতা-পতির সঙ্গে বিলীন হয়ে যান জনম-দুখিনী পতিব্রতা সীতা।

এতদিন যে গদাধর রঘুবীরের ধ্যানে ছিলেন মগ্ন। মা ভবতারিণীর প্রসাদ লাভ হয়েছে। তাঁর প্রসন্নতায় তিনি ধন্য। এবার চাই রঘুবীরের কৃপা। দাস্যভাবে ধ্যানমগ্ন হন গদাধর আপন ধ্যানে। যে রাম সেই কৃষ্ণ। একাধারে রামকৃষ্ণ। রামের ধ্যানে সমাহিত গদাধর।

●

কেন এ ভাব? কেন এ কৃচ্ছ্র-সাধন?

সত্যি বলছি রঘুপতি, তুমিও অন্তর্যামী নিশ্চয়ই জানো এ হৃদয়ে আর কোনো অন্য বাসনা নেই। হে রঘুশ্রেষ্ঠ। আমাকে শুধু তোমার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি দাও। আমাকে কামাদিদোষ থেকে মুক্ত করো।

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েহস্মদীয়ে।
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা ।।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে।
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ।

রঘুবীর কি তাঁকে আপন মূর্তি ধ্যানেই এতদিন রেখেছিলেন ব্যাপৃত? হনুমৎ সেবিত হনুমদ্ ভূষিত রামচন্দ্রই এতদিন কাটালেন আপন পূজোয়। আপন মূর্তি আরাধনায়।

কেন?

এ যে মানুষের মাঝে এসে সাধারণ মানুষের আচার অনুষ্ঠান শাস্ত্রসঙ্গত বিধিনির্দেশ পালনের শুভ ইঙ্গিত।

যো রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা,
ওহি রাম জগৎ পসেরা,
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা।

যে রামচন্দ্র দশরথ পুত্র তিনিই সর্ব-শরীরে বিরাজমান। জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত থেকেও মায়ারহিত নির্গুণস্বরূপ নিত্য বিদ্যমান।

দোঁহা শুনে ছুটে আসেন গদাধর। প্রাণস্পর্শী কণ্ঠস্বর। হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীত-লহরী। কে গো এ নব সন্ন্যাসী? কোথাকার সাধু? কার রাঙা চরণে সমর্পিত এ পবিত্র প্রাণমন? জয় রামলালা! জয় গোপাল!

গদাধর এগিয়ে আসেন জটা-ধারীর কাছে। ধন্য মথুরানাথ। ধন্য রাণী রাসমণি। কত জীবনের তপস্যার প্রতিষ্ঠিত করেছিলে এ পবিত্র দেউল। দূর প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে কত পূত সাধক। কত সাধকের চরণ-ধূলিতে ধন্য এ দক্ষিণেশ্বর। গদাধরের চরণ-প্রান্তে মথুরানাথের হৃদয়ে এসেছিল গভীর পরিবর্তন। সাধুসেবাই যে তাঁর জীবনের ব্রত। নব সন্ন্যাসী যে তাঁর পদধূলিতে পবিত্র করলেন এ মন্দির। এ যে মথুরানাথের সাধুসেবার তপস্যার ফল।

শুধু তাই কি?

সমস্ত জীবন যে মহাতাপস রামচন্দ্রের ধ্যানে কাটালেন, কাটালেন তাঁর সেবায় আরাধনায় তিনি কি পাবেন না একবার জীবন্ত রামচন্দ্রের পরম পবিত্র দর্শন?

জয় রামলালা!

সম্ভাষণ করেন তাপস। গদাধর নত মস্তকে বলেন জয় রামলালা।

কি সৌম্য প্রশান্ত দৃষ্টি। অসীম করুণামাখা নয়ন। তপস্যাক্লিষ্ট তপ্ত কাঞ্চনোজ্জ্বল তনু। গদাধর নিজে জটাধারীর সেবার তদারক করেন। দেবনিবেদিত জীবন যে দেবতারই প্রতীক। এ যে জীবন্ত রামলালা।

কি আশ্চর্য। জীবনের ছকটা কে যেন এঁকে ঠিক সামনে ধরে যাচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে যেন কোন্ না-দেখা শক্তির পথনির্দেশ।

●

গদাধরের প্রকৃতিভাব। মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যান তিনি পুরুষ-মানুষ। রমণী-পরিবৃত গদাধর মার পূজো করেন রমণীবেশে। শুধুই কি বেশে? বেশেই নয় আবেশেও। মাকে খুশী করতে কখনও নাচেন আনন্দে। কখনও বা ধরেন গান।

জটাধারীর রামলালার আরাধনা দেখে গদাধরের হৃদয় থেকে বাৎসল্য ভাব যেন নব অপূর্ব প্রেমাকর্ষণে ঝর্ণা-ধারার মতন নেমে এলো। এ প্রেম-ধারার উৎস কোথায়? রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের মন্ত্রে তিনি যে অনেক আগেই দীক্ষিত। এতদিন ছিল শুধু প্রভুভাব। কুল-বিগ্রহ রঘুবীরকে প্রভু ছাড়া আর যে কিছুই ভাবতে পারেন নি। জটাধারীর অপূর্ব স্নেহসিঞ্চিত স্নিগ্ধ সান্নিধ্য গদা-ধরের মনে জাগালো নব শিহরণ। এ অনুভূতির স্বাদ এর আগে তাঁর কাছে ছিল অজানা। তাই শ্রীরামচন্দ্রের শিশুভাবের সেবার কাজে নিজেকে করলেন নিয়োজিত। জটাধারী এগিয়ে এলেন পথিককে দেখাতে এ নতুন পথ। এ পথ যে তাঁরই তৈরী, তাঁরই পরিকল্পিত এটা কি জটাধারীর কল্পনায় পেয়েছিল ঠাঁই?

জটাধারী গদাধরকে দিলেন দীক্ষা। গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন নবগোপাল।

কি আশ্চর্য? জীবনের সঞ্চিত ধন সবাই এসে সমর্পণ করে যান জীবন দেবতার রাতুল চরণে। সমস্ত জীবন যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী যে রঘুবীর-শিলাকে আশ্রয় করে কাটালেন, যাঁর আকর্ষণে পৃথিবীর সব কিছু ছেড়ে সংসারত্যাগিনী হলেন সেটি সমর্পণ করলেন গঙ্গার বুকে গদাধরের পাশে এসে। সংসারত্যাগী সিদ্ধযোগী জটাধারী যে বালগোপালবিগ্রহটুকু সম্বল করে একদিন বেরিয়েছিলেন সত্যের সন্ধানে সে বিগ্রহের আকর্ষণও ছেড়ে দিলেন গদাধরের স্পর্শমণির পরশে। গদাধরকে রামলালার বিগ্রহটুকু দিয়ে জটাধারী জীবনের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন কেউ জানে না।

এ বিগ্রহ যে জাগ্রত। অল্পভাষী সন্ন্যাসী জটাধারী কাউকে জানতে দেন নি তাঁর দর্শনের কথা। শুধু তিনি এ কথা জানতেন যিনি ছিলেন অন্তর্যামী। যাঁর কাছে কারুর কিছু লুকোবার ছিল না।

রামলালা! নন্দদুলাল। অষ্টধাতুর মূর্তি। সবাই দেখে শুধু ধাতু। জটাধারী আপন তপস্যায় মূর্তিতে দিয়েছেন প্রাণ। বহু তীর্থস্থান ঘুরেছেন জটাধারী। গেছেন বহু মঠ-মন্দিরে। হাতে রাম-লালা। ভিক্ষাপাত্রে সংগ্রহ করেছেন পূজোর অর্ঘ্য। নিবেদিত জীবন নিবেদন করেছেন নব নব উপচার।

জানিস জটাধারী দেখতে পেতো রামলালা সত্যি সত্যি খাচ্ছে। আবার কখনও বা কোন একটা জিনিষ খেতে চাইছে। বেড়াতে চাইছে। আব্দার করছে। আমিও দেখতে পেতুম রাম-লালা ঐ রকম সব করছে। তাই রোজ জটাধারীর কাছে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতুম—আর রামলালাকে দেখতুম।

দেখতুম। সত্যি সত্যি দেখতুম—এই যেমন তোদের সব দেখছি—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখনো আগে, কখনো পেছনে নাচতে নাচতে আসছে। কখনো বা কোলে উঠবার জন্য আবদার করছে। কখনও বা কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে

যা গঙ্গার জলে নেবে ঝাঁপাই জুড়োবে। যত বারণ করি, ওরে অমন করিস নি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে! ওরে অত জল ঘাঁটিস নি ঠাণ্ডা লাগবে, জ্বর হবে সর্দি হবে। সে কি তা শোনে?

রামলালা আবার তাকিয়ে থাকেন গদাধরের দিকে। পদ্মপলাশলোচন। তাকান আর হাসেন। মাঝে মাঝে আবার দুষ্টুমিভরা চোখে তাকান।

একদিন নাইতে যাচ্ছি বায়না ধরলে সেও যাবে। কি করি? নিয়ে গেলুম। তারপর জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না। যত বলি কিছুতেই শোনে না। শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বললুম—তবে নে কত জল ঘাঁটতে চাস ঘাঁট। আর সত্যি সত্যি দেখলুম সে জলের ওপর হাঁপিয়ে শিউরে উঠলো। তখন আবার তার কষ্ট দেখে, কি করলুম বলে কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি।

একদিন রামলালা বায়না ধরেছেন। কিছুতেই সে বায়না থামে না। গদাধর তাকে নিয়ে কি করবেন? তখন তাড়াতাড়ি দুটো ধানশুদ্ধ খই খেতে দিলেন। পরিষ্কার দেখলেন গদাধর খই খেতে গিয়ে রামলালার ধানের তুষে নরম জিব কেটে গেছে।

মনোবেদনায় গদাধর অস্থির হয়ে ওঠেন।

সহচর শিষ্যদল শুনছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে রামলালার গল্প। ঘটনা হলেও শোনাচ্ছে নাকি গল্পের মতন। দু-একজন ভক্ত তাড়াতাড়ি ছুটে দেখতে যান রামলালার বিগ্রহ। কোথায় সেই চঞ্চল শিশুটি? কোথায় রামলালার দুরন্তপনা? এ যে শুধু একটা অষ্ট-ধাতুর বিগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়।

শিল্পীর হাতে একটা তুলির কতই না মূল্য। নিমেষে সেটাকে জীবন্ত করে তোলে সে। নব নব আলেখ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। অশিল্পীর কাছে একটা সাধারণ তুলির কি মূল্য? রামলালাকে দেখার সে চোখ ক'জনের আছে? তাঁকে প্রাণমন দিয়ে ভালবেসে প্রাণবান করার আন্তরিকতাটুকু আছে ক'জনের? কোথায় সে অন্তরের টান? কোথায় সে স্ফটিকস্বচ্ছ প্রাণ।

(ক্রমশ।

'মাম্পস রোগের প্রতিষেধক

মাম্পস' রোগের প্রতিষেধক হিসেবে লভ্য ভ্যাক্সিন সম্বন্ধে জনসাধারণ তেমন অবহিত নন। রোগটি তেমন ক্ষতিকর বিবেচিত না হওয়ায়, এর প্রতিষেধক ব্যবহারের খুব চলন নেই। অথচ, সংবেদন অনুসারে শতকরা পনের থেকে তিরিশ জন 'মাম্পস' রোগীর যৌন গ্ল্যাণ্ড-এ প্রদাহ সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর ফলে মানুষ বন্ধ্যা হতে পারে, যদিও তা ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য হবে, নিয়ম হিসেবে নয়। সে যাই হোক্, 'অক্ষম' পুরুষদের এক-চতুর্থাংশর ঐ অবস্থার জন্য 'মাম্পস' দায়ী।

শিশুদের সাধারণত এই ভ্যাক্সিন দিতে বলা হয় না, যেহেতু শৈশবে এ-রোগ একবার হলে সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

মোটামুটি শতকরা কুড়ি থেকে তিরিশ ভাগ শিশু এ-রোগে আক্রান্ত না হয়েই পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে। ইলিয়নিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার হ্যান্স-জি-গ্রিয়েব্‌ল-এর মতে এদের ভ্যাক্সিন দেওয়া উচিত। কেউ আক্রান্ত হওয়ার পরে পর্যন্ত ভ্যাক্সিন দিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। কারণ, 'মাম্পস'-এর বীজাণুগুলোর দীর্ঘস্থায়ী ডিম ফোটানোর কাল। রোগ হওয়ার পর তিন সপ্তাহ পর্যন্ত লাগতে পারে রোগের চিহ্ন ফুটে বেরোতে। অধিকাংশ মানবদেহে ভ্যাক্সিন-এর ক্রিয়া সুরু হয় দশ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে।

রোগের সূচনা হলেও এজন্যই ভ্যাক্সিন নেওয়া উচিত। যাদের শৈশবে 'মাম্পস' হয়ে গেছে তারা মোটামুটি নিশ্চিন্ত। যাদের হয় নি, তাদের প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন নেওয়া দরকার।

পিকুইক পেপার্স

উপন্যাস

চার্লস ডিকেন্স

শ্রীযুক্ত পিকউইক-এর নাম অমর হয়ে আছে নানা কারণে। কিন্তু ইতিহাসের গোপন অন্ধকারে লুকনো এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রথম পরিচয় আমরা পাই তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত 'পিকউইক ক্লাব'-এর কার্য বিবরণীতে। তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো বর্তমান লেখকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব:

> 'এত দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, ক্লাব-এর মহান প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত স্যামুয়েল পিকউইক মহাশয়ের দ্বারা উপস্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হউক:—
> শ্রীযুক্ত পিকউইক, শ্রী ট্রেসি টাপ্‌ম্যান, শ্রীঅগস্টাস স্নডগ্রাস, এবং শ্রীনাথানিয়েল উইংকল মহোদয়গণ দেশভ্রমণে নিযুক্ত থাকিবেন এবং যথানিয়মে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিবরণ ক্লাব-এর নিকট নিয়মিত প্রেরণ করিবেন।'

আপনার আমার মত খেলো লোক, যাদের কান্ডজ্ঞানের কোনও গভীরতা নেই, তারা উপযুক্ত সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করলেও হয়তো শ্রীযুক্ত পিকউইক-এর গোল চশমা, ঈষৎ স্ফীত উদর, বা কেশবিরল মস্তক চাক্ষুষ ক'রেও মোটেই অনুভব করতে পারতাম না ঐ চশমার আড়ালে রয়েছে পিকউইক-এর তীব্রোজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত এক-জোড়া চোখ, ঐ কেশবিরল মাথা ঢেকে রেখেছে তাঁর বিরাট মস্তিষ্ক। 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান'—যে জানে সে বুঝত এই সেই লোক যাঁর মহতী গবেষণা আবিষ্কার করেছিল হ্যাম্পস্টেড এর (অধুনা ব্যাঙাচিপূর্ণ) ডোবাগুলোর লুপ্ত উৎস, এবং এরই অবিরাম প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে আজ মানুষ ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত গানের গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণ জানতে পেরেছে। অথচ, আবিষ্কর্তার কি সহজ সরল আকৃতি, কি অপরূপ বিনয়াবনত ভঙ্গী! স্বতঃই শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে।

এবং, এর পর যখন ক্লাব-এর প্রতিটি সদস্য সমস্বরে 'পিকউইক' বলে চিৎকার করে উঠলেন, আর বিপুল উদ্যমে শ্রীযুক্ত পিকউইক একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালেন কোট-এর পেছনে হাত রেখে তাঁর নিজস্ব একান্ত ভঙ্গীতে, তখন তাঁর নিম্নাঙ্গের পোশাক দেখলে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ বলেই মনে হত, কিন্তু তাঁর পোশাক পরার ভঙ্গীটি স্বতোৎসারিত শ্রদ্ধার আকর। তাঁর ডাইনে বসে টাপ্‌ম্যান—সেই বিখ্যাত নিয়ত-অতনুশরবিদ্ধ ভদ্রলোক, চিরতরুণ টাপ্‌ম্যান! কাল অবশ্য তাঁর যৌবনের কৃশ-তনু মেদবহুল করে তুলেছে, মাপে বাড়ছে তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গের পোষাক। ধাপে ধাপে।—কিন্তু চিরনবীন টাপ্‌ম্যান-এর মন এখনও 'শ্রোণীভারাদলসগমনা' দৃষ্টে উন্মনা হয়ে ওঠে। তাঁর বাঁ পাশে বসেছিলেন কবি স্নডগ্রাস, যাঁর কবিত্বপূর্ণ নীল কোট এবং লম্বা চুল ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের নির্ভুল পরিচায়ক; তারপর ছিলেন হবুশিকারী উইংকল শিকারী জনোচিত আঁটসাঁট পোষাকে শোভমান।

আমাদের কাহিনী বহু কষ্টে সংগৃহীত—ক্লাব-এর কার্যবিবরণী, চিঠিপত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য উৎস থেকে সযত্নে আহরিত।

॥ অথ গ্রন্থারম্ভ ॥

১৮২৭ খৃস্টাব্দের এক স্মরণীয় সকালে যখন সূর্যদেব কেবলমাত্র উঁকি-ঝুঁকি মারছিলেন, ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় সূর্যের মত শ্রীযুক্ত পিকউইক নিদ্রাভঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে বিপুল উদ্যমে জানলা খুলে বাইরে তাকালেন। মহৎ লোকের লক্ষণ সময় নষ্ট না করা,—পিকউইকও বৃথা সময় নষ্ট করলেন না—এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে পোষাক প'রে তিনি প্রস্তুত। এবং চরিত্রানুগ তৎপরতায় ওভারকোট, টেলিস্কোপ নিয়ে, পকেটে নোটবুক এবং পেনসিল, হাতে বাক্স—গাড়ির সন্ধানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি হাঁক ছাড়লেন।

প্রথম গাড়িখানাই তাঁর বরাতে জুটলো; যাত্রারম্ভেই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন চঞ্চল হয়ে ওঠায় তিনি কোচোয়ানকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ঘোড়াটির বয়স কত ভাই?'

আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে কোচোয়ান গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'বেয়াল্লিশ বছর।'

'কি বললে?' শ্রীযুক্ত পিকউইক-এর নোটবই তৎক্ষণাৎ নির্গত, এবং তিনি পেনসিলপাণি। কোচোয়ান আবার অম্লান-বদনে আগের কথার পুনরাবৃত্তি করল। সন্দেহাকুল চক্ষে তার দিকে তাকিয়েও তার মুখভাবের কোন পরিবর্তন দেখতে না পেয়ে তক্ষুণি তিনি তথ্যটি নোটবুকস্থ করলেন।

'ঘোড়াটার কতক্ষণ খাটনী হয় প্রতিদিন?'—জ্ঞানপিপাসু পিক্‌উইক-এর জিজ্ঞাসা।

'দুই থেকে তিন সপ্তাহ একনাগাড়ে,' কোচোয়ানপুংগব নিরীহকণ্ঠে জবাব দিল।

'সর্বনাশ, বল কি!' বলতে বলতে আবার নোটবুক-এর আবির্ভাব।

'অবশ্য পেন্‌টন্‌উইল-এ ওর থাকার একটা আস্তাবল আছে, কিন্তু আমরা ওকে সেখানে খুব কমই নিয়ে যাই ওর দুর্বলতার জন্য।'

'কী আশ্চর্য! সেটা কী রকম?'

'কেন না, গাড়ি থেকে খুললেই ও পড়ে যায়, কিন্তু যতক্ষণ ওকে বেশ শক্ত করে চেপে জুড়ে রাখা হয় ততক্ষণ ও সোজা থাকে এবং পেছনের চাকাগুলো ও চললেই গড়াতে থাকে এবং ওরও না দৌড়ে আর উপায় থাকে না।'

জ্ঞানান্বেষী পিক্‌উইক এর প্রতিটি অক্ষর টুকে নিলেন তাঁর বিখ্যাত নোটবুকে—ঘোটক-জাতির চমৎকারী দীর্ঘজীবন এবং কঠোর পরিশ্রম ক্ষমতার উদাহরণ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জ্ঞানবৃদ্ধিকল্পে।

●

অকুস্থলে পৌঁছোনর পর নেমেই পিক্‌উইক তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীত্রয়—টাপ্‌ম্যান, স্নডগ্রাস এবং উইংকলকে দেখতে পেলেন।

'এই নাও তোমার ভাড়া', এই ক'টি ঐতিহাসিক শব্দোচ্চারণ অন্তে শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক একটি শিলিং বাড়িয়ে ধরলেন কোচোয়ানের দিকে, কিন্তু পরক্ষণেই হতবাক হয়ে দু' পা পিছিয়ে এলেন তার ব্যবহারে। কোচোয়ানকে এতক্ষণ স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন সে শিলিংটি নিয়ে রাস্তায় ফেলে হঠাৎ তাঁর সংগে লড়াই করার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করল!

সমস্বরে তিন সহকারী বলে উঠলেনঃ

স্নড্‌গ্রাস—'তুমি পাগল।'

উইংক্‌ল—'তুমি মাতাল।'

টাপ্‌ম্যান—'ও দুই-ই—পাগল এবং মাতাল।'

তপ্ত খোলার ওপর বেড়ালের মত লাফাতে লাফাতে কোচোয়ান অবিশ্রান্ত চেঁচাচ্ছেঃ 'চলে আও, চলে আও জী—তোম্‌ চার আদমী এক সাথ আও—হাম সব কোইকো সাথ লড়েংগে!'

সহরের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মুহূর্ত মধ্যে মজা দেখার জন্য ভিড় জমে গেল। কোচোয়ানকে উৎসাহিত করতে সমব্যবসায়ীকুল ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেছে।

একজন প্রশ্ন করল, 'কি হল, হ্যাঁ?'

'হবে আবার কি! ঐ লোকটা আমার নম্বর টুকছিল কেন?'

অবাক পিক্‌উইক আপত্তি জানালেন, 'না না, আমি নম্বর নোব কেন? ছি ছি, সে কি কথা!'

'নেবেন না ত অত লিখছিলেন কি?—শুধু নম্বর কেন, আমি যা যা বলেছি সবই টুকেছেন।......আমি ছাড়ব না, পুলিশের টিকটিকিদের আমি থোড়াই কেয়ার করি! চলে আও, চলে আও—সব কোই আও'—

বলতে বলতে (লিখিতে লেখনী কাঁপিছে সঘনে) কোচোয়ান গিয়ে সত্যিসত্যি শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-এর পবিত্র উদরদেশে এমন চুঁ মারল যে তাঁর বিখ্যাত চশমা পড়ে গেল, তারপর স্নড্‌গ্রাস-এর চোখে এক ঘুঁসি হাঁকিয়ে, টাপ্‌ম্যান-এর পেটে গোঁত্তা মেরে সে নাচতে নাচতে ঘুরতে লাগল।

'কী হয়েছে, হলটা কী, কী জাতের কাণ্ড, অ্যাঁ'—বলতে একজন সিড়িংগে চেহারার যুবক এসে হাজির হলেন সেখানে। পিক্‌উইক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনবদ্য ভংগীতে ঘটনাটা জলের মতই বুঝিয়ে দিলেন।

'বটে বটে', বলেই যুবকটি পিক্‌উইককে একরকম জোর করেই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললেন। 'ওহে ৯২৪ নম্বর, এই নাও তোমার ভাড়া—যাও চলে যাও, ভদ্রলোকের সংগে গোলমাল করা তোমার স্বভাবে দাঁড়াচ্ছে—দিন দিন! ইনি মানী লোক—আমার চেনা—চালাকি ছাড়—চলে আসুন, এদিকে আসুন—বন্ধুরা সব কোথায়—সব ভুল বোঝাবুঝি—সর্বত্রই হচ্ছে—ছেড়ে দিন—মন খারাপ করবেন না—চলুন, চলুন—কিছু না, কিছু না......'

এই ধরণের বিচিত্র কথাবার্তা বলতে বলতে সেই অদ্ভুত লোকটি তাঁদের চারজনকে একরকম জোর করেই যাত্রীদের বিশ্রামঘরে টেনে হাজির করলেন।

'এই বয়, ব্র্যান্ডি লাও, সকলের জন্য—গরম হওয়া চাই—চোখে লেগেছে না কি?—কিছু ভাবনা নেই, কাঁচা মাংস লাগান—এ বয়, জলদি এই ভদ্রলোকের চোখের জন্য কাঁচা মাংস! —খুব ভাল—এখুনি সেরে যাবে—ঠাণ্ডা লোহার রড্‌ও ভাল, কিন্তু অসুবিধে—ল্যাম্প পোস্ট-এ চোখ লাগিয়ে ত আধ ঘণ্টা দাঁড়ান যায় না।...হাঃ হাঃ হাঃ...' বকবক করতে করতেই এক ফাঁকে পুরো এক গেলাস গরম ব্র্যাণ্ডি এক নিঃশ্বাসে সাবাড় করে সংগে সংগে যুবকটি আরাম কেদারায় সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। যেন কিছুই হয় নি!

মহতী প্রতিভা কিছুতেই বিচলিত হয় না। এত কাণ্ডের পরেও শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-এর জ্ঞানলিপ্সা সমানে প্রজ্জ্বলিত। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ঐ যুবকটিকে পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। লোকটি মাঝারি ধরণের লম্বা, কিন্তু পা এবং সর্বশরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় তাকে বেশি লম্বা দেখায়। তার গায়ের সবুজ কোটটি অতীতে হয়ত ঝকঝকে ছিল, তবে বর্তমানে সে জৌলুষের কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। এবং ছোটও হয়ে গেছে খুবই। নিম্নাঙ্গের ট্রাউজারস্‌ও দীর্ঘকাল ব্যবহারের চিহ্নবাহী। তার জীর্ণ টুপির দুপাশ দিয়ে লম্বা কালো চুল ঝুলছে। মুখেচোখে দৈন্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিন্তু, সব ছাপিয়ে তার চোখেমুখে এবং সর্বশরীরে এমন একটা দুষ্টুমি এবং আত্মবিশ্বাসের স্বাক্ষর ছিল যা লোককে প্রভাবিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক যখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই রচেস্‌টার-গামী কোচ-এর চালক এসে জানাল তার ঘোড়া এবং গাড়ি দুই-ই প্রস্তুত।

শুনে পিক্‌উইক খুসীই হলেন এবং সবাই মিলে গাড়িতে চড়ে বসলেন লটবহর সমেত। নতুন বন্ধুটির বকুনি চলল অনর্গল।

কথাপ্রসংগে শিকারের কথা উঠতে উইংক্‌লকে দেখিয়ে পিক্‌উইক আলোচনা আরম্ভ করতেই নতুন ভদ্রলোক কুকুরের কথা সুরু করলেনঃ 'কুকুর রাখবেন—বড় প্রভুভক্ত—বড় বুদ্ধিমান—আমার কুকুর পন্‌টো খুব চালাক—শিকারে গিয়ে এক দিন এক মাঠে কিছুতেই ঢুকবে না—যত ডাকি সে ওপর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে—তাকিয়ে দেখি নোটিস বোর্ড-এ লেখা 'রক্ষককে নির্দেশ আছে কুকুর ঢুকলেই গুলী করে মারবার'—কী বুদ্ধি দেখেছেন!'

জ্ঞানভিক্ষু পিক্‌উইক-এর নোটবুক তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল এবং ঘটনাটি লিপিবদ্ধ হল।

রচেস্‌টার-এ পৌঁছে সকলেই সদর রাস্তার পান্থনিবাসে থাকবার ব্যবস্থা করে নতুন বন্ধুকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশ্রামান্তে চারজনে শহর দেখতে বেরোলেন।

পরদিন রচেস্‌টার-এ সৈন্যবাহিনীর মার্চপাস্ট ও অন্যান্য অভ্যাসের ব্যবস্থা ছিল। সকলের সংগে পিক্‌উইক বন্ধুদের নিয়ে ঐ সৈন্যসমাবেশ দেখতে গিয়ে ভিড়ের চাপে সংগীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। যেখানে গিয়ে পৌঁছুলেন সেখানে চতুর্দিকে ব্যস্ত সৈন্যদলের ছোটাছুটি এবং তা ফাঁকা কার্তুজের ধোঁয়ায় ঢাকা—ভীত ও সন্ত্রস্ত পিক্‌উইক মশায় তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে যেতে গিয়ে দেখলেন আর এক বিপদ। তাঁর মাথার টুপিটি হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল, এবং বিব্রত শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক পলায়নপর টুপির পিছু পিছু দৌড়তে লাগলেন লোক লজ্জার মাথা খেয়ে। তাঁদোর বাতাসের সহায়তায় টুপিটি গড়াতে গড়াতে চলল, পিক্‌উইক তার পিছু পিছু হাঁস ফাঁস করতে করতে দৌড়লেন। যখন টুপির আশা তিনি প্রায় ত্যাগ করেছেন এমন সময় ওটি একখানি গাড়ির চাকায় ঠেকে আটকে গেল, এবং তিনিও

বিজয়ী বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে টুপিটি তুলে বেশ দৃঢ়ভাবে মাথায় দিলেন।

এমন সময় হঠাৎ তাঁর নাম ধরে ওপর থেকে টাপ্‌ম্যান ডাকলেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি পিকউইক তৎক্ষণাৎ ওপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে হারিয়ে যাওয়া টাপ্‌ম্যান একটা খোলা গাড়ির ওপর অধিষ্ঠিত; তার পাশে রয়েছেন সুপুষ্ট একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, দুজন সুন্দরী যুবতী এবং একজন বিগত-যৌবনা মহিলা। সকলেই সৈন্যদলের ছোটাছুটি দেখতে ব্যস্ত। টাপ্‌ম্যানকে দেখলে মনে হয় যে তিনি আশৈশব ঐ পরিবারভুক্ত। হ্যাঁ, আরও একটি নয়নমনোহর বস্তু ছিল গাড়ির পেছনে—বিরাট এক বেতের ঝুড়ি ভর্তি খাদ্যদ্রব্য এবং তার পাশে ঝুড়িটির মতই আকৃতি বিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট একটি বালক ঘুমন্ত অবস্থায়, যাকে দেখলেই মনে হয় যে, ঝুড়ির 'মালিক' সেই এবং প্রয়োজনের সময় ঠিকমত খুলে সবাইকে তৃপ্ত করার ভার ওরই ওপর ন্যস্ত।

'পিকউইক, পিকউইক, ওপরে আসুন'—টাপ্‌ম্যান বললেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে আসুন শীগগির' বললেন সুপুষ্ট প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি। জো, জো;—কী মুশকিল, হতভাগা আবার ঘুমোচ্ছে! এই বাঁদর, সিঁড়িটা পেতে দে!'

নির্বিকার জো ধীরগতিতে কাজটি সমাধা করে আবার তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে স্নডগ্রাস এবং উইংকলও এসে পড়েছিলেন এবং হাত ধরাধরি করে তাদেরও গাড়ির ওপরে তুলে নেওয়া হল।

'বেশ বেশ, খুব ভাল কথা,' প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে আপনাদের মনে নেই, কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। গত বছর আমি আপনাদের ক্লাবে গিয়েছিলাম। তাই এখানে টাপম্যানকে দেখে ধরেছি। খুবই খুসী হলাম—ভারি খুসী হলাম—ভারী খুসী হলাম—'

কিছুক্ষই বাদেই সৈন্যরা ক্ষান্ত দিল, এবং অবিশ্বাস্য তৎপরতার সঙ্গে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি—যাঁর নাম মিঃ ওয়ারডল্‌—'জো, জো,......এই মরেছে, হতভাগা আবার ঘুমিয়েছে' বলে আবার চীৎকার করে উঠলেন। 'মিঃ উইংকল, দয়া করে বাঁদরটাকে চিমটি কাটুন ত—আর কিছুতেই ওর ঘুম ভাঙে না।'

উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগে উত্থিত জো অবিশ্বাস্য তৎপরতার সঙ্গে খাবারের ঝুড়ি খুলে সাজাতে আরম্ভ করল।

খেতে খেতে জ্ঞানপিপাসু শ্রীযুক্ত পিকউইক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আশ্চর্য ছেলেটি তো! ও কি সব সময়ই এভাবে ঘুমোয়?'

'আর বলেন কেন,' মিঃ ওয়ারডল্‌ উত্তর হাজার টাকা পেলেও ওকে আমি ছাড়ব না—ও একটা প্রাকৃতিক বিস্ময়।'

খাওয়া দাওয়া সেরে পরম পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলে মিঃ ওয়ারডল্‌ বললেন, 'মনে থাকে যেন আপনাদের সব। আগামীকাল আপনাদের সবাইকার নেমন্তন্ন আমার বাড়িতে—ম্যানর ফারম্‌, ডিংলে ডেল। ভুললে কিন্তু তুলকালাম্‌ করব। এক হপ্তার আগে ছাড়া পাচ্ছেন না,—মনে থাকে যেন!'

ওয়ারডল্‌ মশাই সকলের সংগে করমর্দন করে গাড়ি ছেড়ে দিলেন। গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই পিকউইক ক্লাবের সভ্যরা সাশ্চর্যে দেখলেন যে জো-র মাথা ঝুঁকে পড়েছে এবং পড়ন্ত রোদে তার মুখে সুনিদ্রাজনিত প্রশান্তি সুপরিস্ফুট।

॥ দুই ॥

সারাদিনের পরিশ্রম এবং মিঃ ওয়ারডলের অকৃপণ আতিথেয়তা, দুই মিলে মিঃ পিকউইককে এমন নিদ্রাভিভূত করেছিল যে সকালবেলার রৌদ্র যতক্ষণ না কড়া-মেজাজে জানান দিল, ততক্ষণ তাঁর ঘুম ভাঙে নি। অবশ্য নিদ্রাভঙ্গ হতেই মুক্তের ঘোড়ার মতই তিনি তীরবেগে উঠে [illegible] এবং বিদ্যুদ্‌গতিতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে জানালার পাশে বসে ডিংলে ডেল-এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগে রত হলেন।

হঠাৎ 'এই যে' বলে উচ্চস্বরে আহ্বান শুনে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি ডাইনে তাকালেন—কেউ না। বাঁয়ে তাকালেন—কোই নেহি! ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—মহাশূন্য! তখন, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করলেন অবশ্যই নিচ থেকে কেউ ডাকছে। তৎক্ষণাৎ তাঁর দৃষ্টি অধোগামী করতেই দেখতে পেলেন মিঃ ওয়ারডল্‌কে, যিনি বাগানে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন।

সদানন্দ মিঃ ওয়ারডল্‌-এর সাগ্রহ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় কি? মিঃ পিকউইক সবেগে নীচে বাগানে এলেন এবং মিঃ ওয়ারডল-এর হাতে একটি ও পাশে মাটিতে আর একটি বন্দুক দেখে তাঁর সদা অনুসন্ধিৎসু মন কারণ জানতে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল।

'কি ব্যাপার! এই সাতসকালে আগ্নেয়াস্ত্র কেন—যোদ্ধৃবেশ কিসের জন্য?' এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন পিকউইক।

'কেন? আপনি জানেন না যে আপনার বন্ধু! উইংকল একজন নামকরা স্পোর্টস্‌ম্যান,—একজন সুদক্ষ শিকারী?'

সাবধানী পিকউইক উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি বটে, তবে চর্মচক্ষে দেখিনি কোনদিন।'

[illegible]

লোককে ডেকে আন।—চলুন মশাই, আজ আপনাকে পাখি শিকার দেখাব।'

কিছুক্ষণ চলেই তাঁরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেলেন—অসংখ্য সদ্যোত্থিত বিহগকুল কর্ণবিদারক কূজনে তাদের সম্বর্ধনা জানাল। মিঃ ওয়ারডল্‌ একটি বন্দুকে টোটা ভরে নিলেন। ইতিমধ্যে টাপ্‌ম্যান, স্নডগ্রাস এবং উইংকল্‌ এসে পৌঁছলেন—বুদ্ধিমান জো কোন 'ভদ্রলোককে' ডাকতে হবে ঠিক না করতে পেরে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসেছিল।

'আরে এদিকে আসুন......তাড়াতাড়ি করুন না। আপনার মত নামকরা শিকারীর কি এত দেরি করা উচিত?'

মিঃ উইংকল্‌-এর মুখখানা যেন একটু ফ্যাকাসে মনে হচ্ছিল; অবশ্য সকালবেলার আলোতে হয় ত ওরকমটা দেখাচ্ছিল, কিন্তু মিঃ পিকউইকের মনে সন্দেহ জাগাল যে, ওটা হয়তো ভীতির চিহ্নও হতে পারে।

সদানন্দ ওয়ারডল্‌-এর ইংগিতে দুটি ছোকরা তরতর করে গাছে উঠতে আরম্ভ করল।

শ্রীযুক্ত পিকউইকের সদাজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা—শিকার হবে পাখি, তাহলে ছোঁড়া দুটো গাছে উঠছে কেন, এই জটিল প্রশ্ন তাঁকে অস্থির করে তুলল, এবং তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ছেলেদুটো গাছে উঠেছে যে?'

'ঘুঘুগুলিকে উড়িয়ে দেবার জন্য।'

'ও!' পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললেন পিকউইক।

ইতিমধ্যে ছেলে দুটো গাছে উঠে ডাল নেড়ে পাখির ঝাঁক উড়িয়ে দিল এবং ভোরের আমেজ ভাঙায় বিরক্ত পাখির চীৎকারে কান একেবারে ঝালাপালা। জবাবে ওয়ারডল্‌-এর বন্দুক গর্জে উঠল এবং সংগে সংগে দুটি পাখি পপাত ধরণীতলে।

'জো, তুলে নাও,' বললেন তিনি এইবার তোমার পালা হে ছোকরা।'

সদর্পে এগিয়ে এলেন বন্দুকপাণি উইংকল। পিকউইক এবং অন্যান্যরা কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন—বোধহয় উইংকল্‌-এর গুলীতে পক্ষীবৃষ্টির ভয়েই! দুচোখ দৃঢ়ভাবে বুজে টাপ্‌ম্যান-এর আর্তনাদ শোনা গেল!!

বেচারা টাপ্‌ম্যান। নারীজাতির একনিষ্ঠ পূজারী এই প্রৌঢ়ের ভাগ্যে শেষে মধুকটাক্ষের পরিবর্তে ছররা লাভ হল বাম হস্তে!

হৈ চৈ পড়ে গেল। শ্রীযুক্ত পিকউইক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে উইংকলকে 'হতভাগা—শয়তান' ইত্যাদি শব্দে আপ্যায়িত করলেন, উইংকল সন্ত্রস্ত ও ভীত হয়ে ধরাশায়ী টাপ্‌ম্যান-এর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন, টাপ্‌ম্যান প্রথমে বাঁ চোখ পরে ডান চোখ খুলে আবার দুচোখ জোরে বন্ধ করে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন, '[illegible]!'......

বর্ণনার জন্য দরকার একজন মহাকবি।

এরপর দুজনে মিলে টাপম্যানকে অতি সাবধানে বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। দরজার কাছাকাছি যেতেই মেয়েরা (অর্থাৎ কর্তার অবিবাহিতা মধ্যবয়স্কা ভগ্নী র‍্যাচেল এবং দুই মেয়ে এমিলি ও ইসাবেলা) এসে পড়ল।

'আরে, বড়ো দাদুর কি হয়েছে', ইসাবেলা বলে উঠল, কিন্তু কুমারী পিসী গ্রাহ্য করলেন না কথাটা। তাঁর চোখে টাপম্যান নব্যযুবক, বড়ো বলতে কেবল পিকউইক।

'ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার মত কিছু হয় নি;' ওয়ারডল বারবার বলতে লাগলেন।

'কি হয়েছে বলই না', এমিলি আর ইসাবেলার জোরালো দাবি।

'কিছু না, কিছু না, টাপম্যান সামান্য আহত হয়েছে।'

এই কথা শোনামাত্র কুমারী পিসীমা আর্তনাদ করে উঠলেন, পরে হিস্টিরিয়া রোগীর মত 'হি হি' করে হেসে দুই ভাই-ঝির গায়ে ঢলে পড়লেন।

'একবালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও ওর মাথায়', বিরক্ত ওয়ারডল-এর মন্তব্য।

শশব্যস্তে সোজা হয়ে র‍্যাচেল বললেন, 'না না, আমি সুস্থ হয়েছি।—বেলা, এমিলি .....ডাক্তার! ও কি আহত হয়েছে? ও কি বেঁচে আছে.....হা, হা, হা।'—দু নম্বর হিস্টিরিয়ার পূর্বাভাষ।

বেচারা টাপম্যান! র‍্যাচেল-এর রকম-সকম দেখে হতভম্ব হয়ে বলে উঠলেন, 'শুনুন, আমি ঠিক আছি। আপনি শান্ত হোন!'

'এ ত টাপম্যান-এরই আওয়াজ!—তা' হলে তুমি মরে যাও নি—বল, মরে যাও নি ত?'

অসহ্য বিরক্তিতে ওয়ারডল ধমক দিলেন, 'কি আবোল-তাবোল বকছ র‍্যাচেল? ওর নিজের মুখ থেকে 'মরে যাইনি' শুনে কি স্বর্গলাভ হবে শুনি?—যাও, যাও ঝামেলা কর না।'

'না না, সে কি কথা,' নারীজাতির চিরসেবক টাপম্যান এগিয়ে এসে বললেন, 'র‍্যাচেল, আমাকে ধর! তোমার সাহায্য ছাড়া আর আমার কিছু দরকার নেই।'

র‍্যাচেল-এর হাত ধরে ধীরে ধীরে টাপম্যান গিয়ে ঘরে সোফার ওপর শুয়ে পড়ে তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে চোখ বুজলেন।

বোধহয় আধ মিনিটও হয় নি, র‍্যাচেল আপন মনে বললেন, 'ও ঘুমোচ্ছে!...... প্রিয় টাপম্যান, তুমি ঘুমোও।'

জ্যামুক্ত ধনুকের মত সোজা হয়ে বসলেন টাপম্যান। আবেগকম্পিত হস্তে র‍্যাচেলকে আলিঙ্গন করে বললেন 'র‍্যাচেল, কি বললে আবার বল.........যদি আমাকে সুস্থ দেখতে চাও, আবার বল।'

ব্রীড়াবনত র‍্যাচেল বললেন, 'ছি, ছি, তুমি.........আপনি শুনতে পেয়েছেন।'

'নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছি—পাবো না কেন? আবার বল, সত্যি বলছি—শুনতে বড় মধুর লাগছে!'

'চুপ, চুপ, দাদা আসছে,'—সরে বসলেন র‍্যাচেল।

ওয়ারডল ডাক্তার নিয়ে ঢুকলেন এবং ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসা করে ভরসা দিয়ে চলে যাবার পর সবাই মাঝপথে থমকানো প্রাতরাশ গ্রহণে ব্যাপৃত হলেন। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল বটে, কিন্তু পিকউইকের সদাহাস্যময় মুখ গম্ভীর হয়েই রইল। উইংকল-এর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস টলে উঠেছিল খুব বেশিমাত্রায়।

সুদক্ষ শিকারী উইংকল-কে ওয়ারডল প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ক্রিকেট খেলতে জান?'

অন্য সময় হলে মিঃ উইংকল সংগে সংগে 'হ্যাঁ' বলতেন, কিন্তু সময়োচিত বিচক্ষণতার সংগে তিনি জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে না।'

স্নডগ্রাস পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি খেলেন বুঝি?'

মিঃ ওয়ারডল বললেন, 'না, এখন আর খেলি না; তবে একসময় খেলতাম। ক্লাবে চাঁদা দিই ঠিকই।'

ব্যাপারটা এই: আঞ্চলিক বিরাট ক্রিকেট ম্যাচ সেইদিনই হবার কথা। দ্বন্দ্বটা ডিংলেডেল এবং মাগলটন-এর মধ্যে, এবং দুপক্ষই উৎসাহ-উদ্দীপনায় টলমল করছিল আসন্ন কুরুক্ষেত্রের প্রতীক্ষায়।

ওয়ারডল পিকউইককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই খেলা দেখতে ভালবাসেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যে খেলা নিরাপদে দেখা যায় এবং যে খেলা অক্ষম খেলোয়াড়দের অমার্জনীয় অকর্মণ্যতার জন্য মানুষের বিপদের কারণ হয়ে ওঠে না।' বলে শ্রীযুত পিকউইক সোজা উইংকল-এর দিকে কঠোরভাবে তাকালেন। উইংকল লজ্জায় নতমস্তক।

ওয়ারডল পিকউইক এবং অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে মাগলটন-এ চললেন; সেখানে আজ ডিংলেডেল এবং মাগলটন-এর যুগান্তকারী দ্বৈরথ। আমাদের নায়ক শ্রীযুত পিকউইক সর্বদাই জ্ঞানাহরণে সচেষ্ট এবং ক্লাবের প্রস্তাব অনুসারে স্থানীয় বিবরণ সংগ্রহে উৎসুক হয়ে মাগলটন-এর সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

ছোট্ট সহরের মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা, যেখানে বাজার বসে; এরই মাঝ বরাবর বেশ বড় একটি হোটেল, যার সাইন-বোর্ড-এর ওপর তিনটি পা উঁচু করে এক পায়ে এক সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশেপাশে নীলামঘর, জীবন ও অগ্নিবীমার অফিস, গমের কল, কাপড়চোপড়ের দোকান, জুতোর এবং ঘোড়ার জিনের দোকান ইত্যাদি রয়েছে—যেমন প্রত্যেক ছোট সহরেই থাকে। দুই মহাশয়—অ্যাটর্নি, এবং বৈদ্যরাজের গৃহও কাছাকাছি।

এই সমস্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহান্তে পিকউইক ধীর পদক্ষেপে বন্ধুদের অনুসরণ করে যথাসময়ে ক্রিকেট মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন। খেলা তখনও আরম্ভ হয় নি। শুধু মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েকজন খেলোয়াড় উল্লাসিকভাবে একটা বল নিয়ে লোফালুফি করছে, যেন পৃথিবীর ভাগ্য ঠিকমত ক্রিকেট বল ধরার ওপর নির্ভরশীল।

মাঠের প্রান্তে কয়েকটা তাঁবু দেখা যাচ্ছিল, তার একটিতে মিঃ ওয়ারডল-এর সংগে গিয়ে হাজির হলেন পিকউইক ক্লাবের অমরকীর্তি সদস্যবৃন্দ। লণ্ডন আগত ওয়ারডল-এর বন্ধুবর্গের খাতির খুবই হল এবং একজন সভ্য নিজে সংগে করে পিকউইকিয়ানদের ভেতরে নিয়ে চললেন।

ঢুকতেই মিঃ পিকউইকের কানে গেল, কে যেন বলছে: 'সুন্দর খেলা—ভাল ব্যায়াম—সত্যি।' এবং দেখলেন তাঁর পুরনো বাক্যবাগীশ বন্ধু আলফ্রেড জিংগলকে।

শ্রীযুক্ত পিকউইক-কে দেখেই দৌড়ে এসে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল, 'এদিকে—এদিকে—চমৎকার বীয়ার—বীফ—আরো কত কি—সুন্দর দিন—বসে পড়ুন—খুব খুশি—দেখে—ভাল ভাল খাবার।'

একসংগে এত কথা বলে জিংগল হাঁফিয়ে গেল। এতক্ষণে পিকউইক কথা বলার সুযোগ পেয়ে শ্রীযুক্ত ওয়ারডল-কে পরিচয় করিয়ে দিলেন বন্ধু হিসাবে।

'আপনার বন্ধু?—মাই ডিয়ার স্যার, কেমন আছেন—আমার বন্ধুর বন্ধু—দেখি, দেখি আপনার হাত দেখি।'

করমর্দনের পরে দুপা পেছিয়ে গিয়ে ভাল করে ওয়ারডল-কে দেখে নিয়ে জিংগল আবার তাঁর হাত ধরে ঝাঁকাতে সুরু করল, যেন আর ছাড়বে না।

'বেশ বেশ, তা এখানে কিভাবে আসা হল?' পিকউইক স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই এসে পড়লাম—মাগলটন-এর হোটেলে—ক্রিকেট পার্টি—আলাপ—খুব খাওয়াল—মাংস, ডিম, বিয়ার—কত কি—বেশ লোক—চমৎকার।'

জিংগল-এর এতাদৃশ বাচনিক ভুতলিপি উদ্ধারে অভ্যস্ত পিকউইক অবশ্য বুঝে নিলেন যে হঠাৎ আলাপে অভ্যস্ত এই লোকটি যে কোন রকমেই হোক মাগলটন-এর ক্রিকেট টিম-এর সভ্যদের সংগে আলাপ জমিয়ে নিয়ে আখের গুছিয়ে বসেছে।

এরপরে চশমাটি দৃঢভাবে নাসিকা

অনুলেপন করে তিনি খেলা দেখতে প্রবৃত্ত হলেন।

খেলার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটাতে পারে। কাজেই কেমন করে ডিংলেডেল-এর আশা ভরসাস্বরূপে মিঃ লাফে বা চোখ বন্ধ করে বলটিকে ডান চোখ দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সাবধান করে দিয়ে সোজা মাগল্টন-এর চ্যাম্পিয়ান মিঃ ডান্‌কিনস-এর দিকে ছুড়ে দিলেন, কেমন করে ডান্‌কিনস অবহেলায় সে বলকে মেরে দুটি রাণ করলেন এবং এই অসমসাহসিক কাজে মাগলেটন-এর সমর্থকরা বিদ্রূপ কলকল্লোলে আনন্দ প্রকাশ করলেন; ডান্‌কিনস এবং পডার যখন ৫৪ রান করে ফেললেন তখন ডিংলেডেল-এর সমর্থকদের বিষাদমাখা বদনমন্ডলী পিক্‌-উইককে কতখানি বিচলিত করেছিল, কেমন করে তারা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরাজয় স্বীকার করেছিল—সে সবের বিস্তারিত এবং রোমহর্ষক বিবরণ দিয়ে তাঁদের মানসিক ক্লান্তি আমরা বাড়াব না।

যতক্ষণ খেলা চলছিল জিংগল-এর হাত এবং মুখ একলহমাও স্থির থাকে নি। খাদ্যগ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে মন্তব্য চলছিল—'ইস্, কী বোকা,' 'দূর, দূর, খেলা ছেড়ে দাও'.......ইত্যাদি গভীর অর্থসূচক কথা-বার্তা শুনে সকলেই বুঝতে পারলেন যে জিংগল ক্রিকেট সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞ।

খেলা শেষে সকলেই তাঁবুতে ঢুকলেন তীরবেগে, কেন না এই বিরাট যুদ্ধ শেষে 'জলপান'—এর জন্য সবাই ব্যগ্র।

'চমৎকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ভাল খেলা—দু'-একজন ভাল......' জিংগল বলতে বলতে সর্বাগ্রে ঢুকলেন।

তাঁর অনর্গল বাক্যস্রোতমুগ্ধ মিঃ ওয়ার্‌ডল্ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই অনেক খেলেছেন?'

'তার মানে......হাজার হাজার বার.....এখানে নয়.....ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ......খুব গরম......কষ্টকর,' বললেন জিংগল।

'নিশ্চয়ই অত গরমে খেলতে খুব কষ্ট হত?' শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিজ্ঞতার পরিচয়জ্ঞাপক প্রশ্ন ছুড়লেন।

'অত্যন্ত গরম......গা পোড়ান......একবার খেলেছিলাম......বন্ধু কর্নেল......টসে জিতলাম......সকাল সাতটায় আরম্ভ......ফিল্‌ডাররা মূর্ছিত......নতুন ফিল্‌ডার, নতুন বোলার......তারাও পপাত ......আবার নতুন দল......করলেন বোলার এবার.. ...দু'জন নেটিভ তাকে ধরে রেখেছে......তিনি চিৎপাত ......শেষে কোয়াং কো সাম্বা বোলার......বিশ্বাসী ভৃত্য......৫৭০ রান......শেষ মুহূর্তে কোয়াং কো-র বলে আউট......ডিনার-এর সময় হয়েছে......স্নান এবং আহার......অল্প পরিশ্রান্ত!'

সমস্ত তাঁবু নিস্তব্ধ, ছুঁচ পড়লেও শুনতে পাওয়া যায়।

অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে একজন বললেন, 'আমরা 'নীল সিংহ' মার্কা হোটেলে সামান্য জলযোগের আয়োজন করেছি—আশা করি আপনারা আমাদের সংগে যোগ দেবেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' অত্যন্ত উৎসাহের সংগে মিঃ ওয়ার্‌ডল্ বলে উঠলেন, 'আমাদের বন্ধু বলতে আমরা নিশ্চয়ই জিংগলকেই বুঝব?'

'অবশ্যই, অবশ্যই,......এর আর কথা কি,' বলতে বলতে জিংগল একহাতে পিক্‌-উইককে এবং অপর হাতে ওয়ার্‌ডল্-কে ধরে টানতে টানতে নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন।

ভোজ বলে ভোজ! সবাই একসংগে কথা বলছেন, কাঁটা চামচের হৃদয়ানন্দবর্ধক মধুর ধ্বনি, ঘর্মাক্ত ওয়েটারদের দ্রুত গমনা-গমন, জিংগল-এর খণ্ড খণ্ড সুউচ্চ মন্তব্য, শ্রীযুক্ত পিক্‌উইকের গভীরার্থব্যঞ্জক দু'একটি মূল্যবান কথা,......ইত্যাদি মিলে এক মনোহর পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয়েছিল।

অবশেষে পানান্তে প্রায় মধ্যরাত্রিতে শান্ত সহরকে ঈষৎ জড়িত কণ্ঠের মাধুরীতে মুখরিত ও উচ্চকিত করতঃ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন। গানের বাণীটি খুবই সূক্ষ্ম অর্থবোধক:—

(কোরাস)

ঘরে ফিরব না, ফিরব না, ফিরব না রে......

ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
—	—	—	—
—	—	—	—

(কোরাস)—মোরা থাকব বসে!!'

॥ তিন ॥

স্যাম ওয়েলার-এর আবির্ভাব

শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-এর বিশাল ব্যক্তিত্বের তুলনায় গস্‌ওয়েল স্ট্রীট-এ তাঁর ভাড়া বাড়ি অবশ্য নিতান্তই নগণ্য, তবুও সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাড়িটি মন্দ নয়। তাঁর বসবার ঘর দোতলায়, ঠিক রাস্তার দিকে এবং শোবার ঘরও রাস্তার দিকে, তেতলায়। সুতরাং বৈঠকখানা বা শোবার ঘর যেখানেই থাকুক না কেন, সর্বদাই তিনি সামনের রাস্তা দিয়ে চলমান জনস্রোত পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ করে স্বভাবজ সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হতেন।

বাড়িটি ছোট—তাঁর প্রয়োজন অনুসারেই নিস্তব্ধ। বাড়ির মালিক শ্রীমতী বার্‌ডেল মাঝবয়সী বিধবা (হায় রে!), পরলোকগত 'বার্‌ডেল-এর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন ছেলেকে নিয়ে তাঁর সংসার। রান্নায় তিনি দ্রৌপদী-বিশেষ এবং গৃহকার্য-নিপুণা—এক কথায় আদর্শ গৃহিণী।

জনকল্যাণের জন্য জাত মহাপুরুষদের পক্ষে জাগতিক প্রয়োজনের খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখা সম্ভব নয়।

শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক ক্ষণজন্মা পুরুষ, কাজেই তিনি সময় সময় ডিনার-এর পোষাক সকালে, কিংবা সান্ধ্য পোষাকের বোতাম সকালের পোষাকে, বা রাতের গলবন্ধ মধ্যাহ্নে ব্যবহার করে বসতেন। বিরক্ত পিক্‌উইক একজন ব্যক্তিগত ভৃত্যের খোঁজ করতে করতে অবশেষে স্যাম ওয়েলার নামে একটি উপযুক্ত লোকের খোঁজ পেলেন।

যে গুরুত্বপূর্ণ দিনের কথা আজ আমরা বর্ণনা করতে যাচ্ছি, সেদিন পিক্‌উইক ছোট খোকা বার্‌ডেল-কে স্যাম-এর খোঁজে পাঠিয়ে নিজে চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যাঁরা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং গুরুগম্ভীর চালচলন সম্বন্ধে ওয়াকে-ফহাল, তাঁদের কাছে আজকের ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ খটোমটো ঠেকতে পারে, কিন্তু আমরা জানি কেন তাঁর এই আপাত-অহৈতুকী চিত্ত-চাঞ্চল্য। আজীবন একক সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত বৃদ্ধ আজ একটু ভাবনায় পড়েছেন—হবু ভৃত্যটি কেমন কাজ করবে, সে চোর-ছ্যাঁচোড় বা ঝগড়াটে কি না,—ইত্যাদি জরুরী চিন্তা তাঁর বিশাল মস্তিষ্কে আলোচিত এবং বিশ্লেষিত হচ্ছিল।

মন দ্বিধান্বিত হলে মানুষ খোঁজে আর একজনের সংগ, পেলে বর্তে যায়, তা সে যেই হোক না কেন। অসামান্য প্রতিভাশালী এবং অলৌকিক কর্মশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত মনুষ্যেতর প্রাণী নন। সুতরাং ঘর পরিষ্কারে ব্যস্ত শ্রীমতী বার্‌ডেল-কেই উদ্দেশ্য করে, তিনি বললেন, 'তোমার খোকা বড্ড দেরি করছে, তাই না?'

'আজ্ঞে, রাস্তাও ত' অনেকটা।'

'ঠিক, ঠিক,—তাই ত' বটে!'

ক্ষণিক নিস্তব্ধতা—কেবলমাত্র শ্রীমতী বার্‌ডেল-এর সুপটু হস্তের সম্মার্জনী-নিঃসৃত মৃদুমধুর শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

খানিক পরে পিক্‌উইক বললেন, 'ঠাকরুণ, তুমি ত পাকা গিন্নী। বল ত' দু'জনের খরচ কি একজনের চেয়ে খুব বেশি?'

চমকে উঠলেন আধ-বয়সী বিধবা, বুঝি বা পিক্‌উইক-এর কথার মধ্যে বিয়ের প্রস্তাবের গন্ধ পেলেন। তাই নবীনা কিশোরী-ইব লাজ রক্তিম মৃদু কণ্ঠের জবাব এল: 'আ ...আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না কথাটা?'

'আহা বল না, বলে ফেল,—তোমার মতটাই শুনি।'

টেবিল ঝাড়তে ঝাড়তে একটু একটু করে পিক্‌উইক-এর কাছে এগোলেন ভদ্রমহিলা

লাজারুণ [illegible] বলে, আড়চোখে তাকাতে তাকাতে। বললেন, 'আজ্ঞে, সেটা দ্বিতীয় ব্যক্তিটির ওপর নির্ভরশীল—সে ছেলেমানুষ কি না, সঞ্চয়ী কি না, পাকা বয়সী কি না ইত্যাদির ওপর।'

'ঠিক, ঠিক,' সোৎসাহে সম্মতিজ্ঞাপন করলেন শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক। 'আমি যার কথা ভাবছি সে লোক খুবই বুদ্ধিমান এবং জাগতিক ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ মনে হয়।'

শ্রীমতী বারডেল-এর হৃদয়ে ক্ষুদ্র একটি মরূদ্যান যেন উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল—পুনর্বার লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি,' দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন পিক্‌উইক।

মরূদ্যানে বোধহয় ফুল ফুটছে!

'তোমার হয়ত মনে হতে পারে তোমাকে আগে বলি নি কেন এবং তোমার ছেলেকে সকালে বাইরে পাঠিয়ে তারপরই বা কেন বলছি—তাই নয়?'

পত্র-পুষ্প-সুশোভিত মরূদ্যানে কলস্বিনী নদী উপছে পড়ল। আর সন্দেহ নেই—এ নিশ্চয়ই বৈবাহিক প্রস্তাবের গৌরচন্দ্রিকা। শ্রীমতী বারডেল বহুদিন থেকেই শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-কে দূর থেকে পুজো করে আসছেন মন তুলসী দিয়ে, কিন্তু এ দুরাশা তাঁর মনে কোনদিন স্থান পায় নি। আজ যখন সৌভাগ্য যেচে ধরা দিয়েছে, তখন পাকা গৃহিণীর মতই তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। কি চালাক!—ছেলেটাকে আগে থেকেই বাইরে পাঠিয়ে বসে আছে!

মুচকি হেসে চোখ ঠেরে একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী বারডেল বললেন, 'কি দুষ্টু আপনি—যাও, তুমি আর বোল না।'

বলতে বলতে আবেশবিভোর বিপুল-জঘনা নারী বিবশা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পিক্‌উইক-এর কোলে এবং তাঁর কণ্ঠলগ্না হয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন আনন্দের আতিশয্যে!

'কী সর্বনাশ!' বিব্রত পিক্‌উইক এবার বিভ্রান্ত।

'আ রে, ও বারডেল—এ কী করছ তুমি!......যদি কেউ এসে পড়ে?'

'আসুক গে,' সাহসিকার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, 'আমি গ্রাহ্য করি না! আমি তোমাকে ছাড়ব না, কিছুতেই নয়।'

বলতে বলতে আবেগকম্পিত হস্তে তিনি বেচারা পিক্‌উইক-কে আরও দৃঢ় বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুম্বন করলেন এবং মূর্ছিত হয়ে পড়লেন চিরাচরিত প্রথায় গললগ্ন অবস্থাতেই।

কল্পনা করুন একবার অবস্থাটা। মনে-প্রাণে আজন্ম ব্রহ্মচারী, বিদগ্ধ সমাজের মাথার মণি, পুরুষসিংহ পিক্‌উইক-এর কী দুরবস্থা! ভাল মনে তিনি গিয়েছিলেন স্যাম-কে ব্যক্তিগত ভৃত্য হিসেবে নিয়োগের কথাটি পাকা গিন্নীর সঙ্গে আলোচনা করতে, ভুল বুঝে (তা সে ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাকৃতই হোক) শ্রীমতী বারডেল কি কেলেংকারীটাই না করলেন।

ঠিক এই সময় (হায় রে কপাল!) সিঁড়িতে দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই টাপম্যান, স্নডগ্রাস, এবং উইংকল ঘরে ঢুকলেন শ্রীমান বারডেল সহ। এমন ঝট্‌ করে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে পিক্‌উইক সময় সময় পেলেন না শ্রীমতী বারডেল-এর স্থূল দেহবল্লরীকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিতে—ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে রইলেন বন্ধুদের দিকে, আলুলায়িতকেশা অসংবৃতবসনা, 'বাত ও কদলীবৃক্ষ' হব সেই তন্বী (!)-কে বুকে নিয়ে।

পিক্‌উইক বক্ষোলগ্না বারডেল-কে দেখে তিনি পিক্‌উইকিয়ান-এর বিস্ময় কল্পনার বস্তু—লেখনী এখানে মূক। ট্র্যাজেডি যখন গভীর, তখন ভাষা পঙ্গু, শিল্পীর তুলিও কেঁপে ওঠে। উল্লিখিত প্রাচীন কাব্যসুলভ স্থিরতাবস্থা কতক্ষণ বজায় থাকত বলা সম্ভব নয়, তবে মাতৃ-ভক্তির অপূর্ব এক অভিব্যক্তি ব্যাপারটায় একটা চলনসই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল।

খুদে বারডেল এতক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল—হঠাৎ তার মনে হল পিক্‌উইক নিশ্চয়ই তার মাকে পীড়ন করেছেন, কেন না অন্যথায় তিনি অমন ঢলে পড়েছেন কেন এবং পিক্‌উইক-ই বা অমন দৃঢ় হস্তে তাঁকে চেপে ধরেছেন কেন? সুতরাং 'হা রে রে রে' শব্দে গস্‌ওয়েল স্ট্রীটের শান্তিভংগ করে সে দ্রুতবেগে গিয়ে পিক্‌উইকের গায়ে সজোরে ঢুঁ মারতে আরম্ভ করল।

বিব্রত শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক চীৎকার করে উঠলেন, 'কি আপদ! এ ক্ষুদে শয়তানটাকে নিবৃত্ত কর।'

চিত্রার্পিতবৎ তিন পিক্‌উইকিয়ান এতক্ষণে ভাষা পেলেন—সমস্বরে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

অতি সংগত প্রশ্ন এবং যুক্তিসংগত উত্তরও তাঁদের প্রাপ্য।

তিক্তকণ্ঠে পিক্‌উইক বললেন, 'জানিনে বাপু! যা বলছি কর—এই উন্মাদ ছেলেটাকে সরাও আর এই স্ত্রীলোকটিকে দয়া করে আমার ঘাড় থেকে নামিয়ে নিচে পৌঁছে দাও। পাগলা কুকুরের মতই বিপজ্জনক এই মা-ব্যাটা।'

উইংকল ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন এবং মিঃ টাপ্‌ম্যান—সদা নারী-প্রেমিক টাপ্‌ম্যান—ক্রন্দনরতা বেপথু শ্রীমতী বারডেলকে সযত্নে ধরে নিচে নিয়ে গেলেন।

টাপ্‌ম্যান ফিরে এলে বিব্রত মিঃ পিক্‌উইক বললেন, 'ভেবেই পাচ্ছি না যে হঠাৎ স্ত্রীলোকটির কি হল। আমি সাদা মনে তার কাছে স্যামকে নিয়োগের কথাটা বলতে না বলতে একেবারে চোখ উল্টে আমার গায়ে ঢলে পড়ল। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে আমিও তাকে ধরে ফেললাম, না হলে ও পড়ে যেত।—অবাক কাণ্ড,—এর কোন হদিশ পাওয়া যায় না। স্ত্রিয়শ্চরিত্রম্‌, আর কি!'

ছোট্ট গলা খাঁকারি দিয়ে তিন বন্ধু বললেন, 'বটেই ত অবাক কাণ্ড!'

'তার মানে? তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

'ছি ছি ছি,' প্রতিবাদের ভঙ্গিতে তিন শিষ্য বলে উঠলেন।

টাপ্‌ম্যান বললেন, 'বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আপনার জন্য।'

'ওর কথাই ত হচ্ছিল. আর ঠিক সময় পাজি......মানে মহিলাটি হঠাৎ বিসদৃশভাবে আমাকে......মানে আমার......দূর হোক ছাই! স্নডগ্রাস, যাও ত ভাই, লোকটিকে ডেকে আন।'

এর পরেই টুপিটি হাতে সদাপ্রফুল্ল স্যাম ওয়েলার এসে উপস্থিত।

উৎসাহের সঙ্গে পিক্‌উইক বললেন, 'বোস, বোস ছোকরা! আমাকে মনে আছে ত?'

মাটিতে টুপিটি রেখে চেয়ারে বসে স্যাম সম্মতিসূচক গ্রীবাভংগী করল। টুপিটি তার জরাজীর্ণ এবং দৈন্য ঢাকবার প্রয়াসে সাদা খড়িম্বারা রঞ্জিত। আপত্তিয়তের হাসি দেখে স্যাম টুপিটি দেখিয়ে বলল, 'দেখতে অমন হলে কি হয় বাবুমশাইরা, টুপিটা অত্যাশ্চর্য এবং ধারিটা ছিঁড়ে যাবার আগে চেহারার জৌলুষও ছিল খুব। অবশ্য, ধারিটা যাওয়ায় বেশ হাল্কা হয়েছে এবং ফুটোগুলি দিয়ে বেশ হাওয়া ঢুকে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।'

'বেশ, বেশ,' পিক্‌উইক বললেন, 'এখন কাজের কথায় আসা যাক. কেমন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' স্যাম চটপট জবাব দিল, 'আসল কথাটা বের করাই ভাল, যেমন বলেছিল পয়সা গিলে পলায়নোদ্যত ছেলের ঘাড় ধরে তার বাবা।'

'আমরা জানতে চাচ্ছি যে তুমি তোমার বর্তমান কাজে খুসি কি না।'

'এ কথার জবাব দেওয়ার আগে বাবু-মশাইরা বলুন যে তাঁরা আমাকে তার চাইতে ভাল কিছু কাজ দিতে পারবেন কি না,' স্যাম অম্লান বদনে বলল।

বালসূর্যের ন্যায় উদার হাস্যে শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক সম্মতি জানালেন।

স্যাম বলল, 'মাইনে, কাপড়, কাজ?'

'বছরে বার পাউণ্ড মাইনে, দুটি স্যুট, আর কাজ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত দেখাশুনো এবং আমার সঙ্গে দেশভ্রমণ।'

স্যাম বলল, 'যদি আপনি অবিবাহিত হন, তা হলে আমি এক্ষুণি রাজি—

মেয়েছেলের ঝঞ্ঝাটে আমি নেই মশাই।'

এমন সহজে এবং নীরবেই এই ঐতিহাসিক সংযোগ ঘটেছিল, যার ফল তাৎকালিক ইংল্যাণ্ড-এর সামাজিক ইতিহাসে হল সুদূরপ্রসারী। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় ভোর জামাকাপড়ের দোকান থেকে কেনা আঁটসাট পোষাকে সজ্জিত হয়ে স্যাম ওয়েলার তার নতুন কাজে যোগদান করল।

পরের দিন ইটানসউইলগামী কোচগাড়ির কোচম্যানের পাশে বসে স্যাম স্বগতোক্তি করছিল, 'এ হল মন্দ নয়। রাতারাতি ভদ্রলোক হয়ে গেলাম। যাক্‌গে আমার কি—বেড়ানটা ও বেশ জমিয়ে হবে আর কাজও খুব বেশি নয়; কর্তাটি লোক ভাল—অতএব যীশুর দয়ার নির্ভর করে ঝুলে তো পড়ি!'

আমরাও বলি 'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।'

॥ চার ॥

ইটান্‌সউইল-এর যুগান্তকারী নির্বাচন

এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই বর্তমান ঐতিহাসিকের যে পিক্‌উইক ক্লাব-এর কাগজপত্র ঘাঁটবার আগে ইটান্‌সউইল-এর নাম তাঁর জানা ছিল না। এবং খোলাখুলি বলতেও বাধা নেই ইংলণ্ড-এর মানচিত্র তচনচ করে খুঁজেও ঐ নামের হদিস আজও অ-মিল।

পিক্‌উইক-এর নোট বই তন্নতন্ন করে খুঁজে এক জায়গায় কয়েকটি লাইন দেখা গেল যা তিনি নিজেই যত্নের কেটে দিয়েছেন। হায় রে মহৎ, তোর লীলা বোঝা ভার! হয়ত বা কোন গূঢ় কারণে তিনি কাউকে জানতে দিতে চান নি ইটান্‌সউইল কোনদিকে বা কোথায়।

প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে আমরা শনৈ শনৈ অগ্রসরমান।

কাগজপত্র ঘেঁটেঘুঁটে যা পাওয়া গেছে, তা থেকে একথা খুবই পরিষ্কার যে, অন্যান্য ছোট সহরের মতই, ইটান্‌সউইল-এর মহান নাগরিকরা অতিমাত্রায় নিজেদের গুরুত্ব-সচেতন এবং তারা নিশ্চিত তাদের নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ইংলণ্ড-এর ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সুতরাং, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে—বিশেষত যখন গোটা ইংলণ্ড-এর ভাগ্য পাঁচ বছরের জন্য তাদের ওপর নির্ভরশীল এবং 'ইটানসউইল গেজেট'-এর মতে, 'সারা সভ্যজগৎ রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে—সাবধান!'—ইটান্‌সউইল-এর সদাজাগ্রত জনগণ প্রলয়ঘনঘোর আরাবে দিক্‌-বিদিক মুখরিত করে গণতন্ত্রের জয়গানে নিরত।

সহরে দুই দল—'কাঁচা' এবং 'পাকা'। প্রায় সমান সভ্যসংখ্যা এদের।—যেটুকু তফাৎ তা ঢক্কানিনাদে এবং কণ্ঠযন্ত্রের ক্রিয়ায় পূরণ করে নেওয়া হচ্ছে।

রাজনীতি-সচেতন ইটানসউইল-এর মহান নাগরিকরা দুই পতাকার এমন ভক্ত যে সব কিছুকেই তারা দলগত মতবাদের দ্বন্দ্বে পরিণত করেছে। 'কাঁচা'রা তাদের সবুজ পতাকা নিয়ে যদি আন্দোলন করে পৌরসভা কর্তৃক কাঁচা নর্দমাগুলো অবিলম্বে পাকা করার দাবিতে, হলদে পতাকার ভক্তবৃন্দ (অর্থাৎ, 'পাকা'র দল) সঙ্গে সঙ্গে মেঘমন্দ্র রবে ঘোষণা করবে তা করলে সহরের সর্বনাশ! পিতৃপুরুষদের কীর্তি ধ্বংস হতে চলেছে! যে দৃশ্যে আশৈশব সহরবাসী অভ্যস্ত, যার মৃদু অথচ তীব্র (?) গন্ধে তাদের নাসারন্ধ্র আজীবন তৃপ্ত (!), তার বিনাশ!!—এ যে কল্পনাতীত।

অথবা, যদি 'কাঁচা'র দল বাজারে আর একটি জলের কল বসানর প্রস্তাব করে, তবে 'পাকা'দের চোখ নির্ঘাৎ কপালে উঠবে এই অন্যায় এবং অযৌক্তিক প্রস্তাব শুনে।

সহরের দোকান এবং গির্জা 'কাঁচা' 'পাকা'-য় বিভক্ত। ডাক্তার-বদ্যি, উকিল-মোক্তার, মুদি-মেছুনী, হোটেল-রেস্তোরা—সবই 'কাঁচা' আর 'পাকা'য় ভাগ করা।

আমাদের মত বোকারাও আন্দাজ করতে পারে এ হেন কুরুক্ষেত্রে প্রতিপক্ষদ্বয়ের নিজস্ব পত্র-পত্রিকা থাকবেই। ছিলও—'কাঁচা'রা চালাত 'ইটান্‌সউইল গেজেট,' এবং 'পাকা'দের হয়ে দশদিক উচ্চকিত করত 'ইটান্‌সউইল' ইন্‌ডিপেনডেন্ট্‌।

আর, যে সে কাগজ নয় এগুলো। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়লে শরীর গরম হয়ে ওঠে, গূঢ়ার্থের কী চমক! কী অপূর্ব লেখন-বৈশিষ্ট্য! অপরূপ এদের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী!

যেমন ধরুন—

'আমাদের অকর্মণ্য সংযোগী 'গেজেট'!'
'সহরের কলঙ্ক, আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল 'ইন্‌ডিপেনডেণ্ট'!'
'শয়তানের মুখপত্র—'গেজেট'!'
'হাড়হাবাতে, নরকের কীট 'ইন্‌ডিপেন-ডেন্ট্‌'!'

এইসব ভাবগম্ভীর এবং মহান দেশপ্রেমদ্যোতক ওজস্বিনী ভাষায় সজ্জিত থাকত উভয় মুখপত্র; এবং এ দুটি স্থানীয় অধিবাসীদের মনের আরাম, প্রাণের শান্তি বর্ধক।

স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞানই শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-কে ঠিক এই সময় ইটান্‌সউইল-এ আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই, কেন না এমন ভোট-যুদ্ধ অদৃষ্টপূর্ব। আক্ষরিক অর্থে। এবার দুপক্ষের মনোনীত প্রার্থীর নাম শুনুন, যেমন পিলে-চমকানো, স্বাজাত্য প্রীতিবর্ধক নামঃ

(১) মাননীয় স্যামুয়েল স্লামকি,
'স্লামকি হল্‌'—'কাঁচা' প্রার্থী

(২) হোরেশিও ফিস্‌কিন (ইনিও মাননীয়), এস্‌ কোয়ার,
'ফিস্‌কিন লজ্‌'—'পাকা' প্রার্থী।

বুঝুন একবার ব্যাপারখানা। সারা ইটান্‌সউইল যে রণোন্মত্ত কুঞ্জরবৎ পরিভ্রমণ করবে সঘন বৃংহণে ইংলণ্ড এর আকাশবাতাস মুখরিত করে, তাতে কিমত্র চিত্রম্‌!

গাণ্ডজন্যাননাদে 'গেজেট' ইটান্‌সউইল-এর 'বুদ্ধিমান, দেশভক্ত এবং জ্ঞানীগুণী' নাগরিকবৃন্দকে আহ্বান জানিয়ে বলল: 'শুধু ইংলণ্ড-এর নয়, সমগ্র সভ্যজগতের দৃষ্টি আজ আমাদের উপর—সাবধান! শয়তানের অনুচরবৃন্দ যুগে যুগে মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে, যেমন স্বয়ং শয়তান করিয়াছিল আদম ও ইভ্‌-কে। নন্দন-কাননে।

'ইন্‌ডিপেনডেন্ট'ও তুল্যনিনাদে গর্জন তুলে জানতে চাইল ধরার অমরাবতী ইটান্‌স-উইল-এর অধিবাসীরা মানুষ, না হীনবীর্য মেষপাল। সত্যই যদি তারা মানুষ এবং ইংরেজ নামের উপযুক্ত হয়, তবে তারা যেন দলে দলে 'পাকা' বাক্সে ভোটপত্র ফেলে তার চাক্ষুষ প্রমাণ করে জগৎসমক্ষে।

ঠিক গোধূলিলগ্নে শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক এবং তাঁর বন্ধুরা এসে পৌঁছলেন এ হেন ভোটতরঙ্গ-উত্তাল ইটান্‌সউইল-এ। সঙ্গে স্যাম ওয়েলার। গাড়ি এসে থামল সহরের এক হোটেল-এর সামনে।—সে হোটেল-এর সর্বাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে 'কাঁচা' দলের পতাকা জড়ান এবং চারফুট লম্বা অক্ষরে নোটিস বোর্ড সাঁটা, সকলকে নিম্নোক্ত জরুরী বার্তা জ্ঞাপনার্থে:

'মাননীয় স্যামুয়েল স্লামকি-র সমর্থক 'কাঁচা' সমিতি এখানে সদা-জাগ্রত—প্রতিদিন!!!'

শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক তাঁর অনবদ্য পর্য-বেক্ষণ শক্তির সাহায্যে নামমাত্র দেখতে পেলেন হোটেল-এর সামনের রাস্তায় কয়েকটি কর্মনাশা দাঁড়িয়ে, যাদের উদ্দেশ্যে দোতলার বারান্দা থেকে ভাঙা গলায় একজন বেঁটে লোক প্রাণপণে হাত-পা নেড়ে কিছু বলছে। অবশ্যই তার বক্তৃতা মাননীয় স্লামকি-র নির্বাচন-যোগ্যতা সম্বন্ধে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। কারণ, 'পাকা' দলভুক্ত কয়েক-জন কাছাকাছি রাস্তার ওপর চারটে বড়সড় জয়ঢাক সজোরে পেটাচ্ছিল, ফলত আর কোন আওয়াজই কানে আসা সম্ভব নয়।

দোতলার লোকটি কিন্তু প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। ভারি কর্তব্যপরায়ণ! ('গীতা'র মহাবাক্য 'মা ফলেষু' অনুসারে ফলাফলের দিকে তাকানর প্রয়োজনবোধ সে করে নি।) তার পাশে দাঁড়িয়ে আর একজন নিয়মিত সময় অন্তর ঠিক ঘড়ি ধরে টুপি খুলে 'হিয়ার্‌, হিয়ার্‌' বলে উঠছিলেন।

পিক্‌উইক এবং তাঁর বন্ধুবর্গ মাটিতে

পদার্পণ করা মাত্র ইটান্‌সউইল-এর স্বাধীন ও নির্ভীক জনগণের এক অংশ তাঁদের ঘিরে ফেলে 'হুররে, হুররে' বলে চেঁচাতে আরম্ভ করল। কেন এবং কার কথায় তারা চেঁচাল সে ব্যাপারে সবাই নির্বিকার।—পৃথিবীর সর্বত্র দলের কথায় নাচাই তাদের কাজ—তারা তা ভালভাবে করছিল বোধহয় পয়সার লোভে।

'স্লাম্‌কি জিন্দাবাদ,' প্রায় সাড়ে সাত ফুট লম্বা একজন চেঁচিয়ে উঠে ভ্রূকুটি করে তাকাল সকলের দিকে।

'নিশ্চয়ই, ঠিক তাই—বটেই ত,' সমর্থকরাও চেঁচাল সমস্বরে।

চারদিকে তাকিয়ে হাবভাব দেখে ধীমান পিক্‌উইক টুপি খুলে সমর্থন জানানই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন।

'ফিস্‌কিন মুর্দাবাদ,' আবার চেঁচাল রুদ্ধকণ্ঠ জনতা।

'বেশ ভাল কথা—আমার কোন আপত্তি নেই,' বললেন সাবধানী পিক্‌উইক।

জনতার সমর্থনে বন্ধুরা নিশ্চিন্ত হলেও কেন যে কে বাঁচবে আর অন্যজন মরবে তার বিন্দুবিসর্গও বুঝলেন না।

টাপম্যান ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন, 'কে স্লাম্‌কি দাদা?'

'জানি নে বাপু, থাম ত,' বিব্রত পিক্‌উইক জবাব দিলেন। 'ভিড়ের মধ্যে সকলে যা করে তাই করাই বিধেয়।'

'কিন্তু ফিসকিন-এর দলও যদি এগিয়ে আসে?' যুক্তিসংগত প্রশ্ন ছুঁড়লেন টাপ্‌ম্যান।

'যে দল বড় তাদের সংগে ভিড়ে যাবে,' পিক্‌উইক সংগে সংগে উত্তর দিলেন।

গোটা বিশ্বকোষ ঘেঁটেও এর চাইতে সুবিধেজনক জীবনদর্শন খুঁজে পাওয়া ভার!

বিজয়ী বীরের মত বন্ধুরা হোটেলে-এ ঢুকে একজন ওয়েটার-কে থাকার জায়গার কথা জিজ্ঞেস করাতে সে মাথা চুলকে বলল, 'জানি না, জেনে আসছি।' বলেই দৌড়ে ভেতরে গেল এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে প্রশ্ন করল, 'আপনারা 'কাঁচা' না 'পাকা'?'

হঠাৎ এমন প্রশ্নে হতভম্ব বন্ধুরা পরস্পরের দিকে তাকালেন। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই কঠিন।

শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-এর অসাধারণ মনীষা যথারীতি বিদ্যুৎবেগে সমাধানে পৌঁছে গেল। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'পার্‌কার মশাইকে চেন?'

'নিশ্চয়ই চিনি। তিনিই ত' মাননীয় স্লাম্‌কি-র নির্বাচনী এজেন্ট।'

'তিনি কি 'কাঁচা'?' অত্যন্ত সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন পিক্‌উইক।

'তাতে আর সন্দেহ কি,' উত্তর এল চটপট।

স্বস্তির নিঃশ্বাস অন্তে দলপতি উবাচ, 'তা হলে তুমি ধরে নিতে পার আমরাও নিঃসন্দেহে 'কাঁচা'। চরম শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়েও আমাদের মধ্যে 'পাকা'র কোনও লক্ষণ বের করতে পারবে না কেউ।'

জামাই আদরে তাঁদের শ্রীযুক্ত পার্‌কার-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

'আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক,' বলতে বলতে ক্ষীণকায় পার্‌কার সবেগে এসে পিক্‌উইক এবং অন্যান্য বন্ধুদের পাণিপীড়ন করলেন। তারপর দলপতির দিকে ফিরে সহাস্যবদনে বললেন, 'তা হলে শেষ পর্যন্ত এলেন নির্বাচন দেখতে।'

'হ্যাঁ, চলে এলাম আর কি। দেশভক্তির যে-কোনও অভিব্যক্তিকেই স্বাগত জানান আমার অভ্যেস্‌। বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে হচ্ছে!'

'অবশ্য অবশ্য!' পার্‌কার-এর পরমোৎসাহিত চিৎকার। 'সন্দেহ নেই। আমরা সব মদের দোকানগুলো আগে থাকতে ভাড়া নিয়েছি—ঢোক আর খাও, পয়সা লাগবে না। 'পাকা'দের কপালে শুধু বিয়ার। কেমন হয়েছে?'

'বেশ, বেশ। ফলাফল সম্বন্ধে কী মনে হয়?'

'কিছু বলা যাচ্ছে না মশাই, কিছুই বলা সম্ভব নয়,' পার্‌কার মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, 'ফিস্‌কিন-এর লোকজন তেত্রিশজন ভোটার-কে 'সাদা হরিণ' হোটেল-এর শক্তিবলে আটকে রেখেছে।'

'সে কি! আটকে রেখেছে কেন?' বিস্ময়াভিভূত পিক্‌উইক-এর প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, যেদিন দরকার হবে, সেদিন পর্যন্ত আটকে রাখবে যাতে আমরা তাদের নাগাল না পাই। আর নাগাল পেলেই বা কি হবে, ওদের চোপর দিনরাত মাতাল করে রেখেছে। ফিস্‌কিন-এর কর্মসচিব ভারি ধড়িবাজ!'

শ্রীযুত পিক্‌উইক এত চমকে গিয়েছিলেন যে তাঁর কথা বলারও ক্ষমতা ছিল না।

পার্‌কার বলে চললেন, 'আমরাও কম চালাক নই! হেঁ হেঁ, 'পাকা'রা চলে ডালে ডালে আর আমরা চলি পাতায় পাতায়। গত রাত্রে ৪৫ জন গিন্নীকে এনে টি-পার্‌টি দিয়েছি এবং প্রত্যেকে একটি করে সবুজ রং-এর ছাতা উপহৃত হয়েছেন।'

'কেন, সবুজ ছাতা কেন?'

'হাঃ, হাঃ, বুঝলেন না? সবুজ 'কাঁচা' দলের প্রতীক। এক চালে দুই বাজি মাৎ করলাম—দলের বিজ্ঞাপনও হল, আবার ঐ গিন্নীদের স্বামীকুলকেও হাত করলাম।—হয়ত ভাইদেরও দু'-চারজনকে!'—আনন্দের আতিশয্যে দু'হাত কচলে পার্‌কার বললেন। আরও কী যে তিনি করতেন আহ্লাদে, বলা মুশকিল; কিন্তু ঠিক এই সময় একজন রোগা এবং লম্বা লোক ঘরে ঢুকলেন। পার্‌কার তাকে পিক্‌উইক-এর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুত পট্‌ এবং তিনি 'কাঁচা' দলের স্বনামধন্য মুখপত্র 'ইটান্সউইল গেজেট'-এর দেশবিখ্যাত সম্পাদক।

লণ্ডন থেকে এসেছেন শুনেই সম্পাদক পট্‌-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন, 'আমাদের নির্বাচন তা হলে রাজধানীতে বেশ আন্দোলন তুলেছে!'

'আজ্ঞে, তাই ত মনে হয়,' পিক্‌উইক-এর সংক্ষিপ্ত উত্তর। আত্মপ্রসাদস্ফীত সম্পাদকমশাই পার্‌কার-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতে আমার গত শনিবারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দান কম নয়, কী বলেন?'

'বটেই ত, বটেই ত,' পার্‌কার-এর তাৎক্ষণিক সমর্থন।

'সংবাদপত্রের ক্ষমতা অসীম,' পট্‌ উবাচ।

সকলেই সবেগে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন সোৎসাহে।

সমর্থনপুষ্ট পট্‌ নবজলধরনিনাদোৎফুল্ল স্রোতস্বিনীর মত বয়ে চললেন, কুলুকুলুনাদে: 'আমার যতটুকু ক্ষমতা এবং উদ্দীপনা আছে তার সাহায্যে এই মহান ব্রত আমি পালন করে যেতে থাকবো—করেংগে ইয়া মরেংগে—কর্তব্যে অবহেলা আমি করব না—যতদিন না ঘৃণ্য, সাক্ষাৎ শয়তানের দূত 'ইটান্সউইল ইনডিপেনডেন্ট'-কে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারি। এতে যদি আমার কিছু হয়, যদি মহাপ্রলয়ে ইটান্সউইল-বাসীরা ভেসেও যায়, তবুও নিরস্ত হব না। অন্যায়ের সংগে আপোষ করব আমি?—কভী নেহি!'

'সাধু, সাধু,'—পিক্‌উইক।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন সম্পাদক। কিছুটা দম ছেড়ে বললেন, 'দেখছি আপনি বেশ বিদগ্ধ পুরুষ। আপনার সংগে পরিচিত হয়ে আমি কৃতকৃতার্থ হলেম।'

'আমিও। আমার বন্ধুদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিই,' বলে পিক্‌উইক একে একে টাপ্‌ম্যান, স্নডগ্রাস এবং উইংক্‌ল-এর সংগে তাঁকে পরিচিত করালেন।

এতক্ষণে অবসর পেয়ে পার্‌কার বললেন, 'শুনুন সম্পাদক, কথা হচ্ছে আমাদের রাজধানীর বন্ধুদের থাকার কী ব্যবস্থা করা যায়।'

'কেন, এই হোটেলে-এ জায়গা নেই?' টাপ্‌ম্যান অনুসন্ধিৎসু।

'একেবারেই না,' পার্‌কার-এর ঝটিতি উত্তর, 'বারান্দাতেও জায়গা নেই।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে পট্‌মশাই বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার একটা প্রস্তাব শুনুন। 'পিকক্‌' হোটেল-এ দু'টি বিছানা খালি আছে, সেখানে দু'জন এবং পরিচারক থাকতে পারবেন। আর, আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আমার সহধর্মিণীর তরফ থেকে কোন আপত্তি হবে না বাকি দু'জনকে আমার গরীবখানায় স্থান দিতে।'

যদিও 'না, না, সে কী কথা' ইত্যাদি

বলে পিক্‌উইক আপত্তি তুললেন, কিন্তু শ্রীযুত পট্‌-এর অত্যগ্রহাতিশয্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হওয়ায়, তাঁর প্রস্তাবমত ব্যবস্থা হল। অর্থাৎ, টাপ্‌ম্যান এবং স্নডগ্রাস স্যাম-সহ 'পিকক্' হোটেল-এ গেলেন এবং উইংকল্‌ সমেত পিক্‌উইক শ্রীমতী পট্‌-এর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কথা রইল সকালে সবাই এসে মিলিতভাবে প্রাতরাশ খেয়ে মাননীয় স্ল্যামকী-র মিছিলে অংশ নেবেন।

পটমশাইয়ের সংসারে মোট তিনি নিজে এবং তাঁর স্ত্রী। জগতের সব মহাপুরুষের মত তাঁরও একটি দুর্বলতা ছিল—দোর্দণ্ড-প্রতাপে তিনি 'পাকা' দলের মুণ্ডপাতে সদাজাগ্রত এবং সিদ্ধহস্ত, 'গেজেট'-এ যাঁর যুগান্তকারী সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদির দাপটে দিকমণ্ডল প্রকম্পিত,—দুঃখের সঙ্গে, সত্যের খাতিরে, স্বীকার করতে হচ্ছে স্ত্রীর সামনে তাঁর অবস্থা ইন্দ্রগোপকীটবৎ। কুঁকড়েই আছেন। হায় রে, যাঁর ঘোর নিনাদে 'পাকা'র দল বাতাহত কদলীবৃক্ষ, তিনিই কি না স্ত্রীর কাছে কথা বলতে তিনবার ঢোক গিলতেন! প্রকৃতির প্রতিশোধ।

'ওগো শুনছো, এদিকে এস,' লঘু কণ্ঠে পটমশাই ডাকলেন অর্ধাঙ্গিনীকে। 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি,—ইনি লণ্ডন-এর মহাপণ্ডিত শ্রীযুত পিক্‌উইক।'

করমর্দন করে প্রশান্ত হাসি হাসলেন পট গৃহিণী।

উইংকল্‌ বেচারা এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন লজ্জায়। তাঁকে দেখে সুগৃহিণী বললেন, 'হ্যাঁ গো, আক্কেল কি তোমার মলে হবে? ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?'

ভীত চকিত কণ্ঠে বারবার ক্ষমা চেয়ে পট্‌ যথাকর্তব্য পালন করলেন উইংকল্‌-কে কাছে ডেকে।

পিক্‌উইক বললেন, 'আপনাকে এ ভাবে বিব্রত করার জন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত।'

সবেগে হস্ত আন্দোলিত করে শ্রীমতী পট্‌ বললেন, 'ও কথা বলবেন না। নতুন মুখ দেখে বাঁচলুম। এই পোড়া জায়গায় দিনের পর দিন কাউকে না দেখে বাস করা যে কী দুর্ভোগ, তা আর কি বলব।'

একটু রহস্য করে পট্‌ বললেন, 'হ্যাঁগো, কাউকেই দেখ না?'

'তা বটে, তোমাকে ত আর না দেখে উপায় নেই,' মুখ বাজার করে পট্‌-প্রাণ-প্রেয়সী উত্তর দিলেন।

পিক্‌উইক-এর দিকে ফিরে ম্লান হাসি হেসে পটমশাই ব্যাখ্যা করলেন, 'মানে বুঝলেন কি না, আমার যে ধরণের কাজ তাতে সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা সাজে না। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সর্বদা নিমজ্জিত থাকতে হয় বলে.....'

'বলি হ্যাঁ গা,' মিসেস্‌ পট্‌-এর তিক্ত উপক্রমণিকা।

'কি গো,' মধুকণ্ঠে উত্তর এল।

'তোমার ঐ হতভাগা সঙ্গীগুলো আর হতচ্ছাড়া কাগজের কথা ছাড়া আর কি কোন কথা নেই? শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল আমার।'

'কিন্তু.. ...'

'থাম, থাম—উঃ বকতে বকতে মাথা ধরিয়ে দিলে। আচ্ছা, উইংকল্‌, টোয়েন্টি নাইন বা গ্রাবু জানেন কি?

'না জানলেও আপনার কাছে শিখতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব,' সোৎসাহে উইংকল্‌ বললেন।

'তা হলে চলুন জানালার কাছে যাই—এ বকর বকর আর সহ্য হচ্ছে না,' বলে তীব্র দৃষ্টি হেনে তিনি উইংকল্‌-কে নিয়ে দূরে সরে গেলেন।

পট্‌গিন্নী দূরে সরে যাওয়ামাত্র পট্‌-মশাই দম দেওয়া বেলুনের মত ফুলে উঠলেন এবং গম্ভীর স্বরে পরিচারিকাকে আদেশ করলেন, 'জেন, এক্ষুণি দপ্তর থেকে ১৮২৪ সালের গেজেট-এর ফাইল নিয়ে এস।'

পিক্‌উইক-কে বললেন, 'পাকা'র দল যখন রাস্তার মোড়ে পথকর আদায় করার জন্য নতুন লোক নিযুক্ত করেছিল, তখন ঐ ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিবাদে আমি যে সব তীব্র সম্পাদকীয় লিখেছিলাম, তার কিছু কিছু আপনাকে পড়ে শোনাতে চাই। আপনার মত গুণগ্রাহী লোকের ভাল লাগবে বলেই মনে হয়।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' সদাবিনয়ী পিক্‌-উইক উত্তরমদদৎ।

আমরা অতীব দুঃখ এবং লজ্জার সঙ্গে জানাচ্ছি পিক্‌উইক-এর নোটবই এবং তৎ-প্রতিষ্ঠিত ক্লাবের কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও উল্লিখিত যুগান্তকারী লেখাগুলোর সন্ধান পাই নি। কেবলমাত্র উইংকল্‌-এর ডায়েরীতে পাচ্ছি পিক্‌উইক নিমীলিত নয়নে বসে সম্পাদকীয় শুনেছিলেন। এতদ্দৃষ্টে স্বতঃই প্রমাণিত হয় সেই অনবদ্য রচনা শ্রবণে পিক্‌উইক-এর মত বিরাট পুরুষও মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়েছিলেন।

পরদিন প্রাতে ঢক্কানিনাদ ও উত্তাল জনকোলাহল, অশ্বরক্ষকবর্দান এবং অন্যান্য কলকোলাহলে দিকমণ্ডল আরাবিত হয়ে মানুষকে জোর করেই আসন্ন নির্বাচনের কথা মনে করতে বাধ্য করছিল। এর সঙ্গে ছিল বিবদমান দুই দলের সমর্থকদের হাতা-হাতি। সব মিলে বেশ একটা রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি।

প্রাতঃসূর্যের প্রায় সাথে সাথেই ভৃত্য স্যাম এসে হাজির এবং তার সাহায্যে বেশভূষা যথাযথ সমাপনান্তে শ্রীযুত পিক্‌উইক অবতরণ করলেন প্রাতরাশ গ্রহণ করতে।

মহাপ্রাণীকে তুষ্ট করে আমাদের নায়কদ্বয় পট্‌গিন্নীর সুচারু হস্তের দ্বারা 'কাঁচা' দলের সিদ্ধান্তমত ঘরের বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

উইংকল্‌-কে দখল করলেন পট্‌-গিন্নী, তিনি তাকে নিয়ে অকুস্থলের পাশে এক গৃহচূড়ে যাবেন নিরাপদে তামাসা দেখার জন্য।

পিক্‌উইক ও পট্‌ হোটেলে গিয়ে দেখলেন পেছনের জানালায় দাঁড়িয়ে মাননীয় স্লাম্‌কী-র দলভুক্ত এক নেতা তারস্বরে বক্তৃতা করছেন 'ইটান্সউইল-এর জনগণকে' উদ্দেশ্য করে। অবশ্য, তখন জানালার নিচে রাস্তায় ছিল ঠিক দুজন বালক এবং একজন বালিকা। বক্তার উৎসাহে কোনও ঘাটতি হয় নি শ্রোতার অভাবে।

আস্তাবলে 'কাঁচা' দলের নানা আকারের পতাকা এমনভাবে স্তূপ করা ছিল যে সেখানকার আদি অধিবাসী ঘোটকবৃন্দকে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়েছিল। শোভাযাত্রার জন্য চার/পাঁচ সারিতে দাঁড়িয়ে ঢাকী-ঢুলির দল প্রাণপণে নিমীলিত নয়নে পিটিয়ে চলেছে—পাইক পেয়াদারা সবুজ পোষাকে এবং সবুজ আটাসোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে সময় কাটাবার জন্য বাদাম চিবুচ্ছে অবিরাম, অবশ্যই মাননীয় স্লাম্‌কী-র পয়সায়। খোলা একখানি চৌঘুড়ি রয়েছে স্বয়ং মাননীয় স্লাম্‌কী-র জন্য এবং সম্মানিত সমিতির সভ্যবৃন্দ ও অন্যান্য মান্যগণ্য বন্ধুদের জন্যও কয়েকখানি দু-ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে।

পতাকার পত্‌পত্‌ শব্দ, ঢাক-ঢোলের কর্ণপটাহবিদারী নিনাদ, শিঙা বাঁশির কাতর আর্তনাদ, গোলমালে অস্থির-চঞ্চল ঘোটক-বৃন্দের হ্রেষারব ও ক্ষুরোত্থিত ধূলি, সমবেত সমিতি সভ্যবৃন্দের 'আলোচনা,' অসংখ্য বালকবৃন্দের কিচ্কিন্ধ্যালাঞ্ছিত কলরোল,—সব মিলে একই ঐকতানে গগনমণ্ডল মুখরিত ও উচ্চকিত করছিল—জয়, জয়, মাননীয় স্লাম্‌কী'র জয়, ফিস্‌কিন্‌ মুর্দাবাদ। এই মহান শব্দকল্পদ্রুমভীত ফিস্‌কিন্‌ এবং 'পাকা'রা নিরাপদ আশ্রয়ে পলায়ন করেছিল কি না, তা অবশ্য পিক্‌উইক-এর নোটবুকে লেখা নেই, তবে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে ইটান্সউইল সহরের আনন্দবর্ধন নিশ্চয়ই হয়েছিল সেই স্মরণীয় প্রাতে, পিক্‌উইক-এর পূত পাদ-স্পর্শপূত পুণ্যদিনে।

একখানি পতাকায় চার ফুটের বেশি উঁচু অক্ষরে লেখা ছিল 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা,' যখন পটমশাই তাঁর পদোচিত ধীরপদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন, তখন মহা হলহলাধ্বনির সঙ্গে ঐ পতাকা আন্দোলিত হল। এবং যখন মাননীয় স্লাম্‌কী (গলায় জড়িত সবুজ গলবন্ধ) এসে আবেগোজ্জ্বল উৎসাহে পট্‌-এর দক্ষিণ হস্ত পীড়ন করে দাঁড়ালেন, তখন সে কী কলরোল, কী ভীষণ পতাকা আন্দোলন,—যেন মন্থনকালে বাসুকী

মেহ-সঞ্চালিত সমুদ্রতরঙ্গের আক্ষেপ, যেন পক্ষচ্যুত মৈনাক পর্বত আলোড়িত বিক্ষুব্ধ বীচিমালার বিক্ষোভতাড়িত বেলাভূমি!

মহামান্য পিক্‌উইক-এর জ্বালাময়ী ভাষাকে অনুকরণ করা অবশ্য সাধ্যাতীত। আমরা আভাসে বোঝাবার প্রয়াস পেলাম মাত্র।

এতক্ষণে মাননীয় স্লাম্‌কী-র জাগতিক ব্যাপার মনে পড়ল, এবং নাতিদ্রুত, নাতিধীর গতিতে মিঃ পার্‌কার-এর দিকে ফিরে জলদ-মন্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন 'সব প্রস্তুত তো, কিছু বাদ যায় নি আশা করি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু বাকি রাখিনি স্যার। সদর দরজায় সাবান দিয়ে সদ্যস্নাত কুড়িজন লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছি—আপনি বেরিয়েই তাদের করমর্দন করবেন; ঠিক তার পরেই মজুত পরিষ্কার কাপড়জামা পরিহিত ছ'জন স্ত্রীলোক, শিশুক্রোড়ে বাচ্চাদের মাথায় হাত রেখে আদর করবেন আর বয়েস জিজ্ঞাসা করবেন অতি অবশ্যই—অন্যথা করবেন না, কেন না এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর......মানে, কথা হচ্ছে......এই মানে......পার্‌কারমশাই ইতস্তত করতে লাগলেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলে ফেলুন। আমি সব ঠিকঠাক চালিয়ে যাব, ঘাবড়াবেন না।'

'মানে যদি নিতান্ত অসুবিধে না হয়...... অর্থাৎ,......যদি কোনরকমে দু'চারটিকে অন্তত চুম্বন করা সম্ভব হয়......'

'কী সর্বনাশ! প্রকাশ্য রাজপথে চুম্বন! যদি তাদের স্বামীরা তেড়ে আসে?'

'রামচন্দ্র, আমি কি তাই বলছি? বাচ্চাদের কথা বলছিলাম!'

'হোলি জেসাস্, তাই বলুন! তা, এটা কি না করলেই নয়?'

'আজ্ঞে না, রাজধানীতে এটাই নিয়ম—পরমভট্টারক মহামান্য সম্রাটকেও করতে হয়।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাননীয় স্লাম্‌কী বললেন, 'বেশ, তাই হোক।'

যে দু'খানি গাড়ী সমিতির সভ্যদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাতে নাগাড়িগাদান হয়ে যতজন সম্ভব উঠে দাঁড়িয়ে রইলেন। পার্‌কার, পিক্‌উইক, টাপ্‌ম্যান, স্নড্‌গ্রাস এবং সমিতির অন্তত দ্বাদশজন সভ্য এক গাড়িতে উঠে অসংবৃত বেশ সামলে সুগলে স্থিত হলেন। এর ফলে পার্‌কার বা আমাদের নায়ক কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

সহসা সহস্রকণ্ঠোত্থিত কলনাদ শুনে শ্রীযুত পার্‌কার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তিনি বেরিয়েছেন।'

পুনরায় কলকল্লোলশ্রবণে বললেন, 'লোকগুলোর সংগে করমর্দন করেছেন।'

আবার গর্জন। 'বাচ্চাদের আদর করছেন।' পার্‌কার-এর পুলক-বিহ্বল ঘোষণা।

জনতা পুলকে উল্লসিত হয়ে ফেটে পড়েছে যেন।

'নিশ্চয়ই একটা বাচ্চাকে চুমু খেয়েছেন,' আনন্দে দু'হাত রগড়ে পার্‌কারমশাই খুসি জানালেন।

এবার অবিশ্রান্ত কলরোলে মেদিনী কম্পিত হয়ে উঠল, আর পার্‌কার মহোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন, 'সবগুলো বাচ্চাকে চুমু খেয়েছেন—বাহ্‌বা, বাহ্‌বা!'

শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।

প্রাক্‌-নির্বাচনী সভাতে দুই প্রার্থীর বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও, এক জায়গায় অপরূপ মিল ছিল, ইটান্সউইল-এর 'মহান' জনগণকে উদ্দেশ্য করে দুজনেই একমত হলেন যে, এমন স্বার্থত্যাগী, উদারচেতা, এরূপ বিদগ্ধ, এতাদৃশ দেশভক্ত, এবং সদৃশ বহুবিধ গুণসম্পন্ন জনসমষ্টি আর কুত্রাপি দেখা যায় না, যায় নি, যাবে না।

'পাকা' বললেন যে 'কাঁচা'-র দোষের সীমাসংখ্যা নেই এবং ইটান্সউইলের প্রতিনিধি হবার কোন যোগ্যতাই তার নেই।

'কাঁচা' বললেন যে 'পাকা' প্রার্থী হচ্ছেন একটি জড়পদার্থ, বুদ্ধিবৃত্তিতে তার পচ ধরেছে, মনুষ্যোচিত লক্ষণ তার মাত্র আকৃতিতেই পরিস্ফুট—অন্যান্য সবই মনুষ্যেতর প্রাণীসুলভ। তিনি প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে ঘোষণা করলেন ইটান্সউইল-এর বিদগ্ধ জনগণকে এ সোজা কথাটা বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে, 'দু' পায়ে হাঁটলেই মানুষ হয় না—তা হল সমগ্র বানরকে, তাকে মনুষ্যপদবাচ্য করতে হত।

ফিস্‌কিন বললেন, তাঁকে যা বলা হবে তিনি তাই করবেন, মাননীয় স্লামকী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—তিনি যেটা বলা হবে সেটাই করবেন না—করবেন কেবল করণীয় কাজগুলো।

উভয়েই বললেন যে ইটান্সউইল-এর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আকাশ—বাতাস, ফল-ফুল—এমন কি কুকুর পর্যন্ত তাঁর প্রাণের প্রাণ। আরও বললেন—এখানেও উভয়ে একমত—তিনিই একমাত্র লোক যিনি উপযুক্ত গুরুদায়িত্ব যথাযথ বহনে সক্ষম, নান্যঃ।

নগরের মহামান্য পৌরপতি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপচাপ। এবারে তিনি আসরে নেমে উপস্থিত নাগরিকগণকেও হাত তুলে সমর্থন জানাতে বললেন।

উত্তোলিত হস্তগণনান্তে পৌরপতি ঘোষণা করলেন যে, মাননীয় স্যামুয়েল স্লামকী-কেই বেশির ভাগ লোক সমর্থন জানিয়েছেন। ফিস্‌কিন প্রবল আপত্তি জানালেন এবং ভোট নেওয়াটাই স্থির হল নির্দিষ্ট তারিখে।

অতএব যে যার ঘরে ফিরে এলেন আপাতত।

প্রাক-নির্বাচনী দিন ক'টি কাটছিল তীব্র উত্তেজনা ও উত্তাল কলরোলে। দুই বিবদমান দল সমানভাবে মনের ও দেহের খোরাক যুগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ইটান্‌সউইল-এর বিদগ্ধ ও দেশপ্রেমিক লোকেরা তার সদ্ব্যবহার করছিলেন পুরোপুরিরও বেশি। একদিন মদ অসম্ভব সস্তা হয়ে গিয়েছিল সব কটি শুঁড়িখানায় এবং রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল ভোটারদের মধ্যে যাদের দেহ ভাল নেই তাদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার মহান উদ্দেশ্যে। আর, পিক্‌উইক বিস্ময় প্রকাশ করে লিখে রেখেছেন যে, আশ্চর্য হল এই যে ভোটের ক'দিন সারা সহরের সকল ভোটারেরই শরীর খারাপ ছিল এবং কেউই গাড়ি ছাড়া এক পা যেতে পাচ্ছেলেন না। এমন ব্যাপক অসুস্থতার কোন কারণ পিক্‌উইক বহু চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারেন নি। লিখে রেখেছেন,—'ভবিষ্যতে কোন গবেষক হয়তো পারবেন!'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিছু ভোটার শেষ দিন পর্যন্তও ভোট দেন নি—তাঁরা প্রকৃত বুদ্ধিমান ও খাটি স্বদেশপ্রেমিক-এর মত দু'দলের তারতম্য চুলচেরা করে দেখছিলেন। এবং ভাল করে বিচার করবার জন্য 'কাঁচা' ও 'পাকা' দু'দলের সংগেই বহু আলোচনা চালাচ্ছিলেন।

শেষ মুহূর্তে পার্‌কার এই ক'জন মহান জনহিতাকাঙ্ক্ষী এবং দেশসেবকদের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন, এবং তাঁদের আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ, তারা সদলবলে মাননীয় স্লামকী-কে ভোট দিলেন এবং 'কাঁচা'র দল গো হল।

নিন্দুকেরা বলেন এই সাক্ষাৎকারের ফলে মিঃ পার্‌কার-এর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বেশ কিছুটা হাল্কা হয়েছিল। আমরা এ ব্যাপারে ওয়াকেফহাল নই, কেবল যা পেয়েছি তাই লিখে দিলাম মাত্র।

॥ পাঁচ ॥

ইটানসউইল (ক্রমশ)

নির্বাচনের পর তিন দিনের দিন যখন শ্রীযুত পিক্‌উইক অভ্যস্ত তৎপরতার সংগে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে—ভাল করে মনে রাখবেন, 'ঠিক সেই মুহূর্তে'—তাঁর অনুগত ভৃত্য স্যাম এসে তাঁর হাতে একখানি কার্ড দিল, যাতে লেখা ছিল,—

শ্রীমতী সিংহশিকারী (সামাজিক),

'গুহা'—ইটানসউইল।

'লোকটি অপেক্ষা করছে,'—স্যাম সাহায্য করল!

'লোকটি? পুরুষলোক?'

'অন্তত দেখে তো তাই মনে হয়—নকল কি না জানি না' স্যাম-এর উত্তর।

'আমাকে চায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকেই চায়,—আর কাউকে নয়। যেমন শয়তান চেয়েছিল ফস্‌টাস্‌-কে, তেমনটি আর কি।'

শ্রীযুত পিক্‌উইক-এর গবেষক মন আরও গভীরে ঢুকতে চায়। তিনি কার্ডটিকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করে সন্দেহজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এ কার্ড ত' একজন মহিলার।'

'দিয়েছে কিন্তু নিঃসন্দেহে পুরুষ, এবং সারাদিনও অপেক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

এ হেন ভীষ্মকল্প লোকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় না দেখে পিক্‌উইক অগত্যা বৈঠকখানায় গেলেন। সেখানে উপবিষ্ট অতি ক্ষুদ্রাকৃতি, গম্ভীর প্রকৃতির একজন লোক তাঁকে দেখে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হয়ে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর প্রশ্ন করলেন:

'আমি নিশ্চয়ই শ্রীযুত পিক্‌উইক-এর সংগে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেছি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই পিক্‌উইক।'

'আপনার পুতহস্ত মর্দন করার অনুমতি চাই।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' শশব্যস্তে পিক্‌উইক তাঁর হাত এগিয়ে দিলেন।

অতি সন্তর্পণে করমর্দনান্তে ভদ্রলোক আবার বললেন, 'আমরা আপনার মহান কীর্তিকলাপ অবগত আছি, আপনার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার খ্যাতি আমার স্ত্রী শ্রীমতী সিংহ-শিকারী জানেন—আমিই শ্রীযুত সিংহ-শিকারী;'—ভদ্রলোক এই যুগান্তকারী রহস্য ফাঁস করে পিক্‌উইক-এর দিকে তাকালেন, কিন্তু তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না দেখে নিরাশ হয়ে আবার বললেন, 'আমার স্ত্রী, শ্রীমতী সিংহশিকারী (সামাজিক), সর্বদাই গুণী লোকের সন্ধান করেন, কারণ তিনি নিজে গুণী এবং গুণগ্রাহী। তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এবং বুঝলেন কি না, সকলেই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখে থাকেন।'

'বাঃ, চমৎকার বলেছেন, এমন স্ত্রীলাভ আপনার সৌভাগ্য বই নয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সে সম্বন্ধে আমার স্ত্রী সদা সচেতন এবং আমাকেও সচেতন রেখে থাকেন। বুঝলেন কি না, আপনার এখানে শুভাগমন-বার্তা পাওয়া থেকেই তিনি আপনাকে তাঁর পরিচিত বিদগ্ধজনের তালিকায় যথোপযুক্ত উচ্চস্থানে স্থাপিত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন। যতক্ষণ আপনার সংগে চাক্ষুষ পরিচয় না হয়, ততক্ষণ তিনি দিনে ন'কাপের বেশি চা খাচ্ছেন না—এতই উদ্‌বেল হয়ে আছে তাঁর হৃদয়-সরসী।'

'এমন নারীরত্নের সংগে পরিচিত হতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব,' বললেন পিক্‌উইক।

'আপনার বাঞ্ছা কাল প্রাতেই পূরণ হবে! কাল সকালে আমাদের গরীবখানায় আমরা ছোট্ট একটি প্রাতরাশ পার্টি দিচ্ছে—খুব সামান্যই আয়োজন, মাত্র শ' তিনেক লোককে বলা হয়েছে! যাঁরা শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানে বা শৌর্যে জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করেছেন, বা যাঁরা স্ফুটনোন্মুখ কবি ও লেখক, তাঁদেরই মাত্র বলা হয়েছে। শ্রীমতী সিংহ-শিকারী (সামাজিক) খুবই বাধিত হবেন যদি আপনি সময় করে পদধূলি দেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—যাব বই কী।'

'আমার গৃহিণী এরকম পার্টি প্রায়ই দিয়ে থাকেন, বুঝলেন কি না,—একজন কবি তাঁকে উদ্দেশ্য করে একটি চতুর্দশপদী রচনা করেছিল,—তাতে সে লিখেছিল—

জ্ঞানের নির্ঝরিসম হের সমাবেশ।
ভাবেতে বিভোর আমি, কী কব বিশেষ॥

'বাঃ, সুন্দর কবিতা। দুটি লাইনে সব বলেছেন।'

'আমার সহধর্মিণী যখন শুনবেন যে আপনার মুখ থেকে এই প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তিনি অত্যন্ত গর্ববোধ করবেন।—আচ্ছা, আপনার এক বন্ধু না কি বাগ্‌দেবীর উপাসক?'

'ঠিক জানি না, তবে স্নডগ্রাস কবিতা টবিতা আউড়ে থাকেন কখনো কখনো।'

'আমার গিন্নীও তাই মশাই! সব সময় কবিতা আবৃত্তি করেছেন! সময় সময়......তা' সে যাক্‌গে। নিজেও লিখেছেন কয়েকটি অনবদ্য কবিতা; আপনি হয়ত তাঁর 'দর্দুর বিলাপ' কবিতাটি পড়ে থাকবেন?'

'আজ্ঞে না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি।'

'কি আশ্চর্য! দেখেন নি? এটি প্রথম প্রকাশিত হয় একখানি মেয়েদের কাগজে, উনি 'বিকটদশনা' ছদ্মনামে লিখেছিলেন। একটু শুনুন:

'যখন দেখিনু তোমা,'
অবতংস দর্দুর কুলের,
ছিলে তুমি পথপ্রান্তে!
সঘন নিঃশ্বাসে
আন্দোলিত তৃণদল,
ঘোষিল তোমার ব্যথা।
কোন ক্রূর নরাধম
হানিল নিষ্ঠুর লোষ্ট্র
তব সুকোমল দেহে?

'চমৎকার! কি করুণ!'

'আজ্ঞে যা বলেছেন! আবার কী স্বতঃস্ফূর্ত বলুন! ......আরও আছে, বলব?'

নেপথ্যে মৃদু নিঃশ্বাসত্যাগ করে পিক্‌উইক মাথা নাড়ালেন।

ডান হাত প'য়তাল্লিশ ডিগ্রী উত্তোলিত করে শ্রীযুক্ত সিংহ-শিকারী সুরু করলেন,

'হায়রে যেমতি,
সহস্রাক্ষ হানি' বজ্র
বধিল ত্রিদশাধিপ—
[illegible] গরজে, যেন হাসে!
যেমতি সে-ক্রোন......'

'ও কী অপূর্ব ভাব! কী ভাষার ঐশ্বর্য!'

'আরও আছে, আরও আছে! এ মধুভাণ্ড অফুরন্ত! তবে, আবৃত্তিটা তাঁর মুখে শুনতে হয়, এবং তাই শুনবেন কল্য প্রাতে, যখন তিনি যথোপযুক্ত পোষাকে সজ্জিত হয়ে স্বয়ং এই কবিতাই আপনাদের শোনাবেন।'

'সজ্জিত হয়ে মানে?'

'জ্ঞানের দেবী মিনারভা-র বেশে। ওহো, ভুলে গিয়েছিলাম—এটা যে ফ্যান্সী ড্রেস পার্টি তা আপনাকে বলা হয় নি।'

'না মশাই, এ বয়সে ওসব ভূতুড়ে পোষাক পরা আমার পোষাবে না,' শিউরে উঠে পিক্‌উইক বললেন।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'ভেবে দেখলাম যে আপনার ন্যায় স্বনামধন্য লোকের স্বাভাবিক পোষাকও আকর্ষণীয়। অতএব, আমার পত্নীর তরফ থেকে আমি বলছি যে এতে শ্রীমতীর কোনও আপত্তি হবে না।'

'তা হলে আমার যেতে কোন আপত্তি নেই।' সহসা গাত্রোত্থান করে শশব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু আমি আপনার সময় নষ্ট করছি—আপনার মত লোকের কাছে সময় যে কত মূল্যবান, তা আমি জানি ত'। সুতরাং আর আপনাকে আটকাব না, তা' হলে আমি শ্রীমতীকে বলতে পারি যে আপনি এবং আপনার বিখ্যাত বন্ধুবর্গ আগামীকাল প্রাতঃকালে আমাদের দীনকুটিরে পদার্পণ করছেন?......বেশ, আপাতত বিদায়। আপনার ন্যায় বিখ্যাত লোকের দর্শনে আমি ধন্য হলেম! চলি,' বলতে বলতে পিক্‌উইককে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই ভদ্রলোক বিদ্যুৎবেগে প্রস্থান করলেন।

তখন শ্রীযুত পিক্‌উইক টুপি পরে হোটেলে গিয়ে উপস্থিত। তাঁকে দেখামাত্র আনন্দোদ্ভাসিত আননে উইংকল্‌ বললেন, 'মিসেস পট্‌ও যাচ্ছেন!'

'যাচ্ছেন? কোথায়?'

'কেন, আপনি জানেন না? পোষাক পার্টিতে। অ্যাপোলোর বেশে।'

টাপ্‌ম্যান সগর্বে ঘোষণা করলেন, 'আমি দস্যুসর্দার সেজে যাব।'

চমকে উঠে পিক্‌উইক বললেন, 'তুমি বলতে চাও যে এই বয়সে টাইট প্যান্ট পরে জোব্বা চড়িয়ে তুমি লোক হাসাবে?'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আমি বুড়ো হয়েছি?'

'ঠিক তাই! এবং অত্যন্ত স্থূলকায়!'

'বুড়ো?...মোটা?'

'এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ!'

'আমি মোটা?'

'নিঃসন্দেহে!'

অপমান করলেন।

'দেখ বাপু, তুমি এই বয়সে দস্যু-সর্দার সেজে জনসমাজে বেরোলে আমার যা অপমান হবে, তার চাইতে বেশি নয়।'

আপনি দেখছি বেশ অভব্য'—ক্রোধে টাপ্‌-ম্যান উন্মত্তপ্রায়।

তুমি একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বর' পিক-উইক রীতিমত উত্তেজিত।

টাপ্‌ম্যান দু'পা এগিয়ে এসে পিক্‌উইক-এর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন, কিন্তু চশমালাঞ্ছিত পিক্‌উইক সুদসমেত ফিরিয়ে দিলেন সে-দৃষ্টি। উইংকল্‌ এবং স্নডগ্রাস বিস্ময় এবং ভয়ে হতবাক।

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে টাপ্‌ম্যান বললেন, 'মশাই' আপনি আমায় বুড়ো বলেছেন!'

'বলেছি।'

'এবং মোটা।'

'আবারও বলছি।'

'এবং—বর্বরও বলেছেন।'

'তুমি তাই বটে।'

একটা অগ্নিগর্ভ থমথমে ভাব নেমে এল সেখানে—একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা মাত্র।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে টাপ্‌ম্যান বললেন, 'আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অসীম, কিন্তু বর্তমান অপমানের প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।' বলতে বলতে তিনি জামার হাতা গুটোতে আরম্ভ করলেন।

'চলে এস, চলে এস,' বুক ঠুকে বঙ্কুবিহারী-ইব দণ্ডায়মান পিক্‌উইক কম্বু-কণ্ঠে আহ্বান জানালেন।

এতক্ষণে স্নডগ্রাস সচেতন হয়ে দৌড়ে গেলেন দুই যুযুধান বন্ধুর মাঝখানে।

'ছি, ছি,' বললেন স্নডগ্রাস, 'ছি, ছি, মানবর পিক্‌উইক! সারা পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তা মনে নেই? টাপ্‌ম্যান, ভাই—মনে রেখো আমরা আমাদের মহান নেতার গর্বে গর্ব করি, তাঁর অলৌকিক যশোরশ্মির আলোতেই আমরা উজ্জ্বল: না হলে আমাদের চিনত কে? কী লজ্জার কথা! মাথা আমার ধুলোয় মিশে যাচ্ছে।'

যেমন রবার দিয়ে ঘষলে পেনসিল-এর কালো দাগ মুছে যায় ক্রমে ক্রমে, তেমনি ক'রেই স্নডগ্রাস-এর ঐতিহাসিক উক্তি স্বাভাবিক হয়ে এল ধীরে ধীরে।

শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়েছিলাম—টাপ্‌ম্যান, আমায় ক্ষমা করো। দাও তোমার হাত বাড়াও।

সজল চোখে টাপ্‌ম্যান নেতার করমর্দন করলেন—ঝড় আসতে আসতে থেমে গেল।

খুবই অন্যায় টাপ্‌ম্যান তুমি দস্যুসর্দার বেশেই যাবে।'

'না, না, আমি বুঝতে পারছি ও বেশ আমাকে মানায় না।'

আমার অনুরোধ।'

'বেশ, তবে তাই হোক। আপনি যখন বলেছেন।'

এইভাবে শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-এর মত বিবেচক লোকও নিজের বিবেকবিরুদ্ধ কাজে সম্মতি দিয়ে বসলেন। তাঁর সদাশয়তার এর চাইতে বড় নিদর্শন খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

সেই পূর্বনির্দিষ্ট প্রভাতে আমাদের নায়কেরা কে কেমন রূপ ধারণ করেছিলেন?

এক—শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক—যথাপূর্বম।

দুই—টাপ্‌ম্যান—অত্যন্ত চাপা জেব্বা এবং পায়ে পট্টি জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে (লেখকদের মতে যা হল দস্যুদের অবশ্য পরিধেয়); শোলা পুড়িয়ে মুখে মেখে কিছুটা কালো হয়েছেন, নাকের নিচে ভয়ঙ্কর গোঁফ, মাথায় ত্রিকোণাকৃতি বিশাল 'নেপোলিয়ঁ' মার্কা টুপি।

তিন এবং চার—তেমন কিছু নয়। গ্রীক চারণকবির সাজে সজ্জিত। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত বন্ধুরা হঠাৎ বাইরে 'দেখ, দেখ, আবার দেখ' চিৎকার শুনে দরজায় এসে মুগ্ধ নয়নে দেখলেন: পটমশাই বিশাল দণ্ড হাতে রুপী কর্মচারীর বেশে গাড়ির দরজা খুলে বসে আছেন তাঁদের জন্য—দণ্ডটি বিশাল, কেন না, 'ইটান্‌সউইল গেজেট'-এর কঠোর ক্ষমতার প্রতীক যথোপযুক্ত ভয়াল হতেই হবে। এমন অপরূপ রূপ দেখে শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক পর্যন্ত 'ব্রাভো' বলে উঠলেন।

সেদিন ইটান্‌সউইল-এর জনগণের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কেন না এই সব সাজ ঔর আও-য়াজের পরক্ষণেই শ্রীমতী পট্‌-কে দেখা গেল! গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর চেহারা ঠিক কেমন ছিল তা একমাত্র তিনি নিজে এবং হোমার ছাড়া আর কারুরই জানার কথা নয়, কিন্তু পট্‌ গৃহিণীর মতে তাঁর পোষাক ছিল আজানুলম্বিত গাউন, মাথায় লম্বা টুপি এবং হাতে বীণা। সর্বশ্বেত পোষাক ভূষিত। পট্‌-গৃহিণীকে দেখে এমন মোহিত হয়েছিল নাগরিকরা যে তারা 'হুররে' বলতে ভুলে গিয়ে মন্দ্রোষধিরুদ্ধবীর্য সর্পবৎ চিত্রার্পিত প্রতীয়মান হচ্ছিল।

নগরবাসীদের চিত্ত মোহিত ক'রে সদল-বলে পট্‌মশাই শ্রীমতী সিংহ-শিকারীর (সামাজিক) গৃহাভিমুখে রওনা হলেন সগৌরবে।

জনতার আনন্দোচ্ছল কলরোলের মধ্যে টাপ্‌ম্যান সহ পিক্‌উইক গাড়ি থেকে নেমে ধীরমন্থর গতিতে পার্টি গৃহে প্রবেশ করলেন। পার্টি বটে! অ্যাপোলো, ডায়ানা, দস্যুসর্দার, চারণকবি, ভারতীয় মহারাজা, নিগ্রো, গায়ক, হ্যামলেট, মিনারভা ...চারদিকে এঁরা অবাধে ঘোরাফেরা করেছেন। 'শয়তান' 'পাকা' দলের খাস মুখপত্র ইটান্‌সউইল ইন্‌ডিপেনডেন্ট এর মতে শিকারী (সামাজিক) যে অপূর্ব সমাবেশের আয়োজন করেছেন, তা দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, বিশেষ করে 'কাঁচা'দের!

এবং, সর্বোপরি, সকলের রূপসজ্জা ম্লান ক'রে, এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে বিরাজ করছিলেন জ্ঞান এবং চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী। 'মিনারভা' বেশে শ্রীমতী সিংহশিকারী (সামাজিক). স্বগৌরবে!

একজন পরিচারক উচ্চ কণ্ঠে (অন্যথায় শোনা যেত না) ঘোষণা করল শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-এর আগমনবার্তা।

'পতিত পত্রে' বিচলিতা রাধিকার মতই শ্রীমতী সিংহশিকারী (সামাজিক) উচ্চকিত নয়নে চারদিকে তাকিয়ে বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কই, কোথায়?'

'এই যে, আমি এখানে,' বলতে বলতে প্রধান অতিথিমশাই দু'হাতে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে 'মিনারভা'র সামনে উপস্থিত হলেন।

তিন পা পেছিয়ে গিয়ে চোখ কপালে তুলে 'মিনারভা' বললেন, 'আমি কি সত্যি সত্যিই আপনাকে দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেছি? এ যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'তাই, মাননীয়া, আমি তিনি-ই বটে, আর কেউ নয়।...আসুন, আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিই—শ্রীযুক্ত টাপ্‌ম্যান, শ্রীযুক্ত উইংকল, শ্রীযুক্ত স্নডগ্রাস,—শ্রীমতী সিংহশিকারী।'

যিনি চেষ্টা করেন নি তিনি বুঝবেন না, টাইট প্যান্ট পরে মাথা নিচু করে অভিনন্দন জানান কী ভয়ানক কষ্টদায়ক। কাজেই 'বাউ' করতে গিয়ে টাপ্‌ম্যান-এর কসরৎ ও শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করা বৃথা। বেচারা টাপ্‌ম্যান—ঠিক এই মুহূর্তে তিনি মনে মনে পিক্‌উইক-এর কথাগুলো স্মরণ করছিলেন।

'মাননীয় পিক্‌উইক,' আদেশের সুরে বললেন শ্রীমতী সিংহশিকারী (সামাজিক), 'আমার ইচ্ছে আজ সারা দিন আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন—অসংখ্য লোক আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তাদের আমি এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারি না।'

'যথা আজ্ঞা দেবী,' বলে পিক্‌উইক আবার নত হয়ে অভিবাদন করলেন 'আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

[এ কথায় নিঃসন্দেহে এই সত্য প্রমাণিত হয় যারা পিক্‌উইক-কে গোমড়ামুখো এবং বেরসিক বলে, তারা ঘোর মিথ্যাবাদী।]

'প্রথমেই আমার খুকিদের সঙ্গে আলাপ করুন,' বলে তিনি তাঁর দুই পূর্ণবয়স্কা মেয়েদের ডেকে আনলেন—একজনের বয়স অন্তত পঁচিশ, অন্যজন বোধহয় দু'এক

বছরের ছোট। পরিধানে সত্যি সত্যি খুকিজনোচিত হাঁটুর ওপরে ফ্রক, নেচে নেচে চলেছে তারা বালিকাসুলভ চাপল্যের হাস্যকর অনুকরণে। এদের খুকি সাজানো হয়েছিল কেন,—তাদের বয়স কম করে দেখানোর জন্য নাকি তাদের মায়ের বয়স আরো কম প্রমাণিত করার জন্য, তা পিক্‌উইক লিখে রেখে যান নি। আমরাও তাই নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারলাম না।

'বাঃ, কী সুন্দর মেয়েরা আপনার,' বললেন পিক্‌উইক। হাঁটু গেড়ে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনান্তে তারা নেচে চলে গেল।

পটমশাই গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, 'তারা তাদের মায়ের মতই সুন্দরী।'

'দুষ্টু কোথাকার,' শ্রীমতী-র পুলক-লাগা উত্তর।

তারপর একটা আধশুকনো আপেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চারজন বিচিত্র পোষাকধারী বাদক তাদের গান গাইতে আরম্ভ করল বিচিত্রতর বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। গানের মাথামুণ্ডু কেউ কিছু বুঝতে পারেন নি,—বোধহয় তাদের যে পোষাক পরা ছিল সেই দেশেরই সংগীত হচ্ছিল; কিন্তু সেটা যে কোন্ দেশ তার কোনও হদিস আমরা পিক্‌উইক ক্লাব-এর খাতাপত্রে পাই নি।

কিছুক্ষণ পরে বহু স্বস্তির নিঃশ্বাস সহযোগে গান শেষ হল। পরক্ষণেই এক বেটেখাটো ছোকরা একটা চেয়ার নিয়ে তার ওপরে নানা কসরৎ সুরু করল—ওপর দিয়ে লাফিয়ে গেল, নিচ দিয়ে দ্রুতবেগে গলে গেল, হাতল ধরে ওপরে পা তুলে রইল, দু'হাতে ভর দিয়ে পা দু'খানি গলায় জড়িয়ে ধরল। অর্থাৎ, কেবলমাত্র বসা ছাড়া চেয়ার নিয়ে আর কিছুই করা বাকি রইল না!

সঘন করতালি সম্বর্ধিত বালকের প্রস্থানান্তে শ্রীমতী পট্ (অ্যাপোলো বেশে) এগিয়ে এলেন রংগমঞ্চে এবং অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে উচ্চাংগ সংগীত পরিবেশন করলেন। অবশ্য তাঁর কণ্ঠস্বর কারোই কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নি, এবং স্বামীগর্বে যথাযথ গর্বিত শ্রীযুত পট্-এর সাহায্য ছাড়া পিক্‌উইক-এর সাধ্য ছিল না তার মর্মোদ্ধার করা।

এরপর এগিয়ে এলেন শ্রীমতী সিংহশিকারী (সামাজিক) তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'দর্দুর বিলাপ' আবৃত্তি করলেন কম্বুকণ্ঠে মুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে। সঘন করতালি-পরিতুষ্ট শ্রীমতী আবার কবিতাটি আওড়ালেন এবং, গুণমুগ্ধ শ্রোতারা জোর ক'রে তাঁকে আর কষ্ট করতে বাধা না দিলে, হয়ত আরও একবার তিনি আবৃত্তি করতেন।

ইতিমধ্যে মধুর ধ্বনি 'পাত পড়েছে' শুনতে পেয়ে সকলেই হুড়মুড় করে দৌড়ালেন, কেন না শ্রীমতীর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তারা জানতেন একশ' জন নিমন্ত্রিত হলে খাবার যোগাড় থাকে পঞ্চাশ জনের—অর্থাৎ, কেবলমাত্র প্রধান প্রধান 'সিংহ'দের জন্যই আয়োজন, ক্ষুদ্র প্রাণীরা যে যা পারে যোগাড় ক'রে নিক্।

কাজেই, ঠেলাঠেলির অন্ত ছিল না।—অনেকেরই পোশাক-আশাক ছিঁড়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছিল এবং বাম হস্তে লজ্জা নিবারণ ক'রে কোনক্রমে দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন অনেকেই।

'শ্রীযুত পট্ কোথায় ?' সদাজাগ্রত অতিথিবৎসল শ্রীমতী সিংহশিকারী প্রশ্ন করলেন।

'এই যে আমি,' করুণ কণ্ঠে উত্তর এল ঘরের এক কোণ থেকে, যেখানে থাকলে সে-দিন খাবার পাওয়ার আশা একেবারে শূন্য।

'এদিকে আসুন, এদিকে।'

'আপনি আর ও'র জন্য মাথা ঘামাবেন না,' শ্রীমতী পট্ উবাচ। 'শুনছো, তুমি ত ওখানেই বেশ ভাল আছ, তাই না ?'

ক্ষীণকণ্ঠে পট্ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

হায় রে! যে হাতে উদ্যত লেখনী 'পাকা'দের হৃৎকম্প ধরায়, সেই হাত থরকম্পিত হয়ে নেমে গেল শ্রীমতী পট্-এর মৃদু ভ্রূকুটিতে!

শ্রীমতী সিংহশিকারী পরিতৃপ্ত প্রশান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালেন—তাঁর নয়নে শান্তির প্রদীপ, হৃদয়ে গভীর তৃপ্তির প্রলেপ।

এ হেন সময়ে শ্রীযুত—যাঁর স্থান দরজার কাছে নির্দিষ্ট—হে'কে বললেন, 'শুনছো, শ্রীযুত ফিট্স মার্শাল এসেছেন !'

'কি সৌভাগ্য! আমি সারা সকাল তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছি যে! আপনারা তাঁকে এখানে আসতে দিন দয়া ক'রে। ও'কে এক্ষুণি আমার কাছে আসতে বল; দেরিতে আসার জন্য আমি ও'কে শাস্তি দোব!'

আমাদের নায়কের অতি পরিচিত কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল: 'আসছি, আসছি!—বড্ড ভিড়—চেষ্টা—ঠেলে ঠেলে—যত শীগ্‌গীর সম্ভব!'

শ্রীযুত পিক্‌উইক-এর হাত থেকে ছুরি-কাঁটা পড়ে গেল। তিনি টাপ্‌ম্যান-এর দিকে তাকালেন। দুজনেই তাকালেন দরজার দিকে।

ততক্ষণে 'ফিট্স মার্শাল' খাবার টেবিল-এ পৌঁছে গেছেন: 'হায় হায়—পোশাকের ভাঁজ—দলাইমলাই—অসম্ভব কথা—আমি শুধু ইস্তিরী হয়ে গেলাম!'

বলতে বলতে নৌসেনাপতিবেশে আমাদের পুরনো বন্ধু আলফ্রেড জিংগল দৃশ্যমান হলেন। এবং, আসামাত্র পিক্‌উইক-এর ভ্রূকুটিকুটিল চোখে চোখ পড়ে গেল।

বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরে 'ফিট্স মার্শাল' বেশী জিংগলে আবার লোক ঠেলে বেরুতে বেরুতে 'ওঃ হো, ভুলে গেছি। ড্রাইভার-কে একটা কথা বলা হয় নি,' বলতেই শশব্যস্তে শ্রীমতী শিকারী বললেন, 'সে কী কথা, স্বয়ং শিকারী খবরটা দিয়ে আসছেন, আপনি কেন ?'

'না, না,—জরুরী—নিজেই বলব—' বলতে বলতে তিনি অন্তর্হিত।

অগ্নিগর্ভ শ্রীযুত পিক্‌উইক কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'মাননীয়া, এই যুবক কোথায় থাকে জানতে পারি কি ?'

'উনি একজন 'বিদ্রোহী' যুবক—প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে উনি সংগ্রাম করেন। আপনার সংগে আলাপ করিয়ে দেবার খুব ইচ্ছে ছিল।'

'তা বেশ ত,—কিন্তু এখন থাকেন কোথায় ?'

'বারি সেন্ট এড্‌মন্ড-এর 'এন্‌জেল' হোটেল-এ। —কিন্তু আপনি চলেছেন কোথায় ? এক্ষুণি কোথায় যাবেন ?—না, না, সে হবে না।'

কিন্তু শ্রীমতীর কথা শেষ হওয়ার আগেই পিক্‌উইক বাইরে বেরিয়ে গেলেন। টাপ্‌ম্যান-ও এলেন, চারদিকে তাকিয়ে বিষাদমাখান গলায় বললেন, 'চলে গেছে।'

'জানি। আমি ওর পেছনে যাবো।'

'কোথায় ?'

'কেন, 'এন্‌জেল' হোটেল-এ! তুমি বুঝতে পাচ্ছ না যে লোক একবার কারুর ক্ষতি করেছে, কে জানে সে আবার কার সর্বনাশের মতলব আঁটছে। মনে রেখো, সেবারে ওয়ার্‌ডল-এর ক্ষতির কারণ আমরা, কেন না তাঁর সংগে ওর পরিচয় আমরাই করিয়েছিলাম।......স্যাম কোথায়? স্যাম!'

'আজ্ঞে, এই যে আমি,' বীয়ার-এর বোতলটা কোন রকমে কোট-এর ভেতরে লুকোতে লুকোতে স্যাম জবাব দিল।

'চলো, চলো, টাপ্‌ম্যান তোমরা পরে আমার কাছে যেও।'

এই বলে শ্রীযুত পিক্‌উইক তক্ষুণি যুবজনোচিত উৎসাহের সংগে হোটেল-এ ফিরে বারি যাত্রা করলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে গিয়েও তিনি জিংগল-কে ধরতে পারলেন না—এ রকম কিছু অনুমান করেই বোধহয় তিনি আগেই পালিয়েছেন। অবশ্য সেখানে ওয়ারড্‌ল-এর সংগে তাঁর দেখা হয়েছিল।

টাপ্‌ম্যান, উইংকল্ এবং স্নডগ্রাস পরদিনই এসে তাঁর সংগে যোগ দিলেন। তাঁর সামনে টাপ্‌ম্যান-কে বিব্রত হতে দেখে সদানন্দ বৃদ্ধ ওয়ার্‌ডল তার পিঠে চাপড়ে বললেন, লজ্জার কিছু নেই। মানুষ প্রেমে পড়েই থাকে এবং যোগাযোগ হলে র‍্যাচেল্-এর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত। নিজের বোন হলেও, ওয়ার্‌ডল বললেন, র‍্যাচেল্ টাপম্যান-এর

যোগ্য নয়। কর্তব্যবোধেই তিনি শয়তান জিংগল-এর হাত থেকে রাচেল্-কে রক্ষা করেছিলেন, নতুবা তার মত আধাবুড়ির ঐ দুর্বুদ্ধির উপযুক্ত শাস্তি হত জিংগল-এর মতন শয়তানের হাতে পড়া।

নানা কথায় সময় কাটছিল। কথাপ্রসংগে ওয়ার্‌ডল বললেনঃ 'বড়দিনের সময় কিন্তু তোমাদের আমার কুঁড়েতে পায়ের ধুলো দিতে হবে—একটা বিয়ের ব্যাপার আছে।'

স্নডগ্রাস বেচারা ওয়ার্‌ডল-দুহিতা এমিলি-র কাছে হৃদয় গচ্ছিত রেখেছিল, কাজেই বিয়ের কথা শুনে চমকে উঠল। 'বিয়ে? কার?'

ওয়ার্‌ডল বললেন, 'হ্যাঁ, বিয়ে! চমকাচ্ছ কেন, বিয়ে ত সবাই করে থাকে হে বাপু। আমার মেয়ে 'বেলার বিয়ে হবে গো!'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন স্নডগ্রাস।

অন্য দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট কণ্ঠে টাপ্‌ম্যান প্রশ্ন করলেন, 'সে কোথায়?'

'সে?......ও, তুমি রাচেল্-এর কথা বলছ? এসব কেলেঙ্কারীর পর তাকে আর বাড়িতে রাখি নি,—এক আত্মীয়ের বাড়ি রেখে দিয়েছি খরচা দিয়ে।......এখন থাম বাপুরা, খাওয়ার সময় হয়েছে। ক্ষিদে পেলে আমার কিন্তু কিছু ভাল লাগে না পেটটি না ভরা পর্যন্ত।

বিপুল উৎসাহে খাদ্যবস্তুর সংগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন বন্ধুরা, এবং অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে টেবিল ভর্তি চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় বিলকুল উধাও। আহারান্তে পরিতৃপ্ত বন্ধুবর্গ ফিরে এসে বসলে ভৃত্য স্যাম এসে পিকউইক-কে একটি চিঠি দিল—বলল পোস্ট অফিস-এ গিয়ে নিয়ে এসেছে।

ধীরে সুস্থে চশমা নাকে লাগিয়ে চিঠিটা খুলে পড়েই পিক্‌উইক চিৎকার করে উঠলেনঃ এ কি!.....না, না,......কেউ বোধহয় ঠাট্টা করছে আমার সংগে!—এ সত্যি হতে পারে না!'

সমস্বরে সবাই বলে উঠলেন, 'কী হয়েছে? কেউ মারাটারা যায় নি ত?'

পিকউইক কোন জবাব না দিয়ে হতবুদ্ধির মত কম্পিত হস্তে চিঠিখানি টাপ্‌ম্যান-কে দিয়ে পড়তে অনুরোধ করলেন।

টাপ্‌ম্যান পড়লেনঃ

'ফ্রিমান কোর্ট, করনহিল, ২৮শে আগস্ট, ১৮৩০।

বারডেল্ বনাম পিক্‌উইক

মহাশয়,

এতদ্দ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, শ্রীমতী মার্থা বারডেল-এর দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে 'বিবাহ ঘটিত প্রতিজ্ঞা' ভংগের মামলা রুজু করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা কমন প্লিস কোর্ট-এ তাহা করিয়াছি এবং আপনার বিরুদ্ধে ১৫০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের জন্য শমন জারি হইয়াছে।

অতএব মহাশয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আপনার লণ্ডনস্থ এ্যাটর্নি-র নাম জানাইতে আজ্ঞা হয়, যাহাতে তাঁহাকে উক্ত শমনটি জারি করা সম্ভব হয়।

ইতি

শ্রীস্যামুয়েল পিক্‌উইক, ভবদীয়
বরাবরেষু।' ডড্‌সন্স অ্যাণ্ড ফগ্।

এক গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল সেখানে। সকলেই যেন হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলেন—কেউ কোন কথা বললেন না; পিক্‌উইক এর দিকে তাকিয়ে সকলে জড়বৎ স্থাণু।

কিছুক্ষণ পরে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু কণ্ঠে টাপ্‌ম্যান বললেন, 'ডড্‌সন অ্যান্‌ড ফগ্,—এরা কারা?'

স্নডগ্রাস সুপ্তোত্থিতের মত বললেন, 'আরে, তাও বুঝলে না? অ্যাটর্নি কোম্পানী, আবার কি?'

সহসা হুংকার ছেড়ে পিক্‌উইক বললেন, 'এ ষড়যন্ত্র, ঘোর ষড়যন্ত্র! ডড্‌সন এবং ফগ্—এই দুই শয়তান মিলে পাকিয়ে তুলেছে! শ্রীমতী বার্‌ডেল কখনও এমন করতে পারেন না, তাঁর এমনটা করার কোন কারণই নেই। কী কুৎসিত ব্যাপার! ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা...'

'তা হলেই ভালো,' খুক্ ক'রে কেসে ওয়ার্‌ডল বললেন।

উচ্চ কণ্ঠে পিক্‌উইক বলে চললেন, 'কেউ কোনদিন আমাকে শুনেছে এই বার্‌ডেল-এর সংগে বেচাল কথা বলতে? কেউ কোনদিন আমাকে দেখেছে তার সংগে সন্দেহজনক অবস্থায়? আমার বন্ধুরা...'

'এক দিন ছাড়া,' টাপ্‌ম্যান বললেন মৃদুকণ্ঠে।

পিক্‌উইক ঢোক গিললেন।—তাঁকে একটু ফ্যাকাশে দেখাল।

ওয়ারড্‌ল বললেন, 'তাই না কি? তবে ত দেখতে হচ্ছে ব্যাপার কি। তখন কি কোনও 'সন্দেহজনক' কিছু দেখা গিয়েছিল?'

টাপ্‌ম্যান ভয়ে ভয়ে নেতার দিকে তাকিয়ে মৃদুতরকণ্ঠে বললেন, 'না, মানে, সন্দেহজনক কিছু নিশ্চয়ই নয়, তবে...'

'তবে? কি তবে?'

'মানে, ব্যাপারটা হচ্ছে...অর্থাৎ, সে-সময়ে শ্রীমতী বার্‌ডেল-কে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন পিকউইক।'

ভীষণ চমকে পিকউইক বলে উঠলেন, 'ঠিক, ঠিক, মনে পড়েছে। তাই ই বটে, কিন্তু...'

রসিক চূড়ামণি উইংক্‌ল টিপ্পনি কাটলেন, 'এবং আপনি তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।'

'তা ঠিক, আমি অস্বীকার করছি না।'

ওয়ারডল চোখ টিপে বললেন, 'বটে, বটে! সন্দেহজনক কিছু নেই বলছ, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন ঠেকছে যে গো!...কি হে, রসিক নাগর!' বলে হাসতে লাগলেন।

'না, না, আমি সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি...থাক, লন্‌ডন-এ গিয়ে ডড্‌সন অ্যান্‌ড ফগ্‌কে সব খুলে বললেই মিটে যাবে নিশ্চয়।'

'কাল এবং পরশু তুমি যেতে পারবে না,-কেন না, পরশু তুমি আমাদের সংগে শিকার করতে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ম্যানিং-এর বাগানে আমাদের চড়ুইভাতি হবে, মনে থাকে যেন।'

'বেশ, তাই হোক। স্যাম, পরশুর পর দিন লন্‌ডন-এর গাড়িতে তোমার আর আমার জায়গা রিসার্ভ ক'রে রেখো।'

'যে আজ্ঞে, তাই হবে স্যার!' বলে দু'পকেটে দু'হাত পুরে স্যাম যেতে যেতে আপন মনে ভাবতে লাগল, 'কর্তার রকম-সকম কেমন যেন! একেবারে গাই-বাছুরে শুদ্ধু বেছেছেন।...বুড়ো বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করলে এমনিই হয়। বাবাঃ, তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে, না হলে পরের এ'টো কুড়োতে হলেই গেছি!'

এইসব জ্ঞানগর্ভ চিন্তাকুল স্যাম লন্‌ডন যাবার গাড়ির অফিস-এর দিকে এগোতে লাগল।

॥ ছয় ॥

শিকার সমাবেশ

নিজেদের আসন্ন বিপদ এবং ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পাখিরা পয়লা সেপ্‌টেম্‌বর-এর সকাল সম্বর্ধনা-কূজনে ভরে তুলেছিল। ছোকরা পাখিরা গৌরবে বহুবচন—পক্ষ কুণ্ডুয়ন এবং সঞ্চালনে ছোকরীদের সামনে তাদের চলাফেরা বিরামবিহীন; মায়েরা মৃদু কূজনে বাচ্চাদের নির্দেশ দিয়ে মধ্যে মধ্যে ঈষত্তপ্ত স্বরে তিরস্কার কচ্ছিল; এবং বৃদ্ধ খেচরবৃন্দ তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত গাম্ভীর্য নিয়ে ছোকরাদের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছিল তাচ্ছিল্য ভরে। হায়, কিছুক্ষণ পরেই যে ওয়ার্‌ডল প্রমুখ জহ্লাদের দল এদের অনেককেই শমনসদনে পাঠাবেন, তা এরা কেউ জানত না!

কিন্তু, ভাবপ্রবণতা এখন থাক। আমাদের ইতিহাস কী বলছে দেখি।

সোজা কথায়, সকালটি ছিল খাসা, একটি নিটোল রম্য প্রভাত—বৃষ্টি বা কুয়াশার চিহ্ন পর্যন্ত বিলীন। শীত বুড়ো তখনও নিষ্ঠুর হাতে গাছের সবুজ পোশাক কেড়ে নেয় নি। পাখির কূজন এবং অসংখ্য কীট-পতংগের উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত এমন সুখদ প্রাতঃকালে একখানি খোলা গাড়িতে ওয়ার্‌ডল, পিক্‌উইক, টাপ্‌ম্যান উইংক্‌ল এবং কোচবাক্সে স্যাম, এসে উপস্থিত হলেন।

গেট-এর কাছে উদ্যানরক্ষক আর একটি ছোকরা দু'টি বিশাল থলে হাতে ক'রে তাঁদের অপেক্ষায়—সংগে দু'টি শিকারী কুকুর।

সভ্য প্রকাশিত হল

বুদ্ধদেব বসুর

কলকাতার ইলেক্‌ট্রা ও সত্যসন্ধ ৫·০০

১৯৬৭ সালের আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত "তপস্বী ও তরঙ্গিণী"র পর বুদ্ধদেব বসুর পরবর্তী নাট্যগ্রন্থ "কলকাতার ইলেক্‌ট্রা ও সত্যসন্ধ"। এতে দুটি নাটক অন্তর্ভূত হয়েছে। একটি তিন অঙ্কের—"কলকাতার ইলেক্‌ট্রা"; অপরটি একাঙ্কিকা—"সত্যসন্ধ"। প্রথম নাটকটিতে বুদ্ধদেববাবু গ্রীক পুরাণের আগামেমনন-কন্যা মোহিনী ইলেক্‌ট্রাকে সমকালীন বাংলাদেশের পটভূমিকায় নতুন ভাবে দেখার ও দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

সমরেশ বসুর

এপার ওপার ৫·০০

সমরেশ বসুর সভ্য প্রকাশিত উপন্যাস "এপার ওপার"-এর কাহিনীর শুরু এক ভয়ংকর জেল-পালানো ডাকাতকে নিয়ে, বুকে যে তীব্র প্রতিশোধের আগুন নিয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুরি হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীদের। এক মহৎ মানবিকতার উপলব্ধিতে ঋদ্ধ এ উপন্যাসটি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে চিহ্নিত হবে।

● আমাদের প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসেতর কয়েকটি বই ●

সাগরময় ঘোষের
ঝরাপাতার ঝাঁপি ৪·০০
সম্পাদকের বৈঠকে ৬·০০

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর
বাংলার লৌকিক দেবতা ৬·০০

রাণা সান্যালের
শিবঠাকুরের আপন দেশে ৪·০০

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের
ইন্দ্রজিতের আসর ৩·০০

ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাসের
এভারেস্ট ডায়েরী ৯·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০
ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৪·০০
শ্রীগৌরাঙ্গ ৩·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
বিবেকানন্দ চরিত ৭·০০

শ্রীপান্থের
হারেম ৫·০০
ঠগী ৫·০০

আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন
কাশ্মীর '৬৫ ১০·০০

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মেঘ বৃষ্টি রোদ ৩·০০

মুকুল দত্তের
ফুটবলের আইনকানুন ৬·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি ৫·০০

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের
চিন্ময় বঙ্গ ৪·০০

কালিদাস রায়ের
চণক-সংহিতা ৩·৫০

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৮·০০

অম্লান দত্তের
গণযুগ ও গণতন্ত্র ৩·০০

সুধীর ঘোষের
গান্ধীজীর দূত ১৫·০০

সুভাষচন্দ্র বসুর
তরুণের স্বপ্ন ৬·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর
লাল বল লারউড ৬·০০
নট আউট ৬·০০

বীরেন্দ্রনাথ সরকারের
রহস্যময় রূপকুণ্ড ৩·৫০

জওহরলাল নেহরুর
আত্মচরিত ১২·০০
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ ২০·০০

আর. জে. মিনির
চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৩৪

বঙ্গজননী

শিল্পী—সীতেশ রায়
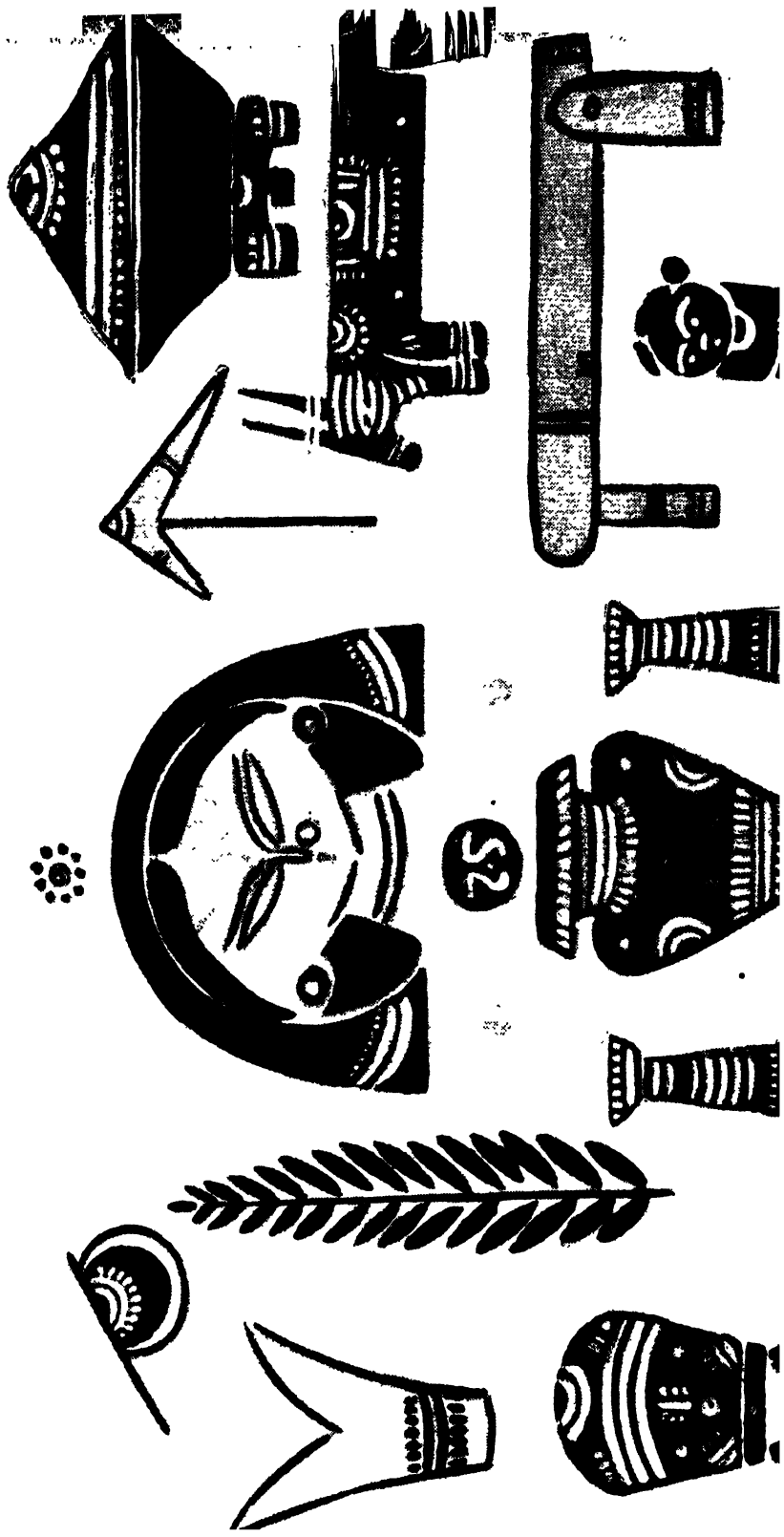
উইংকল চ্যাঁপচুপি ওয়ারডল-এর কানে বললেন, 'হ্যাঁ মশাই, ওরা কি ভেবেছে ওই রাবণের থলে দু'টো আমরা পাখি মেরে ভরে ফেলবো?'

হো হো ক'রে হেসে ওয়ার্ডল জবাব দিলেন, 'কি বলছ হে ছোকরা! ভরব মানে? ওতে ধরলে হয়। একটা ভরব আমি, অন্যটা তুমি। তারপর দরকার হয় ত আমাদের ওভারকোট-এর পকেট ত রয়েইছে।

নিস্তব্ধ উইংক্‌ল অতি ধীরে নেমে দাঁড়ালেন। মনে মনে ভাবলেন এরা যদি ঐ থলি তাঁকে দিয়ে ভর্তি করতে চায় বাড়ি ফেরবার আগে, তবে বেশ কিছুদিন বনে বাস করতে হবে!

ওয়ারড্‌ল নেমে এসে অবলীলাক্রমে ব্যাঘ্রসদৃশ সারমেয়দ্বয়কে আদর করতে লাগলেন, এবং উদ্যানরক্ষককে প্রশ্ন করলেন, 'স্যার জিওফ্রে এখনও স্কট্‌ল্যান্ড-এ রয়েছেন বোধ হয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলে উদ্যানরক্ষক বিস্মিত চোখে উইংক্‌ল-এর দিকে তাকাল। তিনি এমনভাবে বন্দুক ধরেছিলেন যে, যে-কোন মুহূর্তে তাঁর কোটের পকেটে লেগে বন্দুক ছোটার সম্ভাবনা!

তাকে তাকাতে দেখে ওয়ারডল হেসে বললেন, 'আমার বন্ধুরা এখনও ঠিক খুনাখুনি রপ্ত করতে পারেন নি। অবশ্য, একটু ভুল হল, কেন না, উইংকল-এর কিছুটা অভ্যেস আছে।'

উইংকল ফাঁসীর আসামীর মত ম্লান হেসে এমন বিব্রত হয়ে পড়লেন যে, বন্দুকে গুলী পোরা থাকলে কেউ-না-কেউ আহত হতেন নির্ঘাৎ।

চট্ করে সরে দাঁড়িয়ে তিক্তকণ্ঠে উদ্যানরক্ষক বলল, 'ও মশাই, আপনি যদি গুলী-ভরা বন্দুক নিয়ে এরকম কায়দা দেখান ত' পাখীর সংগে আমাদের কাউকেও থলেয় ভরতে পারবেন!'

তিরস্কৃত এবং অধিকতর বিব্রত উইংকল তাড়াতাড়ি বন্দুক সরাতে গেলে বেচারা স্যাম-এর মাথায় ঠকাস করে লাগল।

টুপিটা মাটি থেকে তুলে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে স্যাম উবাচ, 'দাদা তুমি ঠিক ধরেছ! এমনটা চলতে থাকলে এক গুলীতেই থলে ভরে বেশি হয়ে যাবে!'

উদ্যানরক্ষকের পাশে দাঁড়ান ছোকরাটি তা শুনে জোর গলায় হেসে উঠল, কিন্তু উইংকল-এর ভয়াল ভ্রূকুটি দর্শনে হেঁচকি দিয়ে মুখ ঢেকে নিজেও ভুরু কুঁচকে এমনভাবে চারপাশে তাকাতে লাগল যেন কে হেসেছে তাই অনুসন্ধানরত!

ভোজনরসিক ওয়ারডল তখন আসল কথা পাড়লেন। 'হ্যাঁ গো' কর্তা, খাবার নিয়ে ছোকরাকে কোথায় থাকতে বলেছ দুপুর-বেলা?'

'আজ্ঞে, নেড়াগাছ তলায়—ছোট পাহাড়ের কাছে, বারটার সময়।'

'কিন্তু ওটা ত' স্যার জিওফ্রে-র বাগানে নয়।'

'আজ্ঞে না, ওটা ক্যাপটেন বোলেডউইগ-এর বটে, কিন্তু ওখানে কেউ আসে না, আর থানটিও বড় মনোরম।'

'বেশ, বেশ, খুব ভাল কথা!...তাহলে, পিকউইক, তুমি বারটার সময় ওখানে থেকো, কেমন? তোমার শরীর খারাপ, তার ওপর পায়ে বাত। তুমি অর খামোখা আমাদের সংগে বনবাদাড়ে ঘুরবে কী করতে?'

পিকউইক-এর প্রবল ইচ্ছে ছিল এদের শিকার দেখার, বিশেষ করে উইংকল-এর ওপর তাঁর মোটেই ভরসা ছিল না বলে। তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, 'আমার খুবই ইচ্ছা তোমাদের সংগে যাওয়ার। তবে, উপায় না থাকলে আর কী হবে!'

উদ্যানরক্ষকের সহকারী ছোকরা হঠাৎ বলে উঠল, 'বেড়ার ওধারে একটা ছোট ঠেলা-গাড়ি আছে—যদি ওনার চাকর গাড়িটা ঠেলতে রাজি থাকে, তাহলে উনি ওতে বসে যেতে পারেন!'

'ঠিক, ঠিক,' স্যাম এর উৎসাহ খুব। 'ঠিক বলেছ খোকা, তোমার মগজ তোফা!' তার অত্যুৎসাহের কারণ তার নিজেরও শিকার দেখার প্রবল ইচ্ছা।

কিন্তু উদ্যানরক্ষক কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না; তার কথা শিকারের কোনও আইনে ঠেলাগাড়িতে করে যাওয়ার কথা উল্লেখ নেই—শোনা যায় নি কোনকালে!

মহা মুশকিলে পড়লেন আমাদের বন্ধু-বর্গ! অবশেষে, বহু তর্কাতর্কির পর উদ্যান-রক্ষককে 'খুসি' করে তবে ঠেলাগাড়ি চড়ে পিকউইক-এর শিকার দেখার অনুমতি মিলল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই পিকউইক চিৎকার করে উঠলেন, 'স্যাম, থাম! থাম!'

'কী হল আবার?'—ওয়ারডল।

'আমি আর একপাও এগোব না, যতক্ষণ না উইংকল তার বন্দুক ঠিকভাবে ধরে।'

'কেমন করে ধরবো?' উইংকল-এর করুণ প্রশ্ন।

'মাটির দিকে নল ঘুরিয়ে।'

'কিন্তু ওরকম ধরা যে শিকারীদের রীতিবিরুদ্ধ!'

'যারই বিরুদ্ধে হোক না কেন, আমি কেয়ার করি না। মোট কথা, তুমি ওরকমভাবে বন্দুক ধরবে! রীতির দোহাই দিয়ে তুমি যে আমাকে ঠেলাগাড়িতে গুলী করে মারবে, তা আমি সহ্য করতে গররাজি।'

উদ্যানরক্ষক ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, 'আমি ঠিক জানি ওই ভদ্রলোক আজ কাউকে না কাউকে গুলী না করে ছাড়বেন না!'

'অচ্ছা, অচ্ছা, তাই হবে। আমার কোন আপত্তি নেই।'

'ঠিক কথা, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল' স্যাম স্বগতোক্তি করল গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে।

আবার কিছুদূর যেতে না যেতেই পিক-উইক চিৎকার করে উঠলেন। 'স্যাম থাম! থাম!'

'কী মুশকিল! তুমি কি আমাদের আজ আর এগতে দেবে না?' ওয়ার্ডল-এর কণ্ঠে বিরক্তি।

'টাপম্যান এর বন্দুক মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না। বারবার আপত্তি করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু সকলের নিরাপত্তার জন্যই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি টাপম্যানকেও ঠিক উইংকল-এর মতন একইভাবে বন্দুক ধরতে হবে।'

উদ্যানরক্ষক ম্লান হাসি হেসে বলল, 'তাই করুন মশাই, না হলে নিজের গায়েই কোনও সময় গুলী বিঁধবে।'

ভীষণ চমকে উঠে টাপম্যান তড়িঘড়ি মাটির দিকে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে ধরলেন।

কিছুদূর যেতে না যেতেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নিশ্চল হয়ে একদিকে তাকিয়ে রইল পাথরের মত।

'কি হল?' উইংকল-এর উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন। উচ্চকণ্ঠে।

'আঃ, চুপ কর না হে! দেখছ না কুকুর-গুলো লক্ষ্যস্থির করছে?'

'কোথায়, কিসের, কী লক্ষ্য করছে?' এক-নিঃশ্বাসে উইংকল বলে চললেন।

'দোহাই তোমার, একটু চুপ কর, নইলে সব পণ্ড হয়ে যাবে,' তিক্তকণ্ঠে বললেন ওয়ারডল।

বিব্রত উইংকল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ পাখার ঝটপট শব্দ করে ফেজেন্ট জাতীয় কয়েকটা পাখী ঝোপ থেকে বেরিয়ে উড়ল—'দুম' দুম শব্দে ছুটল বন্দুক।

উন্মাদের মত চারদিকে তাকাতে তাকাতে উইংকল চিৎকার করে উঠলেন, 'কোথায়, কই—কোন দিকে? কোথায় গুলী করব, কাকে?'

ইতিমধ্যে শিক্ষিত কুকুরটি মরা পাখী এনে ওয়ারডল এর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। সে দুটোকে হাতে তুলে হেসে ওয়ারডল বললেন, 'কোথায়? এই ত!'

'না, না, অন্যগুলো কই? আমি মারব যে!'

তাঁর পিঠ চাপড়ে ওয়ারডল বললেন, 'অন্যেরা এখন অনেক দূরে, যদি তাদের আদৌ কোন বুদ্ধি থাকে।'

মুচকি হেসে উদ্যানরক্ষক বলল, 'কিছু দূরেই আর এক ঝাঁকের বাসা। যদি ভদ্রলোক এখন থেকে গুলী করতে সুরু করেন,

তাহলে হয়তো সেখানে গিয়ে প্রথম গুলীটা নল থেকে বেরোতেও পারে।'

স্যাম হো হো করে হেসে উঠল সামলাতে না পেরে।

বন্ধুর দুঃখে দুঃখী পিকউইক বললেন, 'স্যাম, অমন গাধার মত হেসো না।'

'যে আজ্ঞে কর্তা,' বলে স্যাম বিকল্প হিসেবে ছোকরা মালীকে লক্ষ্য করে নানা মুখভঙ্গী করতে লাগল। বেচারা ছেলে-—মানুষ এ জাতের অদ্ভুত মুখভঙ্গী দেখে জোর হেসে উঠল, এবং উদ্যানরক্ষক নিজের হাসি লুকোবার জন্য ফিরে তার মাথায় বেশ জোরে গাঁট্টা মেরে বসল।

'ও হে ছোকরা,' উইংকলকে লক্ষ্য করে ওয়ারডল বললেন, 'আমার পেছু পেছু এস। এবারে আর দেরি কোর না কিন্তু।'

'ঠিক আছে,' উইংকল-এর কণ্ঠস্বর দৃপ্ত। 'কুকুরগুলো লক্ষ্য ঠিক করছে না কি?'

'না, না। ধীরে ধীরে,' বলে ওয়ারডল পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন এবং এগোতে থাকতেন ঠিকই যদি না উইংকল বন্দুক ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ গুলী করে বসতেন বেচারা ছোকরা মালীর ঠিক মাথার ওপর দিয়ে।

'এটা কি হল হে বাপু?' অতিবিরক্ত ওয়ারডল জিজ্ঞাসা করলেন।

বিব্রত উইংকল-এর জবাব: 'এমন বন্দুক আমি জন্মে দেখি নি। যতই যা করি না কেন, নিজে নিজেই গুলী ছুঁড়বে। কিছুতেই রোখা যায় না।'

'নিজে নিজেই গুলী ছোড়ে? আজব বন্দুক ত'! তা, নিজে নিজে যদি ছোটে ত' নিজে নিজে একটা পাখী মারুক না হে!' ওয়ারডল-এর প্রাণখোলা হাসি যেন থামতে চায় না।

'তার মানে?' তপ্তকণ্ঠে উইংকল প্রশ্ন করলেন।

'যেতে দিন মশাই, যেতে দিন। আমার অবশ্য তিন কুলে কেউ নেই, আর এই বাচ্চাটা যদি মরে ত' ওর মা নিশ্চয়ই মোটা ক্ষতি-পূরণ পাবে! কাজেই...আবার গুলী ভরে নিন কথা না বাড়িয়ে।'

সব শুনতে শুনতে পিকউইক-এর চোখ ক্রমেই কপালে উঠছিল। এবার তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ওর বন্দুক কেউ কেড়ে নাও—এক্ষুণি কাড়ো!'

কেউ সে কথায় কর্ণপাত করল না এবং পিকউইক-এর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে উইংকল বন্দুকে আবার গুলী ভরে নিয়ে সদম্ভে এগিয়ে চললেন।

টাপম্যান-এর পদ্ধতি অবশ্য সহজ ও সরল মানুষের বহুখ্যাত আবিষ্কারের মত। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির মতই তিনিও মাথা খাটিয়ে শিকারের দুটি সহজ নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন:

(এক) গুলী বন্দুক থেকে বার করা—নিজেকে অহত না করে।

(দুই) গুলী ছুঁড়ে আশপাশের কাউকে অহত না করা। সুতরাং চোখ বুজে আকাশ লক্ষ্য করে ঘোড়া টেনে দেওয়াই নিরাপদ বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

এই অভিনব পদ্ধতিতে তিনি ক্রমাগত বন্দুক ছুঁড়ছিলেন। একবার, গুলী ছোড়ার পর চোখ খুলে দেখলেন আকাশ থেকে দেবতার আশীর্বাদের মতই একটি পাখী তাঁর সামনে পড়ছে! নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ টাপম্যান ওয়ারডলকে প্রশংসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওয়ারডলই দৌড়ে এসে বললেন, 'টাপম্যান, তুমি একটি বর্ণ-চোরা আম! তুমি এই পাখীটিকে বিশেষ করে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়েছিলে!'

'আরে দূর—পাগল না-কি!'

'লুকোলে আর কী হবে,—আমি দেখেছি তুমি ঠিক এটিকেই লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছ! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার জানা কোনও দক্ষ শিকারী পর্যন্ত তোমার মত নিপুণ নিশানা করতে পারত না!...তুমি পুরনো পাপী, টাপম্যান, আর লুকোতে পারবে না!'

বৃথাই টাপম্যান বিব্রত হাসি হেসে প্রতি-বাদ করতে লাগলেন—তাঁর হাসিটাই তাঁর স্বীয় দক্ষতার বিনয়ী-অস্বীকৃতির প্রমাণ বলে ধরে নেওয়া হল এবং সেদিন থেকে—শত নিষ্ফলতা সত্ত্বেও—টাপম্যান-এর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

অবশ্য, বহু পার্থিব খ্যাতিরই জন্মকথা এই।

ইতিমধ্যে উইংকল দুমদাম গুলী ছুঁড়েছেন ধূম্রাচ্ছাদিত করে; কখনও তাঁর গুলী আকাশে সঞ্চারমাণ, কখনও পাক দিচ্ছে মাটির ওপর—বেচারা কুকুরগুলোর জীবন বিপন্ন করে,—কিন্তু সবই বৃথা, একটা পালকও তাঁর গুলীস্পর্শে ধন্য হল না!

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঠেলাগাড়ির কাছে এসে ওয়ারডল বললেন, 'বেশ গরম দিন, তাই না?'

'বেজায় গরম!' পিকউইক-এর উত্তর। 'আমারই সূর্যালোক অত্যন্ত গরম মনে হচ্ছে, তোমাদের ত' লাগবেই।'

'তা ত' বটেই! যাক গে, কাজের কথা শোন—বারটা বেজে গেছে। ঐ যে ঘাসে ঢাকা ঢিপিটা দেখছ, ওখানেই আমরা লাঞ্চ করবো...আরে, বলতে বলতেই ছোকরা খাবারের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে!'

'তাই ত' হে! বেশ চটপটে ছোকরাটি—আমি ওকে একশিলিং বকশিস দেবো স্থির করলুম। ...চল হে স্যাম, আর দেরি নয়!'

'ভাল করে ধরে বসুন স্যার! ...রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও হে বাপু, নইলে চাপা পড়বে যে,' বলতে বলতে সুকৌশলে ঠেলাগাড়ি দ্রুত চালিয়ে নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছল স্যাম, এবং দ্রুত পিকউইককে পাঁজাকোলা ক'রে নামিয়ে দিয়ে দ্রুততর গতিতে খাবারের ঝুড়ি খুলে সব সাজিয়ে ফেলল।

'বাঃ, বেশ খাবার! ...বসে যান কত্তারা, শুভস্য শীঘ্রম্। আসুন, ঠিক যেমন বেয়নেট নিয়ে সৈন্যদল প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তমাত্র দেরি না ক'রে—আপনারাও...!'

বেশি কিছু বলতে অবশ্য হোল না। কর্তৃবৃন্দ এবং অনুচররা তৈরি হয়েই ছিল; বলতে না-বলতেই সকলে পাত পেড়ে বসে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেবল পত্রমর্মর এবং পক্ষিকূজন ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

'চমৎকার, অতি চমৎকার', তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পিকউইক বললেন।

'নিঃসন্দেহে', সমর্থন করলেন ওয়ারডল। 'নাও, একগেলাস পাঞ্চ চলুক।'

'নিশ্চয়ই,......দাও।' একনিঃশ্বাসে গেলাস খালি ক'রে ঠোঁট চেটে মধুর হাসি হাসলেন পিকউইক।

'বড় ভাল হয়েছে হে', দৃঢ়হস্তে পাঞ্চ-পাত্রধারী পিকউইক উবাচ, 'আর একটু খাওয়া যাক্।' বলতে বলতে তিনি আর এক গেলাস চোঁ চোঁ করে মেরে দিয়ে আবার ঢেলে তৎক্ষণাৎ উদরে প্রেরণ করলেন।

দ্রুত হাতে মাংসের স্যান্ডউইচ গলাধঃ-করণরত উইংকল সোৎসাহে বললেন, 'আমি ঠিক করেছি নকল পাখি ক্রমবর্ধমান দূরত্বে রেখে তাক ঠিক করবো এবার থেকে।'

স্যাম মুচকি হেসে বলল, 'আমি একজনকে জানতাম, যিনি ঐভাবে নকল পাখি নিয়ে সুরু করেছিলেন, কিন্তু প্রথমকার দু'গজ দূরে রেখে যেই বন্দুক ছুঁড়েছেন...তারপর সে পাখির কোনও অংশ কেউ দেখতে পায় নি।'

গম্ভীরকণ্ঠে পিকউইক ডাকলেন, 'স্যাম!'

'আজ্ঞে!'

'তোমার গল্প কেউ শুনতে চেয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হলে বাজে বোকো না। কেউ শুনতে চাইলে তবেই গল্প করবে, না হলে নয়, বুঝলে?'

'যে আজ্ঞে কত্তা, তাই হবে।' বলে স্যাম ছোকরা দুটির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে এমন মুখভঙ্গী করল যে তারা হাসতে গিয়ে গলায় খাবার আটকে বিষম খেল। উদ্যান-রক্ষকের বিশাল গোঁফের ফাঁকেও ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল।

পাঞ্চ-এর পাত্রের দিকে তীব্রদৃষ্টি হেনে পিকউইক বললেন, 'পাঞ্চ-টি বেশ হয়েছে, কী বল টাপম্যান? ...চলবে না কি একটু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

সুতরাং আর একগেলাস ঢালা হল।

তারপর আরও এক-গ্লাস ঢেলে পিক্‌উইক দেখতে চাইলেন ময়লা আছে কি না, এবং না থাকায় গলায় ঢেলে দিলেন নিশ্চিন্ত মনে।

'বাঃ, বাঃ, যে-লোক এই পাঞ্চ্‌ বানিয়েছে, তাকে অশেষ ধন্যবাদ', বলে অনুপস্থিত মিশ্রণকারীর স্বাস্থ্যপানার্থে আরও এক-গেলাস খেলেন, অনাগত বন্ধুবর্গের স্বাস্থ্যপান কর্তব্য হিসেবে করলেন, এবং সব শেষে রাজভক্ত প্রজা হিসেবে রাজারাণীরও স্বাস্থ্যপান করতে হল বৈ কি !

পাঞ্চ্‌-এর পুনরাবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পিক্‌উইক-এর হৃদয় আনন্দে টলমল করতে লাগল,—তাঁর নয়ন দুটি বিকচ-কুসুমসদৃশ প্রফুল্ল, ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি, —তিনি শৈশবে শ্রুত একটি গান গাইতে সুরু করলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মনে না আসায় স্মরণশক্তি জাগ্রত করার জন্য আবার পাঞ্চ্‌-এর আশ্রয় নিলেন!

ফল হল বিপরীত। স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হওয়া দূরে থাক, উচ্চারণবিকৃতি ঘটল এবং জড়িতকণ্ঠে 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ' পর্যন্ত বলে পিক্‌উইক নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন।

বহু আলোচনার পর ঠিক হল গাড়ি ঠেলে তাঁর শান্তিভঙ্গ না করে তাঁকে এখানে ঘুমোতে দেওয়া হোক, এবং ফেরার সময় স্যাম এসে গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাবে। তখন পিক্‌উইক পরম শান্তিতে নাসিকাগর্জন করতে লাগলেন এবং অন্যান্যরা চলে গেলেন খেচরমেধ যজ্ঞে আহুতি দিতে।

কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর। বেচারা পিক্‌উইক-এর কপালে সুখনিদ্রা ছিল না সে-দিন।

আমাদের বন্ধুরা যে অন্যের জায়গায় মধ্যাহ্নভোজন করেছিলেন, তা বলা হয়েছে ; এও বলেছি সাধারণত তিনি বা তাঁর কর্মচারীরা ওখানে আসেন না। বিধি বাম হলে যা হয়! ঘটনাচক্রে বোল্‌ডউইগ-এর মনে ঠিক সেই দিনই সমস্ত বাগান পরিভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় তিনি দুজন মালী-সমভিব্যাহারে এসে পিক্‌উইক-এর বিশ্রামস্থলে উপস্থিত হলেন। ভাগ্যের বিদ্রূপ বোধহয় একেই বলে!

অকুস্থলে এসে প্রথমেই তিনি ওক গাছটির দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলেন, যেন বেচারা গাছ ওখানে জন্মে অপরাধ করেছে। বোল্‌ডউইগ মহান আশয়ের এক পিতৃস্বসার বিয়ে হয়েছিল জনৈক কাউন্ট মহোদয়ের এক পিসতুতো ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে, এবং সে-দিন থেকে যে ভ্রূকুটি সুরু করেছিলেন তা আর মিলোয় নি।

কাজেই, ভ্রূকুটি ক'রেই তিনি গম্ভীর-স্বরে মালীকে ডাকলেন 'ও হে হান্ট!'

'আ...আজ্ঞে ?' ভীতকণ্ঠে হান্ট-এর উত্তর এল।

'কালই এ জায়গা ভাল ক'রে সাফ্‌ করবে, বুঝেছ ?— অন্যথা যেন না হয়।'

'যে আজ্ঞে!'

'ফের যেন বলতে না হয়, বুঝলে ?'

'আজ্ঞে, আর বলতে হবে না।'

'আর, আমাকে মনে করিয়ে দিও এখানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে নোটিশ দেওয়ার কথা। একটা স্প্রিং-লাগান ছররা বন্দুকও এখানে রাখতে হবে, আজেবাজে লোকের আসা-যাওয়া বন্ধ করার জন্য—বুঝলে ? শুনতে পাচ্ছ, না কি ?' মাটিতে লাঠি ঠুকে বোল্‌ডউইগ বলে চললেন।

'ভুলবো না স্যার, কখ্‌খনো ভুলবো না, আপনি দেখে নেবেন।'

অপর মালী সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

'তোমার আবার কী হল হে—অ্যাঁ ? পেট কামড়াচ্ছে না কি ?'

'আজ্ঞে, মনে হচ্ছে আজ এখানে বাইরের লোক এসেছিল।'

'বল কি ?' ভয়াল ভ্রূকুটি ক'রে চারপাশে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কাউন্ট-এর পিসতুতো ভাইয়ের কুটুম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেশুনে মনে হচ্ছে এখানে বেশ মৌজ ক'রে ভোজ লাগান হয়েছে।'

'তাই ত' হে—ব্যাটাদের স্পর্ধা দেখেছ! খেয়েদেয়ে চারধার একেবারে আস্তাকুঁড় বানিয়ে রেখে গেছে হে!! ব্যাটাদের পেলে হত একবার—মাথায় ঢুকল ?'

'স্যার', মালীর আর্তকণ্ঠ।

'আঃ, গাধার মত চিৎকার করো কেন ?...' বলতে বলতে বোল্‌ডউইগ-এর দৃষ্টি নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখনিমগ্ন পিক্‌উইক-এর দিকে পড়ল। ক্রোধে কম্পমান বোল্‌ডউইগ হাতের লাঠি দিয়ে (লিখতেও লেখনী কাঁপিছে থরোথরো!) পিক্‌উইক-এর পেটে জোরে জোরে খোঁচা মেরে চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'এই ব্যাটা, কে রে তুই ?'

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে পিক্‌উইক বললেন, 'পাঞ্চ্‌!'

'কি ? কী বললি ব্যাটা ?'

কোন উত্তর নেই—পিক্‌উইক-এর নাসিকা পুনরায় গর্জনরত।

মালীর দিকে তাকিয়ে বজ্রকণ্ঠে কাউন্ট-কুটুম্ব প্রশ্ন করলেন, 'কী বলল, নাম ?'

'মনে হল 'পাঞ্চ্‌' বলেছে।'

'ব্যাটা চালাকি কচ্ছে—বুঝেছ, চালাকি! ভেবেছে আমি বুঝব না। ঘুমের ভাণ ক'রে পড়ে আছে শয়তানটা! ব্যাটা মাতাল—পাঁড় মাতাল, ছোটলোক! ব্যাটাকে গাড়িশুদ্ধ ঠেলে নিয়ে যাও—বুঝলে ?'

'আজ্ঞে কোথায় যাবো ?'

'চুলোয় যাও!'...

'যে আজ্ঞে, তাই হবে।'

'দাঁড়াও, ভাবতে দাও।... ঠিক আছে। —ব্যাটা ছোটলোক মাতালটাকে খোঁয়াড়ে নিয়ে যাও এক্ষুণি। ব্যাটা আমার সঙ্গে চালাকি করছে—পাঞ্চ্‌! পাঞ্চ্‌ কারো নাম হয় ? থাক্‌ পড়ে ব্যাটা খোঁয়াড়ে—নেশা কাটলে ঘুম থেকে উঠেও শয়তানটা নিজের নাম ভাঁড়ায় কি না দেখা যাবে। —কি মাথায় ঢুকেছে ?'

স্ফীত আত্মম্ভরিতার পরিপূর্ণ কাউন্ট-কুটুম্ব লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাগান পরিদর্শন আরম্ভ করলেন আবার এবং পিক্‌উইককে নিয়ে গ্রাম্য খোঁয়াড়ে রেখে এল।

এ-দিকে শিকারীদল যখন দিনশেষে এসে দেখল যে ঠেলগাড়িসমেত পিক্‌উইক অন্তর্হিত, তখন তাঁদের বিস্ময়ের অবধি রইল না, বাতে পঙ্গু ভদ্রলোক যে উঠে হেঁটে চলে গেছেন সেটাই চরম আশ্চর্য, কিন্তু তার সঙ্গে একখানা জলজ্যান্ত ঠেলাগাড়ি শুদ্ধ নিয়ে গেছেন কেমন ক'রে তাই ভেবে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। আতিপাতি ক'রে খুঁজলেন সর্বত্র—চিৎকার ক'রে গলা ফাটিয়ে ফেললেন সবাই, কিন্তু বৃথা! ভেল্কিবাজির মতই একজন বাতগ্রস্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং সেই সঙ্গে বেশ ভারি একটা ঠেলাগাড়ি হাওয়ায় উবে গেছে!

কিছুক্ষণ নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁরা আপাতত বাড়ি ফেরাই ঠিক করলেন পিক্‌উইক বিহনে।

ইতিমধ্যে পিক্‌উইককে নিদ্রিতাবস্থাতেই খোঁয়াড়ে নিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল—তাঁর সঙ্গী ছিল তিনটে শুয়োর, একটা রোঁয়াওঠা ঘিয়ে-ভাজা কুকুর, আর একটা গাধা। অভিনব এই দৃশ্য দেখার জন্য গ্রামের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ লোক এবং সব বালখিল্যর দল এসে জড়ো হল। সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমাণ—জেগে উঠে পিক্‌উইক কী বলেন বা কী করেন!

বেলা পড়ে এলে তাঁর ঘুম ভাঙল ; এবং পারিপার্শ্বিক দেখে তিনি একেবারে তহভম্ব। রিপ্‌ ভ্যান্‌ উইংক্‌ল-ও বোধহয় এর চাইতে বেশি অবাক হয় নি। কারণও ছিল—কোথায় বিহগকাকলীঝংকৃত মহীরুহের নিচে হরিৎ তৃণসমারোহ, আর কোথায় গর্দভ-সারমেয়শূকরপূরিত খোঁয়াড়! এই পরিবর্তনের কোনও যুক্তিসংগত কারণ আমাদের নায়ক খুঁজে পাচ্ছিলেন না, কেবল 'পাঞ্চ্‌'-দেবীর কৌশল ছাড়া!

'হিয়ার, হিয়ার,' বালখিল্যর দল চিৎকার ক'রে উঠল।

'আমি কোথায় ?' হতবুদ্ধি পিক্‌উইক-এর প্রশ্ন।

খোয়াড়ে,' সমস্বরে উত্তর।

'এখানে কেমন ক'রে এলাম? কি করেছি? কোথা থেকে কে নিয়ে এল আমাকে?'

'বোল্ডউইগ—জমিদার বোল্ডউইগ।' সকলের এককথা।

'আমাকে বাইরে যেতে দাও—আমার বন্ধুরা সব কোথায়?'

'হুররে...হুর্ রে' সারা গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠলো আনন্দ-কল্লোলে। একঘেয়ে গ্রাম্য জীবনে এমন নতুনত্ব আনার জন্য তারা পিক্উইক-এর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করায় তার চিহ্নস্বরূপ টমেটো, গাজর, আলু, ডিম ইত্যাদি তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

কতক্ষণ যে এই একতরফা মর্মান্তিক উপহার প্রদান চলত বলা শক্ত, এই সময় একটা গাড়ি দ্রুতবেগে এসে পড়ল, ওয়ারডল নেমে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পিক্উইক-কে পাঁজাকোলা ক'রে গাড়িতে তুললেন, এবং স্যাম তৎক্ষণ খোঁয়াড় রক্ষককে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে ভূমিসাৎ করল।

'বিচারকমশাইকে খবর দাও', কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠল।

'তাই দাও হে গঙ্গারাম—ওঁকে বোলো যে ওঁর পাহারাওয়ালাকে ভুঁই কুমড়ো বানিয়ে দিয়েছি। তিনি যেন নতুন লোক লাগাবার ব্যবস্থা করেন শীগ্গির,' বলতে বলতে স্যাম লাফিয়ে গাড়িতে উঠল এবং গাড়ি চলে গেল চোখের নিমেষে।

ক্রুদ্ধ পিক্উইক সগর্জনে বললেন, 'লন্ডন-এ পৌঁছেই আমি আমার উকিলকে দিয়ে বোল্ডউইগ-এর নামে মানহানির মামলা রুজু করব।'

'বোধহয় আমরা অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম,' ধীরে ধীরে ওয়ারডল বললেন।

'তাহলেও আমি মামলা করব,' পিক্উইক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'উহুঁ, তা করতে পাবে না।'

'নিশ্চয়ই...' বলতে বলতে থমকে গিয়ে পিক্উইক প্রশ্ন করলেন, 'কেন করব না?'

'যে-হেতু তারা পাল্টা নালিশ করতে পারে এই বলে যে আমরা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত 'পাঞ্চ'-পানে মত্ত হয়েছিলাম,' ওয়ারডল হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন।

আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই হাসি রোধ হল না—ঠোঁটের কোণের চোরা হাসি অনতিবিলম্বে প্রবল হাস্যরোলে পরিণত হল। এবং, এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানানোর জন্য তাঁরা শৌণ্ডিকালয়ে গিয়ে তক্ষুণি ব্র্যান্ডি পান ক'রে সুস্থ হলেন।

স্যাম অবশ্য দু'গেলাস পেল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ।

॥ আট ॥

পিক্উইক-এর নতুন বন্ধুলাভ

আমাদের মহানায়ক লন্ডন-এ ফিরেই ডড্সন অ্যান্ড ফগ-এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। কিছুটা খোঁজ করতেই বেরিয়ে পড়ল ওদের অফিস কর্নহিল-এর ফ্রিম্যান্স কোর্ট-এর শেষ প্রান্তে। ওখানে আলো-হাওয়া বর্জিত, নিচু, অন্ধকার একটা ঘরে চারজন কেরাণী নিয়ে ডড্সন অ্যান্ড ফগ-এর অ্যাটর্নি দপ্তর কাজ চালায়। বেচারা করণিককুল থাকে যেন গভীর কূপের তলায়—সমস্ত দিন আলো-হাওয়ার স্পর্শবঞ্চিত!

এহেন দপ্তরটি কাঠের বেড়া দিয়ে ভাগ করা হয়েছে—একপাশে বসে কেরাণীরা, অন্যপাশে পায়রার খোপের মত ঘরে অংশীদাররা অধিষ্ঠিত। ঘরের মধ্যে কয়েকখানা পুরনো কাঠের চেয়ার, কিছু ধূলোভর্তি তাক (যার ওপর বান্ডিল বান্ডিল ফিতেবাঁধা কাগজ এবং কয়েকটা মরচেধরা লোহার বাক্স), উচ্চকণ্ঠ একটা দেয়ালঘড়ি, একখানা দেয়ালপঞ্জিকা, ছাতা রাখবার একটা ভাঙা স্ট্যান্ড, এবং টুপি রাখার উপযুক্ত কয়েকটা দেয়াল আলনা।

এই অপরূপ দপ্তরে এক শুক্রবার সকালে পিক্উইক স্যাম-কে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলেন। সেখানকার ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, এবং তা নিম্নরূপঃ—

দরজায় আলতো টোকা মারতেই ভেতর থেকে উত্তর এলঃ 'ঢুকে পড় না বাপু, ঠক্ঠাক কেন?' অনুমতি পেয়ে পিক্উইক স্যামকে নিয়ে ভেতরে গেলেন।

শান্তকণ্ঠে তিনি জানতে চাইলেন ডড্সন বা ফগ আছেন কি না।

যন্ত্রচালিত কণ্ঠের মত উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে...'ডড্সন নেই এবং ফগ ভয়ানক ব্যস্ত।' এবং তক্ষুণি কানে-কলম-গোঁজা একটা মুণ্ডু বেরিয়ে এল। মাথায় একরাশ চুল, সযত্নে পমেটম দিয়ে আঁচড়ান (তার চাক্ষুষ প্রমাণস্বরূপ কানের পাশ দিয়ে পমেটম্ গড়িয়ে পড়ছে), গলায় ময়লা কলার, উজ্জ্বল কুৎকুতে চোখ দুটো পিক্উইক-এর আগাপাশতলা নিরীক্ষণ করল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

সে আবার বলল, 'ডড্সন নেই, ফগ ভীষণ ব্যস্ত।'

'ডড্সন কখন ফিরবেন?'

'জানি না।'

'ফগ কি খুব বেশিক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন?'

'জানি না।' —বলে কেরাণীপুঙ্গব অত্যন্ত উদ্বেগবোধ নিয়ে কলমটি কানের মধ্যে গুঁজে করল, এবং তার সহকর্মী 'হো হো' ক'রে হেসেই চুপ ক'রে গেল।

'তাহলে আমি অপেক্ষা করব,' বলে অনাহূত পিক্উইক চেয়ারে বসে দেয়ালপঞ্জির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে খুক্খুক্ ক'রে কেসে পিক্উইক অস্বস্তি প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে দয়াপরবশ দুই কেরাণী তার দিকে তাকালে একজন অন্যজনকে বলল, 'মনে হয় ফগ সম্ভবত এতক্ষণে কাজ শেষ করেছে।'

'যাই দেখে আসি,' অপরজন উঁচু টুল থেকে নামতে নামতে বলল, 'কি নাম বলব?'

'পিক্উইক,' আমাদের মহানায়ক গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

কেরাণী চলে গেল। এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল ফগ পাঁচ মিনিট পরে দেখা করবেন।

ফিসফিস ক'রে অপর জন জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, কী নাম বলল বুড়োটা?'

অনুরূপ কণ্ঠে উত্তর এল, 'পিক্উইক—বারডেল এবং পিক্উইক কেস-এর আসামী।'

চাপা হাসির রোল পড়ে গেল দপ্তরে এবং চারজন কেরাণীর চার মুণ্ডু বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি মারতে লাগল।

স্যাম চুপি চুপি পিক্উইক-কে বলল, 'কত্তা, ওরা আপনাকে নিয়ে তামাসা করছে।'

আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন, 'কেন, আমাকে নিয়ে তামাসা কেন?'

উত্তরে স্যাম আঙুল দিয়ে বেড়ার দিকে দেখাল, এবং পিক্উইক সে-দিকে তাকাতেই চার-চারটে পমেটম্-শোভিত মুণ্ডু সাঁৎ ক'রে সরে গেল বেড়ার ওপর থেকে, যেখান থেকে তারা অবলানিধনকারী, দুর্ধর্ষ প্রেমিক-পুঙ্গব পিক্উইক-কে খুঁটে খুঁটে দেখছিল। এবং, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল দ্রুত কলম চালানোর খস্খস্ শব্দ।

ঘণ্টা বাজল, এবং জনৈক কেরাণী জ্যাক্সন এসে পিক্উইক-কে নিয়ে চলল ফগ-এর কাছে। 'শ্রীযুক্ত ফগ' লেখা দরজায় টোকা মেরে অনুমতি নিয়ে তিনি ঢুকলেন ভেতরে।

'বসুন, বসুন!......জ্যাক্সন, ডড্সন ফিরেছেন কি?'

'এইমাত্র এলেন, স্যার।'

'তাঁকে একবার দয়া ক'রে এ ঘরে আসতে বল ত।'

'যে আজ্ঞে।' জ্যাক্সন চলে গেল।

'আপনি ততক্ষণ মামলার কাগজপত্র দেখতে থাকুন। ডড্সন এসে পড়ল বলে; তখন আমরা আপনার বিষয়টি আলোচনা করব।'

আড়চোখে তাকিয়ে কণ্টক চশমাজোড়া পিক্‌উইক টাকপড়া মোটা মানুষটি, দেখে মনে হয় টেবিল-চেয়ার এবং স্তূপীকৃত ধুলোপড়া কাগজপত্তরের সংগে একীভূত হয়ে গেছেন—ও ছাড়া তার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে মনেই হয় না।

কিছুক্ষণ পরে মোটাসোটা, চশমা চোখে, স্ফূর্তিবাজ ডড্‌সন এসে হাজির হলেন। পরিচয় করালেন ফগ ঃ

'ডড্‌সন, ইনি শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক।'

'বেশ, বেশ, মহাশয় তাহলে বার্‌ডেল বনাম পিক্‌উইক মামলার প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মহাশয় এখন কী করতে ইচ্ছুক ?

'ঠিক, ঠিক,' পোঁ ধরলেন ফগ। 'কী স্থির করেছেন শুনি।'

'ছিঃ, ফগ—কথার মাঝে কথা বলা অসভ্যতা—চুপ কর, ও'র বক্তব্য আগে শুনতে দাও আমাকে।'

শান্তস্বরে পিক্‌উইক বললেন, 'আমি এখানে এসেছি আপনাদের সংগে মুখোমুখি আলাপ করতে এবং এই কথা স্পষ্ট ক'রে জানাতে যে আপনাদের চিঠি পেয়ে আমি অবাক হয়ে ভেবেছি কোন্‌ ভিত্তির ওপর নির্ভর ক'রে আপনারা একজন ভদ্রলোককে এমন কুৎসিৎ অপমান করলেন।'

'ভিত্তি মানে ? ...কি বলছেন...' এই পর্যন্ত ফগ বলতেই বাধা এল ডড্‌সন-এর কাছ থেকে।

বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে ডড্‌সন বললেন, 'ফগ, আমি কথা বলব—তুমি নয়!'

'মাপ কর ডড্‌সন।'

কেসে গলা খোলসা ক'রে চশমাটা হাতে নিয়ে ডড্‌সন জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'মামলার ভিত্তি আছে কি না, সে সম্বন্ধে মহাশয়ের বিবেকই প্রকৃত সাক্ষী। আমরা কিছু বলব না। আমাদের তরফ থেকে বলতে গেলে, আমরা আমাদের মক্কেলের কথামত চলতে বাধ্য। মক্কেলের কথা সত্য হতে পারে, মিথ্যা হওয়াও অসম্ভব নয়,—বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, না হওয়াও সম্ভব। তবে যদি সত্য হয় ত আমি এ-কথা বলতে বাধ্য যে মামলার ভিত্তি আটতলা বাড়ির ভিতের মতই সুদৃঢ়। মহাশয় কী করেছেন না করেছেন তা মহাশয় নিজেই জানেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি একথা বলতে বাধ্য যে যদি আমি জুরীতে থাকতাম, তবে মহাশয়ের কার্যাবলী সম্বন্ধে আমার মাত্র একই মত হত।'

ভাষণান্তে ডড্‌সন তাঁর পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতা ছ'ফুটে করার চেষ্টা ক'রে ফগ-এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ফগ তাঁর হাত দু'খানা প্যান্ট-এর পকেট-এ ধরের মতন নিস্তব্ধভাবে করে বললেন, 'ঠিক কথা—হক্‌ কথা!'

'তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি মামলা চালাতে আপনারা দৃঢ়সংকল্প?'

'ধরে নিচ্ছি, মানে ? —নিশ্চয়ই মামলা চলবে।' ডড্‌সন বললেন। 'এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পনের শ' পাউন্‌ড স্টার্‌লিং ?'

'তার সংগে মহাশয় এ কথাটাও শুনে রাখুন—মক্কেল যদি আমাদের উপদেশ মানতেন ত ক্ষতিপূরণের দাবি ওর অন্তত তিনগুণ হত।'

আড়চোখে তাকিয়ে ফগ বললেন, 'যতদূর মনে পড়ছে, শ্রীমতী বার্‌ডেল বলেছেন ১,৫০০ পাউন্‌ড-এর এক পেনি কমেও তিনি রাজি হবেন না।'

'নিঃসন্দেহে তাই,' কঠিন কণ্ঠে ডড্‌সন যোগ করলেন। কারণ, আরম্ভে সুর নরম করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়, এবং পরে বললেন, 'আর, মহাশয় যখন কোন কথা বলছেন না বা কোন আলোচনায় আসছেন না, তখন দয়া ক'রে সপিনাখানি নিয়ে যান,' বলে ডড্‌সন সপিনাটি সযত্নে পিক্‌উইক-এর হাতে গুঁজে দিলেন।

পিক্‌উইক ক্রমেই ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। এবার উঠে তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ভাল কথা, ভাল কথা! আমার উকিলই আপনাদের সংগে আলোচনা করবেন।'

'অত্যন্ত আনন্দের সংগে আমরা আপনার অ্যাটর্নির সংগে কথা কইব।' —হাত কচলাতে কচলাতে ডড্‌সন-এর বিনীত জবাব।

'যা বলেছ ডড্‌সন,' দরজা খুলতে খুলতে ফগ-এর সমর্থন।

উত্তেজিত পিক্‌উইক হাত নেড়ে বললেন, 'যাবার আগে শুধু এই কথাটা আপনাদের জানিয়ে যেতে চাই ঃ পৃথিবীতে যত রকমের জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ হয়েছে আজ পর্যন্ত...'

'দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান,' ব্যস্ত কণ্ঠে ফগ বললেন, 'আমি হাত জোর ক'রে বলছি, একটু অপেক্ষা করুন।' বলে তিনি তাঁর কেরাণী দুজনকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এই ভদ্রলোক কী বলছেন। হ্যাঁ, 'ঘৃণ্য কাজ' না কি যেন বলছিলেন ?'

'নির্ঘাৎ, বলছিই ত,' উত্তেজনায় পিক্‌উইক আগুন। 'জগতের যত কিছু ঘৃণ্য এবং জঘন্য কাজের কথা শোনা যায়, আপনাদের এই কাজ তার মধ্যে ঘৃণ্যতম এবং জঘন্যতম।'

'শুনছ জ্যাক্‌সন ?' ডড্‌সন-এর প্রশ্ন।

উইক্‌স, তুমি ভাল ক'রে শুনে মনে রেখো।' —ফগ।

খুবই আপত্তি আমাদের 'শয়তান ও জোচ্চোর বলতে চাইছেন, না ?'

'বলছিই ত! —আপনারা মনুষ্যরূপী শয়তান! কোন জোচ্চুরিই আপনাদের আটকায় না।'

'শুনতে পাচ্ছ জ্যাক্‌সন?' ডড্‌সন হে'কে জিজ্ঞেস করলেন।

'ভাল ক'রে শোন উইক্‌স'। —ফগ।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল ক'রেই শুনছি,' দুই কেরাণীপুংগবের সম্মিলিত কণ্ঠ শোনা গেল।

'বলুন মশাই, বলুন! বলে যান! চোর, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী—যা ইচ্ছা বলুন, আমরা একেবারে স্পিকটি নট্‌। আপনার প্রাণ যা চায় বলুন, ...জ্যাক্‌সন, উইক্‌স শুনত না পেলে আরও কাছে এসে দাঁড়াও না কেন? ...আসুন, মারতে চান ত লাগান না দু'এক ঘা।'

বলতে বলতে ফগ দু'চার পা এগিয়ে এলেন পিক্‌উইক-এর দিকে, যাতে মারতে ইচ্ছুক হলে তাঁর কোনও অসুবিধে না হয়। এবং, নিঃসন্দেহে বলা চলে ভদ্রলোক মেরেই বসতেন, যদি না গোলমাল শুনে স্যাম দ্রুত এসে তাঁকে ধরে ফেলত।

পিক্‌উইককে ঠেলতে ঠেলতে স্যাম বলতে লাগল, 'আপনি এক্ষুণি চলে আসুন কর্তা আপনাকে নিয়ে হয়েছে মুশ্‌কিল! উকিলদের সংগে কথা কাটাকাটি করতে নেই তাও কি আপনি জানেন না ? চলে আসুন, আ-সুন! গালাগাল করতে চান, ঝগড়া করতে চান—আমি রয়েছি, ভাবনা কি ? এখানে ঝগড়া করার খরচ বড্ড বেশি কর্তা!

এবং, বলতে বলতে স্যাম একরকম জোর ক'রে পিক্‌উইক-কে ঠেলে বের ক'রে নিয়ে এল। রাস্তায় গিয়ে তাঁকে ছেড়ে পেছনে চলতে আরম্ভ করল, তার আগে নয়।

কিছুক্ষণ পরে পিক্‌উইক চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, 'স্যাম, আমি এক্ষুণি উকিল পার্‌কার এর অফিস-এ যাবো।'

'আজ্ঞে ওখানেই আপনার যাওয়া উচিত ছিল আগে।— এখানে এসে ঝামেলা না ক'রে।'

'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ স্যাম।'

'আজ্ঞে 'বোধহয়' নয়, একেবারে খাঁটি নির্ভেজাল ঠিক বলেছি।'

'যাক্‌ গে, যা হবার তা ত হয়েইছে,—এখন চল দেখি পা চালিয়ে পার্‌কার-এর কাছে।...দাঁড়াও, মেজাজটা বড় বিগড়ে গেছে হে ! চল, আগে কোথাও থেকে এক গেলাস ব্র্যান্‌ডি খেয়ে তাজা হয়ে নি। এখানে কোথাও পাওয়া যাবে ?'

লন্‌ডন-এর রাস্তাঘাট স্যাম-এর নখ-দর্পণে। সে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না ক'রে

এক নিশ্বাসে বলতে সুরু করল, 'ডাইনে গিয়ে ফের ডাইনে ঘুরে, গলির শেষ বাড়ি। ঢুকেই বাঁয়ে প্রথম টেবিলটায় বসবেন, কেন না ওটা ছাড়া আর সব ক'টাই নড়বড়ে। —বসলে খুবই অসুবিধে হয়।'

স্যাম-এর নির্দেশ অনুসারে অনতি-বিলম্বে পিক্‌উইক অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছে সব দেখেশুনে বাঁয়ের প্রথম টেবিল-এ বসলেন। চোখের নিমেষে গরমজল-মেশান ব্র্যান্‌ডির গেলাস তাঁর সামনে স্থাপিত হল। স্যাম নলচের আড়ালে কিছু দূরে অন্য টেবিল-এ বসে বীয়ার হুকুম করল।

পিক্‌উইক কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। অতি সাধারণ ঘর —খদ্দেররা বেশির ভাগই মনে হল দূর-পাল্লার কোচম্যান। বিশেষ ক'রে সামনের টেবিল-এ বসা একজন অতি স্থূলকায় কোচম্যান-কে তিনি লক্ষ্য করলেন। ঐ লোকটি পাইপ থেকে ঘন ধোঁয়া বের করছিল, এবং কয়েক টান অন্তর অন্তর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে স্যাম এবং তাঁকে নিরীক্ষণ করছিল। আবার, পিক্‌উইক-এর চোখে চোখ পড়ামাত্র বীয়ার-এর মগে মুখ ডুবিয়ে আড়চোখে স্যাম-এর দিকে তাকাচ্ছিল।

এতক্ষণ স্যাম এদিকে দেখে নি, কিন্তু এবার পিক্‌উইক-এর কৌতূহলী দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে লোকটিকে দেখতে পেল। ভাল ক'রে দেখে যেন তাকে চেনা চেনা লাগল স্যাম-এর, এবং সে ওঠার উপক্রম করতেই ঐ লোকটি ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'আ রে, স্যামি যে!'

'কে ও?' পিক্‌উইক প্রশ্ন করলেন।

স্যাম পুলকিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আজ্ঞে, নিজের চোখকে বিশ্বাস করলে বলতে হয় উনি হলেন বুড়ো কত্তা।'

'বুড়ো কর্তা? কোন্ কর্তা? কোথাকার কর্তা?'

'আজ্ঞে আমার পিতাঠাকুর! ...কেমন আছ গো বুড়ো কত্তা?' বলে স্যাম নিজের পাশের চেয়ারটা ঝেড়েপুঁছে সাফ ক'রে পিতৃভক্তি প্রদর্শন করল। তার বাবা মদের গেলাস হাতে নিয়ে এসে সেখানে বসল।

'স্যামিভেল, তোকে বছর দুই দেখি নি —কেমন আছিস?'

'তাই হবে...সৎ মা কেমন আছে গো বুড়ো কত্তা?'

গম্ভীরকণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'দাঁড়াও বলছি—একটু সময় লাগবে, বিষয়টা কিঞ্চিৎ গুরুগম্ভীর এবং গোলমেলে কি না। —বলি শোন; আমার উক্ত দ্বিতীয় অভিযানকে যখন বিয়ে করি, তখন সে ছিল বিধবা। আহা, এমন চমৎকার বিধবা আশপাশেও ছিল না গো! অমন বিধবার পক্ষে আবার স্ত্রী হওয়াটা বোধহয় ধাতে সইল না, কারণ সহধর্মিণীর মত ব্যবহার তার আসছে না মোটেই! কাজেই, আমি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত করেছি বিধবার পক্ষে আবার স্ত্রী হওয়া নিরাপদ নয়।'

'বল কি বুড়ো কত্তা!' স্যাম-এর কণ্ঠে সহানুভূতি।

'আর কী বলি বল,' সকরুণ চোখ মেলে বৃদ্ধ বলে চলল, 'ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এমনই যে আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম আমার আবার জোয়াল কাঁধে নেওয়া মোটেই উচিত হয় নি বাবা। বাপকে দেখে শেখো স্যাম, কখ্‌খনো বিধবার দিকে ফিরেও তাকিও না! ওরা প্রথমবারের অভিজ্ঞতা থেকে পুরুষ-নির্যা-তনের সূক্ষ্ম কলাকৌশল শিখে নেয়। —সাবধান স্যামিভেল!'

বলে বৃদ্ধ এক চুমুকে বীয়ার শেষ ক'রে ঘনঘন পাইপ-এ টান মারতে লাগল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে পিক্‌উইককে উদ্দেশ্য ক'রে বৃদ্ধ বলল, 'মাপ করবেন, একটা কথা বলব?...মানে আপনার কোন বিধবা নেই ত মশাই?'

হাসতে হাসতে পিক্‌উইক তাকে নিশ্চিন্ত করলেন।

ইতিমধ্যে স্যাম ফিস্‌ফিস ক'রে পিক্‌উইক-এর প্রকৃত পরিচয় পিতাঠাকুরকে জানালে তক্ষুণি মাথার টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন করে বৃদ্ধ বলল, 'মাপ চাচ্ছি মশাই, আগে জানতাম না!—তা, স্যাম ভালভাবে কাজকর্ম করছে ত?'

'খুব ভাল।'

'বড় খুসি হলাম শুনে মশাই। ওর শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট করেছি।......ছেলে-বেলা ওকে রাস্তায় ছেড়ে রাখতাম সব সময়। অবাধে। নিজের ব্যবস্থা নিজে করার মত শিক্ষাপ্রদ আর কিছু নেই—ছেলে মানুষ করার ওই একমাত্র পথ!'

'একটু বিপজ্জনক নয় কি পন্থাটা?...... কিন্তু এখুনি চললেন কোথায়, বসুন। আর কিছু নেবেন কি?

'অশেষ ধন্যবাদ মশাই, আপনার স্বাস্থ্য-পান এবং স্যাম-এর জীবনে সাফল্যের জন্য এক গেলাস ক'রে ব্র্যান্‌ডি হলে মন্দ হত না!'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—অতি শুভ ইচ্ছা,'—তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হল।

গেলাস দু'টি সামনে আসামাত্র বৃদ্ধ তিলেকও দেরি না ক'রে ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিলেন পর পর! পিক্‌উইক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'সাবাস বুড়োকত্তা, সাবাস!'—কিন্তু সাবধান, একটু সামলে খেও, না হলে পুরনো বাত আবার চাগিয়ে উঠতে পারে।'

শেষ গেলাসটি টেবিল-এ রেখে পরিতৃপ্তির জৃম্ভণ তুলে বৃদ্ধ বলল, 'গেঁটে বাতের অমোঘ ওষুধ আমি পেয়ে গেছিরে স্যাম!'

চমকে উঠে পিক্‌উইক তৎক্ষণাৎ নোটবই বের করলেন এবং পেনসিল হাতে আগ্রহাকুল প্রশ্ন করলেন, 'সেটা কী?'

পাইপ টানতে টানতে বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'গেঁটে বাত হয় অতিরিক্ত বিশ্রাম আর আরাম থেকে, কেমন? যদি আপনার—(ভগবান না করুন!)—কোনদিন গেঁটে বাত হয়, বিন্দু-মাত্র বিলম্ব না ক'রে হাতের কাছে যে বিধবা থাকবে তাকেই বিয়ে করে ফেলবেন—ব্যস! আর দেখতে হবে না মশাই! গেঁটে বাত গটগট করে স্বস্থানে প্রস্থান করবে—পেছনে তাকাবে না পর্যন্ত! আর, বিধবাটির কণ্ঠ-স্বর যদি কিঞ্চিৎ কর্কশ এবং উচ্চ হয়, তবে ত সোনায় সোহাগা! খুব ভাল নিদান মশাই, খাসা অষুধ! আমি নিয়মিত গ্রহণ ক'রে থাকি, এবং এটি মনের প্রফুল্লতাজাত যে কোন অবস্থার অব্যর্থ প্রতিষেধক।'

এই অভিনব এবং অশ্রুতপূর্ব ওষুধের বিবরণ দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ ওয়েলার বেরিয়ে পড়ল।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

অনুবাদক—সমীরণ চৌধুরী

আর কি সে দিন হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে, যবে দেব-অবতংশ, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত। যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ, ভারতের পুনর্বার সে শোভা হবে কি আর
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত॥ অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী / বাক্-সাহিত্য

শরৎচন্দ্রের নাম বাঙালী পাঠক কোনদিনই বিস্মৃত হবেন না, বস্তুত রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করেও সম্পূর্ণ স্বকীয় রচনাভঙ্গী দ্বারা অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন একমাত্র তিনিই। তবু শরৎচন্দ্রের সার্বিক সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে বুঝি আমরা এখন সম্যকভাবে পরিচিত হতে পারিনি, অন্তত বর্তমান গ্রন্থটি পড়লে এ সন্দেহ মনে জাগতে বাধ্য। কারণ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ছাড়াও এখানে তিনি আরেকরূপে স্বপ্রকাশ; তা হল প্রাবন্ধিকের। প্রবন্ধ রচনাতেও যে তিনি এতদূর পারদর্শী ছিলেন তা আজও অনেকেরই অজানা। বর্তমান গ্রন্থে শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি সমাজনীতি, ইত্যাদির ওপর তাঁর রচিত যে সব প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করেছে সেগুলি যেমন মৌলিক, তেমনই সুচিন্তিত। বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদির পুরোনো সংখ্যা থেকে এগুলিকে উদ্ধার করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য সংকলক ও প্রকাশক উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থশেষে সংযুক্ত শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও গ্রন্থাবলীর তালিকাটিও, এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধিকর। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সংযোজন। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। সংকলক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—আটটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বসোরার উজীররা / শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

আলোচ্য নাটকটি পাঠকের চিত্তে কিছুটা বিস্ময় বহন করে আনবে, যখন তাঁরা এর রচয়িতার নামটি অবলোকন করবেন। শ্রীঅরবিন্দকে আমরা জানি বিপ্লবী মহানায়করূপে, জ্ঞানী দার্শনিকরূপে ও মহাতাপস রূপে কিন্তু এ সমস্তের অন্তরালেও যে রয়েছেন এক রসিক সাহিত্যস্রষ্টা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নেই আমাদের। আলোচ্য নাটকটি তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের রচনা, রম্য ও রাগে এই নাটকটি পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে যেতে হয়, উজীর-নাজির, বাদশাজাদী, জল্লাদ, মুণ্ডচ্ছেদ ইত্যাদি নিয়ে পুরোপুরি আরব্য উপন্যাসের পরিবেশ, আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে এর রচয়িতাই শ্রীঅরবিন্দ। নাটকটি রোমাঞ্চকর ও গতিময়, নানান রসের ফুলঝুরি কেটে পঞ্চমাংকে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিপ্রতিম শ্রীঅরবিন্দও যে একদিন রোমান্টিক ছিলেন, এই নাটকটি তারই স্বাক্ষরবাহী। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শ্রীঅরবিন্দ, প্রকাশনা—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।
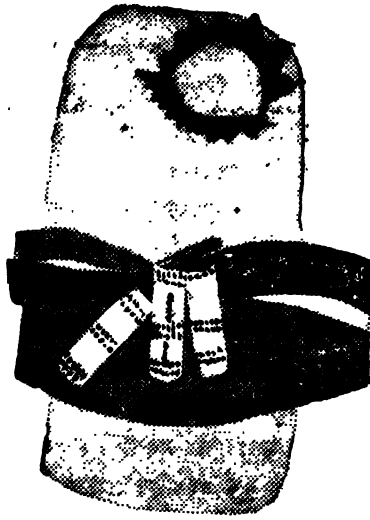
সাহিত্য পরিচয়

অনবগুণ্ঠিতা / ডি এম লাইব্রেরী

জনপ্রিয়া লেখিকার সাম্প্রতিক এই উপন্যাসটি হাতে পেয়ে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। কাহিনী অতিশয় চিত্তাকর্ষক, অকৃতদার হৃদয়বান প্রৌঢ় চন্দ্রভূষণ, একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র, তবু তাঁর পরিণত বয়সের প্রেমকে মেনে নিতে পারে না স্বজনবর্গ; নিন্দা বিদ্রূপের ঢেউ খেলে যায় চারদিকে। প্রাকৃত বোধ করেন চন্দ্রভূষণ তবু বোঝেন না কেন এ অকস্মাৎ তালভঙ্গ, ভালবাসা কেন পাপ হবে। অবশেষে সব সমস্যার সমাধান হয়, পীড়িত চন্দ্রভূষণ-এর শয্যা স্পর্শে অচল ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। চম্পা প্রেমিকা আত্মপ্রকাশ করে সকলের চোখের সামনে কল্যাণী দয়িতারূপে। অপূর্ব মুন্সিয়ানার সঙ্গে ঘটনার জাল বুনেছেন লেখিকা, উপন্যাসের পরিণতি রীতিমত চমকপ্রদ, সেই সঙ্গে আছে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। বইটি পড়ে আমরা সুখী হয়েছি। প্রচ্ছদ ঝলমলে, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা—আশাপূর্ণা দেবী, প্রকাশনায়—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লোকারণ্য / আনন্দ পাবলিশার্স

বেশ একটি আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় গ্রন্থোক্ত কাহিনীর মাঝে। চরিত্র চিত্রণে ও নিপুণ লেখক, সবিতা মাধুরী, অতুল, গণপতি, অসীম প্রভৃতি সব চরিত্রই আপনাপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। পুরোনো দিনের রীতি আশ্রয়ী হলেও বইটি পড়তে ভাল লাগে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—প্রফুল্লকুমার সরকার, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা।

বাঙ্গালী জীবনে রমণী / মিত্র ও ঘোষ

আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তুতে যে বৈচিত্র্য আছে সর্বপ্রথম তাতেই দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়। বাঙ্গালী নর-নারীর ব্যক্তিগত মানসিক সম্বন্ধই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখক খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী, স্বভাবতই তাঁর রচনায় বুদ্ধির দীপ্তি লক্ষণীয় [illegible]

সেজন্য যে রচনা হৃদ্য হয়ে ওঠে নি তা নয়; বরং বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়াবেগ, মনীষার সঙ্গে আন্তরিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে রচনার মাঝে। ব্যক্তি হিসাবে নরনারীর মধ্যে যে নিবিড় ও বিশিষ্ট মানসিক সম্বন্ধ বর্তমান, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিশদ আলোচনা করেছেন লেখক। তবে, আলোচনার বিষয়বস্তুর আবেদন সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন হলেও, বাঙ্গালী জীবনের একটা বিশেষ যুগে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক যে নির্দিষ্ট রূপ ধরে ছিল তারই পরিচ্ছন্ন বিবরণ প্রদত্ত এই রচনার মাধ্যমে। বইটির বিষয়বস্তুকে কালের সীমারেখার মধ্যে ধরতে হলে বলা যায় যে এই কাল বিগত দেড়শত বৎসর। বস্তুত এই কাল আবার বাঙ্গালীর যুগজীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের কাল; সুতরাং একদিক থেকে এই রচনাটিকে বাঙ্গালী জীবনে ইউরোপীয় প্রভাবের ইতিহাসে একটি পরিচ্ছেদও বলা যেতে পারে। বাঙলা প্রাবন্ধিক ও গবেষণামূলক সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সংযোজন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---নীরদচন্দ্র চৌধুরী, প্রকাশক---মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---দশ টাকা।

যে কথা বলা হয় নি / প্রকাশ ভবন

প্রখ্যাত সাহিত্যিকারের এই স্মৃতিচারণমূলক রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী ছিল এন. টি অর্থাৎ নিউ থিয়েটার্স সংস্থা একদিন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আলোড়ন জেগেছিল এই সংস্থার যুগান্তকারী চিত্রগুলির আবির্ভাবের ফলে। আজ এই প্রতিষ্ঠান আর নেই, কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এন. টি এই নামটি অবিস্মরণীয় হয়েই থাকবে। সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমা শিল্পের ওপরও লেখকের ছিল তীব্র আসক্তি এবং তারই তাড়নার একদিন তিনি নিউ থিয়েটার্সে ঢুকেছিলেন সেলুলয়েডের ওপর গল্প লেখবার রীতিপদ্ধতি শেখবার জন্য, আলোচ্য রচনা সেই দিনগুলিরই ডায়েরী-বিশেষ। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কাহিনী অতি মনোরম ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। ছোট ছোট স্মৃতির টুকরোগুলি তাঁর যাদুকরা লেখনীর স্পর্শে হয়ে উঠেছে হৃদ্য ও মর্মস্পর্শী। আমরা বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনা---প্রকাশ-ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---ছয় টাকা।

পশু ও প্রেমিক / গ্রন্থম্

বর্তমান সমাজ জীবনের নিদারুণ অবক্ষয়ের পরিষ্কার ছবি এঁকেছেন লেখক বর্তমান রচনার মাধ্যমে। খ্যাতনামা লেখক নরহরি আচার্য এসে বাসা বাঁধলো একদিন হঠাৎ বড়লোকদের পাড়ায়, বালিগঞ্জের এই অঞ্চলটি সেদিনও ছিল জঙ্গলাকীর্ণ কিন্তু এখন এর রূপ পাল্টে গেছে, সেই সঙ্গে পাল্টে গেছে বুঝি মানুষগুলিও বিকৃত যৌবনের ক্ষুধায় তারা সতত চঞ্চল, আর তা না হলে ক্লাস এইট অবধি পড়া জোয়ান ছোকরা লাট্টুরই বা চলত কি করে? পাড়ার রীণা পাল, প্রগতি সেন, প্রমুখায় যৌবনজ্বালা মেটা-নোটাই তো ইদানীং তার পেশা। আঁটসাঁট জোয়ান ছেলেটার ক্ষিদে খুব আর সে ক্ষিদে নেহাৎই পেটের দেহের নয়; তাই বুঝি শক্তসমর্থ দেহটাকে ভাড়া খাটাতে হলেও লাট্টুর ভেতরে ছিল একটি প্রেমিকের সত্তা বন্ধ্যা এক নারীর মাতৃত্ব-কামনা মেটানোর পর নিজেকে নিজেই বুঝি চিনতে পারে না লাট্টু, সব কিছু ছাপিয়ে কি জেগে উঠতে চাইছে আজ তার মনের ভেতর, একেই কি বলে প্রেম? নিজের ঔরসজাত ছোট্ট শিশুর কোমল বাঁধনে ধরা পড়ে গেল লাট্টু, এক অপূর্ব প্রশান্তিতে ভরে উঠল ওর মন, আর না এবার ও ঘর বাঁধবে। আর পশুর প্রেমিক হয়ে ওঠা দেখতে দেখতে ঘর ছাড়লো নরহরি আচার্য। বইয়ের কাট্‌তি বাড়ানোর চেয়ে যে জীবনের দাবী অনেক বড়, এ সত্য এতদিনে হৃদয়ঙ্গম হল তার। লেখকের মননশীলতায় রচনাটি উদ্দীপ্ত, তাঁর বৈশ্লেষণিক দৃষ্টিভঙ্গী সত্যই অনবদ্য, বোদ্ধা পাঠকমাত্রই বইটি হাতে পেয়ে সুখী হবেন। প্রচ্ছদ রুচিশীল, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---দীপক চৌধুরী, প্রকাশক---গ্রন্থম্, ২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম---পাঁচ টাকা।

স্বরচিত দৃশ্যান্তর / মানস প্রকাশনী

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি সুখপাঠ্য। কবির আন্তরিক প্রত্যয়ের আভাসে কবিতাসমূহ উজ্জ্বল, ভাষা-রীতিতেও বলিষ্ঠতার ছাপ আছে। কয়েকটি কবিতার ভাষা আশ্চর্যরূপেই সোচ্চার, পড়তে পড়তে মনে দোলা লাগে। প্রচ্ছদ রুচিস্মিত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনা---মানস প্রকাশনী, ৯৩।১।এ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---দুই টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস । প্রকাশ ভবন

আলোচ্য গ্রন্থটিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মত সাহিত্যের ইতি-হাসেও একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রয়োজন আছে সেজন্যই প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক এই তিনভাগে একে ভাগ করে নেওয়া সঙ্গত। বর্তমান গ্রন্থে ইংরাজ আমলের প্রথম যুগ থেকে আজ অবধি বাঙলা সাহিত্য যে পরীক্ষা-নিরী-ক্ষার মধ্য দিয়ে একটা পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে তাকেই তার আধুনিক যুগ বলে বর্ণনা করেছেন লেখক। সাহিত্যের সব কটি বিভাগ নিয়েই

আলোচনা করেছেন লেখক এবং তাঁর মতে বাংলা ভাষায় সুকুমার সাহিত্যের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, সারবান সাহিত্যের উন্নতি ততটা হয় নি। বোদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসু এই উভয়বিধ পাঠকই এই বইটি হাতে পেয়ে আনন্দ লাভ করবেন বলে মনে করি। আমরা গ্রন্থটির সাফল্যকামী। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—প্রকাশ-ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

আমার জীবন (ষষ্ঠ খণ্ড)

স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের আত্মকথামূলক রচনার এই নবতম অধ্যায়টি হাতে পেয়ে ভক্ত পাঠকমাত্রই খুসী হয়ে উঠবেন। পূজ্যপাদ মহাত্মা দরবেশজী মহারাজের সঙ্গে গ্রন্থকারের যে কি অসীম স্নেহসম্বন্ধ বর্তমান ছিল, আলোচ্য রচনার ছত্রে ছত্রে তারই পরিচয় বিধৃত। আত্মজীবনী লেখা সাতিশয় কষ্টসাধ্য কর্ম, অনেক সময়ই লেখককে এজন্য আত্মপ্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়, বর্তমান গ্রন্থের লেখক অন্তত এ দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। কথক—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, লেখিকা—শ্রীভারতী দেবী, প্রকাশনা—সদগ্রন্থ প্রকাশনী, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম, পো: রামচন্দ্রপুর আশ্রম, ভায়া—আদ্রা, পুরুলিয়া, দাম—দুই টাকা।

কালপুরুষ

আলোচ্য বইটি এক কাব্য-সংকলন। গুটিকয়েক দীর্ঘ ও হ্রস্ব কবিতা সংগৃহীত হয়েছে এতে। কবির দৃষ্টিভঙ্গী অকপট, তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা সহজেই বলেছেন এবং এটাই এই কাব্যগুচ্ছের পক্ষে বলবার মত সবচেয়ে বড় কথা। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, লেখক—রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—নরেশ ভট্টাচার্য, ৫, চেতলা রোড, কলিকাতা-২৭, দাম—এক টাকা।

ঝরাপাতার ঝাঁপি / আনন্দ পাবলিশার্স

রম্যরচনা জাতীয় রচনার মূলে সত্য থাকলে সেটা যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে, বর্তমান রচনাটি তারই জলজ্যান্ত উদাহরণস্বরূপ। লেখক স্মৃতিচারণ করেছেন, অতীতের কত সরস ব্যক্তিত্ব কত উল্লেখ্য ঘটনা যা নাকি একদা ছাপ ফেলেছিল তাঁর মননে, তার থেকেই কিছু চয়ন করে পরিবেশন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর শৈলী যেমন সরস তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ. চরিত্র সৃষ্টিতেও সিদ্ধহস্ত তিনি—ভোম্বলদা চরিত্রটি তো প্রায় অবিস্মরণীয়। বইটি পড়ে নেহাৎ গম্ভীরানন ব্যক্তির ঠোঁটের কোণেও যে একটুকরো হাসি বিদ্যুৎ-এর ঝিলিকের মত ভেসে উঠবে; সে বিষয়ে আমরা নি:সন্দেহ। প্রচ্ছদ সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—সাগরময় ঘোষ। প্রকাশনায়—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা।

দান্তে, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ / ডি এম লাইব্রেরী

পৃথিবীর তিন মহাকবি দান্তে, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। এঁদের ধ্যান ধারণা ও কর্ম-সাধনার সংক্ষিপ্ত অথচ পরিচ্ছন্ন পরিচয়ের তুলাদণ্ডে বিচার করে আপন বক্তব্যকে পেশ করেছেন লেখক। গবেষণামূলক রচনা হিসাবে এটি সমাদৃত হওয়ারই যোগ্য। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সুরজিৎ দাশগুপ্ত, প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম পাঁচ টাকা।

হারেম / আনন্দ পাবলিশার্স—

'হারেম' আধুনিক সভ্যতার চরম অগ্রগমনের মুখেও যে নাম শুনলে চমক জেগে ওঠে মনে, জেগে ওঠে অদম্য কৌতূহল, এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত না বিস্ময়, কত না আকর্ষণ। হারেম অর্থাৎ অবরোধের নারীদের বাসস্থান, শব্দার্থে নিষিদ্ধ স্থান। মুসলমান ও তুর্কী সুলতানদের হারেমের রহস্য আজও সর্বাংশে উদ্ঘাটিত হয় নি; তবু যেটুকু হয়েছে তার বিবরণ বড় কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। আলোচ্য গ্রন্থে হারেম সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন লেখক, তাঁর রচনা-কৌশলে বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে রহস্য কাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর। গ্রন্থটির ভাবমূল্যও যথেষ্ট, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটিকে প্রামাণ্য বলাটাও অসঙ্গত নয়। প্রচ্ছদ ইঙ্গিতময়, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রী পান্থ, প্রকাশনা—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, দাম—পাঁচ টাকা।

একজন আর কয়েকজন / ডি এম লাইব্রেরী

বাঙলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল রত্ন স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ করেছেন লেখক বর্তমান রচনায়। সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ যে মানুষ হিসাবেও কত বড় ছিলেন, এই রচনায় তার স্বাক্ষর মেলে। বস্তুত এ কাহিনী যে পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা তা নয়, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে উপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা যেভাবে প্রতিবিম্বিত তাই ধরা পড়েছে এই কাহিনীর ছত্রেছত্রে। লেখকের আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধায় কাহিনী হয়ে উঠেছে একাধারে রসোত্তীর্ণ ও আকর্ষণীয়। বইটিতে কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়ে যা রীতিমত পীড়াদায়ক। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি, লেখক—অনিলকুমার ভট্টাচার্য, প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—চার টাকা।

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের গ্রন্থাবলী / বসুমতী

বাংলা তথা সমগ্র ভারতের আইন জগতের একটি বিশিষ্ট নাম নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। আইন জগতের ন্যায় বাংলার সাহিত্য জগতেও নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের নাম সুপরিচিত, তা বলাই বাহুল্য। তাঁর মনোজ্ঞ ও সুখপাঠ্য রচনাসম্ভার পাঠকদের বহুল পরিমাণে আনন্দ ও তৃপ্তি দানে সক্ষম। উপন্যাস রচনায় শ্রীদাশগুপ্ত যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার যোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থটিতে শ্রীদাশগুপ্তের দুটি সুবৃহৎ ধ্রুপদী উপন্যাস সংযোজিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উপন্যাস 'সুশান্ত শা' পাঠকদের মনে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এবং পাঠকবৃন্দ কতৃক অভিনন্দিত হয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে 'সুশান্ত শা' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। দ্বিতীয় উপন্যাস 'নীল শাড়ী' ও শ্রীদাশগুপ্তের অনবদ্য ও মনোরম সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁর রচনার সাবলীলতা এবং মাধুর্যমণ্ডিত বাচনভঙ্গি পাঠকমনকে গভীরভাবে স্পর্শ করবে। রচনার প্রতি ছত্রে ছত্রে লেখকের বলিষ্ঠতার ছাপ বিদ্যমান। রচনার গতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। লেখক মুন্সিয়ানার সঙ্গে তাঁর বিরাট কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছেন বলেই মনে হয়। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। লেখক—শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, বার-এ্যাট-ল'। প্রকাশক—বসুমতী সাহিত্য মন্দির (বসুমতী প্রাঃ লিঃ), ১৬৬ বিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দশ টাকা মাত্র।

ধূসর সংরাগ / ডি লাইট বুক কোং

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প-সংগ্রহ। মোট ছয়টি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এতে। গল্প লেখার আর্ট লেখকের অধিগত, স্বল্প পরিসরে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করতে পেরেছেন তিনি। গল্পগুলি পড়তে ভালই লাগে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—সুনীল রায়, প্রকাশক—ডি লাইট বুক কোং,১৭৩৩, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম—তিন টাকা।

বানপ্রস্থ

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বানপ্রস্থ কি এবং বাণপ্রস্থী কে? কখন বানপ্রস্থে যাওয়া উচিত? বানপ্রস্থে কারা যেতে পারে, সবাই কি বাণপ্রস্থী হবার উপযুক্ত? এই সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা মূলক প্রবন্ধ পত্রিকা। পঞ্চাশোর্ধ বয়সের মানুষকে নিয়েই এই পত্রিকা। অর্থাৎ শেষ বয়সের জন্য এই পত্রিকার ক্রিয়া-কর্মও উদ্যোগ। লিখেছেন: শ্রীমৎ ডঃ মহানুতনাথ ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণিতোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, অধ্যক্ষা ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রী নিঃ, অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী প্রভৃতির মূল্যবান প্রবন্ধগুলি এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। পত্রিকার প্রসার কামনা করি। সম্পাদক: শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, বানপ্রস্থ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা মাঘ। পি ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলি: ৩২ হতে প্রকাশিত। দাম: পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

ধীরে বিস্ফোরণ / মানস প্রকাশনী

বর্তমানে কাব্য গ্রন্থের প্রকাশনা আগের চেয়ে অনেক বেশী, মনে হয় কবিতার পাঠক সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এটা সত্যই শুভলক্ষণ, আলোচ্য গ্রন্থটিও এই জাতীয়। এ গ্রন্থের কবিতাগুলি আধুনিক হলেও দুর্বোধ্য নয়, কাব্যপ্রিয় পাঠক সহজেই এগুলির মর্মোদ্ধার করতে পারবেন। কবি তাঁর বক্তব্যে অকপট ও আন্তরিক। আঙ্গিক উল্লেখ্য। লেখক—সত্যব্রত ঘোষাল, প্রকাশনা—মানস প্রকাশনী, ৯৩।১এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দেড় টাকা।

এক্কাদোক্কা*ন

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটিতে আছে কিছু প্রবন্ধ গল্প এবং কবিতা প্রভৃতি। লেখাগুলি যথেষ্ট মূল্যবান সন্দেহ নাই। তা ছাড়া কবিতাগুলি বেশ আধুনিক ভাবধারায় লিখিত। প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, অনিতা গুপ্ত। গল্প লিখেছেন আশা দেবী এবং শান্তি দাশগুপ্ত। কবিতা লিখেছেন—মনীশ ঘটক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কাজল ঘোষ, ইরা সরকার, রবীন সুর, মনুজেশ মিত্র, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অমর বসু, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, শিবানী সেন, কুমকুম দে। সম্পাদনায় আছেন: কুমকুম দে। পত্রিকাটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। মাঘ—আষাঢ় সংখ্যা। দাম: ৫০ পয়সা। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ থেকে প্রকাশিত।

নীল চিঠি / সুরভি প্রকাশনী

কাহিনী খুব সাধারণ ও সহজ হলেও, মেয়েদের সর্বাধিক প্রচলিত পেশা শিক্ষিকা জীবনের এক পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠেছে আলোচ্য রচনার মাধ্যমে। মনে হয় লেখিকা এই জীবনটাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। শিক্ষাদানের মত মহৎ বৃত্তির অন্তরালেও যে কত পাপ কত অবিচার লাঞ্ছনার ইতিহাস লুকিয়ে থাকতে পারে বইটি পড়লে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। লেখিকার দৃষ্টি রোমাণ্টিক, সুদর্শনা ও নিখিলেশের মিলন ব্যাপারটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তবে তাঁর লেখনী যে ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরবাহী একথাও অনস্বীকার্য। ছাপা ও বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক সাধারণ। লেখিকা—আশা দেবী, প্রকাশনা—সুরভি প্রকাশনী, ১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—তিন টাকা।

বঙ্কিম সাহিত্যে সমাজ ও সাধনা

লেখক মহাশয়, লিখিত আলোচ্য বঙ্কিম সাহিত্য সমাজ ও সাধনা গ্রন্থখানি সেদিক থেকে একটি আদর্শ এবং মূল্যবান গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইবে। বঙ্কিম সাহিত্যের আস্বাদনের জন্য বঙ্কিমের নিজের সাহিত্য রচনা পাঠ করা যেমন পাঠকের কাছে অপরিহার্য, তেমনি বঙ্কিম সাহিত্যের আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের মূল্যায়ন করার জন্য আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙালী পাঠকের সমান আদরণীয় হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। লক্ষণীয় যে, অযথা পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করা হয় নাই। বঙ্কিমের পরিমিত জীবনের মতন এই গ্রন্থের কলেবরও পরিমিত (২৩৫ পৃষ্ঠার)। কিন্তু এরই মধ্যে গ্রন্থকার অত্যন্ত সুনিপুণ পরিকল্পনার সাহায্যে অত্যন্ত প্রাণবন্তরূপে সমগ্র বঙ্কিম-যুগকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থকার কিছুই বলিতে বাকি রাখেন নাই তবে আবার কোথাও মাত্রা ছাড়াইয়াও যান নাই। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, গ্রন্থটির পরিকল্পনা অত্যন্ত সুন্দর পনেরটি পরিচ্ছেদে ইহাকে ভাগ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে এই গ্রন্থে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির ধারাবাহিক ও তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমসৃষ্ট নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া বঙ্কিমের সৃষ্টির বিচিত্রিতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিম ও বঙ্গভাষার আলোচনা প্রসঙ্গেও এই গ্রন্থের আরেকটি মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আশা করি শিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী এবং সমাজসচেতন পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থটি তার যোগ্য সমাদর লাভ করিবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখকরা প্রয়োজন যে, যদিও গ্রন্থটির মুদ্রণ, বাঁধাই ও তার প্রকাশন-পারিপাট্য খুবই---ইহার সুলভ কোন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে হয়ত বঙ্কিম সম্পর্কে এই অবশ্যপাঠ্য পুস্তকখানি সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে আরও সহজসাধ্য হইবে। লেখক—শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট ল্যং ম্যানস, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩, দাম—দশ টাকা।

খুনী তরুণী / ক্লাসিক প্রেস

অপরাধমূলক কাহিনীর বয়নে লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সচরাচর গোয়েন্দা কাহিনীতে যতটা অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে এতে তা অনুপস্থিত। আপাতদৃষ্টিতে অপরাধী বলে মনে হলেও, এক নির্দোষ তরুণীকে আইনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যারিস্টার সঞ্জীব চৌধুরী যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন তা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক, কোর্টের দৃশ্য বর্ণনায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। মোটের ওপর সুপাঠ্য এক রচনা হিসাবেই আদৃত হওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---সুরঞ্জন সেন, পরিবেশক---ক্লাসিক প্রেস, ৩।১ এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দাম—সাত টাকা।

নেপালী শিল্পকলা

ডক্টর অ্যালফ্রেড রুপের উদ্যোগে সম্প্রতি এসেন শহরে খৃষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপালী শিল্পকলার এক বিরাট প্রদর্শনী চলেছে। নেপালী শিল্পে স্বভাবতঃই বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের ছাপ বিদ্যমান। প্রদর্শনীর মধ্যে দর্শকদের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বুদ্ধের জন্মবৃত্তান্তমূলক নবম শতাব্দীর একটি নীলাভ-ধূসর চূণাপাথরের চৌবল ও পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন একটি ব্রোঞ্জের অপূর্ব সুন্দর বৌদ্ধমূর্তি।

আরনাল্‌দো ফ্রাতেইলি

নৈশভোজের সময় হোটেলে ফিরে গেল লরেনসো। পর্যটনে ক্লান্ত এবং মৃত্যু-চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। ঘরে ঢোকবার সময় দেখতে পেল অধিকাংশ পর্যটকরাই নৈশভোজনে বসে গিয়েছে। সেও তাদের অনুসরণ করবে বলে স্থির করল।---অত্যুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত কক্ষটি থিবের সমাধিস্থানগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিল---যে সমাধিস্থানগুলি সে দিনেরবেলায় ঘুরে দেখে এসেছে। এই একই রকম তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত দেয়ালচিত্রগুলি নিঝুম পাহাড়ের অভ্যন্তরে দেখতে পেয়েছিল। চিত্রগুলি ছিল ভোজন দৃশ্যের---কতগুলি নিশ্চল মূর্তির সামনে সাজানো ছিল ভোজ্যবস্তু অনন্তকাল ধরে। --- এই মৃতের জগতে নিজেকেও মৃত বলে মনে হয়েছিল।---মিশর ভ্রমণ ব্যর্থ হয়েছে তার। ভেবেছিল বিদেশীদের সঙ্গে মন্দির আর সমাধিস্থানগুলি পরিদর্শন করে আবার জীবনের ছন্দ খুঁজে পাবে---কিন্তু কি মূর্খ সে।---স্থির করল কালই ইটালীতে ফিরে যাবে।---

হোটেলের একজন জার্মান পরিচারক একটু হেসে লরেনসোকে উৎসাহিত করল।-- নির্জনতা চেয়েছিল সে কিন্তু তাও শেষে অসহ্য মনে হল।---পরিচারক চুপি চুপি বলল--- 'দু'জন ইটালীয়ান মহিলা এসেছেন। আমি আপনার পাশের টেবিলেই তাঁদের বসবার ব্যবস্থা করেছি।'

লরেনসো পাশে চেয়ে দেখল।

'এখনও তাঁরা নেমে আসেন নি। ফ্লোরেন্স থেকে এসেছেন মা আর মেয়ে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে? তাঁরা আপনার পাশের ঘরেই আছেন।'

'আমি কালই ইটালীতে চলে যাচ্ছি।' বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলল লরেনসো।

খিদে ছিল না শুধুও খাচ্ছিল লরেনসো। ---এক বছর আগে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে কোন নারীর প্রতি আর তার কোন আকর্ষণ ছিল না। এই নারীই তাকে শিখিয়েছিল ভালবাসা কি জিনিস বুঝতে এবং এই একটিমাত্র নারীকেই সে সত্যিই ভালবেসেছিল। ---তার মৃত্যুর সঙ্গেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে।---সর্বস্ব দিয়েছিল স্ত্রীকে পরিবর্তে পেয়েওছিল সব।---একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে---বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হয়।---তার চতুর্দিকে কোন বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গে লীনা সামনে এসে দাঁড়ায়।---জগৎ এবং তার মধ্যিখানে যেন একটা মৃত্যুর পর্দা ঝুলছে।---বিস্মিত হয়ে দেখে যে জগৎ আজও আবর্তিত হয়ে চলেছে ঘৃণা ও যন্ত্রণাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে।---হাঁপিয়ে ওঠে সে। লোরেনসো হোটেলের অপরিচিত আগন্তুকদের লক্ষ্য করেছে এবং তাদের সঙ্গে একই ধরণের জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। এদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র কলের পুতুলের মত অভিবাদন জানানো। এই মানুষগুলি তার কাছে প্রাণহীন বলে মনে হয়েছে।---

শুভ্রকেশ ঐ ফরাসী চিত্রকরকে দেখলেই গা জ্বলে যায় লরেনসোর। কেন আমেরিকান ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে অত চেঁচিয়ে কথা বলছে?---অসহ্য। ---যখন টেবিল ছেড়ে চলে যাবার উদযোগ করছে এমন সময় মনে হল দু'টি ছায়ামূর্তি

লঘুপায়ে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। লরেনসো বুঝতে পারল পাশের টেবিলটাও আর খালি নেই। আড়চোখে নবাগতদের দিকে দৃষ্টিপাত করল।--মুখাবয়ব দেখলে মনে হয় একই পদকের দুটি সংস্করণ---একটি নতুন, অপরটি কিছু পুরোন। নিঃসন্দেহে তাঁরা মা আর মেয়ে। মায়ের বয়স পঞ্চাশের বেশী হবে না। কাঁধ দু'টি বেঁকে গিয়েছে। চোখের নিচে দেখা দিয়েছে বার্ধক্যের কুঞ্চিত রেখার জাল। অপরদিকে মেয়েটি তার পঁচিশ বছরের পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর।---সেই মুহূর্তে লরেনসোর মনে হল পঞ্চাশ বছর পর এই মেয়েটিরও কালো চুলগুলি মায়ের মত সাদা হয়ে যাবে এবং কাঁধ দুটিও বেঁকে যাবে।---কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই লরেনসো মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল ফলে একটা আঘাতও পেল। লীনার সঙ্গে মেয়েটির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।---একটা তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করে লরেনসো।---

কেউ তাকে লক্ষ্য করছে মনে হওয়াতে মেয়েটি লরেনসোর দিকে চাইল---সে দৃষ্টিতে ছিল ঔদাসীন্যের ভাব---অন্তরের কোন ভাবাবেশের প্রকাশ ছিল না তাতে।---মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে নিজের ওপর ভীষণ রাগ হল লরেনসোর। তাড়াতাড়ি উঠে ওপরে চলে গেল। সে জানে রাত্রে ঘুমোতে পারবে না কারণ অনিদ্রা আর ভুয়োদর্শনের রোগী ছিল সে।---ছাতে বসে নীলনদের দিকে চেয়ে মৃদু সান্ধ্য-হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে লাগল।

রোমের মে মাসের মত গরম আর শুকনো আবহাওয়া এখন এই মিশর দেশে জানুয়ারিতে। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নীলনদ, অন্ধকার প্রান্তর, পাম্ গাছ---আর যে পাহাড়গুলিকে দীর্ণ করে অসংখ্য সমাধিস্থানের সৃষ্টি হয়েছে সেই রিক্ত পাহাড়গুলিও।---বিদেশীরা নিচে বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিল স্তব্ধ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সমস্ত হোটেলটা নিঝুম হয়ে গেল।---পাশের ঘরে কে যেন দরজা খুলল এবং বন্ধ করল---কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ হ'ল---তারপরেই সব চুপচাপ।---নিশ্চয় অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। লরেনসো ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।---ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশের ঘরে নড়াচড়ার শব্দ হল। ---মেয়েটি দেরাজ খুলল---হাত ধোবার বেসিনে জল ঢালল তারপর অন্য ঘরে কাকে যেন চেঁচিয়ে বলল---'এমন সুন্দর রাতে আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারব না।' পর মুহূর্তেই শোনা গেল স্বল্পস্থায়ী মিষ্টি চাপাহাসির ঝিলিক।---

---কেঁপে উঠল লরেনসো---শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল---শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল---ঠিক লীনার কণ্ঠস্বর---দুরাগত চাপা কণ্ঠস্বর।---প্রত্যেক দিন সকালে যখন ফোনে কথা বলত ঠিক সেই রকম দুরাগত চাপা কণ্ঠস্বর।---'তুমি?' লরেনসো জিজ্ঞেস করত। 'হ্যাঁ' একটু থেমে জবাব দিত লীনা---বাচ্চাদের মত বলত 'হ্যাঁ'---তারপরেই হেসে উঠত---চাপা স্বল্পস্থায়ী মিষ্টি হাসি।---

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে লরেনসো---ঐ কণ্ঠসূত্রের ওপরই যেন তার সমস্ত জীবনটা ঝুলছে।---পাশের ঘরে নবাগতা মৃদুকণ্ঠে গান গাইছিল যাতে হোটেলবাসীদের কোন অসুবিধা না হয়। লরেনসো সেই গান ভাল করে শুনতে পাচ্ছিল না কারণ প্রতিবেশী চলাফেরা করতে করতে গাইছিল আর তার ফলে কাঠের মেঝেতে কিছু কিছু শব্দ হচ্ছিল।---হঠাৎ গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল মেয়েটি।---এবারে গানের বিষয়বস্তু এবং কথা স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হল---'মরিতে দাও মোরে। নিঠুর নিয়তি, গভীর বেদনায় কোথায় সান্ত্বনা।'---গান যেন তীব্র যন্ত্রণা---ক্রমশ কান্নায় পরিণত হল।---'মরিতে দাও মোরে' এই কথাগুলি তারপরেই আবার শুরু খুশীর গান।--

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল লরেনসো। মধ্যিখানের দরজার চাবির ছিদ্রপথ দিয়ে একঝলক আলোর রশ্মি আসছিল---সেইদিকে চেয়ে রইল।---তার এত কাছে রয়েছে যে মেয়েটি সে লীনা।---লীনার মত লাস্যময়ী।--- এই হাসছে---এই কাঁদছে---আবার কখন ওরা গানের ভেতর দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করছে---ঠিক লীনার মত প্রগলভ প্রকৃতির।---প্রসাধন করতে করতে মেয়েটি জলের শব্দ করছিল। এই জলের শব্দে লরেনসোর মানসপটে ভেসে উঠল জীবনের একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি---শিউরে উঠল সে।---মেয়েটি নিশ্চয়ই লীনা।---আবার তাকে দেখতে হবে।---কাঁপতে কাঁপতে দরজার কাছে এগিয়ে গেল এবং চাবির ছিদ্রপথে চোখ রাখল---অস্পষ্ট আলোয় ঘরের একটা কোণ দৃষ্টিগোচর হল--চেয়ারের ওপর একটা স্যুটকেশ খোলা রয়েছে---আলনায় মেয়েদের পোষাক ঝুলছে। হাত ধোবার বেসিনটা ছিল দৃষ্টিপথের বাইরে---ঠিক দরজার একপাশে। গান শোনা যাচ্ছিল কিন্তু গায়িকা ছিল নেপথ্যে।---হঠাৎ একটা গোলাপী আভা---একটা হাত দেখা গেল---ঠিক লীনার হাতের মত---সেই মুহূর্তেই ঘরের আলো নিভে গেল।---লীনার জন্য তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল লরেনসো। বিছানায় শুয়ে বালিশটাকে কামড়াতে লাগল।---

সকালে প্রাতঃরাশ খেতে গিয়ে শুনল যে ইটালীয়ান মেয়ে দুটি বেড়াতে বেরিয়েছে এবং সম্ভবত নৈশ ভোজের আগে ফিরবে না। সমস্ত দিনটাই শূন্য--ব্যর্থ বলে মনে হল। অস্থিরভাবে এখানে-সেখানে ঘুরল। শেষে প্রতীক্ষার উত্তেজনাকে প্রশমিত করবার জন্য ঘুমোবার চেষ্টা করল। সূর্যাস্তের আগেই আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাগানের

দেখতে গেল। ফরাসী চিত্রকরটি মেয়েটির পোর্ট্রেইট আঁকছিল পেন্সিল দিয়ে। মা একটু দূরে বসে বই পড়ছিল। এই চিত্রকরটির প্রতি তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হল লরেনসোর মনে। ছবি আঁকার ছলে ইতিমধ্যেই সে তিনটি চমৎকার পাখিকে জালে আটকিয়েছে--এইটি হবে চতুর্থ।

ইতিমধ্যে গতরাত্রির ভূয়োদর্শন মিলিয়ে গিয়েছে। লরেনসো জানতে পেরেছে মেয়েটি লীনা নয়। লীনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। কিন্তু মেয়েটির আশ্চর্য কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য এবং মুখের এক অনির্বচনীয় ভাব লরেনসোকে আকৃষ্ট করেছিল।---এখনও তার স্নায়ুতন্ত্রীতে শিহরণ লাগছে।---একটু দূরে বসে লরেনসো মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল। মেয়েটি হঠাৎ নির্বিকারভাবে তার দিকে চাইল। মেয়েটি চিত্রকরের সঙ্গে কথা বলছিল। গতরাত্রে যে কণ্ঠস্বর শুনেছিল এ কণ্ঠস্বর তো সেরকম নয়---পুরুষালী আর কর্কশ।---হাসিটাও অন্যরকম। ---মনে মনে ভাবল তার সঙ্গে যখন মেয়েটি কথা বলবে তখন হয়ত তার স্বাভাবিক মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। এদিকে দু'জন আমেরিকান যুবক এসে মা আর মেয়েকে অন্য হোটেলে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর আবার না শুনে লরেনসো কিছুতেই শুতে পারবে না। হোটেলের বাগানে বসে তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে রইল। শেষে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেল।---উৎকর্ণ হয়ে রইল পাশের ঘরে কোন শব্দ শোনা যায় কি না। কিন্তু চাবির ছিদ্রপথ দিয়ে কোন আলো দেখা গেল না।---মাথা ভার হয়ে উঠল---কেমন যেন সব গুলিয়ে যেতে লাগল---হঠাৎ গোলমাল, কথাবার্তা এবং বারান্দায় লোকজনের চলাচলের শব্দ শুনতে পেল।---সে বুঝতে পারছিল এক উজ্জ্বল আলো তার গায়ে এসে পড়েছে।---চমকে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল-- চোখে তখনও ঘুম লেগে রয়েছে।---বাইরে ছাতে গেল। সূর্য তখন অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছে---বস্তুতপক্ষে সকাল ন'টা তো হবেই।

পাশের ঘরে লীনা গলা ছেড়ে গাইছে।---আগের চাইতেও কণ্ঠস্বর পরিষ্কার এবং মিষ্টি মনে হল।---রুদ্ধ-শ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল লরেনসো। সূর্যের আলো আসবার জন্য নিশ্চয়ই সে জানালাটা খুলে দেবে।---জানালাটা সত্যিই খুলল।---দেখা গেল দীর্ঘ অবিন্যস্ত শুভ্রকেশে আবৃত একটি নারীর মুখ।---মহিলাটি গান গাইছিলেন আর চুল আঁচড়াচ্ছিলেন---কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে টের পেয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন---হেসে উঠলেন---গত রাত্রের মত স্বল্পস্থায়ী চাপা মিষ্টি হাসি।---

---হতভম্ব হয়ে গেল লরেনসো। জিজ্ঞেস করল---'সেদিন রাত্তে আপনিই গাইছিলেন? আমি ভেবেছিলাম আপনার মেয়ে বুঝি।'

'আপনার কি অসুবিধে হয়েছিল?'

'না না---আপনার এত চমৎকার গলা।--' একটু থেমে আবার আবার বলল লরেনসো 'একটা পূর্বস্মৃতি মনে পড়তে একটু কষ্ট পেয়েছিলাম।---আমার ধারণা আপনিও নিশ্চয়ই জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছেন---আপনার সেই গানটা---'মরিতে দাও মোরে---'

'সে তো অনেকদিনের কথা। আমি এখন বৃদ্ধা---নেহাৎ অভ্যাসের বশেই গাই এখনও।'

---চুল আঁচড়ান হয়ে গেলে অন্য ঘরে যাবার উদ্‌যোগ করতেই মনে হল হঠাৎ চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না---তাই জিজ্ঞেস করলেন---'আপনি কি ইটালীয়ান?'

'হ্যাঁ, রোম থেকে এসেছি।'

'এখানে থাকবেন কিছুদিন?'

'না। আজই দুপুরের ট্রেনে চলে যাচ্ছি।'

'মাপ করবেন।---আমার মেয়ে তাড়া দিচ্ছে---চলি।'

'নিশ্চয়ই।'

---জানালাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

অনুবাদক---সুবীরকান্ত গুপ্ত

একটি গোলাপের মৃত্যু

(রবার্ট কেনেডির উদ্দেশ্যে)

সৈয়দ হোসেন হালিম

আবার খুনীর হাতে খুন হোল একটি গোলাপ,
সুন্দর পাপড়ি জুড়ে চাপ-চাপ রক্তের ছাপ
এ-কথা জানিয়ে গেল কদর্য দস্যুর হাত
সুন্দরের গলা টিপে শ্বাস রুধি কখনো হঠাৎ
ভিন্নমুখী করে দিতে চায় মিছে ইতিহাস-নদী,
চায় থাক কালো রাত, অপরাধ-কালো জল আকণ্ঠ অবধি।

তবু কি রাত-ই সব?—রাত কেটে আসে নাকো দিন,
অনেক রক্তের লাল বুকে নিয়ে ফোটে ফের গোলাপ রঙিন।

বা মা ক্ষে পা

দশমহাবিদ্যার অন্যতম তারা। কালীর পরেই হয় তাঁর নামোল্লেখ। তারা মূর্তি নীলবর্ণা, ঘোর দশনা, আলুলায়িত কুন্তলা, উগ্রতার যেন প্রতিমূর্তি। তারা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ সাধারণ বা অল্পক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের ক্ষমতার কাজ নয়। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যে মহাসাধক তাঁর উপরেই প্রসন্নতা ঝরে পড়ে তারামায়ের। সাধক সন্তানের দিকে মা তখন এগিয়ে দেন কৃপাপ্রসন্ন পাণি। উগ্রা, রুদ্রা, ভীষণা জননী তখন সন্তানের কাছে ধরা দেন স্নেহশীলা, করুণাময়ী, দাক্ষিণ্যপ্রদায়িনী মূর্তিতে।

তারা-মা তাঁর করুণাবিমণ্ডিত কৃপায় যে সাধক কুলকে ধন্য করেছেন, সেই তালিকায় একটি চিরনমস্য নাম—বামাক্ষেপা। সাধক বামদেব। মহাসাধক। সারা বাঙলার সাধকমার্গের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ।

বাঙলা দেশের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে বীরভূম এক গৌরবময় অধ্যায় অধিকার করে আছে।

বাঙলার গৌরবময় ইতিহাসের রূপায়ণে বীরভূমের অবদান অনন্য। সুদীর্ঘকালের পরিসরে বীরভূম তার আপন বৈশিষ্ট্যে এবং আপন সম্ভারে বাঙলা দেশের জাতীয় জীবন নানাভাবে ভরিয়ে আসছে।

শক্তি সাধনা এবং বৈষ্ণব সাধনার লীলাক্ষেত্র বীরভূম। এই দুই সাধনার সমন্বয়ক্ষেত্র যেন বীরভূম। এই দুয়ের সমন্বয়ে বীরভূমে বাঙালীর অধ্যাত্মচেতনা যেন অভূতপূর্ব পরিণতি লাভ করেছে। এই বীরভূমের সন্তান বামাক্ষেপা। পুণ্যভূমি তারাপীঠের কাছে আটিলা গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন সাধারণ গৃহস্থ।

১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮) বামাক্ষেপার জন্ম। ১৮৩৮ সালে আরও যে সব খ্যাতিমান পুরুষের জন্ম হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে এই প্রসঙ্গে দুটি নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি নাম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি নাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। বামাক্ষেপার আবির্ভাবের ঠিক দু বছর

জর্জ এ্যালেন

আগে এই ফাল্গুন মাসে বাঙলা দেশের আর একটি চট্টোপাধ্যায় পরিবারে নবরূপে আবির্ভূত হলেন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে।

ছেলেবেলা থেকেই আপনভোলা উদাসীন প্রকৃতি আবার ঠিক তেমনই সরল প্রাণখোলা। বাল্যকালে একদিন আগুনে পুড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। ভ্রূক্ষেপও নেই, মন তখন কোন জগতে কে জানে—এত বড় একটা ফাঁড়া কাটিল, মরতে মরতে রক্ষা পেলেন সে সম্বন্ধে কোন বিকারই নেই।

পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন বামাচরণ। উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটে নি। এদিকে সর্বানন্দের সমস্যা যে শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ তাও নয়। সংসার চালানো রীতিমত অসাধ্য হয়ে ওঠে সর্বানন্দের পক্ষে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, প্রাচুর্য তো দূরের কথা, সাধারণভাবে কোনপ্রকারে দিন গুজরান করাও যেন আর সম্ভব হয় না। দারিদ্র্যের শিকার ব্রাহ্মণ সর্বানন্দের পক্ষে।

যাত্রার দল খুললেন সর্বানন্দ। দলে নিলেন বড় ছেলে বামাচরণ আর ছোট ছেলে রামচরণকে। পৌরাণিক পালা হত। রামায়ণ, মহাভারত থেকে পালার

বামাক্ষেপা

বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হত। অনবদ্য কণ্ঠ ছিল বামাচরণের। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত দর্শকেরা। তাঁর গানে এবং অভিনয়ে এককথায় তারা অভিভূত হয়ে পড়ত। চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন বামাচরণ। অভিনেয় চরিত্র এবং অভিনেতার মধ্যে কোন পার্থক্য আর থাকত না। পৌরাণিক চরিত্র রূপায়ণের সময় সকলে লক্ষ্য করত এক অপার্থিব ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন বামাচরণ। হয় তো বাল্যজীবনের এই ক্ষণকালীন অভিনয়ে ভাবীজীবনের আধ্যাত্মিকতার আভাস এইভাবে ধরা পড়ত।

কোনপ্রকারে দিন গুজরান হচ্ছিল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। দেহ রাখলেন সর্বানন্দ। আবার অথৈ জল। কূল নেই, কিনারা নেই।

সংসারের চিন্তা ছাড়াও বিধবা রাজকুমারীর প্রধান চিন্তা বামাচরণকে নিয়ে। তাকে দিয়ে যে কোনও কাজ করানো যাচ্ছে না। গোচারণের কাজেও প্রমাণ হয়ে গেল তিনি অযোগ্য। মাতুল নিয়ে গেলেন। যদি গড়ে-পিঠে মানুষ করতে পারেন। মাতুলও হাল ছেড়ে দিলেন। ঘরের ছেলেকে রাজকুমারী আবার ঘরে ফিরিয়ে আনলেন।

পরমের চিন্তায় যে আচ্ছন্ন অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শের জন্য যে দিশাহারা, অপরূপের সাধনায় যে আত্মমগ্ন সাংসারিক খুঁটি-নাটি চার দেওয়ালের বেড়াজাল কি তার মন ভরাতে পারে? মন ছুটে বেরিয়ে যায় সেই ভূমার আকর্ষণে।

তারামায়ের মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন এক সহৃদয় প্রতিবেশী। মনের আনন্দে কাল কাটান, বামাচরণ। জগজ্জননীর সন্তান তিনি। সন্তান মাকে ডাকবে, পূজা করবে তার অন্তরের আকুলতায়। প্রথা, নিয়মের বেড়াজাল সে মানবে কেন? অন্তরে তো প্রতিনিয়ত শ্বাসে-প্রশ্বাসে পূজার মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। হৃদয়ে তো নিরত মাতৃবন্দনার আরতি। কিন্তু গতানুগতিক পন্থায় বিশ্বাসীর দল তা মানতে চাইবে কেন? সেখানেও নানা বিপদে পড়তে হয় বামাক্ষেপাকে।

তারা মা স্বপ্ন দিলেন নাটোরের রাণীকে। তাঁর প্রিয় সন্তানের অসম্মান হচ্ছে। সন্তানের বেদনা মায়ের বুকে গিয়ে বাজছে। রাণী ভক্তিমতী। উপলব্ধি করলেন এ সামান্য লোক নয় কড়া নির্দেশ জারী করলেন তাঁর কাজে যেন কোন ব্যাঘাত ঘটানো না হয়। ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনেও এ জাতীয় ঘটনার নজীর মেলে।

সিদ্ধসাধক কৈলাসপতি। তাঁর সাধনার খ্যাতি দিকবিদিকে পরিব্যাপ্ত। কৈলাসপতি শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন বামাক্ষেপাকে। দেখালেন তাঁকে প্রকৃত পথ, দিলেন সেই পথের সঠিক নির্দেশ। মাতৃবিয়োগ হল বামাক্ষেপার। সাংসারিক অবস্থা তখন শোচনীয়তার চরম পর্যায়ে। এদিকে বামাক্ষেপা গ্রামশুদ্ধ লোক নেমন্তন্ন করে বসে আছেন। ছোট ভাই রামচরণ ভেবেই আকুল। দাদা একি পাগলামী করে বসল। এক পয়সার সংস্থান নেই, অথচ এই যজ্ঞির কাজ উঠবে কি করে। দাদা তো বলে খালাস। কিন্তু ঠেলা সামলাবে কে? ---যিনি সামলাবার তিনিই সামলালেন। প্রিয় সন্তানের সৎ ও পুণ্যবাসনা জগন্মাতা কখনও অপূর্ণ রাখতে পারেন না। করুণাময়ী পূর্ণ করলেন সন্তানের কামনা। থরে থরে এসে পৌঁছে গেল খাদ্যদ্রব্য। কোথা থেকে এল তা রহস্যই রয়ে গেল। এখানেই শেষ নয়। নামল মুষলধারায় বৃষ্টি। জল, ঝড়, দুর্যোগ। চতুর্দিকে প্রলয় চলছে, অথচ শ্রাদ্ধমণ্ডপ এবং তার সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলঝড়ের চিহ্ন নেই। শান্ত, প্রসন্ন আবহাওয়া।

পণ্যা-রমণীকে পাঠান হল সিদ্ধ সাধকের কাছে। প্রলোভনে বশীভূত করার জন্যে, কে বশীভূত হবে, জলন্ত অগ্নি? সেই আগুনে পথভ্রষ্টা নারীর যা কিছু পাপ, মালিন্য আবিলতা, ধুয়ে মুছে ছারখার হয়ে গেল। সাধকের আশীর্বাদ নিয়ে অমৃতদীপ্তিতে বিকশিত হয়ে সে ঘরে ফিরে গেল।

জমিদার জপে বসেছেন নদীতীরে। মালা জপে চলেছেন চোখ দুটি বন্ধ করে। দিলেন ক্ষেপাবাবা তার জপ ভণ্ডুল করে। চটে আগুন জমিদার। ক্ষেপাবাবা জবাব দিলেন---জপ করছ তো মনে মনে চীনে কোম্পানীর জুতোর চিন্তা কেন? জমিদারের মুখে আর কথা নেই।

প্রিয় সারমেয়দের নিয়ে প্রসাদ খাচ্ছেন ক্ষেপাবাবা। একদল শিক্ষিত যুবকের নাক উঁচু হল। অন্তর্যামী ক্ষেপাবাবার তা বুঝতে বাকী রইল না। তক্ষুণি মুহূর্তের জন্য যুবকরা দেখল যে ঐ সারমেয় দুটির মুখেই মানুষের মুখ আর তাদের প্রত্যেকের মুখে এক একটি জন্তু-জানোয়ারের মুখ। পরমুহূর্তেই আবার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এল। হঠকারিতার সমুচিত উত্তর পেয়ে গেল মদগর্বী যুবক সম্প্রদায়।

কত অনাথ-আতুরের কল্যাণ করেছেন, কত মৃত্যুপথযাত্রীদের বাঁচার জগতে, কত ভ্রান্ত পথিকের ঘুরিয়ে দিয়েছেন মোড়। তাঁর অসংখ্য কৃপাপ্রাপ্তদের মধ্যে দ্বারভাঙার মহারাজা এবং রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অন্যতম।

সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ। এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন বশিষ্ঠদেব। সেই পীঠ আজও ভক্তমানবের হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে সাধকশ্রেষ্ঠ বামাক্ষেপার মাহাত্ম্যে।

১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ (জুলাই ১৯১১) মহাসমাধিতে বিলীন হলেন সাধকশ্রেষ্ঠ পরম পূজ্য বামাক্ষেপা।

প্রশ্ন সম্বন্ধে

॥ পাঠিকারা পড়বেন না ॥

● অমৃত, পাটনা ১---

প্রশ্ন ১ : কারও দাড়ি-গোঁফ বয়সের তুলনায় তাড়াতাড়ি বেরোয়, কারও বা দেরিতে বেরোয়, কেন?

উত্তর : গোঁফ দাড়ি বার হয় পুরুষজনিত হর্মোনের প্রভাবে। এই হর্মোন কারুর শরীরে তাড়াতাড়ি নিঃসৃত হয়, কারুর বা দেরিতে হয়। সেইজন্যে কারুর তাড়াতাড়ি বেরোয়, কারুর দেরিতে বেরোয়।

প্রশ্ন ২ : (ক) গোঁফ ও দাড়ি ঠিক কত বয়সে বেরোয়? (খ) মেয়েদের চেয়ে পুরুষের গায়ে অত লোম হয় কেন?

উত্তর : (ক) সাধারণত তেরো থেকে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে বেরোয়, তবে কয়েক বছর দেরি হয়। আমারই গোঁফ-দাড়ি বেরিয়েছিল চব্বিশ বছরে। এখন রোজ না কামালে চলে না। (খ) পুরুষের লোম বেশি বেরোয় না, তবে বেশ পুরু হয়, আর তা হয় পুরুষজনিত হর্মোনের প্রভাবে।

● শ্রীপ্রিয়রঞ্জন নাথ, খুজুটিপাড়া, বীরভূম---

প্রশ্ন : শরীরকে প্রকৃত বলবান ও স্বাস্থ্যবান করতে গেলে কি কেবল ব্যায়াম আসন দরকারী?

উত্তর : না। তার সঙ্গে পেটভরে খাওয়া ও ভাল চিন্তা করা।

● শ্রীপ্রবীর নাথ, খুজুটিপাড়া, বীরভূম---

ঐ প্রশ্ন, ঐ উত্তর---

● শ্রীভাগবত চক্রবর্তী, যতীন দাস নগর, বেলঘরিয়া, কলি-৫৬---

প্রশ্ন ১ : আমি ছোটবেলা হইতে কফ ও কাশিতে ভুগিতেছি।

উত্তর : আপনি নিয়মিতভাবে দুবেলা (সকাল-সন্ধ্যা) চা চামচের দু চামচ করে Pulmocod, (Plain) খাবেন।

প্রশ্ন ২ : ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়।

উত্তর : আপনি মাঝে মাঝে মেডিকেল কলেজে দেখিয়ে নেবেন, আর সহজপাচ্য খাদ্য খাবেন। দুপুরবেলায় অন্তত দু ঘণ্টা শুয়ে বিশ্রাম করবেন।

● শ্রীমাখনলাল সরকার, আদর্শপল্লী, পাণিহাটি, ২৪ পরগণা---

প্রশ্ন : বহুদিন থেকে সায়াটিক নামক রোগে ভুগিতেছি।

উত্তর : আপনি একদিন অন্তর Tri Redisol H 1000 mcg ১ এম, এল করে ইণ্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন নেবেন, অন্তত পনেরোটা ইনজেকশন।
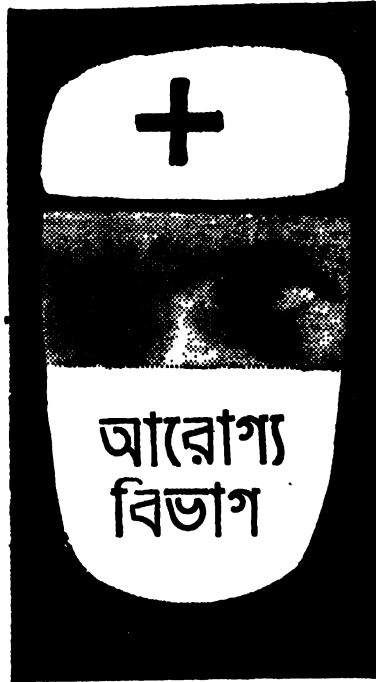
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

● শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়, চলসা, জলপাইগুড়ি---

প্রশ্ন : আমার বয়স ৬৮ বৎসর। গত ৫।৬ বছর হইতে একটা রোগে ভুগিতেছি। রোগটা পিঠের উপরের দিকে অর্থাৎ বুকের পাঁজরের ঠিক উল্টোদিকে একটা ব্যথা হয়। কিছুক্ষণ বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিলে এই ব্যথা থাকে না। শেষ রাত্রের দিকে ব্যথা হয়, ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বিছানা হইতে উঠিয়া না বসা পর্যন্ত ব্যথা যায় না। অন্য উপসর্গ নাই।

উত্তর : আমার মনে হয়, এই উপসর্গ বায়ুর প্রকোপে হচ্ছে। আপনি নিয়মিত হজমের কোন ভাল ওষুধ খাবার ঠিক পরেই দুবেলা খাবেন। Diapepsin (ইউনিয়ন ড্রাগ) অথবা Digeplex (টি সি এফ) জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন। একমাস খেয়ে দেখুন, এতেও যদি উপকার না পান, চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ নেবেন।

● শ্রীরাধাগোবিন্দ নন্দন, দুর্গাপুর-১---

প্রশ্ন : আমার একটি ছেলে বয়স প্রায় ১৫ বৎসর---৪ বৎসর বয়স হতে মাঝে মাঝে ফিট হয়। প্রায় এক মাস দেড় মাস অন্তর হয়। সেই সময়ে মুখে লালা গড়ায়, খাঁচও হয়, চক্ষু লাল ও মাঝে মাঝে স্থির হয়ে যায় এবং দৈনিক প্রায় ১০।১৫বার ফিট ও খাঁচ হয়।

উত্তর : এ রোগের সমাধান চিঠিতে সম্ভব নয়। আপনি যত শীঘ্র পারেন ডাক্তার দেখিয়ে, তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলুন। দেরি করবেন না।

● শ্রীবিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য, মুলুক, বোলপুর, বীরভূম---

হাঁপানি একটা উপসর্গ, রোগ নয়। আসলে কি কারণে হাঁপানি হচ্ছে সেটা আগে দেখা দরকার। আপনি বোলপুর হাসপাতালে অথবা স্থানীয় ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন; তিনি বলে দেবেন কি কারণে হাঁপানি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার নির্দেশও দেবেন।

● শ্রীশম্ভুনাথ দাস, আপার রোড, বার্নপুর---

আপনার পোস্টকার্ড পড়লাম। মুস্কিল হচ্ছে সব রোগের বিধান পত্রের মাধ্যমে দেওয়া যায় না। আপনি স্থানীয় চিকিৎসকদের উপদেশ নিন, কোন ভয় নেই। একটা কথা মনে রাখবেন, কোন চিকিৎসকই কোন রোগীকে কোনদিন অবহেলা করেন না। ডাক্তারের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে, কোনদিন চিকিৎসায় ফল পাবেন না।

● শ্রীরমেশ সেনগুপ্ত, কলকাতা---

আপনি যে ওষুধটি ব্যবহার করছেন, সেটি নিয়মিতভাবে তিনমাস ব্যবহার করবেন।

● জিজ্ঞাসা, আগরতলা ত্রিপুরা---

আপনার কোন ভয় নেই। সপ্তাহে একদিনের বেশি করবেন না। বিয়ে অনায়াসে করতে পারেন। খাওয়া এবং কাজকর্ম যেমন করছেন তেমনিই করুন।

● শ্রীভূপেন সাহা, বি এম রোড, কলি-১০ ---

প্রশ্ন : কি করলে ভাল করিয়া ইংরাজী পড়িতে পারিব?

উত্তর : এ প্রশ্ন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নয়, তবু বলছি, ইংরাজী খবরের কাগজের সম্পাদকীয় রোজ ডিক্‌সনারী নিয়ে পড়বেন। যে কথার মানে বুঝতে পারবেন না, ডিক্‌সনারী দেখে নেবেন। খানিকটা বাংলা তর্জমা করে অভিভাবক কি স্কুলের মাস্টারমশায়কে দেখিয়ে নেবেন। এইভাবে সবচেয়ে ভাল ইংরাজী শেখা যায়।

● গোপাল, কোটা, রাজস্থান---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়েছি। আপনি চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেন নি দেখছি। আমার মনে হয় Tri Redisol H নিয়মিতভাবে মাস তিনেক নিলে কিছুটা উপকার হবে, এর সঙ্গে ম্যাসাজ করুন।

● জে এন কাপুর, কলিকাতা-২২---

(প্রশ্নটি না ছাপাইতে অনুরোধ করি, শুধু উত্তরটি ছাপান হউক।)

আপনি প্রতিদিন রাতে শোবার সময় চা চামচের দু চামচ করে Quino Fael ওষুধ খাবেন একমাস।

● শ্রীশশাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায়,--- হীরাপুর, আমবাগান, বর্ধমান---

যে ওষুধ দুটির নাম লিখেছেন তার প্রথমটি অর্থাৎ সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। স্থানীয় চিকিৎসক যে ওষুধ দিয়েছেন, অনায়াসে তা নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন, তাতে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না।

করোলবাগ, নয়াদিল্লী---৫ (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক)---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। চিঠি পড়ে মনে হল আপনি শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক কষ্টে বেশি ভুগছেন। ও নিয়ে যত মাথা ঘামাবেন, তত শরীর খারাপ হবে। যে উপসর্গগুলির কথা লিখেছেন, তার প্রত্যেকটিই স্বাভাবিক এবং সকলের জীবনেই ঘটে। আমার কথা বিশ্বাস করে দেখুন সুফল পাবেন। নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করুন, কাজকর্ম করুন এবং শারীরিক শ্রম একটু বেশি করুন। দেখবেন উপসর্গগুলি কমে যাচ্ছে।

● শ্রীসমরেশ দাশগুপ্ত, পরাণনাথ পাড়া, বেহালা, কলি-৩৪---

আপনার ২৪।২৫ বৎসর বয়স হয়ে গেছে। এ বয়সে আর লম্বা হবেন না। লম্বা না হওয়ার জন্যে আক্ষেপ করবেন না। পৃথিবীতে অনেক নমস্য ব্যক্তি আছেন যাঁরা খর্বাকৃতি।

● শ্রীসুধাংশুগোপাল বাগচি, গুয়া, সিংভূম---

অংশুসুন্দর বিষয়ে---কাঁচা বাদাম দেবেন না। আগে পেটের গোলমাল সারিয়ে নিন। ওকে নিয়মিতভাবে Liv 52 Drops পাঁচ ফোঁটা সকালে পাঁচ ফোঁটা সন্ধ্যায় খেতে দেবেন। এ ছাড়া Cremosuxidine দু' চামচ করে দিনে তিনবার দেবেন। যে ক'দিন পেট ভাল না হয়। পেট ভাল হয়ে গেলে Liv 52 Drops-এর সঙ্গে কোন ভাল Multivitamin Drops খেতে দেবেন।

স্বস্তির বিষয়েও অনুরূপ চিকিৎসা করাবেন।

● শ্রীবাদলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহনতলা কলি-৫---

আপনি আমাশয়ের জন্য দুবেলা Amicline অথবা Davaquin বড়ি ব্যবহার করতে পারেন, ১০ থেকে ১৫ দিন। লিভারের জন্য Syrup Methionine Forte (অ্যালবার্ট ডেভিড) অথবা K I M Syrup (দেজ মেডিক্যাল স্টোর্স) ব্যবহার করতে পারেন। দুবেলা ভাত খাবার পর খাবেন। অন্তত তিন মাস।

● শ্রীবহুরূপী, রাজেন্দ্র দত্ত লেন, কলি-১২---

প্রশ্ন ১ : বেশ কয়েক বছর যাবৎ গুড়া ক্রিমির যন্ত্রণায় ভুগিতেছি।

উত্তর : অ্যান্টিপার (বারোজ ওয়েলকাম) অথবা অ্যাডেপিন (অ্যালবার্ট ডেভিড) ওষুধ গ্রহণ করে ব্যবহার করতে পারেন। এর নিয়ম হচ্ছে, পর পর দু দিন অর্ধেক থেকে ১ আউন্স রাতে শোবার সময় গ্রহণ করা। দ্বিতীয় দিন রাতে কোন জোলাপ নেবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি স্বাস্থ্যবিষয়ক নয়। অভ্যাস করুন, আগের অভ্যাস সেরে যাবে।

● শ্রীঅম্বর দে, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলি-৫---

১ নং প্রশ্নের উত্তর---আপনার শরীর থেকে ভিটামিন এ এবং স্নেহপদার্থ কমে গেছে। আপনি নিয়মিতভাবে মালটিভিটামিন সিরাপ অথবা বড়ি ব্যবহার করবেন, দেখবেন কমে যাচ্ছে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর---আপনার স্ত্রীর গায়ে আমার মনে হয় অ্যালার্জি খার হচ্ছে। ওঁকে কিছুদিন Antistine বড়ি সকালে ১টি রাতে ১টি (১০ দিন) ব্যবহার করতে দেবেন।

● শ্রীমুরারিমোহন বসু, গোবরডাঙ্গা কলোনী নং ১, ২৪ পরগণা---

আপনি দুবেলা নিয়মিত ভাবে পাল্‌মোকড প্লেন (স্ট্যাডমেড) দু চামচ করে খাবেন, বারো মাস। তাতে আপনার দু নম্বর প্রশ্নেরও সমাধান হবে।

● শ্রীকল্যাণকুমার ধর, বাবুরাম ঘোষ লেন, কলি-৫---

আপনি দুবেলা সকাল সন্ধ্যা কমলা লেবুর রস খান।

● শ্রীহরিসাধন কাক, স্ট্র্যান্ড রোড, কলি-৭ ---

প্রশ্ন ১ আমার বয়স ৪১ বৎসর অত্যন্ত খারাপ স্বাস্থ্য। বৈকাল ৩।৪টা হতে মুখ টক ও তিতো হয়, ক্ষুধা একেবারেই নেই।

উত্তর : আপনি প্রত্যহ দুবেলা খাবার পরই দুটি করে ইস্ট বড়ি সেবন করবেন, আর সকাল-সন্ধ্যা ২ চামচ করে (চা চামচের) খাঁটি মধু খাবেন। নিয়মিত খেতে হবে।

● শ্রীসুরজিৎ রায়চৌধুরী, কোপাটি, দরং, আসাম---

১ নং প্রশ্নের উত্তর : রক্ত, যখন বার হয় না তখন ব্যথা উপশমের জন্য অ্যানুসল মলম ব্যবহার করতে পারেন, তবে এ্যালোপ্যাথ শাস্ত্র অনুযায়ী এ রোগের অপারেশন ছাড়া ভাল চিকিৎসা নেই।

২ নং প্রশ্নের উত্তর : এ উপসর্গগুলি দুর্বলতার জন্য ঘটছে। আপনি আগে ১ নং প্রশ্নের রোগের চিকিৎসা করিয়ে নিন, তারপর দেখবেন স্বাস্থ্য আপনা থেকেই ভাল হচ্ছে।

● শ্রীসুবিমল রায়, সুরেন ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা---

: ডাক্তারবাবু আপনাকে ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি ওঁর তত্ত্বাবধানে থেকে যথাযথ চিকিৎসা করুন। পরে যা লিখেছেন, তার জন্য ভাববার কিছু নেই। আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

● শ্রীজয়দেব ঘটক ও সীমারাণী ঘটক, ধাদকা রোড, আসানসোল---

: কোন ভয় নেই। ওগুলি মানসিক দুর্বলতা থেকে ঘটছে। কোন ওষুধ খেতে হবে না। ভাল খাওয়া দাওয়া করে, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে পড়াশুনা করুন, দেখবেন সব সেরে গেছে।

● শ্রীমিলনকুমার, আরামবাটি, খড়গপুর---

: আপনার পিতার ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে মনে হয়। আপনি প্রেসার দেখিয়ে তাঁর চিকিৎসা করান, বোধহয় ভাল হয়ে যাবেন।

আপনার স্ত্রীর যখন বাইরের চিকিৎসায় সারছে না, তখন কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে দেখিয়ে সুচিকিৎসা করুন। ফাইলেরিয়ার ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।

● বি পি রায়, সুবার্বান পার্ক রোড, সালকিয়া, হাওড়া---

: কোন ভয় নেই। এটা অভ্যাসের দোষে। অভ্যাস করতে করতেই সেরে যাবে।

● শ্রীসুমন বসু, বিলাসী, দেওঘর---

: আপনি ভিটামিন - বি - কমপ্লেক্স ইনজেকশন ২ সি সি করে একদিন অন্তর ইণ্ট্রামাসকুলারলি নেবেন। ১০টি ইনজেকশন নেবেন।

● শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, রাখাল ঘোষ লেন, বেলিয়াঘাটা---

: আপনি ইনক্রিটোন অথবা জেরিয়াটোন জাতীয় ওষুধ সেবন করুন। আপনার কন্যাকে ফরমোড় বড়ি খাবার আধঘণ্টা আগে ১টি করে দুবেলা দেবেন, একমাস।

● শ্রীকাজলকুমার বসু, এ টি এম হোস্টেল, ইছাপুর---

: আপনি রোজ রাতে ২ চামচ (চা-চামচের) কুইনোবেল ওষুধ, আধকাপ জলে ভিজিয়ে খাবেন, দু মাস ধরে।

শ্রীমান অশোককুমার বড়াল, মুর অ্যাভেনু, কলি-৪০---

: আপনি নিয়মিত দুবেলা একটু ব্যায়াম করুন এবং পেট ভরে ভাত খান। দেখবেন স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে।

● শ্রীস্বপনকুমার ব্যানার্জি, যাদবপুর, ২৪ পরগণা---

প্রশ্নোত্তর বিজ্ঞপ্তি

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

কুপন

নাম- -

ঠিকানা- -

- -

মাসিক বসুমতী

: আপনার বুকে বোধহয় গাইনি-কোমাস্টিয়া নামক রোগ হয়েছে। আপনি কোন হাসপাতালের আউট-ডোরে দেখান, কোন ভয় নেই। ছোট একটা অপারেশনে সেরে যাবেন।

● শ্রীসুব্রত চৌধুরী, গোপাল ব্যানার্জি লেন, হাওড়া---

প্রশ্ন ১: গলার ভিতর সকল সময় একটা স্তর পড়ে থাকে। কিছুটা গরম জিনিস খেলে আরাম বোধ হয়। ধূমপানে অভ্যস্ত নই। গলার স্বরটাও পরিষ্কার হয় না।

উত্তর: মনে হয় আপনি ফ্যারে-ঞ্জাইটিসে ভুগছেন। আপনি নিয়মিত দুবেলা গরম জলে নুন ফেলে কুলকুচি করবেন, উপকার পাবেন।

● জনৈক ছাত্র, নবদ্বীপ, রাম-সীতপাড়া, নদীয়া---

প্রশ্ন ১: আমার বয়স ১৬। দুই দিকের স্তন দুইটি ফুলিয়া উঠিয়াছে। একটু লাগিলেই ব্যথা করে।

উত্তর: এ রোগ অপারেশন না করলে সারবে না। আপনি কোন হাসপাতালে দেখিয়ে অপারেশন করিয়ে নিন। আগে ১ নং-এর চিকিৎসা করান, পরে আপনা থেকেই দু'নম্বর প্রশ্নের উপকার পাবেন।

● চঞ্চল তরুণ, ছদ্মনাম, কুলাকর, হুগলী---

: আপনার সমস্ত উপসর্গই মানসিক। আপনি এ নিয়ে কিছু ভাববেন না। দেখবেন আপনা থেকেই সুস্থ হয়ে উঠছেন।

● কৃশকায়, ল্যান্সডাউন টেরেস, কলি-২৬---

: আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে খাঁটি মধু খাবেন নিয়মিতভাবে। দেখবেন চেহারা ভাল হচ্ছে।

● মণিকা দেবী (ছদ্মনাম) ইছাপুর---

: আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনার দৈহিক অসুস্থতা থেকে মানসিক দুশ্চিন্তা বেশি. সেই কারণেই উপসর্গগুলোতে ভুগছেন। আপনি ওসব ব্যাপার নিয়ে একদম ভাববেন না।

মহিলা মহল

॥ পাঠকরা পড়বেন না ॥

● সর্বমঙ্গলা বাগচী, গুয়া, সিংভূম---

প্রশ্ন: ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে গরম জলের উপর পড়িয়া গিয়া উরুমূলের কিছুটা অংশে একদম ছাল উঠিয়া যায়। প্রতি বছর গরমের সময় চুলকায় এবং জায়গাটার দাগড়া কচড়া হয়ে যায়। কি করলে দাগ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে?

উত্তর: গভীর দাগ হলে মিলোবে কি না সন্দেহ। আপনি স্থানটিতে ক্যাম্বিয়ান্ মলম লাগাবেন। যখন কচড়াগুলি সেরে যাবে তখন দাগ মেলাবার জন্য মেলানিডিন্ মলম ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই ওটা অভ্যাসের বশে ঘটেছে!

● শ্রীমতী---রামগড়, নাকতলা---

প্রশ্ন: আমার মাসিক হবার দিন ১২ আগে সাদা স্রাব হয়; আমার শরীর তাছাড়া দুর্বল লাগে। এমন কি সময়মত মাসিক বা ঋতু হয় না। আমার বয়স ২৬/২৭ বৎসর।

উত্তর: আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য ওই রকম হয়। আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু' চামচ সারবোফেরল্ অথবা ফেরাডল ওষুধ খাবেন, তিন মাস। তাতে দেখবেন উপসর্গ কমে যাবে।

● শ্রীমতী নিনতি ভট্টাচার্য, খারুপেটিয়া, আসাম---

: রোজ Amicline অথবা Davoquin বড়ি খাবেন। ১০ দিন। দিনে তিনটে করে। দুই স্তনে যে চাকা হয়েছে, তা চিকিৎসককে দেখিয়ে নিন। ওইজন্যেই গ্ল্যাণ্ডে ব্যথা হয়েছে। কি কারণে চাকা হয়েছে ডাক্তারবাবু দেখে বুঝবেন। চাকা সেরে গেলেই গ্ল্যাণ্ডের ব্যথা কমে যাবে। মাসিকের কথা আগের প্রশ্নে বলেছি।

● শ্রীমতী গীতা গুপ্তা---বারীন ঘোষ লেন, শেওড়াফুলী, হুগলি।

: আপনার ছেলের ক্রিমি আছে কি না দেখে নিন, যদি থাকে তার চিকিৎসা করান, না থাকলে প্রোব্যান্থাইন বড়ি একটি করে শোবার সময় দেবেন। পনেরো দিন। তাছাড়া দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে অ্যামাইনোজাইম্ ওষুধ দেবেন অন্তত দু' মাস।

আপনার স্বামীকে সকাল সন্ধ্যা জলখাবারের পর চা-চামচের ২ চামচ করে ডিজিপেপ্লেক্স অথবা ডায়াপেপসিন্ ওষুধ নিয়মিত খেতে দেবেন।

● কুমারী চিত্রলেখা দে, চন্দন-নগর, হুগলী---

: আপনার বোনের বিষয়ে কোন ভয় নেই। নিয়মিতভাবে দু'বেলা ভাত খাবার পর ২ চামচ (চা-চামচের) করে ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স খাওয়াবেন। প্রয়োজন হলে সারাজীবন।

আপনি সংকোচে পারছেন না। একটা কথা মনে রাখবেন। জীবনে আপনি যা করবেন, তাই সত্য এই ভেবে কাজ করতে হয়। আপনি কোন বলকারক টনিক দুবেলা খাবেন, এবং নির্বিবাদে কাজ করে যাবেন, কোন ভয় নেই। ও উপসর্গ চলে যাবে।

● শ্রীমতী শেফালী মালাকার, কলিকাতা---১২

প্রশ্ন: আমার মুখে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রণ হইতেছে।

উত্তর: আপনি নিম্নলিখিত নিয়ম-গুলি পালন করবেন।

(১) দৈনিক দুপুরে ভাতের সঙ্গে শাক খাবেন।

(২) রোজ রাতে ইসবগুলের ভুষি খাবেন।

(৩) বাদাম, মাখন, ঘী আলু, খুব বেশি মিষ্টি, চর্বি খাবেন না।

(৪) মুখে কিছুদিন কিছু মাখবেন না, এমন কি স্নো পাউডারও না।

(৫) রোজ সকালে আধ খানা এবং বিকেলে আধ খানা Rastinon

বড়ি খাবেন। একমাস। এই বড়ি কোন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাবেন।

● শ্রীমতী অঞ্জলিরাণী দাস C/o শ্রীইন্দুবিকাশ দাস, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, বিবেকানন্দনগর, পুরুলিয়া---

প্রশ্ন ১ : আমার প্রায় সবসময়ই সর্দি থাকে। বিশেষ করে সিজিন চেঞ্জের সময় বেশি হয় ও সেই সঙ্গে জ্বর হয়। কোন টনিক ঔষধের ব্যবস্থা যদি থাকে সর্দির জন্য---তাহা জানাইবেন।

উত্তর : আপনি একমাস Calciostelein B 12 injection 2 ml. Intramuscularly একদিন অন্তর নেবেন। এ ছাড়া দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে Pulmocod (plain) খাবেন। তিন মাস।

প্রশ্ন ২ : এই সর্দির পর আমার শ্বাসনালীতে বা গলায় কফ্ থাকে। কাশলে উঠে না, গান গাইতে গেলে ক্যার ক্যার শব্দ হয়।

উত্তর : ওই চিকিৎসাতেই কমবে তাছাড়া দুবেলা গরম জলে গার্গল্ করবেন।

● নাম নেই, পুরুলিয়া---

প্রশ্ন ১ : আমি রোজ ব্রাশ ও টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজি, কিন্তু বেশ পরিষ্কার হয় না। একটু জোরে মাজলে বা একটু জোরে আঘাত লাগলে দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে আমার দাঁতের মধ্যে এক রকম হলদে দাগ পড়েছে। এই দাগ উঠাইবার উপায় কি?

উত্তর : আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অম্ল হলে দাঁতে দাগ হয়। দাঁত একবার স্কেলিং করিয়ে নেবেন, তারপর নিয়মিতভাবে দাঁত মাজবেন। রক্ত পড়ার জন্যে ভয় পাবেন না। তবে, খুব জোরে মাজবেন না। নরম জায়গা সহজেই ছড়ে যায়।

প্রশ্ন ২ : আমার মাসিক হইবার সময় পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং এই পেটের যন্ত্রণা দুইদিন থাকে।

উত্তর : কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। রোজ রাতে ইসফ্‌গুলের ভুষি খাবেন, এবং রোজ দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে শারকোফেরল খাবেন অন্তত তিন মাস। ৩নং প্রশ্নে যা লিখেছেন তাও উপরোক্ত ব্যবস্থায় কমে যাবে।

দুটি আবিষ্কার

॥ এক ॥

ইংলণ্ড-এ মনুষ্য-নির্মিত 'ফার্' পাওয়া যাচ্ছে। প্রাকৃতিক মিংক্, এরমাইন, এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল চামড়ার মতই এটির চেহারা, ব্যবহারও খুব সহজসাধ্য।

এই নবতম দ্রব্যটির নির্মাতাদের দাবী নাইলন দিয়ে তৈরী নকল 'ফার্' পশুচর্ম থেকে লভ্য 'ফার্'-এর তুলনায় হালকা, বেশি মসৃণ এবং অনেক বেশি উজ্জ্বল। স্বাভাবিক 'ফার্'-এর তুলনায় নকলটির দাম ঢের কম। আসল এর এক দশমাংশ মূল্যে নকল 'ফার্' লভ্য।

এগুলো দীর্ঘদিন অটুট থাকে। পোকা এগুলোর কোনও ক্ষতি করতে পারে না। ব্যবহারও করা চলে ঠেসে। সাদা মিংক, রঙিন এরমাইন, এবং অন্যান্য স্বাভাবিক 'ফার্'-এর স্টাইল-এ

॥ দুই ॥

চশমা অনেকে ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এবং নাকের ওপর থেকে প্লাস্টিক-এর ফ্রেম নীচু হলেই ঝুলে পড়ে, এমন কি খুলে পড়ে যায়। কিছুকাল আগে আমেরিকায় একটা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে পুরো ঝুঁকলেও চশমার ফ্রেম নাকের ওপর থাকবে, একটুও নামবে না, পড়ে যাওয়া ত দূরের কথা।

নরম, অদৃশ্য 'প্লাস্টিক ট্যাব'---নাম তার 'ইয়ার লুক্স',---চশমার ফ্রেম-এর কানে লাগা অংশে লাগালে তা এত দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে যে, কোনও অবস্থাতেই চশমা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

এই 'ট্যাব'গুলো তিনটে আকারে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে এর ব্যবহার সুরু হয়েছে কি না জানা যাচ্ছে না। উৎসাহী মানুষ খোঁজ নিয়ে দেখতে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দিবাকর কোনোদিন মীনাক্ষীকে তার দেখায় নি, তবু মীনাক্ষী সে বাড়ির দরজায় এসে হাজির হলো।

মীনাক্ষী দিবাকরের মামার 'বিজ্ঞাপনের' গল্প শুনেছিল, এবং শুনেছিল তার দোকানের নাম। সেই সূত্র ধরে ঠিকানাটা জোগাড় করে নিয়েছিলো, এবং সাহসে ভর করে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দাঁড়িয়েছিল, তবু সেই সেকেলে প্যাটার্নের টানা লম্বা জালঢাকা বারান্দা-ওলা প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িখানার গেট ঠেলে চট করে ঢুকে পড়তে বাধছিল। তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলো, দিবাকর এত আধুনিক, কিন্তু ওর বাড়িটা একেবারে সেকেলে। এই নীরেট নীরেট বাড়িটার মধ্যে কি প্রগতির হাওয়া খেলে? কিন্তু ঢুকবো কি করে?

এ সময় একটা ঘটনা ঘটল, মীনাক্ষীর পিছন থেকে কেউ একজন বলে উঠলো, 'কাকে চান?'

মীনাক্ষী তাকিয়ে দেখলো।

দেখলো বাড়ির চাকরটাকর কেউ।

হাতে মিঠে পানের খিলি।

পান কিনতে বেরিয়েছিল বোধহয়, ফিরে এসে দরজায় এমন একটি অপরিচিতা তরুণীকে দেখে একটু অবাক হচ্ছে।

এ বাড়িতে আত্মীয়স্বজন ছাড়া কারো যাতায়াত নেই। আর অনেকদিনের পুরনো চাকরের সেই আত্মীয়জনদের চিনতেও বাকি নেই।

সে সবাইকে চেনে।

এবং সবাইয়ের সঙ্গেই মুরুব্বিয়ানা চালে কথা কয়ে থাকে।

কিন্তু আজকের অতিথিটি নবীনের অচেনা, তাই মুরুব্বিয়ানার সুরটা গলার মধ্যেই মজুত রেখে নবীন ঈষৎ সমীহর গলায় বললো, 'কাকে চান?'

মীনাক্ষী জানতো এসময় দিবাকর বাইরে, মীনাক্ষী সেটা ভাল করে জেনেই তবে এসেছিল, তবু হঠাৎ ভেবে পেল না কাকে 'চাই' বলবে? তাই থতমত খেয়ে বলে ফেললো, 'দিবাকরবাবু আছেন?'

'দিবাকরবাবু!'

নবীনের সমীহর গলা উপে গেল। বেরিয়ে এল তাচ্ছিল্যের গলা।

যে মেয়েছেলে দিবাকরকে খুঁজতে এসেছে, তাকে সমীহ করবার প্রয়োজন বোধ করলো না।

তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, 'না নেই। দরকার থাকে সকালের দিকে আসবেন।'

পান নিয়ে গেট ঠেলে ঢুকে ঘুরে দাঁড়াল নবীন, যেন আগলানোর ভঙ্গিতে।

মীনাক্ষীর ওই ভঙ্গিটা দেখে একবার মনে হলো, ধ্যেত্তারি চলে যাই। মনে হচ্ছে এ বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমি সুবিধে করতে পারবো না।

কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে চলে আসবে শুধু একটু ভাল না লাগার কারণে? যে আসা কত আয়োজন করে।

মীনাক্ষী সাহসে ভর করে বলে, 'আমি তাঁর মার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মা!'

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

নবীন আকাশ থেকে পড়ে।

'মা। দিবাকর দাদাবাবুর মা আবার এখানে কোথা?'

'নেই? সে কি? কোথাও গেছেন বুঝি?'

নবীন ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'যাবে কোথায়? কোনো কালেও ছিলো না। দেশে থাকে।'

কী আশ্চর্য!

দিবাকর তাহলে কি করে যখন তখন বলে 'মা এই বললো, এই বোঝালো, মাকে এই শুনিয়ে দিলাম।'

দিনের পর দিন তাহলে বাজে কথা বলেছে দিবাকর?

ধ্যেৎ। তাই কি সম্ভব? মাকে নিয়ে এমন অদ্ভুত বাজে কথা বলবে কেন? কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।

মীনাক্ষী তাই সন্দিগ্ধ-গলায় প্রশ্ন করে, 'এটা দিবাকরবাবুর মামার বাড়ি তো?'

নবীন ইত্যবসরে ট্যারা দৃষ্টিতে মীনাক্ষীকে যাকে বলে পুঙ্খানুপুঙ্খ সেই ভাবে দেখে নিচ্ছিল। তার তীক্ষ্ণ প্রখর বুদ্ধিতে ধরা পড়তে দেরী হলো না মেয়েটা দিবাকরদাদাবাবুর 'লভ'-এর মেয়ে। সিনেমা দেখে দেখে 'লভ'-এর হাড়হদ্দ তার নখদর্পণে।

আর সিনেমাও তো দেখতে বাকি থাকে না কিছু। নিজের চাহিদায় যায়, গিন্নীমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও যায়।

প্রকাশ মণ্ডলের এত সময় নেই যে গিন্নী নিয়ে সিনেমা যাবেন, গিন্নী কুসুমকামিনীর তাই একমাত্র গতি খাশ চাকর নবীন। যান না অবশ্য একা, ব্রজবালা থাকলে ব্রজবালা যায়, ভাই-বৌ বীণা যায়, কিন্তু একটা বেটাছেলের ভরসা তো চাই।

দশটা মেয়েমানুষও এক... ভ্যাকা!' একটা বেটাছেলে হচ্ছে ভরসা। তা সে নাবালক বালক হোক, অথবা গণ্ডমূর্খ চাকরই হোক।

অতএব নবীনের সিনেমা দেখাটা খুব ঘটে। সেই অভিজ্ঞতাতেই বুঝতে দেরী হয় না তার মেয়েটা কে!

তবু বুঝে ফেলেও উদাসীন গলায় বলে, 'হ্যাঁ বাবুর ভাগ্নে বলেই তো জানি।'

মীনাক্ষী চাকরটার কথার মধ্যে একটা স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখতে পায়। মীনাক্ষীর রাগে হাড় জ্বলে যায়। বুঝতে বাকি থাকে না বড়লোকের আদুরে বেয়াদপ চাকর।

কিন্তু চোরের ওপর রাগ করে তো মাটিতে ভাত খেতে পারে না মীনাক্ষী? চাকরের ওপর রাগ করে দরজায় এসে ফিরে যেতে পারে না?

তবে কেমন যেন ধারণা হয়, ভিতরে ঢুকলেও অভ্যর্থনাটা সুবিধের হবে না। কিন্তু কী করা? এসেছে যখন ভিতরে ঢুকে দেখে যাবেই।

'ঠিক আছে।' মীনাক্ষী গম্ভীর স্বরে বলে, 'মামা বাড়ি আছেন?'

'না তো! এখন আবার তিনি কোথায়? 'গদিতে গেছে।'

'স্বামী আছেন তো? না কি তিনিও গদিতে গেছেন?'

মীনাক্ষীর বিরক্তি গোপন থাকে না।

কিন্তু নবীন অদ্ভুত ছেলে. সে ভয় খায় না. এতক্ষণে নিজে একটু সরে মীনাক্ষীকে প্রবেশ পথ দিয়ে বলে, 'গিন্নীমাকে চান তো, ওপরে চলুন। তবে নিচের ঘরে একটু বসতে হবে, আগে জানানো দরকার।'

মীনাক্ষী আশান্বিত হয়ে ঢোকে।

ধড়িবাজ নবীন অমায়িক মোলায়েম গলায় বলে, 'দিবাকর দাদাবাবুর ঘরে বসবেন?'

দিবাকর দাদাবাবুর ঘর!

মীনাক্ষীর মনটা পুলকে ভরে ওঠে। যে মানুষকে সর্বদা দেখি, অথচ জীবনে তার 'ঘর' দেখি নি, তার ঘরটা দেখতে আগ্রহ হয় বৈকি!

কিন্তু মীনাক্ষী তো জানে—দিবাকর দোতলায় মামার মেয়ে ব্রজবালার ঠিক পাশের ঘরে থাকে। তাই বলে, 'থাক এখন নিচেই বসছি।'

নবীন কী ভাবলো বা বুঝলো কে জানে। বললো, 'ঠিক আছে বসবার ঘরেই বসুন।'

মীনাক্ষী ওর পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কানের পর্দা ফুটো করে একটা বিষবাণ এসে মাথার মধ্যে বিঁধে যায়।

'হ্যাঁরে নবনে গেট-এ দাঁড়িয়ে এত কথা হচ্ছিল কার সঙ্গে? ছুঁড়িটা কে?'

৩

নবীন উপরে উঠে গিয়েছিল।

বোধ করি ছুঁড়িটা 'কে', এবং এত কথাটা কিসের তাই জানাতে। মীনাক্ষী একা বসে ঘামছিল আর ভাবছিল, ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়িনি তো!

এই বাড়ি দিবাকরের?

এই ভাষা দিবাকরের বাড়ির লোকের? যে দিবাকর মীনাক্ষীর বাড়ির সেকেলে-পনা দেখে মুহূর্তে মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যায়।

এটা কি সরল গ্রাম্যতা?

নাঃ! কণ্ঠস্বর কী কর্কশ!

ভঙ্গিতে কী অপরিচ্ছন্নতা।

না না এ বোধহয় ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছে মীনাক্ষী।

উঃ! চাকরটাও যে গেল তো গেলই।

নেমে এলে তাকে বলে চলে যেতে পারে, এখন আর ওই গিন্নী-টিন্নীর সঙ্গে দেখা করার উৎসাহ নেই মীনাক্ষীর।

নবীন এলো অনেকক্ষণ পরে।

খুব সম্ভব সব কিছু গিন্নীর কর্ণ-গোচর করে।

এসে সহাস্যে বেশ মাইডিয়ারী ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'হয়ে গেছে কুইন ভিক্টোরিয়ার হুকুম! আসুন ওপরে।'

মীনাক্ষীর আপাদমস্তক জ্বলে যায়, মীনাক্ষীর ইচ্ছে হয় বলে, থাক এখন! হঠাৎ মনে পড়লো অন্য কাজ আছে।'

কিন্তু মীনাক্ষীকে কৌতূহলে টানলো।

যে কৌতূহল মেয়েমানুষের স্বভাব-ধর্ম। দেখাই যাক না কী ব্যাপার! কিন্তু নিশ্চিত হবার উপায়টা কি?

যে লোকটার সঙ্গে কথা কইতে হাড় জ্বলছে, তাকেই বলে, 'আচ্ছা ইনি দিবাকর দাস তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মামার নাম?'

'আজ্ঞে, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মণ্ডল।'

নামটা যেন এই রকমই মনে হচ্ছে মীনাক্ষীর। কারণ প্রথম শুনে 'মণ্ডল' শব্দটা যে হঠাৎ কানে একটা ধাক্কা মেরে-ছিল, সেই স্মৃতিটা স্মরণে এল।

অতএব ওপরে ওঠা।

বসবার ঘরটাকে আর একবার তাকিয়ে দেখলো মীনাক্ষী। প্রকাণ্ড একটা গোল-টেবিল, তার ধার ঘিরে খানকয়েক কাঠের চেয়ার, ভারী ভারী হাতল দেওয়া। দেওয়ালে নানা দেব-দেবীর ছবি, তার সঙ্গে একটি মেমমার্কা ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারখানা বাদে সবই কেমন মলিন বিবর্ণ ধূসর।

পয়সা আছে, রুচি নেই।

কেমন একটা বিতৃষ্ণা মিশানো কৌতূহল নিয়ে নবীনের পিছু পিছু ওপরে উঠলো মীনাক্ষী। আর সেই সময় জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

কুসুমকামিনীও সেই প্রশ্নই করেন, 'তোমার নাম কি?'

কুসুমকামিনীর ঘরে বসবার জন্যে একটি সোফা আছে। ফুলপাতাসম্বলিত সেকেলে গড়নের জোড়া পালঙ্কের পায়ের দিকে একধারে সেটি পাতা। সামনে ছোট টেবিল।

প্রকাণ্ড ঘর। জোড়া পালঙ্ক, সোফা টেবিল দেরাজ আলনা ইত্যাদি রেখেও জায়গা আছে।

কুসুমকামিনী অবশ্য সোফায় বসে নেই। তিনি সেই সোফা থেকে হাত-খানেক উঁচু পালঙ্কে একটি তাকিয়া কোলে নিয়ে বসে আছেন। কাছে ডাবরে পান।

বয়সের তুলনায় চুল পাতলা, মুখে ভারীক্কি ছাপ। তাঁর পাশে ব্রজবালা গড়িয়ে শুয়েছিল, মীনাক্ষীকে দেখে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে উঠে বসলো।

মীনাক্ষী অবশ্য আন্দাজে ভাবলো এই বোধহয় ব্রজবালা। কিন্তু এ মেয়ের মুখে কোনো দুঁদে ধুরন্ধরের ছাপ দেখতে পেল না মীনাক্ষী। বরং যেন নেহাৎই নীরেট নীরেট। এই মেয়ে 'সেই' কথা বলতে পারে?

সে যাক, এদের একবার যাচাই করে যেতে হবে মীনাক্ষীকে। যাতে দিবাকর সম্পর্কে সঠিক জানতে পারে।

ভয়ানক একটা জ্বালা অনুভব করছে; প্রতারিত হওয়ার জ্বালা, দুঃখের জ্বালা।

কুসুমকামিনীর পরনে একখানি কল্কাপাড় মিহি শান্তিপুরে শাড়ি. গায়ে জামা-সেমিজের বালাই নেই। গায়ে জামা-সেমিজের বালাই মীনাক্ষীর নিজের মারও থাকে না। কিন্তু সে যেন আর এক রকম! তার মধ্যে কতকটা যেন কৃচ্ছ্রসাধনের পবিত্রতা। তা ছাড়া সবাই তো গরদ-তসর পরে বেড়ান বিজয়া, একটু পুজো-পুজো ভাব থাকে. খালি গা এত দৃষ্টিকটু লাগে না।

কিন্তু এঁর সবটাই যেন একটা অশ্লীল স্থূলতা।

ডাবর থেকে একটা পান তুলে নিয়ে তার নিচের কোণটুকু দাঁতে কেটে থুঃ করে ফেলে দিয়ে, সেটিকে মুখে পুরে কুসুম-কামিনী রাশভারী গলায় বলেন, 'বোসো।'

মীনাক্ষী বসে।

গৃহবর্তীর থেকে হাতখানেক নীচুতে।

কুসুমকামিনী তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন, 'নাম কি তোমার?'

মীনাক্ষী নাম বলে।

'মীনাক্ষী। বেশ নতুন নামটা তো!' কুসুমকামিনী তেমনি রাশভারী গলায় বলেন, 'দিবাকরকে খুঁজতে এসেছিলে?'

মীনাক্ষী ইতস্তত করে বলে, 'খুঁজতে ঠিক নয়, মানে একটু দরকার ছিল। একটা বই দেবার কথা ছিল।'

কার কাকে দেবার ছিল, তা অবশ্য বোঝা গেল না।

কুসুমকামিনী কিন্তু বুঝলেন। মুচকি হেসে বললেন, 'ও সে একই কথা যার নাম ভাজাচাল তার নামই মুড়ি! খুঁজতে আসো নি, দরকার ছিল! তা ওর কলেজে পড়ো বুঝি?

'হ্যাঁ।'

'কতদিন ভাব?'

ভাব!

কতদিনের 'চেনা' নয়, 'আলাপ' নয়, 'পরিচয়' নয়, ভাব!

মীনাক্ষীর মাথা থেকে পা অবধি একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহে যায়। কিন্তু ভাব নেই—এ কথা তো বলা চলে না? কি করতে তবে এসেছে সে?

মীনাক্ষী রুক্ষ গলায় বলে 'যতদিন একসঙ্গে পড়ছি।'

'অ। তা ভালো। তা কোনদিন তো আসতে দেখি নি। আজ হঠাৎ—'

'বললাম তো একটা বইয়ের দরকার ছিল।'

'তবে যে নবনে বলছিল, মামাকে চেয়েছে, মামীকে চেয়েছে—'

বিপন্ন বোধ করে মীনাক্ষী বুঝতে পারে, ফাঁদটা নিজেই পেতেছে। অতএব সোজা হতে হবে শক্ত হতে হবে। ফাঁদে জড়িয়ে পড়া চলে না। অতএব মাথা তুলে বলে, 'আমার ধারণা ছিল ওঁর মাও এখানে থাকেন, মামার বাড়ি যখন। শুনলাম থাকেন না। কোথায় থাকেন, ঠিকানাটা কি, জানতে চাই।'

কুসুমকামিনী এবার শিথিল ভঙ্গি ত্যাগ করে নড়েচড়ে বসেন, তীক্ষ্ন গলায় বলেন, 'কেন বল তো? হঠাৎ ওর মাকে কী দরকার?'

'আছে দরকার।'

'কেন? ছোঁড়া কোনো বিপদে-আপদে পড়ে নি তো?'

'না বিপদ হবে কেন?'

'তবে বুঝি 'বে'?'

ব্রজবালা মুচকি হেসে বলে ওঠে, 'ও মা. বোধহয় দিবুদার 'বে'র ঘটকালী করতে এসেছেন ইনি।'

কুসুমকামিনী নকল ধমকে বলেন, 'তুই থামতো বেজো।'

বেজো।

তার মানে ব্রজ।

তার মানে ব্রজবালা।

তার মানে ভুল বাড়ি নয়।

অতএব আশার ক্ষীণ শিখাটুকুও নিভে গেল।

মীনাক্ষী বললো, 'আচ্ছা—আমি যাই।'

'ওমা সে কি! বাড়িতে এয়েছো ভদ্দরলোকের মেয়ে অমনি ছাড়বো? একটু চা-জলখাবার খেয়ে যেতে হবে।'

কুসুমকামিনী যে বাস্তবিকই এত অতিথিবৎসলা তা নয়, তবে মেয়েটাকে এক্ষুণি উঠতে দিতে ইচ্ছে নেই। তাই ওই চা-জলখাবারের ফাঁদ।

মীনাক্ষী অবশ্য এ ফাঁদে পা দেয় না।

নিজের পাতা ফাঁদ থেকে উদ্ধার পেতে পারলে বাঁচে এখন সে।

তাই বলে 'না এখন কাজ আছে। দিবাকরবাবু এলে বলবেন মীনাক্ষী মৈত্র এসেছিল।'

'আহা তা তো বলবোই। তবে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলে তা' তো কই বললে না?'

'কতবার বলবো? বললাম তো একটা বইয়ের জন্যে—'

'তা! আমার আবার ভুলো মন, ভুলে যাই। তা' দিবার মার কাছেও তা' হলে ওই বইয়ের জন্যেই দরকার? মাগী আবার এত বিদ্যেবতী হলো কবে লো? অ বেজো।'

কুসুমকামিনী হি হি করে হাসতে থাকেন।

কুসুমকাহিনী যদি অন্য কোথাও মীনাক্ষীর মত মেয়েকে দেখতেন, অবশ্যই রীতিমত সমীহর দৃষ্টিতে দেখতেন। কলেজে পড়া মেয়েদের প্রতি ভয় সমীহ সবই আছে তাঁর। তবে এ ক্ষেত্রে আলাদা। এ হচ্ছে দিবাকরের 'লভ'-এর মেয়ে। অতএব এর সম্পর্কে এর চাইতে সভ্য ব্যবহার করার প্রশ্ন ওঠে না। যে মেয়ে দিবাকরকে পুজ্যি করতে পারে, তার আবার মান-সম্মান।

তার ওপর আবার জাতে বামুন।

বামুনের মেয়ে হয়ে সদগোপের ছেলেকে! ছি। অবিশ্যি যার সঙ্গে যার মজে মন—এ হচ্ছে শাস্ত্রের কথা। কিন্তু হাতের হাছে এমন একটা মজার বস্তু পেলে কে না মজা করে ছাড়ে?

মীনাক্ষী আরক্ত মুখে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমার ভুল হয়েছিল। আচ্ছা—'

মীনাক্ষী বেরিয়ে আসে।

কিন্তু ব্রজবালা হঠাৎ খাট থেকে নেমে ওর পিছু পিছু আসে। যদিও ওই আসাটা মোটেই দৃষ্টিসুখকর হয় না। একেই তো শরীরটা তার ভারী হয়ে গেছে, তার উপর জামা কাপড় যেন এলিয়ে পড়া। যেন দেহটাকে না ঢেকে উপায় নেই, তাই কোনো রকমে ঢেকে রেখেছে।

তবু আসে তাড়াতাড়ি।

চুপি চুপি বলে, 'মায়ের কথা-বাত্তার ধরনই অমনি। ছিরি-ছাঁদ নেই। রাগ করবেন না। আপনার সঙ্গে বুঝি দিবু-দার ভালবাসা আছে?'

মীনাক্ষী ফিরে দাঁড়ায়।

মীনাক্ষী তীব্র গলায় বলে, 'হঠাৎ আপনাদের এমন একটা অদ্ভুত ধারণার হেতু কি? ভালবাসা ছাড়া কেউ কাউকে খোঁজে না? কারুর সঙ্গে কারুর দরকার থাকতে পারে না?'

ব্রজবালা এই তীব্রতায় থতমত খায়।

ব্রজবালা ভেবেছিল, এ মেয়ে দিবুদা বর্ণিত 'সেই সব' মেয়ের একজন। যে মেয়েরা নাকি নীতিধর্ম সতীধর্ম কোনো কিছুকেই কেয়ার করে না। যারা নাকি সহজেই এমন সব ভয়ঙ্কর কান্ড করে বসে, যা শুনলে ব্রজবালার হৃদকম্প হয়।

কিন্তু সে সব মেয়ের কি কেবলমাত্র একটু ভালবাসার কথায় এমন প্রচন্ড রাগ আসে? ব্রজবালা তাই মলিন গলায় বলে, 'না না এমনি ভাবলাম—'

'ও রকম ভাবনা আর ভাববেন না।'

রেগে আগুন হয়েই নামছিল, তবু সিঁড়ির পাশের ঘরটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মীনাক্ষী। বলে, 'এই ঘরটা বুঝি দিবাকরবাবুর? দেখতাম বইটা যদি থাকে।'

বানিয়েই বললো অবশ্য।

ঘরটা এ বাড়ির পক্ষে ছিমছাম, এবং সরু খাট, ছোট টেবিল হালকা বুক সেলফ ইত্যাদিতে একটি একক ছাত্রের উপস্থিতির ছাপ। দেখে মনটা তবু একটু নরম হলো।

হয় তো এ বাড়ির এই পরিবেশটা দিবাকরকেও পীড়িত করে, তাই তার মধ্যে থেকেই নিজের মত একটু ছিমছাম হয়ে থাকে।

কিন্তু সে নরমটা মুহূর্তেই কঠিন হয়ে উঠলো।

ব্রজবালা অবাক গলায় উত্তর দিলো, 'দিবুদার? না তো? এ ঘরে আমার মামার ছেলে থাকে। পড়ে কিনা? আট নটা ক্লাশ পড়া হয়ে গেছে তার। তিন তলায় গোলমাল, তাই এখেনে—খুব ইয়ে ছেলে। বলে অনেক পড়বো 'এমেত যাবো।...দিবুদা—' ব্রজবালা একটু ঢোক গিলে বলে। 'দিবুদা নীচতলায় থাকে। নবীনকে দেখলেন তো? ওই ওর ঘরে। আমি বলেছিলাম, লেখাপড়া করে। তা মা বলে কি, ধান সম্পর্কে পোয়াল মাসী। কোন ডালপালার ভাগ্নে আমার, ওর জন্যে আমি রাজ আদর করতে বসবো নাকি? আমার ওই মা-টি না মোটেই সুবিধের নয়, বুঝলেন? আর কেপ্পনের যাশু।'

কথা বলতে বলতে নেমে এসেছে দুজনেই।

মীনাক্ষী নীচের উঠোনে নেমে বলে, 'আচ্ছা নমস্কার! অনেক উপকার করলেন আমার, তার জন্যে ধন্যবাদ।'

বেরিয়ে যায়।

এগোতে থাকে।

সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে ধসে পড়তে চায় তার।

পৃথিবীতে যেন বাতাস নেই।

আকাশে যেন আলো নেই।

আর কোথাও কোনো আশ্বাস নেই।

দিবাকরকে খুব একটা মহৎ অবশ্য কোনো দিনই ভাবে না সে, তাই বলে এত জোচ্চোর দিবাকর?

●

'একি আপনি?'

রাস্তার মোড়ে যেন ভুত দেখলো দিবাকর। এখানে মীনাক্ষী। তার মানে তাদের বাড়িতেই এসেছিল। তার মানে যা বলেছিল, তাই করে ছেড়েছে। বলে-ছিল, 'ঠিক আছে, নিয়ে না যাও, নিজেই যাবো।'

তা' হলেও দিবাকর মীনাক্ষীর সেই সংকল্পটাকে আমল দেয় নি। ভাবে নি সত্যি আসবে।

কিন্তু এখানে ঠিক ওদের বাড়ির

মোড়ে আর কোন মহৎ কাজে আসবে মীনাক্ষী?

রাগে সমস্ত শরীর জ্বালা করে ওঠে দিবাকরের। মেয়েমানুষের এত মর্দানি? উঃ! ঠিকানাই বা পেলো কোথায়? আর এসে দেখলোটা কি?

নির্ঘাৎ দিবাকরের থাকার জায়গাটা দেখিয়েছে কেউ। নির্ঘাৎ নবনে বদমাইস অনেক কিছু গল্প করেছে।...নির্ঘাৎ মামী আর ব্রজবালা যা-তা প্রশ্ন করেছে।

তার মানে সর্বস্ব ঘুচিয়েছে দিবাকরের।

এখন কোন বালুকণায় এই সমুদ্র বাঁধবে দিবাকর? কোন ছুঁচে রিপু করবে এই প্রচন্ড গহ্বর?

তা' ছাড়া জানাও তো নেই, কতটা কি জেনেছে মীনাক্ষী।

দিবাকরের কতখানি উদ্ঘাটিত হয়েছে!

'তুমি এখানে?'

এ প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময়ের চেয়ে অনেক বেশী ফোটে বিপদে পড়ার সুর।

মীনাক্ষী সেই সুর ধরতে পারবে এটা আশ্চর্যের নয়। মীনাক্ষী তাই দাঁড়িয়ে পড়ে তীব্র ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'বড্ড অসুবিধেয় ফেলে দিলাম, তাই না?'

'না না আমার অসুবিধে কি? তোমারই—'

'আমার কথা থাক।' মীনাক্ষী ঠিকরে ওঠে, 'আমার কোন অসুবিধেই নেই। অসুবিধেটা তোমারই। এত দিন ধরে এত কৌশল করে ধাপ্পার সুতো বুনে বুনে যে মিথ্যের জালটি রচনা করেছিলে, সেটি ছিঁড়ে গেল, তোমার স্বরূপ বেরিয়ে পড়লো, অসুবিধে নয়?'

দিবাকর প্রথমটা জাল দিয়ে জল ধরতে যায়, নুন দিয়ে নদী বাঁধতে যায়, দিবাকর তার মিথ্যের জালে নতুন ধাপ্পার সুতো লাগায়, 'কি হল কি? ব্যাপারটা কি? কার সঙ্গে দেখা হলো? বেজায় পাজী একটা চাকর আছে আমাদের বাড়িতে, ইয়ারের রাজা! সে বুঝি কিছু—'

'দিবাকর! মিথ্যের জালে আর নতুন মিথ্যে জুড়ো না। বড় ঘৃণা হবে। শুধু তোমার উপরই নয়, নিজের উপর, পৃথিবীর উপর।

মীনাক্ষী চলে যেতে উদ্যত হয়।

কিন্তু দিবাকর পথ আগলায়।

দিবাকর কোনমতে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, 'কিন্ত কী হলো সেটা তো বলবে? মামীর প্রকৃতিটা অবশ্য ভাল নয়, দুর্বাসার মহিলা-সংস্করণ। কিন্তু গালমন্দ খেয়ে এলে বুঝি?'

'দিবাকর আর কষ্ট দিও না'— মীনাক্ষীর চোখে জল আসছিল, সে জলকে আগুনে পরিণত করে মীনাক্ষী বলে, 'খড় দিয়ে আগুন ঢাকতে যেও না দিবাকর। হিমালয় পাহাড় ফুঁয়ে ওড়ানো যায় না। তুমি যে কী, তা ভালই জেনে গেছি আমি।'

'মীনাক্ষী',

হঠাৎ দিবাকরের মুখের চেহারার অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটে। দিবাকরের সেই কাঠ-কাঠ আঁট-আঁট মুখটা যেন ঝুলে পড়ে। দিবাকরের পুরু পুরু ঠোঁট দুটো যেন নেতিয়ে পড়ে, দিবাকরের ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলগুলোও এলিয়ে যায়।

দিবাকর কাঁপা কাঁপা থরথরে গলায় বলে, 'জানতাম! আমার এই তাসের অট্টালিকা টিকবে না। কিন্তু কী করবো মীনাক্ষী, এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার! জানি আমি ঠগ-জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী, কিন্তু এসব কেন জানো মীনাক্ষী? আমি বড় গরীব। রাস্তার ভিখিরিরও অধম। আমার সেই দারিদ্র্যের লজ্জা তোমার কাছে উদ্ঘাটন করতে পারি নি, আমার মনে হয়েছে, এ দিনকে একদিন না একদিন আমি জয় করবোই, একদিন আমি 'মানুষ' নামের যোগ্য হবো, সেই ক'দিন শুধু এই পাতার ছাউনীতে মাথা ঢেকে—'

মীনাক্ষী ওই বেদনাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, মীনাক্ষীর সেই লোহা হয়ে ওঠা মনটা ঈষৎ নরম হয়, মীনাক্ষী স্থির গলায় বলে, 'গরীব হওয়াটা অপরাধ নয় দিবাকর।'

'আমি মনে করি অপরাধ—' দিবাকরের ঝুলে-পড়া চেহারাটা আবার যেন একটু সতেজ হয়, যেন পায়ের নিচে আবার একটু মাটি পেয়েছে দিবাকর, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আবার বড় বড় কথা বলতে পারবে। বলতে পারবে জোরালো গলায়, 'আমি মনে করি অপরাধ। কারণ অক্ষমতাই হচ্ছে—সবচেয়ে বড় অপরাধ মীনাক্ষী! আর দারিদ্র্য তো অক্ষমতারই সন্তান।'

মীনাক্ষী তবু প্রতিবাদ করে ওঠে, 'তা হোক দিবাকর, মিথ্যের মত অপরাধ আর কিছু নেই। আমি ভাবতে পারছি না যে তুমি দিনের পর দিন এইভাবে মিথ্যের প্রাসাদ বানিয়ে বানিয়ে আমাকে ঠকিয়েছ। মামারবাড়ির চাকর নবীনের সঙ্গে একঘরে থাকো তুমি! তোমার মা জীবনে কলকাতায় আসেন নি। আর তোমার আত্মীয়রা—'

চুপ করে যায় মীনাক্ষী।

গলাটা বন্ধ হয়ে যায় বলেই চুপ করে যায়।

দিবাকরের চোখের তারায় অলক্ষ্যে আগুন জ্বলে। দিবাকরের মুখের পেশীতে যেন একটা মতলবের ভাঁজ পড়ে। কিন্তু দিবাকর রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'মীনাক্ষী তুমি যদি একটা সুযোগ আমায় দাও, আমার সমস্ত কথা বলার জন্যে একটুখানি সময়—'

মীনাক্ষী আবার ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'সময়? যাতে আরো একবস্তা ধাপ্পা তৈরি করে ফেলতে পারো?'

দিবাকরের মুখের চেহারা আবার দপ্ করে নিভে যায়। দিবাকর পাকা অভিনেতার মত সেই নিভে-যাওয়া মুখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা বিষণ্ণ গলায় বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে থাক, জানতাম আমার দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়লেই তুমি আমায় ঘৃণা করবে, আমায় পরিচিতের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করবে—'

'থামো। নাটক রাখো—' মীনাক্ষী রূঢ় গলায় বলে, 'যে দারিদ্র্যটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে দিবাকর, সেটা তোমার চরিত্রের। অবস্থার দারিদ্র্য লজ্জার নয়, চরিত্রের দারিদ্র্যই লজ্জার।'

'অবস্থাই চরিত্রকে মুচড়ে দুমড়ে বিকৃত করে ফেলে মীনাক্ষী! ওই যে আমি মামারবাড়িতে থাকি, প্রতিক্ষণ কি মনে হয় না এই গ্লানি থেকে মুক্ত হই, কিন্তু কি করবো? যতদিন কলেজে পড়তে হবে, ততদিন এইভাবে কুকুরের মত পড়ে থাকতে হবে।'

মীনাক্ষী মলিন হয়। বলে, 'বুঝতে পারছি তোমার দেশের জমিদারীর গল্পও আরব্য উপন্যাসের গল্প। কিন্তু এ আমি কোনো যুক্তিতেই বরদাস্ত করতে পারি না দিবাকর। এরপর আর তোমার কোন কথাটা বিশ্বাস করতে পারবো আমি?'

দিবাকর মাথা হেঁট করে।

দিবাকর আস্তে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমার সামাজিক অবস্থার আকাশ-পাতাল তফাৎ, অথচ তোমার কাছে পৌঁছবার দুর্দমনীয় বাসনা, তাই মিথ্যের সিঁড়ি দিয়ে আকাশে উঠতে চেয়েছিলাম। যাক শিক্ষা হয়ে গেল। হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। এই শেষ। আচ্ছা চলি।'

মীনাক্ষী ক্রুদ্ধ গলায় বলে 'এই শেষ, জীবনে দেখা হবে না, এ সব কথার মানে কি? বিষ খাবে, না গলায় দড়ি দেবে?'
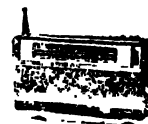
'ভাবছি।'

মীনাক্ষী [illegible] [illegible] ওই

অদ্ভুত মামারবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করো। জোচ্চুরি ধাপ্পাবাজি ছেড়ে মানুষের মত মানুষ হবার সাধনা করো।'

'ততদিন কি তুমি আমার জন্যে বসে থাকবে মীনাক্ষী?'

দিবাকরের স্বর করুণ।

এ যেন আর এক দিবাকর।

মীনাক্ষীর মমতা আসে উদ্বেল হয়ে।

মীনাক্ষীর বুকের মধ্যেকার সেই চিরন্তন নারী অপরাধীকে ক্ষমা করে বসে। মীনাক্ষী ওর ওই ম্লান কণ্ঠ, বিষণ্ণ মুখ আর অপরাধী দৃষ্টিতে বিশ্বাস করে বসে। তাই বলে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুমি ওখানটা ছাড়বার চেষ্টা করো তো।'

মীনাক্ষী ভাবে ওখানটা ছাড়লেই বুঝি দিবাকর সুন্দর হয়ে উঠবে, সত্যের মর্যাদা দিতে শিখবে।

'মীনাক্ষী, তা হলে একবার তোমাকে আমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি আমার মাকে তোমায় দেখাব।'

'তোমার মা? তিনি তো দেশে থাকেন শুনলাম। অথচ তুমি দিনের পর দিন—'

আমি হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি মীনাক্ষী, আমি কান মলছি—'

'থাক, থাক, রাস্তার মাঝখানে আর 'সিন' করতে হবে না। তবে তোমার সঙ্গে দেখা হল তাই। দেখা না হলে হয়তো জীবনে আর তোমায় ক্ষমা করতে পারতাম না।'

দিবাকরও সেটা বুঝতে পারে।

দিবাকর কিছুক্ষণ আগে যে দেখা হওয়াটায় আড়ষ্ট হচ্ছিল, এখন সেইটাকেই ভাগ্যের দান মনে করে। নিজের অভিনয়-ক্ষমতার উপর ওর অগাধ আস্থা। যখন যেমন দরকার চালিয়ে নিতে পারবে। এতদিন মীনাক্ষীকে 'ডাউন' করে এসেছে, এখন অবস্থা বুঝে সম্পূর্ণ উল্টোপথ ধরছে।

এখন দেখছে ওকে আয়ত্ত করবার অন্য এক পথ আবিষ্কার করতে হবে। মোটকথা একবার জব্দ করে ফেলতে পারলেই এইসব সতী প্যাটার্নের মেয়েদের কব্জায় আনা যায়।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা চালিয়ে যাওয়া এ পাড়ায় দৃষ্টিকটু। এ দক্ষিণ কলিকাতা নয় যে, বিকেল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত পথে শুধু যুগল মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। যাদের ভঙ্গিতে থাকে—'এই দাঁড়িয়ে' দুটো কথা বলছি, এখুনি ছাড়াছাড়ি হবে। কিন্তু ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা সেই অবস্থাই চলতে থাকে।

এখানে পথচারীরা বার বার তাকাচ্ছিল।

তবু দিবাকর হেস্তনেস্তটা করে নিতে চায়। তার সেই দীনহীন গ্রামে, ততোধিক দীনহীন কুটিরে তার দীনদুঃখী মা-টিকে একবার দেখাতে চায় মীনাক্ষীকে।

মীনাক্ষী শুধু তার বড়লোক আত্মীয়-দেরই দেখল, যাদের মধ্যে শুধু অহঙ্কার, শুধু নীচতা। কিন্তু দিবাকরের সেই পর্ণকুটিরবাসিনী মা?

না, নিজমুখে তার কথা আর বলবে না দিবাকর।

বলেছে, অনেক বলেছে। মায়ের গল্প কেন করত তা বলেছে—

'কিন্তু কেন জানো মীনাক্ষী—' দিবাকর উদাস উদাস স্বপ্নালু গলায় বলে, আমি যে মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি, আমার যে মনের কথা বলবার কেউ নেই, এটা ভাবতে ইচ্ছে করে না। তাই—' দিবাকর চুপ করে যায়।

এবং শেষ পর্যন্ত মীনাক্ষীকে বাক্য-দত্ত করিয়ে নেয়, কোনমতে একটা দিনের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিবাকরের সঙ্গে দিবাকরের গ্রামে যাবে।

'বাংলা দেশের হতভাগ্য গ্রামকে একবার চোখে দেখাও দরকার মীনাক্ষী—' দিবাকর জোরালো গলায় বলে, 'দেখতে পাবে আসলে আমরা কি? আসলে আমরা কোথায় পড়ে আছি। যে শহরটাকে দেখে গর্বে পুলকিত হয়ে ভাবি আমরা কত এগিয়ে গেছি, সেই শহরটা এই বিরাট দেশের কতটুকু অংশ? বললে বিশ্বাস করবে, এখনও আমাদের গ্রাম এবং তার মত হাজার হাজার গ্রামে মোটরগাড়ী কেমন তা চোখে দেখে নি, ইলেকট্রিক আলো তাদের কাছে রূপকথার গল্প। লক্ষ লক্ষ লোক রেলগাড়ি চড়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে মরে যায়। স্নানের জন্যে যে আলাদা একটা দরজা বন্ধ ঘর থাকতে পারে, এ তারা কেউ জানে না। জানে না—অসুখ করলেই তখুনি ডাক্তার পাওয়া যায়।'...

দিবাকর একটু দম নেয়।

কিছুদিন আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শোনা কোন এক সমাজসেবীর মেঠো বক্তৃতার খানিকটা ঝাড়া মুখস্থ বলে ফেলতে পেরে রীতিমত পুলকিত হয় দিবাকর।...এ ধরণের কথাগুলো যে তার পূর্বমতের বিরোধী তা' খেয়াল করে না।

খেয়াল মীনাক্ষী করে।

ওর দম নেওয়ার অবসরে বলে, 'সে কথা তো আমিও বলি! তুমিই তো কেবল আমাদের সমাজের অন্ধতা আর কুসংস্কার নিয়ে সমালোচনা কর। আর 'ওদেশ' দেখাও। আমিই বলি 'ওদেশে'র সঙ্গে পাল্লা দিতে আমাদের যতকিছু পুরনো সংস্কার ভেঙে ফেলার লড়াইয়ে যদি জিতেই যাও তোমরা, তোমাদের সেই 'প্রগতির রাজ্য'টা ভোগ করবে কাদের নিয়ে? ওই তোমার লক্ষ লক্ষ অবোধ অজ্ঞান হতদরিদ্র দেশবাসীই তো তোমার সম্বল? 'সংস্কারমুক্তির সংগ্রাম' নিয়ে কত মাথাব্যথা হবে তাদের, যাদের পেটের ভাতের সংস্থান নেই? তুমিই লম্বা লম্বা কথা বলে আমায় 'ডাউন' করে ফেলতে চাও। তুমিই বলো 'সতীত্ব', 'পবিত্রতা' এসব শব্দগুলো পুরুষের অধিকার রক্ষার সুবিধের তৈরি। আসলে—একেবারে মূল্যহীন। মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু নিজেই দেখছো দেশের এই অন্ধকার ছবি। 'অধিকার' শুধু দিলেই হয় না। 'অধিকার-বোধ'টা জন্মাবার শিক্ষাও দিতে হয়। না হলে সেটা অস্ত্রশিক্ষা না দিয়ে অস্ত্রের অধিকার দেওয়ার মতই হবে। কিন্তু থাক, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেক লেকচার দেওয়া হলো। তবে একটা কথা বলে যাচ্ছি, যেটা সব কথার শেষ কথা। ব্লাফ দিয়ে শেষরক্ষা হয় না।'

দিবাকরের ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল।

দিবাকরের ইচ্ছে হচ্ছিল ঐ নাক-উঁচু মেয়েটাকে ধরে একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করে দেয়। মেয়েমানুষ মেয়ে-মানুষের মতন থাক, তা নয়, নিজে তেড়ে এসেছেন বিয়ের ফয়সালা করতে। এত-দিন ধরে এত কষ্ট করে নিজেকে লোক-সমাজে চরে বেড়াবার মত একটা পরিচয় বানিয়েছিলাম, উনি এসে তাকে তছনছ করে দিলেন।...উঃ! ভাবলে আমার জ্ঞান থাকছে না। আমার যে কী পোজিশান, তা সবাইকে বলে বেড়াবে নিশ্চয়। আমাকে বিয়ে করার বাসনাটা তো উপে গেল, বলে বেড়াতে আর আপত্তি কি? ...গরীব আমি চিরদিন থাকব না, তোদের মত বড়লোকের নাকে ঝামা আমি ঘসব, এই আমার প্রতিজ্ঞা, তা সে যে কোন পথেই হোক।...টাকা তো পৃথিবীর ধুলোয় পড়ে আছে, সেই ধুলো কুড়োতে পারলেই হলো। শুধু একটু বিদ্যে করে নেওয়া দরকার। ভেক না হলে হয় না। তোদের ঐ 'পণ্ডিত' সমাজে, সভ্য সমাজে চরে বেড়াতে না পারলে তো প্রতিষ্ঠা নেই তাই এমনি করে কুকুরের মত পড়ে আছি প্রকাশ মণ্ডলের বেয়াদপ চাকরের ঘরে। গিন্নীর আদরে চাকর, তাই তার এত দাপট। সেই হতভাগাই বোধ হয় আমার নামে যা-তা বলেছে। আচ্ছা, 'এইসা দিন নেহি রহেগা।'

মনের কথা কেউ টের পায় না, তাই মানুষের পৃথিবীটা আজও চালু আছে। নচেৎ কবেই ধ্বংস হয়ে যেত।

কিন্তু মন বস্তুটা 'বায়ুশূন্য কৌটায়'

ঝুঙ্কিত, ওর থেকে আওয়াজ বেরিয়ে ছাড়ায় না। তাই ঐ কটূক্তিগুলোর মানসিক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর মুখে নম্রভঙ্গীতে উচ্চারণ করে, 'মীনাক্ষী, আসবে তো আমাদের কুঁড়েঘরে?'

মীনাক্ষী দ্বিধাগ্রস্ত হয়, 'কিন্তু গিয়ে কি হবে বলতে পারো?

দিবাকরের 'বিস্ফারিত' ধরণের চোখদুটো মলিন মলিন হয়, 'কিছু না মীনাক্ষী, শুধু আমার মাকে একবার তোমায় দেখাব। আমার মত হতভাগারও যে একটা ঐশ্বর্য থাকতে পারে শুধু সেইটুকুই—'

'কিন্তু কি বলব বাড়ীতে?'

'যা হোক। যা হোক একটা কিছু বলো। একটা রাত, লোকে তো বন্ধুবান্ধবের বিয়েতেও বাইরে কাটাতে পারে।'

'রাত!' মীনাক্ষীর চমকে ওঠাটা অস্পষ্ট থাকে না। 'রাত কেন?'

'তা ছাড়া তো সুবিধেমত আর কোন ট্রেন নেই।...মেদিনীপুর স্টেশনে নেমে তের মাইল গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। চল মীনাক্ষী, শুধু আমার মাকেই নয়, এই বাংলা দেশটার সত্যিকার চেহারাও একবার দেখবে চল।,

দিবাকরের কণ্ঠে তার স্বভাববিরুদ্ধ আবেগ ফোটে!

আর সেই তার সর্বদা প্রজ্বলিত ভঙ্গীর জায়গায় এই নম্র বিষণ্ণ আবেগকম্পিত ভঙ্গীটা নতুন একটা আকর্ষণ এনে দেয়।

মীনাক্ষী রাজী হয়।

মীনাক্ষী এবার এগিয়ে গিয়ে 'বাস'-এ চড়ে। দেখতে পায় না পিছন থেকে দুটো জ্বলন্ত গোলক তাকে ভস্ম করবার ভঙ্গীতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

●

যদি মীনাক্ষী আজ এই দুঃসাহসিক অভিযানে পা না বাড়াতো, হয়ত মীনাক্ষীর জীবন সম্পূর্ণ অন্যরকম হত।

যদি আজ ফেরবার সময় তার জীবনের রাহুর সঙ্গে দেখা হয়ে না যেত, হয়ত মীনাক্ষীর জীবন অন্য মোড় নিত না। কিন্তু মীনাক্ষী দুঃসাহসের পথে পা বাড়িয়েছিল, মীনাক্ষী নির্বুদ্ধিতার ফাঁদে গলা দিতে রাজী হয়েছিল।

আর মীনাক্ষী চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকাতে ভুলে গিয়েছিল।

তাকালে হয়ত ওই জ্বলন্ত গোলকদুটোই ওকে সাবধান করে দিত

। ক্রমশ।

রবার্ট কেনেডির উদ্দেশ্যে

সুনির্মল কুণ্ডু

আমার এ পথযাত্রা সংগঠিত সময়ের তীরে
বারবার হারায়, এখন
সভ্যতার বুকে দিয়ে এতদূরে হেঁটে এসে
দেখি পৃথিবীরে—
আদিম জিঘাংসা মূর্ত দিবালোকে প্রেতের মতন :
অসহায় পৃথিবীকে তবু ভালবেসে
আমাকে নিঃশেষ করি :
কিছু কিছু মুহূর্তের স্পর্শে মন ভরি।

প্রাগৈতিহাসিক আমি পরিবর্তমানতায় ভাসি।
এখন আমার অনুভবে
অহিংস বুদ্ধের বাণী ভেঙে পড়ে, কেবল উৎসবে
কিছু কথা, আলোচনা, স্তব, গান, মালা রাশি রাশি।
আমার আত্মিক মেঘে সহিংস ঝড়ের অনুরণ :
—বাহিরে নূতন দৃশ্যে পরিচয় করেছি গোপন

প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি :
চিরন্তন যীশুর প্রণয়,
শান্তির সাম্রাজ্য এক, বর্ণবিদ্বেষের বিষ নয়—
পরিপূর্ণ সমবোধে এক প্রাণ—কল্যাণের রাখী
আমাদের হাতে হাতে
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ।...
দীপ্ত ভোর আসে তপ্ত সূর্যের আভাতে।

আমার এ পথযাত্রা অসংলগ্ন নীড়ের সন্ধানে
সহসা বিচূর্ণ হয়।—
আবার জিঘাংসু চোখে আততায়ী মুখোমুখি
রক্তমাখা হাতে,
লক্ষ্যস্থির গুলিবাণে সব সম্ভাবনা শেষ এখনি নিশ্চয়।
...কেবলি শান্তির বাণী কেঁপে ওঠে বুকের ভিতর,
অশ্রুভরা চোখে দেখি : শোকচ্ছায়া। জীবন নিথর॥

অনন্যসাধারণ পরিচালক মাইকেল এ্যাঞ্জেলো এ্যানটোনিওনি

সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, তার সঙ্গে আরো একটি নামের সংযোজন হল। ইনি হলেন মাইকেল এ্যাঞ্জেলো এ্যানটোনিওনি। রোসেলিনি, ডি সিকা, ফেলিনি ইত্যাদির মত এ্যানটোনিওনিরও নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং [illegible]িকতা নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই শিল্পকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। হলিউডী ঢঙে তোলা সস্তা উত্তেজনাত্মক ছবি যখন গোটা দুনিয়াকে গ্রাস করতে চলেছে সেই সময় এ্যানটোনিওনির মত প্রতিভাধর ব্যক্তিদের আগমনের ফলে চলচ্চিত্র-শিল্পের রোমাঞ্চকর ইতিহাসে এক নতুন যুগের অবতারণা ঘটেছে বলা চলে।

১৯১২ সালে এসিলিয়া এবং ভেনিজিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চল ফারারায় মাইকেল এ্যাঞ্জেলো এ্যানটোনিওনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশবকাল এবং যৌবনের প্রথমাংশ কাটে মনোরম এবং সুন্দর শহর ফারারাতেই। এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়েই। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দিয়েছিলেন এবং ফারারা থেকে পঁচিশ মাইলের এই পথ তিনি ট্রেনেই যাতায়াত করতেন। সেই সময় তিনি একটি যুবতী মহিলার প্রেমেও পড়েছিলেন। গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি অর্থশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট হলেন। এবং শেষ পর্যন্ত অর্থশাস্ত্রে এবং ব্যবসাগত বিষয়ে ডোক্টর উপাধিপ্রাপ্ত হলেন। টেনিস খেলাতেও এ্যানটনিওনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এরপর তাঁর নিজের একটি গল্পগ্রন্থ এরপর তাঁকে দেখা যায় চিত্র সমালোচকের ভূমিকায়। তৎকালীন ইতালীয় ছবিগুলি লক্ষ্য করে তিনি এমনই কড়া সমালোচনা শুরু করলেন, যার ফলে ভবিষ্যতে তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলি থেকে অনেক অংশ বাদ দেওয়া হতে লাগল। ঠিক এই সময়ই তিনি প্রথম চিত্র-পরিচালনার কাজে মনঃসংযোগ করলেন। প্রথমেই তিনি ছবি তোলার স্থান নির্বাচন করলেন পাগলা-গারদের হাসপাতালে। উদ্দেশ্য সত্যিকারের বাস্তব জীবনের একটি ডকুমেনটারী ছবি তৈয়ারী করা। অতিশয় মানসিক ধৈর্য এবং একনিষ্ঠতার সঙ্গে তিনি কাজে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ক্যামেরার এ্যাঙ্গেল নির্দেশ করা হোল, আলোক সম্পাতের কাজ গুছিয়ে রাখা হোল, পরিচালকের নির্দেশের অপেক্ষায়। বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষগুলোর জন্যও ঘরের মধ্যে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোল। দেখলে মনে হবে কয়েকটি সুস্থ মানুষকে অভিনয়ের জন্য যেন নিয়ে আসা হয়েছে। হাসপাতালের অধ্যক্ষও খুব সন্তুষ্ট হলেন। খানিকক্ষণ গেল এইভাবে। তারপর এ্যানটোনিওনির নির্দেশে সব আলোগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। আলোয় আলো হয়ে উঠলো সমস্ত ঘরখানা। তারপর এক-মুহূর্ত মাত্র। বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষগুলো হঠাৎ যেন নিশ্চল হয়ে গেল। এমন একটা ভয়ার্ত মূর্তি তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠল, যা কোনদিন দামী অভিনেতাদের মুখেও ফুটে উঠতে দেখা যায় না। এই অবস্থায় কাটল কয়েকটা মিনিট মাত্র। তারপর সেই পাগলগুলি আলোর হাত থেকে মুক্তির জন্যে উদ্‌ভ্রান্তের মত ভয়ার্তদৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। এ্যানটোনিওনি এবার বিচলিত হয়ে পড়লেন। কি করবেন তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। হঠাৎ সেই হাসপাতালের অধ্যক্ষের চীৎকার শোনা গেল, স্টপ, লাইট আউট। চোখ-ঝলসানো আলো নিভে গেল। সামান্য আলোর ফাঁক দিয়ে দেখা গেল মৃত্যু-

মাইকেল এঞ্জেলো

প্রণীয় কাণ্ডর কতকগুলো দেহ জড় হয়ে আছে।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাই এ্যান্টনিওনিকে এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করলো। এরপর 'সিনেমা' নামে একটি কাগজের তিনি সম্পাদনার ভার নিলেন। কিন্তু তাও কয়েকটি কারণে তাঁকে ত্যাগ করতে হল। এরপর এ্যান্টনিওনিকে রোমে কাজশূন্য অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। এতদিন বন্ধু বলে যাদের জানতেন তারা কেউ এগিয়ে এলো না সাহায্যের জন্য। ক্ষুধার তাড়নায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

এত সত্ত্বেও তিনি নিজের আদর্শের কথা ভুললেন না। এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম সেণ্টারে তিনি যোগ দিলেন কিন্তু সেখানেও তিন মাসের বেশী থাকতে পারলেন না। এই সময় তিনি অল্প দৈর্ঘ্যের ডকুমেণ্টারী একটি ছবি তুললেন এবং অর্জন করলেন প্রথম পুরস্কার। দলিল চিত্র তোলার ফলেই এ্যান্টনিওনির জীবনে ফিচার ফিল্ম তোলার কাজটা খুব সহজ হয়ে গেল। তিনি একের পর এক ছবি তুলে যেতে লাগলেন। এবং চিত্রামোদী মহলে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করলেন। এ্যাঞ্জেলোকে ঘিরে এক বিতর্কের সৃষ্টি হলো। সকলেই লক্ষ্য করলেন তাঁর সৃষ্টিকে বিশেষ কোন চলচ্চিত্র-ধারার মধ্যে ফেলা চলে না। সম্পূর্ণ-ভাবে স্বতন্ত্রধর্মী প্রচেষ্টা তাঁর। তিনি তাঁর চিত্রগুলির মধ্য দিয়ে সমাজের অবহেলিত কয়েকটি সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন। কোনটিতে দেখালেন প্রবৃত্তির হীনবিকারের দোষে তরুণ এক দম্পতি কি ভাবে পৃথক হয়ে গেল। কোনটিতে কোন নারীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ফেলে তাদের জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা যন্ত্রণা ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'L' Avventura-তে বিশ্বাস-ঘাতকতার [illegible] দেখান হয়েছে। La Notte-তে তরুণ এক ঔপন্যাসিক ও তাঁর স্ত্রীর ভুলভ্রান্তি দেখান হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য বইটির ঘটনাকাল ষোল ঘণ্টার মাত্র। যেমন সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ছিল চব্বিশ ঘণ্টার।

এই থেকেই বোঝা যায় ফরমায়েস অনুযায়ী ছবি তৈরী করার শিল্পিমন তাঁর ছিল না। সত্যিকার সৃষ্টিধর্মী মন তাঁর। নিজের উপলব্ধিগত ধারণার দ্বারাই তিনি পরিচালিত হতেন। মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকের গতিশীলতায় তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁর ক্যামেরা ফ্রেমিং এ্যাঙ্গেলিং দৃশ্যপটের বাস্তবতা চলচ্চিত্র শিল্পে এক অমূল্য অবদান।

এ্যান্টনিওনির সবচেয়ে বড় কথা জনসাধারণের দিকে তিনি ছবি করেন না। ছবির কথাই তিনি ভাবেন। শিল্পীদের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত, শিল্পী তিনি যত বড় আর্টিস্টই হোন না কেন ছবিতে তিনি একটি উপাদান মাত্র। ভিউ ফাইণ্ডারে নিজেদের দেখার অধিকার শিল্পীদের নেই।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'এই করেছো ভাল' চিত্রে অম্বুজ মৌলিক, [illegible] বিশ্বাস

সাগর পারের মায়ালোক

যা বলছিলুম---ছবিকে বাস্তবানুগ করতে ও দেশে নানানধানা ব্যাপার চলছে। সে প্রয়াস অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করে নিচ্ছে সকলেরই। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু সব সময় বিপন্মুক্ত না-ও হ'তে পারে। শিল্পী কলা-কুশলীদের পক্ষে প্রাণঘাতী হওয়াও বিচিত্র নয়!

এমনই একটা কাণ্ড ঘটেছিলো সম্প্রতি। লণ্ডনের এক খবরে জানা যায় রিচার্ড বার্টন একটি ছবির দৃশ্য গ্রহণের সময় তাঁর সহশিল্পী নেস্‌বিটের শরীর লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিলেন। এটা ছিলো চিত্রনাট্যের নির্দেশ। তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা ঠিকই ছিলো, বন্দোবস্ত ছিলো নেসবিটের কোটের তলায় পরা লোহার বর্মে লেগে গুলি প্রতিহত হবে। শরীরের কোনো ক্ষতি করবে না আদৌ। ওদিকে দেখা যাবে আঘাত-প্রাপ্ত স্থান থেকে কৃত্রিম রক্ত তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসছে---অর্থাৎ বাস্তবে যেমনটি হয় অবিকল তেমনি বন্দোবস্ত সব কিছুতে।

বিধিব্যবস্থা সব থাকলেও কিন্তু কার্যকালে সব কেমন ভণ্ডুল হয়ে গেল। ঘটে গেল দুর্ঘটনা। হওয়া বিচিত্র ছিলো না, কিন্তু তা হয়নি। ব্যাপারটা প্রাণান্তকর হ'তে পারেনি। সর্বরক্ষা বলতে হবে। গুলির বিস্ফোরণ অপেক্ষাকৃত তীব্র হওয়ার জন্যে নেসবিট আহত হলেন। তাঁর বাঁ চোখ জখম হোলো। সঙ্গে

রমেন চৌধুরী

সঙ্গে তাঁকে পাঠানো হোলো হাস-পাতালে। সে সময় অভিনেতার অঙ্গ বেয়ে পড়ছে রক্ত দরদর করে---আসল ও কৃত্রিম রক্ত যুগপৎ।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে নেসবিটকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়। রিচার্ড বার্টন এই বিপত্তিতে খুবই বিমর্ষ হয়েছেন।

●

ছবিকে এই বাস্তব-রূপ দিতে সাগর পারে আর এক ধরণের কাণ্ড চলেছে। ওরা কিছুই বাদ দিতে আর চাইছে না। বাস্তব বলে তো সব কিছুই মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরা চলে না---এটা হয়তো আমাদের কাছে, ব্যাক ডেটেড মানুষদের কাছে; ---শ্লীল অশ্লীল প্রশ্ন তুলে এখনই আমাকে ধরাশায়ী করে দিতে পারে অনেকেই। কাজেই শত সহস্র হস্ত দূরে থেকেই তর্কাতর্কিকে পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করছি।

যাই হোক সুইডিশ ছবি 'আই অ্যাম কিউরিয়াস'-কে কিন্তু 'কুৎসিত' আখ্যায় ভূষিত করেছেন মার্কিন মুলুকের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি জেলা আদালতের একজন বিচারক। ওদেশটাতেও অতি-বাস্তবতার ঢেউ ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে পড়ছে, তবু এ ভদ্রলোক ছবিটিকে জিন্দাবাদ বলে উচ্চকণ্ঠ হতে পারেন নি, বরং নিন্দা-বাদই তীব্র হয়েছে তাঁর কণ্ঠে।

সুডেনের ওই ছবিতে যৌন-সম্ভোগের দৃশ্য দেখানো হয়েছে উপায় নেই---এ সব না দেখিয়ে ওরা আর হালে পানি পাচ্ছে না! কিন্তু তবু ওরা ছবিটাকে অশ্লীল বলতে গর-রাজি। ওদের স্বপক্ষে ওদেশের পনেরো জন চলচ্চিত্র সমালোচক ওকালতি করতে দ্বিধা করেন নি। যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক কিন্তু সেই শাক দিয়ে মাছ ঢাকাকে গ্রাহ্য না করে কঠোর মন্তব্য করেছেন সরবে। কারণ আইনগত প্রশ্ন জড়িয়ে আছে দৃশ্যটির ব্যাপারে। এই ধরণের দৃশ্য দেখানোর প্রয়াস নাকি আগে কোনো ছবিতে আর হয়নি। বিচারক শ্রীটমাস এন মারফি জানিয়েছেন তাঁর নিজের খুবই অসহ্য লেগেছে ছবিটিকে! আমেরিকার পক্ষেও এ সুধা গরলে পর্যবসিত!

●

প্রজাপতির নির্বন্ধ একেই বলে! তা না হলে বয়েস তো আর থেমে নেই, মেঘে মেঘে বেলা কিছুটা হয়েছে বৈকি! তবু ফুটলো ফুল। বিয়ের ফুল ফোটায় বাধা নেই কোনো, এ তো জানা কথা। আর এটাও সত্যি যে ফুল বারে বারে ফুটতেও পারে। ওদেশে

বিশ্ববিখ্যাত বলসই থিয়েটার

এটাও স্বাভাবিক বলে আমরা এখনেই আঃ পিছিয়ে থাকতে চাইছি না।
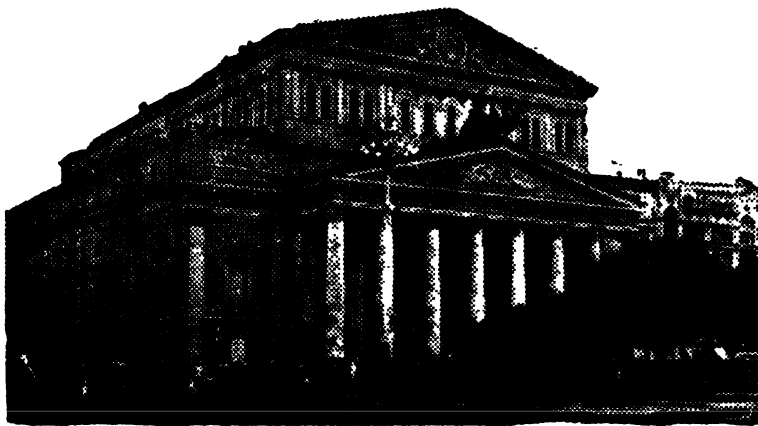
বর্ষীয়সী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মোরিন ও'হারা কিছুদিন হোলো প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজের একজন বৈমানিককে বরণ করেছেন স্বামিরূপে। প্রখ্যাতা শিল্পী এর দ্বারা এটাই প্রমাণ করলেন যে, বিয়ের বয়েস বলতে কিছু নেই। এ যেন ভারতীয় চা—সব সময়েই খাওয়া চলে। বিয়ের পিঁড়িতে বসলেই হোলো—ওখানে অবিশ্যি পিঁড়ির চল নেই। তা না থাক, প্রক্রিয়াটি পশ্চিমী ধাঁচেই না হয় হোলো।

বৈমানিক প্রবর ব্লেয়ার খুবই দুঃসাহসী। ১৯৫১ সালে একা বিমান চালিয়ে উত্তর মেরু পর্যটন করে এসে হারমন 'পুরস্কার' পেয়েছেন। মোরিনকে নিয়ে কয়েকবার আকাশপথে পাড়িও জমিয়েছেন। 'হ্যাঁ', ওঁদের মন-দেয়া নেয়ার খেলা আজকের নয়। বহু যুগের পথ পেরিয়ে এতোদিনে সেটা সামাজিক স্বীকৃতিতে সার্থক হোলো।

মায়ের বিয়ের সময় (!) মেয়ে বিয়ের আসরে হাজির ছিলো। মোরিনের মেয়ে ব্রনউইন, বয়েস তার এখন বাইশ।

মোরিন কি এরপরও চিত্রজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট রাখবেন? ভক্তজনের ভাবনা তো তাই। তবে চিন্তা করে কিছু ফল নেই, মোরিন এখন নীরবে-নিভৃতে থাকতেই অভিলাষী। কিন্তু তার আগে হাতের কাজগুলো না শেষ করে তো উপায় নেই। অতঃপর 'কপোত কপোতী যথা' হওয়ার বাধার কিছু নেই।

●

শ্রীমতী নাদিন ত্রিন্তিগাঁ ফ্রান্সের স্বনামখ্যাতা চিত্র-পরিচালিকা। 'মাই লাভ মাই লাভ' ছবি করে বেশ কিছু দিন চুপচাপ ছিলেন। উপস্থিত আবার তাঁর সাড়া মিলেছে। এবারের ছবিটি তাঁর কোনো একজনের জীবনের সাফল্য অসাফল্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। নাম: 'এ ক্রাইম অ্য লেক্যুর এন সেক্রেত্।' প্রধান পুরুষ-চরিত্রে অংশ নিচ্ছেন তাঁর স্বামী লোকপ্রিয় অভিনেতা জাঁ লুই ত্রিন্তিগাঁ।

●

'পাপা' বলে খ্যাত ছিলেন মানুষটি। শুধু পরিবার-পরিজনের কাছেই নয়, রোমের সর্বত্রই পরিচিত হচ্ছিলেন তিনি ওই নামে। এখন তাঁকে 'পোপ' হ'তে দেখা যাবে।

ব্যাপারটা তাহলে খোলসা করা যাক। এ মানুষটি হচ্ছেন অ্যান্টনী কুইন—প্রথিতযশা অভিনেতা। শ্রীকুইন

বলসই থিয়েটারের মুখ্য ব্যালেরিনা মায়া প্লিসেটস্কায়া
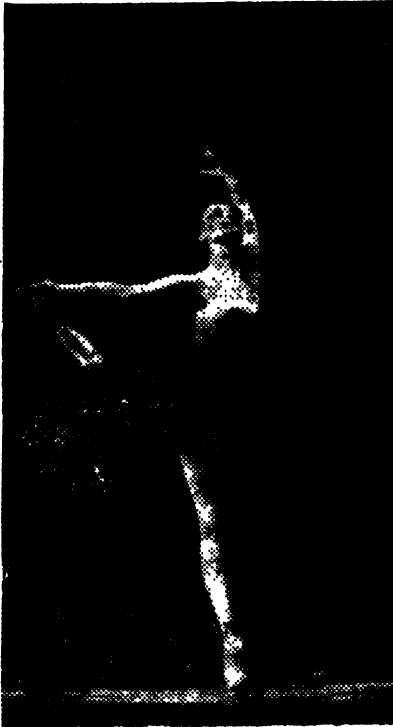
নির্মীয়মাণ ছবি 'দি শুজ অভ দি ফিশারম্যান-এ মহামান্য পোপ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে চলেছেন। একেই বলে ভাগ্য। অভিনেতাদের এই এক মহাসুবিধে, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদল করা যায়। আজ কোটিপতি, কাল পথের ভিখিরী। এই সেনাপতি পরক্ষণেই আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক। তবে অবিস্মরণীয় চরিত্রে অংশ-গ্রহণের সুযোগ সচরাচর মেলে না। সেদিক থেকে অ্যান্টনীকে বিশেষ ভাগ্যবান বলতে হবে।

অস্ট্রিয়ার যুবরাজ রুডলফ আর মেরিয়া ভেটসেরার মধুর প্রণয়কথার চিত্ররূপ 'মেয়ারলিং'। ঐতিহাসিক এই কাহিনী আবার রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত হবে। প্রযোজক পরিচালক টেরেন্স ইয়ং ব্রিটিশ চিত্র প্রতিষ্ঠানের হয়ে এটি তৈরি করছেন। সম্প্রতি অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে একটি বিশেষ বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। হাউস অভ হ্যাপসবার্গ এবং ভিয়েনার ঐতিহাসিক জায়গাতে তোলা হয়েছে ছবি। সোনেবার্গ প্রাসাদের একটি কক্ষ বিশেষ দৃশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন পরিচালক টেরেন্স।

মেরিয়া ভেটসেরার মিষ্টি-মধুর চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন ক্যাথারিন ডেনেভ। অপরাপর ভূমিকায় অভিনয় করছেন ওমার সেরিফ, জেমস ম্যাসন, আভা গার্ডনার, জেনোভ গেজ এবং জেমস 'রবার্টসন' জাস্টিস।

বিয়োগান্ত কাহিনী 'মেয়ারলিং' রুডলফ ও মেরিয়ার আত্মহত্যায় পরিসমাপ্ত। ছবিটিকে বাস্তবানুগ করতে অস্ট্রিয়ার পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রকার সহযোগিতা করছেন।

●

ছবির নাম 'ফরেস্ট সিমফনি'। আরণ্যক কাণ্ডকারখানা। অরণ্যের অধিবাসীদের নিয়েই তোলা হয়েছে ছবিটি—বলাই বাহুল্য। 'যারা চিত্রে অংশগ্রহণ করে তাদের ছবি দেখানোর রীতি রয়েছে বরাবরই। সেটা মানুষের ক্ষেত্রে প্রায়শঃই পালিত। কিন্তু বেচারা জন্তু জানোয়ারকে কে আর মনে রাখে?

কিন্তু তা তো নয়। সে ধারণাকে অসার প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন। অ-বলাদের তাঁরা মোটেই ভোলেন নি। সমাদরের সংগে তাদের অনেককেই—বরং বলা ভালো সবাইকেই খাঁচায় ভরে হাজির করেছিলেন ছবির প্রিমিয়ার শো-তে।—তাদের জন্যেই ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে তারা ছবি না দেখলে চলবে কেন?

সূর্যমুখী

ইউনাইটেডের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে দুদিনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় প্রশান্ত চৌধুরীর সূর্যমুখী। নাটকটি প্রযোজনা করলেন রাজকুমার ঘোষ। এ ছাড়াও এই বাৎসরিক উৎসবে পরিবেশিত হয় বৈদ্যবাটী বান্ধব নাট্যসমাজ কর্তৃক 'ও কাজ করে' নাটক ও জলসা। দ্বিতীয় দিনে নাটক 'সূর্যমুখী' সফল অভিনয়ের সম্মান বহন করে, বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন রাজকুমার ঘোষ, সৌরেন রায়চৌধুরী, শচীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর রায়, পরেশ পাল, যুবরাজ হাজরা, ভদ্রেশ্বর দলুই, কল্যাণ মিত্র, তপন মুখার্জী, অরুণ চক্রবর্তী, সুপ্রভাত চক্রবর্তী, বিমলেন্দু দে, কল্যাণী মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবনকাহিনী ও মনোবিকলন

স্টার মঞ্চে সাপ্লাই একাউন্টস ইনস্টিটিউট-এর শিল্পী-সদস্যারা সম্প্রতি দুখানি নাটক মঞ্চস্থ করলেন। এ'দের নাটক ছিল শক্তিপদ রাজগুরুর 'জীবনকাহিনী' ও রমেন লাহিড়ীর 'মনোবিকলন'। অভিনয়-গুণে দুটি নাটকই দর্শকদের ভালো লেগেছে। প্রথম নাটকের শিল্পীদের মধ্যে শান্তি বোস, পরিতোষ সেন, রজত দত্তরায়, মহীতোষ সেন, লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন জগদীশ চক্রবর্তী. দ্বিতীয় নাটকের শিল্পীদের মধ্যে শান্তি বোসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

বেঙ্গল মিউজিক কলেজের সমাবর্তন উৎসব

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে গত ২০শে ও ২১শে মে সন্ধ্যা ৭টায় বেঙ্গল মিউজিক কলেজের দুদিনব্যাপী ঊনবিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশতম সমাবর্তন উৎসব বিপুল সমারোহে প্রতিপালিত হয়, উভয় দিনের প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রীশোভাময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে—১৯৪০ সালে মাত্র ছয়টাকা মূলধন সম্বল করে আর গুটিকয়েক ছাত্রী নিয়ে অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর কতিপয় ত্যাগনিষ্ঠ সহকর্মী নিয়ে যে সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুঃসাহসিক যাত্রা সুরু হয়—এই কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী প্রি ইউনিভার্সিটি ও তিন বছরের বি মিউজ ডিগ্রি কোর্স-এর একমাত্র সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র। এই কলেজে পঃ বঙ্গের অন্তত আঠারটি বিভিন্ন কলেজের ছাত্রীগণ 'ইলেকটিভ' বিষয় নিয়ে সংগীত-এর পাঠ গ্রহণ করছেন। ১৯৬৪-'৬৭ সাল পর্যন্ত প্রি ইউ, বি মিউজ সংগীত, সংগীতবিশারদ, নৃত্যবিশারদ, বাদ্যবিশারদ, গীতপ্রভা, সুরপ্রভা, নৃত্যপ্রভা বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রায় ২৯০ জন ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়, উভয়দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পরিচালিত বিভিন্ন সংগীত, নৃত্য, যন্ত্র সংগীতের আসরে কৃতী ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন।

টাকার রং কালো

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের স্টোর রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা এবার অভিনয় করলেন সুনীল চক্রবর্তীর "টাকার রং কালো।" অভিনয় মঞ্চস্থ হোল হাওড়া গোলমোহর মঞ্চে। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বিভিন্ন ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন বেচু গঙ্গোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, সুপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, . নীরদবরণ হালদার, গোবর্ধন গোস্বামী, অঞ্জলি দে, রাধারঞ্জন পাল, রমলা নাগ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিতাভ দাশগুপ্ত।

নতুন রঙ্গমঞ্চ

নদীয়া জেলার ফুলিয়াতে ফুলিয়া জনরঞ্জন কেন্দ্র ও গ্রাম্য পাঠাগার এর যৌথ উদ্যোগে সমাপ্তপ্রায়—'ফুলিয়া রঙ্গমঞ্চের' শুভ উদ্বোধন হল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। এই উপলক্ষে দুদিনের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমদিন পরিবেশিত হল লোকরঞ্জন শাখার নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও উদ্যোগী সংস্থা দুটির সভ্যদের দ্বারা দ্বিতীয়দিন মঞ্চস্থ হলো "টিপু সুলতান"।

সৌখীন শিল্পীদের বদান্যতা

বিশিষ্ট অপেশাদার শিল্পী শ্রীমতী তারা ভাদুড়ীর অসুস্থতার জন্য বত্রিশজন মহিলা শিল্পী নিজেদের আয়ের অংশ থেকে মোট আটশো এক শ টাকা সংগ্রহ করে প্রবীণা শিল্পী শ্রীমতী তারা ভাদুড়ীকে দিয়েছেন তাঁর চিকিৎসার জন্য।

কর্ণার্জুন

আসানসোল শিল্পী-সংঘের সদস্যারা সম্প্রতি ডুরান্ড রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের "কর্ণার্জুন" নাটক। দলগত অভিনয়ে শিল্পীদের অভিনয় সুচিহ্নিত। শিল্পীদের মধ্যে সুঅভিনয় করেন সর্বশ্রী অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজবল্লভ ভা, মদনমোহন ঘোষ, দেবকুমার মজুমদার, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, মাস্টার গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী

অসুস্থ মহিলা নাট্যশিল্পী তারা ভাদুড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে ৫,৬২৪ টাকা তুলে দিচ্ছেন মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে। এই টাকাটি 'সৌখীন মহিলা শিল্পীদল' নামে সম্প্রদায়টি একটি সাহায্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছেন

(মোট)। রাজসজ্জা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীসাধিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর

গত ২৭শে মে (সোমবার) দক্ষিণ কলিকাতার "বালক সঙ্ঘের" শিশুশিল্পীরা প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের "যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর" নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করলেন। এই সঙ্ঘের প্রতিটি শিশুশিল্পীর সংযত অভিনয় ভবিষ্যতের উজ্জ্বল-ইংগিত বহন করে। অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমান অমিতাভ চক্রবর্তী, সঞ্জিৎ দেবকুমার, বাবি সুদ, টাবি সুদ, মুনিয়া, দেবকুমার, তপন, বাবলু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে দর্শক হিসাবে বহু গুণিজন উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

গত ১৩শে মে, ১৯৬৮ সাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় তালতলা একতা সঙ্ঘের রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ, বি, টি, এ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্য সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিচালনা করেন শ্রীমতী অসীমা দে এবং সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীপ্রণব মিত্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমুকুর সর্বাধিকারী। অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণনাথ পালচৌধুরী যে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন সভা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনী

'শুভদা' নাটক
১৩ই মে

শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনীর 'শুভদা' নাটকের একটি মুহূর্তে জীবন গোস্বামী, রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী, গীতা দে ও প্রতিমা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও উপেন্দ্রনাথ

পুণ্যশ্লোক মনীষী বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদধন্য নিত্যলীলাসহচর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভ জন্ম-শতবার্ষিকীর শুদিনব্যাপী উৎসব সাড়ম্বর ও মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হ'ল।

গত ৩০শে মে বসুমতী কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন, এম পি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শ্রীসেন উপেন্দ্রনাথের বিরাট কর্মময় জীবনের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। শ্রীসরকার বসুমতী ও বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা-নত চিত্তে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত জীবনীকার সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত তাঁর দীর্ঘ ভাষণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলারহস্য ও উপেন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবনের ব্যাখ্যা করে প্রণতি নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট বক্তা স্বামী পূর্ণানন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী বাণী রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায়
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১শে মে মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅশোককুমার সেন, এম পি, স্বামী অকুণ্ঠানন্দ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে এম জি এণ্টারপ্রাইজ কর্তৃক 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'উপেন্দ্রনাথ' অভিনীত হয়। মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে উপেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনীকে যুক্ত করে নাটক মঞ্চস্থ করা যে কতখানি দুরূহ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এম জি এণ্টারপ্রাইজ দুরূহ কর্মটি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। এজন্য এম জি এণ্টারপ্রাইজ অবশ্যই দর্শকসাধারণ কর্তৃক অভিনন্দিত হবেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এম জি এণ্টারপ্রাইজের প্রধান অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে তাঁর প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী অভিনয় দর্শককুলকে হতবাক করে দেয়। ঠাকুরের চরিত্রে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাণী রাসমণির ভূমিকায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমতী মলিনা দেবী।

উপেন্দ্রনাথের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন মণ্টু হালদার (স্বর্গত

উপেন্দ্রনাথের চরিত্রে মণ্টু হালদার

শিল্পী নবদ্বীপ হালদারের পুত্র)। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকাগুলি যাঁদের অভিনয়ে সুরম্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে তাঁরা হলেন শিশির মিত্র, বিষাদ মুখোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রেমলাল সিংহ, বিভুবসু, সমর চট্টোপাধ্যায়, বিষাদবরণ, গোপীনাথ চক্রবর্তী, শিশিরকুমার, শঙ্কর হাজরা, নমী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপাম লাল, সমীর মুখোপাধ্যায়, হারাধন দাস, বটু ঘোষ, অরারি চট্টোপাধ্যায়, জটাধর পাইন, শম্ভু দাস, সুনীলবরণ, বিশ্বনাথ সোম, লিলি গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতা বসু, উমা দেবী, প্রেমলতা দেবী, লীলাবতী (কল্যাণী দেবী), শীলা গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুন্দ বড়াল ও নরেন্দ্র-নাথের ভূমিকায় অমরেশ দাস। এই স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি অনবদ্য অভিনয়ের জন্য এম জি এণ্টারপ্রাইজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

গৌরী মা

প্রখ্যাত জীবনীকার শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী 'গৌরী মা' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন রবি বোস। এই বহুল বহির্দৃশ্যসম্বলিত চিত্রটির সুর-সংযোজনায় আছেন অপরেশ লাহিড়ী। চিত্রটি পরিবেশনা করছেন ঈগল ফিল্মস। চরিত্রচিত্রণে আছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, মিহির ভট্টাচার্য, এন বিশ্বনাথন, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপনকুমার, দীপক চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, গীতা দে, মিতা মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, মমতাজ আহমেদ প্রমুখ।

মেঘ ও রৌদ্র

রবীন্দ্রনাথের অনুপম কাহিনী 'মেঘ ও রৌদ্র'-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন খ্যাতনামা পরিচালিকা ও অভিনেত্রী শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী। চিত্রটির নায়িকার চরিত্রে অবতীর্ণা হচ্ছেন নবাগতা শ্রীমতী শিবানী মুখোপাধ্যায়। অন্য দু'টি বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন নবাগত বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বরূপ দত্ত। চিত্রটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বও নিয়েছেন পরিচালিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী।

গোরা পিকচার্সের 'নতুন পাতা' চিত্রের স্যুটিং-এর পূর্বে শিখা রায়চৌধুরীকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক ও চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত

টাকার লোভে

পরিচালক ও প্রযোজক রবীন সরকার ছোটদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। চিত্রটির নাম 'টাকার লোভে'। ছোটদের এই মনোরম চিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন সুধাজিৎ সরকার, ভূপেন সরকার, শিশির চক্রবর্তী, মান্দ চট্টোপাধ্যায়, আল্পনা মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, মুষ্টিযোদ্ধা শৈলেন সরকার, লক্ষ্মী ভট্টাচার্য, সত্য দেব, পার্থ মিশ্র, ডাঃ বিমল মল্লিক, ডঃ সুধাংশু প্রমুখ। ক্যামেরায় রয়েছেন ডঃ মনোজ মজুমদার (ম্যানচেস্টার)।

শীলা

খ্যাতনামা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সামাজিক বহুপঠিত উপন্যাস শীলা চলচ্চিত্রের

ছায়াবাণী পরিবেশিত শরৎচন্দ্রের 'কমললতা' চিত্রের নাম-ভূমিকায় শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

রূপোলী পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে। চিত্রটির পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় স্বয়ং। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, গঙ্গাপদ বসু, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এবং অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ।

শাস্তি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনোরম কাহিনী 'শাস্তি' রূপালী পর্দায় রূপায়িত হচ্ছে। চিত্রটি পরিচালনা করছেন স্বদেশ সরকার। চরিত্রচিত্রণে রয়েছেন দিলীপ রায়, গীতা দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চিত্রটিতে সুর সংযোজনায় রয়েছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

ভূপেন রায় পরিচালিত 'আপনযুগের কাহিনী' চিত্রে সীমান্তিনী রায়

দৃষ্টিদর্পণ

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরীর কাহিনী 'দৃষ্টিদর্পণ'। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন রঞ্জন মজুমদার। নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন শ্যামল মিত্র ও আরতি মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় বিকাশ রায়, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, জহর রায়, দিলীপ রায়, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, অনুভা দেবী মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সংগীত বিভাগের ভার বহন করছেন শ্যামলকুমার মিত্র।

আমার সুখ

সুসাহিত্যিক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ও পরিচালনা করছেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। সুরকাররূপে রয়েছেন প্রখ্যাত সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছেন কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা দে, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, রীণা ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

গুরু বাগচি পরিচালিত 'তারছাপু' চিত্রে মঞ্জু দে ও বিকাশ রায়

অন্তত ইঙ্গিতই দিচ্ছে। মাসের দশ দিনের পরই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। শেষ সপ্তাহ অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে উঠতে পারে। অপরদিকে ঝড়-ঝঞ্ঝা জলপ্লাবন, অতিবৃষ্টি ও ভূমিকম্পাদিতে ক্ষতি হতে পারে। নতুন কোনো আগ্নেয়গিরির আবির্ভাবও হতে পারে। নানা দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যাও বাড়বে। ইউরোপের মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দুর্যোগ আরম্ভ হতে পারে। ভারতের পক্ষে মাসের দশ দিনের পর কয়েক মাস অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ। পূর্ব ও পশ্চিমের ঘটনা-প্রবাহ আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে পারে। শনির অশ্রুধারা ও মঙ্গলের রক্তক্ষরা দুর্যোগের সূচনা সম্ভবত এ মাসেই দেখা দিতে পারে। যাক্, শ্রাবণ মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের বর্তমান জন্মদিন থেকে বর্ষকাল ভাগ্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনতে পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁদের সাবধান থাকা উচিত। এ-মাসের জাতিকাদের ভাবপ্রবণতা ও অভিমানের ভাব প্রবল। তাঁরা সঙ্গীতে, অভিনয়ে ও সাহিত্যে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। তাঁরা সুগৃহিণীও হতে পারেন। কিন্তু ক্রোধ দমন করে চলা উচিত। তাঁদের বেশী বয়সে বিবাহ শুভই করে। প্রথম নির্দিষ্ট স্থলে বিবাহ না হলেই বেশী শুভ হতে পারে। যাক্, এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের ব্যক্তিগত শুভাশুভের আভাস দেওয়া হচ্ছে।

মেষ ঃ স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও লেখকদের আয় বেশ বাড়বে। যোগাযোগের দিক থেকে কুটির-শিল্পী ও কাঁচা মালের ব্যবসায়ীদের পক্ষে ভাল বলা চলে। ইঞ্জিনীয়ার - কণ্ট্রাক্টরদের পক্ষে সময় তত অনুকূল নয়। যে ব্যবসায়ই করুন না কেন, বিশেষ ঝুঁকি নেবেন না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকুন। মাসের দশ তারিখের পর কাজকর্মের দিক থেকে অনুকূল। মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সকল কাজেই সাবধান হবেন। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় এবং আপনার ভাবনা

।। শ্রাবণ মাসের ফলাফল ।।

বা চিন্তাধারার সঙ্গে অন্যদের অমিল, মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ করে তুলবে। চাকুরীক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। নতুন-ভাবে কাজের চাপ পড়বে। চাকরী-প্রার্থীর চাকুরীলাভ হতে পারে। ঘনিষ্ঠদের কারো পীড়াদি সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। মহিলা জাতকেরও অনুরূপ ফল হবে। মেষ লগ্নে জন্ম

ভৃগুজাতক

হলে নানাভাবে শরীর ও মনের উপর চাপ পড়বে। তব্ এ মাসে কর্মক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থা দেখা দেবে। আকস্মিক-ভাবে মোটা রকমের ব্যয় হবার সম্ভাবনা।

বৃষ ঃ আর্থিক চাপই বেশী থাকবে। প্রয়োজনও বাড়বে। এই নিয়ে অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। যতই চুপ করে বা ধৈর্য ধরে থাকুন, অপরের দ্বারা উত্ত্যক্ত হতে হবে। কেনা-বেচার ব্যবসায়ে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। লোহার কারবারী, প্রেসের মালিক ও ওষুধের ব্যবসায়ীদের, যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ীদের এমাস নৈরাশ্যসূচক। শত্রুতা বিশেষ ক্ষতি করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে গুরুজনের পীড়া এবং সন্তানের পীড়া দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যও ভাল যাবে না। আঘাত লাগা ও আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। দাম্পত্য-ক্ষেত্রেও অশান্তির ছায়াপাত রয়েছে। মহিলা-জাতকের কোনো সূত্রে লাভের সম্ভাবনা থাকলেও শরীর ও মনের পক্ষে এ মাস ভাল নয়। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে বিশৃঙখলা ও দুর্ভাবনার কারণ ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক কারণে মানসিক দুর্বলতা বাড়বে।

মিথুন ঃ নানা কারণে অস্থিরতা প্রকাশ পাবে। বেশ ধৈর্য ধরে থাকা উচিত। এমন সব কারণ ঘটবে, যাতে অযথা ব্যয়বৃদ্ধি ও মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে। কাজের চাপ থাকবে

বেশী। কাজের দাবী মিটাতে গিয়ে রাতদিন হয়ত পরিশ্রম করতে হবে। বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে একথা বেশী খাটবে। অবশ্য আর্থিক দিক থেকে আশানুরূপ বলা চলে না। সম্ভাব্য চুক্তির কাজে বাধা পড়তে পারে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের সামনে বিরাট সমস্যা দেখা দিতে পারে। আগামী তিন বছর তাদের পক্ষে বিপর্যয়মূলক। চাকুরী ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। গুপ্তশত্রুতা মাঝে মাঝে উত্ত্যক্ত করবে। কারো কাছ থেকে প্রত্যাশিত বিষয়ে হতাশ হতে পারেন। জমি-বাড়ি কেনা-কাটার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশ উৎপাত হতে পারে। মিথুনলগ্নে জন্ম হলে দেহকষ্ট, আর্থিক দুশ্চিন্তা ও শত্রুবৃদ্ধির লক্ষণ আছে। মাসের শেষাংশ অনেকাংশে অনুকূল হবে।

কর্কট : ভাবপ্রবণতা ও সামান্য কারণে বিচলিত হবার অভ্যাস ত্যাগ করুন। সময়টা সুযোগপ্রদ কিন্তু নিজের দোষে সুযোগ নষ্ট হতে পারে। শনি এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছে যে, প্রায়ই কারণে-অকারণে উত্ত্যক্ত হতে হবে। এখন থেকে আট-নয় মাসের মধ্যে বিয়োগ-ব্যথায়ও কষ্ট দিতে পারে। গৃহ-সম্পত্তি ও পারিবারিক ব্যাপারে গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসায়ে মাসের মধ্যভাগ যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। ঝোঁকের মাথায় চাহিদার বেশী পণ্য-সংগ্রহ সম্বন্ধে সাবধান। লোহা, মশলা ও ওষুধের ব্যবসায়ীর পক্ষে এ মাস দুর্ভাবনা আনতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে গতানুগতিক। সম্ভাব্য উন্নতির পথে বাধা। ন্যায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সঙ্ঘর্ষ লাগতে পারে। মহিলা-জাতকের পক্ষে প্রিয়জনের জন্য দুর্ভাবনার কারণ রয়েছে। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক ক্ষেত্রে ঝঞ্চাট, স্বাস্থ্যের গোলযোগ ও কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার আভাস দেখা যায়। স্বজন-পীড়াদিও সঙ্কট আনতে পারে। বাইরে যাবার সম্ভাবনা আছে।

সিংহ : মাসের গোড়ার দিক মোটামুটি ভাল। কিন্তু কোনো ব্যাপারে নিজের কাজের সময় নষ্ট হতে পারে। এ মাসে একাধিকবার বাইরে যাবার সম্ভাবনা আছে। বিষয়-সম্পত্তিঘটিত ব্যাপারে পুরনো জের চলতে পারে। স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে আইনজীবী, শিল্পী ও লেখকদের পক্ষে এখন সুযোগপ্রদ। রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয়দের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শত্রুতা ও অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। কেনা-বেচার ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। মাসের শেষাংশ স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। চোখের গোলযোগ হলে সাবধান হবেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকলে তার বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে কাজের চাপ পড়বে। চাকর-বাকর নিয়ে কিছু অসুবিধায় পড়তে পারেন। মহিলা জাতকের পক্ষে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ও স্বাস্থ্যের গোলযোগ যাবে। নতুন কোনো কাজে হাত দিয়ে নৈরাশ্য-ভোগের আশঙ্কা রয়েছে।

কন্যা : আর্থিক ক্ষেত্রে আগের চেয়ে কিছু ভাল হতে পারে। কিন্তু পারিবারিক সমস্যা এবং ঘনিষ্ঠদের কারো আচরণ মনের উপর চাপ দিতে পারে। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। সঞ্চিত অর্থের অপচয় ও অন্য কারো সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে গোলযোগ এবং ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধার যোগও রয়েছে। ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। কিন্তু শেয়ারের কাজ ও দালালী প্রভৃতির ব্যাপার নৈরাশ্যসূচক। দূরে কোথাও যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে। মাসের মধ্যভাগ বেশ সুযোগপ্রদ। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। অনাত্মীয়া রমণীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। চাকুরীক্ষেত্রে সাধারণভাবেই চলবে। সরকারী চাকরীক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। মহিলা-জাতকের পক্ষে প্রিয়জনের উন্নতিতে আনন্দের সম্ভাবনা। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য খারাপ যাবে। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে নতুন পরিবেশে কাজের চাপ বাড়বে কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। আর্থিক দিক থেকে হঠাৎ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলা : এ মাসটা অত্যন্ত গোলমেলে। সময় সময় অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হবে। আরব্ধ কোনো কাজে বাধা পড়তে পারে। শরীরও উৎপাত করবে। উপরি-আয় কিংবা কোনো সূত্রে বাইরের কোনো আয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে ডাক্তারী, শিল্পীর কাজ ও মনোহারী কুটির-শিল্পের কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের যোগাযোগের দিক থেকে বেশ ভাল বলা চলে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মত-বিরোধ এবং আশ্রিতদের মধ্যে কারো রোগভোগ উত্ত্যক্ত করতে পারে। ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। লেখকদের পক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কেনা-বেচার ব্যবসায়ে মাসের শেষাংশ মন্দাসূচক। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে ঝঞ্চাট হতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে অশান্তি-জনক পরিবেশ মনের উপর চাপ দেবে। মহিলাদের পক্ষে শত্রুতায় উত্ত্যক্ত হবার আশঙ্কা। তুলা লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা শরীর ও মনের উপর চাপ দেবে।

বৃশ্চিক : ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আপনার পক্ষে এখন অত্যন্ত দরকার। কাজকর্মের যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। কিন্তু নানাভাবে উত্ত্যক্ত হবার এবং অপরের আচার-আচরণে উত্তেজিত হবার সম্ভাবনা। খেয়ালের বশে সুযোগও নষ্ট করতে পারেন। স্বাধীন প্রোফেশনে আয় বাড়বে। কেনা-বেচার ব্যবসায়ে আয় বাড়ার কথা। অবশ্য লোহার ব্যবসায়ী ও লৌহজাত শিল্পের উৎপাদনকারীদের পক্ষে এ মাস সমস্যা-পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। উদর-সংক্রান্ত গোলযোগ

ও কোনোরূপ ব্যথা-বেদনা দেখা দিলে সতর্ক হবেন। চাকুরীক্ষেত্রে মনোমত আভাস পাবেন। দাম্পত্যক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। মহিলা-জাতকের পক্ষে অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে অর্থহানি, অযথা বিবাদ ও শত্রুতা সম্বন্ধে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে ভাল কিছু ঘটতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। ঝুঁকির কাজে হাত দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

ধনু : স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে বুদ্ধিজীবীর কাজে বাধা এবং আশানুরূপ ফললাভে হতাশ হবার আশঙ্কা। এ মাসে কোনো পরিকল্পনা রূপায়ণে হাত দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। তবু মাসের মধ্যভাগে নতুন কিছু করার মত যোগাযোগ হতে পারে। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে, ওষুধের কারবারে ও রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনে ঝঞ্ঝাট ও সঙ্কট দেখা দিতে পারে। বিষয় সম্পত্তি ও পুরানো কারবার নিয়েও দুর্ভাবনার কারণ ঘটতে পারে। মূত্রাশয়ঘটিত পীড়া কিংবা গ্রন্থিস্ফীতি দেখা দিলে গোড়াতেই সতর্ক হবেন। সন্তানদের সম্বন্ধেও এ মাস আশাপ্রদ নয়। চাকুরীক্ষেত্রে গতানুগতিকভাবে চলবে। পরিবর্তনের আভাস পেয়েও তাতে নিরাশ হতে হবে। মহিলা বন্ধু দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। মহিলা জাতকের পক্ষে দেহকষ্ট ও মনোমালিন্য প্রায়ই মানসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। ধনু লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি হলেও শরীর উৎপাত করবে।

মকর : স্বাধীন প্রোফেশনে আয় বৃদ্ধি ও যোগাযোগের দিক থেকে ভাল বলা চলে। লেখক, শিল্পী ও অভিনেতাদের পক্ষে বেশ ভাল। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বাতজ পীড়া ও মূত্রাশয়জনিত পীড়াদি সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। কাউকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হতে পারেন। আবার নিজেও অকারণে হিতৈষিজনের মনে আঘাত দিতে পারেন। উত্তেজনা দমন করে চলা উচিত। ঝোঁকের মাথায় কোনো ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ ঝঞ্ঝাটে পড়তে পারেন। দূরে কোথাও যাবার আহ্বান আসতে পারে। ব্যবসায়ে আগের চেয়ে ভাল। কিন্তু পুঁজিপতি ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের মনের উপর গভীর নৈরাশ্যের ছায়াপাত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ও গৃহ-সংসারে প্রায়ই অশান্তির ছায়া পড়তে পারে। মহিলাজাতকের পক্ষেও অনুরূপ। বিবাহযোগ্যা মকর রাশির মেয়েদের এখন বিবাহ দেওয়া ঠিক হবে না। মকর লগ্নে জন্ম হলে নতুন যোগাযোগে আর্থিক উন্নতির আশা, কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে নৈরাশ্য আনতে পারে।

কুম্ভ : আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে বাধা ও সম্ভাব্য প্রাপ্তিতে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারো মনে আঘাত দেওয়া কিংবা ভুল বোঝাবুঝির জন্য মানসিক অশান্তি ঘটতে পারে। ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে কারো জন্য দুশ্চিন্তা ভোগের কারণ রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক হবেন। আন্ত্রিক ব্যথা-বেদনা কিংবা কোনোরূপ স্ফীতি দেখা দিলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। সঞ্চিত অর্থের কিছু অপচয় এবং সখের কোনো জিনিস হাতছাড়া হতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন কোনো কিছু করতে গিয়ে ফাঁপরে পড়তে পারেন। আইনজীবী, অধ্যাপক ও লেখকশ্রেণীর পক্ষে এ সময় সুযোগপ্রদ। চাকুরীক্ষেত্রে এ মাসে কোনো তাৎপর্যমূলক সংবাদ পেতে পারেন। যাই হোক না কেন, অধীর হবেন না। আকস্মিক প্রাপ্তিযোগেরও সম্ভাবনা। মহিলা-জাতকের প্রায় অনুরূপ ফল। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে আয়বৃদ্ধি এবং আগের কোনো ব্যাপারের সুরাহা হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে।

মীন : এ মাসের প্রথম তেরোদিন একটু উত্ত্যক্ত করতে পারে। মধ্যভাগ অনুকূল। শেষাংশে কর্মক্ষেত্রে সুযোগ আসবে। পুরানো মামলা—মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাট উত্ত্যক্ত করতে পারে। নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কোনো বিবাদ-বিতর্ক করা উচিত হবে না। নীরবে নিজের কাজ করে যান। শত্রুরা কুৎসা রটাতে পারে। তাতে কোনো ভয় নেই। আপনার দৃঢ়তা এবং উদারতা আপনাকে জয়ী করবে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারো বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। ব্যবসায়ে আগের চেয়ে ভাল। কিন্তু নতুন কিছু করার পক্ষে বাধা আছে। মৌলিক কাজের স্বীকৃতিলাভ ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মানবৃদ্ধিরও সম্ভাবনা। রাজনৈতিক ব্যাপার এড়িয়ে চলা উচিত। তরুণী মেয়েদের সঙ্গী নির্বাচনে এবং বাইরে যাওয়া সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। মীন লগ্নে জন্ম হলে পুরনো ব্যাপার গোলমাল বাধাতে পারে। সকল ব্যাপারে সাবধান। আর্থিক ক্ষেত্রেও নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে।

পত্রোত্তর

● শ্রী[illegible]কুমার সরকার (শরৎ চ্যাটার্জী রোড)---(১) এবার হবে, (২) হবে না। ● শ্রীবিশ্বরঞ্জন চ্যাটার্জী (কামারকিতা)--- (১) মীন রাশি ও তুলা লগ্ন, (২) দশা জানানো সম্ভব নয়। দর্শন বিশেষ অশুভ। ● শ্রীসমীরকুমার ভট্টাচার্য (মহাজাতি, কলিকাতা -৪০) --(১) জন্মকালে শনি, মঙ্গল ও চন্দ্র অশুভপ্রদ; সুতরাং আশানুরূপ হওয়া কঠিন, (২) অধ্যাপনার দিকে গেলে ভাল হতে পারে। ● শ্রীঅমরকৃষ্ণ (কান্দী)---(১) বাধা পড়তে পারে. (২) অনেকাংশে হবে। ● শ্রীভৌতিক ভট্টাচার্য (জগাছা)----(১) মিথুন রাশি, (২) অনেকাংশে। ●শ্রী শ, সা (চুয়াপাড়া) ---(১) বৃশ্চিক লগ্ন, তুলা রাশি। এর বেশী দশাদি জানানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় (২) একবর্ষ মধ্যে [illegible]

হতে পারে এবং চাকুরীর পর ব্যবসার। ● শ্রীমতী চ-ক-সা (চুয়াবাড়ী)—(১) মীন রাশি ও কুম্ভ লগ্ন, (২) বিবাহ একবর্ষ মধ্যে না হলে প্রবল বাধা, (২) বিবাহিত জীবন মোটামুটি উভয়ের ভাল; লটারীতে প্রাপ্তিযোগ কারো নেই। ●শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন (সেকেণ্ড মার্কেট শিলিগুড়ি)—(১) হবে, (২) সিংহ রাশি। ●শ্রীসমীরকুমার বসু (রাঁচি, যতীন চন্দ্র রোড)—(১) পনেরো মাস মধ্যে, (২) আগামী বর্ষে হবে। ●কুমারী আলপনা ভট্টাচার্য (ভাক্তার লেন, কলিঃ) —(১) উনিশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত দেখুন, (২) এরই মধ্যে হতে পারে। ●শ্রী এম দণ্ডপাট (কাজোড়াগ্রাম)—(১) নয় মাস, (২) আগামী অক্টোবর পর্যন্ত। ●শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ (স্যার গুরুদাস রোড, নারকেলডাঙ্গা)—(১) পুজোর আগে হবে না, (২) নিজেকে যেতে হবে। ●শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (আরামবাটি, খড়গপুর)— (১) রবির প্রতিকার জন্য লাল চুনী কমপক্ষে চাররতি সোনার আংটিতে; (২) নয় মাস পর হতে পারে। ● শ্রীশ্যামাপদ দাস (আরামবাটি, খড়গপুর)— (১) বিজ্ঞান অথবা কোনো কেমিক্যাল লাইনে, (২) তেইশ থেকে পঁচিশ বর্ষ মধ্যে। ● শ্রীকালীপদ দাস (আরামবাটি, খড়গপুর)—(১)রবির জন্য লাল চুনী তিনরতি। সোনার আংটিতে। (২) বাইরে যাবার সম্ভাবনা। ●শ্রীঅনামী (ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা)—(১) শরীর ও মনের উপর চাপ থাকবে, (২) আগামী বছর হতে পারে। ●শ্রীমতী বিজয়া চৌধুরী (মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা)—(১) এর জন্য প্রতিকার দরকার, (২) বর্তমান ইংরেজী সালের শেষাংশ দেখুন। ●কুমারী শ্রীমতী বসু (কালিয়াদহ পার্ক রোড, কলি)—(১) সুযোগ আসবে, (২) তিন বছর দেখুন। ● শ্রীবিবেকানন্দ এস হেম্বদ (বাঙ্গালোর)—(১) হবে, (২) দেড় বর্ষ পর করুন। ●শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার (রাজরাজাতলা)—(১) বৃশ্চিক লগ্ন, ধনু রাশি ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। (২) বিংশোত্তরী মতে শুক্রের দশায় জন্ম এবং ঐ দশা প্রায় সতেরো-আঠারো বয়স পর্যন্ত চলবে। ●শ্রীঅসিতকুমার রায় (প্যারীমোহন রায় রোড, কলিকাতা)—(১) দেড় বর্ষ মধ্যে না হলে হবে না; (২) বিদেশ যাত্রা নেই। প্রমোশন হবে। ●শ্রীমতী স্বর্ণা রায় (শশিভূষণ ব্যানার্জী রোড, বড়িষা)—(১) নির্দিষ্ট সময় না দিলে লগ্ন ঠিক হবে না; বৃষ রাশি ও মৃগশিরা নক্ষত্র, (২) আগামী দেড় বছরের কার্যকারণের উপর নির্ভর করছে। শ্রীস্বপনকুমার দাস (সুবার্বন পার্ক রোড, হাওড়া)—(১) মেষ রাশির পক্ষে এখন সময় অশুভ, (২) অক্টোবরের মধ্যে সুযোগ আছে; প্রতিকার পাঁচরতি ইন্দ্রনীল। ●শ্রীপার্থ (মুরারিপুকুর রোড, কলিকাতা)—দুখানি কুপন। (১) তৃতীয় কুণ্ডলীটি ঠিক আছে; এখন রাহুই বেশী খারাপ করছে এর পর শনিও আড়াই বছর উৎপাত করবে; (২) মঙ্গল ও শনি একত্রে এবং চন্দ্র ও রাহু জন্মকালে একত্রে এ যোগ বিঘ্নকর, (৩) প্রতিকার গোমেদ উৎকৃষ্ট ধরণের আটরতি ও সাদা মুক্তা কমপক্ষে পাঁচ রতি। মুক্তা সোনার আংটিতে এবং গোমেদ রূপায়। বিশেষভাবে শোধনাদির দরকার, (৪) বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়সের পর ধীরে ধীরে উন্নতি। ●শ্রীভবতারাম ভট্টাচার্য (কাদাকুলি, বিষ্ণুপুর)—(১) আগামী ইংরেজী সাল উন্নতিকর। (২) বৃহস্পতি-মঙ্গল বিশেষ শুভকর। ● শ্রীমতী প্রতিমা রায় (টি এন মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা)-(১) কন্যার পক্ষে দেড় বছর ভাল বলা চলে না। । শ্বেত প্রবাল ছয়রতি ধারণ করিয়ে দেখতে পারেন। (২) ছেলেকে বাইরে কোথাও পড়তে দিতে পারেন। ● শ্রীপ্রশান্তরাম ভট্টাচার্য (বোড়াল) —চুক্তিগত সাক্ষাৎ হবে না। ●শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত (রূপনারায়ণনন্দন লেন, কলিকাতা)—(১) বিশেষ সাবধান; দেড় বছর অশুভ; (২) সিংহ রাশি ও কন্যা লগ্ন। কোনো কাজেই এবারে এ বছর উপযুক্ত নয়; (৩) বছরের শেষাংশ দেখুন। সমবায়ের সুযোগ নেই কিংবা লটারীতে হবে না; (৪) বর্তমানের মতই। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। ●শ্রীসুধাংশুশেখর(প্রভুরাম সরকার লেন, কলিকাতা)—(১) জন্ম সালে রবি ও রাহু একত্রে থাকায় অশুভ হয়েছে; চৌত্রিশ বর্ষ বয়সের পর মোটামুটি ভাল। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। (২) গোমেদ আটরতি ও পান্না ছয়রতি। উপযুক্তভাবে শোধনাদি দরকার। ● শ্রীমতী নলিনী দত্ত (শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) আগামী অক্টোবরের পর,(২) বিশেষ সুবিধা হবে না। ● শ্রী এন কে বি (রসা রোড সাউথ, কলিকাতা)—(১) আগামী বছরে, (২) বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়সে। ●শ্রীমণ্টু(দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিঃ)—(১) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে, (২) সম্ভাবনা কম। ● শ্রীঅজিতেশ ব্যানার্জি (আর এম জি লেন, বাগবাজার) —(১) হবে,(২) পঁয়তাল্লিশ। ● শ্রীদিনেশ ব্যানার্জী (গ্রন্থলোক)—রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ও পীত পোখরাজ আটরতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল (নরেন্দ্রপুর)—(১) পাঁচ বছর পর অনেকাংশে ভাল হবে, (২) আড়াই রতি লাল চুনী ও আড়াই রতি কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসুশান্ত দে (মাণিকতলা মেন রোড, কলিঃ)—(১) বর্তমান বাংলা সালে হতে পারে; (২) তিন বছর লাগবে। ●শ্রীরামসুন্দর চক্রবর্তী (ধরণীধর মল্লিক লেন, খুরুট)—(১) বাধাজনক সময়; (২) তিন বছর পর দেখুন। ● শ্রীমুকু (রেলওয়ে কোয়ার্টার, রাণাঘাট)—দু'খানি কুপন। (১) দশা কিংবা অন্তর্দশা কষে জানানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। (২) জ্যোতিষের প্রতিকার করলেই ভাল হয়ে উঠবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। উপযুক্ত চিকিৎসক দেখান। নয়রতি শ্বেত প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। (২) বর্তমানে রাহুই বেশী খারাপ করছে। পাঁচ বছর পর কিছু ভাল হতে পারে।

● শ্রীঅনিকেত ব্যানার্জি (আর এন জি, লেন, কলিকাতা)—(১) আগামী বছরে দেখুন, (২) সাধারণ। ● শ্রীঅশোকদাস (জি টি রোড, হাওড়া)—(১) এখন থেকে পনেরো মাসের মধ্যে (২) ওষুধের কিংবা পুস্তকের। ● শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য (আর ডি এস ও, লক্ষ্ণৌ)—(১) পনেরো মাস মধ্যে, (২) ট্রান্সফার হবে। ● শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী (রায়নগর, বাঁশদ্রোণী)—কন্যা লগ্ন, বৃশ্চিক রাশি, (২) বিপ্রবর্ণ, অনুরাধা নক্ষত্র ও দেবগণ। ● শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় (বেহালা, গভঃ কোয়ার্টার্স)—(১) বর্তমান বর্ষে, (২) হবে না। ● শ্রীঅসীমকুমার মুখার্জী (মিত্তলা লেন, শিবপুর)—(১) পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না, (২) চাকুরী হবে। ● শ্রীবিকাশ ঘটক (আসানসোল)—(১) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। রক্তমুখী প্রবাল আটরতি রূপার আংটিতে, (২) বিজ্ঞানসংক্রান্ত লাইন। ডাক্তারী হলে ভাল হয়। ● শ্রীপূর্ণ ঘটক (আসানসোল)—(১) গোমেদ আটরতি ও মুক্তা চাররতি। মুক্তা সোনার আংটিতে; (২) হতে পারে; তিন বছর বিশেষ সাবধান।

● শ্রীরামকানাই পাল (কাছারীপাটি, রামপুর)—(১) দু বছর পর (২) গৃহনির্মাণ হতে দেরী হবে। ● শ্রীদুর্গা—(পার্ক সার্কাস, কলিকাতা)—(১) অনেকাংশে ভাল হবে, (২) মোটামুটি ভাল। ● শ্রীনবাব (দরগা রোড, কলিঃ)—(১) বদলি হবেন; (২) স্বচ্ছলতা আসবে। ● শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত (মহেন্দ্রচন্দ্র গার্ডেন রোড, কলিঃ)—(১) আড়াই বছর দেখুন, (২) এ বছর না হলে বত্রিশ বর্ষে। ● কুমারী শ্রীমতী বসু (বালিগঞ্জ পার্ক রোড, কলিকাতা)—(১) কেউ কেউ একসঙ্গে দুখানি কুপন পাঠান। তাই চারটি উত্তর দেওয়া হয়, (২) রত্নের কোনো পরিবর্তন হবে না; (৩) যা বলবার বলা হয়েছে; অপেক্ষা করে দেখুন। ● শ্রীমতী শিপ্রা সেনশর্মা (উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিঃ)—(১) তিন বছর ধৈর্য ধরে থাকুন, (২) সুযোগ পাবেন। ● শ্রীসমরকুমার ঘোষ (পাণ্ডুয়া)—(১) পরীক্ষার বিষয় বলা হয় না, (২) ব্যবসায়ে ভাল হবে। ● শ্রীমতী অনীতা সিংহ (রূপনগর—(১) সম্ভাবনা কম, (২) বর্তমান বাংলা বর্ষের শেষাংশ পর্যন্ত দেখুন।

● শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ (হুগলী জিলা পরিষদ অফিস, চিনসুরা)—(১) আগামী অক্টোবরের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে; (২) চাররতি মুক্তা ধারণ করতে পারেন। ● শ্রীমাধবচন্দ্র ব্যানার্জী (দেশবন্ধু রোড, আলমবাজার)—(১) এখন তিন বছর সকল কাজে সাবধান, (২) সাতাশ বর্ষ বয়সের পর। ● শ্রীবেলফুল দাসশর্মা (বিরাটি, কলকাতা)—(১) লগ্ন ঠিক করা যাবে না। সিংহ রাশি ও মঘা নক্ষত্র, (২) লাল চুনী চাররতি। ● শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখার্জী (ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা)—(১) বর্তমানের চেয়ে একটু ভাল, (২) সম্ভাবনা রয়েছে। ● শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র রায় (পূর্বসিঁথি রোড, দমদম)—(১) ভাল হবে; (২) সাঁইত্রিশ থেকে। ● শ্রীসাধু হালদার (নৈহাটি)—(১) বৃষ লগ্ন ও তুলা রাশি। (২) জন্মকালীন মঙ্গল ও রাহু অত্যন্ত অশুভ। ● শ্রীশরৎ মুখোপাধ্যায় (চারিচারপাড়া, নবদ্বীপ)—ছয়রতি পীত পোখরাজ সোনার আংটিতে।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

"Fools are my theme, let satire be my song."
—Lord Byron.

স্বদেশে ফিরে এসে কিছুকাল যে নিশ্চিন্ততায় থাকবেন, সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করবেন, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভাগ্যে লেখা নেই। একেই তিনি পরিশ্রান্ত, রণক্লান্ত। আপন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত। স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে ভুলেই গেছেন। গার্হস্থ্য-জীবন যেন বিস্মৃতপ্রায়। দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে দেখলেন, অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের কোন কোন দল অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিদিন দরবারে একেক দলের মুখপাত্র আর প্রতিনিধিরা এসে অভিযোগ জানাতে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে শ্রবণ করেন মহারাজা। বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধি হ'লেও তাঁদের অনুযোগ একই বিষয়ে। সকলেই ঐ একই নালিশ জানাতে থাকেন,—বিদেশী জলদস্যুদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে আছি। এই সকল দস্যুদের আক্রমণ যে আমরা প্রতিহত করতে পারি, তেমন শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের নাই। মগ, ফিরিঙ্গী আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা দল বেঁধে আসে। অর্থ ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ক'রে যে তারা ক্ষান্ত হয় তা নয়, তারা আমাদের পরিবারের নারী ও শিশুদের অপহরণ করে। পুরুষদের ধরে বেঁধে নিয়ে যায়। কোথায় যে চালান দেয় কেউ জানতে পারে না। শোনা যায় লোকে বলে, অপহৃত মানুষগুলোকে তারা নৌকায় বোঝাই ক'রে বিভিন্ন বন্দরে বিক্রয়ার্থে পাঠিয়ে দেয়। শুধু নিজেদের ভোগকামনা পরিতৃপ্তির জন্য যুবতী নারীদের হাতছাড়া করতে চায় না। হাতে রাখতে চায়। আমাদের মান-সম্ভ্রম আর যে রক্ষা পায় না। মহারাজার রাজ্যে আমরা ধর্মভ্রষ্ট হই কেন? অবিলম্বে আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে আমরা দিল্লীর দরবারে প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা জানাতে বাধ্য হবো! তাই একটা কিছু সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য মহারাজা আপনার সমীপে নিবেদন জানাতে এসেছি। আপনি আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ সদয় হোন। কৃপা বর্ষণ করুন।

দিল্লীর দরবার!

মনে যেন আঘাত পেলেন প্রতাপাদিত্য, দিল্লীর দরবারের কথা শুনে। তাঁর রাজ্যের অশান্তি দূর করতে তিনি কি এমনই অক্ষম ও অযোগ্য। সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর প্রতিপক্ষকে সাহায্যার্থে ডাকতে হবে? তার চেয়ে অসম্মানের আর কী থাকতে পারে!

সমগ্র গৌড়বঙ্গের মানচিত্রটা যেন প্রতাপের চোখের সমুখে ভেসে উঠলো।

এই ভারতবর্ষের একটা বিরাট অংশ—যতটা দখলে আছে প্রতাপাদিত্যের। মানচিত্রে তিনি যেন লক্ষ্য করলেন, বঙ্গদেশটা সত্যই নদীমাতৃক। কত যে নদ নদী, সংখ্যায় যেন ধরা পড়ে না। তদুপরি সমুদ্রের উপকূলে বাঙলা দেশের অবস্থান। সেই হেতু জলদস্যুদের এতটা প্রাদুর্ভাব। যখন তখন যেখানে সেখানে এই হানাদাররা অনুপ্রবেশ করছে। জলের ধারেকাছে যাদের বসতি, তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ করছে এই অসভ্য বর্বর কামুক বিদেশী পশুগুলো! এদের সায়েস্তা করতে না পারলে, সমূলে বিনাশ না করলে দেশে তো আর শান্তি থাকে না।

প্রায় প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে জরুরী বার্তা আসছে প্রতাপের কাছে। নিদ্রায় জাগরণে মহারাজা শুনছেন সেই একই কাতর আবেদন—রক্ষা করো! রক্ষা করো!!

দেশের প্রজারা অতৃপ্ত ও অসুখী থাকলে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হ'তে পারে না, রাজ্য-পরিচালনায় অভিজ্ঞ প্রতাপাদিত্য বেশ ভালই জানেন।

জরুরী বার্তার অধিকাংশ আসছে বাঙলার পূর্বপ্রান্ত থেকে। বরেন্দ্রভূমির প্রজাদের আবেদনই সর্বাধিক।

কিন্তু বাঙলার পূর্বদেশে প্রতাপের যেন তেমন কর্তৃত্ব নেই।

স্বর্গত মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে মনে মনে এ জন্য দায়ী করেন প্রতাপ। স্বীয় পিতাকে দোষ দেন! বিক্রমাদিত্য তাঁর জীবদ্দশায় যশোহররাজ্য ভাগ ক'রে দিয়ে গেছেন দুই শরিকের মধ্যে। দুই শরিক, রাজা বসন্ত রায় ও রাজকুমার প্রতাপাদিত্য। ভাগাভাগিতে প্রধানত বসন্ত রায়ের রাজ্য পশ্চিমভাগে ও প্রতাপের রাজ্য পূর্ব-ভাগে পড়লেও একের কোন কোন স্থান অপরের অংশেও পড়েছিল। এই ভাগাভাগির দুর্লঙ্ঘ্য বিপত্তি আজ ভোগ করতে হয় প্রতাপকে। মৃত পিতার কার্যে অভিমান প্রকাশ পায়। চকশ্রী বা চাকশিরি নামে একটি স্থান যশোহর রাজ্যের পূর্বসীমায় অবস্থিত হ'লেও, এই অংশটা রাজা বসন্ত রায়ের অংশে পড়েছে।

অথচ সমুদ্র-উপকূলবর্তী চকশ্রীতে দস্যুদের আক্রমণ প্রতি-রোধের জোরদার পাকা ব্যবস্থা না করতে পারলে এই দৈনন্দিন অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

আর্জি পেশ করতে চললেন প্রতাপাদিত্য। ক্ষুব্ধ মনে গেলেন পিতৃব্যের কাছে, তাঁর আলয়ে। বিনীতভাবে বললেন, খুল্লতাত মহাশয়, দুর্বিপাকে পড়েছি। এখন আপনিই একমাত্র আশা-ভরসা।

অনুমানে বসন্ত রায় বুঝলেন, বিপাকে প'ড়েই এতটা বিনয় প্রকাশ করছে ধূর্ত প্রতাপ। কার্য সিদ্ধ হ'লেই আবার সে নিজ-মূর্তি ধারণ করবে। দায়ে পড়েছে প্রতাপ, দায় উদ্ধার হ'তে যতটুকু দেরী।

অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করলেন বসন্ত রায়। তিনিও একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনীতিক। একদা দাউদ খাঁর দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন তিনি। বুদ্ধিবল তাঁরও কম নয়।

বসন্ত রায় বললেন,—আমি আবার কী এমন একটা মূল্যবান হয়ে উঠলাম, তোমার চোখে? আমি তো তোমার সম্মান-প্রদর্শনের যোগ্য নই প্রতাপ।

—আমি সেরূপ মনে করি না মহাশয়। আপনাকে সর্বদাই সম্মানের আসনেই রাখি।

বিনম্র সুরে, নতমস্তকে বললেন প্রতাপাদিত্য। তিনি লক্ষ্য করলেন রাজার চোখে যেন বিরক্তির দৃষ্টি। কথা বলছেন, অন্যত্র চোখ ফিরিয়ে।

বসন্ত রায় বললেন,—যাই হোক, এক্ষণে তোমার বক্তব্যটা ব্যক্ত কর।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—বাঙলার পূর্বপ্রান্তে বিদেশী জলদস্যু-দের উৎপাত ও উপদ্রব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতেছে।

—তজ্জন্য আমার কি করণীয় আছে? দিল্লীর সম্রাটের কাছে প্রতিকারের প্রার্থনা জানাও। তিনি অবশ্যই এর প্রতিবিধান করবেন।

—দিল্লীর সম্রাটকে আমি মানি না।

প্রতাপের উক্তি শুনে সরবে হেসে উঠলেন বসন্ত। হাসতে হাসতে বললেন,—তুমি অমান্য করলেও আর আর সকলে মান্য করে তাঁকে।

আবার বললেন প্রতাপাদিত্য,—আমার রাজ্যসীমানায় দিল্লীর সম্রাটের কোন এক্তিয়ার নাই।

বসন্ত বললেন,—তুমি কী সম্রাটের অধীনতা স্বীকার কর না?

প্রতাপ বলেন,—না, কদাপি নয়। আমি মনে করি আকবর শাহের সম্রাট হওয়ার কোন অধিকার নাই। তিনি একজন বিজাতীয়। ছলে বলে ও কৌশলে ভারত-সাম্রাজ্য হস্তগত করেছেন তাঁর পিতৃপুরুষরা।

বসন্ত বললেন,—সম্রাটকে অমান্য করলে তার পরিণাম কী হতে পারে, কখনও চিন্তা করেছো কী? ভেবে দেখেছো?

প্রতাপ বললেন,— প্রয়োজন বোধ করি না।

বসন্ত বলেন,—তবে তো আর কথাই নাই। তর্কে-বিতর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পাক, তাহা আমি চাই না।

খানিক নীরব থেকে প্রতাপ বলেন,—মহাশয়ের সমীপে আমার এক আবেদন আছে।

বসন্ত বললেন,—অকপটে ব্যক্ত করতে পারো।

প্রতাপ বলেন,—বাঙলার পূর্বপ্রান্তে মগ ফিরিঙ্গী আর পর্টুগীজ জলদস্যুদের দমন করতে হ'লে চকশ্রীতে ঘাঁটি স্থাপন করতে হয়। কেন না চকশ্রী সমুদ্র-উপকূলবর্তী যথোপযুক্ত স্থান। এই চকশ্রী পরগণা আমাকে আপনি দান করেন। পরিবর্তে অন্য কোন স্থান আপনাকে দিতে আমি প্রস্তুত আছি জানবেন। চকশ্রীতে আমি নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করতে চাই।

বসন্ত বললেন,—চকশ্রী আমি ভাগে পেয়েছি। দান করতে যাই কেন? এ কেমনতরো প্রস্তাব! তোমার অন্যায় আবেদনে আমি সাড়া দিতে পারি না প্রতাপ।

প্রতাপ বললেন,—আপনি কী চাহেন না বাঙলা দেশের একটা বৃহৎ অংশ বিদেশী জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত হোক।

বসন্ত বলেন,—অবশ্যই চাই। তবে এটাও চাই না, কোন কারণে আমার ভবিষ্যৎ বংশধররা ক্ষতিগ্রস্ত হোক।

প্রতাপ বললেন,—ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেন? পরিবর্তে আপনার পছন্দমত একটা পরগণা আপনি গ্রহণ করতে পারেন।

—তা হয় না প্রতাপ। চকশ্রী আমি ত্যাগ ক'রতে পারি না। কোনমতেই না।

—বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাই। আপাতত বিদায় লই। মহাশয়ের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার জন্য পরে আবার আসতে পারি।

—পরিবারের অন্যান্য সকলের মতামত আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আগে শুনি, আমার পুত্ররা কী বলে।

—যথাজ্ঞা।

কথার শেষে বসন্তের পদধূলি গ্রহণ করলেন প্রতাপ।

—শুভমস্তু।

প্রতাপের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন বসন্ত।

একবার নয়, বারবার যেতে হয় প্রতাপকে। ফিরেও আসতে হয় বিফল মনোরথে। রাজা বসন্ত রায় কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। প্রতাপের প্রস্তাবে গোবিন্দ রায় প্রমুখ ভ্রাতৃবৃন্দ ঘোর আপত্তি জানালেন।

বসন্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রতাপের বাল্যকালের ধারণা সকল যুগপৎ স্মৃতিপথে উদয় হয়।

প্রতাপের মনে পড়লো, জ্ঞাতি পৃথিবীর সকলের নিকট মূর্তিমান ধর্ম বলে কথিত হ'লেও কিন্তু তিনি জ্ঞাতির নিকট অত্যন্ত স্বার্থপর; সকলের কাছে তিনি প্রিয়বাদীরূপে খ্যাতি লাভ করলেও কিন্তু অপ্রিয় বাক্যে জ্ঞাতির হৃদয়বিদারণে অত্যন্ত তৎপর; অন্য লোকের নিকট দাতা ও বিনয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও জ্ঞাতিবর্গের দারিদ্র্য দূর করবার সময় তিনি দরিদ্র।

যাই হোক চকশ্রী পাওয়ার আশা ত্যাগ করলেন প্রতাপাদিত্য। বসন্ত রায় এত আবেদন নিবেদন কাকুতি মিনতি ও অনুরোধেও চকশ্রী হস্তান্তর করতে সম্মত ও স্বীকৃত হলেন না।

কিন্তু যেন তেন প্রকারে পূর্ববাঙলায় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে না পারলে, জলদস্যুদের অকথ্য অত্যাচার থেকে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করতে না পারলে রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হবে—উপলব্ধি করলেন প্রতাপাদিত্য! এই কারণে অন্য কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হ'লেন। নিজে না পারেন, পূর্ববঙ্গের আধিপত্য আপনার পক্ষীয় লোকের অধীনে রাখবার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন।

একদা মনে পড়ে, বসুবংশপাবন মহাবীর কন্দর্পনারায়ণের
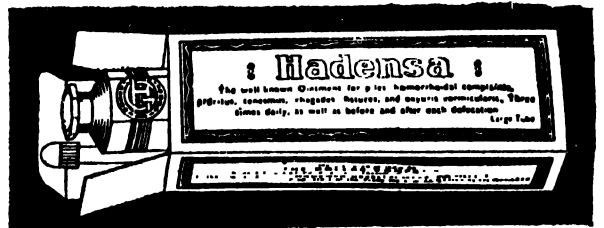
একটি সর্বগুণান্বিত পুত্র আছে। তার নাম রামচন্দ্র। বয়সে অল্প হলেও শুনা যায়, রামচন্দ্র না কী অতীব বুদ্ধিমান, বলশালী ও যুদ্ধবিশারদ। কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ। এই বীরবর হোসেনপুরে মুসলমানগণকে ভয়ংকর যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। হোসেনপুর থেকে মুসলমান-দের বিতাড়িত করেছিলেন। অধিকন্তু, তিনি বাসুরিকাটি, মাধবপাশা, ক্ষুদ্রকাটি নামক নগর স্থাপন করেছেন।

কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে আপন কন্যা বিন্দু-মতীর বিবাহ দিলে কেমন হয়—ভাবতে থাকলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। মহিষী পদ্মিনীর কাছে স্বীয় মনোভাব সংগো-পনে প্রকাশ করলেন তিনি। বললেন,—মহারাণী, তুমি কি বল'? আমার তো মনে হয়, রামচন্দ্র যোগ্য পাত্র।

মহিষী পদ্মিনীর চোখের সমুখ থেকে সকল সুখ ও আনন্দ যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়। একমাত্র কন্যা বিন্দুমতী, সে কী না পরের ঘরে চ'লে যাবে! চোখে যেন আঁধার দেখতে থাকেন পদ্মিনী। ম্লানমুখে তিনি বললেন,—আমার মেয়েটা নেহাৎ নাবালিকা। কতই বা তার বয়স!

প্রতাপাদিত্য বললেন,—পাত্রটি আমার মনোমত। অদ্য না হয় কল্য তোমার কন্যার বিবাহ দিতেই হবে। অযথা বিলম্ব করি কেন। পাত্রটিকে হারাতে চাই না। এমন সুপাত্র ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কি?

পদ্মিনীর বিষণ্ণ নয়নের পলক আর পড়ে না। মুখে যেন কথা ফোটে না। স্বামীর প্রস্তাবে অমত জানাবেন, তেমন সাহস হয় না। তবুও তাঁর মন সায় দিতে চায় না। সহধর্মিণীকে স্তব্ধবাক থাকতে দেখে প্রতাপাদিত্য আবার বললেন,—কন্যাকে পরের ঘরে কে আর না পাঠায়? এ ব্যাপারে অস্থিরচিত্ত হ'লে চলে না।

মহারাণী বললেন,—আমার আদরের দুলালী বিন্দুমতী, পৃথিবীর কিছুই সে জানে না। মহারাজার ইচ্ছায় বাধ সাধি, তাও চাই না। আপনি যেমন বলবেন তেমন হবে।

নাবালিকা বিন্দুমতী প্রায় সদাক্ষণই পুতুল খেলায় মত্ত থাকে। তার ক্ষুদ্র সংসারে আর কেউ নেই। পুতুলগুলিকে ঘুম থেকে তোলে, সাজ-পোষাক পরায়। তাদের মুখে আহার তুলে দেয়। ছড়া কেটে কেটে ঘুম পাড়ায়। আবার মাঝে মাঝে কথা বলে। তাদের গান শোনায়। বিন্দুমতীর ছোট সংসারে কারও হস্তক্ষেপ সে সহ্য করতে পারে না। সে জানতে পারে না তার ভাগ্য-পরিবর্তনের কথাবার্তা চলেছে। তাকে দেশান্তরে যেতে হবে।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—রাজরাণী হবে বিন্দুমতী, আর কথা কি! আমি শুভকার্যের দিনক্ষণ দেখাই। তুমিও প্রস্তুত হও মহারাণী। শ্রীপুরে অদ্যই আমার প্রতিনিধিদের প্রেরণ করতে চাই। দেখা যাক কন্দর্পনারায়ণ কি বলেন। আশা করি তিনি অসম্মত হবেন না।

কন্যা-সম্প্রদান মুখ্য উদ্দেশ্য নয় প্রতাপের, গৌণ। আসল কথা, এই বৈবাহিক যোগসূত্র স্থাপিত হ'লে পূর্ব-বাঙলায় প্রতাপের আধিপত্য বিস্তৃত হবে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে, অত্যাচারী মগ, ফিরিঙ্গি ও পর্তুগীজ জলদস্যুদেরও সায়েস্তা করা যাবে।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন যশোহররাজের বার্তাবহ প্রতিনিধিদের। রাজকীয় সম্বর্ধনার শেষে বললেন,—মহাশয়দিগের আগমনের হেতু কি?

প্রতিনিধিরা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের স্বহস্তে লিখিত একখানি লিপি কন্দর্পনারায়ণের হাতে দিলেন।' বললেন,—চিঠিতে সবই লেখা আছে। আমরা পত্রবাহক দূত মাত্র।

কন্দর্পনারায়ণ। বললেন,—আমার পুত্রটির বয়ঃক্রম অতি অল্প। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের প্রস্তাবে আমি রাজী আছি। পুত্র রামচন্দ্র দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম না করলে তার বিবাহ দেওয়া যায় না। আপনারা দুই এক দিবস অবস্থান করুন। পরিবারের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করি সর্বাগ্রে। তৎপরে জানাবো।

—যথাজ্ঞা রাজা মহাশয়। আপনি যেমত আদেশ করেন।

—আশা করি, আমার সহ সকলেই একমত হবেন। এ শুভ কাজে কেহ আপত্তি জানাবেন না। কথার শেষে কন্দর্পনারায়ণ অন্তঃপুরের পথে অগ্রসর হলেন। তাঁর হাতে প্রতাপ-লিখিত পত্রখানি। সহকারীদের নির্দেশ দিলেন,—যশোহর-রাজের প্রতিনিধি এঁরা। সেবা-যত্নে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। তোমরা অতিথি-সৎকারে রত হও।

চন্দ্রদ্বীপের রাজ-সভার ভণ্ডতপস্বী রমাই ভাঁড় কাছেই উপস্থিত ছিলেন। রমাই বললে,—রাজামশাই, আমাদের রাজপুত্র রামচন্দ্রের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে শুনেছি, তা কী সত্যি?

কন্দর্পনারায়ণ বললেন,—হাঁ! কিন্তু রমাই, তুমি কি কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হ'চ্ছো দিনে দিনে। আমি চলেছি একটা শুভ সংবাদ দিতে অন্তঃপুরে, তুমি পিছু ডাকলে?

রমাই সহাস্যে বললে,—কথাটা মিথ্যে বলেন নাই, কাণ্ড দেখে সত্যিই আমি জ্ঞান হারাতে বসেছি। পিছু যখন ডেকেছি তখন খানিক বসুন। কথা আছে।

রাজা বললেন,—তোমার কথা কি ফুরায় না রমাই?

রমাই বললে,—কথা ফুরালে আর কি থাকলো তাই বলেন। সবই শেষ হয়ে যাবে। পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হ'লে কে আর কথা কয়? শুনেছি ভূতেও না কি মধ্যে মধ্যে কথা বলে। তবে ভূতুড়ে কথায় কেউ আস্থা রাখতে পারে না, সকলেই জানে।

কন্দর্পনারায়ণ বলেন,—রসিকতা থাক রমাই, তোমার যদি কোন বক্তব্য থাকে, বলতে পারো। দেখেছো নিশ্চয়, যশোহর-রাজের প্রতিনিধিরা এসেছেন। আমার গৃহে তাঁরা অতিথি এখন। এঁদের প্রতি আমাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আদর আপ্যায়নে যেন কোন ত্রুটি না হয়, দেখতে হবে।

রমাই বললে,—বলছিলাম কি রাজামশাই, কাণ্ডটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে গড়াবে বলতে পারি না। তবে মহারাজা কন্দর্প-নারায়ণের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের বয়সটা বিবাহযোগ্য হয় নাই এখনও; তথাপি শুনছি যে রাজকুমারের বিবাহের প্রস্তাব এসে গেছে, অপিচ দেখছি আপনিও বিবাহ-প্রস্তাব অন্তঃপুরে বহন ক'রে নিয়ে চললেন, সুতরাং বিয়েটা লাগতে যে অধিক বিলম্ব হবে তাও মনে করি না। শাস্ত্রে বলে, শুভস্য শীঘ্রম্। ভাল কাজ তড়িক-ঘড়িক সেরে ফেলতে হয়। তবে কাজটা ভাল না মন্দ, ভেবে দেখবেন।

—তথাস্তু রমাই। আর কিছু বক্তব্য আছে?

মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ বললেন কিছু ব্যস্ততার সঙ্গে। গমনোদ্যত তিনি, অকারণ অপেক্ষা করতে অনিচ্ছুক।

রমাই নিজের মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলির খোঁচা দিতে দিতে বললে,—আচ্ছা মহারাজা, আপনি কি জানেন যশোর-রাজ প্রতাপাদিত্য কয় পুরুষে রাজা? আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।

মহারাজা,—তোমার কি প্রয়োজন তা জেনে?

রমাই বললে,—পাত্র আমাদের ঘরের, কনের ঘরের খোঁজ-খবর নেওয়ার কাজটাও আমাদেরই সারতে হবে। শাস্ত্রে বলে, লাখো কথার পরে বিয়ে পাকা হয়। এই তো সবে আদি কথা শুরু করেছি। যাকে বলে বিবাহ-প্রস্তাবের প্রস্তাবনা ধ'রেছি। আমার যতদূর মনে পড়ছে, মহারাজা প্রতাপাদিত্য মাত্র দুই পুরুষে রাজা। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ওয়ারিশ মহারাজা প্রতাপাদিত্য। আর আমাদের চন্দ্রদ্বীপের মহারাজা কন্দর্প-নারায়ণ পুরুষানুক্রমিক রাজ্য করছেন। শুনেছি প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো। কেঁচোর পুত্র হ'ল জোঁক। সেই বেটা

জোঁক প্রজার রক্ত খেয়ে খেয়ে ফেঁপে-ফুলে ঢোল হয়ে উঠলো। সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মাথাটা শুনতে পাই কুলোপানা ক'রে তুলেছে। আরও শুনতে পাই সাপের মত না কি চক্র ধরতেও শিখেছে।

মহারাজা বললেন,—তুমি কোথা থেকে এ সব বিষয় অবগত হ'লে রমাই?

রমাই বলে,—আমরা বেদে, সাপ দেখলেই চিনতে পারি। জাতসাপ আমরা চিনি না? শাস্ত্রে বলে, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

প্রতাপাদিত্যের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রমাই ভাঁড়ের ব্যঙ্গোক্তি শুনে কন্দর্পনারায়ণ বিষম রুষ্ট হলেন। বললেন,—রমাই তুমি কিঞ্চিৎ সংযত হও। স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করতে হয়। অধিক কি, যশোহর-রাজের পত্রবাহক প্রতিনিধিরা এস্থানে উপস্থিত আছেন। কোন কারণে তাঁরা অসম্মান বোধ করেন, তাহা আমার কাম্য নয়।

রমাই বললে,—মহারাজা, আমরা এই রাজসভায় পুরুষানুক্রমিক ভাঁড়বৃত্তি করছি। সঙ্ সেজে আসি, রঙ দেখাই। সঙ্ সংযত হয়েছে কখনও শুনেছেন?

প্রতাপ-প্রতিনিধিরা যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। রমাই ভাঁড়ের কথার ইঙ্গিত শুনতে তাঁদের ভাল লাগে না। তাঁদের চোখে মুখে অপ্রসন্নতা ফুটে ওঠে। ভাব দেখান এমন, যেন কোন কথাই তাঁদের কর্ণগোচর হচ্ছে না। তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের কথা বলতে থাকেন। মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চান না যেন রমাই ভাঁড়ের।

কন্দর্পনারায়ণ বলেন,—মহাশয়গণ এর কথা আপনারা কানে তুলবেন না, এই অনুরোধ। রমাই দুর্মুখ ছাড়া কিছু নয়। ওর মুখের কোন আগঢাক নাই।

প্রতাপ-প্রতিনিধি বললেন,—মহারাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজসভায় এই কপিধ্বজটিকে বড়ই বেমানান ঠেকছে, বলতে বাধা নাই। বেটাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিন মহারাজা। তারপর সভায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়ে—

মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। বললেন,—মহাশয়রা যথার্থ বলেছেন।

রমাই বললে,—আমিও মহারাজা যথার্থ কথাই বলি। শুনেছিলাম প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম যখন রাজা হয়, তখন তাকে রাজটিকা পরাবার জন্যে আর কোন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে বিক্রমাদিত্য সকাতর আবেদন জানায়। অনেক কাঁদাকাটা করাতে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহ তাঁর বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল ঠেকিয়ে বিক্রমাদিত্যের টিকা পরিয়ে দেন।

কন্দর্পনারায়ণ বললেন,—এমন ঘটনা আমার জানা নাই। মহারাজা বিক্রমাদিত্য আমার শ্রদ্ধাভাজন। তিনি একজন দক্ষ পুরুষ ছিলেন।

রমাই বললে,—জানি মহারাজা। মুসলমানদের পায়ে তেল মাখিয়ে, দাউদ খাঁর কৃপায় মহারাজা উপাধি পেয়েছিল বিক্রমাদিত্য। দাউদ খাঁর ধনদৌলত আত্মসাৎ ক'রে সেই জোঁকটা –

রমাই ভাঁড়ের হাত ধরলেন মহারাজা বললেন,—চল রমাই, অন্যত্র যাওয়া যাক। তোমার রসিকতা আমার অতিথিরা পছন্দ করছেন না।

রমাই ভাঁড়ের হাত ধরলেন মহারাজা। বললেন,—চল রমাই, অন্যত্র যাওয়া যাক। তোমার রসিকতা আমার অতিথিরা পছন্দ আছে।

সভাকক্ষ থেকে দুজনে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন। রমাই ভাঁড় চললো সরবে হাসতে হাসতে।

প্রতাপের প্রতিনিধিরা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। স্বেদবিন্দু ফুটেছে তাঁদের কপালে। শাখামৃগ শব্দটার ব্যাকারণগত অর্থটা বোধ করি তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

জনৈক মন্ত্রী এসে বললেন,—মহাশয়গণ, গাত্রোত্থান করেন। চলেন আমাদের অতিথি-আলয়ে। বহুদূর হ'তে এসেছেন। আপনাদের বিশ্রাম লওয়া প্রয়োজন।

একজন প্রতিনিধি বললেন,—যেখানে বলেন যেতে প্রস্তুত আছি। অনুরোধ, রমাই ভাঁড় না আসে। দোহাই।

মন্ত্রী ঈষৎ হাসলেন। বললেন,—ভাঁড়ের কথায় কর্ণপাত করে না কেউ। ভণ্ডামি ওর পেশা। লোক হাসানোই কাজ। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নাম শুনলে দেখেছি অনেক ব্যাঘ্র-সিংহ মুষিকের অবস্থা ধারণ করে। প্রতাপের প্রতাপ যে কতটা তা আমাদের জানা আছে। শুনেছি, সম্রাট আকবরকেই প্রতাপ মানেন না। শুনেছি দিল্লীতে কর-প্রদান বন্ধ ক'রে দিয়েছেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। ভুঁইয়াদের মধ্যে বর্তমানে প্রতাপই শ্রেষ্ঠতম।

প্রতিনিধিরা আবার একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

। ক্রমশ।

বীরের এ রক্তস্রোত-মাতার এ অশ্রুধারা

অ[illegible]কাল কালের ধারায় এই শিক্ষাই আমরা চিরকাল লাভ করিয়া আসিতেছি যে, যাহা সত্য, যাহা শাশ্বত তাহাকে নির্দ্বিধায় প্রসন্নমনে গ্রহণ করা এবং মানিয়া লওয়াই সমীচীন। বেদের জন্মভূমি এই পবিত্র ভারতখণ্ডের কোটি কোটি সর্বশ্রেণী নির্বিশেষের নরনারী তাহাদের দর্শনে তত্ত্বে এই শিক্ষার আলোকেই স্নাত হইয়া আসিতেছেন। উপনিষদে, গীতায় এই [illegible], [illegible] উপদেশই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত [illegible]।

[illegible] ধরণীতে অনেক কিছুই [illegible]। [illegible]প, এই বিপুলায়তন অনিত্যের মেলায় নিত্যবস্তুও আপন মহিমায়, গরিমায় এবং দ্যুতিতে চিরভাস্বর। মনুষ্যজীবন অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ এবং ক্ষণভঙ্গুর। যে কোন মুহূর্তে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে। মনুষ্যজন্মের কিন্তু একটি নিশ্চিত পরিণতি আছে—তাহা মৃত্যু। মৃত্যু মানবজীবনের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। [illegible] অপ্রতিরোধ্যও। আজ পর্যন্ত মৃত্যুর সুনিশ্চিত স্পর্শ অতিক্রম করার ক্ষমতা কাহারও হয় নাই। মহাশক্তিধর দোর্দণ্ডক্ষমতাশালী প্রবলপ্রতাপদেরও মৃত্যুর পরোয়ানার নিকট নির্বিবাদে মাথা নত করিতে হইয়াছে।

তাই, মৃত্যু জীবনের এক গভীরতম সত্য এবং জীবনের একটি নির্দিষ্ট পরিণতি। তাই, তার জন্য শোক অর্থহীন, দুঃখ নিরর্থক। কিন্তু তথাপি মৃত্যু আমাদের বিচলিত করে কেন, শোকাকুল করিয়া তোলে কেন, অভিভূত করে কেন? এই বৃত্তিগুলি তখনই মনের মধ্যে জাগ্রত হয় যখন মৃত্যু আসে অত্যন্ত অসময়ে মৃত্যু আসে অতর্কিতে এবং যেখানে একের মৃত্যু বহুর পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়।

মার্কিণ সেনেটার রবার্ট কেনেডির হত্যাকে কেন্দ্র করিয়াই এত কথার অবতারণা। সম্প্রতি আততায়ীর গুলীতে তিনি নিহত হইয়াছেন। রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী এই তরুণ রাজনীতিকের জীবন বিপুল সম্ভাবনার মধ্যেই জয়ের প্রারম্ভে চিরকালের মত নিঃশেষিত হইয়া গেল। জয়ের বিজয়োল্লাসে উদ্দীপিত যে নবনায়কের দেহপ্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল গুলীর আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে তাহা হইয়া গেল নীরব, নিথর, নিস্পন্দ, যে কক্ষ ছিল আনন্দের উৎস—সেই কক্ষ পরিণত হইল মৃত্যুপুরীতে। যেখানে প্রাণের হিল্লোল বহিতেছিল, সেখানেই দেখা গেল আতঙ্কের এবং উদ্বেগের প্রাণকেন্দ্র।

রবার্ট কেনেডি আসন্ন নির্বাচনে যে জয়লাভ করিতেন বোধ করি এ কথা জোরের সাহতেই বলা যায়। তাহার জীবনাবসানে হয়তো (হয়তো কেন নিশ্চয়ই) আপাতদৃষ্টিতে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বা গোষ্ঠী উপকৃত হইলেন; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইল সমগ্র বিশ্ব। মাত্র তেতাল্লিশ বছরের স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি যে ধীশক্তি, সাংগঠনিক প্রতিভা এবং অফুরন্ত উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা মেলা ভার। তদুপরি তাঁহার নিরপেক্ষ নীতি তাঁহার চরিত্রকে ঔজ্জ্বল্য দিয়াছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সত্যাশ্রয়ী। যাহা সত্য, তাহারই তিনি বাণী বহন করিয়া গিয়াছেন, যাহা ভ্রান্ত, যাহা ক্ষতিকর, যাহা বর্জনীয় সে সম্বন্ধে যথার্থ মতপ্রকাশে তিনি কখনও দ্বিধার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু রবার্ট কেনেডির এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড আজ বিশ্ববাসীর সম্মুখে কোন্ সত্যের আবরণ উন্মোচন করিল। আমেরিকার একটি কৃষ্ণঘন মূর্তি জগজ্জনের সম্মুখে আজ আরও একবার উন্মোচিত হইল। শিক্ষায়, দীক্ষায়, শক্তিতে যে রাষ্ট্র আজ পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারের দাবীদার এ কি কুৎসিত বীভৎস তাহার আভ্যন্তরীণ রূপ। মানবজীবনের কোন নিরাপত্তাই সেখানে নাই। কথায় কথায় যেখানে গুলী চলে, হাত বাড়ালেই যেখানে বন্দুক-রাইফেল-গুলী পাওয়া যায় সেখানে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি? হিংসার, কুটিলতার এমন ভয়াল, জঘন্য, লোভলোলুপ আত্মপ্রকাশ কিন্তু মার্কিন মুলুকে এই তো প্রথম ঘটিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে রাষ্ট্রনায়ক কেনেডিরও জীবন এই শোচনীয় অবস্থাতেই অবসিত হইয়াছে। মাত্র মাসাধিক পূর্বেই একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শান্তিসৈনিক লুথার কিং-এর রক্তেও আমেরিকা ভাসিয়াছে। তথাপি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্তব্য কাহারও মনে জাগ্রত হইল না—ইহাই বা কোন ধরণের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়। সঙ্গে সংগে যদি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের আইন বলবৎ হইত, কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রতা যদি দেখা না দিত, তা হইলে আর একটি সম্ভাবনাময় মহৎ জীবন এইভাবে অকালে ঝরিয়া পড়িত না।

সারা বিশ্বের প্রায় সর্বত্র আজ হিংসার আগুন, বিভেদের দুর্নীতি, ঈর্ষার প্রকোপ। এই সঙ্কীর্ণতার এই মানসিক তমসার মূলোচ্ছেদের সাধু সংকল্পে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা কিন্তু অধিক নয়। সেই বিরলসংখ্যকদের তালিকায় একটি মহান্ নাম—রবার্ট কেনেডি। তাপদগ্ধ পৃথিবীর

ক্ষতগ্রস্ত বক্ষে শান্তির পবিত্র বারি সিঞ্চনের পুণ্য ভূমিকায় তাঁহার উল্লেখ বিশেষভাবে করণীয়। বয়সে নবীন অথচ জ্ঞানে প্রবীণ রবার্ট কেনেডি প্রেমের, সহাবস্থানের, মৈত্রীর আলোকবর্তিকা হস্তে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন শান্তি-মন্ত্রে এক নূতন পৃথিবীর সৃষ্টির স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন হইয়া। নিষ্ঠুর নিয়তি সেই মহৎ স্বপ্ন অংকুরেই বিনষ্ট করিল।

হতভাগ্য পিতা, মাতা, মুহ্যমানা সহধর্মিণী এবং সন্তানগণের এই অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যেও একটি বিরাট সান্ত্বনা এই যে, আজ সারা বিশ্ব তাঁহাদের এই গভীর শোকের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এবং তাঁহাদেরই ন্যায় এই মৃত্যুকে আত্মজনের মৃত্যু বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে আজ কবিগুরুর একটি অমর পংক্তিই বারংবার আমাদের স্মৃতিপটকে আন্দোলিত করিতেছে—

বীরের এ রক্তস্রোত,
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধুলায় হবে হারা।

একটি মূর্তিময়ী বিস্ময়ের অন্তর্ধান

ধূলার ধরণীতে করুণাময় ঈশ্বরের মহত্তম মহান দান আমাদের অনুভূতি ও প্রত্যক্ষের সীমার মধ্যে বিদ্যমান, এমধ্যে জীবনই বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ। রূপ-রস-রেখা-রঙে সংগঠিত, অনুভূতির প্রদীপে আলোকিত, হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনায় রোমাঞ্চিত জীবনের আকর্ষণ তাই কম নয়। তদুপরি যে জীবন যত অধিক বৈচিত্র্যে সমন্বিত, তাহার আকর্ষণ এবং গুরুত্বও তত বেশি। এই দুর্লভ দৃষ্টান্ত শেষোক্ত জীবনের গৌরবময়ী অধিকারিণী ছিলেন মনস্বিনী হেলেন কেলার।

সম্প্রতি ওয়েস্ট পোর্টে পরিণতবয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। এ মৃত্যুকে সাধারণ মৃত্যুর গণ্ডীভূত করা চলে না। এ দীপশিখার আচ্ছাদন, অনন্যসাধারণ এক আলোকরশ্মির নির্বাপণ জীবনের রঙ্গমঞ্চের এক শক্তিশালিনী শিল্পীর মহৎ মহাপ্রস্থান। হেলেন কেলারের মৃত্যুজনিত ক্ষতি তাই দেশ-কাল-সমাজের সীমায় আবদ্ধ নয়। ক্ষতি ভূগোলের বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। সপ্ত সমুদ্রের উত্তাল ঊর্মি উপেক্ষা করিয়া, আকাশে আকাশে দূরত্বের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া বিরাট বিশাল বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত-পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সারা বিশ্বে এই শূন্যতা মর্মে মর্মে গভীরভাবে অনুভূত হইল। সারা বিশ্বের প্রতিটি শ্রদ্ধাশীল এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে উজ্জ্বল নরনারী স্পষ্ট উপলব্ধি করিল যে, তাহাদের আত্মীয়বিয়োগ ঘটিয়াছে আর জগতের যত অনাথ, দুঃখী, অসহায়, আতুরের দল জানিতে পারিল—তাহাদের দুঃখমোচনের, ব্যথার অবসানের পুণ্য সংকল্পে যিনি আজীবন দীক্ষিতা ছিলেন, তাহাদের মৌন-মূক মুখে যিনি ভাষা ফুটাইতে, বেদনাপাণ্ডুর ওষ্ঠে হাসির রেখাটি ফুটাইয়া তুলিতে, জ্বালায় জর্জরিত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই মহীয়সী মহিলা আর নাই। ধরার মেয়াদ তাঁহার শেষ হইয়া গিয়াছে।

হেলেন কেলারের বয়ঃক্রম যখন মাত্র উনিশ মাস, সেই সময়ে পৃথিবীর সকল আলো তাঁহার অর্থাৎ সেই শিশুর সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া গেল। অন্ধকারের ঘন কালো পুরু পর্দা তাঁহার দৃষ্টিপথের সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, বাহ্যিক বিশ্লেষণে সেই বাধা তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্তটি পর্যন্ত ছিল। যে সময়ে এই শিশুর জীবনে এত বড় বিপর্যয় ঘটিল, পূর্বেই বলা হইয়াছে, তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ মাস। অর্থাৎ চেতনার অংকুরোদ্গমই তখনও হয় নি। বোধশক্তি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা তখনও অনাবির্ভূত—তাই সেই বিচারে তাঁকে জন্মান্ধ বলিলেও খুব ভুল হয় না। দেড় বৎসরের শিশুর উপলব্ধিশক্তি থাকিলেও তাহা ভবিষ্যতের স্মৃতিতে জীবন্ত থাকে না।

অন্ধত্বের অন্তরালে তাঁহার অনুভূতির মন্দিরে কিন্তু লক্ষ প্রদীপ সর্বদাই উন্মোচিত হইল। শিক্ষায়, দীক্ষায়, শক্তিতে প্রজ্বলিত ছিল। সেই প্রদীপের পুণ্য শিখা তাঁহাকে অতুল আলোর অধীশ্বরী করিয়া তুলিয়াছিল, মানস প্রদীপের সেই অনির্বাণ আলোকরশ্মি তাঁহার সমগ্র জীবনকে আলোয় আলোয় পূর্ণিমার আকাশে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। আলোর জগতের বাহির দুয়ার তাঁহার নিকট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভিতর দুয়ার চিরকালের মত অর্গলমুক্ত হইয়া গেল। যে আলোয় এই মনস্বিনী নিত্য-উদ্ভাসিতা তাহারই অন্য নাম—সহানুভূতি, দরদ এবং ভালবাসা। সর্বোপরি আর্ত অসহায়দের জন্য বুকভরা প্রেম।

হেলেন কেলারের সমগ্র জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন কর্মের অপূর্ব ইতিবৃত্ত। তাঁহার জীবনসাধনা বারেকের তরেও ব্যাহত হয় নাই। বিধাতা তাঁহাকে পরমায়ুর ব্যাপারে অনেকখানি ঔদার্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য, দীর্ঘ পরিসরের পরমায়ুকে তিনি যথোপযুক্তভাবে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অনিন্দ্য মানবের চক্ষু দিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন হেলেন কেলার। সেই দৃষ্টির ভাষার মধ্যে প্রেম, ভাষ্যের মধ্যে প্রেম, মর্মের মধ্যে প্রেম। তাই মানবকল্যাণের দুরূহ কর্মে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণা।

বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' প্রাপ্তা, একাধিক গ্রন্থের রচয়িত্রী কুমারী হেলেন কেলারের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি নিবিড় যোগ ছিল। এই বিরাট বিশাল মহাদেশটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তিনি অবনতা ছিলেন। এ দেশের ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁহারও ভক্তি বন্দনা আকর্ষণ করিয়াছে। একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ এবং হেলেন কেলারের পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কের কথা সকলেরই সুবিদিত। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে হেলেনের সহিত কবিগুরুর প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৯২১ সালে হেলেন এই ক্ষণজন্মা ভারতীয়ের উদ্দেশে একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া কবির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। ১৯৩০ সালেও কবির সহিত কেলারের সাক্ষাৎকার ঘটে।

বিশ্বের এই মহীয়সী মহিলা ভারতের মাটিতেও পদার্পণ করিয়াছেন। ১৯৪৮ ও ১৯৫৫—এই দুইবার তিনি ভারত পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার পিতৃপ্রতিম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন নশ্বরদেহে বর্তমান নাই।

সকল দিক দিয়া সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এই মৃত্যু কেবল প্রতিভা, মনীষা, সেবার জগৎ হইতে কোন ব্যক্তিত্বের মহাপ্রস্থান নয়—এক মূর্তিময় বিস্ময়ের তিরোধান। মানবতাবোধের এক করুণাঘন বিগ্রহের অন্তর্ধান।

আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন

ঘন ঘন দুর্ঘটনা, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির প্রাবল্য প্রভৃতির গুরুত্ব অতিক্রম করিয়া আজ যাহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমগ্র চিন্তা আচ্ছন্ন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আছে তাহা হইল আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন। আজ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনটির দিকে সারা পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। উদ্বেগের এবং উৎকণ্ঠার অবধি নাই। অসীম কৌতূহল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া তিলে তিলে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। এই নির্বাচন লইয়া জল্পনা-কল্পনারও যেন অবধি নাই।

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর হইতেই পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক নাটকের ঘন ঘন দৃশ্য বদল হওয়া সুরু হইল। ঐ সময় পর্যন্ত সুরু হইতে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল হইতে কুড়ি বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিক নাটক বলিতে গেলেই মন্দাক্রান্তা ছন্দেই চলিতেছিল। ১৯৬৭-র মার্চ হইতেই গতি রীতিমত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কুড়ি বৎসরের কংগ্রেসী শাসন অবসিত হইয়া যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হইল। নভেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাইয়া পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভা সৃষ্টি হইল। যুক্তফ্রন্ট টিকিয়াছিল নয় মাস, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব হইল আরও কম। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ইহার সমাপ্তি ঘোষিত হইল। তাহার পর হইতেই এই জুন মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন চলিতেছে।

এখন চূড়ান্তভাবে রাজ্যের ভাগ্য নিরূপণের জন্য অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে চলিতেছে। কিন্তু এখনও এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বাগবিতণ্ডা ও উত্তেজনা সমানভাবেই চলিতেছে।

এত উত্তেজনা ও বাগবিতণ্ডা শুধু নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া নয়, ইহাদের উদ্ভব নির্বাচনের তারিখ লইয়া, নভেম্বর মাস এই নির্বাচনের জন্য স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু নভেম্বরে ভোট গ্রহণের সুবিধা-অসুবিধা লইয়া এখন প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয় শ্রীঅশোককুমার সেন ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, মিনু মাসানী, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কতকগুলি সারবান এবং গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দ্বারা নভেম্বরের ভোট গ্রহণের বিপক্ষে বলেন। তাঁহাদের বক্তব্য যেমনই জোরাল তেমনই যুক্তি-সমৃদ্ধ। তাঁহাদের সামগ্রিক বক্তব্য নভেম্বরে ভোটগ্রহণ কতকগুলি প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হইতে পারে। যোগাযোগের এবং যানবাহনেরও ঐ সময় নানাবিধ অসুবিধা এবং চাষীদের পক্ষে ঐ সময়টি অত্যন্ত ব্যস্ততার সময়। সে কারণে ঐ সময়ে ভোট গ্রহণের কার্যে তাহাদের সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে পাওয়া নাও যাইতে পারে।

বিপুলসংখ্যক ভোটদাতা যদি ভোট-অনুষ্ঠান হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখেন তাহা হইলে এত তোড়জোড় করিয়া ইহার আয়োজনের অর্থ কি ? এত শ্রম, এত প্রচেষ্টা সবই তো ভস্মে ঘি ঢালা হইবে ? কিছুকাল অপেক্ষা করিলে যদি সুষ্ঠুভাবে কার্য নির্বাহ করা যায় তাহা হইলে সেই পন্থা গ্রহণই সমীচীন নয় কি ? —কিন্তু অধৈর্য হইয়া কাজ করিলে সমগ্র প্রচেষ্টাই তো পণ্ড হইবে।

কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য—যাহার মধ্যে সারা রাজ্যের আগামী চার বৎসরের ভাগ্য নিহিত, তাহার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন। অধীরতা এবং হুড়াহুড়ি করিয়া এই কার্য নিষ্পন্ন করিলে তাহা কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না।

একদল যদি যথেষ্ট যুক্তি ও কারণ দর্শাইয়া নির্বাচন স্থগিত রাখিতে চান, অমনই তাহার বিরোধিতা করা কখনই শুভবুদ্ধির সমর্থন লাভ করিতে পারে না। অপ্রিয় হইলেও, ইহা অসত্য নয় যে, এই মনোভাবের জাতীয় চিন্ত অপেক্ষা দলীয় চিন্তাই সবকিছু অতিক্রম করিয়া প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সেন

বৈষ্ণবতত্ত্ব ও দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং বিখ্যাত সাংবাদিক বঙ্কিমচন্দ্র সেন গত ২৬এ জ্যৈষ্ঠ ৭৬ বছর বয়সে তিরোহিত হয়েছেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। 'সারভেন্ট' ও 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সঙ্গে তিনি কিছুকাল এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। 'দেশ' পত্রিকাটি তিনি বহুকাল সম্পাদনা করেছেন। কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা ছিলেন।

লেডী প্রতিমা মিত্র

প্রখ্যাতনাম্নী সমাজসেবিকা লেডী প্রতিমা মিত্র ৭৮ বছর বয়সে গত ২০এ জ্যৈষ্ঠ লোকান্তরিতা হয়েছেন। ভারতীয় আইনজগতের এক মহারথী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বর্গত স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের সহধর্মিণী লেডী প্রতিমা ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি ও দিকপাল সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের দৌহিত্রী এবং দেশবরেণ্য ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসুর তৃতীয়া কন্যা। প্রবীণ চিত্রপরিচালক শ্রীমধু বসু তাঁর অনুজ। আজীবন তিনি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। শুধু বাঙলা দেশেই নয় দিল্লী ও সিমলাতে থাকাকালীনও স্থানীয় বহু জনহিতকর কাজের পুরোভাগে তাঁকে দেখা গেছে। কমলা গার্লস হাইস্কুল এবং শঙ্কর মিত্র কীর্তন শিক্ষালয় তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় কীর্তি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র এ্যাণ্ড্রু ইয়ুল কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীভাস্কর মিত্র এবং কন্যা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরীর সহধর্মিণী স্বনামধন্যা সমাজসেবিনী শ্রীমতী সীতা চৌধুরী বর্তমান।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কথামৃত প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আপনার মাসিক বসুমতীর একটি অনবদ্য সুন্দর লেখা বা সংগ্রাহিকার জন্য আপনাকে এবং সংগ্রাহক যোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়কে ভূয়সী সাধুবাদ জানাই। মাসিক বসুমতী খুলেই দেখি প্রথম পৃষ্ঠাতেই বিরাজমান 'কথামৃত' লেখাটি পরম রহস্যঘেরা অমৃত জগতের দ্বার উন্মোচন করে অন্তরস্থিত অবগুণ্ঠিত ঐশ্বর্যকে অনবগুণ্ঠিত করে দিয়ে রসিকপিপাসুকে আহ্বান জানাচ্ছে সেই পরম ঐশ্বর্যের স্বাদ নিতে প্রাণভরে।

এই অপূর্ব অধ্যাত্মদর্শন বর্ণনায় লেখক আভিধানিক পন্থার আশ্রয় নিয়ে সুষ্ঠু এবং সুযৌক্তিক ধারা গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিটি প্রতিবাদ্য বিষয় বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে যেমন বেদ, বেদান্ত, গীতা, তন্ত্র, পুরাণ, উপনিষদ, সংহিতা, ভাগবত, মন্ত্রকোষ, যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি---বিভিন্ন ভাষ্য থেকে যেমন পাতঞ্জল, যাজ্ঞবল্ক্য, মহীধর, সায়নাচার্য, গেভিল, শ্রীমূল চৈতন্য ভারতী, শঙ্কর, মধ্ব ইত্যাদি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, বৈষ্ণবচরণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গিরিশচন্দ্র, গান্ধীজী প্রমুখ মহাপুরুষদের বাণী থেকে যথাযথ ভাবে উদ্ধৃতি দিয়ে এবং ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

এইভাবে বিভিন্ন মতামতের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি বিষয়কে বোঝানো নিঃসন্দেহে প্রভূত পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার পরিচায়ক। লেখকের এই আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সাধনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে কথামৃত প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্যও পেশ করছি।

'কথামৃতের' এক জায়গায় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন, 'গুণত্রয় (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) অনাদি এবং নিত্য হলেও তারা নিয়ত পরিণামশীল।' কিন্তু তা কী তর্কবিজ্ঞান অনুযায়ী পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাপার নয়? যা অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য তা অপরিবর্তনীয় হতে বাধ্য। যার জন্য প্রকৃতিকে নিত্য বলা হয় নি অথচ প্রকৃতিই হল গুণত্রয়ের সাম্যে স্থিত রূপ।

দ্বিতীয় কথা হল সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে। কথামৃতে এক জায়গায় লিখছেন---'অনন্ত বিস্তারময়ী প্রকৃতি পরমাত্মার স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে সৃষ্টি বিস্তার করেন।' অর্থাৎ পরমাত্মার স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হল, আকাশ থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে স্পন্দিত বা ক্রিয়াশীল হয়ে সৃষ্টির বিস্তার হয় এবং লয়ের সময় বিস্তৃত সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে ঠিক উল্টাভাবে আবার আকাশে এসে লয়প্রাপ্ত হয়।

আকাশতত্ত্বের এই সৃষ্টি এবং লয় প্রসঙ্গ বড় সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের স্পন্দন নিয়ে। ব্রহ্ম নির্গুণ---অর্থাৎ তিন গুণের পারে বা ঊর্দ্ধে। তাহলে ব্রহ্মে স্পন্দন আসবে কী ভাবে? নির্গুণ ব্রহ্মে সৃষ্টির জন্য স্পন্দন এ কথা স্ববিরোধী। আর ব্রহ্মে স্পন্দন না হলে আকাশতত্ত্বও টেকে না। এক জায়গায় লিখছেন---'এই স্পন্দন চিন্ময় ব্রহ্মের রূপান্তর।' কথা একই হল---ব্রহ্মের রূপান্তর কথাটিও অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের স্ববিরোধী উক্তি।

আর একটি আলোচনা হল---ব্রহ্মের জীবদেহে বন্ধন স্বীকার করা নিয়ে। কথামৃতের এক জায়গায় লিখছেন---'চৈতন্য ও মায়ার অবিদ্যাজনিত মিলনে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব বা চিদাভাস যখন ভুলে যায় যে সে নিজেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসত্তা---যখন মায়াধীন হয়ে মনে করে যে সে একটি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র চৈতন্য; তখন সেই চিদাভাসই কারণ শরীর রূপে জীবের দেহ বন্ধনের কারণ হয় এবং আনন্দময় কোষে জীবরূপে ধৃত হয়। এ ভাবেই জীব ও শিবের মধ্যে ভেদজ্ঞান উদ্ভূত হয়।' অর্থাৎ স্ব স্ব রূপে জীবে এবং শিবে কোন ভেদ নেই---ভেদরূপে ভাব আসছে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের প্রভাবে। অজ্ঞানের প্রভাব চলে গেলে দেখব জীব এবং শিব এক, কোথাও ভেদ নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অজ্ঞান কী? কেনই বা এর আবির্ভাব?

অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে স্বতন্ত্র সত্তা ধরলে ব্রহ্ম, মায়া এবং অবিদ্যাকে নিয়ে তিন সত্তা। কিন্তু আমরা জানি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। এক ছাড়া দুই নাই। যদি বলি অবিদ্যা আসলে মায়াই, তাহলে---'চৈতন্য ও মায়ার অবিদ্যাজনিত মিলন' কথাটির কোন অর্থ হয় না। আর একটা কথা ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব বা চিদাভাসই শরীর ধারণ করছে এবং মনে করছে আমি স্বতন্ত্র চৈতন্য। অর্থাৎ জীবব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। এক সূর্য যেমন সমুদ্রতরঙ্গে লক্ষ লক্ষ প্রতিবিম্বে পরিণত হয়, এক ব্রহ্ম তেমনি কোটি কোটি প্রাণীতে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন। এবার প্রশ্ন আসছে---প্রতিবিম্বের মাধ্যমটি কী? 'মানুষের প্রতিবিম্ব দেখা যায় দর্পণে, সূর্য-চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে জলে। তাহলে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হন কার মাধ্যমে? উত্তর যদি হয় মায়া বা অবিদ্যা তাহলে সৃষ্টির প্রারম্ভে দুইটি অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় এবং ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব বা অভেদত্ব অপ্রমাণিত হয়।

জীবন্মুক্ত কাকে বলে বোঝাতে 'কথামৃতে' এক জায়গায় লেখা হয়েছে--- 'ব্রহ্মকে যিনি এ জীবনেই সাক্ষাৎকার করেছেন, কিন্তু ব্রহ্মলাভ করা সত্ত্বেও যাঁর প্রারব্ধ ক্ষয় হয় নি তিনিই জীবন্মুক্ত।' প্রারব্ধ নামে

কর্মভোগ বা সংস্কার, আর সংস্কার আনেই বন্ধনের কারণ। জীবন্মুক্ত বন্ধনহীন, মায়ার আবরণহীন এবং অশুভ সংস্কারহীন হলে তাঁর প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়ার কথা আসে কী করে? আর প্রারব্ধ ক্ষয় না হলে কী ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়? অথবা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর কী প্রারব্ধ থাকে?

পরিশেষে লেখককে একটি অনুরোধ জানাবো যে তিনি যেন বর্তমান নিবন্ধ শেষ করে এই পত্রিকাতেই অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনুরূপ একটি নিবন্ধ লেখেন। তাহলে লেখক এবং সম্পাদক উভয়ের নিকটই অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো।

---শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখার্জি, বালোয়ান, পুরুলিয়া।

ভারতীয় ভাস্কর্য প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আমি আপনাদের মাসিক বসুমতীর একজন পুরোনো গ্রাহক। সেই হিসাবে আপনাদের নিকট আমার মন্তব্য পাঠাবার অধিকার আছে। আজ প্রায় কয়েক মাস হলো আপনাদের পত্রিকায় শিল্পী এবং অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণলাল দাস মহাশয় ভারতীয় ভাস্কর্যের সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখছেন। ভদ্রলোকের লিখনের ধাঁচ এবং বিষয়গুলি পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছে এবং আমার দিক থেকে খুবই উপকার হয়েছে। ওনার যদি শুধু ভাস্কর্য ব্যতীত অন্য কোন 'আর্ট'-এর বিষয় লেখা থাকে এবং ছাপিয়ে আমাদের পরিবেশন করেন তবে খুবই উপকার হয়। কারণ 'আর্টিস্ট' হয়ে যদি আর্ট সম্বন্ধে লেখেন তবে বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট হয়। আপনি যদি তাঁকে আরও অন্যান্য 'ওয়ার্লড হিস্টি অব আর্ট' সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখতে অনুরোধ করেন, তবে আপনার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। ওনার 'স্কেচ'গুলিও আমাদের নিকট খুব ভাল লেগেছে কারণ ঐ 'স্কেচ'গুলি আমরা কোথাও 'কালেকশান' করতে পারি নাই। সেইজন্যেই আমাদের নিকট ওনার লেখা এবং 'স্কেচ'গুলি খুবই মূল্যবান। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং নমস্কার গ্রহণ করুন।

---অসীমকুমার বসু। (আর্টিস্ট), ৬।১, একডালিয়া রোড, কলিকাতা।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আপনাদের জ্যৈষ্ঠের সম্পাদকীয় 'সাম্প্রতিক উপনির্বাচন'---অন্তর্বর্তী নির্বাচন'-এ প্রবন্ধটিতে যে মন্তব্য আপনারা করেছেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ করে ভেবে দেখবার দিন আমাদের এসে গেছে। আপনারা আপনাদের উক্ত সম্পাদকীয়তে সুন্দরভাবে বলেছেন 'শুধু মুখের কথায়, শূন্যগর্ভ আস্ফালনে এবং চটকদারি বাক্‌চাতুর্যে চিরকাল দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখা যায় না সেই মহান এবং শাশ্বত সত্যটিই এই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করিয়া আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হইল।'

বড় বড় কথার বুলি কপচাইবার মহান আদর্শকে আমরা যে রকমভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি এমনটি দৃষ্টান্ত আর পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাইবে না। বড় বড় কথার দ্বারা যে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না---এটা আমরা আজ একেবারে ভুলে যেতে বসেছি। তবে দেশের মানুষ আজ বিশেষ সচেতন---এই যা ভরসা ইংরাজীতে একটা কথা আছে---

You can befool some people for sometime but you cannot befool all people for all time.

এই আদর্শের কথাটি আমরা যেন কখনো না ভুলি। দেশের সঙ্কটের চেয়ে আজ আমরা নিজের স্বার্থের দিকে বিশেষ করে দৃষ্টিপাত করেছি এবং করছি। দেশ যে সবচেয়ে বড় এটা আজ কয়জন অনুভব করেন? প্রাক্‌-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালের ইতিহাসের নজীরই এই কথা প্রমাণ করিবে। দিনে দিনে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে---

The rich has become richer and the poor poorer.

এই বৈষম্য কেন? কে বা কাহারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিলেন? এমনটি হইলো কেন—ইহার উত্তর কে দিবে? দিনের পর দিন দেশের লোকের দুর্দশা চরমে উঠিতেছে বা উঠিয়াছে। এই কি জাতির জনক মহাত্মাজীর রামরাজ্যের আদর্শ। এইবেলের সেই কথাটিই বারবার মনে পড়িতেছে---

People wanted bread but they got stones instead.

সাধারণ মানুষে---এই রাজ্যে কে বা কোন রাজনৈতিক দল কর্ণধার হইবেন---এই নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না, তাঁরা চান দুটি মোটা ভাত-কাপড় ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান। যে রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষকে এই দুইটি জিনিষ দিতে পারিবেন তাঁহারই জয়ী হইবেন। বড় কথার দ্বারা সাধারণ মানুষের পেট ভরিবে না। বড় কথার দিন অনেক পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে।

---শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮।সি, সি এন রায় রোড, কলিকাতা--৩৯।

লেমিং পাখী প্রসঙ্গে

মহাশয়,

১৩৭৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাসিক বসুমতীর ২৫২ পৃষ্ঠায় শ্রীমতী মিনতি সেন লিখিয়াছেন যে 'আর একটি বিচিত্র অভিযাত্রী পাখী হচ্ছে লেমিং'। তিনি পরে আবার লিখিয়াছেন, 'আকৃতি ও প্রকৃতিতে ইঁদুরের প্রায় সমগোত্রীয় এই পাখীগুলির---' ইত্যাদি।

লেমিং কিন্তু পাখী নয়। অভিধানে বলে---Lemming---a burrowing animal of the rat family of Northern Europe. আগেই হয়ত এ বিষয়ে অন্য প্রতিবাদ পত্র

আপনার হস্তগত হইয়াছে। নমস্কার জানিবেন।

—বিনীত, শ্রীপরেশনাথ মিত্র। পোঃ অঃ—বোধনা, জেলা—মেদিনীপুর।

পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়,

সম্প্রতি পাঠক-পাঠিকারা আপনাদের 'পত্রিকা সমালোচনা' করিয়া যে ত্রুটিগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট, বলা বাহুল্য সেই ত্রুটিগুলি সমাধান করিতে আপনাদের কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইতেছে না।

আপনারা পাঠক-পাঠিকাদের প্রশংসার্হ হইবার জন্যই 'পত্রিকা সমালোচনা বিভাগ' অথবা 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' বিভাগটি খুলিয়াছেন। পূর্ব-প্রকাশিত কয়েকটি সংখ্যায় এই অভিযোগগুলি দেখিলাম। আমিও এইগুলির সহিত একমত। যেমন—

(১) ছোট গল্পের সংখ্যা কম।

(২) অনামী, অনুপযুক্ত, কাঁচা লেখকদের লিখিত উপন্যাসে 'মাসিক বসুমতী'র পাতা ভরপুর, (যাহা পাঠক মনে 'সাড়া জাগায় না')।

(৩) অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যেরূপ নামকরা লেখকদের নামকরা উপন্যাসের পুনরাবৃত্তি চলে (যেমন 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'শজারুর কাঁটা' প্রভৃতি) সেইরূপ কোন বহু আলোচিত উপন্যাসের পুনরাবৃত্তি 'মাসিক বসুমতী'তে হয় না বলিলেই চলে। (অবশ্য এখন নমিতা চক্রবর্তী এবং আশাপূর্ণা দেবীর রচিত উপন্যাস যথার্থই পাঠক মনকে আনন্দ দিতেছে) তথাপি একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে 'মাসিক বসুমতী'র মধ্যে যে সকল অভাব দেখিয়াছি তাহাই জানাইলাম। (আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ক্রমশ একঘেয়ে হইয়া যাইতেছে)।

—নন্দা চট্টোপাধ্যায়, সাকচী, জামসেদপুর।

বেচিতে চাই

মহাশয়,

আমি 'মাসিক বসুমতী'র একজন নিয়মিত পাঠিকা। নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীর সংখ্যাগুলি আমি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। সংবাদটি আপনার মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। প্রতি বৎসরের একত্রে লইলে প্রতি সংখ্যা ৩৫ পয়সা হিসাবে বিক্রয় করিব। সমুদয় সংখ্যাগুলি উত্তম অবস্থায় আছে।

গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণকে নিম্নঠিকানায় আমার সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাই।

সন ১৩৩৯ থেকে সন ১৩৬৫ পর্যন্ত প্রতি বৎসরের ১২টি সংখ্যা দুই খণ্ডে 'কার্ডবোর্ড উইথ লেদার' বাঁধাই——২১৬টি সংখ্যা, ৩৬টি খণ্ডে বাঁধাই।

সন ১৩৫৭ সাল, বৈশাখ থেকে সন ১৩৬৭ সাল চৈত্র পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যাই পাওয়া যাইবে।

—কল্যাণ বসু, ৩১।১১, ব্যানার্জী বাগান লেন, পোঃ—সালকিয়া, জিঃ—হাওড়া।

মহাশয়,

নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি একত্রে বা পৃথকভাবে প্রতিখানি ০'৭৫ পয়সা দরে বিক্রয় করিতে চাই। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন।

১৩৬০—বৈশাখ থেকে পৌষ ও চৈত্র (১০)
১৩৬১—বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র (৯)
১৩৬২—আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ থেকে ফাল্গুন (৫)
১৩৬৩—বৈশাখ থেকে শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ থেকে চৈত্র (৯)
১৩৬৪—জ্যৈষ্ঠ থেকে চৈত্র (১১)
১৩৬৫—বৈশাখ, ভাদ্র থেকে ফাল্গুন (৮)
১৩৬৬—বৈশাখ থেকে শ্রাবণ (৪)
১৩৬৭—বৈশাখ থেকে চৈত্র (১২)
১৩৬৮—বৈশাখ থেকে চৈত্র (১২)
১৩৭০—বৈশাখ থেকে শ্রাবণ, কার্তিক, মাঘ থেকে চৈত্র (৮)
১৩৬৯—আষাঢ় থেকে ফাল্গুন (৯)
১৩৭১—বৈশাখ থেকে আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন (৯)
১৩৭২—বৈশাখ, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ থেকে চৈত্র (৭)
১৩৭৩—বৈশাখ থেকে চৈত্র (১২)
১৩৭৪— ঐ (১২)

—অপর্ণা ঘোষাল, ২৪ বি, গুগোল-কিশোর দাস লেন, কলি—৬।

●

মহাশয়,

আমি মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠিকা। নিম্নলিখিত বসুমতীর সংখ্যাগুলি আমি বিক্রয় করিতে চাই। সংবাদটি আপনার মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। আমি প্রতি

সংখ্যা ছয় আনা হিসাবে বিক্রয় করিতে চাই। সমুদয় সংখ্যাগুলি উত্তম অবস্থায় আছে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণকে নিম্-লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করি।

১৩৭১---বৈশাখ --- চৈত্র
১৩৭২---বৈশাখ --- চৈত্র
১৩৭৩---বৈশাখ --- চৈত্র
১৩৭৪---বৈশাখ --- চৈত্র

---ইতি, মিসেস কে দাশগুপ্ত, ৪ নং এন, সি, চৌধুরী রোড, কসবা, কলিকাতা-৪২।

●

মহাশয়,

আমার ১৩৬৪ সালের বৈশাখ হইতে ১৩৭৩ সালের চৈত্র পর্যন্ত মাসিক বসুমতীর প্রতিটি সংখ্যা বিক্রয় করিতে চাই। অনুগ্রহপূর্বক আপনি যদি আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন বাধিত হইব।

---শ্রীমতী বেলা দত্ত

স্যুট নং---৩, কোয়াটার নং---৭-এ
পোঃ---চিত্তরঞ্জন, জেলা---বর্ধমান।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

● শ্রীমতী কমলা চৌধুরী, অবঃ---ডঃ বি চৌধুরী, ৩২, এলগিন রোড, এলাহাবাদ-১ ● শ্রীশক্তিপদ সিংহ, কোয়ার্টার নং ১১, টাইপ-৩, এস পি এম কলোনী, হোসাঙ্গাবাদ, এম পি, ● শ্রীঅমলেন্দু দত্ত, হসপিটাল কলোনী, ডাক---মোসাবনী মাইনস, সিংভূম।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ২৫৲ টাকা পাঠালাম। যথারীতি পত্রিকা পাঠাবেন। শ্রীমতী শৈলজা ভট্টাচার্য, অব---শ্রী এস ভট্টাচার্য, হাজিয়া হাউস, ছোটাপাড়া, রায়পুর।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮৲ টাকা পাঠালাম। বৈশাখ থেকে মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। শ্রীমতী মুকুলরানী দাস, ৮০ বাবুপাড়া, গোরাবাজার, বহরমপুর।

১৩৭৫ সালের জন্য মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮৲ টাকা পাঠাইলাম। শ্রীবিমলকুমার বিশ্বাস, গ্রন্থাগারিক, পল্লীমঙ্গল (গ্রাম্য) গ্রন্থাগার, মানকর, বর্ধমান।

১৩৭৫ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের মাসিক বসুমতীর গ্রাহকমূল্য পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাইলে আনন্দিত হইব। শ্রীশিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ, ১৭।১১, নীলকুণ্ঠ, কুরকী।

আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা শ্রেণিভুক্ত হইতে চাই। মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮৲ টাকা পাঠালাম। ১৩৭৫ সালের বৈশাখ হইতে আমাকে বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরী, অবঃ---শ্রী বি পি চৌধুরী, ৭ বুলেভার্ড রোড, তিসাজারী, দিল্লী-৬।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ২৭-০০ টাকা পাঠালাম। রেজিস্ট্রী ডাকে মাসিক বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করিবেন।---ইলা রায়চৌধুরী।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা বাবদ ১৮-০০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। ---শান্তিলতা পাল, অবঃ---মেজর এস সি পাল, আম্বালা ক্যান্টনমেণ্ট।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৮-০০ টাকা পাঠালাম। মাসিক বসুমতী যথারীতি পাঠাবেন।---উমা রায়, অবঃ---ডঃ পি সি রায়, জয়পুর।

মাসিক বসুমতীর জন্য ৩৩-০০ টাকা পাঠালাম। ইউ কেতে সী-মেল মারফৎ মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। ---ইভা মুখোপাধ্যায়, কেঃ অঃ-ডঃ পি কে মুখার্জী, সেণ্ট ম্যাথিওজ হসপিটাল, বার্নটউড, ওয়ালসঅল সি ও স্টাফ, ইউ কে।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৮-০০-টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ '৭৫ হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। ---চিত্তরঞ্জন রায়, সাবরাকোন হাই স্কুল, সাবরাকোন, জেলা---বাঁকুড়া।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ২৭-০০ টাকা পাঠালাম। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাবেন। শ্রী কে কে চক্রবর্তী, ত্রিপুরা।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৮-০০ টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাতে অনুরোধ করি। শ্রীশশাংকশেখর মুখোপাধ্যায়, কাতরাস কোলিয়ারী, ধানবাদ।

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৮-০০ টাকা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাবেন।---যুগ্ম-সম্পাদক, বাংলা বীণা পাঠাগার, মীরাট।

১৩৭৫ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৯-০০ টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী ইন্দু ভদ্র, কালাগ্রাম, মেদিনীপুর।

১৩৭৫ সালের মাসিক বসুমতীর জন্য বার্ষিক চাঁদা ১৮-০০ টাকা পাঠাইলাম। নতুন গ্রাহিকা করিয়া লইবেন। কমলা চৌধুরী।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক তালিকা-ভুক্ত করিয়া লইবেন। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ---এস পি সিংহ, এস পি এম কলোনী, মধ্যপ্রদেশ।

আমার মাসিক বসুমতীর ১৩৭৫ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৮-০০ টাকা পাঠালাম। বৈশাখ সংখ্যা থেকে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবেন। সুকুমার ঘটক।

দিনের শেষে আপনি যখন কাজ করে
খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন
এক গ্লাস টাটকা লিলি বার্লি খেলে
অনেক আরাম ও আনন্দ পাবেন
লিলি ব্র্যান্ড বার্লি
বলে চাইবেন
আধুনিক
বিজ্ঞানসম্মত
প্রণালীতে প্রস্তুত
LILY
BRAND
BARLEY
লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

৭ই জ্যৈষ্ঠের বই

আশা মিত্রের নূতন উপন্যাস

নাবিক ও নক্ষত্র

সাত টাকা

সদ্য প্রকাশিত :

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

শুভ বিবাহ কথা ৩·০০

'বনফুল'-এর

রবীন্দ্র-স্মৃতি ৩·৫০

ফণিভূষণ দেব-এর

পরলোক

সমীক্ষণ

দশ টাকা

আমাদের প্রকাশনার বিভিন্ন রসসঞ্জাত গ্রন্থসমূহ : উপহারে অনবদ্য

'বনফুল'-এর

প্রচ্ছন্ন মহিমা ৪·০০

মানসপুর ৬·০০

তীর্থের কাক ৫·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রিক্শার গান ৫·০০

কোকিল ডেকেছিল ৩·২৫

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়'র

সেই প্রেম আস্বাদন ৩·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাহ্নের আলো ৪·০০

যখন তরঙ্গ ৭·০০

অঘটনের ঘটা ৬·০০

অঘটন আজো ঘটে ৬·০০

বিমল মিত্রের

নফর সংকীর্তন ২·৫০

আশাপূর্ণা দেবীর মহোত্তম সৃষ্টি

কাঁচ পুঁতি হীরে ৯·০০

মেঘপাহাড় ৩·৩০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের

সৃষ্টি ৫·৫০

সরোজ রায়চৌধুরীর

অনুষ্টুপ ছন্দ ৫·০০

মহাশ্বেতা দেবীর

অমৃত সঞ্চয় ১০·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আকাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

কলকাতার কাছেই ৭·০০

চিত্রিতা দেবীর

দুই নদীর তীরে ৬·৭৫

মনের আলোয় দেখা ৫·০০

প্রতিভা বসুর

মালতীদির গল্প ২·৫০

নবেন্দু ঘোষ-এর

পাপুই দ্বীপের কাহিনী ৩·৩০

গ্রাম : কালচার (বি)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১

হিমালয়

শিল্পী—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

জংলী পথ

প্রাণ আটুবাটু

শ্রীরামকৃষ্ণ—"শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন করে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন—আমার সঙ্গে এসো—এই বলে শিষ্যকে একটা পুকুরের ধারে লয়ে গিয়ে তাকে পুকুরে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে তাকে উঠিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম বোধ হচ্ছিল? শিষ্য বললে, 'প্রাণ আটুবাটু করছিল—যেন প্রাণ যায়!' গুরু বললেন—'দেখ, ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ এরূপ আটুবাটু করে, তবেই তাঁকে পাবে। প্রাণে অসীম ব্যাকুলতা হওয়া চাই—তীব্র বৈরাগ্য হওয়া চাই।'

"ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুবাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণোদয় হলে পূর্বদিক লাল হয়, তখন বুঝা যায় যে সূর্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেরূপ যদি কারু প্রাণ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝা যায় যে এ ব্যক্তির ঈশ্বর লাভের আর দেরী নাই।"

প্রাণময় কোষ

অন্নরসময় (অন্নরসের পরিণতিভূত) স্থূল দেহই অন্নময় কোষ। ইহা জীবের বাহিরাবরণ। এর অভ্যন্তরে পরবর্তী আবরণই প্রাণময় কোষ। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ মিলিত হয়ে প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। এই কোষই প্রাণের বিকৃতিনিবন্ধন বক্তৃত্বহীন আত্মাকে বক্তা, দাতৃত্বহীন আত্মাকে দাতা, গমনাদি চেষ্টাহীন আত্মাকে গতিশীল এবং ক্ষুৎ-পিপাসাহীন আত্মাকে ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত করে আবৃত রেখেছে!

এই প্রাণময় কোষকে আশ্রয় করেই কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষাদি থাকে। তাই একে কামনার কোষও বলে। এই কামনার কোষ চায় (কাম ক্রোধাদির) উত্তেজনা ও অতিরিক্ত স্পন্দন। সে চায় তার মধ্যে নূতন নূতন স্পন্দন হোক—ভোগের উত্তেজনার স্পন্দন। অন্নময় কোষ চায় আলস্য। এ দুটি কোষ একসঙ্গে স্থূল শরীরে আছে!

এই প্রাণময়টি পুরুষবিধ—পুরুষ দেহের ন্যায় হস্ত-মস্তকাদি-সম্পন্ন। অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ এর আকৃতি; বিশেষ এই যে প্রাণই প্রাণময় কোষের শির, ব্যানবায়ু তার দক্ষিণ পক্ষ, অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ (অর্থাৎ সমান বায়ু) তার দেহ-মধ্যভাগ এবং পৃথিবী তার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। হয়ে প্রাণন করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং জীবগণ প্রাণের অনুগত হয়েই জীবন ধারণ করে। কারণ প্রাণই ভূতগণের আয়ুঃ—জীবন রক্ষার নিদান। এই প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষের দেহাবস্থিত।

প্রাণায়াম

প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ। প্রাণের (প্রাণ বায়ুর) আয়াম (গতিরোধ)-ই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বাহিরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করণকেই পূরক বলে না—বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে স্থির রাখাকেই পূরক বলে। তেমনি ভিতরের বায়ুকে বাহির করাকেই রেচক বলে না—প্রাণ বায়ুকে বাহির করে সেখানেই স্থির রাখাকে রেচক বলে;—সদাগতি বায়ুকে স্থির করে রাখলেই আয়াম হয়—গতিরোধ করা হয়। বায়ুকে স্থির রাখলেই প্রাণময় সিদ্ধি হয়। কুম্ভক রেচক-পূরকহীন অবস্থায় বায়ু স্থির থাকে। কুম্ভক কেন বলে? যেমন কলসীতে (কুম্ভে) জল পূর্ণ থাকলে তাতে কোনরূপ শব্দ শুনা যায় না, অল্পমাত্রও খালি থাকলে শব্দ হয়, সেরূপ পূরক দ্বারা দেহের সমস্ত অবয়বে বায়ুর পূরণ হলে আর তাতে বায়ুর সঞ্চার হয় না, সুতরাং স্থিরভাবে থাকে।

সাধারণত পূরকের সময়ের চতুর্গুণ সময় কুম্ভক এবং দ্বিগুণ সময় রেচক; কিন্তু ত্রিসন্ধ্যার প্রাণায়ামের বিধি আলাদা। এভাবে প্রথম অভ্যাসের পরে আন্তর ও বাহ্য কুম্ভক করা হয়। ভিতরকার বায়ু রেচনের পরে আর বাইরের বায়ু না টেনে অবস্থান করার নাম 'বাহ্য কুম্ভক'; আর বাইরে থেকে নিঃশ্বাস দ্বারা বায়ু টেনে নিয়ে ভিতরে আবদ্ধ করে স্থির রাখার নামই 'আন্তর কুম্ভক'। কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কুম্ভক হচ্ছে 'কেবল কুম্ভক', অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত একাগ্র হলে বায়ু যে অতি শান্তভাবে নাসা-ভ্যন্তরেই ক্ষীণভাবে বইতে থাকে, সেই অবস্থা (গীতা—৫।২৭)। ইহা সহজ ও স্বাভাবিক কুম্ভক।

প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য প্রাণের (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের) শান্ত সমতায় আনা। সদ্‌গুরুর উপদেশে এ সব করতে হয়। গুরুর উপদেশ ছাড়া এ সব করতে গিয়ে ভুল হলে হৃদ্রোগাদি হতে পারে। ব্রহ্মচর্য না হলে প্রাণায়াম ঠিক হয় না।

সাধারণ কলির জীবের প্রাণায়াম দ্বারা মনোনিরোধ অপেক্ষা শুধু ইষ্টমূর্তি আদির ধ্যানযোগ দ্বারা যে সহজ ও স্বাভাবিক প্রাণায়াম হয় তাই অধিক উপযোগী। ইষ্টমূর্তির ধ্যানে একাগ্রতা যত বাড়বে শ্বাসবায়ুর চাঞ্চল্য ততই কমবে এবং ক্রমশ

প্রাণ ও মন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত; প্রাণ স্থির করলে মন স্থির হয়—আবা, মন স্থির করতে পারলেও প্রাণ আপনিই স্থির হয়। হঠ-প্রাণায়াম ও রাজ যোগের প্রাণায়াম দুটিতে তফাৎ কি জান? মনে কর একটি গরু গোয়ালে ঢুকতে চাইছে না। তাকে দুই উপায়ে গোয়ালে ঢোকানো যায়। প্রথম উপায়, কয়েক জনে মিলে গরুটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া; এটি হচ্ছে হঠযোগের মত। আর এক উপায় হচ্ছে, তাকে আদর করে তার মুখের কাছে নধর কচি ঘাস ধরে, লোভ দেখিয়ে ক্রমশ পেছন হেঁটে গোয়ালে ঢুকে পড়া, যেন সেও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ে। এটিই রাজ যোগের পন্থা।

অন্তঃ কুম্ভক ও বহিঃ কুম্ভক দ্বারা নিদ্রা-আলস্য ইত্যাদি দোষ দূর হয়ে সত্ত্বপ্রকাশের আবরণ ক্ষয় হয়; কেবল কুম্ভকের অভ্যাসের ফলে চিত্ত একাগ্রতার এবং ধারণার যোগ্য হয়।

প্রাণায়াম বা প্রাণের সংযম হলেই প্রবৃত্তিসমূদয় নষ্ট হয়, কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলির এককালীন ধ্বংস হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে ত্রিসন্ধ্যার প্রাণায়ামের বিধি আলাদা। সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়ামে সম পরিমাণ কালেই পূরক, কুম্ভক ও রেচক করা বিহিত এবং সেসময় যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের রূপ চিন্তা (ধ্যান) করতে হয়। প্রাণায়ামের পূর্বে ন্যাসের বিধি আছে।

পূরকে ব্রহ্মার ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ইড়া নাড়ীতে (বাম নাসায়) বায়ু আকর্ষণ করতে হয়—তখন দক্ষিণ নাসা (পিঙ্গলা) ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চেপে বন্ধ রাখতে হয় এবং অন্তর্দৃষ্টি মণিপুর চক্রাস্থিত ধ্যেয় রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ, দ্বিভুজ, অক্ষসূত্র-কমণ্ডলু-কর ব্রহ্মার উপর রাখতে হয়।

কুম্ভকের প্রধান কার্য আকর্ষিত প্রাণকে স্থির রাখা। তাই কুম্ভকে বিশ্ব-পালয়িতা পুষ্টিকর্তা বিষ্ণুর ধ্যান করতে হয়। এ সময়ে দক্ষিণ ও বাম নাসা যথাক্রমে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা চেপে বন্ধ রাখতে হয় এবং অন্তর্দৃষ্টি বিষ্ণুর স্থান অনাহত চক্রে নীলবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়াসন বিষ্ণুতে রেখে তাঁর ধ্যান করতে হয়।

রেচকে চিত্তের লয়সাধন প্রধান কাজ; তাই তখন রুদ্রের ধ্যান করতে হয়। এ সময়ে দক্ষিণ নাসা মুক্ত করে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতবর্ণ, ত্রিশূল-ডমরু-কর, অর্ধ চন্দ্র-বিভূষিত, ত্রিনেত্র, বৃষারূঢ় শম্ভুকে আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করতে হয়।

সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়ামের পূরক, কুম্ভক ও রেচককালে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শম্ভুর ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ওঁকার, সপ্তব্যাহৃতি ও সশিরস্ক গায়ত্রীমন্ত্র চিন্তা করা বিহিত। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, এবং সত্য—এই সপ্তলোকই সপ্তব্যাহৃতি; এরাই পর-ব্রহ্মের বিরাট অঙ্গের (ব্রহ্মাণ্ডের) সপ্তাঙ্গ এবং জীবের দেহপিণ্ডে সাতটি ব্যক্ত চক্র। 'ওঁ আপজ্যোতিঃরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্'—ইহাই গায়ত্রী শির।

প্রারব্ধ

কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। সকাম কর্মের ফলভোগ করতে হবেই। তাই জীবের কর্মই বন্ধনের হেতু; কর্মই জীবকে পুনঃ পুনঃ ভোগ করাবার জন্য প্রারব্ধরূপে জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। বস্ত্রের মত জীবের ভোগ দেহটিও সূত্র দিয়ে তৈরি; এ সূত্র হচ্ছে কর্মসূত্র। জীবদেহরূপ বস্ত্রের 'টানা'র সুতো হচ্ছে তার পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কার-রূপ প্রারব্ধ—যার ভোগ এখনো বাকী আছে। নির্লিপ্ত ব্যক্তিকেও সংস্কার-বশে কর্মফল বা প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়। আবার এই প্রারব্ধ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে জীবকে সতত নূতন কর্মও করতে হয়; সেই নূতন কর্ম-রূপ সূত্রগুলিও কখনো বা আসক্তিরূপে (মোক্ষের প্রতিকূল), আর কখনো বা আসক্তির প্রতিকূলে থেকে জীবের ভোগদেহরূপ বস্ত্রের 'পড়েন' এবং সূত্রেরূপে সেই বস্ত্রকে 'পাতলা' কিম্বা 'খাপী' করে তুলছে। শাস্ত্র বলেন, পূর্ণজ্ঞান হলে জীবের সঞ্চিত ও আগামী কর্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ জ্ঞান-লাভ হলেও করতে হয়। যে অহঙ্কারে নিজে কর্তা সেজে বসে, তার প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়ে বরং বৃদ্ধিই হয়; কারণ তার সঞ্চিত এবং আগামী কর্মও ক্ষয় না হয়ে প্রারব্ধরূপে তার কর্মবন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

মায়ের কৃপায় প্রারব্ধ-নাশ নানাভাবে হয়—কতক ভোগের ভিতর দিয়ে, কতক সংযমের ভিতর দিয়ে, আবার কতক স্বপ্নের ভিতর দিয়ে বিলীন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যার যা কর্মের ভোগ আছে, তার তা করতে হয়। উত্থান-পতন, ধনী-নির্ধন, এ সব কর্মের ভোগ। সংস্কার প্রারব্ধ এ সব মানতে হয়।

"সুখ-দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, কালুবীর জেলে গিছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহ ধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত বড় ভক্ত; আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ! মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল।

"একজন কাঠুরে, পরম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না; সেই কাঠ কেটেই খেতে হবে। কারা-গারে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হলো, কিন্তু কারাগার ঘুচলো না।

"এসব প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে কদিন ভোগ আছে দেহ ধারণ করতে হয়। একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল; কিন্তু কানা চোখ ঘুচলো না। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল, তাই ভোগ।

"মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার, এ সব আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, তুমি আমার কাছে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বললে, আমি থাকতে পারি; কিন্তু আমার এখনো ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয়ত বনেই একটা রাজ্য হয়ে যাবে।

"তবে, তাঁর নাম করলে, তাঁকে চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত হলে কর্মপাশ অনেকটা কেটে যায়, একজন পূর্বজন্মের কর্মের দরুণ সাত জন্ম কানা হতো; কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কানা তেমনি রইলো, কিন্তু আর সে [illegible] হলো না।

প্রার্থনা

অভাব পারপূরণের ইচ্ছা স্বাভাবিক। যখন নিজের চেষ্টায় সেটা সম্ভব না হয়, তখন যার দ্বারা সেটা সম্ভব তাকে নিজের সে ইচ্ছাটা জানিয়ে তা পূরণ করতে বলার নামই প্রার্থনা। শিশু কে'দে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন এমন কোন অভাব হয় যা মা পূর্ণ করতে পারেন না, তখন আমরা যে সে অভাব পূর্ণ করতে পারে তার কাছে প্রার্থনা করি। কিন্তু যে অভাব সংসারের কোন লোকই পূর্ণ করতে পারে না, সে অভাব পূর্ণ করবার জন্য আমরা সংসারাতীত পরমেশ্বরী বিশ্ব জননীর কাছে প্রার্থনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যিনি সগুণ ব্রহ্ম,—যিনি আদ্যাশক্তি, তিনি প্রার্থনা শুনেন। তিনি অন্তর্যামী। তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে, প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন—ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তা-ও দেবেন। পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবাত্মারই যোগ হতে পারে—প্রার্থনা করলেই হবে।

"তিনি কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে চাইতে হয়—প্রার্থনা করতে হয়; তখন যা চাইবে, তা-ই পাবে।

"অনুরাগের সঙ্গে প্রার্থনা করতে হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে, ব্যাকুলতা আসবে; তখন তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবে। আমি ব্যাকুল হয়ে একলা একলা কাঁদতাম; কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

"ত্যাগ করতে হলে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়; আর সবচেয়ে সেরা প্রার্থনা—'যাতে ভোগাসক্তি যায়, আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।'

"ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। তাঁর কাছে যেতে হলে কর্ম চাই। নির্জনে গোপনে তাঁকে ডাকো—প্রার্থনা করো,—ব্যাকুল হয়ে কাঁদো 'দেখা দাও' বলে। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো,—এবার তাঁর জন্য একটু পাগল হও। সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।"

প্রার্থনার বিশ্বাস

একটা গল্প শুনেছি, একবার কোন দেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়; দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট দেখা দেয়। দেশের ধার্মিক প্রাজ্ঞ সকলে মিলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে সংকল্প করে সে দিনই সন্ধ্যার পরে সকলে মন্দিরে সমবেত হলেন। সেই জনতার মধ্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, একটি বালক ছাতা নিয়ে এসেছে। সে কেন ছাতা নিয়ে এসেছে জিজ্ঞাসা করাতে ছেলেটি বললে—'বা রে! আমরা তো বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবো। ছাতা না থাকলে বাড়ি ফিরতে ভিজে যাব না?'

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি সকলকে এত কাতর করেছিল যে, সকলে মিলে অতি ব্যাকুলভাবে একপ্রাণে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনার পরে সকলে বাইরে এসে দেখলেন আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন—অনতিবিলম্বে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

কাতর হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি প্রার্থনা পূরণ করেন, এ বিশ্বাস যদি থাকে, তবেই প্রার্থনা পূরণ হয়—অভীষ্ট লাভ হয়; যুক্তিতর্ক দ্বারা স্থির করলে কিছু হয় না। আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস চাই।

যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই। যদি প্রার্থনায় বিশ্বাস থাকে তবে ঐ বালকের মত ছাতা নিয়ে আসতে হবে। তিনি সব পারেন; তিনি কারুকে জলে, কারুকে স্থলে, কারুকে আকাশে, কারুকে বাতাসে, আবার কারুকে আগুনে রেখেছেন। তবু আমরা অবিশ্বাস করি। একজন সাধু বলেছেন—"বৃষ্টির জলধারা ধরে আকাশে উঠা যেমন অসম্ভব, তেমনি বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে লাভ করা অসম্ভব। একবার পূর্ণ বিশ্বাসে বিশ্ব জননীর দিকে তাকাও, তাঁর মধ্যে ইহলোক, পরলোক প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে—সত্য সত্য দেখতে পাবে। 'অতএব' এর মা, 'যুক্তির' মা দ্বারা হবে না; 'যথার্থ মা'—এই বিশ্বাসে ডাকো; ডেকে দেখো। আমার মা আমাকে সব দেন; এটা আমার শোনা কথা নয়—দেখা কথা। আমি দেখে বলছি, জোর করে বলছি; আমার দেখা,—শোনা নয়। আমি কাঙাল; কীটের কীট,—অধমের অধম; আমার প্রাণে যখন তিনি আরাম দেন, তখন কারু ভয় নেই। আমার মত কীটানুকীট যদি তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে, তখন কারু ভয় নেই।

"মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! আমার মা—সত্য মা, সকলে পাবে। অপমানে মাকে ডাকো, পাপে ডাকো, নির্যাতনে ডাকো—আন্তরিক বিশ্বাস করে শুধু ডাকো। আমার মা সব প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"প্রার্থনা যদি ঠিক হয়, যদি আন্তরিক হয়—যদি প্রার্থনায় বিশ্বাস থাকে, তিনি শুনবেনই শুনবেন। বিষয়ী লোক স্ত্রী ছেলেপুলের জন্য যেমন কাঁদে, তেমনি ঈশ্বরের জন্য কাঁদতে হবে। ব্যাকুল হয়ে কে'দে কে'দে প্রার্থনা, ঈশ্বর লাভের একটি উপায়। তিনি যে আপনার লোক,—তাঁর উপর জোর চলে।"

প্রেম

শ্রীরামকৃষ্ণ—"প্রেম কাকে বলে? প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ ভুল হয়ে যাবে, নিজের দেহ পর্যন্ত ভুল হয়ে যাবে।

"প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা—সকলের হয় না। গৌরাঙ্গের হয়েছিল। জীবের ভাব পর্যন্ত হতে পারে। ঈশ্বর কোটির—অবতার আদির—প্রেম হয়। প্রেম হলে জগৎ-মিথ্যা বোধ—তা-ও ভুল হয়ে যায়—দেহাত্ম বোধ একেবারে চলে যায়। ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

"গোপীদের প্রেম হয়েছিল। আহা! তাদের কি অনুরাগ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চোখের জল সে আগুনের ঝাঁঝে শুকিয়ে যেতো—জল বেরুতে না বেরুতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো—কেউ কখনো তার ভাব টের পেতো না। এরই নাম প্রেমোন্মাদ। তাঁকে এই উন্মাদের মত ভালবাসাই প্রেম। ঈশ্বরেতে এতো

ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব বন দেখে বৃন্দাবন ভাবতেন, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবতেন। নারদ, শুকদেবাদিরও তাঁর উপর প্রেম হয়েছিল।

"প্রেম রজ্জুর মত। প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়—সেই দড়িতে দড়িতে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন—আর দূরে থাকতে পারেন না। যাই দেখতে চাইবে, দড়ি ধরে টানলেই হয়; যখন ডাকবে, তখনই পাবে।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

এ মাসের প্রচ্ছদপট

পার্ল বাক

নোবেল পুরস্কার-বিজয়িনী পার্ল এস বাক যেন দুটি সত্তার অধিকারিণী। একই সঙ্গে তিনি দুটি দেশের সংস্কৃতি ও মানুষকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন। এই দুটি দেশ হল আমেরিকা ও চীন। পার্ল কমফর্ট সাইডেনস্ট্রিকার ১৮৯২ সালের ২৬শে জুন পশ্চিম ভার্জিনিয়ার হিলসবোরোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা-পিতা চীনে মিশনারীর কাজ করতেন। পার্লের যখন জন্ম হয় তখন কিছুদিনের জন্য তাঁরা হিলসবোরোতে এসেছিলেন। পার্লের পাঁচ মাস বয়সের সময় তাঁরা আবার চীনে ফিরে যান। পার্ল বড় হয়ে ওঠে ইয়াংসি নদী-তীরবর্তী চিংকিয়াং-এ। চীনা সমাজের মধ্যে থেকে পার্ল চীনাদের রীতি-নীতি ও সামাজিকতায় বেশ রপ্ত হয়ে উঠলেন। 'মাই সেভারেল ওয়ার্ল্ডস' নামে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, প্রাতে নিজের মায়ের শিক্ষা এবং সন্ধ্যায় চীনা শিক্ষকের শিক্ষা তাঁর মনটিকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দিয়েছিল। এমনিভাবে দুটি ধারার সমন্বয় হয়েছিল তাঁর জীবনে।

পার্লের স্কুলের শিক্ষা সাংহাই-এ, কলেজের শিক্ষা আমেরিকায় ভার্জিনিয়ার র‍্যানডলফ-ম্যাকন কলেজে। ১৯১৪ সালে স্নাতক হন। ঐ বছর দুটি সাহিত্য পুরস্কারও পান। ঐ কলেজে তিনি কিছুদিন মনস্তত্ত্ব অধ্যাপনাও করেছেন। পরে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন ও সেখানে শিক্ষিকার কাজ করতে থাকেন।

শৈশব ও প্রথম যৌবনে তাঁর লেখার খ্যাতি হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়। তাঁর প্রথম গল্প 'এ চাইনীজ উওম্যান স্পীকস' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। চীনে তাঁর আনন্দের দিনগুলির স্মারক গ্রন্থগুলির মধ্যে 'দি চাইনীজ চিলড্রেন নেক্সট ডোর', 'দি ড্রাগন ফিস্', 'ওয়ান ব্রাইট ডে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯১৭ সালে পার্লের বিয়ে হল ডাঃ জন লসিং বাকের সঙ্গে। বিয়ের পর তাঁরা চলে এলেন উত্তর চীনে। এখানে জীবন-ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। এই অঞ্চলেরই ছবি তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ক্লাসিক গ্রন্থ 'দি গুড আর্থ'টিতে। অতঃপর তাঁরা আমেরিকায় আসেন এবং শ্রীমতী পার্ল বাক ইংরেজীতে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। এইসঙ্গে 'চায়না অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট' গ্রন্থটির জন্য তিনি লরা মেসেঞ্জার পুরস্কারও পান। এই সময় থেকেই শ্রীমতী বাক প্রচুর লিখতে থাকেন এবং ক্রমানুয়ে 'ইষ্ট উইণ্ড : ওয়েস্ট উইণ্ড', 'দি এক্সাইল (তাঁর মায়ের জীবনী), 'দি গুড আর্থ', 'এ হাউস ডিভাইডেড'', 'সন্স', 'দি মাদার', 'ফাইটিং এঞ্জেল' (তাঁর বাবার জীবনী) প্রকাশিত হয়। তিনি একটি ক্লাসিক চীনা উপন্যাস 'শুই হু চুয়ান' অনুবাদও করেন। এটি 'অল মেন আর ব্রাদার্স' নামে প্রকাশিত হয়।

শ্রীমতী বাক ১৯৩৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান। নোবেল কমিটি তাঁর মাতা-পিতার জীবনী দু'খানির অজস্র প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, 'তাঁর উপন্যাসগুলিতে চীনা কৃষক পরিবারের জীবনের প্রকৃত সমৃদ্ধ-পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা মহাকাব্যের বিশালতা লাভ করেছে।'

শ্রীমতী বাকের অজস্র সৃষ্টি ইংরেজী সাহিত্যকে মহিমান্বিত করেছে। তাঁর বিপুল জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি ব্যতীত তিনি শিশুদের জন্যও গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং অজস্র ছোট গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর গল্পের বিষয়-বস্তুর পরিধিও বিশাল।

শ্রীমতী বাক কয়েক বছর যাবৎ 'এশিয়া ম্যাগাজিন' নামে একখানি পত্রিকার যুগ্ম-প্রকাশক ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ওয়েলকাম হাউস নামে একটি শিশুপালন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কিন ও এশীয়দের মধ্যে মিলনের ফলে যে সব সন্তানের জন্ম হয় এই সংস্থায় তাদের পোষ্য-রূপে গ্রহণ করা হয়। শ্রীমতী বাক নিজেও পাঁচটি সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিজের কন্যা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল এবং এরই কাহিনী তিনি লিখেছিলেন 'দি চাইল্ড হু নেভার গ্রু' নামক বইটিতে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন প্রচেষ্টায় তিনি সবিশেষ যত্নশীলা ছিলেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। ব্যাপকভাবে দেশ-ভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখেছেন। এমন কি ১৯৬২ সালে ভারত ভ্রমণ-কালে চীন-ভারত সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মতামত এখানে অনেককেই বেশ চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল।

ডক্টর চোখানি

জলকিঙ্কার

পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজে চলেছে ওরা বোম্বাই থেকে,—অশোকা ও ব্রজদুলাল।

ফার্মের ইণ্ডিয়ান এম্‌প্যায়ারেতে বদলী হয়ে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে ব্রজ। ফার্স্ট ক্লাশের সহযাত্রীদের মধ্যে আরও তিনজন ভারতীয় আছেন, মিঃ ও মিসেস রত্নস্বামী ও ডক্টর চোখানি।

রত্নস্বামী যাচ্ছেন লণ্ডনে, ফার্মের কাজে। এই সুযোগে স্ত্রীকে ইউরোপ ঘুরিয়ে আনতে চান। প্লেনে চাপতে মিসেসের ঘোর আপত্তি, তাই পাড়ি দিচ্ছেন সমুদ্র পথে। প্রৌঢ় দম্পতির কেউই সেরকম মিশুক-প্রকৃতির নন। কথাবার্তাটা একরকম ওদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডক্টর বন্‌শীলাল চোখানি যাচ্ছেন প্যারীতে, ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে, ইজিপ্টলজির গবেষণা করবার জন্যে। ফুটফুটে চেহারা। রাজস্থান ইউনিভারসিটির পি-এইচ-ডি,—প্রাচীন ভারতীয় ইতি-হাসে। শ্বশুর ওঁর মস্ত লোক, দিল্লীর ওপরমহালের কর্তাদের সঙ্গে যথেষ্ট দহরম-মহরম। স্কলারশিপটার জন্যে অনেক যোগ্য ও কৃতবিদ্য প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু বন্‌শীলালের মত মুরুব্বির জোর ওঁদের কারোরই ছিল না।

●

সুয়েজ থেকে পোর্ট সৈয়দের দূরত্ব কম নয়,—প্রায় ১৬৪ কিলো-মিটার। একঘেয়ে ধূসর রুক্ষ পরিবেশ। জাহাজে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্তি এসে যায়। অনেকে তাই সুয়েজে নেমে, মোটরে চেপে কায়রো হয়ে, পোর্ট সৈয়দে জাহাজ ধরেন। পথে মিশরের বহু প্রাচীন কীর্তি—পিরামিড, নানাবিধ মূর্তি এবং কায়রোর বিখ্যাত মুজিয়াম, যাতে পাঁচ হাজার বছর আগের জিনিষপত্র রক্ষিত আছে—দেখে আসেন। টমাস কুকের লোকেরাই এই মোটর ভ্রমণের বন্দোবস্ত করে থাকে। এর জন্যে জন-প্রতি চার্জ পড়ে আট পাউণ্ড। প্রায় পুরোদিনটাই লাগে এই এক্সারশনে।

চোখানী জেনে এসেছেন, প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করলে অনেক সস্তায় সব কিছু দেখে ফেলা যায়। গাইডেরও বিশেষ দরকার হয় না। গাড়ীর চালকেরা অনেক সময় দিব্যি গাইডের কাজটাও চালিয়ে দিতে পারে। এর জন্য সামান্য কিছু অতিরিক্ত ধরে দিলেই হয়।

সুয়েজ বন্দরে নেমে, ওঁরা কজন একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করলেন: বেশ বড় গাড়ী, ইংরাজী জানা ড্রাইভার। আগে একটা ইস্কুলে মাস্টারী করত। ফরাসী জানে না বলে চাকরী গেছে। এখন ট্যাক্সি চালিয়ে ভালই উপায় করে। পাঁচজনকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে, পোর্ট সৈয়দে জাহাজে পৌঁছে দেবে,—বার পাউণ্ড ভাড়া চেয়েছিল, দরদস্তুর করে শেষ নয় পাউণ্ডে রফা হল।

মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে গাড়ী চলছে। মাঝে মাঝে বালিয়াড়ি, কাঁটা ঝোপ, দু-চারটে খেজুর গাছ।—একটানা খানিকক্ষণ চলবার পর হঠাৎ খর্জুর তরুশ্রেণীর অন্তরালে ঝলসে উঠে নীলনদের সুনীল জলরাশি। কী সুন্দর! চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।—একটু পরেই গম্বুজ ও মিনারওয়ালা কায়রো সহরে এসে ঢুকল ওদের গাড়ী।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা হয়ে গাড়ীখানা থামল এসে ন্যাশনাল হিস্টি মুজিয়ামের ফটকের সামনে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাইড ছাড়া, অন্য গাইডকে ঢুকতে দেওয়া বারণ, তাই একজন বুড়ো আরব গাইডকে ঠিক করলেন ওঁরা। প্রত্যেককে পাঁচ পিয়েস্তা দিতে হবে।

মুজিয়ামের হাতায় ঢুকেই চোখে পড়ে একটা অতিকায় বেলে পাথরের মূর্তি,—সিংহাসনে বসে থাকার ভঙ্গীতে। অশোকা মূর্তিটা দেখেই চিনল।

—'এটা দ্বিতীয় রামেশিসের মূর্তি না?' অশোকা চোখানিকে জিজ্ঞেস করে।

ডাঃ বন্‌শীলাল ঈষৎ ঠাট্টার স্বরে বলে ওঠেন,—'অ্যায় জী, ইয়ে থোড়াই রামেশিসকা স্ট্যাচু, হায়। ইয়ে ত গ্রেট ফ্যারাও তুতেন খামেন কা স্ট্যাচু।' তুতেন খামেনের ছবি যা অশোকা দেখেছে, তাতে ওঁর দাড়ি ছিল মুখে, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তাই সে গাইডকে শুধাল,—'ওয়েল ইজ নট দ্যাট দ্য স্ট্যাচু অব রামেসিস দ্য গ্রেট?'

গাইড উত্তর দিল,—'স্যিওর।'

চোখানির মুরুব্বিয়ানায় অশোকা সত্যিই চটেছিল। ওর মনে হল, লোকটা পয়লা নম্বরের হাম্‌বাগ্‌।

ওর উদ্দেশে তাই বলল,—'ডঃ চোখানি, শুনা হ্যায় আপনে গাইড কেয়া বোলা?'

চোখানি হাসে পাইপটানা শিখেছেন। ওর কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন।

অনেক কিছু দেখার আছে মুজিয়ামে।

নানা রকমের শবাধার, মমি, বেড়ালমুখো, শেয়ালমুখো, বাজপাখীর মুণ্ডওয়ালা দেব-দেবী। সিংহ ও

হিপোপটামাসের আকৃতিবিশিষ্ট মৃত্যু-দেবতার অনুচরদের ছবি ও মূর্তি। পাথরে খোদাই হাইরো গ্লীফস্ বা চিত্রলেখা। প্রাচীন ফ্যারাওদের আমলের মুদ্রা, অলঙ্কার বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র, কাঁচের জিনিষ। প্রথম সোসটিসের আমলের চর্মশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। ফ্যারাও তৃতীয় খোটমিসের (যিনি প্রথম জীবনে আমন দেবের মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন) ইথিওপিয়া ও মেসোপটেমিয়া বিজয়ের চিত্র।—আরও কত কি। এছাড়া, সে আমলের প্রমোদ তরণী যাতে হাজার হাজার বছর আগের রাজা-রাণীরা নৌ-বিহার করতেন। পিরামিড থেকে আহরিত মধু, মাংস, গম—চার-পাঁচ হাজার বছরের পরও যেগুলো অবিকৃত রয়েছে।

রত্নস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন,—'আচ্ছা শুনেছি আশী মণ ওজনের একটা স্যাক্রোফ্যাগাস আছে নাকি এই মুাজিয়ামে?'

বনশীলাল বলে ওঠেন,—'ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দ্য' ব্রিটিশ হ্যাড লেফট ইট আনটাচড? দে মাস্ট হ্যাভ টেকেন ইট লং, লং এগো।'

যা হোক, গাইড ওদের সাথে নিয়ে, যে ঘরে সোনার কফিনটা রক্ষিত ছিল, সেখানে ওদের জিনিষটা দেখাল।

সব দেখেশুনে, ফেরার পথে অশোকার কথাটা মনে পড়ল। দিল্লীর বন্ধুমহালে শুনেছিল যে কায়রো ন্যাশনাল হিস্ট্রি মুজিয়ামের একধারের জলাধারে এক ঝাড় প্যাপাইরাস (Papyrus) জন্মানো হয়েছে। জায়গাটা ওদের দেখাবার জন্যে গাইডকে চোখানি বলে উঠলেন,—'এ আপনে কেয়া বগবাস কর রহী হৈ। প্যাপাইরাস কোন চিজ? হামনে কভি ভি নেহি শোনা উসকো নাম।'

রত্নস্বামী ব্যবসাদার লোক। লেখাপড়া বেশীদূর করেননি। তবুও সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বেশ বিস্তৃত। চোখানির অজ্ঞতা দেখে ভদ্রলোক থ' মেরে যান।

—'স্ট্রেঞ্জ। হ্যাভ নট ইউ ইয়েট হার্ড অব প্যাপাইরাস?' ভদ্রলোকটি সরব মুরেই বললেন।

তারপর ওকে বুঝিয়ে দিলেন যে, প্যাপাইরাস হচ্ছে নল-খাগড়া জাতীয় একপ্রকার গাছ। এ থেকে প্রাচীন মিশরে কাগজের মত একরকম জিনিষ তৈরী হত। আমাদের দেশে যেমন ভূর্জপত্রে পুঁথি লেখা হত, মিশরবাসীরাও লিখত এই প্যাপাইরাসের ওপর। 'মেনি অব ইওর রিসার্চ মেটিরিয়ালস্ ইট উড গেট ফ্রম প্যাপাইরাস স্ক্রোলস্।' গাইড ওদের নিয়ে প্যাপাইরাসের ঝাড় দেখিয়ে আনল।

চোখানির মুখটা থমথমে হয়ে ওঠে।

●

বেলা অনেক হয়েছে।

ওদের রীতিমত ক্ষিধে পেয়ে গেছে। সঙ্গে জাহাজ থেকে আনা স্যাণ্ডুইচ, ডিম সিদ্ধ, আপেল, কলা ও থার্মোসের কফি সব শেষ।

সবারই ইচ্ছে মিশরীখানা খাবেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে একটা ভাল দিশি হোটেলে নিয়ে যেতে বলা হল।

হোটেলটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দোতলার ব্যাল্কনীতে গিয়ে বসলেন ওঁরা। খাদ্য ও মূল্য তালিকা ইংরাজী ও ফরাসীতে ছাপা। পোলাও, ভার্মিসিলি, মাছের ফ্রাই, মুর্গীর রোস্ট মাংসের কোপ্তা, খেজুরের মোরব্বা, ফল, মিষ্টি, সরবৎ। গজার মত এক-প্রকার মেঠাই আছে যার ভেতর জ্যাম পোরা।

খাবারের অর্ডার দেবার সময় ডঃ চোখানি হঠাৎ উঠে পড়েন। বললেন,—'আপনারা খান, আমার খাবার ইচ্ছে নেই। কেমন যেন বমি বমি লাগছে।'

ওঁরা চারজনা খাবারের অর্ডার দিলেন। ষোল শিলিং-এর মত পড়ল এক-একজনার।

জিভবাটা দিয়ে মুর্গীর শুকনো রোস্টটা সত্যিই উপাদেয়। ওঁরা খাচ্ছেন, হঠাৎ অশোকা দেখতে পেল, উল্টো দিকের ফুটপাথের এককোণে চোখানি সাহেব এক রুটির দোকান থেকে নান্ আর শিককাবাব কিনে, একটা গাছের নীচে বসে গেছেন খেতে। অশোকা বুজকে দেখাল। বুজ একটুখানি হাসল। সে স্বল্পবাক্ ও কৌতূহল-বর্জিত।

রত্নস্বামী-দম্পতি নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, দেশওয়ালী ভাষায়। বাইরের দিকে তাঁদের নজর ছিল না।

অশোকা বুঝতে পারল, খাবারের দাম দেখে, বন্শীলাল ভেগেছেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ওঁরা এসে আবার মোটরে চাপলেন, পিরামিড ও ফিঙ্কস্ (নরসিংহ) মূর্তি দেখবার জন্যে।

চোখানিও ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন, পাইপ টানতে টানতে। চলল গাড়ী নদীর পশ্চিম তীর ধরে, দক্ষিণে দাস্থর ও গীজের দিকে।

ফ্যারাও, খুফু, খাফ্রা ও মানকুরের পিরামিড দেখতে চলেছেন ওঁরা। গীজের পিরামিড সম্রাট খুফুর সমাধির উপর রচিত। খুব উঁচু, প্রায় ৮৮৪ ফুট। খাফ্রার পিরামিডের পাশে জগদ্বিখ্যাত ফিঙ্কস মূর্তি।

সারি সারি কয়েকটি পিরামিড। একটার গায়ের ছোট্ট দরজার মধ্য দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল অশোকা ও ডঃ চোখানি। বাকি তিনজন খেজুর গাছের ছায়ায় বসে রইলেন। পিরামিডের অভ্যন্তরে ঢুকবার মত উৎসাহ তাঁদের ছিল না।

আঁকা-বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে, ওঁরা দুজন উপরে উঠলেন। একটা ছোট ঘর, মাঝে একটা উঁচু বেদী।

অশোকা বলল, 'এই বেদীর ওপরই মমির শবাধার রাখা ছিল।'

এইবার চোখানি নাকের ভিতর দিয়ে একটু অদ্ভুত হাসি (ইংরাজীতে যাকে বলে স্নিগার) হেসে বললেন—'আপ থোড়ী সে জানতি হ্যায় জী, ইসি লিয়ে আপকো বহোৎ —

হো গেয়ী। ইয়ে ভি আপকো পতা নেহি হ্যায়, কি মমি আণ্ডার গ্রাউণ্ড মে রখতে থে। আপ আগ্রামে নেহি গেয়ী? ভেজ নেহি দেখী? ওহাঁ ম্যায়সা উপরমে নকলী কফিন্ বনা রাখা হ্যায়---ইয়ে ভি ঐসী।'

অশোকা প্রতিবাদ জানায়।

চোখানি বাঁ হাতের তিন আঙ্গুলে পাইপ ধরে ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বললেন, ---'ক্যা জী ক্যা কহা রহী আপ্। হাম ভি থোড়া কুছ জানতা হ্যায়, সামথিং অ্যাবাউট মমিস এ্যাণ্ড অল দ্যাট্। ওল্ড ইজিপশিয়ান হিস্ট্রিকে উপর থিসীস বনানকে লিয়ে সরকার মুঝে ইধার ভেজা হ্যায়।'

যাক্ ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে জানা গেল, অশোকার অনুমানই ঠিক। ডক্টর বনুশীলাল হার মানেন না।

—'ও লোক কভি ইউনিভার্সিটি মে পড়া? ক্যা জানতা হ্যায় উয়ো এন্‌সেণ্ট হিস্ট্রিকা খবর?' ড্রাইভার একখানা ছাপা পুস্তিকা পকেট থেকে বার করল। ওদেশের ডিরেক্টর অব ইনফরমেশানের দপ্তর থেকে প্রকাশিত, ইংরাজীতে লেখা। পিরামিড্ ও মমী সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত তথ্যই আছে ওতে।

ট্যাক্সিওয়ালা একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, পড়তে বলল চোখানিকে।

ডঃ বনুশীলাল বইটা নিয়ে পড়লেন খানিকক্ষণ তারপর অশোকার দিকে ফিরে বললেন,---'আপনে জরুর পহেলী একদফে ইধার আয়ী থী।'

অশোকা ওঁর কথা শুনে চটে উঠল। ঝাঁঝাল কণ্ঠে জবাব দেয়, ---'হয়ে মেরী পহেলী সফর হ্যায় জী। ম্যায় থোড়ী বহোৎ কিতাবসে যো পড়ী, ওহি আপকো বতাই।'

রাগে ওর মুখখানা আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছিল।

কেন জানি চোখানি সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নরম হয়ে যান।

---'মুঝে মাপ কিজিয়ে দিদি। আপনে সজর কর দি। আই অট্ নট্ টু হ্যাভ ফরগটন দ্যাট্ ইউ হেল্ ফ্রম বেঙ্গল।---দ্যা ল্যাণ্ড অব লার্নিং এ্যাণ্ড কালচার। ফুটমুট্ কিঁউ পাঁচ পিয়েস্তা খর্চা কিয়া ম্যায় গাইডকো লিয়ে। মেরি মালুম হ্যায় আপ তো গাইডসে কুছ কম নেহী জান্‌তি হো।'----

চোখানি সাহেবের মুখে একটা অপরাধীর সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে।

রাগের চোখেও হঠাৎ কেন জানি অশোকার মনে হয় চোখানির হাসিটা সত্যিই সুন্দর।

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বর্তমান হুগলী নাম [illegible] নয়। প্রাচীন কালে হুগলী নামে কোনও জনপদের অস্তিত্ব ছিল না। এই জেলার গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মুক্তবেণী তীর্থ ত্রিবেণী আর সপ্তগ্রাম প্রাচীন নগর ও প্রাচীন বন্দর। সরস্বতীর স্রোতাবেগ কমে যাওয়ায় সাতগাঁ বন্দরের বাণিজ্য গৌরব হ্রাস পেয়ে যায়।

হুগলীর প্রাচীন ইতিহাসের কথা বলতে গেলে হুগলী প্রাচীন কোন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাই বলতে হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে এই জনপদ সুহ্ম দেশ—রাঢ় দেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এরই অন্তর্গত বর্তমান হুগলী জেলা। এই রাঢ় দেশ বৈদিক কাল থেকে হিন্দু যুগ, বৌদ্ধ যুগ, মুসলমান যুগে পৌঁচেছে।

পাঠান রাজত্বকালে অর্থাৎ অক্‌বর শাহের আমলের কিছু আগে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামের কাছে বাণিজ্য করতে থাকে। অক্‌বরের সময়ে কোনও এক পর্তুগীজ ব্যবসাদার নাম পেড্রো টাভারনেন্স দিল্লীতে অক্‌বরের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁকে মুগ্ধ করেন। অক্‌বর তাতে এত প্রীত হন যে পর্তুগীজদের বাঙলা দেশে যে কোন স্থানে নগর তৈরী করতে ভজনালয় স্থাপন ও খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে অনুমতি দেন।

অক্‌বরের অনুগ্রহ পেয়ে পর্তুগীজরা ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে অথবা ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমাংশে সাঁতগাঁয়ের কাছাকাছি গঙ্গাতীরে হুগলী বন্দর স্থাপন করে। হুগলী নামটি নিয়ে বেশ কিছু মতদ্বৈত আছে।

কেউ বলেন পর্তুগীজরা গোলাকে 'গোলিন' বলত, পর্তুগীজরা এখানে গোলাগঞ্জ স্থাপন করে এই স্থানকে গোলিন বলতে আরম্ভ করে। এই 'গোলিন' শব্দ ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়ে 'হুগলী' নাম হয়েছে।

আবার কেউ বলেন এখানে অনেক হোগলা হত, বা হোগলা বন ছিল, তাই থেকে হুগলী নাম হয়েছে। যাইহোক ঐ সময় থেকেই হুগলী নামের প্রচলন হয়। পর্তুগীজগণ ঐ নগরের ক্রমশ শক্তিশালী

হুগলীর গুপ্তিপাড়ায় অবস্থিত রামচন্দ্রের মন্দির

সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতের নানাস্থান থেকে চীন, ব্রহ্ম, মালয়, প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য জাহাজ হুগলী বন্দরে সর্বদা যাতায়াত করত। এক কথায় বলতে গেলে তখন হুগলী এসিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

শুধু যে পর্তুগীজরা এসেছিল তা নয়, এসেছিল ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী, দিনেমাররাও। তারা গঙ্গার তীরবর্তী কয়েক মাইলের মধ্যে তাদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে।

সেই সময় কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ গৌড়েশ্বরের অধীনে সৈন্য বিভাগে বিভাগে কাজ করে ও ১৫৩৭।৩৮ খ্রীস্টাব্দে একজন পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন করে।

১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙলার প্রায় সব ব্যবসা-বাণিজ্য পর্তুগীজদের হাতে যায়। তারা লক্ষাধিক টাকা মোগল সরকারকে বাণিজ্যকর দিত। শুধু যে তারা এই সময় গঙ্গার তীরে উপনিবেশ করে ছিল তা নয়, দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১৫০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করেও ব্যাণ্ডেলে ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে অগস্টিনানরা এক চার্চ নির্মাণ করে।

ক্রমে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠল, তারা মোগল সম্রাটকে মানতে চাইল না, তাদের আওতার লোকদের ওপর অযথা অকথ্য অত্যাচার ও জুলুম শুরু করল, ঔদ্ধত্যের চরম সীমায় উঠল। মোগল সম্রাটকে কর দেওয়া বন্ধ করল। বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও মোগল সরকার রাজস্ব পেত না। তারা কামান, রণতরী আনল, দুর্গ তৈরি ও সংরক্ষিত করল।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাজাহান সিংহাসনে বসলেন। পর্তুগীজদের অত্যাচারে ও অবমাননায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজদের বাণিজ্য ধ্বংস করেন, ওদের দুর্গ অধিকার করেন। হুগলীকে বাঙলার রাজকীয় বন্দর ও শাসনকেন্দ্র রূপে স্থাপিত করেন। এই সময় থেকে হুগলী উন্নতির শিখরে ওঠে।

মুসলমান আমলে অকবরের নির্দেশে ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে রাজা তোডরমল বাঙলা দেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। পাঠানরা যেমন বাঙলা দেশকে বহু অংশে বিভক্ত করে শাসনকার্যের সুবিধা করেছিল, রাজা তোডরমলও সেইরূপ বাঙলা দেশকে ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করে রাজস্ব আদায় ও বন্দোবস্তের সুবিধা করেন। ১৯ সরকারের মধ্যে খালসা ও জায়গীর উভয়বিধ জমী থাকত। (রাজকর্মচারীদের ব্যয় চালানোর জন্য যে জমী দেওয়া হত তা জায়গীর ও বাকী জমীর আয় যা রাজকোষে জমা হত তা খালসা)।

১৯ সরকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

(১) সরকার গৌড় (মালদহ); (২) সরকার পূর্ণিয়া ৯ পরগণায় বিভক্ত; (৩) সরকার তাজপুর (পূর্ণিয়ার পূর্বাংশ); (৪) সরকার ঘোড়াঘাট (রংপুর); (৫) বার্বেকাবাদ (রাজশাহী); (৬) সরকার পিঞ্জরা (দিনাজপুর); (৭) সরকার বাজুহা (ঢাকা); (৮) সরকার সিলেট; (৯) সরকার সোনারগাঁ (বিক্রমপুর); (১০) সরকার ফতেহাবাদ (সোনার গাঁ দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত); (১১) সরকার চাটগাঁ; (১২) সরকার তাণ্ডা বা রাজমহল; (১৩) শরীফাবাদ (রাজমহল দক্ষিণ থেকে বর্ধমান); (১৪) সরকার ভূষণা (নদীয়া ও যশোহর); (১৫) সরকার খালিফাবাদ (খুলনা জেলা); (১৬) সরকার বাঙলা; (১৭) সরকার সেলিমাবাদ (ভাগীরথীর পশ্চিম তীর সমুদ্র পর্যন্ত); (১৮) সরকার মান্দারণ (দামোদর ও রূপনারায়ণের মাঝে); (১৯) সরকার সাতগাঁ (ভাগীরথীর উভর তীর)।

বর্তমান হুগলী জেলা সরকার সেলিমবাদ, সরকার মান্দারণ ও সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত ছিল।

আবার বাঙলা বিভাগ হল, ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে। সুলতান সুজা উক্ত ১৯টি সরকারকে ভেঙে ৩৪টি সরকারে বিভক্ত করলেন। এরপর ১৭২২ সালে বাঙলার সুবেদার মুর্শিদকুলী খাঁ ব্যয় সঙ্কোচ করবার জন্য বাঙলাকে ১৩টি চাক্‌লাতে বিভক্ত করেন। ইংরেজরাও বসে ছিল না, তারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। তারপর ১৭৬০ খৃস্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধির সর্ত অনুসারে নবাব মীরকাসেম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চাক্‌লা বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর, চাক্‌লা ইসলামাবাদের অধিকার ছেড়ে দিলে হুগলী জেলার প্রায় সমুদয় অংশ চাক্‌লা বর্ধমানের অন্তর্গত হয়।

১৮৭৯ খৃস্টাব্দে ঐ অংশ বর্ধমান জেলা হতে বিচ্ছিন্ন করে হুগলী জেলায় পরিণত করা হয়।

প্রত্যেক জেলাকে সাব-ডিভিসনে বিভক্ত করা হয়, হুগলী জেলাকেও হুগলী, দ্বারহাট্টা (বর্তমান শ্রীরামপুর) ও ক্ষীরপাই (বর্তমানে আরামবাগ) নামে সাব-ডিভিসনে বিভক্ত হয়।

এই সময় সীমা বিভাগও আবশ্যক-মত পরিবর্তিত হয়—

বর্তমান হুগলী জেলার সীমা—হুগলীর উত্তরে বর্ধমান জেলা, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে হাওড়া, পশ্চিমে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং বর্ধমানের কিয়দংশ।

অবস্থান—হুগলী জেলা উত্তর নিরক্ষ ২২'৩৬ ও ২৩'১৪ কলার মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমা ৮৭'৩০ ও ৮৮'৩০ কলার মধ্যে ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত।

আয়তন—এই জেলার পরিমাণ ফল ১২৩২ বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা—২,২৩১,৪১৮ (১৯৬১)।

মহকুমা—সদর (৪৪৬ বর্গমাইল), আরামবাগ (৪১৩ ব: মা:), চন্দননগর (৩৮৮ ব: মা:), শ্রীরামপুর (১৬০ ব: মা:)।

নদ-নদী

হুগলী নদী (ভাগীরথী)—এই জেলার পূর্বপ্রান্তে প্রবাহিত।

দামোদর নদ—শ্রীরামপুর মহকুমাকে আরামবাগ হতে পৃথক করেছে। সাপুর ও হরিপুর এই দুই গ্রামের নিকট হুগলী জেলায় প্রবেশ করে প্রায় ২৮ মাইল এই জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত।

রূপনারায়ণ—গোঘাট ও আরামবাগের মধ্যে দিয়ে দ্বারকেশ্বর গিয়ে রূপনারায়ণ ধারণ করে এই জেলার দক্ষিণ সীমা নির্ধারণ করেছে।

দ্বারকেশ্বর—মঙ্গলঘাট ও মহিয়াড়ির কাছে এই জেলায় প্রবেশ করে ১৪ মাইল প্রবাহিত হবার পর বালি দেওয়ানগঞ্জের প্রায় ১ মাইল দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম শাখা—ঝুমঝুমি-মেদিনীপুর শিলাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ও পূর্ব শাখা শাকরা বন্দরে শিলাই নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রূপনারায়ণ নাম নিয়েছে।

এ ছাড়া বেহুলা, কানানদী, কুন্তী নদী (মগরা খাল), বৈদ্যবাটি খাল, শ্রীরামপুর খাল, বালি খাল প্রভৃতি নদী ও খালগুলি পশ্চিম দিক হতে ভাগীরথীতে মিশেছে। সরস্বতী, কৌষিকী, কানা দামোদর, কানা দারকেশ্বর, মাদারিয়া খাল প্রভৃতি এই জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। (হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস: বিধুভূষণ ভট্টাচার্য দ্রষ্টব্য)।

হুগলী জেলার কথা বলতে গেলে তার কতকগুলি প্রাচীন গ্রামের কথা বলা আবশ্যক। কয়েকটি প্রাচীন গ্রামের কথা উল্লেখিত হল।

সপ্তগ্রাম

এই জেলার মধ্যে সপ্তগ্রাম প্রাচীন নগর। বর্তমানে ইহা হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশ বিঘা রেল স্টেশনের নিকটবর্তী সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এর সমৃদ্ধি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সপ্তগ্রাম প্রাচীনকাল থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর রূপে পরিচিত ছিল। ভাগীরথীর প্রধান জলস্রোত সরস্বতীর নদীর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গমন করত। প্রাচীনকাল থেকেই সরস্বতীর পথেই সমুদ্রযাত্রা করা হত। সিংহপুরের (বর্তমান সিঙ্গুরের) সিংহবংশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ এই বন্দর দিয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হন। এই স্থানের বহু ঐতিহ্য ছিল। সপ্তগ্রামের হিন্দু রাজাকে পরাভূত করে মুসলমান জাফর খাঁ ১২৯৫ খৃস্টাব্দে সপ্তগ্রাম বিজয় করেন। সপ্তগ্রামে বহু হিন্দু মন্দির ছিল। মুসলমানরা বহু দেবমন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি করে। বাদশাহ মহম্মদ বিন্ তোঘলকের সময়ে বাঙলা দেশ গৌড়, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। বাদশাহ অত্যাচারী হলে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ফকরউদ্দীন স্বাধীনতা অর্জন করেন।

যে সময়ে ফকরউদ্দীন সপ্তগ্রামে রাজত্ব করছিলেন সেই সময় মিশর দেশীয় পর্যটক ইবন-বতুতা ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দে সপ্তগ্রামে আসেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাঙলা দেশের বহু খবর পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা ইলিয়াস শাহ ১৩৫০।৫১ খ্রীস্টাব্দে ফকর-উদ্দীনকে সহসা আক্রমণ করে তাঁকে নিহত করে সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম অধিকার করে নেন।

হোসেন শা'র আমলে হিরণ্যদাস মজুমদার নবাবের কাছ থেকে সপ্তগ্রাম ইজারা নেন। সপ্তগ্রামের রাজস্ব আদায় হত ২৫ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা নবাবকে দিতে হত।

১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধ নগর ছিল। তার সঙ্গে সিঙ্গুর, শিয়াখালা, জনাই, চণ্ডীতলা, বেগমপুর প্রভৃতি স্থানগুলিও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল।

কালক্রমে সরস্বতী মজে যাওয়ায় ও হুগলী নগর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের পতন হয়। বর্তমানে সপ্তগ্রাম এক ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়েছে।

যে সাতটি গাঁ নিয়ে সপ্তগ্রাম—সেই সাতটি গ্রাম হচ্ছে—সরস্বতী তীরে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বচোরা ও বলদঘাটি (এসিয়াটিক রিসার্চ, ৫ম খণ্ড)।

বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী

সপ্তগ্রামনগরী যে ৭টি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল—বাঁশবেড়িয়া তার মধ্যে একটি।

১৭শ শতাব্দীতে বাঁশবেড়িয়া সমৃদ্ধশালী ছিল। এই বংশবাটীর উন্নতির মূলে ছিলেন রাজা রামেশ্বর রায়। এঁর প্রপিতামহ জয়ানন্দ রায়চৌধুরী মানসিংহের সাহায্যে গঙ্গার পশ্চিম তটে বহু স্থান লাভ করেন। সে সময় মুর্শিদাবাদ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নদীর পশ্চিম তটের ভূভাগ তাঁদের অধিকারে ছিল। ১৬৭৩ খ্রীঃ রামেশ্বর রায় আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে বংশা-নুক্রমিক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বাঁশবেড়িয়ায় বসবাসের জন্য ৪০১ বিঘা নিষ্কর জায়গীর লাভ করেন। তিনি এখানে গড় নির্মাণ করেন এবং এই স্থানের নানা উন্নতি সাধন করেন।

যখন বর্গীরা সপ্তগ্রাম পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে তখন এই স্থানের চার-পাশের বহু অধিবাসী এই গড়ের মধ্যে আশ্রয় লয়। তৎকালীন রাজা রঘুদেব বর্গীদের আক্রমণ করে পরাজিত করেন।

এই বংশীয়েরা বহু দেবমন্দির ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

আরামবাগ

আরামবাগ হুগলী জেলার একটি মহকুমা। এই মহকুমার সদর স্টেশন বা প্রধান শহরের নামও আরামবাগ। আরামবাগ, পুরশুড়া, গোঘাট ও খানাকুল এই চারটি থানা নিয়ে এই মহকুমা। পূর্বে আরামবাগের নাম ছিল জহানাবাদ। এর পরিমাণ ফল ৪১৩ বর্গ-মাইল।

আরামবাগ মহকুমার প্রাচীন স্থান-গুলির মধ্যে গোঘাটের অন্তর্গত গড়-মান্দারণ বিশেষ খ্যাত। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে গড়মান্দারণ দুর্গটি এই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল। হিন্দু-মুসলমানের কয়েকটি ভীষণ সংঘর্ষের সঙ্গে এর নাম সংযুক্ত রয়েছে। হজরত ইসমাইল গাজীর দেহ এই স্থানে সমাহিত হয়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই গড়মান্দারণকেই অবলম্বন করে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনা করেন। এই আরামবাগ মহকুমায় আরও কয়েকটি ছোটখাট গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে।

পুরশুড়া থানার অন্তর্গত শ্যামালোক বা শোড়ালুক গ্রামে একসময়ে কোন রাজা রাজত্ব করতেন, লোকে এখন তাঁকে শুধুই রাজা বলে থাকে। তাঁর মেয়ে মল্লিকার নামে 'মল্লিকা' বা কনকে পুকুর আছে। এই পুকুরের উত্তরদিকে রাজবাড়ী ছিল।

পুরশুড়া হতে প্রায় তিন-চার মাইল উত্তরে দামোদর তীরে রাজুলপুর। এর পূর্বনাম ভগীরথপুর। ছ-সাতশ বছর আগে এখানে জয়হরি চক্রবর্তী বলে এক রাজা ছিলেন। সাধারণে তাঁকে 'বামুন রাজা' বলত। এই রাজার গড়বাড়ী, অন্দরে লীলা (কন্যার নামে) পুকুর, কুলদেবতা বিশালাক্ষ্মী আজও স্মৃতি বহন করে আছে। 'হুগলী ও দক্ষিণ রাঢ়' গ্রন্থ প্রণেতা অম্বিকাচরণ গুপ্ত বলেন—শা সমুসুর নামে এক ফকির রাজ্য-লালসায় গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করে জয়হরিকে পরাজিত ও নিহত করেন। স্ত্রী-কন্যা ঐ পুকুরে আত্মহত্যা করেন।

আরামবাগ শহরের দু মাইল উত্তরে বায়ড়ার রাজা রণজিৎ রায়ের নাম আজও লোকমুখে শোনা যায়। তিনি প্রজাবৎসল ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কিংবদন্তী—একসময়ে বিশালাক্ষ্মী দেবী তাঁর কন্যার বেশ ধরে তাঁর গৃহে থাকতেন (ক্রকোর্ডল হিস্ট্রি অব হুগলী)। রাজা রণজিৎ রায় গড়ের মধ্যে বহু দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ-সজ্জনকে ভূমিদান, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করেন। এঁদের বংশ এখন ডিহি বায়ড়ার গড়ে, দিগড়া, মাধবপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। সুসাহিত্যিক রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই বংশের দিগড়া শাখার সুসন্তান।

এই মহকুমায় খানাকুল-কৃষ্ণনগর ও রাধানগর বাঙলার প্রাচীনতম পল্লীগুলির মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যা-নিধির মতে খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রায় আট-ন'শ বছর আগে থেকে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। তিনি আরও বলেন—'খানাকুল - কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের ছোট ভাই'। দুই প্রথিতযশা বংশ রাজা রামমোহন রায়ের ও সর্বাধিকারী বংশ আজও এই স্থানের ঐতিহ্য বহন করে আছে।

পাণ্ডুয়া—পূর্বনাম প্রদ্যুম্ননগর (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব-রঘুনন্দন)। ১৪শ শতাব্দীর রাজারাম শাহসফি হিন্দু

রাজার হাত থেকে পাণ্ডুয়ার অধিকার কেড়ে নেন।

ত্রিবেণী—সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মুক্তবেণী তীর্থ। শোনা যায় এখানের বিখ্যাত ঘাটটি উড়িষ্যার গণপতিবংশীয় শেষ রাজা মুকুন্দদেব নির্মাণ করেন। এর অন্য নাম দক্ষিণ প্রয়াগ।

জনাই—জনাইয়ের আদি বাসিন্দারা ময়রারা, মুন্সীরা ও সিমলীরা। এদের ভেতর ময়রাদের একজনের নাম ছিল জনার্দন। এই জনার্দনের নাম থেকেই 'জনাই' গ্রামের নাম। এদের ভেতর একজনের নাম মনোহর। মনোহর এক নতুন মিষ্টান্ন তৈরি করে। এই মিষ্টান্নে লোকে খুব মজে যায় তাই তার নাম হল 'মনোহরা'। বৌবাজারের ভীমনাগ এই বংশীয়। ময়রাদের পর মুন্সী ও সিমলীরা। এঁদের পর ভট্টাচার্যরা। ভদ্রেশ্বর মুখুজ্যে বলে এক ব্যক্তি কৃষ্ণনগর থেকে জনাইয়ের এক ভট্টাচার্যের কন্যাকে বিয়ে করেন। রামেশ্বর মুখুজ্যে বলে আর একজন এই ভট্টাচার্য বংশে বিয়ে করেন। উভয়েই জনাই অধিবাসী হন। এঁরাই উত্তরকালে জনাইয়ের মুখুজ্যে বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

হরিপাল...

শ্রীরামপুর মহকুমার হরিপাল প্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

প্রাচীনকালে হরিপাল নামে এক রাজা স্বীয় নামে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। হরিপাল রাজার কানেড়া নামে এক রূপবতী কন্যাকে তদানীন্তন গৌড়েশ্বর রাজা ধর্মপাল বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কানেড়া তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাউসেনকে বিয়ে করেন। (ঘনরামের ধর্মমঙ্গল) হরিপালের বিভিন্ন নাম ছিল—সিমুল, সিমল, সিমুলা ইত্যাদি। বর্তমান হরিপাল এক সামান্য গ্রামে পরিণত হয়ে আছে।

সিঙ্গুর

'সিংহপুর' নামের চলতি কথায় সিঙ্গুর হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সিঙ্গুর গ্রামের এমন সব নিদর্শন আছে যা দেখে বোঝা যায় প্রাচীন সরস্বতী নদী এর গায়ে বয়ে যেত, আর প্রাচীনকালে এর সুখ-সমৃদ্ধি ছিল। কাহিনী এই প্রাচীন সিংহপুরের রাজা সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়-সিংহ পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে লঙ্কাদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তখন লঙ্কাদ্বীপের নাম হয় সিংহল। এ কাহিনীর আভাস পাওয়া যায় সিংহলের প্রাচীন পুরাণ কথা 'মহাবংশে'। মধ্যযুগে এই স্থান সুহ্ম রাজ্যের রাজধানী ছিল

হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায় রঘুনাথ নবরত্ন মন্দির

এবং পরবর্তীকালে সিংহপুর রাজ্যের প্রথম রাজধানী হয় ভূরিশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বর্তমান ভূরশুট।

চন্দননগর

ভাগীরথী তীরে চন্দ্রকলার আকারে অবস্থিত বলে চন্দননগর এই নাম। কিন্তু ইংরেজী ও ফরাসী গ্রন্থে—এই স্থান চন্দনকাঠের দেশ বলে পরিচিত—ল্যাণ্ড অব স্যাণ্ডাল উড' (Ville du bois de Santul (প্রবাসী, ১৩৩১ চৈত্র, হরিহর শেঠ)। ১৬৭৬ সালে দিনেমারগণ চন্দননগরের কাছে গোন্দলপাড়ায় এক বাণিজ্য কুঠি তৈরি করে (সেই নগর এর নাম ছিল—দিনেমারডাঙ্গা)। তারপর আলিবর্দি খাঁর সময়ে শ্রীরামপুর ও আকনা গ্রামে ৬৩ বিঘা জমি পায় এবং সেইখানেই কুঠি নির্মাণ করে ব্যবসা করে। দিনেমারগণ শ্রীরামপুরকে 'ফেডারিকস্ নগর' বলত।

১৭শ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত কোন গ্রন্থে বা পুঁথিতে চন্দননগরের নাম নেই। বোড়, খালিসানি, গোন্দলপাড়া এই নামগুলি পাওয়া যায়। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এই তিনটি স্থান সহ আরও কিছু অঞ্চল নিয়ে প্রথমে ফরাসীদের এলাকা স্থাপিত হয় এবং পরে সমষ্টিগতভাবে চন্দননগর নামের জন্ম হয়। ফরাসী অধিকারে আসার পর চন্দননগরকে ফরাসডাঙ্গা অভিহিত করা হয়। ডুপ্লের শাসনকালে এই শহরটি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

ভূরিশ্রেষ্ঠ

আধুনিক হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ নিয়ে প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য। এই ভূরিশ্রেষ্ঠই পরে ভূরশুট নামে পরিচিত। পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে এই অঞ্চল রায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ বংশের শাসনে ছিল। বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত দামোদর তীরে 'গড়ভবানীপুর'-এর রাজধানী ছিল।

একসময় পাঠান সর্দার ওসমান ধনধান্যে পূর্ণ এই ভূরিশ্রেষ্ঠ নগর করতলগত করবার চেষ্টা করেন। সেই সময় রাজা রুদ্রনারায়ণের বিধবা পত্নী রাণী ভবশঙ্করী রাজ্য শাসন করছিলেন। পাঠানগণ বহুবার এই পরাক্রমশালিনী রাণীর কাছে বিফল হয়েছিল। তাই এবার গোপনে রাণীর সেনাপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে হস্তগত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বাঙলা পত্র-পত্রিকার দেড়শো বছর পূর্তি

(১৮১৮-১৯৬৮)

সুশীল মণ্ডল

বাংলা ভাষার সাময়িকপত্রের দেড়শো বছর পূর্ণ হ'ল। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ১৮১৮ খৃস্টাব্দে 'যুব লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' পরিপূর্ণ 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল। যোশুয়া মার্শম্যানের সুযোগ্য পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন 'দিগ্‌দর্শনের' সম্পাদক।

বাংলা ভাষায় লেখা আছে সাময়িক পত্র বলতে মাসিক 'দিগ্‌দর্শন'কেই বোঝায়। এ-সম্বন্ধে যদিও মতান্তর আছে তবুও প্রমাণসাপেক্ষে বলা যায় 'দিগ্‌দর্শন'ই আদি এবং অকৃত্রিম বাংলা মাসিক সাময়িকপত্র। অনেকে বলেন, 'বেঙ্গল গেজেট'ই বাংলা ভাষার আদি পত্রিকা পরিচালক 'গঙ্গাধর ভট্টাচার্য', প্রকাশ-কাল '১৮১৬' খৃস্টাব্দ।

কিন্তু এ সমস্ত মন্তব্যই অনুমান সাপেক্ষ, কারণ বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তিই এই 'অনুমানসাপেক্ষ' সন্দেহ প্রকাশের হেতু।

বিভিন্ন জনের বিভিন্ন আলোচনায় দেখা যায় পত্রিকাটির নাম---(১) 'বেঙ্গল গেজেট', (২) 'বাঙ্গাল গেজেট', (৩) 'বাঙ্গাল গেজেটি'।

অতঃপর এগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক---তা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করে না। তবে এই পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা-কালে তৎকালীন ইংরেজী পত্র পত্রিকায় এটির নাম 'বেঙ্গল গেজেটটি' (Bengal Gazette) দেখা যায়। কিন্তু অমর গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থে পত্রিকাটি 'বেঙ্গল গেজেটি' বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত পরিচালকের নাম 'গঙ্গাধর ভট্টাচার্য' না 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য'? এখানেও বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। 'বেঙ্গল গেজেটে'র পরিচালকের নাম যে আদৌ 'গঙ্গাধর ভট্টাচার্য' নয় তারও বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'গঙ্গাধর ভট্টাচার্যে'র প্রকৃত নাম 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য'।

তৃতীয়ত 'বেঙ্গল গেজেট' '১৮১৬' খৃষ্টাব্দে মোটেই প্রকাশিত হয় নি। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে যদি 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়ে থাকতো

'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান

তাহলে তৎকালীন অন্যান্য সাময়িক পত্রে নিশ্চিতভাবেই তার উল্লেখ পাওয়া যেতো। কিন্তু তা পাওয়া যায় না।

১৮১৮ খৃস্টাব্দে ১৪ই মে তারিখে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'গভর্নমেণ্ট গেজেটে' এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় 'বেঙ্গল গেজেট' শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই ঐ ইংরেজী সাপ্তাহিকের আরও একটি বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায় 'বেঙ্গল গেজেট' এর প্রকাশ আরম্ভ হয়ে গেছে। অতঃপর সঠিক তারিখ পাওয়া না গেলেও 'বেঙ্গল গেজেট' যে ১৮১৮ খৃস্টাব্দের ১৪ই মে থেকে ৯ই জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল একথা ঠিক।

এদিকে দেখা যায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের দিন। তবে কি 'সমাচার দর্পণের আগেই 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়েছিল? এ-সম্বন্ধে 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' বলেন, 'বেঙ্গল গেজেট' পনেরো দিনের মধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু 'সমাচার দর্পণে'র মত, 'দুই সপ্তাহ পরে, কদাচ পূর্বে নহে।

যাই হোক, আলোচনায় দেখা গেল, 'সমাচার দর্পণ' ও 'বেঙ্গল গেজেট' কোনটি আগে কোনটি পরে তা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তবুও বলা যেতে পারে, ১৮১৮ খৃস্টাব্দে ১৪ই মে'র আগে 'বেঙ্গল গেজেট' কোনমতেই প্রকাশিত হয়নি, কারণ 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকার কোন সংখ্যাই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ 'সমাচার দর্পণের' প্রথম সংখ্যায় পাওয়া যায়---সমাচার দর্পণ 'শনিবার ২৩শে মে সন ১৮১৮। ১০ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫-তে প্রকাশিত। অতএব বলা যেতে পারে আদি এবং অকৃত্রিম বাংলা ভাষার প্রথম মাসিক সাময়িক-পত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত ১৮১৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশে' পরিপূর্ণ মাসিক 'দিগ্‌দর্শন'।

শ্রীরামপুরে তখন খৃস্টান মিশনারীরা বসবাস করছেন। সে সময় দেশে পদ্য রচনার একাধিপত্য। পাদ্রীরা ভাবলেন, এভাবে সাহিত্য কখনো জনপ্রিয় হ'তে পারে না। মানুষ

যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে সেই ভাষাই সাহিত্যে বা জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তাই সেকালের খৃস্টান পাদ্রী আর বিদগ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা সুরু করলেন গদ্য-ভাষায় বই লিখতে আর পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে। যদিও খৃস্টান পাদ্রীদের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের জনসাধারণকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা। তাই শ্রীরাম-পুরের মিশনারীরা ধর্ম-প্রচারের সুবিধা হবে ভেবে বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্য মনোযোগ দিলেন। বাঙলা ভাষায় ব্যাকরণ, ডিক্‌সেনারী, সংবাদপত্র ইত্যাদি সবই দেখা দিল তাঁদের হাত দিয়ে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, রূপকথা, ধর্মকথা প্রভৃতি প্রচুর বাঙলা বই লেখবার জন্য তাঁরা বাঙ্গালী পণ্ডিত নিযুক্ত করলেন।

তাই ১৮০০ খৃস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ছাপাখানার জন্ম তাঁদেরই হাতে। ছাপাখানা খুলেই বিভিন্ন জনের গ্রন্থ ছাপা হতে সুরু করলো। রামায়ণ, মহাভারত আর খৃস্ট ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' অনুবাদ হ'য়ে প্রকাশিত হল।

এইভাবে একের পর এক গদ্য-পদ্যের বই ছেপে বেরোতে লাগলো আর ওঁরাও কায়দা করে খৃস্টধর্মের প্রচার করতে লাগলেন। একে ভারতবর্ষ পরাধীন তার ওপর ভারতীয়রা গরীব --- ক্ষমতাশালীরা ভারতবাসীদের এই দারিদ্র্যের সুযোগ নিতে পিছ্‌পা হলেন না। কিছু কিছু লোক তাই হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী আর খৃস্টধর্মের প্রচারে মোহগ্রস্ত হয়ে ওঁদের ধর্ম গ্রহণ করলো। খৃস্টান মিশনারী-দেরও উদ্দেশ্য সফল হ'ল।

তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে, বাঙলা গদ্যের উন্নতির জন্য পাদ্রীদের যে যথেষ্ট দান ছিল তা সর্বজনগ্রাহ্য।

'দিগ্‌দর্শন' এদেশের সাধারণ লোকের মধ্যে নানা বিষয়ে ও জ্ঞান বিতরণের জন্যই প্রকাশিত হত। অবশ্য সেই সঙ্গে সহযোগী সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ'ও ছিল। 'সমাচার দর্পণে' সংবাদ পরিবেশনটাই ছিল প্রধান কিন্তু দিগ্‌দর্শনে থাকতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা---জানা অজানার কথা।

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত চাল্লিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যে কর্ম্ম হইয়াছে সেই কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমাংশ করিয়া চতুর্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ্ ও উপদিগ

বাঙলা ভাষার প্রথম পত্রিকা দিগ্দর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা

'দিগ্‌দর্শনে' সাধারণত আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে--- 'আমেরিকার দর্শন বিষয়', 'বলুন দ্বারা সাদরল সাহেবের আকাশ গমন', 'হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ', 'হিন্দুস্থানের বাণিজ্য' 'উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা।' 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের কথা' ইত্যাদি।

'সে যুগে কোম্পানীর গভর্নমেন্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনা-ভঙ্গী উগ্র এবং ভাষা ইতর ও অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণে ১৭৯৯ সনের যে মাসে লর্ড ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচন বিধান করেন।'

'দিগ্‌দর্শন' সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান এ-সম্বন্ধে লেখেন সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত, কেন না, যে সকল অংশে 'সেন্সর' তাঁহার সাংঘাতিক কলম চালাইতেন। শেষ মুহূর্তে শূন্য অংশ-গুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।'

এইভাবে প্রায় ১৭ বছর বলবার পর ১৮১৮ সালের ১৯শে আগস্ট বড়লাট লর্ড হেস্টিংস সংবাদপত্রের সম্পাদকদের এই 'বন্ধন-দশা' মোচন করলেন।

কিন্তু লর্ড হেস্টিংসের এই নতুন ব্যবস্থা প্রচলিত হবার অনেক আগেই অর্থাৎ এপ্রিল (১৮১৮) মাসে জন ক্লার্ক

মার্শম্যান 'দিগদর্শন' প্রকাশ করেন। দিগদর্শন প্রকাশের পরে যখন দেখলেন 'কোম্পানীর গবর্মেণ্ট' দিগ্দর্শনের কোন লেখাই 'সেন্সর' করেন নি তখন বুকে ভরসা নিয়ে ২৩শে মে ১৮১৮ সালে তাঁরই (জন ক্লার্ক মার্শম্যান) সম্পাদনায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করলেন।

ইতিমধ্যে (১৪ই মে ১৮১৮---৯ই জুলাই ১৮১৮ মধ্যে) কলকাতা থেকেও বাঙ্গালী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গাল গেজেট' নামে আরও একটি সংবাদ সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন।

সাধারণত গ্রন্থেরই বিভিন্ন সংস্করণ দেখা যায়। কিন্তু 'দিগদর্শন' সে সময় তিন ভাবে প্রকাশিত হত।

বাঙলা সংস্করণ ১---২৬ সংখ্যা
ইংরাজী-বাঙলা সংস্করণ ১---১৬ সংখ্যা
ইংরাজী সংস্করণ ১---১৬ সংখ্যা।

দিগদর্শন এপ্রিল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল।

আমরা 'দিগদর্শন' এবং 'সমাচার দর্পণ' থেকে কিছু রচনার নিদর্শন নীচে উদ্ধৃতি দিলাম :

দিগদর্শন---(১ম ভাগ---এপ্রিল ১৮১৮ খৃ:)---

"যে যে দেশে হিন্দু লোক বসতি করে কেবল সেই দেশ হিন্দুস্থান। তাহার দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, এবং হিন্দুস্থানকে দুই ভাগ করা যায়, দক্ষিণ হিন্দুস্থান ও উত্তর হিন্দুস্থান। দক্ষিণ হিন্দুস্থানের উত্তর-সীমা যদি নর্মদা নদী কল্পনা করা যায়, তবে দক্ষিণ হিন্দুস্থানের পূর্ব ও পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্র, এবং দক্ষিণের অন্তসীমা কুমারী অন্তরীপ, তাহার নিকট লঙ্কাদ্বীপ তাহার যথার্থ নাম সিংহল দ্বীপ, কিন্তু তাহার রাজধানী স্থানের নাম লঙ্কা ছিল, তাহাতেই সকল রাজ্যের নাম লঙ্কা। সেখানকার লোকেরা অদ্যাদি সিংহলীশ নামে খ্যাত।"---

'সমাচার দর্পণ'---(২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৮১৯ খৃ:)

'হিসাব করিয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, উড়ে বেহারারা প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায় ও তাহার কিঞ্চিৎও ফিরিয়া আনে না।'

মৃৎশিল্পী

কুমারী সুমিত্রা বসু

জীর্ণ আমার পর্ণ কুটীরে
পুরাতন মোর চাকে
গড়িছি বসিয়া মাটির বাসন
ফেলিয়া নানান ছাঁদে
কয়দিন বাদে আছে হাটবার
যদি কিছু হয় গড়া

বেচিয়া হয়তো পাইয়া কিছু
চড়িবে উনানে কড়া
পড়িয়া রহেছে ছিন্ন কাঁথায়
রোগে পাণ্ডুর মেয়ে---
চলিয়াছে মোর এই কয়দিন
দোকানেতে ধার চেয়ে

ধার লইয়াও শুধতে পারি না
দিতে নাহি চাহে ধার
টাকার অভাবে সংসার মোর
চলিবে কি করে আর
বউয়ের পরণে একখানি বিনা
বস্ত্র নাহিক রয়

অর্থ পাইলে হাট হতে কিছু
কাপড় কিনিলে হয়
ছোট ছেলেটার পাঠশালে বহু
মাহিনা পড়েছে বাকি
শুনিয়াছি টাকা না পাইলে গুরু
ঢুকিতে দিবে না নাকি।

একার আ... চলে সংসার
ছেলে-মেয়ে দুটি ছোট
টাকার অভাবে মোর ঘরে খালি
চলিতেছে অবিরত
ক্লান্তিতে দেহ নুইয়া পড়িছে
চোখেতে আসিছে ঘুম
কর্মকাতর দেহখানি মোর

না মানে কাজের ধুম
দুপুরের রবি নামিছে আকাশে
বাড়িতেছে বেলা বহু
হাটেতে বাসন বেচিবার তরে
গড়িতে হইবে তবু।

পুনর্জন্ম ও তিব্বতীয় বিশ্বাস

জ্যোতির্ময় দাশ

সম্প্রতি ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার ধর্মশালা শহরে মহানুভব দালাই লামার সঙ্গে তাঁর বর্তমান বাসগৃহ স্বর্গ-আশ্রমে এক বিশেষ সাক্ষাৎকার করেন। জন্মান্তরের মত ও পথই এই সাক্ষাৎকারের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দালাই লামা সর্বপ্রথম তাঁর ব্যক্তিগত লামা-জীবনের জন্মান্তরের কাহিনী বর্ণনা করেন। এ নিবন্ধ ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দালাই লামার আড়াই ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারের উপর রচিত।

পরামনোবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

মানব মনকে যে তিনটি সাধারণ বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—স্বাভাবিক অবস্থা অ-স্বাভাবিক অবস্থা ও পরা-স্বাভিক অবস্থা তার মধ্যে শেষের অবস্থাটিকে নিয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট আলোচনা বা গবেষণা হয় নি। পরামনোবিদ্যায় বিশেষভাবে এই শেষ ধারাটিকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করা হয়েছে। মানব মনের সেইসব অশারীরিক বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধিতে যেগুলি ব্যাখ্যাহীন যেমন পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ, ভবিষ্যদ্বাণী বা দর্শন, তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ দর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির সম্প্রতি বিশ্বে বিভিন্ন দেশে কিছু বিজ্ঞানী তথ্যনির্ভর আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করছেন।

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ প্রেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত চৌদ্দ বছর পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরের বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা করছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে দশটি বিচিত্র কেস হিস্টি ও একটি উপসংহারমূলক প্রবন্ধ সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

আত্মা অবিনশ্বর ও এক অখণ্ড বস্তু এবং মৃত্যুতে জীবাত্মা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহান্তরে আশ্রয় নেয় এমন কথা আমাদের বিভিন্ন ধর্মে উল্লেখ থাকলেও আধুনিক বিজ্ঞান তা স্বীকার করে না। ধর্মের (হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন বিশেষভাবে) এই বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা আছে কি না পরামনোবিজ্ঞানীরা সে বিষয়েই গবেষণা করছেন।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান মোটামুটিভাবে সকল সিদ্ধান্তই প্রমাণসাপেক্ষ হলে তবে গ্রহণ করে এবং যা কিছু প্রামাণিক নয় তা ধ্রুব সত্য হলেও সহজে মেনে নিতে চায় না। পরামনোবিজ্ঞান কিন্তু সামাজিক সবকিছু বিশ্বাস অবিশ্বাস, সংস্কার ও কুসংস্কারকে সাধারণভাবে স্বীকৃতি দিয়ে যে সব ধারণার সততা সম্পর্কে গবেষণা করে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়নের চেষ্টা করে। এই আপাতবিপরীতধর্মিতা ভিন্ন পরামনোবিদ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক ও জড়বাদী বিজ্ঞানের মূল কোন চরিত্রগত বিরোধ নেই।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তিব্বতীয়দের পুনর্জন্মের বিশ্বাসও তাদের ধর্মপ্রধান বা নেতা দালাই লামাদের নির্বাচনের ও সে দেশে আত্মার জন্মান্তরে যে বিচিত্র বিভিন্ন সংস্কার প্রচলিত আছে তার ব্যাখ্যা সম্প্রতি অনুসন্ধান করছেন। অদ্যাবধি বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্য প্রমাণাদি থেকে দেখা গেছে অতিমনের অধিকারী বা মস্তিকাতীত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন অনুভাবীরা স্বল্পমার্জিত অতি সাধারণ জীবনযাত্রার বা প্রাচীন জনসমাজে অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে তিব্বতের ধর্ম ও সভ্যতার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে।

তিব্বতের ধর্ম ও লোকসমাজ

সাধারণ জনমানসে তিব্বত সম্বন্ধে এক বিশেষ কৌতূহল আছে। কেন না মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও এই নিষিদ্ধ দেশে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ও সেখানকার লোকদের জীবনধারণ ও আচরণ সম্পর্কে জানা প্রায় সাধ্যাতীত ছিল। অতীতে তিব্বত বিদেশীদের কাছে এক রহস্যময় পর্দার আড়ালে অন্তর্নিহিত ছিল। তিব্বতীরাও তাদের দেশ ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অন্য দেশের এই আগ্রহকে প্রশ্রয় দেয় নি। ১৯০৪ সালে ইয়ং উসল্যাণ্ড নামে জনৈক ইংরাজ সেনাপতি প্রথম হাঁটাপথে তিব্বতে পৌঁছান। ঘটনাটি প্রায় যুদ্ধের ইতিহাসের মতই রোমাঞ্চকর। কিন্তু তার এই অনুপ্রবেশের পরও তিব্বত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তিব্বত যথাপূর্ব রহস্যময়ই থেকে গেছে।

তিব্বতীয় সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা কিনা তিব্বতের জনসাধারণের ওপরে অতীতে এবং বর্তমানে সমান প্রভাব বিস্তার করে আছে তা হল এদেশের ধর্ম। ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্যই এদের চিন্তা ও কর্মধারাকে পরিচালনা করে থাকে।

সপ্তম শতাব্দীতে নেপাল, ভারতবর্ষ ও চীন দেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এদেশে এসে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করেন। আজকের তিব্বতের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মেরই এক বিশেষ উন্নত রূপান্তর। প্রায় ১৬৪২ সাল থেকে ধর্ম তিব্বতের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়

পরিচালনা করতে থাকে এবং সমস্ত সামাজিক ও রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় বিষয় ধর্মের অধীনস্থ বলে গণ্য করা হয়।

তিব্বতের ধর্মীয় অনুশাসন পরিচালনা করেন লামারা। লামাদের মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ হলেন দালাই লামা। বিদেশীদের কাছে দালাই লামা এক চরম রহস্যময় বিষয়ের প্রতিভূ।

বর্তমানে ভারতবর্ষে বসবাসরত দালাই লামার প্রকৃত নাম তেনজিন গ্যাটসো। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দালাই লামা পরম্পরায় ইনি চতুর্দশ দালাই লামা। ইনিই সর্বপ্রথম হাজার বছরের পুরোনো এই রহস্যের কুহেলিকার আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি মনে করেন দালাই লামা সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক যাচাই হওয়া প্রয়োজন। তাঁর ধারণা এই ধর্মীয় সংস্কারের অনেকগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

দালাই লামা নির্বাচনের পদ্ধতি

দালাইলামা নির্বাচনের চিরাচরিত প্রথাটি তিব্বতীয় ধর্মের এক বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য। এই প্রথার সুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে।

সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতের ধর্ম 'বন' ধর্মরূপে পরিচিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। শুরুতে এই নতুন ধর্ম কেবলমাত্র রাজ পরিবার ও কিছু উচ্চ-বর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন 'বন' ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ-ধর্মকে অবজ্ঞা করতেন। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক স্বনামধন্য পণ্ডিত অতিসা তিব্বতে আসেন। তিনি তিব্বতীয় জনসাধারণকে নতুন করে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রাণিত করেন। এরপর থেকেই এ দেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ সমৃদ্ধরূপে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। দেশে বহু অর্থ-ব্যয়ে উপাসনালয় তৈরি করা হয় এবং ক্রমশ ধর্মীয় নেতারা দেশে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন।

১৩৫৭ থেকে ১৪১৭ খৃঃ মধ্যে তিব্বতের প্রখ্যাত ধর্মনেতা ৎসং খাপা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গেলুগপা নামে এক নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। তিব্বতে সাধারণভাবে তারা 'হলদে টুপি' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য মোটামুটি-ভাবে দুটি ছিল। জাঁকজমক ও আড়ম্বরের চেয়ে আধ্যাত্মিক দিকটির বেশি প্রাধান্য রেখে ধর্মের প্রচলিত অনুশাসনগুলির সংস্কার করা। ক্রমশ তিব্বতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পৃথক সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করে এই ধর্মের অধীনে আনা।

ৎসং খাপার ভাইপো গেড়ুন ট্রুপ্পা (জন্ম ১৩৯১ সাল) পরবর্তী নেতা হন। তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের তিনি আরো বিস্তৃত প্রচার করেন। তাঁর সময়েই বহু তিব্বতীয় গেলুগপা সম্প্রদায়ে যোগদান করে। ১৪৭৫ খৃঃ মৃত্যু-পূর্বকালে তাঁকে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রধান ধর্মযাজকরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জনশ্রুতি আছে মৃত্যুর কয়েক বছর পরে গেড়ুন ট্রুপ্পা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন গেড়ুন গ্যাটসো রূপে (পরবর্তী ধর্মপ্রধান)। গেড়ুন গ্যাটসো আবার তাঁর মৃত্যুর পর সোনাম গ্যাটসো (রূপে জন্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন।

সোনাম গ্যাটসো অত্যন্ত বিদ্বান ও নিষ্ঠাবান ধর্মযাজক ছিলেন। ১৫৭৮ খৃঃ তিনি মঙ্গোলিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানকার রাজা আলতান খাঁ ও তাঁর অনুচরবর্গকে তিনি ধর্মান্তরিত করেন। রাজা আলতান খাঁ তাঁকে 'দালাই' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিব্বতী ভাষায় দালাই শব্দের অর্থ সমুদ্র। পরে এই দালাই উপাধি সোনাম গ্যাটসোর দুই মৃত পূর্বসূরীদের উপরও প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ গেড়ুন ট্রুপ্পা ও গেড়ুন গ্যাটসো 'দালাই লামা' উপাধিতে চিহ্নিত হন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দালাই লামা হিসেবে পরিচিত হন।

গোড়ার দিকে দালাই লামারা কেবল-মাত্র গেলুগপা সম্প্রদায়েরই ধর্মপ্রধান ছিলেন। ১৬৬২ খৃঃ তিব্বতের অধিপতি মঙ্গোলিও রাজা গুরসি খাঁ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লামাদের পদচ্যুত করেন এবং তৎকালীন দালাই লামাকে (ইনি পঞ্চম দালাই লামা) সমগ্র তিব্বতের প্রধান ধর্মযাজকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্চম দালাই লামার প্রকৃত নাম ছিল নাগাওয়াং লোবসাং গ্যাটসো।

১৬৫৫ খৃঃ রাজা গুসরি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা তিব্বতের শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নি। দালাই লামাই তখন তিব্বতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল বিষয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং সেই ব্যবস্থাই ত্রয়োদশ দালাই লামা পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

ত্রয়োদশ দালাই লামার প্রকৃত নাম থুবটেন গ্যাটসো। তিনি ১৮৭৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। থুবটেন গ্যাটসোর পরিচালনাধীনে তিব্বতীয়দের জীবন যাপন খুব সরল ও সুখের ছিল। তিনি তিব্বতের রাজনৈতিক পরিচিতির উন্নতি সাধনেও সফল হয়েছিলেন।

চতুর্দশ দালাই লামার অনুসন্ধান

১৯৩৩ খৃঃ ত্রয়োদশ দালাই লামার ৫৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর প্রায় সাথে সাথেই তাঁর পুনর্জন্মের খোঁজখবর সুরু হয়। তিব্বতীদের বিশ্বাস প্রত্যেক দালাই লামা মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই পরবর্তী দালাই লামা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম দালাই লামা গেড়ুন ট্রুপ্পা যখন ১৩৯১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁকে চেনরেসি অর্থাৎ তথাগত বুদ্ধের অবতাররূপে গণ্য করা হয়েছিল। তিব্বতের প্রচলিত বিশ্বাস হল চরাচরের সকল নিরপরাধ প্রাণের রক্ষার্থে তথাগত বুদ্ধ বারবার জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জীবিত দালাই লামা তাঁর পূর্বোবর্তী দালাই লামার জন্মান্তরিত

রূপ হিসেবে ধরা হয়। সে কারণে কোন একজন দালাই লামা একক ব্যক্তিসত্তা নন। তিনি অগ্রবর্তী সকল দালাই লামাদের সম্মিলিত রূপ।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে ভারতবাসী চতুর্দশ দালাই লামাকে তাঁর নিজের নির্বাচন ও অনুসন্ধানের বিষয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি জানালেন এ ব্যাপারে তাঁর স্মৃতি খুবই অস্পষ্ট কারণ তখন তিনি নিতান্তই শিশু ছিলেন। তবে দালাই লামা হিসেবে তাঁর অভিষেক ও আবিষ্কারের কাহিনী লোকপরম্পরায় বিশেষ করে দাজাজা কুনসঙ্গটাবার (তিব্বতের প্রধান সেনাপতি) কাছে যেভাবে শুনেছিলেন সেই কাহিনী বললেন। এই সেনাপতি তৎকালীন নির্বাচন ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

১৯৩৩ খৃঃ ত্রয়োদশ দালাই লামা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর পনর্জন্ম গ্রহণের কিছু তথ্য আগাম প্রকাশ করে যান। তাঁর নির্দেশমত মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ 'পোটালা' ভঙ্গিতে (অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বহুল প্রচারিত প্রচলিত আসন গ্রহণ পদ্ধতিতে) দক্ষিণমুখো করে বসিয়ে রাখা হয়। একদিন সকালে দেখা গেল মৃতদেহের মুখ পূর্বদিকে পরিবর্তিত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ রাজ-জ্যোতিষীকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হয় তিনিও যোগাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর হাতের চাদর পূর্বদিকে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তথাপি প্রায় দু বছর চতুর্দশ দালাই লামার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এই অনিশ্চয়তার জন্য তিব্বতের তৎকালীন রাজা চো-খোর গাই নামে সুখ্যাত হ্রদের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করলেন। তিব্বতে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কেউ এই হ্রদের জলে তাকালে তার আকাঙ্ক্ষিত অদূর ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। দীর্ঘ প্রার্থনার পর রাজা সেই হ্রদের জলে একটি সোনার চূড়াওলা তিনতলা মন্দির ও তার পাশেই ত্রিকোণাকৃতি দেওয়ালবিশিষ্ট একটি কুঁড়েঘর দেখতে পান। এই দিব্য অনুভবে রাজা অত্যন্ত পুলকিত হৃদয়ে লাসায় (তিব্বতের রাজধানী) ফিরে এলেন। এবার জোরদার অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়। অনুসন্ধান কাজে প্রায় সারা তিব্বতই আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। কারণ পরবর্তী দালাই লামা না পাওয়া পর্যন্ত তিব্বতীয়রা নিজেদের অনাথ অভিভাবকহীন বলে মনে করে।

সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি (অবশ্য তা সঠিক নয়) যে মৃত্যুর সাথে সাথেই আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ধারণা কিছু ভিন্ন প্রকারের। তাদের মতে তথাগতদের, তাঁর স্বর্গীয় আবাস ছেড়ে পুনরায় মানবরূপে জন্মগ্রহণে একাধিক বছর অতিক্রান্ত হতে পারে। সে কারণে চতুর্দশ দালাই লামার জন্য সরকারীভাবে ১৯৩৭ খৃঃ অনুসন্ধান কার্য সুরু হয়। পূর্বদিক সম্বন্ধে দৈব নির্দেশ থাকায় অনুসন্ধানকারীরা স্বর্গীয় শিশুটির খোঁজে পূর্বদিকে যাত্রা সুরু করেন। অনুসন্ধানকারীরা সকলেই লামা ছিলেন এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অনুসন্ধান কাজ চালাতে থাকেন। প্রত্যেক দলের মধ্যে একজন রাজকর্মচারী ছিলেন---সকল দলের সাথেই ত্রয়োদশ দালাই লামার ব্যবহৃত নানা প্রকারের বস্তু ছিল।

একটি দলের পরিচালনা করছিলেন কায়েৎ-সাং রিমপকে। তাঁরা চীনা অধিকৃত চিংহাই প্রদেশের অমদো জেলায় পৌঁছলেন। লামা প্রথার সংস্কারক পূর্বে বর্ণিত পণ্ডিত ৎসং খাপা এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে অনুসন্ধানকারীরা অনেকগুলি বালককে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল লাভ হল না। ক্রমশ তাঁরা ভয় পেলেন যে তাঁদের অনুসন্ধান কাজ বিফলে যাবে।

অবশেষে বহু ঘোরাঘুরির পর তাঁরা সোনার গম্বুজওলা তিনতলা এক বিহার দেখতে পেলেন। আর আশ্চর্য বিহারের পাশে ত্রিকোণাকৃতি দেওয়ালবিশিষ্ট একটি কুঁড়ে বাড়ীও রয়েছে। তাঁরা আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। সকলেই নিজেদের পোষাক পরিবর্তন করে চাকরের বেশ ধারণ করে কুটিরে প্রবেশ করলেন। বেশ পরিবর্তন এই ধরণের অনুসন্ধান কাজে খুবই প্রয়োজনীয়; কারণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেশে সাধারণ মানুষের সাথে আলাপ-পরিচয়ের অসুবিধা অনেক।

কুটিরে প্রবেশ করেই তাঁরা নিশ্চিতভাবে অনুভব করলেন যে এখানেই সেই পবিত্র শিশুকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বাইরের দিকে রান্নাঘরের নিকটে অপেক্ষা করা অল্পক্ষণের মধ্যে একটি দু বছরের শিশু দৌড়তে দৌড়তে এসে একজন লামার জামা ধরে টানতে থাকে। এই লামার গলায় ত্রয়োদশ দালাই লামার জপের মালাটি ছিল। শিশুটি দ্বিধাহীনকণ্ঠে 'সেরা লামা' 'সেরা লামা' বলে চীৎকার করে ওঠে। ভৃত্যের বেশে লামাদের চিনতে পারাই যথেষ্ট আশ্চর্যের ব্যাপার, তদুপরি লামাটি 'সেরা' ধর্ম সম্প্রদায়ের পুরোহিত ছিলেন, তাঁকে সনাক্তকরণ তো অলৌকিক। বালকটি লামার জপের মালাটি নেবার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে। সেটি তাকে দেওয়া হলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের গলায় পরে নেয়। এই শিশুই যে জন্মান্তরিত চতুর্দশ দালাই লামা, এরপরে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অনুসন্ধানকারীরা সকলেই নতমস্তকে শিশুটিকে অভিবাদন করলেন।

তখনকারমত তাঁরা সেই চাষী পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন কিন্তু পরের দিন আবার এলেন। এবারে তাঁরা কোনো ছদ্মবেশ ধারণ করেন নি। বালকটির পিতা-মাতার সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল, তাঁদের আর একটি ছেলে কোন এক ধর্ম সম্প্রদায়ে ইতিপূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। শিশুটি তখন ঘুমাচ্ছিল।

অনুসন্ধানকারী চারজন লামা শিশুটিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে পরীক্ষা করার জন্য উপাসনার ঘরে চলে এলেন। সেখানে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। প্রথমে শিশুটিকে চারটে জপের মালা দেখান হল। তার মধ্যে সব থেকে পুরোনো, জীর্ণ মালাটি ত্রয়োদশ দালাই লামার। বালকটি অবিচলিত ও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সেই মালাটি বেছে নিয়ে গলায় পরে আনন্দে সারা ঘরময় নেচে বেড়াতে থাকে। এর পরে বিভিন্ন ঘণ্টির মধ্যে থেকে বালকটি পূর্বের দালাই লামা চাকরদের ডাকার জন্য যেটি ব্যবহার করতেন সেটি বেছে নেয়। আবার তাকে কতকগুলি ছড়ি দেখানো হলে সে দালাই লামার অতি সাধারণ ও পুরাতন ছড়িটি হাতে নেয় ও সেই সাথে রাখা হাতির দাঁতের বা রূপার কাজ করা কারুকার্যবিশিষ্ট ছড়িগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। বালকটিকে পরীক্ষা করার সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন জন্মান্তরিত চেনরেজির (অর্থাৎ ভগবান তথাগত) সব বৈশিষ্ট্যগুলিই তার মধ্যে রয়েছে; সেই রকম লম্বা বড় বড় কান এবং দেহে এমন স্থানে আঁচিল রয়েছে যে, যে দুটিকে চতুর্ভুজ ভগবানের দ্বিতীয় দুটি হাতের স্মৃতি-চিহ্নের মত মনে হয়।

অনুসন্ধানকারী লামারা স্থির নিশ্চিত হলেন যে এতদিন তাঁরা যা খুঁজছিলেন তার সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। গোপন সাংকেতিক লিপিতে চীন ও ভারতের পথে রাজধানী লাসায় তারবার্তা পাঠালেন এবং তৎক্ষণাৎ লাসা থেকে উত্তর পেলেন সবরকমে চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করার। বিষয়টি জানাজানি হলে নানাবিধ অহেতুক কৌতূহলে এই অভিযানের সফলতা ব্যর্থ হতে পারে। চারজন লামা তথাগতের একটি আবক্ষ ছবির সামনে মতান্তরে সম্পূর্ণ নীরব থাকার জীবন-পণ শপথ গ্রহণ করলেন। স্থানীয় লোকেদের সন্দেহ দূর করার জন্য তাঁরা অনুসন্ধান কাজ থামালেন না। নির্বিচারে অন্য অনেকগুলি শিশুকে পরীক্ষা করলেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্মরণ রাখা দরকার এই অনুসন্ধান কার্য চীন অধিকৃত অঞ্চলে করা হচ্ছিল, সে কারণেই এত সতর্কতার প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তী দালাই লামাকে খুঁজে পাওয়া গেছে এ কথা প্রচারিত হলে চীন সরকার হয়তো দালাই লামাকে পথে পাহারা দেবার অজুহাতে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লাসায় পাঠাতো। লামারা বালকটিকে লাসায় নিয়ে যাবার জন্য প্রদেশ সরকার মা-পুফাঙ-এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁরা কেবল জানালেন লাসায় অন্য আরো অনেক বালকের মধ্যে দালাই লামা নির্বাচনের ব্যাপারে একেও পরীক্ষা করা হবে। মা-পুফাঙ বালকটির জন্য একলক্ষ চৈনিক টাকা দাবী করলেন। সে টাকা তৎক্ষণাৎ জমা করে দেওয়া হল। এককথায় এই টাকা জমা করাই লামাদের পক্ষে এক চরম ভুল প্রমাণিত হয়। তিব্বতীয়দের কাছে এই বালকের গুরুত্ব অনুমান করে প্রদেশ সরকার পুনরায় আলাদা তিন লক্ষ টাকা দাবী করলেন। এবার অবশ্য লামারা ভুল করেন নি। তাঁরা সামান্য কিছু টাকা কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে ধার নিয়ে সরকারকে জমা দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন লাসায় পৌঁছে বাকী টাকা পাঠাবেন। রাজ্যপাল এই ব্যবস্থায় রাজী হলেন।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে চারজন অনুসন্ধানকারী লামা তাঁদের চাকর, অর্থপ্রদানকারী ব্যবসায়ীরা এবং সেই পবিত্র বালক ও তার পরিবারবর্গের সকলে লাসা উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তার পরের ঘটনা সাক্ষাৎকারী চতুর্দশ দালাই লামা নিজ মুখে যেভাবে বলেছিলেন আমরা এখানে হুবহু তার উল্লেখ করলাম—

●

'তিব্বত সীমান্তে পৌঁছতে আমাদের কয়েক মাস লেগে গেল। একজন রাজমন্ত্রী অন্য সদস্যদের সঙ্গে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রাজার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি আমাদের দল-নেতাকে দেন। সেই চিঠিতে আমাকে দালাই লামা হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই প্রথম আমি দালাই লামা নামে প্রচারিত হলাম এবং অভিবাদন পেলাম। আমার পিতা-মাতারা যদিও ধারণা করতে পেরেছিলেন আমি জন্মান্তরিত কোন বড় সাধু-সন্ন্যাসী কিন্তু কেবলমাত্র তখনই জানতে পারলেন তাঁদের সন্তান বর্তমান তিব্বতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তা।---

'আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, আমাকে একটি মূল্যবান সোনার পালঙ্কে লাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমি কখনও এত লোকজন দেখি নি। আমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সমস্ত শহর সেদিন রাস্তায় ভেঙ্গে পড়েছিলো। আমার পূর্ববর্তী দালাই লামার দেহ-ত্যাগের পর প্রায় ছ' বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় সমস্ত দেশবাসী তাদের ধর্মনেতার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল।---

'১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী পুণ্য নববর্ষ উৎসবের সময়ে 'দালাই লামা' হিসেবে লাসায় আমার অভিষেক হয়। এই সময়ে আমাকে 'পবিত্রতম', 'করুণাময়', 'মহিমময়', 'সর্বজ্ঞ,' 'অখণ্ডজ্ঞানী', 'পরিত্রাতা' ও 'অসীম জলধি' ইত্যাদি নানা নতুন নামে ভূষিত করা হয়---

'অভিষেক অনুষ্ঠানের কার্যকাল বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে চলেছিল। আমি অবিচলিতভাবে সব করণীয় আচার-আচরণে অংশ নিয়েছিলাম। আমার সেই গাম্ভীর্য ও নিস্পৃহতায় উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী দালাই লামার খাস চাকরদের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই আমি এমন ব্যবহার করেছিলাম যেন তাঁদের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। এ সমস্ত ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর।'

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার মতন সাধক কর্মী চাই
পুরুষসিংহ চায় গোটা বাঙলাই

স্বাবলম্বী ও ভগবানে বিশ্বাসী,
শুচি করে দেশ যাহাদের নিশ্বাসই।
যারা তপস্বী, কেবল তপঃফলে।
সোনা করে দেয় মাটির ভূমণ্ডলে।

জাতির ভাগ্য যাহারা গঠন করে,
মিশাইয়া দেয় যাহা দেবে ও নরে,
একাই একটা বিশাল প্রতিষ্ঠান।
যাদের নিষ্ঠা বাড়ায় জাতির মান,

সাফল্য যারা জোর করে টেনে আনে,
ঊর্ধ্বে উঠার মন্ত্র যাহারা জানে।
তুমি তাহাদেরি তাহাদেরি একজন
দেশ-জাতি গুরু-দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

তিব্বতীয় ধর্মে পুনর্জন্মের প্রকৃতি

চতুর্দশ দালাই লামার নির্বাচনের সম্পূর্ণ কাহিনী শোনার পর এ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য ও বিশ্বাস সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করা হলে তিনি জানালেন যে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, তাঁর সেই শিশুকালে তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসার অনেক লোককে ও বহু জায়গা সনাক্ত করতে পারতেন। দালাই লামা হিসেবে যে বালককে নির্বাচন করা হয় তাঁকে এই জিনিষ-পত্তর ও লোক চেনার ব্যাপারে কঠোরতম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। তিনি জানালেন তাঁকেও এই সকল পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে এবং প্রতিক্ষেত্রে সফল হবার পর তবেই তাঁকে ত্রয়োদশ দালাই লামা থুবটেন গ্যাটসোর স্থানে মনোনীত করা হয়।

তিব্বতীয় পুনর্জন্মের নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দালাই লামা জানালেন, তিব্বতীয় ধর্মে দু' ধরণের পুনর্জন্মের কথার উল্লেখ আছে। সাধারণ ও নিয়ন্ত্রিত পুনর্জন্ম। প্রথম ক্ষেত্রে মৃত আত্মার পরবর্তী জন্মের মাধ্যম নির্বাচনের কোনই ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আত্মা নিজের পছন্দমত পরিবেশ ও মাধ্যমের মাঝে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। উন্নতশ্রেণীর আত্মাই জন্মান্তরের নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। বহু লামা (তিব্বতীয় ধর্ম-যাজক) এই নিয়ন্ত্রিত পুনর্জন্মের রীতিতে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করেছেন। চতুর্দশ দালাই লামা জানালেন, তিনি নিজে এমন অনেক ঘটনা দেখেছেন অথবা জানেন।

বর্তমান দালাই লামা কী বুদ্ধ-অবতার?

সাধারণভাবে তিব্বতীরা বিশ্বাস করেন যে, স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ জন-সাধারণের রক্ষার্থে ও পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বারংবার দালাই লামার রূপ ধারণ করে জন্ম নেন। চতুর্দশ দালাই লামা নিজের ক্ষেত্রে এই সনাতন বিশ্বাসের পরিপন্থী মতবাদ পোষণ করেন। তাঁর মতে তিনি বোধ হয় ত্রয়োদশ দালাই লামার জন্মান্তরিত প্রতিভূ নন এবং সে-কারণেই তাঁর ধারণা তিনি বুদ্ধ অবতার নন। তবে তিনি পূর্ববর্তী দালাই লামার প্রতিনিধিমূলক কোন উচ্চ স্তরের আত্মার মানবরূপ। এটা নিয়ন্ত্রিত জন্মান্তর পদ্ধতিতে সম্ভব হয়ে থাকবে। বর্তমান দালাই লামা বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের সূত্র ত্রয়োদশ দালাই লামার মৃত্যুর সাথেই ছিন্ন হয়ে গেছে সম্ভবত। নিয়ন্ত্রিত পুনর্জন্মের পদ্ধতি পূর্বোবর্তী দালাই লামারা মানবাত্মার শেষ জন্ম-গ্রহণের বা নির্বাণ লাভের (অখণ্ড পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া) প্রাথমিক পন্থা হিসাবে উদ্ভাবন করেছিলেন বলে আধুনিক দালাই লামা ব্যক্ত করলেন।

সংক্ষিপ্ত পরামনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে দালাই লামার এই ইতিহাস ও তিব্বতের ধর্মগত এবং জন্মান্তরের পদ্ধতির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষকরা সমস্ত ঘটনাটিকে হয়তো কাকতালীয় এবং বিভ্রান্তিকর বুজরুকি বলে ঘোষণা করতে পারেন। পরামনো-বিদ্যার গবেষকরা মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করেন তিব্বতীয় জন্মান্তরবাদ ও ধর্ম আচরণের ন্যায় অল্প খ্যাত ও অপরিশীলিত সভ্যতায় হয়তো মানব-মনের পরামনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়নে মহত্বপূর্ণ নতুন দিগন্তের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই সাক্ষাৎ-কারের আয়োজন সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই করা হয়েছিল। দালাই লামা যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিব্বতীয় ধর্মের এই সকল বিশ্বাস ও কিংবদন্তীকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন তথাপি এই বিশ্বাসের বিজ্ঞান-ভিত্তিক যাচাই হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভারতে বসবাসকারী তিব্বতীয়দের মধ্যে অতিমনের অধিকারী ব্যক্তিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 'ইনস্টিটিউট অব টিবেটিয়ান প্যারা-সাইকলজি' নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বাসনা জানান। তিনি নিজে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন জানালেন।

পরিকল্পনাটি কার্যকর হলে আমরা অদূর ভবিষ্যতে তিব্বতীয় ধর্মের বিচিত্র বিশ্বাস ও জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে কুহেলিকাময় রহস্যের সমাধান পাব এবং সব কিছুই একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

দামোদর প্রকল্পের দুই দশক

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালনাধীন দেওচন্দা গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে ভুট্টার চাষ

দামোদর প্রকল্পের দুই দশক পূর্ণ হল। এই কুড়ি বছরের মধ্যে দামোদর উপত্যকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে।

দামোদর নদের বন্যার ভয়াল রূপের সঙ্গে বাঙালীমাত্রেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। গত একশো বছরের মধ্যে অন্তত কুড়িবার দামোদরের বানে আমাদের রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৪৩ সালের প্রবল বন্যার কথা এখনও অনেকের মনে আছে। এ বিষয়ে একজন বিদেশী লেখক বলেছেন : '১৯৪৩ সালে মহাযুদ্ধের এক সঙ্কটজনক অবস্থায় দামোদরের জলে এল বন্যা। তখন যেন এই হিংস্র নদ শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাল। সেই বন্যায় ডুবে গেল দামোদর উপত্যকায় রাখা সৈন্যদের সমরোপকরণ, কলকাতা থেকে যাতায়াত করার রেলপথ আর রাস্তা।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সালে হিসাব ক'রে দেখেছিলেন যে, ১৯৪৩ সালের বন্যার দরুণ ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় আট কোটি টাকা। এই বন্যার পর বাংলা সরকার দামোদরকে শাসন করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। অবশ্য এর আগেও বাঁধ

দামোদর প্রকল্পের নাব্য খাল

নির্মাণের কথা তাঁরা যে ভাবেন নি, তা নয়। দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে এক কমিটি গঠন করা হ'ল। দামোদর উপত্যকায় আমেরিকার টেনেসী ভ্যালী অথরিটির মতো একটি সর্বার্থসাধক প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরী করার জন্যে সেখানকার এঞ্জিনীয়ার ডব্লিউ, এল, ভূর্ডুইন এলেন। ১৯৪৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন বিল লোকসভায় গৃহীত হওয়ার পর এই বছরেরই ৭ই জুলাই এই সংস্থার কাজ আরম্ভ হয়।

দামোদর প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ আর বিদ্যুৎ উৎপাদন। এর অন্যান্য কাজের মধ্যে পড়ে ভূমিসংরক্ষণ, নৌবহন, মাছের চাষ, জনস্বাস্থ্য এবং উপত্যকার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি।

আমাদের স্বাধীনতালাভের পর থেকেই দামোদর প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। প্রথমে তৈরী

হ'ল বিহারে হাজারীবাগ জেলার বরাকর নদের ওপর তিলাইয়া বাঁধ আর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। তারপর কোনার নদের ওপর কোনার বাঁধ। মাইথন বাঁধ ধানবাদ জেলায় বরাকর নদের ওপর নির্মাণ করা হল। এর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি পাহাড়ের নীচে পাথর কেটে তৈরী করা হয়েছে। এখানকার কল্যাণেশ্বরী মায়ের মন্দিরটি বিখ্যাত। মায়ের স্থান থেকেই নাকি 'মাইথন' নামের উৎপত্তি। চতুর্থ বাঁধ পাঞ্চেৎ ধানবাদ জেলায় দামোদর নদের ওপর। বাঁধগুলির মধ্যে এটিই দীর্ঘতম। একটি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র এর সঙ্গেও সংযুক্ত। এই চারটি বাঁধের প্রধান কাজ জল ধরে রাখা।

দামোদর প্রকল্পের পরিকল্পনায় বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য সবশুদ্ধ আটটি বাঁধ নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে চারটি বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। ফলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের শক্তিও কমে গেছে। এই প্রকল্পের প্রাক্তন চীফ এঞ্জিনীয়ার অ্যানড্রু কোমোরা এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন।

চারটি বাঁধ তৈরি হবার পর এ-পর্যন্ত দামোদরে ছ'বার এমন বান এসেছে যা ১৯৪৩ সালের বন্যার চেয়ে কম নয়। পাঁচবার বন্যার গতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। কেবল ১৯৫৯ সালের বন্যায় পশ্চিম বাংলার কিছু ক্ষতি হয়। কারণ চারটি বাঁধের পক্ষে এই ভয়ঙ্করী বন্যার প্রকোপ সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিহত করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু বাঁধগুলি না থাকলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক নানাভাবে বিপন্ন হতেন। অর্থের অঙ্কে ক্ষতির পরিমাণ যা হত চারটি বাঁধের ব্যয়ভারকে নিঃসন্দেহে ছাড়িয়ে যেত।

কলকাতা থেকে প্রায় ১১৫ মাইল দূরে দুর্গাপুর ব্যারেজ। এর কাজ হল জলের বেগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ১,৫৫০ মাইল দীর্ঘ ছোটবড় অনেক খালের মধ্যে দিয়ে সেচের জল সরবরাহ করা। প্রধান দুটি খাল দামোদরের দু'পাশ দিয়ে চলে গেছে। পঁচাশি মাইল দীর্ঘ খালটি বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলা এবং পঞ্চান্ন মাইল লম্বা খাল বাঁকুড়া জেলায় চাষের জল যোগান দেয়। গত বছর খারিফ শস্যের জন্যে প্রায় সাত লক্ষ একর এবং রবি শস্যের জন্যে প্রায় চল্লিশ হাজার একর জমি দামোদরের জল পেয়েছিল।

১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপুর ব্যারেজ, খালগুলির রক্ষণা-বেক্ষণ ও সেচ-ব্যবস্থার ভার দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন।

দামোদরের জলকে নিয়ন্ত্রণ করার কয়েক বছরের মধ্যেই দুর্গাপুরের যে রূপান্তর আরম্ভ হয়েছে তা বিস্ময়কর। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড দিয়ে দুর্গাপুরে যাবার পথে এখনও নজরে পড়ে সাইন-বোর্ডে লেখা 'দুর্গাপুর জঙ্গল'। দশ-পনেরো বছর আগেও এই পথ দিয়ে সন্ধ্যায় পর যাওয়া নিরাপদ ছিল না। আজ সেই বনভূমির পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে এক বিচিত্র বৃহদায়তন শিল্প-নগরের ছবি।

এখানে গড়ে উঠেছে ইস্পাত-কারখানা, কোক-চুল্লী, সারের কারখানা, বয়লার তৈরির কারখানা, কয়লা ধোতাগার, ভারী যন্ত্রশিল্প, কাচ ও অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা। একটি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজও চলছে। ভারত সরকারের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কারখানাগুলির প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কারিগরদের যোগ্যতার মান নির্ধারণ করা হচ্ছে।

এ সবের মূলে আছে দামোদর প্রকল্পের বিদ্যুৎ-শক্তি। আমাদের দেশে এর চেয়ে বড়ো আর কোনও বিদ্যুৎ-উৎপাদক-সংস্থা নেই। ভারতের শতকরা এগারো ভাগ বিদ্যুৎ আমরা দামোদর প্রকল্প থেকেই পাই।

বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরার তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র এবং তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেতের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র থেকে প্রায় এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই পরিমাণ বিদ্যুতে প্রায় দশ লক্ষ সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে আলো জ্বলতে পারে ও পাখা চলতে পারে।

চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মার্কিন সরকার প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন।

গত বছরে দামোদর প্রকল্প বিদ্যুৎ বিক্রি করে সাড়ে একুশ কোটি টাকা পেয়েছেন।

দামোদর প্রকল্প থেকে সরাসরি যারা বিদ্যুৎ কেনে তাদের মধ্যে প্রধান
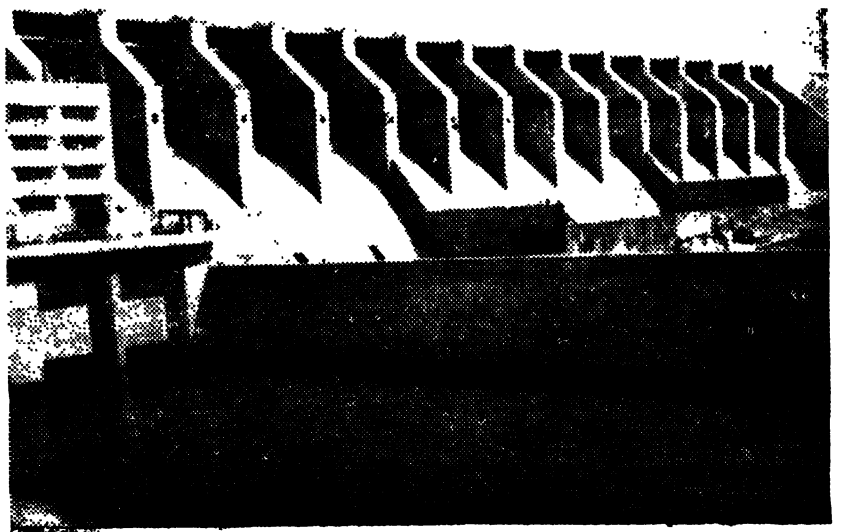
দামোদরের ওপরে পাঞ্চেত বাঁধ
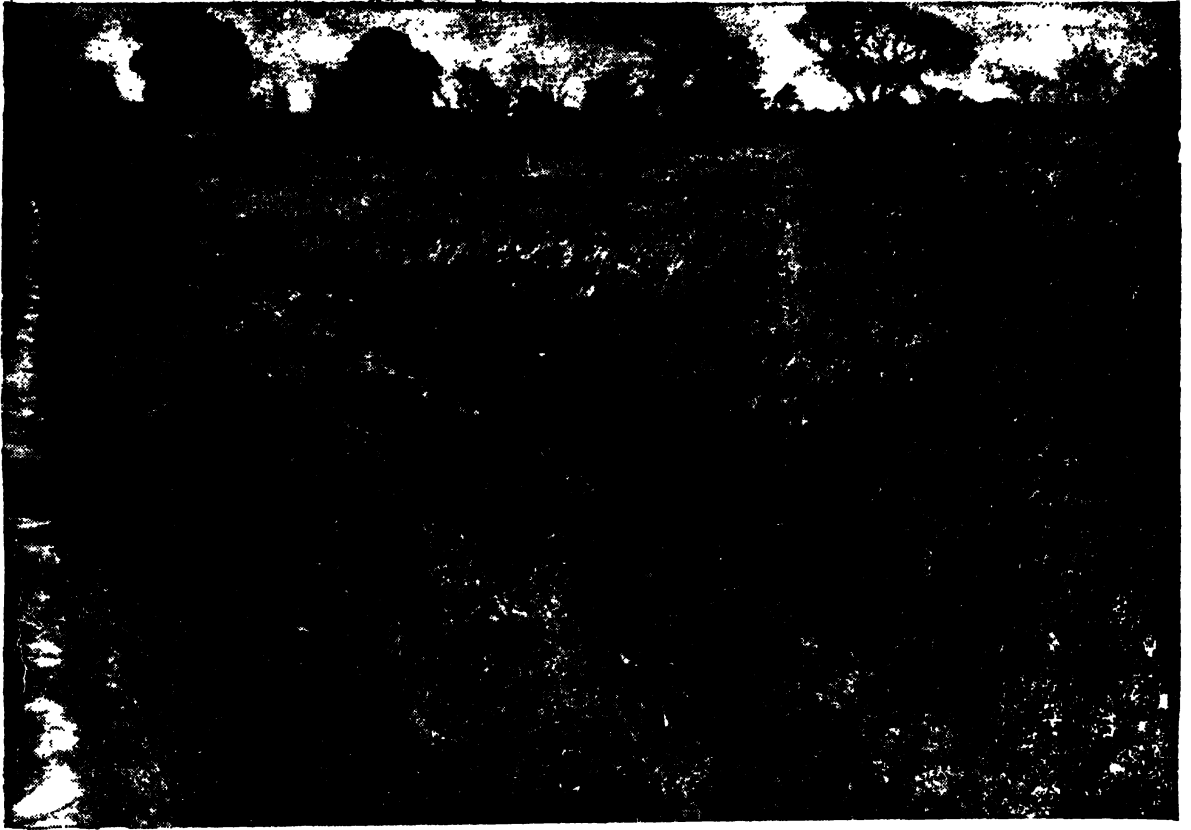
দামোদর প্রকল্পের এই খাল বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় সেচের জল সরবরাহ করে

হল চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন কারখানা; জামসেদপুর, বার্নপুর ও কুলটির ইস্পাত-কারখানা; ঘাটশীলার তামার খনি; ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লার খনিগুলি, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন; পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের ইলেকট্রিক সিটি বোর্ড, ইস্টার্ন ও সাউথ ঈস্টার্ন রেলওয়ে; সিজুয়া (ঝরিয়া) ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি; দিশেরগড় ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি প্রভৃতি।

দামোদর প্রকল্পের ভূমি-সংরক্ষণ বিভাগের কাজ সুরু হয়েছে ১৯৪৯ সাল থেকে। এর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রায় সাত হাজার বর্গমাইলব্যাপী সমগ্র উচ্চ অববাহিকায় ভূমির অবক্ষয় রোধ করা এবং জলাধারগুলিতে পলিমাটি পড়ার পরিমাণ হ্রাস করা।

এই অঞ্চলে প্রায় এক হাজার অবক্ষয়-নিরোধক বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। গেছে সেখানে বৃক্ষরোপণ করে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বনসংরক্ষণ করা হচ্ছে। চারটি জলাধারের সন্নিহিত তীরভূমিতে খামার গড়ে তোলা হয়েছে। এই সব ভূমিতে উৎপন্ন হচ্ছে খারিফ ও রবি-শস্য। ভূমি ও জলসংরক্ষণ এবং জমির উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি সম্বন্ধে হাজারী-বাগ জেলার দেওচান্দায় এক গবেষণা-কেন্দ্রে নিয়মিত পরীক্ষার কাজ চলছে। এখানে যে সব প্রয়োগ-বিধি সফল হচ্ছে তা স্থানীয় কৃষকদের শিখিয়ে দিচ্ছেন ভূমিসংরক্ষণ বিভাগের কর্মীরা।

সেচের জলের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে পানাগড়ে এক কেন্দ্রে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কারিগরী সহযোগিতা পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৮ সালে মৃত্তিকা পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৪ সাল থেকে ছয় মাসের শিক্ষা-নানা প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন ভূমিসংরক্ষণ বিভাগ।

এই সব কাজের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার দামোদর প্রকল্পকে প্রায় আড়াই কোটি টাকা অনুদান মঞ্জুর করেছেন।

বাঁধ জলাধার ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার জন্যে বিশ সহস্রাধিক পরিবার উদ্বাস্তু হন। তাঁদের সকলকেই দেওয়া হয়েছে ক্ষতিপূরণস্বরূপ নগদ টাকা, জমি বা নতুন বাড়ী। তিলাইয়ার কাছে পাঁচটি গ্রামে তাঁদের মধ্যে অনেক পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে তাঁরা পেয়েছেন আধুনিক ধরণের ছোট বাড়ী, চাষের জমি, পরিষ্কার জলের কুয়ো, ছেলে-মেয়েদের স্কুল ও খেলার মাঠ।

দামোদর উপত্যকায় এই প্রকল্পের যে-সব নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে এবং জলাধারগুলির তীরে যে-সব গ্রাম

ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত হয়েছে। ১৯৫০ সালে যখন কোনারে কর্মীরা বসবাস সুরু করেন তখনই ওখানে মহামারীরূপে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। দামোদর প্রকল্পের চিকিৎসা বিভাগ তখন থেকেই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। দশ বছরের মধ্যেই ম্যালেরিয়া নির্বাসিত হয়।

১৯৫০ সালে স্থাপিত হয় মৎস্য চাষ বিভাগটি। দামোদর প্রকল্পের জলাধারগুলির প্রায় পঞ্চাশ একর পরিমাণ জল মাছের চাষের উপযোগী। প্রতি বছর আট শো টন মাছ পাওয়া সম্ভব। ১৯৬২-'৬৩ সালে মাছের চাষ করে দামোদর প্রকল্পের প্রায় পনেরো হাজার টাকা লাভ হয়। বর্তমানে এই বিভাগটির ভার নিয়েছেন ফিশারী কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া।

দামোদর উপত্যকার বহু জায়গা বেড়াবার পক্ষে খুব উপযোগী। দুর্গাপুর, মাইথন, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া, চন্দ্রপুরা, বোকারো ও হাজারীবাগে দামোদর প্রকল্পের অতিথিশালায় থাকা যায়। তিলাইয়ার থাকার বাড়িটি চমৎকার—একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত।

দামোদর প্রকল্প সম্বন্ধে প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী জহরলাল নেহরুর উক্তিটি স্মরণীয়—'এই বিশাল কর্ম্মসংস্থার জন্ম থেকে সুরু করে এর যাত্রাপথের প্রতিটি স্তর সম্পূর্ণ হতে দেখে আমি প্রভূত আনন্দ পেয়েছি। গত কয়েক বছরে নানা উপলক্ষে দামোদর উপত্যকায় এসে এই রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছি। আমার কাছে এই রূপান্তর কেবল একটি বৃহৎ ঘটনামাত্রই নয়, সারা ভারতে আমরা যে বৃহত্তর রূপান্তর আনতে চাইছি এ তারই প্রতীক।---এই প্রকল্প যে-কোনও স্থানীয় প্রকল্পের চেয়ে বড়ো। এ হল আমাদের বিরাট জাতীয় প্রকল্পগুলির অন্যতম। এর জন্যে সমগ্র জাতিকেই আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি।'

আধুনিক কাল

বকুল চৌধুরী

পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে
লোক শত শত।
কেহ নহে একেবারে
এ অধমের মত॥
হাব ভাব দেখি, আর
আধুনিক সজ্জা।
দেখে দেখে ভাবি আমি
মনে হয় লজ্জা॥
জন্মেছি যদিও আমি
আধুনিক কালে।
মন কিন্তু ঢাকা আছে
পুরাতন জালে॥
না শিখেছি সাজ-সজ্জা
নাহি জানি আর্ট।
কথা বলিবার কালে
নহি আমি স্মার্ট॥
বয় ফ্রেন্ড লয়ে পার্কে
বসি নাই আসি।
বলি নাই তোমারে-ই
কত ভালবাসি॥
বলি নাই কত কথা
হাতে হাত দিয়া।
তুমি মোর প্রাণ, প্রিয়
আমি তব প্রিয়া॥
বৃথাই জন্মেছি আমি
আধুনিক কালে।।
আধুনিকা মোরে তাই
গেঁয়ো ভূত বলে॥
দুদিন লজ্জা পাই মনে,
তবু বলিবার নাই।
এটুকু শিখেছি আমি

এই শতাব্দীতে

এস. আতাউল্লাহ

সৌন্দর্যহীনতায় পাণ্ডুর সারা দেশ
লাবণ্য উবে গেছে অভাবের খরতাপে.
কুশ্রী হয়েছে আরো কুৎসিত

যুবকেরা ক্লান্ত জরাগ্রস্ত।
মেয়েরা প্রগতির যুগে ঠুনকো স্বাস্থ্যের মডেল
শাড়ীর প্রলেপে জড়ানো কংকাল।
অথবা যৌবন বেঁচে থাকে সুচী মুখে অজনে.
তাদের ধারণা—জীবনের সব মূল্য
ক্ষুরধার জিভের ডগায়।

আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক সন্তান
পেলাম বজ্রকে বশ করার মন্ত্র
বিদ্যুৎকে হাতের মুঠোয়।
কিন্তু মনকে হারিয়ে ফেলেছি পরমাণুতে
কিংবা রাইফেলের বুলেটে।

মানুষের সৌন্দর্য তাই উবে গেছে
আমরা তো তৃপ্ত প্রসাধনে।
পাঁজরা ঢাকার জন্য পেয়েছি আবরণ;

॥ শ্রীরামকৃষ্ণজগতের কৃপাকথা ॥

• লীলারহস্য কথা •

তখন রাম নামই বল আর কালী নামই বল অথবা যে নামে যে ভাবেই ডাক না কেন একটা ডাকও বৃথা যাবে না। তখনই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বাক্য সফল হবে। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠা না হলে ভগবান লাভের চেষ্টা ছেলেমানুষি। আচ্ছা আবার একদিন হবে।

অনেক মনীষীরা বলেন, একটা নতুন উন্নততর মানবজাতির প্রতিষ্ঠা নাকি অনেক দিন আগে থেকেই হয়েছে। যুগস্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'ঠাকুরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সত্য যুগের আরম্ভ হয়েছে। সত্য যুগ মানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবার যুগ। সত্যের মর্যাদা দেবার জন্য যা-কিছু অন্তরায়, মানুষ সব বিনা দ্বিধায় সত্যের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে এই যুগে আর কুণ্ঠিত হবে না।

যাঁরা জেগে উঠেছেন, যাঁরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, যাঁরা ভগবানলাভের আকাঙখাকে জীবনের পুরোভাগে রেখে যাত্রাপথে এগুচ্ছেন—তাঁরাই দেখতে পাচ্ছেন যে একটা নতুন উন্নততর মনুষ্যজাতির প্রতিষ্ঠা সত্যি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছে। অনেক উন্নত স্তরের মহাপুরুষ এই জাগরণকে মূর্ত করে তোলবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতির ভিতরে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং এই বিরাট জাগরণে দরকার হলে আত্মাহুতি পর্যন্ত দিয়ে মানবজাতিকে এক জাতি, এক ধর্ম এবং এক সমাজে গ্রথিত করতে আরম্ভ করেছে। কেউ কেউ মনে করেন একবিংশ শতাব্দীতে কাজ হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতগতি লাভ করবে। যাক সে সব কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার কারণ নির্দেশ করতে যেয়ে অনেক তত্ত্বকথার আলোচনা হলো। ভাবতে গেলে বিস্ময় লাগে এই বিরাট জাগরণের মূলে রয়েছেন রাণী রাসমণি—কৈবর্ত জাতীয়া মহিলা। তিনিই স্বয়ং জগদম্বার নির্দেশে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ঠাকুর বলতেন তিনি নাকি মায়ের অষ্টনায়িকার প্রধান নায়িকা। এই মহিলার মত সতী সাধ্বী ঈশ্বরপরায়ণা এবং সর্বগুণসমন্বিতা স্ত্রীলোক উচ্চবর্ণের জাতের ভিতরে কটা পাওয়া যায়? যিনি ধনী কামারিণীর হাতে উপনয়নের পর প্রথম ভিক্ষালাভের জন্য বিশেষভাবে জেদ করেছিলেন এবং এবং সেই জেদ শেষ পর্যন্ত রেখেওছিলেন। তিনিই আবার কালক্রমে রাণী রাসমণির মন্দিরে জগন্মাতাকে এক অভিনব উপায়ে জাগরিত করাবার জন্য বিধাতার নির্দেশে বৃতী হলেন। এ সবের কি বিশেষত্ব কিছুই নেই? তারপর দেখা যায় যখন রামদত্ত প্রমুখ বিশেষ ভক্তগণ ভবিষ্যতে ঠাকুরকে নিয়ে যখন উৎসব সুরু করলেন এবং ঐ সময়ে আহারাদির ব্যবস্থা করতে লাগলেন তখন প্রথম প্রথম নানা প্রকার গোলমালের সৃষ্টি হলো ব্রাহ্মণ, কায়স্থ পংক্তিতে বসে খেতে পারেন? ভীষণ সমস্যা। ঠাকুর কিন্তু খুব সহজেই এই সমস্যার সমাধান করলেন, বললেন—

'ভক্তের আবার জাত-বিচার কিসের? কি অপূর্ব সমাধান। ভক্তের জাতবিচার নেই। সহস্র বছরের সংস্কার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের খাবার সময়ে পংক্তিবিচার আস্তে আস্তে খসে যেতে লাগলো কিন্তু পশ্চিমের পদ্ধতি অনুসারে নয়। তুমিও মানুষ আমিও মানুষ কাজেই তুমি যেখানে বসে খাবে সেখানে বসে আমারও খাবার অধিকার আছে।

পশ্চিমে জাতবিভাগটা অবশ্য ধনী দরিদ্র হিসাবে ব্যবস্থিত। আমার ধন আছে তোমার ধন নেই, কাজেই তুমি আমার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খেতে পার না। হয়ত ধনী লোকটি অত্যন্ত অসচ্চরিত্র এবং নির্ধন লোকটি অত্যন্ত সচ্চরিত্র কিন্তু তাহলে কি হবে?—তার যখন ধন নেই তখন সামাজিক মর্যাদায় নিম্ন শ্রেণীতে তার স্থান। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের এই অনুশাসন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এই সমস্যা এর আগে কেউ শোনে নি। প্রভুর কি অদ্ভুত বিধান। তাঁর ব্রাহ্মণ শরীর সেই জন্য অব্রাহ্মণের হাতের অন্ন খাচ্ছেন না। ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা অটুট রেখে চলেছেন। এদিকে লীলাসহচরদের নিয়ে বিচার করতে যেয়ে জাতের কথা তুললেন না। তাঁদের জাতের কৌলিন্য বিচার হলো আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গির দিক দিয়ে, কার স্থান কত উচ্চে। নরেন কায়েতের ছেলে কিন্তু এই নরেনের হাতেই নেতৃত্ব ন্যস্ত হলো। আর হলো

রাখালের হাতে। 'নরেন আমার শ্বশুর ঘর', 'নরেন মর্দা আর আমি মাদি' 'নরেন সপ্তর্ষির এক ঋষি। আমার কাজ করবার জন্য পৃথিবীতে নেমে এসেছে। মা বললেন 'তোর একটি ছেলে আসছে।' ভয়ে অস্থির---'সে কি? আমার যে মাতৃযোনি। আমি যে স্ত্রীকে আনন্দময়ী মা বলে জানি, আমার ছেলে হবে কি করে? মা বুঝিয়ে দিলেন---না রে দেহের ছেলে নয়। মানস পুত্র। আধ্যাত্মিক জগতের তোর উত্তরাধিকারী।'

কিন্তু কই এই দুই যুগস্রষ্টার একজনও ত ব্রাহ্মণ পিতামাতার সন্তান নন। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় নরেন আর রাখালের মত উচ্চাধিকারী ত বোধ হয় লীলাসহচরদের ভিতর কেউ ছিলেন না। নরেন আর রাখালকে অন্যান্য গুরুভাইরা ঠাকুরের অবর্তমানে ঠাকুরের সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করতেন এবং তাঁদের আদেশ বা ইচ্ছা পূরণ করতে কাউকে দ্বিধা করতে দেখা যায়নি। এখানে জাতের বিচার উঠছে না আধ্যাত্মিকতায় শুধু ব্রাহ্মণ কেন ঋষিদের চেয়েও যেন এঁদের দুজনের উর্ধ্বে স্থান বলে মনে হয়। এঁদের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অভুতপূর্ব ছিল। ঠাকুর এইভাবে নীরবে কি অদ্ভুত সমাজ সংস্কারের সূচনা করে গেলেন। এই যে সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গড়ে উঠছে। যাঁরা চরিত্র বলে এবং আধ্যাত্মিক বলে অপূর্ব জীবনের আদর্শ দেখিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের কাছেও কোন গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করছে না তিনি পূর্বাশ্রমে ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ ছিলেন। অতি সহজ ভাবে এঁদের উচ্চস্তরের অধিকার সমাজ স্বীকার করে যাচ্ছে এবং তাঁদের চরণে লুটিয়ে পড়তে কারও মনে অতটুকুও দ্বিধা হচ্ছে না। সমাজ-সংস্কারের কি অপূর্ব আদর্শ চোখের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ এই দুইটি ভাগে সমাজ গড়ে উঠছে। যা সত্য হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। আধ্যাত্মিক অধিকার সহজ সরলভাবে সমাজে মানুষের স্থান নির্ণয় করছে। বিনা সংঘর্ষে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। ধন্য প্রভুর মহিমা।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রভু মাতৃরূপের সাধনায় জীবন আরম্ভ করলেন। রামকৃষ্ণ-চরিত্রে এই মাতৃভাবের জাগরণ আর এক অপূর্ব ব্যাপার ধনী কামারিণী, রাণী রাসমণির কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর স্বীয় পত্নীর সঙ্গে ব্যবহার আর এক অপূর্ব ব্যাপার। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে নিজের স্ত্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহারের কি আর কোন দৃষ্টান্ত আছে? ত্যাগ-তপস্যা এবং পবিত্রতার জলন্ত প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীমা যখন দিনের পর দিন রাতের পর রাত পার্শ্বে উপস্থিত, তখন এই অপূর্ব যুবকের মনে একদিন বা এক মুহূর্তের তরে এই অপূর্ব রমণীরত্নের উপর স্বামীর দাবী নিয়ে উপস্থিত হবার চিন্তা স্বপ্নেও উদিত হয় নি।

পাঠক-পাঠিকা, আজকের দিনে আমরা সাধারণ গৃহস্থ যখন ঠাকুরের জীবনের অনুধ্যান করবো তখন ঠাকুরের এই স্ত্রীকে মা'তে রূপায়ণের ভাবটির মর্যাদা দিতে যেন আমরা শিক্ষা করতে পারি। আসুন তাঁর শ্রীচরণে সতত এই প্রার্থনা জানাই। যেন আমাদের চরিত্রের একটা বিশেষ অংশরূপে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার চেষ্টা করতে পারি। যখনই প্রভুর ছবিতে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিই, যখন তাঁর শ্রীরূপের অনুধ্যান করি তখন আমাদের মনে আকুলভাবে প্রভুর এই ব্যবহারটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

কে বলে ঠাকুর মৃত, কে বলে শ্রীশ্রীমা মৃত, কে বলে তাঁদের পার্ষদরা এই ধরাধাম ছেড়ে আমাদের পরিত্যাগ করে চিরতরে চলে গেছেন? না, তাঁরা এখন এখানে আরও বিশেষভাবে রয়েছেন। তাঁরা যে সমগ্র মনুষ্যজাতির উদ্ধারের ব্রত নিয়ে তাঁদের জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মহূর্ত আমাদের মধ্যেই কাটিয়ে গেছেন। তাঁদের প্রতিটি নিঃশ্বাস সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ফেলেছেন। এই বিরাট ব্রতের মাত্র সুরু। মাত্র শত বার্ষিকী উৎসব মানবজাতি পালন করেছে। পৃথিবীতে যখন এদের পঞ্চশত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে তখন প্রভুর জীবনের অপূর্বদৈবী সম্পদগুলো জলে স্থলে নভোমণ্ডলে বিরাট শক্তির উৎস সৃষ্টি করবে সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক উত্থান, তখন মানুষ দেখে বিস্মিত এবং পুলকিত হবে।

পাঠক-পাঠিকারা আসুন আমরা এই বিরাটের অমৃতধারায় নিজের এবং জগতের কল্যাণের জন্য পুনঃ পুনঃ অবগাহন করার সংস্কার গ্রহণ করি। তাঁরা সর্বদা আমাদের সহায়তা করবার জন্য প্রস্তুত। এসব কথা উন্নত স্তরের মহাপুরুষেরা সর্বদাই বলেছেন। যাক্ যেকথা হচ্ছিল।---

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে মাতৃজাতির প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমরা একটু বিশেষভাবে অনুধাবন করলেই দেখতে পাই। নবজাগরণে মেয়েদের বিশেষ স্থান-গ্রহণ করতে হবে এটা প্রভু বিশেষ করে বুঝেছিলেন। পরিবারে যদি একটি মেয়ে সত্যিকার ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে তার ভালবাসা এবং সেবা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেস্বামীর জাগরণ হবে এবং পুত্র-কন্যারও জাগরণ হবে এবং এই জাগরণে সমগ্র পরিবারটি কল্যাণের পথে অগ্রসর হবে।

দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরে যখন ভদ্রঘরের মেয়েরা কষ্ট স্বীকার করে যেতেন তখন প্রভু আচরণে এবং ব্যবহারে তাঁদের আপন করে ত নিতেনই, তাছাড়া তাঁদের ভিতর পবিত্রতা এবং ভগবদ্-প্রীতির ভাবও অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতেন। আজ এই দুর্দিনে একদিকে যেমন আসুরিক ভাব প্রবল হয়ে সমগ্র মানবজাতিকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে এসেছে তেমনি দেখা যায় একটা অপূর্ব ভগবদপ্রীতির ভাবও আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

আজ আবার বন্ধুর শুভাগমন হয়েছে। বন্ধু বললেন---'ভাই তোমার সব কথাই ত শুনলাম কিন্তু চল আবার সমস্যাটার সমাধানের চেষ্টা গোড়া থেকে আরম্ভ করি---বল তো ধর্ম ধর্ম

মানুষ করবে কেন? খাও দাও আনন্দে থাক। পাশের বাড়ীর লোকদের কোন লোকসান করো না অথবা পুলিসের হাতে ধরা যাতে না পড়তে হয়, এই ভাবে চললে তো মহাআনন্দে জীবন কাটান যায়। ধর্ম বা ভগবান না করলে ক্ষতি কি?'

আমি বললাম—বাঃ, বেশ কথার অবতারণা হলো। জগতে কোটি কোটি লোকের তো এটাই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের দিনে। চল, এর বিচার আজ আমরা করি।

দেখ, ধর্ম এই কথাটা শুনলে বর্তমান যুগে অনেক পিতামাতাই অস্থির হয়ে যান। তার কারণ হচ্ছে এই ধর্ম ধর্ম করে ছেলে-মেয়েরা দৈনন্দিন স্কুল কলেজের অধ্যয়ন বিদ্যাহরণ, স্বাস্থ্য রক্ষা, পিতামাতার এবং ভাই-ভগিনীর প্রতি স্নেহ মমতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে এক একজন ইতঃভ্রষ্ট স্তত নষ্ট হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এই ধারণা কত অযৌক্তিক।

ধর্ম কথাটার সাধারণ অর্থ হচ্ছে এই যে, সহজ সরলভাবে জীবন ধারণ করা এবং দেহ, মন, প্রাণ ইত্যাদির স্বাভাবিক উন্নতিবিধান করার কতকগুলো ক্রিয়াপদ্ধতি মেনে চলা।

বয়স হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষের মনে কতকগুলো প্রশ্নের উদয় হয়। সে হচ্ছে মানুষ বর্তমান নিয়ে ভুলে না থেকে জানতে চায় তার জীবনের ভূত এবং ভবিষ্যদাবস্থার কথা। এই দেহ এবং জীবন আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের পিতা-মাতার কাছ থেকে পেয়েছি। এই পিতামাতার দেহ-মনের অনেক কিছুরই অংশীদার হয়ে এই পৃথিবীতে আশ্চর্য ভাবে আমাদের আগমন।

তারপর প্রথমত মায়ের কাছে শিক্ষা তারপর পিতার কাছে এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা এমন কতকগুলো শিক্ষা সংগ্রহ করি যা একটু অনুধাবন করলে পুলকে, বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। যার কাছে থেকে শিক্ষা পেলাম—কে আমার পিতা, কে দাদা, কে কাকা কে কাকীমা এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংসে সেই শিক্ষা আমাদের বুঝিয়ে দিলে এ সবই সত্য। এ কথা অবশ্য আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন একটু এগিয়ে পিছিয়ে দিলে কি অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমি অমুক বছরে অমুক দিনে এই পৃথিবীতে এসেছিলাম কিন্তু এখানে আসবার আগে কোথায় ছিলাম? আরও কি এই পৃথিবীতে এসেছিলাম? যদি এসেছিলাম তাই সত্যি হয়, তাহলে এ জন্মে? যেমন পরম স্নেহময়ী মা এবং পরম স্নেহময় পিতার আশ্রয় পেয়েছি, তেমনি আগের জন্মেও এ ভাবেরই স্নেহময়ী মা ছিলেন এবং স্নেহময় পিতা ছিলেন—আজ তাঁরা কোথায়? আজ কি আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে? হচ্ছে তাই বা কে বলবে আর হচ্ছে না তাই বা কে বলবে? যদি এই আগের জন্মটা মেনে নিতে হয়, তা হলে তার আগেও নিশ্চয়ই জন্ম ছিল এবং সে জন্ম সম্বন্ধেও ত অনুরূপ প্রশ্ন করা চলে।

এক কথায় যদি বর্তমান মানতে হয় তাহলে ভূত ও মানতে হবে এবং ভবিষ্যৎও মানতে হবে।

এ প্রশ্নের জবাবে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে বলেছিলেন।

'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।'

—হে অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম হয়েছে। বহুবার আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি।

অর্জুন খানিকটা অবিশ্বাসের চোখে যখন বন্ধুর দিকে তাকালেন তখন ভগবান উত্তর দিলেন 'না অর্জুন, আমি বাজে কথা বলছি না। আমি যে সব খবর জানি তাই জেনে শুনেই তোমাকে এ কথা বলছি।'

আমরা জানি ভগবান রামকৃষ্ণ ও তাঁর লীলাসহচরদের দেখে তাঁদের পূর্ব পূর্ব জন্মের খবর দিয়েছিলেন। তাঁর ছিল পাঁচফুলের সাজি। বাগানে যেমন গোলাপ, জুই, গাঁদা, অপরাজিতা ইত্যাদি নানা প্রকারের ফুল ফুটে থাকে শ্রীঠাকুরও তেমনি নিয়ে এলেন একজনকে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে, এক জনকে প্রভু যীশুখৃষ্টের দল থেকে কাউকে কাউকে আবার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দল থেকেও।

এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে।

এখন পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ধর্ম একটা আজগুবি কিছু নয়। ধর্ম একটা সুস্থ সবল এবং স্থিরচিত্ত মনুষ্যের চলার পথের ক্রমবিকাশের ধারা। যেমন অতীতের চিন্তা আমাদের বহু জন্মের খবর এনে দেয় তেমনি ভবিষ্যতের চিন্তা বহু আগামী জীবনের খবর এনে দেবে। এই যে, ভারবাহী পশুর মত আমরা জন্ম-মৃত্যুর হাতে বন্দী হয়ে আছি—. ধর্মের শেষ কথা হচ্ছে জীবন টাকে এমনভাবে চালান যাতে এই বন্দিত্বের চিরকালের মত অবসান হয়। এ কথা আর আলোচনার আগে আবার অন্য কথা আসতে হয়। এই যে পর্ব জন্ম আছে এ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার কথা আমরা উদ্ধৃত করেছি, যাঁরা শ্রীবুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন যে, শ্রীবুদ্ধ যখন বিরাট প্রতিজ্ঞা করে বোধিবৃক্ষতলে বসেছিলেন—প্রতিজ্ঞা—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

(ক্রমশ।

কাজী নজরুল : জীবন, সঙ্গীত ও সাহিত্য

রণজিতকুমার সেন

নজরুল-কাব্যের দুটি মূল দিক হচ্ছে প্রেম এবং সমাজ। তাঁর সাধন-ভূমি স্বদেশও ওই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর নারী-প্রেম এবং দেশ-প্রেমের মধ্যে পার্থক্যটা মূলত বাইরের, ভিতরের নয়। আবার একদিকে নারী-প্রেম ও অপরদিকে দেশ-প্রেম তাঁর মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, তাতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী বেশে; প্রেম তাঁকে মাত্র স্বপ্নবিলাসী ক'রে রাখে নি। এখানে নারী-প্রেমের নারী কাল্পনিক দয়িতাও হতে পারে, আবার স্বদেশ-লক্ষ্মীও হতে পারে। যেমন—

মনে মনে বলি, তুমি যে আমার ছন্দ-
সরস্বতী,
ওগো চঞ্চলা, আমার জীবনে তুমি
দুরন্ত গতি।

●

তোমার অধরে আঁখি পড়ে যবে, অধীর
তৃষ্ণা জাগে,
মোর কবিতায় রস হ'য়ে সেই তৃষ্ণার
রং লাগে।

●

সুর হয়ে ওঠে সুরা যেন, আমি
মদিরামত্ত হয়ে
যৌবনবেগে তরুণের ডাকি খরতর
বারি লয়ে।'---

কোনো কোনো সমালোচক নজরুলের এই নারীকে বাস্তব-জগতের দয়িতা হিসেবে অঙ্কন করেছেন, যেমন সৈয়দ আলী আশরাফ বলেছেন: নজরুলের প্রিয়া কোনো আদর্শ কাল্পনিক প্রিয়া নয়, কোনো মায়ালোকবাসিনী স্বপ্নলোক বিহারিণী রহস্যময়ী জীবন-দেবী বা জীবনদেবতা নয়, এ প্রিয়া একান্তভাবে রক্ত-মাংস-মজ্জায় সজ্জিত মর্ত্যলোকের মানবী। তবে এ-মানবীকে কবি দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে। কখনও মনে হয়েছে---এ যেন প্রিয়া নয়, এ যেন চির শুদ্ধা তাপসকুমারী, আবার কখনও তাঁর প্রিয়া গৃহিণীরূপে অবতীর্ণা হয়েছেন। প্রিয়ার বিচিত্র রূপ ও তার সাথে মান-অভিমানের পালাই হচ্ছে নজরুলের কাব্যের উপজীব্য। এই প্রিয়াই তাঁর কাছে বিশেষমত নারী হয়ে দেখা দিয়েছে। কখনও সে--

কাজী নজরুল

বিজয়িনী নহ তুমি---নহ ভিখারিণী,
তুমি দেবী চির শুদ্ধা তাপসকুমারী
তুমি মম চির পূজারিণী।'

আবার কখনও----

'প্রিয়রূপ ধরে এতদিনে এলে আমার
কবিতা তুমি,
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে
গেল বনভূমি।'

নারী যেখানে কবির কাছে কোনো বিশেষের মধ্যে পর্যবসিত, সেখানেও যৌবনের আত্মসমর্পণে অতৃপ্তির বিষাদই বেড়ে উঠেছে, তাই বিশেষের মধ্যে কবি সন্ধান করেছেন চিরকালের অনামিকাকে। কখনও কখনও সেই সন্ধান থেকে উদ্ভূত হয়েছে সহজিয়া সাধনার প্রেমিকের মতো' যৌনদর্শন; যেমন---

প্রেম-সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র
সে বুঝি চিরন্তন নয়
জন্ম যার কামনার বীজে,
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায়
কল্পতরু নিজে।

●

প্রেম সত্য, প্রেমপাত্র বহু অগণন,
তাই চাই, বুকে পাই, তবু কেন
কেঁদে ওঠে মন।

এই ক্রন্দন সেই চিরকালের অনামিকার উদ্দেশেই। কবির কাছে তখন এ-পৃথিবীর রক্ত-মাংসের প্রিয়া মিথ্যা হয়ে যায়, তখন কবি ঊর্ধ্ব লোকে দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলেন---

অ'নন্তলোকে অনন্তরূপে কেঁদেছি
তোমার লাগি;
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো
আকাশে রয়েছে জাগি।'

তাঁর 'দোলন চাঁপা', 'সিন্ধু হিল্লোল', 'ছায়ানট', 'চক্রবাক', 'নতুন চাঁদ' প্রভৃতি গ্রন্থে এই জাতীয় কবিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নজরুলের পিতা কাজী ফকীর আহমদ বিশেষ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং কাকা কাজী ফজল করীম ভালো ফরাসী জানতেন। শিশুকাল থেকেই নজরুলের উপর তাঁর পিতা ও কাকার প্রভাব পড়েছিল। ফকীর আহমদের প্রথম চার পুত্রের মৃত্যুর পর জন্ম হয় নজরুলের। বাপ-মা তাঁর নাম রাখলেন 'দুখু মিয়া।' বাপ-মার অনেক দুঃখের ধন ছিলেন নজরুল। সংসারটাও ছিল অতি গরীব। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বড়

দুঃখই বড় হতে হয়েছে নজরুলকে। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই বলেছেন: 'সকল ব্যথিতের ব্যথায় সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি।—এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।'

দুঃখের সংসারে দুখু মিয়া ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিলেন। ১৯১৬ সালে দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন নজরুল। ইতিমধ্যে ফকীর আহমদ পরলোকগত হন। দুঃখের সংসার তখন আরও দুঃখের অভিঘাতে ভেঙে পড়ে। বাধ্য হয়ে মক্তবেই মাষ্টারী নিতে হয় নজরুলকে। মাঝে মাঝে হাজী পহ্‌লোয়ানের মাজারে খাদেমগিরী ও ইমামতী করতে থাকেন। ছেলেরা তাঁকে বলতো ছোট ওস্তাদজী আর মোক্তাদিরা বলতো বাচ্চা ইমাম। পরবর্তী জীবনে তাঁর অধ্যাত্মবোধের প্রথম উন্মেষ এ সময় থেকেই অলক্ষ্যে ঘটে। মস্‌জিদে ইমামতী করা থেকেই নজরুলের প্রথম কাব্যসৃষ্টি শুরু হয়। প্রচলিত জীবনযাত্রায় তাঁর ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে প্রতিবেশীরা তাঁকে বলতো খ্যাপা। তাদের চোখে দুখু মিয়া সত্যিই হয়তো তখন খেপে উঠেছেন। স্কুলের মাষ্টার থেকে সুরু করে সবাই বলতেন; ও হতভাগা ওর কিছু হবে না। কিন্তু অলক্ষ্যে প্রকৃতিরাণী কখন্ তাঁকে নিজের স্কুলে সব পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিয়েছেন। একথা কে জানতো?

নজরুল লেখাপড়া ত্যাগ করে লেটোর নাচের দলে গিয়ে নাম লেখালেন। তাঁর শিল্পকৃতি লক্ষ্য করে দলের মাষ্টার তাঁর নাম দিলেন 'ব্যাঙাচি', বলতেন: 'আমার ব্যাঙাচি বড় হয়ে সাপ হবে।' তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি। জীবনে বিষধর সর্পের মতই তিনি জাতির বজ্জাতি ও বৃটিশ রাজশক্তিকে দংশন করেছেন। কিন্তু লেটোর দলেও কোনদিন তিনি কাটাতে পারলেন না; চলে গেলেন আসানসোলে। সেখানে এক রুটির কারখানায় চাকরী নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর পাঠতৃষ্ণা ছিল প্রবল: মাঝে মাঝে অবসরমতো আপন মনে বসে গান করতেন গলা ছেড়ে। —এর পরের ইতিহাস 'বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' বা তাঁর সৈনিক-জীবন যাপন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করে কামানের উপর দাঁড়িয়ে নজরুল হয়তো তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনের আভাস পেয়েছিলেন সেদিন। সেই উন্মাদনাময় রণদুন্দুভির মধ্যে প্রথম রচনা করলেন তিনি 'শাতীল আরব।' আরবদের স্বাধীনচেতা চরিত্রকাহিনীতে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন: 'সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পড়ে না শিকল পদ্ধতির।'

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যে নজরুল আমাদের সামনে দাঁড়ালেন—তিনি সৈনিক নন্, সৈনিক-কবি, তিনি চারণ, তিনি গীতিকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রেমিক। দেশপ্রেমে ও ও নারী-প্রেমে তিনি প্রভেদ রাখেন নি। কাব্যক্ষেত্রে যে সময়ে নজরুলের আবির্ভাব, সে সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে একদিকে সন্দেহবাদ, সংশয় ও নেতিবাদ এসে যেমন জাতীয় জীবনে ভর করেছে, তেমনি যুবকশ্রেণীর মধ্য থেকে জাতীয়-চেতনামূলক উদ্দীপনার অনুসন্ধানও চলেছে। অপরদিকে দেখতে পাই—বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হয়ে তরুণ শিল্পীরা এমন নতুন কোনো সুরের সন্ধান করেছিলেন—যা তৎকালে তাঁদের সামনে পুরোপুরি অনুপস্থিতই ছিল। এ সময়ে অনেকাংশে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হয়ে যিনি কাব্যক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর ছন্দমাধুর্য ও শব্দঝঙ্কার করলো যে, অল্পকালের মধ্যেই তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। কিন্তু ভাব-সম্পদের গভীরতার অভাবে সেই জনপ্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। বাংলার তরুণ মন অই এমন কাব্য অনুসন্ধান করছিল—যার মধ্যে শব্দ-বিন্যাস, ছন্দ-মাধুর্য, কাব্যাদর্শ ও ভাব-সম্পদের একত্র সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যে এই মণি-ভাণ্ডার নিয়ে এলেন নজরুল। রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে নজরুল-কাব্যে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলো তৎকালীন বিপ্লবী তরুণ-সম্প্রদায়। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত হলেও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরীতির ছাপ থেকে গেল নজরুলের সৃষ্টিতে। তিনি কাব্যে অনেকাংশেই সত্যেন্দ্রপন্থী। তবু জাতীয়তাবাদী বা প্রেমবাদী কাব্যের বহুস্থলে আমরা নজরুলের ছন্দঃপতন লক্ষ্য করেছি, যদিও উচ্ছ্বাস ও অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর দ্রুত সঞ্চরণ-শীলতার ভিত্তিতে সেই ছন্দঃপতনকে আমরা গুরুত্ব দিই নি। বাঙালী মন তখন এমন উদ্দীপনা খুঁজছিল—যা তাঁরা বহু প্রতীক্ষার খুঁজে পেলো 'বিদ্রোহী' কাব্যে। নজরুল পরিচিত হলেন বিদ্রোহী কবি বলে। কাব্যের মাধ্যমে তিনি শুধু এদেশের গণচিত্তে অগ্নিসংযোগই করলেন না, সেই সঙ্গে এদেশের হিন্দু-মুসলীম উভয় সম্প্রদায়ের শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কারের মূলেও কুঠারাঘাত করলেন। পুরোহিততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রকে বরবাদ করে খাঁটি মানব-চিত্তের বিশুদ্ধতার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলেন তিনি। 'মানুষ' কবিতায় কবি বললেন—

'গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান।'

বললেন,—

'জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ,
ডাকিল পান্থ 'দ্বার খোলো বাবা,
খাই নি ক' সাত দিন।'

সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারী
ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার
মাণিক জ্বলে।
ভুখারী ফুকারি কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হা দেবতা,
তোমার নয়।'
মসজিদে কাল শিরণী আছিল,
অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে
তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে
আজারির চিন্।
বলে, 'বাবা আমি ভুখা ফাকা আছি
আজ নিয়ে সাত দিন।'
তেরিয়া হইয়া হাকিল মোল্লা—
'ভ্যালা হল দেখি লেঠা,
ভুখা আছো মরো গো-ভাগাড়ে গিয়ে,
নামাজ পড়িস বেটা?'
ভুখারী কহিল, 'না বাবা।' মোল্লা
হাঁকিল—'তা হ'লে শালা,
সোজা পথ দেখ।' গোস্ত রুটি নিয়া
মসজিদে দিল তালা।
ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে—
'আশীটা বছর কেটে গেল,
আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে
বন্ধ করো নি প্রভু
তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু
নাই মানুষের দাবী।
মোল্লা - পুরুত লাগায়েছে তার
সকল দুয়ারে চাবি।'

বললেন—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।'

জাতির জীবনে এমনি করে বর্ণ-বৈষম্য ভেঙে দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিয়ে এক অখণ্ড মানব-গোষ্ঠীতে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন তিনি। মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাধক-বৃন্দের জীবন থেকে এই শিক্ষার উদাহরণ গ্রহণ করা নজরুলের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল, কারণ তাঁর মধ্যে হিন্দু-তন্ত্র, বৌদ্ধ ও সুফীবাদ, বৈষ্ণব ও শাক্তরীতি এবং ইসলামের নীতিবোধ এসে একত্রিত হয়েছিল। কাব্যে যেমন তিনি এই উন্নত দর্শনের রূপায়িত করলেন, তেমনি হেঁয়ালী বর্জন করে সহজতা দান করলেন তিনি কাব্যকে। এদিক থেকে বলা যায়—তিনি ছিলেন পুরো মাত্রায় মিলটন-পন্থী। হিন্দু-মুসলীমদের দ্বন্দ্ব মেটাতেও তিনি বর্ণহীন গোটা মানুষকেই প্রতিষ্ঠা করে বলেছেন—

'হিন্দু না ওরা মুসলিম?'
ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী। বল, ডুবিছে মানুষ,
সন্তান মোর মার।'—

বিপ্লবী যৌবনের উদগাতা ছিলেন নজরুল। যৌবনের জয়োল্লাস করেছেন তিনি কাব্যে। এ জয়োল্লাস রবীন্দ্রনাথে শ্রেষ্ঠ রূপ পেয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর মনে হয়েছিল—হয়তো বাংলা কাব্য থেকে তা দীর্ঘকালের জন্যই অন্তর্হিত হলো, কিন্তু নজরুলের লেখনীতে সেই যৌবন আবার নতুন প্রাণ-শক্তিতে জেগে উঠলো। তিনি বললেন—'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।' বললেন—

'আমি তাই করি ভাই
যখন চাহে এ মন যা।
করি শত্রুর সাথে গলাগলি,
ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা।'

তেমনি অন্যত্র তিনি বললেন—

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগলো জোয়ার
দুয়ার ভাঙা কল্লোলে।'

রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' মতই বন্ধনহীন গতি এই যৌবনের। 'সব্যসাচী' কাব্যেও এই যৌবনের অমিত আহ্বান গিয়ে ভেঙে পড়েছে সারা দেশে। দুর্বৃত্তের দবিনয় ও পরশাসনের ঔদ্ধত্যকে ভাঙতে সেই যৌবনের প্রতীক পার্থর আবির্ভাবকে কল্পনা করে কবি বললেন—

'ওরে ভয় নাই আর দুলিয়া উঠেছে
হিমালয়-চাপা প্রাচী।
গৌরিশেখরে তুহিন ভেদিয়া
জাগিছে সব্যসাচী।
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া
মহাভারতের মহাবীর জাগে,
বলে, আমি আসিয়াছি!
নবযৌবন - জল - তরঙ্গে
নাচে রে প্রাচীন প্রাচী।'

এক অখণ্ড মানবগোষ্ঠী রূপায়ণের স্বপ্নে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের উপর তিনি একেবারেই গুরুত্ব দেন নি। বাঁধ ভেঙে না দিলে যেমন সব ঘাটের সব জলের জোয়ার একীভূত হয়ে মহাসমুদ্রে মিলতে পারে না, তেমনি সব দেশের সব জাতের স্বাতন্ত্র্য না ভেঙে দিলে এক অখণ্ড মানবসমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সকলকে এই সমভাবে দর্শন থেকেই সাম্যবাদের সৃষ্টি। সাম্যবাদী নজরুল তাই গাইলেন—

'গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে
সব বাধা ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলীম-ক্রীশ্চান
গাহি সাম্যের গান।'

নারীকেও তিনি এই সাম্যবাদী চোখ নিয়েই দেখেছেন। নারীকে তাই যারা লাঞ্ছিত করে, কবির ধিক্কার তাদেরই উপর। আসলে পুরুষে ও নারীতে কোনো পার্থক্যই নেই। দুজনকে নিয়েই তবে সৃষ্টি সার্থক, জগৎ সার্থক। কবি বললেন—

'সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী
কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি—
চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,
অর্ধেক তার নর।

তাজমহলের পাথর দেখেছ,
দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী,
বাহিরেতে শাজাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী,
শস্যলক্ষ্মী নারী,
সুষমালক্ষ্মী নারীই ফিরিছে
রূপে রূপে সঞ্চারি।'

●

নর বাহে হল, নারী বহে জল,
সেই জল মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল
সোনালী ধানের শীষে।'

পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী যেমন নির্ভরশীলা এবং বহু ক্ষেত্রে অবহেলিত ও নির্যাতিতা, তেমনি সমাজে যারা নিচতলার মানুষ, যারা মেহনতি লোক, ধনীর দুয়ারে তারা অনাদৃত। এই-ভাবেই আমাদের সামাজিক ইতিহাস এতকাল চলে আসছিল। কিন্তু নতুন যুগে যে নতুন প্রাণের কল্লোল প্রবাহ অনুভব করা গেল, তাতে নিচুতলার মানবগোষ্ঠীর একটা সর্বাত্মক জাগরণ আমরা লক্ষ্য করলাম। এই জাগরণের পিছনে আছে এদেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ও পাশ্চাত্য দেশীয় মানবিক মূল্যবোধের নবরূপায়ণের প্রেরণা। তাকে রূপ দিতে গিয়ে নজরুল লিখলেন---

'চির অবনত তুলিয়াছে আজ
গগনে উচ্চ শির,
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি
ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।'

এই সর্বাত্মক মানব জাগরণের অনুভূতি থেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে যে ইংরেজের পক্ষে বেঙ্গল রেজিমেণ্ট সৈনিক হয়ে নজরুল যুদ্ধে নেমেছিলেন, অবশেষে সেই ইংরেজই হলো তাঁর প্রধান শত্রু। তাদের শৃঙখল যতবারই তাঁকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করেছে, ততবারই তিনি চিৎকার করে বলেছেন:

'এই শিকল পরা ছল মোদের
এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবোরে বিকল।'

কি খিলাফৎ আন্দোলনে, কি গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালী যেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নজরুলের এ জাতীয় বহু গান গাইতে গাইতে কারারুদ্ধ হয়েছে, হাসিমুখে গলায় পরেছে ফাঁসির দড়ি, গেয়েছে---

'মোরা ফাঁসি পরে আনবো হাসি
মৃত্যু-জয়ের ফল,---
মোদের অস্থি দিয়ে জ্বলবে দেশে
আবার বজ্রানল।'

একদিকে তিনি যেমন যৌবন-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনি ভ্রাতৃকলহের উর্ধ্বে শত্রুর স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করে দিতেও তাঁর সমান প্রয়াস দেখেছি। তিনি বলেছেন---

'যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ
পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে
করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া'
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন,
করুক কলহ, জেগেছে ত তবু,
বিজয়কেতন উড়া।
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন,
স্বর্ণলঙ্কা পুড়া।'

এই জাতীয় আরও কয়েকটি কবিতা যেমন---'অগ্রপথিক', 'যৌবন-জলতরঙ্গ', 'অন্ধ স্বদেশ-দেবতা', 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত' প্রভৃতির মধ্যে আমরা নজরুলের শুধু জাতীয়তা-বোধকেই খুঁজে পাই না, সেই সঙ্গে বড় করে পাই আন্তর্জাতিক মানব-গোষ্ঠীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধকে।

কিন্তু এ ছাড়াও নজরুলকে পাই আমরা সামান্য কিছু নাটক, উপন্যাস ও ছোট গল্পকার হিসেবে। এগুলোর মধ্যে তাঁর 'রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থ দুটি এককালে কিছু জন-প্রিয়তা অর্জন করেছিল সন্দেহ নেই। নজরুলের জীবনকাহিনী যাঁরা জানেন, তাঁরা এই কাহিনীগুলির মধ্যে নজরুল-কেই বিশেষভাবে খুঁজে পাবেন; তবে গল্পগুলো গল্প হয়েও মহাকালের স্বাক্ষর রাখতে পারে নি পাঠকের মনে। সেখানে তাঁর কাব্যের পরেই সঙ্গীতের স্থান।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুলের প্রাণের সুষমা অত্যন্ত সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভাবব্যঞ্জনায় স্থানে স্থানে অসঙ্গতি না ঘটেছে, এমন নয়; কিন্তু তাঁর স্বকীয় প্রকাশভঙ্গী ও রচনারীতি বাংলা গানের ক্ষেত্রকে যে বহুদূর সম্প্রসারিত করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি আত্মলীলায় বা প্রাণের তাগিদে যত না গান রচনা করেছেন, ততোধিক গান তাঁকে রচনা করতে হয়েছে রেকর্ড ও ফিল্ম কোম্পানীগুলির তাগিদে। শুধু গান রচনাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই গানে সুরারোপও করতে হয়েছে। তার মধ্যে তাঁর অবকাশ একরকম ছিল না বললেই হয়। নতুবা তাঁর যে গীতিপ্রতিভা ছিল, তাতে বাংলা দেশে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে নজরুলের স্থান তাঁর প্রচলিত খ্যাতির আরও উর্ধ্বে গিয়ে পৌছাতে পারতো। তাঁর মতো একই সময়ে বহুতর ভাবের সঙ্গীত খুব কম গীতিকারই রচনা করতে পেরেছেন। কি শ্যামা বা মাতৃসঙ্গীত, কি জাতীয়-সঙ্গীত, কি ইসলামী গান, কি আধুনিক, ঝুমুর, ভাটিয়ালী ও গজল---সর্বত্র তাঁর লেখনী একই গতিতে চলেছে। তাঁর গান রেকর্ড করেন নি, কিছুকাল আগে পর্যন্তও এমন শিল্পীর সংখ্যা বাংলায় খুব কমই ছিল। তাঁর রচিত 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল', 'যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম', 'তুমি আর একটি দিন থাকো', 'কে বিদেশী মন উদাসী', 'বল্ রে জবা বল', 'খেলিছ এ বিশ্ব নিয়ে বিরাট শিশু আনমনে', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর

গুঞ্জন', 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার মনের বুলবুলি', 'পরমাত্মা নহ তুমি, তুমি যে পরমাত্মীয় মোর', 'জাতের নামে বজ্জাতি সব', 'নীলাম্বরী শাড়ি পরে নীল যমুনায় কে যায়', 'আমি যদি আরব হতাম মদীনারই পথ', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে', 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই', 'আমরা ছাত্রদল', 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'---প্রভৃতি গান বাংলার শিশু-বৃদ্ধ প্রত্যেকেরই জানা।

এ সব গানের রেকর্ড হাজার হাজার শ্রোতাকে দিনের পর দিন মুগ্ধ করেছে। এছাড়া হাসির গানেও নজরুলের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অন্যদিকে চারণের ভূমিকায় 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস', 'লীগ অব নেশন্স', 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট', 'রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্স' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি যে সমস্ত কমিক গান রচনা করেন, দেশ ও রাষ্ট্রের উপর তার প্রভাব ছিল অসামান্য। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তরভাবে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ আংশিকভাবে বাংলা সঙ্গীত-জগতকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন, সে-যুগে নজরুলের মতো আত্মবৈশিষ্ট্য-বাদী গীতিকারের অসাধারণ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়।

তিনি একাধারে ট্রেনার ও টেক্‌নিশিয়ান দুই-ই ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি নিজের কণ্ঠে কিছু গান রেকর্ড করেছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্তী জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বকাল পর্যন্ত ট্রেনার হিসেবেই তিনি কাজ করেছেন। এ-ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের ছাপ রয়ে গেছে।

এই সঙ্গীত থেকেই মূলত তাঁর সাধন-জীবন বা ঈশ্বরানুভূতির পথে যাত্রা। শেষ বয়সে তাঁর মনের মধ্যে এমন এক উন্নত দর্শন এসে আশ্রয় নেয়---যার মধ্যে কর্মের অবকাশে মাঝে মাঝেই তিনি এসে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। বাইরে থেকে অপরের পক্ষে তা উপলব্ধি করবার বিষয় ছিল না। ১৯৪১ সালের ১৬ই মার্চ বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে তিনি যে সভাপতির অভিভাষণ দেন, তার মধ্যে এই সাধন-লব্ধ পারলৌকিক দর্শনের কিছু মূর্ত আভাস আমরা পাই। তিনি বলেন।

'আমি কখন যে গভীর সমাধির অতল গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, তা আজও আমার স্মরণাতীত।---ঐ সমাধির মাঝে শুনতাম, অনন্ত প্রকাশ, জগৎ যেন আমায় ঘিরে কাঁদছে; 'ফিরে আয়, ফিরে আয়।' কেন যেন মনে হ'তো, ঐ নিথর নির্বিকার শান্তির পথ আমার নয়। সমাধির তৃষ্ণা যখন মিটল, পরম একাকীর পরম শূন্য সেদিন যেন আমার সাথীহীন একাকিত্বের বেদনায় কেঁদে উঠলো। সেই রোদনের অসীম প্রবাহ-মূলে দেখা পেলাম আমার চির-চাওয়া পরম সুন্দরের।---যদি তাঁর অনন্ত শ্রীর একটি রূপরেণুকেও আমার কাজে, গানে, সুরে আজ রূপ দিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি ধন্য হবো---পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হবে।---আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন-মরণ তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। ---আমার এই পরম মধুময় অস্তিত্বের প্রেম-শক্তিতে আত্মসমর্পণ করে আমি বেঁচে গেছি, আমার অনন্ত-জীবনকে ফিরে পেয়েছি।'

এই অনুভূতি থেকেই তিনি 'আমার সুন্দর' নিবন্ধটি রচনা করেন---যার মধ্যে তাঁর অধ্যাত্মচেতনা পূর্ণ-রূপ লাভ করেছে।
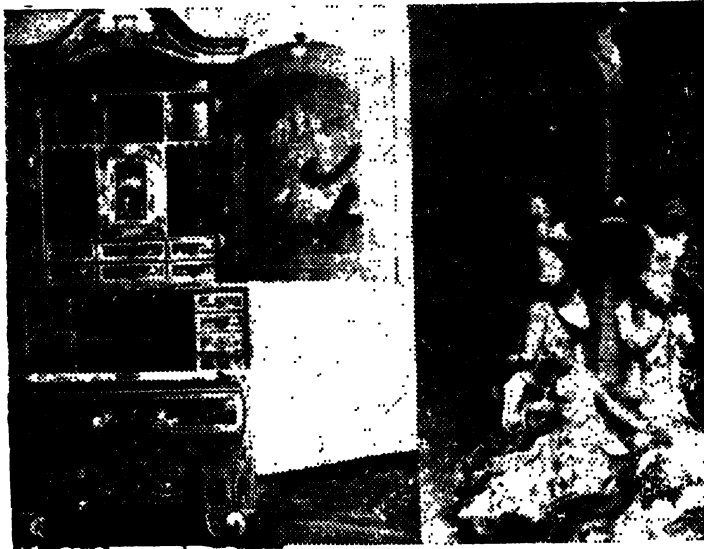
ফরাসী ও জার্মান ঐতিহ্যমণ্ডিত ২০০ বৎসরের প্রাচীন মনোজ্ঞ সম্পদ ফ্রাঙ্কফুর্টের মিউজিয়ামে ইহা রক্ষিত ছিল। সৌন্দর্যের জয় সর্বকালে ও সর্বত্র।

—মুক্তিকুমার মুখোপাধ্যায়

মাসিক
বসুমতী
শ্রাবণ / '৭৫

তিয়াসা
—অজিতকুমার কর্মকার

মাসিক

বসুমতী

শ্রাবণ / '৭৫

শহরতলী

—সুবীরকুমার নাথ

পাহাড়ের দান

—দীপঙ্কর সেন

পারের যাত্রী

—সুদেব ঘোষ

মাসিক
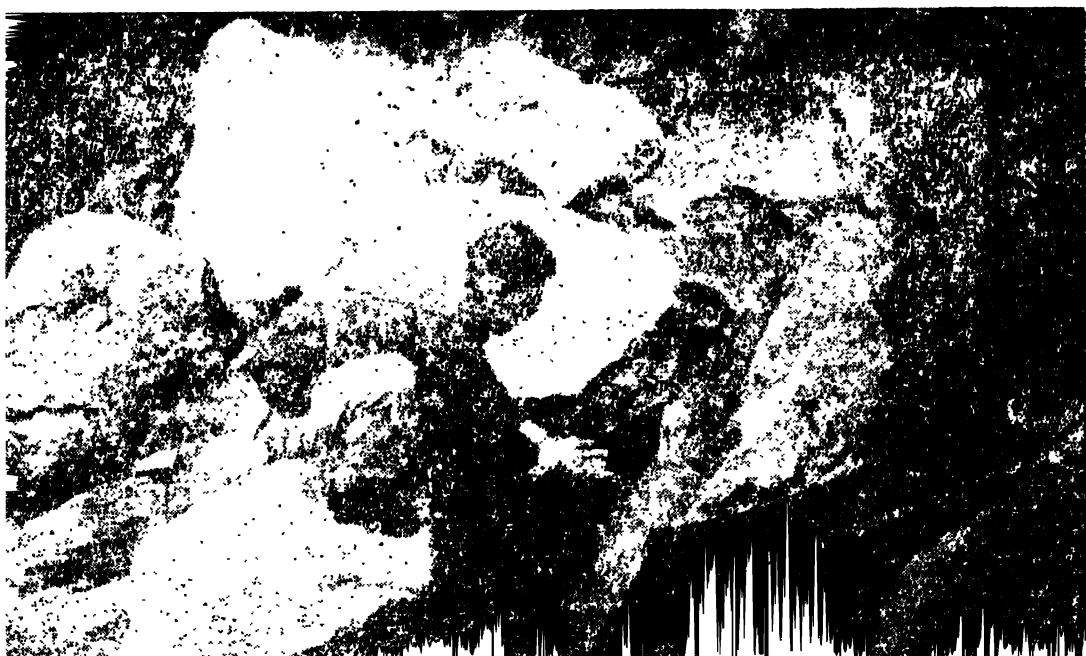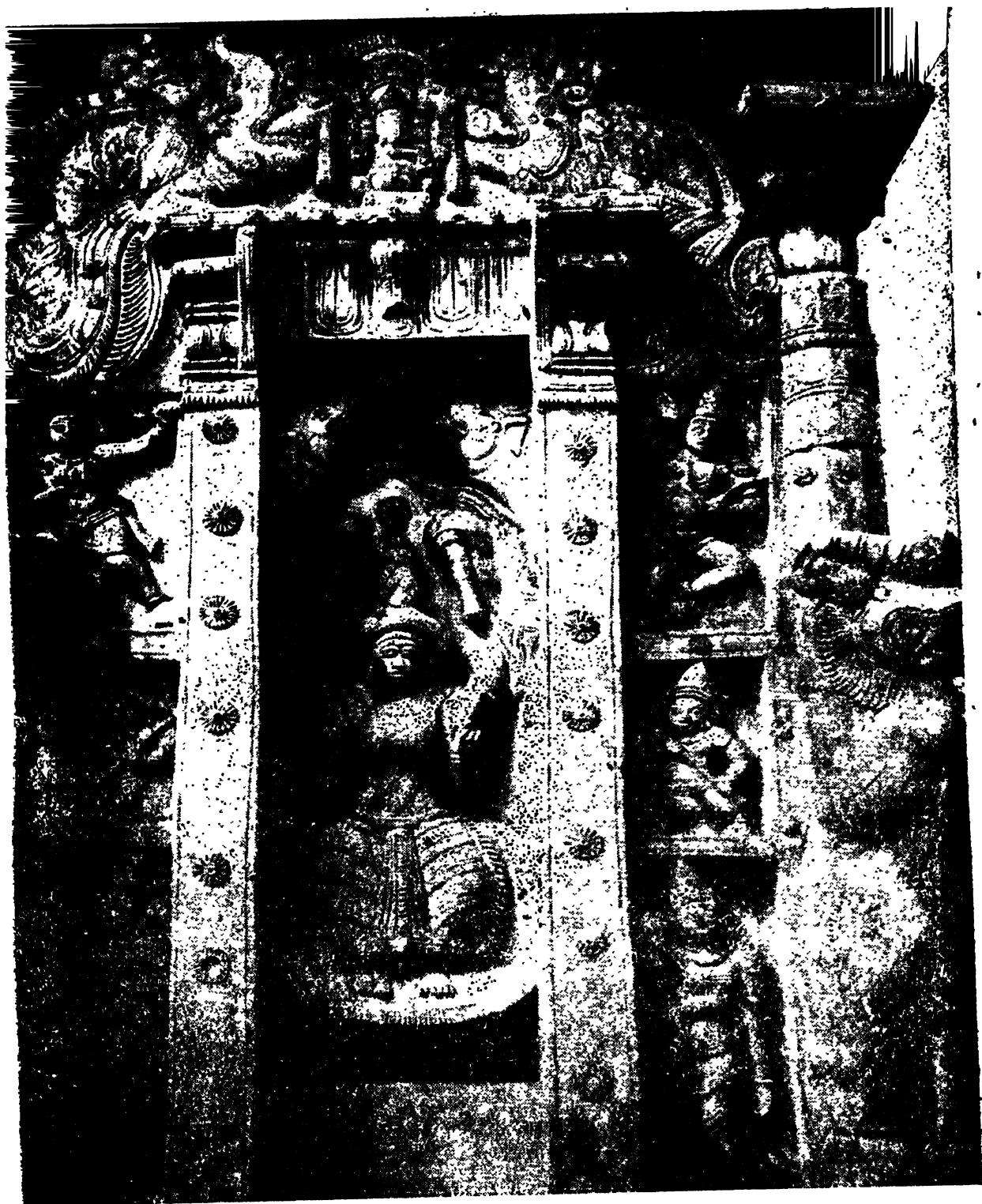
বসুমতী

শ্রাবণ / '৭৫

গজলক্ষ্মী (কৈলাসনাথ)

মাসিক

বসুমতী

শ্রাবণ / '৭৫

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদ্ভুত—অদ্ভুতানন্দ

[লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা]

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় লাটু, আজ্ঞাবাহী সেবক লেটো, স্বামীজীর আদরের প্লেটো ভক্ত রাম দত্ত পরিবারের বালক ভৃত্য লালটু,---কলকাতায় তার আবির্ভাব হতে আরম্ভ করে বারাণসী ধামে তিরোভাব পর্যন্ত সবই অদ্ভুত লীলামাধুর্যে ভরপুর। তাইতো সন্ন্যাস গ্রহণের পর ত্রিকালজ্ঞ স্বামীজী তাঁর নাম দিয়েছিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। চলতি কথায় পরিচয় ছিল লাটু মহারাজ।

ছাপরা জেলার এক নগণ্য গ্রাম। কৃষ্ণবর্ণ সুঠাম সরল বালক, মাঠে মাঠে রাখাল বালকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, কোঁচড়ে হয়তো চানা ভাজা, খররৌদ্রে তাপিত হয়ে বিশ্রাম নেয় বটের ছায়ায়। রাখালদের সঙ্গে হেসে খেলে দূরদূরান্তে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আবার হয়তো এসে বসতো বনস্পতির ছায়ায়। তার শৈশবের এই ছবিটি যেন এক উদাস-সঙ্গীতের মূর্ছনায় ধ্বনিত---

'দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা
গেল খেলে॥
গাইল কি গান সেই তা জানে---'

শৈশব জীবনে নির্জন মাঠে একাকী আপন মনে যে গান সে গাইতো, পরবর্তী জীবনের দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার কূলে বসে সেই গানই করতো। 'মনুয়ারে সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে'---। হৃদয় নিঙড়ানো গানের এই কলিটুকু শুনেই এক সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন---'ওরে! তোর এতেই হবে।'

মাতৃপিতৃহীন বালক এলো কলকাতায় কাকার সঙ্গে। বহাল হয়ে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত রাম দত্তের গৃহ-ভৃত্যরূপে। নাম কি? রাখতুরাম। বাড়ির মেয়েরা ডাকাতে লাগলেন লালটু বলে। ডনকুস্তী করে সুঠাম দেহ হলো আরও সবল। দৃঢ় পেশীযুক্ত হাত দু'খানি সদাই কর্মব্যস্ত। কর্মমুখরও সে। স্পষ্ট বক্তা, ভৃত্যের মুখে অশোভন নিশ্চয়ই। রাম দত্ত ভালোবাসেন, তাই সাত খুন মাপ হয়ে যায়। ও বাড়িতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনছে অহরহ, আর কেমন একটা দর্শন ব্যাকুলতা জাগতে থাকে তার অন্তরে।

ভক্তি প্রসঙ্গ চলে রাম দত্তের বাড়ি প্রতিদিন। নিরক্ষর ভৃত্যটি উৎকর্ণ হয়ে শোনে, যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণের বুদ্ধি ক্ষমতা নেই। শুধু হৃদয়ঙ্গম হয়, আর বাড়তে থাকে ব্যাকুলতা। সুযোগ অবশেষে এলো।

ইন্দ্রাণী দেবী

প্রথম দর্শন। রামদত্ত নিয়ে গিয়েছিলেন লালটুকে ভৃত্য হিসেবে সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দা। লালটু চুপ করে দুয়ারে কাছে দাঁড়িয়ে। মনিব রামবাবু কক্ষে প্রবেশ করলেন। ঠাকুর একটু বাইরে গিয়েছেন। সহসা ঠাকুরকে আসতে দেখা গেল ঘরের দিকে রাধিকার কীর্তন গাইতে গাইতে---'তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে, কথা কইতে পেলুম না। আমার বধূর মনে কথা হলোনা, দাদা বলাই ছিল সাথে তাই কথা হলো না।'

অন্তর্যামী পুরুষ লালটুর দরজার কাছে দাঁড়ানো ছবিটি যেন লীলাচ্ছলে ব্যক্ত করে দিলেন। আহা, লালটু যে সন্ত্রস্ত, উদগ্রীব, ব্যাকুল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চেপে বাইরে দাঁড়িয়ে। মনিব ঘরে ঢুকেছেন, সে যে ভৃত্য; তার যে বাধা অনেক। কিন্তু সকল বাধার অপসরণকারী সেই ত্রিলোকসুন্দর প্রথমেই এসে দাঁড়ালেন পশ্চিমের বারান্দায় দীন বালকের সম্মুখে। শ্রীমুখে সেই কীর্তনের আখর---'তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে, বধূর সনে দেখা হলো না'---এ লালটুর মনিব বেরিয়ে এলেন বারান্দায়, ঠাকুর অমনি বললেন---'এ ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছো? রাম! একে কোথা পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।'

লালটুর বুকের মধ্যে কি তখন উথাল পাথাল করে ওঠে নি? শ্রীমুখ হতে একী অভিনব বাণী এসে ঘা দিল মর্মের মাঝখানে। ঠাকুরের সঙ্গে রামবাবু ঘরে ঢুকলেন। লালটু দাঁড়িয়ে রইলো তেমনি আনত মুখে। কিছু বলবার বা করবার তার সাহস কোথায়। সে যে রামবাবুর ভৃত্য, না ডাকলে তো যাওয়া যায় না। সুযোগ এলো। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল বললেন---'যাওনা ভেতরে।'

লালটুর অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ। কিন্তু যাঁর জিনিস তিনি আর কতক্ষণ থাকতে পারেন। ঠাকুর নিজেই ডেকে নিলেন ঘরের মধ্যে। লালটু পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলো। তারপর করজোড়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো ঠাকুর আর মনিবের মধ্যে কথাবার্তা। বালকের প্রতি চেয়ে চেয়ে ঠাকুর কথার ফাঁকে ফাঁকে হেসে হেসে বলছেন---'বোস্ নারে, বোস।'

পরম পুরুষ তো জানতেন কে এসেছে তাঁর কাছে, কী ওর ভবিষ্যৎ, ইঙ্গিত দিলেন যেন সে কথারই রাম দত্তকে।

বলছেন তখন ঠাকুর, 'যারা নিত্য সিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে—জ্ঞান চৈতন্য রয়েছে। তারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা। মিস্ত্রী এখান সেখান ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গায় চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর ফর

[illegible] জল বেরুতে থাকে—। কথাগুলো বলেই সহসা লালটুকে স্পর্শ করে সেই পাথরের চাপ যেন সরিয়ে দিলেন ঠাকুর।

আর যায় কোথা, লালটুর হৃদয় মথিত করে যেন ভগবৎ প্রেম উৎস উপচিয়ে উঠলো, হুঁশ রইলো না তার, দেহটাই শুধু সোজা হয়ে রইলো, রোমরাজি খাড়া হয়ে উঠলো পুলকাননে, কণ্ঠস্বর গদগদ, কম্পিত কলেবর, দু'নয়নে দর দর অশ্রুধার। এ জগৎ-সংসারে সে যেন আর নেই। এই অশ্রু-বাষ্পবিগলিত মূর্তি বিস্ময়ান্বিত করলো রাম দত্তকে।

ঠাকুর তো মিস্ত্রীর কাজ সেরে নিয়ে উপভোগ করছেন সেই সাত্ত্বিক ধন পবিত্র রূপ। লালটু কাঁদছে তো কাঁদছেই,—তার কান্না বুঝি আর থামে না।

অবশেষে রাম দত্তেরই অনুরোধে আবার স্পর্শ করলেন বালককে, আর সাময়িকভাবে যেন পাথরটা ঠেলে ফোয়ারার মুখটা চাপা দিয়ে দিলেন।

বিদায়কালে রামবাবুকে বললেন ঠাকুর, 'ওরে! ইখানে ওকে মাঝে মাঝে পাঠাবি।' আর লালটুকে বল্লেন,—ওরে! আসিস, এখানে মাঝে মাঝে আসবি। জানিস।'

মনিব-গৃহে ফিরে এলো লালটু। কিন্তু এ কোন লালটু? কর্মতৎপর, আজ্ঞাবহ, কলরবমুখর ভৃত্য লালটু তো নয়! এযে উদাস-কর্মবিমুখ, চিন্তাক্লিষ্ট স্বপ্নাতুর লালটু। দত্ত গৃহ যেন সহসা নীরব হয়ে গেল। সবাইর চোখে পড়লো এ পরিবর্তন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে, লালটু ছটফট করে দক্ষিণেশ্বরের জন্য। সুযোগ এলো আবার সেখানে যাবার।

মনিব প্রদত্ত ফলমূল নিয়ে সেখানে যাবার আগ্রহ দেখালো লালটু,—'হামাকে দিবেন, হামি আপুনার সব উখানকে লিয়ে যাবে। হামনে সব ঠিক পহুঁচা দিবে।' এবার একাই সে গেল এক বসন্তকালের প্রভাতবেলায়। কলকাতা হতে ছয় মাইল পথ হেঁটে।

মন্দিরে [illegible] বাজছে। রোশন চৌকী বাজছে।—আনন্দের নেশা ধরে গেল লালটুর। কুসুম সুরভিত উদ্যান পথে চলছে লালটু, আ একটু গেলেই দেখা মিলবে তার বাঞ্ছিত জনের। যে তাকে 'কাজ ভুলো' করে দিয়েছে, সকল কর্ম হরণ করে কী এক মধুর বেদনায় কেবলি দিন রাত আকর্ষণ করে চলেছে তাকে। আর বেশী অগ্রসর হতে হলো না। সেই বসন্ত প্রভাতে ফুল কাননে অপূর্ব শোভাময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লালটুর পরম নিধি। এক ছুটে গিয়ে প্রণত হয়ে পড়লো চরণে,—দীর্ঘ প্রণাম; নিজেকে যেন নিবেদন করে দিল লালটু, স্নেহে-আদরে ঠাকুর গ্রহণ করলেন তাকে।

পূজা আরতির পর বালককে কাছে বসিয়ে প্রসাদী অন্ন ভোজন করালেন। পুণ্যবান লালটুর জীবনে দ্বিতীয় দর্শনেই এত কৃপালাভ। সন্ধ্যায় তাকে ফিরে যেতে হলো মনিব গৃহে। এবার তার কাজকর্মে শুধু উদ্যমহীনতাই নয়, মনিব বাড়ির আদেশগুলো যেন পীড়া দিতে লাগলো তাকে। অনিচ্ছায় বিষণ্ণ মুখে কোন প্রকারে কাজ সারতে লাগলো। চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাম দত্ত। এ কী হলো লালটুর? হঠাৎ তার এই অদ্ভুত পরিবর্তন কেন? ঠাকুরের কাছে বললেন একদিন সব।

ঠাকুর তখন বললেন—'ওগো রাম! এমনটি হয়ে থাকে। ইখানকে আসবার জন্যে ওর মন কেমন করে। একদিন তাকে পাঠিয়ে দিস্।'

●

এই যে 'মন কেমন করা' 'এমনটি হয়ে থাকে',—এসব যে লাটুর হৃদয়ে পূর্ব রাগের সূচনা, ঠাকুর তারই ইঙ্গিত দিলেন। রামবাবু অবশ্যি পরদিনই লাটুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে।

সেখানে গিয়ে আর বাড়ি ফিরতে চায়না লাটু। ঠাকুর কত বুঝান। 'খবরদার অকৃতজ্ঞ হবিনি, রাম তোর আশ্রয়দাতা ত্রাতা, খেতে পরতে দেয়, রামের সংসার যে আমার সংসার। কিন্তু যার হৃদয়াকাশ রঙিন হয়ে উঠেছে নব অনুরাগের রাঙতায়, তার মন সাংসারিক যুক্তি মানতে চাইছে না কোন মতেই। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে,—'হামনে আপুনার ইখানকে থাকবে। আর নকরি করবে না। আপুনার কাজ হাম নি কোরবে।'

ঠাকুর আবার বুঝান কত রকম করে। লাটুর এক কথা—'হামি আর যাবে না উখানে। হামি ইখানে থাকবে।'

ঠাকুরের চিকিৎসক কবিরাজমশাই উপস্থিত ছিলেন সে সময়। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন,—'আমিও আর ইখানে থাকছি না রে। কবিরাজের দিকে ইঙ্গিত করে কথার জের টানলেন,—এনারাই তো আমাকে দেশে যেতে বলছেন। দেশ থেকে ফিরে আসি, তখন এখানে আসবি। কি বলিস?'

আর কিছুই বলবার রইলো না লাটুর। বিষণ্ণ শূন্য হৃদয় নিয়ে ফিরে গেল কলকাতায় মনিব গৃহে। শুধু সম্বল রইলো শ্রীমুখের বাণী—'সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরে রাখবে। বড় মানষের বাড়ির দাসী সব কাজ করছে কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে—'আমার রাম। আমার হরি।' কিন্তু মনে বেশ জানে এরা আমার কেউ নয়।'

ক্ষণিকের পাওয়া পরম রতন যেন হারিয়ে গেল চোখের সম্মুখ হতে। বিচ্ছেদের ব্যথায় উচাটন কিশোর ছুটে ছুটে আসে দক্ষিণেশ্বরে। আছে সবই। সেই উচ্চচূড় মন্দির, রৌশনচৌকী, কুসুমাস্তীর্ণ কাননবীথি, সেই গঙ্গা—, তবু শূন্য, শূন্য চারিধার লাটুর কাছে। অসহায় অবলম্বনহীনের জীবনে এক অস্থির ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে, কোথা চলে গেলেন তিনি তাকে ফেলে? তবু ওরই মধ্যে ব্যথাতুর মন যেন বলে ওঠে—

'ওগো কভু সুখের ক্রভু দুখের দোলে
মোর—জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে—
তুমি আমায় ভালোবেসেছো।'

এই 'ভালোবাসাটুকু' বুকে করে সে কাঁদছে, বিচ্ছেদের, বিরহের কান্না। উদ্যানপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে উদাসী বালক, যাচ্ছে পঞ্চবটিতে, এখানে বুঝি বা রয়েছে তাঁর সজীব অস্তিত্ব। সকাল থেকে চলে তার প্রভুর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলোর পরিক্রমা। সন্ধ্যায় নির্জন গঙ্গার কূলে বসে অঝোরে অশ্রু-বিসর্জন। এ কান্না চোখে পড়ে গেল ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদার। রাম দত্তের বাড়ি কোন কারণে তিরস্কৃত হয়েই কি পালিয়ে এসে এখানে বসে কাঁদছে বালক। সন্দেহাকুল হয়ে প্রশ্ন করে জানলেন তিনি দিনমান এভাবে ঘুরে মরা, এ ক্রন্দন তার পরমহংসদেবের জন্য। তাঁর দূর প্রভাব কামারপুকুর গেলেও তিনি এখানে আছেন, তিনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন। দর্শন ও প্রণাম না করে সে কলিকাতায় ফিরবে না। রামলাল নির্বাক হয়ে চলে গেলেন মন্দিরে আরতি করতে।

মন্দিরের কাজ সাঙ্গ করে বালকের জন্য প্রসাদ নিয়ে এলেন তিনি গঙ্গাতীরে। বিস্ময়ে চমকে উঠলেন রামলাল। এই নির্জন সৈকতে কাকে প্রণাম করছে লাটু ভূলুণ্ঠিত হয়ে!

বালক মুখ তুলে আশ্চর্য হয়ে শুধালো রামলালকে 'পরমহংসমশাই কুথায় গেলেন?'

বিশ্বাসের নৌকোয় ভালোবাসার রজ্জু দিয়ে কি বালক বেঁধে এনেছিল ঠাকুরকে? লাটু যে নিত্য সিদ্ধ, তার পক্ষে অসম্ভব নয় এ দিব্য দর্শন। এই বিরহকাতরতার মধ্যে অবিরাম বিনিদ্ররজনী রামনাম জপ চলছিল লাটুর।

সেও এক আশ্চর্য লীলা ঠাকুরের। তা নইলে নিত্যানন্দ অবধূতই বা কেন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে রাম দত্তের বাড়িতে শয্যাগত হয়ে রইলেন আর মনিবের আদেশে লাটু শুধু তাঁর সেবাশুশ্রূষাই নয়, রাত জেগে জেগে রামনামরূপ রসায়ন পান করাতে লাগলেন।

ওই নামরূপ সুধা পান করা তিনি রোগযাতনা ভুলে সুস্থ বোধ করতেন। তাই লাটুর প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল এ দাওয়াই পান করবার। এ যেন ভক্তের অন্তর মধ্যস্থ বৈঠকখানা সাজিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত রাখা। তাঁর আসার সময় যে হয়ে এলো! তাই এক সন্ন্যাসীর সেবার মধ্য দিয়ে ধৈর্যে সহ্যে, একনিষ্ঠতার নামজপে অভ্যস্ত করিয়ে লাটুকে যেন একটি স্বর্ণময় ঘটের ন্যায় ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখলেন। এখন থেকে ওই আধার যেন ঠাকুরের জন্যই সংরক্ষিত হয়ে রইলো।

কামারপুকুর হতে দীর্ঘ আটমাস পর ঠাকুর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। প্রথম দিনেই কলকাতায় ভক্তবর রামদত্তের গৃহে---সপ্তমী পূজোর দিন। লাটুর দেহ মনে যেন পিঞ্জরমুক্ত পাখীর আনন্দ। কথামুখর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলো সে।

রামবাবু বুঝলেন সব। এরপর এলো একদিন শুভ লগ্ন---পরম লগ্ন লাটুর জীবনে। পূজোর পর এক ছেলেকে পেয়েছে দক্ষিণেশ্বরে যেতে হলো লাটুকে প্রভুপ্রদত্ত কল-মিষ্টান্নাদি নিয়ে ঠাকুরের কাছে।

কার্তিকের ছোট সন্ধ্যার রাত নেমে এলো। ঠাকুর বললেন তাকে রাতটা থেকে যেতে। রাত্রিতে ঠাকুরের পদসেবার অধিকার পেল লাটু। দিব্যদেহের স্পর্শে লাটুর ভাবুক মন উন্মনা করে উঠলো কী এক মধুর আনন্দ-বেদনায়।

নানাভাবে ঠাকুর প্রশ্ন করছেন ভাবী সাধককে। তার ঘুম পেয়েছে কি না, ভয় করছে কি না, মনটা কেমন কেমন করছে কি না। সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল লাটু 'না'। তার কিছুই হয় নি।

তারপর শেষ পর্যন্ত তার একটা অদ্ভুত স্তম্ভিত ভাব দেখে ঠাকুর যখন বললেন,---'হ্যাঁরে! তোর কি হয়েছে? অমন করে চেয়ে আছিস কেন?'

ভাঙা অশ্রুবন্যায় ভাসতে লাগলো লাটু।

ঠাকুর কিন্তু বেশ ভালোমানুষটির মত জিজ্ঞেস করছেন, 'হ্যাঁরে। তুই কাঁদছিস কেন রে? তোর হোল কি? কি হয়েছে বল না রে'? সেখানে উপস্থিত কেদারবাবুকে আবার জিজ্ঞেস করছেন---'দেখ গো, এ ছেলেটি কেবল কাঁদছে, কিছুই বলছে না'।

কেদারবাবু ভক্ত মানুষ, তিনি ঠিক উত্তরটিই দিলেন---'এত আপনারই লীলা। আপনি এই ছেলেটির মধ্যে শক্তি সঞ্চার কোরেছেন, তাইত এমনভাবে জমে গেছে'।

সেই রাত্রিতে সেবাধিকার দিয়ে শক্তি সঞ্চার করে দীক্ষা দিয়েছিলেন ঠাকুর লাটুকে। লাটুর শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র আধারটি এবার চলে গেল ঠাকুরের নিজস্ব অধিকারে, এখন হতে লাটু হয়ে গেল ঠাকুরেরই জিনিস, তাকেই নাড়াচাড়া করবেন তিনি। দিব্যজীবন শুরু হয়ে গেল লাটুর। ঠাকুরের লাটু, নেটো।

লাটুর সেখানে বিচরণ করতে লাগলো রাম দত্তের বাড়ি, মনপ্রাণ পড়ে রইলো দক্ষিণেশ্বরে। মনের মানসে সেই পরম নিধিকে রেখে নানাভাবে সেবা করতো লাটু। তার মানসপূজা সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে বাস্তবতার মধ্যে। যোগাযোগে সে বলতে লাগলো ঠাকুরকে তার সেবা করার আকাঙ্খার কথা।

নানাদিক রক্ষে সহজে এসে যাচ্ছে সুযোগ এনে দিলেন লাটুর জীবনে। 'সেবা সেবকের' পুনর্মিলন। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহামায়ারই লীলা। ঘটনাচক্রে হঠাৎ মুলুকে চলে যেতে হলো সব চুকিয়ে বুকিয়ে, আর ঠাকুর চাইলেন তখন শুদ্ধসত্ত্ব কিশোরকুমার লাটুকে, অশুদ্ধ আধারের কোন কিছু সহ্য করতে পারতেন না তিনি সে সময়। অতএব চিরজন্মের মত লাটু চলে এলো তাঁর পরম নিধির পদাশ্রয়ে।

লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টাও ঠাকুর

যেমন 'ক' বলতে গিয়ে কৃষ্ণ বলে কেঁদে আকুল, আর লাটুকে দেখা যাচ্ছে 'ক' বলতে গিয়ে 'কা'---বিহারী জিহ্বা এর বেশী আর এগুতে চাইলো না। এও এক বিচিত্র কাণ্ড। লীলাচ্ছলে দেখতে চাইলেন ঠাকুর, লেখাপড়া লেখাপড়া করে শুধু রাশি রাশি পুস্তক ও শাস্ত্রাদি পাঠ করলেই ঐশ্বরিক জ্ঞান হয় না; দর্শন তো দূরের কথা। যে ঈশ্বরের নামে কেঁদেছে সে-ই ভক্ত, সে-ই জ্ঞানী। ভগবানকে জানলে, উপলব্ধি করলে আর কিছু জানবার রইলো না। তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে জড়িয়ে ধরে দিবানিশি মেতে যাও লীলাবিলাসে ---সেই তো পরম পাওয়া। ভক্ত-ভগবান, পূর্ণের সঙ্গে অংশের আনন্দবিলাস।

ঠাকুরেরই কথা, যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হোয়েই রয়েছে'। তাই তো একসময় অর্ধবাহ্যদশায় ঠাকুর বলেছিলেন লাটুকে,---'ওরে লেটো, তোর মুখ দিয়ে একদিন বেদবেদান্ত ফুটে বেরুবে'।

এ কথার চরম সত্যরূপ দেখা গিয়েছিল---যখন তিনি লাটু মহারাজ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ। ঠাকুরের প্রিয় সন্তানদের মধ্যে গুরুর আজ্ঞা লাটুর মত এমন জীবনপাত করে আর কেউ পালন করেছেন বলে জানা নেই।

দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একবার রাত্রির প্রথম প্রহরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; ঘুম-কাতুরে ছিলেন। ঠাকুরের চোখে পড়তেই তিরস্কার করে বলেছিলেন---'হ্যাঁরে! এখনই যদি ঘুমোবি, তবে জপধ্যান করবি কখন? রাত ন'টা বাজে নি এরি মধ্যে ঘুমোচ্ছিস! কোথায় তুই রাতভোর ধ্যান করবি, ধ্যান করতে করতে কখন যে রাত কেটে যাবে জানতে পারবি নি, তা না, এরই মধ্যে ঘুমে চোখ ঢুলে পড়ছে। তুই কি এখানে শুধু ঘুমোতে এসেছিস?

মর্মস্থলে এ তিরস্কার তাঁকে অনুতাপে ধিক্কারে করলো জর্জরিত। তারপর থেকে লড়াই করতে লাগলেন ঘুমের সঙ্গে। ঘুম-নিয়ে নৈশ গঙ্গার কূলে কূলে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। চোখের পাতা বুজে আসতো, ওঃ কী দুঃসহ যাতনা---ছটফটিয়ে রাত ভোর করতেন। এভাবে প্রায় দু' বছর কঠোর চেষ্টা ও নিষ্ঠার পর ঘুম জয়ী হয়েছিলেন তিনি। লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে বলেছিলেন তিনি, 'হামনে আর কোনদিন এমন সময় ঘুমাবে না'। এই প্রতিজ্ঞা আমরণ পালন করে গেছেন তিনি। নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েও ডাক্তার বা অন্য কারুরই কথা গ্রাহ্য করেন নি, সন্ধ্যারাতে তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দেওয়া হতো। তাঁর এমনই অদ্ভুত মনোবল ছিল যে, নিদ্রা তাঁকে কখনো বশীভূত করতে পারে নি; নিদ্রাই হয়েছেন তার দাস, তিনি হয়েছিলেন অর্জুনের ন্যায় গুড়াকেশী। সমস্ত রাত তিনি জপধ্যানে মগ্ন থেকে ইষ্টের সঙ্গে মিলে থাকতেন পরমানন্দে। দিনের কর্মকোলাহলের মধ্যে মিশে কর্মব্যস্ত থাকার মধ্যেও ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন তিনি। যদু মল্লিকের বাগানে পাতা কাটতে গেছেন, দাঁড়ানো অবস্থাতেই সমাধি-মগ্ন হয়ে পড়লেন।

ঠাকুর নিজে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর নিজের চরণ স্থাপন করে চাপ দিলে পর লাটুর সম্বিৎ ফিরে আসে। কোন কোন সময় এমনও হয়েছে যে ঐরূপ ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় ঠাকুর তাঁর বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসে ডলে ডলে তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর সাধক-জীবনের তুলনা কোথায়! তিনি তাঁর দেহমন, মনুষ্য-জীবনের ইচ্ছা অনিচ্ছা---যথাসর্বস্বই ঠাকুরকে নিবেদন করে 'কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়'---এই অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন।

লাটুর কার্যকলাপ, প্রতিটি আচরণ এমনই আকর্ষণীয় এমনই অদ্ভুত যে, ভাবতে গেলে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীমা'র সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করে কলকাতায় ফিরে আসতেই স্বামীজী বললেন, 'ওরে! আমরা সব বিরজাহোম করে সন্ন্যাস নিয়েছি, তুইও নিয়ে নে'।

লাটু সম্মত হলেন। কিন্তু তাঁর [illegible] অদ্ভুত। শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস গ্রহণ মানেই পূর্বাশ্রম জীবনের মৃত্যু, আর বিধি রয়েছে যে বিরজাহোম করার পূর্বে পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদান করতে হয়।

লাটু তাঁর দেশাচার অনুযায়ী মন্ত্র-পাঠাদি কিছু করলেন না। প্রাণের আবেগে পিতৃপুরুষকে আহ্বান করে বলতে লাগলেন---'এ মেরা বাপজী! হিয়া আয়। হিয়া পর (আসন দেখিয়ে) বৈঠ। এই পূজা লে, এই পিণ্ড লে, এই পানি লে।' বাস হয়ে গেল পিণ্ডদান। এই অদ্ভুত কাণ্ড তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর চলনে বলনে, গুরুভক্তি ও সেবা নিষ্ঠার যে অদ্ভুত জলন্ত নিদর্শন রয়েছে, তা শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী-মাত্রেরই জানা আছে। ছাপরা জেলার নগণ্য গ্রাম হতে কলকাতায় এসে অদ্ভুত-ভাবে তাঁর ঠাকুরের কৃপালাভ, তাঁর নিশি দিনের সেবক, শ্রীমার গৃহস্থালী কাজের একনিষ্ঠ কর্মী, গুরুভাইদের জন্য তাঁর অঢেল ভালোবাসা, রোগে শুশ্রূষা,---অদ্ভুত তাঁর নিষ্পাপ হৃদয়ের সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গী---সবই তাঁর অদ্ভুত। তাই বুঝি জ্ঞানসূর্য বিবেকানন্দ লাটুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নূতন নামকরণ করলেন, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, চলতি কথায় লাটু মহারাজ।

তাঁর সরল বাংলা কথার মধ্যে বিহারী উচ্চারণভঙ্গী সত্যি ভারি মিঠে শুনাতো। তিনি শুষ্কহৃদয় কঠোর সন্ন্যাসী ছিলেন না। বিহারী উচ্চারণে তাঁর বাংলা হাস্যকৌতুক রসের কথা পড়তে পড়তে এ যুগের আমরাই হেসে কুটি কুটি হয়ে যাই, আর যাঁরা সে যুগে এসব কাছে বসে উপভোগ করেছেন তাঁদের তো কথাই নেই। গুরুভাইদের সম্বোধনের ভঙ্গী---হ্যাঁ ভাই শরোট, হ্যাঁ ভাই লোরেন, তারপরই মজার মজার কথা। একবার বীরভক্ত গিরিশ চন্দ্রের বাড়িতে রাখাল মহারাজ কথায় কথায় বললেন,---দেহধারণ করলেই রোগশোকে ভুগতে হয়---এগুলো যেন শরীর ধারণের ট্যাক্স; না দিয়ে নিস্তার নেই। [illegible]

যেন একটুকরোর মধ্যে একটা মৌমাছি উড়ে এসে রাখাল মহারাজের কানের কাছে হুল ফুটিয়ে দিল। যন্ত্রণা প্রশমিত করার জন্য গিরিশ সেইস্থানে লাগিয়ে দিলেন একটু পান খাওয়ার চুন। আর যায় কোথা, লাটুমহারাজ অমনি কৌতুকে ফেটে পড়ে বলে উঠলেন---'রাখাল তোর ট্যাক্স লিচ্চেরে, তোর ট্যাক্স লিচ্ছে'। যন্ত্রণার মধ্যেও নিশ্চয়ই রাখাল মহারাজও হেসে উঠেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে গুরুভাইদের মজার অন্ত ছিল না। শিবানন্দ-মহারাজ একদিন অনুপস্থিত দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে একটু টিপ্পনী কেটে কথা বলেছিলেন কোন একটা ব্যাপার নিয়ে।

লাটু মহারাজ বাংলা প্রবাদবাক্য ছুঁড়ে অমনি বলে উঠলেন--- 'দেখো শরোট! হামি তো আগেই বলেছি, শ্যালারা মাসতুতোয় মাসতুতোয় চোরে ভাই'।

আর যায় কোথা, হাসির ছল্লোড় পড়ে গেল গুরুভাইদের মধ্যে। তারপর প্রবাদ-বাক্যের এই পেটকাটা পরিণাম নিয়ে ক্ষেপানো।

আরেক দিনের কথা। সূক্ষ্ম রসবোধ ও হেঁয়ালীতেও কম ছিলেন না তিনি। একদিন তিন ডাক্তার চুণীলাল বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, নিতাই হালদার বলরাম মন্দিরে উপস্থিত। লাটুমহারাজ তিন চিকিৎসককে একসঙ্গে দেখেই টিপ্পনী কাটলেন------'এখন কি চিত্রগুপ্তের ছুটি নাকি?'

ডাঃ কাঞ্জিলাল বল্লেন, এখন কলকাতায় সিজন ভালো, অসুখ বিসুখ কম'। হাসতে হাসতে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললেন লাটুমহারাজ, 'তাই বুঝি তিনে মিলে হামাদের আশীর্বাদ নিতে এসেছেন; বাকী হামনে এতে আশীর্বাদ দিবে না'। এমনি ধারার বহু রসকৌতুকের কথা রয়েছে লাটুমহারাজকে ঘিরে।

তাঁর সন্ন্যাসজীবনে গুরুভাইদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সাধু বলে সম্বোধন করতেন, প্রণাম করতেন। লোকের গুণ ও লক্ষণ থাকা দরকার, লাটুমহারাজ সেই দিক দিয়ে ছিলেন পূর্ণতম।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দের কথা। বীরভক্ত গিরিশ ঘোষ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলেছিলেন, 'গীতার সাধু দেখতে চাও তো লাটুকে দেখগে'।

ভক্ত নবগোপাল ঘোষের উক্তি---'তখন তাঁকে দেখে মনে হতো তিনি যেন এই পৃথিবীর সঙ্গে সব লেনাদেনা শোধ করে বসে আছেন। সেই সময়ে তাঁর নিজস্ব কোন কামনা ছিল না। তখন তাঁহার আহারে রুচিবোধ ছিল না, অনাহারেও দুঃখবোধ ছিল না। দেখিলেই মনে হইত সর্বতোভাবেই আপ্তকাম।'

গিরিশ আরও বলেছেন---'আকাশের চাঁদও কলঙ্কের কথা শোনা যায়। কিন্তু লাটু একেবারে খাঁটি সোনা। লাটুর মতো বেদাগ সাধু আমি কখনো দেখি নি।'

রায়বাহাদুর বিহারীলাল সরকার লাটু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধায় বলেছেন---'রামায়ণে মহাবীর পবননন্দন যেরূপ রত্ন, লাটুমহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-মহাবাণীর সেইরূপ রত্ন'। গুরুভাইদের কাছেও যে তিনি কত উর্দ্ধে ছিলেন তা বাবুরামমহারাজের সামান্য একটু কথাতেই বুঝা যায়---'ওরে! এমন দয়াল লাটুমহারাজ তোদের কৃপা করেছেন, তোদের আর ভাবনা কিসের? অমন প্রেমিক সাধু খুব কম দেখা যায়। তাঁর পায়ের বাতাসে তোদের জীবন পবিত্র, সার্থক হোয়ে যাবে।'

তিনি ছিলেন প্রেমিক, আশাবাদী ও অদোষদর্শী সাধু। ভক্তমণ্ডলীকে কখনো তিনি হতাশার বাণী শুনিয়ে নিরাশ করেন নি। তাদের মন পবিত্র রাখার জন্য সাবধানবাণী শুনাতেন, ধর্মের নিন্দা, গুরুর নিন্দা যে করে, তার আধার বড় অপবিত্র, সে ভগবান থেকে বহু দূরে পড়ে যায়। তারপরই প্রেমভরে বলতেন---'তুমি ধর আর না ধর, ভগবান তোমায় ধরে থাকবেনই। কখনই ছাড়বে না; তাঁর এত দয়া।'

সংসারের শোকে তাপে অভাবে অনটনে ধরা আশ্বাসের কথা আর কী হতে পারে।

স্বামী অভেদানন্দের কথায়---'লাটু মহারাজ বাস্তবিকই ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি miracle স্বরূপ ছিলেন।---তিনি যে আমাদের গুরুভাই ছিলেন ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়।' লাটুমহারাজের সন্ন্যাসজীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এমন ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় জীবনলীলা তুলনাহীন। গুরুভাইরা যখন মঠবাড়ি কেন্দ্র করে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লেন সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে মঠবাড়ির কাজকর্ম ও জপধ্যানও চলতে লাগলো, লাটু মহারাজকে তখন দেখা যেত গঙ্গার কুলে কুলে তপস্যার স্থান খুঁজে নিয়ে ধ্যানমগ্ন।

গুরু ভাইরা বিশেষ করে স্বামীজী কত করে বলেছেন তাঁকে মঠে থাকতে, তিনি রাজি হন নি। কোনরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যেই নিজকে আবদ্ধ রাখতে চাইতেন না তিনি। মাঝে মাঝে যদিও বা যেতেন, গঙ্গার কুলেই ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন।

একবার বিদেশ থেকে ফিরে নানা কথার পর স্বামীজী যখন তাঁকে শুধালেন---'হাঁরে। শুনলুম তুই তো মঠে থাকতিস নি, এদিক ওদিক ঝিগড়ে ঝিগড়ে থাকতিস। তোর চলতো কিসে?'

লাটু মহারাজ বললেন,---'কেনো? ওপেন ঠাকুর (বসুমতীর) সাহায্য করতো। যেদিন কুছু জুটতো না, সে দিন তার দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সে বুঝতে পারতো, সিকিটা---দুয়ানীটা দিয়ে দিতো।'

সেদিন এই কথা শুনামাত্র স্বামীজী---তাঁর ঠাকুরকে আহ্বান করে উর্দ্ধ মুখ হয়ে বলেছিলেন---'ঠাকুর। উপেনের কল্যাণ করুন।' কী অগাধ ভালোবাসাই না ছিল স্বামীজীর এই অদ্ভুত গুরুভাইটির জন্য।

শেষের দিনগুলি তাঁর কাটে বারাণসীতে কাউকে কখনো তিনি

তার ধারা ছিল ঈশ্বর লাভ করতে হলে খালি মন্ত্র নিলে হয় না। নিজেদের অনেক ত্যাগ অনেক কঠোর করতে হয়, তবে তো মন্ত্রশক্তির প্রভাব আসবে জীবনে। ঠাকুরের সর্বপ্রথম মন্ত্র দীক্ষিত লীলাসহচর লাটু; তাঁর ঈশ্বর কোটি সত্তা, লীলাময়ের প্রথম স্পর্শধন্য লাটু---তাঁর তুলনা কোথায়!

বারাণসীধামে স্বামী অদ্ভুতানন্দের মহাপ্রয়াণের সময় কালীমহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) ছিলেন সান-ফ্রান্সিস্কোতে। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় স্পষ্ট উচ্চারণে ডাক শুনলেন তিনবার---কালী! কালী! কালী! তারপর একখানি মুখচ্ছবি চমকিত করলো তাঁকে।

কণ্ঠস্বর ও মুখচ্ছবি ঠিক চিনেও চিনতে পারলেন না তিনি। এ সাতসমুদ্র তীরে কে তাঁকে এমন করে ডেকে দর্শন দিয়ে গেল ভাবিতের জন্য। তার পরদিনই Cable এ জানালেন শরৎ মহারাজ---তাঁদের সকলের বড় আদরের বড় শ্রদ্ধার 'সাধুর' মহাপ্রয়াণের কথা।

স্বামী অভেদানন্দের আর বাকি রইলো না বুঝতে, পরলোকযাত্রার পথে প্রিয় গুরুভাই কালীকে যেন জানিয়ে দিয়ে গেলেন---'আমি চলে যাচ্ছিরে রামকৃষ্ণ লোকে---আমার পরমনিধির কাছে।'

ঊর্ধ্বে আর ঊর্ধ্বে

ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে---ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে মানুষ কবে থেকে আনাগোনা করার চেষ্টারত তার সঠিক হিসেব অমিল। মানবিক নিম্নগতি থাক্, দেখা যাক তার ঊর্ধ্বগতি কেন। মহাকাশ জয়ের প্রচেষ্টা আজ সুরু হয় নি। তবে এ চেষ্টা খুব বেশি দিনেরও নয়। যদিও তা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য। কবে যে অনন্ত শূন্য ভেদ ক'রে গ্রহান্তরে পৌঁছবে তা নিয়ে কানাকানির অন্ত নেই ---কানাকানি, কারণ সংশ্লিষ্ট পক্ষ দুটি এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট তথ্য দিতে নারাজ। কিন্তু, কেন যে মানুষ ঊর্ধ্বগামী কেন যে অনন্তে না ভাসতে চাইছে সে সম্পর্কে কেউ ততটা বিশেষ বলেন নি।

হয়ত এমন যে, এও নাকি ভাব-কথা, মানুষ যে প্রাণবিকাশের সর্বশেষ স্তর, এবং অন্ধ, রহস্যঘেরা আবেগতাড়িত হয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে, যে আবেগে স্যামোন মাছ তার স্রোতের বিপক্ষে সব বাধা অগ্রাহ্য ক'রে উপর দিকে ঠেলে উঠতে থাকে, যত ক্ষণ না সে পৌঁছোয় নিজের সৃষ্টি উৎসে।

মানবদেহের প্রতিটি রক্তকণা, পাথির প্রতিটি পরমাণু, আবহাওয়ার সবকিছুর উৎপত্তি ন' কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল ঊর্ধ্বে, অনন্ত শূন্যের বুকে। আমাদের নিকটতম নক্ষত্র সূর্যর দূরত্ব ওই। দু'কোটি বছর আগে জ্বলন্ত সূর্যর এক অংশ ছিল আমাদের পৃথিবী। সংসা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকে সুরু হল একটা নির্দিষ্ট বিকাশের ছক।

বিবর্তন এক দীর্ঘ ঊর্ধ্ব-লম্ফন বিশেষ বাষ্পীয় পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল। প্রাচীন উষ্ণ মহাসাগরের জলে জড় পদার্থ থেকে উদ্ভব হল প্রাণের---প্রথমে এল এক কোটি প্রাণী। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে যখন মেরুদণ্ডী মাছ এল, তখন একটা মাধ্যম থেকে মাধ্যমান্তরে যাত্রা সম্ভব হল প্রথম যা মানুষকে ফেরং পাঠাচ্ছে মহাশূন্যে।

এই বাধা অপসারণের পালার সূচনা 'লাংফিশ'-এর শরীরে। এটি যেমন লবণাক্ত জলের সমুদ্র থেকে বায়ুসমুদ্রে মুক্তি পেতে চেষ্টিত, মানুষের মহাকাশ যাত্রাও মূলত তেমনই। এই মাছ কান্কো দিয়ে বায়ু গ্রহণে অক্ষম হওয়ায়, একটা রক্ত নালীসমন্বিত ব্লাডার ক্রমে এর দেহে গড়ে ওঠে---একটা স্থূল ফুস্ফুস্। মানুষ নিজের ফুসফুসের সাহায্যে মহাকাশের বায়ু নিতে অসমর্থ হওয়ায় অক্সিজেন ভরা একটা বিশেষ নল নিয়ে সে উপরে ভাসে। এই দু'ক্ষেত্রের নল নিয়ে সে পার্থক্য সময়ের।

লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে 'লাংফিশ' এর প্রয়োজনীয় ফুস্ফুস্ গড়ে উঠতে। মানুষ আর নিজেকে ধীরেসুস্থে খাপ খাওয়ায় না। সে নিজের প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে নেয়।

কোনও অজর অমর সত্ত্বা থাকলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন কোটি কোটি বছরব্যাপী জীবনের এই ঊর্ধ্বমুখী বিবর্তন---এবং তিনি বুঝতেন জীবনের চরম মুহূর্ত আগত ওই!

প্রথম অঙ্কে এল বস্তুকণা, সূর্য, আর সূর্যর আত্মজ পৃথিবী---শক্তির কেন্দ্র থেকে, শীতল, কৃষ্ণবর্ণ শূন্যতা থেকে।

দ্বিতীয় অঙ্কে জন্ম নিল প্রাণকণা, সৃষ্ট বস্তু থেকে। তারপর সাগরতলে বহু কোষী প্রাণিকুল। সাগরতল থেকে মাটিতে এল অ্যাম্ফিবিয়ান, সরীসৃপ, পাখি এবং পাখিই প্রথম মহাশূন্যে পাখা মেলে সীমিত চেষ্টা চালাল ঊর্ধ্ব গতির ক্ষেত্রে।

তৃতীয় অঙ্ক ঢের বেশি আকর্ষণীয়। এল স্তন্যপায়ী প্রাণীকুল। যাদের মস্তিষ্ক রয়েছে। তারা যন্ত্র সৃষ্টি এবং ব্যবহার করতে পারে। মাথা খাটিয়ে আপাত অসম্ভবের বাধা উড়িয়ে দেয়। বেলুন উড়ল। উড়ল জেপেলিন। এয়ারোপ্লেন আসার পর ধাপে ধাপে গতি বাড়ছে ও বাড়ছেই। মহাশূন্যের বাধা এখন মানুষ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে পাঠিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ। এখন বাকি গ্রহান্তরে অবতরণ। সে কাজও এগোচ্ছে শনৈ: শনৈ: এবং সে দিনের আর বেশি দেরি নেই, যেদিন মানুষ গ্রহান্তরে যাত্রা ভিন্ন মহাদেশে যাওয়ার মত সহজভাবে নিতে সক্ষম হবে। মানুষ কি ফিরছে তার উৎস খুঁজে? সেই অনন্ত শূন্য, যেখানে একদিন কোনও এক শুভ মুহূর্তে তার সম্ভাবনা ফুটে উঠেছিল প্রলয়ঙ্কর এক ঘটনার আবর্তে!

শ্রীঅরবিন্দ

পার্থসারথি ঘোষ

মহাজাতির পুণ্যস্মৃতি প্রবন্ধের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাইনে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই; কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ-শোক-তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি (ভারতবর্ষে) জন্মগ্রহণ করেছেন।'

শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বার বার মনে পড়ছে এই কথাগুলি।

ইংরেজী ১৮৭২ সালে কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। ১৮৭৯ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে যান। সেখানে তিনি ১৪ বছর থাকেন। ম্যাঞ্চেস্টারে একটি ইংরেজ পরিবারে লালিত হন। ১৮৮৫ সালে লণ্ডনে সেন্ট পলস স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৯০ সালে উচ্চতম বৃত্তি লাভ করে কেম্ব্রিজ কিংস কলেজে ভর্তি হন। সেখানে দু'বছর অধ্যয়ন করেন। ঐ বছর তিনি আই-সি-এস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু দু'বছর শিক্ষানবিশীর শেষ ভাগে অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অনুপস্থিত হওয়ায় উক্ত আই-সি-এস কার্যে অনুপযুক্ত বিবেচিত হন। সেই সময় বরোদার গাইকোয়ার লণ্ডনে ছিলেন। অরবিন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং বরোদায় একটি চাকুরি পেয়ে ১৮৯৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন।

১৮৯৩-১৯০৬ এই তের বছর তিনি বরোদায় থাকেন। বরোদায় চাকুরিকালে, প্রথমে তিনি রাজস্ব বিভাগে মহারাজার কর্মসচিবরূপে, পরে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে এবং শেষে বরোদা কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি আত্মোৎকর্ষ, সাহিত্যচর্চা, কবিতারচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার আয়োজনে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অরবিন্দ তাঁর পিতার বিশেষ নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে প্রাচ্যও ভারতীয় শিক্ষার সংস্পর্শ শূন্য হয়ে প্রতীচ্য শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। বরোদা থাকাকালীন সংস্কৃত শিক্ষা বহু আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান সভ্যতার রূপ ও আদর্শ গ্রহণ করে তিনি নিজের অভাব পূরণ করে নেন। এই সময়ের শেষের দিকে তিনি নীরবে রাজনীতি সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কারণ বরোদার পদমর্যাদা খোলাখুলি-ভাবে রাজনীতি আলোচনার বাধা-স্বরূপ ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে এখানকার চাকুরি ছেড়ে খোলাখুলিভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ এনে দেয়। ১৯০৬ সালে বাংলার নতুন জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষরূপে বরোদা ত্যাগ করে কলকাতা যাত্রা করেন।

১৯০২---১৯১০ সাল পর্যন্ত এই আট বছর শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যাপৃত ছিলেন। এই আট বছরের প্রথমার্ধ লোকচক্ষুর অন্তরালে সহকর্মীদের নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বাংলার [illegible] দীক্ষা দিয়ে-ছিলেন। ১৯০৬ সালে এই উদ্দেশ্যেই বাংলায় আসেন ও [illegible] এক-দল [illegible] কংগ্রেস কর্মী নিয়ে একটি নতুন দলে যোগদান করেন এই দলের রাজনীতিতে চিন্তাধারা অসহযোগ নীতির পক্ষে স্পষ্ট ছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বাৎসরিক কার্যকরী সমিতিতে মডারেট (ধীরপন্থী) নেতাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে এবং এই মডারেট দলের হাত থেকে কংগ্রেস ও দেশকে নির্দিষ্ট কর্ম-পন্থায় চালনা করবার জন্য মহারাষ্ট্র নেতা লোকমান্য তিলককে সামনে রেখে, কয়েকজন নেতাকে স্বমতে এনে স্বাধীনতার দাবী পূরণে দেশকে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান তিনি। মডারেট ও চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঐতিহাসিক কারণ এটাই এবং দু বছরের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির চিন্তাধারা একেবারে ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

এই নবজাতীয় দলের আদর্শ ছিল স্বরাজ ও স্বাধীনতা, অপর দিকে মডারেট দলের আদর্শ ছিল আয়ার-ল্যণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ দলের প্রণালীতে ধীরে

ভীরে আইন সংস্কারের দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলা। এই নবজাতীয়দলের প্রধান অস্ত্র ছিল আত্মনির্ভরতা। একদিকে স্বদেশকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা, আরেকদিকে বিদেশী সরকারের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগ। একদিকে বৃটিশ ও বিদেশীয় পণ্যবর্জন, আইন-আদালত ও সরকারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছু বর্জন---অপর দিকে জাতীয় শিল্পের প্রসারতা, সালিশী আদালত ও জাতীয় স্কুল, কলেজ প্রভৃতি গঠন এবং যুবসঙ্ঘের দ্বারা প্রয়োজনে পুলিসের কাজ করানো।

এই সময় শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম্' নামে কাগজ বের হয়,---এই পত্রিকা এক নতুন চিন্তাধারা নিয়ে আসে ভারতীয় রাজনীতিতে। কত গভীর, কত উন্নত তার মতামত। শ্রীঅরবিন্দ বিদ্রোহিরূপে ধৃত হন ও পরে মুক্তি পান। ১৯০৭ সালে সুরাটে জাতীয় দলের মতভেদের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। ১৯০৮ সালের মে মাসে তাঁর ভাই বারীন্দ্রের বিপ্লবীদলের আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি ধৃত হন, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। এক বছর বিচারাধীন থাকার পর ১৯০৯ সালের মে মাসে বাইরে এসে দেখলেন যে দলে ভাঙ্গন ধরেছে, নেতারা কারাবাসে ছত্রভঙ্গ, কেউ বা দ্বীপান্তরে, কেউ বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নির্বাসনে, কেউ বা হতাশ হয়ে পড়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করতে তিনি একাই চেষ্টিত হলেন।

এই সময়ে স্বীয় চেষ্টার সাহায্যকল্পে 'কর্মযোগিন্' নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক ও 'ধর্ম' নামে বাংলা সাপ্তাহিক বার করেন। কিন্তু শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হন যে দেশ তাঁর অভিপ্রায় ও কর্মসূচী গ্রহণে এখনও প্রস্তুত হতে পারে নি। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত আন্দোলন বা হোমরুল আন্দোলনে দেশকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য করলেন, কিন্তু দেখলেন যে দেশে এইরূপ আন্দোলনের উপযুক্ত সময় তখনও আসে নি। আলিপুর জেলে এক বছর আটক অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ অভ্যাসে রত ছিলেন বলে তাঁর আভ্যন্তরিক অধ্যাত্ম জীবন অন্তর্মুখীন হতে প্রয়াস পেয়েছিল। অন্তত এক বছরের জন্য রাজনীতিক্ষেত্র থেকে দূরে থাকবার সঙ্কল্প করলেন।

১৯১০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সকল কার্য থেকে অবসর নিয়ে নির্জন বাসের জন্য শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে আসেন ও এপ্রিলের প্রথমে ফরাসী ভারতের পণ্ডিচেরী যাত্রা করেন। 'কর্মযোগিনে' তাঁর স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির জন্য এই পত্রিকার মুদ্রাকরের সাজা হয় ও হাইকোর্টে পুনর্বিচার প্রার্থনায় ঐ সাজা বাতিল হয়ে যায়। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর কর্মসূচীর অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হলে পুনঃ-প্রত্যাবর্তন করবার ইচ্ছে নিয়ে বাংলা ত্যাগ করেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অধ্যাত্ম কর্মে সকল শক্তি সমাহারের প্রয়োজন আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনীতির সকল সূত্র ছিন্ন করে ও জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্বের আহ্বান বারবার প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে প্রবেশ করেন।

১৯১০ সাল থেকে নির্বাণ লাভ পর্যন্ত পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ নিজ সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

চার বছর সম্পূর্ণ নীরবে ও নির্জনে থাকার পর ১৯১৪ সালে 'আর্য' নামে একটি দার্শনিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রধান প্রধান পুস্তকগুলি হচ্ছে, 'ঈশা উপনিষদ', 'দি এসেস অন দি গীতা', 'দি লাইফ ডিভাইন', 'দি সিনথেসিস অব যোগ' ইত্যাদি। এগুলি পর পর 'আর্যে' প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলির ভিতর দিয়ে তাঁর যোগবলের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য পুস্তকে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি, বেদের সত্যার্থ, মনুষ্য সমাজের গতি, কাব্যের প্রকৃতি ও বিবর্তন, মনুষ্যজাতির মিলনের সম্ভাবনা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। পণ্ডিচেরীর প্রথম অবস্থায় তিনি তাঁর ইংলণ্ড ও বরোদায় থাকাকালে লিখিত কবিতাগুলি প্রকাশ করতে থাকেন। সাড়ে ছয় বছর পর ১৯২১ সালে 'আর্যে'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথমে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে চার-পাচ জন ভক্ত ছিলেন। পরে তাঁর যোগপ্রভাবে যোগপথ অনুসরণ করবার জন্য অনেকেই তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। ক্রমে এত বেশী-সংখ্যক লোক জীবনের সকল পার্থিব ভোগকে উপেক্ষা করে উচ্চতর আদর্শে জীবনকে চালনা করার আকাঙ্ক্ষায় আসতে লাগল যে তাদেরকে এক পথে ও এক উদ্দেশ্যে পরিচালনা করবার জন্য একটা চক্র গঠিত হল।

এই হচ্ছে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ভিত্তি এবং ইহা কেন্দ্ররূপে গঠিত হয়েছে না বলে গড়ে উঠেছে বললে বোধ হয় ঠিক বলা হবে।

১৯০৫ সাল থেকে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা আরম্ভ হয়। ভারতে যত প্রকার অধ্যাত্ম সাধনা সাধিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির সাধনা ও সমন্বয়ের দ্বারা সিদ্ধির অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন। পরে অনন্ত সত্তার দুই দিক---পদার্থ ও জীবনী শক্তিকে একত্রিত করে ও একসুরে বেঁধে পূর্ণজ্ঞানের সিদ্ধি লাভ করেন। অধিকাংশ যোগপথই আত্মোৎসর্গের পথে জীবনকে অস্বীকার করে চলেছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের যোগ আত্মজয় করে পুনরায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও আলোক নিয়ে জীবনকে রূপান্তরিত করতে নেমে এসেছে।

এই যোগলব্ধ দৃষ্টির দ্বারা বর্তমান প্রাকৃতিক জগতে মনুষ্য-জাতির জীবন অজ্ঞতা ও বিশ্বাস-হীনতার ভিত্তির উপর বলে স্বিরীকৃত হলেও এই অবিদ্যা ও অজ্ঞানময় মনুষ্য জীবনের মধ্যে দিব্যসত্তা ও ইহা স্ফুরণের সম্ভাবনা জড়িয়ে আছে, ইহাও স্বীকার করা হয়েছে।

আত্মার নির্বাণ পথে দুষ্ট জগতকে একটা ভ্রম বা নিরর্থক ও মায়া বলে দূরে সরিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ এই জাগতিক অবিদ্যার মধ্য দিয়েই অধ্যাত্ম বিবর্তনের দ্বারা দিব্য চেতনা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবেই। বিবর্তন যেখানে এসে পৌঁছেছে তার উচ্চতম প্রকাশ মন: বলা হলেও, বিবর্তনের উচ্চতম বিকাশ মন নয়। এর উচ্চে দিব্যচেতনা বা নিত্য সত্যচেতনা, যার প্রকৃতি হচ্ছে, দিব্যজ্ঞানের আত্মসীমাবদ্ধ আলোক ও ক্ষমতা। মন অবিদ্যাময় বলে সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ইহাই স্বয়ম্ভুবিদ্যা ---যা এর রূপ ও শক্তির খেলাকে সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করছে। যে উচ্চতম মনুষ্য জাতির আদর্শকে সকলে স্বপ্ন দেখে থাকেন তারই পূর্ণতা এই দিব্যচেতনার মধ্যেই সম্ভবপর। এই আলোকে ও পরমসুখে বাস করতে হলে, আত্মসত্তাকে খুঁজে পেতে হলে, দিব্যের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত হতে চাইলে এবং মন প্রাণ ও দেহের রূপান্তরের কার্যে অতিমানস চেতনা শক্তিকে নামিয়ে আনতে হলে সকল সময়ের জন্য বৃহত্তর দিব্যচেতনার দ্বার খুলে রাখতে হবে। এই সম্ভাবনাকে উপলব্ধির দ্বারা বাস্তবে পরিণত করাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের উদ্দেশ্য।

তাঁর প্রধান প্রধান পুস্তক থেকে দু'চার লাইন উদ্ধৃত করে শ্রীঅরবিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা শেষ করবো। 'লাইফ ডিভাইন' পুস্তকে তিনি বলেছেন, 'দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন। (১) ব্যক্তির পূর্ণ পরিণতি অন্তরে ও বাহিরে। (২) ব্যক্তি ও তার আবেষ্টনের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি। (৩) নবীন জগতের প্রতিষ্ঠা ও সেই জগতে পূর্ণতর সমবেত জীবন'।

তাঁর 'লাইটস অব যোগ' পুস্তকে এক জায়গায় বলেছেন, 'ভগবান আপনাকে অর্পণ করেন তাদেরই কাছে যারা নিজেদেরকে নিঃশেষে সর্বাংশে ভগবানকে অর্পণ করে। তাদেরই জন্য শান্তি, জ্যোতি, শক্তি, সুখ, মুক্তি, প্রসারতা, জ্ঞানের শিখররাজি ও আনন্দের সিন্ধু।'

তাঁর 'বেসেস অব যোগ' পুস্তকে রয়েছে, 'স্থূলভাবে কাম সম্ভোগ পরিত্যাগ করতে তো হবেই, এমন কি তার কোন আভ্যন্তর প্রতিরূপ কাম রূপান্তরের অঙ্গ হবে---এ রকম মনে করাও ভ্রান্তি। কাম বৃত্তি আর আধ্যাত্মিকতাকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে সব চেয়ে বেশী সর্বনাশ ঘটে।' সিনথিসিস অব যোগ' পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,---'আধার শুদ্ধ হ'লে, তার ঘরে স্থায়ী ভগবত্ত আনন্দের প্রতিষ্ঠা হবে, মানুষ হয়ে উঠবে মানববর্মা-ধারী ভগবান---তাই তো সিদ্ধি। মুক্তি, শুদ্ধি, সিদ্ধি ওভুক্তি---তাঁর পূর্ণযোগের শুদ্ধি, সিদ্ধি ও ভুক্তি---তাঁর পূর্ণযোগের এই চতুর্বিধ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমগ্র বিশ্বমানবকে নিয়ে।'

আচার্য শঙ্কর প্রচার করেছিলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ---'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য।' আর শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগতও সত্য। মিথ্যা শুধু অন্ধ অহংমিকার বশে জগতের প্রতি আমাদের আসক্তি।'

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতের জন্য কৃত্রিম পেশী

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত এখন কৃত্রিম পেশীর সাহায্যে সচল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘকাল গবেষণালব্ধ এই পেশী অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি সংঘটিত করতে পারবে বলেই গবেষকদের বিশ্বাস।

বিশেষ জ্যামিতিক ছকে নাইলন-তন্তু দিয়ে এই 'হ্যাণ্ড মোটিভেটর', হস্তসঞ্চালকটি তৈরী করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রবারের টিউব বা নল। চাপে-রাখা কারবন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ---গ্যাসটির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয় একটি সরল সুইচ-এর সাহায্যে নল ভর্তি করে নাইলনকে সঙ্কুচিত করে। নল খালি করলেই বাঁধন আলগা হয়ে যায়। বাহু, বুড়ো আঙুল, আর দু'টো তর্জনীতে এই সরল ধাতব যন্ত্রটি লাগাতে হয়। পেশীটি বাহুর সমান্তরালে আঙুলের গাঁট আর কনুই-এর মধ্যে আটকান থাকে। পেশীটি বুড়ো আঙুলে শক্তিসঞ্চারী, অন্যান্য আঙুলেও---তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, আর কনিষ্ঠায়--স্বাভাবিক হ্যাণ্ড-গ্রিপ তীব্রতায় শক্তি সঞ্চার করে। আবিষ্কারটি অত্যন্ত সরল এবং খুব কম খরচে প্রায় যে-কোন পঙ্গু হাতে তা কাজে লাগান সম্ভব হবে।

এ দেশে এই জাতীয় লোকসংখ্যার কোনও হিসেব নেই। আমেরিকায় পোলিও রোগে পঙ্গু হাতের সংখ্যা মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার। এরা এই আবিষ্কারের ফলে উপকৃত হচ্ছেন। গবেষকদের বিশ্বাস অন্যান্য অংগ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হলে ভবিষ্যতে একই-ভাবে তার কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। এই আবিষ্কার যাদের কাজে আসছে তারা সিগারেট বা লিপ্‌স্টিক ধরার যন্ত্রপাতি ধরতে এবং সেগুলো কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছেন।

ভাগবতী-তনু

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ সাতাশ ॥

পরমাত্মা বর, জীবাত্মা বধূ। বিশ্ববৃন্দাবনে ভগবানই একমাত্র পুরুষ আর সমস্ত জীব প্রকৃতি।

আমার চিত্ত একটি নবীন বালিকা বধূর মত। ভীত, মূঢ়, নির্বোধ। তার কতটুকু বুদ্ধি যে সে তোমার বিরাটত্বকে বুঝবে, তোমার মহিমাকে হৃদয়ঙ্গম করবে? তোমার তত্ত্ব তার আয়ত্তের বাইরে, দুটি দিনের আয়ু নিয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে সে তোমার আয়তনের পরিমাপ নেবে? তোমাকে তাই শুধু সে খেলবার সাথী বলে মেনে নিয়েছে। তুমি শুধু তার দুবেলার ধুলোখেলার মানুষ।

'তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার খেলিবার ধন শুধু।'

তার কোনো সাজসজ্জা নেই, না বিত্ত না বিদ্যা না-বা কোনো অহংকারের অলংকার। তবু এই সজ্জাহীনতার জন্যে তার লজ্জাও নেই একরত্তি। সে তার উপকরণহীন সহজ ঘরকরণের মধ্যেই তোমাকে ডেকে আনছে, হেলাফেলার খেলা খেলতে। গুরুজনেরা বলছে, এ তোমার পতি, এ তোমার দেবতা, একে যথোচিত পূজো করছ তো? শুনে বালিকাবধূ ভয় পায়, পূজার সে কী জানে? কাকে বলে মন্ত্র, কাকে বলে উপচার। কাকে বলে আসন, কাকে বা মুদ্রা!

জানি জানি তুমি আমার চাও না পূজার মালা
ওগো খেলার সাথি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে
নয় আরতির বাতি ॥

বাসকশয্যায় বালিকাবধূ তোমারই বাহুবন্ধনের উত্তাপের মধ্যেই শুয়ে আছে, কিন্তু, হায় সে নিদ্রায় অচেতন। কত তুমি তাকে ডাকছ, কত তুমি কথা বলছ কানে কানে, কিন্তু তার সাড়া নেই, প্রতিধ্বনি নেই। এত কাছে থেকেও সে তোমাকে ভুলে আছে। কিন্তু যখন ঘোর দুর্দিনে দশদিক অন্ধকার করে ঝড় আসে, তখন তার ঘুম ভেঙে যায়, তখন আর তার খেলার কথা মনে থাকে না, সে প্রাণপণ নির্ভয়ে তোমাকে আঁকড়ে ধরে, তোমাকেই শরণ্য বলে মানে। পদে পদে তোমার কাছে তার কত অপরাধ, কিছুই হিসেবের মধ্যে আনো না, নানা খেলায় তাকে মাতিয়ে রাখতে ভুলিয়ে রাখতেই ভালোবাসো।

যখন খেলি তখন খেলাটাই বড় হয়, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি না।

তমি জানো বালিকাবধূর খেলা একদিন ঘুচে যাবে, সে নিজেই একদিন উদ্যোগ করে প্রত্যাবর্তন করবে তোমাতে। খেলা শুরু যেমন খেলা, খেলা ভাঙাও তেমনি খেলা। খেলাশেষে আরেক লোকে, অমর্ত্যলোকে, নিয়ে যাবে তাকে, নতুনতরো খেলার খেলুড়ে করে। তারই জন্যে তুমি তোমার বিজন ঘরখানি সাজিয়ে রেখেছ, সোনার পাত্রে সঞ্চিত করে রেখেছ নন্দনের আনন্দমধু।

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।---
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি
তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত ॥

শুধু আমি ভিক্ষুক নই, হে রাজাধিরাজ, তুমিও ভিক্ষুক। তুমিও অনুরাগের প্রত্যাশী।

'আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিলে হাত।'

সংসারকে সাড়ে পনেরো আনা দিয়ে দু পয়সা কম দিলে সে ফোঁস করে ওঠে, কিন্তু ঈশ্বরকে হেলায় দু পয়সা ছুঁড়ে দিলে ঈশ্বর দু' ধামা প্রসাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে কারবারে কোনো বাজারদর নেই। এককণা খুদের বিনিময়ে এককণা সোনা মেলে। এক ফোঁটা অশ্রুর বিনিময়ে মিলে যায় এক রাজ্যের সন্তোষ।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি---এ কী!
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোটো সোনার কণা দেখি।

দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে---
তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে ॥

রাজভিখারি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হয়েও কাঙাল---ভালোবাসার কাঙাল। প্রাপ্তসমস্তকাম হয়েও তিনি দীনহীন---ভালোবাসা তাঁকে কে দেয়? কী হবে তাঁর সূর্য-চন্দ্র আকাশ ভরা অন্তহীন ঐশ্বর্যে যদি ভক্তের ভালোবাসা না পান? এত কৃপা নিয়ে তিনি কী করবেন যদি তাঁর কৃপাপাত্র না মেলে? কৃপাপাত্র যদি না পান তাহলে করুণার অনন্তসিন্ধু হয়েও তো তিনি ব্যর্থ। আমি কাঙাল কৃপার জন্যে, তিনি কাঙাল পাত্রের জন্যে।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ
কী কাতর গান গাই'?

আমি ছাড়া আর কে তোমার কৃপাপাত্র হবে? কিন্তু আমার পাত্রও যে আবার নিপুণ অহংকারের কারুকার্য দিয়ে জমকালো করা। তোমার যে সে-পাত্র মনঃপূত নয়। তাই সে-পাত্রও আমি ভেঙে দিয়ে শুধু রিক্ত অঞ্জলি মেলে ধরব তোমার কাছে, তুমি তাই তোমার প্রসাদে পরিপূর্ণ করে দিও।

আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে।
আছে অঞ্জলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও না পুরে ॥

সহজের মত সুখ নেই।
'সহজ হয়ে সব দিবি তো সহজ হয়ে সকল লবি।'
সন্তোষই সবচেয়ে সহজ, আর সন্তোষেই সুখাবাপ্তি:
সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

যে সুখ চাইবে তাকে সন্তোষ আশ্রয় করতে হবে, আর যে সন্তোষ চাইবে তাকে সংযম অভ্যাস করতে হবে। সুখ বাইরে নেই, সুখ আছে মানুষের অন্তরে। উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে সুখ নেই, সুখ আছে সংযত চিত্তের সহজ সরলতার মধ্যে।

সকলের সঙ্গেই ছুটেছিলাম সমান বেগে, কিন্তু পারলাম না, পিছিয়ে পড়লাম, আর সকলে উচ্চশিরে গৌরবের শিখরে গিয়ে হাজির হল, 'তারা পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ, কত দূরের দেশ,' আর আমি রইলাম ধুলোয় পড়ে, পরাভূত ও প্রত্যাখ্যাত---নিরুদ্যম ও নিশ্চেতন। তখন বুঝিনি যার কেউ নেই কিছু নেই, তার তুমি আছ। যে সত্যি কাঙাল সেই তোমাতে প্রভূতবিত্ত। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম এ না জানি কী দারুণ অপরাধ---কিন্তু যে শুধু অসমর্থ তাকে ব্যর্থ বোধ করতে দাও না, তার জন্যে তুমি হাত বাড়াও, তাকে তুমি নিজে এসে তুলে ধরো। সে তো যাত্রা করেছিল, সে তো ছুটেছিল, তারপর অশক্ত হয়ে থেমে পড়েছিল মাঝপথে---বাকি পথ তুমিই মুছে দিলে, মার্জনা করে দিলে, সে থামল বলেই তো তুমি নামলে, সে স্তব্ধ হল বলেই তো তুমি উচ্চারিত হলে। পিছিয়ে পড়ল বলেই এলে এগিয়ে।

সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হতে না পারি নদী
ভেবেছিলেম তাহা হলেই
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলাম, তুমি
আপনি এলে কবে ॥

'সে যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে একমুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয়।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সেখানে সে, তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও একমুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না। অন্তরের কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করেনি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না। অরাজক রাজ্যের প্রজার মতো আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে না, আমাদের নানা শক্তিকে নানা দিকে কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে। সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে-দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি। একবারও খবর রাখি নে যে, অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।'

সুখ সুখ করে দ্বারে-দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে।
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে ॥

হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়ের রাজা বসে আছেন এ কথা যেন হৃদয়ে গাঁথা থাকে। একথা যেন একটি নিমেষের জন্যেও হৃদয় না বিস্মৃত হয়। আমার যেটুকু সীমা যেটুকু সামর্থ্য তার মধ্যেই আমি পর্যাপ্ত থাকতে চাই, যেটুকু আমার প্রাপ্য তাই তোমার দান ভেবেই আমার পরিতৃপ্তি। তোমার দান বলে যদি না ভাবি তাহলে অপারও তো আমার কাছে অধিক হবে না। কিন্তু যদি তোমার হাতের দান বলে মনে করি তাহলে অল্পও অফুরন্ত। আমার হাতে বহুতন্ত্রিক বীণা নাই থাকল, যে একতারাটি দিয়েছ তাই একমনে বাজিয়ে যাব। একটি নাম---সর্বনাম---তুমি, আর একটি কথা---শেষ কথা---ভালোবাসা।

যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া সেই কড়ি তুই নিসরে হেসে।
লোকের কথা নিসনে কানে
ফিরিসনে আর হাজার টানে
যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা---
একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা ॥

দীনতম জীবটিকেও ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। সে যে একদিন ঈশ্বরেই ছিল, আবার ঈশ্বর তাকে নিজের করে নিতে চান। আমিও তোমার মধ্য থেকে এসেছি, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ। যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়ে আবার তোমাতেই ফিরে চলেছি। তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ যে অসহনীয়। এই বিচ্ছেদের বেদনা শুধু আমার নয়, তোমারও। তাই যেমন তুমি আমাকে টানছ আমিও তোমাকে টানছি। তাই সমস্ত দুঃখের পথ মাড়িয়ে আমাতে ফিরে এস। তুমি তো আমাতেই ছিলে, কে তোমাকে আমার হৃদয় থেকে বার করে নিয়ে গেল? তোমার অনন্তে বিরহ-বেদনা আছে বলে আমার হৃদয়েও বিরহ-বেদনা।

তুমি এস। আমাকে জাগিয়ে তোলো। বিপদ, মৃত্যু, দুঃখ, শোক দিয়ে ক্ষণে-ক্ষণে আমাকে নাড়া দিয়ে যাও। ওগো, তাকে তোরা আসতে দে। তাকে বারণ করিসনে। যদি তার পায়ের শব্দে আমার ঘুম না ভাঙে। তোরা ব্যস্ত হসনে, আমাকে ঘুমুতে দিস। আমি তোদের ডাকে, তোদের কোলাহলে উঠতে চাইনে, আমি শুধু তার স্পর্শেই জাগতে চাই। তার আঘাতের আশায় আমার এই অসাড়তাও ভালো।

ওগো আমার ঘুম যে ভাঙো
গভীর অচেতনে---
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।

আমি যে ঘুমের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আছি সে শুধু জেগে উঠে সুখের স্বপ্নকে চোখের সামনে মূর্তিমন্ত দেখব বলে। আমার সে-দেখা সফল হবে যদি সে আমাকে নিজের হাতে জাগায়। তোরা জাগাতে আসিসনে, তোরা জাগালে আমার সে-স্বপ্ন দুই নির্নিমেষ চোখে প্রত্যক্ষ করা হবে না।

'তোরা আমায় জাগাসনে কেউ, জাগাবে সে মোরে।'

আমরা কেউ উদাসীন, কারু বা অন্যও কাজ আছে। কেউ বা উপহাস করছি, কাউকে বা ঘিরে আছে অভ্যাসের আবরণ। আমরা সংসারের কোলাহল শুনছি, স্বার্থের আহ্বান শুনছি, প্রতিদিনের প্রয়োজনের ডাক শুনছি কিন্তু আনন্দময়ের আনন্দভবনে উৎসবের আমন্ত্রণের ডাক শুনতে পাচ্ছি না।

'আকাশের সমস্ত তারা এমন ডাক ডাকল, কাননের সমস্ত ফুল এমন ডাক ডাকল---দরজা রুদ্ধ---কেউ শুনল না।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এমন সুন্দর জগতে জন্মালুম, এমন সুন্দর আলোকে চোখ মেললুম---সেখানে কি কেবল কাজ, কেবল প্রবৃত্তির কোলাহল। কেবল কলহ, মাৎসর্য, বিরোধ। সেখানে কি ওরাই সকলের চেয়ে প্রধান? এত বড়ো আকাশ, তার এমন নির্মল নীলিমা, একে মানব না। পৃথিবীর এমন আশ্চর্য প্রাণবান গীতিকাব্য, একে মানব না। সেইজন্যে জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে এমনি একটি চিরবিরহের করুণা। প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ হয়েছে, মাঝখানে স্বার্থের মরুভূমি। সেই মরুভূমি পার হয়ে ডাক আসছে। এসো, এসো---সেই ডাকের কান্নায় আকাশ ভরে গেল, আলোক ফেটে পড়ল।'

তবু জাগলাম কই?

'কিন্তু যিনি উৎসবের দেবতা, তিনি অপেক্ষা করতে জানেন।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে তিনিই পার করছেন, পথহারাদের ক্রমে ক্রমে পথে টেনে আনছেন। দুঃখের অশ্রুতে তাঁর মিলনের শতদল বিকশিত হচ্ছে। তিনি জানেন যে বধির সেও শুনবে, চিরযুগের রুদ্ধদ্বার একদিন খুলবে, পাষাণ একদিন গলবে। এই বাধা-বিরোধের ভিতর থেকে তিনি টেনে নেবেন।'

মানুষের জাগরণ সহজ নয়, তাই বিধাতার রাজ্যে এত বিরাট কাণ্ডকারখানা। তাই এত যুগ-যুগান্তের প্রতীক্ষা।

মানুষ যখন ঈশ্বরকে জাগাতে পারবে, তখনই সে নিজে জাগবে।

কুয়োর ধারে বসেছিলাম, তুমি কখন এলে পদধ্বনি শুনতে পাইনি। তোমার ক্লান্ত কণ্ঠের করুণ প্রার্থনা শুনে চমকে উঠলাম। কী আশ্চর্য, তুমিও প্রার্থনা করো---আর তা কি না আমার কাছে। বললে, আমি তৃষ্ণাকাতর পান্থ, আমাকে একটু জল দিতে পারো? পারি। বলে আমার ভরা কলসের থেকে একটি জলের ধারা তোমার করপুটে ঢেলে দিলাম। আর কোনো আমার কৃতিত্ব নেই, শুধু তোমার তৃষ্ণার তপ্ত মুহূর্তে তোমাকে এক অঞ্জলি জল দিতে পেরেছি।

তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল,
এই কথাটি আমার মনে
রহিল সম্বল।

ঈশ্বরও তৃষার্ত। তাঁর তৃষা আমার জন্যে, আমার হৃদয়রসের জন্যে। আমার জন্যেই যে তাঁর তৃষ্ণা তা বোঝা যাচ্ছে আমারই তৃষ্ণার মধ্যে। কে তিনি যাঁর জন্যে আমি তৃষিত হব যদি আমার জন্যে তাঁর তৃষ্ণা না থাকে? তাঁর অসীম তৃষ্ণাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই ভাষাই তো প্রভাতের আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার, এই লিপি লিখনের তো কোনোই প্রয়োজন ছিল না। এ কেবল হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের ডাক। এ এক হৃদয়নির্ঝরের প্রতি এক হৃদয়মহাসমুদ্রের আহ্বান। রস ছাড়া রসের মিলন নেই। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি কোথায়?

আমার বিরহ-বেদনা থেকেই তো বুঝতে পারি তোমার বিরহ-বেদনা। তোমার বিশ্বব্যাপী আনন্দ কাব্যের মধ্যে রয়ে গেছে একটি বেদনার সুর---আমাকে তুমি পাওনি। সেই বেদনার সুরে আমাকেও আমার জীবন-কাব্য রচনা করতে দাও---তোমাকে আজও আমার পাওয়া হল না। দুঃখের মধ্যেই রসের জাগরণ, যেমন নুড়ির আঘাতে ঝর্ণার কলগান। সংসারে

সবচেয়ে বড় দুঃখ তোমাকে না পাওয়ার দুঃখ। সেই বড়ো দুঃখে আমাকে প্রস্ফুটিত করো। সেই দুঃখের মধ্য দিয়ে আর সমস্ত দুঃখ আমি সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যাব। তোমার জন্যে বড়ো দুঃখ পেয়েছি একথা বলতে পাবার মত আনন্দ আর কী আছে?

'তোরা কেউ পারবি নে গো, পারবি নে ফুল ফোটাতে।'

যে পারে সে শুধু একজনই পারে---একপলকে পারে। বেদনার কণ্টক-বৃন্তে আমাকে স্থির থাকতে দে। সেই পারবে আমাকে বর্ণে-গন্ধে উন্মুদ্র করে তুলতে।

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে॥

আমি এ সংসারে আমার খেলা খেলতে আসিনি, তোমার খেলা খেলতে এসেছি। তাই এ খেলায় আমার হারলেও জিত, জিতলেও জিত। খেলাটাই কথা, হার-জিত কথা নয়। তাই---

'হারাও যদি হারব খেলায়, তোমার খেলা ছাড়ব না।'

আর খেলা তো একজন্মেই শেষ নয় পরে আরো কত খেলা খেলতে হবে কে জানে।

'কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে, ডাকিল লীলাভরে,
দুয়ার-খোলা পুরোনো খেলাঘরে।'

তাই কী করে বলি এই পরাজয়ই শেষ পরাজয়? যেন শেষ দানে তোমার কাছে নিজেকে নিঃশেষে বিকিয়ে দিতে পারি---তাহলে আগে-আগে কত হেরেছি তার হিসেবের অঙ্ক শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তখন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এক অতলান্ত শান্তি।

আজ ত্রিভুবন জোড়া কাহার বক্ষে
দেহ মন মোর ফুরালো---যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো---আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো॥

'খেয়া'তে আদ্যোপান্ত এই ঈশ্বরসৌরভ। সে ঈশ্বর কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো প্রস্ফুট। কখনো স্বনামে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কখনো বা বেনামে বিকল্প চিত্রকল্পে অভিব্যঞ্জিত। কখনো বা সে সরাসরি প্রভু, নাথ, স্বামী, বিধাতা, বিশ্বেশ্বর---কখনো বা প্রতীক বর্ণিত, যেমন, মাঝি, সারথি, প্রাণের মানুষ, পরাণ সখা, ধ্যানের ধন---কখনো বা শুধু বন্ধু, মধুর, সুন্দর, প্রিয়। অরূপ-অপরূপ। কখনো ব্যক্তিস্বরূপ, কখনো ভাবস্বরূপ। কখনো স্পষ্টীকৃত কখনো আভাসিত। কখনো আঘ্রাত, কখনো অনুভূত। কখনো ভক্তিতে উচ্চারিত কখনো বা প্রেমে আচ্ছাদিত। কে না জানে কবিতার অলকাপ স্পষ্টতার মধ্যে তত নয় যত ধূসরতার মধ্যে। অর্থে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেই কবিতার রসহানি। তাৎপর্য আধ্যাত্মিকও হতে পারে মানবিকও হতে পারে এই ভাবদ্বৈত ঘটাতে পারলেই কবিতায় সকল কলার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু ভক্ত নন, কবি---ভক্তকবি। তাই কবিতার প্রয়োজনে 'খেয়া'য় তিনি ঈশ্বরকে অস্পষ্ট করেছেন, নাম দিয়েছেন খেয়ার নেয়ে, পথ-পাগল পথিক, নয়তো বা অন্তবিহীন অজানা। আর এই অনির্দেশ্যতার জন্যে কবিতা হিসেবে 'খেয়া'র উৎকর্ষ সমধিক।

দীর্ঘ ষাট বছরের সক্রিয় সাহিত্য জীবন যাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গানে-গল্পে কবিতায়-নাটকে প্রবন্ধে-উপন্যাসে অজস্র বিচিত্র অমূল্য রচনা উপহার দিয়েছেন দেশকে, ধরণীকে। অনেকানেক পথ তিনি পরিক্রমণ করেছেন---মানবিক, প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক, জাগতিক, স্বাদেশিক, বিশ্ব-ভৌমিক---কিন্তু সর্বত্রই তিনি ঈশ্বরকে, সকল সুন্দর সন্নিবেশকে, সকল আনন্দ সন্দোহকে, পথের সাথী করে নিয়েছেন। ঈশ্বর কখনো সন্নিহিত কখনো ব্যবহিত, কিন্তু কখনোই বিরহিত নয়। রবীন্দ্রনাথ কখনোই অনীশ্বর অরাজক রাজত্বে বাস করেন নি। এ নয় যে জীবনের বিশেষ একটা পরিচ্ছেদেই তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিলেন---শুধু 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত ---আর বাকি জীবন তিনি ঈশ্বরশূন্য। যেন ভক্তিপর্ব বা ঈশ্বরপর্ব বলে রবীন্দ্র কাব্যজীবনের কোনো একটি বিশেষ অধ্যায়কে চিহ্নিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তা ঈশ্বরে অনুস্যূত, কী জীবনে কী সাহিত্যে। এই ঈশ্বর প্রণিধান কখনো তিনি বৈষ্ণব পদাবলী, কখনো শ্রীমদ্ভাগবত, কখনো উপনিষদ। সৃষ্টির বৈচিত্র্যের দাবীতে কলা-সাফল্যের খাতিরে ঈশ্বরকে তিনি গোপন করেছেন, কিন্তু কখনো তিনি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হননি। পথে যেতে-যেতে বারে-বারে ফিরে-ফিরে ঈশ্বরকে স্পর্শ করেছেন। আর আজীবন এই ঈশ্বরে লগ্নবিমগ্ন ছিলেন বলেই তিনি জীবনে ও সাহিত্যে এত মহামহিম।

কে যেন আমার নয়ননিমেষে
রাখিল পরশমণি,
যেদিকে তাকাই সোনা করে দেয়
দৃষ্টির পরশনি।
আজ যেমনি নয়ন তুলিয়া চাহিনু
কমলবরণ শিখা
আমার অন্তরে দিল টিকা।
ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে
এ পরশরেখা দিব না ঘুচিতে

সন্ধ্যার পানে নিয়ে এসো বহি
নব প্রভাতের লিখা---
উদয়রবির টিকা।

সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নবপ্রভাতের টিকা---এই ঈশ্বরস্পর্শ বহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মুছে ফেলা দূরের কথা, কখনো তা ম্লান হতে দেন নি।

ঈশ্বর আছেন আর আমাকে যেটুকু তিনি দিয়েছেন তা আমার যোগ্যতার অনেক বেশি---এই বলীয়ান সন্তোষের ভাবই 'সব পেয়েছির দেশ।' ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে দিলে সেটা হয়ে ওঠে 'কিছু না পাওয়ার বাজার।' আর বোঝাবুঝি নেই খোঁজাখুঁজি নেই, এক পরমা নির্বৃতির মধ্যে চলে আসা, সব ভয়-ভ্রম-ভাবনার চরমা আবৃত্তির মধ্যে।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি
নাইকো হাটে গোল---
ওরে কবি, এইখানে তোর
কুটিরখানি তোল।

'যখন জানব পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন, তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন---তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে, তখন সংযম কেবল বাহিরের নিয়ম পালনমাত্র হবে না।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সংসারকে একমাত্র জানলেই সংসার সঙ্কটময় হয়ে ওঠে---তখনই সে অরাজ অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

তাই প্রতিদিন এসো, অন্তরে এসো। সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হোক, কোনো আঘাত না পৌঁছোক, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক। সেখানে ক্রোধকে পালন কোরো না, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জাগিয়ে রেখো না---কেন না সেইখানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেবমন্দির। সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে, তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবে না, সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর, তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্যস্থানের কাটক বন্ধ। এসো সেই অক্ষুব্ধ নির্মল অন্তরের মধ্যে এসো, সেই অনন্তের সিন্ধুতীরে এসো, সেই অত্যুচ্চের গিরিশিখরে এসো। সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও। সেখানে নত হয়ে নমস্কার করো। সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই গিরিশৃঙ্গের নিত্য-বহমান নির্ঝরধারা থেকে পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও, সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।'

[ক্রমশ

অবকের আলপনা শিল্পী---কমলা ঘোষ

আধুনিকতম সাহিত্য

[অশ্লীল রচনায় লেখকদের অবশ্য পাঠ্য]

নলিনীকান্ত গুপ্ত

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে
বৈষ্ণবের গান ?'

র্গ হইতে পৃথিবীর উপরে কবি বৈষ্ণবের গান নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে আমরা আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছি---আমরা চাহিতেছি পৃথিবী হইতেও বৈষ্ণবের গান নামাইয়া পৃথিবীর নীচে পাতালে বা রসাতলে কোথাও তাহার জন্য আসর করিয়া দিতে।

দেবতার লীলা অবশ্য বহুপূর্বেই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তারপরে এতদিন আমরা ধরিয়াছিলাম মানুষের খেলা। এখন মানুষকেও বাতিল করিয়া দিতেছি, মানুষকে ছাড়িয়া বর্তমানে আমরা ব্যস্ত পশুকে লইয়া।

একযুগে দেবতা আর দেবত্বই ছিল সৃষ্টির সকল রহস্য, তাহার মূল সত্য ও শক্তি। তারপর আর এক যুগে দেবতা অন্তর্ধান করিল, আসিল মানুষ---মানুষ আর মনুষ্যত্বই হইল সৃষ্টির সকল রহস্য তাহার মূল সত্য ও শক্তি। এখন আবার তৃতীয় একযুগ আসিয়াছে দেখিতেছি, মানুষ ও মনুষ্যত্ব তাহার প্রাধান্য হারাইয়াছে ; এখন সৃষ্টির সকল রহস্য তাহার মূল সত্য ও শক্তি স্থাপিত পশু ও পশুত্বের মধ্যে।

অবশ্য আমরা মানুষেরই জগতের কথা বলিতেছি---মানুষই ছিল দেবতা, মানুষই হইয়াছিল মানুষ, আবার মানুষই এখন হইতে চলিয়াছে পশু। মানুষের অন্তরের চেতনার বিবর্তন তাহার শারীর বিবর্তনের বিপরীত পথে চলিয়াছে দেখিতেছি।

প্রাচীনতর প্রাচীনতম সাহিত্যে---মানুষভাবের দেবভাবের সাহিত্যের মধ্যে পশুর প্রভাব কি ছিল না ? ছিল, যথেষ্টই ছিল---নতুবা বৈদিক ঋষির মুখ দিয়া কখন বাহির হইতে পারিত না---

যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা।
উলূখল সুতানামবেদ্বিন্দ্র জলগুলঃ॥
---ঋগ্বেদ ১।২৮।২।

কিম্বা কালিদাসের হাত দিয়া 'শৃঙ্গারতিলক'ও রচিত হইত না। অত দূরের দেশে কালে কেন, আমাদের ভারতচন্দ্র মানুষের লীলার যে চিত্র দিয়া গিয়াছেন তাহা স্পষ্টতায়, বে-আব্রুতায় অতি আধুনিকেরও সহিত সমানে টক্কর দিয়া চলিতে পারে। চুম্বন আলিঙ্গন কেবল একালের সাহিত্যের কথা নয়, তাহা চিরকালের সাহিত্যের কথা। তবে আধুনিকের দোষ কোথায় ? দোষ কি না, আপাতত সে বিচার আমরা করিতে বসি নাই, বলিতেছি আধুনিকের বিশেষত্বের কথা। প্রাচীনের শৃঙ্গার বা আদিরস যতই স্থূল যতই রূঢ় হৌক না কেন---তাহা আধুনিকের Freudian libido বা 'কামায়ন' নহে।

আধুনিক কামায়নের বিশেষত্ব কি ? আধুনিক কামায়নের পিছনে আছে গোটা একটি দর্শন, সমস্ত মানুষটিকে দেখিবার ও বুঝিবার একটি বিশিষ্ট ধারা, তাহার আকৃতি প্রকৃতি ধর্মকর্ম বিষয়ে, তাহার সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ বিষয়ে একটা সম্পূর্ণ শাস্ত্র বা থিওরি। সেই শাস্ত্রের মূলসূত্র এই---মানুষ প্রথমত ও শেষত হইতেছে পশু। পাশবিক এষণা ও প্রেরণাই তাহার ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত সমস্ত জীবনকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার অন্তরের বাহিরের অভিব্যক্তি আনিয়া দিতেছে। উপরে উপরে অন্য-রকমের যাহা কিছু রং-চং দেখি না কেন, তাহা শুধু---বিষকুম্ভম্ পয়োমুখম্, শিশ্নটিকে ঢাকিয়া চাপা দিয়া রাখিবার প্রয়াস। কবিতাই রচনা কর, দেশোদ্ধার করিতেই থাক, আর অধ্যাত্মেরই সাধনা কর। মূলত সেই পশুসুলভ যৌন-বৃত্তিটাই ধরিয়া তুমি চলিয়াছ, তাহাকেই একটা ভদ্র পোষাক দিতে চেষ্টা করিতেছ। মানুষের সমস্ত সভ্যতাই হইতেছে---কার্লাইল যে অর্থে বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক গভীরতর ও গুরুতর অর্থে---'পোষাকী' সভ্যতা। আসল খাঁটি দিগম্বর সত্যের আবরণ আচ্ছাদন অবগুণ্ঠনেরই অন্য নাম সভ্যতা। ধরিয়া একটু টানাটানি করিলেই উহা খসিয়া পড়ে---হাজার সভ্য হৌক একটু আঁচড়েই মানুষের ভিতর হইতে তাহার শাশ্বত পশুটি বাহির হইয়া আসে।

বিজ্ঞান তাহার রূঢ় আলোকশলাকা দিয়া আমাদের জ্ঞানের চক্ষু এইভাবে খুলিয়া দিয়াছে ; তাই সত্যকে যথাযথ দেখিতে ও দেখাইতে আমাদের ভয় নাই, কুণ্ঠা নাই---সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

প্রাচীনতর যুগ মানুষকে, মানুষের কামবৃত্তিকে এমন করিয়া দেখে নাই। প্রথমত, কাম ছাড়া মানুষের মধ্যে প্রাচীনেরা আরও অন্যান্য বৃত্তি দেখিয়াছিলেন ; কামকে তাঁহারাও একটা প্রধান বৃত্তি বলিয়াই অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু সেই হেতু, অপরাপর প্রধান বৃত্তিকে অস্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আর কামবৃত্তির মত এই সকল বৃত্তিরও প্রত্যেকেরই আছে যে স্বতন্ত্র সার্থকতা, এ কথাও তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। মানুষের সকল অঙ্গ সোজাসুজি একটিমাত্র অঙ্গে 'সরল' করিয়া ধরিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই, যৌন-আবেগকে অতি-প্রধান স্থান দিলেও তাঁহারা ও জিনিষটিকে কেবলি একটা পাশব বৃত্তি হিসাবে দেখিতেন না ; উহা ছিল তাঁহাদের কাছে একটা প্রতীক---আনন্দের

ঐক্যের, নিবিড়তার, গভীরতার প্রতীক। বৈষ্ণব কবি যখন বলিতেছেন—

মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বলে॥

তখন শুধু শারীর মিলনটিই একান্ত সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ করি কি? না, শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে গভীরতর মিলন, প্রাণের অন্তরাত্মার মিলন প্রকাশ পাইতেছে, সেইটিই আমরা সকলের উপরে বিশেষ করিয়া অনুভব করি? পক্ষান্তরে শুনুন আধুনিকের কথা—

তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুড়ি',
মুখে কাম-কণ্টক-ব্রণ
মহুয়া-কুঁড়ি!

এখানে সকল আনন্দ কেবল শরীরের মধ্য হইতেই কবি খুঁড়িয়া বাহির করিতে চাহিতেছেন। শরীর ছাড়া মানুষের আর-যে-কিছু আছে তাহার ইঙ্গিতও পাই না।

আরও কথা আছে। প্রাচীনেরা যৌনবৃত্তিকে দেখিতেন একটা সুস্থ সুন্দর প্রফুল্ল প্রেয়, এমন কি শ্রেয়বৃত্তি-রূপে। কিন্তু আধুনিক যুগে জিনিষটিকে যে-ভাবে দেখান হইয়া থাকে, তাহাতে মনে হয় ইহা যেন একটা দারুণ ব্যাধি অথচ তাহা সারাইবার সামর্থ্য মানুষের নাই (হয়ত বা সে চেষ্টা করাও মানুষের কর্তব্য নয়)—কারণ, এ ব্যাধি মানবের অস্থিমজ্জাগত, মানুষের স্বভাব ও স্বরূপগত কিম্বা তাহা যেন একটা বিরাট ক্ষুধা, তবু তাহার পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই; এ যেন একটা কঠিন নিয়তি, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, অবশ হইয়া মানুষ তাহার কুম্ভীপাকে ঘুরিয়া মরিতেছে—ভ্রাময়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

বৃত্তিটির স্বভাব ও স্বরূপ যে রকম একটা কঠোরতার নিরানন্দে গঠিত, তেমনি যে আবহাওয়ায় তাহা খেলিতেছে তাহাও তদনুরূপ বিষাক্ত। দৈন্য, দারিদ্র্য, দ্বেষ, নৃশংসতা, বীভৎসতা—সকল রকম ক্লেদ ও দুঃস্থতাই যেন হইয়াছে মানুষের স্বাভাবিক ভূষণ, তাহার সর্বাপেক্ষা সত্যকার আপনকার বিত্ত, তাহার অঙ্গেরই অঙ্গ।

পশুর কথা বলিতেছিলাম—কিন্তু পশুও নয়, পশুর বিকৃতি এ যেন একটা পিশাচ প্রমথের ডাকিনী যোগিনীর জিন-দানার জগৎ! প্রকৃতির মধ্যে কোথাকার একটি অজানা অচেনা অন্ধকার গহ্বরের মুখ, কোন দিককার আশে-পাশের একটা চোরা কুঠরীর দুয়ার—একটা কি নিষিদ্ধ পথ যেন হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহারই মধ্যে আমরা বিষম ঔৎসুক্যে লোভে লালসায় মত্ত হইয়া ধাইয়া চলিয়াছি।

জোলা বা মোপাসাঁ যে-রকম মানুষ দিয়া তাঁহাদের জগৎ গড়িয়াছেন তাহারা পশু অপেক্ষা খুব বেশী উপরের স্তরে নয়; কিন্তু সে পশুতে আছে একটা সরলতা, একটা স্বাস্থ্য, একটা অসংস্কৃত চৌক স্থূল চৌক ভবুও একটা আনন্দ। আর আজ Camille Mauclair বা Rene Maran মানুষ-পশুর যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে বে-আব্রুতার পরাকাষ্ঠা নাই বটে, কিন্তু উহাই তাহার বৈশিষ্ট্য নয়। সে বৈশিষ্ট্য বাহিরের স্থূলত্বে নয়, কিন্তু প্রাণেরই একটা বিশেষ ছন্দে। আধুনিকের প্রাণের গতিতে অভাব সরলতার, অভাব স্বাচ্ছন্দ্যের—তাহা কুটিল জটিল, তাহা আত্মপীড়নে জর্জরিত; প্রতি আবেগে সে অতিমাত্র সাহস দেখাইতে চাহে বটে, কিন্তু সে সাহসের অন্য নাম দুঃসাহস; নির্বিবাদে চলা নয়, সে বাধা-বিপত্তিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিতে চায়; সহজ জ্ঞান সহজ আনন্দ নয়, কিন্তু নিষিদ্ধ যাহা কিছু খোলাখুলির এপাশে ওপাশে তেমন জিনিষের উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি।

জাঁ জিরোদু বা দ্রিয়া লা রোশেল বে-আবরু মানুষ পশুবিশেষ কিছু আঁকিয়া দেখান নাই; অথচ তাঁহাদের মধ্যে আধুনিকত্ব স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহাদের জগতে যখন প্রবেশ করি তখন বোধ হয় যেন কি একটা অস্বস্তি, অস্পষ্টতার মধ্যে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে—শরীরের স্থূল রূপ সেখানে বড় কথা নয়, কিন্তু শরীর চেতনার উপাদান, তাহার মূলতত্ত্বই হইতেছে যেন বুভুক্ষা, অস্বাস্থ্য, হতাশ, হাহাকার—দীর্ণ দীর্ণ দুঃস্থ সত্তা সেখানে কি সব লুকান জগতের দুর্দাম কামনা লইয়া অশনায়াপীড়িত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সময় সময় মনে হয় এ যেন শ্মশান-কালীর বীভৎস বিকট নৃত্য। চিত্রকলার জগতে আধুনিক শিল্পের এই ভিতরের দিকটা বোধ হয় খুব স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

Georges Ronault, Modigliani প্রমুখ ফরাসীর আধুনিকতম কয়েক জনের ছবি দেখিয়া আমার মনে পড়িয়াছে কেবলই ডাকিনী যোগিনীর কথা; এমন কি নিকোলাস রোরিক পর্যন্ত এমন ধারা জগতেরই অধিবাসী বলিয়া আমি বোধ করি।

কবি দান্তের নরকেরই মত আধুনিক সাহিত্য-জগতেরও দুয়ারে যেন লেখা আছে—'সকল আশা বিসর্জন দাও কে তোমরা এখানে প্রবেশ করিতেছ'—তবে দান্তে যন্ত্রণার লাঞ্ছনার শতরকম প্রকারভেদই আবিষ্কার করিয়া থাকুন না, আধুনিকের চেতনার, অনুভূতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ সব চলিয়াছে তাহার কোন সন্ধান তাহার যুগে তিনি পান নাই। আধুনিকের অন্তরাত্মা মূর্ত ট্রাজেডি; এই ট্রাজেডি বাহিরের রূপের বা ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিতেছে না—তেমনি ট্রাজেডি ত' আরোপ মাত্র। ট্রাজেডির বস্তু জমাইয়াই যেন আধুনিকের অন্তরাত্মা গড়া হইয়াছে, এই অন্তরাত্মার স্বাভাবিক চলনে বলনেই ট্রাজেডি ফাটিয়া পড়িতেছে। আধুনিককে জানিয়া শুনিয়া যেন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় দুঃখ-ক্লেশের হাতে আপনাকে তুলিয়া দিয়াছে। প্রাচীনের অন্ধকার হইতেছে অজ্ঞানের অন্ধকার

আধুনিক চেতনা অন্ধকার---তাহার অপেক্ষা আরও অন্ধকার, কারণ তাহা জ্ঞানের অর্থাৎ অতিজ্ঞানের অন্ধকার---

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ
বিদ্যায়াং রতাঃ।

মানুষের---কবির কণ্ঠে আজ যে রসাতলের বাণী মুখরিত, তাহার গোড়া খুঁজিতে সুদূর অতীতেরই মধ্যে যাইতে হয়। কিন্তু উষ্ণ প্রস্রবণের মত এদেশে সে-দেশে একালে সেকালে কখন কদাচিৎ পৃথিবীর আবরণ দীর্ণ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিলেও, জিনিষটা ছিল আকস্মিক আর তাহার ধরণ-ধারণও ছিল অন্য রকমের। কিন্তু বর্তমানে রসাতল যেন একটা বিকট আগ্নেয়গিরির মত ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে---ধূমে ভস্মে গলিত ধাতুস্রাবে মানুষের সমস্ত চেতনার ক্ষেত্র অভিভূত করিয়া চলিয়াছে।

ব্যষ্টি হিসাবে নয়, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে একটা অগ্ন্যুৎপাত, সামাজিক একটা ভূকম্প সুরু হয় ফরাসী বিপ্লব দিয়া। 'বুরবন' সিংহাসনের পতনের সাথে সাথে আভিজাত্য জিনিষটাও ধসিয়া গেল---আর সমাজের তলা হইতে উঠিয়া আসিল দুঃস্থতা, কদর্যতা, যত ক্লেদ যত ময়লা Les miserables সেই বিপ্লবের নেতা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদেরই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন, কেমন ধারা লোক ছিলেন তাঁহারা। Mart, Danton এমন কি Mirabeau পর্যন্ত সকলেই সাধারণ অবস্থায় থাকিলে ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক দিয়া Apaches (ফরাসী গুণ্ডা) হইতে খুব দূরে আসন পাইবার যোগ্য কি না সন্দেহ। কিন্তু তবুও, এই বিপ্লবের যুগে বা তাহার ফলে সমাজের মনোময় ক্ষেত্র আক্রান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে নাই, কাব্যের শিল্পের জগৎ কিছু ধাক্কা খাইলেও তাহার সমুচ্চ সৌন্দর্য, আভিজাত্য অনেকখানি অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিল।

শিল্প-সমাজে পঞ্চম বর্ণ সম্পূর্ণ জাগিয়াছে গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে। সারাজগতে আজ 'বোলশেভিক' বা 'প্রোলেটেরিয়াট্' সাহিত্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলত, রুশ যে আধুনিক এই সৃষ্টিধারার নেতা হইয়া উঠিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। মোটের উপর রুশ-সাহিত্য গোড়া হইতেই ছিল নিপীড়িতের দীনের হতাশের অভিশপ্তের দীর্ঘশ্বাস। সমাজের মধ্যে যে-সব আদর্শ মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারে নাই, যে-সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা কারাগারে দূর বনবাসে বৃথা আক্রোশ করিয়া মরিয়াছে, যে-সকল প্রেরণা, যে-সকল আবেগ, যে-সকল শক্তির ধারা চাপে পড়িয়া মাটির নীচে চেতনার তলদেশে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদেরই অভিব্যক্তি-প্রয়াস হইতেছে রস-সাহিত্য। তাহারই বীজ সারাজগতে সকল দেশের সাহিত্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। আজকালকার সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই যে, তাহাতে আলো অপেক্ষা উত্তাপ বেশী, উত্তাপ অপেক্ষা দাহ বেশী---আনন্দ অপেক্ষা ব্যথা বেশী, ব্যথা অপেক্ষা জ্বালা বেশী---প্রসারতা অপেক্ষা তীব্রতা বেশী, তীব্রতা অপেক্ষা কুটিলতা বেশী ---স্থৈর্য অপেক্ষা গতি বেশী, গতি অপেক্ষা ঘূর্ণি বেশী।

বাংলা সাহিত্যের গায়ে এই বিশ্বের হাওয়া লাগিয়াছে। তবে ইউরোপে এই হাওয়া হইতেছে একটা তুফান বা দারুণ ঝাপটা---অনেক কিছুই ইহার ফলে ভাঙ্গিতেছে, চুরিতেছে, ওলট হইতেছে, পালট হইতেছে। আমাদের দেশে ব্যাপার এখনও ততদূর গড়ায় নাই। আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় সে-সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই---এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোসখেয়ালের কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।

তবুও স্বীকার করিব, আজ যাঁহারা বঙ্গবাণীর জন্য নৈবেদ্য আহরণ করিতে গিয়া পাতাল রসাতল হাতড়িতেছেন, সাহিত্যের সাধক যাঁহারা সত্য সত্যই হাতে হাতিয়ারে 'লজ্জা ঘৃণা ভয়' এই তিনকে বিসর্জন দিয়া বসিয়াছেন, এই যে সব অবধূতমার্গ অঘোরপন্থী তাঁহাদের সকলেই স্রষ্টা হিসাবে যে অক্ষম অপটু তাহা নয়। একাধিক হয়ত শিল্প-রচনার দিক দিয়াই দেখাইয়াছেন বিশেষ ক্ষমতা ও নৈপুণ্য---বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও ভাব উভয় হিসাবে, তাঁহাদের হাতে পাইয়াছে একটা বিশেষ পুষ্টি ও ঋদ্ধি; তবে কথা এই, এই শিল্প হইতেছে মুখ্যত পশু-পিশাচের, প্রেত-প্রমথের জিনদানার* শিল্প; দেবতার শিল্প মানুষের শিল্প যাহা, তাহা অন্য ধরণের বস্তু।

* কথাগুলি সদর্থেই আমি গ্রহণ করিয়াছি, গালাগালি হিসাবে ব্যবহার করা আমার অভিপ্রায় নয়।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
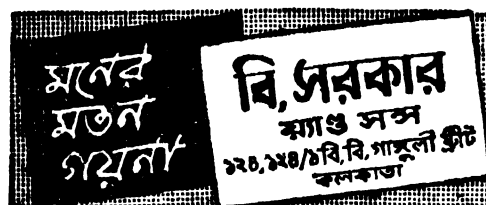
নীহারিকা সেনের সঙ্গে গোবর্ধন রায়ের আলাপটা সেদিন বেশ আকস্মিক ভাবেই হয়ে গেল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী হলে। এতদিন তারা দুজনে ফিফ্‌থ ইয়ার ক্লাসে একসঙ্গে বসছে, কিন্তু মুখচেনা হওয়া ছাড়া আলাপ হওয়ার সুযোগ হয় নি। নীহারিকা প্রফেসর সেনের মেয়ে, ইংরাজীতে ফার্স্ট ক্লাস না পেলেও উঁচু অনার্স পেয়েছে; ঠিক সুন্দরী না হলেও শ্রীমতী ও স্মার্ট। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে কমন রুমে হাসি, গল্প ও তর্কে ছেলেদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করায় তার কোন সংকোচ ছিল না।

এইসব কারণে তার গুণগ্রাহীর অভাব ছিল না ক্লাসে। ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল যথেষ্ট নীহারিকার সান্নিধ্যলাভের জন্য। কিন্তু নীহারিকার মধ্যে এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যা তার মাধুর্য খণ্ডন করত না অথচ ছেলেদের সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব লঙ্ঘন করতে দিত না।

গোবর্ধন ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। যদিও ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে এবং ক্লাসে তার পড়াশুনার খ্যাতিও যথেষ্ট, কিন্তু তার মানসিক কাঠামোটা ছিল কলকাতার ছেলেদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লাজুক, মুখচোরা, সুদূর পল্লীগ্রামের ছেলে। বাবা তার বাঁকুড়া জেলার কোন এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

গোবর্ধনের পড়াশুনা সবই বাঁকুড়ায় এবং এই আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠায় শহরের পালিশ তার কথা-বার্তায়, বেশ-ভূষায় এবং চাল-চলনে এখনও পড়ে নি। তার চেহারায় এবং চালচলনে পল্লীগ্রামের ছাপ অনায়াসে নজরে পড়ে এবং এ বিষয়ে সে নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিল। তাই নীহারিকার সান্নিধ্য লাভের দৌড়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা ত দূরের কথা, স্মার্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশতেও তার সংকোচের অবধি ছিল না।

এতদিন বই-এর পোকার মত পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করার তার সময় হয় নি। তাই খেলাধূলা, রাজনীতি, গান-বাজনা, সিনেমা-থিয়েটারের খবর অল্প-বিস্তর রাখলেও ঐসব বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে নি। অথচ কমন-রুমে ঐসব বিষয়েই প্রধানত তর্ক চলে।

তাই কমনরুমে গোবর্ধনের অবস্থা হয় অনেকটা জল থেকে তুলে ধরা মাছের মত। না পারে ঐসব চর্চায় যোগ দিতে আর না পারে নিজের মতামত জাহির করতে। ফলে তার নীরবতা অন্যান্যদের কৌতুকের খোরাক যোগায়। তাই ক্লাস না থাকলেই গোবর্ধন সোজা লাইব্রেরী ঘরে এসে বই-খাতা নিয়ে বসে। কমন রুমের দিকে যায় না। অবশ্য তার মনে এ-ধারণা যে একেবারে ছিল না তা নয় যে কমনরুমে বসা মানে অধ্যয়ন তপস্যায় পিছিয়ে পড়া।

এ-হেন গোবর্ধন রায়ের সঙ্গে নীহারিকা সেন একরকম গায়ে পড়েই আলাপ করল। ফার্স্ট ক্লাস যে ছেলে পেয়েছে তার যতরকম ত্রুটিই থাকুক, ক্লাসের ছেলেদের কাছে, বিশেষত

ভাল ছেলেদের কাছে তার শ্রদ্ধা একটু থাকবেই এবং এই কারণেই এতদিন আলাপ না হওয়ার ক্রটি পুষিয়ে দেবার জন্য নীহারিকা নিজেই কথা শুরু করল। হয়ত মনের কোণে গোবর্ধনের সম্বন্ধে কিছুটা কৌতূহলও থাকতে পারে।

গোবর্ধন তখন একমনে, গেজেট দেখছিল। আজই তাদের প্রাইজ ও স্কলারশিপ লিস্ট বেরিয়েছে।

নীহারিকা গোবর্ধনের পাশের চেয়ার বসতে বসতে বলল, 'মিস্টার এখানে নিরালায় বসে কি পড়ছেন ?'

গোবর্ধন একটু চমকে উঠে বলল, 'পড়ব আর কি! এখানে কি পড়াশুনা করা যায়! এখানে বসে এইসব আজে-বাজেতে চোখ বোলাচ্ছিলাম।'

নীহারিকা একটু কৌতুকের সুরে বলল, 'আপনি যে সারাক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকেন, সেটা আপনার হয়ত খেয়াল থাকে না না। কিন্তু আমরা দেখি আপনার পড়াশুনা ছাড়া অন্য-কোন বিষয়ে নজর নেই।'

গোবর্ধন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। কি যে উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরে বলে উঠল, 'লাইব্রেরীতে এসে বসি বলে মনে করেন বুঝি খুব পড়াশুনা করছি? মোটেই না। কমন-রুমে বড্ড ভিড় থাকে, বসবার জায়গা থাকে না। তাই লীজার পিরিয়ড কাটাবার জন্যই এখানে এসে বসি।'

নীহারিকা একটু হেসে উত্তর দেয়, সেই কথাই ত আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। আপনি এত নিষ্ঠার সঙ্গে কমন-রুমটা এড়িয়ে চলেন দেখে মনে হয় সত্যিই কমন রুমের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার সম্বন্ধটা অনেকটা অহি-নকুলের মত।"

সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, অপরিচিত এবং সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে কাছে বসে আলাপ করা তার জীবনে কখনও ঘটে ওঠে নি। তাই অস্বস্তিতে তার মন অস্থির হয়ে উঠল। তার ওপর তাদের কথার বিষয়বস্তু হচ্ছে গোবর্ধন নিজে। তাই তার অবস্থা খুবই চরমে এসে গেল। কোনরকমে উত্তর দিল, 'না-না, ওসব কথা বলে আমায় কেন লজ্জা দিচ্ছেন ?'

নীহারিকা গোবর্ধনের অবস্থা অনুভব করে গোবর্ধনকে আর বেশি অত্যাচার না করবার জন্য অন্য কথা পাড়ল, 'মিস্টার রায়, যাক্ ও-সব কথা। এখন বলুন কি পড়ছেন।'

গোবর্ধন তাড়াতাড়ি গেজেটের পাতাটা উল্টে দিয়ে বলল, 'ও কিছু না।'

নীহারিকা এবার হেসে ফেলে বলল, 'আমি কি জানি না আপনি কি পড়ছেন? আমি সকালেই এসে দেখে নিয়েছি আপনার নামটা। তাই ত আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাতে এলাম।'

ঘণ্টা পড়ে গেল। ডঃ ঘোষের ক্লাস এবার। ওরা দুজনেই উঠে পড়ল

নীহারিকার কথা বলার ধরণে এবং হাসি-খুশি অমায়িক ব্যবহারে তার প্রতি গোবর্ধনের মনে এতদিনে যে একটা অহেতুক ভীতি ছিল তা

বেশ কিছুটা কমে গেল। নীহারিকার প্রতি যেন খানিকটা প্রশংসার ভাব এলো মনে।

●

পরের দিন ফিলজফির ক্লাসের পর দু ঘণ্টা আর ক্লাস নেই। যথারীতি ক্লাসের পর লাইব্রেরীর দিকেই যাচ্ছিল গোবর্ধন। এমন সময় করিডোরে নীহারিকার সঙ্গে তার সামনা-সামনি দেখা। মনে হল যেন তার জন্যই এগিয়ে আসছে। চকিতে গোবর্ধনের মনে একটা পুলক খেলে গেল--- নীহারিকা তাকেই খুঁজছে।

নীহারিকা কিন্তু অত কথা ভাববার সময় না দিয়ে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলল, 'চলুন মিস্টার রায়, আমাদের একটা মিটিং হবে আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।'

গোবর্ধনের পুলক মুহূর্তে উবে গেল। এইসব মিটিং-কে সে ভয় খায়। এরকম ছোটখাট মিটিং-এ তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হতে হয় এবং এসব নামে মিটিং কিন্তু আসলে আড্ডা। এসব মিটিং-এ যোগ দেওয়া মানে বাজে সময় নষ্ট করা। তাই এড়িয়ে যাবার জন্য গোবর্ধন বলল, 'এক্সকিউজ মি, মিস্ সেন, পোস্ট-অফিসে একটা কাজ সেরেই আসছি, এক মিনিট লাগবে। আপনি চলুন। আমার জন্যে শুধু শুধু দেরি করবেন না।'

নীহারিকা একটু মিষ্টি হেসে আর আব্দারের সুরেই বলল, 'পোস্ট-অফিস ত পালাচ্ছে না, মিস্টার রায়। মিটিং-এর পরেই না হয় পোস্ট-অফিসে যাবেন। আসুন তাড়াতাড়ি। আপনার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে।'

গোবর্ধন আর আপত্তি করার মত জোর পেল না। ধীরে ধীরে নীহারিকার পিছনে পিছনে এসে ঢুকল কমন রুমে। কমন রুম তখন গমগম করছে। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের বিভিন্ন শাখার ছেলে-মেয়েরা জমেছে। নীহারিকার সঙ্গে গোবর্ধনকে দেখে সবাই যেন একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ঘরের গুঞ্জনধ্বনি হঠাৎ থেমে গেল। গোবর্ধন রায়ের কমনরুমে আসার জন্য শুধু নয়। নীহারিকা সেনের সঙ্গে গোবর্ধন রায়কে দেখলে আশ্চর্য হবার কথাই। এ সম্বন্ধে গোবর্ধনও সচেতন কম নয়। তাই হঠাৎ কমনরুমের আবহাওয়া বদলে যাওয়ায় তার মন কুঁচকে গেল আড়ষ্টতায়। কোনদিকে না চেয়ে সোজা এসে বসে পড়ল কোণের দিকের একটা বেঞ্চে।

নৃপেন দত্ত উঠে আধভাঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে সমানের দিকে হাত দুটোকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ভেরি গুড মিস সেন, মিস্টার রয়কে যে আজ আনতে পেরেছেন তাতে আমরা সত্যই কৃতজ্ঞ। ভেরি ওয়েল, এইবার আমাদের কমিটি ফরম করে ফেলা যাক।'

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত ট্রাউজারের পকেটে আর এক হাত শূন্যে নেড়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে নৃপেন সুরু করল, 'বন্ধুগণ, আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি কি উদ্দেশ্যে তা আপনারা অনেকেই জানেন। আমরা চাই পুরুলিয়া সত্যাগ্রহীদের পূর্ণ সমর্থন জানাতে আর কলকাতায় তাঁরা যখন এসে পৌঁছবেন তখন তাঁদের স্বাগত জানাতে। এই উদ্দেশ্যে আমরা 'পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পুরুলিয়া সত্যাগ্রহী ফাণ্ড' নামে একটা ফাণ্ড খুলতে চাই। এই ফাণ্ড কমিটির প্রেসিডেণ্ট হিসাবে শ্রীযুক্তা নীহারিকা সেনের নাম ও সেক্রেটারী হিসাবে শ্রীযুত গোবর্ধন রায়ের নাম প্রস্তাব করছি। আশাকরি আপনারা আমার প্রস্তাব সমর্থন করবেন।' সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে সমর্থন জানাল। প্রস্তাব সর্ববাদী সমর্থন লাভ করল, প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের মতামতের প্রয়োজন হল না।

নীহারিকা হাসি হাসি মুখে একটু কুণ্ঠিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনারা সবাই যখন আমাকে চান, তখন আমার আর আপত্তি করা চলে না। আপনাদের সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া অসম্ভব। আশা করি, আপনাদের সহযোগিতায় এই গুরু দায়িত্ব আমি যথাযথ পালন করতে পারব।' নীহারিকার কথায় সবাই হর্ষধ্বনি করে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানালো।

এবার গোবর্ধনের পালা। জীবনে এ সবের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোনদিন হয় নি। বরাবরই সে এসব অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলেছে। আজ কিন্তু ইউনিভার্সিটি আর্ট কলেজের এই রকম একটা কমিটির একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়ে মনের কোণে একটা খুশীর ভাব যে হয় নি তা নয়। কারণ, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে এ- কমিটি গড়ে উঠলেও গোবর্ধন এটাকে হাল্কাভাবে নিতে পারল না। খুব গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল। জীবনে এই প্রথম পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। এতদূর এগিয়ে আর পেছনো চলে না। মরিয়া হয়ে সে গড়গড় করে বলে গেল,—

'বন্ধুগণ, আজ আমি অকপটে আপনাদের কাছে স্বীকার করছি যে এরকম সভা বা সমিতির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কোনদিন হয় নি। এই প্রথম আমাকে এরকম একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করলেন আপনারা সবাই মিলে। জানি, এসব বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অযোগ্য। হয়ত পদে পদে আমি আপনাদের থেকে পিছিয়ে পড়ব। কিন্তু আপনারা যখন ভালবেসে আমাকে আপনাদের মধ্যে নিয়েছেন, তখন ভরসা রাখি আপনারা আমায় পিছিয়ে পড়তে দেবেন না। এই আশায় আমি এই গুরু দায়িত্ব নিতে রাজী হলাম।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলেই সে বসে পড়ল। এমন গুছিয়ে এত কথা একসঙ্গে সে যে বলতে পারে তার নিজের ধারণাই ছিল না। মনে মনে আত্মপ্রসাদ হতে লাগল বটে কিন্তু লজ্জায় সে কারও মুখের দিকে চাইতে পারল না। শুধু অনুভব করল ছেলেদের মধ্যে যেন হাসাহাসির ভাব। কানে নানা রকম চাপা মন্তব্যের দু-একটা এসে পৌঁছল। এমন কি একজন যেন বলছে, 'মুখস্থ করে এসেছিল না কিরে!'

নীহারিকা গোবর্ধনের অবস্থা উপলব্ধি করে এই পরিস্থিতি থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মিস্টার রায়, চলুন আপনার পোস্ট-অফিসের কাজটা সেরে আসা যাক।' এই কথা বলেই নীহারিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গোবর্ধন এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার সুযোগ পেয়ে বর্তে গেল। নীহারিকার পিছুন পিছুন সেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। নীহারিকার প্রতি মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সত্যাগ্রহী তহবিলের কাজ পুরাদমে চলতে লাগল। টাকাও উঠল। আগামী সপ্তাহে সত্যাগ্রহীদের কলকাতায় পৌঁছুনর কথা। কিভাবে টাকাটা তাদের দেওয়া হবে সেই নিয়ে নানা রকম পরিকল্পনা চলতে লাগল। এই ব্যাপারে একদিন হঠাৎ গোবর্ধনকে নীহারিকার বাড়ী যেতে হ'ল সোজা কলেজ থেকে। ভাল করে কামান নেই; পোষাকও ধোপদুরস্ত নয়। অন্যমনে পুরানো ছেঁড়া স্যাণ্ডাল পায়ে চলে এসেছে কলেজে। মাথার চুলের অবস্থাও অনুরূপ। এ-হেন অবস্থায় কার্যগতিকে তাকে যেতে হল নীহারিকার বাড়ী।

প্রফেসর সেনের বাড়ী। নাগের বাজারের ছোট বাড়ী, সামনে একটুখানি বাগান। বাগান ও বাড়ীর সর্বত্র একটা রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের মালিন্যের কথা ভেবে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ভিতরে ঢুকবে কি না বার-কয়েক ইতস্তত করল। পরে মনে জোর করে ঢুকে পড়ল গেটের ভিতর। ছোট বাগানটুকু পার হয়েই সামনে বেতের চেয়ার দিয়ে আর ফুলের ও পাম গাছের কয়েকটি টব দিয়ে সাজান সামনের বারান্দা। বারান্দায় কেউ নেই। কিভাবে নিজের আগমনের কথা জানাবে ভাবছে, এমন সময় পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো নীহারিকা।

নীহারিকা প্রথমটা অবাক হয়ে গেল গোবর্ধনকে দেখে। তারপরেই খুব আপ্যায়িত সুরে গোবর্ধনকে অভ্যর্থনা জানাল, 'মিস্টার রায়, আপনি! কতক্ষণ এসেছেন! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? কি অন্যায় বলুন ত। কলিং বেল টেপেন নি কেন? ভাগ্যে এদিকে এসে পড়েছিলাম তা না হলে আপনি যা লোক, হয়ত আরও দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যেতেন। কিছুই আশ্চর্য নয় আপনার পক্ষে।

গোবর্ধনকে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়ে নীহারিকা খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলল, 'এক মিনিট মিস্টার রায়, মাকে খবর দিয়ে এক্ষুণি আসছি।'

নীহারিকা ভিতরে চলে গেল। বারান্দার সামান্য বেতের চেয়ার আর দু'চারটে ফুলগাছ ও পামগাছের টব দিয়ে কেমন সুন্দর করে সাজান যায় তাই সে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের মালিন্যের কথাও মনে এসে গেল। মনে মনে তার বেশ লজ্জা করতে লাগল। নিজের রুচিজ্ঞানের অভাব তাকে আজ বেশ পীড়া দিতে লাগল।

নীহারিকার সঙ্গে নীহারিকার মা বেরিয়ে এলেন। বেশ সৌম্য মূর্তি। গোবর্ধন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে নমস্কার করল।

নীহারিকার মা বেশ আন্তরিকতার ভাব দেখিয়ে বললেন, 'বস-বস বাবা! তোমার কথা নীহারিকার মুখে প্রায়ই শুনি। বড় আনন্দ হল। তা বাবা তুমি মাঝে মাঝে এখানে আস না কেন?'

নীহারিকার মায়ের মিষ্টি কথায় গোবর্ধনের মনের দৈন্য অনেকটা কেটে গেল। উত্তর দিল, 'আজ্ঞে আসব নিশ্চয়।'

নীহারিকার মা বেশ মিষ্টি কথা বলতে পারেন। একে একে গোবর্ধনের সব পরিচয় কথায় কথায় জেনে নিলেন। কথায় বার্তায় গোবর্ধন শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে গেল। যেমন মার্জিত রুচি, তেমনি অমায়িক ব্যবহার। ফেরার সময় গোবর্ধনের সমস্ত জড়তা, সমস্ত ভয় ভেঙ্গে গেল। একটা মধুর ভাব নিয়ে বাসায় ফিরল গোবর্ধন। অনাত্মীয় মেয়েদের সঙ্গে পূর্বে সে বহুবার আলাপ করেছে কিন্তু তা নেহাৎ গ্রাম্যভাবে। তাতে না ছিল কোন মার্জিত ভাব, আর না ছিল এমন মধুর কথার ভঙ্গী। মনে তার বেশ রয়ে গেল।

নীহারিকার বাড়ীর প্রতি গোবর্ধন বেশ আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু অনাত্মীয়ার বাড়ী বিনা আহ্বানে যাতায়াত করার মত মনের বল পায় না। মনে তার একটা সংকোচ থেকে যায়। তাই নীহারিকার দিক থেকে যখন আহ্বানটা বেশি হয় তখনই সে তাদের বাড়ী যাবার মত মনের জোর পায়। এইভাবে আগ্রহ আর সংকোচের দোটানায় পড়ে গোবর্ধনের কয়েকবার যাওয়া-আসা হয় নীহারিকার বাড়ীতে।

সেদিন কথায় কথায় গোবর্ধন জানাল যে, সে বড়দিনের ছুটিতে মধুপুর তার মেসোমশায়ের বাড়ী বেড়াতে যাবে। মেসোমশায় অনেকদিন থেকে তাকে যেতে লিখছেন।

নীহারিকা বেশ আগ্রহের ভাব দেখিয়ে বলল, 'আপনি মধুপুরে যাচ্ছেন? আমারও মধুপুরে যাবার অনেকদিন থেকে ইচ্ছা। ভালই হল, চলুন, না একসঙ্গে যাওয়া যাক্।'

—এত খুব আনন্দের কথা! তা সেখানে কোথায় উঠবেন আপনি?

নীহারিকা কৌতুক মিশ্রিত স্বরে বলে উঠল, 'কোথায় উঠব মানে? সঙ্গে যাচ্ছি আপনার আর উঠব অন্য কোথায়? বেশ লোক ত আপনি! আপনার মেসোমশায়ের বাড়ীতে আমার স্থান হওয়া কি খুব শক্ত?'

নীহারিকার এটা যে একটা পরিহাস এ বিষয়ে গোবর্ধনের লেশমাত্র সন্দেহ নেই। তাই বেশ উৎসাহ দেখিয়ে তার স্বভাবসুলভ লাজুকভাবেই উত্তর দিল, 'এ আর এমন কি কথা। একটা লোকের স্থানাভাব সেখানে নিশ্চয়ই হবে না। আপনাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি তবে অবশ্য আপনার নিজের যদি কোন বাধা না থাকে।'

নীহারিকা একটু অভিমানের সুরে বলে, 'আপনি আমায় কি মনে করেন মিস্টার রায়? আমি এমন কি এক মহামান্য মহাপুরুষ যে আমার ওখানে থাকায় বাধা থাকবে। ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। এখন বলুন কবে কোন ট্রেনে আপনি যাচ্ছেন? যথাসময়ে ট্রেনে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

গোবর্ধন সবটাই পরিহাস বলে ধরে নিয়েছিল। তাই নীহারিকার যাওয়ার কথায় মুহূর্তের জন্যও তার মনে কোন উদ্বেগ হয় নি।

নির্দিষ্ট দিনে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের একটি ইন্টার ক্লাসে এসে গোবর্ধন বসল। ইন্টার-ক্লাসে ভিড় নেই বললেই চলে। বেশ মনোমত বসবার একটা জায়গা করে একটি শতরঞ্চ বিছিয়ে বাঙ্কের উপর স্যুটকেশটি রেখে সবে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে, এমন সময় দূরে প্ল্যাটফর্মে দেখতে পেল প্রফেসর সেনের সঙ্গে নীহারিকা ও তার মা আসছেন। গোবর্ধন একটু চমকে উঠল। সত্যই কি নীহারিকা মধুপুর যাবে। নাও হতে পারে। হয় ত 'সি-অফ' করতে এসেছে। কিন্তু তাও কি সম্ভব? তাদের পরিচয় আর অন্তরঙ্গতা এত বেশি হয় নি যাতে এই রাত্রে বাগের বাজার থেকে হাওড়া স্টেশনে তাকে 'সি-অফ' করতে আসবে। তাহলে কি নীহারিকা তারই সঙ্গে যাবে? বড় বিপদের কথা। সত্যই কি তার সঙ্গে মেসোমশায়ের বাড়ী গিয়ে উঠবে? তাদের বলা নেই, কওয়া নেই, তারাই বা কিভাবে নেবে ব্যাপারটি! একবার মনে হল তার একটু লুকিয়ে থাকে, যাতে তারা দেখতে না পায়। আবার তক্ষুণিই মনে হল সে ত খুব বড় গলায় নীহারিকাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এখন ত গত্যন্তর নেই।

ইতিমধ্যে প্রফেসর সেন তার কামরার সামনে এসে পড়লেন। উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা করতেই হবে, না হলে বড়ই অভদ্রতা হবে। তাই তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে নেমে গোবর্ধন প্রফেসর সেনকে অভিবাদন জানাল, 'স্যার, আপনিও এসে পড়েছেন? মাসীমাও কি মধুপুর যাচ্ছেন?'

প্রফেসর সেন বললেন, 'তুমি যাচ্ছ, না হলে নীহারিকাকে পৌঁছাতে আমাকেই যেতে হত। তা গাড়ীতে বিশেষ ভিড় নেই। খুব সজাগ হয়ে থাকবে। যা গাড়ীতে চুরি হচ্ছে তাতে একটু অন্যমনস্ক হলেই স্যুটকেশ খোয়া যায়। ঘুমালে ত কথাই নেই।'

গোবর্ধন বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। আমি জেগেই থাকি।'

নীহারিকা বলল, 'বাবা, আমি কি এখনও এত ছোট আছি যে অত সব উপদেশ দিচ্ছ। ওসব কথা দরকার হয় যারা প্রথম প্রথম ট্রেনে চড়ছে তাদের। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না বাবা। এখন তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাও। নটা বেজে গেছে। বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

প্রফেসর সেন ও মিসেস্ সেনের আরও কিছুক্ষণ থাকবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নীহারিকার তাগাদায় তাঁরা তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন। গাড়ী একে একে ভরে গেল। গোবর্ধন জানালার ধারে বসল আর নীহারিকা বসল তার সামনের বেঞ্চে। এবার গোবর্ধন তলিয়ে ভাবতে লাগল: সত্যিই নীহারিকা চলেছে আমার সঙ্গে। কিন্তু এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ও আমার সঙ্গে মেসোমশায়ের বাড়ী উঠবে কি না। এ-ও কখন সম্ভব হতে পারে। নীহারিকা যে-রকম ভাবধারায় মানুষ তাতে বিনা আমন্ত্রণে একজন অপরিচিতের বাড়ী গিয়ে উঠবে তা ভাবা যায় না।

গাড়ী ছাড়ল। নীহারিকা হাসতে হাসতে বলল, 'কি মিস্টার রায়, অমন চুপ হয়ে গেলেন কেন? দেখলেন ত কথা যা দি' তা রক্ষা করি।'

---'আমি কি একবারও বলেছি যে আপনি কথা রাখেন না?'

---'না তা নয়, তবে মনে মনে নিশ্চয়ই ধরে রেখেছিলেন যে নীহারিকা যাই বলুক আদতে সে কোনমতেই গিয়ে উঠতে পারবে না। বলুন, কথাটা---কথাটা ঠিক কি না?'

---'এটা আপনার স্বকপোল-কল্পিত। তখন আমি কি চিন্তা করে-ছিলাম তা আপনি বুঝে ফেলেছিলেন---তারিফ করতে হয় আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার!'

---'বলুন, আমি যা বললাম তা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?''

---'তা হলে, আমার কথার আগে উত্তর দিন। আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না।'

নীহারিকা হেসে ফেলল, 'কি অদ্ভুত যুক্তি আপনার! যাচ্ছি একসঙ্গে তবু এ প্রশ্ন ওঠে কেমন করে?'

এবার গোবর্ধনের চুপ করে থাকার পালা। কি জানি কলকাতার সমাজে এরকম হয়ত চলে। হয়ত অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে যাওয়ার কোন আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে তার বাড়ীতে গিয়ে ওঠা কি করে ভাবতে পারা যায়!

নীহারিকা একটু হেসে বলল, 'কি হল? মিস্টার রায়! গম্ভীর হয়ে গেলেন যে। একে মোগলসরাই-এর মত প্যাসেঞ্জার গাড়ী তাতে মধুপুর সারারাতের পথ। অতএব এত শীঘ্রই কথা ফুরিয়ে গেলে এতটা সময় কাটবে কেমন করে? আপনি ও-রকম গম্ভীর হয়ে গেলে চলবে না।'

---'গম্ভীর কোথায় দেখলেন?'

নীহারিকা হঠাৎ বিরক্তি প্রকাশ করে, 'এত আওয়াজ হচ্ছে যে আপনার কথা শোনাই যাচ্ছে না। সামনা-সামনি বসে কথা জমছে না। আপনি ত দেখছি শতরঞ্চ বিছিয়ে রাত্রে শোবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ও-টি হচ্ছে না, আমি আপনার জায়গার কিছুটা দখল করছি, এখানে বসে ভাল করে গল্প করা যাচ্ছে না।' এই বলে নীহারিকা উঠে এসে গোবর্ধনের পাশে শতরঞ্চে এসে বসল। শীতের রাত, যারা শোবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে তারা আরাম করে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। যারা শোবার ব্যবস্থা করতে পারে নি,

আড্ডা মুড়ি-সুড়ি দিয়ে বসে বসেই ঘুমাচ্ছে। জেগে আছে শুধু ওরা দুজনে।

নীহারিকা পাশে এসে বসায় গোবর্ধনের অবস্থা আরও চরম হয়ে উঠল। মনটা সংকোচে ভরে গেল। সেণ্টের গন্ধ তার নাকে আসছে এরকম সান্নিধ্য এর আগে কখনও আর হয় নি। মাঝে মাঝে মনে এক একবার পুলকও যে হচ্ছিল না তা নয়। কিন্তু গোবর্ধন ভাবে, এ-রকমটি হয় কেমন করে। তার মত গেঁয়ো আনস্মার্ট শ্যাবি লোকের প্রতি কি শেষ পর্যন্ত নীহারিকার মত সুরুচিসম্পন্ন আধুনিক মেয়ে আকৃষ্ট হয়েছে। অসম্ভব। কিন্তু কেনই-বা নীহারিকা এমন ভাব দেখাচ্ছে? কি জানি, মানুষের মনের কোন হিসাব পাওয়া শক্ত। কিন্তু গোবর্ধনের ভীরু মন। একথা ভাববার মত মনের বল কোথায়? এক গাড়ী লোক, অনেকের নজর নিশ্চয়ই তাদের দিকে পড়ছে। কি বিশ্রী পরিস্থিতি! কিন্তু কি-বা করা যায়। অস্বস্তিতে আর দুশ্চিন্তায় মন তার আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাই নির্বাক হয়ে বসে রইল গোবর্ধন।

এবার একটু অনুযোগের সুরে নীহারিকা বলতে লাগল, 'কি যে হল আপনার বুঝতে পারছি না। অত সংকোচে অস্থির হয়ে পড়ছেন কেন? গাড়ীতে অত স্পর্শকাতরতা নিয়ে যাওয়া-আসা চলে না। আপনি ও-সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে বেশ স্বাভাবিক হয়ে বসুন।'

নীহারিকা অনর্গল নানা কথা বলে চলল। অদ্ভুত ক্ষমতা তার কথা বলার। চুপচাপ বসে থাকার একঘেয়েমি আসতে দেয় না। গোবর্ধনের ভালই লাগছিল। বিপদের মাঝে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে মানুষ যেমন মাঝে মাঝে বিপদের অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়, তেমনি মধুপুর পৌঁছে কি পরিস্থিতি হবে ভাবতে ভাবতে মন তার এতক্ষণ যে অস্থির হয়ে পড়েছিল, বর্তমান মধুর মুহূর্তগুলো সেই দুশ্চিন্তাকে ছাপিয়ে তার মন মাধুর্যে আর পুলকে ভরিয়ে দিচ্ছিল। এক সময় গোবর্ধন তার বিপদের কথা ভুলেই গিয়েছিল যেন।

আসানসোল এসে গেল। রাত প্রায় শেষ হয়ে ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিয়েছে। আর অল্প পরেই মধুপুর। হঠাৎ গোবর্ধনের আবেশ ভেঙে গেল। চমকে উঠল, তাই ত মধুপুর এসে গেল বলে। এখনও সঠিক বোঝা গেল না নীহারিকার গন্তব্য কোথায়। এখনও তার মনে সন্দেহ, নীহারিকা কোনমতেই তার সঙ্গে তার মেসো-মশায়ের বাড়ী যেতে পারে না। কিন্তু নীহারিকাকে আবার জিজ্ঞাসা করা চলে না। এত বড়গলায় আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন বারবার ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করা বড্ড অশোভন হবে। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল গোবর্ধন।
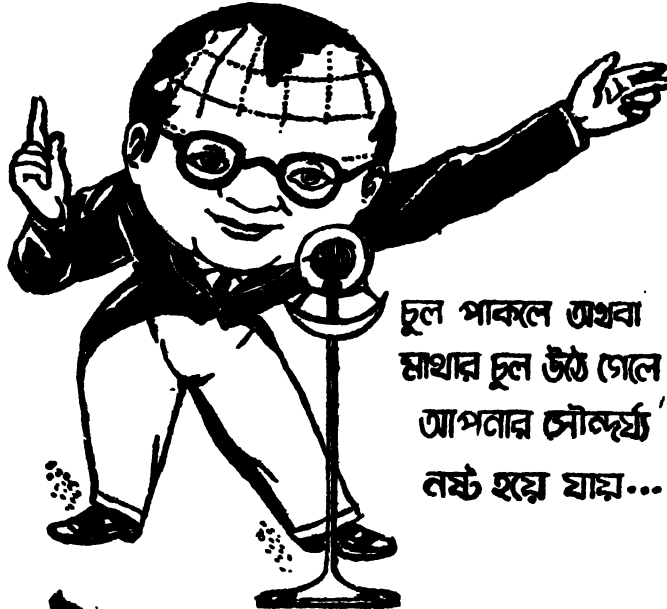
এদিকে আবার তার উৎকণ্ঠা যদি সত্যই নীহারিকা তার সঙ্গে মেসোমশায়ের বাড়ী গিয়ে ওঠে। কি বলে পরিচয় বা দেবে? মেসোমশায় ভারিক্কে লোক। তার সামনে সব কথা ভাল করে গুছিয়ে বলা বড় শক্ত। তারপর যদি তিনি এরকম বান্ধবী নিয়ে বেড়াতে আসাটা অপছন্দ করেন, যদি অবজ্ঞা দেখান বা অপমানসূচক ব্যবহার করেন, তাহলে কি বিশ্রী অবস্থা হবে। মহা মুস্কিল। এত বিপদেও মানুষ পড়তে পারে! তার কেবলই মনে হতে লাগল, আর নয়, এইখানেই নেমে পড়ে ফিরতি ট্রেনে সে কলকাতা ফিরে যায়। কি যে করবে কিছুই ভেবে পায় না। ভিতরে শুধু অস্থিরতায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

করমাটার স্টেশন এসে গেল। এর পরের স্টেশনই হচ্ছে মধুপুর। নাঃ, আর ত চলে না। এখনও বোঝা গেল না নীহারিকার মনের ইচ্ছা। আর ত অপেক্ষা করা চলে না। আর একবার মনের ইচ্ছাটা যাচাই করা প্রয়োজন। মালপত্র গোছ-গাছ করতে করতে গোবর্ধন আবার কথাটা ঘুরিয়ে পাড়ল, 'মধুপুর' এসে গেল। আপনার নামবার কোন প্রচেষ্টাই তো নেই দেখছি। মধুপুরেই ত নামবেন, না অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা মনে মনে করে রেখেছেন?

---'দেখুন মিস্টার রায়, আপনি বেশ পরিহাস করতে পারেন ত।' আপনি সঙ্গে নিয়ে এতটা পথ এলেন, বাবা-মা আমাকে আপনার জিম্মায় দিয়ে গেলেন আর এখন আপনি আমায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন! বড় অদ্ভুত লোক ত আপনি!'

---'আহা, আপনি রাগ করছেন কেন? আপনার যেরকম নিশ্চেষ্ট ভাব তাতে আমার কি মনে হয় বলুন?'

গোবর্ধনের কিন্তু এবার উৎকণ্ঠা চরমে উঠল। নীহারিকা তার সঙ্গে যাচ্ছে---এ নিয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন উপায়? মেসোমশায় যে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন কে বলতে পারে? তাঁরা সব পুরোনো-পন্থী লোক! এখন কি করা যায়? উৎকণ্ঠায় আর দুশ্চিন্তায় তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেছে, মুখে কথা নেই, মাথা সামান্য ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

মধুপুর স্টেশনে গাড়ী এসে থামল। অনেকদিন অসুখে ভোগার পর মানুষের যেমন নড়াচড়ার স্পৃহা থাকে না, গোবর্ধনের অবস্থা প্রায় সেইরকম। মালপত্র গুছিয়ে নামবার প্রেরণা পাচ্ছে না। নিরুৎসাহ চিত্তে শরীর এলিয়ে দিয়ে তখনও বসে রইল।

নীহারিকা প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে নেমে পড়ল। নীহারিকার তাগাদায় আর কুলির উৎপাতে বাক্স-বিছানা নিয়ে গোবর্ধনকে নেমে আসতে হ'ল। প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়ে সে তাকাল নীহারিকার দিকে। ভাবখানা, এবার নির্দেশ দাও কি করতে হবে।

নীহারিকা হেসে বলল, 'নাঃ, আপনি এ-রকম ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে পড়লেন কেন? কি হল আপনার, চলুন তাড়াতাড়ি, তা না হলে রিক্সা পাওয়া যাবে না।'

গোবর্ধন মোহাবিষ্টের মত আমতা আমতা করে জবাব দিল, 'তা---হাঁ--মানে---ইয়ে---হাঁ। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি। তাড়াতাড়ি ত যেতেই হবে।

নীহারিকা বলল, 'এই যাঃ, আপনি দেখছি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি। ওঃ বুঝেছি। আমাকে নিয়ে মেসোমশায়ের বাড়ী উঠবেন কেমন করে এই চিন্তায়-চিন্তায়ই আপনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন, না?'

গোবর্ধন উত্তর দিল 'না-না, কি যে বলেন? মানে মেসোমশায় সেরকম লোক নন---তা---ইয়ে---তিনি খুব আনন্দিত হবেন।'

কথা বইতে বইতে তারা স্টেশনের বাইরে রিক্সা-স্ট্যাণ্ডে এসে পড়ল। নীহারিকা একটা রিক্সায় মালগুলো তুলে দিতে বলল কুলিকে। তারপর নিশ্চল ও অভিভূত গোবর্ধনকে বলল, 'নিন্ নিন্ উঠে পড়ুন। বেলা হয়ে যাচ্ছে, চায়ের জন্য মনটা বড্ড ছট্‌ফট্ করছে।'

গোবর্ধন বলল, 'মানে---একটা রিক্সায় কি ঠিক হবে---মানে আমাদের দুজনকে ধরবে? তার চেয়ে আর একটা রিক্সা করলে---ইয়ে---ভাল হয় না কি?

এবার নীহারিকা নিজের স্যুটকেশ ও ছোট হোল্ড-অলটা আর একটা রিক্সায় তুলে দিল। তারপর নিজে সেই রিক্সায় বসে রিক্সাওয়ালাকে নির্দেশ দিল, 'চলো থারমেসিয়া সেন কুঠি' এবং গোবর্ধনের দিকে একটু বক্র হাসি হেসে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, আপনার বীরত্ব বোঝা গেছে। নিন্, আপনি ঐ রিক্সাটায় উঠে পড়ুন। বেশ কাটল ট্রেনের সময়টা। আপনার মেসোমশায়ের বাড়ীটা চিনে নিতে আপনার খুব অসুবিধা হবে না বোধহয়। আমি চললাম আমার কাকার বাসায়। কাকার লোক ঐ আসছে সাইকেল চড়ে। আচ্ছা বাই-বাই, আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।'

নীহারিকার রিক্সা ডানদিকে বেঁকে চলে গেল। গোবর্ধন বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল দূরে বিলীয়মান রিক্সার দিকে। অনেকক্ষণ জলের তলায় দম বন্ধ করে ডুবে থাকার পর জলের ওপর মাথা তুলে বুকভরা জমাট নিঃশ্বাসটা বার করতে পারলে যেমন আরাম হয়, নীহারিকার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গোবর্ধন সেইরকম আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর রিক্সায় মেসোমশায়ের বাসার দিকে রওনা হয়ে গেল।

॥ আটচল্লিশ ॥

ব্রজবালা। কোথেকে এলো এ ব্রজবালা? বাঁ পা এগিয়ে কোমল তনু দুলিয়ে কে চলেছেন ফুলের ডালি হাতে? একাগ্র মনে ফুল তোলা হলো। কি গভীর তন্ময়ভাব। প্রতিটি ফুলের সাথে যেন মাখানো রয়েছে হৃদয়-দেবতার জন্য হৃদয়ের পূত অর্ঘ্য। প্রেমাশ্রুসিঞ্চিত প্রতিটি কুসুম। যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণ বলেন রাধারাণী। কৃষ্ণবিরহে এ ধীর পদক্ষেপ। এ মনোবেদনা।

ফুলতোলা শেষ হলো গদাধরের। ধীরে ধীরে একটা একটা করে ফুল নিয়ে অতি সযতনে মালা গাঁথতে লাগলেন। পরাতে হবে হৃদয়স্বামীকে। পরাতে হবে নবীন মেঘসন্নিভ যশোদা-

মন্দিরে আছো কেউ সিদ্ধ যোগী যে দিতে পারো তাঁর সন্ধান?

●

শুধু মথুরানাথ কেন?

আশৈশব গদাধরকে দেখে এসেছেন হৃদয়রাম। জেনেছেন অনেক পরে। সেবা করেছেন প্রাণ ভরে। তিনি অবাক। তাঁর চোখে ধোঁকা।

একদিন সেজোবাবু মথুরানাথ হৃদয়কে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে। পুরনারীপরিবৃত গদাধর তখন পরিহাসে মসগুল। হাসির ফোয়ারা বইছে যেন সবার মাঝে।

তাদের দিকে তাকিয়ে সেজোবাবু হৃদয়কে প্রশ্ন করলেন, 'বলো তো এদের ভিতর তোমার মামা কোন জন?'

হৃদয়রাম অবাকভাবে তাকিয়ে থাকেন। তিনি কি আছেন এদের ভিতর?

পাগল হয়েছেন গদাধর। তার সে অতি প্রিয় সঙ্গীত আর গাইছেন না কেন?

সেই যে কবে প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব। আপনি মাতিয়ে জগতকে মাতাবো। হরিপদে নিত্য করিব বিহার।

গদাধর যে চলেছেন সত্যিই জগৎকে মাতাতে।

সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসাতে। অনাবিল আনন্দে। ঈশ্বর বিরহের প্রেমানলে।

●

কৌশল্যাভাবে দর্শন হয়েছে রামলালার। যশোমতীভাবে নন্দদুলাল বালগোপালের। এবার চাই রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে।

রামলালা যে এখনও পাশে। জটাধারীর শেষ মোহটুকু নাশই যে

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য
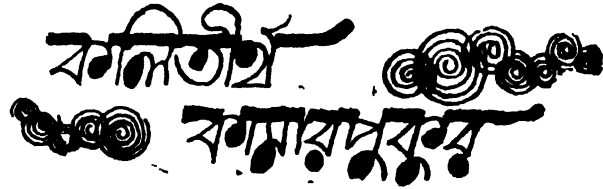
নন্দনকে। পরাতে হবে সুহাসরঞ্জিতাধর মুমুক্ষু-মুক্তিদায়ক কৃষ্ণসুন্দরকে। তিনিই যে এ হৃদয়ের সব কিছু হরণ করে নিয়েছেন। তিনিই যে মাতা। তিনিই পিতা। তিনিই বন্ধু, তিনিই সখা। তিনিই বিদ্যা। তিনিই ঐশ্বর্য। তিনিই যে সর্বস্ব। তাঁকে যে এ মালা পরাতে হবে।

বাষ্পাকুল লোচনে প্রাণমন ঢেলে আবৃত্তি করেন গদাধর---

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।

কে এই ব্রজবালা? কে এই নবীনা রাধারাণী? কে এই সখী?

আর যে বিরহযাতনা সয় না। কৃষ্ণবিরহ। প্রিয়তম সান্নিধ্যলাভ হবে কবে? কবে তাঁর সকল রসের ধারা শ্রীকৃষ্ণতে মিলে হবে হারা? এ বিরাট

সখীর দলে মিলে গেছেন কৃষ্ণসখী। রাধারাণী। ব্রজগোপিকা।

কোথায় গেলে প্রাণকৃষ্ণ? হৃদয়ের দেবতা?

ছুটে আসেন হৃদয়। ছুটে আসেন মথুরানাথ। একি হলো? লোমকূপ দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন? দেহ যে শিথিল। এ কি হলো?

এ যে কৃষ্ণবিরহ-যাতনা। রাধাভাব। এ যে মধুরভাবের পূর্ণ প্রতীক। ভক্তি হয়েছে রাধা সতী। স্নেহ করেছে যশোমতী। একাধারে রাধা যশোমতী?

এ পরশমণির পরশনে যে কত লক্ষ ধরার লৌহময় নরদেহও হয়েছে কাঞ্চনোজ্জ্বল। ধরম করম গেছে। গেছে জাতি-কুলের ভরং। গেছে লাজ সরম। শুধু মরমে মরমে বাজছে বেদনার বাঁশি। কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা। কৃষ্ণপ্রেমে

ছিল বাকী। সেটুকুও গেছে। গেছে তমোনাশন নামের চরণে। গেছে জগত-তারকের চরণস্পর্শে।

একদিন দু'দিন নয়। জটাধারী মাসের পর মাস কাটিয়েছেন গদাধর-সান্নিধ্যে। শুধু রামলালার মোহে। রামলালা যে কিছুতেই ছেড়ে যাবেন না গদাধরকে।

রান্না হয়ে গেছে। ভিক্ষান্ন উপাচারে অর্চনায় বসেছেন জটাধারী। কিন্তু রামলালা কোথায় গেলেন অন্তর্ধান?

জটাধারী ছুটোছুটি করছেন এদিক ওদিক। গেল কোথায়? অষ্টধাতুনির্মিত বিগ্রহ। নেই অর্চনাস্থানে। ছুটে যান গদাধরকে জানাতে। এ মন্দিরে গদাধরই যে তাঁর একমাত্র আশ্রয়। গিয়ে অবাক।

একি?

গদাধরের সাথে খেলায় মত্ত রামলালা। অভিমানেও হেসে ফেলেন

জটাধারী। বলো বাবা এঁর স্বভাব ভাবে কি করে। বারোটা বছর কাটালো ভুলে। মাতা-পিতাকে কত বেদনাই না দিল। পিতার তো মৃত্যুই হয়ে গেল। একবার শেষ দেখাও জুটলো না।

●

শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভের পূর্বে গদাধর ধন্য হয়েছিলেন সীতার দর্শন-সৌভাগ্যে। মা চন্দ্রাও মহাদেব দর্শনের পূর্বে দেখেছিলেন দেবী দুর্গাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। যে রাধাভাবে গদাধর এতদিন শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে ছিলেন মগ্ন, একদিন সেই প্রেম পাগলিনী শ্রীরাধা এসে আবির্ভূতা হলেন তাঁর সামনে।

তাঁর বর্ণনা কে দেবে?

'শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা, তার মাধুর্য বর্ণনাতীত। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পে কেশরের মতন গৌরবর্ণ দেখেছিলুম।'

গদাধর যেন সেই পবিত্র দেবী-মূর্তির সাথে এক হয়ে গেলেন। যেন সেই মহাভাব এসে গদাধরের দেহে হয়ে গেল লীন।

এ মহাভাবের অধিকারী যে পরম ভাগ্যবান যোগীপুরুষ।

ভৈরবী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর অনুমান সত্যি হলো। গদাধরের রাধা-বেশ হলো পূর্ণাঙ্গ। হলো সার্থক। হলো প্রেমময়। কৃষ্ণময়।

গদাধর মহাভাবাবেশে মগ্ন।

একটা দুটো নয়। উনিশ রকমের ভাবের মহামিলনের ঘটে মহাভাব। শ্রীরাধার হয়েছিল এই ভাব। আর হয়েছিল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের।

'উনিশ রকমের ভাব একাধারে প্রকাশিত হলে তাকে বলে মহাভাব। ভক্তিশাস্ত্রে তাই বলে। সাধন করে এক একটা ভাবে সিদ্ধ হতেই লোকের সারা জীবন কেটে যায়। এখানে একাধারে একত্র ঐ রকম উনিশটা ভাবের প্রকাশ।'

উত্তরকালে ভক্তদের বলেছেন শ্রীভগবান।

রাধাভাবাবেশে গদাধরের হলো শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

নবীন জলধর শ্যাম তনু ধীরে ধীরে তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। তারপর গদাধরের শ্রীঅঙ্গে হয়ে গেল বিলীন। নব দুর্বাদল শ্যাম। তাইতো তৃণখণ্ড হাতে গদাধরের এ তন্ময়তা।

'তখন যে কৃষ্ণমূর্তি দেখতাম তাঁর অঙ্গের এই রকম রঙ ছিল।'

যেই রাম, সেই কৃষ্ণ। ভক্ত হৃদয়-মরুতে প্রেমবারি সিঞ্চনের জন্যই যে ধরণীর ধূলোয় তাঁর নব আবির্ভাব। আপন জীবনেই যে তিনি দিলেন সাধনার অভিনব পথ নির্দেশ। রাম-চন্দ্রের উপাসনা হলো। হলো শ্রীকৃষ্ণের। শুধু মানুষকে শেখাতে ধর্মের অনুশীলন।

তুমিই না বলেছিলে ঠাকুর, ভক্ত, ভাগবত, ভগবান তিনে এক, একে তিন?

॥ উনপঞ্চাশ ॥

কে যেন আগে থেকেই সব ছক কেটে রেখেছেন। গদাধরের সাধনার পরিকল্পনাটুকুও তাঁকে করতে হয় না। সবই যেন যন্ত্রের মতন চলেছে। গদাধর যন্ত্র, মা ভবতারিণী যন্ত্রী। আড়াল থেকে তিনি নিজেই সব বন্দোবস্তটুকু করে দিচ্ছেন।

মা ভবতারিণী আরাধনার শাস্ত্র-সম্মত পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার। পরম যত্ন নিয়ে, সাদরে, সবান্তঃকরণে। তন্ত্রমতে আরাধনা শিখিয়ে দিলেন যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী। মধুরভাবের সঞ্চার করলেন জটাধারী। এবার? সব পাবার পরই তো জানা যায় না পাওয়ার আনন্দ। সর্বস্ব ত্যাগের আনন্দ। এখন হবে গদাধরের বেদান্তসাধন।

চাঁদনীতে এসে দাঁড়িয়েছেন কে ঐ উলঙ্গ সন্ন্যাসী? নাগা সাধু? দীর্ঘাঙ্গ। উলঙ্গ। ভক্তপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তসাধন? কেন নয়?

ধন্য রাণী রাসমণি। ধন্য সেজোবাবু মথুরানাথ। শত সহস্র সন্ন্যাসীর পদ-রেণুতে এ দক্ষিণেশ্বর মন্দির আজ পবিত্র শুধু তোমাদেরই গভীর আন্তরিক সাধু সেবার পুণ্য ফলে।

সন্ন্যাসী চলেছেন সাগর সঙ্গমে। সেখান থেকে পুরীতে। জগন্নাথজী ডেকেছেন তাঁকে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছেন কদিন বিশ্রাম নিতে। এ পথের সব সন্ন্যাসীই যা করেন।

জ্যোতিষ্মান সন্ন্যাসী। নির্বিকল্প সমাধি লাভে জীবন করেছেন ধন্য। এখানে এসেছেন গদাধরের জীবন ধন্য করতে। আপন জীবন ধন্য করতে।

পঞ্চবটীতে বসে হাততালি দিয়ে তখন কীর্তন গাইছিলেন গদাধর। কীর্তনে বিভোর এ মূর্তি দেখে তোতাপুরী অবাক। কে এই ধ্যানসিদ্ধ যোগী? কোথেকে এলো এ তপ্ত-কাঞ্চনোজ্জ্বল সৌম্যমূর্তি। তাকিয়ে থাকেন তোতাপুরী। রামকৃষ্ণময়ভাব। জটাধারী ছেড়ে গেছেন অল্প ক'দিন আগে। এখনও যে কাটে নি মধুর রসের সাধনাবেশ।

হ্যাঁরে হাত ঠুকে ঠুকে রুটী তৈরী করছিস নাকি?

প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকান গদাধর। বিস্ময়ে বিভোর। আরে কে এই প্রাণের মানুষ? এ যে অনেক দিনের চেনা। একাধিকবার দেখেছেন ধ্যানে। স্বপনে।

দেখছিস কি?

কিছুই নয়।

সে কি?

হ্যাঁ। তোমাকে আমি চিনি যে। তোমার নাম তোতাপুরী। পাঞ্জাবে তোমার মঠ আছে। দীর্ঘকাল তপস্যা করেছো সেখানে। এখন মা তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তুমি আসবে। আমি জানতুম।

সে কি।

হ্যাঁ। মার কাছেই জেনেছি তুমি আসছো।

কে তোমার মা?

জানো না আমার মাকে? বিশ্বজননী জগন্মাতাকে জানো না? সেকি

আমার তোমার মা। বিশ্বলোকের মা। ত্রিলোকের সর্বজীবের প্রাণের জননী। জেনো না তাঁকে?

হেসে মাটিতে লাঠি ঠোকেন সন্ন্যাসী। বিদ্রূপের হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি।

মা আবার কে?

ঈশ্বর নিরাকার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে শক্তি চালাচ্ছে সব কিছু সে যে নিরাকার পরম ব্রহ্ম। সে-ই আদি। সে-ই অন্ত। জানবি এরই নাম বেদান্ত। ঐ মূর্তির ভিতর তোর মা?

মনে ব্যথা পান গদাধর।

একি কথা সন্ন্যাসীর?

তোতাপুরী বুঝতে পারেন গদাধরের মনোভাব। অন্য প্রশ্ন তোলেন।

সাধনা করবি? বেদান্ত সাধনা?

সে কি?

করেই দেখ না।

গদাধরকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেছেন তোতাপুরী। শক্তি ধরার এই যে প্রশস্ত আধার। জীবনের চল্লিশটা বছরের সাধনার ধন কাকে দিয়ে যাবেন? এতদিন যে এই প্রশ্নই তাঁর মনকে করেছিল বড়ই ব্যাকুল।

এই তো। এই তো সেই আধার। সাধকের মুখশ্রী তপস্যাবলে সমুদ্ভাসিত। অপূর্ব জ্যোতি তাঁর সর্বাঙ্গে যেন ঠিকরে পড়ছে।

তোতাপুরীর ভারী আনন্দ হয়। এতদিনে পেয়েছেন উপযুক্ত পাত্র। শিষ্যত্বের পূর্ণ অধিকারী। বেদান্ত সাধনার দীর্ঘ চল্লিশটা বছরের সঞ্চিত শক্তির উত্তর-সাধক।

আমি তো কিছুই জানি না। দাঁড়াও মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

কি অপূর্ব নির্ভর! কি অসীম অনুরাগ।

বিস্ময়ে বিমোহিত হন বেদান্ত পূজারী।

তাই তো। চল্লিশটা বছর করেছেন দীর্ঘ তপস্যা। ঈশ্বরের সাথে এত নিবিড় সান্নিধ্য, এত আপনভাব হলো না কেন? মনে জাগে অনুযোগ। ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা এই যোগী যে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন তাঁর সাধন পথে।

অদ্বৈত ভাবসাধনে এবার এগুবেন গদাধর। মার অনুমতি পেয়েছেন।

হ্যাঁগো। এ যে জানতুম। মা-ই তোমাকে পাঠিয়েছেন বেদান্ত সাধনের পথ দেখাতে।

যা করার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো। জানো তো আমি কোথাও তিন রাতের বেশী থাকি না কখনও। জানান সন্ন্যাসী।

সে কি কথা? মনে মনে ভাবেন গদাধর। তিনদিনে সব শিক্ষা শেষ হবে কি? শুরু তো হোক। শেষ দেখা যাবে পরে। মা যা করাবেন তাই হবে।

দীক্ষা হবে গদাধরের। আনন্দে মন ভরে আছে। 'একটা কথা আছে। দীক্ষার আগে নিতে হবে সন্ন্যাস।' বলেছেন তোতাপুরী।

বেশ তো। নেবেন সন্ন্যাস। এতো তাঁর শৈশবের স্বপ্ন। সর্বস্ব নিবেদিত মা ভবতারিণী চরণে। সর্বত্যাগী গদাধরের সন্ন্যাসের বাধা কোথায়?

মা চন্দ্রা কিছুদিন থেকে এসে রয়েছেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। গঙ্গা-তীরে। গদাধরের কাছে। জীবনে গদাধর ছাড়া আর কিছুই যে জানেন না। সরলা সর্বত্যাগিনী যোগিনী।

তাহলে এবার শাস্ত্রীয় কাজগুলো শেষ হোক।

গদাধর পিণ্ডদান করলেন আপন উদ্দেশ্যে।

অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত থাকেন গদাধর। ব্রাহ্ম মুহূর্তে তোতাপুরী গদাধরকে নিয়ে বসলেন দীক্ষা দিতে। হোম হবে এবার।

তোতাপুরী মন্ত্র বলেন, গদাধর আবৃত্তি করেন সে মন্ত্র। 'হে পরমাত্মন্ আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিরুদ্ধ করে তদেকচিত্ত হতে চলেছি।

'হে দেব! জ্ঞানের সব বাধা, হৃদয়ের সব মলিনতা দূর করে আমাকে পরম পবিত্র করো। তোমার সূর্য, বায়ু, নদীজল, খেতের শস্য, বনস্পতি-রাজি, জগতের সব জিনিষ তোমার নির্দেশে আমাকে সত্য সন্ধানে সহায়তা করুক। হে ব্রহ্মন্ জগতে তুমি নানারূপে প্রকাশিত। শরীর মন শুদ্ধ করে সত্য-সন্ধানের যোগ্যতালাভের জন্য আমি অগ্নিস্বরূপ তোমাতে আহুতি দিচ্ছি। দয়া[illegible] হও। কৃপা করো।'

এবার হবে বিরজা হোম।

বিরজা নামেই ডাকালো হয় গদাধরের। বিরজা [illegible] সঙ্গীর নাম।

অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে জীবনের সর্বস্ব। দারা পুত্র, সম্পদ, লোকমান সুন্দর শরীরের বাসনা কামনা। আহুতি দিতে হবে জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা। শুদ্ধ করতে হবে পঞ্চভূতের দেহ। শুদ্ধ করতে হবে শরীরের সব বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। অগ্নির স্পর্শে দেহের মলিনতা দূর করে সেখানে আনতে হবে নবোদ্ভাসিত জ্যোতি। কোষ পঞ্চক করতে হবে পরম পবিত্র। যারা ছিল অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় তাদের করতে হবে মলিনতা বিমুক্ত।

দেহের বিষয় সংস্কার করতে হবে পরম শুদ্ধ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃত সংস্কার করতে হবে অগ্নিপূত। শুদ্ধ করতে হবে মন, বাক্য, কায়, কর্ম। তাহলেই শুধু তত্ত্বজ্ঞানের পথ হবে সুগম। তাহলেই শুধু গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞানের হবে সম্যক উদয়।

বিরজা হোম হলো।

তোতাপুরীর আনন্দ ধরে না।

চল্লিশ বছরের সাধনা এতদিনে যেন হলো সার্থক। জীবন হলো চরিতার্থ। মনে প্রাণে যিনি অনুভব করছেন এক অনির্বচনীয় আনন্দা-নুভূতি।

এবার তোমায় বাকি যা কিছু আছে আহুতি দাও এই মহানলে।

তাকিয়ে থাকেন গদাধর। আর কি আছে তাঁর?

কেন? হেসে বলেন তোতাপুরী। ঐ যে পৈতেটুকু পরে আছো গলায়? ঐ যে শাদা কাপড়টুকু পরে আছো। ঐ যে গদাধর নামটুকু নিয়ে বসে আছো। এবার এই পরম পবিত্র হোমানলে আহুতি দাও সব কিছু। অগ্নিশিখায় সমর্পণ করো তোমার সূত্র, যজ্ঞোপবীত আর শিখা।

গদাধর যে এতদিন এই দিনটির প্রতীক্ষাতেই গুণছিলেন প্রহর। এই শুভ মুহূর্তটুকুর স্বপ্নে কেটেছে শৈশবের কত বিনিদ্র রাত। লাহাবাবুদের ধর্ম-শালায় সন্ন্যাসীদের সেবাতেই সেদিন সরলমতি বালক পেয়েছেন নব-সন্ন্যাসের অপরূপ স্বাদ। এই গেরুয়া রঙটি যে আশৈশব তাঁকে নিয়ত ডেকেছে হাতছানি দিয়ে।

তোতাপুরী পরম স্নেহের সাথে গদাধরকে দিলেন কৌপীন। দিলেন ত্যাগের নিশান গেরুয়া।

এবার দিতে হবে একটা ভারী সুন্দর নাম।

কি নাম দেব?

তোতাপুরী হেসে জিজ্ঞাসা করেন।

গদাধর নির্বাক।

তোতাপুরী বললেন আজ থেকে তোমার নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস।

শুনে মথুরানাথ পরমানন্দিত।

ভারী সুন্দর নাম দিয়েছেন ন্যাংটা মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ। যেই রাম, সেই কৃষ্ণ। একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ। এই নামেই যে এতদিন মনে মনে তাঁর ধ্যান করেছেন সেজোবাবু।

(ক্রমশঃ)

॥ দুই ॥

ফরাসী নাট্যকার ইউজেন ইয়োনস্কোর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন অজয়। ইয়োনেস্কো ইয়োরোপের বিদগ্ধ সমাজের অভিনন্দন লাভ করেছেন। তাঁর নাটকগুলো অনূদিত হয়েছে অনেক ভাষায়, কিন্তু এ দেশে এখন পর্যন্ত আদর পাচ্ছে না। ইয়োনেস্কো যখন সমাজকে বিদ্রূপ করেন, তখন সেটা পরম উপভোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু মানবাত্মার বিক্ষোভ যখন তাঁর নাটকে প্রকাশ পায়, মানুষের মনের গুহায় লুকিয়ে থাকা ভয়গুলোকে যেভাবে ইয়োনেস্কো প্রকাশ করেন, সেই ভঙ্গীটা যেন অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না। 'আমেদে' নাটকে মৃতদেহটা যখন

আর সভ্যতার প্রশ্নে তক্তা যেমন করে ডুবে গিয়েছে, অজয়ের সেই দীনতার ছবি কই আসছে আমাদের সামনে?

মগ্ন হয়ে প্রবন্ধ লিখছিলেন অজয়। প্রায় ছুটে ঘরে এসে গলা জড়িয়ে ধরল অপর্ণা।

---বাবা! দেখ না কি সব যা-তা কথা বলছে সরমাসি।

লেখা থেকে চোখ তুললেন অজয়। তখনো ঘোর কাটে নি। চোখের সামনে দেখছেন---রাশি রাশি আসবাব। ঘর বাড়ী দেয়াল মেঝে সব ভরে গিয়েছে আসবাবে। ছাদ ফুঁড়ে নামছে আসবাব। ইয়োনেস্কোর 'নতুন ভাড়াটে' নাটকের নায়ক আসবাবের তলায় ডুবে গেল, শোনা যাচ্ছে তার কথা---'আলো নিভিয়ে দাও'।

---বাবা!,

ভেবে। কালো কুটকুটে রিকসাওয়ালা আর মেয়েটা কেমন ... একেবারে ভদ্রঘরের মেয়ে।

---ওর মা হয়ত ফর্সা ছিল।

---কেবল চেহারা নয় দাদাবাবু, চাল-চলন মেয়েটার অন্যরকম। নিশ্চয় ওর বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস ছিল, নিমের কাঠি ঠিক বুরুশের মত ধরে দাঁত মাজে। খবরের কাগজ পড়ে। একটু একটু খায়। কখনো দেখেছেন রিকসাওয়ালাকে ওর চৌকিতে উঠে বসতে? বরাবর নীচেয় বসে কথা বলে, নমুনা চৌকিতে বসে থাকে। না দাদাবাবু, এ-মেয়ের মধ্যে রহস্যি আছে কিছু। আমার সন্দ হচ্ছে, আপনি ভাল করে খোঁজ নিন। নিয়ে যেতে বলুন মেয়েটাকে।

---হয়তো পাকিস্তানের কোনো

ধারাবাহিক
উপন্যাস

নমিতা চক্রবর্তী

বেড়ে বেড়ে সমস্ত অভিনয়-মঞ্চ অধিকার করে নেয়, তখন সে দৃশ্য সহ্য করতে পেরে ওঠেন না দর্শকবৃন্দ। আর এটা যে ঘাতকের মানসিক বিভীষিকার চিত্র তাও বোঝেন না অনেকে।

ইয়োনেস্কো নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে ভাল লাগছিল অজয়ের। এ-দেশে দরকার এখন এই ধরণের নাটক। 'নন্দকুমার', 'সিরাজদৌল্লা' দেখতে যাচ্ছেন দর্শকবৃন্দ। হাততালি দিচ্ছেন, অতিরিক্তমাত্রায়, অনুভূতিপ্রবণ হলে চোখও মুছছেন রুমাল দিয়ে। কিন্তু ক্লিন্ন ক্লিষ্ট সমাজ আত্মার যুগনিপীড়িত মানবাত্মার আর্তির প্রকাশ নেই কোথাও।

ক্ষুধার অন্ন মিলছে না, বস্ত্র নেই, ওষুধের অভাব, অজস্র বেকার---সব নিয়ে লেখা হচ্ছে প্রচুর। অনেক কথা বলা হচ্ছে ইনিয়ে-বিনিয়ে। আমাদের আত্মা যে অবসন্ন হয়ে পড়ছে, জীবনের কোষে কোষে যে রস সঞ্চিত হয়ে আর্দ্র উর্বর করে তোলে জীবনকে, তাকে

চোখ পরিষ্কার হল অজয়ের। সামনে দেখলেন সুন্দর মধুর একটি উনিশ বছরের মেয়ের মুখ। চুল উড়ছে, চোখে অভিমান, আবদার। হেসে উঠলেন অজয়। আজ আর লেখা হবে না। টুপি পরালেন কলমের মাথায়।

---আয়, বোস, কি হয়েছে?

---দেখ না কি সব বলছে সর-মাসি।

---কি বলছে?

অপর্ণার পিছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল সরবালা। মুখে জয়ের চিহ্ন। অনল অপর্ণাকে মানুষ করেছে সে। গম্ভীর মুখে বলল: নমুনা রিকসাওয়ালাটার মেয়ে নয়।

---মেয়ে নয়? কি করে জানলে তুমি? আশ্চর্য হলেন অজয়।

---জানলুম দেখে আর ভেবে

ভদ্রঘরের মেয়ে। দাঙ্গার সময় পালিয়েছে জলদের সঙ্গে। অজয় বোঝাতে চেষ্টা করলেন সরবালাকে।

---তাও নয়। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল সরবালা।

---নমুনা কলকাতারই মেয়ে। জন্মেও দেখে নি পাকিস্তানের মুখ। রিকসাওয়ালার অর্ধেক কথা বুঝতেই পারে না ও।

চিন্তিত হলেন অজয়। সরবালার যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো গোলমাল আছে একটা। ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। ভিজে চুলে ব্রাশ চালাতে চালাতে চলে এল অনল।

---কেন বাবা?

---বোস, কেমন দেখছিস তোর রোগীকে?

---রোগী নমুনা? ও, ফার্স্টক্লাস। একেবারে সেরে গিয়েছে। কিন্তু পুরনো আস্তানায় ফেরা চলবে না। পুরো নিউমোনিয়া, সাবধানে না থাকলে

বিপদ ধরবে। তা ছাড়া ভারি ডেলিকেট মেলখ [illegible]।

---সব বলছে নমুনা জলদের মেয়ে নয়।

---জলদের মেয়ে নয়? কার মেয়ে তবে?

---সেটাই তো জানা দরকার।

---দরকার? জেনে নাও না নমুনাকে জিজ্ঞেস করে।

---কি করে জিজ্ঞেস করা যায় তাই তো মুশকিল।

---মুশকিল, না বাবা? কেঁদে-টেঁদে ফেলতে পারে। সব মেয়ের ঐ এক কমন দোষ, ছিঁচকাঁদুনে। বোনের দিকে কটাক্ষ করল অনল।

বাবার প্রবন্ধে চোখ বোলাচ্ছিল অপর্ণা, সরবে প্রতিবাদ করল।

---মোটেও না, কক্ষণো সব মেয়ে ছিঁচকাঁদুনে নয়। আমি কখনো কাঁদি বাবা?

---আহা তাকি আর! সেই ফোর্থ পেপার খারাপ দিয়ে একগঙ্গা কেঁদেছিল কে দিদিভাই?

---সে তো মাথাব্যথা করছিল আমার।

---মাথাব্যথা? এ-সব বুঝি মাথা-ব্যথা হলে বলে মেয়েরা?---গেলাম, ফেল করলাম। আর কাউকে মুখ দেখাব না আমি। উঁ উঁ উঁ---নাকিসুরে ব[illegible] অনল।

---বাবা কিছু বলছ না দাদাকে। প্রথম ডিসেকশন করতে গিয়ে পালিয়ে আসে নি ও?

---বেশ, কান্না আর পালানোতে কাটাকাটি হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালেন অজয়। ব্যাপারটা গোলমেলে। জলদকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে।

---দাদা, কি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন বাবা।

দাদাকে বাবার প্রবন্ধ দেখাল অপর্ণা। উদাস চোখে খাতাটি দেখল অনল। জিজ্ঞেস করল: কি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ?

---ইউজেন ইয়োনেস্কো, ফরাসী নাট্যকার

---ইস, কি কঠিন নাম। বানান করা দুঃসাধ্য হবে। অপি, দেখ কি সুন্দর বাবার হাতের লেখা।

---ভারী সুন্দর। আমার লেখাও সুন্দর। তোরটা কিন্তু খুব বিশ্রী দাদা। পড়া যায় না মোটে।

---ডাক্তারদের হাতের লেখা খারাপ করতেই হয়। গম্ভীর মুখে বলল অনল।

---করতেই হয়! ইচ্ছে---ইচ্ছে করে হাতের লেখা খারাপ করিস তোরা? আশ্চর্য হল অপর্ণা।

---ইচ্ছে করেই তো। ওষুধগুলোর বানান একেবারে ভয়ঙ্কর রকম বিদঘুটে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ভুল হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমরা তাই প্রথম অক্ষরটা ঠিক রেখে আর সবগুলোকে জড়িয়ে দেই।

---বারে, ডাক্তারখানা ওষুধ দেবে কেমন করে প্রেশক্রিপশন্ পড়তে না পারলে?

---ওরা ঐ একটা অক্ষরেই বুঝে নেয়।

---তাই বুঝি? ভারি মজা তো। জানিস দাদা, নমুনা ভদ্রলোকের মেয়ে।

---হাঁ, জলদ খুব ভদ্র, কক্ষণো চেঁচামেচি করে না ভাড়াটিড়া নিয়ে।

---জলদ ওর বাবাই নয়।

---নয়? গুড গড! ও! বাবা তাই বলছেন বটে। তা হোকগে ও যে কারো মেয়ে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে। আমার সব ভাউচারটা পেলেই এখন বাঁচি।

---না দাদা চাকরি নিয়ে বিলেত যাবার কথা ভাবিস নে। বাবাই পাঠাবেন তোকে। এখন চাকরির কথা শুনলে মন খারাপ করবেন। একেই জমিদারী চলে গিয়েছে বলে মনে কষ্ট।

---কষ্টের কি আছে? ও তো গিয়ে ভাল হল। অনেকের একফোঁটা জমি থাকবে না, আর কেউ কেউ একেবারে জমিদার! কি বিশ্রী ব্যবস্থা ছিল বলত?

---বিশ্রী, কিন্তু নীহারিকা কি সুন্দর বলতো? ঠিক মনে হয় ভোরের শিশির জমে বাড়ী হয়েছে। সবুজ বাগানের ব্যাকগ্রাউণ্ডে যেন মস্ত বড় পদ্মপাতায় জমানো টলটলে শিশির।

---ওরে বাবা! কি ভয়ানক কবিত্ব! বোনের চুল ধরে টেনে দিল অনল। চুপ হয়ে গেল দুজনেই। চোখের সামনে ভেসে উঠল শুভ্র সুন্দর নীহারিকা, হৈমন্তী দেবীর অয়েল পেন্টিং। আগুনে পুড়ে সতী হয়েছিলেন তিনি। বাপ-মা মরা ছেলে সত্যেশ্বরকে মানুষ করেছিলেন চৈত্রনাথ চাকলাদার। তাঁর বিদ্যা নিষ্ঠা চরিত্রের কথা শুনেছেন অজয়, শুনেছে অনল অপর্ণা। কেমন ছিলেন সেই অনুপম মানুষটি তা দেখে নি তারা। চৈত্রনাথের কোনো ছবি নেই।

●

জলদকে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন অজয়: জলদ, নমুনা সত্যি সত্যি তোমার মেয়ে?

কি করবে সেই চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছিল জলদ। অজয়ের প্রশ্নে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল, বেঁচে গেল সত্যি-কথা বলে।

---না বাবু। আমার অমন পরীর মত মাইয়া হইব কেমনে। আছিল যে দুইটা ছারকপালা, তাগো তো ডালি দিছি পদ্মার জলে। বিদ্বান মানুষরা কয় দ্যাশ দেবতা। দেবতা আর রাক্ষসে তফাৎ নাই বিশেষ। দেবতা বলি লয়, রক্ত দিয়া পা ধোয়। রাক্ষসে কড়মড়াইয়া খায়। ফলটা একই সেই দ্যাশ---রাক্ষস না দেবতা কে জানে, তারে দিছি মাইয়া দুইটারে। পুরনো স্মৃতি দহনে ছটফট করে উঠল জলদ।

---একে তুমি পেলে কোথায়? অজয় জিজ্ঞেস করলেন।

---আমি পাই নাই বাবু। আমার বন্ধু ঝুমরা আনছে। অনাথা মাইয়াটা। জগৎ-সংসারে কেউ নাই ভাই-বন্ধু আপ্তজন।

যতটা জানে সব বিশদ করে বলল জলদ। স্তম্ভিত হয়ে অজয় বসে

হইলেন। পুরনো দিনের বিচিত্র উপন্যাসের কয়েকটি পাতা খসে পড়েছে তাঁর সামনে। অসহায়া মেয়ে, অত্যাচারী পুরুষ, ভিক্ষুক রক্ষাকর্তা। হঠাৎ চমকে উঠলেন অজয়। কি বলছে, কি বলছে জলদ? পাঁচ মাথার মোড়ে সেবাই কুণ্ড লেনের লাল বাড়ী? সে বাড়ী—সে বাড়ী তো—

—হ বাবু। জলদ ঘাড় নাড়ল।

—এক মস্ত বড়লোকের বাড়ী। রাজাবাবু কয় তারে চাকর-দরোয়ানে। সেইখানে আছিল যে মাইয়া মানুষ, তারে মাইরা ফেলছে রাজাবাবু। এই মাইয়াটা সেই বেশ্যার কইন্যা।

আরো যে কত কথা বলল জলদ, কিছু কানে যাচ্ছে না অজয়ের। সুরেশ্বর, শান্তিনগরের সুরেশ্বরের সেই লাল বাড়ী। সুরেশ্বরের রক্ষিতার মেয়ে, সুরেশ্বরের গ্রাস হতে রক্ষা পাবার জন্য ঠিকরে এসে পড়েছে অজয়ের কাছে।

মেয়েটা ভাল নয়। স্বৈরিণী নারীর মেয়ে। কিন্তু ও পালাল কেন ও বাড়ী হতে। ভয়ে? নিজে না রেখে ওকে কারো কাছে মোটা টাকা পেয়ে, ওকে বিক্রী করবার বন্দোবস্ত করছিল সুরেশ্বর? শান্তিপ্রিয় মানুষ অজয়। গোলমাল বাঁধবার ভয়ে তিনি সুরেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। এ মেয়েটা তাঁর আশ্রয়ে আছে টের পেলে মহা হাঙ্গামা বাঁধাবে সুরেশ্বর। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করা দরকার সব ব্যাপার। একটু ইতস্তত করলেন অজয়। একটুও ভাল লাগছে না, তবু কর্তব্য। ছেলে-মেয়ে সরবালা টের পাবার আগেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আশ্চর্য। ঠিক তো ধরেছিল সরবালা, নমুনা জলদের মেয়ে নয়।

অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। আজকে একটু সুযোগ মিলেছে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবার। অনল ডিউটীতে। অপি গিয়েছে সরবালাকে সঙ্গে নিয়ে মাসীর বাড়ী নিমন্ত্রণে। চাকরকে ডেকে অজয় বললেন নমুনাকে উপরে পাঠিয়ে দিতে। নিজের চেয়ারে আবার বসলেন।

ধীরে ধীরে নমুনা এসে দরজায় দাঁড়াল।

—এসো, এসো, এই চেয়ারটাতে বসো। বসো, বোসো। তোমাকে কয়েকটা কথা বলব, তাই ডেকেছি। সময় লাগবে।

চেয়ারে বসল নমুনা। একটু সময় চুপচাপ।

—তোমার, তোমার সত্যি সত্যি নাম কি? কঠিন হতে চেষ্টা করলেন অজয়। হতেই হবে তাঁকে কঠিন। একেই তাঁর প্রতি সুরেশের বিদ্বেষের শেষ নেই, তারপর রক্ষিতার মেয়ে, যাকে হয়তো নিজেই রাখতেন, সে পালিয়ে এসে অজয়ের আশ্রয়ে আছে জানলে একেবারে তুমুল করে ছাড়বেন।

অজয়ের জিজ্ঞাসায় চমকে হিমিকা তাঁর দিকে তাকাল। ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। বুকের মধ্যে কেমন যেন মায়া জাগল অজয়ের। কিন্তু তক্ষুণি মনে হল মেয়েটা ভাল নয়, বেশ্যার মেয়ে, নিজেও সেই বৃত্তি আশ্রয় করবে হয়তো।

আমি সব জলদের কাছে শুনেছি। অবশ্য ও তোমার সব কথা জানে না। তুমি কি বরাবরই সুরেশ্বরের কাছে ছিলে?

—না। মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল হিমিকা।

—তবে?

—আমি সেণ্ট লুইসো অরফ্যান-এজের স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকতাম।

—সুরেশ্বরের কাছে কবে এলে?

—পরীক্ষার পর মা নিয়ে এসেছিল।

মা। মুহূর্তে সব মমতা চলে গেল অজয়ের মন থেকে।

মা। তার মানে একটি কুচরিত্র মেয়ে।

—সুরেশ্বর আমার আত্মীয়। তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারব না। আমি তোমাকে ও বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

একটা মৃদু আর্তধ্বনি বের হয়ে এল হিমিকার কণ্ঠ হতে। থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। অজয় চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। অনেকদিন আগে দেখেছিলেন মস্ত বড় অ্যালসেশিয়ানের সামনে পড়ে কাঁপছিল ছোট একটা বেড়ালছানা। ভয়ে সেটার বন্ধ গলা হতে এমনি একটা মৃদু গোঙানো শব্দ বের হচ্ছিল। অবিকল বেড়ালছানাটার মত ভয়ে কাঁপছে মেয়েটা। অ্যাল-সেশিয়ানটা কিন্তু তিনি নন। সে ঐ সুরেশ্বরের নাম। নামটা একটা বিরাট দৈত্যের মত তার হিংস্র হাত বাড়িয়েছে ওর দিকে, তাই ভয়ে কাঁপছে ও। কিন্তু এত ভয় কেন? রক্ষিতার মেয়ে রক্ষিতা হবে তাই ভয়? বড়লোক, কোনো প্রতিষ্ঠিত মানুষের আশ্রয় পাবে বলেই তো ওর মা ওকে স্কুলে পড়িয়ে আরো শাণিত, আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে চেয়েছে। সুরেশ্বরের বয়স হয়েছে বলে পছন্দ নয়? কথাটা মনে হতেই কেমন যেন একটা রাগ হ'ল অজয়ের। মেয়েটা সুরেশ্বরের বয়সকে ভয় পেয়ে যেন ভয় পাচ্ছে অজয়ের প্রৌঢ়ত্বকেও। ওদের কাজ টাকার বদলে পুরুষের তুষ্টিবিধান করা। ভয়ের, বয়সের কথা ওঠে কিসে?

হঠাৎ একটা তীব্র স্রোত—পুরুষের আদিম রক্তস্রোত অজয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বয়ে গেল। দীর্ঘদিনের নারী-সঙ্গহীন দেহ যেন কিসের তাড়নায় হঠাৎ মাতাল হয়ে উঠতে চাইল। মনে হ'ল সামনে বসে কাঁপছে যে মেয়েটা তার কোমল শরীর এখন পর্যন্ত কেউ অধিকার করেনি! রহস্যের মত অনাবিষ্কৃত ওর কুমারী শরীর। ও তো সেই মেয়ে—যাকে ঘিরে পুরুষের দেহের দাবাগ্নি অনির্বাণ জ্বলবে। ওর সম্মান লজ্জা আশ্রয় কিছুই নেই। ওর অনাবৃত শরীরের উপর দিয়ে দক্ষিণের বাতাস লালসা বাড়াবার জন্য বয়ে যায়। তপস্বীর ধ্যান কেড়ে নিতে জন্ম ওর কামনার পঙ্ক-শয্যায়।

হিমিকা বসে কাঁপতে লাগল। বুঝতে পারল না ওকে পণ্য-নারীর মেয়ে জেনে, ওর পরিধেয় ভেদ ক'রে অজয়ের চোখ দেখছে একটি অনাবৃত

দেহ। সে শরীরে এখনো যৌবনের স্পর্শ জাগেনি। শতদলের কলিকার মত মোহময় মধুময় শরীর দেখে আগুন জ্বলে উঠেছে অজয়ের শরীরে। সংযমী প্রৌঢ়ের শিক্ষা রুচি শালীনতা সব গলে গলে পড়ছে সেই আগুনের তীব্র হলকা লেগে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অজয়। সুরেশ্বরকে ফিরিয়ে দেবেন মেয়েটাকে। কিন্তু তার আগে একবার আস্বাদ করে দেখবেন আঙুর-চোয়ানো নির্যাস। অজয় জানেন, ঝাঁজে তাঁর গলা বুক পুড়ে যাবে, দুর্গন্ধে একটা ভয়ানক বিবমিষার উদ্রেক হবে বাকী জীবন ভরে। তবু আজ নিজেকে সংযত করতে পারবেন না তিনি। শরীরের কোষে কোষে জেগে উঠেছে যে মত্ত কামনা, তাকে বাধা দেবে কে! মেয়েটার কে আছে রক্ষাকর্তা? রিক্সাওয়ালা জলদ? খোঁড়া একটা ভিক্ষুক? কিন্তু ওরাই তো মেয়েটাকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে। যতদিন বুড়ো জলদের মেয়ে পরিচয়ের একটা আচ্ছাদন ছিল ওর গায়ে, পরের মেয়ের যা পাওনা সব মিটিয়ে দিয়েছেন অজয়। এখন জেনেছেন ও কারো মেয়ে নয়। দলিত মথিত লোলুপ লালসা হতে উঠেছে একটি বুদ্বুদ।

আজ এই নিভৃত সন্ধ্যার অবসরে দেহ মথিত ক'রে অনাস্বাদিত মদিরা পান করলেন অজয়। যদি তার ফলে মেয়েটার দেহ ভরে জেগে ওঠে একটি জীবনের ফেনিল উচ্ছ্বাস, কি তার পরিচয় হবে? পরিচয় নেই ওদের। ওরা তো লালসার পঙ্ক হতে উঠে আসা লোভের পাপ। পাপের গর্ভে শিশু পুরুষ হয়ে জন্মালে, একটু বয়েস হলেই মায়ের শয্যা-সঙ্গী ডেকে এনে কামনার সেবা আর মেয়ে হ'লে হিমিকা যা হতে যাচ্ছে তাই হবে। মায়ের জায়গায় এসে দাঁড়ায় পুরুষের দেহের তাপে দগ্ধ হতে। কে জানে, পুরুষ একদিন যার জন্ম দিয়েছে ক্লেদাক্ত বিহ্বল মুহূর্তে তাকেই পরবর্তীকালে

লাঞ্ছিত জঘন্য আনন্দে মথিত মর্দিত ক'রে আসে কিনা।

নেই, পুরুষের ব্যভিচারের কোনো প্রমাণ নেই। কিছুক্ষণ প'রে অজয় যখন গিয়ে তাঁর শান্ত লাইব্রেরী ঘরটিতে বসবেন, রজনীগন্ধা গুগগুলের গন্ধ, অল্প হাওয়ায় কাঁপবে নীল পর্দা। বিদগ্ধজনের মনোলোভা প্রবন্ধ রচনায় যখন মন দেবেন, তখন শান্ত স্নিগ্ধ অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীর মনে যে মত্ত তাণ্ডব জেগেছিল একথা কি কারো দুঃস্বপ্নেও স্থান পেতে পারবে?

এগিয়ে এলেন অজয়। হাত রাখলেন হিমিকার পিঠের উপর। গরম হাত, তপ্ত নিঃশ্বাস। বড় বড় চোখ তুলে হিমিকা তাকাল অজয়ের দিকে, তাকিয়েই রইল। অমনি করেই বুঝি অজগরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে হরিণী। কিন্তু অজয়ের দৃষ্টি ঘোলাটে ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? ঝাপসা চোখে কাকে দেখছেন তিনি? কার মুখ? ও যে অপর্ণা, তাঁর অপি। বাবার লাল মুখ, গরম নিঃশ্বাস, খাবার মত হাত দেখে ভয় পেয়েছে মেয়েটা। ভীষণ ভয় পেয়েছে, গলার কাছে ওর কান্না আটকে আছে, শুকনো চোখের কান্না দেখাও নিদারুণ কষ্ট। চোখ পরিষ্কার হ'ল অজয়ের। কোথা হতে ছুটে এসেছে চন্দনগন্ধী স্নিগ্ধ বাতাস। সে বুঝি বাসা বেঁধেছিল শরীরের কোষে কোষে, জীবনের মর্মমূলে সৃষ্টির আদি রজনীতে। অজয়ের জীবনের চরম দুর্দিনে সে বেরিয়ে এল তার গোপন গুহা ছেড়ে। মুছিয়ে দিল স্বেদাক্ত কপাল, ভ্রূকুটিকুটিল মুখকে আবার স্নিগ্ধ প্রশান্ত ক'রে দিল।

পিঠে রাখা হাতখানির ভাষা বদলে বুঝল হিমিকার শরীর। চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়ল। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল হিমিকা। অজয়ের সমস্ত হৃদয় আবেগে মথিত হয়ে গেল, রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করলেন তিনি।

---কেঁদো না, ভয় নেই। যাও নীচে গিয়ে বিশ্রাম কর একটু।

ভয় নেই, বললেই কি ভয় যায়। ভয় যে বাসা বেঁধেছে হিমিকার বুকের মধ্যে। একটু শব্দ হ'লে, জোরে কেউ কথা বললেও ভয়ে শরীর কেঁপে ওঠে।

●

অপর্ণা গল্প করছিল নমুনার সঙ্গে। গল্প আর কি। মাথা নাড়া, আবছা একটু হাসি---এ-ছাড়া কিছু বলে না মেয়েটা। আজকে অবশ্য একটু বেশী হেসেছে অপর্ণার কথা শুনে। অপি বলেছিল :

---তোমার নমুনা নামটা বিশ্রী, আমি একটু বদলে নইনী ক'রে দিলাম। বেশ সুন্দর আর নতুন নাম, না? হাসলে হবে না, কথা বলে বল সুন্দর নাম কি না নইনী।

হিমিকা হাসল।---আমার আর একটা নাম আছে।

---আছে? সেটা তা'হলে কি বল।

হঠাৎ আবার ভয় উঠে এল হিমিকার বুকের মধ্য হতে। ছড়িয়ে পড়ল মুখেচোখে। মুহূর্তের ভুলে এ কি করল। এখন তো নাম বলতেই হবে।

---আরে মেয়ে, চুপ কেন? নাম বলা বারণ নাকি? একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল অপর্ণা। এত মিনমিনে ভাব সহ্য হয় না তার।---কি নামটা, শুনি।

---হিমিকা। আস্তে আস্তে বলল হিমি।

---হিমিকা। ওমা, কি সুন্দর। একেবারে নতুন ধরনের মিষ্টি নাম। এই দাদা। শোন, শোন, নইনীর ভাল নাম হিমিকা।

---হিমিকা। বেশ, তা নামটার মানে হ'ল কি? হিম? বরফ? গরমের দিনে ভালই কিন্তু শীতের সময়---। হাতের কাগজটার উপর আবার চোখ নামাল অনল।

---অপি, কল্যাণের রোল নাম্বার কত জানিস নাকি?

---ওমা। রেজাল্ট বেরিয়েছে নাকি? না তো, কল্যাণের রোল নাম্বার জানিনে তো। দাঁড়াও এক্ষুণি মাসিমাকে ফোন করছি।

দমদম বিমানবন্দরে অবতরণের পর রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাসে রাজভবন অভিমুখে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধরমবীর

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

শ্রাবণ / '৭৫

[illegible] রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে করমর্দনরত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ভাষণরত শ্রীহেমন্তকুমার বসু

স্ব ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মাল্য অর্পণ করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর

কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে স্বর্গত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর ৭০তম জন্মদিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রীসত্যেন বসু, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ

ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী শ্রীমতী মারকস মহিলা নাগরিক সংস্থা কর্তৃক সম্মানিত হবার পর স্বামী শ্রীমারকস তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

বিক্ষোভরত কলিকাতা পৌর সংস্থার কর্মচারিবৃন্দ

কৃষ্ণনগরের এক জনসভায় ভাষণরত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন। পার্শ্বে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন

দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অপর্ণা। চটির শব্দ অনলের পাশে এসে থামল। ছেলের হাত হতে কাগজটা টেনে নিলেন অজয়।

---তোমার রোল নাম্বার কত? ফিপটি টু? এফ জে ফিপটি টু? এঃ অনেক গুলো নাম্বার কেটে গিয়েছে যে। ফিপটি টু, বেরিয়ে গিয়েছে, ফার্স্ট ডিভিশন।

---দাদা, কল্যাণ---, কে? কে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে বাবা? হুড়মুড় ক'রে অপর্ণা এসে ঘরে ঢুকেছে।

অজয় হাসলেন।---আমাদের নইনী, নইনী ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে।

এ্যা! দেখি দেখি কাগজটা, কত রোল নাম্বার? ভাইবোন ঝুঁকে পড়ল কাগজের উপর। মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

---দাদা, ঠিক বলেছে রে সরমাসি। নইনী কখনো জলদের মেয়ে নয়। ওর নাম হিমিকা, ও ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। ও কি ক'রে রিক্সা-ওয়ালার মেয়ে হবে।

--হুঁ।

---হু কিরে? বিশ্বাস হয়না তোর? কিন্তু ভেবে দেখ জলদ কখনো অমন সুন্দর নাম রাখতে পারে? ওদের দৌড় ঐ নমুনা পর্যন্ত। আঃ! কি এত ভাবছিস দাদা? কথা বলনা। এমন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার! একেবারে শার্লক হোমস্‌কে ডাকা দরকার আর তুই একদম চুপ হয়ে গেলি। মন দিচ্ছিস না মোটে। উঃ! যখন মহামায়া শুনবে, নবতম আশ্চর্য ব্যাপার দেখে চোখ ছানাবড়া ক'রে ফেলবে একেবারে।

এতগুলো কথা একা একা বলবার পরও অনল চুপ করে রইল দেখে অপর্ণা রাগ করল। সে বোঝেনি অনল হিমিকাকে নিয়েই ভাবছিল। ভাবছিল, একটা রহস্য আছে মেয়েটার সম্বন্ধে, আর বাবা সেটা জানেন। কিন্তু গোপন করছেন কেন? ব্যাপার কি?

---এই দাদা! অনলের পিঠে সুড়সুড়ি দিল অপর্ণা।---কথা বলছিস না কেন?

---ভাল করে দে, ঘুম আসছে।

---কলা দেবে। ঘুম আসছে। কি কাণ্ডরে বাবা, নমুনা নয়, হিমিকা। কি সুন্দর নাম। কখনো শুনিনি, একেবারে নতুন নাম। নইনীও নতুন নাম, কেউ শোনেনি।

ঘর থেকে চলে গেল অপর্ণা। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কোন কলেজে ভর্তি হবে হিমিকা। হিমিকাকে ওর নতুন নামটা শোনাতে হবে। মিষ্টি নাম, নইনী, কেউ কোনোদিন শোনেনি।

সরবালার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও হিমিকাকে উপরে চায়ের টেবিলে এনে বসিয়ে দিয়েছে অপর্ণা। বসাবে না তো কি, যে সে মেয়ে নাকি! নাম হিমিকা, লেটার পেয়েছে অঙ্ক আর ফিজিক্সে। দাদা বলে ফিজিক্স ভীষণ কঠিন সাব-জেক্ট, আর অঙ্ককে তো দেবতার মত ভয় ভক্তি করে অপর্ণা। বাবাকে হিমিকার নম্বর দেখিয়েছেন ওদের প্রিন্সিপাল, কিন্তু মার্কশীট দেননি। হিমিকাকে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষুণি হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়ে এক গাড়ীতে বাবা দাদা হিমিকা বেরুবে। দাদা হাসপাতাল, বাবা কলেজ। তারপর হিমিকাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, খেয়ে-টেয়ে জগদেও চলে যাবে বাবাকে আনতে। দাদা ওসব গাড়ী টাড়ির ধার ধারে না, খেয়াল খুশী মত চসে বেড়ায় ট্রাম-বাসে, সত্যি কথা বলতে গেলে, গাড়ী সব চেয়ে বেশী ব্যবহার করে অপর্ণা। গাড়ী ছাড়া চলা ফেরা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। গাড়ী খারাপ হলে ট্যাক্সিতে ওঠে সে। জীবনে দু'বার মাত্র বাসে আর একবার ট্রামে উঠেছে, তাও মেয়েদের পাল্লায় পড়ে। অবশ্য বাবা অনেক সময়ই ট্রাম বাসে চলে বেড়ান। কিন্তু ভারি বিশ্রী, বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। ধাক্কা মারছে গায়ে, দাঁড়াতে হচ্ছে ছেলেদের সঙ্গে প্রায় জড়াজড়ি করে।

---ভাল করে খাও নইনী। তোমাকে বাবা কলেজেও ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন, না বাবা? হিমিকার প্লেটে আর একটা ডিম তুলে দিয়ে মুরুব্বীআনা প্রকাশ করল অপর্ণা। এতদিন তাকেই সবাই খাও খাও বলে পাগল ক'রে ছেড়েছে। এবার সেও কাউকে এই বিশ্রী কথাটা বলবার সুযোগ পেল।

---হ্যাঁ, বেশ ভাল ক'রে খাওয়া করতে হবে। ভীষণ অ্যানিমিক। চায়ের পেয়ালা শেষ করে মন্তব্য করল অনল।

---বাবা, নইনীকে কলেজে নিয়ে যাবে না?

---দেখি। হ'ল খাওয়া? বেশ, বেশ। এবার চটপট তৈরী হয়ে নাও।

তোয়ালে দিয়ে ঠোঁটের কোণ দু'টো মুছলেন অজয়। হিমিকা অপর্ণা ও উঠল।

---তুমি তোমার ঘরে গিয়ে চুল ঠিক কর। আমি শাড়ী জামা পাঠাচ্ছি।

শাড়ীর জন্য ভাবনা নেই, কিন্তু ব্লাউজ নিয়েই মুশকিল যা রোগা তুমি, আমার ব্লাউজ ঠিক---

নিজের ঘরে এসেও আলমারি খুলে ভাবতে হ'ল অপর্ণাকে। এখনকার ব্লাউজ তো গায়ে হবে না হিমির। আগের---

পিছনে গম্ভীর মুখে দাঁড়ানো সরবালার দিকে ঘুরে তাকাল অপর্ণা মাসি আমার আগের ব্লাউজগুলো কোথায়?

---কি হবে সে গুলো দিয়ে?

--হিমিকে পরতে দেব। এখনকার আমার ব্লাউজ তো ওর গায়ে হবে না। উঃ। কি ভীষণ মুটিয়েছ আমাকে তুমি। খবরদার, আর একটুও সন্দেশ, দুধের সর, মাখন খাওয়াবে না। এই সবুজ শাড়ীটা---, আঃ বের করনা, কোথায় রেখেছ ব্লাউজগুলো।

সবুজ শাড়ীটা? আঁতকে উঠল সরবালা।

---এটাতো নতুন শাড়ী। মাত্র দু দিন পরেছ।

---নতুন? পুরণো ছেঁড়া শাড়ী দেব নাকি হিমিকে।

---তুমি দেবে কেন? ওর বাপ জলদকে কিনে দিতে বল না।

---জলদ দেবে? জলদের টাকা আছে নাকি? তাছাড়া হিমি মোটেও জলদের মেয়ে নয়।

--কার মেয়ে তবে?

---কে জানে। বাবা জানতে পারেন।

আমাকেও জানতে হবে। মনে মনে বলল সরবালা। এ বেনোজল সংসারে থিতুতে দেব না কিছুতে, সর্বনাশ করে ছাড়বে তবে।

●

হিমিকাকে দেখে চোখ ছল ছল করে উঠল মাদারের।

---শি ইজ ডেডলী পেল, মাম গন। পা। পুওর চাইল্ড। অরফ্যান।

অরফ্যান, অনাথা। অজয়ের চোখেও প্রায় জল আসতে চাইলো। সতেরো বছরের মেয়েটি, অনাথা---পৃথিবীতে কেউ নেই ওর। কেন আমি, আমি আছি।

মাকণীট নিয়ে বের হলেন ছুল হতে। অনল গাড়ীতে অপেক্ষা করছিল, নম্বর দেখল।

---চমৎকার। খুব ভাল নম্বর। দেখছ বাবা, অঙ্ক ফিজিক্স দু'টোতেই চমৎকার করেছে। মেডিকেলে পড়তে পারে অনায়াসেই, কিম্বা ফিজিক্সে অনার্স। এঃ। আবার দাঁড়াল। জ্বালিয়ে মারছে। এ সময়ে পথে বের হওয়াই মুশকিল।

লাল বাতি জ্বলছে, নিমেষে সারি সারি গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল।

---তোর দেরী হয়ে গেল নাকি? কি হ'ল হিমি? মাথা ঘুরছে?

কোণের মধ্যে ঢুকে হিমিকা থর থর করে কাঁপছে। ওর দিকে চাইতে গিয়েই নজর পড়ল, তাঁর গাড়ীর প্রায় ঘেঁযাঘেষি রোলস রয়েসের দিকে। মুখ বাড়িয়ে তাঁদের দেখছেন সুরেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়। ভীষণ ক্রুরদৃষ্টি। তীব্রতা এসে গায়ে ঠিকরে পড়ছে যেন। একটা ভয়ানক অস্বস্তিকর মুহূর্ত। তক্ষুনি নীল আলো জলে উঠল, স্টার্ট দিল গাড়ীগুলো।

প্রাণপণে নিজেকে সংযত করলেন অজয়। অনল লক্ষ্য করেছে সুরেশ্বরের দৃষ্টি, চেয়ে আছে হিমিকার দিকে। কুঁচকানো ভ্রুতে বিস্ময়ের চেয়ে জিজ্ঞাসা বেশী। ছেলের প্রশ্ন বুঝলেন অজয়। আগেই অনলকে সব খুলে খুলে বলা উচিত ছিল।

---দেরী হয়ে গেল, আজ আর কলেজে গিয়ে কাজ নেই। কি বল? এ কি। এত কান্না কেন? হিমিকাকে জিজ্ঞেস করলেন অজয়।

ভয়ে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল হিমিকা:

---উনি, উনি আমাকে দেখে ফেলেছেন।

---দেখে ফেলেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে।

হিমিকার দিকে ভাল করে চাইতে পারলেন না অজয়। ওর ভয়টা যেন তাঁর বুকের উপর চাবুকের মত এসে পড়েছে।

অনলকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে নিজেও বাড়ী ফিরে এলেন। আজ আর কলেজে যাবেন না। লাইব্রেরী ঘরে ফ্যানের তলায় বসলেন। একটা সতেরো বছরের মেয়ে তার শরীরের লোভে পাগল ষাট বছরের বৃদ্ধের ভয়ে কাঁপছে। লজ্জায় অজয়ের মুখ রক্তবর্ণ হল। সমস্ত পুরুষ জাতির লজ্জা। কলকাতার পথটা অজয়ের কাছে যেন আফ্রিকার জঙ্গল হয়ে উঠল। বাজছে নাগর, সাদা মানুষ পুড়ছে আগুনে। লোভে সবার চোখ চকচকে, এক্ষুনি সুরু হবে নরমাংসের ভোজ। কেবল কি সুরেশ্বরের দুর্দমনীয় লালসার জন্য লজ্জা? মনে মনে নিজেকে বললেন অজয়। সেদিন নিরালা ঘরে নিস্তব্ধতার অবসরে তিনি নিজেও তো উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর নাকেও গিয়েছিল তরুণ নারী মাংসের গন্ধ। সেটা একটা আকস্মিক ব্যাপার, হঠাৎ বিকৃত বুদ্ধি কোথা হতে এসে আচ্ছন্ন করেছিল তাঁকে, এই কৈফিয়েৎ নিজের কাছে দিয়েছিলেন অজয়। না হলে যে অপির মুখের দিকে তাকাতে পারতেন না, সপ্তাহে পাঁচদিন গিয়ে বসতে পারতেন না অধ্যাপকের সম্মানিত আসনে। অধ্যাপক। শিক্ষক। মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক তিনি। দেশে-বিদেশে কত মান। এই তো ক' বছর ও দেশে অধ্যাপনা করে এসেছেন। আবার ডাকছে তারা। কত মানুষ শ্রদ্ধা করে। অধ্যাপক--মানুষের মন গড়বার কারিকর।

তীক্ষ তীব্র করে সেক্সোলজি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে দক্ষিণা পান মোটা অঙ্কের। খাজুরাহোর মিথুন মূর্তিগুলোর ঘনিষ্ঠ-তম ফটো তুলে, সেই ঘনিষ্ঠতার যে সব দৃশ্য শিল্পীরা নিপুণ হাতে পাথরে ফুটিয়ে গিয়েছে, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করেন অজয় সাদা পাতায় কালি ছিটিয়ে। তাঁর বইয়ের মুদ্রণ শেষ হয় মাস না পার হতে। কেন তাঁর এসব বই দেশের উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা গোগ্রাসে গিলে ফেলে? প্রবীণরাও তরুণদের তীর্যক দৃষ্টিতে বিদ্ধ হবার আশঙ্কা না রেখে, অবসর বিনোদনের জন্য অনায়াসে চোখের সামনে মেলে ধরেন---অধ্যাপক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাড়া জাগানো বই---'মানব মনের আদিম রহস্য', 'ভারতের শিল্প ও শিল্পী'। নামী নামী সমালোচকদের প্রশংসাধন্য এসব বই। জ্ঞানী প্রাজ্ঞ অধ্যাপকের বিদগ্ধতার পরিচয় আছে এ সব বইতে। অপূর্ব ভাষায় বুদ্ধিকে যুক্তি আর তত্ত্বের ঐশ্বর্যে শাণিত করে অজয় বই লেখেন। দেশকে সমস্ত জীবনের তপস্যার ফল উপহার দিচ্ছেন এ কথা ভেবে মন এতদিন তৃপ্ত ছিল।

সেদিন হিমিকাকে দেখে, না না, দেখে নয়, ওর পরিচয় জেনে---অনায়াস লভ্য একটি নারী দেহ তাঁর আয়ত্তে---শুধু এই বোধ তাঁকে শিক্ষা সংযম রুচি সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। নিজেকে আবিষ্ট করতে পুরো দুটো দিন কেটেছে। বুঝেছেন, হিমিকাকে নিয়ে বিহ্বলতা আকস্মিক ব্যাপার নয়, তাঁর নিজের প্রবৃত্তিই উঠে এসেছিল সুযোগ পেয়ে। বুঝেছেন, খাজুরাহোর মিথুন মূর্তির বিশ্লেষণে যে মন তৃপ্ত হয়, সেই মনই তাকে হিমিকার প্রতি উদ্যত করেছিল।

সুরেশ্বর দুর্বৃত্ত, পাষণ্ড। কোনো আবরণ না রেখে নিজেকে সদর্পে প্রকাশ করেন তিনি। সকলে জানে তাঁর সে পরিচয়। কিন্তু অজয়? অজয় কি? তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে দেশ, তরুণ দল আগ্রহে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। তিনি মনোবিশ্লেষণের ভাণ করে তাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন---কোন স্থান স্পর্শ করলে, কত তীব্র উত্তেজনায় শরীর মাতাল হয়ে ওঠে। ছেলে-মেয়েরা যদি পর্নগ্রাফিক লিটারেচর পড়ত, ওদের লুকিয়ে রাখতে হত অনাবৃত দেহের ছবি দেওয়া মলাটের বই।

যদি আধুনিক সাহিত্য পড়ত---যাকে দুঃসাহসী বাস্তব বোধের শ্বাসরুদ্ধকারী দলিল বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সে বই পড়তেও একটু নিরালা জায়গা দরকার হত চক্ষুলজ্জা রক্ষার খাতিরে। কিন্তু অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই---এ যে অপূর্ব সাহিত্য-কর্ম। পাথরের গায়ে কোটানো লাস্যময় মূর্তি, তারা তো মানুষ নয়। দেব-দেবী, যক্ষ-যক্ষিণী। মা ছেলের হাত থেকে বই নিয়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে দেখতে পারেন বিষ্ণু-লক্ষ্মীর বিহার মূর্তি। বোন দাদার কাঁধে ঝুঁকে অনায়াসে উপভোগ করে বদ্ধ মিথুন মুখের অপূর্ব কারুকার্য।

দোষ নেই, কোনো দোষ নেই এসব চিত্র সম্বলিত বই লিখলে। এতো শিল্প, ভারতের মহান ঐতিহ্য। মেয়েদের স্বল্প বসন, কুৎসিত সিনেমা, টুইস্ট-নাচ আর বাস্তবধর্মী (?) সাহিত্যকে গাল দিচ্ছেন দেশের হিতকামীগণ। অজয়ের মত বুদ্ধিমান পণ্ডিতরা কিন্তু সেদিকে যান নি। তাঁদের কাজ হচ্ছে পাণ্ডিত্যের অ্যালকোহল পৃথিবীর তীব্রতম উত্তেজক মাদক গুলে দেশকে খাইয়ে দেওয়া। বিদেশী বই কিনবার দরকার কি? নগ্ন নারী-নরের চিত্র উপভোগ করে তপ্ত হয়ে ওঠা? কি নিরাবরণ পাথরের মেয়ে আর রক্ত মাংসের মেয়ে---সবই তো ছবি। বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সব ভ্রমণ কাহিনী খুললেই দেখা দেবে রাশি রাশি যক্ষিণী-কিন্নরী, দেবী-মানবী। কি সৌষ্ঠব তাদের দেহ-ভঙ্গিমায়! কি অপূর্ব বক্রতা, ঋজুতা ক্ষীণতা বিশালতা। দেহকে তপ্ত করবার সব উপাদান উজাড় করে ঢেলে শিল্পীরা গড়ে গিয়েছেন পাথরের নারীদেহ।

কিন্তু এমন তো হতে পারে, ওরাও রক্ত মাংসের মেয়ে ছিল একদিন। দেহে ছিল লজ্জাবসন, গুচ্ছ গুচ্ছ মাধবী মালতির কোরক আর নবপত্রদলে সজ্জা করে ওরা অভিসার করত বন কুঞ্জ বনান্তরালে। বুঝি লুব্ধ পুরুষ মত্ত আবেগে ওদের সব আবরণ দূর করে দিয়েছিল, টেনে নিয়ে এসেছিল দিনের আলোর উজ্জ্বল পৃথিবীর মাঝখানে। আজকালের টুইস্ট নাচের মত ওরাও বুঝি নেচেছিল মিথুন-নৃত্য। তাই দেখে বুঝি ভয় পেয়েছিল বিশ্ব প্রকৃতি। তার ভয় অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছিল। পাথর---পাথর হয়ে গিয়েছিল সেই নগ্ন নর-নারীর দল। সে পাথরকে গুড়িয়ে ধুলো করা গেল না, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে উড়িয়েও দেওয়া গেল না। যুগান্ত ধরে দাঁড়িয়ে রইল সেই সব পাথরের মূর্তি মানুষের নির্লজ্জতার সাক্ষী হয়ে। বুদ্ধিমান মানুষেরা তখন বুদ্ধি বের করল। নিজের দুষ্প্রবৃত্তি ঢাকবার জন্য যেমন একটি ভগবান বানিয়ে তাঁর নাম ছুঁইয়ে চিরদিন সমস্ত অকাজকে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়, তেমনি সেই নাম দিয়েই এই মূর্তিগুলোকেও শুদ্ধ করে নেবার একটা চমৎকার ব্যবস্থা করল। উঠল বিশাল দেব মন্দির, ওদের বসিয়ে দেওয়া হল তার গায়ে গায়ে। আরো কত অমনি মূর্তি রচনা করতে লাগল শিল্পীরা। মণ্ডন শিল্পের নামে নিজের প্রবৃত্তির শান্তি।

আজো কেউ ভক্তিতে গদগদ হয়ে, কেউ শিল্পরসিক, কেউ বা তত্ত্বানুসন্ধানী হয়ে তন্ময় হয়ে দেখছে মূর্তিগুলো। কি আশ্চর্য কুশলী আর বুদ্ধিমান ছিল অতীতের সেই মানুষেরা। মন্দির গড়ে, পাথরে কুঁদে, সৃষ্টি করে গিয়েছে এমন সব অনন্ত-যৌবনার নগ্ন দেহ, যে আধুনিকা বিকিনি পরিহিতার দল হার মানবে তার কাছে শতবার।

মধ্য যৌবনে স্ত্রী মারা যাবার পর হতে নারীহীন জীবন। নিজের অগোচরে খানিকটা আত্মগ্লানি ছিল হয় তো। কিন্তু এখন নিজেকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করছেন অজয়। নারীহীন? প্রস্তরময়ী অজস্র নারীদেহ তো তাঁর সমস্ত অবসরের সঙ্গিনী হয়ে আছে কতদিন ধরে।

সোজা হয়ে উঠে বসলেন অজয়। মাটিতে ফেলে দিলেন---'শিল্প মূর্তির' পাণ্ডুলিপি।

---বাবা,

একটু চমকে আড়ষ্ট হলেন অজয়। অনল ঘরে ঢুকেছে।

—এত তাড়াতাড়ি ডিউটি শেষ হল যায়?

—না, কিন্তু ভাল লাগছিল না তাই—

—বেশ করেছিস। বোস্।

—বাবা—

অজয় বুঝলেন কি জানতে চায় অনল। আবার মনে হল, আরো আগে জানানো উচিত ছিল।

—বাবা, ও হিমিকা—

—হ্যাঁ, হিমিকা, শোন।

অনল শুনল একটি অদ্ভুত ইতিহাস সদ্য বইয়ের পাতা হতে নেমে এসেছে তার সামনে। একটা অনুভূতিতে তার মন ভরে গেল। রাগ বিরক্তি আবার তার সঙ্গে সহানুভূতি, এমন অনুভূতির স্বাদ প্রচণ্ড বড় বয়সে প্রথম পেল অনল। তার বিরক্তি বাড়ল যখন অজয় এই বলে শেষ করলেন—

সুরেশ্বর সহজে ছাড়বে না।

এই ভয়ই পাচ্ছিল অনল। সুরেশ্বর প্রচণ্ড আত্মাভিমানী মানুষ। লজ্জা সঙ্কোচের কিছুমাত্র পরোয়া করেন না তিনি। চরিত্রহীনতা তাঁর কাছে পৌরুষের পরিচয়। হিমিকাকে স্বাধিকারে পাবার জন্য, অজয়কে জব্দ করতে, সদর্পে তিনি নিজের কদর্য স্বরূপ অনাবৃত করবেন। তাতে সুরেশ্বরের কোনো অসুবিধা হবে না, লোকে হাসলে, টিটকারী দিলে কিছু গ্রাহ্য না করে তিনি হাতির দাঁতের সোনামুখ ছড়িটি হাতে নিয়ে গট্ গট্ করে গিয়ে গাড়ীতে উঠবেন। কিন্তু অজয় অধ্যাপক অনল অপর্ণার সমাজে প্রেম, ডাইভোর্স আছে কিন্তু রক্ষিতা-টক্ষিতা একেবারে জঘন্য ব্যাপার।

বিরক্ত হল অনল, তবু চুপ করে রইল। শৈশবে মাকে হারিয়েছে। অজয় তাদের ভাই-বোনকে মা-বাবা দুজনের স্নেহ-সতর্কতা দিয়ে বড় করে তুলেছেন। বাবার সঙ্গে ছেলে-মেয়ের কোনো আলোচনায় বাধা ছিল না। এবারের ঘটনার অভিনবত্ব এমন, যে অনল বাবার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা তো করতেই পারল না, অপর্ণার কাছেও নীরব হয়ে রইল।

(ক্রমশ।

অসাধারণ

শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়

ওরা দুজন বসেছিল মুখোমুখি
বছরের পর বছর
উত্তর পায় নি কেউ কারও কাছ থেকে কোনও,
কারণ, প্রশ্ন করে নি কেউ কারও কাছে কিছুই,
যে মনের কথা আপনিই পৌঁছয় মনে মনে
সে কথাও উচ্চারণ করে নি কেউ—
কারণ কি, তাও ভাবে নি স্পষ্ট করে।
শুধু বসেছিল চোখে চোখ রেখে
মুখোমুখি। এঁকেছিল দুজনের চোখে
দুজনের মুখের ছবি,
মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল দুজনেরই,
প্রত্যেকটি রেখা, বুঝি প্রতিটি রোমকূপের চিহ্নও
পরস্পরের মুখের।
কাজ ছিল হাতে
তাই দিন কেটেছিল মন্দ না
কোনও এক অসাধারণ প্রজ্ঞার আত্মপ্রসাদে।

তারপর কোনদিন বেলা শেষে
আকাশে জমেছিল মেঘ,
কাজ নেই হাতে, মন নেই কাজে,
দিন শেষের রক্ত গোধূলির ঝড়ের আওয়াজ
ঘরে ঘরে পারিবারিক ঘনিষ্ঠ কপাটে কপাটে—
ওদের মাথার উপর খোলা
এতদিনের বোবা আকাশটা
কান্নায় ভেঙে পড়ল:
আগে কেন কাঁদতে পারি নি এমন করে
নেহাতই সাধারণের মত।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দুই ॥

বরাবর কার্তিকের নিজের শোবার ঘরে দুজন ব্যক্তির ছবি থাকত, একখানি তার বাবা প্রসন্নকুমারের অন্যখানি তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডা: ব্রমফোর্ডের। প্রিন্সিপ্যাল তাকে কত ভালোবাসতেন এবার বলি তার দুটি ঘটনার কথা।

বছর বছর ফার্স্ট হয়ে উপরের 'ইয়ার'-এ উঠেছে কার্তিক নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদে। ফার্স্ট হলে কলেজের মাইনে দিতে হয় না, মাইনে দিতে না হলে তার বাবার অর্থাভাবটা প্রকট হয়ে ওঠে না। ফার্স্ট বয়কে ছাত্রেরা একটু খাতিরও যে না করে তাও নয়---ফলে বই না কিনতে পারলেও এর কাছে ওর কাছে চেয়ে-চিন্তে চালিয়ে নেওয়া কঠিন হয় না।

পরবর্তী জীবনে এই ফার্স্ট হওয়ার কোন প্রসঙ্গ উঠলেই ডা: বোসের মুখখানি হাসিতে ভরে যেত, বলতে শোনা যেত, ---ওহে, আমার ফার্স্ট হওয়া তো সখের জন্য নয়, প্রয়োজনের তাগিদে। ফার্স্ট না হলে যে পড়া সম্ভব হত না, কলেজের মাইনে যোগাতাম কি করে?

কিন্তু ওটা তো চালের একদিক। অন্যদিকে ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই তিনি প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন এই চঞ্চল ছাত্রটির পরীক্ষার ফলাফল।

ফাইনাল এম-বি পরীক্ষার মেডিসিন-এর খাতা দেখতে গিয়ে ডা: ব্রমফোর্ড কার্তিকের একখানি উত্তর-পত্র দেখে রেগে টং। বেয়ারা ছুটল ঝামাপুকুরে---ডেকে আন কার্তিককে, দিচ্ছি তার ফার্স্ট হওয়ার সখ ঘুচিয়ে।

প্রিন্সিপ্যালের জরুরী তলব পেয়ে ছুটে গেল কার্তিক, ভয়ে মুখ কাচুমাচু। না জানি কোন্ গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছে।

প্রিন্সিপ্যাল তাকে ধমকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাগলামির চিকিৎসায় এই

সঞ্জয়

ওষুধের ব্যবহারটা লিখেছ, এটি ভুল। এ ওষুধের কথা কোন্ বই-এ লিখেছে দেখাও।

কার্তিক বলে, স্যার, এ মাসের 'ল্যানসেট' (Lancet) পত্রিকায় একটা রিসার্চ পেপার বেরিয়েছে তাতে ওষুধ-টার বিষয় লেখা আছে।

'নটি বয়'---গর্জন করে উঠলেন প্রিন্সিপ্যাল। কে তোমায় বলেছে এ মাসের 'ল্যানসেট' পত্রিকায় যে রিসার্চ পেপার বেরুবে পরীক্ষার খাতায় তার রেফারেন্স দিতে?

ভাগ্যিস আমিও এ মাসের 'ল্যানসেট' পত্রিকাটি যথাসময়ে পেয়েছিলাম এবং ঐ রিসার্চ পেপারটি পড়েছিলাম। না হলে আমারও মনে হত, উত্তর ভুল লেখা হয়েছে। পরীক্ষককে পরীক্ষা করবার ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, তার শাস্তি দেব তোমায়, পাঁচ মার্ক কাটব এর জন্য। দেখি কি করে এবার ফার্স্ট হও।

বিষণ্ণ মনে ফিরল কার্তিক। পাশ করা হয়তো আটকাবে না, কিন্তু ফার্স্ট হওয়ার দফা রফা হয়ে গেল তার। এত বছর রেকর্ড-মার্ক রেখে বরাবর ফার্স্ট হয়ে শেষে তীরে এসে বুঝি তরী ডোবে।

কার্তিক মনের ক্ষোভ মনেই পুষে রাখে। যাকে বলতে যাবে সেই তার মূর্খতায় হাসবে। সত্যিই তো, পরীক্ষকের যদি এই মাসের 'ল্যানসেট' পড়বার সময়-সুযোগ না হয়ে থাকে তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না এবং আধুনিকতম গবেষণার ফল কোন পাঠ্য পুস্তকেও থাকবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং মার্ক কাটা গেলে নেহাৎ অবিচার হয়েছে বলা যায় না।

পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল, না, বিধাতা প্রসন্ন মুখ ফিরিয়ে নেননি। এবারও ফার্স্ট হয়েছে কার্তিক।

১৮৯৭ সাল।

যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব এগিয়ে এলো। সে-যুগে কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী, ভারতের বড়লাট এবং বাংলা দেশের ছোটলাট দুইজনই কলকাতায় থাকতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবর্তন উৎসবেও দুই লাটসাহেবই উপস্থিত।

সেই সমাবর্তনে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ছাত্রদের হাতে ডিগ্রিপত্র দেওয়াচ্ছেন।
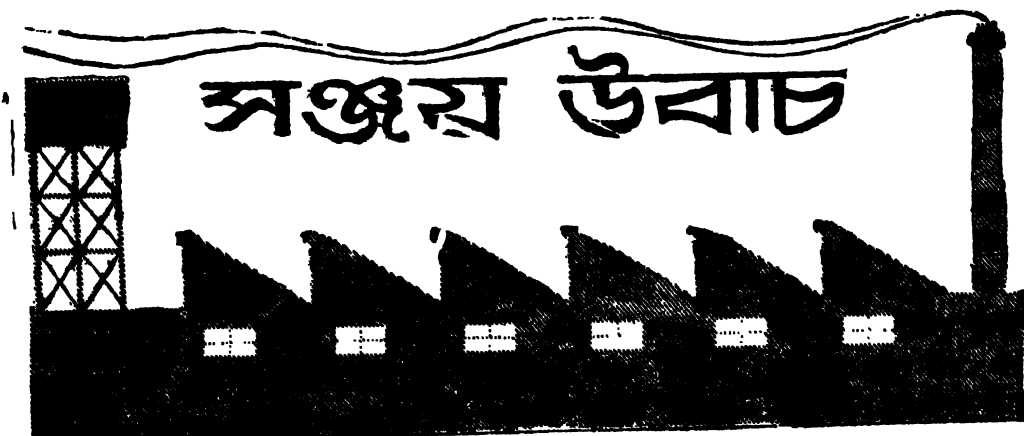
কার্তিক এম-বি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণ পদক উপহার পেল, আর পেল সার্জারীতে প্রথম পুরস্কার ডিউক অব এডিনবরা প্রাইজ, ক্লিনিকাল সার্জারী এবং ক্লিনিকাল মেডিসিন-এর ম্যাকনিয়ড সুবর্ণপদক। এ ছাড়াও কেমিষ্ট্রীতে পেয়েছিল সার্টিফিকেট অব অনার, প্র্যাকটিকাল হিস্টোলজিতে এফ, সি চ্যাটার্জি স্কলারসিপ; প্রথম বছর থেকে শেষ বছর পর্যন্ত বরাবর ফার্স্ট হওয়ায় আবদুল গণি বৃত্তি। আবার রেসিডেণ্ট গুডিভ স্কলারও হয়েছিল সে। তার এম-বি ডিগ্রির রেজিষ্ট্রী নম্বর—'৩০৩'।

একটির পর একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, আর একই ছাত্র বারবার এসে নিয়ে যায় সে পুরস্কার। সে ছাত্রটি আর কেউ নয়, আমাদের কার্তিক। মনে হল, লাটসাহেব যেন নিজ হাতে তাকে উজাড় করে তুলে দিচ্ছেন ডাক্তারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি সেরা সম্মান।

সব শেষ হলে প্রিন্সিপ্যালবললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সী, অনুমতি পেলে এই ছাত্রটিকে আরও একটি পুরস্কার আমার নিজের তরফ থেকে দিতে চাই এবং তা দেওয়ার আগে কি জন্য এই পুরস্কার তাও বুঝিয়ে বলতে চাই।

প্রিন্সিপ্যাল সেই মাসের ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত সর্বাধুনিক রিসার্চ পেপার সম্পর্কে আদ্যন্ত ঘটনাটি ছোটলাট সাহেবকে তথা সমগ্র সভাকে শোনালেন। তারপর কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন—তার পাঁচটি মার্ক কেটে ভেবেছিলাম, এবার বাছাধনকে আর ফার্স্ট হতে হবে না।

কিন্তু পাঁচ মার্ক কাটা সত্ত্বেও সে শুধু আমার পেপারে ফার্স্ট হয়নি, ফার্স্ট হয়েছে গোটা ইউনিভারসিটিতে। একা এতগুলি বিষয়ে ফার্স্ট হয়ে আবার ইউনিভার্সিটিতেও ফার্স্ট হওয়ার এ রেকর্ড বহু যুগ পরেও আর কেউ অতিক্রম করতে পারবে কি না সন্দেহ। এই দুর্লভ কৃতিত্বের পুরস্কার কিছু পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে, আমি তার মার্ক কেটেছিলাম বলে। তাই আমার নিজের ব্যবহারের জন্য বিলাত থেকে আনা এই চমৎকার বহনযোগ্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি ইওর এক্সেলেনসি অনুমতি দান করলে কার্তিককে এই সমাবর্তনে উপহার দিতে চাই।

সভাস্থল করতালিধ্বনিতে ফেটে পড়তে লাগল। আহ্বায়কের ডাকে আবার এলো কার্তিক। এবার তার চোখে জল। আনন্দে সে আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারেনি।

লাটসায়েবের হাত থেকে সুন্দর ছোট্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি সে গ্রহণ করে ফিরে আসবার সময় প্রিন্সিপ্যালকে নমস্কার জানাতে গেল। কিন্তু আপনিই তার মাথা নত হয়ে পড়ল, সভার মধ্যেই সায়েবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে কার্তিক। সায়েব তাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

আর একবার সভা করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

॥ সাত ॥

কনভোকেশনে পাওয়া বৃত্তির টাকা বাবার হাতে তুলে দিলে কার্তিক, সোনার মেডেলগুলি বিক্রি করে ফেললে, বললে—সোনাদানায় কি হবে?

তখন সোনা সস্তা, তবু মেডেলগুলি বিক্রি করে যে টাকা হল, তাই দিয়ে কার্তিক কিনে নিয়ে এলো দুটি টাট্টু ঘোড়া আর একখানি পালকি গাড়ি। ডাক্তারি করতে বেরুতে হলে বাহন চাই সবার আগে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করে গেছেন তিনি, দূরপাল্লার জন্য অবশ্য একাধিক মোটর ছিল। কিন্তু ঘোড়ার গাড়িই ছিল তাঁর প্রিয় বাহন। শহরের মধ্যে ঘুরতে বরাবর ঘোড়ার গাড়িই ব্যবহার করতেন তিনি। কারণ হিসাবে বলতেন—একটা ঘোড়ার গাড়িতে সহিস কোচোয়ান ঝাড়ুদার ইত্যাদি নিয়ে কমপক্ষে পাঁচ-ছ'জন লোকের অন্নসংস্থান হয় মোটর গাড়িতে মাত্র একজন ক্লিনার, একজন ড্রাইভার। আমাদের গরীব দেশে যে-ভাবে চললে দশজন প্রতিপালিত হয়, সেভাবে চলাই ভালো।

তাঁর দেখাদেখি স্যার পি সি রায়ও মোটর না রেখে কিছুদিন একখানি ঘোড়ার গাড়ি রেখেছিলেন। সে সব প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। এখন বলছি ডা: বমফোর্ডের অতুলনীয় ছাত্র-প্রীতির কথা।

কার্তিক ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েও বিলেত গেল না। অল্পদিনের জন্য আই ইনফারমারিতে চাকরি নিল, তারপর বটকৃষ্ট পালের দোকানে বসতে লাগল, আর ঘোড়ার গাড়ি চেপে কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে রোগী দেখে বেড়াতে লাগল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যেই তার পসার ছড়াতে লাগল।

একদিন ঝামাপুকুরের গলিতে ব্রুহাম গাড়ি এলো একখানা। লম্বা গাড়ি, সরু গলির বাঁক ঘুরতে পারে না। অগত্যা একটু দূরেই দাঁড়াল গাড়িখানি। ভিতর থেকে নেবে এলেন গৌরবর্ণ উজ্জ্বলকান্তি ডা: বমফোর্ড, মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। খুঁজে খুঁজে গেলেন 'ডা: ক্যারটিক' বোসের বাড়ি। ভাগ্যিস কার্তিক তখন বাড়িতে ছিল, তাই সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

শিক্ষাগুরু পিতার সমান। কোথায় বসালে কি করলে যে শিক্ষাগুরুকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে বুঝতে পারে না কার্তিক। ডা: বমফোর্ড বললেন,—ব্যস্ত হোয়ো না মাই বয়, আমি তোমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তোমায় যখন তখন ডেকে পাঠাই বলে তো আর তোমার বাবাকে ডেকে পাঠাতে পারিনে।

প্রসন্নকুমার এলেন এবং শুনলেন সায়েবের প্রস্তাব। মুখখানা থমথমে হয়ে গেল তাঁর। কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত বললেন, কার্তিকই ঠিক করবে সে এখন কি করবে।

কার্তিকও পাশে দাঁড়িয়ে শুনলেন

তাঁর পিতৃপ্রতিম প্রিন্সিপ্যালের প্রস্তাব। কার্তিকের জন্য ভারত সরকারের বিশেষ বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাওয়ার সব ব্যবস্থা একরকম তৈরীই আছে। আগামী মাসের জাহাজেই রওনা হতে হবে।

বিলাতি উচ্চশিক্ষা, মূল্যবান ডিগ্রী পরে মোটা মাইনের চাকরি কিম্বা স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসায়ে সুপ্রচুর উপার্জনের এমন সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়বার সুযোগ হাতে পেলে আর যে-কোনো তরুণ ছাত্র লাফিয়ে উঠত। কিন্তু কার্তিক তাকিয়ে দেখল তার বৃদ্ধ পিতার দিকে। কত আশায় বুক বেঁধে তিনি ছেলের ডাক্তার হয়ে বসার দিনটির প্রতীক্ষা করেছেন। ডাক্তার হয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভালো উপার্জন করতে সুরু করেছে এবং বাবাকে চাকুরি হতে অবসর নিতে বলেছে। এখন সব ছেড়ে দিয়ে সে যদি বিলাতে চলে যায়, কত বছর পরে ফিরবে কে জানে? ফিরলেও কি আর সে এই কার্তিক থাকবে? বৃদ্ধ কি নিজের অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন না?

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল না কার্তিকের মনস্থির করতে, সে বললে—এখন তার প্রধান কর্তব্য দু' পয়সা উপার্জন করে বৃদ্ধ বাবাকে সাহায্য করা। সুতরাং এখন বিলাত যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠরত্ন প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিল—দাঁড়িয়ে দেখলে তার জন্মদাতা পিতা, আর শিক্ষাদাতা প্রিন্সিপ্যাল।

গভীর আক্ষেপের সঙ্গে ডাঃ বমফোর্ড বললেন,—ক্যার্টিক! ইউ ওয়ান্ট টু বি এ বাজার ডক্টর। আমি যে তোমায় বিলাতে এফ আর সি এস পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপ্যালের এই কথাটি জীবনের মূলমন্ত্র করেছিলেন ডাঃ কে সি বোস। খ্যাতির চরম অবস্থাতেও তিনি নিজের 'ফি' বাড়াননি। ও প্রসঙ্গ তুললেই বলতেন—'আই অ্যাম এ বাজার ডক্টর।'

ডাঃ বিধান রায় পর্যন্ত একবার অনুযোগ করে বলেছিলেন, প্রফেসনে প্রবীণ ব্যক্তি আপনি, আপনার ফি যদি না বাড়ান, জুনিয়ারেরা ফি বাড়াতে সংকোচ বোধ করে।

ডাঃ বোসের ঐ একই উত্তর—আমি জনসাধারণের চিকিৎসক—যারা দিন আনে দিন খায়, নিতান্তই গরীব গৃহস্থ, তারা যে দু টাকা ফি দিতেও পেরে ওঠে না।

সেদিন ডাঃ বমফোর্ড দুঃখিত চিত্তে ফিরে গেলেও এই উজ্জ্বল ছাত্রটির কার্যকলাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি তাঁর বরাবরই ছিল।

॥ আট ॥

যেবার প্রিন্স অব ওয়েলস ভারত সফরে আসেন সেবার চারিদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক আকারে দেখা দিয়েছিল। যুবরাজের একান্ত সচিব মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে অনুরোধ করলেন, যুবরাজের সফর তালিকায় যে সব স্থান ছিল সেখানে যুবরাজ গিয়ে পৌঁছুবার আগেই জনসাধারণকে বিনামূল্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট বিতরণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিরাট দায়িত্ব, সময় অল্প, অথচ লক্ষ লক্ষ ট্যাবলেট সফরসূচী অনুসারে অগ্রিম সর্বত্র পৌঁছানো দরকার। সারা বাজার খুঁজে কয়েক হাজার ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট সংগ্রহ হল। আর মাল বিলাত থেকে আনিয়ে দেওয়ার সময় ছিল না। অথচ এদেশে তখন ঐটুকু সামান্য ট্যাবলেটও তৈরী হত না।

ডাঃ বমফোর্ডের মনে পড়ল তাঁর প্রিয় ছাত্র কার্তিককে। শুনেছিলেন, কার্তিক শুধু ডাক্তারিই করে না, তৈরী করে ওষুধপত্র। ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেটের ফরমূলা তার অজানা নয়। সে কি পারে না এই বিপদে সাহায্য করতে।

নিজে এলেন ছাত্রের বাড়ি, বললেন যুবরাজের একান্ত সচিবের অনুরোধের কথা, আরও বললেন, তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বড়ি তৈরী করিয়ে দিতে হবে।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে ডাঃ বোস নেমে পড়লেন কাজে। ট্যাবলেট তৈরীর যন্ত্র ঘরে একটা ছিল। আরও দুটি চটপট তৈরী করিয়ে নিলেন। তারপর চলল দিনেরাতে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ—মাল তৈরী করা, প্যাক করা, ডেসপ্যাচ করা।

ট্যাবলেটের পয়সা পাওয়া গিয়েছিল এবং বিলক্ষণ দু পয়সা লাভও হয়েছিল এই সরকারি সরবরাহে। অবিশ্বাস্যরকম দ্রুতগতিতে কাজ অতি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হওয়ায় যুবরাজের একান্ত সচিব একখানি চমৎকার প্রশংসাপত্র রেখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সব চাইতে উল্লেখযোগ্য,—শিক্ষাগুরুর আন্তরিক আশীর্বাদ। তাঁর ছাত্র তাঁর সম্মান রক্ষা করেছে। যুবরাজের কাছে তাঁর মুখরক্ষা হয়েছে এতে তিনি যে কত খুশী হয়েছিলেন তা বলে ফুরোতে পারছিলেন না। তিনি নিজে বাড়ি এসে ছাত্রকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলে গিয়েছিলেন—ইউ উইল ডেফিনিটলি শাইন এজ ম্যান ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট 'ক্যার্টিক্', ইউ আর এ জিনিয়াস।

যতদিন বমফোর্ড ভারতবর্ষে ছিলেন গুরু-শিষ্যের নিবিড় স্নেহশ্রদ্ধার সম্পর্কে এতটুকু কালি পড়েনি। কার্তিক কোনো অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হলেই হল, মেডিক্যাল কলেজে লোক কিম্বা কলকাতার গায়েকতো সঙ্গেই হোক্—বমফোর্ডের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সে কাজ উদ্ধার হতই।

বড়ভাই প্রবোধ বরাবরই খুব ভালো রেজাল্ট করে আইন পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হলেন। অথচ তখন তিনি সামান্য বেতনে অধ্যাপনা করেন। প্রবোধচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন গুরুদাস। যিনি পরে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সর্বভারতে সুপরিচিত হয়েছিলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছিলেন।

বন্ধু গুরুদাসের মত প্রবোধচন্দ্রও জুডিসিয়ারিতে যোগ দিতে চান কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলেন না।

চা-স্পৃহ চঞ্চলে

আধুনিক সভ্যতার [illegible] উপকরণ চা। উগ্র কাথলিজম চাতক মনকে চা-স্পৃহ চঞ্চল ক'রে তোলে।

না না কি চূড়ান্ত সাম্যবাদী। চেংগিস এবং নুরুল, হর্ষবর্ধন এবং গোবর্ধন---শ্মশানভূমিতে সবাই সমান। জীবনের সব অসাম্য---একের উচ্ছল, বিলাসমত্ত, আর একজনের অশ্রুসজল দিন পেরিয়ে নিজেদের সমর্পণ করে মৃত্যুর হাতে। নিঃসর্তে। শেষের সেই ভয়ংকর দিন সকলকে উদার হাতে বিলিয়ে দেয় মুক্তোজিয়া-র অনাদি স্বপ্ন।

দক্ষিণ রাজ্যের অধিপতি চেলা পাঠাবার আগে তা হলে কি সাম্য কেবল দিবা স্বপ্নই হয়ে থাকবে?

নাই নাই ভয়। চা-রসিক পৃথিবীতে রাজায়-প্রজায় অদ্ভুত একটা মিলনভূমি গড়ে উঠেছে। দরিদ্রতম মানুষটিকে যে নাক উঁচিয়ে বলবেন রাজা মশাই---ব্যাটা চোখেও দেখিস নি,---তার আর উপায় রইল না। শুধু দেখা নয়, চা তৈরী করতে এমন কোন মহার্ঘ বস্তু প্রয়োজন হয় না যা, একবারের জন্য হলেও, রাম-রহিম যোগাড় করতে অক্ষম।

বস্তুত চা-চাই। সকলের। নিদেন প্রায় সকলের। 'চা খাও আর না খাও আমায় ত' চাখাও' বলার বীরত্ব এক-আধজনেরই থাকা সম্ভব। কেন না চা-র ধূম্রসুরভি আর মেজাজী তার অলফ্যাকটরি-তে না পৌঁছান পর্যন্ত রসগোল্লার রস পর্যন্ত বে-ভার ঠেকে; মনে হয় আরম্ভটা শুভ হলেও সমাপ্তি ঠিক যুৎসই হল না।

এদেশে চা বলতে গেলে প্রধান পেয়। জল বাদ দিলে চা-র ভিক্ষা সর্বাধিক সংখ্যক ভারতবাসী দু বেলা পান করেন। এর আবার সময় অসময় নেই। বাস্তবিকই তাই। দু বেলা নিতান্ত কথার কথা। ভাত না হলে বরং এক-বেলা চলে---অনেককেই একাধিক বেলা চালাতে হয় ভাত বিনা, সে খবর পাঠকমাত্রেরই জানা---কিন্তু, চা-বিনা চিত্ত-ঘোড়া বশ মানে না। থেকে থেকে চা-হা, চা-হা--হায় রে চা কোথায়, এ কী রে দুর্দৈব। রবে বিলাপ জুড়ে দেয়।

সুশোভন সব খুইয়ে বেহালা সম্বল করার পর দরিদ্র বোনকে করবায়েসি করেছিল---চা চাই, লিপ্টন কিংবা ব্রুকবণ্ড এর চা। মাছ নয়, দুধ নয়, করেছিল আশা মিটাবারে চা-এর পিপাসা।

চীন থেকে ভারত। ভারত পেরিয়ে দিকে দিকে, সপ্তসিন্ধু, দশদিগন্তে চা ছড়িয়ে পড়েছে। চা-রসিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ফ্যানটাসি-র সুশোভন রেণু রেণু হয়ে চারিয়ে গেছে কোটি কোটি ক্যাবুচুরাজ সুশোভনের জীবনে।

সর্বশেষ খবর : ফ্যুরার-এর দেশোয়ালী ভ্রাতৃবৃন্দ '৬২ সালে প্যাক করা চা পান করতেন শতকরা চল্লিশ ভাগ; অধুনা শতকরা চোদ্দ ভাগ বেড়ে গেছে। '৬২তে মাথাপিছু ০-১২৭ কিলোগ্রাম চা '৬৫তে হয়েছিল ০-১৪৭ কিলোগ্রাম। পরিমাণ আরো বেড়েছে ইতিমধ্যে। এবং জার্মানবাসী যত চা পান করেন তার শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ রপ্তানী হয় ভারত থেকে। ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানীতে চা-র চাহিদা বাড়ছে ত' বাড়ছেই।

অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশগুলিও পেছিয়ে নেই। টুইস্ট্ এবং চা- চা-চা-র সঙ্গে চা-এর কদর সারা য়ুরোপে বেড়ে চলেছে ধাপে ধাপে।

এমন দিন আসবে যখন চা-চা-চা থাকবে না। (নশ্বর এই পৃথিবীতে কীই বা [illegible] হায়, [illegible] ভেসে যায়। নয়নের যমুনায়!!)

তখনও চা-র চটুলতা (কিংবা চাটুকারিতাও বলা চলে) গুণবু ছাড়বে রস ঝর ঝর ঝরিয়ে, পুঁথির বিচারক, গণিত ধুরন্ধর, কাব্যপুরন্দর, বিশুভারনত গুরু-রুটি পথ-মরু-পরিচারণ পথক্লান্ত, হিসাবপত্তরত্রস্ত, তহবিল-মিল-ভুলগ্রস্ত, গীতিবীথিচর, তুম্বুরুকরধর তানতালতল-মগ্ন, কন্সটিট্যুশন-নিয়মবিভূষণ এবং কমিটি পলাতক বিধান ঘাতকবৃন্দকে বেঁচে থাকার সত্যিকার মানে বাৎলে দেবে।

বলতে পারি---আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।--যদি ধূমায়িত চা-এর কাপ হাতে থাকে। বাতায়নে তারি আশা নিয়ে আনমনে বসতে পারি সারাদিন, সারা রাত---যে শ্যামল রসধর পুঞ্জ চীন গগন হতে পূর্বজীবন স্রোতে একদা কোন্ ক্ষণে এসেছিল, যদি তার প্রসাদবঞ্চিত না হই।

আচার্যদেব (চা বিনা প্র-ফুল্ল ছিলেন কী করে!) রায় দিয়েছিলেন---চা পান বিষপান! তখনও পর্যন্ত বীট্লবৃন্দ আসর জমায় নি। নেই নেই করেও যা মিলত তাতেই বাঙালী বেঁচেবর্তে ছিল। তাই তিনি অমন কথা অমন সুরে বলতে পেরেছিলেন। আজ আর তা জানা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে দু-এক চুমুক চা না হলে বৈচিত্র্য আসবে কোথেকে! বিচিত্রতা। জীবনেরই অন্য নাম।

অপেক্ষায় আছি সেই স্বর্ণযুগের, যখন কাফে জায়গা ছেড়ে দেবে চাফে-কে প্রোলেতারিয়াৎ-রাজ কায়েম হলে কি আর কফি বা কোকো-র বিলাসিতা বজায় থাকবে? সন্দেহর গভীর কারণ বর্তমান। অতএব---

চিত্ত পিপাসিত রে
চীনা পানীয় তরে।

কার্তিক বললেন কথাটা। পিতৃতুল্য মমফোর্ডকে। সায়েব বললেন---আগে বলতে হয়। আচ্ছা দেখি চীফ জাস্টিসকে একবার বলে।

পেলিটির হোটেলে ডাঃ মমফোর্ড মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করলেন হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসকে আর তাঁরই ছাত্র, তরুণ ডাক্তার বোসকে। খানাপিনার পরে বিশ্রামের সময় মমফোর্ড তাঁর প্রিয় ছাত্র কার্তিকের বিষয়ে অনেক কথা বলবার পর উঠল তাঁর ব্রিলিয়ান্ট ভাইটির কথা। চীফ জাস্টিস কথা দিলেন, অচিরেই মুনসেফ হলেন প্রবোধচন্দ্র, অধ্যাপনা ছেড়ে চললেন হাকিমী করতে। কালক্রমে হলেন বিচারপতি। ডিস্ট্রিক্ট জাজ হিসাবেই অবসর নিয়েছিলেন তিনি।

(ক্রমশ।

তন্ত্র-পরিচ

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

॥ ষট্‌চক্রভেদ ॥

এবার ষট্‌চক্রভেদ কি তাই দেখা যাক।

তন্ত্রশাস্ত্রে পাট---এই চক্র বা পদ্ম হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নানা নাড়ীবিশেষ। যাঁরা শবব্যবচ্ছেদ করেন নি---তাঁদের পক্ষে জানা আদৌ সম্ভব নয় শরীরের অভ্যন্তরে কোথায় কিভাবে সেইগুলি অবস্থিত। এই চক্র বা পদ্মগুলির সংগে আধুনিক শারীর বিদ্যার এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডগুলির সমধিক সাদৃশ্য আছে। তার কথা বিভিন্ন মনীষী আলোচনা করেছেন।

প্রসংগত বলি---এখনও হাতে-কলমে শবব্যবচ্ছেদ না করে কোন শিক্ষার্থী কেবলমাত্র গ্রে সাহেবের 'অ্যানাটমী'র বই পড়েই এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে পূর্ণ শিক্ষালাভ করতে পারেন না। আগের দিনেও যেমন শবব্যবচ্ছেদ করেই চক্রগুলির অবস্থান ইত্যাদি জানতে হতো---আজকের দিনেও ঠিক সেই উপায়েই গ্ল্যাণ্ড-গুলিকে চিনতে হয়।

অনেকে মনে করেন যে---চক্রগুলি হচ্ছে বর্তমান শারীর বিজ্ঞান মতে 'প্লেক্শাস অব নার্ভস্'। কিন্তু সে কথা মানতে পারা যায় না এই কারণে যে, তন্ত্রশাস্ত্রেই আছে চক্র বা পদ্মগুলি থেকে মধু বা রস নিঃসরণ হয়। নার্ভ থেকে তেমন কোন রসের প্রবাহ জাগে না। রসপ্রবাহ বা হরমোন নিঃসৃত হয় গ্ল্যাণ্ডগুলি থেকেই। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পাই নার্ভগুলি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা---মোটার নার্ভ আর সেন্‌সারি নার্ভ। মোটার নার্ভ প্রকাশ করে দেহের যাবতীয় ক্রিয়া, আর সেন্‌সারি নার্ভ প্রকাশ করে দেহের যাবতীয় অনুভূতি। অর্থাৎ নার্ভমাত্রেরই কাজ হচ্ছে সাড়া বা শিহরণ জাগানো রস জাগানো নয়।

কিন্তু ঐ গ্ল্যাণ্ড থেকে যে রস বা হরমোন নির্গত হয়, তার হ্রাস-বৃদ্ধিতে দেহীর স্বাস্থ্যের হানি বা লাভ ঘটে। তাই ত একান্ত প্রয়োজন শবব্যবচ্ছেদ করে ঐ গ্ল্যাণ্ড বা চক্রগুলির অবস্থান, ক্রিয়া ও প্রকৃতি জেনে নেয়া---যাতে সুস্থ রাখা যাবে শরীরকে। মনে পড়ে গেল রাজা অলর্ককে যোগরহস্য বোঝাতে গিয়ে স্বয়ং দত্তাত্রেয় বলেছেন---

ধর্মার্থ কাম মোক্ষাণাং
শরীরং সাধনং যতঃ॥

---ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ---এই চতুর্বর্গ লাভ হয় শরীর রক্ষা করলে---তাই শরীরকে রক্ষা করার মত অবশ্যই নিতে হবে।

তন্ত্রের পদ্ধতি যে যোগ পদ্ধতির সংগে অংগাঙ্গিভাবে জড়িত এ কথা বিশেষজ্ঞমাত্রেই জানেন।

এখন ওই চক্রভেদ করার আরও গূঢ় অর্থ কি তাই বিচার করা যাক। ভেদ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে---প্রকাশ বা ব্যাখ্যা। চক্রভেদ করার মূল কথা হচ্ছে তাই এই যে---কি প্রক্রিয়া মেনে চললে প্রতিটি চক্রকে প্রকাশিত বা সক্ষম করে তোলা যাবে। আগেই তো জেনেছি যে, চক্রগুলির নিয়মিত রস-নিঃসরণের উপরেই নির্ভর করে দেহীর স্বাস্থ্য। এই চক্রগুলিকে নিয়মিত করার জন্যে দৈহিক ও মানসিক বিশেষ বিশেষ আসন ও মুদ্রার উল্লেখ করে গিয়েছেন। তার বিবরণ পাই শিব-সংহিতা ঘেরণ্ডসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে। সেই আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করলে কি চমৎকার ফল পাওয়া যায়, তা কারো অজ্ঞাত নয়।

এ সম্পর্কে বিখ্যাত ব্যায়ামাচার্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষ মশায়ের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। আজো কলিকাতার গড়পার অঞ্চলে তাঁর শিক্ষাগার রয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশ-বিদেশে ভারতীয় যোগ-ব্যায়াম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে এসেছেন তিনি বহুদিন। এ সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা ঘোষ মশায়ের সংগে সংযোগ করতে পারেন।

এখানে কয়েকটি গ্ল্যাণ্ডের সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসকদের মতামত ব্যক্ত করলে বোধ হয় অবান্তর হবে না।

প্রথম ধরা যাক পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড---যার সংগে তন্ত্র বা যোগশাস্ত্রকথিত আজ্ঞা-চক্রেরই অবস্থান মিলে যায়। এই পিটুইটারী থেকে যদি অধিক পরিমাণে রস (যা আয়ুর্বেদে উক্ত কফের সংগে সম্বন্ধযুক্ত) নিঃসৃত হয়---তাহলে দেহী বিরাট দানবাকৃতি লাভ করে আবার রসের পরিমাণ অল্প হলে একেবারেই জীর্ণশীর্ণ দুর্বল হয়ে পড়ে---দেহের বৃদ্ধি আদৌ দেখা দেয় না।

যোগব্যায়ামে এ রসনিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কিংবা ধরা যাক হার্ট ও লাংগস্ বর্তমানে চিকিৎসাবিদরা যদিও এদের গ্ল্যাণ্ড বলে মনে করেন না---কিন্তু মনে হয় তন্ত্র বা যোগশাস্ত্রে এটিকেই বলা হয় অনাহত পদ্ম।

এই পদ্মের জন্যে দেহে আয়ুর্বেদোক্ত বায়ুর ক্রিয়া হয়, সেই বায়ু শোধন করে দেয় আমাদের শরীরের রক্তকে। এদের সহায়ক গ্ল্যাণ্ড হচ্ছে সুপ্রারেন্যাল। এই

সুপ্রারেন্যালের মাধ্যমেই কাজ করে পিটুইটারি।

আবার ধরা যাক লীভার ও প্লীহা। অবশ্য লীভারকেও আধুনিককালে গ্ল্যাণ্ড বলা হয় না। কিন্তু খুবই সন্দেহ হয় যে লীভার হচ্ছে তন্ত্রাদি শাস্ত্রে কথিত মণিপুর পদ্ম। এই পদ্মেই হয় আয়ুর্বেদোক্ত পিত্তের ক্রিয়া। প্যান্‌ক্রিয়াস হচ্ছে এর সহায়ক গ্ল্যাণ্ড।

একথা বোধ হয় না বললেও চলে যে---অনাহত পদ্মে বায়ুর ক্রিয়া এবং মণিপুর পদ্মে পিত্তের ক্রিয়া কোন কারণে ব্যাহত হলে দেহী কতখানি পীড়াভোগ করে। সেই পীড়াকে দূর করা যায় যোগব্যায়াম অভ্যাস করলে---এ পরীক্ষিত সত্য।

এবার বোধ হয় ষট্‌চক্রভেদের মূল কথা কি তার একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। শরীরের মধ্যে যতগুলি মধুদানী পদ্ম আছে---সেগুলি যাতে ঠিক সুষমভাবে রসনিঃসরণ করে তারি সম্যক প্রক্রিয়া হচ্ছে ষট্‌চক্রভেদ। সাধনা করার প্রথম দিকে শরীরকে নীরোগ করে তুলতে না পেলে সাধক আর অগ্রসর হবেন কি করে?

আর এককথা---যদিও স্থূলভাবে ষট্‌চক্র অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র---এই ছটির কথাই প্রকাশ---কিন্তু সহস্রার নামে আরো একটি চক্র আছে। ঐ প্রথম ছটি পার হয়ে সেই সহস্রার চক্র পর্যন্ত আরোহণ করাই হচ্ছে শেষ কথা।

এ সম্বন্ধে আরো জানা যায় যে মূলে আছে দশটি চক্র। সেই দশটি চক্রের প্রত্যেকটি স্ফুরিত হয়ে উঠলেই তবে সাধনার সিদ্ধি লাভ হয়---যার ফলে নীরোগ শরীর লাভ করা যায়। পরিহাসচ্ছলে একটি প্রবাদ প্রায়ই আমরা বলি---'দশচক্রে ভগবান্ ভূত'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রবাদের মধ্যে একটি গূঢ় সত্য নিহিত আছে। এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ডও তো দেখা যায় সর্বসমেত দশটিই আছে। মানুষের শরীরে। চক্রও আছে তেমনি দশটি।

এইভাবে শরীরকে বিশ্লেষণ করতে করতেই সন্ধানী মানুষ শেষ পর্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর সন্ধান পেয়ে যান। সেই কুলকুণ্ডলিনীকে বেদবর্ণিত সর্পরাজ্ঞীর সংগে অভিন্ন বলে মনে করেন পণ্ডিতজন। কুলকুণ্ডলিনীর বর্ণনা পাই---

সার্দ্ধত্রিবলয়া কারা
স্বয়ম্ভুলিংগবেষ্টিতা॥

---সারে তিন প্যাঁচ দিয়ে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করে থাকেন তিনি।

সাপখাঁচেই যখন ঝাঁপির মধ্যে থাকে, সাড়ে তিন প্যাঁচ দিয়েই মাথা নীচু করে থাকে এ কথাটি স্মরণে রাখার।

যাই হোক, সেই পরম দেবতা কুণ্ডলী মূলাধার পদ্মে ঘুমিয়ে থাকেন---তাঁকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই জীবনে সর্বার্থসিদ্ধি ঘটে। বলা হয় আগে ষট্‌চক্রভেদ করলে সমস্ত চক্রকে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করলে, তবেই কুলকুণ্ডলিনীর উদ্বোধন সম্ভব। বাস্তবিকপক্ষে নীরোগ শরীর লাভ করতে না পারলে কেই বা পারেন জীবনে সাফল্য অর্জন করতে?

কিন্তু এই কুলকুণ্ডলিনী বলতে বস্তুত কি বোঝায়? আমরা জানি মূলাধার পদ্ম থেকে যে রস নিঃসৃত হয়---তারি জন্য মানুষের বংশধারা বিস্তার লাভ করে। সেই রসের আয়ুর্বেদোক্ত নাম---রেতঃ। আধুনিককালে তো বৈজ্ঞানিকরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই রেতঃ বা শুক্রকীটের রূপ কি তাও দেখেছেন---এবং শিক্ষার্থীদের জন্যে তার চিত্রও প্রস্তুত করেছেন। সত্যই সেই কীটের আকৃতি সর্পের মত---সর্পের তুল্য ফণাও আছে তার এবং যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, তখনও হয়তো সে সর্পের মতই কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। তবে কি শুক্রকীটই কুলকুণ্ডলিনী?

অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে পাই---সেই কুল কুণ্ডলিনী---

তড়িৎ কোটি প্রতীকাশং স্বা
সূর্যকোটি প্রতীকাশং
চন্দ্রকোটি সুশীতলং।

এর অর্থ করে নিতে গেলে তো---কোন কিছু নিশ্চয় করে ধারণা করা দুরূহ। অবশ্য এইভাবে যদি ব্যাখ্যা করা যায় যে---ওই শুক্রকীট পুরুষানুক্রমে বহু সূর্যের ও চন্দ্রের আলো ভোগ করেই তাদের তেজ ও শীতলতা আহরণ করে বর্তমান অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে---তাহলে বোধ হয় একটু গ্রহণযোগ্য হয়।

কিন্তু ওদিক দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা না করে বাস্তবের দিক থেকে বিচার করার চেষ্টা করা যাক। এ কথা তো স্বীকার করতেই হয় যে---একটি শুক্রকীট থেকেই একটি জীব উৎপন্ন হয়। আর সেই জীব যার মূল হলো বীজ---সেই শুক্রকীটকে তো উপনিষদের ভাষায় স্বচ্ছন্দে বলা যায়---

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।

সেই বীজের শক্তি বিভিন্ন জীবের মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়---এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। মানুষ যে-কোন পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠুক না কেন, তার একটি বিশেষ রকমের প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকে---যাকে সেই ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা বা ট্যালেন্ট বলা যেতে পারে। এমন কোন মানুষ জগতে দেখা যায় না---যার কোন না কোন বিষয়ে সামান্যমাত্র প্রতিভা নেই। অবশ্য এ কথা মানতেই হয় যে, সুযোগ ও সুবিধার অভাবে এবং সাধনার অভাবেও, প্রত্যেকের সেই প্রতিভার যথোচিত বিকাশ ঘটে না। তার জন্যই প্রয়োজন গুরুর---যিনি দিশা দেখিয়ে দেন।

প্রত্যেকের সেই প্রচ্ছন্ন প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো অবশ্যই সম্ভব সম্যক অনুশীলনের দ্বারা। তাহলেই কি সেই ব্যক্তিটি জীবনে সর্বসিদ্ধিলাভ করেন না? সর্বার্থসিদ্ধি তো তাকেই বলে---যখন দেখা যায় যিনি যা হবার জন্যে এই ভুবনে এসেছেন, তিনি তাই হয়ে উঠেছেন---সেই পরিপূর্ণ

প্রকাশ আর করাই তো পরম মুক্ত। ওই সেই পরম মার্গের সন্ধান দিয়েছিলেন সময়ের সামনে কিন্তু আমরা তাকে তো অপাংক্তেয় করে রেখেছি নানা হীন আবরণ দিয়ে।

ওই প্রতিভার সম্বন্ধে আর একটু বলি। প্রতিভা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ তো ট্যালেণ্ট। বাইবেলে পাই ওই ট্যালেণ্ট বলতে আবার প্রাচীন ইহুদীদের মুদ্রা বোঝাতো। সেই ট্যালেণ্ট নিয়ে চমৎকার একটি প্যারাবোল বা রূপক কাহিনী আছে বাইবেলে। সেটি এই ---

এক ধনী ইহুদীর তিনটি ক্রীতদাস ছিল। একবার ধনী কিছুকালের জন্যে বিদেশে যেতে বাধ্য হন। ক্রীতদাস তিনজনকে ডেকে প্রথমজনকে দশটি, দ্বিতীয়জনকে পাঁচটি ও তৃতীয়জনকে একটি ট্যালেণ্ট দিয়ে গেলেন। ক্রীতদাসরা সবাই জানতো যে তাদের প্রভু অতিমাত্রায় অর্থগৃধ্নু।

যাই হোক---যথাসময়ে ধনী গৃহে ফিরে ডাকলেন ক্রীতদাস তিনটিকে। জানতে চাইলেন---'তোমাদের যে ট্যালেণ্ট দিয়ে গিয়েছিলাম, হিসেব দাও তোমরা তা নিয়ে কে কি করেছ?'

প্রথমজন বললো---'প্রভু, আমি সেই দশ ট্যালেণ্ট কাজে লাগিয়ে আরো দশ ট্যালেণ্ট বাড়িয়ে ফেলেছি।'

দ্বিতীয়জন বললো--- 'আমিও আপনার দেয়া পাঁচটিকে দশটি করে তুলেছি, প্রভু।'

তৃতীয়জন বললো---'প্রভু, আমি তো জানি আপনি কত অর্থলোভী। যদি আপনার দেয়া ট্যালেণ্ট ফিরিয়ে দিতে না পারি, আপনি তো আমায় কেটেই ফেলবেন। তাই আমি সেটিকে যত্ন করে মাটিতে পুঁতে রেখেছি।'

তৃতীয়জনের কথা শুনে ধনী বললেন---'শীগগির নিয়ে এসো সেই ট্যালেণ্ট।'

তৃতীয়জন যেই ট্যালেণ্টটি এনে দিল---ধনী তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন---সে ট্যালেণ্টের ব্যবহার জানে না দেখে। আর দুজনকে বললেন---'খুব খুশী হয়েছি তোমাদের ওপরে। তোমরা যে যা বাড়িয়েছ, তা তোমাদেরই থাক। আমিও যা তোমাদের দিয়েছিলাম---তাও তোমরা রাখ।'

প্রতিভাও তো তেমনি ঈশ্বরের দান। তা লাভ করেও যদি কেউ অনুশীলন না করে---তাহলে বলতে হয়---'ওই গল্পের তৃতীয় ক্রীতদাসের মতই সে ট্যালেণ্ট পেয়েও তা খেলায় হারালো।

এখানে আমাদের দেশের প্রচলিত একটি গল্পও বলি।

এক দেশে দুই ভাই ছিল---ভারি গরীব। কোনরকমে জীবিকা অর্জন করতে না পেরে, তারা দুজনেই শিবদুর্গার আরাধনায় মন দিল। মা দুর্গা তুষ্ট হলেন তাদের আরাধনায়, শিবকে বললেন---'আহা, ওদের বড় কষ্ট। তুমি ওদের কিছু দাও।'

শিব তখনি কুবেরকে ডেকে বললেন---'দ্যাখ------ওদের দু ভাইকে দু গোলা ধান দাও।

শিবের আজ্ঞায় কুবের তখনি সেই দুই ভায়ের বাড়ীতে দুগোলা ধান পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ধান পেয়ে দুই ভাই ভারি খুশী। বারবার প্রণাম জানালো শিবদুর্গার উদ্দেশে।

বড় ভাইটির দুর্বুদ্ধি দেখা দিল, সে ভাবলো---'এতো দিন বড় কষ্টে দিন কেটেছে। এবার যখন দেবতার দয়ায় এক গোলা ধান পেয়েছি---তখন প্রাণভরে খেয়ে নিই কদিন।'

ছোট ভাইটি সুবোধ---ভাবল 'যে কষ্টে দিন গিয়েছে---আর যেন সে কষ্টে না পড়ি। দেবতার দয়ায় যা পেয়েছি খুব সাবধানে রেখে ঢেকে খাব---যাতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুখে যায়।'

অতি ভোজনের ফলে বড় ভাই তো দিন তিনেকের মধ্যেই গতায়ু হলো। ছোট ভাই পরিমিত ভোজনের ফলে দীর্ঘজীবন লাভ করলো---শিব-দুর্গার দানে সে সারাজীবন সুখে কাটালো।

এই দুটি গল্পই রূপক। দুটো থেকেই এই সত্য প্রকটিত হচ্ছে যে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তার যদি সদ্ব্যবহার করি আমরা, যদি দুর্বুদ্ধি ও আলস্যবশে তা নষ্ট না করি---তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলার পরম পুণ্যে জীবনে অবশ্যই সর্বসমৃদ্ধি লাভ করব। সেই সমৃদ্ধি লাভ করাইতো হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের ঐকান্তিক কামনা।

ভক্তের বৈশিষ্ট্য

বাস্তবিকপক্ষে যার মধ্যে যে শক্তি আছে, তিনি যদি সেই শক্তির যথাযথ চর্চা করে যান---তাতেই তো মিলবে তার সিদ্ধি। অর্থাৎ যা হবার জন্যে তিনি এসেছেন পৃথিবীতে---তিনি ঠিক তাই হয়ে উঠবেন। এই ভাবে যদি আমরা প্রত্যেকে দেহে প্রাণে মনে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পাই; তবে আর তার থেকে বেশী কি আনন্দময় অবস্থার উদ্ভব হতে পারে বিশ্বভুবনে?

তখনি তো আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখব। মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করতে না শেখে, তার পারিপার্শ্বিককে শ্রদ্ধা করতে না শেখে---তবে আর কি সমাজ সৃষ্টি হবে? অশ্রদ্ধার জন্যে যেখানে কেবলি চলে হিংসা, বিরোধ আর মাৎসর্য্য---সে সমাজ তো পশুদের সমাজ---সে কি মানুষের কাম্য? মানুষ যে চায় জ্ঞান ও শান্তিতে পূর্ণ আনন্দময় সমাজ সৃষ্টি করতে। সেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করার উপায় তো জেনেছি আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে--- তাতে পাই---

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং
তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানং লব্ধা পরাশান্তিম্
অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥
---৪।৩৯।

যিনি শ্রদ্ধাবান্, যিনি সদা সচেষ্ট, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নন, তিনিই জ্ঞানলাভের অধিকারী। আর

জ্ঞান যিনি লাভ করেন, তিনি অচিরে পেয়ে যান পরমা শান্তি।

সেই শ্রদ্ধা, সেই চেষ্টা, সেই ইন্দ্রিয়জয় শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব---যিনি জানতে পেরেছেন তাঁর নিজের শক্তিকে। শক্তিকে যে জাগাতে পারে নি, চিনতে পারে নি সে কিসের জোরে পারবে কোন কিছুকে শ্রদ্ধা করতে, বা সর্বদা উদ্যমশীল হতে বা ইন্দ্রিয়কে জয় করতে? এখানে গীতার ঐ অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকটিও উদ্ধৃতি না করে পারছি না---

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা
বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো
ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

যে জ্ঞানলাভ করতে পারেনি, যে শ্রদ্ধাবান নয় সে সংশয়ের মধ্যে থেকেই বিনষ্ট হয়। তার না আছে ইহলোক না আছে পরলোক---সংশয়ের জন্যে কোন সুখ সে কখনোই পায় না।

তন্ত্রের কথা বলতে কেন গীতার কথা টেনে আনছি---তাও বলি। গীতায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তন্ত্রের মধ্যেই আছে তার সাধনার প্রক্রিয়া---তাই তন্ত্র ও গীতা একেবারে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত।

কিন্তু যা বলছিলাম, তন্ত্র চেয়েছিলেন সেই মহতী বিনষ্টি থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে। সবাইকেই দিতে চেয়েছিলেন সেই বুদ্ধজ্ঞান। কে জানে হয়তো সেই কারণেই তন্ত্র আজ অবলুপ্ত। কারণ সংকীর্ণমনা মানুষ তো সর্বদাই ভয় পায় প্রতিবেশীর সমৃদ্ধি দেখে। এ কথা ভাবে না যে, এ জগতে প্রত্যেকটি মানুষই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'---তাই একজনের সমৃদ্ধিতে কখনোই হানি ঘটে না অপর কারো।

যেমন আকাশমণ্ডলে প্রত্যেকটি গ্রহের কক্ষপথ বিভিন্ন। তাই গ্রহে গ্রহে সঙ্ঘর্ষের কোনই সম্ভাবনা নেই---তেমনি এই ভূমণ্ডলেও জীবমাত্রেরই ক্ষেত্র বিভিন্ন তাই কারো বৃদ্ধিতে পার্শ্ববর্তী কারো হ্রাস ঘটার কোনই আশংকা নেই---কারণ জীবমাত্রেই তো যাযাবর।

স্থাবর যে বৃক্ষলতাদি তাদের মধ্যেও দেখি---স্থানের অভাব সত্ত্বেও কিভাবে বক্রপথে তারা সূর্যের দিকে মাথা তোলে। এই আত্মশক্তি যে প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত। কিন্তু যে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়---একেবারে অচৈতন্য---তার এ বোধ কেমন ক'রে জাগবে?

তাই তো একান্ত প্রয়োজন প্রত্যেকের শক্তিকে সাধনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা।

যদি [illegible] ফল হচ্ছে জ্ঞান ও শান্তি। আর সেই কারণেই মানুষ যেদিন বস্তুবিচার করতে করতে আপনার অন্তরস্থ শক্তির সন্ধান লাভ করলো---সেদিন থেকে প্রচার করতে চাইলো কি প্রক্রিয়ায় সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। তন্ত্রের মধ্যেই আছে সেই প্রক্রিয়াগুলির সবিস্তার উল্লেখ।

যাই হোক, যদিও বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন থেকেই তন্ত্রচর্চার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, কি ভাবে মানুষ শক্তিকে উপলব্ধি করলো আর কি রূপেই বা তার সাধনা করার পথ নির্ধারণ করলো---তবু একথা না মেনে পারা যায় না যে,---মানুষ তার অন্তরস্থ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে আরো বহু প্রাচীনকাল থেকেই। তাই অথর্ববেদের মধ্যেও তন্ত্রসাধনার বীজ সন্নিহিত রয়েছে দেখা যায়। আর মানুষের প্রকৃতি ও অনুসন্ধিৎসা বিচার করে দেখলে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে লক্ষ্য করেই মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করেছে, সমগ্র মানব সভ্যতার অতি প্রত্যূষেই।

মনে হবে

আরতি চন্দ

কোনদিন যদি এই মনের নিভৃতে আলো ঝরে
একফোঁটা শিশিরের এ হৃদয় প্রসন্ন প্রহরে
খোঁপা খোলা গন্ধ ঢেলে সব যেন মদিরতামগ্ন,
দিনের দেবতা একি সকালেই ডাক দিয়ে যায়।

ভয় ছিল কোনদিন বৃথা যাবে বর্ষ ঋতু মাস,
বাতাসে কাঁপন বৃথা, বৃথা এ শ্যামল ধোয়া মাস
কদিন ঝরিয়ে গেল,---অথচ প্রণাম
কখন দেখেছি নীলে---সে এসে কি লিখে গেছে নাম?

দেখিনি কখনও আকে। ভিজে ভোর সোনালী আলোয়
অনুভবে আসে এক নির্জন ধোঁয়ার মত মন,
সুদূরে আকাশ যেন মাটিকে আবেশ ভরে ছোঁয়
তেমনি ছবির মত মনে হবে তার আগমন।

একটি ভূতের জন্ম : ডিউক-এর হাতে

ব্যাকরণের ভূত নয়, ভূত শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে এ লেখায় ব্যবহৃত। মৃত্যুর পর জীবের ছায়াদেহ অর্থে।

ঈশ্বরবৎ শ্রীমান ভূতও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং যথেচ্ছ গবেষণা ঠেকান দুষ্কর। ডিউক-এর হাতে যে ভূতের জন্ম, তার নির্ভেজালত্ব সম্বন্ধে গীতা ছুঁয়ে শপথ করা না গেলেও তিনি যে চেষ্টা করেছিলেন তাঁরই জনৈক সামান্য কর্মচারীকে ভূতভাবনের অনুচর করতে এবং সফল হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নেই। বস্তুত তৃতীয় জর্জ-এর ছেলে ডিউক অব্ কাম্বারল্যাণ্ড-এর এই কাহিনীআজও কম নিষ্ঠুর কিংবা রাজকীয় হঠকারীতার কম বীভৎস নিদর্শন মনে হয় না।

সন্ত জেম্স-এর প্রাসাদস্থ একটি ঘরে কারুর পক্ষে শুতে যাওয়া অসম সাহসিকতা, ঘরটি ভূতে-পাওয়া।

লণ্ডন-এর সহবতলীর বাড়ি যেন তুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ বাড়িটিরই একটি ঘরে, শোনা যায়, বীভৎসতম ভূতের বাস। চেহারা তার এই রকম : ছোটখাট মানুষটি বিছানায় বসে, ঠোঁট একেবারে ফালাফালা, খোলা মুখ যেন বিভীষিকা। তার দেহ আর বিছানা রক্তে থইথই করছে।

মে মাসের শেষ দিন কেউ যদি ঘটনাচক্রে ঐ ঘরে রাত কাটাতে পারেন এবং তাঁর যদি অলৌকিক অনুভূতি থাকে পুরোদস্তর, তিনি বহু পুরনো একটা খুনের দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখতে পাবেন---যা একদিন রাজসিংহাসন টলিয়ে, প্রজা-সাধারণকে বিমূঢ় ক'রে, লণ্ডন সহরটাকে ক্রোধসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তার ফলে হবু রাজার ফাঁসী-কাঠে ঝোলারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

১৮১০ খৃস্টাব্দের সেই রাতে এক-গুঁয়ে লম্পট ডিউক অব কাম্বারল্যাণ্ড-তৃতীয় জর্জ-এর ছেলে---অপেরায় গিয়েছিলেন। দেখেশুনে ফিরে আসেন সন্ত জেম্স-এর প্রাসাদস্থ নিজস্ব ঘরে।

একটু পরেই তাঁর শোবার ঘর থেকে চীৎকার ভেসে এল। নিজস্ব ভ্যালেট ইয়ু-কে ডাকছিলেন ডিউক অপর জনের নাম সেলিস, তিনি তাকে ডাকেন নি।

তাঁর ঘরে ইয়ু ঢুকল, ঝড়ের বেগে। 'আপাতশান্ত এবং স্থির' ডিউক দাঁড়িয়ে ছিলেন শোবার ঘরের মাঝখানে।

সন্দেশবহ

তিনি বললেন, 'সার হেনরী হলফোর্ড-কে ডেকে আন, আমি গুরুতররূপে আহত!'

সে দেখল যে, তরোয়ালটা সে প্রভুর আদেশে কয়েকদিন আগে সোফার ওপর ফেলে রেখেছিল, সেটা রক্তমাখা অবস্থায় মেঝেয় পড়ে রয়েছে। ডিউক-এর সার্টও রক্তমাখা।

সার হেনরী হল্ফোরড কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লেন। ইয়ু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল ক্ষতগুলো পরীক্ষিত হচ্ছে। তার মতে ক্ষতগুলোর 'কোনটাই সাঙঘাতিক নয়, অন্তত দেখে তা মনে হয় না।' একটাই সত্যিকার ক্ষত এবং তা ছিল ডিউক-এর একটা হাতে।

১৯৩০ নাগাদ লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল সিরিল ফোলি ইয়ুর দিব্যিকাটা বিবৃতি উদ্ধার করেন। তা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। ডিউক-এর শোবার ঘরের বর্ণনা প্রসংগে ইয়ু লিখে গেছে—'এ সময়, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হবে, নেলে বা সেলিস্ ডিউক-এর ঘরে ছিল না, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা দুষ্কর।

'শেষে, ক্ষতগুলো নিয়মমাফিক বাঁধা হয়ে যাওয়ার পর, যখন ঘর ঠিকমত গোছান হল, ডিউক বললেন, 'সেলিস-কে ডাক।' সেলিস্-এর ঘরে গেলুম। গিয়ে দেখলুম বীভৎসতম দৃশ্য।

'বিছানার ওপর টানটান হয়ে সেলিস্ শুয়ে রয়েছে, উপাধানে ঠেক-খাওয়া মাথাটা উঁচু এবং তা প্রায় ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন। তার মৃতদেহের কিছু দূরে রক্তাপ্লুত একটা ক্ষুর পড়ে রয়েছে কিন্তু এতদূরে যে ওটা তার ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব এবং এই রকম ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার পক্ষে অত দূরে তা ছুঁড়ে ফেলাও সম্ভব নয়।'

লণ্ডন সহর এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠল। আগেই কেউ ডিউককে পছন্দ করত না, এখন তার প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রদর্শন সুরু হয়ে গেল। লণ্ডনবাসী তাঁকে রাস্তাঘাটে টিট্‌কারী দিত। তাঁর অপেরা দেখতে যাওয়া বন্ধ। পীড়াপীড়ির পর তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁকে খুন করার চেষ্টা করার পর সেলিস্ আত্মহত্যা করেছে। বিশুদ্ধ গল্পিকা। সেলিস ছিল বেঁটেখাটো মানুষ, দুর্বল। ডিউক দৈত্যাকার, গরুর মাংস খোর অতিকায় টিউটন।

ফোলি যতটা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন তা থেকে জানা যায় সেলিস্-এর মেয়ের সঙ্গে ডিউক ফষ্টিনষ্টি করায় হয় তাঁর ঔরসে তার একটি সন্তান হয়েছিল, কিংবা সে আত্মহত্যা ক'রে জীবনের জ্বালা জুড়োয় ডিউক-এর কদর্য ব্যবহারে। কাজেই, সেলিস্-এর মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ডিউক ৩১শে মে-র রাত্রে তার ঘরে ঢুকলেন এবং হতভাগ্য সেলিস অবাক হয়ে উঠে

বসে যখন ঘুম ভাঙাচ্ছিল তখন ডিউক তার চুল ধরে মাথা দেয়ালের ওপর সজোরে ঘেঁতলে নিজের তলোয়ার দিয়ে তার ঠোঁট কালাকালা করে দিলেন।

তারপর একটা ক্ষুর সেলিস্-এর ঘরের মেঝেয় ফেলে রেখে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলেন, নিজের শোবার ঘরে ফিরে নিজস্ব তরোয়াল ফেলে রাখলেন মেঝের ওপর। তারপর হুয়-কে ডাকাডাকি। প্রাপ্ত প্রমাণ এবং অনুমান এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডটির ধাঁচের সঙ্গে বেশ খাপ খায়।

সমস্ত লণ্ডনবাসী যে মূল প্রশ্নটি করেছিল তাহল এই: নিজের মাথা প্রায় উড়িয়ে দেওয়ার পর হাত ধুয়ে সেলিস্ কী ক'রে দিব্যি বিছানায় শুয়ে পড়ল মারা যেতে? মনে রাখা দরকার তার মাথা স্পাইনাল কবড এর সঙ্গে ঝুলে ছিল অতি সূক্ষ্মভাবে।

কেবল জীবমান পিতার সন্তান এবং রয়্যাল প্রিন্স হওয়ার দরুণই ডিউক হত্যার জন্য আদালতে জেরার হাত থেকে বেঁচে যান। শুধু হুয়-এর সাক্ষীই তাঁকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অল্পদিন পরেই হুয় বেপাত্তা। ডিউক তার যথোচিত দেখাশুনোর ত্রুটি রাখেন নি আদৌ।

১৮৩৭-এ এই ডিউক হ্যানোভার-এর রাজতখত লাভ করেন। জারমানীতে গিয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

সন্ত জেমস-এর প্রাসাদে, কিংস স্ট্রীট-এর ওপর যা দাঁড়িয়ে রয়েছে, আজও ডিউক-এর আদেশে সেখানে নিহত হুয়-র বিদেহী আত্মা ঘোরে ফেরে।

বাক্রীতির কবলে

যুগটা ধরতাই বাক্রীতির। মনের বাইরে পা দিয়ে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী বাঙালী পর্যটক আজও নিজের জীবন সঁপে দেয় 'বচো হিন্দী শিখো' জাতীয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিন্দী কথোপকথনের একখণ্ড চটি আধা-বই আধা-অভিধানের ওপর। তাকে নির্ভর করতে হয় কয়েকটা ছকবাঁধা বাক্রীতির ওপর: দয়া করে বলুন না ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ডটা কোন্দিকে।' এবং 'ধন্যবাদ বড় উপকার করলেন।

এই তাৎক্ষণিক বচনপটুতা সাধারণত কথোপকথন দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছলেই পঙ্গু হয়ে ওঠে। যথা, 'ডান দিকে এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিন।' 'আপনি কোত্থেকে আসছেন', 'কতদূর যাবেন বলুন?' বা, 'না না ধন্যবাদের কী প্রয়োজন। আপনি বিদেশী, উপকার করতে পেরে আমি খুশি। আচ্ছা, আপনি স্থানীয় সব দ্রষ্টব্য স্থান এবং বন্দর খবর জানেন তো?' ইত্যাদি।

এর কারণ, আমরা ততক্ষণে বই খুলে পরের পৃষ্ঠায় দেখছি লেখা রয়েছে—'ডাক্তারখানা কোথায় বলতে পারেন? বড্ড পেট কন্কন্ করছে।' এবং 'আপনাদের হোটেলগুলো বেশ ভাল। পয়সাও লাগে কম। আমাদের মুলুকে হোটেল খরচা ঢের বেশি।'

ছোটখাট হাজারো প্রশ্ন নিয়ে ফ্যাসাদ বেধে যায়। কোচোয়ান হেসে খুব কুশল প্রশ্ন ক'রে, আমরা হেঁ হেঁ করি, উপায়ই বা কি। বুঝতেই পারি না বিশেষ প্রশ্নগুলো।

দোকানী পাঁচটা জিনিস দেখিয়ে অনর্গল সবগুলোর গুণাগুণ উর্দুমিশ্রিত হিন্দীতে বলে গেলো, আমরা পকেট ভারি থাকলে হেসে সবচেয়ে দামীটা কিনি, ট্যাঁক প্রায় গড়ের মাঠ হলে ঈষৎ একটু হেসে—যেন বলতে চাই 'রাখো তোমার গুণপনা ব্যাখ্যা, ওসব আমরা ঢের শুনেছি, আর থাক—' নিম্নতম মূল্যের জিনিসটি কিনে নিই।

সব থেকে ভাল বাক্রীতি শিক্ষার বইও গুলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাই বলে ওসব বরবাদ ক'রে শুদ্ধবাংলার উপর নির্ভর করাবও বিপদ আছে। এতে কোনরকমেও কাজ চলে না সময় সময় এবং উল্টা বুঝিলি রাম হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিশেষত বড়সড় দোকানে ঢুকে হিন্দী সংখ্যা সঠিক না জানলে রীতিমত অসুবিধা হয়। পয়সার হিসেব মেলাতে না পারলে, দোকানে দোকানে ঠকে এলে, বেড়ানোর সাধ মেটার সম্ভাবনা কম।

বিহারীরা, উত্তরপ্রদেশবাসীরা বাংলা মুলুকে কাজ চালায় কী ক'রে? ভাঙা হিন্দির সাহায্যে। যা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই মোটামুটি বুঝতে পারেন। এরা বেড়াতে আসে না। কেনাকাটাও এদের অভিপ্রেত নয়। অসুবিধে তাই বড় একটা হয় না।

॥ তিন ॥

কেশবপুর একটি গ্রামের নাম। পশ্চিম বাঙলার শত শত অজানা গ্রামের মধ্যে এটিও একটি। কেশবপুরের কোনও বিশেষত্ব নেই। সেই ধান-ক্ষেতের পাশ দিয়ে দিয়ে মাঠ ভেঙ্গে গ্রামের কাঁচা রাস্তা যার উপর দিয়ে শীতে আর দারুণ গ্রীষ্মে একখানি বিশ বছরের পুরানো বাস নানারকমের বিকৃত আওয়াজ তুলে ধূলোর ঝড় উড়িয়ে পথ চলে। বর্ষায় যায় গরুর গাড়ী। ঘণ্টায় দু মাইল যার গতি।

হরিহরপুর রেল স্টেশন থেকে কেশবপুর অবধি বাস চলে। দিনে একখানি বাস একবার যায়, একবার আসে। কৃষ্ণনগর থেকে বাস ছাড়ে, পার হয়ে আসে মুড়াগাছা, বেথুয়া-ডহরী, সোনাডাঙ্গা। থামে হরিহরপুরে। কলকাতা থেকে আসা বিকালের ট্রেনের সওয়ারী তোলে আবার কেশবপুর থেকে ফিরে সকালের কলকাতার যাবার গাড়ী ধরিয়ে দেয়। যদি কেউ যায় কৃষ্ণনগরে, কোর্ট-কাছারী যদি থাকে কারও, মামলা-মকর্দমার তারিখ পড়ে তো তাকেও একই বাস ঠিক পৌঁছে দেবে দশটায় কৃষ্ণনগরের কাছারীর মাঠে।

কেশবপুরের জীবনযাত্রা অতি সাধারণ। পশ্চিম বাঙলার আর পাঁচটা গ্রামের মতোই সেখানে দারিদ্র্য আছে, অভাব আছে, অভিযোগ আছে, পরস্পরের মধ্যে কলহ আছে। পর-চর্চায় ব্যাপ্ত বৃদ্ধের দল আছেন, বেকার যুবক আছে, কয়েকজন কলকাতাবাসী চাকুরে বাবু আছেন। স্কুল আছে ছেলেদের, মেয়েদের পাঠশালা যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ডাক্তারবাবু আছেন একজন তিনি বহুকাল আগে কলকাতার কোনও এক অল্পবয়স্ক এম-বি পাশ ডাক্তারের কাছে কম্পাউণ্ডারী করে এসেছেন কয়েক বছর। ধান ভাঙ্গার মেসিন আছে। কুমোর আছে কুমোর-পাড়ায়, ছুতোর আছে একঘর। কর্মকার নেই, পাশের গ্রামে গিয়ে কাস্তেতে ধার দিয়ে আনতে হয়। ধোপা নেই, শ্মশান নেই, পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভাগীরথী—তার ধারে যেখানে খুশী চিতে সাজানো যাবে কেউ মানা করবে না।

কেশবপুর গ্রামের কোনও শোভা নেই। শাল কি মহুয়ার জঙ্গল নেই, পাহাড় কি একটা ছোট টিলাও নেই। আছে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ সেখানে ধান ফলে না, এ কথা চাষীরা বলে। বলে মাটি নাকি ধানের শিষে দুধ জোগায় না। একপাশে অর্থাৎ যেদিকে মরা

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
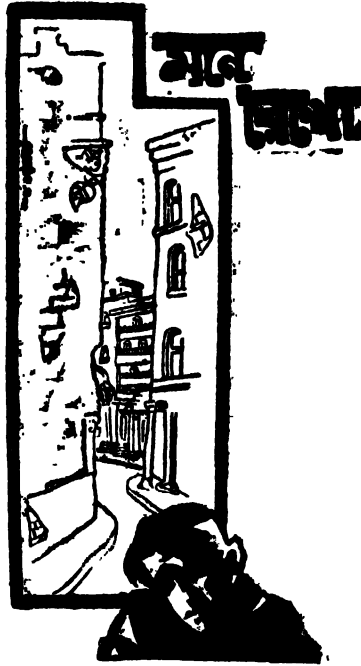
আশীষ বসু

ভাগীরথী আজও তার শীর্ণ জলধারা নিয়ে কোনওক্রমে বিদ্যমান সেদিকে আছে জঙ্গল আর সার সার করে বসানো আখের গাছ। কেশবপুরের রাস্তায় তাই প্রায়ই সারিবদ্ধ গরুর গাড়ীর ক্যারাভান দেখা যায়। কেশব-পুরের আখ চালান যায় চিনিকলে।

কেশবপুরের একটি হাট আছে। সোমবার আর বৃহস্পতিবার হাট বসে বিকেলে। হাটে আলু আসে, কুমড়ো আসে, পটলের সময় পটল আসে। মাছ আসে কদাচিৎ। এ অঞ্চলে মাছের ভারী টান।

বামুন - কায়েত আছে গ্রামের একপ্রান্তে। আসলে গ্রামটার কেন সবচেয়ে বেশী বসবাস পিতল - কাঁসার কারীগরের। তা অমন তিন-চার শ ঘর বসতি তাদের। পাড়াকে পাড়া জুড়ে। যন্ত্র তাদের দুখানি হাত, সম্বল ছেনী-হাতুড়ী, হাতেটানা কুঁদ। কাঁসার শুকনো মুছি নিয়ে বসে দু পায়ের মধ্যে রেখে অক্লেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা পিটে চলে পরদার মতো নক্সী পিতলের থালা।

আর আছে শোলার কারীগর। শোলার পাত কাটা কাগজ জুড়ে জুড়ে তৈরী হয় শোলার টুপীর ফর্মা। কিন্তু এই অবধিই। কেশবপুরের কারীগর এর বেশী জানে না। জানবার প্রয়োজন নেই তাদের। সেই শোলার অর্ধসমাপ্ত টুপী অর্থাৎ ফর্মা বাঁশের মাচা দিয়ে জড়িয়ে চলে যায় কলকাতার বাজারে। সেখানে গ্যাবার্ডিন কাপড়ের খাঁকি রংয়ের সাজ পরানো হবে তাতে। চামড়ার বেল্ট পরানো হবে, ভেতরে দেওয়া হবে এ্যালকাথিন যাতে মাথার তেলে টুপী নষ্ট না হয়।

বাগদী আছে একঘর, ডোম আছে কিন্তু মড়া পোড়ায় না, বেতের ঝুড়ি বুনে দিন চালায়।

বামন - কায়েত যারা ছিল একদিন তারাই ছিল গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ। গ্রাম ছেড়ে তাদের প্রায় সবাই এখন চলে গেছে কলকাতায়। চাকুরে বাবুরা কালেভদ্রে গ্রামের বাড়ীতে আসেন। কোঠাবাড়ী যে ক'টা দেখা যাবে পথ চলতে চলতে তা তাদেরই ফেলে যাওয়া। আর আছে মাঝে মাঝে টিনের বা খড়ের চাল দেওয়া বাড়ী, মাটির পোতা, কাঁচা কি পাকা মেঝে। তারই মাঝে বুনো জঙ্গল, কখনো এধারে ওধারে এক-আধটা আম-জামের গাছ।

ফুলগাছ নেই কেশবপুরে যদিও বা ছিল কোনওদিন সেবারের সর্বনাশা বন্যায় সব ধুয়েমুছে নিয়ে গেছে। কেশবপুরের লোকেরা বলে এখানকার মাটিই নাকি কমজোর হয়ে গেছে বন্যার জলে। পুকুরে নাকি আর জন্মায় না মাছ, গরু নাকি বন্ধ করেছে দুধ দেওয়া।

সত্যিই সেবার বন্যায় সব হারিয়েছে এরা। এ অঞ্চলের গ্রামে বন্যা আর রেখে যায় নি কিছু। গরু-বাছুর নিয়ে গেছে ভাসিয়ে। চাষের বলদ সমেত গোয়ালঘর ভেসে গেছে জলে। ধানের মরাই কাত হয়ে তলিয়ে গেছে বন্যায়। আশ্রয়হীন মানুষ গাছের ডালে উঠেছে, পাকা কোঠার ছাদ খুঁজেছে কাপড়-চোপড়, বাক্স-প্যাঁটরার মায়া ছেড়ে। বন্যা মানুষগুলোকে যেন ভিখারী করে দিয়ে গেছে।

কেশবপুরের লোকেরা চালের আর গমের দোকানে লাইন দিতে শিখেছে তারপরেই। কাপড়ের খোঁজে হাত পেতেছে সরকারী দপ্তরে। ডোলের টাকা খুঁজেছে নানা ফন্দী-ফিকির বাতলিয়ে। বাড়ী বানাবার জন্য সরকারী টিন এনে চড়া দামে বেচে দিয়েছে। ঋণ নিয়েছে নানাভাবে। কখনো একলা কখনো ক'জনে মিলে। জমি দেখিয়ে লোন নিয়েছে, বাস্তুভিটে বন্ধক দিতে চেয়েছে না কখনো। বন্যা এ অঞ্চলের অনেক মানুষকে অসাধু করেছে, অমানুষ করেছে। যেমন কলকাতা শহরে অনেক মানুষকে অমানুষ করেছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর ব্ল্যাক মার্কেট। নদীয়া আর মুর্শিদাবাদের গ্রামগুলো যেন মরেছে বন্যার কোপে। তাই ওখানে মাটিতে আর ফসল ফলে না, গাছে ফল আসে না। মা বসুন্ধরা যেন এখানে বিমুখ হয়েছেন।

পকেটে অনেক টাকা।

এতগুলো টাকা মণিময় যেন একসঙ্গে দেখে নি কখনো। মণিময় প্রথমে মাসের মাইনে পেয়েছে।

টেবিলের ওপর টাকাগুলি ছড়িয়ে অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলো মণিময়। ভাবলো, টাকাগুলো নিয়ে কি করবে সে। জামা-কাপড় বানাবে শীতের আর কিছু টাকা বাবাকে পাঠাবে। মেঘমালার জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাবে কিন্তু কিই বা কিনবে এই কেশবপুরে। মায়ের বড় সাধ ছিল লাল-পাড় একখানা গরদের শাড়ী—কিনে দিয়ে যাবে তাও। কিনতে হবে কিছু কিছু সকলের জন্যই। ইন্দ্রনাথ, মল্লিনাথ, শ্যামলী, চামেলী সবাই আশা করে আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু যাই হোক না কেন কলকাতায় তাকে একবার যেতেই হবে। যেতেই হবে।

●

অনেকদিনের পর রেডিওটার চাবিটা ঘুরিয়ে দিল মেঘমালা একদিন —এখন যেন নিজের অজান্তেই। বাবা মারা যাবার পর ক' মাস কেটে গেছে। কেমন যেন রেডিওটার কথা ভুলেই গেছিল সবাই। হয়তো বা মনে হয়েছে কারোর কিন্তু ভেবেছে বাড়ীর থমথমে ভাবটা ভেঙ্গে দিয়ে লাভ কি!

রেডিওর আওয়াজটা কেমন যেন অপরিচিত শোনালো। মেঘমালার নিজের কানেই। অনেকদিন শোনে নি বলেই না। রেডিওটার কোথাও ঘুণ ধরলো দীর্ঘদিনের অব্যবহারে তা সে বুঝলো না, নিজের কাছে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হল তার। বাড়ীর গুমোট আবহাওয়াটা কাটিয়ে দেওয়াতে কেমন যেন বিব্রত মনে হলো প্রথমটা। পড়া ছেড়ে প্রীতি যখন ওর ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো তখন যেন কেমন অপ্রস্তুত হল সে। মা একবার তাকিয়ে গেলেন পাশের দালান দিয়ে যেতে যেতে। ভাবটা যেন কাজটা মেঘমালা ভালো করে নি এমনি।

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে কেউ কিন্তু তাকে নিষেধ করলো না রেডিওটা চালাতে। কেউই বললো না বন্ধ করে দাও রেডিওটা। বরং সবাইয়ের ভাবটা যেন এমন মেঘমালা রেডিওটা চালিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু আর ক'দিন বাদে হলেই সেটা সবচেয়ে ভালো দেখাতো না কি!

শোক তো ভুলতেই হবে ভাবলো মেঘমালা। বৃথা তাকে পুষে রেখে কষ্ট পেয়ে লাভ কি। যে গেছে সে তো আর ফিরবে না। যে মেঘমালা একদিন ভেবেছিল বাবা নেই—তারা বাঁচবে কি করে, সেই মেঘমালাই বাবাকে বাদ দিয়ে বাঁচার কথা ভাবতে শুরু করলো।

যে গেছে সে তো আর ফিরবে না।

অনেক অনেকদিন আগে হ্যারি-কেনের আলোর সামনে বসে ফ্রকপরা একটি মেয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা আলোটা নেবাবো কি করে ওটা তো কাচ দিয়ে মোড়া। সে কথা পরবর্তী জীবনে মণিময় জেনেছিল। বুকের মধ্যে মেঘমালার মাথাটিকে টেনে এনে তার টানা টানা ভীরু ভীরু চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, না, তুমি এখনো সেদিনের সেই ফ্রকপরা মেয়েটিই রয়ে গেলে। সে মেয়েটি তার বাবাকে বলেছিল—!

মণিময়কে বাকীটুকু বলতে দেয় নি সে। হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল মুখটা ওখানের তার বুকের মধ্যে মিশে গিয়েছিল আরো। কি বোকা মেয়ে তুমি, মাকে বলতে হয় ও কথা। আমাকে স্বপন দেখেছো তা সে কথা আমাকে বললেই তো পারতে। কলেজ থেকে তোমার নাম কেটে দেওয়া উচিত, বলেছিল মণিময় মুখটা ছাড়া পেয়ে।

হ্যাঁ উচিত, তুমি থামো তো। বেশ করেছি বলেছি, জানো মাকে মেয়েরা সব কথা বলে। এমন কি অনেক কথা যা তোমাকেও বলা যায় না, মেঘমালা জবাব দিয়েছিল।

কি বোকাই ছিল মেঘমালা! কিন্তু এখন, এখন তো আর বোকা নেই সে। এই তো কেমন বুঝতে শিখেছে যে গেছে সে আর ফিরবে না।

খুব ছোটবেলায় অনেক দূর-সম্পর্কের এক পিসীমা মারা যান এ বাড়ীতে। ফুল দিয়ে তাঁকে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মেঘমালা জিজ্ঞাসা করেছিল অবাক হয়ে, আচ্ছা পিসীমা কি ঠাকুর নাকি, ওকে তোমরা চন্দন দিলে, ফুল দিলে, নমো করলে কেন? পিসীমা কোথায় যাচ্ছে বলো না।

●

চন্দ্রকান্তবাবুও হঠাৎ মারা গেলেন। একেবারেই হঠাৎ। খবরও পায় নি

মণিময়। খাবার মৃত্যুশয্যায় আসতেও পারলো না সে।

বিরাট এক বটগাছ যেমন হঠাৎ একদিন হুড়মুড় করে সশব্দে পড়ে যায় তেমনিই যেন মারা গেলেন তিনি। কোথায় যেন গিয়েছিলেন বেড়াতে। ফিরে এসে বললেন, আজ আর কিছু খাবো না। বুকের কাছটায় কেমন যেন একটু ব্যথা-ব্যথা করছে। দেখি চ্যবনপ্রাশটা একটু খাই। চামেলী মা, মাথার কাছে একটু বসে বুকটায় হাত বুলিয়ে দাও তো।

জ্বর নেই—জারি নেই, সুস্থসবল লোকটা হঠাৎ চলে গেল। বিকেল-বেলায় হেঁটে বাড়ী ফিরে এসে শুলেন বিছানায়। রাত দশটা নাগাদ বলতে লাগলেন, ওগো শুনছো, একটু পুরোনো ঘি মালিশ করে দাও তো বুকের গোড়ানায় নিঃশ্বাসটা নিতে যেন বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

রাত বারোটা নাগাদ পাড়ার অনাদি ডাক্তারকে ডেকে আনলো ইন্দ্রনাথ। চামেলী, শ্যামলী পায়ের কাছে বসে। নূরমহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের একটি তাকে পর্দা ঢাকা দেওয়া লক্ষ্মীর ছবির সামনে পাঁচ পয়সা ছুঁইয়ে চন্দ্রনাথের মাথার বালিশের নিচে রাখলেন চারুলতা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। চন্দ্রকান্ত চলে গেলেন।

অনাদি ডাক্তার জবাব দিলেন রাত দেড়টা নাগাদ। বললেন ঠিক বুঝতে পারছি না মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাও। মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে যেতে জ্ঞান হারালেন চন্দ্রকান্ত।

মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাবার আগে চোখ মেলে একবার তাকালেন চারদিকে। নূরমহম্মদ লেনের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের চারদিকে। বড় খাটটায় শুয়ে তিনি। নতুন বিয়ে করে এনে অফিসের বন্ধু-বান্ধবেরা জোর করে কিনে দিয়েছিল এই খাটখানা সাড়ে সাত টাকায়। ফর্দ করে এনে দিয়েছিল হাঁড়ি, কড়াই, বালতি, থালা-গেলাস, চাকী-বেলুন আরও যা যা দরকার সব।

দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবি, ফেলে-আসা দিনগুলির। চোখের দৃষ্টি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয় আর তবু তিনি দেখতে পেলেন মণিময়কে কোলে নিয়ে দাঁড়ানো তাঁর ফটো দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে। ওপাশে ইন্দ্রনাথ আর মল্লিনাথের ছবি মাঝে একটা তিন চাকার সাইকেল। মনে পড়ছে পুজোর সময় বোনাসের টাকা পেয়ে সেবার কিনে দিয়েছিলেন ওটা। মণিময়কে দিতে পারেন নি। আর সে চায়ও নি কখনো মুখফুটে। লাজুক ছেলে। চারদিকে চেয়ে দেখলেন একবার। মণিময়কেই খুঁজলেন হয়তো। চারুলতা বুঝতে পারলেন। বললেন, তার করে দিয়েছি মণি কাল সকালেই এসে পড়বে।

মণি, ইন্দ্র, মল্লি, শ্যামলী, চামেলী, চারুলতা আর তাদের সবাইয়ের গ্রুপ ফটো রয়েছে একপাশে। চারুলতা কিছুতেই দাঁড়াবেন না ক্যামেরার সামনে। চন্দ্রনাথের সঙ্গে তো নয়ই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা। সে তো সাহেব-মেমেরা তোলে। ভদ্রঘরের হিন্দু মেয়েদের ওসব করতে আছে না কি! তেমনিই রয়ে গেছেন চারুলতা। অতি অল্পে ঝগড়া করেন, অতি অল্পে হাসেন, কথা বলেন, কথা বন্ধ করেন। যেমনটি এসেছিলেন তেমনটি রয়ে গেছেন।

মণিময়ের সঙ্গে দেখা হলো না চন্দ্রকান্তের। ভোর হবার আগেই মেডিক্যাল কলেজে মারা গেলেন তিনি। ডাক্তাররা ধরতেই নাকি পারলো না কি রোগ হয়েছিল তাঁর।

●

কেশবপুর একটি গ্রামের নাম।

নদীয়া জেলার আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতোই এর বাসিন্দারাও বন্যায় সব খুইয়েছে।

কিন্তু আজকের কেশবপুরের সঙ্গে পুরানো কালের কেশবপুরের কোনও মিল নেই কোথাও। মিল যে শুধু কেশবপুরেরই নেই তা নয় মিল নেই আশে-পাশের আর দশটা গ্রামেরও।

ইতিহাস বলে কেশবপুর একদা অতি জনবহুল বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এর পাশের সব গ্রামের সঙ্গে তার পাল্লা চলতো কাজ-কর্মে, আচার-ব্যবহারে, পাল-পার্বণে, যাত্রা-থিয়েটারে। গ্রামের নামগুলি বিকৃত অবস্থায় আজও পুরনো দিনের সেই সব গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ওই ওপাশের বাম-দীঘির বিলটা পার হয়ে যে গ্রাম তার আজকের নাম মানিকদহ। ওই গ্রামেরই নাম ছিল মাণিক্য দহ। ওপাশের সরকারী রাস্তা পার হয়ে মাইনর স্কুলের সামনে দাঁড়ালে তাল আর আখের বনের আড়ালে আজকের যে গ্রাম দুটি পাশা-পাশি দেখা যাচ্ছে তারা 'নপুরে' আর 'কোটুরে'। লোকের মুখে মুখে নাম পরিবর্তিত হয়ে গেছে তাই লক্ষ্মীরা হয়েছে নপুরে, তা থেকে নপুরে আর কোটিশ্বরী হয়েছে কোটুরে।

কথিত আছে, হরিচরপুর থেকে কেশবপুরের যে পথ তা নাকি লর্ড ক্লাইভের সময়ে তৈরী। ওপাশে পলাশীর আম্রবনে বাঙলার স্বাধীনতার সূর্য যখন অস্তমিত হয়েছিল তখন এই রাস্তা দিয়েই নাকি লোকলস্কর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন ক্লাইভ। আজকের মরা ভাগীরথীর খালে সেদিন নৌকা লাগিয়েছিলেন তিনি। বহর ভিড়েছিলো তাঁর।

কেশবপুরের মাটি খুঁড়লে এখনো সোনার ইট পাওয়া যায় লোকে একথা বলে থাকে। সোনার নয় তবে ক্লাইভের কি হেস্টিংসের আমলের পোড়ানো ইট যে পাওয়া যায়ই একথা নিশ্চয়ই করে বলা চলে।

কেশবপুরের সেদিনের ইতিহাসের কথা আজকের কেশবপুরের মানুষেরা কেন জানি না কিছুতেই মনে করতে চায় না। যদি বলা যায় জানেন এখানে একদিন ক্লাইভের ক্যাম্পে আগুন লেগেছিল। যদি বানিয়েই বলার চেষ্টা করা যায় সেদিনের একটা গল্প যদি বলি, ক্লাইভ একদিন এখানে ক্যাম্প পেতেছেন। ভরা ভাদ্র মাস। ওপাশের ভাগীরথী বয়ে যাচ্ছে তরতর করে। মহাজনী নৌকা আসছে না

ভয়ে। পাটনী শুধু বইছে লোকলস্কর, সৈন্যসামন্ত। সারা গ্রাম জুড়ে চলছে কুচকাওয়াজ। ওই যে ওখানে যেখানে এখন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের পাওয়ার হাউস সেখানেই ছিল ক্লাইভের তাঁবু। সেদিন তাঁবুর মধ্যে উপস্থিত ছিল কারা কারা জানেন?

না, কেশবপুরের মানুষ এসব শুনতে চায় না। আজকের কেশবপুরের মানুষ শুধু জানতে চায় কবে সরকারী খয়রাতী চালের দোকানে চাল মিলবে, কত করে একসের না দেড় সের? ওপাশে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের টেস্ট রিলিফের মাটি কাটার কাজে মজুর নেওয়া হবে। কি পাওয়া যাবে, চালের সঙ্গে টাকা? গল্প লোন দিচ্ছেন ব্লক ডেভালেপমেন্ট অফিসার। কবে, কোথায়?

আপনি গল্প বলছেনই, সেই তাঁবুর মধ্যে বুঝালেন তখন ম্যাপ নিয়ে বসেছেন পলাশী যুদ্ধের রথী-মহারথিগণ। বিভীষণের অভাব নেই সেখানে। সেই তাঁবুতেই আগুন লাগলো মশায়। একেবারে বাঘের ঘরে ওই যে বলে না কিসের যেন বাসা।

কেশবপুরের কথা অমৃতসমান।

না না সেটা ঠিক নয়, কেশবপুরের যে-কেউ আপনার কথার প্রতিবাদ করে বলবে, আপান বাড়িয়ে বলছেন।

কেশবপুরেও মানুষের বসতি আছে। আছেন গঙ্গাধরবাবু, ত্রিলোচনবাবু, পীতাম্বরবাবু, শৈলেশ্বরবাবু। আব্দুল হোসেন আছেন, খোদাবক্স কাসেম আছেন। গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ওপারের চিনির কলের আখ জোগান দেন, ত্রিলোচনবাবুর আছে তেলের কল: তার উপর তিনিই এখানে সরকারী ন্যায্য মূল্যের চালের দোকান খুলেছেন। পীতাম্বরবাবু এখানকার কাঁসা-পিতলের আর শোলার কারীগরদের কাছ থেকে নগদ দামে জিনিষ কেনেন তারপর কলকাতা, বোম্বাইয়ের বাজারে চালান দেন তা। শৈলেশ্বরবাবু এখানকার জমিদারবংশের একমাত্র বংশধর যিনি গ্রামের মায়া কাটাতে পারেন নি বা হয়তো গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার মতো সঙ্গতি আজ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এ ছাড়া গ্রামে পাঁচু ডোম আছে, হরি মুচি আছে আর আছে অগুন্তি কাঁসা-পিতলের আর শোলার কারীগর হরেকৃষ্ণ কর্মকার, রামচরণ মণ্ডল, কালীনাথ দাস প্রমুখ। এদের নিয়েই আজকের কেশবপুর গ্রাম।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সারা দেশব্যাপী উন্নয়নের প্রাক্কালে কেশবপুরে এসেছে আরও করেকাচ মানুষ। ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অফিসে একজন সুপারভাইজার এসেছেন। তাঁর নাম অরুণকুমার রায়। হেড মিস্ত্রী এসেছে রামাবতার মাহাতো। মালটিপারপাস স্কুল খোলার কাজ নিয়ে এসেছেন সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলের বাড়ী উঠছে গ্রামের বাইরে একপাশে। হেলথ সেণ্টার তৈরীর জন্য কণ্ট্রাক্টারের কাজ নিয়ে এসেছেন মৃত্যুঞ্জয় জানা। রাস্তা তৈরীর কণ্ট্রাক্ট নিয়েছেন হরিহরপুরের যামিনী তালুকদার। রোজ সকালে তাঁকে সাইকেল নিয়ে কেশবপুরে আসতে ও বিকেলে হরিহরপুরে ফিরে যেতে দেখা যায়। এ ছাড়া কৃষি-পরিদর্শক আসেন প্রায়ই, ডি ডি টি ছড়াতে আসেন সর্বেশ্বর বোস হরিহরপুর থেকে মাসে একবার। মশা মারার তেল দিয়ে যান যেখানে যেখানে জল জমেছে সেখানে।

এই কেশবপুরেই এসেছে মণিময় মিত্র। এই কেশবপুর আর তার আশে-পাশের কয়েকটা গ্রাম নিয়ে যে ছোট্ট ইউনিটটি সে তারই এক্সটেনশন অফিসর, সব উন্নয়নমূলক শিল্প কাজগুলির তদারকী করাই তার কাজ।

[ক্রমশ।

বিশেষ স্বাস্থ্যের প্রতি আসক্তি ক্ষতিকর হতে পারে

হার্ভারড্ স্কুল পাবলিক হেলথ-এর পুষ্টি বিভাগের ডাক্তার ফ্রেডরিক জে, ষ্টেয়ার-এর মতে কোনও কোনও খাদ্যের প্রতি আসক্তি ক্ষতিকর, আবার কোনও-কোনটি'র প্রতি আসক্তি ক্ষতিকর নয়।

হাক্লবেরী-র চা বহুমূত্রর পক্ষে উপকারী বলে যে ধারণা প্রচলিত, তা ভুল।

তাঁর মতে এই আসক্তি অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব। এত দূর যে, আসক্ত ব্যক্তি এবং তার পরিবার উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে নাও পারেন।

পুরুষানুক্রমে খাদ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'কোয়াক'রা চেষ্টা করে চলেছে মানুষকে উন্নতির দিকে বিমুখ ক'রে 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে। সেদ্ধ শাকসব্জী থেকে সুরু করে বন্য মধু, বিশেষরূপে উর্বরীকৃত জমিতে ফলান ফসল, সব কিছু 'প্রাকৃতিক' বলে চিহ্নিত করা হয়।

তিনি বলছেন, খাদ্যের ব্যাপারে 'কোয়াক'রা বেচতে উন্মুখ, তার দরকার পয়সা, নিজের পকেট ভারী করা, তাই সে হয়ত ইচ্ছে ক'রে তার বিশেষ খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

কোনও একটা খাদ্যই স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। মোটামুটি যাটটা পুষ্টিকর খাদ্য মানবদেহের পুষ্টির জন্য দরকার এবং বাজারে আর মুদিখানায় লভ্য নানা জাতের খাদ্য গ্রহণ করলেই এগুলো মেলে। খাওয়া দরকার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তাহলেই স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ

মিনতি সেন

আপনাদের মধ্যে যারা নিয়মিত রেডিও শোনেন, তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন দিনের মধ্যে একাধিকবার তাতে ঘোষণা করা হয়, 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাষে বলা হয়েছে—' এই সংবাদের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয় তার কারণ দেশের অনেক প্রয়োজনীয় কাজই নির্ভর করে এই আবহাওয়ার পূর্বাভাষের ওপর, আলিপুরের আবহাওয়া অফিসে গেলে দেখতে পাবেন, আবহাওয়ার মতিগতি জানানোর জন্য সেখানে যে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে বহু লোক তেমনি অনেক দামী দামী যন্ত্রপাতিও বসান হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। এখানে প্রশ্ন করতে পারেন, আবহাওয়ার খবর জানা যদি এতই দরকার, তবে এইসব আধুনিক যন্ত্রপাতি বের হওয়ার আগে আবহাওয়া জানা যেত কী করে। এই খবর জানার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাচীন কাল থেকে যে সব মজার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে, তাদের-ই কয়েকটির কথা আজ বলবো।

আবহাওয়ার কথা বলতে গেলে আমাদের দেশের বিদুষী নারী খনার কথা প্রথমে বলতে হয়; বিভিন্ন বচন ও ছড়ার মধ্য দিয়ে তিনি আবহাওয়া জানার কয়েকটি চমৎকার পদ্ধতির কথা বলেছেন। যেমন একটি ছড়ায় আছে, চন্দ্রের সভা বা মণ্ডলের মধ্যে তারা দেখা দিলে বুঝতে হবে প্রবল বৃষ্টি আসছে। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, চন্দ্রের সভা যদি চাঁদের খুব কাছাকাছি থাকে, বুঝতে হবে বৃষ্টি হবে না, আবার সভা যদি চাঁদের থেকে দূরে থাকে, তবে সেটা তাড়াতাড়ি বৃষ্টি নামার লক্ষণ। ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে মাছি বা এই জাতীয় পতঙ্গের ওড়ার ভঙ্গী দেখে আবহাওয়া আন্দাজ করা হয়; যেদিন সেগুলি মাটি থেকে বেশ কিছু উঁচুতে উড়তে থাকে, তারা ধরে নেয় সেদিনটা শুষ্ক যাবে; মাছিগুলি মাটির ঠিক ওপরে উড়লে তারা নিঃসন্দেহ হয়ে, বৃষ্টি হবেই। কারণ দেখা গেছে, আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে, বায়ুও ভারী থাকে, তাই মাছিদের ওপরে উঠতে অসুবিধা হয় না; কিন্তু বৃষ্টি বা ঝড় আসার আগে বায়ু হালকা হয়ে গেলে, তারা বেশী ওপরে উঠতে পারে না, মাটির কাছাকাছি উড়ে বেড়ায়।

আমাদের গ্রামাঞ্চলেও আবহাওয়া আন্দাজ করার কয়েকটি ভাল ও নির্ভুল পদ্ধতি আছে। যেমন, পুকুর বা জলা জায়গায় যদি গরু-মহিষ ইত্যাদিকে বেশ আরামে শুয়ে থাকতে দেখ, তাহলে বুঝতে হবে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ঝড়বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই; আবার মাঠফেরৎ গরুর মুখে ঘাসের টুকরো লেগে থাকতে দেখলে ধরে নিতে পারো, অবিলম্বে বৃষ্টি নামবে; কারণ ঝড়বৃষ্টির আগেই এই জন্তুগুলি তাদের ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতার দ্বারা তা অনুমান করতে পারে, তাই পাছে জলে ভিজতে হয় বলে, কোনরকমে তাড়াতাড়ি ঘাস খাওয়া সেরে তারা বাড়ী ফিরতে চেষ্টা করে, সেই জন্যই তাদের মুখে ঘাসের কণা প্রভৃতি লেগে থাকে। গ্রীষ্মের শেষে বা শরৎকালে কুয়াশা সত্ত্বেও ফাঁকা মাঠের ছোট ছোট ঝোপ-গুলিতে যদি মাকড়সার জাল দেখা পড়ে এবং জালগুলির মাঝে মাঝে জলের ফোঁটা ঝুলতে থাকে, তবে বুঝতে হবে, সেদিনটা পরিষ্কার থাকবে এবং বেশ গরমও পড়তে পারে।

আকাশের মতিগতি জানার জন্য ইংরেজদের মধ্যে নানা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে; আপনারা এগুলির সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন; যেমন আকাশে সাদা রঙের ছোট ছোট ছেঁড়া ও পাতলা মেঘ দেখা দিলে ধরে নেওয়া যায়, পরবর্তী অন্তত ১২ ঘণ্টার মধ্যে আর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাদের

মধ্যে আর একটি ছড়া আছে। ... অর্থ সকাল সাতটার আগে বৃষ্টি নামলে বুঝতে হবে, এগারোটার মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সারাদিনের মধ্যেও আর জল হওয়ার আশংকা নেই। ইংরেজদের মতে, সারাদিন আবহাওয়া কেমন যাবে, সেটা বোঝার শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে বেলা এগারোটা, অর্থাৎ এগারোটার সময় আকাশের যেমন অবস্থা থাকে, সারাদিন মোটামুটি তেমনি চলবে। ওয়েদার কক বা হাওয়া নিশান দেখেও আব- [illegible] কথা চলে, যেমন হাওয়া নিশানের মুখ যদি ক্রমাগত পশ্চিম থেকে দক্ষিণ দিকে ঘুরতে থাকে, তবে বুঝতে হবে শীঘ্র ঝড় আসছে।

সব শেষে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে উষ্ণতা মাপার একটি চমৎকার উপায়ের কথা বলি—যেখানকার লোকেদের মধ্যে আজো পদ্ধতিটির প্রচলন দেখা যায়, এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ঝিঁঝিপোকার ডাক সকলেই শুনেছেন; সন্ধ্যাবেলা ঝোপঝাড়ের মধ্যে এদের আওয়াজ অনেক জায়গাতেই শুনতে পাওয়া যায়। যে-কোনদিন সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যে গিয়ে ঘড়ির সাহায্যে মেপে দেখ, একটা বিশেষ ঝিঁঝিপোকা ১৫ সেকেণ্ডের ভিতর মোট ক'বার ডাকছে, এর সঙ্গে ৩৭ সংখ্যাটি যোগ করলে যা পাবেন, সেটাই সেদিনকার ডিগ্রি ফারেনহাইটে উষ্ণতা। হাতে-কলমে পরীক্ষা করলে দেখবেন, বছরের সবদিনই অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে এই অংকটি মিলে যাবে।

অঙ্গীকার

স্তব্ধ বিজন চতুর্দিক।
দূর থেকে শুধু আচার্যের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে---

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণী বাপিতত্র বাসক্রতরুট্‌ তর্যা দিকে ॥

সংবৃতাশ্রমের চত্বর পিছনে করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। দুটি ছায়ামূর্তি শুধু। একটি পুরুষ একটি নারী। নারী ত্রস্তা, পুরুষ ব্যাকুল।

: শুনতে পেলে আচার্যের বাণী, মৃগাক্ষী?

: পেলাম।

: যেন দৈববাণী হোল, না? ভয়ে তুমি আকুল হচ্ছ সর্বজ্ঞ আচার্য তাই দূর থেকেই তোমাকে অভয়বাণী পাঠালেন। বুঝতে পেরেছ ওর অর্থ?

: পারছি কই?

: পেরেছ, আমি জানি। আচার্য তোমাকে সর্বশাস্ত্র পারদর্শিনী করেছেন। হয়তো তোমার জ্ঞান আমার থেকেও বেশী। তবু---আমার বলতে ইচ্ছে করছে শ্লোকটির গূঢ়ার্থ।

: বল, শুনি।

: শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমাবলে হিংস্র প্রাণীরাও, যেমন মানুষ, বাঘ, সিংহ--শশমৃগের সঙ্গে একত্রে মিত্রভাবে বাস করতো। তবে কেন আমার হরিণী পারবে না---

: হেমধ্বজ সিংহের সঙ্গে একত্রে বাস করতে? কি করে পারবে হেম দেশটা তো বৃন্দাবন নয় শ্রীকৃষ্ণ কোথায় এখানে? যাঁর অপার মহিমা এখানে বিরাজ করছে তিনি হলেন রাজা রত্নধ্বজ সিংহ, তিনি প্রতাপ বলে বাঘ আর গরুকে একঘাটে জল খাওয়াতে চান সত্য কিন্তু এটা চান না যে সিংহ-হরিণে একসঙ্গে বাস করুক। তেমন অনাচার দেখলে তিনি দৃঢ়হস্তে হরিণকুলকে উচ্ছেদ করতে বৃতী হবেন।

সাধনা দেবী

: এত ভয় করছ কেন? আমার পিতা কঠোর শাসক বটে, কিন্তু পুত্রবৎসলও তো। একমাত্র পুত্রের একমাত্র আকাঙ্ক্ষাকে তিনি অপমান করবেন না।

: হেমধ্বজ - তোমার পিতা আমারও নমস্য। শুধু তোমার পিতা বলে নন তিনি সারা দেশের শাসক, সমগ্র জাতির পালক, আমাদের সকলের ভাগ্যনিয়ামক। তাঁর সমালোচনা করার অধিকার অন্তত আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই রাজা রত্নধ্ব- তাঁর একমাত্র পুত্র যুবরাজ হেমধ্বজকে গুরুকুলবাসী শিষ্য করে আচার্যগৃহে প্রেরণ করেছেন। যাতে সে দ্বাদশ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ফিরে গিয়ে যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হয়ে ভবিষ্যতে কঠোর হৃদয় নরপতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি তিনি জানতে পারেন সেই মূল্যবান হৃদয়টি আচার্যের পালিতা কন্যা সামান্যা এক রমণীর কাছে পূর্বাহ্নেই খোয়া গেছে তাহলে কি তিনি ক্ষমা করবেন। না করা সম্ভব?

ব্যাকুল হেমধ্বজ আকুল হয়ে উঠলেন।

: করবেন করবেন আমি বলছি তাঁর ক্ষমা আমি ভিক্ষে করে নেব। কিন্তু মৃগাক্ষী---তোমাকে বাদ দিলে আমার রাজত্ব মিথ্যে হয়ে যাবে, জীবন ভুয়ো হয়ে যাবে, সংসার মরুভূমি হয়ে যাবে। এই ক'বছরে তোমার সাহচর্য---কিন্তু এ সব কথা আবার কেন বলছি? অনেকবার তো তোমাকে শুনিয়েছি, বহুবার বলেছি তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না, চলবে না, চলবে না। তবে কেন? আগামী পরশু আমার চলে যাওয়ার দিন। আগামী কাল আমাদের বিয়ের লগ্ন। এত বড়ো এক সন্ধিক্ষণেও তুমি এইরকম দোলাচলচিত্ত হয়ে থাকবে? মন ঠিক করতে পারছো না?

: আচার্য গণনা করে বলেছেন এ বিয়ের ফল শুভ হবে না কুমার।--তোমাতে আমাতে চিরবিচ্ছেদ ঘটবে। তাই তো স্বাভাবিক। আমার মন বলছে---দেশে ফিরে যাওয়ার পর তোমার যখন অভিষেক হবে তখন তুমি পিতৃআজ্ঞা

লঙ্ঘন করতে পারবে না। কোনো দুতনুকার পাণিগ্রহণ করে তাঁকে পাশে বসিয়ে রাজত্ব করবে। আর আমি?

হৃদয় নেংড়ানো হাসি হেসে উঠলো মৃগাক্ষী।

: ঐ কর্ণিকার গাছের কুঁড়িগুলোর যেমন দশা দেখছ আমারো সেই দশাই হবে। অনাদৃত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত আরেকটি আশ্রমপুষ্প একদিন ঝরে পড়ে থাকবে পথের ধারে। আচার্যের বাণী কি কখনো মিথ্যা হয়?

হেমধ্বজের দৃষ্টি শাণিত হয়ে উঠলো।

: আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, এই সন্ধ্যায় ঐ নক্ষত্রখচিত আকাশ আর দীপ্ত চন্দ্রিমাকে সাক্ষী রেখে---আমি যেদিন প্রথম রাজসিংহাসনে বসবো সেদিন আমার পাশে রাণীর আসনে থাকবে তুমি, শুধু তুমিই। এ প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা হবে না।

●

কিন্তু মৃগাক্ষীর আশঙ্কাই সত্য হোলো। উপযুক্ত পুত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হবার আশায় দিন গুণছিলেন রাজা রত্নধ্বজ। হেমধ্বজ ফিরে আসামাত্র তিনি জানালেন মল্লারের রাজপুত্রীর সঙ্গে হেমধ্বজের পাণপত্র হয়ে আছে। তিন বৎসর পরে হেমধ্বজের অভিষেক হবে। অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই মল্লার রাজকুমারীর সঙ্গে তার উদ্বাহ অনুষ্ঠান—দুটি উৎসব একসঙ্গেই হবে কথা হয়ে আছে—একথা অমোঘ, এর কোনো নড়চড় নেই। মল্লার কুমারী চিত্রিকাই এ রাজ্যের ভাবী রাণী।

হেমধ্বজ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

: আমার পাণপত্র হয়ে গেছে, আমার অনুপস্থিতিতেই?

: কিন্তু আমার অনুমোদনে। সেইটুকুই যথেষ্ট।

: কিন্তু পিতা—পিতা আমি যে ইতিপূর্বেই বিবাহিত।

: বিবাহিত?

: হ্যাঁ পিতা। আচার্যদেবের পালিতা কন্যা মৃগাক্ষীকে আমি বিবাহ করেছি মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে—ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বৈশ্বানর ও স্বয়ং মার্তণ্ডদেব—পঞ্চদেবতাকে সাক্ষী করে। পুরোহিত ছিলেন বুধ শাস্ত্রী।

: আমার পুত্রের বিবাহ হয়ে গেছে আমার অনুপস্থিতিতেই?

: আর কোনো উপায় ছিল না পিতা। জানি আপনার ক্ষমা পাবোই---

: পাবে পাবে। বৃদ্ধ রাজা সস্নেহ হাসি হাসলেন। যৌবনে ও রকম ভুল দু' একটা পদস্খলন কার না হয়ে থাকে? অত বিচার করতে গেলে চলে না। তোমার পূর্বপুরুষেরাই তো অল্পবয়সে অন্তঃপুরের দাসী নিয়ে---

: কিন্তু পিতা এ ভুলও নয় বা অন্তঃপুরের দাসীঘটিতও নয়। হেমধ্বজ বাধা দিলে।

আশ্চর্য, রত্নধ্বজ ক্রুদ্ধ হলেন না, বিচলিতও হলেন না।

: পুত্র, রাজসিংহাসনে শুধু রাজকুলজাতারাই বসবার অধিকারী। যাই হোক্ একথাটা তোমার তথাকথিত বধূকে বোঝানো দরকার। তুমি একটি লিপি লিখে দাও আমি তাকে আনতে লোক পাঠাই।

: তাকে আনাবেন? এই রাজধানীতে?

: ক্ষতি কি। তাকে আনাই—একটা বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেবো—খোলাখুলি একটা আলোচনাও করা দরকার। যদি দেখি তোমাদের দুজনেরই কম বয়সের মোহের ঘোর—তেমন গভীর কিছু নয় তাহলে তো মিটেই যাবে।

: আর যদি দেখেন সম্বন্ধ গভীর, তাহলে?

: তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

যথাসময়ে মৃগাক্ষী এলো। অনুচরদের ওপরে ততটা ভরসা করতে পারেন নি রত্নধ্বজ—নিজেও গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা লোক জানাজানি হোক্ এটা তাঁর ইচ্ছে ছিল না। মূল্যবান পেটিকা থেকে মৃগাক্ষীকে বার করা হোলো। পাথরের চোখ মেলে হেমধ্বজ তাকিয়ে রইলো প্রিয়ার মৃত্যুনীল দেহের দিকে। আসার পথে বনমধ্যে শ্বাসরুদ্ধ করে অসহায়া তরুণীকে হত্যা করা হয়েছে।

কঠিন একপ্রকার অদ্ভুত হাসি হাসলেন রত্নধ্বজ।

: অন্য ব্যবস্থাই করতে হোলো। দেখলাম সম্বন্ধটা গভীর। কিন্তু তো মেয়েটিকে বোঝাতে পারা গেল না। তোমার কিছু বলবার আছে, পুত্র?

হেমধ্বজ নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়েছিল। একটু চমকে উঠলো।—আমার? হ্যাঁ, আছে একটা কথা। আপনি বলেছিলেন রাজধানীতে এনে ওর একটা বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দেবেন।

: মনে আছে।

: সে কথা থাকবে . কি?

: নিশ্চয়ই।

: তাহলে আমার অনুরোধ---রাজ-অবরোধের মধ্যে পুরাঙ্গনে যেখানে তথাকথিত রাজকুলজাতাদের সমাধিস্থ করা হয় সেখানে ওর সাড়ে তিন হাত মাপ পরিমিত জমির বন্দোবস্ত করে দিন।

: উঁহুঁ।

পুরাঙ্গনেই মৃগাক্ষীকে সমাধি দেওয়া হোলো। একা হাতে হেমধ্বজকে সব ব্যবস্থা করতে হোলো---কারণ লোক জানাজানি হোক্ এটা রাজা রত্নধ্বজের ইচ্ছে নয়।

●

তিন বৎসর পর।

যুবরাজ হেমধ্বজ রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। প্রাক্তন রাজা রত্নধ্বজ বৃদ্ধ হয়েছেন। উপযুক্ত পুত্রকে দায়িত্বভার অর্পণ করে তিনি রাজ-শান্তির জটিল আবর্ত থেকে সরে দাঁড়াবেন এবার। অভিষেক ও রাজ-পরিণয় দুটি সুবৃহৎ অনুষ্ঠান এককালীন উদযাপিত হবে। সারা দেশ জুড়ে বিরাট উৎসবের আয়োজন চলেছে।

কিন্তু না।

রাজা হেমধ্বজ প্রথমেই নিরাশ করলেন বাকদত্তা বধূকে। মল্লারের রাজপ্রতিনিধিকে ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

তারপর সিংহাসনে বসে দ্বিতীয় আদেশ দিলেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সারা দেশবাসী সে অদ্ভুত আদেশে। কিন্তু রাজাজ্ঞা নড়চড় হবার নয়। পিতারই প্রতিভূ পুত্র।

পুরাঙ্গনে সর্বজনসমক্ষে সমাধি খনন করে মৃগাক্ষীর শব বার করা হোলো। যেখানে একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপি চুপি ওকে শোয়ানো হয়েছিল। রাজ্ঞীর জন্য রক্ষিত সকল অলঙ্কার মহামূল্য বসন শবকে পরানো হোলো---রাজোচিত মর্যাদায় রাণীর অভিষেকান্তে কঙ্কালকে সিংহাসনের পাশে বসিয়ে রাজা হেমধ্বজ সুদক্ষ হাতে রাজকার্য পরিচালনা শুরু করলেন।

বৃদ্ধ রত্নধ্বজ স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন---পুত্র, এ কি হোলো? আমি যে মল্লার কুমারীকে কথা দিয়েছিলাম।

: কিন্তু আমিও ওকে কথা দিয়েছিলাম, পিতা।

সহসা রত্নধ্বজ ছুটে এসে পুত্রকে বুকে চেপে ধরলেন।

: এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম বাবা। আমার এত কষ্টে গড়া রাজত্ব তোর হাতে নষ্ট হবে না। তুই আমার সার্থক বংশধর।

সভাস্থ সকলেই তাঁর এই সহসা ভাববৈলক্ষণ্যে বিস্মিত হোলো। বিস্মিত হোলো হয়তো মৃগাক্ষীর কঙ্কালও। ওর হাড়ের হাতে ন্যায়ধর্মের প্রতীক রত্নখচিত গোলক ঝক্ ঝক্ করে উঠলো॥

ক্যাম্পের ছাতা দিয়ে মহিলারা বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্যবস্তু তৈয়ারী করছেন

নেশার ফাঁস

নতুন একটা ছোট গাড়ী এসে থামল ঐ আধুনিক কেতায় সজ্জিত হোটেলটির দরজায়—সুবেশ একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক নামলেন এবং এগিয়ে গেলেন হোটেলটির দিকে—হোটেলটির ম্যানেজার ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন। মৃদুস্বরে একটি ভৃত্যকে আদেশ দিলেন দুই নম্বর সুইটস-এ এঁকে নিয়ে যাও।

লিফটে উঠলেন মিঃ রুদ্র।

হাতঘড়িটায় টাইম দেখলেন একবার, নাঃ ঠিক টাইমেই এসেছেন তিনি।

তখন মিঃ রুদ্রের সবে কলেজ-জীবন সুরু। বন্ধু শান্তনু বললে, একটা সারপ্রাইজ দেব তোকে। চল আমার সঙ্গে এক জায়গায়। সেদিন শান্তনুর সঙ্গে এক অভিনব পরিবেশে এসেছিলেন মিঃ রুদ্র।

অনেক সঙ্কীর্ণ গলি পেরিয়ে শান্তনু মিঃ রুদ্রকে নিয়ে একটি বাড়ীতে এসে কড়া নাড়তেই এক স্থূলকায়া মহিলা দরজা খুলে দিলেন। একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানালেন, এসো, এসো—একটি সুসজ্জিত ড্রইংরুম বনাম বেডরুমে বসতে দিলেন ওদের।

দু' চোখে প্রশ্ন তুলে তাকাতেই শান্তনু শান্তগলায় বলেছিল, শুধু দেখে যা।

হঠাৎ অন্তঃপুরে একটি মেয়ের কান্না প্রকট হয়ে উঠতে লাগল, 'দয়া করুন, আমাকে ছেড়ে দিন।'

প্রত্যুত্তরে মুখঝামটা শোনা যেতে লাগল। একটু বাদেই সেই স্থূলকায়া মহিলা এক অষ্টাদশীকে ঠেলতে ঠেলতে সেই ঘরে ঢুকিয়ে ঝপাং করে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

সেই অষ্টাদশী ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে বলল, ছিঃ ছিঃ এই বয়সেই এ সব জায়গায় এসেছেন, ধিক্ ধিক্। বেশী রাতে বাড়ী ফিরে মা-বাপকে কি কৈফিয়ৎ দেবেন? অমুক প্রফেসরের বাড়ীতে একটা নোট নেবার দরকার ছিল এই ত'? আপনারা আমার ছোট ভাইয়ের বয়সী—

এইবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মেয়েটি। শান্তনু এবার ধীরপায়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, ছোট ভাই বলেই না দিদিকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি?

সত্যি? মেয়েটি জলভরা চোখে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ সত্যি। যাও মাসীকে বলে এসো, আমরা তোমাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে যেতে চাই।

সেই বন্ধ দরজায় করাঘাত করতে থাকে মেয়েটি। সেই মহিলার পুনরাবির্ভাব। প্রস্তাব শুনে বললে, একঘণ্টার মধ্যে আসতে হবে।

পদ্মরাণী চক্রবর্তী

রাজী হয় শান্তনু। অতঃপর রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি। গাড়ীতে বসে কোথায় তার বাড়ী জেনে, সেদিকেই নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে। গাড়ী নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছলে মেয়েটিকে নামতে বলল শান্তনু। মেয়েটির দু'চোখে তখন বান ডেকেছে। পোড়া চোখের জলের জ্বালায় একটা ধন্যবাদও সে শান্তনুকে দিতে পারল না।

এরপর শান্তনু ফিরে তাকিয়েছিল তার দিকে। কিরে, বুঝতে পারলি কিছু?

মিঃ রুদ্র তখনও হতবাক। কিছুক্ষণ পরে বলেছিলেন,—এই সব করে বেড়াচ্ছিস তুই?

—কেন কাজটা খারাপ?

—খারাপ নয়। তাহলেও 'কচু গাছ কাটতে কাটতে লোক একদিন ডাকাত হয়।' একটা প্রবাদ আছে—

—আরে রাখ তোর প্রবাদ। এটি নিয়ে ৩টি হল। তিনটিকে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি।

এরপর থেকে কখন কিভাবে যেন মিঃ রুদ্রও শান্তনুর এই হবিতে নিজেও মেতেছিলেন। কলেজ ছেড়ে চাকরী জীবনে এসে শান্তনুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন বটে, কিন্তু সেই নেশাটা এখনও আছে। মোটা টাকার লোভে, দালালরা সদ্য-ধরা শিকার-এর সন্ধান দেয়; শিকারী কিন্তু তাকে পক্ষপুটে ঢেকে মায়ের কোলে রেখে আসে।

এরপর বিয়ে করেছেন মিঃ রুদ্র। বিদুষী, সুন্দরী স্ত্রীকে নিজের এই হবির কথা গোপন করেছেন তিনি। ভুল বুঝবে তাঁকে গোপা। নিজের ডায়েরীতে তাঁর সযত্নে লেখা আছে ঐ সব অ্যাডভেঞ্চার। তাই কখনও অফিসের ড্রয়ার থেকে ভুলেও সেটিকে বাড়ীতে আনেন না।

নিরুপদ্রবে কেটে গেল ক'টা বছর। একদিন কিন্তু তাঁর 'ডায়েরী' বিশ্বাসঘাতকতা করল। অফিসে কখন ড্রয়ারে না রেখে সেটিকে পকেটস্থ করেছিলেন তাঁর পারিবারিক জীবনে ঝড় তুলতে।

ততদিনে একটি কন্যালাভ করেছিলেন তিনি। সুন্দর ফুলের মত মেয়ে, শুধু ফুলের সাথে ওর তুলনা হয়। মেয়ের নাম রাখা নিয়ে দুজনে বহু তর্ক-বিতর্কের পর 'পারিজাত' রেখেছিলেন।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে শুনেছিলেন, গোপা গঙ্গাস্নানে গেছে। সে কি; এই অবেলায়?

—হ্যাঁ, দেহমন দুইই অশুচি হয়ে গেছে তোমার হবি পড়ে, তাই মুক্তিস্নান করে এলাম, তবু দেহটা অপবিত্রই ঠেকছে। স্নান সেরে তখনই ফিরেছে গোপা।

মিঃ রুদ্রের তখন পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। বোঝাতে চেষ্টাও হলেন স্ত্রীকে। তখন ঘরে দোর দিয়েছে গোপা। হ্যাঁ পরদিন দোর খোলাই পেয়েছিলেন মিঃ রুদ্র। রাত্রে ঘুম না হওয়াতে অনেকটা ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল গোপা, হয়ত অপবিত্র স্বামীর স্পর্শমুক্ত হতে।

বিচিত্র হাসিতে মুখ ভরে যায় তাঁর। সেই থেকে মা-মরা মেয়েটাকে বড় করে তুলেছেন; আজ সে অষ্টাদশী। প্রচুর স্বাধীনতা দিয়েছেন তিনি মেয়েকে।

...দের মত সংকীর্ণ মন যেন ওর না হয়।

●

লিফট পৌঁছে গেছে। লিফটম্যান দরজা খুলে দাঁড়াল। তড়িৎগতিতে নিষ্ক্রান্ত হলেন মিঃ রুদ্র। ২নং স্যুইটস-এ অপেক্ষা করছে একটি অনাঘ্রাত কুসুম। কণ্টকাবৃত হয়ে আছে। কণ্টকমুক্ত করে তুলে আনতে হবে তাকে।

২নং স্যুইটস। বসে আছে মেয়েটি পিছন ফিরে। এগিয়ে গেলেন মিঃ রুদ্র, হাত রাখলেন পিঠে। পিছনফিরে তাকিয়েই মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল —বাবা?

কয়েক পা পিছিয়ে এসে ছুটে পালাতে গেলেন মিঃ রুদ্র---পারলেন না। সিঁড়িতে পা স্লিপ করল তাঁর, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলেন মিঃ রুদ্র।

বুদ্বুদ

শ্রীবনানী ঘোষ

তখন ওরা বিকেলের চায়ের আসরে বসেছিল। সকাল থেকেই আকাশে মেঘের ওড়না ছড়িয়েছিল। পৃথিবীতে ছড়াচ্ছিল অসহ্য গুমোট। আকাশটা এখন মেঘে মেঘে কালো হতে থাকল। বেলা তো ডুবছিলোই, এবার ডুবন্ত বেলার শেষ আলোটুকু সেই নিকট কালো আকাশের বুকে রক্তচন্দন মত জ্বলতে লাগল। ওরা চায়ের আসরে বসেছিল। এই পরিবারের সবচেয়ে বয়স্কা সদস্যা সরমা। মেয়ে কলেজের সিনিয়র প্রফেসর; চোখে ভারী ফ্রেমের চশমায় তাকে রাশভারী দেখায়। এমনিতে বেঁটেখাটো একবর্তি মানুষটি হাসিতে খুশিতে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত. প্রাচীনত্বের গৌরব-বহনকারী এই বাড়িটিতে এক সময় ছিল।

সরমাদের তিন ভাই ও আট বোনের সংসার। কেউ মুখথুবড়ে পড়ে নেই, সকলেই আপন আপন সংসারের হাল ধরেছে কবে। শুধু সরমা যৌবনকে পার করে দিয়ে স্বেচ্ছায় কুমারী। সরমার দাদা, এ সংসারে সম্পূর্ণ আউটসাইডার। দুই ভাই—গৌতম ও রতন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত। গৌতম সরকারী অফিসের চাকুরে, রতনের ছোটখাট ফ্যাক্টরী আছে। দুই বৌ, মালতী আর তরু। মালতী শ্রীময়ীর মা, দীর্ঘদিন স্কুলে কাজ করে। মিতভাষী, ঈষৎ বিষণ্ণতার আদর মাখা চেহারা, সব সময় এক-টুকরো গাম্ভীর্য যেন চিটিকে থাকে। তরু—চটপটে। এককালে নাচে নামডাক ছিল। অনেকে চিনতো তাকে। এখন সে মৌ-এর মা। কিন্তু মাতৃত্ব তার লাবণ্যকে ছায়া মাখাতে পারে নি, ইদানীং লেখাপড়ায় ঝুঁকেছে তরু। প্রাইভেটে এম-এ দেবার ইচ্ছে তার প্রবল। মালতী ও গৌতমের মেয়ে শ্রীময়ী। উনিশ বছরের কচিমুখে লাবণ্যের ঢলনামা চেহারা ছিপছিপে দীর্ঘ গড়ন। মৌ-এর সঙ্গে শ্রীময়ীর সাদৃশ্য আছে। বুম্বা ও নিরু ওদের দুই ভাই।

ওরা তখন বিকেলের চায়ের আসরে বসেছিল, গৌতম ও রতন তখনও ফেরে নি। আর সবাই যার যার কাজের শেষে ঘরে এসেছে। তরু তখনও বাথরুমে, ঠাকুর ওদের জন্য চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখছিল। টেবিলের ধারেই ছোট সাইড টেবিল, তার ওপর এস্বেস্টারের টুকরোয় হটপ্লেটের ওপর চায়ের জল কেটলীতে সোঁ সোঁ আওয়াজ তুলছে। টেবিলের একধারে বসে বুম্বা আর নিরু আমেরিকান ফাইটারদের সম্বন্ধে উত্তেজিত আলোচনা করছিল। শ্রীময়ী আর মৌ মগ্ন হ'য়ে গল্প করছে কলেজের। শ্রীময়ী ওর সব চুল এলিয়ে বসেছে, ফ্যানের হাওয়ায় শুকোবে বলে। মালতী নিরু ও বুম্বাকে বলল---আজ আর বাইরে যেও না খেলতে। এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে।

---আচ্ছা তাহ'লে আমরা কারাম খেলব। মালতীর কথার জবাব দিয়েই ওরা আবার আপন গল্পে মশগুল হয়ে গেল।

মালতী এবার সরমাকে বলল,---'পথে ওরা ভিজবে---বৃষ্টি এই নাবলো বলে।'

সরমা চোখ থেকে চশমাটা নাবিয়ে নিয়ে, কাপড়ের আঁচলে মুছতে মুছতে বলল, তাও একটু মাটি ভিজুক, ঠাণ্ডা হোক পৃথিবী, যা গরম পড়েছে। তারপর চশমাটা চোখে চাপা দিতে দিতে দেখল, শ্রীময়ী ওর খোলা চুলের গুচ্ছ হতে ফস করে একগাছি চুল টেনে নিল। মৌকে দেখিয়ে বলল ---দেখেছিস কি চুল উঠেছে আমার?'

মৌও চুলের গোছায় হাত রাখল। টান দিল, কিছুই এল না। তবুও বলল, এখন উঠল না, কিন্তু আমারও আজকাল ভীষণ চুল উঠছে। মালতীও ওদের দেখছিল। আর ওদের আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল,---'বর্ষার পর থেকে শীত পর্যন্ত চুল বেশীটা ওঠে।'

চশমার আড়ালে সরমার চোখ দুটো কৌতুকে জ্বল জ্বল্ করে উঠল। একটু হেসে প্রশ্ন করল---'কেন অত চুল উঠছে? মনে তোমাদের কিসের অত চিন্তা শুনি?'

শ্রীময়ী আর মৌ একসঙ্গে হেসে উঠে বলল---'পিসী না একেবারে---।'

এমনি সময় ঠাকুর চা দিয়ে গেল। সেদ্ধ আলুর টুকরোর ওপর গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে লাগল। মালতী তরুও এসে গেল; গা ধুয়ে, শাড়ী পালটে হালকা প্রসাধন সেরে একেবারে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছে। সরমা সকলকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। ওরা নানারকম গল্প পরিহাসের মাঝে মাঝে, চা, আলু-গোলমরিচ ও স্যাণ্ডউইচ ধ্বংস করতে লাগল। বুম্বা ও নিরু উঠে গেল একটু পরেই। কারাম পেতে বসল, অন্য ঘরে। দ্বিতীয় কাপ চায়ের আয়োজন করতে বলে, তরু বলল সরমা ও মালতীকে---ওঃ ভুলে গিয়েছিলাম বলতে, আজকে আমার টিউটোরিয়ালের এক ভদ্রমহিলা

শ্রীময়ীর জন্য একটি ভালো সম্বন্ধ এনে-ছিলেন।

শ্রীময়ীকে চকিত দেখাল। মৌ লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করল---'কি সম্বন্ধ?'

মালতী স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে মৌ-এর দিকে তাকাল।

তরু চোখ পাকিয়ে বলল---'তোর পাকা কথায় কাজ কি?'

সরমা বলল---আহা, 'ওকে বকছিস্ কেন? ও তো লাফাবেই, ওর যে লাইন ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

শ্রীময়ীর চকিত ভাব কেটে গেল। ফিক্ ফিক করে হেসে উঠল।

মৌ ঈষৎ লজ্জিত ও বিব্রত হাসি মাখিয়ে তীব্র প্রতিবাদে বলে উঠল, মোটেও না, মোটেও না।

যদিও মেঘগুলো সব বৃষ্টি হ'য়ে টুপটাপ ঝরে পড়ছিল না বলে, চতুর্দিকে এক বিচিত্র গুমোট হয়েছিল; তবুও আজকের এই বিকেলটা ওদের কাছে মনোরম হয়ে উঠেছিল। বাড়ীর সকলেই বাইরের জমিতে পা রাখা। তাই একমাত্র শনিবার ছাড়া, সকলে মিলে আর আসর জমাতে পারে না। সকলকেই তার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। পরের দিন অব-সরের দিন, তাই ওরা আজ আর উঠছিল না কেউ।

মালতী প্রশ্ন করল---'কি করে ছেলে?'

তরু বলে গেল যতটুকু সে জানে,---নিজেদের মস্ত ব্যবসা আছে, লেখাপড়ায় বেশী উৎসাহ, আপাতত আমেরিকায় আছে, সম্ভবত রিসার্চ অফিসার না কি একটা বলল ঐ রকম---মানে Prospect ভালো। আমি ছবিও নিয়ে এসেছি।

---ওখানেই সেটেলড নাকি?---জানতে চাইল সরমা।

---না, ওর দেশে ফিরবে, তবে ওখানে বিয়ে করে এখন বৌ নিয়ে যাবে। ওরা স্মার্ট মেয়ে চায়।

মৌকে আদেশ দিল তরু,--- যা ত' আমার কালো ব্যাগের মধ্যে ছবিটা আছে, নিয়ে আয়।

মৌ চলে গেল। এবার সরমাকে উদ্দেশ করেই বলল তরু---দিদি আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে সম্বন্ধটা, মেজদার কাছে তোলা উচিত।

আরও কি বলতে যাচ্ছিল তরু। শ্রীময়ী তাকে থামিয়ে ঈষৎ অনুনাসিক আদুরে স্বরে বলে উঠল---'না মা কাকিমা, বাবাকে কিছু বলতে হবে না। এখন আমি বিয়ে করব না।'

---'তুই থাম্ তো, তোকে কে কথা বলতে বলেছে,'---মৃদু তিরস্কার করে উঠল মালতী।

তরু ঈষৎ হেসে উত্তর করল---'এরপর 'সে চলে যায় যদি হায় দিন চলে যায়' গাইতে হবে। এখন বলবে বিয়ে করব না, পরে বিয়ে দেবার জন্য আমাদেরই দুষবে।'

সরমা হেসে ফেলে বলল---'কেন মিছিমিছি ওকে ওরকম করছিস্। ওকি আর সত্যি সত্যি বিয়ে করব না বলেছে?' কথার শেষে শ্রীময়ীর দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেল সরমা। মনে হল শ্রীময়ীর গোলাপ গোলাপ কোমলত্বে কে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিয়েছে। শ্রীময়ীর খোলা চুলে আলতো করে হাত রাখল সরমা। প্রশ্ন করল---'কেন আপত্তি করছিস কেন? এত ভাল পাত্র। তাছাড়া বিয়ে একদিন একদিন করতেই হবে, তখন সময়-মত সেরে নেওয়াই ভালো।'

শ্রীময়ী আর কথা বলল না কোনও। মৌ ফটো-হাতে ফিরে আসতে আসতে হাততালি দিয়ে বলল

রাজভবনের উত্তর গেটের সম্মুখে খাদ্যের দাবীতে বিক্ষোভরত মাহলাবৃন্দ

[illegible]—হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাদের তো [illegible] হবে। [illegible] চোখে দেখে না কেউ [illegible] থাকে, এবার বলা যাবে—আমার দিদি আমেরিকাতে আছে।'

---বোকার মত কথা বলিস্ না। ভেংচি কাটল শ্রীময়ী। আর মৌ শ্রীময়ীর দিকে তাকিয়ে চোখে এক-রিমেয়ে ইসারার ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল, 'দারুণ'।

শ্রীময়ীর বাঁকা ঠোঁটে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল—'আহা' দেখ্ না, আহা কি'—মৌ ফটোটা প্রসারিত করে দিল শ্রীময়ীর দিকে; মালতী আর সরমা ওটা তুলে নিল। দেখে বলল—'ভালই ত।' শ্রীময়ী তেমনি নিরাসক্ত হ'য়েই জবাব দিল—'ফটো দেখে চেহারা বোঝা যায় না, ফটো অনেক সময় ব্লাফ্ দেয়।'

---বেশ, তোকে আর মতামত দিতে হবে না।---স্মিতহাস্যে সরমা থামিয়ে দিল শ্রীময়ীকে, মালতীকে বলল---হ্যাঁ, হ্যাঁ এবার শ্রীময়ীর বিয়েটা লাগিয়ে দেওয়া যাক্। তারপর শ্রীময়ীর দিকে ফিরে বলল---কি রে, বিয়েতে কি কি চাস্ তুই?

—'কিচ্ছু চাই না।' শ্রীময়ীর দিকে [illegible] ওর চোখের ভাষায় কিসের অনাসক্তি মত। আশ্চর্য দূরের মনে হল শ্রীময়ীকে। শ্রীময়ী সরমার কাছে মানুষ। শ্রীময়ী, মৌ, নিরু, বুয়া, ওরা সরমার যত প্রাণের মালতী বা তরুর বোধ হয় ততটা নয়। সরমার ধারণা, সে যত ওদের চেনে, মালতী বা তরু, গৌতম বা রতন তার সিকি ভাগের এক ভাগও বোঝে না। আপন আত্মজনকে সকলে ভালবাসে, কিন্তু চেনে ক'জন। চিনবার মত মন চাই, চাই মমতা। সরমার তা আছে। তাই----কিন্তু আজ এই মুহূর্তে শ্রীময়ীর নীরব চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থেকে সরমার মনে হল, আরও গভীরভাবে মনে হল শ্রীময়ীর কিছু বলবার আছে। কিন্তু কি এক সংকোচে শ্রীময়ী তার বলার কথাটি প্রকাশ করতে পারছে না, আর নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার ব্যথাটা ক্রমশ যেন ওর সমস্ত মুখে এক বিষণ্ণতার ক্রীম মাখিয়ে দিচ্ছে।

শ্রীময়ী আমাদের সংকোচ করে?---এই সরল প্রশ্নের উপলবিধ সরমার বুকে এক আশ্চর্য ব্যথার সঙ্গে গভীর মমতা জাগিয়ে তুলল। সরমা কি পারে না, দুই হাতে ওর সমস্ত সংকোচকে সরিয়ে দিতে?

—কিছু বলবি তুই শ্রীময়ী?

সরমার দিকে চোখ তুলে তাকাল শ্রীময়ী। ওর দৃষ্টিতে নিরাসক্ত আর্দ্র তার ছায়া। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল, আকাশে। সরমাও দেখল, দেখল আকাশের রঙ্ কি নিবিড় ঘন কালো হয়েছে। কয়েকটি পাখী ডানা মেলে উড়ে চলেছে। চায়ের কাপগুলো একত্র করে রাখছিল তরু।

শ্রীময়ী বলে ফেলল—'আমাকে তোমরা এখানে বিয়ে করতে বোল না, পিসী',---ওকে অসম্ভব রকম লাল দেখাল।

—খেয়াল-খুশীমত চললেই হয় না। ভাল পাত্রের খবর সব সময় কি পাওয়া যায়? তাছাড়া সম্বন্ধ এলেই বিয়ে হচ্ছে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। খোঁজ-খবর নেওয়া হবে।

কথাগুলো প্রায় একনিশ্বাসে, দৃঢ়ভাবে, অস্বাভাবিক দ্রুততায় বলে গেল মালতী। মালতীর এই অকারণ রূঢ়তার কোনও অর্থ খুঁজে পেল না সরমা।

(ক্রমশঃ)

কুমারী হেলেন কেলার

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

দেড় বছরের দুরন্ত শিশু—
এলো দুরারোগ্য মস্তিষ্কের রোগ—
ফুলের মত সুন্দর ও কোমল
কন্যাটি হল ভাগ্যদেবতার চরম শিকার।
গেল চক্ষু, গেল কর্ণ, গেল বাক্য—
প্রভাতের নবীন আলোক ঢেকে, এলো ঘোর অন্ধকার।

কিন্তু আছে মেধা—
পরাজয়ের গ্লানি কি রহিবে মাথায়?
না, কখনোই নহে—সমস্ত জগৎ মানিল বিস্ময়—
সাতাশী বৎসরের সুদীর্ঘ জীবন তার শুভ কর্মময়।

অন্ধ, মূক ও বধির? কি বা যায় আসে?
আছে অতীন্দ্রিয় স্পর্শশক্তি—
তাহারই সাহায্যে নিয়ে শিক্ষার চূড়ান্ত
বাহিরিয়া পথে—
দেশে দেশে অন্ধ, মূক, বধিরের দুঃখে হয়ে বিগলিত
স্পর্শে, অর্থে, দানে, দুর্ভাগাদের করেছেন অভিষিক্ত।

বিদেশিনী মনস্বিনী হেলেন কেলার—
এসেছিলেন আমাদের এই প্রাচীন ভারতে
অন্ধজনে দিতে আলো, দিতে মুক্তি—
অন্ধ কারাগার হতে।
তাঁহারই আশ্বাসে, তাঁহারই [illegible]—
কতজন পেয়েছিল নবীন জীবন
নূতন আশার আলোকে কত হতাশাস জন
হল সঞ্জীবিত—
কে রেখেছে হিসাব তাহার?
তাঁর মৃত্যুদিনে, তাঁহার উদ্দেশে রাখি শত নমস্কার।

সেজুয়ানের মহৎ নারী

বেরটল্ট ব্রেশট

তিন দেবতা ও ওয়াং

॥ পূর্বরঙ্গ ॥

[সেজুয়ানের রাজধানীর একটি রাস্তা। সময় সন্ধ্যা। ভিস্তি ওয়াং দর্শকদের কাছে এইভাবে আত্মপরিচয় দিতে থাকবে]

ওয়াং। আমি সেজুয়ানের রাজধানীর একজন ভিস্তি। আমার কাজটা খুবই একঘেয়ে। যখন জলের অভাব দেখা দেয় তখন আমাকে বহু দূরে দূরে ছুটোছুটি করতে হয়। আর যখন জলের প্রাচুর্য হয়, আমার রোজগার প্রায় বন্ধ হয়ে। এ দেশটা গরীব। ভয়ানক রকম গরীব। সবাই বলেন আমাদের উদ্ধার করতে পারেন এক-মাত্র দেবতারা। বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন এমন একজন গো-ব্যবসায়ী আমাকে বলেছেন যে কয়েকজন খুব উচ্চশ্রেণীর দেবতা পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছেন এবং তাঁরা সেজুয়ানেও আসতে পারেন। একথা শুনে যে আমার কি আনন্দ হয়েছে কি বলব। স্বর্গে নাকি খুব গোলমাল সুরু হয়েছিল। পৃথিবী থেকে নালিশ এবং অভিযোগ উপরে ভেসে উঠে সেখানকার শান্তিভঙ্গ করেছে। শহরে ঢোকবার এই পথ ---গত তিনদিন ধরে আমি এখানে অপেক্ষা করছি, বিশেষত সন্ধ্যার দিকে---দেবতারা এলে যাতে আমিই প্রথম তাঁদের অভিনন্দন জানাতে পারি। কারণ পরে আমি বিশেষ সুযোগ পাব না। বিখ্যাত লোকেরাই তাঁদের চারিপাশে ঘিরে থাকবে এবং অনেকের অনেক কিছু চাহিদা মেটাতে তাঁরা ব্যস্ত থাকবেন। দেবতারা এলে আমি কি তাঁদের চিনতে পারব? তাঁরা একসঙ্গে দল করে আসবেন না এক একজন আসবেন, যাতে লোকের নজর তাঁদের ওপর গিয়ে না পড়ে। (রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন কয়েকজন শ্রমিকের ওপর দৃষ্টি পড়াতে) এই সব লোক তো---

ওয়াং। নিশ্চয়ই তাঁরা নন। এরা কাজ সেরে ফিরছে। বোঝা কাঁধে থাকাতে এরা কাঁধ নুইয়ে হাঁটছে। ওই লোকটাও দেবতা হতে পারে না। ওর হাতের আঙুলে কালি মাখানো। বড়জোর ও সিমেণ্টের কারখানার কেরাণী। (দুটি ভদ্রলোক হাঁটিতে হাঁটিতে চলে যাবেন) একজন ভদ্র-লোককেও আমি দেবতা বলে মানতে রাজী নই। এদের পাশবিক মুখভাব দেখেই বোঝা যায়, এরা দরকার মনে করলে লোকজনকে পিটি দিতেও অভ্যস্ত। দেবতাদের প্রহার করবার দরকার হয় না। কিন্তু ওই যে তিন-জন আসছেন? এঁদের দেখে তো সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মনে হচ্ছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। কখনও খেটে খেতে হয়েছে বলে মনে হয় না, জুতোগুলো ধুলোয় ভরা—নিশ্চয় নানাদেশ ভ্রমণ করে আস-ছেন ওঁরা। এঁরাই সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দেবতারা। (আভূমি আনত হয়ে) মহিমান্বিত প্রভুরা। আদেশ করুন কি করতে হবে।

১ম দেবতা। (বেশ খুশিমনে) তুমি কি আমাদের প্রতীক্ষা করছিলে?

ওয়াং। (সকলকে জলপান করিয়ে) বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছিলাম। আমিই শুধু জানতাম যে আপনারা আসছেন।

১ম দেবতা। আজকের রাতটা থাকবার জন্য একটা আস্তানা চাই। তুমি একটা ঘরের সন্ধান দিতে পার?

ওয়াং। একটা কি বলছেন প্রভু। কত ঘর চাই? সারা সহরটাই আপনাদের আতিথ্য দেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠবে। আপনারা কোন্‌দিকে থাকতে চান বলুন?

(দেবতারা অর্থসূচক দৃষ্টিবিনিময় করবেন)

১ম দেবতা। বৎস, প্রথম বাড়ীটায় চেষ্টা করে দেখ। প্রথম বাড়ী থেকেই সুরু করা উচিত।

ওয়াং। আমার ভয় হচ্ছে যেই একজনের বাড়িতে প্রভুদের থাকবার ব্যবস্থা করবো, শহরের গণ্যমান্য ক্ষমতাশালী লোকেরা তাঁদের ওখানে আপনাদের না নেওয়ার জন্যে আমার ওপর ক্ষেপে উঠবেন।

১ম দেবতা। আমি যা বললাম সেটাকে আমার আদেশ হিসেবে নাও---তা হলেই আর তোমার ওপর দায়িত্ব পড়বে না। প্রথম বাড়িটাতেই প্রথম চেষ্টা করো।

ওয়াং। ওই বাড়ীটা মিঃ ফো-র---একটু অপেক্ষা করুন।

[একটা বাড়ির কাছে গিয়ে কড়া নাড়বে। দরজা খুলে যাবে এবং গৃহস্বামী ওকে তাড়িয়ে দেবে। এখানে মূকাভিনয় হবে। সঙ্কুচিত হবে ওয়াং ফিরে আসবে।]

ওয়াং। চাকরগুলো কি বোকা। মিঃ ফো বাইরে গেছেন---তাই ওরা আপনাদের আশ্রয় দিতে সাহস পেল না। মিঃ ফো নাকি এ সব বিষয়ে ভয়ানক কড়া। আবার বলি চাকরগুলো কি বোকা। ঘরে ফিরে মিঃ ফো যখন জানতে পারবেন কাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন---বাছাধনেরা তখন বুঝতে পারবেন কত ধানে কত চাল।

দেবতারা। (হাসতে হাসতে) বটেই তো।---

ওয়াং। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। পাশের বাড়িটা হচ্ছে বিধবা সু'র। উনি আপনাদের পেলে আহলাদে ডগমগ হয়ে উঠবেন।

[ওয়াং পাশের বাড়ীতে গিয়ে টোকা দেবে এবং সেখান থেকেও তাড়া খেয়ে ফিরবে]

ওয়াং। রাস্তার ওপাশে গিয়ে খোঁজ করতে হবে। মাদাম সু বলছেন, তাঁর একটিমাত্র ছোট্ট বাড়তি ঘর আছে, আর সেটা এমন অবস্থায় রয়েছে যে, কারোকে থাকতে দেওয়া যায় না। আমি এবার সোজা মিঃ চেঙের বাড়ি যাচ্ছি।

২য় দেবতা। ছোট ঘরেই বেশ আমাদের চলে যেতো। মহিলাকে বল আমরা তাঁর ওখানেই যাব।

ওয়াং। ও ঘরটা একেবারে নোংরায় ভর্তি---চারিদিকে মাকড়সা।

২য় দেবতা। তাতে কিছু এসে যাবে না। বেশী মাকড়সা থাকলে মাছির দৌরাত্ম্য থাকবে না।

৩য় দেবতা। (বেশ মোলায়েমভাবে) মিঃ চেঙ বা অন্য যেখানে তোমার ইচ্ছে হয় চেষ্টা কর বৎস। আমি মাকড়সা একেবারে সহ্য করতে পারি না।

[ওয়াং আর একটি দরজায় গিয়ে কড়া নাড়বে এবং ঢুকবে। বাড়ির ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যাবে]

তোমার দেবতারা সব চুলোয় যাক---বলি নিজেদের ঝঞ্ঝাট নিয়েই অস্থির হয়ে আছি, তার ওপর আবার---যত সব।

ওয়াং। (দেবতাদের কাছে ফিরে এসে) মিঃ চেঙ অত্যন্ত দুঃখিত। তাঁর বাড়ি আত্মীয়স্বজনে একেবারে ভরে আছে। শুধু আপনারা বলেই বলছি---আমার মনে হয় ঐ সব লোকের ভেতর কিছু সত্যিকার খারাপ লোক আছে। মিঃ চেঙ চান না আপনারা গিয়ে তাদের দেখেন। আপনাদের মতামতকে উনি এত ভয় পান বলেই আপনাদের আতিথ্যের দায়িত্ব নিতে চান না।

৩য় দেবতা। আমরা কি তাহলে এতই ভয়াবহ।

ওয়াং। খারাপ লোকদের পক্ষে তাই নয় কি? আমরা সবাই জানি কোয়ান্স শহরে বছরের পর বছর বন্যায় ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে।

২য় দেবতা। তাই বুঝি? কিন্তু কেন?

ওয়াং। কারণ আমার মনে হয়, এদেশের লোকেরা দেবদেবীতে বিশ্বাস করে না বলেই ওদের এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।

২য় দেবতা। সম্পূর্ণ বাজে কথা। এই দুর্ভোগের একমাত্র কারণ হচ্ছে ওরা ভালভাবে ড্যামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দিকে মন দেয়নি।

১ম দেবতা। (ওয়াং-এর প্রতি) আর কোথাও কোন আশা আছে বৎস?

ওয়াং। এ আপনি কি প্রশ্ন করছেন প্রভু? ওই সামনের বাড়ীতে গিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা---আমাকেই ওদের ভেতর থেকে বেছে নিতে হবে। আপনাদের সেবা করবার জন্য ওদের ভেতর কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে---একটু অপেক্ষা করুন---

[দ্বিধাগ্রস্তভাবে ওয়াং এগিয়ে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়বে। আসলে এই অবস্থায় কি করা উচিত, তাই ও ভেবে ঠিক করতে পারছে না।]

২য় দেবতা। আমি কি বলেছিলাম?

৩য় দেবতা। হয়তো ঘটনাচক্রেই এমন হচ্ছে।

২য় দেবতা। তা বটে। ঘটনাচক্রেই আমরা স্থুন-এ কোন আশ্রয় পাই নি, ঘটনাচক্রেই কোয়ানেও ওই এক অবস্থা হয়েছে, আবার এই সেজুয়ানেও ঘটনাচক্রেরই প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। দেবতাদের ভয়ভক্তি করে এমন একটি মানুষও আজ পৃথিবীতে নেই---তোমরা স্বীকার করবে না, কিন্তু এটাই হচ্ছে খাঁটি সত্য। আসল কথা আমাদের পরিক্রমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হয়ে গেছে এবং তোমাদের পক্ষেও এখন সেটা মেনে নেওয়া উচিত।

১ম দেবতা। এখনও যে-কোন মুহূর্তে আমরা সৎমানুষের সংস্পর্শে আসতে পারি। আমাদের পরিকল্পনা-মাফিকই সবকিছু ঘটবে, এতো আশা করা যায় না।

৩য় দেবতা। সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছিল পৃথিবী এইভাবেই চলতে পারে---যদি আমরা এই পরিক্রমায় যথেষ্ট সৎলোকের সাক্ষাৎ পাই---যারা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করবার ক্ষমতা রাখে। এই ভিস্তিটি সেই জাতের লোক যদি অবশ্য আমি প্রতারিত না হয়ে থাকি।

[৩য় দেবতা, ওয়াং যেখানে অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে যাবেন]

২য় দেবতা। উনি সব সময়ই প্রতারিত হন। জলওয়ালা আমাদের যখন তার মাত্রাকাটা জলপাত্র থেকে জল দিচ্ছিল, একটা জিনিষ আমার নজরে পড়েছিল, এই দ্যাখো---

(প্রথম দেবতাকে পাত্রটা দেখাবে)

১ম দেবতা। পাত্রের তলায় একটা মিথ্যা পীঠিকা আছে।

২য় দেবতা। লোকটা জোচ্চোর।

১ম দেবতা। বেশ, ওর কথা না হয় বাদ দিলাম। একজন লোক যদি জোচ্চোর হয়, তাতে কিছু যায় আসে না---কিছু সময়ের ভেতরই হয়তো এমন অনেক লোকের দেখা পাবো, যারা আমাদের নিয়মকানুনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। যাই হোক, কোনো এক-জনকে খুঁজে বার করতেই হবে। দু' হাজার বছর ধরে এই একই অভিযোগ শুনতে হচ্ছে---এভাবে পৃথিবীকে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এমন কয়েকজন লোককে খুঁজে বের করতেই হবে যারা পৃথিবীতেও বাস করে এবং আমাদের সমস্ত বিধিবিধান মেনে চলে।

৩য় দেবতা। (ওয়াংকে) তোমার বোধহয় আমাদের আশ্রয়ের জায়গা খুঁজে বার করতে কষ্ট হচ্ছে।

ওয়াং। আপনি বলছেন কি প্রভু! আপনাদের মত অতিথি। আমার দোষেই দেরী হচ্ছে---আমি অত্যন্ত অপদার্থ বলেই ---

৩য় দেবতা। না, না, তা মোটেই নয়।

(তৃতীয় দেবতা সঙ্গীদের কাছে চলে যাবেন)

ওয়াং। এঁরা সবই বুঝতে পারছেন। (এগিয়ে গিয়ে এক পথচারী ভদ্র-লোককে বলতে থাকবে)---দেখুন মশাই, কিছু মনে করবেন না, তিনজন নামডাকওয়ালা দেবতা---যাঁদের সেজুয়ানে আসার কথা লোকের মুখে মুখে গত কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছিল, সত্যি সত্যিই এখানে এসে হাজির হয়ে-ছেন---রাত্রিটা থাকবার জন্যে তাঁদের বাসস্থান দরকার। চলে যাবেন না মশায়---নিজেই একবার ওঁদের দিকে চেয়ে দেখুন, এক-নজরেই সব কিছু আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঈশ্বরের দোহাই, এ বিষয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। জীবনে এ সুযোগ দু'বার আসে না। এই তিনজন দেবতাকে আপনার বাড়ীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করুন---অন্য কেউ এ সুযোগ নেবার আগেই। আমি জোর গলায় বলছি---ওঁরা নিশ্চয় আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।

ভদ্রলোক ওয়াং-এর কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে গেলেন---ওয়াং আর এক-জন পথচারীকে সম্বোধন করে বলল।]

ওয়াং। আপনি তো মশায় সবই শুনলেন। আপনার বাড়িতে একটা ঘর দিতে পারবেন? সাধারণ ঘর হলেই চলবে--দেবতারা তো আড়ম্বর চান না---উদ্দেশ্য মহৎ হলেই তাঁরা খুশি হয়ে যান।

ভদ্রলোক। তোমার দেবতারা কোন শ্রেণীর তা কি করে বুঝব? কি করে জানব কাদের নিয়ে অন্দর-মহলে ঢোকাচ্ছি?

[এগিয়ে তামাকের দোকানের দিকে যাবে। ওয়াং দেবতাদের দিকে ফিরে যাবে]

ওয়াং। একজনকে পেয়েছি যে নিশ্চয়ই আপনাদের রাতের আশ্রয় দেবে।

(হঠাৎ তার নজরে পড়বে বলে পরিমাপ করবার পাত্রটি মাটিতে রাখা রয়েছে। বিব্রতভাবে দেবতাদের দিকে চেয়ে ওটি তুলে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাবে]

১ম দেবতা। লোকটির কথায় খুব উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না।

ওয়াং। (ভদ্রলোকটি দোকান থেকে ফিরছেন দেখে) এই যে মশায়, তাহলে ওঁদের রাতে থাকার ব্যবস্থাটা?

ভদ্রলোক। তুমি কি করে জানলে আমি বাসায় থাকি? আমিও তো একটিমাত্র ঘরেই থাকতে পারি---

১ম দেবতা। লোকটি আমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থলই খুঁজে পাবে না। সেজুয়ান সহরকেও আমাদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়াই ভালো।

ওয়াং। এঁরা প্রথম শ্রেণীর তিনজন দেবতা। মন্দিরে এঁদের যে প্রতিমূর্তি আছে তার সঙ্গে এঁদের চেহারা একেবারে মিলে যায়।

এখনও আপনি আমন্ত্রণ জানালে এঁরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

ভদ্রলোক। (হেসে উঠে) আমার মনে হচ্ছে এরা একদল জোচ্চোর আর তুমি চেষ্টা করছ আমার কাঁধে এদের চাপাতে---

(চলে যাবে)

ওয়াং। (চিৎকার করে) হতভাগা, হৃদয়হীন, অভদ্রলোক কোথাকার। দেবতাদের অসম্মান করার জন্য আজীবন তোমাকে নরকে পচতে হবে। সেজুয়ান শহরের তুমি কলঙ্ক-বিশেষ। (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর) আর তাহলে কার কাছে যাই---এখন একমাত্র ভরসা স্বৈরিণী শেন্‌টে। সে কিছুতেই আমার কথায় রাজী না হয়ে পারবে না। (চীৎকার করে ডাক দেবে 'শেন্‌টে।' উপরের জানলা খুলে যাবে---শেন্‌টে মুখ বার করে দেখবে) তাঁরা এসেছেন---কিন্তু ওঁদের জন্যে কেউ ঘর দিতে চাইছে না। এক-রাতের জন্যে তুমি কি ওঁদের আশ্রয় দেবে?

শেন্‌টে। আমার এখানেও অসুবিধা আছে ওয়াং। একজনের আসবার কথা আছে। কিন্তু বলছ কি? তুমি ওঁদের জন্যে একটা ঘরও খুঁজে পেলে না?

ওয়াং। কি করব বল, সারা সেজুয়ান শহরটা আজ গোবরগাদায় ভরে গেছে।

শেন্‌টে। আমার তো তাহলে লুকিয়ে থাকতে হয়। যার আসার কথা ছিল সে আমাকে না দেখে ফিরে যাবে। ঠিক ছিল সে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে।

ওয়াং। আমরা তাহলে আসব কি?

শেন্‌টে। এস, কিন্তু জোরে কথা বোলো না। আচ্ছা, ওঁদের সামনে আমাকে কি ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে?

ওয়াং। নিশ্চয়ই। ওঁরা যেন বুঝতে না পারেন তুমি কিভাবে জীবিকা চালাও। আমরা নিচে অপেক্ষা করছি তুমি তাহলে সেই লোকটির সঙ্গে বাইরে যাবে না তো?

শেন্‌টে। গত কয়েক দিন কিছুই রোজগার হয়নি। কালকে ঘরভাড়া দিতে না পারলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে।

ওয়াং। এই শুভক্ষণে টাকার চিন্তা মনে স্থান দিও না।

শেন্‌টে। জানি কি করব---খিদেয় যখন পেট চোঁ-চোঁ করে তখন অন্য কথা মনে আসতে চায় না। যাই হোক, ওঁদের আমার বাড়ীতেই আশ্রয় দেব।

(জানলা বন্ধ করে দেবে)

১ম দেবতা। নাঃ, এখানে আশ্রয় পাবার কোন আশাই নেই।

(দেবতারা ওয়াং-এর দিকে এগিয়ে যাবেন)

ওয়াং। (হঠাৎ ওঁদের পেছনে দেখতে পেয়ে চমকে উঠবে) আপনাদের রাতের জায়গা ঠিক হয়ে গেছে।

(হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছবে)

২য় দেবতা। তাই নাকি? তা-হলে যাওয়া যাক।

ওয়াং। তাড়া কি ধীরেসুস্থে গেলেই হবে। ঘরটা একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে।

৩য় দেবতা। আমরা এখানেই বসে একটু অপেক্ষা করি।

ওয়াং। এখানে বড্ড লোকের ভিড়---চলুন রাস্তার ওপারে যাওয়া যাক।

২য় দেবতা। না, এখানে বসেই লোকের যাতায়াত দেখি। এই কাজের জন্যেই আমরা এসেছি।

(ওঁরা রাস্তার ধারে বসবেন, ওয়াং একটু দূরে বসবে)

ওয়াং। একজন মহিলার বাড়িতে আপনারা থাকবেন---উনি একলা থাকেন এবং ওঁকে খেটে খেতে হয়। সেজুয়ান শহরের সেরা মহিলা বলতে এই মহিলাকেই বোঝায়।

৩য় দেবতা। খুবই ভাল কথা।

ওয়াং। (দর্শকদের প্রতি) আমার জলপাত্রটা তুলে নেওয়ার সময় দেবতারা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আপনাদের কি মনে হয়, তাঁরা কিছু বুঝতে পেরেছেন? আর ওঁদের মুখের দিকে তাকাতে আমার সাহস হচ্ছে না।

৩য় দেবতা। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ওয়াং। সামান্য, অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয় তো।

১ম দেবতা। এখানকার লোকেরা জীবনকে কিভাবে নেয়---খুব কষ্টকর লাগে?

ওয়াং। ভাল লোকেদের তাই লাগে।

১ম দেবতা। তোমার নিজের কেমন লাগে?

ওয়াং। আপনারা কি জানতে চান বুঝতে পেরেছি। আমি ভাল লোক নই। তবে আমারও এখানকার জীবনকে দুর্বিষহ বলে মনে হয়।

[এবার একজন ভদ্রলোক শেনটের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াবে এবং কয়েক-বার শিস দেবে---প্রত্যেক শিসের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াং চমকে উঠতে থাকবে]

৩য় দেবতা। (মৃদুস্বরে) মনে হচ্ছে লোকটি এবার হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ওয়াং। (সব কিছু যেন গুলিয়ে গেছে) তাই তো মনে হচ্ছে।

[ওয়াং লাফিয়ে এগিয়ে আসবে-তার জলপাত্র বহন করার দণ্ডটি পেছনে পড়ে থাকবে---ওয়াং উইংস দিয়ে বেরিয়ে যাবে---শেনটে দরজা খুলে মৃদুস্বরে 'ওয়াং' বলে ডাকবে তারপর স্টেজের অন্যধার দিয়ে ওয়াং-এর খোঁজে যাবে। ওয়াং এদিক থেকে মৃদুস্বরে 'শেনটে' বলে ডাকবে---কোন জবাব না পাওয়াতে]

ওয়াং। আমাকে বিপদে ফেলে ও চলে গেছে। ও গেছে বাড়ী ভাড়ার টাকা রোজগার করে আনতে। মহৎ ব্যক্তিদের স্থান দেবার মত জায়গা কোথায় পাই। পরিশ্রান্ত হয়ে ওঁরা

এখানে অপেক্ষা করছেন। আমি আর ওঁদের কাছে গিয়ে বলতে পারি না---দুঃখিত, আশ্রয় মিলল না। আমি যে আঁস্তাকুড়ে থাকি, সেখানে তো আর ওঁদের নিয়ে যেতে পারি না। তা ছাড়া আমি যে জোচ্চর সে কথাও বুঝতে পেরেছেন। আমার সঙ্গে ওঁরা থাকবেনও না। জলপাত্র বইবার দণ্ডটা পড়ে রইল। ওদিকে আর যাব না। সব পারি। যাঁদের ভক্তি করি, তাঁদের একটু সাহায্য যখন করতে পারলাম না, তখন ওঁদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়াই ভাল।

[হঠাৎ কেটে পড়বে। শেন্‌টে ফিরে এসে ওকে খুঁজতে থাকবে ---তার দৃষ্টি দেবতাদের দিকে পড়বে]

শেন্‌টে। আপনারাই কি সেই মহৎ দেবতারা? আমার নাম শেন্‌টে। আমার ছোট ঘরটিতে যদি এসে রাতের মত আশ্রয় নেন, আমি বাধিত হব।

[illegible] দেবতা। জলবিক্রেতা কোথায় গেল?

শেন্‌টে। তাকে তো দেখতে পেলাম না।

[illegible] দেবতা। ও বোধ হয় ভাবল তুমি আসবে না, তাই আমাদের কাছে কি বলবে ভেবে সরে পড়েছে।

৩য় দেবতা। (দণ্ডটি তুলে নিয়ে) এটি যত্ন করে রেখে দিও---ওর পরে দরকার হবে।

[এরপর শেন্‌টের সঙ্গে ওঁরা ভেতরে ঢুকবেন---আলো নিভে যাবে এবং অল্পক্ষণবাদে জ্বলবে। ভোরের আবছা আলোয় শেন্‌টে লণ্ঠন হাতে ওঁদের পথ দেখাচ্ছে। দরজার বাইরে এসে ওঁরা বিদায় নেবেন]

১ম দেবতা। প্রিয় শেন্‌টে, তোমার অতিথিপরায়ণতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা কখনও ভুলব না যে, তুমি আমাদের রাতের আশ্রয় দিয়েছিলে। জলবিক্রেতাকে তার দণ্ডটা ফিরিয়ে দিও। তাকে বোলো মহত্ত্ব এমনি সৎ মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দেবার জন্য আমরা তার কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শেন্‌টে। প্রভু আমি সৎ নই। আপনাদের কাছে আমার একটা স্বীকারোক্তি করবার আছে। ওয়াং যখন আপনাদের আশ্রয় দেবার কথা বলেছিল, আমি ইতস্তত করেছিলাম।

১ম দেবতা। ইতস্তত করার জন্যে কোনো অপরাধ হয়নি। কারণ দ্বিধাকে শেষ পর্যন্ত তুমি জয় করেছিলে। তুমি তো শুধু আমাদের রাতের আশ্রয়ই দাওনি সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু দিয়েছ। অনেকেই সন্দেহ করেছেন---এর ভেতর দেবতারাও আছেন---যে পৃথিবীতে আজকাল আর সদ্ব্যক্তি বলে কেউ নেই। এ ব্যাপারটা যাচাই করবার জন্যেই আমরা সফরে বেরিয়েছি। আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছি যে, তোমার মতো একজন সৎ মানুষের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। বিদায়।

শেন্‌টে। প্রভু একটু অপেক্ষা করুন। আমি সৎ একথা আমি জোর দিয়ে কি করে বলি। আমি ভাল হতে চাই, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো ভাল হওয়া যায় না। বাড়িতে থাকি, সুতরাং বাড়ির ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু টাকা পাব কোথায়? আমি আপনাদের কাছে স্বীকার করছি জীবিকার্জনের জন্যে আমার নিজেকে বিক্রি করতে হয়, তাতেও যা আয় হয় তাতে চলে না---কারণ আরও অনেকে বাধ্য হয়ে এ কাজ করছে---সুতরাং অন্য কাজ পেলে তখনই নিতাম। এ পথে যারা এসেছে সবাই তাই করতে। আপনাদের সব কিছু বিধি-বাঁধন - নির্দেশ মেনে চলতে চাই---কিন্তু সময় সময় বাধ্য হয়েছি---

১ম দেবতা। সৎ লোকের মনেই এ সব দ্বিধা আসে শেনটে। জলবিক্রেতাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিও। সে আমাদের সত্যিকার বন্ধুর কাজ করেছে।

২য় দেবতা---ওর প্রতি আমরা কোনো মহত্ত্ব দেখাবার সুযোগ পেলাম না।

৩য় দেবতা। তোমার মঙ্গল হোক।

১ম দেবতা। সব সময় সৎ থাকবার চেষ্টা করবে---শেনটে, আচ্ছা বিদায়।

[তাঁরা যাবার উদ্যোগ করবেন এবং হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানাবেন]

শেনটে। কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে যে নিশ্চিন্ত হতে পারি না---কি করে সৎ থাকব বলুন, সমস্ত জিনিষের যখন আগুনের মতো দাম---

২য় দেবতা। অত্যন্ত দুঃখিত। ও বিষয়ে আমাদের হাত বাঁধা। অর্থনীতির ব্যাপারে আমাদের মাথা গলাবার উপায় নেই।

৩য় দেবতা। দাঁড়াও। এক মিনিট। একে কিছুটা আর্থিক সুবিধা করে দিলে, এর ভাল থাকবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধে হবে।

২য় দেবতা। ওকে তো আমরা কিছু দিতে পারি না। দিলে উপরে ফিরে গিয়ে সেজন্য আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

১ম দেবতা। কেন দিতে পারি না?

(তিনজন দেবতার কিছুক্ষণ সলা-পরামর্শ হবে)

১ম দেবতা। শেনটে, আমরা জানি বাড়িভাড়া দেবার টাকা তোমার হাতে নেই। আমরা গরীব নই---সুতরাং এখানে রাত্রে থাকার জন্যে তোমাকে খরচ বাবদ টাকা দেব এটাই স্বাভাবিক। এই নাও (শেনটেকে অর্থ প্রদান) কিন্তু কারোকে একথা জানিও না। লোকে ভুল বুঝবে।

[দেবতারা বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে যাবেন এবং ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসবে]

[ক্রমশ।

অনুবাদক—অশোক সেন

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

আনমনে
—সুধীরকুমার নাথ

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

ভাদ্র	আশ্বিন
বিষয়	বিষয়
চোখ	জনারণ্য

প্রথম পুরস্কার ২০৲ ২য়—১৫৲ ৩য়—১০৲

প্রতিযোগিতার ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ

২২-এ শ্রাবণ

বন্দী
—হৈমন্তী দাশগুপ্তা

নতুন প্রভাত —বিন্দুশেখর বিশ্বা

দূরের যাত্রা —দীপঙ্কর সেন

পাঠশালা

—বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যা

(৩য় পুরস্কার)

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম, বিষয়বস্তু ও ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না!]

একা
—দীপক চক্রবর্তী

মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ / '৭৫
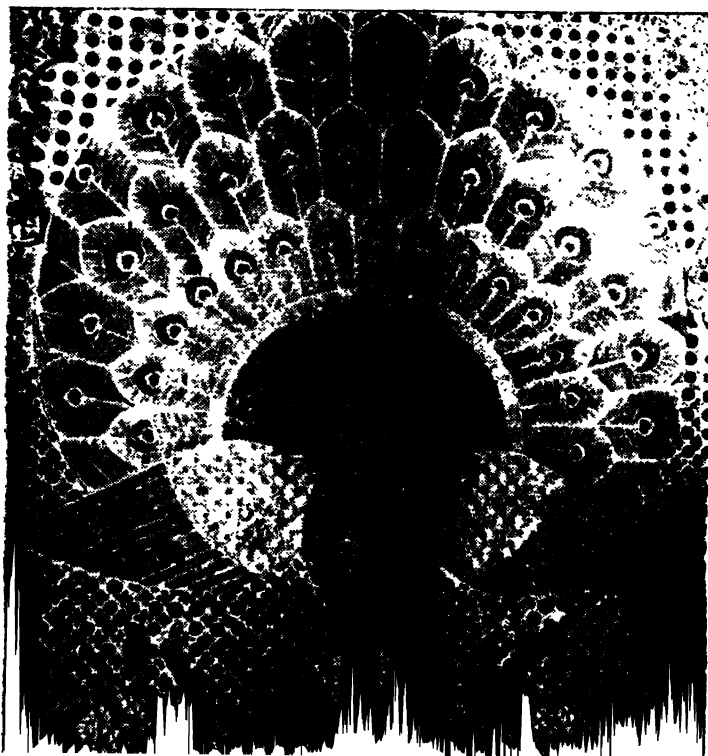
কারুকাজ
—নন্দলাল দে

—মৃণাল রায়

(১ম পুরস্কার)

।। পাঠশালা ।।

—চিত্রজিৎ ঘোষ

(২য় পুরস্কার)

[ছবি বর্ধিত আকারে ও গ্লসি কাগজে পাঠাবেন]

যৌন জ্ঞান

কোন যুবতীর প্রণয়াসক্ত যুবককে সেই যুবতীর বাবা রাতটা তার মেয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে অনুরোধ করলে সে নিশ্চয় অবাক হয়ে যেত। কোনও অতিথি এই অনুরোধ শুনলে আরও বেশি অবাক হতেন। ঔপনিবেশিকতার প্রথম পর্যায়ে আমেরিকায় এটি চালু ছিল।

চালু ছিল প্রাচীন ভারতেও। তার প্রমাণ আমরা ঔপনিষদিক গল্পে আর মহাকাব্যে পাই।

সে যাক্। আধুনিক যুগে আমেরিকার পিউরিটান্‌রা যারা 'যৌন-জীবন সম্পর্কে বিশেষ ছুৎমার্গী, এই প্রথাটি সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করত। এর নাম 'বানড্লিং'। বিপ্লবের পর এ প্রথা খুব তাড়াতাড়ি লুপ্ত হয়ে গেলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পেন্‌সিলভ্যানিয়ায় এর অস্তিত্ব ছিল।

'বান্ড্লিং'-এর শেষ পর্যায়ে, বিশেষত পেন্‌সিলভ্যানিয়ায়, পুরুষ এবং নারীকে পৃথক রাখার জন্য বিছানার মাঝখানে একটি বাধা স্থাপন করার রেওয়াজ চালু হয়। এর নাম 'বান্ডলিং বোর্ড।' বান্ড্লিং-এর সময় এটি দেশের অন্যান্য অংশে সাধারণত ব্যবহৃত হত না। এ ছাড়া, 'স্লিপিং ব্যাগ', এবং ঐ জাতীয় জিনিষ কোমরে, বুকে, পায়ে বাঁধা হত। প্রায়ই দু'জনকে কন্যার বাবা-মা ঐ ঘরে নিজেরা পৌঁছে দিতেন।

আপাতদৃষ্টিতে 'বান্ড্লিং'-এর ফলে গর্ভসঞ্চার ছিল বিরল ঘটনা। কোন যুবতী গর্ভবতী হলে, তার শয্যাসঙ্গী, তাকে বিয়ে করবে বলে আশা করা হত। সে যাই হোক্, এই সব পুরুষের প্রতি বাবা-মার বিশ্বাস ছিল অসীম। গভীর ধর্মপ্রবণ মানুষ এটিকে সম্মানজনক প্রথা হিসেবে পালন করতেন।

শুনলে অবাক লাগে, কিন্তু সে যুগে সোফা বিছানার তুলনায় বেশি বিপজ্জনক বিবেচিত হত। ধারণা ছিলো সোফায় অবৈধ প্রেমচর্চার সুযোগ মেলে ঢের বেশি, তাই 'সোফা-প্রেম' ছিল বহুনিন্দিত। তাদের চোখে সোফা শয়তানের আবিষ্কার।

বাস্তব কারণেই 'বান্ডলিং' গ্রাম অঞ্চলে বেশিমাত্রায় প্রসারিত হয়েছিল। গ্রাম্য বাড়ির ঘর বেশ ছোট, বিছানা নামেমাত্র এবং জ্বালানীর পরিমাণও করুণ।

তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকা সাধারণত 'বান্ডলিং'-এর আশ্রয় নিত, কারণ অন্যথায় ছোকরাটিকে হাঁটুসমান বরফ ভেঙে অনেকখানি রাস্তা ঠেঙিয়ে বাড়ি যেতে হত। আলো আর উত্তাপের অভাব থাকায় তা পুষিয়ে যেত শয্যার উষ্ণতায়। অতিথিদেরও বাড়ির কন্যা বা অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে একই বিছানায় রাত কাটানর অনুরোধ জানান হত। ক্ষুদ্রাকৃতি হোটেল এবং সরাইখানা বহু দূরে দূরে ছড়ান সহরে ছিল। ফলে এখানেও বিছানা ভাগ করতে হত। 'গ্রুপ বান্ড্লিং'ও এককালে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

তবে 'বান্ডলিং'-এর সবটাই বাস্তব প্রয়োজনসম্ভূত হয়। গল্প আছে, দু'টি যুবক একটি বাড়িতে থামল। সে বাড়িতে দুটি বোন। মাঝরাতে তারা ঘোড়া, গাড়ি রাস্তায় ... তাদের বাড়িতে কাটানর জন্য পীড়াপীড়ি করল। ঘর দেখে তারা ভাবলে তারা দু'জন একটা ঘরে আর বোন দু'টি অন্য ঘরে রাত কাটাবে। যখন শুনল মেয়ে দু'টির সঙ্গে তাদের দুজনকে রাত কাটাতে হবে, তারা রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিল।

এদেরই একজন গল্পটি বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলছে—মেয়েটি একটা বিশেষ গাউন গেরো বেঁধে পরেছিল। আবার রাত হলে তার ঐ গেরো যুবকটি খোলার চেষ্টা করায় মেয়েটি প্রচণ্ড ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। যুবকটি ঠাণ্ডা হয়ে থেকেছিল চুপচাপ। তখনকার চাষী-মেয়েরা আজকালকার মেয়েদের তুলনায় বলিষ্ঠতর ছিল, তারা জানত কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হয়।

দেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকায় 'বান্ডলিং' প্রথা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। চার্চগুলো এর বিরুদ্ধে দাঁড়াল, দাঁড়াল সহরের শিক্ষিত মানুষ। জেলাগুলো সমৃদ্ধ হওয়ায় বাড়ির আকৃতিও গেল বেড়ে, ঐ প্রথার উপযোগিতাও তাই এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে গেল। বিপ্লব এল। অনেক কিছুর সঙ্গে 'বান্ডলিং'ও বিপ্লবের ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন। একদিনে নয়, শতখানেক বছর ধরে ধাপে ধাপে নানা ঘটনাচক্রের আবর্তনে এই প্রথা লোপ পায়।

আমেরিকার প্রাথমিক ঔপনিবেশিকদের কেউ কেউ এই প্রথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রথাটির উৎপত্তি য়ুরোপ-এর প্রাচীনতম দেশগুলোয়। জার্মানী আর হল্যাণ্ড-এ এ প্রথা কোন না কোনরূপে ছিল। শেষেরটিতে এব

নাম ছিল 'কুঈ সাকিং'। মার্টিন লুথার-এর শিক্ষার পর অধিকতর ধর্মীয় উদারতার অন্যতম ফলস্বরূপ 'বানডলিং'-এর উদ্ভব। গির্জা ধর্মীয় সম্মিলন থেকে 'সিভিল কনট্রাক্ট'-এ রূপান্তরিত হওয়ায় যুবকদের ক্রমেই ভালবাসাবাসির ব্যাপারে অধিকতর সুযোগ দেওয়া হতে লাগল। হল্যাণ্ড -এ বাগদান হল আক্ষরিক অর্থে 'ট্রায়াল ম্যারেজ', পরীক্ষামূলক বিবাহ।

জার্মান প্রোটেস্ট্যাণ্ট ডাচ্-রা পেন্সীলভ্যানিয়ায় এই প্রথাটি চালু করে। ক্রমে এটি নিউ ইংল্যাণ্ড স্টেট গুলোয় ছড়িয়ে পড়ল, হাড্‌সন্ নদী পর্যন্ত ছড়াল ন্যু ইয়র্ক স্টেট মাধ্যমে, নিউ জেরেসী ইত্যাদি অংশেও তা একইভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। ১৬৩৪-এ প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের যুগে 'বান্‌ডলিং' চালু হয়।

একই ধরণের প্রথা—নাম 'নামজাড্‌বেজ্'—আফগানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আফগানিস্থানের কোন যুবতী যদি তার প্রেমিক বা প্রশংসাকারীর উপকার পছন্দ করত তা হলে তাকে আমন্ত্রণ জানাত তার সঙ্গে রাত কাটানর জন্য। এটি ছিল বিশুদ্ধ ভদ্রজনোচিত আমন্ত্রণ যৌন আলিঙ্গন চলত না এ ক্ষেত্রে।

এসবিমো পুরুষ এবং নারী একই আচ্ছাদনের মধ্যে প্রায়ই উষ্ণতার জন্য প্রবেশ করে। কেন আগন্তুক ঠাণ্ডার মধ্য দিয়ে এলে তাকেও একই জায়গায় শুয়ে উষ্ণ হতে আমন্ত্রণ জানান হয়। আমেরিকা-র মতই এইসব অঞ্চলে একত্রে রাত কাটানর প্রথার উদ্ভব উষ্ণতা লাভের ইচ্ছা, যৌন আকাঙ্ক্ষা নয়।

উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও এই ধরণের একটি প্রথার অস্তিত্ব ছিল। তরুণ যোদ্ধা তার প্রেমিকার তাঁবু বা কুটীরে গিয়ে সূর্যাস্তর পর বুড়োদের নেভান আগুন জ্বালিয়ে একটুকরো কাঠ ধরাত। তারপর সে যেত প্রেমিকার বিছানা অভিমুখে, প্রেমিকা ফুঁ দিয়ে কাষ্ঠখণ্ড নিভিয়ে দিলে সে তার বিছানায় শুয়ে পড়ত; কম্বল দিয়ে প্রেমিকার মুখ ঢাকার অর্থ সে তার সঙ্গীকে গ্রাহ্য করে না।

প্রথাটি আধুনিক মানুষের চোখে বিচিত্র, এমন কি হয়ত কিছুটা অশ্লীলও বটে। আজকের নৈতিক মানদণ্ডে এর মূল্যায়ন যাই হোক না কেন, এ প্রথা মানব-সভ্যতার একটা ধাপের অংশ বিশেষ এবং সেই ভাবেই এর বিচার বিশ্লেষণ হওয়া উচিত।

—বাৎস্যায়ন

বার্ধক্যে যৌনতা

সাম্প্রতিককালে বয়স এবং যৌনতা সম্পর্কে নতুন ধারণা হয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে ষাট বা ঐ বয়সের লোকদের বলা হয় 'তৃতীয় যৌন পর্যায়'-ভুক্ত। পঞ্চাশোত্তরে যৌনক্ষমতা রীতিমত হ্রস্ব হতে থাকে ক্রমানুয়ে, তাই এই সচেতনতা।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌন গ্ল্যাণ্ডগুলোর ব্যর্থতা বাহ্যিক উত্তেজনার ঘাটতি থেকে বেশি বোঝা যায়, গ্ল্যাণ্ড-এর তন্তুগুলোর সক্রিয়তা নষ্ট হওয়ায় ততটা নয়। প্রকৃতপক্ষে ষাট পেরোলে পিট্যুইটারী, অ্যাড্রেনল, থাইরইড জাতীয় যৌন গ্ল্যাণ্ডগুলো একটা বিশেষ ভাবে কাজ করে বলে মনে হয়।

অনেক ক্ষেত্রে এই বয়সেও এ-গুলোর সক্রিয়তা যৌবনের মতই অটুট থাকে। সুতরাং 'তৃতীয় যৌন পর্যায়'-ভুক্ত মানুষ যৌন অক্ষমতার জন্য ঐ অবস্থায় আসেন না, এর কারণ তাঁদের স্বয়ং আরোপিত হেতু আর অভ্যাস।

বয়স্কদের জীবন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা তাঁদের পূর্বাচরিত যৌনজীবন স্বাভাবিকভাবে বজায় রাখার আশ্বাস দিয়েছেন।

এই শতকের গোড়ায় য়ুরোপ, আমেরিকার লোক মনে করতে অভ্যস্ত ছিল যে, মেয়েরা ঋতুবন্ধে যৌনতাহীন আর পুরুষ চল্লিশের পর যৌনজীবন চুকিয়ে দেয়। কাজেই, মানুষ ওই চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমন সব যৌন-আচরণ গড়ে তুলেছিল যা আজকের চোখে মানসিক বিকার বই নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মহিলারা ঋতুবন্ধ যৌনজীবনের সমাপ্তিসূচক ভেবে চেষ্টা করতেন বুড়ি হতে। তাঁদের চোখে ঋতুবন্ধ অমঙ্গলসূচক—এবার এমন এক জীবন সুরু হল যেখানে যৌনতা অ-স্বাভাবিক। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, জন্মমুহূর্ত থেকে বয়স বাড়তে থাকে এবং বয়স সব সময় আপেক্ষিক, জন্ম দিনের সংখ্যা দিয়েই কেবল তাকে মাপা চলে না।

প্রকৃতপক্ষে বয়সের ফলে হঠাৎ এমন কিছু ঘটে না যা দৈহিক যন্ত্রগুলোর ওপর প্রভাববিস্তারী। কার্যকারিতা আর যৌনতার দিক থেকে ঋতুবন্ধের পরও দেহ দীর্ঘকাল পটু থাকে, তবে অসুখ-বিসুখ বা দুর্ঘটনা ঘটলে অবশ্য আলাদা কথা। ষাটোত্তর বহু-সংখ্যক মহিলাকে পরীক্ষা ক'রে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন তাঁদের অনেকেরই —শুনলে বিস্মিত হওয়া সম্ভব—যৌন অঙ্গ স্বাভাবিক, একটুও সঙ্কুচিত নয়। পরীক্ষায় আরও প্রমাণিত হয়েছে এই তত্ত্বগুলো শারীরতত্ত্বের দিক থেকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক।

ভ্যাজিনা এবং বুক ইত্যাদি যৌনাঙ্গ সঙ্কুচিত হয় ঋতুবন্ধের পর যদি মহিলারা যৌনমিলন বন্ধ ক'রে দেন, কিংবা স্বাস্থ্যর অযত্ন করেন, বা অপুষ্টিতে ভোগেন। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক না থাকলে বা মাংসপেশী অযত্নে শিথিল হলেও এমনটা ঘটতে পারে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌন-উত্তেজনায় সাড়া প্রদানে অঙ্গগুলোর কোনও ক্ষতি হয় না। বহু মহিলা মা এবং গৃহিণী

হিসেবে কর্তব্য সমাপনান্তে পূর্ণবয়সে যৌনসাড়া অনুভব করেছেন। এই সময়টা যৌনতার দিক থেকে তাদের জীবনে সর্বাধিক সুখপ্রদ হওয়া খুবই সম্ভব।

কিন্‌সে-র বিখ্যাত প্রতিবেদন 'সেক্‌সুয়াল বিহেভিয়ার ইন হিউম্যান ফিমেল' গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি রয়েছে:

'কিছুসংখ্যক পঞ্চাশ এবং ষাটোত্তর মহিলা, ঋতুবন্ধ যাঁদের অনেক দিন আগে হয়েছে, যৌন ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় তাঁদের কয়েকজনের ডিম্বকোষ দশ থেকে পনের বছর আগে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বের ক'রে দেওয়া হয়েছিল।'

সর্বশেষ মতামত --- চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানবদেহে যা তারপর যৌনক্রিয়ার সমাপ্তি যৌন অঙ্গ বা গ্ল্যাণ্ড-এর কোন পরিবর্তন জনিত নয়, এর মূলে রয়েছে একটা বিশিষ্ট মানসিকতা। ভয় আর দুশ্চিন্তা-কেন্দ্রিক এই মানসিকতা।

বয়স্কদের, বিশেষত মহিলাদের মনে রাখা দরকার যে, বয়স্কতার অর্থ পরিণতি এবং তা মানব জীবনের মূল্যবান সম্পদ।

বয়স হলে মানুষ স্থিত হয়, লোভ সংযত হয় এবং বিচারবোধ সূক্ষ্ম হয়, এগুলো সার্থক যৌনজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রোস্‌ট্যাটিস্‌-এর লক্ষণ ফুটে উঠলে অধিকাংশ পুরুষ মনে করেন, তাঁদের যৌন জীবনের গোধূলি নেমে এসেছে। এখন শুরু হয়ে গেল আলো-ছায়ার খেলা। অধিকাংশই ভুলে থাকেন একটি তথ্য---তারা মাঝে মাঝে বা নিয়মিত প্রোসটেট গ্ল্যাণ্ড-এর প্রদাহ স্ফীতিতে ভোগেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্ল্যাণ্ডটির বড় হওয়ার প্রবণতা আসে ঠিকই, তবে, বিশেষ বড় না হলে কোন যন্ত্রণা বা অসুবিধা হয় না। মোটামুটি শতকরা আটজন (আমেরিকা-য়---আমাদের দেশে এ ব্যাপারে কোনও তথ্য অমিল, অস্ত্রোপচারের সাহায্য নেন; কিন্তু অধিকাংশের দরকার সাধারণ সাবধানতা; হয়ত একটু ম্যাসাজ করলেই গ্ল্যাণ্ডটি আবার সুস্থ আর স্বাভাবিক আকৃতি লাভ করে।

পুরুষের যৌন সুস্থতার প্রতীক প্রোসটেট গ্ল্যাণ্ড---অনেক ডাক্তারের এই মত। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন ঐ গ্ল্যাণ্ড-এর সরল চিকিৎসার সাহায্যে যে সব বয়স্ক পুরুষ নিজেদের যৌনক্রিয়ার অক্ষম ভাবেন তাঁদের সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে দেওয়া যায়। যৌনক্রিয়ারত পুরুষ যন্ত্রণাবশত ক্রিয়ায় বিরতি দিতে বা এমন কি চরম পুলক লাভ করতে অপারগ হওয়ায় নিজেদের যৌন অক্ষমতা সম্পর্কিত চিন্তা তাদের মনে দানা বাঁধে।

যৌন অক্ষমতা আসবেই---এই চিন্তা অল্পবয়সেই মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিশেষত পঁয়তাল্লিশের বেশি বয়সে তা নির্দিষ্ট রূপ নেয়, কেন না তখন থেকে প্রোস্‌টেট-এর সামান্য গোলযোগ দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞ তখন দৈহিক অসুবিধা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে যৌন জ্ঞান দেন এবং তার মানসিক অবস্থাও সুস্থ, বৈজ্ঞানিক চিন্তানুসারী করার চেষ্টা করেন। আগামী দুই বা ততোধিক দশক যখন সম্পূর্ণ যৌনক্রিয়াক্ষম থাকার ষোল আনা সম্ভাবনা, তখনই অসংখ্য পুরুষ নিজেদের অক্ষম ভেবে বসেন।

ষাটোত্তর বয়সে প্রোস্‌টেট্‌-এর স্ফীতি কিছুটা হয় ঠিকই, তবে পুরুষদের জানা দরকার শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ পুরুষের জীবনে ঐ বয়সে এ এক স্বাভাবিক ঘটনা।

মানুষের গড় আয়ু এখন দের বেড়ে গেছে। তাদের যৌনজীবনও একটু সচেতন হলে, দীর্ঘায়িত করা সম্ভব।

বয়স্ক লোকদের যৌনাঙ্গ সম্পর্কে সর্বাধুনিক পরীক্ষার পর জানা গেছে যে, তাদের যৌনাঙ্গ যথেষ্ট বয়স পর্যন্ত পর্যাপ্ত 'হরমোন' উৎপন্ন করতে পারে এবং বৃদ্ধদের 'অরগ্যান রিসেপ্টর' যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। অর্থাৎ, যৌনক্ষমতা এই বয়সেও থাকে এবং থাকে পূর্ণ ক্ষমতায়।

কয়েকটা ক্ষেত্রে 'হরমোন' কমে যাওয়ায় যৌন অক্ষমতা আসে। এ ক্ষেত্রে 'হরমোন' চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ।

ফলকথা, বার্ধক্য আজ আর জীবনের বিভীষিকা নয়। এই বয়সে যৌন অভিজ্ঞতার স্বাদ অপরূপ হতে পারে, যে স্বাদ যৌবনে বা প্রৌঢ়ত্বে কখনও মেলেনি। অনেক বেশিসংখ্যক পুরুষ এবং নারী এ সময় দীর্ঘস্থায়ী যৌন আনন্দ লাভ করেন, যা আর কখনও সম্ভব হয়নি। বৃদ্ধদের যৌন-জীবন সংক্রান্ত জটিলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনোজ, শৈশবাবধি অভ্যস্ত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। দৈহিক কারণ প্রায় শূন্য। এই তত্ত্ব আশা করি, ষাটের পর মানুষকে নতুন ক'রে পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের প্রেরণা যোগাবে।

---স্বাস্থ্যবিদ্

প্রতিমাকে

শংকর চক্রবর্তী

প্রতিমা, তোমার দুটো চোখ
সকালের শান্তির মতন
স্থির দীপ্ত প্রশান্ত আলোয়ে
সে তোমার মন!
তবুও ব্যথায় সিন্ধু নীল
সে সাগর তোমার হৃদয়
অতলান্ত মমতায় মিল

প্রতিমা, হৃদয়ে অমলিন
অনির্বাণ জ্যোতির্ময় আলো
যুগ ক্ষয়ে দীর্ণ—উদাসীন
পৃথিবীতে সেই শিখা জ্বালো—
যে-শিখা ঝড়ের এলোচুলে
স্থির আলো ফেলে ফেলে যায়
অন্ধকার থেকে জ্যোতি

পিক্‌উইক পেপার্স

প

না

(দ্বিতীয় পর্ব)

চার্লস ডিকেন্স

॥ আট ॥

স্যাম এবং শ্রীমতী বার্‌ডেল সমাচার

সবশেষ পরিস্থিতি মনে রাখলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যায় যে পিক্‌উইক-এর পক্ষে আর আগের বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি লম্‌বারড স্ট্রীট-এ নতুন বাসা ভাড়া নিলেন।

একদিন সান্ধ্যভোজের পর তিন গেলাস পোর্‌ট খেয়ে হাতমুখ মুছতে মুছতে পিক্‌উইক ডাকলেন, 'স্যাম।'

'আজ্ঞে ?'

'আমি ক'দিন থেকেই ভাবছি শ্রীমতী বার্‌ডেল-এর বাড়িতে অনেক জিনিস পড়ে আছে। আবার সহর ছেড়ে ওয়ার্‌ডল-এর মেয়ের বিয়েতে যাবার আগেই ওগুলো এনে ফেলা দরকার।'

'যে আজ্ঞে কর্তা।'

'আপাতত টাপ্‌ম্যান-এর বাড়িতে ওগুলো রাখা চলতে পারে। কিন্তু তার আগে সব ভাল ক'রে দেখেশুনে, ঝেড়েপুঁছে ঠিকঠাক করা উচিত।—কি বল ?'

'আজ্ঞে, যা বলেছেন।'

'আমার মনে হয় তোমার একবার গস্‌ওয়েল স্ট্রীট-এ গিয়ে বার্‌ডেল-গিন্নীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যাপারটার একটা গতি করা ভাল।'

'এখুনি ?'

'হ্যাঁ, এক্ষুণি।'

স্যাম যেতে উদ্যত হলে পিক্‌উইক তাকে থামিয়ে কিছু টাকা বের ক'রে বললেন, 'দেখ স্যাম, আমার কিছু ভাড়া বাকি রয়েছে। আর, বড়দিন পর্যন্ত ভাড়াটাও দিয়ে দিও এবং একমাসের এই নোটিশটাও তাঁকে দিয়ে বলো যে তিনি নতুন ভাড়াটে রাখার বন্দোবস্ত করতে পারেন এখন থেকে।'

'তাই হবে কর্তা। ...আর কিছু বলতে হবে কি ?'

'না ঃ ...মানে, না, আর কিছু নয়।'

স্যাম ধীরে ধীরে এগুতে লাগল, কেন না সে জানত 'আরও কিছু' আছে ঠিকই। দরজার বাইরে পা দিতে না দিতেই পিক্‌উইক-এর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'স্যাম।'

'আজ্ঞে', বলে সে ফিরল দ্রুতগতিতে।

'অবশ্য তুমি যদি ও'র সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে মামলাটার কথা তোল...মানে, যদি ...অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি...দূর হোক্ গে ছাই। স্যাম, সোজাসুজি তাঁকে জিজ্ঞেস করবে এই ঘৃণ্য ও মিথ্যে মামলা তিনি চালিয়ে যেতে চান কি না। কৌশলে যদি তাঁর মনের কথা জানতে পার, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, বুঝলে ?'

'আজ্ঞে বুঝেছি বই কি।'

দ্রুতপদে শ্রীমতী বার্‌ডেল-এর গৃহাভি-মুখে রওনা হয়ে প্রায় ন'টার সময় স্যাম পৌঁছল সেখানে। তাকিয়ে দেখল ভোজনকক্ষে আলো জ্বলছে, এবং জানলার শার্সিতে দু'তিনটে মাথার ছায়া পড়ছে। বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে স্যাম বলল, 'অতিথি রয়েছে দেখছি।'

বীরের মত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে স্যাম দাঁড়িয়ে শিস্ দিতে লাগল।

'এই যে রামখোকা, —মা কেমন আছে গো ?'

'খু-উ-উব ভাল—আমিও ভাল,' একগাল হেসে খোকা বার্‌ডেল উত্তর দিল।

'বেশ, বেশ—তাহলে তো জগৎ তুষ্ট। তা, বাপধন, মাকে বল আমি, শ্রীমান স্যামুয়েল ওয়েলার, বড়ই বাধিত হব তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হলে।'

অনুরুদ্ধ খোকা বার্‌ডেল আবার ভোজনকক্ষে ঢুকল।

যে দু'টি নারীমস্তক প্রতিফলিত হয়েছিল জানলার শার্সিতে, সে দু'টির অধিকারী বার্‌ডেল-গিন্নীর দুই সখী—শ্রীমতী ক্ল্যাপিনস্ এবং শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স। তাঁরা একটু সান্ধ্য আলাপ এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া সমাপনান্তে আরাম কচ্ছিলেন আগুনের ধারে বসে। এমন সময় খোকা এসে স্যাম-এর আগমনবার্তা দিল।

তিন সখীর চোখ একসঙ্গে কপালে। বার্‌ডেল-গিন্নী চাপা আর্তস্বরে বলে উঠলেন, 'কি সর্বনাশ! পিক্‌উইক-এর চাকর ?—কি চায় ?'

'কালে কালে হচ্ছে কি !' শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স মাথা নেড়ে সায় দি'ল।

অকস্মাৎ দৃপ্তে শ্রীমতী বার্‌ডেল শিরু

করলেন বিচলিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু কীভাবে এবং কোন উপায়ে বিচলিত হবেন ঠিক করতে না পেরে ছেলেকে ঠেঙান আপাতত কর্তব্য বিধায় তাই করলেন বেশ হাতখুলে। তৎক্ষণাৎ সপ্তসুরে গগনভেদী আর্তনাদ সুরু হল।

'চুপ কর হতভাগা—একদম চুপ!'

'ছিঃ বাবা, মাকে এমন ক'রে বিরক্ত করতে নেই!' এক সখীর মোলায়েম উপদেশ।

'হ্যাঁ, বাবা। এমনিতেই তোমার মা মরমে মরে আছেন, তার ওপর...' বললেন অপর সখী।

'আহা, তাই ত!' প্রথম সখীর কণ্ঠে সমবেদনা ঝরে পড়ল।

খোকার প্রতিবাদ তবুও উচ্চকণ্ঠ।

'এখন আমি কী করি বল ত ?' কিঞ্চিৎ পোর্ট-পানান্তে সবলা শ্রীমতী বারডেল-এর করুণ প্রশ্ন।

শ্রীমতী ক্ল্যাপিন্‌স-এর উত্তর : 'আমার মনে হয় ওর সঙ্গে তোমার দেখা করাই উচিত—কিন্তু একজন সাক্ষীর সামনে।'

তাড়াতাড়ি শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয় দুজন সাক্ষী থাকাটা আরও যুক্তিযুক্ত এবং আইনসঙ্গত হবে।'

'তা হলে...'

সমস্বরে দুই সখী বললেন, 'হ্যাঁ, তাই—এস হে ছোকরা, ভেতরে এস! দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।'

স্যাম ত এক পা বাড়িয়েই ছিল, আবাহনমাত্র বিদ্যুৎবেগে প্রবেশ ক'রে বলল, 'চোর যেমন ঘরে ঢুকে গৃহকর্ত্রীর কাছে প্রথমেই মাফ চেয়ে পরে হাতের কাজ আরম্ভ করেছিল, আমিও তেমনি প্রথমেই ক্ষমা চাচ্ছি আপনাদের অসুবিধে করার জন্য। অবশ্য এর কারণ আমি আর কত্তামশাই আবার সহর ছেড়ে যাচ্ছি শীগ্‌গির।'

'ঠিকই ত, মনিবের দোষের ভাগী এ বেচারাকে ক'রে লাভ কি', শ্রীমতী ক্ল্যাপিন্‌স।

'খাঁটি কথা, হক্ কথা', —শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স।

স্যাম বলে চলল, 'সুতরাং, আমার বক্তব্য হচ্ছে : প্রথম, কত্তার বাড়িছাড়ার নোটিস্, এই নিন; দ্বিতীয়, বাকি ভাড়া দেওয়া—টেবিল-এ রাখলাম; তৃতীয়, কত্তার মালপত্র একসঙ্গে প্যাক করা এবং যখন আমরা লোক পাঠাব, তার হাতে দিয়ে দেওয়া; চতুর্থ, আপনাকে বলা যে, আপনি যখন ইচ্ছে আপনার ঘর ভাড়া দিতে পারেন।'

চোখে রুমাল দিয়ে যথারীতি একটু ফুঁপিয়ে বারডেল-গৃহিণী বললেন, 'যাই ঘটুক না কেন, একথা আমি সবসময় বলেছি এবং বলব যে—একটা ব্যাপারে ছাড়া শ্রীযুত পিক্‌উইক-এর মত ভদ্রলোক সারা লন্ডন শহরে মেলে না। আর, টাকাপয়সার ব্যাপারে ত কথাই নেই—ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড-এর মত নিরাপদ।'

স্যাম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কেন না সে জানত মেয়েরা কথা বলবেই—তাকে কষ্ট ক'রে প্রশ্ন করতে হবে না। অনতি-বিলম্বেই শ্রীমতী ক্ল্যাপিন্‌স মুখ খুললেন।

'আহা বেচারা!'

'যা বলেছ বোন, হৃদয়টা ওর বড়ই আহত হয়েছে।'

স্যাম চুপ ক'রে রইল—মনে মনে বলল, 'এইবার!'

ক্ল্যাপিন্‌স-হৃদয়ানন্দবর্ধনকারিণী সুরু করলেন, 'যখনই মনে পড়ে বুড়ো কী রকম জোচ্চুরি করেছে, আমি আর সহ্য করতে পারি না—গা জ্বালা করে আমার। বুঝলে ছোকরা, আমার সময় সময় ইচ্ছে হয় তোমার কর্তাকে মুখোমুখি বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিই!'

'অত্যন্ত শুভ ইচ্ছা', স্যাম গম্ভীরভাবে বলল।

'দেখে প্রাণ ফেটে যায়, চোখে হু হু ক'রে জল আসে! নেয়ে, খেয়ে, শুয়ে,—বেচারার কিছুতেই সোয়াস্তি নেই; কেবল আমরা যখন সমব্যথী হিসেবে এসে দুদণ্ড গল্পগাছা করি সেইটুকু সময় মানুষের মত থাকে,' উনুনে ফুটন্ত কড়াইয়ের দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে শ্রীমতী ক্ল্যাপিন্‌স শেষ করলেন।

'ভয়ংকর অকথা, বীভৎস পরিস্থিতি,—করুণতম আবহাওয়া', শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স একটুকরো পনির চিবোতে চিবোতে সমর্থন জানালেন।

'আর তোমার কর্তাটি!' রুদ্ধস্বরে শ্রীমতী ক্ল্যাপিন্‌স বলে চললেন, 'কেমন ধারা লোক গো? এত টাকাপয়সা আছে, একজনের জায়গায় পাঁচজন স্ত্রী থাকলেই...মানে...আমি বলছি যে দু'একজন লোক পুষতে তাঁর কি কষ্ট গো! শয়তানটা বেচারাকে বিয়ে ক'রে ফেলুক না কেন?'

'হ্যাঁ', স্যাম বলল, 'সেইটেই হচ্ছে আসল কথা—কেন?'

'কথা! বটে! হত বারডেল আমার মত ত বুঝতে কাকে কথা বলে! ...তবু যা হোক্ আমাদের মত নিরাশ্রয়, অবলা স্ত্রী-লোকদের সাহায্য করার মত লোকও সংসারে আছে বলে রক্ষে! না হলে তোমার কর্তার মত বদমাইসরা ত দেশটাকে জংগল ক'রে ছাড়ত এতদিনে!'

এতক্ষণ কথা বলে হাঁফিয়ে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা—এখন বেশ হাতভরতি পনির নিয়ে মুখে পুরে শ্রম অপনোদনে চেষ্টিত হলেন।

স্যাম মনে মনে ভাবল, 'মামলা ঠিকই চালাবে এরা, তাতে কোন সন্দেহই নেই।'

শ্রীমতী বারডেল এবার টাকার রসিদ হাতের রুমালটা প্রকাশ ক'রে বললেন, 'এই নাও রসিদ। ...আর স্যাম, পুরনো দিনের কথা মনে ক'রে যদি একটু পোর্ট পান কর, তাহলে খুবে খুসি হব।'

স্যাম ত' একপায়ে খাড়া। স্যামকে এক-গেলাস দিয়ে তিনি নিজেদের জন্য আরও তিন গেলাস ঢাললেন।

চোখ কপালে তুলে শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স বললেন, 'এ কি করছ তুমি? ...খাওয়ার আগেই পোর্ট?'

চমকে উঠে শ্রীমতী বারডেল বললেন, 'আমার মাথার ঠিক নেই ভাই।'

'বেচারা, মাথার আর দোষ কি?'

স্যাম বুঝল সবই, এবং তৎক্ষণাৎ বলল 'খাবার আগে কিছুতেই সে মদ্যপান করবে না, যদি না কোন মহিলা তার সঙ্গে পান করেন।'

খুব হাসাহাসি, গা ঠেলাঠেলি, আর ফিস্‌ফিসানি আরম্ভ হয়ে গেল। শেষে শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স অসীম সাহসের সঙ্গে শ্রীযুত ওয়েলার-এর সম্মানার্থে গেলাসটা তুলে ঢক্‌ঢক্ ক'রে গলায় ঢেলে দিলেন, এবং তা দেখে অন্য দুজন মহিলাও তাঁদের গেলাস শূন্য করলেন। আবার হাসাহাসি সুরু হল।

শ্রীমতী বারডেল অল্প কেসে একটু লাল হয়ে স্যাম-কে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয়ই জান?'

'কিছু কিছু কানে এসেছে ঠিকই—কিন্তু আমাকে আর কে বলবে বলুন?'

'সকলের সামনে দাঁড়িয়ে এ-সব কথার আলোচনা করতে হবে ভেবে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি, কিন্তু তুমিই বল, এ ছাড়া আমার আর কী-ই বা করার ছিল! আমার উকিলরা বলছে আমার জয় অবশ্যম্ভাবী। কী যে হবে, কে জানে।'

এই বিলাপ বাক্যে শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স এত বিচলিত হয়ে পড়লেন যে তক্ষুণি আর একগ্লাস পোর্ট খেয়ে তবে সুস্থ হলেন। পরে তিনি বলেছিলেন ওরকম চট্‌পট্ যদি তিনি পোর্ট পান না করতেন ঐ সময়, তা হলে নির্ঘাৎ মূর্চ্ছা যেতেন!

স্যাম বলল, 'কবে নাগাদ মামলা উঠবে বলে মনে হয়?'

'হয় ফেব্রুয়ারী, না হয়ত মার্চ মাসে'।

উৎসাহের সঙ্গে শ্রীমতী ক্ল্যাপিন্‌স বলে উঠলেন, 'ওঃ, কত সাক্ষীই না যোগাড় করেছে ডড্‌সন আর ফগ—কী চালাক ওরা!'

শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স মাথা নেড়ে সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

'আর যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে ডড্‌সন যা ক্ষেপে যাবে...ভাবতেও ভয় হয়। ধারে মামলা লড়ছে ত—জিতলে টাকা পাবে, হারলে ঘোড়ার ডিম।'

'তবে আমরা জিতবই—কোন সন্দেহ নেই!'

'কিন্দুমাত্র না. একেবারেই না।'

ম্লান হেসে শ্রীমতী বার্‌ডেল বললেন, 'তাই যেন হয়—তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভাই!'

এতক্ষণে স্যাম কিছু বলার অবকাশ পেল। 'কথা হচ্ছে ডড্‌সন আর ফগ-এর মত দয়ার্দ্রচিত্ত উকিলরা যে করুণাপরবশ হয়ে ধারে মামলা ক'রে দিয়ে লোকের উপকার ক'রে,—মানে, মামলা লাগান আর করা যাদের ব্যবসা,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন উপযুক্ত ফল পায়, এবং আমার হাত দিয়েই যেন পায়!'

'আহা, বড় ভাল কথা বলেছ গো! স্যাম বড় ভাল ছেলে।' বার্‌ডেল-গৃহিণী সজল চক্ষে [illegible]

[illegible] চেপে স্যাম বলল, 'আমার দেওয়া [illegible] তারা পায়; এই প্রার্থনাই করি। ...এখন আমি উঠি, পোর্‌ট-এর জন্য অজস্র ধন্যবাদ।'

ফিরে এসে স্যাম পিক্‌উইক-এর কাছে যথাযথ বিবরণ পেশ করল। ডড্‌সন এবং ফগ-এর শয়তানির যা কিছু বুঝতে পেরেছিল তাও বলল. এবং তারা যে ধারে মামলা চালাতে রাজি হয়েছে বলেই শ্রীমতী বার্‌ডেল এগিয়েছেন তাও জানাল গম্ভীরস্বরে।

পরদিন আটর্নি শ্রীযুত পার্‌কার-এর সংগে দেখা ক'রে পিক্‌উইক আরও জানতে পারলেন ডড্‌সন-ফগ-এর কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে।

বড়দিনের উৎসব আসন্নপ্রায়। শীতের আরামপ্রদ আমেজ উপভোগ কচ্ছেন লণ্ডন্‌-এর বাসিন্দারা। শ্রীযুত পিক্‌উইক এবং তাঁর বন্ধুরা ওয়ার্‌ডল-এর নিমন্ত্রণে বড়দিনের সময় ডিংলে ডেল্‌-এ যাবার জন্য প্রস্তুত হতে সুরু করলেন—সেখানে বিয়ের ব্যাপার, কাজেই উপহারাদি কেনার ধুম পড়ে গেল বন্ধুদের মধ্যে।

উন্মুখ হয়ে আছেন তাঁরা আসন্ন উৎসবে যোগদানের জন্য।

॥ নয় ॥
ডিংলে-ডেল-এ বড়দিন

অবশেষে ২২শে ডিসেম্বর সকালবেলা পিক্‌উইক ক্লাব-এর সভ্যবৃন্দ আবার মিলিত হলেন। আসন্ন বড়দিনের উৎসবোজ্জ্বল আনন্দের কথা আলোচনা ক'রে তাঁরা নিজেরাও উচ্ছ্বসিত হচ্ছিলেন সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরা পাখির মত। বড়দিন হাসিখুসি, দয়াদাক্ষিণ্য, আর প্রেমপ্রীতির সময়—পুরনো বছর যেন বিদায় মুহূর্তে সবাইকে উৎসবে আহ্বান জানিয়ে [illegible] কলরোলের সংগে বিদায় নিতে চায়। আমাদের চার [illegible] হৃদয় সকলের মতই—অথবা আরও কিছুটা বেশি—উৎফুল্ল ছিল ঐদিন সকালে।

দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ি [illegible] তিনটে নাগাদ তাঁরা এসে আন[illegible] পরিচিত 'ব্লু লায়ন' হোটেল-এ [illegible] হলেন। পৌঁছে দেখেন তাঁদের পরিচিত মোটা জো-কে —যথারীতি সে খাবার ঘরের আগুনের সামনে বসে ঘুমোচ্ছিল। তাকে খুঁচিয়ে তুলে অভ্যর্থনা জানালেন এঁরা।

'আ রে, জো যে! বেশ ভালই ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, খেয়েদেয়ে আগুনের পাশে বসে তোফা ঘুমটি হয়েছে কর্তা। বাবু পাঠিয়ে দিলেন গাড়ি নিয়ে আপনাদের মালপত্র বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ক'টা ঘোড়াও পাঠাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে নি।

'থাক, আর ঘোড়ায় কাজ নেই', স্যাম অর্ধস্বগতস্বরে বলল।

ধমক দিয়ে পিক্‌উইক স্যাম-কে মালপত্র গাড়িটাতে তুলে দিতে বললেন।

শীতের শুষ্ক অপরাহ্ণে বন্ধুরা পা চালালেন তুরন্ত গতিতে। পত্রহীন, রিক্ত ও বিষণ্ণ বৃক্ষাচ্ছাদিত নির্জন পথ, আসন্ন সন্ধ্যার আগমন আশংকায় ম্লান এবং ধূসর। পায়ের তলায় শুকনো পাতার মর্মর, প্রায়ান্ধকার পথের পাশে শীতার্ত মেটে রঙের ঘাস, আসন্ন গোধূলির ম্লানিমা—সব মিলে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল যে গন্তব্যস্থলে চট্‌পট্‌ পৌঁছনোর আশায় এঁরা অতি দ্রুত চলছিলেন, কোন কথা না বলে।

ডিংলে ডেল-এর গলিতে ঢুকতেই অবশ্য বহু কণ্ঠের কাকলি শোনা গেল এবং অনতিবিলম্বে নারীকণ্ঠের উল্লাস সব কল্লোল ছাপিয়ে 'হুর্‌রে, হুর্‌রে' শব্দে গোধূলির নীরবতা ভংগ করা মাত্র অদূরস্থ গাছের আড়াল থেকে বিহগকুল সশব্দে আপত্তি জানিয়ে উড়ে পালাল।

অভ্যর্থনা সমিতিতে ছিলেন বুড়ো ওয়ার্‌ডল—সদা-প্রসন্ন, সদা-হাস্যময়,—ইসাবেলা এবং তার অনুগত ট্রান্‌ডল, এমিলি এবং অন্তত ১৫।২০ জন যুবতী, তারা পরদিনের আনন্দোৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগত।

আনন্দ-কাকলিমুখরিত পথ দিয়ে সবাই বিজয়ী বীরের মত বাড়ি ফিরলেন।

শ্রীযুত পিক্‌উইক-কে দেখে সবাই খুসি —চাকর-চাকরাণীরা প্রত্যেকে তাঁকে হাসিমুখে সাদর আহ্বান জানাল,—যুবতীদের আন্তরিক অভ্যর্থনার উত্তাপে পাথরও গলে যাওয়া বিচিত্র হত না, এবং কুলুংগিতে বহুদিন বসে-থাকা নেপোলিয়ন-এর প্রতিমূর্তি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে নাচ সুরু [illegible] বিস্ময়ের কিছুই ছিল না।

বুড়ো ওয়ার্‌ডল-এর অতিবৃদ্ধা মা যথারীতি সবচাইতে বড় এবং সেরা চেয়ারটিতে বসেছিলেন স্বমহিমায়, কিন্তু কোনও কারণে সেদিন তিনি রেগে থাকায় কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না। ওঁর ব্যাপারটাই এমন যে, রেগে গেলে কালা হয়ে যেতেন অতিমাত্রায়, এবং মেজাজ খুসি থাকলে কিছু কিছু শুনতে পেতেন।

ঐ রাতটা কাটল খুবই আনন্দে—তাস খেলা শেষ ক'রে মহিলারা উঠে যাবার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত সুমিষ্ট 'আইডার' মদ ব্র্যান্ডি এবং নানা ভারতীয় সুগন্ধী মশলা সহযোগে সেবন করলেন অনেক রাত পর্যন্ত স-রব উৎসাহে। এবং, ফলস্বরূপ সুনিদ্রা ভোগও হল সকলেরই। সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে পিক্‌উইক মহোদয়ের নিদ্রায় কিছু ব্যাঘাত হয়েছিল শ্রীমতী ওয়ার্‌ডেল-এর ক্রুদ্ধ মুখ স্বপ্নে দেখায়; স্নড্‌গ্রাস-এর স্বপ্ন সুমধুর করেছিল এমিলি-র আনত বয়ান, এবং উইংক্‌ল-এর স্বপ্নে লঘুপদে গতায়াত করেছিল কৃষ্ণনয়না, ঘনকৃষ্ণঅলক-গরবিনী এক পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—যার নাম আরাবেলা উইংক্‌ল, এমিলি-র বন্ধু।

সকালে ওঠামাত্র পিক্‌উইক-এর কানে এল কলগুঞ্জন—সারা বাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠেছে বিবাহ-উৎসবের প্রস্তুতিতে। চাকর-চাকরাণীদের অনাবশ্যক যাতায়াত এবং চেঁচামেচি, যুবতীবৃন্দের অকারণ উচ্চ হাসি, এবং পারস্পরিক দোষারোপ—'আঃ, কী কচ্ছিস্‌ রে... খোঁচাচ্ছিস্‌ কেন, একটু দেখেশুনে সেফ্‌টিপিন লাগাবি ত!' —এই, আর না ভাই, আমার বেল্‌ট-টা ভাল ক'রে এঁটে দে না রে'...ইত্যাদি গুঞ্জনে ঘুমোয় কার সাধ্য! অমন যে মোটা জো, সে পর্যন্ত আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে গড়াতে গড়াতে এধার ওধার ঘুরে বোধহয় খাবার সন্ধান করছিল।

ওয়ার্‌ডল-এর বৃদ্ধা মাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে শাটিন্‌-এর ব্রোকেড্‌ গাউন—যা প্রায় তিরিশ বছর বাক্‌সবন্দী হয়েছিল। উত্তেজনায় আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছিল মেয়েরা এবং বাড়ির সামনে সব খামারবাড়ির কর্মচারীবৃন্দ একত্রিত হয়ে গলা ফাটিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল; এবং তাদের গগন-বিদারী নিনাদভীত বিহগকুল সন্ত্রস্ত শব্দ ক'রে উড়ে যাচ্ছিল। সকলের ওপরে স্যাম ওয়েলার-এর কণ্ঠ, সকলের চাইতে তার নৃত্য, উদ্দাম, সবার থেকে বেশি তার উৎসাহ। ইতিমধ্যেই স্যাম রীতিমত জনপ্রিয়।

সংক্ষেপে ডিংলে ডেল-এর গির্জার বৃদ্ধ, বধির পুরোহিত বিবাহকার্য সম্পন্ন করলেন, গির্জার পঞ্জীখাতা অমর হয়ে রইল পিক্‌উইক-এর দস্তখত বক্ষে ধারণ ক'রে; বধূবরণ প্রথম করলেন পিক্‌উইক সশব্দে ত্যকে চুম্বন দিয়ে এবং তার গলায় সুন্দর একগাছি স্বর্ণহার পরিয়ে। সর্বোপরি গির্জার ঘণ্টা যেন পাগল হয়ে বেজে চলেছিল সবাইকে পাগল ক'রে।

মোটা জো-র বড় আনন্দ—এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে ক্রমাগত খেতে খেতে সে আরও

যেন ফুলে উঠল এবং তার কণ্ঠউৎসারিতকারী হাস্য সদাবিকশিত হয়ে সকলের নয়নানন্দ বর্ধন করছিল।

ডিনার এর পর বলনাচ—নিচের তলায় মস্ত হলঘরে হয়েছিল আয়োজন। অবশ্য, আপনারা হয়ত ভাবছেন এ ত স্বাভাবিক, বিয়ের উৎসবে হয়েই থাকে—এর আবার আলাদা বিবরণ দিয়ে হবে কি ?

কারণ আছে। কেন না, এই বোধহয় প্রথম শ্রীযুত পিক্‌উইক তাঁর বিখ্যাত পা-চাপা গেইটার প্যান্ট ছেড়ে ঢিলে প্যান্ট এবং ডোরাকাটা মোজা পরে লোকচক্ষুসম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন! এই ঐতিহাসিক কারণেই সাধারণ নৃত্যোৎসব অসাধারণ হয়ে উঠেছিল সেদিন।

চমকে উঠে ওয়ারডল বললেন, 'সে কি হে, তুমি নাচবে না কি!'

'নিশ্চয়ই—দেখতে পাচ্ছ না আমি নাচের জন্য তৈরি ?'

ঠাট্টার সুরে টাপ্‌ম্যান টিপ্পনী কাটলেন, 'আপনার পায়ে সিল্কের মোজা!'

'কেন নয়, আপত্তিটা কি শুনি ?' পিক্‌উইক-এর কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত।

'না, না, আপত্তি কিসের—কিছু না।'

'তাই বল! আমি ত আপত্তির কোন কারণ দেখি না।'

ঠাট্টার হাসি হাসবার উপক্রম করতে গিয়ে বেগতিক বুঝে টাপ্‌ম্যান ঢোক গিলে চুপ করে গেলেন। বললেন, 'মোজাজোড়া বেশ মানিয়েছে।'

তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পিক্‌উইক দীপ্তস্বরে বললেন, 'আমার ত তাই মত। মোজা হিসেবে এতে আশা করি কোন ত্রুটি নেই তোমার মতে ?'

'কখ্‌খনো নয়, কখ্‌খনো না,' বলতে বলতে টাপ্‌ম্যান দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

ওয়ারডল-এর মাকে সযত্নে ধরে পিক্‌উইক বিজয়ী বীরের মত বললেন, 'তাহলে এখন আমরা তৈরি নিশ্চয়ই ?'

নৃত্য সুরু হল...কিন্তু প্রায় সংগে সংগেই একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আ রে, আরাবেলা অ্যালেন আর উইংকল গেল কোথায় ?'

লাজরক্তিম আরাবেলা এবং বিব্রত উইংকল-কে খুঁজে পাওয়া গেল এক অন্ধকার কোণে।

'কী যে কর বাপু—ঠিক সময় ঠিক জায়গায় না থাকার কারণ কি ?' পিক্‌উইক বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

'কারণ ছিল বই কি,' বিব্রত উইংকল এর অস্পষ্ট উত্তর।

আরাবেলা-র লজ্জারুণ সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আকর্ণ হেসে পিক্‌উইক মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, সুন্দর কারণ তাতে আর সন্দেহ কি !'

সকলেই সরবে হেসে ওঠায় বেচারা আরাবেলা একেবারে লালে লাল।

●

ওয়ারডল পরিবারের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে বড় হলঘরে সকলে সমবেত হলেন ডিনার খেতে। একপাশে গনগনে আগুন যেন ডিসেম্বর-এর প্রচণ্ড শৈত্য অগ্রাহ্য করে বড়দিনের খুসিতেই দাউদাউ করে জ্বলছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী 'মিসলটো' পাতার গুচ্ছ দোদুল্যমান। চলিত রীতি এই যে পত্রগুচ্ছের তলায় যে-কোন লোক যে-কোন মহিলাকে চুম্বন করতে পারেন অবাধে—কাজেই পিক্‌উইক অতি সাবধানে এবং অত্যন্ত সম্মানের সংগে ওয়ারডল-এর বৃদ্ধা মাকে সেখানে সশ্রদ্ধ চুম্বন দিয়ে শুভারম্ভ করলেন। অত্যন্ত সহজে আরাবেলা মিসলটো-র তলায় উইংকল-এর আলিংগনাবদ্ধ হলেন এবং ওয়ারডল-এর মেয়ে এমিলি রহস্যজনক উপায়ে সেই সময়েই স্নডগ্রাস সমভিব্যাহারে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক অকুস্থলে হাজির; স্নডগ্রাস এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে না লাগানর পাত্র নন।

পিক্‌উইক-এর আনন্দোজ্জ্বল মুখ যেন সকলকেই স্পর্শ করেছিল—মিসলটোর গুচ্ছতলে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি মধ্যমণির মত সকলকে আকর্ষণ করছিলেন। যে-কটি যুবতী সেখানে উপস্থিত তারা পারস্পরিক গোপন পরামর্শ করে এক সংগে এসে পিক্‌উইক-কে ঘিরে কেউ গালে, কেউ নাকে, কেউ বা চশমার ওপর সশব্দে চুম্বন বর্ষণ সুরু করল। নারীকণ্ঠের আনন্দ কলরোলের মধ্যে বৃদ্ধ ওয়ারডেল এবং পিক্‌উইক মূর্তিমান প্রফুল্লতা হয়ে বিরাজ করছিলেন—এমন কি, পিক্‌উইক-এর চোখ বেঁধে লুকোচুরি খেলিয়ে তবে মেয়েরা শান্ত হল।

আনন্দোৎসব শেষ হলে ক্লান্ত অথচ পরিতৃপ্ত পিক্‌উইক স্মিতহাস্যে মন্তব্য করলেন, 'চমৎকার, এমনটা না হলে বড়দিন ?'

পরদিন সকালে স্যাম গরম জল নিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকলে তৃপ্ত কণ্ঠে পিক্‌উইক বললেন, 'তারপর স্যাম, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, কি বল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে যারা বেশ গা-গতর মুড়ি দিয়ে থাকতে পারেন তাদের বেশ মজা—যেমন কি না সাদা ভালুক বরফের ওপর লাফালাফি করতে করতে বলছিল।'

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি নিচে যাচ্ছি।'

'যে আজ্ঞে—সেখানে দুজন হাড়কাটা এসেছে।'

'হাড়কাটা ? সে আবার কি ?'

'আজ্ঞে তাও জানেন না ?' হাড়কাটা—মানে ডাক্তার!

হো হো করে হেসে উঠলেন পিক্‌উইক।—'বটে, বটে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে এরা এখনও পুরো নয়—ছাত্র!'

'বেশ বেশ,—আমি এদের বড় ভালবাসি। এরা অত্যন্ত ভদ্র হয়; নানা ধরণের লোকের সংস্পর্শে এসে এদের রুচি-প্রকৃতি সংযত এবং সংহত হয়ে ওঠে।'

'তা হবে, তবে এরা কিন্তু আগুনের পাশে বসে নির্জলা ব্রান্ডির সংগে বাঁশের মত মোটা চুরুট ফুঁকে চলেছে।'

'থাক গে, খেতে দাও। যৌবনের চাপল্য—বুঝলে না? খেতে দাও।'

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পিক্‌উইক নিচে নামলে ওয়ারডেল বললেন, 'এস হে পিক্‌উইক, পরিচয় করিয়ে দিই। এটি বেনজামিন অ্যালেন, আমাদের আরাবেলার দাদা, আর ইনি বেন্-এর বন্ধু—বব্ সয়্যার।'

করমর্দন অন্তে বেন্ আর বব আবার ব্রান্ডি সহযোগে প্রাতরাশ গিলতে সুরু করল, এবং পিক্‌উইক ভাল করে তাদের লক্ষ্য করার সুযোগ পেলেন।

ভদ্রতা করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'অনেক দূর থেকে আসছেন বোধহয় ?'

'না, কাছাকাছিই থেকে।'

'সে কী, তবে কাল রাত্রে আসেন নি কেন—কত আনন্দ হত!'

'হয় ত তাই, কিন্তু ওখানকার হোটেল-এ ব্রান্ডিটা বড় খাসা ছিল, তাই আসতে পারলাম না—কি হে বব, বল না!'

'ঠিক কথা, খাঁটি কথা।'

কথা বলে সময় নষ্ট করার ছেলে এরা নয়, কাজেই এক নিঃশ্বাসে শেষ করেই দুই বন্ধু নির্জলা ব্রান্ডির গ্লাস-এ মনঃসংযোগ করল। পিক্‌উইক অবাক হয়ে দেখলেন কেমন নির্বিবাদে গ্লাস-এর পর গ্লাস চুমুকে চুমুকে মেরে দিয়ে আবার দরাজ হাতে ঢালছে ওরা।

'বব, চটপট হাত চালাও! সুযোগের অবহেলা কোর না!'

'আ রে দূরে ছাই, তাই করার পাত্তর আমিই বটে!'

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বব সয়ার চারদিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল, 'মড়া কাটলে বেশ খিদে পায়।'

'চুপ চুপ,' পিক্‌উইক-এর সাবধান বাণী। 'মেয়েরা আসছেন।'

ততক্ষণে বেন্ অ্যালেন আবার ব্রান্ডির গ্লাস-এ চুমুক লাগিয়েছে।

ইতিমধ্যে স্নডগ্রাস, উইংকল এবং চির-তরুণ টাপ্‌ম্যান-দের সংগে মহিলারা এসে

[illegible] এ কী, [illegible] ব্যাপার?'

'তোমাকে কালকেই বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

উইংকল চমকে উঠে ম্লান হয়ে গেলেন।

'তুমি কি সয়ার-কে দেখতে পাচ্ছ না, [illegible]?'

নিতান্ত নিরুপায় আরাবেলা বব্-এর সঙ্গে করমর্দন করায় তার হাসি যেন কর্ণ উচ্ছিষ্ট করা! এদিকে উইংকল হিংসায় [illegible]।

[illegible] পরিচিতির পালা চুকলে সবাই [illegible] গেলেন উপাসনার জন্য— [illegible] গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল [illegible], এবং বব্ তার চেয়ার-এর [illegible] নিজের নাম অমর ক'রে [illegible]।

[illegible] সেরে প্রচুর বীয়ার এবং [illegible] পানে উৎফুল্লচিত্ত ওয়ারডল [illegible] স্কেটিং করার প্রস্তাব দিলে [illegible] সমর্থিত হল; কেন না, বীয়ার এবং [illegible] ভাগ সকলেই পেয়েছিলেন [illegible]।

[illegible] চড়িয়ে, মাহলাদের সহর্ষ অভ্যর্থনায় উৎসাহিত সকলেই নিজের সাহস এবং সামর্থ্যের পরিচয় দিতে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। বব্ সয়ার এবং বেন্ অ্যালেন দেখাল চমৎকার সব খেলা— বব্ আবার একপায়ে যে-সব বিচিত্র লীলা প্রকট করল এবং মেয়েরা—বিশেষত আরাবেলা—যে-রকম অভ্যর্থনা জানাল তাকে, তাতে বেচারা উইংকল একেবারে জবুথবু হয়ে থাক্। এমন কি বুড়ো ওয়ারডল এবং বেন্ অ্যালেন যোগ ক'রে সুন্দর ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে সকলের মনোহরণ করলেন।

বেচারা উইংকল! কবে একদিন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে বাহাদুরী ক'রে কী বলেছিল, তার ফলে বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে নাকালের একশেষ—আবার আজ স্কেটিং করার চেষ্টায় নাস্তানাবুদ হয়ে লজ্জায় চুপচাপ পলায়ন!

ব্যাপারটার বিশদ বিবরণ দেওয়া দরকার। প্রথমে উইংকল স্কেট্ পরতে গিয়ে উল্টো ক'রে লাগালেন, পরে অবশ্য স্যাম-এর সাহায্যে কোনরকমে পায়ে বস্তুটি লাগান হল।

স্যাম তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও উইংকল তাকে কিছুতে ছাড়তে রাজি নন।

'দাঁড়াও স্যাম, দোহাই তোমার একটু দাঁড়াও ভাই! উঃ, কী পেছল রে বাবা!'

'বরফ তো একটু পেছল হবেই স্যার, যেমন বলেছিল চোর ব্যাটা, ধরা পড়ার পর— চুরি তাকে করতে হবেই!'

টাল পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে [illegible] কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আর স্কেট্টা একেবারেই অকেজো, কী বল স্যাম?'

'আজ্ঞে, ওটার কী দোষ—ওর ওপর যে অকেজো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ...এবার তাহলে সুরু করুন।'

'আরে, আরে, থাম স্যাম, থাম!' সজোরে স্যাম-কে আঁকড়ে ধরে উইংকল আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'ভাই স্যাম, আমার লন্ডন-এর বাড়িতে দুটো লোমের কোট আছে, ওগুলো তোমাকেই দিয়ে দিলাম ভাই।'

'ধন্যবাদ স্যার!'

'আর আজ বিকেলেই তোমাকে বড়দিনের বকশিস্ বাবদ এক পাউন্ড দোব!—ভেবে দেখ স্যাম, পুরো এক পাউন্ড—কর্‌করে কুড়িটি শিলিং'।

'আপনার দয়ার অন্ত নেই স্যার!'

'ঠিক আছে, ওটা থাক। ধন্যবাদ চাই না, শুধু আমাকে ছেড়ে দিও না বাপু, বেশ জোর ক'রে ধরে থাকো। আর একটু পরেই আমি শিখে যাবো ভাই!'

অতএব, স্যাম-এর কাঁধে হাত রেখে উইংকল এগোতে লাগলেন সন্তর্পণে, খুব সাবধানে। অপরূপ দৃশ্য!

ইতিমধ্যে ওদিক থেকে পিক্‌উইক হঠাৎ স্যাম-কে জরুরী ডাক দেওয়ায় বিব্রত স্যাম জোর ক'রে উইংকল-এর প্রেমালিংগন ছাড়াতে গিয়ে তাকে হঠাৎ এমন ধাক্কা দিতে বাধ্য হল যে বেচারা উইংকল সবেগে এগোতে এগোতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বব্ সয়ার-এর গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। ফলে, দুজনেই জড়িয়ে পপাত ধরণীতলে! অবশ্য, বব্ তক্ষুণি উঠে দাঁড়ালেও উইংকল বুদ্ধি ক'রে বরফের ওপর বসে ম্লান হাসি হাসতে লাগলো।

হবু ডাক্তার বেন্ অ্যালেন দ্রুত এসে জিজ্ঞেস করল, 'লেগেছে না কি?'

'না, না, এমন কিছু নয়।'

'আমার মনে হচ্ছে লেগেছে! একটু রক্তমোক্ষণ ক'রে দেবো?'

তীরবেগে উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ে আর্তকণ্ঠে উইংকল বললেন, 'না, না, কিছু দরকার নেই!'

'উঁ হুঁঃ, আমার মনে হচ্ছে করলে ভাল হয়!'

'আপনি কী বলেন?'

পিক্‌উইক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। শিকারের কেলেঙ্কারীর পর আবার আজকের ঘটনা তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। তপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন, 'স্যাম, এক্ষুণি ওর স্কেট্ খুলে নাও!'

'আজ্ঞে, আমি এই ত সবে আরম্ভ করলাম।'

ও কথায় আদৌ কান না দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে পিক্‌উইক বলে চললেন, 'স্যাম, খাঁ খালায় ক'রে ফেল। —হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না!'

সুতরাং আদেশ পালন করার জন্য স্যাম উইংকল-কে ধরে দাঁড় করালে তিনি বোকার হাসি হেসে গা থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়তে লাগলেন।

তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে পিক্‌উইক উবাচ—ঐতিহাসিক উক্তিঃ 'তুমি একটি জোচ্চোর!'

কী বলছেন?'

'বলছি, তুমি একটি পুরো জোচ্চোর— যাকে বলে হাম্‌বাগ্, তুমি ঠিক তাই।'

উইংকল হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন কোন কথা না বলে। পিক্‌উইক দৃঢ় পদক্ষেপে অন্যান্যদের কাছে ফিরে গেলেন।

এবার মেয়েরা তাঁকে ধরল স্কেটিং করার জন্য। ওয়ারডল-ও তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। অবশ্য দারুণ শীতে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁরও ইচ্ছে হচ্ছিল খেলায় যোগ দিতে, বিশেষত সেইমাত্র স্যাম স্কেটিং ক'রে বেশ গরম হয়ে ফিরল দেখে তাঁর ইচ্ছেটা প্রবলতর হয়ে উঠল। আমতা আমতা ক'রে তিনি বললেন, 'তোমাদের খুসি করতে পারলে বেশ ভালই হত, কিন্তু তিরিশ বছর পরে পারব কি?'

'তা হোক গে, আপনাকে স্কেটিং করতেই হবে—আমরা ছাড়ব না।' —মেয়েদের কলরোল উচ্ছ্বসিত।

প্রশান্ত হাসি হেসে পিক্‌উইক ওয়ারডল সমভিব্যাহারে বরফের ওপর দিয়ে বয়সোচিত ধীর গতিতে গড়িয়ে চললেন দক্ষতার সংগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এক জায়গায় বরফ ছিল পাতলা, এবং তাঁর ওজনও ফেলনা নয় আদৌ—সুতরাং হঠাৎ চড়চড় ক'রে বড় একটা চাঙড় ভেঙে তিনি জলে পড়লেন সশব্দে! মেয়েরা তীক্ষ্ণ আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, দু'একজন বেশ তৎপরতার সংগে মূর্ছিতও! পুরুষদের দৃষ্টি ভয়ে ফ্যাকাশে, হতভম্ব! স্নডগ্রাস আর উইংকল পরস্পরকে জড়িয়ে এ-ওর বুকে মাথা গুঁজে চোখ বন্ধ ক'রে স্থির। এদিকে টাপ্‌ম্যান বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে গলা ফাটিয়ে 'চোর, চোর!' বলে চেঁচাতে লাগলেন।

একমাত্র ওয়ারডল এবং স্যাম সাবধানে এগোচ্ছিলেন—ইতিমধ্যে পিক্‌উইক ভুস্ ক'রে ভেসে উঠলেন স-চশমা, কিন্তু টুপিহীন। স্নডগ্রাস-এর চিৎকার ভেসে এল, 'দোহাই আপনার, আর ডুববেন না যেন...দোহাই ভগবানের, ভেসে থাকুন!' উইংকল-এর কণ্ঠস্বরও কাঁপছিল, 'ঠিক, ঠিক! আমারও অনুরোধ, দয়া ক'রে আর ডুববেন না!' —যেন তারা না বললে পিক্‌উইক স্বেচ্ছায় ডুবে যেতেন!

ওয়ারডল প্রশ্ন করলেন, 'পা পাচ্ছ ত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জল এখানে খুবই কম।'

উন্ধারেচ্ছু মানুষগুলো এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল। টেনে হিঁচড়ে তাঁকে ওপরে তোলা হলে মেয়েরা তাঁর গায়ে নিজেদের শাল জড়িয়ে দিয়ে স্যাম ওয়েলার-এর হাতে সমর্পণ করল। স্যাম তাঁকে ধরে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হল; তারপর একেবারে ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে গা মুছিয়ে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তবে শান্তি। নিচ থেকে একপাত্র গরম 'পান্‌চ' আনা হলে সেটুকু খেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালেই তাঁর শরীর বেশ ঝরঝরে। হবু ডাক্তার বব্‌ সয়ার বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল এ থেকে প্রমাণ হয় ব্র্যান্ডি সর্বরোগহর। যদি কারও ব্র্যান্ডি খেয়েও অসুখ না সারে ত বুঝতে হবে সে বেকার মত অল্প খেয়েই ছেড়ে দিয়েছে, যথেষ্ট খায় নি।

সেই সকালেই যে যার ঘরে ফিরলেন উৎসব অন্তে। আমাদের নায়করা রাজধানীতে, আরাবেলা তার বাড়িতে এবং বব্‌ সয়ার তার গৃহকোণে। যদিও আরাবেলার বাড়ির ঠিকানা আমরা জানি না, তবে আমাদের দার্শনিক উইংক্‌ল জানত সেই গোপন কথাটি।

॥ দশ ॥

বার্‌ডেল বনাম পিক্‌উইক-এর ঐতিহাসিক মামলা

যে তারিখটি পিক্‌উইক ক্লাব-এর নথিপত্রে অত্যন্ত সাবধানে উল্লিখিত, সেই স্মরণীয় ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সকালে স্নডগ্রাস অ্যাটর্নি শ্রীযুত পার্‌কার-কে কথাপ্রসংগে বলেছিলেন, 'ভগবান জানেন জুরীদের ফোরম্যান সকালে কি খেয়েছে!'

'ঠিক কথা, আশা করি বেশ ভাল প্রাতরাশ তার গিন্নী পরিবেশন করেছে।'

বিস্মিত পিক্‌উইক প্রশ্ন করলেন, 'কেন?' পার্‌কার বললেন, 'অত্যন্ত জরুরী কথা পিকউইক, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সকালে পেট ভরে খেলে মন ভাল থাকে। মেজাজ খারাপ থাকলে সাধারণত জুরীরা বাদীকে সমর্থন করে। তাই বলছিলাম......'

অবাক হয়ে পিক্‌উইক বললেন, 'কিন্তু এমন করে কেন?'

'ঠিক জানি না, তবে মনে হয় যে তাড়াতাড়ি থাকলে চট্‌ করে ছাড়া পাওয়ার সুবিধে হয় বলে বোধহয়। বিবাদীর সমর্থন করতে হলে, নানা যুক্তিতর্ক, নানা আলোচনা ইত্যাদি করা দরকার এবং তাতে সময় বড় বেশী লাগে। ধরুন, ফোরম্যান-এর খিদে পেয়েছে, কিংবা গিন্নীর তাগিদ আছে: সে কী করবে? স্বাভাবিকভাবেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলবে, 'ওঃ, প্রায় পাঁচটা বাজে! কী ঠিক করবেন করুন। আমার মনে হয়—অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত মত মাত্র—আমার মতে বাদী ঠিকই বলছে।' এরপর দেখা যায় সবাই ঘড়ির দিকে তাকায় আর ফোরম্যান্‌-এর মতে মত দিয়ে চট্‌পট্‌ বাড়ি যাওয়ার তাল খোঁজে।'

তারপর পিক্‌উইক বন্ধু এবং অ্যাটর্নি পার্‌কার-এর সংগে আদালতে গেলেন; স্যাম এবং পার্‌কার-এর কেরাণী লোটেন আলাদা গাড়িতে চলল। সেখানে পৌঁছে সকলে যথাস্থানে গিয়ে বসলেন।

সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে আঙুল উঁচিয়ে পিক্‌উইক প্রশ্ন করলেন, 'ওটা বুঝি সাক্ষীদের জন্য?'

'হ্যাঁ।'

জীবনে প্রথম আদালত দেখে হতভম্ব এবং বিচলিত পিক্‌উইক উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। আদালতে সেদিন বেশ লোক জড় হয়েছিল মজা দেখবার জন্য, এবং পরচুলা আর কালো গাউন-পরা ব্যারিস্টারকুল ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যাদের মক্কেল জুটেছিল, তারা হাতে মোটা ব্রীফ্‌ নিয়ে বিকশিতপক্ষ ময়ূরের মত ছন্দোময়, যাদের ব্রীফ্‌ নেই, তারা মোটা মোটা আইন-এর বই বগলে করে বিজ্ঞের মতো তাকানোয় চেষ্টারত।

উকিল, মক্কেল ইত্যাদি মিলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে খোসগল্প করছিল; হাসি-ঠাট্টা তামাসামুখরিত আদালতকক্ষের দিকে তাকিয়ে পিক্‌উইক বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন—'লোকগুলো কী অসভ্য—খোসগল্পের কি এই সময়? যেন কোন মামলা-মকদ্দমা নেই এখানে, বাড়ির বৈঠকখানা পেয়েছে যেন।'

আমাদের নায়কের ব্যারিস্টার ফাংকী-সাহেব এসে ঢুকলেন: তারপর লাল থলথলে নাসা বাজ্‌ফাজসাহেব প্রবেশ করে ফাংকী-সাহেবের করমর্দন ক'রে অভ্যর্থনা জানালেন। বাজ্‌ফাজ যেহেতু বিপক্ষের উকিল, সুতরাং সে কোন্‌ সাহসে স্বপক্ষীয় উকিল-এর সাথে হাসি-তামাসা করে, এই ভেবে পিক্‌উইক উত্তেজিত হয়ে পার্‌কারকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন,—ইতিমধ্যে ব্যারিস্টাররা এবং উপস্থিত অন্যান্যরা সকলে উঠে দাঁড়ালেন এবং কম্বুকণ্ঠে একজন উর্দিপরা কর্মচারী চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ কর, সবাই চুপ কর।' এবং ধীরপদে জজসাহেব এসে বসলেন। জজসাহেব খর্বকায় এবং স্থূলবপু—ঘাড়ে গর্দানে একেবারে এক। গড়াতে গড়াতে এসে টুপ্‌ করে একবার পানকৌড়ির মত অভ্যর্থনাসূচক ভংগী ক'রেই চেয়ারে বসলেন—শুধু মাথাটি টেবিলের উপরে দেখা গেল।

উর্দিপরিহিত কর্মচারী আবার 'চুপ' বলে চিৎকার ক'রে উঠল, প্রতিধ্বনির মত আরও দু'চারজনও 'চুপ, চুপ' বলে তারস্বরে ঘোষণা করাতে আগের চাইতে বেশী গোলমাল। অদ্ভুত অবস্থা!

জজসাহেবের ঠিক নিচে আধময়লা কালো পোষাকপরিহিত একজন কর্মচারী জুরীদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন—দেখা গেল যে ১০ জন মাত্র উপস্থিত। উপস্থিত লোকেদের মধ্য থেকে তাই একজন মুদী এবং একজন ঔষধব্যবসায়ীকে ধরা হল জুরী হিসেবে।

'রিচার্‌ড আপ্‌উইচ', কালো পোষাক ডাকল।

'আ—আজ্ঞে হাজির।'

'টমাস গ্রিফিন।'

'হাজির।'

'বেশ এই বাইবেল ছুঁয়ে শপথ নাও...'

ওষুধের কারবারী টমাস গ্রিফিন জজ-সাহেবকে বললেন, 'হুজুর ধর্মাবতার, আমাকে মাফ্‌ করা হোক্‌।'

'কি কারণে?'

'আজ্ঞে হুজুর, আমার কোন সহকারী নেই বলে।'

'তার জন্য আদালত দায়ী নয়—তোমার সহকারী নিয়োগ করা উচিত ছিল।'

'আমার ক্ষমতা নেই হুজুর—পয়সা নেই।'

'থাকা উচিত ছিল।' রেগে জজসাহেব উত্তর দিলেন।

'আজ্ঞে উচিত ছিল তা জানি, কিন্তু ভগবান বিমুখ হলে কী করব বলুন।'

রাগে লাল হয়ে জজসাহেব হুকুম দিলেন, 'একে শপথ গ্রহণ করান হোক।'

'শপথ গ্রহণ করতে হবে? ...ভাল কথা, তাহলে এ বিচার শেষ হবার আগেই খুন হবে দুটো চারটে।' বলে অম্লানবদনে টমাস শপথ গ্রহণ করল।

শপথ গ্রহণান্তে আসনে বসতে বসতে টমাস আবার বলল, 'আমি শুধু হুজুরকে এই নিবেদন করতে চাচ্ছিলাম যে, আমার দোকানে একমাত্র ছোকরা চাকর আছে। ছেলেটি ভাল, কিন্তু ওষুধবিষুদ সম্বন্ধে কোন কাণ্ডজ্ঞান তার নেই, এবং সোডি বাই কার্ব-এর বদলে যদি পটাসিয়াম সায়ানাইড বা অক্‌সালিক অ্যাসিড দিয়ে দেয়, তার জন্য আমি আর দায়ী থাকলাম না, দায়ী থাকল এই আদালত।'

এই কথাগুলো অম্লানবদনে বলে বেশ আরাম ক'রে ঠেস্‌ দিয়ে বসে টমাস ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে তাকিয়ে রইল। পিক্‌উইক-এর ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী ক্লাপিন্‌স সমভিব্যাহারে শ্রীমতী বার্‌ডেল এসে বাতাসে নোয়ানো কলাগাছের ভংগীতে বসে পড়লেন—পেছনে সহানুভূতিসূচক শব্দ করে ডড্‌সন এবং ফগ্‌ শ্রীমতী বার্‌ডেল-এর ছাতা এবং দস্তানা বয়ে আনছিলেন। বাচ্চা মোরগগুলো যেমন তাদের মাকে ঘিরে আদর করে, ঠিক তেমনি

ডড্‌সন, ফগ্‌ এবং শ্রীমতী ক্লাপিন্‌স শ্রীমতী বার্‌ডেল-কে ঘিরে সহানুভূতি প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যাতে জুরীদের দৃষ্টি তাদের ওপর পড়ে। ঠিক তার পরেই শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স খোকা বার্‌ডেল কে নিয়ে এসে উপস্থিত হওয়ামাত্র সম্মোহিতের মত চমকে উঠে শ্রীমতী বার্‌ডেল ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন এবং ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আমি কোথায় ?' ডড্‌সন, ফগ্‌ এবং দুই বন্ধু সমস্বরে 'আহা হা' করে উঠলেন এবং উচ্চস্বরে তাকে অনুরোধ করলেন শান্ত হতে। শ্রীমতী স্যান্‌ডার্‌স মুখ ফিরিয়ে ফোঁপাতে শুরু করলেন এবং দু'একজন জুরী সশব্দে নাক ঝাড়তে লাগলেন। বেশ বোঝা গেল ডড্‌সন আর ফগ্‌-এর এই চালে সুফল ফলেছে।

শ্রীযুত পার্‌কার বললেন, 'কী বুদ্ধিমান ডড্‌সন। আহা. কেমন চাল চেলেছে দেখেছ! একেই বলে অ্যাটর্নি।'

খোকা বার্‌ডেল-এর কপালে এত আদর বোধহয় জীবনেও জোটে নি। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুল আঁচড়িয়ে, চুমু খেয়ে জামার বোতাম খুলে আবার পরিয়ে দিয়ে—বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। সবশেষে তাকে ঠিক তার মা'র সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। চড়চাপড়ের বদলে অতিরিক্ত আদরে হতভম্ব ছেলেটা এমন ফ্যালফ্যাল করে করুণ নয়নে তাকাচ্ছিল যে, উপস্থিত দর্শকদের মধ্যেও অনেকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

শ্রীযুত পার্‌কার আবার বলে উঠলেন, 'সাবাস ডড্‌সন, সাবাস ফগ্‌! খাসা চাল চেলেছে, চমৎকার।'

কালো পোষাক চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন, 'বার্‌ডেল বনাম পিক্‌উইক।'

বিশালবপু শ্রীযুত বাজ্‌ফাজ উঠে বললেন, 'ধর্মাবতার, আমি বাদীর পক্ষে।'

'আপনার সহকারী কে ?'

সলজ্জ হাসি হেসে শ্রীযুত স্কিমপিন মাথা নুইয়ে জানালেন তিনিই সহকারী।

শ্রীযুত ফাংকী এবং স্নাবিন যথানিয়মে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা বিবাদীর পক্ষে।

জজসাহেব নিজের নোটবুকে নামগুলো টুকতে টুকতে ফ্যাসফেসে গলায় আপন মনে বললেন, 'বাজফাজ ও স্কিমপিন বাদীর পক্ষে, স্নাবিন ও মাংকী বিবাদীর পক্ষে।'

'আ...আজ্ঞে হুজুর, নামটা ফাংকী,—মাংকী নয়।'

'ও, আচ্ছা। আপনার নামটা এর আগে কোনদিন শুনি নি কি না তাই।'

বোকার হাসি হেসে ফাংকীসাহেব লজ্জারুণ বদনে কাগজপত্র নিয়ে অতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন—আদালতে তখন চাপা হাসির ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল।

কালো পোষাক এবং তার প্রতিধ্বনিরা যথারীতি আবার প্রাণপণে চুপ চুপ বলে চিৎকার করে উঠল, এবং জজসাহেব মামলা আরম্ভ করতে আদেশ দিলেন।

বাদীর পক্ষে স্কিম্‌পিন উঠে মিনিট তিনেক ধরে মিনমিন করে কি বললেন তা তিনিই জানেন—কেন না, জুরীদের মুখ দেখে মনে হল না যে তারা কিছু বুঝতে পেরেছেন।

তারপর বাজ্‌ফাজমশাই 'বিশাল দ্রুম ইব' উঠে দাঁড়ালেন সগর্বে এবং ডড্‌সন ও ফগ্‌-এর সঙ্গে সামান্য কথা বলে সওয়াল সুরু করলেন।

বাজ্‌ফাজ বললেন যে তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতায়ও তিনি এমন গভীরভাবে কোন মামলার দ্বারা বিচলিত হন নি। যখন তিনি বর্তমান মামলার কথা প্রথম শোনেন এবং বিশদ বিবরণ পান, তখন তাঁর নয়নে অশ্রু সঞ্চারিত হয়েছিল এবং তিনি মাত্র চার কাপ কফি খেতে পেরেছিলেন প্রাতরাশের পর। এ থেকেই তিনি আশা করেন যে মাননীয় জুরীরা বুঝতে পারবেন কী গভীর মনোবেদনার সঙ্গে আজ তাঁকে বিবাদীর শয়তানির কথা বর্ণনা করে সদাশয় জুরীদের কোমল হৃদয়ে আঘাত করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে! তিনি প্রার্থনা করছেন সহৃদয় জুরীরা তাঁর এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ যেন মার্জনা করেন।

খোসামোদে ভগবান তুষ্ট—কয়েকজন জুরী এর মধ্যেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে লিখতে আরম্ভ করলেন—কি, তা তাঁরাই বলতে পারবেন।

বাজ্‌ফাজ বলে চললেন, বাদী অসহায় বিধবা, আহা, দুর্ভাগা নারী! পরলোকগত বার্‌ডেল—যাঁকে সে দেখেছে সেই ভালবেসেছে এবং যিনি ছিলেন পত্নী ও একমাত্র পুত্রের একমাত্র অবলম্বন—তিনি হঠাৎ মারা গেলেন পত্নী এবং নাবালক শিশুপুত্রকে অকূলে ভাসিয়ে। আজ্ঞে হ্যাঁ, মারা গেলেন—বিবেচনা করুন একবার। একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অসহায় নারী অন্য হাতে ছেলের হাত ধরে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলেন গস্‌ওয়েল স্ট্রীটের ক্ষুদ্র একখানি বাড়িতে। কী করে যে স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন খোকা বার্‌ডেল-কে বাঁচিয়ে রাখবেন—এই তাঁর একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ধ্যান।

বাজ্‌ফাজ একটু থামলেন, পকেট থেকে রুমাল বার করে নাটকীয় ভঙ্গীতে চোখ মুছলেন। তারপর ম্লানমুখে চারিদিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর নামিয়ে আবার সুরু করলেন : 'বিবেচনা করুন আপনারা—কী প্রলয়ঙ্কর অবস্থা, কী ভয়াবহ, কী হৃদয়-বিদারক ব্যাপার। সংসারসমুদ্রে ভাসমান এক নিরাশ্রয় বিধবা এবং অন্যের একমাত্র নিধি নাবালক পুত্র। ওঃ, ভাবতে গা শিউরে ওঠে, হৃদয় বিচলিত হয়, নয়ন হতে অশ্রু স্বতঃই নির্গত হতে থাকে।

'ঠিক সাল তারিখ জানি না, তবে যতদূর জানা যায়, আজ থেকে প্রায় তিন বৎসর পূর্বে সজল নয়নে এই অসহায় স্বামীহারা মহিলা দুরু দুরু বক্ষে তার ঘরের জানলায় একটি নোটিশ ঝুলিয়েছিলেন—'ঘর ভাড়া আছে। —অবিবাহিত ভদ্রলোক-এর আবেদন সর্বাগ্রে গ্রাহ্য।'

সহায়সম্বলহীন বিধবার স্মৃতিপটে সর্বদা জাগরূক থাকত পরলোকগত শ্রীযুত বার্‌ডেল-এর ছবি। পুরুষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল তার মৃতস্বামীর আচার-ব্যবহারের মত। তিনি ছিলেন স্বভাব-ভদ্রলোক, এবং বিধবা সকল পুরুষকেই তার মত মনে করতেন। তিনি মনে মনে বিচার করলেন, 'বার্‌ডেল ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি কাউকে ঠকান নি কখনও ; তিনি যখন আমার কিশোরী হৃদয় জয় করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন অবিবাহিত ভদ্রলোক। অতএব আমি অবিবাহিত ভদ্রলোককেই ঘর ভাড়া দেব—আর কাউকে নয়।

এই ভেবেই অসহায় বিধবা দুরু দুরু বক্ষে নোটিশটি টাঙিয়েছিলেন। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি—শয়তান কাছেই লুকিয়েছিল, পায়ের তলার ঘাসের মধ্যেই সর্প লুক্কায়িত, আগুন লাগান গেল। তিনদিনের মধ্যেই দ্বিপদবিশিষ্ট এবং আকৃতিতে মানুষের মত এক ঘৃণ্য জীব—'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্' এক মনুষ্যাকৃতি দানব—এসে উপস্থিত হয়ে ঘরে ঢুকেছিল। এই জীবটি—এই মনুষ্যাকৃতি শয়তানই হচ্ছে পিক্‌উইক—বর্তমান মামলার বিবাদী।

এতক্ষণ বকবক করে বাজ্‌ফাজ হাঁপিয়ে উঠে থামলেন, এবং সহসা তাঁর কণ্ঠস্বর নীরব হওয়াতে জজসাহেবের দিবানিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। চমকে উঠে তিনি তাড়াতাড়ি কলম তুলে লিখতে সুরু করলেন, যদিও কলমটা দোয়াতে ডোবাতে ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর বিকট ভ্রূভঙ্গী করে চারদিকে তাকালেন।

মুখ মুছে হাঁফ ছেড়ে বাজ্‌ফাজ আবার বলতে সুরু করলেন, 'পিক্‌উইক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমি বলব না, কেন-না ব্যাপারটা মোটেই রুচিকর নয়। আমার বা আপনাদের কারুরই এত রুচিবিকৃতি ঘটে নি যে শয়তানি, জালজুয়াচুরী বা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ শুনে আনন্দ পাব।

এতক্ষণ পিক্‌উইক রাগে ফুলছিলেন—এবারে আর থাকতে না পেরে ঠেলেঠুলে উঠে দাঁড়ালেন ; বোধহয় সুযোগ পেলে

বাজ্‌ফাজকে [illegible]। পার্‌কার এবং স্যাম তাঁকে জোর করে ধরে আবার বসিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা পুরোপুরি লক্ষ্য করে বাজ্‌ফাজ যেন আরও উৎসাহিত হলেন, বললেন, 'আমি শয়তানি' কথাটা ব্যবহার করেছি। আমি আবার বলছি—আপনারা বিবেচনা করে দেখুন—ব্যাপারটা পুরোপুরি দুশ্চিন্তিত এবং পরিকল্পিত শয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়! এবং এ কথা বলে আমি দৃঢ়ভাবে জানাতে চাই—বিবাদী যদি আদালতে থাকেন ত তিনিও শুনে রাখুন —কোন প্রকার ভীতিপ্রদর্শন বা আর কিছুতেই আমি সত্য কথা বলতে ছাড়ব না'—টেবিল সজোরে চাপড়ে—'না, কিছুতেই না। ...অবশ্য, বিবাদী যদি মানুষ হয় বা বিন্দুমাত্র লজ্জাও তার থাকে, তবে তার পক্ষে আদালতে না থাকাই বাঞ্ছনীয়—যদিও, তার ক্রিয়াকলাপ ভাবলে তাকে 'মানুষ' বা 'ভদ্রলোক' কোন বিশেষণেই অভিহিত করা যায় না।'

সরলা, অবলা, নিরালা ও একেলা—শ্রীমতী বারডেল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছেন মনুষ্যরূপী শয়তান পিক্‌উইক-এর পরিচর্যায়। রান্না করা, পোশাকপত্র দেখাশুনো, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা, খাওয়ান, মোজা সেলাই করা, বিছানা ক'রে দেওয়া—কি না করেছেন ভদ্রমহিলা! উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ দ্বারা আমি মহামান্য আদালতের সমক্ষে প্রমাণ করব যে আসামী অনেক সময় দু'চার পয়সা দিয়ে খোকা বারডেল-কে হাতে টানবার চেষ্টা করেছে; এমন কি সময় সময় একটাকা পর্যন্ত দিয়েছে। একদিন,...ভাবতেও ঘৃণায় শিউরে উঠতে হয়...একদিন খোকার মাথায় হাত দিয়ে আদরের ভান ক'রে পিক্‌উইক বলেছিল—বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনুন জুরী মহোদয়গণ—'কি খোকা, আর একজন বাবা হ'লে কেমন হয় গো, অ্যাঁ?'

'আসামীর তিন বন্ধুর সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণ করব একদিন আসামী আমার মক্কেলকে আলিঙ্গন ক'রে আদর করছিল!'

বাজ্‌ফাজ থামলেন। মুখ মুছে, চশমা মুছে তিনি আস্তে আস্তে পকেট থেকে ছোট্ট দু'টুকরো কাগজ বের ক'রে ডান হাতে সেটি তুলে ধরে নাটকীয় ভঙ্গীতে জুরীদের দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, 'এ হচ্ছে দু'খানি চিঠি, যা আসামী আমার মক্কেলকে লিখেছিল। পত্র দু'খানি থেকেও আসামীর ঘৃণ্য ও কুটিল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমি আপনি যেমন সহজ খোলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি—এ তা নয়; প্রতিটি কথা গোপন ও ক্রুর মনের পরিচায়ক।

প্রথমখানি শুনুন, 'প্রিয় শ্রীমতী বারডেল, চপ আর টমেটো সস।'—এর মানে কি? 'চপ'!...আবার 'টমেটো সস'! জুরীমহোদয়গণ, এক সরলা অবলা নারীর হৃদয় নিয়ে এই নিদারুণ খেলা কি আপনারা বরদাস্ত করবেন? —কখনই না!

'পরের খানিতে কোন তারিখ নেই—অর্থাৎ ঘোরতর সন্দেহজনক! 'প্রিয় শ্রীমতী বারডেল, আমি আগামীকাল বাড়ি আসব—বিছানা গরম রাখবার দরকার নেই।'

'আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বিছানা গরম কেন? কে কবে বিছানা গরম [illegible] মাথা ঘামিয়েছে? শ্রীমতী বারডেল-[illegible] 'বিছানা গরম' রাখবার ইঙ্গিত করার [illegible] কি অশ্লীলতা নয়, যদি না—বেশ [illegible] বুঝুন—যদি না তাদের পরস্পর মধ্যে বোঝাপড়া আগেই হয়ে থাকে, [illegible] এটা ভাবী স্বামী স্ত্রীর রহস্যালাপ ছাড়া [illegible] কী হতে পারে তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসছে না। 'বিছানা গরম'! হাঃ হাঃ, জুরী মহোদয়গণ—বেশ কিছুদিন যাতে আর তার বিছানা গরম করতে না হয় তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আপনারা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে—হাঃ হাঃ!'

তাঁর এই রসিকতায় জুরীরা হেসে উঠলেন এবং আদালতেও মুচকি হাসির বন্যা বয়ে গেল।

'আহা, একবার ভাবুন বেচারার কথা! সব আশা নির্বাপিত, তার রোজগার বন্ধ —সে আর মা'র সঙ্গে লুকোচুরি খেলে না, তার মারবেলগুলো অবহেলিত, [illegible] লাটাই ধুলো কুড়োচ্ছে; ম্লানমুখে সে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আর প্রতিবেশীর শান্তি ভঙ্গ করে না।

'এ সবের জন্য দায়ী কে? নিরাশ্রয়া, দুঃস্থা নারীর সাজান বাগান এমন নির্মম হস্তে ধ্বংস করল কে?' ...ডান হাত বাড়িয়ে পিক্‌উইক-এর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বাজ্‌ফাজ বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছাড়লেন, 'দায়ী ওই আসামী, ওই ভদ্রবেশী শয়তান, যে অসহায়া নারীর জীবনকে ঊষর মরুতে পরিণত করেছে, আশাতরুর গোড়ায় ছাই দিয়েছে—পিক্‌উইক, [illegible] পাষাণ, পিক্‌উইক, যে তার বিছানা [illegible] করতে চায়; পিক্‌উইক যে [illegible] গোপন [illegible] ! অথচ সে [illegible] নির্লজ্জের মত [illegible]।

[illegible] এমন লোককে [illegible] ছাড়া [illegible] সমাজ [illegible]!'

[illegible] বাজ্‌ফাজ আসন [illegible] নিদ্রাভঙ্গ হল।

[illegible] একটু পরেই উঠে বাজ্‌ফাজ নবীন [illegible] নির্দেশ দিলেন: 'এলিজাবেথ ক্লিপিন্স-কে ডাকা হোক।'

[illegible] কাছের পেয়াদা গাঁক [illegible] ডেকে উঠল, 'এলিজাবেথ [illegible] একটু দূরে আর

পিক্‌উইল-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন

আদালতের দরজার বাইরে দিয়ে গলা ফাটিয়ে স্ন্যাপিন্‌স'কে আহ্বান জানাল।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী স্ন্যাপিন্‌স ধীরে সুস্থে মুখ মুছে, জামাকাপড় গুছিয়ে, ছাতাটি ঝেড়েপুঁছে মুড়ে শ্রীমতী বার্‌ডেল, শ্রীমতী স্যান্‌ডারস এবং ডড্‌সন ও ফগ সমভিব্যাহারে কোনরকমে গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হলেন—নিচে স্মেলিং সল্‌ট-এর শিশি এবং রুমাল নিয়ে শ্রীমতী বার্‌ডেল প্রস্তুত, তাঁর পাশে শ্রীমতী স্যানডার্‌স ছাতা হাতে যে কোন অবস্থার জন্য তৈরী হয়ে দণ্ডায়মান।

অতি কোমল, মধুক্ষরা কণ্ঠে বাজ্‌ফাজ বললেন, 'প্রিয় শ্রীমতী স্ন্যাপিন্‌স, শান্ত হোন —বিচলিত হবেন না।'

অতএব তৎক্ষণাৎ মহিলা যথারীতি অঝোরে কাঁদতে সুরু করলেন এবং শ্রীমতী বার্‌ডেল স্মেলিং সল্‌ট-এর শিশি ও রুমাল নিয়ে লাফিয়ে কাঠগড়ায় উঠলেন।

'আপনার নিশ্চয়ই গত জুলাই মাসের একদিন সকালের কথা—যখন শ্রীমতী বার্‌ডেল আসামীর ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলেন—মনে আছে?'

'আজ্ঞে, খুব মনে আছে! ও কথা কি ভুলি ?'

'ওদিন, ওখানে আসামীদের ঘরের পাশের ঘরে আপনি কেন গিয়েছিলেন?'

'হুজুর ধর্মাবতার, আমি মিথ্যে বলব না—সত্যিই বলব!'

জজ সাহেব ভ্রূকুটি করে মন্তব্য করলেন. 'তাই হলেই ভাল!'

'ধর্মাবতার, আমি ওখানে গিয়েছিলাম শ্রীমতী বার্‌ডেল-এর অজ্ঞাতসারে। ওদিন আমি একখানি ঝুড়ি নিয়ে তিন পাউন্‌ড মাংস কেনবার জন্য রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখি শ্রীমতী বার্‌ডেল-এর দরজা হাঁ করা।'

জজ সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কি বললে ? [illegible] করা? দরজা আবার হাঁ করে কী [illegible] ?'

বাজ্‌ফাজ বুঝিয়ে বললেন, 'হুজুর উনি বলছেন যে দরজাটা আংশিক খোলা ছিল।'

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জজ সাহেব মন্তব্য করলেন, 'না, তা তো নয়! সাক্ষী বলেছে 'হাঁ করা!'

'হুজুর—ও একই কথা।'

জজ সাহেব ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন এবং নোট বইয়ে কি যেন লিখলেন গম্ভীরভাবে।

সাক্ষী আবার সুরু করলেন, 'ধর্মাবতার, আমি দরজা খোলা দেখে দুটো কথা বলার জন্য ঢুকলাম এবং সোজাসুজি ওপরে উঠে গেলাম। উঠেই—সত্যিকথা বলব হুজুর—গলার আওয়াজ পেলাম।'

'হুজুর ধর্মাবতার, অমন কথা আমার মনেও হয়নি—বিশ্বাস্‌ সত্যিকথা বলছি হুজুর, কথা হচ্ছিল এত উঁচু গলায় যে কানে ছিপি আঁটা থাকলে শুনতে পাওয়া যেত।'

'বেশ, বেশ,—তা'হলে আপনি ইচ্ছে করে শোনেন নি, আপনাকে শুনিয়েছিল! ঐ কণ্ঠস্বরের একটি ছিল আসামীর, কেমন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক কথা!—মিথ্যে বলব না!'

এবং এর পরে ইনিয়ে বিনিয়ে শ্রীমতী স্ন্যাপিন্‌স সেই ঐতিহাসিক কথোপকথন-এর পুনরাবৃত্তি করলেন, যা আমরা আগেই জেনেছি।

জুরীদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। পিক্‌উইক-এর পক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন যে তাঁর মক্কেল স্বীকার করছেন যে মোটামুটি কথাবার্তা ঐ রকমই হয়েছিল।

'নাথানিয়েল উইংক্‌ল হাজির!' —উর্দি-পরা চাপরাসী তারস্বরে ডাকল।

'উইংক্‌ল হাজির!' —সাথী প্রতিধ্বনি তুলল।

'...হাজির।' —প্রাণপণে চেঁচাল দরজার কাছের চাপরাশি।

ক্ষীণস্বরে, 'আজ্ঞে, এই যে আমি এখানে', বলতে বলতে সঘনকম্পিত তনু উইংক্‌ল কাঠগড়ায় গিয়ে আভূমি সেলাম জানালেন জজ সাহেবকে।

তীব্রকণ্ঠে খর্বকায় জজ সাহেব ধমকে উঠলেন, 'আমার দিকে তাকাবেন না—জুরীদের দিকে তাকান।'

ভীত, সন্ত্রস্ত উইংক্‌ল-এর যেটুকু সাহস ছিল তাও উবে গেল। বেচারা, ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে কম্পমান।

এবারে জেরা করতে উঠলেন স্কিম্‌পিন্‌।

'মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমার কথা দয়া করে! মহামান্য আদালত এবং মাননীয় জুরীদের কাছে নিজের নামটি খাঁটি খাঁটি বলুন তো।' —এই কথা বলে স্কিম্‌পিন্‌ এমনভাবে তাকালেন তার দিকে যেন উইংক্‌ল এমনই অনৃতভাষণে অভ্যস্ত যে পিতৃদত্ত নামটাও পাল্টে বলতে পারে।

'উইংক্‌ল, হুজুর।'

ভ্রূভঙ্গী ক'রে জজ সাহেব বললেন, 'ও তো পদবী—আসল নাম কি ?'

ঘাবড়ে গিয়ে অস্পষ্টস্বরে উইংক্‌ল বললেন, 'আজ্ঞে নাথানিয়েল।'

'বেশ—ডানিয়েল।'

'না-আজ্ঞে না...না...থানিয়েল।'

'ভাল, তাহলে হল 'নাথানিয়েল—ডানিয়েল নয়।'

'তাহলে আমাকে বললেন কেন যে আপনার নাম ডানিয়েল ?

ছাড়লেন, নিশ্চয়ই বলেছি—তা না হলে আমার খাতার 'ডানিয়েল' লেখা কেন ?'

এ সওয়ালের সত্যিই কোন জবাব নেই, কাজেই উইংক্‌ল চুপ করে রইলেন।

বিদ্রুপের হাসি হেসে স্কিম্‌পিন্‌ জুরীদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, "শ্রীযুত উইংক্‌ল-এর স্মৃতিশক্তি কিঞ্চিৎ কম—চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে কি করা যায়।

'আচ্ছা মিঃ উইংক্‌ল, আমার কথা দয়া করে শুনুন এবং জবাব দিন। আপনি আসামীর বিশিষ্ট বন্ধু, তাই না?"

'আজ্ঞে আমার সংগে তাঁর পরিচয় আজ প্রায়...'

'দয়া করে জবাব এড়িয়ে যাবেন না... বন্ধু কি না, তাই বলুন।'

'আমি তাই তো বলতে চাইছি যে অনেকদিন...'

'সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব দেবেন কি ?'

জজ সাহেব পুনরায় ধমকে উঠলেন, 'জবাব না দিলে আপনাকেই আসামী করা হবে।'

'যে আজ্ঞে।'

'তা হলে বলুন,—আপনি আসামীর বন্ধু কি না!'

'আ...আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'বেশ। তা' এ কথাটা একবারে বলতে কি হয়েছিল ? কিছু লুকোবার আছে কি ?...আচ্ছা, আপনি বাদীকে চেনেন কি ?

'পরিচয় নেই, তবে দেখেছি।'

'ও,...দেখেছেন, কিন্তু পরিচয় নেই। দয়া করে জুরীদের বুঝিয়ে বলবেন, এ কথার অর্থ কি ?'

'মানে আমার সংগে তাঁর কোন আলাপ-পরিচয় নেই, তবে শ্রীযুক্ত পিক্‌উইক-এর কাছে যেতে-আসতে আমি তাঁকে দেখেছি।'

'কতবার আপনি তাকে দেখেছেন ?'

'কতবার ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কতবার!...প্রয়োজন হলে একশ'বার আমি প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করতে প্রস্তুত আছি!' বলে কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় কাত করে স্কিম্‌পিন্‌ উইংক্‌ল-এর দিকে তাকালেন।

অতঃপর যা হবার তাই হল। স্বভাবতই উইংক্‌ল ঠিক কতবার শ্রীমতী বার্‌ডেল-কে দেখেছেন, তা বলতে পারলেন না। উকিল প্রশ্ন করলেন, 'কুড়িবার কি পঞ্চাশবার দেখেছেন কি ?' জবাব হ'ল, 'তা' ত হবেই।' বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে উকিল বললেন, 'তবে কেন বললেন জানেন না ? ...সাবধান সাক্ষীমশাই, মনে রাখবেন এটা আদালত, বৈঠকখানা নয়!'

অর্থাৎ, বেচারা উইংক্‌ল-কে এমন

একেবারে ভয়ে-সন্তানাবদ্দে হয়ে গেল এবং বলির পাঁঠার মত থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

বিজয়ীর হাসি হেসে স্কিম্‌পিন্ প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা সাক্ষীমশাই....যেদিনের ঘটনা আদালতের বিচার্য বিষয়, সেদিন সকালে আসামীর ঘরে ঢুকে আপনি কি দেখেছিলেন সত্যি বলুন! ...বলতে আপনাকে হবেই, কাজে কাজেই আর এদিক ওদিক না ক'রে চট্ ক'রে বলে ফেলুন দেখি।'

'মানে...বলছি, স্যার বলছি,' ঢোক গিলে, 'মানে মাননীয় পিক্‌উইক ফরিয়াদীর কোমর জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং আমার মনে হয়েছিল যে ফরিয়াদী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন বলেই তিনি দয়াপরবশ হয়ে...'

'আপনাকে আবার সাবধান করা হচ্ছে যে আপনি যা' দেখেছেন তাই বলুন। কি আপনার মনে' হয়েছিল, তা আদালত জানতে চান নি... সে কথা আপনার মনেই থাক! সত্যিকথা বলতে আপনার এত দ্বিধা কেন বলুন ত?'

'তার মানে? আ......আপনি কি বলতে চান যে আমি মিথ্যে বলছি?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না—শুধু জানতে চাই যে আসল ঘটনাটা কি। আপনি বলবেন, জুরী মহোদয়েরা শুনবেন—আমি নিমিত্তমাত্র।......এখন হলফ ক'রে বলুন, আসামী কি এই কথাগুলো বলেছিল: 'প্রিয়তম শ্রীমতী বারডেল, বিচলিত হয়ো না, এই অবস্থায় যখন বাকি জীবনটা কাটাতে হবে তখন আর......'

প্রবল আপত্তি জানিয়ে উইংকল বাধা দিয়ে বললেন, 'না, না—কখনও না— ওকথা তিনি বলেন নি। তিনি বলেছিলেন ওনাকে সংযত হতে কেননা যদি কেউ এসে পড়ে......' বলতে বলতে জিভ্ কেটে উইংকল লাল হয়ে চুপ করে গেলেন।

'বেশ, বেশ—এই ত' সত্যিকথা বেরোচ্ছে।......আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।'

কথা শেষ হবার আগেই উইংকল প্রায় দৌড়ে নেমে এসে এককোণে গিয়ে ম্লান-মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন কোন কথা না বলে।

টাপম্যান এবং স্নডগ্রাস-এর দশাও প্রায় একই রকম হল।

শ্রীমতী স্যান্‌ডারস-এর জেরায় জানা গেল যে তাঁর বিবাহের পূর্বে তিনি প্রেমপত্র পেতেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে, এবং তাতে তাঁর ভাবী স্বামী 'ডাক' বলে সম্ভাষণ জানাত......'টম্যাটো' বা 'চপ' বলে নয়। শ্রীযুত স্যান্‌ডারস্ হাঁসের মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন বলেই তাকে 'ডাক' বলে ডাকতেন,—যদি তিনি 'টম্যাটো' বা 'চপ' ভালবাসতেন তা' হলে হয়ত তাই বলেই সম্বোধন করতেন।

তাঁকে প্রথম বিবাহের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁর মনে হয় যে, যে কোন ভদ্রমহিলাই অনুরূপ অবস্থায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে বাধ্য।

বাজ্‌ফাজ্ বিশাল বপু আন্দোলিত করে বললেন, 'স্যামুয়েল ওয়েলারকে ডাকা হোক।'

প্রথম চাপরাশী হাঁকবার আগেই চটপট জামাকাপড় ঝেড়ে স্যাম স্মিতবদনে কাঠগড়ায় গিয়ে নিজেই বাইবেলখানি টেনে নিয়ে গড়গড় করে শপথবাক্য বলে জুরীদের এবং জজ-সাহেবকে সেলাম জানাল।

'নাম?' জজসাহেব প্রশ্ন করলেন।

'স্যাম হেবলার, হুজুর!'

'বানান কি? 'ওয়েলার' বা 'হেবলার'?'

'আজ্ঞে, ওটা যে বানান করবে তাঁর রুচির ওপর নির্ভর করে। জীবনে মাত্র দু'বার আমাকে বানান লিখতে হয়েছে এবং দু'বারই আমি 'হেবলার' লিখেছি হুজুর।'

'শুনুন, ওয়েলার!'

'বলুন, কর্তা।'

'যতদূর শোনা যায়, আপনি আসামীর কাছে কাজ করেন। স্পষ্ট করে বলুন, ঘাবড়াবেন না, মিথ্যে বলার চেষ্টা করবেন না, বুঝেছেন।'

'আজ্ঞে না, অত পরিশ্রম আমি করতে পারব না—সোজা সত্যিই বলব কিন্তু।'

'বেশ ভাল কাজ পেয়েছেন, কেমন? কাজ কম, পাওনা বেশি— হেঁ হেঁ।'

'হেঁ, হেঁ, ঠিকই বলেছেন, ঠিক সেই সিপাই-এর মত বলেছেন,—যাকে শ'তিনেক চাবুক মারবার পর সেও বলেছিল, 'আর নয় বাবা, যথেষ্ট হয়েছে।'

জজসাহেব ধমকে উঠলেন, 'কে কি বলেছে তার দরকার নেই......ওসব প্রমাণ গ্রাহ্য নয়।'

'যে আজ্ঞে ধর্মাবতার।'

'বেশ। প্রথম যেদিন আসামীর কাছে কাজ আরম্ভ করলেন, সেদিনের বিশেষ কোন ঘটনার কথা মনে আছে কি?......বেশ ভেবে বলুন।'

'আজ্ঞে, ভাবনার কিছুই নেই—বেশ মনে আছে।'

'বেশ, বেশ! তা' হলে ওয়েলার মশাই, জুরীদের দয়া ক'রে খোলাখুলি বলুন ত কি সে বিশেষ ঘটনা।'

'আজ্ঞে, খুবই স্মরণীয় ব্যাপার। সেদিন আমাকে একপ্রস্থ আনকোরা নতুন পোষাক দেওয়া হয়েছিল; এ ঘটনা তখন আমার কাছে যুগান্তকারী বলেই মনে হয়েছিল হুজুর।'

আদালতে হাসির রোল পড়ে গেল এবং জজসাহেব রুক্ষস্বরে বললেন, 'সাক্ষীকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।'

'ধর্মাবতার, সেদিন আমার কর্তাও তাই পোষাক খুব সাবধানে ব্যবহার করো।'

জজসাহেব মিনিট দুয়েক স্যাম-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন রক্তচক্ষু ক'রে, কিন্তু তার মুখে কোন বৈক্লব্য দেখা গেল না। প্রশান্ত বদনে স্যাম দাঁড়িয়ে রইল।

টেবিলের ওপরের কাগজপত্র ব্যস্তভাবে নাড়াচাড়া ক'রে বাজ্‌ফাজ স্যাম-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা' হলে আপনি বলতে চান যে ওই দিন শ্রীমতী বারডেল-এর মূর্চ্ছা, আসামীর তাকে সাদর আলিঙ্গন ও প্রেমালাপ—এসব কিছুই আপনি দেখেন নি?'

'আজ্ঞে না, আমি বারান্দায় ছিলাম। যখন আমাকে ডেকে পাঠান হ'ল, তখন বুড়ী মা সেখানে ছিলেন না।'

'বটে, বটে।' দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লেখার ভঙ্গীতে কলম ধরে বাজ্‌ফাজ হাঁক ছাড়লেন, 'বারান্দায় ছিলেন—অথচ দেখতে পান নি?...আচ্ছা মশাই, আপনার একজোড়া চোখ আছে, না নেই?'

'আজ্ঞে আছে বৈ কি—এই দেখুন না। তবে, ও দুটো যদি চোখ না হয়ে,' এক্সরে হত তা হলে হয়ত দেয়াল এবং দরজা ফুঁড়ে দেখতে পেতাম। ভগবান নিষ্ঠুর, কাজেই আমি দেখতে পাই নি!'

আবার হাসির ঘটা পড়ে গেল আদালতে—এমন কি জজসাহেবের গোমড়া মুখেও হাসির রেখা দেখা গেল। বেচারা বাজ্‌ফাজ এমন বেয়কুফ বোধহয় হন নি—বিব্রত হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগলেন লজ্জায় লাল হয়ে। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'বেশ বলুন ত মশাই, গত নভেম্বর মাসে একরাত্রে আপনি শ্রীমতী বারডেল-এর বাড়িতে গিয়েছিলেন কি না মনে পড়ে?'

'আজ্ঞে, খুউব মনে পড়ে!'

'আচ্ছা! তা হলে এটা আপনার মনে আছে দেখছি! আমি ঠিকই জানতাম, একটা কিছু পাওয়া যাবেই!'

'আজ্ঞে, আমিও তা জানতাম!' অম্লান বদনে স্যাম জবাব দিল।

'ও, তাই বুঝি!...তা, স্যাম ওয়েলার, আপনি সেখানে নিশ্চয়ই বর্তমান মামলার কথা বলতে গিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে না, আমি গিয়েছিলাম বাকি ভাড়া দিতে। তবে, মামলার কথাও হয়েছিল বটে।'

'বটে, বটে,—তা হলে মামলার কথাও হয়েছিল! বেশ, বেশ! দয়া করে জুরীদের সামনে বলবেন কি, কি কি কথা হয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই বলব,—আনন্দের সংগে বলব। যে দুজন সতীসাধবী একটু আগে সাক্ষ্য দিলেন, প্রথমে তাঁরা আমাকে খুব আপ্যায়িত করলেন এবং পরে ডডসন ও ফগ-এর খুব...'

বিনয়াবনত হওয়ার চেষ্টা করলেন।

'অর্থাৎ, তাঁরা বাদীর অ্যাটর্নিদের খুব প্রশংসা করলেন, তাই না? বেশ, বেশ! কি কি প্রশংসা করলেন?'

'আজ্ঞে সত্তীসাধ্বীরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় ডড্‌সন ও ফগ-কে প্রশংসা ক'রে বললেন তাঁরা অতি ভদ্রলোক এবং কেবলমাত্র দয়া-পরবশ হয়েই তাঁরা ধারে মামলাটা ক'রে দিচ্ছেন—কথা আছে আসামীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা পেলে তা থেকে মোটা অংশ তাঁরা ফী হিসেবে নেবেন!'

আদালতে আবার হাসির ঢেউ, এবং ডড্‌সন ও ফগ লজ্জায় লাল। জজসাহেব রুমাল দিয়ে হাসি চাপার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন। এই গোলমালের মধ্যেই উচ্চকণ্ঠে বিরক্ত বাজ্‌ফাজ বলে উঠলেন, 'ধর্মাবতার এ সাক্ষীকে জেরা করা একেবারেই বৃথা—এর বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই অপরিপক্ক!...নেমে যান আপনি!'

চারদিকে সপ্রতিভ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্যাম বলল, 'আর কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন ত আমি রাজি আছি কিন্তু।'

হাসতে হাসতে আসামী পক্ষের উকিল বললেন, 'না বাপু, তোমাকে কিছু প্রশ্ন করার সাহস আমার নেই।'

'নেমে আসুন, নেমে আসুন না,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাজ্‌ফাজ চেঁচিয়ে উঠলেন।

স্যাম হাসিমুখে নেমে এল। অল্পকালের মধ্যে ডড্‌সন ও ফগ-এর যতটুকু সম্ভব ক্ষতি করেছিল সে।

পিক্‌উইক-এর উকিল দাঁড়িয়ে বললেন, 'হুজুর, আদালতের সময় বাঁচাবার জন্য আমি আগে থেকেই বলে রাখছি শ্রীযুক্ত ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং তিনি বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি।'

'বেশ, বেশ!'—বাজ্‌ফাজ। 'তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই হুজুর!...আমি আপনার এবং সদাশয় জুরী মহোদয়দের কাছে সুবিচারের আশায় আমার মামলা রাখলাম।'

স্নাবিন এর পর উঠে পিক্‌উইক-এর অশেষ গুণাবলীর এক লম্বা ফিরিস্তি দিলেন, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কেন না, আমরা তা ভালভাবেই জানি।

জজসাহেবের অনুমতিক্রমে জুরীরা তাঁদের ঘরে গেলেন। ঠিক পনের মিনিট পরে ফিরে এসে তাঁরা বাদীর পক্ষে রায় দিয়ে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৭৫০ পাউণ্ড ধার্য করার সুপারিশ করলেন। সুপারিশ গ্রাহ্য হল।

ইতিমধ্যে পিক্‌উইক গম্ভীরভাবে চশমা খুলে ভাল করে মুছে খাপে পুরলেন—অত্যধিক ধীরে দস্তানা পরলেন সযত্নে;

অনতিবিলম্বে ডড্‌সন এবং ফগ হাত কচলাতে কচলাতে সেখানে এসে হাজির।

'আসুন, আসুন!'

'হে' হে', চললেন?'

'তাহলে মশাইরা নিজেদের খরচা এবারে পেয়ে গেলেন, কি বলেন?'

'হে' হে', তা বোধহয় পেয়ে গেলাম মনে হচ্ছে—হে' হে'!'

'ওই মনেই থাক—পেতে আর হচ্ছে না, বুঝলেন! চেষ্টা করতে থাকুন. প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যান—কোন আপত্তি নেই! তবে, কথা হল কোনকালেই পাবেন না—একটি ছাঁদা পয়সাও আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না, জেনে রাখুন!'

'হে', হে',...দেখা যাক্‌! দেখাই যাক্‌! কয়েকদিন যাক্‌!'

ক্রোধে পিক্‌উইক-এর বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে একরকম জোর ক'রেই স্যাম এবং বন্ধুবর্গ নিয়ে গেলেন এবং পাঁজাকোলা ক'রে গাড়িতে তুলে দিলেন।

॥ এগার ॥

পিক্‌উইক-এর কারাবাস

পরদিন সকালে পিক্‌উইক-এর ঘরে প্রাতরাশ খেতে খেতে শ্রীযুক্ত পার্‌কার প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু সত্যিই কি আপনি আদালতের আদেশ মানবেন না—ক্ষতিপূরণ দেবেন না?'

'একপয়সাও না—এক কানাকড়িও না! আদালতের অন্যায় আদেশ আমি মানবো না; কেন না, কোন অন্যায় আমি করি নি!'

'এই হ'ল আসল কথা—যেমন বলেছিল মহাজন, ধারের টাকা আদায় করতে এসে।'

পিক্‌উইক বললেন, 'স্যাম, দয়া ক'রে এখান থেকে যাবে কি?'

'নিশ্চয়ই স্যার,' বলে স্যাম চলে গেল।

পিক্‌উইক তখন আবার দৃঢ়স্বরে বললেন, 'না, পার্‌কার—আমি একপয়সাও দেব না; কেন না, আমি নিজে জানি যে আমি কোন অন্যায় করি নি।......আচ্ছা, প্রতিপক্ষ কতদিন পরে আমার বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ অমান্য করার মামলা করতে পারে?'

'ঠিক দু'মাস পরে আদালত খুললেই তারা আদালতে আবেদন করতে পারে আপনার বিরুদ্ধে।'

'বেশ কথা—তা হলে সে সময় পর্যন্ত এ প্রসঙ্গের উত্থাপন যেন না হয়।'

●

দু'মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল। একদিন সকালে যখন সহরের ঘড়িগুলোর নানা সুরে ৯টা বাজছিল (অর্থাৎ, কেউ ৯টা, কেউ ৯-১৫, কেউ ৮-৪৫, কেউ বা ৯-৩০...) তখন ছ্যাকরা গাড়িতে ক'রে দু'জন লোক

শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হল। নিদ্রাভঙ্গে জড়িতকণ্ঠে পিক্‌উইক বললেন, 'স্যাম, কামাবার জল দাও।'

দাঁত বার করে লোকটি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, কামাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে এক্ষুণি।'—'উঠুন, আপনার বিরুদ্ধে সমন আছে আদালতের আদেশ অমান্য করার জন্য। আমার নাম ন্যামবি, আমি মহামান্য শেরিফ-এর সহকারী।'

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁপিয়ে উঠেছিল লোকটি। দেয়ালে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে করতে পকেট থেকে দাঁত খোঁটবার পেতলের কাঠি বের করে দাঁত খুঁটতে লাগল এবং আড়চোখে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

স্যাম এতক্ষণ রাগে ফুলছিল। এবারে সে আর সহ্য করতে না পেরে সে বলে উঠল, 'ওহে—শেরিফ-এর কুটুম, ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকলে মাথার টুপি যে খুলতে হয় তাও কি শেরিফ তোমাকে শেখায় নি? টুপি খোল!'

'তোমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছি দাঁড়াও পাজি ছোকরা! ধরে তুড়ুং ঠুকে দেব যেদিন, সেদিন বুঝবে ঠেলা!'

'তবে রে অসভ্য', বলতে বলতে স্যাম একঝটকা মেরে ন্যামবির টুপি ফেলে দিল এবং রাগে লাল হয়ে ন্যামবি হাঁফাতে লাগল। পিক্‌উইককে বলল, 'দেখুন মশাই. দেখে রাখুন। বিনা কারণে আক্রমণ! অন্ততঃ পনের দিন তোমাকে শ্রীঘর বাস না করাই ত নাম পাল্‌টে রাখব!'

'কর্তা, কিছু দেখবেন না—আপনি ত ঘুমোচ্ছেন—আপনার ঘুম ভাঙে নি। যতক্ষণ এ অসভ্যটাকে ভদ্রতা কিছুটা না শেখাই ততক্ষণ আপনি ঘুমোতে থাকুন।—ব্যাটাকে জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে তবে অন্য কাজ।'

ন্যামবি ততক্ষণে বিছানার অপর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে পিক্‌উইক বললেন, 'স্যাম! —আর একটা কথাও যদি তুমি উচ্চারণ কর তাহলে এক্ষুণি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে যাবে।'

'কিন্তু...'

'বাস্‌—আর একটি কথাও নয়। টুপিটা তোল।'

কিন্তু স্যাম কিছুতেই টুপি তুলতে রাজি হল না—গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অগত্যা ন্যামবি নিজেই টুপি তুলে নিল। স্যাম্ আপন মনে বলে উঠল, 'ঘরের ভেতর যদি আবার টুপি পরতে দেখি তাহলে, আগুনে ফেলে দোব।'

ন্যামবির উত্থিত হস্ত নেমে এল।

সে টুপিটা হাতেই রেখে দিল। মাথার ওয়াল্ডে ব্যাপারত বুদ্ধিমত্তর করে করল না।

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পিক্‌উইক স্যামকে গাড়ি আনতে পাঠালেন এবং তিনজনে একসঙ্গে ঐ গাড়িতে চড়ে 'দেনাদারের জেলে' —যার নাম 'ফ্লীট কারাগার'—হাজির হলেন।

ঘড়ঘড় শব্দে দরজা খুলে গেল, পিক্‌উইক এবং স্যাম ঢুকলেন, এবং আবার দরজা বন্ধ হল। পিক্‌উইক-এর জীবনে সুরু হল নতুন অধ্যায়।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুত পার্‌কার এসে হাজির হলেন সশব্যস্তে। বললেন, 'এইবার দেখছেন ত, আপনার একগুঁয়েমী আপনাকে কোথায় এনেছে ? এখনও কথা শুনুন, টাকাটা দিয়ে দিন, পাগলামী ছাড়ুন।'

'পার্‌কার, ও প্রসঙ্গ থাক। অন্যায়ের কাছে আমি কিছুতেই মাথা নোয়াতে পারব না—মরে গেলেও না।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু ভাবুন। নিজের কথা না ভাবলেও আমাদের কথা ভাবুন। চিন্তা করুন, যতদিন টাকাটা না দেবেন, ততদিন—বিবেচনা করে দেখুন—ততদিনই আপনাকে এখানে থাকতে হবে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন—সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, জীবন্মৃত অবস্থায় কতদিন থাকা সম্ভব, তা কি ভেবে দেখেছেন ?'

'দেখেছি—তাই যদি ললাটলিখন হয়,—তবে তাই হোক। আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পার্‌কার চুপ করলেন।

বিলেতী 'দেনদারের কারাগার' ঠিক সাধারণ জেল-এর মত ছিল না—সরকারের বিশেষ কোন দায়দায়িত্ব থাকত না খাওয়ান দাওয়ান-এর ব্যাপারে—বাধ্যতামূলক বাসস্থান দিয়েই সরকার খালাস। বন্দীদের যে যার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত। হতভাগ্য দেনদারদের সংস্থান থাকলে খেতে পেত, না হলে তিলে তিলে মৃত্যু ছিল অবধারিত। কোন নির্দিষ্ট সময় আটকের আদেশ ত নয়, যে পর্যন্ত ধার শোধ না করবে, সে পর্যন্ত আবদ্ধ থাকতে হবে, এই ছিল নিয়ম। বর্তমানে অবশ্য আর এই অমানুষিক ব্যবস্থা আর নেই।

কিছুক্ষণ পরে পিক্‌উইক-কে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল—'ছবি তোলবার জন্য।' ঘরে তিন-চারখানি চেয়ার এবং একটি পাখির খাঁচা ছাড়া আর কিছুই ছিল না—স্যাম তাই দেখে দার্শনিকসুলভ মন্তব্য করল, 'দেখেছেন স্যার, জেলের মধ্যে জেল।'

পিক্‌উইক হেসে উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় একজন লোক এসে বিস্ফারিত লোচনে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। এরই নাম 'ছবি তোলা'। একটু পরে আরও দুজন এসে ঠিক অনুরূপভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক মিনিট।

ছবি তোলা সমাপনান্তে তাঁকে বলা হল এখন তিনি যথাস্থানে যেতে পারেন।

অবাক পিক্‌উইক প্রশ্ন করলেন, 'যথাস্থান'টা কোন স্থান ? থাকব কোথায়... খাব কি ? শোব কোথায় ?'

নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব এল, 'তার আমি কি জানি বাপু।... সময়মত জেলার মশাই এলে যে কোন ঘরে একটা বিছানার ব্যবস্থা হবে ঠিকই। সবাই যখন আছে, তখন আপনারও হবে।'

বিরক্ত ও হতভম্ব পিক্‌উইক বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে স্যাম দারওয়ানদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে আপাতত তাদের একজনের ঘরটা ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল।

সেখানেই তখনকার মত পিক্‌উইক-এর প্রথম কারাবাসের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হল।

ঘর দেখাতে যাবার সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে পাশে বেশ কিছু নিচে অন্ধকার এক হলঘর দেখে পিক্‌উইক বললেন, 'ওখানে বুঝি কয়লা থাকে ?'

'কয়লা ? আপনার মাথা খারাপ নাকি ? কয়লা কিসের—কয়লা দিয়ে কি হবে ?... ওখানে অন্তত ষাটজন লোক থাকে।'

'লোক থাকে ? ষাট জন ? ...কি সর্বনাশ, ওই অন্ধকার নরকে ষাটজন লোক থাকে ? ...ঠাণ্ডায় মরে যাবে যে ?'

'থাকে, এবং মরেও। বছরের পর বছর একইভাবে।. .কেন, ধার করার সময় মনে থাকে না যে শোধ করতে হবে ? যেমন জুয়াচোর, তার তেমনি সাজা।'

বিস্ময়ে ও বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন পিক্‌উইক। নিঃশব্দে দরওয়ানের পেছনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। তিনতলায় উঠে সরু বারান্দা পেরিয়ে এক কোণায় একটা দরজা খুলে দরওয়ান বলল, 'এই দেখ—কেমন ঘর!'

ঘরে আট দশখানা মরচে-পড়া লোহার খাটিয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। স্যাম একচোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, ঘর বটে একখানা। প্রথম শ্রেণীর হোটেলের মতই! তা কোন্ রাজশয্যায় কর্তাকে থাকতে হবে ?'

একপাশের খাটিয়া বেশ গর্বের সঙ্গে নির্দেশ করে দরওয়ান বলল, 'ঐ খানিতে। দেখেছ কি বিছানা...শুলেই আপনা থেকে চোখ বুজে আসবে।'

'হ্যাঁ...চিরনিদ্রা! ...তা, এ ঘরের অন্যান্য বাসিন্দারা ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ?'

'ওরে বাপরে, ভয়ঙ্কর ভদ্রলোক সব! সারাদিন বীয়ার খাচ্ছেন এবং খাওয়ার সময়ও চুরুট টানেন।'

'তবে ত আর কথাই নেই। ভদ্রলোক না হলে আর যায় কোথায়!'

স্যাম অবশ্য এসব কথাবার্তা চালাচ্ছিল যাতে করে পিক্‌উইক-কে অবাস্তব বাস্তব অবস্থায় গুরুত্ব বুঝিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকাটা দিয়ে দিতে বাধ্য করা যায়। কিন্তু তিনি অটল,—সব কিছু দেখেশুনেও ওখানেই রাত্রিযাপনের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করলেন নিরাসক্ত কণ্ঠে।

রাত্রের আশ্রয় এভাবে জোটার পর আমাদের নায়ক বেরোলেন চারদিক দেখতে। চারপাশে ঘুরে যে নরকসদৃশ দৃশ্যাবলী তাঁর চোখে পড়তে লাগল, তাতে তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হওয়ায় তিনি দ্রুত ফিরে এলেন। স্যাম-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'স্যাম এ ত নরক গুলজার হয়ে আছে দেখছি। আটক থেকে কারুরই ত কোন বৈকল্য দেখি না।'

'আজ্ঞে, ব্যাপারটা হচ্ছে একটু অন্যরকম। এদের ভেতরে বেশির ভাগই হচ্ছে বাপতাড়ান মায়ে খেদান-র দল—জাত জুয়াচোর, লোক ঠকান এদের ব্যবসা। এখানে এসে বরং থাকে ভাল। হৈ হৈ করে সময় কাটায়। আসলে মরে সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ, যারা প্রাণের দায়ে ধার করে এবং সময়মত শোধ করতে পারে না। মনোযন্ত্রণায় এরাই পুড়ে মরে, তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়।'

চিন্তাকুল হৃদয়ে পিক্‌উইক এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ফিরে স্যামকে বললেন, 'স্যাম এখন তুমি যাও, কাছাকাছি কোথাও ছোটখাট হোটেল-এ রাত্রিটা থেকে সকালে আমার জামাকাপড়, টুথব্রাস, টাকা-পয়সা, বিছানা ইত্যাদি নিয়ে এসো সময়মত।'

স্যাম-এর ইচ্ছে নয় যে কর্তাকে ছেড়ে যায়—সে নানাভাবে বোঝাতে চাইল যে দরজার কাছে বেশ আরামেই রাত কাটাতে পারবে ; কিন্তু পিক্‌উইক কিছুতেই নিজের জন্য স্যামকে জেলের মধ্যে রাত্রিবাস করতে দিতে রাজি হলেন না। অতএব, বাধ্য হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্যাম-কে যেতে হল নাইসে।

পিক্‌উইক-এর মনোবল আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিল চারদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে। নরকসদৃশ এই আবহাওয়ায় তাঁর রুচিসম্পন্ন হৃদয় সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল এবং মরমে মরে তিনি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন একেবারে। রাত যে কী ক'রে কাটল তা তিনি টেরই পেলেন না।

পরদিন সকালে কোনরকমে প্রাতঃকৃত্য সেরে তিনি আবার গেলেন কেরাণীবাবুর কাছে, তাঁর স্থায়ী আবাসের সন্ধানে। তাঁকে দেখামাত্র খস্‌খস্ ক'রে একখানা কাগজে কয়েক লাইন লিখে বাবুটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নিন, ২৭ নম্বর-এ আপনার জায়গা ঠিক হয়েছে, ও ঘরে আপনার সঙ্গে আছে একজন পাদরী এবং একজন কসাই।'

ভারাক্রান্ত মনে পিক্‌উইক ২৭ নম্বর-এ চললেন "সাথী"দের পরিচয় নিতে। পৌঁছে দেখলেন দরজার ওপরে চক্‌খড়ি দিয়ে কে যেন ফাঁসীর দৃশ্য এঁকে রেখেছে। ঘরে ঢুকে দেখলেন ছিন্ন কালো পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি জানালা দিয়ে মনোযোগ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁকে দেখে প্রশ্নের স্বরে 'কি চাই' বলে চিৎকার ক'রে উঠল লোকটা এবং পিক্‌উইক কাগজখানি তার হাতে দিতে সে কুৎসিত একটা গালাগালি দিয়ে বলল, 'কি জ্বালাতন! হতভাগা আর জায়গা পেলে না? ঠিক যে সময় বেশ গুছিয়ে নিয়েছি, সেই সময়ই...দূর ছাই! নিকুচি করেছে!' বলে আবার জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তীক্ষ্ম শিস্‌ দিতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই বিশাল বপু একজন এসে ঢুকলেন এবং প্রথম তাকে বলল, 'দেখ হে দাদা, কি জ্বালাতন! কেরাণী শা...আবার কাকে এ ঘরে ঢুকিয়েছে সাথী ক'রে দেখ। শান্তিতে সময় কাটাবার জো নেই রে বাবা।'

এদের কথাবার্তার ফাঁকে পিক্‌উইক ঘরখানি ভাল ক'রে দেখছিলেন; মনে হল তাঁর যে অন্তত বছর দশেক ও ঘরে ঝাঁট পড়েনি, দুর্গন্ধে ভূত পালায়। আলনা ত দূরে থাকুক, একটি হুক পর্যন্ত নেই কোথাও—ঘরের কি দুরবস্থা! চারধারে ভুক্তাবশিষ্ট রুটির টুকরো, মাংসের হাড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ময়লা কাপড়চোপড়, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদির সমারোহ; দু'একটা ইঁদুর বেশ সপ্রতিভভাবেই ইতস্তত ছোটাছুটি করছে—বোঝা গেল যে ওদের এখানে অবাধ গতি। চারপায়াগুলো খসে পড়া, নড়বড়ে—তোষকগুলো হাঁ করে আছে, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। পিক্‌উইক-এর নাড়ি উলটে আসছিল।

হঠাৎ প্রথম সাথী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'বাপু, কি হলে তুমি বিদেয় হবে?'

চমকে উঠে পিক্‌উইক প্রশ্ন করলেন, 'সে কি? আমার ধারণা ছিল...'

'তোমার ধারণা নিয়ে তুমি সরে পড় বাপু—যা বলছি তার জবাব দাও!—আমরা তোমাকে হপ্তাখরচ বাবদ' সাড়ে তিন শিলিং দিতে রাজি আছি। বলে ফেল ত।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে, আমি ইচ্ছে করলে অন্য জায়গায়ও থাকতে পারি?'

তাঁর এই অপরিসীম অজ্ঞতায় বিদ্রূপের হাসি হেসে প্রথম সাথী বলল, 'হায় রে, এত বোকাও জগতে আছে? ...বলি, জান না যে ট্যাঁকে টাকা থাকলে দুনিয়ায় সব কিছু পাওয়া যায়? ...ছাড় কিছু মাল, একঘণ্টার মধ্যে আসবাবপত্র, বিছানা সবশুদ্ধ আলাদা ঘর পেয়ে যাবে, বাথরুম-টাথরুম সব কিছু নিয়ে।'

তৎক্ষণাৎ পিক্‌উইক আবার কেরাণীবাবুর কাছে দৌড়ালেন আশ্রয়সন্ধানে। তাঁকে দেখেই বাবুটি একগাল হেসে বললেন, 'আমি জানতাম যে আপনি ফিরে আসবেন এবং আলাদা ঘর চাইবেন। আমি তৈরী আছি—কফিঘরের ওপরে একখানি চমৎকার ঘর আছে...আলো বাতাস—একেবারে প্রাসাদ মশাই! সপ্তাহে এক পাউন্‌ড দিলেই ঘরের বাসিন্দা ঘর ছেড়ে দেবে এক্ষুণি! ...আসবাবপত্র আমার কাছ থেকেই ভাড়া নিতে হবে কিন্তু।'

পিক্‌উইক সাগ্রহ সম্মতি জানাতে, কেরাণীবাবু একলহমায় চাবি নিয়ে তাঁকে এই ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের বাসিন্দা একজন ফ্যাকাশে রক্তহীন ভদ্রলোক, যার উদাস দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় যে পৃথিবীতে তার আর কোন আকর্ষণ নেই—সব আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত এবং আশাহত বেচারা পিক্‌উইক-এর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহে রাজি হয়ে কম্পিত হস্তে সপ্তাহের অগ্রিম ভাড়া নিয়ে একরকম দৌড়ে পালিয়ে গেল।

পিক্‌উইক প্রশ্ন করলেন, 'ওর কোন আত্মীয়স্বজন নেই? বন্ধুবান্ধব?'

'আজ্ঞে, আছে কি না জানি না—তবে উনি এখানে এসেছিলেন প্রথম যৌবনে, আর আজ ত দেখছেনই, মধ্যবয়সে পৌঁছে গেছেন। কেউই আর আসে না ওঁর কাছে, প্রথম প্রথম দু'একজন আসত বটে।'

অর্থের এমনই মহিমা যে এক ঘণ্টার ভেতরে পিক্‌উইক-এর ঘরে কার্পেট এল, দু'খানা চেয়ার, দুটো টেবিল, খাট—বিছানা, জানালার পর্দা, কেটলি, বাসনপত্র ইত্যাদি সবই হাজির হল একে একে।

হাত কচলাতে কচলাতে কেরাণীবাবু দাঁত বের করে আভূমি নত হয়ে জানতে চাইলেন আর কিছু লাগবে কি না।

'হ্যাঁ,—মানে একজন লোক পাওয়া যায় কি, যে জিনিষপত্র আনা নেয়া বা ফাইফরমাস খাটতে রাজি? অবশ্য আমি পারিশ্রমিক দোব।'

'আজ্ঞে, অঢেল। গরীবরা যেদিকে থাকে সেখানে অনেকে বাইরে থেকে আসে দেখাশুনো করতে। পয়সা পেলে তারা সব কাজ ক'রে দেবে।'

'বেশ, বেশ, তা হলে আমার দরকার হলে তোমাকে খবর দেব, কেমন?'

দেনদারের জেল,—তার আবার গরীব অংশ! ব্যাপারটা একটু ভাবলেই টের পাওয়া যায়। তৎকালীন ইংলণ্ড-এর মহাকলঙ্ক ছিল এই দেনদার জেলগুলো। সরকারী ব্যবস্থা বলতে ওই জেলের আশ্রয়—খোরাক বাবদ কিছুই সরকার দিত না। কয়েকজন দয়ালু লোক-এর প্রদত্ত অর্থের সুদ থেকে ওদের খোরাক কিছু জুটত—যা ছিল অত্যন্ত অল্প। অর্ধাশন অনশন ছিল স্বাভাবিক অবস্থা। কয়েকটি দেনদার জেলের সামনে খাঁচায় একজন দেনদারকে পশুর মত বসিয়ে রাখা হত পথচারীদের করুণা উদ্রেকের অভিলাষে, যাতে তারা দয়া ক'রে কিছু সাহায্য করে। অবস্থাটা ছিল অমানুষিক এবং ভয়াবহ।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে পিক্‌উইক গরীবদের অংশে প্রবেশ ক'রে অন্যমনস্কভাবে একটা ঘরে ঢুকে পড়লেন। সে ঘরে একজন মাত্র লোক ছিল—তাকে দেখামাত্র তিনি চমকে উঠলেন।

লোকটি তাঁর পূর্বপরিচিত জিংগল—যে জুয়াচুরি ক'রে তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের বহু ক্ষতি করেছিল। কিন্তু তার বর্তমান চেহারা দেখে পিক্‌উইক-এর মনে রাগের পরিবর্তে করুণারই উদ্রেক হল। অনাহারে ও অভাবে জিংগল-এর দেহ শীর্ণ, চক্ষু কোটরগত এবং জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন; শীতে ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল দাঁড়িয়ে। বিশুষ্ক মুখমণ্ডল একেবারে ভাবলেশহীন মৃতের মুখের মত। কোটরগত চক্ষুতে কোন পরিচিতের চিহ্ন নেই—যেন জীবন্ত কংকাল।

ঘরের অপর পাশে একজন লোক বসে আছে হাঁটুতে মুখ গুঁজে—কাছেই একজন স্ত্রীলোক, সম্ভবত ওরই স্ত্রী, মেঝেয় বসে অর্থহীন আঁকিবুকি কাটছে এবং মুছে ফেলে আবার আঁকছে। পুরোপুরি গীতা উক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মযোগ।

কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চমকে উঠে জিংগল বিস্ফারিত লোচনে বলে উঠল, 'মিঃ পিক্‌উইক?'

'হ্যাঁ জিংগল আমি। তোমার এ দুর্দশা কেন?'

মাথা নিচু ক'রে জিংগল বিষাদভরা কণ্ঠে জবাব দিল, 'অবাক হবার কিছু নেই...... অদ্ভুত জায়গা......উচিত শাস্তি।'

পিক্‌উইক-এর দয়ার্দ্র হৃদয় গলে গেল, তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন, 'চল ত একটু বাইরে—তোমার সঙ্গে কথা আছে।...... কোটটা পরে নাও।'

'আজ্ঞে, কোট খেয়ে ফেলেছি।'

'সে কি? কোট খেয়েছ মানে?......ও বুঝেছি! আহা, বেচে দিতে হয়েছে বুঝি!'

জিংগল ম্লান হেসে বলল, 'কোট কি বলছেন! এক সপ্তাহ বুট খেয়ে বেঁচেছি। শারট বেচে দু'দিন।......ভালই হয়েছে...... কাচার যা হ্যাপা।......আর দেরী নেই...... বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব না......সব শেষ হয়ে যাবে। যবনিকা পতন হবে।'

বিচলিত পিক্‌উইক চোখ মুছতে মুছতে ধমকে উঠলেন, 'থাম, থাম। বাজে কথা বোল না। ওসব কি কথা—ছিঃ। এস, আমার সঙ্গে এস।' বলতে বলতে তার হাত ধরে টেনে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিলেন। টাকার দিকে তাকিয়ে জিংগল হাউ, হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—পিক্‌উইক-এর চোখও শুকনো ছিল না। দ্রুতপায়ে তিনি আবার

নিজের ঘরে এসে দেখলেন যে স্যাম এসে গেছে জিনিষপত্র নিয়ে। তার কাছে বন্ধুদের পরের দিন আসার খবর পেলেন।

একটু ইতস্তত করে পিকউইক বললেন, স্যাম, তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।'

'বলে ফেলুন স্যার—ও উগরে ফেলাই ভাল ; যেমন বলেছিল ডাক্তার বাচ্চা ছেলেটাকে যখন সে শিলিংটা গিলে ফেলেছিল।'

'আমার মনে হয় স্যাম, এখানে কোন অল্পবয়স্ক ছেলে বা যুবককে থাকতে দেওয়া উচিত নয়,—কাজেই......'

'বুড়োদেরও থাকা উচিত নয় স্যার।'

'ঠিক কথা, কিন্তু বয়স্ক লোকেরা আপন বিবেচনার ত্রুটিতে আসতে বাধ্য হয় অনেক সময়। তাদের ভুল ও অবিবেচনার খেসারত যুবকেরা দেবে কেন?—তা ত ঠিক নয়।...... বুঝতে পারছ, আমি কি বলতে চাচ্ছি?'

বুঝতে স্যাম ঠিকই পেরেছিল, কিন্তু গোঁয়ারের মত মাথা নেড়ে বলল, না, আমার বুঝে দরকার নেই।'

'স্যাম ভেবে দেখ আমি ন্যায্য কথা বলছি কি না।'

'আমি জানি না—অত বোঝাবুঝির সময়ও আমার নেই।' স্যাম এর চোখে জল।

'ছিঃ স্যাম, তুমি না বাটাছেলে?......যে ক'দিন আমি এখানে থাকব সে ক'টা দিন আমার ইচ্ছে নয় যে তুমিও আমার সাথে নরক ভোগ কর।—তোমার মাইনে আমি নিয়মিত দিয়ে যাব যতদিন না আমি আবার বাইরে যাই।'

'আজ্ঞে, টাকার আমার দরকার নেই। আপনি কি মনে করেন যে টাকাই সব—আর কোন সম্পর্ক নেই আপনার সঙ্গে আমার?'

'না স্যাম, তা কেন ভাবব। তুমি আমার বন্ধুর মত। তোমাকে কি আমি টাকা দিয়ে অসম্মান করতে চাচ্ছি? জীবনধারণের জন্য টাকাও ত চাই বাবা।'

'আজ্ঞে আপনি দয়া করে চুপ করুন, আমার আর ভাল লাগছে না মোটেই।'

'স্যাম, আমি কিন্তু দৃঢ়সংকল্প এ ব্যাপারে।'

'আজ্ঞে, তা বেশ কথা। তা হলে গরীবেরও একটা কথা শুনে রাখুন? আমিও গোঁ ধরতে জানি।'

বলতে বলতে স্যাম রেগে গিয়ে এক থাবড়া মেরে টুপিটা মাথায় চাপিয়ে একরকম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিকউইক কত ডাকলেম তাকে, সে কর্ণপাতও করল না।

পরদিন স্যাম তার বাবাকে দিয়ে নিজের নামে নালিশ করালো দেনার দায়ে এবং যথারীতি আদালতের হুকুমে গটগট করে এসে জেলে ঢুকল এবং তারপর সোজা পিকউইক-এর ঘরে।

'বেশ, বেশ স্যাম। কালকে তোমার মনে আঘাত দিয়ে সারা-রাত ঘুমোতে পারি নি। বস, তোমাকে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দিই।'

'আজ্ঞে তার আর কোন প্রয়োজন নেই আপাতত।'

'কেন? প্রয়োজন নেই মানে?'

স্যাম মাথা চুলকোতে লাগল :

অধৈর্য হয়ে পিকউইক বললেন, 'কি হল? কথা কইছ না কেন? কি মুশকিল!'

'আজ্ঞে, থাক না। পরে হবে এখন কথাবার্তা। আগে আমার......'

'কি তোমার! ব্যাপারটা কি? খুলে বল এক্ষুণি।'

'মানে.. ...আগে আমার থাকবার জায়গা ঠিক করে তারপর......'

'তোমার থাকবার জায়গা?—তার মানে? কি আবোল তাবোল বকছ?'

'আজ্ঞে কর্তা, ঠিকই বলছি। আমিও দেনার দায়ে ধরা পড়েছি। আর যে লোক আমার নামে নালিশ করেছে সে গোঁ ধরেছে যে আপনার যেদিন খালাস হবে, আমাকেও সেইদিন ছাড়বে—তার আগে কিছুতেই না।'

কথাগুলো একনিঃশ্বাসে বলে স্যাম মাথা থেকে টুপিটা একটানে মেঝেতে ফেলে দিয়ে ভুরু কুঁচকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

ব্যাপারটা বুঝতে পিকউইক-এর দেরী হল না। এমন ভালবাসা বুঝি আর হয় না। সজল চোখে, বিচলিত হৃদয়ে তিনি স্যামকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুজনেরই হৃদয় এত পূর্ণ যে কোন কথারই প্রয়োজন ছিল না।

এর কয়েকদিন পরে পিকউইক স্যাম-কে ডেকে বললেন, 'স্যাম, পুরোণো বন্ধুদের ভুলে গেছ, না মনে আছে?'

'ভুলব কেন? নিশ্চয়ই মনে আছে।'

'তা হলে চল, একজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'সে কি?......এখানে আবার পুরোনো বন্ধু কে কর্তা? কার কথা বলছেন?'

"চলই না। দেখতেই পাবে নিজের চোখে।"

বিস্মিত স্যামকে নিয়ে পিকউইক চললেন জিংগল সকাশে। তাঁর সদাশয়তার দরুণ জিংগল-এর স্বাস্থ্য এবং পোষাক পরিচ্ছদের বেশ উন্নতি হয়েছিল, যদিও দুর্বলতা তার পুরোপুরি যায় নি এবং আস্তে আস্তে ছাড়া সে চলতে পারত না।

ধীরে ধীরে পিকউইক-এর কাছে এসে নমস্কার করে কম্পিতকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানাল জিংগল। পিকউইক তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন 'চল দেখি আমার সংগে—তোমার সংগে আমার কিছু কথা আছে। দেখো, হাঁটতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই . . .প্রস্তুত......খুব দ্রুত নয়...... পা কাঁপে, মাথা ঘোরে।'

'এস, আমার হাত ধর।'

'না, না..... থাক গে।'

'এস বলছি।'

এইসব কথাবার্তা চলার সময় স্যাম হাঁ করে তাকিয়েছিল। বিস্ময়ে সে হতবাক। পিকউইক ইতিমধ্যে একরকম জোর করে

বরফের উপর পিকউইক্ স্কেটিং করছেন

জিংগল-এর হাত ধরে তাকে নিয়ে বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। যেতে যেতে নিম্নস্বরে নানা কথা বলছিলেন। অবশেষে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'তবে এই কথা রইল; শরীরের দিকে নজর রেখো, আর আমার কথাগুলো চিন্তা কোরো। যা' বললাম যদি উচিত মনে কর তবে লিখে তৈরি কোরো সত্বরে। পরে আবার আলোচনা করা যাবে, কেমন! এখন যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো গে, তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ, বেশীক্ষণ ঘোরাফেরা করা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়।'

মাথা নিচু করে জিংগল ধীরপদে প্রস্থান করল।

'কি স্যাম, কি রকম দেখলে, অ্যা?'

'অদ্ভুত ব্যাপার, অলৌকিক কাণ্ড কর্তা। মাথা আমার ঘুরছে বন্ বন্ করে এখনও। আপনি দেখেছেন কি না জানি না, জিংগল-এর চোখে আমি জল দেখলাম।'

উঠানে দাঁড়িয়ে পিক্উইক চারধারে তাকাতে লাগলেন। চারদিকে লোকজনের ছে. ছেঁড়া কাপড় পরা, মলিন মুখ মেয়েরা রান্নাঘরের দিকে চলেছে, উঠানে দাঁড়িয়ে ন্যাকড়ার বল আর পিচবোরড্-এর ব্যাট নিয়ে একদল ব্যাডমিন্টন খেলছে সরবে; জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনেকে চীৎকার করে মন্তব্য করছে।

এই হট্টগোলের মাঝখানে একপাশের একখানি ছোট্ট আটচালায় একটি ছিন্ন বসন পরিহিত মৃতদেহ পড়েছিল—নীরব, নিথর। জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে কার নিষ্কৃতি হল দেখবার জন্য পিক্উইক এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যে মৃতদেহ হচ্ছে সেই লোকের যার কাছ থেকে তিনি ঘর ভাড়া করেছিলেন।

বিষাদভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, 'স্যাম, আমার মাথা ঘুরছে, মন অবসাদগ্রস্ত। ঢের দেখেছি আর দেখবার সখ আমার নেই। এর পর থেকে আমি ঘরের বাইরে বিনা প্রয়োজনে আসব না।'

●

পিক্উইক নিজের কথা রেখেছিলেন—তিন মাস পর্যন্ত সারাদিন নিজের ঘরে বসে থাকতেন; শুধু রাত্রে একটু বাইরে এসে বেড়াতেন। এতে তাঁর শরীর খারাপ হতে লাগল। কিন্তু তবুও পারকার, টাপ্ম্যান, স্নডগ্রাস, উইংকল এবং স্যাম—সবাই-এর সনির্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করে তিনি এক গোঁ ধরে রইলেন: অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করবেন না, ক্ষতিপূরণ কিছুতেই দেবেন না।

পিক্উইক জেল থেকে বেরোলেন

জুলাই মাসের শেষ দিকের এক ম্লান অপরাহ্ণে তিনজন আরোহী নিয়ে একখানি ছ্যাকরা গাড়ি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে গসওয়েল স্ট্রীট ধরে যাচ্ছিল। আরোহীদের মধ্যে দুজন ছিলেন শীর্ণকায়া মহিলা এবং তাঁদের মাঝখানে কোনরকমে বসেছিলেন একজন বেঁটেখাটো মাঝবয়সী ভদ্রলোক মাথা নীচু করে। বেচারা কোন কথা বলতে গেলেই একজন মহিলা খেঁকিয়ে উঠছিলেন—এর থেকেই বোঝা গেল যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। এর চাইতে আর ভাল প্রমাণ আর কি হতে পারে।

ভদ্রমহিলা দুজন গাড়োয়ানকে পরস্পর-বিরোধী নির্দেশ দিচ্ছিলেন, কিন্তু ভদ্রলোক বলেছিলেন যে তাঁরা ভুল বলছেন—অবশ্য তৎক্ষণাৎ ধমক খেয়ে চুপ করে যাচ্ছিলেন।

পরস্পরবিরোধী নির্দেশ শুনতে শুনতে ভুল করে গাড়োয়ান হয়ত দরজায় নামলে থাকল—কিন্তু তক্ষুণি দেখা গেল যে অনতিদূরের লাল দরজা থেকে খোকা বারডেল উঁকি মারছে। ভদ্রলোক গোঁফে তা দিয়ে বলে উঠলেন, 'কেমন, বলেছিলাম কি না, যে বারডেল-এর দরজা লাল।'

তার স্ত্রী সজল চক্ষে ধমকে উঠলেন, 'কথা বোলো না আর তুমি—হতভাগ্য!'

'ছিঃ র‍্যাড্ল চুপ কর,' অপর মহিলা—যাঁকে আমরা জানি শ্রীমতী ক্লাপিন্স বলে—বললেন।

'কিন্তু হাঁ-গা, আমার দোষটা কি—আমি ত' আর রাতারাতি ছলনে দরজাকে লাল রং করে দিই নি।'

শ্রীমতী র‍্যাড্ল ঝংকার দিয়ে বললেন, 'আবার তুমি কথা কইছ!......সারা জীবনটা জ্বলে-পুড়ে মলুম ভাই এই লোককে নিয়ে। কখনো যদি আমার কথা ভেবেছে। সব সময় আমাকে অপমান করার চেষ্টা ওর—নিজের কানেই শুনলে ভাই? আমি আর কি বলব। পোড়া কপাল আমার।

'কিন্তু, ডিয়ার... ...'

'থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না—খুব হয়েছে। এরপর কিন্তু আমি যা-তা করে বসব।'

গজ্গজ্ করতে করতে নেমে শ্রীমতী র‍্যাড্ল দরজায় দাঁড়ালেন। শ্রীমতী ক্লাপিন্স খোকা বারডেলকে আদর করে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'কি খোকা, তোমার মা কেমন আছে গো?'

'খু-উ-উ-ব ভালো, খুব ভালো। আমিও ভালো।'

'বেশ, বেশ।'

'হুঁ, সব ভালো। আমরা তৈরি কিন্তু, বলে দিচ্ছি।'

'আর কেউ যাচ্ছে না কি?'

'হ্যাঁ। স্যান্ডারস মাসি যাবেন,—আমিও যাব, চালাকি নয়।'

'এই মরেছে। এ ছেলেটা খালি নিজের কথা ভাবে।——লক্ষ্মী বাবা, বল না, আর কে যাচ্ছে?'

'রজারস্ মাসিমাও যাচ্ছেন।'

'অ্যাঁ? যে ঘর ভাড়া নিয়েছে—সেই লোক?'

প্যান্ট-এর পকেটে হাত পুরে খোকা বারডেল অন্তত পঁইত্রিশ বার মাথা নাড়ল সম্মতি জানিয়ে।

'বটে, বটে! তবে ত' অনেক লোকই যাচ্ছে দেখছি চড়ুইভাতি করতে।'

ঘণ্টা দুয়েক বাদে শহর থেকে দূরে এক চায়ের দোকানে এঁরা সমবেত হলেন চা খাবার জন্য। বেচারা র‍্যাড্ল-এর কপাল খারাপ। দলের একমাত্র 'পুরুষ' হিসেবে তিনি মাথা গুণে সাত কাপ চায়ের অর্ডার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী চীৎকার করে উঠলেন, 'দ্যাখ্ ভাই দ্যাখ্। মুখপোড়ার কাণ্ড দেখ! আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে দিদি।'

'আবার কি করলাম—কি মুশকিল।'

'কি করলে? ন্যাকা, বোঝ না কিছু? কেন তুমি সাতজনের চা অর্ডার দিলে? খোকা বারডেল আমাদের সকলের কাপ থেকে একটু একটু করে খেতে পারত না? খামখা তুমি এককাপ চায়ের খরচা বাড়ালে কেন?'

'ও বাবা! এর জন্যে এত?......তা ওর দামটা না হয় আমিই......'

'কি? পয়সা বেশি হয়েছে? আমার বন্ধুকে অপমান? কেন—কেন তুমি ও কথা বললে? বারডেল কি এককাপ চায়ের দাম দিতে পারে না?—শোন দিদি, শোন! কেমন করে আমাকে লোকসমক্ষে ইচ্ছে করে অপমান করে দেখ।'

শ্রীমতী ক্ল্যাপিন্স অনেক চেষ্টায় তাকে তিন কাপ চা খাইয়ে শান্ত করলেন এবং বেচারা র‍্যাড্ল তিনজোড়া রক্তচক্ষুর অগ্নিবৃষ্টিতে শুকিয়ে কুঁকড়ে গেলেন।

শ্রীমতী বারডেল-এর ভাড়াটে শ্রীমতী রজারস চারদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'পাড়াগাঁ কি সুন্দর শান্তিপূর্ণ।'

ভাড়াটে হারাবার ভয়ে ভীত শ্রীমতী বারডেল তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ও আপনার ভাল লাগবে না দিদি। আপনি লেখাপড়া জানা আধুনিক মহিলা—পাড়াগাঁয়ের মাছি, মশা, নির্জনতা আর সঙ্গীর অভাব দুদিনেই আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

'তা হবে হয়ত।'

'হবে নয় দিদি, এ একেবারে খাঁটি কথা।'

ইতিমধ্যে র‍্যাড্ল বেচারা আর একবার জাতে ওঠবার চেষ্টায় বলে উঠল, 'লোকে বলে,—আর আমারও তাই মত—ভগ্নহৃদয় লোকের পক্ষে পল্লীশোভা ঠিক ওষুধের মত কাজ করে। যাদের হৃদয় ভেঙে গেছে-

কথাগুলো বলে মৃদু হেসে বেচারা মহিলা-বৃন্দের দিকে তাকাল।

সুতরাং যা ঘটবার তাই ঘটল। শ্রীমতী বারডেল তৎক্ষণাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবং সংগে সংগে গোঁ ধরল খোকা বারডেল।

রাগে ফেটে পড়লেন র‍্যাডল-এর সহধর্মিণী। চীৎকার করে শ্রীমতী রজারস্‌কে বললেন, 'বিশ্বাস করতে পারেন যে কোন দুর্লোকের কাঁধে এমন সিন্ধবাদের বুড়ো চেপেছে?......হায়, হায়, এমন অমানুষও আছে পৃথিবীতে, আর জুটলও আমারই পোড়াকপালে। হে ভগবান, আমার মরণও নেই।'

'দোহাই তোমার. বিশ্বাস কর আমি কিছু ভেবে বলি নি কথাটা?'

'চুপ কর, চুপ কর—তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না।......দূর হও এখান থেকে। তোমাকে দেখলে আমার গা জ্বালা করছে।'

শ্রীমতী রজারস র‍্যাডলকে ইংগিতে সরে যেতে বললেন। গোমড়া মুখে র‍্যাডল নির্বাসিত হলেন।

তারপর রোরুদ্যমান ছেলেকে দুই বন্ধুতে ধরে কোনরকমে শ্রীমতী বারডেল-এর কোলে চেপেচুপে (একটু বড় সাইজের খোকা তো!) ঠেসে ধরল, মা তাকে ধরে চুমুটুমু খেয়ে আদর করে ৫।৬ কাপ চা ঢকঢক করে গিলে তবে শান্ত হলেন।

এই সময় একখানি ছ্যাকরা গাড়ি ঘর্ঘর শব্দে এসে থামল এবং লাঠি হাতে একজন ভদ্রলোক নেমে এঁদের দিকে এগোলেন। শ্রীমতী বারডেল তাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'ও-মা, এ যে ডড্‌সন-ফগ-এর অফিসের শ্রীযুক্ত জ্যাকসন।'

শ্রীমতী ক্ল্যাপিন্‌সঃ 'বোধ হয় পিক্‌উইক টাকাটা দিয়েছে।'

মুখভর্তি টোস্ট সামলাতে সামলাতে শ্রীমতী স্যানডারস অস্পষ্টস্বরে তাড়াতাড়ি মন্তব্য করলেন, 'অথবা বিয়েতে রাজি হয়েছেন, তাও ত' হতে পারে?'

শ্রীমতী রজারস অধৈর্য হয়ে উঠলেন, 'আজকালকার ছেলেগুলো যেন মেয়েছেলে। আসছে দেখ না। এইটুকু আসতে যেন দিন কাবার করে দিচ্ছে।'

কাছে এসে টুপি খুলে সম্মান দেখাল জ্যাকসন। মিসেস বারডেল আকুল আগ্রহে তার হাত চেপে ধরে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার? নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?'

'না মা, কিছু না! কেমন আছেন আপনারা? আপনাদের বিরক্ত করলাম, কিন্তু উপায় নেই। আইন বড় নাছোড়বন্দা বুঝলেন?'

জ্যাকসন বলে চলল, 'আমি গস্‌ওয়েল স্ট্রীট-এ গিয়েছিলাম, সেখান থেকে খবর নিয়ে এখানে আসছি। ডডসন্‌-ফগ-এর ইচ্ছে যে আপনি এক্ষুণি আমার সংগে শহরে ফিরে আসেন।'

'ও-মা, সে কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—এক্ষুণি। ব্যাপারটা জরুরি এবং ফেলে রাখার উপায় নেই—আইন আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছে যে...... দেখছেন না, আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'অবাক কাণ্ড।'

সবাই শ্রীমতী বারডেল-এর সংগে একমত হলেন বটে, কিন্তু সবাই বললেন উকিল যখন বলছে তখন যাওয়াই উচিত এবং এক্ষুণি।

শ্রীমতী বারডেল বেশ খুশি এবং গর্বিত বোধ করলেন—তিনি যে নেহাৎ কেউকেটা নন, কাজের লোক এবং তাঁর উকিল তাঁকে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়, এটা বন্ধুদের কাছে এবং বিশেষত ভাড়াটের কাছে, প্রমাণিত হ'ল বলে।

মুখে অবশ্য বললেন, 'কি যন্ত্রণা বাপু'—কিন্তু মনে মনে বেশ গর্বিত ও উৎফুল্ল হয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন বন্ধুবর্গসহ। গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরে জ্যাকসন মুখ খুলল, 'আমাদের খরচা আদায়ের ব্যাপারটা একটা জগাখিচুড়ি হয়ে রইল, তাই না?'

'তা আর আমি কি করতে পারি বল ছোকরা।—তোমরা যদি ধারে ব্যবসা কর তবে মাঝে মাঝে লোকসান হবে বৈ কি।'

'আপনি ডড্‌সন-ফগকে একখানা হ্যাণ্ড নোট লিখে দিয়েছেন না, খরচা বাবদ?'

'হ্যাঁ—ও একটা 'নামকা ওয়াস্তে' দিতে হয়, তাই।'

'তা ত বটেই—ও কিছু নয়।'

গাড়ি চলছে. শ্রীমতী বারডেল এবং তার বন্ধুরা ঢুলতে সুরু করলেন; হঠাৎ গাড়ি ঝাঁকি মেরে থেমে গেল এবং ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে তিনি চমকে বললেন, 'সে কি, অফিসে পৌঁছে গেলাম?'

'ঠিক অফিসে যাচ্ছি না আমরা!...... নিন, নেমে পড়ুন সব চটপট!'

কিছুটা অবাক হয়ে তাঁরা নামলেন। জায়গাটা কেমন যেন লাগছিল তাঁদের—উঁচু দেওয়াল, মাঝখানে এক বিশাল গেট, ঝনঝন শব্দে গেট খুলে গেল—ভেতরে ঢুকে তাঁদের অস্বস্তি বাড়ল আরও—লম্বা একখানা ঘরভর্তি লোক. সবাই হাঁ করে শ্রীমতী বারডেল-এর দিকে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে।

জ্যাকে দাঁড়িয়ে দুরুদুরু বক্ষে তিনি 'এ আমাদের এক সদর দপ্তর—কিছু নয়।—যান, ভিতরে যান।'

স্খলিত পদক্ষেপে তাঁরা এগোলেন, ইতিমধ্যে ঝনাৎ করে গেট বন্ধ হয়ে গেল।

'ব্যস! আর চিন্তা নেই—কেল্লা ফতে!' জ্যাকসন বলে উঠল।

'তার মানে?'

'মানে আর কিছুই নয়, এই পাওনা টাকাটার ব্যাপার আর কি! টাকা ত আর আদায় হ'ল না, আর আমাদেরও ব্যবসা করে খেতে হবে। কাজেই......দেনা শোধ করতে পারেন নি কি না, তাই বাধ্য হয়ে, নিতান্ত দায়িত্ব মনে আপনাকে জেলে......আইন বড় নাছোড়বান্দা, বুঝলেন কি না?......আচ্ছা, চলি তা হ'লে, কেমন?'

বলতে বলতে জ্যাকসন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাইরে।

শ্রীমতী বারডেল হাউমাউ শব্দে কাঁদতে সুরু করলেন—শ্রীমতী ক্ল্যাপিনস ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন এবং শ্রীমতী স্যানডারস বুদ্ধিমতীর মত দ্রুতপদে পলায়ন করলেন।

ঠিক সেই সময় পিক্‌উইক স্যাম জেলখানার বেড়াতে বেড়াতে এসে হাজির।......এবং পলকায় তারস্বরে আকাশ বাতাস মুখরিত করে শ্রীমতী বারডেল মূর্চ্ছা গেলেন।

'কি ব্যাপার হে', স্যাম এগিয়ে এসে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল।

'ও কিছু নয়......ও একজন আসামী; সবে এসেছে কি না. তাই ভয়ে ওরকম করছে।......এখানে এলে অনেকেই প্রথমে অমন করে, পরে সব ঠিক হয়ে যায়।'

বিস্মিত স্যাম চিৎকার করে উঠল, 'সে কি? কে নালিশ করল? কখন? কেন নালিশ হ'ল?......বল না হে।'

'আঃ দাঁড়াও না বলছি। তব সয় না যে হে!—বাদী ডড্‌সন—ফগ, মামলা খরচা আদায়ের নালিশ।—হ'ল? বাপরে বাপ!'

কোন কথা না বলে দরওয়ানের হাতে জোর করে একটা কড়কড়ে শিলিং গুঁজে দিয়ে স্যাম প্রাণপণে দৌড় বেরিয়ে গেল উকিল পার্কার-এর খোঁজে। রাস্তায় লোকের ধাক্কা খেয়ে. গাড়িচাপা পড়তে পড়তে কোনরকমে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়েও ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারল না—অফিস অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নাছোড়বান্দা স্যাম একে তাকে জিজ্ঞাসা করে পার্কার-এর ধোপানীর ঠিকানা বের করল এবং সেখানে গিয়ে তার বাড়ির ঠিকানা আদায় করে গিয়ে হাজির হ'ল উকিল-বাড়ি।

পার্কার-এর বাড়িতে সেদিন মস্ত ভোজ—বহু লোকের আনাগোনা। আনন্দ কলরোলে মুখরিত গৃহে গিয়ে ময়লা পোষাক

চাকর বাকর অসংখ্য, কিন্তু কেউই বেচারা জ্যাম-এর কথায় কর্ণপাতও করতে রাজি নয়। বিরক্ত স্যাম শেষকালে রেগে গিয়ে বলল, 'খবর দেবে ত দাও, নইলে এমন চেঁচাব যে লোক জড় হয়ে যাবে।'

অনন্যোপায় হয়ে একজন গিয়ে কর্তাকে খবর দিল যে পিক্‌উইক-এর কাছ থেকে লোক এসেছে। পার্‌কার কিছুটা অবাক হলেন, এবং অতিথিদের কাছ থেকে সাময়িক বিদায় নিয়ে এসে স্যামকে বললেন, 'কি হে স্যামচাঁদ, এমন অকালে কেন হে?'

'আজ্ঞে হুজুর, ব্যাপার খুবই গুরুতর—না হলে কি আর দরওয়ানকে ঘুষ দিয়ে ঢুকেছি।'

'তাই ত......আরে তুমিও ত জেলবাসী—হাঃ হাঃ—বেশ, বেশ। তোমার মত কয়েকটা লোক এখনও আছে বলেই দেশটা এখনো গোল্লায় যায় নি।......তা, কি ব্যাপার বল দেখি চট করে। ওদিকে আমার অতিথিরা সব হাঁ করে বসে আছেন আমার অপেক্ষায়।

'আজ্ঞে আজ ডড্‌সন-ফগ শ্রীমতী বারডেল-কে মামলার খরচা অনাদায়ের জন্য জেলে পুরেছে—আমাদেরই জেলে।'

'আঁ! বল কি হে—কি সর্বনাশ! তাজ্জব কাণ্ড।—সত্যিই ডড্‌সন-ফগ চতুর বটে, খেলা দেখাল একচোট খুব!'

'শয়তান স্যার, পাক্কা শয়তান!'

'যা বলেছ।......একদিক দিয়ে খুব ভাল হয়েছে, বুঝলে? দেখি যদি......'

'আজ্ঞে আমিও সেই ভেবেই আপনাকে খবরটা দিতে এলাম।'

'ঠিকই ভেবেছ—সদাপ্রভু যে কখন কাকে দিয়ে কি করান। হয়ত ডড্‌সন—ফগ নিজেদের অজ্ঞাতে আমাদের মহদুপকার করেছে।......ওহো, তুমি রাত্রে থাকবে কোথায়, আর খাবেই বা কি?—এক কাজ কর, এখানেই থেকে যাও রাত্রে; এখন যাও, আমার বাটলার তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমি কাল ঠিক দশটার সময় গিয়ে হাজির হব; পিক্‌উইক-কে এখন কিছু বোলো না।'

'যে আজ্ঞে', বলে স্যাম দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থার সন্ধানে বাটলার-এর সঙ্গে গেল।

পরদিন ভোরে উঠেই স্যাম দৌড়ে গিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হ'ল—যেন সে কোথাও যায় নি। পিক্‌উইক স্যাম-এর গোপন অভিসারের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় ছোটখাট, সদানন্দময় পার্‌কার এসে হাজির হলেন এবং পিক্‌উইক-এর দরজায় টোকা দেওয়ামাত্র স্যাম দরজা খুলে দিল—যেন সে অপেক্ষা ক'রে বসেছিল। এবং বেশ ভারিক্কী গলায় বলল, কর্তা, মাননীয় পার্‌কার এসেছেন।...... আপনি যে হঠাৎ না বলেকয়ে [illegible] কর্তাও আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চান।'

পার্‌কার চোখ টিপে স্যাম-কে জানালেন যে তিনি তার মতলব বুঝতে পেরেছেন, এবং তাকে ডেকে তার কানে চুপি চুপি কি বললেন। কথাটা শেষ হলে স্যাম তাঁর দিকে একবার, পিক্‌উইক-এর দিকে একবার তাকিয়ে সবশেষে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল......পরে মাথার টুপিটা একটান মেরে ফেলে দিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে সুরু করল।

'এসব কি ব্যাপার......অ্যাঁ?' অবাক হয়ে পিক্‌উইক প্রশ্ন করলেন।

'কিছু না, কিছু না—এদিকে এসো পিক্‌উইক, এখানে বস। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'ভাল কথা—আমি বসছি, কিন্তু কথাটা কি সম্বন্ধে জানতে পারি কি?'

'বলছি হে, বলছি—তুমি যে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচ দেখছি,' হাসতে হাসতে পার্‌কার বললেন।

'ছি ছি, ওকি কথা পার্‌কার বেশ, ঠিক আছে, তুমি যা বলবে আমি শুনব, কেমন? হল ত?—সেই পুরোনো কথা নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, তাই-ই বটে—তবে, একটু তফাৎ আছে হে, তফাৎ আছে!......জান কি যে শ্রীমতী বারডেল এই জেলেই এসেছে?'

'জানি।'

'কেন জেলে এসেছে সে তা কি জান?'

'হ্যাঁ।......অন্তত স্যাম-এর কাছে শুনেছি।'

'তা হলে ঠিকই শুনেছ, কেননা স্যাম বুদ্ধিমান ছেলে।—বর্তমানের প্রশ্ন হচ্ছে যে ভদ্রমহিলা কি এখানেই থাকবেন?'

'তার আমি কি জানি?—ডড্‌সনকে জিজ্ঞাসা কর। ফগ-কে প্রশ্ন কর।...... তুমি বেশ ভাল করেই জান সে কথা।'

'আমি ওসব কিছু জানি না বাপু!...... আমি শুধু এইমাত্র জানি যে ব্যাপারটা তোমার ওপরেই নির্ভর করছে—আর কোন কথা আমি জানি না, শুনতেও চাই না।'

চমকে লাফিয়ে উঠলেন পিক্‌উইক, 'তার মানে? কি আবোল তাবোল বকছ?'

'মোটেই আবোল তাবোল নয়।'

প্রকাণ্ড একটিপ নস্যি নিয়ে পারকার আবার বললেন, 'বাপু হে, যা বলি চুপ ক'রে শোন। শুধুশুধু চেঁচামেচি করে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা কেন?—সাদা কথা হচ্ছে যে, তুমি যতক্ষণ না মামলার খরচ এবং কোর্ট-দ্বারা নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ দিচ্ছ, ততক্ষণ ভদ্রমহিলা এখানেই থাকতে বাধ্য। এ কথাটা তোমার মাথায় যে কেন প্রবিষ্ট করাতে পারছি না, তা' আমি জানি না।'

তাই পার্‌কার তাড়াতাড়ি আর একটিপ নস্য নিয়ে বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, হঠ করে কিছু বোলো না: আমার কথা এখনো শেষ হয় নি।......আজ সকালে আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করেছি, কথাবার্তাও হয়েছে। টাকাটা দিয়ে তুমি যে শুধু তাকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে তাইই নয়, পরন্তু—বেশ ভাল ক'রে শোন—তার নিজের হাতে লেখা স্বীকারপত্র পাবে যাতে সে খোলাখুলি লিখে দেবে যে এ ব্যাপারটা আগাগোড়া ডড্‌সন—ফগ-এর দ্বারা সাজান, এর মধ্যে বিন্দুমাত্রও সত্য নেই।......আরও লিখবে সে: লিখবে যে তোমাকে এ অবস্থার মধ্যে ফেলে সে আন্তরিক দুঃখিত, এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।—বুঝে দেখ, এর চাইতে ভাল আর কি হতে পারে।'

'আমি টাকাটা দিলে তবে সে লিখে দেবে। খুব হল।'

'আজ্ঞে না হুজুর। অত কাঁচা কাজ পার্‌কার করে না। এই দেখ সেই চিঠি—আজ সকালেই আমার বাড়িতে শ্রীমতী বারডেল পোঁছে দিয়েছেন।......আমি সত্যি করে বলছি, আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই তিনি এটা লিখে পাঠিয়েছিলেন।...ভাই পিক্‌উইক, আমি ত কেবল তোমার উকিল নই, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুও বটে। আমার কথা শোন, এই সামান্য ক'টা টাকা—যা তোমার কাছে কিছুই নয়—এর জন্য তোমার মত একজন লোক এই নরককুণ্ডে থাকবে, আর একজন মহিলাকেও থাকতে হবে, এ কি ঠিক?......না, কিছুতেই না। অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই হতে দোব না।'

পিক্‌উইক ক্রমেই নরম হচ্ছিলেন এবং পার্‌কার-এর লম্বা লেকচারের-এর জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এই সময় দরজায় ঘা পড়ল।

'এই দেখ—আবার কে এল, অ্যাঁ। নিশ্চিন্ত হয়ে জরুরী আলোচনা করার জো নেই যে।......ভেতরে এস।'

স্যাম তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে সেলাম করল—আনন্দে সে চনমন কচ্ছিল। বলল, 'কর্তা, একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান।'

'আমি এখন কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারব না—আমায় বিরক্ত কোরো না স্যাম—যাও।'

বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে স্যাম হেসে উঠল, বলল, 'আজ্ঞে অত তাড়াতাড়ি কি কিছু ঠিক করা উচিত? আমার মনে হয় যে আপনার দেখা করাই কর্তব্য।'

'তার মানে?'

'দেখা করলেই মানে বুঝতে পারবেন।'

'ভাল কথা—যদি তাই হয়, তা হলে নিয়েই এস বাপু। ঝামেলা চুকে যাক।'

দরজা একটানে খুলে স্যাম চেঁচিয়ে

হুড়মুড় করে উইংকল এবং আরাবেলা অ্যালেন ঘরে ঢুকল, অন্ধকার ঘরে ছড়িয়ে পড়ল যেন একঝলক সূর্যালোক।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে পিকউইক দু'হাত জড়িয়ে বলে উঠলেন, 'আরাবেলা অ্যালেন।'

হঠাৎ হাটুগেড়ে বসে নাটকীয় ভঙ্গীতে উইংকল বললেন, 'না, না—শ্রীমতী উইংকল বলেই ওকে ডাকবেন!......আমায় ক্ষমা করুন স্যার, আপনাদের কাউকে না জানিয়েই......'

পিকউইক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন—ব্যাপারটা চট করে ধরতে না পেরে। কিন্তু আরাবেলার লজ্জারক্তিম মুখ আর বিব্রত হাসি এবং হর্ষোৎফুল্ল স্যাম-এর ভাবভঙ্গী দেখে তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল, এবং সানন্দে তিনি করতালি দিয়ে উঠলেন।

আরাবেলা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আপনি আমাদের ক্ষমা করুন—আপনার অজ্ঞাতে......'

পিকউইক মুখে কোন কথা না বলে দ্রুত চশমা খুলে ফেললেন এবং দু'হাত বাড়িয়ে আরাবেলাকে বুকে নিয়ে সস্নেহে তাকে চুম্বন করলেন, এবং উইংকল-কে 'দুষ্টু কোথাকার' বলে হাসিমুখে তার হাত ধরে টেনে তুলে তার পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিলেন।

শ্রীযুক্ত পারকার আনন্দে উদ্বেল হয়ে অন্তত আধডজনের মত নস্যি একটিপে টেনে নিলেন নাকে। স্যাম হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'বেশ, বেশ! বড়ই আনন্দের কথা।...... তা, তোমার ভাই কোথায়, আরাবেলা? বেনজামিন আসে নি?'

ভীতকণ্ঠে আরাবেলা বলল, 'না না, সে জানে না। তাকে খবর দেওয়ার ভার আপনার ওপর কিন্তু। সে বড় উদ্দাম, বড় রাগী, আর......আর......তার বন্ধু সয়্যার-এর সঙ্গে আমার......'

মনে মনে উল্লসিত পারকার মৌখিক গাম্ভীর্য দেখিয়ে বললেন, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না পিকউইক। ওরকম মেজাজী যুবক তোমার কথা ছাড়া আর কারো কথা শুনবে না।'

'কিন্তু, আমি ত জেলের মধ্যে—আমি কি করতে পারি?'

'সে কথা সত্যি, কিন্তু তুমি ত ইচ্ছে করলেই বেরোতে পার। ভেবে দেখ, একজন ভদ্রমহিলা এবং এই দুটি প্রেমমুগ্ধ বাচ্চার সুখশান্তি একমাত্র তোমার ওপর নির্ভর করছে। ভগবান তোমার ওপর মহান কর্তব্য চাপিয়েছেন—এখন তুমি বিবেচনা করে স্থির কর তুমি কি করবে।'

বুদ্ধিমতী আরাবেলা নারীজাতির শ্রেষ্ঠ শুনে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে পিকউইক অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন।

ঠিক এই সময় টাপম্যান এবং স্নডগ্রাস এসে হাজির হল। অতএব আবার কেঁচে গণ্ডূষ ক'রে সব কথা তাদের বলতে হল এবং তারপর প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ক'রে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন উচ্চস্বরে।

বিব্রত পিকউইক অবশেষে দু'হাত তুলে অনুরোধ করলেন তাদের চুপ করতে এবং বললেন যে তাদের যা খুসি তারা করতে পারে, তিনি আর কোন কথা বলবেন না।

সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠল। স্যাম ত লাফাতে সুরু করল।

অবশেষে, সেদিন বেলা তিনটের সময়, পিকউইক শেষবারের মত ঘরের চারধারে তাকিয়ে ধীরপদে বেরোলেন। জিনিষপত্র স্যাম আগেই নিয়ে গিয়েছিল। ঘরের বাইরে দেনদারের ভিড়—সকলেই উদারহৃদয় পিক-উইক-কে বিদায় জানাতে এসেছে। ভিড়ের ভেতর থেকে জিংগল-কে ডেকে পিকউইক পারকার-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'বেশ, বেশ—তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে—আমার মনে হয় তখন আমার কথা শুনে তুমি খুসিই হবে।'

জিংগল মাথা নিচু ক'রে সম্মান দেখাল তাঁকে। পারকার ব্যস্তভাবে পিকউইক-কে ঠেলতে লাগলেন, যেন মত বদলাবার আগেই তাঁকে ওখান থেকে বের করতে পারলে বাঁচেন।

তাঁদের বেরোতে হলো রীতিমত ভিড় ঠেলে।

সন্ধ্যা কাটল বন্ধুবান্ধবের ভিড়ে হৈ-হৈ ক'রে। পরদিন সকালে স্যাম-কে নিয়ে পিকউইক বারমিংহাম যাত্রা করলেন উইংকল-এর বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে উইংকল-এর বিয়ের কথা জানাবার জন্য। স্যাম মাথা চুলকে বলল, 'কর্তা, ঘোড়াগুলোকে তিনমাস দেনদারদের জেলে রাখলে ভাল হত।'

'কেন?'

'আজ্ঞে, তা হলে যা দৌড়ত, দেখতেন একবার।'

হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন পিকউইক।

বারমিংহাম থেকে বুড়ো উইংকল-কে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লণ্ডন-এ নিয়ে এলেন পিকউইক। ছেলে-বউকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বাড়ি নিয়ে গেলেন তিনি।

জিংগল-এর সমস্ত ধার শোধ দিয়ে তাকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ পাঠিয়ে দিলেন পিকউইক, সেখানে নতুন জীবন সুরু করার জন্য।

ক্ষতিপূরণের টাকা এবং মামলার খরচ পেয়ে জ্যাকসন-ফগও উল্লসিত। বিরাজমান।

শুভ—সমাপ্তি

এইসব আনন্দোজ্জ্বল ঘটনাবলীর পর বেশ কয়েকদিন ধরে পিকউইক এবং স্যাম রোজ ভোরবেলা বেরিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যা-বেলায় ফিরতেন—শত প্রশ্নেও কোন জবাব দিতেন না। কি গোপন কাজে তাঁরা সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন, তা শুধু তাঁরাই জানতেন।

এ ব্যাপারটা নিয়ে অন্তরঙ্গমহলে নানান জল্পনা কল্পনা চলল বেশ কিছুদিন ধরে—নানারকম বাজী ধরাও হল—কেউ বলল বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে, বোধহয় বিয়ে করছে। কেউ বা বলল বোধহয় লম্বা পাড়ির কোন বন্দোবস্ত হচ্ছে; অন্য জনেক ভিন্ন মত স্যাম-কে ধরে টানাটানি চলল খুব, কিন্তু ঘুষ দেবার লোভেও স্যাম কোন কথা বলতেই রাজি হল না।

অবশেষে কৌতূহল যখন উপচে পড়ার উপক্রম, তখন সবাই স্থির করলেন দল বেঁধে [illegible] এই উদ্দেশ্যে বুড়ো ওয়ারডল মুখপাত্র হিসেবে এক ডিনার পার্টির আয়োজন করলেন।

ডিনার শেষে মদ্যপাত্র হাতে নিয়ে ওয়ারডেল পিকউইককে পাকড়াও করলেন। 'আমরা জানতে চাইছি আমরা এমন কি অন্যায় করেছি যার জন্য তুমি আমাদের ত্যাগ করছ?'

'সে কি কথা—ত্যাগ করেছি মানে?'

'মানে খুবই পরিষ্কার—আজ পনের-ষোল দিন ধরে তোমার টিকিটিও দেখতে পাচ্ছি না আমরা—বুড়োটিকে নিয়ে সারাদিন কি কর, কোথায় যাও—কিছুই আমাদের বল না!—কেন, বল দেখি? আমরা জানতে চাই, এবং আজই।'

'বটে? আশ্চর্য ত। আমিও ঠিক করেছিলাম আজই তোমাদের ব্যাপারটা জানাব।—ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আমাদের ক্লাব-এর আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে।—কারুর জীবনে আনন্দ এসেছে, কারুর বা বিষাদ। সাংসারিক ব্যাপারে কেউ বা জড়িয়ে পড়েছে আরও অনেক। এইসব পরিবর্তন-জনিত পরিস্থিতির সঙ্গে আমাকেও খাপ খাইয়ে চলতে হবে। বয়েসও হয়েছে—এখন আর দৌড়ে বেরিয়ে খাপছাড়া জীবনযাপন উচিতও নয়।

এইসব ভেবেই আমি স্থির করেছি একখানি বাড়ি কিনে পাকা আস্তানা করা উচিত। বাড়ি একখানা কিনেছি, সহরের প্রান্তে এবং স্থির করেছি আর বিলম্ব না ক'রে গৃহপ্রবেশ করব। আশা করি বাকি দিন কটা শান্তিতে কাটাতে পারব।'

সকলেই চুপ করে শুনছিলেন—হৃদয় সকলেরই পরিপূর্ণ।

পিকউইক আবার বললেন, 'স্যাম আমার কাছেই থাকবে। বাড়িখানিতে বাগানও আছে ছোট্ট একটু।......আমার একটু আস্তানা আছে। আমার ধর্ম লৌকিক নয়—আমার ধর্ম মানুষকে সুখী করা—আমার আশেপাশে যারা আছে, তাদের সুখী করতে পারলেই আমার ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন হ'ল বলে আমি মনে করি। লোকের মুখের একটু হাসি আমার কাছে শত প্রার্থনার সান্ত্বনা আনে। কাজেই আমার একান্ত অনুরোধ যে আমার গৃহপ্রবেশ হোক বন্ধু ওয়ার্ডেল এর কন্যার বিবাহ আমার বাড়িতে হয়ে; স্নডগ্রাস এবং এমিলি-র বিয়ে আমার বাড়িতে হলে আমার যে শান্তি হবে, তা [illegible] উচ্চারণে [illegible]।'

পিকউইক চোখ মুছলেন। চোখ কারুরই শুকনো ছিল না—এমিলি এবং আরাবেলা ত ফুঁপিয়ে উঠল।

সজলচক্ষে ওয়ার্ডেল পিকউইক-কে জড়িয়ে ধরলেন। আরাবেলা এবং এমিলি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চুম্বনে চুম্বনে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল।

আনন্দ-কলরোলের মধ্যে ডিনার শেষ।

স্নডগ্রাস এবং এমিলির বিবাহের আয়োজনের সামান্যই বাকি ছিল। বিপুল উৎসাহে বুড়ো ওয়ার্ডেল উঠেপড়ে চটপট কেনাকাটা শেষ ক'রে ডিংলেডেল থেকে তাঁর মাকে নিয়ে এলেন।

৭

নির্দিষ্ট দিনে স্নডগ্রাস বরবেশে ডালউইচ গিরজা-য় উপস্থিত হলেন পিকউইক এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ সহ, অবশ্যই স্যাম উপস্থিত ছিল সেজেগুজে হাসিমুখে। এমিলির সলাজ সুন্দর মুখ গিরজার অনেক যুবকের হৃদয় আন্দোলিত করেছিল।

উৎসবান্তে সকলে ফিরলেন পিকউইক-এর বাসগৃহে। আনন্দ-কলরোলে মুখরিত গৃহের মধ্যস্থলে প্রশান্ত পরিতৃপ্তির প্রতিমূর্তি পিকউইক-কে যেন দেবদূতের মত মনে হচ্ছিল সকলের।

প্রাতরাশ ঘোষিত হল—পিকউইক ওয়ার্ডেল-এর মাকে হাত ধরে নিয়ে বসিয়ে দিলেন; সবাই আসন গ্রহণ করার পর স্যাম পিকউইক-এর চেয়ার এগিয়ে দিল,—ধীরে ধীরে তিনি বসলেন এবং পরিতৃপ্তির হাসি হেসে চারদিকে তাকালেন।

এদের পূর্ণ হৃদয়ে বিরাজমান দেখে আমরাও বিদায় নিলাম, শুধু একটু ছোট্ট খবর দিয়ে—এই একই দিনে স্যাম ওয়েলারও বিয়ে হয়েছে।"

॥ সমাপ্ত ॥

অনুবাদক—সমীরণ চৌধুরী

জাগহি

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর

অত্যাচারীর খড়্গ আজো সদা খুনের রং মাখা-ই,
কংস শিশুপাল শকুনি দুর্যোধনের সংখ্যা নাই।
দেশের মাঝে আজও আছে লক্ষ হাজার দুঃশাসন
কীচক জরাসন্ধ আদি মদান্ধ পাষণ্ডগণ।
শক্তিহীনের বুকের উপর শক্তিশালী রথ চালায়,
বস্ত্রহীনা হয় কত না দ্রৌপদী তার মদশালায়।
মনিব মহাজনের বেশে বেড়ায় দেশে মহা হন
অসাধুদের কপটশালা দৃঢ়াস সাধুর মতিভ্রম।

ঘরে ঘরে কুরুক্ষেত্র উদ্গারে কাল ঈর্ষানল,
সঙ্গে আবার স্বার্থবাদের মত্ত হাওয়া বয় প্রবল।
কলি যুগের হস্তে এসে হস্তমিলায় বৈশাযুগ,
রক্তচুষে খায় মানুষের মানুষ পশু-রক্তভুক্।
লক্ষ মুখের ভাত কেড়ে খায় চিবায় শতলক্ষ শির,
হায়রে তবু যায় না ক্ষুধা দুর্নীতি-পাপ-রাক্ষসীর!
বণিক. মুদী, পুতনা সব ভেজাল মালের বিষ ছড়ায়
চোরাবাজারী নব [illegible] টাকার পিরামিড গড়ায়।

বাদ প্রতিবাদ কানাকানি হানাহানি লুটতরাজ
লেগেই আছে, বিঘ্নহারী কোথায় আছো সুপ্ত আজ?
ওঠো জাগো, দুঃখ হতে উদ্ধারিতে মর্ত্যলোক—
"সম্ভবামি যুগে যুগে" বাক্য তোমার সত্য হোক!
লাভ শিকারী, টাকার কুমীর পুঁজিপতির রাজপ্রাসাদ
তাসের ঘরের মতই তোমার একফুঁতে হোক ভূমিসাৎ,
দুষ্ট দলন, শিষ্টপালন, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায়—
শান্তি আসুক, স্বস্তি আসুক, নন্দিত হোক দেশ ত্বরায়।

সম্পাদকের মোক্ষ লেহ

গল্প হলেও মিথ্যে নয়, বলে রে সব কীর্তিকাহিনী কীর্তিত হয় আমার এই লেখাটা সেই পর্যায়ের ভেতরে পড়ে যায় কি না আমি জানি নে; যদিও এই বৃত্তান্তের আগাগোড়াই এক নায়কের লিখিয়ের মুখে শোনা আমার; কিন্তু তাহলেও, ঘটনা হিসেবে হয়ত বা সত্য হলেও, গল্প বলেই এটাকে ধরতে বলব আমি তোমাদের। কেন না, দু'জন বেশ নামজাদা সম্পাদক এই কাহিনীর মুখ্য নায়করূপে উল্লিখিত—সেই কারণেই আমার এই বারণ।

প্রবাসীর বিশ্ববিশ্রুত সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দবাবুর নাম তোমাদের অজানা নয়। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে নাইতে নেমে একবার তাঁর কাশী-প্রাপ্তি হবার মতন হয়েছিল। গঙ্গার অন্তরে কোন্ বিক্ষোভের দরুণ কে জানে, মাঝে মাঝে তার গর্ভে স্রোতের ঘূর্ণির মতই এক-একটা জায়গায় দেখা দেয় অকস্মাৎ, তার তোড়ের মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। প্রায় অন্তর্জলি হবার মতই হয়ে যায়। স্রোতের টানে তলিয়ে যেতে হয় কিংবা ভেসে যেতে হয় তৎক্ষণাৎ।

দশাশ্বমেধ ঘাটে রামানন্দবাবুরও সেদিন বুঝি প্রায় সেই দশাই ঘটেছিল, ভেসে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময় অচেনা এক যুবক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাড়ে টেনে তুলে এনে তাঁকে বাঁচায়।

সকৃতজ্ঞ সম্পাদকমশাই ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলেন। ছেলেটি তাঁর জবাবে বলল—'পরিচয় কী দেব, আমার পরিচয় দেবার মতন কিছু নেই। সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলে আমি, আমার পরিচয়।'

'সাধারণ হলেও তুমি সামান্য নও ভাই। পরের প্রাণরক্ষার জন্য যে নিজের জীবন বিপন্ন করে এগোয় সে নিতান্ত সাধারণ নয়, অসাধারণ কিছু একটা করবেই সে একদিন না একদিন। এই যেমন, আজকেই একটা করে বসলে।'

বলে তারপর তিনি নিজের পরিচয় দিলেন—।' যদি কখনো কলকাতায় যাও আর আমাকে দিয়ে তোমার কোনো কাজ হয়—আমি তোমার কোনো প্রয়োজনে লাগি যদি তা অসঙ্কোচে আমায় জানিয়ো। এই আমার ঠিকানা।'

রামানন্দবাবুর কথা মিথ্যে হয়নি। তারপরেই মানে, প্রবাসী সম্পাদকের পরিচয় পাবার পরেই বোধ হয়—(প্রবাসী তখন ভারত-বিখ্যাত পত্রিকা—সেই পত্রিকায় কারো লেখা বেরুলেই তখনকার দিনে রাতা-রাতি নাম হয়ে যেত তার—নজরুল, প্রেমেন, অচিন্ত্য এবং আরো অনেকে তাঁদের প্রথম লেখা ঐ পত্রিকার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশবিখ্যাত হয়েছিলেন) ছেলেটি সত্যিই এক অসাধারণ কীর্তি করে বসল। লম্বা-চওড়া দশাসই এক কবিতা লিখে বসল অকস্মাৎ।

শিবরাম চক্রবর্তী

তারপরই সেই কবিতা বগলে করে সে দৌড় দিল কলকাতায়।

সোজা উঠল গিয়ে প্রবাসী কার্যালয়ে।

সম্পাদকমশাই তখন আপিস-ঘরেই বসেছিলেন। চোখ তুলে চাইলেন আগন্তুকের দিকে—'কী চাই আপনার?'

'আজ্ঞে, চিনতে পারছেন না আমাকে? আমি কাশীর সেই যুবক যে আপনাকে সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে—'

'ওহো! চিনতে পেরেছি। বিলক্ষণ, বসো বসো। কী করতে হবে বলো আমায় এবার?'

'আজ্ঞে, আমার এই কবিতাটি আপনি পড়ে দেখুন একবার।'

কবিতাটি হাতে নিয়ে আদ্যোপান্ত মন দিয়ে তিনি পড়লেন, তারপর শুধোলেন—'এটা কি প্রবাসী কাগজে ছাপতে হবে নাকি আমাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো আমি কাশী থেকে এলাম। ডাকে না পাঠিয়ে এত খরচা করে নিজেই নিয়ে এলাম এটা স্যার।'

রামানন্দবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন বেশ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'কাশীর ফিরতি গাড়ি কের ক'টায়?'

'সন্ধ্যের একটা গাড়ি আছে। সেটা মেল ট্রেন।—আবার রাত এগারোটাতেও আর একটা প্যাসেঞ্জার।'

'সন্ধ্যেরটাই ভালো। এই নাও টাকা। যাও, দু'খানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে নিয়ে এসো গে।'

'দু'খানা টিকিট?' ছেলেটা একটু অবাক হয় এবার—'দু'খানা কিনে আনব? কেন বলুন তো? দু'খানা টিকিটে কী হবে?'

'আজ সন্ধ্যের গাড়িতেই আমরা কাশী পাড়ি দেব কিনা। যাব আবার কাশীতে।'

'কাশীতে যাবো কেন? আমরা দু'জনে একসঙ্গে আবার আজকেই ফের? এত তাড়াতাড়ি—কেন বলুন তো?' কিছুই বুঝতে না পেরে ছেলেটি বেশ হকচকিয়ে যায়—'আর আমার এই কবিতাটা—? এটার কী হবে? এটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো? ছাপচেন তো আপনার প্রবাসীতে?'

'না। কাশীতে ফিরে আবার আমি সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের কিনারাটায় গিয়ে দাঁড়াব। আর তুমি আমায় ধরে তার পাড় থেকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দেবে আবার। আমি গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেতে চাই। সলিল-সমাধিই আমার একমাত্র কাম্য।'

'গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাবেন আপনি? কিন্তু কেন, বলুন তো?'

'তোমার এই কবিতা আমার কাগজের জন্য গ্রহণের চেয়ে মৃত্যু-বরণ করাই আমি শ্রেয় বোধ করছি।'

এই ঘটনার অনেক—অনেক দিন পরে, আবার সেই দশাশ্বমেধ ঘাট এবং আবার আরেক ভারত-বিশ্রুত সম্পাদক। এবং আবার—আবার সেই হাবুডুবু খাবার পালা!

লেখকরা যেমন অথৈ জলের রেখার ভেতর লেখার দেখা পেয়ে থাকেন, সম্পাদকদেরও তেমনি টেবিলের উপর পুঞ্জীভূত স্তূপীকৃত লেখার সামনে অথৈ জল দেখতে হয়। কিন্তু লেখার সেই জলাঞ্জলি নয়, সত্যিকারের স্রোতের ধারেই জলাঞ্জলি যেতে বসেছিলেন এই ভদ্রলোক। প্রবীণ রামানন্দবাবুর মতই আমাদের এই নবীন সম্পাদক।

হাবুডুবু খাবার পালা থেকে সেই তরুণ সম্পাদককে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচালেন আবার এক তরুণতর যুবক।

প্রায় সলিল-সমাধি থেকে উঠে সম্পাদক সেই যুবককে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন,—'আমার নাম শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, মাসিক বসুমতীর সম্পাদক আমি।'

'জানি জানি। আর বলতে হবে না;' বলে ওঠে যুবকটি। 'আপনার নাম প্রায় মুখস্থ হয়ে আছে আমার।'

নিজের সম্পাদক-খ্যাতিতে প্রাণতোষ পুলকিত হলেন কি না কে জানে। কিন্তু একটু অবাক হলেন বোধ হয়, তাহলেও তিনি তাকে বললেন—'যদি আমি আপনার কোনো কাজে লাগি--আপনি আমাকে সলিলসমাধির থেকে বাঁচিয়েছেন---'

'আপনি! আপনি আমার কী কাজে লাগবেন! না, আপনি আর কী করবেন! আমার যা করবার তা তালেই করেছেন।'

'মানে যদি কখনো আপনি কলকাতায় যান--' প্রাণতোষ বুঝি রামানন্দবাবুর পুনরুক্তি করতে চান।

'যাব ভেবেছিলাম! কিন্তু তার আর দরকার হবে না। এখানেই তো পেয়ে গেলাম আপনাকে—দেখা পেয়ে গেলাম আপনার---'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে কি কলকাতায় যাবার ইচ্ছে ছিল নাকি আপনার?' আবার বুঝি সম্পাদকের প্রাণে একটু পুলক জাগে।

'দেখা করতে? না না—আপনাকে একচোট দেখে নিতেই—যেতে চেয়েছিলাম আমি একবার—'

দেখে নিতেই? কথাটা যেন কেমন বেসুরো লাগে প্রাণতোষের কানে। প্রবাসী বাঙালী বাংলা ভুলে যায় বলে শোনা যায় বটে, কিন্তু তাই বলে কি তা এতখানিই হবে। দেখতে আর দেখে নিতের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য তার পরিমাপ হারিয়ে এমন তালগোল পাকিয়ে বসবে। ধাতু প্রত্যয়ে এমন গোলমাল বাধাবে সে?

'কেন বলুন তো?' জানার কৌতূহল হল সম্পাদকের।

'কেন শুনবেন? তিন বছরের বেশীই হবে, আপনার পত্রিকায় আমি লেখা পাঠাচ্ছি। নানা ধরণের লেখা—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ক্রীড়া-কৌতুক, হাস্যরস, নাট্যগুচ্ছ, কালজয়ী উপন্যাস---কী না পাঠিয়েছি। কিন্তু তার একটাও আপনি ছাপালেন না একবারও। পড়ে দেখেছেন কিনা, পড়বার ফুরসৎ পেয়েছেন কিনা তাই বা কে জানে। তা যাই হোক, আর আমি এখন আপনার হাতে নেই, এবার আমিই আপনাকে আমার হাতে পেয়েছি।'

'তার মানে?' ওর কথায় প্রাণতোষের কেমন যেন খটকা লাগে। কথাটা তেমন সুবিধের বলে বোধ হয় না।

'তার মানে---আপনি জানতে চান? মানে, আমি ভেবেছিলাম কোনোদিন আপনার আর ধার ঘেঁষব না। বড় বড় ধারই, কথায় বলে, তিন বছরে তামাদি হয়ে যায়। আর তিন বছরের বেশিদিন ধরে আপনাকে আমার লেখা পাঠাচ্ছি আমি। আপনার ধার ঘেঁষা আর উচিত হ'ত না আমার। কিন্তু ভগবান যখন দৈবাৎ পাইয়েই দিলেন, আমার ধারে-কাছেই পেয়েছি আপনাকে যখন, তখন আজ আর আপনার রক্ষে নেই—সব ধার আপনার শোধ করব এবার।'

'আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে এসব কী কথা বলছেন আপনি?'

'এক্ষুণি সেই উদ্ধারের শোধ তুলব—বলছি তো! এই দণ্ডেই: চলুন, যেখান থেকে তুলে এনেছি সেইখানেই ফের ফেলে দিয়ে আসি আবার আপনাকে!'

'অ্যাঁ?' ষণ্ডামার্ক সেই যুবকের কথায় হতভম্ব হতে হল সম্পাদককে।

'হ্যাঁ। ওই গঙ্গাগর্ভেই বিসর্জন দিয়ে আসব আপনাকে আবার।'

যুবকটি প্রাণতোষকে আত্মবিসর্জনে নিতান্ত পরাঙমুখ দেখে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে উন্মুখ।

প্রাণতোষ, কোনোরকমে তার হাত পিছলে, ফস্‌কে ভোঁ করে লম্বা একদৌড় মারে। 'রক্ষে করুন মশাই! খুব হয়েছে! আর না।'

প্রাণতোষ ঘটকের তরুণবয়সে কেবল লেখাই নয়, নানান স্পোর্টস্ নিয়েও চেষ্টা চর্চা ছিল বোধ করি, দৌড়ের বাজিও মেরে থাকবেন হয়ত একাধিকবার, তাই, এবারের বাজিতেও সেই ভগ্নমনোরথ লেখককে হারিয়ে দিয়ে তার পাল্লা থেকে সুদূরপরাহত হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন কোনো গতিকে—সে যাত্রায়!*

---

* মৌচাক হইতে সংগৃহীত।

শিবাজীর অন্তর্ধান

তখন ভারতের আসমুদ্র হিমাচলের অধিপতি---মুঘল বাদশাহ,---আওরঙ্গজেব। দোর্দণ্ড প্রতাপে ও ক্রুর রাজনৈতিক চাতুর্যে সমগ্র ভারতের প্রায় সকল বড় ও ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁর পদানত বা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভ্রাতাদের হত্যা করে সিংহাসনে উপবেশন করতেই ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সকল হিন্দুরা মহা-শঙ্কিত হয়ে উঠলো, কারণ বাদশাহ আওরঙ্গজেব দারুণ হিন্দু-বিদ্বেষী।

ঠিক এই সময়, দক্ষিণ ভারতে মারাঠা জাতির মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা কূট-রাজনীতিজ্ঞ, নিষ্ঠাবান হিন্দু, অসম সাহসী, বীরশিবাজীর আবির্ভাবও হল। নগণ্য বিচ্ছিন্ন মারাঠাদের একত্র করে প্রচণ্ড সামরিক জাতিতে পরিণত করেন, মহারাষ্ট্রের এই জননায়ক ছত্রপতি শিবাজী। শিবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বুক হ'তে বিধর্মীদের আধিপত্য সবলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমগ্র দেশব্যাপী একটি অখণ্ড হিন্দু রাজ্য বা 'হিন্দবী-স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত করা।

পুণা, নাসিক, সাতরা---মারাঠাদের দেশ---মহারাষ্ট্র। পুণার এক ক্ষুদ্র জায়গীরদার অর্থাৎ জমিদার বংশে শিবাজী বা শিববার জন্ম হয়। শিবাজী বাল্যকাল হতেই মহা দুরন্ত, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমান। যুদ্ধ-শিক্ষায় আগ্রহ অত্যন্ত, আরও গুণ ছিল তাঁর---নেতা হবার। প্রথম যৌবনে মারাঠা দেশের 'মোবলা' নামক শক্তিশালী পার্বত্য জাতিকে নিজবশে এনে রণ-শিক্ষা দিয়ে বীর সৈনিকে পরিণত করেন ও তাদের দলপতি বা রণনায়ক হন।

তরুণ রণনায়ক শিবাজী মোবলা-দের সাহায্যে মহারাষ্ট্রের কাছাকাছি বহু স্থান বা ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করতে আরম্ভ করেন, তাঁর উদ্দেশ্য সমগ্র ভারত অধিকার করা। সেজন্য অভিযানের পর অভিযান চালাতে লাগলেন। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি সার্থক হলেন। দক্ষিণ ভারতের বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি হতে শিবাজীর বেশী সময় লাগলো না।

নিরক্ষর চাষী জমিদারের মহা দুরন্ত সন্তান হলেন ছত্রপতি শিবাজী।

অধিকৃত রায়গড় নামক স্থানে শিবাজী নিজেকে 'রাজা' বলে

শ্রীগোপেন্দ্র বসু

ঘোষণা করলেন, তাঁর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে 'ভবানী' দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন প্রতাপগড় নামক পার্বত্য এক পল্লীতে।

নগণ্য মারাঠা জাতির মধ্যে এরূপ একজন বীরের আবির্ভাব হয়েছে জেনে ভারতের বহু ব্যক্তির বিশেষত নির্জীব শঙ্কাগ্রস্ত হিন্দুদের মনে একটি আশা ও গভীর আনন্দের আলো দেখা দিল। কিন্তু একজন মহা দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত ও অন্তরে অন্তরে ক্রুদ্ধ হলেন---তিনি ভারতের বাদশাহ-আওরঙ্গজেব। হিন্দু-শিবাজীর বলবিক্রম ও রাজ্য বিস্তারের সংবাদ শুনে অবধি তাঁর বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলে উঠলো তা তাঁর দীর্ঘ জীবনে কোনদিন নিভে নাই, উপরন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর শেষ জীবনে।

কি উপায়ে এই হিন্দুবীর শিবাজীকে দমন বা নিশ্চিহ্ন করা যায়, সেই চিন্তায় বাদশাহ সর্বদা মগ্ন হয়ে রইলেন।

শিবাজী শুধু শক্তিশালী নন---মহাচতুর ও কূট-রাজনীতিজ্ঞ। যুদ্ধ

শিবাজী

বিগ্রহ বিষয়ে অসম্ভব কৌশলী—তাঁর রাজ্য ও রাজধানী দুর্গম পার্বত্য প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রকাশ্য যুদ্ধে শিবাজীকে দমন করা অসম্ভব। ঐ পার্বত্য মূষিককে জব্দ করতে হলে কৌশলের পথ ধরতে হবে—বাদশাহ মনে মনে স্থির করলেন।

ভারতের রাজধানী আগ্রা শহর। আনন্দ কল্লোলে মুখরিত অপূর্ব সাজ-সজ্জায় উদ্ভাসিত আলোকিত। রাজ্য-ব্যাপী মহোৎসব। ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি বাদশাহ আলমগীর বা আওরঙ্গজেবের পঞ্চাশতম জন্মদিন। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ হতে সামন্ত, রাজা, নবাব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এসেছেন এই উৎসবে যোগদান করতে—বাদশাহকে সম্মান জ্ঞাপন করতে।

ছত্রপতি শিবাজীও আমন্ত্রিত হয়ে আগ্রায় এসেছেন। প্রকাশ্য দরবারে তিনি বাদশাহকে সসম্মানে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা 'নজর' বা উপঢৌকন দিলেন।

আওরঙ্গজেব তুষ্ট হয়ে বললেন—'আও শিবাজী রাজা।' মৃদু হাস্য করে মনে মনে বললেন—'শিকার আয়ত্তের মধ্যে এতদিনে এসেছে—এইবার।'

শিবাজীর উপর আওরঙ্গজেবের আক্রোশ—সে ভারতব্যাপী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী বলে।

সেদিনকার দরবার বা উৎসব শেষ হলে বাদশাহের আদেশে শিবাজী 'নজরবন্দী' হলেন।

আগ্রার তাজমহলের কাছে সশস্ত্র সৈন্য বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র গৃহে শিবাজী, তার ভ্রাতা হীরাজী ও পুত্র সম্ভাজী এবং কয়েকজন অনুচরের থাকবার ব্যবস্থা হল।

এহেন সঙ্কটকালেও শিবাজী দমেন না, হতাশ হতে জানেন না, কোন অবস্থাতেও নিশ্চেষ্ট হন না।

শিবাজী, বন্দিবাস হতে পর-রাজ্যলোভী বাদশাহকে লুব্ধ করতে পত্রের পর পত্র দিতে লাগলেন, আবেদন জানালেন,—অনুমতি দিন, আপনার দরবারে উপস্থিত হবো, 'বিজাপুর' 'গোলকোণ্ডা' যাতে আপনি সহজে জয় করতে পারেন সে বিষয় পরামর্শ দেব; আর ঐ কাজে সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত থাকবো, আমি ত' আপনার অনুগত ব্যক্তি বললেই হয়। আমার সাহায্যে যদি ঐ দুটো রাজ্য আপনার লাভ হয় তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে একটা সেনাপতির পদ দেবেন, আপনি ত' সদাশয় মহান্ ব্যক্তি। অতিবড় শত্রুকেও আপনি ক্ষমা করে থাকেন----।

শিবাজীকে বন্দী করার মধ্যে আওরঙ্গজেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা, কিন্তু ক্রূর রাজনীতিজ্ঞ বাদশাহ অকস্মাৎ সে কাজ করলেন না, তিনি বুঝলেন—বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা গ্রাস করতে হলে সত্যই শিবাজীর পরামর্শ ও সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমে যতদূর পারি সে সকল গ্রহণ করবো, তারপর ওকে হত্যা করবো---আর ঐ পার্বত্য মূষিকের দাঁত ত' ভেঙ্গে দিয়েছি---। থাক কিছুদিন পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে, মেরুদণ্ডও ভেঙ্গে আসুক।

বন্দিবাসের রক্ষককে আওরঙ্গজেব নির্দেশ দিলেন,—শিবাজীকে যথোচিত-ভাবে রাখবে, ওর যখন যা প্রয়োজন হবে তা যেন মিটানো হয়। তবে ওর উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখবে। ও মহাধূর্ত এবং পলায়নকার্যে বিশেষ দক্ষ।

বাদশাহ নানা কাজের অজুহাত দেখিয়ে শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না বা তাঁকে দরবারে হাজির হবার অনুমতি দিলেন না, আশা দিলেন, পরে দেখা হবে।

কূট-রাজনীতিজ্ঞ শিবাজী সর্ব বিষয়ে প্রতি দিক হতে চিন্তা করতেন, সেজন্য আগ্রায় আসবার পূর্বে তাঁর অনুপস্থিতিতে মারাঠা রাজ্য শাসন করবার ভার বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত অনুচরদের উপর দিয়ে এসেছিলেন। আগ্রা আয়ত্তের মধ্যে এলে বাদশাহ তাঁকে বন্দী বা হত্যা করতে পারেন. সে বিষয়ও চিন্তা করেছিলেন, সেজন্য শিবাজী তাঁর কয়েকজন অনুচরকে আগ্রার মধ্যে ও নিকটস্থ স্থানে ছদ্মবেশে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রথমেই।

বন্দী অবস্থার প্রথম হতেই শিবাজী ঐ অনুচরদের সঙ্গে অতি গোপনে গোপনে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন।

বাদশাহ শিবাজীকে জানালেন, তিনি রাজকার্যে মহাব্যস্ত, একটু অবসর পেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বা দরবারে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাবেন। বাদশাহ এলেন না, তাঁর পরিবর্তে দরবারের সভাসদ্‌রা শিবাজীর বন্দিবাসে এসে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। চতুর শিবাজী তাঁদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে জানাতেন, বাদশাহ যদি মুক্তি দেন ও আদেশ করেন, তাহলে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্য অতি সহজেই জয় করে তাঁর পদতলে উপঢৌকন দেবে।

সভাসদ্ ও গুপ্তচররা বাদশাহকে জ্ঞাপন করলে, এতদিনে পার্বত্য মূষিকটি পোষ মেনেছে, এখন সে সত্যই বাদশাহের হিতার্থী ও কৃপাপ্রার্থী।

●

কয়েক মাস এইভাবে কেটে গেল।

বন্দিনিবাসে শিবাজী অকস্মাৎ উৎকট ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভীষণ-ভাবে আক্রান্ত হলেন, উত্থান শক্তি বোধ হয় চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, শিবাজী আজ পঙ্গু—দণ্ডায়মান হ'তে বা উপবেশন করতে পারেন না, দিনরাত রোগের যন্ত্রণা ভোগ করছেন, শয্যাশায়ী অবস্থায় শিবাজীর পুত্র ও তার কারাবাসের সঙ্গীরা মহা-চিন্তাগ্রস্ত। বাদশাহের সভাসদ্‌দের কাছে শিবাজী সাশ্রুনেত্রে প্রকাশ করলেন,—তিনি জীবনে বহু পাপ-কার্য করেছেন সেজন্য তাঁর এই শোচনীয় দশা হয়েছে। জগতের কোন চিকিৎসক তাঁকে এই মহারোগ থেকে মুক্ত করতে পারবে না—এ রোগ, দেবতা বা সাধু-সজ্জনের কৃপা ব্যতীত

পারবে না। এইজন্যে দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা-হোম ও সাধু-সজ্জনদের তুষ্ট করা প্রয়োজন।

বাদশাহ অনুমতি দিলেন ---রোগ-মুক্তির জন্যে শিবাজী যা করতে ইচ্ছা হয় করুক, কিন্তু সাবধান ওকে বিশ্বাস করবে না---রক্ষীদের সতর্ক করে দিলেন।

শিবাজীর কক্ষে অহোরাত্র হোম, পূজা, যাগ-যজ্ঞ চলতে লাগলো। আগ্রা ও রাজধানীর নিকটস্থ সাধু-সন্ন্যাসী-পীর-ফকীরদের তুষ্টির জন্য শিবাজী প্রতিদিন মিষ্টান্ন-ফলমূল-পূর্ণ ঝুড়ি, সঙ্গীদের দ্বারা তাঁদের কাছে পাঠাতে লাগলেন।

শিবাজীর বন্দী-গৃহের রক্ষীরা ও আগ্রা শহরের কোতোয়ালীর কর্মচারীরা প্রথম দু'চারদিন অস্বাভাবিক বৃহৎ ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই আপত্তিকর কিছু না পেয়ে পরে ঐরূপ ঝুড়ি পরীক্ষা করা বন্ধ করলেন।

এত পূজা-অর্চনা-দান-ধ্যান করা সত্ত্বেও শিবাজীর রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাঁর সঙ্গীরা ঘোষণা করলে---প্রভুর জীবনের আর আশা নেই। আগ্রার চিকিৎসক বলতে মুসলমান হাকিম। শিবাজী গোঁড়া-হিন্দু, তিনি জীবন বাঁচানোর জন্যেও হাকিমি দাওয়াই স্পর্শ করতে রাজী নন।

শিবাজীর কক্ষের একটি গবাক্ষ ব্যতীত সকল দরজা-জানালা রুদ্ধ। সারাদেহ আবৃত করে মেঝের উপর দিনরাত প্রায় একভাবেই শয়ন করে থাকেন, সামান্য দু'একটা কথা বলতেও তাঁর বিশেষ কষ্ট হয়। কারাগারের প্রহরীরা বা রাজ্যের গুপ্তচর-গণ অথর্ব মুমূর্ষু বন্দীকে আর বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই মনে করে পূর্বের মত সতর্কদৃষ্টি রাখে না। তারা দূর হতে মধ্যে মধ্যে শিবাজীকে দেখে যায়, তিনি অন্ধকার কক্ষের মধ্যে সারাদেহ কম্বলে আচ্ছাদিত করে শায়িত থাকেন।

আগ্রা শহরের উত্তর প্রান্তসীমা হতে কিছুদূরে, অরণ্যময় একটি নির্জন-প্রায় স্থানে, শিবাজীর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি---ন্যায়াধীশ নিরাজী, গত কয়েকদিন হতে ছদ্মবেশে ও গোপনভাবে অবস্থান করছেন, তাঁর সদা-সতর্ক দৃষ্টি পড়ে আছে আগ্রা শহরে যাতায়াতের একটি গ্রাম্য সড়কের উপর।

মহারাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির মুখ-মণ্ডল উদ্বেগ ও আতঙ্কের চিহ্নে পূর্ণ। একদিন না পর পর কয়েকদিন এইরূপ ঐ একই পথের দিকে চেয়ে থাকেন, এক একটি দিন যায় তাঁর চিন্তার ভারও বৃদ্ধি পায়।

আজ প্রাতে সেই দূর-পথের উপর দৃষ্টি পড়তেই নিরাজীর অন্তরে যেন আনন্দেরও আশার স্রোত দেখা গেল।

দূর হতে লক্ষ্য করলেন---ঐ পথ দিয়ে কয়েকটি লোক দু'টি বৃহৎ আকারের ঝুড়ি বহন করে নিরাজীর দিকেই আসছে। নিরাজী ক্ষিপ্রগতিতে নিকটস্থ একটি বৃক্ষের অন্তরালে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঝুড়ি দু'টি আকারে বৃহৎ ও ওজনে বেশ ভারী, মালবাহী লোকদের কিন্তু সেই পথ অতিক্রম করে নিরাজীর নিকট পৌঁছতে অধিক সময় লাগলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাহকরা নিরাজীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ঝুড়ি দুটি ভূমিতে স্থাপন করতেই শিবাজী ও তাঁর পুত্র ক্ষিপ্রগতিতে ঐ ঝুড়ির মধ্য হতে বাহিরে এলেন।

ন্যায়াধীশ নিরাজী শিবাজীর নির্দেশমত প্রস্তুত ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ শিবাজী ও শম্ভুজীর হাতে দু'প্রস্থ সন্ন্যাসীর বেশ দিলেন। দ্রুতগামী বলবান অশ্বও প্রস্তুত ছিল।

সন্ন্যাসীর বেশে পিতা-পুত্র অদৃশ্য হয়ে যেতে কয়েক নিমেষও সময় লাগলো না।

ডিমের ম্যাজিক

যাদুকর এ সি সরকার

বিলাতের লিভারপুর বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়লো। একদিন যেতে না-যেতেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো। দু'একটা চুটকী খেলা দেখেই তো সাহেব আমার খুব ভক্ত হয়ে উঠলেন। এদিকে যতই দিন যেতে লাগলো ততই জাহাজ সুদ্ধ সব যাত্রী আমার পরিচয় পেয়ে যেতে থাকলেন। জাহাজ জিব্রাল্টার পৌঁছবার আগেই সবাই চিনে ফেললেন আমাকে। সবার কাছেই তখন আমার খুব খাতির। আট-নয় মাসের উপর

ইউরোপে আর ইংলণ্ডের নানা জায়গায় ভারতীয় 'যাদুবিদ্যার মহিমা প্রচার করে ভারতে ফিরছি---যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আগে অনেকবার আমার সুনাম শুনেছেন। সহযাত্রী হিসাবে আমাকে পেয়ে তাঁদের উৎসাহের আর শেষ নেই। দেখলেই ধরে বসেন সবাই---ম্যাজিক দেখান---ম্যাজিক দেখান।

একদিন ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে তাঁর কেবিনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'মিঃ সোরসার---আপনাকে একটা ম্যাজিক দেখাই।'

কথা শেষ করে তিনি তাঁর

আলমারীর ভেতর থেকে একটা বোতল বের করে আমার সামনে রাখলেন। দেখলাম বোতলের ভেতরে একটা বেশ বড় জাহাজের মডেল। গর্বভরে তিনি বললেন, 'এ আমার ম্যাজিক। বলুন দেখি কেমন করে এই বড় কাঠের মডেলটা বোতলে ঢোকালাম ?'

আমি অবাক হবার ভাণ করলাম। সাহেব হাসলেন বিজয়ীর হাসি।

এরপর ৭।৮ দিন কেটে গেছে। এডেন পেরিয়ে জাহাজ আরব সাগরে ঢুকেছে। একদিন সকালে একটা বোতল হাতে করে হাজির হলাম সাহেবের ঘরে। সাহেবের সামনে বোতলটা রেখে বললাম, 'দেখুন ক্যাপ্টেন সাহেব, আপনার মত বোতলের পেছনটা কেটে ঢোকাইনি—বোতলটা অটুট অক্ষত রয়েছে তবুও দেখুন কেমন একটা এতবড় ডিম বোতলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

সাহেব নেড়েচেড়ে দেখে অবাক হলেন। তিনি বোতলের পেছন দিকটা কেটে তার ভেতরে জাহাজের মডেল ঢুকিয়ে আমাকে চমকে দিতে চেয়েছিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখে তিনি মহা অবাক হলেন। কেমন করে বোতলের ভেতরে আস্ত একটা ডিম ঢোকালাম তা জানার জন্য তিনি আমাকে বারে বারে অনুরোধ করতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'খুবই সহজ। এতে কোন ম্যাজিকের কেরামতি নেই। একটা ডিম নিয়ে সেটাকে ৬।৭ দিন কড়া ভিনিগারে ডুবিয়ে রাখলে তা বেশ নরম হয়ে যায়। তখন এই ডিমটাকে খোসাশুদ্ধ অবস্থায় টেনে কলার মত লম্বাটে করে ফেললেও এর কোন ক্ষতি হয় না। এরপরে বোতলের ভেতরে জল ভরে নিয়ে বোতলের মুখের ভেতর আস্তে আস্তে ঠেলে ঠেলে এই লম্বাটে সরু নরম ডিমটাকে গলিয়ে দিতে হয়। বোতলের ভেতরে জলের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকার পর এ ডিম আবার নিজের মূর্তি ধরতে থাকবে। জল ঢেলে ফেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে যে ডিমটা ঠিক আগের মত হয়ে গেছে।'

সব কথা শুনে সাহেব আমার দিকে তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি সে হাত ধরতেই তিনি জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

তোমরাও এই মজাদার খেলাটা করে দেখতে পারো।

আমার দেখা সুনির্মল বসু

খুব সম্ভব ১৯৪৬সনের কথা। মাঘ মাস। সাজাদপুর বাণী সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব। অন্যান্য বছরের মত সেবারও কলকাতা থেকে সাহিত্যিক এলেন। ছন্দের যাদুকর সুনির্মল বসু তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত কুঠিবাড়ীতে তাদের থাকতে দেওয়া হলো আর খাওয়ার ব্যবস্থা হল নূরাপাড়া কাছারীর ম্যানেজার কিরণ চক্রবর্তীর বাসায়।

সেদিন তাঁরা খেয়ে এসে কুঠিবাড়ীতে বিশ্রাম করছেন। আমাদের কেউ না কেউ অতিথিদের কাছে সব সময়ই থাকতো। আমি তখন কুঠিবাড়ীর নীচতলাতে বসে অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে উৎসবসম্পর্কিত আলোচনা করছিলাম।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে আমায় বললে আমরা সুনির্মল বসুর সঙ্গে দেখা করবো। আমি বললুম : এখন উঁরা বিশ্রাম করছেন পরে এসো।

কিন্তু ওরা সবাই আমায় জড়িয়ে বললে : না, না, আমরা শুনবো না, এখুনি আমরা দেখা করবো।

সুনির্মলদাকে বললুম সব কথা। তিনি বললেন : ওদের হাত ছাড়ানো যাবে না, চলো।

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সুনির্মলদাকে সঙ্গে করে নেমে এলাম সামনের বাগানে। খালের ধারে বাগান, এখন আর বাগান বলা চলে না। সবুজ তৃণছাওয়া প্রান্তরিকা বললেই চলে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন সাজাদপুরে আসতেন তখন এই বাগানে ছিল নানা রকম মরশুমি ফুলের বাহার আর ট্যাংকের মধ্যে সযত্নে লালিত পদ্ম ফুটে থাকতো বারো মাস।

সুনির্মল বসু

যাক, শীতের মলিন অপরাহ্নে মিষ্টি মিষ্টি রোদ। আমরা গোল হয়ে বসলাম প্রান্তরিকার প্রান্তে। বসেই হেসে বললেন সুনির্মলদা : বল কি উদ্দেশ্যে তোমার অভিযান?

একটি মেয়ে ছিল পারুল। টরটর করে কথা বলতো। সেই বললে : উদ্দেশ্য আবার কি? আপনার কবিতা শুনবো। আচ্ছা এমন সুন্দর সুন্দর কবিতা আপনি নিজেই লেখেন, নাকি অন্য বই দেখে লেখেন।

দশ বছরের পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কবিতা রচনা সম্বন্ধে তার এই হাস্যকর ধারণা থাকবে এতে আর অবাক হবার কি আছে? সুনির্মলদা স্মিত-হাস্যে বললেন : বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি নিজেই লিখি মন থেকে।

একটি ছেলে বললে : তাহলে নতুন নতুন কবিতা বানিয়ে শোনান আমাদের।

সুনির্মলদা হেসে বললেন : তোমার নাম কি।

: শ্যামলকুমার গাঙ্গুলী।

: বাঃ বেশ নাম তো! শোন তবে কবিতা---

শ্যামল কুমার গাঙ্গুলী
খেলেন সদাই ডাঙ্গুলি
গুলি লাগলো হেবোর চোখে
আহ্লাদে মা দিলেন বকে
গাঙ্গুলী যেই ছুটলো
পায়ে কাঁটা ফুটলো।
শ্যামল বলে উঃ হঃ
সবাই বলে ছিঃ ছিঃ।

সবাই হেসে উঠলো। বেশ জমে উঠলো কবির সঙ্গে শিশু-সভা।

কবি মেয়েটাকে বললেন : তুমি তো আমায় অবিশ্বাস করেছিলে, তোমার নামটা বল তো।

পারুল নাম বললে, কবির মুখে খই ফুটলো---

গোলগাল মুখ তার
রং কটা ফর্সা
তরতরে নাক যেন
ত্রিফলার বর্শা
বাটা বাটা চোখ তার
কটা কটা চুল
ফুল নয় নাম তার তবুও পারুল।
গড়গড়ে কথা বলে তরতরে তলোয়ার
গুলী যে ছিড়ে দেয় বাক্যের গুলি তার।
খনখনে গলা তার গনগনে অগ্নি
দেখে যেন মনে হয় ডাকিনীর ভগ্নী।'

: আর শুনবো না আর শুনবো না---বলে পারুল চেঁচিয়ে উঠলো, আমার বিশ্বাস হয়েছে যে আপনি নিজেই লেখেন।

কবি হেসে বললে : হেরে গেলো তো। আচ্ছা তোমার নাম কি---বাঁ

ছেলেটি বললে : মাণিক চক্রবর্তী।

: ও বাবা, একেবারে চক্করবর্তি---
চক্করবর্তি মক্কর করে
নককর পায়রা দৌড়ে ধরে
পায়রা পড়লো ফাঁদে
চক্করবর্তির কাঁধে।

সবাই যখন খুসী খুসী সেই সময় রামু দৌড়ে এসে বললে, তোমরা সবাই আমায় ফাঁকি দিয়ে কবিতা শুনছো, আমি ছাড়বো না।

কবি বললেন : কি নাম তোমার?

ছেলেটি হাঁফাতে হাঁফাতে বলে রামহরি বিশ্বাস।

কবি হেসে বললেন :

রামহরি বিশ্বাস
ঘন ঘন নেয় শ্বাস
ধপ করে বসে পড়ে
শুধু করে হাঁস ফাঁস।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কবি এতো অন্তরঙ্গভাবে মিশে গেছেন যে একজন সাহস করে বলে ফেললেন : আপনার নাম দিয়ে একটা কবিতা শুনবো। শোন তবে,

আমার নাম সুনির্মল
শেষের দিকে বোস
তবে কেন প্রশ্ন করে
হন্তদন্ত হোস্।

দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের বিদায় দিয়ে আমরা চলে এলাম।

অনেকদিন আগের কথা। আজ ভালো করে মনেও পড়ে না সব। আরোও অনেকের নামে অনেক কবিতা তিনি মুখে মুখে বলেছিলেন---সব তো আর টুকে রাখিনি, কাজেই আজ তারা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে।

সুনির্মলদার সঙ্গে শেষ দেখা কলকাতায়। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মহানির্বাণ রোডের বাড়ীতে বসে 'কৈশোরক' পত্রিকার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। সুনির্মলদা এসে ঢুকলেন 'কৈশোরক পত্রিকায়' লেখা দিতে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন : আরে, কি ব্যাপার আপনি কবে এলেন?

আমি বললাম : এখানেই কাছা-কাছিই থাকি তো।

: বেশ বেশ। তা সাজাদপুরের খবর কি, আমার ছোট বন্ধুদের খবর কি? ওরা আমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলো---বললেন সুনির্মলদা।

: হ্যাঁ আমি জানি। উত্তর পেয়ে ওরা খুব খুসী হয়েছিল।---বললুম আমি।

সব শুনে সুনির্মলদার মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠলো।

সেই সাজাদপুর আজ আমার নাগালের বাইরে, কোথায় গেলো সেই মানুষগুলো। সেই গোলগাল মুখের ওপর প্রশান্ত ললাট আর চোখে পুরু চশমা ঢাকা বড় বড় চোখ আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

[illegible] চিত্র : [illegible]

[illegible]

পৌরুষ
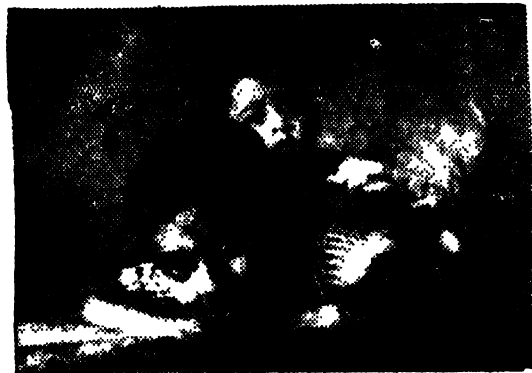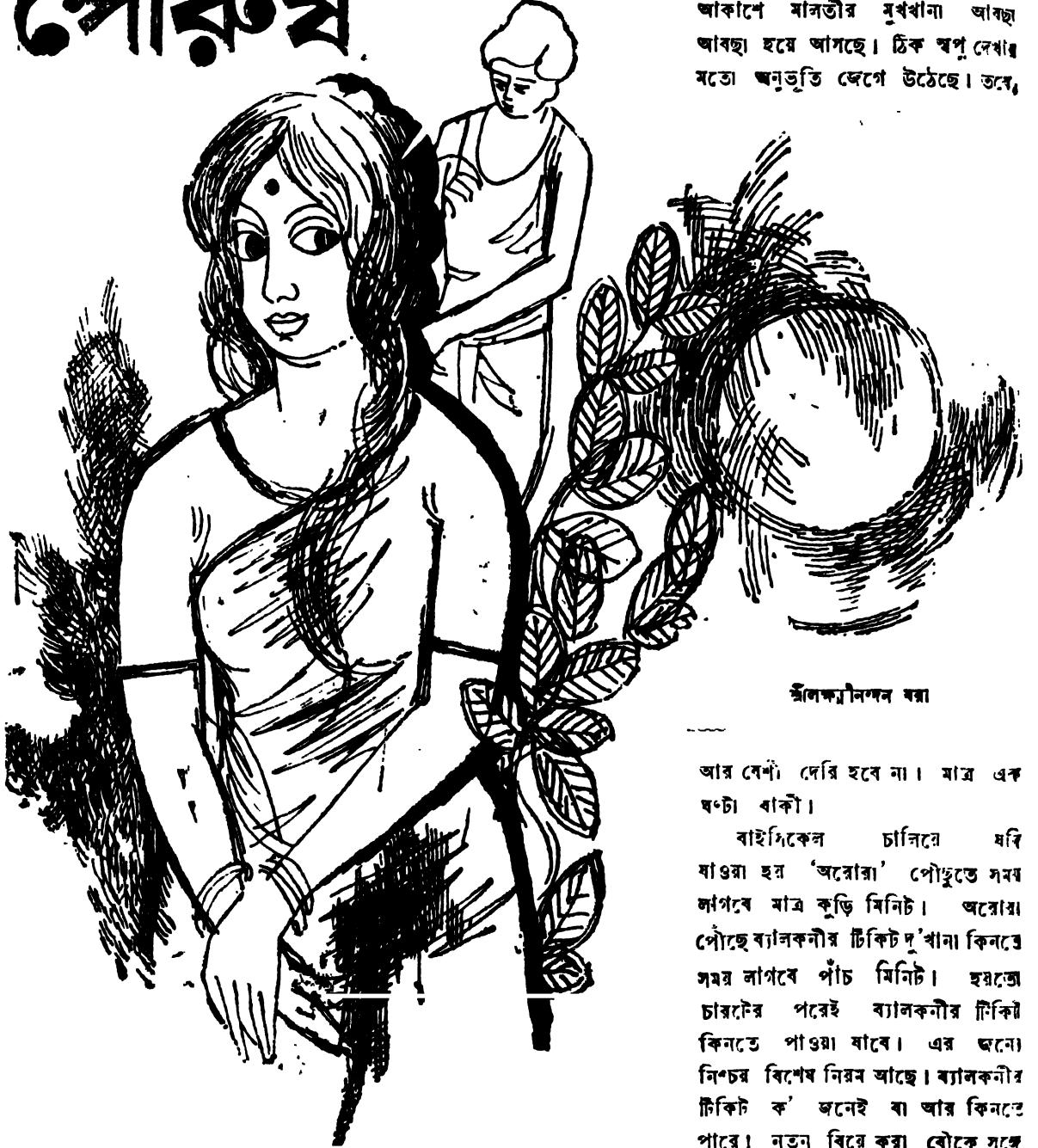
শ্রীলক্ষ্মীনন্দন বরা

সারা বিকেলটাই মালতী আর ও এক সঙ্গে কাটাবে। অবশ্য তার আগেই 'অরোরা' সিনেমা হলে গিয়ে দু'খানা ব্যালকনীর টিকিট কিনে আনতে হবে। ব্রহ্মপুত্রের তীরের ছোট্ট মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে যেতে বেশ ভালোই লাগবে। বসে লুইতের (ব্রহ্মপুত্রের) ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রলেপ সারা অঙ্গে বুলিয়ে এক সময় ওরা 'অরোরাতে' ঢুকে পড়বে, তার বাঁ দিকে বসবে মালতী। মালতী বাঁ দিকে না বসলে বকুলের নিজেকে পুরুষ পুরুষ বলে মনেই হয় না---

পেলেই মনে হয় যে এক বছর দেখে নি। সাড়ে ন'টা থেকে এখন তিনটে পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা হতেই যেন অসহ্য লাগছে। তার মনের আকাশে মালতীর মুখখানা আবছা আবছা হয়ে আসছে। ঠিক স্বপ্ন দেখার মতো অনুভূতি জেগে উঠেছে। তবে, আর বেশী দেরি হবে না। মাত্র এক ঘণ্টা বাকী।

বাইসিকেল চালিয়ে যদি যাওয়া হয় 'অরোরা' পৌঁছুতে সময় লাগবে মাত্র কুড়ি মিনিট। অরোরা পৌঁছে ব্যালকনীর টিকিট দু'খানা কিনতে সময় লাগবে পাঁচ মিনিট। হয়তো চারটের পরেই ব্যালকনীর টিকিট কিনতে পাওয়া যাবে। এর জন্যে নিশ্চয় বিশেষ নিয়ম আছে। ব্যালকনীর টিকিট ক' জনেই বা আর কিনতে পারে। নতুন বিয়ে করা বৌকে সঙ্গে নিয়ে জীবনে প্রথমবার সিনেমা দেখতে যাবে বলেই তো সেও আজ টিকিট কিনতে যাচ্ছে।---

সায়েবের রুমে ঢং করে বড় ঘড়িটা বেজে উঠলো, অর্থাৎ সাড়ে তিনটের সময়-সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গে ওর সারা

সময় যে আর কাটতে চায় না—কিন্তু···
সরকারের ঘড়ি ভুল চলছে একথাই বা কি করে বলে।···

অফিসের আর একজন চাপরাসী, বিশ্বেশ্বর একটি লম্বা বেঞ্চে উপুর হয়ে শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ ধরে একমনে লম্বা খাসের মুখে আঠা লাগিয়ে যাচ্ছিলো। আঠার বোতলে একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে ঠোঁটে একটি বিড়ি গুঁজে দিয়ে বললো—'হে রে বকুল, তোর সায়েব বুঝি কাল টুরে যাবে?'

অফিসের নানা গুঞ্জরণ, টাইপ-রাইটারের খট্ খট্ নানান শব্দকে নীরবতার একটি অংশ বলেই বকুল এতোক্ষণ অনুভব করেছিলো। বিশ্বেশ্বরের কর্কশ গলা শুনে বকুল হঠাৎ চমকে উঠলো। চুপচাপ বসে থাকাটা বিশ্বেশ্বরের চোখের নজরে পড়বার আগেই সে তাড়াতাড়ি শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে বসলো। বিশ্বেশ্বর কি প্রশ্ন করছিলো মনে মনে ও আরেক-বার ভাবলো।

কিন্তু, না, কিছুই মনে পড়লো না। গভীর ঘুমে অভিভূত হয়ে থাকবার সময় কেউ যদি ঘুম ভাঙিয়ে দেয় তখন যে রকম রাগ হয়, এই মুহূর্তে বিশ্বেশ্বরের প্রতি বকুলেরও সেই রকম রাগ হতে লাগলো। উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলো না বকুল।

হাফপ্যাণ্টের পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে দুই ঠোঁটের মাঝে গুঁজে দিয়ে একদৃষ্টিতে ও চেয়ে রইলো ব্রহ্ম-পুত্রের রূপোলী স্রোতের দিকে। সুইংভের রক্তিম জলরাশি দেখতে হয়েছে ঠিক যেনো একটি মৃগেল মাছের লুকরাঙা বুকের মতো—ছোট্ট এতটুকু একখানা বুক। কেউ হয়তো ছোট্ট বলবে না কিন্তু তাহলেও ছোট্ট খুব। মালতীর বুকভরা ভালোবাসার থেকেও অনেক ছোট্ট এই বুক।···

'হা রে কালা, অহঙ্কারে যে ফেটে যাচ্ছিস, বিয়ে করেছিস বলে আমার সঙ্গে কথাও কইবি না না কি? একদিন আমরাও কি একটাকে ধরে আনি নি? বলছি, তোর সায়েব কি কাল টুরে যাবে না?'

'সায়েব টুরে গেলে বলবে 'ডিষ্টি কমিচনুকে।' টাকা দেবে 'টেজুরী'। তুই লাটসায়েবের জিজ্ঞেস করার দরকারটা কি শুনি?'

এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলতে গিয়ে মুখের বিড়িটা নিভে গেলো। বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বকুল আবার নতুন একটা বিড়ি ধরালো।

বিশ্বেশ্বরের খুব রাগ হতে লাগলো। কোমরে দু-হাত রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'কিসের জন্য তোর এতো বাহাদুরী রে। তুইও পিয়ন আমিও পিয়ন। আমি তো অফিসের পিয়ন, আর তুই হলি গিয়ে পার্সোনাল পিয়ন। তোর থেকে মাইনেও আমার পাঁচ টাকা বেশী।'

খুব কড়া সুরে কথাগুলো বলে ফেললো বিশ্বেশ্বর। বকুলের ভীষণ রাগ হলো। অফিসে না থাকলে এতক্ষণে একটি ঘুসিতে বিশ্বেশ্বরের সব দাঁত গুঁড়িয়ে দিতো সে।

'বিশ্বেশ্বর সাবধান মুখ সামলে কথা বলবি। আমি তোর ভাগের ভাতে ভাগ বসাই নি বুঝেছিস।'

কারো নিজস্ব পিয়ন বলার জন্যই বকুলের বেশী রাগ হলো। পার্সোনাল পিয়নকে মুনিবের নিজস্ব চাকর বলে অফিসের পিয়নরা সর্বদাই ঠাট্টা করে।

সায়েবের রুমের কলিং-বেলটা বেজে উঠলো। বকুল উঠে পড়লো। মাথা নিচু করে সায়েবকে কাজ করা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখলো। চারটে বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে দু' টাকার নোট একখানা বের করে বকুলের দিকে এগিয়ে সায়েব বললো, 'গোল্ড ফ্লেক এক প্যাকেট, ম্যাচ একটা।'—

টাকাটা নিয়ে বকুল দোকানে গেলো। আজকেই প্রথমবার ও যেন দোকানটা ভালো করে দেখলো। প্রতিদিন এই দোকানেই তো ও আসছে সায়েবের সিগারেট নিতে। কিন্তু কোনোদিন বকুল এতোসব জিনিষপত্র লক্ষ্য করে নি। কেনবার অনেক জিনিষ আছে দোকানটায়। স্নো, পাউডার, গন্ধতেল, ক্লিপ টার্সেল সব রকম জিনিষ আছে দেখছি।

তন্ন তন্ন করে বকুল প্রতিটি জিনিষ দেখতে লাগলো। অনেক দিন ধরে মালতী একটা টার্সেলের কথা বলেছিলো। নিয়ে আসবো বলেছিলো যদিও, এতো দিনে আর কেনা হয় নি। সায়েব মেমসায়েবের হুকুম, ফাই-ফরমাইস তামিল করতেই তো সময় চলে যায়।—সত্যিই, ও তো একজন পার্সোনাল পিয়ন মাত্র। বিশ্বেশ্বর তো জেনে-শুনেই তাকে ঠাট্টা করেছিলো। ও নিশ্চয় নিজেও একদিন পার্সোনাল পিয়ন ছিল, অনেক ধরাধরি করে এখন হয়তো অফিসের পিয়ন হতে পেরেছে।

'দাদা, এই টার্সেলটার কতো দাম?'

'আট আনা, বিক্রির দাম সাত আনা।'

'কি বলছো দাদা, আমি বুঝতে পারছি না।'

'মানে দোকানে এসে জিনিষের দাম জিজ্ঞেস করাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে দাম হবে আট আনা এবং সত্যি যদি নগদ দাম দিয়ে কেনবার ইচ্ছে থাকে তো এর দাম হবে সাত আনা'—

দোকানদারের বড় বড় কথা শুনে ও আর টার্সেল কিনলো না। লোকটার রক্তে বানিয়ার রক্ত বয়ে চলেছে। প্রতিদিন বিড়ি, সিগারেট কিনতে আসা বকুল আজকে কেনো যে টার্সেলের দাম জিজ্ঞেস করলো লোকটার জানতে একটুও কৌতূহল পর্যন্ত হলো না? আশ্চর্য। লোকটা জিনিষের দাম নিয়েই সব সময় ব্যস্ত।—এক প্যাকেট সিগারেট আর ম্যাচ কিনে সাহেবের রুমে ফিরে এলো বকুল।

● **প্রকাশিত হল** ●

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

আগ্রা যখন টলমল ৪·০০

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা বহুদিন পরে আবার হাজির হয়েছেন তাঁর অনমুকরণীয় ভঙ্গিতে বলা এবং অবাক করে দেওয়া দু'টি দীর্ঘ কাহিনী নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই নতুন বই "আগ্রা যখন টলমল"তে। দু'টি কাহিনীই ইতিহাস-আশ্রয়ী। বহুরঙা প্রচ্ছদে শোভিত এবং প্রতিটি পৃষ্ঠা মনোরম অলংকরণে অলংকৃত ও দু'রঙে মুদ্রিত এ গ্রন্থটি একটি অতুলনীয় উপহার।

● আমাদের সদ্য প্রকাশিত আরও কয়েকটি বই ●

বুদ্ধদেব বসুর
কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ ৫·০০

বিমল মিত্রের
হাতে রইলো তিন ৬·০০

শ্রীপান্থের
হারেম ৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের
লোকারণ্য ৪·০০

বিমল করের
যদুবংশ ৭·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর
লাল বল লারউড ৬·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
ঘুণপোকা ৪·০০

রূপদর্শীর
ব্রজদার গুল্প-সমগ্র ৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শজারুর কাঁটা ৪·০০

সমরেশ বসুর
এপার ওপার ৫·০০

সাগরময় ঘোষের
ঝরাপাতার ঝাঁপি ৪·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
ইতুর থেকে ইত্যাদি ৩·০০

বুদ্ধদেব বসুর
গোলাপ কেন কালো ৫·০০

সমরেশ বসুর
প্রজাপতি ৬·০০

অম্লান দত্তের
গণযুগ ও গণতন্ত্র ৩·০০

বুদ্ধদেব গুহর
হলুদ বসন্ত ৪·০০

বুদ্ধদেব বসুর
তুমি কেমন আছো ৬·০০

বিমল করের
পূর্ণ অপূর্ণ ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অফিস: ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র: ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২০৪

মায়ামৃগ (প্যাস্টেল)

শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত অঙ্কিত

আবার দেয়ালের ঘড়িটা একবার দেখে নিলো। চারটে পাঁচ হয়ে গেছে। সায়েব আরো আধ ঘণ্টা থাকলে ওর বিপদ হবে আজ। সিগারেটের প্যাকেট খুলে সায়েব যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে বললো, 'বকুল, তুই এখুনি একবার বাড়ী চলে যা। মেমসায়েবকে বলবি, আমি সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বাড়ী ফিরবো। কি একটা কাজের জন্য মেমসায়েব তোকে একবার ডেকেছিলো।'

সায়েবকে নমস্কার জানিয়ে ও রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। চিন্তায় তার সারা মন ভরে উঠলো। এখন আবার মেমসায়েবের কাছে যেতে হলে তাকে সেই খলিহামারিতে যেতে হবে। তার আগেই টিকিট দু'খানা কিনে মালতীকে তৈরী হয়ে থাকবার কথা বলে আসতে হবে। মেমসায়েবের কাছে কিছু সময় থেকেই মালতীকে নিয়ে সিনেমায় যেতে হবে। আঃ কি মুস্কিল বিশ্বেশ্বর ঠিক কথাই বলছিলো। সত্যিই ও একটা পার্সোনাল,—সাধারণ পিয়ন। কিন্তু, পিয়নের এই চাকরীটা যদি না থাকতো তাহলে মালতীকে বিয়ে করবার টাকাটাই বা আসতো কোথা হতে? আর বিয়েটা কোনোমতে হয়ে গেলেও, চাকরীটা না থাকলে মালতীকেই বা কিভাবে ও প্রতিপালন করতো!! সরকারী চাকরীটা আছে বলেই তো আজকে দু'জনে মিলে সিনেমা দেখতে যেতে পারবে,---তাও আবার ব্যাল্কনীতে বসে!!---মালতীকে ও জর্জেটের চাদরটা গায়ে দেবার কথা বলে এসেছে।

একটা চাষা কি ওর বৌকে জর্জেটের চাদর কিনে দিতে পারবে? নিজের পরনের কাপড়ের উপর বকুল একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। খাকী রঙের হাফপ্যান্ট এবং খাকী কামিজে জড়ানো তার সারা দেহটাই সরকারী সরকারী মনে হচ্ছে। ভালোভাবে কাজ করে যেতে পারলে সরকার একদিন তাকে পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থাও করে দেবে। তখন আর নিজের ছেলের উপার্জনের আশায় না থেকেও ওরা বেঁচে থাকতে পারবে।

অরোরা সিনেমা হলে খবর নিয়ে জানতে পারলো বেল্কনীর টিকিট পেতে বিশেষ অসুবিধে হবে না। কিন্তু অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাবে না। বই আরম্ভ হবার পাঁচ মিনিট আগে আসতে পারলেও টিকিট নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

বাড়ী পৌঁছে মালতীকে ভালোভাবে সেজেগুজে তৈরী হয়ে থাকতে বললো। কৃতজ্ঞমনে বকুল ভগবানকে একবার স্মরণ করলো। আজ সাইকেলটা খুব ভালোই চলছে। কোনো ঝামেলার সৃষ্টি করে নি। অন্যদিন হলে সাইকেলটার নানান ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকে। আজ ভালোভাবে চলছে বলেই তো এতো সব কাজ করা সম্ভবপর হলো। মনে হচ্ছে, সিনেমা দেখাটা আজকে কপালে নিশ্চয় লেখা আছে। আজকের এই দিনটা ওর অনেক দিন মনে থাকবে। কারণ, প্রথমবারের জন্য মালতীকে নিয়ে ও সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। তাও আবার ব্যাল্কনীতে বসে!! ফিল্ড এসিস্টেন্ট, মেকানিক, কেরানীরাও ফার্স্ট ক্লাসে বসে সিনেমা দেখে না। আজ মালতী বুঝতে পারবে ও যে প্রকৃতই একজন পুরুষ মানুষ। মালতী হয় তো ভাববে, মাইনে তিনকুড়ি আট টাকা হলে কি হবে, বকুলের উপরি পাওনা টাকা হয় তো অনেক বেশী। চাকরীটা তাহলে খুব ভালোই নিশ্চয়!!

খলিহামারি অনেক দূর। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের মেঠো পথ ধরে যেতে পারলে অবশ্য সময় কিছুটা কম লাগবে। সেই পথ দিয়েই ও সায়েবের বাড়ী পৌঁছুলো। আসতে আসতে ও শুনতে পেলো কাছারীবাড়ীতে পাঁচটা বেজে যাওয়ার ঢং ঢং শব্দ। ছবি আরম্ভ হতে পুরো একঘণ্টা সময়ও আর নেই। এখন আবার মেমসায়েব কি কাজ করতে হুকুম দেবে কে জানে!!

বিয়ে করবার আগে, সায়েব যখন একলা ছিলো, তাঁর সঙ্গে তখন কাজ করতে খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু বিয়ের পর মেমসায়েব আসবার পর থেকেই ওর আজকাল অনেক কাজ বেড়ে গেছে।

বকুলকে দেখেই মেমসায়েব বলে উঠল, 'তুই এত দেরি করে কেন এলি? এভাবে চললে আর কিন্তু হবে না। অন্য সায়েবদের পার্সোনাল পিয়নরা রান্না করা, কাপড় ধোয়া, বাড়ীর যাবতীয় কাজ করে দেয়। আর আমাদের নবাব পিয়নকে ডেকে পাঠালেও আসবে একঘণ্টা দেরি করে---'

বকুলের ভীষণ রাগ হয়। জোর করে উত্তর দেয়, 'আমাকে সায়েব চারটের সময় পাঠিয়েছে'।

'আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তবে আর কোনোদিন এ ভাবে দেরি করবি না। যা ড্রইংরুমে কাপ-ডিস সব পড়ে আছে, ধোয়া মোছা করে রেখে দে।'

'গণেশ কোথায় গেলো?'

'ও কাল রাত্রে পালিয়ে গেছে।'

বকুলকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দেখে মেমসায়েব ভীষণ রেগে উঠল। কর্কশ স্বরে বলতে লাগলো, 'ওভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আহা,
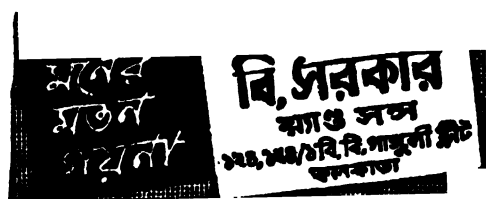
আমার বাছারে, এখন আমারেই কি একাপ চা করে নবাবকে দিতে হবে?"---

নোংরা কাপ-ডিসগুলো নিয়ে বকুল কলের কাছে এলো। তার ইচ্ছে হলো একটি লাঠি মেরে সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে। কিন্তু মালতীর কথা ভেবেই রাগটা সামলে নিলো। বাসন ধুতে ধুতে ও কোনোদিন না ভাবা অনেক কথাই ভাবতে সুরু করলো। আজ বিশ্বেশ্বর ওকে খুব একটা বড় শিক্ষাই দিয়েছে। সত্যিই তো ও একজন পার্সোনাল পিয়ন, মনিবের একান্তই নিজস্ব সম্পত্তি। একটি চাকর মাত্র।

পার্সোনাল পিয়নকে নিশ্চয় পুরুষ বলা যায় না। মনিবের বাড়ীতে সে চায়ের বাসন পরিষ্কার করে চা বানিয়ে বাড়ীর মেমসায়েব এবং তাঁর বান্ধবীদের দেয় শুনলে মালতীই বা কি ভাববে? ও তাহলে কার কাছে নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দেবে?

কেবল কি মালতীর কাছেই? তাও দিনের আর কয় ঘণ্টার জন্যই বা। ছুটার সময় ও যখন বাড়িতে পা দেয়, মালতী তার পা ধোবার জল এনে দেয়। মুখ ধুতে-না-ধুতেই হাতে গামছা নিয়েই দাড়িয়ে থাকে। তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে নিয়ে আসে। যতক্ষণ না খায় মুখের পানে চেয়ে থাকে মালতী। রান্না শেষ করে বকুলকে যখন খেতে দেয়, পাশে বসে বারবার জিজ্ঞেস করে ভালো হয়েছে কি না, পেট ভরলো কি না---কতো যে আদর যত্ন।।

বকুল যেদিন ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরে, পায়ের কাছেই বসে মালতী অনেকক্ষণ ওর পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে দিয়ে হাতপাখা নেড়ে ঠাণ্ডা বাতাসের মিষ্টি পরশ দিয়ে নিমেষে বকুলের সারা দেহ-মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেয়। একটু সদিজ্বর হলেই লম্বাবাটা দিয়ে কত্তুর তরকারী রান্না করে রাখে। [illegible] দিনে আবার কলাই ডালের খার রান্না করে দেয়।

সত্যি মালতী ওর ঘরের লক্ষ্মী। এতো যত্ন ভালোবাসা। সেজন্যই বলেই তো, বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সব ক্লান্তি এসে বকুলকে অস্থির করে তোলে। মালতীর কাছ থেকে আরো বেশী আদর ভালবাসা পাওয়ার লোভে বকুলের সারা অন্তর উন্মুখ হয়ে থাকে। বিয়ে করে এই দু-মাসেই ও কতো যে আদর-যত্ন পেয়েছে, কতো মিষ্টি মধুর কথা শুনতে পেয়েছে।

হ্যাঁ, কেবল এই সময়টুকুতেই ও পুরুষের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। তাহলে ও কেন মেমসায়েবের চটাং চটাং কথা শুনতে যাবে।---

কাপ-ডিস ধোওয়া শেষ। ড্রেসিং টেবিল থেকেই মেমসায়েব বললো, 'বকুল, তোর কাজ কি শেষ হয়েছে? বিয়ে করার পর থেকেই দেখছি তোর দিন দিন কুড়েমি বেড়ে যাচ্ছে'---

বকুল কোনো উত্তর দিলো না। কাপ-প্লেট নিয়ে আলমারিতে তুলে রাখলো। মেমসায়েব আবার বললো, 'নোংরা কাপড় অনেক জমে আছে, সিনেমা হলের কাছে যে লণ্ড্রী আছে সেখানে দিয়ে আসবি। আর বলবি সিল্কের চাদরখানা আর্জেণ্ট। বাকী ক'খানা অর্ডিনারী। গরদের মেখলাতে মাড় দিতে বারণ করে আসবি, ভুলবি না। আর হ্যাঁ, রসিদখানা তোর কাছেই রেখে দিবি।'---

হুকুম দিয়ে মেমসায়েব আবার ড্রেসিং টেবিলে বসলো। আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে কপালে একটি সিঁদুরের টিপ পড়লো। ঠোঁটে ছোঁয়ালো একটু ভেসলিন। বড় ডোনাট খোঁপায় আলতোভাবে একবার হাত বুলিয়ে দিলো। ব্লাউজের হাতায় একটু সুগন্ধি ছড়িয়ে দিয়ে নিকৃষ্ট নাটকের অনভিজ্ঞা অভিনেত্রীর ভঙ্গীতে বললো, 'অ' বকুল ভুলেই গিয়েছিলাম, আলনায় চারটে 'টাই' আছে। এক্ষুণি ইস্ত্রি করে আনতে হবে, তুই নিয়ে যা। তোর সায়েব কাল সকালেই টুরে যাবেন।'

এতো সব হুকুমের কথা শুনে বকুলের অসহ্য লাগলো। কিন্তু উপায় নেই। এতক্ষণে মালতী নিশ্চয় তৈরী হয়ে ওর জন্যেই অপেক্ষা করে আছে। এই সব কাজ করলেই তো বকুলের এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে, বাড়ী পৌঁছুতে অনেক রাত হয়ে যাবে আজ।'

হঠাৎ বকুল সাহসী হয়ে উঠল। ও বললো; 'আজকে আমি পারবো না দিদিমণি।'

মেমসায়েব রেগে চিৎকার করে উঠল, 'কি বললি? নাই দিয়ে দিয়ে তোকে অনেক উপরে উঠিয়েছিলাম। অন্য সায়েবদের পিয়নরা রান্নাবান্না পর্যন্ত করে দিয়ে যায়, আর তুই কাপড়কটাও ধোপাকে দিয়ে আসতে পারবি নি।'

'পারবো না বলি নি, তবে আজকে পারবো না। আমারো তো একটা সংসার আছে।'

'ঠিক আছে যা তোর সংসার নিয়েই তাহলে থাকগে, সায়েবকে বলে দেবো, সায়েবের সঙ্গে আর তোকে কাজ করতে হবে না।'

অন্য পিয়নের মতন চাকরীটার জন্য বকুল একটুও পীড়াপীড়ি করলো না। মেমসায়েবের সামনেই পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে ধরিয়ে নিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, আমি ও কাজ করবো না। তবে, মনে রাখবেন, পুরুষ মানুষ পুরুষ হয়েই থাকে। সেই পুরুষ আপনার মতন মেমসায়েবের কোনো কথাই শুনবে না। অন্য পিয়ন রাখলেও সে কখনো আপনার কথা শুনতে আসবে না কিম্বা আপনার মেখলা ধুয়ে দেবে না।'

এই কথা বলেই ও গোঁ গোঁ করে বেরিয়ে এলো। বাড়ী পৌঁছে দেখে মালতী ওর জন্যই অপেক্ষা করে বসে আছে। একখানি বেগুনী রঙের জর্জেটের চাদর গায়ে দিয়েছে মালতী। সিঁদুরের টিপের চারধারে সুন্দর করে ছোট ছোট ফুল এঁকেছে; হয়তো কুমকুম দিয়েই সেই ফুলগুলো এঁকেছে মালতী। চোখে দিয়েছে সূক্ষ্ম কাজলের রেখা। গায়ে নাইলনের ব্লাউজ। সেই ব্লাউজের ভেতর দিয়ে

ওর সুন্দর শরীরটা খুব ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার জলের নিচে যেমন মাছ দেখা যায়। জরীর কাজ-করা চটিপরা মালতীর পা-দুখানা দেখতে অপূর্ব লাগছে।

মালতীর এতো রূপ বকুল এর আগে কখনো তো দেখেনি। কিন্তু, এতো রূপ দেখে বকুলের আজ অসহ্য লাগলো। মালতী কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বকুল বলে উঠল, 'আয় মালতী, ভেতরে আয়, তোকে এ কাপড়ে একটুও মানাচ্ছে না মালতী।'

মালতী আশ্চর্য। বকুল তো কখনো এভাবে কথা বলে নি, কখনো বলেনি এ কাপড়ে ওকে মানাচ্ছে না? তা হলে? তা হলে নতুন করে বকুলের চোখে কি রং ধরেছে? হতেও পারে। পুরুষ মানুষমাত্রই তো একএকটি ভ্রমর।।----

বকুল অবসন্ন হয়ে বিছানায় বসে পড়লো, মালতী ব্যস্ত হয়ে তার পায়ের জুতোজোড়া খুলে দিলো। ধীরে ধীরে বকুলের মাথায় হাত বুলিয়ে মালতী জিজ্ঞেস করলো, 'তোর কি হয়েছে? কি সব আবোল-তাবোল বলছিস?'

'কিছু না। তবে হ্যাঁ, এই-মাত্র যে বললাম, তোকে এ-কাপড়ে একটুও ভালো লাগছে না। সুতীর সাধারণ কাপড় পড়লে তোকে সব-চেয়ে সুন্দর লাগে দেখতে। চোখের কাজল আর কপালের কুমকুম তোকে কুৎসিত করে তুলেছে মালতী। পাউডার মুখে লাগিয়েছিলি বলেই মনে হচ্ছে তোর গালের চামড়া যেনো খস্‌খসে হয়ে গেছে। এই সব প্রসাধনের কোনো দরকার নেই মালতী। আমার চোখ দিয়ে তোকে সবচেয়ে ভালো লাগে যখন পান খেয়ে তোর ঠোঁট দু'খানা হয়ে ওঠে টুকটুকে লাল---আর'---

'তুই এসব কি বলছিস? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সিনেমার 'টিকস' কোথায়?'

'তোকে অনেক কথা বললেও তুই হয়তো কোনো কথাই বুঝবি না, তবে একটামাত্র কথা বলি তোকে শোন, আমাদের সিনেমায় গিয়ে কাজ নেই, কারণ সিনেমা আমাদের মতন লোকের জন্য নয় রে---।'

'এখানে কি যাত্রা এসেছে?'

'আসেনি, বললাম আরকি। আজকে আমি চাকরীর মাথা খেয়ে এসেছি।'

'কি বলছিস এইসব? সরকারী চাকরী থেকে কাউকে তাড়িয়ে দিতে কি পারে?'

বকুল কোনো উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ বাদে মালতী একটা লণ্ঠন নিয়ে আসে। লণ্ঠনের স্নিগ্ধ আলোর মাঝে বকুল দেখতে পায় ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক আলো অনেক আশা। ও মনস্থির করে, কালকেই ওর গ্রামের বাড়ীতে চলে যাবে। মণ্ড মণ্ডলের তিন বিঘে জমিতে ও আখের ভাগ চাষ করবে, নিজের দু'বিঘে জমিতো আছেই, সেখানে ও করবে আমন ধানের চাষ। গ্রামে কখনো যাত্রা হলে ও পার্ট নেবে নিশ্চয়।

পান খাওয়া টুকটুকে সুন্দর লাল ঠোঁট আর বুকভরা অনেক আনন্দের পসরা নিয়ে মালতীও যাবে 'সেই যাত্রা দেখতে, সেখানে ও করবে বীর পুরুষের অভিনয়।।

অনুবাদিকা—বন্দনা বড়ুয়া

অনির্দিষ্টকালের জন্য মৃত্যু পেছিয়ে দেওয়া অবাঞ্ছনীয়

মৃত্যু অনির্দিষ্টকালের জন্য পেছিয়ে দেওয়া কি বাঞ্ছনীয়? বিশেষজ্ঞদের মতে, এ-অবস্থা যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনই অসম্ভব। দেড়শ' বছরের বেশি বয়স্ক মানুষের অভাব এই অসম্ভাব্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সহজতম এক আংকিক পরীক্ষা এই অবস্থার অবাঞ্ছনীয়তা বুঝিয়ে দিতে পারে। মাত্র কয়েক পুরুষ যদি অনির্দিষ্টকাল ধরে বাঁচতে থাকে ত পৃথিবীর এক ইঞ্চি জায়গাও অনধিকৃত থাকবে না, এবং জায়গা পাওয়া হবে কঠিনতম সমস্যা। অপর পক্ষে, মানসিক শৈথিল্য, যে আধা-অ-ক্রিয় অবস্থা বার্ধক্যে আসে, দূর করা খুব দরকার। প্রত্যেক মানুষকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্মঠ এবং বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে বাঁচার সুযোগ ক'রে দেওয়া দরকার। ভাবুন ত, পরিবারের সর্বসম্মানিত কর্তা, যিনি এতকাল কর্মনিষ্ঠা এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন সকলের কাছ থেকে, ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধমনীগুলো একটু একটু ক'রে কঠিন হওয়ার ফলে আজ তিনি নিজের এবং অন্যদের কাছে প্রতিপদে একটা সমস্যা-বিশেষ---এক কর্মঠ, বুদ্ধিমান মানুষের ব্যংগরূপ বই নয়। জগৎ জুড়ে গবেষণা চলছে এই ব্যাপারে মানুষকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের মত বাঁচতে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কত গবেষক আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের আশা আর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা সফল হবেন। আমরা আছি সেই শুভদিনটির প্রতীক্ষায়।

শিয়ালদা স্টেশন জুড়ে ছিন্নমূল মানুষের যে অস্থায়ী উপনিবেশ, তা পেছনে রেখে একসময় আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

উল্টোদিকের ফুটপাথের গায়ে একটা নতুন মডেলের সুদৃশ্য মোটর দাঁড়িয়েছিল। অলকাদি সোজা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। দরজার একটা পাল্লা খুলে দিয়ে বললেন, 'ওঠো।'

সম্মোহিতের মত উঠে বসলাম। অলকাদিও উঠলেন; সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলতে শুরু করল। অলকাদিই স্টীয়ারিং ধরে বসেছেন। তাঁর হাতে অলকাদি। চাকার তলা দিয়ে কলুষ রাজপথ দ্রুত সরে যাচ্ছে। জানালার ফ্রেমে বড় বড় বাড়ি, দোকান-পসার, জনস্রোত—নিমেষে নিমেষে দৃশ্যপট বদলের পালা চলেছে। অলকাদি বললেন, 'যাদবপুর যাবার একটা রাস্তা না; অনেক দিক দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়।'

আমি চুপ করে রইলাম; এরপর বলারও কিছু নেই।

কিছুক্ষণ চলবার পর বিরাট এক ম্যানসনের সামনে গাড়ী থামালেন অলকাদি। দরজা খুলে নামতে নামতে বললেন, 'এ বাড়িটায় আমার একটু দরকার আছে। তুমি গাড়িতে বোসো। এদিকে নমা পায়ে শীতের রাত কখন নেমে এসেছে, খেয়াল করি নি। আলোর আলোয় আর নিওন সাইনে কলকাতা বদিরেক্ষণা হয়ে উঠেছে। রাতের এই নগরী আশ্চর্য মোহময়ী; তার সর্বাঙ্গে হাজার আকর্ষণের মেলা সাজানো।

কিছুক্ষণ চলার পর আবার গাড়ী থামল। সামনেই চমৎকার একখানা তিনতলা বাড়ি; কম্পাউণ্ডের ভেতর অগণিত নতুন মোটর ছড়ানো আর দেখা যাচ্ছে নানা জাতের সুখী পরিতৃপ্ত সুসজ্জিত মানব-মানবীর ভিড়; তাদের ফাঁকে ফাঁকে উর্দিপরা বয়-বেয়ারাদের ব্যস্ত পায়ে ছোটাছুটি।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে থাকলাম।

যাদবপুরগামী পথটা আমার চেনা। অলকাদি কিন্তু সেদিকে গেলেন না; অন্য রাস্তায় গাড়ী ছুটিয়ে দিলেন।

আধফোটা গলায় বললাম, 'যাদবপুর যাবার রাস্তাটা তো ওদিকে—'

গাড়ী চালাতে চালাতে আমার দিকে মুখ ফেরালেন অলকাদি। হেসে বললেন, 'দেশ থেকে ক'দিন হল এসেছ?'

হঠাৎ এ রকম প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলাম। বিমূঢ় মুখে বললাম, 'সাত দশ দিন।'

'কলকাতার সব রাস্তা কি চেন?'

'না।'

ধীরে ধীরে উইণ্ড স্ক্রীনের যাব আর আসব। জাস্ট ফাইভ মিনিটস্। কেমন?'

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে দিলাম।

অলকাদি চলে গেলেন। পাঁচ মিনিটের কথা বলে গিয়েছিলেন; ফিরলেন আধঘণ্টা পর। গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, 'খুব রাগ করেছ, না?'

বিব্রত মুখে বললাম, 'রাগ করব কেন?'

'একটু দেরি হয়ে গেল ভাই; গিয়ে এমন এক ঝামেলায় পড়ে গেলাম। কিছু মনে কোরো না, প্লীজ।'

মাথা নেড়ে আমি না-না করতে লাগলাম।

অলকাদি বললেন, 'এটা আমাদের ক্লাব। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। তোমাকে তাই আরেকটু কষ্ট করে একলা একলা থাকতে হবে। এবার আর দেরী হবে না। টু মিনিটস্—'

'আচ্ছা।'

দু মিনিটের নাম করে এবারও কুড়ি মিনিটের বেশী কাটিয়ে এলেন অলকাদি। বললেন, 'ভেরি সরি, চিরঞ্জীব; ওরা এমন আটকে দ্যায়। আমাকে তো আসতেই দিচ্ছিল না।'

আমি চুপ।

এরপর আরো কত জায়গায় যে থামলেন অলকাদি আর দু-মিনিট পাঁচ মিনিটের নাম ক'রে আধঘণ্টা কাটিয়ে আসতে লাগলেন হিসেব নেই। মনে

হল সারা রাতই বুঝি আমাকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন অলকাদি। হঠাৎ উঁচু টাওয়ারের মাথায় একটা ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে ন'টা বাজে। দশটার ভেতর পিসেমশাইর বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমি চঞ্চল হলাম। ভীতস্বরে ডাকলাম, 'অলকাদি---'

সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অলকাদি সাড়া দিলেন, 'কী বলছ?'

'অনেক রাত হয়ে গেছে।'

সুগোল হাত ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিলেন অলকাদি। বললেন, 'মোটে সাড়ে ন'টা; একেই তুমি অনেক রাত বলছ!'

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'না---মানে---'

'কী?'

'আমি যেখানে থাকি সেখানে তাড়াতাড়ি গেট বন্ধ হয়ে যায়।'

'আমি জানি।' অলকাদি বলতে লাগলেন, 'বিমলরা তো রাত্তিরবেলা পাঁচিল টপকে ঢোকে। ওদের কাছে ট্রেনিং নিয়ে নাও। রাত দশটার ভেতর একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক বাড়িতে ঢুকবে এ আমি কল্পনাই করতে পারি না। বিমলের বাবার এ ভারি জুলুম; ভদ্রলোক একজন ছোটখাটো অটোক্র্যাট।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমি ওঁর ওখানে উঠেছি। ওঁর কথামত---'

'বুঝেছি। আচ্ছা চল, ফেরাই যাক।' বুঝিবা অনিচ্ছাসত্ত্বেই গাড়ির মুখ যাদবপুরের দিকে ফেরালেন। যেতে যেতে অস্ফুট ফিস ফিস গলায় বললেন, 'তুমি দেখছি একটা ভীতু খরগোস।'

উত্তর দিলাম না; দেবার কিছু নেইও। সুদর্শনা এক মহিলার ধিক্কারে ঘাড় গুঁজে বসে রইলাম।

অলকাদি আগের সুরেই আবার বললেন, 'সময় লাগবে দেখছি।'

তাঁর স্বরে এমন কিছু ছিল, এমন এক তরঙ্গ---যাতে চকিত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'কিসের সময়।'

অলকাদি উত্তর দিলেন না; শব্দ করে একটু হাসলেন শুধু।

যাদবপুর এসে কিন্তু পিসেমশাইর বাড়ির কাছে আমাকে নামিয়ে দিলেন না অলকাদি; বাড়িটাকে ডাইনে রেখে তাঁর গাড়ি এগিয়ে চলল।

বললাম, 'পিসেমশাইর বাড়িটা ফেলে এলেন অলকাদি; ঐ যে ওখানে---'

আমার মনে হয়েছিল, রাত্রিবেলা বাড়িটা চিনতে পারেন নি অলকাদি। কিন্তু খুব শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'জানি।'

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'গাড়ি থামালেন না?'

'এখানে না।'

'তবে?'

'চলো না।'

ভেতরে ভেতরে আমি অস্থির হলাম, ছটফট করতে লাগলাম। কিন্তু মুখ ফুটে জোর করে কিছুতেই বলতে পারলাম না, 'গাড়ি থামিয়ে দিন, আমি এখানেই নামব। পিসেমশাই আশ্রয় দিয়েছেন, আমি তাঁকে কিছুতেই অমান্য করতে পারব না।' বলতে পারলাম না, কেন না এই মহিলাটির হাতেই আমার জীয়ন-কাঠি রয়েছে; তিনি আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবেন। আর ওটা পেলেই বাবা মা আর সবিতাকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে পারি।

অলকাদির গলা আবার শোনা গেল, 'বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাব না, দশ মিনিট---টেন মিনিটস্ ওনলি।'

দু মিনিট পাঁচ মিনিটের নমুনা আগেই দেখেছি; মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

গাড়িটা সোজা নিজের বাড়ির কম্পাউণ্ডে নিয়ে থামালেন অলকাদি। নিজে আগে নামলেন, তারপর আমাকে নামতে বললেন।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'নামব।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নামবে বৈকি।'

'কিন্তু এত রাত্তিরে---'

আরে এসোই না---'

আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার শেষ শক্তিই বুঝি অবশিষ্ট নেই। অলকাদির ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়ে নেমে এলাম।

আমাকে সঙ্গে করে বারান্দায় উঠলেন অলকাদি। তারপর কলিং বেলের বোতামে আঙুলের চাপ দিলেন। একটু পর মধ্যবয়সী একটি বিধবা মেয়েছেলে দরজা খুলে দিল। বিমলের সঙ্গে প্রথম যেদিন এখানে আসি সেদিনই তাকে দেখেছিলাম। মেয়েছেলেটা এ বাড়ীতে কাজ-টাজ করে। অলকাদি অবশ্য বলেছিলেন, ও আমার গার্জেন এ্যাঞ্জেল।'

ভেতরে এসে একখানা সোফা দেখিয়ে অলকাদি বললেন, 'বোসো চিরঞ্জীব।'

বসলাম। অলকাদি আবার বললেন, 'সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছি; কাপড়-টাপড়গুলো একটু বদলে আসি।' মাঝবয়েসী সেই মেয়েছেলেটাকে বললেন, 'হিটারে কফির জল চড়িয়ে দাও মনোদিদি। আজ ধড্ড শীত।'

মেয়েছেলেটার নাম সেদিনই জেনে গেছি---মনোরমা।

মনোরমা আর অলকাদি দু'জনেই এ-ঘর থেকে ভেতর দিকে চলে গেলেন। খানিক পরেই আটপৌরে সাজের ওপর একখানা নক্সাপাড় শাল জড়িয়ে আমার মুখোমুখি এসে বসলেন অলকাদি। মধুর হেসে বললেন, 'আমার ওপর মনে মনে খুব চটে যাচ্ছ তো?'

রাগ ঠিক করি নি, তবে পিসেমশাইর বাড়ীর কথা ভেবে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বিব্রত মুখে কী উত্তর দিলাম, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট নয়।

অলকাদি বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানো চিরঞ্জীব---'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

অলকাদি বলতে লাগলেন, 'সেদিন বিমলের সঙ্গে এসে; ভালো করে

তোমার সঙ্গে আলাপই হয় নি। বিমলটা যেখানে থাকে সেখানে আর কারোকে কথা বলতে দ্যায় না; একাই বকে মাথা ধরিয়ে দ্যায়। তাই আজ তোমাকে ধরে আনলাম। জমিয়ে গল্প-টল্প করব আর কি।'

অলকাদির ইচ্ছার ভেতর আপত্তিকর কিছু নেই; বরং সেটা লোভনীয়ই। তবু আমার বুকের ভেতরকার অদৃশ্য কোন প্রান্তে ছায়া পড়েছে। আমি কিছু বললাম না।

অলকাদি বললেন, গল্প-টল্প শুরু করার আগে কাজের কথাটা সেরে নি।'

'বলুন—' আমি উন্মুখ হলাম।

'তুমি তো গ্র্যাজুয়েট।'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। আমিও তাই ভেবেছিলাম।' অলকাদি বলতে লাগলেন, 'তোমার জন্যে একটা কোম্পানীতে চাকরি ঠিক করেছি; আপাতত কিছুদিন ট্রেনিং নিতে হবে। ধরো মাস দুয়েকের মত। তারপর জুনিয়ার অফিসারের চাকরি পাবে। ট্রেনিং পীরিয়ডে মাইনে আড়াই শ। চাকরি হয়ে গেলে স্টার্টিং চার শো'র। অসুবিধে হবে?'

এ আমার পক্ষে আশাতীত, তায় অকল্পনীয়। অবরুদ্ধ গলায় কোন রকমে বলতে পারলাম না।

অলকাদি বললেন, 'জানুয়ারী মাস তো শেষ হতে চলল।'

'হ্যাঁ; আজ আটাশ তারিখ।'

'ফেব্রুয়ারীতে কিন্তু তোমার কাজটা হচ্ছে না। এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেবার ব্যাপারে কোম্পানীর কিছু অসুবিধে আছে এ মাসে।'

মনে পড়ে গেল, পিসেমশাই আমাকে ছ'মাস পর্যন্ত সময় দিয়েছেন; তার ভেতর চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলেই হয়। ছ' মাসের মাত্র দিনকয়েক কেটেছে। জানালাম, মার্চে চাকরি পেলেই চলবে।

এই সময় মনোরমা কফি বিস্কুট-টিস্কুট দিয়ে গেল।

পূর্ববাঙলায় দূর-অভ্যন্তরে এক অজানা ভুবন থেকে আমি এসেছি; চা বা কফি কোন কিছুতেই অভ্যস্ত নই। তবু যে মানুষ চাকরি যোগাড় করে দ্যায় তাকে খুশী করার জন্য কফির পেয়ালা তুলে নিলাম।

অলকাদি এবার মনোরমাকে বললেন, 'ওবেলা তো খাই নি। কী কী রেঁধেছিলে মনোদি?'

মনোরমা বলল, 'পোনা মাছ, মাংস, নিরিমিষ তরকারী, ডাল, কপির বড়া আর চাটনি।'

'গ্র্যাণ্ড। আমার ওবেলার ভাত নিশ্চয় পড়ে আছে।'

'হ্যাঁ।'

'ঠাণ্ডায় আর ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না, তিনজনের মত লুচি ভেজে নাও। মাছ মাংস আছে, ডিম থাকলে একটু ডালনা কোরো।'

'আচ্ছা।' মনোরমা চলে গেল।

নিঃশব্দে কফির পালা শেষ করলেন অলকাদি। টীপয়ের ওপর শব্দ করে শূন্য পেয়ালা রাখতে রাখতে বললেন, 'নাঃ, কফি দিয়ে সুবিধে হল না।'

আমি তখনও আস্তে আস্তে জিভ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। মুখ তুলে এবার অলকাদির দিকে তাকালাম।

অলকাদি বললেন, 'এত ঠাণ্ডায় এমন নিস্তেজ পানীয়ে গা গরম হচ্ছে না। তাই না চিরঞ্জীব—'

- বললাম, 'কেন, বেশ তো---'

'তুমি একটা হোপলেস।' চোখের তারায় নাচন দিয়ে কেমন করে যেন হাসলেন অলকাদি। বললেন, 'শীতে জবুথবু হয়ে বসে আছ; কফিতে তোমার কিছু হচ্ছে না। দাঁড়াও এক সেকেণ্ডে তোমাকে চাঙ্গা করে দিচ্ছি।'

'কেমন করে?'

'দাঁড়াও না একটু—'

অলকাদি উঠে ভেতরে চলে গেলেন; খানিক পর যখন ফিরে এলেন তাঁর হাতে চ্যাপটা মতন মাঝারি বোতল আর দুটো সুদৃশ্য কাচের গেলাস।

এ বোতল আমার চেনা; যুদ্ধের সময় আমেরিকান টমিরা আমাদের আমতলি পর্যন্ত হানা দিয়েছিল; তাদের হাতে হাতে এই বোতলগুলো দেখেছি। এগুলোর ভেতর কোন সুধা পোরা থাকে, আমার অজানা নয়।

সোফায় বেশ তরিবত করে বসলেন অলকাদি। ছিপির মুখ খুলে ফেনায়িত সোনালী তরল ঢালতে ঢালতে ঘাড় বাঁকিয়ে চোরা চোখে আমাকে বিদ্ধ করলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব; একটি চুমুক---জাস্ট ওয়ান সিপ, সঙ্গে সঙ্গে গা গরম হয়ে যাবে। এই শীতের রাতে মনে হবে বসন্তের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।'

বোতলের ছিপি খুলবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র মিষ্টি গন্ধ স্নায়ুতে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। চকিতে সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল; বিমল বলেছিল সে এখানে তৃষ্ণা মেটাতে এসেছে। সে কি এইজন্যেই? এই সুধা দিয়েই? বিমল আড়ালে আমাকে জানিয়েছিল, অলকাদিকে ঘিরে যাদবপুরের যৌবন সব সময় মৌচাকের মত ভন্‌ভন্ করতে থাকে। সে কি অলকাদির হাতে এই অমৃত আছে বলে? যাই হোক, আমার তালুর ওপর চুলগুলো খাড়া খাড়া সরল রেখায় দাঁড়িয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দুটো গেলাস ফেনায়িত রঙীন তরলে ভর্তি করে ফেলেছেন অলকাদি। একটা গেলাস আমার দিকে এগিয়ে দিলেন; অন্যটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, 'কফি রেখে দাও চিরঞ্জীব; ঐ গেলাসে চুমুক লাগাও—'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল; জিভটা একরাশ খরখরে ধারাল বালির মত মনে হচ্ছে; ঢোক গিলতে পারছি না।

এ আমি কোথায় এসেছি? মেয়ে-মানুষে মদ খায়---বিশেষ করে বাঙলা দেশের মেয়েরা, অলকাদির মত শিক্ষিতা সুদর্শনা মেয়েরা---কোনদিন কল্পনাও করি নি। মনে হল, চোখের সামনে যা দেখছি তা যেন সত্যি না। কেউ

বুঝি নিদারুণ এক দুঃস্বপ্নের ভেতর আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

অলকাদি চুমুকের পর চুমুক দিয়ে যাচ্ছেন। দিতে দিতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল আমি কাঠ হয়ে বসে আছি। একটুক্ষণ অবাক থেকে প্রেরণা দেবার মত করে বললেন, 'ওকি, এখনও হাত দাও নি; তুলে নাও---

গোঙানীর মত একটা শব্দ আমার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, 'আমি---আমি---আমি---'

'আমি কী?'

চোখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল অলকাদির। কণ্ঠস্বর জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি বলতে লাগলেন, 'বল---বল, তুমি কী?'

'আমি কখনও মদ খাই নি।' বলে নিজের অজান্তে ফুঁপিয়ে উঠলাম।

ফোঁপানি শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন অলকাদি। তারপর ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে এগ্রাজে এলোপাথারি ছড় টানার মত শব্দ করে বেঁকেচুরে গড়িয়ে গড়িয়ে হাসতে লাগলেন। হাসির তোড় কিছু কমে এলে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মনো দিদি, মনোদিদি---একবার এ ঘরে এসো।'

মনোরমা রান্নাবান্না করছিল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছ?'

'চিরঞ্জীব বলছে ও কখনও মদ খায় নি। বলে ছেলের সে কি কান্না।' আগের মত আবার গড়িয়ে গড়িয়ে হাসতে লাগলেন অলকাদি।

'তোমার যত কাণ্ড দিদিমণি!' হাসতে হাসতে মনোরমা চলে গেল।

হাসি একেবারে থামিয়ে এবার ঢুলুঢুলু চোখে তাকালেন অলকাদি। স্বরে কাঁপন দিয়ে বললেন, 'তুমি না পুরুষমানুষ। মদের গেলাস দেখে কেঁদে একেবারে বুক ভাসিয়ে দিলে। নাঃ, একেবারে কচি খোকাটি হয়ে আছ দেখছি। ঝিনুকবাটি দিয়ে দুধ খাবে?' বলে আবার হাসি শুরু করলেন।

বিস্তারে যাথা তুলতে পারছিলাম না। কার্পেটে-মোড়া মেঝের দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে কাঁপা গলায় বললাম, 'অনেক রাত হল, এবার যাব।'

'এক্ষুণি কি করে যাবে?'

'কেন?'

'বা রে, তোমার জন্যে খাবার তৈরী করতে বললাম না মনোদিদিকে। আজ রাত্তিরে এখানে খেয়ে যাবে।'

'কিন্তু' গলার ভেতর স্বর আটকে গেল আমার।

অলকাদি আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, মনোরমা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, 'আমার রাঁধাবাড়া শেষ, গরম গরম খেয়ে নাও; নইলে ভাল লাগবে না।'

আমার সব আপত্তি আর অনিচ্ছা তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে খেতে নিয়ে বসালেন অলকাদি। মাছ-মাংস-লুচি-তরকারি; নানারকম সুস্বাদু খাবার আমার সামনে সাজানো। খাচ্ছিও। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। জিভ তার আস্বাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

গোগ্রাসে খাচ্ছিলাম। অলকাদি বললেন, 'ও কি, অমন নাকে মুখে গুঁজছ কেন? আস্তে আস্তে খাও।'

কোনরকমে খাওয়ার পালা চুকিয়ে বললাম, 'এবার আমি যাব অলকাদি---'

'এসে থেকেই তো শুধু যাই-যাই করছ।'

এ কথার উত্তর দিলাম না।

অলকাদি আমার চোখের ভেতর তাকিয়ে বললেন, 'আজ রাত্তিরে তোমার কি কোন কাজ আছে ও বাড়িতে?'

'আজ নেই। তবে কাল সকালে আছে।'

'এত ঠাণ্ডায় আর রাত্তিরে তা হলে গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালেই যেও।'

বলছেন কি অলকাদি। তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একটু গল্পটল্প করেই ছেড়ে দেবেন। এখন বলছেন এ বাড়িতে রাত কাটিয়ে যেতে। সাপিনীর মত শতপাকের বেষ্টনীতে তিনি কি আমাকে জড়াতে চান? ভীতস্বরে বললাম, 'রাত্তিরে এখানে থাকব।'

'হ্যাঁ, থাকবে।' চোখের তারায় বিচিত্র সম্মোহন ফুটিয়ে অলকাদি তাকালেন। ওধার থেকে উঠে এসে আমার পাশে নিবিড় হয়ে বসলেন। তারপর আমার একখানা হাত নিয়ে খেলতে লাগলেন।

অলকাদির চুলের অরণ্য থেকে, শাড়ির ভাঁজ থেকে, গলার খাঁজ থেকে মিষ্টি মোহময় গন্ধ উঠে আসছে। গন্ধটা আমার নাকের ভেতর দিয়ে সমস্ত সত্তায় বুঝি ছড়িয়ে পড়ল; স্নায়ুগুলো ক্রমশ অবশ হয়ে আসতে লাগল। মনে হল চেতনার শেষ অন্তরীপটি ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে আর মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে দ্রুতবহ শীতল স্রোত ওঠানামা করতে লাগল।

সীমাহীন আচ্ছন্নতার মধ্যেও অলকাদির গলা আবার শুনতে পেলাম, 'আমি একলা থাকি এ বাড়িতে; আমাকে ফেলে আজ রাত্তিরে যেও না চিরঞ্জীব।'

নির্জীব ডুবন্ত স্বরে কোনরকমে বলতে পারলাম, 'আমার বড্ড ভয় করছে অলকাদি।'

'কিসের ভয়। আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তো অবলা মেয়েমানুষ। আমি আর কতটুকু ক্ষতি করতে পারি।' গাঢ় গলায় অলকাদি বললেন। তারপর দুটি কোমল বাহু সাপের মত আমাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করল।

চেতনার যেটুকু তলানি এখনও অবশিষ্ট আছে কিছুক্ষণের মধ্যে সেটুকু আর থাকবে না। আমার নাক-কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল, চোখের সামনে সব কিছু ঝড়ের দোলার মত দুলতে লাগল। অলকাদির হাত দুটো কোনরকমে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন---' বলেই দরজা খুলে বাইরের হিমাক্ত অন্ধকার ভেদ করে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

অলকাদির দিকে ফিরে তাকাই নি; তাঁর চোখমুখের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলতে পারব না।

●

সেই যে ছোটা শুরু করেছি ... একেবারে পিসেমশাইর বাড়ির ... এসে থামলাম।

এখন কত রাত, কে জানে। গেটে ইতিমধ্যেই তালা লাগানো হয়েছে। এতকাল অমল বিমলরা পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছে। আজ প্রথম আমি তাদের দলে নাম লেখালাম।

তালা গেটেই শুধু নয়, সদর দরজাতেও। গেট পেরুলেই তো আর বাড়ির ভেতর ঢোকা যায় না। এত রাত্রে কাকে ডেকে যে সদরের তালা খোলাই। ডাকাডাকি করতে গেলে পিসেমশাই যদি টের পেয়ে যান। আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বাগানের মাঝখানে যে নুড়ির রাস্তাটা তার ওপর দিয়ে শিথিল কাঁপা পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল আমার ঘরে আলো জ্বলছে।

আমার ঘরে তো কেউ আসে না। তবে আলো জ্বলছে কেন? কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বুকের মাঝখানের সেই দুরন্ত কাঁপুনির শব্দ শুনতে শুনতে পায়ে পায়ে ঘুর পথে নিজের ঘরের জানলায় উঁকি দিলাম।

কি আশ্চর্য। আমার বিছানায় অমল বসে আছে।

আস্তে করে ডাকলাম, 'অমল---'

অমল মুখ তুলে তাকাল। চোখা-চোখি হতে বলল, 'একটু দাঁড়াও, দরজা খুলে দিচ্ছি।'

আমি আবার ঘুরে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

। ক্রমশ।

মহেশ্বর

উপেন দাশ (মালয়)

ধনরত্ন আহরণ সুখভোগ লাগি অমৃতের হ'তে অধিকারী,
সাময়িক ঐক্যবন্ধ দেবতা দানব সেচেছিল সাগরের বারি।
তুমিও চাওনি রত্ন, রত্ন আর কাঁচ সমান তোমার কাছে, ত্যাগি!
মৃত্যু তব পদতলে, তুচ্ছ অমৃতের কি তোমার প্রয়োজন যোগি।
উঠে হলাহল রাশি দেব-দৈত্য ত্রাস বিশ্ব চরাচর কাঁপে ডরে
"রক্ষা কর মহাদেব" বলিয়া সকলে লুটে পড়ে চরণের 'পরে।
হে দরদী মৃত্যুঞ্জয়! প্রেম পারাবার পরের লাগিয়া তুচ্ছ প্রাণ
নীলকণ্ঠ হ'লে হলাহল করি পান, বিশ্ব করে তব স্তুতি গান।
ঐশ্বর্য অমৃত উঠে রত্নাকর হ'তে বিশ্বের ভাণ্ডার উঠে পুরে,
"কি নিবে হে মহাদেব!" জিজ্ঞাসে জগৎ গলে তুলে নিলে বাসুকিরে।

সমুদ্র মন্থন দড়ি, ফুরায়েছে কাজ, ত্যক্ত আজ অজ্ঞা হেলায়,
বাসুকির তরে তাই কাঁদিল হৃদয়, তুলে নিলে অনন্ত কৃপায়।
অন্নপূর্ণা জায়া তব আদেশিলে তারে "ক্ষুধিতের নাশ হাহাকার",
তুমি নিলে ভিক্ষাপাত্র বিশ্বের দুয়ারে হাত পেতে ফিরে আনবার।
অমরায় দেব-দেবী অগুরু চন্দনে মণিমুক্তা অলঙ্কারে সাজে,
পারিজাত গন্ধভরা নন্দনকাননে উঠে গান নানা বাদ্য বাজে,
আত্মত্যাগে পূতভনু ছাইভস্ম মাথা শ্মশানে মশানে তব গতি
জীবের সকল জ্বালা মঙ্গল প্রলেপে শান্ত কর তুমি, পশুপতি।
সত্য শিব সুন্দর মহাপ্রাণ তুমি, পরহিতব্রতী ভোলানাথ,
"মহাদেব-মহেশ্বর" বলে বিশ্ব তাই চরণে করিছে প্রণিপাত।

স্বপ্ন-বিহঙ্গ

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

চোখ মেললেই—
পূর্ব পরিচিত দৃশ্য। পুরাতন অনুভূতি।
আকাশ-বাতাস-ফুল-ফল-অরণ্য-নদী
গাঁও-গঞ্জ-শহর...
চাপ চাপ অন্ধকার অলি-গলি,
ঘোলা জল, অসহ ক্লান্তি, মৃত্যুনীল বিষণ্ণতা,
পাহাড়ী পথ,
পায়ে পায়ে উদ্দাম প্যারিস রাত্রি
প্রেতরক্ত। ষড়রিপু তাড়না। অগ্নিদগ্ধ জ্বালা।

দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে
সভ্যতার ফানুসে উন্মাদ রেষারেষি
অপর নাম মরণ।

অথচ নিরালা নদীর লাবণ্য বুকে জড়িয়ে
শিশিরস্নাত ধরণীর হাসি ছড়িয়ে
হেমন্ত-বাতাসে
রোদ-মাটি-ফসলের গন্ধ ভাসে
স্বপ্ন-বিহঙ্গ ডানা মেলে
পলে অনুপলে...
হৃদয়ের দরবারে প্রধান অতিথি সে।

সাহিত্য পরিচয়

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা

স্বামীজীর সাহিত্য রচনা ও সমাজ চেতনা সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। উনিশ শতকের বাংলার এই দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের মর্ম উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েছেন লেখক সযত্ন পরিশীলনের মাধ্যমে, বলা বাহুল্য এ ধরণের প্রচেষ্টা সর্বদাই অভিনন্দনযোগ্য। স্বামীজীর গভীর মনীষা ও বিশ্বহিতৈষী মনোভাব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ধারণার অবকাশ ঘটে, গ্রন্থটি পাঠ করলে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচারকামী। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---হরপ্রসাদ মিত্র, প্রকাশক---বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---ছয় টাকা।

সুকান্তনামা / সারস্বত লাইব্রেরী

প্রতিভাবান কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্মরণে তাঁর সমসাময়িক কবিদের প্রশস্তি এই ক্ষুদ্রায়তন কাব্য গ্রন্থটি। অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী এই কবি মাত্র একুশ বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে তিনি অমর সে কথা অনস্বীকার্য, সেজন্যই এই কাব্যসংকলনটি আনুষ্ঠানিক অর্থে প্রিয় কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য মাত্র নয় এ যেন আমাদের নিজেদের প্রতিই শ্রদ্ধাবোধ জাগানো। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে নতুন করে শোকাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে অন্তর, মনে হয় শিশু-সূর্যের আলো যে এত অকস্মাৎ অস্ত যায় একথাই বা জানা ছিল কার? ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। সম্পাদনা---মিহির আচার্য, প্রকাশনা---সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম---তিন টাকা।

Students Fight For Freedom

বর্তমান ইতিহাসের অধ্যায় রচনাতে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের সংগ্রামী মনোভাবের প্রভাব যথেষ্ট, আলোচ্য গ্রন্থে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ছাত্রসমাজ নিজেদের সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্যকেই শুধু তুলে ধরেন নি, নির্দিষ্ট আন্দোলনাদির দ্বারা সে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতেও পেরেছেন কতকাংশে। বলা বাহুল্য জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব বড় কম নয়। বর্তমান গ্রন্থে ছাত্র তথা যুবসমাজের এই সংগ্রামের সম্পূর্ণ বিবরণ বিধৃত। বস্তুত এই রচনা বাঙ্গালী ছাত্রসমাজের আন্দোলনের প্রামাণ্য ইতিহাসবিশেষ। ইংরাজী ভাষায় লিখিত হওয়ায় বাঙ্গালী পাঠক সমাজে কিয়দংশ হয়ত কিছুটা অসুবিধা বোধ করতে পারেন, সেজন্যই আমরা আশা করি যে গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ অচিরেই আত্মপ্রকাশ করে সে অসুবিধার নিরসন করবে। প্রচ্ছদ রুচিসম্পন্ন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---অমরেন্দ্রনাথ রায়, প্রকাশনায়---আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থা, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১---দাম---ছয় টাকা।
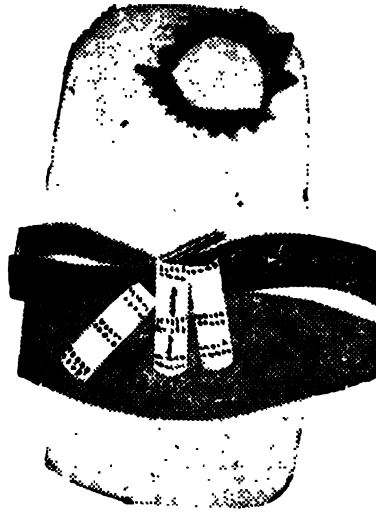
কুয়ারি গিরিপথে / অমর সাহিত্য প্রকাশন

আলোচ্য গ্রন্থটি এক ভ্রমণকাহিনী। লেখক পাকা ভ্রাম্যমাণ যাযাবর বৃত্তি তাঁর রক্তে, বহু তীর্থে পদসঞ্চার ঘটেছে তাঁর বারংবার, তবে তীর্থ তাঁর কাছে গৌণ আসল পথ, আর হিমালয়। হিমালয়ের বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ অভিভূত তিনি, তাই বারবার তিনি এসে দাঁড়ান তার সান্নিধ্যে, দুচোখ ভরে পান করেন তার মহিমময় সৌন্দর্য, তৃপ্ত হয় মন, ভরে ওঠে প্রাণ। আলোচ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি বিবৃত করেছেন কুয়ারি গিরিপথে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কাহিনী। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় রচনার ছত্রে ছত্রে, কিন্তু সেটাই সব নয়, সৌন্দর্যপিপাসু লেখক মানুষকে অবজ্ঞা করেন নি কোথাও, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই রম্য পরিবেশে যে মানুষগুলিকে তিনি দেখতে পেয়েছেন তাদেরও সযত্নে চিত্রিত করতে ভোলেন নি। সামান্যের মধ্যে অসামান্যর পরিচয়কে চিনতে ভুল হয় নি তাঁর। মানুষ ও প্রকৃতি তাই একাত্ম ভাবেই মিলতে পেরেছে তাঁর রচনায়। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। লেখক---উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক---অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯, দাম---সাড়ে পাঁচ টাকা।

তৃষ্ণার জল / ডি এম লাইব্রেরী

প্রখ্যাত সাহিত্যকারের নবতম এই রচনায় গভীর জীবনদর্শনের আভাস মেলে। প্রেমের এক অপরূপ ব্যাখ্যা কাহিনীর মধ্যে বিধৃত। পুরুষ ও রমণীর মধ্যে মন দেওয়া নেওয়ার অবকাশ জীবনে হয়তো একাধিকবার আসে, কিন্তু তাতেই কি তারা পরস্পরের তৃষ্ণার জল হয়ে উঠতে পারে? তৃষ্ণার জল বলতে এক্ষেত্রে রাইটম্যান বা রাইট ওম্যানকেই বোঝাতে চেয়েছেন লেখক, তাঁর বক্তব্য দেহে মনে চিন্তায় মিল থাকলেই শুধু হয় না, সে মিলন সমাজসম্মতও হওয়া চাই এবং চাই সে মিলনের পরিপূর্ণ ফসল অর্থাৎ সন্তান। এজন্যই বর্তমান কাহিনীর নায়ক প্রবাহন ভালবেসেও মিলতে পারে নি রাণী বৌদি, মীরা বা বিয়াট্রিসের সঙ্গে, ইলেনের মধ্যেই খুঁজে পেল অবশেষে পরিপূর্ণ সার্থকতা লেখকের ব্যক্তিত্বপূর্ণ শৈলী, কাহিনীকে

দিয়েছে এক অনন্য মর্যাদা। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---তারাশঙ্কর রায়, প্রকাশক---ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ন-ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম---ছয় টাকা।

জরির আঁচল / মিত্র ও ঘোষ।

আলোচ্য গ্রন্থে নিপুণ হাতে কৈশোরের সদ্যজাগা মনের ক্ষুধাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একটি সদ্য-যৌবনা মেয়েকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় চারটি তরুণ চিত্ত, তারা ভাবে ---ও কাকে চায়? কাকে ভালবাসে? নিজেদের কামনাকে ওজনদাঁড়িতে চড়িয়ে বিচার করে মেয়েটিকে---ওকি, সত্যই প্রেমিকা না রঙ্গিণী? ফলে অনিবার্যভাবেই আসে ক্ষোভ, ঈর্ষা ও সন্দেহ; কিন্তু মিঠুয়ার তরুণ চিত্ত বিচলিত হয় না তাতে, মনের দ্বারে অঞ্জলি পেতে দাঁড়ানোর বদলে দেহের দুয়ারে প্রার্থনা করার বিরুদ্ধে বিষিয়ে ওঠে তার সমস্ত মন; তাই প্রশান্ত মনেই পিতৃনির্বাচিত পাত্রের গলায় মালা দিতে প্রস্তুত হয় সে। নবজাগ্রত যৌবনচাঞ্চল্যকে ভারি রোমান্টিক-ভাবে পরিবেশন করেছেন লেখক চরিত্র ক'টির মাধ্যমে। তাঁর লিখন-ভঙ্গীর শান্তমধুর শোভাও হৃদয়গ্রাহী। বইটি পড়ে আমরা সত্যই আনন্দ পেয়েছি। লেখক---রমাপদ চৌধুরী, প্রকাশনা---মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---চার টাকা।

আর কোনখানে / মিত্র ও ঘোষ।

আলোচ্য রচনাটি স্মৃতিচারণমূলক, লিখতে পারলে জীবনকথা যে উপন্যাসের চেয়েও মনোহরী হয়ে উঠতে পারে, এ রচনা পড়লে সে কথা মানতেই হয়। লেখিকার সরস শৈলীর প্রসাদে বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়; বর্ণনাকৌশলে ঘটনা ও চরিত্রসমূহ যেন জীবন্ত। এ ছাড়াও এ রচনার আরেকটি দিক আছে, বাংলা দেশের এক প্রতিভাশালী পরিবারের বেশ কিছু অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায় এই রচনার মাধ্যমে। স্বর্গত ও স্বনামধন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন লেখিকার জ্যেষ্ঠতাত, সেজন্যই লেখিকার স্মৃতিচারণে এমন সব মানুষের মিছিল আপনা থেকেই এসে দাঁড়িয়েছে, যাঁদের নাম বাঙালীমাত্রেরই অতি পরিচিত: এবং বোধ হয় এই কারণেই রচনাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে বাধে না একটুও। আমরা এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করছি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা---লীলা মজুমদার, প্রকাশনা---মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম---পাঁচ টাকা

হাতে রইলো তিন / আনন্দ পাবলিশার্স।

সাম্প্রতিক সমাজজীবনে যে নিদারুণ অবক্ষয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে দিনে দিনে, সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে তারই প্রতিফলন। আলোচ্য গ্রন্থটিও এই ধারারই স্বাক্ষরবাহী। শক্তিমান লেখক সুবিন্যস্ত গল্পের ছকে ফেলে এ সমস্যা নিয়েই ভেবেছেন ভাবাতে চেয়েছেন। কাহিনী আবর্তিত হয়েছে কয়েকটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারীকে কেন্দ্র করে, যুগধর্মে যারা মনুষ্যত্ব হারিয়েছে বা হারাতে উদ্যত হয়েছে। তবু মানুষ যে মরেও মরে না একথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় উপ-ন্যাসের সমাপ্তিতে; জয়ন্তীর ভেসে যাওয়া জীবনকে যারা কূলের কাছে টেনে নিয়ে আসে সেই সব রকবাজ বখে যাওয়া তরুণের দলের মাঝেই আজও নিহিত রয়েছে জাতির কল্যাণ, জাতির ভবিষ্যৎ। মনে হয় অনুকূল পরি বেশ পেলে সব কাঁটাই যে একদিন ফল হয়ে উঠতে পারে, একথাটাই এই কাহিনীর মূল বক্তব্য। লেখকের অনবদ্য ভাষাভঙ্গীর প্রসাদে রচনাটি আদ্যন্ত উজ্জ্বল। প্রচ্ছদ রঙীন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---বিমল মিত্র। প্রকাশক---আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯. দাম---ছয় টাকা।

এপার ওপার / আনন্দ পাবলিশার্স।

এই অস্থির অশান্ত যুগ মানসিকতার স্বাভাবিক শিকার যৌবন, আর সেই যৌবনেরই সম্যক প্রতীক এই গ্রন্থের নায়ক বিল্ব। অন্ধকারের জীবনে সঙ্গী যারা ছিলো তারাই একদিন প্রতারণা করলো বিল্বের সঙ্গে, তাকে ধরিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করলো নিজেরা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বিল্ব এলো জেলে, অনুতাপে পীড়িত নয় সে তখন, তার মনে তখন একটি চিন্তাই নরকের অগ্নিশিখার মত লিক-লিকিয়ে উঠেছে, সে চিন্তা প্রতিশোধের। জেল থেকে পালালো বিল্ব, শাণিত ছুরি হাতে বেরিয়ে এসেছে সে, মরতে সে ভয় পায় না কিন্তু মেরে তবেই মরবে। কিন্তু লিলি সে কেন এল? কেন ছায়া ফেললো বৈশাখী মধ্যাহ্নের মরুভূমিতুল্য শুষ্ক কঠিন হৃদয়ে? প্রতিশোধের আকাঙখা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো অবিশ্বাস্য এক প্রেমের ছোঁয়ায়, নতুন জীবনে বেঁচে উঠলো বিল্ব, শান্ত সমাহিত চিত্তে, অকম্পিত হৃদয়ে ফিরে গেলো সে আবার কারাজীবনে। অপরূপ ভঙ্গীতে অধঃপতিত একটি মানবাত্মার উত্তরণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। অন্ধকারের পেছনেই যে থাকে আলোকের ইসারা, এই সত্যই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে বর্তমান কাহিনীর ছত্রে ছত্রে। বিল্ব তাঁর এক অপরূপ সৃষ্টি। প্রচ্ছদ রুচি-শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---সমরেশ বসু। প্রকাশক---আনন্দ পাব-লিশার্স প্রাঃ লিঃ; ৫, চিন্তামণি দাশ লেন, কলিকাতা-৯। দাম---পাঁচ টাকা।

বরপক্ষ / বাক্-সাহিত্য

পুরোনো ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অবক্ষয়ের রূপটি বড় পরিষ্কারভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে আলোচ্য কাহিনীর মাঝে। শিক্ষিতা তেজদৃপ্তা কুমারী কন্যা শিবানীর বিয়ে হয়েছিলো মস্তবড় ধনীসন্তান হেমন্তর সঙ্গে, অনেক আশা নিয়েই ধনীগৃহ বরণ করেছিলো নববধূকে। কিন্তু প্রথম থেকেই দেখা দিলো বিরোধ হেমন্ত জননী মায়াদেবীর সুখ সম্ভোগ ভরা কলুষিত জীবনদর্শন মেনে নিতে পারলো না শিবানী, নববধূর লজ্জার আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল এক অগ্নিসম্ভবা নারী। মেরুদণ্ডহীন পুরুষও যার ছোঁয়ায় হয়ে উঠতে পারে সার্থক ও সফল। বহু সংগ্রামের পর স্বামীর হাত ধরে সেই সার্থকতার পথেই পা বাড়ালো শিবানী। অপূর্ব ব্যঞ্জনা ভরা ভাষায় আপন বক্তব্য বলেছেন লেখক, তাঁর শৈলী সত্যই অপরূপের ছোঁয়ায় প্রদীপ্ত, পড়তে পড়তে মন হারিয়ে যায় লাবণ্যময় দিক্‌বলয়ে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---প্রবোধকুমার সান্যাল; প্রকাশক---বাক্-সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম---ছয় টাকা।

নারী রূপে রূপে / গ্রন্থপ্রকাশ

মেয়েরাও আজ কাজ করে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে, জীবিকা অর্জনের তাগিদও তাদের কম নয়, তবু ন্যায্য সম্মানে বঞ্চিত কেন তারা আজও? আলোচ্য গ্রন্থের পাতায় নানারকম জীবিকাধারিণীকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। এঁকেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত অথচ অন্তরঙ্গ ছবি, মনে হয় উপরোক্ত প্রশ্নটিই নানাভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে তাঁর অঙ্কিত খণ্ড জীবনচিত্রগুলির মাধ্যমে, মনে হয় এটাই তাঁর মূল বক্তব্য। লেখিকার দৃষ্টি আন্তরিক ভঙ্গী অকপট আড়ম্বরহীন সহজভাষায় আপন বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন তিনি অকুণ্ঠে; মেয়েদের জীবনে চরম কামনার বস্তু যে সব সবরই এক ও অভিন্ন সত্যকে বিকৃত করতে চান নি তিনি একবারও তাঁর এই সততাকে ধন্যবাদ। প্রচ্ছদ রমণীয়, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা---সুজাতা। প্রকাশনা--গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা---১২, দাম---চার টাকা।

আপনজন / বাক্-সাহিত্য

ছোট ছোট কয়েকটি সরস গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখকের ক্ষমতা আছে, সামান্য সামান্য ঘটনা ও চরিত্রকে আশ্রয় করে যেভাবে কাহিনীর জাল বুনে গিয়েছেন তিনি তা সত্যই প্রশংসনীয়। সরসতার ছোঁয়ায় রচনাগুলি উপভোগ্য, সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষ ও স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য থেকেই লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে নিয়েছেন লেখক এবং স্নিগ্ধ সরসতার আড়ালে নিজের ব্যঙ্গবঙ্কিম ভঙ্গীটাকেও যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন; তবু এক একবার তাঁর ক্ষুরধার শ্লেষ চাবুকের মত সর্ববিধ দুর্বলতা ও অন্যায়ের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। অতি মনোরম রম্যরচনা হিসাবেই আদৃত হওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---ইন্দ্রমিত্র। প্রকাশক---বাক্-সাহিত্য; ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম---চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নতুন তুলির টান / বাক্-সাহিত্য

জনপ্রিয় সাহিত্যকারের সাম্প্রতিক এই উপন্যাসটি হাতে পেয়ে সকলেই খুসী হবেন। অত্যধিক ঐশ্বর্যের বেড়াজালে মনুষ্যত্ব কিভাবে পলে পলে খণ্ডিত হয়ে যায়, সেটা দেখাতেই যেন এ কাহিনীর অবতারণা করেছেন লেখক। গ্রন্থের মূল চরিত্র তিনটি, ধনকুবের ব্যবসায়ী বিপুলানন্দ, তার পত্নী নারায়ণী ও পুত্র রাজা। দরিদ্রের ঘর থেকে শুধু অসামান্য রূপের জোরেই বিপুল্ ঐশ্বর্যের অধিপতি বিপুলানন্দের পত্নীর সম্মানিত আসনটি দখল করতে সক্ষম হয়েছিল নারায়ণী একদিন; কিন্তু দিনে দিনে তিলে তিলে অর্থের প্রসাদে মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত হতে দেখে সে শঙ্কিত; শেষে কি একমাত্র সন্তানকেও নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে ঐশ্বর্যের যূপকাষ্ঠে? সন্তানকে মানুষ করার অদম্য তৃষ্ণায় অধীর হয়ে ওঠে নারায়ণীর মাতৃহৃদয় এবং অভিনব উপায়ে সফলও হয়ে উঠতে পারে সে; শুধু সন্তানই নয় স্বামীকেও অর্থের অভিশাপের হাত থেকে মুক্ত করে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ করে সে। ভোরের শিশিরের মত শুভ্র ও সমুজ্জ্বল এই নারী চরিত্র চিত্রণে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক; নারায়ণী সত্যই এক অনবদ্য সৃষ্টি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়---বাক্ সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম---সাত টাকা।

নিরুদ্ধ যৌবন / হেমেশ্বর প্রকাশ মন্দির

আত্মসম্মানে অবিচল কয়েকটি মেয়ের জীবনকথাই বর্তমান রচনার বিষয়বস্তু। কাহিনী বৈশিষ্ট্যহীন হলেও প্রথম প্রয়াস হিসাবে নিন্দনীয় নয়, লেখিকার শৈলীতে সংযমের আভাস আছে, মনে হয় যথাযথ অনুশীলন করলে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহীন হওয়ার মত কিছু নেই। প্রচ্ছদ সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা---বীণা নন্দী, প্রকাশক---হেমেশ্বর প্রকাশ মন্দির, ৭৭ সি, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, দাম---তিন টাকা।

রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা / সারস্বত লাইব্রেরী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য-সংকলন। আধুনিক রীতি-আশ্রয়ী অনেকগুলি কবিতা একত্রিত হয়েছে, কবির রচনারীতি সুকুমার, বেশ একটি রোমাণ্টিক মননের আভাস পাওয়া যায় কবিতা কয়টির মাঝে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। কবি---তরুণ সান্যাল, প্রকাশনা---সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬. দাম---তিন টাকা।

স্বদেশী গ্রন্থের চার অধ্যায় / কম্পাস পাব্লিকেশনস

বাঙলার রাজনৈতিক পরিবেশের পটভূমিতে যে সব প্রখ্যাত রচনা আত্ম-প্রকাশ করেছে তার মধ্যে প্রধান চারটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে আলোচ্য রচনার বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। আনন্দমঠ, পথের দাবী, চার অধ্যায় ও ধাত্রী দেবতাকে বেছে নিয়েছেন লেখক, স্বদেশী গ্রন্থের বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে। লেখকের রচনায় যথেষ্ট অনুশীলনের স্বাক্ষর বর্তমান, আলোচনা ও মননশীলতার পর্যায়ে উন্নীত। গবেষণমূলক সাহিত্যের ভাণ্ডারে সাদরেই গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে গ্রন্থটি। আমরা বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ রুচিসম্পন্ন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---পুলকেশ দে-সরকার, প্রাপ্তিস্থান---কম্পাস পাব্লিকেশনস লিমিটেড, ৩০।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম---চার টাকা।

সোমনাথ / ডি এম লাইব্রেরী

আলোচ্য উপন্যাসটি ইতিহাসাশ্রয়ী। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে কাল্পনিক এক কাহিনীর মাধ্যমে। লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে সু-প্রতিষ্ঠিত হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই বোধ হয় তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে তাঁর এই উদ্যম প্রশংসার্হ। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই ইতিহাসের চরিত্র ও মেজাজকে পরিবেশন করেছেন লেখক। বিখ্যাত তীর্থ সোমনাথের পূর্ণ পরিচয়ই বিধৃত। কাহিনীর মাধ্যমে অতীতে ভারতের সম্পদ কোন মানের ছিলো তারও একটা ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে বইটি পড়লে। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---শক্তিপদ রাজগুরু, প্রকাশক---ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম---সাড়ে আট টাকা।

স্বরা নারী নগরী / জ্ঞানতীর্থ

যৌনাবেদনমূলক উপন্যাস রচনার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার জলন্ত উদাহরণ-স্বরূপ গৃহীত হওয়ার যোগ্য এই রচনা। লেখক হয়ত খোলাখুলিভাবে বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ের একটি বিশেষ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সাবধান করে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু সংযমের অভাবে তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বস্তুত ভদ্র ভাষার আবরণে নিছক পর্ণগ্রাফী ব্যতীত এ রচনা আর কিছুই নয়। এ ধরণের রচনার যা মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ বহুল প্রচার ও তজ্জনিত অর্থাগম সেটি এক্ষেত্রেও সার্থক হবে বলেই মনে হয়, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত তরুণ পাঠক-সমাজ যে রচনাটি পড়তে উৎসুক হয়ে উঠবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক---চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক---জ্ঞানতীর্থ, ১, বিধান সরণী, কলিকাতা-১২, দাম---সাত টাকা।

হিন্দুত্ব ও আত্মজ্ঞান

আলোচ্য গ্রন্থে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে এবং তার মূল যে আত্মজ্ঞানেই নিহিত, সে কথাও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে। হিন্দুত্বের মূল সংজ্ঞা সম্বন্ধে অন্বেষু ব্যক্তিমাত্রই বইটি পাঠ করে সন্তোষ লাভ করবেন। প্রচ্ছদ ও অপরাপর আঙ্গিক সাধারণ। লেখক---সুশীলকুমার ঘোষাল, প্রকাশনা ---বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২, দাম---চার টাকা।

চরৈবেতি

একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। তৃতীয় সঙ্কলনটিতে রয়েছে মিহির গৌতম, সদানন্দ ভট্টাচার্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রলয় পাল, অমিয় ভট্টাচার্য প্রমুখ সুধীজনের লেখা, চতুর্থ সঙ্কলনটিতে রয়েছে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল চক্রবর্তী, সদানন্দ ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় রায় প্রমুখের উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রত্যেকটি লেখা যথেষ্ট মূল্যবান। পত্রিকাটির প্রসার কামনা করি। সম্পাদক ---শ্রীমুকুল চক্রবর্তী, ১সি, লাইম স্ট্রীট, কলিকাতা-১৫ হইতে প্রকাশিত। দাম--- এক টাকা।

ইট-গাঁথিয়ে

(Varily Kazin-এর 'Brick layer' কবিতার অনুবাদ)

সন্ধ্যা নেমে এলে আমি বাড়ীর দিকেতে ক্লান্ত পথ হেঁটে যাই
শুধুমাত্র অবসন্নতাকে সঙ্গী করে;
এবং আমার এই কাজের পোষাক গান গায় সায়াহ্নেরই কামনায়,
সেই বজ্র-কণ্ঠ গান, যেগুলো ইঁটেরই মতো দৃঢ় আর লাল;

কাজের পোষাকটা গান গায় সেই দুঃসহ বোঝার
আমাকে যেগুলো ব'য়ে তুলতে হয় উঁচু থেকে অনেক উঁচুতে—
বাড়ীটার সেই উচ্চতম সীমানায়,
শীর্ষ ছাদটাতেই, ওরা যেটাকে গগন-চুম্বী নামে আখ্যা দেয়।

আমার দৃষ্টিতে ছিল উৎসবময়তা চাওয়া এক পরিবর্তন,
বাতাসের কণ্ঠস্বর ছিল কুয়াশার স্নানে ভেজা,
এবং সকালও ঠিক যেন এক শ্রমিকের মতো
একান্ত আপন একটা লাল ইঁট ব'য়ে ব'য়ে উচ্চে তুলছিল।

(অনুবাদিকা—কাজল দত্ত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্তোত্র

ভবতারিণী দেবী

প্রসীদদেব, জগন্নিবাস প্রসীদদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।
ভক্তিস্তুতিং মে কৃপয়া-গৃহাণ-অর্ঘ্যং তে শ্রীচরণাম্বুজো বিষ্ণু:
ত্বমেব মাতা-চ-পিতা ত্বমেব ত্বমেব ধ্যাতা বিশ্ববন্ধু:
কলিকল্মষঘনান্ধকারে ত্বং-হি ধ্রুব: পূর্ণেন্দু।

ত্বং ব্রহ্মা-সৃষ্টিকর্তা চ-ত্বং-বিষ্ণু: পরিপালক:,
ত্বং শিব: শিবদোহনস্ত্ব সর্বসংহারকারক:।
ত্বমাশ্বরো,-গুণাতীতো-জ্যোতিরূপ: সনাতন:
প্রকৃত প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃত: প্রকৃতে: পর:
নানারূপ বিধাতা ত্বং ভক্তানাং ধ্যানহেতবে
যেষু রূপেষু যৎ প্রীতিস্তত্তজ্রূপং বিভাষিত:
সূর্যস্তং সৃষ্টিজনক: আঁধার সর্বতেজসাম্
সোমস্তং শস্যপাতা চ সততং শীতরশ্মিনা
বায়ুস্তং বরুণস্তঞ্চ বিদ্বাংশ্চ বিদুষাং গুরু:
মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যু মৃত্যু: কাল কালো সমাপ্তক:
বেদস্তং বেদকর্তা চ বেদবেদাঙ্গ পারগ:
মন্ত্রস্তুংহি জপস্তুংহি তপস্তুং তৎফলপ্রদ:
বাকত্বং বাগাধিদেবস্তুং তৎ কর্তা তদগুরুস্বয়ম্
অহো সরস্বতী বীজং কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বর:
ইত্যেবমুক্তা ভক্তগণো ধৃত্বা শ্রীপদাম্বুজং
তত্রোবাস ত্বমাবোধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমাত্মনং।
নমো নমস্তে জগদিষ্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভু নমো নমস্তে।

●

প্রভু তুমি অখিল বিশ্বচরাচর সকল ভুবনধাতা,
তুমি সৃষ্টি-সৃজন পালন কারণ,
তুমি জীবগণ সম্পদ-সুখ মঙ্গলদাতা—
নমো নমস্তে প্রভু সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।
তোমার অনন্তে রূপ তুমি অচিন্ত্য স্বরূপ;
অবগুণ অনন্ত কে পায়—
ভাস্কর শশধর অম্বর সাগর
সবে তব মহিমা জানায়,
সবে তব মহিমা জানায়,
নমো নমস্তে প্রভু প্রেমানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নমো নমস্তে।
নদী-নদ, কানন-জলদ সমীরণ—
সবে তব করুণা প্রকাশে।
তব স্নেহ নিদর্শন ভুবনে অনুক্ষণ প্রকটিত পুষ্প সুবাসে
নমো নমস্তে প্রভু জগদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নমো নমস্তে।
সমগ্র ভুবনে বিহঙ্গ কূজনে গাহিতেছে তব স্তবগীতি।

আহা কিবা সুন্দর! মধুর মধুরতর
শুনি তাহা প্রাণে জাগে প্রীতি,
নমো নমস্তে প্রভু প্রেমানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নমো নমস্তে।
বিরিঞ্চি শিব বাসবাদি দেব সম
অবিরত যে পদ ধেয়ায়;
সেই রাতুল শ্রীচরণ-দরশন মম ভাগ্যে কি আর ঘটিবে পুন
আমি সে আনন্দ কহিব কাহায়—
নমো নমস্তে প্রভু ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।
ধন্য জীবন মম—সার্থক জনম দেব।
আমি কি কহিব প্রভু, মম ভাষা না জোগায়
প্রভু তোমার অপার মহিমা আমি কি জানি, মম ভাষা না ফুরায়
ভবভয়তারণ, পতিতপাবন, অধমতারণ শ্রীমধুসূদন।
প্রভু, পুন: দিও মোরে তব রাতুল অভয় চরণ।
নমো নমস্তে প্রভু পূর্ণানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নমস্তে।
দয়াময় জগৎ-আশ্রয় সৃজন পালন-নিধনকারী।
ভবতারণ দু:খনাশন বিপদহারী।
নমো নমস্তে প্রভু পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব
প্রভু নমো নমস্তে।

●

শ্যামল সুন্দর জলদাহ জিনি কলেবর—
নমো নমস্তে প্রভু পূর্ণানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নমস্তে।
দয়াময় জগদাশ্রয় সৃজন পালন-নিধনকারী
ভবভয়তারণ দু:খবারণ, ভয়নাশন বিপদহারী,
উজ্জ্বল শ্যামলসজল জলদাহ জিনি কলেবর,
উজ্জ্বল-শ্যামল সুন্দর জলদ জিনি কলেবর
চরণ সরোজে নব বিভাকর—
শুভ্র বসনে সুশোভিত কটি ভুবনমোহন
শুভ্র বসনে সুশোভিত মূরতিধারী—
কটি ভুবনমোহন মূরতি রাশি—
বামস্কন্ধে বিজড়িত বসন অঞ্চল দশী
শুভ্র বসনে সুশোভিত কটি ভুবনমোহন রূপরাশি
ভাবে নেত্র নিমীলিত
করে করে করে বিদলিত বামস্কন্ধে বিলম্বিত
বসন অঞ্চল দলি।

[illegible] অন্তর্গত [illegible]
ভারতের মধ্যে স্বাস্থ্যপ্রদ ও মনোরম স্থানগুলির অন্যতম। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু নরনারীর সম্মিলন হয় এই স্থানে---বাংলা দেশ থেকে তো বটেই। স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং ধর্ম এই তিন বিষয়ে দেওঘর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন আছে। কত লোক ছুটে আসে স্বাস্থ্যোদ্ধারে। কতজন এসে থাকে তার পাহাড়ঘেরা অনবদ্য প্রাকৃতিক সম্পদে আকর্ষিত হয়ে, আবার কত নর-নারী বুকভরা ভক্তি নিয়ে আসে বাবা বৈদ্যনাথের চরণে ভক্তমনের আকুল প্রণাম নিবেদন করতে।

এই দেওঘরের উপকণ্ঠেই তপোবন পর্বত। দিনের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, সন্ধ্যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দিনকে অস্ত পাঠিয়ে সলজ্জ চরণে মৃদুমন্দ-গতিতে এগিয়ে আসছে সন্ধ্যা। এ-হেন সময়ে সমগ্র পরিপার্শ্ব জুড়ে পর্বতের সানুদেশ থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল এক জননীর আকুল আহ্বান তার সন্তানকে।

সন্তান সন্ন্যাসী। বাল্যকাল থেকে গৃহছাড়া। চল্লিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তারপর থেকে। নয়নের মণি হারিয়ে অনাথিনী জননী সর্বহারা অবস্থায় দিন যাপন করে চলেছিলেন। সুপ্ত মাতৃহৃদয়ের বাসনা ছিল পৃথিবীর মেয়াদ শেষ করার আগে একবর অন্তত তাঁর আদরের দুলাল পীতাম্বরকে দেখে যাবেন।

পরম কারুণিক এ প্রার্থনা অপূর্ণ রাখলেন না। জননীর তৃষিত অন্তরের কান্না ঈশ্বরের করুণাধারার স্রোতমুখ খুলে দিল। দৈববাণীতে মা নর্মদাবাঈ জানতে পারলেন তাঁর পীতাম্বর কোথায় আছে।

নর্মদা যখন পীতাম্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন তখন পীতাম্বর আর সে পীতাম্বর নেই। সেই সুবোধ সৌম্য-দর্শন বালক তখন প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডীতে বিচরণকারী। অতি সাধারণ বালক পীতাম্বর সেদিন দৈবকৃপাসম্পন্ন মহা-শক্তিমান এক সাধক। অগণিত নরনারী ছুটে আসছে তাঁর কাছে ভক্তি ও [illegible] অন্বেষণে [illegible] বাসনায় অগ্নিবাণ থেকে [illegible]। কিন্তু শত শত নরনারী পীতাম্বর হিসাবে তার কাছে আসছে না। আসছে শ্রীমৎ স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী হিসাবে।

ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তখন বালানন্দের খ্যাতি সুবিস্তৃত। দিক থেকে দিগন্তে তখন ব্যাপ্ত-পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে তাঁর পুণ্য নাম। লোকের মুখে মুখে তখন ফিরছে এই নাম।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী

জর্জ এ্যালেন

তাঁর লীলাক্ষেত্র হল দেওঘর। কিন্তু তাঁর পিতৃভূমি গার্হস্থ্য-জীবনের বাসভূমি হল উজ্জয়িনী।

সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম। শাস্ত্রানুশীলন ও দীক্ষাদানই ছিল এ পরিবারের বৃত্তি বা জীবিকা। পড়া-শুনোয় এতটুকু মন নেই পীতাম্বরের। কোনদিন তাঁকে দেখা যায় না বারেকের তরেও পাতা উল্টে পড়তে। বাইরে পাতা উল্টোনোর চেয়ে পোড়াবাড়ী, ভাঙামন্দির, ঘোর জঙ্গলের ভিতরে, আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ান তাঁর কাছে খুব প্রিয়। যে সকল জায়গায় লোকে দিনের বেলাতেও ঘেঁষতে সাহস পায় না, ঘোর রাত্রেও নির্ভীক, নিঃশঙ্ক বালকের সেখানে অবাধ গতি। মুক্ত পদচারণ।

প্রমাদ গণেন বিধবা নর্মদাবাঈ। একদিন খোলাখুলিই প্রশ্ন করেন ছেলেকে--- না শিখলি লেখাপড়া না আসবি সংসারের কোন কাজে, তবে তুই করবি কি---সাধু হবি? নিজের মন্দভাগ্যকে ধিক্কার দেন শোকাতুরা বিধবা জননী।

কিন্তু ঐ দুটি কথা 'সাধু হবি?' এক বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কানের ভিতর দিয়ে কথাটা চলে গেল মর্মমূলে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে [illegible] কথা দুটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, [illegible] গুঞ্জিত থাকে।

[illegible] দেখে একদিন উপনয়ন সুসম্পন্ন হল। আনন্দ উৎসব যখন অনুষ্ঠিত হয়েছে তখনও কেউ জানে না তিন-চারদিনের মধ্যেই বড়রকম বেদনা সমগ্র পরিবারকে ছেয়ে ফেলবে। উৎসবের রেশটুকু মিলিয়ে যেতে না যেতেই কান্নার সুরে ভরে গেল উৎসব-প্রাঙ্গণ।

গৃহত্যাগ করেছে পীতাম্বর। ন' বছরের ছেলে। জননীর শিবরাত্রির সলতে। তারপর একদিন দেখা পেলেন মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের। বরোদা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে নর্মদার তীরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ গঙ্গোনাথজী বিরাজিত। অপূর্ব অনুভূতি জাগে বালকের চিত্তে। মনে হয় এ যেন জন্ম-জন্মান্তরের লীলা। জন্মান্তরের সূত্রে দু' জনে যেন দু'জনের সঙ্গে সংযুক্ত। বালকের সমস্ত অন্তর জুড়ে তীব্র বাসনা জাগল এঁরই কাছে দীক্ষা নিতে হবে। ইনিই আমাকে দিতে পারবেন প্রকৃত পথের সন্ধান। ইনিই আমাকে উপনীত করবেন ইন্দ্রিয়ের সঙ্কীর্ণতা থেকে অতীন্দ্রিয়ের প্রশস্ততায়।

দিন ঠিক হল শ্রাবণী পূর্ণিমা। ব্রহ্মানন্দ দীক্ষা দিলেন পীতাম্বরকে। অমৃতের পথের সন্ধান দিলেন। নাম-করণ করলেন 'বালানন্দ'। সেইদিন থেকে জ্যোতিঃ-মঠের আনন্দ উপাধি-ধারী সাধুদের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

১৯০৬ সালে মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ নশ্বরলীলা সম্বরণ করলেন।

ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত আরও দুজন সিদ্ধ-মহাপুরুষের কৃপালাভ করেছেন বালানন্দ। একজন গৌরীশঙ্কর মহারাজ। অপরজন শ্যামাচরণ লাহিড়ী। বারাণসীর এই মহান সাধক বালানন্দকে যোগের বহু বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সম্বন্ধে দীক্ষাদান করেন।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪, খৃস্ট অব্দ ১৯৩৭। নর্মদার উপকূলে যে জীবনের সূচনা ঘটেছিল, তারই পরিপূর্ণতা ঘটল বৈদ্যনাথধাম দেওঘরে। মহাযোগী বালানন্দ সেদিন অপ্রকট হলেন বহু মানবের কল্যাণসাধন করে। বহু আর্তকে উদ্ধার করে, বহু পথভ্রান্তকে পথের সন্ধান দিয়ে।

॥ পাঠিকারা পড়বেন না ॥

● শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬—

প্রশ্ন : বই পড়লে, কপালের দুপাশে খুব বেদনা অনুভব করি, পড়া বন্ধ করলে, কিছুক্ষণের পর আবার বেদনা কমে যায়—

উত্তর : আপনি কোন চোখের চিকিৎসককে দেখান। আমার মনে হয়, আপনার চোখের পাওয়ার বদলেছে।

● অনামী (আসল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক), গোলবাজার, খড়্গপুর—

আপনার কোন ভয় নেই। যে চিকিৎসা করছেন, তাতেই সেরে যাবে। কোন দূষিতরোগ নয়।

● শ্রীশান্তিময় দাশ, গোটাপটি, মালদহ—

প্রশ্ন : প্রায় মাস ১০।১২ হইতে আমার মাথার চুল পেকে যাচ্ছে। বেশির ভাগ চুল পাকিতেছে মাথার পিছন দিকের অংশে—

উত্তর : চুল পাকা নিয়ে যত ভাববেন, চুল পাকা তত বেড়ে যাবে। আপনি চুলের বিষয়ে ভুলে গিয়ে নিয়মিত দুবেলা সকাল এবং সন্ধ্যায় চা চামচের দু চামচ করে খাঁটি মধু খাবেন অন্তত তিনমাস।

● শ্রীজ্যোতির্ময় পালধি, বহুবাজার—

প্রশ্ন : কয়েক বছর যাবৎ আমার মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে এবং সামনের দিকে প্রায় টাক পড়িয়াছে।

উত্তর : আপনাকেও ওই একই পরিমাণের খাঁটি মধু খেতে বলছি। মাথায় বিশুদ্ধ নারিকেল তেল মাখবেন।

● শ্রীপ্রণবকুমার চ্যাটার্জি, বোলপুর—

● আপনি কেমন থাকেন জানাবেন। চিঠি পেয়েছেন জেনে খুসি হলাম।

● শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত, রাণীসাগর, পূর্বপাড়া, বর্ধমান—

আপনার কোন ভয় নেই। ও উপসর্গ সাময়িক এবং আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়।

● এডি (ছদ্মনাম), জি টি রোড (নর্থ), শালকিয়া, হাওড়া—

প্রশ্ন ১ : অতিরিক্ত পানদোষ কি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক? আমার পানাসক্তি অত্যন্ত প্রবল। বয়স প্রায় ৩২। পানাসক্তি নিয়ন্ত্রণের কোন Specific medicine থাকিলে জানাইবেন।
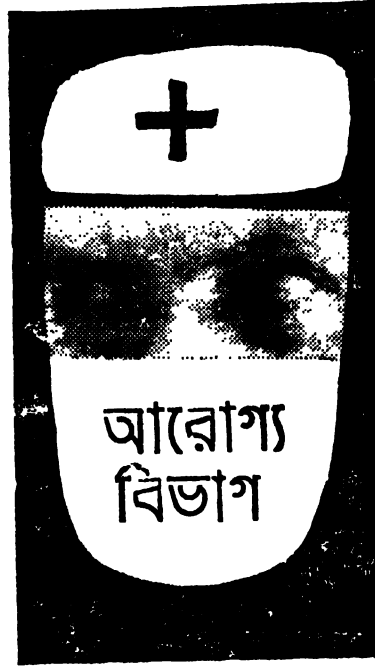
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

উত্তর : নিশ্চয় ক্ষতিকারক। লিভারকে অকেজো করে দেয় এবং লিভারকে শুকিয়ে দেয়। একবার লিভার শুকিয়ে গেলে, আর তাকে ঠিক করার মত কোন ওষুধ নেই। পানাসক্তি নিয়ন্ত্রণ করার ওষুধ থাকলেও তা ব্যবহারে কোন কাজ হয় না, যতক্ষণ না নিজের ইচ্ছেয় ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিন কষ্ট হবে, তারপর দেখবেন এক নতুন জীবন লাভ করেছেন। আমি একজনকে জানি, তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত মদ ছাড়া কিছু পান করেননি। সেই বয়সে তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে মদ্যপান ছেড়ে দেন এবং আজও তিনি সুন্দরভাবে বেঁচে আছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৮৫।

প্রশ্ন ২ : আমার পায়ের গোড়ালীতে ফুলোমত এক জিনিসের জন্য চলার সময়ে বিশেষ অসুবিধা হয়। লেংচে চলতে হয়। দু' তিনবার কাটানো হয়েছে, কোন উপকার হয় নি। এর প্রতিকার কি?

উত্তর : চিঠি পড়ে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া করে কোন চিকিৎসকের মত নিয়ে প্রশ্নটি পাঠাবেন, অথবা কোন হাসপাতালের আউটডোরে দেখিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নেবেন।

● শ্রীরামকৃষ্ণ বসাক, কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর—

প্রশ্ন : আমার বাম হাতের মধ্য আঙ্গুল হইতে কড়ে আঙ্গুল এই তিনটি আঙ্গুল তিন বৎসর হইতে অবশের মত হইয়াছে। কোন জিনিষ স্পর্শ করিলে কিছুই বুঝিতে পারি না আর ডান হাতের মাসেলে ডিম্ব আকৃতি একটি দাগ হইয়াছে, কিছুতেই সারে না।

উত্তর : আপনি আর দেরি না করে কোন বড় হাসপাতালে দেখিয়ে চিকিৎসা করান। দেরি হলে আরও কষ্ট পাবেন।

● শ্রীঅরুণকুমার মুখার্জি, হালদারপাড়া রোড, বজবজ—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর ২ চামচ করে খাঁটি মধু একনাগাড়ে ছ' মাস খাবেন।

● শ্রীমুরারীমোহন বসু, গোবরডাঙ্গা, খাঁটুরা, ২৪ পরগণা—

আপনি নিয়মিত দুবেলা ভাত খাবার পর Pulmocod (Plain) চা চামচের ২ চামচ করে এক মাস খাবেন।

● শ্রী পি এন রায়, বড়গোলাই রেলওয়ে স্টেশন, আপার আসাম—

প্রশ্ন ১ : অনেকদিন ধরে অম্লরোগে ভুগছি—

উত্তর : আপনি নিয়মিতভাবে দুবেলা ভাত খাবার পর একগ্লাস করে গরুর দুধ খাবেন। দুধ-ভাতও খেতে পারেন।

প্রশ্ন ২ : ঘাড়ের কাছে একটা শুকনো ঘা হয়েছে—

উত্তর : ক্যাম্বিসান্ মলম দিনে দুবার করে জায়গাটিতে ঘষবেন।

● শ্রীঅহীন্দ্রলাল পাল, শোভাবাজার স্ট্রীট, কলি-৫—

পুরনো হাঁপানি রোগ নিরাময় করার কোন বিজ্ঞানসম্মত অ্যালোপ্যাথ ওষুধ জানা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর উপসর্গ কমিয়ে ফেলা হয়।

● শ্রীঅশোক ঘোষ, পানিহাটী—

প্রশ্ন ছাপাতে নিষেধ করেছেন, তাই ছাপলাম না, কিন্তু যা নিয়ে ভয় পাচ্ছেন, তা মোটেই রোগ নয়। ও উপসর্গ একেবারে স্বাভাবিক এবং প্রত্যেকের হয়। আপনার কোন ভয় নেই। বিবাহে কোন বাধা নেই।

● শ্রীঅমলেন্দু মিত্র, পো: বক্স নং ৯১৭০, মোম্বাসা, কেনিয়া, শ্রাঃ নং ৫৫১০৪—

প্রশ্ন ১ : আমার ভাইপোর ভাল করে পায়খানা হয় না। খুব কড়া, এমন কি পায়খানা করার সময় কষ্ট হয়। বয়স সাড়ে চার বছর।

উত্তর—আপনি ওকে প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে বেশি করে শাক খেতে দেবেন, দেখবেন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ২ : আমার স্ত্রীর পায়ের গোড়ালি বিশেষ করে বছরের সকল সময়েই ফাটে। ওষুধ থাকলে জানাবেন।

উত্তর : ওঁকে নিয়মিত কডলিভার অয়েল মালিশ করতে বলবেন আর মালটিভিটামিন বড়ি অথবা তরল খেতে দেবেন।

সঙ্গের চিঠিটি সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

● শ্রী দে মিশ্র, পিপলা, মালদহ—

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই কোন ভয় নেই। ছোট ক্রিমির চিকিৎসা করান, দেখবেন শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ২ : আমার গলার চামড়া ফাটিয়া যায়। তখন মা চুন লাগাইয়া দেন। বর্তমানে স্থানটি উঁচু হইয়া আছে। দাড়ি কামাইতে যন্ত্রণা হয়।

উত্তর : একে Keloid বলে। অপারেশন ছাড়া এ নির্মূল হওয়া মুস্কিল।

● শ্রী এ চট্টোপাধ্যায়, বিরাটি, দাশনগর রোড, কলি-৫১—

প্রশ্ন ১ : আমার মাথায় প্রচুর খুস্কি। ইহা দূর করিবার উপায় কি?

উত্তর : আপনি সপ্তাহে দুবার শ্যাম্পু করবেন। স্নানের পর Pragmata মলম মাথায় ঘষবেন। মাথার তেল বদলাবেন না। একই তেল মাখবেন। পুরনো চিরুণী ব্যবহার করবেন না। শুকনো গামছা অথবা তোয়ালে ছাড়া মাথা মুছবেন না। দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে প্যালাডেক (পার্ক ডেভিস) খাবেন অন্তত তিনমাস।

দু নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাই নিয়মিত চিকিৎসা করলে সেরে যাবেন। তারপর সাবধানে থাকতে হবে, কারণ অতি সহজেই আমাশয় হয়।

● শ্রীনির্মল তালুকদার, পর্বতপুর, লখিমপুর, আসাম—

প্রশ্ন ১ : গত দু বছর আমার সারা মুখে একপ্রকার সাগুদানার মত ছোট ছোট গোটা হয়েছিল। বর্তমানে গোটাগুলি তত নাই। কিন্তু সমস্ত মুখমণ্ডল কালো দাগে ভরে গেছে এবং খসখসে হয়ে গেছে।

উত্তর : আপনি নিয়মিতভাবে গ্লিসারিন এবং কডলিভার অয়েল সমান পরিমাণে নিয়ে দুবেলা মুখে মাখবেন। অন্তত চারমাস।

প্রশ্ন ২ : আমার বাবার বয়স ৬০-এর কাছাকাছি। প্রায়ই বুকে ব্যথা বলেন।

উত্তর : এ বয়সে বুকের ব্যথা উড়িয়ে দেবার মত নয়। আপনি স্থানীয় চিকিৎসককে দিয়ে একবার দেখিয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করুন।

● শ্রীমদন মহাপাত্র, শ্যামপুর, সেতুনা রোড, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন ১ : প্রত্যহ চারঘণ্টা ঘুমাইলে দেহের কোন ক্ষতি হয় কি?

উত্তর : দেহের বিশ্রাম কম হয়। অন্ততপক্ষে ছ'ঘণ্টা ঘুমোতে হয়।

প্রশ্ন ২ : গণিত শাস্ত্রটি আমি বিশেষ আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না। কি ভাবে পড়াশুনা করিলে গণিত শাস্ত্রটি ভালভাবে আয়ত্ত করিতে পারিব?

উত্তর : অঙ্ক মোটেই শক্ত নয়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী অঙ্ক ভুল করেন অন্যমনস্কতার জন্যে। আপনি রোজ একঘণ্টা করে অঙ্ক করুন। যে অঙ্কগুলো প্রশ্নমালার আগে করে দেওয়া আছে, সেগুলো করলেই দেখতে পাবেন, সব অঙ্কই সোজা লাগছে।

● শ্রীদুলালচন্দ্র সাহা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান—

প্রশ্ন ১ : গেঞ্জী অথবা জামা পরে ঘুমান কি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর?

উত্তর : আঁটসাঁট জামা বা গেঞ্জি পরে শুলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধে হয়। তা ছাড়া ঘামে ভিজে সেই ঘাম বুকে বসে অসুখ করতে পারে। খুব ঢিলে পাতলা জামা পরলে কোন ক্ষতি হয় না।

প্রশ্ন ২ : কারও ঘামাচি হয়, কারও হয় না, এর কারণ কি?

উত্তর : ঘামাচি সাধারণত হয় ভ্যাপসা গরমের জন্য। বেশি গরমে যখন গায়ে বাতাস লাগে না, তখন ঘামের জল গরম হয়ে যায়। গরম জল গায়ে পড়লে যেমন ফোস্কা পড়ে, তেমনি গরম ঘামের জল চামড়ায় লেগে ক্ষুদে ক্ষুদে ফোস্কা হয়। যার চামড়া এই গরম সহ্য করতে পারে, তার ঘামাচি হয় না, যার সহ্য হয় না, তার ঘামাচি হয়।

● শ্রীবিভাসকুমার ঘোষ, মাগুলাই, হুগলী—

প্রশ্ন ১ : আমি কিছুদিন ধরিয়া আমার পেটের জন্য ভুগিতেছি। রোজই আমার পেটের যন্ত্রণা হয় এবং আমি যা কিছু খাই হজম হয় না।

উত্তর : আপনি রোজ দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে

ডায়াপেপসিন (ইউনিয়ন ড্রাগ) অথবা ডিজিপেপ্‌স (টি সি এফ) খাবেন, অন্তত তিনমাস ধরে।

প্রশ্ন ২---আমার চোখ প্রায় সব-সময় লাল হইয়া থাকে এবং কিছুদিন অন্তর চোখের নীচের পাতায় আঞ্জুনি হইয়া থাকে।

উত্তর: বারবার আঞ্জুনি এবং চোখ লাল চোখের পাওয়ার বদলে গেলে হয়। আপনি কোন চোখের চিকিৎসককে দেখিয়ে নিন।

● পরভিন কুমার, কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২---

দুই প্রশ্নের উত্তরে বলছি, আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর পালুমোকড্‌ ওষুধ ২ চামচ করে খাবেন।

● শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস কৈবর্ত্ত, উলাড়া, রসুলপুর, বর্ধমান---

(২টি কুপন আছে)

১ নং প্রশ্নের উত্তর: আপনার বন্ধু ভাল আছেন শুনে খুসি হলুম। ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। আপনাদের সাহায্য করার জন্যেই এই বিভাগ।

প্রশ্ন: আপনি বলিয়াছেন, খাওয়া নিয়মিত ও ব্যায়াম নিয়মিত করিতে হইবে, কিন্তু আমাকে চাষের কাজ করিতে হয়---এই চাষের সময় আমি একটু ব্যায়াম কম ও তাহার পরে একটু বেশি করি, ইহাতে কি ক্ষতি হইবে?

উত্তর: চাষের কাজ এমনিতেই শ্রমসাপেক্ষ, তাই আর আলাদা ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই। সকালবেলায় পেটভরে ভাত খেয়ে মাঠে চলে যাবেন, চাষের জন্য, দুপুরে হাল্কা কিছু খাবেন রাতে আবার পেটভরে খাবেন, দেখবেন শরীর ভাল থাকছে।

প্রশ্ন ৩: বর্তমানে আমার একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ডাক্তার তিনমাস বসিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনমাস পরে ব্যায়াম চলিবে কি---সামনে চাষ আসিতেছে। সেইজন্য কিছু হাঁটিতে হইবে---ইহাতে ব্যায়াম চলিবে কি না জানাইবেন।

উত্তর: ব্যায়াম করবার প্রয়োজন নেই। যে ডাক্তারবাবু পায়ের চিকিৎসা করছেন, তিনি পায়ের অবস্থা দেখে বলে দেবেন, কি করতে হবে।

প্রশ্ন ৪: ডাক্তারবাবু, আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আপনার কুপনের অপর পিঠে যেন কোন গল্প বা কবিতা না থাকে।

উত্তর---আপনার হয়ে আমি মাননীয় সম্পাদকের কাছে আবেদন জানালাম, কারণ আরও অনেকে এই বিষয়ে অনুরোধ করেছেন।

● এস কে জি, বড়বেলুন, বর্ধমান---

আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই, অ্যামিক্লিন্‌ বড়ি এবেলা দুটো, ওবেলা দুটো করে খাবেন দশদিন।

●শ্রীঅশেষ রায়, মুর্শিদাবাদ---

প্রশ্ন: আমার লিভার ফাংশন খুব খারাপ। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ অনিয়ম না করলেও পেটের গোলমাল কমে না। পায়খানা পরিষ্কার হয় না। প্রায়ই বদহজম হয়।

উত্তর: আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে ডায়াপেপসিন (ইউনিয়ন ড্রাগ) অথবা সায়োপেপ্লস এনজাইমস (অ্যালবার্ট ডেভিড) ওষুধ খাবেন একনাগাড়ে দু মাস ধরে।

●শ্রীবুলবুল ভট্টাচার্য, বলরাম দে স্ট্রীট, কলি-৬---

আপনি নিয়মিত ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে, বি-নিউ-রোক্স (স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্‌) খাবেন অন্তত তিনমাস। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না; এ বয়সে ও চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে।

●শ্রীসুকুমার শাল, পালগলি, চুঁচুড়া, হুগলী---

আপনি দুমাস খাবার পর মালটি-ভিটামিন বড়ি সেবন করুন।

●রকেট (বহুবাজার)---

আপনার প্রশ্ন দুটি ছাপাতে পারলাম না। আপনি প্রশ্ন পাঠিয়ে যখন লজ্জায় নাম দিতে পারেন নি তখন আমি কোন লজ্জায় ছাপাই বলুন তো? যাই হোক, ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

●কাজী আনওয়ার আলী, আর বি ঘোষ রোড, বর্ধমান---

আপনার প্রশ্ন পড়লাম। আপনি সকালবেলায় ১টি এবং সন্ধ্যাবেলায় ১টি করে নেভ্রোভিটামিন ৪ (বয়স্কদের জন্য) বড়ি খাবেন একমাস।

●শ, প, শান্তিপুর, নদীয়া---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে সায়োপেপ্লস লাইসিন (অ্যালবার্ট ডেভিড) খাবেন দু মাস ধরে। দেখবেন সব উপসর্গ কমে গেছে।

●অরুণ (ছদ্মনাম), কলি ৩৫---

আপনার কোন ভাবনা নেই; ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনার স্ত্রীর মতে মত দেবেন। আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের দু চামচ করে মেটাটোন (পার্ক ডেভিস) খাবেন একমাস।

●শ্রীবিমল---(পুরো নাম ও ঠিকানা নেই)---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে বি-নিউ-রোক্স্‌ (স্ট্যাণ্ডার্ড) একমাস খাবেন।

●শ্রীনীলমণি মুখার্জি, শিবপুর, হাওড়া---

পাকা চুল ঠেকিয়ে রাখার নির্ধারিত কোন ওষুধ নেই, তবে দেখা গেছে, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গ্রহণ করলে চুল পাকার পরিমাণ কমে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই গৃহীর জন্য সঙ্গম ও সহযোগ প্রয়োজন, তবে মাত্রাতিরিক্ত যৌন সম্পর্ক অথবা যৌনচিন্তা শরীরকে নষ্ট করে দেয়। গৃহীর পক্ষে অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়। ব্যায়ামও নয়, যৌনাবেগও নয়।

●এম এ ওহাব, নাজরা, ডায়মণ্ড-হারবার---

আপনাকে চিকিৎসক যে ওষুধ দিয়েছেন, তাই ব্যবহার করে দেখুন; মনে হয় ওতেই কমে যাবে।

● সু মু, মেমারী, বর্ধমান—

প্রশ্নঃ আমার বিশেষ অনুরোধ শুধু, জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ির বিষয় মাসিক বসুমতীতে বিস্তারিত আলোচনা করেন, তাহলে আমাদের মত অনেক ব্যক্তির উপকার হবে, কারণ আমরা মফস্বলবাসী। আমরা আপনাদের সাহায্য ছাড়া অন্য কোন সুযোগ পাই না।

উত্তর : প্রশ্নটি খুবই প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী, সেইজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বিস্তারিত আলোচনা করলে, আলোচনা একটি প্রবন্ধের আকার ধারণ করবে, তাই সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলছি—

১। যে-কোন ভাল কোম্পানীর বড়ি বেছে নিতে পারেন। সবগুলোই একই কাজ করে।

২। যাঁদের জরায়ু এবং স্তনে ক্যানসার আছে, অথবা যকৃতের কঠিন রোগে ভুগছেন, তাঁদের এ জাতীয় বড়ি খাওয়া উচিত নয়।

৩। যেদিন মাসিক সুরু হবে, সেদিন এক ধরে পাঁচ দিনের দিন থেকে একুশ দিন প্রত্যহ একই সময়ে এই বড়ি খাবেন।

৪। সাধারণত রাতে শোবার সময় খেলে ভুলে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। যদি রাতে ভুলে যান, পরের দিন সকালে অতি অবশ্য খেতে হবে। রাতে যেমন খাচ্ছিলেন তেমনি আবার খেয়ে যাবেন।

৫। একুশ দিন খাওয়া হয়ে গেলে প্যাকেটটি শেষ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী মাসিকের জন্য অপেক্ষা করবেন। মাসিক যেদিন সুরু হবে সেদিনকে এক ধরে আবার পাঁচ দিনের দিন থেকে সুরু করবেন।

৬। সাধারণত যেদিন বড়ি খাওয়া শেষ হয় তার তিন থেকে পাঁচ দিনের ভেতর মাসিক সুরু হয়। যদি না হয়, সাত দিনের দিন থেকে আবার বড়ি খাওয়া আরম্ভ করতে হয়। কেন মাসিক বন্ধ হয়েছে, সে কারণ চিকিৎসক নির্ধারণ করে দেবেন। সে ক'দিন বড়ি খাওয়া বন্ধ করবেন না।

৭। শিশু যদি মায়ের দুধ পান করে, তাহলে এই বড়ি চিকিৎসকের মতামত না নিয়ে খাবেন না।

৮। প্রতিমাসে এই বড়ি খেতে হবে। যে মাসে খাওয়া বন্ধ করে দেবেন, সেই মাসে অথবা তার পরের মাসে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

৯। বড়ি খেতে খেতে যদি রক্তস্রাব হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। তিনি আপনাকে যথাযথ নির্দেশ দেবেন।

১০। এখনও পর্যন্ত এই বড়ি খাওয়ার কোন কুফল দেখা যায়নি।

সাধারণত উপরোক্ত নিয়মগুলি পালন করলে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়ার সুফল পাওয়া যায়। বাজারে বহু কোম্পানীর বড়ি পাওয়া যায়, কোন বড়ি ব্যবহার করবেন, সে পরামর্শ আপনাকে আপনার চিকিৎসক অথবা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র দেবেন।

● শ্রীঅসীমকুমার ভট্টাচার্য, রাণী-পার্ক, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা—

প্রশ্ন : আমার চোখে বছরে ৬।৭বার করে আঞ্জুনি হয়।

উত্তর : আপনার শরীরে ভিটামিনের অভাব, বিশেষত ভিটামিন এ। আপনি নিয়মিতভাবে ভিটামিন গ্রহণ করুন, দেখবেন ভাল হবে; কারণ অনেক সময়ে খুব অল্প পরিমাণে যক্ষ্মা জাতীয় জীবাণুর অবস্থিতিতে বার বার আঞ্জুনি হয়।

● শ্রীসৌম্য রায়, সিন্ধ্রি, ধানবাদ—

প্রশ্ন ১ : আমি ফুটবল খেলি। খেলার পর আমার দুই হাঁটুর নীচের লম্বা হাড়টায় ব্যথা করে। এটা কি জন্যে হয় আর এর প্রতিকার কি?

উত্তর : অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে মাংসপেশীর মধ্যে গ্লুকোজ খরচ হয়ে গিয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড নামক এক রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড মাংসপেশীর মধ্যে জমা থাকলে পা কামড়ায় ও ব্যথা করে। এর প্রতিকার হিসেবে প্রত্যহ খেলার পর গরম তেল দিয়ে পা মালিশ করবেন এবং রোজ সকালে একগ্লাস করে মিশ্রীর সরবৎ খাবেন।

প্রশ্ন ২ : রাত্রে আমার কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। সেইজন্য চোখের কোলে কালি জমছে।

উত্তর : আপনি রোজ রাতে শোবার পর কোন চিন্তা না করে ঘুমোবার চিন্তা করবেন। ঘুমনো একরকমের অভ্যাস। অভ্যাস করলেই দেখবেন আপনা থেকেই ঘুম আসছে।

● শ্রীকল্লোলকুমার ঘোষ, রামতনু বোস লেন, কলিকাতা—

প্রশ্ন ১ : আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আমি যে ব্যায়াম করি, তাতে কতটা প্রোটিনমূলক খাদ্য খাওয়া উচিত। আদৌ উচিত কি না।

উত্তর : আপনার যে রোগ হয়েছিল তাতে প্রোটিন খাওয়া দরকার তবে সহজপাচ্য প্রোটিন খাবেন, যাতে প্রেসার না বেড়ে যায়, যথা ছানা—

বাকি প্রশ্নগুলির উত্তরে বলি, সাবধানে থাকবেন, অযথা ঠাণ্ডা লাগাবেন না। ঠাণ্ডা লাগলেই ওই রোগ আবার বেড়ে যাবে। অতিরিক্ত মাছ-মাংস খাবেন না; নুন কম খাবেন। কমলালেবুর রস প্রত্যহ নিয়মিত খাবেন। বেশি রাত জাগবেন না। কোন রুগ্ন লোকের সেবা-শুশ্রূষা করবেন না এবং কোথাও অচেনা জায়গায় অপরিষ্কার খাবার খাবেন না। মাঝে মাঝে মূত্র পরীক্ষা করে দেখে নেবেন, দোষ আছে কি না।

● শ্রীঘনশ্যাম চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান, কালনা রোড—

আপনার কন্যাকে Abdec Drops সকালে তিন ফোঁটা বিকেলে তিন ফোঁটা দেবেন। একমাস পরে চার ফোঁটা, তারপর পাঁচ ফোঁটা। ছ ফোঁটা অবধি বাড়িয়ে খাওয়াবেন; একবছর ধরে।

●শ্রীহরিদাস দে, দাসনগর, হাওড়া—

আপনার সব প্রশ্নের উত্তরে আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে নারভিগর উইথ ভিটামিনস্ অ্যাণ্ড ফরমেট্স্ খাবেন।

●শ্রী বি কে দাস, ছোটবাজার, মেদিনীপুর—

আপনি কালবিলম্ব না করে ডাক্তার দেখান এবং তিনি যতদিন পর্যন্ত চিকিৎসা করতে চান, বিনা-দ্বিধায় করবেন।

●শ্রীঅজিতকুমার গুছাইৎ, চিন্তিপুর ভেড়ি, মেদিনীপুর—

আপনি কোন ভাল মাজন আঙুল দিয়ে মাজবেন। ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। ভিটামিন সি খাবেন। বাকি চিকিৎসা ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন।

●শ্রীঅশোককুমার পাল, মেনা, কল্যাণগড়, ২৪ পরগণা—

আপনি প্রতিদিন দুবেলা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাবেন।

●শ্রীদুলালচন্দ্র মণ্ডল, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ—

আপনার উপসর্গগুলি দৈহিক দুর্বলতার জন্য ঘটছে। কোন ভয় নেই। দুবেলা আপনি কোন ভাল টনিক খান, দেখবেন উপসর্গগুলি চলে গেছে।

মহিলা মহল

॥ পাঠকরা পড়বেন না ॥

শ্রীমতী কল্যাণী দে, দাসনগর, কলি-৪৫—

প্রশ্ন: মুখে একটা দুটো করে কালো দাগ বেরিয়ে সারা মুখ ভরে গেছে।

উত্তর: এ ধরণের দাগ সাধারণত লিভারের দুর্বলতার জন্য হয়। আপনি লিভার একস্ট্রাক্ট ইনজেকশান নিন, দেখবেন দাগ অনেক কমে যাচ্ছে।

●অনামিকা (নাম ও প্রশ্ন প্রকাশে অনিচ্ছুক) বৈদ্যবাটী, হুগলী—

আপনি যে উপসর্গের কথা বলেছেন, তা কেন হয়েছে, পরীক্ষা না করে সঠিক বলা সম্ভব নয়। আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন দেরি না করে।

●পু চ (পুরো নাম ছাপাতে অনিচ্ছুক), পাটনা-১।

আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের দু চামচ করে অ্যামাই-নোজাইম খাবেন একমাস। আপনার ছেলেকে এগ্ হোয়াইট বড়ি খেতে দেবেন। তা ছাড়া পড়াশুনায় অভ্যাস করাতে হয়। যাতে মনে রাখতে পারে সে চেষ্টা করতে হয়। কিভাবে পড়লে পড়া মনে থাকে, সে বিষয়ে এর পূর্বে মাসিক বসুমতীতে আলোচনা করা হয়েছে।

●শ্রীমতী সবিতা মৈত্র, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক)—

আপনার চিঠি পড়লাম। একটা কথা মনে রাখতে হবে; পৃথিবীতে বাঁচতে হলে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা আসবে; আসতেই হবে। সেই ঝড়কে যে যত শান্তভাবে গ্রহণ করবে, সেই তত সার্থক পুরুষ। ও সব ব্যাপারে যত উতলা হবেন, তত মনে কষ্ট পাবেন। যা ঘটছে, নিজের ভাগ্য বলে ধরে নেবেন। আপনার ভাই আপনাকে কটুকথা বলেছেন বলে মন খারাপ করছেন, আর আমি জানি মেয়ের

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সংগে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

নাম—

ঠিকানা—

জমানো টাকায় বাবা বাড়ি করে উঠে গেলেন, মেয়ের গলা দিয়ে রক্ত পড়ে বলে তাঁকে পরিত্যাগ করে গেলেন।

● নাম নেই, কলিকাতা-৫০---

আপনার বয়স ৮০।৮২ বছর লিখছেন। এ বয়সে আন্দাজে ওষুধ খাবেন না। চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

● শ্রীমতী দীপ্তি ব্যানার্জি, হালতু, পূর্বাচল, ২৪ পরগণা---

আপনার বন্ধুকে ডাক্তার দেখান। হাঁপানি রোগের ওষুধ আন্দাজে খাবেন না। আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের দু চামচ করে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাবেন দু মাস ধরে।

● শ্রীমতী রূপা দেবী (ছদ্মনাম)---

আপনি নিজের নাম দিতে চান নি তাই দিলাম না, কিন্তু চিঠিটা পুরোপুরি ছাপালাম, কারণ আপনার মত অনেকেই এই উপসর্গে ভুগছেন, কিন্তু লজ্জায় কাউকে বলতে পারেন না। এ কোন রোগ নয়। অনেকের মাসিক কিছু পরে শুরু হয়, তাকে বলা হয় delayed puberty. এ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। এমন কি দেখা গেছে প্রথম মাসিক ১৬।১৭ বছরেও শুরু হয়। কেবল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন আর ভাল খাওয়া-দাওয়া করবেন, দেখবেন উপসর্গ চলে গেছে।

---আমার বয়স ১৩।১৪, ক্লাশ টেন-এ পড়ি। স্বাস্থ্য ভাল। আমার এখনও Mense হয় নি, এইজন্য বাড়ীর লোকেরা খুব চিন্তিত। আমার বয়সের চেয়ে যারা ছোট অর্থাৎ ৪।৫ মাসের তাদের সবার Mense হয়ে গেছে, সেইজন্য আমার বাড়ীর লোকেরা বিশেষ চিন্তিত---'

এ উপসর্গ সাধারণত delayed pubertyতে দেখা দেয়। এ নিয়ে আরও একবছর কিছু ভাবতে হবে না, তারপরও যদি শুরু না হয়, তখন চিকিৎসককে দেখাবেন। আমি বলছি কোন ভয় নেই। ভাবতে হবে না।

● শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ক্রাইপার রোড, কোন্নগর---

আপনার দ্বিতীয় সমস্যার জন্য প্রথম সমস্যার উদ্ভব। আপনি কোন চিকিৎসক দেখিয়ে দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান করে নিন। তাহলে দেখবেন আপনা থেকেই প্রথম সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এ রোগের নির্দেশ পত্রে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বললাম।

● শ্রীমতী সুমিতা পাল, আগর-ওয়ালা কলোনী, ধানবাদ---

আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের দু চামচ করে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খান দু' মাস ধরে।

● 'র, ব,' কলি-৩১---

আপনি খুব সামান্য ব্যাপারে উতলা হয়ে পড়েছেন। আপনি ও নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। কোন হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করবেন না বরং Dinoestrol Cream সকালে এবং বিকেলে লাগাতে পারেন। মাস-খানেক পর দেখবেন, উপসর্গ অনেক কমে গেছে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার কাজকর্ম করুন এবং যদি কোনদিন কোন অসুবিধা হয়, আমি দায়ী রইলাম।

● শ্রীমতী চামেলী দত্তচৌধুরী, (ঠিকানা নেই)---

আপনি দুবেলা ভাতখাবার পর চা চামচের দু চামচ করে ভিটামিন বি কমপেক্স খাবেন। একমাস।

● ইউ, বি, হাওড়া-৪---

প্রশ্ন : আমার বয়স ১৯ বৎসর। বিবাহ হয় নাই। আমার মাসিক হইবার সময় পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। আমি সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। এই যন্ত্রণা চারদিন থাকে তাহার পর পেটে একটা আড়ষ্ট যন্ত্রণা থাকে।

উত্তর : আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে বেশি করে শাক খাবেন। দুবেলা দু চামচ করে (চা-চামচ) খাঁটি মধু খাবেন। মাসিকের একদিন আগে থেকে সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি করে নিয়ো-স্প্যাজমিণ্ডন বড়ি খাবেন, যে ক'দিন মাসিক চলে, সেই ক'দিন। এই চিকিৎসা তিনমাস চলবে।

● কাজল ঘোষ (ছদ্মনাম), সাঁতরাগাছি, হাওড়া---

আপনি সপ্তাহে দুদিন শ্যাম্পু করবেন। বাকি যা করেন করবেন।

মায়াবিনী

কান্তা দাশ

কত দিন দেখিনি তোমায়
ওগো মায়া, মায়াবিনী মেয়ে,
স্বপ্ন জড়ানো মোর আঁখি
ব্যথাতে শুধু আছে ছেয়ে।

ওই ব্যথার কাঁটাগুলো আজকে
স্বপ্নের মুছে সব তাজকে
নিজেকে হারিয়ে শুধু যায়,
বল না গো, মায়াবিনী কন্যা
হতাশার এনে শুধু বন্যা
তোমারে কেন কাছে চায়?

স্বপন ছড়ানো তব আঁখি
চুপিচুপি গেল কেন ডাকি
আমারে ব্যথা দিয়ে শুধু
বল না গো, বল তুমি বল না
করবে আর কত ছলনা
হৃদয়ে জ্বালিয়ে আজ ধূ-ধূ!
তাই বলি,
ওগো মায়া, মায়াবিনী মেয়ে
তারাদীপে মন আকাশ ছেয়ে
চুপিচুপি কাছে আজ এসো
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে,
নতুন লগন নিয়ে
মোরে ভালোবেসো......

।। ভাদ্র মাসের ফলাফল ।।

এবারের ভাদ্র, রাষ্ট্রক্ষেত্রে শুভ লক্ষণের আভাস দিচ্ছে না। শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে (৭ই আগস্ট) যে সময় আরম্ভ হয়েছে, তার জের এ বছরটাকেই গোলমেলে করে তোলার আশঙ্কা। ভাদ্রের ১৮ তারিখ (৩রা সেপ্টেম্বর) থেকে আবহাওয়া আরো ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা শঙ্কাতুর করে তুলবে মানুষকে। যুব বা ছাত্র-আন্দোলন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করবে। কায়েমী ব্যবস্থার উপর শনি আঘাত হানছে। ২৬শে জুলাই থেকে মঙ্গল এসেছে কর্কটে, এর ফলও অশুভকর। এখন থেকে বর্ষ তিনেকের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সূচনা করেছে এই শনি। যাদের জন্ম ভাদ্রমাসে, সিংহ রাশিতে কিংবা সিংহ লগ্নে, তাদের বর্তমান জন্মবর্ষ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ভাদ্রের জাতক সাধারণত উদার হলেও তাদের আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত বেশী। আবার পরের উপকার করলেও তার মধ্যে থাকে রাজসিকতা। নিজে যে বড় একথা তারা ভুলতে পারে না। এবং নিজেকে বড়ো করার জন্য অন্য লোকের উপকারও এরা করে, কিন্তু নিজের স্বার্থ বজায় রেখে এবং যাতে যাদের উপকার করলেন তাদের উপর ভর করে উঁচু সিঁড়ি ভাঙবার আশা রেখে। এরা পরিবারবৎসল হয়ে থাকে। ছেলেমেয়ের প্রতি অতিরিক্ত মমতা থাকে। কিন্তু সন্তান থেকে এদের অশান্তি আসে। বিশেষ করে পুত্রসন্তান তাঁদের দুঃখের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যাক্ এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের শুভাশুভ আভাস দিচ্ছি :—

মেষ : যতই আয় হোক, খরচপত্রের চাহিদা মেটানো হবে কঠিন। তা নিয়ে মনোমালিন্য এবং অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য করবে উৎপাত ; যে-কোনো ধরণের পেটের পীড়া ও চোখের গোলমাল উত্যক্ত করতে পারে। ছেলেদের কারো আচরণ অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। দূরে কোথাও যাবার যোগাযোগ বা আমন্ত্রণ আসতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজনে আশাপ্রদ নয়। কেনা-বেচার ব্যবসায়ীদের বারবার নিরাশ হতে হবে। লোভের বশে অন্য বছরের মতো ঘটক বাড়িয়ে গতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা। নতুন কোনো পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্যোগ দেখা যায়। বাড়িঘর কিংবা জায়গা-জমির ব্যাপার উত্যক্ত করবে। শিল্পী ও লেখকদের যোগাযোগের দিক থেকে ভাল হলেও কার্য-কারণে সব পণ্ড হতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে অতি-

ভৃগুজাতক

রিক্ত চাপ পড়বে। স্পষ্টবাদিতা শত্রু সৃষ্টি করবে। মহিলাজাতকেরও অনুরূপ ফল। শুধু অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো-দ্রব্য লাভের সম্ভাবনা। মেষ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে দুর্ভাবনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের বাধা। স্বাস্থ্যও উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে।

বৃষ : যে-কোনো কাজই করুন না কেন, এক ধরণের ... উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলতে পারে। সঙ্গী কিংবা যাদের সঙ্গে কাজকারবার তাদের দোষ-ত্রুটি ও আচরণ ক্ষুব্ধ করে তুলবে। উত্তেজনা দমন করে নিজের কাজ করে যাওয়াই এসময়ে যুক্তিযুক্ত। ভাইবোনদের মধ্যে কারো জন্য উদ্বেগ ভোগের আশঙ্কা। ষাটের উপর বয়স হলে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হবেন। অনেক সময় মনে হবে যে, শ্বাস ফেলতে পাচ্ছেন না ; হাঁটতে গেলে পা-ও যেন অসাড় হয়ে আসছে। এরূপ লক্ষণ দেখা দিলে গোড়ায়ই সাবধান হবেন। ব্যবসায়ে আশানুরূপ হবে না। ভবিষ্যতের কালোছায়া একরূপ নৈরাশ্যের সৃষ্টি করতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে উদ্যম আশাপ্রদ। সাধু-সন্ন্যাসী ও মঠ-মন্দিরের ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলে তাতে ক্ষতি হবারই আশঙ্কা। বৃহৎ শিল্প পতিদের দুর্ভাবনার কারণ রয়েছে। মহিলা জাতকের প্রীতির প্রসার, কিন্তু

স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক যোগাযোগ ভাল কিন্তু আসন্ন কোনো ব্যাপার কালো-ছায়ায় দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে।

মিথুন : স্বাধীন প্রোফেশনে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীর কাজে, শিল্পকাজে এবং মৌলিক সৃষ্টির ক্ষমতা যাদের আছে তাদের কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসায়েও আশাপ্রদ। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হবে না। শরীরও করবে উৎপাত। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে হতাশ হবার সম্ভাবনা। ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কারো জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা। চাকুরীক্ষেত্রে আকস্মিক কোনো ব্যাপার বিচলিত করে তুলতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকলে তার ফল অনুকূল হবে না। নিজের সম্বন্ধে অহমিকার উপর আঘাত পড়তে পারে। আকস্মিক কারণে মোটারকমের অর্থব্যয় বা ক্ষতি হতে পারে। হারানোতে ক্ষতি বুঝায়। চলতে গিয়ে পায়ে আঘাত লাগতে পারে। কোনোরূপ স্ফীতি ও বেদনা দেখা দিলে সাবধান। মহিলাজাতকের সাধারণভাবে ভাল হলেও প্রিয়জনের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে ব্যয়-বাহুল্য, আর্থিক দুশ্চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাটের আভাস রয়েছে।

কর্কট : পারিবারিক পরিবেশ দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে। দায়-দায়িত্ব বাড়বে, অথচ আয়ের দিক্ থেকে তেমন আশাপ্রদ নয়। ব্যবসায়ে তা কেনা-বেচার কারবারই হোক আর স্বাধীন বুদ্ধিজীবীর কাজই হোক, দুর্ভাবনা থাকবে। ইঞ্জিনীয়ার ও কন্ট্রাক্টারদের পক্ষে এমাস অত্যন্ত গোলমেলে। বৃহৎ শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের পক্ষে এই শ্রাবণ থেকে বর্ষফল অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে এবং যাদের নিয়ে কাজ কারবার তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করা উচিত। দাম্পত্যক্ষেত্রেও নানাকারণে উৎকণ্ঠার কারণ ঘটতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়লেও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা কম। রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকলে তার ফলও আশানুরূপ হবে না। নতুন প্রার্থীদের চাকুরী হতে পারে। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। সৌহার্দ্যের উপর আঘাত আসবে। মহিলাজাতকের পক্ষেও অনুরূপ ফল। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে চোখের গোলমাল হলেও সামাজিক-ক্ষেত্রে যশোবৃদ্ধি কিন্তু শেষাংশ শত্রুতা-সূচক।

সিংহ : এবার নতুন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবার যোগাযোগ হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির ব্যাপার থেকে দূরে থাকা ভাল। আশ্রিত জন কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য আর্থিক অপচয় ও দায়দায়িত্ব উত্ত্যক্ত করতে পারে। ব্যবসায়ে মনোমত হবে না। বুদ্ধিজীবীর প্রোফেশনে আয় বাড়তে পারে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী আয়ের মাত্রা বাড়বে না। কিশোর কিংবা ত্রিশের উপর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য কোনো কারণে উৎকণ্ঠা ভোগের লক্ষণ রয়েছে। শিল্পী ও লেখকদের পক্ষে সুযোগপ্রদ। কিন্তু তাদেরও উক্ত স্থানীয়দের দ্বারা কুৎসা রটনা হতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নিজে বিরত থাকা উচিত। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। কিন্তু চোখের উৎপাত ও রক্তের চাপের গোলমাল দেখা দিতে পারে। তরুণদের পক্ষে তরুণী অথবা মহিলাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। চাকুরী-ক্ষেত্রে গতানুগতিকভাবে চলবে। মহিলা জাতকের পক্ষে এমাস মানসিক অশান্তিসূচক। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে বৈষয়িক দুর্ভাবনা উত্ত্যক্ত করতে পারে।

কন্যা : এ মাস অনিশ্চয়তাসূচক। একদিকে যোগাযোগের উদ্দীপনা, অপর দিকে আর্থিক সমস্যা এবং পুরনো কাজকারবারের জন্য দুর্ভাবনা উত্ত্যক্ত করতে পারে। বাঁধাধরা আয় যাদের নেই, তাদের পক্ষে এমাস অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে উঠতে পারে। ব্যবসায়ে বা স্বাধীন প্রোফেশনে যা আয় হবে, তার চেয়ে বেশী খরচ বিচলিত করবে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারও মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা আনবে। এরই মাঝে নতুন কোনো কাজে এগিয়ে যাবারও সম্ভাবনা। কারো সহায়তা উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সুফল পাবেন। চলাফেরায় সাবধান। চুক্তির কাজেও বিশেষ বিবেচনা করে চলা উচিত। চাকুরীক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট ও অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে উঠতে না-পারার জন্যও ক্ষতির আশঙ্কা। মহিলাজাতকের মনে দ্বিধা, সংশয় ও সন্দেহ বিশেষ অশান্তি আনতে পারে। নববিবাহিতাদের সাবধান থাকা উচিত। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি কিন্তু স্বাস্থ্য ও আর্থিক ব্যাপার উত্ত্যক্ত করতে পারে।

তুলা : এ মাসে স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ নজর রাখুন। পরিবেশ অনেক সময় বিরক্তি উৎপাদন করবে। আপনার মন্তব্য কিংবা মতামত শত্রু সৃষ্টি করবে এবং বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে তা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। নির্দিষ্ট আয়ের কোনো অংশেও আঘাত পড়তে পারে। কেনাবেচার ব্যবসায়ে নৈরাশ্য এবং আশানুরূপ না হবার সম্ভাবনা। চাকুরীক্ষেত্রে সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধি পাবে সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে সময় তত অনুকূল নয়। কোনো আত্মীয়া কিংবা প্রতিবেশিনী দ্বারা উত্ত্যক্ত হতে পারেন। বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পী-দের কোন ব্যাপারে হতাশ হবার আশঙ্কা। এরই মাঝে নতুন কোনো ব্যাপারে যোগাযোগ উদ্দীপনা বাড়াবে। রাজ-নৈতিক ব্যাপার এড়িয়ে চলা উচিত। নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কোনো ব্যাপারে মধ্যস্থতা করা উচিত হবে না। দূরে কোথাও যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে। মহিলাদের চাকুরীক্ষেত্রে শুভ-যোগ কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে অশান্তি হতে পারে। তুলা লগ্নে জন্ম হলে

কর্ম্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট ও শারীরিক কারণে কাজ-কর্মে বাধা আসতে পারে। অবশ্য আকস্মিক লাভের সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : শরীরের উপর চাপ পড়তে পারে। আর আত্মজ-আত্মজাদের জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ ঘটতে পারে। কর্ম্মক্ষেত্রে তা চাকুরীই হোক আর স্বাধীন প্রোফেশনই হোক মাসের মধ্যভাগ একটু ঝঞ্ঝাটসূচক। আর্থিক ব্যাপার আশাপ্রদ বলা চলে না। ব্যবসায়ে বেশ বেগ পাবার সম্ভাবনা। উকীল বা আইনজীবীদের কিছু কিছু সুযোগ আসবে। সরকারী সূত্রে লাভবান ও সম্মানিত হবারও সম্ভাবনা আছে। কোনো অধীনস্থ ব্যক্তি কিংবা মক্কেলের দ্বারা উত্যক্ত হতে পারেন। অযথা অবমানাকরভাবে অর্থক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। কোনো বিশিষ্ট বন্ধুও গোলমাল বাধাতে পারে। পত্নীর শরীর খারাপ হলে বিশেষ সাবধান হবেন। ছেলেমেয়েদের কারো জন্য উত্যক্ত হতে পারেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে পারে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী সম্বন্ধে সাবধান। শিক্ষাব্রতী ও লেখকদের নতুন সম্মানলাভের সম্ভাবনা। মহিলা-জাতকের কোনো সূত্রে লাভের যোগ দেখা যায়। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে শরীর ও মনের উপর চাপ পড়বে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত আছে। বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট উত্যক্ত করতে পারে।

ধনু : মানসিক উত্তেজনার কারণ ঘটতে পারে। নিজে সংযত হয়ে চলা উচিত। বিচলিত হলে চলবে না। সব সময়েই বোঝাপড়া ও সমঝোতার মনোভাব নিয়ে চলা উচিত। অযথা আত্মমর্যাদাবোধে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পারেন। পুরনো বন্ধু কিংবা অংশীদারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় উপকার হতে পারে। এবং বিশেষ কোনো বিপন্ন বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের উপকারে লাগতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখুন। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট কিছু কিছু উৎপাত করবে। কারো জন্য আর্থিক অপচয়ও ঘটতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা উচিত। ব্যবসায়ে নতুন উদ্যম এবং বিশেষ কোনো পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। মাসের শেষাংশে সকল কাজেই সাবধান। বিয়োগ অথবা বিচ্ছেদ-ব্যথাও পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। চাকুরীক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে চলা উচিত। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশী সাবধান থাকা উচিত। ধনু লগ্নে জন্ম হলে অর্থের ব্যাপারে মনে আঘাত লাগিতে পারে। পরিকল্পনামত এগিয়ে যাবার পথে বাধা রয়েছে।

মকর : বাঁধাধরা আয় অর্থাৎ চাকুরী কিংবা পেনসন অথবা বৃত্তি-ভাতা যাদের নেই তাদের সমস্যা

আর্থিক ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে উঠতে পারে এমন কি যাদের বাধাধরা আয়ও আছে, তাঁদের ব্যয়ের চাহিদা মেটানো শক্ত হবে। এর জন্য মনোমালিন্য এবং ঝগড়াবিবাদও হতে পারে। উনত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে যাঁদের বয়স তাদের সব ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। পারিবারিক ক্ষেত্রেও অশান্তি ও অবনিবনা দেখা দিতে পারে। আলেয়ার পেছনে হয়ত ঘুরছেন, কিন্তু তাতে ফল হবে না। পরিশ্রমের অনুপাতে অর্থাগম হবে না। লেখকদের চাহিদা বাড়বে; কিন্তু প্রত্যাশিত অর্থলাভে বাধা। সাংবাদিকতা ও প্রচার বিভাগে যাঁরা কাজ করেন অথবা অধ্যাপনায় যারা লিপ্ত আছেন, তাঁদের পক্ষে এখন তিন মাস বড় জটিল হয়ে উঠতে পারে। ব্যবসায়ে গতানুগতিক। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়। তরুণীদের পক্ষে প্রণয়মূলক ব্যাপারে প্রতারিত হবার আশঙ্কা। মকর লগ্নে জন্ম হলে বৈষয়িক গণ্ডগোল ও আর্থিক দুশ্চিন্তা উত্ত্যক্ত করতে পারে। স্বাস্থ্যও খারাপ যাবে।

কুম্ভ ঃ শনি গোচরে শুভ হলেও এখন অত্যন্ত জটিল সময়। শত্রুবৃদ্ধি এবং নিজের লোকের আচরণ উত্ত্যক্ত করবে। ব্যবসায়ে গোড়ার দিকে তেমন আশাপ্রদ নয়। মোটা রকমের অর্থের প্রয়োজন হবে, অথচ তা সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্ভাবনায় পড়তে পারেন। এরই মধ্যে অধীনস্থ লোকের প্রবঞ্চনা এবং কুৎসা রটানো বিচলিত করে তুলতে পারে। স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে ডাক্তারীতে আয় বেশী বাড়বে। জমি বাড়ি কিনবার মতো যোগাযোগও দেখা যায়। কোনো যন্ত্রপাতি কিনতে গিয়ে লাভবান হতে পারেন। আগুন, জন্তু-জানোয়ার ও জলভয় আছে। যতদূর সম্ভব এ সব জিনিষ এড়িয়ে চলুন। মিলিটারী ও এয়ার সার্ভিসে যাঁরা আছেন, তাঁদের উন্নতিপ্রদ লক্ষণ দেখা যায়। সাধারণ-ভাবে চাকুরীক্ষেত্রে শুভ। আত্মীয়দের চক্রান্ত সম্বন্ধে সাবধান। তরুণরা কোনোভাবে নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে পারে। মহিলাজাতকের কোনো সূত্রে লাভের সম্ভাবনা। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

মীন ঃ নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের সুযোগ পাবেন। বিরুদ্ধ দল মাথা তুলে দাঁড়ালেও বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ধর্ম, সাধু-সন্ন্যাসী ও মঠ-মন্দিরের আওতা থেকে দূরে থাকা ভাল; শনি, মঙ্গল ও রাহু এমন অবস্থায় আছে যে, এসব ব্যাপারের যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারেও নির্লিপ্ত থাকা যুক্তিযুক্ত। চাকুরীক্ষেত্রে মেয়াদ বাড়বে। অবশ্য কিছু ঝঞ্ঝাট থাকবে ব্যবসায়ে ঠিক আশাপ্রদ বলা চলে না। লাভের আশায় অতিরিক্ত পণ্য সংগ্রহ করে কিংবা বেশী টাকার ঝুঁকি নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়তে পারেন। লেখকদের পক্ষে সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালক-দের সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। তবে ঠাণ্ডা লাগা বদহজমের উৎপাত সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান। চাকুরে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিতে পারে। বিচলিত না হয়ে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকা উচিত। মীন লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রের দুর্ভাবনা শরীর ও মনের উপর প্রায়ই চাপ দেবে।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীঅরুণ দাশ (লেক গার্ডেন, কলিকাতা)---(১) আরো পড়ুন, (২) এ বছরে হতে পারে। শ্রীপ্রভাত মুখার্জী (কোক্ কলোনী, দুর্গাপুর)---(১) বাধাজনক যোগ রয়েছে। তবু আগামী বছর দেখুন, (২) মঙ্গল ও বিদ্বান হবে। কিন্তু এখন সব বাধা রয়েছে; বিশেষ বিচার করে বিবাহ দেওয়া উচিত। ● জনাব মনসুর নূর ইরশাদ (বানপুর) ---(১) অক্টোবর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকুন, (২) এর পর কিছু ভাল হবে। ● শ্রীদুলালচন্দ্র মণ্ডল (খারো)---(১) মীন রাশি; পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ও বৃশ্চিক লগ্ন, (২) চাকুরী হবে। ●শ্রীরঞ্জিত বিশ্বাস (মহেশ দত্ত লেন, কলিকাতা)---(১) সময় অত্যন্ত প্রতিকূল। অক্টোবরের পর দেখুন। (২) আগামী বছর চেষ্টা করুন। ● শ্রীঅমল বসু (ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা)---(১) নানা বাধার মধ্য দিয়ে যেতে হবে; (২) তিন বছর পর অনেকাংশে ভাল সময় আসবে। ● শ্রীস্বপন ঘোষ (রেল কোয়ার্টার, বামনগাছি)---(১) বাধা, (২) এখন কর্মযোগ আরম্ভ হয়েছে। ব্যবসায়ে তিন বছর সতর্ক থাকা দরকার। ● শ্রীসুশীল ভাদুড়ী (চুঁচুড়া) ---(১) আঠারো মাসের মধ্যে, (২) দেড় বছর দেখুন। ● মিসেস এন বি পাল (কলেজ রোড, হাওড়া) ---প্রতিকার করলেই সব ক্ষেত্রে উপকার হয় না। তবু সাদা মুক্তা চাররতি ধারণীয় সোনার আংটিতে। ● শ্রীরতিকান্ত চক্রবর্তী (বোস পুকুর রোড, কলিকাতা)---(১) মেয়ের ধনু লগ্ন, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ও বৃশ্চিক রাশি। বিপ্রবর্ণ এবং রাক্ষসগণ, (২) ছেলের কন্যালগ্ন, বিশাখানক্ষত্র, তুলা রাশি ও রাক্ষসগণ। ● শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জী (বিদ্যাসাগর এভিনিউ, দুর্গাপুর)---(১) বিরুদ্ধ যোগ রয়েছে, শ্রাবণের মধ্যে না হলে আগামী বছর, (২) পদস্থ ও গুণসম্পন্ন। ● শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত (ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা)---(১) এভাবে পঞ্জিকা দেখে তারিখ ঠিক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, (২) কারবারে দেড় বছর বিশেষ ভাল বলা চলে না. ● শ্রীঅলকানন্দা (কলেজ রোড, হাওড়া)---(১) বিজ্ঞানই ভাল, (২) অষ্টমস্থ চন্দ্র এবং সপ্তমস্থ মঙ্গলের প্রতিকার জন্য মুক্তা চাররতি ও রক্তমুখী প্রবাল আটরতি। সোনার আংটিতে। ● শ্রীমতী হাসিরাশি ব্যানার্জী (নীলগঞ্জ

রোড, বেলঘরিয়া)—মাসিক বসুমতীর নিয়ম অনুযায়ী কুপন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীতারাদাস রায় (অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা)—(১) তিন বছর বিশেষ সাবধান। প্রতিকার গোমেদ আটরতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি। রূপার আংটিতে। (২) তিন বছর বিশেষ সুবিধার নয়। ● শ্রীস কুব (বাঁশবেড়ে)—(১) বর্তমান ইংরেজী বর্ষে, (২) পাঁচরতি সাদামুক্তা সোনার আংটিতে। ● শ্রীহিমাদ্রিশেখর রায় (শশিভূষণ ব্যানার্জী রোড, বড়িষা)—(১) ধনু লগ্ন, রেবতী নক্ষত্র, মীন রাশি। (২) দেড় বছর পর যত্ন ও সাবধানে চললে উচ্চশিক্ষা হবে। ● শ্রী জি এস গাঙ্গুলী (ক্রীক লেন, কলিকাতা)—(১) গ্রহের বাধা, (২) এ স্থলে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। প্রতিকার জন্য মুক্তা চাররতি এবং রক্তমুখী প্রবাল আটরতি। সবই সোনার আংটিতে ধারণ করিয়ে দেখতে পারেন। ● শ্রীঅরুণেশ্বর রায় (বেথুয়াডহরী)—(১) স্বাতী নক্ষত্র, (২) তিন বছর লাগবে। ● শ্রীদামোদর সরকার (বারারী কোলিয়ারী, ধানবাদ)—(১) সম্ভাবনা আছে, (২) মঙ্গল আর চন্দ্রের জন্য রক্তমুখী প্রবাল আট-রতি ও মুক্তা চাররতি ধারণীয়। মুক্তা সোনার আংটিতে। ● শ্রীসঞ্জয় রায় (শ্যামসুন্দর ঘোষ লেন, বালী)—জন্মের তারিখ, সময় ইত্যাদি না দেওয়ায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ● শ্রীশিবদাস সরকার (টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা)—(১) মিলের পক্ষে বাধা; (২) প্রতিকার করলেই যে ফল হবে তা বলা চলে না। তবু নয় মাস দেখুন। ● শ্রীকালীপদ মিত্র (বালিগঞ্জ, কলিকাতা)—(১) হবে; (২) তিন বছর দেখুন। ● শ্রীপর্ণা মিত্র (গরচা ফার্স্ট লেন)—কলিকাতা)—(১) মোটামুটি ভাল; (২) অবস্থা ভাল হবে। ● শ্রীআনন্দ ভট্টাচার্য (বারাসত)—(১) কুম্ভরাশি ও তুলা লগ্ন। ● শ্রীনগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (সাতগাছিয়া)—(১) এখন ঝঞ্ঝাটপূর্ণ, (২) কিছু শুভ ইঙ্গিত পেতে পারেন। সোনার আংটিতে মুক্তা চার রতি ও চুণী আড়াই রতি। ● শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখার্জী (রাণীগঞ্জ রোড, কলিকাতা)—(১) এবার ভাদ্রের পর কিছু ভাল হবে, (২) ধৈর্য ধরে থাকুন। ● শ্রীমতী বেবী সরকার (বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, ক[illegible])—(১) আগস্ট পর্যন্ত দেখুন (২) চাকুরী বছরের শেষাংশে হতে পারে। ● শ্রীবংশধর পাল (বেলগ্রাম)—(১) এ বছর হবে না, (২) হতে পারে। ● শ্রীউত্তমকুমার ঘোষ (ফুটিগোদা)—(১) এ বছরে হতে পারে, (২) পারবেন। ● শ্রীমতী শীলা দেবী (পুরুলিয়া)—(১) দেড় বছর মধ্যে বাধা, (২) হতে পারে। ● কুমারী বীথি (বারাণসী)—(১) এখনও দেরী, (২) হবে। ● শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী (ক্রশ রোড, জামসেদপুর)—(১) আসবে, (২) মোটামুটি হবে। ● শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী (ক্রশ রোড, জামসেদপুর)—(১) উন্নতি হবে, (২) পনেরো মাসের মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীমতী শিবানী চক্রবর্তী (ক্রশ রোড, জামসেদপুর)—(১) চাররতি মুক্তা সোনা আংটিতে, (২) শ্রাবণের মধ্যে না হলে আরো এক বছর পর। ● শ্রীমতী মধুছন্দা মজুমদার (ক্রশ রোড, জামসেদপুর)—(১) ভালভাবেই, (২) উচ্চশিক্ষার যোগ আছে। ● শ্রীউমাকান্ত দত্ত (বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা)—(১) পড়াশোনা হবে। প্রতিকার জন্য নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করা উচিত, (২) গৃহ হবে। ● শ্রীমতী হিরণপ্রভা দত্ত (বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা)—(১) পঁয়তাল্লিশ

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সংগে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সংগে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সংগে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

·মাসিক বসুমতী·

বর্ষ বয়সের পর, (২) এরূপ যোগ নেই। ●শ্রীতারাপদ চ্যাটার্জী (উদয়নারায়ণপুর) ---প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতীতে সেই মাসের রাশিফল থাকে। মাসিক বসুমতী পড়লেই বুঝতে পারবেন। ● শ্রীঅরূপ (শান্তি নিকেতন)---তুলা লগ্ন হওয়া সম্ভব। ঋণ শোধে নয় বছর লাগবে, (২) রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি ও মুক্তা চার রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীশান্তিগোপাল বসু (কামাট-লাল কলোনী, চন্দননগর)--- (১) ব্যবসায়ে ভাল হবে কিন্তু পাঁচ বছর ধৈর্য ধরতে হবে, (২) বিবাহে মোটামুটি ভাল। ●শ্রীমতী পাঠিকা (হেম ব্যানার্জি লেন, শিবপুর)---(১) এক বছর মধ্যে হতে পারে; (২) মঙ্গলের বাধা। এই বাধা অত্যন্ত গোলমেলে। ●শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (ই থি কলোনী, জামসেদপুর) ---কন্যা লগ্ন, এবং রবিবার হলে সাতই জ্যৈষ্ঠ। রাশি হবে মীন এবং নক্ষত্র হবে উত্তরভাদ্রপদ। ●শ্রীমতী চন্দনা মুখার্জী (রেলওয়ে কোয়ার্টার, পাতিপুকুর)---(১) পরীক্ষার ব্যাপার বলা হয় না। (২) পনেরো মাস মধ্যে। ●শ্রীগৌতম মুখার্জী (রেলওয়ে কোয়ার্টার, পাতিপুকুর)---(১) পরীক্ষার ফল বলা হয় না, (২) ভবিষ্যতে উন্নত জীবন। ●শ্রীখোকন মুখার্জী (রেলওয়ে কোয়ার্টার পাতিপুকুর)---(১) পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো কিছু বলা হয় না, (২) উন্নতি হবে। ●শ্রী এস কে চ্যাটার্জী (হাওড়া রোড, সালকিয়া)---(১) বিংশোত্তরী রবির দশাটাই গোলমেলে; (২) সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আটরতি রক্তমুখী প্রবাল ও আড়াইরতি কনকক্ষেত্রে ক্যাটস আই ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রী এন কে বি (দেশপ্রাণ শাসমল রোড কলিকাতা)---(১) হবে না, (২) পঁয়তাল্লিশ বর্ষ বয়সের পর হতে পারে। ●শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুখার্জী (দেউলপুর)---(১) মিথুন রাশি ও সিংহ লগ্ন, (২) শুভসূচক; বিপদে আপনে রক্ষা করে। ●শ্রীঅসীমকুমার সেন (ছাতাগনি, চিনসুরা---(১) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে; (২)ছয় বছর পর। ●শ্রীপরিতোষ কুমার সরকার (শ্রীপল্লী, পলতা)---(১) উচ্চস্থ রাহুর দশা অশুভ, এর উপর গোচরে শনি অশুভ; জুলাই মধ্যে না হলে আগামী বর্ষ দেখুন। (২) গোমেদ ছয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। রূপার আংটিতে । শ্রীমাণিকলাল দে (দে ব্রাদার্স, শিলিগুড়ি)--(১) মেষ রাশি, (২) এ বছরের শেষাংশ শরীর ও মনের উপর চাপ দেবে। ●শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী (উইলিয়ম লেন, কলিকাতা)---(১) হবে; (২) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ●শ্রীমদনমোহন (রাজারহাট)---(১) কন্যা রাশি ও কর্কট লগ্ন, (২) তিন বছর পর পরিবর্তন। ●শ্রীদীনবন্ধু মুখার্জী (রশিকগঞ্জ, বিষ্ণুপুর)---(১) তুলা রাশি (২) প্রতিকার করলেই যে সব ভাল হয়ে যাবে, তা ঠিক নয়। তিন বছর হিসাব করে চলুন। ●কুমারী শ্রীমতী বসু (বালিগঞ্জ পার্ক রোড, কলিকাতা)---(১) রূপার আংটিতে অনামিকায়)---যথাবিধি শোধনাদি ও পরীক্ষা করে নেবেন; (২) আমার মতে আটরতি লাল পলাও ধারণ করা উচিত। ●শ্রীমতী পুষ্প সরকার (বারারী কলিয়ারী)---(১) সংখ্যা বলতে হলে, মূল কোষ্ঠী দরকার; (২) সমৃদ্ধি হবে। ●শ্রীদামোদর সরকার(বারারী কলিয়ারী) ---(১) ছক ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। (২) সমৃদ্ধ অবস্থা হবে।

●শ্রীকালিপদ দফাদার (বেলতলা, হিঙ্গলগঞ্জ)---(১) ব্যবসায়ে, (২) আড়াই বর্ষ মধ্যে করা উচিত হবে না। ●শ্রীহরিদাস দে (দাসনগর)--(১) উন্নতি হবে, (২) গোমেদ ছয়রতি ও রক্তমুখী প্রবাল আটরতি। রূপার আংটিতে। ●শ্রীকমলেশ সরকার (আগরপাড়া)---কুপন ছাড়া উত্তর দেওয়া হয় না। ●শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী রামরাজাতলা ---(১) এ ব্যাপারে এড়িয়ে চলা উচিত (২) তিন বছর ধৈর্য ধরুন। প্রতিকার জন্য রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীনিরঞ্জন কর (রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিঃ)---(১) উপযুক্ত চাকুরী নভেম্বরের মধ্যে না হলে তিন বছর মধ্যে হওয়া কঠিন। (২) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও একথা বলা চলে। ● কুমারী কালী চক্রবর্তী (রামাপুরা, বারাণসী)---(১) এগারো মাস, মীন রাশি, মীন লগ্ন ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। ●শ্রী এন চক্রবর্তী (প্রফুল্ল চাকী রোড, কলিঃ)---(১) হতে পারে, (২) পরিবর্তন হবে। ●শ্রীমতী রুবি সরকার (ডানলপ কোয়ার্টার্স, সাহাগঞ্জ), (১) পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না, (২) মোটামুটি ভাল। ●শ্রীসমীরকুমার ভট্টাচার্য (রায়পুর রোড, দেরাদুন)---(১) পরীক্ষার বিষয় বলা হয় না, (২) আগামী বছর। ●শ্রীমতী স্নেহলতা রায় (সুন্দরপুর)---(১) আগের চেয়ে ভাল কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে, (২) পাঁচটির বেশী হতে পারে। ●শ্রীমতী মিতা (ধোড়াদহ)---স্বাস্থ্য উৎপাত করবে, (২) উনিশ থেকে একুশে। ●শ্রীনন্দগোপাল বাগচি (ধোড়াদহ)---(১) আর্থিক দুর্ভাবনা থাকবে, (২) পাঁচটির বেশী। ●শ্রীবিশ্বগোপাল বাগচি (ধোড়াদহ)---(১) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। (২) দেরী আছে। ●শ্রীসমরগোপাল বাগচী (ধোড়াদহ)---(১) কোনোসূত্রে লাভ হতে পারে, (২) আগামী বছর হতে পারে। ●শ্রীঅমরগোপাল বাগচী (ধোড়াদহ)---(১) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান (২) ভাল হবে। ●কুমারী কমলা বাগচী (ধোড়াদহ)---(১) মোটামুটি ভাল: শেষাংশে স্বাস্থ্যের উৎপাত; (২) ভালই হবে এবং অল্প বয়সে। ●কুমারী মনীষা বাগচী (ধোড়াদহ)---(১) ভাল কিন্তু শরীর একাধিক বার উৎপাত করবে, (২) উনিশ থেকে একুশ। ●কুমারী বাণী বাগচী (ধোড়াদহ)---(১) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে; (২) পরে ভাল। ●কুমারী সর্বমঙ্গলা বাগচী (ধোড়াদহ)---(১) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। (২) ভাল লেখাপড়া করান। ●কুমারী স্বস্তি বাগচী (ধোড়াদহ)---(১) মোটামুটি ভাল, (২) একুশ থেকে তেইশ। ●শ্রীঅংশুসুন্দর বাগচী (ধোড়াদহ)---(১) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে, (২) ভাল করবে। ●শ্রীসুধাংশু বাগচীর নবজাত পুত্র (ধোড়াদহ)---ভবিষ্যৎজীবন ভাল.

(২) কন্যা রাশি ও কর্কট লগ্ন। ● শ্রীসুধাংশুগোপাল বাগচী (খোড়াদহ), (১) ভাদ্রের পর শরীর ও মনের উপর চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। শেষাংশে উন্নতিকর, (২) ন'রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে এবং চাররতি মুক্তা সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী দীপ্তি বাগচী (খোড়াদহ)---(১) স্বাস্থ্যের উৎপাত (২) একান্নর পর আর সম্ভাবনা নেই। ● শ্রীষষ্ঠী মিত্র (কেদার মুখুজ্যে লেন, শিবপুর)---(১) জন্মকুণ্ডলী এমনি যে, উদর সংক্রান্ত দুর্বলতা থাকবে। এবং মনের উপর ও চাপ থাকবে বিশেষ কোনো একটি রত্নে বিশেষ উপকার হবে না, (২) তিন বছর পর অনেকাংশে ভাল। পাঁচরতি মুক্তা সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীরামপ্রসাদ চ্যাটার্জি (মহাকরণ, কলিকাতা)---তুলা লগ্ন, বৃষ রাশি ও কৃত্তিকা নক্ষত্র, (২) রক্তমুখী প্রবাল কমপক্ষে নয়রতি রূপার আংটিতে স্থায়িভাবে। ● শ্রীঅঞ্জন ভট্টাচার্য (ক্রশ রোড, জামসেদপুর)---(১) পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না, (২) উচ্চ শিক্ষার যোগ আছে। ● শ্রীদীপ্তিময় ব্যানার্জি (কেয়াতলা রোড, কলিকাতা)---(১) মুক্তা চাররতি সোনার আংটিতে এবং ইলেকট্রিকের মোটাতারের মালা ধারণ করে দেখতে পারেন। আড়াই বর্ষ উৎপাতসূচক। (২) চেষ্টা করুন। ● শ্রীশ্যামলকুমার বিশ্বাস (শিবচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট, বেলুড়)---(১) মকর রাশি, (২) ইতিমধ্যে না হলে বর্ষের শেষাংশে। ● শ্রী আর পি এস (সুভাষ পল্লী, বার্নপুর)---(১) এবারে হবে, (২) আড়াই বর্ষ ধৈর্য ধরুন ● শ্রীনন্দনা সেন (বেহালা গভঃ কোয়ার্টার)------(১) কুম্ভে শনি ছিল, (২) হঠাৎ পরিবর্তনসূচক। ● শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য (লক্ষ্ণৌ)---(১) রক্তমুখী প্রবাল কমপক্ষে সাতরতি। রূপার আংটিতে (২) সফল হবেন। ● শ্রীমতী সিপ্রা সেনগুপ্ত, সন্তোষপুর)---(১) কর্কট রাশি ও সিংহ লগ্ন, (২) সম্ভাবনা আছে। ● শ্রীসীতাময় গোস্বামী (বড়োশিবতলা, নবদ্বীপ)---পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না। ● শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ (নৈহাটি, রবার্টসন রোড)---মকর রাশি ● শ্রীঅজানা (মহেশপুর রাজ)---(১) দুজনের রাশিচক্র দরকার, (২) হবে না। ● শ্রীঅমরকুমার দত্ত (বিডন স্ট্রীট, কলিঃ)---(১) স্থায়ী হবে না। (২) পরীক্ষার বিষয় বলা হয় না। ● শ্রীসৌমেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ (কলিকাতা)---মাসিক বসুমতীর মাসিক রাশিফল বিভাগ দেখুন। শ্রীবংশীবদন দত্ত (কান্দী গোপীনাথপুর)---ভদ্র ও সুন্দর গঠন। কিন্তু আপনার জ্যোতিষীর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ● শ্রী[illegible]েন্দ্রনাথ চন্দ্র (কান্দী, গোপীনাথপুর)---(১) মীন লগ্ন ও মেষ রাশি। (২) অধ্যাপনা ও আইনবিদ্যা উপকার দেবে। ● শ্রীমিহির ভট্টাচার্য (নগেন্দ্রনাথ রোড, দমদম)---(১) না, (২) এখন থেকে দেড় বছর মধ্যে। ● শ্রীশিশিরকুমার চৌধুরী (হরিসভা, বর্ধমান)---(১) ভদ্রভাবে চলার মতো। কিন্তু তিন বছর বিশেষ সাবধান, (২) উৎপাত করবে। ● শ্রীমতী উমা চৌধুরী (রাধানগর, বর্ধমান)---(১) একুশ বর্ষ বয়সের মধ্যে, (২) পদস্থ হবে। ● শ্রীমতী পারমিতা চৌধুরী (হরিসভা, বর্ধমান)---বিজ্ঞান কিংবা ডাক্তারী, (২) একুশ পর্যন্ত দেখুন। ● শ্রীমতী উমা চৌধুরী (রাধানগর, বর্ধমান)---(১) এখন হবে না, (২) মোটামুটি ভাল কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। ● শ্রীসন্তোষকুমার গোস্বামী (যশোহর রোড, কলিঃ)---আগামী মার্চের মধ্যে হতে পারে; (২) তারপর দুটি ধাপ। ● শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত (বলরামপুর রোড, দিনহাটা)---ব্যক্তিগতভাবে কোনো উত্তর দেওয়া হয় না। প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতীতে উত্তর থাকে। এখন সময় ভাল নয়। ● শ্রী পি চ্যাটার্জী (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ)---(১) পাঁচ বছর পর অনেকাংশে ভাল। (২) এর আগে বিশেষ ভাল হবে না। ● শ্রীপরশুরাম শর্মা (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা)---দুটি কুপন (১) সেপ্টেম্বরের মধ্যে না গেলে এখন যাবে না। (২) মার্চের মধ্যে; শনি অত্যন্ত কুফলপ্রদ। শরীর ও মনের উপর চাপ দেবে। নীলাতে হবে না। ● শ্রী অ-না-মু (কলিঃ ৩৪)---(১) বাধা পড়ছে, (২) আটরতি রক্তমুখী প্রবাল ও আড়াই রতি কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই যথাবিধি ধারণীয়। ● শ্রীমতী পলা ঘোষ (নীলমণি রোড, কলিঃ)---(১) হবে, (২) দেড় বছর। ● শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্বামী (নিউ রেলওয়ে কলোনী, আমেদাবাদ)---(১) উন্নতি হবে, (২) বাড়ী হবে। ● শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্যামলাল রোড, বর্ধমান)---আপনার চিঠির উত্তরে লিখি, এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে উত্তর দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। কারণ কাউকে অশুভ ফল বললে তার বিপরীত ফল হতে পারে। ● শ্রীমতী গৌরী (মনসাতলা লেন, খিদিরপুর)---উৎকৃষ্ট পান্না ছয়রতি সোনার আংটিতে। ● শ্রীমান শেখর (মনসাতলা লেন, খিদিরপুর)---মিথুন লগ্ন। ধারণীয় রত্ন পীত পোখরাজ ছয়রতি। সোনার আংটিতে। ● শ্রীচিরঞ্জীব মল্লিক (হাওড়া-২) কুপনের সঙ্গে কোনো প্রশ্ন নেই। শ্রীঅ, মৈত্র (দুর্গাপুর)---(১) মোটামুটি ভাল; (২) আগের চেয়ে ভাল। ● শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা---দু'খানি কুপন। এক সঙ্গে একটির বেশী পাঠাবেন না। (১) পরে ব্যবসায়, (২) পুস্তকাদি কিংবা ঔষধপত্র, (৩) বাধা, (৪) ধনু লগ্ন ও কর্কট রাশি প্রতিকারে বিশেষ ফল হবে না। ● শ্রীআশুতোষ চ্যাটার্জী (পূর্বাচল)---ও বিভাবে কোনো ঠিকুজী করে দেওয়া হয় না। ● শ্রীঅখিলচন্দ্র দাস (দিনাপুর)---প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতীতে সেই মাসের রাশিফল থাকে। ● শ্রীবিশ্বনাথ দাস (গড়িয়া)---(১) আশ্বিনের মধ্যে না হলে এখন হবে না। (২) বেসরকারী ● শ্রীভানু (গড়িয়া)---ভরণী নক্ষত্র, মেষ রাশি, নরগণ ও মেষ লগ্ন। ● শ্রীসমীর কুমার ভট্টাচার্য (হিল-কলোনী, ধানুবাদ---(১) অক্টোবরের মধ্যে না হলে এ বছর আট নয় মাস হওয়া কঠিন, (২)

প্রতিকার জন্য রুপার আংটিতে আট-রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীমিহির কুমার কর্মকার (ব্যানার্জী পাড়া রোড, শ্যামনগর)- ●শ্রীপ্রদীপকুমার দে মজুমদার (দুর্গা পিতুরি লেন, কলিঃ)---(১) চব্বিশে, (২) বত্রিশের পর। এখন সময় ভাল নয়। ●শ্রীকল্যাণকুমার দাশ (শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিঃ)---(১) হবে, (২) ভদ্রভাবে চলার মত। ●শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য (তালিত, বর্ধমান)---(১) বর্তমান বাংলা সালের মধ্যে অস্থায়ী কিছু হতে পারে, (২) বেসরকারী। ●শ্রী এ ঘোষ (সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর)---(১) পাঁচ বৎসর পর লক্ষণীয়, (২) জনপ্রতিষ্ঠানের কাজে। ●শ্রীকালোবরণ (কোচবিহার)--(১) প্রতিকার করলেই যে সব ক্ষেত্রে সাফল্য আসে তার কোনো গ্যারান্টি নেই, (২) দাম্পত্যজীবন মোটামুটি ভাল; কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যাদি উৎপাত করবে। কণকক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াই রতি, হীরক আড়াই রতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীরণজিত বটব্যাল (রায়নগর, বাঁশদ্রোণী)---(১) জন্মকুণ্ডলী ঠিক করে দেওয়া এ বিভাগের কাজ নয়, (২) শিক্ষকতা কিংবা ডাক্তারী। ●শ্রীপরভীন কুমার (কলেজ স্কোয়ার,কলিঃ)---(১)হতে পারে। (২) সুনাম হলেও বৃত্তি হিসাবে নাও হতে পারে। ●শ্রীআশীষকুমার মজুমদার (খাদিমপুর)---মাসিক বসুমতী কিংবা দৈনিক বসুমতীর রাশিচক্রের নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রশ্ন করতে হয়। শ্রীবাবু (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিঃ)---(১) তিন বছর ধৈর্য ধরে চলতে হবে, (২) এখন সময় বিশেষ সুবিধার নয়। ●শ্রীঅশোক দাস (জি টি রোড, সালকিয়া)---(১) এ বছর কিছু ভাল। প্রতিকার জন্য কমপক্ষে চার রতি মুক্তা সোনার আংটিতে ধারণীয়, (২) সাধারণ। ●শ্রীসঙ্ঘসেবক(প্রণবনগর)---বর্তমান আড়াই বছর শরীর ও মনের উপর বারবার চাপ পড়বে, (২) আপাতত দেখি না।

●শ্রীকালোবরণ (রাখাভাজা)---(১) তিন বছরের কার্যকারণ দেখুন। (২) উক্ত সময়ের উপর সব নির্ভর করছে। ●শ্রীসুকান্তকুমার বসু (দেউলপুর, হাওড়া)---পরীক্ষার ফলাফল জানানো রীতিবিরুদ্ধ। ●শ্রীবি নাগ, অভয় হালদার লেন, কলিঃ)---ধৈর্য ধরে পাঁচ বছর চলতে হবে। ●কুমারী 'য' (কলি-৫৬)---(১) সঙ্গীতকলাদির দিকে ঝোঁক থাকতে পারে, (২) উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হবে। ●শ্রীসংগীতা (দমদম পার্ক)--(১) দেড় বছর দেখুন। (২) সম্ভাবনা কম। ●শ্রীমতী সুচন্দ্রা বিশ্বাস(অনরেট ফার্স্ট লেন, কলিঃ)---আগামী বাংলা নূতন সাল দেখুন; জ্যোতিষ অনুযায়ী ও প্রতিকার আবশ্যক। মুক্তা চার রতি ও রক্তমুখী প্রবাল আটরতি। সোনার আংটিতে । (২) মোটামুটি ভাল। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য ও অসহিষ্ণু মনোভাব সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। ●শ্রীমতী হিরণ্ময়ী চ্যাটার্জী (হরিদ্রাডাঙ্গা চন্দন নগর)---(১) বর্তমান নভেম্বরের মধ্যে না হলে এখন হওয়া কঠিন, (২) গোমেদ আটরতি ও কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াইরতি ধারণ করে দেখতে পারেন ●শ্রীজ্যোতির্ময় কর (তিলজলা রোড, কলি)---(১) আটরতি উৎকৃষ্ট গোমেদ ও কমপক্ষে আড়াইরতি উৎকৃষ্ট কণকক্ষেত্র ক্যাটস আই সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) বর্তমান বাংলা সালটা দেখুন। ●শ্রী ডি এন চক্রবর্তী (রামাপুরা, বারাণসী)---(১) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে; (২) রক্তমুখী প্রবাল কমপক্ষে আটরতি ধারণ করতে পারেন। ●শ্রীজহরলাল ঘোষ (রাণী পাটনা বালেশ্বর)---আগের চেয়ে কিছু ভাল; তবু পাঁচ বছর উৎপাতসূচক, (২) এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর জন্মকুণ্ডলী ও বর্তমান অবস্থা জানা দরকার। ● শ্রীদীপক ঘোষাল (কালিদাস লাহিড়ী লেন, কলি)---(১) এখন হবে না, (২) চাররতি মুক্তা ধারণ করা চলে। ● শ্রীপটল (কৈয়ল্ড)---(১) দশা জানানো সম্ভব নয়। তবে রাহু ও শনি বগানে অশুভ, (২) এই লগ্ন ও রাশির পক্ষে মুক্তা চাররতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি ধারণ প্রশস্ত। (৩) উন্নতি হবে, দেড় বছর দেখুন, (৪) তেতাল্লিশের মধ্যে হতে পারে। এক সঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠানো ঠিক নয়। ● শ্রীঅমল ব্যানার্জী (দত্ত-বাগান, কলিকাতা)---(১) বাধা রয়েছে। (২) তবু এখন থেকে পনেরো মাসের ফলাফলের উপর অনেকটা নির্ভর করছে। প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রেও আড়াই বছর অস্বস্তিকর। ●শ্রীভাস্করন জৈন (আউদি, মুর্শিদাবাদ)---প্রত্যেক মাসের মাসিক বসুমতী দেখুন। ● শ্রীগুপীনাথ মিশ্র (ব্যাণ্ডেল)---বৃশ্চিক রাশি ও ধনু লগ্ন (২) হবে না। ● শ্রীদি কু বি (কর্নফিল্ড রোড, বালিগঞ্জ), (১) আগামী মার্চ পর্যন্ত দেখুন, (২) মোটামুটি চলনসই। ●শ্রীরামসুন্দর চক্রবর্তী (ধরণীধর মল্লিক লেন, কলিঃ)---(১) সম্ভাবনা আছে, (২) উন্নতি হবে। ● শ্রীএস কে ঘোষ (রাখাল ঘোষ লেন, বেলেঘাটা)---সময় প্রতিকূল। তবু আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হতে পারে। (২) উক্ত সময় দেখুন। ● শ্রীবিনতা (কলি-৯)---সম্ভাবনা রয়েছে। ●মিস লিপি (বালী)---(১) বৃষরাশি। এ ব্যাপারে নীরব থাকাই ভাল; (২) একুশ বর্ষ বয়সের মধ্যে কার্যকারণে বাধা আসতে পারে। লেখাপড়ার ব্যাপারে উক্ত একুশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত দেখুন। ● শ্রীশান্তশ্রী মুখার্জী (পরাশর রোড, কলিঃ)---বর্তমান থেকে দেড় বছর মধ্যে, (২) বিজ্ঞানধর্মী কাজের। ● শ্রীঅতনু ব্যানার্জী । (বারাসত)---(১) উন্নতির দেরী, (২) মোটামুটি ভাল। নবগ্রহ কবচ ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসুনীলচন্দ্র গুহ (ভবানীপুর, খড়গপুর)---(১) সেপ্টেম্বরের পর বুঝতে পারবেন, (২) দেরী আছে; শ্বেত প্রবাল আটরতি সোনার আংটিতে।

'পর পর ক'দিন তাঁকে দেখতে এসেছিলেন কাকীমা হৈমবতী দেবী। কতদিন যেন পরে আজ আবার এলেন এ-বাড়িতে।

প্রায় সমবয়সী এই ভাসুরপোটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একাধারে স্নেহের শ্রদ্ধার বন্ধুত্বের, তথাপি এ-বাড়িতে তিনি কদাচই আসেন।

হৈমবতী সুন্দরী নন, কিন্তু 'সুশ্রী'।

এই শ্রী তাঁর সর্বাঙ্গে দীপ্যমান।

'সুষমা' শব্দটির যে অর্থ, সেটা নতুন করে উপলব্ধি হয় হৈমবতীকে দেখলে। এই প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর আপাদমস্তক একটি ছন্দোময় সুষমায় মণ্ডিত। দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, দেখলে সম্ভ্রম জাগে।

হালকা-পাতলা ছোট-খাটো--- চেহারা, কিন্তু তাতে তারল্য নেই, আছে একটি মার্জিত গাম্ভীর্য। অথচ ব্যবহারিক অর্থে গম্ভীর তিনি আদৌ নন। কথায় ধার আছে, কৌতুক আছে, সৌন্দর্য আছে।

হৈমবতী এসে বসলে, তাঁকে ঘিরে যেন আপনিই একটি উজ্জ্বল পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। হৈমবতী এসে বসলে মনে হয় একটি নির্মল পরিচ্ছন্নতা প্রতীক হয়ে দেখা দিল।

হৈমবতীর প্রতি এ বাড়ির সকলেই আকৃষ্ট, বাদে বিজয়া।

বিজয়া হৈমবতীর আচার-আচরণ সব কিছুকেই নীচু চোখে দেখেন।

হৈমবতী যে বিধবা হয়েও বডিস্-ব্লাউস পরেন, হৈমবতী যে বিধবা হবার পর চুল কেটে ফেলেও সেই চুলে শ্যাম্পু করে মুখে তরুণীর শ্রী ফোটান, হৈমবতীর চশমা, চটি ভ্যানিটি ব্যাগ সব কিছুতেই যে সৌখীন রুচির ছাপ, এটা হৈমবতী একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। আর সেই না পারাটা চাপতেও চেষ্টা করেন না।

হয়তো সেইটাই হৈমবতীর এ-বাড়িতে বেশী না আসার কারণ। নচেৎ স্বামীর সম্পর্কের আত্মীয় তো তাঁর আর বেশী নেই। দূর-সম্পর্কিত হৈমবতীর কর্ণধার।

কিন্তু সে যাক---আজ হৈমবতী তাঁর স্বামীর সম্পর্কিত আত্মীয়-ভবনে বেড়াতে এলেন।

সরোজাক্ষর ছেলেমেয়েরা কেউ হৈমবতীকে ঠাকুমা বলে না, বলে কাকী-দিদা। এই অদ্ভুত ডাকটি

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

সরোজাক্ষই তাঁর বড় ছেলের শৈশবকালে আমদানী করেছিলেন, পর পর আর তিনজনও তাই শিখে গেছে।

বিজয়া এতেও ন্যাকামী দেখেন ঠোঁট উল্টে বলেন, 'আদিখ্যেতা! 'ছোট ঠাকুমা' বললে ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা! তা নয় সৃষ্টি ছাড়া এক ডাক হয়ে যাবেন যে। চিরযুবতী থাকবেন উনি।'

খুড়-শাশুড়ীর উপর যেন তাঁর একটা জাতক্রোধ।

এখন না হয় বিধবা হয়েও বিধবার আচরণ সম্যক্ পালন করেন না বলে রাগ, কিন্তু যখন মহিলাটি সধবা ছিলেন? তখনো তো, রাগের কমতি ছিল না।

'কাকী দিদা এসেছেন।'

ঠাকুরঘরে গিয়ে জানিয়ে এল মীনাক্ষী

বিজয়া মুখটা ধাঁকিয়ে জোরে জোরে মালা ঘোরাতে লাগলেন।

মীনাক্ষী আবার বললো, 'শুনতে পেলে? কাকী-দিদা এসেছেন।'

'এসেছেন তো কী? নাচতে হবে?'

বিজয়া নিমপাতা খাওয়া মুখে মালাটা কপালে ছোঁওয়ালেন।

'নাচবে কি কাঁদবে, তা তুমিই জানো---'মীনাক্ষী বলে, 'খবর না দিলেও তো বলবে, নীচে কত ঘটনা ঘটে যায়, কত লোক আসে' যায় আমি টেরও পাইনা। দাসীর মতন এক পাশে পড়ে আছি, ছেদ্দা করে একটু খবরও দিতে আসে না। বলে গেলাম, এখন তোমার ফুরসৎ হয় নেমো, না হয় নেমো না।'

চলে যায় মীনাক্ষী।

বিজয়া জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলেন, 'কথা দেখো মেয়ের। যেন মিলিটারী। মার সঙ্গে কথা বলছে, না বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলছে বোঝবার জো নেই। আছে, কপালে তোমার অশেষ দুর্গতি আছে। একটা দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে পড়বে তুমি এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তখন ওই খরখরানি বেরিয়ে যাবে। উঠতে-বসতে কাঁদতে হবে।'

বিজয়া এখনো দুষ্টু মেয়ের দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে পড়ে উঠতে-বসতে কাঁদবার স্বপ্ন দেখেন। বিজয়ার এখনো মুখস্থ আছে---

হলুদ জব্দ শিলে,
চোর জব্দ কীলে,
দুষ্টু মেয়ে জব্দ হয়
শ্বশুর বাড়ি গেলে।

ওই প্রবাদের ছড়াটা যে সমাজ অনেকদিন হলো ভুলে গেছে এটা খেয়াল করেন না---বিজয়া। আর খেয়াল করেন না এই অভিশাপ বাণীটি যার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হলো, সে তাঁরই সন্তান।

তা 'খেয়াল' বস্তুটা সংসারে দুর্লভ বৈ কি। ক'জনেরই বা যথাযথ থাকে ওটা? খাম-খেয়ালেরই --- ।

সেই খাম-খেয়ালের একটি নমুনা— সরোজাক্ষর চাকরী ছাড়ার সঙ্কল্প, আর তার কারণ।

'অপমান সয়ে থাকতে পারলাম না---' এর পিছনে তবু একটা যুক্তি আছে। একটা বলিষ্ঠ পৌরুষের প্রকাশ আছে। কিন্তু সরোজাক্ষর ভাষ্যটা যে উদ্ভট।

ওই অপমানের ধাক্কায় হঠাৎ তিনি নাকি অনুভব করলেন, এতদিন ছাত্রদের ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে এসেছেন। অতএব অনুভব করে ফেলে, আর সেটা চালিয়ে যেতে বিবেকে বাধছে।

খাম-খেয়ালের নজীর ছাড়া আর কি?

প্রকৃষ্ট নজীর।

আরে বাবা এ-যুগের ছেলেগুলি যে এক একখানি বিষ্ণুর অবতার, সেটা দেখতে পাচ্ছো না? দেখতে পাচ্ছো না শুধু তোমার পাড়াটি নয়, তোমার দেশটি নয়, দেশে-বিদেশে, সমগ্র পৃথিবীতে ওই ছেলেগুলোই আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে।

রাবণের অনাচারে ক্ষেপে উঠে লঙ্কা দহনের সঙ্কল্পে ওরা ল্যাজে আগুন বেঁধেছে।

তাতে রাবণের লঙ্কা ধ্বংস হচ্ছে কিনা রাবণই জানে' তবে তাদের নিজেদের ল্যাজগুলো যে পুড়ছে তাতে সন্দেহ নেই, সেই পোড়া ল্যাজের দাহনে মুখও পুড়ছে বাছাদের।

মুখ তারা নিজেদের তো পোড়াচ্ছেই, পোড়াচ্ছে আরো অনেক কিছুই। পোড়াচ্ছে সভ্যতা ভব্যতা সংযম আদর্শ, চক্ষুলজ্জা লোকলজ্জা, মায়া-মমতা শালীনতা সৌকুমার্য, কে জানে এই ধ্বংসস্তূপের উপর কোন্ স্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখছে ওরা?

না কি 'স্বপ্ন' টপ্ন কিছু নেই ওদের। শুধু হঠাৎ হাওয়ার' সুযোগ নিয়ে নিজেদের সমস্ত ত্রুটি, নিজেদের সমস্ত দৈন্য ঢাকা দিতে চাইছে 'দাবীর লড়াইয়ের' ছদ্মবেশ দিয়ে।

তা' নইলে ক্ষেত্র-অক্ষেত্র মানছে না কেন ওরা? প্রয়োজন-অপ্রয়োজন মানছে না কেন? কারণে-অকারণে যেখানে সেখানে আর যখন তখন' আগুন জ্বেলে তুলছে কেন? অর্থাৎ আসল লক্ষ্য ওই জ্বালাটাই।

না: লঙ্কা দাহনে মন নেই বাপু ওদের, আপন আপন হৃদয়ের দাহ নিবৃত্ত করতেই ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে। যা-তা করছে।

তা নইলে সরোজাক্ষর মত চির শান্ত চিরসৌম্য অধ্যাপককে ঘেরাও করে বসে অপমান করে।

কিন্তু 'মহৎ প্রাণ' সরোজাক্ষ ওদের দোষ দেখছিল না,· দোষ দেখছিল নিজের। তবে কেন বলা যাবে না জগৎ সংসারে খেয়ালের চেয়ে খাম-খেয়াল বেশী।

হৈমবতীও মৃদুহেসে বলেন, 'লোকে কিন্তু তোমাকে 'খাম-খেয়ালী' বলে বদনাম দিচ্ছে।'

হৈমবতী এ-প্রসঙ্গ তুলতে আসেন নি।

হৈমবতী এসেছিলেন সরোজাক্ষর কাছে কয়েকটা বই নিতে। তবু উঠে পড়লো প্রসঙ্গটা।

বলতে কি সরোজাক্ষই উঠিয়ে ফেললেন।

হৈমবতী এসে ঘরে ঢুকতেই সরোজাক্ষর মুখটা খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, সেই খুশী-খুশী মুখেই হেসে বলে উঠলেন, 'কী তুমিও কি একপালা উপদেশ বর্ষণ করতে এলে' কিন্তু দোহাই তোমার আর যে করে করুক তুমি কোরো না।'

হৈমবতী প্রথমটা বিস্মিত হলেন, কারণ হৈমবতীর স্মরণে ছিল না— সরোজাক্ষর উপর একহাত নেওয়ার একটি সুযোগ এসেছে।

তবে একটু থতমত খেয়েই বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। আর সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন, 'কেন, আমি নয় কেন? আমি তোমার গুরুজন না? উপদেশ বর্ষণের রাইট অবশ্যই আছে আমার।

'সব সময় সব রাইট প্রয়োগ করতে নেই।'

'বা: সুযোগ পেলে কে ছাড়ে? লোকে তোমায় খাম-খেয়ালী বলে বদনাম দিচ্ছে তা জানো?'

'লোকে দিচ্ছে। তুমি তো দিচ্ছো না?' মৃদুহেসে বলেন সরোজাক্ষ।

'বা রে আমিই বা নয় কেন? আমি কি লোক ছাড়া?'

খুব শান্ত গলাতেই বলেন, তবু হৈমবতীর মুখে একটি সরসতার উজ্জ্বলদীপ্তি ফুটে ওঠে।

সরোজাক্ষ হেসে বলেন, 'আমার তো তাই ধারণা।'

'ভুল ধারণা।' আমি ওই লোকেদেরই দলে। আমিও তো বলছি এটা তোমার খাম-খেয়াল। 'আমি ওদের ঠকিয়ে খাচ্ছিলাম।—হঠাৎ এমন একটা দৃঢ় ধারণা করে বসবার মানে হয় না। তোমরাও একদা ছাত্র ছিলে এবং তোমাদের যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তাঁরা সকলেই কিছু মহাপুরুষ ছিলেন না, খুঁজলে তাঁদের বিরুদ্ধেও অনেক তথ্য বেরোতে পারে, তবু তোমরা এখনো তাঁদের নামে সশ্রদ্ধ হও, এখনো কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে 'স্যর!' বলে বিগলিত চিত্তে আভূমি প্রণিপাত করো।'

'করো না কি?'

'আমরা হয়তো একটা 'নির্বিচার পূজার মন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলাম তাই। এ-যুগ ওই নির্বিচার পূজায় বিশ্বাসী

নয়। গুরুজন বলেই তিনি শ্রদ্ধা-ভাজন একথা এ-যুগ মানে না।'

'বিচার করতে বসলে বিচারের শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটা আমাদের মতো মুখ্যু মানুষের চেয়ে পণ্ডিত মানুষ তোমরাই ভাল বুঝবে। আর সেটা চিরকালই আছে। 'ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়'—এটা নেহাৎ এ-যুগের কথা নয়। বুঝলাম নির্বিচারে মানবে না, কিন্তু বিচার করবারও একটা অধিকার থাকা দরকার নয় কি? বিচারবুদ্ধিটা না জন্মাতেই যদি বিচারকের ভূমিকা নিয়ে বসে'—

সরোজাক্ষ একটা নিঃশ্বাস ফেলেন।

কারণ সরোজাক্ষ নিজেও একথা বেশ কয়েকদিন ধরে ভেবেছেন। ভেবেছেন ওরা 'অর্বাচীন'। ভেবেছেন ওরা 'উত্তপ্ত মস্তিষ্ক' 'হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।' তবু বিবেক সুস্থির হতে দেয় নি। তবু মনে হয়েছে, এ সমস্তই আমাদের ত্রুটির ফল। আমাদের 'গলতি'। আমাদের অক্ষমতার নিদর্শন।

অনেক ভেবে ভেবে ভবেই না —

সরোজাক্ষ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'নাঃ ছোট কাকী তবু বলতো এ-যুগের চোখকান অনেক খোলা।'

হৈমবতী তর্ক করেন না। প্রতিবাদও না।

হৈমবতীও একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'কি জানি, খোলা, না অন্য এক মোহ-আবরণে ঢাকা। আমি তো দেখি মস্ত এক খেলার আড্ডায় ও বেচারীরা নেহাৎই দাবার ঘুঁটি, রঙের তাস। ওদের নিয়ে চলছে বিরাট জুয়াখেলা। আর ওরা হতভাগারা ভাবছে—আমরাই হারছি জিতছি 'দান' পাচ্ছি। —বেচারীরা জানেও না 'নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন যেই নিয়েছে খেলার ভার, তাইলে বাঁধে ফেলছে তারে যখন যেমন ইচ্ছা তার।' আর এও বোঝে না 'বাজবলী সব পুনরায় সাজ হলে খেলার জের।' রাজা যুধিষ্ঠির খেলার নেশায় উন্মত্ত হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে শেষে আপন স্ত্রী-পুত্রকে বাজি ধরেছিলেন, এ-দেশটা এমনই সর্বনেশে।—এ-যুগের দাবার যুধিষ্ঠিররা মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎকে বাজি ধরছে।'

সরোজাক্ষ একটু চুপ করে থেকে অন্যমনস্কের গলায় বলেন, 'কে জানে এ থেকে অন্য এক নতুন সভ্যতার জন্ম হবে কি না। যা নির্ভুল। যা নিখুঁত।'

'নির্ভুল।' হৈমবতী মৃদু হাসেন। বলেন, 'প্রকৃতির সৃষ্টিতেই ভুলের শেষ নেই, খুঁতের শেষ নেই, আর মানুষের সৃষ্টি নিখুঁত নির্ভুল হবে? হয়তো হবে একটা ভুলের বদলে আর একটা ভুল। হয়তো একটা খুঁতের বদলে আর একটা খুঁৎ।'

'প্রকৃতি তো অন্ধ।'

'মানুষই বুঝি চক্ষুষ্মান?'

'মানুষের চিন্তাশক্তি আছে।'

'মানুষ তাই ভাবে বটে—' হৈমবতী সহজস্বরে হেসে ওঠেন, 'সত্যি সে শক্তি থাকলে ভাবতো না—পৃথিবীতে শুধু একা 'আমি'ই থাকবো, আর কেউ থাকবে না।'

'মানুষ সম্পর্কে অনেক ভাবো তো দেখছি—'

'ভাবতে হবে কেন? চোখের ওপর জাজ্বল্যমান তো। ওই ভাবনাতেই মানুষ প্রতিজ্ঞা করে বসে 'নিঃক্ষত্রিয় করিব পৃথ্বি'—ওই ভাবনাতেই যুগে যুগে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটায়, ওই ভাবনাতেই সমস্ত কল্যাণবোধ বিসর্জন দিয়ে দাবার ছক্ পেতে বসে। কিন্তু থাক বাবা এসব দার্শনিক আলোচনায়, এখনি তর্ক বেধে যাবে। আর পণ্ডিতে-মূর্খে তর্ক বাধলে ব্যাপার সুবিধের হবে না। তার চাইতে যা বলতে এসেছি বলি—আমায় যে সেই বই দুটো দেবে বলেছিলে, কই দিলে না?'

হৈমবতীর ডিগ্রী-টিগ্রীর বালাই নেই, তবু হৈমবতী সরোজাক্ষর পাঠোপযোগী শক্ত শক্ত ইংরিজি বইয়ের গাদা পার করেন। এটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার বৈকি। অন্তত বিজয়ার কাছে তো বটেই।

বিজয়া অবশ্য ওই পার করাটায় তেমন বিশ্বাসী নয়। বলেন, 'পড়ে না হাতী। তোমার কাছে কায়দা দেখায়।'

সরোজাক্ষ এ-ধরণের কথার উত্তর বড় দেন না, একদিন বলেছিলেন, 'তাতে ওঁর লাভ?—আহা, তুমি অবাক হবে, তুমি বাহবা দেবে, সেটাই পরম লাভ।'

সরোজাক্ষ আর কথা বলেন নি। চুপ করে গিয়েছিলেন। আজও হৈমবতীর কাছে একটু চুপ করে গেলেন। তারপর আস্তে বললেন, 'ওটা কলেজ লাইব্রেরী থেকে এনে দেব ভেবেছিলাম। আচ্ছা আমি ব্রিটিশ কাউন্সেল থেকে।'

'আরে বাবা তাড়ার কিছু নেই—' হৈমবতী লজ্জিত গলায় বলেন, 'বিদুষী নই যে বইয়ের জন্যে কাতর হবো। বেকারের দিন, কাটতেই চায় না, তাই বই বই করে মরি। তবে আপাতত ব্যস্ততা নেই, নতুন করে ভাবার কালী সিংহীর মহাভারত পড়ছি—'

'এই সেরেছে।' সরোজাক্ষ ঈষৎ কৌতুকে বলেন, 'সারদার কানে গেলে আর রক্ষে নেই—'

হৈমবতী কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘরের বাইরে সারদা-প্রসাদের উদাত্ত স্বর শোনা গেল, 'সারদার কথা কি হচ্ছে দাদা? আরে ছোট কাকী যে? কতক্ষণ? খুড়ি ভাসুরপোয় মিলে সারদাবাবুর নিন্দে হচ্ছে তো খুব?' বলে হা-হা করে হেসে ওঠে। খুড় শাশুড়ীকে অবশ্য প্রণাম করতে আসে না। হৈমবতী হেসে ফেলে বলেন, 'কেন বাপু নিন্দে কেন? তুমি কি আমাদের নিজের ছেলে?'

ঘরে চেয়ার থাকতেও এক-প্রান্তে বসে পড়ে সারদাপ্রসাদ কোঁচার খুঁটটা তুলে কপালের ঘাম মুছে বলে, 'সে আপনারা স্নেহ করে না বললেও, লোকে তো পাগল ছাগল ছাড়া কিছু ভাবে না।'

সারদাপ্রসাদ যে বাইরে কোনোখান

থেকে ঘুরে এসেছে, তা তার সাজ-সজ্জায় মালুম হচ্ছে। পরণে ধুতি আর শার্ট হলেও, জিনিস দুটো ধোপদুরস্ত। বেটা দৈবাতের ঘটনা।

সরোজাক্ষর চোখেও ধরা পড়ে দৃশ্যটা। সরোজাক্ষ মৃদু হেসে বলে, 'কে আবার ওকথা বলতে গেল তোমায়?'

'আপনি বাদে সবাই বলে,' সারদাপ্রসাদ বেশ উদাত্ত গলায় বলে, 'বলবে এখন বলবে। দেশটা যে আমাদের চিতায় মঠ দেবার। এই তো গিয়েছিলাম এক পাবলিশার মহাপ্রভুর কাছে। এমন একটা ভ্যালুয়েবল্ ম্যানাস্ক্রীপট্ নিয়ে গেছি, একবার দেখলোও না। যেন দেখলেও পয়সা খরচ হয়ে যাবে।---সাবজেক্ট ম্যাটারটা বোঝাতে গেলাম, তা এমন উপহাস্যি করে কথা বললো, যেন একটা সত্যি পাগল গেছি আমি। বলে কি জানেন, আমরা মশাই ক্ষুদ্রপ্রাণী, দুটো গল্প উপন্যাস বেচে খাই, আমাদের কী সাধ্য যে এই মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করি। আপনি বরং আপনার ওই মহার্ঘ্য পাণ্ডুলিপিটি রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিন, ওরা দরের জিনিসের কদর বুঝবে। শুনুন! শুনলে কী মনে হয়? যত সব ভূষিমাল এসে বইয়ের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, ধান চাল লোহা-লক্কড়ের থেকে অধিক মূল্য দিতে জানে না। আমি বলবো, বরং যখন ছাপাখানা ছিল না, তখন ছিল ভাল। দামী জিনিসের দাম ছিল। সারদার স্বর উত্তেজিত।

'কিন্তু তুমিই তো বল সারদা ছাপাখানা ছিল না বলেই তো আমাদের অনেক কিছু চিরতরে খোওয়া গেছে।' সরোজাক্ষ বলেন, 'ছাপা জিনিসের একটা আধটা কপিও কোথাও পড়ে থাকে।'

সারদা উত্তেজিত থেকে উত্তেজিত-তর হয়। বলে, 'বলেছিলাম, বলেও থাকি। কিন্তু এই সব অসভ্য লোকেদের ব্যবহারে মেজাজ খাপ্পা হয়ে যায় বুঝলেন? বলে কি না, 'বুঝলাম না হয় একদা আমাদের এই মহান ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হয়েছিল, এবং আপনি তা প্রমাণ করেও ছেড়েছেন, কিন্তু সে প্রমাণে এখন কি ঘণ্টা হবে বলতে পারেন? এখন তো পরের দরজায় হাত পেতে বসে আছি,'----কত বড় মুখ্যুর মতো কথা বলুন? হাত পেতে বসে আছি বুদ্ধির দোষে আর কপাল দোষে, বলে চির ভিখিরী যে ছিলাম না, সেটুকুও বোঝাতে হবে না পৃথিবীকে?'

সরোজাক্ষ ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত হন, তবু সে ভাব গোপন রেখে উৎসাহের গলায় বলেন, 'তা' তোমার সেই থিসিস কি শেষ হয়ে গেছে না কি?'

'শেষ।'

সারদাপ্রসাদ যেন একটা অর্বাচীনের কথা শুনলো. এইভাবে মুরুব্বির ভঙ্গীতে বলে ওঠে, 'শেষ কি দাদা? ওটা তো মাত্র। 'ফার্স্ট ভল্যুম। এখনো ও রকম নটা ভল্যুম হবে। অবশ্য হয়েই আছে একরকম। মানে খুচরো খুচরো কাগজে নোট করা আছে. সেইগুলোই একবার গুছিয়ে---'

হৈমবতী সারদাপ্রসাদের গবেষণার বিষয়বস্তু জানেন। হৈমবতী এও বোঝেন, সরোজাক্ষর এখন ওই অবোধ লোকটার সঙ্গে মনের ভাব গোপন করে কথা চালাতে কষ্ট হচ্ছে, তাই হৈমবতীই হাল ধরেন, বলেন, 'তা একেবারে দশখণ্ডই শেষ করে ছাপালে হতো না সারদাপ্রসাদ? এতে জিনিসটা সম্পর্কে ওদের ধারণা স্পষ্ট হবে না।'

'হ্যাঁ আমিও ভেবেছিলাম তাই---' সারদাপ্রসাদ হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'কিন্তু ভেবে দেখছি, এখন থেকেই চেষ্টা করা দরকার যাতে তখন চট করে মার্কেটটা ক্রীয়েট করা যায়। তা যাক্--' সহসাই আবার সারদাপ্রসাদ নিজস্ব উত্তেজিত ভঙ্গীতে ফিরে আসে। বলে, 'ওর জন্যে ভাবি না। একবারেই হাল ছাড়বো এমন পাত্তর সারদাপ্রসাদ নয়। বলে যেই মনে হলো ঠিক লেখা হচ্ছে না, অমনি খাতাকে খাতা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে আবার নতুন করে লিখতে বসলাম।---সব পাবলিশারই কিছু আর 'গোলা লোক' নয়, বিদ্বান বুদ্ধিমান কালচার্ড লোকও আছে এ লাইনে। যাকো তাদের সন্ধান জেনে। তখন বুঝলেন কাকীমা, পড়তে পাবে না। বিষয়টা যে ভয়ানক দামী। মনে করুন না কেন---আজ আমরা 'ওদেশে' 'হৃদ্ বদল'-এর খবর শুনে উর্ধ্ববাহু হয়ে নাচছি, অথচ ওটা ছিল আমাদের এই দেশে।---রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ, উপপুরাণ, দেখুন হাঁটকে, সব পাবেন। মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার একের দেহ থেকে অন্য দেহে প্রাণ 'ট্রান্সফার', ইচ্ছেমত যে-কোনো মানুষের বা যে-কোনো প্রাণীর দেহ ধারণ, চির-যৌবন, অন্যের যৌবন আকর্ষণ করে নিজের শরীরে স্থাপন, কী নয়? বললে ফুরোবে না কাকীমা। এখানে এসে দু'মাস থাকুন, একে একে নজীর ধরে ধরে দেখিয়ে দেব।'

'দু মাস?' হৈমবতী হেসে ফেলেন।

সারদাপ্রসাদ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে, 'দু মাস বলে আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কাকীমা ওটা তবু আমি কম করেই বললাম। দু মাসেও কুলোয় কিনা সন্দেহ। কত আছে, যা আপনার এ যুগের বিজ্ঞান এখনো স্বপ্নও দেখছে না।'

হৈমবতী হেসে বলেন, 'তা কবি-কল্পনাও তো ছিল কিছু? যেমন সত্য যুগে মানুষ একুশ হাত লম্বা ছিল।

সারদাপ্রসাদ হঠাৎ যেন ধ্বসে পড়ে? 'ছি ছি, আপনি এই কথা বললেন কাকীমা? অথচ আমি আপনাকে মা না---এটা আপনি বলবেন না। একুশ হাত মানুষ ছিল না কী বলছেন? তা বলুন পৃথিবীতে অতিকায় হাতী, অতি-কায় জিরাফ, অতিকায় কুমীর কিছুই ছিল না? অবিশ্বাসের কি আছে বলুন? প্রকৃতির কাজই তো হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করে চলা। পৃথিবীতে যখন যেমন

জায়গা ছিল, তখন বৃহৎ বৃহৎ প্রাণী ছিল, মানুষও তাই ছিল। ক্রমশ পৃথিবীতে জায়গা কমতে সুরু করলো, মানুষ বেড়ে যেতে সুরু করলো, ব্যস প্রকৃতি অমনি মানুষের মাপ কমাতে সুরু করলো। এখন আপনাদের সংখ্যা-তত্ত্ববিদরা বলছেন ---এরপর আর পৃথিবীতে মানুষ ধরবে না। দেখবেন ঠিকই ধরে যাবে। তখন মানুষ লিলিপুট বা বুড়ো আঙুলী হয়ে যাবে। তা এখন থেকেই তার কাজ সুরু হয়ে গেছে। প্রথমে 'মন' নিয়ে সুরু হয় কিনা। দিনের পর দিন তাই মানুষের মন 'ছোট' হয়ে যাচ্ছে। আরো ছোটো হয়ে যাবে, তারপর দেহগুলোও ছোট হতে থাকবে। তাহলেই বলুন একুশ হাতে অবিশ্বাস কিসের?'

হৈমবতী এই অভিনব মতবাদের বহরে কষ্টে হাসি গোপন করে বলেন, 'তা' হয়তো সত্যি। তবে 'গুজব' বলেও তো একটা জিনিষ আছে? মনে করো সেই সত্য থেকে কলি, এই চার যুগ ধরে সেই গুজবের বাড় বৃদ্ধি হয়ে চলেছে---

সারদাপ্রসাদ এবার গম্ভীর হয়। বলে, 'আপনিও যদি একথা বলেন তো নাচার। তবে সাহেবরা যখন ওই সব করে দেখিয়ে দেবে, তখন আমরা বাহবা দিয়ে বলবো, 'কী আশ্চয্যি। কী অদ্ভুত।' তখন আর অবিশ্বাস করবো না।'

হৈমবতীর অবশ্য মুখে আসছিল, 'চোখে দেখলে আর অবিশ্বাস করা যায় কী করে?' কিন্তু বললেন না। হৈমবতী অনুতপ্তের ভূমিকা নিলেন। বললেন, 'তা' যা বলেছ। ভেবে দেখলে তাই। একসময় যে এই প্রাচ্যভূমি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, তার প্রমাণ নেই তাও নয়।'

'সেই তো সেই কথাই তো বলে মরছি জীবন ভোর---' সারদাপ্রসাদ হৃষ্টচিত্তে বলে, 'আপনি একটা কথাতেই বুঝলেন, স্বীকারও করলেন, কিন্তু আর কেউ কানই দিতে চায় না। অরণ্যে রোদন করে মরি, বেনা বনে মুক্তো ছড়াই। অথচ তলিয়ে দেখতে পারলেই এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একমুঠো বেনাঘাস তুলে ছুঁড়ে মারলেন, আর সে-গুলো লোহার মুষল হয়ে গিয়ে যদুবংশ ধ্বংস করলো, কী এটা? আমি তো বলবো স্রেফ আণবিক বোমার ব্যাপার একবার নিক্ষেপেই বংশকে বংশ লোপাট।---অথচ যেহেতু আমাদের নিজেদের দেশের ইতিহাসে রয়েছে সেই হেতুই ধরে নিতে হবে ও সব রূপক গুজব কবি-কল্পনা। ---না না এটা ঠিক নয়।---এই যে সেদিন মীনাক্ষীকে বোঝাতে গেলাম, বল্কল জিনিষটা আর কিছুই নয় বাপু, স্রেফ গাছের আঁশ থেকে তৈরি আর্ট সিল্ক, বা রেয়ন সিল্ক। তা' শুনে মেয়ে একে-বারে হেসেই অস্থির। একই জিনিষের নাম যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন তেমনি ভিন্ন ভিন্ন কালেও অনেক সময় বিভিন্ন হয়ে যেতে পাবে এ কথা মানে না।

যাক গে ওর জন্যে ভাবি না। সত্য কখনো চিরদিন আবৃত থাকে না, এই সারদাপ্রসাদের গবেষণার ফল একদিন জগতকে পৃথিবীর দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন দেবে কিনা দেখবেন। আধুনিক বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক, তাকে মাথা হেঁট করে বলতেই হবে, প্রাচীন ভারতবর্ষের যোগবলের কাছে এখনো আমরা 'অ আ ক খ র' ছাত্র আর ওই 'যোগবলটি'ই হচ্ছে বিজ্ঞান-শক্তি।

হৈমবতী ওই অবোধ মানুষটার উত্তেজনায় লাল মুখটার দিকে তাকিয়ে কোমল অথচ ব্যস্ত গলায় বলেন, 'এ সব কথা তোমার মত এমন করে তলিয়ে তো দেখি না বাপু কখনো, শুনলে মনটা খুব চঞ্চল হয়, কিন্তু তুমি এখন সারাদিন ঘুরে এলে, স্নান করবে খাবে—'

'আমার স্নানাহার? ওর জন্যে কিছু ভাববেন না'—সারদাপ্রসাদ অধিকতর উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং আরো বেশ কিছুক্ষণ প্রবল বিক্রমে আধুনিক 'বিজ্ঞান' ও 'প্রাচীন যোগবল' সম্পর্কে তুলনামূলক সমালোচনা করে হঠাৎই একসময় বলে ওঠে, 'নাঃ স্নানটাই সেরে আসি, মাথাটা কেমন ঝাঁ ঝাঁ করছে।'

সারদাপ্রসাদ চলে গেলে হৈমবতী করুণার গলায় বলেন, 'সত্যি সরোজ, কোনোমতে ওঁর ওই লেখা ছাপিয়ে ফেলা যায় না?'

সরোজাক্ষ মৃদু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেন, 'হাজার কয়েক টাকা খরচ করতে পারলে যায়।'

'আমার যদি অনেক টাকা থাকতো' হৈমবতী বলেন, 'আমি একজন পাবলিশার সাজতাম।'

সরোজাক্ষ বলেন, 'কিন্তু তাতেই কি ওকে আঘাত থেকে বাঁচানো যেতো ছোট কাকী? সে আরো বড় আঘাত। এ তো তবু বেচারা জানছে এতবড় একটা কাণ্ড আর কাজ ও কাউকে দেখাতে পাচ্ছে না। তাতে ব্যাকুলতা আছে, আকুলতা আছে, উত্তেজনা আছে, তবু আশাও আছে। অগাধ আশা। যার জোরে ওর এত এ্যাকটিভিটি, কিন্তু তখন? তখন ওই আশাটাই যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। যখন দেখবে ওর গবেষণা গ্রন্থ পড়ে পড়ে পোকার খাদ্য হচ্ছে, তখন ওর ভিতরটাও ঘুণ ধরে ঝরে পড়বে।

'সত্যি কী অবাস্তব একটা নেশার পিছনে ছুটে মানুষটা---'

সরোজাক্ষ মৃদু গলায় বলেন, 'পৃথিবীতে কোন নেশাটাই বা অবাস্তব নয় বলো? ক্ষমতার নেশা, জয়ের নেশা, একচ্ছত্র নায়কত্বের নেশা, স্বর্গের নেশা, ধর্মের নেশা, সংসারের নেশা—যা কিছুই ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে তার কোনটাই বা অবাস্তব আশার নয়? মানুষ থাকলেই অন্ধ নেশাও থাকবে। হয়তো ওটাই গতির শক্তি।' যেদিন সে টের পায় এতদিন যা নিয়ে বিশ্ব-জগৎ ভুলে ছুটছিলাম, সেটা স্রেফ শূন্য, তখনই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়।'

হৈমবতী প্রতিবাদের সুরে বলেন, 'কিন্তু কখনো কি কেউ 'সাকসেস' হয় না?'

'আমার তো মনে হয় হয় না। শ্রীরামচন্দ্র 'রামরাজ্য' গড়েও সুখী হননি।'

'তবু—ও বেচারার ওই দুর্দান্ত আশা দেখে মনে হচ্ছিল, একটা বইও ওর অন্তত ছাপা হলে—'

'নাঃ। তার পরবর্তী যে ভয়ঙ্কর বাস্তব, ও সেটা সহ্য করতে পারবে না।'

হৈমবতী ঈষৎ অন্যমনা গলায় বলেন, 'কিন্তু এদের জন্যে বড্ড মায়া হয়।'

সরোজাক্ষ একটু হেসে ফেলে বলেন, সকলের হয় না। যেমন এ বাড়ির গিন্নীর।'

হৈমবতী সচমকে বলেন, 'এই সেরেছে! এতক্ষণ যে কথাটা মনেই পড়েনি। কোথায় এ বাড়ির গিন্নী? ইস এতক্ষণ এসেছি, খোঁজ করিনি।'

'সেটা কোন পক্ষের করুণায় তাই ভাবছি—'

'নাঃ। আমারই। আমি এলাম, যাই দেখি গে—'

হৈমবতী উঠে দাঁড়াল।

আর সেই দাঁড়ানোয় হৈমবতী বিপদগ্রস্ত হন। ঘরে ঢুকতে এসেও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি নিজস্ব নিয়মে। আড়ি পেতে অপরের কথা শোনা তাঁর একটি প্রিয় কাজ কিন্তু সেটা প্রকাশ হয়ে পড়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই তিনি সহসা একটুকু সরে গিয়ে সিঁড়িতে গলা বাড়িয়ে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ করে বলে ওঠেন, 'আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ ওটা সেরে ফেলো।'

তারপর সাহস করে ঘরে এসে ঢোকেন।

আর যেন এইমাত্র জানলেন, এমন ভঙ্গীতে বলে ওঠেন, 'ছোট খুড়ি যে? কতক্ষণ?'

বিজয়ার বাপের বাড়িতে কাকীকে 'খুড়ি' বলা রেওয়াজ, তিনি সেটাই চালান।

হৈমবতী অপ্রতিভ গলায় বলেন, 'এই তো খানিকক্ষণ। তুমি বুঝি পুজো করছিলে?'

পুজো?' বিজয়া একটি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'পুজো আর কি, পুজো-পুজো খেলা। তবু এই জঞ্জালের জগৎ থেকে খানিকটা সরে যাওয়া।'

এ কথার আর উত্তর কি।

হৈমবতী চুপ করে থাকেন।

বিজয়া নিজেই আবার পূর্বকথা ভুলে গিয়ে বলেন, 'এসেছো, তা' জেনেছি অনেকক্ষণ মীনা গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে। তবে ভাবলাম, আমি আর সাততাড়াতাড়ি নেমে কি করবো? বিদুষী খুড়ি, বিদ্বান ভাসুরপো, তাদের বড় বড় কথার মধ্যে আমি গিয়ে বসবো, হংস মধ্যে বক। তার চেয়ে থাক। আগে তোমরা প্রাণভরে গপ্পো করে নাও তারপর যাবো।'—বিজয়ার মুখে একটুকরো কুটিল হাসি।

হৈমবতীর কিছুই অজানা নয়, বিজয়াকে তিনি যথেষ্টই চেনেন। তবু সরোজাক্ষ হৈমবতীর উপস্থিতিতে বিজয়ার স্বরূপের এই নির্লজ্জ উদ্‌ঘাটনে একেবারে অবিচলিত থাকতে পারেন না।

সরোজাক্ষ বলে ওঠেন, 'বড় বড় কথা না জানলেই যে 'ছোট' কথা কইতে হবে, এমন কোনো আইন আছে কি?'

বিজয়া মূর্খ হলেও বোকা নয়। বিজয়া এ ধরণের কথার উত্তর জানেন, এবং তা' প্রয়োগও করেন। বলেন, 'ছোট মনের মানুষ, ছোট কথা ছাড়া আর কোথায় কি পাবো বল? তা হলে বোবা হয়ে থাকতে হয়। তা' তাই তো আছি। তোমাদের এই বড় মনের বাড়িতে বোবা হয়েই বসে আছি। ছেলে বৌকে নিয়ে গিয়ে সভার মধ্যে বাইজী নাচ নাচাচ্ছে, বৌ মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে বাড়ি ফিরছে, মেয়ে একটা শুদ্দুরের ছেলের সঙ্গে মাখামাখি করে আখের খোওয়াতে বসেছে, আর কর্তা—'

বিজয়া গলার সব বিষটুকু নিঃশেষে ঢেলে বলেন, 'কার কর্তা ঘরে' 'ভাঁড়ে মা ভবানী' জেনেও, তেজ করে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভোলানাথ হয়ে বসে থেকে বড় কথার চাষ করছেন, বড় বড় বই পড়ছেন, আর এই ছোটলোক মেয়েমানুষটা টাকার কথা বলতে এলেই তাকে ঘেন্না করছেন। তবু তো কথাটি কইছি না—বোবা হয়ে বসে আছি।'

স্বভাবগত ক্রতভঙ্গীতে প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে নেন বিজয়া, মাঝখানে বাধা দেবার অবকাশ না রেখে।

কথার শেষে আর বাধা দেওয়ার প্রবৃত্তি থাকে না সরোজাক্ষর।

সন্দেহ নেই ইচ্ছে করেই এই কথাগুলো হৈমবতীর সামনে উচ্চারণ করে নিলেন বিজয়া, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কারণ, হৈমবতী ভদ্র সভ্য সুরুচি-সম্পন্না। কারণ হৈমবতী সরোজাক্ষর শ্রদ্ধেয় প্রিয়জন। অতএব এই কুরুচি-পূর্ণ কথাগুলো বিজয়ার মুখ থেকে হৈমবতীর সামনে উচ্চারিত হলে সরোজাক্ষ মরমে মরে যাবেন। বলে নিয়ে বিজয়া যেন বিজয় গর্বের উল্লাস অনুভব করেন।

নাও, এখন কোথায় মুখ লুকোবে লুকোও?

খুব যে দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসে উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে তোমার কোন 'উচ্চবস্তুর' চাষ হচ্ছে দেখে যাক সৌখীন খুড়ি!

আজ বাদে কাল বাড়ি বাঁধা দিতে হবে, গয়না বেচতে হবে। এই তো সংসারের অবস্থা, উনি পুরুষ—পরম-পুরুষ সেজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। চিরকাল নিজে মহৎ হলেন, সংসারকে তাকিয়ে দেখলেন না। তাই অমন গুণনিধি ছেলে, তাই অমন বেলেল্লা বৌ হচ্ছে—আরো একটি মুগুর তৈরি হচ্ছে তোমার জন্যে ওই তোমার ছোট কন্যেটিই তোমার মান সম্ভ্রম চ্যাপটা করে দেবেন, দেখতে পাচ্ছি। দিব্যচক্ষে। দিক, দিক না তাই চাই আমি। সমাজে তোমার মুখটা ভাল করে পুড়ুক। উচ্চলোকে বসে নিম্নলোককে ঘেন্না করার ফল ফলুক। মেয়ে যখন হাড়ি-ডোমের গলায় মালা দেবে, তখন আমার নাম কেউ তুলতে আসবে না; তোমার নামেই 'ছি-ছি' পড়বে।

চিন্তা বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী।

সরোজাক্ষর ওই মরমে মরে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হিংসু-গুলকে মুহূর্তে এতগুলো কথা ভেবে নিলেন বিজয়া।

হয়তো এমনিই হয়। যে ঘরটা ভালবাসার বাসা হবার কথা সে ঘরটা শূন্য থাকলে শূন্য পড়ে থাকে না। ঘরটা দখল করে নেয় ঘৃণা, দখল করে নেয় হিংস্র আক্রোশ। তাই ভাইয়ে-ভাইয়ে পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে যদি ভালবাসার ঘাটতি ঘটে, তো বহির্শত্রুর চাইতে অনেক বেশী তীব্র হয়ে ওঠে পরস্পরের হিংসা আক্রোশ ঘৃণা।

কিন্তু কথাগুলো মনে মনে বলেছেন বিজয়া, তাই তৎক্ষণাৎ মুখে বলে উঠতে পারেন, যাক ও সব কথা। ঘরের কেলেঙ্কারী বলবার নয়, তবে তুমিও ঘরেরই লোক তাই বললাম গো খুড়ি। যাক দেখো যেন পাঁচ কান না হয়।'

পাঁচকান।

হৈমবতী হেসে বলেন, 'নাঃ সে ভয়টা অন্তত কোরো না।'

সরোজাক্ষ আরো মরমে মরেন।

সরোজাক্ষ অনুভব করেন বিজয়া লেজেগুজে লড়াইয়ে নেমেছে, ওকে এখন বকে দমানো যাবে না। সরোজাক্ষ কিছু বলতে গেলে বিজয়া আরো অপদস্থ করে ছাড়বেন স্বামীকে। অনেক সময় আলাতুমে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এই প্রবৃত্তি। বাইরের লোকের সামনে বাড়ির লোককে অপদস্থ করতে পারলে আর কিছু চায় না তারা।

কিন্তু বিজয়া কি ছোট বাচ্চা?

বিজয়ার হিংসুতাটা কি কেবলমাত্র 'আলাতন' বলে স্নেহের 'কোপ' দেখিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

হৈমবতী সরোজাক্ষর মনের ভাব পাঠ করতে পারেন। তাই সহাস্য-সপ্রতিভতায় বলে ওঠেন, 'তা কি হলো বৌমা তোমার ঠাকুরের প্রসাদ-টুসাদ কই? বার করো? আর একটু চা খাওয়াও। তর্ক করে গলা শুকিয়ে গেছে।'

সরোজাক্ষ কৃতজ্ঞচিত্তে এই করুণাময়ীর দিকে তাকান, সরোজাক্ষর বুঝতে বাকি থাকে না বিজয়াকে অন্য কাজে অন্যমনস্ক করার তাল হৈমবতীর।

বিজয়া কিন্তু এ ফাঁদে পা দেন না। বিজয়া অম্লান গলায় বলেন, 'ঠাকুরের প্রসাদ? সে আর তোমার মতন 'মেম-শাশুড়ীর জন্যে' কি আর আনতে সাহস করি? চাকরকে দোকানে পাঠিয়েছি খাবার আনতে। তোমার তো আর বামুনের ঘরের বিধবার মতন অত শুচি-বাই নেই, 'ওদের দিকে যাচাই করে দিতে বলেছি। এই আনলো বলে।

হৈমবতী স্তব্ধ হয়ে যান—'

হৈমবতী স্বখাত সলিলের চেহারা দেখতে পান। এরপর আর তাঁর বলার উপায় রইল না, 'খাবো না খিদে নেই।'

এরপর বসে বসে শুনতেই হবে, 'বেশ আছো বাবা ছোট খুড়ি, বিচার-আচারের বালাই নেই, চাকর বাকর যা দিলো খেলে। আমার মতন মরণ-দশা নেই বাবা তোমাদের।'

শুনতেই হচ্ছে, কারণ বিজয়া যেখানে উপস্থিত, সেখানে সকলেরই শ্রোতার ভূমিকা হতে বাধ্য। বিজয়া যেন অন্য সকলের সমস্ত সূক্ষ্ম কোণ আর মিহি ধার, ভোঁতা পাথরে শান দিয়ে ক্ষইয়ে দিতে চান।

সরোজাক্ষ কি প্রার্থনা করছিলেন একটা কিছু দুর্বিপাকও ঘটুক, যাতে বিজয়ার কথা থামে। আর সরোজাক্ষর বিধাতা শুনতে পান সে প্রার্থনা এবং মঞ্জুরও করেন?

তাই কথার মাঝখানে দুর্গ্রহের আবির্ভাব ঘটে।

নীচতলায় কি যেন একটা হৈ-চৈ ওঠে, তারপর সিঁড়িতে জুতোর শব্দ, সেই শব্দছন্দের শেষ যতিতে এসে দাঁড়ায় সরোজাক্ষর ছোট ছেলে।

হাতে ছোট স্যুটকেস।

কপালে চওড়া ব্যাণ্ডেজ।

(ক্রমশঃ)

নীড় ও অশ্রু

উপল বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'টি হাঁস, তরুণ-তরুণী, একমুঠো ফেনা,
নীড় খোঁজে, লালফুলে সবুজ ঠিকানা-
লেখা মৃতবৎসা পৃথিবীর 'পরে।
জেটের ধোঁয়ায় কালো আকাশ উপরে
কখনো বা ভেজা-ভেজা মেঘেও মেদুর,
তার নীচে মেলে-দেওয়া একজোড়া ডানা—
আকাশের চেয়ে কাছে, আকাশের চেয়ে
আরো দূর।

সবুজ ঘাসের রাজ্যে, সোনা-সোনা রোদে
দু'ফোঁটা চোখের জলে আছে কিনা দাম
লাভ নেই ভেবে;
তবু এই সূর্যাস্তের নীল অবরোধে
আকাশ কুড়িয়ে এনে তুমি যাই দেবে—
দু'হাতে নিলাম॥

মুছবে না

বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

আফ্রিকার জংগল থেকে বেড়িয়ে আসে
সুসভ্য নেকড়ে
প্রতিটি থাবার সুতীক্ষ্ম নখরে
পোষা মানুষের মৃত্যু
পবিত্র জীবনের টবে
নারকীয় ব্রততীর বীজ
নবযুগের প্রাকামা শিকলকাটা টিয়া
অনন্ত আকাশের খাঁচায়
এবং হয়তো এও সত্য
কবির কবিতা লেখা বন্ধ হলেও
মুছবে না নিগ্রো ক্রীতদাসীর অশ্রু।

খেলাধূলার আসর

শ্রীখেলোয়াড়

বেণুকুমার সম্বা

কোলকাতার মাঠে নবাগত বেণুকুমারের জন্ম বাঙ্গলার মাটিতেই ১৯৪৯ সালে দার্জিলিং জেলার একটি গ্রামে। বাদামতাম টি এস্টেটে। দার্জিলিং-এর টার্নবুল হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সাংসারিক অবস্থা স্বাচ্ছল না থাকার দরুণ পড়াশুনায় আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। বাধ্য হয়েই তাই তাঁকে সেনাবিভাগে চাকুরী নিতে হয় ১৯৬৩ সালে। কিন্তু শিশুকাল থেকে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ থাকার দরুণ তিনি গুর্খা ব্রিগেডে ফুটবলের ট্রেনিং নিতে শুরু করেন। তাঁর খেলায় সন্তুষ্ট হয়ে পরিচালকমণ্ডলী বেণুকুমারকে অল ইণ্ডিয়া সোহাও ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাঁদের টীমে অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধু তাই নয় ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতাতেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া সেনা বিভাগের প্রতিযোগিতাতেও নিজের ডিভিশনের হয়ে তিনি খেলেছিলেন।

১৯৬৫ সালেও বেণুকুমার গুর্খা ব্রিগেডের হয়ে ঐ একই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। পরের দুটি বছর তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার দরুন কোন খেলাতেই অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু অনুশীলনের ত্রুটি তিনি রাখেন নি কোনদিনও। দম যাতে নষ্ট না হয়, শরীরে মেদ যাতে না বাড়ে, গতিবেগ যাতে হ্রাস না পায় তার জন্য সবরকম দৈহিক কসরৎ তিনি করে গেছেন।

পরের বছর ফিরে এসে পুনরায় গুর্খা ব্রিগেডের হয়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম গোল্ড কাপে খেলেন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কোলকাতার মাঠে তাঁর যোগদান এই বছরেই। এরি মধ্যে অবশ্য তিনি কোলকাতার জনপ্রিয় বহু টীমের বিরুদ্ধে খেলেছেন এবং কোলকাতায় আসার আগে ব্যক্তিগতভাবে অনেকের সঙ্গে পরিচিতও হয়েছেন।

ভারতের প্রতিযোগিতামূলক জাতীয় ফুটবল টীম অথবা সন্তোষ ট্রফির হাঁকডাকওয়ালা কোন খেলায় তিনি আজো অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান নি ঠিকই কিন্তু আপন যোগ্যতায়

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার টনি রোচের একটি বল ফেরাচ্ছেন

সে সুযোগ তিনি শীঘ্রই করতে পেরেছেন। শারীরিক ক্ষমতা, প্রচুর দম, স্থির বুদ্ধি ও সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের অধিকারী বেণুকুমার কোলকাতার মাঠে এরই মধ্যে ক্রীড়ামোদীদের চিত্ত জয় করে নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যে সারা ভারতে জয়ের কৃতিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন তা আশা করা মোটেই অমূলক নয়।

সৈয়দ নইমুদ্দিন

আই এফ এ'র অফিসে সেদিন দুরন্ত ভিড়। এদিকে ওদিকে ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে চাপা গুঞ্জরণ। একদিকে প্রবল উৎকণ্ঠা, অপরদিকে আনন্দের ঢেউ। কি ব্যাপার বুঝতে না-বুঝতেই বিরাট একদল বেরিয়ে এল। কিন্তু যাকে নিয়ে বিরাট এই উত্তেজনা তার দেখা পেলাম না। পরে খবর পেলাম নইম মোহনবাগান-এর হয়ে ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। খেলোয়াড় নইম সকল ক্রীড়ামোদীরই কাছে যে কত প্রিয় সেদিনকার সেই ভিড়ই তার প্রমাণ।

নইমের আসল নাম সৈয়দ নইমুদ্দিন। পুরানো দিনের নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় সৈয়দ বসিরুদ্দিনের পুত্র তিনি। ১৯৪৪ সালে হায়দ্রাবাদ শহরে নইমের জন্ম। পিতা স্বনামধন্য খেলোয়াড় হলেও খেলাধুলার চর্চা বাড়ীতে ছিল না বা সেইরকম উৎসাহও তিনি পান নি কোনদিন। তবে ভারতবিখ্যাত কোচ রহিম সাহেবের তিনি সংস্পর্শে আসেন স্কুলজীবনে। হায়দ্রাবাদের জমিরস্থান হাই স্কুলের তিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে আসার ফলেই নইমুদ্দিনের ফুটবলের প্রতি আগ্রহ জন্মায় এবং তিনি অনুশীলন শুরু করে দেন।

কিছুকালের মধ্যেই তিনি স্কুল দলে রাইট ফুলব্যাক হিসাবে নিজের স্থানটি নির্ধারিত করেন। অধিনায়কও হলেন স্কুল দলের অল্প সময়ের মধ্যেই। কিছুদিন রাইট ফুলব্যাক হিসেবে খেলার পর স্টপার হিসেবে রহিম সাহেব তাঁকে খেলার তালিম দেন। ১৯৫৭ সালে আর্টেন্যান ক্লাবে নইমুদ্দিন যোগদান করলেন। ঐ ক্লাবের হয়ে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের বিরুদ্ধে যে অনন্যসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, তা আজো স্থানীয় বহু ক্রীড়ামোদীর মন থেকে মুছে যায় নি। যার ফলে পরের বছরেই হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলে তাঁর ডাক পড়লো। ১৯৬০ থেকে '৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত দলের হয়ে খেলেছেন, এবং ভারতের বহু নামকরা প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ নিয়েছেন। অন্ধ্র রাজ্য দলের হয়ে পর পর ছ' বছর তিনি সন্তোষ ট্রফির খেলাতেও অংশ নিয়েছেন। ১৯৬৬ সাল থেকে অবশ্য তিনি খেলছেন বাংলা দলের হয়ে। '৬৩ সালে এশিয়া যুব ফাইন্যালে ভারতীয় দলের তিনিই নেতৃত্বে ছিলেন। '৬৪ সালে তেলআবিবে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপেও ভারতীয় টীমে তিনি অন্তর্ভুক্ত হলেন। এ বছরই তিনি তেহরানে ইরাণের বিরুদ্ধে অলিম্পিকের প্রাথমিক রাউণ্ডে খেলার জন্য। এ ছাড়া ঐ বছর মার্ডেকা টীমেও খেলেন। ভারত সফরকারী রাশিয়ান ফুটবল টীমের বিরুদ্ধেও তিনি খেলেছেন। '৬৫ সালে ইস্টবেঙ্গলের ডাকে কোলকাতার মাঠে খেলতে শুরু করেন। এবং তাঁর নাম সারা ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান মরশুমে তিনি মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করেছেন।

ছাত্র হিসেবেও নইম খুবই মেধাবী এবং অধ্যাপকদের খুবই প্রিয়। বর্তমানে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র।

টেনিস

গত ২৪শে জুন অল ইংল্যাণ্ড টেনিস ক্লাবের পরিচালনায় ঐতিহাসিক উইম্বলডন টেনিস কোর্টে ৮২তম উইম্বলডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। প্রতিযোগিতার স্থায়িত্বকাল ছিল এক পক্ষ। এই বারেরএই প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পেশাদার ও অপেশাদার খেলোয়াড়দের একসঙ্গে অংশগ্রহণ, যা প্রতিযোগিতার ৯১ বছরের ইতিহাসে কখনো হয় নি।

১৯৬৮ সালের বাছাই তালিকায় পুরুষদের সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়ার এবার বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার শীর্ষস্থান পেয়েছেন এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে পেশাদার খেলোয়াড় শ্রীমতী বিলি জিন কিং ছিলেন শীর্ষস্থানীয়া।

শ্রীমতী কিং অপেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে গত বৎসরেই তিনটি খেতাব পেয়েছিলেন। ভারতের তিনজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণাণ, প্রেমজিৎলাল ও জয়দীপ এই প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা আজ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায়-সেমি-ফাইন্যাল ছাড়া আর বেশীদূর যেতে পারেন নি। এরও কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন কৃষ্ণাণ।

টিকিটের জন্য এবার যে-রকম হাহাকার পড়েছিল তা পূর্বেকার সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাই নিরুপায় হয়ে লটারীর ব্যবস্থা করেছিলেন। জনসাধারণ তাঁদের চাহিদামত টিকিটের মূল্য চেক মারফৎ পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু ১২০০০০-এর মত স্টার্লিং চেক কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। গত বছরে ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল ২০০০০ স্টার্লিং।

এই প্রতিযোগিতায় যাঁরা জয়লাভ করবেন ট্রফি তো তাঁরা পাবেনই, উপরন্তু পাবেন ২৬১৫০ স্টার্লিং ও বাড়তি আরো বিপুল অর্থ। পুরুষদের সিঙ্গলসে খেতাব-বিজয়ীরা পাবেন ২০০০ স্টার্লিং এবং মহিলারা পাবেন ৭৫০ স্টার্লিং।

অপেষাদার খেলোয়াড়রা অবিশ্যি তাঁদের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে কোন আর্থিক পুরস্কার গ্রহণ করেন না। মহিলাদের মধ্যে এবারও আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং বিশ্ববিজয়ীর খেতাব পর পর তিনবার লাভ করলেন এবং পুরুষদের মধ্যে বিজয়ীর খেতাব লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার রড লিভার।

বিশ্বকর্মা : কর্মকাণ্ডের মস্তিষ্ক ও সভ্যতার প্রতীক

মণিলাল খান

বিশ্বকর্মার মত শিল্পী বা বৈজ্ঞানিক বিস্মৃতকালের গ্রন্থে দ্বিতীয় কোন উদাহরণ নেই। তিনি এদেশের শিল্প-বিজ্ঞান জগতের একক ধ্রুব-নক্ষত্র। ভারতের আত্মিক শক্তির এক-দিকে বেদ-পুরাণ-উপনিষদ, আর এক-দিকে অজন্তা ইলোরা কোনারক প্রভৃতি ভাস্কর্য নিদর্শন। উভয়ের মধ্যেই সনাতন ভারতের চিত্তশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বকর্মা বিশিষ্ট একটা চিত্তশক্তির উৎসস্বরূপ। নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য প্রতিভার একটা রসমূর্তি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর তখন মনে হয়---'বিশ্বকর্মা' একটা অখণ্ড পুরুষ-শক্তি, বিশ্বকর্মা একটা 'আর্টের' প্রতীক এবং সবশেষে বিশ্বকর্মা একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়। এই ত্রিমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকর্মার ভাষ্যদানের চেষ্টা করা যেতে পারে।

বিশ্বকর্মা একটা অখণ্ড পুরুষ-শক্তি

শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে পরমাত্মা বিশ্বকর্মা সৃষ্টির পূর্বে থেকেই বিদ্যমান আছেন এবং তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাগণকে সৃজন করেন। পরে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করে শিল্পবিদ্যা প্রকাশ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ, রুদ্রয়োমল বাস্তুতন্ত্র, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশ্বকর্মা সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি শিল্প-বিদ্যার প্রচারার্থে তিনবার রূপধারণ করেন।

এই শিল্প-প্রজাপতি বিশ্বকর্মা-দেবের যে মূর্তিপূজা বর্তমানে প্রচলিত আছে, সেটি 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' থেকে গৃহীত। হস্তিসমারূঢ় বিশ্বকর্মার এই মূর্তি উপযুক্ত ও ভাববাহী নয়। বলা বাহুল্য পণ্ডিতগণ ঐ পুরাণখানির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। ভাটপাড়া - নৈহাটী এবং কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে এই শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠদশকে উপযুক্ত ধ্যানমন্ত্র উদ্ধার করে শিল্পিসম্প্রদায়গণ কর্তৃক নবকলেবরে বিশ্বকর্মা দেবের পূজা শুরু হয়ে গেছে। সেই ধ্যানমন্ত্রটি এইরূপ :

প্রাতরুণ বর্ণাভং শ্বেতহংস সমারূঢ়ং।১
দিগ্বাহু পঞ্চ বক্ত্রঞ্চ নানা শস্ত্র সমন্বিতং।।২
মণি কৌস্তভ ভূষিতং পীতবসনং
ধারিণম্।৩
হিরণ্যগর্ভ দেবেশ বিশ্ব-শিল্প
প্রকাশকং।।৪
---মূলস্তম্ভ।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকর্মা দেবের রূপটি সম্পূর্ণভাবে এই ধ্যানমন্ত্রেই প্রকাশ পেয়েছে। সোনারও---সকালের মত উজ্জ্বল তাঁর দেহকান্তি, তিনি শ্বেত-হংসের ওপর অবস্থান করছেন, তাঁর পাঁচটি মুখ, দশহস্তে নানা অস্ত্র ও বস্ত্র এবং অলঙ্কারযুক্ত পীতবর্ণ পোষাকে তিনি শোভা পাচ্ছেন।

যিনি সকল দেবতাগণকে সৃজন করেন, সৃষ্টির আদি থেকে যিনি বিদ্যমান, শিল্পবিদ্যায় যিনি সুদক্ষ---সেই বিরাট পুরুষ বিশ্বকর্মাদেবের উপযুক্ত বাণী রূপই মূলস্তম্ভে বর্ণিত। বিভিন্ন পুরাণেও বিশ্বকর্মার পঞ্চমুখের উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, শিল্প-সংহিতা, বিশ্বস্তুর বাস্তুশাস্ত্র, মৎস্য পুরাণ, মহা-ভারত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশ্বকর্মার বহু প্রশংসা, সম্মান ও পূজার উল্লেখ দেখা যায়। পদ্মপুরাণ ভূখণ্ড স্কন্ধে বিশ্বকর্মা মাহাত্ম্য ২৫ অধ্যায়ের ৭-১৩ শ্লোকে দ্বারকা নির্মাণকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্মার বন্দনা করেন। বিপদ-কালেও দেবতাগণ বহুবার বিশ্বকর্মার সহায়তায় মুক্তিলাভ করেছেন।

বিশ্বের যা কিছু শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন সবই তাঁর সৃষ্ট। স্বর্গরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী, লঙ্কেশ্বর রাবণের স্বর্ণলঙ্কা, পাণ্ডবগণের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বজ্র প্রভৃতির নির্মাতাও বিশ্বকর্মা। তাছাড়া তিনি সোমযজ্ঞের কর্তা। বস্তুত তাঁর সম্বন্ধে ষষ্ঠিত পুরাণ, তৃতীয়কাণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : 'বিশ্বকর্মা পরব্রহ্ম-জগদাধার সূত্রক:',---বিশ্বকর্মা পরম-ব্রহ্ম, জগতের আধার ও সূত্রস্বরূপ।

বিশ্বকর্মাদেবের জন্ম সম্বন্ধে 'নিখিল ভারত আদি আর্যজাতি' সমন্বিত বিশ্বকর্মার কুলজ ও কালী সিংহের মহাভারতের আদিপর্বে ষটষষ্টিতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা হতে যে সমস্ত প্রজাপতির উৎপত্তি, তাঁদের অন্যতম প্রজাপতি ধর্মঋষির পুত্র---প্রভাস বসুর ঔরসে ও বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী---সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেন, তাঁর গর্ভেই শিল্প-প্রজাপতি দেবসূত্রধরের জন্ম। তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শিল্পের প্রচারার্থে বিশ্বকর্মা তিনবার রূপধারণ করেছিলেন---বিভিন্ন পুরাণে তার উল্লেখ আছে।

বিশ্বকর্মা শিল্পকলা বা আর্টের প্রতীক

'আর্ট' বা শিল্পও বিশিষ্ট একটা বিদ্যা। অবশ্য কাব্য-সাহিত্যও আর্ট-এর মধ্যে পড়ে, সে কথা স্বতন্ত্র। যে চিত্তশক্তির সাহায্যে হোমের সময় যাজ্ঞিক ঋষিগণ জ্যামিতিক বিভিন্ন 'ফিগার' উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, শিল্পিগণের শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে সেই শক্তি আরও নিখুঁত ও গভীর ছিল। কেন না, বালি দিয়ে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি চিত্রনির্মাণ ব্যাপার যে খুব সূক্ষ্ম ছিল তা বলা যায় না; কিন্তু রথের চাকা, তীরের ফলা নির্মাণ অথবা প্রাসাদের নক্সা রচনা কিংবা মন্দিরের সু-উচ্চ চূড়ায় কলস প্রতিষ্ঠার

ব্যাপারে যে জ্যামিতির সূক্ষ্ম হিসাব অথবা চিত্তবৃত্তির প্রগাঢ়তার আবশ্যক সে কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এমন অনেক বস্তু আছে যা মানুষকে মুগ্ধ করেছে। যেমন শিশুচাঁদ টেলিভিশান, রকেট, উড়োজাহাজ, মারণাস্ত্র প্রভৃতি। কিন্তু বেদ-পুরাণে বর্ণিত এই ধরণের অনেক কিছুই যে তৎকালীন শিল্পিগণের বা ঋষিগণের আয়ত্তাধীন ছিল এমন সন্দেহ অমূলক নয়। পুষ্পকরথ (উড়োজাহাজ), দৈববাণী (টেলিফোন), পুনর্জীবন ব্যাপার, অস্ত্রাদি, দিব্যদৃষ্টি, অন্তর্ধান, দূরবীক্ষণ যন্ত্র---প্রভৃতি আশ্চর্য বিষয়সমূহের মধ্যে যে যান্ত্রিক-কলা-কৌশলের ব্যাপার ছিল তা বলা বাহুল্য।

বেদ-পুরাণের কথা ছেড়ে দিলেও বর্তমান পৃথিবীতে বিগত বিস্মৃত কত শতাব্দীর শত শত কীর্তি বা ঐতিহ্য গর্বের ও আকর্ষণের বস্তু হয়ে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে অজন্তা গুহামন্দির, ভুবনেশ্বরে হিন্দু সরোবরের পাথরের মন্দির, কোনাচার্যের নির্মিত কোনারকের সূর্য-মন্দির। এখান থেকে অতীতের জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্থিতি ও গতিবিধি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতেন। ১১২০ ধাপ পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত বরাহ নরসিংহ স্বামীর পাথরের মন্দির, গুজরাটে স্থাপিত সোম বা চন্দ্রসূত্রধরের নির্মিত সোমনাথ মন্দির, এ ছাড়া কাশী-বিশ্বনাথ ও তাঁর স্বর্ণমন্দির, গয়া, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, বদরীনারায়ণ, বক্রেশ্বর পুরী এবং দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থে আরও কত ভাস্কর্য-নিদর্শন রয়েছে। মৌর্যযুগে লৌহনির্মিত অশোক-স্তম্ভগুলো অক্ষতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত জল-ঝড়---এগুলোর গায়ে আজও এতটুকু মরচে ধরাতে পারে নি।

ভারতের এই সমস্ত ভাস্কর্য নিদর্শনের মধ্যে বেদ-পুরাণের ভাষাই প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে---চিত্রে ও রূপে। পৃথিবীর নানাদেশ থেকে কতলোক ভারত-দর্শনে আসেন, কেউ বা এদেশের বেদ-পুরাণ-কাব্য-সাহিত্যকে জানতে চান, আর কেউ সেই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করতে চান তীর্থে তীর্থে ছড়ানো বিশ্বকর্মার জীবন্ত-গ্রন্থের শিল্প-সৌন্দর্যের পৃষ্ঠার মধ্যে। এই বিশাল শিল্পলোকই বিশ্বকর্মার প্রতীক।

বিশ্বকর্মা একটা সম্প্রদায়

বেদ-পুরাণের বিস্মৃতলোক থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত যে সম্প্রদায়, বিশ্বকর্মার প্রতিভাকে অথবা শিল্প-বিদ্যাকে বহন করে এনেছেন---পরম-পুরুষ শিল্প-প্রজাপতি বিশ্বকর্মার নামানুসারে সেই সম্প্রদায়কে 'বিশ্ব-ব্রাহ্মণ' বা 'বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করা হয়। পুরাকালে এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় একত্রে বেদচর্চা ও শিল্পচর্চা করতেন। বাস্তুশাস্ত্র, মৎস্য-পুরাণ, পদ্ম-সংহিতা, ঋগ্বেদে বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণগণের দেবালয় ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করবার কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণ যজুঃ বিশ্বরূপকে (বিশ্বকর্মার ভাই) দেবতাগণের পুরোহিত বলে উল্লেখ করেছেন---'ত্বাষ্ট্রোদেব পুরোহিতঃ' (কৃষ্ণ যজুঃ ১৬৪ পৃষ্ঠা)। আধুনিক কালেও অনেক প্রদেশে এই ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করে থাকেন। তবে অনেকের নিকট কালক্রমে শিল্পচর্চাই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের অনেক প্রদেশে এই ব্রাহ্মণগণ আঞ্চলিক নামেও খ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত। যেমন মিথিলায় বিশ্বকর্মা-ব্রাহ্মণকে মৈথিলি ব্রাহ্মণ, কনৌজ কনৌজী ব্রাহ্মণ বা জঙ্গিদা ব্রাহ্মণ, বোম্বাই প্রদেশে পাঞ্চাল ব্রাহ্মণ, বিহারে একটি শাখাকে বঢ়াই বলেও অভিহিত করা হয়। ভারতের সেন্সাস রিপোর্টে-এ এই ব্রাহ্মণগণ বিশ্বকর্মা বা বিশ্ব-ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃত।

দক্ষিণ ভারতে 'বিশ্বকর্মা প্রচার সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশংকরাচার্যের জীবনীগ্রন্থ 'শংকর-বিজয়'-গ্রন্থে বলা হয়েছে :

আচার্য শঙ্করনামা ত্বষ্টাপুত্রো ন সংশয়ঃ।
বিপ্রকুল গুরুদীক্ষা বিশ্বকর্মাস্তু ব্রাহ্মণঃ॥

আনুমানিক খৃঃ অষ্টম শতকে দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রামে শংকরাচার্যের জন্ম। তিনি বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ-প্রভাব থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রক্ষার জন্যে মাদ্রাজে বৈদিক ধর্ম প্রচারে গমন করেন। তখন তিনি এই পরিচয়ে পরিচিত হন।

অতএব দেখা যাচ্ছে খৃঃ অষ্টম শতকেও বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য ব্রাহ্মণ-গণের ও নৃপতিগণের অসহযোগিতায় কোথাও কোথাও বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ-বংশের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়।

এখন দেখা যাক বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ বংশের মধ্যে কোন্ কোন্ শিল্পিগোষ্ঠী পড়েছে এবং সেখানে বেদ ও পুরাণের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কতখানি।

বশিষ্ঠ পুরাণ, তৃতীয় কাণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বিশ্বকর্মার পঞ্চমুখ থেকে সানগ, সনাতন, অহভূন; প্রত্ন ও সুপর্ণ নামে পাঁচটি আদি ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হন---তাঁরাই পাঁচটি শিল্পবিদ্যায় সুদক্ষ এবং বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হন। এই শিল্প-বিদ্যাগুলি কী কী স্কন্দপুরাণে তারও সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া আছে :

মনু ময়শ্চ ত্বষ্টাশ্চ শিল্পি বিশ্বজ্ঞ এব চ।
পঞ্চৈ তে দেবঋষয়ো বিশ্বকর্মা
মুখোদ্ভবা॥
অয়স্কৃতির্মনুনাঞ্চ ময়ানাং দারুকর্ম চ।
ত্বষ্টানাং তাম্রকর্মাণি শিলাকর্ম চ
শিল্পীনাম্॥
সুপর্ণ তক্ষকানাঞ্চ পঞ্চ কর্মাণি তানি বৈ।
এতে পঞ্চৈক রূপাশ্চ যজ্ঞকর্ম
পরাস্মৃতা॥
---স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

মনু, ময়, ত্বষ্টা, শিল্পি ও দৈবজ্ঞ---এই পাঁচজন দেবঋষি বিশ্বকর্মার মুখ থেকে উৎপন্ন। তাঁদের মধ্যে মনু লৌহকর্ম, ময় কাষ্ঠকর্ম, ত্বষ্টা তাম্রকর্ম, শিল্পী শিলাকর্ম ও দৈবজ্ঞ সুবর্ণকর্ম করতেন। এই সকল কর্ম যজ্ঞকর্ম রূপেই সমাদৃত।

অতএব দেখা যাচ্ছে ভারতের পাঁচটি প্রধান ধাতুর শিল্প-সাধকগণ বিশ্বকর্মা বা বিশ্বব্রাহ্মণ বলে পরিচিত। একমাত্র বাঙলা দেশে বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ বংশের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা কয়েক দশক আগে পর্যন্ত স্বীকৃত ছিল না। সমাজে তাঁরা পতিত হয়ে ছিলেন। পণ্ডিতগণের ধারণা যে, তাঁদের এই পাতিত্য হিন্দুরাজগণের (বল্লাল সেন) সময় থেকেই সুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এর মূলে দুটি কারণ বিদ্যমান :

প্রথমত, ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে অবস্থিত 'অখিল ভারত পাঞ্চাল (বিশ্বকর্মা) ব্রাহ্মণ মহাসভা'র সম্পাদকের নিকট থেকে ৯ই এপ্রিল ১৯৩৩-এ প্রাপ্ত এক আবেদন অনুসারে লাহিড়ীসরাই ক্যাম্পে অবস্থিত 'নিখিল ভারত ব্রাহ্মণ মহাসভা'র তৎকালীন সাধারণ সভাপতি শ্রীকামেশ্বর সিংহের ১৭ই জুন ১৯৩৩-এর প্রেরিত---বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ হিসাবে এ্যাফিলিয়েশন সার্টিফিকেট বা স্বীকৃতিপত্র।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট-এর সমর্থন। ১৯৩১ সালের আদম সুমারিতে এই সম্প্রদায়কে বিশ্বব্রাহ্মণ বা বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ লেখার আদেশ সেনসাস্ কমিশনার জে, এইচ, হাটন-এর এক টেলিগ্রামে জানা যায়। নিম্নে সেই টেলিগ্রামের অনুলিপি উদ্ধৃত হল :

Census Commissioner for India's Wire D. 14. 2. 31. to Bijoy Krishna Roy Sharma, General Secretary, A. I. Viswakarma Brahman Mahasava, Bengal Provincial Branch, Kanchrapara "Return of Viswa Brahman may be made if herediatry caste occupation be added."

---Census Report

অর্থাৎ বংশগত পেশার নাম উল্লেখ করলে বিশ্বব্রাহ্মণ লেখা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক ভারতে বিশ্বকর্মা চর্চা কেবলমাত্র বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই---সকল জাতির মধ্যেই প্রসারলাভ করেছে। ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যা পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা চালু রয়েছে। বস্তুত, বিশ্বকর্মা আজ স্বাধীন ভারতের কর্মকাণ্ডের মস্তিষ্ক এবং সভ্যতার বিশিষ্ট প্রতীক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম)।

২। ঠাকুর গিরিজাকান্ত ভক্তিভূষণ (নবদ্বীপ সার্বজনীন শ্রীগৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠীর সম্পাদক) : ভারতে বিশ্বকর্ম--পাঞ্চাল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় (১ম সংস্করণ ১৩৮৪ সাল)।

৩। বঙ্গীয় সূত্রধর সভা : হীরকজয়ন্তী সংখ্যা ১৯৬২ সাল।

৪। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকারশর্মা : * বিশ্বকর্মার জ্ঞাতি কৌমুদী (১ম সংস্করণ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)।

।। বিশ্বকর্মা প্রতিচিত্র 'বিশ্বকর্মা জ্ঞাতি কৌমুদী' থেকে গৃহীত ।।

ব্যর্থতাকে নিয়ে

সাতকড়ি ঘোষ

এ নিস্পৃহতাই তো কাম্য
ছিল না আমার ; এ গভীর
অন্ধকারে মুখ লুকোতেও
চাই নাই এ অবসর।

আর সব আঁধার ছেঁড়া ভোরেরই
মতন---আলোর সমুদ্রে স্নান
করতে চেয়েছিনু বার বার।

ওদিকেও দেখি যুবকেরা প্রাণ দেয়
মন দেয় কিসের আশায়
হ্যানয় থেকে সায়গনে, লাদাক
আর সিন্ধু সীমানায়।

সেই সব মূর্খ রাজা সেনাপতিদের
ইচ্ছা দিয়ে গড়া ভুলের ফলে
রক্তের স্রোত বুঝি আঘাত হানে
বার বার নকল মাস্তুলে।

হায়, এখন আঁধারেও
এত মানুষ শান্তির সুখ
খুঁজে বেড়ায় ; মানুষ হওয়ার গর্বে
মানবীকে বুকে চেপে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা বাড়ায়।

॥ ইন্দ্রসেন ॥

রাজা।—এতে ক্লান্ত-মনসঃ পুনর্নবীকৃতা স্মঃ।

—মহাকবি কালিদাস

ইং ১৫৯৯ খৃস্টাব্দ।

বসুবংশপাবন মহাবীর কন্দর্পনারায়ণ পত্রোত্তরে মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে জানালেন, আমি আপনার একমাত্র কন্যার সহিত আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান রামচন্দ্রের বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত আছি। তবে পাত্র এবং পাত্রী উভয়েরই বয়স অত্যন্ত অল্প, তজ্জন্য মহারাজার সমীপে নিবেদন, আরও কিছুকাল অপেক্ষা করেন। আমার পুত্র সর্বগুণান্বিত রামচন্দ্র দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলেই আমি বিবাহের দিনক্ষণ স্থির করিব জানিবেন। আশা করি, প্রতিকূল পরিস্থিতি আপনি উপলব্ধি করিবেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাই, মহারাজা প্রতাপাদিত্য দীর্ঘজীবী হউন। আমার শারীরিক অবস্থা সুস্থ নহে। বয়সের আধিক্য আমাকে এক প্রকার পঙ্গু করিয়াছে। রাজ্য-পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করিতেও সক্ষম নহি বর্তমানে পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যভার দান করিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিব মনস্থ করিয়াছি। আশীর্বাদ করেন, রামচন্দ্র যেন সুচারুরূপে রাজ্য-চালনার যোগ্যতা অর্জন করে। অলমিতি—

কন্দর্পনারায়ণের স্বহস্তে লিখিত পত্রখানি পেয়ে মহারাজা প্রতাপাদিত্য যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলেন। পত্রবাহক প্রতিনিধিদের পুরস্কৃত করলেন তিনি। মহারাণী পদ্মিনীর মহলের দিকে চললেন প্রসন্ন অন্তরে। সহাস্যে বললেন,—মহারাণী, এই দও মহারাজা কন্দর্পনারায়ণের পত্রলিপি। মহারাজা স্বহস্তে লিখেছেন। এই বিবাহ-প্রস্তাবের শুভকর্মে তিনি সম্মত আছেন। কিন্তু পুত্র রামচন্দ্র দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম না করা পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করতে হবে, মহারাজা সবিনয়ে জানিয়েছেন। তথাস্তু। তাই হউক। এমন লোভনীয় পাত্রটিকে ত্যাগ করা যায় না।

কথা শুনতে শুনতে মহারাণী পদ্মিনীর হৃদ্‌ঘাত যেন থেমে থাকে। নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে দিনরাত্রি যাপন করেন মহারাণী। এ যাবৎ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কোন কথা কখনও অমান্য করতে সাহসী হন নাই তিনি। একমাত্র নাবালিকা কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহের কথাটা কেমন যেন তাঁর মনে ধরে না। তবুও মুখ ফুটে প্রতিবাদ জানাবেন, সাহস হয় না তেমন। কিশোরী বিন্দুমতী অন্যের ঘরে চলে যাবে, ভাবতেও জ্বালা ধরে বুকে। ঘুমে জাগরণে সকলের অলক্ষ্যে অশ্রুপাত করেন মহারাণী।

স্বস্তির শ্বাস পড়লো পদ্মিনীর। কন্দর্পনারায়ণ জানিয়েছেন, অপেক্ষা করতে হবে। শুনে আশ্বাস পেলেন মনে মনে। ঘন-অন্ধকার, ধীরে ধীরে চোখের সমুখ থেকে অপসৃত হতে থাকে। মহারাণী জলসিক্ত চোখে, হাস্যমুখে বললেন,—ভাল কথা। আপনি যেমন বলেন তেমন হবে। আমার কোন বক্তব্য নাই।

স্মিতহাসির সঙ্গে প্রতাপাদিত্য বললেন,—এ যে দেখি তোমার ইচ্ছাই ফলবতী হল। বিন্দুমতী আরও কিছুকাল তোমার কাছে থাক, আর কী চাই?

অশ্রু টলমল করে পদ্মিনীর পটলচেরা চোখে। তিনি বললেন,—বিন্দুমতী এই পৃথিবীর কিছুই জানে না। জ্ঞান তার কতটুকু! এখনও পুতুলখেলা করে। লজ্জা সম্ভ্রম কাকে বলে জানে না।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—এখন হতে বিন্দুমতীর প্রতি তুমি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। সংসারের কাজে-কর্মে সে যেন মন দেয়। সকল পার্থিব বিষয়ে যেন তার জ্ঞানোদয় হয়। যেন ন্যায় অন্যায় কাকে বলে জানে সে। যেন নীরোগ নির্ব্যাধি থাকে, লক্ষ্য রাখিও।

পাথরের ভার, যেন নামল বুক থেকে। বিন্দুমতীকে কাছে ডেকে স্নেহচুম্বনে তার মুখখানি ভরে দিলেন মহারাণী। বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। মেয়েকে বুকে চেপে রেখে কাঁদলেন পদ্মিনী।

অবাক মানলো বিন্দুমতী। কেন এত সমাদর, জানে না সে। জানে না, কেন এই অশ্রুবর্ষণ। ভেবে পায় না, সে হাসবে না কাঁদবে। সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বিন্দুমতী। এত জল মহারাণীর চোখে, কখনও দেখেনি। বিন্দুমতীও কাঁদে ঠোঁট ফুলিয়ে। মাতৃবক্ষে মুখখানি লুকিয়ে ফেলে চকিতের মধ্যে। তার নধরকোমল দেহ, কাঁপছে থরথর। কচি মুখে ভীতি ফুটে উঠেছে। হাতের জোরালো মুঠিতে ধরা রয়েছে একটি পুতুল।

মহারাণী কাঁপা কাঁপা সুরে বললেন,—আর পুতুল-খেলা নয় মা। সংসারের কাজকর্ম শিখতে জানতে হবে তোমাকে। আজ বাদে কাল তোমাকে যেতে হবে পরের ঘরে। তোমার বিয়ে হবে।

এপাশে ওপাশে মাথা দুলায় বিন্দুমতী। বলে,—না। না। না। আমি তোমার কাছে থাকবো মা। কোথাও যাবো না। আমার বিয়ে হবে না।

পদ্মিনী বললেন,—ছিঃ, এমন কথা বলতে নেই। কুমারী থাকতে নেই মেয়েদের। পরের ঘর করতেই মেয়েদের জন্ম হয়।

পরিচারিকা দাসীরাও কথাটা শুনে কেঁদে সারা হয়। রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, শুনে তারা খুশি হতে পারে না। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মেয়েটা, চোখের আড়ালে চলে যাবে, ভাবতে পারে না তারা। অন্দরমহলে যেন একটা শোকের ছায়া নেমে আসে। সকলের মুখেই বিষণ্ণতা দেখা দেয়।

বাকলা অধিপতি চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ

কন্দর্পনারায়ণের পত্রলিপি বার বার পড়তে থাকেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। পড়তে পড়তে মুখে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য, খুশির চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। স্বপ্ন সার্থক হওয়ার উন্মাদনা দেখা দেয় মহারাজার ভাবভঙ্গীতে। আবার তৎক্ষণাৎ সংযত করেন নিজেকে। হয়তো অনুভব করেন, এখনই এই মুহূর্তে এতটা উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নাই। তাঁর মনোগত অভিসন্ধি যদি লোকচক্ষে ধরা পড়ে, ফল ভাল হবে না। কারও নজরে পড়ে না, প্রতাপের বুকে বাসনার আগুন জ্বলছে, লোভের দীপ্তি ফুটেছে চোখে। কল্পনা-নেত্রে তিনি যেন দেখছেন, পূর্ববঙ্গে অবস্থিত বাকলার অধিকার ভবিষ্যতে হয়তো তাঁরই হাতে আসবে। তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের ভাগ্য। তাই যদি হয়, রাজা বসন্ত রায়ের সকল দর্প চূর্ণ হবে। তখন আর চকশ্রী না পাওয়ার জন্য কোন ক্ষোভ থাকবে না। বাঙলা দেশের পূর্বপ্রান্তটা কোনরকমে দখলে আনতে পারলে মগ, ফিরিঙ্গী আর পর্টুগীজ জলদস্যুদের নিশ্চিহ্ন করতে অধিক বিলম্ব হবে না। অনাগত সুখের গর্বে প্রতাপের বক্ষ যেন স্ফীত হতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। এক নিশ্চিত সম্ভাবনার আলো দেখতে পেয়েছেন তিনি। আলো নয় দেখুন, আলোর আভাসটুকু দেখেছেন। একেকবার মনে কেন দ্বিধা আর সংকোচ আসে। অনুধাবন করেন, পররাজ্যের প্রতি লোভ আদৌ সমীচিন নয়। অন্যের রাজ্য গ্রাসের ইচ্ছা প্রতাপের মত দেশপ্রেমিকের মানসপটে ঠাঁই পাবে, তা কী হয়!

তবে রাজধর্মটা পালন করা, দুর্বলের কাজ নয়। রাজ-নীতিতে ভালমন্দের বিচার চলে না। রাজ্য রক্ষা করতে হলে কৌটিল্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সকল ক্ষেত্রে আত্মজনকে দয়া দাক্ষিণ্য দেখালে নিজেকে ঠকতে হয়।

লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো সংবাদটা।

গোবিন্দ রায় পিতার সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন,—পিতৃদেব, বড়ই দুঃসংবাদ!

বসন্ত রায় বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে মগ্ন ছিলেন। বুঝে কেমন যেন সশঙ্কিত হয়ে বললেন,— কেন? কি হয়েছে? কারও মৃত্যু-সংবাদ না কি! ঘটনাটা ব্যক্ত কর।

—মৃত্যু-সংবাদই বটে! ম্লানমুখে বললেন গোবিন্দ রায়। পিতার নিকটে এগিয়ে চুপি চুপি বললেন,—বঙ্গদেশের পূর্ব-প্রান্তে আমাদের আধিপত্য বিনষ্ট হতে চলেছে। আমাদের কপালে কী যে লেখা আছে, জানি না।

পদাবলীর পুঁথি সরিয়ে রাখলেন বসন্ত রায়। ললাটে বেশ কয়েকটি চিন্তা-রেখা দেখা দিয়েছে চকিতের মধ্যে। বিষন্ন-কণ্ঠে তিনি বললেন, প্রস্তাবনা, গৌরচন্দ্রিকা ইত্যাদি স্থগিত রেখে আসল ঘটনাটা শোনাও কুমারবাহাদুর। ধৈর্য-ধারণ সম্ভব হয় না আর।

গোবিন্দ রায় বললেন,—চন্দ্রদ্বীপের মহারাজা কন্দর্প-নারায়ণের একমাত্র বংশধর যুবরাজ রামচন্দ্রের সহ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহের ব্যবস্থা হতে চলেছে, আপনি কি জানেন?

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন বসন্ত রায়। বললেন,—কিছুই তো জানি না। ইদানীং প্রতাপ আমাকে কিছুই বলে না। যা মন চায় সে করে। চাকশিরি হস্তান্তর না করায় প্রতাপ বোধ করি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে। কৈ সে তো আর আসে না।

ক্ষণেক নীরব ও চিন্তামগ্ন থেকে বসন্ত আবার বললেন,—আহা, বিন্দুমতী আমার বড় স্নেহের, বড় আদরের। কতদিন যে সে বেটিকে দেখি না তার ঠিক নাই। হয়তো প্রতাপ তাকে আমার কাছে আসতে নিষেধ করেছে। বিন্দুমতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ-খানি যখন তখন মনে পড়ে। অত্যন্ত ব্যথা পাই তখন। কী করি, প্রতাপটা যে অকৃতজ্ঞ, পাষণ্ড। হৃদয় বস্তুটি প্রতাপের নাই।

বিরক্তি বোধ করেন গোবিন্দ রায়।

[illegible] এই বিবাহের সুদূরপ্রসারী ফলটা কী হতে পারে, চিন্তা করেন একবার।

বসন্ত রায় বললেন,—অদূর ভবিষ্যতে কী ফল হবে আমিও জানি না, তুমিও জানো না কুমারবাহাদুর। তবু আশা করি এই বিবাহের সংবাদ যদি সত্য হয় ফল মঙ্গলময় হবে। বিন্দুমতীকে ভাগ্যবতী ছাড়া আর কী বলা যায়! একদা বিন্দুমতী মহারাণীর পদে অভিষিক্ত হবে। মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ আর ক'দিনই বা আছেন? শোনা যায় তাঁর শরীর সুস্থ নহে। শুনেছি, রাজ-সভায় প্রায়ই তিনি অনুপস্থিত থাকেন। মন্ত্রীরা ও পারিষদবৃন্দ কাজ চালায়।

গোবিন্দ রায় আরও যেন বিরক্ত বিব্রত হলেন। বলেন,—এই বিবাহ-কার্য সমাধা হলে প্রকারান্তরে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কবজে যাবে পূর্ববঙ্গ। তখন আমাদের কী গতি হবে, অনুমান করেন।

—তা বটে। তা বটে।

বসন্ত রায় বলেন। কেশবিরল মাথায় হাত বুলোতে থাকেন তিনি। বললেন,—এক্ষণে আমাদিগের কী করণীয় আছে কুমারবাহাদুর? তোমার অভিপ্রায়টা কী তাই শুনি।

ইদিক সিদিক দেখে নিয়ে গোবিন্দ রায় বললেন,—এ বিবাহ শেষ পর্যন্ত যেন হতে না পারে, তজ্জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যেন তেন প্রকারে বাধা দিতে হবে।

দুঃখের হাসি ফুটলো বসন্ত রায়ের লোলমুখে। কাতর-কণ্ঠে তিনি বললেন,—নির্দোষ নিষ্পাপ বিন্দুমতীর বিবাহের
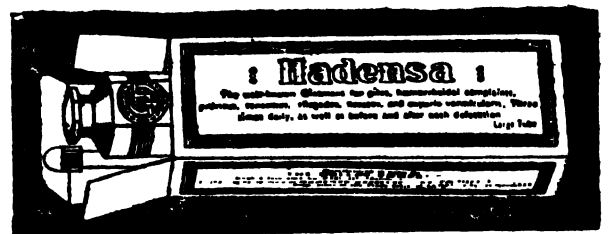
উদ্যোগ-আয়োজনে বাধ সাধবো, আমি এমনই নির্দয় নিষ্ঠুর! আজন্ম ধর্মপথে আছি, অন্যায় অনাচার কাকে বলে জানি না। শেষে কী বৃদ্ধবয়সে মহাপাতক হবো আমি? তা হয় না কুমার-বাহাদুর। তুমিও এমত চিন্তা মনের কোণে ঠাঁই দিও না। জানিও, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। অধিকন্তু বিন্দুমতী আমার সন্তানতুল্য। আমার একটিও কন্যা নাই। বিন্দুমতী আমার কন্যাসমা। তাকে আমি সেই চক্ষেই দেখি।

অগত্যা গোবিন্দ রায় নীরব হলেন। আর কোন বাক্য-ব্যয় নিষ্ফল জেনে পিতৃমহল ত্যাগ করলেন ক্ষুণ্ণমনে। অব্যক্ত আক্ষেপে মর্মাহত হয়ে আপন বিবরে প্রবেশ করলেন তিনি। মনে মনে অভিসম্পাত জানাতে থাকলেন প্রতাপাদিত্যকে। কামনা করলেন, প্রতাপের অপঘাতে মৃত্যু হোক। বজ্রপাত হোক প্রতাপের মাথায়। কালসর্প দংশন করে যেন প্রতাপকে। অগ্নিতে প্রজ্বলিত হোক প্রতাপের দেহ। ফন্দী আঁটতে থাকেন গোবিন্দ রায়, বিয়েটা পণ্ড করা যায় কোন্ উপায়ে। প্রতাপের অভিসন্ধি ব্যর্থ করতে হবে।

৬

বাকলা অধিকারের আশা ক্রমেই বলবৎ হতে থাকে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের মনের সংগোপনে। রাজ্য-বিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় যেন তাঁর থেকে থেকে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেন না। তিনি জানেন বাকলা নামক স্থানটি সমৃদ্ধিশালী। এই রাজ্য অতীব বৃহৎ ও উর্বরা। সেখানে প্রচুর পরিমাণে চাউল, তুলা ও রেশমের বস্ত্র উৎপন্ন হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকে বাকলার নাম সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত।

কয়েক মাস যেতে না যেতেই সংবাদ আসে, বাকলা-অধিপতি মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ দেহরক্ষা করেছেন! দুঃসংবাদ শুনে প্রতাপাদিত্য উদ্বিগ্ন হলেন বটে, তবে ভাবী জামাতা যুবরাজ রামচন্দ্রের সিংহাসন-লাভের পথ নিষ্কণ্টক হওয়ায় যেন নিশ্চিন্ত হলেন। পিতৃবিয়োগের পরে রামচন্দ্র যেন কোন বিপদের সম্মুখীন না হয় তজ্জন্য কয়েকজন বিশ্বাসভাজন অনুচরকে বাকলা-অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। সুপ্রচুর দ্রব্যসম্ভার। পাঠালেন, ফল, মিষ্টান্ন, গব্যঘৃত বস্ত্র ও উত্তরীয়।

অবশ্য রামচন্দ্র বালক হলে কী হয়, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান। রাজ্য-পরিচালনার কাজে অনভিজ্ঞ হলেও অপটু নয় তিনি। যুদ্ধক্রিয়ায় পারঙ্গম। সকল প্রকার অস্ত্র ব্যবহারে সুদক্ষ। বন্দুক তাঁর কাছে যেন খেলার সামগ্রী।

যত দিন যায় তত যেন গুপ্ত অভিপ্রায় দানা বাঁধতে থাকে, প্রতাপাদিত্যের মনে। মহারাজা-কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর কালাশৌচের বৎসরটি উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা প্রতাপাদিত্য স্থির করলেন, আর কালবিলম্ব করা সমীচীন নয়। কুলাচার্যকে কন্যার বিবাহের দিনক্ষণ নিরূপণ করতে অনুরোধ জানালেন। বলা যায় না, একেই রামচন্দ্র বয়সে নবীন। যে-কোন মুহূর্তে তিনি কারণে অকারণে মতের পরিবর্তন করতে পারেন। অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের কন্যার সহ বিবাহের প্রস্তাবটা নাকচ হয়ে যেতে পারে, মন্ত্রিমণ্ডলী, উপদেষ্টাবর্গ ও আত্মীয়স্বজনদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কানভাঙানিতে। তবে আর রক্ষা নাই! মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যতেক পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে; স্বপ্নসৌধ ধূলিসাৎ হবে।

কিন্তু মহাপরাক্রান্ত, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং বহুল সৈন্যের অধিপতি মহারাজা রামচন্দ্র পিতৃ আদেশ লঙ্ঘন করবেন, তেমন অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী নয়। স্বর্গত পিতার প্রদত্ত কথা অনুযায়ী রামচন্দ্র জানালেন, তিনি এই বিবাহে সম্মত আছেন। শুভদিন ধার্য করা হোক।

হবু জামাতার পক্ষ থেকে সম্মতি পেয়ে মহারাজা প্রতাপাদিত্য সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করলেন। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে আর কি চাই। পৃথিবীতে কয়জনের স্বপ্ন সার্থক হয়। শুভ সমাচার সর্বাগ্রে মহারাণী পদ্মিনীকে জানালেন প্রতাপাদিত্য। সানন্দে বললেন,—দেবী, রামচন্দ্র সম্মতি জানিয়েছেন। তুমি বিন্দুমতীর বিবাহের জন্য প্রস্তুত হও। কুলাচার্যকে অনুরোধ করি, শুভদিন স্থির করেন। শুভস্য শীঘ্রম্—

রাজমহিষী আবার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। যেন তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত হল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন,—যথাজ্ঞা মহারাজ। আপনি যেমন ইচ্ছা করেন। রাজকুমারী বিন্দুমতীকে অপরের সংসারে যেতেই হবে। নয়তো তার নারী-জন্ম বৃথা হয়।

আবার যেন তুষের অনল জ্বলতে শুরু হয় পদ্মিনীর বক্ষে। আসন্ন কন্যা-বিরহের চিন্তায় বিমনা বিষণ্ণ দেখায় তাঁকে। অধিক কিছু আর বলতে পারেন না।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—এ বিবাহটা রাজায় রাজায়, ভুলিও না পদ্মিনী। ব্যবস্থাদি সেই মত করিও। কিছুতেই কার্পণ্য করিও না।

বাক্য ফোটে না মহারাণীর মুখপদ্মে। স্থির নেত্র তাঁর। আঁখিতারা ভূমিতে নিবদ্ধ। বললেন,—মহারাজা, আপনি যেমন বলেন তেমনই হবে।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—সকল রকমের স্বর্ণালঙ্কার ও রত্নালঙ্কার দিও আমার বিন্দুমতীকে। তোমার মনোমত বস্ত্রাদি দিও, মূল্য যাই হোক। ব্রাহ্মণ-কাষ্ঠের আসবাবপত্র দিও। দানের ফর্দ তৈয়ারী কর তুমি। অভিজ্ঞা পুরনারীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ কর। প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে তাঁদের মতামত লও। অধিক আর কী বলি!

মহারাণীকে দেখায় যেন চিত্রার্পিতা। তিনি নীরব হলেন। মহারাজা স্থানান্তরে যেতেই ছুটে চললেন ক্ষিপ্রবেগে। বিন্দু কোথায়? আমার বিন্দুমতী? রাজকুমারী?

পরিচারিকা বললে, রাজকুমারী পুতুল খেলছেন খেলনার ঝাঁপি পেড়ে বসেছেন। পুতুলের সংসার পেতেছেন মেয়ে।

মহারাণী কম্পিতকণ্ঠে বললেন,—আমাকে তোমরা বিন্দুর কাছে লয়ে চল। আমাকে তোমরা ধরো। আর চলতে পারি না।

সহচরীরা এগিয়ে আসে ম্লানমুখে! বিষাদ-আকুল মহারাণীর হাত ধরে কেউ। স্খলিত আঁচল তুলে ধরে কেউ। চোখের 'পরে নেমে-আসা চূর্ণ কুন্তল সরিয়ে দেয় কেউ। পিছু থেকে কেউ চামর দোলায়। মহারাণীর শুভ্র-কপালে স্বেদবিন্দু চিক চিক করছে।

চন্দ্রদ্বীপের রাজ-দরবার।

অষ্টকোণ কক্ষের মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদিতে রাজা রামচন্দ্র রায়। কড়ি থেকে লাল শালুতে মোড়া ঝাড় ঝুলছে। দেওয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে একটিতে গণেশের ও বাকিগুলি শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার প্রতিমূর্তি স্থাপিত। সেগুলি বিখ্যাত কারিকর বটকৃষ্ণ কুম্ভকারের স্বহস্তে গঠিত। কক্ষের চারিদিকে শুভ্র চাদর পড়েছে। রাজার দুই পাশে জরিদার তাকিয়া। দেওয়ালের চারিদিকে দেশী আয়না ঝুলানো। রাজা রামচন্দ্রের বামপার্শ্বে এক প্রকাণ্ড আলবোলা ও মন্ত্রী হরিশঙ্কর। রাজার দক্ষিণে রমাই ভাঁড় ও চশমাপরা সেনাপতি ফার্নাণ্ডিজ।

রাজা বললেন,—ওহে রমাই।

রমাই বললে,—আজ্ঞা মহারাজ।

রামচন্দ্র হেসেই আকুল। মন্ত্রী রাজার অপেক্ষা অধিক হাসলেন। ফার্নাণ্ডিজ হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। খুশিতে রমাইয়ের চোখ মিটমিট করতে থাকে। রাজা ভাবেন, রমাইয়ের কথায় না হাসলে অরসিকতা প্রকাশ পায়। মন্ত্রী ভাবেন, রাজা হাসলে হাসাই কর্তব্য। ফার্নাণ্ডিজ ভাবে অবশ্য হাসির কিছু কারণ আছে। তা ছাড়া যে ভাগ্যহীন রমাইয়ের কথায় না হাসে, রমাই তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ে। নয়তো রমাইয়ের

মন্ধাতার সমবয়স্ক ঠাট্টা-তামাসা শুনে অতি অল্প লোকেই আমোদে হাসে তবে ভয়ে ও কর্তব্যজ্ঞানে সকলেরই বিষম হাসি পায়—রাজা থেকে শ্যালক পর্যন্ত।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—খবর কী হে?

রমাই ভাবে রসিকতা প্রকাশ করা আবশ্যক। সে বললে,—শুনা যায়, সেনাপতির ঘরে চোর পড়েছিল।

ফার্নাণ্ডিজ অধীর হয়ে উঠলেন। বুঝলেন, একটা পুরাতন গল্প তাঁর নামে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। রমাইয়ের বদ রসিকতার ভয়ে তিনি যেমন কাতর, রমাই প্রতিবারে তাঁকেই চেপে ধরে। রাজার বড়ই আনন্দ। রমাই এলেই তাই ফার্নাণ্ডিজকে ডেকে পাঠান। রাজার জীবনে দুটি প্রধান আমোদ আছে। এক ভেড়ার লড়াই দেখা, আর রমাইয়ের মুখের সামনে ফার্নাণ্ডিজকে স্থাপন করা। রাজকার্যে প্রবেশের পর থেকে সেনাপতির গায়ে একটা ছিটাগুলি বা তীরের আঁচড় পর্যন্ত লাগে নাই। অনবরত হাসির গোলাগুলি খেয়ে ব্যক্তিটির কাঁদো কাঁদো অবস্থা।

রাজা চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করলেন,—তারপরে?

রমাই বলতে থাকে,—আজ তিন চার দিন ধরে সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করছে। সাহেবের গৃহিণী জানতে পেরে কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনমতেই কুম্ভকর্ণ-কর্তার ঘুম ভাঙাতে পারেন নাই।

রাজা হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। মন্ত্রীও তদনুরূপে হাসতে লাগলেন। সেনাপতি হাসতে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু পারলেন না।

রমাই বললেন,—সেনাপতি দিনেরবেলায় গৃহিণীর নিগ্রহ আর সইতে না পেরে জোড়হস্তে বলেছেন, দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরবো। রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গৃহিণী বললেন,—ওগো চোর এসেছে। কর্তা বললেন,—ওই যাঃ, ঘরে যে আলো জ্বলছে। চোর যে আমাদের দেখতে পাবে। আর দেখতে পেলেই চোর পালাবে। চোরকে ডেকে কর্তা বললেন, আজ তুই বড় বেঁচে গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাতে পারবি। কাল আসিস দেখি, অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।

রাজা হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। মন্ত্রীও হাসলেন। সেনাপতিও হাসলেন, কাষ্ঠহাসি।

রাজা বললেন,—তারপর?

রমাই বললে,—জানি না কী কারণে চোর ভয় না পেয়ে পররাত্রে আবার এলো। গিন্নী বললেন, সর্বনাশ হয়েছে, ওঠো। কর্তা বললেন, তুমি ওঠো না। গিন্নী বললেন, আমি উঠে কী করবো? কর্তা বললেন,—ঘরে একটা আলো জ্বালো না। কিছু যে ছাই দেখতে পাই না। গিন্নী তো বিষম ক্রুদ্ধ। কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—দেখো তো তোমার জন্যই যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও, বন্দুকটা আনো। ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সেরে বললে,—মহাশয়, একছিলিম তামাকু খাওয়াতে পারেন? বড় পরিশ্রম হয়েছে। কর্তা ধমক দিয়ে বললেন,—রোস্ বেটা, আমি তামাক সেজে দিচ্ছি। আমার কাছে আসবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়িয়ে দেবো। তামাক সেবনের পরে চোর বললে,—মহাশয়, আলোটা যদি জ্বালেন বড় উপকার হয়। সিঁদকাঠিটা পড়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না। সেনাপতি বললেন, বেটার ভয় হয়েছে। তফাতে থাক, কাছে আসিস না। কর্তা তাড়াতাড়ি আলো জেবলে দিলেন। ধীরেসুস্থে জিনিসপত্র বেঁধে বমাল সমেত চোর পালিয়ে গেল। গিন্নীকে বললেন,—বেটা বিষম ভয় পেয়েছে।

রাজা ও মন্ত্রী হাসি সামলাতে পারেন না। ফার্নাণ্ডিজ থেকে থেকে টেনে টেনে হাসতে লাগলো।

রামচন্দ্র বললেন,—রমাই শুনেছো, আমার বিবাহ, আমি শ্বশুরালয়ে যেতেছি?

রমাই মুখভঙ্গি সহকারে বললে,—অসারং খলু সংসারং সারই শ্বশুরমন্দিরম্। কথাটা মিথ্যা নয়। শ্বশুরমন্দিরের সকলই সার। আহারটা, সমাদরটা। দুধের সরটি পাওয়া যায়। মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়। সকলই সার পদার্থ। কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ঐ স্ত্রীটা!

রাজা সহাস্যে বললেন,—সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ—

রমাই জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে বললেন,—মহারাজ, তাকে অর্ধাঙ্গ বলবেন না। তিনজন্ম তপস্যা করলে আমি বরঞ্চ একদিন তার অর্ধাঙ্গ হতে পারবো, এমন ভরসা আছে। আমার মত পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়লেও তার আয়তনে কুলাবে না।

যথাক্রমে হাস্য। কথাটার রস আর সকলেই বোঝে, কেবল মন্ত্রী বোঝেন না। এই নিমিত্ত মন্ত্রীকে সর্বাপেক্ষা অধিক হাসতে হয়।

রাজা বললেন,—আমি তো শুনেছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়ই শান্তস্বভাবা। ঘরকন্নায় বিশেষ পটু।

রমাই বললে,—এ কথায় আর কাজ কী। ঘরে আর সকল রকম জঞ্জালই আছে, কেবল আমিই তিষ্ঠিতে পারি না। প্রত্যূষে গৃহিণী এমনই ঝেঁটিয়ে দেন যে, একেবারে মহারাজার দুয়ারে এসে পড়ি।

হাসি থামলে পর রাজা বললেন,—ওহে রমাই, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। সেনাপতিকেও সঙ্গে লবো।

রমাই বললেন,—উৎসবস্থলে যেতে সেনাপতি মহাশয়ের কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কারণ এ তো আর যুদ্ধস্থল নয়।

রাজা বললেন,—কেন?

রমাই বললে,—ফার্নাণ্ডিজ সাহেবের চোখে দিবারাত্রি চশমা আঁটা থাকে। নিদ্রাকালেও চোখে চশমা থাকে, নয়তো স্বপ্ন দেখার অসুবিধা হয়। সেনাপতি মশায়ের যুদ্ধে যেতে কোন আপত্তি নেই, কেবল কাঁচে চশমার গোলা পাছে লাগে এই যা ভয়। চশমার কাঁচ ভেঙে চোখ দুটা যদি কানা হয়ে যায়! কেমন মশায়?

সেনাপতি বললেন,—তাই নয়তো কী। মহারাজ এবার আদেশ করেন তো বিদায় হই।

রাজা রামচন্দ্র বললেন,—যাত্রার সমস্ত উদ্‌যোগ করো। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।

মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রস্থান করলেন।

রাজা বললেন,—রমাই, তোমাকে যেতেই হবে। তুমি দেখবে যেন আমাকে শ্বশুরালয়ে কেউ না অপদস্থ করতে পারে। যেন না ঠকতে হয়। গৌড়বঙ্গের রসিকতাকে বড় ডরাই আমি।

রমাই বললে,—মহারাজা, আপনার এক দূরসম্পর্কের শ্যালক আমাকে বলেছেন, বাসর-ঘরে দেখিও, তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাবে। তখন আমরা নতুন জামাতাকে কী আখ্যা দেবো, রামচন্দ্র না রামদাস?

রামচন্দ্র হতচকিত হয়ে বললেন,—তুমি কী বললে রমাই?

রমাই বললে,—আমি তৎক্ষণাৎ বললাম,—আমাদের রাজার লেজ নাই। আপনাদের দেশে বিয়ে করতে গিয়ে যদি লাঙুল গজায় বুঝতে হবে রাজা যস্মিন্ দেশে যদাচার অবলম্বন করবেন।

জবাব শুনে রাজা মহা খুশি হলেন। ভাবলেন, রমাই হতেই তাঁর এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল হবে। প্রতাপাদিত্যের আদিত্য একেবারে চিরতরে রাহুগ্রস্ত হবে।

রাজা বললেন—রমাই, গিয়ে একেবারে জিতে আসতে হবে।

পাকিস্তানের বর্তমান ক্রিয়াকলাপ

বৈচিত্র্যময়ী এই পৃথিবীতে আমাদের পরিপার্শ্বে এমন বহুবিধ ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহাদের স্বরূপ আমাদের বহু পুরাতন প্রবাদবাক্যগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সময়ের অগ্রসরণে নিত্য-পরিবর্তনশীল পৃথিবীর কত কি রূপান্তর নিয়তই ঘটিতেছে, ইতিহাসে কত পতন-উত্থান সংঘটিত হইতেছে, কত ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, প্লাবন পৃথিবীতে দেখা দিতেছে তথাপি দেখা যায় এত পরিবর্তনের ভয়াল ভ্রূকুটি এবং নির্দিষ্ট নিয়ম উপেক্ষা করিয়াও মানুষের স্মৃতিতে এই প্রবাদগুলি উজ্জ্বল হইয়া থাকিতেছে এবং উহাদের প্রভাব মানুষের মনে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বিরাজমান। এই ধরণের একটি প্রবাদ---'স্বভাব না যায়---' অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুতেই যে সব কিছুর সমাপ্তি তাহা নয়, অবশ্য এ কথা সর্বজনবিদিত যে মানুষের মৃত্যুতে তাহার আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা অবিনাশী। তাই দেহের বিলুপ্তি-সাধন মানেই আত্মার বিলুপ্তি-সাধন নয়। কিন্তু অন্যান্য সব কিছুরই অবসান হয়, তবে আমাদের প্রবাদে বলা হইতেছে যে এই সঙ্গে আরও একটি বৃত্তির সমাপ্তি হয় না। উহা প্রবৃত্তি। মানুষের ভিতর যে প্রবৃত্তি দানা বাধিয়া উঠে তাহা এককথায় মানুষকে গ্রাস করিয়া রাখে এবং উহার চরিতার্থতার জন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে।

এই রচনার প্রারম্ভে এত কথার অবতারণার উৎস পাকিস্তানের বর্তমান ক্রিয়াকলাপ। ভারত সম্বন্ধে তাহার নীতি এই পুরাতন প্রবাদটিই আজ আবার নূতন করিয়া আমাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

যে ভারতের অঙ্গ খণ্ডিত করিয়া এই রাষ্ট্রের উদ্ভব সেই রাষ্ট্রটিই তাহার পত্তনের পর হইতেই ভারতের সহিত কি আচরণ আগাগোড়া করিয়া আসিতেছে তাহা কাহারও অজানা নয়। পুরাকালে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে রাজন্যবর্গ যে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন সেই রেকর্ডকেও ম্লান করিয়া দিল পাকিস্তানের হিন্দু-মেধ যজ্ঞ। সমকালীন ইতিহাসে উহা বিরল দৃষ্টান্ত বলিলেও অত্যুক্তির দোষে দুষ্ট হইতে হয় না। পাকিস্তানের সীমার মধ্যে আজ পর্যন্ত পৃথিবী হইতে কত হিন্দু যে নিশ্চিহ্ন হইল তাহার হিসাব-নিকাশ করা এককথায় সাধ্যাতীত।

ভারতের সহিত বৈরিতার ব্যাপারে পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা বড় সহায়ক চীন। এ ব্যাপারে চীনের অকৃত্রিম উৎসাহ এবং উপদেশ অফুরন্ত ধারায় পাকিস্তানের প্রতি নিরত বর্ষিত হইতেছে।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থা কিছুটা ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। অল্পকাল

যদি জয় হয় তোমাকে আমার হীরকাঙ্গুরীয় উপহার দেবো।

রমাই বললেন,—মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি আপনার শ্বশুরালয়ের অন্তঃপুরে লয়ে যেতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল পান করিয়ে আসতে পারবো।

রাজা বললেন,—ভাবনা নেই। তোমাকে আমি অন্তঃপুরে লয়ে যাবো।

রমাই বললেন,—জানি মহারাজ। আপনার অসাধ্য কী আছে? বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমাদের পূর্ববঙ্গবাসীরা চিরকালই অগ্রণী। রাঢ়ে ও বারেন্দ্রে কী তুলনা হয়?

রাজা রামচন্দ্র আহ্লাদে যেন আটখানা হয়ে উঠলেন। আলবোলার নল মুখে তুলে পরম বিজ্ঞের মত টান দিতে থাকলেন। তামাক খাওয়ার নেশাটা পিতৃবিয়োগের পরে নতুন ধরেছেন মহারাজা রামচন্দ্র। তাই একটু ঘন ঘন পান করেন।

রাজসভায় অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ ভুর ভুর করতে থাকে।

[ক্রমশ।

পূর্বে সমগ্র ঘটনার আলেখ্য পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগিয়েছে।

বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পাকিস্তান অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে। এই অস্ত্রগুলির মধ্যে বোমারু বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্রও রহিয়াছে।

১৯৬৫ সালে স্বর্গত জননায়ক লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে যে অন্যায্য ও নির্লজ্জ আক্রমণ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান করিয়াছিল, পাকিস্তান কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর পাইয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও তাহার শিক্ষা হইল না। অবকাশ পাইলেই কোন না-কোন অছিলায় ভারতকে সে বিব্রত করিয়া তোলে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এবারে যে অস্ত্রগুলি পাকিস্তান রাশিয়ার নিকট হইতে পাইল তাহা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী। আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে এই উপকরণগুলি যথেষ্ট পরিমাণ প্রাধান্য বহন করে। পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষ রাশিয়ার নিকট আপত্তি জানাইয়াছিল কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। এমন কি এই ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাকে ভারতীয় শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আরও লক্ষ্য করিবার আছে যে, ভারতের সীমান্তে সীমান্তে যেভাবে বহিঃশত্রুর সৈন্য সমাবেশ ঘটিতেছে তাহা রীতিমত চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ। জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন পরের কথা, যে-কোন মুহূর্তে পাকিস্তান যদি রাশিয়া হইতে আমদানী করা অস্ত্রগুলি কাজে লাগাইতে চায় তাহা হইলে ভারতের পক্ষেও নিশ্চয়ই তাহা প্রীতিকর হইবে না।

পরিস্থিতি অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য এখন ভারতকেও যথেষ্ট যত্নবান হইতে হইবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরটির দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া, দেশের সৈন্যবাহিনীকে আরও সজাগ সচেতন রাখা এবং সীমান্ত বা ঘাঁটিগুলিকে আরও সুদৃঢ় করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। শান্তিকামী ভারত চিরদিনই সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মৈত্রীতে বিশ্বাসী---কোনদিনই সে পররাজ্য আক্রমণ করিবে না ঠিকই কিন্তু শত্রুর আক্রমণের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করার মত যথোপযুক্ত শক্তির অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য, নচেৎ কোথা হইতে কোন দুর্যোগ কখন আত্মপ্রকাশ করে তাহা বলা দুষ্কর।

ঘর সামলাও

১৮৮৫ সালের কথা। আর সতেরটি বৎসর অতিক্রান্ত হইলেই শতাব্দীর কক্ষ পরিক্রমা সমাপ্ত হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেদীপ্যমান সূর্য সেদিন মধ্যগগনে। ভারতে তখন বৃটিশ রাজত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী সেদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ভারত তো দূরের কথা বাঙলা বিহার উড়িষ্যাও সেদিন কার্জনের শাণিত ছুরিকায় খণ্ড-বিখণ্ডিত হয় নাই। সেদিন ভারতের যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির পত্তন হইল কালক্রমে তাহা জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহার অবদান যেমনই সীমাহীন তেমনই গৌরবময়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এই বিশাল ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান উহাকেই একটি মহান ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কংগ্রেস যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের পরিচালনায় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালাইয়াছে তাহা জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে এক বিরাট গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করিয়া জাতীয় ইতিহাসের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

কংগ্রেসকে লইয়া বাঙলার ও বাঙালীর গৌরব করিবার আরও দুটি বিশেষ কারণ আছে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এই কলিকাতায় এবং সেই অনুষ্ঠানে যিনি পৌরোহিত্য করেন অর্থাৎ ইতিহাসে যিনি প্রথম কংগ্রেস সভাপতিরূপে স্মরণীয় হইয়া আছেন তিনিও একজন বাঙালী।

দীর্ঘ সংগ্রাম, বিপুল লাঞ্ছনাবরণ এবং নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগ স্বীকারের ফলে ভারতবর্ষ যেদিন বিদেশী শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল সেদিন কংগ্রেসও তাহার অবদানের পরিণতিস্বরূপ দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র দেশে সরকার গঠন করিল।

কিন্তু বর্তমানে পরিতাপের বিষয় এই---এই বিরাট ঐতিহ্য, এই বিরাট ইতিবৃত্ত, এই বিরাট ধারার গুরুত্ব এবং পবিত্রতা আজ যাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের পরিচালনভার তাঁহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। কথাটি অপ্রিয় হইলেও সত্য। কঠোর সত্য রূঢ় সত্য এবং বাস্তব সত্য। কংগ্রেস সারা দেশকে মুক্তি অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে, যে কংগ্রেস যথেষ্ট নির্যাতন ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছে দেশের জন্য হাসিমুখে, যে কংগ্রেস অসংখ্য অবিস্মরণীয় আন্দোলনের হোতা ও ঋত্বিকের গৌরব অর্জন করিয়াছে, সেই কংগ্রেস আজ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুখর, দলাদলিতে পরিপূর্ণ, দেশের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি অধিকতর সচেতন।

গত চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের দারুণ ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল। ভারতের নানাস্থানে কংগ্রেস সরকারের পতন ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। যদিও অল্পকালের মধ্যে কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেসী ক্ষমতাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল তথাপি কংগ্রেসের কাঠামোটি যে একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে এ সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার কোনই অবকাশ নাই।

স্বাধীন দেশের কংগ্রেস সরকারের

রাষ্ট্রীয় ভরণী পরিচালনাও ..... দোষমুক্ত ছিল না। নানা গলদ, নানা দুর্নীতিতে ভরপুর কংগ্রেস সরকার প্রভৃত দুর্নাম এবং অখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

বিরোধী বামপন্থী দলই শুধু নয়, শেষে কংগ্রেসেরই অঙ্গীভূত কংগ্রেস বিরোধী দল কংগ্রেসের সুবিস্তৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে, কংগ্রেসের মধ্যেই ভাঙনের সূত্রপাত হইল।

এই ভাঙনই আজ এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন করিল পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেসকে। দীর্ঘদিন ধরিয়া অতুল্য-চক্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, বর্তমানে তাহাই তিলে তিলে এক বিরাট আকার ধারণ করিল।

আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন এক বিরাট কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে ঘন ঘন পটপরিবর্তন হইল—সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই অন্তর্বর্তী নির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। এই ধরণের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রাক্কালেই যদি এই জাতীয় কোন্দল বা দলাদলির ফলে একটি বিরাট ঐতিহ্যশালী দল খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ক্রমাবলুপ্তির পথ ধরিতে থাকে তাহা হইলে তাহা যেমনই বেদনার তেমনই পরিতাপের।

ভারতবর্ষ আজ শুধু আভ্যন্তরীণ সমস্যাতেই জর্জরিত নয়, বাইরের সমস্যাও প্রচুর। একদিকে চীন, অন্যদিকে পাকিস্তান—যে-কোন মুহূর্তে ইহাদের দ্বারা আক্রমণের সম্ভাবনা। তদুপরি খাদ্য শিক্ষা বেকারী এ সকল সমস্যা তো আছেই। এ ক্ষেত্রে এই জাতীয় দ্বন্দ্বে একটি দল ভাঙিবার স্বপক্ষে কি যুক্তি থাকে বা তদ্দ্বারা দেশের বা জাতির কোন কল্যাণসাধন হইতে পারে তাহা আমরা জানি না।

দলত্যাগের ব্যাধিও নূতন নয়। কংগ্রেসের নীতিতে আস্থা হারাইয়া কংগ্রেস ত্যাগ অনেকেই করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার দলে ফিরিয়া আসিয়াছেন সে তালিকাও স্বল্পায়তন নয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অন্যতম। সম্প্রতি প্রাক্তন মন্ত্রী বিজয় সিং নাহারের প্রার্থি-পদ প্রত্যাহার এই জাতীয় ঘটনার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় নেতারাও ইহার ভয়াবহতা অনুভব করিয়া একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার জন্য অনেক উপদেশাদি বর্ষণ করিয়াছেন কিন্তু শুধু উপদেশ বর্ষণেই নয় বিভিন্ন রাজ্যে কেন এই হাল হইতেছে সে সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান করিয়া তদনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সর্বাগ্রে দরকার। তবেই একটি দল নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত হইতে বাঁচিবে।

শিক্ষাজগতে তাণ্ডব

ইতিহাসের মূক পৃষ্ঠাগুলি অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, এমন একটি সময় ছিল যে সময় সভ্যতার কণামাত্রও বিদ্যমান ছিল না। ধীরে ধীরে সময়ের অগ্রসরণে একদল মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ও ঐকান্তিক সাধনার ধারায় ধারায় মানবসমাজে সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটিল। মানুষ আদিম অবস্থান অতিক্রম করিয়া এক উন্নত স্তরে উপনীত হইল। বন্য মানুষ পরিণত হইল সভ্য মানুষে।

এক নির্দিষ্ট সমাজবন্ধন আসিল, গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিল, মানুষ পরিচ্ছদের প্রচলন সুরু করিল, রন্ধনদ্রব্যের সৃষ্টি হইল, নানাভাবে মনের মধ্যে নানা-বিষয়ক আলোকনিক্ষেপ অনুভব করিল। এইগুলি সভ্যতার ক্রমবিকাশেরই এক-একটি অঙ্গ।

সভ্যতায় নিজেকে পরিপূর্ণ করার বাসনায় মানুষ বুঝিল সে ক্ষেত্রে যাহা একান্ত অপরিহার্য তাহার নাম শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতিরেকে সভ্যসমাজে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সারা জগৎ জুড়িয়া সভ্যতার ধাপে ধাপে ক্রমবিকাশ যত ঘটিতেছে—শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব মর্মে মর্মে অনুভূত হইতেছে। অজ্ঞতা অন্ধতার পরিসর অতিক্রম করার পাথেয় একমাত্র শিক্ষার মধ্যেই নিহিত। মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে উপনীত করার বাহন হইল শিক্ষা। সভ্যতার আলোকে পৃথিবী আজ যে পরিমাণ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই রশ্মি সহ্য করার ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার ক্রমপ্রসার সভ্যতার বিস্তৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে, এই মহানগরীতে শিক্ষাজগতে যে-সকল ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হইতেছে তাহা আমাদের চিরন্তন ধ্যান-ধারণাকে উল্টাইয়া দেওয়ার উপক্রম করিতেছে। শিক্ষা মানুষকে বন্য, আদিম পর্যায় হইতে সুসংস্কৃত করিয়াছে বা করিতেছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা আজ যেন ইহার বিপরীত কথাটাই প্রমাণিত হইতেছে। এই সকল কদাচারগুলিকে ন্যক্কারজনক বলাই সমীচীন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা শ্রদ্ধেয় উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন যেভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে কেহই অনবগত নন। ডঃ সেনের এই অপমান তাঁহার ব্যক্তিগত অপমান নয়। এ অপমান সমগ্র যুগকে, এ লাঞ্ছনা দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশেই একটি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর এক প্রতীক বলিয়া মনে করি। তাহা হইল গুরুকে, শিক্ষককে, আচার্যকে যথোচিত

শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা। কিন্তু সেদিন ডঃ সেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রী যে সম্মান (?) দিলেন তাহা সত্যই অভিনব।

অথচ একদিন এই মহানগরীই শিক্ষায়-দীক্ষায় জগতের মধ্যে একটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই মহানগরী হইতে যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হইয়াছিল তাহা সমগ্র ভারতকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, আর আজ সেই মহানগরীর শিক্ষাজগতের কি শোচনীয় আভ্যন্তরীণ চিত্র।

যে ছাত্র-ছাত্রীরা অকথ্য ভাষায় শ্রদ্ধেয় উপাচার্যকে গালিগালাজ করিয়া থাকেন, বক্তব্য জানানোর নামে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার নজীর দেন, প্রতিবাদের নামে অনাচার করিয়া থাকেন ঠিক সেই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে কতটুকু জ্ঞানের আলো বিকিরণ করিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করিবেন তাহা চিন্তা করিলে নিশ্ছিদ্র শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

দীর্ঘদিন ধরিয়া যে শিক্ষানায়ক, যুগাচার্য, দিকপালবৃন্দ তাঁহাদের জ্যোতির্ময় তপস্যায় কালজয়ী সাধনায় দেশের শিক্ষাজগতকে সমুজ্জ্বল তুঙ্গশীর্ষে উপস্থাপিত করিলেন সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রচেষ্টার এই পরিণতি? ভদ্রকুলোদ্ভব, শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের গুরু আচার্যের প্রতি এই আচরণ? শালীনতার, শোভনতার এবং মনুষ্যত্বের শেষ সীমাটিও কি তা হলে অতিক্রান্ত হইয়া গেল? তবে কি সভ্যতার শেষ রজনী সমাগত?

ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভের কারণ অবশ্যই থাকিতে পারে, তাহাদের প্রতি কখনও যে অবিচার হয় না বা সকল ক্ষেত্রেই তাহাদিগের প্রতি যে সুবিচার হইয়া থাকে এমন কথাও অবশ্যই আমরা বলি না। কিন্তু সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট পন্থা আছে, একটি শোভন ভঙ্গী আছে। তাহা যাঁহারা জাতির আশা ভরসা, পরম আদরের ও গর্বের সেই ছাত্র সম্প্রদায় বিস্মৃত হইলেন কেন তাহা বুঝা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইতেছে না।

এই প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের কথাও আসে। তথাকার কর্মিবৃন্দের অসতর্কতা ও অযোগ্যতার শ্রেষ্ঠ নজীর এই বৎসর মিলিল। একের নম্বর অন্যের ঘাড়ে বসাইয়া যে দক্ষযজ্ঞ তাঁহারা এবার করিলেন তাহাতে অল্প-বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা যে কতখানি বিভ্রান্ত হইলেন এবং ক্ষতিগ্রস্তও হইলেন তাহার মূল্যায়ন কে করিবে?

কিন্তু এখন এই জাতীয় অব্যবস্থা ও অযোগ্যতার প্রতিবাদ যদি গুণ্ডামী এবং উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা যদি জানানো যায় তাহা হইলেও সে পন্থাটিকেও কি সমর্থনযোগ্য?

সর্বশেষে আমরা অভিনন্দন জানাই ডক্টর সেনকে। যিনি চরম অপমান ও গণ্ডগোলের সম্মুখীন হইয়াছেন যথোচিত দৃঢ়তা ও মনোবলের সহিত। তাঁহার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মন ধারেকের জন্যেও কোনও ভীতি বা ভ্রূকুটির নিকট মাথা নত করে নাই। আগাগোড়া আপন আদর্শে অবিচলিত থাকিয়া প্রমাণ দিলেন যে, পুণ্যশ্লোক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পূজনীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবরেণ্য জননায়ক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বাঙলার স্থপতি জনবরেণ্য লোকনায়ক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে আসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন সে আসনে আজ যিনি অধিষ্ঠিত তাহার মর্যাদা ও গৌরব তাঁহার দ্বারা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইবে না।

সুশীলকুমার সিংহ

প্রথম ভারতীয় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ও সেণ্ট্রাল টি বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান সুশীলকুমার সিংহ গত ১৩ই আষাঢ় ৭৪ বছর বয়সে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। ইনি রায়পুরের ব্যারন ও প্রথম ভারতীয় গভর্নর স্বর্গত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের অন্যতম পুত্র ছিলেন। তদানীন্তন সরকারের সঙ্গে মতানৈক্যের দরুণ নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে আই সি এস-এর কর্মভার ইনি পরিত্যাগ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক খাদ্য-কমিশনার এবং বহু প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টারের আসনে ইনি সমাসীন ছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

॥দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীইন্দুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত॥

সূচীপত্র

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়,

সর্বপ্রথমে আপনি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার 'বসুমতীর' প্রত্যেক মাসের অভিনবত্বে বড়ই আনন্দ পাই মনে। আনন্দের আরেকটি বিশেষ কারণ গত দুই মাস থেকে আমরা বসুমতী মাসের মাঝামাঝি পেয়ে যাচ্ছি---চলতি মাসের বসুমতীর জন্য আর পরের মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হচ্ছে না। আমি বসুমতীর গ্রাহিকা নই---তবে একনিষ্ঠ পাঠিকা---নিকটবর্তী স্টল থেকে গত ১৩ বছর ধরে 'বসুমতী' কিনে পড়ি।

আষাঢ় মাসের বসুমতীর একটি বিশেষ আকর্ষণ, বিভিন্ন জনের লেখা 'মহামানব উপেন্দ্রনাথের' শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর জীবন-কথা। মনে পড়ে অনেক ছোটতে আমার মায়ের নেওয়া বসুমতীগুলিতে যখন স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথের পৌত্র, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্রের মৃত্যুর কথা পড়তাম, আর অসংখ্য মেডেল নিয়ে রামচন্দ্রের সেই কত রকমের ছবি দেখতাম----তখন আমার শিশুমনেও দেখা দিয়েছিল অসীম দুঃখ। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল তপ্ত অশ্রুবিন্দু। শিশুমনে ভেবেছিলাম সেদিন এত যাঁরা মহৎ লোক---তাঁদের বাড়ীর একমাত্র ছেলেকে কেন ভগবান কেড়ে নিলেন?

এবার আমার একটি অনুরোধ জানাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'জন্ম-জন্মান্তরের গান'---এই আষাঢ় মাসেই শেষ হলো, বড় সুন্দর লেগেছে তাঁর এই লেখাটি। তাঁর সেই গ্রাম্য নায়িকা মেবেলের সকরুণ গানটি যেন এখনও কানে বাজছে। তাঁর রচিত 'সিন্ধু পারে' আর 'বিদেশিনীর' মত এটিও আমাদের মনে দিয়েছে অসীম আনন্দ, তাই অনুরোধ করি নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তর লেখা আবার বসুমতীতে বার করুন। তাঁকে আমাদের মত পাঠিকাদের হয়ে অনুরোধ জানান। 'আমরা বসুমতীতে তাঁর লেখা আরও চাই।'

আশাপূর্ণা দেবীর 'গাছের পাতা নীল' খুবই ভাল লাগছে। এটিও তাঁর অন্য রচনার মতই রসমাধুর্যে আর তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। শ্রদ্ধেয় নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 'সাধু-সাধ্বী কথা' এক কথায় অপূর্ব। প্রতি মাসে এই রচনাটি পড়ার জন্য অসীম আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকি। প্রফুল্ল রায় ও নমিতা চক্রবর্তীর উপন্যাসগুলিও সুন্দর, এঁরা বোধহয় আমাদের প্রিয় 'বসুমতী' ছাড়া অন্য কোন মাসিক পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাস লেখেন নি এ পর্যন্ত। আর অদ্ভুত নতুনত্বের আমেজ এনেছে আমাদের মনে---সঞ্জয়ের রচিত 'সঞ্জয় উবা'চ'---জানি না এঁর প্রকৃত নাম কি? প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা---রসের মাধুরিমার পরিপূর্ণ। আমাদের 'বসুমতীর' দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক, তাই আমার মত নগণ্য পাঠিকার ঐকান্তিক কামনা।

---শ্রীমতী সবিতা দাস, ৬এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড। কলিকাতা-১৯

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার প্রসঙ্গে

মহাশয়,

মাসিক বসুমতী বিভিন্ন রুচির পাঠক ও পাঠিকাগণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। জনপ্রিয়তাও তাহার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহা যেন উপলব্ধি করিতে পারা যায়। গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ও ছাত্র-সমাজ শীর্ষক প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রবন্ধটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজকে প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আশা করি এই প্রবন্ধটি পাঠে দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও সুনাগরিক গঠনের দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত সেই শিক্ষকগণ এবং বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-সমাজের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইবে। শিক্ষক ও অভিভাবকগণের অসতর্কতার সুযোগ লইয়া কতকগুলি রাজনৈতিক দল দেশের উন্নতির নামে ভাঁওতা দিয়া তাহাদের দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কোমলমতি যুবকদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতেছে। যাহার ফলে ছাত্র-সমাজে দুর্নীতি অসদাচারণ ও অশালীনতা বৃদ্ধি পাইয়া একটি অরাজকতার সৃষ্টি হইতেছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের চেষ্টা, পরীক্ষা কেন্দ্রে বসিয়া নকল করা। প্রশ্নপত্র শক্ত হইয়াছে বলিয়া ধুয়া ধরিয়া পরীক্ষা-গৃহের টেবিল-চেয়ার কাগজপত্র তছ্‌নছ্‌ করা। অপর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে বাধা দেওয়া, গার্ডকে প্রহার, কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও প্রভৃতি অসদাচারণগুলিই ইহার নিদর্শন। অন্যদিকে কোন কোন রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার স্বরূপ ট্রামে, বাসে, রেল-বগিতে অগ্নি-সংযোগ পর্যন্ত করিতে ইহারা কুণ্ঠিত হইতেছে না, কিন্তু ছাত্র-সমাজ ভাবিয়া দেখিতেছে না, ইহার পরিণাম কি? এইরূপ কার্যের দ্বারা দেশের কতদূর অগ্রগতি হইবে। তাহাদেরই বা ভবিষ্যৎ কি?

কাণ্ডারী হুঁসিয়ার। এই কাণ্ডারী কে বা কাহারা? আমাদের মনে হয় এ কাণ্ডারী একমাত্র শিক্ষকগণই। তাঁহারা যদি শিক্ষক ও ছাত্র সম্বন্ধ ব্যবসাভিত্তিক মনে না করেন, অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহ-কর্মিগণের আদর্শ গ্রহণ করেন তবে দেশের এই সঙ্কট সমস্যা দূরীভূত হয়। অশ্বিনীকুমার তাহার সহকর্মিগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নৈতিক আদর্শ কতদূর

উৎর্ধগামী হইয়াছিল তাহা উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত থাকিলে এখানে পুনরুল্লিখিত হইলেও বোধহয় অসঙ্গত হইবে না।

একবার স্কুলে পরিদর্শক হিসাবে আসিয়াছেন রেভা: কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে জানানো হইল স্কুলে পরীক্ষা আরম্ভই হইয়াছে। পরিদর্শক মহাশয় পরীক্ষা-হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ঘর নিস্তব্ধ, সেখানে কোন শিক্ষক নাই, সকল পরীক্ষার্থী অভিনিবিষ্টচিত্তে তাহাদের প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিয়া চলিয়াছে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন পরীক্ষা হলে কোন গার্ড নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি উত্তর পাইলেন এই স্কুলের ছাত্রদের নৈতিক জ্ঞানের উপর শিক্ষকগণের পূর্ণ আস্থা আছে।

আর একদিনের কথা। পরীক্ষা-হলে ছাত্রদের প্রশ্ন দেওয়া হইতেছে। হঠাৎ দেখা গেল একটি ছাত্র প্রশ্ন-পত্রটি হাতে লইয়া শিক্ষক মহাশয়কে উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ছাত্রটি সবিনয় উত্তর করিল—প্রশ্নপত্র-খানি ২য় পত্র, বিকালের জন্য, ভ্রম-ক্রমে এখন তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রটি প্রশ্নপত্রের বড় বড় অক্ষরে ছাপা হেড লাইন পড়িয়াই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সমগ্র প্রশ্নপত্রখানি পড়িবার পূর্বেই যে উহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিল, আজিকার প্রশ্নপত্র ফাঁস করিবার যুগে ছাত্রগণ ইহা অনুধাবন করিতে পারিবে কি?

শুধু ইহাই নহে, ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্রগণ তাহাদের শিক্ষকগণের চরিত্র-আদর্শে নিজেদের চরিত্র রূপায়িত করিয়াছিল। পীড়িতের সেবা, দেশের সেবা তাহারা শিক্ষকগণের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া সম্পন্ন করিত। তৎকালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহ-কর্মিগণের প্রচেষ্টায় বরিশালের ছাত্রগণ একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে শিক্ষক ও ছাত্রগণ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকা-নন্দের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিব—

ছাত্রের প্রবৃত্তিকে সদভিমুখী করিবার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। গভীর স্নেহ ও সহানুভূতির অভাবে আমরা কখনও উত্তম শিক্ষা দিতে পারি না। যিনি মুহূর্তে ছাত্রের সঙ্গে অভিন্ন-আত্মা হইতে পারেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিক্ষক

যিনি ছাত্রের স্তরে নামিয়া আসিতে পারেন এবং নিজের আত্মাকে একী-ভূত করিয়া তাহারই মন দিয়া সব কিছু দেখেন ও বুঝিতে পারেন। এইরূপ শিক্ষকই প্রকৃত শিক্ষক, প্রকৃত শিক্ষা-দানে সমর্থ। অন্যে নহে।

ছাত্রের প্রতিপালনীয় ধর্ম কি?

ছাত্রের পক্ষে পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞান, তৃষ্ণা, অধ্যবসায়, নম্রতা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস একান্ত আবশ্যক। ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্কে আজ আমাদের দেশে যে দুঃখকর অবনতি লক্ষ্য করা যায়, সে ক্ষেত্রে স্মরণীয় এই বিবেকবাণী।

—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, গোপাল খাঁ লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

অন্তর্বর্তী নির্বাচন প্রসঙ্গে

মহাশয়,

গত আষাঢ় সংখ্যার মাসিক বসু-মতীতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় কলমে 'আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন' প্রসঙ্গে নিবন্ধটি পড়লাম। এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে আমি কিছু লিখছি। পশ্চিমবঙ্গে অন্ত-র্বর্তী নির্বাচন আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ, আসন-সংখ্যা বণ্টন নিয়ে বিরোধ, দলত্যাগের হিড়িক প্রভৃতি কারণে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যদি এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে না ওঠে, তাহলে আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন-আসরে নেমে লাভ কি? রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের আইন-শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় কি?

—শ্রীতিমির দাশগুপ্ত, ৭৭, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন, বেলেঘাটা, কলি-কাতা-১০।

নারী মহিমা প্রসঙ্গে

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'নারী-মহিমা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত ভালো লাগলো। এই সুন্দর প্রবন্ধের জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'পুরুষের আছে বীর্য, আর মেয়েদের আছে মাধুর্য, একথাটা সব দেশেই প্রচলিত। আমরা তার সঙ্গে আরও একটা কথা

ভোগ করেছি। আমরা যদি মেয়েদের মধ্যে মঙ্গল, অনুষ্ঠানের যে সকল আয়োজন, যে সকল চিহ্ন শুভ সূচনা করে, আমাদের দেশে তার ভার মেয়েদের উপর। নারী-শক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। প্রবাসযাত্রায় বাপের চেয়ে মায়ের আশীর্বাদের জোর বেশি বলে জানি। মনে হয়, যেন ঘরের ভিতর থেকে মেয়েদের প্রার্থনা নিয়ত উঠছে দেবতার কাছে—ধূপপাত্র থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মতো। সে প্রার্থনা তাদের সিঁদুরের ফোঁটায়, তাদের কঙ্কনে, তাদের উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত-অব্যক্ত ইচ্ছায়। ভাইয়ের কপালে মেয়েরাই দেয় ভাই-ফোঁটা। আমরা জানি, সাবিত্রীই মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়েছিল। নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তা নয়, তার কল্যাণ।'

—রঞ্জিতকুমার গুহ, ড্রাফটসম্যান-সার্ভেয়ার, এন সি ডি সি লিঃ, প্লানিং সেকশান, রাঁচি।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আপনাদের মাসিক বসুমতীতে আষাঢ় (১৩৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত অতি উচ্চাঙ্গের, অতি মনোরম ও মহান সম্পাদকীয় 'বীরের এ রক্ত-স্রোত—মাতার এ অশ্রুধারা', সারা বিশ্বের তথা তামাম দুনিয়ার প্রত্যেক চিন্তাশীল, সহৃদয় ও উচ্চমনা মানব-মনে আলোড়ন আনতে বাধ্য করবে। সমস্ত বিশ্ব-মানবগোষ্ঠীর মনই আজ একসুরে গাঁথা। আজ মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে সমতালে—একের ব্যথা আজ অন্যকে সমানভাবে ব্যথিত করে গেলে—আজ সমস্ত দুনিয়াটাই এক সুরে ও এক তন্ত্রীতে গাঁথা। একের থেকে অন্যকে পৃথক করে দেখা আজ আর সম্ভবপর নয়। মহান ও শাশ্বত সত্যের যূপকাষ্ঠে কত মহৎ প্রাণকেই যে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে তাদের সংখ্যা কম হলেও তারা এই পৃথিবীর বুকে নূতন ইতিহাস রচনা করে গেছেন।

হাজার হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—তবু আজও পর্যন্ত আমরা যীশুখৃষ্টের আত্মাহুতির কথা ভুলতে পারি নি। কে ভুলতে পেরেছে জাতির জনক মহাত্মাজীর আততায়ীর হস্তে মৃত্যুবরণের কথা। কে ভুলতে পারবে রাষ্ট্রনায়ক কেনেডি, সিনেটের কেনেডি ও শান্তির দূত মার্টিন লুথার কিংয়ের আততায়ীর হস্তে মৃত্যুবরণের কথা। আজও আমরা ভুলি নি ক্ষুদিরাম, দীনেশ ও বাদলের আত্মাহুতির কথা। আজ সারা বিশ্বের যে অপূরণীয় ক্ষতি হোল—এর পূরণ কে করবে, এর পূরণ কোন দিন হবে না—হতে পারে না—

এই ক্ষতি অপূরণীয় আপনারা সুন্দরভাবে উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন 'সারা বিশ্বের প্রায় সর্বত্র আজ হিংসার আগুন, বিভেদের দুর্নীতি, ঈর্ষার প্রকোপ।' আজ মানব-সভ্যতা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ সভ্যতার চরম শিখরে আসীন সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকের উপর হত্যালীলার প্রভাব এখনো এমন ভাবে চলতে পারে—সেটাই সবচেয়ে, আশ্চর্যের, গভীর দুঃখের ও পরি-তাপের কথা। সাদা ও কালোর রেষা-রেষি যে আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন-ভাবে থাকতে পারে সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও ধিক্কারের কথা। যে দেশ আজ গণতন্ত্রের প্রতীক, যে দেশ আজ গণতন্ত্রের বড়াই করে চলে—সেখানেই আজ সিনেটর কেনেডিকে তাঁর নীতি ও আদর্শের জন্য আততায়ীর হস্তে নিহত হতে হোল।

শান্তির দূত লুথার কিংয়েরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে স্থান হোল না। এই কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতার লক্ষ্য ও নিদর্শন? যে রাষ্ট্র এই মহামানব দুটিকে আততায়ীর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে নাই—এর জন্য সমস্ত দুনিয়াটাই তাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এর চেয়ে কলঙ্কজনক অবস্থা হোতে পারে না। আজ কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন আদর্শবাদই চলবে না। এই পাগলামীর শেষ কি কোন দিন হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারদের আজ এ বিষয়ে বিশেষ করে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

আশা করি, এই কালো ও সাদার ভেদাভেদ আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিরতরে বিদায় নেবে। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের শহীদ ও বীর দেশপ্রেমিক সেনেটর কেনেডির ও শান্তির দূত মার্টিন লুথার কিংয়ের মৃত্যুর বেদী-মূলে দাঁড়িয়ে মার্কিনদেশবাসীকে এই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে—যে, সাদা ও কালোর ভেদাভেদ চিরদিন ও চিরকালের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুছে যাক্। এই পথেই একমাত্র আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সমস্ত বিশ্ববাসী এই মহান দুটি মহামানব দেশ-প্রেমিককে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে।

শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮সি, সি এন রায় রোড, কলিকাতা-৩৯

এক রাতের রাণী প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আমি আপনাদের মাসিক পত্রের একজন পুরাতন গ্রাহক এবং নিয়মিত মাসিক বসুমতী পড়ি। কিছুদিন পূর্বে আপনাদের মাসিক পত্রের দুইটি সংখ্যায় 'এক রাতের রাণী' নামে যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হইয়াছিল উহা পড়িয়া খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছি। ঐ উপন্যাসটি সম্বন্ধে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়ের লেখা যে চিঠি-খানি প্রকাশিত হইয়াছে ঐ চিঠিখানার বিষয়ে আমি দুই-একটি কথা বলিতে চাই।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ঐ উপ-ন্যাসটির সমালোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমি

একমাত্র হইতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। প্রায় সমস্ত কাহিনীটিই যে স্বপ্নের মাধ্যমে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এমনি একটা স্বপ্ন-লেখা কাহিনীর সমালোচনা করিতে গিয়া যিনি উহার মধ্যে বাস্তবতার খোঁজ করেন, তিনি নিরপেক্ষ সমালোচক বলিয়া নিজেকে দাবী করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না।

কাহিনীটি যে সত্যই অবাস্তব তাহা বুঝিতে হইলে যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, বাস্তব-অবাস্তবের বিষয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতামতও সকলেরই জানা আছে। সেই সকল বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়াও এই কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, কাহিনীতে লেখক যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সুষ্ঠুভাবে বলা হইয়াছে কি না; চরিত্রগুলি যথাযথ ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না এবং সর্বোপরি লেখাটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে কি না উহাই---আসল বিচার্য বিষয়, আমার নিজের ধারণা, উপরোক্ত বিষয়গুলিতে লেখক নটরাজন যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন, কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও লেখক নটরাজন একটি অবাস্তব কাহিনীর মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর শাশ্বত সম্পর্কের মত একটি বাস্তব সত্যকে যেভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সত্যিকারের রসিক পাঠকমাত্রই উহার প্রশংসা করিবেন এবং সেই সঙ্গে আপনি ঐ কাহিনীটি প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আপনাকেও ধন্যবাদ জানাইবেন।

কিন্তু উহার পরিবর্তে শ্রীমতী নিরুপমা দেবী আপনার সম্পর্কে যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লজ্জা বোধ না করিলেও পাঠক হিসাবে আমি লজ্জিত। তাহা ছাড়া পত্রের শেষের দিকে উহা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি যেন আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছেন। এই চ্যালেঞ্জের অর্থ কী? একমাত্র নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করাই কি ইহাঁর উদ্দেশ্য? ভগবানকে মিত্ররূপে লাভ করিতে না পারিয়া শত্রুরূপে লাভ করিবার প্রচেষ্টা? আপনার মত একজন উপযুক্ত সম্পাদক সাহিত্যসেবীর প্রতি কী ভাষা প্রয়োগ করা উচিত, সেই জ্ঞানটুকু অর্জন করিবার পরই তাঁহার পক্ষে কলম ধরা উচিত ছিল বলিয়া মনে করি।

শ্রীমণিভূষণ সান্যাল, C/o, শ্রীঅহিভূষণ সান্যাল, কদমতলা, জলপাইগুড়ি।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

ডঃ পি কে মুখার্জী St. Mathews Hospital, Bwentt wood. Walsall C.O. staff UK. ● শ্রীরবীন্দ্রকুমার সরকার, ডাক—ফরিদপুর, (দুমকল হয়ে) জেলা—মুর্শিদাবাদ ● শ্রীগিরিধারী পাণ্ডা, প্রধান শিক্ষক হলদিয়া হাই স্কুল, ডাক---হলদিয়া,

একটি ঘোষণা

লণ্ডনে নিম্ন ঠিকানায় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাওয়া যাবে।

শ্রীরবি হাজরা চৌধুরী
৩৩, উড্ লেন, লণ্ডন,
এন্, ডব্লিউ-৯

কটক, উড়িষ্যা ● ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, নরসিংপুর, ডেভেলপমেণ্ট ব্লক, গভঃ অব আসাম, ডাক---নরসিংপুর, কাছাড়, আসাম ● শ্রীমতী প্রতিমা ধর, অবঃ ৬, পি, কে ধর, ৩৫, ভারগোরা, এস্টেট, কানপুর ● শ্রীমতী দ্বিতীয়া ঘোষাল, অবঃ শ্রীসত্যতপন ঘোষাল, ভূকৈলাস রাজবাড়ী, ডাক---খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩ ● শ্রী এস কে বসু, ডাক---কালিম্পং, দার্জিলিং ● শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, কোয়ারপুর হাই স্কুল, ডাক---কোয়ারপুর, জেলা---বর্ধমান ● শ্রী বিজলী সেন, ইন্দ্রডাঙ্গা আশ্রম, ডাক---তেজহাটী, বীরভূম ● শ্রী এ কে মল্লিক, C.O.I. HQ—14. B.R.T.F, C/o, 99 A.P.O. ● শ্রীঅরুণচরণ রায়, গ্রাম---খোস বাসপুর, ডাক---গোক্রনা, জেলা---মুর্শিদাবাদ ● শ্রীমতী উষা দেবী, নলহাটী, জুনিয়র হাই স্কুল, ফর গার্লস ডাক---নলহাটী, বীরভূম ● শ্রী এস আর সেন শর্মা, The H.C. Co. Sibanu Tunnel Works. ডাক--- Donkaraji, Vizag. A P. শ্রীশশধর দাস, ডাক---নবগ্রাম মুর্শিদাবাদ।

Please find herewith a sum of Rs. 27·00 (Rupees twenty seven) only being the subscription of the Monthly Basumati for one year from the month of Ashar 1375 B.S.—Block Development Officer, Narsingpur Development Block, Cachar.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইবার জন্য ৬ মাসের চাঁদা ৯ টাকা পাঠাইলাম। আষাঢ় সংখ্যা হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। রবীন্দ্রকুমার সরকার, ফরিদপুর।

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের জন্য গ্রাহক করিয়া লইবেন। চাঁদা বাবদ ৯ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। গিরিধারী পাণ্ডা, কটক উড়িষ্যা।

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের চাঁদা ৯ টাকা পাঠাইলাম। যথারীতি পত্রিকা পাঠাইবেন। শ্রীশান্তি লাহিড়ী, দেরাদুন।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৮ টাকা পাঠালাম। পত্রিকা পাঠাবেন। সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, কটক-২

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৮ টাকা পাঠালাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাবেন। শ্রীমতী মীরা দেবী আন্দামান।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ২৪ টাকা (১৮টি সংখ্যার জন্য) পাঠালাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। ইন্দু টকীজ, পুর্ণিয়া।

গোপাল

ীতেশ রায় অঙ্কিত

সিক বসুমতী

ভাদ্র, ১৩৭৫ ।

প্রেম

"সার কথা হচ্ছে সচ্চিদানন্দে প্রেম। কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাসতে হবে? গৌরী বলতো, রামকে জানতে গেলে সীতার মত হতে হয়; ভগবানকে জানতে ভগবতীর মত হতে হয়; ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, সেইরূপ তপস্যা করতে হয়; পুরুষকে জানতে গেলে প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়—সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব।

"প্রেমের আবার রকমফের আছে—একাঙ্গী প্রেম (ভালবাসা একাঙ্গ। কি না, একদিক থেকে—যেমন জল হাঁসকে চায় না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে), সাধারণী প্রেম (নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও—যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব), সমঞ্জসা প্রেম (প্রেমিক চায়, আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক), আর সমর্থা প্রেম (যেমন শ্রীমতীর, কৃষ্ণসুখে সুখী; তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক। গোপীদেরও এই উচ্চ অবস্থা ছিল)।

প্রেমাভক্তি (রাগভক্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঈশ্বরের উপর ভালবাসা থেকে যখন সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে গিয়ে তাঁর উপর ষোলআনা মন হয়, তখন তাকে বলে প্রেমাভক্তি বা রাগভক্তি। এরই অন্য নাম নিষ্ঠাভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি। এ ভক্তি অনুরাগ থেকে হয়,—ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়।

"কারু কারু বৈধী ভক্তি অভ্যাস করতে করতে—সাধ্য-সাধনা করে রাগভক্তি আসে; আবার কারু বা আপনা আপনিই হয়। তারা ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে—যেমন প্রহ্লাদ। তাদের বৈধী কর্মের (পূজা, জপ, ধ্যানাদির) প্রয়োজন হয় না—কোন বিধিনিয়ম থাকে না। তাদের যেন ধান কাটার পর মাঠ পার হওয়া; আল দিয়ে যেতে হয় না। অথবা যেমন বন্যা এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে যেতে হয় না, মাঠের উপর একবাঁশ জল সোজা নৌকা চালালেই হলো।

"ভক্তি দ্বারাই তাঁকে লাভ করা—তাঁকে দর্শন করা যায়; তবে, সে ভক্তি পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি হওয়া চাই। সে ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে—যেমন ছেলের মা'র উপর ভালবাসা, মা'র ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

"এ ভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না; দয়া থাকে। এ ভালবাসা এলে সংসার বিদেশ বোধ হয়—একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে। বিষয়াসক্ত মনে রাগ ভক্তি হয় না।

"এ ভক্তির পতন নাই। যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে, আর যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের এ ভক্তি হয়। সংস্কার না থাকলে প্রেমাভক্তি হয় না।

"গোপীদের প্রেমাভক্তি। এ ভক্তি জ্ঞান বা বিচারের ধার ধারে না। এ ভক্তিতে দুটি জিনিস আছে—'অহংতা' আর 'মমতা'। যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা' বলে গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর 'মমতা'—আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বললেন,—মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ-চিন্তামণি; তিনি সামান্য নন।' যশোদা বললেন—'ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি।—চিন্তামণি না, আমার গোপাল!'

"প্রেমাভক্তি থাকলেই নিত্য-অনিত্য-বিবেক হয়—সর্বদা এই বোধ হয় যে ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য; ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।"

প্রেমের শরীর

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঈশ্বরকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দ্যাখে,—সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিংগ যোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়। ভক্তের এই প্রেমের শরীরই ভাগবতী তনু। এই ভাগবতী তনু দ্বারা সেই চিন্ময়রূপ দর্শন হয়। ভক্তি হিমে সচ্চিদানন্দ (সগুণ ব্রহ্ম) সাকাররূপ ধারণ করেন—সেই চিন্ময়রূপ।

"ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে এ দর্শন হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারিদিকে হলদে দেখা যায়।

"তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়; যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিক শিখাময় দেখা যায়।"

ফকির ও আকবর শাহ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থেকে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। যার অনেক আছে সেও কামনা ছাড়তে পারে না।

"আকবর শা দিল্লীর বাদশা। তাঁর রাজধানীর কাছেই একটি ফকির বনের মধ্যে কুটিরে থাকতো, ফকিরটির কাছে অনেক কে

আসতো; ইচ্ছে সত্ত্বেও ফকির অতিথি সৎকার করতে পারতো না। তাই ফকির ভাবলে, আকবর শা'র কাছে গিয়ে কিছু অর্থাদি আনলে আর এ অসুবিধা থাকবে না। সাধু ও ফকিরের সম্রাটের কাছে অবারিত দ্বার।

আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন। ফকির গিয়ে একটু দূরে বসলেন। ফকির শুনতে পেলেন, নমাজের শেষে আকবর শা বলছেন—'হে আল্লাহ্, ধন দাও, দৌলত দাও— —'; আকবর আর অনেক বলছিলেন, কিন্তু ফকির আর না শুনে উঠে চ'লে যাবার উদ্যোগ করলেন। আকবর ইসারা করে তাঁকে বসতে বলে নমাজ শেষ হলে ফকিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি এসে বসলেন আবার চলে যাচ্ছেন?' ফকির বললেন—'সে আর জাঁহাপনার শুনে কাজ নেই, আমি যাই।' বাদশা অনেক জেদ করাতে ফকির বললেন—'আমার কুটিরে অনেক লোক আসে; কিন্তু অর্থাভাবে কোনরূপ সামান্য অতিথিসৎকারও করতে পারি না। তাই কিছু প্রার্থনা করতে এসেছিলাম।' বাদশা বললেন—'তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন?' ফকির বললেন—'যখন দেখলুম আপনিও আল্লার কাছে ধন-দৌলত প্রার্থনা করছেন, তখন ভাবলুম ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে! চাইতে হয় তো খোদার কাছেই চাইব!'

"দেবার মালিক একমাত্র ঈশ্বর।"

ফুটো কলসিতে জল

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বীর্যধারণ না করলে—ঊর্ধ্বরেতা না হ'লে উপদেশ ধারণা হয় না।

"একজন চৈতন্যদেবকে বললে—'ভক্তদের আপনি এত উপদেশ দেন, তবু এরা তেমন উন্নতি করতে পারছে না কেন?' তিনি বললেন—'এরা যোষিৎ সঙ্গ করে সব অপব্যয় করে;—তাই ধারণা করতে পারে না। ফুটো কলসিতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়'।"

ফোঁস করতে হয়

শ্রীরামকৃষ্ণ—"লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখানো দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে ব'লে উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

"দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়; ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই। ব্রহ্মচারী সাপকে বললে—'তুই তো বড় বোকা। তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম—ফোঁস করতে বারণ করি নাই! তুই যদি ফোঁস করতিস তা হ'লে তোর শত্রুরা তোকে মারতে পারতো না।

"সংসারী ফোঁস করবে—বিষ ঢালা উচিত নয়; কাজে কারু অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়; নইলে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।

"বিড়াল যদি নুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে তাকে একবার মারলেও দোষ হয় না।"

বই পড়া

শ্রীরামকৃষ্ণ—"শাস্ত্র, বই—শুধু এ সবে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হবে না; যাতে কৃপা হয় তা কর। ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে—তাঁকে পারবে না।

"বই পড়ে কি জানবে? শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স—সব খড়কুটো বোধহয়।

"বই, শাস্ত্র, এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ—উপায় জেনে লবার পর আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে নিজে কাজ করতে হয়।

"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনীকাঞ্চনে, দেহসুখে মন আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। আবার বইটই পড়েছে বলে অমনি অহংকার এসে জোটে। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার।

"তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের কি অভাব থাকে? দেখ না, আমি তো মুখ্যু, কিছুই জানি না, তবে এসব কথা বলে কে? আমি যখন কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

"বই বা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। সাধুর পুঁথি একজন খুলে দেখলে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল রামনাম লেখা আছে—আর কিছুই নাই।

"বই আর পোড়ো না—ভক্তিশাস্ত্র ছাড়া। কথাটা হচ্ছে তাঁকে ভালবাসা, আর তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা।

"অনেকে মনে করে বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন অনেক তফাত। আমি ত' বইটই কিছু পড়ি নাই, তবু দেখ মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে।

"সেজোবাবুর সঙ্গে এক জায়গায় গিছলাম। অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি ত' মুখ্যু! তারা আমার সেই অবস্থা দেখে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তার পরে বললে—'মহাশয়, আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া বিদ্যা সব থু হ'য়ে গেল।' এখন বুঝছি, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের অভাব থাকে না; মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে। তাই বলছি, বই পড়লেই জ্ঞান হয় না।"

বদ্ধ জীব

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সংসার যেন জল, জীব যেন মাছ, আর মহামায়া যেন জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, তার অধিকাংশই পালাতে পারে না—পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জালের মধ্যে থেকেই পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে—মনে করে, আর ভয় নেই, বেশ নিশ্চিন্তে আছি। একবারও ভাবে না যে জেলে হিড়হিড় করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরা বদ্ধ জীবের মত।

"বদ্ধ জীবেরা সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ—এত দুঃখ-কষ্ট পায় তবু আসক্তি-ডোরে হাত-পা বাঁধা। তারা ভাবে তারা বেশ আছে—সংসারে আর কামিনীকাঞ্চনেই সুখ হবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও ঐ একই চিন্তা; হয়ত পাশের লোককে বললে—'প্রদীপে অতো সলতে কেন? কত তেল পুড়ছে! সলতে কমিয়ে দাও।'

"বদ্ধজীব ঈশ্বর-চিন্তা করে না। অবসর পেলে হয়তো ফালতো গল্প করে? নয় তো তাস খেলে, নভেল পড়ে সময় কাটায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে—'আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই এই করে সময় কাটাচ্ছি।' এদের কোনমতে হুঁস আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবু চৈতন্য হয় না।

"উট কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দর দর করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটাঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোকতাপ পায়, তবু দু'দিন পরেই যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হলো, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো! এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের ছেলে-মেয়েও হয়। মোকদ্দমা করে সর্বস্ব যায়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলেপুলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে ভালভাবে রাখতে পারে না—আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।

"আবার কখনো কখনো সাপে ছুঁচো গেলা হয়—গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়ত বুঝছে যে সংসারে কিছুই সার নেই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না; তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

"বদ্ধ জীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তা হ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, মরে যাবে।

"বদ্ধ জীব জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এ জ্ঞান নাই। এদের সামনে হরিকথা হ'লে এরা সেখান থেকে চলে যায়,—বলে, হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? যদি তীর্থ করতে যায়, পরিবারদের পুঁটলি বইতে বইতে, আর ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, আর গড়া-গড়ি দেওয়াতেই সময় কেটে যায়—নিজে ঈশ্বর-চিন্তা করবার অবসর পায় না।

"বদ্ধ জীব নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ করে উপার্জন করে। যারা ঈশ্বর-চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যান নাম-গুণ-কীর্তন করে, বদ্ধ জীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়।

"বদ্ধ জীব যেন গুটিপোকা। মনে করলে গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আসতে মায়া হয়; মায়াতে ভুলিয়ে রাখে। যারা মায়ার ভেল্কিতে ভোলে না, সে দু-একজন কামিনীকাঞ্চনের বশ হয় না।

"অথবা যেমন ঘুণীর মধ্যে মাছ; যে পথে ঢুকছে সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলেই পারে, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দ, আর অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, এতেই ভুলে থাকে; তাই বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না। ছেলেমেয়েদের আধ আধ কথা যেন জলকল্লোলের মধুর শব্দ; আর অন্য মাছ, অর্থাৎ পরিবারবর্গ। যে দু-একটা দৌড়ে পালায় তারা মুক্তজীব।

"বদ্ধজীব যেন জাঁতার ভিতর পড়েছে; পিষে যাবে। এদের মধ্যে যে ক'টি ডাল খুঁটি ধরে থাকে তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি ধরতে অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হ'তে হয়।

"ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে, এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে—যেমন মা'র প্রাণ পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। ভগবান ভিন্ন আর কিছুই চাইবে না; আর ভিতরে খুব রোক থাকবে।"

বন্ধন

"সংসার পাশঃ পুরুষং বধ্যাতি"—সংসাররূপ রজ্জুই পুরুষকে বন্ধন করে। এই রজ্জু হচ্ছে প্রকৃতি; প্রকৃতিই পুরুষকে বন্ধন করে এবং প্রকৃতিই আবার সে বন্ধন মোচনও করে। পুরুষের যথার্থ বন্ধন না। সংখ্যাকারিকা বলেছেন—বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের বন্ধন, সংসার বা মুক্তি হয় না। প্রকৃতিই নানাবিধ স্থূল শরীর লাভ করে বদ্ধ সংসারীও মুক্ত হয়; বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার, এ তিনই পুরুষে আরোপ হয় মাত্র।

বন্ধন হয় প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা; সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বন্ধন।

তমোগুণের বন্ধন অজ্ঞান ও ভ্রান্তি। ভগবান বলেছেন—'প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্যাতি ভারত' (গী—১৪।৮)। প্রমাদ, আলস্য (অনুদ্যম) ও নিদ্রা, এই রজ্জুগুলি দিয়ে তমঃ দেহীকে বদ্ধ করে।

'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্যাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহীনম্॥ গী-১৪।৭।

রজঃ রাগাত্মক—রাঙিয়ে ফেলে—তৃষ্ণা ও আসক্তি জন্মায়। তাই রজঃ দেহীকে কর্মরজ্জু দিয়ে বেঁধে ফেলে।

'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্যাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ গী-১৪।৬।

সত্ত্ব স্ফটিকের মত নির্মল, তাই প্রকাশময়ী (দোষকে ঢেকে রাখে না) এবং উপদ্রবশূন্য। কিন্তু দেহীকে সুখ ও জ্ঞানরূপে সম্বন্ধ দিয়ে বন্ধন করে; অর্থাৎ ক্ষেত্রের ধর্ম সুখ ও জ্ঞানকে আত্মায় মিলিয়ে দিয়ে জীব 'আমি সুখী ও জ্ঞানী' মনে করে বন্ধনের সৃষ্টি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আজ বাগবাজারের পুল হ'য়ে এলাম। কত বন্ধনেই বেঁধেছে। একটা বন্ধন ছিঁড়লে পুলের কিছুই হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে—তারা টেনে রাখবে। তেমনি সংসারীদের অনেক বন্ধন। ভগবানের কৃপা ছাড়া সে বন্ধন যাবার উপায় নাই।

"তাঁকে দর্শন করলে আর ভয় নাই। তাঁর মায়ার ভিতর বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই আছে; দর্শনের পর নির্লিপ্ত হ'তে পারে। অবিদ্যার সংসার ভুলিয়ে দেয়; আর বিদ্যামায়া জ্ঞান, ভক্তি, সাধু-সঙ্গ—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়।

"কামিনীকাঞ্চন জীবকে বদ্ধ করে। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার—বিষয়াসক্তের দরকার। কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না। এরই জন্য পরের দাসত্ব করতে হয়; স্বাধীনতা চলে যায়।

"বন্ধন আর মুক্তি, দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন; আবার তিনি ইচ্ছে করে যখন ডাকবেন তখন মুক্তি হবে।"

বস্তুলাভ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বস্তুলাভ কি না ঈশ্বরদর্শন; শুধু দর্শন নয়,—বিভিন্নভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ। একেই বলে সিদ্ধি। অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি নয়, সে সিদ্ধিতে ভগবানকে পাওয়া যায় না। —বস্তুলাভ হয় না। সে (অণিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ভাই, যদি দেখ যে অষ্ট সিদ্ধির একটি সিদ্ধিও কারও আছে, তা হ'লে জেনো যে সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না।'

"তপস্যা চাই, তবে বস্তুলাভ হবে। শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্ত করলে কিছু হবে না। 'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' মুখে বললে নেশা হয় না। সিদ্ধি খেতে হয়।

"আগে চাই চিত্ত শুদ্ধি; তারপর ব্যাকুলতা, সাধনা, তপস্যা, তবে বস্তুলাভ। বস্তুলাভ হ'লে বাইরের আড়ম্বর কমে যায়। তখন কেবল তাঁর নামটি নিয়ে থাকা, আর স্মরণ মনন।"

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

এ মাসের প্রচ্ছদপট

॥ উইলিয়াম ফকনার ॥

সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে মার্কিন সংস্কৃতিকে যাঁরা বিপুল গৌরবে বিভূষিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম ফকনার একটি উল্লেখযোগ্য এবং অবিস্মরণীয় নাম। মার্কিন সাহিত্য আজ যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির উত্তুঙ্গশিখরে আরোহণে সমর্থ হয়েছে তার মূলে ফকনারের অবদানের গুরুত্ব অল্পমূল্যের নয়।

পঁয়ষট্টি বছর স্থায়ী তাঁর নশ্বর জীবনে এক অভাবনীয় বৈচিত্র্যের অভাবনীয় সমাবেশ। জীবনে যিনি যত দেখেছেন, যত পেয়েছেন, যত জেনেছেন---সেই দেখা, সেই শোনা, সেই জানা তাঁর সাহিত্যে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন এবং এই কাজে যিনি যত সফলকাম হতে পারবেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারের জয়মাল্যটি ততই তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে। জীবন-বৈচিত্র্যের ব্যাপক সমষ্টি এবং সাহিত্য জীবনেরই এক সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। তাই যাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যত পরিপূর্ণ সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তিনিই তত শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন.

ফকনারের জন্ম ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জন্মস্থান মিসিসিপির অন্তর্গত রিপলি। স্কুলের পড়া শেষ করে পিতামহের ব্যাঙ্কে যোগ দিলেন। তারপর যোগ দিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠও সমাপ্ত হল না। পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয় বিষাণ। দিকে দিকে শুধু যুদ্ধভেরী। সেই ভেরীনিনাদ ফকনারের তরুণ চিত্তে জাগিয়ে তুলল উন্মাদনা। সে উন্মাদনাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। যোগ দিলেন প্রথম মহাযুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাঙলার এক সেরা কাবও এই প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বাঙলা কবিতার ইতিহাসে এক যুগ-স্রষ্টার সম্মানে তিনি বন্দিত। তাঁর নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

রয়্যাল এয়ার ফোর্সে একজন লেফটানেন্টের পদ পেয়েছিলেন ফকনার। তারপর ফিরে এসে নানা ধরণের জীবিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। চিত্রশিল্পীর কাজ, সূত্রধরের কাজ, পাওয়ার প্ল্যাণ্টে নাইট শিফটের কাজ এবং আরও নানাবিধ বিভিন্ন ধরণের কাজ তিনি করেছেন। নিউ অর্লিন্সে সংবাদপত্রের অফিসেও কাজ করেছেন।

১৯২৬ সালে তাঁর 'সোলজার্স পে' বেরুল। ১৯৩০ সালে বেরুল 'এ্যাজ আই লে ডাইং', তারপর তাঁর অমূল্য গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি একটি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং সাধারণ্যে আনতে থাকে বিপুল আলোড়ন। সাড়া পড়ে যায় দিকে দিকে। তাঁর বইগুলির মধ্যে 'বিটউইন মিডনাইট এ্যাণ্ড ফোর এ এম', 'সাউণ্ড এ্যাণ্ড ফিউরি', 'নাইট ইন অগাস্ট', 'ওয়াইল্ড পাম', 'রিকুয়েম ফর এ নান', 'স্যাঙ্কচুয়ারি' প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য নাম।

১৯২৬ সালে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালে তিনি সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৬২ সালে তাঁর ঘটনাবহুল, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

ধর্মাচার্য বিজ্ঞানানন্দ

(শতবর্ষ স্মরণে)

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা নাস্তিকতার যখন প্লাবন এলো ; যুগপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'লেন একটা মূর্তিমতী প্রেরণারূপে---ঘোষণা করলেন---ঈশ্বর আছেন এবং তাঁকে উপলব্ধি করাই হ'ল মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। ঠাকুরের এই বাণী দিকে দিকে প্রচারিত করলো তাঁর মানস সন্তান দল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন ঠাকুরের এমনই এক সন্তান যিনি এলাহাবাদকে করেছিলেন তাঁর সাধনার পীঠস্থান এবং এখানে আশ্রম স্থাপন করে সর্বসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের উপদেশগুলি প্রচার করেছেন ব্যাপকভাবে। এখানে কেটেছে তাঁর গভীর প্রেরণাময় বৈরাগ্যদীপ্ত জীবনের সুদীর্ঘ ৩৮টি বৎসর। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি ছিলেন 'Bishops of Allahabad' (এলাহাবাদের ধর্মযাজক)। ধর্মাচার্য বিজ্ঞানানন্দের স্বরূপটি কি তা আলোচনা করার পূর্বে তাঁর ফেলে আসা জীবনের উপর একটু আলোক সম্পাত করার প্রয়োজন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম হ'ল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পিতার আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামে। তাঁর জন্ম হয় উত্তর প্রদেশ এটাওয়া শহরে---পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্মক্ষেত্রে।

শৈশবে হরিপ্রসন্ন নিজের গ্রামেই ছাত্র-জীবন আরম্ভ করেন। ছাত্র-জীবনে বহুবার তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব তাঁকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে। প্রথম যখন ঠাকুরকে তিনি দর্শন করেন তখন তিনি ছিলেন নিতান্ত শিশু। আর তখন সন্ন্যাসী দর্শন করার কোনও আগ্রহ তাঁর ছিলই না---বরং গৈরিক বসনের প্রতি তাঁর ছিল একটা স্বাভাবিক ভীতি। কিন্তু শ্বেত-বস্ত্র-পরিহিত ধ্যানমগ্ন ঠাকুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর মনে অপূর্ব ভাবের সমাবেশ হয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনে তিনি এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন---'ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মুখের ভাব কি যেন এক রকম। ফুটি ফেটে গেলে যেমন---এ যেন তাই ---মুখ বিকৃত বলা চলে না। সব শরীরের শক্তি যেন উপরের দিকে উঠে গেছে।---ঠাকুর যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন যেন মা কালীর ভাব। বসার পর শ্রীকৃষ্ণের ভাব। ঠাকুরের মেরুদণ্ড নীচ থেকে মাথা

ডাঃ যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্যন্ত---একটা মোটা দড়ির মত ফুলে উঠেছে---তা যেন সাপের মত ফণা বিস্তার করে আনন্দে হেলছে, দুলছে। (সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ---স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ-৯৭-৯৮।)

শুধু এই কারণেই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ছাত্র-জীবনে বার বার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করার প্রলোভন দমন করতে পারেন নি। তিনি সেখানে ঠাকুরের গভীর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁর শুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করেছেন। ক্রমশ তিনি এগিয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের অতি নিকটে আধ্যাত্মিক আকৃতি নিয়ে। অবশেষে একদিন ঠাকুর তাঁর জিহ্বায় কি যেন একটা এঁকে দিয়ে কুণ্ডলিনী শক্তিকে করেছিলেন ঊর্ধ্বমুখী। ঠাকুরের আদর্শ তাঁকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করে যে, কর্মজীবনে গাজীপুর প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সাংসারিক জীবন তাঁর মনকে তৃপ্ত করতে পারে নি। অন্তরের তীব্র বৈরাগ্য তাঁকে বাধ্য করেছিল সন্ন্যাস গ্রহণ করতে। সন্ন্যাস নেবার পর স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদকে করেছিলেন তাঁর সাধনার পীঠস্থান।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এলাহাবাদে অবস্থানকালটি দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) ১৯০০---১৯১০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত (২) ১৯১০---১৯৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম দশ বৎসর তিনি মুঠিগঞ্জের বৃদ্ধবাদিন কাবের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সময় তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছে কঠোর সাধন-ভজন, শাস্ত্রাদি-অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ভাবতন্ময়তার মধ্যে। এ ছাড়া তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-স্পৃহার পরিচয় আমরা পাই তাঁর কয়েকটি রচনার মধ্যে যেমন সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'রামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ' গ্রন্থখানির হিন্দী অনুবাদ; বাংলায় 'জল সরবরাহের কারখানা' দুইখণ্ডে প্রণয়ন, বরাহ মিহির রচিত বৃহৎজাতকের সংস্কৃত হতে ইংরাজী অনুবাদ, বাল্মীকি রামায়ণের অসম্পূর্ণ অনুবাদ, জ্যোতিঃ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'সূর্য সিদ্ধান্ত' প্রণয়ন ইত্যাদি।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনটির স্থাপনা করেন এবং এখানে তাঁর ধর্মাচার্যের যথার্থ রূপটি প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে যে, যখনই আচার্যের জীবনই হ'য়ে উঠেছে একটা আদর্শ তখনই তাঁর উপদেশ অতি সহজেই লোককে আকৃষ্ট করেছে---তাদের মনে নাড়া দিয়েছে এবং তা অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। গৌতম বুদ্ধের ত্যাগময় জীবন একদিন সমস্ত ভারতবাসীকে মুগ্ধ করেছিল, যার ফলে তারা ছুটে এসেছিল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ

করতে। সেদিন মুখে মুখে ধ্বনিত হ'য়েছিল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি---।'

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজে রাধার অভিনয় করে ব্রজলীলাকে দিয়েছিলেন বাস্তব রূপ; তাইতো সেদিন সমগ্র দেশবাসীর হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বেলিত হ'য়েছিল। সেই প্রেমের বানে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভ করে। সর্ব ধর্মের সমন্বয়তা উপলব্ধি করে ঘোষণা করেছিলেন, 'যত মত তত পথ।' তাইতো সবাই ছুটে এসেছিল তাঁর কাছে আশ্রয় এবং নির্ভরতা লাভের আশায়।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। তাঁর জীবটাই ছিল একটা আদর্শ বা দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন অদ্ভুত মধুরভাষী, তাঁর মধ্যে ছিল বিচিত্র এক মাধুর্ব এবং তাঁর অপরূপ ব্যক্তিত্বে ছিল এমন একটা চৌম্বকীর আকর্ষণ, যা দেখে এলাহাবাদবাসী দলে দলে ছুটে এসেছিল তাঁর কাছে, এসেছিল তাঁর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে।

এখানে তিনি ঠাকুরের কৃতী শিষ্যরূপে একটি কথা বার বার প্রচার করে গেছেন, সেটি হ'ল---ঈশ্বর আছেন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং স্বমহিমায় প্রকাশিত---মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য হ'ল তাঁকে পাওয়া। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন সার্থক সাধক এবং নিজের জীবনে তিনি ঈশ্বর-উপলব্ধিকে করেছিলেন নিত্য স্বাভাবিক ঘটনা।

প্রয়াগে অবস্থানকালে একদিন ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন স্নানের পর তিনি 'ত্রিবেণী মায়ের' কুমারী মূর্তিটি তিনটি বেণী সহ দর্শন করেছিলেন। আর একবার এলাহাবাদে পাঁড়েলা মহাদেবের মন্দির দর্শন করার তাঁর ইচ্ছে হ'য়েছিল---কিন্তু সেখানে যাবার আগের দিন রাত্রে তাঁর ইচ্ছে হ'য়েছিল---কিন্তু সেখানে যাবার আগের দিন রাত্রে তাঁর এক আশ্চর্য দর্শন হ'য়েছিল, যা তিনি তাঁর ভক্তদের এইভাবে ব্যক্ত করেছেন---

"কাল যাদের কথায় কথায় বলে-বলেছিলাম পাঁড়েলা মহাদেব দর্শন করতে যাবো, কিন্তু ভেতরে যে একটা খুব আগ্রহ ছিল তা নয়। হয়ত যেতাম না, কিন্তু র'ত্রে এক আশ্চর্য দর্শন হ'ল---নীচ থেকে ওপর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্যোতিতে ভরে গেল। সে যে কী তা মুখে বলা যায় না। ভারি আনন্দ হ'য়েছিল। বুঝতে পারলাম শিবঠাকুর কৃপা করেছেন।" (সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ; পৃঃ-৪৮) সারনাথে বৌদ্ধ-মন্দিরে গিয়ে তিনি ভাবে বিভোর হ'য়ে গিয়েছিলেন এবং সমাধিস্থ অবস্থায় বুদ্ধদেবের একটা কমনীয় প্রেমঘন মূর্তি তাঁর মানসনেত্রে ভেসে উঠেছিল। এই সব দর্শনের কথা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর ভক্তদের শোনাতেন শুধু তাদের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় জন্মাবার জন্য। এ ছাড়া তাঁর ভক্তি-ভাবও সকলকে মুগ্ধ করতো। তাঁর উপাস্য দেবতা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র।

তিনি বলতেন, 'আমি যখন রামায়ণ লিখতে বসি তখন রাম, লক্ষ্মণ ও মহাবীরকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।' আর একবার তিনি মহাবীরকে কিছু চিনি ও কলা নিবেদন করতে গিয়ে অশ্রুবিগলিত নেত্রে বলেছিলেন, 'মহাবীর জী, তুমি দেশের সন্তানদের অবস্থা ভাল করে দাও। তুমি রামের দাস---রামজীর ভক্ত। সকলকে আশীর্বাদ কর।' (সৎ-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ; পৃঃ---৫৫) তাঁর আবেগময় প্রার্থনাতে ভক্তগণের মন ভক্তিরসে উদ্বেলিত হয়। ঠাকুর দাস্য ভাবের সাধনাকালে নিজেকে হনুমান ভাবে এতদূর ভাবিত করেছিলেন যে তিনি একটা কৃত্রিম ল্যাজও লাগিয়ে ঘুরেছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এই ভাবটি আমরা দেখতে পাই তাঁরই আত্ম-পরিচয়ের উক্তিতে, 'হাম্ রামজীকা বন্দর হ্যায়।' আর সেই সঙ্গে রামজীর অনুগত দাসভাবটি তাঁর মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হত।

আর একবার জনৈক ভক্তকে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ভূত দেখেছ?' সে বলেছিল, 'না'। বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাকে বলেছিলেন, 'পঞ্চভূত তোমার দেহের মধ্যে বাস করছে। কিন্তু রাম নাম করলে তারা সব পালিয়ে যাবে। যেখানে রামনাম হয়---সেখানে ভূত থাকতে পারে না। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এই ভাবপ্রবণতা সর্বসাধারণকে গভীর-ভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

ভক্তিভাব ছাড়া বিজ্ঞানানন্দ মহা-রাজের নিরভিমান ব্যক্তিত্ব, মিষ্টভাষণ, সহজ ও ত্যাগময় জীবন সকলকে করেছিল মুগ্ধ। তিনি কোনও দিন নিজের প্রচার চান নি বা নিজেকে শিক্ষাগুরু রূপে ঘোষণা করেন নি।

কেউ উপদেশ চাইলে বলতেন, 'ছেলেবেলায় বর্ণ পরিচয় পুস্তকে যা পড়েছ তাই জীবনে সাধনা কর।' অর্থাৎ সদা সত্য কথা বলিবে, কাহারও দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়---এই দুটি নীতির যদি সাধনা করতে পার আর সবই তাহলে সহজ হয়ে যাবে।' (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ---স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, পৃঃ--৬৯) খুব প্রয়োজন না হলে তিনি আশ্রমের বাহিরে যেতে চাইতেন না।

স্বামী মাধবানন্দ একটি প্রবন্ধে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বিষয় বলেছেন, 'তীব্র বৈরাগ্য ছিল তাঁর মহান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ।' (১৯৩৮ সালের প্রবুদ্ধ ভারত, জুন সংখ্যায়, ইংরাজী প্রবন্ধ) এর প্রমাণ আমরা এলাহাবাদে বিজ্ঞা-নানন্দ মহারাজের জীবননির্বাহ-প্রণালীর মধ্যেই পাই। প্রথম যখন তিনি বুদ্ধবাদিন ক্লাবে ছিলেন তখন তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এই সময় তিনি রান্না ও বাসন মাজার কাজটি নিজেই করতেন। বাড়ীতে জলের কল না থাকায় রাস্তা থেকে বা প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে জলও আনতে হত। কিন্তু এগুলি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় কোনও দিন বাধা সৃষ্টি করে নি।

ঠিক তেমনি মঠের মধ্যেও, বিলাস তাঁর জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি। এমন কি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির

প্রতিও তিনি ছিলেন একেবারে উদাসীন।

মদনমোহন মালব্যজী একবার তাঁর ঘরে এসে অত্যন্ত পুরানো জলের কুঁজোটি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এবং সেটি বদলানোর কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ভক্তদের তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন জীবসেবা ব্রতে ব্রতী হবার জন্য কিন্তু নিজে কোনও দিন কাহারও সেবা চান নি।

মৃত্যুশয্যায় পর্যন্ত তাঁর এই ভাবটি অটুট ছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন, কিন্তু কেউ কাছে গেলে তাকে কেবল নীরব থাকতে বলতেন—কোন রকম সেবা তার কাছে চান নি। অসুস্থাবস্থায় কোনও চিকিৎসককে ডাকা পর্যন্ত তিনি পছন্দ করতেন না। তার কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে বড় চিকিৎসক আর কেউ নাই। বলা বাহুল্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এই বিশ্বাস ছিল জীবনের সম্বল।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বাইরের রূপটি দেখে অনেক সময় লোকে তাঁকে খামখেয়ালী বা আধপাগলা ভাবতো। তার কারণ সাধারণ লোকে তাঁর সব রসিকতা বুঝতে পারতো না। কিন্তু যাঁরা তাঁর অতি নিকটে এসেছিলেন তাঁরা তাঁর আধ্যাত্মিক মনের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ধর্ম-উপদেশ দেবার সময় জনসাধারণের সামনে কোনও নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন নি। ঠাকুরের বাণীগুলির করেছেন পুনরাবৃত্তি এবং সেগুলিকে বাস্তবের রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। ঠাকুরের মত তাঁরও উপদেশ দেবার ভঙ্গীটি ছিল খুব সরল এবং মাঝে মাঝে হাস্যরস পরিবেশন করে তিনি ভক্তদের মনকে জয় করতেন। তাঁর সমগ্র উপদেশের মূলে একটি কথা বার বার ধ্বনিত হয়েছে এবং সেটি হল এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণই হলেন ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁকেই প্রত্যেক ভক্তের দিবারাত্র স্মরণ করা উচিত, ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করলে মনের পাপ যায় পালিয়ে, মন হয় পবিত্র। তিনি বলতেন, 'ঠাকুরের মধ্যে কালী, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি সব দেবতা আছেন---এই যে ছবি দেখছো উহা ষটচক্রে ভেদের মূর্তি। তিনি সব চক্র ভেদ করে আনন্দেতে ডুবে আছেন। ঠাকুরের ধ্যান করলে বা তাঁর নাম করলে মনের হীনভাব কোথায় চলে যায়, মন উচ্চস্তরে উঠে যায়, কুণ্ডলিনী জেগে ওঠে।---ঠাকুরকে ডাকার মানে কি জান? ঠাকুরের গুণের কতকাংশের অধিকারী হওয়া। যে তাঁর চিন্তা করে সে তাঁর গুণ পায়। 'বিজ্ঞান বাণী—পৃ: ৩-৪) আর এক স্থানে দীক্ষা দেবার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, দীক্ষার মাধ্যমে তিনি ভক্তদের কেবল ঠাকুরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এলাহাবাদের জীবন হল সাধনার জীবন। ভক্ত অনুরাগী প্রেমে ভগবানকে নিয়ে বিভোর থাকে; সে থাকার মধ্যেও সাধনার শেষ হয় না। কারণ আধ্যাত্মিক জীবনের পরিধি বা সীমা অনন্তে মিশেছে। তাই সাধক বিজ্ঞানানন্দ ও আচার্য বিজ্ঞানানন্দের এই উভয়ের মধ্যে আলোচনা করলে আমরা দেখি গুরুবাক্য সম্বল করে অতি দীন বিনয়ী নিরভিমানী সাধক সাধন-পরিবেশ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি আক্ষরিক অর্থে জীবনের সব আচরণকে করেছেন শৃঙ্খলাবদ্ধ। কখনও সে গণ্ডীকে তিনি অতিক্রম করেন নি। তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ নিভৃতে যে উপদেশ করেছিলেন তাঁকে,'---তোরা হলি মায়ের লোক, তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে কাকে ঠোকরানো ফল মায়ের পূজায় লাগে না। তাই বলছি খুব সাবধান থাকবি।---সোনার মেয়ে মানুষ হলেও সেদিকে ফিরেও তাকাবি না।' এলাহাবাদ মঠের পরিবেশে তা ছিল রূপায়িত।

শুদ্ধ আধ্যাত্মিকভাবে বিচরণকালে এ মঠে মাতৃজাতিকে পাছে কখনও যোগিনী মূর্তিতে দেখতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নারী জাতির জন্য আশ্রম-দুয়ার রেখেছিলেন রুদ্ধ।

এমন কি তাঁর সহোদরাকে পর্যন্ত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মঠের বাইরে অবস্থান করতে হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার আশ্রমের মেথরটি নিজে না এসে তার কন্যাকে কাজ করতে পাঠিয়েছিল। বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই মেথর-কন্যাটিকে দেখে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন এবং মেথরটিকে বলে পাঠান যে, পরের দিন থেকে তাকে আর আশ্রমের কাজ করতে হবে না। শেষে মেথরটির অনুনয়ে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই মর্মে পুনরায় কাজের অনুমতি দেন যে, ভবিষ্যতে সে যেন কোনও স্ত্রীলোককে আশ্রমের কাজে না পাঠায়।

আর একবার কোন এক মার্কিন মহিলাভক্ত বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের অনুপস্থিতিতে এলাহাবাদের মঠে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এসেই তাঁকে অন্যত্র যেতে বলেছিলেন।

স্বামী শিবানন্দ তাই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের বিষয় একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'প্রয়াগের এলাহাবাদের আশ্রমে মাদি মাছির পর্যন্ত ঢুকবার হুকুম নেই।' (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ---স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত-পৃ:---২৭৮) কিন্তু তাই বলে নারী জাতিকে স্বামীবিজ্ঞানানন্দ কোনও দিন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন নি। ঠাকুরের মত স্ত্রী-জাতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তিনি বলতেন, 'তাঁদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। মন্দিরে যে মা আছেন, তাঁদের ঠিক তেমনি মনে করবে। তাঁরা মায়ের জাত তাঁদের দূর থেকে প্রণাম করবে। তোমরা যে সন্ন্যাসী'। (সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পৃ:---৮)।

পরবর্তীকালে আচার্য বিজ্ঞানানন্দ যখন ভক্তদের আপনার ব্যথিতদের দরদী, আর্তদের কাছে করুণা

জ্যোতিষে চন্দ্র

মানুষের মনের ওপর চন্দ্রের প্রভাব। জন্মকুণ্ডলীতে চন্দ্রের অবস্থিতি ও অপরাপর গ্রহের সহিত তাহার সম্বন্ধের ভিত্তিতে জাতকের মানসিক গুণাগুণ ও বলাবল নির্ণয় করা হইয়া থাকে। পাপ পীড়িত চন্দ্র মানসিক অস্থিরতার কারণ। নীচস্থ, পাপগ্রহ যুক্ত বা দৃষ্ট এবং শুভ গ্রহের সহিত সম্বন্ধবিহীন চন্দ্র মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে। জনৈক জ্যোতিষী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গ্রহচক্র বিচার করিয়া ফলাফল নির্দেশের পূর্বে চন্দ্রের বলাবল নির্ণয় করিবেন। কারণপ্রায়শ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্বগুণযুক্ত চন্দ্র জাতককে অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা দান করে, যাহার ফলে বিপদেও জাতক অবিচলিত থাকিতে পারেন।

উপরোক্ত উক্তির যথাযথ্য আমি পরবর্তী জীবনে কোষ্ঠী-বিচার কালে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। ইহাও দেখিয়াছি যে, অন্যান্য গ্রহাবস্থান শুভ হইলেও পীড়িত চন্দ্র জাতককে সামান্য আঘাতেও বিশেষ বিচলিত করিয়া থাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে চন্দ্রের বলাবল কি করিয়া নির্ণয় করিব? এ ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে অন্যান্য গ্রহের বলাবল আমরা যেভাবে নির্ণয় করিয়া থাকি ঠিক সেইভাবেই কি চন্দ্রের বলাবল নির্ণয় করা যাইবে? অর্থাৎ স্বক্ষেত্রে শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্টচন্দ্র শুভ নতুবা অশুভ। ফলিত জ্যোতিষচর্চা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই চলিত বিধি পুরাপুরি চন্দ্রের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায় না। মনে রাখিতে হইবে যে, চন্দ্র শুক্লপক্ষে বলবান নতুবা বলহীন। চন্দ্র স্বক্ষেত্রে বলবান। বৃহস্পতিযুক্ত বা দৃষ্টচন্দ্র বলবান। অর্থাৎ কর্কটে শুভগ্রহ বৃহস্পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত শুভ চন্দ্র বিশেষ ফলদাতা। শুক্রযুক্ত বা দৃষ্টচন্দ্র জাতককে অস্থিরচিত্ত করে। মঙ্গলের ক্ষেত্রে চন্দ্রে অবস্থিতি একটি বিশেষ যোগ। এ্যাস্ট্রলজিক্যাল ম্যাগাজিন-এর এডিটর প্রফেসর বি ভি, রমন-এর মতে চন্দ্র মঙ্গল যোগের প্রভাবে জাতক বিশেষ অর্থশালী হন। দেখিয়াছি কর্কট লগ্নের জাতকের ক্ষেত্রে এই যোগ বিশেষ যোজ্য। কারণ লগ্নের অধিপতি চন্দ্র। মঙ্গল এই লগ্নের পঞ্চম এবং দশমপতি-বিধায় একাই রাজযোগকারী চন্দ্রের ক্ষেত্রে মঙ্গল তাই বিশেষ বলবান, তথাপি মঙ্গল পাপগ্রহ। চন্দ্রের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি তাই জাতকের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করিয়া দেয়। তাহাকে অস্থির চিত্ত, একগুঁয়ে এবং হঠকারী করিয়া তোলে। শনিযুক্ত চন্দ্র মানসিক বিষাদের দ্যোতক। অবশ্য এই যোগে মানুষ কঠোর সন্ন্যাসীও হইতে পারে। চন্দ্রের প্রবল শত্রু রাহু। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে অর্থাৎ চন্দ্রের গুণ নষ্ট করে। রাহুচন্দ্র যোগে মানুষ অতি সহজেই কাতর হইয়া পড়েন, কল্পিত দুঃখের আগমনের আশংকায় নিস্তেজ হইয়া পড়েন। আবার বিনা কারণেই আনন্দিত হন। এই দুঃখ এই আনন্দ ব্যক্তিগত কোষ্ঠিতে রাহুচন্দ্রে সম্বন্ধ থাকিলে রাহুর মহাদশায় চন্দ্রের অন্তর্দশায় এই ফল প্রকটভাবে দেখা দিতে পারে। চন্দ্রযুক্ত রাহুতে মানুষের ভ্রমণও হইয়া থাকে। সে অন্য বিচার। অপরাপর গ্রহের অবস্থিতিও সেখানে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। নির্মল চন্দ্র নির্মল মনের দ্যোতক। রবির ষষ্ঠে ও অষ্টমে বৃহস্পতিযুক্ত বা দৃষ্টচন্দ্র বিশেষ ফলদায়ক।

রূপেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রের মিত্র কেতু, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শত্রু শনি। শুক্র, বুধ ও রাহু, চন্দ্র শিল্পীগ্রহ, শিল্পী, সাহিত্যিক-গায়কের জন্মকুণ্ডলীতে চন্দ্রের অবস্থান লক্ষণীয়। শুক্রের ক্ষেত্রে বৃষে চন্দ্র তুঙ্গী, বৃষ দৈত্যাচার্য সর্ববিদ্যাপারংগম শুক্রের আনন্দময় স্থান। চন্দ্র সেখানে বলশালী। চন্দ্রের শিল্পমাধুর্য সেখানে অভিব্যক্ত হয়। চন্দ্রের স্বক্ষেত্রে কর্কট। নীচস্থান বৃশ্চিক যাহা অহংবাদী মঙ্গলের স্বক্ষেত্রে। নাশস্থান মকর। মীনে চন্দ্র উৎফুল্ল। পূর্বেই বলিয়াছি চন্দ্র শুভ গ্রহ, অতএব কেন্দ্রপতি দোষযুক্ত। কিন্তু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন বৃহস্পতি ও শুক্র অপেক্ষা চন্দ্রের কেন্দ্রপতিত্ব হেতু দোষ অল্প। আমার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে, তুলা ও মকর লগ্নের কেন্দ্রীশ দশান্তর্দশায় মারক ফল প্রদান করিয়া থাকে।

বিশেষত সেই চন্দ্র যদি কর্কটে অবস্থিত হয়। যেহেতু গ্রহগণ যে রাশিতে

বিগ্রহ---তখন সব সাজান আবরণ কৃত্রিম রুক্ষতা আপাততদৃষ্টিতে যা অনুদার, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-জাহ্নবীর প্রবাহে সেসব কোথায় গিয়েছে ভেসে। তখন তিনি দিয়েছেন কত আশ্রিতাদের অতি নিকটে স্থান--- তাঁদের জীবনের সকল কথায়, সকল সমস্যায় দিয়েছেন পূর্ণ মনোযোগ। তাঁদের জীবনকে করেছেন আধ্যাত্মিকতায় উন্মুখ। সে শান্তি সে প্রীতি নিশ্চয়ই বাস্তব দৃষ্টিতে সাধক বিজ্ঞানানন্দের ব্যবহারিক ত্রুটিকে সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তাঁর উপদেশ ও জীবন দৃষ্টান্তে প্রকাশ পেয়েছে আদর্শ ধর্মাচার্যের রূপ।

অবস্থিত থাকে সেই রাশির ফল প্রধানত প্রদান করিয়া থাকে। তুলা লগ্নে তুলাস্থিত এবং মকর লগ্নের মকরস্থিত চন্দ্র স্বীয় দশাকালে বিশেষ সুফল দান করে না।

পাঠক আমার সহিত একমত নাও হইতে পারেন কিন্তু আমার এই উক্তি অভিজ্ঞতাপ্রসূত। বহু কোষ্ঠী দেখিয়া এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে।

কর্কট লগ্নে চন্দ্র লগ্নাধিপতি। কুলবধূ যেরূপ কুলরক্ষা করিয়া থাকেন লগ্নাধিপতি সেইরূপ জাতককে রক্ষা করিয়া থাকেন। কর্কট লগ্নের কোষ্ঠি বিচারের সময় চন্দ্রের অবস্থিতি বিশেষভাবে বিচার্য। মীন লগ্নের পঞ্চমাধিপতি চন্দ্র, অর্থাৎ কোণপতি, কেন্দ্রপতি বৃহস্পতির সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ রাজযোগকারক। মেষ লগ্নের লগ্ন পঞ্চমাধিপতি যথাক্রমে মঙ্গল ও রবির সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ বিশেষ শুভদায়ক। বৃশ্চিক লগ্নের চন্দ্র ভাগ্যপতি। রবি কর্মপতি। রবি-চন্দ্র যোগ, বৃশ্চিক লগ্নের নবম ও দশম-পতির যোগ। ইহাও একটি বিশিষ্ট রাজযোগ।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে---যে-কোন ঐ যোগ থাকিলেই তিনি জীবনে উন্নতি করিবেন? রাজ-যোগ সম্বন্ধে এইরূপ কিছু ভ্রান্তধারণা চলিত আছে। অথচ রাজযোগ বিচার বিশেষ কঠিন, রাজযোগ থাকিলেই যে রাজ্যলাভ ঘটিবে ইহা সত্য নহে। রাজযোগের ফললাভ করিতে হইলে আরোও কতগুলি বিধি আছে---শিক্ষার্থীর নিকট সেইগুলি কঠিন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেইগুলি আলোচনা করা নহে। উহা স্থানান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

জন্মকুণ্ডলীর দ্বাদশস্থানের মধ্যে যে গৃহে চন্দ্রের অবস্থিতি তাহাই রাশি। রাশি হইতেই জাতকের মানসিক গঠন বিচার করা হয়। এক-একটি রাশি ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন। চন্দ্রের অবস্থিতি অনুসারে সেই গুণাগুণ জাতকের চরিত্রে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়। যেমন মকরে চন্দ্রের অবস্থিতি জাতককে কঠোর পরিশ্রম করিবার শক্তি দান করে। মেষে চন্দ্র জাতককে দৃঢ়চেতা করিয়া তোলে।

গোচর বিচারে চন্দ্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। রাশি হইতে গোচরফল নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। চন্দ্রের নবম হইতে ভাগ্য বিচার হইয়া থাকে। চন্দ্রের তৃতীয়ে শনি বিত্তদায়ক। চন্দ্র হইতে দ্বাদশে প্রথমে ও দ্বিতীয়ে শনির অবস্থানকালে জাতকের জীবনে নানারূপ পরিবর্তন আসিতে দেখা যায়।

প্রতি ত্রিশ বৎসরে সাড়ে সাত বৎসর শনির এই তিনটি রাশি অতিক্রম করিবার কালে কতই না বৈচিত্র্য আনে, স্থির চন্দ্র হইতে সপ্তমে বৃহস্পতির অবস্থানকালে দেখিয়াছি জাতক-জাতিকার বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়। জন্মকালীন চন্দ্রের সহিত গোচরে শুক্র সম্বন্ধযুক্ত হইলেও অনেক সময় বিবাহ হইতে দেখা যায়।

লেখক এবং সাহিত্যিকদিগের জন্মকুণ্ডলীতে প্রায়শই চন্দ্র ও শুক্রের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। গোচরে ঐরূপ সম্বন্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলেই শিল্পী সাহিত্যিকদিগের জীবনে জনস্বীকৃতি, রাজসম্মান, সাধকসৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রের দশায় গোচর মঙ্গল গোচর বৃহস্পতির সহিত শুভ সম্বন্ধ করিলে চাকুরীতে উন্নতি হয়।

অবশ্য এই বিধি বিশেষ কয়েকটি লগ্নের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেইসব লগ্ন যাহাদের চন্দ্র, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি এই তিনটি গ্রহই শুভফল-দায়ক। আমার শিক্ষাগুরু চন্দ্রমাধব ঘোষ স্থির চন্দ্রের সহিত গোচর বুধের সম্বন্ধ হইতে সহসা অর্থপ্রাপ্তি বিষয়ে ফল নির্দেশের সূত্র দিয়াছিলেন, এই সূত্র প্রয়োগ করিয়া আমি বিশেষ লাভবান হইয়াছি। তাঁহাকে ধন্যবাদ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জন্মকুণ্ডলীতে যে ফলের আদৌ সম্ভাবনা নাই, গোচরে সেই ফল আশা করা বাতুলতা মাত্র।

চন্দ্র বিবাহকারক গ্রহ। পূর্বে বলিয়াছি যে স্থির চন্দ্র হইতে সপ্তমে গোচর বৃহস্পতি ও শুক্রের অবস্থান হইতে বিবাহ-সময় স্থির করা যাইতে পারে। আজকাল সমাজে অসবর্ণ বিবাহ ঘটিতেছে। আমার মতে পাপপীড়িত চন্দ্রের লগ্ন হইতে সপ্তমে অবস্থিতি অসবর্ণ বিবাহ নির্দেশ করে। অনেকে আমার সহিত এ বিষয়ে একমত নাও হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের আমি এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনুরোধ করিব। চন্দ্র হইতে সমুদ্র যাত্রার বিচার হইয়া থাকে। সপ্তম ও দ্বাদশ হইতে দূরদেশে যাত্রা হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে চন্দ্রের অবস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঐ সকল স্থান যদি চরস্থানে হয় এবং তথায় চন্দ্রের অবস্থিতি থাকে তাহা হইলে চন্দ্রের দশান্তর্দশায় জাতকের ভ্রমণ হইতে পারে।

বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে

সত্যানন্দ মণ্ডল

বেণ্টিঙ্কের আদেশে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের আগে পর্যন্ত এদেশে কত যে বীভৎস অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে, সে কথা কে বলবে! শুধু আগুন জ্বলেছে। অসহায়া জীবন্ত নারী শুধু পুড়ে পুড়ে মরেছে। আর যখন এই পুড়ে মরার আইনটা থাকল না, তখন দেখা গেল, ভারতবর্ষে শত শত হিন্দু-বালিকা বিধবা হয়ে রয়েছে; যাদের সারাজীবন কেবল পীড়নে নির্যাতনে দগ্ধপ্রায় হয়ে যাবে, তবু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কখনো কোনদিন সেই নিষ্ঠুর বৈধব্য-জীবন থেকে অব্যাহতি পাবে না বলেই স্থিরীকৃত।

সেকালে মহাত্মা গান্ধীকে একজন লিখেছিলেন,---'আপনি ১৫ বৎসরের পূর্বে কন্যার বিবাহ দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু শাস্ত্রে তো আছে, স্ত্রীধর্ম প্রাপ্তির পূর্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই। এই ধর্মসঙ্কট হইতে রক্ষার উপায় কি?'

তখন মহাত্মা গান্ধী বললেন,---'আমার মতে ইহার ভিতর কোন ধর্মসঙ্কট নাই। যে ব্যক্তি বলে শাস্ত্রের নামে প্রচলিত পুস্তকে যা কিছু লেখা আছে তা সাচ্চা এবং তাহাতে কোন পরিবর্তন হইতে পারে না, তাহাকে পদে পদে ধর্মসঙ্কটে পড়িতে হইবে। একই শ্লোকের নানা অর্থ হইতে পারে এবং এইসব অর্থ পরস্পরবিরোধীও হইয়া থাকে। কত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তো অটল এবং কত শাস্ত্র তো দেশ-কাল ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ অথবা কালবিশেষের জন্য রচিত।---- বাল্য-বিবাহের কঠোর ফল আমি নিজেই ভোগ করিতেছি। কত হিন্দু যুবক দুর্বল নিরুদ্যম ও ভয়ভীত। বাল্য-বিবাহই যে ইহার এক প্রধান কারণ, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।'—

মহাত্মা গান্ধী আর একটি কথাও বলেছিলেন,---'অধর্ম যখন প্রচলিত ধর্মের আশ্রয় লয় অথবা ধর্মের মূর্তি ধারণ করে তখন সকলেই চিরকাল তার সমর্থন করে। বালিকা-বধূকে কখনও বিধবা বলা যাইতে পারে না?'---

পূর্বে ভারতবর্ষে ধর্মের এত ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, ধর্ম নিয়ে এত চিন্তা ও তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এত নিয়ম, নীতিবোধ, দেশাচার ও কুসংস্কারের বন্ধন গড়ে উঠেছিল যে, পরে তার থেকে সত্য পথ নির্দেশের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও আরো অনেকে। আসলে উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা দেশে শুধু চিন্তার বদলে কর্মের দিকেও নজর পড়ল। ব্যবহারিক দিকটার ওপর যখন চোখ পড়ল, তখনই জটিল সমস্যার রূপগুলোর দেখা মিলল স্পষ্টভাবে। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক গণ্ডী থেকে বেরিয়ে কর্মজীবনের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। একটি বিশেষ জীবন-দর্শন গড়ে তোলার উৎসাহে তাঁরা শাস্ত্রকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতেও সচেষ্ট ছিলেন। বস্তুত একদিকে যেমন মানব কল্যাণের প্রতি তাঁদের অনুরক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, অন্যদিকে তেমন উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের চিন্তাধারায় তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ সত্যের প্রতিও আগ্রহ কম ছিল না।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থনে এক বিরাট সংস্কার সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল। এ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা কথা খুব দুঃখের সঙ্গে বলতেন। বলতেন,—'আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি, আমার বিশ্বাস ছিল যে, এদেশের লোক শাস্ত্রানুগত, কিন্তু শেষে দেখিলাম, এদেশের লোক শাস্ত্র মানিয়া চলে না, লোকাচারই ইহাদের ধর্ম।'

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না,'---একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হল। দেশে তখন লোকের মুখে মুখে এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। পথে পথে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে আলোচনা। অথচ এর আগেও যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন কেউ কেউ, তার প্রমাণ আছে। এমন কি এক সময় যে এদেশে বিধবা-বিবাহ হত, তাও সত্য বলে প্রমাণিত। অথচ এমন একটা ব্যাপক আন্দোলনের ঢেউ বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থ প্রকাশেই প্রথম ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

১২৬৮ সালের বৈশাখ মাসে উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত বাংলা নাটক 'বিধবা-বিবাহ' অভিনীত হল কলকাতায়। এদিকে 'বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ' এই নামে প্রসন্নকুমার শর্মার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হল। বইটি বিদ্যাসাগরের প্রচারিত গ্রন্থের প্রতিবাদে লেখা হ'য়েছিল।

বিধবা-বিবাহ সমর্থনে বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতার একটি শ্লোককে বিশেষ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে ব্যবহার করেছিলেন।

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ
পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো
বিধীয়তে॥'

পরাশর সংহিতার বচনকে নানা-রকম ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। অনেক সময় যে অনেকে বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে পরাশর সংহিতার বচনকে ব্যাখ্যা করে ব্যবহার করেন নি, তাও নয়। অবশ্য বিদ্যাসাগর এজন্য বিব্রতবোধ করেন নি বরং আলো-চনায় অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদীদেরও তিনি 'মুক্ত-কণ্ঠে সহস্র সাধুবাদ' দিয়েছেন। পরাশর সংহিতার বচনকেও বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রসঙ্গত বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

সে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিদ্যাসাগরের এই কাজকে প্রশংসা ও সমর্থন করেছিল। একদিকে যেমন বিধবা-বিবাহের নিষেধবাদী ছিলেন অনেকে, অপর পক্ষে তেমন তৎকালীন বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোকের সমর্থনও পাওয়া গিয়েছিল এ বিষয়ে। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্র ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারিচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাজা প্রতাপ চন্দ্র, বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদ, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, দ্বারকানাথ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিধবা-বিবাহের বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

রামমোহনের সহকারিতায় বাংলা দেশে সতীদাহের আগুন নিভে গিয়ে-ছিল। কিন্তু তখনো সমস্যার সুরাহা হয়নি। সমস্যার সমাধানের পথে শুধু একটা কঠিন ধাপই পেরিয়ে আসা গিয়েছিল। আসলে সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈধব্যযন্ত্রণাই ঘরে ঘরে বিধবা নারীর কাছে এক অসহনীয় কষ্টরূপে দেখা দিল।

সেকালে বিধবারা কোন কিছু আমোদ-আহ্লাদ করতে পারত না বা কোন নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান দেখতেও পেত না। তাঁরা কোন শুভানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত না। সারা জীবন ধরে তারা কেবল দুঃখ সয়ে যাবে, সেবা করবে অপরকে, নিন্দা শুনে মাথা নত করে ঘরের কোণে লুকিয়ে থেকে সারাটা জীবন সমস্ত উৎসবের আনন্দ থেকে দূরে সরে থাকবে; এটাই ছিল নিয়ম।

১৯২১ খৃস্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী ভারতে হিন্দু-বিধবা ছিল ৩,২৯,০৭৬ জন। এর মধ্যে আবার পাঁচ বৎসর বা পাঁচ বৎসরের কমবয়সের বিধবা ছিল ১১,৮৯২ জন। পাঁচ বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বিধবা ভারতে ৮৫,০৩৭ জন ও বাংলায় ৮,৭৫১ জন।

১৯২৬ খৃস্টাব্দের ৫ই আগস্ট তারিখে 'হিন্দী নবজীবনে' প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'যখন পঞ্চাশ অথবা তার চেয়ে বেশী বয়সের বৃদ্ধ অথবা রুগ্ন লোককে চড়া দামে একের পর আরেক ছোট বালিকাকে কিনিতে দেখি, তখন কি এই বৈধব্য অসহ্য ঠেকে না? যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে হাজার হাজার বিধবা থাকিবে, ততদিন বুঝিতে হইবে, আমরা বারুদঘরের উপর বসিয়া আছি---যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ হইয়া আমাদের সর্বনাশ হইতে পারে।'

বস্তুত বালিকা-বিধবার সংখ্যা দিন দিন এত বেড়ে উঠছিল যে, তা হিন্দু-সমাজের কাছে এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। এমন অনেক বালিকাই বিধবা হয়ে গিয়েছিল, যারা বিবাহের কিছুই বুঝত না, আর যতদিনে তারা তা বুঝতে পারত, তত দিনের আগেই হয়ত তাদের অনেকের বিধবা হতে হয়েছিল। এজন্য বালিকা-বিধবাদের দুঃখের কথাটা সেকালেও কেউ কেউ বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৩৩৩ সালে প্রবাসীতে 'শিশু-বিধবা' নামে একটি কবিতাও প্রকাশিত হয়ে-ছিল।

অনেক সময়ই দেখা গেছে, বিবাহ-কালে কন্যার বয়স দশ থেকে ষোলো বৎসর, কিন্তু বরের বয়স কন্যার পিতার বয়সের অধিক। যেমন নোয়াখালিতে ষোলো বৎসর বয়সের কন্যার সঙ্গে ৬৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধের বিবাহ ঘটেছে! এমন উদাহরণ একটা নয়, অনেক পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু কোন কোন জায়গায় এর নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কোথাও স্ত্রী স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে, কোথাও হয়ত স্ত্রী নিজেই আত্মহত্যা করেছে। এমনও হয়েছে যে, কোন বৃদ্ধ বিয়ের কিছুকাল পরে মারা গেলে বিধবা মেয়েটি কোন হিন্দু যুবক না পেয়ে একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে পালিয়েছে।

নবযুবতী বিধবাদের বৈধব্য-জ্বালাটা যেন অস্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হত তখন। আর এ ধরণের সামাজিক ব্যবস্থায় তাদের আশা-আকাঙ্খা, মানবিক বিকাশ অত্যন্ত পীড়িত, অত্যন্ত আঘাত খেয়ে জখম হয়ে পড়ছিল। তাই বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত বলে ব্যাখ্যা করলেন, বাংলা দেশের দিকে দিকে, তখন বিদ্যাসাগরের নামে জয়গান ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগর বিধবাদের দুঃখ বুঝতে পেরেছিলেন। মানব-কল্যাণের মহৎ আদর্শের প্রতি, সত্যের প্রতি তাঁর অটল মনোবলের পরিচয়ও দিয়ে-ছিলেন তিনি। বিধবা-বিবাহ আন্দো-লনের সময় অনেক গানই তখন বিদ্যাসাগরের নামে লোকের মুখে মুখে ফিরত। যেমন---

'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট
বিধবাদের হবে বিয়ে॥'

দাশু রায়ের পাঁচালীতেও কিছু গান আছে।

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ ভারত গভর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকৃত হল। কোন অবস্থাতেই বিধবা-বিবাহকে অস্বীকার করা চলবে না, এমন কি বিধবা-বিবাহ যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধও হয়, তবু এই নিয়মই চলবে,---গভর্ণ-মেণ্টের গেজেটে এ কথা বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে যে, বিধবার বিবাহ হলে তার সন্তান বৈধ বলে মেনে নেওয়া হবে।

বিধবা-বিবাহ স্বীকৃত হওয়ার মাস কয়েক পর পুলিশ পাহারা রেখে বাংলা দেশে একটি বিধবা-বিবাহ হয়। বর—শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কন্যা—কালীমতী দেবী। কয়েক বৎসর পর বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে একটি বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহের পর বিদ্যাসাগর তাঁর তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রের এক জায়গায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন,—

'...আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে।'

বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা যে কত স্বচ্ছ, যুক্তিপন্থী ও প্রয়োগবাদী ছিল, তা এই পত্র থেকেই বোঝা যায়। অনেক বাধার মুখেও তাই তিনি অপ্রতিরুদ্ধ। প্রজ্বলন্ত শিখার মত রামমোহনের মত আত্মপ্রত্যয়বাদী বিদ্যাসাগরের এখানেই প্রকৃত পরিচয় দীপ্ত।

এর পরে ক্রমশ নানা স্থানে বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হয়। অনেক সময় বিদ্যাসাগরকে এজন্য প্রচুর ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। যে সময়ে এ ব্যাপারে যত জন উদ্যোগী হয়েছিলেন, প্রয়োজনে ততজন কিন্তু অর্থ সাহায্য করেন নি। শেষটায় অনেকে সরে পড়েছেন বরং। তবু বিদ্যাসাগরকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। আর এজন্যে ক্রমশ গভীর অর্থাভাবে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য স্যার গঙ্গারাম প্রতিষ্ঠিত লাহোরের সমিতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের নানাস্থানে এর বিধবা-বিবাহ সহায়ক কার্যক্রম শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এই সভা-সমিতি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৬৩৩৪টি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হতে সাহায্য করেছে। পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এই-সব বিবাহ হয়।

আমার হৃদয় যদি

নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমার হৃদয় যদি সমুদ্রের উথাল পাথাল
তুমি কেন আকাশ হবে না?
আমার বুকের মধ্যে যদি এত আগ্নেয় মশাল
তুমি কেন শান্ততম প্রদীপ হবে না?
দুরন্ত ঝড়ের বেগে ছিন্নভিন্ন যদি এ হৃদয়,
তুমি কেন স্বর্ণপদ্ম হয়ে জাগবে না
ভোরের আকাশতলে? আমার রক্তের সব জ্বলন্ত বিস্ময়
তোমার জলের শিল্পে তুমি তাকে ফলবান কর।
অসহায় কুরুক্ষেত্রে তুমি তবে রথরজ্জু ধর,
অম্লান সারথ্য দাও, অমোঘ ফাল্গুনী হয়ে
দূর দিগ্বিজয়ে
আমিও বেরিয়ে পড়ি। কিশোর প্রদীপ হয়ে
অতঃপর সমস্ত আগুন
শান্ত হোক। শেষতম ফাল্গুনীর তূণ
মুক্ত হোক—নির্বাণের দিকে।
এস তবে অপর আঙ্গিকে
স্বপ্নের সিঁড়িগুলি যৌথ পদপাতে
পার হয়ে চলে যাই, নবতর প্রাণের পাপড়িতে
জেগে উঠি সলজ্জ সঙ্গীতে।
তারপর ফল হয়ে নবতম প্রাণের সম্মানে
উৎসর্গিত হয়ে যাক অলৌকিক দানে।
সব ঝড় শান্ত হবে—সব ব্যথা—মাটির ভিতরে
বিস্ফোরণ, অগ্ন্যুৎপাত—অগ্নিজ্বালা সব
চিরকাম্য দ্যুতি হয়ে এখন নীরব
আত্মদানে সমাহিত; সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে
প্রশ্নহীন হতে পারি যদি
তাহলে সমুদ্রে যাবে আমাদের সম্বন্ধের নিত্য ভাগীরথী

বৌদ্ধযুগের এক বারবনিতা

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। ভারতে তখন বৌদ্ধযুগ। স্বয়ং বুদ্ধদেব বাণী প্রচার করে চলেছেন। মহাপাপীও তাঁর চরণস্পর্শে উদ্ধার পাচ্ছে। ঠিক এই সময়েরই এক গণিকা-জীবনের কাহিনী এখানে বলতে চলেছি। হয়তো শুনে অনেকেরই ভাল লাগবে না; কারণ গণিকার গল্প, তাতে আবার শোনার কি থাকতে পারে? তারা তো নরকের জীব; নারকীয় জীবনের আবার পরিচয় কি? কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে তাদের জীবনেও আলোর অবকাশ আছে, সুমহান আদর্শের ব্রত তারাও উদযাপন করতে পারে এবং খুব তাড়াতাড়ি, যা হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। সেটা হচ্ছে এই যে, আমাদের বর্তমান সুশিক্ষিত সমাজের মানুষ গণিকা-বৃত্তিকে যেমন ঘৃণার চোখে দেখে, অতি প্রাচীনের মানুষও ঠিক সেইভাবেই দেখত। তাই গণিকা মন্দপালীকে সবাই ঘৃণা করত। কিন্তু ঘৃণা করলে কি হবে। অনেকে তাকে আবার প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। অনেকেই যে তার রূপের আগুনে নিজেদেরকে পুড়িয়ে মারেনি তা নয়, মেরেছিল। এতে কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ আজো এর দৃষ্টান্ত আমাদের এ মহানগরীর বুকে বোধহয় বিরল নয়।

তাই কপিলাবস্তুর বহু লোকই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নর্তকী মন্দপালীর কাছে কাটাত। তাদের সবাইকে সে আনন্দ দিত, নাচের মত নাচ দেখাত। সবাই তার মুখের পানে হাঁ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকত। কিন্তু কেন? যেহেতু তার রূপের মাধুর্য ছিল যেমন আবার তেমনি ছিল তার যৌবনের চঞ্চলতা।

দেবব্রত ভট্টাচার্য

কিন্তু হায়। সবাই তার রূপের মদিরা পান করে বিভোর হত। অথচ কেউ কোনদিনও তার ঐ অভিশপ্ত জীবনটার রাশ টেনে সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে নি। তার ঐ অন্ধকারময় জীবনের অন্তরালে কেউ প্রবেশ করতে যায় নি। আর কেনই বা যাবে? সামান্য একটা 'বাইজী' বইত আর কিছু নয়। সুতরাং তাকে উপভোগ করাই হীনমতি পুরুষের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সেও যে রক্তে-মাংসে গড়া, তারও যে মন বলে বা হৃদয় বলে একটা কিছু থাকতে পারে তা আমাদের এই সুরুচিসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষিত সমাজ-ভুক্ত মানুষ আজো ভাবতে পারে না।

পতিতার অন্তরেও যে একটা জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা থাকতে পারে, তা জানার চেষ্টা কি কেউ করে? না—তা কেউ করে না। তাই মন্দপালীর বুকের ভেতরটা যে তার ঐ পাপবৃত্তির আগুনে অহরহ দগ্ধ হয়ে চলেছিল তা কেবল তার অন্তরের দেবতাই জানতেন। তাকে এ পথে একদিন কে যেন অসহায়-ভাবে ঠেলে দিয়েছিল, আজো যেমন অনেকেই এ পাপ পথে আসতে বাধ্য হয়েছে; ফিরে আসার পথ তাদের আমরা চিরতরে বন্ধ রেখেছি। পতিতা-জীবনের ওপর আমাদের এই সমাজের কি সুন্দর পরিহাস। কিন্তু না—গণিকা মন্দপালী এ নির্মম পরিহাস আর সহ্য করবে না। যেমন করেই হোক সে চায় ফিরতে, সে চায় প্রায়শ্চিত্ত করতে, চিরদিনের মত চায় সে নিজেকে এ পাপপথ থেকে মুক্ত করতে।

এই ভেবেই সে আজ নিজের মনকে প্রশ্ন করে—আমি কি মুক্তি পাব? আমার এই দুঃসহ জীবনের কলঙ্ক কি চিরদিনের মত মুছে ফেলতে পারব না?

রাত তখন গভীর। চারিদিক অন্ধকার। সেই ঘন অন্ধকারের বুক

চিয়ে একটা গলার স্বর তার কানে কোথা হতে ভেসে এল। কে যেন বলছে---'যাবে, যাবে — মন্দপালী; তোমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। ভগবান বুদ্ধকে ডাকো।'

শোনামাত্র সারা গায়ে যেন কিরকম কাঁটা দিয়ে উঠল। অজ্ঞাতসারেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল--- ভগবান! আমি যে মহাপাতকী--- আমার পাপের কি শেষ আছে?

আবার ঠিক সেই একই গুরুগম্ভীর স্বরে অন্তরীক্ষে কে বলে উঠল--- ভগবান বুদ্ধের চরণ স্পর্শ কর।

আর সে স্থির থাকতে পারল না। হঠাৎ মূর্চ্ছা গেল। এই মূর্চ্ছার ঘোর যে তার কতক্ষণে কেটেছিল তা সে জানে না। কিন্তু মূর্চ্ছা কাটিয়ে উঠল এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে, রাতের অন্ধকার আর নেই। ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে গণিকা মন্দপালীর জীবনেরও ভোর হল।

পরের দিন থেকেই তার অঙ্গে গেরুয়া---আর শান্তস্নিগ্ধ মূর্তি। চোখের অস্বাভাবিক করুণ চাহনি। মাথার একরাশ শুকনো এলোচুল। এ যেন এক পরমাশ্চর্য যোগিনী-রূপ। কত লোক এসে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। তাদের সবাইকে সে কেবল একটি কথাই বলেছে---'আজ থেকে জেনে রাখুন নর্তকী মন্দপালী মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিয়েছে।'

শুনে কেউ বা অবাক হয়, কেউ বা হেসে বিদ্রূপ করে। আবার কেউ কেউ তার মুখের উপরই বলে বসে---কি গো সুন্দরী? এবার কি সাধু-সন্ন্যাসী নিয়ে মুজরো করবে? তা বেশ বেশ.---তবে আমাদের মত কাঁচা পয়সা সাধুবাবাদের ঝুলিতে পাবে না।

এ জাতীয় কত কথাই না তাকে শুনতে হচ্ছে, কিন্তু সে তো আর উত্তর করবে না, কেবল সহ্য করে যাবে। এখন সে ভগবান বুদ্ধের চিন্তায় বিভোর। বাহ্যিক জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে। নিজের দেহ-টাকেও ভুলে গেছে। আহার-নিদ্রাও ত্যাগ করেছে।

মন্দপালীর এই ভয়ানক পরিবর্তনের কথা শুনে দেশশুদ্ধ লোক এক-বাক্যে বলতে লাগল--ও আস্ত রাক্ষসী, তার ওপর আবার যোগিনীর বেশ ধরেছে---বৌদ্ধ-ভিক্ষুকদের এবার সর্বনাশ। সুতরাং যেমন করেই হোক ওকে মেরে শেষ করতেই হবে।

কিন্তু যে যা বলে বলুক। তবে গণিকা মন্দপালী যে যথার্থই মরে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাইরের জগৎ এখন তার কাছে অন্ধকার, অন্তর আলোকিত হয়ে চলেছে এবং সেই ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে সে যে সদাই বুদ্ধমূর্তি দেখছে। একমাত্র চিন্তা কি করে সে বুদ্ধের পাদস্পর্শ করে নিজেকে মুক্ত করবে। এ কথা সে জানে যে ভগবান বুদ্ধের কাছে জাত-অজাত বলে কিছু নেই এবং তিনি মহাপাপী-কেও উদ্ধার করেন। তাই সে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানাল।

সহসা এ সংবাদ রটে গেল। কপিলাবস্তু সহরে পড়ল এক বিষম হৈ-চৈ। গণিকার এত বড় দুঃসাহস। যে শোনে সেই যেন আকাশ থেকে পড়ে। কেউ এর কারণ খুঁজে পায় না। সন্ন্যাসীরা প্রমাদ গুণল। সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মন্দপালীর উদ্দেশ্যে অভি-সম্পাত দিতে থাকে।

কিন্তু পতিতার এই আমন্ত্রণে স্বয়ং বুদ্ধদেব ভারি আনন্দিত। তিনি যেন এরই প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু কোন শিষ্যের কাছে তিনি এ কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না।

দিনকয়েক কেটে যাওয়ার পর তাঁর এক অতি প্রিয় শিষ্য অতিশয় বিনীতভাবে জানতে চায় যে তিনি ঐ গণিকার কাছে যাবেন কি না? সে যেন গুরুকে বোঝাতে চায় যে গণিকা তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করলে তিনি অপবিত্র হয়ে যাবেন এবং লোকেও নিন্দে করবে।

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যের মুখের দিকে খানিক সময় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, কোন কথা বললেন না।

তখন শিষ্যমহলে কারো আর বুঝতে বাকী রইল না যে গুরুকে কোনমতেই রদ করা যাবে না। অতএব মন্দপালীকেই যেমন করে হোক আটকানো দরকার। তাই তাকে নিরস্ত করার জন্য বিরাট দেহধারী এক সন্ন্যাসী ছুটল তার উদ্দেশ্যে।

তখন প্রায় আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে। মন্দপালী তার সেই অপরূপ সন্ন্যাসিনীর বেশ নিয়ে রয়েছে বুদ্ধের আগমন-প্রতীক্ষায়। সে সম্পূর্ণ ধ্যানমগ্ন, দুই চোখের পাতা বন্ধ এবং তারই মধ্য থেকে ক্রমাগত চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে তার বুকে পড়ছে। আজ সারা-দিন এক ফোঁটা জল যে সে মুখে দেয় নি উত্থান একাদশীর ব্রত উদযাপন করছে। ঘরের এককোণে শুধু একটা মাটির প্রদীপের ক্ষীণ আলো; আর তারই সামনে একটা কুশাসন, মাটির পাত্রে একভাঁড় জল ও কিছু ফুল আর ফল সাজিয়ে রেখেছে। সেই সঙ্গে দু'দিকে দু'টি ধূপকাঠি জ্বলছে। আর কোলের ওপর নিয়ে বসে আছে এক-গাছি করবী ফুলের মালা; এ যে তার কাতর চোখের জলে গাঁথা মালা--- ভগবান বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্য দেবে বলে এত সব আয়োজন করেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। মাঝে মাঝে ঝিঁঝি-পোকার ডাক আর এক একটা দমকা হাওয়া এসে আশপাশের গাছের ডালগুলোকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন। তারই ওপর ম্লান হাসির মত একটু-আধটু বিদ্যুতের রেখা পড়ছে।। এক অদ্ভুত পরিবেশ।

এমন সময় সেই বিরাটকায় সন্ন্যাসী এসে অতিশয় কর্কশস্বরে ডাক দিল--- মন্দপালী।

ডাক শুনে মন্দপালী চমকে ওঠে। ভয়ে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তাকিয়ে দেখে কি এক ভীষণ

চেহারা---পরনে আলখাল্লা, মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় জটা, হাতে কমণ্ডলু। মাথা নিচু করে মন্দপালী বসে রইল। দাঁড়িয়ে ওঠার মত সামর্থ্যও তার নেই। সন্ন্যাসী তখন আরো রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করে---তুই নাকি ভগবান বুদ্ধকে তোর এই নরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিস?

মন্দপালী ভয়ে তখন একেবারে কাঠ। কোন উত্তর দেওয়ার সাহস তার নেই। সন্ন্যাসী এক পা মাটিতে ঠুকে বলল---জবাব দে, নয়ত এখনি তোর মৃত্যু পাতকিনী।

অপরাধিনীর মত অতিশয় কাতরভাবে মন্দপালী তখন বলল---হ্যাঁ প্রভু---আমন্ত্রণ আমি জানিয়েছি। আমি যে উদ্ধার চাই।

সন্ন্যাসী তখন বলল---এ্যাঁ! এতদূর তোর স্পর্ধা! পাপীয়সী! তোর ঐ পাপ দেহটাকে কুকুর দিয়ে খাইয়ে আজ তোকে উদ্ধার করব।

মন্দপালী তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সহস্রধারায় তার দুই চোখে জলের বেগ। এমন সময় স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে উপস্থিত হলেন। বললেন,---ওঠ মন্দপালী, চেয়ে দেখ---এই যে আমি এসেছি।

সন্ন্যাসীর পানে বুদ্ধদেব শুধু একটা কঠোর দৃষ্টি দিলেন এবং তাতেই তার সমগ্র অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। মন্দপালী বুদ্ধের দুই পায়ে মুখ রেখে চিৎকার করে বলে উঠল---ভগবান! ভগবান! তার চোখের জলেই ভগবানের রাতুল চরণ ধোয়া হয়ে গেল।

বুদ্ধদেব তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাও মন্দপালী?

দুই হাত জোড় করে মন্দপালী বলে,---ঠাকুর আপনার চরণস্পর্শে আমার সকল পাপ মুছে যাক---আমায় মুক্তি দিন---আমি আর কিছু চাই না---ভগবান, ভগবান।

বুদ্ধদেব তার হাতে ছোট একটি ভিক্ষের ঝুলি দিয়ে বললেন---এই নাও মন্দপালী। আজ থেকে তুমি সন্ন্যাসিনী---তুমি মুক্ত।

তারপর অতি ধীর মন্থরগতিতে বুদ্ধ সেই অন্ধকার পথে বেরিয়ে গেলেন।

মন্দপালী সেই ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগল---আমি মুক্ত---আজ থেকে এই ভিক্ষের ঝুলিই আমার সকল কলঙ্কের মহা অলঙ্কার।

সেই একঘেয়ে সরকার আর কর্পোরেশনকে গালমন্দ না দিয়ে আমরা কি ভাবতে পারি না রুনুদা, আমরা যেন সেই তোমার ঠিক ভেনিসের গণ্ডোলায় ভাসা একজোড়া রোমিও-জুলিয়েট?

আমি আত্মমগ্ন

বনফুল

আত্মমগ্নতা আলস্য বা বাড়াবাড়ি কোনটাই নয়। এ এক ধরণের কল্পসুখ যা স্বভাবে 'থেরাপী'---আঘাত আর চমক দিয়ে আমাদের ডাক দেয়, আনন্দ দিয়েও। এবং মনে পড়িয়ে দেয় মানুষ কত জটিল মানসিকতার অধিকারী, আমাদের খাড়া-বড়ি-খোড় প্রাত্যহিক জীবনে আমরা 'তথ্যটি'র কথা ভুলে থাকি।

'আত্মমগ্নতার কিছুটা শুভদ', বলা হয়। আমার পছন্দ---'আত্মমগ্নতার অনেকখানি শুভদ', বাক্যটি। তবে, ঘন ঘন এর পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নয় এবং ঈশ্বর জানেন, জীবনে আত্ম-মগ্নতা কত দুর্লভ।

আমি খোলাখুলি, লজ্জার বালাই না রেখে, তৃপ্তিদায়কভাবে আত্মমগ্ন। বলতে পারি এটি আমার জীবনের এক নিবিড় কল্প সুখদ অবলম্বন। মনের আরাম।

আর সবাই যখন আত্ম-উপেক্ষার বন্দনামুখর, সংযম আর দৃঢ় নীতির বাঁধনে তাদের চরিত্র কী পরিমাণ বন্দনীয় হয়ে উঠছে তার ব্যাখ্যায় অক্লান্ত, আমি তখন প্রমাণ করতে প্রস্তুত কিঞ্চিৎ বিবেচিত আত্মমগ্নতায় আমার জীবন কেমন সার্থক হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে। বস্তুত, আর একটু এগিয়ে খোলাখুলি বলতে চাই কিঞ্চিন্মাত্র 'ধৃষ্টতা'র সুখমগ্ন হয়ে---বন্ধুদের সঙ্গে হেলায় কালহরণ করে, কিম্বা শিকেয় বই তুলে রেখে সর্বশেষ নাচ দেখে---আমি স্বর্গীয় প্রফুল্লতা লাভ করি, হৃদয় কোমল হয়, মন করুণা আর মমতায় ভরে ওঠে। ভাবলে অবাক লাগে, তাই না?

আত্মমগ্নতার এই সুখলাভের জন্য হয়ত কয়েক মাসব্যাপী কঠোর শ্রম স্বীকার করা প্রয়োজন। এমন কি, নিজেকে সামাজিক তৃপ্তিলাভ থেকেও বঞ্চিত করা দরকার হতে পার। ফলত, বহুদিন পরে-আসা আত্মমগ্নতার মুহূর্ত-গুলো হয়ে ওঠে নিবিড়তর আনন্দ-দায়ক, জ্যৈষ্ঠের খর দিগন্তে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টিধারার মত হৃদয়ের গভীর-তম স্তরস্পর্শী। কানায় কানায় মন ভরান, এই অনুভূতি লাভের জন্য গোটা পৃথিবীটা পর্যন্ত বিকিয়ে দেওয়া যায়। সে আসবে---সে যে আসে, আসে আসে,---এই চিন্তাটাই সহনীয় ক'রে তোলে আগেকার সব শ্রম, সব ক্লান্তি।

আত্মমগ্নতার সুখলাভ ব্যয়সাপেক্ষ হতেই হবে তা নয়। ছুটির দিন বেলা ন'টায় আড়মোড়া ভেঙে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ পাওয়ার সুখ স্বল্পমূল্যে লভ্য। ঝরোঝরো ঝরার দিন প্রায় নিস্তব্ধ পরিবেশে একটানা ঝরার শব্দ বিছানায় গা এলিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনার অভিজ্ঞতাও অপরূপ।

যাকে খ্যাতির বিড়ম্বনায় ভুগতে হয়, ছুটতে হয় আজ এখানে, কাল সেখানে, নিরিবিলি কোনও এক সন্ধ্যায় হালকা কোন গল্প উপন্যাস অলস মেজাজে পাঠ, কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে মৃদু আলাপ, উপভোগ্য রসিকতা তার জীবনে কল্প-সুখের আকর। একধাপ নামলেও ক্ষতি নেই। আসল কথা, এমন কিছু কিছু মুহূর্ত থাকা চাই যখন 'আপনার মাঝে আপনি মগন' থাকা যায়।

কণ্ট্রাস্ট, বৈপরীত্য আত্মমগ্নতার অন্যতম মূল উপকরণ আমার মত যাঁরা একদিন কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তাঁরা জানেন অবস্থা একটু ফেরার পরেই অবসরের ফাঁকে ফাঁকে আত্মমগ্নতা কি গভীর আনন্দবহ। নির্দিষ্ট শেষ দিনের আগেই সরকারী বিল চুকিয়ে দিয়ে, গয়লা মুদিবর্গকে ঠাণ্ডা রেখে নিশ্চিন্ত প্রহর যাপন।

বৈপরীত্য স্থানিক, অভ্যাসগত, কিংবা সঙ্গী সংক্রান্তও হতে পারে। ছুটির দিন মাছ ধরতে ধরতে গাছের ছায়ায় তন্দ্রাতুর প্রহর গোণা, কিম্বা অর্থহীন গালগল্পে বিকেল গড়িয়ে দেওয়া সন্ধ্যের হাতে---আহা, আর কিছু নাহি চাহি।

অভ্যাস বা সঙ্গী বদল তুলনায় শক্ত কাজ। হুট ক'রে বেরিয়ে পড়াই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রদ। বিদেশে হঠাৎ রাতদুপুরে পাশের ঘরের প্রতিবেশীর বাচ্চা চেঁচিয়ে উঠল, কিংবা হয়ত স্বামিস্ত্রীর একজন কোন নতুন আইডিয়া শোনাতে এলেন রাত একটার সময়। ঘুমভাঙা চোখে তার সেই কুণ্ঠিত মুখ, ক্ষমা প্রার্থনা এবং তারপরেই সোৎসাহে বক্তৃতা জীবনের স্বাদ পালটে দেয়। কাকডাকা ভোরে ধার্মিক বৃদ্ধের উচ্চকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ, চেয়ারের অভাবে কাগজ পেতে যত্রতত্র উপবেশন, স্নান করতে গিয়ে দেখা চৌবাচ্চায় একফোঁটাও জল নেই এবং হোটেলের হাঁড়ি শূন্য। তা ছাড়া, আশ্চর্য লাগে শুনতে হয়ত, আশপাশের মানুষগুলোর তুলনায় বিদেশী-দের একটু বেশিমাত্রায় তাঁদের মনে হয়। অন্তত যতক্ষণ না আবার ফিরে আসি এবং এই ত্যাঁদড়ামো রীতিমত উপভোগ্য। আত্মমগ্নতার অর্থ নিছক আলস্য বা অমিতব্যয়িতা নয়।

আনন্দই আত্মমগ্নতার মুখ্য উৎস। তবে সে আনন্দে কল্পনার অবকাশ সুপ্রচুর। আত্মমগ্নতার চূড়ান্ত রূপায়ণ আমাদের অধিকাংশের নাগালের বাইরে, অর্থ বা সামর্থ্যে কুলোয় না; কিন্তু যারা এ ব্যাপারে কৃতী তাদের প্রশংসা করতে কোনও অসুবিধের প্রশ্নই ওঠে না। এ বস্তু জীবনে রং ছোঁয়ায়, সামান্যকে হঠাৎ অসামান্য ক'রে তোলে, আনন্দলাভের অ-ভাবিত উৎসও খুলে দেয় কখনও কখনও।

আত্মমগ্নতার নিবিড় মুহূর্তেই জন্ম নেয় কাব্য, অসামান্য নক্সার বাহার, দৃষ্টিনন্দক মন্দির, এমন কি, একশ' বছরের পুরনো রসগোল্লাও এমনই এক আত্মমগ্ন মুহূর্তের দান।

যে মানুষ আত্মমগ্ন, স্বার্থমগ্নতা তার জীবনে অলীক এবং তাই সে বৃহৎ জগতের সঙ্গে অনুভববেদ্য এক গূঢ় সূত্রে সংযুক্ত, সে বাঁচতে শিখেছে।

বাঁচতে জানাই জীবনের সবচেয়ে বড় জানা।

শ্রীঅরুণ গাঙ্গুলী

তপন এবং মৃদুলার বিয়ে হয়েছে প্রায় ১২ বছর। এদের বিয়েটাকে সে সময় একটা সোশ্যাল ইভেণ্ট বলা হয়েছিল। তপন সেন বনেদি বংশের ছেলে। বাবা অনেক নগদ টাকা এবং কলকাতার অভিজাত পল্লীতে একখানা বড় বাড়ী রেখে মারা যান। তপন তখন বিলেতে। এত হঠাৎ মারা গেলেন যে তপন খারাপ খবরটি পেল মারা যাবার পরে, মার অনুরোধে ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষা পরের বছর দিয়ে দেশে ফিরল। একটি বিদেশী নামকরা কোম্পানিতে বিলেত থেকেই চাকুরী নিয়ে এল। তপনের চেহারা খুব ভাল বলা চলে।

কলকাতার বাড়ীতে থাকেন---মা, বিলেত পাশ চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট বড় ভাই এবং অবিবাহিতা ছোট বোন, ছোট বোনের বিয়ের পর মার পছন্দ-মতন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যারিস্টার হর-প্রসাদ মজুমদারের একমাত্র মেয়ে মৃদুলাকে বিয়ে করল।

মৃদুলাও গুণী বি-এ পাশ, ভাল গাইতে এবং ছবি আঁকতে পারে, চেহারাও আকর্ষণীয় কিন্তু রংটা একটু চাপা।

বছরখানেক সকলেই আনন্দে ছিল। কিন্তু মৃদুলা নিজেকে যৌথ পরিবারের ভিতরে মানিয়ে নিতে পারে নি। তপনের মা এবং বৌদির সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারল না। প্রায়ই ঠোকাঠুকি হতে আরম্ভ করল এবং তপন মা এবং বৌদির পক্ষ নেবার জন্য মৃদুলার রাগ এসে পড়ল বেচারা তপনের উপর।

দেখা দিল মহা সমস্যা। সারাদিন খেটেখুটে এসে বৌয়ের রণমূর্তি দেখে আতঙ্কিত হ'ত। মৃদুলার ইচ্ছা স্বামী-স্ত্রী আলাদা ফ্ল্যাটে থাকা। কিন্তু তপন তার মাকে ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু মৃদুলা যখন বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিল---পাড়ার সব লোক মুচকি মুচকি হাসতে আরম্ভ করল---তপন সে তার কলকাতার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল ফরিদাবাদে।

ফরিদাবাদ রেল স্টেশনে সেন-দম্পতিকে অভ্যর্থনা করতে এলেন সেখানকার ডেপুটি চীপ প্রোজেক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এস স্বামিনাথন। সুন্দর লম্বা চেহারা, চওড়া কপাল, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ---ভাল ইংরেজী এবং বাংলা বলেন। চেহারা, পোষাকে এবং হাব-ভাবে আভিজাত্যের ছাপ---বয়স হবে ৩০-৩২। স্বামিনাথনের শিক্ষা কলকাতায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে। সেন-দম্পতিকে নমস্কার করে পরিষ্কার বাংলায় নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন---সত্যিকথা বলতে হলে বলব---যে কাল যখন এত ভোরে আপনাদের স্বাগত জানিয়ে আপনাদের বাংলোতে পৌঁছে দেবার ভার এসে আমার উপর পড়ল তখন একটু বিরক্তই হয়েছিলাম। কিন্তু আপনাদের এই সুন্দর যুগল-মূর্তি দেখে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। এত ভোরে আসা সার্থক হয়েছে---আজকের প্রভাতের মতন যেন আমার জীবনের সব প্রভাতই এরকম মধুর হয়।

তপন ছেলেমানুষের মতন হেসে স্বামিনাথনের হাত জড়িয়ে ধরল, কিন্তু মৃদুলা এরকম কমপ্লিমেণ্টের মুখে নিজেকে একটু বিব্রত মনে করল। তিনজনে গাড়ী করে চলল সুন্দর সুন্দর কলোনীর ভিতর দিয়ে তপনের বাংলোর দিকে। মৃদুলা চুপ ছিল---কিন্তু অস্বস্তিকর ভাবটা কাটিয়ে দেবার জন্য জিজ্ঞাসা করল---মিঃ স্বামিনাথন, আপনার বাংলোটা কোন দিকে?

জবাব এলো---আপনাদের দৌলতখানা যাবার পথেই আমার গরীবখানা পড়বে।

মৃদুলা হেসে বলল---বেশ তো অনুগ্রহ করে তবে একবার আপনার গরীবখানাতে একটু দাঁড়াবেন মিসেস স্বামিনাথনের সঙ্গে দেখা করে যাব।

---ও! এই কথা? কিন্তু তাঁকে পাবেন কোথায়? তিনি যে গোকুলে বাড়ছেন।

মৃদুলা ফস্ করে বলে ফেলল---ও---মানে আপনি কি অবিবাহিত?

---হ্যাঁ আমি সেই মহাদোষে দোষী। তবে সব দোষটাই আমার নয় কারণ কোন মেয়েই আমাকে পছন্দ করল না স্বামিরূপে যদিও নামটা আমার স্বামিনাথন। মিঃ সেনের মতন ভাগ্য করে আমি আসি নি।

কথার মোড় ফেরাবার জন্য তপন জিজ্ঞাসা করল---আচ্ছা এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের বেশীর ভাগই বোধহয় পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু---

তা বলতে পারেন---পাঞ্জাবীর সংখ্যাই বেশী। এদের উপর আমার ধারণাটা ভাল, এরা যেমন পরিশ্রম করতে পারে সেরকম অবকাশের সময় প্রাণখুলে হাসতেও জানে। প্রচুর পানাহার করে---এবং তাদের সেই পেছনে ফেলে-আসা দিনগুলির জন্য কোন আক্ষেপ করে না। কি করে নূতন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে সেদিকেই আকুল আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। জীবন এখনও সজীব।

---একটু বেশী আধুনিক---তাই না? বলল মৃদুলা।

---তা বলতে পারেন। তার কারণ পঞ্চনদীর তীরে ইউরোপীয় সভ্যতার ঢেউ অনেক পরে লাগে। তাই এরা সেই সভ্যতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। একটু ভাল করে মিশলেই ওদের রূপ ধরা পড়ে।

এবার মৃদুলা হেসে বলল---আপনি দেখছি মানব চরিত্রের একজন বড় সমঝদার।

---বড় কি ছোট জানি না---কিন্তু মানুষের চরিত্র আমাকে আকর্ষণ করে এবং এই কারণেই তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে আমার খুব ভাল লাগে। যাক এই যে আপনাদের বাংলোতে এসে গেছি---তারপর মৃদুলার দিকে ফিরে বলল---যদি অভয় দেন তবে একটি আরজি পেশ করতে চাই---

---তা বলুন না, আপনাদের ব্যাপার এসেছি আপনাদের আজ্ঞা পালন করতেই হবে---

---খুব আশ্বস্ত হলাম। তবে দয়া করে আজ আর আপনারা রান্নার হাঙ্গামা না করে---এই গরীবের বাড়ীতে একটু ডাল-ভাত কোনরকমে খেয়ে নিন।

তপন এবার হেসে বলল---আরজি মঞ্জুর।

---আমার পরম সৌভাগ্য তবে আপনাদের এখানেই অপেক্ষা করছি, আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আমার সঙ্গেই চলুন।

তপন মিনিট দশেকের ভিতরে জামা কাপড় বদলে স্বামিনাথনের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প জুড়ে দিল। তপন দেখল যে লোকটি অতি ভদ্র এবং শিক্ষিত। এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে ভদ্রলোকটি আলোচনা না করতে পারেন। তপনের খুব ভাল লেগে গেল স্বামিনাথনকে। মৃদুলার তৈয়েরী হতে লাগল প্রায় ঘণ্টাখানেক---এবং তপনের মনে হলো যেন এই সামান্য ব্যাপারের জন্য সাজগোজটা একটু বেশী হয়েছে। তবে এসব বিষয় নিয়ে নাক গলাতে যেয়ে অতীতে বেশ ধাক্কা খেয়েছে---সেই কথা মনে করে বাক্য-ব্যয় না করে তিনজনে রওনা হলো।

মৃদুলাও বুঝতে পেরেছে যে এরকম সাজ এসকম ইনফরমাল দিনের খাবার জন্য ঠিক হয়নি---এবং দুটি পুরুষই তা লক্ষ্য করেছে।

স্বামিনাথনের বাড়ীতে পা দিলেই গৃহস্বামীর অতি মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় সর্বত্র। সুন্দর নিপুণভাবে সাজান ঘর। কেউ এলে মনে করবে যে গৃহিণী বোধহয় সব সময় বাড়ী নিয়েই দিন কাটান। তিনজনে এবার লাইব্রেরী ঘরে এল, তপন অবাক হয়ে স্বামিনাথনের বই সংগ্রহ দেখছিল, একজন লোক যে এত রকম বিভিন্ন ধরণের বই-এর প্রতি মন দিতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন। তপন নিজে শিক্ষিত এবং স্বামিনাথনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছে---যে লোকটি প্রতিটি বই ভালভাবে পড়েছে---শুধু সাজিয়ে রাখে নি, একদিকে যেমন রয়েছে নানারকম ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাসের বই---আবার আরেক দিকে রয়েছে নানা ভাষায় বিভিন্ন মনীষীদের লেখা যৌন এবং অপরাধের বই।

মধ্যাহ্ন-ভোজ শেষ হলো। একটি নেপালী ছোকরা নিঃশব্দে নিখুঁতভাবে সব করে গেল, মনে হলো যে এরকম খানা-দানা প্রায়ই হয়ে থাকে। বারান্দায় বসে নানা কথা হচ্ছে। মৃদুলাও তার সাধারণ ভাব ফিরে পেয়েছে। কিছুক্ষণ পরে ওখানকার চীফ মেডিকেল অফিসার এলেন সস্ত্রীক---নাম ডাঃ রায়।

যথারীতি পরিচয় করিয়ে দিয়ে স্বামিনাথন বলল, যাক্ মিঃ এবং মিসেস সেনের খোঁজে অধীনের বাড়ী এসেছেন আপনারা এটা আমার সৌভাগ্য। যে রকম দ্রব্যগুণ বলে কথা আছে সেরকম মনুষ্যগুণও আছে। সেন-দম্পতির মানে রায়-দম্পতি হাজির।

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী একটু তির্যক দৃষ্টিতে মৃদুলাকে নিরীক্ষণ করে নড়ে-চড়ে বসলেন। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে---যদিও তা ঢাকবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টার ত্রুটি নেই। কালে বিশেষ সুন্দরী ছিলেন তবে এখনও আকর্ষণ বেশ আছে এবং তা প্রকাশ করবার জন্য ক্ষীণতর আবরণ ব্যবহার করেন।

স্বামিনাথন কথা আরম্ভ করলেন---ডাঃ রায়ই এই জায়গার প্রাণ। কোন লোকের রোগ হলে অক্লান্ত চেষ্টা করে সুস্থ করেন এবং অন্য সময়ে সকলকে ক্লাবের ভিতরে যতরকম খেলা-ধুলাতে তাদের টেনে জীবনী-শক্তি দেন বাড়িয়ে। নিজেও টেনিস্, বিলিয়ার্ড, তাসে বিশেষ পটু, পঁচিশ-তিরিশ বছরের অফিসররা হয়ত ২।৩ সেট টেনিস খেলে হাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু---আমাদের ডাক্তার সাহেবের ক্লান্তি নেই। অপূর্ব জীবনী-শক্তি।

তপন অবাক হয়ে এই লাজুক ডাক্তারটিকে দেখছিল। স্বামিনাথনের কথা শেষ হতে বলল---কেন? ডাক্তার সাহেবের বয়সও যথেষ্ট কম---তাই নাকি?

ডাক্তার সলজ্জ দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে বললেন---কেন আমার বয়স কত হবে মনে করেন?

তপন বলল---তা বিয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে।

ডাক্তার তাঁর স্ত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে বললেন ---না ভুল হলো মিঃ সেন, অর্ধ-শতাব্দীর গণ্ডি পেরিয়ে এসেছি চার বছর আগে।

সেন-দম্পতি একসঙ্গে বলে উঠল---আশ্চর্য, বিশ্বাসই হয় না।

ডাক্তার গিন্নী তার আধাখোলা বুক শাড়ী দিয়ে ঢাকবার কপট প্রকাশে তাকে আরো উন্নত করে বলল---হাঁ উনি একটু কচি সেজেই থাকেন---বুড়ো যে হয়েছেন তা হুঁশই থাকে না।

একটু হেসে আবার শাড়ীটা একটু নাড়াচাড়া করে বলে চলল---আমাদের দুজনের বয়সের অনেক তফাৎ। সেটেল্ড মেরেজ কিনা। বাবা-মা যা ঠিক করে দিয়েছেন তাই মেনে নিয়েছি---আজকালকার ছেলেমেয়ে ত' না।

আচমকা এরকম কথা শুনে সেন-দম্পতি অবাক। স্বামিনাথন নির্বিকার-ভাবে পাইপে তামাক ঠুসে চলেছে। দুচার মিনিট অস্বস্তিকর নীরবতার পর স্বামিনাথন বলল---দেখুন মিঃ সেন---বাঙলা দেশে এতদিন থেকে একটা অভিজ্ঞতা আমার বদ্ধমূল হয়েছে যে বাঙালী মেয়েরা তাঁদের স্বামীদের বুড়ো বলে আনন্দ পায়। বোধহয় 'সাইকোলজিক্যাল' কারণটা হচ্ছে ---ওল্ড হাজব্যাণ্ডস আর রাদার সেফ।।

এবং এবার মৃদুলার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন---বিশেষত যদি কোন প্রিয়দর্শনা যুবতী থাকেন সেখানে। অবশ্য মনোবিজ্ঞানের কথা ডাক্তার হয়ত ভাল বলতে পারবেন।

ডাক্তার এ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বললেন---আরে ভাই আমরা কি অত বিজ্ঞান নিয়ে বিলাসিতা করতে পারি? মামুলী রোগ দেখেই সময় পাই না। জানেন মিঃ সেন আমাদের এই স্বামিনাথনটি একটি 'জিনিয়স', দুনিয়ার এ হেন জিনিষ নেই যার বিষয়ে কিছু জ্ঞান এর নেই। ৫।৬টা দেশী ভাষা এবং গোটা তিনেক বিদেশী ভাষায় পণ্ডিত বলা যেতে পারে।

মৃদুলা এবার কৌতুক করে বলল---তাইতো বুঝি এতবড় গুণীর একটি স্ত্রী জুটল না। নাকি এত গুণ দেখে মেয়েরা একটু ভড়কে যাচ্ছে?

---ঠিক তাই ম্যাডাম। আপনার অনুমান ঠিক। যোগ্য ব্যক্তি শুধু যোগ্য ব্যক্তির কদর বোঝে।

মৃদুলা মুখটা একটু গম্ভীর করে বলল---বেশ তো ডাক্তার সাহেব আজ বিকেলে আপনার ক্লাবে যাওয়া যাক।

উত্তম কথা---কিন্তু 'আমার' ক্লাব না।

স্বামিনাথন ক্লাবের সেক্রেটারী। ঠিক হলো স্বামিনাথন সেন-দম্পতিকে সন্ধ্যায় ক্লাবে নিয়ে আসবে।

বাড়ী ফিরে মৃদুলা তপনকে জিজ্ঞাসা করল---কি ডাক্তার-গিন্নীকে কেমন লাগল?

---কেন? বেশ লাগল---

---তাই নাকি? তোমার রুচি দেখছি দিন দিন বেশ মার্জিত হচ্ছে। ঐ মেয়েলোকটা একটি ক্যাট। ডাক্তারের বয়স চুরি করাতে পতিদেবতার উপর কুপিতা হয়েছিলেন কারণ তাহলে তাঁরও বেশী বয়স কেউ যদি মনে করে বসে। তাই নেহাৎ বোকার মতন কতগুলি একান্ত ঘরোয়া কথা সকলকে জানিয়ে দিল। কচি খুকি?

এবার তপন জিজ্ঞাসা করল---আচ্ছা স্বামিনাথনকে কি রকম লাগছে?

---ও হচ্ছে একটি 'কনসিটেড্ হামবাগ।' হাবভাব এরকম যেন উনি একটি মস্ত জিনিয়াস্---সব জান্তা।

তপন বলল---আমার কিন্তু তা মনে হয় না। 'হামবাগি' করতে একটিবারও দেখলাম না এবং কনসিটেড কি করে হলো তাও বুঝলাম না। কনসিটেড্ মানে যদি আত্মশ্লাঘী হয় তবে স্বামিনাথন তা নয়। সে যে গুণী লোক সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই কিন্তু নিজে একটিবারও জাহির করে নি, বলেছে তার বন্ধু এবং প্রকাশ পেয়েছে তার কথায়। আমার বরঞ্চ একে খুব মার্জিত এবং সভ্য মনে হচ্ছে।

---মার্জিত? কথার ফাঁকে ফাঁকে কি রকম করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

---ও তাই বলো---আমার ধারণা এতে আজকালকার মেয়েরা প্রসন্ন হয়---তাদের অবচেতন মন খুশিতে ভরে ওঠে। বিশেষত সে পুরুষ যদি আকর্ষণীয় হয়।

মৃদুলা রেগে বলল---দেখ নিজের মাপকাঠিতে সকলকে মেপ না। তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই। কোন সুন্দরী মেয়ে দেখলে কিরকম বেশী স্মার্ট হয়ে পড়---কথা বলতে আরম্ভ করলে থামতে ভুলে যাও---হঠাৎ একটু বেশী 'সিভেলরাস্' হয়ে পড়। আচমকা গায়ে গায়ে একটু ছোঁয়া লাগাবার জন্য কিরকম স্বাভাবিক কায়দা খুঁজে বেড়াও---এসব আমার জানা আছে। তাই তোমার মতন নোংরা মন ভাবছেই যে-কোন সুপুরুষের মুগ্ধদৃষ্টিতে আমি পুচ্ছ তুলে নেচে থাকি।

ধীরে ধীরে তপন বলল---আহা এ সামান্য কথায় এত জেদ কেন? একজন নর ও নারী আর একজন নারী অথবা নরের দ্বারা অজানতেই আকৃষ্ট হতে চায়---এটাই স্বাভাবিক ধর্ম, তবে বেশীর ক্ষেত্রেই সেই কুঁড়ি আর ফোটে না। কখনও যদি স্থান কাল পাত্র সুযোগ-সুবিধে অনুকূল পরিবেশ এসে পড়ে তবে অনেকে নিজেকে সামলাতে না পেরে অন্ততপক্ষে ক্ষণিকের জন্যও কেউ তাতে আত্মাহুতি দিয়ে ফেলে। এটি প্রকাশ হলে আমরা তাকে নিন্দা করি---

কিন্তু ভেবে দেখতে ভুলে যাই যে অনুরূপ আবেষ্টনীতে আমি হলে কি করতাম, বিদেশে ওরকম সুযোগ-সুবিধে বেশী তাই সকলের চোখে পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশেরও রূপ বদলাচ্ছে---এবং নর ও নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার নূতন ব্যাখ্যা হচ্ছে—তাই মাঝে মাঝে দু-একটা ঘটনা চোখে পড়ে। কয়েক বছর এরকম চললে দেখা যাবে যে আমরাও বিদেশীদের থেকে ওসব বিষয়ে বিশেষ পিছিয়ে নেই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা আমাদের স্ত্রী-পুরুষকে অনেক কাছে এনেছে---এখন সুযোগ-সুবিধেটা একটু বেশী হলেই হলো।

মৃদুলা এবার ক্ষেপে গেছে---থাক তোমার রুচি এবং মনোবিজ্ঞান আমার অজানা নেই---বলেই রেগে চলে গেল।

চান এবং প্রসাধন সেরে ঘণ্টা দুয়েক বাদে বারান্দায় এসে দেখে যে তপন স্বামিনাথনের সঙ্গে গল্পতে মেতেছে। পাশে আর একজোড়া মানুষ, মৃদুলাকে দেখে স্বামিনাথন উঠে নমস্কার করে বলে---এই যে মিসেস্ সেন কামাথ-দম্পতি এসেছেন আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে।

তপন বাকি পরিচয়টা করে দিল ---মিঃ কামাথ হচ্ছেন এখানকার চীফ একাউণ্টেণ্ট। একজন নামকরা শিকারী আর শ্রীমতী সুশীলা কামাথ একজন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞা।

মৃদুলা সুশীলার নিখুঁত রূপটি দেখছিল, কথা শেষ হলে বলল--- ওঁর চেহারা দেখে বোঝা যায় যে উনি গুণী লোক---

স্বামিনাথন ফোড়ন দিয়ে বলল--- দেখছেন কামাথ সাহেব আমি আপনাদের এইমাত্র বলছিলাম যে মিসেস সেন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমরা সাধারণ লোক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে যা না বলতে পারি উনি শুধু চেহারা দেখেই তার চেয়ে বেশী বলে দিতে পারেন।

মৃদুলা একটু অপ্রস্তত হলো--- তাই তপন অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল--- আমাদের কামাথ সাহেবের বাংলোতে নাকি ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানা আছে।

কামাথ খুশী হয়ে বলল--সত্যিকথা বলতে কি পশুপাখি নিয়ে থাকলে আমি সব ভুলে যাই। ঐ সব জীবদের একটু আদর-যত্ন করলে কি যে কৃতজ্ঞ হয় এরা তা বলবার নয়। আমার যদি অসুখ হয় এবং শুয়ে থাকি এদের স্বাভাবিক সজীবতা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়।

এবার কিন্তু সুশীলা অধৈর্য হয়ে বলল---পশু-পাখির উপরে যাদের এত দরদ তাদের তা নিয়েই শুধু থাকা উচিত। চলুন মিঃ সেন ক্লাবের দিকে যাওয়া যাক।

সকলেই উঠে পড়ল।

●

ভারতীয় জীবনযাত্রায় এই 'ক্লাবের' অনুপ্রবেশ খুব বেশী দিনের নয়, 'ক্লাব' অবশ্য আগেও ছিল, তবে দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের স্বাধীন মনোবৃত্তির পূর্ণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল এই 'ক্লাবের' মাধ্যমে, এখানে এসে আমরা স্বাধীনভাবে বেসঙ্কা সুরাপান করে পরস্ত্রীর বক্ষোলগ্ন হয়ে দ্বৈত নৃত্য করবার সুযোগ পেলাম। আমাদের কুললক্ষ্মীরাও হেঁসেল ঠেলে এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। দিনেরবেলা নিজেদের মধ্যে 'হেন পার্টিতে', তাসের জুয়া ইত্যাদি খেলে সময় কাটান। বিকেলে বাড়ী ফিরে দেহবিন্যাস করে নিজে-দের আইনত 'ডার্লিং'-এর হাত ধরা-ধরি করে ক্লাবে আসা এবং খেয়ে গল্প কোছা ইত্যাদি করে অপরের 'ডার্লিং'-এর সঙ্গে দুই দেহ এক করে অপূর্ব নৃত্য চলে অনেক রাত অবধি। তারপর অবসন্ন দেহ এবং অতৃপ্ত মন নিয়ে আপন ঘরে যাওয়া এবং 'ট্রাংকুইলাস' খেয়ে শুয়ে পড়া। এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত সমাজের 'ক্লাব' লাইফ।

এই প্রসঙ্গে স্বামিনাথন একদিন বলছিল---একশ পঞ্চাশ বছর ধরে ইংরেজরা আমাদের এই কালাদের যা পারে নি তা আমাদের নব-কর্তারা এই সামান্য পনেরো-কুড়ি বছরে আমাদের পুরো সাহেব করে ফেলেছেন। ইংরেজদের আমলে উপরতলার সামান্য কিছু লোক ক্লাব ও হোটেলে গিয়ে নেত্য করত এবং কেউ কেউ আড়ালে মদ খেত কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতে আমরা নিজেদের বাড়ীতে স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েদের সামনে মদ খাওয়া বেশ রপ্ত করে নিয়েছি। আগে যেখানে বিদেশী পোষাক মুষ্টিমেয় লোকে ব্যবহার করত আজ সেখানে স্যুট্ বুটই আমাদের 'জাতীয় ভূষা।' পাঞ্জাবী মাড়োয়ারী ভাইরা তো স্যুট্ পরেই বিয়ে করেন। আর ভাষার কথা না বলাই ভাল। নিজ নিজ মাতৃভাষাতে কথা বলা বা চিঠি লেখা অশিক্ষিতের লক্ষণ। পরভাষার দৌরাত্ম্য অন্দরমহলেও প্রবেশ করেছে--- তাই সেকেলের 'ওগো' 'শুনছো' আর শোনা যায় না---তার বদলে শোনা যায় 'ডারলিং' 'জানি' ইত্যাদি। ভারতের বড় বড় সহরে বড়দিন আগেও অনেক হয়েছে---তবে এই কালা সাহেবদের বড়দিন দেখার মতন। মাসখানেক আগে থেকে সব হোটেল ভর্তি সাদা সাহেবরা নিজেদের বাড়ী কিংবা বিশিষ্ট যায়গায় থাকে। আমরা সেই জোর কদমে মদিরা। যতক্ষণ পর্যন্ত না 'বার' বন্ধ হচ্ছে---ততক্ষণ চালাই কদর্য অঙ্গ-ভঙ্গিতে নাচ, নিজেদের পূজা-পার্বণের খোঁজ রাখবার সময় নেই আমাদের। সত্যি ইংরেজদের ভারত জয় পূর্ণ হয়েছে তাদের ছেড়ে যাবার পর।

অনেকের সঙ্গে পরিচিত হলো সেন-দম্পতি, এক নম্বরের আদর্শ দম্পতি খান্নাদের সঙ্গে। কেউ কাউকেই 'ডারলিং' ছাড়া ডাকেন না, দুজনেই দুজনার গুণে পঞ্চমুখ। কয়না খান্না সুন্দরী, ভূষায় অতি আধুনিকা এবং বিদেশী নৃত্যপটীয়সী। তাই তাঁর ফুরসৎ কোথায়? সকলেই চায় কয়নার ঐ সুন্দর তনুখানি নিজের বুকে জড়িয়ে ধরতে---যদিও ক্ষণিকের জন্য তাও বা মন্দ কি? আর একজন আছেন এদের

জুড়ী তেওয়ারী-দম্পতি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, তেওয়ারী সাহেব তাঁর স্ফীত ভুঁড়ির জন্য নাচে অপটু কিন্তু তাঁর তরুণী সুন্দরী স্ত্রী আরতি সে অভাব একাই পূরণ করে দেন।

আরতি তেওয়ারীর সঙ্গে 'টুইস্ট' নাচ দিলেন একটি সুদর্শন যুবক।

নাচ শেষ হতে তেওয়ারী মেম-সাহেবকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে একটা হাত করে এলেন সেনদের টেবিলে এবং সুন্দর ইংরেজীতে সেনকে বললেন---আপনি বোধহয় এখানকার নূতন চীফ প্রজেক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সেন---

স্বামিনাথন তখন দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন---ইনি হচ্ছেন মিঃ কারতার সিরচাঁদানী। একটি আমেরিকান কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ---আমাদের প্রচুর জিনিষ সরবরাহ করে থাকেন।

কারতার সাহেব বসেই বললেন---আপনাদের জন্য কি ড্রিঙ্ক বলব?

সেন-দম্পতি চাইলেন সফট 'ড্রিঙ্ক'।

কারতার সাহেব অমনি বলে উঠল---তবে তো মুস্কিল আপনাদের সঙ্গে পাল্লা রাখা, লেবুর জলটা খেলে আমার শরীর বেজায় খারাপ হয়ে পড়ে, আমার ডাক্তার তাই 'সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ক' এবং দুধ খেতে বারণ করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ খোস্ গল্প করে কারতার সাহেব বিদায় নিলে মৃদুলা জিজ্ঞাসা করল স্বামিনাথনকে---এঁর মেমসাহেব কোথায়?

---এঁর আইনত মেমসাহেব দিল্লীতে থাকেন এবং প্রাচীনপন্থী---তাই অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মরীচিকার পিছনে ছোটেন---

মৃদুলা একটু শ্লেষ করে বলল---আপনি দেখছি একজন মস্ত মনস্তত্ত্ববিদ্।

---মস্ত না অতি ছোট। তবে আমি মনে করছি একটা বই লিখব যার নাম দেব 'পুরুষ বিপথে যায় কেন?'

মৃদুলা আরো বিদ্রূপ করে বলল---সাবাস্, এত বড় একজন সাহিত্যিক এই ছোট গণ্ডীর ভিতরে কি করে আছেন তা ভেবে অবাক হচ্ছি?

স্বামিনাথন কিন্তু গম্ভীরভাবে বললেন---সাহিত্য আমার ধন্য হবে যদি আমার বই পড়ে একজন নারীও তাঁর বিপথগামী পুরুষকে ঠিকপথে চালিয়ে এনে তাঁদের বিবাহিত জীবন মধুময় করে আনতে পারেন।

মৃদুলারও জেদ চেপে গেছে। সে বলল---আপনার সাধু উদ্দেশ্য এবং অনাগত অপূর্ব গ্রন্থকে স্বাগত এবং সাফল্য কামনা করে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে কেন একটি মেয়ে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে পৌঁছে হঠাৎ অন্যরকমটি হয়ে যায়? এর জন্য কি তার স্বামী কিংবা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কোনই অবদান নেই?

স্বামিনাথন বলল---অল্প বিস্তর অবদান আছে সকলেরই। আমাদের সামনে দুজন অপরিচিত নর ও নারী সুখের নীড় বাঁধবার জন্য বিয়ে করে কিন্তু দু পক্ষেরই কিংবা এক পক্ষের বেশী সহনশীলতার অভাবেই অন্যরকম হয়ে পড়ে, আমাদের দেশে পুরুষদেরই অর্থ রোজগার করতে হয় এবং নানা ঝামেলা হতাশা নিরাশার বোঝা তাঁদেরই বইতে হয় সারাদিন। তারা যখন নিজেদের বাড়ী ফেরে তখন সেসব ভুলে যেতে চায়---খোঁজে একটু সহানুভূতি এবং শান্তি। কিন্তু প্রায়ই কাজে হয় বিপরীত। স্ত্রীর বাক্য খোঁটায় স্বামীর মনে এনে দেয় গভীর নৈরাশ্য এবং অধর্মণ্য ভাব। ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ফাটল ধরে এবং পরে সেই ফাটল আর মেরামত হয় না।

গোমট আবহাওয়া কাটাবার জন্য তপন রাত অনেক হয়ে গেল বলে বাড়ী ফিরে গেল।

●

অনেক দিন হয়ে গেছে সেন-দম্পতি নিজেদের বেশ মানিয়ে নিয়েছেন নূতন পরিবেশে। একটি ছুটির সকালে তপন একা বেড়াতে বেড়াতে গেল খান্না সাহেবের বাড়ী। খান্না সাহেব বারান্দায় একা বসে সেই সাত সকালে গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলছে। তপনকে দেখে খান্না সাহেব তাকে হাত ধরে বসাল এবং কফি অর্ডার দিল---কারণ তপন পান করে না।

তপনের মুখ দিয়ে কেন যেন হস্ করে বেরিয়ে গেল---আচ্ছা খান্না সাহেব এই সকালে এত মদ খাচ্ছেন একা একা কি ব্যাপার?

---ব্যাপার আবার কি হবে? কিছু একটা করা দরকার তো। মদ খেয়ে কেমন রঙ্গীন স্বপ্ন দেখা যায় তা আপনি বুঝবেন না। এ খেয়ে সব ভুলে থাকা যায়, স্ত্রীকেও---

তপন অবাক।

---কেন? আপনারা তো আদর্শ দম্পতি। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি যে সারাদিন অফিস করে বিকেলে টেনিস খেলে রাত্রে মদ খেয়ে ধেই-ধেই করে নেত্য করে বাড়ীতে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন---তবে স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে কোন সময়টুকু থাকেন?

হেসে খান্না সাহেব বললেন---বুদার একে বলে 'পলায়ন-মনোবৃত্তি।' যাতে একান্তে না থাকা যায় তার জন্যই তো সব করা। সভ্য-সমাজে থাকতে হলে এরকম ভাবে দৈনিক প্রোগ্রাম করতে হবে যেন স্বামী-স্ত্রী কখনও একান্তে না থাকে। রাতে এসে বেহুঁস হয়ে শুয়ে পড়ে আবার পরের দিনের অভিনয়ের জন্য তৈয়ারী হওয়া। বুদার মনে করো না যে নেশার ঘোরে এ সব বলছি। যে-কোন বিবাহিত লোক বুকে হাত রেখে বলুক---দেখো মিলে যায় কি না।

এরকম ভাবে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল সেন-দম্পতির। ও যায়গার সকলের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। হোলি আসছে, সকলেই ঠিক করল যে দলবেঁধে সব্বাই যাবে গাড়ী করে এবং রাস্তার ধারে খাওয়া-দাওয়া করা হবে।

তপন এবং মৃদুলারও খুব উৎসাহ। স্বামিনাথন এবং ডাক্তার হলো পাণ্ডা। কিন্তু মন্দ বরাত। ঠিক আগের রাতে তপনের জ্বর হয়েছে। মৃদুলাকে কিছু বলে নি।

সকাল হতেই সকলে হুল্লোড় করে হাজির, প্রথমে এলেন ডাক্তার-দম্পতি। শ্রীমতীর মোহিনী মূর্তি। আলুথালু বেশ ও কেশ। স্খলিত শাড়ীকে টেনে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস করে প্রায় নগ্নবক্ষে একগাদা আবির তপনের শরীরে মেখে নিজের আবির এবং দেহ এগিয়ে দিলেন তপনের সামনে—মনের ফাগ আর চেপে রাখা যায় না।

কিন্তু বেরসিক তপন একটু আবির তার কপালে মাখিয়ে দিলে মাত্র।

শ্রীমতী অপ্রতিভ এবং অসন্তুষ্ট। মৃদুলাকে দেখতে পেয়ে সামান্য একটু তার মাথায় ঠেকাল। 'লেডি কিলার।'

কারতার পেছনেই ছিল। সে কিন্তু এরকম নিরামিষ হোলিতে বিশ্বাসী নয়, তাই শ্রীমতীকে জড়িয়ে ধরে তার মধুর অঙ্গে বারবার আবির মাখাল।

ডাক্তার জায়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন—কারতার সব সময়ই একটু বেশী করে থাকেন, সব আবির আমার গায়ে উজাড় করে দিলেন তবে যার জন্য আনা—মিসেস সেনের জন্য কি থাকল?

মৃদুলা কারতারের এই অভিযানে সন্তুষ্ট হতে পারে নি—কিন্তু মিসেস রায়ের এই বিদ্রূপ তাকে অন্য রকম করে দিল। মৃদুলা বলল—আহা আবিরের কোন অভাব নেই—এই বলে সাঁ করে ঘর থেকে এক বড় ঠোঙ্গা আবির এনে কারতারের মুখে মাথায় ভাল করে ঘসে দিয়ে কারতারের মনের গোপন আশাও পূর্ণ করে দিল।

মহেন্দ্রক্ষণকে নষ্ট হতে দিল না কারতার সাহেব। সেও তার হাতের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল মৃদুলার অঙ্গে আবির লেপে। দুজনেই মত্তের মতন এ ওর গায়ে আবির দিচ্ছে। ব্যাচারী মিসেস রায় উপেক্ষিতা। সে অন্য ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

এরকম সময় স্বামিনাথন একহাতে একঝুড়ি খাবার অন্য হাতে কুমকুম নিয়ে হাজির—হতবাক। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য সে মিসেস রায়কে নিয়ে পড়ল। একটু পরে মিসেস রায়কে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা ডাক্তার সাহেব এবং সেন সাহেব কোথায়?

মিসেস রায় বললেন—আমার বৃদ্ধ পতিদেবতা বোধহয় এতদিনে মিঃ সেনকেও তাঁর দলে টেনে নিয়েছেন। ডাক্তারী করে একেবারে রসবোধ হারিয়েছেন, বসবার ঘরে চেয়ে দেখে যে সেখানে মিসেস সেন, কারতার, ডাক্তার এবং তপন মিষ্টি খাচ্ছে। তপনকে বেজায় বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

স্বামিনাথন জানাল যে সবাই বেলা ১১টায় রওনা হবে এবং সকলেই গাড়ী করে তপনের বাংলোতে জমা হবে। এই বলে ডাক্তার-দম্পতিকে নিয়ে স্বামিনাথন বেরিয়ে গেল।

মৃদুলা চলে গেল শাড়ী বদলে 'ফ্রেশ' হতে। তপনের তখন বেশ জ্বর হয়েছে। মাথাও ধরেছে বেজায়। সে চুপ করে বসে থাকল। ঠিক সময় সবাই হাজির। মৃদুলাকে তপন বলল—যে তার শরীর ভাল লাগছে না—তার না গেলেই ভাল।

কিন্তু মৃদুলা খাপ্পা শ্লেষের সুরে বলল—কেন মিসেস রায়ের সঙ্গে কেলি করে পরিশ্রম হয়েছে বেশী?

তপন মৃদুলাকে ভাল করেই জানে। তাই কথা না বাড়িয়ে সেও রওনা হলো। খাবার সময় তপন প্রায় কিছুই মুখে দিল না দেখে মৃদুলা দু-একবার ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অন্যদের সঙ্গে মেতে উঠল, ঠিক হলো সকলেই জঙ্গলে বেড়াতে যাবে।

তপন আর পারছে না। সে বলল যে, সে একটু বিশ্রাম করে পরে যাবে। কামাথও থেকে গেল। সকলেই উদ্দেশ্যহীনভাবে চলেছে। মৃদুলা এবং স্বামিনাথন নিজেদের অজান্তেই দলের বাইরে পড়ে গেছে।

স্বামিনাথন ভাবছিল তপনের কথা। তাই জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা মিঃ সেনকে কেমন যেন মনে হলো—শরীর খারাপ হয়েছে কি?

—নিজে জানলে তো বলব? এত বছর হয়ে গেল মানুষটিকে চিনতেই পারলাম না। সবই আমার বরাত। আমি নিজে এত হাসি, ঠাট্টা, স্ফূর্তি ভালবাসি তাই বোধহয় ভগবান আমার কপালে এরকম লোক জুটিয়ে দিয়েছেন। মৃদুলার গলা ভার, চোখের কোণে জল এসে জমেছে—দু-এক ফোঁটা পড়লও তাই ব্যাগ খুলে চোখ মুছতে রুমাল বার করতে যেয়ে রুমাল পড়ে গেল—দুজনেই একসঙ্গে তাই তুলতে গিয়ে মাথায় হলো ঠোকাঠুকি। দুজোড়া চোখ দুজনের ভিতরে কি খুঁজছিল।

রুমালটি তুলে মৃদুলাকে দিয়ে স্বামিনাথন বলল—এই বোধহয় সংসারের নিয়ম, লোকে যা চায় তা পায় না। সকলেই মরীচিকার পেছনে অযথা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত দেহটি সংসারে ফেলে রেখে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে পরবর্তী জীবন আরম্ভ করে।

সকলের জীবনেই কোন না-কোন সময়ে অসতর্ক মুহূর্ত এসে পড়ে। মন তখন হয়ে থাকে বিশেষ অভিমানী, সুপ্ত অবচেতন মন বোধহয় খুঁজে বেড়ায় একটু স্নেহের পরশ। সে হোক না কেন অন্যায় তবুও ক্ষণিকের একটু সহানুভূতি মনে দেয় দোলা। সেই দুর্বল মুহূর্ত আজ এসেছে এদের মনে—বাঁধ আর মানে না, মৃদুলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, স্বামিনাথন তাকে আলতোভাবে ধরতেই মৃদুলা মুখ লুকালো স্বামিনাথনের চওড়া বুকে। অশ্রুসিক্ত সুন্দরী তরুণীর আরক্তিম মুখ—লোক-চক্ষুর অন্তরালে এত নিকট সান্নিধ্য। পুরুষের ধৈর্য রুচিবোধ শিক্ষা সংযম ন্যায় ধর্ম বন্ধুপ্রীতি নিষ্ঠা সব যেন এক-নিমেষে অন্তরের মহাপ্রলয়ে লোপ পেয়ে গেল—বেঁচে থাকল শুধু আদিম প্রবৃত্তি। বাঁধন ভেঙ্গে গেছে—ধীরে—অতি ধীরে দুই অন্ধ নর-নারী ডুবে গেল অতল তলে…

সম্বিৎ ফিরে এলো প্রথমে নারীর। একটানে নিজেকে মুক্ত করে নিল---কম্পিত হাতে বিশৃঙ্খল শাড়ীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে এল নিমেষে এবং নিঃশব্দে পেছনে ফেলে-আসা পথ ধরে যেতে আরম্ভ করল। নর হলো অনুগামী। কোন কথা নেই কারু মুখে।

জায়গামতন পৌঁছে দেখে ভয়ানক ব্যাপার। তপন জ্বরে বেহুঁস। কামাথ একটা খবরের কাগজ দিয়ে মাথায় হাওয়া করছে---ডাক্তার রায় হাতের নাড়ী ধরে বিমর্ষ মুখে ঘড়ির দিকে চেয়ে, এদের দেখেই কামাথ ইশারায় মৃদুলাকে ডেকে আস্তে আস্তে বলল---বড়ই বিপদ, হঠাৎ মিঃ সেন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি পুড়ে যাচ্ছে। আমি তখন একা---ভাগ্যিস ডাক্তার রায় কিছু পরেই এসে পড়লেন---

ডাক্তার রায় এবার বলল---এসে বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। প্রবল জ্বরেই এ রকম বেহুঁস হয় তবে চিকিৎসার দেরী হলে মুস্কিল। একে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। গাড়ী তো অনেক দূরে স্ট্রেচার নেই কি হবে?

এবার স্বামিনাথন এগিয়ে এসে বলল---এটা কোন প্রবলেম নয়, সামান্য ২০০-২৫০ গজ আমি ওনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারব এবং ঠিক তাই করল।

ডাক্তার রায় রুগীকে নিয়ে পেছনে বসল, স্বামিনাথনের পাশে মৃদুলা। সাবধানে চালিয়ে স্বামিনাথন পৌঁছে দিল নিজেদের হাসপাতালে, কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে অবস্থা খারাপ হচ্ছে দেখে দিল্লীতে ফোন করিয়ে বড় বিশেষজ্ঞকে আনা হলো সকালে। 'সেরিব্রাল হেমোরেজ' হচ্ছে।

একটু জ্ঞান হতে চোখ মেলে যেন কাকে খুঁজল---স্বামিনাথন বলল---এই যে মিঃ সেন মিসেস সেন এখানেই আছেন।

কিন্তু তপনের দৃষ্টি দেয়াল-পঞ্জির দিকে। হাসিমুখেই বলল---আজ আমার জন্মদিন---এই শুভ দিনটিতেই আমি চলেও যাচ্ছি---বিদায়।।

তপন চলে গেল---সকলে দুঃখে ভেঙে পড়ল। মৃদুলা কিন্তু পাষাণ হয়ে গেছে। একটিও কথা বের হলো না মুখ থেকে। একফোঁটা জলও পড়ল না চোখ ভেঙে। শেষ কাজ হয়ে যাবার পর বাড়ীর সব জিনিস ফেলে রেখে চলে গেল কলকাতায়---কারো সঙ্গে যাবার সময় একটি কথাও বলল না।

স্বামিনাথনও এসেছিল মাথা হেঁট করে। কথা একটিও হয় নি।

●

মাসখানেক পরে স্বামিনাথন গেল কলকাতায় মৃদুলার সঙ্গে দেখা করতে। মাথা নিচু করে বলল---আমি চলে যাচ্ছি ৩।৪ দিন পরে উগাণ্ডায় কাজ নিয়ে---দেশে আর ফিরব না কখনও। শুধু একটি কথা আপনাকে বলতে এসেছি, বিধবা-বিবাহকে আমাদের সমাজ মেনে নিয়েছে---আমি কি আশা করতে পারি?

অনেকক্ষণ মৌন থেকে মৃদুলা বলল, আমার সংসার শেষ হয়েছে।

এবার স্বামিনাথন মুখ তুলে বলল---দেশ-সমাজ ছেড়ে যদি আমরা চলে যাই---তবে?

মৃদুলার উত্তর ধীর এবং শান্ত---না, কখনই না। আমার জীবন শেষ হয়েছে।

স্বামিনাথন উঠে দাঁড়াল---আচ্ছা নমস্কার, ভগবান আপনার সহায় হউন---।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

॥ শ্রীরামকৃষ্ণজগতের কৃপাকথা ॥

• লীলারহস্য কথা •

এই যে আসনে উপবেশন করলাম বহুজন্মের দুর্লভ বোধিত্বের লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমার দেহ নিশ্চল থাকবে। তাতে যদি হাড়-মাসের খাঁচাটা উড়ে যায় তাতেও আপত্তি নেই। কি অটুট সঙ্কল্প। সেই নিশাতেই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করলেন এবং তাঁর দৃষ্টি সুদূর-প্রয়াসী হয়ে উঠলো। তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁর পাঁচশত জন্মের ঘটনাবলী একে একে দেখতে লাগলেন। তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষুর সমখে ফুটে উঠতে লাগলো সে সব। তিনি তাঁর নিজের বহু জন্মের বুদ্ধত্বলাভের সঙ্কল্পের ইতিহাস স্মৃতি-পথে জাগিয়ে বুঝলেন কত তপস্যা, কত নিষ্ঠা, কত বিচার এবং আত্মাহুতি জন্ম জন্ম ধরে করার পর আজ তিনি সম্যক সম্বুদ্ধ হলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে মানব-চরিত্রের ইহা একটা অপূর্ব দিক।

আজ আড়াই হাজার বছর গত হওয়াতেও সেই ইতিহাসের স্মৃতি একটুখানিও ম্লান হয় নি। আমরা এই যুগের মানুষ, আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে এ সব কথা পাঠ করতে হবে এবং অনুশীলন করতে হবে। এই সব শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনের ফলে দু-একজন ভাগ্যবান বুঝতে পারেন যে, আমাদের জীবনের কত দায়িত্ব। আমাদের জীবন এই জন্মের পঞ্চাশ-ষাট কি আশি বছরের মধ্যে সীমিত নয়, আমরা সবাই পাতাল-ফোঁড়া শিব। হয়ত শাস্ত্র এবং মহাজনেরা যেমন বলেন বহু লক্ষ বছর আগে আমরা আমাদের স্বরূপ ছেড়ে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করছি। কত জন্ম, কত মৃত্যু, কত মা, কত বাবা, কত সুখ, কত দুঃখ, কত উত্থান, কত পতন। কখনও পশু, কখনও মানুষ, কখনও দেবতা, কখনও অসুরজীবন চলছে ত' চলছেই। জন্মমৃত্যুর প্রবাহে আমরা ভারবাহী পশুর মত চলছি।

এর কি শেষ নেই? এই দুঃখের হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই? মানুষের প্রাণে যখন এই হাহাকার উপস্থিত হয় তখন তিনি আসেন এবং নতুন ছাঁদে, নতুন রূপে, যুগোপযোগী

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ভাষার মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি দেবার জন্য আমাদের মধ্যে এসে উদিত হন; আর বহু লোক তাঁকে ধরে এবং চিনে ফেলবার আগেই তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে আবার অদৃশ্য হয়ে যান। অন্তত এবারে তাই হয়েছে। থাক্, আবার এ সব কথা পরে হবে।

আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের জীবন বলতে এই হস্তপদাদি সম্বলিত দেহ ছাড়া আর কিছু বুঝতে চাই না। সাড়ে তিন হাত এই দেহটা একটি নাম আর রূপধারী জীব পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট। এ সম্বন্ধে আগেও কিছু কথা হয়েছে। এখন আমাদের পণ্ডিতদের এবং শাস্ত্রের শরণাগত হতে হবে। আমরা মন আর বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব। আমাদের সূক্ষ্ম-শরীর আছে তার বিস্তার বোধহয় অনেক অধিক। তারপর একটা কারণ শরীর আছে। এই ত' গেল শরীরের কথা।

তারপর বলছে, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় আমরা বিচরণ করি। আবার পঞ্চকোষের উল্লেখ আছে। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দ এ পঞ্চকোষের ভিতরে আত্মা আছেন। এই উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় আত্মাই আমাদের স্বজন। এই স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতি করে, চূড়ান্ত স্থিতিলাভ করি এবং সকল প্রকার দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই এই হচ্ছে আমাদের জীবনের আসল কাম্য অবস্থা।

আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে আছি কাজেই এইসব কথা শুনলেও তার ধারণা করতে পারি না। মহাজনেরা যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করে আপ্তকাম হয়েছেন এবং আত্মস্বরূপে অবস্থান করছেন তাঁরা জীবজগতের দুঃখ দূর করবার জন্য ঘুরে ঘুরে এই পৃথিবীতে আসেন।

অনেক সময়ে মাতৃগর্ভে নতুন শরীর ধারণ করে সাধারণ মানবের মত জন্ম, জরা, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়ে চলার পথে চলে যান আবার অনেকে অতি উন্নত স্তরের যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা বৃদ্ধ দেহকে পরিত্যাগ করে ফেলে মৃত শুদ্ধ পবিত্র যুবকের দেহে নিজের প্রাণসঞ্চার করে এবং পূর্বস্মৃতি বহাল রেখে এই জগতে মানুষকে স্বরূপে পৌঁছাবার চেষ্টায় জীবনপাত করেন।

এ কথাটাকে অনেকে মনে করবেন

[illegible] একেবারে আজগুবি কিন্তু এমন একটি মহাপুরুষের দর্শন লাভ লেখকের ঘটেছিল যিনি বলেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে তিনি এই জগতে আছেন কেবল বৃদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করে। যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা নতুন দেহে তাঁর নিজের প্রাণটিকে সঞ্চার করে।

মহাপুরুষ মিথ্যাকথা বলেছেন মনে হলো না, কিন্তু কথাটা সত্য বলে মেনে নেবার মত মন, বুদ্ধি লেখকের তৈরী হয় নি। অবশ্য শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কোন একখানা জীবনীতে পড়েছিলাম যে, তিনি কোন সময়ে বিশুদ্ধ যোগের অবস্থাতে কৈলাস পর্বতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে অনেক যোগী-পুরুষের দর্শন লাভ করেছিলেন।

তাদের ভিতর থেকে একজন অতি প্রাচীন যোগী-পুরুষ তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি অযোধ্যায় যখন শ্রীরাম ছিলেন তখন ছিলেন, তারপর অযোধ্যায় শ্রীরামের অন্তর্ধানে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করে পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করে এবং নানা উন্নত স্তরের যোগী-পুরুষদের কৃপা লাভ করে যোগশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে এই কৈলাস পর্বতে আসেন এবং তখন থেকে কায়া বদল করে ওখানেই আছেন। সত্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত গোস্বামীজীর বাণী কি করে অবিশ্বাস করা যায়?

যা' হোক ওসব কথা শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের বাণী শুনলে মনে হয় আমরা কি প্রচণ্ড স্বপ্নের ভিতর দিয়ে জীবন কাটাচ্ছি; সত্যিকার কাম্য জিনিষের সন্ধানে হারিয়ে আমরা গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছি, কামনা বাসনার দাস হয়ে। মরছি আবার জন্মাচ্ছি। আবার মরছি আবার জন্মাচ্ছি। আমাদের এই দুর্দশা দেখলে যাঁরা উর্ধ্ব জগতের মুক্তপুরুষ তাঁদের মনে আমাদের জন্য চরম দুঃখের আঘাত লাগা স্বাভাবিক নয় কি? তাঁরা তা নানাভাবে, নানারূপে, নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের সত্যের দিকে, শিবের দিকে এবং সুন্দরের দিকে সর্বদা টানছেন এবং যাঁদের জীবনের ভিতরে জ্ঞানটি তৈরী অর্থাৎ সত্য গ্রহণ করবার ক্ষমতা এবং প্রস্তুতি আছে তাঁদের কৃপা ঢেলে দিচ্ছেন।

আমরা লীলারহস্য কথা আলোচনা করতে যেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে পড়লাম। কিন্তু উপায় ত' নেই। এসব কথা জানতেও হবে আর বুঝতেও হবে। অত কথা শুনবার পর বন্ধু বললেন, বুঝতে পারছি তুমি বলতে চাও এবং বুঝাতে চাও যে ধর্ম ছাড়া সত্যিকার এই পৃথিবীতে কিছুই নেই অর্থাৎ আমাদের এই স্থূল শরীর ছাড়া আমাদের নিজেদেরই এই বৃহৎ সত্তা আবিষ্কার করার এবং সত্তার যে শেষ কথা আত্মা সেই আত্মাকে আবিষ্কার করাটাই আসলে একমাত্র কর্তব্য এবং এই আত্মিক স্বরূপকে লাভ করার জন্য যে ভাবে জীবন পথে চলতে হবে তাকেই বলে ধর্ম এবং সেই ধর্মকে জীবনে ধরা মানুষের সব চাইতে বড় প্রয়োজন।

এখানে শিশু যুবক বৃদ্ধ প্রভৃতি কথায় কোন স্থান বা অবসর নেই। শাস্ত্রে একটা কথা আছে যে, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেত।'

অর্থাৎ যে মুহূর্তে বৈরাগ্য আসবে সেই মুহূর্তেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।

এই কথার পণ্ডিতেরা যে অর্থ করেন সেই অর্থে সাধারণ লোকেরা গ্রহণ করলে তাদের ভাল না হয়ে বিষম বিপদ হবারই সম্ভাবনা। বৈরাগ্য হওয়া অর্থটা যদি এই করা যায় যে মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গী বদলে পাঞ্চভৌতিক দেহকে অতিক্রম করে এমন কি দেহত্রয়কে এবং পঞ্চকোষকে অতিক্রম করে সনাতন শাশ্বত আত্মার দিকে মোড় নিয়েছে তা মন্দ কি? আর প্রব্রজ্যা নেওয়া মানে হিমালয়ে চলে যাওয়াটারই বা দরকার কি? ঘরে থেকে অর্থাৎ যে যে তার অবস্থায় আছে সেখানে থেকেই যদি গতি লক্ষ্যপথে চালিত করে তা হলেই ত' হল।

একটি কথা মনে রেখেই অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে যখন তিনি বিষাদগ্রস্ত---যুদ্ধ আমি কিছুতেই করবো না ভাবছেন তখন কত শাস্ত্র-কথা আওড়ালেন কিন্তু তার ভিতরে একটি অপূর্ব কথা এখানে বলা হচ্ছে। শ্রীভগবান বলছেন 'স্বধর্ম' ত্যাগ করো না। স্বধর্ম যদি বিগুণও হয় তাহলেও তোমাকে স্বধর্মই পালন করতে হবে। হাজার হাজার বছর গত হলেও শ্রীভগবানের গীতামুখে এই উপদেশ যা সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করে সমগ্র মানব জাতিকে সমগ্র কালের জন্য বলে গেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তিনি যখন অর্জুন স্বজনকে দেখে যুদ্ধ করতে নারাজ এবং যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যেতে উন্মুখ তখন নানাভাবে অর্জুনকে এই ধর্মযুদ্ধে নামাবার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলেন। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার ধর্ম এই স্বধর্ম ছেড়ে তুমি ভয়ে কাপুরুষের মত ব্যবহার করছ? এই 'স্বধর্ম' কথার আর একটা বিরাট এবং বহুমুখী অর্থ আছে যেটা প্রতি মানুষ প্রতি কাজের ভিতরেই প্রয়োগ করতে পারে। পণ্ডিতেরা এই বিষয়টি বিচার করতে বসলে বিরাট গ্রন্থের অবতারণা করতে পারেন।

বন্ধু গম্ভীরভাবে বললেন, অপূর্ব! অপূর্ব!' আচ্ছা ভাই আজ আর না। এখন আবার মনন এবং নিদিধ্যাসন শ্রবণ ত' হলো।'

বন্ধু উপস্থিত। বলত স্বধর্ম সম্বন্ধে আমাকে বুঝিয়ে বল কিন্তু একটি কথা-তুমি 'রামকৃষ্ণ জগতের' লীলারহস্য কথা বলতে বসেছ, ভুলে যেও না। তুমি পরে এগুলো শ্রীরাম-কৃষ্ণের উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবে ত'?

আমি বললাম, বন্ধু, তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না। তুমি বুড়ো হয়ে অনেক বদলে গেছ। তোমার ধারণা শক্তি কমে গেছে বলে মনে হয়। তোমাকে অনেক বার বলা হয়েছে আমার কাছে জগৎ

একটিই এবং সেটা রামকৃষ্ণ জগৎ-কাজেই যা বলছি সবই রামকৃষ্ণ জগতের কথা এবং সব কথাই রামকৃষ্ণের কথা, এই মূল কথাটা আমার সঙ্গে বিচার এবং আলোচনা করতে বসে সব সময়েই মনে রেখো।

শোন, 'স্বধর্ম' সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। এই না? স্ব মানে নিজ নিজের ধর্ম স্বধর্ম। নিজ কথার অর্থটা কি? নিজ কথার অর্থ হচ্ছে নিজের আসল অবস্থা স্বরূপের অবস্থা। তা হলে হল এই যে স্বধর্ম মানে আত্মার ধর্ম অর্থাৎ জীবনটা যেভাবে চালালে গতির শেষে মানুষ আত্মজ্ঞানে পৌছে যায় সেটাই স্বধর্ম। তোমাকে আগেই বলা হয়েছে যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অবস্থানের স্থান এবং পরিবেশ থেকে নির্ধারণ করতে হবে। একটা অত্যন্ত সোজা কথা ধর। একটা অতি স্থূল কথার সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝাবার চেষ্টা করছি।

তিন বন্ধু হরিদ্বার যাবেন স্থির করলেন। একজন দিল্লীতে। একজন বোম্বাইতে আর একজন কলিকাতা। ধর তুমি তাদের চলার পথ নির্ধারণ করবার জন্য উপদিষ্ট হচ্ছ। তুমি কলিকাতার লোককে হাওড়া স্টেশনে যাবার উপায় নির্দেশ করে দিয়েছ। সে ট্রামে-বাসে হাওড়ায় যেয়ে ট্রেনে বসে হরিদ্বার চললো।

বোম্বাইয়ের বন্ধুটি ভাবলেন, অতদূরের রাস্তা আমি প্লেনে যাবো।

তিনি প্লেনে চললেন আর দিল্লীর বন্ধুটি দিল্লী থেকে হরিদ্বার সুবিধামত ব্যবস্থা করে গেল। কিন্তু তাঁরা তিন বন্ধুই হরিদ্বারে নির্দিষ্ট স্থানে একদিন একত্রিত হল।

তাহলেই দেখ গন্তব্যস্থান একই কিন্তু যেহেতু বন্ধুরা তিনটি পৃথক স্থান থেকে গেলেন তাঁদের গতিপথ সম্পূর্ণ পৃথক হলো এবং তাঁরা যদি তাঁদের পথের খবর লিপিবদ্ধ করেন তাহলে দেখা যাবে একের পথের সঙ্গে আর একের পথের কোন মিল নেই। বুদ্ধিমান বুঝতে পারবে কেন মিল নেই, বোকা লোক যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানের গতিপথ দিয়ে হরিদ্বারে পৌছুতে চেষ্টা করে তাহলে তার কি দুরবস্থা হবে বুঝতেই পারছ।

আচ্ছা এবার এই কথাটা গভীর-ভাবে চিন্তা কর তাহলেই বুঝবে স্বধর্ম কথাটার ভিতরে কতখানি গুহ্য-তত্ত্ব নিহিত আছে। এবার ধর অন্য দিক দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করি। একটি কলেজের ছাত্র সে ধর্ম চায় এবং কলেজের পড়াশুনো করতে চায়। তুমি তাকে কি উপদেশ দেবে?

'ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ' কথা আছে। তুমি বলবে পবিত্র জীবন-যাপন কর। শরীর নীরোগ রাখবার জন্য উপযুক্ত আহার ও ব্যায়াম কর। পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভের জন্য পড়াশুনো কর। পিতা-মাতার সেবা করতে ভুলো না। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলো। প্রতিদিন দেখো মন যেন ভগবদ্‌মুখী থাকে এবং ভগবানকে উত্তরোত্তর অভ্যাস দ্বারা আপনার করতে চেষ্টা কর। আর মনে রেখো যেমন আগেরগুলো করতে হবে তেমনি সব সময়ে বিচার করে চলতে হবে এবং পবিত্রতা, সত্যবাদিতা এবং শ্রদ্ধা এই তিনটির দিকে সর্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আচ্ছা মোটামুটি এইভাবে যদি ছেলেটি চলে তবে সে স্বধর্মের পথে চলছে বলতে হবে এবং ফলে দেখা যাবে সে অতি সুন্দর ভাগবত জীবনের অধিকারী হয়েছে।

এবার ধর একটি মেয়ে---বিবাহিতা বিদুষী এবং দুটি সন্তানের মা। তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়ী আছেন। শ্বশুরটি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। তাঁর স্বধর্মটা কি হওয়া উচিত?

তাঁর গরীব স্বামী। খুব বেশী রোজগার করতে পারেন না। তিনি কি করবেন? তাঁকে ধর্মপথে চলতে হলে কি ভাবে তিনি চলবেন?

সংসার যাতে বিনা ঝঞ্জাটে চলতে পারে তা তাঁকে করতে হবে। স্বামীর সুখ-সুবিধা দেখতে হবে। তবে স্বামীর সঙ্গে সেবাদাসীর মত ব্যবহার করতে হবে। তা নয়। দরকার মনে হলে স্বামীকে আধ্যাত্মিক পথে চালনা করবার জন্য হাসিমুখে শাসন করতে হবে। ছেলেপিলে যেন সুস্থভাবে লেখাপড়ার দিকে মন দিয়ে চলতে পারে তা দেখতে হবে। যে শ্বশুরটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত তাঁর যথাসম্ভব সেবা করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতে হবে।

অবশ্য এই সমস্ত কাজের ভিতর এই দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে যে (সে যদি ভগবান রামকৃষ্ণের আশ্রিত হয়) রামকৃষ্ণই নানারূপে নানাভাবে তাঁর সেবাযত্ন গ্রহণ করছেন।

ছবিতে মাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করা হচ্ছে সেখানেও তিনি যেমন আছেন স্বামীর হাসি-ঠাট্টার ভেতরও তিনিই। ছেলে-পিলের মার কোলে-পিঠে বসার আবদারগুলোও তাঁরই, আবার তিনিই পক্ষাঘাতের রোগীটি।

এই যে সাধনার ধারা স্বধর্মের এই সাধনাই ভবিষ্যতে তাঁকে রামকৃষ্ণ-ময় করে তুলবে। তিনি তখন দেখবেন বাড়ীর সবগুলো ঘরে, সবগুলো মানুষের ভিতরে এবং সবগুলো সুখ-দুঃখের অবস্থার ভিতরে তিনি রাম-কৃষ্ণের সান্নিধ্যই উপভোগ করছেন এবং এইভাবে তিনি স্বধর্ম পালন করলে কর্মযোগে, ভক্তিযোগে এবং জ্ঞান-যোগের ফললাভ করে অন্তিমে রামকৃষ্ণ-লোকে চির-বিশ্রাম লাভ করবেন।

আবার ধর একজন মহিলা-হিন্দু বাল-বিধবা। পুনর্বিবাহ করে নতুন সংসার স্থাপন করবার মতলব নেই। মন ভগবদ্‌মুখী। তিনি চান যত শীঘ্র সম্ভব সময় নষ্ট না করে ভগবানকে লাভ করবেন, অথবা পরিপূর্ণ ভাগবত জীবন লাভ করবেন। তিনি কেন ভাসুরের বাড়ীতে পাচিকা-বৃত্তি অব-লম্বন করবেন? তাঁর উচিত সুবিবেচনা বুঝে কোন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

একপ্রাণ দিয়ে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণ লওয়া।

তিনি সংসারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে হয়ত ভাবছেন তিনি বড় অসহায় এবং অভাগিনী কিন্তু হয়ত তাঁর সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি দেখবেন যদি মনের পবিত্রতা বজায় রেখে একপ্রাণ একচিত্তে তিনি ভগবানের শরণাপন্ন হতে পারেন তাহলে অচিরেই তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

এর স্বধর্ম হয়ত একটু পৃথক ধরণের হবে। এক একজন লোকের প্রারব্ধের জীবনধারা তাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের ভিতরে টেনে এনেছে। এই পরিবেশ থেকে, ওখান থেকেই তাকে এগিয়ে ভগবানের পথে যেতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের স্বধর্ম অনুসারে ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন। তবে মনে রাখতে হবে সে চরম গতি এবং চরমকাম্য একই।

হিন্দু সমাজে বর্ণধর্ম _ আশ্রমধর্ম ইত্যাদি ছিল (কালের পরিবর্তনে এখন ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে)। আর এ সব ব্যবস্থা যদি শক্তিশালী মহাপুরুষেরা এসে আচরণের এবং উপদেশের সাহায্যে অনুশাসন রূপে দেন তখন সেগুলো বিরাট শক্তিলাভ করে সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে।

বর্তমান যুগে বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর লীলাসহচরী শ্রীশ্রীমায়ের শুভাবির্ভাবে এবং তাঁদের জীবনযাত্রা গুণাবলীর আদর্শে সোজা হয়ে যাচ্ছে এবং স্বধর্ম পালন করে জীবনযাত্রা করার উপায়গুলোও আয়ত্তের ভেতর এসে যাচ্ছে।

[ক্রমশ।

মহামিছিল

অনুপপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

মনে কি পড়েছে মহাজীবনের মৃত্যুকাল?
দূর থেকে ঐ ভেসে আসে কোন্ সঘন ধ্বনি,
ধ্বংসের মুখে সৃষ্টিকে আজ দাও সামাল্!
দাও মুছে দাও জড়মানবের আত্মগ্লানি।

আজ ধমনীতে রয়েছে সুপ্ত কি মহাশক্তি
যুগ যুগ ধরে কত প্রাণে সে যে স্পন্দিত,
জাগবে আবার সে' মহারুদ্র, আনবে মুক্তি,
মুমূর্ষু প্রাণ তারি নাচে হবে ছন্দিত।

চেয়ে দেখ ঐ নীল আকাশেতে কি যেন লেখা,
ভেঙেছে কি সেই যুগসঞ্চিত ঘুমের ঘোর,
দূরদিগন্তে দেখা দিল সাদা মেঘের রেখা,
রাতের আঁধার কেটে গিয়ে তবে হোলো কি ভোর?

কোথা সেই প্রাণ, জাগাবে চেতনা,—কে দেবে জবাব?
ঘুমে নিঃসাড়। সামনে রয়েছে নতুন দিন।
বৃথা কালক্ষয় করেছে অনেক "বাক্যনবাব",
হারানো শান্তি আসবে কি ফিরে? সে' আশা ক্ষীণ।

মহাভারতের বুকে হাঁটে দেখ মহামিছিল,
ধ্বনিত হচ্ছে তাদের কণ্ঠে অচিন্ সুর,
হৃদয়দুয়ার বন্ধ হয়েছে, পড়েছে খিল,
কাছে থেকে তাই লক্ষ মানুষ অনেক দূরে।

মহালয়া

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

মহালয়ার অমাবস্যায় পুণ্যতিথি, প্রেত-তর্পণের শেষদিন। এই প্রেত-পক্ষে পরলোকগত বিদেহীদিগকে আবাহন করিয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিবার বিধান কোনও খেয়ালীর খেয়ালে রচিত হয় নাই। জাগতিক জীবনের পর-পারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান মন এ প্রেত-তর্পণে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অসমর্থ হইলেও, যে সমস্ত মহাসাধকের সাধনা ইহ-পরকালের সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল তাঁহাদের অনুগামীর নিকট এই প্রেতপূজা মোটেই নিরর্থক নহে।

যে সমস্ত সাধকের সিদ্ধ-সাধনায় প্রত্যক্ষ দর্শন পরলোকের সমস্ত তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল সত্যদ্রষ্টা সেই সমস্ত ঋষি-বাক্য উপেক্ষা করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে না। সে সত্যকে অস্বীকার করিতে হইলে আমাদের মত সাধারণ লোকের অজানা অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেও অবিশ্বাস করা উচিত। জন্মান্তরবাদের ভিত্তিভূমিতে হিন্দুর ধর্মের দেউল গড়িয়া উঠিয়াছে। জন্মান্তরবাদ অস্বীকারকারীর পক্ষে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব অনুভব করা অসম্ভব। কর্মবাদের পতিপথে জন্মান্তরের ভ্রমণকক্ষ রচিত। কর্মই জীবের জন্ম-জন্মান্তরের যোগসূত্র রক্ষা করিয়া থাকে।

কর্মফল

প্রতিদিনের আচরিত কর্ম মনের উপর রেখাপাত করিয়া বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের বন্ধন-রজ্জু তৈয়ারী করে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মনের কোণে উপস্থিত চিন্তাধারা মনের উপর যে দাগ রাখিয়া যায়, অনেক সময় তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি না থাকিলেও তাহা মুছিয়া যায় না। মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে ইহা বিস্মৃতির গহ্বরে লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু সময় ও সুযোগ পাইলে সে চিন্তারূপ পরিগ্রহ করিয়া মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিদ্রার ঘোরে একটা সাপের দেহে, মানুষের মাথায়, বাঘের মুখ বসান অদ্ভুত স্বপ্ন এই ভাবের লুক্কায়িত বিভিন্ন চিন্তা-ধারার অপূর্ব সমাবেশ মাত্র।

মন

দেহ ও মনের মধ্যে সম্বন্ধ নিকটতর হইলেও দেহ ও মনের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট। দেহ ধ্বংসের সঙ্গে মন অন্য দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান দেহ পরিত্যাগ করে, ইহাই সত্য। মন চৈতন্যের বহির্বিকাশ মাত্র। মনের উপর কর্মের ছাপ পড়িলে, সেই কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে নানাভাবে নানা দেহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যেদিন মন হইতে কর্মের রেখা মুছিয়া যাইবে, সেইদিন মন চৈতন্যে লয় হইয়া সকল ধারা বদ্ধ হইয়া নির্বাণ লাভ করিবে। কর্মহীনতা মনের বিলয়ের একমাত্র পথ, কর্মের দাগ লইয়া মনকে কর্ম-লয়ের জন্য দেহ ধারণ করিতেই হইবে।

চিত্রগুপ্ত

হিন্দুর পুরাণ সত্যকে গল্পের আবরণে ঢাকিয়া সাধারণের বোধ্য করিবার যে অদ্ভুত আয়োজন করিয়াছিল সে ব্যবস্থা জগতে অতুলনীয়। কিন্তু কালক্রমে সাধনার অভাবে সে সত্য আবিষ্কারে অসমর্থ অসাধকের দল গল্পের উপাদানকে পূজার বেদীতে বসাইয়া হিন্দুর সমস্ত আয়োজন পণ্ড করিয়া দিয়াছে। পুরাণকারের মতে যমের মন্ত্রী চিত্রগুপ্তের খাতায় সমস্ত জীব-জগতের কোথায় কাহার মনের কোণে অজ্ঞাতভাবে কোন চিন্তাধারা জমিয়া উঠিতেছে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং সেই অনুসারে মানুষের ভবিষ্যৎ গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হইবে। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টির মনের মধ্যের গোপন চিন্তার কথা লিখিয়া রাখিবার সাধ্য একমাত্র অসীম ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব। ব্রহ্ম যদি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া খাতা-পেন্সিল লইয়া লিখিতে বসিয়া যায়, তবে তাহার অসীমত্ব বিলুপ্ত হইয়া সসীমের সীমার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়।

কাজেই এই অবিশ্বাস্য গল্প বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই, কিন্তু সাধারণ লোক চিত্রগুপ্তের কায়স্থ বলিয়া তাহার পূজা করে। চিত্রগুপ্তের জন্ম ব্রহ্মার কায়া হইতে এবং তাহার ছয়টি ছেলে। এখন এই গল্পটিকে উপেক্ষাভরে উড়াইয়া না দিয়া ইহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মনের উপর গোপনভাবেও কোনও কর্মের ছাপ পড়িলে তাহার ফলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত হইবে। মনের উপর গুপ্তভাবে যে কর্মরেখা অঙ্কিত হয় অথবা যেখানে সে চিত্রগুপ্ত থাকে, তাহাকেই চিত্রগুপ্ত বলে। সমস্ত সৃষ্টির প্রত্যেক জীবের মনের কর্মের ছাপ, তাহার গতিপথ নির্দিষ্ট করিবে। চিত্রগুপ্তের যে লেখা উপেক্ষা করিবার কাহারও সাধ্য নাই। ব্রহ্মের কায়া হইতে অর্থাৎ মন ব্রহ্ম হইতেই সমুদ্ভূত এবং কর্মবদ্ধ মন কায়া ভিন্ন কর্মক্ষয় করিতে পারে না। অতএব মন কায়াস্থ বা কায়স্থ।

মনের ছয়টি বৃত্তি---কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য---চিত্র-গুপ্তের ছয়টি পুত্র। পুরাণকারের গল্পের খোসার উপর ধস্তাধস্তি না করিয়া সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে এই ভাবের সত্যই উদ্‌ঘাটিত হইবে।

মৃত্যুকালে এই মন স্থূলদেহ ত্যাগ করিবার কালে অতিবাহিক সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া, পরপারের পথে অগ্রগমন করে। কারণ, মন থাকা পর্যন্ত তাহাকে কায়াস্থ থাকিতেই হইবে। কর্মের পার্থক্যে সে অতিবাহিক দেহীর গতিপথ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। দেবযান, পিতৃযান ও প্রেতযান এই তিন পথে ওপারের যাত্রিগণ অগ্রগমন করে। এ পারের সাধনায় যাহারা দেহ ও দেহীর পার্থক্য অনুভব করিয়া সাধন-শক্তিতে হাসিমুখে এই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া বন্ধনহীন মনে ওপারে পদার্পণ করে।

উচ্চস্তরে দেবতাস্থানীয় আত্মিকগণ সেই সাধক বিদেহীকে অভিনন্দিত করিয়া লইয়া যায়, ইহা দেবযানের পথ। যে সমস্ত মধ্যস্তরের কর্মী এ জগতে সৎভাবে জীবনযাপন করিয়া দেহ বিমুক্ত হয়, তাহাদের নিকট আত্মীয়স্বজনের বিদেহী আত্মা তাহাদিগকে আবাহন করিয়া পিতৃলোকে লইয়া যায়।

মৃত্যুকালে মৃত পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া রোগীর আনন্দকে অনেক সময় প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়া থাকে। সকল সময় উহা প্রলাপ নাও হইতে পারে। কারণ রুগ্নদেহ পরিত্যাগের পূর্বে কর্মবদ্ধ মন এই দেহ মধ্যেই অতিবাহিক সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করে।

সেইভাবে অতিবাহিক দেহীর এই স্থূলদেহ পরিত্যাগের পূর্বে অতিবাহিক দেহী আত্মীয়স্বজন নিকটে দেখিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস রুগ্ন দেহের মুখ দিয়া উচ্চারিত হইলেও উহা প্রলাপ নহে, খাঁটি সত্য। অতিবাহিক দেহীর পক্ষে স্থূলদেহের মধ্যে থাকিয়া অন্য অতিবাহিক দেহীকে দেখিবার কোনই বাধা নাই। কারণ, স্থূল জগতে এমন কোনও সূক্ষ্মাণুর সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহার মধ্য দিয়া অতিবাহিক দেহীর অবাধ বিচরণে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। এই ভাবের কর্মীর গমনপথকে পিতৃযান বলে।

নিম্নস্তরের জাগতিক আসক্তি-সম্পন্ন মন সহজে এই দেহকে ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হয় না।

বড়লোকের পক্ষে একটা ময়লা বা সামান্য ছেঁড়া জামা পরিত্যাগ মোটেই বেদনাদায়ক না হইলেও, দরিদ্রতম ব্যক্তির পক্ষে তাহার শতছিন্ন মলিন কুর্তাটি পরিত্যাগ করাও যেমন ভীষণ কষ্টকর হইয়া থাকে, নিম্নস্তরের মনোভাবসম্পন্ন বিদেহীর পক্ষেও তেমনি এই রোগজীর্ণ দেহটা ছাড়িয়া যাওয়া অত্যন্ত শক্ত। মৃত্যুর সময় মন মোহাবিষ্ট হইয়া যখন তাহার চেতনা ফিরিয়া আসে, তখন তাহার বিদেহী দেহের পার্শ্বে তাহার মৃতদেহকে শায়িত দেখিয়া ও আত্মীয়-স্বজনের আকুল ক্রন্দনে তাহাকে বিহ্বল করিয়া তোলে, সে যে মরিয়া গিয়াছে এই সাধারণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। যখন ক্রন্দন-রত পুত্র-কন্যা বা স্ত্রীকে বুঝাইলেও তাহারা তাহার কথা শুনিতে পায় না, তখন তাহার মনের খেদ অবর্ণনীয়।

অনেক সময় দেহমুক্ত বিদেহী মৃত-দেহের মধ্যে ঢুকিবার পথের সন্ধান করিয়া থাকে। এই জন্যই হিন্দু-শাস্ত্র মৃত-দেহকে ভস্মীভূত করিবার বিধান দিয়া গিয়াছেন। দেহ-ভস্মের পরে বিদেহীর মন তাহার বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া যাইতে না চাহিলেও, একটা অনির্দিষ্ট আকর্ষণে তাহাকে অন্যদিকে টানিতে থাকে---এইভাবে একটা মোহাবিষ্টভাবে সেই আত্মিক সম্মোহিত অবস্থায় বায়ুস্তরে পরিভ্রমণ করে। 'শ্মশানানলদগ্ধোসি পরিত্যক্তোসি বান্ধবৈঃ, আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়'---অবস্থা তখনকার স্বরূপ বর্ণনা।

মুসলমান শাস্ত্রে মৃত্যুর পর আত্মাকে 'কেয়ামতের' দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। পরে বিচারের দিন উপস্থিত হইলে বিচারের পরে তাহার 'বেহেস্তে বা দোজখে' স্থান নির্দিষ্ট হইবে।

খৃস্টান শাস্ত্রেও মৃত্যুর পর 'ডে অফ জাজমেন্ট' পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পরে বিচারে তার 'হেভেন্ অথবা হেল'-এ থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইবে।

হিন্দুতত্ত্ববিদগণ এ কথার তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। নিম্নস্তরের আত্মিকগণ দেহের আকর্ষণ কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া দেহের সর্বশেষ ভগ্নাংশ ধ্বংস হবার পূর্ব পর্যন্ত দেহ-শেষের-সান্নিধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। দেহের শেষ ভগ্নাংশ ধ্বংস হবার পরে অনির্দিষ্ট আকর্ষণে সে দেহের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়। এই অবস্থায় কয়েক বছর বা ততোধিক কাল অতীত হওয়া অসম্ভব নয়। এই দেহ আকর্ষণে বিচ্যুতির দিনই মুসলমান শাস্ত্রের 'কেয়ামত' খৃস্টানদের শাস্ত্রের 'ডে অফ জাজমেন্ট', হিন্দুসাধক এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয় প্রেতযান পথে অভিযানকারী নিম্নস্তরের মায়াবদ্ধ জীবগণের লোকান্তরিত দেহকে ভস্মীভূত করিয়া তাহাকে দেহের আকর্ষণের অতীত অবস্থায় উন্নীত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, হিন্দু-মতেও তপস্বী বা যতির দেহ ভস্মীভূত না করিয়া সমাধিস্থ করার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যতি-সন্ন্যাসীদের বাদ দিলে কাহার দেহের প্রতি কতটা আকর্ষণ ইহার বিচার বিশ্লেষণে সময় নষ্ট না করিয়া সমস্ত দেহকে ভস্মীভূত করিবার নিদেশ দেওয়া হইয়াছে। শবদাহ প্রথা হিন্দুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

শ্রাদ্ধ

দেবযান ও পিতৃযানের গমনকারী বিদেহীর শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও, প্রেতযানের অভিযানকারীর জন্যই প্রধানত শ্রাদ্ধ ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু কে কোন যানে গমন করিয়াছে জানা অসম্ভব বলিয়াই সাধারণত সকলের জন্যই শ্রাদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র প্রথমেই বলিয়াছে যে, 'দেবতা ভক্তিমিচ্ছন্তি---অন্নমিচ্ছন্তি পিতরাঃ'---অর্থাৎ দেবতাগণ বা

দেবতাস্থানায় ক্ষমতাসম্পন্ন আত্মিকগণ মনের ভাবঅনুভব করিতে পারে। পিতৃলোকাধিষ্ঠিত বিদেহিগণ মন্ত্র ভিন্ন বুঝিতে পারে না। মন্ত্র অর্থ---কথা।

এখানেও একজন উচ্চস্তরের সাধক মানুষের মনের কথা বুঝিতে পারিলেও আমার মত অসাধক বাক্য ভিন্ন অন্যের কথা বুঝিতে পারে না। অতএব বিদেহিগণের শ্রাদ্ধমন্ত্র অর্থাৎ কথা দ্বারা প্রেরণা বা ইচ্ছাশক্তি প্রেরণ করিতে হইবে। এই মন্ত্র প্রেরণের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা অভিনব।

শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দের মৃত্যু নাই---এ কথার অর্থ বেতারের প্রবর্তনের পূর্বে কেহ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারিত না। আজ এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে বহু সহস্র মাইল দূরের শব্দ শূন্যে ভাসিয়া আসিয়া, অন্য দেশের বেতার যন্ত্রে শব্দ উৎপন্ন করিয়া সে দেশের কথা এ দেশকে জানাইয়া দিতেছে। ইহার মধ্যের বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, যে জাতীয় ধাতু বা যন্ত্র হইতে শব্দ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সমশক্তিসম্পন্ন ধাতু বা যন্ত্র ব্যতীত সে শব্দ ধরা পড়ে না।

শব্দ-ব্রহ্মের দ্রষ্টা ঋষি এই সম-ধাতুত্বের সংবাদ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, পিতার শ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠপুত্র পরে তৎকনিষ্ঠ হইতে সপিণ্ড ও সমানোদক পর্যন্ত সমধাতুত্ব রক্ষা করিয়া, শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পরে কঠোর ব্রহ্মচারী অনন্য-চিত্ত পুত্র কায়মনোবাক্যে পিতৃ-চিন্তা করিয়া শুদ্ধচিত্তে দশদিনে দশেন্দ্রিয় পূরণের জন্য পূরক পিণ্ড দিয়া, একাদশাহে একোদ্দিষ্ট (এক-া-উদ্দিষ্ট) করিয়া শ্রদ্ধায় উচ্চারিত মন্ত্রের প্রেরণা প্রেরণ করিবেন। মৃত পিতার বিদেহী আত্মা পুত্রের ঐকান্তিক কামনা উপলব্ধি করিয়া, আনন্দিত মনে উর্ধ্বস্তরে গমন করিবেন।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ সত্যঃ—এই সপ্তস্তরে বিভক্ত আত্মিক ভ্রমণকক্ষে ভূঃ অর্থাৎ পৃথিবীতে স্থূল-কর্ম শেষ করিয়া ভুবর্লোকে গমন করিবে। ভূঃ ও ভুবঃ লোকের মধ্যে প্রেতলোক অর্থাৎ অনির্দিষ্ট অবস্থা, শ্রাদ্ধের পরে আত্মিক পুত্র-শক্তিবলে ও নিজের আকাঙ্ক্ষায় ভুবর্লোকে উপনীত হইবে। সেখানে নূতন স্থানে বাড়িঘাট সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লওয়া অসম্ভব।

এখানে জেলের একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে একটু সহজ হইবে। আমাদের মত পলাতন জেল-ঘুঘুদের কথা বাদ দিয়া যাহারা নূতন জেলে যায়, তাহাদিগকে সেদিন 'সিগ্রিগেশন ওয়ার্ডে' রাখিয়া তৎপর-দিন কয়েদীর মান, ওজন, কার্যতালিকা ঠিক করিয়া কোন ওয়ার্ডে স্থায়িভাবে থাকিবে তাহা নির্দিষ্ট হয়।

ভুবর্লোকে যাইয়াই আত্মিক তাহার গন্তব্যস্থান ঠিক করিয়া লইতে পারে না। তাহাকে সেখানকার অবস্থা বুঝিয়া লইবার জন্য সময়ের আবশ্যক হয়। হিন্দুগণ সেই জন্য শ্রাদ্ধান্তে এক বৎসর পর্যন্ত আত্মিকের পিণ্ড সমন্বয়ের ব্যবস্থা করে নাই।

অর্থাৎ নূতন স্থানে যাইয়া মনস্থির করিতে অসুবিধা হইতে পারে। অথচ জাগতিক মায়ার জের তখন পর্যন্ত একেবারে ছিন্ন হয় নাই বলিয়া, প্রতি মাসে মাসিক শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তে সপিণ্ডকরণ বা পিণ্ড-সমন্বয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমাদের এই পৃথিবী সূর্যকে পাঁচ-বার প্রদক্ষিণ করিবার সময় বৃহস্পতি একবার প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতি সূর্য হইতে দূরে আছে বলিয়া, তাহার কক্ষপথ পৃথিবী অপেক্ষা পাঁচগুণ দীর্ঘ। অতএব আমাদের পাঁচ বৎসর বৃহস্পতির এক বৎসর।

সেই ভাবের গণিতাঙ্কের মাপে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ঋষি সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের এক বৎসরে ভুবর্লোকের একদিন হইবে। এখানকার দিন-রাত্রিকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া ইহার প্রহর ঠিক করা হইয়াছে, আর সেখানকার দিন-রাত্রিকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিয়া, মাস নির্দিষ্ট হইয়াছে। নূতন কয়েদী জেলে গেলে, তাহার আত্মীয়-স্বজন ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ বা সংবাদ পাঠাইলে যেমন তাহার আনন্দ হয় ও মনের শক্তি বাড়ে, সেখানে নূতন আত্মিকের নিকট এখানকার প্রতিমাসে অর্থাৎ সেখানকার প্রতি প্রহরে পুত্র-প্রেরিত শ্রদ্ধার প্রেরণা আত্মিকের শক্তি বৃদ্ধি করে, নূতন স্থানে নিতান্ত একলা এবং নিরাশ্রয় বলিয়া মনে হয় না। তারপর সপিণ্ডকরণ ব্যবস্থা আরও চমৎকার। সপিণ্ডকরণ সময় পিতৃকুলের ৩ জন, মাতৃকুলের ৩ জন ও একজন দেবতার আবাহন করিতে হয়। অর্থাৎ মৃত পিতা বা মাতাকে পথ দেখাইয়া লইবার জন্য পিতৃকুলের নিকটবর্তী ৩ জনকে কোনও একজনের পুনর্জন্ম হইয়া থাকিলে, তাহার পূর্ববর্তীকে অথবা ৩ জনের পুনর্জন্ম হইয়া থাকিলে মাতৃকুলের ৩ জনকে, তাহাদেরও জন্মলাভ হইয়া থাকিলে, দেবতাকে পিতা বা মাতাকে পিতৃলোকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

অবিশ্বাসীর কথা বাদ দিয়া বিশ্বাসীর পক্ষে এই অনুপম ব্যবস্থা, হিন্দু শাস্ত্রকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিবে। মহালয়া 'ভুবলোকের' আলোকোদ্ভাসিত দিবাভাগ বলিয়াই এই সময় পিতৃকুলের গঙ্গোদকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এই তর্পণ ব্যবস্থা বা শ্রাদ্ধবিধি হিন্দু-সাধনার অমর অবদান।

কেন চোখের জলে…

অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এবং মানুষীর নিতান্ত আভিধানিক অর্থে মনে হয় মাথার বালিশ ভিজিয়ে দিলে সম্ভবত ভাল হত।

সত্যিই ভাল হত। যদি---যদি মানসিক আনন্দ বা বেদনা, ক্ষোভ বা পরিতাপ, কোনও আকস্মিক উচ্ছ্বাস চোখের জলে প্রকাশ করা যেত।

কিন্তু যায় না। সাধারণত আমরা সভ্যতার অন্যতম লক্ষণ হিসেবে নির্দেশ করতে অভ্যস্ত হয়েছি আত্ম-দমন---দমন বলাই ভাল। কারণ মাত্রা রাখা দুস্তর। চক্ষুলজ্জার বালাই বড় নিষ্করুণ। কেঁদে মন হালকা করার উপায়ও আজ প্রায় রুদ্ধ। আমি কান্না পেলে কাঁদি। কোন দুঃখজনক ঘটনা আমার চোখে জল আনে। 'অ'-বাস্তব ছায়া-ছবির নায়িকা কঠিন রোগগ্রস্ত হলেও আমার চোখে জল আসে। এবং আমি নিঃসংকোচে ফুঁপিয়ে উঠি। এই ব্যাপারে আমি সম্ভবত 'অ'-মার্জিত।

আমাদের একজন অধ্যাপিকা বলেছিলেন, যখনই জীবনে কোন কঠিন চাপ আসে, তিনি সব কাজ ফেলে ছায়াছবি দেখতে যান। বেছে নেন বেশ সেণ্টিমেন্টাল একটা ছবি এবং মন খুলে ফুঁপিয়ে কেঁদে বাড়ি ফেরেন হালকা মনে। আমার জনৈক আত্মীয়ারও কাঁদার অভ্যাস আছে। ছেলেমেয়েরা তুলকালাম বাধিয়ে তুললে, কিংবা ঘাম ঝরিয়েও যখন নুন আর পান্তার বন্দোবস্ত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তিনি তখন বাচ্চাদের দাদু-দিদিমার কাছে বেড়াতে পাঠিয়ে, রেডিয়ো খুলে কাঁদতে বসেন। তাঁর মতে এর ফলে মনের বোঝা নেমে যায়, আবার সাহসের সংগে ঝড়-ঝাপ্টার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

মনে হতে পারে ব্যাপারটা দুর্বল চিত্তের বহিঃপ্রকাশ বই নয়। মিনমিনে, অশক্ত মন ওইভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু বাস্তবিক ওঁরা মনের ক্লেশ লাঘবের একটা ক্ষতিহীন সরল উপায় খুঁজে পেয়েছেন। অন্যথায়, মনের পক্ষে পারিপার্শ্বিক চাপ রীতিমত ক্ষতিকর হতে পারত

সাধারণের বিশ্বাস কান্না সব সময় গভীর সংক্ষোভজ। তা নয়। অধিকাংশ-ক্ষেত্রে তা হতাশা, বিরক্তি বা ক্লান্তি-জনিত অনুভূতির প্রকাশমাত্র। এই অনুভূতি বারবার চোখের জলের মধ্য দিয়ে মানসিক স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। কাঁদলে সংক্ষোভজাত মানসিক তোলপাড় শান্ত হয়ে আসে, ফলে আমরা এমন সব স্নায়বিক উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই পাই, যার কু-প্রভাব দেহের ওপর পর্যন্ত পড়া সম্ভব।

দেহবিজ্ঞান বলছে কোন কোন রোগ কাঁদতে অপারগ হলে বেড়ে যায়। চোখের জলে মনের চাপ বাঞ্ছিত-মুক্তি না-পাওয়ার ফলেই এমনটা ঘটে। কিছুসংখ্যক মনঃবিশ্লেষকের বিশ্বাস নিউরটিক হাঁপানি, প্রাণপণে কান্না থামানর প্রচেষ্টার সংগে সম্পর্কান্বিত। হাঁপানীর টান প্রায় কান্নারই মত, কিন্তু কান্নায় তা মুক্তি পায় না। এ ছাড়াও, বুক ভার, গলা ভার, মাথার যন্ত্রণা—সব কিছুই মাত্রাধিক আত্মসংযমের সংগে যুক্ত।

ভারতীয়রা কান্নার জন্য বিখ্যাত। সামান্য কারণেই তারা একসময় কাঁদতে পারত। পৌরাণিক শ্রীরামচন্দ্র এবং আধুনিক বিদ্যাসাগর এই প্রব-ণতার উদাহরণ। কিন্তু, ইদানীং কান্নার সেই মর্যাদা আর নেই বোধহয়। দেখে-শুনে তাই মনে হয়। এর একটা মূল কারণ যে দু'শ বছরের ইংরেজ শাসন তাতে সন্দেহ নেই।

অ্যাংলো - স্যাক্সন সমাজে এ ব্যাপারে বাধা-নিষেধ অন্তহীন। একমাত্র বিয়োগ বেদনায় কান্নার সামাজিক অনুমোদন আছে। মেয়েরা সে সমাজে বিয়োগ-ব্যথা ছাড়া, বিবাহের মত ব্যাপারে প্রকাশ্যে কাঁদতে পারেন। ব্যক্তিগত দুঃখে কাঁদা চলে সংগোপনে। চ্যুতি কু-রুচিসূচক।

এই সেদিনও এঁরাই ছিলেন আমাদের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ মানুষের চোখে সভ্যতার আদর্শ। সুতরাং হয়ত নিজেদেরই অজান্তে, আমরা কান্না সংযত করতে অভ্যস্ত হয়েছি ধীরে ধীরে। অন্যান্য য়ুরোপীয়-রা (ইংরেজদের য়ুরোপীয় বলে স্বীকার করলে তবেই 'অন্যান্য' শব্দটা ব্যবহার্য) অ্যাংলো-স্যাক্সনদের মত ক্রন্দনবিমুখ নয়। ইতালীয়রা যে-কোন হৃদয়স্পর্শী উপলক্ষে কাঁদতে অভ্যস্ত। মধ্য য়ুরোপ আর ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসীরা কোনও দেশপ্রেম বা বীরত্বব্যঞ্জক উপলক্ষে কেঁদে ভাসায় নিঃসংকোচে। আসলে আমরা সকলেই কাঁদি---আপনি, আমি, রাম-শ্যাম, জবা-বেলা-মল্লিকা---সকলে। তবে, সবসময় তা স্বীকার করি না। অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষও খুব পরিশ্রমের পর কেঁদে ফেলতে পারেন। জেতার পর হু হু করে কাঁদতে দেখেছি অনেক খেলোয়াড়কে। আনন্দের কান্না।

সভ্য সমাজের দাবী যথাসম্ভব আত্মসংযম। ভাইবোন, ছেলেমেয়ে, অন্যান্য আত্মীয়-বান্ধব, প্রতিবেশী ---আশা করা হয় সকলের সংগে বেশ শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন মনে, অন্তত সেই ভাণ বজায় রেখে আমরা চলব। কিন্তু এই ধরণের কড়া সংযম সব সময় অনাবশ্যক। ক্ষতিকরও বটে। আমাদের স্বাস্থ্য এবং সুখের জন্য মাঝে মাঝে কাঁদা দরকার।

আমাদের অধ্যাপিকা এবং পূর্বোক্ত আত্মীয়া তাৎক্ষণিক অবস্থার জন্য কাঁদেন না। অধ্যাপিকা সেন্টিমেন্টাল দৃশ্য দেখে প্রকৃতপক্ষে আলোড়িত হন না, আত্মীয়াটিও গান শোনার ফলে কাঁদেন না। কিন্তু দু'জনেই নিরাপদ ক্ষেত্র এবং সময় খুঁজে নিয়েছেন সংক্ষোভের তীব্রতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে। এর ফলে অন্য কারুর অসুবিধা বা ক্ষতি হয় না। অথচ তাঁরা স্বস্তি ফিরে পান।

কান্না সত্যি প্রয়োজনীয়। স্থান-কাল-পাত্র একটু বিবেচনা করলে সামাজিক অস্বস্তির দায়টুকুও এড়ান যায়।

আসুন আমরা কাঁদি। অন্যথায় একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে হতেও পারে---কেন চোখের জলে---।

----বিভা চৌধুরী

[প্রতিযোগিতার
ছবি
প্রতি বাঙলা মাসের
২২ তারিখের
মধ্যে পাঠাতে
হবে।

জলজ

—দেবদত্ত

॥ চোখ ॥

নুপুররাণী ঘোষ
(১ম পুরস্কার)

—মানসরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী
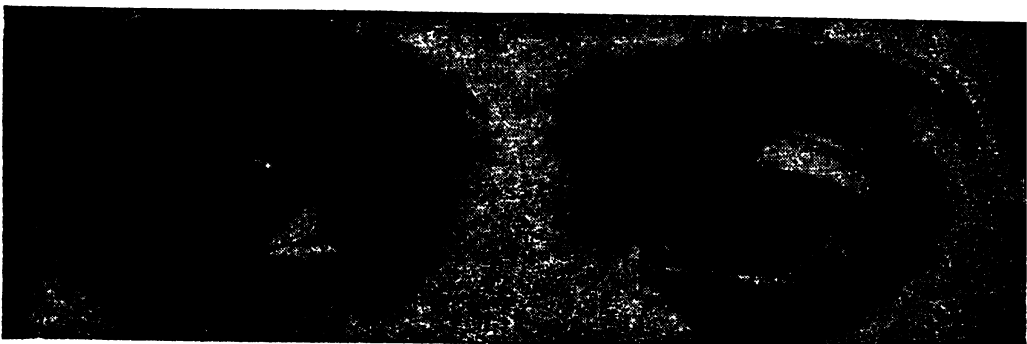
—রবীন মুখোপাধ্যায়
(২য় পুরস্কার)

—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩য় পুরস্কার)

॥ চোখ ॥

মাসিক

বসুমতী

ভাদ্র / '৭৫

—চিত্রজিৎ ঘোষ

আলোর
নীচে অন্ধকার
—বাসুদেব মিত্র

মাসিক বসুমতী, ভাদ্র / '৭৫

জালের পর্দা
—কালীপদ চক্রবর্তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

অহল্যা রাত্রি

নমিতা চক্রবর্তী
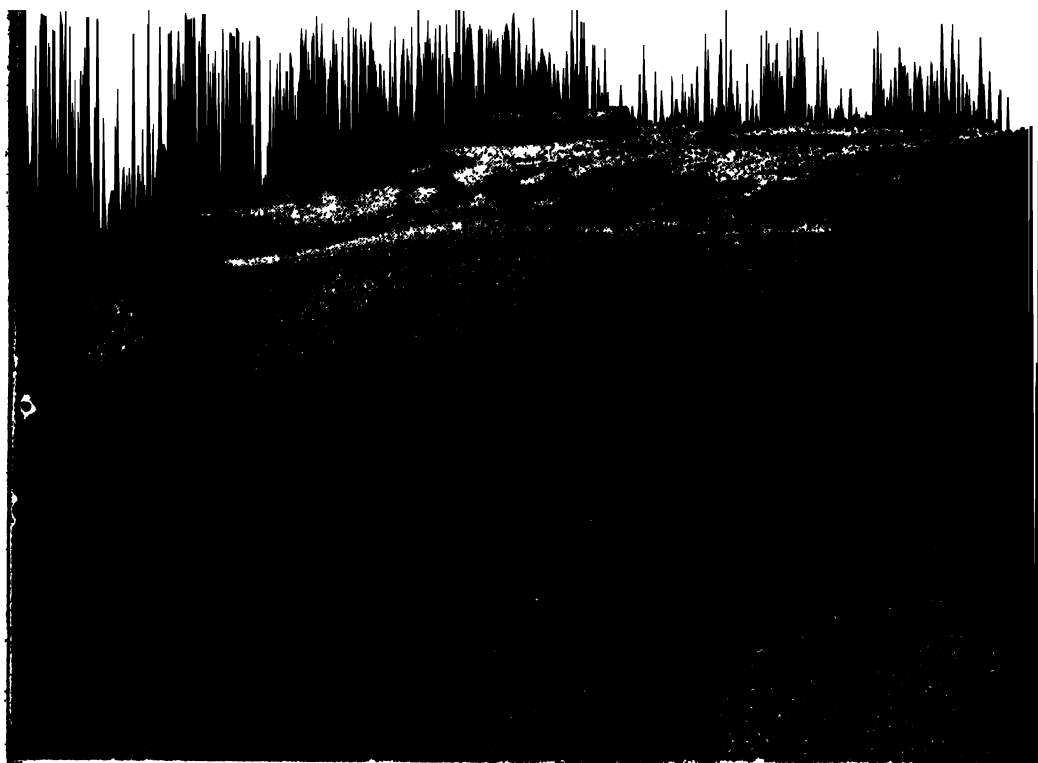
চিঠি এল। হিমিকা কলেজে ভর্তি হবার ঠিক দু'মাস পরে অজয় উকিলের চিঠি পেলেন। তিনি এবং অনল দু'জনেই জানতেন সুরেশ্বর চুপ করে থাকবেন না। এটা তাঁর কাছে সম্মানের চ্যালেঞ্জ আর এ সম্বন্ধে লজ্জা সঙ্কোচ-হীনতাই সুরেশ্বরের কাছে পৌরুষের পরিচয়। কিন্তু ঠিক কি ভাবে আরম্ভ করবেন তাই বুঝে উঠতে পারেন নি অজয়। অবশ্য বেশী ভাবতেও ইচ্ছা হয়নি এ বিষয় নিয়ে।

সেদিন সকালটা খুব সুন্দর। অপর্ণাদের পরীক্ষার খবর বের হয়েছে। অপর্ণা মহামায়া দু'জনেই ভাল ছাত্রী। অপর্ণা সেকেণ্ড ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে, মহামায়া কোনো প্লেস পায়নি, তবে তার নামও অনার্স তালিকার উপর দিকেই আছে। মহামায়াও এসেছে।

মায়া আর অপর্ণার মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। বাবা বিশেষ পছন্দ না করলেও মেয়ের আসা-যাওয়ায় আপত্তি করেন না। এও জমিদারী চাল। মামলা হচ্ছে হয়তো দশ বছর ধরে, কিন্তু সামাজিক ব্যবহার অব্যাহত আছে। সুতরাং অজয়ের প্রতি বিদ্বেষ থাকলেও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে আসা যাওয়া হয়। দু'পক্ষই লৌকিকতা পাঠান উদার হাতে।

অজয় বাড়ী নেই। অনলের হাস-পাতালের ডিউটি সন্ধ্যাবেলায়। তিন-জনে মিলে খুব জমিয়ে তুলেছে। হিমিকাও বাদ পড়েনি। তাকেও ধরে এনেছে অপর্ণা। সরবালা বাধা দিতে গিয়েছিল।

---ও থাকুক না অপি---

---ও এখানে থেকে কি করবে উনি

---ওর বই পড়ুক না। কলেজের পড়া শিখতে হবে না হিমিকে?

---না, হবে না। রাগ করেছিল অপর্ণা।

---কি যে তোমার বুদ্ধি মাসি, আমরা ওপরের ঘরে মজা করব আর ও এখানে বসে পড়া করবে। কলেজে এখনো ভাল ক'রে পড়া আরম্ভই হয়নি।

সুতরাং হিমিকাও উপরের ঘরে এসেছে। ডালমুট কাজু বাদামে ছোট ছোট ভাগ নিচ্ছে, ওদের হাসি ফুটেছে হিমিকার মুখেও। হিমিকাকে আগে দেখেনি মায়া। এক সুযোগে জিজ্ঞেস করল।

---মেয়েটি কে অপি? ভারি মিষ্টি তো।

---ও? ওতো হিমিকা। ভীষণ ভাল অঙ্ক জানে। ডাক নাম নইনী, আমি দিয়েছি। ভাল নয় নামটা?

অপর্ণা উচ্ছ্বসিত হ'ল।

মায়া হাসল।

---সুন্দর। অঙ্কও ভাল জানে, কিন্তু ও এল কোথা হতে?

বিপদে পড়ল অপর্ণা। হিমিকা কোথা হতে এল? ও যে জলদ রিক্সা-ওয়ালার মেয়ে নয় তা বেশ ভালই বোঝা গিয়েছে। কিন্তু কার মেয়ে তাতো---। অনল বোনের বিপদ বুঝল, উত্তর দিল সেই-ই:

---হিমিকা আমার প্রথম পেশেণ্ট মায়া। ওর ভীষণ অসুখ হয়েছিল। পুরো নিউমোনিয়া। বাঁচবার আশাই ছিল না। এবং এখন দেখছ তো? আর আমার কথাও ভাব এক-বার। মর্ণিং শোজ দি ডে। আমার আরম্ভটাই এই রকম সাকসেসফুল, ভবিষ্যৎ কি হবে ভাবো একবার। অবশ্য হিমিকার পর আমার হাতে আর রোগী এসে উঠতে পারেনি এখন পর্যন্ত। তাতে এও ভেবে নিতে পারো যে আমার অ্যাপ্রোচ দেখে ব্যাকটেরিয়া রাজ্যে একটা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কমেই যাচ্ছে কঠিন কঠিন অসুখ-বিসুখ।

হাসল মহামায়া। এখানে এলেই মনটা হালকা হয়ে যায় ওর। গলা ছেড়ে হাসতে পারে চানাচুর খেতে খেতে। কত যে অনিয়ম চলে এখানে তার সাক্ষী বেলা এগারোটাতেও অস্নাত অপর্ণার রুক্ষ্ম চুল, পাঁচটা খবরের কাগজ চারদিকে ছড়িয়ে সোফায় শুয়ে থাকা অনল। বাবা বিশেষ পছন্দ না করলেও মায়া মাঝে মাঝেই এ-বাড়ীতে আসে। কলকাতায় মামা বাড়ীতে সাড়ে পাঁচ-দিন মেয়ের থাকাটাও পছন্দ নয় সুরেশ্বরের। কিন্তু মেয়ের পড়া তিনি চান এবং কলকাতার বাড়ীতে কেবল দাসী-চাকরের তত্ত্বাবধানে যখন মেয়েকে রাখা সম্ভব নয় তখন অগত্যাই যে শ্বশুর বাড়ীতে জীবনে একবার কেবল বিয়ে করতে এসেছিলেন, সেখানে থাকতে দিয়েছেন মহামায়াকে।

সরমার বাপের বাড়ী অন্যরকমের আধুনিক। একমাত্র মামা বিয়ে করেনি, কোনো কলেজে মাস্টারী করে। বাপ আবার এক কাঠি সরেস। ছিল, কোন ইস্কুলের মাস্টার। এখন অবশ্য কাজ কর্ম ছেড়ে ঘর নিয়েছে। সেও এক অদ্ভুত মানুষ। সত্তর বছরের বুড়ো, কালী বাড়ী যায়না, সন্ধ্যা-পুজো নেই, বিচার নেই খাদ্যা-খাদ্যের। শোনা যায় রাশি রাশি বই পড়ে আর খবরের কাগজে গা-জালানো চিঠি লেখে। খবরের কাগজে লেখার

ক্ষাতিক অলক তো পেয়েছে দাদামশাইয়ের কাছে থেকেই।

তবে মনে মনে একথা স্বীকার না করে পারেন না সুরেশ্বর যে, অলক-মায়ার পড়াশোনার ঝোঁকটা মামাবাড়ীর জন্যই হয়েছে। বলতে গেলে মামার জোরই মহামায়াকে পড়তে এগিয়ে দিয়েছে। নয়তো কবে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতেন সুরেশ্বর। মায়া জানে কলেজে পড়ে বাবার আহত অহঙ্কার কিছু তৃপ্ত করতে পেরেছে সে। সুরেশ্বর কখনো ভুলতে পারেন না যে ধনে বড় হয়েও বিদ্যায় খাটো হয়ে আছেন তিনি ছোট তরফের কাছে। তিনি চান অলক অর্পণার মত মায়াও স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করুক। মাথায় ক্যাপ, গায়ে গাউন জড়ানো মহামায়ার শত শত ছবি তোলাবেন সুরেশ্বর। বাংলা দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকা ভরে থাকবে শান্তিনগরের মেয়ের বিদ্যার খবর।

তাইতো পরিচয় দেবার অযোগ্য মামাবাড়ীতে থাকতে মেয়েকে বাধা দেন নি। তাইতো শান্তিনগরের মার্বেল প্যালেসে জন্মে যে মেয়ে দুধ খেল রূপোর বাটিতে, সোনার ঝিনুকে, যাকে সোনা-মাণিকে মুড়ে বার বছর বয়সে আর এক হীরামতি জ্বলানো বাড়ীর অন্দর মহলে মেহগনীর পালঙ্কে পাঠাবার কথা ছিল, যে সোনার চিরুণী খোঁপায় গুঁজে দাসীর হাতে পা টেপার সঙ্গে শুনতো পাড়ার কুৎসার খবর, শুয়ে থেকে আর ঘি-সন্দেশ মাছের পেটি খেয়ে চর্বির থর নামাবার কথা ছিল যার আঠারো বছরের গালে গলায়, সে কলকাতার কলেজে পড়ে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করল।

---এই মায়া এত গম্ভীর কেন? পরীক্ষার খবর বের হ'ল, চমৎকার পাশ, এখন আবার ভাবনা কিসের। থেকে থেকে গম্ভীর হয়ে যাওয়া স্বভাব আমার, না দাদা?

অপর্ণা দু'টো চকলেট মুখে দিল।

---ভয়ে. তোমারও মায়ার স্বভাবটি রপ্ত করা দরকার। পত্রিকার পাতা হতে চোখ না তুলেই বলল অনল।

নাক কুঁচকালো অপর্ণা।

---মায়ার স্বভাব? তার মানে সর্বক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকব? কেন? কোন্ দুঃখে শুনি?

---দুঃখের জন্য নয়, পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার তাগিদেই গম্ভীর হতে হবে।

পদমর্যাদা? তার মানে? অনলের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে দুই মেয়েই বড় বড় চোখে তাকাল তার দিকে। হিমিকা হেসে ফেলল।

---আমি বুঝেছি।

---কি বুঝেছ? জানতে চাইল অপর্ণা।

---তোমরা ফিলজফিতে পাশ করেছ তো, ফিলজফাররা বেশী হাসি খুশী নন, তাঁরা কেবল তত্ত্বকথা বলেন কিনা, তাই তোমাকে গম্ভীর হতে বলছেন অনলদা।

---ওরে বাস্‌রে! কি বুদ্ধি হিমির, না মায়া? হতেই হবে বুদ্ধি। বেজায় অঙ্ক জানে কিনা। উচ্ছ্বসিত হ'ল অপর্ণা। তার উচ্ছ্বাসে বাধা পড়ল তখনি। সরবালা ঘরে এসে ঢুকল।

বলি, বেলার দিকে নজর আছে তোমাদের? বারটা যে বেজে গিয়েছে। আজ আর নাইবে খাবে, না পেট ভরাবে পরীক্ষার খপর দিয়ে? তোমাকে ধন্য বলি অনু, ডাগর হলে, ডাক্তার হয়েছ। এখনো ছোটটির মত থাবুকা মেরে তুলতে হবে চান করবার জন্য। উঃ, কত যে একগাদা ছাইপাঁশ জমিয়েছ চারদিকে।

---ছাইপাঁশ? হায় মূর্খ সরমাসি! জীবনে খবরের কাগজের মূল্য বুঝলে না তুমি। শোন, তোমাকে নিয়ে একটা পদ্য লিখেছি আমি।

---পদ্য লিখেছ? মরণ আমার। ও আর শোনাতে হবে না। ওঠ, চান করতে যাও। মায়াদিদি, এখানেই দুটো যাহোক মুখে দিয়ে যাও।

---না, সরদি আমিও উঠি অনুকা, অপি, আমি তো আজ শান্তিনগরে যাব। তুমি আমার ফর্মটা নিয়ে এস। উঠবার উপক্রম করল মায়া।

---আরে বোসো বসো। শান্তি-নগর তো তোমার সেই বিকেল বেলা, এখন থেকে যাও। নিশ্চয়ই সরমাসি আজ রান্নাঘরে একটা নতুন কৃতিত্ব দেখিয়েছে, না হ'লে তোমাকে থাকতে বলত না। ঝাল তেল, রং---সরমাসির রান্না একেবারে অপূর্ব ব্যাপার। পদ্যটা শোনো আগে।

মহামায়াকে বসিয়ে দিল অনল।

---শোনো তোমরা পদ্য। পিছন ফিরল সরবালা। ঘর ছাড়বার আগেই অনল তাকে ধ'রে ফেলল।

---পদ্য না শুনে যেতে পারবে না।

ওগো সরমাসি
রন্ধন পটীয়সী
সবিস্তারে যাও বলে---
কি পটুতা করেছ বিস্তার
ঝালে ঝোলে অম্বলে।

---ইস, দাদা। দাদার কৃতিত্বে একেবারে মুগ্ধ অপর্ণা। ---জানো মায়া দাদা যে কি চমৎকার কবিতা মুখে মুখে বানাতে পারে। দাদা, সেই পুনিয়াকে নিয়ে বানানো কবিতাটা মায়াকে শুনিয়ে দে না।

---কি করে শোনাব? অয়ি সরলে! আমার সেই যুগজয়ী পদ্যটি---যাতে পুনিয়ার সঙ্গে পুদিনা পাতার তুলনা দিয়েছিলাম, তাকে মহাকাল রেখে দিয়েছেন হয়তো তাঁর সময়ের পাতায়। কিন্তু আমার তো স্মরণ নেই। মায়া তাহলে---।

---না, অনুকা, দাদু, মামা সবাই বসে থাকবেন না খেয়ে। আমি বরং আর একদিন---।

---আচ্ছা খাচ্ছ না তা'হলে? কিরে? চাকর পুনিয়া এসে জানাল পিয়ন এসেছে, রেজিস্ট্রী চিঠি আছে বাবুর নামে।

---রেজেস্ট্রী? কিন্তু বাবা তো বাড়ী নেই। আচ্ছা, নিয়ে আয়, আমি রেখে দিচ্ছি।

সই করে চিঠি নিল অনল, উল্টে পাল্টে দেখল।

---ক্রম সলিসিটর গুহ অ্যাণ্ড মিত্র। কি ব্যাপার।

---খুলে দ্যাখ না চিঠি, দরকার হ'লে বাবাকে ফোন করে দিবি। অপর্ণা বলল।

অনল চিঠি খুলল, পড়তে লাগল। চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে অপর্ণা দরজার কাছে এল। মহামায়াকে গাড়ীতে তুলে দেবে।

---তুমি ও আজ শান্তিনগরে চল না অপি, কাল সকালে মেজদা পৌঁছে দিয়ে যাবে।

---আমি? শান্তিনগরে? দাদা, শোন্, মায়া আমাকে শান্তিনগরে যেতে বলছে। এ কিরে? কিসের চিঠি?

নীল হয়ে যাওয়া অনলের মুখের দিকে চেয়ে, দৌড়ে ভাইয়ের কাছে এল অপর্ণা। হাত থেকে চিঠি তুলে নিয়ে পড়ল।

---ওমা! কি সর্বনাশ! কি ভীষণ চিঠি লিখেছেন বড়দা।

বড়দা। মহামায়ার বাবা। আশ্চর্য হতে গিয়েই মহামায়ার মনে পড়ল গুহ-মিত্র বাবার সলিসিটর। ততক্ষণে বোনের আর্তকণ্ঠে সংবিৎ ফিরে পেয়েছে অনল। অপর্ণার হাত থেকে চিঠি টেনে নিল। কভারে ভরতে ভরতে বলল---

---যা, যা তুই চান করতে।

---দাদা!

---ঠিক আছে। সরমাসি অপিকে---

দাদার চোখের দিকে চেয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল অপর্ণা। গাড়ীতে উঠতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল মহামায়া। একবার ইতস্তত করল।

---অনুকা' বাবা কি নীহারিকা নিয়ে কোনো---। মায়া জানত নীহারিকা মর্টগেজ আছে স্বরেশ্বরের কাছে।

---না। সংক্ষেপে উত্তর দিল অনল। গাড়ীর দরজা খুলে উঠবার ইঙ্গিত করল মহামায়াকে।

ঘরে ফিরে চোখে পড়ল হিমিকা। কাঠের মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সে। বুঝেছে এ চিঠি তাকে নিয়ে। একটা বিতৃষ্ণায় অনলের মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। জঘন্য চিঠি এসেছে। স্বরেশ্বরের সলিসিটর জানিয়েছেন---তাঁর মক্কেলের নাবালিকা রক্ষিতাকে অপহরণ করবার জন্য একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বরেশ্বর কেবল আত্মীয় ব'লে--- সেই কাজে বিরত হবেন, যদি এই চিঠি পাবার পর যূথিকা দাসীর মেয়েকে অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরেশ্বরের বাড়ীতে ফিরিয়ে দিয়ে যান---।

অনলকে দেখে উঠে দাঁড়াল হিমিকা। আস্তে আস্তে দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল।

---শোন, দাঁড়াও। অনলের দৃঢ় কণ্ঠ শুনে হিমিকার শরীর কেঁপে উঠল। ঘরের মাঝখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

---তোমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। একটুও দ্বিধা না ক'রে বলল অনল। দয়ামায়া মানবতাবোধ তারও আছে। কিন্তু কিন্তু একটা বাজে মেয়ের জন্য নিজেদের বিব্রত করতে পারা যাবে না। অনল জানে স্বরেশ্বরের নির্লজ্জতার সীমা নেই। অজয়ের সুনাম ও শিক্ষাকে চিরদিন ঈর্ষা করেন তিনি। এ সুযোগ কখনো ছাড়বেন না। মামলা-মোকদ্দমা ক'রে চারদিক কালো ক'রে দেবেন একেবারে।

---বুঝেছ, তোমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। আবার বলল অনল। এবার বড় বড় চোখ তুলে তাকাল হিমিকা।

---কোথায় যাব?

একটা দুর্দান্ত রাগে ভ'রে গেল অনলের সমস্ত শরীর। ইচ্ছা হল সোজা হাত ধ'রে মেয়েটাকে পথে বের করে দেবে। হয়তো কটূক্তি কিছু করত, বাধা পড়ল। অজয় এসে ঘরে ঢুকলেন।

---কি হয়েছে?

নিজেকে সংযত করল অনল। টেবিল থেকে তুলে স্বরেশ্বরের উকিলের চিঠি বাবার হাতে দিল।

চিঠিটা পড়তে পড়তে একটা চেয়ারে বসলেন অজয়।

---তুমি যাও হিমি, চান-টান করেছ? করনি? যাও, চান ক'রে খাওগে।

---বাবা!

---হুঁ।

---ওকে---মেয়েটাকে বড়দার বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও বাবা। চিঠি লিখে জানিয়ে দাও, তুমি কিছু জাননা। কেমন ক'রে ও এ বাড়ীতে এসেছে তাও লিখে দাও।

---না।

না। কোনো আপোস নয়। হিমিকাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না। চিঠি লিখে কিম্বা দেখা ক'রে স্বরেশ্বরকে ঘটনা বোঝানোর চেষ্টা, কিছু করবেন না অজয়। মোকদ্দমা হবে, কুৎসায় ভ'রে যাবে সব দিক। আরো যে কতটা হতে পারে ভাল ক'রেই বোঝেন অজয়, তবু অনমনীয় দৃঢ় হয়ে রইলেন তিনি। একটা জঘন্য কুৎসিত পরিস্থিতি নির্ভুল পায়ে এগিয়ে এসে সমস্ত পরিবারকে ক্লেদাক্ত করে দিল।

অপর্ণা বিছানা থেকে উঠতে পারে না। একেবারে ভেঙে পড়েছে সে। বাবা, তার দেবতার মত বাবার নামে এই কদর্য অভিযোগ। অথচ কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। চোখের সামনে হিমিকা বসে আছে জলন্ত প্রমাণ হয়ে। সরবালা ব্যাপারটা না শুনলেও বুঝেছে একটা অশান্তি শুরু হয়েছে মেয়েটাকে নিয়ে। হিমিকে সরাবার জন্য জলদের কাছে গিয়েছিল। রিক্সাওয়ালা সাফ জবাব দিয়েছে--- হিমি তার মেয়ে নয়। ও যে রিক্সাওয়ালার মেয়ে নয়, হতে পারে না, প্রথম হতেই জানে সরবালা। কিন্তু কারোর তো মেয়ে। সে কই? অনেক জেরাতেও জলদ পরিষ্কার হয় নি। বলেছে---রাস্তায় জ্বরে অচৈতন্য মেয়ে দেখে রিকসাতে তুলে ডাক্তারবাবুর কাছে এনেছিল।

●

বেশীদিন অপেক্ষা করতে হ'ল না সরবালাকে। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট

কোর্টে মামলা শুরু হয়েছে। বড়লোক, দুই জ্ঞাতি। খুড়ো-ভাইপো সম্পর্ক, খারাপ মেয়ের দখল নিয়ে মকর্দমা। কৌতূহল ফেটে পড়ছে মানুষ। আইন-আদালতের পাতা ভ'রে খবর বের হচ্ছে। এমন কর্ণসুখকর, আলোচনায় মুখরোচক খবর অনেকদিন পরে পরে উঠে থাকে খবরের কাগজে। খাদ্য আন্দোলন, ভারত আক্রমণ, বাংলা বন্ধ এসব খবরে বিক্রী কিছু বাড়লেও ঝাঁঝালো রসের সংবাদে একলাফে সার্কুলেশন বেড়ে যায় কুড়ি হাজার তেমন করে ফেনাতে পারলে। মোড়ের পানওয়ালাও কিনে নেয় একখানা সুতরাং দুপুরবেলা চোখে চশমা লাগিয়ে পত্রিকার পাতা খুলতেই সরবালার চোখে পড়ল মামলার বিবরণ।

প্রথমে ঝাপসা ঝাপসা তারপর সব পরিষ্কার দেখল সে। নমুনা আর কেউ নয়, সুরেশ্বর বাঁড়ুজ্যের—বড়বাবুর রক্ষিতার মেয়ে। নিজেও হয়তো রক্ষিতা ছিল। সমস্ত গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল সরবালার। কতদিন এই মেয়েটাকে প্রায় কোলে ক'রে রেখেছে স্নান না ক'রেই হেঁসেলে গিয়েছে, করেছে আহ্নিক। এই মেয়ে, এই খারাপ মেয়েটাকে নিয়ে মামলা। খবরের কাগজে ছেপে বের হচ্ছে কত অকথা-কুকথা। দেবতুল্য মানুষটার নামে দুর্নাম রটেছে আর অপির অনলের ভবিষ্যৎ কালো হয়ে উঠেছে। অনু-অপি, সরবালার হাতে ওদের তুলে দিয়ে চোখ বুজেছিল হেমলতাদি। বাপের বাড়ীর দেশের মেয়ে সরবালা। ছোট হতেই হেমলতা তাকে ভালবাসত। স্বামী মরে যেতে সর আথান্তরে পড়েছিল। হেম নিয়ে এল, ঘর-সংসার সঁপে দিল তার হাতে। তারপর ছেলে-মেয়ে-স্বামী সব ফেলে সতীলক্ষ্মী চলে গেল। স্বর্গ থেকে দেখছে হেমলতাদি সরবালা সব দায় বইছে কিনা। অপি-অনু—তারা তো সরবালার প্রাণ। রাক্ষসী-দের প্রাণ যেমন লুকানো থাকে পক্ষী পাখলার মধ্যে, তেমনি সরবালার প্রাণও রয়েছে অপি-অনুর মধ্যে। চোখ জলতে লাগল সরবালার। তাড়াবে, একেবারে নির্মূল ক'রে এ-বাড়ীর থেকে তাড়াবে নমুনাকে। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করল সরবালা।

●

তারিখ পড়ে পড়েও শেষের দিকে চলে এল মামলা। ডাক পড়ল সর্বশেষ সাক্ষী। যার ওপর সমস্ত ফল নিভর করছে সেই হিমিকা দাসীর। হিমিকার সাক্ষ্য নেওয়া হবে। কোর্টে আর লোক ধরে না। সুন্দরী, শিক্ষিতা অল্পবয়সী খারাপ মেয়ে। তাকে দেখা যাবে, চোখ-মারা শিস দেওয়ার সুযোগ মিলবে। কি অপূর্ব রোমাঞ্চ! এর আগে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী—সুরেশ্বরের চাকর-দাসী-দরওয়ানের সাক্ষীও বেশ মজাদার ছিল। তারা সবাই বলেছে মা-মেয়ে দু'জনেই সুরেশ্বরের রক্ষিতা ছিল। আসামী পক্ষে কোনো সাক্ষী নেই। সম্ভ্রান্ত বিদ্বান অধ্যাপকের কলঙ্ক-কাহিনীতে শহর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

আসামী পক্ষের উকিল, ক্রিমিন্যাল কেসের ঝানু প্লীডার আদিত্য মণ্ডল অবশ্য জেরা ক'রে ক'রে কাহিল করে দিয়েছে সুরেশ্বরের সাক্ষীদের। তারা অনেক উল্টো-পাল্টা কথা বললেও এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে যে অন্তত হিমিকার মা ঘৃণিতা গণিকা এবং দীর্ঘদিন ধ'রে সুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষিতা ছিল।

হিমিকার ডাক হ'ল। আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল সে। কলেজ হতে তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। বাড়া বসে আজকের দিনের অপেক্ষায় ছিল হিমিকা। আদালতে তাকে দেখে উৎসুক চোখগুলো চক-চকে হয়ে উঠল, অনেকবার 'অর্ডার' বলতে হ'ল ম্যাজিস্ট্রেটকে। অজয় ভেবেছিলেন হয়তো কেঁদে ফেলবে, হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে হিমিকা। দীর্ঘদিন ধ'রে আদিত্য মণ্ডল তাকে তালিম দিয়েছে। হিমিকার শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বাধা দিতে চেয়েছে অজয়।

আদিত্য বলেছে—তুমি খাস তো প্রফেসর।

—কি গো মা, ঠিক ঠিক বলতে পারবে তো সব কথা, না গুলিয়ে ফেলে জিতিয়ে দেবে অন্যায়কে?

—পারব। ঘাড় নেড়েছে হিমি। রাত জেগে তার বক্তব্য মুখস্থ করেছে, আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে বলেছে সে সব কথা। কিন্তু কোর্টে দাড়িয়ে চোখে অন্ধকার দেখল সে, পা টলতে লাগল। শুনল অনেক দূর হ'তে ভেসে আসা শব্দ।

—সুরেশ্বর বাবুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

অনেক কষ্টে উত্তর দিল হিমিকা:

—কোনো সম্পর্ক নেই।

—সম্পর্ক নেই? বল কি? এতদিন তার আশ্রয়ে কাটালে আর কোনো সম্পর্ক হ'ল না? তোমার মা তো বে—বারবনিতা, সুরেশ্বরবাবুর রক্ষিতা ছিল.

দু'টো কুচকানো চোখের দৃষ্টি ছুরির ফলা হয়ে বিঁধে গেল হিমিকার শরীরের মধ্যে। এতদিনের সব শিক্ষা ভুলে কেঁদে ফেলল হিমি।

—আমার মা, আমার মা খুব ভাল ছিল।

আদিত্য মণ্ডল উঠে দাঁড়ালেন।

—আই প্রোটেস্ট মাই লর্ড! সাক্ষীকে জেরা করা হোক, কিন্তু মায়ের প্রশ্ন তুলে তাকে বিপর্যস্ত করা চলবে না।

সুরেশ্বরের উকিল উত্তরে হেসে উঠেছিল, ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিলেন। হিমিকার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, সাক্ষীর মা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন চলবে না। উকিলকে নিরস্ত হতে হ'ল।

ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল হিমিকা কুমারী। স্কুল সার্টিফিকেটে প্রমাণিত হল সে সাবালিকা। বাইশ পাতা ভ'রে রায় লিখলেন ম্যাজিস্ট্রেট। অজয় নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক। তার নির্ভীকতার প্রশংসা করলেন, সমালোচনা করলেন সুরেশ্বরের রুচি-প্রবৃত্তির। হিমিকাকে আয়ত্ত করবার মামলায় হেরে নীহারিকা

দখল করবার জন্য দেওয়ানী মকদ্দমা দায়ের করলেন সুরেশ্বর।

পত্রিকার পাতা ভরে প্রকাশিত হ'ল অজয়ের প্রশংসা। দেবতার মত মানুষ। শিবিরাজার মত বিপন্নকে রক্ষা করতে নিজেকে বিসর্জন দিতে বসেছিলেন। ছাত্ররা এসে জোর ক'রে তাঁকে কলেজে নিয়ে গেল, সভা করল তাঁকে মানপত্র দেবার জন্য। যে পত্রিকা ভ'রে মহামানব অজয়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হ'ল তাতেই আবার ছাপা হয়েছিল হিমিকার আদি অন্ত বৃত্তান্ত। সে পতিতার মেয়ে, পতিতা নিজে। কোনো ঘরে শিক্ষায়তনে মন্দিরে মঠে তার স্থান নেই। কেউ নেই, কিছু নেই হিমিকার। পায়ের নীচে হাঁ মেলেছে পাতাল জোড়া গহ্বর আর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে পতিতা মায়ের ছায়া। স্নেহ মমতা মর্যাদা কিছুতেই হিমিকার অধিকার নেই। সে কেবল ইন্ধন যোগাবে। সৃষ্টির প্রথম দিন হতে পুরুষের বুকে যে লালসার আগুন জ্বলছে, তাতে আহুতি দেবে নিজেকে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাইতো তাকে দেখে সুরেশ্বরের মনে স্নেহ জাগেনি। তার বুকের মধ্যে যে সাপটা ঘুমিয়ে ছিল, হিমিকার দেহের মদগন্ধে ঘুম ভেঙে সে ফণা বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়েছিল হিমিকার সামনে।

একটি বছরের কঠিন অভিজ্ঞতায় হিমিকা বুঝেছে তাকে দেখে কারোর ভালবাসা জাগবে না। সে কেবল রাতের নর্মসহচরী। তার মুখে সংযম শুচিতার কথা শুনলে পৃথিবী ভ'রে অট্টহাসি উঠবে। তবে কি করবে, কোথায় যাবে হিমিকা? এই বাড়ীর একটি কোণে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবন? ঢেকে রাখা ভাতের থালা হ'তে খাবার খেয়ে রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত গুণে বেঁচে থাকবে কোনো মতে?

ঝুমরা ভিক্ষার ছল ক'রে রোজ একবার হিমিকার খোঁজ নিতে আসে। তাকেই ধরল সে।

—আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাবে ঝুমরা?

—আমাদের কাছে? আঁতকে উঠল ঝুমরা।

—ফুটপাথমে তুম ক্যায়সে রহোগী বেটা।

—পারব, আমি ফুটপাতে থাকতে পারব। আমাকে নিয়ে চল।

দু'চোখে জল ভ'রে হিমিকা আবেদন জানাল তার একমাত্র আপনজন খোঁড়া ভিখারী ঝুমরার কাছে।

ঝুমরার চোখেও জল এল। হা, রামজী, এ তোমকো কেইসা আজব দুনিয়া। এত্তা বড়া কোঠি, কেতনা খানা নষ্ট হোতা হর রোজ, আউর একঠো দুঃখীয়া লেড়কিকো উপর দিল একদম পাথর হো গয়া।

বড়লোকদের মন পাথর, কিন্তু ঝুমরাই বা কি করে। জলদের ঘরে রাখা যাবে না। তার ভাঙা ঘরে এমন মেয়ে দেখলে হল্লা জমাবে রাজ্যের মানুষ। ঝুমরার কাছে? ফুটপাতে নইনী? কুত্তার মত ওকে ছিঁড়ে খাবে বেইমান মানুষগুলো। তারা ভিখারীদের পুলিশে ধরিয়ে দেবে চোট্টা ব'লে, তারপর লেড়কীটাকে নিয়ে যাবে। ভদ্দর আদমীর চাইতে ভিক্ষুক ভাল। ওয়া নইনীর মন না হ'লে, তাকে ছোঁবেও না। বহিন ডাকবে, বলবে মা। খেতে দেবে ভিক্ষার ভাত কিন্তু নিরাপত্তা দিতে পারবে না। রামজীর কিরপাসে কুছ রূপয়া মিল যায়, তো ঝুমরা বিটিয়াকো লিয়ে, চলে যাবে নিজের গাওমে। ভাল জোয়ান ছোকরা, ক্ষেতি আছে, ভইষা আছে, এমন দুল্হা এনে সাদি দেবে নইনীর। জরদ রং নয়া চুনরী, চাঁদি রূপাকো জেবর, এমন নয়া দুল্হীন কখনো দেখেনি সরিয়া গাঁওয়ের মানুষ। সবই হতে পারে কিন্তু রূপয়া মিললে।

টাকা। টাকা থাকলে তো জলদও অনেক করতে পারে। নতুন বাড়ী কিনে, বসিয়ে দিতে পারে মেয়েটাকে, ডাকতে পারে নমুনা ব'লে। কিন্তু টাকাই নেই।

টাকা নেই জলদ-ঝুমরার। টাকা তো আছে সুরেশ্বর, সীতারামজী, বুলাকীদাসের। তারা টাকার উপর বসিয়ে দিতে পারে হিমিকাকে। শুধু একবার হাঁ বললে হীরামতির গয়না, বেনারসীর সাজ দেবে তারা হিমিকে কেবল একটু সরাব খেতে হবে, নাচতে হবে বে-আব্রু হয়ে, খুশী করতে হবে টাকাওয়ালাদের দরাজ দিলকে।

[ক্রমশ।

এই আমাদের প্রার্থনা

আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম বলতে বোঝায় যা ধারণ করে তাই। অর্থাৎ, যে আচারব্যবহার মানুষকে তার নিজের এবং অন্যের জীবন সংগতিপূর্ণ ক'রে তুলতে সাহায্য করে তাই ধর্ম।

ধর্ম মানে কিছু শব্দসমষ্টির উচ্চারণ আর কয়েকটা বাঁধাধরা আচার পালন নয়। প্রার্থনা আমাদের ধর্মসহায়। কেন? না, এর মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের সত্যিকার পরিচয় পাই। এর মধ্যে ফুটে ওঠে আমাদের গভীরতম ইচ্ছার রূপ, আমাদের স্বকৃত ক্রিয়াকলাপের [illegible]।

শাস্ত্র বলেন---'আত্মানং বিদ্ধি।' নিজেকে জানা কিন্তু আদৌ সহজ নয়, সম্ভবও হয় না পুরোপুরি, অধিকাংশ মানুষ নিজেদের কামনার কাচ দিয়ে স্বরূপ দেখতে অভ্যস্ত, তবে প্রকৃতই কী তা দেখা আর ঘটে ওঠে না। আত্মপ্রবঞ্চনা ঘটে চলেছে প্রায় প্রতি পদে, এবং এই সত্য এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও বিরামহীন। বস্তুত, জীবন অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে সামান্য প্রাপ্তি বই নয়। ইচ্ছা দুর্মর। পথ বন্ধ। বাস্তবে তাই আত্মপ্রবঞ্চনা এড়ান দুষ্কর। 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!

আত্মসম্মানবোধের পরিপন্থী সব কিছু আমরা চেপে যেতে চাই। যা করেছি ইতিমধ্যে, কিম্বা যা করবো বলে ঠিক করেছি, সে জন্য নিজেদেরই সম্ভাব্য যুক্তি আমরা অবিরাম শোনাই। এমন সবগুণ এভাবে আবিষ্কার করি নিজেদের মধ্যে, যা অস্তিত্বহীন। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে, যদি আমাদের এই সম্মোহিত অবস্থা একেবারে কেটে যায়, আমরা যদি বাধ্য হই নিরাবরণ সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে, জীবন হবে দুঃসহ রকমের অসুখী।

প্রার্থনা আমাদের নিভৃত উচ্চারণ। প্রার্থনা আমাদের একটু একটু ক'রে সইয়ে সইয়ে সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়। এজন্যেই প্রার্থনা এত শুভংকর। যদিও প্রথমে নিজের কাছে ছোট হওয়া এ ক্ষেত্রে প্রায় অবধারিত। প্রার্থনার অর্থ স্বেচ্ছায় স্বসম্বন্ধীয় সত্যের সামনে দাঁড়ানো। প্রার্থনাকারী প্রশ্ন করে নিজেকে---আমার উদ্দেশ্য কী, কী আমার সবচেয়ে জোরালো ইচ্ছা? অন্য লোকের প্রতি আমার দৃষ্টিভংগী কেমন? আমার দুর্বলতা কোনগুলো? সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি কী করছি? চলতি হাওয়ার সংগী হয়েই আমি তৃপ্ত, না কোনও বিশেষ আদর্শ জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করছি?

সর্বশক্তিমানের কাছে নিবেদন সৎ এবং আন্তরিক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি আছেন কি নেই সে তর্ক না ক'রেও বলা চলে ঈশ্বরের ধারণা মংগলপ্রদ, ঈশ্বরনিরপেক্ষভাবেই। এ সময় নিজেদের সব ধূর্ত যুক্তি আর বানানো সত্তার মুখোস নির্মম হাতে খুলে ফেলা দরকার। প্রার্থনায় আমরা স্বরূপে ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হতে চাই, চাই নির্মলতর, শুদ্ধতর হয়ে উঠতে। নৈতিক মান উন্নত করার এটি প্রাথমিক শর্ত---তবে তা আমাদের অহংবোধ আহত করে। কখনও খুব বেশি মাত্রায়। সহ্য করা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

প্রার্থনা মানুষকে নিয়ে যায় স্বর্গে। মানবিক কল্পনায় যা স্বার্থলেশশূন্য চির আনন্দধাম। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষ যত গভীরভাবে স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, তত তার জগৎ আর জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী পাল্টায়। নিজের স্থান বুঝতে পারলে অন্যকে তার প্রাপ্য স্থান দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হয় না।

আন্তরিক প্রার্থনা সুফলদায়ী হবেই।

আমাদের পুণ্য মাতৃভূমি অগণিত সাধুসন্তের আবির্ভাবধন্য। তাঁদের কথা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র রবি ঠাকুরের জীবন থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি সৎ প্রার্থনা কীভাবে মানুষকে তমসা থেকে আলোর রাজ্যে নিয়ে যায়, ছোট 'আমি'র বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেয় বড় 'আমি'র উদার উপলব্ধির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে।

আমরা সবাই ভাবতে ভালবাসি। মানুষমাত্রেই অমৃতস্য পুত্রাঃ, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাই। আমরা চাই মানুষ মানুষের প্রতি আরও অনেক ভাল ব্যবহার করুক। এটা পুত ইচ্ছার স্তর আজও পেরোয় নি। আমরা কি সত্যি সকলকে নিজেদের ভাইয়ের মত দেখি? কাউকে না কাউকে ত অত্যন্ত অপছন্দ করি আমরা সবাই। প্রার্থনা তাই সৎ হয় না।

আমরা সৎ হওয়ার প্রার্থনা জানাই। প্রায় প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সৎ। একটু ভাবলেই তা নিজেদের কাছে ধরা পড়ে। সাধারণত আমরা ধার শোধ করি, অপ্রয়োজনে মিথ্যা বলি না। 'সাধারণত'---ওই পর্যন্ত। আমরা অনেক কথা বলি যা আসলে বলতে চাই না, অননুভূত মনোভাব প্রকাশ করি, মনে মনে নিন্দা করা সত্ত্বেও প্রশংসা করতে অভ্যস্ত; ইচ্ছা---আমরা আসলে যা নই লোকে আমাদের তাই ভাবুক। প্রার্থনা আমাদের এ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আমাদের অনেক ত্রুটি, অনেক বিচ্যুতি। প্রকাশ্যে 'হরের্নামৈব কেবলম্' আওড়ান সহজসাধ্য, নিজের কাছে ধরা পড়ার সম্ভাবনা তাতে স্বল্প। প্রার্থনা একান্ত, এর মধ্যে আমাদের স্বরূপ ফুটে ওঠে অবিকৃত মহিমায়। অস্বস্তি থাকে না যদি ভাবতে পারি আমরা কী হয়েছি তা বড় কথা নয়, কী হতে চাই সত্যি সত্যি তাই চরম কথা।

আমরা কি কোনদিনই নিজেদের মুখোমুখী দাঁড়াব না?

—বিভা চৌধুরী

ত্রিপুরার আদিম অধিবাসী কিরাত জাতি

ত্রিপুরার রাজবংশের [illegible] রাজমালায় কিরাত জাতির কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতানুসারে ত্রিপুরা রাজ্য কিরাত দেশে অবস্থিত এবং কিরাত জাতিই এই পার্বত্য রাজ্যের আদিম অধিবাসী। Nonnos নামে এক গ্রন্থকার গ্রীক ভাষাতে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম ছিল Dionysiaka অথবা Bassarika. ঐ গ্রন্থটিতে কিরাত জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ঘাঁটলে দেখা যায় যে, কিরাত জাতি নৌ-যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল। তারা চামড়ার জলযান ব্যবহার করতো। ঐ কিরাত সম্প্রদায়ের Thyamis এবং Olkaros নামে দু'জন অধিনায়ক ছিল। তাঁরা উভয়েই নৌ-চালনা বিদ্যাবিশারদ Tharscros-এর পুত্র। গ্রীক গ্রন্থটিতে কিরাত জাতিকে 'Cirradioi' এই নামে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক M' Crindle সাহেব 'কিরাদই'-কে কিরাত নামের অপভ্রংশ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। 'Pliny' কিরাতদের Syrites নামে অভিহিত করেছেন। 'Periplus of the Erythracan Sea' গ্রন্থের গ্রন্থকার কিরাতগোষ্ঠীকে 'Kirrhadi' এই নামে ব্যাখ্যা করেছেন।

M' Crindle সাহেবের মতানুসারে কিরাতগোষ্ঠী একটি পার্বত্য জাতি এবং অরণ্য ও পর্বতে তাদের বাস।

ব্রহ্মদেশ ও কম্বোজের প্রাচীন ইতিহাসের শিলালিপি পাঠে এ কথা জানতে পারা যায় যে, কিরাত জাতি ব্রহ্মদেশ থেকে আসাম, ত্রিপুরা পর্যন্ত সমস্ত স্থান জুড়ে ছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নেপাল রাজ্যে প্রাচীনকালে 'কিরন্তি জাতি' নামে একটি জাতি বাস করতো এবং তা কিরাতদেরই একটি শাখা-গোষ্ঠী বলে এখনও পরিগণিত হচ্ছে। সময়ের বিবর্তনে কিরাত জাতির অধিকারে সমস্ত পূর্ব-ভারত চলে যায় এবং সে স্থান কিরাত-ভূমি নামে অভিহিত হতে থাকে। এ সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিরাত জাতির কথা বৈদিক গ্রন্থসমূহেও উল্লেখ আছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে অথর্ববেদের নাম করা যেতে পারে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Liassen সাহেব তাঁর Indische Alterthums Kunde' নামক গ্রন্থে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে প্রমাণ করেছেন যে কিরাত জাতি বৈদিক যুগের অব্যবহিত কাল পর থেকেই নেপালের পূর্বাঞ্চলে বাস করতে আরম্ভ করে। 'মানব ধর্মশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে কিরাত জাতিকে ক্ষত্রিয় জাতি বলে প্রমাণিত করা হয়েছে, তবে, M' Crindle সাহেবের মতানুসারে কিরাতেরা শূদ্র জাতি এ কথা তাঁর গ্রন্থে বলা হয়েছে;

রাহুল [illegible]

কিন্তু বর্তমানকালের ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন যে, কিরাতেরা মূলতঃ ক্ষত্রিয় জাতিই ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যায় যে, কিরাত জাতির বাসস্থান হিমালয়ের পূর্বে, ভূটান, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশ এমন কি চীন সীমান্তবর্তী সুদূর কম্বোজ (অধুনা কম্বোডিয়া) দেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। M' Crindle সাহেবের 'The Ancient India' নামক গ্রন্থে কিরাত জাতি সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়েছে ---

'By the cirradioi are meant the Kirata, a race spread along the shores of Bengal to east ward of the mouths of the Ganges as far as Arracan. They are described by the author of the 'Periplus of the Erythracan Sea' who calls them the Kirrahadi as savages with flat noses. He places them on the coast to the west of the Ganges but erroneously they are the Kirrhadat of plotemy.'

—Page No-199.

এ ছাড়াও কিরাতদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক H. G. Rawlinson তাঁর 'Intercourse between India and the Western World' নামক গ্রন্থে বলেছেন---

'The Pygmics are the Kirata the Morgo'ian hillmen of Bhutan or the wild tribes of the Assam frontier perhaps.'

এ ছাড়া নেপাল রাজ্যের পার্বত্য বংশের বংশাবলী খুঁজলে দেখা যাবে যে, আহীর রাজবংশের পর ১৯ জন কিরাত রাজা নেপালে রাজত্ব করে গেছেন। এর কয়েক শতক পরে পুনরায় তাঁরা নেপালের রাজসিংহাসন অধিকার করতে চেয়েছিলেন, সেই সময়ে নেপালের রাজা পৃথ্বীনারায়ণের কাছে এক যুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হয়ে সে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে এসে অরণ্যে আশ্রয় নেন।

তারপর থেকেই কালক্রমে তাঁরা অরণ্যের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। মহাভারতেও কিরাতদের কথা উল্লেখ আছে। কিরাতদের মধ্যে সুসভ্য ও অসভ্য সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। আসাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের কিরাত সম্প্রদায়গুলি কয়েক শতক পরে দ্রুহ্যবংশীয় ক্ষত্রিয়—অর্থাৎ ত্রিপুরার রাজবংশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কালের বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনও লুপ্তপ্রায় দু-একটি কিরাত সম্প্রদায়কে ত্রিপুরার গভীর অরণ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

পুস্তকাবলী :—

১। [illegible]।

২। The Ancient India.

॥ দুই ॥

চিঠিখানা ডাকে দিই-দিই করেও সকালটা কাটালো মেঘমালা। বার বার করে পড়লো সেটা। কাটাকুটি করলো খামটার ওপর খানিকক্ষণ। যত্ন করে ধরে ধরে লিখলো ঠিকানাটা।

ঠিকানা লেখার একটা খাতাই করতে হয়েছে মেঘমালাকে। যতবার যেখানে গেছে মণিময় ঠিকানা দিয়ে গেছে তাকে। লিখে দিয়ে গেছে নিজের হাতে। হাতের লেখা তার ভালো নয়। ভালো করার জন্য চেষ্টাও করে নি কখনো। মণিময় কতোবার বলেছে, তার বয়েই গেছে শুনতে।

নতুন বইগুলো কেনা হলে মণিময়ের সামনে এসে ধরেছে গোড়ার পাতাটা খুলে, কই হে কলমচী নামটা লিখে দাও তো দেখি। বেশ গোটা গোটা করে লেখো, মেঘমালা দত্ত। স্কুলে, কলেজে সব সময়ই ওই এক ব্যবস্থা। বই খাতা নতুন যা কিনবে মেঘমালা, সব কিছুতেই নাম লিখে দিতে হবে মণিময়কে। বাইরে যাবে মণিময় একডজন খাম বানাবে মেঘমালা। ছ' খানায় নাম লেখা হবে মেঘমালার, ছ' খানায় মণিময়ের ঠিকানা সহ। মাথার দিব্যি দেওয়া থাকবে পৌঁছেই তার করার, ফিরতি ডাকে চিঠির জবাব দেবার।

●

পকেটে অনেক টাকা মণিময়ের। সেই টাকা দিয়ে সে কি করবে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। মনে পড়লো মা'র কথা, মাকে গিয়ে প্রণাম করবে আগে। টাকাগুলো দেবে তার হাতে তুলে। তারপর তার থেকে চেয়ে নেবে কয়েকটি টাকা। মেঘমালার জন্য কিনবে কিছু। কি কিনবে কি কিনবে তাই ভাবলো অনেকক্ষণ বসে। ক'টা টাকার আর কিই বা হবে। ঘড়ি, শাড়ী, গহনা—না না ওসব তার অনেক আছে। মনে পড়লো শেষে, চকোলেট খেতে ভালবাসে মেঘমালা। ক্যাডবেরীর দুধ দেওয়া কোকো চকোলেট তাই কিনবে এক বাক্স। সে আর ও দুজনে সেই অনেকদিন আগেকার মতো—। [illegible] আর হয় না [illegible] অনেক বড়ো হয়ে গেছে। বড় কি হয় নি মণিময়ও!

●

হরিহরপুরে এসে থামলো ট্রেনটা, এখানেই এ ট্রেনের শেষ নয়। ট্রেন যাবে সেই লালগোলা অবধি।

সন্ধ্যা উতরে গেছে। স্টেশনের চারদিকে কেরোসিন তেলের বাতি জেলে দিয়ে গেছে মহাদেব, স্টেশনের পয়েণ্টসম্যান; মণিময় এখানকার চেনা লোক। সবাইকে চেনে মণিময়ও।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

আশীষ বসু

ট্রেন চলে গেল।

স্টেশন মাস্টার বৃন্দাবন সামন্ত ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতা থেকে ফিরলেন, না কৃষ্ণনগর?

কলকাতা থেকেই।

বাড়ীর খবর সব ভালো?

চলে যাচ্ছে একরকম।

কেশবপুর যাবেন আজই না থাকবেন এখানে।

কেন বাস নেই?

বাস আসে নি এখনো। বোধ হয় রাস্তার খারাপ-টারাপ হয়ে থাকবে। আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে যান না। ডাকবাংলো বোধহয় খালিই আছে। খাস বাড়ী থেকে খাবার পাঠিয়ে দেবো এখন মহাদেবকে দিয়ে, টিফিন কেরিয়ারে।

না থাকা যাবে না বিশেষ জরুরী কাজ আছে কাল সকালে। কৃষ্ণনগর থেকে এস ডি ও আসবেন ওয়ার্কস এ্যাণ্ড বিল্ডিংসের।

তাহলে যেতেই হবে কি বলেন? কিন্তু যাবেন কিসে?

বড় চিন্তায় ফেললে দেখছি।

গো-যান আছে। রাত সাতটায় বলদ জুড়লে এগারোটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছবার আশা আছে। তবে রাস্তাটা ভালো নয় আর চারিদিকে যেমন আকাল, লোকে চার আনা পয়সার জন্যও মানুষ খুন করতে চায় না কি। না গেলেই ভালো করতেন। দেখুন ভেবে।

এমন সময় স্টেশনের অফিসে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলো।

পলাশী থেকে বোধহয় ডাকছে। ট্রেনটা গেলো তো এখুনি। যাই কলটা এ্যাটেণ্ড করে আসি। ওরে মহাদেব বাবুকে একটা গাড়ী-টাড়ী দেখে দে না গঞ্জের ওদিক থেকে। আসুন না ততক্ষণ বসবেন এখানটায়।

মণিময় গিয়ে বসলো অফিস ঘরে। স্যুটকেশটা আর হোল্ডওলটাকে বয়ে নিয়ে এল মহাদেব। রাখলো এক কোণায়।

টিফিন-ক্যারিয়ারে করে খাবার পাঠিয়ে দেওয়ার রহস্যটা এখন আর অজানা নয় মণিময়ের কাছে। না হলে রাত্রে স্টেশন মাস্টার বৃন্দাবন আধ মাইল দূরের ডাকবাংলোয় মহাদেবকে দিয়ে লুচি-মাংস করিয়ে তাকে আরেক দিন যে খাওয়া খাইয়েছিলেন, এমনি আর এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে সে কি শুধুই পরোপকারের বাসনায়।

স্টেশন মাস্টার বৃন্দাবনবাবু হুঁশিয়ার লোক। তিনি খবর রাখেন মণিময় কে, কোথায় তার গন্তব্যস্থান, কতখানি তার হাতে ক্ষমতা। তাই তিনি একদিন কথাবার্তার মধ্যে সুবিধামতো বলে বসলেন, বাইরে থেকে লোক কতোভাবে কতে

পয়সা এ অঞ্চল থেকে কামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সবাই, আর আমরা কি না এখানকার লোক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। ছেলেটাকে সেদিন তাই বলছিলুম কি—কলকাতার অফিসে অফিসে কাগজ পেন্সিল খাতা সাপ্লাই করে জুতোর তলা খইয়ে বেড়াস, মণিময়বাবুর কাছে যা না—তার হাতে কত কাজ বলে মণিময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বৃন্দাবনবাবু একবার মুখের পরিবর্তনটা বুঝতে চেষ্টা করলেন, আপনি মণিময়বাবু একবার একটু হাত ঝাড়লেও বুঝলেন কি না ছেলেটার একটা হিল্লে হয়ে যায়। গত বছর সাধ করে বিয়ে দিলাম, তা ব্যাটা একটি পয়সা ঘরে আনতে পারে না।

বৃন্দাবন সামন্তকে চিনতে দেরী হয় নি মণিময়ের।

এই তো সেদিনকার কথা। কলকাতায় গেছিল হেড অফিসে। এক পার্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বড় সাহেব। বললেন, আপনার ওখানকার মেশিনগুলোর জন্য কিছু কিছু যন্ত্রপাতি সাপ্লাই করবেন এরা। একটু এদের কারখানাটা দেখে আসুন তো।

কারখানা দেখাতে ট্যাক্সি করেই নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। চা-খাবার খাওয়ালেন। ভদ্রতাবোধে তাও সে খেলো। কারখানা দেখলো।

ফিরে আসবার সময় সেই কণ্ট্রাক্টর ভদ্রলোক বললেন, আপনি তো গাড়ী নিয়ে আসেন নি, যদি কিছু মনে না করেন তো এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি রাস্তার ট্যাক্সী-খরচ—।

বাকীটুকু আর তাকে বলতে দেয় নি মণিময়। শুধু বলেছিল, আমার চেহারা দেখে কি ভদ্রলোক মনে হচ্ছে না আপনার?

সে কি কথা স্যার, সে কি কথা—বিনীতভাবে জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

বলল মণিময়, ভদ্রলোককে বাড়ী ফিরে যাবার গাড়ী ভাড়া দিতে হয় একথা কে শেখালো আপনাকে।

এদিকে মহাদেব গাড়ী ডেকে এনেছে। উঠলো মণিময়। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল বৃন্দাবনবাবুর কাছ থেকে।

●

অনেক ভেবে-চিন্তে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে চিঠিখানা ছিঁড়েই ফেললো মেঘমালা। না এ কথা লেখা যায় না। কোনও মেয়েই এমন করে চিঠি লিখতে পারে না। কখনো না। এ চিঠি মেঘমালা লিখতে পারে না, কাউকেই না, মণিময়কেও না। চিঠিখানা ছিঁড়ে আবার নতুন করে চিঠি লিখতে বসলো সে। কতো কথা জমা রয়েছে মনে, কিন্তু সবই কেন যেন কলমের ডগায় এসে ফিরে যাচ্ছে। কতবার ভাবছে এই কথাটা দিয়ে শুরু করবে পরক্ষণেই আবার তা পালটাচ্ছে।

অনেক কাটাকুটির পর মাত্র কয়েকটি লাইন লিখলো মেঘমালা, আজ অনেক কাজের মানুষ হয়েছো তুমি। কিন্তু এমন একদিনের কথা আজ কি তোমার মনে পড়ে, যেদিন সম্ভবত তোমার চারপাশে কাজগুলো এমনি করে ভিড় করে ছিল না। এমন একদিন যেদিন তোমার সব কাজ ছিল তোমার একান্ত অনুগত। আজ কি তুমি জোর করে বলতে পারো, সব কাজ ফেলে দিয়ে এসো আমরা চুপ করে বসে থাকি। পৃথিবী জুড়ে এই যে সবাই খালি কাজ কাজ করে ছুটে চলেছে, তাদের গতির মধ্যে কাজকে অনুভব করার শক্তি কোথায়! যে কাজ করে সে কি কাজকে অনুভব করতে পারে। যে লোকটা কামারশালে হাতুড়ী পিটছে সে কি শুনতে পাচ্ছে হাতুড়ীর আওয়াজ! তাই তুমি বলতে, এসো মালা, আমরা কাজকে অনুভব করি। সারা দুনিয়া যখন কাজে ব্যস্ত তখন চলো না আমরা পালাই, এমন কোথাও যেখানে কাজ নেই। যেখানে শুধুই ছুটি-ছুটি—দেহের আর মনের, চিন্তার আর প্রয়োজনের। আজকে কি তুমি পারবে বলতে সে কথা?

ওকথা থাক, মেঘমালা লিখলো, তোমার কাজ থেকে ছুটি চাই আজ আমার জন্য। অনেক দরকারী কথা আছে। পত্রপাঠ চলে এসো একবার। ধরো চিঠিটা পাবে পরশু সকালে। দুপুরের গাড়ীতেই ফিরে এসো। একেবারে সোজা চলে এসো এখানে। অপেক্ষা করবো যে তা তো জানোই।

(এমনি চিঠি ছিল মেঘমালার। মণিময় সব ভুলে যেতো। যদি বা কখনো ভেবেছে রাগ করে যাবে না অমনি চিঠি এসেছে খামে। যে চিঠিতে 'বলা'র চেয়ে 'না-বলা' কথাই বেশী। কথার চেয়ে ভাবই সেখানে প্রবল। সে চিঠিকে অগ্রাহ্য করে কার সাধ্য!)

ইন্দ্রনাথ ফেল করলো পর পর দু'বার। পড়াশোনা ছেড়ে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে আড্ডা দিতেই তাকে দেখা গেল বেশী। অতি লাজুক, কৃশতনু, ভীরু ভীরু স্বভাবের ছেলেটি দিনে দিনে কথাবার্তায়, চাল-চলনে, পোষাকে-আসাকে আচারে-ব্যবহারে এমন হয়ে উঠলো যে তাকে দেখে চেনাই দায়।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল করার সময় চন্দ্রকান্তবাবু বেঁচেছিলেন। মণিময় কেশবপুর থেকে ফিরে এসে সব শুনে বললো, ইন্দ্রেরই দোষ, পড়াশোনা করবে না, কিছু না—তা পরীক্ষায় এমনি পাশ করবে নাকি? পড়ুক আবার ভাল করে, চেষ্টা করে দেখুক যদি পারে পাশ করতে। একটা না পাশ করলে বেয়ারার চাকরীও জুটবে না। ভদ্রলোকের ছেলে শেষে কি কুলীগিরি করবে!

দ্বিতীয়বারের চেষ্টাতেও পাশ করতে না পেরে পড়াশোনাটা নিজেই ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ। ভাই মল্লিনাথ, তার চেয়ে দু'বছরের ছোট। পরীক্ষা দিল সেই বছরেই এবং পাশও করলো।

শ্যামলী তখন ক্লাস টেনে পড়ছে, চামেলী নাইনে। মাথায় বড়ো হয়ে উঠেছে দু'জনেই। ফ্রক পরা ছেড়ে শাড়ী ধরেছে আগেই।

শাড়ী পরতে বলেছিল মণিময়ই। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতো শ্যামলী। অতবড় মেয়ে। বাবার কথা তো কানেই তুলতো না। যা একটু ভয় করতো দাদা মণিময়কে। তা সে তো বেশীর ভাগ সময় থাকতো বাইরেই। মণিময় তাই বলেছিল, শাড়ী পরে রাস্তায় রাস্তায় এ বাড়ী ও বাড়ী চ্যাং চ্যাং করে ঘুরতে নিশ্চয়ই লজ্জা করবে মেয়ের--- অতএব।

মা তাকে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন, হ্যাঁরে মণি, মেয়ে দু'টো বড়ো হচ্ছে, ওদের খরচাও বাড়ছে দিন দিন। ইন্দ্রটা তো বাড়ীতেই বসে রইলো। মন্টিটাকে কলেজে ভর্তি করতে হবে। কোথা থেকে কি করবো বলতো ? ওর অবস্থা তো সব জানিসই। সঞ্চয় বলতে একটি পয়সাও কোথাও নেই। সেদিন আমার কাছে চার আনা পয়সা চাইছিলেন। বলছিলেন, কালীঘাটে যাবো ঠাকুর দেখতে। তা আমার কাছে তো পয়সা থাকে না। শ্যামলীর কাছে ছিলো---সেই যে তুই পুজোর সময় একটা টাকা হাতখরচা দিয়েছিলি, তাই জমানো ছিল। তাই থেকেই বার করে দিল মেয়ে। একটু থেমে দম নিয়ে বললেন, বুড়ো মানুষটাকে আর কতো জ্বালাতন করি বল। সারা জীবনটা এই সংসারের জন্যই তো জ্বলে পুড়ে গেছেন। তোর কাছে কি জমা-টমা কিছু নেই বাবা ?

মাইনে পাই আড়াই শো টাকা। সবই তো জানো মা। দেড়শো টাকা পাঠিয়ে দিই বাড়ীতে। ওখানে খেয়ে ঘরভাড়া দিয়ে আমার কি থাকে বলো ? ওরই মধ্যে জামা-কাপড় ধোপা-নাপিত, আমোদ-আহ্লাদ সব।

জানি, জানি সব। কিন্তু আমিই বা দেড়শো টাকায় এই রাবণের গুষ্টি চালাই কি করে বলো। মেয়েগুলোকে শাড়ী পরতে তো বললি, কিনে দিতে পারবো কি দরকার মতো।

কিন্তু আমি কি করবো বলো মা, চুরি তো করতে পারি না তোমাদের জন্যে।

রূঢ় কথাটা হঠাৎ যেন কেমন বেরিয়ে গেল তার মুখ দিয়ে। বলবার পরেই মনে মনে অনুতাপ বোধ করলো সে। মাকে ও কথা বলাটা উচিত হয় নি। সঙ্গে সঙ্গেই নরম স্বরে বললো, তোমার কাছে তো কিছুই লুকোই না মা, তুমি কি করে বললে জমানো টাকার কথা।

জমা আর থাকবে কি করে, সব পয়সা-কড়ি তো ঢেলে দিয়ে আসছো বাবা অন্য জায়গায়।

মা।---চিৎকার করে উঠলো মণিময়, এ তুমি কি বলছো মা। ছিঃ ছিঃ তোমার ছেলে এত নীচ হবে মা। তাই তুমি ভাবলে।

চারুলতা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। শূন্য ঘরে আরাম-চেয়ারটার উপর বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো মণিময়, মা কিসের ইঙ্গিত করে গেলেন। মেঘমাল্লাদের কি। ছিঃ ছিঃ একথা ভাবতেও ঘৃণায় তার সর্বশরীর শিউরে উঠলো। সেই চারুলতা যে তার বাবা চন্দ্রকান্তের হাত ধরে যশোহর জেলার কোনও এক অখ্যাত গ্রাম থেকে এসেছিলেন নুরমহম্মদ লেনের বাড়ীতে। এ কি সেই তিনি, যিনি তাঁর জীবনকে তিল তিল করে ক্ষয় করে দিয়েছেন দেড়খানা ঘরের চোর-কুঠুরীতে, জলের কলের লাইনে, এঁটো বাসনের গোছা হাতে সর্বজনীন কলতলায়। এই কি সেই মানুষটি, যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর ছেলে-মেয়েগুলি একদিন বড় হবে, মানুষ হবে, অনেক টাকা রোজগার করে আনবে।---জমি কিনবেন, বাড়ী করবেন দক্ষিণ কলকাতায়।

এর পর অনেকদিন বাড়ী আসে নি মণিময়।

এর মধ্যে মারা গেছেন চন্দ্রকান্তবাবু।

॥ পাঁচ ॥

কেশবপুর গ্রাম বলতে মাথাগুণতি কয়েকজন। গঙ্গাধরবাবু, ত্রিলোচনবাবু, পীতাম্বরবাবু আর শৈলেশ্বরবাবু। নিজেদের সংসার যাঁরা নিশ্চিতভাবে চালিয়ে আরও দু একজনকে পুষতে পারেন, বাড়ীতে ভাত-কাপড় দিয়ে।

গরুর গাড়ী অতি মন্থর গতিতে চলছিল সেদিন। একটা বিশেষ জরুরী কাজে হরিহরপুরে এসে সকাল সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরতে হবে মণিময়কে। কেশবপুর থেকে বেরিয়েছে সেই কোন সকালে। সূর্য তখন সবে উঠছে পূর্বাকাশে। আরদালী পিয়ন মকর চা আর ডিম সিদ্ধ করে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি উঠে স্টোভ ধরিয়ে।

ঘড়ির দিকে চোখ ফেরালো মণিময়। বেলা ন'টা বেজে পঁচিশ। রাস্তা এখনো প্রায় তিন---সাড়ে-তিন মাইল।

হরিহরপুর থকে কেশবপুর এই আট মাইল রাস্তাটা বর্ষার জলে ধুয়ে গেছে তখন। সাত-আট দিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে রাস্তার ধারের আল গলে গড়িয়ে পড়েছে মাঠে। মাটির বাঁধ দেওয়া রাস্তা আর ধানের ক্ষেত সব মিশে একাকার। কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে চারদিকে। যেখানেই পা নামান অন্তত আট-দশ ইঞ্চি বসে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তার আশেপাশের খেজুর গাছের সারগুলো থেকে এখনও বৃষ্টি পড়ছে টুপ টুপ করে, যেমন পাকা খেজুর পড়ে শীতের মরশুমে। কালও সারাদিন সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।

রাতে বারবার বাইরে বেরিয়ে আকাশের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করেছে মণিময়। ঘড়ি দেখেছে হরদম। অ্যালার্ম দিয়ে শুয়েছে পাছে সকালে ঘুম না ভাঙ্গে। কিন্তু সকাল হতে না-হতেই অত যে জল-ঝড় সব ধুয়েমুছে একেবারে নিঃশেষ। রোদ উঠলো যথাসময়ে, আরদালী পিয়ন মকর এসে হাজির। গরু জুড়ে ডাক ছাড়তে ছাড়তে যথাসময়ে এলো গরুর গাড়ী নিয়ে হরিবল্লভ। কেশবপুরের বাস বর্ষায় বন্ধ হয়ে গেছে।

রাস্তা তখনো প্রায় তিন-সাড়ে-তিন মাইল বাকী। ঘড়িতে ন'টা বেজে পঁচিশ। ট্রেন সাড়ে এগারোটায় দু'এক মিনিট আগেই।

হরিবল্লভ, চার মাইল রাস্তা আসতে কাটিয়ে দিলে তিন ঘণ্টা? মণিময় জিজ্ঞাসা করলো।

কি করি বাবু, গরুগুলার খাওয়া হয় নাই তিনদিন, আর গরুর মালিকের পরশু রাত থেকে। গাড়ী যাবে কি করে। হরিবল্লভ বিনীতভাবে উত্তর দিল।

তিন দিন খায় নি গরু, তো তাকে জুড়লে কেন?

আর গরু কই দাদাবাবু, গত সালের বন্যায় তো বলদ দুটা নিলে ভাসিয়ে। একটা গরু ছিল সেটা কি যে অখাদ্যি খেলে, বমি করে করে মারা পড়ল। এই বলদ-জোড়া তো রিলিফের টাকা পেয়ে কিনলাম শেষে। সেগুলিও বাঁচবেক নি, মরবে। ঠিক মরবে।

সামনে ওটা কিসের বাজার দেখা দেখা যায় হরিবল্লভ? মুন্সীগঞ্জের না!

হ্যাঁ বাবু।

গাড়ী থামাবে একবার এখানে।

সে কি বাবু, সাড়ে এগারোটার গাড়ী ধরবেন যে বললেন!

সাড়ে এগারোটার গাড়ী কি আর ধরাতে পারবে?

দেখি বাবু যদি পারি, এই বলে গরুর ল্যাজে মোচড় লাগালো হরিবল্লভ। খেঁজুর গাছের ডাঁটার মৃদু আঘাত দিল সঙ্গে সঙ্গে।

মুন্সীগঞ্জের হাট থেকে সেদিন চিঁড়ে-দই কিনে খাইয়েছিল হরিবল্লভকে। খড় কিনে খাইয়েছিল বলদ দুটোকে। সাড়ে এগারোটার গাড়ী ধরা গিয়েছিল অবশ্য।

●

চুপচাপ গাড়ীর এক কোণায় বসে সেদিনের এই সব কথা ভাবছিল মণিময়। গাড়ী ডেকে দিয়েছে মহাদেব, স্টেশন-পোর্টার। বাস আসে নি কৃষ্ণনগর থেকে। কেশবপুর যেতে আজ গো-যানই সম্বল। আর যদি নেহাৎই গো-যানে আপত্তি থাকে তো পায়ে পায়ে হেঁটে আপনি কেশবপুর পৌঁছতে পারেন ঘণ্টা তিনেকে। মাঠের আলের রাস্তা, চাঁদনী রাত, সোজা হেঁটে চলে যান। ডাইনে বাঁয়ে কোনওদিকে তাকাবেন না।

না, কেশবপুরের এ পথে রাতে কেউ একা হাঁটে না। আকাশে যত চাঁদের আলোই থাকুক না কেন। চার আনা পয়সার জন্য মানুষ খুন করতে নারাজ নয় এমন লোকের নাকি অভাব নেই এ রাস্তায়। যদি পথ চলতেই হয় তো দল বেঁধে লাঠির মাথায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে।

কিন্তু এ পথ তো আজকের নয়। লর্ড ক্লাইভ, না তখনও তিনি লর্ড হননি, রবার্ট ক্লাইভ এ পথ দিয়ে সৈন্যসামন্ত লোক-লস্কর নিয়ে পথ হেঁটেছেন। কোনও দিন কখনো এ পথের এমন অপবাদ কেউ দিতে পারে নি। কেশবপুরের মানুষ দরজায় খিল কি হুড়কো না এঁটেই বরাবর ঘুমিয়েছে।

আজও চাঁদের যেন হাট বসেছে। সারা মাঠ জুড়ে। লর্ড ক্লাইভ যেদিন

তাঁবু পেতেছিলেন এখানে, সেদিনও কি এমনি চাঁদের আলো ছিল সারা আকাশ জুড়ে?

সারা আকাশভরা আলোয় ঝক্‌মক্‌ করছিল বাঁ-দিকের ভেটারনারী কলেজের নতুন বাড়ীটা। অতি আধুনিক ডিজাইনের দোতালা। সুদৃশ্য বাংলো হবে। একপাশে গরু রাখার শেড উঠছে। অতি দ্রুত হাতে কণ্ট্রাক্টর শেষ করে চলেছে কাজ।

হরিবল্লভের গরু দুটো মারা গেল। গত বর্ষায়। বেচারা নিজেই পেটভরে দু'বেলা খেতে পায় না, তো এত টাকা কাহনের খড় কিনে বলদকে খাওয়াবে কোথা থেকে। নিজের ঘরের চালে জোটে না খড় তো গোয়ালের চালের ফুটো বেচারা সারাবে কি করে। যদিও বা করতো তো তেমন সওয়ারী কোথায়। কালেভদ্রে মাল আসে গাড়ীতে রেল ইস্টিশন থেকে। বেলডাঙ্গার চিনি কলে যায় আখ-বোঝাই গাড়ী। শোলার টুপীর ক্রেট, থালা-বাসন চালান যায় কলকাতায়। তাও আজকাল বেশীর ভাগ মালই যায় লরীতে। দৈত্যের মতো বিশালকায় সব গাড়ী আসে কলকাতা থেকে। তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বোঝাই করে দাওয়া। তারপর বিকৃত হর্নের আওয়াজে সচকিত করে তোলে চারিদিক আর ধুলো উড়িয়ে হরিহরপুরের কাঁচা রাস্তা পার হয়ে কৃষ্ণনগরের পথ ধরে। অর্থ-উলঙ্গ একপাল ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে ধরে গাড়ীটাকে। একটা কঞ্চি দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করে ভারী ভারী খাঁজকাটা রবারের টায়ারগুলো। হাত বুলিয়ে ধুলো সাফ করে মাডগার্ডের বনেটের। অতি সাহসী দু' একজন ভাব জমাবার চেষ্টা করে গাড়ীর ড্রাইভার আর কুলীদের সঙ্গে।

●

চন্দ্রকান্তবাবু মারা যাবার পর কলকাতায় আর বড় একটা যায় না মণিময়। বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়ে দেয় কেশবপুরে। কালেভদ্রে যায় কৃষ্ণনগর তাও আফিসের কাজেকর্মেই।

পড়াশোনা ছেড়ে দিল ইন্দ্রনাথ আর মল্লিনাথ দুজনেই। ইন্দ্র স্কুল ফাইন্যাল পাশ না করেই, মল্লি কলেজে না ঢুকেই। মণিময় আসে নি আর কেশবপুর থেকে। সেই বাবা মারা যাবার সময় যা একবার এসেছিল, কাজকর্ম মিটিয়ে ফিরে গেছে। আসবার সময় শুধু ইন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছিল মণিময়, লেখাপড়া তো আর হলো না, দু'-তিন জায়গায় চিঠি লিখে দিচ্ছি—দেখো যদি কিছু জোটে।

ইন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিল, তুমি বড় কাটখোট্টা কথা বলো দাদা। না হয় তোমার পয়সায় আছি, তা বলে যখন তখন যা তা কথা শোনাবে তুমি। জোটে কি, না জোটে, দিতে হবে না তোমায় চিঠি, কাজ কর্ম যা হয় জোগাড় করে নেবো আমিই। তোমাকে আর দয়া করে সাহায্য করতে হবে না।

অবাক হয়ে গেল, মণিময়, কি কথার কি জবাব শুনছে সে। জোরে চেঁচিয়ে উঠলো সে—ইন্দ্র।

বাবা মারা যাবার পর থেকেই দেখছি তুমি খালি ট্যাক্‌ ট্যাক্‌ করে কথা শোনাচ্ছ। সেদিন মাকে অযথা কতকগুলো কথা শোনালে। টাকার যদি তোমার এতই মায়া, তো এসো না এখানে। আমরা ভিক্ষে করে খাবো তবু তোমার ব্যঙ্গ শুনবো না, করুণার দান নেবো না। কক্ষনো না।

আর কোনও কথার জবাব দেবার অবকাশ পেলো না মণিময়। জামার হাতায় চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ইন্দ্রনাথ।

মল্লি সোজাই জবাব দিল, কলেজে আর পড়তে চাই না দাদা। একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখছি।

কোথায় কোথায় চেষ্টা করছিস বল দেখি যদি চেনা-শোনা বার করা যায়।

সে তুমি পারবে না দাদা। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজ করেন এই যে স্কট লেনের হিরণ্ময়দা উনি বলেছেন ক্লার্কশিপ পরীক্ষাটা দিতে। এই তো কাল বিকেলেই এসে সার্ভিস কমিশনের ফর্মগুলো সব দিয়ে গেলেন। কি চমৎকার লোকটা গত মাসে আমাদের সবাইকে মেট্রোয় 'ক্যুয়ো ভাডিস' ছবিখানা দেখিয়ে আনলেন। তারপর আমিনিয়ায় তন্দুরী রুটি আর মাংসের চপ যা চমৎকার না। মাংসের স্বাদটা যেন এখনও তার জিবের ডগায় রয়েছে এমন ভাব করলো মল্লি। আমি, মেজদা, চামেলী, মলি সবাই—পনেরো কুড়ি-টাকা খরচা হোল ওর। সেদিনই তো চামেলীকে কতগুলো কি বই কিনে এনে দিলেন। অবশ্য ওঁকে দাম দিতে হয় নি কোন্‌ পাব্লিশার্স নাকি ওর বিশেষ বন্ধু, অনেক কথাই জানালো মল্লি।

কে হিরণ্ময়বাবু চিনতে পারলো না মণিময়। তবে এটুকু বুঝলো যে, এ সংসারে তিনি প্রবেশাধিকার পেয়েছেন আজ নয় চন্দ্রকান্তবাবুর আমল থেকেই। সময়ে অসময়ে টাকা-কড়ি দিয়েও নাকি সাহায্য করেন তিনি। মণিময় এ সবের কিছুই জানে না।

হিরণ্ময়বাবুটির এ বাড়ীতে আগমন তাহলে বেশ পাকাপাকি হয়ে গেছে, কি বল মা, মাকে সামনে পেয়ে পরের দিন সকালবেলায় জিজ্ঞাসা করলো মণিময়।

ও ইন্দ্রর বন্ধু। আসে যায়, সময়ে অসময়ে নানা উপকারে লাগে। ছেলেমেয়েগুলো সব দাদা দাদা করে। অনেকটা কৈফিয়ত দেবার মতো শোনালো চারুলতার কণ্ঠস্বর।

তা কথাটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা কেন?

লুকিয়ে রাখাটা আবার তুই দেখলি কোথায় মণি। আসে যায়, জানি একদিন দেখা হলে তুই নিজেই আলাপ করবি, তাই আর ওকে বলি বলি করেও বলা হয় নি। আর সংসারের সব খবরে তোরই বা এত মাথা ব্যথা কেন বলতো—আমি তো এখনো আছি মাথার ওপরে।

আর কথা বাড়ালেন না চারুলতা। লঘু পায়ে চলে গেলেন ও ঘরে।

নুর মহম্মদ লেনের দেড়খানা

ঘরের ফ্ল্যাটে চন্দ্রকান্ত মিত্রের সংসার আজও তেমনি আছে। শুধু সেই সংসারে নেই চন্দ্রকান্তবাবু নিজেই।

কিন্তু সবই কি তাই আছে? একান্তে জানলার ধারে বসে রাস্তার গ্যাসের আলোটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মণিময়।

নূর মহম্মদ লেন দৈর্ঘে প্রস্থে তেমনি রয়েছে। যেখানে ওই কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা ডাস্টবিনটা রয়েছে সেখানেই ওটা আছে আজ দীর্ঘ বিশ বছর ধরে। সেই সব সার সার বাড়ী যাদের চেহারায় কারোর সঙ্গে যার কারও বিন্দুমাত্র মিল নেই। ওপাশে হ্যারিসন রোড ধরে ট্রাম চলছে তেমনি ঘর্ঘর শব্দ করে।

চন্দ্রকান্ত মিত্রের দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটের হাফ ঘরখানার রাস্তার পাশের জানলাটির ধারে বই নিয়ে পা গুটিয়ে বসা একটি বালকের ছবি মণিময়ের মনে আঁকা আছে। অনেকদিন পরে জানলাটিয় বসে দেখলো মণিময় সেই জানলাটা তার আজকের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ছোট, অনেক অপরিসর হয়ে গেছে। জানলার বাইরের পৃথিবীটুকুতে তার আর জানবার কিছু অবশিষ্ট নেই।

ঘরের ভেতরে চোখ ফেরালো মণিময়। মায়ের সঙ্গে মল্লি চাপা গলায় কথা বলছে। হিরণ্ময়দার কথা ওকে আমি বলেছি। বলেছি তো কি হয়েছে। চোর নাকি। ওনার পাঠানো দেড়শো টাকায় যেন চলে এই সংসার। আর টাকাটা তো উনি দেন না মেজদা ওর কাজ করে দেয় তবেই না।

দুজনের কারোর গলাই শোনা গেল না এরপর।

মল্লির কালকের কথাগুলো মনে পড়লো মণিময়ের, কি চমৎকার লোক। গতমাসে মেট্রোয় আমাদের সবাইকে 'ক্যুয়ো ভাডিস' দেখালেন।

কেমন চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে এরা, ভাবছিল মণিময়। মা, ইন্দ্র, মল্লি, চামেলী, শ্যামলী, সবাই জেনেছে এই তাদের বর্তমান, এই ওদের ভবিষ্যৎ।

ক্যুয়ো ভাডিস। কোন পথে। কিন্তু কি পথে চলেছে ওরা? মণিময় ভাবছিল কোন পথে এদের নিয়ে যাচ্ছেন হিরণ্ময়বাবু নামক ভদ্রলোকেরা?

●

কোয়ার্টারে পৌঁছেই মেঘমালার চিঠিখানা পেলো মণিময়। যে চিঠিতে মেঘমালা লিখেছে, তোমার কাজ থেকে ছুটি আজ আমার জন্য চাই। অনেক দরকারী কথা আছে। পত্রপাঠ চলে এসো একবার।

হাসলো মণিময়, পত্রপাঠ চলে যাবে মণিময়। যাবেই তো। কতবার গেছে। কতদিন, কতভাবে, আর আজ যাবে না সে। স্কুলে, কলেজে অফিসে এমনি চিঠি এসেছে কতবার। নাম নেই, ধাম নেই, তারিখ নেই, সম্বোধন নেই, ইতি নেই শুধু খামের গায়ে লেখা আছে ঠিকানা আর ভেতরে একটা টুকরো কাগজে লেখা আছে দুটি ছত্র: এখুনি একবার চলে এসো। বড্ড তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। আজ আসতে পারবে না। অফিসে বড্ড কাজ। তবু লক্ষ্মীটি এসো। আচ্ছা কি রঙের শাড়ীটা পরবো বলো তো? কপালে টিপ দেবো কাজলের না চন্দনের? আলতা তো পরবোই তুমি যা বকো নইলে।

কি কোনও চিঠিতে লিখবে, এক প্যাকেট কোকো চকোলেট এনো তো অনেকদিন খাই না—কি কিছু কাজু বাদাম, নয়তো চালকুমড়োর মিঠি, পেঠামেঠাই।

কখনো এ চিঠিকে অবজ্ঞা করেনি মণিময়। অথচ এবার সে কলকাতায় গেলো এবং ফিরলো কিন্তু দেখা করলো না মেঘমালার সঙ্গে। নিজের বাড়ীতে তো যায়নি ইচ্ছা করেই।

আবার চিঠি এসেছে মেঘমালার, পত্রপাঠ চলে আসবে। হোলডওলটা খুলবে সে। বিদায় দেবে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে। না আবার ফিরতি গাড়ীতে যাবে হরিহরপুর স্টেশনে। সেখান থেকে রাত দু'টায় ট্রেন। ভোরে পৌঁছবে কলকাতা, সাড়ে ছ'টায় মেঘমালাদের বাড়ী।

পিয়ন মকর রান্না চাপিয়েছে। বাইরে এল গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে। মালপত্রগুলো টেনে আনলো ভেতরে।

বাবু বাস পেলেন না বুঝি, ট্রেন লেট ছিল। মকর জিজ্ঞাসা করল।

নারে, বাস আজকে আসেই নি। কৃষ্ণনগর থেকে ছেড়েছে কিনা তাই সন্দেহ।

তাই আমি ভাবছি যে বাবুর এত দেরী হচ্ছে কেন। বাসের আওয়াজও তো পাচ্ছি না সন্ধ্যে থেকে। রাত তো কম হয়নি। তিন-চার ঘণ্টা হবেই।

ঘড়ি নেই মকরের। দিন রাতের হিসেব সে কলের ঘড়ি দিয়ে ছকে বেঁধে করে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে সকাল, তা দু'ঘণ্টা হোল। চা করে দেবো বাবু। যেন সকাল দু'ঘণ্টা হলেই চা খেতে হবে।

(ক্রমশ।

॥ পঞ্চাশ ॥
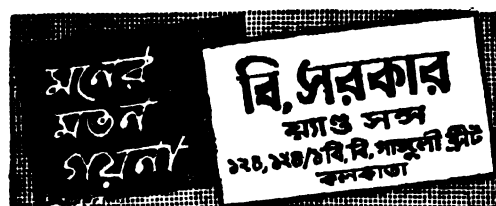
একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। জগৎ মিথ্যা। মায়া শুধু কায়ার ছায়া। সত্যকে জানতে হলে, সত্যকে পেতে হলে চাই নির্বিকল্প সমাধি। মাঝখান চলবে না। চলবে না রূপাশ্রয়।

তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে বসেন। তাঁকে নির্বিকল্প সমাধিতে করতে হবে সমাহিত। আত্মধ্যানে সমাহিত।

কিন্তু একি?

চোখ বন্ধ করে ধ্যানাসনে বসলেই শ্রীরামকৃষ্ণ এ কি দেখছেন? আলোর ঝর্ণাধারায় চারিদিক স্নিগ্ধ স্নাত করে কে দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে? এ যে তাঁর চিরারাধ্যা মা জগদম্বা।

অনেক ঊর্ধ্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] সমাধিমগ্ন। রূপ থেকে গেলেন অরূপে। রূপের আড়ালে বেজে উঠলো অরূপ বীণা। ভুবন ভরে উঠলো নবসুরে। নিকটে দূরে ভেদ গেল ঘুচে। মন ছুটে গেল সীমা থেকে অসীমে। অন্ত থেকে অনন্তে। আনন্দ থেকে সচ্চিদানন্দে। জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে। নদী থেকে সাগরে। তুচ্ছ থেকে বিরাটে। সাধারণ থেকে ভূমায়, সর্বব্যাপ্তিতে। অদ্বৈতে। ব্রহ্মানন্দ সাগরে।

তোতাপুরী পাশে বসেছিলেন। দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন। নির্বিকল্প সমাধি। আস্তে আস্তে কুটিরের বাইরে এলেন। কে জানে কেউ আবার এসে যদি বিরক্ত করে কুটিরে এসে। তাই কুটিরে তাড়াতাড়ি তালা মেরে [illegible] হাত দিয়ে দেখলেন মা ঠিক আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন।

বেদান্তের অন্ত নির্বিকল্প সমাধি। চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সাধনার ফল। আপন শিষ্যের তপস্যায় সফলতার আনন্দে নৃত্য করেন তোতাপুরী। আত্মহারা হন সর্বত্যাগী নাগা।

কি শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়। তিন দিনে নির্বিকল্প সমাধি। যেন বিশ্বাস হয় না সন্ন্যাসীর।

●

এখন যে এ সমাধি ভাঙতে হবে। বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেছে সমাধিতে। আর কতক্ষণ বসবেন এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণ স্পর্শে যে কিছুই হবে না তাঁর।

ধারাবাহিক রচনা ॥

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

'তোমার ঐ নির্বিকল্প সমাধি আমাদের হবে না। আমি পারব না মনকে নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে মগ্ন করতে।'

হাল ছাড়েন না তোতাপুরী।

একদিন দুদিন করে তিন-তিন দিন গেল কেটে। এবার তোতাপুরী ধৈর্য হারান। অনুরাগেই আনে রাগ।

বলেন, 'চেষ্টা করো। চেষ্টা করো। কেন হবে না?'

কুটিরে পড়েছিল কাচখণ্ড। তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিলেন তোতাপুরী। ছুঁচের মতন তীক্ষ্ণ অংশটুকু তাড়াতাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূতে দিলেন ফুটিয়ে।

নিয়ে এসো এই বিন্দুতে তোমার সমস্ত মনটুকু।

দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে বসেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গভীর ধ্যানে। জ্ঞানকে কল্পনা করলেন অসি। সেই অসি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করলেন মনের মূর্তিকে। আর রইলো না কোনো বিকল্প। মন চলে গেল নাম ধ্যানের [illegible] দিলেন সন্ন্যাসী। পাশেই পঞ্চবটি সেখানে রইলেন প্রতীক্ষায়। শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান প্রতীক্ষায়।

কিন্তু একি?

সারাটি দিন গেল। এলো রাত। রাত গেল এলো দিন। এমনিভাবে কাটলো এক দুই করে তিনদিন, তিন রাত। শ্রীরামকৃষ্ণ তো ডাকছেন না তাঁকে কুটির দ্বার খুলে দিতে।

সন্দেহ জাগে তোতাপুরীর মনে। জাগে চঞ্চল ব্যাকুলতা। কি হলো শ্রীরামকৃষ্ণের?

দরজা খুলে ধীরে ধীরে কুটিরে প্রবেশ করেন তোতাপুরী। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আর আপনাতে নেই। মন ছুটে গেছে মেঘের মাঝখানে। অনন্তের সাথে লীন হয়েছে তাঁর প্রাণমন। নিষ্কম্প নির্বাত দীপশিখা। পরম ব্রহ্মে বিলীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

হরি ওঁ।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নাগা সন্ন্যাসীর কণ্ঠ ভেসে গেল গঙ্গার তরঙ্গে নেচে নেচে দূরে দূরান্তে। অণু-পরমাণুতে বাজতে লাগলো সে প্রতিধ্বনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ নেমে আসেন সমাধি থেকে শরীরে।

নির্বিকল্প সমাধিতে একুশ দিনেই শরীর মিলে যায় মহাসমাধিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের এখন আর অন্য কোনো সাধনায় মন লাগে না। আনন্দামৃতের স্বাদ পেয়েছেন নব সাধনায়।

শুধু আনন্দ। সচ্চিদানন্দ। নির্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত ভাবে পরমব্রহ্মে লীনভাব! আর তাঁর কি চাই?

শুধু নির্বিকল্প সমাধিতে থাকলেই যে চলবে না। নিজের আনন্দ নিয়ে সচ্চিদানন্দে কাল কাটালে চলবে কেন। তাঁকে দিয়ে মা জগদম্বার অনেক কাজ বাকী। লোক-কল্যাণ। লোকের ত্রাণ। কাঙালের জীবনে করুণাবর্ষণ কে করবে?

বহুজন হিতায়। বহুজন সুখায়। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য। তাদের মঙ্গলের জন্য। তাইতো ফিরে আসতে হয় সমাধি থেকে সমাজে।

উত্তরকালে এ বিষয়ে ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন, যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিনমাত্র শরীরটে থেকে শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝড়ে পড়ে তেমনি পড়ে যায়। সেখানে ছ' মাস ছিলুম। কখোন কোন্ দিক্ দিয়ে দিন আসতো, রাত যেতো তার ঠিকানা হতো না। মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে—তেমনি ঢুক্তো, কিন্তু সাড় হতো না। চুলগুলো ধুলোয় ধুলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল। হয়তো অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তাও হুঁশ হয় নি। শরীরটে কি আর থাকতো? এই সময়েই যেতো। তবে এই সময়ে সাধু এসেছিল। তাঁর হাতে রুলের মতন একটা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল। আর বুঝেছিল—এ শরীরটা দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনও বাকি আছে। এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময়ে খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনার চেষ্টা করতো। একটু হুঁশ হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এরকমভাবে কোনো দিন একটু আধটু পেটে যেতো। কোনোদিন যেতো না।

এইভাবে ছ'মাস গেছে। তারপর এই অবস্থায় কতদিন পরে শুনতে পেলুম মা'র কথা—ভাবমুখে থাক্, লোক-শিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক। তারপর অসুখ হলো, রক্ত-আমাশয়। পেটে খুব মোচড়, খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছ' মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নাবলো। সাধারণ মানুষের মতন হুঁশ এলো। না হলে এ মন ছুটে গিয়ে থাকতো নির্বিকল্প অবস্থায়।'

আর একদিন বলেছেন, 'এখানকার মনের স্বাভাবিক গতিই উর্ধ্বদিকে। নির্বিকল্পের দিকে। সমাধি হলে আর নামতে চায় না। তোদের জন্য জোর করে নামিয়ে আনি। কোনো একটা নীচেকার বাসনা না ধরলে নামবার তো জোর হয় না, তাই তামাক খাবো, জল খাবো। সুক্তো খাবো। অমুককে দেখবো, কথা কইবো এরকম ছোটো-খাটো বাসনা মনে তুলে বার বার সেইটে আওড়াতে আওড়াতে তবে মন ধীরে ধীরে নীচে নামে। শরীরে নামে। আবার নামতে নামতে হয়তো উর্ধ্বে চোঁচা দৌড়ুলো। আবার তাকে তখোন ঐরকম বাসনা দিয়ে ধরে নামিয়ে আনতে হয়।'

আরে ফির কিউ রোটি ঠোক্তে হো?

দুহাতে তালি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন গাইছিলেন। পঞ্চবটিতে বসে প্রায় রোজই করেন ওরকম। মাকে শোনান কীর্তন। কখনও শ্যামার নাম, কখনও বা শ্যামের।

তোতাপুরী আগেও দেখেছেন। হেসেছেন মনে মনে। ভেবেছেন বেদান্ত সাধনের পর আর চলবে না এ সব নামকীর্তন।

কিন্তু একি? এ অভ্যাস যে এখনও গেল না।

নির্বিকল্প সমাধির আস্বাদ পেয়েছেন যিনি এখনও গেল না তাঁর আকারের ভজনা?

হেসে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, দূর শালা। আমি রুটি ঠুকছি? আমি যে মাকে কীর্তন শোনাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছো না গান গাইছি আর হাতে তালি দিচ্ছি? আর কিছু বললেন না গুরুকে।

'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে' প্রায়ই বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তোতাপুরী শুধু শোনেন আর হাসেন। ভারী অসুখ করেছে তোতাপুরীর অসম্ভব যন্ত্রণা পেটে। আমাশয়ের দোষ কি? দেহের ওপর যে বিন্দুমাত্র মায়া নেই যোগীর। যত্ন নেই। তার ওপরে বাংলা দেশের হাওয়া মোটেই সহ্য হয় না পশ্চিমের মানুষের। যাই যাই করেও যে মন্দির ছেড়ে যাওয়া হয়না। শ্রীরামকৃষ্ণ আটকে রেখেছিল। এখনও যে তোতাপুরীর সাধনা সম্পূর্ণ হতে কিছু বাকী।

ভয়ানক—অসহ্য যন্ত্রণা। আর সহ্য হয় না তোতার। গভীর রাতে যান গঙ্গায় ডুবে যেতে। আর যে সহ্য হয় না বেদনা।

কি আশ্চর্য! এত বড় গঙ্গা, তাতে ডুবে মরার জল নেই? যেদিকেই যান তোতা মাজা-সমান জল। এ কি নয় সেই উত্তাল তরঙ্গপ্রবাহিনী পূর্ণযৌবনা গঙ্গা? হাড়মাসের খাঁচাটা আর রেখে কাজ নেই। চল্লিশ বছরের সাধনায় মনটুকু পর্যন্ত বশে আনা হলো না।

ব্রহ্মচিন্তা করতে করতে তোতা এগিয়ে যান মাঝ গঙ্গায়। সেখানেও জল নেই।

ব্রহ্মজ্ঞানী তাপস এতক্ষণে বুঝতে পারেন, এ যে মায়ার খেলা। বিশ্বজননী জগদম্বার খেলা। এতদিনে চোখ খুললো তোতাপুরীর। ভুল হয়েছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনায় তাই হয় নি পূর্ণ সফলতালাভ। শিষ্যের সংস্পর্শ করেছে তাঁর পুণ্য জীবন ধন্য। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই মায়া। যিনি শিব তিনিই শক্তি। ব্রহ্মশক্তি থেকে ব্রহ্ম আলাদা হবে কি করে? হরগৌরী যে অভিন্ন। শরীর, যন্ত্রণা, জীবন, মৃত্যু, জ্ঞান, অজ্ঞান সবই যে অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা জগদম্বা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে এতদিন শুনেছেন তোতা, এতদিনে সেটা অনুভব করলেন মনে প্রাণে। নির্গুণা গুণাতীতা, সাকার আকার নিরাকারা, পরম ব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি জগদম্বা।

তোতা তাড়াতাড়ি পরমানন্দে গিয়ে ধ্যানাসনে বসেন ধুনীর পাশে। পরম পবিত্র হোমানল স্পর্শে ধ্যান করেন মা জগদম্বার।

সব শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যে জানতেন এমনিটি হবে। এই জন্যই যে তোতার দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন। তিনি যে এতদিন এই দিনটিরই অপেক্ষায় প্রহর গুণেছেন।

আনন্দে আত্মহারা তোতার বেদনা কোথায় উড়ে গেছে। আর সে যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র নেই। নেই কোনো রোগ। শোক। মন চলে গেছে শোক-দুঃখ আনন্দ-বেদনার উর্দ্ধে। মা যে ত্রিতাপহরা। পরমানন্দময়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বলেন, তবে না বলতে তুমি এ সব মায়া মিথ্যে? তুমি না বলতে মায়ের খেলা মায়ামাত্র? তুমি না বলতে মায়ের চিন্তায় নেই কোনো প্রয়োজন? এবার কেমন হলো? কতবার তোমাকে বলেছি ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। কেমন জানো? এই যে দেখছো আগুন। এই আগুনের দাহিকা শক্তি, আর আগুনে আছে কোনো ভেদ? নেই। ঠিক তেমনি ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভেদ। অবিচ্ছেদ্য।

তোতাপুরী বুঝলেন, কেন মা তাকে এতদিন আটকে রেখেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। কেন তাঁর মন অকারণ চঞ্চলতায় দিনের পর দিন ছটফট করেছে। মায়ের করুণা হয়েছে বঞ্চিত। সেই কৃপাবিন্দু পাথেয় নিয়ে এবার সাধক পাড়ি দিতে চান জীবনের বাকী পথটুকু।

●

অদ্বৈত জ্ঞান দেওয়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণকে মা জগদম্বা। তোতাপুরীকে তাই তো পাঠালেন। শুধু কি অদ্বৈত জ্ঞান? এ মহাতাপসকে সন্ন্যাস দেবেন কে? কার আছে এতখানি তপস্যার্জিত পরম শক্তি? তাইতো মা পাঠালেন তোতাপুরীকে। সবই যে তাঁরই অপার করুণা। আপন গুরুতে যদি কখনও জাগে সন্দেহ, সংশয়।—তাইতো তোতাকে দিলেন মাতৃভক্তি। চল্লিশ বছরের ব্রহ্মবাদীকে দিলেন ব্রহ্মশক্তির আস্বাদন। সেও যে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণকে খুশী করতে। তাঁকে গুরুর কাছে এগিয়ে নিতে। গুরুকে এগিয়ে আসতে তাঁর কাছে।

সবই তো হলো এবার তাহলে আসি।

সজল নয়নে জানান তোতাপুরী। রমতা সাধু। ত্রিযামিনীর বেশী কোথাও কাটান না মুহূর্তটুকু। দেখতে দেখতে এগারোটা মাস কেটে গেল দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে।

মনে মনে প্রশ্ন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ কোথা যাবে?

মুখে বলেন না কিছু।

হেসে তোতপুরী বলেন, নিজেই জানি না কোথায় যাবো। তোমার মা জগদম্বা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব।

নির্ভরতা এসেছে। ভগবানে নির্ভর। এ ছাড়া যে নেই গতি। এ যে বিশ্বাস, এ যে প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি। এর জায়গা যে জ্ঞানের অনেক উর্দ্ধে। এইটেই যে চাইছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যে গুরুকে ভালবাসেন। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন অভিন্ন আত্মা। তাই যে ঠিক নিজের ভাবে আনতে চাইছিলেন মনের মানুষকে—গুরুকে, সখাকে, বন্ধুকে। সতীর্থ সন্ন্যাসীকে।

শুধু আমার মা কেন? তোমারও মা। জগতের সবার মা। জগজ্জননী জগদম্বা। হ্যাঁ ঠিকই বলেছো। তিনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাবে। তাছাড়া যাবার কি পথ আছে?

ধুনীর আগুন এখনও নেবে নি। পঞ্চবটিতে এখনও জ্বলছে সে পবিত্র হোমানল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন

গঙ্গার কিনারায়। এতক্ষণে কোথায় গিয়ে পৌঁচেছেন ন্যাংটা কে জানে? আর কোনোদিন তাঁর দেখা হবে কি না তাই বা কে জানে?

অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাই হচ্ছে তাই করে যা। কোনো চিন্তা নেই। মা সব ঠিক করে দেবেন। সত্যি তোতাপুরীর এই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে হাজির হওয়াটা একটা ভারি আশ্চর্য ঘটনা। এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে সেদিনের সেই দৃশ্য। সত্যি কি আনন্দই না দিয়ে গেলেন একদিন তোতপুরী। নির্বিকল্প সমাধিতেই তো মগ্ন থাকতে পারতেন সন্ন্যাসী। কি দরকার ছিল তাঁর তীর্থ পর্যটনের। মা জগদম্বার নির্দেশেই যে তাঁকে আসতে হয়েছে বাংলার মাটিতে।

'মন কুড়িয়ে এক করে সব চিন্তা ভুলে যা। মা জগদম্বার চিন্তাটুকুও ছেড়ে দে। কোনো আকারের চিন্তা নয়। নিরালম্ব। শুধু আকারহীন আশ্রয়হীন ভাবনা আন্ মনে।'

কি ঝড়টাই না গেছে। মার চিন্তা ছেড়ে দেওয়া।

কিন্তু কোথায় গেল চল্লিশ বছরের সেই ব্রহ্ম উপাসনা? ভক্তির স্রোত এসে যে সব ভাসিয়ে দিলে। কোথায় ভেসে গেল জ্ঞানের গরিমা!

'পাচসিকে পাঁচ আনা' মনের কাছে কে দাঁড়াতে পারে?

যোগী তোতার ওপর যে চিরদিনই ঠাকুরের অগাধ ভক্তি ছিল, সেটা তাঁর অদ্বৈত ভাবাতীত ভাবে তীব্র সাধনা। নিজে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে করাতেন।

'বেদান্তের অদ্বৈত ভাবটা কি জানিস? ওটা সব শেষের কথা। কি রকম জানিস? যেমন অনেক দিনের পুরানো চাকর। মনিব তার গুণে খুশী হয়ে তাকে সকল কথা বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুব খুশী হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। চাকর সঙ্কোচ করে, কি করো কি করো বললেও মনিব জোর করে টেনে বসিয়ে বললে আঃ বস্‌না। তুইও যে আমিও সে—সেই রকম।'

তখন আর থাকে না কোনো ভেদাভেদ।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই মন হয়ে যায় লীন। শোনো, মনে মনে বিচার করো। তারপর মিথ্যার আলিঙ্গন ছেড়ে সত্যকে আঁকড়ে ধরো। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, শুনলে। সেটা বিচার করলে। মনে মনে পাকা করলে। তারপর মিথ্যাকে ছেড়ে শুধু সত্যকে ধ্যান। ব্রহ্মে সম্পূর্ণ সমর্পণ।

বেদান্তের অদ্বৈতভাবের পথই যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন।

এর জন্য চাই ত্যাগ। মায়া ছাড়তে হবে। মায়াই যে মিথ্যা। অলীক। তাঁর দয়া ছাড়া সেটা কখনই আসে না।

'কি জানিস? কামকাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়াটা, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ওরকম ধারণা যদি করিয়ে দেন, তাহলেই শুধু হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি? সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা করতে পারে?'

চাই শুধু হৃদয়ের অনাবিল ভক্তি। অকৃত্রিম অনুরাগ। জানিস না 'ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারে না, তখন ভক্ত হল রস। ভগবান হল রসিক। ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অরুন্ধতী

বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েটি রোজ চেয়ে থাকে উন্মুক্ত আকাশের দিকে;
রাত্রে গোণে আকাশের তারা, আর দিনে গোণে বিহঙ্গ।
হঠাৎ কোনদিন দেখতে পাই
সে আমার দিকেই চেয়ে রয়েছে আনমনে,
কত গভীর নিষ্প্রভ তার দৃষ্টি,

জানি না, সে দৃষ্টির সীমা আছে কিনা?
মনে হয় সমুদ্রের চেয়েও বুঝি তা অতলস্পর্শী!
কতদিন ভেবেছি—প্রশ্ন করি—
তবু কেন যেন পারি নি, হেরে গেছি লজ্জায়? তা না নয়।

তার নাম অরুন্ধতী, মাতৃবিফলা, অভিশপ্তা নারী।
প্রেমবঞ্চিতা—রূপের আধার—ব্যর্থতার নিষ্ফল চাউনি।
জানি সে চেয়ে থাকবে জগতের সব সার্থক নারীদের দিকে,
ব্যর্থতার আক্রোশে জ্বলন্ত তার চোখ, তবু বাহ্যিক সুপ্ত।

সে জ্বলছে—জ্বলবে
যতদিন না এ বিশ্বসৃষ্টি ধ্বংস হয়।

দৃশ্য

সেজুয়ানের মহৎ নারী

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[একটি ছোট তামাকের দোকান--- এখনও দোকান খোলে নি]

শেন্‌টে। (দর্শকদের প্রতি) দেবতারা আসার পর তিনদিন হয়ে গেল। তাঁরা বলেছিলেন রাত্রে থাকার জন্যে আমাকে টাকা দেবেন। যা দিলেন, হিসেব করে দেখি এক হাজার ডলারেরও বেশি তাঁরা আমাকে দিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে এই তামাকের দোকানটা কিনেছি। গতকাল এখানে উঠে এসেছি---এখন আশা হচ্ছে অনেক কিছু সৎ কাজ করতে পারব। এই দোকানের পুরোনো

বেরটল্ট ব্রেশট

মালিক মিসেস সিনের ব্যাপারটাই দেখুন না। গতকাল মহিলা এসেছিল আমার কাছে ছেলেপিলেদের জন্যে চাল চাইতে। আবার দেখছি [illegible] এদিকে আসছেন।

(মিসেস সিন আসবে---দুজনে দুজনকে বাউ করবে।)

শেন্‌টে। শুভ সন্ধ্যা মিসেস সিন।

মিসেস সিন। শুভ সন্ধ্যা মিস শেন্‌টে। নতুন বাড়ি লাগছে কেমন?

শেন্‌টে। ভালই লাগছে। আপনার ছেলেমেয়েরা নতুন জায়গায় কেমন রাত কাটাল্যে?

মিসেস সিন। অন্যের বাড়ি, অবশ্য ঐ লড়ঝড়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটাকে ঠিক বাড়ি বলা যায় না। বাচ্চাটা যা কেসেছে সারারাত।

শেন্‌টে। এটা তো ভাল খবর নয়।

মিসেস সিন। কতোটা খারাপ, সে তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তোমার এখন 'ভাল সময়'---কিন্তু এখানে থাকলে অনেক রকম অভিজ্ঞতা হবে। এখানকার সারা পল্লীটাই নোংরা এবং জঞ্জালে ভর্তি।

শেন্‌টে। ঠিকই বলেছ। দুপুরে সিমেণ্ট কারখানার লোকগুলো এসেছিল।

মিসেস সিন। আর কেউ কিনতে আসে না। কাছাকাছি যারা থাকে তারাও না।

শেন্‌টে। দোকানটা আমাকে বিক্রি করবার সময় কিন্তু এসব কিছুই বলো নি।

মিসেস সিন। বলো বলো, যা মন চায় বলে নাও। আমার বাচ্চাদের মাথা গোঁজবার ঠাঁইটা প্রথমত টাকার জোরে ছিনিয়ে নিলে--- এখন যা মন চায় বলো। বলো আমি ঠগ, জোচ্চোর---আমাকে সবই সহ্য করতে হবে---

(কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে)

শেন্‌টে। একটু দাঁড়াও, তোমাকে চাল এনে দিচ্ছি।

মিসেস সিন। আমি কিছু টাকা ধার নিতে এসেছিলাম।

শেন্‌টে। (ওর পাত্রে চাল দিয়ে) টাকা দিতে পারব না। এখন পর্যন্ত কোনো কিছু বিক্রীই করতে পারি নি।

মিসেস সিন। টাকা না হলে চলবে কি করে? আমার সবকিছু তুমি নিয়ে নিয়েছ। তুমি যদি এভাবে আমার গলায় ছুরি চালাতে চাও, তাহলে আমার বাচ্চাদের তোমার দোর-গোড়ায় ফেলে রেখে যাব। বুঝলে?

(একটান দিয়ে শেন্‌টের হাতের পাত্রটা কেরে নেবে।)

শেন্‌টে। এত মেজাজ করো না—টানাটানিতে চালগুলো মাটিতে পড়ে নষ্ট হবে।

[এক বয়স্ক দম্পতি ও একজন নোংরা পোষাকপরা লোক ঢুকবে]

মহিলা। এই যে প্রিয় শেন্‌টে—আমরা শুনলাম তুমি ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছ। এখন দেখছি তুমি ব্যবসা সুরু করে দিয়েছ। ভাবতে পারো আমরা আজ ঘরছাড়া। আমাদের তামাকের দোকানটা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ভাবলাম একটা রাত তোমার কাছে নিশ্চয় আশ্রয় পাবো। আমার ভাইপোকে তো জানো—ও আমার আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে না।

ভাইপো। (চারিদিকে চেয়ে) বেশ চমৎকার দোকান তো!

মিসেস সিন। এরা আবার কারা?

শেন্‌টে। আমি যখন প্রথম গ্রাম থেকে এ শহরে আসি, এরাই ছিল আমার প্রথম বাড়িওয়ালা। (দর্শকদের প্রতি) আমার জমা টাকা ফুরিয়ে গেলে, এরা আমাকে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল। এখন বোধ হয় ভয় পাচ্ছে আমি ওদের রাস্তা দেখিয়ে দেব। কিন্তু ওরা সত্যিই গরীব। এদের না আছে কোনো আশ্রয় না কোনো বন্ধু-বান্ধব, এদের দরকার সাহায্যের, এদের কি করে দূর করে দিই? (মহিলাকে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে) তোমাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি, আমি খুশিমনে তোমাদের আশ্রয় দেব। কিন্তু দোকানের পেছনে যে ঘরটি আছে, সেটি কিন্তু খুব ছোট।

পুরুষটি। ওতেই আমাদের চলে যাবে। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরা পেছনের দিকে চললাম—তোমার কাজের বাধা হবো না। প্রথম আশ্রয়স্থলের কথা মনে থাকতেই নিশ্চয়ই তামাকের দোকান নিয়েছ। এ ব্যাপারে আমিও তোমাকে দু চারটে উপদেশ দিতে পারব। আর খানিকটা সেই কারণেই তুমি তামাকের দোকান খুলেছ শুনে এখানে এলাম।

মিসেস সিন। (কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে) এই সঙ্গে সঙ্গে দু' একজন খরিদ্দার যদি আসতো।

মহিলা। এ কি আমাদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে?

পুরুষ। চুপ, চুপ, একজন খরিদ্দার সত্যিই আসছে।

(ছিন্নভিন্ন পোষাকে একটি লোকের প্রবেশ)

লোকটি। ক্ষমা করবেন, মিস আমি বেকার।

(মিসেস সিন হেসে উঠবেন;

শেন্‌টে। আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি বলতো?

বেকার। শুনলাম তুমি কাল দোকান খুলেছ? বাঁধা জিনিষপত্র খুলতে গিয়ে অনেক সময়েই দেখা যায় ভেতরের মাল খানিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা সিগারেট দাও না?

মহিলা। কতদূর বেয়াদপ! তামাক ভিক্ষে করছেন। তামাক তো রুটি নয়—

বেকার। রুটির তো অনেক দাম! সিগারেটে দু' তিনটে টান দিলেই নতুন মানুষ বনে যাব—এ তো মিইয়ে গেছে।

শেন্‌টে। (সিগারেট দিয়ে) দামী কথা বলেছ—নতুন মানুষ বনে যাবে। কাল তোমাকে নিয়েই দোকান খুলব—হয়তো তোমার থেকেই সৌভাগ্য আসবে।

[বেকার খুব তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দেবে এবং কাশতে কাশতে বেরিয়ে যাবে]

মহিলা। এটা কি ভাল কাজ হ'ল?

মিসেস সিন। এইভাবেই যদি তুমি দোকান খোলো, তাহলে তিনদিন যেতে না-যেতেই তোমাকে দোকান বন্ধ করতে হবে।

পুরুষ। আমি বাজী রেখে বলতে পারি ও লোকটার হাতে পয়সা ছিল।

শেন্‌টে। কিন্তু ও যে বলল ওর কিছু নেই।

মহিলা। শেন্‌টে না করতে জানে না। তুমি বড় ভাল শেন্‌টে। দোকান চালাতে হলে বাজে লোকেদের হটিয়ে দিতে হবে।

পুরুষ। ও সব লোককে বলবে দোকানটা একজন আত্মীয়ের। আর সে হিসাব - নিকাশ ব্যাপারে ভয়ানক কড়া। এইভাবে কাজ চালিয়ে যাও তো?

মিসেস সিন। দয়ার অবতার হয়ো না বসে, এইভাবেই লোককে তাড়িয়ে দেবে, বুঝলে?

শেন্‌টে। (হাসতে হাসতে) বিরক্তি দেখাবো তো? তাহলে তোমরাও ঘর পাবে না—আর আমার চালও আমি ফিরিয়ে নেব।

মহিলা। সে কি, ওই চালটা তুমি বুঝি দিয়েছ?

শেন্‌টে। (দর্শকদের)
এরা কিন্তু ভাল নয়
এদের কোনো বন্ধু নেই
অন্যকে কিছু দিলে এরা বিরক্ত হয়
সবকিছু নিজেরাই নিতে চায়
এদেরই বা দোষ দিয়ে লাভ কি?

[একটি ছোটখাটো লোককে আসতে দেখা যাবে। মিসেস সিন তাকে দেখেই সরে পড়বে এবং যাবার সময় বলবে]

মিসেস সিন। আচ্ছা, আবার কাল আসব।

(খাটো মানুষটি মিসেস সিনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে)

ছোট মানুষটি। মিসেস সিন, তোমার খোঁজেই এসেছিলাম।

(মিসেস সিন ভভক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে)

মহিলা। মিসেস সিন কি রোজই আসে? তোমার কাছে কিছু দাবি-দাওয়া আছে না কি?

শেন্‌টে। না দাবি নেই। খিদের তাড়ায় আসে---আর এতবড় দরকারটাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ছোট মানুষটি। ও জেনেশুনেই পালিয়ে গেল। তুমি বুঝি নতুন, মালিক---শোনো, আমি হচ্ছি ছুতোর মিস্ত্রী—ওই বদমাইস মহিলা আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে এখন পর্যন্ত আমার পাওনা টাকা দেয় নি। টাকা না পেলে ওইসব সেল্‌ফ্ আমি তোমার দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাব।

শেন্‌টে। কিন্তু দোকান কেনবার সময় আমি তো এ সবের দাম ওকে দিয়েছি।

ছুতোর। আমি সে সব জানি না— একশো রূপোর ডলার আমার পাওনা আছে। সেটা আমি আদায় করে ছাড়বো---তা না হলে আমার নাম লিনটো নয়।

শেন্‌টে। আমি কি করে দেব। আমার আর টাকা নেই।

ছুতোর। তাহলে তোমার দোকান যাতে বিক্রি হয়ে যায় সে ব্যবস্থা আমি করবো।

পুরুষ। (শেন্‌টেকে প্রম্পট করবে) তোমার সেই কাজিন---

শেন্‌টে। আসছে মাসে এস।

ছুতোর। (চিৎকার করে) না।

শেন্‌টে। এত নির্দয় হয়ো না মিস্টার লিন্‌টো। একসঙ্গে সবার পাওনা কি করে আমি মেটাব বল? একটু ধৈর্য ধরো।

লিন্‌টো। আমার সঙ্গে বা আমার পরিবারের বেলায় তো কেউ ধৈর্য ধরে না। আমার পাওনা চুকিয়ে দাও, নইলে ওইসব শেলফের তক্তাগুলো খুলে নেব।

ভাইপো। তোমার সেই কাজিনকে জানিয়ে দাও। (ছুতোরকে) তোমার দাবি-দাওয়া লিখিতভাবে জানাও—শেন্‌টের কাজিন দেখা চুকিয়ে দেবে।

ছুতোর। ওইসব কাজিনের ধাপ্পা আমার কাছে চলবে না—

(হো-হো করে হেসে উঠবে)

ভাইপো। বোকার মত দাঁত বের করে হেসো না। ওই কাজিন আমার বিশেষ বন্ধু।

পুরুষ। কাজিনের স্বভাবটা কিন্তু তীক্ষ্ণধার ছুরির মতো।

ছুতোর। আচ্ছা, আচ্ছা, তাকেই বিল পাঠিয়ে দেবো।

(একধারে এসে বিল তৈরী করতে মন দেবে)

মহিলা। (শেন্‌টের প্রতি) ওকে এখন থামাতে না পারলে তোমার গায়ের জামা পর্যন্ত খুলে নেবে। আমি বলি কি---সত্য হোক, কি মিথ্যে হোক, কোনো দাবি-দাওয়া তুমি মেনে নিও না---তাহলে কিছুতেই সামলাতে পারবে না। রাস্তায় রুটির টুকরো ছুঁড়ে দাও, দেখবে কুকুরের দল এসে কামড়া-কামড়ি সুরু করে দিয়েছে---পাওনাদারেরা-ও সেইরকম---তাছাড়া সলিসিটররা রয়েছে কেন?

শেন্‌টে। লোকটি কাজ করেছে--- পয়সা না নিয়ে তো সে চলে যেতে পারে না। তারও সংসারের ভরণপোষণ চালাতে হয়। কি বিশ্রী ব্যাপার---ওকে দেবার মতো টাকা আমার হাতে নেই। দেব তারাই বা কি ভাববেন?

পুরুষ। আমাদের যে মুহূর্তে আশ্রয় দিয়েছ, তখনই তোমার যথেষ্ট সৎকাজ করা হয়ে গেছে। আর কিছু ভাল কাজ করবার তোমার বিশেষ দরকার হবে না।

[একটি খোঁড়া লোক এবং একজন সন্তানসম্ভবা নারী এসে ঢুকবে—পুরুষ এবং মহিলার উদ্দেশ্যে বলবে]

খোঁড়া। এই যে তোমরা এখানে চলে এসেছ। আমাদের ফেলে রেখে এভাবে চলে আসাটা সত্যি বাহাদুরির কাজ---

মহিলা। (অস্বস্তির সঙ্গে) এ হচ্ছে আমার ভাই উং আর আমার ভাইয়ের বৌ। চেঁচামেচি কোরো না, দূরে ওইখানে গিয়ে বসো— আমাদের পুরোনো বন্ধু শেন্‌টের কাজের ব্যাঘাত হবে তোমাদের গোলমালে। (শেন্‌টেকে) ওদেরও আমাদের সঙ্গে থাকতে বলি, কি বল?

শেন্‌টে। তোমাদের আমি এখানে থাকতে স্বাগত জানাচ্ছি।

মহিলা। (ওদের প্রতি) শেন্‌টেকে ধন্যবাদ জানাও। আর এই চায়ের কাগজগুলো নিয়ে যাও। (শেন্‌টেকে) ওদের কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। তুমি দোকানটা কিনে ভালই করেছ।

শেন্‌টে। (দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাসলে) হ্যাঁ, দোকানটা নিয়ে ভালই করেছি।

[এখানে ঢুকবেন মিসেস মিৎসু---উনি এখানকার মালিক। তাঁর হাতে থাকবে একটি ডকুমেণ্ট]

মিসেস মিৎসু। মিস শেন্‌টে, আমি হচ্ছি মিসেস মিৎসু, এই বাড়ির মালিক। আমার মনে হয় আমাদের ভেতর কোনো গোলমাল হবে না। নিজের এগ্রিমেণ্টটা আমি নিয়ে এসেছি---এই দ্যাখো। (পড়ে দেখবে শেন্‌টে এগ্রিমেণ্টটা) ছোট একটা ব্যবসা চালু হল— তার মানেই এটা একটা খুবই শুভ মুহূর্ত—তোমরা কি বলো! কিন্তু শেন্‌টে, তোমার সম্বন্ধে দু-একটা পরিচয়পত্র আমার দরকার।

শেন্‌টে। না হলে চলবে না?

মিসেস মিৎসু। তোমার সত্যিকার পরিচয় তো আমার জানা নেই।

পুরুষ। মিস শেন্‌টে সম্বন্ধে আমরা সার্টিফাই করতে পারি। এ শহরে আসবার প্রথম অবস্থা থেকেই আমরা ওকে জানি।

মিসেস মিৎসু। তোমাদের পরিচয়ও তো আমি জানি না।

পুরুষ। আমি তামাক ব্যবসায়ী মা কু।

মিসেস মিৎসু। কোনখানে তোমার দোকান?

পুরুষ। বর্তমানে আর আমার দোকান নেই---ক'দিন আগেই সেটা বিক্রি করে দিয়েছি।

মিসেস মিৎসু। বটে। (শেন্‌টের প্রতি) আর কেউ নেই যে তোমার পরিচয় দিতে পারে?

মহিলা। কাজিন, তোমার কাজিন।

মিসেস মিৎসু। কিরকম ভাড়াটে রাখছি, সে বিষয়ে আমার আগে থেকে জানা চাই---আর যে ব্যবস্থা তোমাকে আগে থেকে করতেই হবে। আমার বাড়িটা হচ্ছে ভদ্রলোকের থাকবার জায়গা---

মিসেস মিৎসু। তোমার পরিচয় না পেলে এগ্রিমেন্টে সই করতে পারবো না।

শেন্‌টে। (ধীরে, মাথা নিচু করে) আমার একজন কাজিন আছে।

মিসেস মিৎসু। ও, কাজিন আছে? কাছাকাছি থাকে নাকি? তাহলে তো সোজা আমরা তার কাছে যেতে পারি? সে করে কি?

শেন্‌টে। সে অন্য শহরে থাকে।

মহিলা। তুমি তো বলেছিলে সুঙে থাকে।

শেন্‌টে। হ্যাঁ, সুঙ-এর 'মিস্টার সুইটা'।

পুরুষ। তাই বলো, আমি তো তাকে চিনি। লম্বা রোগা ধরণের দেখতে---

ভাইপো। (ছুতোরকে) ভায়া, তোমাকেও শেন্‌টের কাজিনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, মনে আছে তো ---তোমার বিলের ব্যাপারে?

ছুতোর। (বিরক্তিভরে) বিলটা তৈরী করছি। এই নাও। কাল সকালে প্রথমেই এখানে আসবো।

(বেরিয়ে যায়।

ভাইপো। (ছুতোরের উদ্দেশ্যে এবং বাড়ির মালিক মিসেস মিৎসুও যাতে শুনতে পায় এইভাবে) ভাবনা কোরো না, শেন্‌টের কাজিন তো পাওনা দিয়েই দেবে।

মিসেস মিৎসু। (শেন্‌টের প্রতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) ভাল কথা, আমিও তার সঙ্গে দেখা হলে খুশি হব। গুড ইভিনিং ম্যাদাম---

(বেরিয়ে যাবে)।

মহিলা। (অল্প বাদে) সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। বাজী রেখে বলতে পারি সকালবেলার ভেতরই বাড়িওলি তোমার সম্বন্ধে সব খবর খুঁজে বের করে নেবে।

ভাইয়ের বৌ। (ভাইপোকে এইখানেও বেশিদিন থাকা চলবে না মনে হচ্ছে।

[একটি বৃদ্ধ আর তার পথপ্রদর্শক একটি বালক ঢুকবে]

বালক। এই যে এরা সব এখানে এসেছে।

মহিলা। কি ঠাকুর্দা, কি খবর? (শেন্‌টের প্রতি) বৃদ্ধ বড় ভালো লোক। নিশ্চয় আমাদের সম্বন্ধে ভেবে ভেবে আকুল হোয়েছে। আর ছোট ছেলেটা, দেখছ কত বড় হয়েছে। প্রচুর খেতে পারে। সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?

পুরুষ। (একবার চারিদিকে তাকিয়ে) শুধু তোমার ভাইঝি আসছে। (শেন্‌টেকে) আমাদের দলটা কি বেশি হয়ে গেল? তুমি যখন আমাদের ওখান ছিলে, তখন আমাদের সংসার বড় ছিল না। তারপরে পরিবার বৃদ্ধি পেতে সুরু হল। যত অবস্থা খারাপ হয়, বাড়িতেও বেশী লোক দেখা যায়---পরিবার বাড়ে আর অবস্থাও আরও খারাপের দিকে যায়।

[শেন্‌টে দোকান বন্ধ করবে---সবাই বাইরে এসে ছড়িয়ে বসবে]

মহিলা। সব থেকে বড় কথা হল তোমার দোকান চালানোর পথে আমরা বাধা হবো না। তোমাকেই তো বাড়ির ভাবনা ভাবতে হবে। আমরা ঠিক করেছি, দিনের বেলার আমরা সব বেরিয়ে যাবো। বাড়িতে থাকবে শুধু বৃদ্ধ ঠাকুর্দা (আর ভাইয়ের বৌটি), আমিও হয়ত থাকতে পারি। (অন্যরা হয়তো দু' এক সময়ে এসে ডাক দিয়ে যেতে পারে। ছোকরারা সব আলোটালোগুলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করো। এ বাড়ি তোমাদের নিজেদেরই ভেবে নিয়ে সবদিক দেখে শুনে নিতে ক্ষতি কি?

[ভাইয়ের বৌটি হেসে উঠবে---এবার সবাই কোনো না কোনো রকমের ধূমপান সুরু করে দেবে]

ভাইপো। এস সবাই মিলে কাজিনের স্বাস্থ্য পান করা যাক।

(একভাগ মদ নিয়ে সবাইকে দেবে)

মদটা কোথা থেকে পাওয়া গেল?

ভাইয়ের বৌ। উনি তামাকের বস্তাটা আসবার আগে বাঁধা দিয়ে এসেছিলেন।

পুরুষ। বল কি? ওই তামাকের বস্তাটা তো আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। কি সর্বনেশে বল তো?

ভাইপো---আমাকে গালাগাল দিচ্ছ, আবার মদের পাত্রে চুমুক দিতেও মুখে বাধছে না।

মহিলা। থামো, গোল করো না। দোকানটা যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক ছোট। আমার আণ্ট এবং অন্য কয়েকজনকেও আসতে বলেছিলাম---কিন্তু এতজন এলে চলবে কি করে?

[বাইরে থেকে চিৎকার শোনা গেল---

'দরজা খোলো']

মহিলা। (চিৎকার করে) আণ্টি, তোমরা নাকি? (আস্তে) কিন্তু এতজন লোক এলে খরচ চলবে কি করে?

শেন্‌টে। আমার এই সুন্দর দোকানটা---কত আশা আমার মনে বাসা বেঁধেছিল---কিন্তু খুলতে না খুলতেই মনে হচ্ছে এটাকে বন্ধ করতে হবে। (দর্শকদের) যে নৌকা আমাদের পারে নিয়ে যেতে পারতো সেটা প্রথমেই

গেল ডুবে, জলে যারা হাবুডুবু খাচ্ছিল সবাই নৌকাটাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সেটাকেও দিলে ডুবিয়ে—

[বাইরে থেকে চিৎকার—
'দরজা খোলো']

॥ মধ্যবর্তী দৃশ্য ॥

সদর প্রান্তে রাস্তার ধারে
(ভিস্তি ওয়াং বসে আছে)

ওয়াং। (চারদিক চেয়ে) গত চারদিন ধরে দেবতাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—সব দিক নজর রেখেছি—কেউ আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। একদিন প্রায় সামনা-সামনি পড়ে গিয়েছিলাম আর কি। যাক এতদিনে ওঁরা নিশ্চয় অন্য কোনো জায়গায় চলে গিয়েছেন—আর ভয় নেই।

[দেওয়ালে হেলান দিয়ে ওয়াং ঘুমোতে থাকবে—মৃদু সঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যাবে—তারপরে দেবতারা এসে সামনে দাঁড়াবেন। হঠাৎ চোখ খুলে ওঁদের দেখতে পেয়ে ভয়ে দুহাত মুখের সামনে চাকা দিয়ে বলতে থাকবে]

ওয়াং। দোহাই আমাকে বকাবকি করবেন না—আমি স্বীকার করছি আপনাদের জন্যে সে রাত্রে কোনো আশ্রয় যোগাড় করতে পারি নি। আমি অপরাধ স্বীকার করলাম—দয়া করে আমাকে রেহাই দিন।

২য় দেবতা। তোমার ভুল হয়েছে। একটা আশ্রয় তুমিই ঠিক করে দিয়েছিলে। তুমি চলে যাবার পর সে এসেছিল। রাত্রের জন্যে আমাদের তার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল—আমাদের সুখ-নিদ্রার সব ব্যবস্থা এবং তদারক করেছিল। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আলো দেখিয়ে যাত্রাপথে নিয়ে এসেছিল। তুমি বলেছিলে সে সৎ মানুষ, আমরাও দেখলাম সে প্রকৃত সৎ মানব।

ওয়াং। তাহলে শেন্‌টেই প্রভুদের আশ্রয় দিয়েছিল?

৩য় দেবতা। নিশ্চয়ই।

ওয়াং। আর আমি কি না পালিয়ে এসেছিলাম। তার উপর এতটুকু আস্থা রাখতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিল সে আসতে পারবে না। কারণ অর্থাভাবে সে তখন ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিল এবং রাত্রে টাকা রোজগারে না বেরোলে পরদিন ভাড়া বাকীর জন্যে তাকে বাসা ছাড়তে হতো।

দেবতারা। (একসঙ্গে) (প্রথম) দুর্বল চরিত্রের মানুষ—(তৃতীয়) মনোভাবটা খারাপ নয়, (দ্বিতীয়) কিন্তু অন্তরটা দুর্বল! (প্রথম) কঠোর জীবনসংগ্রামের মাঝে পড়ে মনে করে তার ভেতরে ভালো বলে কিছু নেই। (তৃতীয়) বিপদে পড়লে সাহস হারিয়ে ফেলে। (দ্বিতীয়) শক্তিহীনতা কোনো কিছু শুভতে বিশ্বাস করে না। (প্রথম) না ভেবেচিন্তে হঠাৎ কাজ করে বসে, আগে থেকেই আশা হারিয়ে ফেলে।

ওয়াং। হে মহানুভব দেবতার দল, আমি সত্যি সত্যিই খুব লজ্জা বোধ করছি।

১ম দেবতা। ওহে জলওয়ালা, তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে গিয়ে শেন্‌টে কিভাবে জীবন কাটাচ্ছে সে বিষয় খবরদারি করো—তাহলে আমাদের দরকার হলে তোমার থেকেই সব জানতে পারবো। দেখবে শেন্‌টের এখন ভালই হচ্ছে—সে নাকি একটি ছোট মতন দোকান চালাবার টাকা পেয়েছে—তাই এখন তার মনের সব সৎ ইচ্ছা অনুসারে সে কাজ করতে পারবে। ভাল কাজ করবার সুযোগ পেলেই, ভাল হওয়া যায়। আমরা আরও দূরে দূরে ঘুরে বেড়াবো এবং আমাদের পরীক্ষার কাজ চালাবো। এরই ফলে সেজুয়ানে শেন্‌টের মতো আরও অনেক সৎ মানুষ আমরা আবিষ্কার করতে পারবো। এর ফলে সেই বিশ্রী গুজবটা—অর্থাৎ সৎ মানুষেরা এই পৃথিবীতে বাসের অনুপযোগী—এটাকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া যাবে।

(আলো নিভে যাবে)

[কার্টেন] [ক্রমশ।

জ্বালে দীপ আকাশের তারা

শ্রীমতী হেনা নাগ

এখনো মনের কোণে জেগে আছে অপূর্ব বিস্ময়
দিগন্তের যবনিকা ঢেকেছিল সমস্ত চেতনা
গন্ধ আর দুঃখভরা এ পৃথিবী জাগাল কামনা
অতন্দ্র মত এলে নবরূপে চৈতালী সন্ধ্যায়।

রতিহীন প্রণয়ীর একাকিত্বে সকল বঞ্চনা
বিপ্রলব্ধা অভিমুখে ছুটেছিল নিবিড় আবেশে
যেখানে জ্বলেনি ধূপ সদ্য-কুন্তলা বিরহিণী পাশে
অশ্রুলিপ্ত দুটি চোখ ভরে আছে দয়িত কল্পনা॥

এমনি সন্ধ্যায় বুঝি দেখা হল বহুদিন পরে
মরমের তীরে তাই আজ ফুটেছে যে ফুল
আতিশয্যহীন, তবু দেহ ঘিরে রয়েছে দুকূল
চপল কামনা ঘেরা দু'চোখের মুগ্ধদৃষ্টি তরে।

মুছেছে দিনের আলো, জ্বালে দীপ আকাশের তারা
অকৃপণ যদি হয় নিশীথের একটি প্রহরা॥

পোলিও রোগের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

শ্রীরণজিৎ সেনগুপ্ত বৈদ্যশাস্ত্রী

পোলিও একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। সাধারণত শিশুরাই এই রোগের কবলে পড়ে থাকে। এই রোগ এতই ভয়াবহ যে, রোগের প্রথম অবস্থায় রোগকে আয়ত্তে আনতে না পারলে অধিকাংশকেই সমস্ত জীবনব্যাপী অপরের গলগ্রহ হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়।

পোলিও VIRUS সংক্রামিত ব্যাধি। সাধারণত জ্বর হয়ে এই রোগের প্রকাশ হতে দেখা যায়। পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রোগীর অভিভাবকরা বুঝতে পারেন না যে, এই জ্বর থেকে পোলিও প্রকাশ পাবে। হঠাৎ দেখা যায় যে, রোগীর হাত-পা এমন কি সর্বাঙ্গ অসাড়তা প্রাপ্ত হয়েছে; এতে চমকে উঠা, ভুলবকা খিচুনী প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দিয়ে থাকে। Spinal Cord হচ্ছে এর প্রথম আক্রমণস্থান।

Meningitis হয়েও পোলিও প্রকাশ পেতে দেখা যায়। সে স্থলে Brain-এ সংক্রামিত হয়। এতে রোগীর-বাক্‌শক্তির অল্পতা বা হানি ঘটায়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা প্রকাশ পেয়ে থাকে। Motor Nerve এর উপরই এই রোগের প্রভাব বেশী। Sensory Nerve অনেকটা কার্যকরী থাকে।

এই রোগের সার্থক ঔষধ আবিষ্কার করার জন্য—পাশ্চাত্যের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রসমূহ বহু গবেষক নিযুক্ত করেও এখন পর্যন্ত সফলকাম হতে পেরেছে বলে শুনা যায় নাই। সুস্থ শিশুদের যাতে পোলিও রোগ না আসতে পারে তার জন্য Antio Polis টিকা বের হয়েছে মাত্র।

আমি সুদীর্ঘ কাল যাবৎ অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পোলিও রোগের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট থেকে এই রোগের ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, যা সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ উপাদানে প্রস্তুত।

আমি চার রকম খাবার ঔষধ বের করেছি, উহা দিনে ৪ বার করে জলে গুলে সেবন করতে হয়, কোন অনপান বা মালিশ Massage -এর প্রয়োজন হয় না।

ঔষধ কয়টি :---

যোগকল্প, যোগপ্রভা, যোগশঙ্খ ও যোগারুণ (রেজিস্টারীকৃত)।

নূতন বা পুরাতন রোগীর ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থাভেদে উক্ত চার রকম ঔষধ থেকেই আমি ব্যবস্থা করে থাকি। উক্ত ঔষধে কোন প্রকার খারাপ Re-action হয় না। ঔষধ Polio Virus দ্রুত ধ্বংস করে এবং Nerve কে Re-generate করে মাংসপেশীকে সক্রিয় করে তুলে এবং রোগীকে দ্রুত আরোগ্যের দিকে নিয়ে যায়। পরন্তু রোগীর Liver function ভাল হয়ে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং General Health এর উন্নতি ঘটায়। আমি শত শত রোগীর ক্ষেত্রে উক্ত ঔষধসমূহ প্রয়োগ করে একটি রোগীতেও খারাপ Re-action হতে দেখি নি।

প্রসবকালীন আঘাতজনিত কারণে জন্ম থেকে পঙ্গু শিশুও উক্ত ঔষধে হাঁটিতে পেরেছে। এ বিষয়েও আরও কিছু গবেষণার প্রয়োজন।

আজকাল পাশ্চাত্যে নূতন আবিষ্কৃত অনেক ঔষধ প্রথমে ইঁদুর গিনিপিগ, বানর প্রভৃতি জন্তুর উপর প্রয়োগ করে তবে মানুষের উপর প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তার মধ্যেও কতক ঔষধকে চিকিৎসকরা পরে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করে---জনসাধারণকে সাবধান করে দিয়ে থাকেন। আমার ঔষধ শিশুদের Syestem-এর পক্ষে যে কত উপকারী তা বলার নয়।

পোলিও রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর চিকিৎসার সুযোগ পেলে (যা আমি অত্যন্ত কম পেয়ে থাকি) রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন প্রকার Deformity আসার সম্ভাবনা থাকে না।

পুরাতন পোলিও রোগীদের রোগাক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের--যা শুকিয়ে, কিছু শীতল হয়ে Deformity অবস্থায় এসেছে; সে ক্ষেত্রেও আমার ঔষধ রোগীদের উক্ত রোগাক্রান্ত অঙ্গে Blood Circulation বৃদ্ধি ঘটিয়ে Muscletissue প্রভৃতিতে সক্রিয় ও পুষ্টি এনে যথেষ্ট উপকার দেখান সম্ভব হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য করা সম্ভব হয় নাই।

আমি প্রমাণ করতে চাই এবং বলতে চাই যে, 'পোলিও---easily curable disease'---যদি রোগীকে রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়।

১৯৫৯ থেকে আমি আয়ুর্বেদ পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে 'টালিগঞ্জ অঞ্চলে' আমার গবেষণার সুযোগ করে দিতে' বেশ কয়েকবার অনুরোধ জানিয়েছি। সরকার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জানান যে, উত্তর কলিকাতার কোন আয়ুর্বেদ হাসপাতালে আমার গবেষণা চালাবার ব্যবস্থা তাঁরা করে দিতে পারেন মাত্র। কিছুদিন পূর্বে আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং স্বীকার করেন যে, টালিগঞ্জ অঞ্চলে গবেষণার স্থান না হলে আমার অসুবিধে হবে। যে-হেতু ঔষধের প্রতিটি উপাদান

আমাকে নিজে সংগ্রহ করে। নিজ হাতে ঔষধ প্রস্তুতাদিতে আমার বহু সময় ব্যয় হয়। সে-ক্ষেত্রে দূরের রোগীর নিয়মিত এবং প্রয়োজনবোধে বার বার তত্ত্বাবধান করে, রোগীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি আনয়নের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

তবে কেহ যদি আমার গবেষণার অনুকূলে Clinic খুলে দেন, তা হলে সরকার যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন,---এ প্রতিশ্রুতিও তাঁরা দিয়েছেন। কিছু বাঁধা থাকায় সরকার হতে নাকি Clinic খুলে দেবার অসুবিধা আছে।

আমার প্রয়োজন : --- টালিগঞ্জ অঞ্চলে আমার বাসার নিকটতম স্থানে অন্তত: ৫।৭টি Bed যুক্ত একটি ছোট Clinic যেখানে আমি প্রয়োজনবোধে বার বার যেয়ে রোগীদের অবস্থার উপর লক্ষ্য রেখে উপসর্গাদিসহ মূল রোগকে আমার একই ঔষধে (সামান্য সংযোজনায়) দ্রুত নিরাময় করে তুলতে পারি। পোলিও ও তার সমস্ত উপসর্গ যে একই ঔষধে আরোগ্য হবে,---এ প্রত্যয় আমার দৃঢ়ভাবেই আছে।

আমার ঔষধের Perfection প্রায় আনতে পেরেছি বলে আমি মনে করি। এই সুযোগটুকু পেলে তা শীঘ্রই সম্পন্ন করতে পারব বলে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। আমার ঔষধকে আমি Polio রোগের 'Specific Medicine' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। একটি ছোট Clinic খুলতে কত টাকারই বা প্রয়োজন।

পাকিস্তানে আমাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে আসতে হওয়ায় আমার নিজের পক্ষে Clinic খোলা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তৎসত্ত্বেও কঠোর প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও আমি আমার ঔষধের উৎকর্ষসাধনে তৎপর আছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে একাধিক দৈনিক সংবাদপত্রের 'স্টাফ রিপোর্টার' আমার পোলিও রোগের আবিষ্কারের তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদের কাগজে প্রকাশ করেছেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ৩২ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এ প্রত্যয় আমার দৃঢ়ভাবে হয়েছে যে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে যে অমূল্য বস্তুসম্ভার রয়েছে ; সম্যক সুযোগ পেলে আরও বহু কঠিন রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা এর মধ্যে রয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে,---চিকিৎসা-জগতে পোলিও চিকিৎসার জন্য আমি মূল্যবান কিছু দিয়ে যেতে পারব ;---যা, বিশ্বের লক্ষ লক্ষ পোলিও রোগ-গ্রস্ত শিশু এবং যাবা অদূর ভবিষ্যতে আক্রান্ত হবে, তাদের ও তাদের অসংখ্য আত্মীয় পরিজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন।

এই রোগের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা সমস্ত চিকিৎসা-জগতে এক বিরাট সমস্যারূপে সমস্ত চিকিৎসকদের ও রোগীর অভিভাবকদের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে থাকেন, রোগীদের পরমুখাপেক্ষী এই অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে,---যার কোন প্রতিকার তাঁরা হাতড়ে পান না।

একটি Clinic গড়ে তুলত হলে প্রথম প্রয়োজন ছোট একখানা বাড়ী, উহা দান হিসাবে বা ভাড়াতে পাওয়া যেতে পারে ; এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও কিছু টাকা।

এককভাবে অথবা সমষ্টিগত সাহায্যেও ইহা হওয়া সম্ভব। এজন্য সহৃদয় দেশবাসীকে আমি এগিয়ে আসতে অনুরোধ করি। যত সামান্য দানই হউক, ---উহা আমার উদ্দেশ্য সাধনে পরম সহায়ক হবে,---যা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। উহা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা হবে।

পোলিও রোগের বিভীষিকা থেকে সমগ্র বিশ্ব মুক্ত হউক, সকলে জানুক---'পোলিও সহজ-সাধ্য ব্যাধি'---ইহাই আমার একমাত্র সাধনা, ---একমাত্র কামনা।

স্বয়ংক্রিয় গাড়ি

আজ নয়, বিগত দশকের মাঝামাঝি সময়েই স্বয়ংক্রিয় গাড়ি উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই 'রাডার'-সমন্বিত গাড়ি আপনা-আপনি থেমে যায়, যদি কোন মানুষ বা অন্য কিছু তার সঙ্গে ধাক্কা লাগানর উপক্রম করে। জনৈক ডেমোক্র্যাটিক সদস্য এই গাড়ি চড়ে এমন অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি কংগ্রেস-এর অধিবেশন শেষ হওয়ার ঠিক আগে সহকর্মীদের কাছে এর বর্ণনা দিয়েছিলেন।

এটি হয়ত শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হবে---এই দাবী জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেন : 'এই গাড়ির 'রাডার'-স্ক্রীন-এ এর সম্মুখে আগত কোন ব্যক্তি বা বস্তর অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা ফুটে ওঠে এবং তখন এটি থামবেই।

'গাড়ি পেছোনর সময় পদাতিক বা অন্য কোন সম্পত্তি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন বা হয়, তার জন্যও সমজাতীয় একটা বন্দোবস্ত রয়েছে। গাড়ি যত বেশি দ্রুত ছুটবে, 'রাডার বীম' তত বেশিদূরে প্রোজেকটেড হবে।'

এই রাডার ঘণ্টায় অন্তত দশ মাইল বেগে গাড়ি না ছুটলে কার্যকর হয় না। গাড়ির 'পাওয়ার স্টিয়ারিং'-এর তুলনায় এর খরচ আদৌ বেশি নয়।

আলেকজাণ্ডার-এর উক্তি একটু পালটে বলা যায়---সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই পৃথিবী। এখানে কয়েক কোটি মানুষ উপবাসী, অর্ধভুক্ত, নিরাশ্রয়, বিনা চিকিৎসায় মরণোন্মুখ---অথচ ভোগ-বিলাস এবং সুখ-সুবিধার নিত্যসব উপকরণ সৃষ্ট হচ্ছে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের জন্য।

তন্ত্র-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

শক্তির রূপ-কল্পনা

রূপ-কল্পনার আবশ্যকতা

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা তো তন্ত্রের অন্তর্গত দেহতত্ত্বের কিছু কিছু বিচার করবার চেষ্টা করলাম। এবার ক্রমশ হতো তন্ত্রের গভীরে প্রবেশ করব, ততো জানতে পাব তার মধ্যে প্রাণতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে কেমন নির্দেশ সন্নিবিষ্ট আছে। সেই পথেই প্রথম পাই শক্তির রূপকল্পনার কথা।

রূপকল্পনার আদিতে ছিল নাদ ও বিন্দু, আবার দেখি কোথেও সেই নাদ ও বিন্দু। এই নাদ ও বিন্দু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। মানুষের অঙ্কন বিদ্যা বা সাদা কথায় রেখা-টানা ও লেখা-লেখনের প্রথম শুরু হচ্ছে বিন্দু থেকে, একথা পণ্ডিতজনেরা জানিয়েছেন। রেখা বিজ্ঞানের যে বিশেষ বিদ্যা---জ্যামিতি, তাতেও বিন্দুকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মানা হয়। তাতে বিন্দুর সংজ্ঞা পাই---যার অবস্থান আছে কিন্তু আয়তন নেই, তারই নাম বিন্দু।

বিন্দু শব্দের নির্বচন ও মর্ম

বিন্দুতে বা প্রকাশয়তে অনেন ইতি বিন্দু :---এই হচ্ছে বিন্দু শব্দের নির্বচন। এই বিন্দুই সব কিছুকে প্রকাশ করে। আবার তার যে সংজ্ঞার কথা আগেই ব'ললাম তাতে পাচ্ছি তার অবস্থানের কথা। অবস্থান শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে পোজিশান। পোজিশান শব্দটির মূল হচ্ছে পোজিট---যার থেকে নিষ্পন্ন হয় পজিটিব শব্দটিও। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা তো প্রমাণ করেছেন যে বিন্দু, যার অন্য অর্থ শুক্রকীট, তা বিদ্যুৎ-ধর্মী---এবং পজিটিব এনার্জীর দিকেই চলে পড়ে। এই তার ধর্ম বা স্বভাব।

নাদ শব্দের নির্বচন ও মর্ম

নাদ শব্দটির নির্বচন হচ্ছে---ন অদতি ইতি নাদঃ। অর্থাৎ ইনি কিছু গ্রাস করেন না। জীবসৃষ্টির মূল প্রক্রিয়ার তো দেখি ডিম্বকোষের মধ্যে

সত্যবান

বা স্ত্রী-বীজের মধ্যে শুক্রকীট বা পুংবীজ প্রবেশ করে---সাধারণভাবে মনে হয় যে, প্রকৃতি যেন পুরুষকে গ্রাস করছেন---কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঘটে ঠিক উল্টোটাই---কিছুকাল পরে প্রকৃতি বৃহত্তর রূপ দিয়ে পুরুষকে প্রসব করেন। এই নাদ তো আঁকা হয় একটি আর্ক বা চাপের মত করে---সম্পূর্ণ সাবিল বা বৃত্তটির মাত্র আভাস দিয়ে। বাস্তবিকই এই নাদ কোন বাধা দেয় না বিন্দুকে প্রসারিত হতে---সেই কথা বোঝাবার জন্যেই যেন পূর্ণবৃত্ত বা পরিধি না দেখিয়ে তার একটিমাত্র অংশ দেখান হয় চাপ এঁকে। আবার এই নাদ, যার অন্য অর্থ স্ত্রীবীজ---তাও ঐ রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের মতে বিদ্যুৎ-ধর্মী ---যা নেগেটিব এনার্জীর দিকে চলে পড়ে। এ তার ধর্ম বা স্বভাব।

তন্ত্র থেকেও আমরা জানতে পাই যে প্রকৃতিই সাকার রূপে সেই নিরাকার পুরুষ বা ব্রহ্মকে প্রকাশ করছেন---কিন্তু আসলে ব্রহ্ম হচ্ছেন আবিঃ বা স্বপ্রকাশ---প্রকৃতি শুধু ক্ষেত্ররূপে তাঁর বিস্তারের পথ করে দেন। কিন্তু এ গভীর কথা থাক---সাধারণ রূপ-কল্পনার কথাই বলি।

ব্রহ্মের রূপ-বিকাশ

শক্তিকে যে উপলব্ধি করতে হয় প্রাকৃতিক বস্তু বিচার করতে করতে তার কথা আমরা জেনেছি। সেই বিচারকে অনেক জনে বলেন প্রকৃতি বেদ। কিন্তু সেই ভাবে তো পাই শুধু উপলব্ধি মাত্র, যাকে সত্যিই অনির্বচনীয় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তারি সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাই---

> য তো বাচা নিবর্ত্তন্তে
> অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥

বাস্তবিক---বাক্য সেখান থেকে ফিরে আসে---মনও যেন কিছু ধরার মত বস্তু খুঁজে পায় না। তবে আবার কেন চেষ্টা সেই অবাঙমানসগোচরকে রূপ দেবার ?

এ সম্বন্ধে তন্ত্রেই বলা হয়েছে---

> সাধকানাং হিতার্থায়
> ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

সাধকের হিতের জন্যে নিরাকারকে সাকার ক'রে তোলা হয়েছে। কেন ? কি হিত হয় তাতে ?

হিত কিছু হয় বৈ কি। যাঁরা কেবল নিরাকার ভাব নিয়ে থাকেন---তাঁরা তো জড়ত্ব লাভ করেন---এই সংসারের কোন কাজেই আর তাঁরা যোগ দিতে পারেন না। শাস্ত্রেও পাই---সাধক যখন তুরীয়ভাবে পৌঁছে যান---তখন হয়ে যান সমাধিস্থ। সেই সমাধিস্থ সাধককে দিয়ে আর জগৎ-কার্যসমষ্টি সম্ভব হয় না---তখন তিনি আর সাধক থাকেন না, হয়ে যান সিদ্ধ। কাজেই সমাজরক্ষার বা সৃষ্টিরক্ষার জন্যে

এমন কিছু কারণ আবশ্যক, যা কেবল ভাব বা অনুভূতি নয়---যাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায় বা দান ও গ্রহণ করা যায়। সেই ধরা ছোঁয়া দেবার জন্যেই তো স্বয়ং ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপ ধরে জাগছেন আমাদের সম্মুখে। এই দেখেই তো সম্ভব হয়েছে ভাবগত শক্তির রূপ ফুটিয়ে তোলা।

প্রসংগত এখানে সাধারণভাবে একটু বিচার করা যাক---ভাবের লোকে যিনি পৌঁছে যান---তাঁর অবস্থা কেমন হয়। আমরা যখন কোন শ্রুতিসুখকর বা দর্শনসুখকর বিষয়ে আকৃষ্ট হই---তখন মন যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়ে যায়। তখন কেবলি এই ইচ্ছা হয় যে, এই ভাবটি যেন কেউ ভঙ্গ করে না দেয়। সেই অবস্থা মানুষকে একেবারেই বিচ্যুত করে দেয় কর্মশক্তি থেকে। তখন যেন আর বাহ্যচৈতন্যও থাকে না। সেই অবস্থার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ পাই---এই গল্পটি থেকে।

বাপ ব'সেছেন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দাবা খেলায়। যখন খুব জমেছে খেলা---হঠাৎ খবর এলো---'তোমার ছেলেকে 'সাপে কেটেছে।'

বাপ তখন এমনি মত্ত খেলায় যে, ঐ খবর তাঁর মনের মধ্যেই প্রবেশ করলো না। প্রশ্ন করলেন---'কাদের সাপ?'

বেশ মনে হয় যে---ভাব বা আনন্দমগ্ন মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্গুণ সদানন্দময় ব্রহ্মকে কল্পনা করা হয়েছে সগুণক্রিয়াময়ী বা নৃত্যময়ী কালীর পদতলে। কর্মের সঙ্গে নৃত্য যে কতখানি অচ্ছেদ্য তার কিছু পরিচয় পাই আচার্য যাস্কের নিরুক্ত থেকে---সেখানে দেখি পর শব্দটির নির্বচন হ'চ্ছে---নৃত্যতি কর্মসু অর্থাৎ কাজ ক'রতে গেলেই যে নৃত্য করে তারি নর। বাস্তবিক পক্ষে কাজই তো জাগায় শরীরের বিভিন্ন অংগে স্পন্দন---সেই স্পন্দন নৃত্যেরি অন্য নাম।

যাই হোক, বুকের ওপর দিয়ে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে চলেছেন কালী, তাঁর দিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই শিবের, তিনি আপন আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। কিন্তু এও তো সত্য যে সেই আত্মানন্দে বিভোর ব্যক্তি সৃষ্টির কোন কাজেই আর নামতে পারেন না। তাই সাধারণ মানুষ কোন সমাধিস্থ সাধুকে দেখে পরম শ্রদ্ধায় প্রণাম অবশ্যই করে---কিন্তু তাঁর কাছে কোন কিছু নিশ্চিত নির্দেশ না পেয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই ফিরে আসে। যেখানে কোন প্রকাশ নেই, কানে শোনার, চোখে দেখার বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করার কোন বস্তু নেই, সেখানে গিয়ে কোন সাধারণ মানুষই তৃপ্তি পায় না।

অথচ সেই প্রকাশমাত্রেই হচ্ছে বেদনাময়। বাস্তবিকপক্ষে আদ্যা-শক্তিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করলে---তাঁকে তো আর আনন্দময়ী বলে মনে হয় না, মনে হয় তিনি বেদনাময়ী। মনে পড়ে রামকৃষ্ণদেবের কথা। যখন কোন ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'মা কালীকে কেন আমরা উলাংগিনী-রূপে ধ্যান করি?'

তিনি তাঁর চিরাচরিত সহজ কথায় উত্তর দিয়েছিলেন---'ওরে, বিশ্ব-প্রসব করছেন যিনি, তাঁর কি সময় আছে কাপড় পরবার?'

কথাটি চিন্তা করবার। প্রসূতি-মাত্রেই জানেন---প্রসবের বেদনা কি কঠিন। বিশ্ব-প্রসব করছেন যিনি, যাঁর থেকে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জীব জন্মলাভ করছে---তিনি যে কি পরিমাণ বেদনা বোধ করেন---তা সত্যিই অনুমান করা যায় না। তবে সেই সঙ্গে এ-কথাটিও স্মরণে রাখবার যে---প্রসূতিমাত্রেই নবজাত সন্তানের মুখ দেখে প্রসবের সমস্ত বেদনা তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হন, গভীর বাৎসল্যরসের আনন্দে আপ্লুত হয়ে যায়। কাজেই বলা যায়---জগৎ-সৃষ্টির মূলে আছে যেমন বেদনা, তেমনি জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে অপূর্ব আনন্দ। আর বেদনার অন্তে পাওয়া আনন্দ বলেই---প্রকাশের আনন্দ অনুভূতির আনন্দের থেকে বহু গুণে বেশী।

এই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমেই উল্লেখ করা যায় কবি, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর প্রমুখ যাঁরা ঈশ্বরদত্ত সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী, তাঁদের কথা। তাঁরাও সবাই জানেন, যে কোন ভাবকে অনুভব যত আনন্দময়, প্রকাশ করা ততোধিক বেদনাময়, তবু তা অতি আনন্দের। আর সেই বেদনার শেষে যে আনন্দ জাগে তা অতি লোভনীয় বলেই ভাবুকের মনে যখন কোন ভাব জাগে, তখন তা প্রকাশ করার জন্যে তাঁর কি ব্যাকুলতাই না জাগে। অন্তরস্থ ভাব যেন অগ্নির মতই দাহ জাগায়---সেই দাহে অস্থির হয়ে ওঠেন ভাবুক। তাইত হয়, কারণ, ভাবমাত্রেই হচ্ছে আবিঃ। প্রকাশ হওয়াই যে তার ধর্ম। তাই সমস্ত বাধা ভেদ করে সে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের মধ্যেও তো সেই রহস্য হয়েছে। শক্তিকে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। তাই দেখি, ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে 'কাম' নামে সেই কথা প্রকাশ পেয়েছে। সেই কাম অগ্নিতুল্য---যে অগ্নি তার জন্মস্থানকে পর্যন্ত ভস্মসাৎ করে।

মনে পড়ে বুদ্ধদেবের কথা, সিদ্ধি লাভ ক'রে কি আকুল হয়ে তিনি সবাইকে তা দেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলেন, কিংবা চৈতন্যদেবের কথা, মহাভাব লাভ করে কি করে দ্বারে দ্বারে তা প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন, কিংবা রামকৃষ্ণদেবের কথা, ভাবে আকুল হয়ে কি কাতরতাই তিনি প্রকাশ করেছিলেন ভক্তসমাগমের জন্যে। ভাব লাভ ক'রে ভাবুকরা কি উন্মাদের মত আচরণ করেছেন যুগে যুগে, তার বহু প্রমাণই এখানে জড় করা যেতে পারে কিন্তু বাহুল্য ভয়েই বিরত হচ্ছি।

রূপ-কল্পনার ক্রমবিকাশ

ঠিক ঐ কারণেই মানুষ যখন তার অন্তরস্থ শক্তিকে উপলব্ধি করলো---তাকে যথাযোগ্য রূপের মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সাধ এই যে, পুজো করবে সেই শক্তিকে।

এই পুজোর প্রবৃত্তি মানুষের মনে

দেখা দিয়েছিল স্মরণাতীত কাল থেকেই। মানব বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন সেই যুগে মানুষ প্রকৃতির নানা লীলার মধ্যে নানা ভয়ঙ্কর শক্তির প্রকাশ দেখে পুজো করতে আরম্ভ করে। তখন তারা বন্যা, ঝড়, বজ্র, বিদ্যুৎ দাবানল, ভূমিকম্প প্রভৃতি সব কিছুকেই পুজো করতে থাকে। বৈদিক যুগের ঋষিরাও তো দেবতা বলে যাঁদের নামে মন্ত্র রচনা ক'রে গিয়েছেন---তাঁরা মূলত প্রাকৃতিক শক্তির নানা প্রকাশ। ক্রমে উন্নততর বুদ্ধির মানুষ সেই প্রাকৃতিক শক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করেন। মোট-কথা সেই আদি যুগে যেখানে মানুষ ভয় পেয়েছে, বিস্ময় বা আনন্দবোধ করেছে, সেখানেই নিবেদন করেছে হৃদয়ের শ্রদ্ধা। তারই ফলে জগতে বৃক্ষপূজা, পশুপূজা, মহামারী বা মৃত্যুপূজা প্রেত বা পিতৃপূজা প্রভৃতি বিবিধ পূজার প্রচলন দেখা দিয়েছে। জড়পূজারও বহু নিদর্শন সেই প্রাচীন-কাল থেকে উৎপত্তি লাভ ক'রে আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে।

ক্রমে মানুষের বোধ জাগতে লাগলো। প্রসারিত হতে লাগলো জীবন-দর্শনের পরিধি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কি অন্ত আছে অনুসন্ধিৎসু মানুষের। শেষ পর্যন্ত সে সব থেকে বিস্ময়কর আবিষ্কার করলো তার নিজের মধ্যে---আত্মশক্তিকে। জগতের ইতিহাসে এর থেকে মহৎ আবিষ্কার আর কি আছে?

কিন্তু আবিষ্কার করলেই তো হবে না---সেই আত্মশক্তির অনুভূতিকে যদি প্রকাশ করার মত রূপ না দেয়া যায় তবে তা কি ক'রে সর্বজনগ্রাহ্য হবে? একা আনন্দ করে তো মানুষ তৃপ্তি পায় না---দল বেঁধে আনন্দ করাই যে তার স্বভাব। তাই তো অনুভূতিগ্রাহ্য শক্তির রূপ না দিয়ে সে পারলো না। কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষের চেয়ে কোন বৃহত্তর বা মহত্তর রূপ কল্পনা করতে পারে না, তাই ঈশ্বরকেও কল্পনা করেছে একটি বিরাট মানুষের মত করে---যার প্রমাণ পাই ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে---সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ---

ভেবেছে তাঁর হাজার হাজার মাথা, হাজার হাজার চোখ, হাজার হাজার পা আছে। পরবর্তী যুগে অবশ্য আমরা যে সব দেবদেবীর প্রতিমা গড়ে পুজো করি তা কিন্তু ঠিক এমনটি নেই। তাহলেও সেই দেবদেবীরাও যে সর্বশক্তিমান---এ বিশ্বাস ভক্তমাত্রেই রাখেন।

স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক এমনি কথা বলে গিয়েছেন যে, মানুষ ঈশ্বরের কল্পনা করেছে বলেই তাকে বৃহৎ ও মহতের চূড়ান্ত মানুষরূপেই বোঝে। যদি মাছ ঈশ্বরের কল্পনা করতো, সে বৃহত্তম মাছ বলেই বুঝতো। এমন কেন হয়? তার উত্তর বোধ হয় আমরা এই শ্লোকাংশ থেকেই পেতে পারি---

'যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'

ভাবনা বা ভাবই তো দানা বেঁধে ওঠে রূপে।

যার যেমন ভাব।
তার তেমন লাভ॥

কারোর সাধ্য নেই নিজের ভাবনার ঊর্ধ্বে যাবার। তাইতো যদিও জানি যে, ঈশ্বর এই তাবৎ জড়জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা---তবু চাই আমরা তাঁকে মানুষরূপেই। সম্বোধন করি তাঁকে মানুষের প্রতি মানুষ যে আত্মীয়তাসূচক বা শ্রদ্ধাসূচক সম্ভাষণ করে---সেই ভাবেই। বলাই বাহুল্য এই বোধ মানুষের একদিনে অতর্কিতে আসে নি---তার কিছু আলোচনা পূর্বেই করেছি। আবার আমাদের দেশে প্রচলিত দশাবতারের মধ্যেও রয়েছে তেমনি আভাস। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতিকে যে দেবতা বলে স্বীকার করে নিয়েছি আমরা---আমাদের ঈশ্বর কল্পনার ক্রমপর্যায়ই তার মধ্যে নিহিত নয় কি?

বেশ বোঝা যায় এর থেকে যে, মানুষ জ্ঞানেবিজ্ঞানে সাহিত্যে শিল্পে যত অগ্রসর হতে লাগল---তত সে আরো ভাল করে চিনতে লাগলো---তার আপনার মধ্যে যে শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল। আর ততই সে জড় পশু প্রেতাদির পুজোর সংগে, নানা দেবদেবীর রূপ-কল্পনা করে পুজো করতে শিখলো। ডাক পড়লো শিল্পী-সাহিত্যিকদের---যাঁদের স্বভাবই হচ্ছে ভাবকে রূপায়িত করার। সেই শিল্পীরা যে মূলে সবাই ভাবুক ও সাধক ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা যতই বিচিত্র উপায়ে রূপদান করতে লাগলেন তাঁদের অন্তর্নিহিত ভাবের, ততই তা সর্বসাধারণের মনে সাড়া জাগাতে লাগলো। ঐ প্রকাশের মাধ্যমে সমস্ত সমাজ একটি সংহত অবস্থা লাভ করলো, প্রবর্তিত হলো মূর্তিপূজার প্রথা। কে জানে যে কালে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা ছিল তেত্রিশ কোটি সেই কালেই তেত্রিশ কোটি দেবতার রূপ দেয়া হয়েছিল কি না। কারণ মনের ভাবতো প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র, তাই রূপ দিলে প্রত্যেক ভাবই পৃথক হতে বাধ্য।

তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভারতে এখনো পর্যন্ত যত সংখ্যক স্ত্রী-দেবতার পূজা হয়, তত সংখ্যক পুরুষ-দেবতার পূজা হয় না। আর পুরুষ-দেবতামাত্রকেই পূজা করতে হয় শক্তিসমন্বিত অবস্থায় অর্থাৎ সস্ত্রীক।

রূপ-কল্পনার সার্থকতা

কিন্তু সাধকের কি হিত হয় রূপ-কল্পনায় তার সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করা যাক। যে-কোন বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে একেবারে সেই বিদ্যার মূলতত্ত্বে প্রবেশ করা অতীব কঠিন---এ সত্য শিক্ষা ব্যাপারে জড়িত পণ্ডিতজনের অজ্ঞাত নয়। শিক্ষায় প্রতীক প্রয়োগ তাই আজকের দিনে একটি সর্বসম্মত পথ।

এখানে বলে রাখি---যখন শব্দ-সাধনা ও ষট্‌চক্রভেদ করার ফলে, সাধকের শরীরক্ষেত্রটি উপযুক্ত হয়ে উঠলো---তখনি তাতে বীজ বা মন্ত্র বপন করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান না হলে, প্রাণতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের পাঠ নেয়া সম্ভব নয়। যাঁরা

কেবল দেহ সাধনা করে থাকেন, তাঁরা জীবনের একদেশদর্শী সাধক হয়ে ওঠেন। আমাদের জীবন তো কেবল দেহসর্বস্ব নয়, প্রাণ ও মন যে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, এই তিনটির সম্যক্ অনুশীলন করলে তবেই পারি আমরা জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে। সেই তো জীবনের পরম সিদ্ধি।

দেহ তো একেবারে বাহ্য বস্তু—তাই তাকে বুঝে নেবার জন্যে কোন প্রতীকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রাণ ও মন হ'লো আরো গভীরের বস্তু, তাই তাদের বুঝে নিতে হলে প্রতীক ব্যতিরেকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কোন ভাবগ্রাহ্য অনুভূতিকে নিয়ে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারি না।

শিশুদের শিক্ষা দিতে গেলে তাই শিক্ষাবিদ্‌মাত্রেই কিণ্ডারগার্টেন অথবা মণ্টেসরি সিস্টেম প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন। সেই দুই পদ্ধতিতে শিশুর কাছে কেবলি গল্পচ্ছলে ভাবগত উপদেশ না দিয়ে, নানা বস্তু, মূর্তি ও প্রতীকের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়।

এই আমাদের দেশেও তো দেখি, কেবলি রূপকথা না শুনিয়ে ছোটদের কাছে ধরে দিই আমরা নানা খেলার বস্তু। সেই সমস্ত খেলার মধ্যে একটি অপূর্ব খেলা হচ্ছে---পুতুল-খেলা। আমাদের ছোটরা কি ভাবে সেই পুতুল-খেলার মাধ্যমে সুগৃহস্থ ও সুগৃহিণী হয়ে ওঠার শিক্ষা পায়, তা চোখের ওপরেই দেখতে পাই। কি চমৎকার ভাবেই না ছোটরা নকল করে তাদের বাবা, মা, দাদা, বৌদি, ঠানদি, মাষ্টারমশাই প্রভৃতির চরিত্র—তা একটু আড়াল থেকে দেখলে বড়রাও বিস্মিত হয়ে যান।

ভুললে চলবে না যে, ওই পুতুল-খেলাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—খেলার মাধ্যমে সত্যিকারের সংসারধর্ম পালনের যোগ্যতা অর্জন করা। তেমনি মূর্তিকে পূজা করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার সাধনা করা। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

এখন ঐ ছোটদের কথা আর একটু বলি। দেখা যায়, যখন কোন কারণে অভিভাবকরা ছোটদের জন্যে খেলার পুতুল যোগাড় করে নিতে পারেন না, তখন ওই ছোটরাই কি চমৎকার নিজস্ব উপায়ে মাটি বা কাপড়-টুকরো দিয়ে মনোমত পুতুল তৈরী করে নিয়ে খেলার সখ মেটায়। এর থেকে স্বভাবতঃই এই সিদ্ধান্তে পেঁছনো যায় যে, মনের সাধ বা ভাবকে রূপ দেবার প্রবৃত্তিটি হচ্ছে মানুষের সহজাত।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রত্ন-তাত্ত্বিকরা আমাদের সে খবর দিয়েছেন যে, মানুষ যখন অরণ্যচারী, গুহাবাসী ছিল, কোন শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শ লাভ করে নি—তখনও তারা নানা দুষ্ট জন্তুর চিত্র গুহাগাত্রে অঙ্কন করতো। জার্মানী ও ফ্রান্সের বেশ কয়েকটি গুহায় এখনো সেই সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন রয়েছে এবং সেগুলি সযত্নে রক্ষা করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ভাবকে প্রকাশ করার এই সহজাত শক্তি পেয়ে মানুষ কি রূপ-কল্পনা না করে পারে? আরো একটি কথা—এখনও তো দেখা যায় কোন নতুন নগর কি অট্টালিকা, কি সেতু, কি উদ্যান ইত্যাদি নির্মাণ করার আগে তার প্লান বা মডেল তৈরী করে নেন স্থপতিরা। সেই ক্ষুদ্র প্রতীকটি থেকেই উত্তরকালে রচিত হয়ে উঠে, অপূর্ব স্থাপত্যের একটি বিরাট রূপ। আবার ঐ ক্ষুদ্র প্রতীকটিতে এমনভাবে সমস্ত বিশেষ বিবরণ নিহিত থাকে যে, তারি আদর্শে বৃহত্তর স্থাপত্য সৃষ্টি করার কোনই অসুবিধা হয় না স্থপতির, নির্ভুলভাবে এগোতে পান তিনি নির্মাণের কাজে।

প্রতীকপূজার মাধ্যমেও ঠিক সেই-ভাবে সাধক এগিয়ে যাবার পথ পান উত্তরোত্তর মহত্তর জীবন লাভ করতে। স্বামী বিবেকানন্দও তো জানিয়েছেন যে, বিশাল পৃথিবীকে চিনতে হলে যেমন মানচিত্র দেখার অভ্যাস করা প্রথমে দরকার, যদিও মানচিত্রটাই পৃথিবী নয়—ঠিক সেইভাবে শক্তি বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানতে বা ধারণা করতে হলে প্রথম দরকার প্রতীক-পূজার, যদিও এই প্রতীক শক্তি বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নয়। এই জন্যেই তন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সাধকের হিতের জন্যেই ব্রহ্মের রূপকল্পনা অত্যাবশ্যক। সেই আকার হচ্ছে অভীষ্ট সাধনের সহায়মাত্র, সম্বল বা শেষ ফল নয়---পথ মাত্র, গন্তব্য নয়। এইখানে কবীর দাসের একটি দোঁহার উল্লেখ করলে অবান্তর হবে না। তিনি বলেছেন—

ভীতর সৈঁ যব বাহির আওয়া।
সিত সকতি হৈঁ নাঁও ধরাওয়া॥

—ভিতরের থেকে যখন বাহিরে এলো, শিব যখন ভাব থেকে রূপ লাভ করলো, তখনই তার নাম হলো শক্তি। এইভাবেই শিব আর শক্তি এই দুয়ের উৎপত্তি। বাস্তবিক অভীষ্টকে কায়-মনোবাক্যে উপভোগ করতে হলে—তার নাম ও রূপ-কল্পনা করা ছাড়া উপায় নেই।

[ক্রমশ।

একটি চিঠি

রমাপতি ভৃত্যের হাত থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিল বিমর্ষভাবে। অফিস থেকে বাড়ি ঢুকে সোজা এসে রমাপতি আরাম কেদারায় শুয়ে পড়ে। কল্যাণী ধূমায়মান চায়ের কাপটা নিয়ে হাজির হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। রমাপতির জুতোর আওয়াজ কল্যাণীর চেনা। আরো বিশেষভাবে চেনা মানুষটার মনটিকে। কল্যাণী জানে অফিস ফেরৎ মানুষটাকে এইভাবেই খুশি রাখতে হয়, এইভাবেই খুশি রেখেছে এতদিন।

বার কয়েক চুমুক দিয়ে কাপটা দূরে সরিয়ে রেখে দিল। বিস্বাদ লাগছে। চা খাওয়াটা তো শুধু খাওয়ার জন্য নয়। ইচ্ছে করছিল মংলুকে ডেকে চায়ের কাপটা ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। ফেরৎ কাপটা দেখলে কল্যাণী অনুভব করতে পারবে রমাপতির মনটাকে; বুঝতে পারবে খুব রেগেছে মানুষটা। কিন্তু এতে কলহকে ঠেকানো যাবে না। কাপটা ফেরৎ না পাঠিয়ে ওই-ভাবেই ফেলে রেখেছিল রমাপতি। যখনই ভরা কাপটা দেখবে কল্যাণী—এই দেখতে পাওয়াটাই রমাপতির কাছে আনন্দের। এক রকমের আনন্দ যেন আছে এতে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ওই অবস্থাতেই শুয়ে রইল রমাপতি।

একেই অফিসের খাটুনি, তার ওপর বাড়িতে এসে দু'দণ্ড শান্তি পাবে—তারও উপায় নেই। যাকে নিয়ে শান্তি সে নিজেই অশান্তরূপ নিয়ে রয়েছে, আজ সারাটা দিন।

অস্তগামী সূর্যরশ্মির শেষ ঝলক পায়ে পায়ে বারান্দাটাকে পেরিয়ে লাউয়ের মাচাটায় মেলে দেওয়া লেপটার ওপর খানিক সময় লেগে রইল। লেপটা মেলে দিয়েছিল কল্যাণী দুপুরের রোদে গরম হবার জন্য। রমাপতি লেপের তপ্ততাটুকু উপভোগ করল খানিক মনে মনে। সেই আরাম-গরম লেপটা সন্ধ্যায় হিমেল বাতাসে ঠাণ্ডা হতে চলেছে এখন। সকালবেলায় লেপটা মেলে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল কল্যাণীর। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কল্যাণী অন্য মানুষ হয়ে গেছে। লেপটা যে তুলতে হবে তাও ভুলে গেছে যেন।
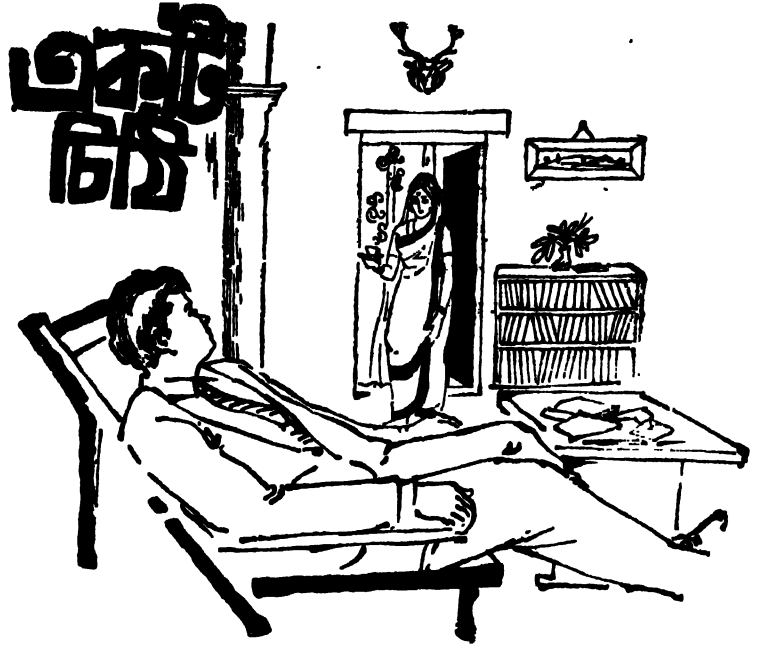
ছোট্ট একটা ঘটনায় কল্যাণীর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে আজ।

বিপুলকুমার সেনগুপ্ত

ঘটনাটা তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। রমাপতির শ্বাশুড়ীর চিঠি এসেছিল কাল কল্যাণীর নামে। লেটার বক্সে পড়েছিল। কল্যাণীর বাবার অসুখ, সম্ভব হলে ওরা যেন চলে আসে। চিঠিটা পড়ে শমন পড়ার মত মুখ করে পকেটে রেখেছিল রমাপতি। বাড়ি থেকে ন'শ মাইল দূরে রয়েছে ওরা। 'আয়' বললেই ট্রেনের হ্যাণ্ডেল ধরা সম্ভব নয়। মাইনে পেতে এখনো দিন দুয়েক বাকি। আর তা ছাড়া যাওয়াটা জরুরী হলে চিঠি না এসে 'তারই' আসত। সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে, চিঠিটা আর একবার পড়ে পকেটে রেখে দিল রমাপতি।

—কার চিঠিগো ওটা? বাজারের থলিটা কাগজে মুড়তে মুড়তে জিজ্ঞেস করল কল্যাণী।

—বন্ধুর চিঠি। এড়িয়ে গেল রমাপতি।

রমাপতি জানে ও-চিঠি দেখলে কল্যাণী এখনই ছুটতে চাইবে অথচ ছোটাবার মত তাকত এখন রমাপতির নেই। কোন রকমে এ বেলাটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া। অফিসে গিয়ে ধার যদি কারো কাছে পায় তো ভাল, রাত্রের গাড়িতেই রওনা হওয়া যাবে।

কল্যাণীর কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়ল রমাপতি। কাছে থাকলেই মুস্কিল।

গলির মোড়ে পিওনের সঙ্গে দেখা। রমাপতির একটা চিঠি ছিল। মনীষার চিঠি। বন্ধুর বোন। ক'দিন আগে ইণ্টারভ্যু পেয়ে এসেছিল এখানে। উঠেছিল রমাপতির বাড়িতেই; দিন তিনেক থেকেই চলে গেছে। দু'ছত্র লিখে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে চিঠিতে। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতাই জানিয়েছে তার বেশি কিছু নয়।

দুপুরে খেতে বসে এই চিঠিটাই অশান্তির ঝড় তুলল। অফিসের কাছে বাড়ি, তাই টিফিনে বাড়ি চলে আসে রমাপতি। একে পাহাড়ী দেশ তারওপর রমাপতি যা শীতকাতুরে। এই পাহাড়তলীতে বদলি হয়ে আসার পর রমাপতি সকালে কোনদিনই স্নান করেছে কি না সন্দেহ।

ঠাণ্ডাজল মিশিয়ে জলের উষ্ণতা-টুকু পরখ করছিল বাথরুমে বসে রমাপতি। ওদিকে যে উষ্ণতর হয়ে উঠেছে

আর একটি মানুষ, সে খেয়াল নেই। সযত্নে গোপন করে রাখা চিঠিটা ছিল জামার ভেতরের পকেটে আর মনীষার চিঠিটা ছিল বুক-পকেটে। কাচাকাচির দিনছিল আজ। এ পকেট ও পকেটের মাল বার করতেই নজরে পড়ল চিঠিটা। ভেতরের পকেটে হাত ঢোকাবার মত আর ইচ্ছে রইল না। হঠাৎ সাপ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ার মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কল্যাণী, তারপর নিজেই সাপ হয়ে ফোঁস করে উঠল।

---বললেই পারতে বান্ধবীর চিঠি, এড়িয়ে যাবার দরকার কি ছিল।

ভাতের থালাটা দু'হাত দূর থেকে মেঝে ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে রমাপতির সামনে এল। জলের গ্লাসটা আর একটু হলেই কাত হয়ে যেতো। পিঁড়ির ওপর বসে রমাপতি। সবান্দে পাউডার মেখে জেবুটানা একটা লুঙ্গী পড়ে খুশিখুশি মনে খেতে বসেছিল রমাপতি।অফিসার কাজে বাইরে গেছে। কাজের চাপটাও কম। খেয়ে দেয়ে একটু গড়িয়ে নেবার ইচ্ছাও ছিল। সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।

---বান্ধবী! চিঠি!! অবাক মুখ তুলল রমাপতি।

---বান্ধবীর চিঠি। ফোঁস করে উঠল কল্যাণী। ভাবছ কিছু টের পাই নে আমি।

রমাপতি বুঝল, কল্যাণী নাড়ী টিপে ধরেছে সত্যি, কিন্তু ডায়োগনসীস্ করতে ভুল করছে। ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার পরম ইচ্ছায় রমাপতি নরম সুরে বলল---

---মনীষার চিঠিটার কথা বলছ, ওটাতে তোমাকেই লেখা।

লঙ্কা-ফোড়ন পড়ল যেন।

---হ্যাঁ ওই জন্যই তো বুকে করে রাখছ চিঠিটাকে। চিঠিটা যদি আমারি হবে, সকালে যখন জিজ্ঞেস করলাম, চেপে গেলে কেন?

রমাপতি বুঝল জল গড়িয়েছে অনেকখানি। সহজ পথে বার হবে না। সন্দেহ যখন মনের দরজায় করাঘাত করে, মন তখন ভদ্রতাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়!

---চিঠির সবটাই তোমাকে লেখা নয়, মনীষা আমাকেও লিখেছে। খানিকটা উত্তেজিত কণ্ঠ রমাপতির। ভাতের থালায় হাত দেয় নি তখনো।

ঠোঁটের ডগায় উত্তরটা যেন বসিয়ে রেখেছিল কল্যাণী, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে মারল। মনীষার সঙ্গে রমাপতির তরুণ বয়সের চপলতার দু'একটা ঘটনাও চিৎকার করে শুনিয়েছিল, যা কল্যাণী জেনেছিল মুখ থেকেই।

সকালে চায়ের আসরে নানারকম গল্প হ'ত ওদের। মনীষা ছিল খুব সপ্রতিভ, চোখে-মুখে কথা বলত যেন। অবসর মত সব মানুষই চায় কয়েক পা পেছনে সরে এসে ফেলে আসা অতীতের জমিটায় একটু ঘুরপাক খেতে। মনীষাও চেয়েছিল। দাদার এই লাজুক বন্ধুটি সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথাই শুনিয়েছিল মনীষা। উদঘাটন করেছিল অনেক কৌতুককর চিত্র। রমাপতি আর কল্যাণী হেসেছিল খুব সেদিন। কল্যাণী হেসেছিল ভিন্নতর ব্যঞ্জনায়। স্বামীর পুরানো দিনের কয়েকটা ছবি তবু দেখতে পাওয়া গেল।

একই শঙ্খে দু'রকম ফুৎকার। যে ছবিগুলো কল্যাণীকে আনন্দ দিয়েছিল সেগুলোই দংশন করছে এখন। ভাতের থালায় ভাত রইল পড়ে। পোষা বেড়ালটা থালার সামনে অবাক হয়ে বসে রইল সারাক্ষণ। ভাতের হাড়িতে জল ঢেলে দিল কল্যাণী। খাওয়া হল না কারোরই। শুধু কাদা ঘাটতে লাগল দু'জনে। মাঝে মাঝে ছুঁড়তে লাগল পরস্পর।

সেদিন ব্যাপারটার ওইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি। তুবড়ির মুখে আগুন পড়ছে, সমস্তটা না জ্বলে নিস্তার নেই।

নিভে যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরাল রমাপতি।

বিয়ের আগে ভালবাসা ছিল ওদের। ভালবেসে বিয়ে করেছিল ওরা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিয়ের পর ভালবাসা থাকতে নেই। প্রাক্‌বিবাহপর্বে ওদের ভালবাসার শাখাশীর্ষে কদম ফুটেছিল ঠিকই, কিন্তু সন্দেহ ছিল গাছের মূল আঙুল ছড়িয়ে মাটির গভীরে কতটা প্রবেশ করেছিল।

কল্যাণীর একটা গর্ব ছিল নিজের রূপ আর বাপের বাড়ির আভিজাত্য। কল্যাণীর ওপর আর এক বোন ছিল, সে আজ একজন করিৎকর্মা অফিসারের গৃহিণী হয়ে রাজধানীতে রয়েছে। তার রাজধানীতে অধিষ্ঠান কল্যাণীকে পীড়া দেয়। কল্যাণী অনসূয়া নয়। মাঝে মাঝে কল্যাণী ভাবে ও যদি রমাপতির গৃহিণী না হোত তবে হয়তো কোনদিন ও হোতে পারত সিরিমাভো বন্দরনায়েকের মত কেউ একজন। অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হতে পারত কল্যাণীর, যেখানে বিয়ে হলে হয় তো কোনদিন অভাবের মুখোমুখি হ'তে হ'ত না ওকে সত্যি। মাস শেষের দিনগুলো কখনোই রক্তশূন্য রোগীর পাণ্ডুর মুখের মত মনে হ'ত না---যেটা কল্যাণী আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কল্যাণীর যৌবনের বারান্দায় যারা পদচারণা করেছিল, তাদের মধ্য থেকে এমন একজনকে বেছে নিয়েছিল যে তাকে সুখী করেছিল সত্যি, যদি একমাত্র ভালবাসাই সুখ হয়ে থাকে।

কল্যাণী রমাপতির কাছে শুধু ভালবাসাই চেয়েছিল। বলেছিল, সুখ? ওতো সুস্বাস্থ্য আর বিস্মরণ-শক্তি থাকলেই পাওয়া যায়। কবে কি পেয়েছি, খেয়েছি, মনে না পড়লেই হ'ল। কল্যাণী তখন সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে ভাল ভাল বই রমাপতিই যোগান দিত তখন। কথাটা শুনে রমাপতি খুশি হয়েছিল খুব। আর পাঁচটা মেয়ের মত ও শুধু লোভ দেখানো বই পড়ে না। নিজের এবং কল্যাণীর চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রমাপতির ইচ্ছে হচ্ছিল কল্যাণীর সুন্দর চোখ দুটির ওপর চুমু রাখে।

বিয়ে প্রসঙ্গে কল্যাণীদের তরফ

থেকে আপত্তি উঠেছিল। রমাপতির ভাল চাকরি নেই, বেটা আছে ওটা ধর্তব্য নয়। আর ছেলেটার একটা বদ নেশা আছে---সাহিত্য করে। তার মানে চালচুলোহীন উড়নচণ্ডী ছোকড়া এই রমাপতি। ইনকামট্যাক্স অফিসার কল্যাণীর মামার চিঠির ধরণটা ছিল অনেকটা এই রকম। চিঠিটা পড়িয়েছিল কল্যাণীকে। পড়েছিল কল্যাণী। পড়ে দেশলাই-এর আগুনে চিঠিটা ধরিয়ে রমাপতির সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছিল সেদিন কল্যাণী। রমাপতির আজ সব মনে পড়ে।

বিকেলের আলো নিভে আসছে। চার পাশ শান্ত হয়ে আসছে ক্রমশ। রায়পুর শহর থেকে ডিল্যুক্স স্পেশাল বাসটা একটু আগে যাত্রীবোঝাই হয়ে পৌঁছে গেছে। ঘুঙুর-ঘণ্টার ধ্বনি তুলতে তুলতে রিক্সাগুলো যাত্রী নিয়ে এই পাহাড়তলীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

রমাপতি ঘাড় ঘুরিয়ে খেয়াল করল হঠাৎ কখন যেন লেপটা তুলে নিয়ে গেছে কল্যাণী। কল্যাণী না হয়ে মংলুও হতে পারে। রমাপতি লক্ষ্য করল রান্নাঘর থেকে একটা আলো ক্রমশ বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষটা অন্ধকারে বসে আছে, এতক্ষণে তবু হুঁশ হ'ল কল্যাণীর। রমাপতি মাথার নীচে একটা হাত রেখে চোখ বুজে শুয়ে রইল। আলোটা সামনে এল, টেবিলের ওপর রাখল, তারপর নিঃশব্দেই ফিরে যাচ্ছিল মানুষটা। পায়ের শব্দটা সেই পরিচিত শব্দ নয় বলে চোখ খুলল রমাপতি। মংলু এসেছিল। জমানো ক্রোধটা ভয়ংকর বিস্ফোরণের আভাষ রাখল রমাপতির চোখে মুখে যতটা ততোধিক মনে। মংলুর ওপর বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছিল, কোন রকমে সামলে নিয়ে রমাপতি একটা সিগারেট ধরাল। রমাপতির ইচ্ছে নয় যে চিৎকার করে একটা কদর্য সীন তৈরী করে। তাতে ব্যাথারও উপশম ঘটবে না। তার থেকে মৌনতাই ভাল। চুপ করে থাকলেই ও পক্ষ টের পাবে যে রমাপতি একটা পাথর। পুরুষ মানুষের আবার দুঃখ কি। ভেতরে ভেতরে গুমরে ওই মেয়েটা। নিজের আঁচে নিজেই সেদ্ধ হোক।

লণ্ঠনের আলোটাকে সহ্য করতে পারছিল না রমাপতি। লম্পটের মত এক চোখ মেলে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রমাপতির সুন্দর সংসারটায় ভাঙন ধরেছে, তাই খুশি যেন। আলোটাকে নিবিয়ে ছিল রমাপতি। অন্ধকারই ভালো। অন্ধকারেই আলো খুঁজতে লাগল রমাপতি।

মনে পড়ছে অমরেশকে। বলেছিল, তোদের তো আর চন্দনচর্চিত হয়ে বোকা বোকা ছবি তুলতে হ'ল না। তোরা তোদের কাগজটা বাঁধিয়ে রাখ।

---বেশ বললেন, তারপর যখন

বাচ্চারা কেউ জিজ্ঞেস করবে, মা ওটা কি? কি বলব?

---বলবেন ওটা পাটনারশীপ ভাঁড়। হৃদয় নামক কোলিয়ারীর বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছেন আপনারা, ওটা তারই, ছলিল।

---কোলিয়ারী যখন ধ্বস নামতে পারে। আজকাল কাগজে তো হামেশাই ধ্বস নামার খবর দেখা যায়। অমরেশের সিগারেটের আগুনে নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে নিতে নিতে বলল রমাপতি। কল্যাণী কথাটা লুফে নিল যেন।

---ধ্বস নামার আগে চতুর মালিক ঠিকই খবর পায় এবং তারা সময় মতই ভাঁড় ভাঙিয়ে কাজ গুছিয়ে নেয়

---কি বলেন দত্তগুপ্তবাবু?

এ সব ছবি ওদের বিয়ের বছর খানেক পরের। অমরেশ দত্তগুপ্ত ছিল তখন প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার। বন্ধু-বান্ধবদের বিয়ের পর ছবিটবি তুলতে মাঝে-মাঝেই নিমন্ত্রিত হতো। রমাপতির বেলায় ওকে শুধু নিমন্ত্রণই রক্ষা করতে হয়েছে। কোনো ছবি তুলতে হয় নি। কোলিয়ারীর ধ্বস নামা প্রসঙ্গে অমরেশ সেদিন অনেক কথা বলেছিল। শুনিয়েছিল ওর বন্ধুবান্ধবদের নানা কাহিনী। কিন্তু কোন কথাতেই কোন আগ্রহ ছিল না এই দম্পতির। কল্যাণীরা ওদের নিজেদের মধ্যেই মশগুল হয়ে ছিল। এক বছরে সঞ্চিত মৌচাকের তখনো অনেক কোটর ছিল অপূর্ণ। সেগুলো পূর্ণ করতেই ওরা ছিল ব্যস্ত।

সামান্য আয়ের চাকরী ছিল রমাপতির। তাই মাঝে-মাঝেই নিজে রুক্ষ হয়ে উঠত। প্রথম প্রথম কল্যাণী সামলাত। দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এক হাতে রুখত দারিদ্র্যের দানবটাকে আর একহাতে রুখত রমাপতিকে। সে কল্যাণীর রূপছিল ভিন্নতর। মাঝে-মাঝেই একটা চৈনিক প্রবাদ কল্যাণী রমাপতিকে শোনাত।

---দেখ, দুঃখের দিনে দারিদ্র্যের পাখি যদি মাথার ওপর ওড়ে তো উড়ুক, তাকে বাধা দিও না; তবে লক্ষ্য রেখো যেন মাথার ওপর বাসা না বাঁধে।

---অর্থাৎ?

--অর্থাৎ, এই সামান্য টাকার চাকরীতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। অন্য কোথাও চেষ্টা কর।

কল্যাণী আভাষে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে সংসারটাতো আর চিরদিনই ছোট থাকবে না, থাকবে না দুজনের মধ্যে সীমায়িত। যারা আসবে তাদের ভদ্র-ভাবে বড় করতে হলে উপার্জনের অঙ্কটা কিছুটা বাড়াতেই হবে। তখন ওদের বিয়ের দু'বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু ওরা খুশিতে টৈ-টম্বুর তখনো। সমুদ্রের সেই সুন্দর পাখীগুলোর মত, যে পাখীগুলো আপন ডানায় সূর্যালোক মেখে নিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমুদ্রের বুকে ডানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করে। ক্লান্তি নেই, অবিশ্রান্ত সেই খেলা, সেই সুন্দর পাখিগুলোর মত উড়ে উড়ে ওরা প্রায় দুটো বছর কাটিয়ে দিল। তারপর। তারপর যখন ওরা ডানা গুটিয়ে নীড়ে ফিরল, তখন দেখল ওদের নীড়ে কোন আগন্তুক আসে নি। প্রথম প্রথম ওরা দু'জনেই খুশি হয়েছিল, ওদের দু'জনের ছোট্ট সংসারে কোন ঝামেলা রইল না। কিন্তু ক্রমশ দু'জনেই অসুখী হয়ে উঠছিল ওই বাড়তি ঝামেলাটা ওদের সংসারে নেই বলে। সংসারটা ওদের ছোট রয়ে গেল এখানে বেদনা যতটা, ততোধিক বেদনাদায়ক ওরা নিজেদের কাছে পরস্পর ছোট হয়ে যাচ্ছিল।

পরে কল্যাণীর ইচ্ছেতেই অনেক চেষ্টা করে কলকাতা ছেড়ে রমাপতি চলে এসেছে পাহাড়তলীর ছোট এই শহরে। কোন রকম গুছিয়ে নিয়েছে নিজেদের। রমাপতির বিশ্বাস ছিল যে, সে কল্যাণীকে সুখী করতে পেরেছে, যদি একমাত্র ভালবাসাই সুখ হয়ে থাকে।

কিন্তু সেখানেও ফাটল ধরছে আজ।

চার পাশে বেশ ঘন অন্ধকার নেমেছে। সমুখের উট-কুঁজ পাহাড়টাকে আর ঠাওর করা যাচ্ছে না। বড় বড় গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল অন্ধকারে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করছে। পাতা কুড়োনী মেয়েগুলো গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে দল বেঁধে। দল-ছুট কোন একটি মেয়ের নাম বোধকরি শান্তি, তাকে চিৎকার করে ডেকে বেড়াচ্ছে ওরই কোন স্বজন। শান্তিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রমাপতির ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে এক ঘুসি মেরে চিৎকারটাকে থামিয়ে দেয়, নয় তো মানুষটাকে ওই পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ছুঁড়ে দেয়, যাতে চিৎকারটা গড়াতে গড়াতে তলাকার খাদে সমাধিস্থ হয়ে যায় চিরদিনের মত। কিন্তু কিছুই করল না রমাপতি। সারাটা বাড়ি থমথম করছে নিস্তব্ধতায়। ওই বিশ্রী চিৎকারটা দু'কান ভরে শুনতে লাগল রমাপতি।

মিনতি

(গান)

সুধীরকান্ত গুপ্ত

মিনতি আমার মাগো রাখি ঃ
আমার ভুবনে আনো আলো আরো আলো
হৃদয়-গহনে মোর মণি-দীপ জ্বালো
করুণায় দাও মোরে ঢাকি'॥
মিনতি আমার............

জীবনের কলতান কত ধূপছায়া
রচে পলে পলে কত মরীচিকা-মায়া
জাগাও ঘুমন্ত দুটি আঁখি॥
মিনতি আমার............

স্বপ্নময়ী স্বর্গলোক চাহিনা তো আমি
মরণ-লাঞ্ছিত পৃথ্বী হোক দেবকামী
তোমার প্রেমের জ্যোতি মাখি'॥
মিনতি আমার............

যুগোশ্লাভিয়া সফরের সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। পার্শ্বে প্রেসিডেন্ট টিটো, মাদাম টিটো ও ডঃ হোসেনের কন্যা সাইদা খান

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

ভাদ্র / '৭৫

ইলেকট্রো-মেডিক্যাল এ্যাণ্ড এ্যালায়েড ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেডের একটি এক্স-রে মেশিন দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর

সোভিয়েট সাঁজোয়া ইউনিট বোহেমিয়ার একটি গ্রাম অতিক্রম করছে
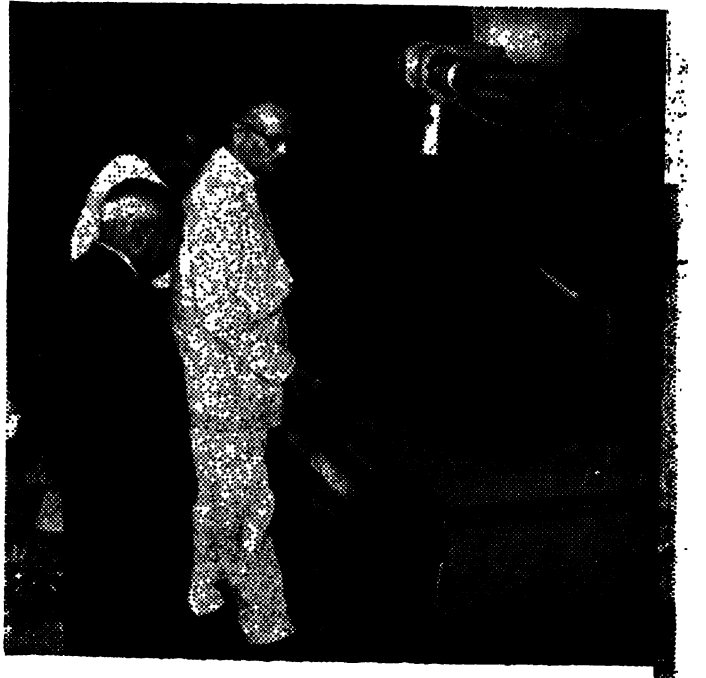
চেকোশ্লোভাক সীমান্তে যাওয়ার জন্য বোহেমিয়ার গ্রামের পথে সোভিয়েট সাঁজোয়া-বাহিনী

বালির বস্তা দিয়ে গ্রামের বাঁধ-এর ভাঙন রোধ করার চেষ্টা করছেন স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ

মাসিক বসুমতী । ভাদ্র / '৭৫

শ্রী চিত্রগৃহে সারা বাংলা রামপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভাষণরত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তিলাভের পূর্বে সাংবাদিক বৈঠকে আপ্যায়িত করা হচ্ছে উত্তর ভিয়েৎনামে আটক মার্কিন বৈমানিকবৃন্দকে

বন্যা-অধ্যুষিত গ্রামের বাসিন্দারা গ্রাম ত্যাগ করে যাচ্ছেন

রামধনু

সবিতা রায়

আজ যেন খুব অসময়ে পাশের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালো স্কুটারটা। জানালার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে দেখতে গেল কুন্তলা। রোজ সন্ধ্যায় এর আওয়াজ কানে আসে তার। আরোহী একটি কেতাদুরস্ত সদ্য যুবক। স্কুটারটি থেকে নেমে কোন ইংরেজী গানের কলি শিস দিতে দিতে এগিয়ে যায় সে। আবার পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর ফিরে আসে। সঙ্গে থাকে আধুনিক বেশে সজ্জিত একটি কিশোরী খুশির জোয়ারে দুজনে বেরিয়ে পড়ে।

পাশের বাড়ীর এই স্বাতী কুন্তলার কল্পলোক জুড়ে থাকে। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি তার সাজের বাহার। পড়েও মেমসাহেবী স্কুলে। রোজ সন্ধ্যার স্বাতী যখন তার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যায় কুন্তলার বুকের ভেতরটা আনন্দে রোমাঞ্চে কেমন কেঁপে ওঠে। তার অস্তিত্বটা যেন স্বাতীর মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ঠিক সেই সময় কলতলা থেকে মায়ের তীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে আসে সংসারের কাজে সাহায্য করবার জন্য। ত্রস্তপদে এগিয়ে যায় কুন্তলা। মা'র ফরমাস অনুযায়ী কাজ করতে করতে গুন্ গুন্ করে গানের সুর ভাঁজে। অগুন্তি রুটি বেলতে বেলতে ভাবে, সে যেন স্বাতী হয়ে অলকের মুখোমুখি বসে আছে। ড্রেন পাইপ প্যান্ট পরা পা-দুখানা মেলে দিয়ে অলক অলসভঙ্গীতে একটা সিগারেট ধরিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কুন্তলার কালো মুখখানা লজ্জায় ঘেমে ওঠে। কাজ সারতে সারতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত ঘনিয়ে আসে। গা ধুয়ে এসে যখন গুমোট ঘরের সরু শিকের জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, চাঁদের আলোয় পাশের প্রকাণ্ড বাড়ীখানাকে যেন সত্যি রাজপুরী বলে মনে হয়। কিছু পরেই কলকাকলিতে মুখর হয়ে ফেরে অলক আর স্বাতী। আবছা আলোয় গায়ে গায়ে মিশে বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায় ওরা। ওদের প্রতিদিনের বিদায়পর্বটি যেন কোন মধুর উপন্যাসের একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ।

ষোল পেরিয়ে সতেরোয় কোঠায় পা দিয়েছে কুন্তলা। নিম্ন-মধ্যবিত্তে পরিবারের মেয়ে সে। তার পরে অনেক-গুলি ছোট ভাইবোন। সংসারের অভাব অনটনের ভিতরও নিজেকে সে সুখী মনে করে। কারণ, স্বপ্নলোকে সে তো ঐ পাশের প্রাসাদের অধিশ্বরী। গভীর রাতে ময়লা তেলচিটে বালিশে মাথা রেখে সে চলে যায় আর এক জগতে। সেখানে হাল্কা নীল আলোয় নরম সাদা বিছানায় সারা গায়ে সুগন্ধি পাউডার মেখে অপরূপ রাতের পোষাক পরে স্বাতী তার দুখানা হাত বুকের উপর ভাঁজ করে শুয়ে আছে। সব চেয়ে ছোট ভাইটি ঘুমের মধ্যেই বিশ্রী আওয়াজ করে কেঁদে ওঠে। মা ঘুমের ঘোরে তার পিঠ চাপড়াতে থাকেন। সারা দিনের ক্লান্তির পর অসাড়ে বাবা ঘুমোন। থেকে থেকে তার নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যায়। মশা ও ছারপোকার মিলিত আক্রমণকে ঘুমের ঘোরে প্রতিরোধ করতে করতে রাত শেষ হয়ে আসে।

সেদিন কুন্তলাদের একটানা জীবনে যেন আকস্মিক একটা সাড়া পড়ে গেল। মা ঘর-দোর গোছাতে ব্যস্ত। বাবা সাধ্যাতিরিক্ত বাজার করে এনে হাঁপাতে হাঁপাতে হাত-পাখা ঘোরাচ্ছেন। ছোট ভাই-বোনগুলো বার বার বকুনি খেয়ে ঘরের এক পাশে পুঁটুলির মত বসে আছে। আর কুন্তলা তার একখানা মাত্র বাইরে পরে বেরোবার কাপড়টি সযত্নে পাট করবার চেষ্টা করছে। বিকেলে কুন্তলাকে দেখতে আসবে। মেয়ে পছন্দ হলে কোন দাবী দাওয়া নেই। কুন্তলার বাবার কাছে এ যোগাযোগ একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

নির্দিষ্ট সময়ে পাত্র একাই এল মেয়ে দেখতে। এক পলক তাকিয়ে দেখলো কুন্তলা। ভাবলেশহীন ভারিক্কী চেহারা। কুন্তলার আপাদমস্তক যেন

গম্ভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখছে। একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু কেনবার সময় হিসাবী ক্রেতার বোধহয় এই রকম মুখ-ভঙ্গী চোখে পড়ে। কুন্তলা আর দ্বিতীয়-বার তাকিয়ে দেখলো না।

তার স্বপ্নলোকের সলিলসমাধির পরোয়ানা নিয়ে এসেছে যেন এই ব্যক্তিটি। শতরঞ্চির দিকে মাথা নীচু করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড়টা ব্যথা করে এল। মা থালাভর্তি খাবার সাজিয়ে নিয়ে এলেন। বাবা কাঁচুমাচু-মুখে সেগুলোর সদগতি করার জন্য অনুরোধ করতে থাকলেন। আর কুন্তলা মুখ না তুলেও বুঝতে পারলো ঐ থালার দিকে আড়াল থেকে তার ছোট ভাইবোনগুলোর লোভনীয় দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ঠিক একই রকম নির্বিকার মুখে সমস্ত খাবার নিঃশেষ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে পাত্র উঠে দাঁড়ালো। ভোজনপর্বের নমুনা দেখে বাবা মা অনুমান করলেন—মেয়ে পছন্দ হয়েছে।

যথাসময়ে তাঁদের মনোবাসনা অনুযায়ী পাত্র এল। আর কুন্তলার ইচ্ছা হোল ডাক ছেড়ে কাঁদে। এত বড় পৃথিবীতে সে তো কখনো কিছুমাত্র অবাস্তব দাবী উপস্থিত করে নি। অভাবে দারিদ্র্যে বেড়ে উঠেছে। কোন খেদ ছিল না তার সেজন্য, কিন্তু কাছে থেকে দূরের ঐ মায়াপুরী তার চোখের আড়াল হয়ে গেলে কি নিয়ে সে বাঁচবে? অকরুণ বিধাতা তার এই সম্বলটুকুও কেড়ে নিচ্ছেন কেন? রাত্রিবেলা দুচোখের পাতা বেয়ে জল ঝরে—ভয়-কম্পিত দু'একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে আসে তার সঙ্গে। ঘুমে বেহুঁস মায়ের হাতখানা মাথার উপর এসে পড়ে কখনো চাপা অভিমান নিয়ে মনে মনে গুমরে উঠে হাতখানা সরিয়ে দেয় সে।

মনস্থির করে ফেলেছে কুন্তলা। আর ঐ জানালার কাছে দাঁড়াবে না। স্বাতী অলকের জীবনের পথ আর তার জীবনের পথ একেবারেই ভিন্নমুখী। ঐ মায়ালোকের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে কাটাতে হবে তাকে। বাড়ীতে সংসারের বিবাহের আয়োজনের প্রস্তুতিপর্ব চলতে থাকে। কোন জলুষ নেই তাতে। নেই কোন উজ্জ্বল কল্পনার মায়াকাঠির ছোঁয়া। চোখের সামনে বারবার সেই হিসেবী গম্ভীর মুখটা ভেসে ওঠে। আর সেই সঙ্গে আর একটি সুন্দর তরুণ মুখ। যদিও জানে তার বক্ষলগ্না হয়ে আছে স্বাতী। তাতে কি আসে যায়? সে তো স্বাতীর মধ্যে বিলীন হয়েই তাকে পেতে চায়। এর বেশী কিছু আকাঙখার অপেক্ষা রাখে না সে। অলকের সুঠাম চালাবার সুখ ভঙ্গী, লঘুপদক্ষেপে চলা, স্বাতীর হাসি আর সঙ্গিনীর হাত ধরে সদর্পে বেরিয়ে যাওয়া চলমান চিত্রের মত মনের পর্দায় গাঁথা হয়ে রয়েছে। সারাজীবন ধরেই একজন সেখানে রূপকথার গল্পের মত লক্ষিত থাকবে।

বিবাহের আয়োজনে কুন্তলারও সাহায্য করতে হয় মাকে। বাবা বহু কষ্টে সারাদিন অফিসের খাটুনির পর এদিক ওদিক ঘুরে এক-একটি সামগ্রী হাতে করে বাড়ী ফেরেন। ভাইবোন-গুলি উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে। মা মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে শীর্ণ হাতে কুন্তলাকে টেনে আনেন দেখাবার জন্য কিন্তু সে যে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করে না। কন্যার এই মনোভাবকে পিতা-মাতা লজ্জার প্রতিভাস বলেই ভাবতে চেষ্টা করেন।

অবশেষে একদিন সেই বহুপ্রতী-ক্ষিত দিনটি নিতান্তই অনাড়ম্বরভাবে এসে গেল। শুভদৃষ্টির শুভক্ষণে সেই হিসেবী চোখের কথা ভেবে কুন্তলা দৃষ্টিবিনিময়ে বিরত রইল। স্বামীগৃহ শহরতলীতে। ট্রেনে যেতে হয়। বিদায়-পর্ব সারা হলে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে সেই মায়াপুরীর দিকে চোখ ফেরালো কুন্তলা। সারা বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ। যেন একটা ঘুমন্ত পুরী বলে মনে হচ্ছে। বাড়ীর ভিতর কেউ আছে বলে মনে হয় না। অনেক দিন জানালার ধারে দাঁড়ায় নি সে। তাই খবর জানে না কিছু। হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখলো স্বামী তার জন্য রিক্সায় বসে অপেক্ষা করছে। নিজের অন্যমনস্কতায় কুণ্ঠিত বোধ করে পাশে উঠে বসলো সে। পায়ের নীচে বিবাহের যৌতুক-সামগ্রী সমেত ছোট টিনের সুটকেশটি।

স্টেশনে নেমে তৃতীয় শ্রেণীর ভিড়ে ঠাসাঠাসি কামরার দিকে এগিয়ে গেল তারা। কোন রকমে ঠেলাঠেলি করে উঠলো। উঠেই এত মানুষের মাথার ভিড়ের উপর দিয়েও কামরার বাইরে দৃষ্টি পড়লো কুন্তলার। এ কী দেখছে সে? পাগলের মত ভিড় ঠেলে দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা করে দেখলো। হ্যাঁ, সে ঠিকই দেখছে। অলকই তার সঙ্গিনীকে ঘনিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার মুখের হাসিটি যেন আরও প্রাণবন্ত কিন্তু সঙ্গিনীটিতো তার পরিচিত নয়। নূতন একজন। একসঙ্গে আনন্দ, বিস্ময় ও আতঙ্কের ঢেউ খেলে গেল কুন্তলার মনে। এ কেমন কল্পনার চোরা-বালিতে প্রাসাদ গেঁথে চলেছিল সে দিনের পর দিন? মাথার ঘোমটা খসে পড়েছিল। একটি বলিষ্ঠ হাতের আকর্ষণে এগিয়ে যেতে হলো তাকে। তাকিয়ে দেখলো স্বামী বহুকষ্টে একটু জায়গা দখল করে তাকে বসাবার আয়োজন করেছে। বিনা দ্বিধায় তার চোখের দিকে তাকালো কুন্তলা। না, হিসেবী নয়, পরম স্নেহের দৃষ্টি তার স্বামীর চোখ দুটিতে। এ দৃষ্টির ভিতর রামধনুর ক্ষণস্থায়ী বিচিত্র রংয়ের খেলা নেই। আছে একটি অতি ক্ষুদ্র বাস্তব নীড়ের প্রতিশ্রুতি—যার ভিত আকাশের নীচে নয়, শক্ত মাটির নির্ভরে।

বুদ্বুদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আর শ্রীময়ী তখন, সরমার চোখেই তার করুণ আবেদনভরা দুই আর্দ্র চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল---'পিসী, তোমরা কি আমাকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিতে চাও?'

সরমার সমস্ত উৎসাহের আগুনে কেউ যেন ঝপ্ করে একঘটি জল ঢেলে দিল। এতদিনে প্রথম সরমা অনুভব করল---সরমার বয়স এখন উনিশ। সরমা জানল যে শ্রীময়ী আর ছোটটি নেই। শ্রীময়ীর ইচ্ছে-অনিচ্ছের জগতে ওদের হস্তক্ষেপ কি তবে এখন অনধিকারীর প্রবেশমাত্র? কণ্ঠনালীর কাছে এক অপরিচিত বেদনার চাপ অনুভব করল সরমা।

শ্রীময়ী কত সহজে, কত দ্রুত পদক্ষেপে বয়সটায় পৌঁছে গেল, যে-বয়সটা সেই মানুষকে আত্মরতি শেখায়? তাই ত, সেই যে ছোট মেয়েটা যে একদিন এই বাড়ীর আনাচে কানাচে ছুটে ছুটে বড় হল, আজ তার মনটা এই বাড়ী ছাড়িয়ে কোথায় কতদূরে বিস্তৃত হয়ে গেছে সে খবর ত রাখে নি তারা। তারা ত একদিন তাকে চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। শিখিয়েছে এগিয়ে চলতে, শিখিয়েছে নিজেকে দেখতে, আজ হঠাৎ পেছন থেকে আহ্বান শুনলেই বা সে ফিরবে কেমন করে?

যেন নতুন এক চশমা দিয়ে সরমা দেখতে পেল শ্রীময়ীর চোখের ভাষায় কি গভীর নিবিড়তা। কত বিষণ্ণতার কালো রাত যেন সেখানে অতল হয়ে জমাট বেঁধে আছে। কই কোনদিনও ত বুঝতে পারে নি সরমা---শ্রীময়ীর ঐ ঘন চোখের অন্তরালে একটি নিবিড় মনের স্বতন্ত্র পৃথিবী রয়েছে। তারা ত খুশী থেকেছে শ্রীময়ীর বাইরের রূপটাই দেখে, যে শ্রীময়ী আর সব মানুষদের মত হাসি পেলে হাসে, খিদে পেলে খায়, কান্না পেলে কাঁদে, ঘুমের সময় ঘুমোয়।

কিন্তু সরমা কি জানত না, যে উনিশ বছরের কোনও মানুষ শুধুমাত্র কতকগুলো ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দাস নয়, নয়---অভিভাবকদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের পুতুলমাত্র। তবুও ত খুশী থেকেছে---শ্রীময়ীর পরীক্ষার আগের রাত জেগে পড়া দেখে, আর নাচের মেডেলের প্রশংসায়। কোনওদিন কি বুঝতে চেষ্টা করেছে---বুকের তিল তিল ভালোবাসা দিয়ে যাদের গড়ে তুলছে, যাদের চতুর্দিকে সেতু আর নিরাপত্তার প্রাচীর তুলে দিয়েছে,---প্রাচীরের আড়াল হয়ে যাওয়া সেই মানসিকতার জমিটি কেমন হল?

সরমা শুনতে পেল, মালতী আবার তেমনি তার মাত্রাতিরিক্ত রূঢ়তার সঙ্গে প্রশ্ন করছে---'তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধই বা হচ্ছে কেন? এই পাত্র পছন্দ নয় ত অন্য পাত্র দেখব।'

শ্রীবনানী ঘোষ

---বলছি ত এখন আমার বিয়ের চেষ্টা করো না।' তীব্র স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠল শ্রীময়ী।

মৌ তখন ঘরের সবগুলো জানালাকে পর্দার বাঁধন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল। যদি একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যায়। শ্রীময়ীর উত্তর শুনে মালতী থমথমে নীরবতায় অটল হয়ে সরমার দিকে তাকাল। সরমা তরুর দিকে।

আর তরু এবার সরাসরি প্রশ্ন করে বসল---কেন রে ইচ্ছে নেই কেন? কোনও অসুবিধেয় পড়েছিস্ নাকি? দেখো বাবা, সিঙ্গল মুশকিলে পড়ে ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে বসিস না, যদি অসুবিধেয় পড়িস ত mutual অসুবিধেতে পড়িস্।'

কিন্তু তরুর হালকা ভাষা শ্রীময়ীর মুখের ভাবে কোনও রেখান্তর ঘটাল না। ওকে আরও বিবর্ণ দেখাল। যেন অনেক দূরের থেকে কোনও গ্রহান্তর থেকে একটি নিরীহ প্রশ্ন অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল------'যদি আমার নিজের কোনও পছন্দ থাকে, তার সঙ্গে আমাকে বিয়ে দেবে তোমরা? বলতে বলতে শ্রীময়ীর গলাটা কেঁপে উঠল। বিস্মিত মৌ হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল---এই দিদি, তুই কি বলছিস? আমাকে ত কোনওদিনও বলিস নি।'

সরমা দেখতে পেল, কথা বলার আবেগে মৌ-এর সমস্ত শরীর থরথরিয়ে উঠল। শ্রীময়ী কোনও উত্তর দিল না। সরমা অনুভব করল---তার হাত-পা, গা সব শির্ শির্ করছে। রক্তের অণুতে কিসের ধ্বনি যেন বেজে উঠছে রিণ্ রিণ্ করে। মালতীর চোখে চোখ রাখতে পারে নি শ্রীময়ী। সে শুধু তার কান্নাবোজা স্বরে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়ে ধীরপায়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

সরমা মালতীর দিকে তাকাল, ওকে অতিরিক্ত চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। তরুকে আনমনা লাগছে। যেন সে ভাবতে চেষ্টা করছে তাদের আশু কর্তব্য কি। মৌও আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সরমা ভাবতে চাইল---কে সে? শ্রীময়ীকে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে কারও সঙ্গে তারা মিশতে দেখে নি? কে জানে হয়ত কলেজ টলেজের কেউ হবে।---আনমনার মতই সরমা বলল---আজকালকার কিছু একটা হওয়া আশ্চর্যের নয়।

তরু ঘরের আনমনা ভাবটা উড়িয়ে দিয়ে আবহাওয়া শিথিল করে দিতে চাইল। বলল---'সত্যিই তাই। মেয়ের সুখটাই বড় কথা। মেয়ে যদি সুখী হয়, তবে আমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।'

মালতী তখনও তার চিন্তার সাগরে ডুবেছিল। অন্তত তাকে সেই রকম দেখাচ্ছিল। ওর কপালের কাছের ভ্রূ-দুটো ঘন কুঞ্চিত হয়েছিল। সরমা তরুর কথার উত্তরেই বলল---তাছাড়া আপত্তি করলেই কি শুনবে ভেবেছো? দাদাকে বাবা কম বাধা

ছিলেন? মনে রাখা এখন জগতে সম্পূর্ণ Outsider.

—গুরুঠাকুর খুব আপত্তি করে-ছিলেন? তরু প্রশ্ন করল।

সরমার কাছে অতীত মূর্ত হ'য়ে উঠলো, বললেন—দাদা অনেক বুঝিয়েছিলো বাবাকে। বলেছিল আপনি আমার দিকটা দেখছেন না, বাবা বলেছিলেন—যে ছেলে কুলের দিকে তাকায় না, তেমন বাপের অপুত্রক থাকাও ভালো। অথচ কুলের ভয় দেখিয়ে কি বাবা রুখতে পারলেন দাদাকে। ছবিদিরা ছিল ভঙ্গকুলীন। তুই ত দেখিস নি, কি চমৎকার দেখতে ছিল ছবিদি। যেমন শান্ত তেমনি মিষ্টি করে কথা বলত। দেশী-বিদেশী সাহিত্য, খেলার খবর, সব বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ছবিদির। আজকাল আর ছবিদিদের মত গভীর মনের মেয়ে পাওয়া যায় না তরু।

—দাদা পালিয়ে গিয়েছিল?

—ছবিদিরা পাশের বাড়ীতেই থাকত। ছবিদিদের বাড়ীতে কোনও আপত্তি ছিল না ত, আর মণ্টুদা ছবিদির দাদা, নিজের বিয়ের বন্দোবস্ত করেছিল, ওদের বাবা ছিল না। দাদা বাবার চোখের ওপর দিয়ে পাশের বাড়ীতে বিয়ে করল। তারপর ছবিদিকে অন্য বাড়ীতে নিয়ে গেল।

—তোমার সঙ্গে দাদার কোনও সম্পর্ক ছিল না?

—দাদা যাবার সময় আমাকে বলে গিয়েছিলেন, সরমা, পালিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি আর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। কত যে তুচ্ছতা আমাদের চারিদিকে। বড় হলে বুঝবি, আমি কোনও অন্যায় করি নি।

—আসলে, যারা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না তারাই কষ্ট পায়।

—সত্যিই তাই। অন্যায় কেউই করে নি। বাবা নিঃসন্দেহে ভুল করে-ছিলেন। কিন্তু তাতে অন্যায় ছিল না। তিনি যুগ বোঝেন নি। নিজের ছেলের চেয়ে জেদকে বড় করেছিলেন। দাদাকে বাবা প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। অথচ সংস্কারের কাছে ভালোবাসা ত বিকিয়ে গেল। কিন্তু ছেলেকে কি তিনি রাখতে পারলেন নিজের করে?

তরু এবার, নির্ভাবনার হাসি হেসে, হালকা উত্তর দিল—তাহলে দিদি, শ্রীময়ীর বেলাতে আমাদের নিশ্চয়ই একই ভুল করা ঠিক হবে না। আমরা ত যুগ বুঝেছি, আর সেই সঙ্গে আমাদের উদার হওয়াও উচিত।

সন্ধ্যা আসন্ন হয়েছিল, এবার ঘন হয়ে নামল। আশে পাশের কোন্ একটা বাড়ী হতে শাঁখ-বাজানোর শব্দ ভেসে এল। মালতী পাথরের মূর্তির মত নিশ্চলতা নিয়ে বসেছিল। ওদের আলোচনা ওকে স্পর্শ করছিল কি না বোঝা গেল না। সরমা তরুর কথায় সম্মতি জানাল। কিন্তু মালতীর এই মাত্রাতিরিক্ত গাম্ভীর্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাবল—তবে কি এই হয়, সন্তানেরা যখন মাতৃ-অনু-ভূতি ছাড়িয়ে—আপন শ্রেয় অনুভূতির পথে যাত্রা সুরু করে—সেই পরিবর্তনই কি বাবা-মায়ের মনে প্রাচীর তুলে দেয়, সংস্কার বা অন্য কোনও বাধা—একটি ভাণ মাত্র। মালতী কেন এত বেশী গম্ভীর হয়ে আছে?

বাড়ীর দরজায় ট্যাক্সির আওয়াজ হল, মালতী ও তরু সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়াল।

—'ওরা এল বোধ হয়'— ওর মানে গৌতম বা রজত। মালতী আর তরু একই সঙ্গে চলে গেল। টেবিলের ওপর ফ্যানটা বন্ধ করল সরমা। ঠাকুরকে বলল—টেবিলটা পরিষ্কার করে নিতে, তারপর নিজের ঘরে আসবার জন্য বারান্দায় পা রাখল।

শিশুসন্তানকে খাইয়ে মায়ের আনন্দ

বুধাও নিরু এখনও ক্যারম খেলছে। স্ট্রাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল। বৌ বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

সরমা বুঝল। শ্রীময়ীর ব্যাপারে যে হঠাৎ ধাক্কা খেয়েছে সেই ধাক্কাকে সামলে নেবার চেষ্টা করেছে। শ্রীময়ীর ঘরের কাছে আসতেই সরমা কেমন মুখ হ'য়ে গেল। জানতে ইচ্ছে হল---কে ছেলেটি। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলেন ঘরে। কিন্তু তার আর ভেতরে প্রবেশ করা হলো না।

ঘরের আলো জ্বালায় নি শ্রীময়ী। জানালায় মুখ রেখেছে। টেবিলের ওপর উঠে বসে আছে। চুলের রাশ ছড়িয়ে আছে পিঠময়।

সরমা বুঝল শ্রীময়ীর উনিশ বছরের মন এখন সেই পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করছে, যে পৃথিবীতে প্রবেশের পথটি সরমার অজানা। শ্রীময়ীর ভঙ্গিটা আঁকা হয়ে গেল সরমার মনে। মনে হল---'এ যেন এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা' যাকে সরমার স্নেহ দিয়ে আর কোনও দিনও মুছে দেওয়া যাবে না।

নিজের ঘরে ফিরে এল সরমা। জানলা দিয়ে আকাশে তাকাল। ভারী আকাশ, কালো স্লেটের রঙ, শ্রীময়ীর বিষণ্ণতা মালতীর গাম্ভীর্য—সব মিলিয়ে তাকে কেমন অতীতাশ্রয়ী করে ফেলল। নিজের উনিশ বছরের কালকে মনে পড়ল, যে দিকে সরমা সচরাচর চোখ মেলতে চায় না। আজকের পরিবেশ, কথোপকথন সবকিছু যেন টেনে নিয়ে গেল সেই উনিশ বছরের জীবনটাতে।

ভালবাসা কি সরমা জানত না। সেই উনিশ বৎসরের জীবনে সরমা কোনওদিনই অনুভব করে নি,—ভালোবাসা মানুষকে কতটা দুর্বল করে দেয়।

সরমার বাবা বলেছিলেন—এই সব ভালোবাসা-টাসা, সব ন্যাকামো বুঝলি, কতকগুলো নাটক-নভেল পড়ে পড়ে এই সব হচ্ছে।

সরমা বাবাকে মানত না, কিন্তু ভালোবাসা বলতে কোন্ টান অনুভব করে মানুষ, তাও বুঝত না সরমা। তবে সে ভালোবাসার আকর্ষণ, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্বকে তুচ্ছ করে, দাদার দেওয়া কষ্টের মত কষ্টভোগ করায় নিজেকেসে ভালোবাসাবাসির উর্ধ্বে রাখতেই চেয়েছিল সরমা। সরমার নিজেকে সাধারণের থেকে আলাদা করতে চাইত। সরমার প্রমাণ করবার ভয়ঙ্কর ইচ্ছে ছিল,---মেয়ে মানেই শুধু ওভারি এণ্ড ওম্ব নয়, সরমা নিছক মেয়ে নয়, মনুষ্যত্বে পূর্ণ মেয়ে, সরমা জীবনকে অপচয় করতে চায় নি। পূর্ণ করতে চেয়েছিল। অথচ জীবনকে কোথায় কখন কিভাবে ক্ষয়িত হয়ে যায়। সরমা বুঝতে পারে নি। সরমা ক্ষয়ই জানত না, তার চেয়ে গভীর অবক্ষয়কে জানবে কি করে?

সরমা একটি নিজস্ব গণ্ডীতে বাস করত, তাই সে অপমান করতে পেরেছিল মণ্টুদাকে। ছবিদি'র দাদা ছিল মণ্টুদা, চেহারায় মিল ছিল দুই মেরুর ব্যবধানের---দীর্ঘ, অল্প লম্বা, পুরু ফ্রেমের চশমা-পরা মণ্টুদাও জ্ঞানের সাগর ছিল। পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতাকে উপহাস করেই যেন গঠিত ছিল তার জল-বাঁকা অধর। একদিন নাম-করা লেখক হবে এই ছিল তার সাধনা। কে বলতে পারে মণ্টুদা বেঁচে থাকলে আজ তারাশঙ্কর অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায় হতে পারত না?

সেই মণ্টুদা। সরমার মত মেয়ের কাছে বিনা প্রস্তুতিতে বলতে পেরেছিল ---সরমা তুমিই আমার জীবনের এসেট্, তোমাকে পেতেই হবে। শুধু এ কথা? বলেছিল---সরমা, যৌবন ভোগ করবার সময়, না হলে সময় আর কাল তাকে অপহরণ করে নিয়ে চলে যায়।'

কে ভালবাসে শ্রীময়ীকে? সে কি অমনি করে জলন্ত সিসের ভাষায় কথা বলে শ্রীময়ীর সঙ্গে। শ্রীময়ী নিশ্চয়ই কান চেপে ধরে না সরমার মত। সরমার মত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হুল ফোটায় না। নিদারুণ আফশোষে পড়ে মরে না---এই ভেবে যে সে একটি পুরুষের নিতান্তই কামনার কথা হয়ে উঠেছে। শ্রীময়ী নিশ্চয়ই চোখের আগুনে পুড়িয়ে দিতে চেয়ে সরমার মত বলে ওঠে না—ছিঃ তোমার লজ্জা নেই। তোমার মত ছেলের সঙ্গে বাবা আমায় বিয়ে দেবেন না। হ্যাঁ, ওদের আর্থিক অসচ্ছলতার দিকটাতেই আঘাত দিতে চাইত সরমা।

মণ্টুদার মত কি শ্রীময়ীকে কেউ অত জলন্ত ভাষায় চিঠি লিখেছিল; যে চিঠির ভাষা সরমার উনিশ বছরের বসন্তের সমস্ত শুভ্রতাকে অপবিত্র অমলিন করবে বলে হাত বাড়িয়েছিল। সরমা, জলে উঠেছিল—কান্নায়, ঘেন্নায় অপমানে।

কি লিখেছিল আজও মনে আছে, সরমার মনে আছে মণ্টুদার

প্রতিটি অক্ষরকে। আর মনে আছে কেমন করে সেই চিঠি সরমার হাতের আঙুলে দলে, পিষে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সরমার আজন্ম কুমারী থাকার খবর ঘোষিত হয়েছিল পরই এসেছিল সে চিঠি। লিখেছিল---

ওঃ কি ভীষণ, নিরবতার দেওয়াল তুমি। যাকে ভালবাসি তাকে কামনা করবার মত সুখ আর কিছুতে নেই। সরমা নিজেকে জানতে শেখো, তোমার মনের কাছে আমার আবেদন নিঃসঙ্গ একক হ'য়ে ঘুরে মরুক। জীবন বড় ছোট, একবার ভুল করলে আর নতুন করে সুরু করবার সময় থাকে না। হু হু করে সময় বয়ে চলেছে। সরমা, আর কবে তুমি জাগবে?

চিঠির উত্তর দিয়েছিল সরমা। শ্রুতলিপি লিখনের দ্রুততায় শেষ করেছিল সে চিঠি। ছোট্ট কয়েকটি কথা।

মণ্টুদা, একদিন তোমাকেই জীবনের আদর্শ বলে ভাবতাম। তোমার কাছেই সমস্ত শিক্ষার সুরু। কিন্তু এতো অধঃপতনের চেয়ে বোধহয় তোমার মৃত্যুও ভালো ছিল।

হ্যাঁ, মনে আছে, বেশ ভালো করেই মনে আছে সরমার মৃত্যু কথাটার ওপরই জোর দিয়েছিল সে। কিন্তু সরমা কি জানত, তার কথাটাই অমন করে ফলে যাবে? সরমা কি আর সত্যি সত্যি মৃত্যু কামনা করেছিল? কখনো তা সম্ভব হয়?

অথচ সেই রাত্রিতেই মরে গেল মণ্টুদা। সরমার ওপর চিরকালের শোধ নিয়ে গেল, আর সরমাকে শিখিয়ে রেখে গেল যে মৃত্যুর কোনও বয়স নেই। কাউকে কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, একজন উনত্রিশ বছরের, আস্ত জোয়ান ছেলে, কাজের শেষে বাড়ী ফিরল, খাওয়া দাওয়া করল, ঘুমোতে গেল---আর উঠল না। ডাক্তাররা পারে নি, বলেছিল হার্টফেল।

কিন্তু মণ্টুদার যে হৃদয় যৌবনকে অত তীব্রভাবে অনুভব করত, সেই হৃদয়টা কখন অত নরম হয়ে গিয়েছিল? ডাক্তারেরা রোগ ডায়গোনাইজ করতে পারে নি---হার্টফেল বলে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিল।

কিন্তু সরমা? তার বুকের তন্ত্রীতে এক অপরাধবোধ যেন ভার হ'য়ে উঠেছিল। সরমার মনে হ'য়েছিল---আসলে তার মৃত্যুকামনাটাই সত্য হ'য়ে ফলল। নিজের কাছে নিজে বিশিষ্ট হ'য়ে গেল চিরকালের জন্য। সরমা আজও জানে না, সরমার সেই চিঠি মণ্টুদা পড়েছিল কি না। কিন্তু ছবিদি পেয়েছিল। বৌদি হ'য়ে ডেকে পাঠিয়েছিল সরমাকে। সেই প্রথম দাদার বাড়ীতে গিয়েছিল সরমা, বাবাকে না জানিয়ে।

গল্প করতে করতে হঠাৎ ছবিদি চিঠিটি দেখিয়েছিল। প্রশ্ন করেছিল--এটা ত তোরই লেখা?

সেই প্রথম সরমা তার বুকের গোপন অস্থিরতাকে একটা প্রকাশ দিতে পেরেছিল। মণ্টুদার মৃত্যুর পর সেই প্রথম কেঁদেছিল সরমা, ছবিদির হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল---বিশ্বাস কর, আমি সত্যি করে লিখি নি। ছবি দিও কাঁদছিলো। কিছুই বলে নি। হয়ত বিশ্বাস করেছিল।

অনেকক্ষণ পর ছবিদি বলেছিল---জানিস, মানুষ যাকে ভালবাসে তার থেকে আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

হ্যানয়ের কর্মব্যস্ত রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণরত নারী-পুলিশ

ভয়

ভজন চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তারবাবু আছেন? ডাক্তারবাবু? একটু পরেই কম্পাউণ্ডার অজিতের গলা শুনতে পেলাম---কে?

আইগ্গে ডাক্তারবাবু আচেন?

---আছেন।

---আমার ছেলেডার বড্ড অসুখ। তাঁরে নিত্তি এইচি।

---কি এনেছ নৌকো না পাল্কি?

---আইগ্গে লৌক।

সে লোকটাকে নিয়ে অজিত আমার কাছে এলো; একটা গ্রাম্য চাষাভুষো লোক। তার মুখে রুগীর রোগের বিবরণটা সব শুনলাম। লোকটার গ্রামটাও অনেক দূরে। কেসটা নিলে রাত্তিরে---আর ফেরা যাবে না। সাধারণত রাতের কেস আমি নিই না। বললাম, অন্য ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাও।

লোকটা তার কাঁধের ময়লা গামছাটা দিয়ে কোটরগত চোখ দুটো মুছে নিয়ে, হাত দুটো জোড় করে বললে---দয়া করেন ডাক্তারবাবু। দয়া করেন। আমার ছাবুরি বুঝি আর বাঁচাতি পারলাম না। দয়া করেন।

লোকটার গলায় ভিক্ষুকের আকুতি। মনটা খানিকটা ইতস্তত করল। তারপর ভাবলাম যাওয়াই যাক্।

যে ক'টা রুগী বসেছিলো তাদের দেখে নিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট হোল্ডল আর ডক্টরেস্ ব্যাগটা নিয়ে লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল।

●

বর্ষার ভরা নদী------

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে।-----নদীর দুপাশে জমাট্ অন্ধকারে নিস্পন্দ বনানী---

নৌকার কেরোসিন বাতির বিষণ্ণ আলোটা কালো জলে পড়ে কেঁপে কেঁপে ঝিমিয়ে যাচ্ছে।

ছলাৎ ছলাৎ আছড়ে পড়ছে ঢেউ-গুলো। মাথা কুটছে নৌকর গায়। আবছা অন্ধকারে গোলুইয়ের ওপর মাঝির ঝাঁকড়া মাথাটার সঙ্গে কালো পাথরের মতো দেহটা বৈঠার টানে টানে দুলছে। কানে আসছে একটানা বৈঠা টানার আওয়াজ---ছুপ্ছুপ্---ছুপ ছুপ্---

পৌঁছতে খানিকটা রাত হবে।

ছৈ-এর সামনে বসে আছি। নানান কথা মনে ভিড় করছে। পাশ করে বেরিয়েছি। পশ্চিমের দিকেই প্র্যাকটিস করার ইচ্ছে। যে কেসটা দেখতে পাচ্ছি সেটার কথাও ভাবলাম।

যখনকার কথা বলছি তখনকার দিনে দূর গাঁয়ের গরীবেরা সাধারণত প্রথমটা শিউলীপাতার রস, মাদুলি, এটা-ওটা, টোট্কা-টুট্কি করেই দেখতো। তারপর যখন ডাক্তার ডাকতো তখন অনেক ক্ষেত্রেই মটকা ধরে যেতো। ডাক্তারের করবার আর বিশেষ কিছুই থাকতো না।

এ কেসটাও তাই কিনা কে জানে।

জায়গাটায় যখন পৌঁছে গেলাম রাত হয়েছে। মাঝি নিলে হ্যারিকেন আর ডক্টরস্ ব্যাগটা। আর লোকটা নিলে বেডিংটা, আর একটা মোটা লাঠি। গ্রাম্য কাঁচা উঁচু নীচু সরু পথ। দু'পাশে ঘাস আর বনকচুর বন। পথে সাপ-খোপের ভয়।

কিছুদূর গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম---আর কতদূর হে?

লোকটা বললে---আর বেশীদূর বাতি হবে নি বাবু। আর এই এট্টু গেলিই আমার গেরাম।

এট্টু নয় বেশ খানিকটা রাস্তা গিয়ে ছোট্ট একটা গ্রাম। চারিদিকে আসশেওড়া, ভ্যারেণ্ডা, আগাছার জঙ্গল। শ্যাওলাভরা মজা ডোবা। বড় বড় গাছ-গাছালির গহণ অন্ধকার নিঃশব্দ কৌতূহলে তাকিয়ে আছে। আমাদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কেবল মাঝে মাঝে জোনাকির মতো এক একটা আলোর কৌটা জীবিত মানুষের অস্তিত্ব জানাচ্ছে।

যে বাড়ীটায় গেলাম, মাঝখানে মস্ত একটা কাঁচা উঠোন। উঠোনটার দূরে দূরে গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্ট ছোট্ট এক একটা কুঁড়েঘর। তারই একটা কুঁড়েতে নিয়ে এলো আমায়।

রুগী দেখে বুঝলাম অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। বছর আঠারোর একটা ছেলে, ময়লা কাঁথা আর তেলচিটে বালিশটার সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে। জ্ঞান আছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কেমন একটা করুণ নিঃস্পন্দ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। তখনো সে দৃষ্টিতে বাঁচার আকুতি।---কিন্তু সব শেষ হয়ে এসেছে।

দু'বার দুটো ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘড়ি দেখে বসে রইলাম। কোনই কাজ হোল না। রুগী জীবনের সঙ্গে শেষ চেষ্টা করে শেষ নিঃশ্বাস ফেললো। কাছে মেয়েরা যারা বসেছিলো কেঁদে উঠ্‌লো। নির্মম মৃত্যুর কাছে রক্তাক্ত প্রাণের ব্যর্থ অনুযোগ।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হ্যারিকেনের আলোয় পথ দেখিয়ে ওরা আমায় অনেকটা দূরে অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া একটা কুঁড়েতে নিয়ে গিয়ে মাদুর পেতে দিয়ে বসলো। দেখলাম আমার হোল্ডলটাও রেখেছে একপাশে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে বসে এদের নির্বুদ্ধিতার কথাই ভাবতে লাগলাম। রাত বেড়ে চলেছে। ক্ষিদেও পেয়েছে যথেষ্ট। কাউকে কিছু বলাও যায় না। সবাই ব্যস্ত। মেয়েরা উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে। তাদের কান্না হারিয়ে-যাওয়া ছেলেকে অন্ধকারে জঙ্গলে ডেকে ডেকে ফিরছে।

বর্ষাকাল। বৃষ্টি না হলেও আকাশটাও মেঘে কালো হয়ে আছে। ভিজে-ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ----

●

এমনি সময়ে একখানা খয়েরী ডুরে উঁচু করে পরা শ্যামলা একটা মেয়ে, একটা মাজা পেতলের ঘড়ায়

একখড়া জল, আর একটা মাজা ঘটি নিয়ে এলো। হ্যারিকেনের আলোয় মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। যৌবন ওকে দূর থেকে আলতো হাতে ছুঁয়েছে। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফোলা-ফোলা। চোখের জলে পুরন্ত গাল দুটো ভিজে। মনে হোলো ও হয়ত হাবুর প্রতিবেশিনী বামুনদের—আমবাগানে বড় ফজলি গাছটার নিচে ওর ওই খয়েরী ডুরের আঁচলে বাঁধা চুরি করা কুলের আচারে হয়তো হাবুরও ছিল সমান লোভ। রুখু চুলের ঝুরি মুখের ওপর থেকে সরিয়ে সরিয়ে ও হয়তো হাবুর ছিপের চার বানাতো; ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিত। ভরদুপুরে কাঁচা উঠোনটা নিকোতে নিকোতে হাবুর মা বলত,—এ রাখী এইচিস্। আমার হাত জোড়া। পান্তর কাঁসিডা হাবুরি ধরে দেত না; ড্যাকরা ছেলে চেঁচাতি লেগেছে।

ডাঁসা পেয়ারা চিবোতে চিবোতে রাখী মুখ ঘুরিয়ে বলত—'হাত তো আম্মো জোড়া খুড়ি—

ইঃ হাত জোড়া—হাবু রাখীর কোঁচড়ভর্তি ডাঁসা পেয়ারা উঠোনময় ছড়িয়ে দিয়ে চোখ পাকিয়ে বলত—এবার তোরেও আছড়াব রাখী। হ্যাঁ—এই বললাম।—

দুম্ করে পান্তার কাঁসিটা হাবুর সামনে বসিয়ে দিয়ে রাখী চোখ মুছতে মুছতে বোলত—আচ্ছা—

জল রেখে চলে গেছে মেয়েটা। হোল্ডল থেকে তোয়ালেটা আর সাবানটা বার করে নিয়ে দাওয়ায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলাম।

মেয়েটা আবার এলো। আমায় একখানা কুশের আসন পেতে দিয়ে ঝকঝকে মাজা কাঁসার থালায়, কিছু আম, কিছু ছানা আর একবাটি দুধ রেখে দিয়ে চলে গেল।

খেয়ে উঠে হোল্ডলটা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ওঘর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এসে মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। মাটির ঘর—জঙ্গল——বুকচাপা অন্ধকার—। ভুসো-পড়া লণ্ঠনটার মিটমিটে আলোর একটা থমথমানি। ছেলেটার মৃত্যু-মলিন মুখখানা আর তার নিস্পন্দ চোখের করুণ আকুতি বারবার মনে পড়ছে। মনে হয়েছে যেন ও যায় নি ওর অপূর্ণ জীবন ফেলে—নিরুদ্ধ অভিমান নিয়ে আমার কাছেই কোথাও রয়েছে।

বেশীদিন কলেজ থেকে বেরুইনি। গা-টা একটু ছম্‌ছম্ করে উঠলো—। তারপর কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। বাইরে থেকে কে যেন ভারী গলায় ডাকছে—ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু—

বললাম—কে?

সে বললে—আপনার আলোডারে এট্টু নিয়ে যাবো বাবু? কাট কাটতি হবে।

বললাম—নিয়ে যাও।

লোকটা হ্যারিকেনটা নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেল; যাতে কোন বন্য জন্তু না ঢুকতে পারে।

নিঃসীম অন্ধকার——মেঘলা রাতের অথৈ অন্ধকারে আকাশের তারা ক'টাও ডুবে গেছে।

ছোট্ট ছিটেবেড়ার জানলাটা দিয়ে মাঝে মাঝে একটা হাওয়ার ঝাপটা ভেসে আসছে। যেন কোন বিদেহী আত্মার দীর্ঘশ্বাস। ওঘর থেকে তখনো গুন্ গুন্ করে ক্লান্ত কান্নার গুমরুনি ভেসে আসছে। আর দূর থেকে আসছে কাঠ কাটার আওয়াজ, ঠক্‌ঠক্—ঠক্‌ঠক্।

একটা রাতজাগা পাখী চিৎকার করে কোথায় উড়ে গেলো। ঘুম আর আসে না। অপরিচিত জায়গা। শোকার্ত পরিবেশ। তারপর আবার একসময় তন্দ্রার মত এসেছে। কিন্তু কেন জানি না তন্দ্রাটা আমার এবারও ভেঙে গেল—

অন্ধকারেই চেয়ে আছি। রাত এখন ক'টা কে জানে—দূরে কতগুলো শেয়াল ডাকছে।

বারবার ছেলেটার মৃত পাণ্ডুর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে।—

একটা বুনো গন্ধ আসছে জঙ্গল থেকে—

কোথায় একটানা ঝিঁঝি ডাকছে।

এমন সময়ে মনে হোল, আমার বড় কাছাকাছি কে যেন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। বন্ধ ঘরে নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসবে কার?

ভাবলাম ও কিছু না, মনের ভুল। কিন্তু একটু পরেই শব্দহীন অন্ধকারে আবার শুনলাম নিঃশ্বাসের আওয়াজ। এবার ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগলো।

এরপর একটুক্ষণ সব চুপচাপ। কিন্তু তারপরেই আমার মাথার পেছন দিকে বালিশের গায়ে খসখস শব্দ হতে লাগলো।

জোর করেই চোখ দুটো বন্ধ করে আছি। একটা অবিশ্বাস্য অনুভূতি স্নায়ুর ওপর চাপ দিচ্ছে। একবার মাথার পেছন দিকে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম হাত উঠলো না। হয়তো শীতল কিছুর গায়ে ঠেকে যাবে। আর ঠিক এমনি সময়ে আমার কপালের ওপর আবার একটা নিঃশ্বাস। কি একটা অজানা রহস্যে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে হিম-স্রোত বয়ে গেল। কার যেন শীতল হাত ঘরময় কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাছে আলো নেই। অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারছি না। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। বন্য জন্তুর ভয়ে ওরা আমাকেও জন্তুর মতো খোঁয়াড়ে বন্ধ করে রেখে গেছে।

এদিকে আবারও সব চুপচাপ। নিথর নিস্পন্দ কুঁড়ে—আস্তে আস্তে বিছানাটার ওপর উঠে বসলাম। আর বসতেই দেখলাম, দূরে দুটো চোখ যেন নিমেষমাত্র একবার জ্বলে উঠেই নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে গেল।

আশ্চর্য। কী ব্যাপার? ভৌতিক? কিন্তু উপায়ই বা কি? বালিশটার মধ্যে মাথা গুঁজে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। কেমন মনে হতে লাগলো

অন্য ঠিকানায়

বারি দেবী

বোস সায়েব দু'একদিন ছাড়াই আসতে লাগলেন। আসেন সন্ধ্যেবেলায় দু'একঘণ্টা বসেন, গল্প করেন, আর মদ খান।

লোকটার প্রতি যেটুকু কৃতজ্ঞতা ভাব জেগেছিল মনে, কিছুদিন তার সঙ্গলাভের পর মন থেকে মুছে গেছে তার প্রতি সেই দুর্বলতা। তার পরিবর্তে প্রবল বিতৃষ্ণা আর ঘৃণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে অন্তরটা। ওর স্থূল কথাবার্তা, হাস্য-পরিহাস, আর মাতলামী আর সহ্য করতে পারছি না আমি।

ওর সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্নের জাল আমার ছিঁড়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তবুও একটা সুস্থ সুন্দর ভদ্র পরিবেশ, স্বামী-সন্তান, এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা যে নারীর মজ্জাগত, তাই তাকে রূঢ়ভাবে অস্বীকার করবার মত শক্তিও পাই না মনে। তাই দিনরাত একটি চিন্তার ঝড় বইছে আমার মনে---কি করা যায়? কি করবো? লক্ষ্য করছিলাম যে পাওয়ার সায়েব যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে আমার জগৎ থেকে। ঠিক যেমন প্রথম দেখেছিলাম ওকে, অতিমাত্রায় গম্ভীর, নীরব, নিঃশব্দ পাথরের স্ট্যাচুর মতো, আবার সেই রূপটা যেন ওর ফিরে এসেছে। মনে আঘাত পাই ওর এই রূপান্তর দেখে।

একদিন সন্ধ্যায় বোস সায়েব বললেন---বড্ড দুশ্চিন্তায় পড়েছি সোনা। ব্যবসার অবস্থা বড়ই মন্দা, অনেক টাকা আটকে পড়েছে, তাই কাঁচামাল আনতে পারছি না টাকার অভাবে। অনেক ভেবে ছুটে এলাম তোমার কাছে, হাজার পাঁচেক টাকার জন্যে। অবশ্য ধার হিসেবে নেব,---আর ক'দিন বাদেই শোধ দিতে পারবো। বলো সোনা, তুমি দেবে তো?---ধার?---বুকটা মোচড় দিলো একটা কিসের যন্ত্রণায়! ধার দেব কার টাকা,---কাকে? একটা প্রশ্ন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত খোঁচা দিচ্ছে মনে। এ লোকটা কি তার হত্যাকারী? যার টাকা আজও আত্মসাৎ করতে চাইছে? অনুমান তো সেই কথাই বলেছিলো, অবশ্য সঠিক প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি।

ভেবে কিছু স্থির করতে পারবো না জানি, তাই মনের যন্ত্রণা, কান্না, সব চেপে রেখে, পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিলাম ওকে।

পরদিন সকালে পাওয়ার সায়েব এসে দাঁড়ালো আমার কাছে।

এমন অসময়ে ওকে দেখে বুঝলাম ও কিছু বলতে চায়। কোন ভূমিকা না করেই বললো পাওয়ার---আমাকে এবার ছুটি দাও সিস্টার।

ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বেদনার্ত কণ্ঠে বললাম---তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে সায়েব? কেন? কি হলো তোমার?

মাথা নত করলো পাওয়ার সায়েব। তারপর মৃদুস্বরে জবাব দিল---আমি ভালোবাসতাম, আমার সায়েবকে, তাই যে তার জান প্রাণ খতম করেছে সে, যে-ই হোক না কেন, সে দুষমন আমার শত্রু।---আর সে এসে দিনের পর দিন আমার সায়েবের পয়সা লুটে খাবে, এ আমি সইতে পারবো না সিস্টার,---তাই---তাই---এখান থেকে সরে যেতে চাইছি।

---সায়েব? সায়েব তুমি ঠিক জানো যে এই লোকটা তোমার সায়েবকে মেরেছে? দারুণ উত্তেজনায়, গলার স্বর আমার কেঁপে উঠলো।

---হ্যাঁ জানি! ধীরকণ্ঠে জবাব দিলো পাওয়ার সায়েব। ওর আশ্চর্য শান্ত চোখ দুটোতে জ্বলছে যেন দুটি বিদ্যুতের শিখা। কয়েক মুহূর্ত সেই জ্বলে ওঠা চোখের দৃষ্টি রাখলো সে আমার চোখের ওপর, তারপর বললো---যে লোকটা টেলিফোনে আমার সায়েবকে খুন করবে বলে শাসাতো তার গলার স্বর আমি ভুলি নি সিস্টার। তা ছাড়া, আমাদের পুরোনো ড্রাইভার, যার কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে সায়েবের গাড়ীতে

যেন কোন অশরীরী তার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে আমার চারিপাশে একটা বোবা কান্না নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তখনো দূর থেকে কাঠ কাটার আওয়াজ আসছে ঠক্ ঠক্---ঠক্ ঠক্।

রাত আর শেষ হতে চায়না। একটা ভয় আর বেদনার অনুভূতি সমস্ত মনটাকে নিঃসাড় করে রেখেছে।

৭

তারপর কখন এক সময় ভোরের আলো সান্ত্বনার মতো ছোট্ট ছিটে বেড়ার জানলাটা দিয়ে আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো। সেই আলোতে দেখলাম ঘরটার একপাশে মার্জারমহিষী নিশ্চিন্ত বিশ্রামে নিদ্রামগ্ন।

খোকা রেখেছিলো, তার নাম সে যাবার সময় বলে দিয়ে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছিলো।

একটু থামলো পাওয়ার সায়েব। নিজেকে একটু সামলে নিলো তারপর ভারী গলায় বললো সে, —আমার সায়েবের এ দুনিয়ায় আর কেউ শত্রু ছিল না সিস্টার, ঐ বোস সায়েব ছাড়া। আর সেই বেনামী চিঠিগুলোর কথা বোধহয় তোমার মনে আছে, সেগুলো আছে আমার কাছে, প্রয়োজন হলে তুমি ওঁর লেখার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারো, অবশ্য সেই চিঠি যদি উনি নিজের হাতে লিখে থাকেন।

এইসব নানারকম কিছু চিন্তা করেই আজ আমি এসেছি তোমার কাছে ছুটি নিতে সিস্টার।

--না, না, তুমি যেও না সায়েব, তুমি যেও না। তোমার সায়েব যে আমাকে তোমার হাতে দিয়ে গেছেন, তুমি আমাকে একটা নেকড়ে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে যেও না সায়েব।

কথাগুলো বলতে বলতে আমি ছুটে গিয়ে দুহাত দিয়ে ওর হাত শক্ত করে চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

গভীর স্নেহ-মমতায় ভরা ছলো-ছলো কণ্ঠে বললো পাওয়ার—আমি জানি সিস্টার। আমার সায়েব যে ভীষণ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আমাকে, তার থেকে ছুটি নেওয়া আমার চলে না। ---কিন্তু তোমার দিক দিয়েও তো ভাববার কিছু আছে। এমন নিঃসঙ্গ হয়ে সারাজীবন কেমন করে কাটবে তোমার? তাই বোস সায়েব যখন আইনত স্বামীর দাবী নিয়ে এলেন তোমার কাছে, তখনই আমি ভেবে-ছিলাম যে---যদি উনি স্বামীর কর্তব্য পালন করতে চান, অর্থাৎ সব বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করে স্বাভাবিক সুন্দর একটি সংসার গড়ে তোলেন তোমাকে নিয়ে, তবে তোমার পক্ষে সেটা ভালোই হবে। তাই সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমি চলে যেতে চাইছিলাম সিস্টার।

তবে একথাও বার বার আমার মনে হয়েছে যে—শেষ পর্যন্ত উনি ওঁর দায়িত্ব পালন করবেন তো? কারণ যে মানুষকে খুন করতে পারে, তার দ্বারা কোন ভালো কাজ হওয়া সম্ভব কি না, তা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না সিস্টার। সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

--আমি জবাব দিলাম—তুমি ঠিক বলেছো সায়েব, ঐ খুনে দস্যুটা আমার ভালো করবার জন্য বা ভদ্রভাবে সংসার করবার জন্যে আসে নি, ও এসেছে তোমার সায়েবের সম্পত্তি লুঠ করবার জন্য। সেই-জন্যে ঐ নেকড়ে বাঘটা এসেছে পুরোহিতের ছদ্মবেশ ধারণ করে। ওর মুখে, প্রথমে মিঠে বুলি শুনে আমারও মোহ কিছুটা জেগে ছিল মনে,---কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ওর আসল মূর্তিটা আমার নজরে পড়েছে। তুমি ঐ হিংস্র পশুটার মুখ থেকে আমাকে বাঁচাও সায়েব। আমার মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন একাধারে সবই যে তুমি। তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই সায়েব।

দুহাত বুকের ওপর ক্রশ করে, চোখ বুজে মাথা নত করলো পাওয়ার সায়েব। তারপর গাঢ়স্বরে বললো— ও কথা বোলো না সিস্টার। মা বাপ ভাই বন্ধু সবই একমাত্র সেই পরম করুণাময় ঈশ্বর। আমি তাঁর সেবক দাস মাত্র, আর তোমাদের একান্ত অনুগত ভৃত্য। তুমি তাঁকে ডাকো, সব বিপদ অবশ্যই কেটে যাবে। আমিও এ বিষয়ে চিন্তা করছি তবে বোস সায়েবকে কিছু জানতে দিও না, বা ওঁর আসা যাওয়ার বাধা দিও না, একটু ধৈর্য ধরে থাকো সিস্টার, উপায় কিছু একটা হবেই।

●

দিন সাতেক আসে নি বোস সায়েব। ওর নোংরা সঙ্গ থেকে ক'দিন নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তি এসেছে মনে, তবুও অন্য বিষয়ের চিন্তায় কণ্টকিত মন, সর্বদাই ছটফট করে, যন্ত্রণামুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—কেমন করে, কোন উপায়ে, এই নরপশুটার কবল থেকে মুক্তি পাবো? পাওয়ার সায়েবও এ বিষয়ে এখনও কোনো কথা বলেন নি।

তারপর সাতদিন পরেই সন্ধ্যার দিকে আবার এলো বোস সায়েব।— টাকাটা পেয়ে ওর খুব উপকার হয়েছে, সব ঝামেলা মিটোতে বড্ড ব্যস্ত ছিল সেজন্য এ ক'দিন আসতে পারে নি, বললো সে।

গলার স্বর ওর থমথমে, মুখে ঝাঁঝালো গন্ধ। আমার গা ঘেঁষে বসেছিলো লোকটা, মনে হচ্ছিলো একটা ময়াল সাপ যেন আমাকে গিলতে আসছে। আমি পাওয়ার সায়েবকে ওর কফি দিতে বলার ছুতো করে উঠে গেলাম,---তারপর ফিরে এসে ওর বিপরীত দিকের সোফায় বসলাম।

ইচ্ছে হলো, ওর হাতের লেখাটা একবার পরীক্ষা করবার জন্য, অবশ্য তার খুব একটা দরকার ছিল না, পাওয়ার সায়েবের কথাই আমার কাছে যথেষ্ট। তবুও একটা কৌতূহল জেগেছে মনে, তাই একটা কাগজের প্যাড এগিয়ে দিয়ে বললাম যে---স্টুয়ার্ট কোম্পানীকে একটা কড়া করে চিঠি লিখে দাও তো, গাড়ী বিক্রির টাকা এখনও দেড় হাজার ওর কাছে আমার যা পাওনা আছে, সাত দিনের মধ্যে না পেলে, আমি কোম্পানীর নামে নালিশ করবো।

---ও, তাই নাকি? তোমার টাকা আটকেছে? এই যে এমন কড়া চিঠি দিচ্ছি যে, বাছাধন টের পাবে। বলে, প্যাডটা টেনে নিয়ে দীর্ঘ এক চিঠি লিখলো বোস সায়েব।

চিঠি শেষ করে পকেট থেকে একটা ছোট বোতল বার করে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা গলায় ঢাললো। বলটা খুব খুশি হয়ে উঠলো ওর টাকার কথায়। নেশাটাও বোধহয় জমেছে খুব, তাই অনর্গল কথা বলতে লাগলো, আর দমকা হাসি তার সঙ্গে।

---যতো সব শয়তান আছে তোমার

চারপাশে, সব,---সবকটাকে খতম করবো আমি, তবে আমার নাম বিশু বোস। দেখ না আমার ক্ষেমতা কতখানি। ঐ যে, শালা বাবা মল্লিকের নাতি, এসেছিল আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে,---তাকে একেবারে দুনিয়া ছাড়া করে ছেড়েছি না ?---শা---লা------

আমি শিউরে উঠলাম ওর দিকে চেয়ে। ভয়ে ঘৃণায় সারা দেহ কাঁটা দিল,---তবুও সে ভাব দমন করে, আরো কিছু জানবার জন্যে বললাম ওকে---

---যখন বাবা মল্লিকের নাতি, আমাকে চুরি করে নিয়ে পালালো, তখন কৈ তুমি আসোনি তো তাকে উদ্ধার করবার জন্যে ?

---সে যে হবার নয় গো, তাই যাই নি। জাত যাবে, মান সম্মান যাবে, লোকে একঘরে করবে যে। যে মেয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে একবার ঘর ছেড়ে গেছে তাকে কি আর ফিরিয়ে আনা যায় ? সমাজ আছে যে। তাই তো তোমার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে, তোমার মরা খবর রটিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু আমি ঠিক টিকটিকির মত লেগে রইলাম ওর পেছনে, প্রতিশোধ নেবার জন্যে। তাই তো ভয়ে দেশ ছেড়ে পালালো। তারপর যখন ফিরে এলো, তখন বেশ কিছুকাল চুপ করে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম, যে ওর ভয়টা আগে কাটুক, বাইরে চলাফেরা করুক, তারপর ঘুঘুকে ফাঁদে ফেলবো।

কত যে টাকা ঢালতে হয়েছে এর জন্যে। যাক গে সার্থক হয়েছে পয়সা খরচা, গায়ের জ্বালা মিটেছে আমার। তবে কি জানো ? তোমার যে ক্ষতিটা করে গেছে সে শালা, সেটা তো আর পূরণ করা যাচ্ছে না।---তবে তাতেই বা দুঃখ কি বলো। ছিলে তো তার রক্ষিতা হয়ে, এখন না হয় নিজের স্বামীর রক্ষিতা হবে, এই আর কি।---তা মন্দটা আর কি হবে, বলো, অঁ্যা, বেশ মজাই হবে, বেশ মজা---হা, হা, হা, হা।

হায়নার হাসি নাকি বড় ভয়ঙ্কর। আজ সেই হাসি যেন শুনছি নিজের কানে। শুধু শোনা নয়, হায়নাটা দেখছি লাফিয়ে এসে আমার ঘাড়ে পড়লো বলে।

দু'হাত দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে সবলে টেনে নেবার চেষ্টা করলো। আমি মৃদু আর্তনাদের সঙ্গে ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, আর সেই মুহূর্তে পাওয়ার সায়েব ওর জন্য কফি নিয়ে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো দরোজার সামনে।

বিশু বোসের বোধহয় তখন কোন খেয়াল ছিল না,---তাই জড়ানো স্বরে বললো---কি হলো ? সরে গেলে কেন চাঁদ ? ও-হো বুঝেছি বুঝেছি। অভিমান ? আচ্ছা ঠিক আছে; আজ রাতে তোমার কাছেই থাকবো কি বলো ? পাওয়ারকে বলো ডিনার তৈরী করতে। মুর্গীর ঝোল, আর ফ্রাই রাইস, আর কিছু নয়। আর বৌকে ফোনে বলে দিচ্ছি যে কাজ আছে, রাতে ফিরতে পারা যাবে না।

---বৌ ?--- মুখ দিয়ে কথাটা আমার বেরিয়ে গেল।

---ওঃ! তাও জানো না বুঝি। তুমি চলে যাবার পরেই তো আমার আবার বিয়ে দিলেন বাবা। একটা ছেলে একটা মেয়েও হয়েছে। তা হোক

কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে 'পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি' শীর্ষক আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ

এ বৌটা কিন্তু তোমার বড় সুন্দর নয়, তাই মনটা তোমার কাছেই পড়ে আছে। শুধু সমাজের ভয়ে এই পাঁচটা বছর---আর ঐ দুশমনটাও ছিল পর্বত হয়ে আমাদের মাঝখানে। তা শালাকে একেবারে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি।

সোফার ওপর ধপাস করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো, বিশু বোস, আর দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকলো ওর কাছে। কফি হাতে এগিয়ে এলো, পাওয়ার সায়েব। আমি ওর হাত থেকে কফি নিয়ে টেবিলে রেখে বললাম:

--আজ তো বোধ হয় ডিনার এখানে হবে না, কারণ, পাওয়ার সায়েবের খুব শরীর খারাপ, ও রাঁধতে আজ পারবে না। আর আমারও ভীষণ মাথা ধরেছে সেজন্য---

---ও,-কে। ঠিক আছে আজ থাক অন্যদিনই হবে। তোমার জন্যেই বলছিলাম আর কি।

উঠে বসে কফি খেল বোস সায়েব তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল---কাল আবার আসবো।

●

দিনের আলোর মতই সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর কিছু জানবার বা বলবার নেই। পাওয়ার সায়েবও নিজে কানে শুনেছে বোসের স্বীকারোক্তি যে, সে সূর্যকান্তকে খুন করেছে;—মানে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড়টাকে উড়িয়ে দিয়েছে। বোস সায়েবের লেখা চিঠি তা অবান্তর হলেও, সেই বেনামী চিঠির হস্তাক্ষর একই প্রায় সেই। এখন সূর্যকান্তর হত্যাকারী হিসেবে ওকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশে খবর দেওয়া যায়, কিন্তু পাওয়ার সায়েব বললো যে—ওসব হাঙ্গামায় আর কাজ নেই সিস্টার, কারণ ওতে সায়েবকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তোমার জীবনও বিপন্ন হবে। অনেক ভেবে দেখলাম যে তোমাকে বাঁচতে গেলে এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও কিছুদিনের জন্যে সরে যেতে হবে। এ ছাড়া অন্য কিছু উপায় আমি ভেবে পাচ্ছি না সিস্টার।

---কোথায় যাবে সায়েব? কোথায় পালালে ওর কবল থেকে রেহাই পাবো আমি? আমাকে সেইখানে নিয়ে চলো সায়েব। আর একদিনও যে আমি ওকে সইতে পারবো না সায়েব, আজ রাতেই তুমি যা হয় কিছু ব্যবস্থা করো। ব্যাকুলভাবে ওর হাত ধরে বললাম আমি।

---অত উতলা হয়ো না সিস্টার। যতক্ষণ এ কালা আদমীটা আছে, ততক্ষণ কোনো দুষমনের সাধ্য নেই যে তোমার কোন ক্ষতি করে। কালই রিজার্ভ করবো ট্রেনের বার্থ, অনেক চেষ্টা করলেও দু'-তিন দিনের আগে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এ দুদিন, একটু ধৈর্য ধরে থাকো সিস্টার।

একটু থেমে আবার বললো পাওয়ার ---আচ্ছা সিস্টার তোমার মনে আছে? সেই জায়গাটার কথা? সেই যে সায়েবের সঙ্গে আমরা গিয়ে যখন গোপালপুরে ছিলাম কিছুদিন, তারপর সেখান থেকে গাড়ী করে যখন ঘোরা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় ওয়ালটেয়ার থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল ঘুরে একটা জায়গায় গিয়ে আমরা সমুদ্রের ধারে একটা ডাক বাংলোতে একবেলা বিশ্রাম করেছিলাম। ভারি চমৎকার নির্জন জায়গাটা ঠিক যেন একটা উপদ্বীপের মত। ওর তিন দিক সমুদ্রে ঘেরা। চারিধারে তাল আর পাইনের বন। সমুদ্রের জলে ডোবা, ছোট ছোট ডুবো পাহাড়, একটা খুব পুরোনো লাইট-হাউসও আছে। জায়গাটার নাম তোমার মনে আছে সিস্টার?

বুকটা আমার গভীর বেদনার ঘায়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো, চোখ ভরে জল এলো, একজনের কথা মনে করে। চোখ মুছে জবাব দিলাম কথার।

---মনে আছে বৈকি। সেই জায়গাটার নাম বিমুনীপত্তনম। আগেও ওখানে আমরা গিয়েছি, যখন প্রথম দক্ষিণ ভারতে তোমার সায়েব আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। জায়গাটা ওঁর বড় ভালো লেগেছিলো, তাই বলেছিলেন ওখানে একটা নার্সিং হোম করবেন, গরীবদের জন্যে। আর সারাজীবন ঐখানেই বাস করার ইচ্ছে ছিল তাঁর কিন্তু---

আর কথা বলতে পারলাম না। কান্নার দমকা আমার গলার স্বর রুদ্ধ করলো।

দু'হাতে মুখ ঢেকে পাওয়ার সায়েব ছুটে চলে গেল আমার সামনে থেকে।

[ক্রমশ।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

একটা পুঁটলি হাতে বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। গায়ে এক লম্বা নতুন কোট। তার পেছনে পেছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলছিল লাল-চুল এক পাহারাওয়ালা। তার হাতেও একটা চুপড়ি। তাতে একরাশ বাজেয়াপ্ত করা টিপারী ফল। চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। কোন লোক নেই। ছোট ছোট দোকান আর শুঁড়িখানার খোলা দরজাগুলো ক্ষুধার্তের মত হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ধারে কাছে একটা ভিখারীরও দেখা পাওয়া যায় না।

হঠাৎ একটা চীৎকার ভেসে এল 'পাজী খেঁকি কুকুর কোথাকার! আর কামড়াবি? খবরদার! একে ছেড়ে দিও না। খামোকা কামড়ে দিল। ধর্ বেটাকে।'

'ঘেউ---উ---।' কোন এক কুকুরের আর্তনাদ শোনা গেল। একটা কুকুরকে পিকৃগিনের কাঠের কারখানার মধ্য থেকে তিন পায়ে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। পেছন পেছন ছুটে আসছে একটা লোক। পরনে বুকখোলা ওয়েস্ট কোট আর মাড় দেওয়া ছাপা শার্ট। লোকটা হোঁচট খেতে খেতে কোন রকমে কুকুরটার পেছনের একটা পা চেপে ধরল। কুকুরটা আবার আর্তনাদ করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার চীৎকার, 'যত পারিস চেঁচা। তোকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি না।' চারিদিকের দোকানগুলো থেকে ঘুম ঘুম মুখ উঁকি মারতে লাগল। আর মুহূর্তের মধ্যে যেন মাটি ফুঁড়ে একটা ভিড় হাজির হয়ে গেল।

'স্যার!' মনে হচ্ছে যেন কোন গণ্ডগোল হচ্ছে।' পাহারাওয়ালা বললে। অকুমেলভ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের দিকে এগোলেন। কারখানার গেটের সামনেই বোতাম খোলা ওয়েস্ট কোট পরিহিত সেই লোকটাকে দেখা গেল। টানহাত তুলে ডান হাতের একটা আঙুল বিজয়-পতাকার মত সবাইকে দেখাচ্ছে। আঙুলটা কেটে রক্তপাত হচ্ছে। তার মাতালের মত মুখ দেখে মনে হল তাতে লেখা আছে 'আমি তোকে মজা দেখাচ্ছি।' অকুমেলভ লোকটাকে চিনতে পারলেন। স্বর্ণকার ক্রুকিন। ভিড়ের মাঝখানে চার পা ছড়িয়ে এইসব ঘটনার নায়ক সেই কুকুরটা বসে। সারা শরীর কাঁপছে। একটা সাদা বরজয়ী কুকুর। ছুঁচলো নাক, পীঠের ওপর একটা হলদে ছোপ। ওর জলভরা চোখে লাঞ্ছনা আর হয়রানির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন অকুমেলভ, 'ব্যাপার কি? তুমি অমন

চেকভ

আঙুল উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আর এক্ষুণি চীৎকার করল কে?' এক নিশ্বাসে প্রশ্ন করে গেলেন।

একটু কেশে নিয়ে ক্রুকিন ভিজে বেড়ালের মত মিউ মিউ করে উঠল, এই দেখুন না স্যার। আমি চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলাম। মিত্রি মিত্রিচের দোকানে কাঠের ব্যাপারে কিছু দরকার ছিল। হঠাৎ কোন কারণ নেই এই পাজীটা আঙুল কামড়ে দিলে। আমি একটা খেটে খাওয়া মানুষ। এখন বলুন ত' কি করি? এর একটা বিহিত হওয়া চাই। দয়া করে আমার ক্ষতিপূরণের একটা ব্যবস্থা করে দিন। আইন কি এই বলে যে হিংস্র প্রাণীদের অত্যাচার সহ্য করে আমাদের চলতে হবে। আর এই রকমই যদি চলতে থাকে, জীবনটা কি রকম দুর্বিসহ হয়ে দাঁড়াবে ভাবুন তো স্যার।'

চোখ কপালে তুলে ভীষণভাবে কেশে অকুমেলভ গম্ভীরভাবে বললেন, সেখানে কুকুর ছেড়ে দেওয়ার মজা আমি টের পাওয়াচ্ছি। সত্যি, যারা আইন মেনে চলতে চায় না, তাদের কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার। এমন একটা জরিমানা ঠুকে দেব, বাছাধন টের পাবে মজাখানা। ভাল করে বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল। এলদিরিন! কুকুরটা কার খুঁজে বার করে একটা স্টেটমেণ্ট তৈরী কর। আর অবিলম্বে কুকুরটা মেরে ফেলার ব্যবস্থা কর। বোধ হয় কুকুরটা পাগলা। এখন আমার প্রশ্ন কুকুরটা কার?'

জনতার ভেতর থেকে একজন বলে উঠল, 'আমার মনে হয় কুকুরটা জেনারেল জিগালভের।'

'জেনারেল জিগালভের? হুম্। এলদিরিন। আমায় কোটটা খুলতে সাহায্য কর ত'-- উঃ! কি গরমটাই পড়েছে। নিশ্চয় বৃষ্টি হবে।' তারপর ক্রুকিনের দিকে ফিরে ধমকে উঠলেন, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না। এই-টুকু একটা কুকুর তোমার মত লম্বা চওড়া একজনের আঙুলের নাগালই বা পেল কি করে? তুমি নিশ্চয় কোন কিছু দিয়ে আঙুলটা কেটেছে আর এখন ক্ষতি-পূরণের মতলব ভাঁজছে। আমি তোমা-দের মত বদমাশদের হাড়ে হাড়ে চিনি।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'ও বদমাশী করে কুকুরটার নাকে জলন্ত সিগারেট দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে আর কুকুরটাও খিঁচিয়েছে

কামড়ে। কুকুরটার এতে কি দোষ? যত রকম শয়তানী বুদ্ধি সব সময় ক্রুকিনের মাথায় খেলছে।'

'থাম একচোখা মিথ্যেবাদী।' খেঁকিয়ে উঠল ক্রুকিন, 'মিথ্যে কথা বলছ যে? তুমি আমাকে ও কাজ করতে দেখেছ? দারোগাবাবু বিচক্ষণ মানুষ। উনি জানেন কে সত্যি কথা বলছে না-বলছে। আমি যদি মিথ্যে বলে থাকি ভগবান আমার বিচার করবেন। আইনের চোখে সবাই আমরা সমান। আর স্যার। আমার নিজের এক ভাই পুলিশে চাকরী করে। আপনি যদি জানতে চান---।

'থাম। তর্ক করো না।'

এতক্ষণে পাহারাওয়ালা এলদিরিন নিশ্চিতভাবে মতপ্রকাশ করল, 'না ওটা জেনারেলের কুকুর নয়। জেনারেলের এ রকম কুকুরই নেই। তাঁর সব কুকুরই শিকারী কুকুর।'

'ঠিক বলছ?'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

'ঠিকই বলেছ। জেনারেলের কুকুরগুলো সব দামী দামী দো-আঁশলা কুকুর। আর এটা? একটা ঘিয়ে ভাজা, খেঁকি কুত্তা। হুঁ। এ রকম কুকুর কেউ পোষে? পাগল নাকি? মস্কো কিংবা পিটার্সবার্গে এরকম একটা কুকুর দেখলে কি করা হবে জান? এক মুহূর্তে এর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়া হবে। যাক্‌গে ক্রুকিন। সত্যিই তুমি ক্ষতিগ্রস্ত। অত সহজে ছেড়ে দিও না। কুকুরের বেশ শিক্ষা হওয়া দরকার।'

কিছুক্ষণ পর পাহারাওয়ালা আবার বললে, 'আমার ভুল হয়েছে। বোধ হয় এটা জেনারেলেরই কুকুর। আমি গতকাল ঠিক এই রকম একটা কুকুর তাঁর খামারে দেখেছি।' 'নিঃসন্দেহে এটা জেনারেলের কুকুর।' জনতার ভেতর থেকে আর একজন বলল।

'হুম্। এলদিরিন। আমায় কোটটা পরতে সাহায্য কর ত'---ওঃ বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। কি রকম কাঁপুনী আসছে। কুকুরটাকে এক্ষুণি জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দাও। বল যে আমি রাস্তায় দেখতে পেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর কুকুরটাকে রাস্তায় ছাড়তে বারণ করো। আমার মনে হয় এটা বেশ দামী কুকুর। কিন্তু প্রত্যেক বাঁদর যদি এর নাকে জলন্ত সিগারেট ঢোকায় তাহলে এটা খুব তাড়াতাড়িই নষ্ট হয়ে যাবে। আর তুমি শয়তান। তোমার হাত্‌খানা নামাও আর সঙের মত আঙুলের প্রদর্শনীতে কাজ নাই। দোষ ত' তোমারই।'

এইসময় কে একজন বলে উঠল, 'ঐ ত' জেনারেলের প্রধান পাচক আসছে। ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক। এই প্রোখর। বুড়োকর্তা একবার এদিকে এসে দেখো ত' এটা তোমাদের কুকুর কি না?'

'অবাক করলে। আমরা জীবনে এ রকম কুকুর পুষি নি।'

অকুমেলভ বললেন, 'আর জিজ্ঞাসাবাদের দরকার নাই। বলেছি এটা রাস্তার কুকুর। ব্যস এটা রাস্তার কুকুর। এটাকে মেরে ফেলে ব্যাপারটা শেষ করে দাও।'

'এটা আমাদের নয়।' প্রোখর আবার বললে, 'তবে---এটা জেনারেলের ভাই-এর। কয়েক দিন হ'ল উনি এসেছেন। আমাদের জেনারেল সাহেব বরজয়ী তেমন পছন্দ করেন না। কিন্তু ওনার ভাই, উনি খুব ভালবাসেন বরজয়ী।'

'কি? জেনারেলের ভাই এসেছেন নাকি? ভ্লাদিমির ইভানিচ?' চমকে উঠে একটা কান এঁটো করা হাসি হাসলেন অকুমেলভ, 'অ্যাঁ। উনি এসেছেন? আর আমি জানি না?'

'হ্যাঁ উনি এসেছেন।'

'আশ্চর্য। ভাইকে দেখতে এসেছেন বুঝি? আমি কিছুই জানতে পারি নি। তাহলে এটা তাঁরই কুকুর? বেশ, বেশ। তাই ত' বলি। কি সুন্দর ছোট্ট পুতুলের মত কুকুর। চু, চু, চু, চু---, হাচ্চু---। ওর আঙুলে কামড়ে দিয়েছিস? হাঃ, হাঃ, হাঃ---। বেশ করেছিস। আয় আয় এদিকে আয় ভয় পাচ্ছিস কেন? ও বাবা আবার রাগ দেখান হচ্ছে। আঃ, আঃ, চুঃ চুঃ।'

প্রোখর কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে গেল। জনতা ক্রুকিনের উদ্দেশ্যে হেসে উঠল।

অকুমেলভ তাঁর বিপুলায়তন কোটটা জড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে ক্রুকিনের দিকে ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিবাণ হেনে শাসিয়ে গেলেন, 'তোমারও মজা টের পাওয়াচ্ছি, শয়তান।'

অনুবাদক—শ্রীশ্যামলেন্দুশেখর ব্যানার্জী

প্রেম

শ্রীসুধীরকুমার দেব

মহাসিন্ধু মন্থনে এল অমরত্বের উৎস,
জীবন-মাধুরী মথিত এ সঞ্জীবনী সুধা।
যার মোহের যাদু বিগলিত কূজনে, কাকলীতে,
বর্ণনা লিপি শিখি আর প্রজাপতির পাখায়,
নির্ঝর প্রবাহে সঞ্চারিত যার উচ্ছ্বাস,

কমনীয়তার অনুলেপন কুসুমের অঙ্গে,
যার স্পন্দন, প্রদীপ শিখার মৃদু কম্পনে,
অনুরাগ, অরুণিমা রঞ্জিত ঊষার আননে
রূপরেখার ভাতি ইন্দুর অংশু লাবণ্যে,
তটিনীর তরঙ্গ ভঙ্গিমায় দোলে যার ছন্দ,

সজীবতা জাগে নব কিশলয়ের ধমনীতে
মৃদুমন্দ সমীরণে যার পুলক শিহরণ,
যাতে রং বুলিয়ে যায় স্বপ্ন, আশা আর কল্পনার তুলি,
জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রণতি জানায় যাকে,
বাঞ্ছিত সে মহাসিন্ধি পরিশুদ্ধ 'প্রেম'।

শিশুর স্বয়ংরতি সংযমন

মানসিক লাব সানুলীনতা আনে —পুরনো এই ধারণাটি নির্বুদ্ধিপ্রসূত এবং সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু আজও স্বয়ংরতি সম্বন্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি অর্ধ-সত্য প্রচলিত; এ জন্য স্বয়ং তৃপ্তিলাভের ফলাফল মনের উপর কী হয় না-হয় তা বিচার করা দরকার এমন দৃষ্টিকোণ থেকে—যা ছেলেমেয়েদের মানসিক সাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে ইচ্ছুক বাবা-মার কাজে লাগে।

প্রথমেই বলা দরকার স্বয়ং-তৃপ্তিলাভ স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতে দেখা দেয় গোড়ার দিকে। নিজের হাত, পা, হাঁটা চলা, কথা ইত্যাদি আবিষ্কার করার ইত্যাদি সংক্ষোভজ অভিব্যক্তির মতনই আত্ম-তৃপ্তি স্বাভাবিক প্রবল কামনার প্রকাশ, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তীণ ইচ্ছার অভিব্যক্তি এবং এইসব প্রাবল্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে মানুষ নিজে তৃপ্তি-লাভের পথ খুঁজে নেয়।

অন্যান্য [illegible] উত্তেজনার প্রশমনের মত আত্ম-তৃপ্তিলাভও মানিয়ে নেওয়া, সংযমন, সময়, স্থান, পরিবেশ ইত্যাদির অধীন করা দরকার। অর্থাৎ, এই নির্দোষ ক্রিয়াটির জন্য সন্তানদের শাস্তিদান আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া অনুচিত, প্রয়োজন এমনভাবে তা নিয়ন্ত্রিত করা, যাতে শিশুর ব্যবহার ভদ্র এবং সুরুচি-প্রকাশক হয়ে ওঠে।

প্রকাশ্যে স্ত্রীর সংগে মিলিত না হওয়ার অর্থ যে তা যথোচিত নয়, রুচিবোধেরও অভাবসূচক। এ থেকে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে দাম্পত্য সম্পর্কে আমাদের অনীহা, বা যৌন-ব্যাপারে আমরা লজ্জাবোধ করি। স্থান - কাল - পাত্র সম্পর্কিত সমাজসম্মত বোধই এ ক্ষেত্রে আমাদের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ করে।

এবার বাস্তব অবস্থার দিকে চোখ ফেরান যাক। ছ'মাস বয়সে পর্যন্ত শিশু স্বয়ংরতিজ পুলক অনুভব করতে পারে। তবে সাধারণত বছরখানেক বয়সেই এটি হয়।

শব্দ-স্পর্শ এবং দৃষ্টির সাহায্যে সব কিছু চাখতে চায়। ঐ ভাবেই তারা হঠাৎ আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং অনুভূতিটি খুব সুখপ্রদ এবং নতুন লাগায় বাড়াবাড়ি হওয়া সম্ভব। অন্য পথে যথেষ্ট আনন্দ পেলে আতিশয্য সাধারণত ঘটে না।

এ ব্যাপারে বাবা-মা'র দৃষ্টিভংগী সংক্ষোভহীন, স্থির, চিন্তামূলক হওয়া দরকার। কোন বদভ্যাস দূর করার ক্ষেত্রে অন্য পাঁচটা বিষয়ে শিশুর মন ফেরান খব কার্যকর, বদভ্যাসটি গড়ে ওঠার সময়েও এটি বেশ কাজে আসে। এটি সব থেকে বেশি দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি। কোন শিশু আত্ম-উদ্দীপনার কৌশল আবিষ্কার করলে তাকে রঙিন খেলনা উপহার দেওয়া সাধারণত কার্যকর প্রমাণিত হয়। সে তখন খেলনা নিয়ে মেতে ওঠে। বালকের (বা বালিকার) ক্ষেত্রে ভংগীটি আরও বেশি নির্দিষ্ট এবং সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। যেমন বলা যেতে পারে, 'না বাবা, সকলের সামনে ওরকম করতে নেই। এটা উচিত নয়। চলো, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।'

বর্তনের তুলনায় বেশি ফলপ্রসূ, বিশেষত বালক-বালিকার ক্ষেত্রে।

মূলগত কোন মানসিক ত্রুটি না থাকলে কোন শিশুর স্বয়ংরতি মাত্রাতিরিক্ত হয় না। আঙুল চোষা বা দোলার মত আত্ম-উদ্দীপনা আরাম আর তৃপ্তিলাভের একটা উপায়মাত্র, যে উপস্থিত হচ্ছেন তাতে কিছুই আসে যায় না। যে শিশু অনবরত এই ক্রিয়াসক্ত, সে আসলে ভালবাসা এবং সস্নেহ সম্মতি চায়। অবশ্য একঘেয়েমি ভোলানোর জন্য ওটা এক ধরণের সক্রিয়তা হওয়াও সম্ভব। খেলনা ইত্যাদি নিয়ে বন্ধ ঘরে যে শিশুর দিন কাটে, বাইরে ছুটোছুটি করে যে নিজের ইচ্ছে এবং ক্ষমতাটুকু সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায় না, তাদের পক্ষে একঘেঁয়ে বোধ করা খুব স্বাভাবিক, এদের মধ্যে অন্তর্মুখী জাতীয় শিশু-বালকরা আত্ম-তৃপ্তি লাভের পথ বেছে নেয়, বহির্মুখীরা তা প্রকাশ করে খিটখিটে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

যে-শিশু অত্যন্ত একাকী বা যার সংগী কেবল বয়স্করা, সে নিজের সংক্ষোভ-মাত্রা খুঁজে নিতে চায় এবং স্বয়ংরতি তাকে এতে সাহায্য করে।

স্বয়ংরতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল গোটা জীবনের সংগে এটি কীভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায় সুষ্ঠুভাবে, উচ্ছেদের পদ্ধতি আদৌ চিন্তনীয় নয়। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলো থেকেই বোঝা যাবে যে, যৌনতা জীবনের সমার্থক নয়। কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটি মানুষের একটি প্রয়োজনীয় সংক্ষোভজ অনুভূতি।

জীবনের ভিন্ন পর্যায়ে এটির প্রকাশও ভিন্ন। আত্মতৃপ্তি শৈশবের অবিচ্ছেদ্য অংশ—কিন্তু ভুরু কুঁচকে বা অপ-ব্যবহারে উৎসাহ দিয়ে এটিকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া অনুচিত।

ভুরু কোঁচকালে যৌনতা লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে ওঠে, শিশু ভাবে এটি নোংরা, গোপনীয় এবং অ-স্বাভাবিক। তা ত' আমরা চাই না। তাই দরকার নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে শিশুকে বোঝান যে ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বড়দের 'আপনি' বলা বা সমবয়সীদের সস্নেহে 'ভাই' সম্বোধন করার মত সু-রীতি অনুসারী হওয়া প্রয়োজন।

সূক্ষ্মতা শিশুর পক্ষে বোঝা কঠিন, দরকার তাই পরোক্ষ উপায়ের সাহায্য নেওয়া। তাদের বাঞ্ছনীয় সংগী জুটিয়ে দিতে হবে—সংগী এবং সংগিনী, তাদের সংক্ষোভ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশের উপায় ক'রে দিতে হবে গান-বাজনা, সাহিত্য, ব্যায়াম, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। তাদের প্রতি ভালবাসা এবং সামাজিক প্রশংসা প্রকাশ করা দরকার তাদের গুণাবলীর প্রশংসার মাধ্যমে, ভুলগুলো সাবধানে, সুকৌশলে শুধরে দেওয়া উচিত। শাস্তিদানের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে, কেবল এর ফলে তারা আত্ম-তৃপ্তির পথ খুঁজে নেবে সেজন্য নয়, ফলাফল আরও খারাপ হতে পারে।

এক ভদ্রমহিলা স্বয়ংরতিকালে মা'র কাছ থেকে প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিলেন। মা তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন এই বলে যে, বাবা এলে বলে দেবেন। তাঁর বাবা ফিরতেন রাত দুটোর পর, কাজ সেরে। ফলে তাঁর অন্ধকার সম্পর্কে এমন আতংক হয় যে তিনি বিয়ের পর অনুরক্ত স্বামীর সংগে মিলনে পূর্ণ তৃপ্তি পেতেন না। ঘটনাচক্রে দিনের বেলা একবার মিলিত হয়ে চরম পুলক লাভ করেন। পরে অবস্থাটি বিশ্লেষিত হলে সব জানা যায়।

ওপরে যে সব আলোচনা হয়েছে তা থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে কোন্‌টা বাঞ্ছনীয় এবং কোনটা নয়। সব থেকে বেশি প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথায় অবস্থার বিচার। শিশুর সংক্ষোভজ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে বাবা-মা চটে উঠলে অমংগল অবধারিত। মনে রাখা দরকার, শিশু-বালকের আত্মতৃপ্তি লাভ বন্ধ করার চেষ্টা যেমন ক্ষতিকর (অসম্ভবও বটে) তাকে অবাধে তা করতে দেওয়াও সম্ভব নয় আমাদের আধুনিক সামাজিক পরিবেশে। কাজেই, প্রয়োজন তাকে সংযমিত করা, তার মধ্যে স্থান-কালের বোধ জাগরিত করা।

—বাৎস্যায়ন

বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা

অনেক বিশ্রুত মনস্তাত্ত্বিকের মতে আধুনিক জটিল আবহাওয়ায় বিবাহিত জীবনে পুরুষের সব থেকে বড় প্রয়োজন প্রগাঢ় ভালবাসা। 'প্রগাঢ়' আর 'ভালবাসা' শব্দ দু'টির ওপর তাঁরা খুব জোর দেন। কেন না, তাঁদের মতানুসারে, মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা একে ত' সময়সাপেক্ষ, তার ওপর যথেষ্ট ব্যয়বহুল। সুতরাং এর সুযোগ নিতে পারে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মানুষ। তা ছাড়া, অনেকে এই ধরণের চিকিৎসা অপছন্দ করে। সর্বোপরি, স্ত্রীর প্রগাঢ় ভালবাসা না পেলে স্বামীকে শুধু চিকিৎসা ক'রে সম্পূর্ণ সুস্থ করাও অত্যন্ত দুরূহ।

পুরুষের সুস্থ থাকার জন্য সে যে কর্মঠ এবং সুপুরুষ এই বোধ প্রয়োজন। অথচ, অধিকাংশ পুরুষ ভালবাসা বা মনোযোগ চেয়ে নিতে অনিচ্ছুক, এতে তাদের পৌরুষ আহত হয়। এমন কি, এই দু'টি জিনিসের জন্য তাদের গভীর আন্তরিক কামনাও তারা প্রকাশ করতে চায় না। না পেলে ক্ষতি হয় দেহ এবং মনের তৎসত্ত্বেও। এই তথ্যটি স্ত্রীদের মনে রাখা দরকার।

স্ত্রীর সহজ স্বতোৎসারিতা ভালবাসা স্বামীর অনেক দুশ্চিন্তা দূর ক'রে দেয় অনায়াসে। এই প্রকাশের পেছনে উদ্দেশ্য থাকতে পারে, আবার তা অকারণ হওয়ারও সম্ভব। আসল কথা স্বামীকে কতটুকু ভালবাসা দিতে পারেন আপনা হতে, তিনি কতখানি যৌনতৃপ্তিকর সে প্রসঙ্গ নয়। যৌনতৃপ্তি ভালবাসা থাকলে আসে স্বতঃসিদ্ধর মত। পুরুষ স্বভাবে কিঞ্চিৎ বহির্মুখী হওয়ায়, তার চরিত্রে কিছু পরিমাণ নির্লিপ্ততা অজাংঙ্গী হওয়ায়—যা নারীচরিত্রে সু-দুর্লভ—অনেক স্ত্রী স্বামীকে যথেষ্ট মমতাঘন না ভেবে তাদের প্রতি অবিচার করেন, এ অবিচার নিজেদের প্রতিও। কারণ, ফলত যে মানসিক উৎকণ্ঠা হওয়া সম্ভব তা বাড়তে দিলে দাম্পত্য জীবনের শান্তিটুকুও বিঘ্নিত হয়। স্বামীকে ভালবাসতে গিয়েও তাঁরা কোন কোন সময় অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি ক'রে ফেলেন। ভালবাসা আর কামনা গুলিয়ে গেলে এমনটা হয়।

ভালবাসার হেরফের হয় অনেক, পুরুষের প্রয়োজনেরও। পুরুষের অন্যতম মূল প্রয়োজন তার আবাল্য পরিচিত ভালবাসা। এবং বিবাহিত জীবনে স্ত্রী ছাড়া অন্য কারুর কাছ থেকে তা পর্যাপ্ত এবং ঠিক ঠিক ভাবে মেলে না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, একটা বয়সে পৌঁছে পুরুষ আর মা'র কাছে মন খুলতে পারে না। তার কর্মজীবনের দুশ্চিন্তা, ব্যক্তিগত নৈরাশ্য, সামাজিক ব্যর্থতা (প্রত্যেকের জীবনে কম-বেশি পরিমাণে এগুলো থাকতে বাধ্য)—এই সব তখন তাকে একলা বহন করতে হয়। অথচ, ভালবাসা পাওয়ার আকাঙক্ষা কমে না একতিলও। আন্তরিক সহানুভূতির প্রয়োজন ক্রমেই বাড়তে থাকে। এইসব কিছু পুরুষ মাত্র একজনের কাছ থেকে পেতে পারে—তিনি স্ত্রী। যিনি তার সহধর্মিণী এবং সহমর্মিণী।

তার পাওয়া এবং দেওয়ার ইচ্ছা ঐ একজনের মধ্যেই তখন সার্থকতা লাভ করতে পারে।

স্ত্রীদের এই দিকটা খেয়াল রেখে তা কাজে লাগান উচিত। উচিত কেবল স্বামীর সুখের জন্য নয়, তার নিজের জন্যও বটে। তার মধ্যে যে মাতৃত্ব-অনুভূতি রয়েছে তা এইভাবে তৃপ্ত হয়। ফল উভয়ত শুভঙ্কর। তবে, মাত্রাহীন মা-ত্ব আর অ-পর্যাপ্ত মা-ত্বর মধ্যেকার তফাৎটুকুও খেয়াল না রাখলে নয়। কেন না, পুরুষের আর একটি মূল চাহিদা স্বাধীনতা। দেখা দরকার, স্বামী যেন নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে মনে না করেন। তা হলেই হল। আবার, সে স্ত্রীকে প্রিয়ারূপেও পেতে চায়।

বদ্ধ হয়ে পড়ার অনুভূতি পুরুষের পক্ষে অস্বস্তিকর। কিছু পরিমাণে ক্ষতিকরও বটে। নারী নিজের সংসারে তৃপ্ত। পুরুষ নিজেকে মেলে ধরতে চায়। গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে সে সর্বক্ষণ স্বস্তি পায় না। তার এই মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা মানসিক হওয়াও সম্ভব। সে বুঝতে চায় খেলার মাঠে গেলে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বসলে, এদিক-ওদিক ঢুঁ মারলে স্ত্রী কিছুই মনে করেন না। এটা তার স্বভাবে রয়েছে এবং স্ত্রীও তা খুশিমনে মেনে নিয়েছেন। দেখা যায়, স্বাধীনতা পেলেই সে অনুভূতিটা তাকে চাঙা রাখে।

কোন কোন স্ত্রী কিছুটা এদিক-ওদিক হলেই ক্ষুব্ধ হন, মনে করেন তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তাঁরা চান স্বামীর অখণ্ড মনোযোগ, যা বাস্তবে প্রায়ই না হওয়ায় অশান্তি দানা বাঁধতে থাকে। একটু ভাবলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁর প্রতি স্বামীর ভালবাসা অত ঠুনকো নয়। তবে, পুরুষের ভালবাসার প্রকাশ সংগত কারণেই ভিন্ন। স্ত্রীর প্রকাশভংগী যত নিবিড় এবং অন্তরংগ হয়, স্বামীরটা ততখানি সবসময় হয় না। এর কারণ সাদা চোখেই ধরা পড়ে—নারী এবং পুরুষের জন্মসূত্রে লব্ধ মানসিকতা, শিক্ষার ধারা এবং জীবনযাপন-পদ্ধতি ভিন্ন। আর পাঁচটা ব্যাপারের মত ভালবাসার প্রকাশভংগীও তাই স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন হয়।

এখন প্রশ্ন হল কীভাবে পুরুষকে স্বাধীনতার স্বাদ দেওয়া যায়। সহজতম পন্থা অবশ্য তার স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু, বিবাহিত জীবনে তা কি সম্ভব? না বাঞ্ছনীয়? দ্বৈতজীবনে পারস্পরিক প্রাক্-বিবাহ স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তবে, স্ত্রী যদি স্বামীকে গভীর-ভাবে ভালবাসতে পারেন, তার আনন্দ-জনক টুকিটাকিতে সানন্দে অংশ নেন, ত ঐ খর্বতাটুকু সুখদ হয়ে ওঠে। স্বামী সানন্দে তা মেনে নেন।

কোন কোন স্ত্রী অবশ্য স্বামীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। ফলে, দু'জনেই সুখী। স্বামী পুরুষ বন্ধুদের সংগে আড্ডা দিলে বা কোথাও গেলে তারা তা সহজভাবে মানতে পারেন। কিন্তু অন্য কোন মহিলার প্রতি সামান্য-তম আগ্রহ দেখলেও তারা স্বামীর প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠেন। অথচ, ব্যাপারটা এ যুগে আদৌ অস্বাভাবিক নয়। অনেক স্বামী এই ভয়ে অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সংগে ন্যূনতম সৌজন্যমূলক বাক্যালাপ করতেও কুণ্ঠিত হন এই কারণে।

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই প্রয়োজন মাঝে মাঝে অন্যের চোখে নিজেদের দেখা। মেলামেশার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এর ফলে জীবনে নতুন উৎসাহ আসে দু'জন দু'জনকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন।

ঠিক কোন্ স্তরে ভালবাসা কামনার স্তরে পৌঁছায় বলা শক্ত। কিন্তু আমরা শান্ত গভীর ভালবাসা আর কামনার পার্থক্য অনুভব করি। আমরা জানি, কোন কোন সময় প্রথমটা এবং কখনও দ্বিতীয় অবস্থা আসে ঘুরেফিরে। অনু-ভবের এই পরিবর্তন গোটা দাম্পত্য-জীবনে অসংখ্যবার হয়ে থাকে। দৈহিক কামনার সময় নর এবং নারীর অনু-ভূতির চেহারা একরকম। এ অবস্থা স্বামী এবং স্ত্রীর প্রত্যেকবার একই সংগে না আসাই স্বাভাবিক। এ তথ্য যাঁরা মনে রাখেন সেই দম্পতীরা সুখী হন।

দৈহিক কামনার সংগে ভালবাসার সার্বিক সংগতি নেই। তবে ঐ সময়েও ভালবাসার অনুভূতি সাধারণত থাকে। যদিও প্রেম-প্রকাশক্ষমতা এক এক সময় এক এক রকম হয়। সব সময় তা সংরক্ত হতে পারে না, হওয়া অবাঞ্ছনীয়ও বটে। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে ভালবাসার রামধনু একে-একে তার সম্পদ উজাড় করতে পারে; তাকে তা করতে দেওয়াই উচিত।

কোন কোন স্ত্রী স্বামীর মত ভাল-বাসার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম; স্বামীর গভীর আনন্দ থেকেও তারা বঞ্চিত। এদের পক্ষে স্বামীর জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ভালবাসা স্বামীকে স্বতোৎসারিতভাবে দেওয়া খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে। এরা স্ব-ইচ্ছার বদলে ভালবাসাকে মনে ঠাঁই দিলে সমস্যার সমাধান বহুলাংশে হওয়া সম্ভব।

মানবসভ্যতার ধারায় পুরুষ যুগযুগান্ত ধরে যৌনতৃপ্তিলাভে অগ্রসর, ভালবাসাও তারা পেতে চায় আকণ্ঠ। এই মনোভাব কয়েক হাজার বছরব্যাপী সভ্যতার উত্তরাধিকার।

সুতরাং সব দিক বিবেচনা ক'রে বলা যায়, আসল কথা হল স্ত্রীর ব্যবহার স্বামীকে তৃপ্ত করে, না অস্বস্তি, এমন কি ভয়ে ভয়ে দেয় তার মন। স্ত্রী যদি চান স্বামী তাঁর মত একইভাবে তাঁকে ভালবাসুন, স্বামী অস্বস্তি অনুভব করবেনই।

অথচ স্ত্রীর ভালবাসা স্বামীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, খাদ্যের তুলনায় এক-তিলও কম নয়। তাই স্ত্রীর উচিত ভালবাসা সাধ্যমতন উদার হাতে স্বামীকে বিলোন। আর, সময় যায়, স্বামীও ক্রমে বার্ধক্যের দিকে এগোতে থাকেন, স্ত্রীর তাই তাঁকে বুঝতে দেওয়া দরকার, ক্রমেই বেশিমাত্রায়, স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসা ক্রমবর্ধমান; স্বামীকে না হলে তাঁর চলে না।

পুরুষের ন্যায্য অধিকার

নারীর অধিকার পুরুষের সঙ্গে সমান হোক, এ দাবী বহু দিন যাবৎই সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং আজ তা প্রায় স্বীকৃত, কিন্তু পুরুষের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধেও যে দাবী উঠতে পারে একথা-টা বড একটা কেউ ভাবে না ; কিন্তু ভাবা উচিত নয় কি ?

বিশ্বের সর্বত্র পুরুষের এ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেজন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াও সমীচীন।

মেয়েরা সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করুক—তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, আর বর্তমানে তা তো তারা করছেও, কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—মেয়েরা আজ একচুলও পেছিয়ে নেই বরং আরেকটা জায়গায় পুরুষদের চিরস্থায়ী হার হয়েই রয়েছে—তা হলো সন্তানধারণের ক্ষেত্র, সহস্র অ্যাজিটেশনেও সে অধিকার কোনদিনই করায়ত্ত হবে না পুরুষের।

কিন্তু তাতে আমাদের ক্ষোভ নেই আমরা বলতে চাই যে, সব জায়গায় সমান অধিকার দাবী করার পরও মেয়েরা কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে চায় কেন ? মেয়েরা কেন আশা করবে একত্রে ভ্রমণের কালে পুরুষসঙ্গীই সর্বদা বহন করবে ব্যয়ভার, সিনেমা দেখতে গিয়ে আগে ভাগে পকেট থেকে টেনে বার করবে মুদ্রাধার, রেস্তোঁরা বা চায়ের দোকানে ঢুকলে বিল মেটোবার দায় আগু বাড়িয়ে নিজের কাঁধে তুলে নেবে অকুণ্ঠে ?

অর্থাৎ অবলারা যখন সবলা হওয়ার জন্যই বদ্ধপরিকর, তখন আর চাঁই-বেচাঁইয়ে তারা অবলা হয়ে উঠবেই বা কেন ?

আমি যদি কোন মেয়েকে একদিন সিনেমায় নিয়ে যাই, গাঁট খরচা করে ভালমন্দ খাওয়াই, তবে পরের দফায় সেই বা পয়সা বার করবে না কেন ?

দুর্ভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত কোন মেয়েকে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করাতে পারলাম না, চেষ্টা যে করি নি তা নয় কিন্তু কোন ফল হয় নি। সঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ রঙ্গিণী হয়ে উঠে প্রত্যুত্তর করেছে যে, তাতে নাকি আমারই অপযশ, মেয়েদের সঙ্গে করে এনে যে পুরুষ ম্যানিব্যাগ সামলাতে চায়, সে নাকি পুরুষই নয়, ইত্যাদি---ইত্যাদি।

এই---এতেই আমার সমূহ আপত্তি, এমনটা হবে কেন আজও ?

এ সব ব্যাপারে যে সব আইন-কানুন প্রচলিত, সে সবই তো কোন মান্ধাতার আমলের তৈরী বস্তাপচা কায়দা-কানুন ; যখন মেয়েদের চেপে রাখা হত সব রকমে, পৌরুষের জিগির তুলে, তখন পুরুষেরাই তৈরী করেছিল ওগুলো আর চালিয়েছিলোও তারাই তবে ?

আজ পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থায় ওগুলোর আর কোন মূল্যই তো থাকা উচিত নয়।

কিন্তু মজাটা এই যে, আজও বহাল-তবিয়তে বজায় রয়েছে ওই সব কায়দা-কানুন, খুব স্বাধীনস্বভাবা মেয়েকেও কিছু বলতে শোনা যায় না ওগুলোর বিরুদ্ধে।

পুরুষদের ভাগ্যে সেই নাকের দায় থাকলো।

একটি অফিসে [illegible] পাশাপাশি মেয়ে পুরুষ দুই-ই, মাসান্তে মাইনের কড়িটি একইভাবে ট্যাঁকে পুরছেন, তবু পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটার পর করণিক যুবকটি ফিরে যায় মধ্য যুগে, শিভ্যালরাস এক নাইটের ভূমিকায়, অফিসের দোরে করণিকা তরুণী প্রতীক্ষারতা, অতএব নিয়ে চল তাকে কোন টি-শপে বা কোন রেস্তোঁরায়, গাঁটের কড়ি ভেঙে যোগাও যুগল ভ্রমণের পাথেয়।

আরও মজা দেখুন, এখনও মেয়েরা আশা করে যে, বাসে ট্রামে ছেলেরা তাদের দেখলেই বিকশিত দন্তে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের আসন ছেড়ে দেবে ; তবে এ বাবদে আজকাল ছেলেরা আর ততো বোকা নেই ; প্রায়শ দেখা যায়—দণ্ডায়মানা নারীকুলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গ্যাঁট হয়ে তারা নিজের নিজের আসনে বসে আছে অসঙ্কোচে ও অশঙ্কিত বিবেকে।

তারপর আরও আছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ঢেউ লেগেছে আজ সব দেশেই অথচ এই ধরণের মামলায় ক্ষতিপূরণ পায় সচরাচর স্ত্রী—স্বামী নয়, কেন, স্বামীদের কি কোন দামই নেই ? সত্যি বলছি—এই সব দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে, ভাবছি—পুরুষদের ন্যায্য অধিকারের দাবীতে এক সংস্থা গঠন করে জোর আন্দোলন চালাব, যাতে আমরাও আর কাব্যে উপেক্ষিতার মত সমাজে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে না থাকি।

—শ্রীমন্ত

প্রত্যেকে চায় বাঞ্ছিত হতে।

স্বামীর জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা তাই এত গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রী ছাড়া আর কেউ কি স্বামীকে এই অনুভূতির তৃপ্তি দিতে সক্ষম ? কাজেই, স্ত্রী স্বামীর জীবন-যাপনের পদ্ধতি পর্যন্ত কেবল ভাল-বাসার প্রগাঢ় ভালবাসার মোহন মন্ত্রে বদলে দিতে পারেন।

এবং মনস্তাত্ত্বিকদের অভিমত এই যে, প্রগাঢ় ভালবাসার ক্ষমতা প্রায় প্রত্যেক নারীর মধ্যে রয়েছে। যাঁরা স্বামীদের মনে স্বাধীনতা আর নিরা-পত্তার অনুভূতি আনতে অক্ষম, তাঁদের অধিকাংশই নিজেদের এই অশেষ মংগলপ্রদ ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন নন। একটু সচেতন হলেই তাঁরা কেবল স্বামীর জীবনে মংগলকর প্রভাব বিস্তার করবেন না, একটা পরিবারের সুখ আর সমৃদ্ধির হেতু হবেন। যার প্রভাব জাতীয় জীবনেও বিশেষ সুদূরপ্রসারী হওয়া সম্ভব।

এর থেকে মহত্তর সার্থকতা[illegible] কি সম্ভব ?

—[illegible]

॥ নয় ॥

ডাক্তারিতে কার্তিকের পশার বাড়তে লাগল। ছিলেন চক্ষু-চিকিৎসক, জনসাধারণের চাহিদায় হতে হল জেনারেল প্র্যাকটিশনার।

যখন চক্ষু-চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খুব খ্যাতি তখন সুদূর কাশ্মীর হতে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী চক্ষু-চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে একজন বিদেশী চিকিৎসককে দেখিয়ে চোখে অস্ত্র করবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাতে সুফল না পেয়ে যখন পীড়িত অবস্থায় ফিরে যাবেন স্থির করেন সেই সময় কেউ তাঁকে ডা: বোসকে দেখাবার পরামর্শ দেয়। তাঁর চিকিৎসায় কাশ্মীরের মন্ত্রী মশাই সম্পূর্ণ নিরাময় হন। তিনি ডা: বোসকে কাশ্মীর পরিদর্শনের জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। কর্ম-ব্যস্ততার জন্য সে আমন্ত্রণ গ্রহণ ডা: বোসের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হয় নি। তবে বছরের পর বছর কাশ্মীর হতে নানা উপহার সামগ্রী আসত। যতদিন সেই মন্ত্রীমশাই জীবিত ছিলেন, সেই সম্বন্ধটুকু বজায় ছিল।

চিকিৎসক হিসাবে বাঙালি সমাজে তাঁর যে খ্যাতি হয়েছিল, ইউরোপীয় মহলেও তার ঢেউ পৌঁছাল। যে সময়ে ধনী বাঙালী পরিবারেরও সায়েব ডাক্তার ডাকা ফ্যাসান ছিল সেই যুগে কলকাতার এক বিখ্যাত ধনী ইউরোপীয় পরিবারে পারিবারিক চিকিৎসক হয়েছিলেন ডাঃ বোস। এ জনপ্রিয়তা কি করে সম্ভব হয়েছিল এখন বলছি সেই কাহিনী।

যে সায়েব কোম্পানীতে তাঁর বাবা কাজ করতেন ধরা যাক সেখান-কার বড় সায়েবের নাম ছিল মি: ক্রম্পটন। তিনি ছিলেন কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের একজন গণমান্য ব্যক্তি। তাঁর সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হিসাবে তাঁর যেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, সেকালের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় বড় ইংরাজ কর্ম-চারীরাও তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন।

সঞ্জয়

মি: ক্রম্পটন ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কলকাতার বাসায় বিশ্বম্ভর নামে একটি বিশ্বাসী উড়িয়া ভৃত্য তাঁর সংসারের তদারক করত। চাকর, বাবুর্চি, মালী, দরোয়ান, কোচোয়ান প্রভৃতির একটি বৃহৎ বাহিনী পরিচালনা করে সুষ্ঠুভাবে সায়েবের মান-মর্যাদা বজায় রাখত সে। কোথাও এতটুকু ত্রুটি হতে দিত না।

ফলে সায়েবও খুব ভালোবাসতেন চাকরটিকে। তাই তিনি চাকরটিকে বলেছিলেন, উড়িষ্যা থেকে তার ছেলেকেও কলকাতায় এনে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাতে। বিশ্বম্ভর নিয়ে এসেছিল তার ছেলে নীলাম্বরকে। নীলাম্বর সায়েব বাড়ীতে থেকে ইস্কুলে পড়ত।

দৈবক্রমে ঐ নীলাম্বরের হল কলেরা। মি: ক্রম্পটনকে যে সায়েব চিকিৎসক চিকিৎসা করতেন তাঁকে খবর দেওয়া হল।

সায়েব ডাক্তার এসে উড়ে চাকরের ছেলের সংক্রামক কলেরা হয়েছে শুনে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার পরামর্শ দিলেন। তাতে বিশ্বম্ভর সম্মত নয় শুনে দূর থেকে রোগীকে দেখে খাওয়ার ওষুধ ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেল।

ওষুধ খাওয়ানো হল, রোগীর তাতে বিশেষ কোন উপকার হল না।

মি: ক্রম্পটন সেদিন অফিস থেকে ফিরে রোগীর খবর নিতে গেলে বিশ্বম্ভর সায়েবের পায়ে মাথা কুটতে লাগল। ক্রম্পটন বললেন---তোর যদি এ ডাক্তারের বিশ্বাস না থাকে অন্য ডাক্তার ডাকছি। কর্নেল হান্টলিকে ডেকে আন।

বিশ্বম্ভর বললে---সায়েব, যদি অনুমতি দাও, একজন বাঙ্গালী ডাক্তার ডাকি। সবাই বলছে, ঝামাপুকুরের ডাক্তার কার্তিক বোসকে দেখাতে, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

ক্রম্পটন বললেন বেশ। তোর যদি তাকে বিশ্বাস হয়, তাকেই ডাক।

ডাক্তার বোসের ঘোড়ার গাড়ি যখন আলিপুর রোডের সায়েব বাড়িতে পৌঁছালো তখন তিনি দেখলেন--- প্রাঙ্গণে পায়চারি করছেন ক্রম্পটন স্বয়ং। রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় তিনি সেদিন অফিসে পর্যন্ত যান নি। ডাক্তার বোস গাড়ি থেকে নামলে ক্রম্পটন বললেন---রোগীকে আমার নিজের ছেলে মনে করে

চিকিৎসা করবেন যত টাকা লাগে আমি দেব।

ডাক্তার বোস রোগীকে দেখে আতঙ্কিত হলেন। সারা বিছানায় মলমূত্র—তারই মধ্যে রোগী কাতরাচ্ছে। নিজহাতে পরিচর্যা করলেন, রোগীকে ওষুধ দিলেন, স্যালাইন দিলেন এবং নিজের একজন কম্পাউণ্ডার পাঠিয়ে দিলেন রোগীর পরিচর্যার জন্য।

পরদিনই রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হল এবং শীঘ্রই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

যতদিন রোগী অসুস্থ ছিল, রোজ যেতেন ডাঃ বোস। বিশ্বম্ভরের কাছ থেকে ফি নিতেন না। বলতেন—আগে রোগী সুস্থ হোক—ব্যস্ত কি?

শেষে একদিন ক্রম্পটনই ধরলেন—বললেন ডক্টর তোমার চিকিৎসায় ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। এবার কত টাকা দেব বলো। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমি তা পালন করব।

ডাঃ বোস বললেন—মিঃ ক্রম্পটন, আপনি আমার বাবার 'বস'। আপনার অফিসের প্রসন্ন বোসের ছেলে আমি। আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পেরেছি এতেই আমি আনন্দিত। আর রোগী সেরেছে ঈশ্বরের দয়ায়—এতে আমার কোনই কৃতিত্ব নেই। সুতরাং আমায় টাকা নিতে অনুরোধ করবেন না। তা হলে আমার বাবা অসন্তুষ্ট হবেন।

কিন্তু মিঃ ক্রম্পটন তো দেখেছেন এই তরুণ চিকিৎসক কি অপরিসীম যত্নে এই কলেরার রোগীটিকে নিজে শুধু চিকিৎসা করেন নি, তাকে পরিচর্যা করেছেন। চাকরের ছেলে বলে সায়েব ডাক্তারের মত দূর থেকে তাচ্ছিল্যভরে দেখেন নি। এই হল প্রকৃত সেবা, পীড়িতদের সেবা, আর্তের সেবা। সত্যই তরুণ ডাক্তারটি শিখেছেন তাঁর কাজ সুন্দর ভাবে করতে, সাফল্যের সঙ্গে করতে। একে আশীর্বাদ জানাতে ইচ্ছা করে বয়স্ক বিদেশীর।

তার উপর ডাক্তারটি তাঁদেরই আফিসের প্রসন্নর পুত্র। একটা কিছু করা চাই তার জন্য। প্রসন্নের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়, কারণ সে চাকরি থেকে অবকাশ নিয়েছে। সুতরাং ডাক্তারের জন্যই করতে হবে কিছু কিছু।

বন্ধু-বান্ধব বড় বড় ইংরেজ পরিবারে সরকারী বেসরকারী বড়কর্তাদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। ওয়াণ্ডারফুল ডক্। ব্রিলিয়াণ্ট বয় অব বসফোর্ড। মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপ্যালের নামটাও এসে পড়ল কথায় কথায়। তাঁর কাছে তাঁর ছাত্রের প্রশংসা করলে তিনি তো আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

ফলে ডাক পড়তে লাগল পার্ক স্ট্রীট, থিয়েটার রোড, আলিপুর রোড, কীড স্ট্রীটে। সায়েব পাড়ায় পসার জমে উঠল ডাঃ বোসের।

॥ দশ ॥

একদিন ডাঃ বোস বটকৃষ্ণ পালের দোকানে চেম্বারে বসে রোগী দেখছেন, লক্ষ্য করলেন—সাদা গলাবন্ধ কোট পরনে হাতে একটি ছোট ব্যাগ একজন ভদ্রলোক দোকানে ঢুকে কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে যাচ্ছেন। কাউণ্টারে তিনি যেন ব্যাগ থেকে কি বের করে দেখালেন, মনে হয় দোকান থেকে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হল না বলেই যেন কিছু বিরস মুখে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

ভদ্রলোকটির মুখ খুব পরিচিত, যদিও তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হয় নি কখনও।

ডাঃ বোস যে পাড়ায় থাকেন সে পাড়ায় যাতায়াত করতে দেখা যায় ভদ্রলোককে, কারণ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসর। কেমেস্ট্রি পড়ান। বিলেত থেকে ডি-এস-সি হয়ে এসেছেন। বলতে গেলে প্রথম 'ডক্টর অব সায়ান্স' হিসেবে ডক্টর পি সি রায় নামটাও শিক্ষিত মহলে খুবই সম্ভ্রম উদ্রেক করে।

সেই অধ্যাপক রায় দোকানে এসেছেন, আলাপের এমন সুযোগটা হাতছাড়া করা চলে না। বিশেষ করে মনে হল—যেন তিনি কিছুটা হতাশার ভাব নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন। যদি কোন বিষয়ে তাঁর সহায়তা করা যায় তাই বা মন্দ কি!

ডাঃ বোস বেরিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন—ডক্টর রায়, আপনি এখানে?

অল্পবয়স্ক ডাক্তারটি তাঁর নাম জানেন দেখে ডক্টর রায় একটু অবাকই হলেন, তিনি প্রতি-নমস্কার করে বললেন—আপনাকে কিন্তু আমি ঠিক চিনতে পারছি না।

ততক্ষণে ডাঃ বোস তাঁর চেম্বারের দরজা খুলে সমাদর করে ডাঃ রায়কে ভিতরে আহ্বান করে বললেন,—আমার নাম কার্তিকচন্দ্র বোস, আপনাদের পাড়াতেই থাকি, তাই প্রায়ই আপনাকে দেখি। কিন্তু কোনদিন আলাপের সৌভাগ্য হয় নি। তবে আমি আপনাকে চিনি, কারণ আপনি আমাদের দেশের কৃতী সন্তান। আপনাকে কে না চেনে? আসুন, একটু বসবেন এখানে।

বসবার পর কথা উঠল—ডক্টর রায় কি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তাই নিয়ে। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ান আর অবসর সময়ে দেশীয় ওষুধ তৈরী করেন। বটকৃষ্ণ পাল এদেশের সেরা ওষুধের কারবারি। তাঁদের কাছে তাই দু'রকম দেশী ওষুধ দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এঁরা দিশি ওষুধ রাখতে বা বিক্রি করতে আগ্রহী নন। তাই এখন নিজেই ওষুধ দুটি নিয়ে এসেছিলেন। সিরাপ বাসক, কাশির ওষুধ। আর একোয়া টাইকোটিস কনসেনট্রেটেড বা যোয়ানের আরক—অজীর্ণ উদরাময়ের ওষুধ। দুটিই দেশীয় উপাদানে তৈরী।

ডাঃ বোস বললেন—তা, এঁরা নিতে অসম্মত হয়েছেন?

এঁরা বললেন—এ সব দেশী ওষুধ এঁরা রাখবেন না। ওষুধের ভিতরে যাই থাক না কেন, বাইরের কাপড়চোপড় অর্থাৎ শিশি, লেবেল, প্যাকেটের

কারখানা নেই। এ ওষুধ চলবে না।
এখানে সবাই বিলাতি ওষুধের কারবার।

কথাটা সত্য। বহু বিখ্যাত বিলাতি ওষুধের ভারতীয় আমদানি-কারক বি কে পাল এণ্ড কোং। সারা ভারতে তার সুনাম। যা-তা ওষুধ রাখবেন কেন তাঁরা?

ডাঃ বোস তবু দেখতে চাইলেন ওষুধ দুটি। ডক্টর রায় বের করলেন ব্যাগ থেকে---যোয়ানের জল, টলটল করছে সোনালী রং। লেবেলে নাম লেখা---কোম্পানীর নাম: বেঙ্গল কেমিক্যাল। আর বাসক সিরাপের ঘন গাঢ় রং। দেখতে ভালোই। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিজে যত্ন করে তৈরী করেছেন---এ জিনিষ খারাপ হবে কেন? আর যোয়ান কিম্বা বাসক কোনটাই তো অপরিচিত গাছ-গাছড়া নয়, একেবারে পরিচিত ঘরোয়া সামগ্রী। এতে কাজ না হয়ে পারে না। অঙ্গসজ্জা নেই বলে ওষুধ চলবে না এ কি একটা কথা হলো?

ডাঃ বোস বললেন---ক'টা ফাইল আছে আপনার কাছে?

ডক্টর রায় বললেন---ছটি করে শিশি সঙ্গে এনেছি। কিন্তু ওঁরা তো নিতেই চাইলেন না।

ডাঃ বোস বললেন---ওঁরা তো আপনাকে চিনতে পারেন নি। আপনি বসুন, আমি ওঁদের বলে দেখি।

দোকানের মালিক ভূতনাথ পাল তাঁর বন্ধু, তাঁকে গিয়ে বললেন ডাঃ বোস। তাঁর একই উত্তর---ও দেশী ওষুধ চলবে না। কোন অঙ্গসজ্জা নেই, ও ওষুধ আলমারিতেও রাখা যাবে না।

ডাঃ বোস বললেন---কাশি আর বদহজমের রোগী এলেই প্রেসক্রিপসন করে দেব এই ওষুধের। দুদিনে বিক্রি হয়ে যাবে। রেখে দাও ওষুধ ক'টি। আর এসো আলাপ করে দিই। ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক। প্রথম ডক্টর অব সায়ান্স---ডক্টর পি সি রায়ের সঙ্গে।

বটকৃষ্ট পালের সুবৃহৎ দোকানে বিক্রি হতে লাগল বেঙ্গল কেমিক্যালের বাসক সিরাপ আর যোয়ানের জল।

কিন্তু ছটি করে শিশি ফুরিয়ে যেতে দুদিনও লাগল না। তখন খবর দেওয়া হল---আরও ওষুধ দিন। ডক্টর রায় একডজন করে ওষুধ পাঠালেন। তাও দিতে না-দিতে ফরসা। যতক্ষণ কলম আছে কার্তিক বোসের হাতে আর রোগীর ভিড় আছে তাঁর চেম্বারে ওষুধ কাটবে না এ কি একটা কথা হল? বিশেষ করে যে ওষুধে কাজ হয়, যে ওষুধ তৈরী করেছেন ভারতের সেরা রাসায়নিক ডক্টর পি সি রায়।

সুতরাং এবার তাগিদ অন্যদিকে। একা বটকৃষ্ণ পাল যা বিক্রি করতে পারেন তখনকার দিনের গোটা বেঙ্গল কেমিক্যাল তা তৈরী করতে পারে না।

পি সি রায় বুঝলেন---এই তরুণ ডাক্তারটির মত উদ্যোগী মানুষ পেলে তিনি মনের মত ওষুধের কারখানা তৈরী করতে পারবেন।

ডঃ রায় গিয়ে হাজির হলেন একেবারে ঝামাপুকুরের বাড়িতে, সঙ্গে ঐ পাড়ার ডাঃ অম্বিকাচরণ বোসকে নিয়ে। বললেন, ভাই, একদিন আসুন দেখে যান, কিভাবে ওষুধ তৈরী হচ্ছে। কলেজে ছেলেদের শুধু কেমিস্ট্রি পড়ালেই কাজ হলে চলবে না। দেশে কেমিক্যালস তৈরী করবার কারখানাও করতে হবে, যাতে হাতেকলমে ছেলেরা যা শিখবে তা কাজে লাগিয়ে দেশের শিল্পসম্পদ বাড়িয়ে তুলতে পারে। আর দেশীয় গাছ-গাছড়া দিয়ে এতকাল যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা চলল, এখন তাকে নতুন করে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। দেশীয় উপাদানে নতুন নতুন ওষুধ তৈরী করতে হবে। তার জন্য চাই আপনার মত চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দক্ষ মানুষ---যিনি পরামর্শ দিতে পারবেন, কিভাবে কি ওষুধ করলে তা বেশী কাজে লাগবে।

কথাটা ভালো লাগল ডাঃ বোসের। বস্তুত তিনি এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করলেও জানেন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মধ্যেও গভীর সত্য নিহিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটুকু পড়াশুনা হয় করে এসে সেখানেই বইপত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে শুধু রোগীদের মাথায় হাত বুলিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়া যে সব চিকিৎসকের স্বভাব, ডাঃ বোস কোন দিনই সে শ্রেণীর চিকিৎসক ছিলেন না। তাই তিনি এলোপ্যাথির চিকিৎসার নব নব গবেষণার বিষয়ও যেমন নিয়মিত পড়াশুনা করতেন, তেমনি পড়তেন চরক-সুশ্রুত রচিত আয়ুর্বেদের মূল গ্রন্থগুলি। ভবতারণ শাস্ত্রী নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে নতুন করে সংস্কৃত শিখেছিলেন, ওষুধের বিষয়ে সম্যক পরিচয়ের জন্য গাছ-গাছড়া ও অন্যান্য প্রকার ভেষজ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবার বুঝবার আগ্রহ তাঁর ছিল সুগভীর। পরে 'ভারতীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব' নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ডক্টর রায়ের কথার মধ্যে তিনি যেন তাঁর হৃদয়ের অনুসন্ধানেরই প্রতিধ্বনি খুঁজে পেলেন। মুগ্ধ হলেন ডক্টর রায়ের প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহারে। এত বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তির এমন সরল সহজ ব্যবহারও তাঁকে ডক্টর রায়ের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করল। তিনি বললেন---শীঘ্রই একদিন যাবো আপনার কারখানা দেখতে।

[ক্রমশ।

হিসেব মেলানো

দীপক সেন

মর্ত্যের মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায় কি না---পেতে হলে তা কেমন করে সম্ভব তা হল উপনিষদের বাণী, সাধকদের বক্তব্য। কিন্তু যে সাধনায় অমৃতের আস্বাদ পাওয়া সম্ভব সে সাধনায় অন্তরায় অন্তহীন। কবিমানসে যা ধরা দেয়, শিল্পীর তুলিতে যা মূর্ত হয়ে ওঠে---সাধকের সাধনায় যার সন্ধান মেলে---সেই পরশ মাণিক যে সাধারণের মনের কোণে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি নেহাৎ না দেয় তা নয়। কিন্তু তারপর---।

মানুষের অন্বেষণ করার শেষ নেই---শুধু খোঁজা নয়---খোঁজার পর হিসেব মেলানোর অপরিসীম আগ্রহ। সাধারণ, এমন কি অনন্যসাধারণের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নেই। হিসেবে না মেলার জন্যে আক্ষেপ এরপর অনিবার্য। প্রকাশভঙ্গীর অভাবে সাধারণের ভাষায় যা অনায়ত্ত, অনন্যসাধারণের লেখনীতে তাই হল---'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

যে-কোনও গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক মায় হিসাবপরীক্ষক যে বিষয়ের কিনারা করতে পারবেন না---যে হিসেব মেলাতে পারবেন না---তা হল মনের গহনে যে অনুসন্ধিৎসা তার হিসেব তার হদিশ। কি পাই নি তার হিসেব চাওয়া নিরর্থক---কেন কি হয়, কি হয় না তার উত্তর কেউ দিতে পারবে না। 'পেলেও যেমন না পেলেও তেমন শুধু থাকে হাহাকার।'

সাধারণ, অসাধারণ, অনন্যসাধারণ সবারই হিসেব মেলানোর জন্যে যে স্থৈর্য বা ধৈর্যের প্রয়োজন তা থাকে না। বোধ করি মনুষ্যজন্মই এর জন্যে দায়ী। মানুষ যা ভাবে তা মানুষ বলেই, ভাবে, অন্য কোনও প্রাণীর সে ক্ষমতা নেই। অনন্যসাধারণের বক্তব্য---'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।' কিন্তু এখানেও বক্তব্যের শেষ নয়---এর পরেও আছে, আর তা হল---

'আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি
আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে।'

মানুষ সামাজিক জীব [illegible] হিসেব মিলিয়ে চলবার আগ্রহ অনেক বেশী প্রবল। মানুষের জন্যে সমাজ না সমাজের জন্যে মানুষ---এ দ্বন্দ্ব, এ আত্মদ্বন্দ্বে মানুষ সবচেয়ে বেশী জর্জরিত। সমাজে থাকার জন্যে মানুষের দরকার সংসার। সংসারে থাকলে সাধক হওয়া যায় না---সাধনার অন্তরায় থাকবেই সে যে-কোনও সাধনাই হোক না কেন। সংসারে থাকলে বড়জোর সংসারসাধক হওয়া যায়, ভালমন্দ যে রকমই হোক না কেন।

সমাজ ও সংসার উভয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যিনি দেখাতে পারেন তিনি সর্বত্যাগী। তিনি বলতে পারেন---

'সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।'

ঐ একই কথা সংসার সাধকের বক্তব্য হলে তার মূল্যায়ন ন্যূনতম মর্যাদারও অযোগ্য। বাস্তব বলে আমরা যা জানি---যা জেনে এসেছি শতবার স্তব করলেও নূতন প্রস্তাব সমাজগ্রাহ্য নয়। তাই প্রতি পদক্ষেপে হিসেব মেলানোর প্রশ্ন। হিসেব মিলিয়ে চলছি না মনে হলেই পদে পদে বিপদ। দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপের জন্যে অশেষ আক্ষেপ। সংসার সাধকের পক্ষে জীবনে সর্বস্ব-[illegible] ব্যতিক্রম হলেই মনে হয় সর্বহারা হতে হবে---অতএব কাজ নেই।

সংসারে থাকলে সংসার সাধকের অন্যথা আচরণ করলেই বিড়ম্বনা। তাই জীবিকা চাই---জীবন-নির্বাহের জন্যই। শ্রীমদ্ভগবদগীতার অমৃত নির্দেশ অনাসক্ত হয়ে কর্মে আত্মনিয়োগ করবার কথা মনে রাখবার কোনও উপায়ই নেই। সব অবহেলা করতেই হবে। জীবনের জন্যে জীবিকা না জীবিকার জন্যে জীবন এ সংশয়ে বিচলিত হবার উপায় থাকবে না। অনাসক্ত হয়ে কর্মে নিয়োগ করার বদলে শক্ত হয়ে কর্মে আত্মনিয়োগ করাই কর্তব্য। বিংশ শতকে নৈতিক মানের চাইতে অর্থনৈতিক মানমর্যাদার প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী। হিসেব মেলানোর প্রশ্ন সবচেয়ে প্রকট বলেই।

সভ্যতার উষার যে খোঁজার শুরু সভ্যতার সঙ্কটে পারমাণবিক যুগে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েও সে খোঁজার শেষ নেই। চকমকি পাথর ঘষে আগুনের ফুলকিতে তুষ্ট হতে পারলে বারুদ আবিষ্কৃত হতই না হয়ত। লণ্ঠনে তৃপ্ত হলে বিজলী বাতি ফ্লুওরেসেন্ট ল্যাম্প পর্যন্ত গড়াতোই না সভ্যতা। বিজ্ঞান, বিবর্তন সব কিছুর গোড়ার কথা অনুসন্ধিৎসা---হিসেব মেলানোর প্রশ্ন।

প্রণয়ে তৃপ্ত হলে পরিণয়ের বন্ধনে যেতে চাইত না---প্রেমাস্পদাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাইতো না একটি মানুষও। ঘর বাঁধার শোভন সংস্করণ বিবাহানুষ্ঠান বর্জন করার কথা প্রগতিশীল মানুষেও

[illegible] চায় না। অতি [illegible] —'সুখের লাগিয়া এ ঘর [illegible] অনলে দহিয়া গেল'—বৈষ্ণব পদাবলীর এই বক্তব্য যখন তাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপের আবলী হয় তখন তারা অন্যভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করেন। আবার তারপরেও নূতন করে হিসেব মেলানোর চেষ্টা—পুনর্বিবাহ।

কিন্তু কেন এমন হয়? হিসেব মেলানোর প্রশ্ন জীবনের সবচেয়ে বড় কথা হয়ে ওঠে। কেন আমরা বুঝতে চাই না যে একে একে দুই আর দুয়ে দুয়ে চার এ হিসেবের ছকে জীবনকে বাঁধা যায় না। জীবনের কোনই নিশ্চয়তা কি আছে? বিবাহের কথা বাদ দেওয়া যাক—জন্ম, মৃত্যু সবই অনিশ্চিত। অনিশ্চিতের হিসেব মেলাতে গেলে চিৎ হতেই হয় এ কথা জানা সত্ত্বেও মানুষ পারে না নিজেকে সংযত করতে।

'গাছ যদি জানতো কেমন করে ফুল ফোটাতে হয়' তাহলে ফুল ফুটত কি না এও যেমন হিসেবে পাওয়া যায় না—মানুষের মনের হিসেবও বোধ [illegible] অজ্ঞাত [illegible] যায় না। [illegible] শক্তিমানের কথা [illegible] নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বোঝাতে চায় যে মনের অভিলাষকে বাস্তবে আনা যায় না। আনা যায় না বলেও আবার হিসেব মেলানোর প্রবণতা। যা পেয়েছি তার কতখানি যথার্থ সেটুকু যাচাই করার ইচ্ছে আমাদের প্রবল বলেই জয় করেও ভয় ভাঙে না। সংশয় থাকে অন্তরে। শুধু নির্ভেজাল হিসেব মেলানোর তাগিদে আমরা মেনে নিতে পারি না—

'অন্তরে কিছু সংশয় থাক
ভাষায় একটু দ্বিধা
কিছু ভুল কিছু কাটাকাটি নিয়ে
জীবনের মুসাবিদা।'

জীবনে ইতস্তত বোধের মধ্যে, অস্বস্তির মধ্যে অকারণ উদ্বেগে অপরিমিত প্রমাণ পাওয়ার আকুতি থাকে আমাদের, সেইজন্যেই চরম পরীক্ষার সময়ে পরম প্রিয়কে হিসেব মেলানোর ঝোঁকে প্রশ্ন করতেও দ্বিধা থাকে না। মনে ভয় হয় যদি জীবনের সর্বশেষ [illegible] নিক্রমণের সময় জীবনটা মাঝখানে ভেঙে যাওয়া অমরার গীতি অনুপম' হয়ে যায় তাহলে?

অকস্মাৎ পথ চলা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পশ্চাৎপটে যদি হিসেব মেলানোর যুক্তিই থাকে তাহলে ভুল, মিল, যতি সবই হারাতে বাধ্য। 'ভালবেসে যদি সুখ নাহি, তবে কেন মিছে ভালবাসা'—এ যদি হিসেব মেলানোর তাগিদে হয় তাহলে 'অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে আমি মুখ নিদ্রাহীন চোখে'—এ আশঙ্কাকুল অবস্থা আসতে বাধ্য। সেও হিসেব মেলানোর তাগিদেই নইলে কেনই বা 'মনে হবে আমি বড় একা।'

'গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা'—কবিমানসে সেই সৌন্দর্য পরিব্যাপ্ত ছিল বলেই যা কথা ছিল সব হারিয়ে গেল তবু প্রশ্ন রইল—'আর কি কখনও কবে এমন সন্ধ্যা হবে?' কিন্তু কেন? কেন এই প্রশ্ন? হারানো কথার সূত্র যদি সেই আগামী সন্ধ্যায় মনে পড়ে। হারানো সে কথা যে পরম রমণীয় সন্ধ্যার ছাড়া বলার অর্থই হয় না।

সঞ্চীয়া

গম-বিপ্লব
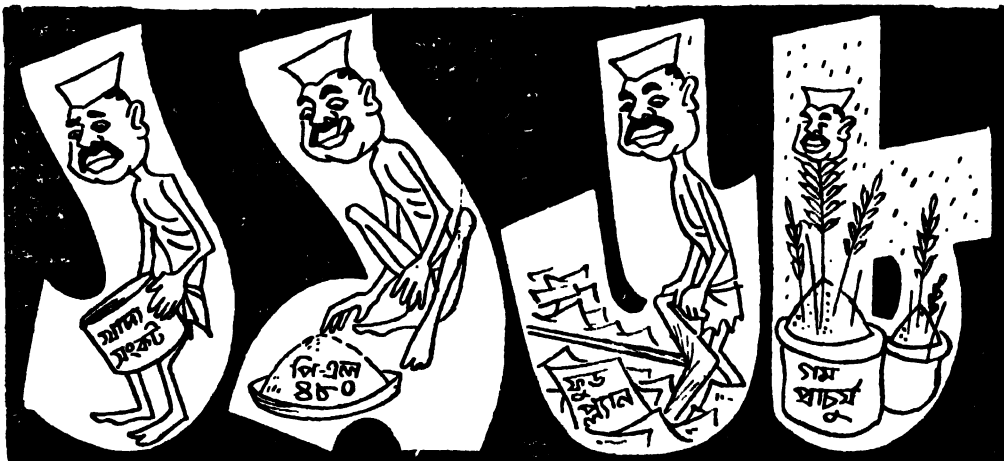
নারী স্বাধীনতা ও ঠাকুরবাড়ী

প্রাচীন ভারতে নারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিলো। এমন কি শাস্ত্রালোচনা ও দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে নারীদের স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকৃত হয়েছিলো। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান দান করতেও আনন্দে স্বীকৃত হয়েছে।

মহানির্বাণ তন্ত্রের একটি সূত্রেও বলা হয়েছে: কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ। এরপর মুসলমান যুগে অত্যাচার উৎপীড়নের ভয়ে নারীগণকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ক্রমবিলম্বিত লয়ে এই অবরোধ প্রথাই সংস্কারে পরিণত হয়ে গিয়েছে---যা নারী-স্বাধীনতার চরম পরিপন্থী। মধ্যযুগের ভারতের সমাজ-জীবনে অনেক অন্ধ কুসংস্কারের বেনোজল ঢুকে পড়ে এবং বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে নারীদের নির্বাসন দিয়ে পরপুরুষের চক্ষুর অন্তরালে গৃহকোণে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। গৃহরুদ্ধ হলেও নারীরা সেদিন মর্যাদা পান নি। নারী যেন কেবল পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে উঠেছিলো। তাই কৌতুক করে কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেছেন:

'ভিতর বাগে উদোম এলো,
কিন্তু বাহির পাদে গেরো'।
---হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

ইতিহাস তবু থেমে থাকে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা দেশে সুরু হলো নবজাগরণের নূতন অধ্যায়। ইউরোপের জনমানসের কণ্ঠ তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার ---তারই ঢেউ এসে আঘাত করলো বাংলার সমাজ-মানসের তটে।

চির-স্বাধীনতাপ্রিয় রামমোহন বাংলার নারীস্বাধীনতার প্রথম সংগ্রামী সৈনিক। ১৮১৮ খৃস্টাব্দে সহমরণ-রূপ সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে রামমোহন লিখলেন সহমরণ বিষয়ক পুস্তিকা। বললেন, 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?---আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?'

১৮৪৯ খৃস্টাব্দে সুরু হলো স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের আন্দোলন। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সাহায্যে বেথুন স্কুল খুললেন। (উল্লেখযোগ্য যে, এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা-বৎসরে যে তিনটি ছাত্রী ছিলেন তাঁদের একজন হলেন বংশবাটি নিবাসী হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নীপময়ী দেবী, এঁরই সংগে দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হেমেন্দ্রনাথের বিয়ে হয়) বারাসাত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি মফস্বল অঞ্চলেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রক্ষণশীলের দল সুরু করলেন আক্রমণ--- ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা লিখলেন,---

একা বেথুন এসে শেষ করেচে
আর কী তাদের তেমন পাবে
পিঁড়ি পেতে আর কী তারা
সাঁজ-সেঁজুতির ব্রত করবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
এ বি শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।

কিন্তু নবজাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সংস্কারবাদীরা নিরস্ত হলেন না কিছুতেই। বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ১৮৫০ সালে শোনা গেলো বিদ্যাসাগরের বজ্রনির্ঘোষ। ১৮৫৬ সালে তাঁরই নির্দেশে সুরু হলো বিধবা-বিবাহ আন্দোলন।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সংগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কোন অংশ তিনি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আমরা দেখি যে, স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর মত ছিলো উদার। স্বীয় কন্যাকে তিনি বেথুন সাহেবের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। অন্তঃপুরের একটি প্রাচীন রীতিরও সংস্কার সাধন করেছিলেন তিনি। সেকালে বাঙালীর সংসারে শ্বশুর-ভাসুরের সামনে বধূরা বেরোতেন না। দেবেন্দ্রনাথের উদার হৃদয় এই সংকীর্ণতাকে পছন্দ করতে পারে নি। নারী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে যে তাঁর মত ছিলো তার আরো একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাই তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর রচনা থেকে। সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে বাড়ীর মেয়েরা যখন খোলা ছাদে বেড়াতে সুরু করলেন তখন দেবেন্দ্রনাথের পিসতুতো ভাই চন্দ্রবাবু এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের কাছে জানান তাঁর অভিযোগ।

উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 'কালের পরিবর্তন হইয়াছে। নবাবের আমলে যে নিয়ম খাটিত এখন আর সে নিয়ম খাটিবে না। আর কিসের বাধা দিব?'

তাছাড়া তখন দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) পত্রিকায় নারী-স্বাধীনতার স্বপক্ষেও নানারকম প্রবন্ধাদি লেখা হতো।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন বিলাতে, দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ আপন গৃহের অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি বাড়ীর মেয়েদের বাঙালা শিক্ষা দিতেন,

এবং 'এইরূপে তাঁহারা (মেয়েরা) মেঘনাদ বধ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।' তারপর হেমেন্দ্রনাথের বিয়ে হয়---নীপময়ী দেবী শিক্ষায়-দীক্ষায় স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী ছিলেন। নীপময়ী দেবী স্বামীর কাছ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সাহিত্য-রথীদের রচনা, অলংকার শাস্ত্র, সংগীত ও চিত্র-বিদ্যায় শিক্ষা করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাই হেমেন্দ্রনাথকে যথার্থই বলেচেন,

'He was the educationists of the day'.

ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরা এইভাবে শিক্ষার আলোক পেলেন। কিন্তু 'অবরোধ' নামক সামাজিক প্রথাটি বিলুপ্ত হয় নি তখনো। বাড়ীর মেয়েরা বাইরে বড়ো একটা বেরুতে পারতেন না; মেয়েদের এবাড়ী থেকে ওবাড়ী যেতে হলেও ঘেরাটোপ ঘেরা পালকিতে যেতে হতো।

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে বিলাত থেকে ফিরলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম ভাঙলেন অবরোধ প্রথা। তাঁরই উৎসাহে মেয়েরা বিকেলে বাড়ীর ছাদে বসা-বেড়ানো সুরু করলেন। খোলা গাড়িতে চড়ে বাইরে বেড়াতে বের হলেন। পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে তিনি যেদিন ঘেরাটোপ ঘেরা পালকিতে না তুলে স্টীমারে চড়িয়ে আপন কর্মস্থল বোম্বাই-এ নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও হেমেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় বাড়ীর মেয়েদের শিক্ষার জন্য এক মিশনারী মেমকে নিযুক্ত করা হয়।---এখানেই তাঁর আন্দোলন শেষ হয় নি। স্ত্রীকে তিনি বিলাতে নিয়ে যান সেখানকার নারী-স্বাধীনতার আলোকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। জ্ঞানদানন্দিনীও ছিলেন যোগ্য স্বামীর যোগ্যা স্ত্রী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে নারী-স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকে হাস্যরসের অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি এর গুরুত্ব ও মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেন তখন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকের জন্য লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন---'এ সময় আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন। গঙ্গার ধারে বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান করে, স্ত্রীর সাথে অশ্বারোহণে পাশাপাশি গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়ে তিনিও সমাজে তুললেন প্রচুর আলোড়ন।

অবরোধ প্রথার উচ্ছেদকল্পে ও নারী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে ঠাকুরবাড়ীর পুরুষদের এই আন্দোলনের ফল ফললো। ধীরে ধীরে বাড়ীর মেয়েরাও এইভাবে গড়ে উঠলেন। দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী অবরোধ ভেদ করে একেবারে মুক্ত সমাজের মধ্যে বেরিয়ে এলেন; সুরু করলেন সাহিত্য-সাধনা, যা 'তখনকার যুগে স্বপ্নাতীত কল্পনাতীত ব্যাপার।'

১৮৭৯ খৃস্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন—এবং 'দীপনির্বাণ' থেকে সুরু করে পর পর কয়েকটা উপন্যাস এতে ছাপা হলো।

হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীও শিক্ষায়-দীক্ষায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু বালিকাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সুন্দররূপে পিয়ানো বাজাতে শেখেন। এবং ভূতপূর্ব ছোটলাট, বর্তমান লর্ড ক্রোমারের কন্যা কুমারী বেয়ারিং-এর নিকট হইতে একটি রূপার ফুলদানী বিশেষ পুরস্কার রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাছাড়া বিদ্বজ্জন সমাগম উৎসবে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে অভিনয় করেও তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

তারপর সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবী আর স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবী যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সংগে পাশ করে স্নাতক হলেন সেদিনও বাঙালী সমাজে চাঞ্চল্যের সীমা ছিলো না।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ এসেচেন। নানা বিরুদ্ধ শক্তির আলোড়নের আঘাতে সমাজেও তখন নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। জাতীয় জাগরণের সংগে সংগে নারীরাও সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া তখন ভারতের ভাগ্যাকাশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাবও হয়েছে।

'সরলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের কথা।

যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে
বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে করো
অশঙ্কিনী।

তাছাড়া তাঁর 'চোখের বালি'র (১৯০৩) বিনোদিনী, 'গোরা'র (১৯১০) সুচরিতা - ললিতা, 'ঘরে বাহিরে'র (১৯১৬) বিমলা, 'শেষের কবিতা'র (১৯২৯) লাবণ্য, 'চার-অধ্যায়ে'র (১৯৩৪) এলালতা এঁরা সবাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল। এতদিন ঠাকুরবাড়ীতে নারী স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম চলেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে তা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলো। নারীর অবরোধের বিরুদ্ধেই তিনি শুধু সংগ্রাম করেন নি, তিনি নারীত্বকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অভিষিক্ত করেছেন।

আমাদের দেশে জামাই বাড়ীতে শ্বশুরীর বাস কথাটা এককালে প্রায় অকল্পনীয় ছিল এবং আজও সেটা প্রথা হয়ে দাঁড়ায় নি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে তা নয়; ছেলের বিয়ে হয়ে গেলেই ছেলের সংসারে মার আর দাবী থাকে না। কিন্তু জামাইবাড়ীতে বাস করার ঘটনা সেখানে বিরল নয়; কিন্তু এর পরিণতি প্রায়শ সুখের হয় না।

বর্তমান রচনায় শাশুড়ীর জামাই বাড়ীতে বাস করা উপলক্ষে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

এ বিষয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আরও এইজন্য যে, সাম্প্রতিক-কালে পাশ্চাত্যের ঘর সংসারের অন্ধ অনুকরণ করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আমার বান্ধবী সুসানের ব্যাপারটাই বলি তবে শুনুন।

[illegible] অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়েই মেপে দেখতে চান কন্যার সংসার জীবনটিকে এবং তখনই সুরু হয়ে যায় সংঘাত।

আধুনিক জীবনযাপন রীতি স্বভাবতই একটু গোচ্চার, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চালচলন—এর কিছুই স্বাভাবিক ঠেকে না মার চোখে, মেয়ের চিন্তাধারা যে তাঁর মত না হওয়াটাই সম্ভব একথাও মানতে প্রস্তুত নন তিনি; কাজেই স্বতঃসিদ্ধভাবে জামাতার উপরই বিদ্বেষ জন্মায়; নিজের মেয়ে যে একটা অপদার্থের হাতে পড়ে মাটি হতে বসেছে একথাটাকেই আঁকড়ে ধরে হা-হুতাশ চলতে থাকে তাঁর, অবশ্য প্রকাশ্যে নয় মনে মনে।

কিন্তু মনের অসন্তোষ এমনই জিনিষ যা নাকি একেবারে চাপা যায় না কোনমতেই, কাজেই ছোট ছোট কথা

[illegible] সেবাযত্ন ইত্যাদির অভাবেও তাঁকে কষ্ট পেতে হবে না কোনদিন।

বয়স হয়ে গেলে সকলকেই অল্প-বিস্তর পরনির্ভর হয়ে পড়তে হয়, কাজেই 'এতদিন করেছি আজ কেন করব না' এ ধরণের মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে কোন লাভ নেই। বৃদ্ধ বয়সে স্নেহ-মমতার স্পর্শ ছাড়া জীবন যাপন করা প্রায় অসম্ভব, কাজেই নিজের পুরোনো রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরে থেকে কেউ যদি সে পথে কাঁটা দিতে চান তবে তাঁকে নির্বোধ বলা ছাড়া আর উপায় কি?

অপর পক্ষে বার্ধক্যের অসহিষ্ণুতাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে সাবধানে নিজের পথে চলাতেই তো যৌবনের সার্থকতা। বহু বছর ধরে যে নারী আপন সংসারে কর্তৃত্ব করে আপন ইচ্ছানুযায়ী সংসার পরিচালনা করে এসেছেন, তাঁর কর্তৃত্বের অভিলাষ একদিনে

আমার মা বাস করেন আমাদের সঙ্গে

বহুদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা, এক-সাথে লাঞ্চ খেতে খেতে একথা-সেকথার পর ও হঠাৎ বলে উঠল—'জানিস আজ-কাল একটু বিপদের মধ্যেই কাল কাটাচ্ছি; আমার মা এসে বাস করছেন আমাদের সঙ্গে।' আশ্চর্য একটু হলাম বৈকি এহেন মন্তব্য শুনে, ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু কৌতূহলী হয়ে উঠতেই সুসান খোলাখুলিভাবে জানালো সব।

ওর গৃহিণীপনা নিয়ে খুঁৎ ধরা, ওর ছেলেমেয়েদের চালচলন সম্বন্ধে মন্তব্য ইত্যাদির প্রাবল্যে ওর স্বামীও যে প্রায় ধৈর্যহারা হতে বসেছেন, এ তথ্যও জানা হয়ে গেল আমার কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

সমস্যাটা সত্যিই ভাববার মত কারণ এ কারুরই ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এ সমস্যা সর্বজনীন। নতুন আর পুরোনো-দের মধ্যে মতের পার্থক্য চিরদিনই ছিলো, আর চিরদিনই থাকবে, কাজেই একই সংসারে পঞ্চাশোর্ধ্বা মাতা ও যুবতী কন্যার মধ্যে যে মতৈক্য হওয়াটা সম্ভবপর হয় না তাতেও বিস্মিত হওয়ার

ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেতে থাকে অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ; যার তাপে ক্রমে ঝলসে উঠতে থাকে গোটা সংসারটাই। এক্ষেত্রে শাশুড়ী আসছেন শুনলে জামাইয়ের মুখ যদি শুকিয়ে ওঠে তবে তাঁকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি করে? এখন ভেবে দেখতে হবে এ সমস্যার প্রতিকার হতে পারে কি ভাবে? এ সব ক্ষেত্রে শাশুড়ীকেই বেশী বিবেচক হয়ে উঠতে হবে; কারণ তাঁর মনে রাখা উচিত যে, তাঁর সংসার তিনি যেমন স্বাধীনভাবে চালিয়েছেন বরাবর, তাঁর মেয়েরও সেই স্বাধীনতায় সম্যক অধিকার বর্তমান; তাঁর বিবেচনা করা উচিত যে সব মানুষেরই দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ সর্বথা অবাঞ্ছনীয় এবং মেয়েদের কাছে নিজের স্বামী-পুত্রের গুরুত্ব মা-বাপ বা ভাইবোনের চেয়ে অনেক বেশী। মেয়ের সংসার বা দাম্পত্য জীবনে অনাবশ্যক উঁকিঝুঁকি না মেরে তিনি যদি সহজ প্রসন্নতার সঙ্গে পরিবর্তিত জীবনধারাকে মেনে নিতে পারেন তা হলে তাঁর নিজের আসনটিও

নিঃশেষ হয়ে কর্পূরের মত উবে যেতেও তো পারে না, কাজেই কন্যার সংসারে মাতা স্থায়িভাবে বাসা বাঁধলে কন্যারও উচিৎ মাতাকে এমন কিছু কিছু কর্মে ব্যাপৃত রাখা যাতে তাঁর সময়ও কাটে মন ও ভাল থাকে।

বই পড়ার অভ্যাস খুব কাজে আসে এসব ক্ষেত্রে কয়েকটি মনের মত বই ও পত্র-পত্রিকা হাতের কাছে পেলে কর্মহীন মানুষের দিন স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হয়, তাছাড়া আছে ঘরে বসে খেলা যায়, এমন কয়েকটি প্রমোদের উপকরণ, যথা তাস লুডো ইত্যাদি। বেতারের গুঞ্জন শুনতেও ভালবাসেন অনেকে, কাজেই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধকে সেসব দিয়েও ভোলানো যায় খানিকটা। আমাদের দেশে বয়স্কা নারীর মধ্যে পূজা-পাঠের প্রবণতা বিদ্যমান, এতেও সময় কাটে অনেকটা এবং বোধহয় ভালই কাটে। যাইহোক উভয় পক্ষকেই এসব ক্ষেত্রে খানিকটা সহিষ্ণু হতে হয়, এবং তাতেই বজায় থাকে মানসিক শান্তি ও স্বাস্থ্য।

—শ্রীমতী

সিন্ধু-সভ্যতার ও বৈদিক যুগের গ্রাম ও নগর বিন্যাস

মানুষ যখন সর্বপ্রথম গুহা হইতে বন্য জন্তুদের বিতাড়িত করিয়া নিজেরাই সেই সকল গুহায় বসবাস করিতে লাগিল তাহা আজ হইতে বহু বহু সহস্র বৎসর অতীতের কথা।

পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিত। সম্ভবত বন্য জন্তুদের চামড়া হইতে নির্মিত তাঁবুতে তাহারা বাস করিত। তাহাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয়া তাহারা খাদ্য সংগ্রহ করিত। প্রাকৃতিক কারণে অথবা তাহাদের শিকার করিবার ও মাছ ধরিবার ফলে যখন কোনও স্থানে খাদ্য ফুরাইয়া যাইত তখন [illegible] জীবন যাপন করিতে হইত।

পরে মানুষ যখন জমিতে বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে এবং পশম ও তুলা হইতে সুতা তৈয়ারি করিতে শিখিল তখন হইতে এক অর্থনৈতিক বিপ্লবের সুরু হইল। নূতন প্রস্তর যুগের মানুষ তাহার বাসস্থান নির্মাণের নূতন কৌশল আয়ত্ত করিল। তাহারা মাটি, পাথর বা ডালপালা দ্বারা তৈয়ারী কুঁড়েঘরে বাস করিত। অনেক প্রকারের পশুকেও পোষ মানাইয়া তাহারা গৃহ-পালিত করিল। মাটির খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা নিঃশেষিত হইলে তাহারা নিকটবর্তী জমিতে সরিয়া যাইত। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের মত তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত না। প্রায়ই তাহারা তাহাদের পূর্বের ঘরগুলির ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন ঘর নির্মাণ করিত। তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ছোট ছোট গ্রামে বাস করিত।

খ্রীস্টপূর্ব তিনসহস্র বৎসরেরও পূর্বে মানুষের ইতিহাসে প্রথম নাগরিক সভ্যতার সুরু হইল। মিশর, মেসোপটামিয়া, ভারতবর্ষ ও চীনের পলিমাটির দ্বারা উর্বর চারিটি নদীর উপত্যকায় এই প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয়।

মার্কণ্ডেয় ও বায়ুপুরাণে লিখিত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মানুষ প্রথমে পর্বতে ও সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে বাস করিত। তাহাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম গৃহগুলি বৃক্ষের অনুকরণে নির্মিত হইত। পরে মানুষ গ্রাম ও নগরাদি নির্মাণ করিল। এইগুলি দুর্গম মরুভূমিতে, পতিত জমিতে ও পর্বতের উপরে অবস্থিত দুর্গের আকারে নির্মিত হইত।

প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতা এবং হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো

প্রাচীন ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকায় সর্বপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য হইতে জানা গিয়াছে যে খ্রীস্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেও এই প্রাচীন সহরগুলি শক্তিশালী ও পরস্পর বিবদমান কেন্দ্রীয় সংগঠন দ্বারা শাসিত হইত। এই সময়ের মধ্যে আদিম মানব সভ্যতা কৃষিপ্রধান গ্রাম হইতে অতি উন্নত নাগরিক সভ্যতায় পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীঅবনীকুমার দে

মহেঞ্জোদারোর ৪০০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত হরপ্পায় সুবৃহৎ শস্যাগারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

মধ্য-সিন্ধুদেশের লারকানা অঞ্চলের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে মহেঞ্জোদারো অবস্থিত। সিন্ধিভাষায় মহেঞ্জোদারোর অর্থ "মৃতদের স্থান"।

এই সহরের সর্বপ্রকার পৌর শাসন ব্যবস্থা অতি সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত হইত। নগর-বিন্যাসের নির্দিষ্ট রীতি প্রচলিত ছিল। সহরের ময়লা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা সযত্নে পরিকল্পিত হইয়াছিল। প্রধান পুরোহিত কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইত এবং সহরে সর্বপ্রকার আইন ও শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইত।

মহেঞ্জোদারো হরপ্পা অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্রতর ছিল। ইহার আয়তন ছিল প্রায় এক বর্গ মাইল। সহরের বহির্ভাগ সিন্ধুনদের পলিমাটির দ্বারা আবৃত থাকায় মনে হয় আরও অধিক স্থান জুড়িয়া সহর বিস্তৃত ছিল। যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে সহর, সহরের প্রবেশদ্বার ও পর্যবেক্ষণ বুরুজগুলি ঘিরিয়া প্রাচীর ছিল।

ব্যবসায়, দোকান বাজার, শিল্প ও বসবাসের জন্য সহরের মধ্যে বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন অংশে বসবাস করিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সহরের বিশেষ নির্দিষ্ট অংশে বাস করিতেন। দরিদ্র লোকেরা পৃথক অংশে বাস করিত। দোকান, বাজারের জন্য কয়েকটি রাস্তা নির্দিষ্ট ছিল। প্রথমে প্রধানত বসবাসের জন্যই সহরটি ব্যবহৃত হইত কিন্তু পরে ইহা শিল্পপ্রধান সহরে পরিণত হয় এবং ফলে সহরের একাংশ শিল্প, কুম্ভকারশালা ও শঙ্খ কাটিবার কার্যে ব্যবহৃত হইত।

রাস্তাঘাট

সহরে সরু ও চওড়া দুই প্রকারের রাস্তাই ছিল। রাস্তাগুলি অল্পবিস্তর সোজা ছিল, আঁকাবাঁকা ছিল না। সহরের প্রধান প্রধান অংশে রাস্তাগুলি ত্রিশ ফুটেরও অধিক প্রশস্ত ছিল এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রধান অঞ্চলগুলিতে রাস্তার প্রশস্ততা ছিল ২৮ ফুট হইতে ১৩ ফুট। দুই সারি গৃহের মধ্যবর্তী পশ্চাদ্দিকের গলি ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি হইতে ৭ ফুট প্রশস্ত ছিল।

রাস্তাঘাটগুলি প্রধানত 'grid-iron' বা দাবার ছকের আকৃতিতে বিন্যস্ত ছিল। উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত 'First Street' (প্রথম রাস্তা) সহরের একটি প্রধান রাস্তা ছিল। ইহার গড় প্রশস্ততা ছিল ৩০ ফুট। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে সহরের মধ্যে যান-বাহনাদি চলিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে ইহাই ছিল সহরের একমাত্র রাস্তা যেখানে যানবাহনাদি চলাচল করিতে পারিত। পূর্ব পশ্চিম প্রসারিত 'East Street' (পূর্ব রাস্তা) ছিল সহরে যাইবার প্রধান প্রবেশ পথ। সহরের রাস্তাঘাট বিন্যাসের প্রধান দুইটি মেরুরেখা ছিল এই দুইটি রাস্তা।

নগর-পরিকল্পনার রীতি

নাগরিকদের সুখ-সুবিধার জন্য সহরে সুনির্মিত স্নানাগার ও অন্যান্য প্রশস্ত সৌধাদি ছিল। ধর্মানুষ্ঠানের জন্য কোন প্রকার গৃহ ছিল না।

সাধারণত উত্তর-দক্ষিণ মুখে বায়ু প্রবাহিত হইত। এই কারণে ঐ সকল রাস্তাঘাট উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমমুখী করিয়া বিন্যস্ত ছিল। রাস্তা ও গলি, ইট

বাঁধান ছিল না। ইহার পরিবর্তে মাটি ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে মনে হয় যে শহরের ভিতর সর্বপ্রকার চক্র-যান চলাচল নিষিদ্ধ ছিল। রাস্তার সংযোগস্থলে কোণাগুলি গোলাই করা হইত। রাত্রিকালে সহরে প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। রাস্তার দুই পাশে গৃহগুলি সুবিন্যস্ত থাকিত এবং উহাদের সম্মুখভাগে কোন প্রকার কারুকার্য করা থাকিত না। গৃহাদির কোণাগুলি ইচ্ছাপূর্বক গোলাকার করা হইত।

সকল দোকানঘরগুলি একই ধরণে তৈয়ারী হইত: সম্মুখভাগে কেবলমাত্র একটি দোকানঘর থাকিত এবং পশ্চাদ্ভাগে একটি অথবা দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর থাকিত। জনসাধারণের জন্য সাধারণ জলপানের স্থানও থাকিত। সহরের এক অংশের গৃহগুলি দোকান ও বসবাস উভয় প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হইত।

বাসগৃহ পরিকল্পনায় 'প্রয়োজনীয়তা'ই মূলনীতি হিসাবে অনুসৃত হইত। খোলা উঠানই ছিল বাসগৃহের প্রধান অংগ। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত হইত এবং খোলা উঠানের চারিদিকে বিন্যস্ত থাকিত। নদীর বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গৃহগুলিকে কৃত্রিম বেদীর উপর নির্মাণ করা হইত। সহরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রকার গৃহই ছিল। ভৃত্যশ্রেণীর লোকেদের গৃহে মাত্র দুইটি ঘর থাকিত। অতিশয় দরিদ্রলোকেরা সহরের বাহিরে চালাঘরে বাস করিত। এইগুলির কোন চিহ্নই আর এখন নাই। অপেক্ষাকৃত বড় গৃহগুলি দুই তিনতলা উঁচু হইত। গৃহের বাহিরের দেওয়ালের সংলগ্ন ও ভিতরের দিকে রান্নাঘর থাকিত। গৃহপালিত পশুদের উঠানে রাখা হইত। সিঁড়ি অপ্রশস্ত ও উহার ধাপগুলি বেশ উঁচু উঁচু হইত। স্নানঘর ও পায়খানার জল দেওয়ালের মধ্যের গর্ত দিয়া বাহিরে আসিয়া রাস্তার ধারে সুনির্মিত নর্দমায় পড়িত।

হারেম বা পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না এবং স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা পাইতেন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাদি

মহেঞ্জোদারোয় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইত। এই কারণে সহরে জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত ছিল। দুইটি পাশাপাশি গৃহের মধ্যবর্তী এক মুখ বন্ধ গলিতে অবস্থিত জনসাধারণের জন্য নির্মিত কূপ হইতে পানীয় জল সরবরাহ হইত। গৃহের ভিতরের দিকে ও রাস্তার ধারে স্নানঘর থাকিত। গৃহে পোড়ামাটির তৈয়ারী খাড়া নল ব্যবহার করা হইত। গৃহের ভিতরে নর্দমা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নর্দমা থাকিলে তাহা বাঁধানো মেঝের ঠিক নীচেই থাকিত। তাহা হইতে দুই স্তরে উঁচু পায়খানা তৈয়ারী হইত। শৌচকার্যের জন্য সম্মুখে ছোট বর্গাকার বাঁধান স্থান থাকিত। শৌচের জল দেওয়ালের মধ্যের গর্ত দিয়া রাস্তার নর্দমায় পড়িত। ময়লা জল রাস্তার নর্দমা বহিয়া উন্মুক্ত স্থানে মাটির মধ্যে গর্তে যাইয়া পড়িত। এই জল সহরের বাহিরে লইয়া যাইবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। মলমূত্রাদি 'Cess-pit' বা মলকুণ্ডে পতিত হইত। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেদের বাসগৃহে মলকুণ্ডরূপে বৃহৎ জালামাত্র ব্যবহার করা হইত। রাস্তার নর্দমা দিয়া মলমূত্রাদি পরিবাহিত হইত না। বৃষ্টির জল সহরের বাহিরে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত ছিল। গৃহাদি হইতে জঞ্জাল অপসারণ করা পৌরসংস্থার প্রধান কার্য ছিল। গৃহে জঞ্জাল ফেলিবার জন্য দেওয়ালসংলগ্ন ঢালু প্রণালী থাকিত। রাস্তায় ময়লা ফেলিবার আধার হইতে মেথরেরা জঞ্জাল অপসারণ করিত। সুবিধাজনক স্থানে জনসাধারণের জন্য জঞ্জাল ফেলিবার আধারও রক্ষিত হইত।

গৃহ-নির্মাণ পদ্ধতি

সুবৃহৎ অট্টালিকাগুলির ভিত মাটিতে বেশ নীচু পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইত। অত্যন্ত যত্নসহকারে ভিত নির্মাণ করা হইত।

গৃহ নির্মাণের জন্য ১১"×৫২"×২২" মাপের আয়তাকার ইঁট ব্যবহার করা হইত। প্রায় এই মাপেরই ইঁট এখন ব্যবহার করা হয়। আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় রৌদ্র-শুষ্ক ইঁট ব্যবহার করা হইত। ইঁট গাঁথিবার জন্য সাধারণত কাদার মশলার প্রচলন ছিল। প্রশস্ত ইঁটের দেওয়ালের দুই বহির্ভাগে ইঁট ব্যবহার করা হইত এবং ভিতরের অংশ পাথর দিয়া ভর্তি করা হইত। ইঁট দ্বারা তৈয়ারী বাড়িতে কোনরূপ কারুকার্য করা হইত না। গৃহের উন্মুক্ত অংশে কাঁচা ইঁট কখনও ব্যবহার করা হইত না। যে স্থানে রৌদ্র, বৃষ্টি ইত্যাদি লাগিবার সম্ভাবনা থাকিত না কেবলমাত্র সেই সকল স্থানেই কাঁচা ইঁট ব্যবহৃত হইত।

ক্ষুদ্র গৃহগুলির বাহিরের দেওয়ালের বহির্ভাগ জমির সহিত লম্বভাবে অবস্থিত থাকিত। বৃহৎ অট্টালিকাগুলির ক্ষেত্রে ঐরূপে দেওয়ালের ভিতর দিক খাড়া হইত এবং বাহিরের দিকে ঢাল থাকিত। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের গৃহের দেওয়াল চার হইতে পাঁচ ফুট পর্যন্ত চওড়া হইত। বাহিরের দেওয়ালের বহির্ভাগ প্লাস্টার করা হইত না। খালি ইঁট বাহির করা থাকিত।

এই সময় খিলানের প্রচলন ছিল না। প্রচুর পরিমাণে কাঠ পাওয়া যাইত বলিয়া কদাচিৎ ইঁটের থাম ব্যবহার করা হইত। চতুষ্কোণ আয়তাকার ও বর্গাকার থাম ব্যবহৃত হইত। গোলাকার থামের ব্যবহার দেখা যায় না।

পিটানো মাটির উপর রৌদ্র-শুষ্ক ও পোড়ানো ইঁট বিছাইয়া ঘরের মেঝে তৈয়ারী করা হইত। ঘরের মেঝে ২২ ইঞ্চি পুরু ইঁটের ও স্নানঘরের মেঝে ৫২ ইঞ্চি পুরু ইঁটে তৈয়ারী হইত। ঘরের ভিতরের দিকে দেওয়ালের উপর কাদার প্লাস্টার লাগানো হইত এবং উহা ঘষিয়া বেশ মসৃণ করা হইত।

গরম আবহাওয়ার জন্য গৃহে জানালার ব্যবহার খুব কম ছিল। গৃহের বাহিরের দেওয়ালের জানালাগুলি আকারে গর্তের মত ছিল বলিলেই চলে। ঘরকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য এই জানালাগুলি দেওয়ালের খুব উঁচুতে রাখা হইত। দরজা ও জানালার উপর চ্যাপ্টা কাঠের 'lintel' ব্যবহার করা হইত।

গৃহের ছাদ সমতল হইত। কাঠের তক্তার উপর ইঁট বিছাইয়া ও তাহার উপর মাটি পিটাইয়া ছাদ নির্মাণ করা হইত।

বৈদিক যুগের নগর-বিন্যাস প্রণালী

খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আর্যগণ তাঁহাদের আদি বাসস্থান হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছিলেন। জার্মান পণ্ডিত ডাঃ উইলহেলম্-এর মতে সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক যুগের মধ্যে প্রায় এক হাজার বছরের ফাঁক আছে। সিন্ধু সভ্যতার পতনের মুখে বৈদিক আর্যেরা ভারতে আসেন। সম্ভবত ১৩৫৭ খৃস্ট পূর্বাব্দে আর্যগণ প্রচুর সংখ্যায় সমুদ্রপথে আসিয়া পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। পরে চাষবাসের ও পশুচারণের জন্য নূতন জমির সন্ধানে তাঁহারা আরও পূর্বদিকে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

আর্যগণ ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সমাজ বেশ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদের সময়ের সভ্যতা খুবই উন্নত ছিল। এই সময়ে তাঁহাদের সংস্কৃতিও সর্বোন্নত ছিল। আর্যদের বিপক্ষীয় অনার্যেরা ব্যবসায়ী শ্রেণীর ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহাদের পূর্ব পুরুষেরা সিন্ধু উপত্যকায় বাণিজ্যিক সভ্যতার পত্তন করিয়াছিলেন।

জমি-সেচ ব্যবস্থা

জমি সেচের জন্য পাথরের কপিকলের উপর দিয়া চামড়ার তৈয়ারী দড়ি টানিয়া ও দড়ির অপর প্রান্তে বাঁধা বালতি দ্বারা কূয়া হইতে জল তোলা হইত। এই জল চওড়া নালী দিয়া লইয়া যাওয়া হইত ও সেচকার্যে

ব্যবহৃত হইত। সেচের জন্য খাল এবং কূপ হইতেও জল লওয়া হইত। সেচকার্যের জন্য জলসরবরাহের জন্য বাঁধও নির্মাণ করা হইত।

গৃহ-পরিকল্পনা ও নির্মাণ পদ্ধতি

ঋগ্বেদের সময়ে স্থাপত্যবিদ্যা প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং ধর্মের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। গৃহ-নির্মাণকার্যকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা হইত। গৃহ-নির্মাণের একটি বিশেষ ধারা প্রচলিত ছিল। এলোমেলোভাবে গৃহ-নির্মাণ করা হইত না। যত্নসহকারে মাপিয়া গৃহাদি নির্মিত হইত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য ও অনুপাত রক্ষা করিয়া গৃহ-বিন্যাস করা হইত।

যজ্ঞের বেদীই ছিল বৈদিক গৃহের কেন্দ্রস্থল। ইহার উপর গৃহের আকার নির্ভর করিত। উঠানের মাঝে পূজার বেদী ও চারিদিকে ঘরগুলি স্থাপিত হইত। প্রসারিত-হস্ত মানুষের দৈর্ঘ্য ধরা হইত ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ইহাকে বলা হইত 'পুরুষ'। ইহাই ছিল বেদীর পরিমাপ। সাধারণত ৭½ ফুট বর্গাকার বেদী তৈয়ার করা হইত।

ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় যে গৃহগুলি বেশ বড়, সুবিস্তৃত ও সুদৃশ্য হইত। গৃহে অনেকগুলি দরজা থাকিত এবং কদাচিৎ যন্ত্রপাতি রাখিবার ঘরও থাকিত। হয়ত কয়েকতলবিশিষ্ট গৃহেরও প্রচলন ছিল। গৃহে বহুসংখ্যক ঘর থাকিত এবং উহা যৌথ পরিবারের সকলের এবং উহার মেষ ও গবাদি পশুগুলিরও বাসের উপযোগী করিয়া আয়তনে বেশ বড় করিয়া নির্মিত হইত। গৃহ-নির্মাণের জন্য কাঠই প্রধান বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হইত। থামের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। গৃহের দেওয়াল মাটি ও নলখাগড়া বা শরের তৈয়ারী হইত এবং (Post) উপমিত ও (lintel) পরিমিত দ্বারা গৃহের কাঠামো তৈয়ার করা হইত।

বৈদিক-সমাজ এবং গ্রাম ও নগর বিন্যাস

সমাজ ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর গ্রাম ও নগর বিন্যাস রীতি নির্ভর করিত। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে এক একটি পরিবারই ছিল সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অংশ। পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা এবং তাঁহার মৃত্যু বা অবসরগ্রহণের পর তাঁহার পুত্র হইতেন কর্তা। একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নারীরা সংসারের কাজকর্ম করিতেন এবং সময়ে সময়ে ক্ষেতেও কাজ করিতেন। প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের প্রচলন ছিল।

মহেঞ্জোদারো
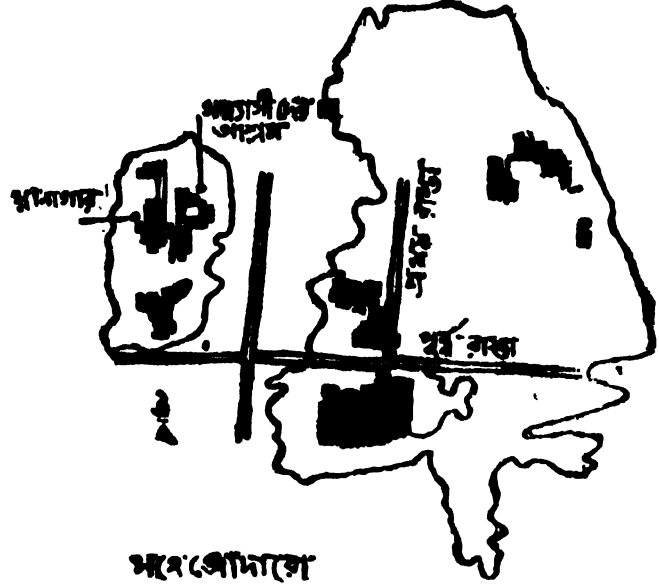
পরবর্তী বৈদিক যুগে শূদ্র বর্ণের উদ্ভব হয়। সম্ভবত বিজিত আদিবাসীদের এই বর্ণের লোক বলা হইত। তাহাদের কৃষিকার্যে, সৈন্যদলে ও অন্যান্য বর্ণের লোকেদের নিজস্ব কার্যে নিযুক্ত করা হইত। পরবর্তী বৈদিক যুগে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের জন্য নিজস্ব কাজ নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

বৈদিক যুগের গ্রাম ও বর্ধিত গ্রাম বা নগরের সম্যক চিত্র পাওয়া যায় না। জীবন যাত্রায় নিরাপত্তার অভাব থাকায় কয়েকটি পরিবার একত্রিত হইয়া মাটির বা পাথরের তৈয়ারি ঘেরা স্থানে বাস করিত। কয়েকটি পরিবারের সমষ্টিকে 'গ্রাম' বলা হইত। এই সময়ে সাধারণ গ্রাম এবং ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি ছাড়া কেবলমাত্র সুরক্ষিত ঘেরা স্থান বসবাসের জন্য নির্মিত হইত।

সম্ভবত পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী স্থানে যেখানে প্রচুর পরিমাণে পাথর পাওয়া যাইত সেই সকল স্থানে প্রস্তর নির্মিত নগরের ন্যায় দুর্গ নির্মিত হইত। বাহিরের প্রাচীর বাঁশ অথবা কাঠের তক্তা অপেক্ষা আরও শক্ত জিনিষ দ্বারা তৈয়ারি করা হইত। কয়েকটি সমকেন্দ্রীয় দেওয়াল গাঁথিয়া দুর্গ নির্মাণ করা হইত। দেওয়ালগুলি চুণকাম করা হইত। অথবা কোনপ্রকার চকচকে জিনিষ দ্বারা তৈয়ার করা হইত।

এই সময়ে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিবাদ লাগিয়া থাকিত বলিয়া নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেক বৈদিক গ্রামের চারিদিকে বেড়া দেওয়া হইত। ভিতরের দিকে বেড়ার চারিদিকে 'মঙ্গল-বীথি' নামে রাস্তা থাকিত এবং কখন কখন বেড়ার বাহিরের দিকে কাদায় ভর্তি নালা থাকিত। বৈদিক পূজার বেদী ঘিরিয়া থাকিত মণ্ডপ। সম্ভবত ইহা হইতেও বেড়ার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে।

গৃহের সংখ্যার উপর গ্রামের আকার নির্ভর করিত। বৃহৎ সংহিতা মতে গ্রামের আকার বর্গাকার বা বহু-বাহুবিশিষ্ট হইত। গ্রামবাসীদের সংখ্যানুপাতে গ্রামের ভিতরের রাস্তার সংখ্যা ও প্রশস্ততা নির্ণয় করা হইত। গ্রামের প্রধান প্রবেশদ্বারগুলি উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি চারিটি প্রধান দিকে থাকিত। গ্রামের আয়তন লোকসংখ্যার উপর নির্ভর করিত।

পরবর্তী বৈদিক যুগ

অনেকের মতে আনুমানিক ২৫০০ হইতে ১০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের কাল ধরা যাইতে পারে।

যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য হইতে জানা যায় যে তৎকালীন সভ্যতা কুরুক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষের আরও পূর্ব অংশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থায়িভাবে বসবাসের জীবন-যাপন উন্নতির সহিত জীবিকার্জনের নিমিত্ত বহু প্রকারের বৃত্তি প্রচলিত হইয়াছিল এবং ফলে এই সময়ে পুরাপুরি ভাবে জাতি প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কৃষি ও পশুচারণ বৃত্তিও উন্নতিলাভ করিয়া চলিয়াছিল। সভ্যতার উন্নতির সহিত শিল্পেরও প্রভূত প্রসার ঘটিয়াছিল এবং সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, লোহা, তামা, সীসা, টিন প্রভৃতি ধাতু বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

অথর্ববেদের সময়ে সাধারণ বাসগৃহ বহুভুজাকৃতি ও নানাআকারের হইত।

বৈদিক মণ্ডল ও অভ্যন্তরস্থ যজ্ঞ-বেদী ইত্যাদি

গৃহ-নির্মাণে রৌদ্র-শুষ্ক ইঁট ব্যবহার করা হইত। ইহাও অনুমান করা হইতে পারে যে এই সময়ে ইঁট পোড়াইবার প্রণালীও লোকেদের জানা ছিল। উপমিত ও পরিমিত (... এণ্ড বীম) প্রথায় গৃহ-নির্মাণ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। ছাদ-নির্মাণে লম্বা-লম্বি ও আড়াআড়ি ভাবে বাঁশ ব্যবহার করা হইত। ইঁটের তৈয়ারি জটিল অট্টালিকাও নির্মিত হইত। ১০,৮০০ ইঁট দ্বারা নির্মিত প্রসারিত-পক্ষ বৃহৎ পক্ষীর আকারের ন্যায় যজ্ঞ-বেদী নির্মাণের বিবরণও পাওয়া যায়।

ভারতীয় আর্যদের গ্রাম ও নগর বিন্যাস রীতির কিঞ্চিৎ বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সর্বপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানের পূর্বে স্নান করা অত্যাবশ্যক ছিল বলিয়া সহজেই স্নানাদি-কার্যের সুবিধার জন্য নদীতীরে, হ্রদের ধারে বা সমুদ্র-সৈকতে গ্রামগুলির অবস্থান নিরূপিত হইত। সেই স্থলের মাটি কৃষি-কার্যের উপযোগী কি না এবং মাটির অল্প নীচেই পানীয় জল পাওয়া যাইবে কি না তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য ভূ-পরীক্ষা করা হইত।

বাসগৃহ নির্মাণের জমি অসমতল, বৃত্তাকার, ত্রিভুজাকৃতি বা অসমান আকারের হইলে তাহা বর্জনীয় হইত। কামারশালার নিকটবর্তী জমি ও কারখানা হইতে নির্গত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন জমি বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত না। দক্ষিণদিকে পুষ্করিণী বেষ্টিত জমি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। চারিদিকে যথেষ্ট উন্মুক্ত স্থান, বৃক্ষাদি ও ফল-ফুলের কুঞ্জ থাকা আবশ্যক ছিল যাহাতে বাসগৃহের চারিদিক দেখিতে সবুজ মনে হয় ও মনের দিক দিয়াও আকর্ষণীয় হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যে সমৃদ্ধ ও প্রচুর জলরাশির সন্নিকটবর্তী স্থানে দুর্গ, নগর ও সহরগুলি নির্মিত হইত। সকল মন্দিরগুলিই পুষ্করিণীর নিকটে স্থাপিত হইত।

পরস্পরের আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য কয়েকটি গ্রাম একটি রাজার শাসনাধীনে একত্রিত হইত। মনে হয়, পূর্ববর্তী আর্যদের সুরক্ষিত শিবিরের অনুকরণে গ্রামগুলির বিন্যাস করা হইত। গ্রামগুলি আয়তাকার হইত। ইহাদের চারিদিক ঘিরিয়া প্রাচীর থাকিত। দুইটি প্রধান রাস্তা গ্রামের কেন্দ্র-স্থলে পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করিত। এইরূপে গ্রামটি চারিটি অংশে বিভক্ত হইত। এই প্রধান রাস্তা দুইটির শেষ প্রান্তে গ্রামের প্রাচীরের মধ্যে চারটি প্রধান প্রবেশদ্বার থাকিত। প্রাচীরের চারিটি কোণার নিকটে চারিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বার থাকিত। পূর্ব-পশ্চিমমুখী দীর্ঘতর রাস্তাটিকে বলা হইত 'রাজপথ'। ক্ষুদ্রতর রাস্তাটির নাম ছিল 'বামন' বা 'মহাকাল'। এই দুইটি রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা থাকিত। এই দুইটি প্রধান রাস্তা দিয়াই বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যাতায়াত চলিত। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে পাথর বাঁধানো ঢিবির উপর 'বোধি' বৃক্ষ রোপিত থাকিত। ইহার ছায়ায় বসিয়া সকলে গ্রাম-পরিচালনার বিষয় আলোচনা করিতেন। অপেক্ষাকৃত বড় বড় গ্রামগুলিতে কাঠ, ইঁট বা প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপের ন্যায় মন্ত্রণাগৃহ ও উহার সন্নিকটে গ্রামের অধিষ্ঠাতা বা অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর মন্দির থাকিত। গ্রামের বিভিন্ন অংশের তত্ত্বাবধান-কারী দেবতাদের মন্দিরগুলি অংশের নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হইত। এবং গ্রাম-বাসীদের বাসগৃহ, জনসাধারণের স্নানাগার, উদ্যান, ফুল ও ফলের বাগান এই কেন্দ্রস্থান-গুলির চারিদিকে বিন্যস্ত থাকিত। প্রধান প্রবেশদ্বার ও বাহিরের প্রাচীরের সন্নিকটে বাজারের স্থান নির্দিষ্ট থাকিত। বাহিরের প্রাচীর ও গ্রামের বাহিরের অংশের গৃহগুলির মধ্যে একটি প্রশস্ত রাস্তা গ্রামটিকে বেষ্টন করিত। ইহাকে বলা হইত 'মঙ্গলবীথি'। ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের আশীর্বাদ লাভের জন্য ও দুষ্ট আত্মাদের দূরে রাখিবার জন্য মন্ত্র-পাঠ করিতে করিতে এই রাস্তা দিয়া গ্রামটিকে প্রদক্ষিণ করিতেন। জনসাধারণের জন্য গ্রামের প্রাচীরের চতুর্দিকে প্রশস্ত সবুজ মাঠ নির্দিষ্ট থাকিত। এখানে গ্রামবাসীরা কৃষিকার্য করিতেন ও পশুচারণ করাইতেন। গ্রামের প্রবেশদ্বারের উপর সুউচ্চ গোপুরম হইতে রক্ষীরা পর্যবেক্ষণ করিতেন।

গ্রাম বা নগরের কেন্দ্রস্থলে তত্ত্বাবধানকারী দেবতার মন্দির, রাজপ্রাসাদ, বিচারগৃহ, মন্ত্রণাগৃহ, মন্ত্রীদের বাসগৃহ, সেনাপতিদের বাসগৃহ, কোষাগার এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সৌধগুলি সন্নিবিষ্ট থাকিত। ভারতীয় আর্যদের নির্মিত সহরগুলিতে বহু উন্মুক্ত স্থান, কেন্দ্রস্থল ও ঘেরা স্থান থাকিত। মন্ত্রণাগারের সহিত অবস্থিত রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে সুবৃহৎ পুষ্করিণী থাকিত। রাজ-প্রাসাদের সুরক্ষিত প্রাচীর থাকিত। কেবল-মাত্র মহিলাদের ব্যবহারের জন্য পৃথক স্নানা-গারের ব্যবস্থা ছিল। অন্তঃপুরবাসীদের অবসর সময় যাপনের জন্য পাথরের ও বালির কৃত্রিম ঢিবি এবং ফুলের বাগান থাকিত। সন্নিকটস্থ উদ্যানে হরিণ ও শিকারের নিমিত্ত অন্যান্য পশু রাখা হইত। এই মনোরম কেন্দ্রটিকে প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা সহরের অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইত। ইহাকে সহরের একটি প্রধান কেন্দ্র-স্থল রূপে পরিকল্পনা করা হইত।

প্রধান দেবতার মন্দির আর একটি কেন্দ্র-স্থলরূপে পরিকল্পনা করা হইত। মন্দির-সংলগ্ন সমস্ত আঙিনাটিকে কয়েকটি চত্বরে বিভক্ত করা হইত। প্রধান দেবতার মন্দিরের চারিদিকে তাঁহার সহগামী দেবতাদের মন্দিরগুলি নির্মিত হইত। মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে পুষ্করিণী ও উদ্যানও থাকিত। মন্দির প্রাচীরের বাহিরে চারিদিকে চারিটি প্রশস্ত রাস্তা মন্দিরটিকে চারিপাশের স্থান হইতে পৃথক করিয়া রাখিত।

আর একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল 'আশ্রম'। বিতর্কসভার জন্য হলঘর, বিভিন্ন পাঠঘর, ছাত্র এবং অধ্যাপকদের জন্য বাসগৃহ, পুষ্করিণী, ফুলের বাগান এবং দেবতার মন্দির লইয়া এই কেন্দ্র গঠিত হইত।

সরাইখানা, নাট্যশালা ও বাজারগুলি ছিল অন্যান্য কয়েকটি কেন্দ্র। বাজারের মধ্যে কোন-প্রকার চক্রযান চলাচল নিষিদ্ধ ছিল।

মহিলাদের জন্য উদ্যান, জনসাধারণের জন্য খেলিবার মাঠ এবং সামরিক প্রয়োজনের জন্য হস্তী ও অশ্বাদির শিক্ষাদানের নিমিত্ত উন্মুক্ত স্থান নির্দিষ্ট থাকিত।

এইরূপ কেন্দ্রস্থল ও খেলা স্থানগুলি শহরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ও শহরের বিভিন্ন অংশে সমভাবে বিন্যস্ত থাকিত।

সূত্রসাহিত্যানুযায়ী গৃহ-নির্মাণ প্রণালী

অনেকের মতে সূত্রসাহিত্যের কালানুক্রমিক বিভাগ এইরূপ—

শ্রৌত সূত্র......৮০০ হইতে ৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ

ধর্ম সূত্র......৬০০ হইতে ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

সূত্র সাহিত্য হইতে জানা যায় যে এই সময়ে গৃহ-নির্মাণের ভূমির আকার বর্গাকার, আয়তাকার বা চতুর্ভুজাকৃতি হইত। উত্তমরূপে ভূমি পরীক্ষা করিবার পর গৃহ-নির্মাণের স্থান নির্বাচন করা হইত। মাটির গুণাগুণ জল শোষণ করিবার ক্ষমতাও পরীক্ষা করা হইত।

এই যুগের প্রথম পর্বে গৃহনির্মাণের নিমিত্ত গর্তের মধ্যে কাঠের খুঁটি খাড়া করিয়া রাখিয়া ঐগুলি গৃহের কাঠামো রূপে ব্যবহৃত হইত। গৃহের মধ্যস্থলে একটি প্রধান খুঁটি থাকিত। গৃহের ছাদ নির্মাণ করিবার জন্য বাঁশ ব্যবহার করা হইত। এই যুগের পরবর্তী পর্বে গৃহ-নির্মাণে ইঁট ব্যবহার করা হইত। গৃহের চারিদিকে জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকিত। গৃহের প্রধান প্রবেশদ্বার দক্ষিণদিকে রাখারই বেশি প্রচলন ছিল। ইহা পূর্বে বা উত্তরেও রাখা হইত কিন্তু কখনই পশ্চিমদিকে রাখা হইত না। গৃহের চারিদিকে বৃক্ষরোপণ করা হইত। এই সকল বৃক্ষ যে সকল নির্দিষ্ট স্থানে রোপিত হইবে তাহাও সূত্রসাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তক হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য লওয়া হইয়াছে :—

(1) Early chapters in Indian Town Planning by Sri S. C. Mukherjee.

(2) Town Planning in Ancient India by B. B. Dutt.

(3) Early Indus Civilizations by Earnest Mackay.

(4) Mohenjo-daro and the Indus Civilization by Sir John Marshall.

(5) A Study on Vastu-vidya by Dr. Tarapada Bhattacharyya.

(6) The History of Aryan rule in India by E. B. Havell.

(7) Hindu Civilization by Radha Kumud Mukherji.

আমেরিকায় ট্যুরিসম

১৯৫৮-র খবর।

ঐ বছর গ্রীষ্মে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন ভ্রমণকারী গাড়িতে, ট্রেন-এ, কিংবা উড়োজাহাজে ক'রে প্রত্যহ ছুটি উপভোগ করতে ছুটেছিলেন। ওদের খরচপত্রের হিসেবের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, ওরা আমেরিকার একটি বৃহত্তম ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রেখে-ছেন।

'কমার্স ডিপার্টমেন্ট' এর প্রতি-বেদন অনুযায়ী আমেরিকায় ছুটি কাটানর উদ্দেশ্যে আমেরিকানরা প্রতি বছর পনের থেকে কুড়ি বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। অধিকাংশ অর্থ খাদ্য, বাস-স্থান, যাতায়াত, আর আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয়িত হয়।

অধিকাংশ ভ্রমণকারী (প্রায় শতকরা আশি জন) গাড়িতে ভ্রমণ করেন। এ হিসেবও 'কমারস্ ডিপার্টমেন্ট'-এর। রাত্রিকালে শতকরা উনসত্তর জন 'মোটেল'-এ বিশ্রাম নেন। বেড়ানর খরচ সাধারণত তাঁরা পান সঞ্চয় কিংবা সাম্প্রতিক রোজগার থেকেই। কেউই বড় একটা ধার করেন না। প্রত্যেক পরিবারের গড় বার্ষিক ব্যয়—বেড়ানর জন্য চারশ' ডলার।

ট্যুরিসম্ বিরাট ব্যবসা হওয়ায় এর বিজ্ঞাপনজনিত ব্যয়ও প্রচুর। বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতি বছর প্রায় একশ' মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়। কিন্তু ভ্রমণকারীরা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, সে তুলনায় এই অংশটি কিছুই না। 'ফ্লোরিডা অ্যাডভার্টাইজিং কমিশন'-এর বক্তব্য অনুসারে বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয়িত ডলার পিছু লাভ হয় একশ' পঁচিশ ডলার।

কুবেরধাম আমেরিকা। কুবের অনুচরবৃন্দও কম যান না দেখা যাচ্ছে। প্রভুদের মত এককভাবে হাওয়ায় ডলার ওড়ানর ক্ষমতা না থাকলেও মিলিত-ভাবে তাঁরাও যা ব্যয় করেন তা দেখে রোজ গড় উনিশ পয়সা রোজগারী ভারতবাসীর চক্ষু চড়কগাছ।

সূর্য ও পৃথিবী

মহাজাগতিক বস্তুসমূহের প্রতি চিরকালই সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নির্ণয়ে অতীতের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার মধ্যে অলেকজান্দ্রিয়ায় গবেষণারত তলেমীর (১০০ খৃস্টাব্দ), সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিপূর্ণ এবং তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক-সমর্থনপুষ্ট হইয়াছিল। সৌর পরিবার সম্পর্কে আমাদের এখন যে ধারণা, তলেমী ঠিক তাহার বিপরীত ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার রচিত পুস্তকে (Almagest) তিনি যুক্তিসহ লিখিয়াছেন যে, সূর্য অপরাপর গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান এবং পৃথিবী অচঞ্চল ও স্থির। তাঁহার এই মতবাদ বাইবেল ধর্মগ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং প্রায় ১৪০০ বৎসর ধরিয়া ইহাই ছিল সৌর পরিবার সম্পর্কে অবিসম্বাদিত ধারণা।

তলেমীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সর্বপ্রথম ১৫৪৩ খৃস্টাব্দে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন নিকোলাস্ কোপার্নিকাস্। তিনি তাঁহার রচিত পুস্তকে যে জ্যামিতিক সমাধান ও প্রমাণ উপস্থাপিত করিলেন তাহা তলেমীর সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কোপার্নিকাসের এই মতবাদ 'সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ' নামে পরিচিত।

এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্য অচঞ্চল ও স্থির এবং পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের সহিত সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে।

এই মতবাদের প্রবর্তক কিন্তু বিশ্ববাসীর সমর্থন পাইলেন না এবং অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতেও ছাড়িল না।

পরবর্তী বৈজ্ঞানিক বেসেল্ ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে কোপার্নিকাসের 'সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ'কে সমর্থন জানাইলেন এবং এই মতবাদের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রহিয়াছে তিনি তাহার উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

আরও এক শতাব্দী পরে গ্যালিলিও এই মতবাদের সত্যতা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিতে যাইয়া ধর্মবিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। তাহার অপরাধ—তিনি নাকি বাইবেলের অসম্মান করিয়াছেন। খুব নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হইলেন স্বাধীন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক।

জ্যোতির্ময় দত্ত

শুনিতে পাওয়া যায়, যখন তিনি অন্ধ ও অসহায় অবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তখনও তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইতেছিল—'তবুও, তবুও ইহাই (পৃথিবী) ঘোরে', ইহার নয় বৎসর পরে গ্যালিলিও কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন।

ঐ একই মতবাদকে সমর্থন করিতে যাইয়া গিয়োর্ডানো ব্রুনো প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তাঁহাকে নির্দয়ভাবে পুড়িয়ে মারা হইয়াছিল। শুধুমাত্র একটি সত্যাশ্রয়ী মতবাদকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলিয়া ধরিতে যাইয়া সেযুগের স্বাধীন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণ এইভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

শোনা যায় আমাদের দেশের একজন পণ্ডিত আর্যভট্টও পৃথিবী যে মহাশূন্যে থাকিয়া সূর্যের চারিদিকে—ঘুরিতেছে একথা বলায় তদানীন্তন পণ্ডিতগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহা সত্য যাহা ধ্রুব তাহা একদিন প্রকাশিত হইল এবং বিশ্ববাসীকেও মানিয়া লইতে হইল।

১৫৬৯ খৃস্টাব্দে টাইকোব্রাহী নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রমাণ করিয়া ... ও স্থির এবং পৃথিবী অন্যান্য গ্রহাদির সহিত সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান (ঠিক বৃত্তাকার পথে নয়, উপবৃত্তাকার পথে)।

টাইকোব্রাহী দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ডেনমার্কের মানমন্দিরে তাঁহার নিজের তৈয়ারী যন্ত্রপাতি লইয়া প্রত্যেক রাত্রিতে আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির গতিবিধি সতর্কতার সহিত অনুধাবন করেন। কিন্তু গণিতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা না থাকায় তিনি কোনও নির্দিষ্ট তত্ত্বের অবতারণা করিতে পারিলেন না।

তাঁহার সুযোগ্য সহকারী কেপ্লার গণিতশাস্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি 'ইম্পেরিয়াল ম্যাথেমেটিসিয়ান্' আখ্যায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। কেপ্লার দীর্ঘ বাইশ বৎসর গবেষণা করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার তিনটি সূত্র প্রণয়ন করেন, যাহা 'কেপ্লারের নিয়ম' নামে পরিচিত। ইহা জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদান।

কেপ্লার তাঁহার বিখ্যাত নিয়মগুলিতে বলিলেন, পৃথিবী এবং অপরাপর গ্রহসমূহ উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু ইহার সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না অর্থাৎ গ্রহগুলি সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাকার পথের না ঘুরিয়া কেন উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে একটি নাভিকেন্দ্রে রাখিয়া ঘূর্ণায়মান, ইহা তিনি ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না। তাহার পক্ষে ইহা সম্ভবও ছিল না কারণ সে যুগের বিজ্ঞানে গতি-জড়তার ধর্ম তখনও অজ্ঞাত ছিল।

১৬৮৫ খৃস্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির অধিকাংশ সভ্য যেমন রবার্ট বয়েল্, স্যামুয়েল প্যাপীস্, এড্মাণ্ড হ্যালে প্রমুখ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ মন্তব্য করিলেন যে, কোনও গ্রহের সূর্যের চতুর্দিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান থাকা তখনই সম্ভব যদি সূর্য তাহাকে এমন বলে আকর্ষণ করে, যাহার মান সূর্য হইতে গ্রহটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়। কিন্তু তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারিলেন না।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার

মাসিক
বসুমতী
ভাদ্র / '৭৫

মার্জার
বিচিত্রা

আলোকচিত্র
প্রতিযোগিতা

১ম	পুরস্কার	২০ টাকা
২য়	"	১৫ "
৩য়	"	১০ "

বিষয়বস্তু
আশ্বিন
জনারণ্য
কার্তিক
হাতের কাজ

—সুরেন্দ্রকুমার সিংহ

[ছবির পেছনে নাম ধাম ও বিষয়বস্তু লিখে পাঠাবেন]

—অভিজিৎ দাশগুপ্ত

জলের ধারে

★

—নিরুপমা মুখোপাধ্যায়

তৃষ্ণাকুল

-দীপঙ্কর সেন
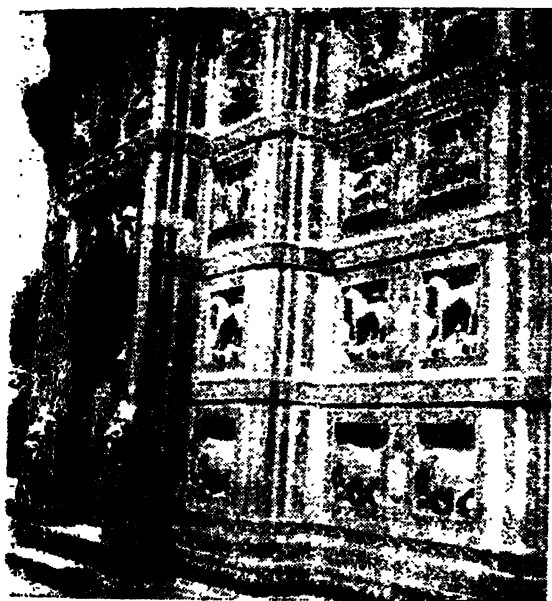
দুর্গা মন্দির (রামনগর)

—অমল ভট্টাচার্য

মাসিক
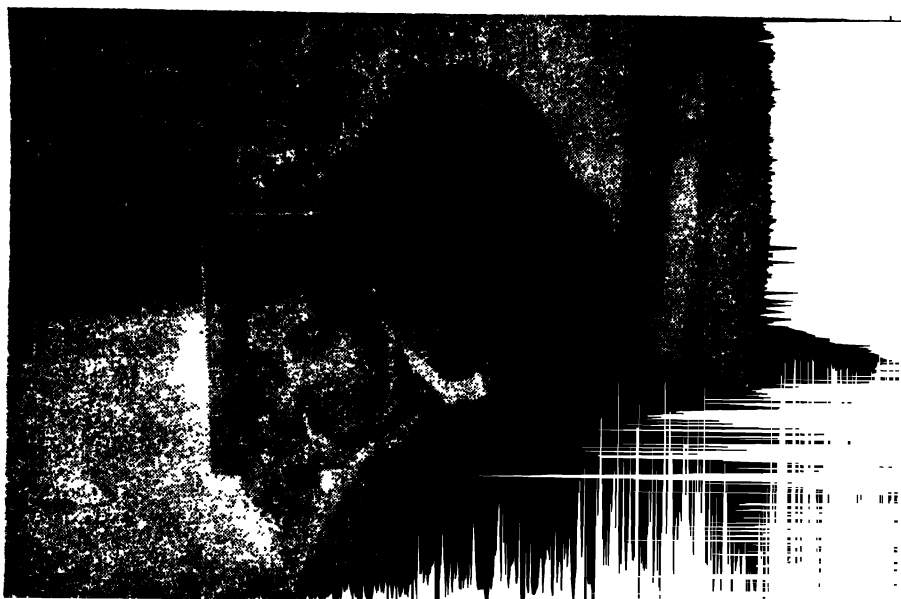
বসুমতী

ভাদ্র / '৭৫

সাঁঝের সাজ

—হৈমন্তী দাশগুপ্তা
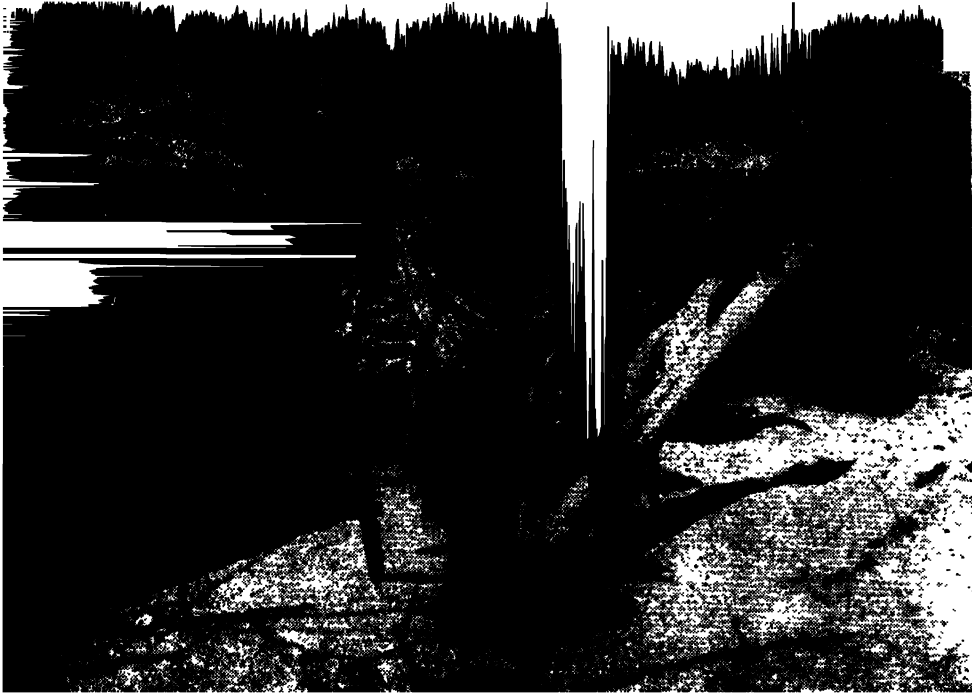
-অজিতকুমার কর্মকার

[ছবি বর্দ্ধিত আকারে ও গ্লাস কাগজে পাঠাবেন]

মাসিক

বসুমতী

ভাদ্র / '৭৫

খেয়াঘাট

—এস পাল
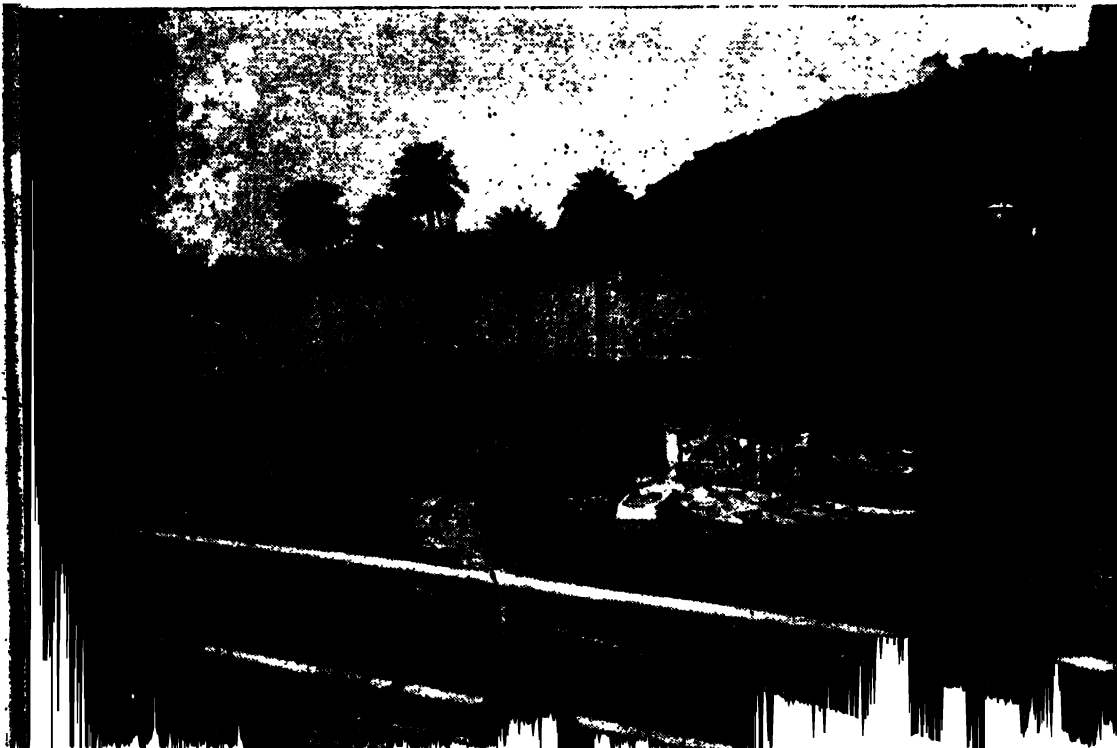
ফাল্গুনের একটি দিন

গোপাল ভৌমিক

ফাল্গুনের একটি বিশেষ দিন
চিহ্নিত হয়ে আছে আমার জীবনে :
এই বিশেষ দিনটিতে
আমি নাকি পৃথিবীতে এসেছিলাম।
প্রতি বৎসর একবার নির্ভুল নিশ্চয়তার
এই দিনটি ঘুরে ঘুরে আসে আমার জীবনে
অথচ তার দ্যোতনা
আমার পঞ্চাশ বৎসরের জীবনে এক ও অভিন্ন নয়।

কৈশোরে এই দিনটিতে
চোখ মেলে তাকালেই বুঝতাম
এ দিনটি স্বতন্ত্র ও সবিশেষ :
মায়ের মুখে মধুর হাসি
বাবার চোখে আনন্দের ঝিলিক
বুঝিয়ে দিত বিশেষ দিনের মর্যাদা।
শীতের অপসৃয়মান ছোঁয়া লাগা ভোরে
উদিত [illegible] হত পরম প্রিয়।

যৌবনে এ দিনটি এসেছে
প্রায়ই বিদেশে, মা-বাবার চোখের আড়ালে :
তবু দেহ-পেশীর স্বাস্থ্য
ও মনের অদম্য তারুণ্যে
আমার অভীপ্সা ছুঁতো আকাশকে।
জীবনে কে যেন আসবে
কি যেন হঠাৎ পাবো
সেই সম্ভাবনায় হৃদয় গুন্‌গুন্‌ করে গান গেয়ে উঠত।
প্রভাত-সূর্যকে মনে হত
কোন দূরাগত হাতছানির প্রতীক।

আজ পঞ্চাশোর্ধ্বে
ফাল্গুনের সেই একই দিন ফিরে আসে :
অথচ হাওয়ায় সে উন্মাদনা নেই,
দেহমনে নেই কৈশোরের লাবণ্য
কিংবা যৌবনের দুঃসাহস।
শীতের ছোঁয়া-লাগা ভোরে
সেই একই সূর্য আকাশে
অথচ তার রোদ কেমন পাণ্ডুর!

আইজাক নিউটনও এই রয়্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার অধিবেশনে খুব কমই আসিতেন। এই সময়ে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন।

এড্‌মাণ্ড হ্যালে নিউটনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সমস্যার কথা জানাইলেন এবং তিনি জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, নিউটন বেশ কয়েক বৎসর আগেই ইহার সমাধান করিয়াছিলেন কিন্তু কোনও কারণে তিনি তাঁহার গবেষণার কাগজপত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন (সম্ভবত এটি তাঁহার 'Diamond' কুকুরটির কীর্তি—এ গল্প সকলের সুপরিচিত)।

রয়্যাল সোসাইটির আর কোনও সভ্য এই সমস্যার সমাধান কোনওদিন করিতে পারিবেন না জানিয়া এড্‌মাণ্ড হ্যালে নিউটনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন, তাঁহার গবেষণা-প্রসূত ফলসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে। হ্যালের অনুরোধ ও প্রচেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত নিউটনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia) প্রকাশিত হইল। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ সম্পর্কে নিউটনই সর্বপ্রথম গবেষণা করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতিতে তাই তাঁহার অবদান গৌরবোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি

শিশির নিয়োগী

কাকাতুয়ার প্রথম পরিচয় তার মাথা। ঝুঁটিই হ'ল কাকাতুয়ার বিশেষত্ব। কাকাতুয়া সুশ্রী পাখীদের মধ্যে পড়ে না আর মেজাজটিও তিরিক্ষি। তবে গুণের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় এবং যার জন্য কাকাতুয়া মানুষের মন জয় করতে পারে সেটা হ'ল এরা মানুষের গলার নকল ক'রে কথা বলতে পারে কিছু কিছু।

পৃথিবীর নানান দেশে বিভিন্ন জাতের কাকাতুয়া দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে হলদেঝুঁটি অস্ট্রেলিয়ান কাকাতুয়ার কথাই বলি। তাসমানিয়া অঞ্চলেও এই জাতীয় পাখী পাওয়া যায় বেশী। এদের মাথার ঝুঁটি হলদে রং-এর, ঠোঁট ও পায়ের রং মিশ কালো। যাঁরা ক্ষেত-খামার করেন তাঁরা হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়াকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। এই পাখী তাঁদের ক্ষেতের বীজশস্য এবং ফসল খেয়ে নষ্ট করে। এরা গাছের কোটরে কিংবা বড় পাথরের ফাটলের মধ্যে বাসা করে। একসঙ্গে এরা দুটো ক'রে ডিম পাড়ে—সুন্দর সাদা সে ডিম।

এরা মোটামুটি পোষ মানে। কিছুদিন খাঁচার মধ্যে বন্দিজীবন কাটানোর পর এই জীবনে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। আগেই বলেছি এরা সহজেই মানুষের নকল ক'রে কথা বলতে চেষ্টা করে। অনেক কাকাতুয়া একটা গোটা বাক্য উচ্চারণ ক'রে ফেলতে পারে প্র্যাকটিসের দৌলতে। প্রতিপালককে ছাড়া—অন্য কাউকেই খাতির করে না কাকাতুয়া—কাছে এলেই বিরক্ত হ'য়ে কর্কশ স্বরে চিৎকার করবে আর গলাটা বাড়িয়ে ঠুকরে দেবার জন্যে।
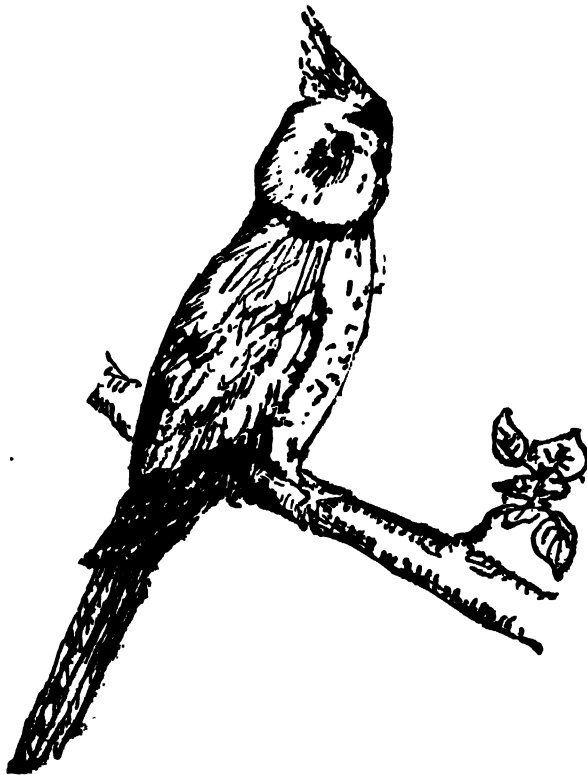
এদের মধ্যে অনেক কাকাতুয়ার কথা জানা গেছে যারা অনেক আশ্চর্য-জনক ব্যবহার করতে পারে। একটি পাখীর কথা শোনা যায় সেটি কেবল পরিচিত লোক দেখলেই কথা বলত। জিজ্ঞাসা কোরত কেমন আছো? কাকাতুয়া একবার কারও ওপর চটে গেলে সহজে সেই রাগ পড়তে চায় না। সে কাছে এলেই চিৎকার করবে এবং কাছে কোন জিনিস থাকলে ঠোঁটে ক'রে তুলে ছুঁড়ে মারবে লোকটির দিকে।

একটি হ'লদেঝুঁটি কাকাতুয়ার কথা জানা যায় যার প্রতিপালক ছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বাড়ীতে তাঁর অনেক নাতি-নাতনী ছিল। নাতী-নাতনীরা বৃদ্ধ ভদ্রলোককে 'দাদু' বলে ডাকত শুনে কাকাতুয়াটিও 'দাদু' কথাটি খুব বলত—বিশেষ ক'রে বাচ্চারা কাছে এলে চিৎকার ক'রে বলত 'দাদু', 'দাদু', 'দাদু'।

একদিন দাদু হঠাৎ মারা গেলেন। কাকাতুয়াটি এরপর থেকে কোনদিন দাদু কথাটি উচ্চারণ করেনি। বাড়ীতে কারও অসুখ-বিসুখ থাকলে কাকাতুয়াটি বুঝতো, চিৎকার করত না। খাঁচার দরজা খুলে দিলে সে রোগীর বিছানার পাশে গিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকত।

নিজের শরীর খারাপ লাগলে কয়লা রাখার জায়গা থেকে একটা টুকরো কয়লা মুখে ক'রে নিয়ে এসে খেয়ে ফেলত—এই কয়লাই ছিল ওর দাওয়াই। কাকাতুয়াটির যখন বয়স হ'ল সে আর উড়তে পারত না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো।

দেখলে গৃহস্বামীর কষ্ট হ'ত। একবার মনে করলেন কাকাতুয়াটিকে মেরে ফেলে তাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবেন। গৃহস্বামী খাঁচার কাছে গিয়ে কাকাতুয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তোর কষ্ট দেখে আর পারিনে। তোকে মেরে ফেলি?'

কাকাতুয়া এই কথায় কি বোঝে ভগবান জানেন, তবে উত্তর দেয়—না।

গৃহস্বামীর চোখে জল আসে। বলেন—তুই আরও কিছুদিন বাঁচতে চাস, না?

কাকাতুয়া কাতরভাবে বলে---হ্যাঁ।

এই কথা দুটি পরে যেই যখন যেভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে কাকাতুয়াটি ঠিকমতই উত্তর দিয়েছে---'হ্যাঁ' বা 'না' বলে।

আশ্চর্য ক্ষমতা কাকাতুয়াটির।

আর এক শ্রেণীর কাকাতুয়া আছে নাম 'লেডবিটার।' এগুলোও সাধারণত অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। গায়ের রং সাদা, কপালের রং গোলাপী, মাথার ঝুঁটিটা সাদা হলুদ ও কমলা রং-এ মেশানো। এরা একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির ও সহজে পোষ মানে। এই কাকাতুয়াগুলি দেখতে সত্যিই সুন্দর।

লাল ঝুঁটি কাকাতুয়াগুলিও দেখতে মন্দ নয়। এদের চোখগুলো নীল রং এর। আকারেও এরা দাঁড়কাকের মত বড়। এদের জন্যে শক্ত খাঁচার দরকার হয়।

বুকের কাছে গোলাপী রংওয়ালা কাকাতুয়ার প্রশংসা করেন অনেকে। এরা নাকি বিজ্ঞ, ঠাট্টা-তামাসা পছন্দ করে, অন্যদের মত তিরিক্ষি মেজাজের নয়ও সহজে পোষ মানে এবং কাছে গেলে ঠোকরায় না আর সময় নেই অসময় নেই চিৎকার ক'রে বাড়ী মাথায়ও তোলে না।

কাকাতুয়ার ঠোঁটটি সাধারণত একটু মোটা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে সরু ঠোঁটওয়ালা বিশ্রী চেহারার এক-জাতীয় কাকাতুয়া দেখতে পাওয়া যায়। এরা বড় দল বেঁধে থাকে। এদের সরু ঠোঁটের জন্য এরা শক্ত জিনিষও ঠুকরে খেতে পারে। তবে এই কাকাতুয়ার চেহারাও যেমন বিশ্রী স্বভাবটিও তেমনি---মেজাজ যেন সব সময়েই খিঁচড়ে আছে।এরা প্যাঁচার মতোই বোকা স্বভাবের। এরা সাধারণত একটু বেশী বয়সেই ব্যাধের জালে ধরা পড়ে। তখন এরা এত একগুঁয়ে হয়ে যায় যে সহজে পোষ মানতে চায় না। তবে উড়তে পারে খুব সুন্দর। বাজপাখী এদের আক্রমণ করলে এরা চরকী মেরে এত তাড়াতাড়ি এত উঁচুতে উড়ে যায় যে বাজপাখী এদের কিছুই করতে পারে না।

প্রায় সব কাকাতুয়াই দরকার বুঝলে ঠোঁটটি টেনে পালকের মধ্যে গুঁজে দিতে পারে। তখন ঠোঁটটি প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু ককাটিল জাতীয় কাকাতুয়া এ রকম পারে না। ঠোঁটটা বাড়াতে পারে ছোট করতে পারে না। ককাটিল দেখতে খুব সুন্দর---গায়ের রং পিঠের দিকে ছাইবর্ণের, পেটের দিকটা সাদা, মুখ এবং মাথার ঝুঁটির রং সবজে হলুদ, ল্যাজের নীচের দিকটা কালো, ঠোঁট এবং পা দুটি ধূসর রং-এর। বনে স্বাধীনভাবে থাকলে এরা বছরে দুটোর বেশী বাচ্চা দেয় না কিন্তু পোষা ককাটিলকে বছরে দুবারের বেশী বাচ্চা দিতে দেখা গেছে। দেখতে

হলদেঝুঁটি কাকাতুয়া
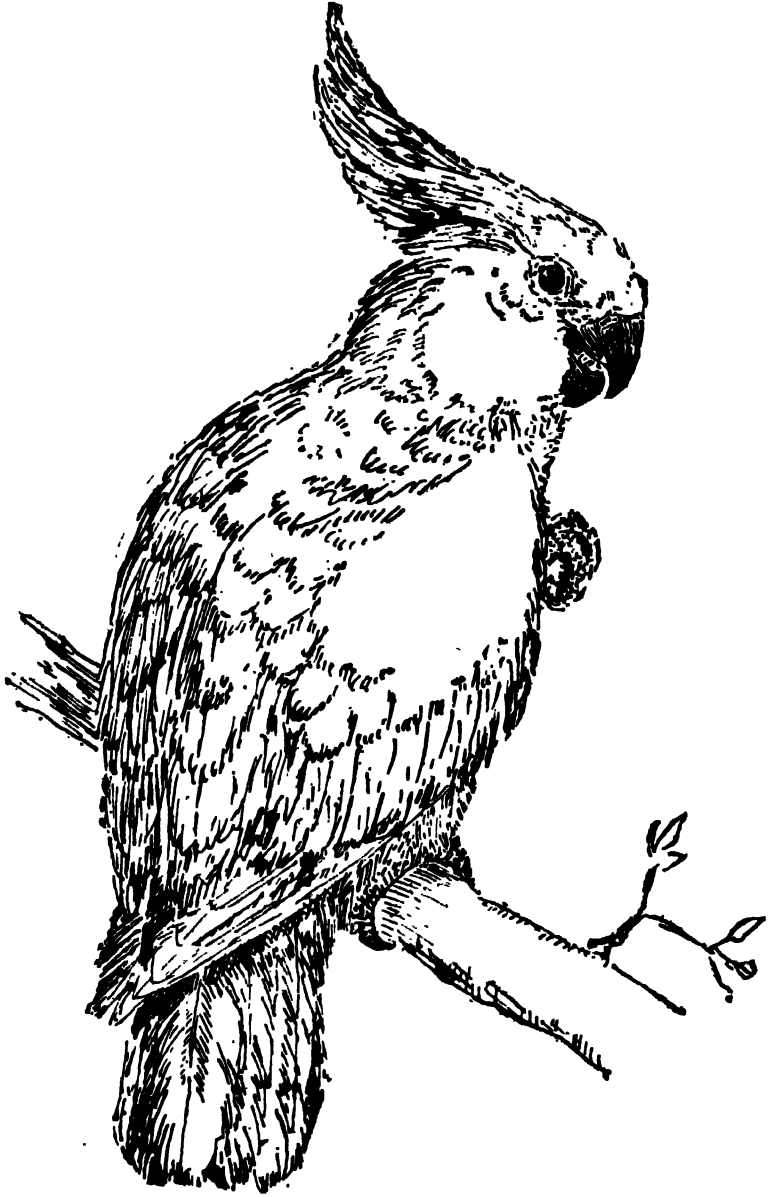
ছুদের এবং বছরে অনেক বাচ্চা দেয়—এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও পাখী-পালকরা কিন্তু ককাটিল তেমন পছন্দ করেন না। তার কারণ হল ককাটিল বিরক্তিকর পাখী—সারাদিন লাফালাফি ঝটপটি করছে আর সংগে বিশ্রী চিৎকার—আর একটু অসতর্ক হলেই সবাইকে কামড়ে দেবে। এরা মোটামুটি ভালোই কথা বলতে শেখে। কিন্তু স্বস্তিতে কথা বলবে কখন? এক খাঁচায় অন্য জাতের পাখী থাকলে তাদের সঙ্গে রাতদিন ঝগড়াঝাটি নিয়েই ত' আছে।

বাংলা দেশের কাকাতুয়াকে 'রাধা-কেষ্ট' বোল শেখানো হয়। বলতেও শেখে। কিন্তু তাতে তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয় না। 'রাধাকেষ্ট' কীর্তন করতে করতেই আপনাকে কাছে পেলে ঠুকরে দেবে। আপনি ব্যথায় চিৎকার ক'রে উঠলে সে তার কণ্ঠস্বর আরও উচ্চগ্রামে তুলে বলবে—'রাধা কেষ্ট', 'রাধা কেষ্ট'!!

---

* রচনাটির সংগে মুদ্রিত চিত্রগুলি লেখক [illegible] অংকিত করিয়াছেন।

লেডবিটার কাকাতুয়া

দাঁড়কাক ও টুনিপাখীর গল্প

(অসমীয়া উপকথা)

সমরেশ ভট্টাচার্য

কোন-এক সময়ে একটা দাঁড়কাক ও টুনি পাখীর মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়। একদিন গাছের ডালে বসে দুই বন্ধু দেখতে পেল, এক বুড়ী ধানসিদ্ধ করে উঠোনে রৌদ্রে শুকোতে দিয়েছে। দাঁড়কাক টুনিপাখীকে বললে, বন্ধু চল বুড়ীর ধান দিয়ে এ বেলার ভোজন-পর্ব সমাধা করি।

টুনি পাখীও খুশী হয়ে বললে, উত্তম কথা বলেছ, চল যাওয়া যাক।

কিন্তু একটা কথা দাঁড়কাক ধূর্ত চোখে টুনিপাখীর দিকে তাকাল, আমাদের মধ্যে একটা সর্ত স্থির করতে হবে—তুমি যদি আমার চেয়ে বেশী ধান না আনতে পার তবে তোমায় আমি খেয়ে ফেলবো আর আমি কম আনলে তুমি আমায় খাবে।

সর্ত শুনে টুনিপাখী বেশ চিন্তিত হল। তার ছোট্ট এইটুকুন ঠোঁটে করে দাঁড়কাকের সমান ধান আনা কিছুতে সম্ভব নয়। সর্তের নামে কায়দা করে ভক্ষণ করাই যে কাকের মুখ্য উদ্দেশ্য টুনি পাখী তা বুঝতে পেরে মনে মনে বললে, মরতে তো হবেই, তবু চেষ্টা করে দেখতে বাধা কোথায়?

মনে মনে একটা বুদ্ধি ঠিক করে টুনি পাখী বললে, বন্ধু তোমার সর্ত আমি মেনে নিলাম।

দাঁড়কাক প্রশংসা করে বললে, এ'জন্যই তোমায় এত বুদ্ধিমান বলে লোকে। যাও, প্রথম সুযোগ তোমাকেই দিচ্ছি। নিজের ভাগের ধান নিয়ে এস ঠোঁটে করে।

সেটা কি ভাল দেখায় বন্ধু? টুনি বললে, বিদ্যা-বুদ্ধি এবং শক্তিতে তুমি আমার চেয়ে কত বড়, তুমিই প্রথম যাও।

না ভাই তুমি আগে এসে গাছে বসেছিলে, তোমারই প্রথম যাওয়া উচিত। দাঁড়কাক আদর করে বললে।

অগত্যা টুনিপাখীকেই প্রথম ধান নিয়ে আসতে হলো। দাঁড়কাকও নিজের অংশ নিয়ে আসল। স্বভাবতই দাঁড়কাকের ঠোঁটে বেশী ধান উঠেছিল—সর্তমতে সেই জয়ী হল।

লোভী দাঁড়কাক উৎফুল্ল হয়ে টুনিকে বললে, বন্ধু প্রস্তুত হয়ে এস, তোমাকে ভক্ষণ করি।

আমি প্রস্তুত হয়েই আছি বন্ধু। টুনি জবাব দিল; কিন্তু আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে প্রিয় বন্ধু। দয়া করে রাগ করো না—তুমি তো নানা রকম পচাগলা জন্তু জানোয়ার ভক্ষণ কর, তাই তোমার ঠোঁট বড় নোংরা এবং দুর্গন্ধ—কৃপা করে সমুদ্রের জলে তোমার ঠোঁট ধুয়ে এসে আমাকে ভক্ষণ কর।

কাক বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করার জন্য তখনই সমুদ্রের পানে পাখা মেলল। সমুদ্র ভাই, সমুদ্র ভাই!

কেন ডাকছ? সমুদ্র উত্তর করল।

দাঁড়কাক ছড়া কেটে বললে—

দে পানী পখালোঁ ঠোঁটি।

ভোজন করোঁ টিপাচী গোটি॥

(একটু জল দাও সমুদ্র ভাই,

টুনী পাখী খাবো ঠোঁট ধুতে চাই।)

সমুদ্র বললে, পাত্র ছাড়া জল নেবে কেমন করে? একটা কুঁজো-টুজো নিয়ে এস।

সমুদ্রের কথা শুনে দাঁড়কাক গিয়ে উপস্থিত হল কুমারের কাছে; কুমার ভাই, বাড়ী আছ কি?

কুমার বেরিয়ে এল বাড়ীর ভেতর থেকে, হ্যাঁ আছি।

তাড়াতাড়ি আমাকে একটা কুঁজো দাও—সমুদ্রের জলে ঠোঁট ধুয়ে টুনি পাখী খাবো।

আমার কাছে তো এখন আর কোন কুঁজো মজুত নেই। সব বিক্রি হয়ে গেছে। তুমি অল্প মাটি এনে দাও, কুঁজো একটা তৈরী করে দেবো।

মাটির কাছে গিয়ে হাজির হল কাক, আমাকে অল্প মাটি দাও তো।

যত লাগে খুঁড়ে নিয়ে যাও। মাটি বললে।

মাটির কথা শুনে মহিষের কাছে উড়ে গেল দাঁড়কাক, মহিষ ভাই, দয়া করে তোমার শিং যদি আমায় ধার দাও তবে বড় উপকার হয়।

নিজে শিং খোলা আমার সাধ্যের বাইরে। যদি খুলতে পার তবে নিয়ে যাও।

দাঁড়কাক ধরল গিয়ে কুকুরকে, ভাই সারমেয়, দয়া করে যদি মহিষটা আমায় মেরে দাও তবে আজীবন তোমার কেনা হয়ে থাকব।

হঠাৎ একেবারে বিনয়ের অবতার হয়ে উঠলে যে, উদ্দেশ্যটা খুলে বলো তো আগে।

টুনি পাখীর বৃত্তান্ত সমস্তই কুকুরকে খুলে বললো কাক।

ব্যাপারটা তো বেশ মজাদার দেখছি। তবে ভাই আমার একটা বক্তব্য আছে—অনেক দিন থেকে দুধ পান না করাতে আমার আর তেমন আগের মত শক্তি নেই। তুমি আমাকে অল্প দুধ এনে দাও তাহলে মোষের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যেতে পারি।

কাক এবার গিয়ে হাজির হল গরুর কাছে।—গাভীমাতা, আমাকে একটু দুধ দেবে?

তুমি তো কোনদিন দুধ নিতে আস না। কি করবে দুধ দিয়ে?

কাক সমস্ত খুলে বললে গরুকে।

কিন্তু আমার তো বেশ বয়েস হয়ে গেছে। তা ছাড়া পেট ভরে ঘাসও খেতে পাই না। তাই দুধও অনেক কমে গেছে। তুমি আমাকে অল্প ঘাস এনে দাও আগে। তারপর দুধ নিয়ে যেও।

দাঁড়কাক ছুটল ঘাসের কাছে, 'আমাকে কিছু ঘাস দাও ভাই, গরুকে দেবো।'

ঘাস আবার চাইতে হয় নাকি? কেটে নিয়ে যাও যত লাগে।

ঘাসের কথা শুনে কামারবাড়ীর পানে পাখা মেলল কাক। কামারদাদা, বাড়ী আছ কি?

হ্যাঁ ভাই তামাক সাজছিলাম। হুঁকো হাতে কামার বেরিয়ে এল। বল, তোমার কি কাজে লাগতে পারি।

দয়া করে ঘাস কাটার জন্য একটা কাস্তে দাও।

ঘাস আবার কি কাজে লাগবে তোমার? তুমি তো ঘাস খাও না।

কামারকে আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে বলল কাক।

আমাকে একটু আগুন এনে দাও তাড়াতাড়ি—এক্ষুণিই কাস্তে তৈরী করে দিচ্ছি একটা। আমার চুল্লীর আগুন নিভে গেছে। নইলে তোমাকে বলতাম না। তামাক সাজতে সাজতে আগুনের কথাই চিন্তা করছিলাম। যাও তাড়াতাড়ি আগুন নিয়ে এস।

কামার বাড়ী থেকে বেরিয়ে আগুনের সন্ধানে ইতস্তত উড়তে উড়তে নদীর ঐ পাড়ে আগুনের ধোঁয়া দেখল কাক। বেগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখল এক বুড়ী ধানসিদ্ধ করছে।

বুড়ী-মা আমাকে একটু আগুন ভিক্ষা দেবে? কাক বললে।

তুমি তো বড় ভদ্রলোক দেখছি—একটু আগুন নেবে তা বলছ ভিক্ষা দাও—নেবে কেমন করে?

আমার পাখায় বেঁধে দাও। কাক মরীয়া হয়ে বললে।

বুড়ী একটা জ্বলন্ত কাঠ বেঁধে দিল কাকের পাখায়। কাক যাত্রা করল কামারবাড়ীর পানে।

নদীর উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় বাতাস লেগে আগুন হল প্রবল। আর পাখা পুড়ে দাঁড়কাক লাভ করল সলিল সমাধি।

টুনি পাখী লুকিয়ে লুকিয়ে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল কাকের কাণ্ডকারখানা। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যাত্রা করল তার ছোট্ট নীড়ের উদ্দেশ্যে।

এবার আমাকেও ফিরে যেতে হয়। কেন না আমার জামাকাপড় পরিষ্কার করতে পাঠাতে হবে।

ঢেঁকি পাতার কান ফুটল।

আমার গল্প শেষ হল॥

সুপুরি গাছে ফুল ফুটেছে।

(কার) কোথায় যেতে সাধ হয়েছে?

কালো পুষির সাদা কান।

বলো সবে 'রাম' নাম।*

---

* অসমীয়া ভাষায় এ রকম উপকথাকে বলা হয় 'সাধু কথা।' আমরা যেমন বলি 'নটে গাছটি—' সাধুকথার শেষে এ রকম ছড়া বলা হয়।

-হেলেন কেলার-

মেয়েটির মাত্র এক বছর দু'মাস বয়স। ভারী সুন্দর দেখতে---ধবধবে গায়ের রঙ। উজ্জ্বল চোখ। সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ, মাথাভর্তি একরাশ সোনা-ঝরান কোঁকড়া চুল। বাবা-মায়ের আদরের ধন সে---নয়নের মণি সে। নাম হেলেন কেলার, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যের টাসকাম্বিয়ায় ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুন জন্ম। বাবা মিলিটারিতে কাজ করতেন। ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার নাম তাঁর। বেশ স্বচ্ছল পরিবার---দুঃখ-দারিদ্র্যের কোনো চিহ্ন নেই। মস্ত বড় বাড়ি তাদের বাড়ির লাগোয়া একটি ফলফুল শোভিত সুন্দর বাগান। তাতে হেলেন লঘুপাখা প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়ায়।

বিধাতা-পুরুষের তা' সহ্য হলো না। উনিশ মাস বয়সে একপ্রকার সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হলো সে। বাবা-মা শহরের সেরা সেরা চিকিৎসকদের ডাকলেন। তাঁরা মনোযোগ দিয়ে দেখলেন বটে, কিন্তু আসল রোগ কী ধরতে পারলেন না। প্রাণে বাঁচলো বটে মেয়েটি---কিন্তু সে হারালো তার দৃষ্টিশক্তি---আর হয়ে গেলো বধির। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের যে ভাণ্ডার এতদিনে তাকে রূপে, রসে-গন্ধে ভরিয়ে তুলেছিল, তাতে নেমে এলো নিকষ কালো অন্ধকার।

বাবা-মা দুঃখে শোকে ভেঙে পড়লেন। কয়েক মাস কেটে যাবার পর তাঁরা কিছুটা সামলে উঠলেন।

সুধাংশু গুপ্ত

এমন সুন্দর সদ্যফোটা গোলাপ ফুলের মতো তাজা শিশুটিকে বাঁচাতেই হবে---আবার যাতে সে ফিরে পেতে পারে প্রাণ-ঝরনার আনন্দ কলতান। ---সে চেষ্টায় বাবা অস্থির হয়ে পড়লেন। মায়ের প্রাণ ---মেয়েকে দেখলেই বেদনায় চোখের কোণে জল ভরে আসে।

দুপুরে খাওয়া শেষ করে বই পড়ার বাতিক ছিলো তাঁর। একদিন একটি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটি জায়গায় এসে থেমে পড়লেন। তিনি যেন আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত হবার সন্ধান পেলেন! ওতে লেখা ছিলো একটি অন্ধ-বধির নাকি কী এক অভিনব পদ্ধতিতে লেখাপড়া এবং মুখ নেড়ে কথা বলা শিখেছে।

স্বামী ক্যাপ্টেন আর্থার কেলারকে ওই পত্রিকার অংশটুকু দেখালেন। তিনি সুখবরে খুশী হলেন।

খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। শেষে একদিন ক্যাপ্টেন সাহেব অভাবনীয়-ভাবে তা জানতে পারলেন। মিস অ্যানি স্যালিভান নামে একটি মহিলার সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। তাঁরও অসুখে চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, পরে অপারেশনের পর স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন। এ্যানি আর্থার কেলারের কাছ থেকে সব শুনে হেলেনের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন।

তিনি যথাসময়ে শিক্ষকতা করার জন্য ক্যাপ্টেনের বাড়িতে হাজির হলেন। কিন্তু হেলেন কেলার এর মধ্যেই ভারী দুরন্ত হয়ে উঠেছে। বদ-মেজাজি তিরিক্ষি ও জেদি হয়েছে তার স্বভাব। শিক্ষিকা এসেই তাকে ভাল করে দেখে নিলেন। কীভাবে হেলেনকে শিক্ষা দিতে হবে তা ঠিক করে ফেললেন। খেলাচ্ছলে শিক্ষা প্রদানে গোড়াতেই এক কাণ্ড ঘটলো। মিস অ্যানি ছাত্রীর হাতে প্রথমে দিলেন একটি বড় পুতুল ও কেক। হাতে বানান করলেন ঐ দুটি শব্দের। কিন্তু সে তার কিছুই বুঝতে পারলো না। জিনিষ দুটো কী করে নিয়ে পালাবে তাতেই পরম আগ্রহ তার। সে তা নিয়ে---পড়ি-কি-মরি করে দিলো ছুট। কিছুদিন আর শিক্ষিকার কাছে পর্যন্ত এলো না সে।

মিস অ্যানি কিন্তু আশা ছাড়লেন না। আবার নতুন শিক্ষা প্রণালীর কথা ভাবতে লাগলেন।

আর একদিন খাবার টেবিলে দু' জনে খেতে বসেছেন। ছাত্রীটি করলে কী? দুটি প্লেটে দুজনের যে খাবার

হেলেন কেলার

রাখা ছিলো—তা থেকে তাঁর খাবার তুলে মুখ দেবার চেষ্টা করলো। অমনি তিনি শক্তমুষ্টিতে হাত ধরে ফেললেন তার---কিন্তু সে এক হ্যাঁচকা টানে শিক্ষিকার হাত সরিয়ে নিয়ে মেঝের ওপর খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিলো। এ বেয়াদপি সহ্য করলেন না তিনি। তাকে দিয়েই জোর করে মেঝে থেকে খাবার তুলে খাওয়াতে বাধ্য করলেন।

সভ্যতার প্রথম পাঠ এইভাবে শিক্ষা দিলেন তাকে। হেলেন আস্তে আস্তে তার দোষ বুঝতে পারলো এবং শিক্ষিকার কথামতো চলতে লাগলো।

একটু একটু বোধশক্তি জন্মালো। তাঁকে এবার নতুন নতুন শব্দ শেখানো চলতে লাগলো। ওই ভাবে প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন শব্দ আয়ত্ত করে ফেললো সে। যে-হেতু সে চোখে দেখতে পারতো না ---তাই তার হাতের ওপর তা লিখে দেওয়া হতো। দশ বছর বয়স থেকে তার পড়াশোনার ঝোঁক বেজায় বেড়ে গেলো। হেলেন নীতিমত ভাবে অঙ্ক, লাতিন, জার্মান ইংরেজি ভাষা নিয়মিত রুটিন করে পড়তে লাগলো। শিক্ষিকার সঙ্গে মুখ নেড়ে কথা বলার অভ্যাস জন্মালো। অন্ধ বিদ্যালয়ে কিছুদিন লেখাপড়া করে কেম্ব্রিজে চলে এলো। তারপর র‍্যাডক্লিফ কলেজে ভর্তি হলো সে।

একাগ্রতা, অদম্য আগ্রহ এবং গভীর নিষ্ঠা নিয়ে ইতিহাস ও দর্শনের মূল নিয়মগুলো পড়তে লাগলো---শুধু স্পর্শ দ্বারা। চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় অনার্স গ্র্যাজুয়েট হলো হেলেন কেলার।

অন্ধ-বধিরদের জীবনে যে হাসি, কান্না সুখ দুঃখ মমতা ভালবাসা আছে তা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারের জন্য ছুটে বেড়াতে লাগলো হেলেন। কীভাবে শিক্ষা প্রদান করলে তারা তা উপলব্ধি করতে পারে সে সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা আরম্ভ করলো। প্যারিসের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়েছিলো।

অন্ধ-বধিরদের কল্যাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ছুটে বেড়াতে লাগলো হেলেন কেলার। এমন কি তিনি চলচ্চিত্রের যাদুপুরী হলিউড পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন অর্থ জন্য। কিন্তু আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হলো না। তবু তিনি নিরাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকেন নি।

একবার কলকাতা এসে জনসভায় অন্ধ-বধিরদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতায় অনেক নতুন আলোকপাত করেছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় তাঁর প্রথম সাক্ষাৎলাভ ঘটেছিল। স্পর্শ দ্বারা তিনি বিশ্বকবির বিশ্বমানবতার রূপটি অন্তরে অনুভব করতে পেরেছিলেন। ভারতে এসেই প্রথমেই হেলেন কেলার রবীন্দ্রনাথের সাধনপীঠ শান্তিনিকেতন দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনের একটি সুন্দর ছবি তোলা হয়েছিলো তখন। সে ছবি এক জীবন্ত আলেখ্য হয়ে বেঁচে রয়েছে। হেলেন কেলার তাঁর একটি চমৎকার আত্মজীবনী লিখে গেছেন। তাতে অনেক কথা বলেছেন। শিক্ষিকা মিস এ্যানি স্যালিভান—যিনি ছিলেন তাঁর পথনির্দেশিকা ও বন্ধু। তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন এক জায়গায়:

My teacher is near to me that I searcely think of myself apart from her...

অর্থাৎ আমার শিক্ষিকা এতো কাছের যে তঁকে আমি আলাদা করে কল্পনাই করতে পারি না। অন্ধ-বধিরদের আশা ভরসা ও ব্যর্থ জীবনে নতুন হৃৎস্পন্দনের সাড়া জাগিয়ে সাতাশি বছর বয়সে হেলেন কেলার পরলোকগমন করেছেন।

'অন্ধজনে দেহ আলো'র জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয়া এই মহীয়সী মহিলার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

গল্প হলেও সত্যি

পাটনায় 'খুদাবক্স ওরিয়েণ্টাল পাবলিক লাইব্রেরী' নামে একটি লাইব্রেরী আছে। এখানে বই তো আছেই, আর আছে পুরনো দুষ্প্রাপ্য অনেক পুঁথি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর ইতিহাস গ্রন্থ লেখক, এই দু'রকমের লোকই এখানে আসেন এইসব পুঁথি পড়বার জন্যে। অন্যান্য বই পড়বার জন্যেও এখানে পাঠকের সমাগম হয়।

এই লাইব্রেরীতে একজন বাঙালী ভদ্রলোক প্রায় প্রতিদিনই আসেন পুঁথি ইত্যাদি পড়তে। তন্ময় হয়ে তিনি পড়েন। পুঁথি ইত্যাদি থেকে অনেক কথা লিখে নেন নিজের একখানি খাতায়।

ফারসী অর্থাৎ পারস্য দেশের ভাষায় লেখা অনেক পুঁথি আছে এখানে এই সব পুঁথিও তিনি পড়তে পারেন,

সবিতা পাল

কারণ, ফার্সী ভাষাটা তিনি শিখে নিয়েছেন আগেই। জ্ঞানলাভের জন্যে কী প্রবল ঝোঁক ভদ্রলোকের।

নানা বিদ্যার মধ্যে ভারতের ইতিহাসের দিকেই বেশি আগ্রহ তাঁর।

ভদ্রলোকের জন্ম হয় রাজসাহীতে। সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কলকাতায় এসে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং তারপর 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন।

অন্যান্য কলেজে অধ্যাপনা করার পর পাটনা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করছেন বহু বছর ধরে এবং ইতিহাস-পাঠ আর ইতিহাস চর্চায় মশগুল হয়ে আছেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এত পড়ে, এত জেনেও তৃপ্তি পান না তিনি। নিজের রোজগারের অনেক টাকা খরচ করে পুরাতন ফার্সী পুঁথি কিনেছেন

এ ছাড়া, ভারতের ইতিহাসের আরও অনেক কথা জানবার জন্যে দুর্লভ পুঁথির ফটোগ্রাফও মাঝে মাঝে আনান বিলেতের ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে।

এরপর তিনি ভারত ইতিহাসের অনেক বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখেন আর রচনা করেন 'আওরঙ্গজীব', 'শিবাজী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। এগুলি পড়ে দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন তাঁর বিদ্যার পরিমাণ। সুধী সমাজে এটাও ভাল করে জানলেন যে, ভারতের 'মোগল-যুগ'এর ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি যেমন ওয়াকিবহাল তেমন আর কেউই নন।

এই বিখ্যাত ঐতিহাসিকের নামটি তোমরা জেনে রাখো। ইনি হলেন আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়।

-জাপানে দেখানো ম্যাজিক-

জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)

আকাসাকা প্রিন্স-হোটেলে আমার ঘরের ঠিক উল্টোদিকেই একজন বর্মী হাস্যরসিক থাকতেন। জাতীয় টেলিভিশন কোম্পানী 'এন-এইচ-কে'-এর আমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন জাপানে---তাঁর হাস্যরস পরিবেশন করতে। সুনাম এবং সাফল্যের আতিশয্যে সর্বদাই তাঁর মুখে ঝকঝকে হাসি লেগে থাকতো। বেশ ভালো লোক বলে আমার ধারণা হলো।

'এন-এইচ-কে' টেলিভিশনে আমাদের অনুষ্ঠান প্রায়ই লেগে থাকতো। সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সাথে আলাপ জমাতে বেশী দেরী হলো না। কে যেন একজন আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন-- ওনার নাম হচ্ছে---'উ মাউং শেইং'।

আমার হাসি পেল তাঁর নাম শুনে; কারণ---ঐ নামটার মানে আমি জানি এবং তা হচ্ছে---'শ্রীঘণ্টা হীরে'।

যাই হোক---অভিব্যক্তি চাপা দিয়ে কথা শুরু করেছিলাম সেই 'ঘণ্টা হীরে-বাবু'র

উ শেইং-এর সাথে কতো রকম যে কথাবার্তা হলো তা বলা মুশকিল। তবে তাঁর ঐ হাসিমাখা কথাবার্তার মধ্যে একটা জিনিষ ধরা পড়লো---যে তাঁর মনে কোনও একটা চাপা দুঃখ আছে---যার জন্য তিনি অনেক ক্ষেত্রেই নিজেকে খুব ছোট মনে করেন। ব্যাপারটা হচ্ছে---তাঁর স্বাস্থ্য, মানে তিনি এত রোগা যে অনেক সময়ে শুধু সমবয়সী নয়, অল্পবয়সীর কাছেও লজ্জিত বোধ করেন।

কথায় কথায় তাঁর জবাবেই আমি একথার বলে ফেলি---'স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিলেই তো স্বাস্থ্য ভালো হয়---এতে অসুবিধাটা কি।'

'অনেক চেষ্টা করেছি মশাই---কিস্যুতেই কিস্যু হয় নি'---জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন তিনি।

বুঝলাম এ ব্যাপারে ভদ্রলোকের মনের জোর একদম ভেঙ্গে গেছে। কথা ঘুরিয়ে অন্য কথা শুরু করতে যাবো---এমন সময়ে হঠাৎ হোঃ হোঃ করে চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন---'আরে আমার চিন্তা কি, আমার ম্যাজিসিয়ান বন্ধু আপনিই তো রয়েছেন---হ্যাঁ করে দিন না আমায়। এমন শক্তি করে দিন আমার গায়ে যাতে নাকি আমি ঐ মোটা ম্যানেজারকে কাহিল করে দিতে পারি।'

বলা বাহুল্য উ শেইং-এর ম্যানেজার মশাই অসম্ভবরকম মোটা এবং দৈত্যাকৃতির। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথপোকথন শুনছিলেন।

আমি ব্যাপারটা সহজ করবার জন্য বলি---'আপনার জন্যে কোনও ম্যাজিকের প্রয়োজন নেই---আপনার এই শরীরেই যা ক্ষমতা আছে তা দিয়ে এই ম্যানেজার মশাইকে নাজেহাল করে দেওয়া যায়।'

'আহা বলেন কি বলেন কি
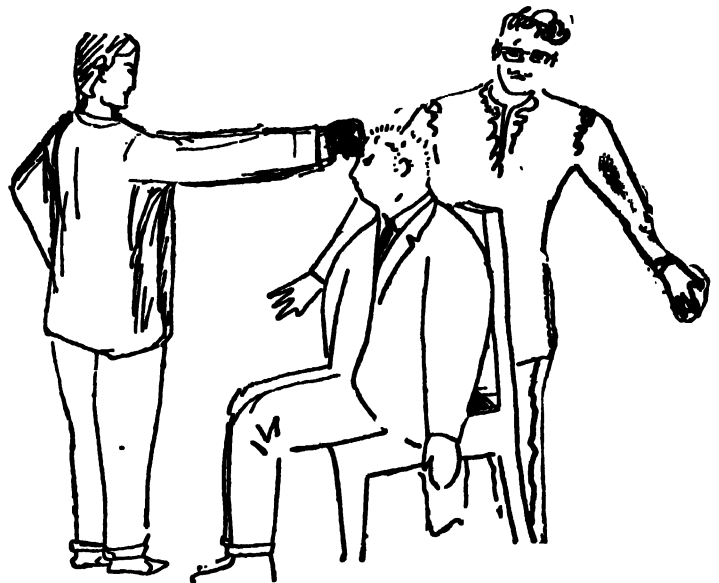
এক্ষুণি আমাকে ডালগোল পাকিয়ে বাইরে ফেলে দেবে—ওর গায়ে দারুণ জোর'---বলতে বলতে উ শেইং প্রায় দৌড়িয়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

আমি থামাই তাঁকে—আর তারপর ম্যানেজার মশাইকে বলি---'আচ্ছা আপনি বসুন তো ঐ চেয়ারে, হাত দুটো ঝুলিয়ে দিন---আর তারপর পরীক্ষা করে দেখছি'---আপনার গায়ে জোর বেশী না উ শেইং-এর গায়ে জোর বেশী।

অমায়িকভাবে ম্যানেজার মশাই একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। এবারে আমি তাঁকে বললাম---'আচ্ছা এবার উঠুন—দাঁড়ান দেখি তারপর আবার বসুন।'

ভদ্রলোক অম্লানবদনে আমার আদেশ মেনে গেলেন।

এবার আমি উ শেইংকে বললাম—'আপনি আপনার মাত্র একটা আঙুল দিয়ে ওনার সমস্ত শক্তিকে হারিয়ে দিতে পারেন।'

আস্তে করে ঢোক গিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন---'কী ভাবে?'

আমি মিঃ উ শেইং-এর বুড়ো আঙ্গুল নিয়ে ম্যানেজার মশাই-এর কপালে ছুঁইয়ে দিয়ে বললাম---'একটু চাপ দিন',

উ শেইং চাপ দিলেন---আর একই সাথে ম্যানেজারকে বললাম---'আপনি উঠে দাঁড়ান।'

উ শেইং ম্যানেজার মশাই-এর কপালে আঙ্গুলের চাপ দিচ্ছেন আর ম্যানেজার মশাই উঠবার চেষ্টা করছেন। কী আশ্চর্য ঐ বিশাল বপু ম্যানেজার মশাই মোটেই উঠতে পারলেন না। ঠাণ্ডাঘরে বসে থরথর করে শুধু ঘামতে লাগলেন।

'কী করে পারলাম'---অবাক চোখে জিজ্ঞেস করলেন উ শেইং।

আমিও বুঝিয়ে দিলাম তাঁকে ব্যাপারটা। আসলে এতে মোটেই ম্যাজিক নেই। যখন কোনও মানুষ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তখন তার ভারকেন্দ্র বা সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি থাকে পেছনমুখী। তারপর যখন সে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তখন সেই ভারকেন্দ্রকে সামনের দিকে আনতে হয়। সুতরাং কোনও ভাবে যদি আমরা মাথা এগুতে না দিই তাহলে হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে মোটেই উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে—মাত্র একটা আঙ্গুলের চাপে মাথা এগুনো বন্ধ করে দেওয়া যায়, ওতে বিশেষ কোনও শক্তির প্রয়োজন হয় না। কপালে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে শুধু একটু ঠেলে রাখলেই হলো।

উ শেইং খুসী হয়েছিলেন সেদিন—খেলাটা দেখিয়ে এবং শিখে। তোমরা এটা তোমাদের বন্ধুমহলে দেখাতে পারো, দেখবে তারা কেমন অবাক হয়ে গেছে।

তারকেশ্বরে স্থাপিত নেতাজীর মর্মর মূর্তি—শিল্পী : শ্রীমদ্ভি পাল

॥ সম্পূর্ণ উপন্যাস ॥

থিওডর ডস্টয়েভস্কি
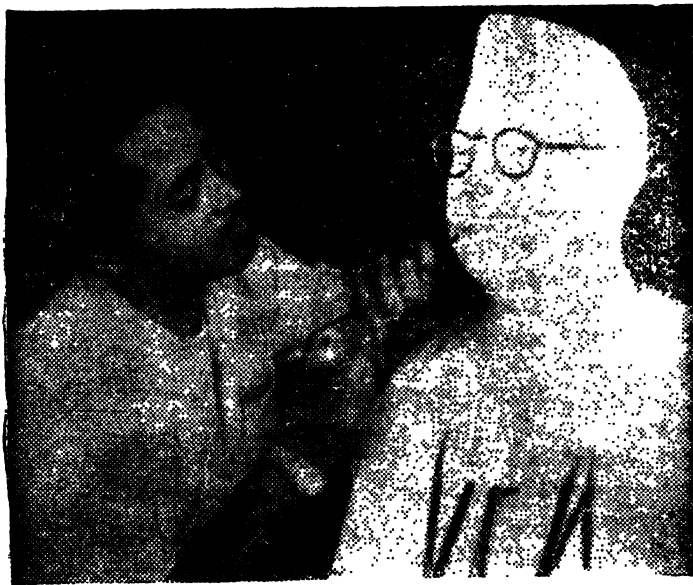
অতি মনোরম রাত, আর এমন রাত শুধু তরুণ-তরুণীদের জন্যই। অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত আকাশ—অতি উজ্জ্বল, নির্মল। সেদিকে চেয়ে মনে হল, এমন সুন্দর আকাশের নীচে থেকে লোক কখন বদমেজাজী আর অস্থির চিত্ত হতে পারে না। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে ঘুম ভাঙল, কিন্তু প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো মনকে প্রফুল্ল করে তুলতে পারল না। কেমন একটা অবসাদে মনটা ছেয়ে আছে। কিছুতেই তাকে সরস করে তুলতে পারলাম না। একসময় হঠাৎ মনে হল বিশ্বশুদ্ধ লোক যেন আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। অবশ্য এরকম ভাবনার কোন কারণ নেই, যেহেতু আজ আট বছর ধরে আমি পিটসবার্গে আছি, এখানে আমার কেউ অন্তরঙ্গ নেই যার কাছ থেকে অবহেলা পেতে পারি। তবু মনে হল কে যেন নেই। কাকে যেন হারিয়েছি। মনের এই নিঃসঙ্গ অবস্থা আতঙ্কের সৃষ্টি করল। তিনদিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। না একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম না।

অবশ্য আমি এখানে বিদেশী, আমাকে কেউ ভাল করে চেনে না। কিন্তু আমি রাস্তায় প্রত্যেকটি লোকের গতিবিধি লক্ষ করি, এবং প্রত্যেকটি মুখ আমার পরিচিত, মনে হয় আমি যেন পিটসবার্গের সবাইকে চিনি। মনের এই অস্বস্তিকর অবস্থা, অথচ তার কারণ কি খুঁজে পাচ্ছি না। দু রাত ধরে অনেক ভাবলাম, নিশ্চয় আমার ঘর দুয়ার সব অগোছাল হয়ে আছে তাই মনে এই অস্বস্তি—কারণ আমার ঘর যদি অগোছাল হয়ে থাকে ড্রইংরুমে চেয়ারগুলি এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকে তবে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি আমার ঘরের ছাদ আর বিবর্ণ সবুজ রং-এর দেয়ালটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম, সেগুলো মাকড়সার জালে ভর্তি। বালিকা ঝি মেরী সেগুলোকে সযত্নে পুষে রেখেছে। অবশ্য ঘরের চেয়ার-গুলো যথাস্থানেই আছে, এবং দরজা জানালার পর্দাগুলিও ঠিকভাবেই ঝুলছে। মেরীকে ডেকে বললাম, কিরে, কাজ ঠিকমত করছিস না কেন? দেয়ালে এত মাকড়সার জাল ঝুলছে কেন?

মেরী কিছুক্ষণ আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল। আর মাকড়সার জালগুলো যেমনি ছিল তেমনি হাওয়ায় দুলতে লাগল। হাঠৎ যেন মনটা হাল্কা হয়ে গেল। ভাবলাম, এই তো মনের অস্বস্তিকর অবস্থার কারণ খুঁজে পেয়েছি।

হাল্কা মনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম অনির্দিষ্টভাবে চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম যে কখন আমি সহর ছাড়িয়ে টোল গেটের কাছে এসে গেছি। আমি রাস্তা দিয়ে নেমে শস্যক্ষেতের ও লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। মনে হল আমি যেন ইটালীতেই আছি। মনের বোঝা হাল্কা হয়ে গেল। আমি যখন সহরে ফিরে আমার বাড়ির রাস্তা [illegible] তখন বেশ রাত হয়ে গেছে, ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। একটা ক্যানেলের পাশ দিয়ে চললাম, রাস্তায় একটাও ভাল প্রাণী দেখতে পেলাম না; অবশ্য আমার বাড়ি সহর ছাড়িয়ে অনেকদূরে। আমি গুন্‌গুন্ করে গান গেয়ে চললাম, এটা আমার অভ্যেস। একজন হাসিখুসী লোকের যদি কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু বা ভাল সমাজ না থাকে তবে সে তার মনের খুসী গানের ভিতর দিয়েই প্রকাশ করে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত এডভেঞ্চারে জড়িত হয়ে পড়লাম।

একটু দূরে ক্যানেলের রেলিং ধরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথা রেলিং-এর উপর ন্যস্ত, বোধহয় ঝুঁকে সে ক্যানেলের মাটি-গোলা জল দেখছে। তার মাথায় ফিকে হলদে রং-এর সুদৃশ্য টুপী

এবং গায়ে কালো রং-এর মনোরম ক্লোক। মনে হল মহিলাটি তরুণী।

আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে তরুণীটির পাশ দিয়ে চললাম, কিন্তু সে একেবারও মুখ ফিরিয়ে দেখল না। মনে হল আমার পদশব্দ সে শুনতে পায় নি, নিবিষ্ট মনে সে কিছু ভাবছে। কিন্তু কিছুদূর না যেতেই একটা অস্পষ্ট কান্নার শব্দ ভেসে এল। দেখতে পেলাম তরুণীটি ফুলে ফুলে কাঁদছে। হতভম্ব হয়ে ভাবলাম, কি করা যায়।

আবার কান খাড়া করে শুনলাম, সত্যই মেয়েটি অস্ফুটস্বরে কাঁদছে। তার প্রতি সমবেদনায় আমার মন ভরে গেল। যদিও মেয়েদের সংগে কথা বলতে গিয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে যাই লজ্জায়, তবু মনে হল এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং ভাবতে লাগলাম কি বলে কথা আরম্ভ করব।

কিন্তু তার আগেই মেয়েটি নিজেকে সামলে নিল, একনজরে আমাকে দেখেই নত মুখে ক্যানেলের উপর পুল পার হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। আমার আর ঐ রাস্তায় যাবার সাহস হল না, বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল।

সান্ধ্য পোষাকে সজ্জিত এক ভদ্রলোককে দেখা গেল, সে রাস্তার অপর দিক দিয়ে আসছিল। সে মাতালের মত টলতে টলতে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে চলছিল। মেয়েটি সোজা তীরের মত যাচ্ছিল। যখন তাদের সাহায্য করবার সংগী থাকে না তখন তারা এদিক ওদিক না চেয়ে সোজা হন হন করে চলে যায়। এবার সে ভদ্রলোকটি হঠাৎ গতি ফিরিয়ে মেয়েটির পিছু নিল, আর সে মেয়েটি তা দেখে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কিন্তু লোকটি ততক্ষণে প্রায় তার নিকটে পৌঁছে গেছে। মেয়েটি ভয়ে চীৎকার করে উঠল। আমার আড়ষ্টভাব কেটে গেল, ডান-হাতে আমার লাঠিখানা বাগিয়ে নিয়ে নিমেষে আমি মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার হাতের লাঠিখানা দেখে লোকটি সরে পড়ল। দূরে গিয়ে অসভ্য ভাষায় আমার কাজের সমালোচনা করতে করতে চলে গেল।

আমি মেয়েটিকে বললাম, ভয় পাবেন না, আমার হাত ধরুন, লোকটা আর আপনার পিছু নিতে সাহস পাবে না। মেয়েটি নীরবে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল, ভীতা কপোতীর মত তার হাতটা থরথর করে ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপছিল, আমি আড়চোখে তার দিকে চেয়ে দেখলাম, মেয়েটি তরুণী আর দস্তুরমত সুন্দরী। তার কালো চোখের পাতায় তখনো কান্নার জল লেগে আছে। মেয়েটিও আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু লজ্জিত ভাবে চোখ নীচে করল, মনে হল তার ঠোঁটে যেন একটু হাসির রেখা দেখা দিয়েছে।

বললাম, আপনি তখন আমাকে দেখে কোন কথা না বলে চট করে চলে গেলেন। কিন্তু আমি যদি সংগে থাকতাম তবে এই ঘটনাটা ঘটত না।

কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনিনে, তাই প্রথমে আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল যে আপনিও.........

কিন্তু এখন কি করে ভাবলেন যে আমি ঐ দলের নয়?

পরিপূর্ণভাবে আমার দিকে চেয়ে তরুণী বললে, আপনার চোখের দৃষ্টি দেখে। আর আপনি যখন আমার হাত ধরেছিলেন তখন আপনার হাত কাঁপছিল, তাতে মনে হল যে আপনি ওদের চেয়ে ভিন্ন।

মনে আত্মপ্রসাদ এল। বললাম, ঠিকই বলেছেন। সত্যি—আমার ও ভয় করছিল, কারণ মেয়েদের ব্যাপারে আমি বড় লাজুক, আমি আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের সংগে একাকী কথা বলায় অভ্যস্ত নই, কি বলতে কি বলে ফেলি কে জানে।

তরুণী অবাক হয়ে বললে, সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। এই দেখুন না আমার হাত এখনও কাঁপছে, আপনার সুন্দর ছোট হাত-খানা ধরা ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কারো হাত ধরি নি। কি করে মেয়েদের সংগে সুন্দর ভাবে কথা বলতে হয় তা মোটেই জানিনে। যদি অনভ্যাসের বশে কোন অশোভনভাবে কথা বলে থাকি তবে মাপ করবেন।

তরুণীটি বললে। জানেন মেয়েরা আপনার মত এ ধরণের লাজুক লোককেই বেশি পছন্দ করে। চলুন আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন।

আমি লাজুক, লাজুকভাবে খুশী মনে মেয়েটিকে নিয়ে অগ্রসর হলাম। মেয়েটি একটু আশ্চর্যভাবে বললে, এ কিন্তু অবাক কান্ড, আপনি এতখানি বয়সে মেয়েদের সংগে একেবারে মেলামেশা করেন নি। আচ্ছা আপনি কি করেন সারাদিন, কোথায় থাকেন?

আমি অপ্রতিভভাবে বললাম। দেখুন আমি দশজনের মত নই। ধরুন, আমি এক ভবঘুরে, শুধু স্বপ্ন দেখে বেড়াই, স্বপ্নে কাব্য রচনা করি, স্বপ্নে প্রেমের জগতে আনাগোনা করি।

মেয়েটি একটু নীরব থেকে বললে, আচ্ছা এতরাত্রে আমাকে এমন নির্জনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে আমিও হয়ত বাজে মেয়েলোকের দলে...........। আচ্ছা কি কারণে আপনি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন?

আমি অপ্রতিভ হয়ে গেলাম, যেন ধরা পড়েছি। ধীরে ধীরে বললাম, তা নয়, তা নয়, এতরাত্রে একজন তরুণীকে রাস্তায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি ভেবেছিলাম, এই আমার কর্তব্য তাকে কোন বিষয়ে সাহায্য করা। তাছাড়া আমি এখানে নবাগত। আজ আমার মনটা খুব খুসী ছিল, আমি আপনমনে গান গেয়ে বেড়াতে বেড়াতে চলছিলাম। হঠাৎ আপনাকে দেখলাম, আপনার পাশ দিয়ে চলে কিছু দূরে গিয়ে আপনার কান্না শুনে আমি বিচলিত হলাম। আর তারপরই ঐ গুন্ডাটাকে দেখে আমি ছুটে এলাম সাহায্য করতে। ভাই যেমন বোনকে রক্ষা করে এছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েটি কৃতজ্ঞতায় আমার হাত ধরে মাথা নোয়াল তারপর বললে—আমার এই ধরণের প্রশ্ন করাটা অন্যায় হয়েছে, তবে বুঝতে পেরেছি যে আমি ভুল করিনি লোক চিনতে। ঐ সামনের গলিতেই অ[illegible] দু পা গেলেই আমার বাড়ি, আচ্ছা [illegible] অনেক ধন্যবাদ, চলি।

আমি অধীরভাবে বললাম, আর কি আমাদের দেখা হবে না, এটাই কি শেষ দেখা?

মেয়েটি হেসে বললে, প্রথমে বলেছিলেন দুচারটে কথা বলবেন, এখন দেখছি বেশ কথা বলতে পারেন। যাহোক, দেখা নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারলাম না।

বললাম, কাল সকালে এখানে আসব। আমি দুঃখিত, আপনার উপর দাবী-দাওয়া রাখছি বলে।

হ্যাঁ, আপনি কিন্তু বড় অধৈর্য কিছু দাবী তো করছেনই।

শুনুন, আমার কথা শুনুন। সত্যি আমি নিজেকে সামলাতে পারছিনে। আমি কাল এখানে আসবই, আমি একজন ভাবুক স্বপ্নালু। আমার বাস্তব জীবনের সংগে পরিচয় নেই। এই কটি মুহূর্তকে মনে হয় যেন স্বপ্নে দেখেছি। আমি সারারাত আপনাকে স্বপ্নে দেখব। সারা সপ্তাহ। সারা বছর। আমি কাল ঠিক এই সময়ে এখানে হাজির হব, এবং গতকাল কি ঘটেছিল সেটার স্মৃতিতে বিভোর হয়ে থাকব। এই স্থানটি আমার অতি প্রিয়।

তরুণী বললে, মনে হচ্ছে কাল রাতে ঠিক দশটায় আমিও এখানে হাজির হব। আর মনে হচ্ছে আপনার এখানে আসাও বন্ধ করতে পারব না। কিন্তু অনুগ্রহ করে ভাববেন না যে আমি আপনাকে এসময়ে দেখা করবার জন্য আসতে অনুরোধ করছি। দেখুন নিজের কাজে আমাকে এখানে আসতেই হবে। আজ যেমন এসেছিলাম। সরলভাবেই বলছি, আপনি এখানে এলে কিছু মনে করব না। হয়ত আমার আজের মত আবার কিছু অশোভন ঘটনা ঘটতে পারে। তবু আমাকে আসতেই হবে। দেখুন আপনিও

একটা সর্তে।

পুলকিত হয়ে বললাম, রাজী, সর্তবদ্ধ হলাম, কি করতে হবে বলুন।

তরুণী মৃদুহেসে সপ্রতিভভাবে বললে, আপনি আমাকে প্রেম নিবেদন কর্তে পারবেন না, সে অসম্ভব। শুধু মনে রাখবেন যে আমি আপনার নিকটতম বন্ধু, এর বেশি কিছু নয়।

তার হাত ধরে একরকম চেঁচিয়েই বললাম, ভয় পাবেন না একটুও প্রেমের কথা বলব না।

মেয়েটি অপ্রস্তুতভাবে বললে, না, না আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে না, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। আমার উপর বিরক্ত হবেন না, আপনি যদি জানতেন...... দেখুন আমার এমন কেউ নেই যে মনের কথা খুলে বলতে পারি, আমি একটা গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই, শুধু রাস্তায় কয়েক মিনিটের দেখা পরিচিত লোকের কাছে উপদেশ চাওয়া বোকামী, কিন্তু আমার মন বলছে আপনি সে ধরণের লোক নন, মনে হচ্ছে যেন আপনার সংগে বিশ বছরের পরিচয়। আশা করি আমাকে হতাশ করবেন না।

হ্যাঁ, আপনি আমার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারেন, কিন্তু শুধু ভাবছি, এই চব্বিশ ঘন্টা কি করে কাটাব! আচ্ছা বিদায়, রাত্রে সুনিদ্রা হোক। আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হল, আপনার কাছ থেকে ভাই-এর মতই স্নেহ উপদেশ পাব। আচ্ছা কাল এ সময়ে নিশ্চই আসবেন। আজ নয়, কাল আপনাকে আমার কাহিনী সত্যি খুলে বলব।

সে চলে গেল, আর আমি আনন্দে ভরপুর হৃদয়ে আমার আস্তানায় ফিরে চললাম।

পরের রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সেখানে পৌঁছলাম। ঠিক সময়ে কাল রাতের তরুণী এসে হাজির হল, আমাকে দেখেই একগাল হেসে হাত ধরে বললে, যাক আপনি তা হলে আসতে পেরেছেন।

আমি এখানে দু ঘন্টা ধরে বসে আছি, জানেন সারাটা দিন আমার কিভাবে কেটেছে?

হ্যাঁ, তা আমি জানি, আমি জানি, আপনি কি জানেন কেন আমি এসেছি? কালের মত আজে-বাজে কথা নয়, আজ অতি জরুরী কথা আছে। দেখুন সারাদিন আপনার কথা ভেবেছি, নিজেকে একটা বোকা মেয়ে মনে হয়েছে, আমি আপনাকে চিনিনে, আপনার পরিচয়ও জানিনে, অথচ অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে বিশ্বাস করে বসলাম। আসুন আমরা এখানে বসি আর প্রথমে আপনার কথা শুনি।

আমার তো কোন কাহিনী নেই।

সে আমি বিশ্বাস করিনে, আপনার এতখানি বয়স হয়েছে আর কোন মেয়ের সংগে আপনার বন্ধুত্ব নেই?

আমি তো প্রায় সব ধরণের লোকের সংগেই মিশেছি, কিন্তু তা বলে আমার কোন বান্ধবী নেই।

কিন্তু কেন? কেন আপনার মেয়েদের সম্বন্ধে এত ঔদাসীন্য? ও আচ্ছা, দাঁড়ান আমি বুঝতে পেরেছি, খুব সম্ভব আমার ঠাকুরমার মত আপনারও ঠাকুরমা আছে। আমার ঠাকুরমা অন্ধ। আর সেজন্য আমাকে একা কখনও বাইরে যেতে দেয় না। আমি লোকের সংগে কিভাবে কথা বলতে হয় তা একরকম ভুলেই যাচ্ছি। দুবছর আগে আমি একবার অবাধ্য হয়েছিলাম তাই ঠাকুরমা কি করলেন জানেন, তাঁর গাউনের সংগে আমার গাউন সেফটিপিন দিয়ে গেঁথে রাখলেন, যাতে একা আমি কোথাও যেতে না পারি। তার ফলে দিনের পর দিন দুজনে একই পিনে আটক হয়ে আছি। ঠাকুরমা যদিও চোখে দেখতে পায় না, তবু অভ্যাসবশে মোজা বোনে আর আমি তার পাশে বসে হয় বই পড়ি, নয়ত সেলাই করি।

হায় ভগবান, আপনার দুর্ভাগ্য বলতে হবে। না, না, আমার অমন ঠাকুরমা বা দিদিমা কেউ নেই।

তবে কেন আপনি একা-একা ঘরে সারাদিন বসে থাকেন?

আচ্ছা, আপনি কি জানতে চান আমি কে?

নিশ্চয়, সত্যি করে বলুন আপনি কে, কি পেশা।

আচ্ছা সত্যি পরিচয় দিচ্ছি, আমি একটা চরিত্রবিশেষ।

চরিত্র, কি ধরণের চরিত্র—বলে মেয়েটি হেসে কুটিকুটি। মনে হল বহুদিন যেন সে এভাবে হাসে নাই।

আমি বলতে বাধ্য আপনি একটি মজার লোক। চলুন ঐ পাথরটায় বসি, আপনি নির্ভয়ে আপনার কাহিনী বলে ফেলুন। এদিক দিয়ে কেউ যাবে না, আপনার কথা শুনতেও পাবে না। আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে কোনকালে আপনার একটিও বান্ধবী ছিল না, এ শুধু আমাকে ভোলাবার জন্য বলছেন।

মেয়েটির সরলতা আর হাসি দেখে আমারও খুব হাসি পেল। বললাম, আচ্ছা শুনুন তবে। আমি হলাম এক স্বপ্নরাজ্যের মানুষ, সেটা কি জানেন তো?

বাঃ, স্বপ্নরাজ্য কি জানব না কেন? আমিও তো ঠাকুরমার পাশে বসে বসে কত স্বপ্ন দেখি, কল্পনার মন কোথায় উধাও হয়ে চলে কোন স্বপ্নরাজ্যেরই দিকে [illegible]।

বাঃ! বেশ সুন্দর কল্পনা তো। আচ্ছা আপনার নামটি কি এখনও জানতে পারলাম না।

আমার নাম নাসতেঙ্কা।

শুধু নাসতেঙ্কা?

হ্যাঁ সবাই আমাকে নাসতেঙ্কা নামেই ডাকে।

নাসতেঙ্কা, নাসতেঙ্কা, কি মিষ্টি নাম নাসতেঙ্কা, বলে আমি মুগ্ধ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে নাসতেঙ্কা সচকিত হয়ে বললে, দেখুন আর তো সময় নষ্ট করা চলে না, আমি যেজন্য এসেছি তার কথাই বলব এখন।—আপনার নিকট থেকে নিশ্চই ভাই-এর মত অকৃত্রিম পরামর্শ পাব।

নাসতেংকা বলতে শুরু করল—শৈশবেই আমার মা-বাপকে হারিয়েছি, ঠাকুরমাই আমাকে মানুষ করে তুলেছেন। এককালে তাঁর অবস্থা ভালই ছিল, কারণ তাঁর চালচলন এবং আক্ষেপ থেকে তা বুঝতে পারি। যখন বড় হলাম তখন ঠাকুরমা তাঁর পোষাকের সংগে আমার পোষাক আটকে রাখতেন আর বলতেন, যদি আমার অবাধ্য না হও তবে তোমাকে খাওয়া-পরার জন্য ভাবতে হবে না, আমার যা আছে তোমাকেই দিয়ে যাব।

প্রথম প্রথম পিন গেঁথে সারাদিন ঠাকুরমার সংগে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। একদিন আমাদের ঝিকে আমার জায়গায় বসিয়ে আমি বেড়াতে চলে গেলাম, ভাবলাম ঠাকুরমা বুঝতে পারবেন না। ঠাকুরমা ইজিচেয়ারে ঘুমাচ্ছিলেন। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন আমার কাছে কি একটা জিনিস চাইলেন। আমার ঝি কানে খুব কম শোনে, তাই ঠাকুরমা কি চান বুঝতে পারল না। সে হতভম্ব হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুরমা জিনিস না পেয়ে যেই আমাকে ধমকে উঠলেন অমনি ভয়ে ঝি সেফটিপিন খুলে ভোঁ দৌড় লাগাল।

একথা বলে নাসতেঙ্কা খুব হাসতে লাগল, আমিও হাসিতে যোগ দিলাম। নাসতেঙ্কা বললে, না, না, হাসবেন না, আমি হেসেছি কি মজা হয়েছিল সেটা ভেবে। কিন্তু সত্যি আমি ঠাকুরমাকে ভালবাসি। আমি অনাথ, তিনিই তো আমাকে কত যত্নে মানুষ করেছেন। সেই থেকে তাঁকে ছেড়ে আমি বাইরে কোথাও বেড়াতে যাইনে।

বলতে ভুলে গেছি যে আমরা আমাদের নিজের বাড়ি—মানে ঠাকুরমার বাড়িতে থাকি। এটা একটা ছোট কাঠের বাড়ি, মোটে তিনটে জানালা আছে, আর বাড়িটা ঠাকুরমার মতই বুড়ো। উপরে একটা ছোট ঘর আছে, সেটা ঠাকুরমা ভাড়া দিয়েছেন।

ভাড়াটে নিশ্চই বুড়ো ছিল?

[illegible] ভাড়াটে ছিল এক [illegible] করছিস, মরে যা না, এতে আমার কান্না বুড়ো, কানে শুনত না, চোখে দেখত না, চলতেও পারত না, একেবারে পঙ্গু. কিছুদিন পর সে মারা গেল। কাজেই আর এক ভাড়াটে বসাতে হল। এবার এল এক তরুণ, পিটসবার্গে তার কিসের ব্যবসা আছে। আমাদের বাড়িভাড়া আর ঠাকুরমার পেন্সন দিয়েই খরচ চলত। কাজেই নতুন ভাড়াটে দর কষাকষি না করায় ঠাকুরমা উপরের চিলকোঠাটা তাকেই ভাড়া দিলেন। কিন্তু কি রকম ভাড়াটে বুঝতে না পেরে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে নাসতেঙ্কা, ভাড়াটের কেমন বয়স?

আমি মিথ্যে বলতে পারলাম না। বললাম, একেবারে তরুণও নয় আবার বুড়োও নয়।

দেখতে কেমন?

বললাম, চেহারা ভালই।

ঠাকুরমা উত্তর শুনে ভড়কে গেল। বললে, না, এটা তো ভাল হল না। দেখ নাসতেঙ্কা একটা কথা বলি বাছা, তুই যেন এর ফাঁদে পড়িস না। যা-ও এক ভাড়াটে এল তাও আবার দেখতে সুন্দর। আমাদের আগের দিনগুলো ছিল কত শান্তির, বুড়ো ভাড়াটে ছিল। আর এখন কি বিপদেই না পড়লাম, অথচ ভাড়া না দিয়েও উপায় নেই।

আমি নিশ্চুপে ঠাকুরমার পাশে বসে মোজা বুনতে লাগলাম। আর ভাবলাম ঠাকুরমার কি হয়েছে কে ভাড়াটে এল সুন্দর না কুৎসিত, তা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি আছে? মোজার ঘর গুণতে গুণতে এসব চিন্তা এসে সব ভুল করে দিতে লাগল।

এক সকালে আমাদের ভাড়াটে তার মালপত্র নিয়ে এল, সে নিচে নেমে বললে, তার ঘরের দেওয়ালে যে কাগজ লাগাবার কথা ছিল সেটার কি হল।

ঠাকুরমা তার সংগে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে আমাকে বললেন, আমার শোবার ঘর থেকে হিসেব বইটা নিয়ে আয় তো।

আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। কেন জানিনে আমার মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল, আমি ভুলে গেলাম যে ঠাকুরমার গাউনের সংগে আমার গাউনে পিনে গাঁথা। ভাড়াটেকে না দেখিয়ে পিনটা খুলে নেবার কথা মনেই এল না। এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম যে আমার টানে ঠাকুরমার ইজিচেয়ারও সরে এল। আর যখন দেখলাম যে আমাদের ভাড়াটে তা লক্ষ্য করেছেন। তখন মরমে মরে গেলাম, আমার পা দুটো যেন মেজে আঁকড়ে রইল। আমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। লজ্জায় দুঃখে আমি কাঁদতে লাগলাম, মনে হল এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হল না কেন।

ঠাকুরমা চেঁচিয়ে বললেন, ওখানে দাঁড়িয়ে আরো বেড়ে গেল। আমাদের ভাড়াটে বুঝতে পারলেন তাঁর সামনে এই ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও অপমানিত হয়েছি, তাই তিনি নিঃশব্দে উপরে চলে গেলেন।

এরপর থেকে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেই মনে হত ঐ বুঝি তিনি আসছেন, তাড়াতাড়ি আমার পিন খুলে ফেলতাম। কিন্তু তিনি আর নিচে এলেন না। দু সপ্তাহ পরে তিনি ঝি'র মুখে ঠাকুরমাকে খবর পাঠালেন যে তাঁর কাছে খুব ভাল ভাল ফ্রেঞ্চ বই আছে। তিনি জানেন যে ঐ বইগুলি পড়লে সত্যি আমরা খুসি হব। ঠাকুরমা অনুমতি দিলে তিনি বইগুলো পাঠাতে পারেন. আমি পড়ে শোনাতে পারব, আর আমার দিনগুলিও ভাল কাটবে।

ঠাকুরমা ঝি'র মারফত ধন্যবাদ জানিয়ে বইগুলি আনালেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বইগুলি কি ভাল রে? বই যদি ভাল না হয় তবে তোকে সেগুলো পড়তে দেব না. এসব বাজে বই পড়ে মাথায় খারাপ ধারণা জন্মে।

কি খারাপ ধারণা জন্মে ঠাকুরমা, কি ধরণের বই ওগুলো?

এই ধর, যেমন হাল্কা গল্প উপন্যাস, তাতে লেখক দেখায় যে অল্পবয়সী মেয়েরা কেমন দুষ্ট লোকের ফাঁদে পড়ে। ওরা তরুণীদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিপথে নেয়, বলে তোমাকে বিয়ে করব। তারপর মেয়েটি তার প্রেমে পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে পালায়। আর শেষ পর্যন্ত সেই লোফার লোকটা মেয়েটিকে ত্যাগ করে যায়, তার সর্বনাশ হয়। লেখক এমন সুন্দরভাবে এসবের বিবরণ দেন যে, আগে আমি তন্ময় হয়ে রাতের পর রাত এসব গল্প উপন্যাস পড়েছি। কাজেই মনে রেখ ওসব কদর্য বই পড়ো না। বইগুলোর নাম কি রে?

ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস, ঠাকুরমা।

তুমি ঠিক জান ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস? নাসতেঙ্কা, কোনরকম ষড়যন্ত্র নেই তো, ভাল করে দেখ বই-এর ভিতর কোন প্রেমপত্র আছে কি না।

বললাম, কই. কোন চিঠিপত্র তো দেখতে পাচ্ছিনে।

নাসতেঙ্কা ভাল করে খুঁজে দেখ—দেখ বই-এর মলাটের ভিতর হয়ত লুকানো চিঠি

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে তারা চোখের আড়াল হয়ে গেল

আছে। তুই তো জানিস নে, ভাল মেয়েদের এইসব বদমাশরা কিভাবে সর্বনাশ করে।

না ঠাকুরমা, মলাটের ভিতরও কোন চিঠি নেই।

আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে। এখন বই পড়ে আমাকে শোনা।

ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস ঠাকুরমাকে পড়ে শোনাতে লাগলাম এবং একমাসের মধ্যেই প্রায় তাঁর অধিকাংশ বই পড়া শেষ করলাম। এরপর তিনি পুস্কিনের বই পাঠালেন। ভাবলাম এরপর তাঁর বইগুলো শেষ হলে আমি কি করব।

একদিন হঠাৎ আমার ভাড়াটের সংগে দেখা হয়ে গেল। ঠাকুরমা আমাকে একটা কি জিনিষ আনতে বললেন আর সেটা আনতে গিয়ে সিঁড়িতে তাঁর সংগে দেখা। লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠল, উনিও লজ্জিত হলেন, একটু মৃদু হেসে বললেন, সুপ্রভাত, আপনার বইগুলো কেমন লাগছে, কার বই বেশি ভাল লাগে?

বললাম, আইভান হোব লেখক আর পুস্কিনই বেশি ভাল লাগে।

সেদিন আলাপ এই পর্যন্তই। সপ্তাহখানেক পর আবার একদিন তাঁর সংগে সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল। সেদিন কিন্তু ঠাকুরমা পাঠান নি, আমি নিজের কাজেই উপরে যাচ্ছিলাম তখন প্রায় বেলা দুটো, আর মাঝে মাঝে ভাড়াটে এসময় বাড়ি ফেরেন। তিনি আর আমি দুজনে নমস্কার বিনিময় করলাম।

তিনি বললেন, সারাদিন ঠাকুরমার সংগে একা বসে বসে আপনার দিনগুলো হয়ত একঘেয়ে হয়ে উঠছে। তিনি এই প্রশ্ন করার সংগে সংগেই কেন জানিনে আমার মুখটা লাল হয়ে উঠল। আমার লজ্জায় যেন মাথা কাটা গেল। অপমান বোধ হল, যে বাইরের লোক পর্যন্ত আমাকে করুণা করে যে, বুড়ি ঠাকুরমার সংগে পিনে গাঁথা হয়ে আমার দিনগুলো কিভাবে কাটছে। কোন উত্তর না দিয়ে চলে আসতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না।

তিনি বললেন, দেখ তুমি অত ভাল মেয়ে, তুমি হয়ত একথা শুনে কিছু মনে করবে না, যে তোমার ঠাকুরমার চেয়েও তোমার কথা আমি বেশি ভাবি, মনে হয় তুমি সুখে থাক। আচ্ছা তোমার কি কোন মেয়েবন্ধু নেই যার সংগে দেখাসাক্ষাৎ করতে পার?

বললাম, কেউ নেই, মাসেনকা বলে একটি মেয়ে ছিল, সেও অন্যত্র চলে গেছে।

তুমি কি আমার সংগে থিয়েটারে যাবে?

থিয়েটারে? কিন্তু ঠাকুরমা?

ঠাকুরমাকে না জানিয়ে চুপিচুপি আমার সংগে থিয়েটারে চলো।

না, আমি ঠাকুরমাকে ঠকাতে পারব না, আচ্ছা চলি, নমস্কার।

তিনিও আর কোন কথা না বলে, গুডবাই করে চলে গেলেন।

কিন্তু আমাদের রাত্রের খাওয়া শেষ হবার পর তিনি আবার নিচে নেমে এলেন। তিনি বসে বসে অনেকক্ষণ ঠাকুরমার সংগে গল্প করলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরমার বন্ধুবান্ধব আছে কি না, আগে তিনি বেড়াতে যেতেন কি না ইত্যাদি—তারপর একসময়ে হঠাৎ বললেন, আমি থিয়েটারের কয়েকটা টিকেট কিনেছিলাম। বন্ধুদের নিয়ে যাব বলে, কিন্তু বন্ধুরা বিশেষ কাজে আবদ্ধ হওয়ায় যেতে পারবে না, এখন টিকেট নিয়ে কি করি, অপেরাটা কিন্তু খুব ভাল ছিল। বার্বার অব সেভাইল সেটার নাম।

ঠাকুরমা চেঁচিয়ে উঠলেন, বলো কি, বার্বার অব সেভাইল, আমাদের কালে খুব নাম করেছিল।

আমার দিকে একনজর চেয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেই পুরোনো দিনের অভিনেতারাই করছেন।

অবশ্য আমি সবই বুঝতে পারছিলাম, আমার বুকটা উত্তেজনায় ঢিবঢিব করছিল, মুখটা লাল হয়ে উঠল।

ঠাকুরমা বললেন, এই অপেরার প্রধান অভিনেতাকে আমি চিনি। তিনি চমৎকার অভিনয় করেন। আমিও এককালে প্রাইভেট থিয়েটারে রসিনার পার্ট নিতাম।

তিনি বললেন, আপনারা কি থিয়েটারে যাবেন? কেউ যদি না যায় তবে অনর্থক আমার পয়সাগুলি জলে যাবে।

ঠাকুরমা বললেন, নিশ্চয় যাব, কারণ আমার নাসতেঙ্কা কখন থিয়েটার দেখে নি।

আহ্লাদে মন ভরে উঠল। দুজনে ভাল পোষাক পরে তাঁর সংগে থিয়েটারে গেলাম। ঠাকুরমা অবশ্য চোখে দেখেন না। কিন্তু গানটা তো শুনতে পারবেন। তাছাড়া সত্যি ঠাকুরমার মনটা বড় কোমল ছিল। তিনি শুধু যেতে স্বীকার করেছিলেন আমার জন্য, যাতে আমি থিয়েটার দেখে খুসি হই। কারণ নিজেরা টিকেট কেটে থিয়েটার দেখা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন ব্যাপার ছিল।

আমাদের ভাড়াটে সারাটা বিকেল এত সুন্দরভাবে আমার সংগে কথা বললেন, বারে বারে আমার দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাইলেন।

আমি বুঝতে পারলাম আমাকে বিকেলবেলাটা মনুষ্যসমাজে নিয়ে যবার জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন। আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। বিছানায় যখন শুতে গেলাম তখন আমার মনটা খুসি আর গর্বে ভরে উঠল। এত জোরে জোরে বুকটা দপদপ করতে লাগল, উত্তেজনায় মনে হল যেন গাটা জ্বরগ্রস্তের মত গরম হয়ে উঠেছে, সারারাত থিয়েটারের দৃশ্যপট স্বপ্নে দেখলাম।

এরপর আমি ভাবলাম তিনি বোধহয় প্রায়ই আমাদের সংগে দেখা করতে আসবেন, কিন্তু দেখলাম মোটেই না, তিনি শুধু মাসে একবার নেমে আসতেন আমাদের থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্য। দুবার শুধু তাঁর সংগে থিয়েটারে গিয়েছিলাম, কিন্তু এতে মোটেই সুখী হলাম না, বুড়ী ঠাকুরমার সংগে দিনরাত থাকতে হয় এজন্য ইনি শুধু আমাকে কৃপা করে বাইরে নিয়ে যেতে চান, তাছাড়া আর কিছু নয়, ছিঃ।

এরকম ভাবতে ভাবতে আমার মনের শান্তি নষ্ট হল। আমি কোথাও একমিনিট বসতে পারতাম না। না পারতাম বই পড়তে, না পারতাম সেলাই করতে। কখন কখন ঠাকুরমাকে চকিত করে জোরে হেসে উঠতাম, কখন বা নীরবে বসে চোখের জল ফেলতাম। দেখতে দেখতে আমি শুকিয়ে যেতে লাগলাম। থিয়েটার চলে গেল, উনি আর কখন আমাদের এখানে আসতেন না। যদি কখন সিঁড়িতে দেখা হত তাহলে নীরবে মাথা নুইয়ে, বা কখন কোন কথা না বলে আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে উপরে চলে যেতেন, আর আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। সমস্ত রক্ত মাথায় উঠত, মুখটা চেরীর মত লাল হয়ে যেত।

কিছুদিন পর আমাদের ভাড়াটে নিচে নেমে এলেন, আর ঠাকুরমাকে বললেন যে, তিনি জানাতে এসেছেন যে তাঁর পিটসবার্গের কাজ শেষ হয়েছে, এখন তিনি এক বছরের জন্য মস্কো চলে যাবেন। তিনি ঠাকুরমাকে হিসেবপত্র বুঝিয়ে উপরে চলে গেলেন। আর আমি প্রায় মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থায় চেয়ারে এলিয়ে পড়লাম।

এখন আমি কি করি, ভাবতে ভাবতে চিন্তাজালে জর্জরিত হয়ে উঠলাম এবং শেষকালে আমার মন স্থির করলাম। কাল ভোরেই তিনি মস্কো যাত্রা করবেন, ঠাকুরমা ঘুমিয়ে পড়লে পর তাঁর সংগে আমার এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। আমার কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ একটা পোটলা বেঁধে মুতবৎ উপরে চললাম আমার ভাড়াটের সংগে দেখা করতে। সিঁড়ি চড়তে চড়তে মনে হচ্ছিল আমার পা যেন অচল হয়ে যাচ্ছে, ঘণ্টাখানেক লাগবে উপরে পৌঁছতে।

আমি যখন তাঁর ঘরের দরজা খুললাম, তখন তিনি আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কি? তিনি বোধহয় মনে করলেন একটা ভূত এসেছে। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে দিলেন। আমি আর দাঁড়াতে পারছিলাম না, আমার মাথা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছিল, পলকের জন্য চোখে অন্ধকার দেখলাম, আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। যখন একটু সুস্থ বোধ করলাম, তখন

পেটিকাটা বিছানার উপর রেখে একপাশে [illegible]। [illegible] কিছুক্ষণ [illegible] কাঁদতে [illegible]। মনে হল তিনি আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেছেন, আমার সামনে এসে বিবর্ণ বিরস মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, তা দেখে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

তিনি বললেন, শোন নাসতেঙ্কা, আমি তোমার জন্য এখন কিছুই করতে পারছিনে। আমি গরীব। বর্তমানে আমার হাতে কোন কাজ নেই, যদি তোমাকে এখন বিয়ে করি তবে খাওয়াব কি?

দুজনে অনেকক্ষণ কথা বললাম, শেষকালে আমি মরিয়া হয়ে বললাম, আমি ঠাকুরমার সঙ্গে পোষাকে পিন গাঁথা হয়ে দিনের পর দিন এভাবে কাটাতে পারব না। আমি ঠাকুরমার কাছ থেকে চলে এসেছি। যদি আপনি পছন্দ করেন তবে আপনার সঙ্গে মস্কো চলে যেতে চাই। আপনাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। লজ্জা, প্রেম, আর অহঙ্কার [illegible] দুঃসাহসী করে তুলল। একরকম মূর্চ্ছিতের মত আমি বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। আমার ভয় হচ্ছিল তিনি আমাকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়ত হবেন না।

তিনি কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর আমার কাছে এসে আমার হাত [illegible] আমার আদরিণী নাসতেঙ্কা, বলতে বলতে তাঁর চোখেও জল এল। বললেন, শোন, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, যদি কখন বিয়ে করি তবে এ পৃথিবীতে [illegible] তোমাকেই বিয়ে করব। আমি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছি, যদি কেউ আমাকে সুখী করতে পারে—তবে সে তুমি। কিন্তু শোন, এখন আমাকে কাজের খোঁজে মস্কো যেতেই হবে, সেখানে বছরখানেক থেকে আবার আমি এখানে ফিরে আসব। ততদিন যদি তুমি অন্যত্র বিয়ে না কর, আমার অপেক্ষায় থাক, তবে আমি এলেই আমাদের বিয়ে হবে।

পরদিন প্রাতে তিনি চলে গেলেন। আমরা স্থির করেছিলাম, ঠাকুরমাকে এখন কিছু বলা হবে না। এই হল আমার কাহিনী। সেই একবছর পূর্ণ হয়েছে, আজ তিনদিন হল তিনি পিটসবার্গে এসেছেন। আর এখনও......এখনও......

আমি অধৈর্যের সহিত চেঁচিয়ে বললাম, আর এখন ও কি... ?

নাসতেঙ্কা নিজেকে বহু কষ্টে সংযত করে বললে, এখানে ফিরে এসে তিনি দেখা করেন নি, বা কোন খবর দেন নি। বলেই হঠাৎ নাসতেঙ্কা তার সুন্দর মাথাটা নুইয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বাসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তার কান্না দেখে আমার বুকটা ব্যথায় ভরে উঠল। আমি মিনতি করে বললাম, নাসতেঙ্কা, দোহাই তোমার নাসতেঙ্কা এভাবে কেঁদো না। হয়ত তিনি পিটসবার্গে আসেন নি।

না, না, আমি জানি সত্যই তিনি ফিরে এসেছেন, তিনি এখানেই আছেন। নাস[illegible] অধৈর্যের সহিত বললে, তিনি চলে যাবার দিন আগের রাতে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হবার পর আমরা এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। রাত তখন দশটা। আমরা এই পাথরটার উপর বসেছিলাম। তখন আর আমার চোখে জল ছিল না। আমি এত সুখী ছিলাম। সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, ফিরে এলেই তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন, আর তখনও যদি আমি তাঁকে বিয়ে করতে প্রস্তুত থাকি, তবে ঠাকুরমাকে বলে অনুমতি নেবেন। আমি জানি তিনি এখানে ফিরে এসেছেন, কিন্তু আজো তিনি এখানে আসেন নি, আজো [illegible]—আবার সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে বললাম, নাসতেঙ্কা, আমি কি করতে পারি? আমি কি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব?

তুমি কি পারবে? মাথা তুলে সে বললে।

ও তা অবশ্য ঠিক, আমি তাকে চিনতেই পারব না, তবে তুমি এককাজ কর, তাকে একটা চিঠি লেখ না কেন?

সে দৃঢ়ভাবে বললে, না, না, তা হয় না, মনে করবে যেন জোর করে ওর গলায় ঝুলছি, বলে সে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু নাসতেঙ্কা তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার ধারণা একেবারেই ভুল, তোমার তাঁকে একথা লিখবার অধিকার আছে, কারণ তিনি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে গেছেন। তাছাড়া তুমি আমাকে বলেছ যে তিনি অতি সৎ লোক। তুমি অভিমান করে ভুল করো না নাসতেঙ্কা, তুমিই তো বলেছ যে তিনি বলেছেন তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবেন না, তবে অমন করছ কেন?

কি লিখব বলে দাও?

লেখ ডিয়ার স্যার.....

যাঃ ডিয়ার স্যার লিখব কেন? আচ্ছা বেশ, আর কি লিখতে হবে।

আচ্ছা লেখ, তুমি বলে গিয়েছিলে তুমি ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, কিন্তু আজ তিনদিন হল আমি তোমার অধীর প্রতীক্ষায় [illegible] যে এক অনাথা দুঃখিনী মেয়ে তোমাকে চিঠি লিখছে, তাকে মাপ করো, তার এমন কেউ নেই যে এইসময় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে [illegible] দেয়, গভীর দুঃখে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। রাগ করো না, অভাগিনী তোমাকেই একদিন তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল, আর এখনও তোমাকেই গভীরভাবে ভালবাসে।

এই কথাগুলো শুনে নাসতেঙ্কার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আনন্দে চেঁচিয়ে [illegible], আমি যা ভেবেছিলাম তাই তুমি বলেছ, ঠিক আমার মনের কথা। তুমি আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলে, নিশ্চয় ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন আমাকে সাহায্য করতে, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বললাম, এতে ধন্যবাদের কিছু নেই, আমিই বরং তোমার কাছে কৃতজ্ঞ যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, এবং তুমি আমাকে এমন অন্তরঙ্গভাবে নিয়েছে, কারণ তুমি চিরদিন আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে গাঁথা থাকবে।

হয়েছে, হয়েছে, এখন আমার কথা মন দিয়ে শোন। আমরা ঠিক করেছিলাম যে, এখানে একটি পরিবার আছে তারা লোক খুব ভাল, এবং তাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, তিনি এখানে এসেই আমার নামে চিঠি লিখে তাদের কাছে [illegible] আমাকে দিতে। তারা এসব বিষয়ের কিছুই জানে না, আর যদি কোন কারণে চিঠি না লিখতে পারেন তবে উনি নিজেই ঠিক এই এখানে রাত দশটায় আসবেন। আমি জানি নিশ্চয় তিনি এখানে পেঁছেছেন। কিন্তু আজ দুদিন ধরে আমি এখানে অপেক্ষা করছি, তিনি আসেন নি, বা চিঠিও দেন নি। ঠাকুরমাকে ছেড়ে সকালবেলা তো আমি বাড়ি থেকে বের হতে পারব না। কাজেই তুমি যদি আমার চিঠিটা নিয়ে এ বাড়িতে দিয়ে এসো তবে তারা তাঁকে সে চিঠিটা দেবে, আর যদি কোন উত্তর থাকে তবে কাল রাত দশটায় সেটা নিয়ে এসো।

—কিন্তু চিঠি, চিঠি কোথায়, প্রথমে তোমাকে চিঠি লিখতে হবে, তার মানে কালের আগে তো চিঠি দেওয়া সম্ভব হবে না।

চিঠি......? একটু অপ্রস্তুতভাবে নাসতেঙ্কা বললে, ও চিঠি [illegible]

কিন্তু সে তার কথা শেষ করতে পারল না। প্রথমে সে তার সুন্দর মুখখানা ঘুরিয়ে নিল, তারপর যখন চাইল, দেখলাম তার মুখ গোলাপের মত লাল হয়ে উঠেছে, এবং সহসা বুঝতে পারলাম তার চিঠিখানা আমার হাতে এসে গেছে, সে পূর্বেই সেখানা লিখে রেখেছিল। একটা খামবন্ধ চিঠি। দুজনে খিলখিল করে হেসে উঠে একটা গানের কলি ধরলাম, রসিনারা, রসিনারা— আনন্দে আমি তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলাম। সে রাঙা টকটকে মুখে হাসল, আর চোখে মুক্তার মত অশ্রুজল টলটল করতে লাগল।

সে দ্রুত বলে গেল, আচ্ছা থাম, গুডবাই, আমি বাড়ি যাচ্ছি। এই চিঠি আর এই ঠিকানা, যেখানে তুমি পৌঁছে দেবে। কাল আবার দেখা হবে।

সে আমার হাত দুটো ধরে মাথা হেলিয়ে [illegible] দিয়ে দ্রুত বাড়ির পথে চলে গেল,

আর আমি সেখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

সে আমার চোখের আড়াল হতেই মনে হল কালের আগে আর দেখা হবে না।

পরদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। কেমন একটা বিষণ্ণ নিদারুণ দিন।...কোন আশা ভরসা নেই, বহুদিন আগে, দুর্দিন নিরানন্দ দিন আসবে, আমি প্রথমেই সেটার আভাস পেতাম। নানারকম অদ্ভুত চিন্তা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল। আমার মনটা কেমন একটা বিষাদে ছেয়ে গেল। আমার সে সমস্ত চিন্তাধারার সমাধান করতে যেন কোন শক্তি বা ইচ্ছা ছিল না।

আজ আমাদের দেখা হবে না। গতকাল রাতে যখন আমরা গুড্‌বাই বলেছিলাম তখন আকাশে একটু একটু মেঘ দেখা যাচ্ছিল। আমি দেখলাম কাল যে সুদিন হবে এমন ভরসা কম। কিন্তু সে কিছু বলল না, সে আশায় আনন্দে উৎফুল্ল ছিল, তার মধ্যে কোনরকম নৈরাশ্য দেখাতে তার ইচ্ছা ছিল না। কারণ তার জন্য এটা আনন্দ-উজ্জ্বল দিন, কোন মেঘ তাতে ছায়াপাত করবে না।

যখন কারো হৃদয় সুখে আনন্দে ভরপুর থাকে, তখন সে দেখতে কত সুন্দর হয়। যখন কেউ তার দয়িতের হৃদয়ের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, তখন সে ভাবে জগৎশুদ্ধ লোক তাদের সুখে হাসিতে আনন্দে যোগ দেবে। মনে পড়ল গতকাল সে আমার সঙ্গে কি মিষ্টি ব্যবহার করেছিল, নানা মধুর কথায় আমার মন কেড়ে নিয়েছিল। যখন নারীরা সুখী, তখন তারা এত মিষ্টি স্বভাবের হয়, আর আমি? কেন আমিও তো বিগলিত হয়ে উঠেছিলাম, ভেবেছিলাম সে হয়ত.........

আমি পরিপূর্ণ হৃদয়ে তার কাছে এলাম। সে খুসীতে ঝলমল করছিল। সে তার চিঠির উত্তরের আশা করছিল, ভেবেছিল তার চিঠি পেয়েই তার প্রিয় ছুটে আসবে, আমি আসবার ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই সে সেখানে বসে আছে। প্রথমে সে আমার প্রতি কথাতেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠল। আমি কথা বলছিলাম, কিন্তু খুব কম।

তুমি কি জান কেন আমি এত খুসী? সে বললে, তুমি কি জান কেন তোমার দিকে চাইলে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে? তুমি কি জান কেন আজ তোমাকে আমার এত ভাল লাগছে?

আমার বুক আশঙ্কায় উত্তেজনায় দুলতে লাগল। বললাম, কেন?

আমি তোমাকে এত ভালবাসি কারণ তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন কর নি বলে। আমি জানি এ অবস্থায় তোমার বদলে যদি অন্য কেউ থাকত তবে সে আমাকে প্রেমের কথা বলে উত্ত্যক্ত করে তুলত। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, মুখখানা যথাসম্ভব করুণ করে তুলত, কিন্তু তুমি এত মিষ্টি। বলতে বলতে সে আমার হাত এত জোরে চেপে ধরল যে আমি উঃ করে উঠলাম, আর সে হাসতে লাগল।

সে বলে উঠল, তুমি সত্যি সত্যি আমার প্রকৃত বন্ধু, আমার বিপদে যেন তুমি ভগবান প্রেরিত দূত। তুমি কি রকম নিঃস্বার্থ-ভাবে আমাকে সাহায্য করছ, আর আমার প্রতি তোমার ভালবাসা খাঁটি। আমার বিয়ের পরও মনে হয় তুমি আমার এমনি প্রকৃত বন্ধু থাকবে, তুমি আমার ভাই-এর চেয়েও বেশি, তোমাকেও আমি কম ভালবাসি নে।

এসময় কেন জানি না আমার সমস্ত হৃদয় অব্যক্ত ব্যথায় ভরে উঠল। নিজের মনেই হাসি পেল, সংযত হয়ে বললাম, তুমি ভয় পাচ্ছ, তোমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি ভাবছ তোমার প্রিয় আসবেন না।

ওহো, এসব কি বাজে কথা বলছ, আমি এত খুসী না থাকলে তোমার এই সন্দেহে কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম। কিন্তু জানো তোমার কাছ থেকে অনেক ভাল কথা শুনেছি, আর সেসব কথায় আমার চিন্তাধারা আরো বেড়ে গেছে। তবে তোমাকে সত্যিকথাই বলি, আমি এখন ঠিক প্রকৃতস্থ নই, আমিও সন্দেহের দোলায় দুলছি, অল্পতেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠছি, যাক্‌গে, এখন আর সেসব বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করো না, আমার মনটা বিভ্রান্ত হয়ে আছে।

ঠিক এমন সময় পদশব্দ শোনা গেল, দেখা গেল একজন লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। নাসতেঙ্কা চেঁচিয়ে উঠল, আমি তার হাত ছেড়ে একটু নড়েচড়ে চললাম যেন ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা দুজনেই দেখলাম—সে নয়।

—তুমি কেন এত ভয় পেয়েছ, কেন আমার হাত ছেড়ে দিলে, এই বলে সে আবার আমার হাত ধরল। এতে ভাববার কি আছে, আমরা দুজনে তার সঙ্গে দেখা করব, আমি চাই সে দেখুক আমরা দুজনে পরস্পরকে কত ভালবাসি।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, একজন আর একজনকে কি করে ভালবাসি? ও নাসতেঙ্কা, নাসতেঙ্কা, নিমেষে মনে জাগল,—কি ভালবাসার কথাই না তুমি শোনালে আমাকে। এমন একটা মুহূর্ত আসে যে প্রেমের কথা শুনলেই হৃদয় ব্যথায় আর নৈরাশ্যে জর্জরিত হয়। তোমার হাত শীতল, কিন্তু আমার হাতে আগুনের জ্বালা নাসতেঙ্কা, তুমি অন্ধ, তবু আমি তোমার উপর রাগ করতে পারছি না। উত্তেজনায় আবেগে আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলাম।

নিজেকে সংযত করে বললাম, তুমি কি জান আজ সারাদিন কিভাবে কেটেছে?

কেন, কি হয়েছে? শীগ্‌গির আমাকে বল, এতক্ষণ আমাকে কিছু বল নি কেন?

আচ্ছা নাসতেঙ্কা, শোন তাহলে, প্রথমে তো তোমার চিঠি নিয়ে ভালমানুষ বন্ধুর বাড়ি গেলাম, তারপর বাড়ি ফিরে বিছানায় শুতে গেলাম।

হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞেস করল, শুধু এই?

নিজেকে সংযত করে বললাম, হ্যাঁ তাই, আমি বুঝতে পারছিলাম অবাধ্য অশ্রুজল আমার চোখে জমা হয়েছে। বললাম, তোমার সঙ্গে দেখা হবার ঘণ্টাখানেক আগে আমার ঘুম ভাঙল। কিন্তু সত্যকথা বলতে কি আমার চোখে ঘুম মোটেই ছিল না, বহুদিন পূর্বের বিস্মৃত এক মধুর রাগিণী মনে বাজতে লাগল। মনে হল তা যেন আমার আত্মা থেকে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে..... আর এখন—

নাসতেঙ্কা বাধা দিয়ে বললে, এসব কি বলছ, আমি তো এর একটা কথাও বুঝতে পারছিনে।

—নাসতেঙ্কা, আমি আমার এই বিচিত্র অনুভূতি তোমার কাছে প্রকাশ করতে চাই, আমি করুণসুরে বলতে আরম্ভ করলাম, মনে অতি ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত—

—আর বলো না, আর বলো না, দোহাই তোমার! নিমেষে যেন দুষ্টু মেয়ে আমার মনের কথা বুঝে নিতে পারল।

সে হঠাৎ বাচাল আর চতুর হয়ে উঠল। সে আমার হাত ধরে অনর্গল কথা বলে হেসে চলল, আর আমাকেও হাসাতে চেষ্টা করতে লাগল। আমার কোন কথা শুনলেই উচ্চ-হাসিতে ভেঙে পড়তে লাগল। সে হঠাৎ আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করতে সুরু করে দিল, এতে আমার ভয়ানক রাগ ধরল। সে বললে, শোন, প্রথমে আমি সত্যি সত্যি তোমার উপর বিরক্ত হয়েছিলাম যে তুমি কেন আমার প্রেমে পড় নি। তোমার সম্বন্ধে এরপর আমি কি ধারণা করতে পারি? বুঝতে পারলাম তুমি না হয় খুব দৃঢ়চিত্ত, কিন্তু আমার মত এমন সাদাসিদে ধরণের মেয়ের একটু প্রশংসা করতে হয় বৈকি। কারণ আমি তোমাকে আমার সব কথা খুলে বলেছি!

কিছুদূরে ঢং-ঢং করে ঘড়ি বাজতে লাগল। বললাম—দেখ, মনে হচ্ছে যেন এগারটা বাজছে।

সে ঘড়ির শব্দ গুণে গুণে বলল, হ্যাঁ এগারটাই বেজেছে।

আমার মনে খুব অনুতাপ হল. রাত বেশি হয়েছে বলে তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভেবো না কোন কারণে হয়ত আজ আসতে পারেন নি, কাল নিশ্চয়ই আসবেন। হয়ত তাঁর হাতে চিঠিটা দেরিতে পোঁছেছে, তিনি চিঠি লিখতে বা আসতে সময় পান নি।

কাল সকালে না হয় আমি নিজে গিয়ে চিঠি এনে তোমাকে দেব।

নাসতেঙ্কা বললে, সেটাই ভাল, তুমি কাল সকালে যত শীগগির পার সেখানে গিয়ে চিঠিটা এনে আমাকে দিও, আমার বাড়ি কোথায় জানই তো? এই বলে সে আবার তার বাড়ির ঠিকানা আমাকে বলতে লাগল। হঠাৎ সে একেবারে চুপ মেরে একটি লাজুক মিষ্টি মেয়ে হয়ে গেল।

আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনে যেতে লাগল, কিন্তু যখন আমি তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম তখন কোন উত্তর না পেয়ে অবাক হলাম, আমি তার চোখের দিকে চাইলাম, সে চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সে কাঁদছিল।

—আহা কি ছেলেমানুষ, কাঁদছ কেন, ছিঃ কেঁদ না, বলাতে সে নিজেকে সংযত করে হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু তখনও তার থুতনি কাঁপছিল, আর বুক উঠানামা করছিল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বললে, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম, তুমি এত ভাল, আমি পাষাণী হয়ে না বুঝবার ভাণ করছি। তুমি কি জান আমার কি মনে হচ্ছে? আমি মনে মনে তোমাদের দুজনকে তুলনা করছিলাম, সে কেন তুমি নয়? সে কেন তোমার মত হল না? সে কিন্তু তোমার মত এত ভাল নয়, যদিও আমি তাকে তোমার চেয়েও বেশি ভালবাসি।

উত্তরে আমি কিছুই বললাম না, সে আমার কাছ থেকে কিছু শুনবার প্রত্যাশায় ছিল।

অবশ্য এটা সত্য যে আমি তাঁকে বেশি ভালভাবে চিনিনে, আর তাঁকে ঠিকভাবে বুঝতেও পারিনে। সব সময়েই মনে একটা ভয় থাকে। তিনি সব সময়েই একটু গম্ভীর প্রকৃতির, আর যেন একটু গর্বিত. অবশ্য আমি শুধু তাঁর চেহারা দেখে এরকম ধারণা করছি। আমি জানি আমার চেয়েও তাঁর অন্তর বেশি কোমল, তিনি আমার দিকে যেভাবে চেয়েছিলেন সে দৃষ্টি আমি ভুলতে পারিনে। বুঝতে পেরেছ? সেই আমি যখন আমার পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু সব সময়ই মনে হয় তিনি আমার চেয়ে অনেক উপরে, আমরা দুজন সমান নয়।

আমি উত্তর দিলাম. না, নাসতেংকা, না তা নয়, তোমরা দুজন সমান নও এটা ঠিক নয়। এতে শুধু বোঝায় যে তুমি পৃথিবীতে অন্য কিছু থেকে তাকে অতি গভীরভাবে ভালবাস, এমন কি তোমার নিজের চেয়েও বেশি ভালবাস।

নাসতেঙ্কা বললে, মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। আমি শুধু তাঁর কথা বলছিনে, কিন্তু সাধারণভাবে সবার কথাই বলছি, অনেক সময় আমি ভাবি লোক কেন ভাই ভাই-এর মত হয় না। কেন নিজের ভাল চিন্তাধারা অন্য থেকে গোপন করে, কেন নিজের মনে কি ভাব খেলছে সেটা তারা সরলভাবে প্রকাশ করে না। তাদের মনের কোমল ভাবটুকু গোপন করে তারা কঠোর ভাব দেখায়। মনে হয় তারা হয়ত ভাবে যে, তাড়াতাড়ি তাদের নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিলে যদি তার মর্যাদা না পায়, তবে মনে অত্যন্ত আঘাত পাবে।

—ওঃ নাসতেংকা, তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু এরও নানা কারণ আছে, যেমন ধর, আমার মনে এই মুহূর্তে যে চিন্তাধারা আগের চেয়েও বেশিভাবে চলছে, আমি জানি আমি তা গোপন করে চলছি।

সে অতি গভীরভাবে বললে, না, না তুমি মোটেই সে ধরণের নও, আমি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারব না, যে তোমার সম্বন্ধে আমার কি ধারণা। আমার মনে হয়, আমি বোঝাতে পারছিনে যে, ঠিক এই মুহূর্তে তুমি আমার জন্য কতখানি ত্যাগ করেছ। আমি একথা বলছি বলে আমার উপর দয়া করে রাগ করো না, লাজুকভাবে
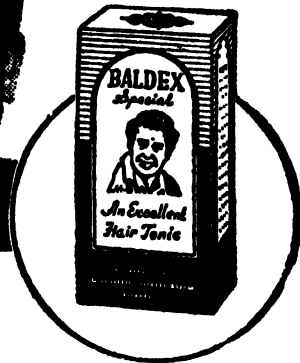
এই কথা বলে সে আমার দিকে চাকিতে চাইল। তুমি জান, আমি একটা অতি সাদাসিদে মেয়ে, সংসারে আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই, অনেক সময় বুঝতে পারিনে যে কিভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করব। যদিও সে কথা বলার সময় হাসতে চেষ্টা করছিল তবু মনে হচ্ছিল যে ভিতরের একটা লুক্কায়িত আবেগে তার গলার স্বর কাঁপছিল। আমি তোমাকে বলতে চাই যে আমি কৃতজ্ঞ, আমিও সে কথাটা জানি। ওঃ ভগবান তোমাকে এজন্য সুখী করুন। আমি বুঝতে পারছি তুমি নিজেকে স্বপনালু ভাবুক বলে যে বর্ণনা দিয়েছিলে তা মোটেই ঠিক নয়। তুমি তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যদি তুমি কখনও কারো প্রেমে পড় তবে তাকে নিয়ে চিরসুখী হও। আমি তাকে কোন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি না, কারণ সে তোমাকে পেয়ে সুখী হবে। আমি তা জানি কারণ আমিও একজন নারী, কাজেই তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পার।

শুধু আমার হাত নিবিড়ভাবে ধরে সে চুপ করে রইল, আমিও এত বিচলিত হয়েছিলাম যে, কোন কিছু বলতে পারলাম না, কয়েক মিনিট নিশ্চুপে কাটল।

অবশেষে সে মাথা তুলে বললে, অনেক রাত হয়ে গেছে আজ আর সে আসবে না।

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, কাল তিনি ঠিক আসবেন।

সে খুসী হয়ে বললে, আমারও মনে হয় তিনি কাল আসবেন। আচ্ছা বিদায়। কাল আবার দেখা হবে, তবে যদি বৃষ্টি নামে তবে হয়ত কাল না এসে পরদিন আসব।

—তুমি কিন্তু এখানে নিশ্চয় উপস্থিত থেকো, সেদিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে কিছু বলতে চাই।

সে তার হাত বাড়িয়ে দিল, আমার দিকে অতি শান্তভাবে চেয়ে বললে—এখন থেকে আমরা সর্বদাই একসঙ্গে থাকব, নয় কি?

দুজনে দুজনের নিকট বিদায় নিলাম।

ও নাসতেঙ্কা, ও নাসতেঙ্কা, তুমি যদি জানতে যে এই মুহূর্তে আমি নিজেকে কি রকম নিঃসঙ্গ মনে করছি। বাড়িতে যখন নয়টা বাজল, আমি আমার ঘরে আর থাকতে পারলাম না। দিনের দুর্যোগ থাকা সত্ত্বেও আমি পোষাক-পরিচ্ছদ পরে বের হয়ে পড়লাম। আমি সেখানে পৌঁছে গেলাম। যে পাথরটায় আমরা দুজনে বসতাম সেটার উপর বসলাম। তারপর তার বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে সামনের রাস্তায় গেলাম, সেখানে গিয়ে মনে অত্যন্ত লজ্জা হল, তক্ষুণি ফিরে চললাম, যদিও তার বাড়ির কয়েক হাত দূরেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মুখ তুলে একবার তার জানালার দিকেও চাইলাম না। কি একটা দিনই না কেটেছে যদি এমন স্যাঁৎসেঁতে আর বিশ্রী দিন না হত, তবে হয়ত সারারাত আমি পথে ঘুরে বেড়াতাম।

কিন্তু কাল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, কাল সে আমাকে তার কথা খুলে বলবে।

আজও তার জন্য কোন চিঠি ছিল না, আর তাতে আশ্চর্য হবার কিই-বা আছে। হয়ত তারা দুজনে এতক্ষণে মিলিত হয়েছে......।

হায় ভগবান, কি আশ্চর্যভাবে সব বিষয়ের সমাধান হয়ে গেল, আর কি ভীষণ পরিসমাপ্তি।

আমি রাত ৯টার সময় সেখানে পৌঁছলাম। সে সেখানেই ছিল। আমি দূর থেকেই তাকে দেখতে পেলাম। সে ক্যানেলের পুলের উপর দাঁড়িয়েছিল প্রথমবার ঠিক তাকে যেমন দেখেছিলাম, সেইভাবেই সে রেলিং-এর উপর মুখ রেখে নীচে তাকিয়েছিল। যখন আমি তার কাছে এলাম সে কিছু বুঝতেই পারল না, মানসিক চাঞ্চল্য থামিয়ে আমি ডাকলাম নাসতেঙ্কা, সে চকিতে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বললে, আচ্ছা এসেছ, শীগ্‌গির খুলে বল কি হল।

আমি তার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত চাইলাম। চিঠিটা কোথায়? দুহাত দিয়ে রেলিংটা শক্ত করে ধরে আবার বললে, তুমি কি চিঠিটা নিয়ে আস নি?

কোনরকমে বললাম, না আমি তো কোন চিঠি পাই নি। কেন, তিনি কি আসেন নি?

তার সমস্ত মুখ অসম্ভব বিবর্ণ হয়ে উঠল, একটুও না নড়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি তার সমস্ত আশা নির্মূল করে দিয়েছি।

অবশেষে সে জড়িত ক্ষীণস্বরে বললে, ঠিক আছে, যদি তিনি এভাবে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করেন তবে তাঁকে ভুলে যাওয়াই উচিত।

সে তার চক্ষু নত করল, তারপর আমার দিকে চোখ তুলে চাইতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না, হঠাৎ আমার দিকে পেছন ফিরে রেলিং-এ মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—ফিরে এস, ফিরে এস বলে, আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম, তার কাছে যাবার ইচ্ছে হল না। আর তাকে আমার বলবারই বা কি আছে?

সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না। আর বলো না যে সে আসবে। কেন সে আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর অমানুষিক ব্যবহার করল? কেন? কেন সে এমন করল? নিশ্চয়ই আমার চিঠি এমন কিছু অশোভন ছিল না? বলতে বলতে আমার তার [illegible] স্বর [illegible] হয়ে গেল, আর তার দিকে চেয়ে [illegible] ব্যথায় আমার [illegible] কতবিক্ষত হতে লাগল।

আবার সে বলতে লাগল। কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা, একটা লাইনও লিখল না, যদি সে শুধু লিখত যে সে আমাকে চায় না, ত্যাগ করেছে তবে কি ক্ষতি হত? তিনদিনে একটা লাইন লেখবারও অবকাশ হল না। অনায়াসে আমার মত একটি গরীব অসহায় মেয়েকে অপমান করতে পারল, আমার দোষ এই—আমি তাকে ভালবাসি। এই তিনদিন আমার কিভাবে কেটেছে ভগবান জানেন। যখনই ভাবি, যে আমিই প্রথমে তার কাছে গিয়েছিলাম, আমিই তার কাছে একটু ভালবাসার জন্য কেঁদেছি, একটু ভালবাসার জন্য তাকে কিভাবে অনুরোধ করে নিজেকে খাটো করেছি, সে কথা মনে করে তখনই শরীরে জ্বালা ধরে। আমার দিকে ফিরে সে বললে, নিশ্চয়ই একটা কিছু ভুল হয়েছে, এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়, হয় তুমি ভুল করেছ, নয়ত আমি ভুল করেছি। তার কালো দুটি চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল। নিশ্চয় সে আমার চিঠি পায় নি। হয়ত এখন পর্যন্ত সে কিছুই জানে না। দোহাই তোমার, তুমি আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে, কি করে তিনি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হলেন? একটা লাইনও আমাকে লিখলেন না, জগতে অতি নিকৃষ্ট প্রাণীর প্রতিও লোকে করুণা করে থাকে। মনে হয়, তিনি হয়ত কিছু শুনেছেন। অথবা আমার সম্বন্ধে তাঁকে কেউ কিছু বলেছে। সে চেঁচিয়ে উঠল বল, বল, তোমার কি মনে হয়?

—নাসতেঙ্কা শোন, আমি তোমার হয়ে কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

—ঠিক?

—আমি তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে চেষ্টা করব তাঁর মনোভাব কি, আর আমি তাঁকে সব খুলে বলব।

—সত্যি? সত্যি?

—তুমি একটা চিঠি লেখ। না, অস্বীকার করো না নাসতেঙ্কা, তোমার একাজের জন্য, যাতে তিনি তোমাকে মর্যাদা দেন, তার চেষ্টা করব, তাঁকে সব বুঝিয়ে বলব।

—না, না, তা হয় না, যথেষ্ট হয়েছে, আর একটা কথাও না, আর একটা লাইনও না, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমি তাকে জানিনে, আমি তাকে চিনিনে, আমি তাকে ভুলে যেতে ......অসম্পূর্ণ বাক্য আর সে শেষ করতে পারল না।

—শান্ত হও, আদরের নাসতেঙ্কা শান্ত হও, এস এখানে বসো।

—না, আমি শান্তই আছি, কিছু ভেবো না, আমি যা বললাম এ কিছুই নয়, আমার চোখের জল কিছু পরেই শুকিয়ে যাবে, তুমি

মনে করো না যে আমি নিজেকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি, কি বল?

আমার হৃদয় আবেগে পূর্ণ ছিল, আমি কিছু বলতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না।

সে আমার হাত মুঠি করে ধরে বললে, তুমি কিন্তু কখন এমন করতে না, যদি কোন নারী স্বেচ্ছায় তোমার কাছে এসে প্রেম নিবেদন করত, তাহলে তুমি তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রূপ করতে পারতে না। তুমি তাকে সাদরে গ্রহণ করতে, তুমি নিজে বুঝতে পারতে যে এই অনাথার জগতে কেউ নেই। সে অনভিজ্ঞা এক নারী, সে তোমার প্রেমে অন্ধ হয়েছে, কিন্তু এটা তো তার দোষ নয়, এটা তো তার দোষ নয়—হে ভগবান, হে ভগবান......।

আমি নিজের হৃদয়াবেগ আর সংযত রাখতে পারলাম না, অধীরভাবে বললাম, এটা আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এ দস্তুরমত আমার প্রতি নির্যাতন, নাসতেংকা, তুমি আমার মর্মে আঘাত করছ। আমি চুপ করে থাকতে পারছিনে, তোমাকে আমার মনের যত আবেগ তা খুলে বলতেই হবে। একথা বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সে আমার হাত ধরে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বললে, কি হয়েছে?

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, নাসতেংকা শোন, আমি যা বলছি, তা হয়ত অর্থহীন, বোকামি, তা কখনও হতেই পারে না, আমি জানি তা কখন সম্ভব হবে না, তবু আমি নিশ্চুপ থাকতে পারলাম না, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

—সেটা কি? সেটা কি? সে কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, সে দৃষ্টি কৌতূহল ভরা। কি হয়েছে তোমার? সে বললে।

—যদিও এটা প্রশ্নের বাইরে, তবু তোমাকে খুলে বলছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, নাসতেংকা আমি তোমায় ভালবাসি, এখন তুমি সবই জানতে পারলে, এখন তুমি নিজেই বিচার কর, এক্ষুণি তুমি আমাকে যে ধরণের কথা বলছিলে সে রকম, বা তার চেয়ে আরো বেশি কিছু বলবে, বা আমি তোমাকে যা কিছু বলব তা শুনবে।

নাসতেংকা কথায় বাধা দিয়ে বললে, অবশ্য অনেক আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি আমায় ভালবাস, তখন মনে হত, হয়ত আমাকে তোমার ভাল লেগেছে তাই আমার প্রতি সাধারণভাবে অনুরক্ত হয়েছ, কি কাণ্ড, কি কাণ্ড......।

—নাসতেংকা, প্রথমে এই মনোভাবটা সাধারণ ধরণেরই ছিল, কিন্তু এখন আমার অবস্থা প্রায় তোমার মতই, যেমন তোমার পুঁটলি নিয়ে তুমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলে। আমার অবস্থা আরো শোচনীয়, কারণ সে সময় তিনি কারো প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন না, আর তুমি—তুমি এখন......।

নাসতেংকা অপ্রস্তুত হয়ে গেল, তার গাল দুটো আরক্ত হয়ে উঠল, সে চোখ নত করে আড়ষ্টভাবে বললে, তুমি এসব কি বলছ আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছিনে।

—নাসতেংকা, আমার উপর রাগ করো না, এটা আমারই দোষ এভাবে তোমাকে প্রেম নিবেদন করা, কিন্তু আমি কি করতে পারি? নাসতেংকা বিদায়, আমি আর একমুহূর্তও এখানে থাকতে পারছিনে, তুমি আর কখনও আমাকে দেখতে পাবে না। আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই, আমি তোমাকে ভালবাসি, একথা কখনই আমার মুখ থেকে শুনতে পেতে না, জগতে আমার এই অতি গোপনীয় কথা কেউ জানতে পারত না, যদি না তুমি এই মুহূর্তে তোমার মনের কথা এভাবে ব্যক্ত করতে। এটা তোমার দোষ, আমার নয়, এখন তুমি আমাকে এভাবে ঝেড়ে ফেলতে পার না।

—কিন্তু আমি তো......আমি তো তোমাকে ঝেড়ে ফেলছি না। নাসতেংকা নিজেকে সংযত করে একথা বললে।

—তুমি আমাকে বিদায় দেবে না? কিন্তু নাসতেংকা আমি তো এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমি চলে যাব, হ্যাঁ নিশ্চয় চলে যাব, তার আগে বলে যাই, তুমি যখন কাঁদছিলে, মনের আবেগে ক্ষোভে নিজের হৃদয়-ব্যথা প্রকাশ করছিলে, তখন আমি বসে থাকতে পারি নি, তোমার এই অসহায় অবস্থা দেখে আমার হৃদয় অসহ্য ব্যথায় ভরে উঠল, আমি নিজেকে সম্বরণ করতে পারলাম না, তোমার প্রতি আমার গভীর প্রেম ব্যক্ত করলাম, ও নাসতেংকা, নাসতেংকা তুমি এ কি করলে, তুমি বুঝতে পারবে না যে, একটি খাঁটি বিশ্বস্ত হৃদয় তোমাকে গভীরভাবে ভালবেসেছে, আর অসহ্য মর্মযন্ত্রণায় তা বিক্ষত হচ্ছে।

নাসতেংকা তার আসন থেকে তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়াল, অসহ্য মনোবেদনায় আমার চোখ থেকে জল ঝরছিল, নাসতেংকা তার রুমাল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল। বললে, যদিও সে আমাকে ভুলে গিয়েছে তবু আমি তাকে এখনও ভালবাসি, তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলব, তুমি কি অপেক্ষা করতে পারবে?

—অপেক্ষা? কিসের জন্য অপেক্ষা? কি বলছ তুমি?

—শোন, আমি তাকে ভালবাসি, কিন্তু আমার মন থেকে সে ভালবাসা আমি মুছে ফেলব, আমি এখন তাকে ঘৃণা করি, হ্যাঁ ঘৃণাই করি, অকারণে সে আমার প্রেম অবহেলা করেছে। তুমি যেমন আমাকে ভালবাস, তেমনি আমিও তোমাকে ভালবাসি কারণ তুমি তার চেয়ে অনেক ভাল, অনেক শ্রেষ্ঠ, সে—বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, চোখের জল মুছে নীরবে আমার সঙ্গে চলতে লাগল।

সে বলতে সুরু করল,—আবেগ কম্পিত সুরে বললে, তুমি মনে করো না যে আমি অস্থিরচিত্ত, দুর্বল, মনে করো না আমি তাকে এত সহজে আর এত তাড়াতাড়ি ভুলতে পেরেছি, অবিশ্বাসিনী হয়েছি। কিন্তু সত্যি করে বলছি, এই একটা বৎসর ধরে গভীরভাবে তাকে ভালবেসে তার প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়েছি, একদিনের জন্যও এমন কি স্বপ্নেও তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়ে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইনি, কিন্তু সে তো তা করে নি, সে আমাকে ভুলেছে, আমাকে ঘৃণা করেছে, তার অবহেলায় আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে! না, না আমি আর তার প্রেমে অন্ধ হয়ে থাকব না, আমি তাকে ভুলতে চাই, আমি তাকে ঘৃণা করতে চাই, আমি আর একজনকে—আর একজনকে ভালবাসব, যে আমাকে ভালবাসে, যার অন্তর আমার প্রতি সমবেদনায় ভরা। মনের আবেগে সে বলতে লাগল, যদিও আমি তাকে এখনও ভালবাসি, কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি, তোমার ভালবাসায় আমি ধীরে ধীরে তাকে ভুলতে পারব, আমার কৃতজ্ঞতা, আমার ভালবাসা একসময়ে তোমার প্রতি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, এই নাও, আমার হাত ধরো—বলে তার হাত বাড়িয়ে দিলে।

আমি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলতে পারলাম, নাসতেংকা, ও নাসতেংকা।

সে নিজেকে সংযত করে বললে, আচ্ছা হয়েছে তো, আমি আমার মনের কথা খুলে বলেছি, এখন তুমি খুসী হয়েছ তো? চল এখন আর এসব কথা না, এখন অন্য কথাবার্তা বলা যাক।

—হ্যাঁ নাসতেংকা, এখন আমি খুবই সুখী, চলো, এ আলোচনা স্থগিত রেখে আমরা অন্য বিষয়ে আলোচনা করি।

আমরা নানা ধরণের কথা বলতে লাগলাম, কখন হাসতে লাগলাম, কখনো চেঁচিয়ে কথা বললাম, কখন দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে পুল পার হয়ে অন্যদিকে চলে গেলাম, আবার ফিরলাম আবার গেলাম, উচ্ছ্বসিত আনন্দে যেন আমরা শিশু হয়ে পড়লাম।

—আচ্ছা নাসতেংকা, জানতো আমি গরীব, মোটে বারশো রুবল পাই, সংসার চলবে তো?

—কেন চলবে না? তাছাড়া আমার ঠাকুরমা তো পেন্সন পান, ঠাকুরমাকে কিন্তু আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।

—নিশ্চয় ঠাকুরমা তো যাবেনই, আর

তোমার সেই বুড়ী ঝিকেও নিয়ো, অবশ্য তার বুদ্ধি বিবেচনা খুবই কম। আচ্ছা কাল থেকে তুমি আমাদের বাড়ি চলে এসো? কেমন?

—তোমার বাড়িতে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করব না।

—আমাদের ছাদে একটা ঘর আছে তোমাকে তো আগেই বলেছি। এখন সে ঘরটা খালি। একজন বুড়ী ভাড়াটে ছিল সে চলে গেছে, আর আমি জানি, ঠাকুরমা একজন তরুণ ভাড়াটে চান। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঠাকুরমা, তরুণ ভাড়াটে কেন চাই?

ঠাকুরমা বললেন, না চাইবার কারণ কি? আমি বুড়ো হয়ে গেছি, অল্পবয়সী লোক কাছে থাকলে নিশ্চিন্ত থাকব। তুমি কি ভেবেছ যে আমি তোমার বিয়ের কথা ভাবছিনে?

একথা শুনে দুজনেই হাসলাম। সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তুমি না কোথায় থাক আমি ঠিক মনে করতে পারছিনে।

আমি আমার ঠিকানা বললাম, এটা বেশ বড় বাড়ি, হ্যাঁ, ওটা নিশ্চয়ই সুন্দর বাড়ি, কিন্তু তবু মনে হয় যথাসম্ভব শীঘ্র তুমি এসে আমাদের কাছে থাকলে ভাল হয়।

—ঠিক আছে, আমি কালই চলে আসব, তবে ভাড়া বাকি আছে, কিন্তু কোন চিন্তা নেই, শীগগিরই আমি বেতন তো পাবই, বোনাসও পাব, তখন বাড়িভাড়া চুকিয়ে দেব, তুমি কোন চিন্তা করো না। দেখো আমি কিভাবে সংসার চালাই, অবশ্য তার আগে একটু শিখে নিতে হবে, তবে কথা রইল, কাল থেকে তুমি আমাদের ভাড়াটে।

—হ্যাঁ, আর আমরা আবার দি বার্বার অব স্যাভাইল দেখতে যাব, শুনেছি ওটা নাকি আবার শীগগিরই আসছে।

নাসতেংকা হেসে বললে, নিশ্চয়, আমিও ওটা দেখতে ভালবাসি কিন্তু সেই বার্বারকে নয় অবশ্য, আমরা নয়ত অন্য আর একটা কিছু দেখব।

—বেশ তো বলে আমি তার সংগে চলতে লাগলাম। আমরা যেন নিজেদের হারিয়ে ফেললাম, নিজেদের সম্বন্ধে কোন অনুভূতি নেই, কেমন ছোটদের মত অনর্গল কত অর্থহীন কথা বলতে লাগলাম, কত হাসলাম, আর অনির্দিষ্টভাবে পথ চলতে লাগলাম। হঠাৎ নাসতেংকার খেয়াল হল, বললে, উঃ অনেক রাত হয়ে গেছে এখন বাড়ি ফিরতে হবে।

আমরা ফিরে চললাম, আমাদের সেই পুরাতন আসন বড় পাথরটার কাছে এসে নাসতেংকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার দুচোখ জলে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আমরা কি ছেলেমানুষ হয়েছি; আচ্ছা অনেক রাত হল, এখন বাড়ি চল।

—হ্যাঁ নাসতেংকা, রাত তো অনেক হয়েছে সত্য, কিন্তু আমি বাড়ি ফিরব না এখন, কারণ আমার চোখে ঘুম কিছুতেই আসবে না।

—আমারও ঘুম আসবে না, তবু বাড়ি ফিরতে হবে। আচ্ছা কথা রইল কাল তুমি নিশ্চয় চলে আসবে। হ্যাঁ নিশ্চয়। দেখ নাসতেংকা, আকাশের দিকে চেয়ে দেখ মনে হয় কাল বড় মনোরম দিন হবে। কি সুন্দর নীল আকাশ, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে। একটা মেঘ যেন ধীরে ধীরে এটার উপর দিয়ে আসছে, না, না চলে গেল, দেখ নাসতেংকা চেয়ে দ্যাখ, কি সুন্দর চাঁদ।

কিন্তু নাসতেংকা ওদিকে চাইল না, সে নির্বাক, নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এর্কামিনিট পরই সে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, আমার হাতে তার হাত কাঁপতে লাগল। আমি তার দিকে চাইলাম, সে আমাকে আঁকড়ে ধরল।

ঠিক এই মুহূর্তে একজন যুবক আমাদের অতিক্রম করে চলে গেল। হঠাৎ সে থামল, আমাদের দিকে নিবিষ্টভাবে চাইল, আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল। আমার মনটা যেন কেমন হয়ে গেল।

মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, নাসতেংকা ও কে?

ফিসফিস করে নাসতেংকা বললে 'সে'।

নাসতেংকা কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত আরো শক্ত করে আঁকড়ে রইল। আমি প্রায় দাঁড়াতে পারছিলাম না।

—নাসতেংকা, নাসতেংকা তুমি। তুমি এখানে? বলে সে কপেক পা অগ্রসর হল।

হে ভগবান, সে কিভাবে চমকে চেঁচিয়ে উঠল, সে কিভাবে আমার হাত ছেড়ে তার দিকে ছুটে গেল বলতে পারব না, আমি দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলাম।

সে নিমেষে ছুটে গিয়ে হাত ধরে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ সে আমার পাশে ছুটে এসে দাঁড়াল দ্রুত-গতিতে। বায়ুর চেয়েও যেন তার গতি দ্রুত। আমি সম্বিৎ ফিরে পাবার আগেই সে আমার গলা জড়িয়ে আমাকে উচ্ছ্বাসের সহিত চুম্বন দিল।

আর একটা কথাও না বলে সে ছুটে চলে গিয়ে তার হাত ধরল আর তাকে টেনে নিয়ে চলল।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে তারা চোখের আড়াল হয়ে গেল।

রাত্রি প্রভাত হল,—আবহাওয়া সাংঘাতিক ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল, আমার জানলার কাচে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা এসে আঘাত করছিল, ঘরটা একেবারে অন্ধকার, বাহিরটা অতি বিশ্রী। আমার খুব মাথা ধরেছিল, কিরকম মাথা ঘুরতে লাগল, মনে হল আমার জ্বর হয়েছে।

ঝি এসে বললে, স্যার, আপনার নামে একটা চিঠি, এইমাত্র পোস্টম্যান দিয়ে গেল।

আমি আমার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললাম, চিঠি, কে লিখেছে?

—জানিনে কে লিখেছে, নিশ্চয়ই নিচে নাম স্বাক্ষর আছে।

খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করলাম, সে লিখেছে—

ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা করো, আমি তোমাকে, এবং আমার নিজেকেও প্রতারিত করেছি, সেটা একটা স্বপ্ন, একটা ভ্রান্তি ছিল। আজ আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি, আমাকে ক্ষমা করো।

আমাকে দোষ দিও না, তোমার প্রতি আমার মনোভাব একটুও বদলায় নি, আমি তোমাকে প্রথম থেকে যে রকম ভালবাসতাম, মনে হচ্ছে এখন তার চেয়েও বেশি ভালবাসি। আহা আমি যদি যুগপৎ দুজনকে ভালবাসতে পারতাম, তুমি যদি সে হতে।

ভগবান জানেন, আমি এখন তোমার জন্য কিছুই করতে পারছিনে। আমি জানি এই মুহূর্তে তুমি নিজেকে কত অসুখী মনে করছ। আমি তোমার সংগে কিরকম নিকৃষ্ট ব্যবহার করেছি, তবে যদি কেউ ভালবাসে তবে শীঘ্রই তার মনের ক্ষত দূর হয়ে যায়, জানি তুমি আমাকে ভালবাস।

তুমি আমাকে ভালবেসেছ সেজন্য ধন্যবাদ, এটা আমার মনে একটা সুখস্মৃতি হয়ে গাঁথা থাকবে। তুমি যে সময় প্রকৃত বন্ধুর মত তোমার মন আমার কাছে খুলে ধরেছিলে, যখন তুমি আমার ভগ্নহৃদয়ে সমবেদনার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিলে, সে সময়টা আমি কখন ভুলব না। আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব, কখন একথাটা হৃদয় থেকে মুছবে না।

আমাদের আবার দেখা হবে, তুমি আমাদের দেখতে আসবে, তুমি আমাদের ত্যাগ করবে না। তুমি চিরকাল আমার বন্ধু। আমার ভাই হয়ে থাকবে। যখন আমাদের দেখা হবে, তুমি আবার আমার হাত ধরবে। ধরবে তো? তাহলে মনে করব যে তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, এবং আমাকে আগের মতই ভালবাস।

হে আমার প্রিয়বন্ধু, আমাকে তোমার মন থেকে মুছে ফেলো না, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। সামনের সপ্তাহে আমাদের বিয়ে, তাঁর মনে আমার প্রতি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর কথা [illegible] বলে আশা করি তুমি রাগ করবে না। আমি তাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব, আশা করি তাকে তুমি পছন্দ করবে।

ক্ষমা করে আমাকে মনে রেখো, ভালবেসো।

ইতি—

তোমার নাসতেঙ্কা

আমি বারে বারে চিঠিটা পড়লাম, আমার দুচোখ জলে ভরে গেল। হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ল, দুহাতে আমি মুখ ঢাকলাম।

মেরী ডাকল, স্যার চেয়ে দেখুন, চেয়ে দেখুন!'

—কি হয়েছে মেরী?

—কেন, আমি ছাদ থেকে সমস্ত মাকড়সার জাল ঝেঁটিয়ে ফেলেছি, এখন ঘরটা কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিয়ের [illegible] এই [illegible] পার্টি হতে পারে।

আমি মেরীর দিকে চাইলাম, হাসিখুসী মধ্যবয়সী তরুণী, কিন্তু আমি জানিনে কেন হঠাৎ মনে হল তার মুখের চামড়া কুঁচকান, চোখে কোন ঔজ্জ্বল্য নেই, আর কেন জানিনে মনে হল আমার ঘরটাও যেন মেরীর মত বুড়ো, জীর্ণ, বিবর্ণ। ঘরের সবকিছু কালো, এমন কি মাকড়সার জালগুলি পর্যন্ত ঘন হয়ে সব ছাদ ঢেকে রেখেছে। হয়ত জলভরা মেঘের পেছন থেকে সূর্য দেখা দিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেছে। তাই ঘরের সব শ্রীহীন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে অথবা আমার ভবিষ্যৎ নিরানন্দ জীবনের আভাস দিচ্ছে। এই মুহূর্তে মনে হল, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, পনের বছর ধরে এই জীর্ণ ঘরে বাস করছি, সেই একাকী জীবন, সেই মেরী ঝি'র পরিচর্যা, সুদীর্ঘ বৎসরেও যার কোন পরিবর্তন হয় নি।

কিন্তু নাসতেঙ্কা, তোমার বিরুদ্ধে আমি বিদ্বেষ পোষণ করব? তোমার উচ্ছল শান্তিময় সুখের পথে কালো ছায়াপাত করব? তাঁর তিরস্কারে তোমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নষ্ট করে আলোকের বদলে অন্ধকার দিয়ে তা ঢেকে দেব? তোমার হৃদয় তপ্ত অনুশোচনা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলব? তোমার আনন্দের মুহূর্তে হৃৎকম্পের সৃষ্টি করব? যখন তুমি তার সঙ্গে বিবাহের বেদীর দিকে হেঁটে চলবে, তখন তোমার কালো চুলে যে সমস্ত প্রস্ফুটিত ফুল লাগানো থাকবে তার একটাকেও আমি পিষে নষ্ট করব?

না, না, কখনো নয়—তোমার আকাশ চির নির্মল থাকুক, তোমার মুখের হাসি চিরদিন আনন্দে উজ্জ্বল থাকুক। আর একজনের নিঃসঙ্গ কৃতজ্ঞ হৃদয়ের যে মুহূর্তটি তুমি আনন্দে ভরে তুলেছিলে সে মুহূর্তের জন্য তুমি চিরসুখী হও।

দয়াময় ভগবান,—শুধু এক মুহূর্তের জন্য আনন্দ? মানুষের সমস্ত জীবনের জন্য এমন একটি আনন্দ-উজ্জ্বল মুহূর্ত কি প্রচুর নয়?

অনুবাদিকা—অমিতাকুমারী বসু

॥ সমাপ্ত ॥

যেখানে ডাক্তারের ভুল হয়েছিল

ডাক্তারের কাছ থেকে আপনি কী আশা করেন? সর্বদা হাসিখুশি, অক্লান্ত, আপনার সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, সবসময় ঠিক ঠিক রোগ নির্ণয়ে সক্ষম, এবং সবসময় নির্ভুল চিকিৎসা করতে পারঙ্গম?

ডাক্তারও মানুষ, এবং মনুষ্যোচিত ভুল তাঁরও হতে পারে, হয়ও।

বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ খবর বেরিয়েছিল—কী ভাবে অনেক বছর ধরে জনৈক রোগী নানারকম যন্ত্রণার কথা জানানো সত্ত্বেও তার ফুসফুসের কর্কট রোগ ধরা যায় নি। ঐ ভদ্রলোক আসলে দীর্ঘকালের 'হাইপোকনড্রিয়াক'; এবং এত ঘনঘন তিনি ডাক্তারের কাছে যেতেন যে, তার অবস্থার সূচনা পরিলক্ষিত হতে পারে নি। ক্লান্তি আর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ডাক্তারটি পরিণত গর্ভাবস্থা ধরতে অক্ষম হয়েছিলেন।

জনৈক ডাক্তারের বাড়িতে থাকত একটি মেয়ে, যে হঠাৎ সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে সুরু করল। কুঁচকিতে আঘাত লেগেছে বলায়, ডাক্তার তাকে ওষুধ দেন এবং ব্যাপারটা আর কেউ খেয়াল করে নি। পরে এমন অবস্থা হল যে, মেয়েটি বাঁচল না। এই ট্র্যাজেডি ঘটতই, কিন্তু রোগনির্ণয় সম্ভব হত আরও একটু সতর্ক [illegible]।

সাধারণত যে রোগীদের ডাক্তার খুব ভাল করে চেনেন---যেমন, নিজের কোন আত্মীয়---তাদের সুচিকিৎসা তার দ্বারা হয় না।

ঐ জার্নাল সিদ্ধান্ত করেছেন: স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, 'কনসালটিং রুম'-এ রোগীর অবস্থা সুষ্ঠুভাবে বুঝে নেওয়ার আগে তার নিজেকে এবং নিজের দুর্বলতাগুলো খুঁটিয়ে বুঝে সাবধান হওয়া উচিত।

শেষাংশ

ভুরিশ্রেষ্ঠ

এক অমাবস্যার রাত্রিতে বিধবা রাণী রাজধানী গড়ভবানীপুর থেকে প্রায় ১২।১৪ মাইল দূরে খাসডিঙ্গার (বাসুড়ী গ্রামের) নিজের প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দিরে পূজার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

সেনাপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাত্রির অন্ধকারে ওসমান গুপ্তভাবে মন্দিরে রাণীকে আক্রমণ করবার জন্যে অতি সন্তর্পণে বাসুড়ীর দিকে সসৈন্য অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু রাণীর মন্ত্রী সেনাপতির আচরণে সন্দিগ্ধ হয়ে পূর্বাহ্নেই রাণীকে গোচর করেন। রাণী তৎক্ষণাৎ বাসুড়ী থেকে চার মাইল দূরে ছাওনাপুর দুর্গের দুর্গাধিপতিকে সসৈন্য মন্দিরে উপস্থিত হতে আজ্ঞা দেন। সৈন্যরা এলে রাণী স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে পাঠান সৈন্যদের বেষ্টন করে ভীষণ বেগে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পাঠানদের মধ্যে বহু হতাহত হয় ও ওসমান অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন।

অক্‌বর রাণী ভবশঙ্করীর এই বীরত্ব শুনে তাঁকে 'রায়বাঘিনী' উপাধি দেন। (বঙ্গ-বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

এই বংশীয় রাজা নরনারায়ণের বহু কীর্তি এখনও ভুরশুটে বর্তমান। বহু দেবালয় ও পুষ্করিণী তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে বর্ধমানরাজ কীর্তি-চাঁদের ক্রোধ ছিল। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ যখন সস্ত্রীক তমলুকে বর্গভীমার মন্দিরে ছিলেন, সেই সুযোগে কীর্তিচাঁদ হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভুরশুট রাজ্য আক্রমণ করেন। হঠাৎ আক্রমণ করে একে একে দুর্গ অধিকার করেন ও অবশেষে রাজধানী গড়ভবানীপুর অবরোধ করেন। আক্রমণের সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ দ্রুত তমলুক হতে রাজধানী ফিরে আসেন---কিন্তু গড়-ভবানীপুর রক্ষা করতে পারেন নাই। মুর্শিদকুলী খাঁ এই ভুরশুট রাজ্য কীর্তি-চাঁদকে বন্দোবস্ত করে দিলেন।
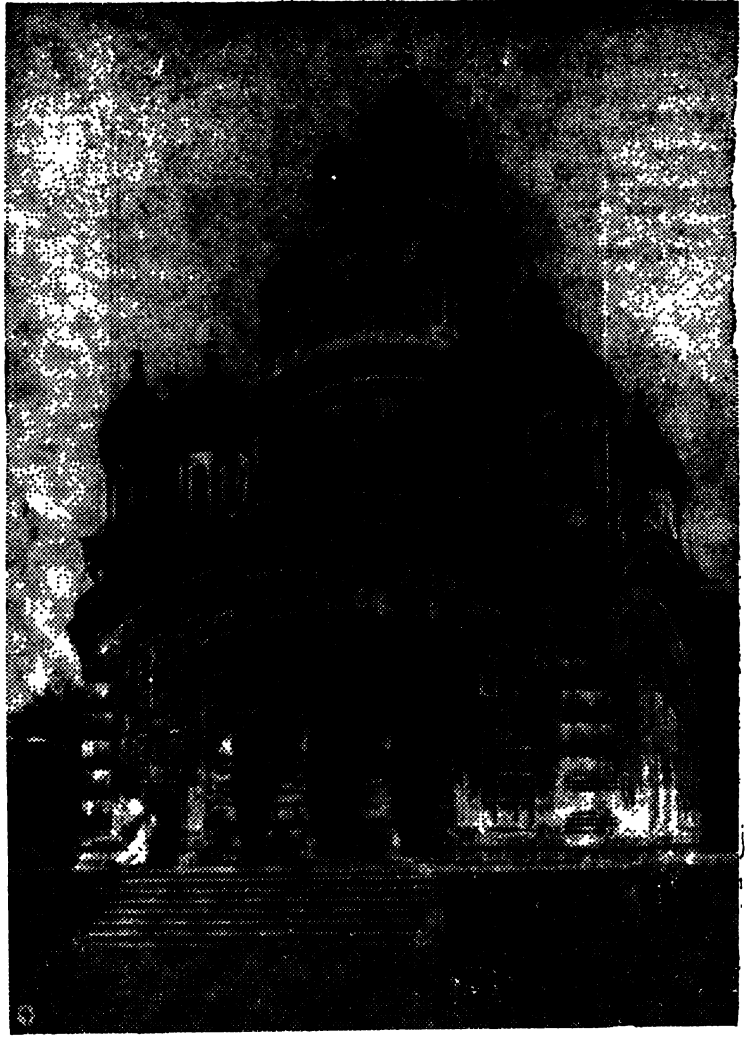
আনন্দভৈরবী মন্দির : সুখড়িয়া (হুগলী)

হুগলী

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজের রাজ্য মধ্যে ছাওনাপুর, নস্করডাঙ্গা, দোগেছে, পেঁড়ো ও গড়ভবানীপুর দুর্গ ছিল। এই পেঁড়োর গড়েই রাজার জ্ঞাতি নরেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র মহাকবি ভারত-চন্দ্রের জন্ম হয়।

প্রাচীন কীর্তি

বাসুদেব মন্দির---বাঁশবেড়িয়ার রাজা রামেশ্বর স্থাপিত ১৬৭৯ খৃস্টাব্দে। এই মন্দিরে নানা রীতিনীতি যানবাহন জাহাজ, দেবদেবী, কিন্নরকিন্নরী পশু-পাখী প্রভৃতি মন্দিরের ইষ্টক-ফলকে অঙ্কিত আছে।

মহিষমর্দিনী বা স্বয়ম্ভরা মন্দির---১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব কর্তৃক স্থাপিত।

হংসেশ্বরী মন্দির—রাজা নৃসিংহ দেবের পত্নী রাণী শঙ্করী ১৮১৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরটির ১৩টি চূড়া আছে। ইহা তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ প্রণালীতে গঠিত---ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, ইত্যাদি মন্দিরের ভেতরের সোপান। দেবী মূর্তি কুলকুণ্ডলিনী। পূর্বে এই মন্দিরে সরস্বতী পূজার দিন পড়ুয়াদের নাচ হত। নাটমন্দিরে সভা হত। অধ্যাপকদের মালা-চন্দন দিয়ে সংবর্ধনা করা হত।

চুঁচুড়া---এই গীর্জার প্রথম পাদরী ছিলেন তারাচাঁদ।

গোপীনাথ বিগ্রহ (কৃষ্ণনগর)---স্বামী অভিরাম প্রতিষ্ঠিত ১২১৯ সালে নির্মিত।

রাধাবল্লভ বিগ্রহ (কৃষ্ণনগর)---যাদবেন্দ্র চৌধুরী স্থাপিত।

ঘণ্টেশ্বর মন্দির (খানাকুল)---এর পাশে ছিল রত্নেশ্বর নদী, অভিরামের শাপে কানা নদী হয়।

রামমোহন রায়ের স্মৃতি-মন্দির---(রাধানগর) আগমবাগীশের পঞ্চমুণ্ডীর আসন।

রাজবলহাটে-- রাজবল্লভী দেবীর মন্দির, মায়ের দীঘি।

আঁটপুরে---রাধা গোবিন্দের মন্দির।

মহানাদে---জটেশ্বরনাথ শিবের মন্দির (যোগী সম্প্রদায়ের), ব্রহ্মময়ী মন্দির, হিন্দু-কীর্তির প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপ ও বহু মন্দির আছে। এখানে জীয়ৎ কুণ্ড ও বশিষ্ঠ গঙ্গা চন্দ্রকুণ্ডা, পাপহরণ পুষ্করিণী সাত সতীন পুকুর সুপ্রসিদ্ধ

কামারপুকুর---গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গড়মান্দারণের ভগ্নাবশেষ, তার কিছু দূরে শৈলেশ্বরের মন্দির। এই শিব-মন্দির পাঠান রাজত্বকালের। রঘুনাথের মন্দির। গোপেশ্বর শিব-মন্দির, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান।

মাহেশ---জগন্নাথ মন্দির।

তারকেশ্বর---তারকেশ্বরের মন্দির।

হুগলীতে--- ইমামবাড়া, কাজেম মল্লিকের বাগ

ব্যাণ্ডেলে---চার্চ।

গুপ্তিপাড়ায় — রামচন্দ্র মন্দির, চৈতন্যদেবের জোড়বাংলা মন্দির।

শেওড়াফুলিতে—নিস্তারিণীর মন্দির (রাজাদের প্রতিষ্ঠিত)।

বাক্‌সা—রঘুনাথের নবরত্ন মন্দির।

ত্রিবেণীতে — জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ, জাফর খাঁর সমাধি-স্তম্ভ।

সিঙ্গুরে — পুরুষোত্তমপুরের বিশা-লক্ষ্মী দেবীর মন্দির (১১৭৮), ডাকাতে কালী মন্দির, মনসা মূর্তি।

সুকড়িয়ায় (সুখাড়িয়া)—আনন্দ ভৈরবী মন্দির।

গড়ভবানীপুরে মণিনাথের মন্দির (৭৫০ বছর পূর্বে)।

বাঁশবেড়িতে---(বাঁশবেড়িয়ায়) ভুবনেশ্বর ও রঘুনাথের মন্দির, ভবানীদেবীর মন্দির।

বোড়তে---(চন্দননগর) বোড়াই চণ্ডী।

এ ছাড়া বহু লোকদেবতার অর্চনা হুগলী জেলায় হয়ে থাকে---যেমন---শীতলা, রক্ষাকালী, ওলাই বিবি বা ওলাই চণ্ডী, জগৎগৌরী, মনসা, খাদাই, বেহুলা, ঘণ্টাকর্ণ, অচলরায়, ধর্মরাজ। ধর্মরাজের কয়েকটি মন্দির আছে--বৈঁচী গ্রামের কাছে কোচমালি, বেতালায, বালেশ্বরপুরে, খানাকুলের নতিবপুরে, গোবাটি। জনকুমারী, মাকাল (জেলেদের দ্বারা পূজিত) বিশ্বকর্মা, পঞ্চপীর (মুসলমান মাঝিদের দ্বারা পূজিত), গোবিন্দরাজজী (বলাগড়ে), বিষহরি, বিশালক্ষ্মী, গন্ধেশ্বরী, সত্য-নারায়ণ, সদাচাঁদ পীর (হুগলী), আনন্দ সাহেব (আলি ইমাম সাহেব---বৈঁচীর কাছে বীরপুরে), মন্দ পীর (কোচ-মালি), বন মসজিদ (হুগলী), সাচাঁর ফকিরের দরগা (হুগলী) ইত্যাদি।

মেলা

শ্রীরামপুরে 'মাহেশের রথ'। এই এই মেলা প্রায় ১০দিন থাকে।

তারকেশ্বরে---শিবরাত্রি উপলক্ষে।

পাণ্ডুয়ায়--পাণ্ডুয়ার মেলা শীতকালে।

হুগলীতে ভাগীরথী-তীরে বারুণী মেলা বৈশাখী মেলা, যজ্ঞেশ্বর তলা।
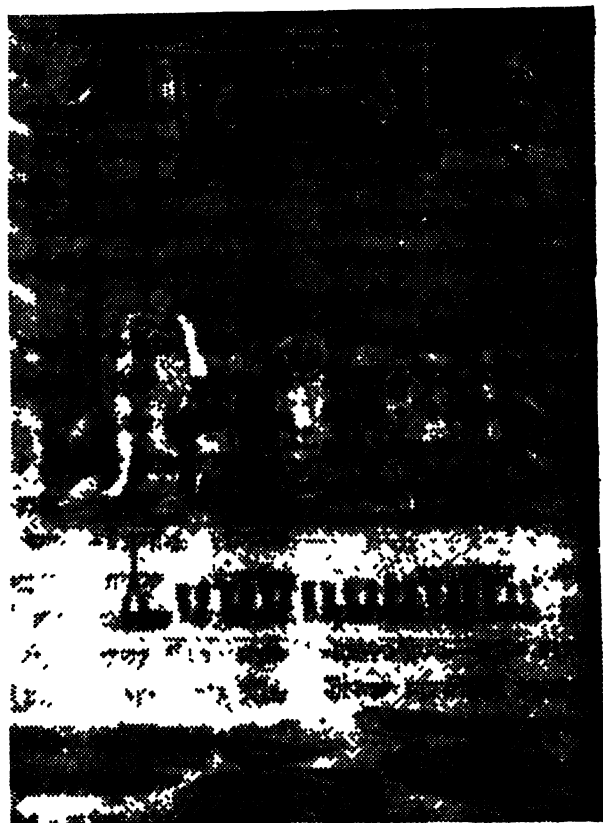
গোপীনাথ বিগ্রহ—কৃষ্ণনগর
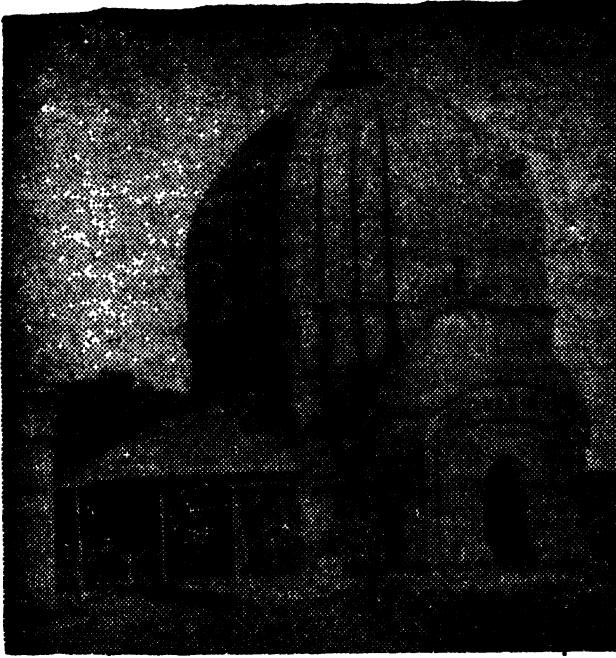
ঘণ্টেশ্বর মন্দির—খানাকুল

মহানাদের 'মানাদের জাত' মেলা শিবরাত্রি উপলক্ষে চন্দননগরে রথের মেলা।

গুপ্তিপাড়ায় রথের মেলা। ইত্যাদি।

শিল্পকেন্দ্র

এই জেলায় সূক্ষ্ম তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত বেগমপুর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, বেগড়ী, হরিপাল ধনেখালি। আঁটপুর, রাজবলহাট প্রভৃতি স্থানগুলি। শ্যামপুর, খানাকুল, বালিগ্রাম, বদনগঞ্জ প্রভৃতির বাজারগুলি সুপ্রসিদ্ধ। এখানে পেতলের বাসন, রেশম, তসর, সূক্ষ্ম তাঁতের কাপড়। কাঠের আসবাব প্রভৃতি প্রচুর আমদানি হয়। হুগলীর বালি ও ত্রিবেণী কাগজের কল আছে ইত্যাদি।

প্রত্নতত্ত্ব গবেষণাগার

এ জেলায় মাত্র দুটি স্থানে প্রত্নবস্তুর গবেষণাগার আছে—একটি শেওড়াফুলিতে সারদাচরণ মিউজিয়াম অপরটি রাজবলহাটে অমূল্য প্রত্নশালা।

বাঙলায় প্রথম

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে মিশনারীরা শ্রীরামপুরের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। উইলকিন সাহেবের শিষ্য পঞ্চানন কর্মকার কেরী সাহেবের ছাপাখানায় অক্ষরের ছেনি তৈরী করেন। তাঁর জামাই মনোহরও এই ছাপাখানায় মুদ্রাক্ষর তৈরি করেন।

হুগলীতে এণ্ড্রুস নামে একজন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন—এই মুদ্রাযন্ত্রে ম্যাথেনিয়াল ব্রাসি হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ বেদ' (২য় সং) বাঙলা দেশে শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপা হয়।

প্রথম কাশীরাম দাসের মহাভারত শ্রীরামপুরে পাদ্রী মার্শম্যান সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

চন্দননগরে গিরেটি বা গৌরহাটি সমৃদ্ধশালী স্থান। সাহেবরা এই জায়গার সৌন্দর্যের সঙ্গে ভেনিসের সৌন্দর্যের তুলনা করতেন। এই গিরেটিতে তখন অভিনয় হত। এইখানে একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়েছিল। এটিই বাঙলা দেশের দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ।

গ্রীষ্মকালে যে পাখার ব্যবহার হয় তার আবিষ্কার হয় চুঁচুড়ায় এক ডাচ শাসনকর্তা কর্তৃক। ১৭শ শতাব্দী তিনি ডাচ ব্যারাকে যখন গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তখন প্রথমে একখানা খবরের কাগজকে ভাঁজ করে হাওয়া খেতে লাগলেন, তার থেকে হাতপাখার রেওয়াজ হয়। (জন্মভূমি, ১২৯৮)।

বাঙলা দেশে খ্রীস্টানদের প্রথম গীর্জা পর্তুগীজ ভীলালোবোস কর্তৃক ১৬৯৭ সালে ব্যাণ্ডেলে স্থাপিত হয়।

বাঙলা দেশে ইংরেজদের প্রথম বসতি হুগলী শহরে ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে। এই বছরেই এখানে তাঁর ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। Ormé's Hist. of Hindustan Vol ii P. 8-9.

মোগল আর ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রথম সাংঘাতিক বিবাদ বাধে হুগলী শহরে ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে।

ভারতে কলে কাগজের উৎপাদন হয় ১৮৭০ সালে হুগলী নদীর তীরে বালির 'রয়েল পেপার মিলে।'

হুগলী জেলার গৌরব

রাজা রামমোহন রায় (খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (আরামবাগ মহকুমার নিকটবর্তী কামারপুকুর গ্রামে), তান্ত্রিক রামদেব ভট্টাচার্য (ভূরিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রাজবংশের গুরু ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের গুরু), শ্রীপাদ অভিরাম স্বামী (খানাকুল-কৃষ্ণনগর), ঋষি অরবিন্দ ঘোষ (কোন্নগর), কেবলমাত্র এঁদের আবির্ভাবেই হুগলী জেলা পুণ্য ও ধন্য হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, পণ্ডিত ও সাহিত্যিক

হুগলীতে— হুগলীর শেষ ফৌজদার নবাব খাঁ জহান খাঁ, 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেনের' গৌরী সেন, ভিখারীদাস মোহান্ত, চতুর্দশ বাবাজী, (আকড়াবাড়ী), নায়েব নাজির ভৈরবচন্দ্র মুখার্জী, আনন্দমোহন বসু (কলকাতার সদর কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার) আইনবিদ শিবচন্দ্র দে, রায় ঈশানচন্দ্র মিত্রবাহাদুর, ডাঃ বদনচন্দ্র চৌধুরী, দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী রায়বাহাদুর, বাংলার অন্যতম আদি নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ (বাবুগঞ্জ), জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রায়বাহাদুর, বলরাম মল্লিক, হাজি

ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মলীন, ভক্ত ও সাহিত্যিক দিগম্বর বিশ্বাস (ব্যাণ্ডেল) প্রমুখ।

ত্রিবেণীতে—পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, মাধবাচার্য।

খন্যানে—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

চুঁচুড়াতে — সঙ্গীতজ্ঞ রাম শীল, ক্ষেত্রনাথ শীল (রাজাবাবু), জগমোহন শীল, লালবিহারী দত্ত, মাধবচন্দ্র দত্ত, মতিলাল শীল, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, প্রাণকৃষ্ণ লাহা, অম্বিকাচরণ লাহা, হৃষীকেশ লাহা, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, দীননাথ ধর, নীলরতন হালদার, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

চন্দননগরে— ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (ফরাসী কোম্পানীর দেওয়ান), অগ্নিযুগের কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ রায়, মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়, নারায়ণচন্দ্র দে, অরুণচন্দ্র দত্ত, ভবতোষ ঘটক, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস হালদার, প্রাণতোষ ঘটক, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (হিতবাদী সম্পাদক), বসন্তলাল মিত্র (সঙ্গীতজ্ঞ), ধীরেন্দ্রলাল ধর প্রমুখ।

শ্রীরামপুরে —বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (চাতরা), রায়বাহাদুর মহেশচন্দ্র লাহিড়ী।

শেওড়াফুলি — হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

কোন্নগরে — নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অবিনাশ ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রাজা দিগম্বর মিত্র, ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।

উত্তরপাড়ায় — রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পেঁড়োগড়ে—রাজীবলোচন রায় (কানাপাহাড়), কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর ও রাধানগরে—যাদবেন্দ্র চৌধুরী, রাজা রামমোহন রায়, রমাপ্রসাদ রায়, রত্নগর্ভ আগমবাগীশ, কণাদ তর্কবাগীশ, রামনারায়ণ মুন্সী, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সর্বাধিকারী, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজকুমার সর্বাধিকারী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, বিপিনবিহারী ঘোষ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বিশ্বম্ভর পাইন, মন্মথনাথ ঘোষ প্রমুখ।

হরিপালে—রামজয় বিদ্যাভূষণ, গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কার, পাঁচালীকার রসিকচন্দ্র রায়।

পানিসেওলাতে — জজ সারদাচরণ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র।

বাঁশবেড়িয়ায় — রাজা নৃসিংহ দেব রায়মহাশয়, কুমার মুনীন্দ্র দেবরায়মহাশয়, বেভাঃ প্যারীমোহন রুদ্র, শ্রীধর কথক, মহিলা-কবি ধরেন্দ্রবালা সিংহ, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমার শরবিন্দুনারায়ণ রায়।

বদনগঞ্জে—আউলিয়া মনোহর দাস।

জিরাট-বলাগড়ে—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায়, মোহিতলাল মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বড়াগ্রামে—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেটের' সম্পাদক গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য।

বেগমপুরে — মহিলা সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী।

গুপ্তিপাড়ায় — সঙ্গীতজ্ঞ কালী মির্জা (মুখোপাধ্যায়), বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বাগ্মী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

সিঙ্গী গ্রামে — কবি কৃত্তিবাস ও কৃষ্ণকিঙ্কর।

মলয়পুরে — মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ।

ইলছোবা - মণ্ডলাই গ্রামে—রামগতি ন্যায়রত্ন।

দেবানন্দপুরে — কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গুলিটায় — কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৈকালায় — চন্দ্রনাথ বসু, চণ্ডীচরণ স্মৃতিরত্ন।

উলাগড়ে — কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন।

সরিষাগ্রামে - কবি নগেন্দ্রনাথ সোম।

পালেড়া গ্রামে — মহিলা-কবি নগেন্দ্রবালা মুস্তৌফী।

পোলাগ্রামে—নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য।

গোপীনাথপুরে - — কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

গুরুপে — প্রসিদ্ধ গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মুগাগ্রামে — পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

বাবাগুা গ্রামে — যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সেনহাটিতে—বিশ্বম্ভর পাণি।

পাউনানে — নীলমণি দে।

জনাইয়ে — পণ্ডিত শিবপ্রসাদ গাঙ্গুলী, মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদক কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, (জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী), অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার।

আঁটপুরে — শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ)।

গরলগাছায় — উকীল উমাকালী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সংরাগ

সংরাগ অবাধ্য পশুর পাল, সুতরাং এটি আটকান অবশ্য কর্তব্য—ধর্ম, যুক্তি, কাণ্ডজ্ঞান ইত্যাদির সহায়তায়। এভাবে সংযত হলে সংরাগ অনুগত ভৃত্যবৎ উপকারী; কিন্তু ছাড়া পেলে, আস্কারা পেলে এটি মানুষের প্রভু হয়ে ওঠে। অত্যন্ত বন্য প্রভু। এবং মানুষকে তা উদ্দাম, বলগাহীন ঘোড়ার মত অসংখ্য অসুবিধের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এই চরম বিরক্তি ছাড়াও এর ফলে মানসিক শান্তি সুদূরপরাহত হয়ে যায়। —স্যার এস হেল

মায়াদ্বীপের নরখাদক

মন্মথনাথ সরকার

মহালয়ার রাত্রি। আহার শেষ করে মুখ ধুচ্ছি।

একটা চিৎকারের শব্দ কানে আসছে, বাঘ বোটে বসে আছে। শীঘ্র বন্দুক নিয়ে আসুন।

এসকল সংবাদে আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি, কাজেই কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্দুক, টর্চ ইত্যাদি নিয়ে ডিঙ্গীতে রওনা হলাম।

চিৎকারকারী বোটের নিকট গেলে তারা বলল, ঐ সামনের বোটে বাঘ। সেখানে গেলে তারা বলে, ঐ সামনের বোটে।

এইভাবে মাইল দুই অগ্রসর হয়ে একটা খালের মুখে একটা মেদিনীপুরের বোটের উপর টর্চ ফেললে তারা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। কাছে গিয়ে দেখি সর্বনাশ হয়ে গেছে এই বোটেই।

মাঝি ও তার ছোট দুই ভাই কাজকর্ম সেরে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝি ছিল হালটার কাছে। তার দুই ভাই ও আর একটা লোক পাল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল সামনের দিকে। বাঘ জল সাঁতরে এসে বোটে উঠেছে। মাঝির কাছ দিয়ে গিয়ে তার মেজো ভাইটাকে নিয়ে নীচে পড়েছে। মাঝি নীচে পড়ার শব্দে জেগে উঠে দেখে এই কাণ্ড। আমাদের দেখে ওরা একেবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আমাদের পক্ষে এ এক ভয়ানক বিপদের কথা। সুন্দরবনে সকলে নৌকায় বাস করে। কাজকর্ম সেরে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ে নদীর মধ্যে। ওখান থেকে যদি বাঘে নেয় তবে? একেবারে সমুদ্রের কাছে এই জঙ্গল। তখন সমস্ত জঙ্গলে জল। আমরা অসহায়, জঙ্গল তেমনি ঘন, হেতাল ও ঝামটি গরান। এ রাত্রে আর কোন উপায় নেই। অনেকগুলি ফায়ার করলাম। আমাদের লোকের সাহায্যে বোটটাকে মাঝ নদীতে নঙ্গর করলাম। অন্যান্য বোটের লোকদের সতর্ক করে ফিরে ফিরে এলাম।

পরদিন অগ্রবর্তী দলকে অগ্রসর হতে বলে আমি আরো লোকজন সঙ্গে নিয়ে ওখানে উপস্থিত হওয়া-মাত্র দেখি, নূতন করে ক্রন্দনের রোল উঠেছে। অগ্রবর্তী দল আমার অপেক্ষা না করে লাস আনার জন্যে জঙ্গলে ঢুকেছিল। ওদের মধ্যে একজনকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে।

এ অত্যন্ত বিপদের কথা। এ বাঘ জলেস্থলে সমান অভিযান চালাতে ওস্তাদ। দুই দুইটা লাস জঙ্গলে রেখে এতগুলি লোকের কাজ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমি জঙ্গলে নেমে পড়লাম। এমন সাক্ষাৎ যমের মুখে হুকুম করে কাউকে ঠেলে পাঠাব এমন দুর্বুদ্ধি আমার কখনও ছিল না। আমি কিছুদূর অগ্রসর হলে দেখি দুটি লোক আমার পিছু নিয়েছে। তারা বাপ বেটা, যেমন লম্বা তেমনি বলিষ্ঠ। দা আর কুড়াল তাদের সম্বল।

তারা কাছে এসে বলল, বাবু, আমরা মাতঙ্গিনী হাজরার গোষ্ঠীর লোক। ইংরেজের বুলেটে আমাদের ভয় ধরাতে পারে নি। এ শিয়াল আমাদের কাছে তুচ্ছ। আপনি চলুন, আমরা আপনার পিছনে আছি।

তারা কিন্তু চলল আমার আগে আগে। জঙ্গল কেটে অগ্রসর [illegible] জন ও আরো কয়েকজন লোক এসে পড়েছে। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে দ্বিতীয় লাসটা পাওয়া গেল। গলা দিয়ে পড়া টাটকা রক্ত কেবল জমাট বেঁধে উঠেছে। একটা গাছে বেঁধে ওকে কয়েকজন নিয়ে অগ্রসর হলো। আমি পা দিয়ে রক্তটা কাদার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে ও এসে এখুনি রক্তটা না খেতে পারে। এমন সময় একেবারে ৪।৫ হাত দূরে বাঘ গর্জন করে উঠল। আমার বন্দুকের ঘোড়া দুটি উঠানই ছিল, ফায়ার করলাম, একটা জঙ্গল ভাঙার শব্দ কানে এলো।

শিকারী বাঘ কখনো শিকারের কাছে এসে গর্জন করে না। ও বোধহয় আমার আপাদমস্তক খাকীমণ্ডিত দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল, কারণ ও যত লোক এ এলাকায় কোতল করেছে তার মধ্যে খাকীমার্কা কেউ ছিল না, অথবা একদিন জঙ্গলরাজকে অপমান করেছিলাম বলে আমাকে একটা ধমক দিয়ে গেল। কিন্তু বিপদটা যে কত বড় বিপদ তা ভুক্তভোগীরাই জানেন।

বেলা পড়ে গিয়েছিল। লাসটা একটা বড় বোটে এনে পাহারাধীনে রাখা হলো। পরদিন অন্য লাসটা খুঁজে বের করা হলো। তার পাঁজরার হাড় কয়টি আর মাথাটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। দুটি লাস একত্রে বেঁধে বন্দুক পাতা হলো। রাত্রে বাঘও এলো। শব্দ হলো। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

সকালে দেখি বাঘ নেই। আছে শুধু রক্তের ছড়াছড়ি। দেখা গেল বাঘটা হামাগুড়ি দিয়ে সুতার নীচ দিয়ে ঢুকে লাস ধরে টান দিয়েছিল। গুলি লেগেছে পিছনের দিকের বাঁ পা'টায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো, বাঘ পাওয়া গেল না।

ছড়া

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

বউ হবে জাপানী
পরনেতে কিমনো,
পল্লব-কাঁপানি
আঁখি দুটি ঝিমনো।
শালী সব কিশোরী
—ফরাসী বা স্পানীয়,
দাসী কিছু মিশরী
কিছু খোরাসানীয়।
খানসামা চৈনিক্
প্রহরীরা গোরখা
রিটায়ার্ড সৈনিক
সকলেরই বোরখা।

বউ হবে জাপানী
আজ থাকি রোমেতে
ইলিশের জাপানি
কাল খাই হোমেতে।
খরচেতে দমিনে
রিয়াসত ইরাকে
তেল তার জমিনে
আলাদিনী চিরাগে
রয়ালটি টাকাটা
আসে কোটি ডলারে
আয়কর না-কাটা
বাহুল্য বলারে।

বউ হবে জাপানী
(হ'লে পরে জানিও—
সেরে যাবে হাঁপানি,
দু-চোখের ছানিও!)
প্রাসাদটা ভেনিসে,
স্যাটো প্যারি, ভিয়েনা;
প্রেসিডেন্ট টেনিসে
মোটা চাঁদা দিয়ে, না!
ভিলা কিছু বাহারে
শহরের বাইরে
রিভিয়েরা, পাহাড়ে
—সে কি আর নাই রে?

বউ হবে জাপানী
(নাম, ধরো, কাগামা!
হাসে সুরে মা-পা-নি,
কথা বলে গা-পা-মা!)
থাকে প্রেম আবেশে
সারাদিন মুগলী
স্বামী খেলে খাবে সে
নয় রবে উপোসী।
স্বামী গেলে আড়ালে
খুলে ফ্যালে কেশ বেশ,
ফিরে এসে দাঁড়ালে
...STOP PRESS
..STOP PRESS!

STOP PRESS
এক বউ জাপানী
(সাবিত্রী সাধ্বী!)
হেরে গিয়ে লুডোতে
ফিরে গেছে জাপানেই
ভেঙে দিয়ে জুডোতে
সোয়ামির হাড্ডি!

যে দুটি বোটের লোক পড়েছিল তারা খালি বোট নিয়েই দেশের উদ্দেশে পাল টেনে দিল। আর একবার কাঁদতে কাঁদতে নদীতীরে ভাইদের সমাধিস্থানে পুঁতে রেখে গেল দুটি দাঁড়—তাতে ঝুলান ছিল একটা বিছানা-বালিস ও গামছায় বাঁধা কিছু চাল। ঐটা লোক পড়ার নিদর্শন। লোকচক্ষুর অন্তরালে এরকম নিদর্শন এ অঞ্চলে অনেক দেখা যায়।

আর কেন বাঘের অত্যাচার হয় নি। দেড় মাস পরে দেখা গেল মায়াদ্বীপ নদীর চরে একটা বাঘ জলে নেমে পাড়ি জমিয়েছে। কাদার উপর দাগ পড়েছে তিনটি বড় বড় পায়ের। পিছনের বাঁ দিককার পা-টার কোন ছাপ পড়ে নি।

সাহিত্য পরিচয়

বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় /

বুকল্যাণ্ড, প্রা: লি:

আলোচ্য গ্রন্থটি গবেষণামূলক প্রাবন্ধিক সাহিত্যের অন্তর্গত। মুখ্যত বৈষ্ণব সাহিত্য জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের জন্য রচিত হলেও এ গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু জনমাত্রকেই যথেষ্ট আনন্দ দান করবে। গ্রন্থটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রথম অধ্যায়টি পদাবলীর উপকরণবিষয়ক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা পদাবলী ধারার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী এবং ভক্ত দার্শনিকগণ প্রদত্ত তাঁর আবির্ভাবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বিধৃত। তৃতীয় অধ্যায়ে ভক্ত ও পণ্ডিত গোস্বামী গণের হাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের যে রূপটি ধরা পড়েছে, তারই সম্যক পরিচয় প্রদত্ত। চতুর্থ অধ্যায়ে চৈতন্য-পূর্ব যুগের দুই কীর্তিমান পদাবলীকার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ছয়টি অধ্যায়ের মাধ্যমে বৈষ্ণব পদাবলী শাস্ত্রের এক পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য পরিচয় দিতে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক। বাঙালীর প্রাণসত্তা কীর্তন, সঙ্গীতের অপরাপর শাখাকে যতই কেননা সাধুবাদ জানাক, বাঙালীর অস্থিমজ্জায় মিশে আছে কীর্তনের রস, কাজেই এ রচনাকে যে বাঙালী পাঠক সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---নীলরতন সেন, প্রকাশক---বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬, দাম---বারো টাকা।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান /

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স, প্রা: লি:

সেকালের রচনা হিসাবে চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের আবির্ভাবের কিছু পরেই সম্ভবত এই গ্রন্থটি রচিত হয়, অথচ লেখক সুকৌশলে রচনাটিকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং তাতে সফলকামও হতে পেরেছিলেন। বলা বাহুল্য টেকচাঁদের ব্যঙ্গবিধুর দৃষ্টি তাঁতে অনুপস্থিত; তাঁর চোখ সরসমনা পর্যবেক্ষকের, তার পরিচয় আঁকা রয়েছে উপাখ্যানান্তর্গত পল্লী-চিত্রগুলিতে ও মানব-চরিত্রের খণ্ডগুলিতে। বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভিকপর্বের রচনা হিসাবে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের' ভাষাও যথেষ্ট সুপরিণত। এই বিস্মৃতপ্রায় রচনা ও তার রচয়িতাকে নতুন করে পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করে প্রকাশক যথেষ্ট সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন ছাপা ও বাঁধাই ভাল। সম্পাদনা---শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, প্রকাশনা---জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, দাম---ছয় টাকা।
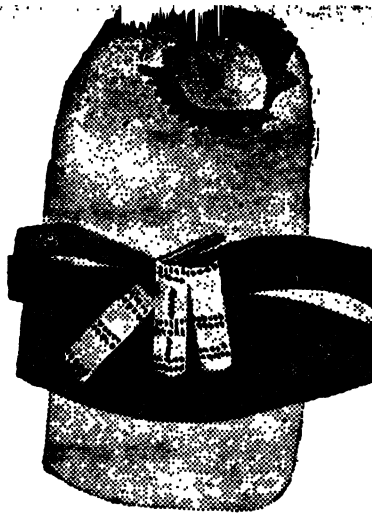
Art Today / USIS

আধুনিক শিল্পকলাসম্বন্ধীয় এই বিরাট গ্রন্থে, বহুবিধ প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। চলমান জীবনের সঙ্গে শিল্পকলার অঙ্গাঙ্গী যোগ রক্ষা করাই যে শিল্পের মূল উদ্দেশ্য এ সত্য সপ্রমাণিত বর্তমান গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে। বিজ্ঞানের মত শিল্পের ক্ষেত্রেও যে কালক্রমে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়ে আসছে, একথা সহজেই বোঝা যায় গ্রন্থটি পাঠ করলে এবং গ্রন্থের লেখকত্রয়ীর আন্তরিক প্রযত্নে তাঁদের বক্তব্য সহজেই মর্ম স্পর্শ করে। সুন্দর সুন্দর আলোকচিত্রের সহায়তায় গ্রন্থোক্ত বিষয়বস্তুকে অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে; বস্তুত শিল্পকলা বর্তমানে যে কতটা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেচে, সে সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন একটি ধারণার অবকাশ ঘটে গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে। প্রচ্ছদ সুদৃশ্য, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। লেখকত্রয়---রে ফকনার, এডউইন জিগ্‌ফীল্ড ও জেরাল্ড হীল। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশ্যন সার্ভিসের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৩।

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ /

ভারবি

আধুনিক সাহিত্যের মাপকাঠিতে রবীন্দ্রসাহিত্য কিভাবে বিচার্য, আলোচ্য গ্রন্থে সে সম্বন্ধে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলে থাকেন তার মোট বক্তব্য হল এই যে, রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তা বড় স্পষ্ট ও সহজ, অর্থাৎ কিনা রবীন্দ্রনাথের ভাষা প্রায় গদ্যের মত সহজ ও ঋজু, সব ক'টি শব্দ তার অভিধাযুক্ত, সব কটি বাক্যের মানে বোঝা যায় সহজে ও অল্পায়াসে। আধুনিকদের আরেকটি জিগির হল এই যে, জগতের অশুভ কদর্য বীভৎস রূপটা রবীন্দ্রনাথের চোখে নাকি ঠিকমত ধরা পড়ে নি, সোজা কথায় তিনি নাকি সঠিকমাত্রায় বাস্তবসচেতন নন। আলোচ্য রচনায় এই দুটি বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলো

সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন লেখক। আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবগত বিরোধ কোনকালেই নেই, একথা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সুন্দরভাবেই প্রমাণ করেছেন লেখক। রচনায় গভীর চিন্তাশীলতা ও মননের স্বাক্ষর আঁকা। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক গ্রন্থের ভাণ্ডারে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রকাশক—ভারবি, ২৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—আট টাকা।

চারঙুয়ারা / উর্বশী

আলোচ্য উপন্যাসে দেহপসারিণী কয়েকটি নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বময় জীবন-চিত্র তুলে ধরেছেন লেখিকা। কামিনী, লক্ষ্মী, সুমিতা ও শিখা, পরের মানুষকে সান্নিধ্য দেওয়াই যাদের পেশা, তাদের নেপথ্য জীবনে যে লুকানো থাকে কত হতাশা; কত বেদনার ইতিহাস—তা কেই বা শোনে কেই বা জানে; তবু তারা বলতে চায়, তিলে তিলে যে অপমৃত্যুকে এরা এবং এদের মত আরো অনেকেই বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে একবার একটি ক্ষণের জন্যও সেকথা জানাতে চায় সোচ্চারে। লেখিকার আন্তরিকতায় তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট প্রাণস্পর্শী হয়েই ফুটে উঠেছে। নারী হয়েও নারীজীবনের সমস্ত সার্থকতা থেকে বঞ্চিতা এই দুর্ভাগিনীদের উপর মমতায় ভরে ওঠে পাঠক-অন্তর। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা—রাণু ভৌমিক, প্রকাশনায়—উর্বশী, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭, দাম—তিন টাকা।

আলোর ইসারা / গ্রন্থপীঠ

দেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে একটি বিয়োগান্ত কাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখিকা। মনে হয় দেশের পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছেন লেখিকা এবং উপন্যাসোক্ত চরিত্র-গুলির মাধ্যমে সেই ভাবনাকেই মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন; কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ, লেখনীর যে পরিণতি থাকলে এ ধরণের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে তাঁতে তা নেই। দুর্বল লেখনীর প্রসাদে কাহিনী আগাগোড়া সামঞ্জস্য-বিহীন ও ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে, রাজ-নৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে উপন্যাসের উপকরণ মিশিয়ে যে ককটেল তিনি প্রস্তুত করছেন, তা স্বাদে যেমন ঘোলো তেমনি দুষ্পাচ্য। চরিত্রচিত্রণেও তেমন কোন পারঙ্গমতার পরিচয় নেই তবু নায়িকা বেলার চরিত্রটির মাধুর্য মন টানে। আঙ্গিক মনোরম। লেখিকা—শিপ্রা দত্ত, প্রকাশনা—গ্রন্থপীঠ, ২০৯ বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬, দাম—সাড়ে সাত টাকা।

ভ্রমণ কাব্য—পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা

ভ্রমণবিষয়ক এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির প্রথমবর্ষীয় তৃতীয় সংখ্যাটি হাতে পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি। নানা কারণেই এই পত্রিকাটি উল্লেখ্য, প্রথম ও প্রধান কারণ হল এই যে, ভ্রমণ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থাদি থাকলেও কোন নিয়মিত সাময়িকপত্রের একান্ত অভাব। আলোচ্য সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। ভ্রমণের অভ্যাস ঘরকুনো বাঙালীর বড় একটা নেই, কিন্তু মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন প্রয়োজনীয় ঔষধও আর নেই। এ জাতীয় সাময়িকপত্রের আত্ম-প্রকাশকে সেজন্যই বিশেষ সুফলপ্রদ মনে করাটা অসঙ্গত নয়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। সম্পাদক—মনোজ দাস, ১১৭।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—এক টাকা।

On the, Origin of the Namasudras

নমশূদ্র সম্প্রদায়ের আদি ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন লেখক। বাঙলার এই অন্যতম বৃহৎ সম্প্রদায় যে সত্যই নীচবংশজাত নয়, এই কথাটাই সপ্রমাণিত করতে চেয়েছেন লেখক। আলোচনা প্রসঙ্গে নানা নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন তিনি—যা যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগায়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—নীরদ-বিহারী রায়, বি-এ, এল এল বি, প্রকাশক—কীর্তি পাবলিশিং কনসার্ন, ৬৭।এ।২, ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা-৮, দাম—এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

এক্ষণ / এক্ষণ কার্যালয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক দ্বিমাসিক এই সাহিত্যপত্রটির এটি ষষ্ঠবর্ষীয় প্রথম সংখ্যা। বাঙলা দেশে বিশুদ্ধ সাহিত্য-রসের প্রতি বাঙালী পাঠকের মন যে ক্রমেই অনুকূল হয়ে উঠছে, এ ধরণের সাময়িকপত্রের প্রচার ও প্রসারে সেটাই অনুভবগম্য হয়। আলোচ্য সংখ্যায় কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করেছে, যেগুলির মধ্যে যথেষ্ট সুচিন্তিত মননের আভাস পাওয়া যায়। পুরানো বিস্মৃতপ্রায় রচনা 'কলিদাস' কমলাদাসকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে, এই সাময়িক-পত্রের কর্মকর্তারা চিন্তাশীল বোদ্ধা পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হলেন। প্রচ্ছদ সুদৃশ্য, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। সম্পাদনা—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য, প্রকাশনা—এক্ষণ কার্যালয়, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, দাম—এক টাকা।

ম্যাজিক-ম্যাজিক / ইন্দ্রজাল পাবলিকেশন

বিশ্বখ্যাত যাদুকর পি সি সরকারের সুযোগ্য পুত্র জুনিয়ার পি সি সরকার বা শ্রীপ্রদীপচন্দ্র সরকার লিখিত, যাদু-বিদ্যা সম্বন্ধীয় এই গ্রন্থটি হাতে পেয়ে

থাকলেই খুশী হয়ে উঠবেন। বিজ্ঞানের স্নাতক এই তরুণ যাদুকর ইতিমধ্যেই যাদুবিদ্যার আসরে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন আপন প্রতিভাবলেই। বর্তমান গ্রন্থে যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক সম্বন্ধে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত, কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করে তোলার পর, ছোট ছোট অথচ আকর্ষণীয় কয়েকরকম ম্যাজিকের খেলার রহস্য ফাঁস করেছেন লেখক, তাঁর বর্ণনভঙ্গী এত চমৎকার যে অল্পায়াসে বা অনায়াসেই খেলাগুলির প্রদর্শন-ভঙ্গী আয়ত্ত করে নিতে সক্ষম হবেন যে-কোন জিজ্ঞাসু পাঠক। ম্যাজিক সম্বন্ধে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রই যে এ গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ, আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। লেখক---যাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) প্রকাশনা---ইন্দ্রজাল পাবলিকেশন, ২৭৬।১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-১৯, দাম---পাঁচ টাকা।

সারস্বত / সারস্বত প্রকাশনী

আলোচ্য সাহিত্যপত্রটি হাতে পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি, প্রথম শ্রেণীর একটি সাহিত্যপত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার বীজ এতে উপস্থিত। শিল্প সাহিত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা ও সঙ্গীত এ সবেরই সুষ্ঠু আলোচনা যে এর মাধ্যমে প্রকাশ পাবে, মুখবন্ধে এই পত্রিকার কর্মকর্তারা সে আশ্বাস দিয়েছেন এবং বর্তমান অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় চিত্রকলা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধও প্রকাশ করেছেন। আরও কয়েকটি উল্লেখ্য রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটার মধ্যে প্রথম ও প্রধানতম হল---'প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে' শীর্ষক রচনাটি, যা লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। আমরা এই সাহিত্যপত্রটিকে সাদর স্বাগত জানাই। আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। সম্পাদক---দিলীপকুমার গুপ্ত, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশনা---সারস্বত প্রকাশনা, ৬, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১, প্রতি-সংখ্যা---এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কলকাতা / কলিকাতা ভবন

সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজবিষয়ক এই মাসিক সংকলনটি কিছুটা বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। আলোচ্য সংখ্যায় সাম্প্রতিককালের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকারের রচনা করেছে। আত্মপ্রকাশ প্রবন্ধের মধ্যে 'উনিশ শতকের নব জাগরণ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা এই সংখ্যার সবচেয়ে মূল্যবান রচনা, এই কবিতার মাধ্যমে রোমান্টিক কবি বুদ্ধদেবকে আবার যেন আমরা নতুন করে আবিষ্কার করি। সম্পাদনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর বর্তমান। প্রচ্ছদ আধুনিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। সম্পাদক---জ্যোতির্ময় দত্ত, প্রকাশনা---কবিতা ভবন, ২০২, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯, দাম---এক টাকা।;

সারস্বত

একটি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। অভিজাত্যসম্পন্ন পত্রিকাটি চোখে পড়ার মত। যেমন এর বহিরাবরণ, তেমনি অন্তর। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ যথেষ্ট মূল্যবান। তাছাড়া অনূদিত কবিতা রয়েছে কিছু। আছে গল্প একটি এবং স্থাপত্য ও শিল্প সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে। লিখেছেন ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী, প্রভাতকুমার গোস্বামী, চিত্ত ঘোষাল, তরুণ সান্যাল, অরুণাচল বসু, অশোক ভট্টাচার্য, হারানচন্দ্র নিয়োগী। সম্পাদনা করেছেন: অমিয় কুমার ভট্টাচার্য। দাম---এক টাকা। ২০৬, বিধান সরণী, কলি-৬ থেকে প্রকাশিত। আমরা পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জীবনের ঘূর্ণি ঝড়ে / রামলাল পাবলিশিং

স্নুতপা / ডি লাইট বুক কোং

অনুর্বর মৃত্তিকা / ভারত বুক এজেন্সি,

উপরোক্ত তিনটি উপন্যাস সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে এসেছে। সম্পূর্ণ অনুলেখ্য রচনারীতির স্বাক্ষরবাহী এই উপন্যাসত্রয়ী সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলার কিছু নেই।---লেখকবর্গের রচনা এখনও বহু অনুশীলনসাপেক্ষ। আঙ্গিক মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। জীবনের ঘূর্ণিঝড়ে---লেখক---যোগীলাল হালদার, প্রকাশক---রামলাল পাবলিশিং হাউস, ১০৪।বি, দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড, কলিকাতা-১৫, দাম---দু টাকা। স্নুতপা---লেখক---রঞ্জন রায়, প্রকাশক---ডি লাইট বুক কোং, ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬, দাম---চার টাকা। অনুর্বর মৃত্তিকা। লেখক---ভূপেন্দ্র আদিত্য, প্রকাশক---ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬, দাম---তিন টাকা।

বিজ্ঞতা

মানুষ কী ভাবে বিজ্ঞ হয়? আমি বলছি, শুনুন। যথাসম্ভব সবার মতামত সে শোনে এবং মনে মনে তা নিয়ে চিন্তা করে। তার ব্যক্তিগত মতামত এবং আচরণ সম্পর্কিত প্রতিটি সমালোচনা তার সতর্ক বিবেচনার বিষয় ---এবং প্রশংসার তুলনায় সমালোচনাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। সমালোচনা সঙ্গত হলে সে তা থেকে লাভবান হতে সচেষ্ট হয়। যদি তা নাও হয়, সে কখনও ক্ষেপে ওঠে না। সে তখন নিজের মতামত বা আচরণ সমর্থনের উদ্দেশ্যে যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থিত করে। সংক্ষেপে, বিজ্ঞতা খোলা মনের সম্পদবিশেষ। —টম্পসন

ঠিক ক'রে লিখুন

উইল করার সময় সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। অনেক ভাবী অশান্ত, এমন কি গৃহবিচ্ছেদ এই সতর্কতার ফলে এড়ান সম্ভব।

দানপত্র দ্ব্যর্থবোধক হওয়া উচিত নয়, বলা খুব সহজ কিন্তু এ ফ্যাকড়া থাকেই। তবে, অনেক ত্রুটি এড়ান যায়।

আসবাব, জিনিষপত্র ইত্যাদি যার নামে নির্দিষ্ট করা হয়, তার বরাতে দুঃখ ভোগ থাকতে পারে। যারা হয়ত এক ছেলের নামে 'ক' কোম্পানীর শেয়ার-গুলো রেখে গেলেন, অথচ মৃত্যুকালে তা কোনও শেয়ার না থাকায় ঐ ছেলে না পেল শেয়ার, না তার সমপরিমাণ অর্থ। নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার দাতার মৃত্যু-কালে না থাকলে তা উত্তরাধিকারী পায় না।

'এস্টেট্' উইল ক'রে যাবার সময় যদি তার দাম বেশ বেশি থাকে ত' আর এক অসুবিধা ঘটে। পরে মূল্য কমলে, যা হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়, উত্তরাধিকারী ঠকে যায়। এ অবস্থা এড়ানর একটা উপায় ঐ 'এস্টেট্'-এর নামে শেয়ার কেনা। তা হলে 'এস্-টেট্'-এর দাম কমলে আনুপাতিক হারে শেয়ার বাঁচিয়ে দেবে।

দাতা (পুরুষ বা স্ত্রী) দম্পতিকে 'এসটেট'? সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সুবিধে দেওয়া হয় তার সুযোগ নিন এবং সুবিধে হলে স্ত্রীর নামে 'এস্টেট্' অছি করুন. মৃত্যুকর এ ক্ষেত্রে তার মৃত্যুর পরেই দেয়; স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার দিতে হবে না।

অনেক স্ত্রী মনে করেন স্বামীর 'এস্টেট্' পুরোপুরি তাঁর নামে থাকা উচিত। কিন্তু আয় যদি তিন লাখ টাকার বেশি হয় ত তিনি ঐ রোজগারে সুখেই দিন কাটাতে পারেন, সে যাই ঘটুক না কেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিনি আজীবন সুদ নিলে দু'বার মৃত্যুকর সরকারকে দেওয়ার দরকার হবে না। দানপত্রে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে---লিখিত সর্তে বিধবা স্ত্রী নগদ টাকা পাবেন এবং বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা তার পাওনা হবে। সাধারণভাবে বলা যায় আসবাব-পত্রাদি আজীবন সুদের আওতামুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী ওগুলো নিন এবং দেখুন যাতে সংশ্লিষ্ট সব কিছু জড়িয়ে হয়। মনে হয়, টুকিটাকি জিনিষ এবং আসবাব পর্যন্ত তার নয়, এই চিন্তাটাই তার পক্ষে সবচেয়ে বেদনাদায়ক।

সত্যি বলতে কি, আসবাবপত্রাদির ভাগ-বাঁটোয়ারা অনেক সময় পারি-বারিক অশান্তি সৃষ্টি করে। কাজেই, মৃতের আসবাব তার ছেলেদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ ক'রে দেওয়ার চাইতে ভালতর পন্থা আর হতে পারে না। আরও ভাল হয় দানপত্রে লেখা থাকলে যে, বয়স অনুসারে তারা পছন্দ করবে, 'প্রোবেট' মূল্য অনুসারে তাদের মূল্য নির্ধারিত হয়ে শেয়ারে জমা হবে; বাকিটা বিক্রি ক'রে সমান ভাগে বিভক্ত হবে প্রাপ্ত অর্থ।

'এস্টেট্' সংক্রান্ত উইল পড়লেই কোন না-কোন খুঁত সাধারণত বের হয়। যেমন, 'ক', 'খ' এবং 'গ' সম্পত্তির মালিক। দাতার মৃত্যুর আগে যদি এদের কারো মৃত্যু হয় ত তার অংশ নিয়ে অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু উইলে যদি লেখা থাকে---এই এই অংশ 'ক' 'খ' এবং 'গ' অথবা তাদের উত্তরাধিকারীর ন্যায্য পাওনা, তা হলে এই অসুবিধা অনায়াসে এড়ান যায়।

মোট কথা, উইল করার সময় সাবধান হওয়া দরকার। ওয়াকেবহাল সলিসিটর যিনি দাতার পারিবারিক পরিস্থিতি জানেন, দাতার আর্থিক অবস্থা যাঁর কাছে পরিষ্কার, তিনিই এ ব্যাপারে যোগ্যতম ব্যক্তি। এবং যদি দানপত্র বেশ গোলমেলে হয় ত 'কাউনসিল' দ্বারা তা সিদ্ধ করিয়ে নেওয়া দরকার। আর, যতক্ষণ পর্যন্ত দাতা সেই দানপত্রের ভাষা এবং তাৎপর্য আইনের অপ্রতিরোধ কচকচি সমেত, বুঝতে পারছেন, ততক্ষণ তাতে নাম সই করা উচিত নয়।

যা বলা হল তার কোনটাই কষ্টসাধ্য নয়। কেবল শেষের ব্যাপারে একটু দৌড়ঝাঁপ করতে হতে পারে। কিন্তু ঐ সাবধানতার ফলে উত্তরকালে যে স্বস্তি আর শান্তি লভ্য---তার তুলনায় উপযুক্ত কষ্টটুকু কিছুই নয়।

উইল সুতরাং বিবেচনা ক'রে করার উপযোগিতা সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ স্বল্প।

---পত্রনবীশ

● সদ্য প্রকাশিত হল

সন্ধ্যারাগ ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৫·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র যাদু জানেন, তাঁর কলমের যাদুস্পর্শে অতি সাধারণ মানুষ এবং ঘটনাগুলি অকস্মাৎ যেন অসাধারণ এবং অপরূপ হয়ে ধরা দেয় আমাদের সামনে। কোনও এক মহান্ শিল্পী এবং স্রষ্টার পক্ষেই শুধু সম্ভব এই অসাধ্যসাধন। "সন্ধ্যারাগ" মহান শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ন'টি মহৎ সৃষ্টি—ন'টি অসাধারণ ছোটগল্পের এক অভিনব সংকলন।

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ॥ বিমল কর ॥ ৪·৫০

বিমল করের ছ'টি সুনির্বাচিত গল্পের এক অতুল্য সংকলন "আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন"। আকারে এর সবগুলিই দীর্ঘ, এবং প্রকারে বিচিত্র। এগুলির প্রত্যেকটিই, এক কথায়, অনন্য। কেন না, বিমল করের গল্পের যাঁরা নিয়মিত পাঠক, তাঁরা জানেন, তাঁর গল্পগুলির এমন কিছু উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য আছে, যা সেগুলিকে এক আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ॥ বিশ্বদেব বিশ্বাস ॥ ৫·০০

খ্যাতনামা পর্বতারোহী বিশ্বদেব বিশ্বাস ১৯৫৬ সালে যখন প্রথম দার্জিলিঙে হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটে পর্বতারোহণের শিক্ষা গ্রহণ করেন, তখন প্রথম হিমালয় দর্শনের অপার আনন্দ ও বিস্ময় তাঁকে অভিভূত করেছিল। সেই আনন্দ-বিস্ময়ের রঙে রাঙানো তাঁর পর্বতারোহণ শিক্ষাকালীন অশেষ কষ্টকর ও রোমাঞ্চকর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার কাহিনী "কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে"।

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি ৫·০০

গৌরকিশোর ঘোষ ॥ পর্বতাভিযান-কাহিনী

বেগম মেরী বিশ্বাস ২৫·০০

বিমল মিত্র ॥ ঐতিহাসিক উপন্যাস

সূর্যসাক্ষী ১৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ উপন্যাস

প্রেমের চেয়ে বড় ১২·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ উপন্যাস

রহস্যময় রূপকুণ্ড ৩·৫৫

বীরেন্দ্রনাথ সরকার ॥ পর্বতাভিযান-কাহি

পূর্ণ অপূর্ণ ১০·০০

বিমল কর ॥ উপন্যাস

বিবর ৫·০০

সমরেশ বসু ॥ উপন্যাস

বনপলাশির পদাবলী ৮·

রমাপদ চৌধুরী ॥ উপন্যাস

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-১৪৮৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৩৩
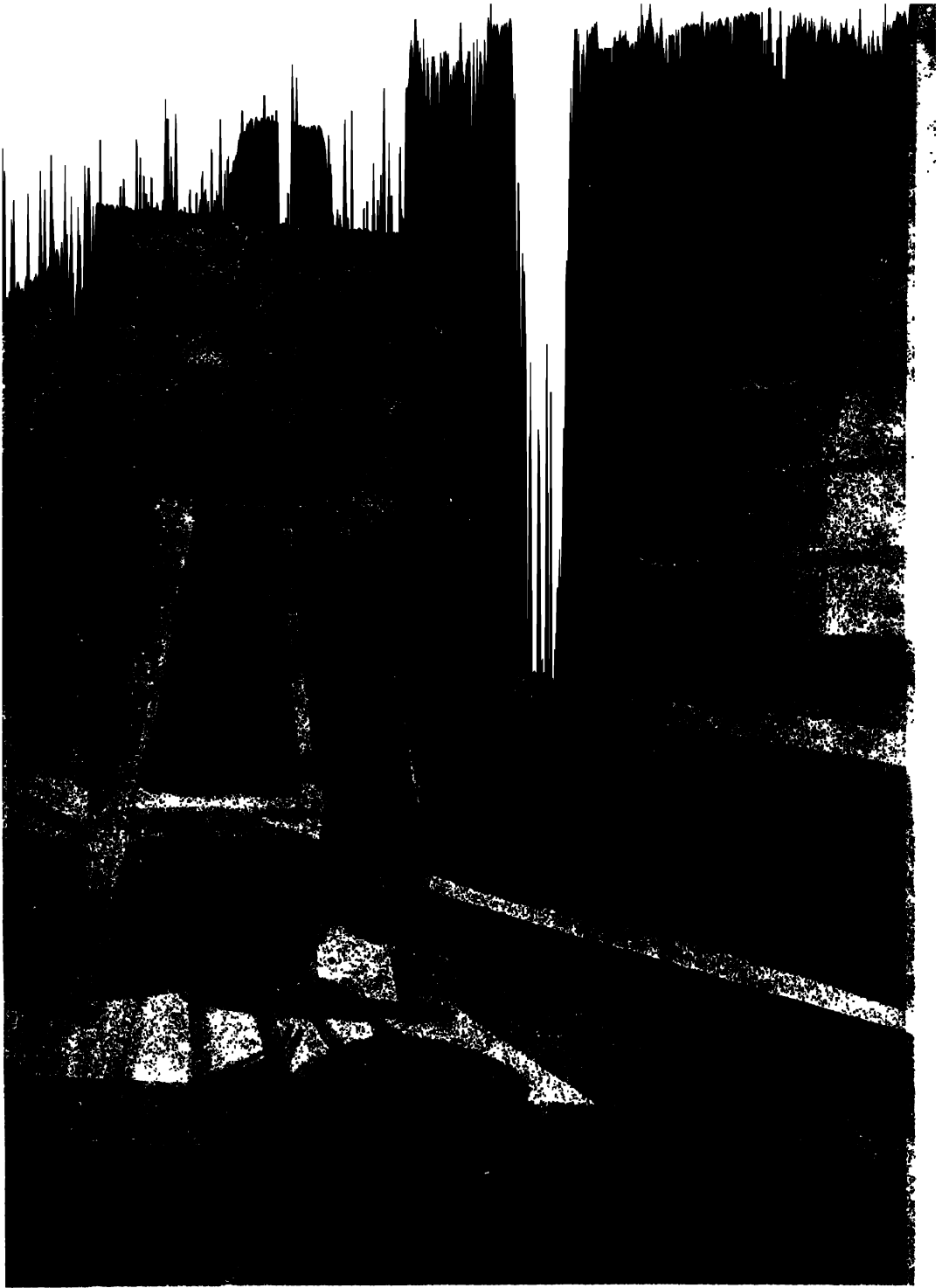
ষ্টুডিও

—জহরলাল সাহা পোদ্দার অঙ্কিত

নীলদর্পণ নাটক

সত্যশঙ্কর সুর

যে-সকল নাটক স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য 'নীলদর্পণ' তাহাদেরই অন্যতম। আজ হইতে একশত আট বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা এখনও শেষ হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বহু বাংলা নাটকের পরিচয় আজ লুপ্ত হইয়া গেলেও ইহার পরিচয় আজও পাঠক কিংবা দর্শকের কাছে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই নাটকটির ভিতর দিয়া আমরা উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙ্‌লা দেশে নীলকর-দিগের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ পাই। নীলদর্পণ নাটকখানি দীনবন্ধুকে অমর করিয়াছে। দীনবন্ধু যদি এই একখানি নাটক ব্যতীত আর কিছুই রচনা করিতেন তাহা হইলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের দরবারে চির-সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।

একটি সমসাময়িক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ইহার বিষয়বস্তু, সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকে। বাংলার প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালে ইহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া এই নাটক রচনা করেন, তাহা নাট্যকারপ্রদত্ত ভূমিকা হইতে জানা যায়। নাট্যকার লিখিয়াছেন---'নীলকর-নিকর করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাদের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেত চন্দন বৃত্তি ধারণ করুন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাবর্গের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখরক্ষা হয়।'

নীলদর্পণ যখন প্রকাশিত হয় তখন ইহাতে গ্রন্থকারের কোন নাম ছিল না। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। দীনবন্ধু নিজে সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তিনি ডাকবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে কার্য করিতে অনেক সময় নীল-করদিগের অত্যাচার সচক্ষে দেখেন এবং ইংরাজ নীলকরদের সংস্পর্শে আসেন। সেইজন্য প্রত্যক্ষভাবে যাহাতে তিনি নীলকরদিগের অপ্রীতিভাজন না হইয়া পড়েন, সেই জন্য তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। নীলদর্পণ যখন প্রকাশিত হয় তখন গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল ---

দীনবন্ধু মিত্র

> নীলদর্পণং। নাটকং। নীলকর-বিষধর দংশন কাতর প্রজানিকর। ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং ঢাকা। শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক বাংলা যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দ ১৭৮২। ২রা আশ্বিন, পুস্তকে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০+৮

নীলদর্পণে নাট্যকার তৎকালীন এক সামাজিক চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নীলকর সাহেবের অত্যাচার-নিপীড়নের করুণ কাহিনী অবলম্বনে নীলদর্পণ রচিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে

এদেশে নীল চাষ আরম্ভ হয়। সেইজন্য ইহার নাম Indigo।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নীল-ব্যবসা তাহাদের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী এবং অন্যান্য ব্যবসা-উপজীবীদের হস্তে অর্পণ করে। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা অন্যায়ভাবে চাষীদের নীলচাষ করিতে বাধ্য করিত। চাষীরা ইহাতে অসম্মত হইলে নীলকর সাহেবেরা তাহাদের নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করিত এবং নীচু অন্ধকার গুদামঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিত অথবা বর্শাবিদ্ধ করিত। এই অত্যাচারের ফলে বাংলা দেশের দুটি সুখী-স্বচ্ছল পরিবার কিভাবে ধ্বংস হইয়া গেল, নাট্যকার তাহাই দেখাইয়াছেন। ইহাতে চাষীদের অবস্থা খুবই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল।

অধ্যাপক হারানচন্দ্র চাকলাদার তাঁহার Fifty years Ago পুস্তকে লিখিয়াছেন---

"The object of the planters was to secure the maximum profit at the minimum or no cost of its production to the raiyat and at a nominal price which, even if fully paid would be ruinously unprofitable."

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন---'নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin 'টম কাকার কুটার' আমেরিকার কাফ্রি-দিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটি মোটেই অত্যুক্তি নহে।

Uncle Tom's Cabin-এর আলোচনা প্রসঙ্গে W. B. Cairns লিখেছেন---

'It has some amount of literary greatness if not artistic skill'.

নীলদর্পণ সম্পর্কে এই কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য।

নীলদর্পণের বিষয়বস্তু লেখকের কাল্পনিক নহে। দীনবন্ধুর পরে এই সম্পর্কে 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকার ১৮৭৩ সালের ৭ই নভেম্বর সম্পাদকীয়তে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহাতে এই নাটকের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে কিছু জানা যায়।

'নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।'

এই সম্পর্কে ডা: হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত Indian Stage গ্রন্থে লিখেছেন---

"Indeed Khetramani of the drama was none but Haramani a peasant girl of Nadia in flesh and blood known as one of the beauties of Krishnanagar who was carried off to the Kulchikatta factory in charge of Archibald Hills the chola saheb, where the girl was kept in his bed-room till late hours of night and the kind magistrate of Amarnagar was no other person than Mr. W. J. Herschel grandson of the great astronomer."

এই সম্পর্কে অধ্যাপক হারানচন্দ্র চাকলাদার লিখেছেন

"It did immense service in awakening the mind of all classes of the native population to the gross misery of the people of the Indigo districts and it helped the cause of the abolition of Indigo slavery in Bengal almost as much as Mrs. stowes 'Uncle Tom's Cabin' did towards the abolition of slavery of America."

এই উক্তিগুলি হতে জানা যায় যে নীলদর্পণ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত।

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসেও নীলদর্পণ নাটক স্মরণীয়। কারণ এই নাটক লইয়া সাধারণ রঙ্গালয় উৎপত্তি হয় এবং বৈতনিক প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই কারণে নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র

'অমরাবতী' চিত্রে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

ঘোষ মহাশয় দীনবন্ধুকে রজালয়ের গুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

শোনা যায়, একদা নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উড সাহেব রূপে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীকে পায়ের জুতা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি সত্য নহে। আমি এই সম্পর্কে বহু অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু কোথাও লিখিত প্রমাণ পাই নাই।

নীলদর্পণ পাশ্চাত্য প্রভাবে অঙ্কিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহাতে ছোটবড় মোট সাঁইত্রিশটি চরিত্র। ইহার মধ্যে ত্রিশটি পুরুষ চরিত্র এবং সাতটি নারী চরিত্র। নীলদর্পণ নাটকের চরিত্রগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ইংরেজী চরিত্র, (খ) ভদ্র চরিত্র (গ) ভদ্রেতর চরিত্র। ইংরেজ চরিত্রগুলির মধ্যে উড ও রোগ সাহেব উল্লেখযোগ্য। ভদ্রচরিত্রগুলির মধ্যে বিন্দুমাধব, নবীনমাধব, সাধুচরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভদ্রেতর চরিত্রগুলির মধ্যে তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এই তিন শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকার ভদ্রেতর চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

নীলদর্পণ নাটকের নায়ক আছে কি না জানি না, তবে নায়িকা সৈরিন্ধ্রী। কারণ নায়িকার চরিত্রে যে গুণ থাকা দরকার, তাহা আমরা সৈরিন্ধ্রী চরিত্রে পাই। এই নাটকে অনেকে নবীনমাধবকে নায়কের মর্যাদা দিতে চাহেন, কিন্তু নায়কের চরিত্রের মধ্যে যে যে গুণ থাকা দরকার তা নবীনমাধব চরিত্রে পাওয়া যায় না।

নীলদর্পণের ভদ্রেতর চরিত্র প্রসঙ্গে মধুসূদন দত্তের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-র প্রভাব বর্তমান। নীলদর্পণে নীলকর নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলা কৃষকদের দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত করেছেন এবং পরোক্ষভাবে দেশাত্মবোধ প্রচার করেছেন। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে লেখকের অত্যাচারী জমিদারের ধিক্কার আছে কিন্তু দেশাত্মবোধ

চৌরঙ্গী চিত্রের বিশিষ্ট দুই শিল্পী বিশ্বজিৎ ও অঞ্জনা ভৌমিক[illegible]

নাই। তবে ক্ষেত্রমণির উপর নীলকর সাহেবের অত্যাচার এবং নবীনমাধব ও তোরাপের সাহায্যে উদ্ধারসাধনে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁর অনুসরণ আছে বলে মনে হয়।

নীলদর্পণ নাটকের সংলাপ সম্পর্কে কিছু বলবার আছে। এই নাটকে চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের আদর্শের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হয়েছেন। সংস্কৃত নাটকের ভদ্র চরিত্রগুলিতে যেমন সাধুভাষায় কথা বলা এবং ভদ্রেতর চরিত্রগুলিতে প্রাকৃতভাষায় কথা বলা হত। দীনবন্ধুও তেমনি নীলদর্পণ নাটকে ভদ্রচরিত্রে সাধুভাষা এবং ভদ্রেতর চরিত্রে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন।

নীলদর্পণ নাটকের প্রভাব পরবর্তী নাট্যকাররা গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মৃত্যুর ঘনঘটা, করুণরসের আতিশয্য প্রভৃতি করুণ রসাত্মক লক্ষণ যা নীলদর্পণে ছিল তাহা আমরা পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল, বলিদান প্রভৃতি নাটকে দেখতে পাই। সুতরাং বলা যেতে পারে নীলদর্পণ পরবর্তী সামাজিক নাটকসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

নীলদর্পণ প্রকাশিত হইবার পরবৎসর ১৮৬১ সাল। ঐ বৎসর নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ The Indigo Mirror, by a native কৃত অনুবাদ হয়। এই ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশক ছিলেন রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ সাহেব। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নীলকরদের বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং এই চাঞ্চল্যের ঢেউ ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে পৌঁছায়। ফলে ইংরেজরা লঙ্ সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলায় বিচারক লঙ্ সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করেন। মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে দেন। লঙ্ সাহেবের ঐ মামলায় বিচারপতি স্বয়ং লঙ্ সাহেবকে লেখক অনুবাদকের নাম প্রকাশের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু লঙ্ সাহেব কোনমতেই নাম প্রকাশ করতে রাজি হন নি। তার এ কথা বাঙালী কোনদিন ভুলবে না। লঙ্ সাহেব আদালতে তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন---'মিউটিনি শেষ হয়ে গিয়েছে; কে জানে ভবিষ্যতে কি হবে? যা অনেকের কাছে ভীতিপ্রদভাবে দূর থেকে দেখা দিচ্ছে, আমরা তাঁর দিকে চোখ বুজে থাকতে পারি না। তা নিকটেও হতে পারে, দূরেও হতে পারে। কিন্তু রুশ দেশেও তার প্রভাব ভারত-সীমান্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। তার প্রভাব যা কাবুলে বিশ বৎসর পূর্বে বিস্তার লাভ করেছিল

ভারতবর্ষেও মিউটানির সময় অনুভব করা গিয়েছিল।'

লর্ড সাহেবের এই উক্তি সত্যই প্রশংসনীয়।

এই সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় লিখেছেন 'ওয়েলস নিরপেক্ষ বিচারকের মত ব্যবহার করেন নি, তিনি নীলকরদের উকিলের মত ব্যবহার করেছিলেন। জুরীরাও ছিল নীলকরদের হাতের পুতুল। সূত্রগুলি সব ওয়েলসের হাতেই ছিল এবং ন্যায় বিচারকের পরিবর্তে, তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পুতুল-নাচ দেখিয়েছিলেন।'

উনবিংশ শতাব্দীতে যতগুলি অন্যায় বিচার হয়েছিল, তার মধ্যে লর্ড সাহেবের এই বিচার উল্লেখযোগ্য। এই বিচারের সাথে মহারাজ নন্দকুমারের বিচার তুলনীয়।

নীলদর্পণ নাটকটি কালীপ্রসন্ন সিংহের খুব প্রিয় নাটক ছিল। এই নাটক প্রচারের জন্য তিনি বহু টাকা একদা তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন —'মধুসূদন বাবুর বাটীতে কয়দিন ধরিয়া নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইতেছে তাহা আপনি অবগত আছেন। পুলিশ এই বিশিষ্ট ভদ্রলোককে ধরিয়া লইয়া আটক রাখিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রয়োজন এবং যত টাকা প্রয়োজন হইবে তাহা সমুদয় ব্যয়ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিব। নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় বন্ধ থাকিবে না, প্রত্যহ হইবে অন্তত যতদিন আমি আছি।' এই চিঠিটা সম্প্রতি বিড়লা একাডেমী অব আরটস এ্যাণ্ড কালচারের উদ্যোগে যে প্রদর্শনী হয়েছিল সেখানে এ চিঠিটি ছিল।

নীলকর দমনে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী। ১৮৫৮ সালে যখন বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে খুলনা মহকুমায় এসেছেন তখন অত্যাচার করত। বঙ্কিমচন্দ্র নীলকরদের অত্যাচার দমনের জন্যে সহস্তে ভার গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় নীলকররা বঙ্কিমচন্দ্রের মাথার জন্য একলক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল, একথা খুলনার সকলে জানত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নীলকরদের এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা নীলকরেরা কোনদিন ভুলবে না।

সবশেষে আমি শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায় প্রবন্ধ শেষ করলাম—

'—নাটকখানি বঙ্গ-সমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না, আবালবৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদমফুল' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বোম্বাইয়ের শ্রীমতী তনুজা

নাট্যলোক

আজকাল

ভিলাই স্টীল প্ল্যাণ্টের কলকাতা অফিস রিক্রিয়েশান ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তাঁদের প্রথম নাট্যপ্রয়াস হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল'। মধ্যবিত্ত জীবনের বেদনা ও যন্ত্রণার কাহিনী নিয়ে রচিত এই নাটকটি এঁরা সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন বিশ্বরূপায়। সুন্দর টিমওয়ার্ক ও পরিচ্ছন্ন প্রযোজনার গুণে নাটকটি সহজেই দর্শকদের চিত্ত অধিকার করে। বিশেষ করে প্রবীণ শিল্পী হরেন বোসের মর্মস্পর্শী অভিনয় বুঝি ভোলবার নয়, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর চারটি চরিত্রে রঞ্জন রায়চৌধুরী, শৈলেন মিত্র, সরোজ গুপ্ত ও মাধব বসু অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দেন, অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন শম্ভু শেঠ ও বিজন দাস, ভোলা সেন, গোপাল শেঠ ও সন্ত রাউ। লতিকা দাশগুপ্তের রমা ও কল্পনা বাগের লতা। সুন্দর নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন কঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেঘে ঢাকা তারা

জীবনের বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল পথ বেয়ে মানুষের সংগ্রামের এক সুন্দর আলেখ্য নিয়ে রচিত শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা'। সম্প্রতি নাটকটির সফল অভিনয় পরিবেশন করলেন স্বরাষ্ট্র আরক্ষা বিভাগ সাংস্কৃতিক পরিষদ স্টার রঙ্গগৃহে। প্রতিটি শিল্পীর প্রাণবন্ত অভিনয়ে নাটকটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একসুরে বাঁধা ছিল, অভিনয় চলাকালীন কখনই অভিনেতারা মনে হতে দেন নি যে তাঁরা উঁচুদরের শিল্পী নন, যদিও কোন বিশিষ্ট বা নামী অভিনেতা দলে ছিলেন না, তবুও কেবলই মনে হয়েছে কত উঁচুদরের শিল্পীর অভিনয় এখানে প্রতিফলিত, চলন-বলন এমন কি ভাব পরিস্ফুটনে কেউই কোন অংশে কম নন, যে অপেশাদারী তথা অফিস প্রমোদ বিভাগের এত সুন্দর দলগত অভিনয় সেজন্য নাট্য-পরিচালক প্রতুল দাসও প্রশংসার অংশীদার, সেদিনের অভিনয়ে যাঁরা সুনাম অর্জন করলেন তাঁরা হলেন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন সাহা, ভূপেন দেব, রাণাপ্রতাপ ঘোষ, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল ভট্টাচার্য, দেবব্রত হালদার, কৃষ্ণদাস মণ্ডল, মাণিক চক্রবর্তী, শান্তনু সেনগুপ্ত, মিতালী দাস ও সন্তোষ চক্রবর্তী, মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'নীতা' অতুলনীয়, অলোকা গঙ্গোপাধ্যায়ের গীতা সার্থক।

নাম নেই

গত ১৭ই এপ্রিল বুধবার '৬৮ মিনার্ভা নাট্যমঞ্চে 'আনন্দম্' (এস ই রেলওয়ে ক্লেমস অফিস) কর্তৃক কিরণ মৈত্র রচিত 'নাম নেই' নাটকটি অভিনীত হয়। প্রথমেই বলতে হয় এ-ধরণের নাটকের প্রযোজনা করার পিছনে খুবই দুঃসাহসের পরিচয় আছে। নাটক দেখে মনে হয় আনন্দমের সভ্যবৃন্দের দলগত অভিনয় যথেষ্ট আনন্দদানে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে মিঃ ডেভিড ও রত্নেশ্বরের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীসোমেন দাশগুপ্ত ও শ্রীঅশোক সান্যালের অভিনয় দর্শকবৃন্দের মনে রাখার মত। সুষমার চরিত্রে শ্রীমতী অলকা গঙ্গোপাধ্যায় দর্শকবৃন্দের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল বলে মনে

উইমেন্স কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের একটি বিশেষ মুহূর্তে শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায় ও মিত্রা মল্লিক

হন। নাটকটির অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন সর্বশ্রী স্বরাজ ঘোষ, কালীপদ কর, দুর্গাদাস হালদার, অমরেশ সরকার, সুধীর গিরি, সতীরঞ্জন দে-সরকার, দিলীপ সাহা ও অজিত মিত্র। নাটকটির পরিচালক ছিলেন শ্রীস্বরাজ ঘোষ। অভিনয়ের পূর্বে একটি ছোট গীতি নৃত্যানুষ্ঠান 'বর্ষাবরণে' পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীমঞ্জুলকুমার সিংহ।

রাত্রি শেষ

সম্প্রতি রঙমহলে পি সি মাহিন্দ্র মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটের সভ্যরা মঞ্চস্থ করলেন নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'রাত্রি শেষ।' প্রয়োগগুণে নাটকটিতে এমন কিছু মুহূর্তের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, যা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। নাট্যনির্দেশক সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন বহু জায়গায়। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন অবনী মুখোপাধ্যায়, এন পিচাই, অনন্ত চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল দাস, দীপালী ঘোষ, জয়শ্রী কর, রমেশ সাহা, সমরেন্দ্র দাস, অশোক ভট্টাচার্য, তারিণী ভট্টাচার্য, রথীন চন্দ, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ কর, সমীর মিত্র, শীথি গঙ্গোপাধ্যায়, দীপা হালদার ও জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

গার্গী মুখোপাধ্যায়

কুমারী গার্গী মুখোপাধ্যায় (গৌরী) এই বৎসর গীতিকা আয়োজিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়, মহিলা 'খ' বিভাগে---খেয়াল, রাগপ্রধান, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, বাউল ও ভাটিয়ালীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বৎসর নিখিল ভারত হিমাংশু সঙ্গীত প্রতিযোগিতার মহিলা---'খ' বিভাগেও ইনি খেয়ালে ও রাগপ্রধানে প্রথম স্থান, শ্যামাসঙ্গীত ও আধুনিকে দ্বিতীয় স্থান এবং পল্লী-গীতিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এঁর পিতা খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার মনোজ মুখোপাধ্যায়-এর নিকট ইনি নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা করিয়া থাকেন সে লেডী অবলা বসু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। এঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পীর কৃতিত্ব

শ্রীমতী অমৃতা মৈত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আকাশবাণীর শিশু-মহলে তিনি নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। যুব জয়ন্তী, যুব উৎসব ও সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন [illegible] সঙ্গীত পরিবেশন

শ্রীমতী অমৃতা মৈত্র

করে তিনি পুরস্কৃত হন। এই কৃতী শিল্পীকে আবিষ্কার করেন সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস। শ্রীমতী মৈত্রের রবীন্দ্রনাথের 'জীবন আমার চলছে কেমন ও সখী দেখে যা এবার এল সময়'---গান দু'টি পরিবেশন করে সঙ্গীত-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

কুমারী বিজয়া মুখোপাধ্যায় এই বৎসর নিখিলবঙ্গ গীতিকা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় মহিলা 'গ' বিভাগে খেয়াল, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, রাগপ্রধান, বাংলা গান, কাব্য-গীতি, বাউল ও ভাটিয়ালীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের গল্পদাদুর আসরে নিয়মিত কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করিয়া থাকে। এর পিতা খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার প্রো: মনোজ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সে নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া থাকে। ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নৃত্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি সুপরিচিত নৃত্যশিক্ষায়তন নৃত্যভারতীতে এক মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নয়নাভিরাম নৃত্য-প্রদর্শনে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কত্থক নৃত্যপ্রদর্শনে কুমারী 'ক্যারেন গার্টলিয়ের' সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। গার্টলিয়ের এদেশে নবাগতা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তিনি যে-ভাবে কত্থক নৃত্য আয়ত্ত করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন খণ্ডনৃত্যে অংশগ্রহণ করেন কুমারী সর্বাণী গুহ, মধুশ্রী ঠাকুর ও নবঘনশ্যাম সিংহ। কুমারী সর্বাণীর মণিপুরী ভঙ্গিমায় রাধানৃত্য, কুমারী মধুশ্রীর রবীন্দ্র নৃত্য ও নবঘনশ্যাম সিংহের খোলনৃত্য (পুংচলম্) দর্শকদের প্রশংসালাভ করে। অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন শ্রীমান চিত্রেশ দাশ। এইদিন তিনি কত্থক নৃত্যে 'তাৎকার' প্রদর্শন করেন।

শম্পা মুখোপাধ্যায়

কুমারী শম্পা মুখোপাধ্যায় এই বৎসর গীতিকা আয়োজিত নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার শিশু বিভাগে রবীন্দ্রসঙ্গীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। পিতা খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার মনোজ মুখোপাধ্যায়ের কাছে নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করতে আরম্ভ করেছে। সে শিয়ালদার রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী। এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বাংলা তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে যাঁদের অবদান অপরিসীম এবং বৃটিশ সরকারের সিংহাসন যাঁরা টলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক, দেশমাতৃকার বরেণ্য সন্তান বিনয়, বাদল ও দিনেশের নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই তিন মহান সন্তানের গৌরবময় জীবনের বিরাট ঘটনাবলীকে রূপালী পর্দায় সগৌরবে প্রতিফলিত করতে চলেছেন মহাবিপ্লবী অরবিন্দ চিত্রের পরিচালক দীপক গুপ্ত। চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে বাংলার খ্যাতনামা শিল্পীদের দেখা যাবে। চিত্রটির নামকরণও করা হয়েছে বিনয়-বাদল-দিনেশ।

তিন ভুবনের পারে

সমরেশ বসুর সামাজিক প্রণয়-কাহিনী তিন ভুবনের পারে চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন কমল মিত্র, রবি ঘোষ, পদ্মা দেবী, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ প্রমুখ। নায়িকার চরিত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন বোম্বাইয়ের সুদর্শনা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী তনুজা। নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সুদর্শন নট সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির পরিবেশনায় আছেন রুমা ফিল্মস।

আলেয়ার আলো

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত চিত্র 'আলেয়ার আলো'র মুক্তি আসন্ন। চিত্রটিতে সুরসংযোজনা করেছেন সুরকার গোপেন মল্লিক। চিত্রটির দুটি মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন অনুপকুমার, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, মঞ্জু দে, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

অপরিচিত

সমরেশ বসুর কাহিনী 'অপরিচিত'কে চিত্রে রূপদান করছেন পরিচালক সলিল দত্ত। চিত্রটির সঙ্গীত পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটিতে অংশগ্রহণ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা সেন ও উত্তমকুমার। চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

জীবন সঙ্গীত

সুসাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক কাহিনী 'জীবন সঙ্গীত'কে রূপদান করেছেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায়। চিত্রটির নেপথ্যে গেয়েছেন বাণী দাশগুপ্তা, সমরেশ রায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে। চরিত্র-চিত্রণে শেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, বঙ্কিম ঘোষ, শোভা সেন, সুমন, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, বীণা ঘোষ, সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীতাংশের দায়িত্বে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পরিবেশনায় চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

গড় নাসিমপুর

খ্যাতনামা সাহিত্যিক বারীন্দ্রনাথ দাসের বহুলপঠিত জনপ্রিয় উপন্যাস 'গড় নাসিমপুর' চিত্রায়িত হচ্ছে। চিত্রটির চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন কাহিনীকার স্বয়ং। পরিচালনায় রয়েছেন অজিত লাহিড়ী। সুরসংযোজনায় আছেন শ্যামলকুমার মিত্র। চিত্রটির

অগ্রদূত পরিচালিত 'কখন মেঘ' চিত্রের নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক
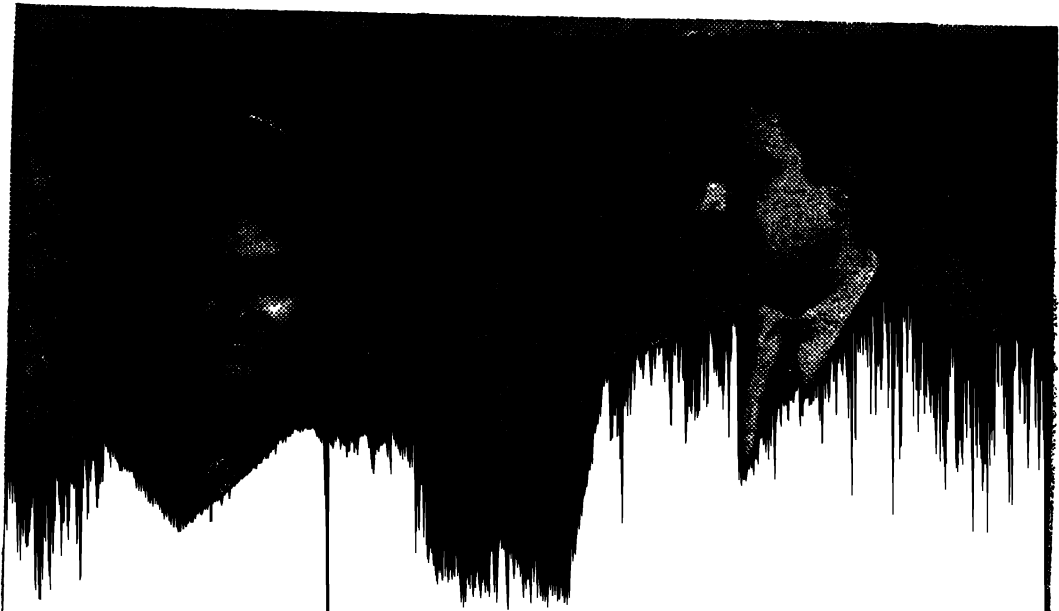
প্রধান তিনটি চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রয়েছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, মধুমতী প্রমুখ। স্যাডো প্রোডাকসনের ঐতিহাসিক চিত্র 'গড় নাসিমপুর।'

পরিণীতা

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনী 'পরিণীতা'কে চিত্রে রূপদান করছেন পরিচালক অজয় কর। সুরসৃষ্টিতে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিত্রটিতে যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁরা হলেন নায়কের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নায়িকার চরিত্রে 'বালিকা-বধূ' খ্যাতা অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। সহ-ভূমিকায় রয়েছেন অনুভা গুপ্তা, যমুনা সিংহ, গীতা দে, রোমি চৌধুরী, সমিত ভঞ্জ, নীরা মালিয়া, বঙ্কিম ঘোষ, বিকাশ রায়, বিজন ভট্টাচার্য, ছায়া দেবী, কমল মিত্র প্রমুখ। চিত্র ফিল্মসের চিত্র 'পরিণীতা'। চিত্রটির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন এমন হল। এর জন্য দায়ী কে। সমাজ? না সমাজের উপর দোষ দিয়ে কি লাভ। সমাজ তো সকলকে নিয়েই। তবে। নারী-স্বাধীনতা। তারও তো প্রয়োজন। চার দেয়ালের মধ্যে নারীকে আবদ্ধ রেখে সমাজের অগ্রগতি তো সম্ভব নয়। তা হলে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘরে এসে ব্যালকনির উপর হাতপানা রেখে ভাবতে থাকেন অধ্যাপক হিমাংশু গুপ্ত। তাঁর সংসার তো বেশ সুখের ছিল। শান্তির ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মত দুঃখের ছায়া তাঁদের সংসারকে কোনদিন বিস্তারলাভ করতে পারে নি। সংসার তাঁর খুবই ছোট। স্ত্রী মলিনা দেবী, পুত্র হীরু আর কন্যা সোমা। লোক বলতে সংসারে এই চারজন। জীবনের বেশী অংশটা কেটে গেছে। বাকীটা এইভাবে কাটাতে পারলেই তাঁর শান্তি।

কিন্তু তা বুঝি আর হোল না। সবার অলক্ষ্যে কোন অজানা সুড়ঙ্গপথে ভাঙ্গন এসে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হতে শুরু করলো। হিমাংশুবাবু অধ্যাপক। সুতরাং তিনিই প্রথম পেলেন অশুভের ইঙ্গিত। কিন্তু মূল তখন এমনই ভাবে বিস্তারিত হয়েছে তাকে উৎপাটিত করার ক্ষমতা তখন তিনি নিজেই হারিয়ে ফেলেছেন। নিজেকে তাই এখন বড় নিঃস্ব মনে হয় তাঁর। সংসারে সকলেই আজ স্ব স্ব প্রধান। কেউ কারুর দিকে তাকাবারও যেন অবকাশ পায় না। সংসারের মধ্যে থেকেও কেউ যেন সংসারে নেই।

আধুনিক সমাজ-জীবনের ছায়া সোমার তারও উপর এসে পড়ায় সেও তাতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। বড় বড় রেস্তোরাঁয় পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় না বসলে জীবনটা তার নিরানন্দ বলেই মনে হয়। আর হিমাংশুবাবু সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে যখন নিজের ঘরে আসেন তখন বিরাট এক শূন্যতা বিরাজ করে তাঁর সংসারে। সে শূন্যতার মধ্যে যেন তিনি আপন মনেই তলিয়ে যান। ব্যালকনিতে বসে ভাবেন কেন এমন হল। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সুইচ টিপে আলোটা পর্যন্ত তখনো জ্বালান হয় নি। হয়তো খেয়ালই নেই হিমাংশুবাবুর। হঠাৎ এসে হাজির হয় মাধুরী।

'আপনজন' চিত্রে স্বরূপ দত্ত ও ছায়া দেবী

সোমার বন্ধু। সম্প্রতি তার বিবাহ হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে বাইরেই থাকে। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী বেড়াতে এলে সোমার সঙ্গে দেখা করতে ভোলে না। কিন্তু আজ হিমাংশুবাবুর মুখে বাড়ীতে তো কেউ নেই মা, সোমা তো থাকেই না এ সময়ে, কথাটি শুনে বড় আশ্চর্য লাগল তার, ব্যথিতও হল। মাধুরীর বুঝতে বাকী থাকল না এ বাড়ীতে ভৃত্য নিশিকান্ত ছাড়া হিমাংশু-বাবুর আর কেউ নেই। হিমাংশুবাবুর দোষই বলুন আর গুণই বলুন, তিনি চান পুত্র নিজের পরিচয়ে বড় হয়ে উঠুক, আত্মসচেতন, আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে আপন কর্মক্ষমতার দ্বারা, পিতৃপরিচয়ে নয় কিন্তু স্ত্রী কমলা চান, যেন তা হবে, ও তো বড় হয়েই জন্মেছে। এই নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ বাধে। হীরুও বাবাকে ভুল বুঝে অন্য একটা চাকুরী নিয়ে সে কোলকাতার বাইরে চলে যায়। এর জন্য দায়ী হল হিমাংশুবাবু অন্তত মলিনা দেবীর তাই মত। স্ত্রীর ব্যবহারে স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে যান হিমাংশুবাবু।

এদিকে সোমাও মলিনা দেবীর পছন্দ করা ছেলে শোভনকে বিয়ে তো করেই না, উপরন্তু আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে দেয় মাকেই। তারপর নিজের মনোনীত ছেলেকে বিয়ে করে সেও কোলকাতা ছাড়ে। এরপর মলিনা দেবীর ও হিমাংশুবাবুর সম্বন্ধ আরো তিক্ত হয়ে ওঠে। মলিনা দেবী বলেন, বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী রেখে তোমরা সুখী হতে চাও।

হিমাংশুবাবু উত্তরে বলেন, না মলিনা না, যা করেছি তা সবই তোমাদের জন্য। তোমরা সুখী হয়ে সমাজে সম্মান প্রতিপত্তি নিয়ে চলবে এই জন্যেই। কিন্তু সবই বৃথা। মলিনা দেবী কোন কথায় কর্ণপাত না করে শুভানন্দ মিশনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লী চলে যান।

একা, সম্পূর্ণভাবে এবার একা হিমাংশু-বাবু। ভাবনায় চিন্তায় কঠিন অসুখে পড়ে যান। অফিসের লোকজন দেখতে আসে। আসে তাঁরই স্টেনো মণিকা দেবী। তারপর হিমাংশুবাবুকে একা জেনে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগেন মণিকা দেবী নিজেই। তাঁর সেবায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন হিমাংশুবাবু।

এদিকে মলিনা দেবীও দিল্লী থেকে হঠাৎ ফিরে এসে তাঁর স্বামীর সঙ্গে অন্য একটি অপরিচিতা মেয়েকে দেখে সন্দেহে ফেটে পড়েন। মণিকা দেবী লজ্জায় আর অপমানে মাথা হেঁট করে চলে যান। হিমাংশুবাবুও সহ্য করতে না পেরে সমস্ত সম্পত্তি পুত্রস্থানীয় ধূর্জটির উপর দিয়ে সংসার ছেড়ে চলে যান।

কিন্তু কোথায় যাবেন জানা নেই। তপ্ত মরুভূমি তিনি যেন পার হয়ে এলেন। ছায়াতীরে পৌঁছতে চান এবার। শেষের ক'টাদিন শান্তিতে কাটাবার তাঁর আকুল চেষ্টা

জরাসন্ধ রচিত 'ছায়াতীর' কাহিনী-টির চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রতিভাবান পরিচালক সুশীল বিশ্বাস। সঙ্গীত পরিচালনা ও গীতরচনায় আছেন শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায় ও সুনীলবরণ। ভূমিকালিপিতে আছেন হিমাংশুবাবু---বিকাশ রায়, মলিনা দেবী---বিনতা রায়। সোমা---মিতালী রায়, মণিকা—মাধবী মুখোপাধ্যায়, মাধুরী---শ্রাবণী বসু, হীরু---দ্বিজু ভাওয়াল, শোভন—রবি ঘোষ, ধূর্জটি---অজয় গাঙ্গুলী, জ্যোতির্ময়—দিলীপ রায় ও নিশিকান্ত--জহর রায়।

সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'আঁধার সূর্য' চিত্রে রত্না ঘোষ ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়

সাগরপারের মায়ালোক

একবার জনৈক খ্যাতনামা চিত্রকর বন্ধু বলেছিলেন: আচ্ছা পাগল কে বলো তো? ওরা, না আমরা?

বলা বাহুল্য, পথে যেতে যেতে এক উন্মাদের দুঃখজনক পরিস্থিতিই এ আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্ত করেছিলো।

বন্ধুবর আরো বলেছিলেন: ওরা তো নিশ্চয় কিছু ভাবে। সে ক্ষেত্রে ওরা যদি আমাদের পাগল বলে ধারণা করে নেয় তাহলে অপরাধের কিছু নেই। আজ যে রকম শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে তর্কাতর্কির জল ঘোলা হচ্ছে তাতে মনে হয় নাকি—শ্লীলই বা কোন্‌টা, তার বিপরীতই বা কি? দেশের হাওয়া যেমন বইছে তাতে আগেকার ধারণামতো শ্লীলটাই অশ্লীলরূপে প্রতিভাত। লজ্জাবোধটা বর্তমানে কর্পূরের মতো উবে গেছে, পথে ঘাটে ভূরি ভূরি প্রমাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। 'Comit no nuisance' ফলকটা আগে ইতস্তত চোখে পড়ত অবিশ্যি

রঞ্জন চৌধুরী

no কথাটা মসীলিপ্ত অবস্থাতেই দেখা যেত এবং তার সামনে ওই নুই-সেন্স সৃষ্টিকারীরা যথারীতি কর্মব্যস্তই থাকত। কিন্তু সেটা আজকের মতো দণ্ডায়মান হয়েই কেউ অকুতোভয়ে সাধন করত না। ওই যে বলেছি লজ্জা নামক চিত্তবৃত্তিটি লজ্জায় আজ মুখ লুকিয়েছে। এর কোনো বিহিত নেই, —অন্তত এদেশে।

পিয়াসাগির কাব্য চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের পথে দমদম বিমানবন্দরে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও নবাগত স্বপন রায়

এর কারণ চলচ্চিত্র। এর দায় নাকি পুরোপুরিই বিদেশী ছবিতে বর্তায়। কারণ জিনিষটা তো সেখান থেকেই আমদানি এবং সেখানকার রীতিনীতির সঙ্গে আমাদের অনেক কিছুই মেলে না। এমন অনেক ব্যাপার আছে যেটা ওখানকার ছবিতে অবারিত ভাবে দেখাতে বাধে না, অথচ আমাদের মাঝে ও ধরণের প্রদর্শনী নিশ্চয়ই সুরুচি-সম্মত হয় না। কিন্তু যেহেতু ওটা উত্তেজক ওষুধের মতো, তাই যতোটা সম্ভব খুরপথে ঢুকিয়ে দেবার প্রাণান্ত কাণ্ডকারখানা চলেছে। এ ব্যাপারে হিন্দীর তুলনায় বাংলা অনেকটা পিছিয়ে আছে বলতে পারা যায়। হিন্দী যে ওই বিদেশী ছবির আদর্শ উত্তরাধিকার লাভ করেছে তাতে ভুল নেই। 'এ'-মার্কা সব ছবিই তাই নিষিদ্ধ ফলের মতো কচি-কাঁচা থেকে ডাঁসা-পাকা সবাই মিলে আলুথালু হয়ে চিবিয়ে গিলে জীবন সার্থক করছে। আদিরসে ডুব দিতে সবাই তো একেবারে মুক্তকচ্ছ।

খবরে দেখছি ছবিতে আদিরসের সাগরপারের কারবারীরা এতোকাণ্ড করেও কিন্তু হালে পানি পাচ্ছেন না। দিনের পর দিন তাঁরা তূণ উজাড় করে পরসন্ধান করছেন, তবু ভরে না যে চিত্ত। রূপকথা-টুপকথা তো সিকেয় তোলাই হবে, দর্শকরা আর ওতে ভুলবেন না। তাঁরা ফজলি আমেও মজতে রাজী নন—ফজলিতর আমের ব্যবস্থা না করলেই চলবে না। তাই আমেরিকার চিত্রনির্মাতারা ঠিক করেছেন যৌনসংক্রান্ত ঘটনাগুলো পর্দার বুকে আরো ঢালাও ব্যবস্থায় দেখাবেন। পুরোনো দিনের প্রথা আজকের নতুন দিনের আলোয় বড্ডই বিবর্ণ ঠেকছে। বিস্বাদও। নিষ্ঠাবানরাও আর স্বমতে তিষ্ঠতে পারছেন না। কাজেই হলিউডে সিদ্ধান্ত বদলের হাওয়া বইছে। ওখানকার প্রযোজকদের যে প্রতিষ্ঠান (এ্যাসোসিয়েশন) আছে তার নতুন সভাপতি শ্রীজ্যাক ভ্যালেন্টির প্রথম কাজ হবে প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীর সংশোধনসাধন।

দু' বছর আগে [illegible] ১৯৬৬-তে একবার নিয়মাবলী ঠিক করা হয়েছিলো, যৌনতা, নগ্নতা এবং ভাষার ব্যাপারে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে 'হুজ অ্যাফ্রেড অভ ভার্জিনিয়া উলফ' ছবিতে। যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা খোলাখুলি বলা সুরু হয়। বক্ষোদেশ (নারীর নিশ্চয়) অবারিত প্রদর্শিত হয় 'দি পনব্রোকার', 'হাওয়াই' প্রভৃতি চিত্রে। পিছন দিক থেকে নগ্ন অবস্থায় দেখা মেলে চার্লটন হেস্টন ('প্ল্যানেট অভ দি এপস্'), মাইকেল পার্কস ('দি বাইবেল'), টেরেন্স স্ট্যাম্প ('ফার ফ্রম দি ম্যাডনিং ক্রাউড'), পল নিউ ম্যান ('কুল হ্যাণ্ড লিউক') প্রভৃতির।

আরো অনেক কিছুই সরাসরিভাবে দেখানো চলছে। হলিউডের প্রযোজকরা 'ব্লো আপ' ছবিতে খেলাধূলোর এক জমজমাট দৃশ্যে দুটি বিবসনা যুবতীকে ডেভিড হেমিংসের সঙ্গে দেখিয়েছেন। শয়নঘরের স্থান করে দেওয়া হচ্ছে চিত্রনাট্যে নিষেধ উপেক্ষা করতেই। এই যে সব হচ্ছে, একে শ্রীভ্যালেন্টিনটির এক নতুন অভিধায় ভূষিত করেছেন। পূর্ণতাপ্রাপ্ত দর্শকদের দেখবার উপযুক্ত বলে তাঁর এসোসিয়েশন মঞ্জুরী দিচ্ছেন।

মার্কামারা অশ্লীল রচনা (নিষিদ্ধও বটে) চিত্রায়িত হচ্ছে এখন বেশ কিছু। হেনরী মিলারের 'ট্রপিক অভ ক্যান্সার' তুলতে চলেছেন প্যারামাউণ্ট পিকচার্স। আরেকটি অনুরূপ রচনা, নাম : 'ক্যাণ্ডি'। তাকেও অনতিবিলম্বে রজতপটে দেখা যাবে। তার শিল্পী-তালিকায় নামকরা সবাই রয়েছেন।

আর তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। এই হোলো আজকের হলিউডের হাল। অথচ এখান থেকেই হানফিল্ম এসেছিলো 'মেরী পপিন্স', 'সাউণ্ড অভ মিউজিক।' আরো আগে হাত বাড়ালে পাওয়া যাবে 'গন উইথ দি উইণ্ড', 'হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালি', 'ফর হুম দি বেল টোলস', 'দি টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস', 'চেনহার' প্রভৃতি। দেখা যাক শ্লীল-অশ্লীলের প্রতিযোগিতায় কার জয় হয়।

হলিউডের নিগ্রো তারকা সিডনী পোইটিয়ার বেশ কয়েক বছর ধরে প্রস্তুতিপর্ব চালাচ্ছিলেন। নিগ্রো তরুণীদের নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো ছবি হয়নি। তাদের জীবন-কথা রজতপটে প্রতিফলিত না হওয়ার অভাব বরাবরই রয়ে গেছে। পোইটিয়ার তাই দীর্ঘদিন ধরে কাহিনী লেখার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর গল্পের নায়িকা পেশায় দাসী। একজনের বাড়িতে কর্মরত অবস্থায় সে এক নিগ্রো তরুণের প্রেমে পড়েছিলো।

গল্পটি বর্তমানে লেখা শেষ হয়েছে প্রাথমিক কাজকর্মও সারা। নাম : 'ফর লাভ অভ আইভি।' নায়িকা চরিত্রটিতে রূপ দেবার জন্যে পোইটিয়ার অ্যাবে লিংকনকে মনোনীত করেছেন। শ্রীমতী লিংকন আমেরিকার নামকরা জাজ গায়িকা। কোন্ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিডনী পোইটিয়ার এমন একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন—তার কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন আমেরিকান সমাজে বসবাসকারিণী মেয়েদের কথা সেই সঙ্গে তাঁর নিজের অল্পবয়স্কা চারটি মেয়ের সম্বন্ধে চিন্তা করেন তিনি খুবই। আমেরিকার চিত্র-জগতে নিগ্রো মেয়েরা আজ পর্যন্ত ঠাঁই পায়নি। নিগ্রো মেয়েদের ছবির পর্দায় প্রতিফলিত করার কোনই চেষ্টা হয়নি এতাবৎ। তারা যে বঞ্চিত হচ্ছে সুযোগ থেকে বরাবরই, সেটা তাঁকে চিন্তিত করে সদাসর্বদা।

নিজের ঘরে, মেয়েদের অহরহ যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেটা নিজের চোখে দেখতে পান পোইটিয়ার। তাঁর

নির্মীয়মাণ 'শাশ্বতী'র একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

মেয়েরা মনোমত পুরুষ বন্ধু পায় না। বিয়ে ইত্যাদির সমস্যা তো রয়েছেই। এটাকে তিনি বৃত্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমেরিকার নিগ্রো মেয়েদের অস্তিত্বকেই তিনি রূপালি পর্দায় তুলে ধরতে সেই জন্যে অনন্যচিন্ত্য।

●

'দি ওনলি গেম ইন টাউন' চিত্রে লিজ দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হতে চলেছেন ফ্র্যাঙ্ক সিমাত্রার বিপরীতে। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের এই নিবেদনটি পলিটজার পুরস্কারপ্রাপ্ত ফ্র্যাঙ্ক ডি গিলরয়ের লেখা ব্রডওয়ের মঞ্চসফল নাটকের চিত্ররূপ। লাস-ভেগাসের একটি নাইট ক্লাবের নর্তকীর রূপসজ্জা নেবেন এলিজাবেথ টেলর, ফ্র্যাঙ্ক সিমাত্রা হবেন একজন দক্ষ পিয়ানোবাদক এবং জুয়াড়ী। ছবির চিত্রগ্রহণ সুরু হবে সামনের সেপ্টেম্বরে।

ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে বোধ হয়। কথাটা তাহলে আরেকটু খুলেই বলি। ওই যে বলেছি 'ফরেস্ট সিম্ফনি-'র কথা ওটির পরিচালক হচ্ছেন জুরিদি। মস্কোর প্রাচীনতম চিত্রগৃহ দি যদোকেস্ত-ভেনিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোলো প্রিমিয়ার। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে ছবি দেখতে এলো মস্কোর চিড়িয়াখানার বাসিন্দারা। তারাই যে ছবির অংশগ্রহণকারী শিল্পী (!)।

এই অবাক-করা শো-র কথা ছড়িয়ে যেতেই লোকজন ছুটে এলো চিত্রগৃহের আশপাশে। সম্মানিত অতিথিরা কিন্তু তাতে মোটেই ভিন্ন ভাবাপন্ন হয় নি। তারা সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে অপূর্ব সংযমের সংগে দেখলো তাদের কীর্তিকলাপ রজত-পটে। কোনো উচ্চবাচ্য করে নি। এমন কি মানুষের মতো আত্ম-বিস্মৃত হয়ে অশালীন কোনো কাণ্ডও নয়। উচ্ছ্বাস ভরে কেউ চেঁচিয়েও ওঠে নি। বুঝুন ওরা কতো শিষ্ট।

শো-র শেষে ফট্ ফট্ করে আলো জ্বলে উঠতে দর্শকরা অভিনন্দন জানালে ওরা মাথা নেড়ে কান দুলিয়ে সে সাদরের সবটুকুই গ্রহণ করে। কিন্তু বলিহারি বলতে হবে উদ্যোক্তাদের—তাঁরা পথপ্রদর্শক হয়ে রইলেন একটা নতুন ব্যবস্থাপনার।

●

পৃথিবীর অন্যতম বর্ণোজ্জ্বল চিত্রোৎসব কেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবার অনুষ্ঠিত হতে পেল না। না হওয়ার কারণ তো পড়েই রয়েছে—ফ্রান্সের গোটা দেশটাকে স্তব্ধ করে দেওয়া অসহযোগ শেষ পর্যন্ত চিত্রোৎসবকেও নীরব করে দিয়েছে। যথাসময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত শিল্পী প্রযোজক প্রভৃতি যখন শুরু করবেন সূচী অনুযায়ী কাজকর্ম, সেই মুহূর্তে ধর্মঘটীরা আবেদন জানালেন। তাঁদের দাবী এবং অনুরোধ না মেনে উপায় তো নেই। সংগে সংগে পরিত্যক্ত হোলো এ বছরের মতো কার্যসূচী। অনেক প্রযোজক তো তার আগেই উৎসব থেকে তাঁদের ছবি প্রত্যাহার করে নেন। অপারেটররা কাজ বন্ধ করে দিলেন, গেটকীপাররাও দরজা থেকে সরে গেলেন—অনুষ্ঠানকক্ষে সবকিছু অচল। ওদিকে হোটেলে আবার খাবার দেয়া হবে না জানিয়ে দেওয়া হোলো, ব্যাঙ্কেও টাকাকড়ি লেন-দেন বন্ধ। বিদেশীদের তো চক্ষু চড়কগাছ। তাঁরা যে তাদের শুকনো গলা এক-বোতল কোকাকোলায় ভিজিয়ে নেবেন—তারও উপায় নেই, রেস্তোরাঁর দুয়ার রুদ্ধ। বন্ধ পানশালা প্রভৃতি বিলকুল।

সব কিছু একেবারে ভোঁ ভোঁ। কেন উৎসবের হেন পরিণতি। চিত্র-জগতের সবাই চিত্রার্পিতবৎ হয়ে গেলেন অদৃষ্টের ফেরে।

জেমিনির 'তিন বহুরাণীয়া' ছবিতে কাঞ্চনা, শশীকলা, জয়ন্তী ও সাওকর জানকী

॥ পাঠকরা পড়বেন না ॥

● শ্রীমতী সরমা হাজরা, পর্বতপুর, বর্ধমান---

প্রশ্ন ১ : আমার ছেলের বয়স ৪ বৎসর। স্বাস্থ্য দুর্বল। খুব ছোট ক্রিমি আছে। ছেলের স্বাস্থ্য ও ক্রিমিনাশক কোন ভাল ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিলে উপকৃত হব।

উত্তর : অ্যাণ্টিপার অথবা হেলগাসিড্ কিনে নেবেন। সকালবেলায় চা-চামচের এক চামচ, রাতে শোবার সময় চা-চামচের এক চামচ ওষুধ দেবেন, সাত দিন। তার পরই হ্যালিববরেঞ্জ, অথবা প্যালাডেক দুবেলা এক চামচ করে খেতে দেবেন স্বাস্থ্যের জন্যে। একমাস পরে ক্রিমির উপদ্রব না থাকলেও আর একবার ক্রিমির ওষুধ সাতদিন খাওয়াবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার মাথার চুল ভীষণ উঠে যাচ্ছে। পায়খানা খুব একটা ভাল পরিষ্কার হয় না। মাঝে মাঝে পেটের যন্ত্রণাও হয়। এর প্রতিকার কি ?

উত্তর : আগে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করুন। পায়খানা পরিষ্কার না হলে অনুরূপ উপসর্গ হতে পারে। আমার মনে হয়, আপনার পেটে লুকোন আমাশয় আছে। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর (ভাত মানে প্রধান খাদ্য) চা-চামচের দু চামচ করে অ্যামাইনোজাইম খাবেন একমাস এবং সকাল সন্ধ্যা একটি করে ডেভোকুইন বড়ি খাবেন। পনেরো দিন।

● শ্রীমতী মেহেরুন্নেসা, মিয়াবাজার, মেদিনীপুর---

প্রশ্ন ১ : লোকে যে বলে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ না হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। এর সত্য কতখানি ?

উত্তর : এই হিসেব গড়পড়তার ধরা হয়। সাধারণত চান্দ্রমাসে (Lunar month) এই হিসেব হয়। ক্যালেণ্ডার হিসেব অনুযায়ী ন মাস অথবা পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে থাকে।

প্রশ্ন ২ : নিজ সন্তানের প্রতি যদি কোন পিতার নিজের পিতৃত্বের সন্দেহ জাগে, তাহলে উভয়ের Blood examine -এর দ্বারায় সন্দেহভঞ্জন করা যায় কি ?

উত্তর : না। এর কোন বৈজ্ঞানিক সঠিক পদ্ধতি নেই।

প্রশ্ন ৩ : কোন কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার লক্ষণ কি ?
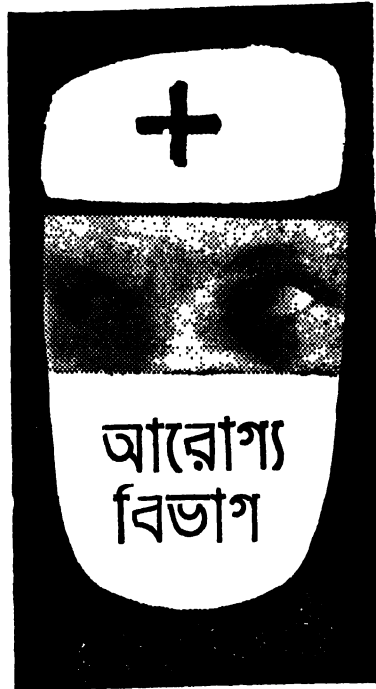
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

উত্তর : মাপ করবেন। এ-লক্ষণগুলি বলা যাবে না। কারণ তাতে সাংসারিক ও সামাজিক অশান্তি বাড়বে, কোন উপকারে লাগবে না। এই উপসর্গগুলি একমাত্র চিকিৎসক ছাড়া আর কারও জানবার অধিকার নেই।

● শ্রীমতী অঞ্জলিরাণী দাস, জয়গীরচক, মেদিনীপুর---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে পালমোকড্ পেুন খাবেন।

প্রশ্ন ২ : আমার ছোট ভাই-এর

উত্তর : ওর আমাশয়ের চিকিৎসা করান, আর শরীর ভাল হওয়ার জন্য দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে খাঁটি মধু খেতে দেবেন, অন্তত ছ মাস।

● শ্রাবণী, হাওড়া---১---

১নং প্রশ্নের উত্তর : ওর জন্যে ভাবতে হবে না। অনেকের ক্ষেত্রে ওটা স্বাভাবিক।

২নং প্রশ্নের উত্তর : ব্যথা পাওয়া উচিত নয়। এর সঙ্গে মাসিকের কিছুটা সম্পর্ক আছে। আপনি এ বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৩নং প্রশ্নের উত্তর : মাসিক পরিষ্কার হলে চর্বি আপনা থেকেই কমে যাবে।

● শ্রীমতী সুমিতা চট্টোপাধ্যায়, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা---৬---

রোজ স্নান করুন, ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রত্যহ তেল মেখে স্নান করবেন। সপ্তাহে একদিন মাথা ঘষবেন, সেদিন মাথা ঘষার পর মাথায় (চুলের ডগায় নয়) ভাল করে Pragmatar মলম ঘষে ঘষে লাগাবেন।

● শ্রীমতী রত্না সেন, কলিকাতা---

প্রশ্ন ১ : আমার চুল বেশি ওঠে না, কিন্তু একদম লম্বা হয় না। চুল কোঁকড়ানো। ডগা কাটলেও লম্বা হয় না।

উত্তর : কোঁকড়া চুল সাধারণত লম্বা হয় না। এ নিয়ে কিছু ভাববেন না।

দু নম্বর প্রশ্নে যা বলেছেন, তা পরীক্ষা না করে মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি কোন চিকিৎসকের মতামত নিন, তিনি বলে দেবেন।

● শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী রায়, বাক্সে প্রতাপপুর, বর্ধমান---

প্রশ্ন ১ : আমার কাঁকালে, কোমরে এবং পায়ের হাঁটুতে মাঝে মাঝে বাতের মত যন্ত্রণা হয়।

উত্তর : আপনি সকালে দুপুরে রাতে ২টি করে Tanderil বড়ি দশদিন খাবেন।

প্রশ্ন ২ : অপারেশন করার পরও কি সন্তান হবার সম্ভাবনা থাকে ?

কমলে থাকে না, তবে ধইতে বলছে অবাধ হতে পারে, কারণ এখনও জানা যায় নি। গবেষণা চলছে।

● শ্রীমতী সবিতা দাশগুপ্ত, পূর্ব-পুটিয়ারী--

আপনি নিয়মিত দুবেলা ভাত খাবার পর, চা-চামচের দু চামচ করে খাঁটি মধু খাবেন। অকারণ মেদ কমাবার জন্যে ব্যায়াম করবেন। শারীরিক পরিশ্রম বেশি করলে মেদ কমে যায়। শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত কম হলে পেটে বায়ু হয়।

● শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, গ্রাহিকা নং ৫৫১৭০---

আপনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নেবেন একমাস, সপ্তাহে একবার করে শ্যাম্পু করলে মাথা পরিষ্কার থাকে।

পুরুষ মহল

॥ পাঠিকারা পড়বেন না ॥

● শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী, কাটা-খাড়ী, কাছাড়---

প্রশ্ন ১: কি ভাবে মোটা হইতে পারিব জানাইবেন---

পরিমাণে খেয়ে।

প্রশ্ন ২: কি ভাবে যৌন উত্তেজনা দমন করা যায়?

উত্তর: নিয়মিতভাবে খেলাধূলা, ব্যায়াম এবং পড়াশুনা করে।

● শ্রীসন্তোষকুমার রায়, বনমালী ঘোষাল লেন, কলি---৩৪---

আপনি দু'বেলা খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে অ্যামাইনোজাইম ওষুধ খাবেন, দেড় মাস। সকালে ১টি বিকেলে ১টি ডেভোকুইন বড়ি খাবেন ১৫ দিন।

● এম, বি, দেশবন্ধু রোড, আলমবাজার, কলি-৩৫---

প্রশ্ন: কিছু খেলে মুখটা টক হয়ে যায় আর ঢেঁকুর ওঠে।

উত্তর: অম্বলের জন্য হচ্ছে। দুবেলা খাবার পর একপোয়া করে দুধ খেয়ে দেখুন একমাস।

● শ্রীশুভাশিস মজুমদার, গিরিডা কলিয়ারী, হাজারিবাগ---

প্রশ্ন ১: মাঝরাত্রে পা সোজা করা যায় না, শিরায় টান ধরে এবং খেলার পর পায়ে বেদনা করে।

এই ধরণের ব্যথা হয়। আপনি সকাল সন্ধ্যে একগ্লাস করে মিশ্রীর সরবৎ খাবেন। মিষ্টি একটু বেশি করে খাবেন, প্রয়োজন হলে গ্লুকোজ ইনজেকশন নেবেন।

প্রশ্ন ২: খুব লম্বা। একটু বেঁটে হতে চাই। উপায় জানাবেন।

উত্তর: কোন উপায় আমার জানা নেই।

● শ্রীসীতেশ দত্ত, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-২৫---

আপনি অ্যান্টিপার, হেলমাসিড অথবা অ্যাডেপিন সিরাপ খেয়ে ক্রিমি নাশ করুন, তারপর কোন ভাল ওষধ খেলেই শরীর ভাল হয়ে উঠবে।

● শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সোমড়া, হুগলী---

আপনি নিয়মিতভাবে খাবার আগে ডিজিপ্লেক্স অথবা সায়োপ্লেক্স লাইসিন চা-চামচের ২-চামচ করে খাবেন অন্তত দেড় মাস।

● বি (ছদ্মনাম)---

আপনার কোন ভয় নেই। নিয়মিত পেটভরে খান এবং খেলাধূলা পড়াশুনা করুন। দেখবেন সব উপসর্গ চলে গেছে।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে 'আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী' কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

● শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিকুঞ্জ, মিহিজাম, বিহার—

আপনি Macalvit Im ইনজেকশন নিন। এ ছাড়া পালমোকড উইথ ওয়াইয়াকল্ ওষুধ দুবেলা চা চামচের ২-চামচ করে খাবেন, অন্তত দু মাস।

● শ্রীবিপুব সিংহ, সিমলা রোড, কলিকাতা—

আপনি সমস্ত ওষুধ ছেড়ে দিয়ে দুমাস সকাল সন্ধ্যা ২-চামচ করে খাঁটি মধু খান।

● শ্রীবিভূতিভূষণ মিশ্র, নাঘাইয়া, মালদহ—

আপনি দুবেলা খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে Catoxyl খাবেন অন্তত একমাস।

● রথীন্দ্রমোহন সান্যাল, গভর্নমেণ্ট কলোনী, মালদহ—

পশ্ন: আমি চার বৎসর যাবৎ Spondylitis রোগে ভুগিতেছি—

উত্তর: স্পণ্ডিলাইটিস রোগ সারানো বেশ আয়াসসাপেক্ষ। আপনি নুন খাওয়া কমিয়ে দিন। ছেড়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়। যেখানে হয়েছে সেখানে রোজ তিনবার করে, Ultra-violet Rays পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট নেবেন। Siobutazone Tablets কোন চিকিৎসকের মত নিয়ে ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

● শ্রীবিমলচন্দ্র দে, অম্বরিবাগান, জলপাইগুড়ি—

প্রশ্ন: তিন বছর যাবৎ একশিরা এবং বুক ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি।

উত্তর: এ বিষয়ে দেরি না করে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি যা বলেন, সেইমত চিকিৎসা করান।

● শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিকুঞ্জ, মিহিজাম, বিহার—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। এ-টুকু বলতে পারি, আপনার ক্যানসার হয় নি। আমার মনে হয়, ব্রঙ্কাইটিসের পর আর একেবারে সুস্থ হতে পারছেন না। আপনি Macalvit Im. ইনজেকশন একমাস ধরে নিন, দেখবেন সেরে গেছেন।

● শ্রীমনোরঞ্জন মুখার্জী, দিগনগর, নদীয়া—

আপনার কন্যাকে দু মাস B-Neurophos অথবা B-G-Phos জাতীয় ওষুধ খাওয়ান। দেখবেন স্নায়ুর উত্তেজনা অনেক কমে যাবে।

●শ্রীঅমলকুমার জানা, ঠাকুরচক, মেদিনীপুর—

আপনার উভয় প্রশ্নের উত্তর একই সঙ্গে দিচ্ছি; আপনি নিয়মিত দুবেলা ভাতখাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে Neogadine খাবেন অন্তত দু' মাস ধরে।

● শ্রীরবীন্দ্রনাথ সাহা, নেপাল সাহা লেন, হাওড়া—

আপনি P. G. Hospital-এ যেমন দেখাচ্ছেন, দেখান। বাইরে এ অপারেশন ব্যয়সাপেক্ষ।

● শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যো-গেহ, পূর্ব সিঁথি লেন, কলি-৩০—

আপনি আপনার ছেলেমেয়েকে অধিক পরিমাণে ভিটামিন-এ খেতে দেবেন। এ ছাড়া একবার চক্ষু-চিকিৎসককে দিয়ে দেখিয়ে নেবেন।

● শ্রীসুদর্শন অধিকারী, ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর—

আপনি গন্তুষ্ট করতে না পারলে আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল হবে না। আপনি নিয়মমত দুবেলা করে চা-চামচের ২-চামচ অ্যামাইনোজাইম খাবেন, দু মাস।

● ডা: বিমলভূষণ রায়, পুলিশ কলোনী, নদীয়া—

হাইপার অ্যাসিডিটি অনেক সময়ে মানসিক দুশ্চিন্তার জন্য এবং অতিরিক্ত ধূমপানের জন্য হয়। বর্তমানকালের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাইপার অ্যাসিডিটি স্ট্রেস অ্যাণ্ড স্ট্রেন, ডিজিজের অন্যতম। আমার মনে হয় ওষুধ ছেড়ে দিয়ে দুবেলা খাবার পর একগ্লাস করে ভাল দুধ খেয়ে, নিজের কাজকর্ম করলে অনেক ভাল থাকবেন।

● শ্রীদুর্যোধন দাস, কলি-১—

প্রশ্ন: আমি ফাইলেরিয়া রোগে অনেকদিন যাবৎ ভুগিতেছি।

উত্তর: আপনি স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে দেখান। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আপনার রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

● শ্রী এস লাহা, এম-বি-রো, কলি-৪—

আপনি Gynecomastia রোগের জন্য এত উতলা হয়ে পড়েছেন কেন? যে-কোন বড় হাসপাতালের আউটডোরে গেলেই এর চিকিৎসা হবে।

● জি, সি, আই, ডি ক্যাম্প, ইস্ট রিজিয়ন, মেজিয়া—

আপনি রোজ মুখে Livoderm মলম লাগিয়ে কাজে বেরোবেন, তা ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন।

● শ্রীশঙ্কর ঘোষ, খড়দহ, ২৪ পরগণা—

আপনি সকাল বিকেল চা-চামচের ২-চামচ করে খাঁটি মধু খাবেন, পুরো শীতকাল ধরে।

সন্ধ্যারাগ

ভাস্কর দাশগুপ্ত

প্রত্যহের কর্মভারে বিকল হৃদয়—
গল্পে-গানে বিধ্বস্ত বিকেল,
রাত্রের নীরবতা তবু বাঙ্ময়
টেবিলে প্লেটের পরে—
একরাশ জুঁই-চাঁপা-বেল।

কোথায় হারিয়ে গেছে প্রেয়সী আমার...
ফুল সব স্মৃতি হয়ে তার কথা মনে
পড়ে যায়,
আমাকে সে বলেছিল আসবে আবার
নিটোল সন্ধ্যা কাটে—
তার প্রতীক্ষায়॥

দেবাশিস
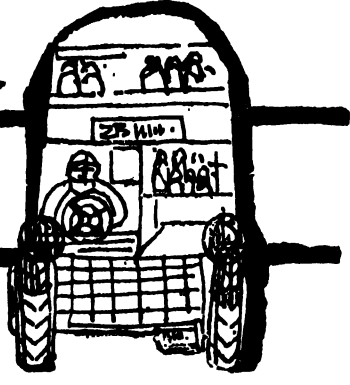
পর পর দু-বছর গাড্ডু খেয়ে পরের বার কম্পার্টমেণ্টালে স্কুল ফাইনাল পাশ করলাম। ফলে না পারলাম কলেজে ঢুকতে না পেলাম কেরানিগিরিও। বন্ধু দেবুর মাথাও হরেদরে আমারই সমান। তৃতীয় বারেও স্কুলের ফটক ডিঙোতে না পেরে সে মোটর ড্রাইভিং শিখছিলো। তার দেখাদেখি আমিও ভরতি হলাম তাদের স্কুলে।

মোটর ড্রাইভিং-এর সার্টিফিকেট নিয়ে যথাসময়ে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে দেখি ও-লাইনেও চাকরির আকাল। বছরখানেক ছুটোছুটির পর আমার এক দূর-সম্পর্কের উকিল মামার চেষ্টা-তদ্বিরে তাঁর এক গুজরাটি মক্কেলের জিপের ড্রাইভার হয়ে গেলাম বটে কিন্তু সে-সুখ বেশিদিন সইলো না। বছর না পেরুতেই ভদ্রলোক তাঁর জিপখানা ফেললেন বেচে। ফলে যথা পূর্বম্।

দেবুর ভাগ্য ভালো। সে স্টেট ট্রান্সপোর্টে চান্স পেয়ে গেল। পাকা চাকরি। আমাকে না জানিয়ে কোন্ ফাঁকে দরখাস্ত করেছিল স্টেট ট্রান্সপোর্টে। রাগে ও ঈর্ষায় মনে মনে ওকে গালাগালি করছি দিনে অন্তত বার দশেক, হঠাৎ ওই এসে শুধু সুসংবাদটি নয়, সঙ্গে একখানা দরখাস্তের ফরমও দিয়ে গেল।

'স্টেট ট্রান্সপোর্টে ড্রাইভার নেবে কয়েকজন, কালই দরখাস্ত পাঠিয়ে দিস।' ওভার-টাইম খেটে বাড়ি ফিরবার পথে বলে গেল ক্লান্ত দেবু।

পরের দিন দিলাম ওখানে এক দরখাস্ত ঠুকে আর দিন পনেরো না পেরুতেই পেয়ে গেলাম ইনটারভিউ।

বেকারির ঠেলায় এক্কেবারে নিঃস্ব অবস্থা তখন আমার, একটু সাজ-পোষাক করে হাজির হব মোটেই সে অবস্থা নয়। অগত্যা দেবুর নতুন চপ্পল-জোড়া ধার করে আর মণ্টুর ড্রেনপাইপ প্যাণ্টটায় পা গলিয়ে কতকটা কেতা-দুরস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হ্যাঁ, টেরিকটের একটা হাওয়াই-সার্ট ছিল তখনো আমার। জামাইবাবুর কাছ থেকে বাগিয়েছিলাম সেটা বছরখানেক আগে। দিই-দিই করেও আর ফেরত দিই নি, ততদিনে সেটা আমারই হয়ে গেছে।

অফিসে গিয়ে দেখি আরো জন ত্রিশেক এসেছে আমার মতো ইনটারভিউ দিতে। শুনলাম, এইভাবে ইণ্টারভিউ চলছে দিন সাতেক ধরে আর চলবেও। উঁহু, আমাদের ব্যাচে লেডিজ ছিল না। এ-লাইনে বোধহয় এখনো আসেন নি ওঁরা, পুলিশ লাইন পর্যন্ত ধাওয়া করে আপাতত থেমেছেন মহিলারা। তবে আসতে বোধহয় আর দেরি নেই বেশি। অবশ্য এলেই চান্স পাবেনই। সমানাধিকারের দাবি তো আছেই, সঙ্গে আছে 'লেডিজ ফার্স্ট' ডিকটাম।

জন দশেকের পরই আমার ডাক পড়লো। স্মার্টভাবে ঘরে ঢুকে আধা-মিলিটারি কায়দায় সেলাম ঠুকলাম। ওভাবে সেলাম দিতে দেবুই বলে দিয়েছিল আমাকে। ইনটারভিউ বোর্ডের সভাপতি ভদ্রলোকটি মিলিটারি-ফেরতা অফিসার---মিলিটারি আদব-কায়দা দেখলে নাকি গলে যান তিনি। মিলিটারিতে ট্রান্সপোর্ট সেকশানে ছিলেন। মিলিটারি থেকে রিটায়ার করতেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্টেট ট্রান্সপোর্টে আনা হয়েছে তাঁকে। পদমর্যাদায় স্টেট ট্রান্সপোর্টের চেয়ারম্যানের পরেই তাঁর স্থান।

ইনটারভিউ বোর্ডে তিনজন মেম্বার: মাঝখানে বসে যিনি তিনিই সেই মিলিটারি-ফেরতা সভাপতি। বাকি দুজনের একজন চীপ মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার আর তৃতীয় জন খদ্দরের টুপিপরা এক নন-অফিসিয়াল, হয়তো পায়াভারি কেউকেটা হবেন।

আমার মিলিটারি সেলামে সভাপতি খুশী হলেন মনে হলো। তিনিই নাম ধাম জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সখানা দেখাতে বললেন। লাইসেন্সখানার ভাঁজ খুলে এগিয়ে ধরতেই তার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন: গাড়ি-চালানো অভিজ্ঞতা আছে?

আছে, স্যার---বলেই আমার পুরনো মুনিবের সার্টিফিকেটখানা মেলে ধরলাম।

সেদিকে নজর না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন তিনি: গাড়ি 'বাম্প' করাতে জানেন, যাকে বলে আচমকা ঝাঁকুনি দেয়া?

জানি স্যার।

কী করে করতে হয়?

ফুল স্পীডে গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ ব্রেক কষে ডেডস্টপ করালেই হলো, বা স্লো স্পীডে চালাতে চালাতে গিয়ার চেঞ্জ করে হঠাৎ ফুল স্পীড দিলেই হলো। তাছাড়া রাস্তার মসৃণ অংশ এড়িয়ে খানাগর্তের ওপর দিয়ে সবেগে চালালেই হলো।

গুড, গুড, এখন বলুন তো স্টেট বাসে বাম্প করালে কী সুবিধা আর কীই বা অসুবিধা?

মজবুত গাড়ি হলে অসুবিধা নেইকো। আর এতে সুবিধা এই যে, চলার মুখে ঘন ঘন বাম্প করালে, বিশেষ করে অফিস টাইমে, অনেক বেশি প্যাসেঞ্জার ক্যারি করা যায়, বাম্পের ঠেলায় চিড়েচেপটা হয়ে প্যাসেঞ্জাররা গায়ে-গায়ে লেপটে যায় বলে দ্বিগুণ প্যাসেঞ্জার ধরানো চলে যাসে। তাতে রাস্তায় কম বাস বার করলেও চলে যায়, কোম্পানির আয়ও কমে না।

বা:, বা:, এসব তো বেশ জানেন দেখছি। যারা বাম্প করাতে পটু এখন থেকে তাদেরই আমরা সিলেক্ট করবো ঠিক করেছি।

আমি মৃদু হাসতেই বাঁ পাশের মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার বললেন: গাড়ি চালাতে গিয়ে কোনো অ্যাকসিডেন্ট করেছেন আপনার জীবনে?

ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ-অর্থক উত্তর দিলাম।

কোথায় কীভাবে করেছিলেন, বলুন তো।

মৌলালির কাছে সি আই টি রোডে, স্যার, আমার দোষ ছিল না মোটেই। মাত্র পঞ্চাশ মাইল স্পীডে চালাচ্ছি জিপ, হঠাৎ লাফ দিয়ে একটা ছেলে পড়লো আমার জিপের সামনে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে জিপ উঠলো গিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথে। সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো মস্তান গল্প করছিলো। তারা দুজনেই চাকার তলে যেতেই ব্রেক কষলাম। সবে সন্ধ্যে হয়েছে তখন। ব্রেক কষতেই দেখি সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে—সবখান থেকেই 'মার্ মার্, কাট্ কাট্' করতে করতে লোকজন তেড়ে আসছে। ধর্, ধর্, বানা হালুয়া বাছাধনকে'—সকলের কণ্ঠে ওই একই ধ্বনি।

অগত্যা পৈতৃক প্রাণটা বাঁচানোর তাগিদে দিলাম চালিয়ে জিপ সম্মুখ-পানে। কোথা দিয়ে চালাচ্ছি, কাকে হালুয়া বানাচ্ছি, খেয়াল নেই। কখনো ফুটপাথের ওপর দিয়ে চালাচ্ছি, কখনো বা রাস্তার ডান পাশ ঘেঁসে, অবশ্য অন্য গাড়ির সঙ্গে কলিশান এড়িয়ে। এই-ভাবে মিনিট দশেক চালিয়ে জিপখানা গ্যারেজের সামনে ফেলেই হাওয়া। পরের দিন কাগজে বেরিয়েছিল, বোধ-হয় দেখে থাকবেন, কুল্লে শ'খানেক জখম হয়েছে, রাস্তায় ও হাসপাতালের পথে জনদশেক মারা গেছে।

ও:, আপনিই সেই মাণিক। তাই বলুন। সাবাস্ বাহাদুর বটে আপনি। কতকটা বেসামালভাবে বলে উঠলেন সভাপতি। হাসিরও রোল উঠলো।

হাসি থামলে চীপ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার বললেন: জিপখানা তাহলে বাঁচাতে পেরেছিলেন দেখছি।

হ্যাঁ, মালিকের যান আর আমার জান—দুইই। কাঁচুমাচু হয়ে বললাম।

বেশ, বেশ, অ্যাকসিডেন্ট করেও ক্ষিপ্ত জনতার কবল থেকে যারা এই-ভাবে আমাদের বাসগুলো বাঁচাতে পারবে তাদেরই আমরা সিলেক্ট করতে চাই। যেভাবে বাসগুলো পুড়িয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে সকলে মিলে। দীর্ঘনি:শ্বাস ছেড়ে সভাপতি বললেন।

তাছাড়া অ্যাকসিডেন্টের পর যারা বাসগুলোকে সেফলি ডিপোয় নিয়ে আসতে পারবে তাদের পুরস্কৃত করার কথাও ভেবে দেখা হচ্ছে। এক-খানা গেলেই তো প্রায় লাখ টাকার ধাক্কা। মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার বললেন।

এবার খদ্দরের টুপিপরা ভদ্রলোক বললেন: আচ্ছা, ধরুন দুদিক থেকে দুখানা ট্রাম আসছে জোর কদমে আর এদিকে আপনি আপনার বাঁ পাশের ট্রামখানাকে ওভারটেক করতে গিয়ে বাসসুদ্ধ ট্রাম দুখানার মাঝে পড়ো-পড়ো হয়েছেন। এ-অবস্থায় ট্রাম দুখানা কাছাকাছি হচ্ছে দেখেও ওদের মাঝ দিয়ে সুড়ুত করে আপনার বাস-খানা গলিয়ে নিতে পারবেন?

আপনাদের দু-একজন কুশলী ড্রাইভারকে তো দেখেছি এ অবস্থায় আলগোছে বাসখানাকে গলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা পারলে আমি পারবো না কেন, স্যার? বাসখানাকে ঠিকই নিয়ে যেতে পারবো, তবে বাদুড়ঝোলা প্যাসেঞ্জারের দু-একজনের জান হয়তো খোয়াতে পারে, বাইচান্স পাদানিতে যদি কলিশান হয়ে যায়।

তাতে কিছুই এসে যাবে না, বাসের ক্ষতি না হলেই হলো। বাসের নিরাপত্তাই প্রথম দেখতে হবে, পরে ড্রাইভার-কনডাকটরদের। প্যাসেঞ্জারদের কথা ছেড়েই দিন। সভাপতি বললেন।

না স্যার, গাড়ি ফেলে পালানো আমার কিতাবে লেখা নেই। মালিকের গাড়ি বাড়ি পৌঁছিয়ে না-দেয়া পর্যন্ত আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে কক্ষণো মনে করিনে আমি। তবে—

তবে কী?

রাস্তা জাম থাকলে একটু মুশকিলে পড়তে হয় আর কি। এই ধরুন, শ্যামবাজারের দক্ষিণে অ্যাকসিডেন্ট হলে পাঁচমাথা পেরিয়ে দ্রুত বেলঘরিয়ায় বাস নিয়ে আসা বেশ কঠিন ব্যাপার। শিয়ালদহ-এসপ্লানেডেও ওই একই অসুবিধা। হকারদের দরুণ এসব জায়গায় ট্রাফিক যা জাম হয় তাতে ফুটপাথের কোল ঘেঁসে কেন, রাস্তার বুকের ওপর দিয়েও স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালানোর আর উপায় নেই। আখে একই চোরাগুপ্তিভাবে কাজ চালাতে

দুকানের ভেকধারী দোকানদাররা, ফুটপাথ ছাড়া বাস রাস্তায় মাত্র একটা লাইন দিত, মাঝে মাঝে পুলিশের সঙ্গে কানামাছিও খেলতো। রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হতেই দিন কয়েক তারা গা ঢাকা দিয়েছিল, পুলিশের তৎপরতায় হাত-পা ছড়িয়ে তখন চলাফেরা করা গেছলো কয়েক দিন। কিন্তু চার-পাঁচ দিন না যেতেই রাজ্যপালের কি এক ঘোষণার পর থেকেই পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আবার জাঁকিয়ে বসেছে তারা গোটা মুল্লুকটা জুড়ে পা ছড়িয়ে। ফুটপাথে, বাস রাস্তায় পসরা সাজাতে ভাড়া লাগে না বলে সাজানো দোকান লিজ দিয়ে অনেক দোকানিও ফেরিঅলা সাজছে, বাস রাস্তায় দু-তিন সারি দোকান সাজিয়ে রাস্তার বুক পর্যন্ত আগলাচ্ছে স্বাধীন দেশের সৎ ব্যবসায়ীরা, কাকেও আর পরোয়া করছে না তারা।

হ্যাঁ, রাস্তা জাম হলে অবশ্য একটু অসুবিধা হবার কথা। একটু ভেবে মাথা চুলকে বললেন সভাপতি।

আমার মনে হয় স্যার, এক ব্যবস্থা করলে অফেণ্ডিং বাসগুলোকে জনতার আক্রোশ থেকে সহজেই বাঁচানো যেতে পারে।

কী ব্যবস্থা?

বাসরুটের দুপাশে তিন-চারশ' গজ অন্তর পুলিশ ফাঁড়ি বসানো। অ্যাকসিডেণ্ট হলেই সবসুদ্ধ কাছের ফাঁড়িতে গা-ঢাকা দেয়া যাবে তাহলে।

আপনার প্রস্তাবটি অবশ্য ভেবে দেখবার মতো, তবে পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট এতে সায় দেবে কিনা কে জানে? অবশ্য ওরা কাছাকাছি ফাঁড়ি না বসালেও আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কোন্ পরিস্থিতিতে ড্রাইভারকে কী করতে হবে, কীভাবে তারা সিচুয়েশান ফেস করবে, সে-সব নিয়ে আমাদের গবেষণা চলছে। এর জন্যে আমাদের একটা একসপার্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। গম্ভীরভাবে বললেন সভাপতি।

তাছাড়া কখন কীভাবে বাম্প করাতে হয়, অ্যাকসিডেণ্টের পর কী উপায়ে মান ও জান বাঁচাতে হবে—সে সবের তালিম দেওয়ার জন্যে সম্প্রতি আমরা একজন একসপার্টও অ্যাপয়েণ্ট করেছি। সভাপতি থামতেই অনেকটা শুধার সঙ্গে বললেন মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার।

এসব তো জানতাম না, স্যার। একসপার্ট অ্যাডভাইস মিললে ড্রাইভার-কনডাকটররা তো নিশ্চিন্ত, সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে তারা।

আমি থামতেই একটা চুরুটে আগুন ধরাতে ধরাতে সভাপতি বললেন: মাই ডিয়ার ইয়াংম্যান, আপনার ভেতরে প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাচ্ছি আমরা, আপনাকে সিলেকট করতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে একটা কথা। অ্যাকসিডেণ্ট করে কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়লে আমরা কিন্তু আপনাদের ছাড়াতে যেতে পারবো না, বা আপনাদের জন্যে টাকা ব্যয় করতে পারবো না। তখন সাসপেণ্ড করে রাখা হবে আপনাদের। তবে মামলায় খালাস হলে আবার চাকরি মিলবে। সেক্ষেত্রে মামলার খরচার কিছুটা দেওয়া যায় কিনা তাও বিবেচনা করে দেখা হবে।

অ্যাকসিডেণ্ট করেও যদি বেঁচে যাই, তবে স্যার, মামলা করে কিছুই করতে পারবে না পুলিশে, অন্তত আমাকে। তখন আমার মামাই বাঁচাবেন আমাকে। ফৌজদারি কোর্টের দুঁদে উকিল তিনি, তাঁর জেরার ঠেলায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে সাক্ষীরা, দিনকে রাত বানাতে পারেন তিনি। তাছাড়া অন্য দাওয়াইও আছে তাঁর।

কী দাওয়াই?

এই ধরুন, বেয়াড়া মামলা দেখলে জেরার ঝুঁকি না নিয়ে সাক্ষীদের পোষ মানানোর ব্যবস্থা করা। সাক্ষীদের মুখ বন্ধ করানো আর এমন কি কঠিন কাজ। আপনারা তো জানেন, ফৌজদারি মামলায় দু-একজন সাক্ষী একটু উলটো গাওনা গাইলেই কেল্লা ফতে, আসামীদের বাজিমাৎ। মামা বেঁচে থাকতে শাস্তির আশঙ্কা নেই আমার।

আপনার মামার কথা তো আগে শুনিনি। কী নাম তাঁর, কোন্ কোর্টে আছেন? তাঁর নাম-ঠিকানা দিয়ে যাবেন তো অবশ্য করে। আমাদের এমপ্লয়িজদের উপদেশ দেব এখন থেকে তাঁকেই এনগেজ করতে। সভাপতি বললেন।

মামার নাম দিগ্বিজয় তলাপাত্র, একডাকেই চেনে সকলে তাঁকে, ব্যাঙ্কশাল আলিপুর শিয়ালদহ হাওড়া—সর্বত্রই তাঁকে নিয়ে টানাহেঁচড়া। তাঁর নাম-ঠিকানা দিয়ে যাব খন।

আমি থামতেই গম্ভীরভাবে বললেন সভাপতি: ভালো কথা, মৌলালির অ্যাকসিডেণ্টের নায়ক যে আপনি সেকথা আমাদের জানিয়ে ভালোই করেছেন। কিন্তু এখন থেকে ওটা চেপে যাবেন। পুলিশ ও মিলিটারি আপনার খোঁজ করছে।

পুলিশ কেন খুঁজছে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু মিলিটারির মাথাব্যথা কিসের?

আপনাকে ওরা চাকরি দিতে চায় বলে, আপনার মতো ঝানু ড্রাইভারের দরকার ওদের। ট্যাংক চালিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করতে আপনার মতো গুণিজনকে ওদের চাই-ই। চরম মুহূর্তে ঘটোৎকচের মতো শত্রুদের সাবাড় করবার সামর্থ্য আপনার আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। আপনাকে আমরা চাকরি দিয়েছি, আপনি আমাদের বাহিনীতে আছেন, তা জানতে পারলেই মিলিটারি জোর করে নিয়ে যাবে আপনাকে আর আপনার মতো একজন জিনিয়াসকে হারাবো আমরা।

ঠিক আছে, ব্যাপারটা না হয় গোপনই রাখবো।

এরপর টুপিপরা ভদ্রলোক বললেন: আচ্ছা, হাঁটুজল কোমরজলে ডোবানো রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা আছে আপনার?

আজ্ঞে না, বর্ষাবাদলায় দিনে জিপ বার করতে দিত না গুজরাটি শেঠজী। ট্রেনিং স্কুলের ওরাও দেয়নি সে-সুযোগ। 'তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, কলকাতায় থাকলে ও চান্স তুমি পাবেই।' জলে ডোবানো মহানগরীতে গাড়ি চালাতে চাইলেই আশ্বাস দিয়ে বলতো মোটর ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ

এককোমর জলে বাস দিয়ে ড্রাইভার-দের ডুব সাঁতার খেলার মনোরম কসরতটি অবশ্য কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তখন ঈর্ষাও হয়েছে ড্রাইভারদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে। এখন দয়া করে আপনারা আমাকে সিলেক্ট করলে সে পুলক-শিহরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে না আমাকে। তাছাড়া স্বল্প জলে জোর কদমে বাস চালিয়ে পথচারীদের গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে মজা লুঠবারও সুযোগ মিলবে আপনাদের কৃপায়।

না:, আপনাকে চাকরি দিলেও সে-সুযোগ বোধহয় আর দেব না আপনা-দের। আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আচমকা বললেন মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার।

কেন, স্যার? হতাশার সুরে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ও:, আপনি বোধহয় জানেন না, আগামী বর্ষা থেকে আমরা রবারের নৌকা ছাড়বো বাসরুটের ঘোপেঘাপে। এই ধরুন, বেলগাছিয়া, ঠনঠনিয়ার মতো জুতসই অঞ্চলে। খেয়ার মতো কাজ করবে সেসব অঞ্চলে রবারের নৌকোগুলো। ফালতু পয়সা খরচা না করেও তখন নৌকা ভ্রমণের আনন্দও পাবে আমাদের অনুগ্রাহী আরোহীরা। তাতে আরোহীর সংখ্যাও বাড়বে।

'এপারে আমি ওপারে তুমি, মাঝখানে নদী বয়ে যায়'—গোছের আর কি? গানের কলিটি বেফাঁসে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কতকটা তাই। ওহো, দেখছি গানও জানা আছে আপনার, আপনি রসিক লোক তো। স্মিতহাস্যে টুপিঅলা বললেন।

একটু অপ্রস্তুত হলাম। তবে সামলে নিয়ে বললাম: তবে তো।

না, তাতে ঘাবড়াবার কিছুই নেই। আধা হাঁটুজল বা তিন কোয়ার্টার পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হবে আপনাদের। কাদা-জল ছিটিয়ে হোলি খেলার সুযোগ নিশ্চয়ই দেব আপনাদের। বলে সভাপতি হেসে উঠলেন।

তাতেই হবে, স্যার, তাতেই একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বললাম আমি। তারপর একটু কাঁচু-মাচু হয়ে মোলায়েম সুরে নিবেদন করলাম: স্যার, যদি বেয়াদপি মাপ করেন তো আপনাদের ব্রেকডাউন সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নির্ভয়ে বলুন। বাসের ব্রেকডাউন সমস্যাটি আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে রীতিমতো। ভালো ইঞ্জিন, ভালো সাজসরঞ্জাম দিয়েই গড়াচ্ছি বাসগুলো, তবু ব্রেকডাউনের সংখ্যা বেড়েই চলেছে অপ্রত্যাশিতভাবে, ব্রেকডাউনের ঠেলা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে আমাদের পক্ষে। ঔৎসুক্য-ভরে সভাপতি বললেন।

ঘন ঘন ব্রেকডাউন কেন হচ্ছে তা আপনারাই ভালো জানেন, স্যার। ভালো ইঞ্জিন, ভালো পার্টস থাকলেও কোথাও গলদ রয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। তবে ব্রেকডাউন হলেও আপনাদের যাতে লোকসান না হয়, বা আয় না কমে সে-সম্বন্ধে আমার নিজস্ব একটা সাজেসশান আছে। তবে সেটা খুলে বলতে ভয় হচ্ছে, খুলে বললে আপনারা হয়তো আর আমাকে নেবেন না, হয়তো আপাতত নতুন ড্রাইভার না নিলেও চলে যাবে আপনাদের।

ইনটারভিউ বোর্ডের মেম্বারদের ঔৎসুক্যে এইভাবে বেশ খানিকটা সুড়সুড়ি দিয়ে থামলাম আমি।

এদিকে আমার সাজেসশানটি জানবার জন্যে যেন তর সইছে না ওঁদের। আমাকে থামতে দেখে সভাপতি বলে উঠলেন: না, না, সব খুলে বলতে হবে আপনাকে। আমরা কথা দিচ্ছি, আপনার সাজেসশান যাই হোক না কেন, আপনাকে আমরা নেবই।

গলা খাঁকারি দিয়ে ঢোক গিলে গলাটা সাফ করে নিয়ে শুরু করলাম আমি: 'ব্রেকডাউন হলেই গলায় কাছি বেঁধে সঙ্গে সঙ্গেই বাসগুলোকে ডিপোয় টেনে আনছেন আপনারা রিপেয়ারের জন্যে। কিন্তু বাসের টায়ারটিউব ঠিক থাকলে কেন যে সেগুলোকে হাসপাতালে পাঠান তা আমি বুঝতে পারি না। তা না করে আরেকটা বাসের সঙ্গে জুড়ে দিলে যে কাজ চলে যায় তা বোধহয় আপনারা ভেবে দেখেন নি। খুঁত বাসটাকে একটা নিখুঁত বাসের সঙ্গে ট্রেলারের মতো কায়দা করে জুড়ে দিলে একসঙ্গে দুটো বাসই প্যাসেঞ্জার ক্যারি করতে পারে, দু-কামরার ট্রামগুলো যেভাবে চলছে সেইভাবে দুটো বাসই এক সঙ্গে চলতে পারে। তখন মাত্র একটা চালু ইঞ্জিন আর মাত্র একজন চালিয়ে ড্রাইভার হলেই, ব্যস! একটার পেট্রোলে দুটো বাসই চালানো যাচ্ছে সেক্ষেত্রে। তাতে পেট্রোল-মবিল কম লাগছে, এক-জন ড্রাইভারও উদ্বৃত্ত হচ্ছে। তাতে খরচা কত কমছে একবার ভেবে দেখুন। অবশ্য তখন বাসের গতি কিছুটা স্লো হবে। তবে তাতে কোম্পানির লোকসানের কিছুই নেই। যাদের বাসে যাবার দরকার, পনেরো মিনিটের জায়-গায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগলেও তারা বাসে যাবেই। একচেটে ব্যবসার এইখানেই তো মজা।

অবশ্য বডি ভেঙ্গে তচনছ হয়ে গেলে বা টায়ার-টিউব ফেটে গেলে এভাবে চালানো যাবে না। কিন্তু ইঞ্জিনের গোলমালের জন্যেই তো বেশি ব্রেকডাউন হচ্ছে আর তার মেরামতির জন্যেই তো লাখ লাখ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, আপনাদের লাভের মধুর বেশিটা তো মেরামতির পিঁপড়েই সাবাড় করে দিচ্ছে।

আমার কথাগুলো ওঁরা যেন গিলছিলেন। আমি থামতেই সভাপতি বললেন: এ্যা:, তাই তো, এই সহজ কথাটা তো আমাদের মাথায় ঢোকেনি। ইয়োর্স ইজ এ ভেরি কনসট্রাকটিভ সাজেসশান। চেয়ার-ম্যানকে বলে কাল থেকেই এটা চালু করা যায় কি না দেখছি। আর আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মতো জিনিয়াসকে আমরা ছাড়ছিনে, আপ-নাকে চাকরি দেবই।

এইভাবে আপ্যায়িত হয়ে গদগদ

সুরে বললাম : আর একটা কথা বলবো, স্যার?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।

বাসের ভাড়া বাড়ানোর কথা মাঝে মাঝে কেন তুলছেন, স্যার?

দৈনিক বিরাট লোকসান হচ্ছে বলে, আয় থেকে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে বলে। এই দেখুন না, সামান্য দড়ি কিনতেই বছরে লাখখানেক বেরিয়ে যাচ্ছে।

কোন দড়ি? যে কাছি দিয়ে ব্রেকডাউন বাসগুলো টানা হচ্ছে?

না, না, সেগুলো তো কাতার কাছি, তার খরচা আলাদা। এ হলো ঘণ্টা-বাজানো দড়ি। ওই যে কয়েক গজ করে দড়ি টানানো থাকে ফি বাসে।

ওগুলো কি বিলেত থেকে আমদানি স্যার, না পি-এল ফোর-এইটির দৌলতে পাওয়া?

না, না, বিলিতী মার্কিনী নয়, দিশী। ওর বাজারে এখন নাকি আগুন। তাই, কেবল ওর পেছনেই লাখখানেক বেরিয়ে যাচ্ছে।

তা স্যার, আগুন লাগলে তো আক্রা হবেই, দমকলের বাবারও সাধ্যি নেই সে-আগুন নেবানো। তা, তাই বলে ভাড়া-বাড়ানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন কেন? তা না করে বরং---

বরং কী? আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন সভাপতি।

ভাড়া না বাড়িয়ে বরং সিটগুলো সরিয়ে দিন, ডাবল ডেকারের নিচের তলার সিটগুলো আর একতলা বাসের বেবাক সিটগুলো, দেখবেন যে-পরিমাণ জায়গায় এখন দুটো লোককে বসাচ্ছেন সেখানে জন আষ্টেক নির্বিঘ্নে দাঁড়াতে পারছে, আর 'আগে নামতে দিন', 'সামনে এগিয়ে যান,' 'লেডিজ সিট নেই', 'মারো ঠেলা, হেঁইও' প্রভৃতি আউড়ে কনডাকটরদের গলা সাধতে হচ্ছে না। সিটগুলো তুলে দিলে সিট তৈরির জন্যে ফালতু খরচা তো হচ্ছেই না, অধিকন্তু বাড়তি প্যাসেঞ্জার নিতে পারায় ভাড়াও বেশি মিলছে। তাছাড়া গদিঅলা সিট দিয়ে সাজিয়ে বাসের শোভাবর্ধনেরই বা দরকার কী? অন্তত গদিঅলা সিটগুলো তুলে দিন, দেখবেন তৈরী খরচা কত কমে যাচ্ছে। ডানলোপিলোর সিট নেই বলে কি প্রাইভেট বাসে লোকে চড়ছে না?

পাবলিক তা শুনবে কেন? গদির আস্বাদ পেয়েছে তারা। তাছাড়া মাঝে মাঝে সিটে বসতে পারছেও অনেকে?

পাবলিকের মনস্তত্ত্ব কিছুটা জানা আছে আমার, স্যার। তাদের সকলেরই পকেট এখন গড়ের মাঠ; তাই কৃচ্ছ্র-সাধনে আপত্তি নেই মোটেই তাদের। কয়েক দফায় ভাড়া তো বাড়ানো হয়েছেই, আর না বাড়লেই পাবলিক সন্তুষ্ট। তাছাড়া একদিনেই সব সিট না তুলে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে ওগুলো সরিয়ে নিন, দেখবেন তারা টেরও পাবে না, কেউ রাকাড়বে না। আর যদি ডানলোপিলোর সিট রাখতেই চান তো প্রমোদ ভ্রমণের লাকসারি বাসগুলোতে রাখুন গিয়ে, 'দ্রুতক্রান্তা' 'লঘুচ্ছন্দা' 'কলস্বনা' 'মধুস্বপ্না' 'দীঘাচরী' 'দিগন্তিকায়' যত খুশি ডানলোপিলোর কুশন বসান গিয়ে।

হ্যাঁ, এ প্রস্তাবটিও বিবেচনার যোগ্য। আমাদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে দেখি, তিনি কী বলেন।

যদি বেয়াদপি মাপ করেন, স্যার, তবে আর একটা কথা বলতে চাই। সভাপতিকে নিবেদন করলাম।

হ্যাঁ বলুন, তবে সংক্ষেপে। বললেন সভাপতি।

কথাটা এমন কিছু না হলেও এর গুরুত্ব কম নয়। পুলিশের সঙ্গে আপনাদের স্টাফের সম্পর্কের কথাটাই বলতে চাইছি আমি। ভাড়া নিয়ে পুলিশের সঙ্গে মাঝে মাঝে কেন যে লাঠালাঠি করছে আপনাদের স্টাফ তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরতেই পারছি নে। আপনাদের স্টাফ কি মোটর ভেহিকল রুলস, ট্রাফিক রুলস হামেশাই ব্রেক করছে না? অফ-ডিউটির সময় পুলিশের পাঁচ-দশজনকে বিনা ভাড়ায় বাসে চড়তে দিলে সে সব গাফিলতির যদি জবাবদিহি করতে না হয় তবে তাদের চটানো কেন? বিনা ভাড়ায় বাসে চড়তে দিলে তারা খুশী হবেই আর সে সব ত্রুটি তারা উপেক্ষা করবেই। আমার কথা, কত প্যাসেঞ্জারই তো নিয়ত বাসে চড়ছে বিনা ভাড়ায়, তার সঙ্গে গেলই না হয় কিছু পুলিশের লোক, তাদের পরিবারবর্গ।

তাছাড়া পারবে কি পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সমানে লড়তে আপনাদের লোক-জন? বৃটিশ আমল থেকে প্রফুল্ল ঘোষের আমল পর্যন্ত নিত্য কত হল্লায়, কত খণ্ডযুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে লড়ে জয়-মাল্য গলে পরেছে তারা। স্ট্রীটফাইটে তাদের যে অভিজ্ঞতা আছে সে অভিজ্ঞতা আপনাদের বাহিনীর নেই। তাছাড়া রাইফেল-রিভলবার তো দূরের কথা, আপনাদের ডিপোয় ঢাল-তলোয়ার পর্যন্তও নেই একখানা। ট্রান্সপোর্টের নিধিরাম সরদারদের সম্বল তো ওই বাস স্টার্ট-দেওয়া হ্যাণ্ডেলখানা। আমার বক্তব্য, পুলিশদের ক্ষেপিয়ে লাভ নেই, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ বিড়ম্বনারই সামিল।

ঠিক আছে, আপনার কথাগুলো ভেবে দেখা যাবে। এ-সম্বন্ধে শীগগিরই কমিশান বসছে। তখন এসব বিবেচনা করে দেখবো আমরা। যাক, আপনি এখন আসুন। আবার বলে রাখছি, আপনাকে আমরা অ্যাপয়েণ্ট করবোই, আপনি প্রস্তুত থাকবেন। বলে সভাপতি বিদায় জানালেন।

এবার ছোট্ট একটা নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম আমি।

●

দিন সাতেকের মধ্যেই স্টেট ট্রান্সপোর্টে ড্রাইভারের চাকরি হয়ে গেল আমার। তবে এখন আর আমি দেবুর মতো সামান্য ড্রাইভার নই। শুধু দেবু কেন, সব ড্রাইভারদের টপকে আমি এখন তাবৎ ড্রাইভারদের 'হেড এক্সপার্ট ট্রেনার।' নতুন ড্রাইভার নিযুক্ত করার সময় আমাকেও নেওয়া হয় ইনটারভিউ বোর্ডে চতুর্থ মেম্বার রূপে, আমি কলকে পাই সবার আগে।

বক্রী শনি দুর্যোগ দুর্দৈব-এর কারণ। আর এই শনি মাসের বারো তারিখে আবার মীনে ফিরে যাচ্ছে। পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শনি মীনে বক্রীই থাকবে। সিংহস্থ মঙ্গল আশ্বিন মাসে শনি ও রাহুর উপর পূর্ণদৃষ্টি দেবে। নানা ধরণের বিক্ষোভ অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতা, পরস্পর সংঘর্ষ এবং প্রভুত্ব-কামীদের মধ্যে হীনমন্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে। শনি আবার মেষ রাশিতে মার্চ মাসে ফিরে আসবে। শনির মেষ রাশির অবস্থিতিকাল অত্যন্ত ভয়াল হয়ে উঠতে পারে। শ্রমিক-মালিকে বিরোধ ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করতে পারে। যাক্ এই আশ্বিন মাস জনমনে অশুভ কালোছায়া ফেলতে পারে; আতঙ্কগ্রস্ত হতে পারে নরনারী। লোকহানিকর যোগও রয়েছে প্রবল।---আশ্বিনে যাদের জন্ম, যাদের কন্যা লগ্ন, কিংবা কন্যা রাশি অথবা মীন লগ্ন কিংবা মীন রাশি তাদের প্রত্যেকেরই সকল ব্যাপারে এই মাসে সাবধান থাকা উচিত। চৈত্র মাসে যাদের জন্ম তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। মিথুন লগ্ন কিংবা মিথুন রাশির ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে অশান্তিকর পরিবেশ দেখা দিতে পারে। সিংহের পক্ষে সামান্য ভুলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যাক্ এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী আশ্বিন মাসের ব্যক্তিগত শুভাশুভের আভাস দিচ্ছি।

॥ আশ্বিন মাসের ফলাফল ॥

মেষ : যতই আয় হোক না কেন, আর্থিক দুশ্চিন্তা মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলতে পারে। পারিবারিক চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে উঠবে। বাইরের দেনাপাওনার ব্যাপারেও সমস্যা থাকবে। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও মিষ্ট ব্যবহারে অপমানকর অবস্থা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। চাকুরী ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ থাকবে। স্নায়ু প্রায়ই উৎপাত করবে। কোনো অনিষ্ট রোগ আক্রমণ করে কিনা সে-দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। পাকাশয় উদর রক্ত যাদের তাদের ব্যাপারেও উত্যক্ত হবার সম্ভাবনা। মহিলা জাতকের পক্ষে শত্রুবৃদ্ধি ও পারিবারিক ব্যাপারে অশান্তি ভোগের আশঙ্কা। মেষলগ্নে জন্ম যাদের তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ব্যবসায়ে নতুন যোগাযোগ হলেও আশানুরূপ হবে না। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ মানসিক চাপ বাড়াবে। শেষাংশে কোথাও যাবার যোগাযোগ হতে পারে। বিশিষ্ট বন্ধু কিংবা প্রভাব-শালী ব্যক্তিদের মধ্যে কারো সহায়তা কাজে লাগবে। ছেলেমেয়েদের বিশেষ কষ্টকর হয়ে উঠবে। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়, আর্থিক ব্যাপারে মনোমালিন্য এবং আর্থিক অসঙ্গতির জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ নষ্ট হতে পারে। ব্যব-সায়ে আগের তুলনায় আয় কিছু বাড়লেও আশানুরূপ হবে না। চাকুরী-ক্ষেত্রে বদলি কিংবা পরিবর্তনের ইঙ্গিতও পেতে পারেন। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বাতজ উৎপাত ও উদর বায়ু সংক্রান্ত গোলযোগ উত্যক্ত করতে পারে। কোনো নতুন পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার পক্ষে এখন বাধা রয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মনো-মালিন্য, সন্তানপীড়া ও বিশিষ্ট কোনো হিতৈষী বন্ধুর জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মাসের শেষাংশ আশাপ্রদ। মহিলা-জাতকের পক্ষে মনোমত দ্রব্যলাভ হলেও এ মাস প্রায়ই উৎকণ্ঠায় কাটাবার সম্ভাবনা। বৃষলগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে আর্থিক দুর্ভাবনা এবং

ভুগজোতক

এখন অর্থাগমের যোগাযোগ ও নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখা দিলেও নানাভাবে ঝঞ্ঝাট ভোগের আশঙ্কা।

বৃষ : আর্থিক দিক থেকে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ আশাপ্রদ হতে পারে। কিন্তু গোড়ার দিকের ঝঞ্ঝাট সামলানো

[illegible] চালিয়ে যাবার পক্ষে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। বাইরে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন: অর্থাগমের দিক থেকে মোটামুটি ভাল। কিন্তু সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ও সেইহেতু ব্যয়বৃদ্ধি এবং বাইরে কোথাও যাবার পরিকল্পনায় বাধা পড়তে পারে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রতিদিন সকল কাজেই বিশেষ-সাবধান। পারিবারিক ক্ষেত্রে আকস্মিক কোনো সঙ্কট দুর্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে নতুনভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে বুদ্ধিজীবী ও লেখক-দের এবং শিল্পীদের যোগাযোগের দিক্ থেকে ভাল। নতুন ইঞ্জিনীয়ারদের বাইরে চাকুরী পাবার সম্ভাবনা। গৃহ নির্মাণকারী কন্ট্রাক্টার বা ইঞ্জিনীয়ার-দের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা। রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্যোগীদের হতাশ হবার আশঙ্কা। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হোন। আশ্রিতদের কারো জন্য ক্ষতি হতে পারে। নতুন প্রার্থীদের চাকুরী হতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে হতাশা এবং প্রিয়জনের জন্য দুশ্চিন্তা ভোগের আশঙ্কা। মিথুনলগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা এবং কর্মক্ষেত্রে নৈরাশ্যের ভাব প্রবল হয়ে উঠতে পারে।

কর্কট: স্বাধীন প্রোফেশনেই হোক আর চাকুরীই হোক্ সকল ক্ষেত্রেই এখন বিশেষ ধৈর্য ও সতর্কতার আব-শ্যক। সামান্য ভুলে সুযোগ নষ্ট অথবা ক্ষতির আশঙ্কা। ঝঞ্ঝাট এবং পরের জন্য ঝুঁকি নেওয়া সম্পর্কেও সাবধান থাকা উচিত। কোনো ব্যাপার তলিয়ে না দেখে শুধু উত্তেজনার বশে অথবা ভাবপ্রবণতায় তার সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত হবে না। ব্যবসায়ের মোড় পরিবর্তন হতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত থাকলেও শত্রুতা ও নানা ধরণের ঝঞ্ঝাট মানসিক শান্তির বিঘ্ন ঘটাতে পারে। নতুন কোনো পরি-কল্পনা অনুযায়ী কাজে হাত দেবার আগে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করুন। পারিবারিক অসুখ-বিসুখও উৎপাত করতে পারে। শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী এখন কিছুদিন বিশ্রাম করাও আপনার পক্ষে আবশ্যক। মধ্যভাগের পর বাইরে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদির ব্যাপারে অনুকূল অবস্থা আসছে। জমি বাড়ি কেনাকাটার ব্যাপারে এখন উদ্যোগী না হওয়াই ভাল। মহিলা জাতকের পক্ষে শারীরিক কষ্ট ও সাংসারিক ঝঞ্ঝাট উত্ত্যক্ত করবে। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে অন্যান্য বারের মত মনোমত কাজে বাধা ও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা।

সিংহ: এক ধরণের ঔদাস্য দেখা দিতে পারে। কাজের চাপ অনেকাংশে কমবে তবুও একরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা মানসিক অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে। পারিবারিক ব্যাপার মোটামুটি ভাল। কিন্তু কারো অসুখ-বিসুখ মধ্যভাগে উত্ত্যক্ত করতে পারে। গুরুজনদের কারো স্বাস্থ্য-সঙ্কট সম্বন্ধে দুর্ভাবনা ঘটতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যও তেমন ভাল যাবে না। সামাজিক আপ্যায়নাদিতে ব্যয় বাড়বে। মধ্য-ভাগে বাইরে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের আয়ের পক্ষে নতুন যোগাযোগ হতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন যোগাযোগের সম্ভাবনা। আসন্ন কোনো পরীক্ষা থাকলে তার জন্য বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধরে নিজে প্রস্তুত হোন। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ঘটিত কোনো নতুন ঝঞ্ঝাট মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। মহিলা-জাতকের পক্ষে এখন নানাভাবে উত্তেজনার কারণ ঘটতে পারে। নতুন কোনো খবর চাঞ্চল্য আনতে পারে। সিংহলগ্নে জন্ম হলে আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ হবে না। প্রিয়জনের জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ ও অযথা ঝঞ্ঝাট বিব্রত করতে পারে।

কন্যা: সাধারণভাবে চললেও আর্থিক সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠতে পারে। সঞ্চিত অর্থের অপচয় ও কোনো লেনদেনের ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা। শরীরও উৎপাত করবে। দাম্পত্য জীবনেও দুশ্চিন্তা ভোগের আশঙ্কা আছে। বিবাহিতা কন্যা সম্বন্ধেও নতুন চিন্তা উত্ত্যক্ত করতে পারে। পুরনো রোগ থাকলে আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ব্যবসায়ে জটিলতার মধ্যেও আয় বৃদ্ধি হবে। চাকুরীক্ষেত্রে সংশয় দেখা দিতে পারে। নতুন কোনো শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদনের প্রচেষ্টা যাঁরা করছেন, তাঁদের যোগা-যোগের দিক থেকে ভাল হবে। রাজ-নৈতিক ব্যাপার এড়িয়ে চলা আবশ্যক। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে অনুকূল অবস্থা হবে না। প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে এখন এগিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। মাসের মধ্যভাগে অপ্রত্যাশিত লাভেরও সম্ভাবনা। মহিলা জাতকের পক্ষে আর্থিক অনটন ও প্রিয়জনের জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা। কন্যা-লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি পেলেও স্বাস্থ্য ও আর্থিক চিন্তা উৎপাত করবে।

তুলা: কেমন যেন এক ধরণের মানসিক দুর্বলতা এবং আয়ু সম্বন্ধে দুর্ভাবনা মাঝে মাঝে উতলা করে তুলবে। পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে যাঁদের বয়স তাদের সম্বন্ধে একথা বেশী খাটবে। প্রোফেশনে বা ব্যবসায়ে অর্থাগমের হ্রাস পাবে। অথচ ব্যয় বাড়বে প্রচুর। ব্যবসায়ে নতুন যোগাযোগের পক্ষেও বাধা। আশানুরূপ কাটতিও হবে না। নতুন ব্যবসায়ের কিংবা কোনো কার-খানা গড়ে তোলার চেষ্টা যাঁরা করছেন, এ মাসে তাঁদের বিশেষ কোনো সুবিধা হবে না। দূরে কোথাও যাবার পক্ষে বাধাও রয়েছে। স্বাস্থ্য মাসের অধি-কাংশ সময়ই বিব্রত করবে। তবু আগের কোনো প্রচেষ্টার ফল এখন অনুকূল হতে পারে, চাকুরী ক্ষেত্রে আশানুরূপ হবে না। বৈষয়িক ব্যাপারে শত্রুতা অন্যের আগ্রাসী মনোবৃত্তি উত্ত্যক্ত করে তুলতে পারে। অবশ্য নতুন প্রার্থীদের চাকুরীর ব্যাপারে

শুভ ইঙ্গিত রয়েছে। কনট্রাক্টার ও দালালদের নতুন যোগাযোগের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়তে পারে। মাসের শেষাংশে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের এখন অনুকূল হবে না। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রিয়জনের উন্নতিতে আনন্দ ও আর্থিক লাভ হতে পারে। তুলালগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের উৎপাত ও প্রিয়জন চিন্তা উত্ত্যক্ত করতে পারে। ব্যয়াধিক্য বিচলিত করবে।

বৃশ্চিক : এবার যেন সংশয়-দ্বন্দ্ব কাজকর্মে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে বলে মনে হবে। অথচ সব জেনেশুনেও কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। সহকর্মী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যাপারে জড়িত হয়ে নিজেই শেষে ব্যতিব্যস্ত হতে পারেন। ব্যবসায়ীক্ষেত্রে আশানুরূপ হবে না। বরং মোটা রকমের টাকা আটকা পড়তে পারে। কারখানা খোলার বিষয়ে ঝঞ্ঝাট দেখা দেবে। ভ্রাতা কিংবা ভ্রাতৃস্থানীয় কারো জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা। নিজের স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে। স্পষ্টবাদিতা ও আত্মসম্মানজ্ঞান ক্ষতির কারণ হতে পারে। উচ্চক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে এ সময় বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। পারিবারিক ক্ষেত্রে মোটামুটি চলনসই; কিন্তু আকস্মিক অসুখ-বিসুখে ঝঞ্ঝাট বাড়তে পারে। ব্যয়ের মাত্রা হিসাব ছাড়িয়ে যেতে পারে। নব-বিবাহিতদের পক্ষে বিশেষ সাবধানে চলা উচিত। বিবাহেচ্ছুদের এখন বিবাহে পাকা কথা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। নতুন প্রার্থীর চাকুরী লাভ হতে পারে। মহিলাজাতকের পক্ষে কোনোসূত্রে লাভ এবং প্রিয়জনের সম্বন্ধে সুখবর পাবার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক যোগাযোগের দিক থেকে ভাল হতে পারে।

ধনু : নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য ত্যাগস্বীকার ও ক্ষতিস্বীকার করার মতো অবস্থা দেখা দিতে পারে। বৈষয়িক ব্যাপারে এর জন্য অনেক অশান্তি ভোগের আশঙ্কা। পুরনো যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে, তাও আবার যুক্ত হতে পারে। ব্যবসায়ে নতুন পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য ব্যস্ততা ও অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা। রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। বৃহৎ পুঁজিপতিদের পক্ষে আকস্মিক সঙ্কট দেখা দিতে পারে। ওষুধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যের ছোট ছোট উৎপাদনকারীদের পক্ষে অনুকূল সময়। পারিবারিক ক্ষেত্রে অতৃপ্তি ও অশান্তি মনের উপর চাপ দেবে। আয়ের মাত্রা আগের তুলনায় কিছু বেশী হলেও চাহিদা অনটন বাড়াবে। হঠাৎ চাকুরী পরিবর্তনের সম্ভাবনাও আছে। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে অশান্তি বাড়বে। মহিলাজাতকের পক্ষে স্বাস্থ্য চিন্তা ও প্রিয়জন সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কারণ ঘটতে পারে। ধনলগ্নে জন্ম হলে সুনাম বৃদ্ধি হলেও স্বাস্থ্য ও পারিবারিক ঝঞ্ঝাট উত্ত্যক্ত করতে পারে।

মকর : বাইরে যাবার কোনো প্ল্যান থাকলে তাতে বাধা উপস্থিত হতে পারে। আবার যতই নির্লিপ্ত থাকতে চান না কেন, পারিবারিক বা আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে জড়িত হয়ে সময় নষ্ট ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। হঠাৎ গুরুজনদের কারো অসুখ-বিসুখ সঙ্কটসৃষ্টি করতে পারে। বাড়িঘর সংক্রান্ত ব্যাপারে ও পুরনো কারবার নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও পরের জন্য ছুটাছুটি করার আশঙ্কা। ব্যবসায়ে নতুন ইঙ্গিত এবং সাফল্যর আলো দেখা দিতে পারে। কারখানা স্থাপন কিংবা কেনাকাটার ব্যাপারে সুবিধা হতে পারে। চলতি ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। কিন্তু অধীনস্থ ও আশ্রিত জনের জন্য ঝঞ্ঝাট ও ব্যয়বৃদ্ধি ঘটতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে গতানুগতিক। নতুন প্রার্থীর চাকুরী লাভ হতে পারে। তরুণী অবিবাহিতা মেয়েদের বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পরীক্ষার্থী মেয়েদের পক্ষেও
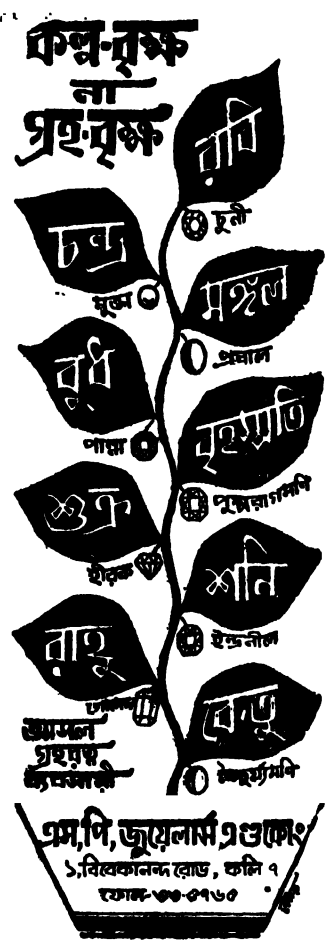
শুভ। মকর লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও কাজকারবারে অনিশ্চিত অবস্থা দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে।

কুম্ভ : মাসের মধ্যভাগে হঠাৎ কোনো জটিলতা দেখা দিতে পারে। বৈষয়িক ব্যাপারে বুদ্ধি-বিবেচনা করে চলা দরকার। পুরনো বিষয়ের মীমাংসা হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ে নতুনভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। ঘরবাড়ি নিয়েই নতুন ব্যবস্থা করার মত ইঙ্গিত আছে। নতুন কারখানা করার কিংবা অন্যের কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবারও সম্ভাবনা। আর্থিক দিক থেকে তেমন আশাপ্রদ নয়। একসঙ্গে অনেক টাকা লেনদেনের ব্যাপারে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। পারিবারিক দিক থেকে মনের মত পরিবেশ হবে না। নিজের উপযুক্ত জেনেও বিরুদ্ধ হয়ে উঠতে

পারে। সিনেমা সংক্রান্ত কারবারী, প্রযোজক ও পরিচালকদের বিশেষ সঙ্কটে পড়ার সম্ভাবনা। মহিলাজাতকের পক্ষে আকস্মিক লাভ এবং শেষাংশে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। কুম্ভলগ্নে জন্ম হলে নতুন উদ্যম এবং তার জন্য ব্যস্ততা বুঝায়। কিন্তু ব্যাধিক্য ও পারিবারিক সমস্যা উত্যক্ত করে তুলবে। স্বাস্থ্যও ভাল যাবে না।

মীন : বক্রী শনি বিশেষ শুভ করবে না। তবু কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু আশা করতে পারেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানমূলক কাজে সম্মান বাড়বে। চাকুরীক্ষেত্রে গতানুগতিক চলবে। শিক্ষাব্রতী ও বিজ্ঞানব্রতীদের নতুন কোনো সম্মানজনক কার্যের আমন্ত্রণ পাবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ে দুর্ভাবনার কারণ রয়েছে। এবং পুরনো ব্যবসায় ঢেলে সাজাবার মত চিন্তা দেখা দেবে। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বাইরে যাবার তোড়জোড় করেও নির্দিষ্ট সময়ে যাবার পক্ষে বাধা আসতে পারে। লেখক ও শিল্পীদের অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে লাভবান হবার সম্ভাবনা। নতুন কোনো ব্যবসায়ে নামার আগে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করুন। বৃহৎ পুঁজিপতিদের ও বৃহৎ কারবারীদের পক্ষে এখন থেকে দু' বছর বিপর্যয়মূলক হয়ে উঠতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা উচিত. দৈবনির্ভরতা ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। মীনলগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলমাল ও আর্থিক দুর্ভাবনা হলেও প্রীতির প্রসারে আনন্দ বৃদ্ধি পাবে।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীপ্রতাপরঞ্জন মুখার্জী (ভিলাই)—একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠাবেন না। ইতিমধ্যে উন্নতি না হলে এ বছর হবে না, (২) আড়াই বছর পর, (৩) কর্কট রাশি ও মীনলগ্ন, (৪) হবে না। ● শ্রীমতী রেণু মুখার্জি (সূর্যনগর, রিজেন্ট পার্ক)—প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার কোনো প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির পায়ে নীল অপরাজিতা ও জবাফুল দিয়ে দেখুন। ●শ্রীবিনতা (কলিকাতা-৯)—(১) উচ্চ শিক্ষার যোগ, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত সাবধান। (২) গ্রহকবচ কিংবা রিষ্টিনাশক কবচ ধারণ করাতে পারেন। ● শ্রীক্ষিতিনাথ সুর (তারাগুনিয়া)—(১) চিন্তা নেই, বর্তমান বর্ষে হতে পারে, (২) সুখশান্তি হবে। ●শ্রীচারুচন্দ্র দাশ (শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলি)—(১) দেরী হবে, (২) তিন বছর ভাল নয়। ● শ্রীমতী অপরিচিত (রায়পাড়া)—এক সঙ্গে একটি কুপনের বেশী দেবেন না; (১) শিক্ষিত ও পদস্থ; (২) একুশ থেকে বাইশের মধ্যে, (৩) কতবার আসবে বলা সম্ভব নয়, (৪) সুখের। ●শ্রীঅপরিচিতা (গরিফা)—(১) বর্তমান বছরে হতে পারে, (২) মোটামুটি ভাল। এ বছর না হলে আরো তিন বছর দেরী। ●শ্রীশ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (কালচিনি)—(১) আগামী এগারো মাসের মধ্যে, (২) প্রবাল নয়রতি। ● শ্রীমতী সুখেলা চক্রবর্তী (রিষড়া)—মাসিক বসুমতীর কুপন সহ নিয়মমাফিক প্রশ্ন করতে হবে। ● শ্রীজগৎকৃষ্ণ মিত্র (রিস্রাবাড়ী)—(১) মকর লগ্ন। (২) কিছু উপকার হতে পারে। ● শ্রীশ্যামসুন্দর

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

মিত্র (মির্বাথাটী)—(১) বৃশ্চিক রাশি। জন্মের সময় না দেওয়ায় গণ ও লগ্ন জানানো সম্ভব নয়, (২) অনুরক্ত হবে কিন্তু স্বাধীনচেতা। ● শ্রীঅবনীকুমার চ্যাটার্জী (বিলুগ্রাম) —(১) প্রথম জনের বর্তমান বর্ষ একটু ঝঞ্ঝাটপূর্ণ হবে: (২) এবার শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। ● শ্রীসমীরকুমার পালিত (আনন্দ পালিত রোড, কলিঃ)—(১) শনি ও রাহুর প্রভাবে মেষ রাশির উপর কুপ্রভাব পড়েছে। কিন্তু বৃহস্পতি এখনো শুভ ফল দিচ্ছে, (২) তিন বছর ধৈর্য ধরে চলতে হবে। ● কুমারী সুস্মিতা সেনগুপ্ত (ডাক্তার লেন, কলিকাতা)—(১) মোটামুটি ভাল, (২) ভালই হবে। কোনোরূপ শিল্প-কলা শিখলে সুনাম হতে পারে। ● শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় (সেণ্ট্রাল রোড, আগরতলা—(১) অষ্টমস্থ রাহু ও চতুর্থস্থ মঙ্গল বাধা আনছে; ধৈর্য ধরে চলুন, (২ প্রতিকার করলেই যে সব ক্ষেত্রে উপকার হয় তার নিশ্চয়তা নেই: তবু রাহু ও মঙ্গলের প্রতিকার জন্য উৎকৃষ্ট গোমেদ ছয়রতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী স্বপ্না মুখার্জী (বলরাম দে স্ট্রীট, কলিঃ)—(১) একুশ বর্ষ বয়সের মধ্যে হবার সম্ভাবনা; (২) চন্দ্রের অবস্থান অশুভ। এর জন্য সাদামুক্তা কমপক্ষে চার রতি ধারণ করানো উচিত। ● শ্রীশোভনকুমার মুখার্জী (নন্দ মল্লিক লেন, কলিকাতা)—(১) লেখাপড়ায় তিন বছর বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা দরকার, (২) স্থায়ী চাকুরী হতে দেরী হবে। ● শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেনগুপ্ত (মুরারিপুকুর রোড, কলিকাতা)—(১) বর্তমান গ্রহ-সন্নিবেশ প্রতিকূলে হলেও ভবিষ্যতে ভাল হবে, (২) রক্তমুখী প্রবাল নয় দশরতি ধারণ করে দেখুন। রূপার আংটিতে। ● শ্রীরঘুনাথ মুখার্জি (দুর্গাপুর-৩)—(১) প্রতিকার করলেই যে উন্নতি হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, (২) উভয়বিধ উন্নতির জন্য রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন।

রূপোর আংটিতে। ● শ্রীসংগীতা (দমদম পার্ক, কলিকাতা)—(১) সম্ভাবনা আছে, এগারো মাস দেখুন; (২) দু' বছর মধ্যে পড়াশোনার বাধা আসতে পারে। ● শ্রীঅলোককুমার দাস (ওয়ারলেস হেড-কোয়ার্টার, কলিকাতা-৪০)—নভেম্বরের মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীজ্যোতির্ময় দে (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা)—(১) অক্টোবর পর্যন্ত সাবধান, (২) মোটামুটি ভাল হবে। ● শ্রী এস কে সেন (রাঁচি)—(১) বর্তমানে আড়াই বর্ষ মধ্যে স্থায়ী কোনো কিছু হওয়ার পক্ষে বাধা; এবং এখন থেকে আঠারো মাস লক্ষ্য করুন, কোনো যোগাযোগে অর্থাগমের পথ হতে পারে, (২) মোটামুটি ভাল; তবে তাঁর স্বাস্থ্য ও মেজাজ সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। ● শ্রী বি এস (জাম্বু)—(১) এবার হতে পারে, (২) প্রতিকার জন্য আটরতি রক্তমুখী প্রবাল সোনার আংটিতে ধারণীয়। শ্রীতপনকুমার ব্যানার্জী (এডিসন রোড, দুর্গাপুর)—(১) আগামী ইংরেজী সালে হতে পারে, (২) উক্ত সালে না হলে এখন হওয়া কঠিন। ● শ্রীমহাদেব (ধাত্রীগ্রাম)—(১) এখন থেকে এগারো মাস লেখাপড়ার অনুকূল, (২) বর্তমানে তিন বছর মাঝে মাঝে নানা ঝঞ্ঝাট হবে। যেভাবে প্রশ্ন করেছেন, এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। জ্যোতিষীকে দিয়ে কোষ্ঠী বিচার করান। ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য (আর ডি এস ও, লক্ষ্ণৌ)—(১) বর্তমানে এগারো মাস অনুকূল, (২) বর্তমানে যোগ নেই, (৩) রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি। রূপার আংটিতে। (৪) পাবেন। একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠাবেন না। এতে অসুবিধা হয়। ● কুমারী নন্দিতা চক্রবর্তী (ল্যান্সডাউন প্লেস, কলিকাতা —(১) হতে পারে, (২) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান গ্রহের প্রতিকার জন্য শ্বেতপ্রবাল আটরতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন ● শ্রীচন্দ্রনাথ দত্ত (আলমগঞ্জ)—একটির

বেশী কুপন একসঙ্গে পাঠাবেন না। (১) কর্কট হবে। (২) ব্যবসায় মোটামুটি ভাল কিন্তু হঠাৎ কোনো সঙ্ঘর্ষ দেখা দিতে পারে। (৩) আগামী বাংলা বর্ষে সদগুরু লাভের ইঙ্গিত দিচ্ছে, (৪) ভ্রমণ হবে। ● শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বসু (সুকিয়া রো, কলিঃ)—(১) পীতাম্বর নীল পাঁচ-ছয়রতি ধারণ করে পরীক্ষা করতে পারেন। (২) একটু দোষ থাকবেই, এর প্রতিকার নেই। ● শ্রীমতী নবাগতা (জামির লেন, কলিকাতা)—(১) হতে পারে, (২) মোটামুটি ভাল। ● শ্রীপ্রসাদকুমার দে (উড়িষ্যা)—চাকুরীর যোগ, (২) হবার সম্ভাবনা। ● শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্তী (চাকদহ)—(১) অনুকূল নয়, (২) গোমেদ সাত রতি ও রক্তমুখী প্রবাল নয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। রূপার আংটিতে। ● শ্রীমতী গৌরী কাহালী (কাঁচরাপাড়া)—(১) মকর রাশি, ধনিষ্ঠানক্ষত্র, রাক্ষসগণ ও বৃষলগ্ন (২) আগামী নয় মাস দেখুন। ● শ্রীমলয় রায়চৌধুরী (কোপার্মী)—(১) রাহু ও মঙ্গলের অবস্থান বিরুদ্ধ। তবু এখন হতে পারে, (২) সরকারী হতে বাধা নেই। ● শ্রীমতী লীলারাণী সিংহ (ক্যানিং টাউন)—(১) ছয়রতি গোমেদ ও আটরতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করে দেখুন; (২) উন্নতি হবে। ● শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কোপার্মী)—(১) আছে, (২) ভদ্রভাবে চলবে। ● শ্রীনির্মলকুমার দাস (শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) স্বাভাবিক, (২) আড়াই বছর দেখুন। ● শ্রীঅলোক মিত্র (রামপুরহাট)—(১) ইংরেজী নতুন বছরে, (২) হবে না। ● শ্রীবিনতা (ঝামাপুকুর)—(১) বছর তিনেক ভাল হয়; (২) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান, পরীক্ষার বিষয় বলা হয় না। ● শ্রীদুলালচন্দ্র মণ্ডল (খাঁরো)—উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র, মীন রাশি ও বৃশ্চিক লগ্ন। (২) সম্ভাবনা কম। ● শ্রী এ কে সরকার (পঞ্চানন তলা রোড, হাওড়া)—এখন বছর

প্রবাল নয় রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী বাসনারাণী মুখার্জী (বেহালা)---(১) চাকুরী হতে পারে, (২) দেড় বর্ষ মধ্যে। ● শ্রী ডি বসু (হাওড়া-৪)---(১) শ্বেতপ্রবাল সোনার আংটিতে ছয় রতি ধারণ করলে উপকার হতে পারে। ● শ্রীবিমলচন্দ্র হোড় (শ্রীরামকৃষ্ণ রোড, দমদম ক্যান্ট)---(১) পঁয়তাল্লিশ বর্ষ বয়সের পর এর তুলনায় অনেকাংশে শুভ, (২) সোনার আংটিতে আট-নয় রতি শ্বেত-প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী প্রমীলা সুর (বন্দিপুর)---(১) কন্যা রাশি, দেবগণ ও মীন লগ্ন, (২) বাধাজনক যোগ। সামনের অগ্রহায়ণ থেকে দেড় বছর মধ্যে না হলে হওয়া কঠিন হতে পারে। ● শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র (পঞ্চানন মিত্র লেন, বেলেঘাটা---(১) বৃশ্চিক রাশি ও কুম্ভ লগ্ন, (২) বর্তমান ইংরেজী সালে হতে পারে। প্রতিকার জন্য রক্তমুখী প্রবাল আট-নয় রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসুকুমার প্রামাণিক (কল্যাণপুর), কোষ্ঠী বিচারের কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। ● অশোককুমার দাস (বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা)---(১) অক্টোবরের মধ্যে না হলে দেড় বছর পরে, (২) এরূপ যোগ দেখি না। ● শ্রীসুধীরকুমার রায় (ক্রীক রো, কলিকাতা)---(১) শুক্রের দশার শেষাংশে বুধ কিছু ভাল করবে কিন্তু ছেষট্টি বর্ষ বয়স পর্যন্ত বিশেষ ভাল বলা চলে না। (২) রবির দশা শারীরিক কষ্টের কারণ হবে; এবং রবির দশা অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে। ● শ্রীমতী ব্যানার্জী (গোপুর)---(১) সময় আগামী পৌষ পর্যন্ত বেশ গোলমেলে, (২) ইতিমধ্যে হয়ে না থাকলে আগামী মাঘ থেকে যোগ পড়বে। প্রতিকার জন্য রক্তমুখী প্রবাল আটরতি, সোনার আংটিতে ধারণীয়। ● শ্রীসত্য দত্ত (দমদম, কলিকাতা)---(১) বর্তমান দশা ও গোচর

(২) মানসিক শান্তি লাভের পক্ষে বর্তমান অনুকূল নয়। ● শ্রীবাসু (আসানসোল)---(১) রক্তমুখী প্রবাল ও পীত পোখরাজ চাররতি করে, (২) আগে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন; বিজ্ঞানে কৃতিত্ব আসবে। ● শ্রীকনক (আসানসোল)---(১) গোমেদ ও শ্বেত প্রবাল তিনরতি করে রূপার আসনে। (১) শিকার যোগ আছে। ● শ্রীপ্রাণ (আসানসোল)---(১) মুক্তা ধারণ করানো চলে। (২) রসায়ন বিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে। কিন্তু আগামী তিন বছরের কার্য-কারণ দেখুন। ● শ্রীঅসীমকুমার মুখার্জী (রাজনগর টপ ফ্লোর, নিউদিল্লী-১)---(১) এগারোই সেপ্টেম্বরের মধ্যে না হলে এখনো দেরী। (২) বর্তমান আড়াই বর্ষ মধ্যে হওয়া কঠিন। ● শ্রীনিবেদেন্দু ভদ্র (বারুইপুর)---(১) বর্তমান সময় এত গোলমেলে তিন বছর ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। প্রতিকারে বিশেষ কোনো উপকার হবে না। (২) তবু আগামী অক্টোবরের পরে কিছু কিছু ভাল হবার সম্ভাবনা। ● শ্রীদিলীপ-কুমার দত্ত (অবধায়ক—শ্রীগণেন্দ্রলাল দত্ত, শিলচর, মানুগ্রাম) একসঙ্গে দুখানি কুপন পাঠানো নিয়ম নেই। (১) হবে না। (২) তিন বছরের বেশী হবার পক্ষে বাধা, (৩) ভাল ছিল না (৪) ভদ্রভাবে চলার মত পেশায়। ● শ্রীঅজিত-কুমার দাস (ভবানীপুর লেন, বর্ধমান)---দুখানি কুপন, (১) কন্যা রাশি ও কর্কট লগ্ন, (২) বর্তমান তিন বছরের বাধা আসতে পারে, (৩) বিশেষ নয় (৪) শনি বিরুদ্ধ। এর প্রতিকার জন্য আড়াই রতি রক্তমুখী নীলা ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী ---(কারোল-বাগ, নিউ দিল্লী)---(১) শনি ও মঙ্গলের অবস্থান এরূপ করছে; এবং ধৈর্য ধরে তা সহ্য করতে হবে। (২) চারটির বেশী মনে হয় না। এরজন্য উভয়ের কুষ্ঠী দরকার। প্রতিকার জন্য রক্তমুখী নীলা আড়াই রতি যথাবিধি শোধনাদির পর সোনার আংটিতে ধারণীয়। ● শ্রী টি

(১) শনির জন্য রক্তমুখী নীলা আড়ে চাররতি। রূপার আংটিতে যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) হবে না। ● শ্রীজীবনকুমার গুপ্ত (ঘোষপাড়া, কৃষ্ণনগর)---বর্তমান বাংলা বর্ষ মধ্যে না হলে হওয়া কঠিন, (২) তিন বছর পর উন্নতির সম্ভাবনা। ● শ্রীর-না-পাল (নীরোদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা)---(১) মোটামুটি ভালই হবে, (২) কয়েক মাসের মধ্যে হতে পারে, (৩) বিদেশ যাবার সম্ভাবনা নেই, (৪) দেরী আছে। একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠাবেন না। ● শ্রীসু-বসু (মাণিকতলা মেন রোড (১) সুখী হবেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, (২) বেশী দেরী হবে না। ● শ্রীঅজন্তা বসু (কলিকাতা)---(১) বর্তমান বাংলা বর্ষে হতে পারে, তা না হলে আরো দু'বছর দেরী হবে, (২) বিশেষ ভাল নয়। ● শ্রীধরণীমোহন মল্লিক (আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা)---(১) জ্যোতিষ শাস্ত্রের বাইরে এরূপ জিনিস, (২) কোনো নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের পরামর্শ নিতে পারেন। তিন বছর বিশেষ ভাল নয়। ● শ্রীমতী মঞ্জুলা দেবী (কাঁথি)---(১) আগামী বছর হতে পারে, (২) মোটামুটি ভাল, (৩) সম্ভাবনা আছে, (৪) হতে পারে। একসঙ্গে একটির বেশী কুপন পাঠানো নিয়মবিরুদ্ধ। ● শ্রীমতী অসীমা ঘোষ (গোবিন্দ আঢ্য রোড, কলিকাতা)---(১) সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেখুন, (২) এ বছর না হলে দু'বছর পর। ● কুমারী দেবিকা ঘোষ (যতীন্দ্র রোড, রাঁচী)---(১) এখন থেকে আঠারো মাস মধ্যে হতে পারে, (২) মোটামুটি ভাল হবে। ● শ্রীহ-কু দাশগুপ্ত (ঝাড়গ্রাম)---(১) সিংহ রাশি। মকর লগ্ন ও দেবারিগণ, (২) তিন বছর পর। ● শ্রীদেব চক্রবর্তী (চক্রবেড়ে কলিকাতা)---(১) ব্যবসায় হতে পারে, (২) স্বাস্থ্যের উৎপাত থাকবে।

... মাথাতে চলে এসেছেন। ব্যাণ্ডেজ দেখে সকলেই শিউরে ওঠে, তবে বিজয়ার মাতৃহৃদয়, তাই বিজয়া চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ কী কাণ্ড বাবা কমল? কোথায় কী সর্বনাশ ঘটিয়ে এলি?'

কমলাক্ষ অগ্রাহ্যভরে উত্তর দেয়, 'কিছু না বাবা, কিছু না। এমন কিছু মহা মারাত্মক কাণ্ড ঘটেনি। গোটা চার-পাঁচ মাত্র স্টীচ দিতে হয়েছে।

'স্টীচ্ দিতে হয়েছে?' হৈমবতী কাছে এসে বলেন, 'তা হলে তো নেহাৎ কম লাগেনি। কী হলো, পড়ে মাথা কাটিয়েছ, না মারামারি করেছো?'

নাতি সম্পর্কের কৌতুকের ভঙ্গিমাতেই বলেন।

কমলাক্ষও সেই স্বরে বলে, 'কাকী-দিদাই ঠিক ধরেছেন। ওই শেষেরটা।'

'মারামারি? রাস্তার ছেলেদের মতন মারামারি করে কপাল ফাটালি তুই?' বিজয়া ঘৃণা ধিক্কার আর ব্যঙ্গে গঠিত একটা স্বরে পুনরায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'চমৎকার। এই একটা ছেলেই বাকি ছিল, সেও বাড়ির ধারা রাখছে। মহাপুরুষ বাপের মহৎ শিক্ষার ফল। বলি কী নিয়ে কার সঙ্গে করলি এ-সব?'

'বৌদি,' সারদাপ্রসাদ ধমকের গলায় বলে, 'সেই ইতিহাস একটু পরে শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। এখন ছেলেটাকে দেখুন শুনুন।'

বিজয়াকে ধমক দিয়ে কথা একমাত্র সারদাপ্রসাদই বলতে পারে।

বিজয়া একটু দমে যান।

বলেন, 'আমি আর কী দেখবো। তোমরাই দেখো। ডাক্তারকে খবর দাও।'

ডাক্তার।

কমলাক্ষ হৈ-হৈ করে ওঠে, 'দরকার নেই বাবা, দরকার নেই। হসপিটালের ডাক্তার দেখেছে, বেঁধেছে, ঠিক হয়ে গেছে।' ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলে ওঠে কমলাক্ষ, 'বাড়ির আসল মানুষটাকে দেখছি না কেন? বিচ্ছুবাবু?

এবং 'ঝাকুর' সঙ্গেই তার ভাব ছিল সবচেয়ে। কিন্তু এখন রীতিনীতি পালটেছে।

কমলাক্ষ বাড়ি ছাড়া, নীলাক্ষ আর বৌদি স্থনন্দা ছেড়েছে তাদের পূর্ব নীতি। হয়তো বা সব কিছু নীতিই।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

অথচ কিসের জন্যে কে কি ছাড়ছে বোঝা যাচ্ছে না।

বিজয়া কিন্তু এই অবকাশে সুযোগ ছাড়েন না। বিজয়া বলে ওঠেন, 'তোর জানা সংসারের ভোল এখন অনেক বদলে গেছে বুঝলি? ভাইপোকে দেখতে ইচ্ছে হলে এখন হয় তার ইস্কুলে যেতে হবে, নয় তার মামার বাড়ি।'

পর দুটো ছুটিতে 'ক্যাম্পে' যেতে হয়েছিল তাদের, তাই ঈষৎ অবাক হয়ে বলে, 'হঠাৎ এ ব্যবস্থা?'

'দু দিন থাকলেই বুঝতে পারবি। তোর বৌদি তো এখন ছেলেকে বাপের বাড়িতে রেখে পার্টিতে মাতে যাচ্ছে।'

'বা: বা:, শুনে বড় আহলাদ হচ্ছে।'

সরোজাক্ষ স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকান।

হৈমবতী অস্বস্তিবোধ করেন।

হৈমবতী বলেন, 'আমি এখন যাই সরোজ।' আর তারপরই ... এই হঠাৎ চলে যাওয়ার অস্বা... ...তে বলেন, 'কমল তুই তো এখন আছিস ... একটু ভাল হলে যাস একদিন। শুনবো তোর বীরত্বের কাহিনী।'

'তার আগেই শুনবেন---' কমলাক্ষ হেসে হেসে বলে, 'কাগজেই দেখতে পাবেন। এমন একখানা জোরালো ঘটনা কি আর কাগজে না বেরোবে? 'খড়্গপুর টেক্‌নলজিক্যাল স্কুলে ছাত্র-বিক্ষোভ। শিক্ষকগণ প্রহৃত, পুলিশ ও ছাত্রের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ, উভয় পক্ষে আহতের সংখ্যা বাইশ, তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অবশ্য তার দু'জনই পুলিশ। থান ইঁটের ব্যাপার তো!'

দিব্য হেসে হেসে বলে কমলাক্ষ।

যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

যেন হাসিরই কথা, তাই হেসে হেসে বলছে।

অতএব বলতে পারা যায়, বাড়ি থেকে অনেক দূরে থেকেও এ-বাড়ির আর এক ছেলেরও ভোল পালটেছে। মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে এসে লজ্জা পাচ্ছে না সে। লজ্জা পাচ্ছে না শিক্ষককে পিটিয়ে, পুলিশকে হটিয়ে।

হৈমবতী চলে গেলেন।

বিজয়া ব্যস্ত হয়ে বলতে গিয়ে-ছিলেন, 'তোমার জন্যে চায়ের জল চড়িয়েছে, তোমার জন্যে খাবার আনতে গেছে---'

হৈমবতী হেসে, কমলাক্ষর গায়ে

একটু হাত বুলিয়ে বলে যান, 'আমার ভাগটা আমায় নাড়ি খাবে।'

বিজয়া পাশ কাটান।

হাসপাতালের ব্যাণ্ডেজ, অনায়াসে ছুঁয়ে চলে গেল বিধবা মানুষ।

মার চেয়ে দরদ!

বিজয়ার কী ইচ্ছে হচ্ছিল না, ছেলের গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে? কিন্তু ব্যাণ্ডেজের জাতটা দেখতে হবে না?

'চমৎকার দেশটি হলো আমাদের।' বলে সারদাপ্রসাদও আবার মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে চলে যায়, সারদা আর হৈমবতী চলে যেতে সরোজাক্ষ আস্তে বলেন, 'এগুলোর কী খুব দরকার ছিল?'

কমলাক্ষ মাস্টার পিটিয়ে আর মাথা ফাটিয়ে এসে, হেসে ওড়াবার চেষ্টা করলেও, বাবার মুখোমুখি একটু আড়ষ্ট হয়। তবু সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করে। 'পরিস্থিতি শুনলে আপনিই বুঝবেন দরকার ছিল কি না।'

সরোজাক্ষ ঈষৎ দৃঢ় গলায় বলেন, 'আমার পক্ষে হয়তো বোঝা শক্ত। কারণ আমাদের আমলে দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা ছিল। তবু জিগ্যেস করি কতো খারাপ পরিস্থিতি হলে তুমি আমায় ধরে ঠেঙাতে পারো?'

'ও আবার কী কথার ছিরি?' বিজয়া বিরক্ত গলায় বলেন, 'কমল, তুই চলে আয়। হাত-মুখ ধুবি, খাবি।'

'তুমি যাও, ও যাচ্ছে—'সরোজাক্ষ বলেন, 'আমার প্রশ্নের উত্তরটা তোমায় দিয়ে যেতে হবে কমল। আমি কতটা গর্হিত আচরণ করলে তুমি আমায় ধরে মারতে পারো?'

কমলাক্ষর অবশ্য কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝতে দেরী হয় না, তবু সে পাশ কাটাতে বলে, 'হঠাৎ এ কথাটা বলছেন কেন?'

'কেন বলছি, সেটা বোঝবার মতো ক্ষমতা অবশ্যই তোমার হয়েছে। চিরদিন এই শিক্ষাই তো পেয়ে এসেছো— শিক্ষক পিতার তুল্য।'

কমলাক্ষ এবার উদ্ধত গলায় বলে, 'আপনাদের আমলের ওসব আদর্শ আর চলবে না বাবা। তখন ব্যাপারটা উভয় পক্ষেই ছিল। শিক্ষক শিক্ষকের মতো ব্যবহার করতেন।'

'সেই কথাই তো জানতে চাইছি কতোদূর গর্হিত কাজ করেছেন তাঁরা যে, ধরে মারতে হয়?'

খুব চটপট বললো না অবশ্য কমলাক্ষ, তবে জেরার মুখে বেরোলো ঘটনার ইতিহাস।

এ-ধরণের জেরা সরোজাক্ষ জীবনে করেন না ছেলে-মেয়েদের। যখন ওরা ছোটো ছিলো, ছোটো-খাটো খুঁটিনাটি নিয়ে বিজয়া জেরা করতে বসতেন, সরোজাক্ষর কানে গেলে বিরক্ত হতেন। বলতেন, 'ওতে ওদের অসহিষ্ণু করে দেওয়া হয়, ভীরু করে দেওয়া হয়, মিথ্যাকথা শেখানো হয়। ছেড়ে দাও।'

কিন্তু আজ হঠাৎ সরোজাক্ষ নিজেই ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিলেন না। যেন কেমন এক কৌতূহল, আর জিজ্ঞাসুচিত্ত নিয়ে জানতে চাইলেন। যেন দেখতে চান এই জগতের আর কোথায় কী ঘটছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন নিজের অবস্থা।

তাই জানতে চাইছেন, কতটা গর্হিত আচরণ করেছিল তোমাদের মাস্টার।

কমলাক্ষ তার উত্তর দিয়েছে। কমলাক্ষর মতে—

তোমরা যদি বলো গর্হিত নয় তো বলো। তোমরা তোমাদের পুরনো চশমা দিয়ে নতুন পৃথিবীকে দেখতে চাওতো দেখো। পৃথিবীর তাতে কিছু এসে যাবে না। লজ্জিত হয়ে বদলাতেও বসবে না সে নিজেকে।

এ-যুগ বলবে মাস্টার হয়েছো বলে মাথা কেনো নি। তুমি টাকার বিনিময়ে তোমার অধীত বিদ্যা বিক্রি করছো, আমি আমার টাকা দিয়ে সেই জিনিস কিনছি। এর মধ্যে এ-সম্পর্ক আসে কিসে যে আমাকে তুমি কিনে নেবে? আমায় তুমি সদাচার শেখাতে আসবে? কোনো ছেলে যদি হোস্টেলের বাইরে তার গার্ল ফ্রেণ্ড নিয়ে বেড়ায়, তাতে তোমার নিষেধ করতে আসার কী রাইট আছে?

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই।

কোন মাস্টার নাকি দেখেছিলেন, হোস্টেলের একটি ছেলে রাস্তায় তার এক গার্ল ফ্রেণ্ড নিয়ে হি-হি হো-হো করে বেড়াচ্ছে।

ক্লাশ কামাই করে নয় অবশ্য, ছুটির দিনে।

ব্যস তিনি গেলেন নাক গলাতে। তিনি ছাত্র-জীবনের আদর্শ, হোস্টেলের ডিসিপ্লিন, এই সব নিয়ে এলেন লেকচার ঝাড়তে। তারপর তাঁকে বুঝতে হবে না, সাপের ল্যাজে পা দিলে কী হয়?

সব ছাত্র এক কাট্টা হয়ে মাস্টারকে পেড়ে ফেলবে না?

তাও যদি হাতে-পায়ে পড়তো তো হতো। তিনি গেলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানাতে।

ক্ষেপবে না ছেলেরা?

ভাঙবে না কলেজের চেয়ার টেবিল যন্ত্রপাতি? যা নিয়ে কাজ করে নিজেরা। সেই সব জিনিসই ভেঙে তচনচ করে ছাড়লো।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও তেমনি বুদ্ধু, তুই না হয় মেটাবার চেষ্টা কর? তা নয় তিনি পুলিশ ডাকলেন।

ব্যস্ তার পরিণতি এই।

ছাত্ররাও অবশ্য আহত হয়েছে। পুলিশের লাঠিতে হয়েছে।

কিন্তু পুলিশ আহত হয়েছে থান ইঁটে। আর মাস্টাররা আহত হয়েছেন চেয়ার-টেবিল থেকে।

কমলাক্ষ ছিল দল-নেতাদের একজন, তাই তার মাথায় একটা লাঠি না পড়ে যায় নি। কিন্তু তাতে সে কেয়ার করে না। সে—বাবার কথার সজোরে প্রতিবাদ করে, নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে মাস্টারের। 'স্টুডেন্ট

হলে কেউ নাবালক নয়। তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তুমি মাথা গলাতে আসো কেন?

খোকামী করলে, তার প্রতিফল তো পেতেই হবে।'

সরোজাক্ষ আস্তে বলেন, 'হোস্টেলের ছেলেদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষকদের কোনো দায়িত্ব নেই?'

'থাকবে না কেন? আছে। কোনো ছেলে যদি রাত দশটার পর হোস্টেলের বাইরে থাকে, সে-সম্বন্ধে হোস্টেলের আইনের প্রশ্ন তুলে কথা বলার দায়িত্ব বা রাইট আছে। তাছাড়া কখনোই নয়।'

'সম্পর্কটা কি শুধুই আইনের? ভাল-মন্দের দায়িত্ব বলে কিছু নেই?' সরোজাক্ষ শিথিল গলায় বলেন, 'কোনো ছেলে যদি হোস্টেলের বাইরে গিয়ে মদ খায়, শিক্ষকের চোখে পড়লে কিছু বলতে পারে না?'

'হোস্টেলের বাইরে?' কমলাক্ষর মুখে মৃদু একটু হাসির আভাস ফুটে ওঠে. 'কষ্ট করে বাইরে যাবে কেন? ভিতরেই তো যথেষ্ট চলছে।'

সরোজাক্ষ অবোধ বৈকি।

বিশুদ্ধ গলায় যাকে বলে 'ন্যাকা'। তা নইলে সরোজাক্ষ এ কথায় এতো মর্মাহত হন? তাই সরোজাক্ষ বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ছেলের দিকে। যেন বুঝতে পারছেন না ও কি বলছে।

কমলাক্ষ বাপের এই মর্মাহত অবস্থা. কি বুঝতে পারে না? তবু সে যেন বাপের মোহভঙ্গ করতেই নির্মম হয়।

তাই বেপরোয়া গলায় বলে, 'অবাক হচ্ছেন? আপনারা নেহাৎ ভাল ছেলে ছিলেন, আর চিরকাল বাড়ীর মধ্যে মানুষ হয়েছেন, তাই পৃথিবীটাকে দেখবার সুযোগ পান নি। নইলে 'মদ' জিনিসটা কবে ছিল না? কবে না খেয়েছে মানুষ? স্টুডেণ্টরাও ছেড়ে কথা কয় নি। পুরনো কালের হোস্টেলের সঠিক ইতিহাস দেখুন তো।

তবে হ্যাঁ, আগে লোকে অনেস্ট কম ছিল, লুকিয়ে খেতো, এখন লোক অনেস্ট হয়েছে, অতো লুকোচুরি করে না। হোস্টেলের অধিকাংশ ছেলেই তো মদ খায়। এবং চা-কফির মতো প্রকাশ্যেই খায়।'

সরোজাক্ষ ছেলের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলেন, 'তুমিও বোধ হয় সেই অধিকাংশের মধ্যেই পড়ো?'

'আমি?'

কমলাক্ষ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথাটাই ঝাঁকিয়ে বলে, 'যদি বলি পড়ি না, হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। তবে বিশ্বাস করলে বলবো, 'পড়ি না'। কারণটা নীতিগত কিছু নয়, ও আমার ভাল লাগে না। তবে যারা খায়, তাদেরও এমন কিছু মহাপাতকী মনে করি না। ওটা আজকাল এতো সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। ছেলেরা তো দূরস্থান বলে মেয়েরাই---'

এবার একটু চুপ করে যায় কমলাক্ষ।

বোধ হয় মনে করে বাবার পক্ষে একটু ওভারডোজ হয়ে যাচ্ছে।

সরোজাক্ষর মাথাটা আবার ঝুঁকে পড়ছে কেন? রক্তচাপে? না অন্য একটা চাপে? তাঁর নিজেরই বাড়িতে অধিক রাত্রে কোন নাটক অভিনয় হবে, সেইটা স্মরণ করে?

কমলাক্ষ তো দেখবে সেই নাটকের অভিনয়। কমলাক্ষ তো দেখে নি ইতিপূর্বে।

কিন্তু আশ্চর্য, সরোজাক্ষ তাঁর ওই বেহেড্ পুত্রবধূকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন না। সরোজাক্ষ যেন তাকে মমতার চক্ষে দেখেন, দেখেন করুণার চোখে।

তবু সরোজাক্ষর মাথাটা ঝুঁকে পড়লো, হয়তো সরোজাক্ষ ভাবলেন, এ প্রসঙ্গ আমি তুললাম কোন মুখে?

কমলাক্ষ চলে গেল ভিতরে।

স্ফূর্তিবাজ ছেলে, ওর মনে কোনো ভার দাঁড়াতে পায় না।

ও মীনাক্ষীকে দেখতে না পেয়ে, আর খোঁজ করতে গেল।

কিন্তু মীনাক্ষী কোথায়?

যাকে 'কাকীদিদার' আগমন বার্তা জানিয়েই সে হাওয়া হয়ে গেছে।

●

বিজয়াই ছেলেকে নিয়ে বসলেন। সংসারের ঘটনা পুঙখানুপুঙখ জানিয়ে আক্ষেপ করলেন। সরোজাক্ষ যে বিজয়ার ওপর শত্রুতা সাধতেই চাকরী ছেড়ে সংসারটাকে ভাসাতে বসেছেন, সে কথাও বলতে ছাড়লেন না।

কমলাক্ষ অবশ্য ওটা মানলো না। বললো, 'এ-ধারণার কোনো মানে হয় না তোমার। বাবা তো চিরদিনই ওই রকম অদ্ভুত আদর্শবাদী। একটা অবাস্তব পৃথিবীতেই বাস করলেন বরাবর। আর তোমরা কেই বা নয়? তুমি আছো তোমার নিজের বানানো এক অলৌকিক স্বর্গে, বাবা আছেন তাঁর আদর্শের পৃথিবীতে। আর আমরা তোমাদের অভাগা সন্তানরা মোহমুক্ত চোখ নিয়ে তোমাদের করুণা করছি। তা যাক্, শ্রীমতী মীনাক্ষী দেবী গেলেন কোথায়? এসে পর্যন্ত তো তাঁর টিকি দেখছি না।'

'মীনা?'

বিজয়া ঠোঁট উল্টে ছোট ছেলের কাছে তাঁর ছোট মেয়ের পাখা গজানোর বার্তা শোনান এবং শীগ্‌গিরি যে সে একটা অজাত-কুজাতকে বিয়ে করে বসবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

কমলাক্ষ মা'র কথাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না, বটে, কারণ বরাবরই জানে মা'র তিলকে তাল করা রোগ, তবে দাদা বৌদির নতুন উন্নতির বিশদ খবরে চমৎকৃত না হয়ে পারে না। যা রটে তার কিছুও তো বটে।

'আর দিদি? দিদির খবর কি?'

'দিদি!'

বিজয়া ঠোঁটের সেই একই ভঙ্গী করেন, 'তিনিও সুবিধে পেলে, বৌদির দলেই যান, তবে কিপ্‌টে বলেই একটু রক্ষে। দু'টিতেই তো সমান কিপ্‌টে। আসে যায়, এক পয়সার মিষ্টি কখনো হাতে করে আসে না।'

মা'র এই একঘেয়ে কথা আর ভাল লাগছিল না কমলাক্ষর। তাই সে 'যাই একটু ঘুরে আসি।' বলে উঠে দাঁড়ায়।

'এখন আবার কোথায় ঘুরতে যাবি মাথায় ফেট্টি নিয়ে?'

'মাথায় ফেট্টি? হুঁ: ওতে লজ্জা কি? ওতো বিজয়-গৌরবের স্বাক্ষর।'

বলে হাসতে হাসতে চলে যায় কমলাক্ষ।

কিন্তু নীচতলায় সারদাপ্রসাদ ধরে।

'তোমার আর ক' বছর বাকি?'

'আর এক বছর---', কমলাক্ষ হেসে বলে, 'যদি অবশ্য ফেল না করি। কেন বলুন তো?'

সারদাপ্রসাদ বলে, 'অ্যাঁ? ফেল করবে কেন?'

'পাশ করছি কেন এই ভেবেই তো অবাক হচ্ছি মাঝে মাঝে। সারা বছরই তো ফাঁকি দিই।'

সারদা গম্ভীর হয়।

বলে, 'বাবার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা? সে পয়সা এ ভাবে অপচয় কর?'

কমলাক্ষও সহসা গম্ভীর হয়।

বলে, 'হঠাৎ এ প্রশ্নটা আপনার মাথায় উদয় হল যে?'

'হবার কারণ রয়েছে। তোমার বাবা কলেজ ছেড়ে দিয়েছেন জানো না বোধহয় তুমি।'

'জানতাম না। মা'র কাছে জানলাম।'

'তা' এখন তো সংসারের কথা সকলকেই ভাবতে হবে', সারদাপ্রসাদ তার মুখে বেমানান একটা গাম্ভীর্য নিয়ে বলে, 'নীনু তো ঝেড়ে জবাব দিয়েছে।'

কমলাক্ষ হালকা গলায় বলে, 'বাবাকে ওই পাগলামীটা ছাড়তে হবে। আবার গিয়ে জয়েন করতে হবে।'

'ছেড়ে দিয়ে আবার?'

সারদাপ্রসাদ অবাক চোখে তাকায়।

কমলাক্ষ ওই অবাকটা বোঝে না। বলে, 'সেটা অসম্ভব নয়। বুঝিয়ে একটা চিঠি লিখলেই হবে। বললেই হবে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কাজটা করেছিলাম---'

'তোমায় যাবার কথা হচ্ছে কমল।'

সারদার গলা শান্ত শোনায়।

কমলাক্ষ চঞ্চল হয়ে ওঠে। কমলাক্ষ অশান্ত গলায় বলে, 'বাবা তো চিরকালই একটা অবাস্তব বুদ্ধিতে চললেন। অন্য অন্য জায়গায় মাস্টাররা ঠেঙানী খেয়ে আবার হেঁট মুখে এসে কাজ করছে, আর বাবা একটু ঘেরাও হয়ে---আশ্চর্য। ঘেরাও আবার আজকাল কে না হচ্ছে? আচ্ছা আমি একটু বেরোচ্ছি।'

কমলাক্ষ বেরিয়ে যায়।

পিছনের চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখে না।

দেখে না তাই ভাল। দেখলে চমকে যেতো। সারদাপ্রসাদ নামের মানুষটার চোখে যে এমন আগুন জ্বলতে পারে সেটা তার ধারণার বাইরে।

●

আবার যে চোখ দুটো সর্বদাই প্রায় আগুনের ঢেলার মতো জ্বলতো, সেই চোখ এমন মলিন নিষ্প্রভ নিভে-যাওয়া কয়লার মতো দেখাতে পারে তেমন ধারণাও ছিল না একজনের।

কিন্তু দেখাচ্ছে তাই।

দিবাকরের চোখ দুটো যেন নিভে-যাওয়া কয়লার মতো হয়ে গেছে।

'কাল বিকেল চারটের গাড়ীতে যেতে পারবে মীনাক্ষী?'

মীনাক্ষী অস্বস্তির গলায় বলে, 'আচ্ছা ভোরবেলার কোনো গাড়ী ধর না, যাতে সন্ধ্যের গাড়ীতে ফিরে আসা যায়।'

'তেমন কোনো গাড়ী নেই মীনাক্ষী।'

'যে ভাবেই যাও একটা রাত কাটাতেই হবে।'

তারপর দিবাকর বোঝাতে বসে, শুধু দিনের আলোয় গিয়ে ঘুরে এলে, গ্রামের যথার্থ দৈন্য, যথার্থ চেহারা ধরা পড়বে না। তার জন্যেও অন্তত মীনাক্ষীর রাতটুকু থাকা উচিত।--- দেখবে 'অন্ধকার মানে কি। দেখবে--- অসহায়তা মানে কি। দেখবে---কী আমাদের দেশ।

কিন্তু এতদিন দিবাকর তো অন্য কথাই বলেছে।

তা বলেছে বটে।

কিন্তু কেন বলেছে?

জ্বালায়।

ভেবেছে মনের মুক্তি এলেই বুঝি অবস্থারও মুক্তি আসবে। এখন বুঝছে সেটা ভুল।

অনেক কথা হয়।

অনেক কাঠ-খড় পোড়ে।

অবশেষে মীনাক্ষী রাজী হয়।

বাড়িতে কী বলবে?

বলুক না সাহসের সঙ্গে, একজন সহপাঠীর গ্রাম দেখতে যাচ্ছি। অনেক দিন ধরে বলেছে।

কথা দিয়ে এলো।

কিন্তু যেন মনের মধ্যে একটা পাষাণ ভার। আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকছিল, হঠাৎ কমলাক্ষকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেল।

'ছোড়দা তুই কখন এলি? হঠাৎ এখন? মাথায় কী হলো?'

একঝাঁক প্রশ্ন।

কমলাক্ষ যতটা সংক্ষিপ্ত করে সম্ভব উত্তরটা দিয়ে বলে ওঠে, 'তোমার কী ব্যাপার শ্রীমতী মীনাক্ষী দেবী, শুনলাম তোমার নাকি পাখা গজিয়েছে, তুমি নাকি উড়ছো, কোনদিন না হঠাৎ ফুড়ুৎ করে বনে পালাও।'

'শোনা হয়ে গেছে সব?' মীনাক্ষী হালকা গলায় বলে, 'যাক বাঁচা গেছে, আমাকে আর খাটতে হলো না।'

তারপর মীনাক্ষী নিজের সমস্যার কথা পাড়ে।

কিন্তু কমলাক্ষ যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয় তার মনের পাথর।

'এই ব্যাপার! এর জন্যে এতো চিন্তা? না:, তোদের এ যুগে জন্মানোই

ভুল হয়েছে। ওই বিজয়া দেবীরাই সমকালীন তুই। একদিনের জন্যে সহপাঠীর দেশে বেড়াতে যাবি, তাই নিয়ে এতো দুশ্চিন্তা, এতো ভাবনা। মার্ভেলাস?'

'আহা আমার নিজের জন্যে যেন' মীনাক্ষী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'আমাদের বাড়িটি, কেমন, জানো না বুঝি? পারমিশন পেতেই---'। এই কথাই বলে। বাধা তার নিজেরই মধ্যে, তা বলে না।

'ওইখানেই ভুল।' কমলাক্ষ বলে, 'ওটা পাবার চেষ্টামাত্র না করে নিজের মনে কাজ করে যাও, দেখবে সব সহজ হয়ে যাবে। এতো কিছু নাবালিকা নও তুমি যে, একদিনের জন্যে কোথাও যেতে পাবে না। এটা কি উনবিংশ শতাব্দী না কী?'

মীনাক্ষী হয়তো একটু আশ্বস্ত হয়, কিন্তু মীনাক্ষী আশ্চর্য হয়। কতো দিন আসে নি কমলাক্ষ? এর মধ্যে কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তার।

কমলাক্ষই সর্বদা বলতো, 'আরে বাবা, একটু বাধা বাধা ভাব, একটু মত নেওয়া নেওয়া খেলা, এগুলো করলেই যদি বুড়ো ভদ্রলোককে, আর পুণ্যশীলা মহিলাটিকে সন্তুষ্ট রাখা যায়, করলে ক্ষতি কি? সত্যি তো আর খোসামোদ করছো না? একটু তোয়াজ দেখাচ্ছো, মিটে গেল সমস্যা।---আসল কথা---কাজ হাসিল। সেটা লাঠি মেরেও হয়, তোয়াজ করেও হয়। আমার মতে তোয়াজটা অনেক সহজ। একটা যন্ত্র ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করলেও তেল দিতে হয় তাতে। আর এ তো মানুষ। দেখবি যথাসময়ে একটু তৈল প্রয়োগে সব শান্ত।'

কিন্তু এ কমলাক্ষ নতুন।

এর ভাষায় যেন দিবাকরের সুর।

পুরনো দিবাকরের।

এ বলতে চায়, সাবালক হয়েও নাবালকের ভূমিকা অভিনয় করে চোলো না। তুমি হচ্ছো তোমার। তুমি কারো ইচ্ছার পুতুল নও।

মা-বাপ সম্মানের জিনিস, কিন্তু যতক্ষণ তিনি নিজে সম্মানীয় রাখেন নিজেকে।

একদা তাঁরা এই হতভাগ্যদের পৃথিবীতে এনেছিলেন বলেই তাদের কিনে রেখেছেন? কে তাঁদের আনতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

কেউ না।

তাঁরা নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করতে যা করেছেন, আমরা তার অবাঞ্ছিত আকস্মিক ফলমাত্র।

●

কমলাক্ষর নতুন মতবাদে অবাক হয়ে যায় মীনাক্ষী। আর তারপরই সেই অবাক হওয়া মন আস্তে আস্তে সাহসী হয়ে ওঠে। সত্যিই বটে, কী তুচ্ছ একটা ব্যাপারকে কতটা উচ্চ মূল্য দিচ্ছে সে। ভারি তো কাণ্ড।

দিবাকরের সঙ্গে একটা ট্রেনে চেপে বসবে, নামবে, তার মার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দারিদ্র্যের ঘরের আন্তরিকতার যত্ন সানন্দে গ্রহণ করে একটা রাত কাটিয়ে সকালে চলে আসা। এর জন্যে এতো ভাবছে কেন?

'তুই তো এখন আছিস?'

'তাই ভাবছি। অন্তত যতদিন না মাথাটা সারে।'

'ঠিক আছে। যদি গৃহকর্তা বা গৃহিণী বিশেষ আপত্তি সুরু করেন, তুই ম্যানেজ করে দিবি।'

মীনাক্ষীর বুকের পাষাণ ভারটা নামে। মীনাক্ষী প্রস্তুত হয়।

●

সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফেরে নীলাক্ষ, সঙ্গে স্ত্রী। শ্বশুরবাড়ী থেকে তুলে এনেছে।

মাঝে মাঝেই এ ব্যবস্থা হয়।

নীলাক্ষ অফিস যাবার সময় সুনন্দাকে তার বাপের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায়, সুনন্দা সেখান থেকেই ছেলেকে স্কুল থেকে আনিয়ে নেয়। আবার এবেলা নীলাক্ষ শুধু স্ত্রীকে নিয়ে ফেরে, পুত্র থাকে। নিজেরা বেড়িয়ে ফিরে তাকে উদ্ধার করে আনে সেই রাত্রে।

বিজয়া যে ছোট্ট ছেলেকে বলেছিলেন, 'ভাইপোকে দেখতে চাস তো তার মামার বাড়িতে যেতে হবে---' কথাটা নেহাৎ অত্যুক্তি নয়।

ব্যবস্থাটা ক্রমশই এই খাতে গড়াচ্ছে।

আগে এতো পিত্রালয়-প্রীতি ছিল না সুনন্দার, ক্রমশই বাড়ছে। আবার তার মায়ের মাতৃস্নেহও বাড়ছে। একদিন মেয়েকে না দেখলেই নাকি তিনি চক্ষেহারা হন। অথচ আগে হতেন না।

কমলাক্ষকে দেখে অবশ্য খুশী হয় সুনন্দা, কিন্তু কমলাক্ষ হয় না। বিচ্ছুর অভাবটা তার বড় বেশী লাগে।

নিজে সে অনেক বদলেছে, তার হৃদয়যন্ত্রে সম্পূর্ণ নতুন সুর, অথবা অ-সুর। কিন্তু বাড়ির এই সুর বদল তার ভয়ঙ্কর খারাপ লাগছে।

যেন যে জিনিষটা রেখে গিয়েছিল, সে জিনিষটা তার অনুপস্থিতিতে হারিয়ে গেছে।

হয়তো এই রকমই হয়।

মানুষ নিজে প্রতিনিয়ত বদলায়, কিন্তু আশা করে, আমার পারিপার্শ্বিকতা অবিচল অবিকৃত থাকুক। নিজে সে তার মূল্য দিক বা না দিক, থাকাটা দরকার।

●

কমলাক্ষ তেমন করে কথা কইল না।

কমলাক্ষ তার নিজের ঘরে গিয়ে অসময়ে শুয়ে পড়লো।

কমলাক্ষ সব প্রথম হাতজোড় করে বলেছিল, 'মাথার ব্যাণ্ডের প্রসঙ্গটা বাদে, অন্য প্রসঙ্গ।'

তবু সুনন্দা বরকে বললো, 'আমার আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন? কমলাক্ষবাবুর আপ্যায়নের জন্যে?' নীলাক্ষ ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'বাবুতো ভাল করে কথাই কইলেন না।'

সুনন্দা ভুরু কোঁচকায়।

সুনন্দা ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'হঠাৎ এমন অদ্ভুত ধারণা হলো কেন তোমার যে, আমি তোমার ছোট ভাইয়ের সেবা যত্নের জন্যে বাড়ি বসে থাকতে চাইছি?'

'তবে খামোকা বাড়ি বসে থাকবে কেন?'

'প্রত্যেকেরই ভাল লাগা, ভাল না-লাগা ব্যাপারটা আছে। আজ আমার ভাল লাগছে না।'

নীলাক্ষ তবু কয়েকবার স্ত্রীকে অনুরোধ উপরোধ করলো।

তারপর বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

সুনন্দা এদিকের ছায়াও মাড়াল না। সুনন্দা অন্ধকার বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুনন্দার মনের মধ্যে একটা ফাটা গ্রামোফোন রেকর্ড বাজতে লাগলো। যে রেকর্ডের কথাগুলো হচ্ছে এই রকম, এ বাড়িতে ওকেই সবচেয়ে ভালবাসতাম আমি। মনে যখন আমি সত্যিকার 'আমি' ছিলাম। আর ও-ও আমায় সবচেয়ে প্রীতির চক্ষে দেখতো। এখন ও আমায় ঘৃণা করছে। করছে সেটা তো দেখতেই পেলাম।

শুধু ওরই নয় এখন আমি আমার সমস্ত পুরনো পরিচিত জগতের কাছেই ঘৃণিত। কারণ আমি আমার পুরনো 'আমি'কে ভস্ম করে সেই ভস্মের টিকা পরে নৃত্য করছি।

তার বদলে আমি কী পেয়েছি?

পেয়েছি মেহেরা সাহেবের প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি। পেয়েছি শকুন্তলা রায়ের ঈর্ষা। আর পেয়েছি জগৎকে তুচ্ছ করবার ক্ষমতা।

এখন আমি আমার স্বামীকে অনায়াসে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারি। শ্রীমতী বিজয়া দেবীকে অবহেলার চরম দেখাতে পারি। পারি আরো অনেক কিছুই।

কারণ এই গৃহগণ্ডীর বাইরে আমার যে একটা মূল্য আছে সেটা টের পেয়েছি আমি।

পাওয়ার খাতায় আরো জমা পড়েছে।

কিন্তু সুখ পেয়েছি কি?

নিদেন শান্তি?

অথবা আরো সস্তা জিনিস, স্বস্তি?

পাই নি।

ওর কোনোটাই পাই নি।

কারণ ওর বদলের ওই দামী দামী জিনিসগুলো আমি সত্যি চাই নি। আমি শুধু আমার স্বামীর উপর আক্রোশ করে নিজেকে ধ্বংস করেছি।

এখন 'ও' আমাকে ভয় পায়।

এইটাকে যদি সুখ বলো তো সুখ।

অথচ কমল আমায় অগ্রাহ্য করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল বলে আমার পৃথিবীটা বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে।

আমি চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়েছি। আমি ওর ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি।

আমার শ্বশুর আমায় শ্রদ্ধা করতেন, এখন আমি তাঁর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারি না।

অথচ আমি ওঁর ঘরের সামনে দিয়ে মাতাল হয়ে টলতে টলতে আসি।

এই অদ্ভুত জীবনটার পরিসমাপ্তি কী, জানি না।

হয়তো যখন আমার ছেলে বড় হয়ে আমায় ঘৃণা করবে, তখন এর পরিসমাপ্তির চেহারা দেখতে পাবো।

সুনন্দা নীচে রাস্তার দিকে তাকায়।

কতটুকু দূরত্ব?

হঠাৎ এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে এখুনি সব প্রশ্নের উত্তর মিলে যেতে পারে কি?

এই মুহূর্তে সেই রকম একটা ইচ্ছে দুর্দম হয়ে উঠছে।

আশ্চর্য!

একটা ক্ষুদে ছেলে আমায় ঘৃণা করছে, তাই আমার কাছে সমস্ত পৃথিবীটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে?

ছিঃ!

পেটে আজ আনন্দরস পড়ে নি তাই এমন দুরবস্থা।

শুনেছি মাতালদের মদ না খেলে অকারণ বিষাদ রোগ হয়।

আমারও তাই হয়েছে।

কী মজা! কী মজা! আমিও মাতাল। তার মানে আমি জাতে উঠেছি। আমি অভিজাত হয়েছি। আর আমায় গেরস্থ ঘরের বৌ বলে চেনা যাবে না।

শকুন্তলা রায়ের পর্যায়ে উঠে গেলাম আমি।

কী মজা!

কিন্তু এতো মজার মধ্যেও আমার কান্না পাচ্ছে কেন? আজ তো আমি নেশা করি নি। আমার শরীরের সব রক্তই কি তবে মদ হয়ে গেছে? নেশা না করলেও নেশা হয়? তাই শুধু শুধু কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, শুধু শুধু হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে।

ও-মা-গো, আমি কী করি?

[ক্রমশ।

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

জর্জ এ্যালেন

ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-জীবন যাঁরা অনুশীলন করেছেন তাঁদের এ কথা অজানা নয় যে পরম-ব্রহ্মের এই মূর্তিমন্ত বিগ্রহ দক্ষিণেশ্বরে একদিন ভবতারিণীর মন্ময়ী বিগ্রহে সূচ ফুটিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে মাতৃমূর্তি নিষ্প্রাণ অথবা নিছক মূর্তিমাত্র নয়, মাতৃমূর্তি পরিপূর্ণরূপে প্রাণময়ী। মৃন্ময়ী শুধু নয়, চিন্ময়ীও। ঘন কৃষ্ণ কালোর ভিতর থেকে রক্তের গাঢ় লাল ধারা ফিনিক দিয়ে ছুটে সাধারণ মানুষকে অপরিসীম বিস্ময়ে এবং অবর্ণনীয় আশ্চর্যে ডুবিয়ে তুলেছিল।

তবে এ কাহিনী হয়তো অনেকের অবিদিত থাকলেও থাকতে পারে যে এই ধরণের আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল পরবর্তীকালে। ঘটিয়েছিলেন ঠাকুরেরই এক অনুগামী। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক ও অন্বেষীদের একজন। বিগ্রহের গালে তিনি সজোরে করেছিলেন চপেটা-ঘাত। এই অভাবনীয় ঘটনা যাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল সেই মহাপুরুষের নাম নিগমানন্দ। স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী।

দীর্ঘ জটাশ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত, নধর কান্তি স্বামী নিগমানন্দ। ললাটে প্রশস্ততা, চোখে সুদূরপ্রসারী স্নিগ্ধ দৃষ্টি, ওষ্ঠাধরে স্মিত প্রসন্ন হাসি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি শ্রীঅরবিন্দের যে দেশ বক্ষে ধারণ করার অতুল পুণ্যের অধিকারী হয়েছে---সেই গরীয়সী বাঙলা দেশই নিগমানন্দেরই জন্মভূমি। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শৌর্যে, বীর্যে, কলানৈপুণ্যে এবং আধ্যাত্মিকতায় যে বাঙলা দেশ সারা জগতের দরবারে বিপুল স্বীকৃতি ও সাধুবাদের অধিকারী নিগমানন্দ সেই বাঙলারই আর এক মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান।

ছেলেবেলা থেকেই এক অসাধারণ মনোবল এবং অপরিসীম দৃঢ়তার অধিকারী তিনি। সত্যের এবং ন্যায়ের বন্দনায় তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অন্যায়, অবিচারের সঙ্গে তাঁর চিরবিরোধ। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় তিনি মরণপণ।

একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

একটি অসহায় বৃদ্ধা আর্ত চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন। চীৎকার অকারণে নয়, অনন্যোপায়ে। বয়স হয়েছে। দেহ ন্যুব্জ, চর্ম শিথিল, সংগ্রামশক্তি নিঃশেষিত তথাপি অত্যাচারী পুত্রবধূর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, সমাপ্তি নেই যেন পীড়নের---বাচনিক পীড়ন মনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় কিন্তু দেহ স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু শারীরিক পীড়ন সারা দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। বৃদ্ধবয়সে সে জ্বালা মনে হয় মর্মান্তিক। বৃদ্ধার দিন শেষ হয়ে আসছে। শেষ প্রহরের বিদায় সঙ্গীত শ্রুত হচ্ছে, সেই মুহূর্তে অমানুষিক প্রহার জুটছে পুত্রবধূর হাত থেকে।

বাড়ীর সামনে দিয়ে পথ চলছিলেন নিগমানন্দ। সোজা ঢুকে পড়লেন। পুত্রবধূকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তার হাতে নিরুপায় বৃদ্ধার কি অবস্থাটা হচ্ছে।

ফৌজদারী মামলা এল তাঁর বিরুদ্ধে। শেষে অপর পক্ষ নিজেদের ভুল-ত্রুটি বুঝতে পেরে মামলা তুলে

সেই। চিরদিনই এইভাবেই অসহায়, আতুর, উৎপীড়িতদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন নিগমানন্দ। যা অন্যায় যা অবিচার যা অবিধেয় চিরদিনই তার প্রতিবাদে তিনি হয়ে উঠেছেন সোচ্চার।

পূর্বোক্ত ঘটনাটি যে সময়ে ঘটেছিল তখন নিগমানন্দ সন্ন্যাস নেন নি। তখনো তিনি গৃহস্থাশ্রমে। সেদিন তাঁর নামও নিগমানন্দ ছিল না। সেদিন তাঁর নাম ছিল নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

নলিনীকান্তের আদিনিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার কুতুবপুর গ্রামে। ১২৮৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমার দিন (১৮৭৯ খৃঃ) তাঁর জন্ম। পিতৃদেব ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ধর্মপ্রাণ ও পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরূপে সর্বজন সমাদৃত ছিলেন। মা মাণিক্যসুন্দরী ছিলেন স্নেহ, মায়া ও করুণার মূর্তিমতী বিগ্রহ।

অলৌকিক ঘটনার বিকাশ তাঁর জীবনের বাল্যকাল থেকেই। ছেলেবেলায় চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করে একদিন এক অলৌকিক ঘটনার তিনি সম্মুখীন হলেন। হঠাৎ এক জায়গায় দপ করে খানিকটা আগুন জ্বলে উঠল, সেই অগ্নিপুঞ্জের ভিতর থেকে আবির্ভূত হল এক দশভুজার মূর্তি।

সিদ্ধ সাধকের দিব্যজীবনে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনারাশির এই প্রথম পূণ্যসূচনা।

আঠার বছরে পা দিলেন নলিনীকান্ত। বাবা-মার চিন্তা এল পুত্রকে সংসারী করা। বাবা-মার জীবনের শেষ কর্তব্য পুত্রকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সংসারধর্মে তাকে প্রবেশ করানো। শক্তি ছাড়া শিব অচল। জীবনে নারী ছাড়া পূর্ণতার সন্ধান মেলে না। ভাঙা সংসারে আলো জ্বালার স্বপ্ন প্রত্যেক বাবা-মাই দেখে থাকেন। সন্ধ্যার বুকেই মানুষ প্রভাতের স্বপ্ন দেখে। খুঁজে খুঁজে সুপাত্রী মিলল। সর্বাঙ্গসুন্দরী এক কল্যাণী পাত্রীর সন্ধান মিলল। নাম সুধাংশুবালা। ভুবনমোহনের ঘর আলো করে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন বধূহিসাবে। নলিনীকান্ত পেলেন আদর্শ সহধর্মিণী। কর্মজীবন শুরু হল নলিনীকান্তের রাণী রাসমণির এস্টেটে কাজ নিলেন। এই জায়গাটিতে একটি লক্ষ্য করার বস্তু আছে। ভগবান রামকৃষ্ণও একদিন রাণী রাসমণিরই এস্টেটে কর্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে তফাৎ এই যে রামকৃষ্ণের সময়ে পরমপূজ্যা রাণী রাসমণি বর্তমান ছিলেন কিন্তু নলিনীকান্তের সময়ে তিনি লোকান্তরিতা।

চাকুরিস্থল নির্দিষ্ট হল নারায়ণপুর। তাঁর সামগ্রিক জীবনেতিহাসে এক অপরিসীম গুরুত্ব বহন করছে এই নারায়ণপুরে। এখানেই বলতে গেলে তাঁর নবজন্ম। এখানেই জীবনের এক বিরাট পটপরিবর্তনের তিনি সম্মুখীন হন, যায় জীবনের এক মোড় ফিরল তাঁর এখান থেকেই। বলতে গেলে নারায়ণপুরেই তাঁর নিদ্রা থেকে জাগরণের উন্মেষ হয়।

নলিনীকান্ত তখন সুপারভাইজার। রাত তখন আটটা। দপ্তরে বসে একটি অতীব জটিল কাজ করে চলেছেন। এ হেন সময়। হঠাৎ, হ্যাঁ। একেবারে আকস্মিক এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দেখলেন প্রদীপের ক্ষীণ আলোকতেজে স্পষ্ট দেখলেন স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়। স্পষ্ট সত্য। কিন্তু কি করে এ সম্ভব হল। ভেবে দিশাহারা হয়ে যান নলিনীকান্ত। কোথায় কুতুবপুর আর কোথায় নারায়ণপুর, দুয়ের মধ্যে যোজন যোজন ব্যবধান। বলা নেই, কওয়া নেই, এই অসময়ে কি করে সুধাংশুবালা আসতে পারেন।

মনের ভুল ভেবে কাজে মন দিলেন নলিনীকান্ত, কয়েক দিনের মধ্যেই পূজাবকাশ এসে গেল। শারদীয়া মহাপূজায় বাড়ী গেলেন নলিনীকান্ত। গিয়ে দেখলেন গৃহ আছে তবে গৃহলক্ষ্মী নেই। সুধাংশুবালা অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হিসাব করে দেখলেন যেদিন সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীকে দেখেছিলেন সে সময় থেকে কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর দেহান্তর ঘটেছে।

চোখে অন্ধকার দেখলেন নলিনীকান্ত, প্রাণপ্রিয়া অর্ধাঙ্গিনীর বিচ্ছেদ সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল নলিনীকান্তের পক্ষে। সেই শূন্যতা অপরিসীম যন্ত্রণার রূপ নিয়ে প্রতিভাত হল। একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা তখন লোকান্তরিতা স্ত্রীর সঙ্গে সংযোগসাধন করা।

কলকাতায় এলেন নলিনীকান্ত, সে সময়ে স্বামী পূর্ণানন্দের যথেষ্ট খ্যাতি। তাঁর প্রচার তখন ঘরে ঘরে। একদা যিনি ডাফ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন পরবর্তীকালে মহাতান্ত্রিক সেই স্বামী পূর্ণানন্দ এব অপূর্ব কথা তাঁকে শোনালেন। তিনি বললেন, সকল স্ত্রীই আদ্যাশক্তি মহামায়ার ছায়া---ছায়ার সন্ধানে যে শক্তি ব্যয় হয় সেই শক্তি এবং সাধনাতে স্বয়ং মহামায়ার কৃপালাভ হতে পারে। তখন তো সব কিছুই করায়ত্ত। পায়ে লুটিয়ে পড়লেন নলিনীকান্ত। দীক্ষা চাইলেন।

স্মিতপ্রসন্ন হাস্যে পূর্ণানন্দ জানালেন তিনি নন। নলিনীকান্তের গুরু নির্দিষ্ট হয়েই আছেন, সময় এলেই তাঁর সাক্ষাৎ মিলবে।

তারপর একদিন ঘরে ঘুমিয়ে আছেন নলিনীকান্ত---সেই ঘরে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। সেই দিব্যদেহী পুরুষ মন্ত্র দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পুলক বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন নলিনীকান্ত। চলে গেলেন কাশী। ভারতের কোন প্রদেশে নয়--ভারতের শাশ্বত আত্মার বুকে। খাস বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার রাজত্বে। সেখানে নির্দেশ পেলেন---'চলে যাও বীরভূমের তারাপীঠে, তান্ত্রিক-শ্রেষ্ঠ বামাক্ষেপার শরণ নাও---তাঁর কাছেই পাবে তোমার গুরুর সন্ধান।'

তারাপীঠে সেদিন রুদ্রদীপ্তিতে বামাক্ষেপা নেই---সেদিন তাঁর মধ্যে বৈরাগীর করুণাঘন স্নিগ্ধতা। সেই

পুরোনো ছায়া আবার পেলেন নলিনীকান্ত। রুদ্রভৈরব সেদিন শান্তশিব।

কোথায় সেই ভয়াল ভীষণ হুঙ্কার তার বদলে সেদিন এক অপরূপ শান্ত মহিমা।

তান্ত্রিক ক্রিয়া শিক্ষা সুরু হল। ক্ষ্যাপাবাবা একদিন বসিয়ে দিলেন মহাশ্মশানে। নিচ্ছিদ্র নিবিড় আঁধারের ঘনকুঞ্জ। গহন আঁধারের পটভূমিতে এক বিচিত্র রোমাঞ্চকর শিহরণ। তারপর অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে উঠল আলো। দশদিক ছেয়ে গেল সেই অভাবনীয় আলোকরশ্মিতে। চাওয়া যায় না সে আলোর দিকে। সেই আলোকমালার মধ্যেই উদ্ভাসিত হল জগজ্জননীর মূর্তি। পরিচয় জানতে চাইলেন নলিনীকান্ত। জানলেন--- তাঁর ইষ্টদেবী।

সহ্য করতে পারলেন না তরুণ সাধক। অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লেন জ্ঞানোন্মেষে দেখলেন তিনি ক্ষ্যাপা-বাবার কোলে।

আজমীঢ় গেছেন নলিনীকান্ত। চমকে উঠলেন একজনকে দেখে। এ কি লীলা। এই তো সেই দিব্যমূর্তি যাঁকে একবারমাত্র দেখেছিলেন--- যিনি একদিন তাঁর শয়নকক্ষে তাঁকে মন্ত্রদান করে এসেছিলেন। এই তো তাঁর অভীষ্ট গুরু। গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন নলিনীকান্ত।

বৈদান্তিক গুরু সচ্চিদানন্দের আশ্রমে স্থান হল নলিনীকান্তের। শুরু হল কঠোর কঠিন আশ্রম-জীবন। প্রতি পদে পদে গুরুর অকথ্য গালা-গালি আর বাক্যযন্ত্রণা। সহ্য ও ঐকান্তিকতা, ধৈর্য ও একাগ্রতার অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন নলিনীকান্ত। রুক্ষ গুরু ধরলেন স্নেহশীতল মূর্তি।

তন্ত্রশিক্ষা, বেদান্তশিক্ষার পর শুরু হল যোগশিক্ষা। যোগিবর সুমেরু দাসজী তাঁর যোগসাধনার গুরু।

সাধক-জীবনে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতি হতে থাকে নিগমানন্দের। কোথায় বাঙলা দেশ। কোথায় সুদূর মধ্যপ্রদেশের বাস্তার রাজ্য। বাস্তারের রাজা পথ পাচ্ছেন না। অথচ অন্তরে তীব্র আকুলতা। পরমের সন্ধানে তিনি তখন দিশাহারা। কিন্তু সঠিক নিশানা দেবার লোকেরই সন্ধান নেই। দৈববাণী ধ্বনিত হল রাজকর্ণে---যাও বাঙলা দেশের নিগমানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ কর। তিনিই তোমার গুরু, তোমার সহায়ক, তোমার দিশারী।

জ্ঞানপন্থী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। লব্ধপ্রতিষ্ঠ তান্ত্রিক ও যোগী নিগমানন্দ বেশীদিন মরজগতে বর্তমান ছিলেন না। ষাটের ঘরে পা দেওয়ার পূর্বেই তিনি মহানিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। অখণ্ড আলোর জগতে চলে গেলেন।

শীতল দু'চোখ নিয়ে

শান্ত মুখোপাধ্যায়

কি করে সাহিত্যিক হবো, উষ্ণ মনের আঙিনাতে
তৃতীয় নেত্রের ছায়া ভিড় করে, ভিড়ের ভেতর
অধিকাংশ মুখগুলি চিরস্থায়ী নয়।

দু'চোখে নিরুত্তাপ অনুভূতি নিয়ে
তুমি দেখছো হৃদয়ের শূন্য আবেগ।
এদিকে আমার
অসুস্থ মনের সিঁড়িগুলি
যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে
অন্ধকারে ; অবিচ্ছিন্ন হিম শীতলতা
তোমার দু'চোখ ভরে নামে।

আমার মনের পোড়া ছাই-ভস্ম নিয়ে
কিছুটা উষ্ণ হও ; উষ্ণ হলে পরে
বিস্মৃত চেতনা ফিরে পাবে।

শীতল দু'চোখ নিয়ে তবু
একমুহূর্তে চেয়ো না কখনো ;
নির্বিকার শীতলতা হৃদয়কে বড় দগ্ধ করে।

॥ ইন্দ্রসেন ॥

'নিগূঢ় সংসার তত্ত্ব। হায়! ক্ষুদ্র নর
কেমনে বুঝিবে তাহা, কে বুঝাবে তারে?"
—নবীনচন্দ্র সেন

শরৎরজনী। চাঁদের হংসধবল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে আছে ধরণী। জলে-স্থলে উথলে উঠছে স্বর্ণবর্ণ চন্দ্রপ্রভা। দেখতে দেখতে কখন তারায় তারায় ভরে গেছে ঘন কালো আকাশ। যেন স্নিগ্ধকন্যাকারা ছড়িয়ে দিয়ে গেছে চন্দনপঙ্কে মাখা সন্ধ্যা-পূজোর ফুলগুলি। তিমির আজ গ্রাস করতে পারলো না পৃথিবীকে। কেন না তারকার অন্তঃপুর থেকে পাণ্ডুর চাঁদ বেরিয়ে এসেছে আকাশে। আঁধার আজ হার মেনেছে।

ঐ শোভাময় আকাশের প্রতিচ্ছায়া ফুটেছে যেন মর্ত্যের দর্পণে। যশোহর রাজপুরী আজ সহস্র দীপের আলোকমালায় উদ্ভাসিত; শুভ উৎসবের আনন্দ-কলতানে মুখর। সানাই বেজে চলেছে অবিরাম। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের একমাত্র কন্যা বিন্দুমতীর আজ বিয়ে। রাজ্যের সকল অধিবাসী আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন রাজপ্রাসাদে। পাত্র আর কেউ নয়, চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি মহারাজা রামচন্দ্র।

সম্প্রদান-কার্য শেষ করে মহারাজা প্রতাপাদিত্য নিরম্বু উপবাস ভঙ্গ করতে চললেন অন্তঃপুরে। পানাহার সেরে হৃষ্টচিত্তে বললেন,—দেবী, পাত্রটি তোমার মনোমত হয়েছে কী?

মহারাণী পদ্মিনী বললেন,—হাঁ, তা হয়েছে। বিন্দুমতীর পাশে ভারি মানিয়েছে। তবে মেয়েটা কী না রাত পোহালেই চোখের আড়ালে চলে যাবে, সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে আছি। ঈশ্বর করুন, আজকের রাতটা আর না ফুরায়।

দেখতে দেখতে রাত্রি হ'ল অর্ধ-প্রহর। আকাশের অনেক দূরে তখন উঠে গেছে চাঁদ। জ্যোৎস্নার অমৃতধারায় সারা জগৎ আলোয় আলো। মন্দ মন্দ বইছে নৈশ সমীরণ। রাত্রি ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলাদের জনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিবেশিনীরা নতুন জামাতাকে দেখার জন্য এবং সম্পর্ক অনুসারে জামাইকে উপহাস করতে অন্তঃপুরে সমাগত হলেন।

রাজা বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ রায় একফাঁকে রামচন্দ্রকে কাছে পেয়ে চুপিচুপি বললেন,—ভাই রামচন্দ্র, আমরা তোমাকে ঠিক উত্তেজিত করতে চাই না। তবে গোপনে জানিয়ে রাখি তোমার শ্বশুর প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত স্বার্থপর ও নীচাশয় ব্যক্তি। তোমার রাজ্য আত্মসাৎ করবার জনাই তোমাকে তিনি কন্যাদান করেছেন। দেখিও, আবশ্যক হ'লে তিনি তোমার প্রাণনাশ করতেও কুণ্ঠিত হবেন না।

মহারাজা রামচন্দ্র যেন শিউরে শিউরে ওঠেন। যতই হোক বয়সে তিনি তরুণ ও অব্যবস্থচিত্ত। মনটা যেন ভেঙে গেল তাঁর। বিবাহের আনন্দ উবে গেল মন থেকে। কিংকর্তব্য হারিয়ে রামচন্দ্র বললেন,—এমতাবস্থায় আমার কী করণীয় আছে?

গোবিন্দ রায় মুচকি হেসে বললেন,—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আচারে ইঙ্গিতে কথায় ব্যবহারে প্রমাণ করতে হবে, তুমি ঐ শঠ প্রতাপ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নও। প্রমাণ দিতে হবে, তোমার ধমনীতেও রাজরক্ত প্রবাহিত আছে। আমাদের আর কিছু বক্তব্য নাই, শুধু বলি, প্রতাপের কুপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখিও। নচেৎ তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রতাপের সত্যকার পরিচয় যে বিস্তারিতভাবে প্রদান করি তেমন অবকাশ এখন নাই, পরে সুযোগমত সকল বৃত্তান্তই জানাবো।

রামচন্দ্রকে নিকটে পেয়ে মহারাজা প্রতাপাদিত্য কথাপ্রসঙ্গে বললেন,— তুমি রাজা হও, মহারাজা হও, তুমি আমার জামাতা। আমি তোমাকে সেই চক্ষেই দেখবো। বয়সে তুমি নবীন, অভিজ্ঞতা নাই বললেই চলে। তাই বলি, রাজ্যচালনার কাজটা সহজ নয়। আপন বুদ্ধির প্রয়োগে কিছু করিও না। আমার সহ পরামর্শ বিনা কোন গুরুতর কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। জানি, তোমার মন্ত্রী, পারিষদ, সেনাপতি সবই আছে, কিন্তু তারা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হ'তে পারে না। পর কখনও আপন হয় না।

মহারাজা রামচন্দ্র ক্ষণেক নির্বাক থেকে ধীরে ধীরে বললেন, —আমিও বলি আপনি রাজাই হোন মহারাজাই হোন আপনি সম্পর্কে আমার সহধর্মিণীর পিতা। আমিও মহাশয়কে সেই চক্ষেই দেখবো। স্বীকার করি, বয়সে আমি নবীন, আমার অভিজ্ঞতা অল্প, তথাপি আপনাকে জানাই, রাজ্য-পরিচালনার কাজে আমি আমার বুদ্ধিই প্রয়োগ করবো। আমি অন্যের দ্বারা চালিত হ'তে চাই না। আমার মন্ত্রী, পারিষদ ও সেনাপতির 'পরে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে জানবেন। সুতরাং আমার কান ভাঙিয়ে কোন ফল হবে না।

জামাতার কথা শুনে প্রতাপ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'লেন। তরোয়ালের মত দুই বাঁকা ভুরুতে আরও যেন বক্রতা ফুটলো। বললেন,—ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না। তুমি যে এতটা দুর্মুখ জানা ছিল না রামচন্দ্র।

ব্যঙ্গের হাসি দেখা দেয় রামচন্দ্রের মুখে। তিনি বললেন,— অবস্থার গতিতে দুর্মুখ হ'তে হয়।

প্রতাপ বললেন,—আবার বলি, তুমি সংযত হও রামচন্দ্র। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার সুমতি দিন। জানিও, মূর্খ ও নরাধম কোন সংকাজে লাগে না।

আবার হাসলেন রামচন্দ্র। সহাস্যে বললেন,—সৎ বা

অসতের বিচারক যে আপনি, তা আমি মনে করি না। দেখা যাক, কে সৎ আর কেই বা অসৎ।

আর কালক্ষেপ করলেন না মহারাজা প্রতাপাদিত্য। তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করলেন অসম বিরক্তির সংগে। যেতে যেতে স্বগতোক্তি করলেন,—পাষণ্ড, অর্বাচীন, মূর্খ!

উক্তি ক'টা কানে যায় রামচন্দ্রের। তিনি মনে মনে বললেন, —যথাসময়ে এর সমুচিত জবাব পাবে।

তখন দূরে দুই প্রহরের নহবৎ বেজে চলেছে। স্তব্ধরাত্রি। সেই নহবতের সুরেল শব্দ অফুরন্ত জ্যোৎস্নার সংগে, পুষ্পগন্ধ-ভারাক্রান্ত বাতাসের সংগে মিশে যেন প্রাণের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করে।

জামাই অন্তঃপুরে বাসরঘরে এসেছেন। পুরনারীদের সৌন্দর্যের ছটায় রামচন্দ্রের দৃষ্টি যেন বার বার ব্যাহত হ'তে থাকে। সুন্দরীদের আক্রমণ অসহ্য ঠেকছে মাঝে মাঝে। চারিদিকে হাসির কোলাহল উঠছে। চারিদিক থেকে কোকিল-কণ্ঠের কঠোর উপহাস, নিটোল নধর বাহুলতার তীব্র তাড়ন, চম্পক-অংগুলির চন্দ্রনখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলতে থাকে।

লজ্জা, আনন্দ, আশঙ্কা—একটা অনিশ্চিত ভাবের আবেগে বিন্দুমতীর বুকে যেন তোলপাড় শুরু হয়। অবশ ঠেকে দেহ-বল্লরী। হাত-পা যেন হিম হ'য়ে যায়। লজ্জা আর ভয়ের রক্তরাগ ফোটে মুখে। কেমন যেন নিতান্ত কাতর দেখায় রামচন্দ্রকে।

গোবিন্দ রায় ও তাঁর অনুজরা কাছাকাছি ছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন রামচন্দ্র বিপাকে পড়েছেন। পরিহাসের মাত্রা ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠছে। এমন সময়ে জনৈকা প্রৌঢ়াকে বাসরঘরে পাঠিয়ে দিলেন গোবিন্দ রায়। বললেন,—যাও, গিয়া রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন কর।

প্রৌঢ়া এসে কাটাকাটা কথা শোনাতে থাকে। যশোহর-বাসিনীদের উদ্দেশ্যে নানা কটুকথা শোনায়। হাসতে হাসতে বলে,—জানি, তোমরা নতুন জামাইকে দেখে দিশেহারা হয়ে উঠছো। পরের সোনা দিও না কানে, ছিঁড়ে যাবে কান হ্যাঁচকা টানে।

—কার কানে টান পড়ে এই দেখো বাছা।

পরিহাসপ্রিয় পুরনারীরা রামচন্দ্রের দুই কান ধরে টানা-টানি করতে থাকেন।

প্রৌঢ়া ক্রোধে আত্মহারা হয়ে অশালীন উক্তি করে। রুচি-বিগর্হিত বাক্য বর্ষণ যাঁরা সহ্য করতে পারেন না তাঁরা জিব কেটে কান চেপে ধরে বাসর থেকে পালিয়ে যান। ঠাট্টা-তামাসায় কণ্টকিত রামচন্দ্র স্বস্তির শ্বাস ফেলেন। বিন্দুমতী তখন লজ্জা ভয়ে অধোবদনা। তার চক্ষু ছলছলিয়ে উঠেছে। সারা দেহ কাঁপছে ঠকঠকিয়ে।

তখন সেই প্রৌঢ়া বাসর থেকে বেরিয়ে মহারাণীর মহলে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে মহিষী দাসদাসীদের আহার-পর্ব তদারক করছেন তখন। প্রৌঢ়া রমণী মহারাণী পদ্মিনীর নিকটতম হয়ে বললেন,—এই যে নিকষা জননী। দেখি তোমার গায়ের রঙটা আসল না নকল।

কথা বলতে বলতে প্রৌঢ়া মহারাণীর গায়ে একটা চিমটি কাটলো সজোরে।

জনৈক অনুগত ভৃত্য দূর থেকে ঘটনাটা লক্ষ্য করতে করতে সহসা বাঘের মত একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললে,—ব্যাটা, কৌশিক পাজী, তোকে আমি চিনতে পেরেছি। তুমি ব্যাটা বাকলার সেই রমাই ভাঁড়! মহারাণীর গায়ে হাত দিয়েছিস, আজ তোরই একদিন কী আমারই একদিন!

প্রৌঢ়ার মস্তকের গুণ্ঠন উন্মোচন করলো ভৃত্যটি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে রমাইকে বজ্রমুষ্টিতে তুলে ধরলো সে। বললে,—চল্, তোকে আজ হাতীর পায়ের তলায় শুইয়ে দেবো। আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে। জানিস আমার নাম হিরণ্যকশিপু?

রমাই বললে,—দোহাই, ব্রহ্মহত্যা করিস না। আজকের মত ছেড়ে দে।

চতুর্দিকে একটা সোরগোল উঠলো। ব্যাপারটা ঝড়ের মুখের শুকনো পাতার মত ছড়িয়ে পড়লো।

হিরণ্যকশিপু দাঁত খিঁচিয়ে বললে,—কে তোকে অন্দরমহলে পাঠিয়েছে তাই বল্ আগে?

রমাই কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে,—মহারাজা রামচন্দ্র পাঠিয়েছেন।

সত্য না মিথ্যা কে জানে, অন্তঃপুর থেকে বিতাড়িত হ'ল রমাই। যতেক দাসদাসী তাড়া করলো তাকে। রমাইয়ের পিছু পিছু যেন ভীমরুলের ঝাঁক ছুটেছে।

কথাটা রাষ্ট্র হতে অধিক বিলম্ব হয় না।

রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেছে।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জনৈক পার্শ্বচর এসে সংবাদ দিলো জামাতা রামচন্দ্র রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে-ছেন। সেখানে সে পুররমণীদের সংগে লচসা করেছে। এমন কী মহারাণীর গায়ে হাত তুলেছে!

দুঃসংবাদ শুনে প্রতাপের মূর্তি অতি ভয়ংকর ধারণ করলো। শয্যায় শায়িত ছিলেন, নিদারুণ রোষে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলেন। স্ফীতজটা সিংহসদৃশ দেখালো প্রতাপকে। সরোষে বললেন,—লছমন সর্দারকে ডাকো।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে লছমন এসে হাজির হ'তেই মহারাজা বললেন,—আজ রাত্রেই আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই।
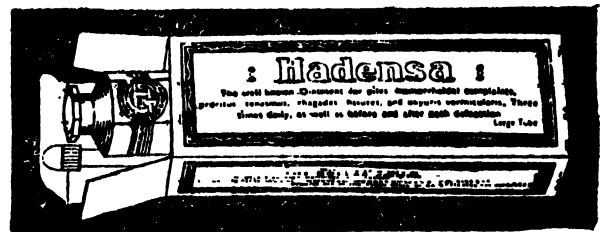
সেলাম ঠুকে লছমন বললে,—যো হুকুম মহারাজা।

সংবাদদাতা পার্শ্বচর তখনই মহারাজা প্রতাপাদিত্যের দুই পদ জড়িয়ে ধরে বললে,— মহারাজা, ক্ষমা করুন। রাজকুমারী বিন্দুমতীর কথা একবার স্মরণ করুন।

প্রতাপ আবার বললেন,—আজ রাত্রের মধ্যেই আমি রামচন্দ্রের ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই।

রাজকুমার উদয়াদিত্য এসে উপস্থিত হলেন। বললেন,—মহারাজা, আজ তারা এতক্ষণে অন্তঃপুরে শয়ন করেছে। আপনি রামচন্দ্রকে মার্জনা করুন।।

অসম্মতি জানালেন মহারাজা। ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে প্রতাপ বললেন,—এ অপরাধের ক্ষমা নাই। রামচন্দ্র ক্ষমার অযোগ্য। লছমন শুন, কাল প্রভাতে যখন রামচন্দ্র রায় অন্তঃপুর হ'তে বাহির হবে তখন তাকে বধ করবে। তোমার প্রতি এই হুকুম বলবৎ থাকলো।

রাজকুমার উদয়াদিত্য রাত্রির মধ্যযামে চুপিচুপি গিয়ে বিন্দুমতীর শয়নকক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হ'লেন।

তখনও দূরে সানাইমঞ্চে নহবৎ বেজে চলেছে।

শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করে জ্যোৎস্নার আলো এসে বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে। রামচন্দ্র রায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বিন্দুমতী শয্যার কিনারায় নিশ্চুপ বসে আছে। কী ভাবছে সে কে জানে। তার গালে হাত। শয্যার প্লাবিত জ্যোৎস্না দেখছে বিন্দুমতী। দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করছে দুই চোখে। বুঝি যেমনটি সে কল্পনা করেছিল তেমনি হয় নি। বক্ষোমাঝে যেন আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি।

শয়নে এসে একটিও কথা বললেন না রামচন্দ্র। প্রতাপাদিত্য তাঁকে অপমান করেছেন। তাই হয়তো প্রতাপ-কন্যার প্রতি এই অবহেলা। রামচন্দ্রের নীরবতা প্রমাণ দেয় যেন, যশোহরের রাজকন্যাকে চন্দ্রদ্বীপাধিপতির পাশে মানায় না। রামচন্দ্র সেই যে পাশ ফিরে শুয়েছেন, আর একটিবারও পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন না। যত মান-অভিমান সকলই বিন্দুমতীর প্রতি।

জেগে বসে আছেন রাজকুমারী। একবার জ্যোৎস্নার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। একবার ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে দেখেন। কাঁপা কাঁপা বুক থেকে একটি একটি দীর্ঘশ্বাস ওঠে। প্রাণের মধ্যে বড় ব্যথা পেয়েছেন বিন্দুমতী।

সহসা একবার রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙলো। সহসা দেখলেন নববিবাহিতা অর্ধাঙ্গিনী শয্যাতটে বসে আছেন। বৌ কাঁদছে।

নিদ্রোত্থিত অবস্থার প্রথম মুহূর্তে যখন অপমানের স্মৃতি জেগে ওঠে নি, গভীর নিদ্রার পর মনটা কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছে, রাগের ভাব আর নেই তখন হঠাৎ বিন্দুমতীর অশ্রুঝরা কচি করুণ মুখখানি দেখে রামচন্দ্রের মনে যেন করুণার উদ্রেক হয়। বিন্দুমতীর হাতখানি ধরে রামচন্দ্র বললেন,—বিন্দুমতী, তোমার চোখে জল কেন? বিনিদ্র কেন তুমি?

যেন অভিভূত হয়ে উঠলেন রাজকুমারী, সমবেদনার কণ্ঠস্বর শুনে। কোন কথা বলতে পারলেন না বিন্দুমতী। শয্যার একপাশে ঢলে পড়লেন রাজকুমারী।

রামচন্দ্র উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে বিন্দুমতীর মাথাটি তুলে নিজের ক্রোড়ে স্থাপন করলেন। উত্তরীয়-অঞ্চলে মুছিয়ে দিলেন রাজনন্দিনীর চোখের জল। বললেন,—অশ্রু সম্বরণ কর বিন্দুমতী।

এমন সময়ে রুদ্ধদ্বারে কে যেন আঘাত করলো। মৃদু করাঘাত সভয়ে।

রামচন্দ্র বললেন,—কে?

বাহির থেকে উত্তর এলো,—দ্বার খোলো অবিলম্বে।

শয়নকক্ষের দুয়ার খুলে দেখা দিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র।

উদয়াদিত্য কম্পিতকণ্ঠে [illegible] বললেন,—এখনই পালাও এই রাজপুরী থেকে। একপলও বিলম্ব করিও না।

কথা শুনে যেন চমকে শিউরে উঠলেন রামচন্দ্র। মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করলো। রুদ্ধশ্বাসে তিনি বললেন,—কেন? কী হয়েছে?

—কী হয়েছে তাহা বলবো না। এখনই তুমি পালাও।

বিন্দুমতী শয্যা ত্যাগ করে উঠে গিয়ে বললেন,—ভাই, কী হয়েছে?

উদয়াদিত্য বললেন,—সে কথা শুনে তোমার কাজ নাই বোন।

বিন্দুমতীর প্রাণ কেঁদে উঠলো। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন,—কী হয়েছে তাই বল।

উদয়াদিত্য সহোদরার কথায় কর্ণপাত না করে বললেন,—রামচন্দ্র, অনর্থক কালবিলম্ব হ'তেছে। এইবেলা গোপনে পালাবার উপায় দেখো।

সহসা বিন্দুমতীর মনে একটা দারুণ অশুভ আশংকা জেগে উঠলো। গমনোদ্যত ভ্রাতার পথ আটকে বললেন,—ভাই তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কী হয়েছে বলে যাও।

উদয়াদিত্য ভয়ে ভয়ে চারিদিক দেখে বললেন,—তুই আর গোল করিস না বিন্দু, চুপ কর। আমি সবই বলছি।

যখন উদয়াদিত্য একে একে ঘটনার আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করলেন তখন একবার বিন্দুমতী সজোরে কেঁদে ওঠার উপক্রম করতেই উদয়াদিত্য তার মুখ চেপে ধরলেন। বললেন,—চুপ চুপ! বিন্দু তুই দেখছি সর্বনাশ করবি।

বিন্দুমতী রুদ্ধশ্বাসে অর্ধরুদ্ধস্বরে দ্বারপ্রান্তে বসে পড়লেন।

বড় কাতরস্বরে রামচন্দ্র বললেন,— এখন আমার কী উপায় হবে? পলাইবার কী পথ আছে, আমি তো কিছুই জানি না।

উদয়াদিত্য বললেন,—আজিকার উৎসব-রাত্রে প্রহরীরা চারিদিকে সতর্ক আছে। আমি একবার দেখে আসি, যদি কোথাও কোন উপায় থাকে।

বিন্দুমতী বললেন,—তার চেয়ে বরং একবার দাদামশায়কে খবর দাও, যদি কিছু উপকার দেখে।

যুবরাজ বললে,—যথার্থ বলেছিস বিন্দু।

বসন্ত রায় তখন অগাধ নিদ্রায় ডুবে ছিলেন। ঘুম ভাঙতেই উদয়াদিত্যকে দেখেই ভাবলেন, বুঝি ভোর হয়েছে।

উদয়াদিত্য বললেন,—দাদামহাশয়, বিপদ হয়েছে।

রাজা বসন্ত রায় ত্রস্তভাবে উঠে উদয়াদিত্যের কাছে এসে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করলেন,—আঁ! সে কী ভায়া! কী হয়েছে? কিসের বিপদ?

যুবরাজ সমস্ত বললেন। বসন্ত রায় শয্যায় বসে পড়লেন। বললেন,—না দাদা, না। এ কী কখনও হ'তে পারে? এ কী কখনও সম্ভব?

উদয়াদিত্য বললেন,—আর সময় নাই, একবার পিতার কাছে যান। তাঁকে এই আদেশ কার্যকরী করতে নিষেধ করুন।

বসন্ত রায় উঠে চললেন। যেতে যেতে বললেন,—না মা, তা হয় না। হ'তে পারে না। আমি হ'তে দেবো না। কখনও নয়।

প্রতাপাদিত্যের মহলে প্রবেশ করে বসন্ত রায় বললেন,—বাবা প্রতাপ এ কী কখনও সম্ভব হ'তে পারে।

মহারাজা তখনও শয়নকক্ষে যান নাই। মন্ত্রগৃহে বসে আছেন। একবার ক্ষণেকের জন্য স্থির করেছিলেন, লছমন সর্দারকে ডেকে আদেশ ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু সেই সঙ্কল্প অচির-কালের মধ্যে মন থেকে দূর হয়ে যায়। প্রতাপাদিত্য কখনও দুইবার আদেশ করেন না। কিন্তু বিন্দুমতী? তাঁর একমাত্র আদরিণী কন্যা বিন্দুমতী বিধবা হবে। রামচন্দ্র রায় স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করলেও তো বিন্দু বিধবা হ'তো। মাঝে মাঝে যখনই

[illegible] অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছেন প্রতাপাদিত্য। ভাবছেন, রাত কখন ফুরাবে? রাত্রি শেষ হ'তে আর কতটুকু বাকী!

ঠিক এমন সময়ে বৃদ্ধ বসন্ত রায় ব্যস্তসমস্ত হয়ে মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করলেন। আকুলভাবে প্রতাপাদিত্যের দুই হাত ধরে বললেন,—বাবা প্রতাপ, এ কী কখনও সম্ভব?

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। প্রতাপাদিত্য ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত গর্জে উঠে বললেন,—সম্ভব নয় কেন তাই শুনি?

বসন্ত রায় কিন্তু কোমলকণ্ঠে বললেন,—জামাতা রামচন্দ্রকে বালক বললেই হয়। সে অপরিণামদর্শী। সে কি প্রতাপ, তোমার রোষের যোগ্য পাত্র?

পূর্ববৎ উচ্চস্বরে প্রতাপাদিত্য বললেন,—বালকের এতটা দুঃসাহস কোথা হ'তে আসে! রামচন্দ্র কী জানে না আগুন নিয়ে খেলা করলে হাত দগ্ধ হ'তে পারে? একটা নির্বোধ মূর্খ লক্ষ্মীছাড়া ব্রাহ্মণকে স্ত্রীলোক সাজিয়ে আমার মহিষীর সঙ্গে রসিকতা করতে অন্তঃপুরে পাঠানোর ধৃষ্টতা রামচন্দ্র কোথা হ'তে অর্জন করলো! তাকে আমি নির্বুদ্ধি বলতে পারি না। এটা বালকের কাজ নয়। তবে বলতে হয় বালককে কেউ বুদ্ধি যুগিয়েছে। আপনার পুত্র গোবিন্দ রায় এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত আছে, তাও আমার অজানা নাই।

বসন্ত রায় বললেন,—এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না। যাই হোক, রামচন্দ্রকে তুমি ক্ষমা করো প্রতাপ। ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

অসহ্য বোধ করলেন যেন প্রতাপাদিত্য। মুখে বিকৃতি ফুটলো। বললেন,—দেখেন মহাশয়, যশোহর রাজ-বংশের কিসে অসম্মান হয় সেই জ্ঞান যদি আপনার থাকে তবে কী মাথায় মোগল-বাদশাহের দেওয়া শিরোপা ধারণ করতে পারতেন? প্রতাপাদিত্যের মাথাটা যে নত হ'য়ে পড়েছে এই অবমাননায়। যবনের পদধূলিতে আপনি তিলক ধারণ করেছেন। মধ্যে মধ্যে আমার ইচ্ছা হয় আপনার ঐ শিরোপাধারী মাথাটা ধূলিতে লুটায়ে দিই, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বার বার বাধা পড়ে। আপনি তাই এখন রায়-বংশের অপমানকারীর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছেন! ধিক ধিক!

বসন্ত রায় ধীরে ধীরে বললেন,—প্রতাপ, আমি বলি রামচন্দ্রকে হত্যা না করে এই বৃদ্ধকে আগে হনন করো। বিন্দুমতী বিধবা হবে, তৎপূর্বে আমাকে ধরাধাম থেকে বিদায় দেও

কথার শেষে তিনি মাথা নত করলেন।

ক্ষণেক নীরব থেকে প্রতাপাদিত্য মন্ত্রগৃহ থেকে সক্রোধে বেরিয়ে গেলেন। তিনি অনুমানে জেনেছেন, তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। সদরমহলে পৌঁছে তিনি প্রহরীদের ডেকে হুকুম দিলেন, রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন খাল এখনই যেন বড় বড় শালকাঠ দিয়ে বন্ধ করা হয়। সেই খালে রামচন্দ্র রায়ের নৌকা আছে। তোমরা সাবধানে থাকো, আজ রাত্রে কেউ যেন অন্তঃপুর থেকে বার হ'তে না পারে।

বসন্ত রায় বিষণ্ণ মুখে অন্তঃপুরে ফিরে চললেন। তাঁকে দেখে বিন্দুমতী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বসন্ত বললেন,—ভাই উদয়াদিত্য তুমি একটা উপায় বাতলাও। আমার বুদ্ধিতে আর কুলায় না।

উদয়াদিত্য হাতে তরবারি ধারণ করলেন। বললেন,—রামচন্দ্র, তুমি আমার সঙ্গে আইস। দেখি কে বাধা দেয়। বিন্দু, তুমি এখানেই থাকো।

রামচন্দ্র বললেন,—না বিন্দুমতীও সঙ্গে চলুক।

রাত্রির নৈঃশব্দে সকলে পা টিপে টিপে চলতে থাকেন। ভীতির বিভীষিকা যেন চতুর্দিক থেকে তার অদৃশ্য হস্ত প্রসারিত করছে। রামচন্দ্র যেতে যেতে সম্মুখে পার্শ্বে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। [illegible] তোমার মেন কে [illegible] তাঁর অপেক্ষায় আছে।

অন্তঃপুরের অতিক্রম করে বহির্দেশে [illegible] দ্বারে উপনীত হয়ে উদয়াদিত্য দেখলেন, দ্বার রুদ্ধ।

বিন্দুমতী বললেন,—ভাই, নিচে যাওয়ার দরজা হয়তো খোলা আছে, চল সেই পথে যাই।

সকলে সেইদিকে অগ্রসর হলেন। দীর্ঘ সর্পিল অন্ধকার সিঁড়ি [illegible] নিচে নামতে থাকেন।

[illegible] মনে হয়, এই সিঁড়ি বেয়ে নামলে আর হয়তো কেউ [illegible] সিঁড়িটা যেন সেই অতল আঁধার পাতালে গিয়ে মিশেছে। হয়তো বাসুকি-সর্পের গহ্বর এখানেই আছে। সোপান-শ্রেণী শেষ হ'লে দেখা গেল দ্বার বন্ধ। বিন্দুমতী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আবার সকলে ওপরে উঠে চললেন

পুরাতন ভৃত্য রামমোহনকে মনে পড়লো রামচন্দ্রের। কোথায় এখন সে? বাকলা থেকে তাকে সঙ্গে এনেছেন তিনি। রামমোহন হয়তো কোথাও নিদ্রায় অচেতন হয়ে আছে। তাকে সম্মুখে পেলে রামচন্দ্র এখনই হয়তো তাকে বধ করতে পারেন, কর্তব্যে অবহেলার দোষে।

বসন্ত রায় আবার বললেন,—উদয়াদিত্য, রাত্রি শেষ হ'তে চলেছে। সূর্যোদয়ের আর বেশি দেরী নাই। যা হয় একটা কিছু কর। আর যে ধৈর্য রক্ষা করা যায় না।

উদয়াদিত্য তরবারি হস্তে অন্তঃপুর অতিক্রম করে রুদ্ধদ্বারে সবলে পদাঘাত করলেন। বললেন,—কে আছিস?

বাহির থেকে উত্তর এলো,—আজ্ঞা যুবরাজ, আমি সীতারাম।

যুবরাজ জোরালো সুরে বলেন,—শীঘ্র, দ্বার খোলো।

সীতারাম অবিলম্বে দুয়ার খুলে দিয়ে জোড়হস্তে আবেদন জানালো,—যুবরাজ, ক্ষমা করুন। আজ রাত্রে অন্তঃপুর থেকে কারও বের হওয়ার উপায় নাই।

যুবরাজ বললেন,—তবে কী আমাকে সত্যই অস্ত্রচালনা করতে হবে সীতারাম? আচ্ছা তাই হোক।

কথা বলতে বলতে তরবারি উঁচিয়ে ধরলেন উদয়াদিত্য। যুবরাজের পদপ্রান্তে মাথা নামালো সীতারাম। বললে,—কী যে বলেন, যুবরাজ! তবে আমার যাতে প্রাণটা না যায় সেই ব্যবস্থা করুন। আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখুন। নয়তো আমি মহারাজকে কী জবাব দেবো!

উদয়াদিত্য বললেন,—এই ঘনান্ধকারে রজ্জু কোথায় পাই?

সীতারাম বললে,—আমি দড়ি এনে দিই যুবরাজ।

যুবরাজ বললেন,—তাই কর। আমি ততক্ষণ যাই, রামচন্দ্রের ভৃত্য রামমোহনকে ডাকি। তুমি রজ্জু আনো।

রামচন্দ্রের লোকজনেরা একটি ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিল। উদয়াদিত্য ডাকলেন,—রামমোহন আছো এখানে? রামমোহন! রাম—

রামমোহন চমকে উঠে পড়লো। বললে,—যুবরাজ, আপনি এখানে কেন?

উদয়াদিত্য বললেন,—রামমোহন বাহিরে এসো। কথা আছে।

অতঃপর রামমোহন কক্ষের বাহিরে এলে সকল ঘটনা বিবৃত করলেন যুবরাজ। বললেন,—সবই তো শুনেছো, এখন উপায়?

হাসলো রামমোহন। বললে।—আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদে এই লাঠিই আমার উপায়। আর ভরসা মা-কালীর পা দুখানি।

উদয়াদিত্য বললেন,—রামমোহন তুমি সর্বাগ্রে সীতারামের আপাদমস্তক বাঁধো। নয়তো তার জীবন রক্ষা হয় না।

সীতারাম বললে,—যুবরাজের অসীম কৃপা।

বন্ধনকার্য শেষ হ'লে যুবরাজ বললেন,—রামমোহন একবার ছাদে চল।

সকলে রাজপ্রাসাদের ছাদে উঠলেন। ছাদ থেকে প্রায় সত্তর হাত নিচে খাল। সেই খালে রামচন্দ্রের চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা ভাসছে।

উদয়াদিত্য বললেন,—বিন্দু তুই যা খানকতক মোটা চাদর নিয়ে আয়।

বিন্দুমতী ছুটে গিয়ে কয়েকখানি চাদর এনে দিলেন। রামমোহন সেগুলি পাকিয়ে বেঁধে বেঁধে একটা প্রকাণ্ড রজ্জুর মত তৈরি করলো। ছাদের উপরের একটি স্তম্ভে রজ্জু সজোরে বেঁধে রামমোহন বললে, মহারাজা, আপনি আমার কাঁধে উঠে বসেন। আমি দরা বেয়ে নিচে নেমে পড়বো।

রামচন্দ্র সম্মতি জানালেন। তখন রামমোহন উপস্থিত সকলকে প্রণাম করলো। বললে,—জয় মা-কালী! জয়, মহাবীরের জয়!

বিন্দুমতী স্তম্ভে হেলান দিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখ থেকে জল পড়ছে। বৃদ্ধ বসন্ত রায় কম্পিত চরণে দুর্গা নাম জপতে শুরু করলেন।

ঘটনাটা সকলেই লক্ষ্য করতে থাকেন রুদ্ধশ্বাসে। যেন নাটকের চরম একমুহূর্ত দর্শন করছেন।

রজ্জু আঁকড়ে ধরলো রামমোহন। তার বৃষস্কন্ধে রামচন্দ্র। অত্যন্ত সন্তর্পণে রজ্জু ধরে নিচে নামতে থাকে রামমোহন।

চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা নেচে নেচে উঠল। ঘুমন্ত মাঝিরা জেগে উঠলো। রামমোহন মহারাজাকে নামিয়ে দিয়ে বললে,—মাঝি-সর্দার, নৌকা ছাড়ো। আর দেরী নয়।

বৃহৎ নৌকা কিছুদূরে এগোতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। বড় বড় শালকাঠে জলপথ আটকানো। রামমোহন জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শালকাঠের বন্ধন মুক্ত করতে খুব বেশি বিলম্ব হ'ল না।

এ হেন সময়ে প্রহরীরা দূর থেকে লক্ষ্য করলো, নৌকা পালিয়ে যায়। তারা পাথর ছুঁড়তে শুরু করলো। কিন্তু দ্রুতগতি নৌকার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারলো না।

—বন্দুক দাগো! বন্দুক দাগো!

প্রহরীরা বন্দুক দাগতে শুরু করলো। তাও ব্যর্থ হ'ল। নৌকা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

নৌকায় রামচন্দ্র বললেন,—আমার নির্বিঘ্নে গমন-বার্তা প্রতাপাদিত্যকে জানাতে হয়। সেনাপতি কামানে অগ্নি-সংযোগ করেন।

সেনাপতি কালীপ্রসন্ন কামান দাগলেন একের পর এক।

ভোররাত্রে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল। পর পর তোপের শব্দে সহসা তাঁর ঘুম ভাঙলো। মহারাজা সভয়ে ডাকলেন,—প্রহরী! প্রহরী!

কেউ আসে না। দ্বাররক্ষক প্রহরীরা ভয়ে পালিয়েছে। কেউ কোথাও নেই। কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন প্রতাপ। বিদ্যুৎবেগে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে ডাকলেন,— মন্ত্রী! মন্ত্রী!

মন্ত্রী একজন ছুটে এলেন। প্রতাপাদিত্য বললেন,—মন্ত্রী, প্রহরীরা কোথায়?

মন্ত্রী বললেন,—ক'টাকে দেখলাম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। বাকী কয়টা হয়তো পালিয়েছে।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—রামচন্দ্র কোথায়? উদয়াদিত্য? বসন্ত রায়?

মন্ত্রী নিরুত্তর। দারুণ অস্বস্তিতে প্রতাপ আবার বললেন,—মুখে কথা নেই কেন?

মন্ত্রী বললেন,—বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

মহারাজা বললেন,—যাহা বোধ করা যায় তাহা সকল সময়ে সত্য হয় না।

উদয়াদিত্য এসে দেখা দিলেন। বললেন,—মহারাজা রাজজামাতা—

প্রতাপাদিত্য বললেন,—হাঁ হাঁ রামচন্দ্র রায়। সে কোথায়?

উদয়াদিত্য বললেন,—রাত্রেই তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপাদিত্য বললেন,—আমিও তাই অনুমান করেছি' বসন্ত রায় নিশ্চয়ই তার সহায় হয়েছেন?

উদয়াদিত্য বললেন,—না মহারাজ। দাদামহাশয় কিছুই জানেন না। রামচন্দ্র ছাদ থেকে নৌকায় লাফ দিয়ে—

এ কাজ বসন্ত রায়ের। এই ধ্রুব-বিশ্বাস প্রতাপের হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'ল। তিনি বললেন,—আমার এত বড় পরাজয়! সহ্য করব না। প্রতিশোধ গ্রহণ করবো!

ক্রুদ্ধ পিতার রোষদৃষ্টির সমুখে অধিক্ষণ থাকতে পারলেন না উদয়াদিত্য। সূর্যরশ্মিতে তিনি যেন ঝলসে গেছেন ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন উদয়াদিত্য।

আহত সিংহসদৃশ দেখায় যেন প্রতাপকে। বোঝা যায়, এই প্রজ্বলিত অগ্নি সহজে স্তিমিত হবে না। তাই কেউ আর প্রতাপের সমুখে যেতে সাহস করে না। মন্ত্রী, সেনাপতি কেউ নয়। প্রহরী তো ছার। [ক্রমশ]

স্বামীর কি বলা উচিত?

স্বামী এবং স্ত্রী কতদূর পর্যন্ত খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করতে পারেন, নিষ্ঠুরতার অভিযোগ না শুনে? বিখ্যাত বিচারকরা প্রশ্নটির আইনগত দিকের উত্তর দিয়েছেন। 'দ্বেষ বা অন্যায় মতলবহীন স্বাধীন মতবিনিময় দাম্পত্য-জীবনের বোঝা-পড়ার মূল হওয়া সম্ভব', বিচারক সেনারুস বলেছেন এবং বিচারক ?ড সন ঘোষণা করেছেন, কেবলমাত্র অত্যন্ত নগণ্য ক্ষেত্রেই স্বামী বা স্ত্রী একে অন্যকে নিজের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করেন না, এমন কি সেটি অপরের আচরণ সম্পর্কিত সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও। এইসব মন্তব্য, আন্তরিকতার সংগে উক্ত মন্তব্যগুলো 'নিষ্ঠুর' বলার আগে বিচারালয়ের অত্যন্ত ধীরভাবে বিবেচনা করা দরকার।

উল্টো পক্ষে, 'স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ এবং এত আন্তরিকতাপূর্ণ যে, সুখী এবং সফল দম্পতিদের মধ্যে গোপনীয়তা শব্দটাই অর্থহীন হয়ে ওঠে।'

আমাদের দেশে হুটহাট করে আদালতে ছোটার রেওয়াজ নেই— সাধারণত সাময়িক অশান্তি মিটে যায়। এর ফল কি ভাল হয় নি? য়ুরো-আমেরিকার বিবাহ-বিচ্ছেদের তালিকা দেখলেই এ প্রশ্নর জবাব মিলবে।

খেলাধূলা

ক্রীড়ারসিক

বীরবাহাদুর গুরুং (ইস্টবেঙ্গল)

কাজের মানুষ কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না যেমন সত্য তেমনি খেলাধূলাই যাঁদের জীবন, খেলাকে ভুলে বা বলা চলে কোলকাতার মাঠকে ভুলে বা তার উপর অভিমান করেও বেশীদিন থাকতে পারেন না। যেমন পারেন নি বীর বাহাদুর গুরুং। বাইরে থেকে এসেছেন কোলকাতার মাঠের ডাকে, ফিরে গেছেন আবার এসেছেন।

১৯৩৪ সালে দেরাদুনে শ্রীগুরুং-এর জন্ম। ১৯৫২ সালে এ ভি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইচ্ছে ছিল পড়াশুনায় আরো এগিয়ে যাওয়ার কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। স্কুলে থাকাকালীন সময়েই তাঁর খেলার সূত্রপাত হয়। ১৯৫০ সালে জে জে ক্লাবে যোগ দেন এবং বেশ কয়েক বছর সে দলের হয়েই খেলেন।

১৯৫৩ সালে তিনি গুর্খা রাইফেলস দলের হয়ে খেলতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। দেরাদুনের নামকরা ক্লাব বিজয় ক্যান্ট স্পোর্টিং ক্লাবের অনুরোধে গুরুং ১৯৫৫ সালে ঐ ক্লাবের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নজরে পড়ে যান সেই সময়েই। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা ডুরাণ্ডে গিয়েছিলেন টিম নিয়ে। সেখানে বিজয় ক্যান্ট স্পোর্টিং ক্লাবের ঐ ছেলেটির খেলায় মুগ্ধ হয়ে ডাক দেন তাঁদের টীমে খেলার জন্য।

শ্রীগুরুং-এর বয়স তখন একুশ। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, অটুট দম ও প্রচুর আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী গুরুং তখন সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। ১৯৫৬ সালেই কোলকাতার ইস্টবেঙ্গলের ক্লাবে যোগ দিলেন। ঢুকেই তিনি তাঁর খেলায় বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। পুরো পাঁচটি বছর তিনি ঐ ক্লাবেই কাটালেন। এর মধ্যে একবার তিনি অধিনায়ক সম্মানও [illegible] অর্জন করেছেন। ১৯৬১ সালে গুরুং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ত্যাগ করেন এবং মোহমেডান টীমে এসে যোগ দিলেন। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারলেন না ফিরে গেলেন দেশে।

দেশে ফিরে পুনরায় তিনি দেরাদুনের জুবিলান্ট দলের হয়ে খেলতে সুরু করলেন। পরে তিনি জিপসি ক্লাব নামে নিজেই একটি ক্লাব স্থাপন করলেন। বেশ নামও করলো ক্লাবটি। কয়েকটা ট্রফিও যে অর্জন করলো না তা নয় এবং সে শুধু বীরবাহাদুর-এর জন্যেই। ইস্টবেঙ্গল কারেন হয়ে তিনি ভারতের সব কয়টা বড় বড় ট্রফিতেই অংশগ্রহণ করেছেন। জাতীয় ফুটবলে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের হয়ে অংশ নিয়ে তিনি নতুন একটি রেকর্ড করেছেন বলা চলে। টিকারাম, বেণুকুমার, রায়বাহাদুর প্রমুখ খেলোয়াড়গণ যে আজ কোলকাতার মাঠে খেলছেন সেটা বলা চলে তাঁরই জন্যে।

রূপা মুখোপাধ্যায়

অরুময় নৈগম (মোহনবাগান)

ছেলেবেলার দুরন্ত আশা বড় হবে যে ফলবতী হবে এ আশা করজন করতে পারে। স্বপ্ন তো অনেকেই দেখে কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে তা সত্যি হয়। মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবুতে বসে সেদিন কথার ছলে বললেন, মোহনবাগান দলের অধিনায়ক অরুময় নৈগম, কোলকাতার মাঠে অরুময় নামেই যিনি বিখ্যাত। সবে প্রতিদিনকার মত অনুশীলন শেষ করে উঠেছেন, এরপর আছে ইনডোর ব্যায়াম অর্থাৎ বার্বেল তোলা, কোমর, পা, বুক এবং হাতের মাংসপেশী যাতে সুস্থ সবল থাকে তারি জন্য কোচ রহিমের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত অনুশীলন, তারপর বাথরুম থেকে স্নান শেষ করে খাবার টেবিলে এসে বসলেন। খাবারও এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ডিমের পোচ, দুখানা টোস্ট, ফল এবং ছানা অথবা দুধ। বলা বাহুল্য আমিও তাতে অংশগ্রহণ করলাম। এরপর অরুময়-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমাদের আলোচনা।

১৯৪২ সালে বাঙ্গালোরে অরুময়ের জন্ম। ছেলেবেলা কেটেছে সেখানেই। ছাত্রকালীন অবস্থাতেই তিনি খেলাধূলা সুরু করেন। বিন্নি মিলস তখন নামকরা টীম। সেই টীমের হয়ে তিনি

খেলবার সুযোগ পেলেন ১৯৫৮ সালে। এরপরই তিনি যোগদান করলেন হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট দলে। তাঁর খেলার উন্নতমানের পরিচয় পাবার ফলেই অরুময় ১৯৫৮ সালেই মাদ্রাজ দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফির খেলায় প্রতিনিধিত্ব করলেন এবং পর পর তিন বছর তিনি এ খেলায় অংশ নিলেন।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসলো কালিকটে ১৯১০ সালে। অরুনয় পুনরায় অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তাদেরও দৃষ্টি এড়াল না। তাঁরাও অরুময়-এর খেলার গতিবিধি লক্ষ্য রাখছিলেন কয়েক বছর ধরেই। এবার তাঁরা আর দেরী করলেন না। ডাক দিলেন অরুময়কে।

সেটা ১৯৬১ সাল। প্রথম বছরেই তিনি সকলকার মন ভরিয়েছিলেন। কোলকাতার মাঠে এসে বাইরের অনেক খেলোয়াড়কেই প্রথমে অসুবিধে করতে পারেন না। কিন্তু অরুময় একটুকু বিচলিত না হয়ে ধীরস্থিরভাবে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে খেলার মাঠের দর্শকদেরও নয়ন জুড়িয়ে দিলেন। তার ফলে ১৯৬১ সালেই সন্তোষ ট্রফিতে তিনি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করলেন। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ এশিয়ান গেমসেও তিনি ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন।

'৬৩ সালে তিনি কোলকাতার মাঠে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন। পরবর্তী বছরেও টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে নামেন। অরুময়-এর এই অগ্রগতির মূলে আছে তাঁর চতুর বুদ্ধি, অসাধারণ দম এবং বিপদকালে ধৈর্য না হারানো। প্রতিপক্ষের রক্ষণ-ব্যূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে গোলের মুখে বল ঢুকিয়ে দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর দু' পায়েই আছে বার-কাঁপানো শট।

অরুময় নৈগমের খেলায় এ বছরে যদিও সে রকম জৌলুষ নেই তবুও তিনি যে এখনও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেফট আউট এ কথা অনস্বীকার্য।

দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড

৪৩ বৎসর বয়স্ক অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার এ্যাথলীট জর্জ গার্ডন ৬০ মাইল দৌড়, মেলবোর্নের পোর্টসী থেকে অলিম্পিক পার্ক ৬ ঘণ্টা ৩৫ মি: ৪৫-২ সেকেণ্ড অতিক্রম করে ১৯৩৭ সালে আর্থার নিউটন প্রতিষ্ঠিত ৭ ঘ: ১১ মি: ৪০ সে: বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

৭০০০ রানের দুর্লভ সম্মান

ক্রিকেট খেলায় ব্যক্তিগতভাবে ৬০০০ রান সম্পূর্ণ করেছেন ইংল্যাণ্ডের ৪ জন, হ্যামণ্ড, হাটন, কাউড্রে এবং ব্যারিংটন, অস্ট্রেলিয়ার ২জন ব্র্যাডম্যান এবং হার্ভে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কেবলমাত্র সোবার্স। কিন্তু ৭০০০ রান অর্জন করেছেন মাত্র একজন, ওয়াল্টার হ্যামণ্ড। ৮৫টি খেলায় ৭২৪৯ রান ও ২২টি সেঞ্চুরী করেছেন। আরো যে কয়জনের সম্ভাবনা আছে তাঁরা হচ্ছেন, কলিন কাউড্রে, কেন ব্যারিংটন এবং গ্যারিফিল্ড সোবার্স

মালয়েশীয় টেনিস

মালয়েশিয়ার উন্মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতায় এগারটি দেশের খেলোয়াড়দের আহ্বান করা হয়েছে। ১২ই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর আলোচ্য প্রতিযোগিতা পেনাংয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ভারতও আমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

মারডেকা ফুটবল টীম প্রসঙ্গে

মারডেকা ফুটবল টীম তৈরির জন্য খড়গপুরে শিক্ষণশিবির বসেছে। ৪০ জন খেলোয়াড় ভারতের বিভিন্ন জায়গা হতে আমন্ত্রিত হয়েছেন অনুশীলন করার জন্য। এর মধ্যে ১৭জন খেলোয়াড় পাকাপোক্ত নির্বাচিত হয়েছেন এবং গত ৯ই আগস্ট কুয়ালালামপুরে মারডেকা ট্রফির খেলায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য হয়েছেন রওনা। কিন্তু কথা হচ্ছে এইভাবে টীম পাঠানো কি একটা প্রহসন নয়। যেখানে যথার্থ অনুশীলনের অভাব, ক্যাম্পের হাজিরা খাতা তদন্তে ঠিকমত যে সব খেলোয়াড়দের সই থাকে না বাইরের খেলায় তাদের টীমের অন্তর্ভুক্ত করায় লাভ কি? এ ছাড়াও এবারে আরেক সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে ফরোয়ার্ড লাইনে গোল করার মত নাকি খেলোয়াড়ের অভাব। গোলরক্ষক নিয়েও নাকি নির্বাচকদের আর এক সমস্যা। তাইই যদি হয় তা হলে বাইরে গিয়ে প্রতিটি খেলায় হার স্বীকার করে লোক হাসানোর কি প্রয়োজন। অর্থের ক্ষতি, ভারতেরও সম্মানহানি। আমাদের দেশের ক্রীড়াজগতের হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা কি তা বোঝেন না। নয়, সব বুঝেসুঝেই না-বোঝার ভাণ করে থাকেন। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনেকেরই লাভ হয়ে থাকে যেমন বছর বছর একটা করে সুন্দর এক্সকারশনও হয় আবার ফেরার পথে কিছু কিছু জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া যায়।

সুতরাং মন্দ কি। ভারতের সম্মান থাকল কি গেল, আর্থিক ক্ষতিও কতটা হয়ে গেল তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কার কি বয়ে গেল। এরকমভাবে টীম কি না পাঠালেই নয়। হোক না দু'চার বছর দেরী। তদ্দিন ঠিকভাবে খেলোয়াড় তৈরি হোক না কেন?

জীবনের উৎস

এই মুহূর্তে যদি প্রশ্ন করা হয় পরমুহূর্তে কি ঘটবে?—বোধ হয়; তার একটিমাত্র তাৎক্ষণিক জবাব পাওয়া যায়—'মৃত্যু।'(১)

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমরা আশ্রয় নিয়েছি ভীতির, দৈনন্দিনের প্রতিটি কার্যে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি আশঙ্কার; প্রতিমুহূর্তে আমাদের কাছে শোচনীয় অবিশ্বাস, উৎকট স্বার্থপরতা আর পারস্পরিক দুঃসহ মানস-বৈকল্যের মধ্যে।

কিন্তু, আমি বলি, মৃত্যু আমাদের কাম্য হোক না-হোক তা দুর্নিবার্য; তথাপি মৃত্যু আমরা চাই স্বাভাবিকতার মধ্যে। কোন দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে আকস্মিক যে মৃত্যু, মানবিক কারণেই তা অবরণ্য।

সুতরাং যে জীবন আমরা যাপন করছি (বরং বলা ভাল, যাপন করতে বাধ্য হচ্ছি), সে জীবন যাপন কোনো মানুষেরই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

আমি তত্ত্বজ্ঞানী নই। সুতরাং জীবনের উৎস সম্পর্কে আমি দার্শনিক কোন ব্যাখ্যা বা ভাষ্য ব্যাখ্যা দিতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং যাঁরা এই প্রবন্ধের নামকরণ দেখে এর মধ্যে কোন দর্শন বা ধর্মশাস্ত্রসম্মত তত্ত্বালোচনা বা অন্তত তার স্পর্শ প্রত্যাশা করেছিলেন কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেও তাঁদের এখানে নিরাশ করি।

তাহলে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি সেখানে ও সেই পরিবেশে বাস করা যদি আমাদের অভিপ্রেত না হয় তাহলে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী এই অসহনীয় পরিবেশ জীবিত রেখেছেন কেন? তাঁরা কি পারস্পরিক ভালোবাসা ও নিরাবিল সম্বন্ধমধুর জগৎ পছন্দ করেন না?

এই প্রশ্নের কোন অগ্রপশ্চাদহীন অচিন্তিত মন্তব্য কেউ প্রত্যাশা করবেন না। আলোচনার ভিত্তিতেই তার একটা নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সময়োপযোগী হবে।

এটা ধরে নেওয়া যায় প্রাণি-জগতের সকলেই আশা-আনন্দের মধ্যে নিজেদের রাখতে চায়। সম্ভবত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার এ বিষয়ে সর্বাধিক। জীবনের উৎস বলতেও

সমর চৌধুরী

আমি ঠিক এই কথাই বোঝাতে চেয়েছি। অথচ দেখা যাচ্ছে মানব-সমাজেই মানুষের সর্বাধিক নিরাপত্তা কতো দ্রুত বিলীয়মান, বিধ্বংসের পথেই কী আশ্চর্য নৈষ্ঠিক অনুসৃতি!

আমি মনে করি (যদি না আমি ভুল করে থাকি) সামাজিক এই দুর্দৈব মানুষই সৃষ্টি করেছে; এবং বোধ হয়, সময় এখনও আছে। ইচ্ছা করলে এই সামূহিক আত্মধ্বংস থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারি।—অন্তত চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এই রকম আলোচনা সবসময়ই একটা নৃশংস সমাদর পায় এইভাবে: 'কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?'—আমার মনে হয় এই প্রবন্ধে তার একটা সঙ্কেত পাওয়া কঠিন হবে না।

এ ব্যাপারে মানব সমাজের প্রথম কাজ হ'লো অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া এবং এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ তার স্বভাবসঙ্গত সুস্থ আলো-বাতাস পরিপূর্ণ পৃথিবী পুনরায় ফিরে পেতে পারবে। সব বিষয়বস্তুর স্বপক্ষে ও বিপক্ষেই বিতর্ক উঠতে পারে এই সত্যটি মনে রেখেই আমার বক্তব্য তুলে ধরছি।

আমার মতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে এভাবে ব্যবচ্ছেদ করা চলে। (১) শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্বিন্যাস, (২) মানবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ এবং সম্ভবত তৃতীয়টি এভাবে লেখা যেতে পারে, (৩) যুদ্ধের উন্মাদনা বা সেই মনোভাব কিছু একেবারে আগাছার মতো নির্মূল করা।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রথম প্রয়াস হিসাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রাধিকার প্রদান অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য সত্য। শিক্ষা বলতে যদি মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের (২) সংজ্ঞা গ্রহণ করা যায়—

অর্থাৎ এরকম মনে না করা হয় যে তথ্য ও ঘটনার একটা বিভ্রান্তিপূর্ণ সংগ্রহই (যা জীবনের বাস্তব কোনো দাবিই মেটাতে পারে না) শিক্ষা তবে সেক্ষেত্রে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমি অবসর গ্রহণেই সম্মত থাকবো। বিপরীত অর্থে শিক্ষার পুনর্বিন্যাস অর্থে শিক্ষাকে এমন একটা গ্রহণযোগ্যতা দেওয়ার আমি পক্ষপাতী যার ফলে ব্যক্তিবিশেষে নিজস্ব সমস্যাগুলির সমাধান তো করতে পারবেই এমন কি সাবিক দৃষ্টিতেও মানসিক সম্পর্কেও ক্রমে নিকটতর হয়ে আসতে থাকবে।

সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার বিশ্বব্যাপী আদান-প্রদানও মানবাত্মিক দিকগুলোর সুস্থতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন বলে অবশ্যই বিবেচিত হবে। কেননা সংস্কৃতি-মূলক চিন্তারাশি সর্বদেশের সর্বকালের সর্বপ্রকার চিন্তার সারস্বরূপ। সেইজন্যই

১। এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে নৈরাশ্যবাদী বলে অপবাদ দেওয়া হতে পারে; কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তা অযৌক্তিক বলে মনে করি।

২। All knowledge, however acquired, all skill resulting from motor activity, all habits, all acquaintance with people and things, have been learned in the broad sense of terms.
—Psychology (Woodworth)

বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্য তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। সাংস্কৃতিক চিন্তা-বিনিময়ের মাধ্যমেই মানুষের সকল প্রকার মানবিক সম্পর্ক নিকটতর হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু সাংস্কৃতিক এই সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথম কাজ পৃথিবীর পরিবেশকেই পরিবর্তিত করা। কেন না যখন আমাকে নিষ্পেষিত করবার জন্য প্রত্যেকে উন্মুখ ঠিক তখন আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ততাই আমার কাছ থেকে স্বাভাবিক প্রাপ্য। সেই-জন্যই দেখা গেছে সেইসব মহামানবের অশ্রুকাতর উপদেশ আমরা ঘৃণাভরে যুগোপযোগী নয় বলে জঞ্জাল স্তূপে ফেলে দিয়েছি---যাঁরা বারবার আমাদের বলেছিলেন, ঘৃণা নয়---ভালোবাসো, উপেক্ষা নয়---আলিঙ্গন, বিভেদ নয়---পারস্পরিক সম্প্রীতিই মানব জীবনের লক্ষ্য--- এবং এইগুলিই আজ পালন করবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

তৃতীয় সূত্রের আলোচনা যেহেতু প্রথম দু'টির মধ্যেই পরস্পরসম্পর্কিত সে কারণ তার স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে আন্তর্জাতিক অস্ত্র-সজ্জার দিকে তাকিয়ে প্রত্যেক সুস্থ মানুষই নিঃশর্ত স্বীকৃতি জানাবেন---যাতে বড়ো বড়ো করে লেখা থাকবে: আমরা কোন যুদ্ধ চাই না, আমরা কোন অস্ত্রসজ্জা পছন্দ করি না; আমরা চাই বাঁচবার অধিকার, সুস্থভাবে পৃথিবীকে ভোগ করবার ন্যায়সঙ্গত সহজ শোভন স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়া।

পৃথিবীর এই অবস্থা ফিরে পেতে হ'লে আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তারাশির আদান-প্রদান, দার্শনিক নৈতিক ও ধর্মীয় শোভন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর গুটিকতক মানুষের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ফলে তাঁরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যখন মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিলো, তখন মানব জাতির সার্বিক মৃত্যুকেই তাঁরা কণ্ঠলগ্ন করতে চাইছেন। বিশ্ব জনমতের প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি ছাড়া এই কর্মতৎপরতা থেকে তাঁহাদের নিরস্ত্র করার সহজতর পন্থা বোধ হয় আর নেই এবং এই চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসাবেই আমরা শিক্ষার পুনর্বিন্যাস ধর্ম দর্শন সংস্কৃতিমূলক চিন্তাধারার নিকট সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সূত্রাকারে বলেছি।

অন্তিমলগ্নে আমি মানবদরদী যুদ্ধবিরোধী দার্শনিক মহামনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি উক্তি উপহার দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করি---

'Meantime the world in which we exist has other aims. But it will pass away, burnt up in the fire of its own hot passions; and from its ashes will spring a new a younger world, full of fresh hope, with the light of morning in its own eyes.

—Roads to Freedom.

নতুন আলোক

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

সিগারেটের নরম ধোঁয়ায়, যুঝে যুঝে
নরম জ্যোৎস্নার ভিতরে,
নক্ষত্রের নিচের ঘাসেই
দুই চোখ খেলা করে।

সাহস-সাধের-সৌন্দর্য
চাঁদের শিশির পাতায়,
ঘুমের অঘ্রাণের অন্ধকার
চুপিচুপি কাছে ডেকে যায়।

ক্রমে হারায় তাতে
নগরীর ব্যথা বাতাস,
অমূল্য উদ্যমের স্নিগ্ধ স্পষ্টতার...
হীরক উজ্জ্বল আকাশ।

তাই,
স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জলে
চুপিচুপি দুই চোখ
প্রান্তর, নক্ষত্র-মাটি-আকাশে,
খোঁজে চলে নতুন আলোক।

দক্ষিণ বাতাসে এলোমেলো

অসীম মাহাতো

একটি শঙ্খের খোঁজে
চঞ্চল নীল সমুদ্রের তীরে
অচেনা বালুর মধ্যে
হারিয়েছিলাম।

অথচ নামমাত্র মূল্যে
বাজারে অসংখ্য শঙ্খ
আর পাঁচজনে যা করে
এবং সেটাই হত সংগত শোভন

শঙ্খের অভাবে তুমি
শামুকও ঘসে মেজে নিতে পারতে
চন্দন আর গঙ্গামৃত্তিকার তুলনা

আমি দক্ষিণ বাতাসে
এলোমেলো
একটা শঙ্খের খোঁজে
অচেনা বালুকা স্তূপে।

প্রমথ চৌধুরী : শতাব্দীর অর্ঘ্য

ঠিক একশত বৎসর পূর্বে সারা বাঙলার গর্ব ও গৌরব বিবর্ধনের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণের প্রতিশ্রুতিসহ যে কয়জন দিকপালের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যেই সর্বাগ্রে যে নামটি উল্লেখনীয় সেই অবিস্মরণীয় নাম প্রমথ চৌধুরী।

বর্তমান বর্ষ তাঁহার শতবর্ষ পূর্তির বৎসর। বাঙলা সাহিত্য যাঁহাদের কালজয়ী এবং অনন্যসাধারণ অবদানে সমৃদ্ধির উত্তুঙ্গ শিখরে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে প্রমথ চৌধুরী তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। যে যুগে সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এককথায় অনতিক্রম্য—সেই সময় দুইজন সাহিত্যস্রষ্টার ভিতর দেখা গেল এক পরিপূর্ণ নিজস্বতা। আঙ্গিকে, বক্তব্যে, বিন্যাসে যাহা একেবারে স্বতন্ত্র। এই দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রচনা-রীতির যে দুইজন সার্থক স্রষ্টা তাঁহাদের একজন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ অপরজন প্রমথ চৌধুরী।

বাঙলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র রচনারীতির জন্মদাতা প্রমথ চৌধুরীর মুখ্য অবদান তাঁহার ভাষা। সে ভাষার ভিতর একটি আভিজাত্যের আমেজও যেমন পাওয়া যায়, আবার তেমনই এক স্বতঃস্ফূর্ততা ও সাবলীলতাও তাহার মধ্যে ধরা পড়ে। মানুষের মুখের ভাষাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন প্রমথ চৌধুরী। যাহা মুখের ভাষা, যাহা প্রাণের ভাষা তাহারই পরিচর্যায় এবং উৎকর্ষসাধনে ব্রতী হইলেন প্রমথ চৌধুরী। মুখের ভাষাকে সাহিত্য-সৃষ্টির অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করায় সেই রচনা হইয়া উঠিল যথেষ্ট সাবলীল এবং প্রাণস্পর্শী। তাঁহার প্রখর পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম রসবোধ সেই ভাষাতে একটি মেজাজ আনিয়া দিল।

প্রমথ চৌধুরীর আরও একটি প্রধান ভূমিকা আছে। শুধু দিকপাল সাহিত্যকার হিসাবেই নয়, এক মনস্বী চিন্তানায়ক হিসাবেও বাঙলা দেশকে তিনি বিপুল পরিমাণে ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। বাঙলা দেশের এক অতীব তাৎপর্যপূর্ণ কালে সাহিত্যের আসরে তাঁহার বহুপ্রতীক্ষিত প্রবেশ। সেই সময়ে বাঙলা দেশকে সামগ্রিকভাবে এক যুগসন্ধিকাল বলিলেও অত্যুক্তির দোষে দুষ্ট হইতে হয় না। যে পরিশীলিত, পরিমার্জিত মনের তিনি অধিকারী ছিলেন, তাহারই আলোকে তিনি বাঙালীর চিত্তবিশ্লেষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাঙালীর মনের গভীরে সার্থক ডুবুরির মত যে ব্যাকুল অন্বেষণ তিনি করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাহার নিখুঁৎ আলেখ্যটি অবিকৃতভাবে তাঁহার সন্ধানী চোখে ধরা পড়িয়াছিল। ধরা পড়িয়া গেল মনের শূন্যতা, চিত্তদৈন্য, মেরুদণ্ডহীনতা এবং নিষ্প্রাণতা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে বলিতে গেলে তাঁহার লেখনীর জয়যাত্রার সুরু। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের এই শোচনীয় অবস্থা ঘুচাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ও শাণিত ভাষার মাধ্যমে তাঁহার সৃষ্টির অভিসার সুরু হইল। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ [illegible] স্বীয় চরিত্র সম্বন্ধে এবং তাহার [illegible] বিষয় বাঙালীর এক [illegible] আনিয়া দেওয়া। "বীরবল" ছদ্মনামের অন্তরালে যে অমূল্য রচনা সৃজন করিতেছে সেগুলি অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হয় যে, সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতখানি ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং সজীব ও সতেজ মনোভাবের সারবান চিন্তাধারার মাধ্যমে জাতের মনোরাজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া এক নব যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বীরবলের হালখাতা, চার-ইয়ারী,

প্রমথ চৌধুরী

[illegible], ঘোষালের ত্রিকথা প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যে এক একটি মহার্ঘ সম্পদ, যাহা সর্বাংশে অতুলনীয় মনীষা এবং অভাবনীয় বৈদগ্ধ্যের এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। তাঁহার 'সবুজপত্র' বাঙলা দেশের সাময়িকপত্রের নবযুগ আনয়নের এক অগ্রদূত। তাঁহার কবিতাবলী বিদ্রূপের আকারে এক তীব্র চরিত্রবিশ্লেষণ।

তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনায় সর্বোপরি যে কথাটি মনে আসে, সেটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁহার রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার ধ্যানের, সাধনার ও মননের বিপুল সার্থকতা ও পরম বিজয়।

দেশজোড়া তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসবের পুণ্যলগ্নে আমরা এই যুগস্রষ্টা, সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারার পূজ্য, পথিকৃৎ, অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত, শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তারথী সর্বোপরি আধুনিক কথ্যভাষার ভগীরথ জাতীয় সংস্কৃতির এই অন্যতম নায়কের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম উৎসর্গ করিতেছি।

বাঙলা ছায়াছবির সঙ্কট

সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য---উভয়ের কোনটিই কখনও একা আসে না। যে-কোনও একটির আবির্ভাব যখন একবার সুরু হয়, তখন প্রায়শই দেখা যায়, তাহা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় দেখা দিতেছে। শুধু ব্যক্তি-জীবনে নয়, জাতীয়-জীবন এবং রাষ্ট্রনৈতিক-জীবনেও এই একই ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

গত কয়েক বৎসরের সালতামামি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, বাঙলা দেশের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের যে বিপুল ঘনঘটা তাহার যেন কখনও আর শেষ নাই। তাহার ধারা যেমনই অন্তহীন, তেমনই নিরবচ্ছিন্ন। একটি দেশ বা জাতি যখন একবার দুর্যোগের করালগ্রাসে পতিত হয়, তখন সেই দুর্যোগের গণ্ডী তাহার সকল ক্ষেত্রে, সকল বিভাগে, সকল শাখায় ব্যাপ্ত প্রসারিত হইয়া এক বিরাট আকার ধারণ করিয়া থাকে।

বাঙলা দেশ আজ অজস্র সমস্যার শিকার। যেখানে দুইবেলা উপযুক্ত আহার সংস্থানই এক রীতিমত দুশ্চিন্তা ও সমস্যার ব্যাপার সেখানে অন্যান্য সমস্যাও যে অনুপস্থিত নয়, সে সম্বন্ধে আর কোনপ্রকার সংশয় থাকিতে পারে না। যে জাতিকে অন্নচিন্তা দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছে স্বভাবতই আরও অজস্র দুশ্চিন্তা যে পর্বতপ্রমাণ আকারে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অন্যান্য রাশি রাশি সমস্যার মধ্যে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সমস্যাও আজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রমশই এই বিশেষ সমস্যা তিলে-তিলে এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই অবস্থা আর কিছুকাল বহাল থাকিলে এই বিরাট শিল্পটি যে-কোন শোচনীয় পরিণতির মুখোমুখি হইবে তাহা ভাবিলে ক্ষোভের ও বেদনার অন্ত থাকে না।

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র বাঙালীর জাতীয়-জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। জাতীয়-জীবনে ছায়াছবির

যে জনপ্রিয়তা সে সম্বন্ধে নূতন কোন ব্যাখ্যা, বর্ণনা বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। ছায়াছবির জনপ্রিয়তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাঙলা দেশেও কোন বয়স, সমাজ, শ্রেণীর গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। ইহা সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর সর্বসাধারণের। সে-ক্ষেত্রে এত বড় শিল্পের এই শোচনীয় অবস্থা অবিলম্বে অবসিত হওয়ার চেষ্টায় যত্নবান হওয়া আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সংস্কৃতির নানা অঙ্গ। কাব্য, নৃত্য, কাহিনী, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি। ইহাদের সব কিছুর এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটাইয়াছে চলচ্চিত্র। তাইতো জাতীয়-জীবনে তাহার গুরুত্ব এতখানি ব্যাপক, তাহার আবেদন এত বিরাট। তাই চলচ্চিত্র নিছক চিত্তবিনোদনের বা হাল্কা প্রমোদেরই সামগ্রী নয়। জাতীয়-জীবন বা চরিত্রগঠনের এক অসামান্য মাধ্যম। প্রচারের যুগে বক্তব্য বা ভাবধারা প্রচারের যতগুলি মাধ্যম আছে, একথা অনস্বীকার্য সেই তালিকায় শীর্ষদেশে ইহার নাম উল্লেখযোগ্য।

ইহার সাংস্কৃতিক মূল্য ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক দিয়াও এক বিরাট গুরুত্ব আছে। প্রায় সত্তর হাজার শিল্পী ও কুশলী ইহাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকেন এবং প্রমোদকর বাবদ ছায়াছবি হইতে সরকার প্রতিদিন লাভ করেন আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা। আজ এই অচলাবস্থার ফলে এই সত্তর হাজার লোকের একটি বিরাট অংশ যদি বেকার হইয়া যান, তাহা হইলে দেশের এই ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের আলেখ্য যে আরও কতখানি ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক হইবে তাহা ভাবিয়া দেখার মত যথেষ্ট সময় এখন সমুপস্থিত।

একেই বাঙলা ছবি সমস্যামুক্ত নয়। তাহার উপর হিন্দী ছবির বা বাজার বাঙলা ছবির সে বাজার নয়—সে-ক্ষেত্রে বাঙলা ছবির প্রসারের পরিবর্তে যদি তাহার ধ্বংস সাধিত হয়, তবে রসিক ব্যক্তিমাত্রেই তীব্র মর্মবেদনা অনুভব করিবেন।

যে বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র-শিল্প দেশের গর্ব ও গৌরব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে, যে বাঙলা ছবি বিশ্বব্যাপী সমাদর ও স্বীকৃতিতে বিভূষিত, যে বাঙলা ছবি মানুষ নূতন চেতনায় সঞ্জীবিত করিয়াছে, নব নব চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, জাতীয়-জীবনের নবদিগন্তের সন্ধান দিয়াছে এবং প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অসংখ্য স্রষ্টা-শিল্পীর অবিরাম সাধনায় উৎকর্ষের চরম শীর্ষে উপনীত হইয়াছে, তাহার রাহুমুক্তি আমরা অবিলম্বে কামনা করি। প্রার্থনা করি তাহার ভাগ্যাকাশ কালো মেঘের কবল হইতে অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিয়া দীপ্তিমান সূর্যের প্রসন্ন রশ্মিতে ভাস্বর হইয়া উঠুক।

ধ্বংসের পথে কলিকাতা

ভারতবর্ষের মহানগরীগুলির মধ্যে বয়সের বিচারে কলিকাতা কনিষ্ঠতম হইলেও অন্যান্য সকল বিষয়ে তাহার স্থান যে সকলের ঊর্ধ্বে এ কথা শুধু দেশের মধ্যেই নয়, পৃথিবীর সকল প্রান্তের অভিজ্ঞ মহলে সর্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত বিশ্বের তাবৎ গুণীমহল এবং ওয়াকিবহাল সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে কলিকাতার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যে অনস্বীকার্য—এই অকাট্য এবং শাশ্বত সত্যটিকে পরম শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। শুধু শিক্ষা-সংস্কৃতি সভ্যতার বিচারেই নয়,—রাষ্ট্রনৈতিক এবং ভৌগোলিক দিক দিয়াও কলিকাতার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত।

কিন্তু আজ কলিকাতার যে শোচনীয় রূপ আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, তাহা ভাবিলে বেদনার অন্ত থাকে না। এই বেদনাদায়ক আলেখ্য যে কোন ব্যক্তিরই মনোবেদনার কারণ হইতে পারে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যে সকল সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি গঠিত, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে কিন্তু কেহই এই অবস্থার প্রতীকারে এক পাও অগ্রসর হইতেছেন না। বড় বড় বুলি নিক্ষেপ করিতেছেন, বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইতেছে। মহানগরীর অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। বাগবিতণ্ডার ঝড় বহিতেছে। খসড়ার পর খসড়া প্রস্তুত হইতেছে, বৈঠকের পর বৈঠক বসিতেছে—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে কি হইতেছে তাহা তো নগরবাসী নিজেরাই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছেন।

কলিকাতার অবস্থা এখন এমন এক সঙ্কটজনক স্তরে উপনীত হইয়াছে

রূপ, এই মহানগরীতে বসবাস করা সাধারণ লোকের পক্ষে ক্রমশই অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

নগর সংরক্ষণের ভার পৌর প্রতিষ্ঠানের সেই সঙ্গে আরও দুটি অতীব দায়িত্বপূর্ণ এবং পবিত্র কর্তব্য তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। সে দুইটি হইল জল-সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা। মহানগরীর পথে পথে আজ যে জঞ্জালের স্তূপ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার ফলে এই মহানগরী যে অচিরেই জঞ্জালের প্রাচীরে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, এমন আশঙ্কাও অমূলক নয়। কোটি-কোটি মানুষের বসবাসের স্থল এই মহানগরী যদি জঞ্জালে পরিপূর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার পরিণতি যে কি মর্মান্তিক তাহা আশা করি বুঝাইয়া বলার আর প্রয়োজন নাই।

পৌরপ্রতিষ্ঠান নামক ইতিহাস-বিখ্যাত জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি আজ নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত। দলাদলিতে পরিপূর্ণ। জনসেবার চিন্তা সেখানে আজ শিকায় উঠিয়াছে।

আজ ভারতবর্ষের যা রাজনৈতিক অবস্থা, সে ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার দিক দিয়া কলিকাতার গুরুত্ব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বড় কথা, সারা ভারতকে আজও যেভাবে কলিকাতা সব দিক দিয়া সহায়তা করিয়া আসিতেছে তাহার বিনিময়ে যে অপূর্ব কৃতজ্ঞতা ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় ভারত সরকার দিতেছেন, তাহা আমাদের বিস্মিত না করিয়া পারিতেছে না। পথঘাটের যা অবস্থা, পরিবহনের যা গোলমাল, পথচারীর যা অনন্ত দুর্ভোগ—এসব কোন কিছুরই কোন প্রতিকার অদ্যাপি হইতেছে না। আজ পর্যন্ত কলিকাতায় একটি স্টেডিয়াম হইল না।

সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র, ভারতের বৃহত্তম এবং পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম নগরী, বৃটিশ যুগে অখণ্ড ভারতের দীর্ঘকাল স্থায়ী রাজধানী, অগণিত যুগ-স্রষ্টা মনীষী, চিন্তানায়কের লীলাভূমি এই বিশ্বজনসমাদৃত মহানগরীর প্রতি আজ যে ঔদাসীন্য ক্রমবর্ধমান আকার ধারণ করিতেছে, তাহার পরিণতি যে কতদূর ভয়াবহ তাহা ভাবিয়া দেখার মত যথেষ্ট সময় কিন্তু আর অদূরে নয়।

বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গত ৯ই শ্রাবণ ৭৪ বছর বয়সে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। ইনি পার্সি ব্রাউন ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষালাভ করেন। অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে জলরঙ-এ ওয়াস ও টেম্পোরা রীতিও অনুশীলন করেন। প্যারিসে শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে এসে সরকারী আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন ও ১৯৫৭ সালে অবসর নেন। শিল্পী হিসাবে দেশে ও দেশের বাইরেও তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কথাশিল্পী স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪-এ শ্রাবণ মাত্র ৪৮ বছর বয়সে দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগান্তে অন্তিমনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি একজন স্নাতক ছিলেন। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক ও আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী—এই দুই বাল্যবন্ধুর সঙ্গে কৈশোরেই সাহিত্য-সাধনা সুরু করেন। তাঁর লেখা প্রায় পঁচিশখানা গল্প ও উপন্যাসের গ্রন্থের মধ্যে পঙ্কজ, বেগম, এক ছিল কন্যা, বৈশালীর দিন, গোপীসংবাদ, অমৃত সমান, আলোর অরণ্য, আঁখি প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম, তাঁর একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর অকালমৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন শক্তিমান লেখককে হারাল।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[শ্রী বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীনন্দকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত]

বন্যা-দুর্গত

—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত
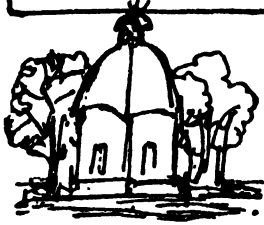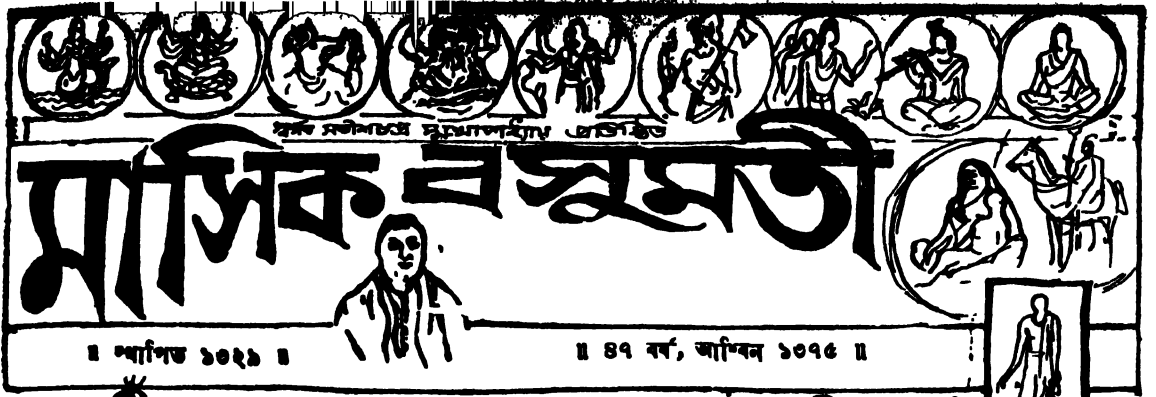
॥ প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥

কথামৃত

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম পাঁচটি অঙ্গকে (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার) বহিরঙ্গ সাধন বলা হয়; আর শেষ তিনটি অঙ্গকে (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) অন্তরঙ্গ সাধন বলা হয়।

যাগ-যজ্ঞাদি-বেদবিহিত কর্মকেও অনেক সময় বহিরঙ্গ সাধন বলা হয়। আনন্দগিরি বলেন—কর্মযোগ বহিরঙ্গ সাধন এবং ধ্যানযোগ অন্তরঙ্গ সাধন।

বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ অবস্থা

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যতক্ষণ স্থূল দৃষ্টি, বাহ্যবিষয় আসক্তি—অন্নময়, মনোময় কোষে মন থাকে—মায়ারূপ পর্দা দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি আবৃত থাকে, ততক্ষণ বহির্মুখ অবস্থা। আর যখন মায়ারূপ পর্দা সরে যায়, বাহ্যদৃষ্টি লোপ হয়, আনন্দময় কোষে মন থাকে, অথবা মন লীন হয়—মনের নাশ হয়, তখন অন্তর্মুখ অবস্থা। সে কি রকম জান? দয়ানন্দ বলেছিলেন—'অন্দরে এসো, কপাট বন্ধ করে। অন্দরবাড়িতে যে-সে ঢুকতে পারে না।'

"থিয়েটারে অভিনয় দেখেছ তো? যতক্ষণ পর্দা পড়ে আছে—পর্দার ভিতরে দৃষ্টি যায় না, ততক্ষণ বাইরের দিকেই দৃষ্টি থাকে, কথাবার্তা চলে। যাই পর্দা উঠে গেল, তখন আর বাহ্য-দৃষ্টি থাকে না—সমস্ত দৃষ্টি এবং মন অভিনয়ের দিকে যায়। আবার পর্দা পড়লে বাইরে দৃষ্টি। তেমনি মায়ারূপ যবনিকা পড়লেই মানুষ বহির্মুখ হয়; আবার যবনিকা সরে গেলেই মানুষ অন্তর্মুখ হয়—সমাধিস্থ হয়।

"যতক্ষণ বহির্মুখ ততক্ষণ ভালমন্দ,—ততক্ষণ এটি প্রিয়, এটি ত্যাজ্য। দেখ না, নামরূপ তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বহির্মুখ, ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যাজ্য। উপদেশের জন্য এটা ভাল, ওটা মন্দ, যদিও ভালমন্দ সবই তিনি।"

বহুরূপী

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে নানা মত হ'য়ে কত লাঠালাঠি, কত মারামারি! কিন্তু তাঁকে কোনরকমে একবার লাভ করতে পারলে তখন ঠিক বুঝা যায় যে বাস্তবিক কোন গণ্ড-গোল নাই। সে পাড়ায় না গেলে সব খবর পাবে কেমন করে? একটা গল্প শোন :—

"একজন বাহ্যে করতে বসে গাছের উপর একটা জানোয়ার দেখতে পেলে, পাকা লাল রঙ। সে এসে আর একজনকে বললে, 'দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম!' সে লোকটি বললে—'বাহ্যে করতে গিয়ে আমিও দেখেছি—তা, সে ত' লাল নয়, সবুজ—পাকা সবুজ রঙ।' আর একজন বললে—'না-না—, আমি দেখেছি—হলদে।' এভাবে আরো কেউ কেউ বললে—'না-না—সেটা নীল! আবার এভাবে কেউ বেগুনী, জরদা, পাঁশটে, যে যেমন দেখেছে বললে। শেষে ঝগড়া। তখন সকলে মিলে সে গাছতলায় গিয়ে হাজির প্রমাণের জন্য। সেখানে গিয়ে দেখে একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, 'আমি এ গাছতলাতেই থাকি, আমি সে জানোয়ারটাকে বেশ জানি—তোমরা যা-যা বলছ সব সত্য। সে কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত রকম রঙ হয়। আবার কখনো দেখি তার কোনরকম রঙই নাই। বহুরূপী!'

"যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে সেই শুধু জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন; নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ, আবার নির্গুণ (The Absolute) গাছতলায় যে থাকে সেই জানে, বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।"

বহূদক ও কুটীচক

মুক্তিমার্গ অবলম্বনকারীকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর ক্রমে চারিটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তার প্রথম অবস্থা হচ্ছে বহূদক। এ অবস্থায় তাকে আত্ম মোক্ষার্থে ও জগৎ হিতার্থে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়। তখন ভগবান তাকে যেভাবে, যে অবস্থায়, যে আশ্রয়ে রাখেন, সে সেভাবেই থাকে; যে আহার্য ভগবান জোটান তা-ই গ্রহণ করে। পরিব্রাজকভাবে পরিক্রমা করতে করতে নিষ্কাম ও অকর্তাভাবে লোকহিতকর ব্রহ্ম-কর্মাদি ক'রে তার ব্রহ্মনির্ভরতা শিক্ষা হয়, ভগবানে গভীর শ্রদ্ধা লাভ হয়, অহং বুদ্ধি, মমত্ব বুদ্ধি ও বাসনা তৃষ্ণাদি লোপ পায়, সর্বাবস্থায় সহনশীলতা (তিতিক্ষা), সন্তোষ, ভয়শূন্যতা ও সৎসাহস লাভ হয়। দেহাত্মবুদ্ধি দূর হ'য়ে সর্বজীবে একাত্মবোধ হয়—নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, সমপ্রাণতা ও প্রেম লাভ হয়, আর সকল সংশয়, কুসংস্কারাদি বিনষ্ট হয়।

বহূদকের পরে দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে কুটীচক। এ অবস্থায় কোন কুটীতে (কুটীরে) বা গুহায় বা আশ্রমে বাস ক'রে গভীর উপাসনা, ধারণা ও ধ্যানে রত থেকে অভ্যাস দ্বারা নিষ্কামভাবে, ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্মাদি করতে হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে হংস ও পরমহংস অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বহূদকের পর কুটীচক। বহূদক বহূতীর্থের উদক, কি না, জল খায়—বহু তীর্থ ভ্রমণ করে; তার মনে এখনো শান্তি হয় নাই। যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটীর বেঁধে বসে—স্থির হ'য়ে আসন ক'রে নিশ্চিন্ত মনে ভগবৎ চিন্তা করে; তখন কুটীচক।

"যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান—যখন বোধ হেথা হেথা তখনই জ্ঞান।"

বাউল

বৈষ্ণবদের এক শ্রেণীর নাম বাউল। তারা সাধন করাকে বলে 'রসের কাজ'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"একজন বাউল এসেছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার রসের কাজ সব হ'য়ে গেছে? খোলা নেমেছে? যত রস জ্বাল দেবে তত রেফাইন (refine) হবে। প্রথম আকের রস, তারপর গুড়, তারপর দোলো,—তারপর চিনি—তারপর মিছরি, ওলা এই সব। ক্রমেই আরো রেফাইন হচ্ছে।'

"খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে? না—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে। যেমন জোঁকের উপর চুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে। ইন্দ্রিয় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। 'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ'।

"তারা বলে, 'হাওয়ার খবর' জান, অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরণ হ'য়ে সুষুম্নার ভিতর দিয়ে যে মহাবায়ু উঠে, তার খবর।

"জিজ্ঞাসা করে, কোন্ পৈঠেতে আছ?—ছ'টা পৈঠে—ষড়চক্র। যদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে, বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে।

"বাউল সিদ্ধ হ'লে 'সাঁই' হয়। তখন সব অভেদ। অর্ধেক মালা গোহাড়, অর্ধেক মালা তুলসীর। 'হিন্দুর নীর, মুসলমানের পীর।' সাঁইয়েরা ব্রহ্মকে বলে 'আলেখ্'। সাঁই-এর পর আর নাই।"

বাচ্য-বাচক, ব্যাপ্য-ব্যাপক

বাচ্য মানে প্রতিপাদ্য (বর্ণনীয় বিষয়); আর বাচক হচ্ছে প্রতিপাদক বা অর্থপ্রকাশক শব্দ বা বাক্য, অর্থাৎ নাম।

ব্যাপ্য-ব্যাপক মানে কি? ব্যাপ্য মানে সাধ্য (কারণ বা হেতু) অর্থাৎ প্রতিপাদ্য; আর ব্যাপক মানে হচ্ছে সাধ্যের সীমিত অবস্থা—যেমন ছোট একটি রূপ; যেমন অবতার মানুষরূপ হয়েছেন।

পদার্থের নাম এবং রূপ এই দু'টি ভাগ। কিন্তু রূপভাগ নিজ নিজ নামভাগ থেকে আলাদা নয়—যেমন বিষ্ণুর নাম ও স্বরূপ একই। সকল পদার্থেরই আকার নিজ নিজ নামের সঙ্গে জড়িত; তাই নামস্বরূপই আকার। তেমনি সমস্ত নাম ওঁকার থেকে ভিন্ন নয়—ওঁকারস্বরূপ নাম—বাচক অর্থে নাম। ব্রহ্মের বাচক অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম।

প্রণব ঈশ্বরের বাচক; প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। বাচকের সহিত বাচ্যের সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ—যেমন পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ। শব্দমাত্রই সংকেত হলেও অর্থের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিত্য। পাতঞ্জল বলেন—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'—প্রণব তাঁর বাচক। ভগবান যেমন ত্রিবিধভাবে সংসারের মধ্যে বিরাজ করছেন, প্রণবের মধ্যেও তেমনি ত্রিবিধভাবে বিরাজিত আছেন। তাই ভগবানই প্রণবের প্রকৃত বাচ্য। ব্রহ্মসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' পদও এই প্রণবার্থ-বাচক। জন্মাদি দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও নাশ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনটিই বুঝায়। অস্য (এই জগতের) জন্মাদি (সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ) যতঃ (যাঁহা হ'তে হয়েছে)—ইনিই পরমেশ্বর। প্রণবও তেমনি বাচক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে—হে রাম, তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক; 'বাচ্য বাচক ভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর'। বাচ্য বাচক অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক।"

বাৎসল্য ভাব

পিতা, মাতা, গুরু ইত্যাদি পুত্র-কন্যা, শিষ্য ইত্যাদিকে যেমন স্নেহপাত্র এবং অবশ্য প্রতিপাল্য বলে ভালবাসেন, ভগবানকে তেমনি ঐকান্তিকভাবে পরম স্নেহাস্পদ ও প্রতিপাল্য ভেবে ভালবাসতে পারলে তাকে 'বাৎসল্য বা স্নেহরতি' বলে। কৃষ্ণের গুরুজনদের তাঁর প্রতি যে প্রাণঢালা মমতাপূর্ণ ভালবাসা ছিল তা-ই বাৎসল্য-রতি। ব্রজধামে নন্দ যশোদা এ রসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক সাধিকা। আবার হিমালয় মেনকা, দশরথ কৌশল্যা, কশ্যপ অদিতি ইত্যাদিও এই বাৎসল্য রসের সাধক সাধিকা।

পরম স্নেহের পাত্রের প্রতি স্নেহরূপ অনুকম্পাকারীর সম্ভ্রম-রাহিত্যই বাৎসল্য ভাব—কখনো প্রেমপূর্ণ, কখনো স্নেহপূর্ণ, আবার কখনো বা বাৎসল্যের সঙ্গে অন্যভাব মিশ্রিত থাকে। যেমন যুধিষ্ঠির ও বলরামের কৃষ্ণের প্রতি সখ্য মিশ্রিত বাৎসল্যভাব ছিল।

নাড়ীর টানে যে স্নেহ সঞ্জাত হয়, যাকে অপত্যস্নেহ বলে, তারই নাম বাৎসল্য, কিম্বা, বৎসের উপর প্রাণের টান। ভগবানের উপর সেই রকম প্রাণের টানই বাৎসল্য ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যশোদার বাৎসল্য ভাব। যশোদা কৃষ্ণ খাবে ব'লে ননী হাতে ক'রে বেড়াতেন। ছেলেটি পেটভরে খেলেই মা সন্তুষ্ট।

"স্ত্রীরও কতকটা বাৎসল্যভাব থাকে—স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়।"

বাদ

বিচার বা তর্কের তিনটি প্রকার ভেদ আছে—বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প। তার মধ্যে বাদ হচ্ছে তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য তর্ক বা বিচার; বিতণ্ডা হচ্ছে তত্ত্বের দিকে জোর না দিয়ে পর-পক্ষ-দূষণরূপ তর্ক; আর জল্প হচ্ছে তত্ত্ব নির্ণয়ের দিকে ব্যস্ত না হ'য়ে শুধু তর্কে জয়ের জন্য আত্মপক্ষ-স্থাপনরূপে তর্ক। এই তিন রকম তর্কের মধ্যে বাদই কল্যাণপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান গীতায় (১০।৩২) বলেছেন, 'বাদঃ প্রবদতামহ'—ব্রহ্ম নির্ণয়কারী বাদই আমার বিভূতি।

ন্যায়শাস্ত্র মতে তত্ত্ব নির্ণয়ের ফলই বাদ। তত্ত্ব নির্ণয় কিরূপে হয়? পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বিচার ও তর্ক দ্বারা যতটা সম্ভব অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন ক'রে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়। এভাবে অনেক বিচারের পর একটি বাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দর্শনশাস্ত্রে অনেক প্রকার বাদ প্রচলিত আছে—যথা, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, পরমাণু-বাদ, পরিণামবাদ, আরম্ভবাদ, বিবর্তবাদ, শূন্যবাদ, শক্তিবাদ, আভাষবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, ইত্যাদি।

কার্য কারণ তত্ত্বের মীমাংসার জন্যই প্রধানত এই সকল বাদের সৃষ্টি। দার্শনিক দ্রষ্টাগণ নিজ নিজ যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুভূতির বিভিন্নতা হেতু বিভিন্নভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তাই বিভিন্ন বাদের প্রচার

বানরের ছা, বনাম বিড়ালের ছা

শ্রীরামকৃষ্ণ—"দুই থাকের সাধক এবং ভক্ত আছে। এক থাকের বানরের ছা'র স্বভাব। বানরের ছা যো সো ক'রে নিজে মা'কে আঁকড়ে ধরে। এ থাকের সাধক বা ভক্ত মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এরা নিজে চেষ্টা ক'রে ভগবানকে ধরতে যায়।

"আর এক থাক আছে তাদের বিড়ালের ছা'র স্বভাব। বিড়ালের ছা নিজে মা'কে ধরতে পারে না। সে প'ড়ে প'ড়ে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে—মা! মা! করে। মা তাকে কখনো বিছানার উপর, কখনো ছাদের উপর কাঠের আড়ালে মুখে ক'রে নিয়ে রাখছে, সে নিজে মা'কে ধরতে জানে না। মা যেখানে রাখে সেখানেই থাকে। এ থাকের সাধক বা ভক্ত নিজে ভেবে-চিন্তে কিছুই করে না—ঈশ্বরকে বকলমা দিয়ে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আর ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। মা তার কান্না শুনে থাকতে না পেরে এসে দেখা দেন। দু'জনেই সাধক বা ভক্ত।

"যত এগুবে, ততই দেখবে তিনিই সব হ'য়েছেন। তিনিই গুরু—তিনিই ইষ্ট। তিনিই জ্ঞান ভক্তি সব দিচ্ছেন।"

বাপ-মা

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বাপ-মা প্রসন্ন না হ'লে ধর্ম-টর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত' প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধ'রে মা'কে বোঝান। বললেন, 'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব!'

"মানুষের কতকগুলি ঋণ আছে। মাতৃ-পিতৃ ঋণ তার মধ্যে। মা-বাপের ঋণ পরিশোধ না করলে কোন কাজই হয় না।"

ছোট নরেনকে ঠাকুর বলেছিলেন—"তুই বাপ-মা'কে খুব ভক্তি করবি, কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবি নি; খুব রোক্ আনবি। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই।

"বাপ কত বড় বস্তু! বা-মা'কে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করতে চায় তার ছাই হবে। যতক্ষণ মা আছেন মা'কে দেখতে হবে। আমি মা'কে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হ'য়ে এসেছেন। তাই কারু শ্রাদ্ধ শেষে ইষ্টের পূজা হ'য়ে পড়ে। কেউ ম'রে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়,—তারও এই ভাব।

"যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে, ততক্ষণ মা'র খবর নিতে হবে। যেমন নিজের কাশি হ'লে মিছরি মরিচ করতে—মরিচ লবণের যোগাড় করতে হয়, তেমনি মা'র খপরও নিতে হয়। তবে, যখন নিজের শরীরেরও খপর নিতে পাচ্ছি না—তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।"

বারাণসী বা কাশী

জাবালোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেছেন—বৃহৎ কুরুক্ষেত্ররূপ সংসারে দেহটি অণুকুরুক্ষেত্র; ইহাই দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধায়ক যজ্ঞভূমি এবং ব্রহ্মসদন। অবিমুক্ত মোক্ষস্থান এই দেহেই আছে। আধ্যাত্মিকভাবে এই অবিমুক্ত স্থানকে বারণা ও নাশী বলা হয়েছে, অর্থাৎ যেখানে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত দোষসকল নিবারিত হয় তাহাই 'বারণা' এবং যেখানে সর্বেন্দ্রিয়কৃত পাপসমূহ নষ্ট হয় তাহাই 'নাশী'। ইহাই ইহ এবং পরলোকের সন্ধিস্থান। এই স্বর্গলোকেই দিব্যজ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়। এই স্বভাবমুক্ত আত্ম-সান্নিধানে নিত্য অনন্ত অব্যক্ত ব্রহ্ম সদা আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই অবিমুক্ত স্থানে পরমাত্মার ধ্যানযুক্ত হওয়াই শ্রেষ্ঠ আত্মোপাসনা।

এই স্থানই পিণ্ড মধ্যে বারাণসী ক্ষেত্র; ইহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা এবং ভ্রূ—এই তিনের ঠিক মধ্যবর্তী সন্ধিস্থানে অবস্থিত। এই সন্ধিস্থানই সেই স্বর্গস্থান বারাণসী ক্ষেত্র, যেখানে জীবের প্রাণ নির্গমনের সময় স্বয়ং মহাদেব তারকব্রহ্মনাম উপদেশ করেন—যেন অমৃত পেয়ে জীব মোক্ষলাভ করে। যিনি এস্থানে ধ্যান করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তিনি এই তারকব্রহ্মনাম শুনতে পান। এ অবস্থায় মৃত্যুই বারাণসীতে বা কাশীতে মৃত্যু।

যে স্থান পিণ্ড মধ্যে 'বারণা' ও 'নাশী'র অন্তর্বর্তী ব্রহ্মাণ্ডে তাই 'বরুণা' ও 'অসী'র মধ্যবর্তী বারাণসী বা কাশীধাম।

কাশী কাকে বলে? সাধকের জ্ঞান-প্রবাহ যেখানে গিয়ে আত্ম-স্বরূপকে প্রকাশ করে সে স্থানই কাশী। আচার্য শঙ্কর বলেছেন:

'মনোনিবৃত্তি' পরমোপশান্তিঃ
  সা তীর্থবর্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা
  সা কাশিকাহাং নিজ বোধরূপং॥—যতি পঞ্চক।

অর্থাৎ মনোনিবৃত্তিই (বিষয় ভোগের তৃষ্ণা নিবারণই) পরম শান্তি; ইহাই তীর্থশ্রেষ্ঠা মণিকর্ণিকা। বিমল জ্ঞানপ্রবাহই আদি গঙ্গা; আর যাতে প্রকাশদীপ্তি আছে, তাই কাশী (কাশ=দীপ্তি বা প্রকাশ+ইন্ অস্ত্যর্থে)। তাই জ্ঞানীর দেহই কাশী; বিষয় নিবৃত্তি-জাত মনের শান্তিই মণিকর্ণিকা, বুদ্ধিই অন্নপূর্ণা, অন্নময়াদি পঞ্চকোষে যে বুদ্ধি বিরাজমানা তাহাই ভবানীস্বরূপা—এগুলি দেহরূপ প্রতি গৃহেই আছে। সর্বসাক্ষী সর্বান্তর্যামী পরমাত্মাই

শিব। শিব নির্মল বিশ্বের অন্তরাত্মা এবং যদিও তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগম্য, তথাপি তাঁকে আমরা বুদ্ধিস্থ ব'লে বুঝতে পারি। আত্মতত্ত্বজ্ঞানই কাশীর তুল্য মুক্তিপ্রদ; জ্ঞানেই কাশীর প্রকাশ হয়; জ্ঞানরূপা কাশীই সকলকে প্রকাশ করে। যিনি জ্ঞানকাশীকে জেনেছেন, তাঁরই কাশীলাভ হয়েছে।

বাল-গোপাল

ওঙ্কারনাথজী বলেছেন—'গোপালই ব্রহ্ম, উনিই আত্মা, উনিই ভগবান। এই-ই ব্রহ্মের সাকার রূপ—জ্ঞান-চক্ষে দেখলে মায়িক রূপ বটে। গোপাল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন; আর কোন তত্ত্বে দরকার কি? ভক্তির চোখে, ভাবের চোখে, দেখতে শেখো ভগবানকে। তাঁর ঐশ্বর্য ভুলে যাও। তাঁকে বন্ধু ভাবো, পুত্র ভাবো, পতি ভাবো—এমন কি দাস ভাবো— হাঁ, দাস ভাবো—দাবি ক'রে ভাবো। তিনি ভক্তের দাসত্ব করেছেন। তিনি যে প্রেমের কাঙাল—তাঁকে যেভাবেই ডাকো, ডাকলেই সাড়া দেবেন; তবে প্রেমের সঙ্গে ডাকা চাই। ভয় ক'রে ডেকো না—ভয় করবার কিছু নেই তাঁকে।

"বাল গোপাল বড় লাজুক; সবার সামনে বার হন না—বিশেষ ক'রে তার কাছে যে ভাবে, তিনি বিগ্রহ—কাঠ বা পাথরের তৈরী। যে তাঁকে মন অর্পণ ক'রে ভাল না বেসেছে, বিশ্বাস না করেছে, তিনি যেচে অপমান কুড়ুতে যাবেন সেখানে?

"ভগবান যখন ইষ্টদেবের বেশে লীলা করেন কৃষ্ণ সেজে, কালী সেজে—তখন তিনি মানুষের বা দেবদেবীদের মনোভাব—যেমন রাগ, লজ্জা, মান-অভিমান, এমন কি ভয় পর্যন্ত পান। এরই নাম লীলা। বিরাট ঐশীশক্তি, যা বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে কে ভালবাসতে পারে আপনার ভেবে? শত শত নক্ষত্র, শত শত চন্দ্র সূর্য যাঁর ইঙ্গিতে লয় হয়—যিনি পলকে সৃষ্টি, পলকে স্থিতি, পলকে প্রলয় করতে পারেন, তাঁকে কে ভক্তি করতে পারে, যদি না তিনি নিজেকে ছোট ক'রে আমাদের সামনে আসেন?

"কৃষ্ণ বিশ্বের বনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ান—বালকস্বভাব, উদাস; কেউ যদি ডাকে তার কাছে যান, না ডাকলে আপন মনেই একা একা থাকেন। ভালবেসে কেউ ডাকলে, সঙ্গী পেয়ে তিনি সুখী হন। তিনি ভালবাসার বশ,—অতি করুণ প্রকৃতি। নারীভাবে যে তাঁকে ভালবাসে সে-ই রাধা। সে-ই তাঁর নিত্যলীলার সহচরী—মীরাবাঈ। যে জানে পৃথিবীর সব কিছুই তিনি, তার কাছে পৃথিবী ও স্বর্গ মোহন সঙ্গীতে একই সুরে বাঁধা। জ্ঞানীরা তাই কৃষ্ণকে বংশীধারী-রূপে দেখেন—বংশীধারী বলেই জানেন। কিন্তু এ চোখে দেখতে পেলে তবেই তো?"

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

এ মাসের প্রচ্ছদপট

ও' হেনরী

মার্কিন ছোট গল্পের জাদুকর ও' হেনরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নর্থ ক্যারোলাইনায়। তাঁর আসল নাম উইলিয়াম সিডনী পোর্টার। তাঁর বাবা ছিলেন চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী। ১৫ বছর বয়সেই ও' হেনরী স্কুল ছাড়েন। তার পর পাঁচ বছর এক আত্মীয়ের দোকানে কাজ করার পর অসুস্থতার জন্য টেক্সাসে চলে যান। পরবর্তী দশ বছর তিনি অফিসের কেরাণী, ড্রাফ্টসম্যান প্রভৃতি নানা পেশায় কাজ করার পর শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকের কাজ নেন।

ও' হেনরীর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা---তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ। এক ব্যাঙ্কের তহবিল তছরুপের দায়ে তাঁর জেল হয়েছিল। বস্তুত এই অঘটন না ঘটলে পৃথিবীর সাহিত্যরসপিপাসুরা ও' হেনরীকে পেত না। কারাগারের রুদ্ধকক্ষে বসেই তিনি সর্বপ্রথম কতকগুলি ছোট গল্প লেখেন ও প্রকাশ করেন। ১৯০২ সালে তিনি নিউ ইয়র্কে যান ও সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে তিনি খ্যাতিলাভ করেন এবং পরে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে একজন দিকপাল হন।

১৯০৪ সালে ৬৫টি এবং ১৯০৫ সালে ৫০টি ছোটগল্প তিনি লেখেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে তিনি ৯ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর ছোটগল্পের মোট সংখ্যা ২৫২।

১৯১০ সালের ৫ই জুন মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ও' হেনরীর মৃত্যু হয়।

নিজের জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতারই ফসল ও' হেনরীর ছোট গল্পগুলি। তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য হল তাতে একটা মানবিক আবেদন থাকে। গল্পের আগাগোড়া একটা সাসপেন্স বজায় রেখে আকস্মিক পরিসমাপ্তির মধ্যে তিনি চমক সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। একজন বিশিষ্ট লেখক বলেছিলেন:

"ইংলণ্ডের যেমন ডিকেন্স, ফ্রান্সের যেমন ভিক্টর হুগো, আমেরিকার তেমনি ও' হেনরী।"

'ক্যাবেজেস এণ্ড কিংস', 'দি ফোর মিলিয়ন', 'হার্ট অব দ্য ওয়েস্ট', 'দি ট্রিমড ল্যাম্প', 'রোডস অব ডেস্টিনি', 'সিক্সেস এণ্ড সেভেনস', 'রোলিং স্টোনস' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কীর্তি ঃ

ভারতীয় সাহিত্যিক উত্তরাধিকার এবং ঐতিহ্যের উদ্বোধক

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষ্ণবাসুদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক, সুতরাং তাঁকে নিয়েই সুরু করা যাক্। মহাভারতের কাহিনীতেই তাঁর স্থান ভালভাবে নির্দেশিত—তিনি পাণ্ডব এবং কৌরব বীরদের পিতামহ, তদানীন্তন রীত্যনুসারে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার স্ত্রীর গর্ভে স্বীয় ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্মদাতা। ভীষ্মের মত তিনিও মহাভারতের বীরবর্গের মধ্যে নেস্‌টর্‌তুল্য, এবং সময় সময় (গ্রীক নাটকের) 'ডিউস্ এক্‌স মেকিনা', অর্থাৎ প্রয়োজনকালে অন্য থেকে আবির্ভূত দেবতার মত আচরণ করেছেন। নিজের কণীয়স্ সমসাময়িক কৃষ্ণবাসুদেবের মহত্ত্বর ইনি প্রথম প্রশংসাকারী, অন্য দু'-চারজনের সংগে। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অন্য একটা মহান কারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহ বলছে ইনি ভারতীয় সাহিত্যর চূড়ামণি—মহাভারত রচনা ছাড়াও চতুর্বেদ এবং অষ্টাদশ পুরাণ সংকলন করে তিনি দ্বিমুখী কাজ সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ, দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তৎকালীন আর্যসমাজে মুখে মুখে প্রচলিত ধর্মীয় স্তোত্র এবং যাদুমন্ত্র আর তুক্‌তাক, এবং ধর্মকৃত্য সংগ্রহ করে চতুর্বেদে সংকলিত করেন; তাঁকে বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ্ এবং সাহিত্যপ্রেমিক বলা হয়েছে; তিনি তৎকালীন আর্য সমাজে প্রচলিত পুরাণ-কাহিনী আর উপকথা এবং বীরপুরুষ আর ধার্মিক ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কিত গল্প যোগাড় করেন, এগুলো আর্য-অনার্য সমাজের মিশ্রিত কাহিনী। এবং, যুক্তিসংগতভাবেই আমরা অনুমান করতে পারি পরবর্তীকালের পুরাণগুলোর ভিত্তি তাঁরই সংগ্রহ। ভারতীয় সাহিত্যর প্রাচীনতম সম্পদ বেদ এবং পুরাণ এভাবে ঐতিহ্যানুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের একক পরিশ্রমের ফসল। বেদ সংকলন করায় তাঁর উপাধি হয় ব্যাস—সংকলক, বা বেদ-ব্যাস, বেদ-সংকলক।

গড়ে ওঠার কালে এক সংকটক্ষণে ব্যাস ভারতবাসীর জন্য যে কাজ করেছেন তা হোমার-এর কাজের সংগে তুলনীয়। হোমারও ইন্‌দো-য়ুরোপীয়ভাষী হেলেনেস্-দের সংগে প্রাক্ ইন্‌দো-য়ুরোপীয় অজিয়ান জাতির মিশ্রণকালে সংস্কৃতি-রক্ষার গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সন্দেহ নেই এ কথা উহ্য যে ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্ভবত কিছু-সংখ্যক ব্যাসের প্রতীক নাম, তাঁরা সংগ্রাহক, সংকলক, এবং নিয়ামক—মৌখিক সাহিত্য, এবং মৌখিক বা লিখিত পুরাণ-কাহিনী এবং উপকথার। এঁরা নিঃসন্দেহে তাঁর আগে এবং পরে এসেছেন ঃ ঠিক যেমন হোমার হোমেরিডেন এবং অন্যান্য চক্রসম্পর্কিত নানা কবি এবং গায়কের প্রতীক নাম। তবে ব্যাসের কীর্তি হোমার-এর তুলনায় অনেক বেশি। কারণ আর্যভাষী ভারতীয়দের জন্য ব্যাস বিপুলায়তন ধর্মীয় সাহিত্য এবং বিপুলায়তন বীরগাথা আর কাব্য রচনা করেছিলেন; আর হোমার ইন্‌দো-য়ুরোপীয়ভাষীদের জন্য শুধুমাত্র বিপুলায়তন বীরগাথা রচনা করেছিলেন (নিঃসন্দেহে শাশ্বত এবং প্রকৃত কাব্যরূপে)। তবুও প্রাচীন গ্রীকজাতির সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যে হোমার-এর স্থান সর্বোচ্চে—তাঁর রচনা বা সংকলন বহুলাংশে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও।

তাহলে চতুর্বেদ খৃস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ব্যাস কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল, এ সময়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চিরায়ত পুরাণ-কাহিনী, উপকথা, এবং ইতিহাস বা আধা-ইতিহাসের আর্য-ভাষায় সংকলনের কাজও সুরু হল। এই সাহিত্যকে নতুনত্ব বা সূচনা আর্যভাষার জন্য একটা লিপি গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব ছিল। আর্যদের নিজস্ব কোনও বর্ণমালা ছিল না, অথচ খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষাভাষী হরপ্পা আর মোহেন-জো-দরো-র অধিবাসীদের নিজস্ব বর্ণমালা ছিল যা আমরা সীল এবং খোদাইকরা শব্দাবলী থেকে তিনটে স্তরে দেখতে পাই। এই-সব প্রাক্-আর্য দ্রাবিড়দের দেখেই আর্যরা তাদের ভাষা লেখার ধারণা পেয়েছিল। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যে আর্য-ভাষার সংগে সম্পর্কান্বিত ব্রাহ্মী লিপি রীতিমত প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচ্ছন্ন লিখন-পদ্ধতির মর্যাদায় ভূষিত। ব্রাহ্মী লিপির শেষতম উৎস হিসেবে বূহলার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট প্রাচীন ভারত-তত্ত্ববিদ্‌রা এক সময় ফেনেসিয়ান্-উৎসের উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এই মত সংস্কারের অপেক্ষা রাখে, এবং মোহেন-জো-দরো-র লিপির শেষ রূপ থেকে ব্রাহ্মী লিপির ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটা সুতরাং একটা প্রাক্-আর্য পদ্ধতি যা সংস্কৃত করে আর্যরা ভারতবর্ষে নিজেদের ভাষা লেখার কাজে লাগায়। এখন, খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও ব্রাহ্মী নিখুঁত লিপি হয়ে ওঠে নি—এর বানান তখনও বিশুদ্ধ হয় নি এবং মিলিত শব্দনির্দেশ করাও সম্ভব হয় নি (যথা, 'ডাব্‌ল কন্‌সোনান্‌ট'গুলো এককভাবে লেখা হত)। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকীয় ব্রাহ্মী-র প্রোটো-ব্রাহ্মী হিসেবে সূচনা খৃস্টপূর্ব দশম শতকে হওয়া সম্ভব চতুর্বেদ এবং আদি পুরাণগুলো সেক্ষেত্রে বর্ণমালা পাওয়ামাত্র সংকলিত হতে সুরু করতে পারে আর্যভাষায়।

বেদব্যাসকে খৃস্টপূর্ব দশম শতকে ফেলার অর্থ বৈদিক সাহিত্যকে নিম্নতর সীমায় আনা, ওগুলো সংকলনের স্থূল কাল, বরং বলা চলে যখন ওগুলোর সংকলন সুরু হয়। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন কেমন ক'রে সংকলনের কয়েক শতাব্দী পরেও বৈদিক বিধি মুক্ত ছিল এবং তা আদৌ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয় নি। বৈদিক গ্রন্থগুলো থেকে খৃস্টপূর্ব দশম শতকে ভারতবর্ষে আর্য ভাষার অবস্থা বোঝা যায়, এবং ইন্‌দো-এরিয়ান বৈদিক ভাষারূপ এবং মেজাজে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ক্যুনেইফর্ম খোদাই লিপির প্রাচীন পারস্য ভাষা আর সমসাময়িক বা কিছু আগের আবেস্তান (গাথা ভাষা) ভাষার খুব কাছাকাছি। হেমচন্দ্র খৃস্টপূর্ব একাদশ শতকে ঋক্‌বেদের অনেকখানি অংশ রচিত হয়েছিল মনে করেন। কিন্তু খুব সম্ভবত প্রাচীনতম স্তোত্রগুলো আরও কয়েক শতাব্দী আগেকার, এবং তাহলে সে সময় ভাষা বৈদিক বা ঋক্‌বেদীয় ছিল না, ছিল এরই প্রাচীনতর রূপ, যা কিনা বলা যায় ইন্‌দো-ইরানিয়ান্ কিংবা শেষ অবস্থায় আর্যভাষা ('আর্য' বলতে বৈদিক এবং আবেস্তান ভাষার আনুমাণিক

উৎস বোঝাচ্ছেন, সংকীর্ণ আর বিশিষ্ট অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত)।

ব্যাস কর্তৃক বৈদিক এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সূচনা ভারতবর্ষের একীকরণ-সূত্র, ভারতীয় জ্ঞান এবং চিন্তার সর্বধাত্রী ভাণ্ডার

বৈদিক স্তোত্রগুলো, ঋক্ এবং অথর্ববেদের সূত্রাবলী আর যজুর্বেদের ধর্মীয় প্রকরণ সম্বন্ধীয় সূত্রনিচয় বিশেষ করে উত্তর ভারতের (পাঞ্জাব এবং গাংগেয় উপত্যকার পশ্চিম অংশবাসীদের) আর্য ভাষাভাষীদের আর্য-উত্তরাধিকারসংক্রান্ত, এদের মধ্যে বহুসংখ্যক অনার্য উপাদান সংগুপ্ত। হোম আর্যসমাজে স্বীকৃত ধর্মীয় আচার, এই আচার-মানা আর্যরা বিজেতাদের উত্তরপুরুষ এবং আর্য-উন্নত পুরোহিতশাসিত, কিন্তু আর তা গ্রহণকারী অনার্যদের ধর্ম, ধর্মত এবং ঐতিহ্য তখন ছিল সেখানে। আর নিষাদ এবং দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রচলিত অনার্য বা আর্য-পূর্ব ঐতিহ্য এবং আধা-ইতিহাস ও উপকথা-পৌরাণিক উপাখ্যানগুলো আর্য উপকথা ইত্যাদির সংগে মিল ছিল এবং সেগুলোর বুননে স্থান করে নিচ্ছিল, বিশেষত আর্য শাসকরা অনার্যদের শাসনভার উত্তরাধিকার সূত্রে পেলে, জিতে কিংবা বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করে। নিঃসন্দেহে এই মিশ্রণে কিছু বাধা এসেছিল : এই বাধার প্রতিধ্বনি আর্যদের দিক থেকে পাওয়া যায় (যথা, ঋকবেদের) দশম সূক্তর ৮৬নং স্তোত্র, বৃষাকপি-র স্তোত্র ; পুরাণে পাই ইন্দ্রর প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা হিসেবে কৃষ্ণবাসুদেবের প্রতি বিমুখতা, আর বৈদিক না হওয়ায় দেবতা হিসেবে শিবের প্রতি বিমুখতা) ; আর অনার্যদের দিক থেকে বিজিত জাতি হিসেবে সমন্বয়ের সুর বাজলে যে ঢের কম বাধা আসবে তা সহজেই অনুমেয় : বস্তুত, সন্দেহ করতে পারি যে, এই সমন্বয় অনার্যরা মোটামুটি সমর্থন করেছিল, এবং আর্য আর অনার্য, জগতের মিশ্রণজাত ভারতবাসীরা সাগ্রহে এই সমন্বয়কে সমর্থন জানিয়েছিল।

খৃস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দর পরে আর্যরা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ জয় করেছিল—হয় ত' আরও কয়েক শতাব্দী পরে। কিন্তু অনার্য রাজা এবং শাসকদের ঐতিহ্য খৃস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দর চেয়ে কয়েক শতাব্দী বেশি পুরনো। এবং পৌরাণিক ঐতিহ্য বহুলাংশে অনার্য ইতিহ। এ প্রসঙ্গে গ্রীস দেশের শৈশবকালের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অনেকাংশে প্রি-হেলেনিক্ অজিয়ানদের পুরাণ কাহিনী, উপকথা এবং ঐতিহ্যই ইন্দো-য়ুরোপীয় গ্রীক ভাবান্তরিত হয়েছিল। এই সব ইন্দো-য়ুরোপীয় আক্রমণকারী-দের পুরাণ-কাহিনী, উপকথা ইত্যাদির সংগে মিশে মিশ্রিত ক্লাসিক্যাল যুগের অজিয়ান আর ইন্দো-য়ুরোপীয় হেলে-নিক্ গ্রীকদের জাতীয় উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত মাঈসিনিয়ান্ শিল্প-নিদর্শন থেকে জানা গেছে ইদিপাস্-এর গল্প, শিকার-দেবী আর্টেমিস সম্পর্কিত উপকথা আর পার্সিফোনিয়া-র পাতালে গমন (অন্যান্য সমজাতীয় প্রাচীন গ্রীক গল্প আর উপ-কথার প্রতীক স্বরূপ) প্রকৃতপক্ষে প্রি-হেলেনিক।

দ্বৈপায়ন ব্যাস পবিত্র বা ধর্মীয় আর্য উত্তরাধিকার সংকলিত করেছিলেন চতুর্বেদে, খৃস্টপূর্ব ১০০০ অব্দর আর্য বা আর্য-ভাষী জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকথা আর পুরাণ-কাহিণী সংগ্রহ এবং ছোট ছোট বই বা সাহিত্যালোচনার মধ্যে সেগুলো ধরে রাখার প্রবল প্রেরণাদাতাও তিনি। এই সব সংগ্রহর যথাযথ নামও পুরাণ—তিনি দিয়েছিলেন: এই প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ব-কথা স্মর্তব্য : তিনি ছিলেন আধা-সম্ভ্রান্ত, বরং বলা চলে বর্ণসংকর, মহাভারত এবং পুরাণমতে এ মত সর্বজন-গ্রাহ্য ; ঋষি পরাশর (যাঁর মা না কি চন্ডালরমণী) তাঁর পিতা এবং সত্যবতী (মৎস্যগন্ধা) তাঁর জননী। সত্যবতী দাস-কন্যা (সম্ভবত দ্রাবিড়ভাষী), ইনি ছিলেন আপনসমাজের প্রধান এবং এঁর প্রজারা ছিল মৎস্যজীবী। ব্যাসের জন্ম-কালে কুমারী সত্যবতী পরে কুরু গোষ্ঠীর প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনুর মহিষী হন; এবং শান্তনুর ঔরসজাত তাঁর পুত্র মারা যাওয়ার পর তাৎকালিক রীত্যনুসারে ব্যাস ভ্রাতৃবধূদের স্বীয় ঔরসে গর্ভস্থা করে ক্ষেত্রজ সন্তানদ্বয়ের জন্ম দেন। ঘটনাক্রমে মহাভারতে বর্ণিত এই ধরণের অসংখ্য গল্প থেকে বোঝা যায় তখন জাতীয় বর্ণসংকরতা কী প্রসার লাভ করেছিল, সামাজিক ক্রমবিকাশের সেই স্তরে অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহ গণ্য হত অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা হিসেবে।

উপকথার এবং পুরাণ-কাহিনীর প্রথম সংগ্রাহক হিসেবে ব্যাসের কীর্তি মিশ্রিত হিন্দুজাতির কল্পনা এমন প্রচণ্ড-ভাবে উদ্দীপিত করেছিল যে, তিনি ভারতবর্ষর যে কোনও অংশে প্রচলিত উপকথা এবং পুরাণ-কাহিনীর ঐতিহ্যগত সব জ্ঞানের উৎস এবং ভাণ্ডার রূপে পরিগণিত হন। আঠারটি পুরাণ এবং উপ-পুরাণ জাতীয় অন্যান্য অসংখ্য রচনা পরবর্তীকালে তাঁর একক কীর্তি রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। মনে হয় ব্যাস ছিলেন কুরু-পাঞ্চাল দেশের অধিবাসী, কিন্তু নৈমিষারণ্যর মত পুরাণ সংগ্রহর অন্যান্য কেন্দ্রও তাঁর অথবা তাঁর শিষ্যদের নামের সংগে যুক্ত হয়ে পড়ল। এ ছাড়াও কৌরব-দের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয়-এর গল্প—'জয়' নামে—আদি-মহাভারতে রচনা করার কৃতিত্বও তাঁর বলে মনে করা হয়। কাব্যটি তাঁর নিজস্ব রচনা। এই ব্যাপারটা অ-সম্ভব নয়—আইরিশ পৌরাণিক গাথার ওসিয়ান্-এর মত ব্যাসও পুরনো, বহু পুরনো কবি এবং দ্রষ্টা হিসেবে নিজের নাতিদের জীবনকথার কাব্যরূপ দিতে সমর্থ ছিলেন—তারা বেঁচে, চেষ্টা করে, ভালবেসে, যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাওয়ার পর। কিন্তু কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধ সূত-পুত্র লোমহর্ষণ (গল্পকারের উপযুক্ত নামই বটে!) কর্তৃক প্রথমে রচিত হওয়াও সমান সম্ভব ; লোমহর্ষণের ব্যক্তিগত নাম ছিল উগ্রশ্রবঃ ; আর, ব্যাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা সব চেয়ে জনপ্রিয় কাহিনীর, যা কি না প্রাচীন হিন্দু-জীবনের সারাৎসার এবং ইতিহাস এবং ভারতবর্ষর জাতীয় মহাকাব্যে পরিণত হল, স্রষ্টা হিসেবে অন্য কারুর নাম সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না।

এইভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিষাদ, দ্রাবিড়, কিরাত এবং আর্য-উৎসসম্ভূত মিশ্রিত একটা জাতিকে একসূত্রে বেঁধে-ছিলেন, আর্যভাষায় তাদের জাতীয় সাহিত্য দান করে—যা অপর তিনটি দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল—তিনি তাদের মধ্যে একজাতি একপ্রাণ একতার অনুভূতি সঞ্চার করেছিলেন। এই জাতীয় সাহিত্য তিনি দিয়েছিলেন ধর্মীয় কাব্যের শুদ্ধা-বশিষ্ট অংশ, লোককাব্য, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক জ্ঞান এবং সব জাতের বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাহিনী সংগ্রহ করে। জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক হিন্দুত্বে তাঁর অবদান অ-লোকসামান্য : চিন্তাবিদ্ এবং দার্শনিক হিসেবে তাঁর জীবন বা তাঁর ব্যক্তিত্বর অন্যান্য দিক বাদ দিয়েও এই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস শেষ পর্যন্ত এক-জন মানুষ এবং একজন ঋষি রয়ে গেলেন—একজন অ-লৌকিক ঋষি যাঁকে বলা চলে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ-প্রণয়নকারী ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্বর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা (যে ধর্ম কোনও নির্দিষ্ট মানুষের প্রতি আরোপিতব্য বাঁধাধরা 'ডগ্‌মা'-হীন, এবং যার কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব মূল আবর্তনদণ্ড নেই, এবং যা কোন একটা বিশিষ্ট 'ক্রীড্' বা 'ক্যাচেট' সমন্বিত একমাত্র বিশ্বাস না হয়ে নানা ধর্ম এবং সংস্কৃতি সমন্বয়, তাকে

যদি এইভাবে বর্ণনা করার অনুমতি দেওয়া হবেই)।

কৃষ্ণবাসুদেবের কীর্তি : তাঁর ঐতিহাসিকতা এবং ব্যক্তিত্ব

কিন্তু কৃষ্ণবাসুদেবের ক্ষেত্রে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক আত্যন্তিক মানবীয় ব্যক্তিত্ব থেকে তিনি দেবতায় রূপান্তরিত ; ঈশ্বরের অবতার, উহু, স্বয়ং ঈশ্বর। প্রিয়েরে দেবতা করার এ রকম উদাহরণ আর নেই। পুরাণ-কাহিনী, বিস্ময়কর গাথা, বীরত্বপূর্ণ কীর্তি এবং রোমান্টিক কাজ আর গাঢ়তম এবং আন্তরিকতম ধর্মীয় উল্লাস—এই সব মিলে কৃষ্ণকে এমন এক প্রকৃত দেবতায় রূপান্তরিত করেছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে তাঁর মূল মানবিক চরিত্রে প্রকৃত পরিবেশে নামিয়ে এনে স্থাপন করা অসম্ভব। তবুও এ চেষ্টা করা হয়েছে ; এবং প্রথমে বোধহয় বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষের মহান ঔপন্যাসিক এবং চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে (কলকাতা, ১৮৯২-তে ২য় সংস্করণ) এই প্রচেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে তুলে ধরতে সব থেকে নবীন এবং সর্বাধিক যুক্তিসংগত আলোচনা করেছেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর 'মেটেরিয়াল্‌স ফর দ্য স্টাডি অব দ্য আর্লি হিস্ট্রি অব দ্য বৈষ্ণব সেক্ট' গ্রন্থে (দ্বিতীয় বক্তৃতায়—'দ্য লাইফ্ অব কৃষ্ণ বাসুদেব অ্যান্ড দ্য আরলি প্রগ্রেস অব ভগবাতিসম্', পৃঃ ৩২ থেকে ১১৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৩৬)।

হেমচন্দ্রর বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কেবল উল্লেখ করা যায় কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় যদুগোষ্ঠীর বৃষ্ণি শাখাভুক্ত ; তাঁর বাবা বাসুদেব, এবং তাঁর মা দেবকী খুব সম্ভবত অনার্য রাজকুমারী, মথুরার রাজা কংসর বোন ; মামার ভয়ে জন্মর পরেই তাঁকে যাযাবর একদল পশু-পালকদের সংগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; পরে তিনি মামা কংসকে বধ করে মাতা-মহকে (যাঁর সিংহাসন তাঁরই পুত্র কংস অন্যায়ভাবে বলপূর্বক দখল করে নিয়ে-ছিলেন) সিংহাসনে স্থাপন করেন ; উত্তরের গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে যদু-গোষ্ঠীর সৌরাষ্ট্রে পুনর্বসতি স্থাপনের ব্যাপারে তাঁর নেতৃত্ব ছিল ; তিনি ছিলেন পাণ্ডবদের বন্ধু, বিশেষত অর্জুনসখা, তাঁর বোন সুভদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন অর্জুন ; তিনি ছিলেন একজন মহান ধর্মনেতা এবং শিক্ষক, আর্যরীতির পুজা-আংগিক-কে নিম্নতর স্থান দিয়ে এবং ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, ফলা-কাঙ্ক্ষাহীন কর্তব্যসম্পাদন এবং কঠোর নৈতিক ধর্ম পালন প্রচার করে তিনি এক ধরণের এক নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন এবং যাঁরা প্রথমে উপলব্ধি করে-ছিলেন নানা আংগিকের উপাসনা ভিন্ন পথ মাত্র, যা ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠে আন্তরিকতা এবং স্বীয় কর্মদ্বারা মংগল করার ইচ্ছা থাকলে, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর জীবন সম্বন্ধে আর একটা নির্দিষ্ট তথ্য সম্ভবত এই যে, তিনি ছিলেন ঘোর আংগিরসের শিষ্য ; এঁর কাছ থেকেই তিনি নিজের ভবিষ্যৎ দর্শনের বীজ, অর্থাৎ নৈতিক জীবনযাপন, সত্য, আত্ম-সংযম, আন্তরিকতা বা সততা, অ-হিংস ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন, স্বার্থত্যাগ এবং চিন্তার পরিচ্ছন্নতা যে বৈদিক পুজা-আংগিক এবং, বলির তুলনায় বেশি প্রয়োজনীয় এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

মানুষ কৃষ্ণর জীবন সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্য মিলেছে। কোন্ কোন্ স্তর পেরিয়ে তাঁকে ক্রমে ঈশ্বরের স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল তা আমরা দেখতে পারি। উপর্যুক্ত হেমচন্দ্রর বইতে অত্যন্ত দক্ষতা এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে আলোচিত হয়েছে কীভাবে কৃষ্ণ বৈদিক সূর্য-দেবতা বিষ্ণুতে রূপান্তরিত বা বিষ্ণু ও তিনি অভিন্ন রূপে পরিণত হলেন, এবং কেমন করে ভাগবত ধর্ম বা আপন দেবতায় বিশ্বাস বিষ্ণু-কৃষ্ণ ধর্মমতের অংশ হল। বৈদিক সূর্য-দেবতা বিষ্ণু মনে হয় এক অনার্য (দ্রাবিড়) বিশ্বজাগতিক পুরুষোত্তম দেবতায় লীন হয়েছিলেন, যিনি বিশ্ব-জগদ্ব্যাপী, আকাশ যাঁর প্রতীক (তুলনীয় : তামিল vin=আকাশ, এবং প্রাকৃত ভিণ্হু, ভেণ্হু=বিষ্ণু), এবং যিনি মানবকল্যাণের জন্য আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার সংগে সংগে বিষ্ণু-নারায়ণের অবতার হিসেবে কৃষ্ণ বাসুদেবের জীবনী ঘিরে, নতুন নতুন পুরাণ-কাহিনী উঠতে লাগল এবং মানুষ হিসেবে তাঁর জাগতিক অস্তিত্বর সংগে যুক্ত পুরনো কাহিনী বা ঘটনাবলী বিস্ময়-কর এবং অতিপ্রাকৃত চমকপ্রদ কীর্তি-গাথায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এইভাবেই পালি জাতকে দেখতে পাই বিষ্ণু হলেও কৃষ্ণ (কণ্হ) জনৈক সুন্দরী চণ্ডাল বা অনার্য নারীর রূপজালবদ্ধ হয়েছিলেন, নিম্নবর্ণের এই মহিলা জম্বাবতীকে তিনি বিয়ে করেন, এবং তিনি কৃষ্ণর অন্যতম পত্নীরূপে পরি-গণিত হন। (দসব্রাহ্মণ জাতক, ৫৪৬নং, এবং তার অন্য।) কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক কাহিনীতে জম্বাবতী হয়েছেন জাম্ববতী, ভল্লুক-রাজের কন্যা এবং তাঁর সংগে কৃষ্ণের বিবাহ রাজকীয় ষড়যন্ত্র আর স্যমন্তক মণি নামে একটা আশ্চর্য-জনক রত্ন দুঃসাহসী অভিযানের ফলে আবিষ্কার করার শেষ ঘটনা হিসেবে উল্লিখিত। বিভিন্ন শাখাবিভক্ত এবং স্থানীয় বৈচিত্র্য সমন্বিত রোমান্টিক রাধা-কাহিনী ঐতিহাসিক কৃষ্ণের প্রায় ১,৫০০ বছর পরে, ১,০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দের দ্বিতীয় ভাগে যাযাবর পশুপালকদের সংগে তাঁর প্রথম জীবন-যাপন এবং তাদের মেয়েদের সংগে সম্ভাব্য খুচরো প্রেম-খেলা থেকে তৈরি করা হয়েছিল। মূলত প্রাক্-খৃস্টীয় প্রথম দিককার জাতকের কাহিনীগুলোয় অত্যন্ত মানবিক কৃষ্ণের টুকরো টুকরো পরিচয় লভ্য, হেমচন্দ্র এর কিছু কিছু লক্ষ্য করেছেন, এবং এথেকে প্রতীয়মান হয় এই রূপান্তরিত ঈশ্বরের অন্তরালে রয়েছেন একজন প্রকৃত মানব শিক্ষক এবং বীর। জৈনসূত্র থেকেও একই-রকম মানবীয় কৃষ্ণের টুকরো টুকরো পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় ধর্ম এবং চিন্তার আর্য-অনার্য : আগম এবং নিগম, পুজা এবং হোম

বৃহত্তর পৃথিবীর প্রাগ্রসর দ্রাবিড় নগর-সভ্যতা এবং অসট্রিক-দের গ্রাম-সভ্যতা আর জংলী বিদ্যার প্রভাবে যাযাবর আর্যত্ব রূপান্তরিত হচ্ছিল। আর্যদের দ্বারা আনীত বিজয়সুলভ মেজাজের ভিত্তি জাতিগুলোর মিশ্রণে ঢিলে হয়ে গেল। শুদ্ধ বা মিশ্রিত আর্য-উদ্ভূত মানুষ দেবতাদের প্রতি বিস্তারিত বৈদিক উৎসর্গ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলল। পৌরাণিক কাহিনী বলছে কৃষ্ণ যাযাবরদের (সম্ভবত অনার্য) সংগে থাকার সময় শ্রেষ্ঠ বৈদিক দেবতা ইন্দ্রকে সম্মান জানাতে অস্বীকৃত হয়ে গিরি-গোবর্ধনের এমন এক ধর্মমতকে সমর্থন জানান যা মেজাজে অনার্য মানসিকতার বেশি কাছাকাছি।

ভারতীয় ঐতিহ্যে বরাবর ভারতীয় ধর্মর দুটি মান স্বীকৃত, দর্শন আর অনুষ্ঠান—বৈদিক এবং অ-বৈদিক ইতিহ্য —যথাক্রমে নিগম এবং আগম। অ-বৈদিক আগম 'তাই যা চলে আসছে' স্মরণাতীত কাল থেকে : এর মধ্যে পড়ে উমাকে শিব প্রদত্ত বিশেষ শিক্ষা, এবং তন্ত্রশাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানবিধি এবং যোগের ধারণা এবং অভ্যাসবিধি। আগম ঐতিহ্য মূলত অনার্য, যদিও পরে অস্ট্রিক এবং সিনো-টিবেটান উপাদান এর মধ্যে আরো-পিত হয়। নিগম ঐতিহ্য 'তাই যা ভিতরে প্রবিষ্ট হয়েছে' পরবর্তী সাংস্কৃতিক স্থাপনা রূপে, বাইরে থেকে চাপান বৈদিক

অগ্নি-অনুষ্ঠান হোম। আগম আর নিগম এই দুটো শব্দে সন্দেহ হয় যে, এই দুটি শব্দ আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র কোন দুর্বোধ্যের দেওয়া, যিনি মনে করতেন এটি জাতি এবং দেশের কাছে বেশি পুরনো বস্তু। যাই হোক, বসবাসকারী আর্য, বিশেষত সম্ভ্রান্ত আর্যদের জীবনে বৈদিক অনুষ্ঠান এবং বৈদিক ধারণাগুলো ছিল গভীর প্রভাববিস্তারী; এবং প্রাক্-বৈদিক, অর্থাৎ প্রাক্-আর্য অনুষ্ঠান এবং ধারণাসমূহ বৈদিক পুরোহিতবর্গ স্বভাবতই উপেক্ষা করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহজ মানুষের মধ্যে (আর্য-অনার্য মিশ্রণজাত মানুষ) প্রাচীনতর ধারণাগুলো আর অনুষ্ঠান থেকে গেল, যেমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। থাকল খোলাখুলি বা গোপনে, আর্যত্ব বা বৈদিকতার প্রচারকদের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে।

আর্য এবং অনার্যদের এক জাতিতে পরিণত করার জন্য নিগম আগমের যুক্ত করার দরকার ছিল। তেত্রিশজন বৈদিক দেবতা, কিঞ্চিৎ মানবিকতাসমন্বিত প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর অনার্য দেবমণ্ডলভুক্ত হওয়াও ছিল প্রয়োজনীয়। অনার্য দেবতারা বিশ্বজাগতিক তাৎপর্যপূর্ণ যাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড প্রাকৃতিক এবং সূক্ষ্ম নৈতিক শক্তির প্রতীক, যে শক্তি বিশ্বজগদ্ব্যাপী আর ব্যক্তিক ধারণায় অত্যন্ত আনবিক। এঁরাই পরে শিব, উমা, বিষ্ণু এবং শ্রী ইত্যাদি হয়ে যান আর্য-অনার্য যুক্ত দেবমণ্ডলে। আরও দরকার ছিল বৈদিক অনুষ্ঠান হোম-কে অনার্য (দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক) অনুষ্ঠান পুষ্পাঞ্জলি আর বলির সঙ্গে এক স্তরে আনা (কিংবা নিদেনপক্ষে কিছুটা ছাড় দেওয়া)।

মানুষের আত্মিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের মধ্যে মহান শিক্ষক কৃষ্ণবাসুদেব, যিনি আন্তরিকতা আর বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক, কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানভুক্ত নন, সম্ভবত সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় হিন্দুজাতির গঠনপর্বে আর্য-সমাজে থেকে অ-বৈদিক, আগম-নির্দিষ্ট তান্ত্রিক বা পৌরাণিক পূজানুষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানান এর অন্তরালবর্তী সমস্ত ধ্যান-ধারণা সমেতঃ যেমন তিনি প্রাক্-আর্য কৃষ্ণসম্প্রদায় ধর্মমত আর মতাদর্শ যোগকে আনুষ্ঠানিক এবং পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

হোম বা অগ্নি-অনুষ্ঠান এবং পূজা বা পুষ্পানুষ্ঠান দুটি বিশিষ্ট ধর্মীয় চিন্তা বা ধারণাজাত। বৈদিক ধর্মে পূজার পুষ্পানুষ্ঠান অজ্ঞাত। ওখানে হোমই সর্বং একমাত্র অনুষ্ঠান। হোমের অন্তরালস্থ ধারণাটি এই। দেবতারা সংখ্যায় তেত্রিশজন। তাঁরা স্বর্গবাসী। অগ্নি তাঁদের সন্দেশবহ। হোমকারী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত কোনও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নয়, সে কেবল কয়েকজন দেবদেবীকে জানে যাঁরা প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মানবীয় রূপ, যেমন, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, ঊষা, বজ্র, বৃষ্টি, আকাশ-খিলান, পৃথিবী ইত্যাদি, যাঁদের ঐশ্বর্য কেড়ে নেওয়া বা দানের ক্ষমতা আছে।

ঐশ্বর্য বলতে বোঝায় গোপাল, অশ্ব, মেষ এবং প্রচুর শস্যাদি। এ ছাড়াও তাঁরা পুত্রদানে এবং শত্রুনিধনে সক্ষম ছিলেন। বন্ধুজনোচিত নির্ভরতার সুরে তাঁদের ডাকা হত; তাঁদের পূজার দৃষ্টিভঙ্গী হল দদামি, উত্য দদাসি, 'আমি দিই, যাতে তুমিও ফিরিয়ে দিতে পার'। নিজের ভোগ্য খাদ্য—স্বহস্তে নিহত মেষের বা ছাগলের মাংস আর চর্বি, ঘোড়া কিংবা গরুরও, যারলির রুটি, দুধ আর মাখম, এবং সোমরস, যা সে বেদীর ওপর প্রজ্বলিত আনগুনে পোড়াত—সে উৎসর্গ করত। পুড়ে-যাওয়া উৎসর্গীকৃত খাদ্যাদির সুগন্ধ পেতেন দেবতারা, এবং খুশি হয়ে প্রার্থিত বস্তু দান করতেনঃ পূজা শেষ। ধারণাটি সরল এবং অত্যন্ত আদিম। এটি পুরনো ইন্দো-য়ুরোপীয় পূজানুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান আর্যদের ভারতবর্ষের বাইরের আত্মীয়দের মধ্যে—ইরাণীয়, স্লাভ, হেলেনেস, ইতালীয়, কেলট আর জারমানদের মধ্যে—প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরের জারমানিক প্রতিশব্দ God (ইংরেজির মত) বলতে ব্যক্তিকৃত অগ্নিতে সমর্পিতব্য পানীয় বোঝাত (ইন্দো-য়ুরোপীয় *ghutom=সংস্কৃত hutam)। এ শব্দের উৎস অজ্ঞাত। সুমেরীয়, এবং তাদের অনুসরণ করে সেমিটেস-দেরও একই রকমের পোড়ান উৎসর্গের প্রথা ছিল, কিন্তু মিশরীয় বা অজিয়ানরা তা না করে কেবল দেবতাদের মূর্তির সামনে খাদ্য নিবেদন করত, এই নিবেদন রাখা হত উচ্চ বেদী বা স্তম্ভের ওপরে। ইন্দোয়ুরোপীয়-রা কোনও মূর্তির কথা জানত না।

পূজানুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। পূজকের চোখে সমস্ত বিশ্বজগৎ একটা মহাজাগতিক শক্তি বা ঐশ্বরিক আত্মায় পরিপূর্ণ, এবং পূজক তার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ স্থাপনে ইচ্ছুক। এই উদ্দেশ্যে তাকে শেখান হয় যে, ঐন্দ্রজালিক এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐশ্বরিক আত্মাকে আহ্বান জানালে (অথবা তার অংশবিশেষ) তারই প্রতীকের মধ্যে তাকে অধিষ্ঠিত করা সম্ভব—মূর্তি, পাত্র, প্রস্তরখণ্ড, গাছ বা গাছের ডাল, ছবি বা কোন নক্শা প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এই অনুষ্ঠানের সাহায্যে আত্মা প্রতীকস্থ হয়, এবং তক্ষুণি তা পূজকের চোখে বিশ্বাসময় জীবন্ত উপস্থিতি; তারপর থেকে প্রতীকটি পূজনীয় অতিথি, এমন কি কোন প্রজার কাছে-আসা রাজার মত। প্রতীকের ওপর জল ঢালা হয়, ফুল, (বেল) পাতা এবং ফল, চাল বা অন্য কোনও উৎপন্ন শস্য তাকে নিবেদন করা হয় ; রান্না করা খাদ্য, সব রকমের সুখাদ্য (ভোগ-নিবেদন) তার সামনে নিবেদিত হয় উৎসর্গীকৃত খাদ্য হিসেবে বিশেষ পবিত্রতা লাভ করানর উদ্দেশ্যে। প্রতীকটিকে, বিশেষত মূর্তি হলে, পোশাক, অলংকার, এবং মণিমুক্তাদি দিয়ে সাজানর রেওয়াজ চালু। প্রতীকমধ্যস্থ ঈশ্বরকে নাচ-গান-নাটক দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সম্মান জানানর জন্য পূজার পর আরতি হয়। ঈশ্বরের কোনও ভীষণ দিকের পূজার সময় তার সামনে পশুবলি দেওয়া হয় (বৈদিক বা আর্য উৎসর্গ-পদ্ধতি প্রায়শই ভিন্ন ছিল, চাপ দিয়ে পশুদের ধমনী আর পাকস্থলীতে রক্ত-চলাচল বন্ধ করা হত), এবং হয় একটা চ্যাপ্টা বাটিতে পশুরক্ত মূর্তি বা প্রতীকের সামনে রাখা হয়, কিংবা ছড়িয়ে দেওয়া হয় মূর্তির ওপর। রক্তচন্দন বা সিন্দুরও কখনও কখনও ব্যবহৃত হত, নিঃসন্দেহে উৎসর্গীকৃত পশুরক্ত বিকল্প হিসেবে।১ তারপর এই অনুষ্ঠান অন্তে, পূজক তার দেবতার সংগ্রে প্রার্থনা, অনুনয়, এবং ধ্যানের সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের উপযুক্ত বিবেচিত হত। পূজকের ইচ্ছানুসারে প্রতীক বা মূর্তি ঈশ্বরের স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসস্থানরূপে নির্মাণ করা হয়। অস্থায়ী বাসস্থান হলে পূজা-অন্তে আর একটা অনুষ্ঠান শেষ করা মাত্র মূর্তি বা প্রতীক থেকে স্বর্গীয় আত্মা অন্তর্হিত হন তখন তা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মাত্র, কোন আত্মিক বা ধর্মীয় ক্ষমতাহীন।

বোঝাই যাচ্ছে হোম এবং পূজার ধারণার উদ্ভব ভিন্ন 'মিলিয়ু'-তে অর্থাৎ ভিন্ন সামাজিক পরিবেশ। মিশ্রিত হিন্দুজাতি এবং মিশ্রিত উৎসের ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাস দুটিই পেয়েছিল উত্তরাধিকারসূত্রে। হোম বিশেষরূপে আর্যরীতি এবং আর্যদের বিশেষ অধিকার হওয়ায় অনার্যদের হোম করার অধিকার ছিল না।২ সাধারণত

১। স্নিগ্ধকর প্রলেপ হিসেবে চন্দন ব্যবহৃত হত।

২। কিন্তু পূজা-অনুষ্ঠানে সকলে স্বাগত।

প্রাচীন অনুষ্ঠানে পশুর উৎসর্গ করা হত আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবেঃ এটি পশু-কর্ম নামেও পরিচিত। পূজার পুষ্প অত্যাবশ্যকঃ এটাকে তাই বলা চলে পুষ্প-কর্ম। এই ভিত্তিতে সংস্কৃত শব্দ পূজো মারক্ কলিন্স দ্রাবিড় শব্দ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন—পু = ফুল, এবং দ্রাবিড় মূল *cey, gey*-র অর্থ করা, বৈদিককালে আদি দ্রাবিড় যৌগিক শব্দ এই দুয়ের মিলনে হল *pu-gey*=পুষ্প-কর্ম; 'পূজা-নুষ্ঠান' (জার্ল কারপেন্টিয়ের, পূজা শব্দটির ভিন্ন উৎসের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—দ্রাবিড়-মূল *pusu* বা *pucu* = *'to smear'*, লেপন করা, তাঁর মতে চন্দন, সিঁদুর বা রক্ত পূজা অনুষ্ঠানের মূল অংগ হওয়ায় তার দ্বারা চিহ্নিত করা)

কৃষ্ণবাসুদেবের শিক্ষা : সহনশীলতা, বোঝাবুঝি এবং গ্রহণ ভারত-আত্মার মূল বৈশিষ্ট্য

মহাভারতের ভগবদ্‌গীতা অংশের, যা খৃস্টজন্মকালের কাছাকাছি মার্জিত রূপ পেয়েছিল সম্ভবত, এবং যেখানে রয়েছে কৃষ্ণবাসুদেবের মূল শিক্ষাগুলো (বিশেষ ছান্দোগ্য উপনিষদে তাঁর গুরু ঘোর আংগিরস নির্দেশিত শিক্ষার কোন কোন ধারা অনুসারী), নবম অধ্যায়ে দেখা যায় কৃষ্ণ পরম সত্য লাভের উপায় হিসেবে আনুষ্ঠানিক পূজার উপযোগিতা সম্পর্কে নিজের মতামত দিচ্ছেন, যা এখানে (নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের কোনও 'কৃষ্ণই স্বয়ং ঈশ্বর' মতবাদে বিশ্বাসী সম্পাদক কর্তৃক) স্বয়ং কৃষ্ণ। এই পরম আত্মা, পরম সত্যকে অস্তিত্ব এবং বিশ্ব-নির্মাতার চরম উৎস হিসেবে প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। কেউ জ্ঞান, কেউ বা বিশ্বাসমার্গে এই উপলব্ধিতে সচেষ্ট হয়। বুদ্ধিহীন মানুষ এ সম্বন্ধে নিম্নতর ধারণা গড়ে তোলে। বৈদিক (আর্য) পন্থানুসারী মানুষ প্রচলিত উৎসর্গ করে, এবং ফলত তারা কিছুকাল স্বর্গে থেকে আবার মর্ত্যে নেমে আসে—তারা মোক্ষলাভ করে না। তাদের আদর্শ এবং ধারণা অনুযায়ী তারা জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে সমর্থ হয়। নবম অধ্যায়ের ২২নং শ্লোকের নির্গলিতার্থকে বলা চলে সহনশীলতা এবং গ্রহণের মহান সনদ। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্বের এই হল মূল চরিত্র—('স্বামী জগদীশ্বরানন্দের বংগানুবাদ) :

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

আমাকেই (শ্রীভগবানকেই) অনন্যভাবে চিন্তাপূর্বক যে সন্ন্যাসিগণ আমার ধ্যান করেন, সেই নিত্য সমাহিত ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি।)

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩ ॥

(হে কৌন্তেয়, যাঁহারা আস্তিক্যবুদ্ধিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারাও অজ্ঞানপূর্বক আমারই পূজা করেন।)

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

(দেবতাগণের আত্মারূপে আমি সকল শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু অন্য দেবতার ভক্তগণ আমাকে স্বরূপত জানেন না বলিয়া তাঁহারা আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন।)

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

(দেবোপাসকগণ ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদির পর পিতৃভক্তগণ অগ্নিষ্বাত্ত অর্যমাদি পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতোপাসকগণ বিয়ক ও চতুর্ভগিন্যাদি ভূতগণকে লাভ করেন এবং আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করেন।)

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

(যে শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁহার সেই ভক্তি উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।)

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

(অতএব হে কৌন্তেয়, যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করিবে।)

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

(আমি সকল ভূতে সমানভাবে বিরাজ করি, আমার প্রিয় ও অপ্রিয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করি।)

উপর্যুক্ত ২৬নং শ্লোক হিন্দুত্বের ইতিহাসে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণঃ এর্জায় পূজার অ-বৈদিক পূজার সমান গুরুত্ব এতে স্বীকৃত। সম্ভবত এই প্রথম পূজাকে গোঁড়া হোমের সংগে সমান উপযোগী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এই হল কৃষ্ণবাসুদেবের মহান কীর্তি—তৎকালিক যে রীতি বহুল প্রচারিত হলেও বৈদিক আর্যরা, বিশেষত আর্য পুরোহিত সম্প্রদায় যাকে বাঁকা চোখে দেখিতে সেই রীতিমত ধর্মীয় জীবনে সম্মানিত স্থান দেওয়ার মত দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল। আর সব কিছু বাদ দিয়ে একলা চলার এই দৃষ্টিভঙ্গী একদিনে শেষ হয় নি : মনুসংহিতায় দেখা যায় কেবলমাত্র বৈদিক উৎসর্গ অনুষ্ঠানকারীদের তুলনায় মন্দিরে মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণরা চলিত মত বা সংস্কারবিরোধীরূপে অবজ্ঞার পাত্র হতেন।

পূজা অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং মংগোলীয় ধর্ম-অভিজ্ঞতা ক্রমবিস্তারমান হিন্দু ধর্ম আর কর্মের মধ্যে সাধারণভাবে উপর্যুক্ত জাতিগুলোকে গ্রহণের প্রতীক, এবং এটি কেবল অংশত বৈদিক ধর্ম-ভিত্তিক। এটি এবং অন্যান্য সুগভীর আত্মিক ব্যাপারে কৃষ্ণবাসুদেব ছিলেন নতুন যুগপ্রবর্তক।

ব্যাস এবং কৃষ্ণ ভারতবর্ষ--মাধ্যমে বিশ্ব-মানবের এক উল্লেখযোগ্য অংশের বৌদ্ধিক এবং আত্মিক ভাগ্য-নির্মাতা

কৃষ্ণবাসুদেব-ব্যক্তিত্বর এই দিক; আর্য-অনার্য জগতের সাংস্কৃতিক মিলনকামী শক্তিসমূহের প্রতি তাঁর সচেতন সমর্থন তাঁকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। তিনি এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস—ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা হিসেবে যিনি ভারতবর্ষ এবং বিশ্বকে নিদেন বেদ-সংগ্রহ এবং প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী আর উপকথার ভিত্তি উপহার দিয়েছিলেন, এবং যিনি সম্ভবত মহাভারত মহাকাব্যের আদিম রূপকার—এক মহান সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উপহারদাতা হিসেবে ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধালাভের অধিকারী। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দুই স্রষ্টার একজন মূল্যবান বৌদ্ধিক এবং নান্দনিক দিক থেকে, এবং অন্যজন সামাজিক, নৈতিক এবং আত্মিক দিক থেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ। মূল চরিত্রগত বিচারে এঁদের ঐতিহাসিকতা সংগতকারণেই অনস্বীকার্য। তাঁদের স্বরূপে কল্পনা করা যেতে

পারে ; মধ্যদেশ বা অধুনা যে অঞ্চল উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং পূর্ব পাঞ্জাব কর্মকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করে তাঁরা খৃস্টপূর্ব দশম শতকে বেঁচেছিলেন মহাভারতের আলোড়নকারী যুদ্ধকালে যখন পাশ্চাত্যে, গ্রীস দেশে, আর একটি সুপ্রাচীন হেলেনিক জাতি একইভাবে জন্মগ্রহণ করছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে একজন কৃষ্ণবর্ণ, অযত্নরক্ষিত চুল এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতসুলভ লম্বা দাড়িঅলা মানুষ হিসেবে কল্পনা করা যায়। দেখতে তেমন সুপুরুষ নন, মাথায় একবেণীবদ্ধ চুল, দু টুকরো উল বা তুলোর কাপড় পরিহিত, কিংবা কাঁধের উপর একখণ্ড হরিণের চামড়া ছড়ান, আর হাতে লম্বা শক্তপোক্ত একটা বংশদণ্ড, ঘুরছেন গ্রাম-গ্রামান্তরে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সংগে দেখা করে তাঁদের কাছ থেকে বৈদিক স্তোত্র জোগাড় করছেন, বেতনভুক্ কবি-গায়কদের মুখে শুনছেন প্রাচীন রাজাদের স্তুতিমূলক গাথা, এবং চতুর্বেদ আর পুরাণ-কাহিনী সংকলনের খসড়া তৈরি করছেন। কৃষ্ণবাসুদেবকেও একইভাবে রাজসভা এবং ঋষি কুটির বা ব্রাহ্মণ আর পুরোহিতদের পাড়ায় সমাজ স্বচ্ছন্দচারী রূপে কল্পনা করা যায়, সর্বত্রই তাঁর বিপুল চাহিদা, এবং নিজের সুচিন্তিত আর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রবলভাবে বলছেন এবং শুনছেনও। পরবর্তী পুরাণ-কাহিনীতে কৃষ্ণবাসুদেবের চেহারা এবং পোষাক সম্পর্কীয় উল্লেখ মেলে ঃ রং তাঁর কৃষ্ণ, নাম থেকেই যা বোঝা যায়, কিন্তু অত্যন্ত সুপুরুষ, তাঁর চুল খাড়াখাড়া (হৃষীকেশ, এল্ ডি বারনেট শব্দটির এই মানে করতে ইচ্ছুক) ; হলুদ রং-এর পোষাক তাঁর পছন্দ, মাথার চুল, পাগড়ি বা শিরস্ত্রাণে ময়ূরের পালক লাগাতে তিনি ভালবাসতেন। অর্জুনের সারথি রূপেও তাঁকে কল্পনা করা যায়, দ্বি-চক্র রথে পাশাপাশি বাঁধা চারটে শ্বেত অশ্বকে তিনি নিপুণ হাতে চালাচ্ছেন, লম্বা পতাকাসমন্বিত দণ্ডোপরি বাঁদরের মূর্তি এখন যান, যার ওপর যোদ্ধা এবং চালক দুজনেই দাঁড়ান পছন্দ করেন ঃ অর্জুনকে যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করানর জন্য ব্যাগ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালীন কৃষ্ণকেও মনশ্চক্ষে দেখা সম্ভব, এবং ঐ উদ্দেশে ব্যবহৃত তাঁর যুক্তিগুলোর অন্তত অংশবিশেষ চিরায়ত ভগবদ্‌গীতা-য় দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণবাসুদেব এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভারতীয় সভ্যতাকে গড়ে-ওঠার-কালে যে ধাঁচে ফেলেছিলেন তার ফল কেবল ভারতবর্ষে সীমিত ছিল না। এটি হিন্দুত্বকে (ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম দুটিকেই) পৃথিবীর এক বিরাট অংশের মানুষের মানসিক এবং আত্মিক উন্নয়নের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত করল, শুধুমাত্র প্রাচীন এবং মধ্য যুগেই নয়, আধুনিক কালেও। বেদ, পুরাণ, এবং মহাভারতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জন্য একটি বাণী দিয়ে গেছেন ব্যাস এবং কৃষ্ণ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃথিবীর জন্যও তাঁদের বাণী রয়েছে, যেখানেই আত্মার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট সেখানেই এ মন্তব্য সত্য।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বি-প্রায় বলা যায় আর্য-অনার্য উৎসসম্ভূত কৃষ্ণবাসুদেব এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভারতবর্ষে জাত, ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর জন্য বাণী রয়েছে এমন বহুসংখ্যক মহাপুরুষের প্রথম দুজন ঃ এঁরা হলেন কৃষ্ণ, ব্যাস, বুদ্ধ, মহাবীর, পাণিনি, অশোক, পতঞ্জলি, অশ্বঘোষ, কালিদাস, মাণিক্য-বাচকর, হর্ষবর্ধন, শংকরাচার্য, কবীর, চৈতন্য, নানক, তুলসীদাস, আকবর, দারা শিকোহ্, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণ মহর্ষি এবং অন্যান্যরা। এবং তাঁদের মহত্ত্ব ভারতবর্ষে ঐতিহ্যানুসারী পন্থায় স্বীকৃতি পেয়েছে, গীতার নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিদ্বয় অনুসরণে তাঁদের ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়--

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম ॥

--দশম অধ্যায়, ৪১নং শ্লোক।

(যাহা যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহশালী সেই সকলই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।)

অনুবাদক—সমীরণ চৌধুরী

[এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (Vol. XVI, No. 1, 1950) প্রকাশিত উপরোক্ত প্রবন্ধটি লেখকের অনুমতিক্রমে ইংরাজী থেকে বাঙলায় অনুবাদ করে দেওয়া হল।
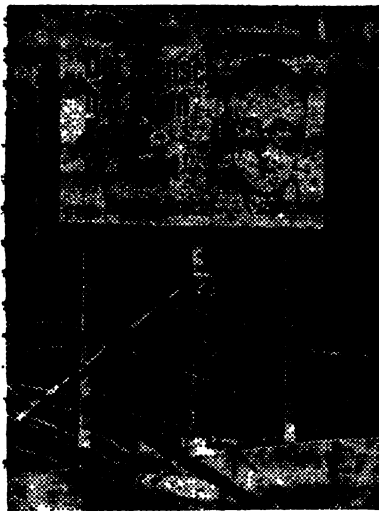
বার্লিন প্রাচীরে পোস্টারের লড়াই

বেরটল্ট ব্রেখট ছিলেন একজন বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক। কমিউনিস্ট শাসনের স্বরূপ দেখার জন্য তিনি জার্মান সোভিয়েট অঞ্চলে থাকতেন এবং কোনদিন তিনি তাদের সমালোচনা করেন নি। সম্প্রতি তাঁর একটি উক্তি ছাপিয়ে একটি বিরাট পোস্টার বার্লিন প্রাচীরের কাছে খাড়া করা হয়েছে। উক্তিটি হলো, —মানুষের একটি ত্রুটি—সে চিন্তা করে।

বেরটল্ট ব্রেখটের প্রতিকৃতিসহ বার্লিনের একটি দেওয়ালচিত্র

বঙ্গের দুর্গোৎসব

মাতৃপূজা ভারতের চিরন্তন ধর্ম। বাংলা দেশ এই ধর্ম পালনে অগ্রণী। প্রাক-চৈতন্য যুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চৈতন্যযুগে মহাপ্রভু স্বয়ং ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, যবন হরিদাস ও রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, ভট্ট রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ প্রমুখ ষড় গোস্বামী; আবার চৈতন্যোত্তর যুগে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু, চরণদাস বাবাজী, রামদাস বাবাজী প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের অধ্যাত্ম সাধনায় সারা বাংলা দেশে যে প্রেমধর্মের প্লাবন বয়েছিল, শক্তিসাধনায়ও তেমনি নান্নুরের চণ্ডীদাস, মেহারের সাধক সর্বানন্দ, নদীয়ার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপা, বর্ধমানের সাধক কমলাকান্ত, হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদ, চট্টলের সাধক শুক্লাম্বর ভট্টাচার্য ও সাধু তারাচরণ পরমহংসদেব, ফরিদপুরের রামঠাকুর, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও অপরাপর মাতৃসাধকের অসামান্য তপশ্চর্যায় বঙ্গভূমি পবিত্র ও ধন্য হয়েছে।

কিন্তু বঙ্গের দুর্গোৎসব সকল বাঙ্গালীর নিজস্ব উৎসব। দেবী মহামায়ার আবাহন ও আরাধনায় বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই উৎসবকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শারদোৎসব, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এর নাম দিয়েছেন দুর্গোৎসব। এই উৎসবের দিনে বঙ্গভূমিতে অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগে, অভিনব পুলকে দুলে ওঠে বাঙ্গালীর চিত্ত।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ও কালীবিলাস পুরাণে শরৎকালে দুর্গোৎসবের উল্লেখ থাকলেও শরৎ ঋতুতে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উল্লেখ মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে নেই। কবে কোন শরতের শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে দেবী ভগবতীর আরাধনা করেছিলেন কোন মহারথী—সে ইতিহাস ছায়াচ্ছন্ন। তবে এ কথা স্বীকার্য যে শরতের বঙ্গভূমি উৎসব ও মাতৃপূজার পক্ষে প্রশস্ত। শরতে বাঙ্গলার নিসর্গ শোভা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়। শরতে বঙ্গমাতার অপরূপ নয়নাভিরাম শোভা দেখেই হয়তো বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাসের চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল। তাই শরৎকালকেই মাতৃপূজার প্রকৃষ্ট সময় নির্দিষ্ট করে তাঁর বাংলা রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধনের উপাখ্যানটি সংযোজিত করেছিলেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী

সত্যিই অভিনব বঙ্গভূমির শারদ-রূপ। বর্ষণমুক্ত প্রকৃতি 'সদ্যস্নানসিক্ত বসনা,' উদার নির্মেঘ আকাশ সৌর-করোজ্জ্বল, যামিনী 'শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত', নদ-নদী, খাল-বিল সলিল-সিঞ্চিত পরিপূর্ণ, তটভূমি কাশফুলের শুভ্র হাস্যোজ্জ্বল-শোভাময়। সবুজ শস্যক্ষেত্র, নব পত্রোদ্গমে বৃক্ষরাজি হরিৎবর্ণ, দিকে দিকে সবুজের সমারোহ, গাছে গাছে দোয়েল-কোয়েল-শ্যামা-পাপিয়ার কলগান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

—'পারে না বহিতে নদী জলধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে না'ক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে।'

কবি নজরুল শরতের বঙ্গজননীর বন্দনাগান গেয়েছেন—

"গন্ধে আকুল শেফালিকা,
বকুল মুকুল করছে নতি,
নীপের বনে গোল বেঁধেছে,
হচ্ছে মা তোর পুষ্পারতি।
বাদল মেঘের সজল হাওয়ায়
নদীর বুকে ঢেউ খেলে যায়
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই
শ্যামল সেজেছে ধরণী।"

মাঠে ও সরোবরে অজস্র অস্ফুট শ্বেত-রক্ত কুমুদ ও শতদল। টগর, কেতকী, মল্লিকা, জবা, শেফালিকা, স্থল-পদ্ম, সূর্যমুখী, গোলক চাঁপা, স্বর্ণ পর্কটি ও নানা বর্ণের কুসুম-শোভায় বৃক্ষরাজি সুশোভিত। ঋষি বঙ্কিমের বঙ্গভূমি শরতে 'ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী,' আবার কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি সর্ব ঋতুতে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা।' প্রকৃতি যেন তার অফুরন্ত সম্ভার উজাড় করে দিয়ে সযত্নে সাজিয়েছেন বাংলা মাকে। শরতের বাতাসে হিমের স্নিগ্ধ পরশ। কৃষকের ঘরে ঘরে শস্য-সম্ভার, প্রবাসীর মনে মনে মায়ের কোলে ফিরে আসার সম্মোহন স্বপ্ন।

এমনি মধুর পরিবেশে আসে শারদীয়া মাতৃপূজার পুণ্য মহালগ্ন।

পাঁচশো বছর আগে বাংলার অন্যতম বার ভূঁইয়া—তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাঙ্গালায় প্রথম শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। একই বৎসরে উত্তরবঙ্গের কুমুন্দি ও প্রতাপরাজ পরগণার প্রবল পরাক্রান্ত ভস্বামী রাজা জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাসন্তী দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন।

তারপর থেকে পাঁচশো বছর ধরে বঙ্গভূমিতে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত শুধু ধনীর পূজামণ্ডপেই মাতৃপূজার আরাধনা হতো। তাঁদের পূজামণ্ডপে দীন-দরিদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁদের পূজা ছিল ধনীর বিলাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাঙ্গালিনী' কবিতায় এই পূজার চিত্র তুলে ধরেছেন:

'আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে,
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়ে কাঙ্গালিনী মেয়ে।'

পূজা অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে সাড়ম্বরে, ধনীর সন্তানেরা দামী পোষাক পরে

ঠাকুর দেখছে, আর ছিন্নবসনা কাঙালিনী মেয়েটি তার ছোট ভায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখে। মাতৃ সন্দর্শনের জন্য তার চিত্ত-ও আকুল উদ্বেল, কিন্তু ধনীর আনন্দযজ্ঞে তার অধিকার কোথায়? তাই সে দাঁড়িয়ে 'নিতান্ত সংকোচভরে একধারে আছে সরে।'

তার অসহায় অবস্থায় করুণা-বিগলিত-চিত্ত কবি মন্তব্য করেছেন:

'মাতৃহারা মা যদি না পায়,
তবে আজ কিসের উৎসব?
তবে মিছে আজ সহকার শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।'

মাতৃপূজায় ধনী-নির্ধন সকলের সমান অধিকার। সকলেই যেন মাতৃপূজায় সমান অংশ নিতে পারে। তাই তিনি দেশবাসীকে সম্মিলিত আহ্বান জানিয়েছেন:

'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ নীরে।'

সকলের স্পর্শে পবিত্র হবে মঙ্গলঘট, মাতৃ-অভিষেক সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণেই হবে সার্থক।

মানবদরদী কবিগুরুর এই আবেদনে আজ সাড়া দিয়েছে দেশবাসী। পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে আজ সার্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাতৃমন্দিরের দ্বার আজ সকলের জন্য উন্মোচিত হয়েছে।

মাতৃপূজার দিন আসন্ন। সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষমাণ। মায়ের সন্তানেরা আয়োজনে ব্যস্ত। মুখর হ'য়েছে সারা দেশ। দোকানে দোকানে নব বস্ত্রাদি কেনা বেচার ধুম পড়েছে। স্থানে স্থানে মাতৃপূজা-মণ্ডপ তৈরী হ'চ্ছে। বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র ও পত্র-পুষ্পে আচ্ছাদিত হলো পূজামণ্ডপ। তোরণ দ্বারে রোপিত হ'লো কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব শোভিত মঙ্গলঘট স্থাপিত হ'লো।

এলো মহাষষ্ঠী। আগমনী গানের সুর ভেসে আসতে লাগলো বাতাসে দূরদিগন্ত হ'তে। জননীর অস্ফুট পদধ্বনি শোনা গেল—পাখীর কূজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, নির্ঝরিণীর কলতানে, নদীর কুলুনাদে, বৃক্ষপত্রের মৃদু মর্মরধ্বনিতে।

মা এলেন। বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী মহিষাসুরমর্দিনী, দশপ্রহরণধারিণী জগজ্জননী রূপে। দশদিক উদ্ভাসিত হ'লো মায়ের রূপচ্ছটায়। বাঙালী প্রাণের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিরূপে মা কন্যারূপেও আবির্ভূতা হ'লেন সন্তানের গৃহে। সঙ্গে নিয়ে এলেন সর্বত্যাগী পতি বৃষভবাহন মঙ্গলময় শিবকে। এলেন সিদ্ধি-ঋদ্ধি-বিদ্যা ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক গণদেবতা মূষিকবাহন সিদ্ধিদাতা গণেশ, কমলা কমলদলবিহারিণী, পেচকবাহিনী লক্ষ্মীদেবী, শ্বেত মরালবাহিনী শুভ্রকমলাসীনা বীণাপাণি বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী ও ময়ূরবাহন দেবসেনাপতি শক্তিশালী কার্তিকেয়। দেবী মহামায়ার পুত্র-কন্যা। ভক্ত সন্তানগণ গাইলো—'শংখে শংখে মঙ্গল গাও—জননী এসেছে দ্বারে'। পুরাঙ্গনাগণ শংখ ও হুলুধ্বনিতে স্বাগত জানালো, বরণ করলো জননীকে।

নবপত্রিকার দ্বারা 'কলা বউ' সাজানো হলো, মঙ্গলবেদী রচিত হলো, স্থাপিত হ'লো মঙ্গলঘট। মাতৃপূজার শুভ উদ্বোধন হলো।

ষষ্ঠীর নিশি না পোহাতেই নহবৎ বাজলো, সপ্তমীর ভোরের সানাই গেয়ে উঠলো, সুরময় হ'লো ভোরের বাতাস। স্নান-আহ্নিক সমাপনান্তে শুভ্রবস্ত্রপরিহিত পুরোহিত এলেন। সমবেত হ'লো নামাবলীআচ্ছাদিত-দেহ স্নান-শুদ্ধ বৃদ্ধের দল।

'সর্বজনহিতায়, সর্বজন সুখায়চ' সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য সঙ্কল্প করলেন পুরোহিত। ভক্তিগদগদচিত্তে চণ্ডীপাঠ শুনতে লাগলেন ধর্মপ্রাণ বয়োজ্যেষ্ঠেরা—

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ
সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।'

চতুর্দিক [illegible] মুখর করে ছুটে এলো শিশুর দল। পূজার দীপ জ্বললো, ধূপের সুরভিতে আমোদিত হ'লো মণ্ডপ। ঢাক-ঢোলের নাদে মুখরিত হলো পূজাঙ্গন,—ভক্তিরসে পরিপ্লুত হলো সকলের অন্তর। সমাপ্ত হলো প্রথম দিনের পূজা। ইতর-ভদ্র, ধনী-নির্ধন সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে মায়ের চরণে নিবেদন করলো ভক্তি-অর্ঘ্য। হিংসা-বিদ্বেষ ভাব দূরে গেল, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা অন্তরে অন্তরে জেগে উঠল যুগপৎ। সাত্ত্বিক ভাবের কাছে পরাজয় স্বীকার করলো তামসিক ভাবরাজি। সার্বজনীন ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হ'লো—সকলের চিত্ত। তরুণেরা মহা উল্লাসে ও উৎসাহে শব্দ-বিস্তারক যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্গীত ও হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করলো সারাদিন। সন্ধ্যায় বেজে উঠলো মঙ্গলারতির বাদ্য। আলোয় আলোয় ঝলমল করতে লাগলো পূজা-মণ্ডপ। রাজপথ জনসমুদ্রে পরিণত হ'লো, মণ্ডপে মণ্ডপে আনন্দের হাট বসলো। কাতারে কাতারে দর্শনার্থী চললো রাজপথ বেয়ে—যেন এসেছে সকলের ঘরের বাইরে এসে আনন্দযজ্ঞে যোগদানের দিন। কুলললনারাও বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হয়ে মাতৃবন্দনায় যোগ দিলেন।

এমনি করে মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী শেষ হ'লো, এলো বিজয়া দশমী বা বিসর্জনের তিথি।

মাকে বিদায় দিতে হবে। শূন্য হবে পূজামণ্ডপ। স্তব্ধ হবে আনন্দের প্রবাহ। বেদনা-ভারাক্রান্ত হ'লো ভক্ত সন্তানদের হৃদয়, অশ্রুসিক্ত হ'লো নয়ন। তবুও যেতে দিতে হবে—দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। পুরনারীরা জননীর সিঁথিতে সিঁদুর পরালো, যাবার বেলায় কানে কানে বললো, 'আবার এসো'। ভক্তেরা রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'গচ্ছতু পুনরাগমনায়'।

মতের পাল্টা বিরোধী মত প্রচলিত আছে। সব রকম মতের স্বপক্ষেই কোন-না-কোন মন্ত্রের ভাষ্য অনুমান করা যায়। সেই বিতর্কের দুঃসাধ্য ব্যূহে প্রবেশ করলে আমার মতো অনধিকারীর পক্ষে নির্গমনের পথ পাওয়া দুষ্কর হবে অতএব সে চেষ্টা না করে যে মত আমার গ্রাহ্য মনে হয়েছে এবং ভরসা করি খুব কম লোকের আপত্তির কারণ হবে, সেটাই বলা যাক্।

ঋগ্বেদের সমাজ পশুপালক কৌম সমাজ বা বর্বর দশার শেষ স্তর থেকে শ্রেণীবিভক্ত আদি কৃষিসমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। অধিকাংশ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন যে, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সমকালীন নয়, প্রাচীন ও অর্বাচীন ভেদে অন্তত দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। সুদীর্ঘ কাল ধরে মুখে মুখে রচিত মন্ত্রগুলি বংশানুক্রমে মুখস্থ করে রক্ষা করা হয়েছে। খুব সম্ভবত খৃস্টপূর্ব সার্ধ সহস্রাব্দে তা সঙ্কলিত হয়েছে। সুতরাং সমাজ বিকাশের একাধিক স্তরের উপস্থিতি অসম্ভব নয়।

তবে উল্লেখের সংখ্যাধিক্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ঋগ্বেদের সমাজ বর্বর দশার উচ্চস্তরে ছিল এবং স্থানে স্থানে শ্রেণীবিভক্ত কৃষি সমাজের রূপ পরিস্ফুট হচ্ছিল। কৃষি, কৃষির যন্ত্রপাতি, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, ব্রোঞ্জ, লোহা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী বেশ কয়েকজন রাজার উল্লেখ কোথাও বা জনপদ অধিপতির কাছ থেকে বলি বা উপঢৌকন পাবার কথাও দেখা যায়। এই সমাজ পিতৃতান্ত্রিক অর্থাৎ পুরুষপ্রধান। তবে পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর অধিকার বা স্বাধীনতা যতখানি থাকে প্রায় ততখানিই ছিল ঋগ্বেদের সমাজে।

কেউ কেউ কোন কোন ঋকের ব্যাখ্যায় আদিম দল-সমাজের অনুমান করেছেন কয়েকটি মাতৃধারার বংশ পরিচয়, কিছু অবাধ যৌনাচারের অনুমান তাঁদের নিঃসন্দিগ্ধ বা প্রচুর প্রমাণ নাই।

যা হোক্, এ সব বিতর্কে প্রবেশ এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবলমাত্র ঋগ্বেদে ঘরে-বাইরে নারীর যে বিচিত্র ভূমিকা দেখা যায়, বিভিন্ন সূক্ত এবং ঋকাদি উদ্ধার করে তাই দেখাতে চেষ্টা করব। পাঠক তা থেকে সহজেই ঋগ্বেদের সমাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে পারবেন।

ঋগ্বেদে নারী

যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মধ্যযুগে নারী বিদ্যাচর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিতা ছিলেন। বেদচর্চা ছিল নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। অথচ সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে কেবল বিদ্যাচর্চা নয়, বেদ রচনাও করেছেন বহু নারীঋষি। বেদের আর সব মান্য ঋষিদের সমতুল্য ছিল তাঁদেরও সম্মান। ঋগ্বেদে অন্তত কুড়িজন নারীঋষির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এঁদের কেউ একটি বা দুটি ঋক, কেউ বা একটি সম্পূর্ণ সূক্ত রচনা করেছেন। তার মধ্যে কক্ষীবৎ কন্যা অম্ভৃণ কন্যা বাক্, ভরদ্বাজ কন্যা রাত্রি, সাবিত্রী সূর্যা, অত্রি কন্যা বিশ্ববারা ও অপালা একাধিক ঋক বা সমগ্র সূক্ত রচনা করেছেন। তাছাড়া রোমশা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্র স্নুষা, পৌলোমী শচী, কশ্যপ পুত্রীদ্বয় শিখণ্ডিনী ও অপ্সরা, কামায়নী শ্রদ্ধা, অঙ্গিরা কন্যা শশ্বতী—এঁরা একটি বা দুটি ঋক রচনা করেছেন। বিভিন্ন বৈদিক ঋষিদের সূক্তে সেগুলি স্থান পেয়েছে।

কেবল বৈদিক মন্ত্র রচনাতেই নয়, বৈদিক যজ্ঞেও নারীর বিশিষ্ট অধিকার ছিল। বৈদিক যজ্ঞে যজমানের সহধর্মিণী রূপে নারীর অধিকার ছিল। ১০।৪০।১০ ঋকে আদর্শ স্বামীর স্বরূপ বর্ণনায় কক্ষীবৎ কন্যা ঘোষা বলেছেন—

জীবং রুদন্তি বি ময়ন্তে অধ্বরে
দীর্ঘামনু প্রসিতিং দীধিয়ুর্নরঃ।

অর্থাৎ সেই রকম বরই প্রার্থনীয়—যে সকল ব্যক্তি, বনিতার প্রাণরক্ষার জন্য রোদন করে, বনিতাদিগকে যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে, তাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদনপূর্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করিতে নিযুক্ত করে, সেই সমস্ত বনিতাগণ পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়।

৫।৪৩।১৫ নং ঋকে দেখা যায় ঋষি অত্রি বলেছেন,—

বৃহন্বয়ো বৃহতে তুভ্যমগ্নে বিয়াজুরো
মিথুনা সঃ সচন্ত।

হে অগ্নি তুমি বলশালী, পরিণীত দম্পতি ধর্ম কর্ম দ্বারা জীর্ণ হইয়া একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করিতেছে—

সুতরাং যজ্ঞে হব্য আহুতি প্রদানেও যে নারীর শাস্ত্রসম্মত অধিকার ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবে পৌরোহিত্যে অধিকার বোধ হয় একমাত্র পুরুষেরই ছিল।

যুদ্ধ-বিগ্রহেও নারী যে কেবল অংশ গ্রহণ করতেন তাই নয়, সেনাপতিত্বও করতেন। নারী-যোদ্ধার বীরত্ব পুরুষ ঋষির রচনায়ও উচ্চ প্রশংসিত। ভর্ম্যাশ্ব পুত্র মুদ্গল ঋষি বিরচিত দশম

মণ্ডলের ১০২নং সূক্তে মুদগলানী ইন্দ্রসেনার অদ্ভুত বীরত্বের জীবন্ত বর্ণনা দেখা যায়। ইন্দ্রসেনা সম্ভবত ঋষি মুদ্গলের পত্নী। কিন্তু মুদ্গলানীর বীরত্ব বর্ণনা যে, কেবলমাত্র পত্নীপ্রেমের আতিশয্য নয় তা বর্ণনা দেখলে বেশ বোঝা যায়।

উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা
অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্।
রথীরভূন মুদ্গলানী গবিষ্টৌ
ভরেকৃতং ব্যচেদিন্দ্র সেনা ॥
---১০।১০২।২

বায়ু এই রথারোহীর অঞ্চল সঞ্চালিত করেছিল, যিনি সহস্র বিজয়িনী হয়েছিলেন। মুদ্গলানী ইন্দ্রসেনা রথী হয়ে গাভীগুলিকে শত্রু-সৈন্য থেকে বের করে এনেছিলেন।

সূক্তের ষষ্ঠ ঋককে দেখা যায়---

কর্কর্দবে বৃষভো যুক্ত আসীদ বাবচীৎ
সারথি রথস্য কেশী।
দুধের্যুক্তস্য দ্রবতঃ সহানস টিচ্ছন্তি স্মা
নিষ্পদো মুদ্গলানীম ॥
---১০।১০২।৬

শত্রু-হিংসার জন্য বৃষ যোজিত হইল, ইহার কেশধারিণী সারথি, অর্থাৎ মুদ্গলানী শব্দ করিতে লাগিলেন। রথে যোজিত সেই বৃষকে ধরিয়া রাখা গেল না, সে শকট লইয়া ধাবমান হইল, সৈন্যগণ নির্গত হইয়া মুদ্গলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

১১নং ঋককে বলা হয়েছে,---

.---পীপ্যানা কুচক্রেনেব সিঞ্চন
এষৈষ্যা চিদ্রথ্যা জয়েম ---॥
---১০।১০২।১১

তিনি মেঘের ন্যায় বাণ বর্ষণ করলেন। এইরূপ সারথি দ্বারা আমরা যেন জয়লাভ করি।

দ্রুত ধাবমান বৃষভ রথে, বায়ু-সঞ্চালিত বস্ত্রাঞ্চল, ঘন বর্ষার মত তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে মুদগলানী অগ্রসর হচ্ছেন, আর তার পিছনে সৈন্যগণ ধাবমান। শত্রুসৈন্যের বেষ্টন থেকে গাভীগুলি বের করে আনছেন---এই বর্ণনা থেকে তাঁকে সেনাপতি বলে মনে হয়।

ঋগ্বেদে আরো একজন নারী-যোদ্ধার উল্লেখ দেখা যায়, ইনি রাজা খেলের স্ত্রী বিশ্পলা।

প্রথম মণ্ডলের ১১৬নং সূক্তের পঞ্চদশ ঋককে দেখা যায়---

চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা
খেলস্য পরিত কম্যায়ম্।
সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশপলায়ৈ
ধনে হিতে প্রত্যধত্তম্ ॥

খেলের স্ত্রী বিশ্পলার একটি পা, পক্ষীর একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল; হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা রাত্রিযোগে সদ্যই বিশ্পলাকে 'গমনের জন্য এবং শত্রুন্যস্ত ধনলাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।

আর একটি ঋককে দেখা যায়,---

যাভির্বিশপলাং ধনসামর্থ ব্যং
সহস্রমীলহ্ আজাবজিন্বতম্।
---১।১১২।১০

যে সকল উপায়ের দ্বারা ধনবতী এবং গমনে অসমর্থ বিশপলাকে বহুধনযুক্ত সংগ্রামে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে'---

বিশ্পলা যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পা হারান এবং তাকে একটি লৌহজঙ্ঘা পরিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরণের কথা ১।১১৮।৮, ১।১৮২।২, ১০।৩৯।৮ ইত্যাদি ঋককেও দেখা যায়।

ঋগ্বেদের সমাজ সংগঠনে সভা এবং সমিতির স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদে রাষ্ট্র, বিশ, গ্রাম, জন, কুল ইত্যাদি সংগঠনের নাম পাওয়া যায়। রাষ্ট্র সম্ভবত কতকগুলি বিশ নিয়ে গঠিত, বিশগুলি বোধ হয় বিভক্ত ছিল গ্রামে, গ্রামগুলি ছিল কুল বা পরিবার নিয়ে গঠিত। বিশগুলির অধিপতি রাজা বা বিশপতি আর গ্রামের অধ্যক্ষ ছিলেন গ্রামণী। সংগঠনগুলি ছিল বিচিত্র ধরণের, সর্বত্র সমসূত্রের নয়। গ্রামের সম্মেলন বোধ হয় সভা আর বিশের সম্মেলন সমিতি। দশম মণ্ডলের 'সং গচ্ছধ্বং' মন্ত্রে সমিতিগুলির ঐক্যের প্রার্থনা করা হয়েছে।

সুতরাং সেখানে মতভেদ, কাজেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল বলে মনে হয়। গ্রামের সভাগুলি সম্ভবত গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো ছিল। সভায় নারীরও যে বিতর্কে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল---১।১৬৭।৩ নং ঋক থেকে তা অনুমান করা যায়। এই ঋকের 'ন যোষা সভাবতী বিদথ্যেব সংবাক' ভাষ্যে সায়ন বলেছেন, সভাবতী সভা জনসঙ্ঘ। তদ্বতী।---সা যথা যজ্ঞসভাং প্রাপ্যাবিভবতি তদ্বৎ। যথা, বিদথ্যা বেদনার্হা বিবদমনয়োর্বাক্, সা যথা সভাবতী তদ্বৎ।' ইত্যাদি--

এখানে সভাবতী নারীর বিতর্ক-পটুতাই সম্ভবত আভাষিত।

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্পর্কে কিছু কিছু ইংগিত যা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেখানেও নারীর অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকৃত ছিল না। পঞ্চম মণ্ডলের ৬১ নং সূক্তের দানস্তুতিতে ঋষি শ্যবাশ্ব তরন্ত মহিষী শশীয়সির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, এমন কি তিনি তাঁকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তা দান পাবার উল্লাসেই হোক আর যাই হোক। শ্যবাশ্ব লিখেছেন---শশীয়সি তাকে সনৎসাশ্ব্যং পশুমুত গব্যং শতাবয়ম্' অর্থাৎ অশ্ব-গো ও শতমেষাত্মক পশুযূথ দান করেছেন, দান-বিক্রির ক্ষমতাই সম্পত্তিতে অধিকার সূচনা করে। ঋগ্বেদে নারীর সম্পত্তিতে অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণরূপে ১।১২৪।৭নং ঋকটি উদ্ধৃত করা হয়।

অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচীগর্তারুগিব
সনয়ে ধনানাম্।
জায়েব পত্য উশতী সুবাসা উষা
হস্রেব নিরিণীতে অপ্সঃ ॥

এই ঋকের ভাষ্যে সায়ন বলেছেন।
যথা লোকে ভ্রাতৃরহিতা যোষিত্
যোচিত বাসোহলঙ্কারাদি
লাভায় পিতৃন এতি (গচ্ছতি)।
সতি ভ্রাতরি ন এব উচিত

প্রদানা্ ...ধ্যেক তোষয়ন্তি।

...ভাবাৎ পিতরমেব প্রাপ্নোতি।

যথা। সতিভ্রাতরি স এব পিতুঃ

পিণ্ডদানাদিকং সন্তান

কৃত্যং করোতি। তস্যাভাবাৎ স্বয়মেব

তৎ কর্তুং পিত্রাদীন গচ্ছতি।'

অর্থাৎ ভ্রাতৃহীনা গতভর্তৃকা রমণী ধনাদিলাভের জন্য পিতৃগৃহে যায়। ভ্রাতা থাকলে সে ভগ্নীকে উপযুক্ত দানাদি দ্বারা তুষ্ট করে। ভাই থাকলে পিতার পিণ্ডদান সেই করে। ভ্রাতৃহীনা নারী পিণ্ডদানাদি সন্তান কৃত্য করার অধিকারী।

একটি ঋকে দেখা যায়, তখনকার দিনে কুমারী কন্যা পিতৃকুলের সম্পত্তির অংশ চাইত।

অমাজূরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদা

সদসস্ত্বামিয়ে ভগম্।

কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভরদদ্ধি ভাগং

তন্বো যেন মামহঃ॥ ২।১৭।৭

'হে ইন্দ্র যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিত অবস্থিতা দুহিতা যেমন আপন পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি- ।'

তৃতীয় মণ্ডলের ৩১ নং সূক্ত থেকে বোঝা যায় যে, অপুত্রক পিতার সম্পত্তি দৌহিত্র পেত।

শাসদ্বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্বিদ্বাঁ ঋতস্য

দীধিতিং সপর্যন্।

পিতা যত্র দুহিতুঃ সেকমৃঞ্জন্ৎসং শগ্ম্যেন

মনসা দধন্বে॥

—৩।৩১।১

'পুত্রহীন পিতা সমর্থ জামাতাকে

সম্মানিতকরত

শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহিতাজাত পৌত্র

প্রাপ্ত হয়েন।

অপুত্রক পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে

বিশ্বাসকরত

প্রসন্ন মনে শরীর ধারণ করেন।'

এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋক থেকে মনে হয় ভাই থাকলে কুমারী কন্যা ভরণপোষণ এবং বিয়ের খরচ পেত।

ন জাময়ে তান্বো রিকথমারৈক্চকার

গর্ভং সনিতুর্নিধানম্।

যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ

কর্তা সুকৃতোরণ্য ঋন্ধন॥

—৩।৩১।২

'ঔরস পুত্র দুহিতাকে পৈত্রিক ধন দেন না তিনি উহাকে ভর্তার প্রণয়ের আধার করেন। যদি পিতা-মাতা-পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া-কর্ম করেন এবং অন্য জন সম্মানিত হয়েন।'

বেশ বোঝা যায়, ভাই না থাকলে দুহিতা যদি পুত্রিকা বলে গণ্য হয়, তাহলে সে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হত। সায়নও তাই বলেছেন---

'অভ্রাতৃকায়া দুহিতুঃ পত্রিকা

করণাৎসা রিকথভাক্

ইত্যুক্তম্। ভ্রাতৃমত্যাস্তস্যা

রিকথভাক্ত্বং নাস্তীতি ব্রূতে।'

ঋগ্বেদে নারীর যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছার পরিচয় সর্বত্র দেখা যায়। যম-যমী সূক্ত উদ্ধার করে কেউ কেউ অবাধ যৌনাচারের অনুমান করেন। কিন্তু এই প্রকল্প বিতর্ক-মূলক। অনেক আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ যৌথ বিবাহ বা অবাধ যৌনাচার অপেক্ষা এক পতি-পত্নী পরিবার প্রথাকে আদিম সমাজের মূল উপাদান মনে করেন। অবাধ যৌন সম্পর্কের প্রকল্প স্বীকার করলেও তা একান্ত ভাবে আদিমতম সমাজের। যেহেতু ঋগ্বেদের সমাজ আদিম সমাজ থেকে অনেকদূর অগ্রসর সুতরাং এই যুগ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত অনুচিত হবে। ঋগ্বেদ যে বিস্তীর্ণ যুগের রচনা-সংগ্রহ তাতে দু'এক জায়গায় হয়ত আদিম সমাজের স্মৃতি থাকতে পারে; তবে ঋগ্বেদের সমাজে প্রধানত একপতি একপত্নী রীতিই জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর প্রচলিত ছিল দেখা যায়, রাজা বা ধনীরা সম্ভবত একাধিক বিয়ে করতেন।

ঋষিকা বিশ্ববারা প্রার্থনা করেছেন—

"সং জাম্পত্যম্ সুযমম্ আ কৃণুষ্ব"

ভাষ্যে সায়ন বলেছেন—জাম্পত্যম্। জায়া চ পতিশ্চ জায়াপতি। তয়োঃ কর্ম জাম্পত্যম্ তত্ত সুযমং সুষ্ঠু নিয়োমনোপেতম্।' অর্থাৎ তুমি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর। সুতরাং একপতি একপত্নীই সামাজিক রীতি ছিল মনে করা যায়।

১।১০৪।২ ঋকে 'জায়া পতিমেব প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি—মন্ত্রে জায়া ও পতি শব্দ একবচনাত্মক।

দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে দেখা যায় রাজা পুরূরবার অবরোধে ৭ জন মহিলা ছিলেন। তবে একাধিক পত্নী যে খুব সুখকর ছিল না, তা বোঝা যায় কূপে পতিত অঙ্গির পুত্র ত্রিত বা অঙ্গিরার প্রার্থনায়,---

'সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।'

---১।১০৫।৮

'সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, এই পার্শ্বস্থ কূপের ভিত্তিসকল আমাকে সেইরূপ সন্তাপ দিতেছে।'

সুতরাং মনে করা যায় যে, বৈদিক যুগে পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণের প্রথা থাকলেও পত্নীর বহুপতি গ্রহণ প্রচলিত ছিল না। কাঠক সংহিতায় আছে,—

'একঃ বহ্বী জায়া বিন্দতে ন একস্যা বহুবঃ পতয়ঃ।' ২।৩।৮

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও দেখা যায়, একস্য বহব্যঃ জায়া ভবন্তি ন একস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ'

—ঐ ব্রা ৩।২।১২।

'এক পুরুষের বহু পত্নী হইয়া থাকে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি একসঙ্গে হয় না।' (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ)

ঋগ্বেদে নারী-জীবনের বিভিন্ন অবস্থানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে-গুলি লক্ষ্য করলে সেই প্রাচীন যুগেও

নারীর স্বাধীনতা যে এখনকার কাল থেকে কম ছিল না, তা বেশ বোঝা যায়। প্রথমেই ধরা যাক্ বিধবা সমস্যা। ঋগ্বেদের ঋষিরা বিধবাকে জীবনের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন নাই। প্রাচীন-যুগ-সুলভ সবল সংস্কার-হীন উদার মানবিকতার সহানুভূতি নিয়ে ঋষি ভৃগু সদ্য বিধবাকে জীবনে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন,—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন
সর্পিষাসং বিশন্ত।

অনশ্রবোনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্ত
জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ১০।১৮।৭

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতা-
সমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তা গ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জ-
নিত্বমভি সংবভূথ ॥ ১০।১৮।৮

'এই সকল নারী বৈধব্যদুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন॥' ১০।১৮।৭

'হে নারী, সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া আইস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে॥' ১০।১৮।৮

দশম মণ্ডলের ৪০নং সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের 'কোবাংশয়ুত্রা বিধবেব দেবরং?' এই মন্ত্রাংশের, বিধবা, দেবরকে শয়নে আহ্বান করে, এই অর্থ করা হয়। যাস্ক নিরুক্তে দেবর বলতে দ্বিতীয় বর এই ব্যাখ্যা করেছেন---

'দেবরঃ কস্মাদ্দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে'
(নিরুক্ত ৩।১৫)

মনে হয় স্বামীর মৃত্যুর পর দেওরকে বিয়ে করার রীতি ছিল। এমন কি পরবর্তী সূত্র সাহিত্যেও এর সমর্থন দেখা যায়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আছে,—

'অত উর্ধ্বং গুরুভিরনুমতা দেবরাজ্জনয়েৎ
পুত্রম্পুত্রা।' (২।২।৬২)

ঋগ্বেদের যুগে কুমারী কন্যার পুত্র যে কর্ণের মতো দুর্দশাগ্রস্ত ছিল না, তা বোঝা যায়, কনীত পুত্র রাজা পৃথুশ্রবার সামাজিক প্রতিষ্ঠায়।

দানাসঃ পৃথুশ্রবসঃ কানীতস্য সুরাধসঃ।
রথং হিরণ্যয়ং দদন্মহিষ্টঃ
সূরিরভূদ্বর্ষিষ্টমকৃতশ্রবঃ॥
(৮।৪৬।২৪)

'উৎকৃষ্ট ধনযুক্ত কন্যা-পুত্র পৃথুশ্রবার দান এই, তিনি হিরণ্ময় রথ দিয়াছেন, তিনি অতিশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ। তিনি অতিশয় প্রবৃদ্ধ কীর্তি লাভ করিয়াছেন।'

প্রায় হাজার বছর পরবর্তী বৌধায়ন ধর্মসূত্রে কানীন (কুমারী পুত্র) সহোঢ় (গর্ভবতী নারীকে বিয়ে করলে যে পুত্র হয়) ও পৌনর্ভব (ক্লীব ও পতিত পতি ত্যাগ করে অন্যের দ্বারা উৎপাদিত পুত্র) উত্তরাধিকার না পেলেও গোত্রে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। (বৌধায়ন ধর্ম সূত্র ২।২।৩১)

নারী হৃদয়ের নিঃসঙ্কোচ আসঙ্গ লিপ্সার সরল প্রকাশ অঙ্গিরা কন্যা শশ্বতী-রচিত একটি ঋকে---

অন্বস্য স্থূরং দদৃশে পুরস্তাদনস্থ
উরুরবরম্ব মাণঃ।
শশ্বতী নার্যভিচক্ষ্যাহ সুভদ্রমর্য ভোজনং
বিভর্ষি ॥ ৮।১।৩৪

সায়ন ভাষ্যে বলেছেন,---
অয়মাসঙ্গো রাজা কদাচিৎ দেব শাপেন নপুংসকো বভূব। তস্য পত্নী শশ্বতী ভর্তুর্নপুং সকত্বেন খিন্না সতী মহত্তপস্তেপে। তেন চ তপসা স চ পুং স্বং প্রাপ। প্রাপ্ত পুং ব্যঞ্জনং তং রাত্রাবুপলভ্য প্রীতা শশ্বত্য তমস্তৌত।

এখনকার দিনে কোন মহিলা কোন পত্রিকায় অনুরূপ কবিতা লিখলে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হতেন।

বারবনিতা বৃত্তি নাকি পৃথিবীর এক প্রাচীন বৃত্তি। ঋগ্বেদের আমলেও যে এই বৃত্তির অসদ্ভাব ছিল না, তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১৬৭নং সূক্তের চতুর্থ ঋকে আছে 'সাধারণ্যেব মরুতো মিমিক্ষুঃ।' মরুৎ দেবতার স্তুতি করতে যেয়ে বিদ্যুতের বর্ণনা দিতে ঋষি কবি তাকে সাধারণী নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সায়ন এই মন্ত্রের ভাষ্যে বলেছেন, 'সাধারণ্যেব। যথা লোকে সাধারণ্যা স্ত্রিয়া সংগতা যুবানো রেতো মুঞ্চন্তি তদ্বৎ॥' সুতরাং এখানে সাধারণী বলতে বারবনিতাকে নির্দেশ করা হয়েছে মনে করা যায়।

আরো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় দশম মণ্ডলের ২৭নং সূক্তের দ্বাদশ ঋকে যেখানে বলা হয়েছে,---

'কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ
পরিপ্রীতা পণ্যসাবার্যেণ।'

'কিছু স্ত্রীলোক আছে যারা কেবল অর্থেই প্রীতা হয়ে মানুষের প্রতি অনুরক্ত হয়।'

'রাক্ষস বিবাহ' অর্থাৎ জোর করে বিয়ের কথাও যেমন দেখা যায় আবার কন্যার স্বেচ্ছায় পতিবরণ এবং স্বয়ংবরেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে।

যুবং রথেন বিমদায় শুন্ধ্যুবং ন্যূহথুঃ
পুরুমিত্রস্য যোষাণাম্।
যুবং হবং বধ্রিমত্যা অগচ্ছতং
যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ॥ ১০।৩৯।৭

এই ঋকে এবং আরো নানা জায়গায় ঋষি বিমদার বিয়ের যে উল্লেখ আছে, তা থেকে মনে হয়, শুন্ধ্যুর নামে পুরুষ মিত্র রাজার কন্যাকে রথে করে নিয়ে বিমদা ঋষির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কন্যার স্বেচ্ছায় পতিবরণের পরিচয় আছে ১০।২৭।১২ নং ঋকের দ্বিতীয়াংশে।

ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ স্বয়ং
সা মিত্রং বনুতে জনেচিৎ॥

'যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয়পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।'

বরংবরের কথা পাওয়া যায় 'সূর্যার বিয়ে' সূক্তে। সূর্য-কন্যা সূর্যা পতি প্রার্থনা করেছিলেন। সূর্য যখন সোমের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করলেন তখন অশ্বিদ্বয় তার পাণিপ্রার্থী হলেন। দেবতারা সকলে সূর্যাকে অভিলাষ করেছিলেন।

তারা পরস্পর ঠিক করলেন, আদিত্য পর্যন্ত দৌড়াবেন। যিনি জয়লাভ করবেন সূর্যা তারই হবে। অশ্বিদ্বয় জয়লাভ করে সূর্যাকে রথে ওঠালেন।

আবার পিতা সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করতেন—

অস্মৃক্ষাম যোষণাং ন মর্যে নিত্যং ন
সূনুং তনয়ং দধানাঃ। ১০।৩৯।১৪

'যেরূপ জামাতাকে কন্যা দিবার সময় তাহাকে বসনভূষণ অলংকৃত করিয়া সম্প্রদান করে, তদ্রূপ এই স্তবকে আমি অলংকৃত করিয়াছি। যেন নিত্যকালে আমাদের পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

দশম মণ্ডলের 'বিবাহ সূক্তে' সূর্যার বিয়ের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তার থেকে সেকালের মেয়ে বিয়ে যে একালের হিন্দু কন্যার মতোই ছিল, তা বেশ বোঝা যায়। এর অনেক মন্ত্র আজো বিয়েতে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য একথা বলে রাখা ভালো যে, এ প্রবন্ধের সমস্ত বর্ণনাই মুখ্যার্থক, যদিও মন্ত্রগুলির প্রাকৃতিক এবং যাজ্ঞিক তাৎপর্য আছে। যাই হোক সূর্যার বিয়ের বর্ণনা দেখা যাক।

'সূর্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি
পরিষ্কৃতম্ ॥ ১০।৮৫।৬

সূর্যদুহিতার বিয়েতে সূর্যার অতি সুন্দর বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়ে এল। অশ্বিদ্বয় সূর্যার বর হলেন, অগ্নি হলেন অগ্রগামী দূত। পূষা বোধহয় নিতবর হলেন। পতিগৃহে যাবার সময় সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তা আগে আগে বৃষভ-শকটে অর্থাৎ গরুর গাড়ীতে গেল। সেই উপঢৌকনের গাভীগুলি তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তার পতিগৃহে যাবার রথে সুন্দর পলাশ আর শিমূল কাঠ আছে, তা সোনার মতো উজ্জ্বল। পতিগৃহে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে গেল।

পরিশেষে নারীর প্রতি ঋষির চিরকালীন আশীর্বাণী উচ্চারণ করে প্রবন্ধ শেষ করা যাক—

গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো
বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ॥
ইহ প্রিয়ং প্রজায়তে সমৃদ্ধতামস্মিন্
গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা
জিব্রী বিদথমা বদাথঃ ॥ ১০।৮৫।২৭

'গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর। এই স্থানে সন্তানসন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতি লাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য সম্পাদন কর। বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর।'*

* উদ্ধৃতি চিহ্নের অন্তর্গত সব অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত।

জাগরণ

বেভ্‌জএনী রেভ্‌ত্সুশএঙ্কো

তখন স্বপ্নের মতই ছিল জেগে থাকা
এই কুটীরে এই বসতিতে জেগে থাকা
যেন এক নির্জন স্বপ্নের ভিতর,
ভাবনা : এইত সময় যাবার আর মরসুমী ফল তোলার,
তোমার চুলে হাত বুলিয়ে জাগিয়ে তোলার,
আর উন্মীলিত তোমার চোখে চুম্বন রাখার,
প্রতিদিন এই সব এক নতুন আবিষ্কারে।
এই বসতিতে আমরা ছিলাম একমাস,
বাগানে পাখিদের কাকলি
মেঠো পথের বাতাসে নাচে গমের শীষ,
চাপা শব্দ মেঝেয় মাচানের।
এবং একটি সূর্যমুখীকে আমরা যখন
দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছিলাম
কোন বিশেষ কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় নি তখন।
ভোরের আভাসে যখন আমরা
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম
(সফরীরা সুড়সুড়ি দেয় সেইখানে তোমার পায়ে)
কোন জটিল বিতর্কের অবকাশ ছিল না তখন।
রহস্যাবৃত মনে হয় নি প্রথমে
মানুষের অসাধ্য বর্ণনায়
সেইরাতে আমার পাশে শুয়ে
তুমি যে স্বপ্ন দেখেছিলে।
নিয়তনির্ধারিত প্রাপ্য বলেই আমি ভেবেছিলাম
প্রত্যহ প্রভাতে আমাদের মিলন
কোনদিনও যার বিচ্ছেদ হতে পারে না বা হত না।
আর কিভাবে একথা মেনে নিয়ে সময় সময় মনে মনে
নিজেকে তৃপ্ত ভাবতাম
তোমার কিছুই থাকতে পারে না আমার কাছে
অপরিচিত।
তোমাকে মানসাঙ্কে মেলান যায় না,
আমার সব বিচার তুমি ভুল প্রতিপন্ন করেছ,
যেহেতু তোমার সত্তা অপ্রত্যাশিতে।
তুমি কখনও এসে মিলিত হও নি আমার পরিচিত
সীমানায়,
প্রত্যহের পুনরাবৃত্তিতে কখনও না,
কেবল নতুনত্বের সূচনায় এবং তোমার অভিনব বিস্ময়ে।
আমাদের কোন অমিল ছিল না সেই
গুঞ্জন তুলে উড়ে চলায়,
তথাপি এক অস্তিত্ব ছিল
আমাদের ঘিরে বৃত্তাকারে,
আমাদের সঙ্গে উড্ডীন এবং নিরীক্ষণ করতে আমাদের।

অনুবাদক—সত্যধন ঘোষাল

॥ শ্রীরামকৃষ্ণজগতের কৃপাকথা ॥

• লীলারহস্য কথা •

এই স্বধর্ম একটা বিরাট সমস্যা। এ নিয়ে আর আলোচনার স্থান এখানে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-রহস্যের কথা আমাদের আলোচনা হচ্ছে। বলা হয়েছে, তাঁর স্বভাবের ভেতরে খুব শৈশব অবস্থা থেকেই কতকগুলো জিনিষ লক্ষ্য করা হয়েছে, যেমন লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি তাঁর জন্য স্বীকার করেন নি।

দ্বিতীয়ত—স্ত্রী জাতির প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ সহানুভূতি শ্রদ্ধা এবং উদারতার দৃষ্টিভঙ্গি।

তৃতীয়ত—এক অমানুষিক পবিত্রতা—এত পবিত্রতা যে, তা মানুষ ত দূরের কথা মানুষ ছেড়ে অন্য উন্নত জীবের ভেতরেও দেখা যায় কি না সন্দেহ। বুদ্ধ ও ভগবান ছাড়া আর সর্ব ব্যাপারে ত্যাগের দৃষ্টি।

চতুর্থত—মানুষকে অহরহ কি করে ভগবদ্‌মুখী করা যায় তার জন্য অনবরত চেষ্টা।

পঞ্চমত—ধর্মের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেঙ্গে করে যে সব ধর্ম একই বার্তা বহন করেছে তা নিজে প্রত্যক্ষ অনুভব করে জগতে সেইভাবকে প্রচার করার জন্য লোকের মনে সেই ভাবটাকে জাগিয়ে তোলা। শ্রীরামকৃষ্ণেরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী'—যত মত তত পথ' এখন পৃথিবীর সর্বদেশের এবং সর্বধর্মের মনীষীরা গ্রহণ করে এক জাতি এক ধর্ম প্রভৃতি একত্বের ভিত্তিতে নবমানব জাতি গড়বার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁরা সেই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকেই এভাব পেয়েছেন—তা হয়ত স্বীকার করছেন না, তাতে কি আসে যায়? রাম কৃষ্ণ ত নামের জন্য কাঙ্গাল ছিলেন না। বরং নামকে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণাই করতেন। এত ঘৃণা করতেন যে, 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা'—এটা তাঁরই শ্রীমুখের বাণী।

বন্ধু বললেন, 'কথাগুলো ত ভালই লাগছে, তবে চল আমরা আর একটু বিশদ করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটা একটা ভাবকে। বিশ্লেষণ করি।

দেখ, বাঙলা দেশে এমন কি ভারতবর্ষে বহুকাল থেকে আমরা দেখে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আসছি যে, সাধক সাধনা করতে থেকে কোন বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করে সাধনা করছেন। কেউ অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে সাধনা সুরু করলেন। বহু বছর বহু সাধনার পর হয়ত সিদ্ধিলাভ করলেন। তদানীন্তন কালের লোকেরা তাঁকে সিদ্ধপুরুষ বলে মানলো। তিনি অনেক শিষ্য করলেন এবং তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর চেলারা তাঁর গদীতে মনোনীত একজন শিষ্যকে বসালেন। এইভাবে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। কালক্রমে শিষ্যরাও নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লেন এবং এইভাবে সেই সম্প্রদায়টি নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো।

হয়ত সেই সময়েই অথবা পরে আর একজন শক্তিশালী সাধক শ্রীকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করলেন। তাঁর সাধনার ধারা হয়ত কামোপাসনার প্রায় অনুরূপ অথবা খানিকটা বিভিন্ন ধারায় চলতে লাগলো। কালক্রমে তিনিও সিদ্ধ পুরুষ বলে পরিগণিত হলেন তিনিও শিষ্য গ্রহণ করতে লাগলেন।

যথাসময়ে তাঁর দেহত্যাগ ঘটলে তাঁর শিষ্যদের ভিতর হতে মনোনীত কোন শিষ্য তাঁর সম্প্রদায়ের কর্তা হলেন এবং শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে তাঁরাও সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে লাগলেন।

এই দুই ধারার সাধুগণ সবাই বিশেষ উন্নত এবং তাঁরা আমাদের নমস্য। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করতে গেলে দেখা যায় যে, দেশের দিক দিয়ে, জাতের দিক দিয়ে এই দুই সম্প্রদায় দেশটাকে কিন্তু দুটো ভাগে বিভক্ত করলেন। আবার আর একটি কথা হচ্ছে যে, এই দুই সম্প্রদায়ের সাধুদের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিরাট গৃহস্থের দল। এই গৃহস্থগণ যতই শিক্ষিত এবং আদর্শ চরিত্রের হোন না কেন, তাঁদের ভিতরও পরস্পর হিংসা দ্বেষ এবং লড়ালড়ির ভাব বিদ্যমান। এইভাবে দেবতারা মনে হচ্ছে ভাগাভাগি করে ভক্তদের দ্বারা ভারতের তথা জগতের ভিতরে নিজেদের হিস্যা ভাগাভাগি করে রেখেছেন। অবশ্য এই ভাগাভাগি শেষ করে সব ক্ষুদ্র গণ্ডি ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। তা হয়েছে, কিন্তু যেভাবে ঠিক হওয়া উচিত ছিল তা বোধ হয় হয় নি। মহাত্মা নানক হয়ত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আজ ত' দেখছি শিখদের একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়।

বন্ধু, আজকের দিনে কি দেখছো? রাশিয়া আর আমেরিকা যা কখনও মানুষ স্বপ্নেও ভাবেনি তা করতে বসেছে। চন্দ্রলোকে ত' যা ব্যাপার—একদিন তুমি-আমিও ঘুরে আসতে পারি। চন্দ্রলোক কেন আজ মানুষ শুক্রলোকও আক্রমণ করতে উদ্যত। মঙ্গল এবং বৃহস্পতি-লোকেও হয়ত আমাদের বংশধরেরা অবলীলাক্রমে পৌঁছে যাবে। সায়েন্স এবং টেকনোলজির কি অসীম অভিযান! কিন্তু তা হলে কি হবে? এত শাস্ত্রজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কালীর ভক্ত কৃষ্ণের ভক্তকে প্রাণভরে ভাল-বাসতে পারছে না, কৃষ্ণের ভক্ত শিবের ভক্তকে ভালবাসতে পারছে না। আবার শিবের ভক্ত গণপতির ভক্তকে ভাল-বাসতে পারছে না। ঠাকুরের ভাষায়—'সব গেড়ে ডোবার দল।' কেন এই-রকমটা হলো বন্ধু, বুঝতে পারছো?

বন্ধু, এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলবার আছে। এ সব কিন্তু সবই রামকৃষ্ণ জগতের লীলারহস্য কথা, এ কথাটা তুমি ভুলে যেও না।

বন্ধু, তুমি বারবার আমাকে বলছ আমার কাছে সব জাতিটাই রামকৃষ্ণ জগত—এ কথার অর্থ কি? এত আমার মনে হয় নিছক ভাবুকতা। বন্ধু, এই প্রশ্নটি করবার জন্য আমার উপর রাগ করো না।

আমি বললাম না বন্ধু, তুমি একটা অপূর্ব প্রশ্নের অবতারণা করেছ। তোমার উপর রাগ করব কেন? আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার প্রশ্ন শুনে। তবে তোমার কথার উত্তর দিতে গেলে আমাকে আবার পণ্ডিত-দের শরণাপন্ন হতে হবে।

শোন, পণ্ডিতেরা তত্ত্বকথা নানা-ভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। চরম তত্ত্ব হচ্ছে 'ব্রহ্ম'। তবে সে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁরা আকারে ইঙ্গিতে বলেন সোজা ভাবে কিছু বলতে পারেন না, কারণ সেই ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের বাইরে। শাস্ত্র বলেছেন,—'অত:বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাস'—যাকে বুঝতে পেরে বাক্য ও মন না পেয়ে ঘুরে এসেছে। সে অবস্থা, তাকে অবস্থাও বলা যায় না, সেটা যে কি বুঝাই দায়। তাই শ্রীবুদ্ধ সেই অবস্থাকে শূন্য বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু আজকের দিনে শূন্য কথার মানেও ত' এক বলে আমরা মানি। অঙ্কের পণ্ডিতেরা তাই বলেন।

সেই ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্ম যদি বলা যায় তাহলে তাকে নিস্তরঙ্গ বলতে হবে। যা অনন্ত তার অন্ত কই? যার অন্ত নেই তার রূপ কই? যার রূপ নেই তাকে বর্ণনা করে বুঝাবে কি প্রকারে? সমাধি থেকে অবশ্য সেই অবস্থার লাভ হয়। এই বলা যায় যে, মানুষের নামরূপের জীবন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়ে যায় সেই অবস্থায়। তবে থাকে কি? আনন্দ। আনন্দ আর আনন্দ। সেই আনন্দের আর শেষ নেই।

আচ্ছা এই যে ব্রহ্ম তা যখন তরঙ্গায়িত হয় যার মূল কথা হচ্ছে—একোহম বহুস্যাম। বহু হবার একটা কল্পনা সেই ব্রহ্মে জাগ্রত হয়। সেই জাগরণের ভাবটাকে সগুণ ব্রহ্ম বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে আমার মনে হয়, শক্তি বলেছেন। তিনি বহুবার এ সব বুঝাতে চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কি অপূর্ব কথা —ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। তার মানে হচ্ছে যাহা ব্রহ্ম তাহাই শক্তি। তবে প্রভেদ কি কিছুই নেই? হ্যাঁ, আছে—ব্রহ্মের তরঙ্গায়িত অবস্থায় সত্ত্ব রজ তমের তিনটি গুণ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ভাব সমন্বিত হয়ে সেই ব্রহ্মের বুকে ফুটে উঠে তখনই তাকে বলে শক্তি। সেই অবস্থাটার সাঙ্কেতিক প্রকাশ হচ্ছে, শিবের বুকে কালী। শিবকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা যায় এবং তিনিই কালীরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের তরঙ্গায়িত অবস্থা।

অবশ্য এসব কথার অনেক সমালোচনা হতে পারে। যেমন-;-যদি কেউ বলে, 'শিব যে বলছ সে কোন শিব? যাঁর হাত আছে, পা আছে আর গোঁফ আছে, দাড়ি আছে সেই শিব অর্থাৎ শিবকে যেমন আমরা ছবিতে দেখি?'

না, সেই শিব নয়। আমি যে শিবের কথা বলছি সে হচ্ছে বিরাট জ্যোতির অন্তহীন চৈতন্যময় প্রকাশ। যে শিবের ছবি আমরা দেখতে পাই সেই শিবকে যদি বলা যায় 'স্বল্প শিব' তবে এই শিব হচ্ছে 'মহাশিব।'

বন্ধু, আরও যদি এ সম্বন্ধে বুঝতে চাও তাহলে পণ্ডিতের শরণাপন্ন হও। আমার বুদ্ধি আর অগ্রসর হতে রাজী নয়। তাহলে আমরা পাচ্ছি কি? আমরা পাচ্ছি যে কি—তা ঠিক করে বুঝাতে পারা যায় না। তার মানে হচ্ছে—'ব্রহ্ম কি?' না, ব্রহ্ম হচ্ছেন ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সচ্চিদানন্দ কি? না ব্রহ্মের স্বরূপ। .বেশ ত জবাব। যেখানে মন যায় না, বুদ্ধি যায় না। সেখানকার কথা তুমি আর কি জানবে? পণ্ডিতরা আরও দুটো চোখা কথা বলে তোমাকে.তারিয়ে দেবেন। কিন্তু তাহলেও তোমার যদি আরও মীমাংসা দরকার তবে যেতে হবে পণ্ডিতের কাছেই।

বন্ধু! আচ্ছা বেশ, সে না হয় বুঝলাম কিন্তু তুমি যে আমাকে সত্যি কি বলতে চাও তা কিন্তু এখনও বুঝলাম না।

আমি বললাম, থামো বন্ধু থামো। অত উতলা হয়ো না। তুমি এসেছ অন্ধের কাছে হাতির রূপ বর্ণনা করতে। অত উতলা হলে চলবে কেন?

আসল কথাটি ভেবে চিন্তে বলতে হয়। আসল কথাটি বলতেই ত' চাই। দেখ শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলেছেন, 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ'। সেটা আরও পরিষ্কার করতে যেয়ে বললেন, 'সাপটা যখন স্থির, যখন নড়ছে না—তখন ব্রহ্মের অবস্থা, আবার যখন এঁকেবেঁকে চলছে তখন তাকে শক্তি বলি। তবেই হলো। একটা হলো কম্পন ব স্পন্দনহীন আর একটা

হলো কম্পন আর স্পন্দনযুক্ত অবস্থা। অবশ্য কম্পনহীন আর স্পন্দনহীন বললে, আবার উল্টো উৎপত্তি হবে। প্রশ্ন আসবে যেটা কম্পনহীন আর স্পন্দনহীন সেটাই যে আবার কম্পনযুক্ত এবং স্পন্দনযুক্ত হলো---তার উত্তরে কি বলবে তুমি ?

বন্ধু, এ সম্বন্ধে আর বুঝাবার ক্ষমতা আমার নেই ; কারণ আমি ন্যায়শাস্ত্রও পড়ি নি আর দর্শন শাস্ত্রও পড়ি নি---কাজেই যা বলেছি তার চাইতে বেশি বুঝিয়ে বলবার আমার ক্ষমতা নেই। তবে শোন আসল কথা---যাকে আদ্যাশক্তি বলা হয়েছে কেউ কেউ বলেন--'-পরাশক্তি'। তিনিই কামারপুকুরে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের খোলটার ভিতরে আবির্ভূত। পুরো আবির্ভাব। সেটা বুঝেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেটা জগতের সামনে ধরে বুঝিয়ে দেবার জন্যই অত আদর করে সেই বিরাট ঋষির একটা অংশকে সপ্রেম আহ্বানে টেনে এনেছিলেন। স্বামীজী এ সব জেনেই বলেছিলেন, 'অবতার বরিষ্ঠ'। কারণ সগুণ ব্রহ্মের সবটাই যে অবতরণ করেছেন।

বন্ধু বললেন, তোমার বুদ্ধি এবার কিন্তু ফেঁসে গেল। তুমি বলছ আদ্যাশক্তির পূর্ণ আবির্ভাব শ্রীরামকৃষ্ণে ? সাধারণ অঙ্কের জ্ঞানও তোমার নেই ? তুমি কি বল শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুরে তখন আদ্যাশক্তির লোকটা একেবারে খালি ? অর্থাৎ কলিকাতায় ছিলেন ভূধর গাঙ্গুলী। হঠাৎ শোনা গেল ভূধর গাঙ্গুলী দিল্লীতে আছেন। তা-হলে তার অর্থ হল কলিকাতার ভূধর বাবাজি আর নেই তার বাসস্থান এখন খালি। তাই নয় কি---কি জবাব দেবে তুমি ?

আমি বললাম, বন্ধু, তাইত, তুমি দেখি খুব ধরে ফেলেছ মনে করছ। কিন্তু সামান্য অঙ্কের ধাঁধাটি বুঝতে পারলে না ? এক থেকে এককে বাদ দিলে কি থাকে অবশিষ্ট ? জানত 'শূন্য' থাকে। শূন্য মানেও ত 'একই'। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ শূন্য লিখতে যেয়ে একটি বৃত্ত আঁকতে হয়। আচ্ছা বৃত্তটি ত' একটি সীমাবদ্ধ কিছু। তা হলে কিছুই রইলো না হল কি করে ? সেই জিনিষটা লক্ষ্য করেই শ্রুতি বলছেন---'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।'

পূর্ণকে পূর্ণ থেকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকছে পূর্ণই। বা: কি সুন্দর কথা। শক্তিকে শক্তি থেকে নিয়ে এলে শক্তিই অবশিষ্ট থাকে, তাই হলো না ? অবশ্য পণ্ডিতেরা কি বলবেন আমি জানি না। পাঠক-পাঠিকা আশা করি বুঝে নেবেন।

বন্ধু তুমি হেসো না। প্রভু সহায়। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি কথা। রামকৃষ্ণ-সাহিত্য তুমি নিপুণভাবে পাঠ করেছ, তুমি নিশ্চয়ই এই ঘটনাটি জান। শ্রীশ্রী মা দক্ষিণেশ্বরে প্রভুর ঘরে বসে তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি এবং আদরের সঙ্গে খাওয়াচ্ছেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন। হাত থেমে গেল, বললেন---কি দেখলাম ? চোচয়ে উঠলেন মা। ঠাকুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো মা'র দিকে। ঠাকুর বললেন, কি দেখেছ ? তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো।

মা একেবারে স্থির। ঠাকুর বললেন, কি দেখেছ ? মা তখনও স্থির। এইবার ঠাকুর অস্থির হয়ে উঠলেন, বললেন---'যদি না বল তাহলে এই হাত তুলে নিলাম, আজ আর খাবো না।'

এতক্ষণে মা বুঝলেন, কি দেখেছেন---তাঁকে বলতেই হবে, তা না হলে ঠাকুর খাবেন না। অথচ বিস্ময়ে এবং পুলকে তিনি একেবারে অভিভূত। কিন্তু না বললে ত' আর উপায় নেই।

মা বলছেন, দেখলাম, তুমি যখন খাচ্ছ, তোমার গলা থেকে মাথাটা সব মা কালীর। তুমি খাচ্ছ না, মা কালীই খাচ্ছেন। এমন কি মা-কালীর মাথার মুকুট তোমার মাথায় অর্থাৎ মা-কালীর মাথায় রয়েছে।

ঠাকুর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, যেন অত বড় একটা গোপন কথা বের হয়ে গেল। ঠাকুর সবিস্ময়ে বললেন, ওগো, যা দেখেছ ঠিকই দেখেছ কিন্তু ও সব কথা গোপন করে রেখো, কাউকে বলো না।

বন্ধু, কি রকম মনে হচ্ছে ?---আজ এই পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গ আবার যখন উত্থাপন করা হবে তখন এ সম্বন্ধে আরও আলোকপাত করো।

বন্ধু, সত্যি আজ তোমার কথা শুনে তোমাকে ছেলেবেলার মত ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

। ক্রমশ ।

লিনোকাট অনিমেষ চৌধুরী

জন্মান্তরের সূত্র সন্ধানে

।। বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ।।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম আলেকজেন্দ্রিনা

[পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে যে, গত জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের সংবাদপত্রের পাতায় রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুর পরামনোবিজ্ঞান শাখার অধ্যক্ষ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মান্তরবাদের উপরে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি স্বদেশে ও বিদেশে পাঠকসাধারণের মধ্যে প্রভূত আলোড়ন আনে এবং লেখক পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। চিঠিপত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জবাব দিয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি সেই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে প্রধান কতকগুলি নির্বাচন করে সেগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই নতুন ধারাবাহিক নিবন্ধগুলি রচনা করেন। জন্মান্তরবাদের উপর সকল সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর এখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ই পৃথিবীর একমাত্র বিদ্যালয় যেখানে পরামনোবিজ্ঞান নির্ধারিত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্প্রতি লস এঞ্জেলসের পুলিশ কর্তৃপক্ষ রবার্ট কেনেডির হত্যাকারীকে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেন। —স]

পুনর্জন্ম কি সম্ভব?

ব্যক্তিবিশেষের ওপরে এ-প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে। যাঁদের এ-বিষয়ে বিশ্বাস আছে তাঁরা হয়ত 'হ্যাঁ' বলবেন এবং অবিশ্বাসীদের উত্তর বিপরীত হবে। কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা এ প্রশ্নটির সম্ভাব্যতার প্রতি খোলা মনে চিন্তা করেন, এর অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি ভেবে দেখেন আর তাঁদের ভাবনা-চিন্তা থেকে বহুতর প্রশ্নের জন্ম হয়।

পুনর্জন্ম সম্ভব কিনা,, প্রথম দুই শ্রেণীর লোকেদের কাছে এ-প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। কেন না, প্রথমত এ-প্রশ্নের আজ মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা থেকে পুনর্জন্মের অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়ত প্রশ্নটি তাঁদের কাছে হয়তো আদৌ কোন প্রশ্ন বলে বিবেচিত হবে না। তাঁদের আচরিত ধর্মমতে হয়ত মানব-আত্মার জন্মান্তরের কোন স্বীকৃতি নেই এবং মানব-জীবনের সাধারণ শারীরিক ক্ষমতা ও ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের সঙ্গে বিষয়টিকে মেলাতে না পেরে তাঁরা হয়তো প্রশ্নটিকে বাতিল করবেন। পুনর্জন্মের সম্ভাবনার প্রতি মূল সে সমস্ত প্রশ্নগুলি সচরাচর করা হয়ে থাকে তার উত্তর দেবার আগে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।

অলিভিয়ার ঘটনা

ডাঃ কারমেলো সামোনা ও তাঁর স্ত্রী আদেলার একমাত্র মেয়ে আলেকজেন্দ্রিনা ১৯১০ খৃঃ ১৫ই মার্চ সিসিলি দেশের পালেরমো শহরে পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়। আলেকজেন্দ্রিনার মৃত্যুর তিন দিন পরে তার মা আদেলা স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, তাঁর মৃত সন্তান পুনরায় তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে। শ্রীমতী সামোনা ব্যাপারটিকে কোন আমল দিলেন না। কারণ কিছু কাল আগে তাঁর শরীরে একটি অপারেশনের পর ডাক্তারেরা সাধারণভাবে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর আর সন্তান জন্মের সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু ১৯১০ খৃঃ ২২শে নভেম্বর শ্রীমতীর দুইটি যমজ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে একটি মেয়ের সাথে মৃত আলেকজেন্দ্রিনার আকৃতি ও প্রকৃতির মিল থাকায় তারও নাম আলেকজেন্দ্রিনা রাখা হয়। দ্বিতীয় আলেকজেন্দ্রিনা প্রথমার মতই শান্ত, নম্র এবং একা একা খেলা করতে ভালবাসত। তাছাড়া ওদের মধ্যে

দৈহিক কতকগুলি সৌসাদৃশ্যও ছিল। তার চোখের কটা ভাব, কানের গড়ন ও মুখের আকৃতি অগের সন্তানের মত হুবহু এক এবং সে প্রথমার মত ন্যাটা ছিল। খাওয়া-দাওয়ায়ও তাদের স্বভাব রুচি এক ছিল।

দ্বিতীয় আলেকজেন্দ্রিনার ১০ বছর বয়সের সময় সে মনরিয়েলে বেড়াতে যায়। এর আগে সে কখনও সে অঞ্চলে যায় নি। মনরিয়েলে পৌছানমাত্র সে জানায় যে, আগে এখানে সে এসেছে এবং কালো পোষাক পরিহিত ধর্ম-যাজকদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। শ্রীমতী সামোনার তখন মনে পড়ে যায় যে, প্রথম আলেকজেন্দ্রিনার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁরা মনরিয়েলে বেড়াতে আসেন ও সে সময় গাঢ়-নীল পোষাকের ওপরে লালের কাজ করা আলখাল্লা গায়ে কয়েকজন গ্রীক্ পুরোহিতদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়।

দ্বিতীয় আলেকজেন্দ্রিনার শারীরিক সাদৃশ্য, স্বভাবগত ঐক্য ও বিগত-জীবনের স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাবার পর ডাঃ সামোনা ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা মানতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, প্রথম আলেকজেন্দ্রিনাই পুনরায় তাঁদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছে।

ব্রেজিলের ঘটনা

শ্রীমতী ইভা লরেঞ্জের কন্যা এমিলিয়া মৃত্যুর পর তার মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিল, 'মা আমাকে তোমার ছেলে হিসেবে গ্রহণ কর---আমি এবারে তোমার ছেলে হয়ে আসতে চাই।'

এমিলিয়া বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

এমিলিয়া ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লরেঞ্জ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সেই সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য এমিলিয়া ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করতো। ভাইবোনেদের কাছে প্রায়ই কথা প্রসঙ্গে জানাতো যে যদি জন্মান্তর বলে কিছু থাকে তাহলে এবার সে ঠিক ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এরকম থেকে মৃত্যুবরণ করার জন্য এমিলিয়া তার বিয়ের সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং মেয়েজন্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে কয়েকবারই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। উনিশ বছর বয়সে ১৯২১ খৃঃ ১২ই অক্টোবর অবশেষে সে সাইনাইড বিষ খেয়ে মারা যায়।

এমিলিয়ার মৃত্যুর পর শ্রীমতী লরেঞ্জ প্ল্যানচেট ইত্যাদি কয়েকটি আধ্যাত্মিক আলোচনা-চক্রে যোগদান করে এমিলিয়ার আত্মার সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপন করেন। এমিলিয়া আত্মহত্যা করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, সে আবার পরিবারের মধ্যে ফিরে আসতে চায় ছেলে হয়ে।

শ্রীমতী লরেঞ্জ ব্যাপারটি তাঁর স্বামীকে জানান। তিনি বিষয়টি অবাস্তব বলে মনে করেছিলেন। এমিলিয়ার পুনর্জন্ম গ্রহণে আর একটি বাধা ছিল। লরেঞ্জ-দম্পতির সন্তান-সন্ততির সংখ্যা সে সময়ে বারো এবং শ্রীমতী লরেঞ্জের গর্ভধারণের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সব অবিশ্বাসের অবসান ঘটিয়ে ১৯২৩ খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা জ্যেষ্ঠ কন্যার নামানুসরণে ছেলেটিরও নাম রাখেন এমিলিয়া, তবে সাধারণভাবে ছেলেটি পাওলো নামে পরিচিত হয়।

বালক পাওলোর আচার-আচরণে মৃত এমিলিয়ার বহু মিল ছিল। বালক বয়সেই সে সেলাই-র কাজে আশ্চর্য দক্ষতা দেখায়। প্রথম চার-পাঁচ বছর সে কিছুতেই ছেলেদের পোষাক পরতে রাজী হত না এবং মেয়েদের জামা-কাপড় পরতে ভালবাসতো। মাঝে মাঝে সে এমন কথা বলে ফেলত যেগুলির সাথে মৃত এমিলিয়ার যোগাযোগ ছিল। পাওলোর পাঁচ বছর বয়সের সময় এমিলিয়ার ফ্রকের কাপড় কেটে তাকে একটি ছেলেদের পোষাক করে দেওয়া হয়। সেটি তার পছন্দ হয় এবং এরপর থেকেই সে ক্রমশ ছেলেদের জামা-কাপড় পরতে সুরু করে। তার স্বভাবেও তারপর বালিকাসুলভ আচরণ কম হতে থাকে। অবশ্য কৈশোরে পদার্পণের আগে পর্যন্ত তার আচরণ সম্পূর্ণ পুরুষোচিত হয়নি।

ঘটনার প্রাচুর্যতা

পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই দেশের পুনর্জন্মের কাহিনী ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণনা করা হল পুনর্জন্মের ঘটনার প্রাচুর্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ। সাধারণ-ভাবে সকলেই বিশ্বাস করে থাকেন ভারতবর্ষেই এ-ধরণের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতা কোন বিশেষ একটি দেশে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মান্তরিত ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এ সবের থেকে একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, মৃত আত্মার পুনর্জন্ম সম্ভব এবং এ-সম্পর্কে জনসাধারণের ঔৎসুক্য অন্যান্য বিজ্ঞান-চেতনার মতই স্বাভাবিক।

॥ দুই ॥

বিশ্বাসের সাথে পুনর্জন্মের কোন যোগাযোগ আছে কী?

পুনর্জন্মের সম্ভাবনা জন-সাধারণের বা সমাজের প্রবল বিশ্বাসে প্রভাবান্বিত হতে পারে। সে কারণে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এলাকায় এ-ধরণের ঘটনার খবর তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়া যায়। অনুকূল সামাজিক পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুভাবী ব্যক্তির অতীত জন্মের স্মৃতি স্মরণে আনার সহজাত সুযোগ এনে দেয়। বিপরীত অবস্থায় তার বিগত স্মৃতি হয়ত জাগরিত না হতেও পারে।

একজন চিত্র-শিল্পীর ছবি আঁকার জন্য যেমন সচরাচর স্টুডিওর পরিবেশের প্রয়োজন আছে, সে রকম স্মৃতিশক্তি পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে সমমনীয় পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য জন্মান্তরবাদে কোন বিশ্বাস নেই এমন অঞ্চল থেকেও পুনর্জন্মের খবর পাওয়া গেছে।

বিষয়টি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা জেরুজালেমের (The Holy Land) একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। সেখানের ধর্মআচরণে এই মতবাদের স্বীকৃতি নেই।

জেরুজালেমের ঘটনা

শহরের দন্ত-চিকিৎসকের ছয় বছরের ছেলে ডেভিড মরিস প্রায়ই জানাত যে, সে তার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করতে পারে। তার মতে সে অতীতের রাজা ডেভিড, যিনি তিন হাজার বছর আগে ইহুদীদের প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন। সম্রাট তাঁর রাজত্বকালে একটি সুদৃশ্য মন্দির স্থাপনা করেছিলেন, কালক্রমে সে মন্দিরের সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেলেও পশ্চিম দিকের বিধ্বস্ত দেওয়ালটি জেরুজালেম শহরে আজও দাঁড়িয়ে আছে। বালক ডেভিডের ঘটনাটি এই রকম। ডাঃ শ্যামে মরিস তাঁর ডাক্তারখানায় ব্যস্ত আছেন, একদিন এমন সময়ে তাঁর স্ত্রী এডনা অত্যন্ত চিন্তিত মুখে এসে জানালেন যে ডেভিডকে এক মনস্তাত্ত্বিকের কাছে নিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এডনা জানালেন—'ডেভিডের জন্য আমি বড় চিন্তায় আছি। সে আর মোটে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে না। কী রকম আচ্ছন্নের মত হয়ে যায় এবং বিড় বিড় করে কী সব বলতে থাকে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ডেভিড শুধু আমাকেই বিরক্ত করার জন্য এসব করে। কারণ অন্য ছেলেদের সঙ্গে অথবা তুমি যখন বাড়ী ফেরো তখন স্বাভাবিক-ভাবে কথা বলে। আমি বকাবকি করলে ও আরো বিগড়ে যায়। আমার মনে হয় আমাদের এখনই কোন সাইকোলজিস্টের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। নইলে হয়তো ডেভিড ক্রমশ 'মাথা পাগলা' ছেলে হয়ে যাবে।

ডাঃ মরিস সেদিনের সব কাজ ফেলে রেখে স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ী ফিরে এলেন। ছেলে ডেভিড তখন বসবার ঘরে কার্পেটের ওপর কাঠের ব্লক (খেলনা) নিয়ে দুর্গের মত একটা

জেরুজালেম থেকে

ডেভিড তার অতীত জীবনকে স্মরণ করে থাকে

কিছু তৈরী করতে ব্যস্ত। শ্রীমতী মরিস ডেভিডকে বকতে লাগলেন—'তোমাকে না কতবার বারণ করেছি এ-ঘরে খেলা করবে না—নিজের ঘরে খেলবে। তোমার জ্বালায় এই দামী কার্পেটটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'

ডাঃ মরিস কিছুই বললেন না। ডেভিডের তৈরী করা ঘর-বাড়ীর প্যাটার্নটা তাঁর খুব পরিচিত মনে হল। তিনি ভাবতে লাগলেন কিসের সঙ্গে এর মিল আছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, কয়েক সপ্তাহ আগে ন্যাশনাল মিউজিয়মে দেখা পুরাতন 'প্রথম পবিত্র মন্দিরের (First Holy Temple of God) একটি রেখা-চিত্রের সঙ্গে এটির আশ্চর্য মিল রয়েছে। কিন্তু ডেভিড তো সেই দুষ্প্রাপ্য ছবি দেখে নি—তাহলে সে কী করে এটা করল?

ডাঃ মরিস তার অভিনিবিষ্ট ছেলের পাশে চেয়ার টেনে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—'ডেভু, এটা তুমি কী করেছো? এটা কী একটা রেলের স্টেশন নাকি?' তাঁর গলায় আদরের সুর।

শিশু ডেভিড তার দিকে ফিরে তাকাল—তার সুন্দর নীল চোখ দুটি মনে হল, তখন কোন সুদূরের চিন্তায় লিপ্ত। বন্যার স্রোতের মত শব্দের তোড়ে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। ডঃ মরিস সেই দুর্বোধ্য শব্দের কিছু বুঝতে পারলেন না। কেবল প্রাচীন হিব্রু ভাষার একটি শব্দ, যেটা অর্থ তিনি জানতেন, থেকে তিনি বুঝতে বুঝতে পারলেন ডেভিড 'মন্দির' কথাটি বারবার বলছে।

স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তিনি টেপ রেকর্ডার আনতে বললেন এবং ডেভিডের দুর্বোধ্য কথা রেকর্ড করে নিলেন। বালক ডেভিড হঠাৎ এক বিচিত্র ভঙ্গীতে হেসে উঠে লাথি মেরে সেই খেলাঘরের ছবিটি ভেঙে ফেলে তার ঘরে ছুটে চলে গেল।—'দেখলে তো কি রকম হয়ে উঠছে ছেলেটা দিন দিন।' শ্রীমতী মরিস স্বামীকে অনুযোগ করলেন।

ডাঃ মরিস টেপটি নিয়ে ন্যাশনাল মিউজিয়াম পৌঁছলেন। মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ জ্বি হারম্যান Dr. Zvi Hermann ডাঃ মরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। হারম্যান জেরুজালেমের পৌরাণিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ এবং এদেশের প্রচলিত পুরাণো নতুন প্রায় সকল ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল আছে। তিনি মাটির তলায় পাওয়া হাজার হাজার পুরোণো শিলাগুলির পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

ডাঃ মরিস পুত্র ডেভিড সম্বন্ধে বন্ধুকে কিছু না বলে টেপটি চালিয়ে দিলেন। রেকর্ডারের মধ্যে

ডেভিডের সেই দুর্বোধ্য শব্দগুলি টীকা ও পরিষ্কার শোনা যেতে লাগলো। ডাঃ হারম্যান টেপটি প্রথমবার শোনার পর চিন্তান্বিত হলেন—বার বার সেটি চালালেন, কখনও ধীরে কখনও জোরে, বিভিন্নভাবে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকার পর একটা কাগজ টেনে কিছু লিখলেন।

লেখাশেষে বললেন—এটা বহুকাল আগের প্রচলিত হিব্রু বলে মনে হচ্ছে। বর্তমানের সঙ্গে কিছু কিছু শব্দের মিল থাকলেও এর ক্রিয়ার ব্যবহার উচ্চারণভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাসে অনেক তফাৎ আছে। এ-ভাষাটা আমি এখনও পুরোপুরি রপ্ত করে উঠতে পারি নি, তবু আমার মনে হয় প্রথম কয়েকটা লাইনের মানে হচ্ছে এইরকম : 'আমি এই রাজ্যের রাজা তোমাদের সাথে কথা বলছি; আমার প্রতি অনুগত থাকো, আমি তোমাদের গৌরবের পথে চালিত করবো।'—কিন্তু তুমি এটা কোথায় রেকর্ড করলে? শুনে মনে হয়, কোন পেশাদার অভিনেতা ঐতিহাসিক নাটকের পার্ট রিহার্সাল দিচ্ছে।'

ডাঃ হারম্যান বলে চললেন—'রাজা ডেভিড আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে ইস্রায়েলে রাজত্ব করতেন। তিনি যখন জেরুজালেমে ঈশ্বরের প্রথম মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেন, তখন কিছু পণ্ডিতে প্রবল বিরোধিতা করে। ফিচুটা মন্দির গড়ে তাঁর পর রাজাকে বাধ্য হয়ে পরিকল্পনাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করতে হয়। পরে তাঁর উত্তরসূরী রাজা সোলেমান সেই মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন। নাটকের পক্ষে প্লটটা বেশ ভাল, কিন্তু আমাদের দেশের কোনো অভিনেতা পুরাণো হিব্রু জানে তাতো জানতাম না। সত্যি বলতে কি অভিনেতা কেন, এমন অনর্গল ও নির্ভুলভাবে পুরাণো হিব্রু কেউ লিখতে বা বলতে পারে এমন লোকের সাথে আমার তো কখনও পরিচয় হয়নি। যাই হোক ভদ্রলোকটি কে? আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

ডাঃ মরিসের ততক্ষণে মাথা ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। অত্যন্ত বিমূঢ়ের মত তিনি বলেন—'আমার ছেলে, আমার তিন বছর বয়েসের ডেভিড কিছুক্ষণ আগে একথাগুলো বলেছে।'

এবারে হতবাক্ হবার পালা ন্যাশানাল মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ হারম্যানের। তিন বছর বয়সের বালক ডেভিড মরিসের শরীরে তিন হাজার বছরেরও অতীতের আত্মার অবিস্মরণীয় কাহিনীর সূত্রপাত ১৯৬৪ খৃঃ এক সকালে এভাবে হয়েছিল।

মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা

ডাঃ মরিস তাঁর ছেলেকে সুপ্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাপক ইব্রাহিম ওরবাকে (Prof. Ebraim Auerbach) এবং ডাঃ হারম্যানের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল রাখলেন। পরীক্ষকরা লক্ষ্য করলেন ডেভিডের ঘরের সব জানলা বন্ধ থাকলে বালক ডেভিড তার বয়সের ছেলের মত সব কিছুতেই স্বাভাবিক আচরণ করে কিন্তু জানলা খোলা থাকলেই তার একটা আচ্ছন্নভাব আসে এবং সে সেই আগের দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতে থাকে।

তাঁরা আরো লক্ষ্য করলেন যে, হাওয়ার গতিবেগ উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যখন প্রবাহিত হয় তখন ডেভিডের এই আচ্ছন্নভাব আরো বেশি ঘন ঘন হতে থাকে। জেরুজালেমের একটি প্রাচীন মানচিত্রে এই বায়ুর গতিপথ ধরে পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেল রিহাভিয়া কোয়ার্টারে ডাঃ মরিসের বর্তমান বাড়ীর দুই মাইল উত্তর-পূর্বে পুরাণো জেরুজালেমের মাউন্ট মোরিয়া পর্বতের অবস্থান। এই পাহাড়েই তিন হাজার বছর আগে রাজা ডেভিডের দুর্গ এবং তাঁর প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্তই তাদের রিপোর্টে লিখলেন কিন্তু তাঁদের নিজেদের কোনো সিদ্ধান্ত তাঁর ওপর আরোপ করলেন না।

[ক্রমশ।

অনুবাদক—জ্যোতির্ময় দাশ

অন্বেষণ

অমরেন্দ্র ঘোষাল

আমি এখন এমন কাউকে খুঁজি
আমি এখন একান্ত অসহায়ভাবে
এমন কাউকে খুঁজে চলি;
যে আমাকে আমার হাত ধরে তার সাথে করে
কোন এক ফুলেদের দেশে নিয়ে যাবে।

সারাদিন ধরে ধরে (কিন্তু কেন হয়তো বা অনেকদিন ধরে)
আমি আমার অনেক জানা মুখের স্মৃতির ছবি ভুলে
ভুলে গিয়ে পরিচিত নিয়মের ফ্রেমে বাঁধা ছবি
দীর্ঘকাল সেই ফুলেদের দেশে থেকে যাব।

কোন কলস্রোতা নদীর কাছে গান শিখতে শিখতে,
অথবা কোন অলস গোধূলিতে কোন এক পর্বতের মুখে
কথকতা শুনতে শুনতে আমার সন্ধ্যা যত
শেষ হয়ে গিয়ে রাত্রি হয়ে যাবে।
ফিরে এসে কৈফিয়ৎ কাউকে দেব না।
আবার কখনও বা কোন এক ফুলের নাম ধরে ডেকেই
তার মুখেতে ফিরে আমার নাম শুনতে চেয়ে
ছুটতে ছুটতে কোন এক চলমান ঝর্নার সঙ্গী হয়ে
সুদূরে হারাব।
ফিরে এসে কৈফিয়ৎ কাউকে দেব না।

মহাকবি কালিদাস

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ

বা নানা বিভ্রান্তি, নানা পরস্পর-বিরোধী ঘটনার প্রচলন। কাহারো কাহারো মতে সংবৎ অব্দের প্রবর্তক উজ্জয়িনী বা অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের উজ্জ্বলতম রত্ন কালিদাস। এই সংবৎ প্রচলিত হয় ৫৬ (মতান্তরে ৫৮) খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। কেউ কেউ বলেন, গুপ্তবংশের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) সভার নবরত্নের অন্যতম কালিদাস। এই বিক্রমাদিত্য ৩৮১ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, কালিদাস কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের সমসাময়িক। এই কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন ৪১৪ খ্রীস্টাব্দে। অনেকে আবার কালিদাসের আবির্ভাবকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ এই অভিমত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবকাল ৬০৬ খ্রীস্টাব্দ। তাঁহার সভাকবি বাণভট্ট হর্ষচরিত গ্রন্থের প্রারম্ভে কালিদাসের প্রশংসাসূচক যে শ্লোকটি সন্নিবেশিত করেন তাহা এই---

নির্গতাস্য ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥

কাজেই কালিদাসের জন্মকাল সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ। আবার জৈমিনী ন্যায়মালার গ্রন্থকার মাধবাচার্য উক্ত গ্রন্থে যেখানে 'বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়' বিচার করিতেছেন সেখানে এক জায়গায় লিখিয়াছেন--- 'কালিদাসাদি কাব্যবৎ'। মাধবাচার্য খ্রীস্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীর লোক হইলে কালিদাসের আবির্ভাবকাল উহার অন্তত দুই-তিন শত বৎসর পূর্বে ধরা যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, কালিদাস উজ্জয়িনীপতি যশোধর্মদেব বিক্রমাদিত্যের সময়ে বর্তমান ছিলেন (৫২৮ খ্রীস্টাব্দ)। জ্যোতির্বিদাভরণ নামে একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থের লেখকও কালিদাস বলিয়া অনেকে বলেন। এই গ্রন্থের শেষ শোকে আছে---

কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃদ্রঘুবংশ পূর্বং
জাতং যতো ননু কিয়চ্ছ্রুতি কর্মবাদঃ॥
জ্যোতির্বিদাভরণ কাল বিধান শাস্ত্রং।
শ্রীকালিদাস কবিতোহি ততো বভূব॥

ইহাতে কালিদাস যে মেঘদূত কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের রচয়িতা ইহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। ঐ জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থে কালিদাস নিজেই গ্রন্থরচনার কাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ৩০৬৮ কল্যাব্দে (বিক্রম সংবৎ ২৪, খৃঃ পূঃ ৩৪) তিনি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন।

অন্য একটি মত অপেক্ষাকৃত উদ্ভট হইলেও ইহার সমর্থকও বিরল নহে। এই মতে কবির প্রকৃত নাম কালিদাস নহে। কাশ্মীরের ইতিহাসে মাতৃগুপ্ত নামে এক শাসনকর্তার উল্লেখ আছে। কথিত আছে ইনি বিক্রমাদিত্যের পারিষদ এবং অসাধারণ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন। কাশ্মীররাজ শ্রেষ্ঠসেনের মৃত্যুর পর ঐ রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইলে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে ঐ দেশ শাসন করিতে প্রেরণ করেন। ইনি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাশ্মীরের শাসনকর্তা ছিলেন, পরে সন্ন্যাসী হইয়া কাশী বাস করেন। এই মাতৃগুপ্তই নাকি জগদ্বিখ্যাত কবি কালিদাস।

'গণরত্নমহোদধি' গ্রন্থের রচয়িতা বর্ধমান এই গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোকে বলেন---

সপ্তনবত্যধিকেষ্বেকাদশসু শতেষ্বতীতেষু।
বর্ষাণাং বিক্রমতো গণরত্নমহোদধির্বিহিত॥

বিক্রমতঃ অর্থ বিক্রমের সময় হইতে ১১৯৭ বৎসর পর এই গ্রন্থ লিখিত হয়। মল্লিনাথ চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। মল্লিনাথের আবির্ভাবকাল যদি ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ ধরা যায় তবে গণরত্নমহোদধি অন্তত তার একশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে লেখা কারণ মল্লিনাথ প্রায়ই তাঁর লেখায় ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ১২৫০ হইতে ১১৯৭ বাদ দিলে ৫৩ খ্রীস্টাব্দ এবং ইহা বিক্রমের রাজত্বকাল ও কালিদাসের আবির্ভাবকাল।

১৯০৯---'১০ খ্রীস্টাব্দে মার্সাল (Marshall) এলাহাবাদের নিকট ভিটা নামক জায়গা খনন করেন। সেখানে এক মুনির পর্ণকুটির এবং ইহার সম্মুখভাগে বৃক্ষে জলসিঞ্চনরত একটি বালিকাকে দেখা যায়। আরও দেখা যায়, একজন মুনি জনৈক রাজা ও তার সারথিকে কোন একটি কার্য করিতে নিষেধ করিতেছেন। এই রাজা দুষ্যন্ত এবং মুনি তাঁকে আশ্রম-মৃগ বধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। অদূরে কুটিরের সম্মুখে জলসিঞ্চনরতা বালিকাটি শকুন্তলা। এই চিত্রগুলি (Medallion) সুঙ্গদের সময়ে বলিয়া মনে হয়। সুঙ্গেরা পাটলীপুত্রে ১১৭ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৭২ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ১১৭ খ্রীঃ পূঃ হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই শত শত বৎসরেরও অধিককালের মধ্যে যে কোন সময়েই কালিদাসের আবির্ভাবকাল হইতে পারে। তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই যে কালিদাসের আবির্ভাব---এই সিদ্ধান্তই সম্ভবত বেশীর ভাগ পণ্ডিত দ্বারা স্বীকৃত।

বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের

...নামের তালিকা পাওয়া যায় তাহা এই—

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু
বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহ মিহির
বররুচির্ণব বিক্রমস্য।

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস। বরাহমিহির ও বররুচি। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই কালিদাসের সমসাময়িক নন। বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন ৫০৫ খ্রীস্টাব্দে আর অমর সিংহের আবির্ভাবকাল অষ্টম শতাব্দী বলিয়া ধরা হয় ও ইনি শঙ্করাচার্যের সমসাময়িক। তাই এখানেও সমকালীনতা রক্ষিত হয় নাই।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল ছাড়াও কালিদাস এই নামে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। রাজশেখর বলেন—
একোঽপি জীয়তে হন্ত। কালিদাসো
ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসো ত্রয়ং
কি মু॥

এখানে অন্তত তিনজন কালিদাসের নাম পাওয়া যায়—(১) মহাকবি কালিদাস (সম্ভবত), (২) বলভদ্রপুত্র কালিদাস, (৩) রামগোবিন্দের পুত্র কালিদাস। ইঁহারা তিনজনই কবি এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কালিদাসের বহু কবিতা প্রথম কালিদাসের নামে প্রচলিত। বহু পরবর্তী-যুগে চণ্ডীদাস নাম নিয়াও এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

কালিদাসের পিতার নাম সদাশিব মিশ্র (ন্যায়বাগীশ); ইনি ভৃগুগোত্র-সম্ভূত এবং নিবাস উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী পৌণ্ড্রগ্রামে। আবার কেহ কেহ বলেন, উজ্জয়িনী নিবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নিরঞ্জন তর্করত্ন তাঁহার পিতা। কালিদাসের পিতা গ্রামের জমিদারের পুরোহিত ছিলেন। কালিদাসকে ...তি গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাকে সেখানে কদাচিৎ দেখা যাইত। গ্রামের ভদ্রাভদ্র সকলে তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, পিতার নিকট অভিযোগের পর অভিযোগ আসিয়া জমা হয়, কিন্তু এই দুর্দান্ত বালককে আঁটিয়া উঠা পিতার সাধ্যাতীত ছিল। এমন কি গুরুমশায়ও কালিদাস যেদিন পাঠশালায় আসিতেন সেদিন খুব সন্ত্রস্ত থাকিতেন। অষ্টম বর্ষে কালিদাসের উপনয়ন হয় এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু এই সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বিদ্যালাভও তাহারা সম্ভবপর হইল না।

সেই সময় গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন মণিকেশ্বর সিংহ। তাঁর একমাত্র কন্যা বিদ্যাবতী কমলা যোগানন্দ নামক সর্বশাস্ত্রবিশারদ এক আচার্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত বিদুষী হইয়া উঠিলেন এবং বড় বড় পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত করিতে লাগিলেন, তিনি পণ করিলেন যে তাঁকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত করিবেন তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন আর পরাভূত ব্যক্তি প্রকাশ্যে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবেন। বড় বড় রাজা ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের লাঞ্ছনাই সার হইল, কেহ তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। তখন সমস্ত পরাভূত নৃপতি ও পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন যে তাহারা যে ভাবেই হউক একটি মহামূর্খের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিবেন। তারা দিকে দিকে মহামূর্খের সন্ধানে বাহির হইলেন। একদল দেখেন এক যুবক বৃক্ষের যে ডালে বসিয়াছেন তারই গোড়ায় কুঠারাঘাত করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন না ডাল ছেদনে তাঁর পতন অনিবার্য। বুঝিলেন এটি একটি মহামূর্খ এবং ইহার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ ঘটাইতে পারিলে তাহার দম্ভের সমুচিত প্রতিফল দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য এই যুবকের নাম কালিদাস।

পণ্ডিতদের কথায় ইনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং অনেক বুঝাইবার পর রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। পণ্ডিতেরা কালিদাসকে স্নান করাইয়া মহাপণ্ডিত বেশে সুসজ্জিত করিয়া মহাসমারোহে রাজসভায় নিয়া চলিলেন এবং রাস্তায় বলিলেন যে, সে কোন কথা বলিবে না, কোন প্রশ্ন করা হইলে আকার-ইঙ্গিতে উত্তর দিবে।

মহারাজ মণিকেশ্বর সিংহের বিরাট সুসজ্জিত রাজসভা, মহারাজ স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট। দুই পার্শ্বে দুই-খানি বহুমূল্য আসন সংস্থাপিত। একখানি আসনে বিদুষী রাজকন্যা উপবিষ্টা, অন্যখানি রাজকন্যার সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে সমাগত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য সংরক্ষিত। সম্মুখে দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী মৃদু শাস্ত্রালাপ গুঞ্জনে রত। একটা বিরাট ও মহান গাম্ভীর্যে সমগ্র রাজসভা পরিব্যাপ্ত। অকস্মাৎ শাস্ত্রালোচনার গুঞ্জনধ্বনি স্তব্ধ হইল, পণ্ডিতমণ্ডলী একযোগে দণ্ডায়মান হইয়া সভায় প্রবেশরত পণ্ডিতবেশ-ধারী কালিদাসকে মহাসমাদরে ও সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাইলেন। রাজাও সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলে কালিদাস হস্তেঙ্গিতে তাহাকে তাঁর বসিতে বলিয়া নিজে আসন পরিগ্রহ করিলেন। তখন দ্বারপণ্ডিত ঘোষণা করিলেন—এই মহাপণ্ডিত রাজকন্যার সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে সমুপস্থিত তবে সম্প্রতি মৌনব্রতাবলম্বী হওয়ায় প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই আকার-ইঙ্গিতে করিবেন।

কালিদাস কি ভাবিয়া রাজকন্যার কর্ণভূষণের দিকে দুই তর্জনী উত্তোলিত করিলেন। রাজকন্যা ভাবিলেন ইহা দ্বৈতবাদের কথা। তাই তিনি একটি অঙ্গুলি উত্তোলিত করিয়া অদ্বৈতবাদের কথা বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পণ্ডিত একযোগে এরূপ বিদ্রূপ হাস্য করিলেন যে রাজকন্যা অপ্রতিভ ও স্তব্ধ।

তাঁর ব্যাখ্যায় নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ

কুটতর্ক ও বিশ্লেষণে তাৎপর্য প্রকাশের সূক্ষ্মতায় রাজকন্যাকে পরাজিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

রাজকন্যার সহিত কালিদাসের বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর, বাসর রাত্রি, এক উষ্ট্রের ডাকে ভীতচকিত কমলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওটা কিসের ডাক?

কালিদাস নীরব। আবার প্রশ্ন তবুও নীরব। তৃতীয়বার প্রশ্নের পর কালিদাস বলিলেন, উট্র।

রাজকন্যা স্তম্ভিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলিলেন?

কালিদাস বুঝিলেন, ভুল হইয়াছে, তাড়াতাড়ি শুদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'উট্ট'।

রাজকন্যা বুঝিলেন পণ্ডিতেরা চক্রান্ত করিয়া এক মহামূর্খের সহিত তাঁহার বিবাহ সংঘটন করাইয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখে ও বেদনায় তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হইল—

কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ,
কিং ন করোতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড় নিতম্বা।

কালিদাসকে কমলা সেই সময়েই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। অপমানিত লাঞ্ছিত মর্মাহত কালিদাস এক বাপীতটে সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনদিন তিনরাত্রি নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পর সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে কালিদাস বিদ্যা ও কবিত্ব-শক্তির বর প্রার্থনা করায় দেবী বলিলেন, সন্নিকটবর্তী বাপীতে নিমজ্জিত হইয়া যাহা পাও নিয়া আস।

কালিদাস ডুব দিয়া একতাল মৃত্তিকা নিয়া দেবীর সম্মুখে আসিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—উহা কি?

কালিদাস বলিলেন, কাঁদা।

দেবী আবার পূর্ববৎ ডুব দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই নিয়া আসিতে বলায় কালিদাস এবারও একতাল মৃত্তিকা নিয়া আসিলেন। দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—উহা কি?

কালিদাস বলিলেন—কর্দম।

তৃতীয়বার ডুব দেওয়ার পর আবারও দেবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কালিদাস বলিলেন—পঙ্ক।

দেবীর আনন প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—বৎস। আর একবার ডুব দিয়া যাহা পাও নিয়া আইস।

এবার কালিদাস ডুব দিয়া এক হস্তে একটি সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম এবং অন্য হস্তে একটি উৎপল নিয়া দেবীর সম্মুখে আসিতে দেবীর শরীর হইতে এক অপার্থিব জ্যোতি কালিদাসের শরীরে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল—

পদ্মমিদং মম দক্ষিণহস্তে
বামকরে লসদুৎপলমেকং।
ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্রে
কর্কশনালমকর্কশনালং॥

কালিদাস অগ্রে দেবীর চরণ বন্দনা না করিয়া 'পঙ্কজনেত্রে' এই সম্বোধন করায় দেবী তাঁহাকে সর্ব বিদ্যালাভের বর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অভিশাপ দেন যে, তাঁহার বেশ্যাহস্তে মৃত্যু হইবে।

কালিদাস সর্ব বিদ্যাবিশারদ্ হইয়া শ্বশুরগৃহে ফিরিলেন এবং বিদুষী ভার্যার কক্ষের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন—ভদ্রে। দ্বারমুদ্ঘাটয়।

মহামূর্খ স্বামীর কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে এই বাক্য শোনামাত্র কমলা শিহরিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—কিমত্র প্রয়োজনম্।

স্বামীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—অস্তি কশ্চিৎ বাক্‌বিশেষঃ।

রাজকন্যা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া স্বামীর পদতলে নিপতিত হইলেন। কালিদাস বিদুষী ভার্যাকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইলেন এবং নিজে পার্শ্বে বসিয়া দেবীর প্রসাদলাভের সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন।

পুলকাশ্রুতে কমলার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল, অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন—আমার একটি প্রার্থনা।

কালিদাস বলিলেন—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। বল কি তোমার প্রার্থনা?

রাজকন্যা বলিলেন—আমাদের প্রথম মিলনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই চারিটি শব্দ আদিতে বসাইয়া তুমি চারিটি অবিস্মরণীয় মহাকাব্য রচনা কর।

কালিদাস তাহাই করিলেন। 'অস্তি কশ্চিৎ বাক্ বিশেষঃ' এই চারিটি শব্দ আদিতে রাখিয়া চারখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। উহারা যথাক্রমে কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ ও ঋতুসংহার।

কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোক—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নীধিবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

মেঘদূতের প্রথম শ্লোক—

কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা
স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিত মহিমা
বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া
স্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং
রামগির্য্যাশ্রমেষু॥

রঘুবংশের প্রথম শ্লোক—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-
পরমেশ্বরৌ॥

ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক—

বিশেষ-সূর্যঃ স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ
সদাবগাহক্ষতর বারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোদভ্যুপশান্ত মন্মথো
নিদাঘ-কালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে॥
(পাঠান্তরে প্রচণ্ড সূর্য)

দেবী সরস্বতীর বরে লব্ধবিদ্যা কালিদাসের কিন্তু বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। তিনি বহু কষ্টে বিস্তর পথশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া বিদ্যার্জনের জন্য কাশীধামে উপস্থিত হইলেন এবং ওখানকার বিখ্যাত জ্ঞানী

কিছু শিরোমণির নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা শিরোমণিকে চমৎকৃত করিল। তিনি একে একে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গুরুর চরণ বন্দনান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কাজেই মনে হয় দেবীর বরে তাঁর হৃদয়ে অধ্যয়নস্পৃহা জাগরিত হয় এবং অধ্যবসায় ও নিরলস অধ্যয়নস্পৃহার বলে সদগুরুর প্রসাদে সর্ব বিদ্যাবিশারদ হন।

কালিদাসের নামে যে কত হাজার হাজার উদ্ভট শ্লোক প্রচলিত তার ইয়ত্তা নাই। গত দুই হাজার বৎসরের সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে জুড়িয়া যত রসাল শ্লোক, যত সমস্যা-পূরক শ্লোক, যত হেঁয়ালীপূর্ণ শ্লোক—তার অধিকাংশই তাঁর নামে প্রচলিত। তাদের সমষ্টিগত আয়তন এক বৃহদাকার পুস্তকের চেয়েও অনেক বড়। নিম্নে কয়েকটি অধিকতর প্রচলিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—

মদ্ররাজের সভায় তিনজন শ্রুতিধর ছিল। প্রথম শ্রুতিধর যে-কোন শ্লোক একবার, দ্বিতীয় শ্রুতিধর দুইবার এবং তৃতীয় শ্রুতিধর তিনবার শুনিলেই অবিকল বলিয়া যাইতে পারিত। রাজা ঘোষণা করিলেন, যে তাঁহাকে নূতন শ্লোক শুনাইতে পারিবে তিনি তাঁহাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিবেন।।

পণ্ডিতেরা আসিয়া নতুন শ্লোক তৈয়ারী করিয়া রাজাকে শুনাইবামাত্র প্রথম শ্রুতিধর বলিয়া উঠিত যে, ইহা তাহার জানা। সে গড়গড় করিয়া বলিয়া যাইত। দ্বিতীয়-জনের শুতক্ষণে দুইবার শোনা হইয়া গিয়াছে, সেও মুখস্থ বলিয়া গেল। এবার তিনবার শুনিয়াছে বলিয়া তৃতীয় শ্রুতিধর ইহা তাহার জানা বলিয়া মুখস্থ বলিয়া গেল।

নূতন শ্লোক রচনাকারী পণ্ডিত বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া পরাজয় স্বীকার করিত। কালিদাস এই ব্যাপার শুনিয়া নূতন শ্লোক শুনাইবার জন্য মদ্ররাজ-সভায় উপস্থিত। রাজার অনুমতি নিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া সভায় বলিলেন—

স্বস্তি শ্রীমদ্ররাজ ত্রিভুবন বিজয়ী
ধার্মিকো সত্যবাদী
পিতা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা
স্বর্ণকোটির্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি শীঘ্রং
সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ।
নো বা নবকৃতমিতি চেৎ
লক্ষ মুদ্রাং দেহি মে।

অর্থ—সত্যনিষ্ঠ ধার্মিকবর
ত্রিভুবনজয়ী মদ্ররাজ!
কল্যাণ হোক কুশল হোক,
আছে নিবেদন সভার মাঝ।
স্বর্গীয় তব পিতৃদেব তো
ঋণ করেছিল আমার কাছে।
নবনবতিযুতা স্বর্ণকোটি
সভার সকলে সাক্ষী আছে।
যদি এই কথা আপনারা সবে বলেন
কাহারো জানা তো নাই।
নূতন শ্লোক শোনালেম তবে
লক্ষ মুদ্রা আমার চাই।

কালিদাস নূতন শ্লোক শুনাইয়া লক্ষমুদ্রা নিয়া চলিয়া আসিলেন।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে নিম্নোক্ত শ্লোক কয়টি ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট চমকপ্রদ ও সুন্দর কাহিনী বাদ দিয়াই উল্লিখিত হইল—

পাদপূরক শ্লোক—

(১) প্রাতঃকথায় তো ব্রাহ্মণ মুখং
প্রক্ষালয়ন্ত্বট।
নগরে ভাষতে কুক্কু চবৈত্তুহি
চবৈত্তুহি।।

(২) কবিতা বনিতা চৈব সুখদা
স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমানা তু সরসা বিরসায়তে।।

(৩) ভিক্ষো। মাংসনিষেবনং প্রকুরুষে?
কিং তেন মদ্যং বিনা।
মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং?
প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং?
দ্যূতেন চৌর্যেন বা।
চৌর্যদ্যূত পরিগ্রহোঽপি ভবতঃ
নষ্টস্য কান্যা গতিঃ।।

(৪) ধনং পর্বতং বচশ্চিত্ররূপং
বপুঃ কর্মদক্ষং কুশাগ্রবুদ্ধিঃ।
ন দানং ন পাঠো ন ধর্মো ন কীর্তি-
স্ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্
ততঃ কিম্।

(৫) অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজাঃ নষ্টাঃ সন্তুষ্টাঃ ইব
পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকাঃ নষ্টাঃ নির্লজ্জাশ্চ
কুলাঙ্গনাঃ।।

(৬) অশক্তো তস্করঃ সাধু কুরূপা চেৎ
পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা
তপস্বিনী।।

সংশ্লিষ্ট গল্পের শ্লোকগুলি সকলেরই পরিচিত বলিয়া আর উল্লেখ করিলাম না।

কালিদাস শক্তির উপাসক ছিলেন। মহাদেবের ভাবগম্ভীর, মহিমান্বিত ধ্যানসমাহিত বিরাট বিশ্বম্ভর মূর্তির প্রশান্ত অনির্বচনীয়তা তাঁহাকে গভীরভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল, যার পরিচয় তাঁর সমস্ত রচনাতেই পাওয়া যায়।
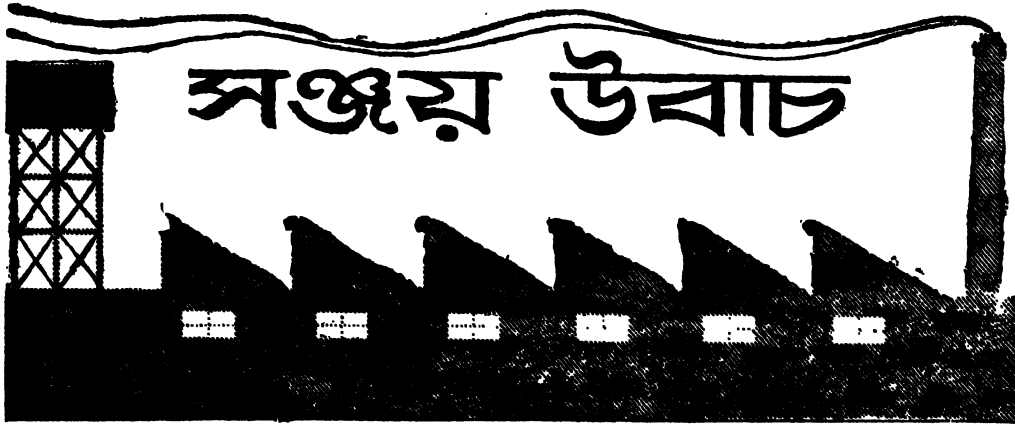
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ এগার ॥

কারখানা দেখতে গেলেন কার্তিকচন্দ্র।

কিন্তু কোথায় কারখানা? ৯১নং সার্কুলার রোডের উপর একটি ছোট বাড়ি। সেখানে ডক্টর রায়ের বাসা। একটি ঘরে তিনি থাকেন, আর একটি ঘরে হাঁড়ি-কড়া শিশি-বোতল, বক্‌যন্ত্র, লেবেল-আঠা। এই তো কারখানা। এখানে বকযন্ত্রে যোয়ানের আরক তৈরী হয়। ওখানে উনুনে বাসকের সিরাপ সিদ্ধ হয়। শিশিতে ভর্তি করে ছিপি এঁটে লেবেল সেঁটে, বাজারে যায়।

ডাঃ বোস দেখে বললেন—দাদা এই আয়োজনে তো কোন কাজই হবে না। দু'ডজনের স্থলে দশ ডজনের অর্ডার এলেই ঘরে স্থান হবে না। কারখানা বাড়ি বড় হওয়া চাই। অনেক লোক কাজ করতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।

পি সি রায় বললেন—দাদা বলে যখন ডেকেছ, তখন আজ থেকে আর আপনি নয়, তুমি। আমি পি সি আর তুমি কে সি। পি সির ভাই কে সি যখন এসেছেন তখন উপায় সব হবেই।

নতুন করে ভাবনা চিন্তা সুরু হল। পি সি-র সঙ্গে কে সি এসে জুটেছেন শুনে ডক্টর রায়ের অন্য উৎসাহী বন্ধু যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কাজে আরও আগ্রহী হলেন। সবাই মিলে প্রথম এই স্বদেশী মাল দোকানে দোকানে রাখবার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন। ফলে মালের চাহিদা বাড়ল। তখনও কিন্তু ডক্টর রায়ের বাসস্থানেই ওষুধ তৈরী হতে লাগল।

কথাপ্রসঙ্গে একদিনের কাহিনী বলছিলেন ডাঃ বোস। অনেকগুলি দোকান থেকে অর্ডার এসে পড়েছে। সারাদিনের চেষ্টায় মাল তৈরী হয়েছে বটে কিন্তু বোতলে ভরা এবং লেবেল লাগানো প্যাককরা বাকি। বিকালে

সঞ্জয়

ডক্টর রায় কলেজ থেকে ফিরেছেন, ডাঃ বোসও গিয়েছেন। দুই বন্ধুতে লেগে গেলেন বোতলে ওষুধ ভর্তি করে লেবেল লাগাতে।

আকাশে অঝোর ধারে বৃষ্টি নেমেছে। বাড়িটির ছাদ ফাটা ছিল, ছাদ চুইয়ে জল পড়েছে মেঝেতে। উঁচু টেবিলের উপর বোতল শিশি রেখে সেই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন দুই বন্ধু—একজন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক ডক্টর পি সি রায়, আর একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি পরীক্ষায় গোল্ড মেডালিস্ট ডাঃ কে সি বোস।

এইভাবে দুঃখ-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজেদের অজ্ঞাতেই তাঁরা করে চলেছিলেন ভারতে ভেষজ শিল্পের গোড়া পত্তন। টাকার অভাব ছিল, স্থানের অভাব ছিল, লোকজনের অভাব ছিল—শুধু অভাব ছিল না উৎসাহের। পি সি রায়ের চোখে স্বপ্ন, তাঁর ছাত্রেরা শুধু টেস্ট টিউব নেড়েই কেমিস্ট্রির পাঠ শেষ করবে না, লব্ধজ্ঞান কাজে লাগিয়ে তুলবে বড় বড় কারখানা। পরাধীন ভারত শিল্প-সম্পদে স্বাধীন হবে।

আর কে সি বোসের মনে কল্পনা, বিলাতি ওষুধের স্থান নেবে সব দেশী ওষুধ, দেশীয় গাছগাছড়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী ওষুধ দিয়ে পরাধীন ভারত স্বাবলম্বী হবে। স্বাবলম্বন কথাটা বড় প্রিয় ছিল তাঁর।

কলুটোলা স্ট্রীটে ছিল তখনকার দিনের ওষুধের পাইকারি কারবারের সেরা বাজার। সেখানে কথা বললেন দোকানীদের সঙ্গে। বিখ্যাত কবিরাজ চন্দ্রকান্ত সেনের সুবৃহৎ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় তখন কলকাতায় আর একটি সেরা কারবার। তাঁরা যেমন 'সুরবল্লী কষায়', 'চন্দ্রকান্ত রস' প্রভৃতি কবিরাজি ওষুধ বের করেছেন, তেমনি বের করেছেন সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশতৈল—'জবাকুসুম'। এখন 'জবাকুসুম হাউস' নামেই পরিচয় এই বৃহৎ কারবারের প্রধান দপ্তর ভবনটির। কোম্পানীর নাম সি কে সেন এণ্ড কোং। এই পরিবারেরই অন্যতম কৃতী সন্তান নগেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর কারবারের নাম কবিরাজ এন এন সেন এণ্ড কোং। তাঁদেরও কবিরাজি ওষুধের সঙ্গে আছে আর একটি বিখ্যাত কেশতৈল—'কেশরঞ্জন'। তাঁদের গদি চিৎপুর রোডে।

কলুটোলার সি কে সেনের বাড়িতে তখন বসেন দুই দিকপাল কবিরাজ

উপেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ সেন। দুজনের সঙ্গেই কার্তিকচন্দ্রের খুব বন্ধুত্ব। তাঁরা বয়সে বড়, তাই তাঁদের কার্তিক 'দাদা' বলেন, তাঁরাও এই তরুণ ডাক্তারটিকে নিজেদের ছোটোভাইয়ের মতই স্নেহ করেন।

শ্যামাপুকুর থেকে ঘোড়ার গাড়ি বড়বাজারে যাওয়ার পথে কলুটোলা হয়ে যায়, যাওয়া-আসার পথে অন্তত-পক্ষে একবার সে গাড়ি থামবেই কলুটোলার সেই বিখ্যাত বাড়িটিতে।

উপীনদা,---কুলেখাড়া দিয়েই রোগীটি সারিয়ে তুললাম---বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন কার্তিক।

উপীনদা অর্থাৎ কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, এসো এসো কার্তিক। কুলেখাড়া ব্যবহারে উপকার পেয়েছ তাহলে। কিন্তু তুমি বাপু মেডিক্যাল কলেজের গোল্ড মেডালিস্ট---এ সব কুলেখাড়া, লোধ, ইন্দ্রযব, সর্পগন্ধা, অর্জুন,---এ সবের দিকে নজর কেন? কবে না বলে বসবে কাশি হয়েছে, বাসকের পাতার রস খাওয়াও। ওহে লোকে যে তোমায় হাতুড়ে ডাক্তার বলবে।

কার্তিক বললেন---হাতুড়ে না বলুক ঐ রকমেরই একটা চমৎকার নাম আছে আমার,---'বাজার ডক্টর'। বলেছিলেন আমার প্রিন্সিপ্যাল। বলে তিনি পরম শ্রদ্ধাভরে শ্রদ্ধেয় ডা: বর্-ফোর্ডের তাঁর প্রতি স্নেহের নিদর্শনের ঘটনাটুকু সংক্ষেপে বললেন। তারপর বললেন---পুরোপুরি বাজার ডক্টর হতে হলে তো এই দেশী গাছগাছড়ায় রোগ-চিকিৎসার পদ্ধতিটা জানা দরকার। আর সেই জন্যই তো তোমার কাছে আসি উপীনদা। তোমার নির্দেশমত কত রোগী সারিয়েছিও ঐ সব পাতা-শিকড় খাইয়ে।

নগেন্দ্রনাথ পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি একজন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করছিলেন। চোখ বুজে নিবিষ্ট মনে রোগীর কব্জিটিতে আঙুল চেপে নাড়ীর সূক্ষ্ম গতি অনুভব করে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করছিলেন তিনি। বাত পিত্ত কফ---নাড়ীর গতিতে এই তিনটি তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে রোগ নির্ণয় করে সে যুগের কবিরাজেরা যে অমোঘ ওষুধপত্র ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন এ যুগের চিকিৎসায় তা সুদুর্লভ হয়ে পড়েছে। তখন একজন রোগী পরীক্ষা করতে অনেক সময় দিতে হত। রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েই সে সময় দিতে পারতেন, দিতেন, তাই ফলও পেতেন। এখন সব ঝড়ের গতিতে দ্রুত নিষ্পন্ন করা চাই, না হলে সময়ের সঙ্গে দৌড়ে পারা যাবে না। তাই কি চিকিৎসা বিভ্রাটের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়?

নগেন রোগী পরীক্ষা শেষ করে তার ওষুধ লিখে সহায়ক কবিরাজের হাতে ওষুধ তৈরী করে দিতে বলে কার্তিকচন্দ্রের কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন, নতুন খবর কি কার্তিক।

কার্তিকচন্দ্র বললেন---এইমাত্র উপীনদা বললেন না, আমি দিশী গাছগাছড়ায় চিকিৎসা করতে গিয়ে কবে হয়ত রোগীকে কাশির জন্য বাসক পাতা খাওয়াবো।

কিন্তু এটা আর 'যদি', 'হয়ত', নয়, নির্জলা সত্য। সত্যিই আমি কাশির জন্য সিরাপ বাসক নামে একটি ওষুধ প্রেসক্রাইব করছি, আর তাতে চমৎকার ফল পাচ্ছি।

বল কি হে কার্তিক। এ যে আমাদের আয়ুর্বেদের ওষুধ হে। সিরাপ বাসক কে করলে?

কার্তিক ডক্টর পি সি রায়ের পরিচয় দিয়ে বটকৃষ্ণ পালের দোকানের ঘটনা, তাঁর বাসগৃহে বেঙ্গল কেমিক্যালের ছোট্ট ওষুধের কারখানায় কিভাবে ওষুধ তৈরী হয়, এই জ্ঞানতপস্বী বৈজ্ঞানিক কিভাবে দেশীয় গাছগাছড়ার নানারকম ওষুধ তৈরী করবার সংকল্প করে এগিয়ে চলেছেন কিন্তু অর্থাভাবে, স্থানাভাবে, লোকাভাবে চাহিদার উপযুক্ত পরিমাণে মাল তৈরী করতে পারছেন না।---সব ঘটনাই বললেন একে একে।

তারপর বললেন---মাত্র আটশ টাকা মূলধনে তিনি কারবার শুরু করেছিলেন। মূলত এটাও ছিল একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। এখন টাকা ফেললে এটিকে একটি সত্যকারের লাভজনক কারবারে পরিণত করা যায়।

শুনে দুই ভাই গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন---দেখ হে, আমাদের এই কবিরাজি ওষুধ যে লার্জ স্কেলে করলে চলে তাও তো আমরা করে দেখছি। নিজেদের রোগীর জন্য ব্যবহারের মাল তৈরী করেও ডাকে অনেক ওষুধ সরবরাহ করি। দূর দূর দেশ থেকে রোগীরাও ওষুধ নেয়, অনেক কবিরাজও ওষুধ কেনেন। তোমরা যদি কলকব্জা বসিয়ে বড় করে কারখানা গড়ে তুলতে পারো সত্যি একটা কাজের মত কাজ হয়। বাঙ্গালীর যৌথ কারবার চলে না এটাই চালু কথা। তোমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা উদ্যোগী হয়ে একে যদি একটি যৌথ কারবার রূপে দাঁড় করাতে পারো তাতেও মহৎ দৃষ্টান্ত দেখানো হবে। আরও দশজন এভাবে কাজ কারবার করতে উৎসাহী হবে।

নগেন বললেন---তুমি চেষ্টা কর কার্তিক। আমরা আছি তোমার সঙ্গে।

●

সেদিন চেম্বারের কাজ চুকিয়ে বন্ধু ভূতনাথকেও কথাটা বললেন কার্তিক। ভূতনাথ পাল---বটকৃষ্ণ পালের ছেলে এবং সুবৃহৎ কারবারের কর্ণধার, অগাধ পয়সার মালিক।

ভূতনাথ শুধু ভালোবাসেন না কার্তিককে, শ্রদ্ধাও করেন তাঁর কর্ম-দক্ষতায়, তাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর সুগভীর জ্ঞানে। ভূতনাথ কারবারী লোক, বিচক্ষণ ব্যবসায়ী তিনি। সুতরাং দেশীয় ওষুধের কারখানায় যে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় নয়

এটাও বললেন তিনি—বিশেষ করে যে কারবারের মেরুদণ্ড হলেন ডক্টর পি সি রায়ের মতো কুশলী বিজ্ঞানী আর ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসুর মতো নিপুণ চিকিৎসাশাস্ত্রী।

ভূতনাথও রাজি হলেন কার্তিককে সহায়তা করতে।

ভূতনাথের আগ্রহী হওয়ার আরও কারণ ঘটেছিল। বিশ্বাস হয়েছিল ওষুধ তৈরী করবার ব্যাপারে কার্তিকের ক্ষমতার উপর। এবার বলি সেই ঘটনাটা।

কিন্তু তার আগে বলে রাখি—কার্তিক স্থির করলেন, ডক্টর রায়কে বলবেন—কারখানা বাড়াবার জন্য মূলধন তুলে কোম্পানীকে যৌথ কারবারে পরিণত করতে হবে।

॥ বার ॥

যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা ঘটেছিল সকলের অলক্ষিতে কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, এইভাবেই সকলের অজ্ঞাতে ভারতবর্ষে সত্যিকার দেশীয় পেটেণ্ট ওষুধ প্রবর্তন ঘটবে ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসুর হাত দিয়ে, যদিও কার্তিকও জেনেশুনে সে কাজ করেন নি। পৃথিবীতে অনেক মহৎ ভাবনার বীজ এমনই অকিঞ্চিৎকরভাবেই উপ্ত হয়, এবং যার হাত দিয়ে তা হয় হয়ত সে নিজেও তা জানতে পারে না।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। বটকৃষ্ণ পালের দোকানে একদা স্বয়ং বটকৃষ্ণবাবুর নজরে পড়েছিল কয়েকটি এক আউন্স শিশিভর্তি ওষুধ কাউণ্টারে সাজানো। তাই দেখে অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রবীণ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণবাবু সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এক উৎসাহী ছাত্রের মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত কার্তিকচন্দ্র বসুর।

এবার অনুরূপ আর একটি ঘটনা নজরে পড়ল বটকৃষ্ণ পালের পুত্র ভূতনাথ পালের। তিনিও লক্ষ্য করলেন, কাউণ্টারে মোট ন'টি চার আউন্স শিশিভর্তি ওষুধ, তাতে একই লেবেল লাগানো। অর্থাৎ একজন রোগীর নামে একই প্রেসক্রিপশনে এক ওষুধ ভরা নয় শিশি।

স্বভাবতই তাঁর কৌতূহল উদ্রিক্ত হল। এটি কম্পাউণ্ডারের ভুল, না রোগীর খেয়াল—জানা দরকার। ডাক পড়ল ভূতনাথবাবুর টেবিলে হেড্ কম্পাউণ্ডারের।

তিনি গিয়ে যা বিবরণ দিলেন, তা আরও চমকপ্রদ। তিনি বললেন, এই প্রেসক্রিপশানে এ যাবৎ সত্তর-বাহাত্তর শিশি ওষুধ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে এক শিশি করে, শেষে তিন-চার শিশি করে একসঙ্গে এক ভদ্রলোক নিয়ে যেতেন। এবার তা ন' শিশিতে পৌঁচেছে নগদ দাম দিয়ে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান অনুসারে ওষুধ নিতে চাইলে না দেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ভূতনাথবাবু ব ল লে ন,—ক্রেতা ভদ্রলোকটি যখন ওষুধ নিতে আসবেন তাঁকে যেন ভূতনাথবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হয়।

বিকেলের দিকে এলেন এক ভদ্রলোক। অফিস-ফেরত ঘরমুখো ডেইলি প্যাসেঞ্জার। এসেই তিনি তাগাদা দিলেন তাঁর ওষুধের জন্য। তাঁর দাঁড়াবার সময় ছিল না।

খবর পেয়ে ভূতনাথবাবু তাঁকে সমাদর করে বসালেন, তারপর কেন তিনি একই ওষুধ বারম্বার এতগুলি করে কেনেন তার কারণ জানতে চাইলেন।

সে ভদ্রলোক বললেন—তাঁর বাড়ি সোনারপুর। তিনি রোজ কলকাতায় এসে অফিস করেন। মাস ছয়েক আগে একবার ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে জীর্ণসার হয়ে এখানে এসে ডাক্তারকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে যান। সেই ওষুধ খেয়ে তাঁর ম্যালেরিয়া সেরে যায়। খানিকটা ওষুধ ছিল, তাই খাইয়ে বাড়ির আর একজনেরও উপকার হয়। তাই বাড়ির কারো ম্যালেরিয়া হলে তিনি এই ওষুধটি কিনে নিয়ে খাওয়ান, তাতেই জ্বর সারে। এখন পাড়া-প্রতিবেশীদেরও এই ওষুধ কিনে নিয়ে দেন, তাতে তারাও নিরাময় হয়।

ভূতনাথবাবু ব্যবসায়ী লোক। জিজ্ঞাসা করেন—বোতল বোতল ওষুধ বয়ে নিয়ে গিয়ে আপনার তো ঝামেলা পোহাতে হয়।

ভদ্রলোক বললেন—ঝামেলা ঠিক না। দেশে ছোট একটু দোকান আছে। সেখানেই ওষুধগুলি রাখি, যার দরকার সে নিয়ে যায়। আমার তাতে দু পয়সা থাকে।

বটে!—কথাটা ভাববার মত। ভাবলেন ভূতনাথবাবু। সে ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে কম্পাউণ্ডারকে ডেকে সেই প্রেসক্রিপশানখানা আনালেন। অনেকগুলি ওষুধের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একটি ম্যালেরিয়া মিকশ্চার। প্রেসক্রিপশানের তলায় স্বাক্ষরদাতার নামের আদ্যক্ষর ডাক্তারখানায় প্রেসক্রিপশান বুকে লেখা আছে।—কে, সি, বি, উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভূতনাথবাবুর মুখ। বন্ধুবর কার্তিকের প্রেসক্রিপশান। সাত মাস আগে লেখা, এখনও তারই অনুসরণ করে বোতল বোতল ওষুধ তৈরী হচ্ছে, লোকে খাচ্ছে, উপকার পাচ্ছে, নিরাময় হচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাঃ বোস বটকৃষ্ণ পালের দোকানের ডিস্পেনসারিতে গেলে ভূতনাথবাবু তাঁর চেম্বারে এলেন। এমন অনেক দিন আসেন। সময় পেলে এবং ঘর খালি থাকলে বন্ধুর সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করে যান। ডাঃ বোস তাই ভূতনাথবাবু তাঁর চেম্বারে আসায় বিশেষ কিছু তাৎপর্য অনুভব করলেন না।

কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন—তিনি সেদিন অভিভূত ভূতনাথ। তিনি এসেই বললেন—কার্তিক একবার আমার এখানে এসো। একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটেছে, দেখবে এসো।

ডাঃ বোস রোগীদের একটু বসতে বলে গেলেন ভূতনাথবাবুর সঙ্গে।
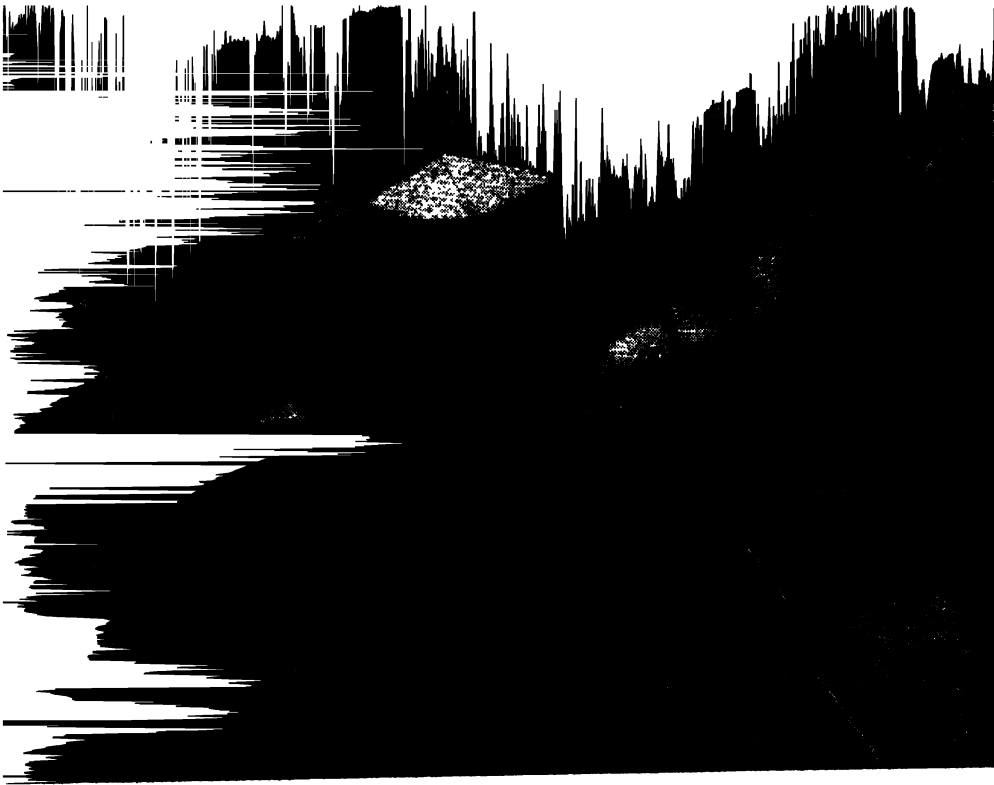
[ক্রমশ।

জনারণ্য

—[illegible] কুণ্ডুচৌধুরী

(২য় পুরস্কার)

মাসিক বসুমতী আশ্বিন / '৭৫

—আশুতোষ সিংহ

(৩য় পুরস্কার)

মাসিক বসুমতী পড়তে পড়তে
—আশুতোষ সিংহ

মাসিক
বসুমতী
আশ্বিন / '৭৫

থিরবিজুরী

—অভিজিৎ দাশগুপ্ত

জনারণ্য

—সমীরকুমার দত্ত

(১ম পুরস্কার)

॥ [illegible] ॥
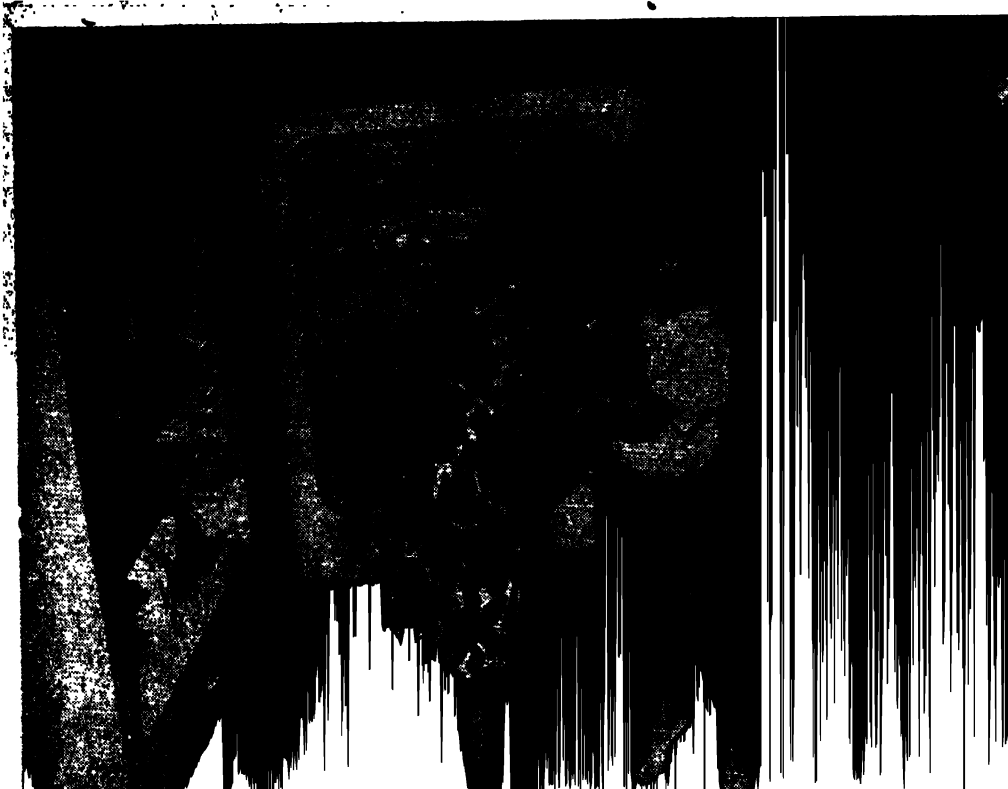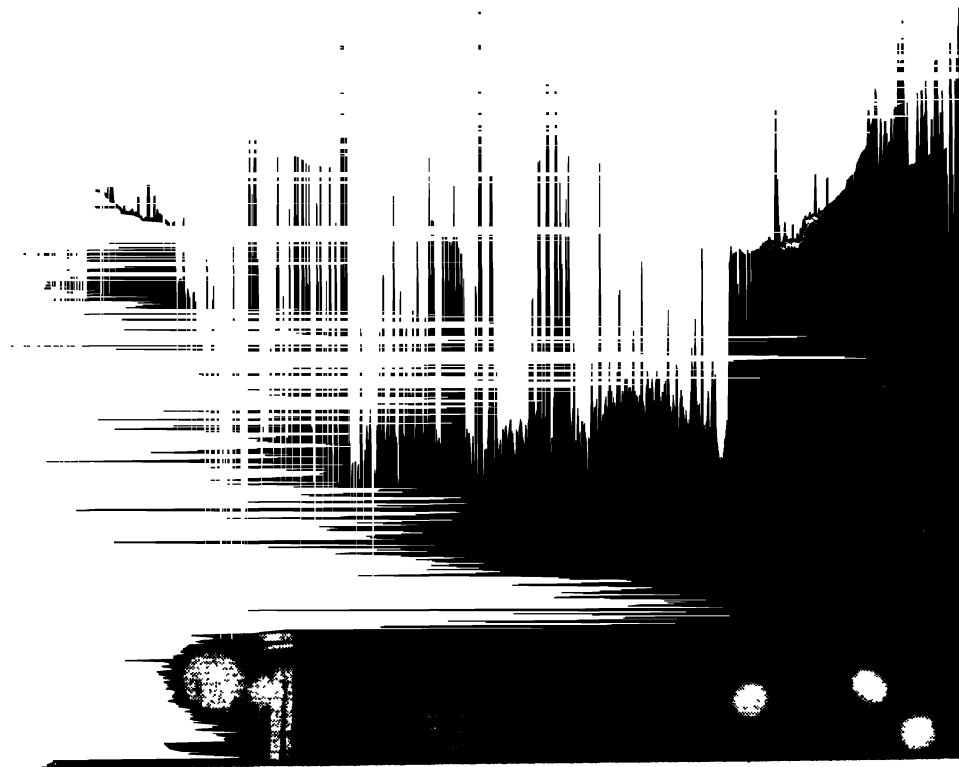
বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিয়ে অমল বলল, 'এসো।'

আমি ভেতরে ঢুকতেই আবার দরজায় তালা লাগিয়ে দিল অমল। তারপর দুজনে আমার ঘরে চলে এলাম।

অমল আমার বিছানায় বসল। সারাদিনের ধুলোবালি-মাখা চট্‌কানো জামাকাপড় খুলতে খুলতে আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, তুমি আমার ঘরে বসে-ছিলে।'

অমল বলল, 'কেন থাকতে নেই?'

এ বাড়িতে অমলের কাছেই আমি সব চাইতে সহজ হতে পেরেছি। শুধু এ বাড়িতে কেন, সীমান্তের এ পারে এই একটিমাত্র মানুষ যার কাছে অসঙ্কোচে নিজেকে মেলে দিতে পারি অবশ্য এ ব্যাপারে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল হয়ে যদি উঠতে পেরে থাকি তা অমলেরই জন্য। ছেলেটা এমনই, নিজের চারদিকে যে দেয়াল তুলে দরজা জানলা বন্ধ করে থাকতে পারে না এবং অন্য কারোকেও ঐভাবে থাকতে দেয় না। যাই হোক বললাম, 'না, ঠিক তা নয়। তবে---'

'কী?'

'আমার ঘরে আগে আর কখনও তোমাকে এমন করে বসে থাকতে দেখিনি তো। তাই---'

'অবাক হয়ে গেছ, না?'

'তা একটু হয়েছি।'

মুচকি হেসে অমল বলল, 'কৃতজ্ঞতা, বুঝলে ভাই, স্রেফ কৃতজ্ঞতার জন্যে আমি তোমার ঘরে বসে তোমার অপেক্ষা করছিলাম।'

ঈষৎ বিমূঢ়ের মতন বললাম, 'কৃতজ্ঞতা।'

'ইয়েস।' আস্তে করে মাথা নেড়ে অমল বলল, 'রোজ রোজ তুমি আমাদের দরজা খুলে দাও; একটা দিন তোমাকে না দিলে কখনও চলে। এটা হল মিউচুয়াল কো-অপারেশন---পারস্পরিক সহযোগিতা।'

হেসে ফেললাম, 'প্রতিদান দিচ্ছ।'

'যা বলো।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর অমলই সুরু করল, 'তুমি তো জান, সারাদিন, তারপর এতখানি রাত পর্যন্ত ছিলে কোথায়?'

'সুরেশবাবু---ঐ যে তুমি যাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে---' আমি বলতে লাগলাম, 'তাঁদের সঙ্গে মিছিলে বেরিয়েছিলাম।'

'মিছিল।'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম, 'উদ্বাস্তদের নিয়ে ওঁরা আজ মিছিল বার করেছিলেন।'

'কিন্তু---' অমলকে চিন্তিত দেখাল, 'সুরেশদা তোমাকে পেলে কি করে?'

'পরশুদিন উনি এ বাড়িতে এসে-ছিলেন। মিছিলে যাবার জন্যে বার-বার করে অনুরোধ করে গেছেন।'

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

প্রফুল্ল রায়

মনুষ্যকুলে আমি পুরোদস্তুর নিশাচর; মাঝরাতের আগে বাড়ি ফেরা আমার কুষ্টিতে নেই। আজ কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসেছিলাম।'

'রেকর্ড করেছ তা হলে।' আমি হাসতে লাগলাম।

'রেকর্ডই বটে।' অমল আমার গলা মিলিয়ে হেসে উঠল।

'তা হঠাৎ এ রকম দুর্মতি কেন?'

'শরীরটা ভাল লাগছিল না, তাই চলে এসেছি। আর এসেই---'

'কী?'

'তোমার খোঁজ করেছি কিন্তু হিজ ম্যাজেস্টির পাত্তাই নেই। মঙ্গলের কাছে শুনলাম, 'বেরিয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ।'

'তাই নাকি। বেশ---' অমলের চোখ কৌতুকের আলোয় চিকচিক করতে লাগল, 'সুরেশচন্দর তা হলে তোমাকে বাগাতে পেরেছে। ওর মিছিলে এখন পর্যন্ত তুমিই তা হলে লাস্ট রঙরুট।'

'রঙরুট।'

'ঐ রিক্রুট আর কি।'

জামাকাপড় ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, আধময়লা একটা লুঙ্গি আর হাফসার্ট পরে গায়ে চাদর জড়িয়ে অমলের পাশে এসে বসলাম, 'রিক্রুট-টিক্রুট কিছু না। উদ্বাস্তদের ব্যাপার, আমি নিজেও উদ্বাস্ত। তাই কৌতূহল হয়েছিল, গিয়েছিলাম।'

অমল শুধালো, 'মিছিল কি রকম হল?'

'ভালই।'

'বড়?'

'মন্দ না একেবারে।'

'কত লোক হবে?'

'তা হাজার দু-আড়াই।'

'বাঃ বাঃ, সুরেশদা বেশ উন্নতি করে ফেলেছে, দেখছি।'

অমল কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম।

অমল আমার মনের কথাটা বুঝিবা পড়তে পারল। বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই টের পেয়েছ সুরেশদা এ অঞ্চলের ছোটখাটো একজন উদ্বাস্তু নেতা। তবে কেউ ওকে নেতা বানায় নি, আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ম্ভু বলতে পার।'

আমি হাসলাম।

অমল বলতে লাগল, 'আজ তিন বছর ধরে সুরেশদা মিছিল বার করে চলেছে।'

'তিন বছর।'

'ইয়েস।'

'প্রথম প্রথম দু-চারজনের বেশি জুটত না। যা জুটত তাই নিয়েই বেরিয়ে পড়ত সুরেশদা। রাইটার্স বিল্ডিং আর রাজভবনের কাছে গিয়ে শ্লোগান দিয়ে আসত।' অমল বলতে লাগল, 'ভদ্রলোকের যাই বলো, টেনাসিটি আছে। হাল ছেড়ে বসে থাকেনি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লেগে থেকে এখন তো রীতিমত বড় মিছিলই বার করছে। দেখা যাক, রিফিউজিদের জন্য সুরেশদা কতদূর কি করতে পারে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

অমল আবার বলল, 'তা আজ কোন পর্যন্ত যেতে পেরেছিলে?'

'রাজভবন পর্যন্ত।' আমি বললাম, 'ওখানে যেতেই পুলিশ পথ আটকাল।'

'তারপর?'

'সুরেশদা বক্তৃতা-টক্তৃতা করল। তারপর মেমোরেণ্ডাম দিতে রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়েছিল।'

অমল বলল, 'তিন বছর ধরে ঐ এক জিনিষ চলছে। মিছিল, বক্তৃতা, মেমোরেণ্ডাম। যাক ও সব।' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল তার, 'ভাল কথা—'

আমি উন্মুখ হলাম, 'কী?'

'সন্ধ্যের পর এক ভদ্রলোক তোমার খোঁজে এসেছিলেন।'

'কী নাম বল তো?'

'শিশিরকুমার মুখুটি।'

'শিশির মুখুটি।' আমি অবাক হয়ে গেলাম ; সেই সঙ্গে চিন্তাগ্রস্তও। হঠাৎ কি এমন হতে পারে যাতে শিশির মুখুটি সুদূর বাগবাজার থেকে মহানগরীর দক্ষিণ মেরু এই যাদবপুরে ছুটে এসেছিলেন।

অমল ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ।'

'ভদ্রলোক কে?'

'কেউ না। দেশ থেকে আসতে আসতে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। তা কিছু বলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'আসছে বুধবার ওঁর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ। তোমাকে বারবার করে যেতে বলে গেছেন। তুমি তো শ্মশানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে শ্মশানবন্ধুই হয়েছ।'

আমি চুপ করে রইলাম। শিশির মুখুটির কথা আমার মনেই ছিল না। মাঝখানের কটা দিন, নানারকম ঘটনা আর অজস্র ঘটনা এলোমেলো উদ্দাম ঢেউয়ের মতন আমাকে এমনভাবে দুলিয়ে গেছে যে শিশির মুখুটি বা তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর মতন নিদারুণ মর্মান্তিক ব্যাপারও ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলি নি, ঠিক তারা কিছু আড়ালে সরে গিয়েছিল।

খুব আস্তে অন্যমনস্ক গলায় বললাম, 'হ্যাঁ। শ্মশান বন্ধুই তো।'

অমল বলল, 'ভদ্রলোককে আমি কথা দিয়েছি ; তোমাকে পাঠিয়ে দেব। না গেলে কিন্তু আমি নিজের কাছেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ব।'

আগের সুরেই বললাম, 'যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাব।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর অমল বলল, 'আরেকটা খবর আছে।'

'কী?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

কিছু না বলে, অমল হঠাৎ জোরে জোরে হেসে উঠল।

আমি অবাক, 'হাসছ যে।'

'হাসির ব্যাপার ঘটেছে, তাই।'

'কী ব্যাপার?'

'এ বাড়ির ওল্ড ম্যান। আমাকে নোটিশ দিয়েছে।'

বিদ্যুৎ চমকের মতন আমার মনে পড়ে গেল। পিসেমশাই উচ্ছেদের দেবার জন্য সেদিন একটা নোটিশের ড্রাফট মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন এবং আমি খাতায় তা টুকে নিয়েছিলাম তারপর সেটা দু কপি টাইপ করে খামে পুরে তিনি মঙ্গলের হাতে দিয়েছিলেন। খামের ওপর অমল আর বিমলের নাম ছিল। মঙ্গল তা হলে খাম দুটো জায়গামতন পৌঁছে দিয়েছে।

সব জেনেশুনেও রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের নোটিশ?'

'উচ্ছেদের।'

'উচ্ছেদ।'

'হ্যাঁ ভাই।' অমল বলতে লাগল, 'চাকরি-বাকরি করি না ; এম-এ পড়তে পড়তে পড়াও ছেড়ে দিয়েছি। দামড়া বেকার ছেলেকে কতকাল আর পুষবেন, বাবা ঠিকই করেছেন। নিজের পথ এবার নিজেকেই দেখতে হবে।'

আমি নিশ্চুপ।

অমল আবার বলল, 'বাবা কালই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। তবে—'

'কী?'

'এত অল্প সময়ের নোটিশে তো যাওয়া যাবে না। ভাবছি—' বলতে বলতে অমল থেমে গেল।

উদ্বিগ্নমুখে আমি জানতে চাইলাম, 'কী ভাবছ?'

'ওল্ড ম্যানের কাছে কাল সকালে একটা এ্যাপীল করব।'

'কিসের এ্যাপীল?'

'আর দিন পনের আমাকে যেন এখানে থাকতে দেওয়া হয়। পনেরটা তো মোটে দিন ; নিশ্চয়ই থাকতে দেবেন, না কি বলো?'

উত্তর দিলাম না।

অমল থামেনি। 'দুম করে চলে যাবার নোটিশটা পেলাম। চলে যাও বললেই তো আর যাওয়া যায় না। অন্য একটা আস্তানা খুঁজবার সময়ও তো দেওয়া উচিত। হিউম্যান গ্রাউণ্ডেই দেওয়া উচিত। পনের দিন টাইম পেলে নয়া ডেরার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে উঠতে পারব।'

আমি এবারও চুপ।

একটু ভেবে অমল বলল, 'সারা-দিন ঘুরে টায়ার্ড হয়ে এসেছ; আর তোমাকে বিরক্ত করব না। আচ্ছা, এখন চলি। তুমি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়।'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল আমার, 'না-না, বিরক্ত মোটেও হচ্ছি না। খিদে নেই, আজ রাত্তিরে আর খাব না। তুমি বোসো।'

অমল বসল না; 'আজ আর না ভাই। তোমার ঘুম না পেলেও আমার পেয়েছে।' বলে একটুখানি হেসে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলে গেল।

খুব আমার খুব খারাপ লাগতে লাগল। অমল চলে গেলে এ বাড়িতে থাকার আকর্ষণ আর আনন্দের প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার হাতে যদি এতটুকু ক্ষমতা বা উপায় থাকত, তাকে কিছুতেই এভাবে চলে যেতে দিতাম না।

একসময় আলোটালো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুলাম কিন্তু ঘুম এল না। অশ্রান্ত ক্ষুব্ধ গুঞ্জনের মতন মাথার ভেতর অমল ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে হানা দিতে লাগল। আর তারই ফাঁকে একবার বিমলের কথা মনে পড়ে গেল। বিমল---বিমলও তো অমলের মতনই নোটিশ পেয়ে বসে আছে। তার প্রতি-ক্রিয়াটা জানা গেল না।

কতক্ষণ বিছানায় ছটফট করেছি, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি---মনে নেই।

●

পরের দুটো দিন আর বাড়ি থেকে বেরুলাম না। পিসেমশাইর ডাইরি আর হিসেবের খাতাগুলো দেখে দেখেই কাটিয়ে দিলাম।

দুদিন পর পিসেমশাই বললেন, 'তুমি কিন্তু একটা কথা একবারেই ভুলে গেছ চিরঞ্জীব।'

'আজ্ঞে---' আমি চকিত হলাম।

'হিরণ্ময় মানে আমার সেই বন্ধুটি তোমাকে ওর বাড়ি যাবার জন্য বলে গিয়েছিল; নিশ্চয়ই যাওনি---'

সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। সঙ্কুচিত বিব্রতমুখে বললাম, 'আজ্ঞে না। কতক-গুলো ঝঞ্ঝাটে এমন জড়িয়ে পড়ে-ছিলাম---'

'কাল রাত্তিরে হিরণ্ময় আমাকে ফোন করেছিল।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'তোমার কি ও-বেলা, এই ধরো সন্ধ্যে নাগাদ কোন কাজ আছে?'

'আজ্ঞে না।' আমি মাথা নাড়লাম।

'তা হলে আজই একবার হিরণ্ময়ের বাড়ি যাও। বেচারা তোমার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।'

'আচ্ছা যাব।'

'আমি কিন্তু হিরণ্ময়কে ফোন করে দিচ্ছি।'

'দিন।'

'দেখো আবার ভুলেটুলে যেও না।'

'আজ্ঞে না।'

'হ্যাঁ, ভালো কথা---' আমার চোখের ভেতরে তাকিয়ে পিসেমশাই শুধোলেন, 'হিরণ্ময়ের ঠিকানা তুমি জানো?'

'জানি। সাদার্ন এ্যাভেনিউতে। নম্বরটা আমার খাতায় লেখা আছে।'

'গুড।'

●

সারাটা দিন খবরের কাগজ পড়ে, চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে, নানা অফিসে দরখাস্ত ছেড়ে কাটিয়ে দিলাম। তার ফাঁকে অবশ্য চান---খাওয়া এবং সামান্য একটু দিবানিদ্রাও সেরে নিয়েছি। তারপর সন্ধ্যের আগে স্যুটকেশ থেকে পরিষ্কার জামাকাপড়টি বার করে পরে নিলাম। অবশেষে চুলটি ভাল করে আঁচড়ে ন্যাকড়ায় জুতোর উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাসে করে ঢাকুরিয়া লেক পর্যন্ত সেখান থেকে সাদার্ন এ্যাভেনিউ ধরে হাঁটতে সুরু করলাম।

চমৎকার রাস্তা। এখানে ট্রামের ঘর্ঘর নেই। দু'ধারে মসৃণ পীচের মাঝখান দিয়ে সবুজ ঘাসের আইল্যাণ্ড। মখমলের মতন নরম ঘাসে পা ডুবিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

সহরের এই প্রান্তটি মনোরম। এখানে ভিড় কম, উচ্চকণ্ঠ চিৎকার নেই বললেই চলে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, নানা রঙের মেলা বসে গেছে যেন। সুবেশ নরনারীর দল অলস মন্থর পায়ে লক্ষ্যহীনের মতন বেড়াচ্ছে। আয়ার দল প্র্যাম ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভেতর কুট-কুটে ফুলের মতন একেকটা বাচ্চা।

খানিকটা বেড়িয়ে একসময় হিরণ্ময় সোমের ঠিকানা খুঁজে বার করলাম। বিরাট কম্পাউণ্ডওলা সুদৃশ্য তিনতলা বাড়ি। সামনের দিকে নুড়ি বসানো পথ; তার দু'ধারে ঘাসের লন। ঝাউ গাছ, টেনিস কোর্ট ফোয়ারা এবং আরো অনেক কিছু সুন্দরভাবে লনের গায়ে সাজানো।

হিরণ্ময় সোম কতখানি ভাগ্যবান আর্থিক কৌলীন্যের কোন স্তরে তাঁর প্রতিষ্ঠা---এই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তা যেন খানিক অনুমান করতে পারলাম।

যাই হোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলাম। ভেতরে ঢুকতে ভরসা হচ্ছে না। একেকবার দুঃসাহসে ভর করে যদিও বা দু পা এগোই, সঙ্গে সঙ্গে দশ পা পিছিয়ে আসি।

একটা উর্দিপরা নেপালী দারোয়ান গেটের কাছে বসেছিল। আমার এই দ্বিধান্বিত ভীত ভাবটা হয়ত সে লক্ষ্য করে থাকবে। হঠাৎ লোকটা উঠে এল; আমার কাছাকাছি এসে বলল, 'আপনি কি ব্যানার্জিবাবু? চিরঞ্জীব ব্যানার্জী?'

'হ্যাঁ।' আমি অবাক। লোকটা কি খড়ি পাততে হাত গুণতে জানে?

আমার বিস্ময় বা বিমূঢ়তা খেয়াল করল না লোকটা। বলল, 'সাহাব বলে রেখেছেন, আপনি আসবেন। আসুন আমার সঙ্গে---'

'সাহাব কে?'

'সোম সাহাব---এ বাড়ির মালিক।'

'হিরণ্ময় সোম?'

'জী---আসুন।'

নেপালী দারোয়ান সামনের দিকে পা বাড়াল; আমি তাকে অনুসরণ করলাম। [ক্রমশ।

স্কেচ্ শিল্পী: অরুণ সরকার

বঙ্কিম সাহিত্যে বঙ্গনারী

ডাঃ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভা শুধুই ভাষাসম্পদ ও বাক্যবিন্যাসেই পরিসমাপ্ত হয় নাই, চরিত্র বিশ্লেষণে, বিশেষ নারী চরিত্র নিরূপণে তাহা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। নারী-চরিত্র বলিতে আমাদের এই বাংলা দেশের তদানীন্তন কালের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েও বলা যায় বা তৎপূর্বের বঙ্গসমাজের নারী-সমাজের কথা, অথবা সরল কথায় বাঙালী মেয়েদের বুদ্ধিমত্তা, সাহস, চরিত্রবল প্রভৃতির চিত্র যে অপূর্বভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত বা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

বর্তমানে সর্বদায় আমাদের দেশে বলা হয় এটা নারী প্রগতির যুগ, অর্থাৎ এখনকার মেয়েরা আগেকার স্ত্রীলোকদিগের মত নিরক্ষর থাকে না বা হাঁড়ি-বেড়ি লইয়া কাটাইতে চাহে না। আজকালকার মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে, চাকুরী করে, এককথায় পুরুষের সঙ্গে সমান পর্যায়ে কাটাইতে চাহে।

অবশ্য এই প্রবন্ধে বর্তমান নারী প্রগতির সমালোচনা করা মোটেই উদ্দেশ্য নহে। এ প্রবন্ধের বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থাবলীতে বাংলা দেশের তথাকথিত অশিক্ষিত নারীরাও কত উচ্চাবস্থা লাভ করিতেন ও অসামান্যা চরিত্রবতী হইতেন তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা, সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া না শিখিলেও, সাহস, নির্ভীকতা ও চরিত্রবলের পরিচয় পাওয়া যায়, 'চন্দ্রশেখরের' 'শৈবলিনী' চিত্রে, অপূর্ব রূপলাবণ্যমণ্ডিতা পূর্ণযুবতী শৈবলিনী ভীমা পুষ্করিণীতে এক সন্ধ্যাকালে নমদিনী সুন্দরীর সঙ্গে গাত্রধৌত করিতে গিয়া সহসা লক্ষ্য করিল যে পুষ্করিণীর অপর তীরে নীলকুঠির দুষ্ট ইংরাজ ফস্টর জঙ্গলের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে, তাহা দেখিবামাত্র সুন্দরী জল হইতে উঠিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু শৈবলিনী তিলমাত্র ভীতা না হইয়া আরও গভীর জলে গাত্র নিমজ্জিত করিয়া ঐ লোলুপ সাহেবের দিকে রক্তচক্ষু হইয়া স্থির হইয়া রহিল এবং সাহেবকে নানারূপ গালিগালা করিতে লাগিল।

সাহেব বাঙ্গালা ভাল বুঝিত না, কিন্তু শৈবলিনীর নির্ভীকতা ও চক্ষুর তীব্রদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া সেদিনকার মত সে স্থান ত্যাগ করিল এবং যাইবার সময় নিজ ভাষায় 'গুড বাই' বলিতে বলিতে গেল।

তাহা শুনিয়া শৈবলিনী উত্তর দিয়াছিল, 'আমরণ। আবার ভাই ভাই বলা হচ্ছে, খেংরে বিষ ঝেড়ে দেবো হারামজাদাকে।'

এই সাহস এই বঙ্গ যুবতীর কোন স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখিয়া হয় নাই, ইহা তাহার স্বভাবজাত, বঙ্গনারীর চরিত্রসিদ্ধ, এইরূপ নির্ভীকতা ও তৎসহ পরিহাসরসিকতা বাঙ্গালী বালিকার চরিত্রের আরও একটি অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন, সাহিত্য সম্রাট তাঁহার জাতীয় উন্মেষকারী চিরস্মরণীয় আনন্দমঠ গ্রন্থে ; শান্তির চরিত্রে।

আনন্দমঠের একজন সন্তান ব্রহ্মচারী জীবানন্দের স্ত্রী শান্তি। সন্তানধর্মে দীক্ষিত হইবার পর জীবানন্দ স্ত্রী শান্তির জন্য আশ্রয় রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার পর তাহাকে এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে মহেন্দ্রের অসহায়া শিশু-কন্যাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উহাকে লইয়া ভগিনী নিমাইয়ের নিকট স্বগ্রামে গিয়া পড়িলে, নিমাইয়ের পীড়াপীড়ি ও কৌশলের দ্বারা পরিত্যক্ত স্ত্রী শান্তির সহিত দেখা হইয়া যায় ও তাঁহার স্ত্রীর অতিশয় ছিন্নবস্ত্র শীর্ণ দেহ দেখিয়া তাঁহার নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়ে।

ইহা দেখিয়া শান্তি তাঁহাকে বলিল, 'ছিঃ তুমি কাঁদিও না, তুমি বীর। আমি পৃথিবীতে বড় সুখী যে আমি বীরপত্নী'---ইত্যাদি।

এই ক্ষুদ্র বালিকার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিতেছেন, 'শান্তির অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সংসারে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না, কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে পড়াইতেন শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিত। এই পুরুষের সাহচর্যের ফলে হইল শান্তি কখন মেয়ের মত কাপড় পড়িতে শিখিল না, দ্বিতীয়ত, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিখিতে লাগিল ও বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল।

'অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন ও ব্যাকরণের সঙ্গে দু'একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন। ক্রমে পিতা পরলোকগমন করিলেন।

এখানে দ্রষ্টব্য যে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অর্থাৎ ইংরাজী না শিখিয়াও এই শান্তি একসময় এক ইংরাজ যুদ্ধ অফিসার ক্যাপ্টেন টমাসকে, শৈবলিনীর ন্যায়ই নির্ভয়চিত্তে এমন কি পরিহাস করিতে করিতে তাহার প্রাণবধের পরিবর্তে হাস্যরসিকতার সহিত বলিয়াছিল, 'সাহেব, আমরা স্ত্রীলোক--কাহাকেও আঘাত করি না, একটা কথা জিজ্ঞাসা

করিতেছি আমার একটি রূপী বাঁদর ছিল সেটা সম্প্রতি মরে গেছে, কোটর খালি পড়ে আছে, কোমরে ছেকল দেব তুমি ঐ কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্তমান কলা হয়, খাবে?'

সাহেব উত্তর দিলেন, 'টুমি বড় স্পিরিটেড উওম্যান, তোমার ক্যারেক্টে হামি খুশী আছি, ইত্যাদি।

শুধু যে নির্ভীকতা ও হাস্য-পরিহাসে শান্তি পারদর্শিনী ছিলেন তাহা নহে, সাহসে ও বুদ্ধিমত্তায় যে ঐ সাধারণ বাঙ্গালী যুবতী পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে দুর্বল নয়, বরং সমকক্ষ তাহা বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, যখন ক্যাপ্টেন টমাসের হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া, দূরে নিক্ষেপ করিয়া শান্তি অতিশয় বিদ্রূপের সহিত সাহেবকে গালিগালাজ অথবা পরিহাস করিয়াছিল বঙ্কিমের ভাষায় এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরিচয় এইখানে প্রদান করিলে বড়ই চিত্তাকর্ষক হয়। যথা—

সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত কুসুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া 'ও কে? এক নবীন সন্ন্যাসী রূপে বন আলো করিয়াছে। ক্যাপ্টেন টমাস বিস্মিত হইলেন-----বলিলেন টুমি কে? সন্ন্যাসী বলিল, আমি সন্ন্যাসী। ক্যাপ্টেন---'তুমি রিবল্, হামি টোমায় গুলী মারিব।' সন্ন্যাসী, 'মার' ক্যাপ্টেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন, এমন সময় বিদ্যুৎবেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণ-চর্ম খুলিয়া ফেলিল। একটানে জটা খুলিল। সাহেব দেখিল অপূর্ব স্ত্রীমূর্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'সাহেব আমি স্ত্রীলোক কাহাকেও আঘাত করি না-----। আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।' সাহেব বলিল, 'টুমি আমার গোড়ে ঠাকবে?' তার উত্তরে শান্তি টমাসকে যাহা বলিয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে'

এতখানি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে সাধারণ গৃহস্থঘরের বাঙ্গালী মেয়ের মধ্যে যাহাদিগকে অধুনা অশিক্ষিতা, সেকালের বলিয়া বর্তমান সমাজ কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন, এইরূপ অসীম সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যে-কোন দেশের নারীর পক্ষে গৌরবের কাহিনী হইবে। এই শান্তিই পরে দেশোদ্ধারের জন্য আনন্দমঠে ছদ্মবেশে নবীনানন্দ নামে সন্তান সাজিয়া যোগদান করিয়াছিল। এই দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়াই মনে হয় বাঙ্গলার গত বিপ্লবী-যুগে বীণা দাস প্রমুখ বাঙ্গালী বীরাঙ্গনারা দেশের জন্য আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছিল। বঙ্কিমই জাতির পথ-প্রদর্শক।

বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীকতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পতা ছাড়াও রমণীসুলভ অন্যান্য বৃত্তিতে বাঙ্গালীর মেয়ে পৃথিবী মধ্যে কত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিতা তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নারীর পাতিব্রত্য, 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখী স্বামীর পরনারীর উপর গোপন আসক্তি আছে জানিয়া কুন্দনন্দিনীর সহিত স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের সুযোগ দিবার জন্য নিজে গৃহ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া কিছুদিনের জন্য কোনস্থানে লুক্কায়িতা ছিলেন। আমাদের দেশে সীতা-সাবিত্রীর পাতিব্রত্য ধর্মের উপাখ্যান আছে, কিন্তু সূর্যমুখীর আদর্শ মনে হয় সীতা-সাবিত্রীকেও ছাপাইয়া উঠে। স্বামীর সুখেই সুখ। নিজের সমস্ত সত্তা সেখানে বিলীন হইয়াছে, গীতায় যাহাকে 'অর্পণম' অথবা সমগ্রভাবে 'আত্মসমর্পণম' বলা হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, নাহং নাহং, তুহুঁ, তুহুঁ, সূর্যমুখীর যেন সেইভাবে।

এই পতিব্রতার আদর্শ শুধু বাঙ্গলা দেশে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে বিরল। বিষবৃক্ষের 'সূর্যমুখী' বাঙ্গালীর স্ত্রীজাতির মধ্যে শুধু আদর্শস্থানীয়া নহে, নমনীয় ও স্ত্রী-জাতির অগ্রগণ্যা।

সূর্যমুখীর অন্তর্ধানে নগেন্দ্র তাই পাগল হইয়া সংসারকে অরণ্য জ্ঞান করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, 'তুমি শুধু আমার স্ত্রী নও, তুমি আমার সহধর্মিণী, পরামর্শদায়িনী, তুমি আমার সর্বস্ব ইত্যাদি।'

হিন্দুধর্মে পতিব্রতাও ধর্ম হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে এবং এই পতিব্রতা যে কতদূর উচ্চস্তরের হইতে পারে তাহা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই অপূর্বভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অন্যত্র কোথাও এরূপ দৃষ্ট হয় না।

বৃন্দাবন লীলার ন্যায় ভক্তিগ্রন্থেও দেখা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়াছিলেন বলে শ্রীরাধিকারও ক্রোধ এবং ঈর্ষা হইয়াছিল, শুধু ঈর্ষাই নয় পরে তিনি ইহার জন্য অনেক অভিমানও করিয়াছিলেন, যাহাকে মান বা মানভঞ্জনের পালা বলে। বঙ্কিমের 'সূর্যমুখী' নারীসমাজে অপূর্ব, অলৌকিক ও অতুলনীয়।

পাতিব্রত্য ধর্মের আর এক অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে, যেখানে ভবানী পাঠকের আশ্রিতা ও তৎকর্তৃক নানা ধর্মগ্রন্থ পাঠরতা প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের মানসকন্যা নিশিকে এক সময় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ভাই তুমি বিবাহ করিয়াছ?'

বৈষ্ণবী নিশি উত্তর করিল, 'আমি কৃষ্ণকে বিবাহ করিয়াছি।'

প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, 'তুমি স্বামী দেখ নাই, তাই কৃষ্ণের কথা বলিতেছ। স্বামীকে দেখিলে একথা বলিতে না।'

অথচ এই প্রফুল্ল নিজে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা। শুধু পরিত্যক্তা নহে, তাহার স্বামী পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তথাপি, এই মহনীয় নারীর হৃদয়ে পতিদেবতা সদা-বিদ্যমান। শুধু বিদ্যমান নয়, সর্বদেবতার ঊর্ধ্বে তাঁহার আসন।

শুনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট তাঁহার কতিপয় শিষ্য বঙ্কিমের এতাদৃশ ধৃষ্টতা যে কৃষ্ণের উপরে স্বামীকে স্থান দেওয়ার কথা জ্ঞাপন করিলে পরমহংসদেব

॥ পূর্ব প্রকাশিতের পর ॥

বারুদঘরের জমি নাকি কোম্পানী নিয়ে নেবে। তাহলে যে ভারী মুস্কিল। নিরিবিলিতে বসে একটু ধ্যান করেন শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে। কোম্পানী ওখানে কিছু খুললে এখানে যে আর থাকবে না সে শান্ত নীরবতা।

কি হবে?

গভীর রাতে ধ্যানাসনে বসেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সামনে এসে দাঁড়ালো এক বিরাটাকার পুরুষ। তোতাপুরীর দেখা সেই ভৈরব।

কি গো? কি ব্যাপার?

অতো চিন্তা করছিস কিসের?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, জমিটুকুতে কোম্পানী নাকি কি করবে। কিছু খুললেই তো হৈ-চৈ। পুজোটুকুও আর করা যাবে না সে ভিড়ে।

ও, এই কথা বল্। তার জন্য এত চিন্তা কেন? মামলা করছেন তো সেজোবাবু। সে মামলায় দেখবি তোদেরই জয় হবে। বাস্ হল্লো তো?

ভৈরব কোথায় চলে গেলেন। এ দেবস্থান দেখাশুনা করেন। মাঝে মাঝে এসে দেখা দেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

ব্যারিস্টার এসেছেন কলকাতা থেকে। নামকরা ব্যারিস্টার। বিলেতে ছিলেন বহুদিন। বাঙালী সাহেব। আইনের চেয়ে বেশী ভালবাসেন সাহিত্যকে। জীবিকার চেয়ে বেশী মানেন জীবন দর্শন। তাই লেখেন কবিতা। কবির নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হিন্দুর ছেলে। ধর্ম ছেড়েছেন। খ্রীস্টান হয়েছেন।

খ্রীস্টান ধর্ম সমান ভালো। স্বধর্ম ত্যাগের কি দরকার ছিল? যে হিন্দু সে ভালো হিন্দু হোক, যে মুসলমান সে ভালো মুসলমান হোক, যে খ্রীস্টান সে ভালো খ্রীস্টান হোক। তবেই তো হবে সর্বধর্ম-সমন্বয়।

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

সত্য যে এক।

বারিক বিশ্বাসের সাথে আসেন মাইকেল মধুসূদন। শ্রীমধুসূদন। বারিক সেজোবাবুর বড় চেলে।

কোথায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব? দুটো কথা শুনতে চাই তাঁর।

ঠাকুর প্রথমে বেরুলেন না। বেরিয়ে এলেন নারায়ণ। নারায়ণ শাস্ত্রী। ভক্ত মানুষ। ভারী শ্রদ্ধা। ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী। এগিয়ে আসেন মাইকেলের কাছে।

সংস্কৃতে সুরু হয় কথাবার্তা।

সংস্কৃতে কেন? বাংলাতেই বলুন না।

সব প্রশ্ন ছেড়ে নারায়ণ মাইকেলকে প্রথমেই প্রশ্ন করেন—ধর্ম ছাড়লেন কেন?

মাইকেল নীরব। কোনো জবাব নেই। প্রতারিত হয়েছেন জীবনে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণ ব্যানার্জির সুন্দরী কন্যার প্রণয়াসক্ত যুবক। হৃদয়ের বিনিময়ে ধর্ম ছেড়ে দিলেন। দুকূলই গেছে। বাপ বিতাড়িত করেছেন ধর্মত্যাগীকে। কৃষ্ণমোহন দেন নি আপন কন্যাকে। তাছাড়া আর একটা মোহ ছিল। সাগরদাঁড়ির ছেলের ভারী সখ ছিল সাগরপাড়ি দেবার। সবাই যে একঘরে করে দেয় সাগরপারে গেলে। তারা শাস্তি দেবার কে? আগে থেকেই তাদের তাই ছেড়ে দেন শ্রীমধুসূদন। খ্রীস্টানরা যে একঘরে করবে না।

খ্রীস্টান হলে হবে কি? রামায়ণ-মহাভারত কণ্ঠস্থ। ইংরিজী, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত, তামিলে অগাধ পাণ্ডিত্য। সরস্বতীর বরপুত্র। অভী: মন্ত্রে যেন দীক্ষিত। তাই কাউকেই পান না ভয়। দারিদ্র্যকেও নয়।

ঠাকুর এগিয়ে এলেন শ্রীমধুসূদনকে দেখতে।

বঙ্কিমবাবুর পুস্তক আনিয়া ঐস্থান তাঁহাকে শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তদনুযায়ী তাঁহার উক্ত ভক্তেরা একদিন দেবী চৌধুরাণীর ঐ অংশ পঞ্চবটীতে ঠাকুরকে পড়িয়া শুনান।

উহা শুনিয়া ঠাকুর নাকি বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম ঠিকই লিখিয়াছিলেন, স্বামীতে এমন কি যে-কোন পূজনীয় ব্যক্তিতে ঈশ্বরের আরোপ চলিতে পারে।

এই প্রবন্ধকে আর দীর্ঘ না করিয়া উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, বঙ্কিমের প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি যেন বঙ্গদেশের বহু মনীষীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কি চরিত্রবর্ণনে, কি সমাজ-চিন্তায়, কি দেশপ্রেমে, বঙ্কিমের তুলনা বঙ্গদেশে নাই। অন্যত্র কোথাও আছে কিনা বিবেচ্য, বঙ্কিম একাধারে সাহিত্যিক, কবি, সমাজসংস্কারক, দেশাত্মবোধের ও মাতৃমন্ত্রের ঋষি। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে, বঙ্কিমের সাহিত্য পাঠে তাঁহার কবিশক্তির অনেক সাহায্য পাইয়াছে। বঙ্কিমকে আমরা আজও উত্তমরূপে চিনি নাই। তাঁর উপযুক্ত দিব্য আসন আমরা তাঁকে দিই নাই। আজ তাঁর চরণে আমরা সকলে ভক্তি প্রণাম জানাই।

উঠে দাঁড়ান মধুসূদন। বয়সে মধুসূদনই অনেক বড়। তাহলেও ভক্ত হৃদয়। কীর্তনে আনন্দ পান। দরিদ্রদের গান শুনিয়ে দেন বিনা পয়সায়। শুধু কীর্তন শোনালেই হোল। কবিমন। অল্পতেই ভাব জাগে মনে।

কিন্তু এ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কইছেন না কেন?

জানিস? শত চেষ্টা করেও যেন তাঁর সাথে কথা কইতে পারলুম না। কে যেন এসে আমার মুখখানা জোর করে চেপে ধরলো।

করজোড়ে দাঁড়িয়ে শ্রীমধুসূদন। হোক সে খ্রীস্টান। হোক সে ধর্মত্যাগী সে যে মহামায়ারই সন্তান। তাইতো ঠাকুর মুখ খুললেন জোর করে।

মধুসূদন করজোড়ে চাইলেন আশীর্বাদ।

নারায়ণ শাস্ত্রীর রাগ তখনও যায় নি। ধর্মত্যাগী খ্রীস্টান এখানে আসবে কেন? মনে মনে গর্ গর্ করেন নারায়ণ।

ছিঃ। কারু নিন্দে কোরো না। পোকাটিরও না। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে যেন কারু নিন্দে না করি।

যাই করুক না মধুসূদন। হৃদয়ে রয়েছে অগাধ ভক্তি। তাইতো বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করেও শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ-ধূলিতে ধন্য করলেন আপন জীবনকে।

অশান্ত হৃদয়। চিরচঞ্চল কবিমন, চিরটি জীবন কেটেছে ঝড়ের ভিতর। জোটেনি শান্ত নিভৃত নিরালাশ্রয়টুকু। জীবনে যেন কিছুই হলো না। চাওয়া ও পাওয়ার মাঝখানে রয়েছে একটা বিরাট ব্যবধান। শুধু চাই শান্তি।

করুণাময় করুণাধারা বর্ষিত করেন অশান্ত চিরচঞ্চল মনে।

—শোনো, কবি! গান শোনো। শান্তি পাবে। আরাম পাবে। শোনো— মা জগজ্জননী জগদম্বার গান।

রামপ্রসাদী সুরে গান ধরেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

দুনয়নে ধারা বয়ে যায় কবি মাইকেল মধুসূদনের। এ আনন্দাশ্রুটুকুই যে তাঁর বাকী জীবনের পাথেয়।

পরমানন্দে ফিরে যান কবি মধুসূদন।

●

কদিন পর সেজোবাবু ছুটতে ছুটতে আসেন। শুনছো বাবা? ঠাকুর শুনছো?

হাসিমুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান শ্রীরামকৃষ্ণ, কি গো? আবার কি হলো?

আমরা যে জিতে গেছি। বারুদ-কুটীর ওদিকের জমিতে কোম্পানী আর কিছু খুলতে পারবে না মনে মনে বলেন—জানতুম। তোমার চরণ-স্পর্শ করে গেছেন যে মধুসূদন। তাঁকে হারাবে কে?

যে মহান তীর্থভূমি কামারপুকুর থেকে এসেছে এ গদানুরের মহান সঙ্গীত-লহরী, তার জয় হোক। কলি-যুগে এর চেয়ে বড়তীর্থ আর কোথায়!

সমাপ্ত।

পথের ধারে (লিনোকাট), শিল্পী—বিমল রায়

(মালয়ালম গল্প)

নারীর জীবনে একটা সময় আসে যখন সে পুরুষের বিষয়ে চিন্তা করতে সুরু করে। তারপর সে এমন এক বয়সে উপনীত হয় যখন সে পুরুষের স্বপ্ন দেখে। অনন্তর সে পুরুষের প্রতীক্ষা করে। এই প্রতীক্ষা কখনো কখনো পুরুষ-বিদ্বেষে পরিণত হয়। কোনও মেয়ের যদি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে হয়, তাহলে ভেবে দেখুন সেই বিয়েটা কেমন হতে পারে।

ভার্গবী আম্মার বিয়ের সময় তার নিজের বয়স পঁয়তাল্লিশ আর বরের বয়স সত্তর। স্বামীর ছোট মেয়ের মাত্র দু' মাস আগে একটা ছেলে হয়েছে। বিয়ে হয়েছিল যথারীতি। সমাজের অনুমতি পাওয়া গিছল। আশীর্বাদ, গায়ে হলুদ প্রভৃতি নিয়মমতই হয়েছিল। ছেলেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে আলাদা করে দেবার পরও পরমুপিল্লার হাতে বেশ মোটামুটি দু' পয়সাই ছিল। এরই জন্য ভার্গবী আম্মার আত্মীয়-স্বজন বিয়েতে মত দিয়েছিলো।

পরমুপিল্লার প্রথম পত্নীর মৃত্যু হয়েছে দু' মাসও পোয়েনি, তারই মধ্যে তার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়ে গেল। হয়ত আপনারা জিজ্ঞেস করে বসবেন যে সত্তর বছরের বুড়োর আবার স্ত্রী লাগবে কোন কাজে? হ্যাঁ---দরকার আছে বই কী। এই শেষ বয়সে ওর সেবা-শুশ্রূষা করবার, একটু জল গরম করে দেবার মত কেউ ছিল না। এ জন্যই পরমুপিল্লা দ্বিতীয়বার বিয়ে করল। মেয়েরা ছিল অবশ্য কিন্তু তারা তো এখন পরের ঘরের বৌ। তারা

তকষি শিবশংকর পিল্লাই

এখন যে যার স্বামীর সেবা করতেই ব্যস্ত---বাপের সেবা করবে কখন। আর যুবতী মেয়েরা বাপের সেবা-শুশ্রূষা ঠিকমত করতেও পারত না।

পরমুপিল্লা একটি স্ত্রীর সন্ধানে ছিল। তখনই পরিচয় ভার্গবী আম্মার সঙ্গে। একজন ঘটক মারফত পরিচয় হয়। সে নিজে ঐ নারীর স্বভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। তার মনের ধারা-প্রকৃতি সম্বন্ধেও তার কোন খেয়াল ছিল না। ভেবেছিল ও এখন আর বাচ্চা-কাচ্চা বিয়োবে না, ঘরের কাজ কর্মগুলো করবে। পরমুপিল্লার দরকারও ঐটুকুই। এমনটিই সে চাইছিল।

বিয়ে হয়ে গেল। ঐদিনই বৌ এলো শ্বশুরবাড়ী। সেখানে দুধে আলতার পাত্র নিয়ে তাকে বরণ করে তোলবার কেউ ছিল না। শ্বশুরবাড়ী আসবার সময় নববিবাহিতা বধূ ঐটুকুর প্রত্যাশা তো করেই থাকে। ভার্গবী আম্মাও নিশ্চয় এমন প্রত্যাশা নিয়েই এসেছিল। হয়ত প্রত্যাশা নৈরাশ্যে পরিণত হয়েছিল---কে জানে?

আত্মীয়স্বজনরা কেন ভার্গবী আম্মার বিয়ে দিল? আর সেই বা নিজে কেন এ ব্যাপারে রাজী হলো? ওকে বাঁচতে হলে তো খেতেও হবে পরতেও হবে। বেঁচে যতদিন থাকতে হবে ততদিন যাতে খাওয়া-পরার দুঃখ না হয়, তাই চাইছিল। পরমুপিল্লা চাইছিল যে বাকী জীবনটুকু সেবাযত্ন করার মত একটা বৌ যদি জুটে যায়। তবে এ বিবাহে যৌনসন্তুষ্টির কোন স্থানই নেই?

শয়ন মন্দির। সেটাকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। পাশাপাশি দুটো খাট পাতা হয়েছে। লম্বা চওড়ায় দুটোই সমান। খাট দুটো পুরানো চঙ-এর। উঁচু আর কাঠের। ওগুলো তৈরী

হয়েছিল হয়ত পঞ্চাশ বছর আগে। ওর ঠাকুরদা ঠাকুমা হয়ত ওতেই শুতেন। বিছানা তৈরী দামী কাপড়ে। ওগুলোরও হয়ত কোন পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। সে যা-ই হোক না কেন এগুলো এমনই একজনের কীর্তি ---যে ছিল শয্যাবিলাসী।

ভার্গবী আম্মাকে বাসরঘরে পৌঁছে দেবার নেই কেউ। আর ঐ ঘরে কামনা-উদ্বেল কোন পুরুষও তার প্রতীক্ষায় বসে-ছিল না। কামরা খালি। ঘরের মেঝেয় এককোণে বাত্তি জ্বলছিল। একটা মথ এখানে-ওখানে ঠুক খেতে খেতে উড়ে বেড়াচ্ছিল। কোন অজ্ঞাত জীবনের কিছু চিহ্ন এঁকে দিচ্ছিল ভিত্তিপাত্রে। ভার্গবী আম্মা মনে মনে ভড়কে যাচ্ছিল। সে যেন কোন অজ্ঞাত জীবনস্পন্দন অনুভব করছিল। এরই মধ্যে তার কাঁধের কাছে কার দীর্ঘ-শ্বাস অনুভূত হলো।

সে ভাবছিল পরমুপিল্লার প্রথমা স্ত্রীর কথা। কূলপ্লাবী যৌবনে পরমুপিল্লা সেই নববধূর সঙ্গেই প্রথম রাত্রি কাটিয়েছিল সম্ভবত। পুরাতনের স্মৃতিভরা ঐ পারি-পার্শ্বিকে এ ধরণের চিন্তা দ্বিতীয়া স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কামতপ্ত চুম্বনের স্বপ্ন। সুরত-জনিত শীৎকার। ঐ ঘরে নিঃসঙ্গ ভার্গবী আম্মার এইসব মিষ্টমধুর অনুভূতি হচ্ছিল। দেওয়ালে সে যেন অনেকগুলো পুরুষের প্রতিচ্ছায়া দেখ-ছিল। হঠাৎ শুনল পিছনে কে যেন রাগে দাঁত কড়মড় করছে। ভার্গবী আম্মার মাথায় ঠোকা দিয়ে মথটা উড়ে গেল। বাতির শিখা নাচছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন এমন একজন পুরুষের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছে যার ওপর তার কোন অধিকারই নেই।

আরে তুমি কাঁদছ কেন? পরমু-পিল্লা ভার্গবী আম্মার গলায় হাত জড়াতে জড়াতে বলল। কিন্তু ভার্গবী আম্মা নিজেই জানত না যে সে কাঁদছে কেন। তবে হ্যাঁ, সে এটুকু জানত যে সে বিজাতির মধ্যে পড়েছে।

পরমুপিল্লা ওকে খাটে দিয়ে গেল। সে মাথা নীচু করে স্বামীর কোলে বসে রইল। নববধূর পুলকানুভূতি অবশ্যই তার মনে জাগছিল।

নারী পুরুষের সেবাশুশ্রূষা করতে থাকবে, তাকে জল গরম করে দেবে আর পুরুষ তার জন্যে পয়সা খরচ করবে —বিয়ে বলতে কী এটুকুই বোঝায়? তা যদি হয়, তবে এদের ব্যাপারটাকেও নিশ্চয়ই বিয়ে বলতে হবে। এক্ষেত্রে স্বামী অভিজ্ঞ। হৃদয় তার অতীত স্মৃতিতে রঞ্জিত। ঐ সব অভিজ্ঞতা অর্জনে সে অপর্যাপ্ত আনন্দ পেয়েছে। পত্নীর সেবায় আনন্দ সে আগেই পেয়েছে। এখন এই বয়সে সোজপক্ষের বৌকে সে কেমন করে ভাল মনে হৃদয়ে স্থান দেয়। ওকে ভালবাসে কী করে? আর ওদিকে ভার্গবীর হৃদয়বেদী দেবতা প্রতিষ্ঠার জন্য শূন্যই পড়েছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার বিষে তার অন্তরের অন্তস্তলও কলুষিত। ওখানে যদি কখনও অন্য কোন নারীকে স্পর্শ করেনি এমন দেবতাও এসে হাজির হন তিনিও ঐ বেদী সম্পূর্ণ অধিকার করতে সক্ষম হবেন না। এক অসম্ভব ব্যাপার।

ভার্গবী আম্মা স্বামীর নিত্যকর্মের আগাগোড়া ভালভাবেই বুঝে নিয়েছে। পূর্বদিক ফরসা হবার আগেই উঠে পড়ল। কিন্তু স্বামী কোন আপত্তি করল না। ওকে আটকালো না। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল না। সূর্যোদয়ের আগেই যা কিছু করণীয় সব করা সারা। পরমুপিল্লার প্রথম গিন্নীও তো ঠিক এমনই করত। ভার্গবী আম্মারও তারই মত জীবন কাটাতে হবে। দুপুরবেলা খেতে বসে পরমুপিল্লা বলল, যাই বল না কেন আমার জানুর হাতের তরকারীর মত স্বাদ লাগছে না। বলতে বলতে সে মিটি-মিটি করে হাসছিল।

কিন্তু ভার্গবী আম্মা ওর হাসির জবাবে হাসবে কী করে? সে তো চোখের ওপর সতীনের প্রেতাত্মা দেখছিল। আর এটাই স্বাভাবিক। চোখ তার ছলছলিয়ে ওঠে কিন্তু নিজের দুঃখ সে প্রকাশ হতে দেয় না।

রাত্রে ঐ অপমানিতা স্ত্রী অনেক-ক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকল। স্বামী তার কান্নার কারণটুকু পর্যন্ত জানতে চায় না। ঘুমোচ্ছে। ভরপেট খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে। এইতেই সে সন্তুষ্ট পরিতৃপ্ত। আর কিছুই চায় না সে। কাঁদতে কাঁদতে ভার্গবী আম্মা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপর আসে তন্দ্রা। রাতের অন্ধকারে বাসর শয়ানের রাণীর অবগুণ্ঠিত বাসনা আর অতৃপ্ত কামনা-গুলো ভয়াবহ স্বপ্নে রূপ ধারণ করে। সে চেঁচিয়ে ওঠে। পরমুপিল্লার ঘুম ভেঙে যায়। ভার্গবী কেন চেঁচাল জানতে চায়।

ভার্গব আম্মার পত্নীত্ব যেন কেবল জবাবদিহির জন্যই।

যে স্বামীর সেবায় লেগে থাকে। পাড়াপড়শীদের কাছে স্বর্গীয়া জানুর প্রকৃতি কেমন ছিল জানতে পারে। পতির সেবায় লেগে থাকতে থাকতে সে স্বামীর জন্যই মরেছে। পত্নী-অভাবে পরমুপিল্লা পড়েছিল মহা ফাঁপরে। ভার্গবী আম্মার কর্তব্য সেই অভাবটাই পূরণ করা। কিন্তু সেই কর্তব্যভার বহনে নিজেকে অক্ষমই মনে হতে লেগেছে।

বাড়ীতে ঝগড়া চেঁচামেচি কিছুই হয়নি। একদিন সকালে একটা বোঁচকা কাঁকালে করে পতিদেবতার সুমুখে হাজির। বিদায় নিতে এসেছি।

চলে যাচ্ছ তুমি? স্বামী জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ---চলে যাচ্ছি। এখানে আর থাকতে পারছি না। স্ত্রীর নির্বিকার উত্তর।

আরে! আমি এমন কী করলাম?

কিছুই করনি---আর সেই জন্যেই আমার দ্বারা আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

পরমুপিল্লা এ কথার তাৎপর্য বুঝতে পারল না। সম্ভবত ভার্গবী আম্মাও ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি।

পরমুপিল্লা জিজ্ঞেস করে, তুমি চলে গেলে আমি কী করব?

ভার্গবী আম্মাও সারাজীবন মনিবের সেবায় কাটিয়েছে।

সে উত্তর দেয়, আমিও সেই চিন্তাই করছি।

তারপর তার দুঃখ ফেটে পড়ে: উঃ। কেন এমন হলো।

এটা এমনই এক পরিস্থিতি যে স্ত্রী নিজের বিয়েটাকেই দিচ্ছে। বিয়ের পর করছে অনুশোচনা। মেয়েমানুষের জন্য পত্নী হবার জন্যই। মায়ের স্তন্য থেকেই সে পত্নী-ধর্ম গ্রহণ করে। পতির সেবা করাই তার ঐতিহ্য। বেচারা সেই ধর্মটাকেই বজায় রাখতে পারল না।

নীরবে ভার্গবী আম্মা চলতে লাগল, পরমুপিল্লা দেখতে লাগল। ও কয়েক পা যেতেই পরমুপিল্লার একটা কথা খেয়াল হলো। সে ভার্গবী আম্মাকে ডাকল। ভার্গবী আম্মা অস্বস্তি বোধ করে পিছন ফিরে ওর দিকে দেখল।

পরমুপিল্লা বলে, তুমি চলেই যাচ্ছ যখন---ত হলে---একটা কথা---

কী কথা? অশ্রুসিক্ত চোখে ভার্গবী আম্মা দেখতেই থাকে।

পরমুপিল্লা একজন পিতা, কয়েকটা শিশুর পিতামহও বটে।

সে বলল, যাচ্ছ যখন তালাক দিয়ে আলাদা হয়ে যাও।

ভাববার চিন্তা করবার ছিল না কিছুই। ভার্গবী আম্মা রাজী হয় এবং উভয়ে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসের দিকে চলতে থাকে। বিয়ের পর কেটেছে কেবল সাত দিন---আর আজই হয়ে গেল বিবাহ বিচ্ছেদ।

ভার্গবী আম্মা কোথায় যাবে? হ্যাঁ ---বড় বোন রয়েছে তা। সে তার ওখানেই গেল। নিজের বয়স্কা বোনের দায় ঘাড় থেকে নামিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। এখন আবার সেই বোঝাই ঘাড়ে এসে জেঁকে বসল। তার পক্ষে এ এক বিরাট সমস্যা।

তারও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল আর সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

জিজ্ঞেস করল, তুই ফিরে এলি কেন?

ভাববার কিছু ছিল না। ভার্গবী আম্মা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, আমার দ্বারা সেখানে থাকা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল আরো ন্যায়-সঙ্গত, ত্যাগপত্তর দিয়ে এলি কী বলে?

এ প্রশ্নের উত্তর ভার্গবী আম্মার কাছে পড়েই ছিল। বলল, এ বিয়ে আমার পছন্দ হয়নি।

তৃতীয় প্রশ্নও খুবই স্বাভাবিক, এখন তুই খাবি কী করে?

এ প্রশ্নের উত্তর ভার্গবী আম্মার জানা ছিল না। আত্মীয় বান্ধবরা বেঁচে থাকবার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল কিন্তু সে রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে গিয়েই সে ফিরে এসেছে। তাদেরই হয়েছে জ্বালা। ওর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাববার দায় এখন আর তাদের নয়।

●

ওচ্চিরার প্রসিদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে বসে সেদিন এক মাঝবয়সী স্ত্রীলোক গান গাইছিল। সে আর কেউ নয়—ভার্গবী আম্মাই।

দু-চারদিন পরে সেখানে আরেক ভিখারী এসে হাজির হল। সে পরমু-পিল্লা। উভয়ের পুনর্মিলন হল। পরি-স্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গিছল। হিসাব গিছল বদলে সেবা করার জন্য যখন কোন ভাই রইল না তখন পরমুপিল্লা ওচ্চিরায় চলে এল। ভার্গবী আম্মারও পরবৃদ্ধের সান্নিধ্য লাভ হয়ে গেল। এখানে তাদের বিচ্ছিন্ন করার মত কোন শক্তি ছিল না। না ছিল জানকী আম্মার প্রেতাত্মা, না ছিল পরমুপিল্লার সম্পত্তির চিন্তা। আর ছিল না শয্যার বিকারাবেশ। যাদের সেবা এবং সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে এমন দুটি মানুষ আবার মিলেছে। পরিবেশে [illegible] দাম্পত্য উথলে উ[illegible]

অনুবাদক—সুদীন চট্টোপাধ্যায়

কি লজ্জা! কি লজ্জা!

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

আমার দু' চোখ; কি লজ্জা—দু' চোখ আমারই।
রুমালে যারা হাতের রক্ত লুকায়,
তীক্ষ্ণ ছোরার হাসিতে মুখ ভরায়—
তাদের ঘৃণায় জ্বলে উঠতো আমারই দুই চোখ;
নিঃশে জলে অশ্রু ঝরায় আমারই সেই চোখ।
কি লজ্জা! কি লজ্জা!

তাদের আমি পাপী বলি—বিশ্বাসের ভিত্তি ভাঙে যারা·
শব্দের ঋজুতা নিয়ে যে কণ্ঠ বাতাসে ছড়াও
আগমনী; মুক্তির সঙ্গীতে যে শহর ভরাও·
সেই কণ্ঠ অকস্মাৎ প্রতিধ্বনি আনে,
বুকের পাহাড়ে যেন আর্ত ঝর্ণা ভাঙে!
কি লজ্জা! কি লজ্জা!

ভেদ ঘুচে গেছে। এই দীর্ঘদিনের প্রবাসে মণিময় কথা বলার মাত্র একটি মানুষকেই পেয়েছে কাছাকাছি সব সময়। প্রথম প্রথম সহরের মানুষকে ভয় করতো মকর। আরদালী পিয়নের চাকরী সাধারণত অফিসেরেরা নিজেরাই দেন। মকরকে দেখেশুনে মণিময়ের কাছে এনে দিয়েছিলেন শৈলেশ্বরবাবু, এখানকার পুরনো জমিদার বংশের একমাত্র বংশধর যিনি আজও কেশবপুরের মায়া কাটাতে পারেন নি তিনি। মকরকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন একদিন, লোকের কথা বলছিলেন মণিময়বাবু তা এই লোকটিকে দিচ্ছি আপনার কাছে। । সাত পুরুষ ধরে কাজ করে আসছে আমাদের বাড়ীতে বুঝলেন। যা বলবেন সে কাজে কখনো না বলবে না।

জমিদারী নেই কিন্তু কথার দাপটটা আছে শৈলেশ্বরবাবুর। সাত পুরুষ তাদের বাড়ী চাকরী করার কথাটা বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন।

মকরের শরীরে আজ আর এক-বিন্দু মাংসও বোধহয় অবশিষ্ট নেই। কালো রঙের রোগা লিকলিকে চেহারাতে শুধু হাড় ক'খানা ঢাকা। সরু সরু হাত-পায় বড় পেটটা যেন একেবারে বেমানান। আট হাতি ধুতি, ধুতির ওপর ফতুয়া। তার ওপর মণিময়ের দেওয়া একখানা পুরানো গরম কোট। শীতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে কেশবপুরে।

খাওয়া দাওয়ার শেষে বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরালো মণিময়।

●

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে ব্রাস চালাচ্ছিল চামেলী। শ্যামলী এসে ঘরে ঢুকলো।

দাদাকে একটা চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানালেই কিন্তু ভালো হত দিদি।

ভারী দাদা, গত তিন মাসের মধ্যে একখানা চিঠি দিয়ে একটা খবরও নেই। শুধু মাসে মাসে টাকা পাঠালেই যেন কর্তব্য শেষ হলো। তোর যদি অতো ভক্তি থাকে তো দিগে যা দাদাকে চিঠি।

ঢুকলেন ঘরে।

চামেলী বাইরে বেরোবি নাকি কোথাও।

হ্যাঁ মা, হিরণ্ময়দার অফিসের সেই রিহার্সালটার তারিখ আছে আজ। এক্ষুণি আসবেন হিরণ্ময়দা নিজে।

সামনের বছরে পরীক্ষাটা দিতে হবে এখন কেন যে এসব করে

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
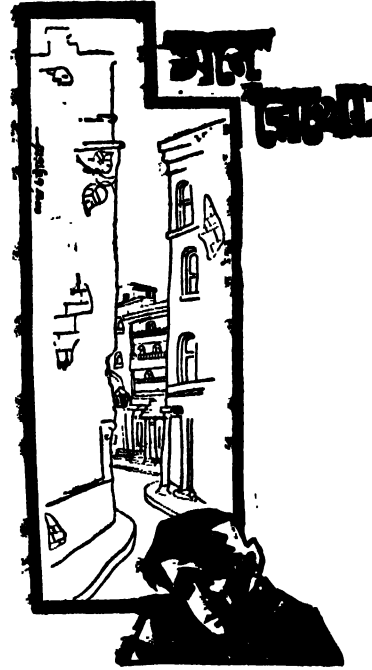
বেড়াচ্ছিস তুই। আবার ওদিকে মণি এসে শুনলে বকাবকি করবে আমাকেই। আমারই হয়েছে যত জ্বালা। ওমা এ কাপড়খানা আবার তুই কিনলি কবে?

একটা টিউশনী পেয়েছি মা, তোমাকে বলা হয়নি। তারই মাইনের টাকাটা পেয়ে কাল শাড়ীটা কিনলাম। মলির জন্যও কিনেছি একখানা। এই মলি মাকে দেখা না শাড়ীটা।

থাক অন্য একসময় দেখালেই চলবে---বলে ঘরের বাইরে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল শ্যামলী। দেখি ভাতটা আবার ধরে যাবে শেষে।

চামি, বলে মা আরো সরে এলেন চামেলীর দিকে, মিথ্যাকথা বলিস টিউশানী দিয়ে পঞ্চাশ-ষাট টাকা মাইনে দেয় না কেউ। আমার কাছে লুকোস না, বল, দু'খানা শাড়ী এলো কোথা থেকে? হিরণ্ময় কিনে দিয়েছে, তাই না?

দেখো মা, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। হিরণ্ময়দা শাড়ী কিনে দেবেন কেন, আর তা দিলে আমিই বা তা নিতে যাবো কোন লজ্জায়। গরীব হতে পারি মা, কিন্তু তা বলে—বাকীটুকু শেষ না করেই পাউডারের পাফটা আলতো করে মুখে ঘষতে লাগলো চামেলী মুখের চামড়াটা যথাসম্ভব টেনে।

কথার মাঝে ইন্দ্র এসে হাজির। চামি, তুইই ডোবাবি দেখছি, সন্ধ্যে ছ'টায় রিহার্সাল আর তুই কিনা এখনো পাউডার ঘসছিস। অফিসের বাবুরা ফাইল গুটিয়ে বসে আছে এতক্ষণ। বেলা ক'টা হল জানিস? পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ। ট্যাক্সী করে গেলেও—ট্যাক্সীর কথা বলেই জিব কামড়ালো ইন্দ্র। ট্যাক্সী ভাড়ার টাকাটা প্যান্টের পকেটে অনুভব করলো সে। বড়বাজার অবধি হাইকোর্টের ট্রামে চড়েই যাওয়া যাবে বেশ। এ সময় অফিস যাওয়ার গাড়ীগুলো খালিই যায় বরাবর। শিয়ালদা থেকে হাইকোর্টের ট্রামে বড়বাজার অবধি গিয়ে সেখান থেকে ট্যাক্সী তো একটা নিতেই হবে না হলে আবার সম্মান থাকে না যে। বিশেষ করে ট্যাক্সী ভাড়াটা যখন ওঁরাই দিচ্ছেন। চামেলীর অবশ্য অজানা নেই কিছু।

আজ সারা রাস্তাটা ট্যাক্সীতেই যাবো আমরা। তাতেও তোর কমপক্ষে একটা টাকা বাঁচবে মেজদা। রাস্তায় পা দিয়ে বললো চামেলী।

দ্যাখ চামি কথায় কথায় ঠুকবি না বলে দিচ্ছি। না হয় দু'পয়সা কামাচ্ছিসই তুই। আর আমি যে সার্ভিসটা দিচ্ছি তার বুঝি কোনও দামই নেই।

কেন বৃথা ঝগড়া করছিস। আজকের ট্যাক্সী ভাড়াটা আমিই দেবো। তোর বড় টাকার দেমাক হয়েছে চামি।

কথা বলতে বলতে একটা খেবী ট্যাক্সী এসে হাজির রাস্তার ওপাশে। ট্যাক্সীটাকে ডেকে চড়ে বসল দু'জনে।

চামেলীই কথা বলল প্রথম। আজকে মা জানতে চাইছিলেন এত টাকা পাচ্ছি কোথা থেকে আমি।

কি বললি তুই?

টিউশানী করছি বললাম।

মাকে বোঝানো বড় শক্ত। কি বললো শুনে?

বিশ্বাস করেনি। আরও কি কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মধ্যে তুই এসে পড়লি।

তারপর খানিকক্ষণ দু'জনের মধ্যে আর কথা নেই।

হিরণ্ময়দা থাকবে আজকে?

কি জানি, গতদিন তো বললেন আসতে পারেন নি কি কাজে? চামি জানিস হিরণ্ময়দার রাইটার্স বিল্ডিংসের চাকরী গেছে।

কবে রে?

অনেকদিন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই।

তাহলে এখন চলছে কি করে?

কিছু বুঝতে পারি না। এদিকে পকেটে তো সব সময়ই দেখি একশো টাকার সব নোট।

ব্যবসা-ট্যাবসা আছে বোধহয়।

●

মেঘমালার এদিকে কিন্তু চিন্তার অন্ত নেই। রাতদিন ভাবছে, কই এমনটি তো কখনো হয় না। তার চিঠি পেয়ে এলো না মণিময়। তাহলে কি চিঠিটা ভুল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছালো। না কি তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে মণিময়। না, না মণিময় তেমন ছেলে নয়, কখনও নয়। কোনও সময়েই, কোনও অবস্থাতেই মণিময় তাকে ছেড়ে যেতে পারে না। তাহলে কি কোনও অসুখ-বিসুখ করলো তার। সেই যে মণিময়ের বাবা মারা যাবার সময় একবার এসেছিল তাও তো আজ ছ-সাত মাস হতে চললো।

ক্যালেণ্ডারের পাতাটা ওলটালো মেঘমালা। ১৯৫৮ সাল শেষ হয়ে এলো। নভেম্বর মাসের আজ চার তারিখ। অক্টোবরের পাতাটা ছেঁড়া হয়নি এখনো। ক্যালেণ্ডারের পাতা ওলটানো তার আজকের স্বভাব নয়। স্কুল-কলেজে মণিময়ের কাছে যতদিন পড়েছে ওই ক্যালেণ্ডারটাই ছিল যেন তার একান্ত অবলম্বন। গোল করে দাগ দেওয়া থাকতো তারিখগুলোয় যে যে দিন আসবে মণিময়। আগে আগে তো মণি আসত রোজই। ইদানীং চাকরী পেয়ে তার আসাটা কমছে ক্রমে। শেষে কমতে কমতে আজ ছ'মাস তার দেখাই নেই একেবারে।

সময় যেন আর কাটে না মেঘমালার। বাবা মারা গেছেন আজ বছর ঘুরে গিয়ে আরো তিন মাস। মণিময় চাকরী করছে. তাও প্রায় তিন বছর হোল। সে বি-এ পাশ করেছে তাও কি কমদিন। এক বছরের কাছাকাছি। নিজের ড্রেসিং টেবলটার ড্রয়ারগুলো টেনে বার করলো মেঘমালা। খাটের নীচে থেকে বার করলো চামড়ার বড় সুটকেশটা।

মণিময়ের দেওয়া জিনিষগুলোয় সারা সুটকেশটা ভরা। সাদা পাথরের একখানা ফটো-ফ্রেম দু খানা হয়ে ভাঙা। একদিন রেগে মণিময় নিজেই ভেঙে দিয়েছিল ফ্রেমখানা। আগ্রা থেকে এনেছিল কিনে। টুকরো টুকরো খানকয় চিঠির সঙ্গে একগাদা বাসি ফুলের রাশ। সেই মালাটা যেটা পরিয়ে দিয়ে ছ'বছর আগের এক জন্মদিনে মণিময় বলেছিল, আজ তোমার নতুন করে জন্ম হল মালা। তোমার আর আমার। এই ফুলগুলো শুধু রইলো সাক্ষী আর সামনের ওই গাঢ় অন্ধকার সমেত এক আকাশ তারা। গঙ্গার জলগুলো ছলছল করে বয়ে যাচ্ছিল—সেদিকে চেয়ে বলেছিল মণিময়, ওগুলো ভারী দুষ্টু তাই না মালা, একবারও দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছে না এদিকে। ওদের সাক্ষী মানবো না।

এমনি টুকরো টুকরো কত স্মৃতির চিহ্নই ধরা আছে সুটকেশটায়।

প্রীতিময় ছুটতে ছুটতে এলো মেঘমালার ঘরে।

তাড়াতাড়ি সুটকেশটার মধ্যে সব ভরে ডালাটা বন্ধ করল মেঘমালা।

দিদি তোর একখানা চিঠি আছে। পিয়ন দিয়ে গেল আমার হাতে।

চিঠির কথা শুনে সচকিত হলো মেঘমালা। চিঠি নিশ্চয়ই মণিময়ের। চিঠির ওপরের খামের ঠিকানাটা কিন্তু মণিময়ের লেখা না কিছুতেই। মণিময়ের হাতের লেখা যে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে চেনা।

চিঠিখানা সে সরিয়ে রাখলো একপাশে।

আবার ডালাটা খুললো সুটকেশটার। ছোট ছোট ক্যালেণ্ডার জমানো একপাশে। সবগুলোতে তারিখগুলোর পাশে পাশে মণিময়ের হাতের দাগ দেওয়া। সাতই জানুয়ারী মণিময়ের জন্মদিন, আটাশে ফেব্রুয়ারী মণিময় প্রথম এলো এ-বাড়ীতে তখন উনিশ শ পঞ্চাশ সাল। উনিশ শ' বাহান্ন পনেরোই এপ্রিল সে আর মণিময় গেছিল শান্তিনিকেতনে। আরও কত সব তারিখ। মণিময়ের আর তার ইতিহাসের সব স্মরণীয় দিনগুলো ক্যালেণ্ডারে ধরা আছে লাল-নীল পেন্সিলের গণ্ডীতে।

চিঠিখানার প্রতি নজর পড়লো এতক্ষণে। খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করলো মেঘমালা। দার্জিলিঙের একটা মেয়েদের স্কুলে চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছিল তারাই জবাব দিয়েছে। লিখে পাঠিয়েছে, কলকাতার এক ঠিকানায় বসবে ইণ্টারভ্যু বোর্ড, সেখানে হাজির হতে হবে মেঘমালাকে এগারোই নভেম্বর সোমবার।

চিঠিখানা দেরাজে বন্ধ করে রাখলো মেঘমালা।

প্যাডটা টেনে নিয়ে মণিময়কে চিঠি লিখতে বসলো তারপর।

চিঠি লিখছিল একমনে ঘাড় গুঁজে মা স্নেহলতা এসে কখন দাঁড়িয়েছিল টেবিলটার পাশে বুঝতেই পারে নি সে।

মণিকে চিঠি লিখছিস।

প্যাডটা মায়ের চোখের আড়াল করবার কোনও চেষ্টাই দেখা গেল না মেঘমালার। মায়ের কাছে লুকোনো নেই কিছু। নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল সে।

বৃথাই লিখছিস চিঠি, মণিও ছেড়ে গেছে আমাদের।

মায়ের মুখের দিকে নীরবে মুখ তুলে তাকালো মেঘমালা। বিধবার পোষাক নেই তাঁর পরনে। মেঘমালাই জোর করে তাঁকে পরিয়েছে কালো ফিতেপাড় শাড়ী, গলায় সরু মফচেন হার। হাতে চুড়ি পরতে কিছুতেই রাজী হন নি তিনি। যে হাতে শাঁখা নেই সে হাতে চুড়ি পরা নাকি সাজে না।

এমনিই কতদিন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে মেঘমালা। ছাবী চেহারা তাঁর। ধবধবে সাদা গায়ের রঙ, সুডৌল মুখে যেন কোনও খুঁত নেই কোথাও। মণিময়কে মনে পড়ে, প্রায়ই বলতো, তোমার মাকে দেখলে যে কেউ মা বলে ডাকবে, যেন জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ।

কিন্তু আজ এ কি চেহারা মার। জীবনযুদ্ধে পরাস্ত এক সৈনিকের মতো সব আশা ভরসা শেষ কোনও মানুষের ছবি তা। মুখটা যেন শত আঘাতময়।

আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন অমন করে? মা জিজ্ঞাসা করলেন মেঘমালাকে।

তুমি কি করে একথা বলতে পারলে মা।

সংসারকে তুই চিনিস না মালা। এখন আমাদের সবাই ছেড়ে যেতে চাইবে। ভাববে যদি বুঝি কারো কাছে কোনও সাহায্য চেয়ে বসি আমাদের অভাবের দিনে তাই কৌশলে এড়িয়ে যাবে সবাই।

কিন্তু তাই বলে মণিময়?

কি জানি বড় ভয় হয়, তাই বললাম। বলতে বলতে অন্য ঘরে পা বাড়ালেন স্নেহলতা। প্রীতিটা আবার গেল কোথায়। যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, আজকে চিঠি এলো কার, তোর?

আমারই।

মণিময়ের চিঠি কি?

না মা, একটা স্কুলের চাকরীর।

চাকরীটা করবি ভাবলি।

কি জানি মা, দেখি ভেবে।

ভাববে কি আর, সব কিছু ভাবনা যে সে একদিন তুলে দিয়েছে আর একজনের হাতে।

কোথাও কি গেছে কখনো মণিময়ের মত না নিয়ে। মণিময়কে না জিজ্ঞাসা করে কি করেছে কোনও কাজ।

সে খুব ভালো করেই জানে যে, মণিময় কখনো তাকে চাকরী করার মত দেবে না। জানে মেয়েদের চাকরী করা পছন্দ করে না সে। কতবার বলেছে, ঘর বাঁধা কি কখনো এমনি ছাড়াছাড়ি করে হয়। তুমিই তো হলে ঘর। তোমার আকর্ষণেই তো ছুটে ছুটে যাবো সেখানে। তা না তুমিই যদি আসো বাইরে তবে আমার ঘর কি শুধু দু কামরার ফ্ল্যাট আর তাতে সাজানো খাট-পালঙ্কের ঠাকুর-চাকরের সংসার?

তবু তাকে লিখলো মেঘমালা, এগারোই ইণ্টারভ্যু, যাবো কি না বল তো মণি?

॥ ছয় ॥

কেশবপুর গ্রামের আর একটি রাত শেষ হলো।

আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় শুয়ে চোখ খুললেন ত্রিলোচন দত্ত। আবার চোখটা বুজে হাত বাড়িয়ে আলতো-ভাবে বিছানায় যেন খুঁজলেন কাকে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার শেষ হয় নি তখনো। দেওয়ালগুলোর কোণে কোণে তখনও জমাটবাঁধা অন্ধকার। অন্ধকার জমাট বাঁধা পালঙ্কটার নীচে, আলমারী আর আলনাটার আড়ালে, তোরঙ্গ রাখা বেঞ্চিটার পেছনে।

আবার হাত বাড়ালেন ত্রিলোচন-বাবু।

বিছানার অন্য এককোণে বালিশে মুখ লেপটে শুয়েছিল স্ত্রী সাধনা। তার চুড়িশুদ্ধ একখানা হাত ধরে টেনে আনলেন ত্রিলোচনবাবু এ পাশে।

আঃ আমাকে খেয়ে ফেললে তুমি। কাল সারারাত ধরে দুটো চোখের পাতা এক করতে দাও নি। এখন আবার ভোর না হতেই শুরু হল।

●

কোয়ার্টারে ঘুম ভেঙে চায়ের কাপটার জন্য হাত বাড়ালো মণিময়। তক্তপোষের ওপরে পাতা বিছানাটায় আড়মোড়া ভেঙে বালিশটার নীচে আবার মুখ লুকোল সে।

বাইরে ছড় ছড় করে জল পড়ছে কোথা থেকে তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। টুং-টাং করে বাসন মাজার আওয়াজ হচ্ছে। মকর উঠেছে বোঝা গেল।

স্টোভটার আওয়াজ পাওয়া গেল এবার।

চাদরটা সরে গিয়েছিল গা থেকে। হাত বাড়িয়ে গলা অবধি টেনে নিল মণিময়। কেশবপুরে শীত এসেছে।

●

গঙ্গাধরবাবু সাতসকালেই গিয়ে আখ জমা নেওয়ার গদী খুলেছেন। গঙ্গাজল ছড়িয়ে ধূপধূনো দিয়েছে চাকর জগদীশ। কোথাও গাড়ীতে বলদ জোড়া হচ্ছে, আখ বোঝাই হচ্ছে। একটু পরেই আখের গাড়ীর ক্যারাভান রওনা হবে বেলডাঙ্গার চিনিকলে। কতো গাড়ী আখ যাবে তার হিসেব নিচ্ছেন গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শীত পড়েছে। পীতাম্বরবাবুর গায়ে একটা কালো চাদর জড়ানো মাথা আর কান ঢাকা তাতে। তাঁর পায়ে ফুল মোজার সঙ্গে পাম্পসু, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে সরু পাড় ধুতি, হাতে মোষের শিংয়ের নক্সাকাটা ছড়ি।

●

আবদুল হোসেনের ধানভাঙ্গা কলের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের ধিকধিক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে রাত থাকতে থাকতেই। কেশবপুরে ইলেকট্রিসিটি আসার সুযোগ সবচেয়ে আগে গ্রহণ করেছেন তিনি। তেল-ইঞ্জিনটাকে বদলি করে সেখানে বসিয়েছেন ইলেকট্রিক মোটর।

এত সকালেই ধান ভাঙ্গাবার জন্য জমা হয়েছে কেউ কেউ। টেস্ট-রিলিফের গম ভাঙ্গাবার লোকই অবশ্য বেশী। নগদ পয়সা অবশ্য কারো হাতেই তেমন নেই। আড়াই সের গম ভাঙ্গানোর মজুরী হিসাবে একপোয়া গম জমা দিয়ে যেতে হবে আবদুল হোসেনের গদীতে। হোসেন সাহেব তাই জমিয়ে যাবেন এবং পরে প্রয়োজনমতো চড়াদামে বাজারে ছাড়বেন তা।

●

পীতাম্বরবাবুর ভোর হয় নি এখনো।

সারারাত ধরে কাজ হয়েছে কাল হরেকৃষ্ণ চুনারীর ঘরে। শোলার কাপ কেটে কেটে তাই দিয়ে বানানো হয়েছে টুপীর ফর্মা।

যতো ওস্তাদ কারীগরের মত পাকা হাতই হোক না কেন দিনে চার থেকে পাঁচটা টুপী তৈরী করতেই তার দিন শেষ হয়ে রাত গড়িয়ে আসবে। উপুড় হয়ে বসে দু'পা এক জায়গায় এনে তার মধ্যে শোলার ডাঁটি ধরে কাত-ছুরি দিয়ে একনাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে হবে শোলার কাপ বা পাতিশোলা। তাই দিয়ে আঠা মাখিয়ে মাখিয়ে তৈরী করতে হবে শোলার চপ বা ফর্মা। বাঁশ কেটে কেটে চটা বানিয়ে তাই দিয়ে তৈরী করতে হবে ক্রেট, একডজন টুপীর ফর্মা যাবে তাতে। ক্রেটের মধ্যে টুপী পর পর বসানো থাকবে কিন্তু চাপ লাগলে ভাঙ্গবে না।

কেশবপুরের হাট বসে যেখানটায় তারই চারপাশ ঘিরে কেশবপুর গ্রামের জীবনের যতটুকু চাঞ্চল্য। সেখানেই আছে একটা চা আর বিস্কুটের দোকান। ভাজা নেড়ো আর নিমকি বিস্কুট পাওয়া যাবে সেখানে। চাল-ডাল মশলার দোকান আছে একটা। পাশে একটা ছোট স্টেশনারী দোকান। তাতেই পাওয়া যাবে বৌদিদি তরল আলতা, চুলের ফিতে, মাথার সিঁদুর, বঙ্গলক্ষ্মীর সাবান, মাথায় দেবার গন্ধ-তেল। সস্তা দামের সিগারেট পাওয়া যাবে সিজারস, নাম্বার টেন, চারমিনার, লণ্ডন, নেভিকাট। ধুতি-শাড়ীর দোকানও আছে একটেরে। গামছা পাওয়া যাবে। দু চারখানা রঙদার লুঙ্গির সঙ্গে ছিটের তৈরী জামা। সাইকেল সারাবার দোকান আছে একটা। তারই পাশে মিষ্টির দোকান। না সন্দেশ-রসোগোল্লা কেশবপুরে পাওয়া যায় না। বড় বড় বাতাসা পাওয়া যাবে সেখানে আর কদমা। ছাপা সন্দেশ পাওয়া যায় কালেভদ্রে। তারই পাশে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নিবারণ হালদারের চেম্বার। প্রয়োজনমতো এ্যালোপ্যাথিও করেন তিনি। পাশকরা ডাক্তারের দরকার হলে যেতে হবে সেই হরিনারায়ণপুরে।

এরই এককোণে কাঁসা-পিতল আর শোলার টুপীর কারবারী পীতাম্বর গাঙ্গুলীর অফিস ঘর।

সকাল হতে না হতেই সেখানে ভিড় জমা হয়েছে কারীগরদের। ক্রেটের পর ক্রেট ভর্তি টুপী আসছে। প্রত্যেক কারীগরই কেশবপুরে কমপক্ষে বারো-চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করে।

শোলার টুপীর কারবারের রীতি-নীতি অদ্ভুত। শোলা সাধারণত থাকে মহাজনদের ঘরে। সপ্তাহে সপ্তাহে সেই শোলা মহাজনের লোক কারীগরদের ঘরে পৌঁছে দেয়। দেওয়া শোলার সঙ্গে টুপীর হিসেব মিলিয়ে ঘরে তোলে মহাজনের লোক। কারীগরদের মধ্যেই আছে ঠিকাদার। যারা সব সময় চোখ রাখে তৈরী মালের দিকে। কেউ শুধু ঘরে শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে কি না সেদিকেও নজর থাকে তার। বাইরের তৈরী মাল যাতে অন্যপথে চালান না যায় তাও লক্ষ্য রাখতে হয়। শোলার টুপী বানাবার রেট তিন আনা ফর্মা পিছু তা নিয়ে কোনও কথা উঠছে কি না কারীগরমহলে তাও খবর রাখতে হবে। গতবারের আকালে মহাজনের টাকা দাদন নিয়েছিল কে কে তাও মুখস্থ তার। কত সুদ

জমা হোল এবং সুদে আসলে টাকার অঙ্কটা কোথায় গিয়ে হাজির হওয়া সত্ত্বেও মহাজন এবারের আকালের কথা ভেবে তাদের সে টাকার জন্য তাগাদা লাগাচ্ছেন না এবং শুধু মাঝে মাঝে মজুরী থেকে কেটে নিয়ে সেটা কমাবার চেষ্টা করছেন এ সব বলার জন্যও সেই রয়েছে। আসলে পীতাম্বর গাঙ্গুলীর কারবার চালায় ঠিকাদার ভোলানাথ মণ্ডলই।

সেদিন সকালেও ভোলানাথই আগে এসে হাজির। কর্তা আসেন নি তখনো। টুপীর ক্রেট নিয়ে এসেছে হরেকৃষ্ণ, রামচরণ মণ্ডলের ছেলে হরিচরণ, কালীনাথ দাস, শিবতারণ সামন্ত আরও অনেকে।

রীতিমত সোরগোল সুরু হয়ে গেছে পীতাম্বরবাবুর অফিসের সামনে। টুপীর বাজার বসেছে যেন। অন্যপাশে কাঁসা-পেতলের দাঁড়ি উঠছে নামছে। সেদিকেও চোখ আছে ভোলানাথের।

●

মালটিপারপাস স্কুলের বাড়ীর তদারকী করছেন সুধাংশুবাবু। সকালে এসে মিস্ত্রী লেগেছে কাজে।

মৃত্যুঞ্জয় জানা এসেছেন হেলথ সেণ্টার তৈরীর কাজ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মালটিপারপাস স্কুল তৈরীর কাজও তাঁর। সাত সকালেই বেরিয়ে পড়েছেন সাইকেল হাতে।

ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সুপার-ভাইজার অরুণকুমার রায়ের বেড়াতে বেরোন অভ্যাস ভোর হতে না-হতেই।

স্কুলের বাড়ীর সামনে দেখা হল তিনজনের।

ওভার-কোট চড়াচ্ছেন এর মধ্যেই। এই তো সবে নভেম্বর।

সকালে ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ, অরুণবাবু মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কথার জবাব দিলেন।

তাহলে ডিসেম্বর - জানুয়ারীতে কি করবেন।

●

শৈলেশ্বর পাল আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। প্রচণ্ড একটা শব্দ করে একগাদা চুন বালি সমেত এক জায়গার দেওয়াল খসে প্লাস্টার ভেঙে আছড়ে পড়লো সিমেণ্টের মেঝেয়। ছাদের কড়ি-বরগাগুলোর মধ্যের এককোণের এক অংশে গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হল যেন।

পালগিন্নী মেঝেয় শুয়েছিলেন বিছানা পেতে। চিৎকার করে সরে এলেন একপাশে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন পালমশাই।

কতবার করে বলছি সারাও বাড়ীটা। কোনদিন শেষ করবে আমাদের। কি যে তোমার বাপের ভিটের মায়া, কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাও না। দুটো মানুষ কলকাতায় গেলে দুপেট ভাত কি আর জুটতো না।

সারাও সারাও তো বলছো, সারাতে কি আমারই মন চায় না, কিন্তু সারাবার টাকা কোথায়। আর এই বারো ভূতের বাড়ী নিজের টাকায় সারাবোই বা কেন আমি।

বাড়ীটা বারো ভূতের কিন্তু প্রাণটা তো তোমারই, সেটা গেলে দেখবে কে শুনি!

বাড়ীটার একাংশ ভাড়া নিয়েছেন হরিহরপুরের কামিনী তালুকদার। বারো জনের ভাগের বাড়ী তবু ভাড়াটা বসিয়েছিলেন শৈলেশ্বরবাবু। অন্যান্য ভাগীদাররা যে কেউ কখনো কথা বলে নি এমন নয়। তবে ইউনিয়ন বোর্ড আর চৌকিদারী ট্যাক্স প্রভৃতি অন্যান্য খরচাদি শৈলেশ্বর বাবু নিজেই করেন বলে এ সম্পর্কে মামলা-মকর্দমা করে নি কেউ। তবে মাঝে মাঝে চিঠিপত্রে ঝগড়া চলে এ পক্ষে ওপক্ষে। টাকা খরচা করে কেশবপুরে এসে ভাড়ার অংশ আদায় করার মতো উৎসাহের বোধ করি অভাব আছে আর সকলের। তাই কখনো মুখোমুখি ঝগড়া হতে শোনে নি কেউ।

ভাড়ার অংশটার বেশীর ভাগই তালুকদার মশাই তাঁর রাস্তা তৈরীর সাজ-সরঞ্জামে ভর্তি করে রেখেছেন। টিনভর্তি পিচ, জমানো একপাশে। সেদিন কেশবপুরেই ছিলেন কামিনীবাবু।

বাইরে বেরিয়ে এসে শৈলেশ্বর-বাবুকে ডাকলেন তিনি, কি পাল-মশাই, ভেতরে এত গোলমাল কিসের।

ত্রিলোচনবাবুর সন্তানসন্ততি সর্ব-সমেত পাঁচটি এ পক্ষের আর ও পক্ষের মিলিয়ে।

এ সম্পর্কে নানাজনে নানা কথা বলে।

ত্রিলোচনবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী কমলা তখন অন্তঃসত্ত্বা। বড়ছেলেটির বয়স তখন দুই, কোলে। ত্রিলোচন বাবুর শ্বশুরমশাই সর্বদাপুরের মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার সর্বেশ্বর মিত্র হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। হঠাৎ মারা গেলেন বললে ভুল হবে, ভুগছিলেন অম্বলের রোগে প্রায় এক বছর। সর্বেশ্বরবাবুর দুই মেয়ে কমলা আর সাধনা, ছেলে নেই। স্কুল মাস্টার। মানুষ, অনেক দেখেশুনে শেষে ম্যাট্রিক পাশ ত্রিলোচন দত্তকে পেলেন কেশবপুরে। তখন ত্রিলোচনবাবুর বাবা বেঁচে। জমি-জায়গা আছে, আর আছে তেলের কলের ছ'খানা ঘানিসমেত চালু কারবার। তখনো বিজলী আসে নি এদিকে। কেরাসিন তেলের ইঞ্জিন চলতো ধিক ধিক করে। বড় মেয়ে কমলার বিয়ে দিলেন সেখানেই। তার বছর না ঘুরতেই মারা গেলেন ত্রিলোচন-বাবুর বাবা। পরের বছর সর্বেশ্বর বাবু নিজে।

একেবারে নিঃস্ব স্কুল মাস্টারের সংসারে দীর্ঘদিন জিদ বজায় রেখে বসবাস করতে পারলেন না কমলার মা সর্বজয়া। এদিকে পরের মেয়ে সাধনা-টিকেও পাত্রস্থ করা দরকার। মাথার মাথায় বাড়ছে কেবলি। বয়সও পনেরো পেরিয়ে ষোলয় পা দিল।

কমলার আর সাধনার দু'জনের প্রকৃতিগত মিল ছিল অনেক কিন্তু অমিলও ছিল বহু। সর্বোপরি সাধনার ছিল বাড়ন্ত চেহারা, পুরুষ্ট আস্থা আর

দুধসাদা রঙ। কমলার রঙ চাপা, স্বভাব সরল, চেহারার পালিশ নেই। সাধনা যেমনি বুদ্ধিমতী কমলার বুদ্ধি তেমনি কম।

কমলা যখন দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা তখন হঠাৎ তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবার জোগাড়। সচরাচর প্রথমবারে যে সমস্ত বিপদাপদ হবার সম্ভাবনা থাকে কেন জানি দ্বিতীয়বারেই কমলার মধ্যে দেখা গেল সে-সব এবং দেখা গেল বেশ ভালোভাবেই।

ঠিক এই সময়ে যখন বাইরের কারবার, কৃষ্ণনগরের হাসপাতালে দৌড়দৌড়ি করে কমলাকে সপ্তাহে দু'বার দেখতে যাওয়া, ছোট ছেলেটাকে সামলানো ইত্যাদি নিয়ে ত্রিলোচনবাবু ব্যস্ত, তখন সর্বজয়া এলেন কেশবপুরে সাধনার হাত ধরে।

বাবাজী, সব খুইয়ে দিয়ে সবেদা-পুরের পাট চুকিয়ে এলাম। উনি চলে গেলেন। ভাসুরের সংসারে আর কতদিন থাকি বল। তারপর, সাধনাকে দেখিয়ে বললেন, সঙ্গে এই মূর্তিমতী দুর্ভাবনা, যেন মাথার ওপর সব সময়ে খাঁড়া ঝুলছে। তুমি বাবা আপনার লোক, ছেলের মতো, তোমরাই দেখেশুনে ওর একটা গতি করে দাও। তোমার ভরসাতেই কেশবপুরে আসা।

অকূলে যেন কূল পেলেন ত্রিলোচন-বাবু। ভগবানই আপনাদের পাঠিয়েছেন মা। আমি তো দেখছেন কি নাজেহাল হচ্ছি সারাদিন। ভাবছিলাম লোক পাঠাবো আনতে।

ত্রিলোচনবাবুর সংসারে জায়গা হোল সাধনার আর সর্বজয়ার।

কৃষ্ণনগরের হাসপাতালে ভর্তি হবার পর কমলার অবস্থা খারাপ হতে লাগলো ক্রমেই। সপ্তাহে দুদিন কৃষ্ণ-নগরে গিয়ে তাকে দেখে আসা আর সম্ভব হল না। ঘর ভাড়া নিতে হল সেখানে এক মাসের জন্য।

হাসপাতালে একদিন সারা রাতই থাকতে হোল সর্বজয়াকে। রাত বারোটা নাগাদ সেখানে কাটিয়ে বাসায় একাই ফিরে এলেন ত্রিলোচনবাবু। দু' বছরের ছেলেটিকে চৌকির ওপর ঘুম পাড়িয়ে তখন মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়েছে সাধনা। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। পাশে সাধনার রান্নাকরা খাবার একধারে থালাচাপা দেওয়া।

ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন ত্রিলোচনবাবু। আলতোভাবে ছেলেটিকে কোলে তুলে রেখে এলেন পাশের ঘরের বিছানায়। তারপর এ ঘরে এসে খিল এঁটে দিলেন ভালো করে। তারপর হ্যারিকেনটা দিলেন নিবিয়ে একফুঁয়ে।

সেই রাত্রেই হাসপাতালে মারা গেল কমলা।

কয়েক দিন পরে বিয়ে করে সাধনার হাত ধরে কেশবপুরে এসে উঠলেন ত্রিলোচনবাবু। সেখানকার মানুষ অতি সহজেই মেনে নিল ঘটনাটা।

[ক্রমশ]

বার্লিনার আন্সেম্বল সেজুয়ান নাটকের প্রথম অভিনয়ের (১৯৫৭) একটি দৃশ্য.

সেজুয়ানের মহৎ নারী

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[শেন্‌টের তামাকের দোকান]

(চারিদিকে সব শুয়ে রয়েছে—একটা আলো জ্বলছে—দরজায় ধাক্কার আওয়াজ পাওয়া যাবে)

মহিলা। (কোনরকমে ঘুম থেকে উঠে) শেন্‌টে, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। শেন্‌টে গেল কোথায়?

ভাইপো। আমাদের প্রাতরাশ তৈরী করছে বোধহয়—কাজিনের খরচে।

[মহিলা উঠে দরজা খুলে দেবে—একটি যুবকও তার পেছনে ছুতোরঘরে ঢুকবে]

যুবক। আমিই শেন্‌টের কাজিন।

বের্টল্ট ব্রেশট

মহিলা। (অবাক হ'য়ে) কি বললে?

যুবক। আমার নাম স্নুইটা।

(পরিবারের একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেবে—তাদের মধ্যে এভাবে কথাবার্তা হ'বে—)

ভাইপো। ওর কাজিন।

পুরুষ। [illegible] তো [illegible] ছ'লে কথা হয়েছিল, ওর তো কেউ কাজিন নেই।

ভাইপো। তুমি যদি আমাদের শেন্‌টের কাজিন হও, তাহলে তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করো, বুঝলে?

স্নুইটা। এখন যে-কোনো মুহূর্তে দোকানের খরিদ্দারেরা আসতে শুরু করবে। সব তৈরি হও গিয়ে—আমাকে এখন আমার দোকানটা খুলতে হবে।

পুরুষ। তোমার দোকান? আমার ধারণা এ দোকানটা আমাদের বন্ধু শেন্‌টের সম্পত্তি। (স্নুইট মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাবে) তুমি কি বলতে চাও দোকানটা ওর নয়?

মহিলা। ও তো তাই বলছিল—কোথায় নিখোঁজ হল শেন্‌টে?

স্নুইটা। ওর ফিরতে দেরি হবে। আমাকে দিয়ে সে তোমাদের জানিয়েছে—এখন আমি যখন এখানে আছি তার পক্ষে আর তোমাদের জন্যে কিছু করা সম্ভব হবে না।

মহিলা। তাই না কি? অথচ আমরা ভেবেছিলাম সে কত ভাল মেয়ে।

ভাইপো। ওর কথায় বিশ্বাস করো না, শেন্‌টেকে খুঁজে বার করো।

পুরুষ। ঠিক কথা, তাই করতে হবে। (কয়েকজনকে উদ্দেশ করে) তোমরা দু'জন এইদিকে চলে যাও, আর তোমরা কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে, আমি আর ঠাকুরদা এখানে বসে ঘাঁটি রক্ষা করবো। বালকটি বেরিয়ে গিয়ে আমাদের জন্যে কিছু খাবার জোগাড় করে আনুক। (বালককে) এই ছোকরা, ওই কোণে রুটির দোকানটায় চলে যাও—যতোই পারবে পকেটে ঠেসে নিয়ে আসবে।

মহিলা। কয়েকটা ছোট গোল কেক্ আনতে ভুলো না।

পুরুষ। কিন্তু সাবধান। দোকানদার

যেন ধরে না ফেলে। আর পুলিশের ধারকাছ দিয়ে যাবে না।

[বালক টাকা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যাবে। অন্যরাও যে যার পোশাক পরে নেবে]

সুইটা। এভাবে কেক চুরি করলে, যে দোকানে তোমরা আশ্রয় নিয়েছ সেখানকার বদনাম হবে।

ভাইপো। এর কথা কেউ শুনো না। আমরা শেন্‌টেকে এখুনি খুঁজে বের করবো, সে একে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দেবে।

(ভাইপো, বালক, ভাইঝি বেরিয়ে যাবে)

ভাইয়ের বৌ। (যেতে যেতে) আমাদের প্রাতরাশের জন্যে কিছু খাবার রেখে দিও।

সুইটা। (শান্তভাবে) শেন্‌টেকে তোমরা খুঁজে পাবে না। আমার কাজিন তোমাদের আতিথেয়তা করতে না পেরে সত্যিই খুব দুঃখিত—আর তোমরা তো দলে কম নও। এটা একটা ছোট তামাকের দোকান—আর এই থেকেই শেন্‌টেকে জীবিকা চালাতে হবে।

পুরুষ। শেন্‌টে এ ধরণের কথা কখনও আমাদের বলতো না।

সুইটা। হয়তো তোমার কথাই সত্যি। (ছুতোরকে) এ শহরের সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগ্য কি জান? এখানে এত দারিদ্র্য যে, কোনো একজন লোকের পক্ষে তা সামলানো অসম্ভব। (দর্শকদের) এগারোশো বছর আগে আমাদের এক কবি এদেশ সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন, আজও তা সমানভাবে সত্যি। হাজার হাজার লোক যখন ঠাণ্ডায় জমে মরছে, তার প্রতিবিধান হবে কি করে—একজন বা দুজনের শরীর গরম রাখবার ব্যবস্থা করে দাও কি হবে? দশ হাজার ফুট লম্বা একটা কম্বল যদি পেতাম একই সঙ্গে শহরের প্রতিটি ইঞ্চি জমি তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেত।

(সুইটা দোকানের জিনিষপত্র গুছোতে থাকবে।)

ছুতোর। দেখতে পাচ্ছি তুমি তোমার কাজিনের সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মোকাবিলা করছ। এই দোকানের কাজ করবার জন্য আমার পাওনা একটা ছোট্ট বিল আছে—তোমার কাজিন এদের সবার সামনে আমার পাওনাটা মেনে নিয়েছে—একশো রূপোর ডলারের বিল।

সুইটা। (নিজের পকেট থেকে বিলটা বার করে) একশো ডলারের বিলের সংখ্যাটা বড্ড বেশি হয় নি কি?

ছুতোর। এর কমে হবে না—আমাকে স্ত্রী-পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে হবে তো?

সুইটা। তোমার ক'জন ছেলেমেয়ে?

ছুতোর। চারজন।

সুইটা। কুড়ি ডলার পাবে।

ছুতোর। (হেসে উঠে) তুমি কি পাগল? আপরোটগাছের তক্তা দিয়ে সেল্‌ফগুলো বানিয়েছি জান?

সুইটা। ওগুলো নিয়ে যাও।

ছুতোর। তার মানে?

সুইটা। অত পয়সা আমি দিতে পারবো না—ওগুলো নিয়ে যাও।

মহিলা। এইবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি (খিক খিক করে হেসে উঠবে।)

ছুতোর। (সঙ্কুচিত ভাবে) মিস শেন্‌টে আসুক—তখন কথা হবে—সে তোমার থেকে অনেক ভাল।

সুইটা। তা তো বটেই। তা না হলে তার সর্বনাশ হবে কেন?

ছুতোর। তুমি বুঝি চাও, আমার পরিবারের লোকেরা না খেয়ে মরুক?

সুইটা। আগে যা বলেছিলাম, আবার বলছি—কুড়ি ডলার নিয়ে আমাকে রেহাই দাও।

ছুতোর। একশো ডলার।

সুইটা। আগেই বলেছি হবে না।

ছুতোর। মাপ নিয়ে তক্তাগুলো কাটা—অন্য কাজেও লাগবে না—সুবিধায় পেয়েছ, যাক গে যা ইচ্ছে দাও।

সুইটা। এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা—

(মহিলা খিক খিক করে হাসতে থাকবে)

সুইটা। এই নাও কুড়ি ডলার।

(ছুতোর টাকাটা নিয়ে চলে যাবে।)

মহিলা। (খিক খিক করে হেসে উঠে) একশো ডলার আমার পাওনা—কমে চলবে না—পরিবার রয়েছে—চারজন ছেলেপিলে—আর শেষ পর্যন্ত কুড়ি ডলারেই হিসেব-নিকেশ হয়ে গেল। (খিক খিক করে হাসি)।

সুইটা। এবার তোমরাও কেটে পড়ো এখান থেকে।

পুরুষ। আমরা---যাবো?

সুইটা। হ্যাঁ---তোমরা যাবে। যত সব জোচ্চোর আর পরগাছার দল। আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো দেখি।

পুরুষ। ওর কথা কানে না তোলাই ভাল। খালি পেটে কথা বলতেও ভাল লাগে না। ছোঁড়াটা গেল কোথায়?

সুইটা। কাপ-কেক চুরি করে ও ছোঁড়াটা যে এখানে এসে আশ্রয় নেবে। এ সব চলবে না। (চিৎকার করে) আবার বলছি এখান থেকে বেরিয়ে যাও সব। (সব চুপচাপ বসে থাকবে।)

সুইটা। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। (উইংস এর কাছে গিয়ে) পুলিশ অফিসার!

পুলিশ অফিসার। (ভেতরে ঢুকে) বলুন মিঃ সুইটা।

সুইটা। আমি আর আমার কাজিন এই দোকানটা খুলেছি। কখনও কোনো আইনবিরোধী কাজ যাতে এ দোকান থেকে না হয় সে বিষয়ে আমরা খুব কড়া নজর রাখব ঠিক করছি।

পুলিশ। খুবই ভাল কথা।

সুইটা। এঁরা সবাই আমাদের অতিথি।

আমার কাজিনের সঙ্গে এঁদের এক সময় স্বল্প-স্বল্প পরিচয় ছিল ---এঁরা এখন চলে যাচ্ছেন। আপনি আসবার আগে আমরা পরস্পরের থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম।

পুরুষ। (রুষ্টভাবে) বেশ বেশ, আমরা তবে চলি।

সুইটা। আমি আমার কাজিনকে বলব, তোমরা তার আতিথেয়তার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছ---কিন্তু তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না।

(দূর থেকে শোনা গেল---'চোর চোর ধর'---)

পুলিশ। এ আবার কি ব্যাপার? (ছেলেটা দৌড়ে আসবে, তার পকেট থেকে কেক এবং রুটির রোল বেরিয়ে আসতে চাইবে। মহিলা তাকে পালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করবে---বালক ফিরে পালাতে যাবে---)

পুলিশ। এখানে দাঁড়াও। (ওকে ধরে) কোথায় কেকগুলো পেলে?

বালক। ঐখান থেকে।

পুলিশ। চুরি করে এনেছ তো?

মহিলা। এ বিষয় আমরা কিছুই জানতাম না। সবই এই ছেলেটার বজ্জাতি। ক্ষুদে শয়তান।

পুলিশ। মিঃ সুইটা, এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন? (সুইটা চুপ করে থাকবে)।

পুলিশ। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের সবাইকে আমার সঙ্গে থানায় আসতে হবে।

সুইটা। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এখানে এ ধরণের কিছু ঘটতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারি নি। তা ছাড়া বুঝতেই পারছেন চুরির ব্যাপারটা লুকোতে হলে আপনাকে আমি এখানে আসতে অনুরোধ করতাম না।

পুলিশ। আমি সবই বুঝতে পেরেছি মিঃ সুইটা। কিন্তু আমাকেও আমার কর্তব্য করতে হবে। এদের ধরে নিয়ে যেতেই হবে। (সুইটাকেও করবে) চল হে সবাই---(সবাইকে ঠেলে নিয়ে চলে যাবে)

(একা সুইটা ---মিসেস মিৎসু ঢুকবে।)

মিৎসু। তুমিই বোধহয় সেই কাজিন। আমার বাড়ি থেকে পুলিশ লোক ঠেঙ্গিয়ে বের করছে, ব্যাপারটা কি? এখানে তোমার বোন বোর্ডিংহাউস খুলেছিল কি উদ্দেশ্যে বলতো? যত সব ছোট লোককে বাড়িতে এনে ওঠালে এমনটাই হয়ে থাকে। এ সব আমার আগে থেকেই জানা আছে।

সুইটা। সবাই নিশ্চয় আমার কাজিনের বিরুদ্ধে অনেক কথাই তোমাকে বলেছে। ও খেতে পায় না---ও গরীব, ওর সুনাম নেই---

মিৎসু। অতি নিচুস্তরের---

সুইটা। ও সত্যিই অত্যন্ত গরীব।

মিৎসু। আমার মন নরম করবার চেষ্টা করো না। ও কত রোজগার করছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিভাবে ও জীবন কাটিয়েছে সেটাই ভাববার কথা। আমি বুঝতে পারছি কোনো জায়গা থেকে সে কিছু টাকা পেয়েছে---তাই দিয়ে দোকানটা কিনেছে। কিন্তু এখানকার ভাড়াটেরা সবাই ভদ্রলোক। এদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবার মতো লোক বলে তোমার কাজিনকে আমি মনে করি না। (একটু থেমে) ভেবো না আমার মনে দয়ামায়া নেই, কিন্তু আমার একটা দায়িত্ববোধ ও তো আছে।

সুইটা। (তিক্তস্বরে) মিসেস মিৎসু, আমাকে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, স্পষ্ট করে বলুন আপনার এই সম্ভ্রান্ত বাড়িটিতে থাকতে কত দিতে হবে---(টেবিলের ড্রয়ার থেকে এগ্রিমেণ্টটা নিয়ে) মাসিক ভাড়া দিতে হবে তো?

মিৎসু। তোমার কাজিনকে ছ'মাসের ভাড়া আগাম দিতে হবে। দুশো রূপোর ডলার।

সুইটা। দুশো রূপোর ডলার! বল কি? এত টাকা পাবো কোথায়? এত টাকা তো এই দোকান থেকে রোজগার হতে পারে না।

মিৎসু। সে কথা আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল।

সুইটা। মিসেস মিৎসু, এত কঠিন হয়ো না---আমি স্বীকার করছি আমার কাজিন কয়েকজন হতভাগ্যকে আমার এখানে আশ্রয় দিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে কিন্তু ও ঠেকে শিখবে ---আমি বলছি ও যাতে এসব বুঝতে পারে সে চেষ্টা আমি করবো। আমি এ কথাও বলছি ওর মতো ভাড়াটে তুমি পাবে না। এত ধীরস্থির পরিশ্রমী শান্ত প্রকৃতির মানুষ সহজে দেখা যায় না। নিয়মিতভাবে ও তোমার ভাড়া যুগিয়ে যাবে। ওর মতো ভাড়াটে লক্ষে একজন মিলবে কি না সন্দেহ।

মিৎসু। দুশো রূপোর ডলার আগাম দিতে হবে। না হলে যে রাস্তায় ওর স্থান---সেখানেই ফিরে যেতে হবে। (পুলিশ অফিসার ঢুকবে)

পুলিশ। আমি আপনাকে ডিসটার্ব করতে চাই না মিঃ সুইটা।

মিৎসু। এ দোকানটার ওপর দেখছি পুলিসের নজর লেগেই রয়েছে।

পুলিশ। মিসেস মিৎসু, ভুল ধারণা করবেন না। মিঃ সুইটো আমাদের কাজে সাহায্য করেছেন এবং সেই জন্যই পুলিসের তরফ থেকে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।

মিৎসু। আমার সঙ্গে এসব ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই। মিঃ সুইটা, আশা করি তোমার কাজিন আমার প্রস্তাবে রাজী হবে। ভাড়াটেদের সঙ্গে যাতে বনিবনা থাকে সেটাই আমি চাই। আচ্ছা গুড মর্নিং। (বেরিয়ে যাবে)।

সুইটা। গুড মর্নিং মিসেস মিৎসু।

পুলিশ। মিসেস মিৎসুর সঙ্গে কি আপনার গোলমাল হচ্ছে?

স্নুইটা। আমার কাজিনের কাছ থেকে ভাড়া আগাম চাইছে। ও মনে করে আমার বোন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর নয়।

পুলিশ। আপনি কি টাকাটা জোগাড় করতে পারছেন না? (স্নুইটা চুপ করে থাকবে) কিন্তু মিঃ স্নুইটা আপনি নিশ্চয় টাকাটা কারুর কাছ থেকে ধার নিতে পারেন।

স্নুইটা। তা পারি। কিন্তু শেন্‌টেকে কে টাকা ধার দেবে?

পুলিশ। আপনি কি এখানে থাকছেন না?

স্নুইটা। না। তা ছাড়া এখানে আর আসতেও পারব না। এদিক দিয়ে সফরে বেরিয়েছিলাম বলেই শেন্‌টেকে সাহায্য করার সুযোগ পেলাম। ওর কি হবে ভেবে সত্যিই চিন্তিত হচ্ছি।

পুলিশ। মিঃ স্নুইটা ভাড়ার ব্যাপারে গোলমালে পড়েছেন শুনে সত্যিই দুঃখিত হলাম। জানেন এ দোকানটাকে আমরা একটু সন্দেহের চোখেই দেখেছিলাম—আপনি ওই লোকগুলোকে আমাকে ধরতে সাহায্য করার পর বুঝলাম, আইন রক্ষার ব্যাপারে আমরা আপনাকে বন্ধু হিসেবে দেখতে পারি।

স্নুইটা। অফিসার, আমার কাজিন এই ছোট দোকানটাকে দেবতাদের উপহার মনে করে। আমিও এটাকে যে করে হোক বাঁচাতে চাই। যাক্‌গে আপনি কি ধূমপান করেন?

পুলিশ। (দুটি সিগার নিয়ে পকেটে ভরবে) মিঃ স্নুইটা, আমাদের থানার সবাই আপনি চলে যাচ্ছেন শুনে দুঃখিত হবে। কিন্তু মিসেস মিৎসুর চিন্তাধারাটা আপনি বুঝতে চেষ্টা করবেন। দেখুন, সত্যিকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই—শেন্‌টে দেহ বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করতো। আপনি হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন এ ছাড়া তার আর কি উপায় ছিল? কিন্তু সে যাই হোক, এটাতো খুব সম্মানের ব্যাপার নয়। কেন নয়? কারণ প্রেমের সাহায্যে টাকা রোজগার করা চলে না—ওই ভাবে রোজগার করলে লোকে তাকে স্বৈরিণীবৃত্তি বলবে। নরনারার সম্পর্ক যখন টাকাকে বাদ দিয়ে গড়ে ওঠে সেটাই প্রেম এবং তাকেই মহৎ সম্পর্ক আখ্যা দেওয়া চলে—নচেৎ নয়। প্রেমের তাগিদেই নারীর পুরুষের সঙ্গে মেশা উচিত, খাবার পয়সা আদায়ের জন্যে নয়। আপনি হয়তো প্রশ্ন কর-

বেন, ও তাহলে কি করবে? ছ' মাসের ভাড়া তো যোগাড় করতে হবে? মিঃ স্নইটা, এর উত্তর আমার জানা নেই। (বেশ চিন্তামগ্নভাবে) মিস্টার স্নইটা, উত্তর খুঁজে পেয়েছি। যে করে হোক আপনার কাজিনকে বিয়ে করবে, এমন একজন লোক খুঁজে বের করুন।

(একটি ছোটখাট ধরণের বৃদ্ধা মহিলা ঢুকবেন)

বৃদ্ধা। আমার স্বামীর জন্যে সস্তায় একটি ভাল চুরুট চাই। কাল আমাদের বিয়ের চল্লিশ বছর পূর্ণ হবে—আমরা একটা ছোটখাট উৎসব করবো।

স্নইটা। (নম্রভাবে) চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও উৎসব করবে?

বৃদ্ধা। আমাদের সাধ্যে যা কুলোবে সেই অনুসারেই করবো। রাস্তার ওই ধারে আমাদের কার্পেটের দোকান। আমরা প্রতিবেশী হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব---আজকালকার এই দুর্দিনে এটারই সব থেকে বেশি দরকার। (স্নইটা কয়েকটি সিগারের বাক্স খুলে দেবে।)

পুলিশ। মিঃ স্নইটা, এক্ষেত্রে দরকার টাকার---সেই জন্যেই আপনার কাজিনের বিয়ের প্রস্তাব করছি।

স্নইটা। (বৃদ্ধার প্রতি) আমি একটা ব্যক্তিগত গোলমালের ব্যাপার নিয়ে এই অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম।

পুলিশ। ছ' মাসের ভাড়া যোগাড়ের ব্যাপার। বিয়ে করেই এ টাকাটা আদায় করতে হবে।

স্নইটা। অত সহজ হবে না।

পুলিশ। কেন হবে না---ওতো ভাল পাত্রী। তা ছাড়া ছোট হলেও ওর ব্যবসাটা ভবিষ্যতে ভাল দাঁড়াবে। (বৃদ্ধার প্রতি) আপনি কি বলেন?

বৃদ্ধা। (ইতস্তত: করে) হ্যাঁ---তা বটে---

পুলিশ। ব্যক্তিগত বিভাগে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার।

বৃদ্ধা। যুবতীটি রাজী হলে তবে তো?

পুলিশ। রাজী হবে না কেন? আমি বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া করে দিচ্ছি। আমাদেরও অন্যকে সাহায্য করবার ইচ্ছে হয়। ছোট ছোট দোকানদারদের প্রতি পুলিশের কর্তাদের কত সহানুভূতি, আমার কাজ দেখেই তা বুঝতে পারবেন।

(হা হা করে হেসে উঠবে, তারপর নোটবুক আর পেন্সিল বার করবে পকেট থেকে---পেন্সিলের শিষটা একবার চুষে নিয়ে লিখতে থাকবে।)

স্নইটা। এটা মন্দ আইডিয়া না।

পুলিশ। (পড়তে থাকবে) কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষ---অল্প-স্বল্প বিত্তের অধিকারী---মৃতদার হলেও চলবে---যদি বিয়ে করতে সম্মত হন---তামাকের দোকানের মহিলা স্বত্বাধিকারিণীকে?---এর পরে যোগ করে দিতে হবে মনোহারিণী, পিঙ্গলকেশী-যুবতী---কি, কি মনে হচ্ছে?

স্নইটা। একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না?

বৃদ্ধা। না না, ঠিক আছে। মোটেই বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। আমি শেন্‌টেকে অনেকবার দেখেছি। (পুলিশ অফিসার নোট বই থেকে পাতাটা ছিঁড়ে শেন্‌টেকে দেবে।)

স্নইটা। জীবনরথের চাকার তলায় পড়ে পিষ্ট হয়ে যাবার থেকে বাঁচতে হলে বহু সৌভাগ্য থাকা দরকার। কি চমৎকার সব প্রস্তাব। কি সব বিশ্বস্ত বন্ধুর দল। (পুলিশকে) ভাড়ার টাকা কিভাবে পাবো তার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপনি এসে সত্যিকার ভাল উপদেশ দিয়ে সাহায্য করলেন। এবার মনে হচ্ছে একটা উপায় হবেই।

(ব্ল্যাক আউট ও রাস্তার দৃশ্য)

[ক্রমশ।

অনুবাদক—অশোক সেন

জোনাকিরা সারারাত

বসুমিত্র দত্ত

রূপসী চাঁদের ছবি স্বপ্নে দেখা রমণীর মুখ।

পরাজিত অন্ধকার তৎপর দ্রুত পলায়নে
ক্রমশ ঘনিষ্ঠ জ্যোৎস্না সোহাগের মায়াবী তুলিতে
আকাঙ্ক্ষার চিত্র আঁকে রক্তাভ গোলাপে ; অন্যমনে
জোনাকিরা সারারাত দ্যুতিময় মণিহার গাঁথে।

আলোকিত মনভূমি। পলাতক সুখের সন্ধানে
হিনত মুহূর্তগুলি হৃদয়ের কাছাকাছি আসে
শোনিতে সংগীত বাজে অবিশ্রাম মধ্যরজনীতে
পরিচিত করাঘাতে গোপন দুয়ার খুলে যায়।

সারারাত জোনাকিরা আগুনের ফুল হয়ে ফোটে।

সুমিত ঘোষ

গাড়ীগুলো সারি লাগিয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে বাঁধের জলে সূর্যের শেষ রং একটু একটু করে গলে যাচ্ছে। একটা হাসির তুফান উঠলো একটি বাংলোকে ঘিরে। এ রকম মাঝে মাঝে ওঠে।

মিস্টার সাহা—

আসুন আসুন—

আমার মেয়ে—ডালিয়া—

তাই নাকি? এত বড় হয়ে গেছে?

মামার বাড়ীতে ছিল তো, দেখেন নি কখনো, তাই বড় লাগছে। বয়স তো মাত্র—

তেরো—যোগ করলে ডালিয়া থামু।

সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট ইন্ ফিলোজফি—

মিস্টার সাহা—

এই যে আসুন—

মাই ওয়াইফ—

নমস্কার—

নমস্কার—

ওদিকে সোফায় ভীড় জমিয়েছেন মিস্টার ও মিসেস ব্যানার্জী। মিস্টার ও মিসেস ভাট, মিস্টার ও মিসেস তলাপাত্র। ওঁরা কিসের একটা আলোচনায় মশগুল।

মিস্টার সাহা গৃহকর্তা। একজন উঁচু দরের অফিসার। মেয়ে জলন্তিকার জন্মদিন উপলক্ষেই এই পার্টি।

বিশেষ একটা সোফায় বসে একমনে সিগারেট টেনে চলছিলেন মিস্টার মিটার। সি এল ডিপার্টমেণ্টের জেনেরাল সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়র। অবিবাহিত। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু শরীরটাকে এমনভাবে খাড়া করে রেখেছেন, দেখলে বছর দশ বয়স কম বলে মনে হবে।

রঙীন চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঢুকলেন। রঙীনের বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। তাঁর স্ত্রীর পঁচিশ। রঙীন উঠতি ইঞ্জিনীয়র। ফার্স্ট ক্লাস সার্টিফিকেট। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। যদিচ এখনও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়র হিসেবেই কাজ করছেন।

রঙীনের স্ত্রী তনিয়া—অমন সুন্দরী শুধু এই ড্যাম এরিয়ায় কেন, সারা বাংলা দেশেই বা ক'টা আছে। রং ধবধবে সাদা। গাল দুটিতে রক্তের আভা। চোখ দুটি টানাটানা। মুখে এমন একটা আকর্ষণীয় ভাব আছে, যা সহজেই সকলের মন টানে। তনিয়ার চেহারার আভিজাত্যে অনেকেই রঙীনের রুচিকে প্রশংসা করে, কেউ কেউ রঙীনের স্ত্রী-ভাগ্যে ঈর্ষাও করে।

তনিয়া পরেছে লাল পেড়ে গেরুয়া রঙের সিল্কের কাপড়। জামাটা লাল। কপালে ছোট্ট একটা টিপ। দাড়ির কোণে ছোট্ট একটা কালো কৃত্রিম তিল।

রঙীন চৌধুরীর সি এল ডিপার্টমেণ্টে শীঘ্রই ট্রান্সফার হবার

কথা। তাই মিস্টার সাহা সি এল ডি'র হেড মিস্টার মিটারের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। যদিও রঙীন মিস্টার মিটারের সবই জানেন। জানেন তিনি একজন ধুরন্ধর অফিসার। কিছু না নিজের ডিপার্টমেন্টের জন্যে করেছেন। আর প্রতাপ যা কি তাঁর। অমন অ্যাডিস্যানাল ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়র মিস্টার ভেঙ্কটরমন পর্যন্ত ভয় খান। আর ওপর মহল তো তাঁর হাতের মুঠোয়।

রঙীন চৌধুরী, এ ই। শীঘ্রই সি এল ডি'তে যাচ্ছেন।

মিস্টার মিটার, জি এস ই।

দু'জনেই হ্যাণ্ডসেক করেন।

মিসেস—রঙীন মৃদু হাসেন।

নমস্কার—

নমস্কার।

রঙীন আগে থাকতেই তাঁর স্ত্রীকে মিস্টার মিটারের পরিচয় দিয়ে রেখেছিল। অতএব এখানে এসে কি ধারায় চলতে হবে, তনিয়া জানে। বিয়ে হওয়ার পরেই শিখেছে। যে সমাজে যা রীতি। পতিদের চাকরীর উন্নতির জন্যে এই নতুন কোর্স নেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে অনেকেই মনে করেন।

ওদিকে অর্গানে বসে মিসেস সাহা তাঁর থাবা থাবা হাত দিয়ে রিডে ঘা দিচ্ছেন। তাঁর বিশাল দেহটা সারা অর্গানটাকে ছেয়ে ফেলেছে। তাঁকে যলো করছে তাঁর মেয়ে জুলন্তিকা।

অর্গান বেজে উঠলো।—ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে।—

নাও ধর জুলন্তিকা—

এত লোকের মাঝে মেয়ে নার্ভাস হয়ে গেছে। গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুলো না। শেষে মিসেস্ সাহা আরম্ভ করে দিলেন। মেয়েও গলা মেলায় তার নাকি সুর নিয়ে। কিন্তু মায়ের তীব্র কণ্ঠে মেয়ের গলা চাপা পড়ে যায়। সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই, তিনি ঘরেতে ভ্রমর আসার আনন্দেই মত্ত। কিন্তু একে তাঁর কুরিয়ে আসা কণ্ঠ, তার ওপর হাস্যোদ্দীপক চেহারা। সর্বোপরি বিচিত্র গলা, তাতে কে বা ভ্রমর আসবে। কিন্তু এসব মহলে হাজার রকম ফুলের মেলা, তাদের ঘিরে হাজার ধরণের ভ্রমর। তাই মিসেস্ সাহার আকাশী রঙা কাপড় আর নীল রঙা বুক কাটা ব্লাউজ, মুখে ঘন পাউডারের প্রলেপ ও ছোট্ট লাল কুমকুমের টিপের জৌলুষে কোন ভ্রমর এলেও আসতে পারে।

গান শেষ হল। চারিদিক থেকে হাততালি পড়লো।

চমৎকার। চমৎকার। এক্সেলেন্ট। আপনি জিনিয়স। অথচ স্ট্রেঞ্জ, আপনাকে এতদিন চিনি নি। সত্যি আমার নিজের কাছেই অবাক লাগছে। মিস্টার ভাট এমনভাবে হাত নেড়ে বলতে সুরু করলেন, মনে হল বুঝি তিনি নাটকের ডায়লগ পড়ে যাচ্ছেন।

আপনি নিশ্চয় শান্তিনিকেতনে ছিলেন? তনিয়া জিজ্ঞাসা করে। অথচ তনিয়া জানে, ও রকম গান শিখতে শান্তিনিকেতন - কোলকাতা যেতে হয় না, রান্নাঘরের কাজ করতে করতে রেডিওই যথেষ্ট। কিন্তু কথায় কথায় শান্তিনিকেতন-কোলকাতা-বোম্বে - দিল্লী যোগ না দিলে প্রশু জুতসই হয় না, এ জানে তনিয়া।

মিসেস সাহা আলতো হেসে মুখ নেড়ে নেড়ে বললেন, মাত্তর বছর চারেক রবিবাবুর কাছে গান শিখেছিলুম—তারপরেই সাহা সাহেবের সংসারে ঘানি টানা—গানেরও ইতি—

সকলে হেসে উঠলেন। কারণে-অকারণে হাস্যলহরী তোলা এখানের নিয়ম—এ সবাই জানেন।

প্লিজ, আরেকটা গান। অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গান ধরলেন মিসেস সাহা। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—

একটা পৃথক সোফায় বসে মিস্টার মিটার ও তনিয়া। তনিয়া মিসেস সাহার কচি খুকুমি দেখে মনে মনে জ্বলে যাচ্ছিল।

ঘুরে রঙীন আর অন্যান্য সহকর্মীদের মাঝখানে স্টেনো কাম-টাইপিস্ট মিস কুলজিৎ কাউর—কি সব আলোচনায় মত্ত। তনিয়া দেখলো, রঙীন যেন ইচ্ছে করে নিজেকে ঐ গুহ্যতত্ত্ব আলোচনায় নিযুক্ত করে রেখেছে। তনিয়ার এ-অভিজ্ঞতা নতুন নয়।

মিসেস সাহার পর নিশ্চয় আপনি একটা গান শোনাবেন মিসেস চৌধুরী—তনিয়ার কানের গোড়ায় মুখটা নিয়ে গিয়ে মিস্টার মিটার অনুরোধ জানান।

আমি তো গান জানি না—একটুকরো হাসি দোল খেলো তনিয়ার রাঙা গালদুটোর টোলে,—এ-রকম হাসি তৈরীতেও সে অভ্যস্থ। বললে, তবে সেতার জানি।

ইউ মীন, তারের যন্ত্র? মিস্টার মিটার চোখ বার করে জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ। ওস্তাদ বিলায়েৎ খানের ছাত্রী ছিলুম আমি।

তাই নাকি? মিস্টার মিটার আরও তনিয়ার কাছে সরে এলেন।

ওস্তাদজীর আমি প্রিয় ছাত্রী ছিলুম। আমার হাত এত মিষ্টি যে, ওস্তাদজী তাঁর নিজের সেতারটাই আমায় প্রেজেন্ট করেছেন। অবশ্য সেটা বাপের বাড়ীতে আলমারীর মধ্যে তুলে রেখেছি। এ রকম মিছে কথা বলায়ও অভ্যস্থ। রঙীনের সঙ্গে ঘর করতে এসেই শিখেছে। আর এতে সে আনন্দিতও বটে। ও চিরদিন নায়িকা হতেই চেয়েছে সেই স্কুল-জীবন থেকে সুরু। তারপর কলেজ-জীবনে ও নাকি কলেজ বিউটি বনে গেল সবারই কাছে। অনেকে ওর কাছে ভীড় জমিয়েছিল। কাউকেই সে চাই নি। কারণ ওর বাবা ওর মনে গোড়া থেকেই একটা বীজ রোপণ করে রেখেছিলেন—তোর যা রূপ, এম-এটা পাশ কর, কত ইঞ্জিনীয়র এসে ঘুর ঘুর করবে। কিন্তু সিনেমায় যেমন অনেক নায়িকার প্রেম, একদিন কবে কোন খিড়কী দরজা দিয়ে পাড়ি জমায়, তেমনি বুঝি বসন্তের একটুকরো রঙীন আকাশ নিয়ে এলো একটি ছেলে—ওরই সঙ্গে পড়তো—শ্রীমান হতাশ বসু—অত্যন্ত সাদাসিধে, সাধারণ পোষাক-আর, চুল

ছকোখুকো। তনিয়ার হাসি পায়—ওকে কিনা ভালোবাসলে। কি করে তনিয়া ওকে ভালোবাসতে পারলে; হতাশ ছন্নিনীয়র নয়, কোনদিন হবার কথাও নয়। হতাশ কবি হতে চায়। তনিয়া তাই আঘাত দিলে। আর হতাশ তনিয়ার বিয়ের রাত্রে তনিয়ার নামে একটা শোক-গাঁথা পাঠিয়ে একপাত্র বিষ চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেছিল অপার্থিব দুর্লভ প্রেমকে অক্ষয় করে রাখতে। তনিয়া কিন্তু মোটেই কাঁদে নি, বরং একটা হাসির তুফান ছুটিয়েছিল আন-প্র্যাকটিক্যাল কবির দুর্দশা দেখে।

রঙীন চৌধুরীকে পেয়ে তনিয়া সুখী। রঙীন ফার্স্ট ক্লাস বি ই। তনিয়ার রূপেই নাকি দেবতার মাথা থেকে ফুল পড়েছে। নইলে তনিয়ার মত শিক্ষিতা মেয়ের ছড়াছড়ি। তনিয়ার সারাজীবনের সাধ মিটেছে।

সত্যি তো, তনিয়া যেন নতুন এক আকাশের তলায় এল। পুরুষ যে এত রোমান্টিক হতে পারে, এ তনিয়া জানতো না, যদি না এই আকাশের তলায় সে আসতো। এখানের সব কিছুই আলাদা। আর বেয়ারা আর্দালী-দের মুখে 'মেমসাব' কথাটা শুনতে কিই না ভালো লাগে।

কিন্তু মিসেস চৌধুরী, একদিন কিন্তু আপনার হাতের কাজ দেখাতে হবে।

আপনি গান-বাজনা ভালোবাসেন?

মিস্টার মিটার হেসে উঠলেন জোরে। বলেন কি, জানেন তো, উওমেন অ্যাণ্ড মিউজিক শুড নেভার বি ডেটেড্—

সত্যি বলছেন?

আমি মিথ্যে বলি না।

মিসেস সাহা আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে চলেছেন। সোফা থেকে মিস্টার মিটার আর তনিয়া উঠে বাইরের ফুল-বাগানের আবছা আলোয় গিয়ে নীল আর সাদা পদ্মভর্তি একটা কুয়ার ধারে দাঁড়ালেন।

নেকটাইটা ঠিক সেট আছে কি না হাত দিয়ে দেখতে দেখতে বলে ওঠেন মিস্টার মিটার, এখন দেখছি বিয়ে করি নি অনেক উপকার হয়েছে।

কেন?

নিজের ঘরণী থাকলে তার প্রতি একটা পক্ষপাতিত্ব জন্মায়। সে সব থেকে আমি মুক্ত। তাই নিরপেক্ষ বিচারশক্তি আমার জন্মিয়েছে। আর তাই আপনার বিউটী আমি এত অ্যাপ্রেসিয়েট করতে পাচ্ছি। মিসেস চৌধুরী, আপনি সিম্পলি বিউটীফুল; আপনাকে যারা পায়, তাদের জীবন কৃতার্থ। কবির কথায়, এ থিঙ্ক অব বিউটী ইজ্ এ জয় ফর এভার—কথাটা যে এত সত্যি, এ আমি আগে উপলব্ধি করি নি। আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, নিজে প্যারিস হয়ে হেলেন অব্ স্পার্টাকে চুরি করে নিয়ে যাই।

যান না; হেলেনদের সঙ্গে প্যারিসদের মিলনের একটা আর্ট আছে। তাই প্যারিসদের কখনও বাধা দেয় না হেলেনরা। তনিয়া উত্তর এত তাড়াতাড়ি দিতে পারতো না, কিন্তু এখানে এসেই ও শিখেছে।

মিস্টার মিটার খুব কায়দা করে হেসে উঠলেন।

মিসেস সাহা তাঁর গান থামিয়েছেন। আবার সেই আগেরই মত হাততালিতে ফেটে পড়েছে। সেই আগেরই মত মিসেস সাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন সবাই।

এ গান হচ্ছে না তো, হচ্ছে হল্লা—নাক কুঁচকে বললেন মিস্টার মিটার।

যা বলেছেন। আবার বলছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতনে শিখেছেন।

জীবনে শান্তিনিকেতনে গেছেন কি না সন্দেহ। মিস্টার সাহা মোস্ট থার্ড ক্লাস—অয়েলিফিকেশন ছাড়া আর কোন কোয়ালিফিকেশন আছে কি না আমার জানা নেই। এই আমাকেই কি কম জ্বালাতন করেন—

তনিয়া হাসে। মিসেস সাহাও তেমনি। গান গাইলে মনে হয় দাঁত খিঁচোচ্ছেন। ঠিক তাই না?

ঠিকই তাই, মিসেস চৌধুরী, আমি, ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, আপনি না থাকলে এতক্ষণ চলে যেতুম। এই নীরস জায়গায় আমি হাঁপিয়ে উঠতুম।

তাই নাকি? তবে বলুন, আমি একটা মূল্যবান কিছু। কিন্তু কি জানেন, অনেকেই তা মনে করেন না।

অনেকে মানে মিস্টার চৌধুরী?

তনিয়া হাসে মিটি মিটি।

কাঁধদুটো উঁচুদিকে ঝাঁকিয়ে বললেন মিস্টার মিটার, বিউটিকে অ্যাপ্রি-সিয়েট করার মত চোখ থাকা দরকার মিসেস চৌধুরী। সবাই পারে না। এই দেখুন না, এত ফুল ফুটে রয়েচে বাগানে, কে দেখচে লক্ষ্য করে। কিন্তু একজন কবির চোখে কত নতুন করেই না এর সৌন্দর্য দেখা দিতো, যেটা আমরা ভাবতে পারি না। নারীর সৌন্দর্যও অ্যাপ্রিসি-য়েট করার জন্যে চাই কবির চোখ।

কবির চোখ বলতেই ওর মনটা কেমন যেন করে উঠলো। ওর কলেজ-জীবনের হতাশ বন্ধুর কথা মনে পড়লো। এতক্ষণের ঐ হাসি, ঐ কথাবার্তা—সবই যেন যান্ত্রিক, রঙীন দম লাগিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাবী বসের আছে; আর তনিয়াও কি সুন্দর ভাবেই না প্রেজেণ্ট করতে পাচ্ছে। কিন্তু এই যে হঠাৎ ওর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, এটা কিন্তু নকল নয়, অভিনয় নয়।

অ্যাম আই রঙ, মিসেস চৌধুরী?

না—না, সে কি হতে পারে।

আপনি কথাটা শুনে ঠিকমত সায় দিলেন না কি না।

এবার তনিয়া বুঝলো, সঙ্গে সঙ্গে সায় না দেওয়াটা সত্যি অন্যায়। রঙীন চৌধুরী যদি এখানে থাকতেন, পরে ভর্ৎসনা করতেন ওকে। বলতে, আপনি রঙ নন; ভাবছিলুম এই রকম অ্যাপ্রি-সিয়েটর থাকলে নিজেকে যাচাই করতে পারতুম। সবাই তো রসিক নন। তাই ভালোবাসার কাঙাল হয়ে চিরটা কাল কাটাতে হল। তনিয়ার গলাটা ভারী হয়ে এল। ওর দু'চোখ দুটো মুক্তোর কুঁচো চিকচিক করতে লাগলো।

'মিস্টার মিটার পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছিয়ে দেন। চাপাকণ্ঠে বলে ওঠেন, কি সুন্দর লাগছে আপনাকে। কাঁদলে মেয়েদের এত সুন্দর লাগে, তা জানতুম না।

কথাটা শুনে নিজেকে আর দমিয়ে রাখতে পারলে না তনিমা। ঝর ঝর করে একরাশ অশ্রু সারা গাল বেয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

ওর ভিজে গালটা নোনতা লাগলো মিস্টার মিটারের। আপনি যে আনহ্যাপী তা জানতুম না মিসেস চৌধুরী। তনিয়ার বুকের আঁচলটা মেঝের গড়াগড়ি খাচ্ছে। আবছা আলোতে তনিয়ার অনাবৃত সাদা বুকের ওপর লকেটটা চিকচিক করছে। তনিয়ার সে খেয়াল নেই। সে অন্যদিকে তাকিয়ে একমনে জল ঝরিয়েই চলেছিল।

ওর হাতটা টেনে নিয়ে বললেন মিস্টার মিটার, আপনি শান্ত হন মিসেস চৌধুরী। কি জানেন, অ্যাডজাস্টমেন্টই হল জীবনের বড় কথা। আমি জানি শক্তই, কিন্তু মিসেস চৌধুরী, এ ছাড়া তো আর উপায় নেই।

না-না, আমি পারবো না। ও বব্ ছাঁট চুলগুলো জোরে ঝাঁকিয়ে দিলে। ক্লীপে বন্দী থাকা সত্ত্বেও কয়েকগোছা চুল সুন্দরভাবে ওর গালের দুধারে জমাট বেঁধে গেল। মিস্টার চৌধুরী একেবারে জড়পিণ্ড। ওর সঙ্গে হাঁপিয়ে উঠছি—বিলিভ মি—

সত্যি কি সুন্দর লাগচে। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য আজ আমার কাছে।

মিস্টার মিটারের বুকের লাল গোলাপটা তনিয়ার নাকে ছোঁয়া লাগলো। মিস্টার মিটারের বুকের একটা দপ-দপানি শব্দ আর গোলাপের গন্ধে কেমন এক শিহরণ জাগে তনিয়ার। এ রকম কতক্ষণ গেল জানতে পারলে না সে।

সাব—বেয়ারা এসে দাঁড়ায়।

ঠিক হ্যায় যাও, বাদ্মি—ধমকে ওঠেন মিস্টার মিটার।

ও বেচারী চলে গেল।

তনিমা তাড়াতাড়ি বুকের কাপড়টা মেলে দেয়। আনতো করে চুলগুলো সাজিয়ে রাখে। রুমালে করে পাউডারের ছোঁয়া সারা মুখে দেয়।

আই অ্যাম সরি—তনিয়া বললে, কি জানি, কেমন যেন আপনাকে আপনজন মনে হয়; বিলিভ মি।

আমারও। আপনাকে আমি ভুলতে পারবো না।

তনিয়া জানে, এর উত্তর ঠিক এই হবে। ঠিক এই। অন্য কোন উত্তর হতে পারে না। অবন্তিকা নাচছে। ওর মা আমার অর্গানে পা দিয়েছেন। হাই হারো। হারো টাদা—হাইয়ো-হাইয়ো হাইহো—অবন্তিকা থপ থপ করে নাচছে।

তনিমা পাশে একটু সরে গিয়ে জানলা দিয়ে ওর নাচ দেখতে লাগলো।

কি আর দেখবেন, নাচ তো নয়, যেন ভল্লুকের নাচ।

যা বলেছেন—

দেখছেন, আপনার সঙ্গে আমার কি অদ্ভুত মিল।

সত্যি—এটা আমিও তখন থেকে লক্ষ্য করচি। আচ্ছা, এবার চলি— মিস্টার চৌধুরী হয়তো আমায় খুঁজছেন।

ওহো—সরি—আচ্ছা, পরে দেখা হবে।

আসবেন তো আমাদের ওখানে?

আপনি ডাকলে, না গিয়ে থাকতে পারি মিসেস চৌধুরী।

পার্টি সেরে সবাই চললেন। মিস্টার মিটার নিজের গাড়ীতে রঙীন আর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে নিলেন। গাড়ী হু-হু করে চলেছে। মিস্টার মিটার হেসে রঙীনকে বলেন, আপনি নাকি চ্যাপ স্ত্রীভাগ্য করেছেন বটে—

রঙীন চৌধুরী হাসেন হো-হো শব্দ করে। তনিয়াও।

আপনি বড় বাড়িয়ে বলচেন কিন্তু —আদুরে কণ্ঠে বলে তনিয়া।

নেভার, আমি অযথা কিছু বলি না—নাকি মিস্টার চৌধুরী?

ঠিকই বলেছেন, আমিও ওর রূপের বড়ী প্রশংসা করি, ওর বিশ্বাস হয় না আমার কথায়। আমি ওকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে নাকি—

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না। এই যদি রূপ না থাকতো, দেখতেন কারুর মুখে রূপসী শোনবার জন্যে আকুল হোতেন। ঠিক তাই না মিস্টার চৌধুরী?

আপনি যা বলেছেন—

আমি যা তা বলি না।

রঙীন চৌধুরী হাসেন একপশলা।

কবে থেকে আসছেন আমার ডিপার্টমেন্টে?

সামনের মাসের সাতুই তারিখের এদিকে আমায় রিলিজ করবেন না।

ভাবচি, আপনাকে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের জন্যে মিস্টার ঘোষকে বলবো। মনে হয়, আমার অনুরোধ ফেলতে পারবেন না তিনি।

সত্যি বলচেন?

মিথ্যে বলি না আমি। মিস্টার মিটার তনিয়ার দিকে চান মৃদু হাসিতে। তনিয়া যেন লজ্জা পায়। গাড়ী ছুটছে। বাঁধের ওপর দিয়ে গাড়ী চলেছে। বাঁ দিকে জমা জল থৈ থৈ করছে। বাঁধ থেকে নীচের কলোনীর আলোগুলো ঝিলমিল করছে।

রঙীন চৌধুরী ঘুমুচ্ছেন। নাক ডাকিয়ে। অদ্ভুত ঘুমুতে জানেন। অথচ আশ্চর্য, আজ তনিয়ার ঘুম পাচ্ছে না। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বিছানার এপাশ ওপাশ করতে লাগলো।

সেন - মুখার্জী - রক্ষিত - দেবনাথ মিটার—মুখগুলো সব ভেসে ওঠে। ওঁরা সবাই এসেছিলেন। প্রেমভিক্ষা জানাতে নয়—এ যেন ওঁদের অধিকার। রঙীন চৌধুরীর ওপর যে অধিকার, তনিয়ার ওপরও সেই অধিকার। অথচ ওকে এককথায় কেমন সব মেনে নিতে হয়েছে।

রঙীন চৌধুরীর নাকডাকানি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

জানলা থেকে পর্দাটা সরালো তনিয়া। গেটের আলো দুটো জলছে।

সারা ড্যাম শান্ত, নিস্তব্ধ। এত নিস্তব্ধতা যেন কখনই অনুভব করে নি তনিয়া।

ই-ই, এস-ই, জি-এম, এ-ই-ই--- এমনি একের পর এক। রঙীনের বাপ-মা বলেন, ও ছেলের ভবিষ্যৎ নাকি খুব উজ্জ্বল। ও একদিন কেউকেটা হবে। হয়তো ঠিকই বলেন। কিন্তু---কিন্তু'র কথাটা তাঁরা জানেন না কিন্তু। তনিয়া আর ভাবতে পারলে না।

ও বড় হবে, ধাপে ধাপে উঠবে ওপরে, আর তনিয়া হবে ওর সিঁড়ি। এ সিঁড়ির ধাপ কি কখনও শেষ হবে না? উঃ শেষের কটা দিন---মিসেস সাহার মত---তনিয়া পারবে না, ও ছটফট করতে লাগলো। ঠাণ্ডার মেজাজ থাকলেও ড্রইংরুমে গিয়ে ফ্যানের তলায় বসে। মাথা ঘুরছে ওর। অডিকলনের প্রলেপ দেয়। ও স্থির হয়ে থাকতে পারলে না।

কলেজ-জীবনের কবি হতাশ বসুর কথা মনে পড়লো। কি সুন্দর না ছিল দিন ক'টা। দিনের পর দিন এই-ভাবে অভিনয় করতে হোত না, আজ নিজেকে ইচ্ছে করে হত্যা করেছে। সেদিনের শান্ত-সুন্দর মনটা আজ কলুষিত হয়ে গেছে। একটা মিথ্যের জগৎ রচিত হয়েছে তনিয়াকে ঘিরে। ও কেঁদে উঠলো।

ঘড়ির টিক টিক, ফ্যানের এক-টানা হিস হিস, পাশের ঘর থেকে স্বামীর একটানা নাকের ডাক, কখন কখন বাইরে থেকে কুকুরের ডাক। তনিয়ার কানে আসে সব---সব---এমন কি নিজের কান্নাটাও ওর কানে বড় জোর লাগে। তনিয়া একা---একা---কেউ নেই---কেউ নেই।

সারারাত্ত কাটলো। রাত একটু একটু করে কেটে গেল তনিয়া দেখলে। রঙীন চৌধুরী এখনও ঘুমুচ্ছেন। ভারি বিরক্তি জন্মালো স্বামীর ওপর। এই জীবন---অথচ আশ্চর্য, একদিন এই জীবনকে তনিয়া কত ভালোবেসেছে। তখন কেবল গাছের ফুলই দেখেছে। কিন্তু ভালো ফুল পেতে গেলে যে পচা সার দিতে হয়, জানতো না তনিয়া। না আর নয়---আর বালির বাঁধ দিয়ে চলতে পারবে না।

ঘরে গিয়ে একধাক্কায় স্বামীকে তুলে দিলে ঘুম থেকে। স্বামী হতভম্ব।

তনিয়া কাঁদছে। অঝোরে কাঁদতে লাগলো। রঙীন জানেন তনিয়া যখন ইচ্ছে কাঁদতে পারে, হাসতে পারে বটে, কিন্তু এ কান্না সে কান্না নয়।

কি হল তনু?

এবার তুমি আমায় মুক্তি দাও।

কি আবোল-তাবোল বকছো তুমি।

তনিয়া কেঁদেই চলেছে।

তনু, তুমি কি পাগল হলে?

না-না-তুমি আমায় ভুলিও না---প্লিজ---

তিনি ব্যাপারটা কিছু বুঝলেন, কিছু বুঝলেন না। তবু, একটা বৈ ঝড়ের সঙ্কেত এটুকু অনুমান করলেন। তিনি বুদ্ধিমান। অতএব বুদ্ধিমানের পক্ষে এখন কথা না কওয়াই ভালো।

ঝি এসেছে। বেয়ারা এসেছে কাজ করতে।

মেমসাব---কিছু চাপা ডাক। শঙ্কিতও বটে। মেমসাব না উঠলে এত ভোরে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি রেগে যেতে পারেন।

মেমসাব---কণ্ঠটা আরেকটু ওপরে ওঠে।

মেমসাব কি ঘুমুচ্ছেন?

মেমসাব---মেমসাব---আশ্চর্য, তনিয়া এমন সুন্দর জায়গা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। আর কোথায় এমনি 'মেম সাব' বলে শঙ্কিত স্বরে ডাকবে।

তনিয়া জল মুছে ফেলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরিপাটি করে নেয়। সত্যি তনিয়া সুন্দরী---মিস্টার মিটার সত্যি বলেছেন, এ থিং অব বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার---তনিয়া---তনিয়া চির-তনিয়া হয়ে থাকতে চায়। তনিয়া মেমসাহেব হয়ে থাকতে চায়---ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী হয়ে থাকতে চায়---তনিয়া গাড়ী চায়---ফ্রীজ চায়---বিরাট বাংলো চায়---বেয়ারা আর্দালী চায়---ছি ছি তনিয়া কি সত্যি পাগল হল?

আই অ্যাম সরি---কিছু মনে কোর না রঙীন:

মাঝে মাঝে

সত্যানন্দ মণ্ডল

সবকিছু ঝরে যায় ঝরে যায়---
ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝরে পড়ে কত তারা,
ঝরে পড়ে চেনা হাসি দ্রুততায়---
দিবানিশি ঝরে যায় জলধারা।
হাতের মুঠোয় হাত---খসে পড়ে---
দুলে ওঠা চোখে চোখ প্রথামত,
হাজার হাজার ফুল ঝরে পড়ে---
আমার প্রাপ্য সে আজো অনাগত!
আমার চাওয়া আজো ঝরে যায়---
রূপকথার প্রেম এ জিহনামূলে,
মাঝে মাঝে তিক্ত স্বাদ ধসে যায়---
মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ওঠে দুলে।

মৃত্যু

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই যে আলো, এই যে বাতাস
সূর্যের কত যে রং;
সব একটা কালো অন্ধকারে
মিশে যায় গভীর নিস্পন্দতায়।
জীবনের চাহিদার অবলুপ্তি;
নির্বাক শূন্যতায় মাঝে রেখে যায়
ভাবহীন প্রশান্ত মৌনতা;
আসে অনাহূত অসীমের আমন্ত্রণ।

॥ দশ ॥

মামলায় হেরে রাগে আগুন হয়ে উঠেছিলেন সুরেশ্বর। চিরদিনের আশ্রিতা একটা বেশ্যার মেয়ে, কানা-কড়িও যার দাম নয়, তাকে দখলে রাখবার জন্য মোকদ্দমা, আবার সেই মোকদ্দমাতেও হার হ'ল। কিন্তু মামলা না করে অন্য উপায়েও হিমিকাকে আনা যেত এবং সেটা সহজ উপায় ছিল। রাগের মাথায় মনে পড়ে নি নীহারিকার কথা। পৈতৃক বাড়ীর উপর অজয়ের অগাধ মমতা, ঐ দিক দিয়েই একটা বন্দোবস্ত হয়ে যেত। বন্ধুরা যে সমর্থন করে নি সুরেশ্বরের কাজে সেটাও বোঝা গেল সীতারাম দাসের কথায়।

---আরে ছো ছো সুরেশ্বরবাবু। জমিদার ছিলেন বেওসা করছেন। আপনাকে দিয়ে অনেক কাম হোবে। সীতারামজী বলছেন, বদনামী হজে আপনার আদমীরা যদি ভোট না দেয়, সেই বাত।

---হ্যাঁ, সীতারাম দাস বলল।

---উ বদমাস আদিত্য মণ্ডলের আলাদা সিট রয়েছে, তবু শালে সতন্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেখলাবে ওর হিম্মত কত। হামি সেই বাত বলছি, আপ-নার অসুবিস্তার কথা।

---কিছু অসুবিধে নেই। এ দিকের সব আমার কাছে বাঁধা। হয় খাতক নয়তো কলে কাজ করে। আর মেয়ে নিয়ে বদনাম তো পুরুষেরই হয়। হিজড়ের বদনাম নেই।

হা-হা ক'রে হাসল শ্রোতার দল।

বুলাকি দাস বলল: নিজের লোক কত লোকের মাথা দিয়েছেন সাবান্য কারণে। তা উনি বিধানসভায় গেলে সভার জৌলুষ বেড়ে যাবে অনেক।

---ওতো সাচ বাত। আচ্ছা রায়-বাবু, কেতো রূপেয়া পেলে অজয়বাবু ছাড়বে ছুকরীটাকে তার নিশানা দিতে পারেন? আপনার তো সুরেশ্বর-বাবুর সঙ্গে খুব দোস্তী, দেখেছেন ছুকরীটাকে? চুপি চুপি চিত্ততোষকে জিজ্ঞেস করল বুলাকী।

●

হিমিকার কথা জানল সবাই। ছেলে মেয়ে স্বজন---কারোর কাছেই সঙ্কোচ বোধ করবার প্রয়োজন দেখলেন না সুরেশ্বর। বড় ছেলে অমরেশ্বরকে একটু শ্বশুরবাড়ীর সমালোচনা শুনতে হ'ল। অলকের মনের কথা ধরা যায় না কখনো,

ধারাবাহিক
উপন্যাস

মমিতা চক্রবর্তী

এক কসবীকা লিয়ে বদনাম কিনলেন? আপনার পয়সা থাকলো, তো মিলবে কেতো নও জোয়ান ছুকরী। ওর জন্য দিমাগ খারাব হ'ল আপনার? একেবারে মামলা ঠুকে দিলেন, পত্রিকায় খোবোর হ'ল। ইলেকশনে আপনার কেস নষ্টো হয়ে গেল।

---বদনাম আবার কিসের? রাগত কণ্ঠে বললেন সুরেশ্বর---কেনা বাঁদীকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে জ্ঞাতিশত্রু, তাকে শাস্তি দেবার জন্য লড়ব না? যেমন আপনাদের বুদ্ধি তেমনি বিচার হ'ল। ইলেকশনে অসুবিধে হয়, দাঁড়াব না।

---না, না, সে বাত্ত নেহি। বাধা দিল মোতীচাঁদ।

---আমরা ঠিক করেছি বেবসায়ী-দের সুবিস্তার জন্যই বিধানসভা, লোকসভায় আমাদের মানুষ পাঠাব। আপনি সবসে আচ্ছা ক্যাণ্ডিডেট। গোরমেণ্টের ঘরে নেই বলে আমার ফাইন হয়ে গেল পঁচাশ হাজার রূপেয়া, ঘোষবাবু বেঁচে গেল। ওভি বহুৎ বেলেক করেছিল।

---ঘোষবাবু কেতো রূপেয়া ঘুষ দিল? তুমি কবলালে মোটে পাঞ্চ হাজার। সীতারামজী তো তিনঠো কোম্পানী বন্ধ ক'রে দিল। জয়েণ্ট স্টক হতে নুটিশ এল কতবার। কুছ হ'ল না। তোমার মেজাজ বহুৎ কড়া। সুরেশ্বর বাবুকো মেজাজভি বহুৎ চড়া হ্যায়। ঠাণ্ডা মেজাজ হোবে, তো হাসিল হোবে সব কাজ।

পান মুখে দিল মোতীচাঁদ।

রায়-বসু কোম্পানীর চেয়ারম্যান চিত্ততোষ রায় হাসল।

---সুরেশ্বরবাবুর মেজাজ তো থাকবেই। জমিদার মানুষ। একদিন বিশেষত এখন অনেক দিন ধ'রে সে কলকাতার বাসাতেই আছে। সব চেয়ে পরিবর্তন হ'ল মহামায়ার। সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। দাদু মামা ---কারোর অনুরোধেই এম-এ ক্লাসে ভর্তি হ'ল না। বাবার প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণায় তার মন চিরদিনের জন্য বিমুখ হয়ে গেল। হিমিকাকে না দেখলে হয়তো এতটা হ'ত না। মায়া জানত তার বাবা বিশুদ্ধ চরিত্রের নন। মার্বেল প্যালেস, আর হীরার বালার মত এটাও জন্মসূত্রে পাওয়া ব'লে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু হিমিকা---তার চেয়ে ছোট একটি মেয়ে, যে সুরেশ্বরকে হয়ত বাবা বলেই জানত, তার প্রতি একজন বর্ষীয়ান পুরুষের এই দুর্দান্ত লালসার আকর্ষণ কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না মায়া।

---জানো মেজদা, লজ্জায় ঘৃণায় মরে যেতে ইচ্ছা করছে আমার।

অলককে বলল মহামায়া। অলক চুপ ক'রে রইল। বলবার কি আছে, লজ্জায় মরবার ইচ্ছা হলেও শুধু লজ্জা পেয়ে কেউ মরেছে ব'লে শোনা যায় নি কোনো দিন। সুতরাং গ্লানি আর লজ্জা যতই হ'ক তারা কেউ মরবে না। হয়তো প্রত্যক্ষ করবে বাবার আরো অনেক বেপরোয়া অভিযান।

---তুমি ওকে---হিমিকাকে দেখেছ মেজদা?

---না।

---আমি দেখেছি। তখন তো জানতাম না যে---। এমন ইনোসেন্ট দেখতে। কি মুশকিলেই না ওকে নিয়ে পড়েছেন ছোট দাদু।

---মুশকিল কিসের? অলক জিজ্ঞেস করল।

---বা মুশকিল নয়? কত দুর্নাম কাগজে কাগজে।

---অনেক প্রশংসাও বেরিয়েছে পরে।

---ওকে নিয়ে যে কি করবেন ছোট দাদু।

---পড়ছে তো।

---কোথায়। নাম কেটে দিয়েছে কলেজ থেকে, খবর বের হবার সঙ্গে সঙ্গে। ওর প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে, কি বল মেজদা।

কর্তব্য। এতক্ষণে হাসল অলক। দুঃখ-বিদ্ধ হাসি।

---তুইতো জানিস, একবার কর্তব্য করতে গিয়েছিলাম, ওর মাকে মরতে হ'ল, চাকরি ফেলে পালাল সমর সেন। কর্তব্য, ভাল কাজ, ওসব ছোট দাদু, অনলদের জন্য। আমরা ওদিকে হাত বাড়ালেই কানমলা খাব ভগবানের। তপস্যার আসনে বসবার অধিকার যেমন অর্জন করতে হয়, তেমনি অধিকার পেতে হয় ভাল কাজে হাত দেবার জন্য। তুই মিছে ভেবে অস্থির হচ্ছিস। যে ভার ছোট দাদু নিয়েছেন, তা বইবার শক্তি তাঁরই আছে। তিনিই চিন্তা করছেন।

হিমিকাকে নিয়ে চিন্তা করছিলেন অজয়। হিমিকা নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। মন্দবালা তার ছায়া ছুঁলেও স্নান ক'রে আসে। অপর্ণার মুখ পাথরের মত। অজয় সময় পেলেই ওর ঘরে গিয়ে কথা বলেন। প্রশ্নের জবাব দেয় হিমিকা, আবার নিস্তব্ধ। মানুষের বিশেষত এমন অল্পবয়সের পক্ষে পরিস্থিতিটা যে কি ভয়ানক তা বুঝেও কোনো উপায় দেখতে পান না অজয়। হঠাৎ মনে হ'ল নার্সিং পড়ালে হয় হিমিকাকে। এ লাইনে বিশেষ বাধা নেই। অনল অনায়াসে ওকে নিজের হাসপাতালেই ঢুকিয়ে নিতে পারবে, পাশ করবার পর। হয় তো ভালই পাশ করবে। বিলেত যেতে পারবে স্কলারশিপ নিয়ে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উত্তেজিত হলেন অজয়। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন।

---নার্সিং পড়বে হিমিকা?

চৌকীর উপর শুয়ে হিমিকা দু'টো টিকটিকির লড়াই দেখছিল। ধড়কড় ক'রে উঠে বসল। নার্সিং পড়া? তার মানে কিছু একটা করা? উজ্জ্বল হ'ল তার মুখ, আবার ছাই হয়ে গেল নিমেষে।

---কি বল, পড়বে নার্সিং?

---আমাকে, আমাকে কি---। থেমে গেল হিমিকার মৃদুকণ্ঠ।

অস্থির হয়ে অজয় ছেলের বাড়ী আসবার অপেক্ষা করতে লাগলেন। অনলই সব ব্যবস্থা করতে পারবে নিশ্চয়ই। বিকেলে বাড়ী এসে বাবার কথা শুনল অনল। আশ্চর্য হ'ল।

---নার্সিং পড়বে? কেন, কলেজের পড়া চালাতে পারছে না? ফার্স্ট ডিভিশন তো ছিল।

---ইয়ে, কলেজ থেকে তো ওর নাম কেটে দিয়েছে অনেক দিন। অজয় বললেন।

---কেন?

---ওই সব খবরের কাগজ টাগজে দেখে আর কি।

---খবরের কাগজে? কিন্তু তাতে ওর দোষ কি? দাঁড়াও দেখছি আমি।

পরদিনই কলেজে গিয়ে অনল প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করল। প্রচুর বাদানুবাদের পর প্রিন্সিপ্যাল বললেন:

---আমি মেনে নিচ্ছি তোমার সব যুক্তি। মেয়েটির কোনো দোষ নেই। কিন্তু ওকে কলেজে রাখতে পারব না আমি। কলেজের দুর্নাম হবে। মেয়েরা কলেজ ছেড়ে দেবে।

মুখ লাল করে প্রিন্সিপালের ঘর হতে বেরিয়ে অনল দেখা করল কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারীর সঙ্গে। রোগা, কালো, মোটা কাচের চশমা চোখে মেয়েটাকে দেখেই বুঝল অনল লিভার খারাপ।

---শুনুন, হিমিকা নামে একটি মেয়ে পড়ে ফার্স্ট ইয়ারে। তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।

---নাম কেটেছে? মাইনে দিতে পারে নি? এক্ষুণি যাচ্ছি প্রিন্সিপালের কাছে। ঝলসে উঠল ইলা দত্ত।

---রোল নাম্বারটা দিন তো।

---বসুন। একটু কথা শুনতে হবে আপনাকে। মাইনে নয় ব্যাপারটা জটিল। কিছুদিন আগে একটা মামলা হয়েছিল। খবরের কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়ই। ডক্টর অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় হিমিকার অভিভাবক, কিন্তু ওর মা---। মনে পড়ল ইলার।---ও সেই হিমিকা। তা সে, সে তো ---।

---শুনুন। স্পীড দিল অনল।

---মানুষ তার জন্মের জন্য দায়ী নয়, কাজের জন্য দায়ী। হিমিকা কোনো অন্যায় কাজ করে নি। ওর মাকেও তার কাজের জন্য দায়ী করা চলে কি? তার জন্য দায়ী ত আমাদের সমাজের নৈতিক অধঃপতন। আমরা চিরদিন খারাপ কাজের জন্য ছি-ছি করেছি, কিন্তু যে উঠতে চায় তার দিকে কখনো হাত বাড়াই নি। আজো কি সেই ভুল করব আমরা? ভদ্র সুস্থ জীবন যে পেতে চায় তাকে ঠেলে দেব আবর্জনার মাঝে।

---কক্ষণো না। উত্তেজিত হ'ল ইলা। একটা মহান, মহান এবং কঠিন কর্তব্যের ডাক শুনতে পেল। উড়ন্ত আঁচল কোমরে গুঁজে ফেলল ইলা।

কলেজ ইউনিয়নের বিচ্ছু মেয়েগুলো যে কতটা করতে পারে তা ভালমতই টের পেলেন প্রিন্সিপাল। ঠিক দু' মাস সতেরো দিনের মাথায় কলেজ হতে চিঠি এল হিমিকার নামে ক্লাস করবার নির্দেশসহ।

একটু সময় চিঠি হাতে নিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল অনল। এতদিন হিমিকার জন্য লড়াই করতে করতে কখন যে হিমিকার উপর থেকে সব বিদ্বেষ চলে গিয়েছে একটুও বুঝতে পারে নি। আজ প্রথম অনুভব করল রাগ বিতৃষ্ণা কিছু নেই, গভীর মমতায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে সমস্ত মন। চলে এলো হিমিকার ঘরে অনেক দিন পর।

---এই যে হিমিকা দেবী, আর গা ঢেলে খাটে ছড়িয়ে পড়া নয়। স্নান খাওয়া সেরে কলেজে যাও। এই না'ও চিঠি।

হিমিকার হাতে প্রিন্সিপালের চিঠি দিল অনল। ধৈর্য ধ'রে দেখল হিমিকার তিন-চার বার ক'রে চিঠি পড়া।

---আঃ এত কি আছে চিঠির মধ্যে যে, পড়া শেষ করতে পারছ না। ইংরেজী বুঝছ না নাকি? যাও যাও চটপট রেডী হয়ে নাও। বাবা নামিয়ে দিয়ে যাবেন তোমাকে।

আস্তে আস্তে মুখ তুলল হিমিকা। বিষণ্ণ করুণ মুখ।

---আমি তো আর কলেজে পড়ব না।

---কলেজে পড়বে না? তাজ্জব বনল অনল।

---পড়বে না তো কি করবে? নার্স হবে?

স্নান ক'রে অজয় উপরে উঠছিলেন, অনলের উচ্চকণ্ঠে সরে এলেন।

---কি হয়েছে?

---কি হয়েছে? প্রফেসার লাহিড়ীর চিঠি দেখলে তো, তিনি ওকে কলেজ যেতে লিখেছিলেন। নইনী এখন বলছে ও আর পড়বে না। কাণ্ডটা বোঝ একবার। দু' মাস ধ'রে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে আমার। সেই ইউনিয়নের পাণ্ডা মেয়েটার খোশামোদ করেছি রাশি রাশি, ওদের বক্তৃতা শুনেছি, চাঁদা দিয়েছি। এখন কি না বার্তা---না তিনি পড়বেন না।

দুম দুম ক'রে পা ফেলে চলে গেল অনল। অজয় অনেক অনুরোধ করেও হিমিকাকে কলেজে যেতে রাজী করাতে পারলেন না।

হিমিকা কোনো কথা বলল না। উঠল না, স্নান-খাওয়া কিছু করল না সে। নিয়মমত তার ভাত ঘরের কোণে ঢাকা দিয়ে ঠাকুর চলে গেল, সরবালা আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল একটা ঘরের মেঝেতে। দাসী-চাকরের কথা শোনা গেল না। নিস্তব্ধ দুপুর নামল বাড়ীতে।

অনলের হাসপাতালের ডিউটি শেষ হয় আড়াইটার সময়। বাড়ী ফিরতে চারটে, সাড়ে চারটে। আজ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী এল অনল। একটা কথা তার হঠাৎ মনে হয়েছে। হিমিকা পড়তে চায় না। কেন। প্রথম তো খুব উৎসাহ ছিল কলেজে যেতে। টাকা? ঠিক, মোকদ্দমা চলবার সময় টাকা-পয়সা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েচে বাড়ীতে। সরমাসীর ক্ষুরধার জিহ্বাও নিশ্চয় এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান দান করেছে হিমিকাকে। সুতরাং হিমিকা আর টাকা খরচ করাবে না ঠিক করেছে। বোকা মেয়ে। আরে তারা হচ্ছে শান্তিনগরের জমিদারবংশ। মরাহাতির দামও লক্ষ টাকা হয়। একটা মেয়েকে পড়াতে আবার তাদের অসুবিধা। বাড়ীতে ঢুকে সোজা হিমিকার দরজায় ঠুক্ ঠুক্ শব্দ করল অনল।

জানালায় কপাল ঠেকিয়ে সেই কপালের কথাই ভাবছিল হিমি। কলেজে পড়বার অনুমতি এসেছে। কিন্তু অনুমতি এলেই কি পড়া যায়? ওকে দেখলেই ফিস্ ফিস্ করবে মেয়েরা সরে বসবে, উঠে যাবে ওর বেঞ্চি থেকে। অন্য ইয়ারের মেয়েরা ভিড় ক'রে আসবে তাকে দেখতে। প্রফেসর পড়াতে পড়াতে তার দিকে চেয়ে এক মিনিট থেমে যাবেন। দপ্তরী দরোয়ান ক্লার্ক সবাই তাকাবে বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে। চোখ দিয়ে জল পড়ছিল হিমিকার। দরজায় শব্দ হতেই ক্ষিপ্রহাতে জল মুছে ফেলল। ঝি এসেছে, বাসন বের করবে। কিন্তু ভাত তো আজ খেতে পারে নি। ক'দিন, না খেয়ে থাকতে পারবে সে? সরবালা এক্ষুণি জানবে সে ভাত খায় নি। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলবে---ঢং দেখে সারা হলাম। অপিদির অমন সুন্দর চোখ দিয়ে একঝলক ঘৃণা উপচে পড়বে। এখন খুব তাড়াতাড়ি একটু খেয়ে নেবে?

সাড়া না পেয়ে অনল দরজা একটু ঠেলে দিল---ঘুমচ্ছো নাকি? ঘুমোও নি; কি করছ? হিমিকা তাড়াতাড়ি দরজার সামনে এল, দু'হাত দিয়ে মেলে ধরল কপাট। নীল চশমার মধ্য দিয়ে শেষ দুপুরের কড়া আলোয় অনল দেখল শুকনো চুল, শুকনো মুখ একটি মেয়েকে।

---এমন চেহারা কেন? জ্বর নাকি? জ্বর নয়। স্নান করো নি? ---ভাত খাও নি?

আশ্চর্য হয়ে অনল দেখল মেঝের উপর ভাতের থালা। বেলা সাড়ে তিনটার সময় অভুক্ত অস্নাত নতমুখী মেয়েটির দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠল অনলের। কত মেয়ে দেখে অনল, এমন দেখে নি। তার বোন অপর্ণা স্নেহে আদরে লালিত মোমের পুতুল। তাকে ঘিরে কত স্নেহ-মমতা, আশঙ্কা উদ্বেগ। অপির একটু মাথা ধরলেও বাবা কলেজে যেতে পারেন না। মহামায়া রাজকন্যার মতই গরিমাময়ী। সহপাঠিনী সহকর্মিণী, বন্ধুর বোন, কত মেয়ে ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। হিমিকার মত তারা কেউ নয়। ও যেন পথের পাশে ছিটকে পড়ে থাকা একটুকরো রুক্ষ শুষ্কভূমি। একটু ঘাসের আবরণ নেই, একটা গাছের ডাল ছায়া দেয় নি একফোঁটা। রোদের নিষ্করুণ তাপে কেবল জ্বলছে আর

জলছে। একটু সামনে এগিয়েএল অনল, আদর করে অনেক দিন পরে ডাকল:
---নইনী, যাও, যাও স্নান করে এস। যাও, লক্ষ্মীটি। কথা শোনো আমার, স্নান করে এসে যা পার একটু খাও। থালাটা, থালাটা ঢাকবার কিছু নেই? ঝুড়িটা দিয়ে ঢাকা দাও। ব্যস্। এবার স্নান।

হিমিকার ঘর থেকে সরে ও-দিকের দরজায় উঁকি দিল অনল।

সরমাসি, ওঠো. চারটে বেজে গিয়েছে।

চমকে তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় টেনে উঠে বসল সরবালা। মরণ তার। মনে ছিল না আজ অনুর ডিব্‌টি দু'টোয় শেষ।

---এই যে উঠেছি বাবা, তুমি ঘরে গিয়ে হাত-পা মেলে বোসো গে, আমি খাবার সরবৎ আনছি।

---থাক, আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। নইনীকে একটু দেখ গে। এখন পর্যন্ত খায়নি ও। অপি কোথায়?

---অপি? সে তো পড়া-লেখা করছে; কিম্বা ঘুমোচ্ছে।

---বেশ। একটা মেয়ে স্নান করে নি খায় নি, আর তোমরা দিব্যি ঘুমোচ্ছ। চমৎকার অবস্থা হচ্ছে বাড়ীর দিনে দিনে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল অনল।

রাগে আগুন হয়ে হিমিকার ঘরে এসে ঢুকল সরবালা।

---বলি বাছা, তোমার মতলবটা কি?

ভাতের গ্রাস মুখে তুলছিল হিমিকা, আর তুলতে পারল না। নির্বাক চোখে চেয়ে রইল সরবালার দিকে।

---এঃ, আবার, ড্যাব ড্যাব ক'রে চাইছে কেমন। যেন গিলে খাবে আমাকে। ক্যান্ লো ছুঁরি। তোর এত নালিশ করেল কেন? কি ইচ্ছে তোর মনে? নরুকে পোকা, তার আস্পদ্দা দেখে বলিহারি যাই।

অপর্ণা নীচে নেমে এসেছিল, বারান্দার ওদিক হতেই জিজ্ঞেস করল: কি হয়েছে সরমাসি?

---হবে আবার কি। যা হবার তাই হয়েছে। বাদুলে জল ক্ষেতে ঢুকিয়েছে তোমার বাবা, সব ধুয়ে মুছে সর্বনাশ করে নামবে। এমন লাগিয়েছে আমার নামে অনুর কাছে হারামজাদী, অনু আমাকে বত কথা শুনিয়ে গেল।

---দাদা তোমাকে কথা শোনাল? আশ্চর্য হ'ল অপর্ণা।

---অনুর দোষ কি। কেঁদে কেটে লাগালে ভাঙালে বুঝবার সাধ্য আছে সত্যি কথা অনুর। আমি নাকি ওকে খেতে দেই নি।

---খেতে দেও নি! না: কেবেই আছে এখানে দু' বছর ধরে?

উপরে উঠে গেল অপর্ণা। সিঁড়ির মাথাতেই দেখা হ'ল অনলের সঙ্গে।

---এই যে, শোন্ অপি, তোকেই খুঁজছিলাম আমি।

দাদার কথার উত্তর দিল না অপর্ণা। শক্ত মুখে চেয়ে রইল।

---শোন্ অপি, আজকে হাসপাতাল হতে ফিরে দেখলাম, তখনো নইনী খায় নি। ওকে তোরা একটু দেখিস না কেন বল ত'? আর দেখ, নইনী হয়তো আমাদের টাকা খরচের কথা ভেবেই পড়তে চাইছে না। তুই বুঝিয়ে বললে---।

---খরচের ভয়। দাদার কথার মাঝখানেই ব'লে উঠল অপর্ণা--- ওর জন্য তো আর খরচ হয় নি আমাদের এতদিন। দুর্নাম তো জুটেছে ফাউ।

---কি বলছিস?

---বলছি ঠিকই। তুই যেমন বোকা দাদা, ভেবেছিস টাকার কথা ভাবছে ও। আসলে কথা টিটকারী খাবার ভয়ে বলেছে যাবে না।

---টিটকারী কিসের?

---ওর বংশ-মর্যাদার। মা-দিদিমার পেশার খবর। কাগজে বেরিয়েছে তো ভাল ক'রেই। তারপর নিজের---।

---ছি অপি, ছি।

থেমে যেতে হ'ল অপর্ণাকে। দাদার এই গাম্ভীর্যকে ভয় পায় সে। এ সময়ে অনল আর অপর্ণার হাসি-খুশী ছেলেমানুষ দাদ থাকে না। গম্ভীর রাশ-ভারী মানুষ, বংশের প্রতিনিধি। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে এল অনল। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরাল। অপর্ণার কথায় আজ অনল অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। নিরপরাধ মেয়েটাকে অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ সূচিমুখে সবাই বিক্ষুব্ধ করছে। পৃথিবীতে দয়া-মায়া সহানুভূতি এমন চুক্তি-সাপেক্ষ, আগে কোনোদিন বোঝে নি অনল। ধন-মান-মর্যাদার হাত ধ'রে নেই এরা মানুষের কাছে আসে। নিজের বোনের প্রতিও জীবনে সর্বপ্রথম একটা বিরাগ অনুভব করল সে। ভাগ্য অপর্ণাকে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী দিয়েছে। নিজের সুরক্ষিত স্বর্গে বসে অপি ঘৃণার চোখে দেখছে হিমিকাকে। আনন্দ, সম্মান, অর্থ, ভালবাসা সব পেয়েছে জন্মসূত্রে এবং সেই জন্যই অনায়াসে হিমিকাকে কুৎসিত আবর্জনার মত ভাবতে পারছে। অপর্ণারা কোনো দাম না দিয়েই বসে আছে রাজকন্যার মহিমায়; আর যে অপরাধ করে নি, তার ভারে কুণ্ঠিতা হিমিকা কাঁপছে থরথর ক'রে। অপমানিতা ম্লানমুখী হিমিকার কথা বারবার ভাবল অনল। পুরুষের বুকে জন্ম নিল এক অসীম মমতা।

অনলের মমতা প্রথম টের পেল সরবালা। সে দেখল হিমিকার দিকে অনল চেয়ে থাকে, কিন্তু সে চোখ পুরুষের নয়, ভালবাসার। অনল পুরুষের চোখ দিয়ে হিমিকাকে দেখলে এত ভয় পেত না সরবালা। খারাপ লাগলেও বুঝতো ওসব মেয়েদের দিকে পুরুষরা চাইবেই। কিন্তু এ যে এক করুণ মমতা ঝরে পড়ছে অনলের চোখ দিয়ে। এ-মমতা যখন কোনো মেয়ের জন্য পুরুষের বুকে জন্মায়; তখন জীবনটা হেলায় বিকিয়ে দেয় তারা। ভয়ে তাই বুক শুকিয়ে গেল সরবালার। শকুনের ছায়া পড়েছে

সোনার সংসারে। সরবালা দেখতে পেল, কালো-পাখা মেলে নেমে আসছে একটা ভয়ানক শকুন। তার ডানার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে অনলের মুখ। অমন হীরের ধার ছেলে, তার আর সেই দ্যুতি নেই যেন। অনলকে বুকে নিয়ে নিজের জীবনের সব দুঃখ ভুলেছে সে। তার সেই সর্বস্বধনের সর্বনাশ এসেছে। সুখ-শান্তির পবিত্র সংসার। কোথা হতে উঠে এল এই কালনাগিনী, তার বিষে, ফণার নাচনে মাতাল হয়ে উঠেছে অনু। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সবাই। জ্বলে যাবে? কক্ষণো না। তুচ্ছ দাসী সরবালা। কিন্তু দীর্ঘ একুশটি বছর জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তিলে তিলে রং করেছে এই সংসারকে সে। কতদিন ধরে, স্বপ্ন দেখছে অপির বর আসবে চতুর্দোলায় চড়ে। অনুর বউ আসবে আলোর ঝরনা ঝরিয়ে। সরবালা গরদের ধুতি পরে আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে ঘুরে বেড়াবে। কুটুম্ব সজ্জন তাকে দেখিয়ে বলাবলি করবে---দাসী বটে, কিন্তু মায়ের বাড়া সরবালা। সেই স্বপ্ন ভেঙে যাবে, অনু ডুবে যাবে কলঙ্কের সাগরে? কক্ষণো না। সরবালার জীবন থাকতে এমন সর্বনাশ ঘটতে দেবে না সে। একটা কঠিন সঙ্কল্পের প্রতিজ্ঞার দৃঢ় হল। হিমিকাকে তাড়াবার উপায় চোখে পড়েছে তার।

হিমিকাকে তাড়াবার ভাল উপায় ভেবেছে সে। এখন কাজে লাগাতে পারলে হয়। মামলা করে অনেক কালি ছিটিয়েছেন বড়বাবু। কিন্তু সরবালা জানে যে বিষে মৃত্যু, সেই বিষই অমৃত হয় নিদানকালে। মৃত্যু-বাণ হেনেছিলেন সুরেশ্বর, কিন্তু এখন, এই দুঃসময়ে অনলকে বাঁচাতেও পারেন তিনিই কেবল।

গরদের চাদর গায়ে জড়িয়ে আঁচলের খুঁটে টাকা বাঁধল সরবালা। দেশ থেকে বোনঝি এসেছে, অসুখ। তাকে দেখতে যাবে। প্রায়ই যেতে লাগল সরবালা এবং যাঁর জন্য এত হাঁটাহাঁটি তাঁর দেখাও পেল। গঙ্গা নাইবার সময় অনেকবার কুমারটুলীর বাড়ীতে এসেছে সরবালা। সে জানত মাঝে মাঝেই নানা কাজে কলকাতার বাড়ীতে আসেন সুরেশ্বর।

বেলা চারটের সময় ঘুম ভেঙে একগ্লাস কৎবেলের সরবৎ খাবার অভ্যাস সুরেশ্বরের। সামনে শ্বেত-পাথরের গ্লাস, অম্বুরী তামাকে মিষ্টি-গন্ধ ধোঁয়া, মৃদু মৃদু ডাকছে মুখনল। ভারী মধুর আলস্যের একটা আমেজ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। পায়ের কাছে একেবারে উপুড় হয়ে প্রণাম করল সরবালা। ধুলো ঠেকালো কপাল বুক জিহ্বায়।

---কে?

---আজ্ঞে আমি সরবালা।

---কে সরবালা? ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন সুরেশ্বর।

---আজ্ঞে আমি সরবালা, নীহারিকার দাসী।

---হুঁ। মনে পড়ল সুরেশ্বরের। ছোট বাড়ীর পুরনো দাসী। গিন্নি মরে যেতে ওই মানুষ করেছে অজয়ের ছেলে-মেয়েকে। যেমন ছোট প্রবৃত্তি অজয়ের, বিয়ে নয়, কোনো সম্ভ্রান্ত বাই নয়, রেখেছে একটা দাসীকে। মনে পড়ল দু-একবার এ-বাড়ীতেই মায়ের কাছে দেখেছেন ওকে।

সরবালা বুদ্ধিমতী। সে জানে একে দাসী। তাতে প্রতিশত্রুর দাসী। সহজে তার সঙ্গে কথা কইবেন না বড়বাবু। কিন্তু কথা বলিয়ে ছাড়বে সে। আবার মাটিতে মাথা ঠেকাল সরবালা।

---বড় বিপদে পড়ে চরণে আশ্রয় নিতে এসেছি রাজাবাবু। আপনি ছাড়া রক্ষে করবার কেউ নেই।

নড়ে-চড়ে বসলেন সুরেশ্বর। শান্তিনগরের রাজত্ব না থাকলেও এখন পর্যন্ত তিনিই রাজাবাবু। বিপদ। এমন কি, কি বিপদ ঘটতে পারে, যার জন্য দাসী পাঠিয়ে সাহায্য চাইতে হচ্ছে অজয়কে।

মাথা তুলে সরবালা বলতে লাগল।

---আপনার বাড়ী থেকে পালানো সেই মেয়েটা কালসাপিনী বাবা। সংসার ওর বিষে জ্বলে যাচ্ছে, আপনি কৃপা করে রক্ষা করুন।

মেয়েটা। যূথিকার মেয়ে। সচেতন হয়ে উঠলেন সুরেশ্বর। ব্যাপার কি। ভাবলেন মনে মনে। অজয় মেয়েটাকে বিয়ে করছে না কি! ছেলে-মেয়ের সামনে বুক ফুলিয়ে রক্ষিতা রাখবার মত পৌরুষ যে অজয়ের নেই, তা ভালই জানেন তিনি। তারপর অতি বিদ্বান পাগল ওরা, উদারতা দেখাবার, মহৎ হবার তাগিদে অনায়াসে বিয়ে করে বসতে পারে বাজারের বেশ্যাকে। কথাটা ভাবলেন বটে সুরেশ্বর। কিন্তু উল্লাস বোধ করতে পারলেন না। খারাপ মেয়ে নিয়ে বাজি রেখে মামলা করা যায়। বড়লোকের অনেক খেয়ালের মত এও একটা খেয়াল। তাকে বিয়ে করে বধূ ব'লে মেনে নেওয়া, সে অপমান বংশের। বৎসরান্তে কালিকা মন্দিরের পূজার ভার ছোট তরফের উপর। কালী-মন্দিরে ঢুকবে অপবিত্র মেয়েটা, সন্তান হ'লে জলপিণ্ড দেবে পূর্ব-পুরুষকে। উঃ। উত্তেজনায় একেবারে খাড়া হয়ে বসলেন সুরেশ্বর। গড়গড়ার নল আছড়ে ফেলে সরবালার কাছে শুনতে চাইলেন বিপদের বিবরণ।

সরবালা বুঝল, তার কার্য সিদ্ধির মুখে। সবিশেষ টীকা-টিপ্পনী যোগে সে জানাল অনলের আসক্তির কথা। যা চোখে দেখে নি, ভবিষ্যতে ঘটতে পারে ব'লে ভয় পাচ্ছে, তাকে বর্তমানে নিয়ে এল। তারপর কথা শেষ ক'রে কোঁপাতে লাগল আঁচলে মুখ ঢেকে।

ভীষণ উদ্বেগ বোধ করলেন সুরেশ্বর। অনলকে তিনি ভয় পান। উদ্ধত যৌবন ছেলে, তার রক্তে নেশা ধরলে ঠেকাবার সাধ্য হবে না কারোর। যূথিকার মেয়ের প্রতি অনলের নেশা জন্মালে, আপত্তি নেই সুরেশ্বরের। ভালমতই তাহ'লে জব্দ হবে অজয়। এমনিতেও জব্দ কম হয়নি। মামলায় হারলেও

পশ্চিমবঙ্গ জনত্রাণ ভাণ্ডারের জন্য ত্রিশ হাজার টাকার চেক জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের প্রতিনিধির নিকট থেকে গ্রহণ করছেন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর

॥ চিত্রে সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী

আশ্বিন / '৭৫

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের কার্য-নির্বাহক সমিতির সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, সাদিক আলি প্রমুখ
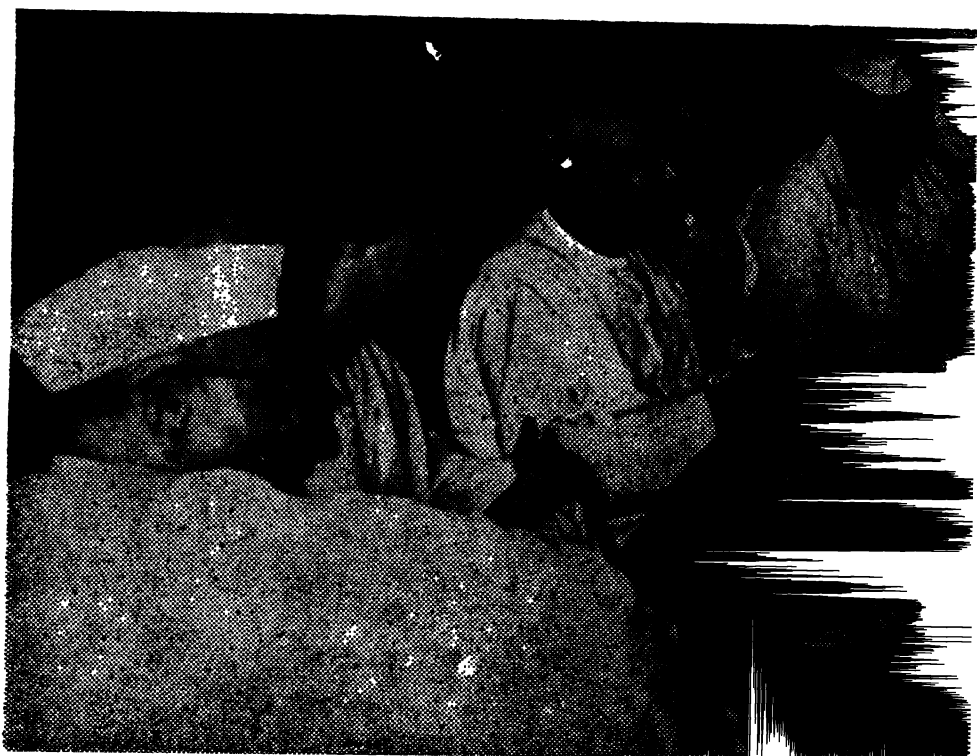
লোকসভার সদস্য এবং ভারতের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন সম্প্রতি পেশাগত ব্যাপারে যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে বি বি সি-র (বাংলা) প্রযোজক শ্রীকমল বসুর সঙ্গে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে নয়াদিল্লীতে সোভিয়েট দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যবৃন্দ
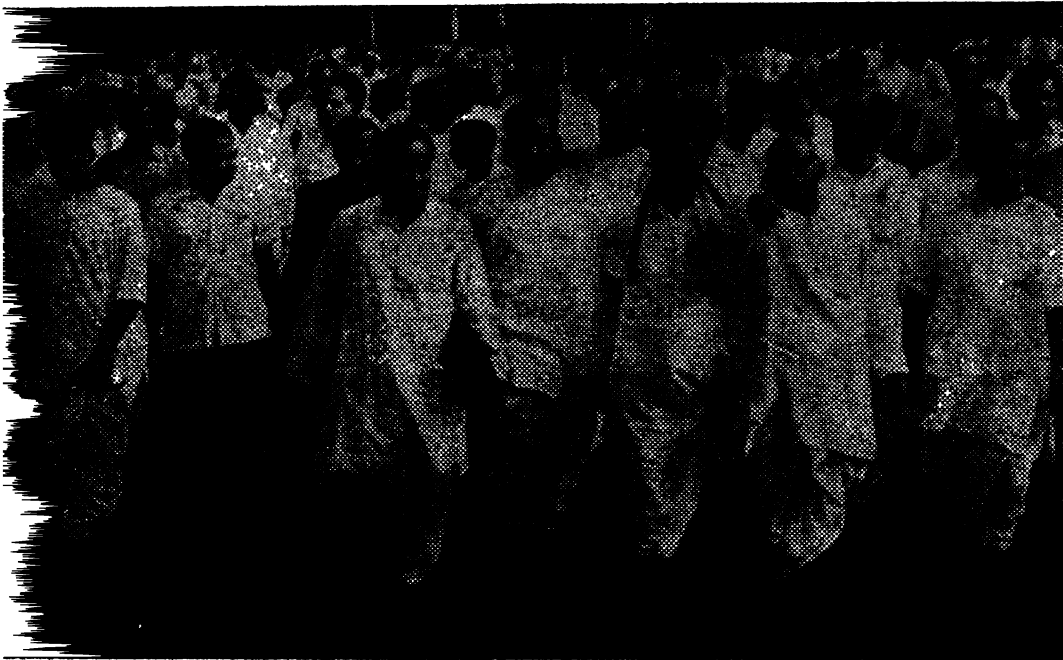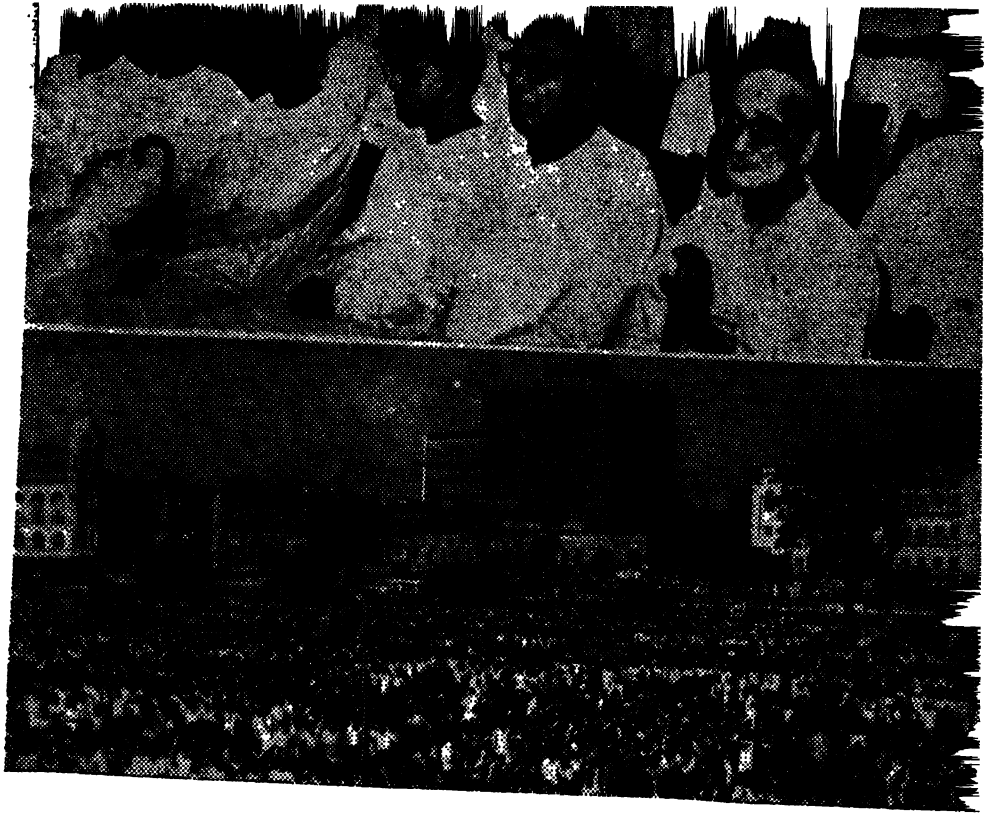
মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির জনসভায় শ্রীসাধন গুপ্ত, মুজাফ্ফর আমেদ, শ্রীনিরঞ্জন সেন, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, আবদুল্লা রসুল, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ

মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানে স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবক্ষমূর্তির উন্মোচন করেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। পার্শ্বে সভার সভাপতি শ্রীকেশবচন্দ্র বসু

স্বাধীনতা দিবসে ভাষণরত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত গণতান্ত্রিক জার্মান মৈত্রীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণরত দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের নেতা আলফ্রেড নজো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সুরেশ্বরই আদতে জিতেছেন। কালি-কলমে লেখা অজয় বাঁড়ুয্যের নির্দোষতা বিশ্বাস করে নি কোনো মানুষ। এরি মধ্যে অধ্যাপক নায়ক, পতিতা নায়িকা নিয়ে তিন চারখানা বড় বড় উপন্যাস লিখে ফেলেছেন, অনেক লেখক। নায়ক-নায়িকার বর্ণনা, তাদের উদ্দাম বিহার এমন নিপুণ হাতে এঁকেছেন যে, সুরেশ্বরও সে সব পড়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। আঠারো বছর বয়স থেকে তাঁর এই সব জায়গায় আনাগোনা, তিনিও এতটা জানতেন না। বই পড়লে মনে হবে বিদগ্ধ-সমাজের মুকুটমণি সেইসব লেখকগণ সমস্ত রাত মত্ত প্রলাপে কাটিয়ে এইমাত্র উঠে বসেছেন তাঁদের ব্যভিচারের শয্যায়। সেই বিধ্বস্ত শয্যা, উপভুক্ত নগ্ন নারীদেহ, অনাচারের অজস্র চিহ্ন, একতিলও সরাতে দেন নি। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে, লাল চোখের কোণে পিঁচুটি, সমস্ত শরীর ভ'রে অসহ্য কুৎসিত গন্ধ। কাগজ কলম নিয়ে বসেছেন পণ্ডিত লেখক। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে এঁকে যাচ্ছেন প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ। সুরেশ্বর জানেন না তাঁর মত ধনীর ব্যভিচারের কাহিনী ---পড়ে সুখ পাবেন না কেউ। ও তো জানা কথা, কিন্তু প্রবীণ ডক্টর অধ্যাপকের পতন-কাহিনী, সে যে একেবারে প্রথম কৌমার্য মোচনের মত রোমাঞ্চকর। নিরাবরণ কলঙ্কে মাধুর্য নেই। প্রায় দাম্পত্য-জীবনের মতই উত্তাপহীন। তাইতো ব্যভিচারকে স্বাদু করবার জন্য মানুষ কত মশলা মেশাচ্ছে তার মধ্যে। ধর্ম তো একটা বিশেষ মশলা। আশ্রম বানিয়ে সাধন-সঙ্গিনীদের নিয়ে সাধনা। এই নামের যাদুতে আত্মদান করবে কত আধুনিকা উচ্চশিক্ষিতা মেয়েও। যারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সাহস কিম্বা সুযোগ যোগাড় করতে পারল না, তাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। এমনি সব রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখছেন পণ্ডিত লেখকের দল, যে পড়তে পড়তে নিঃশ্বাস তপ্ত হয়ে উঠবে, চোখ বিস্ফারিত, কামনার আগুন জ্বলবে শরীর ভরে। তখন, তখন যদি কাছে এসে নিশ্চিন্ত প্রশ্রয়ে দাদার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে উদ্ভিন্নযৌবনা বোনটি অথবা কিশোরী কন্যা যদি গলা জড়িয়ে ধরে, একটা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক স্নেহে উত্তাল হবে তো বাবা-দাদার মন, না অবিবেচক মাতাল অনুভূতি অন্য কিছু অনুভব করবে?

সুরেশ্বর খুশী হতেন যদি যূথিকার মেয়ের প্রতি আসক্ত হ'ত অনল। বাপ-ছেলেতে লাগত একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ। কিন্তু এ যে একেবারে সর্বনাশের খবর এনেছে সরবালা। বিয়ে। অকলঙ্ক বংশে পাপের পদার্পণ। বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে। কি জঘন্য প্রবৃত্তি।

অনেক কথা বলল সরবালা। সুরেশ্বর বললেন, সারগর্ভ দু-একটা কথা। ঘণ্টাখানেক পরে, অনেকটা হালকা মনে বাড়ীর পথ ধরল সরবালা।

রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়েছে, বাড়ী নিস্তব্ধ। সরবালা হিমিকাকে ডাকল :

---শোনো বাছা, ভাবি---কথা বলব না। না বলেও উপায় নেই। সোনার সংসারে তো আগুন দিয়েছ, আর কতটা করবে? একেবারে ছাই ক'রে দেবে? দুই চোখ মেলে নির্বাক বসে রইল হিমিকা। সরবালার জিভ চলতে লাগল।

---বিনা দোষে দেবতার মত মানুষটাকে কলঙ্কের ভাগী করলে, অপির বিয়ের কি হবে ভগবান জানেন, আর অনলকে তো গরাস করে বসেছ।

---মাসি---।

---এঃ! মাসি! ও সম্বন্ধ কাড়াতে এসো না আমার সঙ্গে। এ বড় শক্ত ঘানি। তোমাদের ঢং শুনেছি অনেক, চোখে দেখলাম এবার। কামরূপ কামিক্ষের ডাকিনী তোমরা। পুরুষকে ভেড়া বানাও। দোহাই মা রক্ষাকালী, ভদ্রকালী, এঘর থেকে তোমার দৃষ্টি তুলে নাও।

জিহ্বা দিয়ে আগুনের বাণ ছুঁড়তে লাগল সরবালা। হিমিকার সর্বশরীরে দাউদাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল। তবু সে বসে রইল পাথরের মত। প্রস্তাবনার মহিমা দেখে খুশী হল সরবালা। সে ভালই জানত তার জিভের কাছে এগুতেও পারবে না একফোঁটা মেয়েটা।.. একটু সময় নীরবে থেকে গলার স্বর বদলালো সে। বোঝাবার মত ক'রে বলতে লাগল।

---জানিতো তোমাদের এই ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তা'বলে কি নেমকহারামী করবে? তোমাকে বুক দিয়ে দিয়ে যারা বাঁচালো, আগুন দেবে তাদের ঘরে? বলি মানুষের রক্ত-মাংস দিয়েই তো তোমাদের শরীল গড়া। এমন মহা পাতকীর কাজ করো না। অনুর মাথাটা একেবারে চিবিয়ে খেয়ো না। করজোড় হচ্ছি বাছা, ছেলেটাকে ছেড়ে দাও।

---আমি,---আমি তো ওঁকে কিছু করি নি। অনেক কষ্টে বলল হিমিকা।

---তুমি কিছু কর নি। একটু থমকাতে হ'ল সরবালাকে। বানিয়ে বলবার মতও কোনো দোষ পেল না।

---কর নি কিছু বটে প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু তোমার চাল-চলন, অল্পবয়স দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছে ছেলেটার। আর মাথা ঘুরলে সর্বনাশ হতে বাকী থাকল কি বল?

---কিছু করি নি, কিছু করি'নি আমি। এতক্ষণে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেলল হিমিকা। একটু মায়া হ'ল সরবালার। সত্যিই মেয়েটার কোনো দোষ নেই। কিন্তু সেই বা না বলে কি করে। অনলের চোখে যে অনেক কিছুই দেখেছে। আস্তে আস্তে হিমিকার কাছে সরে এল সরবালা।

---কেঁদ না, আমার কথাই শোনো আবাগীর মেয়ে। তোমাদের কিছু করতে হয় না। তোমাদের নেশা দিয়ে গড়েছেন ভগবান। পুরুষগুলো দেখলেই মাতাল হয়ে ওঠে। অনুও পাগল হয়েছে, নষ্ট হতে বসেছে সংসার। তুমি তো সুবুদ্ধি মেয়ে।

এখান থেকে চলে যাও, ঘর-সংসার রক্ষা পাক।

—কোথায় যাব? কাঁদতে কাঁদতে বলল হিমিকা।

—পোড়া কপাল। তোমাদের আবার জায়গার অভাব। কতজন মুখিয়ে আছে মণি-মুক্তো নিয়ে। তুমি একটু ঘাড় নাড়লেই রাজাবাবু, তোমাদের পুরনো মনিব গো, ছুটে আসবেন গাড়ী-পাল্কী নিয়ে।

কেঁপে উঠল হিমিকা। শ্বশুরের কাছে যেতে হবে?

—না না না। ওখানে যেতে পারব না আমি।

—পারবে। রাগ না ক'রে বলল সরবালা। জানে ধৈর্য ধ'রে বোঝাতে হবে হিমিকাকে। রাগ-ঝাল ক'রে মেয়েটাকে কাদা বানিয়েছে এখন একটু ছেনে নরম করা, তারপর তুলে দেওয়া রাজাবাবুর গাড়ীতে।

—পারবে, আমার কথা শুনলে ভালই হবে তোমার। জন্ম তো তোমাদের এই করতেই। দু'দিন, আগে আর পরে, এই ব্যবস্থাই তোমাদের। তোমরা তো আর সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে ঘর করবার বরাত নিয়ে জন্মাও নি। বেশ্যাবৃত্তি করেই পেট চালাতে হবে। অনু ঝোঁকে পড়েছে, রাখবে হয়ত তোমাকে কয়েক বছর। কিন্তু তাতে তোমারই আখের নষ্ট। ওর তো আর টাকা নেই। ডাক্তারী করে কত টাকা কামায় বল যে, ষাঁড় বেশ্যার খরচ—হাতীর খরচ চালাবে? টাকাও ওদের নেই। আমি হাঁড়ির খবর বলছি। নীহারিকা বাঁধা আছে বড় ঘরে। জমিদারী তো বেশীর ভাগ চলেই গিয়েছিল, এখন আর কতা টাকা দেবে গরমেণ্ট? তাহলে? তোমার পরকালের কি হবে? টাকা ছাড়া পুরুষ তো তোমাদের শত্তুর। এদিকে রাজাবাবু দু হাতে টাকা ঢালবেন তোমার পায়ে। বুড়ো মানুষ, তেমন হুজ্জতি করবার বয়স আর নেই ওর। সুখে-শান্তিতে থাকবে ভাম:

একদিনের পক্ষে যথেষ্ট বলা হয়েছে বুঝে, শুতে চলে গেল সরবালা।

—নাও রাত হয়েছে, শুয়ে পড়। শুয়ে শুয়ে ভাব আমার কথাগুলো। দরজা বন্ধ কর এবার।

ঘরের দরজা বন্ধ করল হিমিকা কিন্তু শুতে পারল না। তার দুই কান ভরে বাজতে লাগল সরবালার কথা। সে সর্বনাশিনী, আগুন দিতে বসেছে আশ্রয়দাতার ঘরে। তাকে চলে যেতে হবে। দাদার তাঁকে ডেকেছিলেন কিন্তু মোকদ্দমার সময় উকিল বলে দিয়েছিলেন সে যেন ভুলেও দাদারের নাম করে না। তাহ'লে বিপন্ন হবেন তিনি। সেই জন্যই তাঁকে সাক্ষী করাও হয়নি। দাদারের কাছে যেতে পারবে না। তবে কোথায় কার কাছে যাবে হিমিকা। শ্বশুর? অবোধ নিয়তি কি তাকে দু'হাতে ঠেলে দিচ্ছে পাতালের অতল গহ্বরে। দৃষ্টির ওপারে, অনুভূতির চেতনায় দাঁড়িয়ে আছে হিমিকার অপরাধিনী মা। কথা বলছে না, চোখ তুলছে না। তার আনতশুভ্র কপালে তো কোনোদিন কলঙ্ক রেখা দেখেনি হিমিকা। সেই বিষণ্ণ মধুর মুখের ছায়া দেখেছে হিমিকা গির্জা ঘরে টাঙানো ম্যাডোনার মুখে।

সকাল হ'ল। সমস্ত রাত্রি জেগে কাটিয়ে হিমিকা দরজা খুলে বাইরে এল। শান্ত অস্ফুট সোনালী সকাল। ওদিকে দোতলার বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে অনল। হিমিকার দিকে চাইল, প্রথম সূর্যের আলো লাগল অনূঢ়া পৃথিবীর বুকে।

সরবালা ভুল করেছিল। অনলের ভাল লাগার খবর হিমিকাকে দিয়ে। যা ছিল ভবিষ্যতের সুদূর সম্ভাবনায়, তাকে প্রায় অবধারিত করে তুলল সে। অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা, তার মাঝে বাজছে একটি সুর, একটি ভাল লাগার খবর। তাপে জ্বলা মাধবীলতায় লেগেছে নব শ্রাবণের ধারা, দেখা দিচ্ছে লাবণ্যের সহ-

চরী। এ-বাড়ী ছেড়ে ... কি, এ যে অনলের বাড়ী, এর প্রতিটি কণা দিনে দিনে মধুর হয়ে উঠছে।

উপরের ঘরে যাওয়া অনেকদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে হিমিকার। সরবালার চোখে আগুন দর্পণার ঘৃণা। কত তাচ্ছিল্য দাসী-চাকরের প্রতিটি কথায়। কিন্তু দু'টি চোখ অমৃত বর্ষণ করছে, অমৃত একটি মুখের একটি দুটি কথায়। সরবালার প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও নিজেকে একটু কাজে লাগাতে চাইল হিমিকা।

—মাসি, আমি সিঁড়ি মুছে দেই? ঘষে দেব ভাল ক'রে বাথরুমের মেঝে? কালি দেব জুতোগুলোতে?

কখনো ধমকে ওঠে সরবালা—আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না তোমাকে। বেশী বেশী দেখাতে যেও না।

কখনো বা চুপ করে থাকে। এমনি একদিন জুতোয় কালি দিতে ব্যস্ত হিমিকাকে দেখল অনল।

—এ কি। তুমি জুতোয় কালি দিচ্ছ কেন? পুণিয়া, পুণিয়া কোথায়? ওঠো, ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো তুমি। একেবারে হিমিকার কাছে এসে দাঁড়াল অনল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল হিমিকা।

—পুণিয়া বাজারে গিয়েছে, তাই—

—তাই তুমি কালি দিচ্ছ জুতোতে?

অনলের গলা শুনে নেমে এলেন অজয়।

—কি ব্যাপার?

—দেখ বাবা বাও, পুণিয়া বাজারে গিয়েছে, তাই ও কালি দিচ্ছে জুতোতে।

—কালি, জুতোয়? ছি-ছি, হাতটা একেবারে গেছে। যাও যাও, ভাল ক'রে হাত ধুয়ে এস সাবান দিয়ে। আর কাজ খুঁজে পাও না, জুতোর কালি। চল, আমি অনেক কাজ দেব।

ওপরে নিজের ঘরে হিমিকাকে নিয়ে এলেন অজয়।

—এই দ্যাখ, একটা পাঞ্জাবীতেও বোতাম নেই, বোতাম লাগাও দেখি।

পাঞ্জাবী হাতে নিল হিমিকা—এ-গুলোতে যে আপনি সোনার বোতাম লাগান।

---সোনার বোতাম। ও, আচ্ছা। শার্ট? শার্টে জো অমু বোতাম লাগায়। অমু তোর শার্ট দে, হিমি বোতাম লাগিয়ে দেবে।

অনল কৃতজ্ঞ হলো বাবার প্রতি। হিমিকার অবস্থা তিনিও বুঝেছেন।

আস্তে আস্তে হিমিকার হাতে এল কিছু কাজের ভার। সরবালাকে বাধ্য হয়েই সেটা মেনে নিতে হল। সর্বদা হৈ-হৈ করে চলা অভ্যাস অনলের। অনবরত ভাঙছে শার্ট-প্যাণ্টের বোতাম, ছিঁড়ছে মোজা। অজয় কলেজে যাবার সময় প্রায়ই পান না হাতের কাছে রুমাল কলম মানি ব্যাগ। সরবালা এসব পারে না। হতভাগা পুনিয়া ইচ্ছেমত গা ঢাকা দেয়। অপর্ণা জানে গীটার-সেতার বাজাতে। সুন্দর টেনিস খেলে, গাড়ী চালাতে হাত স্টেডি। তারপর সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করতে অভ্যস্তও নয় এসব পরিবারের মেয়েরা। হিমি নিপুণ হাতে রিপু করল অনলের ছেঁড়া ত্সকেটের বুশ শার্ট। কলেজে যাবার সময় অজয় হাতের কাছে পেতে লাগলেন রুমাল-চশমা। একটু বেশী সাহস ক'রে অপর্ণার কলমে কালি ভরতে লাগল, ব্লাউজে বুনল জুঁই-ফুল, মেমসাহেবদের মত ঘাড়ের উপর চুল উল্টিয়েও দিল দু'তিন দিন। অপর্ণার মন নরম হয়ে এল।

সরবালা কিন্তু তার ধারে কাছেও হিমিকাকে ঘেঁষতে দিল না। ওসব ঢং দেখে ভুলবার পাত্রী সরী-দাসী নয়। যতই ভোলাক আর মজাক, এ-বাড়ী ছাড়তেই হবে মেয়েটাকে।

হিমিকা ভয় পায় সরবালার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে কিন্তু কোথা হতে যেন একটা অভয় পেয়েছে ও। তাই তো ছুটেছুটে ওপরে আসে। পট ক'রে তুলে দেয় অজয়ের একটা পাকা চুল, অনলের বারণ না মেনে জুতো ব্রাস করে ঘস ঘস। অপর্ণার টেবিল গোছায়। সমস্ত বাড়ীতে একটা ছায়া পড়ল হিমিকার। অপর্ণার আদরের ডাক শোনা যেতে লাগল---নইনী এ-সপ্তাহের ইলাস্ট্রেটেড উইকলী খুঁজে পাচ্ছি না, ব্লাউজ নেই নইনী শাড়ীর সঙ্গে পরবার। অনল ডাকে হিমি, চা গরম জলদি, অজয় ইজিচেয়ারে টান টান হবার আগেই লাইম জুসের শরবৎ হাতের কাছে। বাড়ীতে চাকর দাসীদের চোখের তাচ্ছিল্য সরে যাচ্ছে, সরবালা বাতের ব্যথায় কাতর, ক্ষান্ত দিয়েছে তার খর জিহ্বাকে।

●

ছ' মাস, সোনার ছ'টি মাস বিধাতা নন্দনবনের গন্ধ মাখিয়ে উপহার দিলেন চিরদুঃখী মেয়েটাকে। সোনার চোখে দেখছে অপর্ণা, অজয়ের কত স্নেহ। আর অনল। বাতাসের মত, আলোর মত বারে বারে চোখের আলো ছুঁয়ে যাচ্ছে হিমিকাকে। সমস্ত জীবন ভরে এক আনন্দের খবর এসেছে। সকাল হবার, সূর্য উঠবার খবর। কমলকলিকা বিকশিত হচ্ছে উর্ধ্বমুখী হয়ে।

---আজকাল নইনী দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছে, না বাবা? মেয়ের কথায় অজয় খাবারের থালা থেকে চোখ তুললেন, হাসলেন সস্নেহে।

---নইনী তো সব সময়ই সুন্দর।

---সব সময়? আগে ও এত সুন্দর ছিল দাদা?

অপর্ণা ভাইকে সাক্ষী মানতেই সোরগোল ক'রে উঠল সরবালা। হাত থেকে ফেলে দিল একটা রেকাবী। ঝন্ ঝন্ শব্দে অপর্ণার কথায় ঢাকা ফেলতে চাইল। বোকা, একেবারে একটা বোকা মেয়ে। ভাইকে সুন্দরী দেখাচ্ছে। যেটুকু বাকী আছে, তাও হয়ে যাবে। বড়া ভাজা, কইমাছ শর্ষের প্রব্লেম নিয়ে আলোচনা চালাতে লাগল তড়বড় করে। কিন্তু ততক্ষণে নইনীকে ভাল করে দেখে ফেলেছে অনল। সুন্দর। কাকে সুন্দর বলে? কোঁকড়া চুলে ঢাকা সুন্দর মাথা, ঝিনুক কপাল, সুঠাম তনুবল্লরী? অনল দেখল চোখের পাতা নামানো, অল্প কাঁপছে অধর-ওষ্ঠ। নইনীর মুখ। নইনী, হিমিকা---মৃত্যুর কালো পর্দাটার সামনে মূর্চ্ছিত ক্ষীণতনু। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে অনল ফিরিয়ে এনেছে হিমিকার জীবন। এতদিন যে মমতা ছিল সূক্ষ্ম অনুভূতিতে, নিজের মনেরও অগোচরে, সে বেরিয়ে এল তার গহীন শয়ন ছেড়ে। পঁচিশ বছর বয়সে প্রথম যৌবন তৃষ্ণা জাগল অনলের মনে। হিমিকা তার।

---কি বলছে অপি? হাসপাতাল থেকে ফিরে টাই খুলতে খুলতে বলল অনল, হিমিকা তার টেবিল গোছাচ্ছিল, জিজ্ঞেস করল জিজ্ঞাসার উত্তরে:

---কি বলছেন আপিদি?

---তুমি নাকি খুব সুন্দর হচ্ছ আজকাল?

আবিরের রং লাগল হিমিকার গালে, দৃশ্যটা একটু উপভোগ করল অনল।

---দেখেছ নতুন টাইটার অবস্থা?

---ইস্। কি ক'রে হ'ল?

---কি করে আবার। পুনিয়ার কাণ্ড। গরম ইস্ত্রি ঘষে দিয়েছে।

এই নিয়ে চারটে টাই পোড়াল আপনার। কি যে হবে।

---কি আর হবে। অল্প ক'দিনের মধ্যেই টাই-দেউলে হয়ে যাব আমি।

অনলের কথায় হাসল হিমিকা। কুন্দফুলের মত দাঁত দেখা গেল, টোল পড়ল নিটোল গালে।

তখন নীরব দুপুরের শেষ বেলা। জানালার অবকাশে মেঝের গায়ে রোদ পড়েছে চাঁদের আলোর মত। নিমেষে অনলের মন উত্তাল হয়ে উঠল। দু'হাত বাড়িয়ে বুকের উপর টেনে নিল সে হিমিকাকে। চুম্বন করল স্ফুরিতাধরে। হয়তো অনেকক্ষণ হিমিকাকে তেমনি বক্ষলগ্ন ক'রে রাখত অনল, সম্বিৎ ফিরল হিমিকার চোখের জলে। তাকে ছেড়ে দিল। জিজ্ঞেস করল:

---আমাকে ভালবাস না হিমি?

হিমিকা কথা বলতে পারল না। তার চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ বলতে লাগল বাসে, ভালবাসে সে অনলকে। অনল বুঝল, শুনল সে কথা।

---তবে কাঁদছ কেন?

---সরমাসি রাগ করবে। অতি কষ্টে উচ্চারণ করল হিমিকা। এতক্ষণে হেসে ফেলল অনল।

---বাবা মন, অপি নয়, সরমাসির রাগের ভয়? পাগল একেবারে। কিছুর ভয়, কারোর ভয় করতে হবে না তোমাকে। আমি আছি, তুমি আমার।

●

আছ, তুমি আছ, অভীক মন্ত্রে সব ভয় মরে গেল হিমিকার। কুণ্ঠিতা মেয়ে যেন রাণীর মহিমায় ঝলমল করে উঠল। সকালবেলা স্নান ক'রে ঘরে আসছিল হিমিকা, দাসী মঙ্গলা তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হ'ল।---তোমার কি হয়েছে গা?

---কি হয়েছে? হেসে জানতে চাইল হিমিকা।

---তুমি যেন একেবারে রদ্দুর মেখে নেয়ে এলে। ওমা, কি হ'ল ওপরে?

উপরে একটু গোলমাল। অজয়ের গলা---অপি, অপি, জল, জল দাও সরবালা চোখে-মুখে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল পুনিয়া। হিমিকা এগিয়ে এল ---কি হয়েছে পুনিয়া?

---দিদি বেহোঁস হো গয়া, হম ডাগদার লানে যাতা, দাদাকোভি খবর দেনে হোগা।

হিমিকা আশ্চর্য হয়ে কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল সরবালা।

---পুনে মুখপোড়া, ডাক্তারবাড়ী গেলি নে?

---দিদির কি হয়েছে মাসী? ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল হিমিকা।

---হয়েছে? তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন হাঁ করে? যা, নিজের কাজে যা সব।

চাকর-দাসীদের ধমক দিল সরবালা। ঢুকে এল হিমিকার ঘরে।

---হয়েছে সর্বনাশ। কালনাগিনী তুমি মোক্ষম দংশেছ মেয়েটাকে।

সত্যই বিপর্যস্ত হবার মত অবস্থা ঘটেছে। শীতাংশু মল্লিক, রূপে গুণে বংশমর্যাদায় অপর্ণার যোগ্য পাত্র। চার বছর ধরে তাদের [illegible]। সামনের সপ্তাহের মাসে বিয়ের সব ঠিক। সকালের ডাকে চিঠি এসেছে শীতাংশুর। সে বিয়ে করতে পারবে না। শীতাংশু লিখেছে:

অপর্ণা,

তোমাকে চিঠি লিখে কঠিন কর্তব্য করতে হচ্ছে। আমাদের বিয়ে হবে না। আমাদের কোনো দোষ নেই তবু দুঃখ পেতে হ'ল। সম্প্রতি তোমাদের পরিবারে যে ঘটনা ঘটেছে, তারপর আর আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। আমরা অভিজাত জমিদারগোষ্ঠী নই। স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার, যা আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তা নিয়ে গর্ববোধ করতে পারি না। আমাদের উচ্চ মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারে আশ্রয় দেবার নাম ক'রে Prostitute পোষাকে দুর্নীতি বলেই গণ্য করা হয়। তোমার সঙ্গে আমাকে মানাবে না। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে ছেদ টানতে বাধ্য হলাম। আমাকে ক্ষমা করো। তোমার ভবিষ্যৎ সুখের হোক।

---শীতাংশু

চিঠি পড়ে অপর্ণা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। অনল হাসপাতালে, অজয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

সব শুনে কেঁদে ফেলল হিমিকা।

---কান্না? কান্নার তোমার হয়েছে কি। তোমার কান্না দেখে তো কাঁদবে শেয়াল কুকুর। নিন্দুখী মানুষগুলোকে শেষ করলে তুমি।

ওরাও মহাপাপ করেছে, পুণ্যের সংসারে নরকীকে ঢুকিয়েছে। তার ফল ভুগতে শুরু করেছে। মেয়েটার জীবন গেল, এবার ছেলেটার পালা, চাকরি যাবে, ভদ্দরসমাজে মুখ তো ডুবেছেই।

ডাক্তার এসেছে, উপরে চলে গেল সরবালা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ী এল অনল। সমস্ত বাড়ী থম থম করছে। নিজের ঘরে ঢুকে আঁধার কোণের মধ্যে বসল হিমিকা।

নিস্তব্ধ দুপুর নামল। উপর হ'তে কেউ নামে নি। ঠাকুর যথারীতি ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে গেল হিমিকার ঘরে। একটুও খেতে পারবে না। বুঝেই উঠল হিমিকা। ভাতটার ব্যবস্থা করতে হবে। নয় তো সরবালা এমন কটুকথা বলবে যা সহ্য করা বড় কষ্টের। রাস্তার দিকের দরজা খুলতেই দেখা গেল তার রক্ষাকর্তা সেই পথ-ভিখারী ঝুমরা বসে আছে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। হিমিকাকে দেখেই তার চোখ চক্‌চক ক'রে উঠল। মাইয়াটাকে দেখবার জন্যই তো এ-পাড়ায় আসা। লাঠি ধ'রে কোমর বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ঝুমরা।

---ক্যায়সা তবিয়ৎ বিটিয়া? এতনা উদাস লাগতা কিউ?

বিটিয়া, ঝুমরার ডাকে হিমিকার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। মুখ নীচু ক'রে ওর থালার মধ্যে ভাতগুলো ঢেলে দিল সে। চোখের জল চাপতে চেষ্টা করল। তার চোখের জল তো কুমীরের কান্না, ডাকিনীর মায়া। ঝুমরা কিন্তু টের পেল, বলল:---রো'ও মৎ বেটি, ভগওয়ান তেরা মঙ্গল করেগা।

বেশী কথা বলতে পারল না। সরবালা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। হয়তো বকবে মেয়েটাকে। রাস্তা পার হয়ে গেল ঝুমরা। আড়চোখে দেখলো দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাছে জলদের আস্তানা। সোজা চলে এল ঝুমরা সেখানে।

---এ জল্‌দা, তু বলেছিলি তোর ডাঙ্‌দার বাবু বহুৎ বড়িয়া আদমী।

---হ, কইছি তো। অখনও কই। কিন্তু পুরুষ পোলা তো হগল দিগে চক্ষু রাখতে পারেনা, ঝি মাগীটা খচ্চর। কষ্ট দেয় মাইয়াটারে। ঝুমরার মুখে হিমিকার কান্নার কথা শুনে বলল জলদ।

ঝুমরা জানাল---বিটিয়াটা বহোৎ দুব্‌লা হয়ে গিয়েছে, একদম খতম হয়ে যাবে।

---যায়, যাইব। আমাগো কি!

বলে কত বেটি খতম হইল। নিজের দুই বেটিরে থুইয়া আইলাম ধলেশ্বরীর জলে। পরের মাইয়ার ভাবনায় ঘুম আইব না অখন। চুপ দে ঝুমরা, মাথা গরম করিস না আমার।

গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে লাগল জলদ।

---দেখ, জলদা, রাস্তামে যো ভিখ মাংতা, উসকো ভি দিল হ্যায়, দর্দ হ্যায়। লেকিন ভদ্দর আদমিকো কুছ নেই। একঠো বাচ্চা, দুনিয়ামে কোই নেই, এতনা দুখ দিয়া বিটিয়াকো, আঁখোসে আশু গিরতা উসকো।

---হ, বুজঝি। বড়লোকের তো দয়া-মায়া নাই জানি। কিন্তু দয়া-মায়া লইয়া আমরা করুমটা কি? মাইয়াটারে আমার চালায় রাখতেও পারুম না, তুইও রাস্তায় আর খানকি হাতে দিয়া বসাইতে পারবি না। ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে লাথি জুতা খাইয়াও থাকতে হইবে ঐখানেই। বড়লোকের মায়া নাই কিন্তু টাকা আছে, ঘর আছে। পরনে বস্তর দিতে পারে, অন্ন দিতে পারে উদরে। আমাগো দরদের দাম কি? কানাকড়ি দিয়াও দরদ কিনব কেউ? ভালবাসলে পেট ভরব, না উদলা গাও ঢাকব মাইয়াটার? আমার বুদ্ধি ল' তুই। ঐদিকে আর ঘেঁষিস না। তরে দেখলেই মাইয়াটা কাঁদব। বাড়ীর লোকে দেখলে আরো রাগ-ঝাল করব তখন।

ঝুমরা চুপ করে রইল। জলদ ঠিক কথাই বলেছে। বুক ফেটে গেলেও নইনীর জন্য কিছু করতে পারবে না সে। যদি ঝুমরার কোমর না ভাঙত, যদি ভইষ কিনতে পারত, জমিন ছাড়াতে পারত, তা'হলে সেই বিহারের দূর গাঁওতে নিয়ে যেত তার ঘরে নইনীকে। বউকে ডেকে বলত---এ ধনিয়াকে মাই, দেখ কলকাতাসে একঠো বেটি লায়া তুমকোবাস্তে।

এখন যে একটা ভিক্ষুক, পথের কুকুর ঝুমরা। নইনীর আশু দেখে তার দিল সে লোহু গিরবে, কিন্তু কিছু করতে পারবে না ঝুমরা।

হিমিকার জন্য কে করতে পারবে? সরবালাকে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল হিমিকা। সরবালা কিন্তু রাগ করল না। আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল।

---ঘরে এস।

কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এল হিমিকা।

সরবালা তেমনি শান্ত গলায় বলল, ---ভাতটা খেলেই পারতে, যে রাগ অনলের। অপি একটু সুস্থ হলেই নেমে আসবে। ঘাড় ধরে তোমাকে বাড়ীর বের করে দেবে পুনিয়াকে দিয়ে। কি করবে, কোথায় যাবে, কিছুর তো ঠিক নেই। পেটে ভাত থাকলে পায়ে জোর থাকত।

পাথর হয়ে গেল হিমিকা। অনল। অনল তাকে তাড়িয়ে দেবে? পারবে? পারবে, পারবে। মনে পড়ল হিমিকার সেই দিনের কথা। সুরেশ্বরের চিঠি পেয়ে জ্বলে উঠেছিল অনলের চোখ, তাকে বলেছিল চলে যেতে।

নিজের কথার মহিমা বুঝল সরবালা।

---আমার কথা তো শুনলে না, রাণীর মত ড্যাং ড্যাং করে গাড়ী হাঁকিয়ে যেতে, এখন পুনিয়ার লাথি খেয়ে পথে ঘাড় গুঁজড়ে পড়বে।

সরবালার কথা শুনল হিমিকা, শুনল তার অমোঘ নিয়তির নির্দেশ।

একটু আত্মস্থ হতেই অজয় খোঁজ করলেন হিমিকার। সমস্ত নিশ্চয়ই শুনেছে, ঝড় বহে গিয়েছে ওর উপর দিয়ে। উপরে অপর্ণার সামনে আর ডাকতে চাইলেন না হিমিকাকে। সন্ধ্যা বেলা নিজেই নেমে এলেন।

---হিমি। হিমি কোথায়? ওকে ডেকে দাওতো সরবালা।

হিমিকাকে ডেকে দেবে। এদিক ওদিক চোখ ফেলল সরবালা।

---নইনীকে তো দেখতে পাচ্ছিনা দাদাবাবু।

---দেখতে পাচ্ছ না? কোথায় যাবে? দেখ ছাদে। পত্রিকাতে চোখ রাখলেন অজয়। বিষ্টি কেটেছে সারাটা দিন।

পুনিয়া খবর দিল---ছাদে নতুন দিদি নেই।

নেই? কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে হিমিকা। হাতে একটা টাকা নেই, নেই গায়ে একটুকরো সোনা। অচেনা-অজানা পৃথিবীতে কোথায় যাবে মেয়েটা। বেরিয়ে পড়েছে। একদিন যেমন রাতের অন্ধকারে নিজের অন্ধ ভাগ্যকে সম্বল ক'রে জ্বরের ঘোরে বেরিয়ে এসেছিল সুরেশ্বরের বাড়ী থেকে, তেমনি চলে গিয়েছে আজো? তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ হ'ল। জিজ্ঞেস করা হ'ল জলদকে। কোনো খবর মিলল না। হিমিকা কোথাও নেই, কর্পূরের মত বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে।

কোথায় গেল হিমিকা? ও তো রাস্তা-ঘাট কিছু চেনে না। কিন্তু রাস্তা চিনলেই বা কি হতো? ওর কি পৌঁছবার মত কোনো ঠিকানা আছে? জ্যৈষ্ঠ মাসের পীচগলা রাস্তা কি ওকে সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারবে যে রাস্তা চেনা দরকার হিমিকার? হিমিকার রাস্তা চেনা দরকার নেই। সরবালাকে অনুসরণ করে ও কেবল হাঁটছিল। তৃষ্ণায় যখন গলা

ইতিহাস

[illegible]

জীবনের বৃন্ত হতে খসে গেল একটি বছর
একটি চরণ চিহ্ন আঁকা হলো কালের পাতায়—
অসীম প্রবাহ মাঝে মিশে গেল একটি নিশ্বাস
প্রদীপ নিভিয়া গেল রজনীর বিনিদ্র প্রহরে।

একটি বছর মোর হারাইল নিথর উষায়
সাতটি রঙের ছবি মুছে গেল মেঘের আড়ালে—
একটি বাঁশীর গান মুছে গেল আজিকে সহসা
আমার উজল দিন ইতিহাসে লেখা রয়ে গেল।

সম্মুখে অনাদি পথ—গতিহীন ধূসর সাহারা
পথের দু'পাশে কাঁপে পুরাতন শীতের কুয়াশা।
আমার সন্ধ্যা আসে চুপি চুপি মৃত্যুর মতন
জীবনের দিকে দিকে কেঁদে ফেরে নদীর ভাঙন।

আমার দুখের গান পেলো নাকো মনের ঠিকানা
রৌদ্র দহনে তনু পলে পলে হলো নিঃশেষ।
একটি বছর গেল—রেখে গেল তুহিন পরশ
রাতের তমসা তীরে চলিতেছে আয়ুর মিছিল।

কাঠ হয়ে এসেছে, রাস্তাটা উঠে এসেছে চোখের সামনে তখন একটা মস্ত কালো গাড়ীর মধ্যে তাকে তুলে দিল সরবালা। হিমিকা একটুও দ্বিধা না করে নিজেকে সমর্পণ করল গাড়ীর কালো গর্ভে, চোখ বুজল, যখন চোখ খুলল, লাল-বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। একটা শক্ত হাত তাকে টেনে নামাল, তিন-তলায় তুলে, বিস্তৃত খাটের নরম বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিল। গভীর ঘুমের অতলে ডুবে গেল হিমিকা।

যূথিকার মেয়ে ফিরে এসেছে। মামলায় হেরেছেন সুরেশ্বর কিন্তু গাড়ী-বাড়ী-টাকার লোভ জিতিয়ে দিয়েছে তাঁকে। তিনি জানতেন যূথিকারা কেবল টাকা চায়। টাকা দিয়েই বশ করবেন মেয়েটাকে। অবশ্য ওকে পাবার জন্য আর তেমন ইচ্ছা নেই। এটা কেবল জেদ। অজয়কে হারানোর জেদ। মেয়েটাকে নাস্তানাবুদ ক'রে তাড়িয়ে দেবেন, কিম্বা উপহার পাঠাবেন বুলাকি দাসকে সেটা ভাববেন পরে।

ব্লাড প্রেসারটা বেড়েছে। অনিচ্ছার সঙ্গেই বিশ্রাম নিলেন এক সপ্তাহ। মেয়েটাকে ভাল ক'রে দেখাই হয়নি। লালবাড়ীতে এসে বসলেন নিজের ঘরে। ডেকে পাঠালেন যূথিকার মেয়েকে। কেমন একটা রোমাঞ্চের মত লাগছে। কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল, নিজে ফিরে এসেছে আবার। অবশ্য নিশ্চয়ই সরবালা প্রচুর লোভ দেখিয়ে আসতে রাজী করেছে। কিছু একটা গয়না দিতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু তক্ষুণি মনে পড়ল এই মেয়েটাকে নিয়েই অজয়ের কাছে মামলায় হেরেছেন তিনি। হঠাৎ চমক ভাঙল সুরেশ্বরের। মেয়েটাকে তো ডেকে পাঠিয়েছেন অনেকক্ষণ। ভারি স্পর্ধা তো, এখনো আসছে না। গম্ভীর গলায় আবার ডাক দিলেন।

একটু পরে ঘরে এসে ঢুকল যূথিকার মেয়ে। ঘরের উজ্জ্বল আলোর কোল কুঁচকে যাওয়া রক্তিমাভ চোখ দিয়ে সুরেশ্বর দেখলেন যূথিকার কুড়ি বছরের মেয়েকে, যাকে এখনো কোনো পুরুষ আয়ত্ত করেনি। শরীরে একটা আলোড়ন অনুভব করলেন সুরেশ্বর। বাবা ভুবনেশ্বরের রক্ত প্রবল হয়ে বইতে লাগল শিরায় শিরায়। চোখের পলকে মত্ত হয়ে উঠলেন তিনি। হাত ধরে মেয়েটাকে কাছে আনলেন, একটানে ছিঁড়ে ফেললেন ওর বক্ষাবরণ।

পুরুষ হাতের স্পর্শে দীর্ঘ ঘুম ভেঙে যেন জেগে উঠল হিমিকা। প্রাণপণে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইল।

—চোপরাও হারামজাদী। দুই মুঠোর মধ্যে হিমিকাকে ধরলেন সুরেশ্বর।

চুপ করবে? কিছু কথা তো বলেনি হিমিকা। তার আত্মার প্রতিবাদ কি শুনেছেন সুরেশ্বর?

কিন্তু এবার কথা বলল হিমিকা:
—আমাকে ছোঁবেন না আপনি।

—ছোঁব না? তোকে কেটে কুচি কুচি করব আমি তারপর কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব।

প্রবল বেগে হিমিকার পরনের কাপড় আকর্ষণ করলেন সুরেশ্বর। হিমিকা দূরে ছিটকে গেল। অসম্ভব রাগের মধ্যেও আশ্চর্য বোধ করলেন সুরেশ্বর। এত সাহস মেয়েটার। ভাল ক'রে তাকালেন তার দিকে। দীর্ঘ, প্রায় নিরাবরণ গৌরতনু, দু'চোখ জ্বলছে, সেই অদ্ভুত দৃষ্টির সামনে প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়লেন তিনি। এ কে? এ কি পতিতা যূথিকার মেয়ে? চুল খুলে পড়ছে, আঁচল লুটাচ্ছে মাটিতে, ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়েছে সর্পিণীর মত। ওরা কি অমন করে তাকাতে পারে?

—তুই কে? কে তুই?
—আমি হিমিকা।

থর থর ক'রে কেঁপে উঠে খাটের উপর ছিটকে পড়লেন সুরেশ্বর। বিদ্যুতের চাবুক পড়েছে তাঁর চৈতন্যে। হিমিকা যূথিকার মেয়ে ভেবে হৈমন্তীকে এনেছেন তিনি। ভয়ঙ্কর সেই নামের সামনে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন সুরেশ্বর। দেখলেন শিখারূপিণী নারীমূর্তি, পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছে এক প্রচণ্ড পুরুষ। মাথার শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে তাঁর। আহত কুকুরের মত আর্তনাদ করে উঠলেন সুরেশ্বর।

—যাও, যাও তুমি এখান থেকে।

[ক্রমশ।

আরব সাগর। মালাবার উপকূলে—'ঠিক এমনি ঝড় উঠেছিল সেদিন—এমনি জলোচ্ছ্বাস'—বলে যায় ফার্নাণ্ডিজ।

সেদিন ভাস্কো-ডা-গামার সমাধিতে বসে তাকিয়েছিলুম আরবের নীল জলের দিকে, প্রচণ্ড ঝড়, তরঙ্গের পর তরঙ্গ। এক বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস—ফার্নাণ্ডিজ, সেই পর্তুগীজ-ভারতীয় নাবিকের সমস্ত সত্তায় দেখতে পেলুম। মালাবারের কোলে সে মৌসুমী সন্ধ্যা, আকাশ সমুদ্রের সে উত্তাল রূপ বিচলিত করে তুললো।

'বহুত মেহেরবান্, সাব্, প্লিজ টু মাই কটেজ'—হাত দিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ের দিকে দেখায় ফার্নাণ্ডিজ—চল্লিশ বছর বয়সের সাহেব—যার পূর্বপুরুষ কোন্ এক পেড্রোলাস্ পাঁচ পুরুষ আগে ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গী হয়ে ভারতের মাটিতে এসে নেমেছিল এমনি এক রক্তিম সন্ধ্যায়। তার চোখেমুখের করুণ আহ্বান ঠেলতে পারিনি সেদিন, যেন এক আহত হৃদয়ের ডাক—টেনে নিয়ে চললো—সমুদ্রকূলের সমাধিভূমি থেকে।

'কটেজ-ডা-লিস'। পাহাড়-ঘেরা একটা পাথর-দেওয়ালের ঘরে গিয়ে বসলুম; আঙ্গুরলতায় ঢাকা, সামনে আঙ্গুরের বাগান, আর তিনদিকে উঁচু নীচু পাহাড়—মালাবারের পাহাড় বনভূমি। ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট্ট নদী, সাগরের বুকে আছড়ে-আছড়ে পড়ছে, সামনের ফটক দিয়ে দেখা যায় অশান্ত আরবের নীল ঢেউ, অফুরন্ত। অগুণতি, ছোট ছোট পালতোলা নৌকো আর মাঝে মাঝে বড় বড় জাহাজ—কোনটা চলেছে কোচিন বন্দর ছাড়িয়ে আমেরিকা ইউরোপ আফ্রিকার দিকে, আবার কেউ হয়ত কত দেশ-বিদেশের কত আকার কত রং-এর সব মাল বোঝাই করে এসে ভিড়েছে মালাবারের উপকূলে।

আলো-আঁধারি ওই পাহাড়ী ঘরে,—জ্যোৎস্না রাত, মাঝে মাঝে জাহাজের সার্চ লাইট-হাউসের আলোয় কোথায় হারিয়ে যেতে লাগলুম—স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূসর ওড়নায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সমস্ত দেহ-মন; পৌঁছলুম চারশ বছর পাড়ি দিয়ে ইতিহাসের উজান পথে। ঐ আসে

সতীশচন্দ্র মেইকাপ

দুর্ধর্ষ জলদস্যু ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরে। দুর্ধর্ষ দুঃসাহসী নাবিক সমুদ্রে ভয়ঙ্কর সে। কালিকটের রাজা জামোরিনের সিংহাসনের তলায়, দেখলুম, হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে—অনুমতি চাইছে এদেশে ব্যবসার অধিকার?

'নেহি'—প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠেছিলুম—মুহূর্তের মধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দে চীনামাটির কাপ প্লেট ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ কানে এলো—আমার প্রতিবাদকে প্রত্যাখ্যান করলে।

সুদীর্ঘ চারশ বছরের প্রাচীন ইতিহাস। একটা ধাতুর তৈরী জিনিষ টং-টং টাং-টাং ধ্বনি তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়ার শেষে থেমে পড়ার সুরের রেশ কানের কোন্ সূক্ষ্ম তারে আঘাত দিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলুম—জল-দস্যুকে বরণ করে নেয় ভারতবর্ষ। দুঃস্বপ্নের প্রচণ্ড আঘাত। আর দেখলুম, আমার অস্বাভাবিক ভাবের আঘাতে যার হাত থেকে জিনিষগুলো গড়িয়ে পড়লো তার ম্লান-মুখ—

'সাব্'—ফার্নাণ্ডিজ আমার সামনে অবাক বিস্ময় নিয়ে—আর দরজা-মুখে 'শিলভিয়া' লজ্জারক্তে ম্লানমুখে আমার দিকে চেয়ে,—দাড়ি-গোঁফে ঢাকা দীর্ঘ বলিষ্ঠ ফার্নাণ্ডিজের ঈষৎ নুয়ে

গড়া শরীরটার অধিকারী যে—শতাব্দীর পারাবার থেকে সাঁতরে আসা ভাস্কো-ডা-গামা নয়—তা বুঝতে আমার দেরী হলো না।

তার নম্র ডাকে। 'ভেরী সরি'—অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠলুম-'এক্সকিউজ মি' এ লিটল্ ওয়াটার—একটু-জল'।

অদৃশ্য হয়ে যায় শিলভিয়া—একটু পরেই এসে দাঁড়ায়, হাতে তার নীল রং-এর পান-পাত্র, তার অদ্ভুত নীল চোখের রং-এ নীলাভ ছোট গ্লাসটি তুলে ধরি।

'থ্যাঙ্কস্'-হাত বাড়িয়ে দিই, চোখের দৃষ্টি আপনি গিয়ে থেমে যায় তার দুটি চোখের তারায়। অনন্ত গতির সোতে; চঞ্চল প্রকৃতিতে ক্ষণিকের শুধু পলকের বিরতি মাত্র, সে যেন কাল মহাকাল ছাড়িয়ে যেতে চাইলো।

'সাব মাই ডটার শিলভিয়া, ডার্লিং'; ফার্নাণ্ডিজ পরিচয় করিয়ে দেয় তার অতিথিকে।

শিলভিয়ার রূপ সেদিন বিস্মিত চমৎকৃত করে তুললো—সেই মুহূর্তে মনে হলো—কোন উজ্জয়িনীর রাজ-কন্যা যেন শিপ্রা নদীর ওপার থেকে পথ খুঁজতে খুঁজতে থেমে গিয়েছে। কুচকুচে কালো চুলের বন্যায় যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ নৃত্য করে চলেছে কিন্তু তার পদ্মের মত সে শান্ত সুন্দর রূপে, সুডৌল শ্বেতাঙ্গ দেহের অদ্ভুত মিশামিশি আমাকে এক বিস্ময়ের রাজ্যে হাজির করলো, আমার মনের গহনে যে প্রশ্ন সেদিন ফার্নাণ্ডিজ শিলভিয়ার বুঝে উঠতে আদৌ কষ্ট হলো না, অনুভব করলুম, অতিথির নীরবতা তাদেরও সেদিন নীরব করে রাখলো, রূপোর অপূর্ব কারুকার্যের পেয়ালায় কফি তার স্বল্পভরা গন্ধসমেত ধীরে ধীরে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললো, শিলভিয়া ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় কি এক প্রশ্নময় গভীর দৃষ্টি আমার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়ে।

'ফার্নাণ্ডিজ'—মৃদু ডাক দিলুম জানালা দিয়ে চেয়ে থাকা উদ্দেশ্যহীন, আপনার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলা সেই পর্তুগীজ নাবিককে।

'ঘরের', ইবনকাঠের ফ্রেমে আঁটা দেওয়ালের একটা ছবির দিকে চেয়ে ফার্নাণ্ডিজ। আমার চোখ টেনে নিয়ে যায় সেদিকে, সমুদ্রের গর্জন ও ঝড়ের বেগ তখন আকুল উদ্দাম হয়ে উঠছে—মাঝে মাঝে জানালার শার্সির ওপর জলের ঝাপটা আর বিদ্যুতের আলোর আঘাত পিছলে পিছলে পড়ছে।

হ্যাঁ সেদিনের রাত্রিও ছিল এমনি ঝড়ো এমনি ভয়ঙ্কর, সারি সারি নারিকেলের গাছের ছায়ায় আঁকা ছবিটার দিকে চেয়ে বলে যায় সে—'ঐ যে বাংলো, ওখানো থাকতো জারিনা আর ডিরোজ, জলদস্যু ডিরোজ সেণ্ট মিলান দ্বীপের অধিবাসী, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ঘুরে মিসরের কাছাকাছি যখন সমুদ্রের ওপর তার জাহাজ সে সময় তাদের গতিপথে বহু দূর থেকে দেখতে পায় এক ব্যবসায়ী জাহাজের পতাকা, সমুদ্রের পোকা ডিরোজের বেশী সময় লাগলো না বুঝে নিতে।

ঐ জাহাজের খোলের ভেতর সারি সারি শেকলে আটকানো কি অমূল্য মাল রয়েছে, পারস্যের অমূল্য পসরা সাজিয়ে সঙ্গোপনে চলেছিল জাহাজটি সেদিন আফ্রিকার উপকূল ধরে, দক্ষিণ ঘুরে ইউরোপের কোন্ বন্দরের দিকে, শুধু পারস্য নয়, আফ্রিকা তেহেরান কাশ্মীর বহু দেশের বহু বয়সের কিশোরী তরুণীদের নিয়ে চলেছিল দাস ব্যবসায়ীর সেই বহু মূল্যের জাহাজখানা।

'সাব,—ঐ আমার জারিনা-ডিরোজের লুটের ভাগের অংশ'-বলে যায় ফার্নাণ্ডিজ,—'জারিনা আমাকে বলেছিল,—ডিরোজের হাত দুটো ঠিক অক্টোপাশের মতই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছিল, ছাড়াতে পারিনি,—জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম সেই মুহূর্তে; তারপর জানি না, যেন কোন্ অতীত জীবনের অন্ধকার রাত্রির স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে দেখি তার জাহাজখানা কোন্ এক দেশের তীরভূমি ধরে দক্ষিণের পথে তর্ তর্ করে ছুটে চলেছে; তারপর,'—

ঈষৎ সবুজ সাদা ছবিটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক রূপরেখার, সকল ছন্দের উত্তরণী নারীমূর্তি নিঃসীম সমুদ্র নীলিমার পটভূমিতে নারিকেল-ঘেরা দ্বীপপুঞ্জের এক বাংলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যেন রক্তিম ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠে কি এক অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে চায়—তারপর থেমে গেল ফার্নাণ্ডিজ, আমিও ছবিতে চোখ রেখে ভুলে গেলুম তার অস্তিত্ব। জারিনা-শিলভিয়া সম্পর্কের কথা প্রশ্নের আকারে জেগে উঠতে চেয়ে দেখি ফার্নাণ্ডিজ নিশ্চল, নিষ্পলক, সম্পূর্ণ নির্বাক, ভয় ভয় করতে লাগলো, বুঝে উঠতে পারলুম না কি করা দরকার।

শিলভিয়া দ্রুত পায়ে ঢুকে পড়ে, 'ড্যাডি মায়ের ঐ ছবিটার দিকে ঐভাবে চেয়ে থাকে কতদিন, তারপর দেখতে দেখতে সমস্ত সম্বিৎ তার এমনিভাবেই কোথায় হারিয়ে যায়—আপনি আর কোন কথা শুনতে পাবেন না আজ'—বলতে বলতে আমাকে ইঙ্গিত করে তাকে অনুসরণ করতে।

আমরা এসে দাঁড়াই আঙুর বাগানের ফটকটার কাছে, সমুদ্রের কল্লোল, ঝড়ের সে উদ্দামতা আর তখন নাই, ধীরমন্দগতিতে দক্ষিণের বাতাস বয়ে চলেছে কোন্ বিরহী মনের করুণ কাহিনী শুনিয়ে,—ব্যথায় মনটা টন্ টন্ করতে থাকে। শিলভিয়া তুলে নেয় বাগানের নাম না-জানা গন্ধভরা একগোছা শাদা ফুল তার দুহাতে—আমার হাত, নীলদুটো চোখে স্থির, অচঞ্চল ফুলভরা আলতো দুই হাত আমার হাত থেকে সরিয়ে নেয় না সে—অসহায় হয়েই বলে উঠি—'গুড্ নাইট'।

একটা উত্তাপ কোন গভীর থেকে উত্তর হয়ে দীর্ঘশ্বাসের আকারে আমার ওপর তীব্র আঘাত দেয়—'গুড নাইট'—

অতি ছোট্ট বিদায় বাণী আমার সমস্ত দেহ-মনকে অপূর্ব ভাবাবেশে মাখিয়ে দেয়, শিলভিয়ার চোখে জল, চোখ ফিরিয়ে নিই, বেরিয়ে পড়ি,

পেছনে পড়ে থাকে কটেজ ডা লিস্, নির্বাক ফার্নাণ্ডিজ, আর নিশ্চল জারিনা, লাইট-হাউসের আলো মাঝে মাঝে চমকে ওঠে—চমকে ওঠে আমার মানস-লোক। বাক্যহারা আমার মনের গহনে ফার্নাণ্ডিজ ভাস্কো ডা গামার সমাধি রক্ষক, আমি চলি পাহাড়ীয়া পথ ধরে।

কটেজ ডা লিস-এর পথ বার বার আকর্ষণ করতে থাকে,—সাউথ ওয়ার্ড রুমের সাজান জীবন পড়ে থাকে অনেক অনেক পেছনে, কোচীনের পোতাশ্রয়ের পথ ধরে কে যেন হাতছানি দেয় ভাস্কো ডা গামার সেই সমাধির পথে—কটেজ ডা লিস-এর পথে।

এক অস্ফুট আর্তযন্ত্রণা কোথা থেকে ভেসে আসে বিমূঢ় করে দেয়! গোধূলি সন্ধ্যায় পাহাড়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে আরবের কূলভাঙ্গা সমুদ্র গর্জন শুনতে শুনতে গিয়ে পৌঁছুই সেই অজানা ফুলের গন্ধমাখা আঙ্গুর বাগানের দরজায়, নীল দুটো চোখ তুলে শিলভিয়া এসে দাঁড়ায়। ডানহাতের ওপর তার হাতের ছোঁয়া লাগে, আমরা গিয়ে বসি—শ্বেত-পাথরের ছোট্ট একটি সমাধির কাছে। বাগানের শেষ প্রান্তে পাহাড়তলীর মাথায় যেখানে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তার মাথায় একটি ক্রশ, বড় যত্নে আঙ্গুরের লতাগুলো পাথরের সমাধিকে জড়িয়ে রয়েছে, ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রতি শিলাখণ্ডে, পাশে ঝরণার ধারা যেন অনন্তের সুর গেয়ে চলেছে, সমাধি সমুদ্র পাহাড়-ঝরণায় সে সহজ সবুজ-রূপ, অরূপের ভাব সমুদ্রে মিলে মিশে একাকার।

'ডাডি এখনও ফেরেনি তার কাজ থেকে'—বলতে বলতে এক থোকা সাদা ফুল আমার হাতে তুলে দেয় শিলভিয়া,—সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝকঝকে একটি বাতিদানে জেলে দেয় দীপের আলো, হাঁটু গেড়ে সমাধির সামনে কিছুক্ষণ নীরব থেকে উঠে দাঁড়ায়। 'এ আমার মায়ের সমাধি।'

জারিনার স্মৃতি সৌধ—সহজেই বুঝতে পারি, ফার্নাণ্ডিজের বুটের শব্দ শোনা যায় পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার। শিলভিয়া এগিয়ে যায় আমি ঈষৎ এগিয়ে যাই, আমায় দেখেই সজীব হয়ে ওঠে ফার্নাণ্ডিজ 'গুড ইভনিং, স্যার' 'সো হ্যাপি' সে হাত বাড়িয়ে দেয়।

করমর্দন করি, একটা প্রচণ্ড আগ্নেয়-গিরি, যুগ যুগ ধরে শুধু গর্জন করে এসেছে, সমাজ পৃথিবীর যত আবর্জনা যেন পুড়িয়ে দিতে চেয়েছে—কিন্তু

...নাম না জানা একগোছা সাদা ফুল

নিজেই শুধু দগ্ধ হয়েছে—এমন একটা প্রচণ্ড আবেগ ফার্নাণ্ডিজের দুঃসহ ব্যথা যেন প্রকাশের পথ পেয়ে যায়, আমায় নিয়ে সে নিবিড় হয়ে বসে তার সেই হারানো স্মৃতির দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিয়ে।

'ডি'রোজ, দ্যাট্ পাইরেট্—হ্যাঁ সে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু, কিন্তু আমার জীবনের সব আনন্দ সমস্ত সুখ আমার জারিনা, তাকে পাওয়ার মূলেও ওই ডি'রোজ। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই তাকে পাওয়ার জন্য, কিন্তু যখন ভেসে ওঠে সেই শয়তান ডি'রোজের অপকীর্তির দৃশ্য তখন কি ভাবি—স্বয়ং ডেভিলও সে-দিন হয়ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল'।

থেমে যায় ফার্নাণ্ডিজ শিলভিয়া আমার দিকে একবার তার গভীর চোখ দুটো মেলে ধরে কি যেন ভেবে নেয়, তারপর ঘন নীল পর্দাটা সরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। নির্বাক সাহেবের ভাববিহ্বল মূর্তির পেছনে কাঁচের জানলাটার ধারে গিয়ে দাঁড়াই,—উঁচু পাহাড়ের ওপর সেই ঘরের আলো-ছায়ার নীচে সমুদ্র প্রবাহ, শিলভিয়া তার সেই ফুলের পাপড়ির মতো হাতেধরা কফি আর স্যাণ্ডুউইচ ট্রে নিয়ে ঘরে ঢোকে, যেন প্রাণের সঞ্চার হয়। আমরা ফিরে পাই আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব, কফির পেয়ালা সে এগিয়ে ধরে—তার অতিথির দিকে আর ড্যাডির সামনে।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায় ফার্নাণ্ডিজ 'ইয়েস্,—প্লিজ স্যার', বলে—স্যাণ্ডুউইচ আর কফির সদ্ব্যবহার করতে থাকি আমরা।

শিলভিয়া তার সুডৌল হাতের ছোঁয়ায় আমার মনে, দেহের তন্ত্রে তন্ত্রে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে—নিজেও কফির পেয়ালা হাতে নেয়, 'এক্স্‌কিউজ্ মি' অনুমতি নিয়ে সে সরে যায়—হারিয়ে যেতে চায় বিরহ-বেদনার সে মমন্তুদ সে নিষ্ঠুর কাহিনীর জীবন্ত মঞ্চ থেকে।

মালাবার উপকূলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য দ্বীপমালার দিকে আবার দৃষ্টি ফেরায় ফার্নাণ্ডিজ। বহুদূরে নক্ষত্রের ঝিক্‌মিক্ আলোর মত রাতের অন্ধকারে একটি-লাইট হাউস। 'ঐ লাইট হাউসের পাশেই একটি ছোট্ট বাংলো'—বলে যায় ফার্নাণ্ডিজ, 'ডি'রোজ—সমুদ্রে জাহাজ লুঠ করে ভারতের উপকূল ধরে এগিয়ে আসছিল—এমন করে ভারত আফ্রিকা ইউরোপের কূলে কূলে—সে তার মাল নিয়ে বেচা-কেনার সওদা করে বেড়াত, সেদিনের সকাল-বেলায় লাইট হাউসের বাগানঘেরা বাং-এর বাহার নিষ্ঠুর ডি'রোজকেও

মুগ্ধ করেছিল। পালতোলা বিরাট জাহাজের নোঙর ফেলার হুকুম জারী ক'রে, লোক-লস্কর নিয়ে জাহাজ থেকে ঘাটে নেমে পড়ে ডি'রোজ। কয়েকজন জেলে আর এক পাদ্রিকে দেখতে পায় সে। তারপর লাইট হাউসের পাহারা-দারের সঙ্গে অনেক গোপনে সে তার চুক্তির কথা জানায় সমুদ্র-দ্বীপটির ওপর বিস্তার করে তার প্রভুত্ব আর তার বাংলো-বাড়ীর সমস্তটাই তার বে-আইনী দখলে চলে যায়।'

কাহিনীর পথ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখি জারিনার মূর্তির দিকে। ফার্নাণ্ডিজ তখন আমার সামনে আর সামান্য মাসোহারার সমাধি রক্ষক নয়—কোথায় হারিয়ে যায় আমাদের বিভেদ, 'সাব, কি ভাবে দেখলুম জারিনাকে, আমার সবটুকু রক্তবিন্দুর সঙ্গে সে কোন অনন্তকালের পারাপার থেকে এসে মিশে এক হয়ে গেল—সে যে আমি বলতে ভাষা পাই না—জারিনার হাতে পায়ে বাঁধা শেকল, তাকে দুটো খোজা কাফ্রি কৃতদাস টানতে টানতে নিয়ে তুললে বাংলো-বাড়ীটার ভেতর। বাধা-সভ্য দ্বীপটার সবক'টা দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে গেল সেদিন। মালাবারে সেদিন নেমে এসেছিল প্রচণ্ড বর্ষা, আর আরব সাগরের ঢেউ-গুলো মত্ত শক্তির বেগ পেয়ে ঝড়ের কি মাতন তুললো, যেন সমগ্র কোচিন রাজ্যের লক্ষ নারিকেলের সারি বুঝি—উপড়ে উপড়ে পড়তে চায়। সন্ধ্যা আসে নেমে,—লাইট্ হাউসের আলো দপ্দপ্ করতে থাকে। হ্যাঁ তুমি শুনতে পাচ্ছো না—জেন, ঐ যে চার্চের ঘণ্টা বাজছে, ও আমার জারিনা কাঁদছে। এ তার আর্তনাদ। আমাকে ডাকছে—আমাকে যেতে হবে।'

উঠে পড়ে ফার্নাণ্ডিজ—প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে ক্ষিপ্ত জন্তর মত। কটেজ ডা লিস-এর দরজাটা ধাক্কা দিয়ে ছুটতে থাকে, সিঁড়ি দিয়ে কালো পাহাড়টার তলার অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে যায় সে না। মুহূর্তমাত্রে যেন স্বপ্ন রাজ্য পাড়ি দিয়ে জেগে উঠি বর্তমানকালের সীমানায়। শিলভিয়া হঠাৎ এসে চেপে ধরে হাতখানা—'না এমনি করে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই আমি, শিলভিয়া কাঁচের জানালার পাশে কুশানে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়—দৃষ্টি তার দূর দ্বীপমালার ওপর নিশ্চল নিষ্পলক সে বলে যায়, 'ঐ বাংলো-বাড়ীর গীর্জায় যাওয়ার পথে ড্যাডি দেখতে পায় জারিনাকে। তার অশান্ত চোখের জলে বিচলিত হয় সে। অতিকষ্টে উদ্ধার ক'রে রাতের অন্ধকারে আশ্রয় নেয় জঙ্গলের এক কুঁড়ে ঘরে। দু'জনে গড়ে তোলে তাদের প্রিয় এই কটেজ ডা লিস আর সৃষ্টি করে তাদের প্রিয়তর আমার জীবনকে। বছর ঘুরে আসে, ডিরোজের জাহাজের গতিপথ ও পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী হয়—কোচিনের ঐ দ্বীপ-বাংলোটার ঘাটে নেমে জলদস্যু তার গোপন কক্ষে গিয়ে ব্যর্থ হয়, নারীদেহের লোভ থেকে বঞ্চিত হয়। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, ড্যাডি ফেরার ঠিক আগেই ঢুকে পড়ে—ডিরোজ, হাতে তার খোলা তলোয়ার—মামিকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সে, ধারালো তলোয়ারখানা আমূল বসিয়ে দেয় বুকের মধ্যে, ভয়ার্ত চীৎকার করে লুটিয়ে পড়ে আমার মামি—সব শেষ হয়ে যায়—সে আজ বিশ বছর আগের কাহিনী।'

কিন্তু কোথায় ফার্নাণ্ডিজ। ধূসর পাহাড়ের তলায় ঢেউয়ের ফণা যেন লক্ষ-কোটি আর্তনাদ করে আছড়ে পড়তে চায়, বুকের মধ্যে অনুভব করি বিদ্যোৎ হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় সব দরজা-জানালা খুলে যায়—শিলভিয়ার হাত ধরে ছুটতে থাকি—আঙুর-বাগানের পথ ধরে, জারিনার সমাধি যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকে জ্বলে ওঠে।

আমরা চলতে থাকি, জেলেদের নৌকোর পাল নামান, বাতির আলো বড় ম্লান। কিন্তু জীবনের ত শক্তি, তার পথ কত দুর্গম, সে জ্বলে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়, তবু তার শিখা অনির্বাণ,—এক থেকে আরওতে ছড়িয়ে জড়িয়ে যায়—সেই সন্ধানে ফার্নাণ্ডিজের সন্ধানে আমরা নির্বাক ছুটে চলি।

উঁচু পাহাড়ের একেবারে চূড়োয় একটি লাইট হাউসের তলায় অচেতন ফার্নাণ্ডিজের দেহ, যেন কিছুকে আঁকড়ে রয়েছে, নীল অচঞ্চল চোখে চেয়ে থাকে শিলভিয়া, সে নির্বাক। আমি চেয়ে থাকি ফার্নাণ্ডিজের দিকে আর একবার শিলভিয়ার মুখে।

●

আকাশের তলায় অন্ধকারে দপ্ দপ্ করে লাইট হাউসের আলো, আর কালো কালো ঢেউয়ের মাথায় গলে যায় হারিয়ে হারিয়ে যায়। দুবাহু মেলে ঢেউ-এর দল উন্মত্ত আবেগে লুফে নেয় তার অশান্ত বুকে সেই আলোর রঙীন ইসারা। ঢেউয়ের বুকে বার বার এঁকে চলে তার মধুর চুম্বন—বিবর্তন।

পাথরের সে কঠোর আঘাত—আলিঙ্গনে ফার্নাণ্ডিজের দেহ সম্পূর্ণ নিথর, মালাবারের তীরে গড়ে ওঠে আর একটি সমাধি—প্রেমের দেউল।

নীড়-ভাঙ্গা ঝড়ের রাতে আজো গেলে দেখা যায় দুটি বাতিঘর, প্রেমের সমাধি-দেওয়ালে তার আলোর ইসারা।

ঘুম নিয়ে

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখে থাকতে হলে প্রধানত তিনটে জিনিষ চাই। এই জিনিষগুলো যিনি নির্ঝঞ্ঝাটে পেয়ে গেলেন তিনি অবশ্যই ভাগ্যবান ব্যক্তি। এই জিনিষ তিনটে হ'ল খাওয়া, পরা ও ঘুম। খাওয়া-পরার জন্যে পয়সা লাগে। কিন্তু ঘুম কিনতে হয় না। ঘুম এমনিতেই আসে (অন্তত আসা উচিত)। ঘুমোবার জন্যে ভগবান রাতের বরাদ্দ করে রেখেছেন। কিন্তু বিনি পয়সার ঘুমের জন্যেও মানুষকে আজকাল অনেক সাধ্য-সাধনা, অনেক আরাধনা করতে হচ্ছে হরদম। আজ রাতে আপনার ভাল ঘুম হবে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে কি আপনি জোর গলায় বলতে পারবেন যে, হবেই?

পারতে পারলে তো ভালই। কিন্তু পারবেন না। কারণ বিছানায় শুলেই যে ঘুম হবে এর কোন গ্যারান্টি নেই। এলো তো সঙ্গে সঙ্গে এলো কিম্বা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। নয়তো বিছানায় সারারাত্র এপাশ ওপাশ। মাথার বালিস দুমড়ে গেল, বিছানার চাদর কুঁকড়ে গেল। বার কয়েক উঠলেন, বাথরুমে গেলেন, জল খেলেন। তারপর আবার বিছানায়। ঘুম তবু এলো না। কিম্বা শেষরাত্রে এলো কৃপণের মত। ঘুম নামাবার জন্যে এ কি ডাকাতি।

ঘুম নিয়ে আজকাল ভাবনা কমবেশী সকলেরই। প্রায় সকলেই অভিযোগ করছেন: ভাল ঘুম হচ্ছে না। তবে কি ঘুম নেই পৃথিবীতে? আছে। অনেক ও অফুরন্ত আছে। তাকান এদিক ওদিক। দেখবেন কত লোক অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। ডেকে ডেকেও তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না: ঘুম ভাঙ্গানো যাচ্ছে না। তারা যেখানে সেখানে ঘুমোচ্ছে, রিক্সার ভেতরে, মটর গাড়ির মধ্যে, মাঠে-ময়দানে, গাছের ছায়ায়, এমন কি রাস্তায় ফুটপাথে। একের বিছানার দরকার তো নেই, বালিস তো বাহুল্য। শুধু বাইরে বা রাস্তাতেই কেন? বাড়ির মধ্যে আসুন। যাঁরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তো পাশের ঘরে কাকা সারা-রাত বিছানায় ছটফট। এক ভাই সারা-রাত ঘুম-ঘুম করে ঘামছে আর অন্য ভাইকে বেলা হয়ে গেছে বলে ঠেলে ঘুম ভাঙ্গাতে হচ্ছে।

তবে কি বলবেন ভাগ্যের ব্যাপার, অনেকটা তাই। এত অভাব অভিযোগ ভাবনা চিন্তা আর দুঃখ কষ্টের মধ্যে যে আরামে আর নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুমোতে পারল সে সুখী আর ভাগ্যবান বৈকি। কারুর সমস্যা ঘুম পাড়ানো, কারুর সমস্যা ঘুম তাড়ানো। কেউ ঘুম আনার জন্যে বই পড়েন, নানা সৎ চিন্তা করেন, আবার কেউ ঘুম ভাঙাবার জন্যে চোখে-মুখে জল দেন, ঘন ঘন চা খান।

সুতরাং সমস্যা শুধু ঘুমের অভাবেরই নয়, ঘুমের বাড়াবাড়িরও। যদিও ভগবান ঘুমের জন্যে রাতটি বরাদ্দ করেছেন। দিবানিদ্রা আজকাল বেড়েছে। অনেকে আছেন যাঁরা দুপুরে কিছুক্ষণ না ঘুমোতে পারলে শরীর খারাপ বোধ পারেন। তাই বলে এঁদের যে বিনিদ্র রাত কাটে এ কথা মনে করবেন না। অবশ্য যাঁদের 'নাইট ডিউটি' বা রাতেই চাকরি তাঁদের ঘুমের ব্যাপার বাধ্য হয়ে দিনেই সারতে হয়। অনেকে আছেন যাঁরা ঘুমের ব্যাপারে কোন সময়ের অপব্যবহার করেন না। যখনই একটু ফুরসৎ পান, তখনই ঘুমিয়ে নেন। তা সে ট্রামে-বাসে কি ট্রেনে বসেই হোক, বা হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতেই হোক। কিম্বা অফিসের কাজের ফাঁকেই হোক। একটু আগেই কথা বলছিলেন পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ একটু পরেই দেখলেন তাঁর নাক ডাকছে।

ঘুমের সঙ্গে নাক ডাকার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ঘুমোবার সময় নাক প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর ডাকে। কারুর ডাক শান্ত ও সংযত। কারুর বিকট ও ভয়ংকর। কোথাও বিচিত্র ডাক। বলা বাহুল্য যাঁর নাক ডাকে সে ছাড়া তাঁর নাক-ডাকা সবাই শুনতে পায়। আর পাশে যে শোয় নাক ডাকার গর্জনে তার ঘুমের বারোটাই শুধু বাজে না, তাকে ঘুম একরকম বর্জনই করতে হয়। কারুর পাতলা ঘুম, কারুর ঘুম গাঢ়। একজন এক ঠেলাতেই উঠে পড়েন, অন্যজনকে ঠেলে ঠেলে ওঠাতে হয়। বাড়িতে ডাকাত পড়ল, সর্বস্ব চুরি হয়ে গেল তবু আপনার ঘুম ভাঙল না, এমন সর্বনেশে ঘুম না ঘুমোনোই ভাল। ঘুমের জন্যে ট্রেন ফেল করেছেন অনেকে, ঘুমিয়ে পড়ে নামবার স্টেশন পার হয়ে গেছেন। এমন কি চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়েছে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য—কত কি কাণ্ড ঘটে গেছে কতবার। এমন বে-আক্কেল ঘুম, বেসামাল ঘুমও কম সর্বনাশের নয়। ঘুমের বাড়াবাড়িতে প্রাণ নিয়ে নাড়ানাড়ি হতে কতক্ষণ। অবশ্য কাল-ঘুম হলে আর ভাবনা নেই। সব ঝঞ্ঝাটের শেষ। শত ডাকাডাকিতেও তা ভাঙবে না।

ঘুম ভাল। ঘুম দরকার। কিন্তু দরকার হলেই কি ঘুম আসবে? বরং আজকাল ঘুম নেই। বিকেলে ঘুম আনবার জন্যে পয়সা খরচা করতে হচ্ছে। ঘুমের বড়ির প্রচুর বিক্রি। এদেশেই বা কম কি? এদের জন্যেই কি কবি সুকান্ত 'ঘুম নেই' লিখে গেছে? কে জানে! তবে যাদের প্রায়ই রাতে বিছানায় ছটফট করে পাশের কারুর নাক ডাকা শুনতে শুনতে আর রাস্তার কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' শুনতে শুনতে 'জাগরণে যায় বিভাবরী' তাদের দুর্ভাগ্যের কথা কে না জানে।

আসে। যেমন শিবরাত্রি কি জন্মাষ্টমী আবার বাসর জাগা তো আছেই। নব-বিবাহিতদের ফুলশয্যার পর থেকে রাত তো একরকম জাগারই। ভাল ওস্তাদের গান শুনতে বসলে কোন ফাঁকে যে রাত কেটে যায়, খেয়ালই থাকে না। এ সব অবশ্য মাঝেমধ্যে ---যাকে বলে ব্যতিক্রম। কিন্তু যাদের ঘুম নেই, কি পোড়া চোখে ঘুম আসে না---তারা কি করবে? তাদের জন্যে দরকার ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির আজ। কিন্তু শিয়রের কাছে বসে ঘুমপাড়ানি আর আজকালকার ক'জন মা আগেকার মত খোকা-খুকুদের ঘুম পাড়ায় 'চাঁদ মামা খোকার চোখে ঘুম দিয়ে যা' গান শুনিয়ে?

ঘুমোনো ভাল। ঘুম দরকার। যত পারেন ঘুমোন। ঘুমিয়ে যদি সব দুঃখকষ্ট ভুলতে পারেন, তবে আপনি ভাগ্যবান। কুম্ভকর্ণ আজ আর নেই। কুম্ভকর্ণের বংশের বংশধরেরা ঘুমের দেশ থেকে কবেই নির্বংশ হয়েছে। আর সেই সঙ্গে ঘুমও। তবু ঘুমোন। যত পারেন---যখন পারেন। কিন্তু আক্ষেপ আপনাকে যেন করতে না হয়, 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না।' সেটা মনে রাখবেন।

যামিনী না যেতে যদি জাগাতে চান, জাগান। তবে যারা জেগে ঘুমোয় তাদের থেকে সামলে। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রূপকথার গল্পের দেশের ঘুমন্ত রাজকুমারীর যদি ঘুম ভাঙ্গাতে পারেন, তবে তার মত রোমাণ্টিক আর কিছু নেই। তবে সাবধান সেই সব কপট নিদ্রা থেকে যারা ঘুমের ভাণ করে মটকা মেরে পড়ে থাকে।

অকাল বোধন

রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বণিকের তুলাদণ্ড সর্বত্র জয়ী—
সকল আশ্রমে।
বসন্তে কি বর্ষাগমে
ভূত-ভবিষ্য পুরাণে বা আগমে-নিগমে,
আচার্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যায়,
যত কিছু দেখায়, অদেখায়, না-দেখায়
অজাত অমৃতময় বেদধ্বনিতে,
ত্রৈমাত্রিক প্রণবের প্রান্তিক সংগীতে,
একটিই সিদ্ধান্ত লেখা
দিয়ে নানা রূপরেখা—
মা আমার অদ্বিতীয়া, আনন্দময়ী।

বিদ্যা-অবিদ্যা, ছিদ্রা-অছিদ্রা,
দ্বন্দ্ব অজাতশান্তি
সিদ্ধি, ঋদ্ধি ও ভ্রান্তি—
সকলকে কোলে নিয়ে আপন বেদীতে
তুলাদণ্ড লয়ে হাতে
কেন্দ্রীভূতা মা আমার
আসুরিক অজ্ঞান ভেদিতে।

গজে অশ্বে নৌকায় দোলায়—
শোকে-তাপে, সুখে-দুখে, সংগমে দুর্গমে
মা আমার অশ্রান্ত চামর ঢুলায়।
আগমনী বাঁশী বাজে দূরে ও অদূরে
ভিন্ন তানে এক সুরে।

শ্রাবণের শেষে আজ উঠেছে চন্দ্রমা।
তোমরা করিও ক্ষমা
অখ্যাত এ কবির অকাল বোধনে।
জানি না কার এ অশ্রু
নিবেদিত আত্মসংবেদনে।

শারদোৎসব না দুর্গোৎসব?

এ বিষয় নিয়ে অতিশয় গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

সুরেখা দে

এ হয়ত একই বলে মনে হয়ে থাকে, অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের কাছে নয়---সাধারণের কাছে। বেশ কয়েক বছর আগে, আমারও মনে হত যে, শারদোৎসব আর দুর্গোৎসব, দুয়ের মানেই তো এক। কারণ, মা দুর্গার আগমন যেহেতু শরৎকালে, সেহেতু শারদীয়া উৎসব বললেও যা বোঝায়, মা দুর্গার উৎসব বললেও তো সেই একই অর্থ। কিন্তু না, শারদোৎসব দুর্গোৎসব এক নয়। দুটি উৎসবই সম্পূর্ণ আলাদা। দুই উৎসবের আবির্ভাবের দিক দিয়েও এক বিরাট ব্যবধান। দুটি উৎসবের জন্ম ইতিহাসের দিক থেকে কালের যে কি পরিমাণ দূরত্ব তা যথার্থই শুনলে আশ্চর্য হতে হয়।

তাই বলি যে, সত্যিকারের 'শারদোৎসব' বলতে যা বোঝায়, তা আজকের নয়, বহু প্রাচীনের। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর ধরে চলে আসছে। অর্থাৎ ঋকবেদের সময় থেকে। এক কথায়, ঐ উৎসব ছিল শরৎ ঋতুর প্রথম প্রবেশজনিত উৎসব। আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় তাই প্রমাণ করে বলেছেন যে, 'শারদোৎসব অল্পদিনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বৎসর এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। দুর্গোৎসব নয়, শারদোৎসব: শরৎ ঋতু প্রবেশজনিত উৎসব।'

অতএব নতুন ঋতুর আগমনে যে উৎসব, তাকেই বলা হয় শারদোৎসব। আমরা বর্তমানে যেমন '১লা বৈশাখ' নববর্ষের উৎসব পালন করে থাকি, বৈদিক যুগে তেমনি শরৎ ঋতু থেকেই নতুন বছর আরম্ভ হত এবং তাই এই উৎসব মহাসমারোহে পালন করা হত।

বাস্তবিকপক্ষে দুর্গাপূজার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না বলেই ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বৈদিক ঋষিদের কাছে এক শরৎ বলতে এক বছর বোঝাত। তাই তাঁরা কাউকে আশীর্বাদ করার সময় বলতেন,---'শতং শরদঃ জীবতু।' অর্থাৎ শত শরৎ বাঁচিয়া থাক।

অবশ্য এ কথা সত্য যে বর্ষা ও শরৎ ঋতুর সন্ধিক্ষণেই কোন এক সময়ে আমাদের এই দুর্গাপূজার আবির্ভাব ঘটেছে; মাত্র আজ থেকে আনুমানিক প্রায় সাড়ে তিন 'শ বছর আগে।

এই সময় পূর্ব বাংলার তাদের পুর নামে জায়গায় কংস নারায়ণ বলে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন এবং জানা যায় যে, তিনিই নাকি সর্বপ্রথম বাংলা দেশে এই দুর্গাপূজোর প্রবর্তন করেন। কিন্তু ঠিক কি রকমের প্রতিমা যে তিনি গড়িয়েছিলেন তা নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ যুগে যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রতিমার রকমফের হয়েছে যথেষ্ট এবং বাংলা দেশে বর্তমানে খুসিমাফিক 'আর্ট' দিয়ে যে কত রকমের দেবীমূর্তি গড়ান হচ্ছে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন এবং কালপ্রবাহের খরস্রোতে মা দুর্গাকে খেয়ালের বশে কোথায় কোন রূপে দাঁড় করান হবে, তা সেই মহাকালই বিচার করবে।

মানুষের মনের সঙ্গে, রুচির সঙ্গে, যুগের আবহাওয়া যায় বদলে, তাই তার ধর্মীয় জীবনে ক্রমাগত পরিবর্তনের পালাই চলতে থাকে, তা যদি না হবে তাহলে আমাদের এই দশভুজা মা'র সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ কি করে এলেন, কোথা থেকে এলেন এবং কিসের অনুকরণে করে

এলেন, তা মনে হয়, যতদূর জানি, কেউ আজ অবধি সঠিকভাবে বলতে পারেন নি। যতদূর মনে হয়, শাক্ত পদকর্তাদের হাতেই সৃষ্টি মার সঙ্গে তাঁর ছেলে-মেয়েরা।

বাংলার মা তাঁর ছেলেমেয়েকে সদাই চোখে হারান, সন্তান-সন্ততি না থাকলে কি আমাদের মায়ের কোল মানায়? তাই বোধহয় অতীতের কোন এক শুভক্ষণে মহামায়ার এই পূর্ণাঙ্গ স্বরূপটি শাক্ত কবির মানসলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাই এই মাকে আমরা এত ভালবাসি। মায়ের প্রতি আমাদের হৃদয়ে রয়েছে প্রাণোন্মাদকারী এক বিষম আকর্ষণ।

জগৎ-মাতার এই পূজোর বিপুল আয়োজন বাঙালী সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের---একে আমরা সার্বজনীন দুর্গোৎসব বলি কেন? সকলে একত্র হয়ে মায়ের পূজো অনুষ্ঠান করি বলে? না, শুধু সেজন্যে নয়---সকলে একত্রিত হই বলে যদি দুর্গোৎসবকে সার্বজনীন আখ্যা দিয়ে থাকি, তবে নিশ্চয় এ আখ্যাও ভুল।

অতএব তাহলে বলব যে, মায়ের পূজোৎসবের যে ব্যাপকতা ও মর্মস্পর্শিতা ---তা তাঁর প্রত্যেকটি সন্তানের অন্তরে সমান; তাই বলে থাকি সার্বজনীন। তাই না, এই পূজোর আনন্দ শুধু বাঙালীর প্রাণজগতে নয়, প্রকৃতিজগতেও সজীব আনন্দ ধারার ঢেউ খেলে যায়। শরতের সোনালী আকাশে শিউলিঝরা আঙিনায়, শস্যপরিকীর্ণ মাঠে, জলে স্থলে সর্বত্র প্রাণের প্রাচুর্য ও সম্পদের মহিমা হিল্লোলিত হয়ে ওঠে।

সেই জন্যেই তো মায়ের প্রসাদে তাঁর নির্ধন সন্তানের বুক আনন্দে ভরে ওঠে, হাহাকার দূর হয়ে যায়, স্বাচ্ছন্দ্যের ও অনাবিল আনন্দের এক ভাব জেগে ওঠে। প্রকৃতির অবারিত প্রসন্নতার পটভূমিকায় মায়ের এই মহা পবিত্র উৎসব আনন্দ-সুন্দর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই দুর্গোৎসব আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। এর মধ্যে দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য নানাভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। মায়ের আগমনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পুনরাবৃত্তি, নানা হতাশার গ্লানি ও হীন অর্থনৈতিক জীবনের বেদনা ইত্যাদি সব কিছু যেন দূরে সরে গেছে বলে সাময়িক মনে হয়, আর সেই জায়গায় সহসা জেগে ওঠে স্নেহ প্রেম প্রীতি ভালবাসা-জড়িত এক নতুন সমাজচেতনা। তাই না এই উৎসব আমাদের কাছে শুভ, মঙ্গলময় ও কল্যাণ শ্রীমণ্ডিত। সাধক তাই দেখতে পান 'মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী মূর্তি।'

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনটি দিন দেখতে দেখতে কেটে যায়। নবমীর রাত্রি যেন অতি তাড়াতাড়ি পুইয়ে যায়। সানায়ে বিদায়ের সুর শোনা যায়। মাকে বিদায় দিতে প্রাণ চায় না। যে মা আমাদের কাছে শস্য-সম্পদশক্তিরূপিণী, তাঁরই জন্য আবার বিসর্জনের মন্ত্র পাঠ করতে হয়। কিন্তু পাছে আমাদের মন একেবারে ঝিমিয়ে না পড়ে বলেই মহাদশমীতে বিজয়া বা বিজয়োৎসব আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু এ বিজয়োৎসব যে কিসের বিজয় তা আজো ভারতের কোন হিন্দু পণ্ডিত, দার্শনিক বা শাস্ত্র-টীকাকার নির্ভুলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে যে পারেন নি তা আমি আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই করে বলতে পারি।

কারো কারো মতে রামচন্দ্রের রাবণবধের পরে যে বিজয়োৎসব হয়েছিল তারই প্রতীক আমাদের এই বিজয়া দশমী; আবার আর একদল পণ্ডিতের মতে, শরৎকালে রাজা মহারাজগণের দিগ্বিজয় যাত্রায় দেবী পূজার উৎসব কিন্তু ঐ সমস্ত যাই হোক না কেন, এই বিজয়া উৎসবের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে যে মিলনের মন্ত্র বেজে ওঠে, তাই আমাদের কাছে যথেষ্ট। মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে প্রতিটি ব্যক্তিজীবন সমষ্টিভাবে মিলনমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে নবতম এক চেতনার সৃষ্টি করে, সমাজতন্ত্রের বীজ বপন করে আমাদেরই মনের মাটিতে আগামী দিনের শুভ-কামনায়।

সারা পৃথিবীতে চিকিৎসারত একজন ডাক্তার

সারা পৃথিবীতে প্র্যাকটিস করেন এ রকম এক ডাক্তারের নাম এরিখ মার্টিন ---ইনি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। পৃথিবীর প্রায় পঁচিশটি অনুন্নত দেশে বারোশত জার্মান কর্মী নানা কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। ডাক্তার মার্টিন এদের চিকিৎসক। সুদূর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনুন্নত অঞ্চলে কাজ করার মতন শক্তি আছে কি না, পুরোপুরি তা পরীক্ষা না কোরে কোন জার্মান স্বেচ্ছাসেবককে দেশ থেকে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় না। স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিন মাস ধরে তাদের ওষুধপত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদেশে যাবার সময় স্বেচ্ছা-সেবকদের প্রত্যেককে একটি ওষুধের বাক্স দেওয়া হয়। এ ছাড়া ডাক্তার মার্টিনের সঙ্গে তাদের নিয়মিত চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়। দরকার হলে তিনি পৃথিবীর যে-কোন দেশে গিয়ে তাদের দেখে আসেন। ডাক্তার মার্টিনকে সাহায্য করার জন্য শীঘ্রই একজন তরুণ আফ্রিকান চিকিৎসক ও একজন তরুণী নার্স এগিয়ে আসছেন। এঁরা আফ্রিকায় কর্মরত জার্মান স্বেচ্ছা-সেবকদের রোগব্যাধি সম্বন্ধে ডাক্তার মার্টিনকে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাবেন।

দেবীর আগমনে

প্রতি বছরের মতই মা শারদা পর্ব-মঙ্গলারূপে, দুঃখদৈন্যপীড়িত বাংলায় তিনটি দিনের জন্য আবার ফিরে আসছেন। শেফালীর সুমিষ্ট সৌরভে মন উৎফুল্ল, আচ্ছন্ন। সোনালী রোদে কেমন একটা মিষ্টি আমেজ।

'মণিদ্বীপনির্বাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।'

দেবীর চরণে এই নমস্কার আমাদের একান্ত, একাগ্র ও সত্য হোক, ---মোহ মোহ-তমসার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। দেবশক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠুক বাংলার প্রতিটি নরনারী। ভাবময়ী শারদা সর্ব অভাব সমস্ত দৈন্য ও দুর্বলতার অবসান করুন, এই কামনা নিয়ে মায়ের চরণে আত্মনিবেদনের অনন্ত আগ্রহে আজো বাংলার অধিকাংশ নরনারী সম্ভবত সমান সমুৎসুক। আজো শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হাতে ভক্ত-পূজারীর দল, মায়ের আগমন প্রতীক্ষায় চঞ্চল উন্মুখ। ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে তেমনি আবাহন-মন্ত্র, আগমনী গান। প্রবাসী বাঙালী-চিত্ত আজো স্বদেশের স্বজন-সান্নিধ্যের লোভে তেমনি লোভাতুর। দীর্ঘ বিরহের পরে মিলনের মহাসানী আনন্দময়ীর মায়ের আগমনে বাঙালীমাত্রেরই সমগ্র অন্তর মিলনোন্মুখ হয়ে উঠবে, এ আর বিচিত্র কি।

দেখছি সমস্ত কিছুই প্রায় ঠিক আছে অথচ কি যেন নেই। কি নেই, কি ছিল, কিই বা আমরা হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি, এ প্রশ্ন অন্তর থেকে স্বতঃ-উত্থিত হয়, জবাব মেলে না। কত দিন বা আগের সে কথা, অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সু-মধুর কণ্ঠনিঃসৃত প্রীতির প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া অপূর্ব সেই গান----

"আজ আগমনীর আবাহনে,
কি সুর উঠিল বেজে।"

সেই ভক্তিবিনম্র চিত্তের আগমনী সুর কি বাংলার ছিন্নতন্ত্রীতে আজো ঠিক তেমন করেই বাজে, দোয়েল শ্যামা কি তেমন করেই ডেকে ডেকে আনন্দরসে অন্তর বিবশ ক'রে দিতে পারে? পারে যদি, তাহলে কেন আজ আগমনী গানে এমন ক'রে ফুটে ওঠে বার্থতার করুণ আকৃতি? কেন কেবলি মনে হয়---গান সত্য নয়, প্রাণ সত্য নয়, পূজা আয়োজন, আবাহন, আগমন, সব ব্যর্থ---সব। বাংলার জীবন-মরুতে আজ একমাত্র সত্য শুধু বিসর্জন। তা না হলে, ঋষি বঙ্কিমের 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' ধরিত্রী আজ এত কৃপণা হয় কিসের জন্য, কোন পাপে?

রাণী গঙ্গোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণার দেশের মানুষ, একমুষ্টি অন্নের জন্য আজ এভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে মরছে কেন? যাঁর দক্ষিণে সমৃদ্ধি-স্বরূপিণী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, সেই সঙ্গে সিদ্ধিরূপী গণেশ। বলরূপী কার্তিকেয় নিয়ে আমাদের ঘরে আবির্ভূতা; সেই মায়েরি সন্তান আমরা এত নিঃস্ব? তবে কি মাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, মায়ের স্বরূপ চিনতে ভুল করেছি? তাই বটে। ভাবছি যে, এমন মাকে পেয়েও যারা হারায়, তাদের দুর্ভাগ্যের বুঝি তুলনা চলে না।

দেবী দুর্গা
চিত্র: প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জানি না এ জন্য কে বা কারা দায়ী, তবে এটুকু স্থির জানি যে, কোন রকম কাঁচকলা বা কচুসেদ্ধ খেয়েই আজ আর ক্ষুন্নিবৃত্তি হচ্ছে না, যে-দিকে তাকাবে কেবলি নাই-নাই, খাই-খাই, চাই-চাই রব। জীবন ধারণের পক্ষে যা কিছু অতি প্রয়োজনীয় বস্তু তার সবগুলিই প্রায় দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হয়ে পড়ায় দেশের অধিকাংশ নরনারীকেই দেখা যায় আজ অন্তঃসারশূন্য, সেই অনুপাতে বিরক্ত বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ। এদেরই দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বাতাসে যে, আকাশবাতাস কালো হয়ে উঠেছে, নিতান্ত চোখ বুজে না থাকলে, সেটাও সকলেরি চোখে পড়ার কথা।

এমনও শোনা যায়, এদেশের চিরসহিষ্ণু মানুষ-সাধারণের আজ নাকি আর ধৈর্যের বাঁধ নেই, তারা নাকি প্রায় জলন্ত লৌহপিণ্ডবৎ অসহিষ্ণু উত্তপ্ত---যদিও এ আগুনে নিজেরাই সমানে জ্বলছে। মানুষের পেটে যখন ক্ষুধার আগুন জ্বলে, সহস্র নীতিকথার পাহাড় গ'ড়েও যে তাকে ঠাণ্ডা রাখা যায় না, একটা শিশুরও এটা জানা থাকবার কথা; সুতরাং সাধারণের ঘাড়ে এ অপবাদ চাপিয়ে সমস্যার মীমাংসা হওয়ার নয়। তারো ওপরে যখন শোনা যায় যে, জিনিষপত্রের অভাব সত্যি ততটা নয়, যত অভাব স্বভাবের অর্থাৎ প্রচুর পয়সা খরচে প্রচুর দ্রব্য আজো মেলে। তা-হলে কথাটা দাঁড়ালো কি? যার পকেটে পয়সা আছে, সে-ই সর্বদিকে টিকে থাকতে সমর্থ হবে---কিন্তু যার নেই নেই? এ দেশের অধিকাংশই তো এই না-থাকার দলে।

ভাবছি যে, এইরূপ অরীতি বা দুর্নীতিই যাদের একমাত্র পাথেয়, তাদের পূজা-পদ্ধতিইবা কেমন

আর সেই দেশের কল্যাণইবা ফিরিয়ে আনবে কে? আনন্দ আর আড়ম্বরের মুখোশ প'রে, আনন্দময়ী মাকে যে ঠকানো যায় না, এতদিনেও কি আমাদের সেই কথাটা সম্যক উপলব্ধির সময় আসে নি? মা তো কেবল নিজের সেবা চান না, চান্ তাঁর নিরন্ন দীনদরিদ্র আর্ত সন্তানের সেবা। সত্যিকারের পূজাপার্বণের প্রকৃত উদ্দেশ্যও যে তা-ই। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সেই সত্যটাকেই আজ আমরা সম্পূর্ণ ভুলতে বসেছি। কোথায় গেল সরল বিশ্বাসী আত্মভোলা বাঙালীর সেই মুখভরা হাসি, বুকভরা আশা-আনন্দ, চোখভরা উজ্জ্বল দীপ্তি। কেন গেল? দ্বেষ-হিংসা স্বার্থ আর দলাদলির চরমে পৌঁছে, তার ভয়াবহ পরিণতি প্রত্যক্ষ করেও কি একথা মুহূর্তের জন্য স্মরণে আসে না যে, আজো আমরা মায়ের পূজার যথার্থ অধিকারী আছি কি না? মায়ের পূজা-উৎসব চাই---অথচ মাকে চিনিনে, আনন্দময়ীর আবাহন চাই আনন্দ-লেশশূন্য হয়ে, এটা কি ক'রে সম্ভব?

আমরা জানি যে, কেবল পট্টবস্ত্রে ভূষিত হ'য়ে, জপের মালা হাতে চোখ বুজে বসলেই ধ্যান হয় না, চন্দনের ঘন অনুলেপনেও চিত্তশুদ্ধি সম্ভব নয়, সর্বজ্ঞানদায়িনী অন্তরের মাকে অন্তরে জাগাতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের প্রেম আর ভক্তিরসে অনুরঞ্জিত হওয়া দরকার, তা না ক'রে বৃথাই আমরা অন্ধের মত খুঁজে ফিরি 'হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ।' মা যে আমাদের সর্বদুঃখ-দুর্গতি হারিণী এই বিশ্বাসই কি সত্যি সত্যি আছে? নেই। থাকলে দেশের এমন দুর্দশা হতেই পারে না। আমরা নিজেদের পশুপ্রবৃত্তিগুলি বলি দিতে পারিনে, অসহায় ছাগশিশু বলি দিয়ে বাহাদুরি নিই।

বলির অর্থ উল্টাতে হবে। আয়োজন হোক নূতন সম্ভারে, নব উপচারে। চাইনে ঢাকের বাজনা, থামিয়ে দাও মাইকের কর্ণবিদারী আর্তনাদ, চাইনে হৈ-হুল্লোড়ের মাত্রামাত্রি আর লোকের কাছে মহত্ত্ব বাড়াতে প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান।

বাইরের ঢাক থেমে গিয়ে, বেজে উঠুক অন্তরের জয়ঢাক, সেই আনন্দলোকের বিজয় বাজনা। মেয়েরা অন্নপূর্ণা মূর্তিতে, পবিত্র অন্তঃকরণে স্বামী-পুত্রের কল্যাণ ভিক্ষা মেগে নাও। দুর্ভিক্ষ যে বাঁধা পড়েছে মেয়েদের বিলাস-ব্যসনে। অভাব যতক্ষণ স্বভাবে না দাঁড়ায় ততক্ষণ চিন্তা কিসের? ত্যাগের তীর্থ ভারত-ভূমিতে যে চিরকাল অভাবের ওপরে স্বভাবই জয়ী হয়ে এসেছে। মহাশক্তির অংশ মেয়েরা আজ কোথায় নেমেছে, ধীরভাবে ভেবে দেখার সময় কি আজো আসে নি? স্বামী-সন্তানের জন্য তাদের আজ কঠোর তপঃপরায়ণা না হ'লেই চলে না।

কয়েক বছর আগের শারদীয় উৎসব আর আজকের উৎসবের তফাৎটা যে কত বেশী, এ কথা মেয়েরা বিশেষ ক'রে মায়েরা ছাড়া কেই-বা আর এমন ক'রে বুঝবে? পূজার দিনের নিয়ম রক্ষার জন্য স্বামী-সন্তানের মুখে পঞ্চ ব্যঞ্জন, নানাবিধ মিষ্টান্ন তুলে দেয়ার কথা ভাবাও যে মস্ত বিড়ম্বনা, দুবেলা দুটি ভাত জোটানই তো অধিকাংশ গৃহস্থের ঘরে আজ বিলাসিতার ব্যাপার। বাঙ্গালীর অতি প্রিয় দুখানা সন্দেশ—হায় রে! এটা যে আজ নিতান্ত কল্পনার বস্তু। যদিও অতি কষ্টে সংগ্রহের কারো সাধ্য হয়, তার যা নতুন নমুনার স্বাদ। পূর্বস্মৃতি তখুনি মনে কান্নার ঢেউ তুলবে সন্দেহ নেই।

অতি সামান্য দু'খানা নারিকেলের ছাঁচ পর্যন্ত সাধ মিটিয়ে সন্তানের হাতে তুলে দিতে পারবেন না---এরকম মায়ের সংখ্যাও এদেশে বড় কম নয়। এত বড় সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হল আমাদের কোন্ অভিশাপে?

কিন্তু এও বলি, যত বড় অভিশাপ নেমে আসুক না, যেমন ক'রে হোক এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে হবে। জীবনে যত বড় সমস্যা আসুক, চরমে না ওঠা পর্যন্ত যে প্রায়শই তার মীমাংসা হয় না, এ আমরা জানি। জানি, ঝড়ের পরেই মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ দেখা যায়: সুতরাং এ দুর্যোগও কেটে যাবে, অন্তত এই আশা নিয়েই দুরূহ পথ অতিক্রম করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

প্রয়োজনের তাগিদে সমস্ত নিয়ম-নীতির পরিবর্তন আবশ্যক। নিজের দেশ, পরিবেশ ও পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনা করে আজ আমাদের প্রতিটি কাজ করা উচিত। চারিদিকের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে কেবলমাত্র যার যার নিজ স্বার্থ চিন্তা ক'রে নিজেরটুকু নিয়ে নিজের বাঁচিয়ে চলাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়।

মনে রাখা দরকার অপরের মুখে সত্যিকারের হাসি ফোটাতে পারলে তবেই নিজের মুখের হাসি অক্ষুণ্ণ অক্ষয় হয়। মায়ের মন্দিরে ভক্তির প্রদীপ জেলে দিয়ে, এসো, সকল ভাইবোন আজ এক সাথে মিলে প্রার্থনা জানাই, বিঘ্নসঙ্কুল এই বন্ধুর পথও আমরা যেন নির্দ্বিধায় হাসিমুখে অতিক্রম ক'রে যেতে পারি। সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে, যিনি সকলের মা, তাঁর স্নেহে সকলের সমান অধিকার। সেই বিশ্বজননীর পদতলে দাঁড়িয়ে, তাঁর বরাভয় লাভে সকলে যেন সমান ধন্য হতে পারি। তবেই জানবো আমাদের ভাগ্যের অন্ধকার লুপ্ত হলো, মাতৃপূজা আজ সার্থক হলো।

'শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তি হরে দেবি নারায়ণি
নমোহস্তুতে॥'

হরিদ্বার

হিন্দুর পরমতীর্থ হরিদ্বার,---আজ এর পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছি, দক্ষিণে পতিতপাবনী নীলগঙ্গা উত্তাল বেগে বয়ে চলেছে। যাঁর বন্দনা করেছে স্বর্গের দেবকুল হ'তে মনুষ্যসমাজ পর্যন্ত। রাজা ভগীরথ সগর বংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গার তপস্যা বহু যুগ ধরে করে মর্ত্যে আনতে পেরেছিলেন। ---সেই ভাগীরথী গঙ্গা। স্থানবিশেষে এর বহু নাম ও বহু গুণ।

নীল গঙ্গার দিকে চেয়ে আছি, চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় না, শত দেখেও যেন আশ মিটে না, ঈশ্বরের সৃষ্টির পূর্ণতা যেন এখানেই সব দিয়ে রেখেছেন। কি তার প্রাকৃতিক রূপ; তেমনি চারদিকে একটা সৌন্দর্যের তন্ময়তা যেন মোহময় স্বপ্নপুরী। চোখে ও মনে উপলব্ধি করে ও লেখনীর ভাষায় তা ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য। 'হরিদ্বার!' দেবদুর্লভ স্থান। পুরাণে আছে কপিল মুনি এখানেই তপস্যা করে 'হরির' দর্শন পেয়েছিলেন। তাই এর পুরাতন নাম ছিল 'কপিলা।' নীলগঙ্গা হিমালয় বেয়ে নেমে এই স্থান হ'তেই ভারতের ভূখণ্ডের দিকে দিকে প্রবাহিত হয়েছে তাই 'গঙ্গাদ্বার' নামেও একে আখ্যা দেওয়া হোত।

কবির বা মানবের কল্পনায় যে 'বৈকুণ্ঠের' উল্লেখ আছে, মনে হয় এই সেই 'বৈকুণ্ঠ'; যুগ যুগ ধরে কত মুনি, ঋষি, কত নরনারী এখানে এসেছেন। কত সাধনার 'হরিকে' লাভ করেছেন। আজও করছেন। তাই বুঝি এর আধুনিক নাম 'হরিদ্বার।' এই হরিদ্বারের শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে দেড় হাজারেরও বেশী বছর আগে পরিব্রাজক 'হুয়েন সাং' নাম দিয়েছিলেন 'মো-ইউ-লো'---অর্থাৎ মায়াপুর। মায়াপুরই বটে, এত লোক, এত আসা-যাওয়া, তবু যেন শান্ত, সৌম্য, ভাব নিয়ে নীলগঙ্গার বুকে 'হরিদ্বার' দাঁড়িয়ে আছে আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে। যেন মায়াঞ্জন মেখে।---------

স্টেশন হতে টাঙ্গা চেপে সোজা 'হর কি পৌড়ি' ঘাটের এক দোতালা ধর্মশালায় উঠলাম। গবাক্ষপথে 'হর-কি পৌড়ি'র শোভা দেখার মত। ধর্মশালার কত লোক আসছে যাচ্ছে। সবাই নীরবে যে যার কাজ করে চলেছে। কোন চৈ-

বকুলসৌরভ সেনগুপ্তা

হল্লা নেই---নীর্থভঙ্গি শান্তি ও শৃঙ্খলায় জড়ান রয়েছে, পরনিন্দা, পরচর্চাও শুনতে পাই নি, সবাই সবাইকে আপন মনে ডেকে কথা বলে। ধর্মশালায় সব জিনিষপত্র রেখে এসে আমরা নীলগঙ্গা ও ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝের চত্বরে বসে প্রাতের চায়ের পাট সেরে নিলাম। আর বসে বসে গঙ্গার উত্তালতা দেখছিলাম।

তারপর ওপার রীজ পার হয়ে নীলগঙ্গা পেছনে ফেলে, মায়াপুর ডাম দেখতে গেলাম। প্রবাদ আছে এখানেই নাকি বাণ রাজার রাজত্ব ছিল। দুর্গের ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু এখনও আছে। তবে লুপ্তপ্রায়।

'হর-কি পৌড়ি'র ঘাটে বহু মন্দির। কোথাও লক্ষ্মীনারায়ণ, কোথায়ও হনুমানজী, কোথায়ও রামসীতা, কোথাও কেদারবদ্রীর প্রতিমূর্তির ম[illegible] ---আজকের আধুনিক যুগে বৈদ্যুতি[illegible] সমারোহ সর্বত্রই চলেছে। সন্ধ্যা প্রাক্কালে পথে পথে মন্দিরে মন্দি[illegible] বৈদ্যুতিক আলো জ্বলার সাথে সা[illegible] মন্দির-প্রকোষ্ঠে তেমনি আবার তৈ[illegible] দীপ মোমের আলো জ্বলে ওঠে, ব্রহ্ম কুণ্ড ও নীলগঙ্গার উত্তাল তরঙ্গে দোদুল্যতায় সে এক মণিময় শোভা ধারণ করে; ---মন আপনা হতেই সব কিছু ভুলে ভক্তির রসে আপ্লুত হয়ে পড়ে। সংসারের সুখ, দুঃখ, হিংসা, ক্রোধ এসব যেন এখানে কারুর মনে স্থান পায় না। আলোর শিখায়, আলোর তরঙ্গে, শঙ্খ-ঘণ্টার মধুর ধ্বনিতে, ধূপ, চন্দন, তুলসী-পুষ্পের সংমিশ্রণের গন্ধে সে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হয়। তার সাথে কোথাও কোথাও মন্দিরে মন্দিরে নারী-পুরুষ একত্রে ঘুরে ঘুরে মন্দির প্রদক্ষিণ করছে। সাথে সাথে গানও করছে। সে এক মধুর স্মৃতি। যিনি মনের সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা এই সুখস্মৃতি হৃদয়ে গেঁথে নিতে পারবেন আমৃত্যু সে আনন্দ তাঁর মনে থাকবে। এই ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝে সম্রাট আকবর তার প্রিয় সেনাপতি 'মানসিংহের' মৃত্যুর পর তার আত্মার কল্যাণ কামনায় (তাঁর কোন এক হিন্দু রাজকর্মচারী দ্বারা) ব্রহ্মকুণ্ডে অস্থি বিসর্জন করান ও সেই অস্থিবিসর্জনের স্থানটিকে 'মানসিংহ-

হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে

ছত্রী' নামে এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান। শ্বেতমর্মরের এই সৌধটি ব্রহ্ম-কুণ্ডের মধ্যস্থলে মনে হয় যেন একটি শ্বেতপদ্ম।

ঘাটের দুই দিকে ছাতাওয়ালা সাময়িক বহু খাবারের দোকান। জনশ্রুতি যে, এই সব ছাতা মৃত ব্যক্তিবিশেষের আত্মার কল্যাণে গঙ্গার ঘাটে ছায়া দানার্থে দান করা হয়ে থাকে। এরই নীচে রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হতে নিজেদের বাঁচাবার জন্য ব্যবসায়ীরা খাবারের দোকান করে থাকে। দুপুরে ও সন্ধ্যার পর দেখা যায় মহান ও ধর্মপ্রাণ এবং ধনী ব্যক্তিরা দানছত্র খোলেন, সাধু-সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, কানা, খোঁড়া, এরা প্রত্যেকেই রুটি-তরকারী, বা রুটি সুজী বা গুড় পেয়ে থাকেন। শোনা যায় এককালে মাঝে মাঝে পরমান্নও (পায়েস) দান করা হত।

লোকমুখে শোনা যায় হরিদ্বারে এখন সহরে হাওয়া লেগেছে। ব্রহ্মকুণ্ড ও নীলগঙ্গার মধ্যবর্তীস্থলে বিড়লা সাহেবের বিরাট উঁচু ঘণ্টা-ঘড়ি, কিছু আগে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পোড়ামাটির-মূর্তি। নীলগঙ্গার ওপারে সরকারী ড্যাম, রুশ-ভারত মিলিত চেষ্টায় বায়োকেমিক ভেষজ ফ্যাক্টরীর গোড়া পত্তনও দেখে এসেছি। বৈজ্ঞানিক যুগে হরিদ্বারকেও বৈজ্ঞানিক ধাঁচে ফেলা হচ্ছে মনে হয়।---------

॥ দুই ॥

মায়াপুর ড্যাম দেখে নীলগঙ্গায় স্নান সারতে হ'ল, জলে হাত দিলে মনে হয় ঠাণ্ডায় জমে যাব। তখন ছিল অক্টোবরের শেষ, মনে মনে ভাবছি স্নান করবো কি করে। দেখতে পেলাম অগণিত যুবা, যুবতী, বৃদ্ধা, বৃদ্ধ, শিশু সবাই অবগাহন করছেন, আমরাও শিকলঘেরা তরঙ্গসঙ্কুল নীলগঙ্গায় শিকল ধরে নেমে অবগাহন করলাম। মনে হল দেহে যেন নূতন স্পন্দন, নূতন শক্তি দিয়ে গেল। ব্রহ্মকুণ্ড ও নীল-গঙ্গায় সিকি মাইলব্যাপী দুপাশে শিকল ঘেরা ও ২।৩ হাত অন্তর ৩।৪ হাত লম্বা লম্বা শিকল ঝুলান। ঐ সিকি পরিমাণ ঘাটলার সাথে একটু পর পর সিঁড়িঘাটের গায়ে এনামেল প্লেট মারা রয়েছে। 'জলে নামিতে সাবধান। শিকল ধরে স্নান করুন।'

এখানে আরও দুটি মজা উপভোগ করা যায়। একটি মাছের খেলা, ঘাটে ঘাটে একদল বিক্রেতা আটার গুলি বিক্রয় করে। গঙ্গায় পোষা মাছ তা খেয়ে বেড়ায়, যেখানে লোকের ভিড় সেখানেই এরা বেশী ঘোরাফেরা করে। তীর্থযাত্রীর কাছ হতে চিরাচরিত এই খাদ্য খেয়ে মাছেরাও এইটুকু বুঝেছে, ঘাটলার পারে যেখানে জনসমাগম সেখানেই খাবার মিলবে, প্রকৃতপক্ষে তাই হয়ে থাকে, মানুষে তাদের ভয় নেই। এমন কি লছমনঝোলা হতে হৃষীকেশ নৌকায় পার হতেও দেখলাম নৌকার সাথে সাথে মাছেরা দলবদ্ধভাবে পেছন পেছন চলেছে, আর যাত্রীরা সেই আটার গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে জলে ফেলছে ও ছোটবড় সবাই আনন্দ করছে----

আর এক আনন্দ সন্ধ্যার প্রাক্কাল হতে রাত্রির কতকটা সময় পর্যন্ত, 'মানস ডালা' গঙ্গায় ভাসান হয়। ছোট ছোট পাতায় তৈয়ারী ডালা, তাতে ছোট একটি প্রদীপ বা মোমবাতি এবং কিছু ফুল দিয়ে সাজান থাকে। আকারভেদে দামের তারতম্য হয়ে থাকে। সেই ডালাগুলির সাজানোর এমন পদ্ধতি যে, গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গেও সেগুলি ঢেউর তালে তালে নেচে চলে। 'মানস ডালা'র আলোটি জেলে দিয়ে মনের মানসকে গঙ্গার নিবেদন করে সেই ডালাটি ভাসিয়ে দিতে হয়, উত্তাল তরঙ্গের সাথে সাথে আলোর নৃত্য করতে করতে দূর-দূরান্তে ছুটে চলে কত শত শত 'মানস ডালা' না আলোক-মালা। যতদূর দৃষ্টি চলে---মনে হয় শত শত তারকারাজী গঙ্গাবুকে নেমে এসেছে।---

পরদিন প্রাতে চললাম 'সপ্ত-সরোবরের' দিকে, এখানে গঙ্গা সপ্তধারায় ভাগ হয়ে গেছে, প্রবাদ শোনা যায়, এখানে বসে সপ্ত ঋষি তপস্যা করে হরিদর্শন করেন। তা ছাড়া বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এখানেই দেহত্যাগ করেন।

সপ্ত সরোবর দেখে ফিরে এলাম 'ভীমগোড়ায়'। জনশ্রুতি সপ্তধারাকে মর্ত্যের পথ দেখাবার জন্য ভীম এখানে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানে একটি গভীর 'কুণ্ড' আছে, এই 'কুণ্ডে'র জলে স্নানে এক বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই কুণ্ডের প্রহরায় বা সেবায় এক বাঙ্গালী ভৈরবীকে দেখলাম। ঢাকা জেলার তিনি ছিলেন, ১৬।১৭ বছর বয়সে তিনি এখানে এসেছিলেন ও ভৈরবী হন। এখন বয়স অনুমান ৬৫।৭০ হবে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে কোন মেয়েমানুষের পক্ষে এই পর্বতগুহায় ভৈরবী হওয়া কম কথা নয়।

কঙখল হরিদ্বার হতে প্রায় ৩ মাইল মতন। বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্রে আমরা টাঙ্গায় চলেছি, মাইলখানেক গেলেই নির্জন পথের দুদিকে পুরান বাড়ী। মন্দির ভাঙ্গা ও বট-অশ্বত্থের ঝুড়িতে ছাওয়া, পড়ন্ত সূর্য তাকে আরও ঘনায়মান করে তুলেছে। এদিকটাতেই নাকি মহারাজ দক্ষপ্রজাপতি রাজত্ব করতেন। দক্ষের কন্যা সতী, তার পিতা যে দক্ষযজ্ঞ করেছিল এবং সতী যেই যজ্ঞকুণ্ডে মহাদেবের নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন,---এই সেই 'যজ্ঞ কুণ্ড'। তারই ধ্বংসাবশেষ এই কঙখল মন্দির। মজা গঙ্গার বুকে পাথরের ফাটল ধরা সোপানে সবুজ শ্যাওলা ধরে আছে, গঙ্গার জল এখানে ঘোলাটে ও স্রোতোহীন, কেউ বলে এটাই ভগীরথের আদি গঙ্গা। কেউ বলে সরকার কর্তৃক ড্যামের জন্য গঙ্গায় বাঁধ দেওয়ায় এই গঙ্গার এই অবস্থা। বৃক্ষচ্ছায়ার তপো-বনে আজও দক্ষরাজের দুর্গপ্রাকারে ভগ্নাবশেষ রয়েছে। এ ছাড়া আরও দর্শনীয় স্থান---এ সব অত অল্প সময়ে আমাদের দেখবার ভাগ্য বা সময় হয়ে ওঠে নি। যেমন ধর 'মনসাদেবীর মন্দির', সত্যনারায়ণ মন্দির, অনেক ছোট ছোট গুরুকুল, জ্বালাপুর আরও দেবস্থান।

তৃতীয় দিবসে বাসে করে ১৪

মাইল দূরে হৃষীকেশের দিকে চললাম। সেখান হতে 'লছমনঝোলা' ৩ মাইল। পাহাড়ের গা ঘেঁসে বাস চলেছে, একটু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। নীচে গভীর খাদ। একদিকে পাহাড় আর একদিকে গভীর খাদ, এরই মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথে বাস যাতায়াত করে।

অজানার সন্ধানে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও দেবত্বের মোহে মানুষ এই গিরিসঙ্কটেও ছুটে চলে। সেই খাদের মধ্যে গঙ্গার ধারা উত্তাল বেগে ছুটে চলেছে, জল বলে মনে হয় না, মনে হয় কতকগুলি সাদা ফেনা। খাদের অপর পারে সবুজ ঘন বনে আবৃত সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী, সেই পাহাড়ের বুক চিরে কত যে ঝর্ণা গঙ্গায় এসে পড়েছে, তার হিসেব নেই। ১৪ মাইল বাসে এসে হৃষীকেশে নামলাম আজ আর হৃষীকেশের সেই সৌম্য, শান্ত ভাবগম্ভীর অবস্থা নেই। এখানে এখন পাঞ্জাবী ও সিন্ধিদের একচেটিয়া ব্যবসা-কেন্দ্র হয়ে গেছে।

এখান হতেই তীর্থযাত্রীরা লছমন-ঝোলা হ'য়ে কেদারবদ্রীর পথে রওনা হন।

হৃষীকেশ হতে হেঁটে এক-দেড় মাইল পথ ঝুলা সেতুর উপর দিয়ে লছমনঝোলায় যেতে হয়। এখানেও যাত্রিনিবাস আছে। 'গীতা ভবন' এটি একটি দেখবার মতন। এরই দেড়শ ফুট নীচে গঙ্গা বয়ে চলেছে, দুই ধারে সবুজ বনে ঘেরা পাহাড়, কিন্তু মনে হয় নীল আকাশের সব নীলের ঘনত্ব যেন এখানে এসেই জমেছে, আর সেই নীলগঙ্গা---যাকে দেখেও চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না, এখানেও সেই মাছ। স্থানে স্থানে ঘাট বাঁধান, পাহাড়ের গায়ে গায়ে দোকানপাট, রেস্তোঁরা। গঙ্গার উপর পাহাড়ের গায়ে একটি রেস্তোরাঁর দোতলায় বসে মধ্যাহ্নের আহার কর-ছিলাম।---আর যেতে যেতে গঙ্গার ঝর্ ঝর্ সর্ সর্ শব্দে উত্তাল তরঙ্গ-মালাকে ছুটে যেতে দেখছিলাম।

মনে হল মনও কেন এমনি ও লছমনঝোলা আর হরিদ্বারের মন্দিরে মন্দিরে চিরদিন ছুটে বেড়ায় না।— কিন্তু কোথায়, আমরা গৃহী, গৃহের পিছুটানেই যে বড় হয়ে আছে, পরদিন প্রাতে আবার পাঁচ দিনের মোহময়, প্রাণময়, নয়নাভিরাম 'হরিদ্বারকে' পেছনে ফেলে গৃহের দিকে যাত্রা শুরু হল---অন্তরের পরম শ্রদ্ধা দিয়ে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বলে আসলাম, 'হে আমার পতিতপাবনি নীলগঙ্গা, হে আমার হরিভক্তির হরিদ্বার---যেন এ জীবনে আবারও তোমায় দেখবার, উপলব্ধি করবার আমার সৌভাগ্য হয়।' ট্রেন ছাড়ার সাথে সাথে মনেও যেন একটি শূন্যতা নিয়ে ফিরলাম এবং বেশ কিছুদিন মনের মাঝে হরিদ্বারের চিরশোভা, চিরআনন্দ জেগে রইল--

রচনাটির সহিত মুদ্রিত আলোক-চিত্রটি পার্থসারথি সেনগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

শিল্পী-প্রদীপা চক্রবর্তী

বুদ্বুদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)
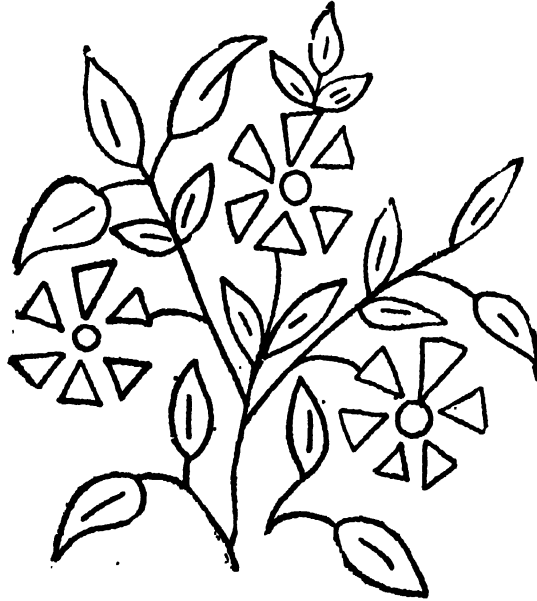
সরমা জানে না, ছবিদি কোনও ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলো কি না। কিন্তু সরমার সেই কান্না, তার মনজুড়ে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। সরমার বলতে ইচ্ছে করত---মণ্টুদা, বিশ্বাস কর তোমাকে আমি ভালবাসতে চাই নি। বিয়ে করতে চাই নি। কিন্তু তোমার মৃত্যুও আমি চাই নি।'

শেষ পর্যন্ত সরমার কাছে যৌবনের চেয়ে জীবনই বড় রয়ে গেছে। কিন্তু সরমা কি তার যৌবনের চেতনা নিয়ে জেগে ওঠে নি? আশ্চর্য যতদিন মণ্টুদা, একটা রক্তমাংসের উপস্থিতি নিয়ে কামনা করেছিল ততদিন সরমার কুমারী মনের ঘুম ভাঙল না। আর মৃত্যুর উপহাসের কঠিন ধাক্কায় সেই যে সরমা জাগল---তার সেই জাগরণ; সেই যৌবনকে অনুভব করবার চেতনাই মণ্টুদাকে বুঝতে শেখাল। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সরমাকে পরিণত করেছিল, মণ্টুদা বেঁচে থেকে সরমার যে মনকে অধিকার করতে পারে নি, তার আকস্মিক মৃত্যু সরমার সেই মনকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে নতুন করে গড়ে দিয়েছিলো। সারা জীবন কুমারী থেকে থেকে সরমা তার সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অপরাধবোধের স্খালন করতে চেয়েছে, কিন্তু ভালোবাসা বলতে ঠিক কি বোঝায়, সে কথা আর জানা হয় নি সরমার।

কিন্তু আজ এই আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস বয়ে আনা নরম সন্ধ্যায় শ্রীময়ীকে আবিষ্কার করে, মণ্টুদার স্মৃতিতে আপ্লুত হতে হবে সরমা যেন অনুভব করল---মাঝে মাঝে যখন খুব বেশী ভাবে অনুভূত হয় যে, শরীরটা রক্তমাংসে গড়া, আনমনে পথ চলতে চলতে হঠাৎ একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া সর্বাঙ্গে বুলিয়ে যায়, মাথার ওপর চাঁদ ওঠে, আকাশ তুলো তুলো মেঘে ভরে যায়, সারাদিনে শরীরের সবটুকু এনার্জি খুইয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে, সেই আলো-হাওয়ার পথে ভেসে বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হয়।

কখনো কখনো অবান্তর ভাবেই মনে হয় সরমার জীবনের কোনদিকটা যেন শূন্য রয়ে গেল, কি জানি, যদি কোনও পুরুষ বুকে মাথা রেখে, অথবা, সেই বুকেই মুখ ডুবিয়ে হু হু করে কেঁদে ওঠা যেত, হয়ত, অনেক বিষণ্ণতা, অনেক পুরোণো গ্লানি, পুরোনো অপরাধবোধের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। তখন বুকের গভীরে সেই আলোর মত উজ্জ্বল হাওয়ার মত ফুরফুরে কোনও আশ্চর্য

ভবানী ঘোষ

অনুভূতিকে অনুভব করে সে, যে, অনুভব আরও বিষণ্ণ করে তোলে তাকে, আর যে বিষণ্ণতাকে একমাত্র হৈমন্তী বিকেলের সঙ্গেই উপমা দেওয়া চলে।

আজ এতদিন পর সেই অনুভূতিকেই ভালবাসা সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছে হল সরমার। কিন্তু ভালবাসা অনুভূতিকে তো একা একা সজীব রাখা চলে না। তা হয় না। ভালবাসাকে অবয়ব দিতে হলে, তার পাত্র চাই। আর এই নবতর উপলব্ধি এক আশ্চর্য জেদী মনোভাবের সঙ্গে তাকে ভাবাল---যদি শ্রীময়ী তার জীবনে সেই আশ্চর্য অনুভবের সন্ধান পেয়ে থাকে, তবে সে কেন তাকে জীবন দেবে না। শুধুমাত্র আগে জন্মানোর দাবীতে কি অধিকার আছে শ্রীময়ীর গুরুজনদের এই সব দুর্লভ মূল্যবান দামী জিনিষ নিয়ে খেলা করবার, ভালোবাসা যদি অমূল্য সম্পদ হয়, তবে তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা পৃথিবীর গর্হিততম অপরাধ।

আকাশের মেঘ তখন সরমাদের এই পরিবারের মতই গভীর ও থমথমে হয়েছিল। সরমার ইচ্ছে হল, বৃষ্টি হ'য়ে এই মেঘকে ভাসিয়ে দিতে। পৃথিবীকে শান্ত করে, মেঘের ভারকে হালকা করে দেয়। জানালার পর্দাগুলো টেনে দিতে দিতে সে ঠিক করল---শ্রীময়ীর পাশে দাঁড়াবে, ওর খোলাচুলের ওপর দিয়ে বিলি কেটে কেটে কপালে মুখে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করবে---শ্রীময়ী তোর কোনও ভাবনা নেই। আমি তোর পাশে আছি। বল আমাকে কে, কে সে ছেলে।

এমনি সময় ঘরে ঢুকল মালতী। সরমার সঙ্গে কোনও কথা বলবার আগেই, চেপে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজাটা। মালতীর চোখে চাপা কান্নার আভাস, সরমা এগিয়ে গেল---

---মন খারাপ করে আছিস কেন? শ্রীময়ী যদি চায়---

সরমার কথা মাঝপথেই থামিয়ে দিল মালতী। বলল---দিদি তুমিই ত বড় করেছো শ্রীময়ীকে। বেশ বল, পারবে কমলের মত ছেলের হাতে ওকে তুলে দিতে।

---কমল? চমকে উঠলেন সরমা মনে হলো তাঁর সমস্ত কোমল অনুভূতির ওপর কে যেন তীব্রভাবে মস্ত এক হাতুড়ীর আঘাত হানল।

সঙ্গে সঙ্গে জানালার কপাট দুটো ঠাস্ ঠাস্ শব্দ করে উঠল। সরমা চট্‌পট চলে গেল জানালায় ছিট্‌কিনি তুলতে। দেখল আকাশটা যেন কালো শকুনের ডানা হ'য়ে ঝাপটা দিল পৃথিবীর বুকে। সংঘর্ষ সুরু হ'য়ে গেল আকাশে আর মাটিতে---শোঁ শোঁ, শোঁ শব্দ উঠল। সে কি মাতামাতি, বাতাসের প্রচণ্ড বেগে গাছগুলো সব কাঁপছে, দুলছে বেঁকছে, যেন সশঙ্ক আশ্রয় প্রার্থনা করছে পরস্পর পরস্পরের কাছে।

বাতাসের বেগে আবর্তিত হতে হতে অনেকগুলো শুকনো পাতা ফর্‌র্ ফর্‌র্ করে উড়ে গেলো। মনে হল ঝড়ের দৈত্য বুঝি শুষে নেবে সবটুকু জলকণা, জানালা বন্ধ করে ফিরে এল সরমা। মালতীর কান্নাফোলা মুখের দিকে

তাকেরে প্রশ্ন করল—তুই কি বলছিস মালতী? কমল?

সরমা ভাবতে পারল না একটা লোফার ছেলে। রকক্লাবে আড্ডা মারে। টেরি বানিয়ে, হিরো হিরো ভাবে ঘুরে বেড়ায়। মাকাল ফল। শ্রীময়ীর সমবয়সীই হবে। শ্মশান-বন্ধু হওয়া ছাড়া আর কোন কাজ আছে নাকি ওর? সরমা জানে না, সরমা শুধু এটুকুই জানে কমল হচ্ছে তেমন ছেলে, যাদের নাম সংসারে জমা খরচের খাতায় খরচের ভাগে লেখা হ'য়ে থাকে। ডাক্তারবাবু মানে কমলের বাবাই না কয়েক দিন আগে গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন সরমার কাছে—'বুঝেছেন, ছেলেটা আমার আর মানুষ হল না। তবে ও সব নিয়ে আমি আর ভাবি না। আমাকে ও সব স্পর্শ করে না কি করব বলুন, জীবনের ফিফটি পার্সেন্ট ত বাদ দিয়েই রাখতে হয়।' —সেই কমল— আর ভাবতে পারলো না সরমা।

মালতী বলল—হ্যাঁ, আমি বেশ কিছু দিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা, তা ছাড়া কমলের সঙ্গে ওকে আমি তিনচারদিন দেখেওছি বাস থেকে। ভয়ে কিছু বলিনি। যদি উল্টোচাপে পড়ে জেদ বেড়ে যায়, তাই আজকেও ওর কাছে ছেলের নাম জানতে চাইনি। এখন তাও ভয় পাচ্ছে আমরা জানি না ভেবে, হয়ত নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু একবার নামটা জেনে গেলে ত মেনেই নিতে হবে।

দোরে আঘাত পড়ল। মালতী খিল খুলে দিল। তরু ঢুকল। ঝরে যাওয়া পাতায় যেমন এক রকম খস্‌খসে ভাব ফোটে এমনি স্বরে সরমা বলল—সব শুনেছিস? তরু মাথা নাড়ল।

—কি উপায়?—সরমাকে অবসন্ন দেখাল।

তরু অন্যমনস্কের মত, যেন বাইরে ঝড়ের শব্দে, হাওয়ার শব্দে কান পেতে কিছু শুনতে শুনতে বলল—কিন্তু কমলের সঙ্গে কি করে হতে পারে? এতো এ্যাবসার্ড।

সরমার চোখের কাছে শ্রীময়ীর চেহারাটা ভাসতে লাগল, দীর্ঘ, ছিপ-ছিপে, কোমল ত্বক, মসৃন কণ্ঠস্বর আর নরম চোখের শ্রীময়ীকে, নাচের সময় শ্রীময়ীকে দেখলে মনে হয় যেন হালকা পাতা, হাওয়ায় দুলছে। শ্রীময়ীর চেহারায় কোথাও আতিশয্য নেই। কিন্তু পাতলা স্বাস্থ্য জুড়ে ছড়ান আছে অপরূপ কমনীয়তা। শ্রীময়ীকে কি মর্যাদা দেবে কমল? কি মূল্য দিতে পারবে সে, যে ছেলে নিজেকেই মূল্য দিতে পারে নি? ভাবতে ভাবতে মালতীর দিকে তাকাল মালতীই যে শ্রীময়ীর মা, এই জানাটা যেন অনেক বেশী প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠল।

মালতী বলল—'দিদি শ্রীময়ীকে এখন কোনও রকম প্রশ্ন করা উচিত হবে না। আমি ওকে ডাকছি।

রতন চলে গিয়েছিল তাস খেলতে, মালতী ডেকে পাঠানোতে গৌতম ঘরে এল। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল ওরা, বাইরে তখন ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি নেবেছে। বড় বড় ফোঁটায় ফোঁটায়। দেখলে মনে হবে যেন কালোজামে ভরা গাছে কেউ হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়েছে আর ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ছে সেই ফল অসংখ্য, অজস্র অবিরাম। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। জল আর হাওয়ায় মাতামাতি হচ্ছে। তারা জানালা খুলে দিল সব। পর্দাগুলো হাওয়ায় উড়তে সুরু করে দিল। ঘরের মধ্যে হাওয়া বন্দী হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। তবুও মনে হচ্ছে যেন একটা চাপা অস্বস্তি অথচ বোবা কান্না ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৌতমের মুখের ওপর বিরক্তি এবং ধৈর্যহীনতার লক্ষণ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে চশমার আড়ালে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

—সব শুনেছিস?—সরমা গৌতমের চোখে চোখ রাখলো।

—শ্রীময়ীর কথা?—একটি দামী চুরুটে লম্বা টান দিল গৌতম।

—হ্যাঁ।

—এতে আশ্চর্যের কি আছে। আদর দিয়ে দিয়ে তোমরাই ওর মাথা খেয়েছো। জানতাম যে এ রকমই কিছু হবে একটা।

গৌতমকে এক মস্ত বিচারকের মত দেখাল। অপরাধী সাব্যস্ত করে ওদের তিনজনের দিকে নিষ্করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গৌতম। সরমার মনে পড়ে গেল—সরমাদের বাড়ীতেই সরস্বতী পুজোর দিন কমল আর শ্রীময়ীকে একই সঙ্গে হাতেখড়ি দেওয়া হয়েছিলো। ছোটবেলাতে সরমার কাছেই একত্রে ছড়া শিখত ওরা।

মনে পড় গেল, সেই ছোটবেলাতেই কমল তার ছোট্ট দুই হাত বিস্তৃত করে

শ্রীময়ীকে বলত---তোকে আমি এতখানি ভালবাসি।

শুনে হাসত সরমা আর মালতী। কিন্তু সে ত' অনেক আগের কথা। সরমার মনে হল তাকে যেন কেউ কাঠগড়ার সীমানায় ঝুপ করে নাবিয়ে দিল। সরমা ভাবল, তবে কি আমাদের সেই তখন থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল?

মালতী গৌতমের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ---বাজে কথা বোলো না। তুমি আগে বুঝেছিলে?

---না বোঝবার কি আছে, বিরক্ত উদাসীনতার সঙ্গে চুরুটে আরও একটি লম্বা টান দিল গৌতম।

---যদি বুঝেই থাক, তবে আগেই বল নি কেন? কেন বল নি আগে মালতীকে অদ্ভুত লাগছিল সরমার। মালতী এত বেশী ক্ষুব্ধ যে, উত্তেজনায় ও নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইছে।

তরু পেছন থেকে পিঠে হাত রাখল মালতীর---এই দিদি, থামো এখন কি ঝগড়া করবার সময়।

আর সরমা বলে উঠল---কে দোষী সে বিচার পরে হবে। এখন বল, কি করা যাবে।

গৌতম বিষাক্ত হেসে বলল---কেন বিয়ে করতে বল মেয়েকে, ছেড়ে দাও। দেখে আসুক একটু পৃথিবী কি, বুঝুক যে কাব্য করে জীবন চলে না।

সরমা ধীর গলায় বলল,---রাগ করিস কেন? কে চেয়েছে যে শ্রীময়ী এ রকম ভুল করুক?

মালতী অসহিষ্ণু হয়েই ছিল। তরু চুপচাপ। মালতী ছটফট করে বলল---'মিছিমিছি বাজে কথা বাড়ছে। 'এ্যাট এনি কস্ট' ওদের মেলামেশাটা বন্ধ করতে হবে।

গৌতম ওর মুখ থেকে চুরুটটা নাবিয়ে, প্রশ্ন করল---কি রকম?

মালতী সবাইকে বুঝিয়ে বলতে লাগল---শ্রীময়ী এখনও ছোট। আঠারো-উনিশ বছরের কোনও মেয়ে নিজের ভালোমন্দ কতটুক বোঝে?

গৌতম এবার পুরুষোচিত আদেশের স্বরে বলে উঠল---বেশ, আগে মেলা-মেশাটা বন্ধ কর, সব বন্ধ, কলেজ, নাচের ক্লাশ, সব ছাড়িয়ে দাও, বাড়ীতে বন্দী থাকুক সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

---না, না তাতে ঠিক হবে না। সারাদিন আমরা কেউই বাড়ী থাকি না। পাশাপাশি বাড়ী, লুকিয়ে হলেও দেখা করবে। কে ওর প্রতি নজর রাখবে? ---মালতী বলল।

---আচ্ছা, ওকে যদি জোর করে একটা বিয়ে দিয়ে ফেলা যায়, ভাল বর পেলে, ও কি কমলকে ভুলবে না? কি আছে কমলের?---সরমা বলল।

এতক্ষণ পর কথা বলল---তরু। নরমকণ্ঠে উত্তর করল---না, না, সেটা ঠিক হবে না।

গৌতম বলল---ওই ভাল। বাড়ী কিছুদিন বন্দী থাক। তারপর সবাই মিলে বুঝিয়ে বলা হবে।

গৌতমের চোখের দিকে তাকিয়ে নিরুপায়ের মত মালতী বলে উঠল---না, না, তাতে কিছু লাভ হবে না, তোমরা জান না। শ্রীময়ীর একটি অসম্পূর্ণ চিঠি পেয়েছি। তাতে পালিয়ে যাবার কথা পর্যন্ত লেখা আছে। শেষে পালিয়ে-টালিয়ে গিয়ে না খেয়ে মরবে।

সরমা কিছুই আর ভাবতে পারছিল না। ভয়ানক অবসন্ন লাগছিল তার। মনে হচ্ছিল অপরিসীম শ্রান্তি তাকে যেন ছেয়ে ছেয়ে গেছে।

মালতী আবার মুখ খুলল---বলল---আমার মনে হয়, ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। দূরে কোথাও। বুঝতে দেওয়া হবে না যে, অন্য কোথাও ওকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

---কোথায় পাঠাবে?

---মায়ের কাছে শিলং চলে যাক। ওখানে বৌদি আছে। বৌদিকে আগে চিঠি লিখে দিলেই হবে। মৌকেও এখন পাঠিয়ে দিই পরে ফিরিয়ে আনলেই হবে।

মালতীর সমাধান সকলেই আন্ত-রিকভাবে গ্রহণ করল কি না বোঝা গেল না। তবে প্রতিবাদ করল না কেউ। গৌতম তার বর্মাচুরুটে শেষ টান দিতে দিতে বলল ---আশ্চর্য সেদিন জন্মাল শ্রীময়ীটা। আর এর মধ্যেই ও কিনা প্রেম করতে শিখে গেল। ও যে এতটা বড় হ'য়ে গেছে, আমি ত' বুঝতেই পারি নি। মোমবাতির শিখা যখন হাওয়া পেলে, দেওয়াল কাঁপা কাঁপা ছায়ার সৃষ্টি করে, গৌতমের কথায়, শ্রীময়ীর জন্মলগ্নের সময়টা তেমনি স্মৃতির শিখা হ'য়ে ওদের মনের মাঝে কেঁপে কেঁপে ছায়া বানাল।

শেষ পর্যন্ত এ কথাই ঠিক রইল। মৌ ও শ্রীময়ীকে শিলং পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কালই প্লেনের টিকিট কাটবার ব্যবস্থা হবে যত শীঘ্র পাওয়া যায়। খেতে বসে রাতেই হঠাৎ কথাটা বলে বলল গৌতম। সবাই খাচ্ছিল, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছিল না।

গৌতম রতনকে উদ্দেশ্যে করে বলল---আমি ভাবছি শ্রীময়ী আর মৌ শিলং গিয়ে ঘুরে আসুক কিছুদিন। শ্রীর দিদিমার শরীরটা ভালো নয়। একটু দেখে আসা উচিত। কিরে তোরা কি বলিস?

মৌ হাসিমুখে সম্মতি জানাল। শ্রীময়ী কোনও কথা না বলে, খেতে লাগল। ওর নিশ্চুপ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে গৌতম বলল---শ্রীময়ী, আজ রাতেই একটি লিস্ট বানিয়ে ফেলিস, কি কি লাগবে তোদের।

শ্রীময়ী কোনও উত্তর করল না। সরমা লক্ষ্য করল শ্রীময়ীর কালো চোখে সজলতার মায়া ঘনাচ্ছে। তবুও ওর চোখে ওই কিসের তেজ এত আলো হয়ে জলছে?

গৌতম আর রতন টেবিল ছেড়ে চলে যাবার পরই শ্রীময়ী সোজা চোখে মালতীর দিকে তাকিয়ে বলল---আমি যাব না, আমি শিলং যাব না।

শ্রীময়ী তখন বেসিনে হাত ধুচ্ছিল। শ্রীময়ীর অবাধ্যতায় সরমা বুঝতে পারছিল, তার নিজের মুখের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। কি এক সর্বনাশা ভয়ে, নীল হয়ে যাচ্ছে ওর বুকটা। শ্রীময়ী বলে গেল---আমি সব

বুঝতে পারছি, তোমরা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে। বলতে বলতে দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল শ্রীময়ী। ওর দুই আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে জল নেমে এল।

---শোন, শোন্---সরমা বলে উঠতেই---তেমনি দুই হাতে মুখটাকে কান্নাবিকৃত স্বরে বলতে থাকল শ্রীময়ী---পারবে না পারবে না তোমরা, আমি কি বাচ্চা মেয়ে নাকি, আমার সঙ্গে জোর করতে পারবে না।

হয়ত চলেই যাচ্ছিল শ্রীময়ী, আচমকা মালতী তীব্র চোখে তাকিয়ে শ্রীময়ীর মুখ থেকে হাতের ঢাকা খুলে নিল, তারপর গালে চটাস্ করে একটি চড় দিয়ে বসল।

সরলা আর্তনাদ করে উঠল---মালতী কি হ'চ্ছে।

কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে, মালতী কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল অসভ্য মেয়ে কোথাকার। এইজন্য তোমাকে এত কষ্ট করে বড় করেছি। লেখাপড়া শিখিয়েছি, গান-বাজনা শেখাচ্ছি। কি হবে, কি হবে, তোমাকে এত সব করে, সব কিছু বন্ধ করে দেব তোমার। চল তুমি।

আতঙ্কিত, বিব্রত বিস্মিত শ্রীময়ীকে আর কোনও কথা বলবার সুযোগমাত্র না দিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল মালতী; দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। এ ঘর থেকে ছিট্‌কিনির আওয়াজ পাওয়া গেল।

---মৌ তুমি পড়তে যাও। হতচকিত মৌকে আদেশ দিল তরু।

মৌ চলে গেল। আশ্চর্য এক থমথমে আবহাওয়ার মুখোমুখি বসে রইল সরমা ও তরু। মালতী ফিরে এল। উত্তেজনায় তখনও সর্বাঙ্গ কাঁপছিল মালতীর, আমি জানতাম, আমি জানতাম এরকম হবে,---আমি যেদিন এই চিঠি পড়েছি সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, টেবিলের ওপর মুখ নাবিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মালতী। বহুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে, একসময় নিজের ঘরে ফিরে এল সরমা।

আজকেই সন্ধ্যায় ভালোবাসার প্রতি যে কোমলতা মুঠো মুঠো কুয়াশার মত সরমার সমস্ত মনে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা এতক্ষণে বিলীন হ'য়ে গেছে। সরমা ভেবে পেল না কি আছে কমলের? কি দিয়ে ভোলাল শ্রীময়ীকে?

---আমি কি বাচ্চা মেয়ে নাকি? শ্রীময়ীর শেষ প্রশ্নটা সরমার শ্রবণে যেন বেজেই চলল। এত জোর কোথায় পেল শ্রীময়ী? যে ছেলের নিজের পায়ের তলায় মাটি নেই, তাকে ভালবেসে---শ্রীময়ী যখন কাঁদছিলো ওকে দেখাচ্ছিলো যেন এক নরম কবুতরের মত। তবুও ওর চোখে কিসের তেজ ঝ'রছিলো অত আলোয় হ'য়ে? আজ এই মুহূর্তে চরমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, শ্রীময়ী আর আমাদের নেই। সরমা ভাবলো, ওর উনিশটা বছর আমাদের হাত থেকে ওর ভালোমন্দ; ন্যায়, অন্যায় বোধের চাবিকাঠি যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। সরমা জানে শ্রীময়ী আর কোনও দিনও ওদের হ'য়ে ফিরে আসতে পারবে না। যতই ওকে কমলের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে, ততই শ্রীময়ী সরে যাবে তার এই একান্ত ভালোবাসার কাছ থেকেও।

শ্রীময়ী যদি সত্যিই পালিয়ে যেতে চায় কমলের সঙ্গে? কোথায় ওকে নিয়ে তুলবে কমল? ওর নিজের জগৎ ত' ওই রকক্লাব। অবশ্য বাড়ী একটি আছে---ডাক্তারবাবুর। সরমার চতুর্দিকে যেন এক নিরবয়ব শূন্যতা কাঁপতে লাগল---ভালবাসা যে দস্যু তা কি সরমা জানে না। যদি দস্যু হয়েই আকর্ষণ করে শ্রীময়ীকে ওরা তাকে কি দিয়ে রাখবে? নাকি কাফ্‌লাভ? বাছুরে প্রেম? শিলং থেকে ঘুরে এলেই ভুলে যাবে সব।

না:, শ্রীময়ীর পাশে আর দাঁড়ান হল না সরমার, জোর গলায় প্রমাণ করা গেল না---ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা পৃথিবীর গর্হিততম অপরাধ। কেমন করে দাঁড়াবে শ্রীময়ীর পাশে। রঙিন বুদ্বুদ তৈয়ারী করেছে শ্রীময়ী। বুদ্বুদ রঙিন হতে পারে, কিন্তু একদিন সেত ফাটবেই। শ্রীময়ী ছোট হতে পারে কিন্তু সরমা ত' আর ছোট নয়। শ্রীময়ী যা জানে না, সরমা ত তা জানে। শ্রীময়ীর ব্যথা সরমাকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিলেও সরমা একথা জানে---যে শুধুমাত্র ভালোবাসার বুদ্বুদ দিয়ে জীবনকে বাধা যায় না। অথচ সরমা কি পারত না, শ্রীময়ীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করতে---যদি অন্য কাউকে, কমলের মত, অপদার্থ নয়, আর কাউকে ভালবাসত শ্রীময়ী ?...

॥ সমাপ্ত ॥

শুনতে পাই

সীমা দত্তচৌধুরী

শুনতে পাই জীবিতের মত
মৃতেরও একটা পৃথিবী আছে।
সেখানে জীবিতের প্রবেশ নিষেধ
তাদের নেই কোন বাধা নিষেধ গন্ডী
নেই কোন নিয়ম কানুন
নেই কোন জল্পনা, কল্পনা, পরিকল্পনা।

নেই কোন রাজায় রাজায় বা হাল আমলের
মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে লড়াই — গদী নিয়ে।
গলা ফাটিয়ে কেউ দেয় না স্লোগান,
কনভার্সিং-এ বের হয় না ছেলে বুড়োর দল,
প্যারোডিও হয় না গাথা
তা নিয়ে নেই কারো মাথা ব্যথা।
সবাই স্বাধীন — মুক্ত বিহঙ্গের মত।

অন্য ঠিকানায়

বারি দেবী

আমাদের ট্রেনের বার্থ রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। প্রথমে আমরা যাবো ওয়ালটেয়ার। সেখানে 'মেরিনা হোটেলে' থেকে বিমূনীপত্তনম্-এ সমুদ্রের ধারে ছোট বাড়ী একটা ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করা হবে।

পাওয়ার সায়েব জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে করতে বললো,---তিন দিন তো আর বোস সায়েবের পাত্তা মেলে নি, আর তিনটে দিন কোনরকমে কাটিয়ে এমন জায়গায় তুমি চলে যাবে সিস্টার যে, কোন দুষমন শয়তান আর তোমার পাত্তা পাবে না। সারা ভারত তো ঘুরেছি, কিন্তু এমন নির্জন নিরাপদ সুন্দর জায়গা আর দেখি নি। তবে খুব হুঁসিয়ার থেক সিস্টার, যাবার ব্যাপারটা, বোসসায়েব কোনরকমে যেন জানতে না পারেন। এখানে থাকবে মঙ্গল সিং, ভারি বিশ্বাসী লোক, ওর কাছ থেকেও তোমার ঠিকানা আদায় করা সম্ভব হবে না। ট্রেনের বার্থ রিজার্ভ করিয়েছি অন্য নামে, সেজন্য সেখান থেকেও খবর কিছু মিলবে না। সব দিক বেঁধে কাজ তো করছি সিস্টার, তবে সবার ওপরে ঈশ্বরই আমাদের শ্রেষ্ঠ ভরসা। তুমি তাঁকে দিন রাত মনে প্রাণে স্মরণ কোরো সিস্টার।

সেই দিনই বিকেলে বোসসায়েব এলো। লক্ষ্য করলাম যে, অন্যদিনের মত ড্রিংক করে বেতাল অবস্থায় আজ আসে নি। মাতাল বিশু বোসকে তবু সহ্য হয়, কিন্তু যখন ও আসে সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে তখন ওকে যেন আরো ভয়াবহ বলে মনে হয়।

চা খেতে খেতে, নানা কথার বেসাতি সাজিয়ে গল্প জমাবার চেষ্টা করলো সে।

---টেলিফোনটা কেন বাতিল করলে সোনা? কাজের চাপে আসতে না পারলে ফোনে কথা বলেও তো শান্তি পাই। ভেতরের লোক আমার হাতে আছে বল তো চেষ্টা করি ফোন নেবার।

---বেশতো চেষ্টা করো, জবাব দিলাম আমি। সমস্ত ভয় সঙ্কোচ ঘৃণাকে মনের সিন্দুকে চাবি দিয়ে রেখে এখন যে নিখুঁত অভিনয় করতে হবে আমাকে, যা দিয়ে আমার ওর প্রতি সকল বিরাগ ঢাকা পড়ে। ওর মনে যেন আমার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগে। নির্বিঘ্নে আর তিনটে দিন কাটিয়ে যেন আমি পালাতে পারি।

---ঠিক আছে। কালই আমি লাগবো, তোমার ফোনের জন্যে। এখন তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী পরামর্শ করতে চাইছি সোনা।

নড়ে চড়ে বসলো বিশু বোস। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো---আমাদের ব্যবসার কথা বলছি। এখন তো সব ভাগাভাগি হয়ে গেছে; বাবাও কিছুকাল বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন, সেজন্য সব কিছু ঝামেলা পড়েছে আমার মাথায়। এখন বেশ ভালোভাবে মালপত্তর তৈরী করে ব্যবসাটাকে দাঁড় করাতে গেলে, কয়েক লাখ টাকার দরকার, কিন্তু কাঁচা টাকা তো আমার নেই। সেজন্য একজন ভালো পার্টনার খুঁজছি। অনেক ভেবে দেখলাম যে, বাইরের লোককে না নিয়ে তোমাকে যদি বলি আমার পার্টনার হতে, তুমি রাজী হবে তো সোনা? তুমি আমার পরমপ্রিয় আপন জন, যেমন খাটবো নিজের জন্যে তেমনি তোমার জন্যেও। লোহার ব্যবসা জানো তো, ওতে টাকা ঢাললে, তার বিশ গুণ ফেরৎ আসবে, সে টাকা তুমি পেলে আমার প্রাণে সইবে। আর ব্যাঙ্কে টাকাগুলোকে বসিয়ে রেখে বা লাভ কি বলো? বরং ব্যবসাতে খাটালে কত বেশী লাভ করতে পারবে। এখন তোমার কি ইচ্ছে বলো। অবশ্য এখুনি কিছু বলতে বলছি না, দুচার দিন ভেবে দেখো আমার কথাটা, মনে হয় তুমি বুঝবে কারণ রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী, এই তো তুমি।

আমার গালে একটা আদরের টোকা দিয়ে হাসলো বিশু বোস।

বুকের ধকধকানিটা দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। কি জবাব দেব? পাওয়ার সায়েব কই?

বিশু বোসের শিকারী বেড়ালের মত দুটো জলজলে চোখ স্থির হয়ে আছে আমার মুখের ওপর। আমাকে নীরব দেখে, ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হেসে বলল সে---অত ভাববার কি আছে? যা বললাম, ও সম্বন্ধে পরে ভেবেচিন্তে যা হয় কোরো, তবে এখুনি হাজার তিনেকের মত দিতে পারবে তো? ওটাই আজ বড্ড দরকার সোনা।

---হ্যাঁ। ওটা আজ দিতে পারবো। অতি কষ্টে জবাব দিয়ে তিন হাজার টাকার চেক লিখে ওর হাতে দিলাম আমার মুক্তিপণ।

চেকটা পকেটে রেখে বিশু বোস আমার কাছ ঘেঁসে বসলো। তারপর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো---শরীরটা তোমার যেন দিন দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে। ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার সোনা,---বলো তো আমি কাল নিয়ে আসি। বড্ড যে ভাবনা হয় তোমার জন্যে। কাছে থাকতেও পারি না,---কি যে করি।

আমি আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে বসে বললাম---না, না ডাক্তারের দরকার নেই---খুব ভালো ডাক্তারের হাতেই চিকিৎসা চলছে আমার।

বড় অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করছে মনটা। বিশু বোসের লালসাভরা দৃষ্টি নামা-ওঠা করছে আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে। কি করবো? পালাবো নাকি? না, পালাতে হলো না,---আমাদের দুজনের জন্যে কফি নিয়ে এলো পাওয়ার সায়েব।

আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে জানালাম পাওয়ারকে---তুমি আমায় বাঁচালে সায়েব।

আমার দিকে চেয়ে টেবিলে কফি রেখে বললো পাওয়ার সায়েব---তোমার খেয়াল আছে তো সিস্টার। আজ সন্ধ্যে বেলায় তোমার ব্যাণ্ডেলে সিস্টার অ্যারোমার বাড়ী যাবার কথা? তিনি তো তোমাকে দু'চার দিন থাকার কথাও বলেছেন, যদি থাকতে চাও তবে সেইমত গুছিয়ে দিতে হবে তো? সন্ধ্যে হয়ে এলো দেরী আর করা চলে না।

---সিস্টার অ্যারোমা? কে-সে? ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো বিশু বোস।

আমি বুঝেছিলাম পাওয়ারের ইঙ্গিতটা। বললাম---সিস্টার অ্যারোমা, আমার অসুখের সময় খুব সেবা করেছিলেন, আমাকে খুব ভালোবাসেন। আজ ওঁর ছেলের জন্মদিন, তাই আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন, আর বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন ওঁর কাছে দু'চার দিন থাকার জন্যে। ওখানে দেখবার অনেক কিছু আছে, সেসব ঘুরে দেখাবেন আমাকে।

---বেশ তো। খুব ভালো প্রস্তাব। তোমার শরীর মনেরও উপকার হবে, একটু বেড়িয়ে এলে। তুমি ঘুরে এস, আর আমিও এই ক'দিনের ভেতর কাজের দিকটা একটু সামলে নিই। মনে হয় দিন পাঁচ, ছয় বাদে এসে, তোমাকে অনেকটা ভালো দেখবো। তবে ঐ ব্যবসার ব্যাপারটা যা বললাম ভালো করে এ'কদিন ভেবে চিন্তে ঠিক করে রেখ,---কেমন?

জোর করে ঠোঁটে হাসি টেনে এনে বললাম---আচ্ছা।

কফি শেষ করে চলে গেল বোস সায়েব।

---তুমি আমাকে বাঁচালে সায়েব। সাক্ষাৎ বাঘের মুখের সামনে বসে যে কি ভয় করছিলো আমার। বললাম পাওয়ারকে।

---আমি যে কফির সরঞ্জাম নিয়ে পাশের ঘরে বসে তোমাকে পাহারা দিচ্ছিলাম সিস্টার। এযে আমার ডিউটি। ভয় কি তোমার? যাক দুষমনটা এখন পাঁচ ছ'দিন আর তোমায় জ্বালাতে আসবে না, তার ভেতর নির্বিঘ্নে পালাতে পারবে তুমি। এর জন্যে আরো তিন হাজার টাকা খেসারৎ দিয়ে ভালোই করেছো তুমি।

●

আরো তিনটে দিন, অস্বস্তির মাঝে কাটিয়ে, চতুর্থ দিনে বাড়ী ছেড়ে রওনা হলাম আমি আর পাওয়ার সায়েব। আমার পরম বিশ্বাসী দারোয়ান অর্জুন সিং রইলো বাড়ীতে। সে বললো---আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলে যান দিদিমণি। যতদিন ইচ্ছে থাকুন সেখানে। আপনার খবর কিছু আমি জানি না, এই একটিমাত্র কথা, শুনবে যে আসবে আপনার তল্লাসে।

মনে হল, পাওয়ার সায়েব, আর অর্জুন সিং, এরা আমার অনাত্মীয় বা ভৃত্য নয়, এই ভয়াবহ দুনিয়ায় এরাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, পরম আপন জন।

●

ওয়ালটেয়ারে নেমে, মেরিনা হোটেলে কয়েকদিন থেকে, বিমুনী-পত্তনম্‌-এ এই বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে চলে এসেছি আমরা। তারপর কেটে গেছে ছ-টা মাস!

আবার আমরা ফিরে যাবো কলকাতায়। যার করাল গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পালিয়ে এসেছিলাম এখানে, আর এই ছ'মাস ভোগ করলাম এই নির্বাসন দণ্ড; সেই বোস সায়েব এখন মোটর এ্যাক্সিডেণ্টে পঙ্গু অবস্থায় শয্যাগত। তাই তার দিক থেকে উপস্থিত কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। তবুও সে সুস্থ হবার পর আবার যদি---

না, না ওসব কথা ভাবতে আর ভালো লাগছে না। এখন আমার মনের পাত্রটি যে নব অনুরাগ সুধা-রসে কানায় কানায় পূর্ণ। নতুন প্রেম, নবীন আশা আমায় ডাকছে হাতছানি দিয়ে। আমি সকল বেদনা-বিপত্তির কণ্টক-অরণ্য পেরিয়ে চলেছি তারই দিকে।

সমুদ্রে জাহাজডুবির পর ভাসমান জাহাজের বুকে কাঠের একটি তক্তায় ভাসমান অসহায় কোনো মানুষ যদি দেখতে পায় এক সবুজ দ্বীপের নিশানা, তখন সে আপ্রাণ শক্তিতে ভেসে চলে তারই দিকে, আমার অবস্থা ঠিক তারই মত।

১৩

আমাদের ট্রেনের বার্থ রিজার্ভ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন পরে ফিরে যাবো নিজের জায়গায়। এতদিন অবশ্য সেখানে ফিরে যাবার জন্য কোন বাসনা জাগে নি মনে। কেমন করে জাগবে? কোন আকর্ষণ তো ছিলনা তার প্রতি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবহীন, স্নেহ-ভালোবাসাহীন স্থানটি আমার কাছে মরুভূমি তুল্য সেই মরুভূমিতে আজ পেয়েছি এক ওয়েশিসের সন্ধান, আর তারই আকর্ষণের টান, টানছে আমাকে।

যাবার আগে দেখা করতে গেলাম মাদাম ডেনিয়েলের সঙ্গে। কতদিন আসি নি, তাই ভারি সঙ্কোচ বোধ করছিলাম ওঁর পবিত্র মুখের দিকে চাইতে। মাদাম কিন্তু সেই আগেকার মতই গভীর স্নেহভরে কাছে টেনে নিলেন আমাকে। আমার দুর্ভাগ্যের সকল কথাই জানতেন মাদাম,---তাই জানতে চাইলেন যে---এখন ফিরে গেলে আবার কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই তো?

মাদামের প্রশ্নের জবাবে জানালাম; বোস সায়েবের খবর। শুনে তিনি বললেন---পাপ করলেই তার শাস্তি ভোগ করতে হয় মা। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন।

আমি সলজ্জভাবে বললাম---আমি আপনাকে আরো কিছু বলতে চাই মাদাম।

---বলো মা। আমি তোমার কথা শুনতে সর্বদাই ইচ্ছুক। সহাস্যে বললেন মাদাম ডেনিয়েল। আমি সঙ্কোচ, লজ্জা সব কিছুকে দমন করে, আমার সঙ্গে রজতের যে নতুন সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে, তার কথা সংক্ষেপে বললাম মাদামকে।

কথা বলতে বলতে বার বার গলার স্বর কেঁপেছে আমার, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর দৃষ্টি হয়েছে নত।

মাদাম ডেনিয়েল, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন আমাকে, আর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন আমার কথাগুলো।

সব শুনে তিনি বললেন---ঈশ্বর তোমাদের এই মিলন সার্থক করুন,---যদি অসুবিধা না হয় তবে বিয়ের সময় আমাকে জানিও।

তারপর তাঁর বুকে ঝোলানো ক্রশটিকে আমার মাথায় ছুঁইয়ে, কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে প্রার্থনা করে, মৃদুস্বরে বললেন---ঈশ্বর দয়া করুন, তবুও যদি কখনও বিপদে পড়ো, আমাকে জানিও অথবা আমার কাছে চলে এস।

মমতাময়ী মাদামকে প্রণাম করে, বিদায় নেবার সময় আমার দুচোখ জলে ভেসে গেল। এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, এ যে আমার কাছে দুর্লভ বস্তু।

রজত সেনকে ট্রেনের টাইম জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল পাওয়ার সায়েব, তাই স্টেশনে এসেছিল সে।

একমাস পরে, আবার দেখা হল আমাদের। দুজনে চাইলাম দুজনার দিকে। সর্বদেহে লাগলো মধুর ভাবের শিহরণ। দুটি ট্যাক্সি নেওয়া হল। মাল-পত্তোর নিয়ে পাওয়ার সায়েব একটিতে, ও অপরটিতে উঠলাম আমরা দুজন।

ছ' মাস আগে যখন এসেছিলাম এই পথ দিয়ে তখন নিদারুণ ভয়, হতাশা, আর তিক্ততা ছিল আমার মন-প্রাণ ছেয়ে। আর সেই পথেই আজ ফিরে চলেছি, নতুন প্রেম, আশা, আর আনন্দে ভরপুর মন নিয়ে। পৃথিবীর সকল সুখ আর স্বস্তি যেন আজ সাথী হয়েছে আমার। পরম নিশ্চিন্তে এই বসে আছি ওর হাতের মুঠোয় নিজের হাতখানি রেখে। কোন কথা নেই। দুজনেই নিরব, শুধু এক আশ্চর্য অনুভূতিমুখর হয়ে বলছে---হে বন্ধু! এই স্বর্গের প্রতিকণা তুমি দিয়েছ আমায়, তোমার কাছে পৃথিবীর আর সকল সুখ তুচ্ছ হয়ে যায়

পার্ক স্ট্রীটের সেই বাড়ী, তবু যেন মনে হচ্ছে সে বাড়ী নয়। গভীর বিষাদ, নৈরাশ্য আর মহাশূন্যতায়, যে বাড়ীর আবহাওয়া ছিল ভারাক্রান্ত, মাত্র ছ' মাস পরে সেই বাড়ীতে বইছে শান্তি স্বস্তির মুক্ত বাতাস। সকাল হতেই রজত আসে এখানে, তারপর সারাদিন কাটে ওর সঙ্গে।

পাওয়ার সায়েবকে ভারি খুশি খুশি লাগছে। সে কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে ছুটে আসে, গল্প জমায় আমাদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে হাসি-গল্পেও, এমন মেতে ওঠে যে, রান্নাঘর থেকে যখন পোড়া গন্ধ ভেসে আসে, তখন ওর হুঁস হয়। তখন ও একহাত জিব বার করে, ছুটে চলে যায়, পোড়া-তরকারী সামলাবার জন্য।

অর্জুন সিং-এর কাছে শুনলাম একটা নতুন খবর, যে আমার ঠাকুমা মারা গেছেন। আর বাবা নাকি আবার বিয়ে করেছেন। শুনে আশ্চর্য লাগলো। কারণ আমার মা যখন মারা গেছেন তখন আমার বাবার বয়স ছিল মাত্র তিরিশ বছর। তখন বিয়ে না করে এই সাতচল্লিশে বিয়ে করলেন কেন? তবে কি ঠাকুমার জন্যেই এতকাল বিয়ে করেন নি? কি জানি, কিছু যেন বুঝতে পারছি না। আমার বাবা চিরকালই আমার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে রইলেন।

বেশী শীত পড়েছে। হলুদ হলুদ রোদে খুশির আমেজ ছড়ানো। ঐ খুশির রোদ গায়ে মেখে, সারাদিন আমি আর রজত ঘুরে বেড়াই। সহরের বুকে যে ছিল এত সব সুন্দর জায়গা---এতদিন তো নজরে আসে নি। কারণ সূর্যকান্তর সঙ্গে ঘুরেছি প্রায় সারা ভারত। কত পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, কত যে রমণীয় স্থানে ঘুরেছি আমরা, কিন্তু কলকাতা মহানগরীর পথে ঘাটে, দিনের আলোর এমন নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে ঘোরা তো হয় নি, তাই এ জায়গাগুলো রয়েছে আমার কাছে অপরিচিত।

[ক্রমশ।

অথচ কেউ বুঝতেই পারল না? মণিবাবু তাকিয়ে রইলেন ভটচায্যিমশায়ের দিকে।

বুঝতে না পারাই স্বাভাবিক; স্টেজে অভিনয় হচ্ছে—বৃত্রাসুরকে ইন্দ্র বধ করবেন—দর্শকরা সকলেই দুর্বৃত্তের মৃত্যুর জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। এমন সময় বৃত্রাসুরকে যে সত্যিই বধ করা হ'ল, একথা বোঝা শক্ত অস্বীকার করা চলে না। বরঞ্চ দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অসুর বধের স্বাভাবিক দৃশ্য দেখে, অসুরের বুক থেকে রক্তের ধারা লক্ষ্য করে তাঁরা অভিভূত হয়ে বাহবা দিলেন অবিকল অভিনয়ের অভিব্যক্তিতে।

আপনি প্রথম থেকেই অভিনয় দেখেছিলেন?

অভিনয় শুরু হবার অনেক আগেই আমায় আসতে হয়েছিল।

কেন?

একটু হাসলেন ভটচায্যিমশায়, তারপর বললেন—ব্যাপারটা কি জানেন, এটা পল্লীগ্রাম, কলকাতার অভিনয়ের ব্যবস্থা সংগে সংগে হয়ে যায়, কিন্তু গ্রামের জমিদার বাড়িতে বাৎসরিক উৎসব একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। সকলেরই এতে অংশ আছে, দায়িত্ব আছে।

প্রত্যেক বছরই এ ধরণের অভিনয় হয়? জিজ্ঞাসা করলেন মণিবাবু। তিনি সদর থানার ইনচার্জ, তদন্তে এসেছেন দুর্ঘটনার পরে।

এখন জমিদারদের অবস্থা পড়ে গিয়েছে। তা না হলে এর আগে পুজোর পর সাতদিন ধরে মেলা আর উৎসবের আয়োজন থাকত। সত্যশঙ্করবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি গত হলে এও বন্ধ হয়ে যাবে হয়ত—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভটচায্যিমশায়ের।

শুনেছি, তিনি নাকি সবসময়ই ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন; তাঁরও উৎসাহ আছে এতে?

উৎসাহের কথা বলতে পারি না, তবে আগের দিনের নিয়মকানুন অনুষ্ঠান পালন করতে চেষ্টা করেন উনি, শ্রদ্ধা আছে তাতে। আর শুধু ধার্মিক বললে ভুল হয় উনি মহাতান্ত্রিক।

তান্ত্রিক! এযুগেও এসব চলে? অবাক হলেন মণিবাবু।

চলে কিনা জানি না তবে বীরভূম বীরাচারের ক্ষেত্র, পবিত্র কৌলভূমি, তন্ত্রসাধনার জন্য বিখ্যাত। একটু হাসলেন ভটচায্যিমশায়। তারপর বললেন, এরপর সবই উঠে যাবে। অন্য যুগ এসেছে—সভ্যতার ধাক্কা আমরা গ্রামে বসেও অনুভব করছি।

দুর্ঘটনা কখন হয়েছিল, মনে আছে?

রাত প্রায় সাড়ে তিনটে।

দুর্ঘটনার পর কি হ'ল?

আমি সাজঘরে গিয়েছিলাম। তখন বৃত্রাসুর তীরবিদ্ধ অবস্থায় শুয়েছিল একটা বেঞ্চের উপর।

বিঁধেছিল?

ঠিক মনে নেই, ভাল করে লক্ষ্য করি নি।

এ ধরণের দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা মণিবাবুর নেই। খুন-জখম, মারামারি, প্রতিশোধ-প্রণোদিত হত্যার তদন্ত করতেই অভ্যস্ত তিনি। অভিনয়ের মধ্যে একজন অভিনেতা সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে মারা গেল, এটা কল্পনা করতেও অসুবিধা হচ্ছে মণিবাবুর। আরও কিছু তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে বলে মনে হ'ল তাঁর। মণিবাবু বৃদ্ধ ভটচায্যিমশায়কে আটকালেন না। আরও সাক্ষ্য নেবার আছে। এরপর তিনি স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টারকে ডাকলেন। চিন্তাহরণবাবুকে দেখেই তাঁর মনে হ'ল লোকটা চতুর প্রকৃতির। গ্রাম্যরাজনীতি নিয়ে নিশ্চয় মাথা ঘামিয়ে থাকেন।

আপনার নাম? প্রশ্ন শুরু করলেন মণিবাবু।

চিন্তাহরণ চ্যাটার্জি।

কতদিন স্কুলে আছেন?

তিনবছর সাতমাস।

ছিলেন?

আমি প্রথম থেকে শেষপর্যন্তই ছিলাম, তবে আরম্ভ হতে একটু দেরি হয়েছিল।

কেন?

ঠিক সময়ে আরম্ভ হলেই আশ্চর্য ব্যাপার হত কারণ পাংচুয়ালিটি জ্ঞান আমাদের কম। উপদেশ দেওয়ার অভ্যাসটা ছাড়তে পারলেন না মাস্টারমশায়—

মণিবাবু বুঝতে পারলেন।

অভিনয়ের রাতের কথা একটু খুলে বলুন—অনুরোধ করলেন তিনি।

প্রত্যেক বছরই এ বাড়িতে কলকাতা থেকে কোন না কোন পার্টি এসে অভিনয় করে থাকে। এবার এসেছিল "বিনোদিনী থিয়েট্রিক্যাল পার্টি।" তারা অভিনয় করল "বৃত্রাসুরবধ।" কথাটা বলে হাসলেন চিন্তাহরণবাবু। তারপর বললেন—আপনি হয়ত আশ্চর্য হচ্ছেন—আধুনিক নাটক না করে মান্ধাতা আমলের নাটক করা হল কেন?

সত্যশঙ্করবাবু আধুনিক নাটক পছন্দ করেন না হয়ত।

শেষদৃশ্য

[সম্পূর্ণ উপন্যাস]

ডঃ নির্মলকুমার সরকার

না, এ বিষয়ে তিনি কোন মতামত দেন নি। আমার উপরই নাটক নির্বাচনের ভার ছিল। আমি "বৃত্রাসুরবধ" পছন্দ করেছি। পল্লীগ্রামে "একপেয়ালা চা" বা "চাঁদের কান্না" চলবে না—।

নাটক সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে চাইছিলেন তিনি কিন্তু মণিবাবু বাধা দিয়ে বললেন—দুর্ঘটনা কখন হয়েছিল, মনে আছে?

প্রায় রাত সাড়ে তিনটে—তখন নাটক বেশ জমে উঠেছে। যেমন বৃত্রাসুর তেমনি ইন্দ্রের অভিনয়। তাছাড়া যুদ্ধের দৃশ্য—রণবাদ্য বাজছে, মশাল জ্বলছে, স্টেজের আবহাওয়া দারুণ দুর্যোগপূর্ণ—। এমন সময় ইন্দ্রের বাণ এসে বৃত্রাসুরকে বিদ্ধ করল। মর্মভেদী আর্তনাদ করে উঠল বৃত্রাসুর। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্তস্রোত বইতে লাগল তার বুক থেকে। বৃত্রাসুরবধ হ'ল।

কিন্তু সত্যিই বধ হল এটা বুঝেছিলেন?

না, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম প্রাণবন্ত অভিনয় দেখে। কিন্তু তারপর ড্রপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা তুমুল কলরোল উঠল। প্রথমে ভেবেছিলুম সেটা জনগণের উচ্ছ্বাস। কিন্তু পরে ভুল ভাঙল।

তখন কি করলেন? মণিবাবু তাকালেন চিন্তাহরণবাবুর দিকে।

তখন সব জানাজানি হয়ে গিয়েছে। লোকেরা দারুণ উত্তেজিত। তারা সকলেই ইন্দ্রকে মানে কালিদাসকে চাইছিল।

কেন?

কারণ সকলের চোখের সামনেই ইন্দ্রের হাতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হয়েছে। তাকে শাস্তি দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তখন।

আপনি ফণী রায়কে চেনেন? প্রশ্ন করলেন মণিবাবু।

সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তবে—কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মাস্টারমশায়।

থেমে গেলেন কেন বলুন।

ব্যাপারটা একটু ডেলিকেট, মানে জমিদার বাড়ি সংক্রান্ত—।

তা হোক, সব কথাই খুলে বলা উচিত। তা না হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে না—মণিবাবু অনুরোধ করলেন তাঁকে।

তা'হলে বলছি, ফণী রায় সত্যশঙ্করবাবুর নিজের ভাইপো।

সে কি! অবাক হলেন মণিবাবু।

হ্যাঁ, ছোটবেলায় ও কলকাতায় গিয়েছিল বাবার সঙ্গে। ফণী রায়ের আসল নাম বিমলাশঙ্কর। ওর বাবা মদ্যপ আর দুশ্চরিত্র ছিলেন। দেশের সব সম্পত্তি নষ্ট করে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে তিনি কলকাতায় বাসা নিয়েছিলেন। লাভের মধ্যে ছেলেটা থিয়েটারে ঢুকে উচ্ছন্নে গিয়েছে।

একথা কোথায় শুনলেন?

স্বয়ং সত্যশঙ্করবাবু আমায় থিয়েটারের দিনই সব বলেছেন। ফণী রায়কে দেখেই বিমলাশঙ্কর বলে চিনেছিলেন তিনি। বংশমর্যাদার ব্যাপারে উনি খুবই স্পর্শকাতর, তাই সেদিন তাঁকে খুব উত্তেজিত দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম।

উনি কি শান্ত স্বভাবের লোক?

হ্যাঁ, কিন্তু সেদিন এত রেগে গিয়েছিলেন যে আমার সামনেই চীৎকার করে বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে হচ্ছে মায়ের খড়্গ দিয়ে ওকে বলি দিই। নিজের বংশের মর্যাদা যে রাখতে জানে না তার মৃত্যুই উপযুক্ত শাস্তি।

সত্যশঙ্করবাবুর উত্তেজনার কারণ আর কেউ জেনেছিল?

তা বলতে পারব না। তবে নায়েব বনমালীবাবু আর দারোয়ান পাঠকজী দুজনে সেদিন উত্তেজিত হয়ে পরামর্শ করছিল বলে দেখেছি—

ওদের কথা কিছু শুনতে পেয়েছিলেন?

না, আমি কাছে যেতেই ওরা চুপ করে গিয়েছিল।

মাস্টারমশাইকে বিদায় দিলেন মণিবাবু।

ভটচায্যিমশায় বা মাস্টারমশায়ের সাক্ষ্য থেকে মণিবাবু কয়েকটা খবর পেলেন কিন্তু বৃত্রাসুর-বেশী ফণী রায়কে অত লোকের দৃষ্টির সামনে অপর একজন অভিনেতা হত্যা করবে কেন তার কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না। যাত্রা বা থিয়েটারে যুদ্ধের দৃশ্য হয়ে থাকে কিন্তু তাতে এরকম মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি শোনেন নি। মণিবাবু কোন কূলকিনারা করতে পারছেন না। এবার তিনি নায়েব বনমালী দাসকে ডেকে পাঠালেন। মণিবাবু আশা করলেন এর কাছ থেকে হয়ত কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে। নায়েবরা সাধারণত বেশ চতুর হয়ে থাকে। সদাসর্বদা তারা চোখ খোলা রেখে কাজ করে। কিন্তু নায়েব বনমালীকে দেখে একটু অন্যরকম বলে মনে হল তাঁর। মুখে যেন তার একটা উদাসীনতার ভাব রয়েছে। নির্লিপ্তভাবে এসে বসলেন তিনি।

আপনি এখানকার নায়েব?—জিজ্ঞাসা করলেন মণিবাবু।

হ্যাঁ, এখন অবশ্য জমিদারী বলতে কিছু নেই, তবে যা আছে তাই দেখাশুনা করে থাকি।

কতদিন কাজ করছেন এখানে?

প্রায় তিনবছর।

থিয়েটারের দিনের কথা সব মনে আছে?

হ্যাঁ, এ তো সেদিনের ঘটনা।

ক'টার সময় অভিনয় শুরু হয়েছিল?

তা বলতে পারব না।

কেন, আপনি থিয়েটার দেখতে যান নি?

না, সে রাত্রে আমায় তহবিল মেলাতে হয়েছিল।

রাত্রে তহবিল মেলাতে হল কেন, কোন গরমিল ছিল?

হ্যাঁ, প্রায় পাঁচহাজার টাকার মত।

এর আগে এ ধরণের গরমিল হয়েছে কখনও?

তা হয় নি। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নায়েববাবুর।

কোন সন্ধান পেয়েছেন?

না, এখনও কোন হদিশ করতে পারি নি।

তহরুপের কথা কখন জেনেছিলেন?

থিয়েটারের দিন সকালে। বাবুই আমায় জানিয়েছিলেন।

তাহ'লে এ সংবাদটা আমাদের গোপন করা হয়েছিল?

ঠিক তা নয়, তবে বাবুই বলেছিলেন একে একটা খুনের তদন্ত চলছে তার উপরে এটা না জানানোই ভাল।

কিন্তু খুনের সঙ্গে তহবিল তছরুপের কোন সম্পর্ক আছে কি না তা আপনারা জানবেন কি করে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে মণিবাবু নায়েবমশায়ের দিকে তাকালেন।

ওদিক দিয়ে আমি কিছু চিন্তা করার মত সময় পাই নি। এতগুলো টাকা কে নিল সে দুশ্চিন্তা আমায় পেয়ে বসেছিল।

আর জমিদার বাড়িতে একটা খুন হয়ে গেল সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন সময় ছিল না?—মণিবাবু বিরক্ত হয়ে তাকালেন নায়েবমশায়ের দিকে।

আমি সেকথা বলছি না, তবে টাকা গরমিলের দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে। শান্ত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন নায়েবমশায়।

চাবি কার কাছে থাকে?

ঘরের চাবি আমার কাছে আর সিন্দুকের চাবি বাবুর কাছেই থাকে।

সত্যশঙ্করবাবু ধর্মকর্ম নিয়ে থাকলেও হুঁশিয়ার লোক, কি বলেন?

কোন উত্তর দিলেন না নায়েবমশায়, তবে মুখের ভাবে মণিবাবু অনুমান করলেন তাঁর মন্তব্যে নায়েবমশায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

টাকা ছাড়া আর কিছু হারিয়েছে?

হ্যাঁ, একটা বল্লম—অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন নায়েবমশায়।

বল্লম, আশ্চর্য হলেন মণিবাবু—কোথায় ছিল?

সিঁড়িতে উঠতে দেয়ালে টাঙান ছিল। দুটো বল্লম আর তার মাঝে একটা ঢাল।

মণিবাবু বুঝলেন এটা ঐশ্বর্য আর মধ্যযুগীয় মনোভাবের পরিচায়ক। ধনী জমিদারদের বাড়িও মার্বেলের স্ট্যাচু, ঝাড়-লণ্ঠন দেওয়া বৈঠকখানার মত এ ধরণের অস্ত্র একটা প্রদর্শনযোগ্য জিনিস ছিল। সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয়ের উদ্রেক করত হয়ত এগুলো।

কবে বল্লম চুরি গিয়েছিল?

থিয়েটারের দিন সকালে আমরা এ

জিনিসটা লক্ষ্য করেছি। উত্তর দিলেন নায়েবমশায়।

এ জিনিসগুলো শুধু সাজানই থাকত?

হ্যাঁ, তা থাকত, কিন্তু এগুলো ব্যবহার করা চলে বলেও শুনেছি।

তাহলে এ দিয়ে একটা লোকও মারা যেতে পারে, কি বলেন?

হয়ত পারে; আগের দিনে বর্শা, বল্লম, সড়কি দিয়েই জমিদারের লোকেরা দাংগা করত বা ঠেকাত। এ বাড়িতে অবশ্য ঐ দুটো বল্লম আর বন্দুক ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার এখন আর নেই।

দুর্ঘটনার পর আপনি গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ; আমি তখন ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম, দরজায় ধাক্কা দেওয়াতে উঠে পড়েছিলাম বলে মনে আছে।

কে আপনাকে ঘুম থেকে তুলেছিল?

তা বলতে পারব না; তখন খুব গোলমাল চলছে। ঘুম থেকে উঠে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কে যে আমায় ডেকেছিল তা আর খেয়াল নেই।

আপনি সাজঘরে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, তখনও বুকে তীর বেঁধা অবস্থায় ধুতোস্র মানে ফণী রায়কে বেঞ্চে শুয়ে থাকতে দেখেছি। ডাক্তারবাবু তার পরিচর্যা করছিলেন।

কে ডাক্তারবাবু?

হরিভূষণ ব্যানার্জি, কয়েকখানা বাড়ির পরেই থাকেন। সৌভাগ্যবশত তিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন থিয়েটার দেখার জন্য।

আপনি কি করে জানলেন? আপনি তো সে-সময়ে ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন!

সেটা আমি পরে জেনেছি—একটু থেমে উত্তর দিলেন নায়েবমশায়।

থিয়েটারের দিন সকালে স্কুলের হেড-মাস্টার চিন্তাহরণবাবু সত্যশংকরবাবুর সংগে দেখা করেছিলেন বলে মনে আছে?

হ্যাঁ, সেদিন সকালেই মাস্টারমশায় বাবুর কাছে গিয়েছিলেন।

বিশেষ কোন কারণ ছিল?

তা বলতে পারব না, তবে উনি রোজই বাবুর সংগে একবার না একবার দেখা করে থাকেন। স্কুল পরিচালনার সম্বন্ধে আলোচনা করেন হয়ত।

সেদিন সত্যশংকরবাবুর মেজাজ কেমন ছিল?

তিনি একটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, উত্তর দিলেন নায়েবমশায়।

কোন ঘটনা—টাকা হারানোর ব্যাপার?

না সেদিক থেকে তাঁর কোন দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করি নি।

বলেন কি? একসংগে পাঁচহাজার টাকা নিখোঁজ হ'ল অথচ তিনি চুপ করে রইলেন।

আইত দেখলাম। তিনি শান্ত স্বভাবের লোক, সহজে বিচলিত হন না।

তাহলে কোন ঘটনায় তিনি বিচলিত হলেন?

ফণী রায় বাবুর ভাইপো, তিনি এসে নিজেদের বাড়িতে অভিনয় করছেন একটা পেশাদার দলের হয়ে এটাতে তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

রেগে গিয়েছিলেন এজন্য?

হ্যাঁ, ছোট করে উত্তর দিলেন নায়েব-মশায়।

আপনি আর দারোয়ান পাঠকজী সেদিন সকালে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন মনে আছে?

থিয়েটার সংক্রান্ত ব্যবস্থার জন্য আর বাবুর আত্মীয় ফণী রায় সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম।

নায়েব বনমালী দাসকে বিদায় দিলেন মণিবাবু। তারপর তাঁর সহকারী রাহার সংগে সাক্ষ্যগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করলেন কিছুক্ষণ। একটা জিনিস মণিবাবুর বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। পাঁচহাজার টাকার কথাটা সত্যশংকর পুলিশের কাছ থেকে গোপন করলেন কেন। সত্যশংকর যতই শান্ত এবং ধার্মিক হোন না কেন, তাঁর ভাইপো ফণী রায় একটা পেশাদারী দলের সংগে তাঁরই বাড়িতে স্ত্রীলোককে নিয়ে অভিনয় করছে এটা তাঁর পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হয়েছিল। প্রাচীন জমিদার বাড়ির একজন কুলাংগার চোখের সামনে তাঁর সম্মান আর বংশের মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে যাবে এটা তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়েছিল। এমন কি এতে তাঁর সংযম আর ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গিয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই: কিন্তু ইন্দ্রবেশী অভিনেতাই বা সকলের সামনে তাকে হত্যা করবে কেন? অন্য সুযোগ বা সুবিধা তার যথেষ্ট ছিল! তাছাড়া স্টীলের তীর সে পেল কোথায়। থিয়েটারে এ ধরণের তীর ব্যবহার হয় না বলেই তিনি জানেন। অবশ্য এ ধরণের অস্ত্র সে আগেই জোগাড় করে নিতে পারে। তাহ'লে অভিনয়ের মধ্যে দুর্ঘটনার অজুহাতে কি সে হত্যার সুযোগ নিয়েছে? চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন মণিবাবু।

একটা সাইকেল রিক্সায় ডাক্তারবাবু একটু দেরীতে এসে পৌঁছলেন। হরিভূষণ ব্যানার্জির বয়স প্রায় ষাটের কাছ ঘেঁসে, কিন্তু শরীর বেশ মজবুত বেঁটেখাটো ভদ্রলোক, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, পরনে সার্ট এবং প্যান্ট। স্টেথিস্কোপটি তিনি হাতছাড়া করেন না। ঘরে ঢুকে তিনি মণিবাবুকে বললেন—একটা কেসে আটকে গিয়েছিলাম, দেরি হয়ে গেল।

না, এমন কিছু নয়, আপনি বসুন। চেয়ারটার দিকে ইংগিত করলেন মণিবাবু।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ডাক্তারবাবু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে মণিবাবুকে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন—আপনি এখানে নুতন এসেছেন?

হ্যাঁ, চ্যাটার্জির কাছ থেকে আমিই চার্জ নিয়েছি—উত্তর দিলেন মণিবাবু।

তাই আপনার সংগে এখনও আলাপ হয় নি, অবশ্য ডাক্তারের সংগে আলাপ না হওয়াই ভাল—একটু হাসলেন ডাক্তারবাবু।

দরকার হলে উপায় থাকবে না—। যাক এবার কাজের কথায় আসা যাক—সেদিন থিয়েটারে আপনি উপস্থিত ছিলেন?

ছিলাম, আর আমিই ফার্স্ট এড দিয়েছি, অবশ্য এডের কোন দরকার ছিল না—মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তারবাবুর।

মানে সংগে সংগেই মারা গিয়েছিল?

হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্ট ডেথ।

কি কারণ মনে হয়েছিল আপনার?

ধারাল তীর হার্ট ভেদ করেছিল।

তাহলে ইন্দ্রকেই দোষী বলছেন?

তা বলছি না, তবে আমার মনে হয় এটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। রোজই অভিনয় করছে ওরা, এ জিনিসটা কখনও হয়েছে বলে শুনি নি।

কিন্তু সকলের সামনে ইন্দ্র ফণী রায়কে মেরেছে এবং প্রত্যেকে তাকেই সন্দেহ করছে।

অমূলক সন্দেহ—মন্তব্য করলেন ডাঃ ব্যানার্জি।

কেন?—মণিবাবু বিস্মিত হয়ে তাকালেন।

তার কারণ হত্যা করতে হ'লে, মনে বা দেহে যে জোর থাকার প্রয়োজন, তার এতটুকুও ইন্দ্র মানে কালীপদর নেই।

কি করে বুঝলেন?

কালীপদ নিজেই হার্টের রুগী।

আপনি কি করে জানলেন? মণিবাবু উৎসুক হলেন।

যেদিন ওরা এখানে এসেছিল, সেদিন থেকেই আমি ওর চিকিৎসা করছি। আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল ও শেষপর্যন্ত অভিনয় করতে পারবে কি না।

কিন্তু অভিনয় কালীপদ করেছিল।

তা করেছিল, স্বীকার করলেন ডাক্তারবাবু।

আপনাকে আর আটকে রাখব না—।

নমস্কারের ভংগীতে হাতটা তুলে ডাক্তারবাবু প্রস্থান করলেন।

বাইরের দিকে তাকালেন মণিবাবু। জানালা দিয়ে পড়ন্ত বেলার আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। দূরে দেউড়িতে ঘন্টা বাজার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। তাঁর মনে হল দূর থেকে কে যেন মন্ত্রপাঠ করছে।

কে বলত? রাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন মণিবাবু।

বোধহয় পূজারী মন্দিরে পূজো করছেন।

না, এত স্পষ্ট আর সুন্দর উচ্চারণ সাধারণত ওঁরা করেন না। কয়েক সেকেন্ড তিনি মন দিয়ে শুনলেন তারপর দারোয়ান

পাঠকজীকে ডেকে পাঠালেন। পাঠকজী এসে প্রকাণ্ড এক সেলাম ঠুকে মিলিটারি কায়দায় দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি থিয়েটার দেখেছিলে?

না হুজুর।

কেন?

ভাল লাগে না।

যে লোকটা মরেছিল তাকে চেনো?

হ্যাঁ, অসুর সেজেছিল।

কে মারল তাকে জানো?

ইন্দ্রজী ছাড়া আর কে মারবে হুজুর। তিনিই মালিক।

ঠিক। তুমিই ত পুলিশকে খবর দিয়েছিলে।

জী হাঁ।

কে মন্ত্রপাঠ করছে বলত?

বাবুজী, কালীঘরে পূজা করছেন।

পাঠকজীকে বিদায় দিলেন মণিবাবু। সে বেরিয়ে গেলে মণিবাবু রাহাকে বললেন—কি ব্যাপার বুঝছি না, সবই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

কেন স্যার? অবাক হয় রাহা।

ইন্দ্র রুগী তায় হার্টের অসুখে ভুগছে। সাধারণ অসুখ নয়—এরকম অবস্থায় সে কিভাবে মারতে পারে?

কেন পারবে না স্যার। যদি জোরাল মোটিভ থাকে তাহলে মৃত্যুপথযাত্রী লোকের পক্ষেও খুন করা সম্ভব।

কথাটা শুনে কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন মণিবাবু তারপর বললেন, এরপর কে আছে?

হরশংকরবাবু। উত্তর দিল রাহা।

সত্যশংকরের ছেলে না?

হ্যাঁ।

হরশংকর প্রবেশ করল। যুবক, সুন্দর সুগঠিত চেহারা তবে জমিদারসুলভ নয়। দেখলেই মনে হয় একজন স্পোর্টসম্যান।

আপনার নাম হরশংকর রায়? জিজ্ঞাসা করলেন মণিবাবু।

হ্যাঁ।

সেদিন থিয়েটার দেখেছিলেন?

দেখেছি তবে লাস্ট সিনটা বাদে।

কেন? মণিবাবু সোজা তাকালেন হরশংকরের দিকে।

তখন ভিতরে উঠে গিয়েছিলাম।

কিন্তু শেষদৃশ্য না দেখে? এইটেই তো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হয় বলে শুনেছি।

ঠিক শুনেছেন, তবে আমার ভাগ্যে দেখা হ'ল না।

খুব জরুরী কারণ ছিল? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মণিবাবু।

না এমন কিছু নয়, তবে—কথাটা শেষ হ'ল না হরশংকরের।

বলতে বাধা আছে কিছু?

ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার,—।

আই সী—আপনি কি ব্যায়াম করেন?

প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেললেন হরশংকর, বলল—হ্যাঁ, নিয়মিত রাইডিং, বাইচ স্যুটিং সব কার।

মনে পড়েছে—বলে উঠলেন মণিবাবু—এইচ রায়; আপনিই কলকাতার রাইফেল স্যুটিং-এ ফার্স্ট হয়েছিলেন?

হ্যাঁ, এবছর আমিই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।

হঠাৎ মন্ত্রপাঠ বন্ধ হয়ে গেল। জায়গাটা অস্বাভাবিকভাবে নিস্তব্ধ হয়ে উঠল সংগে সংগে। একটু পরেই সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ শোনা যেতে হরশংকর দাঁড়িয়ে উঠে বলল—বাবা আসছেন।

তাহলে ওঁর সংগেও একটু আলাপ করি আমরা। বললেন মণিবাবু।

হরশংকর বেরিয়ে যাওয়ার সংগে সংগে সত্যশংকর ঢুকলেন। ঋজুদেহ, মাথার সাদা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে। মুখে সাদা দাড়ি গোঁফ। পরনে জাফরানী রঙের পট্টবস্ত্র। গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। সত্যশংকরের শুভ্র গৌরবর্ণ দেহ একটু শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেখলেই সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়।

চেয়ারে বসলেন সত্যশংকর।

আপনি সেদিন থিয়েটার দেখেছিলেন? প্রশ্ন শুরু করলেন মণিবাবু।

রাত আড়াইটের পর একবার যেতে হয়েছিল তবে ইচ্ছে ছিল না।

ভাল লাগে না?

না তা নয়, তবে মায়ের পূজা করতেই বেশি ভাল লাগে আমার। সেদিন সন্ধ্যা থেকে রাত আড়াইটে পর্যন্ত মায়ের ঘরেই ছিলাম।

পূজা করছিলেন?

শুধু পূজা নয়, মায়ের সামনে কবিতাও পড়েছি।

কবিতা। অবাক হলেন মণিবাবু।

হ্যাঁ, প্রথমে কালিদাসের মেঘদূত, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব দিয়ে শুরু করলাম; তারপর ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, কীটস, শেলী—কিন্তু মনটা যেন বিষাদে ভরে গেল আমার। তাই পড়তে আরম্ভ করলাম রবীন্দ্রনাথ। তখন হয়ে গিয়েছিলাম আমি। হঠাৎ মায়ের মুখের দিকে নজর পড়ল। দেখলাম মায়ের ঠোঁটের কোণে হাসি। পরম কৌতুক আর স্নেহে তিনি আমায় লক্ষ্য করছেন।—

সত্যশংকরের কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত মাদকতা আছে। মণিবাবু আবিষ্টের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সত্যশংকরের দৃষ্টি জানালা পেরিয়ে অনেকদূরে চলে গিয়েছে। অন্যজগতের মানুষ যেন তিনি।

বৃত্রাসুরের মৃত্যুর দৃশ্য দেখেছিলেন? প্রশ্ন করলেন মণিবাবু। প্রশ্নটা কেমন যেন খাপছাড়া শোনাল।

একটু পরে উত্তর দিলেন সত্যশংকর—হ্যাঁ ছিলাম, একজন স্বজনের মৃত্যু চোখের সামনে ঘটল।

স্বজন।

বৃত্রাসুর-বেশী কশীবাবু আমারই ভাইপো, বিমলাশংকর। আমার বাড়িতে এসে আমার নামও ডোবালে, মৃত্যুও হ'ল অপঘাতে।

অনেকে এটা হত্যা বলে সন্দেহ করেছেন।

কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কে হত্যা করল?

আপনার বাড়িতে ও অভিনয় করাতে আপনি কি খুব রেগে গিয়েছিলেন?

একটু হাসলেন সত্যশংকর, বললেন—হ্যাঁ রেগে গিয়েছিলাম, বিচলিত হয়ে ধৈর্যের বাঁধ আমার ভেংগে গিয়েছিল। তা বলে তাকে হত্যা করি নি বা করাইনি—একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

আপনার মতে কে তাকে হত্যা করতে পারে?

আমার পক্ষে তা বলা শক্ত, আবার হাসলেন সত্যশংকর—।

অপ্রস্তুত হলেন মণিবাবু, বললেন—না আমি বলছি, আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন।

সন্দেহ করি বললে অন্যায় হবে, মিথ্যা-ভাষণ হবে। আমি সচরাচর মিথ্যা বলি না।

আপনার কিছু টাকা তছরূপের কথা শুনলাম, একথা আমাদের জানানো হয় নি কেন? মণিবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

তছরূপ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না, গরমিল হতে পারে; অন্য কোন খাতে খরচ হয়ে থাকবে সম্ভবত, এখন কোন হদিশ পাচ্ছেন না নায়েবমশায়।

সিঁড়ি থেকে একটা বল্লম চুরি গিয়েছে একথা কিন্তু আমাদের জানান উচিত ছিল। মণিবাবুর স্বরটা এবার গম্ভীর।

কিন্তু এ তো সামান্য ব্যাপার।

বলেন কি, এটা সামান্য ব্যাপার! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মণিবাবু।

তা বৈকি; তাহলে, অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, তার খবরও আপনাদের দেওয়া উচিত।

কি রকম? মণিবাবু বুঝতে পারছেন না সত্যশংকর তাঁর সংগে রহস্য করছেন কি না।

আমার নস্যির ডিবে, বৌমার চুলের কাঁটা আর হরশংকরের তক্তা ঠোকা নিকেলের হাতুড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু ঐ বল্লম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যায়।

হয়ত যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে হয় নি। স্টীলের তীরটাই ওর মৃত্যুর কারণ। নজর করে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

তাহলেও—আমতা আমতা করলেন মণিবাবু, আমাদের জানালে ভাল হ'ত। সে যাক, এ বিষয়ে আপনার অভিমতটা জানালে

ধ্বংস হবে। মণিবাবু দস্তুরমত বিরক্ত হয়েছেন। সত্যশংকরের ... কাছে তিনি যেন পরাভূত হয়ে প'ড়ছেন। বাস্তবিক পক্ষে সত্যশংকরই যেন তাকে জেরা করছেন, তিনি নন।

আমার অভিমত—সত্যশংকরের গলার স্বরে চমকে উঠেছেন মণিবাবু—।

হ্যাঁ, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

না, আপত্তি কিসের? তবে আমার অভিমত আপনাদের কাছে হাস্যকর ঠেকবে। অজকাল আপনারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ বিশ্লেষণ করে থাকেন; আমার মতামত তাই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

তা হোক, বলুন মণিবাবু ব্যগ্র হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

পাপাশ্রিত ব্যক্তি অপঘাতেই মরে থাকে—। কথাটা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর পুজোর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যশংকরের অন্তর্ধানে ঘরটা যেন হঠাৎ নিস্তব্ধ আর শূন্য হয়ে গেল। মণিবাবু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। একটা অবাস্তব, আবহাওয়া যেন তাঁকে নিস্তেজ আর পঙ্গু করে দিয়েছে বলে মনে হ'ল।। তবু জোর করে তিনি মোড় ঘুরিয়ে নিলেন—তাঁর মনকে। তারপর রাহাকে বললেন—থিয়েটারের লোকেদের স্টেটমেন্টগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক—যদি কোন হদিশ করা যায়। প্রথমে ইন্দ্রর কথাই ধরা যাক—কি নাম যেন?

কালীপদ দাস—উত্তর দিল রাহা।

বেশ। কালীপদ দাস আর ফণী রায় দুজনে কতদিন একসঙ্গে কাজ করেছে?

প্রায় পাঁচবছর ওরা বিনোদিনী থিয়েট্রিক্যাল পার্টিতে কাজ করেছে।

কি রকম সম্পর্ক ছিল ওদের মধ্যে।

ওদের মধ্যে সদ্ভাবই ছিল।

মারাত্মক তীরটা সম্বন্ধে কালীপদ কি বলেছে? মণিবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

ইন্দ্রের তূণে রাংতামোড়া তীরই থাকে, এ ধরণের স্টীলের তীর কালীপদ কোনদিনই দেখে নি।

কিন্তু তার অজান্তে কেউ যদি তীরটা রেখে দিয়ে থাকে তাহ'লে?

মণিবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন জানালার দিকে। তারপর বললেন—কালীপদর সম্বন্ধে আর কিছু জানা গেছে?

কালীপদ চিররুগ্ন, মাঝে মাঝে তাকে হাসপাতালে কাটাতে হয়। তবে সুঅভিনেতা বলে ওকে দলে রাখা হয়েছে। কিন্তু ফণী লোকটা সুবিধের নয়।

কেন? মণিবাবু রাহার দিকে তাকালেন।

ফণী মদ্যপ আর দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল তার। তার ফলে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাকে।

স্বাভাবিক। মন্তব্য করলেন মণিবাবু।

ফণীকে তার মেজাজ আর স্বভাবের জন্য দলের সকলে ভয় করত এমন কি ম্যানেজার পর্যন্ত।

ম্যানেজারটা কে?

বিধুভূষণ তরফদার, সোল প্রোপাইটার—বিনোদিনী থিয়েট্রিক্যাল পার্টি এবং বিনোদিনী হোটেল। চীৎপুর রোডে একটা পুরানো বাড়ির দোতলায়, থিয়েটার আর নীচে হোটেল চালিয়ে বিধুভূষণ কারবার ফেঁদেছে।

তার মানে? মণিবাবু তাকালেন রাহার দিকে।

তার মানে, যারা থিয়েটারে অভিনয় করত তারা হোটেলে খেতে পেত।

বিনামূল্যে?

না, তা নয়। বিধুভূষণ পাকা ব্যবসাদার। কোন লোককেই মাইনে দিত না, খাওয়া বাবদ মাইনে কাটা যেত। এমন কি শেষ অবধি সকলেই দেনাদার হয়ে পড়ত। সে কারণে দল ছেড়ে নড়বারও উপায় থাকত না।

বা, তরফদার বেশ মজাদার লোক বলে মনে হচ্ছে।

মন্তব্য শুনে রাহা হাসল একটু, তারপর বলল—কিন্তু বিধুভূষণও ফণীর কাছে জব্দ ছিল। বিধুভূষণের মেয়ে কমলাকে ফণী হাত করে প্রায় জামাই আদরে বিধুভূষণের কাছে বসবাস করত। তবে ইদানীং ছন্দাকে নিয়ে ফণী আর কমলার মধ্যে গোলমাল চলছিল। —

ছন্দা আবার কে? জিজ্ঞাসা করলেন মণিবাবু।

কমলা আর ছন্দা দুজনেই দলের অভিনেত্রী। "বৃত্রাসুর বধ" পালাতে কমলা বৃত্রাসুরপত্নী আর ছন্দা নর্তকী সেজে থাকে।

তাহলে কমলাকে সন্দেহ করা যেতে পারে, হিংসার জন্য তার পক্ষে এটা করা সম্ভব।

কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে? রাহার সন্দেহ হয়।

ভিড়ের মধ্যে কেন? বাধা দিয়ে মণিবাবু বললেন—উইংগসের পাশ থেকে কিংবা সিনের পিছন থেকে মারতে অসুবিধা কি? স্টেজের মধ্যে কিন্তু লোকসংখ্যা কম নয়। আস্তে মন্তব্য করল রাহা। কালীপদ না কমলা, এত জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। চিন্তান্বিত হয়ে মণিবাবু বললেন—শেষ পর্যন্ত সাহায্যের জন্য কলকাতার দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে?

কে আসতে পারে? রাহা অবাক মণিবাবুর দিকে।

বোধহয় সুব্রত চৌধুরী। উত্তর দিলেন মণিবাবু।

সুব্রত চৌধুরীর সঙ্গে আমার স্কুল থেকেই পরিচয়। মেডিকেল কলেজ থেকে যখন আমি ডাক্তারী পাশ করে বার হলাম, তখন দেখি সুব্রত পুলিশে চাকরী নিয়ে নিউ আলিপুরের ছোট ফ্ল্যাটে জাঁকিয়ে বসেছে। আমি ভেবেছিলাম, সুব্রত হয় প্রফেসর হবে নয় ফিল্মে নামবে, দুটোরই যোগ্যতা ছিল ওর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশে চাকরী নিতে আমি যেন নিরাশ হলাম। অবশ্য সুব্রত যে রকম খেয়ালী তাতে পুলিশ কেন পেশাদারী কুস্তিগীর বা ফুটবল খেলোয়াড় হলেও আশ্চর্য হতাম না।

সুব্রতর ফ্ল্যাটেই আমার সময় কাটে বেশি কারণ ওকে আমার ভাল লাগে বেশি। ওর বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চেহারা ... ছাড়া, কারে ওর ক্ষুরধার বুদ্ধি আর পরিহাসপ্রিয়তা—সবই আমায় আকর্ষণ করে। সেই কারণে রোজই নিয়মমত ওর ফ্ল্যাটে আমায় হাজিরা দিতে হয়।

সেদিন সুব্রতর ফ্ল্যাটে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি সুব্রত ঘরের মেঝেতে বসে একমনে কাগজের নৌকা তৈরি করছে। দেখলাম ইতিমধ্যে তার নৌকায় ঘরের আসবাবপত্র ভরে গিয়েছে।

একি ব্যাপার সুব্রত? প্রশ্ন করলাম আমি হতবুদ্ধি হয়ে।

নৌকা তৈরি করছি। মুখ না তুলেই উত্তর দিল সে।

সে দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মাথার কোন—

না, গোলমাল হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল সুব্রত।

তাহ'লে কাগজের নৌকা তৈরি করছ কেন? বর্ষার দিনে ছেলেরাই এধরণের নৌকা করে জলে ভাসায়। তোমার বয়স একটু বেশি হয় নি কি?

উত্তরে সুব্রত একটু হেসে বলল—তুমি যদি শোন আমি কতক্ষণ ধরে একাজ করছি তাহ'লে আরও অবাক হবে। গত রাত থেকে আমি কাগজের নৌকা করে চলেছি।

কিন্তু এ পাগলামীর অর্থ কি? আমি দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলাম।

ধৈর্য পরীক্ষা করছিলাম, উত্তর দিল সুব্রত।

সারারাত হেলেমানুষের মত কাগজের নৌকা তৈরি করে ধৈর্যের পরীক্ষা হল কিভাবে?

একটা দেশলাই-এর সব কাঠিগুলো একের পর এক জ্বালাতে পার?

শক্ত কি। বিস্মিত হয়ে তাকালাম আমি।

খুব শক্ত, চেষ্টা করে দেখ, পারবে না। কয়েকটা জ্বালাবার পরই বুঝে যাবে—হাতটা কেঁপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে নির্ঘাত।

জন্মের পদ্ধতির সার্থকতা এখানে। আমার জন আর হাতের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য আর যুগ্ম যোগসূত্র বজায় আছে কি না তাই আমি দেখছিলাম। মনে ক্লান্তি এলে শারীরিক ক্ষমতাও কমে যায় একথা তুমি নিশ্চয় জান।

জানি। উত্তর দিলাম আমি, তোমার কোন অবসাদ আসে নি?

না, ফিজিওলজিতে ফেটিগ কার্ভ করেছ? মাংসপেশীকে ক্রমাগত যদি খাটান যায় তাহ'লে একসময়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনের বেলায়ও সেই কথাই খাটে। তাকে বলে মেণ্টাল ফেটিগ। আমি দেখছিলাম কখন আমার ক্লান্তি আসে। তুমি এসে না পড়লে হয়ত আরও কিছুক্ষণ চালান যেত।—আমায় অপ্রস্তুত হ'তে দেখে সুব্রত বলল—ডাঃ দেয়ার ইজ মেথড ইন্ মাই ম্যাডনেস্—একথা তুমি অস্বীকার করবে না।

না, তা করব না। স্বীকার করলাম আমি।

বেশ তাহ'লে এস একটু কফি খাওয়া যাক।

কফি শেষ হবার পর সুব্রত বলল—একটা কেস এসে পড়েছে তাতে আর কিছু না হোক একটু সুবিধা আছে কলকাতার স্নায়ুবন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে কয়েকদিন। যাবে না কি বীরভূমে?

হাতে বিশেষ কাজ ছিল না তাই রাজি হয়ে গেলাম। সুব্রত কিন্তু যাবার আগে আমায় কয়েক জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল। প্রথমে আমরা গেলাম চিৎপুর রোডে "বিনোদিনী থিয়েট্রিক্যাল পার্টি"র ম্যানেজার বিধুভূষণের খোঁজে। ইতিমধ্যে কেসটা সম্বন্ধে আমি সুব্রতর কাছ থেকে মোটামুটি জেনে নিয়েছি। "বৃত্রাসুর বধ" অভিনয়ে বীরভূমের এক জমিদার বাড়িতে সত্যিই বৃত্রাসুর বধ হয়েছিল। কাগজেও তার উল্লেখ ছিল লক্ষ্য করেছি। সে যাই হোক আমরা চিৎপুরে "বিনোদিনী থিয়েট্রিক্যাল পার্টি'র" অফিসে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন বিধুভূষণ বিনোদিনী হোটেলের ক্যাশ মেলাচ্ছিল। আমাদের দেখে ম্যানেজারমশায় ব্যস্ত হয়ে বলল—আপনারা?

আপনিই ম্যানেজার? পাল্টা প্রশ্ন করল সুব্রত।

আজ্ঞে হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে উঠল বিধুভূষণ

একটা কল দিতে এসেছি আমরা।

আসুন, ওপরে আসুন।

দোতলায় আমাদের নিয়ে চলল বিধুভূষণ। নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলায় উঠলাম। ছোট একটা ঘর। তক্তপোষের ওপর একটা শতচ্ছিন্ন তেলচিটে সতরঞ্চি পাতা। দেয়ালের গায়ে দড়ি টাঙানো। তার একদিকে হরেকরকমের কাঁচা-পাকা পরচুলা আর দাড়ি। অপরদিকে রাজসূলভ ভেলভেটের ওপর জরি ও চুমকি বসানো পোশাক-পরিচ্ছদ। বেশ জমকালো ব্যাপার। খরিদ্দারকে যথারীতি আপ্যায়ন করে বিধুভূষণ জানতে চাইল, কোথায় অভিনয় হবে। সুব্রত বীরভূমের নাম করতে ম্যানেজার প্রবলবেগে মাথা নেড়ে আর্তনাদ করে বলল—মাফ করবেন, ও রাস্তায় আর যাচ্ছি না।

কেন, কি হ'ল, বোকার মত তাকায় সুব্রত।

আসুন, ওপরে আসুন

হতে আর বাকি কি; এখনও মাথার ওপর কেস ঝুলছে।

আপনি রায়বাড়ির বৃত্রাসুর বধের ব্যাপারে ভয় পেয়েছেন?

নিশ্চয়, কে না ভয় পাবে বলুন। ও একটা ভূতুড়ে জায়গা মশাই। রাতে বীভৎস কান্নার শব্দ শোনা যায়। কে যে কাঁদে, তা কেউ জানে না। অবশ্য ফণী মরেছে, তাতে আমার খুব কষ্ট হয় নি।

কেন?

ওর মত হারামজাদা বদমায়েশ গুণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেয়ে, আমিও বেঁচেছি, মেয়েটাও বেঁচেছে।

মেয়ে! সুব্রত উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল বিধুভূষণের দিকে।

হ্যাঁ, আমারই মেয়ে কমলা। বৃত্রাসুর-পত্নীর পার্ট করে, আর ফণী আমারই জামাই।

বিধুভূষণকে আদর্শ শ্বশুর বলে মনে হ'ল না।

আপনারা হয়ত আমার কথা শুনে অবাক হচ্ছেন, বিধুভূষণ বলে চলল—কিন্তু জামাই হ'লেও তাকে সহ্য করা সকলেরই পক্ষে শক্ত হয়ে উঠেছিল। ওই রায়বাড়িতে দারোয়ান পাঠকজীর মেয়েকে টানাটানি সুরু করেছিল।

বলেন কি! সুব্রতর মুখভাবে বিস্ময় সূচিত হল।

হ্যাঁ, সে এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার। এদিকে কমলা অন্যদিকে পাঠকজী, দুজনেই ওকে মারবার জন্য প্রস্তুত। অনেক বুঝিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করি। নিয়োগীপুকুর লেনে ফণী সবাইকে জ্বালিয়েছে, সবাই ওর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

নিয়োগীপুকুর লেনে—সুব্রত আরও জানতে উৎসুক।

হ্যাঁ; চীৎপুরে ও বড় একটা সুবিধা করতে পারত না। ওর আড্ডা ছিল নিয়োগীপুকুরে।

উঠে পড়ল সুব্রত। যেটুকু জানার প্রয়োজন ছিল তা সে জেনে নিয়েছে।

রাস্তায় বেরিয়ে সুব্রত বলল, চল এবার নিয়োগীপুকুরে ফণীর আস্তানার খবর নেওয়া যাক।

জায়গাটা সুবিধার নয়, বস্তীঘেরা সরু গলি। কয়েকটা পুরানো বাড়িও অবশ্য রয়েছে। রাস্তার ধারে একটা তেলকল। জায়গাটা ধোঁয়া, ধুলো আর ড্রেনের দুর্গন্ধে যেন নরকের সৃষ্টি করেছে। আমি প্রথমে এর মধ্যে যেতে একটু আপত্তি করছিলাম। সুব্রত কিন্তু সেদিকে কানই দিল না। কিছুদূর যাবার পর সুব্রতকে অনুসরণ করে আদারিণী কেবিনে ঢুকলাম। এ ধরণের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এর আগে আমি কখনও পদার্পণ করি নি। আরও আশ্চর্য হলাম, সুব্রতর কথা আর ভাবভঙ্গীর অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে। একটা ভাঙ্গা টেবিলের সামনে বসেই সে বলে উঠল—কি, দোস্ত চা চলবে ত'। বিস্ময়ে আর ভয়ে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই দোকানে চা খাওয়া ত' দূরের কথা, বসতেই আমার ঘৃণা হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই তাই বসলাম।

এইটাই ছিল ফণী রায়ের আড্ডা, বুঝলে দোস্ত। সুব্রতর কথা বলার ভঙ্গী একেবারে লোফারের মতন। আমি অবাক হয়ে ওর

ব্যথাতুরা

—দীপঙ্কর সেন

[ছবি গ্লাস কাগজে পাঠাবেন]

[প্রতিযোগিতার ছবি প্রতি বাঙলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে]

মাসিক
বসুমতী
আশ্বিন / ১৩৭৫

আলোকচিত্র
প্রতিযোগিতা
১ম পুরস্কার ২০ টাকা
২য় ,, ১৫ ,,
৩য় ,, ১০ ,,
বিষয়বস্তু
কার্তিক সংখ্যা
হাতের কাজ
অগ্রহায়ণ সংখ্যা
উঁচু থেকে নীচু

বন্যার তাণ্ডবে

গ্রামাঞ্চল

আলোছায়া
—চিত্রজিৎ ঘোষ

মাসিক

বসুমতী

আশ্বিন / ১৩৭৫

দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেশ-ভূষার পরিবর্তন না করে শুধু মুখভঙ্গী এবং ভাষার পার্থক্যে যে একজন ভদ্রলোক মুহূর্তের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোফারে পরিণত হতে পারে, এটা না দেখলে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত।

ফণীকে চিনতেন আপনি? জিজ্ঞাসা করল একজন, চা-পানরত অর্ধবয়সী ভদ্র লোক।

আলবৎ, ওর সংগে আমার কতবার লড়াই হয়েছে। ও ত এক নম্বরের বেইমান ছিল।

কথাটা শুনে ভদ্রলোক স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—ফণী শুধু দুর্দান্ত গুণ্ডা ছিল না, আপনি যা বললেন বেইমান, তাই ছিল সে। ঐ যে লাল বাড়িটা দেখছেন, ওটাতে সীতাংশু আর তার বোন মীনা থাকত। সীতাংশু ছিল যেমন শিক্ষিত, তেমনি ভদ্র। যখনই ফণীর সংগে মেলামেশা শুরু করল তখনই আমি মানা করেছিলাম। কিন্তু শুনল না। তেমান ভুগতে হ'ল। ভদ্রলোক থামলেন।

সুব্রত আড়চোখে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তা ভুগেছে বটে।

সুব্রতর মন্তব্যে ভদ্রলোক যেন একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন—ভুগেছে মানে? জাত-মান সব গেল, সীতাংশুর বোন মীনাকে নিয়ে একেবারে উধাও। মনের দুঃখে, ক্ষোভে সীতাংশু বাড়িটা আধা দামে বিক্রি করে দেশান্তরী হ'ল। কেউ তার খোঁজ পেল না।

আমার পাশে বসে থাকা প্যান্ট-পরা একজন লোক ক্রমাগত কেশে চলেছে। চায়ের কাপটা মুখের কাছে একবার তুলে, আদালিণী কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। সুব্রত আমার অবস্থাটা বুঝেছিল তাই সেও সংগে সংগে বেরিয়ে এল। সুব্রতর মুখের ভাব বাইরে এসে স্বাভাবিক হ'ল। কিন্তু কোন কথা বলল না। সে চুপ করে চলতে লাগল আমার সংগে। গভীর চিন্তায় মগ্ন বলে মনে হ'ল তাকে। এ অবস্থায় তার সংগে কথা বললেও সে উত্তর দেয় না আমি জানি, সুতরাং তার সংগে আর কোন বাক্যালাপ হ'ল না। এরপর দুদিন আমি একটা জরুরী কেসে মেতে-ছিলাম। তাই সুব্রতর সংগে দেখা করতে পারি নি। তৃতীয় দিন, গিয়ে দেখি সুব্রত গভীর মনোযোগে একটা দলিল পড়ছে। আমায় দেখে বলল—সীতাংশুর খবর কিছু পাওয়া গেল?

সীতাংশুর খবরে তোমার কি হবে?

কান টানলেই মাথা আসবে, আস্তে করে উচ্চারণ করল সুব্রত।

তার মানে? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

সীতাংশুর সন্ধান পেলে তার বোন মীনা আর ফণী রায়ের কথা আরও কিছু জানতে পারব। সীতাংশু তার বাড়ি বিক্রি করেছিল গৌরহরি বড়ালকে। তার কাছ থেকেও কিছু খবর পাওয়া গেল। বাড়ি বিক্রি করে সীতাংশু কলকাতা ছেড়ে পাটনায় গিয়ে ব্যবসা করে অনেক টাকা লোকসান দেয়। তারপর তার সংবাদ পাওয়া যায় গয়া জেলায়।

আশ্চর্য হলাম আমি সীতাংশুর ভাগ্য-বিড়ম্বনায়। উচ্চশিক্ষিত একজন ভদ্র যুবক কি করে হারিয়ে গেল লোকারণ্যের মধ্যে।

আমার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সুব্রতর লক্ষ্য পড়ল আমার ওপর। বলল—দুঃখিত হবার মতন ঘটনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খবর নিয়ে জেনেছি সীতাংশু পোস্ট গ্রাজুয়েটে ভাল ছাত্র বলে সুনাম অর্জন করেছিল। বোনের জন্য সে আত্মবিশ্বাস একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল।

তার বোন মীনার কোন খবর পেয়েছ? এবার প্রশ্ন করলাম আমি।

হ্যাঁ, মীনার সন্ধান পেয়েছি। ফণী রায় তাকে ত্যাগ করার পর সে একজন পাঞ্জাবী ব্যবসাদারকে বিয়ে করেছে।

দাদার খবর করে নি?

করেছিল কিন্তু তাতে কোন সুফল হয় নি। সীতাংশু যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে। সে যাক, তুমি নিশ্চয় সকলের স্টেটমেণ্ট পড়েছ। বৃত্রাসুরের মৃত্যু সম্বন্ধে কাকে তুমি সন্দেহ কর?

বলা শক্ত, তোমার মতে, মোটিভ হিসাবে ধরতে গেলে অনেককেই সন্দেহ করা যায়।

যেমন—সুব্রত উৎসুক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

প্রথমেই ধর সত্যশংকর। বংশমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষভাবে স্পর্শকাতর। সম্মানের জন্য ফণী রায় ওরফে বিমলাশংকরকে হত্যা করতে বা করাতে পারেন। দ্বিতীয় অভিনেত্রী কমলা—হিংসার বশবর্তী হয়ে এ কাজ তার পক্ষে করা অসম্ভব নয়। তৃতীয় দারোয়ান পাঠকজী—যার মেয়েকে অসম্মান করেছিল ফণী রায়। চতুর্থ কালীপদ—যে ইন্দ্রের অভিনয় করেছিল তার দ্বারা এটা ঘটতে পারে যদিও মোটিভ তেমন জোরালো নয় এবং লোকটাও খুব অসুস্থ।

ভালকথা, এই চারজনের মধ্যে কোনটা তোমার সবচেয়ে জোরাল বলে মনে হচ্ছে—সুব্রত যেন আমাকেই জেরা করতে শুরু করল।

সত্যশংকর—সংগে সংগেই উত্তর দিলাম আমি। তান্ত্রিক লোকেদের আমি বিশ্বাস করি না। তাদের আচার-ব্যবহার যেমনি অস্বাভাবিক তেমনি সন্দেহজনক। ভাইপো বংশের মর্যাদা নষ্ট করবে আর সত্যশংকর চুপ করে বসে থাকবে, এটা আমার মনে হয় না।

আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনল সুব্রত তারপর একটু হেসে বলল—তান্ত্রিক বলেই হত্যার অভিযোগে নিজে করতে হবে তার কোন মানে নেই—আর যতই জোরাল মোটিভ থাক সত্যশংকর এত বোকা লোক নয় যে স্টেজের ওপর সকলের সামনে হত্যা করবে বা করাবে। সে যাক, আর একটা খবর তোমায় দেওয়া হয় নি—বিধুভূষণ চোরাইমালের ব্যবসা করে আর ফণীকে সে-ই যোগাড় করে তার দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু জামাই করল কেন ওকে?

কমলা বিধুভূষণের পালিতা, নিজের মেয়ে নয়।

তাহলে নির্ঘাত এ বিধুভূষণের কাজ—উত্তেজিত হয়ে মন্তব্য করলাম আমি।—অভিনয়ের মধ্যে সকলের দৃষ্টি একই দিকে নিবদ্ধ, তখন বিধুভূষণ ফণী রায়কে হত্যা করতে পারে বৈকি।

কিন্তু কারণ কি? আস্তে কথাটা উচ্চারণ করে সুব্রত তাকাল আমার দিকে।

চোরাইমাল নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে যাক সুব্রত, এবার আমি তোমায় প্রশ্ন করি—তোমার কাকে সন্দেহ হয়?

হেসে ফেলল সুব্রত, বলল—বড় জটিল ব্যাপার ডাক্তার। অনেকগুলো রোগ দেহে আক্রমণ করলে যেমন রোগ নির্ণয় করা শক্ত হয়ে পড়ে এ ক্ষেত্রেও আমার পক্ষে এখান থেকে কিছু বলা প্রায় দুঃসাধ্যও বলতে পার।

তাহ'লে আর দেরি করে লাভ কি, চল যাওয়া যাক—।

অবশেষে আমরা বীরভূমে রায় বাড়িতে উপস্থিত হ'লাম। মণিবাবু সাগ্রহে সুব্রতকে আহ্বান জানালেন। কেসের জটিলতায় তিনি প্রায় নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। তাই কলকাতার সাহায্য পেয়ে তিনি খুশী হলেন। সেই সংগে স্বস্তিও পেলেন যথেষ্ট।

বিকেলে চা-পানের পরই সুব্রত আমাকে নিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। মণিবাবু সংগে লোক এবং আলো দিতে চাইলেন কিন্তু সুব্রত কোনমতে তাকে নিবৃত্ত করল।

পল্লীগ্রামের মেঠো রাস্তা। সন্ধ্যা নামতে আর দেরি নেই। দুধারে কাঁচা বেতের বেড়া—মাঝে ঘাসে ঢাকা। শুধু লোক-চলাচলের ফলে একটা সরু রাস্তা তৈরি হয়ে চলে গিয়েছে। অজানা লতাপাতা আর নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ মিশেছে মাটির সোঁদা গন্ধের সংগে। বাতাসকে কেমন অদ্ভুত হাল্কা লাগল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের সংগে জোনাকির আলো পল্লীগ্রামের সন্ধ্যাকে মনোরম করে তুলেছে।

কিছুদূর যাবার পর আমরা একটা দোকান দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে লক্ষ্য করলাম, দোকানে সবই পাওয়া যায়। শাকসব্জি থেকে শু

করে মনোহারী জিনিস এমনকি পানবিড়ি পর্যন্ত।

খানিকটা এগিয়ে যেতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। আমরা নবাগত দেখে তিনিই প্রশ্ন করলেন—আপনারা এখানে নতুন এসেছেন?

হ্যাঁ, উত্তর দিল সুব্রত—আগেই থিয়েটারের সময় আসার কথা ছিল, আসতে পারি নি।

ভালই হয়েছে আসেন নি; তাহলে ঝামেলায় পড়তেন আমার মত। আমার নাম সিধু ভট্‌চায্‌। আমিও সে রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম।

ফণী রায়কে কে মারল বলে আপনার মনে হয়।

কালীপদ, সে ইন্দ্র সেজেছিল, সেই মেরেছে। ওর হার্টের অসুখ অজুহাত, একেবারে বাজে। সিধুবাবু দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করলেন।

সত্যশঙ্কর থিয়েটার দেখেছিলেন? চলতে চলতে প্রশ্ন করল সুব্রত। রাত আড়াইটের সময় একবার আসরে এসেছিল।

রাত্রে!

ওর সময় কোথায়? দিনরাত কালী-ঠাকুরের সামনে বসে পুজো করে।

এতক্ষণ পুজো?

না তার মধ্যে পাগলামিও আছে, মানে কবিতা আবৃত্তি বা বক্তৃতাও করে থাকে।

সত্যশঙ্কর আমার বন্ধু অবশ্য এখন আর তেমন যোগাযোগ নেই, তবে অল্প-বয়স থেকে ওকে দেখেছি। ও স্বাভাবিক নয়। ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরণের ক্ষমতা আছে বলে মনে হয়।

কি রকম? জিজ্ঞাসা করল সুব্রত।

একবার লক্ষ্ণৌ থেকে হীরাবাঈজী এসেছিল গান গাইতে। সত্যশঙ্কর তাকে ঠাকুরঘরে কালীমূর্তির সামনে গান গাইয়েছিল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! কিছুক্ষণ গান গাইবার পরই হঠাৎ দেখলাম হীরাবাঈজী মায়ের সামনে নাচতে সুরু করেছে। সব যেন আমার গোলমাল হয়ে গেল। কতক্ষণ হীরাবাঈজী নেচেছে তা আমার মনে নেই। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি আমি হলঘরে শুয়ে আছি। বাঈজীরও পরিবর্তন হ'ল। এরপর সে আর কোনদিন মুজরো নেয় নি। শুনেছি শেষ অবধি সে নাকি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিল।

আমরা আবিষ্টের মত সিধুবাবুর কথা শুনছিলাম। একসময় সুব্রত বলে উঠল—সত্যশঙ্করকে অদ্ভুত খামখেয়ালী বলা যায়?

খামখেয়ালী নয় পুরোদস্তুর পাগল। ওকে দাঁড়িয়ে সিধুবাবু বললেন, তা না হলে হরশঙ্করের এ অবস্থা হয়। ডাক্তারী কাইন্যাল পরীক্ষা দেবার মাত্র বাকি থাকতে ছেড়ে দিয়ে সব অকারণে ফিরে এল। রাজ্য সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখানে এসে শিকার করছে আর খেলা নিয়ে মেতেছে। এতে কিন্তু সত্যশঙ্করের আপত্তি নেই। বুঝুন ব্যাপারটা। আচ্ছা চলি আমি—

হঠাৎ সিধুবাবু অন্য রাস্তা ধরলেন।

বুঝলে ব্যাপারটা—আমাকে জিজ্ঞাসা করল সুব্রত।

না—সংক্ষেপে উত্তর দিলাম আমি।

তাঁর ফণী রায়ের ঠিক হার্ট ফেল করেছিল—

এবার বুঝলাম একজন ডাক্তারী জানা লোক যে দেহের মধ্যে হার্টের অবিকল অবস্থিতির সংবাদ রাখে এবং লক্ষ্যভেদ করা যায় স্পোর্ট অর্থাৎ হরশঙ্করই একাজ করতে পারে একথা বলতে চায় সুব্রত।

কিন্তু ফণী রায়কে হরশঙ্কর মারবে কেন?

একই কারণে, বংশের কলঙ্কের জন্য। হয়ত সত্যশঙ্করের প্ররোচনা ছিল এর মধ্যে।

পরের দিন সুব্রত তদন্ত শুরু করল।

প্রথমে এল দরোয়ান পাঠকজী—পাঠকজী মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী বেঁধে সেলাম করে দাঁড়াল।

তোমার নাম কি?

বলদীরাজ পাঠক।

কতদিন কাজ করছ? জিজ্ঞাসা করল সুব্রত।

বিশ সাল হবে হুজুর। পাঠকজীর ভাষার একটু টান আছে।

তুমি এখানে একলা থাক?

না হুজুর, আমার মেয়েও আমার সঙ্গে থাকে।

সে রাতে তুমি থিয়েটার দেখেছিলে?

না।

কেন?

আমার ভাল লাগে না হুজুর।

এর আগের সালে তুমি থিয়েটার দেখেছিলে।

হ্যাঁ।

প্রত্যেক বছরই দেখে থাক?

হ্যাঁ হুজুর। এবার উত্তরটা দিতে একটু ইতস্তত করল পাঠকজী।

যে মরেছে সে লোকটা সম্বন্ধে কিছু জান?

পাঠকজীর চোখদুটো জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, ও লোকটা বিলকুল শয়তান ছিল।

পাঠকজী, তোমার কাছে কি হাতিয়ার থাকে?

দুটো লাঠি।

আর কিছু নয়?

না।

সুব্রত উঠে মণিবাবুকে কি নির্দেশ দিল। মণিবাবু গেলেন। পাঠকজী এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবার যেন তার মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে ঘাম মুছতে লাগল। একটু পরে মণিবাবু ফিরে এলেন, সঙ্গে দুটো লাঠি আর একটা বল্লম। সেটা নিয়ে সুব্রত পরীক্ষা করে দেখল। এই বল্লমটাই সিঁড়ি থেকে উধাও হয়েছিল বলে জানা গেল। এটা তোমার ঘরে গেল কি করে পাঠকজী, প্রশ্ন করল সুব্রত। পাংশুমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল পাঠকজী। তাকে বিদায় দিয়ে সুব্রত বলল, সিঁড়ির বল্লমটার খোঁজ পাওয়া গেল। অবশ্য পাঠকজী যে উদ্দেশ্যে এটা নিয়েছিল, এ জিনিস দিয়ে সে কাজ করা সম্ভব হ'ত না। একেবারে মরচে পড়া টিনের ফলাটা। সকলেই একমত হলেন। এরপর ডাকা হ'ল ডাক্তারবাবুকে। তিনি চেয়ারে বসতেই সুব্রত জেরা সুরু করল।

কালীপদ মানে ইন্দ্রের ভূমিকায় যে নেমেছিল তাকে আপনি চিকিৎসা করেছিলেন?

করেছি, হার্টের রুগী চিকিৎসা ছাড়া চলতে পারে না।

চিকিৎসার জন্য কালীপদ ছাড়া দলের আর কেউ আপনার কাছে গিয়েছিল?

এবার ডাক্তারবাবু বেশ একটু সময় নিয়ে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, কমলা গিয়েছিল।

তারও কি অসুখ হয়েছিল? সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডাক্তারবাবুর দিকে।

কয়েকটা জটিল পুরানো রোগে সে ভুগছে।

এর আগে আপনি কোথায় প্র্যাকটিস করতেন ডাক্তারবাবু?

বলগাঁয়।

তার আগে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুব্রত।

শ্রীরামপুরে করেছি। একটা ঢোক গিলে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু।

হালিশহরে প্র্যাকটিস করেন নি?

করেছি, কিন্তু এসব প্রশ্নের কারণ কি! বিরক্তভাবে তাকালেন ডাক্তারবাবু।

কমলাকে সেখানে দেখেন নি? সুব্রতর মুখে বাঁকা হাসি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তারবাবু। তারপর বললেন, হ্যাঁ, কমলাকে তার স্বামী ছুরি মেরেছিল, তারই চিকিৎসা করেছিলাম।

পুলিশকে জানিয়েছিলেন?

না।

তাহ'লে ফণী রায়কে আপনি চেনেন।

তখন চিনতাম না। এখানে কমলা আমায় দেখিয়েছিল তাকে তবে কোন আলাপ হয় নি।

কমলা আপনার ওপর কৃতজ্ঞ ছিল নিশ্চয়।

হ্যাঁ, সে নিজেই খোঁজখবর নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

এবার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি বিবাহিত।

না, আমি অবিবাহিত, শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু।

ফণী রায়কে যে বাণবিদ্ধ করেছে তার সম্বন্ধে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—বলতে লাগল সুব্রত লোকটির হার্টের অ্যানাটমির জ্ঞান আর লক্ষ্যভেদের নিপুণতা থাকার কথা।

আমার তা মনে হয় না। উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে, হার্টের তীরবিদ্ধ হওয়া নিছক দৈববশে হতে পারে। দেহের যে কোন ভাইটাল পার্টে ওটা লাগলে ফণী রায়ের মৃত্যু হত।

ডাক্তারবাবুর জবানবন্দী শেষ হল। এই সুযোগে সুব্রত বাইরে থেকে বেড়িয়ে এল বেশ কিছুক্ষণ। দুপুরে আহারের পর আমি সুব্রতকে বললাম, তোমার তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে সুব্রত। সত্যশঙ্কর, হরশঙ্কর, ডাক্তারবাবু, পাঠকজী, থিয়েটার দলের—কালীপদ, বিধুভূষণ, কমলা,—করছ কি সুব্রত, এরপর দেখছি, তোমায় কম্পিউটার বসাতে হবে।

আমার কথা শুনে সুব্রত হেসে উঠল। বলল, এ ধরণের দুর্ঘটনায় অনেকের ওপরই সন্দেহ এসে পড়ে।

প্রসেজ অব এলিমিনেশন করবে না শেষ-পর্যন্ত নিমাইকেই আসামী বলে চালান করে দেবে।

দেখা যাক, তবে সন্দেহভাজনের তালিকা আরও দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এরপর আবার কাজ শুরু হ'তে নায়েব বনমালী দাশকে ডাকা হ'ল। প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগল। সাধারণত নায়েবজাতীয় লোকেদের মুখেচোখে যে ধূর্ততার ছাপ থাকে, বনমালী দাসের মধ্যে তার কোন চিহ্ন লক্ষ্য করলাম না। একটা যেন শান্ত-সৌম্য ভাব আছে তার চেহারার ভেতর। সুব্রত কিন্তু অবান্তর একটা প্রশ্ন করে বসল—আপনি ইংরাজি জানেন?

সামান্য—আস্তে উত্তর দিলেন বনমালী-বাবু।

এইটে পড়ুন, শুধু হেডিং পড়লেই হবে—একটা পুরানো ম্যাগাজিন এগিয়ে দিল সুব্রত।

বনমালীবাবু সেটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন যেন।

কি হ'ল, নিজের লেখাটা চিনতে পারছেন? 'বায়রনের কাব্য প্রতিভা'—লিখেছেন সীতাংশু দত্ত। সে যাক, থিয়েটারের দলের মধ্যে ফণী রায়কে চিনতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার ভগিনী মীনাদেবী সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

না।

আপনি থিয়েটারের রাতে নিজের ঘরে শুয়েছিলেন, তাই না।

হ্যাঁ।

দুর্ঘটনার পর আপনাকে কে ডেকেছিল বলতে পারেন?

না।

আপনাকে ঘর থেকে ঢুকতে বা বার হতে সে রাতে কেউ দেখেছে?

তা বলতে পারব না।

আপনার ঘরের পাশে কে থাকে?

একজন চাকর।

কেন? চাকরদের ঘর বাইরের দিকে শুনলাম।

হ্যাঁ, তাই. তবে ভেতরের কাজ করে বলে এ এদিকেই থাকে।

চাকরের নাম কি.

রামবীর তেওয়ারী।

এ গ্রামে হরি কামার বলে কেউ আছে?

আজ্ঞে, কামার পাড়ায় থাকে।
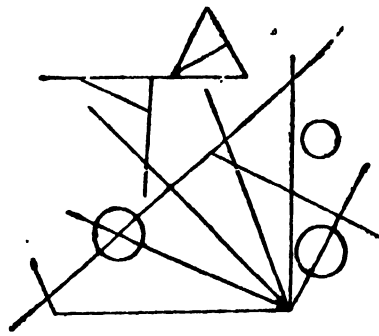
সে থিয়েটারের আগে কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

হ্যাঁ, একটা বৈষয়িক ব্যাপারে দেখা করেছিল আমার সঙ্গে।

এটা সুব্রতর প্রাক-মধ্যাহ্নভোজনের বেড়ানোর ফল বলেই মনে হ'ল আমার।

আপনি ভাল শিকারী বলে শুনেছি।

ভাল নয়, তবে ছোটবাবুর সঙ্গে শিকার করতে প্রায়ই যেতে হয়। অবশ্য কলেজে পড়বার সময় ট্রেনিং কোরে ছিলাম।

নায়েববাবু বিদায় নিলেন। আমি আর থাকতে না পেরে সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি করছ সুব্রত, যাকে জেরা করবে তাকেই ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে নাকি। কোন উত্তর দিল না সুব্রত। এ ত আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে, বলতে লাগলাম আমি, আসামী ধরতে গিয়ে তুমি জিনিসটাকে আরও ঘোলাটে করে তুলছ। মোটিভের ওপর জোর দিতে গিয়ে তোমার তালিকা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে গোটা গ্রামটাকে তুমি হয়ত অভিযুক্ত করে বসবে।

জবাব না দিয়ে সুব্রত শুধু দু কুঁচিত কার জানালার দিকে এসে মারণাস্ত্র তীরটার দিকে দেখতে লাগল একমনে। সুব্রতর দৃষ্টি স্থির, শ্বাসরুদ্ধ। সে যেন তীরটার আত্মকথা শুনছে। সুব্রত একবার ডানহাতের অনামিকা দিয়ে তীরটাকে আলতোভাবে স্পর্শ করল। ক্ষণভঙ্গুর আর মূল্যবান শিল্পবস্তু যেন নিষেধ সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে সে ছুঁয়ে নিল।

এখানেই সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করল। এরপর যেখানে থিয়েটার হয়েছিল সেখানে সুব্রতর সঙ্গে গেলাম আমরা। বাঁধা স্টেজ উঠানের মধ্যে। তার চারিদিকে বারান্দা দিয়ে ঘেরা। দোতলা চকমিলান বাড়ি। স্টেজের ঠিক বিপরীত দিকে দোতলার বারান্দা মেরামত হচ্ছে দেখলাম। জায়গাটা বাঁশের ভারা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। এবার সুব্রত একটা অদ্ভুত কাজ শুরু করল। একটা প্রকাণ্ড ফিতে নিয়ে একদিক রাহাকে ধরতে বলে সে নানা ধরণের মাপ নিতে লাগল। প্রথমে মাপা হ'ল উঠান, দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে। তারপর প্যাসেজ থেকে স্টেজের দূরত্ব নেওয়া হ'ল। সেই সঙ্গে স্টেজের খাড়াই আর স্ক্রীনের আয়তন। ছাদ থেকে ফিতে ফেলে দোতলার দৈর্ঘ্য নেওয়া হ'ল কয়েকবার কোণ, সমকোণ, সমান্তরাল, কতরকমের যে মাপ নেওয়া হ'ল তা লক্ষ্য করে আমাদের মাথা প্রায় গুলিয়ে গেল। আমাদের কথার কোন জবাব না দিয়ে সুব্রত এবার একটা কাগজ নানা ধরণের জ্যামিতিক রেখায় ভরিয়ে তুলল। সেই কাগজটা আমি সংগ্রহ করেছিলাম, এর একটা প্রতিলিপি তুলে দিলাম। সম্ভব অসম্ভব রেখাসম্বলিত কাগজটি সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সূর্যের ছটার মত কয়েকটা লাইন, মাঝে কতকগুলি বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত এবং কয়েকটা সমকোণ। তাছাড়া ত্রিভুজ আর সমান্তরাল রেখারও ছড়াছড়ি। কি যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। যাই হোক, ঘরে গিয়ে বসতেই সুব্রত বলল. তদন্তের শেষে তাহ'লে আমরা কাকে সন্দেহ করতে পারি।

তুমি আর আমি ছাড়া সকলকেই—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম আমি।

দারোয়ান পাঠকজী কি মারতে পারে না? প্রশ্ন করলেন মণিবাবু।

না—উত্তর দিল সুব্রত, মোটিভ থাকলেও এ ধরণের লোক ওরকম উপায় গ্রহণ করবে না। হয়ত ভীষণ রেগে চেঁচামেচি করবে, মনিবকে নালিশ করবে বা বড়জোর এক ঘা লাঠির বাড়িও দিতে পারে। কিন্তু স্টেজে অভিনয়কালে একজনকে তীরবিদ্ধ করবে, একথা অসম্ভব।

তাহ'লে সিঁড়ির ধনুকটা নিয়েছিল কেন?

ওটা সংগ্রহ করে রেখেছিল বটে কিন্তু ব্যবহার করে নি একথা নিশ্চিত বলা যায়।

তাহ'লে এ বনমালী নায়েবকে কাজে, ফণী রায়কে চিনতে পেরে সীতাংশু ওরফে বনমালী, অপমানের শোধ তুলল এও হতে পারে,—মণিবাবু সুব্রতর দিকে সমর্থনের আশায় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

না, মাথা নাড়ল সুব্রত, ভগিনীর অপমান এবং বংশের কলঙ্কের জন্য সীতাংশু দেশ-ত্যাগী হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু তার মত একজন শিক্ষিত লোক, ভদ্র আর কবি মন নিয়ে এ ধরণের প্রতিশোধ নিতে পারে না। হরশংকরের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি, এরপর হয়ত আরও কিছু জানতে পারা যাবে।

মধ্যাহ্ন আহারের পর সুব্রতকে ছুরি কামারের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে প্রশ্নটা সে এড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কয়েকটা চিঠি পোস্ট করার জন্য আমরা স্থানীয় ডাকঘরে গেলাম। পোস্টমাস্টারমশায় খুব আলাপী লোক, আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন; অবশ্য সুব্রতই তাঁকে কথা বলতে উৎসাহ দিতে লাগল বারবার। উদ্দেশ্যটা একটু পরেই বোঝা গেল। সত্যশংকরের বাড়ির সম্বন্ধে নতুন কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করল সে। মাস্টারমশায়ের কথামত সত্যশংকরের বাড়ি প্রেতাশ্রিত। আর হবেই না বা কেন, সত্যশংকর একজন মহাতান্ত্রিক, তাঁর বাড়িতে নানা ধরণের অলৌকিক ব্যাপার ঘটে থাকে একথা সকলেই জানে। মাস্টারমশায় নিজে যা দেখেছেন তা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। গভীর রাতে অন্ধকারে তিনি রায়বাড়িতে মশালের মত একটা আলো দেখতে পেয়েছেন। তাছাড়া একটা অস্বাভাবিক গোঙানীর আওয়াজ ঐ বাড়ি থেকে শুনতে পাওয়া যায় প্রায়ই। আওয়াজটা নিস্তব্ধ রাত্রে অজানা হিংস্র জন্তুর বলেই মনে হয়, শুনলে যে-কোন সাহসী লোকই ভয় পাবে, একথা বেশ জোর দিয়েই জানালেন। আমরা এদুদিনে অবশ্য কোন অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনি নি। পোস্টমাস্টার মশায়ের কথা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না, কারণ পল্লীগ্রামে এ ধরণের ভয়াবহ জনশ্রুতি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সুব্রত কিন্তু বেশ মনোযোগের সঙ্গেই কথা-গুলো শুনল।

ফিরতি পথে, ভুতের গল্প এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রথমে সে কোন উত্তরই দিল না। বুঝলাম সুব্রত আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে। কি হ'ল এত চিন্তা কিসের? জিজ্ঞাসা করলাম আমি, ভুতের গল্প শুনে অভিভূত হয়ে পড়লে যে!

না, আমি ভাবছি অন্য কথা—উত্তর দিল সুব্রত, রায়বাড়ীর আশে পাশে এত বেড়াল মরছে কি করে।

বেড়াল! আশ্চর্য হ'লাম আমি, কই আমি তো কিছু লক্ষ্য করি নি।

এই দেখ একটা, বলে উঠল সুব্রত।

সত্যিই একটা মরা বেড়াল পড়ে আছে। সেটাকে কে যেন মেরে ফেলে দিয়েছে রায়বাড়ীর মাঠের ধারে। পর পর কয়েকটা মরা বেড়াল দেখাল সুব্রত, সবগুলিরই রক্তাক্ত অবস্থা। আমি ডাক্তার, পোস্ট-মর্টেম রুমে কাজ করেছি; কতভাবে হত্যা করা যায় তার মোটামুটি একটা ধারণা আমার আছে। এ বেড়ালগুলোকে কেউ পিটিয়ে মারে নি, কোন ধারাল অস্ত্রাঘাতে এদের মারা হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এতগুলো বেড়ালকে এভাবে হত্যা করার কোন সংগত কারণ খুঁজে পেলাম না। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও সে চিন্তামগ্ন।

রায়বাড়ীতে ফেরার পর সুব্রত কলকাতার কয়েকটা চিঠি এবং টেলিগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চিঠিতে ভাল খবরই ছিল হয়ত, তা না'হলে হঠাৎ সুব্রতর মুড ভালর দিকে যেত না।

তদন্তের কাজ শুরু হ'ল আবার। হরশংকরের, অভিনয়ের রাতে শেষদৃশ্যের আগে উঠে যাবার কারণটা জানা গেল। সদ্যবিবাহিত যুবকের সারারাত উঠানে বসে থিয়েটার দেখতে ভাল লাগে নি।

এরপর এল রামব্রীজ। রামব্রীজের নাম আমরা আগেই শুনেছি এবার চাক্ষুস দেখলাম। প্রায় ছফুটের উপর লম্বা—মাথায় খোঁচা খোঁচা কদমছাট কাঁচাপাকা চুল—চোখ দুটো রক্তবর্ণ, দেখলেই ভয় হয়—যেন একটা নররূপী দৈত্য!

তোমার নাম কি? জিজ্ঞাসা করল সুব্রত।

রামব্রীজ তেওয়ারী, স্পষ্ট বাংলায় উত্তর।

বাড়ী কোন জেলায়?

আজমগড়।

কতদিন কাজ করছ?

তিরিশ বছর।

কি কাজ করতে হয়?

ঘরদোর ঝাড়ু দিই।

তুমি বাড়ীর ভিতর দিকে থাক কেন?

ভেতর বাড়ীর কাজই আমার করতে হয়, তাই।

গতরাতে একটা গোঙানির আওয়াজ শুনেছ?

হ্যাঁ, ভাঁড়ার ঘরে একটা ইঁদুর মারা হয়েছিল।

ইঁদুর না বেড়াল?

ইঁদুর, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল রামব্রীজ।

বাড়ীর আশেপাশে এত মরা বেড়াল কেন পড়ে থাকে, বলতে পার?

না।

কে ওগুলো মারে, তাও জান না?

না।

এ বাড়ীতে বেড়াল ঢুকলে কেন মারা হয় বলতে পার?

বেড়াল সব বাড়ীতেই থাকে হুজুর—কিন্তু এ বাড়ীতে এলে আর জ্যান্ত ফেরে না—সুব্রত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রামব্রীজের দিকে।

রামব্রীজ নিস্তব্ধ হয়ে কয়েকমুহূর্ত মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম সে অস্বস্তি বোধ করছে। রামব্রীজের পর সত্যশংকরকে ডাকতে মণিবাবু একটু তটস্থ হয়ে পড়লেন। হবারই কথা, এ অঞ্চলে সকলেই তাঁকে সমীহ করে চলে।

সত্যশংকরের পরনে এবার লালরঙের সুদৃশ্য বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক, শুভ্র চুল আর দাড়ি সুবিন্যস্ত। সত্যশংকর ধীর মন্থর পদক্ষেপে এসে চেয়ারে বসলেন। সুব্রত আর সত্যশংকর পরস্পরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কতদিন আপনার বিবাহ হয়েছে? হাস্যকর আর অবান্তর বলে মনে হ'ল সুব্রতর প্রশ্ন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন সত্যশংকর, বললেন স্পষ্টস্বরে—চল্লিশ বছর।

আপনার শ্বশুরমশায় কি আড়িয়া নলহাটির জমিদার ব্রজেশ্বর ঘোষ?

হ্যাঁ, অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন সত্যশংকর।

তাঁর একমাত্র সন্তান মনোরমা দেবীই কি আপনার স্ত্রী?

তাই।

তিনি কতদিন মারা গিয়েছেন?

সাতাশ বছর; কিন্তু এসব ব্যক্তিগত আর সাংসারিক প্রশ্ন করছেন কেন? সত্যশংকরের কণ্ঠে উষ্ণতার আভাস।

প্রয়োজন আছে, তাই—শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল সুব্রত; তা নাহলে কারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামায় না।

আর কিছু প্রশ্ন করবেন সত্যশংকর সোজা সুব্রতর দিকে তাকালেন।

আর দু'একটা রামব্রীজ আপনার কাছে কতদিন কাজ করছে?

প্রায় তিরিশ বছর হবে।

ও কোথা থেকে এসেছে?

রামব্রীজের বাড়ী বোধহয় বিহারে।

না, আমি জিজ্ঞাসা করছি ও কি আপনার শ্বশুরবাড়ীর চাকর?

হ্যাঁ, রামব্রীজ ওখান থেকেই এসেছে।

আপনার ভাইপো বিমলাশংকর ওরফে ফণী রায়কে থিয়েটারের দলে দেখে আপনি খুব বিরক্ত হয়েছিলেন একথা আমরা জানি; কিন্তু অভিনয়ের দিন সকালে তার সঙ্গে আপনার নির্জনে দেখা করার কি দরকার ছিল?

নিকট আত্মীয় বিপথগামী হ'লে তাকে সৎপথে ফেরাবার চেষ্টায় কোন অপরাধ আছে?

না, তা হয় না, উত্তর দিল সুব্রত

কিন্তু—কথাটা বলতে গিয়ে সুব্রত থেমে গেল।

থামলেন কেন, বলুন আপনার কি বলার আছে। সত্যশংকর এবার শান্তভাবে তাকালেন সুব্রতর দিকে।

না, এমন কিছু নয়, আমি আপনার তহবিল গরমিলের কথা ভাবছিলাম।

বুঝেছি, হাসলেন সত্যশংকর, তারপর মৃদুস্বরে বললেন—দেখুন, টাকাটাও আমার, ভাইপোও আমার; তাকে যদি সেটা আমি দিয়েই থাকি, তাহলে কারুর আপত্তি হওয়ার তো কথা নয়।

সুব্রত চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল—এবার আপনার কাছে একটা অনুরোধ করব।

বলুন।

আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আর একবার অভিনয় করি।

এতো খুব আনন্দের কথা। আপনার সখ আছে দেখে খুশী হ'লাম। আমি স্টেজ, ড্রেস সব ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি।

না, তার আর বিশেষ দরকার হবে না, সে ব্যবস্থা আমিই করেছি; তবে আমরা মাত্র একটি দৃশ্য অভিনয় করব।

[illegible] করবেন? হাসিমুখে তাকালেন সত্যশংকর।

না, আমরা বৃত্রাসুর বধের শেষদৃশ্য পুনরভিনয় করব।

কেন, তার কি প্রয়োজন—মুখের হাসি মিলিয়ে গেল সত্যশংকরের।

হ্যাঁ, তার প্রয়োজন আছে, সুব্রতর গলায় দৃঢ়তার আভাস।

কিন্তু শেষদৃশ্যতেই তো আগুন জ্বালা হয়েছিল। মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছে সত্যশংকরের, ভয় পেয়েছেন তিনি। উত্তেজনায় তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন—না, এ হ'তে পারে না, বললেন তিনি।

কেন, তাতে আপনার আপত্তি কি? এর আগেরবারও শেষদৃশ্যে আগুন জ্বালা হয়েছিল, তখন আপনি আপত্তি করেন নি কেন?

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সত্যশংকর। অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গেলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন— আমি জানতাম না যে স্টেজে আগুন জ্বালান হবে, তা'হলে তখনই অভিনয় বন্ধ করে দিতাম।

কিন্তু আপনার আপত্তির কারণটা জানালেন না।

আমার সব আপত্তি সকলকে জানাই না—দম্ভভরে কথাটা উচ্চারণ করলেন সত্যশংকর। তবে স্টেজে বা অন্য কোথাও আগুন জ্বালান চলবে না। কথাটা বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না, দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর ডাকা হ'ল হরি কামারকে। গ্রামের কামারপাড়ায় তার দোকান। বঁটি, কাটারি ইত্যাদি জিনিস সে নিজে তৈরি করে থাকে।

তোমার নাম হরিসাধন কর্মকার? প্রশ্ন শুরু করল সুব্রত।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার কাছে তীরের ফলা আছে?

না, তবে হুকুম করলে তৈরি করে দিতে পারি।

এর আগে কখনও তৈরি করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার তৈরি তীর রথের মেলায় খুব বিক্রী হয়ে থাকে।

সেগুলো কিসের তৈরি?

টিনের, উত্তর দিল হরি কামার।

স্টীলের তীর করতে পার?

হ্যাঁ, তাও করি; পাখী শিকার করতে অনেকেই নেয়।

এ বাড়ীর কারোর জন্য স্টীলের তীর তৈরি করেছ—?

প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল হরি কামার, বলল—রামরতীজের জন্য প্রায়ই করে হয়, তাই দিয়ে ও বেড়াল মারে।

বেড়াল মারে কেন?

ও বলে বেড়াল নাকি রোগ ছড়ায়; বেড়ালের ওপর ভীষণ রাগ রামরতীজের আবার হাসল হরি কামার।

রামরতীজ কি এখানে বরাবর থাকে, দেশে যায় না?

না, দেশে ও যায় না, বলে ওর কেউ নেই ওখানে। তবে দেশ থেকে ওর চিঠি আসে শুনেছি, হয়ত কোন আত্মীয় খোঁজ নেয় মাঝে মধ্যে।

এ তীরটা তুমি তৈরি করেছ—টেবিল থেকে তীরটা তুলে সুব্রত দেখাল হরি কামারকে।

হ্যাঁ, এটা আমারই হাতের তৈরি। রামরতীজ গ্রামোফোনের একটা স্প্রীং দিয়েছিল, তাই থেকে বানিয়েছি। সংগে সংগে উত্তর দিল হরি কামার।

হরি কামারকে বিদায় দেওয়া হ'ল। সব শুনে মণিবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন—আর আমরা অপেক্ষা করছি কেন।

কি করবেন? হেসে তাকাল সুব্রত মণিবাবুর দিকে।

অ্যারেস্ট করে ফেলি রামব্রীজকে—তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মণিবাবু।

ব্যস্ত কি, তার আগে অভিনয়টা করে ফেলি।

কিন্তু অভিনয় কেন করছেন, বুঝলাম না।

কেন, পুলিশের কাজ করি বলে শখ থাকতে নেই। সুব্রত উঠে পড়ল।

আমরা দুজনে ঘরে ফিরে গেলাম। সুব্রতর বেশ হাসিখুশি ভাব দেখলাম। তুমি কেন বৃত্রাসুর বধের শেষদৃশ্য অভিনয় করতে চাইছ, তা বুঝতে পেরেছি—বললাম আমি।

কেন বলত, সুব্রত তাকাল আমার দিকে।

ক্রাইম রিকনস্ট্রাক্ট করতে চাও তুমি; আগের ব্যাপারটা হুবহু পুনর্গঠিত করে তুমি আসামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাও।

থ্যাংক ইউ ওয়াটসন কিন্তু তাকে চিনব কেমন করে বলত।

আসামীর উত্তেজনা লক্ষ্য করে, উত্তর দিলাম আমি।

কিন্তু আসামী যদি উপস্থিত না থাকে—হাসিমুখে সুব্রত তাকিয়ে রইল আমার দিকে উত্তরের আশায়।

তাহ'লে এটা করছ কেন? উত্তর দিতে না পেরে প্রশ্ন করলাম আমি।

এক্সপেরিমেণ্ট করতে দোষ কি?

না, তা নেই তবে সন্দেহভাজনের তালিকা বড়ই হয়ে—। এমনিতে আটজন হয়ে গেছে।—সত্যশংকর হরশংকর, বনমালী নায়েব ওরফে সীতাংশু দত্ত, দারোয়ান, পাঠকজী, থিয়েটার ম্যানেজার বিধুভূষণ, অভিনেত্রী ফণী-প্রিয়া কমলা, ইন্দ্রবেশী কালীপদ এবং পরিশেষে রামব্রীজ। কি, কাকে ধরতে চাও? কৌতূহলভরে তাকালাম আমি সুব্রতর দিকে।

পুলিশ যদি সন্দেহ করে এই আটজনকেই ধরে, তাহ'লে দোষ দেওয়া যায় না—উত্তর দিলে সুব্রত।

তাহ'লে কি প্রসেজ অব এলিমিনেশন করবে?

না ডাক্তার, এ রোগের ডায়াগনিসিস নয় এ আলাদা জিনিস।

তাহ'লে পুনরাভিনয় করছ কেন?

হেসে ফেলল সুব্রত তারপর বলল—অভিনয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে, একথা অস্বীকার করছি না; এই পরিবেশে এবং সুযোগে কে ফণী রায়কে হত্যা করেছে তার কিছুটা হদিশ করতে পারব বলে আশা রাখি।

তাহ'লে সব সন্দেহভাজন লোককেই তুমি হাজির করবে?

নিশ্চয়, মায় থিয়েটার ম্যানেজার পর্যন্ত।

কিন্তু এই পুনরাভিনয়ে বিপদের আশঙ্কা থাকবে নাকি?

থাকবে, উত্তর দিল সুব্রত, সেদিক দিয়ে আমাদেরও যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। কথাটা বলে হঠাৎ সুব্রত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল গভীরভাবে।

কি হ'ল, আবার কি ভাবছ।

আমি ভাবছি রামব্রীজের কথা; কথা নেই বার্তা নেই খামোকা বেড়াল মারছে কেন লোকটা।

একটা অদ্ভুত খেয়াল বলতে পার, বললাম আমি, আমার এক পিসেমশাই রোজ ভোরে ছাদে উঠে বাড়িতে কটা কাক বসে তা গুণে নেন।

কারণ? হাসিমুখে সুব্রত তাকাল আমার দিকে।

কি মুশকিল, খেয়ালের আবার কারণ থাকে নাকি! রামব্রীজ বেড়াল অপছন্দ করে তাই সে সেগুলো মেরে ফেলে।

মাথা নাড়ল সুব্রত, না, আরও কিছু আছে। জমিদার বাড়ির চারদিকে মরা বেড়াল ছড়ানো আছে, একথা সকলেই এমনকি সত্যশঙ্কর নিজেও জানেন; তা সত্ত্বেও তাঁর মত একজন ধার্মিক লোক এটা হতে দিচ্ছেন কি করে। তাঁরই বাড়িতে তাঁরই একজন চাকর দিনের পর দিন কতকগুলো নিরীহ জীবকে অকারণে হত্যা করে যাচ্ছে আর তিনি কোন প্রতিবাদ করছেন না, এটা আমার অস্বাভাবিক লাগছে।

বেড়াল মারার সঙ্গে ফণী রায়ের মৃত্যুর কি সম্বন্ধ খুঁজে পেলে তুমি? প্রশ্ন করলাম আমি।

এখনও পাই নি, ছোট্ট করে উত্তর দিল সুব্রত তারপর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল পিছনের বারান্দায়। সামনেই দিগন্তব্যাপী মাঠ তারপরেই নদী। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পেরিয়ে গিয়েছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না আলো করে রেখেছে চতুর্দিক। অবাক হয়ে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেই দিকে। ডাক্তার, হঠাৎ বলে উঠল সুব্রত, তোমায় যদি এখন কোন ডাক্তারীর প্রশ্ন করি তাহলে তোমার কেমন লাগবে।

খুব খারাপ।

তাহ'লে বুঝতে পারছ পরিবেশের মূল্য কি।

তখন বুঝিনি তবে পরে বুঝেছিলাম।

পরেরদিন সকালে উঠেই সুব্রত তোড়জোড় লাগিয়ে দিল। প্রথমে আমরা সকলে জড় হ'লাম বৈঠকের জন্য। মণিবাবু, সুব্রত রাহা অপর একজন সহকারী এবং আমি। সুব্রত বলল—আপনারা সকলেই তদন্তের আদ্যোপান্ত শুনেছেন এবং সাহায্য করেছেন। দুঃখের বিষয় কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অভিনেতা ফণী রায়কে মারার মত মোটিভ আমরা যদি খুঁজি, তাহলে দেখতে পাব সব ক্ষেত্রেই তা রয়েছে; সত্যশংকর, তার ছেলে হরশংকর, সীতাংশু দত্ত ওরফে বনমালী নায়েব, অভিনেত্রী কমলা, দারোয়ান পাঠকজী, থিয়েটার ম্যানেজার বিধুভূষণ, ইন্দ্রবেশী কালীপদ এবং সব শেষে চাকর রামব্রীজ—এদের সকলেরই সুযোগ সুবিধা এবং খুঁজলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মোটিভও সবক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে। সব জিনিসটা তালিকাভুক্ত করলে এইরকম দাঁড়ায়—

সত্যশংকর বংশমর্যাদার জন্য।

হরশংকর—একই কারণে।

সীতাংশু ওরফে বনমালী—প্রতিশোধ নেবার জন্য।

অভিনেত্রী কমলা—ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে।

দারোয়ান পাঠকজী—কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য।

ম্যানেজার বিধুভূষণ—ফণী রায়ের ওপর জাতক্রোধ এবং টাকার জন্য।

রামব্রীজ—সত্যশংকরের আদেশে।

এবং ইন্দ্রবেশী কালীপদ—ব্যক্তিগত আক্রোশে।

এতে কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট নই। বস্তুত এ অবস্থায় আমরা প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছি। সেই কারণে আমি ফণী রায়ের হত্যার অবিকল পরিবেশটি ফিরিয়ে আনতে চাই—সুফলও হতে পারে আবার ব্যর্থ হওয়াও আশ্চর্য নয়। বিপদ আসারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তা সত্ত্বেও এছাড়া অন্য উপায়ও আমাদের নেই। থামল সুব্রত। মন দিয়ে আমরা সুব্রতর কথাগুলো শুনলাম। এবার আমার মনে হ'ল সত্যিই যেন আমরা খুনীর নাগালের মধ্যে এসে পড়েছি। অজানা আশঙ্কায় আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়লাম।

অভিনেতা নির্বাচন হয়ে গেল। সুব্রত—বৃত্রাসুর, রাহা—বৃত্রাসুর পত্নী, অপর একজন সহকারী—ইন্দ্র। মণিবাবু বা আমাকে অভিনয়ের মধ্যে নেওয়া হ'ল না। কারণটা একটু পরেই বোঝা গেল। এক-ফাঁকে সুব্রত আমাকে একটু নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বলল, আমরা স্ব-ইচ্ছায় একটা সংকট-জনক অবস্থার মধ্যে যাচ্ছি। অভিনয় করাটাকে একটা হাসির জিনিস বলে ধরে নিও না তাহ'লে বিপদ ঘটতে দেরী হবে না। এটা একটা সূক্ষ্ম পরীক্ষা।

তাহ'লে এ ঝুঁকি নিচ্ছ কেন? প্রশ্ন করলাম আমি।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ? আড়চোখে সুব্রত তাকাল আমার দিকে।

না, তা নয়, আমতা আমতা করলাম আমি।

এছাড়া অন্য উপায় নেই, থাকলে এ ঝুঁকি নিতাম না; বলতে লাগল সুব্রত, সে যাই হোক, আসামী কি ধরণের ব্যবহার

করবে তা আমাদের অজানা। সুতরাং খুব সাবধানে আমাদের চলতে হবে। অপরপক্ষ সর্বদা চেষ্টা করবে আমাদের সামান্য ত্রুটি বা অসাবধানতার সুযোগ নিতে; সেইজন্য আমি যে কথাগুলো তোমায় বলছি, মন দিয়ে সেগুলো শুনে রাখ—আমার প্রত্যেকটি উপদেশ আদেশ বলে ধরে নিতে হবে এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করাটা হবে তোমার কাজ. রাজী আছ?

ভয় পেলাম আমি তবু বললাম—হ্যাঁ, আমি রাজী।

নিম্নকণ্ঠে কয়েকটা কথা বলে দিল সুব্রত। মনে রেখো, বলল সুব্রত, তোমার যে কাজের ভার দিচ্ছি তার প্রধান উপকরণ হোল ধৈর্য আর একাগ্রতা—তার স্বরে সমস্ত জিনিসটার গুরুত্ব একনিমেষে আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠল। নিজেকে আমি সংগে সংগে প্রস্তুত করে নিলাম। কথাগুলো মনে গেঁথে রাখ, আবার বলল সুব্রত, অর্জুন যেমন লক্ষ্যভেদের সময় গাছ দেখতে পায় নি, পাখী দেখে নি শুধু দেখেছিল তার চোখ, তেমনি তুমিও অন্য কোনদিকে লক্ষ্য করবে না, ভ্রূক্ষেপ করবে না; তোমার লক্ষ্যবস্তুর ওপর দৃষ্টি স্থির করে রাখবে, অনথা যেন না হয়। সুব্রতকে আমি কথা দিলাম কারণ এখন আব পিছিয়ে আসার কোন প্রশ্ন ওঠে না। মণিবাবুকেও সুব্রত ঐ ধরণের কি যেন আদেশ দিয়ে দিল। লক্ষ্য করলাম, কথাগুলো শুনে মণিবাবু শক্ত আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

প্রায় বিকেলের দিকে থিয়েটার ম্যানেজার বিধুভূষণ সাজসরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হ'ল। সুব্রতকে পুলিশের লোক জেনে সে যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত আবার এখানে কল নিতে হ'ল, সুব্রত বলল বিধুভূষণকে।

আপনাদের কথা এড়াই কি করে। উত্তর দিল বিধুভূষণ।

সব জিনিস আনা হয়েছে?

হ্যাঁ সবই এনেছি।

বেশ; এবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, থিয়েটারের দিন সকালে ফণী রায় সত্যশংকরের সাথে দেখা করেছিল, একথা জান?

হ্যাঁ, তারপরেই তার সংগে আমার দেখা হয়েছিল।

তখন ফণী রায়ের মেজাজ কেমন ছিল?

খুব হাসিখুশী বলে মনে হচ্ছিল আমার।

ফণী রায় কিছু টাকা পেয়েছিল বলে আমরা সন্দেহ করছি।

চুরি! চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিধুভূষণের।

তা হয়ত নয়, উত্তর দিল সুব্রত, কিন্তু

টাকাটার হদিশ পাচ্ছি না. তুমি জান কিছু?

কত টাকা?

পাঁচ হাজার।

না, কিছুই জানি না। ভালমানুষের মত মুখভংগী করল ম্যানেজার বিধুভূষণ।

গতবার পুরো বই অভিনয় হয়েছিল?

না, আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৃত্রাসুর কয়েক লাইন বলেছে, ইন্দ্র কয়েকটা তীর ছুঁড়েছে, তারপর মশাল জ্বালতেই, এবং অদ্ভুত চীৎকার করে ফণী লুটিয়ে পড়ল স্টেজের ওপর।

অদ্ভুত চীৎকার—সুব্রত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ম্যানেজার বিধুভূষণের দিকে।

হ্যাঁ, ফণীর গলার আওয়াজটা আমি চিনতে পারি নি অথচ আমি স্টেজেই দাঁড়িয়ে!

বিধুভূষণ অভিনয়ের তদ্বির করতে চলে যাবার পর সুব্রত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—। কি হোল, জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

না, এমন কিছু নয়; ফণী রায়ের টাকাটা কোথায় গেল তাই ভাবছি। বিধুভূষণ আদর্শ চরিত্রের লোক নয়।

তাহলে ওকে অ্যারেস্ট করছ না কেন?

তা করলে হয় তবে একটা বিপদ হবে, আমাদের অভিনয়ে প্রম্পট করবে কে?

সুব্রতর মুখে হাসি দেখে বিরক্ত হলাম আমি।

অন্ধকার হয়ে এল। স্টেজ আগের মতই সাজান হয়েছে বলে সকলে অভিমত প্রকাশ করল। ম্যানেজার বিধুভূষণ পাকা লোক। সাজসজ্জার কোন খুঁত রাখে নি। বৃত্রাসুরের ভূমিকায় সুব্রতর সজ্জাটা দেখার মত। মাথায় জমকালো মুকুট, বুকে লাল ভেলভেটের ওপর চুমকি দেওয়া বর্ম, কোমরে লম্বা তলোয়ার ঝোলান; চোমরানো গোঁফ, চোখের তলায় সিঁদুরের রেখা আর কপালে একটা লাল টিপ। বৃত্রাসুরপত্নী হিসেবে রাহার সজ্জাও ভাল। বিধুভূষণ তাকে, সুন্দর শাড়ী, অলঙ্কার আর মেকাপ দিয়ে পৌরাণিক যুগের অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী বানিয়েছে। ম্যানেজার বিধুভূষণ বই নিয়ে উইংসের পাশে তার নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়াল।

এবার অভিনয় শুরু হবে। প্রথম ঘণ্টা পড়ল, এটাই ছিল আমাদের প্রস্তুতির সংকেত। স্টেজ থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম, শুধু অভিনেতারা আর বিধুভূষণই রয়ে গেল সেখানে। কে যে কোথায় চলে গেল বুঝলাম না তবে আমি গন্তব্য পথের দিকে চললাম। উঠান পেরিয়ে পশ্চিমের দালান, তারপর মাঝের প্যাসেজ যা চলন রাস্তা পার হয়ে বনমালী নায়েব ও রামব্রীজের ঘরের পাশে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার পশ্চিমদিকের বারান্দায় পৌঁছলাম। এটাই আমার গন্তব্যস্থান। বাড়ীর নক্সাটা একটু জানা দরকার। আগেকার জমিদার বাড়ী যেমন হয়ে থাকে সেরকমই প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীতে দুটো উঠান—একটা বাইরের অর্থাৎ যেটায় স্টেজে অভিনয় হয়েছিল, অপরটা অন্দরের। উঠানের চারিদিকে দালান এবং দু তলাই বারান্দা দিয়ে ঘেরা। তার কোল ঘেঁষে অনেকগুলো ঘর। নীচের দালানের মাঝে, পূর্বদিকে বাইরে যাবার এবং পশ্চিমদিকে অন্দরে যাবার রাস্তা। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দোতলার সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ি দিয়েই আমি পশ্চিমের বারান্দায়

...লোছ। ...

...এখানে বলা যাবে। বারান্দা থেকে পরিষ্কারভাবে চারিদিক দেখা যায়। উঠানে বেশ কয়েকজন চেয়ারে বসে আছে দেখলাম। তার মধ্যে সত্যশংকর, তার পাশে হরশংকর ও মণিবাবু; অপর পাশে রামব্রীজ, পাঠকজী, নায়েবমশায় এবং কয়েকজন সিপাহী। এছাড়া অনেক নতুন লোক এসেছে বলে মনে হ'ল। সুব্রত এদের কলকাতা থেকে আনিয়ে নিয়ে থাকবে। চতুর্দিকে এরা ছড়িয়ে আছে। দরজার কাছে, স্টেজের আশেপাশে, প্যাসেজ ঘেঁষে এবং বারান্দায়। উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠা এদের মুখে এবং ভাবভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। সকলের মুখে দৃঢ়তার আভাস। সকলেই অপেক্ষা করছে একাগ্রচিত্তে নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য।

তৃতীয় ঘণ্টা বাজল। আর দেখা হল না কারণ আদেশ অনুযায়ী তৃতীয় ঘণ্টার পর লক্ষ্যবস্তুর ওপর আমাকে তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যও অন্যদিকে তাকাতে পারব না। কান রইল কিন্তু স্টেজের দিকে। শুরু হ'ল বৃত্রাসুর বধের শেষদৃশ্য। সুব্রতর গলার স্বর শুনতে পেলাম স্পষ্ট—

—কহ দেবী কি বা প্রয়োজন তব—রাহার কণ্ঠে বৃত্রাসুর পত্নীর নিবেদন শেষ হ'ল। আবার শোনা গেল সুব্রতর গলায় বীরদর্পের আস্ফালন—

সমরে জিনিব আমি ত্রিভুবন নাশি
শালপ্রাংশু সম ভুজ।
যাক বিশ্ব রেণু রেণু হয়ে
রসাতলে পাঠাইব নন্দন কানন॥
থরথর কাঁপিবে মেদিনী
উর্বশী হইবে সখী কিংকরী তোমার।

আবার রাহার কণ্ঠস্বর—বৃত্রাসুর পত্নী স্বামীকে বাধা দিয়ে বলছে, না প্রভু, তুমি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না, দেবরাজ ইন্দ্র আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে তোমায় হত্যা করবে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর রণদামামা বেজে উঠল। বুঝলাম এবারে যুদ্ধ শুরু হবে। বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে পেলাম। রণবাদ্য সমানেই বেজে চলেছে। হঠাৎ মনে হ'ল একঝলক আলো যেন স্টেজের উপর এসে পড়েছে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার উপায় নেই। সত্যশংকরের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, চীৎকার করে বলছেন তিনি—বন্ধ কর, নিভিয়ে দাও, আগুন নিভিয়ে দাও। সেই সংগে রামব্রীজের হুংকারও শোনা গেল। জোর গলায় সেও প্রতিবাদ করে চলেছে। অভিনয় কিন্তু বন্ধ হ'ল না। সব চীৎকার মিলিয়ে একটা তুমুল কলরোল উঠল। আমি সেদিকে তাকাতে পারছি না। সুব্রতর সতর্কবাণীর কথা বারবার মনে পড়ছে। আমারই ওপর ...

... ওদের মধ্যে যে কোন লোকই প্রাণ হারাতে পারে। সব তুচ্ছ করে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ঐ একটি দিকে পূর্বদিকের দোতলার জানালার দিকে। জানলাটা স্টেজের ঠিক ওপরে। এটার ওপর দৃষ্টি রাখাই আমার কাজ। উঠোন থেকে সত্যশংকরের বজ্রকণ্ঠের আদেশ, রামব্রীজের চীৎকার, অভিনেতাদের জোর গলায় বক্তৃতা ও তার সংগে রণবাদ্যের প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওকি! পূর্বদিকের জানলাটা খুলছে না? হ্যাঁ খুলে যাচ্ছে, একটা পাল্লা বাইরের দিকে এগিয়ে আসছে খুব ধীরে ধীরে। না, কোন ভুল নেই, আরও ফাঁক হয়ে গিয়েছে। ওকি, একটা তীরের ফলা যে! সুব্রত, চীৎকার করে উঠলাম প্রাণপণে। ঝকঝক করে ঝলক দিয়ে তীরটা সাঁ করে বেরিয়ে এল একনিমেষে। সংগে সংগে সব যেন ওলট পালট হয়ে গেল। স্টেজের দিকে তাকালাম ভয়ে ভয়ে। ঠিক সময়ে কি সতর্ক করতে পেরেছি সুব্রতকে? না—তার হাতের জ্বলন্ত ...

সকলে মিলে ছুটতে লাগলাম

... লুটিয়ে পড়েছে স্টেজের ওপর। হয়ত একটু দেরী হয়েছে। আমার ভুলের জন্যই বিপর্যয় ঘটে গেল। লাফ দিয়ে সিঁড়িগুলো কোন রকমে পেরিয়ে স্টেজে গিয়ে পৌঁছলাম। না, সুব্রত বেঁচে গিয়েছে। তীরটা তার গায়ে লাগেনি। উঠে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার করে বলল—দেরী করো না, চল আমার সংগে। সকলে মিলে ছুটতে লাগলাম তার সংগে ভেতরের দিকে। প্যাসেজ পেরিয়ে অন্দরের উঠানের খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানে নামলাম। জায়গাটাকে বাগান বলা ভুল হবে, জংগল বলাই উচিত। চতুর্দিকে অন্ধকার—। আগাছা আর ঝোপের মধ্যে দিয়ে আমরা ছুটে চললাম। লক্ষ্য করলাম আমাদের পিছনে রামব্রীজও ছুটে চলেছে প্রাণপণে। একটা ছোট্ট সিঁড়ি সামনে তার লতাগাছ আর ঝোপ দিয়ে প্রায় ঢাকা। সেইটে দিয়ে আমরা সকলে ওপরে উঠলাম। আগের লোক সুব্রতর আদেশে ঘরের তালা ভেঙে ফেলল। অন্ধকার ছোট একটা কামরা। টর্চের আলোতে যা দেখলাম তাতে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা।

দুএকজন পুলিশের লোকও আতংকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। সামনে যাকে দেখলাম তাকে জন্তু বলেই প্রথমে মনে হ'ল। মাথাটা নুয়ে প্রায় বুকের কাছে এসে পড়েছে। মুখের চিহ্ন নেই শুধু লম্বা দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে নাকের জায়গায় দুটো বড় ছিদ্র। কান দুটো [illegible]—মাথা বা ভ্রূতে চুলের লেশ নেই। ভীষণ রকমের কুৎসিত। ভালভাবে সব দেহটা লক্ষ্য করে বুঝলাম সেটা জন্তু নয়, মানুষ। আমি ডাক্তার, তবুও মানুষ বলে চিনতে দেরী হ'ল আমার! এতক্ষণে বুঝলাম অল্পবয়সে সাংঘাতিকভাবে তার সর্বাংগ পুড়ে গিয়েছিল তাই এই অবস্থা হয়েছে। মাংস চামড়া সব পুড়ে দলা পাকিয়ে গিয়েছে। থুতনির আর গলার চামড়া বুকের সংগে মিশে যাওয়াতে মাথাটা বন্যজন্তুর অনুকরণে বাঁকিয়ে রয়েছে একভাবে। হাসপাতালে কাজ করার সময় অনেক রকমের রুগী দেখেছি কিন্তু বীভৎসতায় এর তুলনা মেলে না। রামব্রীজই আগে পোঁছেছিল। তাকে জড়িয়ে ধরে সে একটা অমানুষিক আর অদ্ভুত চীৎকার করতে লাগল। একটানা আওয়াজটা শুনলে যে কোন সাহসী লোকেরও হৃৎকম্প হবে। ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করে দেখলাম। কামরাটা ছোট কিন্তু অপরিষ্কার নয়। একটা লোহার খাটে বিছানা পাতা কিন্তু ওপরের চাদরটা ছিন্নভিন্ন করে মেঝেতে ছড়ান। বুঝলাম ওটা অমানুষিক ক্রোধের ফল। কোণের টেবিলের ওপর লক্ষ্য করলাম কয়েকটা

পুতুল। তুলোর খরগোশ আর কাঠের ঘোড়া রয়েছে।

বাবুজী, রামব্রীজের গলা—

এ কে জিজ্ঞাসা করল সুব্রত।

আমিই সব বলছি—পিছনে সত্যশংকর এসে দাঁড়িয়েছেন। আপনারা বসবার ঘরে আসুন।

আমরা ফিরে চললাম নীচের ঘরে। তখনও সমানে হয়ে চলেছে সেই অস্বাভাবিক লোমহর্ষক আওয়াজটা। সকলে এসে জড়ো হলাম নীচের বৈঠকখানায়। সত্যশংকরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কোন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা গেল না। প্রসন্ন, সৌম্যমূর্তি, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই সেখানে। সুব্রতকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে লাগলেন— আপনি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক খবরই সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু সেটা অসম্পূর্ণ। আপনি অবশ্য সূত্রটা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। সব জিনিসটা শুনতে আবার বিবাহ থেকেই শুরু করতে হয়। আমার বিবাহ হয়েছিল, আড়িয়া নলহাটীর জমিদার ব্রজেশ্বর ঘোষের একমাত্র কন্যা মনোরমা দেবীর সংগে। আমার শ্বশুরমশায়ের অগাধ সম্পত্তি ছিল। উইলে তিনি সব সম্পত্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তখনও কিন্তু আমাদের কোন সন্তান হয় নি। তিন বৎসর পর আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলেন। সেদিনের কথা আমার আজও মনে আছে। কত আকুল আগ্রহেই না অপেক্ষা করেছিলাম। একটু পরেই খবর পেলাম আমি সন্তানলাভ করেছি। শংখধ্বনি আর আনন্দের কোলাহলে মুখরিত হ'ল চতুর্দিক। প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার এক সংবাদ এল, আরও একটি সন্তান প্রসব করেছেন আমার স্ত্রী। এটিও পুত্র; যমজ পুত্র সন্তান লাভ করলাম আমি। জ্যেষ্ঠ তার ভাইয়ের চেয়ে মাত্র আধঘণ্টার বড়। কিন্তু তবু বড়, এবং সেই হিসেবে আমার শ্বশুরমশায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'ল সে। বড় ছেলে হরশঙ্কর আর ছোটছেলে উমাশঙ্কর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলেন তিনি, যমজ সন্তান প্রসব করার পর আমার স্ত্রীর শরীর কিন্তু ভেংগে গেল। তিনি শয্যাশায়ী হলেন। কিছুদিন রোগভোগের পর যখন মারা গেলেন তখন আমার পুত্রদের বয়স দু'বছর। এই সময় খোকাদের দেখার জন্যে আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে একটা ছোট্ট চাকর এসেছিল, তার নাম রামব্রীজ। আমার জীবনযাত্রা সাধারণ থেকে একটু পৃথক তা হয়ত আপনারা লক্ষ্য করেছেন। বেশীরভাগ সময়ই আমার কাটত পুজোঅর্চনা নিয়ে। হঠাৎ এক বিপর্যয় হয়ে গেল। দুর্ঘটনা ঘটল আমার স্ত্রীর শ্রাদ্ধের রাত্রে। শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্মের জন্য প্রকাণ্ড একটা হোগলার আটচালা বাঁধা হয়েছিল। শ্রাদ্ধের কাজ হয়ে যাবার পর জায়গাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তুমুল গোলমালের শব্দ শুনে কালীঘর থেকে বাইরে এসে দেখলাম হোগলার আটচালা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সর্বনাশ, খোকারা কোথায়? ছোটটি আমার কাছেই ছিল। কিন্তু বড়টি কোথায় গেল? চীৎকার করে রামব্রীজকে ডাকতে লাগলাম পাগলের মত। একটু পরেই তারা এল। রামব্রীজের কোলে বড় খোকা; সে পুড়ে গিয়েছে। শীতকাল, তায় গায়ে তার মোটা জামা ছিল; সেগুলো খুলতে খুলতেই অনেকটা পুড়ে গিয়েছে। মুখ, হাত, পা, বুকের বেশ কিছুটা অংশ। বুঝলাম ও আর বাঁচবে না। কিন্তু ঐ বিপদেও আমার জমিদারী-মন সজাগ রয়েছে। বড়ছেলে শ্বশুরমশায়ের সম্পত্তি পাবে সেটা সবাই জানে, কিন্তু যমজ ছেলে, কোনটি বড় আর কোনটি ছোট তা আমি আর রামব্রীজ ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। তাই রটিয়ে দিলাম ছোটছেলেই পুড়েছে। সেইসংগে নামটাও পাল্টে দিলাম; ছোটছেলে উমাশংকর বড় হতে লাগল হরশংকর বলে। প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলাম, ছেলেটা বাঁচবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার চিকিৎসার সুফলেই হোক বা রামব্রীজের অক্লান্ত সেবা আর তার নিজের আয়ুর জোরেই হোক, ছেলেটা বেঁচে গেল। এটা একটা সাংঘাতিক বিপদ হ'ল আমার পক্ষে। লোকচক্ষুর সামনে যে ওকে আনা যায় না তা আপনারাই দেখে বুঝেছেন। অত বীভৎস চেহারা দেখা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস। রামব্রীজই ওর কাছে সব হয়ে দাঁড়াল ওকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য আমি পূর্বদিকের ঐ ঘরটা তৈরি করে দিলাম। তার আলাদা সিঁড়ি হ'ল, অন্দর দিয়ে তার আলাদা রাস্তা। পিছনের বাগান বা খিড়কির দরজা স্পর্শ করা নিষেধ ছিল।

কিন্তু ওর সম্বন্ধে কেউ জানতে চাইত না? এতক্ষণ পরে প্রশ্ন করল সুব্রত।

অনেকেই কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছে বই কি। তারা সবাই জানে আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় পাগল অবস্থায় ওখানে থাকে।

মাঝে মাঝে রাত্রে ওখানে আলো জ্বলে আর খুব চীৎকার হয় বলে শুনেছি—

আবার বলল সুব্রত।

ঠিকই শুনেছেন; তাহলে কিভাবে ও পুড়েছিল সেটা আগে বলি শুনুন—

হোগলার আটচালায় একটা বড় প্রদীপ জ্বলছিল। কোন ফাঁকে একটা বেড়াল এসে সেটা উল্টে দেয়; তার ফলেই সেই অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল। সেই থেকে ছেলেটা বেড়াল বা আগুন দেখলেই খেপে যায়। সেইজন্য রামব্রীজ বেড়াল মারে আর আমি আগুন জ্বলতে নিষেধ করি। চুপ করলেন সত্যশংকর। ঘরটা অকস্মাৎ যেন খুব নিস্তব্ধ বোধ হ'ল।

মনের দিক দিয়ে কি ও স্বাভাবিক? জিজ্ঞাসা করল সুব্রত।

না, ওর কোন জ্ঞানই নেই। এমন কি রামব্রীজ ছাড়া আর কাউকেই চেনে না। মন আর দেহের ওপর অকস্মাৎ আঘাতে ও অস্বাভাবিক হয়ে গেল; বয়সে বড় হ'ল বটে কিন্তু মনে ও শিশুই রয়ে গেল। তাই ওর টেবিলে পুতুল আর অন্য খেলনা সাজান থাকে ওকে ভোলাবার জন্য।

অভিনয়ের রাত্রে কি হয়েছিল জানেন? প্রশ্ন করল সুব্রত।

জানি, আমি আগেই বলেছি, ও বেড়াল আর আগুনকে ভয় করে। শুধু ভয় নয় বেড়াল আর আগুন দেখলে ও ক্ষেপে যায়। তখন ওকে সামলান শক্ত হয়ে পড়ে। রামব্রীজের মত সবল লোকও ঘায়েল হয়ে যায় তাকে সামলাতে। অভিনয়ের রাতে রামব্রীজ জানাল, অত আলো দেখে খোকা ক্ষেপে গিয়েছে। আমি তাকে বললাম যে, আগুন যখন নেই তখন ও শান্তই থাকবে। কিন্তু শেষদৃশ্যে জ্বলন্ত মশাল দেখে আমি কাকে যেন আগুন নিভিয়ে দিতে বললাম। সকলে ভাবল বাড়ীতে আগুন লাগবার ভয়ে বুঝি আমি ঐ কথা বলছি। অনেকে আশ্বাস দিল আর আমিও ভাবলাম এত রাতে হয়ত সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যশংকরবাবু চুপ করলেন।

তারপর?

তারপর, অভিনয় চলতে লাগল। বৃত্রাসুর আর ইন্দ্রের যুদ্ধ শুরু হ'ল। হঠাৎ দেখলাম একটা তীর এসে বৃত্রাসুরের বুকে বিঁধল। তখনই বুঝলাম সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

আপনি ফণী রায় মানে বিমলাশংকরকে অভিনয়ের দিন টাকা দিয়েছিলেন?

দিয়েছি, শয়তানটা পুবের ঘর সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। তা নিয়ে হৈ চৈ হলে মামলা মোকদ্দমার হাংগামায় জড়িয়ে পড়তে হ'ত।

তাহ'লে তবিলের গরমিল হয় নি?

না, টাকাটা ওর মুখ বন্ধ করতে গেল।

বনমালী কি পুবের ঘরের রহস্যের কথা জানত?

হ্যাঁ, ওকে আমি বলেছি, ওর মত সৎ আর উদার লোক আমি কমই দেখেছি। আমার কর্মচারী হলেও ওকে আমি শ্রদ্ধা করি।

তা'হলে টাকার কথা ওর কাছে গোপন করেছিলেন কেন?

বনমালী জানলে এতগুলো টাকা আমায় খরচ করতে দিত না। উঠে দাঁড়ালেন সত্যশংকর।

আপনার অনুরোধ কিন্তু আমি রাখতে পারিনি শেষ পর্যন্ত, উঠে দাঁড়াল সুব্রত।

আপনার কর্তব্য আপনি করেছেন; প্রতিপক্ষ হলেও আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রশংসা করি আমি। কথাটা বলে সত্যশঙ্কর মন্থরগতিতে বেরিয়ে গেলেন। একঝলক উজ্জ্বল আলো যেন তাঁর সঙ্গে অন্তর্হিত হ'ল।

আপনি কিন্তু ব্যাপারটা সব জানতেন, এবার অনুযোগ করলেন মণিবাবু।

না, ঠিক জানতাম না, তবে অনুমান করেছিলাম মাত্র। প্রথমে সদ্যমৃত আর রক্তাক্ত অতগুলো বেড়াল আমাকে চিন্তিত করেছিল। সেই সূত্র ধরে পোস্টমাস্টার মশায়ের, জমিদার বাড়ীর ভৌতিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প শুনে এবং তার সঙ্গে হরি কামারের সাক্ষ্যে ভিত্তি করে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছিল। প্রথমে হ'ল, রামব্রীজ বেড়াল মারে কেন? লোকটা পাগল নয় তা আমরা জেনেছি। তাছাড়া সত্যশঙ্করের অগোচরে বেড়াল বধ হয় না। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি তাঁরই ইচ্ছায় এ কাজটা হচ্ছে। কিন্তু কার জন্য হচ্ছে? সত্যশঙ্কর বা হরশঙ্করের বেড়ালের ওপর কোন বীতরাগ নেই বলেই আমরা জানি। তাহলে নিশ্চয় অলক্ষ্যে অবস্থিত একজন তৃতীয় ব্যক্তির খেয়ালখুশী চরিতার্থ করবার জন্য স্বাভাবিক ও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এটা করেছে তা ধরে নেওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, রামব্রীজ চাকর হয়েও বাইরে চাকরদের ঘরে থাকে না কেন? সে বলেছে তার কাজ ভেতরে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছি অন্দরের কাজ ঝিয়েরাই করে থাকে। তাহ'লে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এই বাড়ীতে রামব্রীজের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। চাকর হয়েও সে নায়েববাবুর ঘরের পাশে স্থান পেয়েছে। অথচ সত্যশংকর বা হরশঙ্করের খাসবেয়ারা সে নয়, অন্য লোক বহাল আছে সেখানে। তাছাড়া ম্যানেজার বিধুভূষণের কথায়, ফণী একটা অদ্ভুত চীৎকার করে স্টেজে পড়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত শব্দটি ফণী করে নি, বলেই আমার মনে হয়। প্রচণ্ড ক্রোধের অমানুষিক আওয়াজ এটা। আমাকে তীর মারবার সময়ও সেটা শুনেছি কারণ জানলা আমার সামনেই ছিল। তৃতীয় প্রশ্নটি জেগেছিল, ফণী রায়ের বুকে তীর বেঁধার ভঙ্গী দেখে।

এরজন্যই কি তুমি নানা-রকমের মাপ নিয়ে সেই জ্যামিতিক রেখা-গুলো এঁকেছিলে? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

হ্যাঁ; কোনদিক থেকে তীরটা এসেছিল সেইটেই আমার চিন্তায় ফেলেছিল। বৃত্রাসুরে অর্থাৎ ফণী রায় সেই সময় স্টেজে কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সেটা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য। সে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমদিকের উইংসের পাশ ঘেঁষে। দ্বিতীয়বার অভিনয়ের সময় আমিও ঠিক ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম। তাহ'লে তার পিছন দিকে ছিল উত্তর-পশ্চিম কোণ আর সামনে ছিল পূব-দক্ষিণ কোণ। পশ্চিমদিক থেকে তীর ছুঁড়লে ফণী রায়ের পিঠে সেটা লাগত; দক্ষিণদিকের বারান্দা থেকে মারলে সেটা ফণী রায়ের ডান অঙ্গে লাগত কারণ তার ডানদিক সেই দিকেই ফেরান ছিল; উত্তরদিকের কথা বাদ দেওয়াই ভাল কারণ একে সেটা স্টেজের পেছনদিক তায় উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা; পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে ভিড় ও লোক চলাচলের পথ; সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চয় মারা হয় নি। তাহ'লে সবদিক বাদ দিলে আমরা একটা জায়গা পাচ্ছি—সেটা হল পূর্বদিকের একতলা এবং দোতলার ওপর নীচে দুটো ঘর। একতলার ঘরটা আমি দেখেছি; ওটা একটা গুদাম, দরজায় মোটা তালা ঝোলান। কব্জাগুলো মরচে ধরা আর মাকড়সার জালে ভর্তি। দেখেই বুঝলাম ওতে কেউ হাত দেয় না। বাকী রইল পূর্বদিকের দোতলার ঘর। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হ'ল যখন আমি অনেক চেষ্টার পরও ওর প্রবেশপথ খুঁজে পেলাম না। আর ডাক্তার, সুব্রত এবার আমায় লক্ষ্য করে বলতে লাগল, এবার বোধহয় পরিবেশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা তুমি বুঝেছ। পুনরভিনয় না করলে আমরা ঠিক লোকটির সন্ধান পেতাম না।

কিন্তু দারুণ ঝুঁকি নিয়েছিলে তুমি, বললাম আমি।

তা হয়ত নিয়েছি, কিন্তু তোমায় ধন্যবাদ জানাই; ঠিক সময়ে তোমার চীৎকার না শুনলে আরও একটি বৃত্রাসুর বধ হত।

সত্যিই অমন পরিত্রাহি চীৎকার এর আগে আমি কখনও করি নি বলে মনে হোল।

॥ সমাপ্ত ॥

যে আঁখিগুলিকে আমি

[টি, এস, এলিয়টের কবিতা]

খণ্ডতার মধ্য দিয়ে যে-আঁখিগুলিকে
শেষবার আমি অশ্রু মাখতে দেখেছিলুম,
তাদের সেই সোনালী দৃশ্য পুনরায় ওঠে ভেসে
এখানে, মৃত্যুর এই স্বপ্নলীন দেশে ;
চোখগুলিকে দেখি, কিন্তু অশ্রু আজ অদৃষ্টিগোচর—
এটাই আমার যত কষ্টের আকর।

আমার যন্ত্রণার কারণ এই—
আঁখিগুলিকে আর আমি দেখতে পাব না,
সিদ্ধান্তপূর্ণ সেই চক্ষুগুলি ;
তাদের আমি দেখতে পাব না, একমাত্র
মৃত্যুর অন্য রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে ছাড়া :
সেইখানে, যেমন এখানে,
আরো কিছু বেশি সময় আঁখিগুলি থাকে টিকে
আরো কিছু বেশি কাল ধ'রে অশ্রুগুলি ঝরে
এবং আমাদের রাখে হাস্যাস্পদ ক'রে ॥

অনুবাদক—মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমান

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শত্রুকে পরাজিত করে বিষ্ণুপুর এবং অন্যান্য স্থান বর্ধমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পর বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ যে বারোটি বিজয়তোরণ নির্মাণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে এই একটিমাত্রই আজ অবশিষ্ট আছে।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
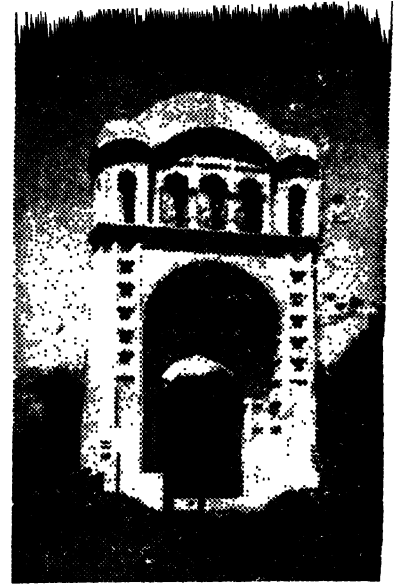
খারবারী প্রবেশপথ

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক চতুর্বিংশ ও শেষ জৈন ধর্মপ্রবর্তক বর্ধমান বা মহাবীর স্বামী বাঙলায় এসে ধর্মপ্রচার করায় তাঁর নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হয়। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় এই স্থানকে গঙ্গারিদই, গঙ্গারিডি (গঙ্গা-রাঢ়ী) বলা হয়। মেগাস্থিনিসের সময় গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী মেদিনীপুর, ভরশুট, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানগুলি গঙ্গা, রিডি বা গঙ্গারাষ্ট্র নামে অভিহিত হয়েছিল। পরে গঙ্গারাষ্ট্রের গঙ্গা পরিত্যক্ত হয়ে শুধু রাষ্ট্র হয়। রাষ্ট্র থেকে 'রাঢ়' কথার প্রচলন হয়।

---বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র।

ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ় দেশের মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রাম বা নগরের উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে বর্ধমান, অম্বিকা, পারুল, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি অন্যতম।

প্রাচীন গ্রন্থে এ ছাড়া বর্ধমানের নাম পাওয়া যায় না। এর অনেক পরে মুসলমানদের ইতিহাসে বর্ধমানের নাম সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ১৫৭৪ খৃস্টাব্দে।

এই সালে বাঙলার শেষ পাঠান-রাজ দায়ুদ খাঁ রাজমহলে সম্রাট অকবরের সৈন্য কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হলে তাঁর পলায়িত পরিবারবর্গ বর্ধমানে ধৃত হয়। এর প্রায় দশ বছর পরে এই দেশে দায়ুদ-পুত্র কুতুর সঙ্গে মোগল সৈন্যের অনেকবার সংঘর্ষ হয়। এরও উল্লেখ আছে ইতিহাসে।

তারপর ১৬২৪ খৃস্টাব্দে যুবরাজ খুরম যিনি পরে শাহজাহান নামে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন, তিনি বর্ধমানের দুর্গ ও শহর আক্রমণ করে অধিকার করেন। তাঁরই সময়ে বা কিছু পরে আবু রায় কপুর নামে এক ক্ষত্রিয় লাহোর থেকে বাণিজ্য উপলক্ষে বর্ধমানে এসে বাস করেন। ইনি বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ। কালক্রমে ইনি মোগল সরকারের নজরে পড়েন এবং ১৬৫৭ সালে মোগল সম্রাটের পক্ষ থেকে রেকাববাজারের চৌধুরী ও কোতোয়ালরূপে স্থানীয় ফৌজদার কর্তৃক নিযুক্ত হন। এঁর পুত্র বাবু রায় বর্ধমান পরগণা ও সন্নিকটস্থ তিন মহালের জমিদারী ক্রয় করে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর পুত্র ঘনশ্যাম রায়। তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম রায় আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সনদ পান।

১৬৯৬ খৃঃ জেতুয়া ও বরদার তালুকদার শোভা সিংহ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে রহিম খাঁ নামে জনৈক পাঠান সামন্তের সাহায্যে কৃষ্ণরামকে নিহত করেন ও তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী করেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম কোনক্রমে গোপনে ঢাকায় পালিয়ে যান। শোভা সিংহ কৃষ্ণরামের কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি দিলে উক্ত কন্যা কৌশলে শোভা সিংহকে ছোরার আঘাতে বিদ্ধ করে নিহত করেন। জগৎরাম ঢাকা থেকে ফিরে এসে মোগলের সাহায্যে পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন।

১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্গিগণ বর্ধমান জেলায় উপস্থিত হয়ে কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করে। জগৎরাম ও বিষ্ণুপুরের রাজা তাদের বিতাড়িত করবার জন্যে মুর্শিদাবাদের নবাবকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও এক বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা ১৭০২ খৃঃ তিনি নিহত হন।

জগৎরামের দেহান্তর ঘটলে তাঁর পুত্র কীর্তিচন্দ্র উত্তরাধিকারী হন। ইনি পিতামহ কৃষ্ণরামের হত্যাকারী শোভা সিংহের ভাই হিম্মৎ সিংহের ও বর্ধমানের [illegible] দুজন বি[illegible] নেতা মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার জমীদার রঘুনাথ সিংহ ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহকে পরাস্ত করেন। ইনি নিজ [illegible] রা[illegible] বি[illegible]র করেন। ১৭৪০ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

কীর্তিচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র চিত্রসেন

রায় (১৭৪০-১৭৪৪) রাজপদে বসেন ও রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ইনিই প্রথম সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক 'রাজা' উপাধি পান।

চিত্রসেনের মৃত্যুর পর তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা তিলকচাঁদের (১৭৪৪-'৭১) সময় বর্ধমান জেলা বর্গীদের হাতে যার-পর-নাই দুর্দশা প্রাপ্ত হয়। তার ওপরে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হলে জেলাটির দুরবস্থা চরমে ওঠে। নানা অসুবিধার মধ্যেও ইনি বীরভূম রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পরাজিত করেন ও পরে স্বয়ং পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৭৫৩ সালে ইনি দিল্লী-সম্রাট কর্তৃক 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ও পাঁচ হাজারী হন অর্থাৎ সম্রাট শা আলম কর্তৃক পাঁচহাজার সৈন্যের অধিনায়ক হন। এই সময়ে তিলকচাঁদের মৃত্যু হয়।

এরপর তাঁর পুত্র মহারাজা তেজচন্দ্র (১৭৭১-১৮৩২) জমীদারীর উন্নতি সাধন করেন। ইনি বর্ধমান থেকে কালনা পর্যন্ত মেটাল রোড তৈরি করেন ও মগরা সেতু নির্মাণ করেন। তিনি দেহত্যাগ করলে মহাতপচাঁদ (১৮৩২-১৮৭৯) রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি দত্তকপুত্র। এঁর কার্যনৈপুণ্যে জেলাটি আবার সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। ইংরেজরাও তাঁকে সম্যকরূপে সম্মানিত করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১৩টি তোপ পাইবার সম্মান লাভ করেন, এ সম্মান জমীদার শ্রেণীর অপর কেউ পূর্বে পান নি। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী এই অনুষ্ঠান হয়। তিনি বহু সদনুষ্ঠান করে গেছেন। তিনি বহু ব্যয়ে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন ও মুদ্রণ আরম্ভ করেন। বিখ্যাত গায়ক ও গীতরচক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেন। তিনি স্বয়ং অনেক গান রচনা করেন। বর্ধমানের রাজবাড়ী, গোলাপ বাগ, শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র তাঁর কীর্তি।

মীরকাশিম কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হয়। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে সমস্ত বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী যখন মোগল সম্রাট কোম্পানীকে দান করেন, তখন মীরকাশিমের দানটিও মঞ্জুর হয়।

তেজচন্দ্রের দত্তক পুত্র আফতাবচাঁদ (১৭৭৯-১৮৮৫) রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি বাংলা দেশের প্রথম 'নোবলম্যান' হন। ইনি পিতার অনূদিত মহাভারতের মুদ্রণ শেষ করেন ও বিনামূল্যে তা বিতরণ করেন। ইনি বর্ধমানে কলেজ, ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, ব্রাহ্মমন্দির
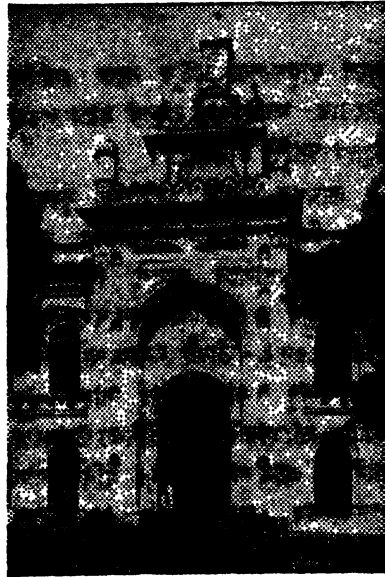
অঞ্জমান ক্লক-টাওয়ার

প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এঁর মৃত্যুর পর এঁর দত্তক পুত্র বিজয়চাঁদ (১৮৮৭-১৯৪২) বর্ধমান রাজগদী পান। বাল্যকালাবধি ইনি সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, দু'বার বিলাত গমন করেন। বহু সাময়িকপত্রের লেখক, বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ইনি একাদশী ও ত্রয়োদশী, বিজয়গীতি, চন্দ্রজিৎ, গায়ত্রী, কমলাকান্ত প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন।

রাজগদী পান। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পর, জমিদারী বিলোপ হয়ে যায়।

বর্ধমানে চকদীঘির জমীদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিংহরায়েরাও ক্ষেত্রী ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মদন সিংহ। এই বংশও বর্ধমানে বিশেষ খ্যাত বংশ।

জেলার সীমা

ভাগীরথীর দক্ষিণ তীর হতে পূর্বে—দামোদর নদ, পশ্চিমে—আসানসোল মহকুমার শেষ।

আয়তন—২৭১৬ বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা—৩,০৮২,৮৪৬।

মহকুমা—সদর (১,২৮৭ বঃ মাঃ) আসানসোল (৬২৪ ব-মাঃ), কালনা (৩৮৫ ব-মাঃ), কাটোয়া (৪০৯ ব-মাঃ)।

নদ-নদী

এই জেলার মধ্যে দিয়ে দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর (বা ধলকিশোর), অজয় ও বাঁকা নদী প্রবাহিত। ছোট নদীর মধ্যে—বেহুলা নদী; গাঙুর—শাখা নদী; চাপাই নদী, ব্রাহ্মণী নদী—কাটোয়া থানাকে পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত করেছে। কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানা থেকে বেরিয়ে সরগ্রাম, শুশুনা, করজ গ্রাম, গাজীপুর ও সিঙ্গি অঞ্চলের মূলটি কৃষ্ণনগর মৌজার খড়ি নদীতে এসে পড়েছে। কুনুর নদী—আউস গ্রাম থানার অধীনে জঙ্গল মহিলা হতে এই নদের উৎপত্তি, অজয় নদের শাখা। ইত্যাদি।

অম্বিকা (কালনা)

অম্বিকানগর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কথিত আছে, প্রাচীনকালে অম্বরিষ ঋষি এক পাথরের ওপর ঘটস্থাপনা করে অম্বিকাদেবীর আরাধনা করতেন। সেই স্থানটি এখন গ্রামের মধ্যভাগে। তার পাশেই এক পুকুর আছে। এই পুকুরও অম্বিকাদেবীর পুকুর বলে খ্যাত। ঐ ঋষি অম্বিকাদেবীর আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন, 'সিদ্ধেশ্বরী' নামে

অম্বিকাদেবীর মূর্তি স্থাপনা করেন। এখনও সেই মূর্তি পূজিত হয়। এই দেবীর নাম অনুসারে গ্রামের নাম 'অম্বিকা' রূপে প্রচলিত হয়।

অম্বিকাদেবীর আর এক নাম কলনা। উক্ত ঋষি প্রসিদ্ধি লাভ করলে এই স্থানে এক গঞ্জও বসে যায়। সেই জন্য এই স্থানের নাম হয় কালনা। গ্রামের নাম অম্বিকা, গঞ্জের নাম কালনা।

কেউ বলেন, কল্যাণের অপভ্রংশ থেকে হয় কল্যাণ, তা থেকে কালনা। বহু প্রাচীন গ্রন্থে এই গ্রামের নাম উল্লিখিত আছে। এই স্থানে ১০৮টি শিবমন্দির প্রভৃতি দেবালয় আছে। কালনা ধান ও চাউলের প্রধান ব্যবসার স্থান।

অগ্রদ্বীপ

কাটোয়া মহকুমায় ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি বৈষ্ণবতীর্থ-বিশেষ। এই স্থান পূর্বে নদীয়া জেলায় অন্তর্গত ছিল, কিন্তু ১৮৮৮ খৃঃ ১লা এপ্রিল হতে একে বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গঙ্গাগর্ভে চড়া পড়ে এই স্থানের সৃষ্টি হয় বলে এর নাম অগ্রদ্বীপ।

এখানে প্রসিদ্ধ গোপীনাথ-মন্দির আছে। চৈতন্যদেবের অন্যতম কায়স্থ শিষ্য গোবিন্দ ঘোষ কর্তৃক এই গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান গোপীনাথ মন্দির কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। চৈত্র মাসে ৭ দিনব্যাপী গোপীনাথের মেলা হয়। বহু স্থান থেকে যাত্রীরা আসেন।

পারুলিয়া

পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত পারুলিয়া। প্রাচীনকালে ভাগীরথী এর পূর্ব-সীমায় প্রবাহিতা ছিল। এই গ্রাম অতি প্রাচীন, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রামের নিকটবর্তী জায়গা চাষ করবার সময় প্রাচীন কালের কূপ, প্রশস্ত রাজপথের চিহ্ন, প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ দেখা গেছে।

কিংবদন্তী আছে, এই পারুলিয়া গ্রাম রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল। তিনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। (বাঙলার বিবরণ—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, অনুসন্ধান, পত্রিকা ১২৯৯)। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল রাক্ষস। পারুলিয়া গ্রামের এক অংশে বিস্তৃত উঁচু জায়গা আছে, তাকে রাক্ষসীপোতা বলে। লোকে বলে ঐ স্থানে মন্ত্রী রাক্ষসের বাড়ী ছিল। কেউ বলেন, 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থের বর্ণিত প্রসিদ্ধ রাজা নন্দের প্রতিষ্ঠিত এই পারুলিয়া। এই রাজার মন্ত্রীর নামও রাক্ষস। যাই হোক প্রাচীন-কালে এই স্থান অতি সমৃদ্ধ ছিল। যবন অধিকারে এই গ্রাম পিরল্যা নামে অভিহিত হয়।

ইন্দ্রাণী বা ইন্দ্রেশ্বর

কাটোয়ার নিকট। এটিও একটি প্রাচীন নগর। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে যে সময় গঙ্গা হিমালয় থেকে অবতরণ করেন, সেই সময় ইন্দ্র এইস্থানে গঙ্গাস্নান করেছিলেন। সেই জন্য এর নাম ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী।

এক সময় ইহা সমৃদ্ধিশালী ও বর্ধিষ্ণু ছিল। তখন ইহা পুরাণ … বিবেচিত হয়। এই নগরে গঙ্গার তীরে ১২টি ঘাট ছিল, তার উল্লেখ রামায়ণে আছে।

বেহুলা

মেমারির নিকটবর্তী গ্রাম। বেহুলা নদীর তীরে। প্রবাদ—বেহুলা যখন লখিন্দরকে নিয়ে এই স্থান দিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যাচ্ছিল তখন গ্রামের লোক জিজ্ঞাসা করে 'কে যায়'—সেই থেকে গ্রামের নাম হয় কেজা।

প্রাচীন কীর্তি ও দেবদেবী

সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির—শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাজাগণ প্রতিষ্ঠিত ১০৮ শিব-মন্দির। প্রবেশ দ্বারে আরও ১টি মন্দির আছে। মোট ১০৯টি। ১১৯৫ সালের কার্তিক মাসে মহারাজাধিরাজ তিলকচাঁদের মহিষী মহারাণী অধিরাণী বিষ্ণুকুমারী দেবী কর্তৃক এই মন্দির স্থাপিত।

বাহুলা বা বাহুলী দেবী—৫১ পীঠের অন্যতম। কাটোয়ার কেতুগ্রামে (বামবাহু)।

মঙ্গলচণ্ডী—উজানিতে (কোগ্রাম) (বাম কনুই) পতিত।

যোগাদ্যা—ক্ষীর গ্রামে (দক্ষিণ বাহু পতিত)।

জয়দুর্গা—কাটোয়ার কাছে কালীঘাটে (মুণ্ড পতিত)।

পাথরের মন্দির—আসানসোল থানার গড়ুইয়ে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শরৎ ভোরের আলো

শ্রীশ্যামসুন্দর বসু

শরৎ ভোরের রাণী,
শিউলি বনে খেলতে এল
মাতিয়ে ভুবনখানি।

সাদা কাশের ফুলে
কত স্বপন দুলে,
কোন দেশের খবর দিলে
মেয়ের কাছে আনি।

শরত ভোরের আলো,
মাণিক রাশি ছড়িয়ে দিয়ে
ঘুচিয়ে দিল কালো।

ঐ যে শ্যামল ক্ষেতে
পাখিরা উঠে মেতে
খেলায় মাতে শিশুর দল
লাগে কথার ভালো।
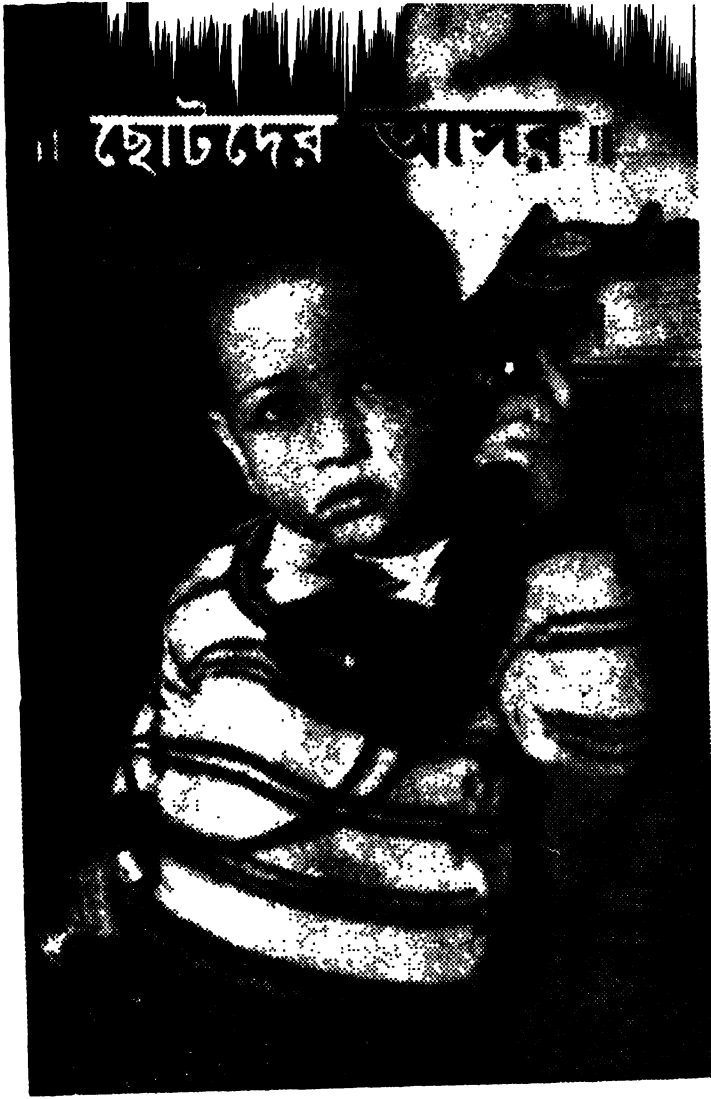
আলোকচিত্র—রতেন ভট্টাচার্য

একদিনের গল্প

ইন্দ্রবিকাশ দাস

সকালবেলা মা তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। তারপর সারাদিন পড়াশোনা, খেলা ইত্যাদির পর রাতে আবার ঘুমিয়ে পড়। তোমার মত আর একজনের সারাদিনের গল্প বলছি শোন।

সে ঘুমিয়ে আছে মাটিতে। ভোরবেলা মেঘ এসে ডাকলে---খোকা, ও খোকা---উঠে পড়, আর কত ঘুমোবে?

হাঁকে ডাকে সে চোখ মেলে তাকাল। কোন্ ফাঁক দিয়ে সকালের একটু সোনালী রোদ এসে গায়ে পড়েছে। ভেজা মাটির মিষ্টি গন্ধ, মেঘলা আকাশ---এ সব ত' সে আগে দেখেনি, তাই বড় বড় চোখে অবাক হয়ে দেখছে! এতক্ষণ ঘুমের পর চারদিকে সব নতুন সুন্দর লাগছে। ছোট্ট বীজ—ভয় তার খুব। ইয়া বড় একটা কাঠপিঁপড়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার তার দিকে চেয়ে শুঁড় নাড়তেই ভয়ে সে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

চোখ খুলে দেখে পিঁপড়েটা চলে যাচ্ছ---যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। একটা চড়ুই ঘাসের বনে খাবার খুঁজতে খুঁজতে এদিকে আসছে। বীজ

ভেতর মাথাটা গুঁজে বসে থাকল—যেন পাখীটা দেখতে না পায়। ভাবছে এই বুঝি চড়ুইটা ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে মুখে ফেলে দেয়। খানিক পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে দেখে অন্য একটা পাখীর সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে চড়ুইটা ওদিকে চলে গেছে। বৃষ্টির বড় বড়
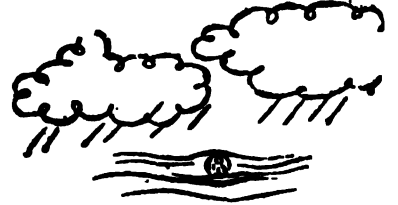
ফোঁটার ঘায়ে ছোট্ট বীজটা ছিট্‌কে সরে গেল ওদিকে। তাতে ওর একটু লাগল বৈকি! ভাবল এক জায়গায় ভাল করে বসে সব দেখতে হবে। ছোট্ট, সাদা, নরম পা দিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরল সে। কোমল, সবুজ গা তুলে উঠে এল একটু উপরে। এত্ত বড় আকাশ—কখনো নীল, কখনো মেঘ কালো। সবুজ মাঠ, রূপালী [illegible], পাখী—
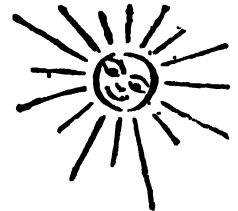
উপরে যে এতসব ব্যাপার কে জানত! দেখে ত' চোখ ছানাবড়া।

দিনরাত বিষ্টি, মেঘের ডাক ইত্যাদি নিয়ে বর্ষা চলে গেল। আস্তে আস্তে শরীরটা তার বড় হল। শিকড় গেল মাটির অনেক নীচে খাবার-দাবারের খোঁজে, কাণ্ড বড় হয়ে তা থেকে ডালপালা ও পাতা বেরুল। বাতাসের সঙ্গে সবুজ পাতারা তির্‌তির্‌ করে উড়তে থাকে, ডালপালা দোল খায়। শিউলী গাছে ফুল এল, সাদা মেঘগুলো নীল আকাশে দিগন্তের ওপর বসে থাকে, মাঠে মাঠে কাশের সাদা ঢেউ, শাপলা

ধালুক ভয়। খানখিল। বিকেলের সোনালী রোদ কি যে মিষ্টি! শিকড় মাটি থেকে রস এনে পৌঁছে দেয় পাতায়। পাতার রান্নাঘরে রোদের আঁচে খাবার তৈরী হয়। সে খাবার গাছের সারা শরীরে চলে যায়---তা না হলে তারা বাঁচবে কেমন করে? সবুজ মাঠের রং হল সোনালী। বাতাসটা একটু একটু ঠাণ্ডা লাগে। সে অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন আর পিঁপড়ে, পাখী ও মেঘের শব্দে ভয় পায় না। পাখীরা তার ডালে বাসা করে আছে, কত পিঁপড়ের দল পাতা-ঠোঙার ঘর করেছে তার আগায়। রাখাল ছেলেরা তার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশী বাজায়। দূরের পথিক তার ছায়ায় বসে আরাম করে। বর্ষার সময় যে তাকে দেখেছিল সে এখন চিনতে পারবে না।
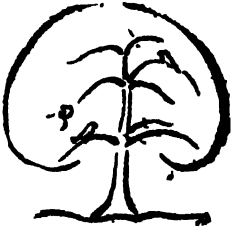
দেখতে দেখতে শীত এসে গেল। উত্তুরে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায় তার উপর দিয়ে, কাজকর্মে ভাটা পড়ে। পাতাগুলোর রং হলদে হয়ে আসে। নিজের পাতাদের সে আর ধরে রাখতে পারে না। তারা ঝরে পড়ে, উড়ে যায় এদিক-ওদিক। তাকে দেখতে যেন বুড়ো থুড়ো লাগে। ন্যাড়া গাছটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবে কবে সেই সোনা ঝলমল দিনগুলো আসবে। বিকেলের দখিন বাতাসে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। খুশির সোনার কাঠিটি কে যেন তার গায় ছুঁইয়ে দিয়ে যায়। দেখল চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। নিজের ভেতর যে এত আনন্দ জমা ছিল, তা কি সে নিজেই জানত! অন্য সব গাছ নূতন পাতার ডালি নিয়ে উৎসবে মেতেছে। দেখল, তারও সরু সরু ডালগুলি কিকে সবুজ চিকণ পাতায় ভরে গেছে। তারা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে মিষ্টি বাতাস গায়ে মেখে।

চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। পাখীরা গাছের ডালে ডালে নেচে গেয়ে বেড়াতে লাগল। লেজ নাচিয়ে ছোট কালো পাখীটাও মিষ্টি গান গাওয়া বড় কালো পাখীটার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা তার তলায় নাচ-গান, খেলায় মেতে উঠল। মৌমাছির গুনগুনানি ও নানা-

রকম ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল বাতাস। তার ডালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অনেক কুঁড়ির ছোট্ট মিষ্টি মুখগুলি। কুঁড়ি তার বৃতির ঢাক্‌না দিয়ে ফুলের আর সব অংশকে ঢেকে রাখে---যাতে রোদ-জল, পোকামাকড় তাদের নষ্ট না করে দেয়।

তারপর সেই ঢাক্‌নার কপাট খুলে সুন্দর ফুটফুটে ফুলটি বেরিয়ে এল টুক্ করে। বৃতির পাশে থাকে বড় বড় কয়েকটি রঙীন পাপড়ি। এই রঙের নেশায় আসে পাখী, প্রজাপতি ও নানা রকম পোকা-মাকড়। তাছাড়া ফুলের ভেতর যে

মধু থাকে তার লোভ ত' আছেই। ফুলের গন্ধ ধরে রাখে এই পাপড়ি, পাপড়ির ভেতর দিকে আছে---সরু কাঠির মত রঙীন কয়েকটি জিনিস---যার নাম পুংকেশর।

এই কাঠির আগায় লেগে থাকে রেণু---হলুদে পাউডারের মত। সব পুংকেশরের মাঝখানে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে একটি গর্ভকেশর---যার নীচের দিকটা মোটা উপর দিক সরু। পাখী, পোকামাকড়, মৌমাছি এরা যখন মধু খেতে ফুলের ওপর তখন পুংকেশরের রেণু তাদের পায়ে লেগে যায়। তাদের নড়াচড়া সময় ঐ রেণুর কয়েকটা গর্ভকে সরু দিকটার আগায় আটকে যায়। নাম পরাগ মিলন।

দখিন বাতাস একটু একটু হতে থাকে। ফুলের গর্ভকেশর আর সকলে ঝরে যায়। গর্ভকে নীচের দিকটা মোটা হতে থা গরম বাতাস দাপাদাপি করে এদিক-ওদিক। গর্ভকেশরটা বড় ও মোটা হয়ে যায়---যার ফল। ওর ভেতর আছে ছোট

বীজ। ফল তার ঢাকনা দিয়ে নর কচি বীজদের সুন্দর করে গুছি আদরে ঢেকে রেখেছে। সবুজ ফল পেকে বাদামী রঙের হয়। পশ্চি দিক থেকে অন্ধকার করে আ কালবৈশাখীর মেঘ। রোদের তাঁত খু বাড়ে। গরম বাতাস ঝলসে দিয়ে যা গাছটিকে। কি কষ্ট! পাকা ফল আ বীজদের ধরে রাখতে পারে না। ফলের ঢাক্‌না ফেটে বীজরা বেরিয়ে পড়ে ডাংগুলি খেলতে। ঝড়ের রাতে বীজ ছিটকে চলে যায় অন্যদিকে, আছড়ে পড়ে মাটির ওপর। মাটি তাকে কোলে নিয়ে গায়ে মাথায় আদর করে হাত বোলায়। চুমু খেয়ে বলে---সোনা, কোথায় ছিলি রে সারাদিন! তারপর সেইখানে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সেই সকালবেলা উঠেছিল---সারাদিন কি খাটুনিটাই না গেছে! সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার সকালে মেঘ-ভুতুর শাড়ীপরা সেই মা ডাকলে তার ঘুম ভাঙবে।

-অথ বিক্রমাদিত্য-বেতাল কথা-

বেতাল দমদমের এক তালগাছের তলায় বসে গাঁজায় দম দিয়ে বেতালা বেসুরো গলায় গান গায় হরদম। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁকে দেখে বাদামী রংয়ের দামী গাড়ী থেকে নামেন।

বেতাল একটু চমকে একপলকে গাঁজার কলকেটা ছুঁড়ে ফেলে। বিক্রমাদিত্য এগিয়ে গেলে সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সংক্ষেপে দুই ক্ষেপে বলে, প্রণাম মহারাজ, কুশল তো?

প্রতিক্ষেপেই তার ভয়, গাঁজার গন্ধ ছড়ালো বুঝি।

বিক্রমাদিত্য শিকারী বিড়ালের গোঁফ চেনেন। তাই বলেন, কি হে বকধার্মিক, অপকর্ম করছিলে বুঝি? ঘরে বসেই কোরো। আজকাল তো তোমার দেখা পাওয়া ভার। চব্বিশটা কাহিনী শুনিয়েই চম্পট দিলে দেখছি। আর একটা হলে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' দ্বিতীয় খণ্ড পূর্ণ হবে। ভয় নেই, দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাবো না। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পঁচিশ নম্বর কাহিনীটা বলতে পারো।

বেতাল খানিক ভেবে বলে, কাল আর একদফা লেগে বেতাল পঞ্চবিংশতির দ্বিতীয় পর্ব শেষ করে দেবো।

বিক্রমাদিত্য হেসে বলেন, কাল বিকালে এদিকেরই একটা সভার প্রেসিডেণ্ট হয়ে আমাকে আসতে হবে। ছটার আগেই ভাঙবে। তখন এখানে এসে শেষ কাহিনী শুনব।

পরদিন বিকালে হেলিকপ্টার থেকে নেমে সভায় বিক্রমাদিত্য দু ঘণ্টা ধরে প্রাণ মিটিয়ে গলাবাজী করেন। তাঁর অমাত্যরাও কমতি যান না। ফলে সভা ভাঙ্গে প্রায় আটটায়। বিক্রমাদিত্য মালার ভারে কুঁজো হয়েও মুখটা হাসি-হাসি করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান।

তাঁর ভাড়াটে ক্যামেরাম্যানরা প্রচুর ছবি তুলে রেহাই পায়। অবশেষে সকলকে রেহাই দিয়ে তিনি মোটরে চড়ে বেতালের কাছে এসে বলেন, তুমি তো এইমাত্র এসেছ। ছটায় এলে বিশ টুকরো পোড়া বিড়ি ছড়ানো থাকতো।

বেতাল হেসে বলে, অমাত্যরা বক্তৃতাবাগীশ। আমি জানি তারা আটটার আগে রেহাই দেবে না। তাই সময়টা কাজে লাগিয়েছি। মাছ তো পাই না, তাই একডজন মানকচু কিনে ঝোল রান্না করে এলাম।

বিক্রমাদিত্য বিরক্ত হয়ে বলেন, মাছ পাও না বলছো কেন? এখন মানকচুই তো মাছ। আমি তো নোটিশ

মণি গন্ধ

দিয়ে মানকচুকে জাতে তুলেছি। সেগুলো পড় না বলেই তো এত বোঝাবুঝি হয়। নোটিশের কপি রয়েছে পকেটে, দুচারটা শোনো।

তিনি দামী চশমাটা নাকে লাগিয়ে পড়েন---

মুরগী রাবড়ী অট্টালিকা ও ফরেন টুর ---সাধারণের জন্য নয়।

কোটাল কাজী ও অমাত্যের গোপন কি---সর্বোচ্চ দুশো টাকা।

ট্যাক্সলেখার দশ রকম খাতা---কুড়ি টাকা।

জলে দুধ---আট আনা সের।

সিমেণ্টের মাটি, চালডালের পোকা ---আট আনা বস্তা।

বারোটা মানকচু = আধ সের ইলিশের আঁশ।

বিক্রমাদিত্য নোটিশ ও চশমা পকেটে রেখে মৃদু হেসে বলেন, নোটিশটা দেওয়াতে দুর্নীতি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার ভাগ্যটা ভালো। আধ সের ইলিশের আঁশ পেয়ে গেছ। যাক্ এবার খুশী হয়ে শেষ কাহিনীটা বলো।

বেতাল মনে মনে বলে, বারোটা মানকচু = এক সের ইলিশের গন্ধ। মুখে বলে---আপনি ফিল্মস্টারদের সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?

বিক্রমাদিত্য পাইপ ধরিয়ে বলেন ---বিলক্ষণ জানি। আমার রাজ্যে অপরাজিতা নামে এক নায়িকা আছে যার নাম মেথরাণী কেরাণী থেকে সুরু করে মহারাণী পর্যন্ত জপ করেন।

বেতাল হেসে বলে---মহারাজের যে এদিকে টেস্ট আছে তা তো জানা ছিল না।

বিক্রমাদিত্য মলিন মুখে বলেন---না বেতাল, আদৌ টেস্ট নেই। প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্য ইণ্টারেস্ট দেখাতে হয়। হেঁ-হেঁ না করলে সকলে আমাকে সেকেলে বলবে। মহারাণী হয়তো গোসাঘরে ঢুকবেন। বস্তির ঝি সেই ক্যান্তমণি দাসী হয়ে গেল ফিল্মস্টার অপরাজিতা। সে বহু লক্ষ টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে আমাকে হাঁকিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ট্যাক্স আদায়ের জন্য এক পাঠান অফিসারকে পাঠালাম। কিন্তু সে ট্যাক্স আদায় না করে হার উপহার দিয়ে পাঁঠা হয়ে চলে এলো। তখন ঝানু বুড়ো অফিসারকেও পাঠালাম। কিন্তু তার হরিণ চোখ দেখে সে বুড়ো ব্যাটারও মনে বসন্তের কোকিল ডেকে ওঠে। তাই সে ট্যাক্স আদায়ের বদলে অটোগ্রাফের খাতায় সই আদায় করে ফিরে আসে।

বেতাল মনে মনে বলে, ট্যাক্স পেলে তুমি টেলিভিশন সেট কিনে ওয়ার্লড কাপের খেলা দেখতে। আমাদের তো লাভ হতো ঘণ্টা। মুখে বলে, আজবদ্বীপে ফিল্মকুমারী নামে এক নায়িকা একটা বাজে ছবিতে বাজে অভিনয় করায় ছবিটা দারুণ মার খায়। কিন্তু সেই ছবি ও ফিল্মকুমারী সুদূর উদ্ভটদ্বীপের বেস্ট প্রাইজ পেলে গোটা আজবদ্বীপ অট্টহাস্য করে ওঠে। মহারাজ বলুন, উদ্ভট দ্বীপ ছবিটাকে প্রাইজ দিলো কেন?

তারা আজবদ্বীপের হালচাল, কালচার ও ভাষার সাথে আদৌ পরিচিত

নয়। তারা কিছুই না বুঝে প্রাইজ দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে তারা সব বোঝে।

বেতাল মৃদু হেসে বলে—যেদিন ফিল্যাকুমারীর বাইশ বছর পূর্ণ হয় সেদিনই গভীর রাতে প্রাইজ পাওয়ার খবর আসে।

বিক্রমাদিত্য হিসাব কষে বলেন—তার মানেই ত্রিশ। ভক্তদের অনুরোধে অনেকে বয়স কমায়। কিন্তু অপরাজিতা ভক্তদের বিদ্রূপকে কলা দেখিয়ে পাঁচ বছর ধরে বয়স বাইশে রেখেছে।

বেতাল বলে, পরদিন সকালে ফিল্যাকুমারীর বাড়ীর ভিতরে গণ্যমান্যদের ও বাইরে নগণ্যদের ভিড়। ভিতরের পর্ব মিটিয়ে সে বারান্দায় এলে নগণ্যরা কিউ দিয়ে দাঁড়ায়। সে মধুর হেসে মধুমাখাকণ্ঠে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ভক্তদের উপহারগুলো বগলদাবা করতে থাকে। তার ভুবনমোহিনী হাসিতে মুগ্ধ হয়ে এক অতিসাহসী তরুণ মাতে অতিমাত্রায়, ফলে সে ফিল্যাকুমারীর এক ষণ্ডামার্কা আত্মীয়ের ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে হাসপাতালে যায়। পরে সে কাজীর কাছে নালিশ করে ফিল্যাকুমারীকে কাঠগড়ায় টানে। আত্মীয়টা চার বছর ঘানি টানে।

বিক্রমাদিত্য প্রচুর হেসে বলেন, না, বেতাল সে কাজীর কাছে যায়নি বরং কাজীই গোপনে তাদের কাছে আসে। চারজনে পরামর্শ করে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়। কাজী জানে যে তিন জনেরই সমাজে দারুণ প্রতিপত্তি। এভাবে নিষ্পত্তি না করলে বিপত্তি ঘটতো। তাকে কিষ্কিন্ধ্যার জঙ্গলে বদলী করে দেওয়া হতো।

বেতাল বলে, খবরটা কিন্তু সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে দুর্মুখরা দুমুখে ফিল্যাকুমারীর নিন্দা করতে সুরু করে। ফলে সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কিছুদিন পরে ভেসে আসে দুঃসংবাদ, ফিল্যাকুমারী আর নাই। সকলকে পথে বসিয়ে সে কবে পরলোকের পথে হাঁটা দিল, কেউ বলতে পারে না। মহারাজ বলুন, তখন সবার মনে কি রি-অ্যাকসন হলো? বিক্রমাদিত্য পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলেন,—মারাত্মক রি-অ্যাকসান হলো। বুড়োদের তাস-পাশা বন্ধ, বুড়ীদের জপমালা স্তব্ধ। গিন্নীরা হেঁসেলমুখো না হয়ে গোমড়ামুখে অন্ধকারে বসে। তরুণদের রুমাল চোখের জলে ভেজা। তরুণীদের ভ্যানিটিব্যাগ তরকারীর ঝুড়ির পাশে ছড়ানো। পকেটকাটাদের কাঁচি কুলুঙ্গিতে তোলা। কবিরা ভাবালু চোখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সাংবাদিকরা মনগড়া কাহিনী রচনায় ব্যস্ত। কালোবাজারীরা মনের দুঃখে জিনিষের দাম আরও বাড়ায়। দেবদাসরা মদের দোকানে ভিড় জমায়।

বেতাল বলে, কয়েকদিন প[র] হঠাৎ ফিল্যাকুমারীর আবির্ভাব হওয়া[য়] সারা দেশ আনন্দে মেতে ওঠে। আব[ার] আগের মতো দাবা-পাশা-জপমা[লা] পকেটকাটা ইত্যাদি চালু হয়। কবি[রা] চোখ নামায়, দেবদাসরা মদ ছাড়ে তরুণদের রুমাল শুকায়, তরুণীরা ধূলো ঝেড়ে ব্যাগ তুলে নেয় আর কালো বাজারীরা জিনিষের দাম কমায়।

বিক্রমাদিত্য হো-হো করে হেসে বলেন, বেতাল আর গুল মেরো না পকেট গড়ের মাঠ হলে কবিরা চোখ নামাবে, দেবদাসরা মদ ছাড়বে। তরুণীরা কখনই ফেলে দেওয়া ব্যাগ নেবে না আর কালোবাজারীরা দাম কমাবে না। যাক, আর সময় নেই, বাকীটা পরে শুনবো। তুমি এখন আবার তালগাছের তলায় বসো না যেন। সোজা ঘরে যাও, আমি চলি।

বিক্রমাদিত্য গাড়ীতে ওঠেন। প্রকাণ্ড গাড়ীটা প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলে এরোড্রোমের দিকে। বেতাল বিড়বিড় করে বলে, তোমাদের বেলায় রাবড়ী আর মুরগীর ঠ্যাং আর আমাদের বেলায় জলো দুধ আর মাছের আঁশ। বেশ আছো বাবা।

বেতাল আবার তালগাছের তলায় বসে গাঁজায় দম দিয়ে বেতালা বেসুরো গলায় গান গায় হরদম।

ছোট্ট কথা

শ্রীঅতীন মজুমদার

ছোট্ট কথা ছোট্ট ত' নয়, অনেক অনেক বড়,
ছোট্ট কথা ছোট্ট মুখে লাগে মধুরতর!
ছোট্ট কথা শুনতে ছোটই, করলে জড়ো তারে
মস্ত অভিধানও জেনো তার কাছেতে হারে!
সান্ত্বনারই ছোট্ট কথা : আশাহীনের আশা,
জানায় বুঝি আকুল প্রাণে ব্যাকুল ভালবাসা!
ব্যথায় ভরা ছোট্ট কথা হাজার খুশির মাঝে
গভীর দুখের কান্না হ'য়ে করুণ-সুরে বাজে!
'সত্য' এবং 'মিথ্যা' — দুটোই ছোট্ট কথা তবু,
আকাশ-পাতাল তফাৎ যেন —হয় নাক মিল কভু!
'প্রেম' ও 'ক্ষমা' ছোট্ট কথা, তুলনা তার নেই,—
সব কথারই সেরা,—উজল অর্থ মাহাত্ম্যেই!
ছোট্ট কথা : 'মা।' আহা তায় কতই সোহাগ ভরা,
ঐ কথাতেই মাটির বুকে স্বর্গ যে দেয় ধরা।

মনে রেখো

বিশাল পৃথিবী। কত জাতির কত ধর্মের মানুষ এখানে যে বাস করে তার ইয়ত্তা নেই। এই মানুষের সম্পর্কে জানবার আগ্রহ প্রায় সকলের-ই আছে, তাই না ? আজ তোমাদের প্রাচীন এথেন্সের সম্পর্কে কিছু বলছি।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীসের আসন আজও বহু উর্ধ্বে। এই গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স। এথেন্সে প্রাচীনকালে শুধু যে দার্শনিক, শিল্পী প্রভৃতিই ছিলেন—তা নয় এখানে বহু সাহিত্য-রসিকও ছিলেন। অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন যে সব নাট্যকার এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'এস্কিলাসের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁকে গ্রীক ভাষায় বিয়োগান্ত নাট্য-সাহিত্যের জনক বলা হয়। 'এসকিলাস' সত্তরখানার বেশী নাটক লিখেছিলেন। সেগুলির মধ্যে মাত্র সাতখানা পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে। গ্রীক নাট্যকারগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে 'এসকিলাস' তেরোবার পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এঁর একখানি ঐতিহাসিক নাটকের নাম 'দি পার্সিয়ানস'। এই নাটকে পারস্য সম্রাট জারক্সেসের সঙ্গে গ্রীকগণের প্রসিদ্ধ স্যালামিসের নৌ-যুদ্ধের বর্ণনা আছে। গ্রীকদের বীরত্ব এবং জয়লাভের উল্লাস কোরাস গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হ'য়েছে।

এঁর পরেই যে গ্রীক নাট্যকারের নাম মনে আসে—ইনি 'সফোক্লিস'। এঁর নাট্য-প্রতিভা ও অধ্যবসায় ছিল অসাধারণ। এঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে সারা বিশ্ব সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছে। 'সফোক্লিস' মোট একশত তিরিশখানি

হিমাদ্রিশঙ্কর সিংহ

নাটক লিখেছিলেন। এগুলির মধ্যে মাত্র সাতখানি নাটক পাওয়া গেছে। এথেন্স নগরের নাট্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইনি মোট আঠারোবার প্রথম পুরস্কার অর্জন করে নাট্য সাহিত্যে অক্ষয় আসন লাভ করেন। বিয়োগান্ত নাট্যকার বলেই ইনি প্রসিদ্ধ।

'ইউরিপিডিস' একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক নাট্যকার। এঁর লেখা নব্বইখানি নাটকের মধ্যে মাত্র আঠারো খানির সন্ধান গবেষকদের হস্তগত হ'য়েছে। ট্র্যাজিডি রচনায় এঁর সার্থকতা সত্যিই অসামান্য ছিল। এঁর নাটকের চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বলিষ্ঠ।

গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে হাস্য-রসাত্মক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে 'এরিস্টোফ্যানিস' সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কথিত হন। এঁর রচনার মধ্যে সমাজ-জীবনের বহু সমস্যা হাস্য-রসের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এই দিক দিয়ে 'এরিস্টোফ্যানিস' স্বয়ং সমাজসংস্কারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। এঁর লেখা নাটকের সংখ্যা চুয়ান্নখানি। কিন্তু মাত্র এগারোখানি নাটক প্রকাশিত হ'য়েছে।

নাটকের মধ্যে জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ থেকে নাটকের স্বকীয়তা স্বভাবতই চোখে পড়ে। প্রাচীন নাটকের মধ্যে গ্রীসদেশের স্থান নিঃসন্দেহে বহু উর্ধ্বে। আর এই অবদানের পেছনে যে-সব মহান নাট্যকার রয়েছেন—তাঁদের কয়েকজনের সম্পর্কে সংক্ষেপে তোমাদের আজ কিছু জানালাম। বড় হ'য়ে দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়লে এই রকম আরও কত কি জানতে পারবে; পূর্ণ করে নিতে পারবে নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে। আর এ পূর্ণতার মাধ্যমেই তো জীবনের সার্থকতা, তাই না ?

শিল্পী—খনা মুখোপাধ্যায়

মজার শাস্তি

কল্যাণকুমার মিত্র

ইটালী ও ফ্রান্সের সীমানার কাছে একটা ছোট্ট দেশ আছে, ভূমধ্যসাগরের তীরে। দেশটার নাম মোনাকো। এর লোকসংখ্যা সব মিলিয়ে বড়জোর ৭000 হবে। আর আয়তনেও এতই ছোট যে প্রত্যেকের ভাগে এক একর করে জমিও পড়বে না। তবুও সেটি একটা স্বাধীন রাজ্য আর অন্যান্য রাজ্যের মত সব কিছুই সেখানে আছে।

সবচেয়ে আগে, সেখানে একজন রাজা আছেন, রাজসভা আছে, মন্ত্রী, পাত্র মিত্র অমাত্য ও পারিষদবর্গ যা থাকার কথা সবই সেখানে বহাল তবিয়তে আছে। রাজ্য রক্ষার জন্য একটি সৈন্যবিভাগ আছে যদিও মোট সৈন্যসংখ্যা ষাট-এর বেশী নয়। সেই সৈন্যবিভাগে একজন সেনানায়ক আর তাঁর অধীনে বিভিন্ন পদাধিকারী সৈনিক ও সাধারণ সৈনিক রয়েছেন। এইভাবে দেখা যায় অন্য যে-কোন স্বাধীন দেশের মত সমস্ত রকম ব্যবস্থা এখানে রয়েছে যদিও ক্ষুদ্র আকারে।

রাজকোষের আয়ের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কর ধার্য করা হয়েছে। যেমন, তামাকের ওপর কর, বিভিন্ন পানীয়ের ওপর কর, স্পিরিটের ওপর কর---ইত্যাদি। কিন্তু রাজ্য ছোট হলেও খারাক মোটেই কারুর ছোট নয়। বিশেষ করে রাজা ও তাঁর মন্ত্রী অমাত্যবর্গের খোরাক সাধারণত একটু বেশীই হয়ে থাকে। কাজেই ঐ ক'টা লোকের কাছ থেকে যে রাজস্ব মোট আদায় হয় তা দিয়ে রাজ্যশাসন চালানো সম্ভব নয়। তখন রাজা ও মন্ত্রিগণ অনেক পরামর্শ করে রাজস্বর পরিমাণ কি করে বাড়ানো যায় তা ঠিক করলেন। সেই অনুসারে একটা জুয়ার আসর খোলা হল সেখানে। যে-কেউ এসে জুয়া খেলতে পারবে কিন্তু সে হারুক বা জিতুক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মালিকের কাছে জমা দেবে আর মালিককে তার অধিকাংশই রাজার কাছে কর হিসেবে দিতে হবে।

এই জুয়ায় কত লোক হারে আবার কত লোক জেতে। ইউরোপের মধ্যে খালি এই ছোট্ট রাজ্যেই এই ধরণের জুয়ার অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছুদিন আগে জার্মানীর কতকগুলি রাজ্যে এই জুয়ার প্রচলন হয়েছিল কিন্তু দেখা গেল যে সমস্ত লোকেরা সর্বস্ব পণ করে হেরে যাচ্ছে তারা মনের দুঃখে হয় জলে ডুবে নয়তো গুলিতে আত্মহত্যা করছে।

এই কাণ্ড দেখে সেখানকার সরকার জুয়াখেলা বন্ধ করে দেয় সম্পূর্ণভাবে কিন্তু 'মোনাকো'র রাজাকে নিষেধ করার অধিকার কারুর নেই তাই একমাত্র এখানে এই জুয়াখেলা সমানে চলছে। রাজার নিজের প্রয়োজনে রাজার বিরুদ্ধে কারুর কিছু বলার অধিকার ছিল না, কেউ কিছু বলতো না। রাজ্যে মোটামুটি লোকে শান্তিতে বাস করতো।

কিন্তু হঠাৎ একবার একটি কাণ্ড ঘটে। রাজ্যে একটি লোক খুন হয়। এই প্রথম খুন এর আগে কেউ কখনো খুন হয়নি। কিন্তু খুন যখন হয়েছে তখন খুনীকে ধরতেই হবে। পুলিশ তৈরী। তারা বেরিয়ে পড়লে খুনীকে ধরবার জন্যে, অবশেষে খুনী ধরা পড়ল---স্বাভাবিক কারণ এটুকুন দেশে সে কোথায় লুকিয়ে থাকবে।

খুনী ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিচারের ব্যবস্থা হল। নির্দিষ্ট বিচারালয়ে বিচারপতি এলেন। জুরিগণ এলেন, ব্যারিস্টার কৌঁসুলী, পেয়াদা সকলেই হাজির। বিচার আরম্ভ হল, খুনীর দোষ প্রমাণিত হল এবং জুরিগণের সঙ্গে একমত হয়ে বিচারপতি আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

রাজাও এই আদেশের সঙ্গে একমত হলেন। কিন্তু রাজ্যে কোন ফাঁসীর মঞ্চ বা গিলোটিন ছিল না এবং জল্লাদও ছিল না। কারণ এর আগে কখনো দরকার হয়নি। রাজা তখন এ বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, তাঁরা বললেন বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে।

সেইমত, রাজা প্রথমে ফরাসী সরকারকে চিঠি লিখলেন, সেখান থেকে গিলোটিন ও জল্লাদকে পাঠাতে কি রকম খরচা পড়বে ?

উত্তরে ফরাসী সরকার জানালো ষোল হাজার ফ্রাঙ্ক খরচা পড়বে সমস্ত কিছুর জন্যে।

শুনে তো রাজার মাথায় হাত। বলে কী। এত মুদ্রা পাবো কোথায়। জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করতে গেলে তারা তো ক্ষেপে উঠবে। কম নয় মাথাপিছু দুই ফ্রাঙ্কেরও বেশী পড়ছে।

তখন মন্ত্রীরা তাঁকে জানালো, আপনি ইটালীর রাজার কাছে লিখুন তিনি কিছু কম করতে পারেন, কারণ ফ্রান্সে তো গণতান্ত্রিক সরকার তাই আপনার ওপর বিদ্বেষপ্রসূত বেশী চেয়েছে।

রাজা তাই করলেন কিন্তু বিশেষ সুবিধে হল না। ইটালীর রাজা জানালেন, বারো হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ পড়বে।

তাতেও মাথাপিছু প্রায় দু ফ্রাঙ্ক করে পড়ছে। আর রাজকোষে এমন টাকা নেই যাতে অতিরিক্ত খরচ করা যায়। তাই বাধ্য হয়েই রাজাকে বিদেশ থেকে গিলোটিন ও জল্লাদ আনার প্রস্তাব ত্যাগ করতে হলো।

মন্ত্রীরা তখন বললো, আপনার সৈন্যরা তো শত্রুদের মারবার জন্যে শিক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে কাউকে বলুন না এ কাজ করতে।

কিন্তু কোন সৈন্যই এ প্রস্তাবে রাজী হলো না। তারা বললো এভাবে লোক মারতে তারা শেখেনি।

তাহলে আসামীকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া যায় তা ঠিক করার জন্যে একটা কমিটি গঠন হয়ে গেল। সেই

কমিটিতে এই প্রস্তাব পাশ হলো যে আসামীকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক, তাতে রাজার মহানুভবতার পরিচয় মিলবে আর ফাঁসীর ব্যবস্থাও করতে হবে না।

রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু সারাজীবন বন্দী রাখার মত জেল সেখানে নেই, যা আছে তাতে সাময়িকভাবে কোন আসামীকে রাখা যায়। তাই আসামীর জন্যে সুদৃঢ় বাড়ী তৈরী হল আর তাকে পাহারা দেবার জন্যে লোক নিয়োগ করা হল, রাজবাড়ী থেকে তার জন্যে খাবার আসতে লাগল।

এইভাবে বেশ দিন কাটছে কিন্তু একমাস পরে রাজা দেখলেন এই আসামীকে রাখতে গিয়ে মাসে ছ'শো ফ্রাঙ্ক অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। আবার তিনি মন্ত্রীদের ডাকলেন, এভাবে খরচ হতে থাকলে আমি তো ফতুর হয়ে যাবো, একটা কিছু ব্যবস্থা কর।

আবার মন্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হল এবং সেখানে ঠিক হল, যেহেতু তার এখন মরবার সম্ভাবনা নেই উপরন্তু তার চেহারা ক্রমশ ভালো হচ্ছে অর্থাৎ এখনো সে এভাবে থাকলে কম করে পঞ্চাশ বছর বাঁচবে। এই পঞ্চাশ বছর তাকে বসিয়ে খাওয়াবার মত ক্ষমতা রাজ্যের নেই। তাই তাকে নজরবন্দী হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হোক, রাজাও তাতে মত দিলেন।

আসামীকে তা জানানো হল। কিন্তু আসামী কিছুতেই চলে যেতে রাজী হলো না। সে বললে, আমায় এখন ছেড়ে দিলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, কে আমাকে আশ্রয় দেবে? আপনারা আমার যে বদনাম চারিদিকে রটিয়েছেন তাতে কোথাও আমি চাকরি পাবো না, সমাজ আমায় গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং আমি এখানেই থাকতে চাই। তাছাড়া আমি একজন খুনের আসামী। আপনারা প্রথমে আমায় প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন, আমি তো মাথা পেতে নিলুম, কিন্তু আপনারা আমাকে ফাঁসী দিতে পারলেন না এবং কোনরকমেই বধ করতে পারলেন না। তারপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন তাও আমি গ্রহণ করলাম। আপনারা সে কথাও রাখতে পারছেন না। তাই এখন আমাকে ছেড়ে দিতে এসেছেন কিন্তু আমি এ প্রস্তাব গ্রহণে অপারগ। (সকলের দিকে একবার চেয়ে কিছুক্ষণ থেমে) অবশ্য একটা শর্তে আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি যদি আপনারা কথা দেন প্রতি মাসে আমার খাওয়াপরা বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেবেন।

রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন, কারণ এছাড়া আর উপায় ছিল না। সেই ব্যক্তি তখন রাজ্যের সীমানার বাইরে গিয়ে একখণ্ড জমি কিনে চাষবাস করতে লাগলো আর নির্দিষ্ট সময় অন্তর এসে প্রাপ্য টাকা নিয়ে যেতে লাগল।

ভাগ্যিস, সে এমন দেশে খুন করেনি যেখানকার রাজা তার মাথা কাটার জন্যে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্যে টাকার পরোয়া করতো না। তাই তো সে বেঁচে গেল। *

* বিদেশী গল্প হইতে।

জার্মানীর সেরা চৌখস মেয়ে

ফেডারেল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ব্রেমেনের ইভেলিন জেকনী জার্মানীর সর্বাপেক্ষা চৌখস মেয়ে এই উপাধি অর্জন করেছেন। ইভেলিনের বয়েস বর্তমানে কুড়ি। তিনি সহকারী হিসাবে একটি ঔষধালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। মেনজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির অধ্যাপক ডগ হার্বার্ট স্টাইনারের সহযোগিতায় একটি সেরা জার্মান মহিলাদের মাসিক পত্রিকা ছ'মাস ধরে যে প্রতিযোগিতা চালিয়েছেন, সেই মেধা ও প্রতিভাসাপেক্ষ প্রতিযোগিতায় ইনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

ভালুক মশাইর তালুক

সুখেন্দু দত্ত

হাজারিবাগের জঙ্গল। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ে রাস্তার উপর দিয়ে ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে আমাদের জিপ চলেছে। দল বেঁধে আমরা চলেছি প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। বন বিভাগে একটা ছোট্ট বাংলো আছে সেখানে পথের পাশে উঁচু টিলাতে।

পথের দু'পাশে নিবিড় অরণ্য। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কোথাও খানিকটা দৃষ্টি চলে, কোথাও তাও না। ঘোর জঙ্গল রাস্তাকে দু'দিক থেকে যেন চেপে রেখেছে।

আমাদের ক'জনকে নিয়ে জিপ চলেছে টাল সামলাতে সামলাতে। বনের রূপ দেখতে দেখতে আমরা চলেছি। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যই অপূর্ব। ঘন বন ও শৈলশ্রেণী। কোথাও কোন লোকালয় নেই, আশে পাশে কোথাও কোথাও একটা বন্যগ্রাম পর্যন্ত নেই। এক জায়গায় কানে এল—কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরনার কলমর্মর। জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে সেই কলমর্মর যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

জিপ চলেছে, কিন্তু এ জঙ্গলের রাস্তা যেন ফুরোবার নয়। ভয়ও যে না করছিল এমন নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি জিপটা খারাপ হয়ে যায়, আর সুযোগ বুঝে ঠিক তখনই যদি লাফ দেয় কোন বুনো জানোয়ার তা হলে---

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, 'এ-জঙ্গলে কি বাঘ আছে?'

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ। ড্রাইভার সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিল, 'হাঁ হুজুর।'

'ভালুক?'

'জী হুজুর।' ফরেস্ট গার্ড আশ্বস্ত করল।

'বুনো হাতি?'

'হাঁ হুজুর। আর নীল গাই ভি আছে।' জিপের ড্রাইভার এবার যেন একটু অনুকম্পার হাসি হাসল।

প্রশ্ন করবার উৎসাহ ওই পর্যন্তই এসে থেমে গেল। যে রকম উৎসাহের সঙ্গে হাঁ হুজুর আর জী হুজুর বলে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোন প্রশ্নেই যে নেহি হুজুর বলে আশ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। বাঘ, ভালুক হাতি কোন জানোয়ারেরই তো অভাব নেই এ-জঙ্গলে।

জিপের সামনের দিকে বসে আছে ড্রাইভার আর ফরেস্ট গার্ড, পিছনে আমি, রেলের সত্যেনবাবু আর ফরেস্ট অফিসার ব্যানার্জি। জিপের সামনে একটা রাইফেলও শোয়ান আছে। তবে ব্যানার্জি বললেন, 'ওটা শুধু সঙ্গে রাখা। দরকার পড়ে না, কারণ জঙ্গলের জানোয়ার অকারণে মানুষকে আক্রমণ করে না।'

জঙ্গলের বাঘ - ভালুক - হাতি বাগে পেয়েও মানুষকে আক্রমণ করে না---এও একটা নতুন কথা শুনলাম বটে।

যেতে যেতেই কয়েক জায়গায় দেখলাম ভালুকের থাবা, বাঘের পায়ের দাগ। আর হরিণের পায়ের দাগ তো সর্বত্র। প্রতি পদে ভয় হচ্ছে, এই হয় তো পথের উপর বেরিয়ে আসবে একটা বাঘ। নয় তো বেরিয়ে পড়বে একটা কালো লোমশ ভালুক।

কাছেই কোথা থেকে চকিতের জন্য ভেসে এল ময়ূরের তীক্ষ্ণ ডাক। ভারতের জাতীয় পক্ষী। ভয়ঙ্করের মধ্যেও সুন্দর হাজারিবাগের এই জঙ্গল।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে জিপের ড্রাইভার এবার আমাদের একটু আশার বাণী শোনাল। যে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমরা এখন চলেছি সেটা স্টেট নাকি ভালুকদের খাস তালুক। অজস্র ভালুক হাজারিবাগের জঙ্গলের এই অংশে।

জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছি তা, যত বড় প্রকৃতি রসিকই হই না কেন, এই সংবাদে কিছু বিচলিত না হয়ে পারলাম না। রেলের সত্যেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। জঙ্গলে আমাদের কনস্ট্রাকশনের লোকেরা তো রাত্রে প্রকৃতির ডাকেও তাঁবুর বাইরে যেতে সাহস পায় না, এই ভালুকের ভয়ে। রাত্রে তাঁবুর মধ্যেও আলো জেলে রাখতে হয়। এদেশের লোক বাঘের চেয়ে ভালুককেই বেশি ভয় করে।'

ফরেস্ট অফিসার ব্যানার্জি বললেন, 'বুনো জানোয়ারদের মধ্যে ভালুক ভয়ানক শক্তিশালী আবার দারুণ নার্ভাস। ভয় পেলেই ভালুক আক্রমণ করে বসে। ভালুকের আক্রমণ থেকে ফিরে এসেছে এমন মানুষ দেখলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। বীভৎস সে সব ক্ষতের দাগ কোনদিনই মিলিয়ে যায় না। ভালুক নাকি আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারলেই চোখ উপড়িয়ে নেয়।'

আহা, কি আশার বাণীই না শোনান হল। এ সব কথা শোনার পর জিপ তো চলল কাঁপতে কাঁপতে। আমার মনে হল, রাস্তার দুধারে জঙ্গলের মধ্যে বাঘ, ভালুক, চিতারা সব বেরিয়ে পড়েছে শিকারের সন্ধানে। যে কোন মুহূর্তে তাদের একজন লাফিয়ে পড়বে আমাদের শ্লথগতি জিপের উপর।

'ঘস্ - স্ - স্!' জীপটির হঠাৎ ব্রেক কষল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম, 'কি হল? বাঘ নাকি?'

ড্রাইভার পরম নিশ্চিন্তে জবাব দিল, 'বাঘ নেহি, ভালু।'

চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম, জঙ্গলের পাশ থেকে একটা বিরাটাকায় দুর্ধর্ষ ভালুক বেরিয়ে এসে বজ্র আলিঙ্গনে আমার হাড়গোড় গুঁড়ো করে দিচ্ছে!

ড্রাইভার জিপ ব্যাক করতে করতে খানিকটা পিছনে সরিয়ে আনল। না, পাশের জঙ্গলে নয়, একেবারে সামনেই খোলা রাস্তার উপর ভালুক। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, প্রায় একশ' হাত দূরে

রাস্তার উপর শুয়ে আছে মস্ত একটা কালো ভালুক। মিশকালো বিরাট জানোয়ারটা পথ জুড়ে পড়ে আছে। দেখে তো আমাদের চক্ষু স্থির।

তা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপরে কেন ভালুক।? নেমে গেলেই তো পারে। তাও গোটা পথটা জুড়ে রাস্তার উপরই একেবারে শুয়ে পড়েছে যে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ড্রাইভার বোধ হয় দয়াপরবশ হয়েই বলল, 'চলা যায়গা উ। ঘাবড়াইয়ে মৎ।'

বার কয়েক জিপের তীক্ষ্ণ হর্ন দিল সে। কিন্তু ভালুকটা নড়বার নামও করে না। হর্নের শব্দে জানোয়ারটা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে, করমচার মত তার লাল চোখ দুটো জিপের দিকে ঘুরিয়েছেও সে বার-কয়েক। ঘন লোমের আবরণে তার ছোট ছোট লাল চোখ দুটো কুৎকুৎ করে যে রকম মস্ত চাহনি মেলে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, তাতে মনে হল তার সেই দুই চোখে অনেক বুদ্ধি। ভালুকটা বোধ হয় এখনি গর্জন করে তেড়ে আসবে আর ছুটে এসে আমাদের ছিঁড়ে ফেলবে।

কিন্তু ছুটে আসা তো দূরের কথা, ভালুকটা নড়বার নামও করে না। ড্রাইভার জিপটা আরও একটু ব্যাক করে নিল। ফরেস্ট অফিসার ব্যানার্জী জিপের সামনে থেকে তাঁর রাইফেলটি কোলে তুলে নিলেন। ভালুকটার কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই, কি যে তার মতলব বোঝা যাচ্ছে না। ছুটে এসে জিপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, আবার সুবুদ্ধি হলে পাশের জঙ্গলে নেমে যেতেও পারে। তাড়াতাড়ি রাইফেলটা ভর্তি করে তৈরী হয়ে বসে রইলেন ব্যানার্জী। আমরাও রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে ভালুকটা এবার ঠিক মানুষের মতই দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার লাল চোখ দুটো চক্ চক্ করছিল। রাইফেলের সেফটি খুলে ট্রিগারে আঙুল রেখে তৈরী হয়ে রইলেন ব্যানার্জী ভালুকের বুকের সাদা দাগটা লক্ষ্য করে। ভালুকটাকে মারবার ইচ্ছা তাঁর নেই, কিন্তু সেটা তেড়ে এলে প্রাণ বাঁচাতে হলে তৎক্ষণাৎ গুলি করতেই হবে।

ভালুকটা আমাদের জিপের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে 'আঁক' করে একটা শব্দ করে উঠল। তার সেই গর্জনে আমাদের পিলে চমকে উঠল। ফরেস্ট অফিসার ট্রিগার টিপতে যাবেন, এমন সময় ভালুকটা ঘাড় ফিরিয়ে আর একটা হাঁক দিল। তার সেই দীর্ঘায়িত গর্জন পাহাড়-জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হল। পরমুহূর্তেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী পায়ে মস্ত মাতালের মত হেলেদুলে পাশের ঝোপের আড়ালে নেমে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম, প্রচণ্ড বেগে জঙ্গল দুমড়িয়ে তীরবেগে সে দৌড়চ্ছে।

অভিজ্ঞ জিপ-ড্রাইভার এতক্ষণে হো-হো করে হেসে উঠল। ভালুকটাকে ভয় পাবার কিছু ছিল না। জঙ্গলের মধ্যে রাস্তার উপরই হঠাৎ জ্বর এসে পরায় বেচারিকে পথের উপই শুয়ে পড়তে হয়েছিল। কথায়ই বলে, ভালুকে জ্বর। মানুষের ভয়ে বেচারি স্বস্তিতে শুয়ে থাকতে পারছিল না, আবার পালাতেও পারছিল না। কি করুণ অবস্থা। জ্বর ছেড়ে যেতেই এখন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়েছে।

দলের সবাই খুব একচোট হেসে নিলাম। সত্যি, জন্তুজগতে ভালুক যেন এক ভাঁড়। মহাবলশালী এই জীবটির অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি চেপে রাখাই দায় হয়ে ওঠে অনেক সময়। মনে পড়ল, কলকাতায় পোষা নাচিয়ে ভালুকের ঘন ঘন জ্বর হওয়ার কৌতুক দেখেছি। নড়তে পারে না তখন, শুয়ে শুয়ে শুধু কাঁপে। কি অবস্থা হয় তখন তাদের।

ভালুকটাকে শেষ পর্যন্ত গুলি করতে হল না বলে আমরা অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম। আর দ্বিধা না করে জিপ ছাড়া হল। ভালুক মশাইর খাস তালুক পার হয়ে আমরা অবশেষে নির্বিঘ্নেই পৌঁছে গেলাম টিলার উপর বন-বাংলোয়।

গান

শ্রীমমতা ঘোষ

বিপদ আসে উড়িয়ে নিশান
অট্ট কলরবে;
শিরায় শিরায় রক্ত নাচে,
প্রলয় এবার হবে।
বোঝাপড়ার দিন যে গেছে,
অস্ত্র হাতে আয় না সেজে,
আঘাত হানো বৈরী 'পরে
জোয়ান ছেলে সবে।

দেশমাতারি দুর্দিনেতে
কে আজ আলসভরে
আরাম খুঁজে আড়াল হয়ে
রইবি পড়ে ঘরে?
ডাক এসেছে যৌবনেরি,
দাঁড়া তবে ভারত ঘেরি,
বীরের দলে ভয় করে না
মরণ-মহোৎসবে।

অনুসজ্জিত অফিসার সমূহের সমাগমে সমাধি স্থানটিকে ফুলেভরা এক মাঠের মত দেখতে লাগছিলো।

কর্নেল লিমোসিনের পত্নীকে সদ্য সমাধিস্থ করা হয়েছে; দুদিন আগে সমুদ্রে স্নান করার সময় জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছিলো মেয়েটির।

যাক সব চুকেবুকে গেল এতক্ষণে। ধর্মযাজক মহাশয় চলে গেছেন কিন্তু দুজন সহকর্মীর বাহু আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে কর্নেল এখনও চেয়ে আছেন সদ্যবোজানো গর্তটির দিকে, যার মধ্যে স্থাপিত হয়েছে ওককাঠের নতুন শবাধার—তাঁর স্ত্রীর প্রায় বিকৃত মৃতদেহ যার গহ্বরে শায়িত।

প্রায়-বৃদ্ধ এই কর্নেল লম্বা ও রোগা ধরণের মাত্র তিন বছর আগে সহকর্মী আর এক কর্নেলের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর অনাথা তরুণী কন্যাটি যখন একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে, তখন ইনি তাকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন।

যে দুজন সহকারীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কর্ণেল তাঁরা সচেষ্ট হলেন ওঁকে সেস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

একটু বাধা দিলেন শোকাহত স্বামী, অবাধ্য অশ্রুধারা প্রাণপণ চেষ্টায় সংযত করতে করতে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, —'না---না---আর একটু থাকি।'

জোর করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলেও পা দুটো যেন ভেঙে আসছিলো তাঁর, ওই গহ্বরটাকে মনে হচ্ছিলো সমুদ্রের মতই অতল অনন্ত, ওরই মধ্যে যে নিহিত আছে তাঁর জীবন, তাঁর প্রাণ, জীবনাধিক প্রিয় যা কিছু।

হঠাৎ এগিয়ে এলেন জেনারেল আরমোঁ, সবল হাতে টেনে সরিয়ে আনলেন তাঁকে সেখান থেকে, বললেন—'চলে এসো বন্ধু, এখানে আর থেকে লাভ কি?"

গী দ্য মোপাসাঁ

নীরবেই মেনে নিলেন কর্নেল বন্ধুর স্নেহশাসন, ফিরে গেলেন নিজের বাসায়।

পড়ার ঘরের দোর খুলতেই টেবিলের ওপর রাখা একটা খামেভরা চিঠি চোখে পড়লো ওঁর। চিঠিটা হাতে তুলে নেওয়ার সময় বিস্ময় ও হৃদয়াবেগের আধিক্যে প্রায় পদস্খলন হচ্ছিলো তাঁর, কারণ স্ত্রীর হাতের লেখাটি চিনতে পেরেছিলেন তিনি।

খামের ওপরের পোস্টমার্ক সেদিনেরই অর্থাৎ সদ্যই বিলি হয়েছে চিঠিটা।

খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে এনে পড়তে সুরু করলেন কর্নেল।

বাবা,

দয়া করে পুরানো সেই দিনগুলোর মত তোমাকে বাবা বলে ডাকবার অনুমতি দাও; যখন তুমি এ চিঠি পাবে তখন আমি আর থাকব না এ দুনিয়ায়; হয়ত সে কথা ভেবেই আমাকে ক্ষমা করতে দ্বিধা করবে না তুমি।

তোমার করুণা উদ্রেক করে নিজের অপরাধকে লাঘব করতে চাই না, শুধু সত্য নিছক ছাঁকা সত্যটাই তোমাকে জানাতে চাই শোনাতে চাই; নারী-হৃদয়ের সমস্ত আকুতি দিয়ে, তাও এমন একজন নারীর যে আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আত্মঘাতিনী হবে।

দয়া করে যখন আমাকে গ্রহণ করেছিলে সেদিন সমস্ত মন ঢেলেই ভালবেসেছিলাম তোমাকে, কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল সেদিন পিতৃহারা অনাথা তরুণীর সমস্ত হৃদয়, প্রায় বাবার মতই ভালবেসেছিলাম তোমাকে।

একদিন যখন তোমার কোলে বসে ছিলাম আর তুমি চুম্বন করেছিলে আমাকে, তখন নিজেরও অজ্ঞাতসারে তোমাকে 'বাবা' বলে ডেকে উঠেছিলাম, সে ডাক স্বতঃ-উৎসারিত, কিছু ভেবে বা বুঝে ডাকা নয়, কারণ আমার মনের অতলে তোমাকে পিতা ছাড়া আর কোনভাবেই কোনদিন ভাবতে পারিনি।

তুমি হেসে উঠেছিলে, আমাকে বলেছিলে—ওই নামেই আমাকে বরাবর ডেকো লক্ষ্মী সোনা আমার, খুব ভাল লাগছিলো শুনতে।

আমরা শহরে এলা... র

পিতা আমার ক্ষমা করো আমি প্রেমে পড়লাম।

ওঃ---বহুদিন যুঝেছিলাম আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না নিজেকে বিলিয়ে দিলাম সম্পূর্ণভাবে, পতন হলো আমার।

বিবাহিতা নারীর ধর্মচ্যুতি ঘটলো।

সে কে ?

তুমি চিনে নিতে পারবে না তাকে আমি ভাল করেই জানি।

ডজনখানেকেরও বেশী যুবক অফিসারদের যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়ীতে, সেজন্যই আরও নিশ্চিন্ত বোধ করছি।

বাবা তাকে খুঁজে বার করতে চেও না, তাকে ঘৃণা করো না।

তার জায়গায় অন্য যে কোন মানুষই যেরকম আচরণ করতো, সেও তাই করেছিল শুধু।

তাছাড়া আমি নিশ্চিত জানি যে সেও আমাকে ভালবেসেছিলো গভীর ভাবেই।

কিন্তু শোন - - - একদিন যখন আমাদের মেলবার কথা ছিলো বেকাশেশ নামে ছোট্ট দ্বীপটিতে, মনে পড়ে সেই দ্বীপটির কথা, তুমিও তো চিনতে জায়গাটা।

ঠিক ছিলো যে সাঁতার দিয়ে আমি দ্বীপটাতে যাব সেখানে সে অপেক্ষা করবে একটা ঝোপের আড়ালে।

সবেমাত্র মিলিত হয়েছি আমরা এমন সময় সামনের দিকের কয়েকটা গাছপালার আড়াল থেকে হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো তোমার আর্দালী 'ফিলিপ'।

ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চীৎকার করে উঠলাম আমি, তখন আমার প্রেমাস্পদ আমাকে বললো—ভয় পেয়ো না সোনা শান্তভাবে সাঁতার দিয়ে আজকের মত বাড়ী ফিরে যাও ; এ লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া আমি করবো।

অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় কোনমতে বাড়ী ফিরে গেলাম, প্রতিমুহূর্তে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটার আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে রইলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে বসবার ঘরের সামনের বারান্দায় নিরিবিলিতে আমার সঙ্গে দেখা করলো ফিলিপ। নীচু গলায় ফিসফিস করে বললো---আমি আপনার একান্ত অনুগত বান্দা মাদাম, চিঠিপত্র কিছু দেওয়ার থাকলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

বুঝলাম আমার প্রেমিক টাকা দিয়ে ওকে হাত করেছে।

সেই থেকে ওই লোকটার মাধ্যমেই চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলতে লাগলো আমাদের।

প্রায় দু মাস কেটে গেল এইভাবে, লোকটাকে বিশ্বাস করেছিলাম আমরা, তুমিও যেমন বিশ্বাস করেছিলে ওকে।

তারপর কি ঘটলো শোন।

একদিন একলা ওই ছোট্ট দ্বীপটাতে গিয়ে দেখি লোকটা অপেক্ষা করছে সেখানে এবং সে আমাকে জানালো যে তার কামনা তৃপ্ত না করলে সে আমাদের সব কিছু ফাঁস করে দেবে তোমার কাছে।

ওঃ - - - পিতা আমার---ভয়ে যেন পাগলের মত হয়ে উঠেছিলাম আমি। সব কিছু জানতে পারলে তুমি কি ভয়ানক কাণ্ডই না করবে, হয়ত - - - হয়ত আমার প্রেমিকের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হবে এইসব ভেবে যেন ভয়ে উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠলাম। আর - - - আর ভাবলাম এইভাবেই ওই শয়তানকে হয়ত আবার কিনে নেওয়া যাবে।

হায় - - - ভগবান ঐ লোকটাও নাকি আমাকে ভালবেসেছিলো, কি লজ্জা - - - কি লজ্জা।

আমরা মেয়েরা যে বড় দুর্বল, অনেক দুর্বল তোমাদের চেয়ে।

তাই বোধহয় একজন মেয়ের যদি একবার পা পিছলোয় সে আর কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারে না।

আমি কি করছি সে জ্ঞান তখন আর ছিল না, ভয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ঐ জানোয়ারটার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

বাবা---আমি নিজের দোষ খণ্ডন করার চেষ্টা করছি না কিন্তু শুধু যা ঘটেছে তাই জানাতে চাই তোমাকে।

আর তারপর থেকে যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটতে সুরু হল, ঐ লোকটা তার যখন ইচ্ছা তখনই ভোগ করতে সুরু করলো আমাকে ভয় দেখিয়ে।

অন্যজনের মত সেও আমার প্রেমিক হয়ে দাঁড়ালো—ন্যক্কারজনক অবস্থা নয় কি ?

ভেবে দ্যাখো তো সে কি অসহনীয় শাস্তি।

এইবার সব ঘুচলো আমার, আমাকে যে মরতেই হবে।

বেঁচে থাকতে এতবড় অপরাধের কথা স্বীকার করতে পারবো না তোমার কাছে---একমাত্র মৃত্যুই সে সাহস যোগাতে পারে।

মরা ছাড়া গত্যন্তরও তো কিছু নেই, এত নোংরা হয়ে গেছি যে কিছুই আর আমাকে পবিত্র করতে পারবে না।

কারুকে ভালবাসার—না কারুর ভালবাসা পাওয়ার অধিকার আর নেই আমার।

এখুনি সমুদ্রে স্নান করতে যাব এবং আর ফিরবো না।

তোমাকে লেখা এই চিঠিটি আমার প্রেমিকের ঠিকানায় পাঠালেম; আমার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী সে এটি যথা-সময়ে তোমার হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

সমাধিস্থান থেকে ফিরে এসে চিঠিটা পড়বে তুমি।

বিদায় - - - পিতা, আর কিছু বলার নেই যা তোমার মন চায় তাই করো, আর - - - আর পার তো আমায় ক্ষমা করো।

ঘর্মসিক্ত কপালটা মুছে ফেললেন কর্নেল। যুদ্ধক্ষেত্রের সেই পরিচিত স্থৈর্য আবার যেন ফিরে পেলেন তিনি।

হাতের পাশে ঘণ্টিটার ওপর চাপ দিলেন।

একজন ভৃত্যকে দেখা গেল দোরের সামনে।

ফিলিপকে একবার ডেকে দাও—বললেন কর্নেল, তারপর টেবিলের দেরাজটা খুললেন।

লোকটা এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই; লাল রং-এর ঝাঁকড়া গোঁফ ধূর্ত মুখের ভাব লম্বা চওড়া বিশালদেহী এক সৈনিক।

সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকালেন কর্নেল।

আমার স্ত্রীর প্রেমিকের নামটা জানতে চাই।

কিন্তু - - - হুজুর---

খোলা দেরাজটার ভেতর থেকে এক-টানে রিভলভারটা বার করে আনলেন কর্নেল---তাড়াতাড়ি বল, জান তো আমি বাজে কথা বলি না।

হুজুর - - - তাঁর নাম ক্যাপটেন সেণ্ট অ্যালবার্ট।

নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওর দুচোখের মাঝখানে একটা আগুনের ঝলক দেখা গেল, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে, গুলিটা ঠিক কপালের মাঝখানে লেগেছিল।*

অনুবাদিকা—শ্রীমতী রেবা দেবী

* দি অড়ালি গল্প হইতে।

আলোকচিত্র—সোমা চৌধুরী

বার্ধক্যে যৌন সমস্যা

কত বছর বয়সে কাউকে বৃদ্ধ বলা চলে? ফলেও, বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষায়তন এবং সরকারী কাজে সাধারণত ৬৫ বছর বয়স্ক লোককে বৃদ্ধ মনে করা হয়। স্পষ্টতই সংখ্যাটি সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক এবং শাসনকার্যের পক্ষে সুবিধাজনক।

৬৫-তে সবাইকে বৃদ্ধ বলা যায় না। খনি-কর্মীরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ সুরু ক'রে, তারা তাই ৬৫-র অনেক আগে বুড়িয়ে যায়। কিন্তু অসংখ্য মানুষ ৬৫-র পরেও বেশ শক্তপোক্ত—দেহ এবং মনে।

সাধারণভাবে একটা ভুল বিশ্বাস প্রচলিত—হঠাৎ দুম্ ক'রে মানুষ-মানুষীর যৌনজীবন স্তব্ধ হয়ে ওঠে। পুরুষের ক্ষেত্রে বয়সটা মোটামুটি ৬০, স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ঋতুবন্ধ।

সাম্প্রতিক বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে—পুরুষের ষোল-সতের বয়সের পর থেকেই যৌন-ক্ষমতা হ্রস্ব হওয়া সুরু হয়, এবং তা চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, মৃদুগতিতে। যৌন-ক্ষমতা তা হলে কোন্ বয়সে শেষ হয়ে যায়? মানুষভেদে বয়সভেদ অনিবার্য, অন্যান্য কয়েকটা ব্যাপারও এক্ষেত্রে গণনীয়:

উত্তরাধিকার

অন্যদের তুলনায় বেশি সক্ষম হওয়ার অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ যৌন-অঙ্গের সুস্বাস্থ্য, এবং সাধারণত এই শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ পড়ে সারা দেহে। যে লোক সারাজীবন রীতিমত যৌন ব্যাপারে তৎপর, সে ৬৫-র পরও দীর্ঘদিন যৌনকর্মক্ষম থাকবে ধরে নেওয়া যায়।

সাধারণ স্বাস্থ্য

শরীরের যে-কোন অঙ্গে ব্যাধি হলে যৌনাংগ সহ অন্যান্য অংগ আগে বা পরে প্রভাবিত হয়ে থাকে। আবার, দৈহিক এবং মানসিক সুস্বাস্থ্য যৌনাংগকে খুব সক্রিয় হতে সাহায্য করে।

মানসিকতার প্রভাব

যৌনসাথী না থাকলে সুস্থ যৌন-জীবন যাপন অসম্ভব। যেমন বয়স্ক কোনও বিপত্নীকের পক্ষে নতুন করে সামঞ্জস্য বিধান করা ঘোরালো সমস্যা এবং ফলত তার যৌনজীবনের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমন কি, তার ক্ষমতা শেষ হওয়ার আগেই যৌন-জীবন একেবারে শেষ হয়ে যেতে পারে।

বয়স্ক লোকদের সকল যৌনক্রিয়া এমন কতকগুলো অবস্থা-নির্ভর, যা সবসময় তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। অনেক বয়স্কব্যক্তিই বাহ্যিক প্রতিকূলতার জন্য নিজেদের যৌনক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেন না।

যৌনক্ষমতা হ্রাসের প্রভাব

বয়সের জন্য যৌন অংগগুলোর ক্ষমতাও হ্রাসের ফলে যে লক্ষণ দেখা দেয়, তা 'জীবনের পরিবর্তন' শীর্ষক সাধারণ নামে অভিহিত করা চলে।

অনেক চিকিৎসক বলেন, পুরুষের জীবনে (দৈহিক) পরিবর্তন নিরস্তিত্ব। অন্যান্যরা চিত্ত-দৌর্বল্য, আকস্মিক মেজাজ পরিবর্তন, উৎকণ্ঠা এবং ক্রন্দনশীলতা নির্দেশ করেন, এগুলো প্রায়ই যৌন অক্ষমতার সংগে যুক্ত ক'রে দেখা হয়। তারা বলেন, এই লক্ষণ এবং যৌন ক্ষমতা হ্রাস মেয়েদের ঋতুবন্ধের তুল্য। প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় মধ্য বয়সে 'জীবনের পরিবর্তন' আসে না। সে যাই হোক, আমরা জানি যে, মধ্য বয়সে পুরুষের দেহে কয়েকটা লক্ষণ চোখে পড়ে; যদিও কারো কারো ক্ষেত্রে আরও পরে তা প্রকট হয়, কারো ক্ষেত্রে আবার আদৌ হয় না।

অকেজো আসাহায় অনুভূতি

নিজেকে অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত ভাবা, কিংবা দেহমনে সতর্ক এবং সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ দৈহিক অবসর গ্রহণে বাধ্য হওয়া বয়স্কদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এক-ঘেয়েমী, গুরুত্ব হারানর অনুভূতি, ভালবাসা আর নিরাপত্তাবোধের অভাব—এইসব মানুষের-মানুষীর যৌনক্ষমতা সমেত গোটা অস্তিত্বই দ্রুত শেষ ক'রে দিতে পারে।

বন্ধ্যাত্ব

কেউ কেউ আশি, এমন কি আরও বেশি বয়স পর্যন্ত স্ত্রী-ডিম্ব উর্বর করতে সক্ষম। তবে, মধ্যবয়সে থেকেই পর্যাপ্তসংখ্যক এবং যথেষ্ট

ক্ষমতাসম্পন্ন পুং-বীজ উৎপাদন-ক্ষমতায় ভাঁটার টান ধরা সম্ভব।

ক্ষমতাহীনতা

এই লক্ষণটি পঞ্চাশোর্ধ পুরুষের জীবনে বহুদৃষ্ট, কিন্তু মিলনাকাঙ্ক্ষা আগের মতই তীব্র থাকতে পারে। ক্ষমতাহীনতা হয় মানসিক এবং আত্মপ্রত্যয়হীনতার ফলাফল, কিংবা যৌন-অংগর বয়সজনিত।

নারীর জীবনে 'পরিবর্তন' সর্বজনস্বীকৃত। যাই হোক, ৪০-৫০-এর মধ্যে ব্যাখ্যাতীত যে-কোন লক্ষণকেই ঋতুবন্ধজনিত মনে করার প্রবণতা রয়েছে। এ সময় কয়েকটা পরিবর্তন আসে :

(এক) ঋতু একেবারে বন্ধ হওয়ার আগে ধীরে ধীরে মাসিক স্রাবের পরিমাণ কমে এবং মাসিক হয় অনিয়মিত সময়ে।

(দুই) জরায়ুর ডিম্বপ্রসবে অক্ষমতাই বন্ধ্যাত্বর হেতু। তবে, ঋতুবন্ধর পরও কুচিৎ গর্ভ সঞ্চার হতে দেখা গেছে।

(তিন) যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা থাকে। গর্ভসঞ্চারের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় এই আকাঙ্ক্ষা বাড়তে পারে।

(চার) ঋতুবন্ধকালে যৌনমিলন কখনও কখনও বেদনাদায়ক হলেও পরবর্তীকালে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ভ্যাজিনা বা ভ্যাজিনা-র প্রবেশমুখস্থ তন্তুগুলো কুঁচকে এবং শক্ত হয়ে গেলে এ রকম হয়।

(পাঁচ) মিলনে অনীহা সাধারণত মানসিক অস্বস্তিজাত, কুচিৎ তা ঋতুবন্ধকালীন দৈহিক পরিবর্তনজনিত।

বয়স্কদের যৌন-জীবনযাপন, তাদের সমস্যা এবং সমাধানের জন্য অবলম্বিত উপায় কিছু পরিমাণে বিশ্লেষিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্লেষণের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়।

ডাঃ কিন্‌সে-র প্রতিবেদন বলছে, 'যৌনজীবনের অবনতি অত্যন্ত বেশি অবিচ্ছিন্ন এবং কোন নির্দিষ্ট বয়সেই বার্ধক্য হঠাৎ মানুষকে গ্রাস করে না।

ডাঃ পার্ল, কার্ল এম ব্যোম্যান, ডাঃ ডবল্যু আর উল্‌ফ্‌, ডাঃ এ ডবল্যু স্পেন্স্‌ প্রমুখ খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞরাও এ-সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।

যৌনক্রিয়ায় ভাঁটার টান আলোচনা করার সময় বয়স ছাড়াও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা দরকার। এটি যৌন-আতিশয্যর ফল নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ কমে আসে। পুরুষরা তরুণী বা অধিকতর আকর্ষণীয় যৌন সাথী পেলে তাদের যৌনক্ষমতা চটপট বাড়তে পারে, এই আকস্মিক বৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা আছে, কেন না, তার যৌন-বাসনার ধাক্কা হৃৎপিণ্ড সব সময় ঠিক মানিয়ে নিতে নাও পারে।

মধ্যবয়স্ক এবং বৃদ্ধদের যৌন-সমস্যা মোটামুটি অবহেলিত, এবং স্বল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞই এ-ব্যাপারে গভীরভাবে মাথা ঘামিয়েছেন। কিছুদিন আগেকার এক মেডিক্যাল ম্যাগাজিনে-বলা হয়েছিল, 'বয়সের সংগে সংগে পুরুষের সত্যিকার যৌনক্ষমতা হ্রাস পায়, কিন্তু যৌনাকাঙ্ক্ষা এবং মিলন-ক্ষমতা, এমন কি গর্ভসঞ্চারের ক্ষমতা আরও বেশি বয়স পর্যন্ত থাকা সম্ভব।

যৌনশীতলতা সাধারণত মানসিক বা 'বার্ধক্যে'র জন্য নয়। সান্ত্বনা সঠিক যৌনশিক্ষা এবং সুখী বিবাহ সাহায্যে এক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটান সম্ভব।

পুরুষের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব ঘোচান শক্ত। অণ্ডকোষের তন্তুর অবস্থার ওপর এটি বহুলাংশে নির্ভরশীল। হরমোন চিকিৎসা করা যেতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলাফল সন্তোষজনক হয় না। অণ্ডকোষের কাজ ঠিক মত না হলে পুরুষের অক্ষমতা পৌরুষ-হরমোন চিকিৎসায় সাধারণতঃ সুফলপ্রদ হয়। মানসিক হেতুজ অক্ষমতা ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা কোনও কাজে আসে না। এ ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্য আবশ্যক।

যৌন ক্ষমতায় অনাবশ্যক হ্রাস বন্ধ করতে হলে উচিৎ সক্রিয় যৌন জীবন অস্বাভাবিক না ভেবে যতদিন সম্ভব যৌনমিলনে ব্রতী হয়ে তৃপ্ত হওয়া। মধ্য বয়সের পরই পারিপার্শ্বিক মানুষকে জোর ক'রে ভাবতে শেখায় ব্যাপারটি আর শোভন নয়, এমন কি ক্ষতিকর। ধারণাটি সর্বৈব ভুল।

এ-ব্যাপারে তাই অত্যন্ত প্রয়োজন পারিবারিক এবং সামাজিক সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর। যৌনসুখ উপভোগ স্বাভাবিক সঙ্গত, সুস্থ এবং সবল মানসিকতার নিদর্শন। মানুষের প্রবলতম এই ইচ্ছা চাপ দিয়ে বন্ধ করার কুফল মানুষই ভোগ করছে দীর্ঘদিন। আর এ অবস্থা চলতে দেওয়া উচিৎ নয়। এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবেন উপযুক্ত চিকিৎসক। সামাজিক কুসংস্কারই হাস্যকর, এবং অবশ্যই ক্ষতিকর আর পীড়াদায়ক। যৌনেচ্ছা নয়। এ ইচ্ছা পূরণ হওয়া মঙ্গলজনক। আর, ভুললে চলে না, প্রায় সব মানুষই মধ্য বয়সে বা বার্ধক্যে তা পূর্ণ করতে চায় সম্পূর্ণ সমাজস্বীকৃত পন্থায়। সামাজিক আপত্তির কারণটাই সে কারণে কারণহীন।

—বাৎস্যায়ন

অগম্যাগমন

অর্থাৎ পিতা-পুত্রী ভ্রাতা-ভগিনী জাতীয় অত্যন্ত নিকট সম্পর্কের যৌন-মিলন—চিরকাল নিন্দিত হয়েছে। অতীতে এর শাস্তি ছিল ভয়াবহ—প্রায়শই মৃত্যু। প্রায় প্রত্যেক সমাজে পিতামাতার সঙ্গে কন্যা বা পুত্রের মিলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ. কেবল দু'একটা সমাজে শাসকদের পারিবারিক যৌন মিলন অনুমোদিত, এমন কি প্রত্যাশিত। প্রাচীন অ্যাজ্‌টেন এবং মিশরীয় টলেমীদের মধ্যে এ প্রথার সাক্ষাৎ মেলে। ভাই-বোনের মিলনজাত সন্তানের সাহায্যে তারা কয়েক পুরুষ নিজস্ব বংশ শাসন বজায় রেখেছিলেন শাসকদের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম অনুমোদনের কারণ একটি ধারণা—নিজস্ব রক্ত সম্বন্ধীয় ছাড়া অন্য কেউ তাদের মিলনের অনুপযুক্ত।

অগম্যাগমন বীভৎস রসসঞ্চারী, সুতরাং দেহ-মনের ওপর এর ফলাফল সাংঘাতিক হওয়া স্বাভাবিক। এটাই সাধারণ বিশ্বাস; অনেকের মতে এর ফলে সন্তানের পাগলামী বা মানসিক ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। এই ধারণা ঠিক নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—

জার্দিপিয়াস এবং এ্যান্‌টিগোন

নিজ মাতাকে বিবাহ করার কথা যখন জানতে পারলেন, তখন মর্মাহত জার্দিপিয়াস স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করে কন্যা এ্যান্‌টিগোনের হাত ধরে দেশত্যাগ করলেন।

যেমন, ভাই আর বোন মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মিলনজাত সন্তানের মধ্যে জনক-জননীর প্রবণতা তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। ঘোড়া এবং কুকুর উৎপাদকেরা এটা জানে এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে অভীপ্সিত ফল আদায় ক'রে নেয়।

কিন্তু অগম্যাগমন বাঞ্ছনীয় প্রবণতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় প্রবণতাও তীব্রতর করে স্পষ্টই এটি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর।

নিঃসন্দেহে আমরা এটি অবাঞ্ছনীয় ভাবি, তাই অগম্যাগমন আমাদের চোখে ঘৃণ্য। তাছাড়া, এর ফলে সংযত মানসিক উত্তেজনা দায়িত্বহীন পথে ছাড়া পাওয়ায় গুরুতম পারিবারিক দ্বন্দ্ব প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

জকারম্যান 'এপ' এবং 'মাংকি'-দের গবেষণা ক'রে এই বক্তব্যের সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। তিনি আবিষ্কার করলেন স্বাধীনচারী বাঁদরদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান দু'চারজন বয়স্ক বাঁদর মেয়েদের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য আটকে রেখে। তারপর ঐ বয়স্ক বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়েপড়া মাত্র তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী এক বা একাধিক বাঁদর মেয়েদের নিজস্ব ভোগে লাগাত বৃদ্ধ বা রুগ্নদের খুন ক'রে। সমবয়সীদের সঙ্গেও দারুণ আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব হত।

স্পষ্টই এই ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব পারিবারিক একতা নষ্ট করে। মানুষ এ ব্যাপারে যে বাধানিষেধ তৈরী করেছে তা প্রকৃতই অত্যন্ত সুফলপ্রদ। এমন কি অত্যন্ত আদিম সমাজের তরুণদের পরিবারের বাইরে থেকে জীবনসঙ্গিনী খুঁজে নিতে উৎসাহ দেওয়া হত, এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিস্তারিত 'টোটেম' প্রথা চালু আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই জাতীয় সমাজে বাধানিষেধ এত বিস্তৃত যে, নিজের মা এবং বোনদের বাদ দিতে গিয়ে তরুণকে তার গোষ্ঠীর আধাআধি মেয়েদের বাদ দিতে হয়।

অগম্যাগমন বীভৎস হওয়া সত্ত্বেও বহু আইন প্রায়ই এটি ঠিক ঠিক সংযত করতে সক্ষম হয় না। এথেন্স-এ যে কোন পুরুষ বোনকে বিয়ে করতে পারত, যদি সে এক মায়ের পেটের না হয়। অর্থাৎ সৎ বোনকে বিয়ে করা ছিল আইন সম্মত ব্যাপার। হেরোডোটাস পারস্যরাজ ক্যাম্বীসেস প্রসঙ্গে লিখে গেছেন যে, রাজা একবার বড় বোনকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়ে বিচারকদের প্রশ্ন করেন ভগ্নী বিবাহে কোনও বাধা আছে কি না।

বিচারকরা ঘুরিয়ে উত্তর দেন বোনকে বিয়ে করা চলে এই মর্মে কোন আইন তাঁরা খুঁজে না পেলেও দেখেছেন পারস্যরাজ তাঁর যা খুশি করতে পারেন।

রাজা তক্ষুণি বড় বোনকে, এবং কিছুদিন পরে ছোট বোনকে বিয়ে করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এ তাঁর মানসিক অ-স্থৈর্যের প্রকাশ; শোনা যায় তাঁর মৃগী রোগ ছিল, মদ্যপানে তাঁর আসক্তি ছিল, এবং তিনি শেষ পর্যন্ত মনোরোগে আক্রান্ত হন।

ধর্মীয় আদালতের চোখ এড়ালে অগম্যাগমন ইংলণ্ড-এ দীর্ঘকাল অপরাধ

হিসেবে গণ্য হত না, তবে ১৯০৮ এর 'অগম্যাগমন আইন'-এ পৌত্রী, পুত্রী বা মাতার সঙ্গে মিলন দণ্ডযোগ্য অপরাধ। নারীর সম্মতি এক্ষেত্রে কৈফিয়ত হিসেবে অ-গ্রাহ্য।

আধুনিক সমাজে তিনভাবে অগম্যাগমন সম্ভব :

(এক) জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, পশ্চাদপদ, এবং মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে ;

(দুই) মদ্যপায়ীদের মধ্যে, বিশেষত তাঁরা নাগাড়িগাদান হয়ে বাঁচতে বাধ্য হলে ;

(তিন) প্রথম শৈশবে বিচ্ছিন্ন ভাই-বোনের মধ্যে, পরস্পর পরস্পরকে চিনতে না পারায়।

মানসিক ত্রুটি

ব্যক্তিত্ব গঠনপর্বেই প্রতিটি মানুষ কিছু কিছু বাধা-নিষেধের পরিচিত হয় যা তাদের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়। কারো মনে এই বাধা-নিষেধের প্রভাব অল্প, আবার কারো মনে খুব দৃঢ়মূল প্রভাববিস্তারী। মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন মানুষের প্রতিরোধক্ষমতা অল্প এবং যৌনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় তারা সাধারণ মানুষ এড়িয়ে যায় এমন প্রলোভনে পা গলিয়ে দেয়।

যে সব ঘটনা বিচারকদের আতংকিত করে এবং যা কোনও কোনও দেশে কঠোর শাস্তিযোগ্য, তার অনেকগুলো মানসিক ত্রুটিজাত। যেহেতু নির্বুদ্ধিতার ফলে এরা গর্ভনিয়ন্ত্রণের কৌশল জানে না, এদের মিলন প্রায়ই গর্ভসঞ্চারী হয় এবং মেয়েটি স্বীকার করে ভাই বা বাবা তার সঙ্গে যৌনমিলনে ব্রতী হয়েছিল।

মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন মানুষ সাধারণত কম রোজগারী এবং তার পরিবারের দারিদ্র্য চূড়ান্ত। একই ঘরে নাগাড়িগাদান হয়ে থাকতে তারা বাধ্য, ফলত তাদের যৌনেচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে, ভিন্ন পরিবেশে এমনটা হত না। এই সব ক্ষেত্রে ক্রোধ নয়, করুণা করা প্রয়োজন এবং সামাজিক ভাবে এগিয়ে আসা দরকার পর্যাপ্ত বাসস্থান নির্মাণ

আম্মন ও তামার

ওল্ড্ টেস্টামেন্ট-এর 'বুক অফ্ স্যামুয়েল'-এ উল্লিখিত আছে যে রাজা ডেভিডের জ্যেষ্ঠ পুত্র আম্মন তার বৈমাত্রেয় ভগিনী তামারকে বলপূর্বক ধর্ষণ করেছিলেন।

করার জন্য ; দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর গুরুগম্ভীর উপদেশ বলী বিতরণ প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে অবাঞ্ছনীয়।

মদ বা ঐ জাতীয় পানীয় মানুষের স্বাভাবিক সংযম ধ্বংস করতে পারে। মদ্যপানের ফলে বিভ্রান্তি স্বাভাবিক এবং তা হলে নিজেরই অজান্তে যৌন ক্রীড়া সম্পন্ন হয়ে যায়। আর, একবার এ রকম হওয়ার পর সে বারবার ঐ কাজে প্রলুব্ধ হয়, যেহেতু শাস্তি একবার বা একাধিকবারে তুল্যমূল্য।

মাতা-পুত্রের চেয়ে পিতাপুত্রী বা ভাইবোনের অবৈধ যৌন-সম্পর্ক বেশি চোখে পড়ে। এ ধরণের 'কেস'-এর সংখ্যা উড়িয়ে দেবার মত নয়।

শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন ভাই-বোনের অবৈধ যৌনসম্পর্ক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ডাঃ সি অ্যালেন তাঁর 'দ্য সেকস্যুয়ালস পারভার্শনস অ্যাণ্ড অ্যাবনর্ম্যালিটিস' গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। খবরের কাগজের রিপোর্ট-এও এটি দেখা যায়। ব্যাপারটা অ-স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের ফসল বলে বিচারকরাও এ ব্যাপারে অনেকটা সহানুভূতিশীল।

শৈশব থেকে ভাইবোন যে সামাজিক সম্পর্ক মেনে চলতে অভ্যস্ত হয় তাতে পারস্পরিক যৌনাকর্ষণ আদৌ থাকে না। ফলত, ভাই বোনের দৈহিক সৌন্দর্যে বিতৃষ্ণ হয়—বোন প্রকৃতপক্ষে সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও এবং বোন ভাইকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চোখে দেখে। অতি শৈশবে বিচ্ছিন্ন হলে মানসিক গড়নে এই প্রবণতা ফুটে উঠতে পায় না। আবার, কোনও অজ্ঞাত কারণে এই জাতের ভাইবোন তীব্রভাবে পারস্পরিক আকর্ষণ বোধ করে। হঠাৎ কাছাকাছি এলে তারা পরস্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করে কিনা - [illegible]

এর প্রতিকার কি ?

প্রতিকার স্বভাবতই অগম্যাগমনের কারণ নির্ভর। মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন ব্যক্তিদের গড়ে তোলা হয় কঠোর নৈতিক শাসনে, কারণ তারা নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ছাড়া অন্য কিছু ঠিক বোঝে না। কাজেই, সাধারণভাবে এদের যৌন স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়া অনুচিত। বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালে—এই সময় যৌনাবেগ সুতীব্র থাকে।

মদ্যপানের সমস্যাটি জটিলতর হবে, মেয়েদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ক্রমপ্রসারমাণ, ফলে তারা প্রয়োজনমত সাবধান হওয়ার সুযোগ ক্রমেই বেশিমাত্রায় পাবেন।

শৈশবে বিচ্ছিন্ন ভাইবোনের অবৈধ যৌন মিলন এড়ানো যায় এ সম্পর্কে তাদের যথোপযুক্তভাবে জানালে।

মানসিক ত্রুটিসম্পন্নদের সামলানো যায় না, সমবেতভাবে চিকিৎসা করা যায় মাত্র। এদের সামলান খুব দরকার কারণ এর ফলে কেবল বাবা-মা ক্ষতিগ্রস্ত হন না, শিশুরও মানসিক ত্রুটি হওয়া খুবই সম্ভব, বিশেষ দু'টি মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন জনক-জননীর সন্তানের ভবিষ্যৎ শংকাজনক। মদ্যপায়ী হলে উপযুক্ত চিকিৎসা দরকার। অগম্যাগমনের ব্যক্তি যেন হলে জেলেই তার চিকিৎসা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্তকে মদ্যপায়ী জনক বা জননীর কাছ থেকে পৃথক করা দরকার।

ক্ষতিগ্রস্ত সন্তানের মন থেকে সর্বপ্রথম অপরাধ বোধ মুছে দিতে হবে। কখনও কখনও সুপারভিসিয়ন সাইকোথেরাপির সাহায্যে এটি করা সম্ভব। .. তখন ঠিক কী ঘটেছিল বলতে পারে। যাই হোক, তাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে চিকিৎসা করা উচিত।

কিন্তু 'সিজোফ্রেনিয়া' জাতীয় কোন নির্দিষ্ট রোগ হলে তার যথোপযুক্ত থেরাপী চিকিৎসা দক্ষ চিকিৎসকের সাহায্যে করানই বাঞ্ছনীয়।

অগম্যাগমনের ব্যাপারে সব তথ্য জানাও জানা সম্ভব হয়নি। যেমন বাবা বা মার অ-বৈধ কামনাতৃপ্তির ফলে ঠিক শতকরা কতজন সন্তান স্নায়বিক অথবা মানসিক রোগগ্রস্ত হয় তা অজানা। গবেষণা চলছে। আশা করা যায় এ তথ্য একদিন জানা যাবে।

এ কথা ঠিক যে অধিকাংশ লোকের মনেই অগম্যাগমনের আকাঙক্ষা থাকতে পারে এবং এটি স্মরণ থাকলে অবাক হয়ে ভাবতে হয় মানুষ কত সংযত, কত বেশি সামাজিক। কারণ, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে এই অবাঞ্ছিত ঘটনার সংখ্যা সামগ্রিকভাবে অত্যল্প। বোঝা দরকার সমস্যাটি চিকিৎসাসংক্রান্ত। আইন করে কঠোর শাস্তি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত।

—বর্ণাজীব

ঈশ্বরের উদ্দেশে

প্রভাকর মাঝি

ঈশ্বর, তোমাকে ন্যাদ্দিন তোয়াজ করে দেখলুম,
তুমি নির্বিকার।
ডাকলুম। নিরন্তর।
যথাসাধ্য বিবেকের নির্দেশে চললুম......
(বিবেকের বিকল্পই তো তুমি, কি বলেন ঈশ্বর মশাই ?)
ভাবের ঘরে চুরি করতুম না, মদ খেতুম না—
যদ্দুর সম্ভব সিধে সড়ক ধরে চলতুম।
সত্য ন্যায় ইত্যাদি ভারিক্কি কথাগুলোকে
প্রাণপণে আঁকড়ে ছিলুম এবং গাধার মতো খাটলুম।
কিন্তু তোমার ল্যাবোরেটরির ব্যবচ্ছেদাগারে
তুমি কেবল আমাকে নিরীহ গিনিপিগ রূপেই ব্যবহার করলে।
কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষাই চালিয়ে গেলে
সেই সিকনি-পড়া হিলহিলে ছেলেমেয়ে,
তালপতার রুগী জীবনসঙ্গিনী।
ঈশ্বর, তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছিলুম। বৃথা।
অথচ চোখের সামনে দেখছি,
আমার সহযাত্রীরা,—যারা ভুলেও কোনোদিন
ওপথ মাড়ালো না,—দিব্যি গুছিয়ে নিচ্ছে।
কংক্রিটায়িত রাস্তা দিয়ে ড্যাং-ড্যাংওয়ে চলে যাচ্ছে।
আমিই শুধু ঠকে গেলুম। কিন্তু আর না।
তাই প্রথম কিস্তিতেই গ্রাম্য ফাটি-অলার
অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আজ তাকে হিসেবে ঠকালুম।
ঈশ্বর, আমি শয়তানের হাতে হাত মেলালুম।

॥ পাঠিকারা পড়বেন না ॥

● ভাগোটী দত্ত, C/o. ডি সাইন লাভিস, শঙ্কর হালদার লেন, কলি-৫—

প্রশ্ন : বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে শরীরটা দোলে। কোনও দূরস্থানে যেতে ভয় হয়, মনে হয় এখুনি পড়ে মরে যাব। সেই ভয়ে কোথাও যাওয়া যায় না। চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।

উত্তর : শারীরিক দুর্বলতার জন্য ঘটেছে মনে হয়, তবে প্রেসার দেখিয়ে নেবেন। অতিরিক্ত বেশি অথবা কম ব্লাডপ্রেসারের জন্য শরীরের দোলা বোধ হতে পারে।

যদি ব্লাডপ্রেসার সংক্রান্ত কিছু না হয়, তবে দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে 'সায়োপ্লেকস্ লাইসিন' (অ্যালবার্ট ডেভিড) পুরো শীতকাল ধরে খাবেন। প্রেসারের ব্যাপার হলে তার চিকিৎসা করাবেন।

● এম মাধব রাও, মার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা-৪৯—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়ে সারাংশে উত্তর দিচ্ছি।

প্রশ্ন ১ : আজ প্রায় ৭।৮ বৎসর হইতে চলিল আমার শরীরের পিঠে অনেক জায়গাতে টিউমারের মত ছোট বড়, অনেক আছে, দেখতে বড়ই বিশ্রী লাগে। কপালে দুই একটা, হাতের বাহুতে দুইটি চারিটি, ব্যথা নাই, জ্বালা নাই।

উত্তর : আপনি যে রকম বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয়, আপনার লাইপোমা নামক টিউমার হচ্ছে। এগুলি চর্বির টিউমার এবং খুব নিদোষ। অনেকের এই টিউমার সারা জীবন-ব্যাপী থাকে। দৃষ্টিকটু লাগলে অপারেশন করা ছাড়া আর কোন চিকিৎসায় নিরাময় হবার সম্ভাবনা নেই।

প্রশ্ন ২ : আমার গলায় কাঁধের কাছে Cervical Ribs আছে অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

উত্তর : Cervical Ribs-এর বিষয় যে চিকিৎসকের মত নিয়েছেন, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। তাঁর মত নিয়ে চিকিৎসা করান, দেখবেন সুফল পেয়ে গেছেন।

● শ্রীসলিলকুমার ঘোষ, জননগরী, ২৪ পরগণা—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে B. G. Phos খাবেন, অন্তত এক মাস।

● শ্রীদেবব্রত মজুমদার, কালী-বাড়ি লেন, কলি-৩২—

আপনি প্রথম প্রশ্নে যে অভ্যাসটির কথা লিখেছেন, তা ছাড়তে হবে।
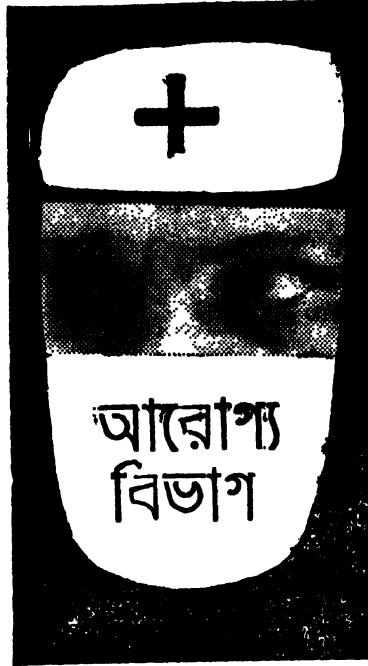
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

হাঁপানির পক্ষে এটি খারাপ। দ্বিতীয় প্রশ্নে যা বলেছেন, তা কোন রোগ নয়, তবে মাত্রাতিরিক্ত ভাল নয়; সপ্তাহে একদিনের বেশি উচিত নয়।

● শ্রীমান রোহান কানহাই, আলমবাজার, উড়িয়াপাড়া লেন, হুগলী—

প্রশ্ন ১ : কিছুদিন যাবৎ প্রস্রাবের সঙ্গে বীর্য বেরিয়ে যাচ্ছে। কি করলে এর প্রতিকার হবে?

উত্তর : আগে প্রস্রাব পরীক্ষা করান, যদি পরীক্ষায় পান, তাহলে যে-কোন চিকিৎসকের কাছে গেলেই তিনি চিকিৎসার উপদেশ দিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন ২ : কিছুদিন যাবৎ আমার চোখের কোলে কালি পড়ছে।

উত্তর : অতিরিক্ত দুর্ভাবনায়।

● শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ, তালপুকুর, ২৪ পরগণা—

বিকেলবেলায় খেলাধুলা করবেন, আর দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে, অ্যামাইনোজাইম এক মাস খাবেন।

● শ্রীতারাপদ দত্ত, গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টার, চুঁচুড়া, হুগলী—

আপনি দুবেলা ভাত খাবার আগে চা চামচের দু চামচ করে ডিজিপ্লেকস্ অথবা সায়োপ্লেকস্ এনজাইম ওষুধ খাবেন, অন্তত একমাস।

● শ্রীজগদীশচন্দ্র ধর, সি পি সি বি ব্লক, কলি-২৭—

আপনি দুবেলা খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে সায়োপ্লেকস্ লাইসিন এবং খাবার আগে চা চামচের দু' চামচ করে ডিজিপ্লেকস্ খাবেন দু' মাস।

● শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার—

প্রশ্ন ১ : আমার কোমরের কাছে দুইটি শ্বেত দাগ আছে। বিস্তৃতি খুবই কম। অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছি এবং শ্বেতী নয় বলে অভিমত পেয়েছি, কিন্তু আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না।

উত্তর : সাদা দাগ হলেই যে শ্বেতী হবে, এ ধারণা ভুল। অনেক সময়ে কাপড়ের কষা চাপে বাইরের চামড়ায় ক্ষত হয়ে, সাদা দাগ হয়। অনেক সময় যকৃতের দুর্বলতার জন্যে চামড়ার স্বাভাবিক রঙ নষ্ট হয়ে গিয়ে সাদা দাগ হয়। মোট কথা ভালভাবে এবং নিয়মিত চিকিৎসা করলে, সাদা দাগের বিস্তৃতি কম ঘটে, তবে একবার সাদা দাগ হয়ে গেলে তা আর সারে না। নাইলনের ক্রমাগত ঘর্ষণেও সাদা দাগ হয়।

প্রশ্ন ২ : গৃহ চিকিৎসার জন্য একটি ভাল বই-এর নাম জানাবেন।

উত্তর : কোন একটি বইতে চিকিৎসার সব দিক দিয়ে আলোচিত

মাসিক বসুমতী

। আশ্বিন, ১৩৭৫ ।।

শ্রীশ্রীদুর্গা

-পিনাকী বাগচী অঙ্কিত

হয়েছে বলে মনে হয় না। আপনি স্বর্গত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের পুস্তক অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

● শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস, গন্ধর্বপুর লেন, মালদহ—

প্রশ্ন : আমার কন্যার পাগল ব্যাধি ভাল হবে কি না? যদি ভাল হয়, কতদিন পরে হবে?

উত্তর : নিশ্চয়ই ভাল হবে। আজকাল পাগলের খুব ভাল চিকিৎসা আবিষ্কার হয়ে গেছে। কতদিন লাগবে একথা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।

● শ্রীবিভূতিভূষণ মিশ্র, নঘরিয়া, মালদহ—

আপনাকে যথাসময়ে ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীতপনকুমার দত্ত, চাঁদপুর, চুঁচুড়া, হুগলী—

প্রশ্ন : আমি হাঁ করে ঘুমাই, মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে লালাও পড়ে। আমার হাত, পা, নাকের ডগা ভীষণভাবে ঘামে। পড়বার সময় গামছা ভিজে যায়। ঘুমের সময় বিশেষ ঘাম হয় না, পিপাসা প্রচণ্ড আছে।

উত্তর : আমার মনে হয় আপনি অ্যাডিনয়েড্‌-এ ভুগছেন। সেইজন্যে দুর্বলতা অধিক, আর দুর্বলতার জন্য অতিরিক্ত ঘাম হয়, আর বেশি ঘাম হবার জন্যে বেশি পিপাসা লাগে। যাই হোক, আপনি কোন E N T Specialist-কে দেখিয়ে Adenoid সারিয়ে ফেলুন, দেখবেন অন্যসব উপসর্গ কমে যাচ্ছে।

● শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাকসেনা, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোজিভ লিঃ, গোমিয়া, হাজারিবাগ—

প্রশ্ন : আমার ছেলে ১৯৬৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, ১১-১৬ মিঃ জন্মগ্রহণ করে। তার তড়কা (Jerks) এবং ফিট আছে। ফিট্‌ হবার সময় শরীর শক্ত হয়ে যায়, হাত-পা সোজা হয়, তারপরেই দাঁত লেগে যায়, চোখের তারা উপরে উঠে যায়, সমস্ত শরীরে ভীষণ ঝাঁকানি হয়, ২।৩ মিনিটের বেশি থাকে না এবং এরপরেই প্রস্রাব হয়ে যায়।

উত্তর : আমার মনে হয় আপনার ছেলের মৃগী (Grand Mal) হয়েছে। আপনি সময় নষ্ট না করে কোন শিশু-রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে, চিকিৎসা সুরু করুন।

● শ্রীহরিসত্য রায়, কামালপুর, শক্তগড়, বর্ধমান—

প্রশ্ন : আমার একমাত্র পুত্র শ্রীর দুই বছর বয়স হইয়াছে, আজ পর্যন্ত কথা বলতে বা দাঁড়াতে পারে না।

উত্তর : অনেক সময়ে দাঁড়ানো বা কথা বলা একটু দেরিতে শেখে। আপনি নিরাশ হবেন না। ছেলেকে নিয়মিত দুবেলা Abdec Drops (Park Davis) অথবা Siovite Drops (Albert David) একবেলা ছ'ফোঁটা ওবেলা ছ'ফোঁটা খেতে দেবেন, অন্তত ছ মাস। এ ছাড়া রোজ কডলিভার তেল মালিশ করবেন।

● শ্রীঅসিতকুমার বিশ্বাস, লছমীগঞ্জ, দেওরিয়া, উত্তর প্রদেশ—

প্রশ্ন : আমি গত এক বৎসর যাবৎ পেটের বাঁ দিকে নাভির পাশে ব্যথা অনুভব করি। সবসময়ে মনে হয়, খাবার বাঁ দিকেই রয়ে গেছে। সকালে পায়খানা করবার পরও মনে হয়, Complete evacuation of the bowel হয়নি এবং সাথে সাথে বাঁ পাটাও সম্পূর্ণ ব্যথা করে, বিশেষ করে রাত্রে ঘুমোবার সময় ও আরাম করবার সময়।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

উত্তর : পুরনো আমাশয়ের জন্য অপরিপূর্ণভাবে মলত্যাগ হচ্ছে না, ফলে এই কষ্ট হচ্ছে। আপনি প্রথমে জোলাপ নিয়ে পেট পরিষ্কার করুন, তারপরই Amicline অথবা Davoquin বড়ি দিনে চারটে করে দশদিন খান। দেখবেন সব উপসর্গ চলে গেছে। তারপর যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না থাকে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

● শ্রীশঙ্কর মিত্র, ঘোষপাড়া, গরিফা, ২৪ পরগণা—

আপনি মহাভৃঙ্গরাজ তেল (ডাঃ শিকদার) মেখে দেখতে পারেন, তার সঙ্গে দুবেলা খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স তিন মাস খাবেন।

● ভাগ্যহীন, কলকাতা—

আপনি অহেতুক ভয় পেয়ে নিজেকে ভাগ্যহীন বলে মনে করছেন কেন? যে উপসর্গগুলো বলেছেন প্রত্যেকটি স্বাভাবিক কারণে ঘটছে। আপনি আমার কথামত চলুন দেখবেন সমস্ত উপসর্গ কমে গিয়ে, সংসারে শান্তি স্থাপিত হয়েছে।

(ক) সপ্তাহে দুদিন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবেন। (খ) প্রথম রাতে মিলিত হবেন না। প্রথম রাতে ঘুমিয়ে নিয়ে শেষ রাতের দিকে মিলিত হলে উভয়পক্ষের স্বাস্থ্যের উপকার হয়। (গ) বিচলিত একদম হবেন না। প্রথম প্রথম দু একবার ব্যর্থ হলেও দেখবেন এই পদ্ধতিতে উপকার পাবেন। যৌন-জীবন নিয়ে যত ভাববেন, তত উগ্রতা বাড়বে, আর উগ্রতা বাড়লেই যে উপসর্গগুলি বলেছেন, সেইগুলো হবে। উপসর্গ বাড়লে, ভয় বাড়বে, আর ভয় বাড়লে আবার উপসর্গ বাড়বে। এই উপসর্গগুলি শারীরিক দুর্বলতার জন্যে যত না বাড়ে মানসিক অস্বস্তিতে বেশি বাড়ে।

● আর এস জি, কলকাতা—

আপনি দুবেলা একটি করে নেব্রোভিটামিন ফোর (অ্যাডাল্ট) বড়ি খাবেন, দুমাস।

● শ্রীঅলোক সেনগুপ্ত, গরিফা, ২৪ পরগণা—

আপনি দুবেলা এলিক্সির নিয়োলা-ডাইন ২ চামচ (চা চামচের) খাবেন ভাত খাবার ঠিক পরেই।

● শ্রীদিবাকর দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৬—

আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে সায়োপ্লেক্স লাইসিন খাবেন এবং মালটিফাংগিন মলম আঙুলের ফাঁকে লাগাবেন অন্তত দু মাস।

● শ্রীকমলকুমার মুখোপাধ্যায়, মগুলাই, হুগলী—

প্রশ্ন ১ : গত দুই বছর আগে আমার বসন্ত হওয়ার ফলে মুখে বিশ্রী ভাবে দাগ পড়িয়া গিয়াছে, মুখের দাগ মিলোবার কি কোন প্রতিকার আছে?

উত্তর : সঠিক কোন প্রতিকার নেই, তবে লিভোডার্ম মলম মুখে মেখে দেখতে পারেন।

প্রশ্ন ২ : মাঝে মাঝে আমার কপালের অর্ধদিকে মানে ডান চোখের উপরটা ভীষণ যন্ত্রণা হয়। এর ফলে আমি রাত্রিতে পড়িতে পারি না।

উত্তর : আপনি সন্ধ্যেবেলায় ১টি করে Stemetil বড়ি খাবেন। ১৫দিন ব্যথা হোক আর নাই হোক। এ ছাড়া খাঁটি মধু দু বেলা দু চামচ করে খাবেন, তিনমাস।

● শ্রীঅসীমকুমার চৌধুরী, রিষড়া, হুগলী—

আপনি দুবেলা চা চামচের ২ চামচ করে হ্যালিবঅরেঞ্জ খাবেন, তিনমাস।

● শ্রীযামিনীভূষণ সাউড়িয়া, হাওড়া—

কোন ভয় নেই। অনায়াসে বিয়ে করা চলে।

● এ চট্টোপাধ্যায়, বিরাটি, দাশ-নগর রোড, কলি-৫১—

দুধ গোটা কথাটার মানে বুঝলাম না। যদি গাইনিকোম্যাস্টিয়া হয়, তাহলে অপারেশন করে বার করে দিতে হয়। মাথায় নারিকেল তেল মাখবেন।

● অনেক ছাত্র, বর্ধমান—

আপনি নিয়মিত সায়োপ্লেক্স লাইসিন চা চামচের দু চামচ করে দিনে দুবার কি তিনবার খাবেন।

● চন্দন (ছদ্মনাম) কলি-২৩—

আপনি Amicline অথবা Davoquin বড়ি খাবেন, দিনে তিনটি করে ১০ দিন।

আপনার মাকে Digeplex অথবা Sioplex Enzymes ওষুধ দিনে দুবার করে খেতে দেবেন, অন্তত তিনমাস।

● শ্রীবংশধর পাল, বেলগ্রাম, গোবর্ধনপুর, বর্ধমান—

প্রশ্ন ১ : Cutaneous apparatus বলতে কোনগুলো বোঝায়? বিস্তারিতভাবে জানাইবেন।

উত্তর : চলিত ইংরাজীতে চামড়া এবং চামড়ার নীচের স্তরকে Dermis এবং Epidermis এবং তার মধ্যে যেসব গ্রন্থি থাকে তাকে Cutaneous apparatus বলা হয়। বিস্তারিতভাবে জানানো আরোগ্য বিভাগে সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ২ : ঐ apparatusগুলোতে কি কি রোগ হয়?

উত্তর : সমস্ত রকমের চর্ম ও স্বেদগ্রন্থিজনিত রোগ।

প্রশ্ন ৩ : Digestive apparatus কোনগুলো?

উত্তর : হজম সংক্রান্ত ব্যাপারে শরীরের যে অংশ এবং গ্রন্থি কাজে লাগে, যথা, মুখমণ্ডল, জিব, তালু, লালাগ্রন্থি, পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, পিত্তথলি ও প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি। অজীর্ণজনিত সমস্ত রকমের রোগ Digestive apparatus-এর গোলমালে হয়।

● শ্রীঅসিতকুমার রায়, পিলখানা রোড, মুর্শিদাবাদ—

আপনি রোজ ভাতখাবার পর Diapepsin (Union Drug) দুবেলা চা চামচের দু চামচ করে খাবেন, অন্তত একমাস। দু নম্বর উপসর্গের জন্য ভাবতে হবে না। আপনা থেকেই সেরে যাবে।

● শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যো-গেহ, দমদম---

আপনার পুত্র কন্যাদের ব্যাপার পড়লাম। আমার মনে হয়, আপনারা সকলেই ভিটামিন 'এ'র অভাবে ভুগছেন। সকলকে খুব বেশি করে ভিটামিন 'এ' দিন। অনেকটা কমে যাবে।

● শ্রীমৈনাককান্তি রায়, রজনীবাবু রোড, কাঁচড়াপাড়া---

আপনি দুবেলা খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে Neogadine খাবেন একমাস।

● নাম পড়া যাচ্ছে না, সঙ্গে কুপন নেই। পোস্টকার্ডের চিঠি। ব্রণ সম্পর্কে লিখেছেন। ব্রণ কমাতে হলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেই হবে, আর বাদাম ছাড়াও অনেক কিছু খেয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা যায়। শাকসব্জী কি খুবই মূল্যবান?

● শ্রীচিন্ময়দাস ভৌমিক, কয়াডাঙ্গা, ২৪ পরগণা---

ভুঁড়ি কমাবার জন্য ব্যায়াম করাই সবচেয়ে ভাল পথ। চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে, হাত দুটি মাথার ওপর তুলে দিয়ে, হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁবেন। হাত কানের সামনে আসবে না আর হাঁটু ভাঁজ হবে না।

● শ্রীসুখরঞ্জন বৈদ্য, ফুলবাগান, নবদ্বীপ, নদীয়া---

প্রশ্ন: কোমরের নীচ থেকে দুই পায়ে প্রতি লোমকূপের গোড়ায় এক একটি করে ফুসকুড়ি হয় এবং পাকে। অত্যন্ত চুলকোয়, গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত বাড়ে।

উত্তর: চিকিৎসককে দেখিয়ে পেনিসিলিন ইনজেকশন নেবেন। টনসিল দেখাবেন। অনেক সময়ে টনসিলে পুঁজ জমলে এ ধরণের রোগ হয়। তবে ভয়ের কিছু নেই। সেরে গেলে Multivitamin খাবেন।

ছদ্মনাম---ছদ্মবেশী বা অটোমেশন, ঠিকানা প্রকাশ করিব না---

প্রশ্ন ১: আমি নারীসঙ্গ কামনা করি, কিন্তু না পাওয়ার ফলে হস্তমৈথুন করিতে বাধ্য হই। ফলে ক্রমশ শীর্ণকায় হইতেছি।

উত্তর: জ্ঞানপাপীকে জ্ঞান দেওয়া পাপ।

প্রশ্ন ২: মেয়েকে কিরূপে ভালবাসিতে হয়, অর্থাৎ প্রেম কিরূপে করিতে হয়।

উত্তর: যতদূর মনে পড়ে, ডাক্তারী পড়বার সময়, মাস্টার মশায়রা এ বিষয়ে পড়ান নি।

● শ্রীতারাপদ সাহা, মুরারিপুকুর রোড, কলি-৪---

আপনি আগে আটদিন মিথিলিন ব্লু দিয়ে রেকটাল্ ওয়াস্ করিয়ে নিন, তারপর ওষুধ ব্যবহার করুন, দেখবেন ফল পাবেন।

● শ্রীনিখিলচন্দ্র সাহা, স্মিথ রোড, আনন্দবাজার---

আপনি দিনে তিনটি করে Amicline বড়ি ১০দিন খাবেন।

● শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য, মিশন-পাড়া, ডিগবয়---

আপনি সকাল-সন্ধ্যে চা চামচের দু চামচ করে Haliborange ওষুধ তিন মাস খাবেন।

॥ মহিলা মহল ॥

॥ পাঠকরা পড়বেন না ॥

● শ্রীমতী কণিকা ব্যানার্জী, মাণিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা---

আপনি Livoderm নামক মলম সকালে একবার রাতে শোবার সময় একবার লাগাবেন, দুমাস।

● শ্রীমতী মীনাক্ষী ঘোষ, সুইনহো স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯---

আপনার মেদহীনতার জন্য সমস্ত উপসর্গ হচ্ছে। আপনি নীচের নিয়মমত চলবেন।

১। অ্যাম্পিক্লিন বড়ি, সকালে ১টি, দুপুরে ১টি, রাতে ১টি---দশ দিন।

২। ডিজিপেপ্স দুবেলা ভাত খাবার আগে চা চামচের ২ চামচ করে এক মাস।

৩। হেপাটোগ্লোবিন দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে দু মাস।

সব ওষুধগুলি একসঙ্গে চলবে।

● শ্রীমতী মানসী, দক্ষিণেশ্বর---

চিঠি পড়ে বুঝলাম আপনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। অভিভাবকের কাছে না লুকিয়ে আপনার উপসর্গগুলো অন্তত মায়ের কাছে বলুন এবং কোন চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মতামত নিন। আগে থেকে বিচলিত হওয়া ঠিক নয়।

● শ্রীমতী অমিতা রায়, ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা---

আসন ব্যায়াম প্রভৃতি যা করছেন ছেড়ে দিন। Davoquin বড়ি সকালে ১টি রাতে ১টি দশদিন খান। তারপর ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Sharkoferrol অথবা Ferradol খান তিন মাস। ধৈর্য হারালে চিকিৎসা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিন মাস পরে জানাবেন কেমন থাকেন।

● শ্রীমতী অনীতা ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর, মাণিকপুর---

আপনি প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সকালে ১টি, রাতে ১টি করে Phenergan বড়ি ও Spasmindon বড়ি একসঙ্গে খাবেন। পর পর তিন মাস।

আপনার দিদাকে যে-কোন ভাল কোম্পানীর Vitamin B 12 ইনজেকশন নিতে বলবেন দশটি এবং Vitamin B বড়ি খেতে বলবেন দিনে দুটি করে এক মাস।

● শ্রীমতী মুখার্জী, কলকাতা---

আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Digeplex খাবেন, আর খাবার পর Livibrone খাবেন।

● শ্রীমতী, মালুদা, ধানবাদ---

আপনার উপসর্গ পড়লাম। সন্তান হবার জন্য প্রথমে আপনার স্বামীকে পরীক্ষা করিয়ে নিন। যদি কোন গোলমাল থাকে, তার চিকিৎসা করা-

বেন। যদি কোন গোলমাল না থাকে, তাহলে D. C. and I নামক ছোট্ট অপারেশন করিয়ে নেবেন।

● ঊর্মিলা, ফুলকুসমা, বাঁকুড়া—
বিঃ দ্রঃ—দয়া করিয়া প্রশ্নগুলি ছাপিবেন না।

১ নং প্রশ্নের উত্তর: ডাঃ নাহার যে চিকিৎসা করছেন, তা ওই রোগের নিখুঁত চিকিৎসা। কলকাতাতেও ওই রোগের ওই চিকিৎসাই হবে।

২নং প্রশ্নের উত্তর: বাচ্চা ছেলের তোতলামি একটু বয়স হলেই সেরে যায়। তবে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নেবেন জিব জোড়া (Tongue-tie) আছে কি না। ছেলের স্বাস্থ্য ভাল করুন, দেখবেন উপসর্গ চলে গেছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর: দুবেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে Elyvin খেতে দেবেন।

৪নং প্রশ্নের উত্তর: দাঁতের চিকিৎসককে দেখিয়ে নিন।

● শ্রীমতী র বি (ছদ্মনাম), সন্তোষপুর, কলিকাতা-৩২—

আপনি আমাশয়ের জন্য Davoquin Tablets দিনে তিনটে করে খাবেন, ৭ দিন। ৭ দিন পরে Sharkoferrol চা চামচের দু চামচ করে খাবার পর খাবেন, তিন মাস।

● শ্রীমতী শান্তা সেনগুপ্তা, জহরনগর, গড়েগাঁও, বোম্বাই-৬২—

প্রশ্ন: আমার Hookworm আছে। কোমরে অসহ্য ব্যথা। পাকস্থলী ঝুলে পড়েছে। নার্ভাসনেস আছে। খাওয়ার পর পেট টনটন করে, ব্যথা করে এবং খুব জ্বালা করে। কি করলে এর প্রতিকার হবে?

উত্তর: Siozan (Albert David) বড়ি Hookworm-এর চিকিৎসায় ভাল ফল দেয়। ব্যথার জন্য Siobutazone বড়ি অথবা Parabutazone বড়ি ব্যবহার করতে পারেন। শরীরে চর্বি তৈরী করার জন্য Sharkoferrol খাবেন।

● ডাক্তার লেন—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আগে আমি যে ওষুধ বলছি একমাস ধরে ব্যবহার করে দেখবেন; তাতেও যদি না কমে তখন ব্যবস্থা করা যাবে। যন্ত্রণা থাক আর নাই থাক, ওষুধ ব্যবহার করবেন।

Ferradol চা চামচের দু চামচ করে দুবেলা ভাত খাবার পর। Ambodryl Capsule সকালে ১টি রাতে ১টি। Optalidon রাতে শোবার সময় ১টি।

● শ্রীমতী দাস, ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট, কলি-৯—

আপনি সকালে স্নানের পর এবং রাতে শোবার আগে Ascabiol অথবা Scabalcid মাখবেন। Antistine সকালে ১টি, সন্ধ্যায় ১টি বড়ি ৭দিন খাবেন আর Paladec ওষুধ চা চামচের দু চামচ সকালে এবং দু চামচ সন্ধ্যায় খাবেন।

● শ্রীমতী কণিকা দেবী, আনন্দ পালিত রোড, কলি-১৪—

প্রশ্নগুলি না ছাপাইতে অনুরোধ করি।

উত্তর: বেশ, ছাপালাম না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই ওর কোন চিকিৎসা আমার জানা নেই। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, দশদিন যাতে গভীর ঘুম হয়, তার ব্যবস্থা করুন। দশদিন পরে যে ওষুধ আপনি ব্যবহার করেছেন, তাই করুন, দেখবেন ফল পাবেন।

● মিসেস নিয়োগী, আসানসোল, বর্ধমান—

Lyndiol 2·5 যেমন খাচ্ছেন ঠিক তেমনি খেয়ে যান, কোন ভয় নেই। ওখানের স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে মতামত নেবেন, অনেক সময়ে জরায়ু উলটে থাকলে অনুরূপ উপসর্গ দেখা দেয়। আপনার চিঠি পড়ে বুঝলাম যে দোষগুলি ছিল, Lyndiol খাবার পর কমে গেছে বা সেরে গেছে।

তোমার সন্তুষ্ট আঁখি

মনোমর চক্রবর্তী

হৃদয় কবাট তব খোল খোল, নিষ্ঠুরা জননী,
যাত্রীর মিছিল আরো দীর্ঘতর কেনই করিবে?
যতদূরে দৃষ্টি চলে সততই অঙ্কিত দেখি—
নৈরাশ্য ব্যর্থতা ভীতি জনতার গ্রন্থিত নিশানে।

বিধবার অশ্রুজল, শিশুদের ক্ষুধার্ত চিৎকার,
চতুর্দিকে সত্যসন্ধ মানুষের তীব্র অপমান;
নিয়ত সহিতে আর পারি নাক গর্হিত আচার;
উদ্ধত দানবহস্তে ক্রীড়নক তোমার আসন।

দুর্যোগের অন্ধকার দূরে করো রুচির আলোকে,
অত্যাচার আস্ফালন, ওগো মাতা, করো প্রশমিত;
তোমার দক্ষিণ হস্ত পুনরায় কর প্রসারণ,
তোমার সন্তুষ্ট আঁখি দেখা দিক্ সুস্নিগ্ধ ভাস্বর।

যোগিবর গম্ভীরনাথ

জর্জ এ্যালেন

মাথার উপর ধ্যানগম্ভীর হিমালয়। পায়ের তলায় লীলাচপল কন্যা-কুমারিকা। একপাশে আসাম আর একপাশে বোম্বাই। মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নাম ভারতবর্ষ। যার মাটিতে সুধা, হৃদয়ে মধু। কবিগুরুর ভাষায় যে ভুবনমনোমোহিনী কবির বর্ণনায় যে মহিমার জন্মভূমি সারা এশিয়ার তীর্থ-ক্ষেত্র! যার শাশ্বত সনাতন সভ্যতা, যার মর্মবাণী, যার ভাব ও ভাবনা সারা পৃথিবীকে টেনে এনেছে তার গরীয়সী অঙ্কে, যে এসেছে তাকে ভরিয়ে দিয়েছে তার অফুরন্ত দানে, যে এসেছে সেই ফিরে গেছে তার বৈশিষ্ট্যের মাধুরী মাথায় নিয়ে, কত পতন-উত্থান-ঝড়-ঝঞ্ঝা আক্রমণ-লুণ্ঠনের রোমাঞ্চকর কাহিনী বৈচিত্র্য আরোপ করেছে তার গৌরব-ময় ইতিহাসকে। কত ঋষি-যোগী-সাধক দ্রষ্টার পূতপবিত্র পদরজে ধন্য হয়েছে এ দেশের লাবণ্যময়ী মৃত্তিকা।

এই ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে গোরখপুর নামে একটি স্থানের নির্দেশ মিলবে। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত এই গোরখপুর। ঐতিহাসিক গুরুত্ব তার ভারতের অন্যান্য প্রধান নগরী-গুলির তুলনায় অনেক কম থাকলেও তার আধ্যাত্মিক মূল্য অবশ্যই অনস্বী-কার্য। লক্ষ্য এক, পথ বহু। সাধনার নানা ধারা নানা পথ কিন্তু সব পথ সব ধারাই উপনীত হচ্ছে সেই এক লক্ষ্যে, সব নদীই মিলিত হচ্ছে এক সাগরে সকল সাধনার মধ্যে যোগ-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্বিধায় অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত।

লক্ষ্য তো একই, সে ... রমের অন্বেষণ। যোগমার্গের সাধনায় যে সম্প্রদায়গুলি পথ দেখাচ্ছে তাদের মধ্যে নাথযোগী সম্প্রদায় বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। এই বিশেষ সাধন-প্রণালীর সূচনা করেন মহাযোগী গোরক্ষ-নাথ। সেই পূজ্য মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথ ধরে পরে অনেকানেক সাধক প্রভূত সিদ্ধিলাভ করে ভগবচ্চরণে উপনীত হতে সক্ষম হন ও আপন আপন সাধনায় সারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের দুর্বার সাধনায় ও দুশ্চর তপস্যায় নাথ-যোগী সম্প্রদায় ভারতের সাধক পরিমণ্ডলে একটি বিশেষ আসন ও মর্যাদা লাভ করে আসছেন। সারা ভারতে নানা স্থানে মঠ, আশ্রম ও যোগগুহা তাঁদের কীর্তির চিহ্ন বহন করছে। এই অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল তপস্যানিরত ছিলেন গোরক্ষনাথ।

সেদিন এ অঞ্চল ছিল গহন অরণ্য, হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ প্রতি পদে পদে ছিল গণনাতীত বাধা এবং ভয়ভীতি। গোরক্ষনাথের তপস্যা ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠল মঠ মন্দির ইত্যাদি। তাঁর পুণ্যনামবিজড়িত গোরখপুর নগরীর হল পত্তন।

এই ধারারই মহান সাধক যোগী গম্ভীরনাথ। গোরক্ষনাথ তাঁর কালজয়ী অধ্যাত্ম সাধনায় যে দীপ জ্বেলে গেলেন তার প্রাণপ্রদীপের পবিত্র রশ্মিতে লক্ষ লক্ষ প্রাণকে আলোকিত ও আলো-ড়িত করার পুণ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন গম্ভীরনাথ।

জম্মুর (কাশ্মীর) এক ছোট গ্রামে তাঁর জন্ম। লালিত তিনি এক বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারে। দূর পল্লী অঞ্চলের সংস্কার ও প্রথার পরু পর্দা ভেদ করে

যোগিবর গম্ভীরনাথ

শিক্ষার আলোক তখনও পর্যন্ত সে-সব জায়গায় পৌঁছায় নি। সামান্য বিদ্যা গম্ভীরনাথ লাভ করেছিলেন। কিন্তু বিধাতা দিলেন এক অসামান্য প্রতিভা, যেটুকু স্বল্প বিদ্যাই তিনি আয়ত্তে এনেছিলেন তাতেই তিনি অপরিসীম মেধা ও নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। প্রতিভার সঙ্গে এনেছিলেন রসাসক্তি। কলা-বিদ্যার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। ভজন গানে এবং সেতার বাজনায় মুগ্ধ করতে লাগলেন প্রত্যেককে।

মহাশ্মশান হাতছানি দেয় কিশোরকে। জীবনের সর্বপ্রকার পার্থিব আনন্দ ও আরামের কোন বাধা যাঁর সামনে নেই তবু তিনি নিজেও যেন জানেন না কি অমোঘ শক্তি নিয়ে ঐ শ্মশান তাঁকে আকর্ষণ করে, তাকে উপেক্ষা করার মত কোন শক্তিই যেন তাঁর ভাণ্ডারে নেই। নিশ্চিন্ত জীবন, আরাম বিলাস---এ সব কিছুর চাইতে শ্মশানের জটাজুটধারী সন্ন্যাসীদের সেবা করতেই যেন তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে মতিগতি সমস্ত অন্যদিকে মোড় নিল। কিশোরচিত্তে দানা বেঁধে উঠল সাংসারিক ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে মুক্তির স্বতীব্র পিপাসা। সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতেই তিনি মগচিত্ত। গৃহসুখ, সংসার, আরাম-বিলাস কোন মন্ত্রবলে তারা একেবারে মুছে গেল তাঁর মন থেকে---কোথা থেকে বৈরাগ্যের একরাশ শুধু স্বর্গীয় উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর সুদূরের পিয়াসী মন। দেখতে দেখতে একদিন উপনীত হলেন গোপাল-নাথের সমীপে। উত্তর ভারতের দিকপাল যোগী গোপালনাথ গ্রহণ করলেন গৃহত্যাগী, সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিকামী এই তরুণকে শিষ্যহিসাবে। নাম হল গম্ভীরনাথ।

দীক্ষালাভের পর গোপালনাথের নির্দেশ অনুযায়ী গম্ভীরনাথ সাধন পথে অগ্রসর হতে থাকেন। কিছুদিন এই-ভাবে চলার পর আনুষ্ঠানিক কাজগুলো একের পর এক সম্পন্ন হতে থাকল। একদিন গুরু গোপালনাথ শিষ্যের চুটকাটা বা শিখাচ্ছেদনের পবিত্র অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করলেন। নাথ যোগী-দের নিজস্ব প্রথা অনুসারে নব সাধককে 'অওঘর' শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া হল। অতঃপর গম্ভীরনাথ পরিপূর্ণরূপে সন্ন্যাসী হলেন 'নাদ, সেলি ও কৌপীন' পরিধান করে।

তারপর একদিন শেষ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াটিও নিষ্পন্ন হয়ে গেল। সে কাজ হ'ল---কর্ণবেধ। গুরু শিষ্যের কানে পরিয়ে দিলেন দুটি কুণ্ডল। একে বলা হয় দর্শনী। কানে ছিদ্র করে এঁদের এই কুণ্ডল পরানো হয় বলেই এই সম্প্রদায়ের সাধকদের বলা হয় দর্শক কর্মযোগী (দর্শনী শব্দটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই)।

গোরখপুর থেকে বারাণসী। গোরক্ষনাথের স্থান থেকে স্বয়ং বিশ্বনাথের স্থান। অন্নপূর্ণার আসন। প্রচলিত কথাই আছে যে, যেখানকার অধিষ্ঠাত্রী মা অন্নপূর্ণা সেখানে কেউ অভুক্ত থাকবে না। নিঃসম্বল, কৌপীনসর্বস্ব যোগী গম্ভীরনাথ। শাকান্ন সংগ্রহের আর্থিক সংস্থান নেই। একটি কপর্দকও নিঃস্ব যোগীর নেই। করুণাময়ী মায়ের দিব্য মহিমায় একদিনও অভুক্ত রইলেন না গম্ভীরনাথ। প্রতিদিনই দৈবকৃপায় আহার্য জুটে যেত তাঁর।

এদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে লোকের মুখে মুখে। দিকে দিকে। সকলেই জানতে পারেন যে এক তরুণ সাধকের আবির্ভাব হয়েছে। অদূরেই তিনি বাসা বেঁধে আছেন। সকলেই দলে দলে ছুটছে---তাঁর কিঞ্চিৎ কৃপার আশ্রয়ে তাঁর চরণপ্রান্তে আপন আপন বক্তব্য নিবেদন করে মনের আকাশ থেকে মেঘ সরিয়ে ফেলতে।

নির্জনতা নষ্ট হয়ে গেল। লোকের ভিড় বাড়া আরম্ভ হল। সাধকের সাধনায় ঘটল ব্যাঘাত। বাধ্য হয়ে কাশীধাম ত্যাগ করে তাঁকে চলে যেতে হল প্রয়াগধামে। প্রয়াগে একাদিক্রমে তিন বছর তিনি কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তিন বছর পর বেরিয়ে পড়লেন নর্মদা পরিক্রমায়।

সিদ্ধপুরুষ হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। কাছের ও দূরের বহু মানুষ জানতে পারল যে, শত শত সাধকের পুণ্যপদরজধন্য লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে আবির্ভাব হয়েছে এক মহাযোগী সিদ্ধপুরুষের। সেই পরমের সঙ্গে যাঁর আত্মিক যোগসূত্র দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে গেছে।

প্রায়শই এক বিরাটাকৃতি বিকট-দর্শনে বাঘ আসত তাঁর কাছে। তবে আসত বিরল-একান্তে। আসত নিভৃত নির্জনে। একদিন হঠাৎ ঘটে গেল তার ব্যতিক্রম। সকলের সামনেই ব্যাঘ্র-পুঙ্গব এসে হাজির। মুহূর্তের মধ্যে ভীতচকিত হয়ে পড়ল প্রতিটি প্রাণী। নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় ত্রস্ত দিশাহারা অভয় দিলেন মহাযোগী। মা ভৈ, বাণী ধ্বনিত হল সাধকের কণ্ঠ থেকে। তিনি বললেন ভয় নেই, ইনি আসলে এক মহাপুরুষ। ব্যাঘ্রের ছদ্মবেশে এখানে বিরাজিত। খানিকক্ষণ চুপ করে অবস্থান করে ব্যাঘটি ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

সাধকের সবচেয়ে বড় শত্রু 'অহং'। 'অহংবোধকে' সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি না দিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। এই অহংচেতনাই জাল বিস্তার করে বাধা দেবে উন্নতির ক্ষেত্রে। অহং আসে নানা মূর্তি ধরে। নানা আবরণে আবৃত হয়ে, নানা ছিদ্র দিয়ে সত্তায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এ বিষয়ে সাধককে অতি সজাগ থাকতে হবে। এ বিষয়ে একটি অপূর্ব গল্প শুনিয়েছিলেন গম্ভীরনাথ। গল্পটি গোরক্ষনাথের, তাঁর এক সেবক তাঁকে নিত্য পরমান্ন রেঁধে খাওয়াত। তার ধারণা হল সেবার দ্বারা সে প্রভুকে প্রীত করেছে অতএব তার অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। সে চেয়ে বসল যোগ-বিভূতি প্রত্যক্ষ করতে। গোরক্ষনাথের অবিদিত কিছুই নেই। সঙ্গে সঙ্গে যাবৎ কাল ধরে যত পরমান্ন সেই সেবক তাকে খাইয়েছিল---সেই পরিমাণ চাল,

দুধ, চিনি সবত উদ্ধার করে তার সামনে তিনি ফেলে দিলেন। ভ্রান্ত, আচ্ছন্নের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। চূর্ণ হল তাঁর অহং।

নিজের ভক্তেরও ত্যাগের গর্ব এইভাবে একদিন খর্ব করেছিলেন গম্ভীরনাথ। ভক্তপ্রবর তাঁর অধস্তন কর্মচারীর পুত্রের মরণাপন্ন পীড়ায় আকুল হয়ে সাধকের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য---ঐ ছেলেটি ভাল হয়ে যাক্---তার বিনিময়ে তাঁর নিজের কোন পুত্রের প্রাণও দিতে তিনি ইচ্ছুক। গম্ভীরনাথ বুঝলেন এ শুধুই অপরের প্রতি দরদ নয়। ত্যাগের গর্বও এখানে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে এবং পরোপকার বৃত্তিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এই ত্যাগের গর্ব। সে গর্বও সহ্য করেন নি দিব্য-সাধক। বিলক্ষণ তিরস্কার করেছিলেন। গর্বী ভক্তকে। তবে কৃপার সাগর তিনি---মুমূর্ষুকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

গম্ভীরনাথের দিব্য জীবন অলৌকিক ঘটনায় ভরপুর। সেই অসংখ্য ঘটনা-বলীর মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এক চিন্তাকুলা জননী তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে। বৃদ্ধা একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যা এবং বিত্তবতী। তাঁর একমাত্র পুত্র বিলেতে আছে, ব্যারিস্টারি পড়ছে, কিন্তু গত চার মাস ধরে তার কোন খোঁজ খবর নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি তত্ত্বতল্লাস করেও কোন ফল হয় নি। অতএব, বাবাকে তাঁর পুত্রের সংবাদ এনে দিতে হবে। গম্ভীরনাথ ধরা দিতে চান না। তিনি এড়াবার চেষ্টা করেন। বলেন---সাত-সমুদ্র তের-নদী পারে বিলেত আমি নিঃস্ব-রিক্ত কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী সেখানকার খবর আমি কিভাবে সংগ্রহ করব? বৃদ্ধাও নাছোড়বন্দা। মায়ের ব্যাকুলতাপূর্ণ আকৃতিতে করুণাময় যোগীর হৃদয়ে আবেদন জাগে। 'দেখি, কি করা যায়'---বলে সোজা উঠে চলে গেলেন একটি ঘরের মধ্যে। বেরিয়ে এলেন মিনিট চল্লিশ পর। এসে প্রসন্ন মনে বললেন---আগামী সোম-বার তোমার ছেলে গোরক্ষপুরে এসে পৌঁছে যাবে। সাধকের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হবার নয়। ছেলে তো ফিরলই কিন্তু তারপর যা ঘটল, তা আরও চমকপ্রদ, আরও বিস্ময়কর, আরও রোমাঞ্চপূর্ণ। এককথায় যা সর্বতো-ভাবে বুদ্ধি-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত। এ ঘটনা উপলব্ধির, বিশ্বাসের। সেই ছেলে একদিন আশ্রমে এল। প্রথম সম্বোধন তার 'হ্যাঁলো বাবা, ইউ আর হিয়ার?' চমকে উঠল সবাই। ছেলের মুখ থেকেই শোনা গেল, যে বোম্বাই পৌঁছতে যখন একদিন বাকী সেই সময়ে গম্ভীরনাথকে সে জাহাজের ডেকে দেখেছিল এবং তাঁর সঙ্গে ব্যাক্যালাপও করেছিল। দেখা গেল, যে দিন এবং যে সময় সাধক রুদ্ধদ্বারকক্ষে বসে-ছিলেন---সেই সময়ের মধ্যেই ব্যারিস্টার তাঁকে জাহাজের ডেকে দেখেছে। সূক্ষ্ম শরীরে গৃহকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যোগিবর জাহাজের ডেকে উপনীত হয়েছিলেন।

১৯০৯ থেকে লোকগুরুরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। বাঙলাদেশ আজ তাঁর সম্বন্ধে যে আগ্রহ এবং শ্রদ্ধা পোষণ করছে তার মূল হচ্ছেন ভারতের আর এক দিকপাল সাধক প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। প্রভুপাদই বাঙালী জাতির নিকট সর্বপ্রথম এই মহাসাধক সম্বন্ধে প্রচার করতে থাকেন এবং বাঙলা-দেশের ভক্ত-সমাজে গম্ভীরনাথের প্রথম পরিচয় বিজয়কৃষ্ণরই মাধ্যমে। বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বাঙালী শিষ্যের সংখ্যা উপনীত হয়েছিল ছ'শোতে।

১৯১৪ সালে গম্ভীরনাথ কল-কাতা এলেন। চোখের অসুখে আক্রান্ত হয়ে। অসংখ্য বাঙালী এই সময়ে তাঁর চরণ দর্শন করে ধন্য হন।

১৯১৫ সালে হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভ ঘুরে এলেন। ১৯১৭ সালের ২১এ মার্চ। সেদিন মহাবারুণী তিথি। গোরক্ষপুরের কাছেই যোগীচক। এইদিন এই যোগীচকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী গম্ভীরনাথের পার্থিব লীলার অবসান হল।

এখন কোথাও

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আমি কি কোথাও ফিরে যাবো? যেতে বড়ো ইচ্ছা করে
বাগানের দিকে নানা ফুলের সৌরভে
সঞ্জীবিত হ'তে কিংবা যেতে ইচ্ছা করে
নির্জন নদীর পারে যেখানে অনন্ত প্রতিধ্বনি
দ্রুতগামী সময়ের। যেতে বড়ো ইচ্ছা করে
মাঠের শস্যের কাছে নতজানু হতে; ইচ্ছা করে
শেফালী গাছের নিচে একটু দাঁড়াই
ঘ্রাণে বুক ভরে নিতে কিংবা মাটির গভীরে
যেখানে বীজের গন্ধ তার কাছাকাছি
চলে যেতে চাই।

অথচ এসব শুধু আকাঙ্ক্ষাই শুধু প্রতিধ্বনি।
শুধু মাঝরাতে বিছানায় শুয়ে
একবার পৃথিবীর বৃহত্তম স্মৃতির ভিতরে
চলে যাওয়া, যে-রকম বনের হরিণ
চলে যেতে চায় তীব্র তৃষ্ণায় কখনো
নদীর নির্জনে। পরক্ষণে শিকারীর ভয়ে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান বনের আড়ালে।
আমি কি কোথাও ফিরে যাবো! প্রত্যাবর্তনের
পথ রুদ্ধ; আগুনে বিপ্লবে ঝড়ে সব
দৃশ্য-সজ্জা ছিন্ন ম্লান, ফিরে যেতে পারছি না
এখন কোথাও॥

দা ড়ি - মা হা ত্ম্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়

আমার তো মনে হয় মানুষের জীবনের সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করে তার মুখের সৌন্দর্যে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাই হোক, মুখের সৌন্দর্য যদি অটুট থাকে, অর্থাৎ মুখখানা যদি ছবির মত হয়, তাহলে অতি বড় পাষণ্ডও তার প্রেমে পড়তে পারে। বিচারের আসনে বসে মুখের রমণীয়তায় মুগ্ধ হয়ে অপরাধীকে বিচারপতি শাস্তির পরিবর্তে মুক্তি দিয়েছেন—এমন নিদর্শনও জগতে আছে।

এক-কালে আমিও এমনি এক পটের বিবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। মুগ্ধ হয়েছিলাম শুধু তার মুখখানা দেখে। মুখ দেখতে গেলে বুঝি অন্তর দেখার অবকাশ থাকে না। তাই, সেই পটের বিবির সংস্পর্শে এসে আমাকে অনুতাপ করতে হয়। কিন্তু—

কিন্তু মেয়েদের কথা উপস্থিত ছেড়েই দেওয়া যাক। কারণ, আমার আলোচ্য বিষয় শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও এবং সত্যি বলতে কি এখানে ছেলেদের—অর্থাৎ পুরুষদের প্রাধান্যই বেশী।

মুখের সৌন্দর্যে যদি জীবনের সাফল্য আসে তাহলে—তাহলে গোঁফ দাড়ির মাহাত্ম্যও কিন্তু অস্বীকার করা চলে না। আর যদি অস্বীকার করা নাই চলে, তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি মেয়েরা এক্ষেত্রে নেপথ্য-নায়িকা এ-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের অধিকার শুধু আছে পুরুষদেরই। মুখের যে পরিচ্ছন্নতায় মেয়েদের বিশেষত, আমি বলতে পারি পুরুষদের স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করবে তার বিধি-প্রদত্ত গোঁফ-দাড়িতে। যাঁরা নাপিতের সাহায্য নিয়ে এই সম্পদ হেলায় নষ্ট করেন, আমি বলব তাঁরা নির্বোধ। 'সম অধিকার' নিয়ে ইদানীং নারীদের এই যে মাতামাতি এবং একে-একে পুরুষদের পেছনে ফেলে তারা যেভাবে এগিয়ে চলছে, এ সময় আমরা যদি গোঁফ-দাড়ি বর্জন করে বসি, তা'হলে সব অধিকারই কি ওদের মুঠোর মধ্যে চলে যাবে না? সুতরাং, এখন শুধু গোঁফ-দাড়ি রেখেই ওদের আমরা জানিয়ে দিতে পারি যে, আমরা এখনও পুরুষ আছি।

এ চেতনা আমার আগে ছিল না—আজকাল হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ছিল এ-ক্ষেত্রেও। তাই তাঁর প্রেয়সী আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি দাড়ি রেখেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই দাড়িই হচ্ছে পুরুষদের একমাত্র সম্বল—এ-জিনিষ, বর্জন করলে আগামী বংশধররা আমাকে নির্বোধ বলবে। তা না হলে বেদান্ত-উপনিষদ ঘেঁটে-ঘেঁটে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই বা দাড়ির মোহ ত্যাগ করতে পারলেন না কেন? আমার ইচ্ছা আছে, ঠাকুর বংশের দাড়ির সম্বন্ধে একটা থিসিস লিখে ডক্টরেট' নেব। এ-বিষয়টি নিয়ে বোধ হয় এখনও কেউ ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন নি।

দাড়ির মাহাত্ম্যের কথা লিখতে গেলে অনেক লিখতে হয়। ছোট বেলায় দাড়িওয়ালা কাউকে দেখলেই নমস্কার করতাম। ভাবতাম, কেবলমাত্র সে-ই দাড়ির অধিকারী হতে পারে—যে নাকি সৎ, যে সন্ন্যাসী। কিন্তু আমাদেরই বাড়ীর পাশে একটি চোরকে ধরা হয়েছিল। সারা রাত [illegible] [illegible] মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন সে বাড়ীর মালিক। তা'ছাড়া কোন উপায় ছিল কি না, জানি না, তবে জীবনে সেই আমার প্রথম চোর দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। এবং আশ্চর্য হয়েছিলাম সে চোরটির মুখে একমুখ দাড়ি দেখে। তারপর থেকে 'চোর' বলতে বুঝতাম কয়লার মত কালো গায়ের রঙ এবং যার-একমুখ দাড়ি আছে। পড়ে শুনেছিলাম, পর-পর কয়েকটি কারাবাসের পর সেই দাড়িওয়ালা চোরের কী সুবুদ্ধি যে হয়েছিল, নিজের এহেন ব্যবসা তথা সংসারকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র দীর্ঘ দাড়ি সম্বল করে সে সন্ন্যাসী হয়েছিল—এর প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করতে এসে মনোবিজ্ঞানীরা যাই কেন না বলুন, আমি জানি ওই চোরটির মনে সন্ন্যাসী হওয়ার বাসনা জাগিয়েছিল যে, সে বস্তু দাড়ি। দীর্ঘদিন চৌর্যবৃত্তি করে (অর্থাভাবেই হোক, আর মনের বিলাসেই হোক) সে দাড়ি রেখেছিল। কারাগারে বসে মুক্ত জীবনের সবচেয়ে জাগ্রত স্মৃতি হিসেবে সে পেয়েছিল দাড়িকে। কল্পনা করা অন্যায় হবে না যে, সে আনমনে দাড়িতে হাত বুলাত, এবং ভাবত—সে যখন মুক্তি পাবে তখন তার দাড়িগুলো আধ হাতেরও অধিক দীর্ঘ হবে। দিন গোণবার চেয়ে দাড়ির দৈর্ঘ্য বিচার করে মুক্তিলাভের দিনটির ব্যবধান যাচাই করাই বোধ করি তার কাছে সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল।

হয়তো সে ভাবত—জেল থেকে মুক্তি পেয়ে নাপিতের সাহায্য নিয়ে মুখখানাকে পরিষ্কার করে সে বাড়ী গিয়ে উঠবে। কিন্তু যখন সে মুক্তি পেল, এতদিনের দুঃখের সাথীকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করতে তার প্রাণ সায় দেয়নি। বরং এমনই একটা মোহ ওই দাড়ির ওপর তার এসেছিল যে, শেষ পর্যন্ত সে সন্ন্যাসী হওয়াই শ্রেয় মনে করল—নিজের সংসার আত্মীয়-স্বজনকে ভুলে।

আমার এ বিভ্রান্তি রং কি রাইট এ-বিচারের দায়িত্ব আমি আপনাদের ওপর ছেড়ে দিতে নারাজ। আমি জানি, দাড়ি মানুষকে সৎ এবং সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমার সন্দেহ হয়, দাড়ির বাহুল্য যদি না থাকত, তা'হলে রবীন্দ্রনাথ বোধ করি নোবেল পুরস্কার পেতেন না। এবং মেঘনাদ বধ কাব্যের কবির অমরত্বপ্রাপ্তির পেছনেও ওই দাড়িই পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করেছে। চিরকুমার পি, সি, রায় সে যুগের নব্য যুবকদের নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন—সে শুধু দাড়ির কল্যাণেই। রাজা রামমোহন রায় যদি মোটা গোঁফের পরিবর্তে কেবল দাড়ি রাখতেন, তা'হলে সে যুগে তাঁকে বিধর্মী এবং নাস্তিক বলে নিশ্চয় কেউ ধিক্কার দিতে পারতেন না। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়েও কেশবচন্দ্রকে আজ আমরা ভুলতে বসেছি শুধু ওই কারণেই।

আমার এক শিল্পী বন্ধু এককালে দাড়ি রেখেছিলেন। অনেক ভিড়ের মধ্যে দাড়ি দেখেই আমি তাঁকে চিনে নিতে পারতাম। এ-সুবিধেটা শুধু আমার নয়, একদিন ওঁর স্ত্রীর মুখেও শুনেছিলাম, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলে দাড়ি দেখেই উনি নিজের স্বামীকে আবিষ্কার করে নেন।

কথায় কথায় একদিন শিল্পী বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা আপনি দাড়ি রেখেছেন কী জন্যে?

একমুখ হাসলেন শিল্পী-বন্ধু। বললেন, প্রশ্নটা ছোট, হ'লেও এর উত্তরটা আমি ছোট করে দিতে চাই নে।

বললাম, বিলক্ষণ। ছোট প্রশ্নের উত্তরও যে ছোট হবে, এমন কোন নজির ভূগর্ভে নেই। বলুন, বড় করেই বলুন।

অনেক কথা বলেছিলেন তিনি। আজ আর সব ঠিক ঠিক মনে নেই। বলেছিলেন—আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন তিনি, জান, এই দাড়ির কল্যাণে আমি সব কাজে উৎসাহ পাই। নিজেকেই নিজের অসাধারণ বলে মনে হয় আমার। সত্যি বলতে কি—এই দাড়িকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।

কথাটা প্রথমে পরিহাস বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে বিচার করে দেখেছি, না কথাটা পরিহাস তো নয়ই, কথাটাকে সত্য বললেও যেন সব কিছু বলা হয় না।

শিল্পী বন্ধুর আর একটি কথার সত্যতাও মনে মনে আমি উপলব্ধি করেছি। দাড়ির কথা উঠলে তিনি আর একদিন বলেছিলেন, জান, মেয়েরা এই দাড়িকে সহ্য করতে পারে না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে এই দাড়ি নিয়ে রোজ মান-অভিমান চলে। ফলে আমাদের দাম্পত্য-জীবনটা পুরোনো হ'তে পারে না।

দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে এহেন অভিজ্ঞতা আমার নেই। কারণ, ঘরে স্ত্রী থাকলে কী হবে—আমার মুখে দাড়ি নেই। কিন্তু এককালে আমি দাড়ি রেখেছিলাম। বাহুল্য হলেও বলতে হয়, বন্ধু-বান্ধবের টিটকারীও সহ্য করেছি অনেক। এমন কি আমার এক প্রাক্তন প্রেমিকা এজন্যে আমাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করেছেন। আর আমি তা' নির্বিবাদে হজম করেছি।—এছাড়া একটা লাভও আমার হয়েছিল। দাড়ি না থাকলে হয়তো সে লাভে লাভবান আমি হতে পারতাম না।

এক সময় সমাজ-সেবার জন্যে আমি উঠে পড়ে লেগেছিলাম। গ্রামের ছেলেদের নিয়ে পচা পুকুরের পানা সাফ করা থেকে বন-জঙ্গল কেটেও সাফ করেছি অদম্য উৎসাহে। এই সময় এক শরৎকালে অতিবৃষ্টির ফলে বন্যার প্রকোপে গ্রাম ভেসে গেল। সুতরাং আমাদের জন-মঙ্গল সমিতির সম্পাদক হিসেবে আমার ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব এসে পড়ল। বের হলাম চাঁদার খাতা নিয়ে।

কর্তব্যবোধ খাতিরে আমার প্রাক্তন প্রেমিকার রুদ্ধ-দ্বারে গিয়েও টোকা দিতে হ'ল। বলা বাহুল্য সে বাড়ীর মালিক আমাদের মত সমাজসেবকদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

আমরা জানি এক্ষুণি দোর খুলে বেড়িয়ে আসবেন বাড়ীর মালিক। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেখে দোর বন্ধ করে দেবেন। দোর খুলে পর মুহূর্তে দোর দেওয়ার সময়টুকুর মধ্যে আমাদের সকরুণ আবেদনটি যে-কোন বীরপুরুষ তাঁকে জানাবে—এই নিয়ে আমরা আলোচনা সুরু করেছি। ইতিমধ্যে দোর খুলে যিনি বের হয়ে এলেন, তিনি সে বাড়ীর মালিকের কন্যা।

দু'জনের চোখাচোখি। আমার পাশে যারা ছিল, তারা আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

আমি ইতস্তত করছি কী বলব।

কিন্তু কথা বললেন তিনিই আগে। আর যেভাবে কথা বললেন, তা' শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত তিনি বললেন, কাকে চাই আপনার।

এতদিন যার কাছে 'তুমি' আসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম, আজ হঠাৎ আপনি'র আসনে প্রমোশন পেয়ে মোটেই সুখী হলাম না। আর প্রেমের নেশায় আপনি যদি একদিনও মাতাল হয়ে থাকেন, তা' হলে নিশ্চয় বুঝবেন, 'আপনি' সম্বোধনে প্রেমের বুনিয়াদ এমনি খুব দৃঢ় মনে হয় না।

আমি বোকা বোকা দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাইলাম।

তিনি বললেন, এক মুখ দাড়ি নিয়ে আমার সামনে আসতে তোমার লজ্জা হ'ল না?

বললাম, কই, না তো?

—তা' হবে কেন, মানুষ কি আর আছো?

তখন, সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, সত্যই অমানুষেরাই বুঝি দাড়ি রাখে। মনে পড়েছিল সেই শৃগাল আর দাড়িওয়ালা ছাগল এর কথা। মনে পড়েছিল শৃগালের শেষ

ভাষণটি। সুতরাং প্রত্যুত্তরে আমি শুধু নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে ছিলাম ভীষণ লজ্জায়।

চোখ তুলে চাইতে পরি নি, তা'হলে বুঝতাম আমার প্রেমিকার চোখে মুখে তখন কতখানি অবজ্ঞা ফুটে উঠেছিল।

বেশ কিছুক্ষণ দু'পক্ষই নীরব।

তারপর উনিই জিজ্ঞেস করলেন, কী জন্যে এসেছ আবার?

বললাম, এসেছিলাম তোমার বাবার কাছে। বন্যার জন্যে কিছু চাঁদা আদায় করতে।

মুখে একটা ব্যঙ্গাত্মক শব্দ করে চলে গিয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম, ওর বাবাকেই বুঝি ডেকে দিতে গিয়েছে। কিন্তু না, কিছুক্ষণ পরে সেই ফিরে এলো। একখানা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দিয়ে বলেছিলো, যাও। আর কোনদিন এস না এখানে।

ওর কথা আমি রেখেছিলাম। আর কোনদিন আমি ওর ওখানে যাই নি। চাঁদার খাতায় আমার প্রাক্তন প্রেমিকার টাকার অংকটাই ছিল সবচেয়ে বড়। এজন্যে দলের অনেকেই আমাকে 'বাহবা' দিয়েছিল। কিন্তু---

কিন্তু বন্যাপীড়িত নর-নারীর জন্যে সে পাঁচ টাকা দেন নি। এমন কি আমার জন্যেও নয়। আজ আমি ভাবি, শুধু আমার দাড়ির জন্যেই ওই পাঁচ টাকা ওর কাছ থেকে আদায় হয়েছিল।

সত্যিই মেয়েরা দাড়িকে সহ্য করতে পারে না কেন, তারও একটা সত্য উদ্ঘাটন আমি করেছি।

মুখের অপরূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে বিধাতা পুরুষ ছেলেদের মুখে দাড়ি এঁটে দিলেন। কিন্তু নারীকে সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখলেন আর দাড়ির কোন উপাদান তার ভাণ্ডারে অবশিষ্ট নেই। কী করবেন, ভগবান খুব চিন্তায় পড়লেন। নারীকে যদি তেমন কিছু না দেওয়া যায়, তা'হলে ভবিষ্যতে স্ত্রী জাতি তাঁকে একচক্ষু বলে নিন্দা করবে। সুতরাং তাঁদের সুষমা দিলেন নারীর মুখে। দেহে দিলেন ফুলের কোমলতা। ভগবান ভাবলেন, যাক্—বাঁচা গেল।

কিন্তু, ভগবান বাঁচলেও নারীরা বাঁচবে কি না সন্দেহ আছে। কারণ, তারা পুরুষদের এই দাড়ি দেখে ঈর্ষায় এখনও জ্বলে-পুড়ে মরছে। আমার মনে হয়, বিধাতাপুরুষের কাছে তারা এখন একটি প্রার্থনাই করে, হে ভগবান, আগামীকাল সকালে উঠে যেন দেখি আমাদের মুখেও পরুষদের মত এক-মুখ দাড়ি হয়েছে।

আমি জানি এই বিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর বধির। নারীদের আকুল আবেদন হবে অরণ্যে রোদন। সুতরাং হে পুরুষ-সমাজ, নারীদের সঙ্গে সমান পাল্লায় আজ যদি আমরা নাই দৌড়তে পারি, তাতে ক্ষতি কী? শতাব্দীর উপল-খণ্ডের ওপর বসে আমরা না হয় পরম আনন্দে দাড়িতেই হাত বুলাব।

প্রণাম তোমায় হে রামকৃষ্ণ

পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণাম তোমায় হে রামকৃষ্ণ, যুগ-অবতার তুমি,
ধন্য করেছ, পুণ্য করেছ, মোদের ভারতভূমি;
তুমি ভুলায়েছ ভেদাভেদ জ্ঞান,
শিখাইয়াছিলে ন্যায়ের বিধান,
গ্রাম্য ভাষায় বিরাট তথ্যে
বুঝালে সেদিন তুমি।
তোমার চরণ-স্পর্শে ধন্য
মোদের ভারতভূমি॥
তিনটি জেলার মিলন যেথায়, সেথায় জন্মভূমি,
তিনটি জাতির মহাশ্মশানেতে হইল সিদ্ধভূমি,
শ্যামের মাঝেতে শ্যামারে দেখিলে,
ভেদ ও অভেদ এক করে দিলে,
বিশ্ব জগৎ বন্দনা করে
তোমার চরণ চুমি।
প্রণাম তোমায় হে রামকৃষ্ণ
যুগ অবতার তুমি॥

তোমার নরেন, বাংলার ছেলে, জগৎ সভায় গিয়ে,
গুরুর কৃপায়, হে মহান প্রাণ, তাদের প্রেরণা দিয়ে
শুনাল তাদের ভারতের কথা,
বুঝাল তাদের ভক্তির বারতা,
বুঝিল তাহারা ধর্মজগতে
শ্রেষ্ঠ ভারতভূমি।
সব প্রেরণার মূলেতে সাধক
রহিয়াছেলে যে তুমি॥
অন্যায় আর শঠতায় ভরা মেকী মানবের দেশে,
কাঙাল মানব যেথায় কাঁদিছে বরাভয় দিতে এসে,
শুধু বল তুমি "জেগে ওঠ প্রাণ,
কণ্ঠে বাজুক তাঁর জয়গান,"
সার্থক হবে মানবজন্ম,
ধন্য ভারতভূমি।
প্রণাম তোমায় হে রামকৃষ্ণ
যুগ-অবতার তুমি॥

শরীরকে সুস্থ রাখতে

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

[illegible] সুস্থ রাখতে বাস্তবিকই পর্বতপ্রমাণ রাজসিক খাদ্যও যেমন পারে না, তেমনি রাশিকৃত ওষুধপত্রও পারে না ; পারে বিশুদ্ধমতে নিয়ম-তান্ত্রিক যোগব্যায়াম। কেন না শরীরের ভেতরটা যদি যথার্থরূপে শুদ্ধ না থাকে খাদ্য খাওয়ার ভূমিকা তো সেখানে পাকস্থলীতে পচন পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না। এমনি ভাবেই পচন পদার্থের বিষাক্ত বায়ু এবং খাদ্যের রস সারা অঙ্গে রক্তপ্রবাহের সাথে মিলিত হয়ে শরীরের আর সব যন্ত্র-গুলিকে সারাক্ষণ বিভ্রান্ত করে ক্রমশ দুর্বল করে দেয়। তার ফলে পাকস্থলীতে অস্বাভাবিক উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তাপের ফলে পাকস্থলীর জলীয় পদার্থ শুকিয়ে গিয়ে কোষ্ঠ-কাঠিন্য ইত্যাদি দেখা দিয়ে বিবিধ রোগের ইঙ্গিত দিতে থাকে। কথায় আছে -

'Constipation is the root cause of all the diseases of civilization'.

সুতরাং এ জাতীয় উপসর্গকে উপলক্ষ করে যখন শরীরের ভেতর ওষুধপত্র পড়তে থাকে সেইসব ওষুধপত্রের রাসায়নিক পদার্থ দুর্বল যন্ত্রগুলিতে তার কর্তব্য অনুযায়ী কাজ করে যায় মাত্র। কিন্তু তাতে একটা মানুষের জীবনী শক্তি বৃদ্ধিতে কতটুকু কার্যকরী হয় সে কথা সত্যি করে বলা খুবই কঠিন। Dr. Bigolow-এর মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে গেছেন যে—

'The amount of death and disaster in the world would be less then its new, if all diseases were to be left to itself'.

মানে ইনি বলতে চান যে, 'ওষুধ খাদ দিয়ে রোগীদের প্রাকৃতিক আরোগ্য বিধানের ওপর যদি ছেড়ে দেওয়া যেতো তাহলে রোগীদের বিপদ আপদ এবং মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে যেতো।'

এই অকাট্য উক্তি যেমন অপ্রতি-বাদক তেমনি নিগূঢ় সত্য, ভারতীয় উপরাষ্ট্র সভার স্বাস্থ্য বিভাগের ভূতপূর্ব একজন স্বনামধন্য সদস্য দেহতত্ত্ব পণ্ডিত ডাক্তার জে এন হার্টার দৃপ্ত ঘোষণায় প্রকাশ করেন—

'There is not a single medicine in the world that does not carry harm in its molecules.'

অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন কোন ওষুধ আবিষ্কার হয় নি, যার মধ্যে দেহের পক্ষে ক্ষতিজনক কোন উপাদান নেই। সুতরাং ওষুধপত্রের সাহায্যে রোগের চিরারোগ্য এবং দীর্ঘ জীবন লাভের পথ কতটুক পরিষ্কার সে কথা ভাববার প্রয়োজন আছে বৈকি।

এ কথার আমরা অবশ্যই স্বীকৃতি দেবো যে, Nature manufactures all the medicines that man requires—যোগাসনে সেই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্বজনস্বীকৃত।

আসন অভ্যাস করলে যেসব গ্রন্থিরস নিঃসরণ হতে থাকে সেইসব গ্রন্থিরস-শক্তিই এক একটি রোগের নিদান ও বিধান। সেইসব গ্রন্থিপুষ্টির জন্যই প্রয়োজন সুখাদ্যের। এই সুখাদ্য শব্দের অপলাপ হবে যদি আমরা তাকে ছানা-মাখন-ঘি-ডিম-মাংস ইত্যাদির পর্যায়ে গ্রহণ করি। অথচ এসব খাদ্য যে প্রয়োজনহীন সে কথাও আমি স্বীকার করি না, কিন্তু যাদের সঙ্গতি নেই তারা কি কোনমতেই শরীরটাকে সুস্থ রাখার যোগ্য নয়? মোটেই অ নয়। বিভিন্ন ধরণের শাক-সব্জি, তরকারী, মশুর ডাল, সোয়াবীন, ছোলা, চিনাবাদাম এবং ফল-মূলের বিবিধ শক্তি কারো চাইতে মোটেই কম নয়। বরং এগুলিই যথার্থ নিয়মে শরীরটাকে যথাসম্ভব নীরোগ রাখার ও দীর্ঘজীবন লাভের অন্যতম খাদ্য, কারণ এতে বিন্দু-মাত্র ভেজাল নেই। সবই প্রকৃতির আলো-বাতাস আর রসে পুষ্ট বস্তু। এ সব খাদ্যের সারবস্তু আসনব্রতীরা অনা-য়াসে শরীর পুষ্টির জন্য রক্ত ও গ্রন্থি-দলকে নিবেদন করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, যথাযোগ্য পুরস্কারের প্রত্যাশায়।

একথা প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, দেহের অভ্যন্তরে যতই দূষিত পদার্থ জমায়েত হতে থাকবে দেহ ততই ক্রমশ গরম হতে থাকবে। এটাও দেহের প্রতি প্রকৃতির এক বিরাট দ্বন্দ্বহীন মমত্ববোধ, সেই গরম অবস্থা প্রথমে সামান্য জ্বরের সঙ্কেত দিয়ে দেহ তখন কিছু প্রকৃতিজাত সাহায্য পাবার প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে যদি আমরা কোন রাসায়নিক ওষুধ না নিয়ে প্রাকৃতিক বিধিমতে উপবাস ও হালকা জোলাপ এবং প্রচুর পরিমাণে জলপান দ্বারা পাকস্থলীকে দু-এক দিন কোন ভারী খাদ্য না দিয়ে বিশ্রামের দ্বারা আভ্যন্তরীণ পুঞ্জীভূত ময়লাগুলিকে বাইরে বের করে দিতে পারি দাস্ত ঘর্ম প্রস্রাব ইত্যাদির মাধ্যমে, তাহলে দেহের কোন কল-কব্জাই অকালে এখর্ব হতে পারে না। এবং নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন লাভের পক্ষেও কোন সংশয় থাকবে না ; অবশ্য যদি সেই সঙ্গে নিয়মিত যোগব্যায়াম অভ্যাস থাকে।

শুধু শরীর কেন শরীরের অন্যতম সেনাপতি-মন, তারও সুসংস্কারের বিধি প্রকৃতির বিশাল ক্ষেত্রে ছড়ানো রয়েছে

ভোরের বিশুদ্ধ বায়ু আর সূর্যালোকে শরীর মনকে তাজা করার এমন ওজঃ-শক্তি নিহিত রয়েছে যা বিশ্বের কোন খাদ্যে বা ওষুধে নেই। এহেন বিনে পয়সায় প্রকৃতিদত্ত টনিক গ্রহণে আমরা অপারগ, শুধুমাত্র আলস্য অভি-শাপের প্রকোপে আর সংকল্পের একান্ত অভাবের দরুণ, তবে এটাও ঠিক যে বিবিধ উৎকট রোগের উপশম-কল্পে ডাক্তারদের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা যায় না। যাই হোক, এবার গভীরভাবে আপন মত ও যুক্তির দ্বারা চিন্তা করে দেখুন যে, বাস্তবিকই আপনারা নিয়মিত যোগাসন অভ্যাস করে এবং ভোরের আলো-বাতাস ও সুখাদ্যের বিনিময়ে নবজীবন লাভের একান্ত অধিকারী কি না।

যদি সেকথার জবাব আপনারা আপনাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির কাছ থেকে নিশ্চিন্তে পেয়ে থাকেন তাহলে কাল-বিলম্ব না করে আজই যোগাসনে ব্রতী হবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে শুভারম্ভের অভিষেক করুন।

এবারে আমি আসনগুলি কেমন করে অভ্যাস করবেন এবং তার মোটা-মুটি উপকার কি তা বলে যাচ্ছি, মনে রেখে অভ্যাস করবেন। আসন অভ্যাসের মোটামুটি নিয়মগুলি এরূপ হবে---

(ক) ভরা পেটে বা খালি পেটে অভ্যাস করবেন না, হালকা কিছু পেটে থাকবে।

(খ) শ্বাস-প্রশ্বাস নাক দিয়ে নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়বেন ধীর ও গভীরভাবে।

(গ) প্রতিটি আসন ৩।৪ বার করে অভ্যাস করবেন এবং প্রতিটির বেলায় ৩০ থেকে ৫০।৬০ সেকেণ্ড পর্যন্ত অভ্যাস করবেন।

(ঘ) প্রত্যেকটি আসনের পরে ৩০-৫০ সে: শবাসনে সমস্ত শরীরটাকে শিথিল করে বিশ্রাম নেবেন।

(ঙ) এইসব আসন অভ্যাস করতে গিয়ে যদি আমার কোন সাহায্য নেবার মত কৌতুহলের উদ্রেক হয় অবশ্যই
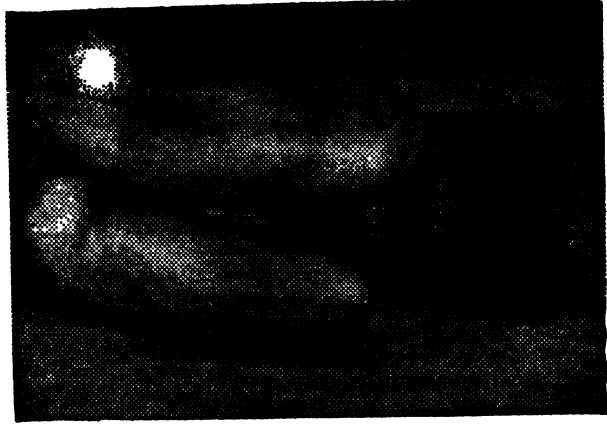
যোগমুদ্রা

1/1D, Nyayaratna Lane. Cal---4 (ফোন নং ৫৫-৮২০১) এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

প্রথমে পদ্মাসন করে বসে হাত দুটো ছবিটির মত কোমরে পেছনে রেখে দম নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে দিন এবং ঐ অবস্থায় নিজের সুবিধামত দম বন্ধ করে যত-টুকু সময় সম্ভব থাকতে হবে। তারপর ওখান থেকে ধীরে ধীরে দম নিতে নিতে পেট টেনে বুক উঁচু করতে করতে সোজা হয়ে বসে দম ছেড়ে দিয়ে পা খুলে ছড়িয়ে দিয়ে বসেই বিশ্রাম নিন বা শুয়েও শবাসনে বিশ্রাম নিতে পারেন।

একবার হল, এমনিভাবে পুনরায় অভ্যাস করুন। মোট ৬।৭ বার অভ্যাস করতে পারেন, এই মুদ্রাটি দিনে এবেলা ওবেলা দুবার অভ্যাস করুন আপাতত।

এই মুদ্রা নিয়মিত অভ্যাস করে যেতে পারলে হজমশক্তিকে সাহায্য করার পক্ষে প্লীহা ও যকৃতের ভূমিকা সঠিকভাবে বজায় তো নিশ্চয়ই থাকবে। তাছাড়া যদি প্লীহা যকৃৎ বেড়ে যায় তাকেও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে স্বাভাবিক আকৃতিতে পরিণত করতে খুব সাহায্য করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেটে বায়ু হলে এবং যাদের সকালবেলা দাস্তের বেগ আসতে চায় না তাদের পক্ষে খুব কার্য-করী। কোমরের কাছের বিভিন্ন স্নায়ু এবং পেটের যন্ত্রকে শরীরটাকে সুস্থ রাখার উপযোগী করে তোলে।

ছবিটি ভালভাবে লক্ষ্য করুন। বাঁ পা ভাঁজ করে মাটিতে পেতে রেখে ডান পাটি বাঁ পায়ের ওপর দিয়ে নিয়ে হাঁটু বগলের কাছে রাখুন এবং ডান পায়ের পাতা বাঁ হাঁটুর কাছে রেখে এবার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাঁটুটিকে আটকে বাঁ হাঁটু আঁকড়ে ধরুন। এবার ডান হাতটি কোমরের পেছনে রেখে ঘাড়টিকে ডান দিকে ঘুরিয়ে রাখুন। এই অবস্থায়

অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন

লক্ষ্য রাখবেন যেন ডান পায়ের উরুতেও চাপ পেটে বেশ ভালভাবে পড়ে। এবারে স্বাভাবিকভাবে ১০।১২ বার ধীর স্থিরভাবে দম নেওয়া ছাড়া করলেই নির্দিষ্ট সময় থাকা হয়ে যাবে। এবার পা ছেড়ে দিয়ে অপর পায়ে ও হাতে এর ঠিক উল্টোটি করুন। এভাবে একবার হল, এমনি ভাবে ৩।৪ বার অভ্যাস করতে পারেন।

আসনটির উপকার শিরদাঁড়াকে নিখুঁত ও কর্মক্ষম রাখার পক্ষে অদ্বিতীয়। পিঠের দিকে মাথার খুলি থেকে কোমরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শিরদাঁড়ায় যতগুলি জোড়া আছে তার প্রত্যেকটির যথার্থ ব্যায়াম হয়। এবং শিরদাঁড়ায় দু-পাশের অতি প্রয়োজনীয় পেশীগুলি এবং স্নায়ু-কেন্দ্র সকলের উপযুক্ত ব্যায়াম হয়ে সমস্ত দেহটাকে ও মনটাকে ঝরঝরে করে রাখে।

এছাড়াও যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের সবলতা বৃদ্ধি পেয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য, কোমরের বাত, পিঠের বাত, বদহজম ইত্যাদি ভাল করার যথেষ্ট অধিকার রাখে।

ডান পা মুড়ে হাঁটু মাটিতে রেখে কুঁচকির কাছে পায়ের পাতা রাখুন। অপর পা লম্বা করে রেখে মাথা এমন ভাবে হাঁটুর কাছ থেকে উরুতের দিকে সরিয়ে রাখবেন যেন পেট বুক উরুতে গা ঠেকে যায় এবং হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ধরে রাখবেন। এই অবস্থায় নির্দেশিত সময় সাধারণভাবে দম নেওয়া ছাড়া করে থেকে সোজা হয়ে বসুন। এবারে অপর পায়ে একই নিয়মে অভ্যাস করুন। দুপায়ে করার পর শবাসনে শুয়ে বিশ্রাম নেবেন। ৩।৪ বার অভ্যাস করতে পারেন।

এই জানু শিরাসনে বহুমূত্র ব্যাধির প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকতে পারা যায়। কারণ বুকের কাছে প্যাংক্রিয়াস যন্ত্র যেখান থেকে ইনস্যুলীন তৈরি হয় সেই যন্ত্রটির যথাযোগ্য ব্যায়াম হয়ে সবল করে তোলে বলেই বহুমূত্র ব্যাধিতে আশ্চর্য ফললাভ করা সম্ভব। তাছাড়া পেটের পেশীগুলি এবং নাভির কাছের আরও সব প্রয়োজনীয় স্নায়ু-গুলিকে মজবুত করে শরীরের জড়তা দূর করে এবং শিরদাঁড়ার তলাকার অংশকে নমনীয় করে। অপরাপর স্নায়ুগুলিকে তৎপর রেখে সারাদিন একটা মানুষকে ক্লান্তিবিহীন অবস্থায় কর্ম করবার অধিকার দেয়.

পবন মুক্তাসন

চিৎ হয়ে শুয়ে প্রথমে ডান পা তারপর বাঁ পা এরপর দুপা একসঙ্গে দু'হাতে বেশ করে জড়িয়ে ধরবেন যেন হাঁটু ও উরুতে বুক ও পেটে লেগে থাকে। এই অবস্থায় মাথাটা একটু মাটি থেকে তুলে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখতে পারেন। প্রতিবারে ৮।১০ বার স্বাভাবিকভাবে দম নেওয়া ছাড়ার কাজ করবেন এমনি ভাবে একবার হলে, এভাবে ৪।৫ বার অভ্যাস করতে পারেন। বলা বাহুল্য বাঁ পায়ে অভ্যাসের সময় ডান পা লম্বা করে মাটিতে বাঁ পায়ের মত শুইয়ে দেবেন, পাতলা পেট হলে পেটে একটা পাতলা বালিশ বা তোয়ালে ভাঁজ করে রেখে অভ্যাস করলেই যথার্থ চাপ কার্য সম্পন্ন হবে।

এই আসনটিতে পেটের আটকে থাকা বায়ু বেরিয়ে গিয়ে শরীর ও মনের প্রশান্ত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে অসম্ভব সাহায্য করে।

এছাড়া অজীর্ণ, অম্বল, পেট ফাঁপার, পেটের চর্বি কমাতেও সাহায্য করবেই উপরন্তু পেটের পেশী ও স্নায়ু ক্ষুধাবৃদ্ধির গ্রন্থিগুলি সতেজ থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা দোষ দূর করতেও সমান শক্তি রাখে।

আসনগুলির ছবি বার বার দেখে ও বার বার পড়ে তারপর অভ্যাস শুরু করলে ভুল হবে না।

জানু শিরাসন

কার্তিক মাস হবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটনাবৈচিত্র্যে চাঞ্চল্যকর; সাধারণভাবে জনগণের দুর্দশা বাড়বে, দেখা দেবে তীব্র অসন্তোষ। বিশ্বজোড়া একরূপ থমথমে ভাব। মধ্য-দক্ষিণ ইউরোপের সংকট আরো ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। আরো দু-একটি দেশের কাঠামো ও কর্তৃত্বের উপর আঘাত আসতে পারে। আততায়ীর শাণিত ছুরিকা রক্তপাতের আশঙ্কা ঘনিয়ে তুলছে। শনি বক্রী রয়েছে। কার্তিকের বারো তারিখের পর পনেরো দিন জটিলতাসূচক। ভারতের পক্ষে এ সময় ভাল বলা চলে না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উৎপাত করবে। কার্তিক মাসে যাদের জন্ম, তাদের মধ্যে যাদের বয়স পনেরো থেকে সতেরো, আটাশ থেকে একত্রিশ, বিয়াল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ, আটান্ন থেকে একষট্টি, বাহাত্তর থেকে তিয়াত্তর, তাদের এসব বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। স্বাস্থ্যের সামান্য খুঁটিনাটিও অবহেলা করা উচিত হবে না। তুলা লগ্ন ও তুলা রাশির পক্ষেও একথা খাটে। সর্বক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট এবং নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। যাহ্ এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী কার্তিক মাসের শুভাশুভ আভাস দেওয়া হল।

॥ কার্তিক মাসের ফলাফল ॥

মেষ : আয় যতই হোক না কেন, আর্থিক টানাটানি থাকবার সম্ভাবনা। কোনো সূত্রে স্বাধীন প্রোফেশনের ভাল যোগাযোগ হতে পারে। বিজ্ঞানধর্মী প্রোফেশনে ভাল ফল হবে। কেনাবেচার ব্যবসায়ীদের মধ্যে লোহার কারবারী ও কনট্রাক্টের ব্যবসায়ীদের সঙ্কট যেতে পারে। যাতে আইনঘটিত কোনো গোলমালে না পড়েন, সেদিকে নজর রাখবেন। শেয়ারে লোকসানে ক্ষতির যোগ স্বাস্থ্য ভাল যাবে না; পেটের গোলমাল ও বায়ুর উৎপাতে কষ্ট হতে পারে, চাকুরীক্ষেত্র মনোমত হবে না। হঠাৎ বাইরে যাবার সম্ভাবনা আছে। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে অনুকূল নয়। মহিলাদের মধ্যে সন্তানসম্ভবাদের সতর্ক থাকা উচিত। চাকুরে মহিলাদের ভাল হতে পারে। কারো প্ররোচনায় লুব্ধ হওয়া ঠিক হবে না। মেষলগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও স্বাস্থ্যের গোলযোগ সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ভাল হতে পারে। দূর ভ্রমণ ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ এড়িয়ে থাকা উচিত। পারিবারিক পীড়াদি উত্ত্যক্ত করবে।

বৃষজাতক

বৃষ : কর্মক্ষেত্রে হতাশার ভাব মাসের মধ্যভাগ থেকে অনেকাংশে কেটে যাবে। সাংসারিক ব্যাপারে দুর্ভাবনা থাকবে। ব্যবসায় নতুন করে গড়ে তোলার সম্ভাবনা। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আর্থিক অপচয় ঘটতে পারে। প্রিয়জনদের মধ্যে কারো হঠাৎ অসুখ-বিসুখ উৎপাত করবে। কারো সাহায্য করতে গিয়ে আর্থিক টানাটানি বাড়তে পারে। কনট্রাক্টার ও অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে হতাশার আশঙ্কা। চাকরীক্ষেত্রে নতুন কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়। সরকারী চাকুরীতে বদলির সম্ভাবনা। গাড়ি ও আসবাবপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে প্রতারিত হতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে। ব্যথা-বেদনা কষ্ট দিতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে অযথা শত্রুতা ও আর্থিক টানাটানি সংসারে অশান্তি আনতে পারে কিন্তু চাকুরীক্ষেত্রে ভাল হবে। বৃষলগ্নে জন্ম হলে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলেও শরীর ও মনের উপর চাপ পড়বে। ব্যবসায়ে নূতন দুর্ভাবনার আশঙ্কা। চাকুরীক্ষেত্রে পরিবর্তনের আভাস পেতে পারেন।

মিথুন : প্রোফেশনে আয় বাড়বে। এমন কি নিজের মৌলিক সৃষ্টির জন্য অন্যবারের তুলনায় আশাপ্রদ বলা চলে। কিন্তু নানা কারণে মানসিক

শরীরে ধাক্কা ও রক্তবৃদ্ধি বুঝায়। বাতজ পীড়া ও হৃদদৌর্বল্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। ধাক্কা লেগে কিংবা চোট লেগেও কষ্ট পেতে পারেন। কোথাও যাবার সঙ্কল্পে বাধা পড়বে। এবং ভ্রমণকালে অর্থহানিরও আশঙ্কা। প্রসাধন সামগ্রী ও কাপড়ের ব্যবসায়ী-দের মন্দা যাবে। প্রকাশকদের বা পুস্তক-বিক্রেতাদের পক্ষে হতাশাব্যঞ্জক। আইন ব্যবসায়ীদের পক্ষে সুযোগ-প্রদ। দালালী কিংবা কনট্রাক্টরী যাঁরা করেন, তাদের দু-এক বার সঙ্কটের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা। চাকুরী-ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। ঐ রাশির মহিলাদের পক্ষে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বাধা ও আর্থিক ব্যাপারে গোলযোগ বুঝায়। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে কর্ম-ক্ষেত্রে গোলযোগ ও আর্থিক নৈরাশ্য উৎপাত করতে পারে। শারীরিক গোলযোগ হলে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

কর্কট: প্রীতিপ্রদ প্রসার ও সামা-জিক সম্পর্কের উন্নতিসূচক। গঠন-মূলক কাজ এবং নতুন কোনো কার-বার গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হবার সম্ভাবনা। কিন্তু বৈষয়িক গোল-যোগ এবং জমিবাড়ি সংক্রান্ত ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। মা কিংবা মাতৃ-স্থানীয়া কারো সঙ্কটও হতে পারে। স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে আইন-ব্যবসায় ও প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ এবং উপদেষ্টার কাজে উন্নতি বুঝায়। লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে নৈরাশ্যসূচক। মামলা মোকদ্দমায় যাতে জড়িয়ে না পড়েন, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। চাকুরীক্ষেত্রে উপরওয়ালা-দের সঙ্গে মতবিরোধ ও অশান্তি দেখা দিতে পারে। কোথাও যাবার পক্ষে এ মাস অনুকূল নয়। পারিবারিকক্ষেত্রে মাসের মধ্যভাগ ঝঞ্ঝাটসূচক। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রিয়জন চিন্তা এবং স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তা ভোগের সম্ভাবনা। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতি হলেও শরীর প্রায়ই দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে।

সিংহঃ কর্মক্ষেত্রে তা চাকুরীই হোক আর কোনো প্রতিষ্ঠানের পরি-চালনা কিম্বা মালিকানা হোক মাসের অধিকাংশ সময় ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে কাটতে পারে। সঞ্চিত অর্থব্যয় এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ঝঞ্ঝাট প্রায়ই উত্যক্ত করতে পারে। শেষাংশে স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ষাটের উপর বয়স হলে বিশেষ সাবধান। পুরনো চালু কারবারে গোলযোগ হতে পারে। লেখক, শিল্পী ও আইনজীবীদের পক্ষে মাসের শেষাংশে অনুকূল। গল্প-লেখকদের বই চিত্রে রূপায়িত হতে পারে। নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা কারবার গড়ে তোলার চেষ্টা না করাই এখন ভাল। তবু মাসের মধ্যভাগ থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সংগঠন-মূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই এখন যুক্তিযুক্ত। মহিলাদেরও অনুরূপ ফল। সিংহলগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও শরীর-কষ্টের সম্ভাবনা।

কন্যা ঃ শরীর সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে নৈরাশ্যের ভাব এবং পরিকল্পনামত কাজে বাধার সম্ভাবনা। উৎসাহ-উদ্দীপনা গোড়ায়ই নষ্ট হতে পারে। তবু মধ্যভাগ কিছু অনুকূল হবে। ঐ সময়ে জরুরী কাজকর্ম করে ফেলতে পারেন। তৃতীয় সপ্তাহ কর্মক্ষেত্রে কোনো সুযোগ আসতে পারে। কর্মপ্রার্থীদের পক্ষে এ সময় অনুকূল। ব্যবসায়ে মন্দা চলতে পারে। পুরনো কাজকারবার গুটিয়ে নেবার মতলবও দেখা দিতে পারে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে নৈরাশ্য ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মতবিরোধে অশান্তি বুঝায়। পুরনো কোনো রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চলা উচিত। সরকারী চাকুরীতে বদলির আভাস রয়েছে। মহিলাজাতকের কোনো সূত্রে প্রাপ্তি হতে পারে। কন্যালগ্নে জন্ম হলে আয় বৃদ্ধি হলেও স্বাস্থ্য ও পারিবারিক পরিবেশ অশান্তি বৃদ্ধি করতে পারে। বাইরে যাবার সম্ভাবনা আছে।

তুলা ঃ উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেলেও এমন কতকগুলো ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে, যা অপ্রত্যাশিত। সঞ্চিত অর্থেও টান পড়তে পারে। আত্মীয়জন ও দূরস্থ আত্মীয়ের জন্য ঝঞ্ঝাট ও উদ্বেগ যেতে পারে। ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধি হবে। কিন্তু মাসের শেষাংশে ব্যবসায় সংক্রান্ত জটিলতা উৎপাত করবে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। স্বাধীন প্রোফেশনে যেখানে বুদ্ধির খেলা সেখানে সুযোগ আসবে কিন্তু নিজের গাফিলতির জন্য ক্ষতি হতে পারে। লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে এ সময় সুযোগপ্রদ। গল্প-লেখকদের বই চিত্রে রূপায়িত হতে পারে। সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজকদের পক্ষে আকস্মিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা। চাকুরীক্ষেত্রে গতানুগতিক চলবে। বান্ধবী ও তরুণী মহিলাদের সম্বন্ধে সাবধান। মহিলাদের কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তুলা লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক চিন্তা ও নানাবিধ উৎপাত হতে পারে।

বৃশ্চিক ঃ নতুন কোনো উদ্যমে সাফল্য এবং নতুন করে কিছু গড়ে তোলার সম্ভাবনা। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে গোলযোগ হতে পারে। ধৈর্য ধরে নিজের কাজ করে যান, বাধা দূর হবে। অপ্রিয় সত্য কথা বলা এবং বেফাঁস কথা বলা সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। কাউকে কোনো ব্যাপারে কথা দেওয়ার আগে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে আগে চিন্তা করুন। বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসকদের পক্ষে এ মাস আয় বৃদ্ধিকারক। কাপড় ও প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবসায়ে মন্দা যাবে। লোহার ও লৌহজাতদ্রব্যের ব্যবসায়ে কোনো সঙ্কট দেখা দিতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে ভাল হতে পারে। মহিলাজাতকের পক্ষে আনন্দবৃদ্ধির যোগ। শেষাংশে স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বিবাহযোগ্যাদের বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাপ্রদ। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে।

ধনু ঃ কর্মক্ষেত্রে সংঘাত এবং শত্রুবৃদ্ধির মত যোগ। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার মত আভাস রয়েছে। আর্থিক দিকে মধ্যভাগ থেকে শুভ হবে। ব্যবসায়ে নতুন সম্ভাবনা। এ মাস নতুন কোনো কারবার কিংবা মনোমত কোন কাজের অনুকূল। মধ্যভাগে শরীর কিছু উৎপাত করবে। শিরঃপীড়া ও উদরসংক্রান্ত গোলযোগ সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। পত্নীর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে থাকুন। আত্মমর্যাদার উপরও আঘাত আসতে পারে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে উত্ত্যক্ত হবারও আশঙ্কা। চাকুরীক্ষেত্রে নতুন কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়। নতুন প্রার্থীদের চাকুরী হতে পারে। মহিলা জাতকের সাংসারিক ব্যাপারে অশান্তি এবং মনোমত ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। ধনুলগ্নে জন্ম হলে প্রীতি প্রসার ও আত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা। কিন্তু পারিবারিক কারণে মনের উপর চাপ থাকবে। নতুন কোনো সূত্রে অর্থাগম হবারও সম্ভাবনা।

মকর ঃ সংসারের চাপ বাড়তে পারে। দায়িত্বও বাড়বে বেশী। অর্থাগমের দিক থেকে যেমন ভাল; তেমনি খরচও হবে অতিরিক্ত। পারিবারিক পীড়াদি উত্ত্যক্ত করবে। ভাইবোনের জন্যও ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। অথচ গুরুজনের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটবে। পুরনো কাজকারবার ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন হতে পারে। লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে ভাল। গত সাত বছর ধরে যাঁরা নৈরাশ্যে কাটাচ্ছেন, তাঁদের এবার সুযোগ আসতে পারে। মাসের মধ্যভাগে নয়দিন সকল কাজেই সতর্ক হয়ে চলা দরকার। বেচা-কেনার ব্যবসায়ে তেমন মনোমত হবে না। ছাপাখানার কাজ বাড়বে কিন্তু পুরনো সূত্রে গোলযোগ বুঝায়। মহিলা জাতকের শত্রুবৃদ্ধি এবং সাংসারিক ব্যাপারে অশান্তি বুঝায়। মকর লগ্নে জন্ম হলে কাজকর্মের দিক থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি ও আর্থিক যোগাযোগের সম্ভাবনা, চাকুরী ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে থাকা উচিত। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করতে পারে।

কুম্ভ ঃ গোড়ার দিকে নৈরাশ্যসূচক। কিন্তু মধ্যভাগে কাজকর্মের যোগাযোগ ও আর্থিক যোগাযোগ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। নতুন সঙ্কল্পমত কাজের ব্যাপারে কারো সহায়তা পাবার সম্ভাবনা। রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। কেনাবেচার ব্যবসায়ীদের পক্ষে মোটামুটি ভাল; কিন্তু লোহা কিংবা লৌহজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ে ঝঞ্ঝাট দেখা যায়। চিকিৎসকদের পক্ষে মাসের শেষাংশ ব্যবসায়ের অনুকূল। আকস্মিক কোনো কারণে বাইরে কোথাও যাবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। কিন্তু পড়ে গিয়ে আঘাত লাগা সম্বন্ধে সাবধান।

পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি হবে। মহিলাজাতকের কোনো সূত্রে লাভবান হবার সম্ভাবনা। কুম্ভলগ্নে জন্ম হলে নতুন উদ্যম এবং আর্থিক দিক থেকে আশাপ্রদ। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। পত্নীর ব্যাপারে দুর্ভাবনা দেখা দিতে পারে। আকস্মিক ক্ষতিরও আশঙ্কা।

মীনঃ পরিবেশ মোটামুটি ভাল; চাকুরীক্ষেত্রে কিংবা দলীয় ব্যাপারে অশান্তিকর পরিবেশ দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। কিন্তু কিডনি ও শুক্রসংক্রান্ত কোনো গোলযোগ দেখা দিলে সাবধান। প্রতিষ্ঠানের মালিক ও বৃহৎ কারবারীদের পক্ষে নৈরাশ্যব্যঞ্জক হতে পারে। রাসায়নিক দ্রব্যের এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনকারীদের পক্ষে সঙ্কটসূচক। বৈষয়িক ব্যাপারে অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট এবং জমি-বাড়ির ব্যাপারে উত্ত্যক্ত হতে পারেন। নতুন প্রার্থীদের চাকুরীলাভের সম্ভাবনা। কারো সহায়তায় নতুন কোনো কাজে নামারও যোগাযোগ রয়েছে। ছেলেমেয়েদের কারো সম্বন্ধে শুভ ফল আশা করতে পারেন। ঐ রাশির তরুণী মেয়েদের, সঙ্গী নির্বাচনে ও ভ্রমণাদিতে সতর্ক থাকা উচিত। মহিলাজাতকের পক্ষে মাসের মধ্যভাগ স্বাস্থ্যের পক্ষে অশুভ। মীনলগ্নে জন্ম হলে শরীর-কষ্ট এবং কর্মক্ষেত্রে নৈরাশ্যসূচক। শেষাংশে অনুকূল অবস্থা দেখা দিতে পারে। আর্থিক ব্যাপারেও দুর্ভাবনা দেখা যায়।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রী পি কে সি (নাজির লেন, (কলিকাতা)—(১) দু' রকমের পঞ্জিকা আছে। সুতরাং দুটোই ঠিক ; (২) দেড় বছর পর কিছু ভাল। ● শ্রীনন স্যামডিস (পুটিয়ারী) একটির বেশী কুপন দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। প্রশ্নের বিষয়গুলো সম্বন্ধে সঠিক জানতে হলে উভয়ের রাশিচক্র দরকার, (১) লগ্নস্থ গ্রহ এরূপ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করছে, (২) নিজে ওসব ব্যাপার এড়িয়ে চলা ভাল, (৩) টাকাকড়ির ব্যাপারে নীরব থাকা ভাল, (৪) নয় মাস লক্ষ্য করুন। ● শ্রীগৌতম মুখার্জী (ব্রাউন হোটেল, বাঁকুড়া)—(১) সম্ভাবনা আছে, (২) চাকুরী একরূপ হবে। ● শ্রীমতী ছায়া বোস (কলিকাতা-৯)—(১) বিরুদ্ধযোগ আছে; তবু আগামী বছরটা দেখুন, (২) দেড় বছর পর অনেকাংশে শান্তিপ্রদ। ● শ্রীসতীপ্রসাদ চক্রবর্তী (রঙ্গলাল স্ট্রীট, কলিঃ)—(১) এখন বিরুদ্ধ দশা চলছে; কর্মক্ষেত্রে এ-বছর বিশেষ সাবধান, (২) পরে অন্য চাকরী হতে পারে; কিন্তু পাঁচ বছর নানা ঝঞ্ঝাট। ● শ্রীশীতাংশু চন্দ (শিলচর)—ব্যক্তিগত উত্তর দেওয়া হয় না; কাজ হবার মত যোগ। ● শ্রীবিজয় গঙ্গোপাধ্যায় (শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা)—(১) সম্ভাবনা আছে, (২) মধ্যবয়সের পর মোটামুটি ভাল। ● শ্রীঅমলকুমার মুখার্জি (চিত্তরঞ্জন কলোনী, পশ্চিম রাজাপুর)—(১) বিরুদ্ধ গ্রহের দশা চলছে; এর উপর গোচরে শনি ও রাহু অশুভ। (২) প্রতিকার জন্য গাঢ় লাল প্রবাল আটরতি ও পীত পোখরাজ ছয়রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। প্রবাল রূপার আংটিতে এবং পোখরাজ সোনার আংটিতে। ● শ্রীঅনুচারিয়া (শিলচর)—(১) আশানুরূপ এখন হবে না, (২) অর্থাভাব দূর হতে দেরী হবে। ● শ্রীশশধর মহাপাত্র (ইন্দা, মেদিনীপুর)—একসঙ্গে বেশী কুপন পাঠানো যুক্তিযুক্ত নয় এবং আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। (১) উন্নতি হবে কিন্তু দেরীতে, (২) পরে ব্যবসায় হতে পারে। স্বাস্থ্য এখন ভাল যাবে না; স্ত্রীর পক্ষে আট রতি শ্বেতপ্রবাল সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। লটারীতে প্রাপ্তির যোগ নেই। ● শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ (ফুটিগোছা, চব্বিশ পরগণা)—ভাল চাকুরী পেতে এখনো দেড় বছর দেরী, (২) বাইরে যাবার সম্ভাবনা। ● শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ (ফুটিগোছা, চব্বিশ পরগণা)—(১) হবে, (২) মোটামুটি প্রীতি থাকবে। ● শ্রী জি, সি ব্যানার্জী (ব্যারাকপুর)—(১) প্রথমে ঝঞ্ঝাট হলেও পরে ভাল, (২) হবে। ● শ্রীমতী ছায়া ব্যানার্জী (ব্যারাকপুর)—একত্রিশ বর্ষ বয়সের কিছু হবে, কিন্তু গ্রহের প্রতিকার করা দরকার, (২) তিন বছর পর। ● শ্রীমতী এণা ব্যানার্জি (ব্যারাকপুর)—(১) নয় মাস মধ্যে সম্ভাবনা; (২) মোটামুটি ভাল। ● শ্রীমতী নীলা ব্যানার্জি (ব্যারাকপুর)—(১) অশ্বিনী নক্ষত্র, মেষ রাশি ও মকর লগ্ন, (২) শারীরিক উন্নতিতে দেরী হবে। বিশিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং গ্রহের প্রতিকার জন্য রত্নাদি ধারণ করাতে পারেন। ● শ্রীসুশীলকুমার সাহা (সুইনহো স্ট্রীট, কলিকাতা)—বাংলা তেরশো একচল্লিশ সালে এবং রাশি হবে মকর; (২) আশানুরূপ হতে বাধা। ● শ্রীএম দত্তপাট (কাজোড়াগ্রাম)—(১) হবে, (২) অন্য সূত্রে প্রচারিত হবে। ● শ্রীমতী ছবিরাণী সরকার (ডাঃ এস কে গুপ্ত রোড, সাঁত্রাগাছি)—(১) ছেলের রাশি সিংহ ও লগ্ন মিথুন, (২) ষষ্ঠস্থ

কেতু স্বাস্থ্যের হানিকর; এ ছাড়া শনি ও মঙ্গল পরস্পর সপ্তমে আছে। ● শ্রী এস কে সরকার (ডাঃ এস কে গুপ্ত রোড, সাঁত্রাগাছি)—সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত দেখুন, (২) মার্চেণ্ট অফিসে হতে পারে। ● শ্রীলোটাস (কলিকাতা-৮)—(১) অনুকূল নয়, (২) হবার সম্ভাবনা কম। ●শ্রীপ্রদীপকুমার দাস (বেহালা)—(১) কুম্ভলগ্ন, রেবতী নক্ষত্রে ও মীনরাশি, (২) জন্মকালে মঙ্গল ও শনি একত্রে আছে এ যোগ বিরুদ্ধ। তিন বছর বিশেষ ভাল নয়। ● শ্রীঅরিন্দম (হাইলাকান্দি)—(১) বাধা আছে এবং হওয়া কঠিন, সম্ভাবনা আছে। ● শ্রীভোলানাথ চ্যাটার্জী (মাইকেল দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা)—বাধা এবং অশান্তিজনক যোগ। তিন বছর না দেওয়াই ভাল। (২) শ্বেতমুক্তা চাররতি ও রক্তমুখী প্রবাল আটরতি। সোনার আংটিতে যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণ করিয়ে দেখতে পারেন। ●শ্রীমতী সুলেখা চক্রবর্তী (টি সি মুখার্জি স্ট্রীট, রহড়া)—সোনার আংটিতে চার-পাঁচরতি মুক্তা এবং রূপার আংটিতে আটরতি উৎকৃষ্ট গোমেদ ধারণ করতে পারেন। ছেলের মীনলগ্ন ও কুম্ভরাশি। ● শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখার্জী (সাউথ-পড়িয়া)—কুপন সঙ্গে না পাঠালে উত্তর দেওয়া হয় না। লগ্ন তুলা। রাহু, কেতু, বুধ ও শনির অবস্থান কষ্টদায়ক। ● শ্রীবটেশ্বর (কলেজ রো, কলিকাতা)—(১) সম্ভব হওয়া কঠিন, (২) এরূপ প্রাপ্তির যোগ নেই। ● শ্রীদেবব্রত সরকার (রাণা প্রতাপ রোড, দুর্গাপুর)—(১) এখন থেকে আগামী মার্চের মধ্যে কোনো সুযোগ, (২) তিন বছর পর মোটামুটি ভাল। ● শ্রীভাগবত চক্রবর্তী (বেলঘরিয়া)—ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেওয়া হয় না; মাসিক বসুমতীর কুপন সঙ্গে দিলে উত্তর দেওয়া হয়। তিন বছর কিছু সুবিধার নয়। ● শ্রীমতী গীতা গোস্বামী (যশোহর রোড, কলিঃ)—(১) হবে, (২) ছয়রতি গাঢ় লাল প্রবালের আংটি রূপোতে ধারণ করিয়ে দেখুন। ● শ্রীসন্তোষকুমার গোস্বামী (যশোহর রোড, কলিঃ)—(১) এমন নয়, (২) পরে হবে। ● শ্রীমতী উমা রায় (অবধায়ক: শ্রী ডি, পি, রায়, জলপাইগুড়ি)—(১) মোটামুটি ভদ্রভাবে চলার মত জীবন; বিদ্যাভাব মধ্যম: কর্মভাব ভাল; (২) মনোজ্ঞ হবে, বাইশ বর্ষ বয়সে কিংবা পঁচিশ বর্ষ বয়সে। ● শ্রীমতী ইলা রায় (অবধায়ক: শ্রী ডি পি রায়, জলপাইগুড়ি)—বর্তমানে দেড় বছর একরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটতে পারে। (২) গৃহনির্মাণের যোগ আছে; ভাগ্য মোটামুটি ভাল বলা চলে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। ● শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য (ক্ষেত্রমোহন নস্কর রোড, কলিঃ)—(১) লেখাপড়া করে ভদ্রভাবে চলবে, (২) লটারীতে প্রাপ্তির যোগ এখন নেই। ● শ্রীমতী কেকা ভট্টাচার্য (ক্ষেত্রমোহন নস্কর রোড, টালিগঞ্জ)—(১) মোটামুটি ভাল; কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে, (২) গোমেদ ধারণ করা চলে। ● শ্রীঅধীরচন্দ্র ব্যানার্জী (দেশবন্ধু রোড, কলিঃ)—(১) এখন থেকে আড়াই বছর পর, (২) পরে হবে। ব্যবসা করতে হবে। দশা জানানো সম্ভব নয়; নয়রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে। ● শ্রীশিবাজী চ্যাটার্জী (কে এল ব্যানার্জী রোড, তেলিনীপাড়া)—(১) অক্টোবরের মধ্যে না হলে মার্চের পর (২) পীত পোখরাজ সোনার আংটিতে আটরতি। ● শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ)—প্রতিকারে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না; তবু রক্তমুখী প্রবাল আট-নয়রতি রূপার আংটিতে এবং গোমেদ আট নয় রতি রূপার আংটিতে ধারণীয়। শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা কবচ ধারণও করতে পারেন। ● শ্রীবেবী ভট্টাচার্য (বোড়াল, চব্বিশ পরগণা)—(১) মোটামুটি ভাল, (২) ... গাঢ় লাল পলা সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। শ্রীসুব্রতকুমার চ্যাটার্জী (রেল কোয়ার্টার, গার্ডেন রিচ)—তিন বছর ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। বসুমতীর কুপন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীসুধাংশুশেখর সেন (উল্যান লপ মেন রোড, কদমা)—(১) পরীক্ষার বিষয় বলা হয় না, (২) বিবাহের সময় সাড়ে একুশ বর্ষ মধ্যে। ● শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (ভিলাই)—মিথুন লগ্ন ও বৃষ রাশি, (২) উন্নতি হবে। ● শ্রীঅনিকেত ব্যানার্জী (রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিঃ)—নির্দিষ্ট স্থানের নাম বলা সম্ভব নয় তবে কলকাতার বাইরে বুঝায়। (২) তারিখ ও সময়াদি নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। ●শ্রীবিশ্বরঞ্জন ঘোষ (ত্রিবেণী)—সেপ্টেম্বরের মধ্যে না হলে মার্চের পর ●শ্রীঅনামী (ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা)—তিনজনের তিনখানি কুপন। প্রথমটির চার-পাঁচ রতি মুক্তা ও আটরতি রক্তমুখী প্রবাল সোনার আংটিতে এবং উন্নতির পক্ষে বাধা উক্ত রত্নেই দূর হতে পারে। কন্যার লটারীতে হবে না। তৃতীয় স্বামীর পক্ষে তিন বছর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। পুত্রের টেকনিক্যাল কিংবা বিজ্ঞানসংক্রান্ত লাইনে ভাল হতে পারে ● শ্রীমতী গীতা নায়ার (দেবীনিবাস রোড, দমদম)—তুলা লগ্ন ও শতভিষা নক্ষত্র; (২) প্রতিকার জন্য শ্রীশ্রীদক্ষিণা-কালিকা কবচ ধারণ করতে পারেন। ●শ্রীদীপককুমার সেনগুপ্ত (গভঃ কলোনী, মালদহ)—(১) বৎসরের শেষাংশে হতে পারে; (২) সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উৎপাত। ●শ্রীমতী অনুরাধা সেনগুপ্ত (গভঃ কলোনী, মালদহ)—(১) কাজ হবে, (২) দেড় বছর দেখুন। ●শ্রীপ্রসাদচন্দ্র বসু (মাকড়দহ রোড, হাওড়া)—(১) পাঁচ বছর বিশেষ সুবিধার নয়, (২) লোহা ও সীসা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। কিন্তু যথাবিধি শোধনাদি দরকার।

●শ্রীললিতকুমার সুর (বন্দীপুর)—(১) অশ্লেষা নক্ষত্র, কর্কট রাশি ও কন্যালগ্ন, (২) দেড় বছর মধ্যে হতে পারে। উক্ত সময় অতিক্রান্ত হলে বিশেষ দেরী হবে। ●শ্রীঅজা (উলুবেড়িয়া)—(১) ঋণমুক্ত হবেন, (২) সহ্য করতে হবে। ●শ্রীমতী শিপ্রা সেন শর্মা (উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলি)—(১) চৌদ্দ বর্ষ বয়স পর্যন্ত বিশেষ সাবধান, (২) বিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্র উপযোগী, কিন্তু বিশেষ সাবধানে এর পড়াশোনা যেন চলে। সঙ্গী-নির্বাচনেও সাবধান। ●শ্রী এস কে দাস (বজবজ)—(১) ধৈর্য সহিষ্ণুতা দরকার ও আটত্রিশ বর্ষ বয়স থেকে মোটামুটি ভাল, (২) গ্রহ-শান্তি করলেই যে ফল হবে, তার নিশ্চয়তা নেই; তবু শ্বেত প্রবাল ছয় থেকে আট রতির মধ্যে সোনার আংটিতে ধারণ করতে পারেন। এবং শনি ও মঙ্গলবারে কোনো প্রতিষ্ঠিত কালী মূর্তির পায়ে জবা ও অপরাজিতা ফুল দিয়ে দেখুন। ●শ্রী পি এন দাস (গার্ডেনরীচ) এগারো মাসের মধ্যে হতে পারে, (২) পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে। কিন্তু উক্ত সময়ে না হলে অতিরিক্ত দেরী হবে। ●শ্রীমতী সুকন্যা ও শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায় (নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড, নাকতলা। (১) সুকন্যার মেষলগ্ন, মৃগশিরানক্ষত্র ও মিথুন রাশি, (২) শান্তার ধনু লগ্ন মূলানক্ষত্রও ধনু রাশি। ●শ্রীমতী শেফালী দেবী (নেতাজী চন্দ্র বসু রোড, নাকতলা)—কন্যা লগ্ন, বিশাখানক্ষত্র, বৃশ্চিক রাশি। বর্তমান সময় স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। ●শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা), (১) উন্নতি হবে; (২) মোটামুটি ভাল কিন্তু গ্রহের প্রতিকার আবশ্যক। ● কুমারী মাধুরী ভট্টাচার্য (দক্ষিণ বারা-সাত)—(১) আগামী বর্ষে অনেকাংশে অনুকূল, (২) সাড়ে বাইশ বর্ষ বয়সের মধ্যে সম্ভাবনা। ● শ্রীমধুসূদন ব্যানার্জী (ব্যারাকপুর)—ব্যক্তিগতভাবে কোনো কাজ করা হয় না। ● শ্রীমতী মীনাক্ষী দেশাই (চক্রবেড়িয়া লেন, কলি)—(১) হবে এবং ভাল বলা চলে কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে, (২) শনি ও মঙ্গল শারীরিক কষ্টের কারণ হতে পারে। আগামী বছর সকল কাজেই সাবধান। ● শ্রীছত্র-ধার্য (হেম চক্রবর্তী লেন, হাওড়া) (১) দেড় বর্ষ মধ্যে না হলে, অত্যন্ত দেরী, (২) সামাজিক মোটামুটি ভাল কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাট ও আর্থিকক্ষেত্রে আশানুরূপ হবে না। ● শ্রীকার্তিকচন্দ্র ব্যানার্জী (অমিতা ঘোষ রোড, কলিকাতা)—গ্রহের প্রতিকার জন্য রক্তমুখী প্রবাল আট রতি ও পীত পোখরাজ আট রতি সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীসন্তোষকুমার নায়ক (ল্যান্সডাউন প্লেস, কলিকাতা)—(১) আড়াই বছর ঝঞ্ঝাটপূর্ণ, (২) নেই। ● শ্রীমতী নমিতা বসু (দমদম পার্ক, কলি)—(১) দেড় বছর মধ্যে হতে পারে। (২) পদস্থ চাকুরে কিংবা চিকিৎসক। ● শ্রীসুশীল নন্দী (সারদা চ্যাটার্জী লেন, হাওড়া)—(১) এবার হবে, (২) চেষ্টা করুন। ● শ্রী এ কে ভট্টাচার্য (অবধায়ক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঠাকুর, বারাণসী হিন্দু ইউনিভার্সিটি)—বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান। ● শ্রীসেন-গুপ্ত (চাকুরিয়া)—(১) এলোপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ দেখান, (২) সূর্য কবচ ও চুণী ধারণ করে দেখতে পারেন। সময় লাগবে।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

মান
এক
য়েছেন,
র বদলে
গড়ে
থেকে কেন্দ্র

সাহিত্য পরিচয়

কারা বই পড়েন না এবং কেন পড়েন না

বছর পাঁচেক আগে লণ্ডনের এক আরোগ্য নিকেতনে লাইব্রেরী-য়ানের কাজ করেছিলাম আমি কিছুদিন।

নিয়মিত বই নিতে দেখেছি সে সময় শুধু বয়স্কা মহিলাদের।

তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই রোমান্টিক উপন্যাসের ভক্ত ছিলেন এবং নিজের নিজের পাঠ্য নির্বাচন করতেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

কোন সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ধার ধারতেন না তাঁরা, আকস্মিক ঘটনা-বাহুল্যও পছন্দ করতেন না—যেমন পছন্দ করতেন না বিষয়বস্তুর অপরিচিত পরিবেশ বা প্রধোক্ত চরিত্রসমূহের অত্যধিক আধুনিক মানসিকতা।

নায়ক বিদেশী হলে চলবে না; তাহলে তাকে খল-নায়ক হতেই হবে শেষ পর্যন্ত আসল নায়কের নিগৃহীত হওয়ার জন্য।

ধনী-সন্তান নায়ক দরিদ্র-কন্যাকে বিবাহ করতে পারে কিম্বা ধনী-কন্যা দরিদ্র যুবককে, কিন্তু দুজনেই যেন ধনী না হয়।

সবচেয়ে মনোমত নায়িকাকে হয় হাসপাতালে নার্স নয় সেক্রেটারী বা এয়ার-হোস্টেস হতে হবে, অভাবপক্ষে রিসেপসানিস্ট বা পেশাদার মডেলও চলতে পারে।

সবচেয়ে পছন্দসই গল্প হল দরিদ্র হাসপাতাল-নার্সের সঙ্গে ডাক্তারের প্রণয়—পাশে পাশে অবশ্য ধনী দুহিতা এক প্রতিযোগিনীরও উপস্থিত থাকাটা অত্যাবশ্যক।

এই ধরণের বিষয়বস্তু যাঁদের পছন্দ, সেইসব বয়স্কা রমণীবৃন্দ খুব দ্রুতগতি পাঠিকা না হলেও নিয়মিত পাঠিকা।

এঁরা সপ্তাহে একবার বই বদল করেই খুশী থাকেন, এবং বইটি পড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইয়ের নাম বিলকুল ভুলে যান।

'আমি গত সপ্তাহে যে বইটা নিয়েছিলাম শ্রীমতী হাইলার সেটি পড়তে পেলে খুশী হবেন। বইটার নাম আমার ঠিক মনে নেই, তবে সবুজ মলাট বইটার আর নায়িকার বিয়ে হয়েছিল এক তরুণ স্থপতির সঙ্গে, ওদের দেখা হয়েছিল এক হোটেলে। পাওয়া যাবে নাকি ওটাই, একথা বলবেনই তাঁরা।

দিনের পর দিন এঁদের এই ধরণের কথা বলতে শুনেছি, পছন্দসই বইয়ের কথা তাঁরা না বলতেই বুঝে নিয়েছি, নিজের থেকেই বার্টা রাক, এথেল এম ডেল বা রুবি আয়ার্সের কোন একটি উপন্যাস আলমারী থেকে বেছে নিয়ে অসঙ্কোচে সামনে ধরেছি।

অল্পবয়সী মেয়েরা খুব কম পড়ে এবং অনতিবিংশোত্তীর্ণারা তো পড়ে না বললেই চলে। সাময়িক পত্র পত্রিকার পাতা উল্টেই তাদের সাহিত্যরস অনুধাবন করার তৃষ্ণা প্রশমিত হয়ে থাকে প্রায়শ।

একবার এই ধরণের একটি মেয়ে লাইব্রেরীতে এসে 'দি লিটল ওয়ার্লড অফ ডন ক্যামিলো' নামে একটি বই নেড়ে চেড়ে দেখছিলো—'এ বইটায় কি স্পেনের সম্বন্ধে কিছু আছে?' জিজ্ঞাসা করলো সে।

'না---না ইটালীর কথা আছে বরং' উত্তর দিলাম আমি, 'স্পেনের সম্বন্ধে কোন রচনা চাইছেন আপনি?'

'না---না সেরকম কোন দরকার নেই, আমার ভাই নানান বই পড়ে, সে পোস্টাপিসে কাজ করে কি না।' লাইব্রেরীতে কাজ করার সময় দুটিমাত্র মহিলার কথা স্মরণে আসে যাঁরা গল্প উপন্যাস ছাড়া অন্য কিছু পড়তে চেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন শিক্ষিকা, কাজেই বিস্মিত হই নি, ইনি নেলসনের জীবনী পড়তে চেয়েছিলেন; অপরা এক লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, ইনি পড়তে চেয়েছিলেন টি এস ইলিয়টের কাব্যগুচ্ছ। মেয়েদের মত ছেলেদেরও এ ব্যাপারে প্যাটার্ন বজায় রাখতে দেখেছি সর্বদা, অধিকাংশ পুরুষই ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের অনুরক্ত পাঠক, এ ছাড়া সাময়িক পত্র-পত্রিকা তো আছেই। ভ্রমণ বা এ্যাডভেঞ্চার-মূলক কথা কাহিনীরও বিশেষ কোন চাহিদা দেখতে পাইনি। যুবকদের পড়াশুনার অভ্যাস তো আরও কম।

বিদেশী মানুষরাই যা একটু ব্যতি-ক্রম ছিলেন, এঁরাই পড়তে টড়তে ভালবাসতেন কিছুটা এবং খুব সাধারণ মানুষও মাঝে মাঝে যে সব বই পড়তে চাইতেন, তাতে বিস্ময়বোধ না করে পারি নি। মনে আছে একবার এক পোলিশ তামাক ব্যবসায়ী অল্ডাস হাকসলীর একটা বই পড়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে অত নামকরা বইটা হাতে পেতে নিশ্চয় অনেক দেরী হবে, কারণ ভাল বইয়ের পাঠকও তো অনেক।

তাঁকে আশ্বস্ত করে যখন জানালুম যে ওই বইটা লাইব্রেরীতে আসার পর তিনিই সর্বপ্রথম ওটার সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছেন, এবং ওটা তিনি যে-কোন মুহূর্তেই পেতে পারেন।

তখন সত্যিই হতবাক হলেন ভদ্রলোক*।

*বিদেশী সাময়িক পত্র থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্গীত-চন্দ্রিকা / রবীন্দ্র ভারতী

সঙ্গীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বিখ্যাত এই গ্রন্থের নবরূপে আত্মপ্রকাশকে সঙ্গীতানুরাগী পাঠকমাত্রই স্বাগত জানাবেন। গোপেশ্বরবাবু জীবনব্যাপী চর্চায় সঙ্গীত সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, এই গ্রন্থ তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ। অনেকগুলি সঙ্গীত শুদ্ধ স্বরলিপিযোগে প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলি সংগৃহীত হয়েছে প্রাচীন ও প্রখ্যাত সুরকারদের রচনা থেকে। এঁদের মধ্যে আছেন, তানসেন, বৈজুবাওরা, বিলাস খাঁ, সুরদাস সদারঙ্গ, সুজন খাঁ প্রমুখ অমর সঙ্গীতবিদবর্গ। প্রধান শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধেই মূলত আলোচনা করা হয়েছে, যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি; অবশ্য নানা অপ্রচলিতপ্রায় লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতও অবহেলিত নয় যেমন, ঠাস্ক, প্রবন্ধ, ছন্দ, রাগমালা ও কওল-কলবানা। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি এক বিশেষ উল্লেখ্য অবদান। গ্রন্থকারের সযত্ন অনুশীলনের ফলে গ্রন্থটি এক বিশেষ মূল্যায়নের অধিকারী। প্রচ্ছদ রূপ-সুষম, ছাপা ও বাঁধাই অনবদ্য। লেখক—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। দাম—[illegible] টাকা।

বঙ্গভঙ্গ / আনন্দধারা প্রকাশন

বহুকাল আগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জেগে উঠেছিলো ভরা জোয়ার, বাঙালীর স্বদেশ-প্রেমের গাঙে, লর্ড কার্জনের হাতে সেদিন দু'টুকরো হতে বসেছিল সোনার বাংলা, কিন্তু সেদিনের বাঙালী ছিল না আজকের মত আত্মবিস্মৃত, তাই সেদিনের বিদেশী শাসক পারে নি তার মনোরথ পূর্ণ করতে। বঙ্গভঙ্গের আদেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো সমস্ত জাতি—বলতে গেলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই প্রথম প্রভাত। আলোচ্য গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকে পরিষ্কারভাবেই ধরতে পারা যায়, বর্তমান রচনার মাধ্যমে সে হিসাবে গ্রন্থটি শুধু মূল্যবানই নয় প্রামাণ্যও বটে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক — সমুদ্রগুপ্ত। প্রকাশনায়—আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—বারো টাকা, পঞ্চাশ পয়সা।

যতদূর মনে পড়ে / বাক-সাহিত্য

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিক নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের 'যত দূর মনে পড়ে' রচনাটি অল্পকাল পূর্বে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাঠক-সমাজকে নতুন করে অবহিত করা বাহুল্যমাত্র। জীবনের দীর্ঘকাল আইন ব্যবসায়ে তাঁর অতিবাহিত হয়েছে। অসংখ্য বিচিত্র, রোমাঞ্চকর এবং ঐতিহাসিক মামলা পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কুশলতা প্রদর্শন করেছেন। সেই ধরণের বহু মামলার ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থের লেখক বিধৃত করেছেন তাঁর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে। গ্রন্থটি সাধারণ্যে সমাদৃত হয়েছে। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাসের এই গ্রন্থটি প্রসঙ্গে বক্তব্য এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি---'তোমার লেখা 'যতদূর মনে পড়ে'। সেদিন সকালে আমার হাতে এসে পড়ল। আগ্রহভরে বইখানি তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে এক বৈঠকেই আদ্যোপান্ত শেষ করে ফেললাম, তৃষ্ণার্তজন যেমন করে গ্রীষ্মকালে বড় এক গেলাস জল এক চুমুকে নিঃশেষে পান করে। এক একটি মামলার কাহিনী পড়ছিলাম আর চোখের উপর ভেসে উঠছিল চির পরিচিত আদালত ঘরের ছবি। অপূর্ব হয়েছে তোমার স্মৃতিচয়ন। পড়া শেষ করে মনে হতে লাগল আরো লিখলে না কেন? ঝরঝরে ভাষায় মানব-জীবনের নানা সুখ-দুঃখের চিত্রগুলি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বড়ই আনন্দ পেয়েছি তোমার এই বইখানা পড়ে। আরো লিখো।' গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা মনোরম এবং প্রচ্ছদ লেখকের আলোকচিত্রে শোভিত। একটি মুখবন্ধ রচনা করেছেন মাসিক বসুমতী-সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। গ্রন্থটির বিষয়গত গুরুত্বে একে একটি প্রামাণিক গ্রন্থের পর্যায়ে অনায়াসে ফেলা যায়। প্রকাশক---বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, দাম---তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

চার্লি চ্যাপলিন / শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং

চার্লি চ্যাপলিন ছায়াজগতের এক অবিস্মরণীয় নাম। কৌতুকের মাধ্যমে গভীর জীবনদর্শনকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে আর কেউ পারেন নি আজ পর্যন্ত, তাই শুধু কৌতুকরসের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার বললে বুঝিবা কিছুই বলা হয় না চার্লির সম্বন্ধে, আসলে তিনি সত্যদ্রষ্টা শিল্পী। এই প্রতিভাধর মানুষটির জীবনায়ন করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। লেখকের আন্তরিকতায় রচনা আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে, চ্যাপলিন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কিছুই পাওয়া যায় রচনার মাঝে। আমরা এই জীবনী গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। কয়েকটি আলোকচিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে বইটির মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—অশোক সেন। প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মণি বৌদি / বাক্-সাহিত্য

খ্যাতনামা সাহিত্যিকার বর্তমান উপন্যাসটি রচনা করার সময় এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, উপন্যাসের সাধারণ রীতির বদলে আলোচ্য রচনার বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে একটিমাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র

করে। লেখকের শক্তিশালী লেখনী, নারী-চরিত্রের স্বভাব-বৈচিত্র্যের এক অপরূপ নিদর্শন হিসাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গ্রন্থের নায়িকা মণি বউদির চরিত্র-টিকে। নায়িকা বলে উল্লেখ করলেও আসলে মণি বউদি এ রচনার সব কিছু, নায়ক হিসাবে যিনি উপস্থাপিত তিনি যেন বেশ কিছুটা উপেক্ষিত, একটি সাইফার মাত্র। বিচিত্ররূপিণী নারীর মূর্তপ্রতীক মণি বউদির চরিত্রটি এতই জীবন্ত যে, মনে হয় রক্ত-মাংসের কোন মানুষকেই প্রত্যক্ষ করছি। যেন উপন্যাসের নায়িকামাত্র নয়, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই এক ফসল এই চরিত্র। লেখকের অনন্য শৈলীর প্রসাদে রচনাটি আগাগোড়া সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয়। আমরা এই গ্রন্থের সম্যক সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ চটকদার, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। লেখক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিজয়ী বসন্ত / মিত্র ও ঘোষ

জনপ্রিয়া লেখিকার এই রোমাণ্টিক রচনা পাঠক-সমাজকে খুসী করে তুলবে বলেই মনে হয়। কাহিনী অবশ্য কিছুটা গতানুগতিক। দরিদ্র-কন্যার সঙ্গে ধনীসন্তানের প্রণয়মধুর মিলনে তার পরিসমাপ্তি। গরীবের ঘরের শ্যামা মেয়ে অনন্যার সঙ্গে আকস্মিকভাবে একদিন পরিচয় ঘটলো। ধনীর সন্তান গৌতমের। প্রথম দর্শনেই প্রেম, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখে বুঝিবা কিছু খুঁজে পেলো সুকান্ত সুদর্শন গৌতম তার অনন্যা। সে তো স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধ হল, গৌতম যে সত্যই রূপকথার রাজপুত্র। বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনী হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল। মিলনান্তক পরিসমাপ্তি স্বভাবতঃই মনকে টানে। লেখিকার মুন্সীয়ানার পরিচয় রচনার সর্বত্র প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—আশাপূর্ণা দেবী, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছ' টাকা।

অকথিত কাহিনী / সান্যাল অ্যাণ্ড কোং

সমসাময়িক কালের বহু উল্লেখ্য ঘটনার প্রামাণ্য দলিল এই রচনা। ১৯৬২ সালে নেফা ও লাদাকে ভারতীয় বাহিনীর বিপর্যয় ও সেই চরম সঙ্কটকালে নেহরু, মেনন ও মোরারজী দেশাইয়ের ভূমিকা সম্বন্ধেও নতুন এক আলোকসম্পাত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখকের ঘটনা-বহুল জীবনের ও অধিকাংশ বিধৃত রচনার মাধ্যমে। আলোচ্য রচনাটি মূল ইংরাজীর সরল বঙ্গানুবাদ, অনুবাদকের কর্মে যথেষ্ট অনুশীলনের স্বাক্ষর আছে। এই বহুবিতর্কিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে, অনুবাদক বাঙ্গালী পাঠক-সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। লেখক—লেঃ জেনারেল বি এম কল, সম্পাদনা—বিজন চক্রবর্তী। প্রকাশনা—সান্যাল এণ্ড কোম্পানী। ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—কুড়ি টাকা।

তুষারে রোদ / আই এ পি

আজকের দিনের সাহিত্যসমাজে যাঁরা খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছেন, শ্রীমতী জয়ন্তী সেন তাঁদের অন্যতমা। ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা এই খ্যাতি অর্জনের পথ তাঁর প্রশস্ত করে দিয়েছে। সাহিত্যের নানা বিভাগ তাঁর সেবায় সমৃদ্ধ হয়েছে। সুদীর্ঘকাল যাবৎ ইনি কবিতা রচনা করে আসছেন, বলা বাহুল্য কবি মহলে ও কবিতা-অনুরাগী সমাজে ইনি যথেষ্ট স্বীকৃতি ও সাধুবাদে ভরপুর হয়ে উঠেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর কবিতার একটি সঙ্কলন। প্রতিটি কবিতা তাঁর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের আলোয় উজ্জ্বল। কবিতাগুলির মধ্যে কবির একদিকে বলিষ্ঠ ও যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী অন্যদিকে রসপিপাসু মনের স্নিগ্ধ প্রতিচ্ছবি সমানভাবে ফুটে উঠেছে এবং এই দুয়ের সম্মিলনে তাঁর সৃষ্টি এক অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে। তাঁর বিষয়নির্বাচন প্রয়োগকুশলতা এবং বর্ণনমাধুর্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। একদিকে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের প্রতিচ্ছবি, অন্য দিকে জীবনের রূপ রসময় নন্দনস্পর্শসমৃদ্ধ অভিব্যক্তি তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে। দুয়ের সমন্বয়ে তাঁর কাব্য যেমনই প্রসাদগুণসম্পন্ন, তেমনই গতিবেগে ভরপুর হয়ে উঠছে। কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও জটিলতা দুর্বোধ্যতা কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই। সহজ সরল প্রাঞ্জলভাবে কবিতাগুলি চিত্রিত এবং রূপায়িত। কাব্যরসিকমহলে এই মনোরম কাব্যগ্রন্থখানি যথেষ্ট সমাদর পাবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ-পারিপাট্যও উল্লেখযোগ্য। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী, প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৭। দাম—তিন টাকা।

মাঠ থেকে বলছি / রূপরেখা

'ফুটবল বাঙালীর জাতীয় খেলা, যদিও আজ ক্রিকেট খেলার রাজা বলেই স্বীকৃত দেশে-বিদেশে, তবু বাঙ্গালী আজও ফুটবল-পাগল। আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক এই ফুটবল, বিষয়বস্তুও ফুটবল-কেন্দ্রিক। লেখক খ্যাতনামা ফুটবলরসিক, বেতারে বহুদিন অবধি ফুটবলের ভাষ্যকার, বহু নামকরা ম্যাচ তিনি দেখেছেন, বহু নামকরা খেলোয়াড়ের খেলা উপভোগ করেছেন; বর্তমান রচনা সেই সব আনন্দঘন অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য দলিলবিশেষ। লেখক আপন বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার দুর্লভ কৌশল করায়ত্ত করেছেন। এ রচনা তাই শুধু প্রামাণ্যই নয়, মনোরমও বটে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—অজয় বসু, প্রকাশক—রূপরেখা। ১২৪।১এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দেশে দেশে রূপকথা / শ্রীপ্রকাশ ভবন

দেশ-বিদেশের রূপকথামূলক গল্প শুনিয়েছেন লেখিকা এই গ্রন্থের মাধ্যমে। মোট সাতটি গল্প আছে এতে। লেখিকা শিশুচিত্ত জয়ের কৌশল জানেন, বেশ মন-কাড়ার ভঙ্গীতেই গল্পগুলি পরিবেশন করেছেন তিনি। ছোটরা যে বইটি হাতে পেয়ে খুসী হবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা—ইন্দিরা দেবী। প্রকাশক—শ্রীপ্রকাশ ভবন। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১৪। দাম—দু' টাকা।

প্রতিনায়ক / আনন্দধারা প্রকাশন

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দেশের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিতে কাহিনীর জাল বুনেছেন লেখক। আদর্শবাদী যে-কোন মানুষই যে এই পরিস্থিতিতে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে বা পড়তে পারে বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সে সত্য বিধৃত। আদর্শবাদী জননেতা ও কর্মী সত্যসুন্দর অর্থাৎ এই কাহিনীর নায়ক চরিত্রটি যেন বাস্তবের নিখুঁত ছবি, তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গে বেদনাও তাই অপরূপভাবেই সত্য হয়ে উঠতে পেরেছে, গভীরভাবেই দাগ এঁকে দিয়েছে পাঠকের মননে। পরিবেশের সর্পিং আলিঙ্গনে সততা যখন নিপীড়িত, মনুষ্যত্বের পতন হওয়াটা তখন আর কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, তা অনিবার্য এক পরিণামমাত্র। তবু মানুষ সংগ্রাম করে এর বিরুদ্ধে বাঁচতে চেষ্টা করে, বাঁচাতে চেষ্টা করে অপমানিত মানবাত্মাকে; বর্তমান গ্রন্থ এই সংগ্রামেরই ইতিহাস। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—সাত টাকা।

ধর্ম-পরিচয় / শ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রকাশনী

মানুষের জীবনে এই বৈজ্ঞানিকের যুগেও ধর্মের ভূমিকা বড় কম নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মন সর্বদাই ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়ের অন্বেষণে উন্মুখ, আর ধর্ম হচ্ছে এই অনুসন্ধানেরই সবচেয়ে বড় আশ্রয়। আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মের পরিচয় প্রদত্ত। সারগর্ভ ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ধর্মের অন্তর্নিহিত রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। বোদ্ধা পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী। প্রকাশক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রকাশনী। ৮৭বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

লক্ষ্মী ঃ আশ্বিন থেকে আশ্বিনে / মনালোক

লক্ষ্মীপূজা বাঙালী হিন্দুর জীবনে একটা বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে রয়েছে, অঞ্চলভেদে তার নানা বৈশিষ্ট্য নানা রূপ আলোচ্য গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। নানাস্থানের লক্ষ্মীপূজার লৌকিকরূপের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা যথেষ্ট কৌতুহলপ্রদ। লেখকের অনুসন্ধিৎসা গভীর বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ মনোজ্ঞ, অন্যান্য আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশক—মনালোক। ৯৭, অ্যাণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

আমার শিকার স্মৃতি / মেরিট পাবলিশার্স

শিকার সম্বন্ধে যাঁদের কৌতুহল আছে আলোচ্য বইটি পড়ে তাঁরা খুসী হবেন। লেখক দক্ষশিকারী, শিকার জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এখানে। শিকার কাহিনী যে কতটা কৌতুহলপ্রদ হতে পারে গ্রন্থোক্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত না হলে তা বোঝা যায় না। ভাল শিকারী হতে হলে যে-সব গুণ থাকা অত্যাবশ্যক তারও উল্লেখ করেছেন লেখক। এক শিক্ষিত ও অনুসন্ধানী মননের ছাপে কাহিনী প্রোজ্জ্বল। আমরা বইটি পড়ে খুসী হয়েছি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বিজয়কান্ত সেন। প্রকাশক—মেরিট পাবলিশার্স। ৫১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম—পাঁচ টাকা।

ধানের রং সোনা / মানস প্রকাশনী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কবিতা-সঙ্কলন। কবি বাস্তবসচেতন, কবিতাগুলির মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়। অতি আধুনিকতার ছোঁয়ায় কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হলেও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য কয়েকটি কবিতা পড়তে ভালই লাগে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। কবি—বীরেন চক্রবর্তী, প্রকাশনা—মানস প্রকাশনী। ৬৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

আরণ্য প্রেমকথা / কথাশিল্প

পূর্ব-ভারতের লোকসাহিত্য থেকে বেছে নিয়ে কয়েকটি অনবদ্য প্রেম-কাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। অরণ্যচারী অধিবাসীদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথা ও অনুশাসনাদি আমাদের সভ্য জগৎ থেকে অনেক পৃথক; প্রেমের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবেই সত্য, কাজেই বিষয়বস্তু যে অভিনব একথা সহজেই স্বীকার করা চলে। বস্তুত নবীনত্বের এক স্বাদস্পর্শে কাহিনীসমূহ উপাদেয়, পড়তে ভাল লাগে এবং পড়ার পরও সে ভাল লাগার রেশ অনেকক্ষণ ধরে মনের তারে ঝঙ্কার তোলে, শেষ হয়ে যাওয়া গানের মূর্ছনার মত। প্রচ্ছদ-শিল্প সুষম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নলিনীকুমার ভদ্র, । প্রকাশক—কথাশিল্প। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত

সম্প্রতি শাক্ত পদাবলীতে, বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত শাক্ত পদাবলী নামক গ্রন্থখানির মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীতগুলির অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন কোন কোন মহলে উঠেছে। নজরুল জীবিত ও সর্বজনপ্রিয় কবি। তাছাড়া আজ দুই যুগেরও বেশী সময় তিনি জীবিত থেকেও বাক্-চলচ্ছক্তিরহিত সমাধিস্থ। চিকিৎসা শাস্ত্রের নিদানমতে আর কোনদিন তিনি না পারবেন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীকে খড়্গে পরিণত করতে, না পারবেন প্রেমের গুলবাগে গানের বুলবুলির সুর ফোটাতে, না পারবেন নতুন নতুন ভক্তিমূলক গানের প্লাবনে ভক্ত হৃদয়কে রসাপ্লুত করতে। তাঁর শেষোক্ত গানগুলির মধ্যে শ্যামাসঙ্গীতগুলির যাঁরা অনুরাগী তাঁদের পক্ষে স্বভাবতই শাক্ত পদাবলীর স্বীকৃত ধারার মধ্যে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতগুলির স্বীকৃতি বা অন্তর্ভুক্তি কাম্য হতে পারে। যদিও সে প্রশ্ন বিচারসাপেক্ষ। আর সে বিচার হবে নজরুলের কাব্য ও বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে।

সন্তোষ রায়চৌধুরী

নজরুলের কবি-জীবনের সূত্রপাত হয় মূলত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আর সমাপ্তি হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তাঁর কৈশোর বয়সে লেটোর দলে গান বাঁধার মধ্যে পরবর্তী কবি-জীবনের পূর্বাভাষ হয়তো কিছুটা ছিল কিন্তু সেটা তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের মধ্যে ধর্তব্যের মত কিছু নয়। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক গ্রাম্য-কবিদের অন্তত সাহিত্যিক-কবিদের আসরে ঠাঁই আমরা দিই না—তা সেই সব গানে যতই শিল্পকলা, ভাষাচাতুর্য বা মুন্সিয়ানা থাকুক না কেন। যাই হোক, জীবনে বাংলা গীতি-কবিতার আসরে হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে শৌর্য-বীর্যের যে জোয়ার আনেন তাই তাঁকে একেবারে জনমানসের মণিকোঠায় নিয়ে তোলে। বাংলা দেশে বোধহয় তিনিই একমাত্র কবি যিনি রণক্ষেত্র হতে বন্দুক ছেড়ে এসে কলম ধরে একনিমেষে জয় করে নিয়েছিলেন গোটা একটা রাজ্য—যে রাজ্যে তিনি আজো খ্যাত হয়ে আছেন শুধু কবি হিসাবে নয়—বিদ্রোহী-কবি হিসাবে।

তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু জের যায়নি। আমাদের ভরসা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর বৃটিশের দাক্ষিণ্যে এদেশে স্বায়ত্তশাসনের পথ সুগম হবে। কিন্তু তার বদলে নানা দুর্লক্ষণে রাজনৈতিক জীবনে চাঞ্চল্য বেড়েই চলেছে। একদিকে সন্ত্রাসবাদী অন্যদিকে অহিংসবাদী উভয় দলই সক্রিয়। নজরুল ছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের দলে। সদ্য যুদ্ধ হতে ফেরা সৈনিক-বন্দী কবির রক্তে যেমন ছিল বিদ্রোহের দোলা, কাব্যে তেমনি এল বিদ্রোহের উন্মাদনা। বাংলা কাব্যের নূপুর নিক্বণ উত্তাল হয়ে পরিণত হলো অস্ত্রের ঝনঝনায়---বাংলা কাব্যে এল প্রাণের বেগ।

'মোসলেম ভারতের' প্রথম সংখ্যা (১৯২০) থেকেই লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে থাকলেও কবি-হিসাবে তিনি প্রথম আলোড়ন তোলেন 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' লিখে কবিতা দুটিই প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। অবশ্য তার পূর্বে ১৯২০ সালে নবযুগ সান্ধ্য-পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদনায় নিযুক্ত থাকাকালীন কৃষক-মজদুরদের দাবী নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধের জন্য নবযুগের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সেই প্রবন্ধগুলো পরে (১৯২৯) সংকলিত হয়ে যুগবাণী নামে প্রকাশের সময় সরকার তার প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করে দেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিপ্লবাত্মক মনোভঙ্গীর পরিবর্তন না হলেও তিনি জাতীয়

কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হন। এমন কি পরে জাতীয় কংগ্রেসের সভ্যও হন। ১৯২৫ সালে তাঁকে আমরা পাই মজুর স্বরাজ্য পার্টির মুখপত্র লাঙল পত্রিকার দুগ্যা সম্পাদক হিসাবে।

১৯২৯ সালে আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করলেন নখ্যাত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে। দেড়মাস পরে পূজা সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হলো---

আর কতকাল থাকবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি ;
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,
আসবি কখন সর্বনাশী ?

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো বৃটিশ সরকার, কুমিল্লা হতে খুঁজে গ্রেপ্তার করে এনে রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলো।---প্রথমে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, পরে হুগলী জেলের অবর্ণনীয় অত্যাচারের মধ্যেই লিখলেন বিখ্যাত কবিতা---'শিকল পরার গান', 'বন্দীর বন্দনী' ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত জেলের অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় করলেন অনশন ধর্মঘট।

অন্যদিকে তাঁর রচনা বৃটিশ সরকা: . ; র এক বাজেয়াপ্ত করেছেন--- অগ্নিবীণা (১৯২২), যুগবাণী (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), চন্দ্রবিন্দু (১৯২৯) প্রলয় শিখা (১৯৩০)। বৃটিশ আমলে অগ্নিবীণা ও বিষের বাঁশীর কাব্যগ্রন্থ দুখানির পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হলেও, বাকীগুলির পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হয় স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে---১৯৪৯ সালে।

শুধু বিদ্রোহ বা বিপ্লবাত্মক কবিতাই নয়, একজন মুসলমান হিসাবে মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য নিয়ে রচিত তাঁর ইসলামী সঙ্গীতগুলি বাঙলা সাহিত্যে ঐ জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে অতুলনীয়। ইসলামী সঙ্গীত গ্রন্থ জুলফিকার প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। ঐ সব সঙ্গীতের মধ্যে---

'ও মন রমজানের ঐ রোজার
শেষে এল খুশীর ঈদ',
'বক্ষে আমার কাবার ছবি,
চক্ষে মোহাম্মদ রসুল',

---প্রভৃতি গানগুলি যে কোন মুসলমানের প্রাণে খুশীর বান ডাকাতে পারে।

প্রায় ঐ একই সময়ে নজরুল রচনা করেছেন প্রেম-সঙ্গীত। প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর গানে। বিশেষ করে উর্দু গানের সুরকে তিনি যেভাবে বাঙলা গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা নাই।—

'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে
দিসনে আজি দোল',
'আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায়
কে গো দরদী'
'চেয়োনো সুনয়না আর চেয়োনা
এ নয়ন পানে'

—প্রভৃতি গানগুলির কথা নিশ্চয় বয়স্ক পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে হবে না।

ঠিক ঐ একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে ও পরে তিনি ভক্তিমূলক শ্যামা-সঙ্গীতগুলো রচনা করেন। ভাবে, ভাষায় ও রচনা-সৌকর্যে সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই অনবদ্য। এমনকি শাক্ত পদাবলী নামে যে সমস্ত পদ বাঙলা সাহিত্যে প্রচলিত আছে তার অনেকগুলির চাইতেও নজরুলের কিছু কিছু শ্যামাসঙ্গীত অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তবুও তন্ত্রসাধকের শাক্ত ভাবনায় যে উত্তরাধিকার থাকলে তাঁর শ্যামা-সঙ্গীতগুলিকে শাক্ত পদাবলীর

কাজী নজরুল ইসলাম

পশ্চিমবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য দশ হাজার এক টাকার একখানি চেক রাজ্যপাল ধরমবীরের হাতে অর্পণ করেন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ

অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে শ্রেয় যুক্তি বলে মনে হতে পারে, তা কি তাঁর ছিল?

সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে কবির পরিবেশ, মনোভঙ্গী, আচার-আচরণ বা এককথায় বাস্তব জীবনকে খতিয়ে দেখা দরকার। মুসলমান বলে কবি কোনদিন নিজেকে কোন জাতি বা গোষ্ঠী হতে পৃথক করে দেখতেন না। বরঞ্চ বন্ধুদের কাছে নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করতেন। বন্ধুদের মধ্যে মুসলমানের চাইতে হিন্দুর সংখ্যাই বোধহয় বেশী ছিল। সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক অশুভ বুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল উদ্যত, শাণিত, তীক্ষ্ণ। দেশপ্রেমিকের আসন ছিল তাঁর প্রথম শ্রেণীতে—চারণ কবি হিসাবে নয়—সক্রিয় রাজনীতিক হিসাবে।

১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় সারা বাঙলা দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, তখন কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন উপলক্ষে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গান—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি এবং তিনি নিজে সম্মেলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত হিসাবে গানখানি গান।

অন্যদিকে ১৯২৪ সালে কুমিল্লায় প্রমিলা সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সে বিবাহ অনেকেই পছন্দ করেন নি। তাছাড়া নজরুল-জীবনে যে খামখেয়ালীপনা ছিল তা স্বতই পারিবারিক শান্তির প্রতিবন্ধক ছিল। উপরন্তু ছিল চির দারিদ্র্য। ১৯২৫ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান আজাদ কামাল জন্মের কিছুকাল পরেই মারা যায়। তাতে তাঁরা প্রচণ্ড শোক পান। সে শোক কাটিয়ে উঠেন ১৯২৬ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় পুত্র অরিন্দম খালেকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। তার ডাক নাম ছিল বুলবুল। সে ছিল নজরুল দম্পতির নয়নের মণি। দু বছর পরে (১৯২৮) নজরুলের মা মারা গেলেন। তার দু' বছর পরে (১৯৩০) চার বছর বয়সে বুলবুল মারা যায় বসন্ত রোগে। যে ক'দিন বুলবুল শয্যাশায়ী ছিল, তার শয্যাপার্শ্বে বসে নজরুল 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজের অনুবাদ করেন। বইটি ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় বুলবুলের নামে উৎসর্গীকৃত হয়ে।

একান্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন নজরুল। শান্তির সন্ধানে ছুটে বেড়ান চারিদিকে। অধ্যাত্ম চিন্তা, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য গুরুর সন্ধান করেন নানা ধর্মের লোকেদের মধ্যে। কোথাও শান্তি পান না।

শেষে এক বন্ধুর কাছে শোনেন যে, শ্রীঅরবিন্দ সন্ন্যাস নিয়ে সাধনার যে পর্যায়ে পৌঁচেছেন লালগোলা স্কুলের শিক্ষক গৃহীযোগী বরদাচরণ মজুমদারও সাধনার সেই পর্যায়ে পৌঁচেছেন।

তাঁর শরণ নাও।

ছুটলেন লালগোলায়।

বরদাবাবু নাচার, নজরুলও ছেড়ে দেবার জন্য ছুটে যান নি। শেষ পর্যন্ত বরদাবাবু তাঁকে অধ্যাত্ম উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। একই সঙ্গে অনুশীলন চলতে থাকে নানা ধর্মের ধর্মশাস্ত্রের। সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন পর্যন্ত উঠে অঙ্গে। ধর্ম সাধনায় এই পর্যায়ে রচিত হয় তাঁর ভক্তিমূলক গানগুলি—তা সে শ্যামাসঙ্গীতই হোক আর ইসলামী সঙ্গীতই হোক।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

কে এল কাপুর নিবেদিত ও প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক তপন সিংহ পরিচালিত চিত্রটি 'আপন জন'। চিত্রটির চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন পরিচালক স্বয়ং। চিত্রটিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, যাঁরা তাঁরা হলেন---পার্থ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, রবি ঘোষ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, ছায়াদেবী ও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রয়েছেন নবাগত শিল্পী স্বরূপ দত্ত প্রমুখ। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড। চিত্রটির মুক্তি আসন্ন।

গৌরী মা

মহীয়সী রমণী 'গৌরী মা'র বিরাট ঘটনাবহুল জীবনের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনীকে চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করা হচ্ছে। এই ভক্তিমূলক চিত্রটি পরিচালনার বিরাট দায়িত্ব বহন করছেন চিত্র পরিচালক রবি বসু, সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছেন অপরেশ লাহিড়ী। চরিত্রচিত্রণে আছেন গুরুদাস ভট্টাচার্য, মিতা মুখোপাধ্যায়, তপতী দেবী, দীপ্তি রায়, পদ্মা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য ও অনেকে।

সূর্যপরশ

'সূর্য পরশ' চিত্রটির কাহিনী রচনা করেছেন সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কাহিনীকার স্বয়ং। চিত্রটির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় থাকছেন গীতা দে, কালীপদ চক্রবর্তী, রঞ্জিৎ ঘোষ, নির্মলকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। উদয় ভানু প্রোডাকসন্সের চিত্র 'সূর্য পরশ।'

পদ্মাবতী জয়দেব

গীতিবহুল ও ধর্মমূলক কাহিনী 'পদ্মাবতী জয়দেব' পরিচালনা করছেন 'চিত্রদূত।' চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। গীতিবহুল চিত্রটিতে সুর দিচ্ছেন বিজন পাল। চিত্রটিতে কণ্ঠদান করেছেন যাঁরা তাঁরা হলেন---গীতা দাস, ঘন্টশালা, সুশীলা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। চিত্রটিতে বাংলার বিশিষ্ট চিত্রতারকাদের দেখতে পাওয়া যাবে। চিত্রটি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

চৈতালি

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর সামাজিক কাহিনী 'চৈতালি' চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। চিত্রটি পবিচালনা করছেন প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়। এ রঙীন চিত্রটিতে সুরদানের ভার গ্রহ করেছেন কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ও সুরকার শচী দেববর্মণ। চিত্রটির নেপথ্যে যাঁর গান গেয়েছেন তাঁরা হলেন মান্না দে আশা ভোঁসলে ও লতা মুঙ্গেশকর চিত্রটিতে নায়কের ভূমিকায় অবতী হচ্ছেন বাংলার স্বনামধন্য শিল্পী উত্তমকুমার ও নায়িকার চরিত্রে রয়েছে সুদর্শনা চিত্রশিল্পী শ্রীমতী তনুজা আর ডি বনশলের বাংলা চিত্র 'চৈতালি'। অন্যান্য সহ-ভূমিকাগুলিতে থাকবেন খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ।

স্বনামধন্যা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়
চিত্র : দিলীপ বসু

নাট্যলোক

'৪২
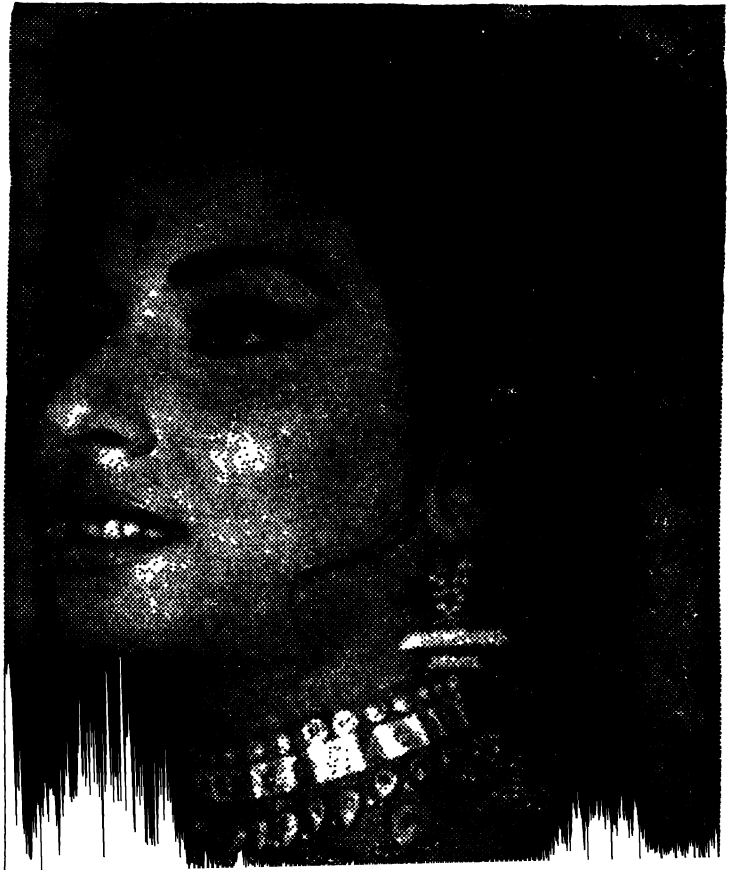
শ্রীরামপুর কাকলী গোষ্ঠির শিল্পীরা সম্প্রতি শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবনে হেমেন গুপ্তের মূল কাহিনী অবলম্বনে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য রূপায়িত '৪২' নাটকটি অভিনয় করলেন, ১৯৪২ সনের 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত এ নাটক। নির্দেশনায় অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নত প্রয়োগ-চিন্তার নির্দেশ বহন করেছে। আবহসঙ্গীত ও আলোক-সম্পাত উপযুক্ত নাট্যমুহূর্ত রচনার সহায়তা করেছে। চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে অজয়, মেজর, দাশু মণ্ডল ও বীণারূপে অচীন মৈত্র, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী, অমল চক্রবর্তী ও রুণু বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাগ্রে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা ছিলেন অমর চট্টোপাধ্যায়, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বৈদ্য, অসিত বোস, অলোককুমার, কৃষ্ণ দাশগুপ্তা, লেখা দত্ত ও তপতী ঘোষ।

উল্টো তার

সম্প্রতি রঙমহল মঞ্চে জাতীয় নাট্য সংসদের অভিনয়-শিল্পীরা এ নাটক মঞ্চস্থ করলেন। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন অলোক কুণ্ডু। নিমাই দাসের কাহিনী অবলম্বনে এটি নাটকে রূপান্তরিত করেন শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ, শিল্পীদের সমবেত প্রচেষ্টায় নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা যেতে পারে। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিলেন প্রভাত রায়, বঙ্কিম দাস, দিলীপ দে, বিমল সেনগুপ্ত, নারায়ণ গৌতম, নীলোৎপল মণ্ডল, খোকন সাহা, অমল জোয়ারদার, সদানন্দ দাস, পাঁচু দাস, কেশব রায়, নিমাই দাস, কেয়া রায়, ভারতী দাস প্রমুখ শিল্পীরা।

বিশ বছর আগে

কোলকাতা পৌর-সংস্থার স্টোরস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পী-সদস্যরা সম্প্রতি এ নাটকটি সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করলেন রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। নাটকটি পরিচালনা করেন দেবকুমার রায়। শ্রীরায়ের সুনিপুণ ও বলিষ্ঠ পরিচালনায় শিল্পবোধের পরিচয় মিলেছে। কয়েকটি সংঘাতময় নাট্যমুহূর্তে শিল্পীদের অভিনয় স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত। সুদর্শন মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানরঞ্জন সাহা, বিশ্বেশ্বর বোস, চিত্ত সরকার, অনিল ভট্টাচার্য, নির্মল সেন এবং নাট্যনির্দেশক শ্রীরায় স্ব-প্রয়োজনাগুণে পরিচিতি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের জন্য সুচিহ্নিত হয়েছেন চিন্ময় বিশ্বাস, আশীষ সান্যাল, তপন মিত্র, অরুণ দত্ত, অঞ্জলিকা গঙ্গোপাধ্যায় ও লতিকা দাশগুপ্তা।

পোস্টমাস্টার ও বশীকরণ

দর্পণ সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এ নাটক দুটি সম্প্রতি অভিনয় করলেন প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে, ভিন্ন রূপের দুটি নাটক দেখে এ দিনের দর্শকরা অশেষ তৃপ্তিলাভ করেছেন। নাটকীয় মহূর্তগুলি শিল্পীদের অভিনয়-

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ নাটক 'এন্টনী কবিরাজ'-এর জন্য শরৎশশীবালা পুরস্কার উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের নিকট থেকে গ্রহণ করছেন শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য চিত্র : মোনা চৌধুরী
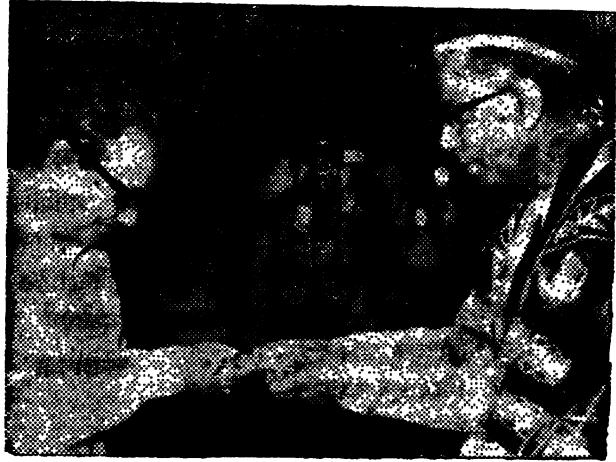
চরিত্রচিত্রণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, উল্লেখযোগ্য মহিলা শিল্পীরা হলেন মিতা দাশগুপ্তা, প্রতিমা চক্রবর্তী ও বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়।

বিয়োগবিধুর ও লৌহপ্রাচীর

সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কোলকাতা শাখার কর্মীরা অভিনয় করলেন এ নাটক দুটি, প্রথম নাটকে মানব-জীবনের বিচ্ছেদ বেদনার একটি নিটোল রূপ দিতে চেয়েছেন নাট্যকার আশীষ সান্যাল। কিন্তু অপটু সংলাপ এবং উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টির অভাবে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। এদিক থেকে এঁদের দ্বিতীয় নাটক 'লৌহ-প্রাচীর' প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এবং সুঅভিনয়ের গুণে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দক্ষতায় সপ্রাণ হতে পেরেছিল। নাট্যকার অগ্নি মিত্র রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প পোস্ট মাস্টারকে' নাটকে রূপায়িত করেছেন। নাটকীয় দ্বন্দ্ব, চরিত্রের সময়োচিত চিন্তাধারাকে অবিকৃত রেখে একটি সার্থক নাটক সৃষ্টির জন্য নাট্যকার অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন। দুটি নাটকেরই আবহসঙ্গীত রবীন্দ্র-অনুসারী। আলোকসম্পাত এ তুলনায় বুঝি কিছুটা নিষ্প্রভ। উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টির জন্য যাঁদের নাম সর্বাগ্রে মনে আসবে তাঁরা হলেন উমা গুহ, শিব ঘোষ, অশোক বসাক, কালী ঘোষ, সুদাম সাহা, অজিত বোস, রীতা চট্টোপাধ্যায় ও নিমাই দাস, দুটি নাটকই পরিচালনা করেন অজিত বোস।

নতুন রেকর্ড

এ বছরের মহাপূজায় যে-সকল নতুন রেকর্ড সঙ্গীতানুরাগীদের যথেষ্ট আনন্দে অভিষিক্ত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস প্রকাশিত 'দ্বিধাভরে তুমি এস না' ও 'বিশ্বভুবন যবে তন্দ্রাহারা' বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। রাগাশ্রয়ী এই আধুনিক গান দুটি গেয়েছেন সুখ্যাত শিল্পী অরবিন্দ বিশ্বাস। গান দুটির সুরযোজনার কৃতিত্ব ও তাঁরই। গান দুটি রচনা করেছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা ঠাকুর। শব্দচয়নে, প্রকাশভঙ্গীমায় এবং চিন্তাধারার স্বকীয়তায় শ্রীমতী 'ঠাকুর' এই গান দুটির মাধ্যমে তাঁর বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। নৃত্যশিল্পী হিসাবে ইতিপূর্বে তিনি রসিকসমাজে যথেষ্ট স্বীকৃতিলাভ করেছেন। গীতিকার হিসাবেও তাঁর পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই।

সঙ্গীতশিল্পী

জীবন-সাধনার পথে সঙ্গীত যাঁদের পাথেয় সুশীল মল্লিক তাঁদের অন্যতম। বর্তমানে তাঁর গাওয়া চারখানি রবীন্দ্র-

সঙ্গীতশিল্পী সুশীল মল্লিক

সঙ্গীতের রেকর্ড অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাই সঙ্গীত-জগতে আজ তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

ছেলেবেলা কেটেছে কালনায়। তখন থেকেই গানের নেশা, কিন্তু বাড়ীতে সে সুযোগের যথেষ্ট অভাব ছিল। রেডিও রেকর্ড থেকে শুনে শুনে গান তুলতেন আর গুনগুন করে তাই গাইতেন।

প্রথমে শ্রীসুধীন দাশগুপ্তের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং পরে আধুনিক শিখলেন শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। পরিচয় হল শ্রীশৈলেশ ভড়ের সঙ্গে। সেই প্রথম শুরু হল তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা। তৃষ্ণা মিটলো। মন ভরে গেল আনন্দে। ১৯৬৪ সালে প্রথম রেকর্ড করেন শৈলেশ ভড়ের পরিচালনায়। বর্তমানে তিনি বেতার শিল্পী। সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত আছেন।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত শংকর-এর 'চৌরঙ্গী' চিত্রে উত্তমকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও দীপ্তি রায়

সাগরপারের মায়ালোক

রমেন চৌধুরী

ছায়াছবির কল্যাণে বিভিন্ন সমাজের নানান কিছু জানা-শোনার সুযোগ দিয়ে থাকে। পৃথিবী জুড়ে কতো না মানুষের মেলা। তাদের কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। সমাজ ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে প্রতি পদে তার বিভিন্নতা। ছবিতে মাঝে মাঝে সে রূপ প্রত্যক্ষ করি, আমরা কূপমণ্ডুকের দল। পৃথিবীর পরিধি তো পঁচিশ হাজার মাইল বলেই জানি কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষ পৃথিবী বলতে কতোটা বোঝে? আমার পৃথিবী তো বেলগেছে থেকে ধর্মতলা, ড্যালহৌসী—বড়োজোর টালিগঞ্জ কিংবা বালিগঞ্জকে নিয়ে। কোনো রাঙা শুক্রবারে (ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন) বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে রওনা দিই বাঙলার বাইরে। সে তো দৈবাৎ। নইলে পঁচিশ হাজার মাইলের পৃথিবী পাঁচ-সাত মাইলেই সীমাবদ্ধ। তাই জানার একমাত্র উপায় বই পড়া, আর দেখার একটিমাত্র মাধ্যম ছায়াছবি।

অশ্বেতকায় বলতে যাদের বিশেষভাবে বোঝায় সেই নিগ্রো সমাজ সম্পর্কে আমার মতো অনেকেরই ধারণা বিশেষ নেই বলেই মনে হয়। নিগ্রো মেয়েরা কেমন করে দিন কাটায় সেটা বাইরে কারুর পক্ষেই জানা নিশ্চয় সম্ভব নয়।

সুখের কথা আমেরিকার নিগ্রো মেয়েদের নিয়ে একটা ছবি তোলার তোড়জোড় চলেছে বলে খবর মিলেছে। এতোদিন পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা আর হয়নি। এই প্রথম নিগ্রো মেয়ের জীবনকাহিনী রূপালি পর্দায় রূপবিস্তার করবে।

এই যে প্রয়াস—একে দুঃসাহসিক আখ্যায় ভূষিত করা চলে অনায়াসে। খোদ আমেরিকায় হচ্ছে উদ্যোগ আয়োজন। বুঝুন এটি হচ্ছে সেই দেশের মাটিতে—যেখানে বর্ণের জন্যে এই দশকে কয়েক বছরের মধ্যে তিন তিনটে মহৎ জীবন উন্মাদ আততায়ীর আগ্নেয়াস্ত্রের ঘায়ে অকালে ঝরে পড়েছে। এ রোগ ওখানকার শ্বেতকায় মানুষের রক্তে রক্তে প্রবহমাণ। কোনোদিন যাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং সেখানে নিগ্রো মেয়ের জীবন-কথাকে চিত্রায়িত করার মূলে দুর্ধর্ষ একটা প্রেরণা আছে। অবশ্য এ কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন হলিউডের নিগ্রো চিত্রতারকা সিডনী পোইটিয়ার। এটা তাঁর বহু দিনের একাগ্র এবং নিরলস অধ্যবসায়ের বাঞ্ছিত ফল। কয়েক বছর ধরে যে রচনায় তিনি ব্রতী ছিলেন, এখন তা সম্পূর্ণ হয়েছে। গল্পের নায়িকা নিগ্রো তরুণীটি এক নিগ্রো তরুণের ভালোবাসায় বিভোর হয়েছিলো। আসলে সে ছিলো এক গৃহস্থের দাসী। নাম রাখা হয়েছে কাহিনীর: 'ফর লাভ অব আইভি।' ইতিমধ্যে প্রাথমিক পর্বের যাবতীয় কাজ সারা, শিল্পীও নির্বাচিত। ওই 'আইভি'র ভূমিকায় অংশ নেবার জন্যে 'আমেরিকা'র জাজ গায়িকা অ্যাবে লিংকনকে মনোনীত করেছেন শ্রীপোইটিয়ার।

হঠাৎ কেন এমন একটা কাজে ব্যাপৃত হ'লেন—এই প্রশ্নের জবাবে সিডনী বলেছেন, তিনি আমেরিকান সমাজে বসবাসকারিণী নিগ্রো মেয়েদের কথা অনেক দিন ধরে ভেবেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজের মেয়েদের সম্পর্কেও তাঁর বিশেষ চিন্তা। অল্পবয়স্ক চারটি মেয়ে আছে তাঁর। সকলের দিকটা চিন্তা করেই তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছেন। আজ পর্যন্ত আমেরিকান সমাজে নিগ্রো মেয়েরা চিত্রজগতে মোটেই স্থান পায়নি। ছবির পর্দায় তাদের নিয়ে আসার পরিকল্পনাও কারুর মাথায় আসেনি। সেই সুযোগ থেকে তারা যে বঞ্চিত, এই কথাটা ভেবেই তিনি আর দেরি করেন নি।

সিডনী পোইটিয়ার তাঁর নিজের মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হয়েই সময়োপযোগী উদ্যোগে মত্ত। উনি দেখেছেন মেয়েরা পুরুষ বন্ধু পায় না, বিয়ের সুযোগও অনেকের আসে না।

'কাসানোভা ৭০' চিত্রে মার্গারেট লী ও মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানী

এই যে সমস্যার ঝড়, একে উপযুক্ত উত্তাপে গলিয়ে ফেলতেই তিনি চান। আমেরিকার নিগ্রো মেয়েদের যে অস্তিত্ব রয়েছে সেটা ছায়াছবিতে রূপ দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরার সাধনায় তিনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

আমরা সাগরের এপার থেকে তাঁকে সাধুবাদ দিচ্ছি এবং অপেক্ষায় থাকছি।

●

মোট ৭৩খানি ছবির প্রখ্যাত শিল্পী জেমস ম্যাসন বর্তমানে যে ছবিটি করছেন তার নাম: 'এজ অভ কনসেণ্ট।' অস্ট্রেলিয়ান শিল্পী নর্মান লিণ্ডসের লেখা এই কাহিনীর নায়ক ৮৯ বছরের এক চিত্রাঙ্কন-শিল্পী। এর আগে বলে রাখা দরকার জেমস ম্যাসন পৃথিবীতে সাড়া জাগানো ছবি 'ললিটার' প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ প্রেমিক নায়কের চরিত্রাভিনেতা এটা নিশ্চয় মনে আছে। দেখা যাচ্ছে এই শিল্পী 'যতো বুড়ো' প্রেমিকের পার্টেই দেখা দিচ্ছেন ইদানীং। 'জর্জি গার্ল' চিত্রেও তাঁর যে রোল ছিলো তার বয়েস ষাটবছরের কাছাকাছি। ষোড়শী নায়িকার অতি বৃদ্ধ সঙ্গী। বয়েসের এতোটা ফারাক হলে কি হবে, চরিত্রটি যে রসের নাগরের।

সে যাই হোক প্রায় সবাই বয়স্কের শিল্পী সাগর সৈকতে দেখতে-পাওয়া এক সপ্তদশীর প্রেমে পড়লো। এর শুরুতে এবং শেষে অনেক কাণ্ড আছে অর্থাৎ গল্পটা ভারি মজার। শেষে দেখা যাবে ষোড়শীর সঙ্গে প্রায় তার ছ'গুণ বেশি বয়েসের মানুষটির মালা বদল পর্বটি সত্যিই সমাধা হয়েছে।

জেমস ম্যাসনের বিপরীতে সপ্তদশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন রয়েল সেক্সপীয়ার থিয়েটার কোম্পানীর নবাগতা অভিনেত্রী হেলেন মিরেন। বয়েস: মাত্র উনিশ।

'এজ অভ কনসেণ্ট' ছবিটি প্রযোজনা করছেন মাইকেল পাওয়েল। এ ছবির কাজ শেষ হ'লে ম্যাসন জেমস সিডনীর লুমেটস প্রোডাকসনের 'দি সী গার্ল' (রচনা: চেকভ) ছবির নায়ক রূপে দেখা দেবেন। হেলেন মিরেন খুব সম্ভব নায়িকার রূপসজ্জা নেবেন।

●

সংস্কার সু-ই হোক আর কু-ই হোক তার উপস্থিতি সকলের মাঝে দেখা যেতে পারে। এদেশ ওদেশ বলেও কিছু নেই। মানুষ খুব বাস্তববাদী হলেই যে এর হাত থেকে রেহাই পাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তা না হলে অত বড়ো চলচ্চিত্রকার ফেলিনি-র এমন দশা হবে কেন? প্রগতিশীল চলচ্চিত্র নির্মাতা রূপে সারা বিশ্বে যাঁর প্রসিদ্ধি তিনিও কি না কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অবাক কাণ্ড আর কাকে বলে।

কথাটা তাহলে প্রাঞ্জল করাই যাক। ফেডারিকো ফেলিনি তাঁর ছবিতে যে বাণী এতাবৎ প্রচার করেছেন তাতে বাস্তববাদী হতে বলেছেন সবাইকে, তিনি নিজে কিন্তু কুসংস্কারে দিশেহারা। কথাটা প্রকাশ পেয়েছে ওঁর ঘনিষ্ঠ মহলের ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে। সেই লোকটি জানিয়েছেন ফেলিনির নাকি বদ্ধ ধারণা মানুষ যতো ভালোই হোক না কেন মৃত্যুর পর পরলোকে নীত হয়ে অতলান্ত দু:খে নিমজ্জিত হয়। এ থেকে পরিত্রাণ নেই, মুক্তিও সুদূরপরাহত।

ব্যাপারটার শেষ কিন্তু এখানেই নয়। এ ধারণা সত্ত্বেও ফেলিনি এমন একটা ছবির কাজ সুরু করলেন যাতে সংখ্যাহীন মৃত্যুর উপস্থিতি। স্বনামধন্য চিত্র-প্রযোজক ডিনো ডি লরেন্তিস এ ব্যাপার দেখে সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। বললেন: খবরদার, ও ছবি কোরো না। তাহলে তোমারও মৃত্যু নিশ্চিত।

ফেলিনি দমে গেলেন এই সতর্কীকরণে।

'অদ্বিতীয়া' চিত্রের সেটে বোম্বাইয়ের ডেইজী ইরাণী

চিত্র: মোনা চৌধুরী
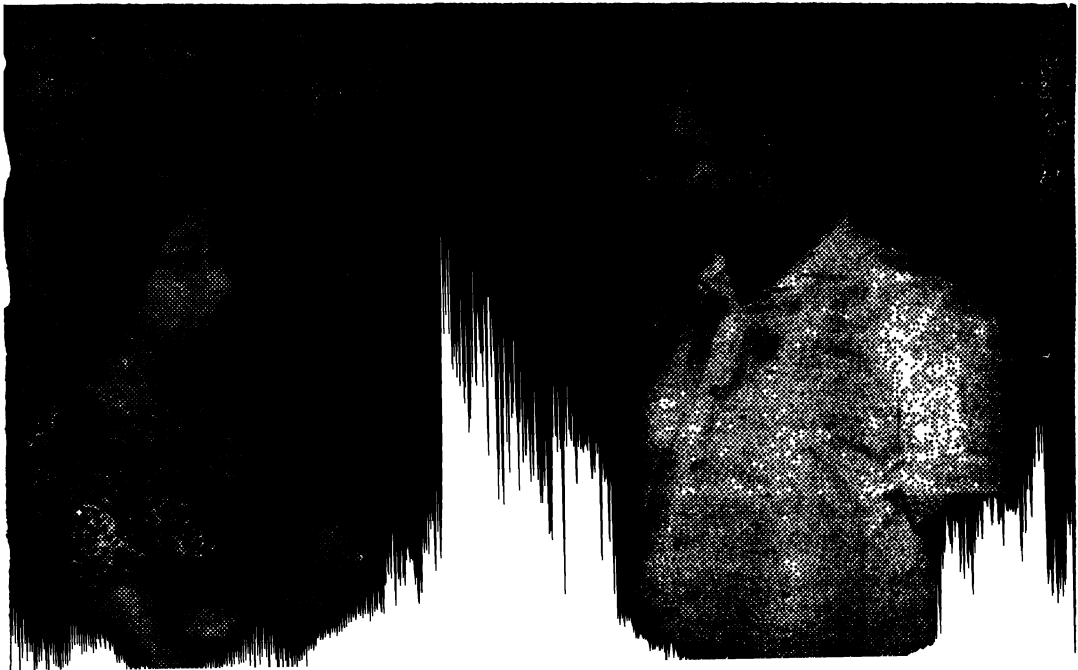
ছবির [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] রইলো। শুধু তাই নয় অহরহ ওই কথাই তাঁকে কাতর করে তুললো। তাঁর মনে হোলো ছবিতে অমন ধারা মৃত্যুর আধিক্য দেখানো নিশ্চয় খুবই অন্যায় হ'য়ে গেছে। এ যেন তিনি নিজের মৃত্যুকে প্রকারান্তরে নিজেই ডাক দিয়েছেন।

অবিরত একই চিন্তার ফলে শক্ত-সমর্থ মানুষটি দেখতে দেখতে কাহিল হয়ে পড়লেন। পরে এমন হোলো যে তাঁর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়লো। এমন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ কেমন করে মিলবে—অনেক ভাবনার পর খেয়াল হোলো, ডেকে পাঠালেন এক স্পিরীচুয়ালিস্টকে। অধ্যাত্মবাদী এসে ওঁকে নির্ভাবনার পথ দেখিয়ে দিলেন। উনি মরবেন না এ যাত্রায়, তবে ওঁর আগামী দুটি ছবির অসাফল্য অর্থাৎ অপমৃত্যু অনিবার্য।

ফেলিনি এরপর ভালো হ'য়ে উঠলেন। নতুন ছবির কাজও তিনি অপরিসীম উৎসাহে আরম্ভ করে দিলেন। ইতালীয় জনৈক খ্যাতনামা অভিনেতাকে ডেকে-ছিলেন [illegible] তাঁর ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। কিন্তু সেই শিল্পীটি ওঁকে ছবি দুইখানির দৃশ্য গ্রহণ শেষ করে ফেলতে অনুরোধ জানান। অবিশ্যি কথা দেন: ছবির কাজ সমাধা হওয়ার খবর পেলেই তিনি এসে হাজির হবেন কিন্তু এমনই মজা শিল্পিপ্রবর তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন নি।

এ-ও ওই কুসংস্কারেরই খেলা। ফেলিনির ছবিতে অংশ নিলে শিল্পীরও যদি প্রাণসংশয় হয়; তাহলে?---

বাংলা ছায়াছবি

সংসারটাই বিচিত্র। সুতরাং এই বৈচিত্র্যময় সংসারের মানুষগুলো যে বিচিত্রতর হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কি থাকতে পারে। পুটের মধ্যে কেউ আসে আবার মিলিয়ে যায়। আবার কাউকে ভোলা যায় না, গভীরভাবে রেখাপাত করে মনের মধ্যে। কারও মধ্যে আছে ভালবাসা, আন্তরিকতা, কারো মধ্যে সবটাই মেকী। কারো হৃদয় শূন্যতা-ব্যর্থতায় ভরা, কারো মধ্যে পরিপূর্ণ আনন্দ। এই শূন্যতার ছবি শহর-জীবনে যতটা দেখা যায়

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অমনটি বোধ হয় আর কোথাও নয়। এখানকার শক্ত মাটিতে পা ফেলবার জায়গাটুকুরও বোধ হয় অভাব।

চিত্রাভিনেত্রী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় চিত্র: দিলীপ বসু
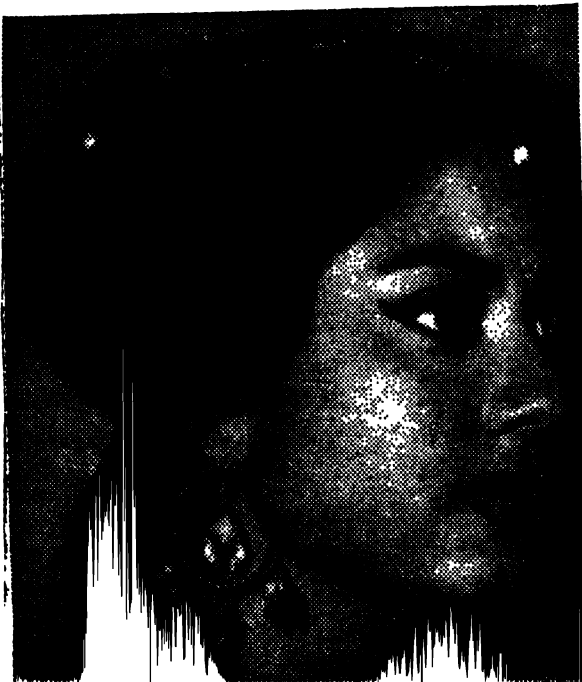
তবু এরি মধ্যে মানুষ আছে। তার মধ্যেও হৃদয় আছে, ভালবাসা আছে। বিশুকে আপনারা চেনেন। জমিদারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও আভিজাত্য যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি। ইউনিভার্সিটির তরুণ ছাত্র। স্বভাবে কবি হলেও দার্শনিক সে। ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শেও সে সবার থেকে আলাদা। মেসবাড়ী থেকে পড়াশুনা করে বিশু। আধুনিক বৈচিত্র্যময় যে সব মানুষের সংস্পর্শে এসেছে বিশু, আসুন আমরাও তার কিছুটা রসাস্বাদন করি। মেসবাড়ীর পাশে 'বোষাল কেবিনের' প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বিশুকে অবাক করে। ছোটখাট সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আরও বাস্তব কিছু দৃশ্য রাতের অন্ধকারে বড় অশালীন বলে মনে হয়। লাটুবাবু, গোকুল, সরলা ঝি এই চরিত্র-হাটের মেলায় যেন বেসামাল। কেউ বা রাতের অন্ধকারে মাতাল হয়ে ফেরে পাড়ার লোক জানিয়ে, নেশার ঘোরে কেউ বেসামাল। সরলা ঝিও বাদ যায় না। বৃদ্ধ সাধুবাবুর সঙ্গে তার মেলামেশাটা এখন চোখে লাগে।

মেসবাড়ীর পেছনে খোলা বস্তির আর এক জীবন। পর্দার বালাই নেই সেখানে। তিনকুলের বৃদ্ধ খুড়ো তার তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীকে সন্দেহ করে চলেছে। কালো মেকানিক্সকে সাবিত্রী না কি ভালবাসে। কিন্তু দোষ কি সাবিত্রীর? যৌবনের কোন সোহাগ

লে পেল না ঐ বুড়ো মিলসেটার কাছে। তাই অঢেল যৌবনের অধিকারী কালোকে তার ভাল লাগে। এ পর অন্য জগৎ। বিশুর পরিচিত দেবাশীষ, দীপঙ্কর আর মণিদি এই জগতে কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্র। গোকুল, সরলা লাটুবাবুর সঙ্গে কোন তফাৎ নেই এদের। মণিদির অতীত প্রেমিক প্রকাশ কথা দিয়েও কথা রাখে নি। লীলাকে বিয়ে করে আজ সে বিদেশে রয়েছে। এই ভাবে মণিদির জীবনে জোয়ারের টানের মত একের পর এক এসেছে আবার ভাঁটায় মিলিয়ে গেছে। জীবন-টাকে মণিদি অন্যভাবে দেখছেন। আজও মজলিসী আড্ডায় বয়সটাকে বেঁধে নিয়ে দিব্যি নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন তরুণদের সঙ্গে। কেউ কেউ মণিদির পড়ন্ত যৌবনে এসে আজো হোঁচট খায়। কিন্তু মণিদি কি সত্যি সুখী। বিশ ভাবে। বিশু হাঁপিয়ে ওঠে।

মনের পরিবর্তনের জন্য সে মেস ছেড়ে বন্ধু দেবাশীষের যোগা-যোগে ধনী ব্যবসায়ী মিঃ মজুম-দারের একমাত্র সন্তান অজিতের গৃহ-শিক্ষক এবং অভিভাবক হয়ে যোগ দেয়। জীবনে এই প্রথম বিশু উঁচু-তলার মানুষগুলোকে দেখলো। যেন কোন প্রাণ নেই এদের মধ্যে। সাজানো স্বামী, সাজানো সংসার। অথচ ঘর থেকে বাইরের টানই বেশী। বাড়ীর গৃহিণী রত্না তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। সেও বন্ধু আর বান্ধবীদের নিয়ে নাচে গানে মত্ত থাকে। সংসার থাকে পিছনে পড়ে।

বিশুকেও ওরা দলে টানে কিন্তু সাড়া দেয় না বিশু। এই নিয়ে ঠাট্টাও অনেক সহ্য করতে হয় তা'কে, কিন্তু বিশু সত্যের বিশ্বাসী। সে ভেবে পায় না এরা কেন এমন হয়। আলোর মিথ্যে মরীচিকার পিছনে ছুটে লাভ কি ওদের। মনের ভিতরে যেখানে অন্ধকার বাইরের আলো সেখানে কি করবে।

বিশু এণাক্ষীকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে শূন্যতার জগৎ থেকে পূর্ণতার মধ্যে। কিন্তু আজ এণাক্ষীর দৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। বিশ্বর ভালবাসার দাম সে দিতে পারবে কেন? সে মূল্য-বোধ তার নেই। অবশ্য তার প্রেমকে এণাক্ষী ছোট করতে চায় না। তাই একদিন ইন্দ মিত্রকে বিয়ে করেও এণাক্ষী যত কিছু পিছনে ফেলে বিশুর প্রতি নীরব ভালবাসা রেখে এ শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায়।

বিশু অবাক বিস্ময়ে ভাবে ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের একি যন্ত্রণা, উমার ভাল-বাসা এর অনেকগুণে বড়। কোনদিন সে মুখফুটে তার ভালবাসাকে জানায় নি। বরং হৃদয়ের মাঝখানে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। সে প্রেম ধূপের মত নীরবেই জ্বলে। রঙ নেই, গন্ধ আছে। অস্থির নয়। স্থিতি আছে। বিশু তাই মনের মত যাকে খুঁজে পায় সে উমা। তার শান্ত দুটি চোখ ঠিক ছায়াপথের মত। গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু এটা ঠিক গল্প নয় বিশুর চোখ দিয়ে আপনার আমার দেখা আজকের আধুনিক সমাজের কয়েকটি চরিত্র চিত্রণ মাত্র।

এই চিত্র কাহিনীর নাম ছায়াপথ। সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে নির্মিত সিনে প্রডাক-সন্সের এই ছবিটি পরিচালনা করছেন 'ঢেউ পর ঢেউ' চিত্রের বলিষ্ঠ পরি-চালক ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল। ছবির চরিত্রে বাস্তবভাবে রূপদান যারা করছেন---বিশু--অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা---মাধবী মুখোপাধ্যায়, মণিদি---মঞ্জু দে, প্রকাশ---বিকাশ রায়, এণাক্ষী---সুমিতা সান্যাল, রত্না---কণিকা মজুমদার, দেবাশীষ---তরুণকুমার, মিঃ ---দিলীপ রায়, কালো---মণিকুল

'সবরমতী' চিত্রের নায়িকা স্বাগ্রিয় দেবী   চিত্র : দিলীপ বসু
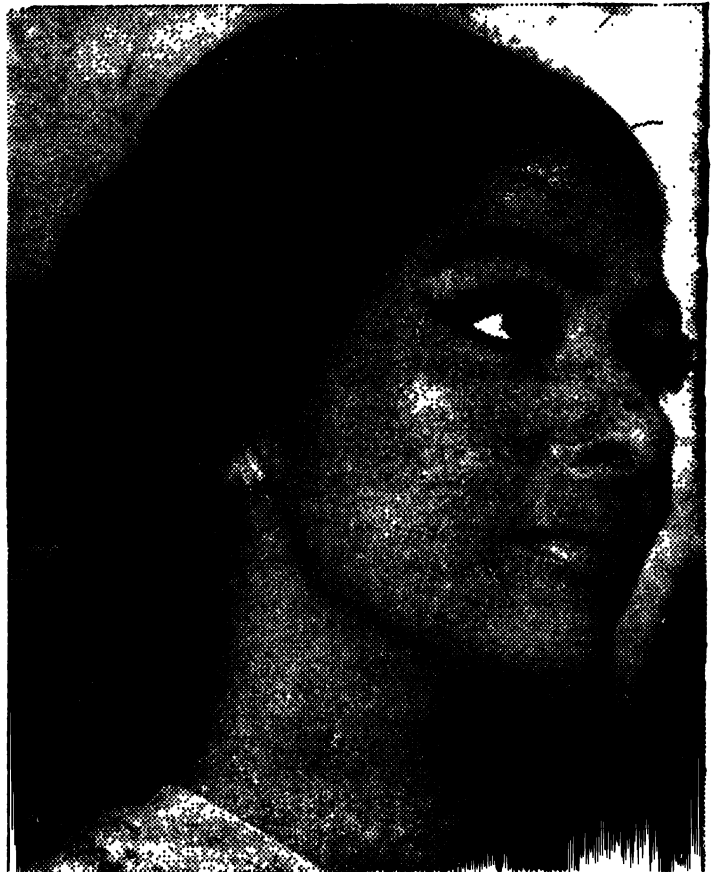
শেখর চট্টোপাধ্যায়, লাটু-বাবু—নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী—স্বরূপা চট্টোপাধ্যায়, সরলা—আরতি দাস, বুড়ো—সুহৃদ রায়, ইন্দর সিং—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত—শ্রীমান শেখর রাও, শকুন্তলা—অলকা গাঙ্গুলী, তনুশ্রী—দীপা চট্টোপাধ্যায় ও লীলা—কৃষ্ণা রায়। সুরঞ্জনার পরিবেশনায় ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রবিশঙ্কর। কাহিনী চিত্রনাট্য পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণে আছেন ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল।

পূজার নতুন রেকর্ড

পূজার আনন্দময় দিনগুলি গানে-বাজনায় আরও মধুর করে তুলবার উপকরণ হিসাবে রেকর্ডের প্রয়োজন এখন সর্বজনস্বীকৃত। জনসাধারণের সঙ্গীত-পিপাসা মেটাবার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী গত অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ধরে পূজায় নতুন গানের পসরা সাজিয়ে প্রকাশ করে আসছেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

তাঁদের এবারের পূজার অর্ঘ্য যেমন পরিমাণে সুপ্রচুর, তেমনি বিষয়-বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। যেমন শিল্পী-সমাবেশে গৌরবময়, তেমনি সঙ্গীত ও সুরকার নির্বাচনে মনোমুগ্ধকর। এখানে আমরা সংক্ষেপে রেকর্ডগুলির পরিচয় দিচ্ছি।

পূজায় প্রকাশিত ৩৫ খানি 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ও কলম্বিয়া রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে দুখানি লং প্লেইং রেকর্ড—একখানিতে ডক্টর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় গীতিবহুল নাটক 'কবি' পালা নাটক হিসাবে বেরিয়েছে। এতে অংশ গ্রহণ করেছেন চলচ্চিত্রে যাঁরা 'কবি' নাটকখানিকে সাফল্যের উচ্চ চূড়ে তুলেছিলেন, সেই কবিয়াল-রূপী রবীন মজুমদার, ঠাকুরঝির ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা আর বসনের ভূমিকায় নীলিমা দাস। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী (বড়), হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতাংশে কন্ঠদান করেছেন, এবং সুর পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচী। নাটকখানি পরিচালনা করেছেন—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। (রেকর্ড নম্বর —ই এ এল পি ১৩৩৬) নাটকটি সত্যই উপভোগ্য হয়েছে।

আর একখানি লং প্লেইং রেকর্ডে আছে পূর্ব পূর্ব বৎসরের বারোখানি সেরা পূজার গান, গেয়েছেন—প্যারাল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুমন কল্যাণপুর, মান্না দে, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকর, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ইলা বসু। (রেকর্ড নম্বর ই সি এল পি ২৩৭৯)।

সাতখানি ই পি রেকর্ড যেন সাত-রঙা রামধনুর মতই চমৎকার—প্রত্যেকটি রেকর্ড স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও সম্প্রদায়ের বিখ্যাত 'মহিষ-মর্দিনী' এবার ই পি রেকর্ডে বেরিয়েছে (এস ই ডি ই ৩০২৩)। স্তোত্র আবৃত্তি এবং আবহসঙ্গীত শ্রোতাকে স্তম্ভিত করে উদ্বুদ্ধ করে।

কুমার শচীন দেববর্মণের চারখানি অনবদ্য আধুনিক গান সংগ্রহ করবার মত। যেমন সুরবৈভব তেমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা। (৭ ই পি ই ১০৭১) 'তুমি এসেছিলে পরশু', 'কই কইরে ঘুঙুর', 'নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক' এবং 'ভজিতে তব নেশা।' অতুলনীয় গান।

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় চারখানি চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন—'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি', 'আমি চাহিতে এসেছি শুধু', 'বলি গো সজনী' এবং 'কী বেদনা মোর জান সে কি'। (৭ ই পি ই ১০৬৯) প্রত্যেকটি গানই অতুলনীয়।

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় গেয়েছেন চারখানি মধুর অতুলপ্রসাদী গান—'আমার ঘুম ভাঙান চাঁদ'; 'কে গো গাহিলে পথে', 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে', 'বাদল ঝুম ঝুম বোলে।' (এস ই ডি ই ৩০২২)।

সমর সিংহ আর আরতি বসু গেয়েছেন দু'খানি করে ছড়ার গান—'বলতে পারিস মা', 'তালে পা ফেলে', 'ও আমার পায়রাবোম' এবং 'আয় ঘুম আয়'। (৭ ই পি ই ১০৬৮) ছোটরা শুনে খুশী হবে।

গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ললিত মধুর কণ্ঠে গেয়েছেন নৌকাখণ্ড। মহাজন পদাবলীর এই কীর্তন গান বাঙালীর হৃদয়ের ধন, মাথায় তুলে নেবার মত সামগ্রী। (এস ই ডি ই ৩০২৪)।

গীটার যাঁর হাতে কথা বলে সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চারখানি জনপ্রিয় হিন্দি ছবির গান গীটারে বাজিয়েছেন। (টি এ ই ১৪৬৭)

আর আছে ছাব্বিশখানি ৭৮ আর পি এম রেকর্ড। আধুনিক গান গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়—'আমি বুঝি না।' 'আকাশ কথা বলে'। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা, নচিকেতা ঘোষের সুরে মন ভরে ওঠে। (জি ই ২৫৩২৪)।

আশা ভোঁসলে গেয়েছেন —'যাবো কি যাবো না' ॥ 'এই, এই দিকে এসো না।' গৌরীপ্রসন্ন রচনা, রাহুল দেববর্মণের সুর মন মাতায়। (জি ই ২৫৩২০)।

ইলা বসু গেয়েছেন—'ভুলে যেতে তুমি পারবে কি' ॥ 'কানে কানে সেই কথাটি।' কথা ও সুর—সুধীন দাশগুপ্ত। চমৎকার। (জি ই ২৫৩২৫)।

কিশোরকুমারের কণ্ঠে গৌরী-প্রসন্নের রচনা রাহুল দেববর্মণের সুরে নতুন কৌতুক গীতি—'বম্ বম্ বকু'। 'আকাশ কেন ডাকে' (আধুনিক)। অনবদ্য। (এন ৮৩২৯০)।

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা মান্না দে-র সুরে—'ভার ভার মুখখানি' এবং 'আমার মনকে নিয়েই।' সুধা বৃষ্টি করে করে যেন। (এন ৮৩২৮৬)।

তালাত মামুদের বাংলা গান আশ্চর্য সুন্দর—'চোখের জলের দাগ ধরে'। 'এ যদি আকাশ হয়।' মুকুন্দ দত্তের

রচনা ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর যাদু সৃষ্টি করেছে। (এন ৮৩২৯১)।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আর অনল চট্টোপাধ্যায়ের রচনা, গায়ক সুর দিয়েছেন নিজে। 'যদি বলি তোমার দু চোখ'। 'বোঝ না গো কেন।' সবারই ভালো লাগবে। (জি ই ২৫৩১৮)।

ধনঞ্জয়ের পূজার গানের জন্য সবাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে। শ্যামল গুপ্তের রচনায় নিখিল চট্টোপাধ্যায়ের সুর—'চৈত্র রাতের পূর্ণিমা চাঁদ ॥' 'চোখে চোখে চেয়ে খুঁজি।' (জি ই ২৫৩২৭)।

নির্মলা মিশ্র আধুনিক গানে নিজস্ব ছাপ রেখেছেন। ভবেশ গুপ্তের রচনায় সুর দিয়েছেন রবীন্দ্র-প্রশান্ত। 'যা যা, যারে আমার ময়না'। 'যায়রে এ কি বিরহে।' (জি ই ২৫৩১৯)।

নির্মলেন্দু চৌধুরীর পল্লীগীতি কে না ভালোবাসেন? তাঁর এবারের গান দুটি গৌরীপ্রসন্নের রচনা, সুর—শিল্পী (এন ৮৩২৭৯) এক কথায় অনবদ্য। 'ডাগর দীঘল চোখে কন্যা' এবং 'রুণুর ঝুনুর পায়।'

নবাগত পিণ্টু ভট্টাচার্য দু'খানি আধুনিক গানে বাজার মাৎ করেছেন। 'জানিনা কখন সে যে' আর 'চলনা দীঘার সৈকত ছেড়ে।' গান দুটিই বেশ উপভোগ্য। (জি ই ২৫৩২২)।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার গেয়েছেন মুকুল দত্তের রচনা, হেমন্তের সুরে। আশাতীত সুন্দর। (জি ই ২৫৩২৬) 'আঁধার আমার ভালো লাগে' এবং 'মিছে দোষ দিও না আমায়।'

উঠতি শিল্পীদের মধ্যে বনশ্রী সেনগুপ্ত বিশেষ জনপ্রিয়। লক্ষ্মীকান্ত রায়ের রচনা হিমাংশু বিশ্বাসের সুরে চমৎকার ভাবে গেয়েছেন 'নিঝুম রাত নিরালা' এবং 'আহারে মরি, কি বাহার করি' (এন ৮৩২৮১)।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের কৌতুক চিত্র---'ইলেকশান্' রচনা করেছেন সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। (এন ৮৩২৮৩) সময়োপযোগী।

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক গান—'আমি নীল চোখে' ॥ 'মন নাহি লাগে সখী রে ॥ ভবেশ গুপ্তের রচনা, রবীন্দ্র-প্রশান্তের অনবদ্য সুর অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। (এন ৮৩২৯৫)।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মিষ্টি গান—'না, যেয়ো না মধুযামিনী' এবং 'সোনালী দিন যায়'। শ্যামল গুপ্তের সার্থক রচনায় শিল্পীরই দেওয়া সুর যাদু সৃষ্টি করেছে। (এন ৮৩২৮৫)।

মান্না দে গেয়েছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা, সুধীন দাশগুপ্তের সুরে—'কথায় কথায় যে রাত হয়ে যায়' ॥ 'আমি তার ঠিকানা রাখিনি' (এন ৮৩২৮৪)।

মিণ্টু দাশগুপ্তের কৌতুকগীতির রচনাও তাঁর নিজেরই—'সেই তো পাগল হয়' ॥ 'এ জন্যে ঠকালে প্রিয়া' (এন ৮৩২৮০)।

মুকেশ এবার গেয়েছেন সলিল চৌধুরীর রচনা, তাঁরই দেওয়া সুরে—'মন মাতাল' ॥ 'ঝুন ঝুন ময়না নাচো না'।

শ্যামল মিত্রের আধুনিক গান সবারই প্রিয়। তাঁর এবারের গান দুটির রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর দিয়েছেন শিল্পী নিজেই। 'এই পৃথিবীতে হায়' ॥ 'সারাটি জীবন ধরে'। (এন ৮৩২৮৮)।

লতা মঙ্গেশকরও গেয়েছেন সলিল চৌধুরীর রচনাও তাঁরই সুরে—'যদি বারণ কর তবে' ॥ 'ও ঝর ঝর ঝরনা' (এন ৮৩২৮৮)।

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন প্রণব রায়ের দু'খানি সুখশ্রাব্য রচনা, নচিকেতা ঘোষের সুরে---'কুহু কোকিল কেন ডাকো' ॥ 'ওই চাঁদ দোলে দোলে দোলে'। (জি ই ২৫৩২৩) মনে রাখবার মত গান।

সবিতা চৌধুরীর কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর রচনা ও সুরে দুটি উজ্জ্বল আধুনিক গান---'চৈতালী দিনে' এবং 'যারে যা যা মনপাখী'। (এন ৮৩২৮৯)।

সুবীর সেন গেয়েছেন অভিজিৎ-এর রচনা ও সুরে—'এ যেন সেই চোখ' ॥ 'হয়ত তোমার অনেক ক্ষতি করেছি'। (এন ৮৩২৭৮)।

সুমন কল্যাণপুর বাংলা গানেও তাঁর সুরেলা কণ্ঠে মধুবৃষ্টি করেছেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ও রতু মুখোপাধ্যায়ের সুরে—'বাদলের মাদল বাজে' ॥ 'তোমার আকাশ থেকে'। (এন ৮৩২৮৭)।

আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে পূজার বাজারের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মুকুল দত্তের দুটি আধুনিক রচনায় তিনি নিজেই সুর আরোপ করে গেয়েছেন—'ঘুম নেই' ॥ 'ফেরানো যাবে না আর'। (জি ই ২৫৩২১)। গান দুটি বারবার শুনেও মন ভরে না, ইচ্ছে হয় আবার শুনি।

ঝিকিমিকি বেলায় এই বাড়িটায় ওকে নিয়ে এসে ঢুকলো দিবাকর। কিন্তু সেই 'ঝিকিমিকির' পরমায়ু যে বেশী নয়, তা' ধরা পড়ছে তার লালচে আভায়।

কিন্তু বাড়িটা কি 'গরীবের পাতার -কুটির ?'

যে 'কুটিরে' দিবাকরের মহীয়সী জননী তাঁর অগাধ স্নেহ সাগর নিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকেন দিবাকরের আশায় ?

না, সে বাড়ি এ নয়।

এ কোনো বিগতকালের ধনীর পরিত্যক্ত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

যতক্ষণ স্টেশন থেকে হাঁটাপথে আসছিল মীনাক্ষী, ততক্ষণ বেশ ভালই লাগছিল তার। ঝোপঝাড় গাছপাতার মাথায় পড়ন্তবেলার আলোর লুকোচুরি, ছবিতে দেখা কুঁড়েঘরের মতো উঁচু উঁচু মাটির দাওয়া দেওয়া পাতার কুঁড়ে, পানা পুকুর, পায়েচলা পথ, কৃচিৎ এক-আধটি গ্রাম-বধূর জল আনতে যাওয়ার দৃশ্য, মনের জগতে পাড়া-গাঁয়ের যে ছবি আঁকা আছে, তার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে।---

দিবাকর এইগুলোর পরিচয় দিতে অনর্গল কথা বলছিল, কিন্তু মীনাক্ষীর মনে হচ্ছিল এতো কথার দরকার ছিল না। এর আর পরিচিতি দেবার কী আছে ? আঁকা ছবিতে যা দেখেছে, সিনেমার ছবিতে যা দেখেছে, তারই জীবন্ত সংস্করণ বৈ তো নয়।

অনেকবার ভাবল বলে যে, 'দিবাকর তুমি একটু কম কথা বলো, শান্ত হও ধীরে কথা কও, ওরে মন নত করো শির। কারণ সন্ধ্যা আসছে।'

কিন্তু বলতে পারলো না।

বলবার ফাঁক পেল না।

আবার কোনো এক সময় যখন ফাঁক পেলো, তখন নিজেই কথার বীজ পুঁতে বসলো। বললো, 'আচ্ছা তোমাদের এখানে ইঁটের দেওয়াল করতে নেই না কি ? সমস্তই তো দেখছি মাটির বাড়ি।'

দিবাকর মৃদু হেসে বলে, 'মাটির মানুষদের দেশ যে।'

তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে অকারণ তার সেই অগ্নি-গোলকের মতো চোখ দুটো মুছে নিয়ে বলে, 'এই মাটির দু'খানা ঘর

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

তুলতেই এদের যথাসর্বস্ব বাঁধা পড়ে, সারাজীবন ঋণ আর শোধ করে উঠতে পারে না।'

মীনাক্ষী একটু ছেলেমানুষী গলায় বলে, 'বাঃ তা' কেন ? মিস্ত্রীকে না দিয়ে নিজেরা করে নিলেই পারে ? কী আর শক্ত ?'

দিবাকর উচ্চরোলে হেসে ওঠে। নির্জন পথে, পথ চলতে দিবাকরের সেই হাসিটার হঠাৎ যেন গা ছমছম করে ওঠে মীনাক্ষীর।

'এতে এতো হাসির কী আছে ?' ভয় ভাঙতেই বোধ করি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে মীনাক্ষী, এতে এতো হাসির কী আছে ? যারা ঘর বানায় তারাও তো মানুষ ? চাষা-টাষা মানুষরা যদি নিজেরা খেটেখুটে---'

'নিজেরা খেটে-খুটেই করে নেয় মীনাক্ষী, মিস্ত্রীর স্বপ্ন দেখে না এরা। মেয়ে-পুরুষ, বাল-বাচ্ছা সবাই মিলে খাটে। কিন্তু মাল-মশলা তো চাই ?'

'মাল-মশলা ?' মীনাক্ষী অবাক হয়ে বলে, 'মাল-মশলা আবার কী ? শুধু তো মাটি। চারিদিকে এতো মাঠ---'

'নাঃ তোমাকে যতোটুকু অবোধ ভেবে রেখেছিলাম, দেখছি তার দশগুণ অবোধ তুমি। মাঠ পড়ে আছে বলেই কি মাটি নেওয়া যায় ? যার জমি সে আপত্তি করবে না ? তা' ছাড়া---বাঁশ বাখারি দড়ি পেরেক, এ সব চাই না ?'

'বাঃ ওর এতো কী দাম।'

'অনেক দাম মীনাক্ষী, এদের কাছে ওই তুচ্ছ বস্তুগুলোই অনেক দামী।'

দিবাকরের গলার স্বর ভারী হয়ে আসে। দিবাকর আস্তে মীনাক্ষীর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলে, শহরে নাট্যকাররা এদের দুঃখ দুর্দশায় বিগলিত চিত্তে জোরালো নাটক লিখে মঞ্চস্থ করে বাহবা লোটেন, কিন্তু জানো, এদের দুঃখের এক সহস্রাংশও তা'তে প্রকাশ হয় না। এদের কথা ভাবো মীনাক্ষী। গভীর ভাবে ভাবো।'

মীনাক্ষী চুপ করে গিয়েছিল।

মীনাক্ষীর মনটা ভারী ভারী হয়ে গিয়েছিল। মীনাক্ষীর মনে পড়েনি দিবাকরের হাতটা তার কাঁধের উপর রয়ে গেছে।

এক সময় দিবাকর আবার হালকা গলায় বলে, 'নাঃ তোমার মনটা খারাপ করে দিলাম। কী জানো ? দেশে এলেই ---যাক গে, ও সব কথা থাক। হ্যাঁ কী বলছিলে তখন ? এখানে পাকা

বাড়ি আছে কি না? তা' একেবারে নেই, তা' নয়। অনেক হতভাগ্যের মধ্যে, এক-আধজন ভাগ্যবানও থাকে তো।'

'দিবাকর তুমি যে বলেছিলে স্টেশন থেকে খুব বেশী দূরে নয় তোমাদের বাড়ি, কিন্তু অনেকক্ষণ তো হাঁটছি।'

'গ্রামের হিসেবে এইই 'সামান্য' মীনাক্ষী। তোমার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'না না, কষ্ট হতে যাবে কেন? এমনি বলছি।'

'আর একটু কষ্ট করতে হবে।'

বলেছিল দিবাকর।

তারপর বেলা যখন মরণোন্মুখ, তখন দিবাকর এই ধ্বংসগ্রস্ত পোড়ো অট্টালিকাটায় এসে ঢুকলো মীনাক্ষীকে নিয়ে।

মীনাক্ষী অবাক হয়ে বলে, 'এখানে কী? এটা তোমার বাড়ি না কি?'

'না। আমার কেন হবে'? দিবাকর হঠাৎ যেন ব্যাঙের গলায় কথা কয়ে ওঠে, 'নিন্দে করছিলে এখানে কোঠাবাড়ি নেই বলে, তাই কোঠাবাড়ি দেখাতে নিয়ে এলাম।'

ওর এই স্বরটা ভাল লাগলো না মীনাক্ষীর। ভয়ানক অস্বস্তি হল কপাট উড়ে যাওয়া জানলা দরজার ফোকরগুলো দেখে। ভয় করে উঠলো ভাঙা দেয়ালের গায়ে গায়ে গাছের শিকড় নামা দেখে।

মীনাক্ষী তাই রুক্ষ গলায় বলে উঠলো, 'নিন্দে আবার কখন করলাম? শুধু জিগ্যেস করেছি। ঘাট হয়েছে বাবা। চল চল, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কোথা থেকে হয় তো সাপ-খোপ বেরিয়ে পড়বে---'

দিবাকর একটা নির্লজ্জ হাসি হেসে বলে, 'এক্ষুণি চলে যাবো মানে? এতো কলাকৌশল করে এতো তোড়জোড় করে আসা কি এক্ষুণি চলে যাবার জন্যে?'

সহসা চারিধারের ভাঙা দেওয়ালগুলো ভূমিকম্পে দুলে ওঠে, ঝিকিমিকি আলোটা মুহূর্তে গাঢ় অন্ধকারের গহ্বরে ডুবে যায়, একটা দাঁত খিঁচোনো দৈত্য ওই ফোকরে ফোকরে উঁকি দিয়ে দিয়ে বেড়ায়।

মীনাক্ষীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

মীনাক্ষীর বুকের ভিতরে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঁই এসে বসে।

তবু মীনাক্ষী চীৎকার করে ওঠে, ভাঙা ভাঙা গলায়।

'এ কথার মানে কি দিবাকর?'

দিবাকর বিচলিত হয় না।

দিবাকর তেমনি নির্লজ্জ হাসি হেসে বলে, 'মানে অতি প্রাঞ্জল। কলকাতার সমাজে, কোনোখানে তো পাওয়া যাবে না তোমায়, তাই অনেক দিনের একটা বাসনা পূরণ করতে এতো কাঠখড় পোড়ানো---'

'দিবাকর!'

মীনাক্ষী তীব্র তিরস্কারে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এতোবড় শয়তান তুমি?'

দিবাকর রূঢ়গলায় বলে, 'গরীব যদি জগতের কোনো ভোগ্যবস্তুর দিকে হাত বাড়ায় তা' হলেই সে শয়তান বলে গণ্য হয়। কিন্তু এ ছাড়া তোমায় আমি পেতাম কী করে?'

'পাওয়া!'

মীনাক্ষী অন্ধকার হয়ে যাওয়া পটভূমিকায় তার একদার প্রেমাস্পদের মুখটা দেখবার চেষ্টা করে। সবটা মিলিয়ে শুধু একটা ছায়ামাত্র দেখতে পায়। তার উদ্দেশ্যেই ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'একে তুমি পাওয়া বল?'

'বলি। তাই বলি---' দিবাকর নিষ্ঠুর গলায় বলে, 'এইমাত্র স্বর্গ থেকে পড়নি তুমি মীনাক্ষী, এই পৃথিবীটাকে দেখনি তা নয়? আমাদের মত রক্ত-মাংসের মানুষের কাছে 'পাওয়ার' আর কোন্ অর্থ আছে তুমিই বল?'

'দিবাকর, এতো নীচ হোয়ো না, নিজেকে এতো ছোটো কোরো না। তোমার সভ্যতার কাছে, তোমার ভদ্রতার কাছে নিজেই তুমি এ প্রশ্নের উত্তর চাও।'

'সভ্যতা? ভদ্রতা? ওগুলো তো স্রেফ এক একটা মেকি শব্দ। আমি ওর ধার ধারি না। আমি ঠিক করেছি'---

'তুমি কী ঠিক করেছ, সেটা আমার না জানলেও চলবে'---মীনাক্ষী ভিতরের ভয় চাপা দিয়ে সহজ ভাব দেখায়। যেন দিবাকর নামের ওই ছেলেটা একটা বাজে বিষয় নিয়ে তর্ক করছে এইভাবে জোরে জোরে বলে, 'তোমার বাড়ি দেখার সাধ আমার মিটেছে, এখন দয়া করে এখান থেকে বেরিয়ে চলো দিকি। স্টেশনের দিকে চল। অদ্ভুত! যেন একটা হিন্দী সিনেমার 'ভিলেনের' অভিনয় করতে বসেছ তুমি।'

দিবাকর পকেট থেকে একটা টর্চ বার করে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আবার পকেটে পুরে ফেলে মীনাক্ষীর একটা হাত চেপে ধরে কাছে টানবার চেষ্টা করে বলে, 'ঠিকই বলেছ। তোমাদের তথাকথিত রোমাণ্টিক নায়ক হবার বাসনা আমার নেই। ভিলেনই হতে চাই আমি। অনেক চেষ্টা করে, অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এ ব্যবস্থা করেছি, দয়া করবার ক্ষমতা আজ আমার নেই। এ বাড়ির ও পাশের একটা অংশ বাসযোগ্য আছে, এবং বাস করেও একজন। আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সে আজকে ঘরের অধিকার ছেড়ে চলে গেছে। একদা কোনো এক রাজা-মহারাজার বাগানবাড়ি ছিল এটা---'

'দিবাকর। আমি তোমার এই বাড়ির ইতিহাস জানবার জন্যে ব্যগ্র নই।' হাতটা ছাড়িয়ে নেয় মীনাক্ষী, 'খুব খারাপ লাগছে আমার।'

কিন্তু হাতের তালুটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল তার, ওই লোকটা যে একদা তার বন্ধু ছিল, এটা আর মনেও পড়ছে না। একটা হিংস্র জানোয়ারের সামনে পড়ার মতই অবস্থা হচ্ছে তার। আর ছুটে পালাবার চিন্তাটাই পেয়ে বসে তাকে।

বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে ক্ষয় রোধ করে আপনার দাঁত শক্ত করে তুলুন।

দাঁত ক্ষয়ে যায় কেন?

খাওয়ার পর আপনার দাঁতে খাবারের যে ছোট ছোট টুকরো আটকে থাকে তা অ্যাসিডে পরিণত হয় যা দাঁতের রক্ষাপ্রদ এনামেলকে দুর্বল করে তোলে। ফলে দাঁতের তাজা টিস্যুগুলো ক্ষয়কারী বীজাণুদের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। আর ক্ষয় মানেই যন্ত্রণাদায়ক ফাঁক (কেরীজ), যাতে দাঁত পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কী করা দরকার?

ফ্লোরাইড দিয়ে দাঁতের এনামেল দৃঢ় করে তুলুন। ফ্লোরাইড এনামেলের সঙ্গে একহয়ে ক্ষয় ও অ্যাসিড রোধ করবার জন্য তা আরও দৃঢ় করে তোলে।

কেমন করে তা করতে হবে?

সক্রিয় ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড সোডিয়াম মোনাফ্লোরোফোসফেট যুক্ত একমাত্র টুথপেস্ট বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে দাঁত মাজুন আর মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার জন্যে আপনার ডেন্টিস্টের কছে যান। বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে মেজে আপনার দাঁত অতিরিক্ত দৃঢ়তা সঞ্চারিত করে দিন—এই টুথপেস্ট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে বিশেষভাবে উপকারী।

CIBA Cosmetics

কিন্তু সূর্যালোকের শেষ কণিকা-টুকুও যে মুছে গেল। মীনাক্ষী চারধারে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। মীনাক্ষী তবু সেই অন্ধকারেই সেই ভাঙা অট্টালিকার দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। ছুটতে চেষ্টা করে।

কি কোথায় ছুটবে?

এই নীরন্ধ্র অন্ধকারে কে জানে কোথায় আছে কাঁটা ঝোপ, কোথায় আছে ডোবা পুকুর। দিবাকর এগিয়ে আসে। বলে, 'মীনাক্ষী বৃথা ছেলে-মানুষী করো না। এটা লোকালয়ের থেকে অনেক দূরে, চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ শুনতে পারবে না, আর পৃথিবীর কেউ জানতেও পাবে না, তোমাকে আমি কয়েকঘণ্টার জন্যে পৃথিবী থেকে চুরি করে এনে---'

মীনাক্ষী হঠাৎ নীচু হয়ে একখানা ভাঙা ইঁট কুড়িয়ে নেয়। ঘৃণার গলায় বলে, 'ইতর শয়তান, ছোটলোক। আর এক পা-ও যদি এগোও, তোমার প্রাণের চিন্তাও করবো না আমি তা জেনো।'

'কর তবে খুনই কর আমায়'---দিবাকর যেন কৌতুকের গলায় বলে, 'ভেবেছিলাম একরাতের জন্যে স্বর্গের টিকিট কিনছি, তা যখন হবে না, তা হলে তোমার হাতে মরেই স্বর্গে যাই।'

পাকা অভিনেতা দিবাকর দাস, তেমনি ভাবেই বলে, 'মনে একটা অহঙ্কার ছিল বুঝি গরীব চাষা হয়েও রাজকন্যার ভালবাসা পেয়েছি। দেখছি সে অহঙ্কার মিথ্যে।'

মীনাক্ষী একটু নরম হয়।

নরম গলাতেই বলে, 'সেটা বুঝতে পেরেছ তার জন্যে ধন্যবাদ। আশাকরি বুঝে ফেলে আবার সেই মিথ্যেটাকে গায়ের জোরে সত্যি করে তোলার চেষ্টা করতে যাবে না। নাও, টর্চটাকে বার করো দিকি, চলো---'

হঠাৎ হেসে ওঠে দিবাকর, জোরে জোরে। বলে, 'যার অন্য জোর নেই, তার গায়ের জোরই ভরসা। মিথ্যে আর ভুগিও না, হাতের ইঁটটা ফেল। আশ্বাস দিচ্ছি জগতের কেউ জানতে পারবে না। আবার তোমায় অক্ষত ফেরৎ নিয়ে যাবো।'

'তোমার কৃপার কথা মনে থাকবে'---মীনাক্ষী অন্ধকারেই ক্ষীণ নক্ষত্রলোককে ভরসা করে এগোতে এগোতে বলে, 'তবে দরকার হবে না, আমি নিজেই যেতে পারবো।'

মীনাক্ষী চেষ্টা করে করে অন্ধকারেই এগোতে থাকে।

কিন্তু মীনাক্ষীর নিয়তি বুঝি অলক্ষ্যে ক্রূর হাসে। ঠিক সেই সময় সহসা শূন্য প্রান্তরের দিকে দিকে তীব্র চীৎকারে আকাশ সচকিত করে তোলে স্বেচ্ছাবিহারী গ্রাম্য শেয়ালের দল।

মীনাক্ষী যে শত্রুর ভয়ে পালাচ্ছিল সেই শত্রুকেই ডেকে ওঠে, 'দিবাকর টর্চটা ধরো। তোমার ধর্মের দোহাই।

কিন্তু দিবাকর কি ওকে আলো দেখাবার জন্যে, ওর ফিরে যাওয়ার পথ সুগম করার জন্যে টর্চটা ধরে? দিবাকর কি ধর্মের ধার ধারে?

তা ধারে না, তা ধারে না।

দিবাকর সত্যি সত্যিই সস্তা নাটকের ভিলেনের ভূমিকা অভিনয় করে।

মীনাক্ষীর হাতের ইঁট কোনো কাজে লাগে না।

অন্ধকারে স্থানচ্যুত হয়ে কোথায় হারিয়ে যায়।

মীনাক্ষীও বুঝি হারিয়ে যায় একটা অতলস্পর্শী অন্ধকারের মধ্যে।

●

'লে বাবা। আমি এলাম মাথা ফাটিয়ে, আবার তুই এলি জ্বর করে---' কমলাক্ষ চেঁচিয়ে বলে, 'ওমা দেখে যাও তোমার ছোট মেয়ে ফিরেছেন। তবে শুধু হাতে নয়, গ্রাম থেকে বেশ একখানি উপহার নিয়ে।--- ব্যাপার কি বল দিকি? পাড়াগাঁয়ের মাটিতে গিয়েই কি ডোবার জলে ডুব দিয়েছিলি না কি?'

'হ্যাঁ দিয়েছিলাম। তাই দিয়েছিলাম।' মীনাক্ষী ক্লান্তগলায় বলে, 'এখন একটু শুতে দে দিকি।'

শুতে চায় মীনাক্ষী।

নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে চায়। কোনো কিছু ভাববে না, কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করতে বসবে না, কাউকে দোষ দিতে যাবে না, নিজেকে ধিক্কার দেবে না, শুধু একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে একটু ঘুমোবে।

কিন্তু কে তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেবে?

অনভিজ্ঞ ওই ছেলেটা 'জ্বর' শব্দটাকে বিশ্বাস করে নিচ্ছে বলেই কি 'বিজয়া' নামের ভয়ানক অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণদৃষ্টি মহিলাটি তাই বিশ্বাস করবেন?

এ সংসারে একটিমাত্র মানুষ সুখী ছিল, প্রকৃত সুখী।

কিন্তু তারও 'সুখ' গেছে।

তার সেই মনোরম গৃহকোটরটি ছেড়ে পৃথিবীর হাটে নেমে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে সে। ভাবছে---

আশ্চর্য! কী বুদ্ধিহীন এই পৃথিবী! এ পৃথিবী যেন তার জানা জগতের বাইরের আর কিছু জানতেই চায় না। শুধু তাই নয়, যেটা তার অজানা তাকে ব্যঙ্গ করে বিদ্রূপ করে 'হাস্যকর' বলে স্রেফ উড়িয়ে দেয়। একবার কৌতূহলের বশেও উল্টে দেখতে রাজী হয় না।

দীর্ঘদিনের সাধনার ফল, প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও আধুনিক জগতের বিজ্ঞানের পাণ্ডুলিপির বোঝা বয়ে বয়ে পৃথিবীর দরজায় দরজায় ঘুরে এই মূর্খ পৃথিবী সম্পর্কে হতাশ হয়ে এখন সারদাপ্রসাদ চাকরী খুঁজছে।

অথচ জগতের কোনো কাজ জানে না সে। তবু সে শুধু যাকে পায় তাকেই বলে বসে, 'দাদা একটা চাকরী জোগাড় করে দিতে পারেন?'

তবে ঝোঁক তার প্রেসে কাজ করবার।

হয় তো ওই প্রেসের চাকরীর ঝোঁকের অন্তরালে কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশা প্রচ্ছন্ন আছে তার।

কিন্তু সবাই চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা

'আগে কোথায় কাজ করেছেন? কোন প্রেসে?'

'করিনি কোথাও। এখানে ক'দিন বলে এসেছি।'

'ওঃ' তা' হঠাৎ প্রেসে কাজ করতে ইচ্ছে হল যে? অন্য কোথায় কাজ করতেন? ছেড়ে এলেন কেন এ বয়সে?'

সারদাপ্রসাদ বিরক্ত হয়।

রেগে রেগে বলে, 'কেন কী বিত্তান্ত, এতো কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে যাবো কেন মশাই? আপনার চাকরী খালি আছে কি না তাই বলুন।'

অপর পক্ষই কি তবে ছেড়ে কথা কইবে, মেজাজ দেখাবে না? যাই বা তাকে বাহাল করা হচ্ছে, চাকরী যে চাইতে এসেছে, সেই চাকর। অতএব মনিবের গলাতেই বলে তারা, 'আছে খালি। কিন্তু আপনাকে দেব না। তবে এইটুকু জেনে যান, ওই সব 'কেন কী বিত্তান্ত' না জেনে কেউ আপনাকে একখানা অফিসারের চেয়ারে বসিয়ে দিতে আসবে না। একটা বেয়ারার কাজ করতে এলেও শুধু আপনার 'কে', আপনার সাত পুরুষের ঠিকুজি কুষ্টির বিত্তান্ত জানতে চাইবে।'

'কেন? কেন শুনি মশাই? দাগী আসামী না কি?'

ওরা হ্যা-হ্যা করে হেসে ওঠে।

বলে, 'ওঃ চিড় খাওয়া! তাই বলি।'

চিড় খাওয়া ব্রেনের লোক স্বাভাবিক হয় না।

কিন্তু সরোজাক্ষর ব্রেনেও কি চিড় খেয়েছে? তাই তিনি বাড়ির চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়াটাও ছেড়ে দিয়েছেন?

ডাক্তারের নিষেধকাল কবে পূর্ণ হয়ে গেছে, তবু মানুষটা ঘর ছেড়ে নড়ে না, একী কুদৃশ্য।

কমলাক্ষ মায়ের কাছে এসে বলে, 'ব্যাপারটা কী বল তো মা'র? কর্তা আর রাস্তায় বেরোন না কেন? অসুখ তো কিছু দেখি না।'

বিজয়ার মাথার মধ্যে এখন সর্বদাই আগুন জ্বলছে। বিজয়া তাঁর ছোট মেয়েকে উঠতে বসতে 'ডঙ' করছেন আর নিজের কপালে করাঘাত করে করে মৃত্যুকামনা করছেন।

তাই বিজয়া তাঁর অনেকদিন পরে বাড়ি আসা ছোট ছেলেটাকেও রেয়াৎ করে কথা বলেন না। কড়া গলায় উত্তর দেন, 'কেন বেরোন না তা আমায় জিগ্যেস করতে এসেছিস কেন? আমায় রাতদিন তার সঙ্গে গলাগলি করতে দেখেছিস বুঝি? যা না নিজে জিগ্যেস করগে না।'

'আমি? বাপস।'

কমলাক্ষ ভয়ের ভাণ করে।

'কেন বাপস্ কেন?' বিজয়া তিক্ত গলায় বলেন, 'নিজের বাপ বৈ পাড়ার লোক নয়, পাগল-ছাগল হয়ে যাচ্ছে কি না তোরা দেখবি না তো দেখবে কে?'

'আমার দরকার নেই বাবা।'

কমলাক্ষ বলে, 'আমি শীগ্গীরই চলে যাচ্ছি বাবা। বাড়ির যা অবস্থা দেখছি।—বাড়ির কর্তা তোমার ভাষায় 'পাগল-ছাগল' হয়ে যাচ্ছে, বাড়ির গিন্নী সর্বদাই সিংহবাহিনী, বাড়ির বড় ছেলে গোল্লার দোরে গিয়ে বসে আছেন, বাড়ির বড় মেয়ে একবার করে এসে ছটা বিকীর্ণ করে চলে যাচ্ছেন, বাড়ির ছোট মেয়ে মিছিমিছি 'জ্বর' বলে রাতদিন শুয়ে আছেন, আর বাড়ির যে একটা 'মজার মানুষ' ছিল, সে রাস্তায় রাস্তায় 'চাকরী দেবে গো? চাকরী দেবে গো' করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

বিজয়ার মাথায় আগুন জ্বলছে, তবু বিজয়া থমকে ভুরু কোঁচকান। বিজয়া বলেন, 'চাকরী চাকরী করছে কে?'

'কেন শ্রীযুক্ত পিসেমশাই।' কমলাক্ষ হো হো করে হেসে ওঠে, 'বাবা চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন, তাই উনি সংসারের ভার নেবেন। সোজাসুজি বাবার চেয়ারটায় গিয়ে বসলেই পারেন।

[ক্রমশ।

ছড়া

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

গঞ্জ থেকে ফিরছিলে তুমি
নায়ের থেকে উঠতেছিলে ডাঙ্গা—
চরের মাঝে লাঙল দিতে দেখি
পা দু-খানি মুখের চেয়ে রাঙা।

আহা, কী বরণ।
আহা, কী গড়ন।
সেদিন থেকে লাঙল বলদ ফেলে
তোমায় ভেবে হলুম গো লাফাঙ্গা
মিতে বন্ধু ধরে আমার তখন
তোমার বাড়ি পাঠালে লালডাঙা।

পঁচিশ কুড়ি টাকা
পণে নগদ হাঁকা
বাপে তোমার বললে আমায় হেসে
বিয়েটা নয় দু-মুঠো ভিখ্ মাঙা।
পা-জড়িয়ে ধরতে ভীষণ রেগে
ধমক দিয়ে দু-চোখ করলে রাঙা।

দেখতে দেখতে ক্ষেপে
খুন গেল যে চেপে
বাপের তোমার ধরতে টিপে টুঁটি
সবাই আমায় মার দিলে হাড়ভাঙা
বাঁশের ঘায়ে দু-ফাঁক হল মাথা
ছ-মাস হাসপাতালে থেকে আবার চাঙ্গা।

জমি জিরেত বেচে
লাঙল বলদ বেচে
পঁচিশ কুড়ি যে-দিন হ'ল হাতে
হাওয়ার আগে গেলুম গো লালডাঙা—
গিয়ে দেখি তোমার হচ্ছে বিয়ে
পাত্র শালা পাড়ার ভাই বাঙা

আলতা-রাঙা পা,
ফেলছো কোথায় গা।
ভেবে ভেবে দেশ-গাঁ ছেড়ে শেষে
গঞ্জে এসে চালাই সাইকেল-টাঙ্গা—
তোমার কথা যে-দিন মনে পড়ে
চোলাই গিলে লাগাই মারপিট দাঙ্গা।

পা দু-খানি সেই
আছে মনে মিশেই।
হঠাৎ সে-দিন গঞ্জে আমার গাড়ি
চাপ্‌ল এসে টলতে টলতে বাঙা
কাছা-কোঁচার ঠিক-ঠিকানা নেই
নষ্টপাড়ায় নামলে তো প্রায় নাঙ্গা।

ডবল ভাড়া দিলে
তাইতে চোলাই গিলে
দেখতে যেন পাচ্ছি ওগো তোমার
সিঁথির চেয়েও কেঁদে দু-চোখ রাঙা—
পড়ছে মনে তোমার বাপের কথা
বিয়েটা নয়, দু-মুঠো ভিখ্ মাঙা।

জলুক হাঁড়ির লাঠি
ফাটুক রাঙুক মাটি
বিয়ে তোমায় করতে পারি নি গো
তাই তো তোমায় করব এবার সাঙ্গা
সেথায় যদি পুলিশ আমায় খোঁজে
তোমায় নিয়ে যাবো গো আরডাঙা।

খেলাধূলা

ক্রীড়ারসিক

এবারের মার্ডেকা ফুটবল প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে মার্ডেকা ট্রফি থেকে বিদায় নিয়ে ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এসেছেন। দুঃখ করার কিছু নেই, প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় নয়—একেবারে ষষ্ঠ স্থান তাঁরা লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি পূর্বেকার প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। যেখানে [illegible]রিকার ভাষায় আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যাওয়াই সার হবে, কেষ্টর দেখা তবু মিলবে না।

হোলও তাই কিন্তু তবু বলার [illegible]থ, চলার পথ তো আটকাবার নয়। তাই কেউ কেউ এখন বলছেন, খেলায় শুধু জয়লাভ করার জন্যেই নয়, বা স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াবার জন্যেই নয়, সৌজন্য বলেও তো একটা কথা আছে। এবং সেই সৌজন্য বজায় রাখার জন্যই যাওয়া।

অর্থাৎ ভাল করে দল গঠন করা [illegible] কি হল না, ভারতের সম্মান [illegible]য় থাকল কি থাকল না—সেদিকে [illegible]বার প্রয়োজন নেই, কোনরকমে [illegible]াড়াতালি দিয়ে একটা দল সামনে [illegible] পিছুনে পিছুনে আমরাও যাই। খাই-দাই। কিন্তু শিবের গাজন গাওয়া আর হয় না।

হবে কি করে? নিজেদের সাধন ভজনেই তো কর্তাব্যক্তিরা ব্যস্ত। তাই যত দোষ গিয়ে পড়ল খেলোয়াড়দের উপরে। ভারতীয় ফুটবলের নির্বাচকমণ্ডলী এবং কোচ শৈলেন মান্নার তো তাই অভিমত। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে—অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে গিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা তাই কি আরো প্রকট হয়ে উঠল না। তাঁরা ফরোয়ার্ড লাইনের উপর দোষারোপ করেছেন।

কিন্তু ওঁদের বাদ দিয়ে কি আরো ডজনখানেক তরুণ এবং দক্ষ খেলোয়াড় এই কোলকাতা বা অন্যান্য প্রদেশ থেকে জোগাড় হত না। নিশ্চয়ই হোত। প্রত্যেক ফুটবল অনুরাগীই তা বিশ্বাস করবেন। আসল কথা সেদিকে তাঁরা কেউ যান নি। খুঁটির জোর যাঁদের বেশী তাঁরাই দেখে দেখে চান্স পেয়েছেন। তা না হলে শান্ত মিত্রকে নিয়ে গিয়েও খেলান হোল না কেন? অথচ তাঁর মত নির্ভরযোগ্য ব্যাক খুব কমই আছে বর্তমানে।

জন-এর অবস্থাও তথৈবচ। জানি দলের কোচ যথাযোগ্য উত্তরও তৈরি রেখেছেন এর জন্য। কিন্তু তা ধোপে টিকবে কি?

অথচ সত্যি বলতে কি আসল গলদ যে রয়ে গেছে কর্তৃপক্ষের মধ্যেই, তা তাঁরা কখনই স্বীকার করবেন না। তা না হলে কোলকাতার মাঠের লীগের খেলার চার্ম নষ্ট করে কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি খড়গপুরে শিক্ষণ-শিবির খুলতে গেলেন কেন? এতদিন কি তাই হয়েছিল। না কি নতুনত্বের কিছু চমক লাগিয়ে দেওয়া। আর খুললেই যদি, তা হলে টিম গঠন করার জন্যে তাঁদের কোলকাতায় ছুটে আসতে হল কেন?

তবে কি ক্যাম্পের ব্যাপারটা নেহাৎই ফার্স। এও শোনা যায়—পেটোয়া অনেক খেলোয়াড়ই নাকি নিয়মিতভাবে অনুশীলন করেন নি। অথচ তাঁদেরকেই নিয়ে যেতে হবে। জোড়াতালির কি সুন্দর ব্যবস্থা বলুন তো। অথচ কোচিং হয়েছে মাত্র পনেরো দিন। সুতরাং তার ফলও হয়েছে তেমনি।

এশীয় 'অল স্টার ফুটবল দলের' ভারতের তিনজন নির্বাচিত খেলোয়াড়

নঈম
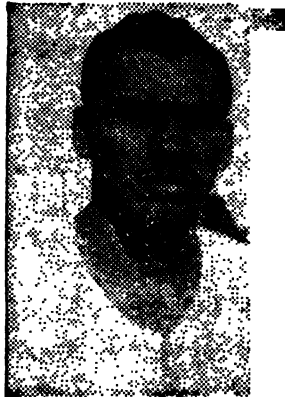
সি প্রসাদ

ইন্দার সিং

গত বছরে ভারতীয় দল অংশগ্রহণকারী এগারটি দলের মধ্যে নবম স্থান লাভ করেছিল, আর এবারে আটটির মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। সুতরাং সমতা তাঁরা ঠিকই বজায় রেখেছেন। হলই বা থাইল্যাণ্ডের কাছে পরাজয় বরণ—স্থানীয় সমর্থকদের কাছে চূড়ান্ত অপমান আর পুলিশ-পাহারায় নিরাপদ স্থানে আশ্রয়লাভ, তবু আন্তর্জাতিক আসরে খেলতে হবে।

তাই বলছি, লজ্জা বোধার যদি বালাই থাকতো তা হলে আজকের এই সব অকর্মণ্য কর্মকর্তারা গদি ছেড়ে দিয়ে চলে আসতেন। আসর জাঁকিয়ে বসে থাকতেন না। আর উঠতি খেলোয়াড় যাঁরা সত্যিকারের ট্রেনিং পেলে একদিন ভারতের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে পারতো চিরদিনের মত তাদের চোখের আলোকে নিভিয়ে দিতো না। তাহলে যে ভারতীয় ফুটবলের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতবর্ষের মর্যাদাও বিনষ্ট হবে না। কিন্তু সে-দিন কি আসবে?

●

সুধাংশু আচার্যকে আমরা শক্ত মানুষ বলে ভেবেছিলাম। শুধু শক্তই নয় উপযুক্তও। এবং সেই হিসেবে আমাদের উপর আস্থা রেখে যাঁরা ভেবেছিলেন, অতুল্য ঘোষ মহাশয় যিনি নাকি কোলকাতার মাঠের শক্ত মাটিকে কর্দমাক্ত করে গেছেন এইবার হয়তো সেই মাটি পুনরায় শক্ত হবে আর তার উপর গজিয়ে উঠবে সব তৃণদল। কিন্তু হায়! সে মাটি শক্ত হওয়া দূরের কথা বরং পাঁক অন্যে সে আরও ঘুলিয়ে উঠছে আর অগণিত দর্শক অবাক বিস্ময়ে তা লক্ষ্য করে ভাবছে, এ কি হল।

কিন্তু কপাল চাপড়াবার যে কিছু নেই সে কথা আগেও আমরা বলেছি পুনরায় আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। গত আগস্ট মাসে আই এফ এর এক সভায় ১৯৬৭ সালের শীল্ড ফাইন্যাল মীমাংসা বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, শীল্ড ফাইন্যাল ইনকমপ্লিট' বা 'অসম্পূর্ণ' বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। এবং আমার মনে হয় এ হেন ম..না কেউ শোনে নাই কোনকালে।

কারণ অতীতে আই এফ এ শীল্ডের ইতিহাসে বকেয়া বহু ফাইন্যাল খেলাকে পনরনষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি বটে কিন্তু যুগ্ম বিজয়ী বা খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 'খেলা অসম্পূর্ণ' এ ধরণের উদ্ভট কথা শোনা যায়নি বলে বিশেষভাবে অবাক লাগছে। এর অর্থ কি তাও আমরা বুঝলাম না।

সভাপতি মশাই নাকি বলেছেন, গত বছরের টুর্নামেন্ট কমিটি এর ফয়সালা না করে '৬৮ সালের কমিটির কাছে বিষয়টি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এই সভাপতিই তো একদিন বলেছিলেন, শীল্ড ফাইন্যাল অমীমাংসিত থাকতে দেব না। আমাদের জিজ্ঞাস্য তবে কেন এরকম হল। এর জন্য দায়ী কে? আর ইস্ট-বেঙ্গল টিমের ত্রিমুকুট লাভের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তারাই বা এর থেকে বঞ্চিত হবে কেন? প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের ভুলের বা অযোগ্যতার শাস্তি বহন করবে কি টিম আর দর্শকেরা—যে দর্শকেরা পাঁচের টাকা খরচ করে বাঁচিয়ে রেখেছে আই এফ এ এবং তার অন্তর্ভুক্ত টিমগুলোকে। তাই আমাদের কথায় এ ধরণের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার দিকে কর্তৃপক্ষ এবা থেকে একটু সজাগ হো..।

তোক্রন কাপ

চলতি মাসের শেষের দিকে ভারতবর্ষ বনাম জাপানের পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলার আসর বসবে।

সম্প্রতি ভারতে জুনিয়র লন টেনিস খেলোয়াড় আনন্দ অমৃতরাজ এবং ভূপতি সিংহল লন টেনিস প্রতিযোগিতায় 'ডবল' খেতাব অর্জন করেছেন। অমৃতরাজ জয়ী হন পুরুষদের সিঙ্গলসে ও ডবলস-এ এবং ভূপতি পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস-এ জয়লাভ করেন।

শুনলেও অবাক হবেন

১০০ মিটার দৌড় নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিকসদের আসরেও আজ যত উদ্দীপনা, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ঐ ১০০ মিটার দৌড় নিয়েই। বৈজ্ঞানিকেরাও যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন তাই নিয়ে। এ্যাথলেটিকস-দের দৈহিক গঠন, শক্তিসামর্থ্য এবং সামাজিক পরিবেশ এই ১০০ মিটার দূরত্বটি কে কতটা কম সময়ে পার করে দিতে পারে সেই কথাই তাঁরা ভাবছেন। নিগ্রো এ্যাথলেটরা এমনি প্রকৃতিদত্ত কয়েকটি উপাদানে বলীয়ান, তাই তাঁরাই আজ আসর জাঁকিয়ে আছেন। এতদিন পর্যন্ত এই দূরত্ব অতিক্রমের রেকর্ড ছিল ১০ সেকেণ্ড এবং এর কম সময়ে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয় এইটাই একরকম স্থির হয়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তিনজন নিগ্রো এ্যাথলেট জিম হিনেস, রোনিয়ে স্মিথ এবং চার্লি গ্রিন ৯.৯ সেঃ ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সমস্ত বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আরও কম সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

দায়িত্ব পালনে অক্ষম রাজ্যপাল

ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপালের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। স্কুলের ছাত্রদেরও এ-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানা থাকে। ঘটনাচক্রে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে রাজ্যপালের কার্যাবলীর যে নিদর্শন মিলিতেছে সংবিধানের নির্দেশের সহিত তাহাদের মিল খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। সংবিধানের নির্দেশের সহিত বাস্তবের যেন কোন মিলই নাই। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাজ্যপাল ধর্মবীর বর্তমানে যাহা করিতেছেন এবং যাহা করিতেছেন না—সেই সবকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের এই উপরোক্ত মন্তব্যের সৃষ্টি।

সংবাদপত্র জাতীয়-জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। সভ্যতার ও প্রগতির প্রতীক সংবাদপত্র। তাই সভ্যজগতে সংবাদপত্রকে বর্জন করা চলে না। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ দূরের পৃথিবীর ব্যাপক বার্তা জানিতে চায়, জাতীয় স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বিবরণ শুনিতে চায়—কিন্তু সংবাদপত্র উন্মোচিত করিলেই রাজ্যপালের বিভিন্নরূপে আলোকচিত্র নিশ্চয়ই তাহার চিত্ততৃপ্তির সহায়ক হইতে পারে না। রাজ্যপালকে কর্মব্যস্ত দেখাটা খুবই স্বাভাবিক এবং তাহাই বাঞ্ছিত বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে—যে রাজ্যে গুরুত্ব এবং সমস্যা সমান মাত্রায় বিরাজ করিতেছে—সে রাজ্যের রাজ্যপাল যে কর্মব্যস্ত থাকিবেন তাহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মের মধ্যেও তো শ্রেণীভেদ, প্রকারভেদ আছে। কোন ধরণের কর্ম—তাহাও তো ভাবিবার কথা। কাজের কাজ না করিয়া অপ্রয়োজনীয় এবং অগুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকিয়া সময় অতিবাহিত করিলে সংবাদপত্রে প্রত্যহ আলোকচিত্র প্রকাশিত হয় বটে কিন্তু দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে চরম অবহেলাও প্রমাণিত হয়। দুঃখের বিষয়, রাজ্যপাল ধর্মবীর এখন এই মন্তব্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে নিজেকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হইয়া আসেন। তৎপূর্বে প্রায় এক বৎসরকাল তিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ছিলেন। পাঞ্জাবে দুর্নীতি উচ্ছেদকল্পে এবং চোরাবাজার দমনে তাঁহার যে যোগ্যতা ও শক্তিমত্তার কথা শোনা গিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার পশ্চিমবঙ্গে আগমনে সকলের মনেই একটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল। প্রথম কিছুকাল তিনি লোকলোচনের অন্তরালেই প্রায় ছিলেন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তখন এখনকার মত প্রায়শই তাঁহার প্রতিকৃতি শোভা পাইত না। ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইল। রাজ্যপালের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গেল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই পবিত্র দায়িত্ব বা কর্তব্য রাজ্যপাল কতটুকু পালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন,

কাজের কাজ বলিতে রাজ্যপাল রাজনৈতিক বিক্ষোভ বা হাঙ্গামাগুলি দমন করিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ শুধু বিক্ষোভ বা হাঙ্গামারই ক্ষেত্র নয়, আরও অসংখ্য সমস্যা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে। প্রশাসনিক গলদ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অযোগ্যতা এই গলদগুলির মূলোচ্ছেদ করিতে রাজ্যপাল কতটুকু সফল হইলেন বা চেষ্টা অন্তত কতটুকু করিলেন। চিত্রতারকার বিবাহোৎসবে উপস্থিত থাকা অপেক্ষা এই কাজগুলিতে তিনি যদি মনঃসংযোগ করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমগ্র রাজ্য এবং রাজ্যবাসী উপকৃত হইত। জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ করিয়া সংবাদপত্রে আপন প্রতিকৃতি প্রকাশ করানো যায়, কিন্তু তাহাতে বিপন্ন, অসহায় জনগণের কি উপকার সাধিত হয় আমরা জানি না। প্রসঙ্গত

একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক—দুর্বৃত্তদের সাহায্যে টাকা তোলার জন্য যে আহ্বান তিনি জানাইয়াছিলেন—সে আহ্বানে তিনি সাড়া পাইলেন না—সাধারণ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এই ঘটনার মাধ্যমে এই সত্যটিই প্রকটিত হইতেছে না কি?

পরবর্তী নির্বাচনও আসন্ন। বিভিন্ন দল নির্বাচনে আপন আপন জয়লাভের চেষ্টায় মাতোয়ারা। কি হইবে, কিছুই বলা চলে না। কোন নির্দিষ্ট পরিণতি এখনও চিন্তা করা চলে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এ ক্ষেত্রে আমাদের একটিমাত্র অনুরোধ—এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এই 'বিরাটকর্মী' রাজ্যপালটিকে বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যেন অবিলম্বে এখান হইতে সরাইয়া লন এবং তাঁহার স্থলে একজন প্রকৃত কর্মী ও দুর্নীতি, অযোগ্যতা দূরীকরণে সক্ষম রাজ্যপালকে অভিষিক্ত করেন—তাঁহার অন্তত আর যাহাই থাকুক, সংবাদপত্রে আপন প্রতিকৃতিটি দেখিবার মোহ তিলমাত্র থাকিবে না এবং গোটা বাঙলা দেশ তাহাতে হয়তো অনেকখানি উপকৃত হইতে পারে।

জননেতা নয়—অভিনেতা

লব্ধকীর্তি সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বামপন্থী মতবাদের উগ্র সমর্থক বলিয়া যাঁহারা চিহ্নিত করিয়া থাকেন, আশা করি তাঁহারাও ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, যথাযথ সময়ে এই বামপন্থী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। উপযুক্ত সময়ে তিনি তিলমাত্র ইতস্তত করেন না তাহাদের অন্যায় এবং ত্রুটি সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া কঠোর এবং নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা তাহাদের ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জনগণকে বিভ্রান্তির কবল হইতে উদ্ধার করিতে। তাঁহার এই জাতীয় রচনাগুলি নিঃসন্দেহে বলা চলে দলগত চিহ্নমুক্ত সর্বপ্রকার পক্ষপাতশূন্য, নির্ভীক ও ন্যায়নিষ্ঠ লেখনীর এক একটি অসামান্য নিদর্শন।

গত ১৮ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর) তারিখে দৈনিক বসুমতীর প্রধান সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত তাঁহার একটি সার্থক ও অভিনন্দনযোগ্য রচনা আমাদের উপরোক্ত মনোভাবের সত্যতা ও যাথার্থ্য প্রমাণ করে।

রচনাটি ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া। এই তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক সমর্থক (?) আন্দোলনগুলি (হুজুগ বলাই শ্রেয়) মহানগরী কলিকাতার অবস্থাকে যে দিনের পর দিন কী ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে তাহা ভাবিলে আজ উদ্বেগের অন্ত থাকে না। ইহার চাপে এবং প্রাবল্যে শহর কলিকাতার আজ যে নাভিশ্বাস উঠিতে সুরু হইয়াছে তাহা আশা করি কাহারও দ্বারা অস্বীকৃত হইবে না।

কিছুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, শ্রমিক-মালিক বিরোধ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যাহা সমগ্র নাগরিক জীবনে ক্রমশই এক অচলাবস্থা বনাইয়া আনিতেছে।

শুধু শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কলিকাতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সারা ভারতবর্ষ কলিকাতার শিল্প-বাণিজ্যগত অবদানে লাভবান হয় এবং এ-বিষয়ে বিদেশে ভারতের যে গৌরব তাহা কলিকাতার কল্যাণেই প্রাপ্ত। ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় প্রতি যুগে, প্রতি কালে, প্রতি সমাজেই বিশ্বাসঘাতকতা অনুপস্থিত নয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রকাশ কখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবার কখনও গোষ্ঠিকেন্দ্রিক। শ্রমিক-মালিক ক্রমবর্ধমান বিরোধেও এই তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ানিস্টদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং জাতীয় ক্ষতিসাধনের অপরাধের ভার আরোপ করিলে হয় তো ভুল করা হইবে না। প্রায়শই দেখা যায় হতভাগ্য অল্পশিক্ষিত, সরল শ্রমিক-সাধারণের সম্মুখে ইহারা এক বিরাট লাভের কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপিত করিয়া সেই দিবাস্বপ্নে তাহাদের বিমোহিত করিয়া উত্তেজিত করিয়া তোলে। কিন্তু ইহার পরিণতিও তো কাহারও অজানা নয়। বাধ্য হইয়া মালিকপক্ষকে কলকারখানা বা উৎপাদনকেন্দ্রের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ফলে বোঝার উপর শাকের আঁটি কথাটিই আবার নূতন করিয়া প্রমাণিত হয়। একে বেকারিত্ব বাঙলা দেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক দুষ্ট ক্ষতস্বরূপ—এ ক্ষেত্রে আবার তাহারই মাত্রাবৃদ্ধি। ট্রেড ইউনিয়ন নেতার আসল কর্তব্য কি? শ্রমিক ও মালিক উভয়ের পক্ষেই তাঁহারা সেতুস্বরূপ পরস্পরের স্বার্থরক্ষারই দায়িত্ব তাঁহাদের। উভয়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের মূলোচ্ছেদ ঘটাইয়া প্রীতি ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব দুই পক্ষের মধ্যে স্থাপন করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা বিপরীত বস্তুই দেখিতেছি। মিলনের গ্রন্থিবন্ধনের পরিবর্তে বিরোধের সেতুই তাঁহারা ক্রমশ দুর্লংঘ্য করিয়া তুলিতেছেন। মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের উত্তেজিত ও নিয়োজিত করাই যেন তাঁহাদের একমাত্র কাজ তাহাই যেন তাঁহাদের ধর্ম। দেশের সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া বিবাদ-বিসম্বাদ ও অচলাবস্থা গড়িয়া তুলিতেই তাঁহারা যেন বদ্ধপরিকর।

মালিকদের অবিচার অব্যবস্থা আমরা অস্বীকার করি না বা তাঁহাদের জয়ধ্বনি করার জন্যও এই রচনার অবতারণা নয়। কিন্তু (শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ভাষায়) 'সমস্ত ক্ষেত্রে স্ট্রাইকের জন্য কি মালিকরাই দায়ী?' শ্রীমুখোপাধ্যায় এই রচনায় স্পষ্টতই বলিয়াছেন, 'আমরা মালিকদেরও কতকগুলি অধিকার অস্বীকার করিতে পারি না, ধর্ম

করিতে পারি না ; পরে পরে সুচির দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ করার প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এই কথাটিও বিশেষভাবে স্মর্তব্য—'এই ধরণের উক্তি কি অতিবিপ্লবী বাক্যবিলাস নয়।

পুঁজিপতি-সম্প্রদায়ের উপর বিষোদ্গার করা ইঁহাদের এক অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। অথচ ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ভারতের বহু জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির মূলে (অর্থনৈতিক) এই পুঁজিপতিদের সহায়তা অপরিহার্য। এই তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ইহার কোন বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান দিতে পারিয়াছেন কি ?

জননেতার মুখোস পরিয়া ইঁহারা যে সকল কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করিতেছেন তাহার পরিণতি আমরা কি দেখিতেছি। কি রাষ্ট্রগত, কি অর্থনীতিগত, কি সমাজগত এক সর্বৈব ক্ষতিসাধন। অন্তর্বর্তী নির্বাচনও আসন্নপ্রায়। ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপ আরও চরমে উঠিবে। সস্তা চটকে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টাই সর্বক্ষেত্রে ইঁহারা করিবেন। অতএব, জননেতার মুখোসধারী এই অভিনেতাদের ভাঁওতাবাজির রাহুগ্রাস হইতে যত শীঘ্র বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি-সমষ্টি মুক্ত হয়—তাহা হইলে কলিকাতার চরম বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে পারে এবং বলা বাহুল্য তাহা এ সারা জাতির প্রতি ঈশ্বরের এক পবিত্র আশীর্বাদস্বরূপ।

কলিকাতা রক্ষা পাক

ভারতের বৃহত্তম ও পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম নগরী কলিকাতার বিপুল গৌরব ও মহিমায় ভাস্বর শ্রেষ্ঠত্বের অসংখ্য বিবরণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। নব্যভারতের জাতীয়তার উন্মেষে, আধুনিক ভারতবর্ষের জাগরণের, শিক্ষা-দীক্ষায়, নব নব উদ্ধর্মী চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতকে অতুলনীয় করিয়া তোলার ক্ষেত্রে তাহার অনবদ্য অবদান দেশ-কাল-সমাজ নির্বিশেষে সসম্মানে স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমানে এই রূপময়ী, লাবণ্যযুক্তা এবং গরীয়সী নগরীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে কি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে সে সম্বন্ধেও সর্বসাধারণকে অবহিত করা আজ বাহুল্য মাত্র। কলিকাতার এই হাড়ির হাল আজ কলিকাতাবাসীর সুবিদিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীরও অজানা নয়।

ভারতের কনিষ্ঠতম নগরী কলিকাতা। ১৬৯০ খৃস্টাব্দের ২৪-এ আগস্ট তাহার জন্ম, বয়সের বিচারে তাহার পরমায়ুর পৌনে তিন শত বৎসর অতিক্রান্ত, বলিতে গেলে কলিকাতা মূলত ইংরাজের সৃষ্টি। ভারতের বুকে ক্রমাগত ইংরাজশক্তি তাঁহাদের সমস্ত সাধনা ও ঐকান্তিকতা দিয়া কলিকাতাকে সরূপ, রূপলাবণ্যময়ী, শ্রীমণ্ডিতা ও নানা সৌন্দর্যে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং কলিকাতাকেই সারা ভারতের রাজধানীর মর্যাদা দিয়াছিল, কালক্রমে কলিকাতা হইয়া উঠিল সমগ্র ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড। শুধু রাজনৈতিক বিচারেই শিক্ষা-দীক্ষা-সাংস্কৃতিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও কলিকাতার অবদান এবং গৌরব যেমনই অভাবনীয় তেমনই বিস্ময়কর। এক কথায় কলিকাতাই হইল আধুনিক ভারতবর্ষের প্রসূতিগৃহ।

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অগণিত মানুষ উপনীত হইয়াছে এই কলিকাতায়। কত গুণী, কত সুধী, কত নেতা, কত কর্মী—দিক দিগন্তর হইতে, দেশ-দেশান্তর হইতে সময়ের অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই মহানগরীকে সর্বমানবের এক মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। আজ সেই কলিকাতা ক্রমশই বিদেশী পর্যটকের নিকট সর্বপ্রকার আকর্ষণ তিলে তিলে একেবারে হারাইতে বসিয়াছে। এখন দেখা যায় বহু বিদেশী কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া ডাস্টবিনে, আবর্জনাস্তূপ-মন্থনরত ভিখারী, জরাজীর্ণ, কঙ্কালসার নরনারীর আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া আপন আপন দেশে তাহা প্রদর্শন করিয়া কলিকাতার শোচনীয় অবস্থা বিশ্ব দেশবাসীর সামনে মহানন্দে তুলিয়া ধরিতেছেন। শুধুই কি এই ? কলিকাতার বিপদ কি এই একটিই ?

জওহরলাল নেহরুর দুঃস্বপ্ন কলিকাতার সর্বাঙ্গে আজ বিপদের ঘনঘটা, সর্বনাশের নাগপাশ পথ-ঘাট, জনস্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, জলসেচ, বাস সমস্যা, জাতীয় ও সাধারণের সম্পদ—কোনটিই বিপন্মুক্ত নয়। সর্বোপরি নাগরিক জীবন ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত এবং আশ্বাসশূন্য। মিছিলে মিছিলে নাগরিকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। গুণ্ডাবাজী এবং প্রশাসনিক অযোগ্যতা এবং নানাবিধ নিষ্ক্রিয়তার লীলাক্ষেত্র আজ কলিকাতা। কলিকাতার দফাটি হাল আমলে সর্বাপেক্ষা গয়া করিয়া দিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার। মহানগরীতে তাঁহাদের নেতৃত্বে আপাত-শেষ রাজনৈতিক তুমুল বিক্ষোভটি ঘটিল। অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, যতীন চক্রবর্তী প্রমুখ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের শূন্যগর্ভ এবং আকাশকুসুম আশ্বাসে কলিকাতাবাসী যে কতদূর প্রতারিত হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলার আবশ্যক দেখা যায় না। গদীলাভের প্রাক্কালে তাঁহারা যেভাবে কলিকাতাবাসীকে রাজা বানাইবার স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন এবং যেভাবে বিস্তর লম্ফঝম্ফ করিয়াছিলেন তাহার পরিণতি আজ কলিকাতাবাসীর দ্বারা মর্মে মর্মে উপলব্ধ।

ক্রমানুয়ে অনুষ্ঠিত এই সব মিছিলে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিক্ষোভসমূহে দেখা যায় লাভশূন্য কিন্তু ক্ষতির মাত্রা অপরিসীম। জাতীয় সম্পদসমূহ বিনষ্ট হইল জনতার নামধারী কয়েকজন নিযুক্ত গুণ্ডার দ্বারা। ট্রাম-

জল ভস্মীভূত হইল, ট্রাম লাইন উৎপাটিত হইল, রেল-লাইন ধ্বংস হইল, বৈদ্যুতিক তার বিচ্ছিন্ন হইল, সরকারী, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনষ্ট হইল---এক কথায় সমগ্র কলিকাতার সোনার অঙ্গকে অসংখ্য ক্ষত ও বিষাক্ত ঘায়ের প্রলেপে যথেষ্ট পরিমাণ বীভৎস করিয়া তোলা হইল। জনসাধারণের দুর্গতি কমার পরিবর্তে যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়াই গেল।

এই মহানগরীর বুকের উপর একটি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান আছে। তাহার নাম কলিকাতা কর্পোরেশন। শোনা যায় ইহার দায়িত্ব নগর সংরক্ষণ, জল-সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা। তিনটিই অতীব দায়িত্বপূর্ণ (এবং গুরুত্বপূর্ণও) কর্তব্য যাহার মধ্যে সমগ্র কলিকাতা-বাসীর জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু এই মহান ও পবিত্র কর্তব্যত্রয় পালনে তাঁহারা কতদূর সফল তাহা রীতিমত বিচার করার বিষয়।

কলিকাতার এই মরণাবস্থা আজ মার্কিন মুলুকেও আলোচনার বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। একটি মার্কিন সাময়িকপত্র কলিকাতার এই শোচনীয় অবস্থা তুলিয়া ধরিয়াছেন। দিল্লীরও এতদিনে যেন কিঞ্চিৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এই সকল ব্যাপারে কলিকাতা আসিলেন। সংবাদে প্রকাশ পঁচাত্তর কোটি টাকা কলিকাতা উন্নয়ন তথা বিপন্মুক্তির ব্যাপারে ধার্য করা হইয়াছে।

এখানেও ভয়ের কারণ আছে। পূর্বোল্লিখিত দিক ছাড়াও আরও দুইটি দিক আছে---সেদিক দিয়াও কলিকাতার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। একটি অর্থনৈতিক অপরটি ভৌগোলিক। ভয়ের কারণ, এই জন্য বলা হইল যে, এতগুলি বৈশিষ্ট্যের এবং এই বিরাট অভাবনীয় নানা বিষয়গত গৌরবের আধার যে কলিকাতা---সেই কলিকাতার উন্নয়ন-কার্য শুধু টাকা ধার্য করিলেই শেষ হয় না। টাকাগুলি যাহাতে যথাযথ ব্যয়িত হয়, সেগুলির দিকেও যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি এবং তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে, ভারপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই উদর ভরপুর হইবে---কলিকাতার অবস্থা যে তিমিরে---সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। যে কলিকাতার আয়তন আজ (বৃহত্তর কলিকাতা সমেত) সাড়ে চার শত বর্গমাইল এবং যে কলিকাতার (বৃহত্তর কলিকাতা সমেত) লোকসংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষেরও অধিক সেই কলিকাতার উন্নয়নের জন্য এতদিন পর সরকারের যদিও বা আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গ ঘটিয়া অর্থ সাহায্য মঞ্জুর হইল---সেই টাকা যথা-যোগ্য প্রয়োজনে ব্যয়িত না হইয়া যদি কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী-বিশেষের কোষাগার বিবর্ধিত করিয়া তোলে তাহা হইলে তদপেক্ষা বেদনা, লজ্জা ও কলঙ্কের নিদর্শন আর কি থাকিতে পারে তাহা আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থ-নীতিবিশেষজ্ঞ, উত্তরপ্রদেশ ললিতকলা আকাদমীর চেয়ারম্যান ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় গত ৮ই ভাদ্র সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ৭৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিশ্বের সুধীমহলে সসম্মানে স্বীকৃত এবং তারই স্বীকৃতি-স্বরূপ পৃথিবীর অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। চল্লিশখানিরও অধিকসংখ্যক গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর। সুকুমার সাহিত্যেরও তিনি একজন কুশলী রচয়িতা। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ'-এ সম্মানিত করেন। দিক্‌পাল ঐতিহাসিক স্বর্গত ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অন্যতম অগ্রজ।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[শ্রীসরস্বতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]